মাসিক বসুমতী

১০ম বর্ষ—প্রথম খণ্ড

(১৩৩৮ সালের বৈশাখ সংখ্যা হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত)

সম্পাদক

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত
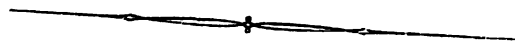
বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী-বৈদ্যুতিক রোটারী-মেসিনে"
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১০ম বর্ষ] · ১৩৩৮ সালের বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত [১ম খণ্ড

বিষয়ের নামানুক্রমিক সূচী

চিত্র-সূচী

ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

বসুমতী প্রেস

শিল্পী— জি, এস, রাজিন।

১০ম বর্ষ] বৈশাখ, ১৩৩৮ [১ম সংখ্যা

শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা

'রাগাদিশূন্যং করুণাধিবাসং জ্ঞানপ্রকাশং ভবপাশনাশম্।
আনন্দরূপং মৃদুমঞ্জুহাসং শ্রীরামকৃষ্ণং শরণং ব্রজামি।'

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দ। মাঘমাস।

বসন্ত-সমাগমে বসুধা বৈধব্যের সিতবেশ পরিহার করিয়া শ্যামবাসে অঙ্গ আচ্ছাদন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অশ্রুধারা এখনও শুকায় নাই, তরুপত্রে ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরিতেছে। প্রেমময়ী প্রকৃতির প্রতি অঙ্গ প্রাণ-তরঙ্গ-চঞ্চল। পবনে প্রেম-হিল্লোল। তরু-লতায় পুষ্পিত প্রেম আপনার সৌরভে আপনি বিভোর। ভৃঙ্গের গুঞ্জনে, বিহঙ্গের কূজনে প্রেম-গান। প্রেমোন্মাদিনী কল-নাদিনী জাহ্নবী প্রেমধারায় ধরণী অভিষিক্ত করিতেছেন। স্বভাবের রঙ্গ-মঞ্চে যেন কি এক অপূর্ব্ব নাট্যের আয়োজন চলিতেছে। জানবাজার রাজভবন কিন্তু
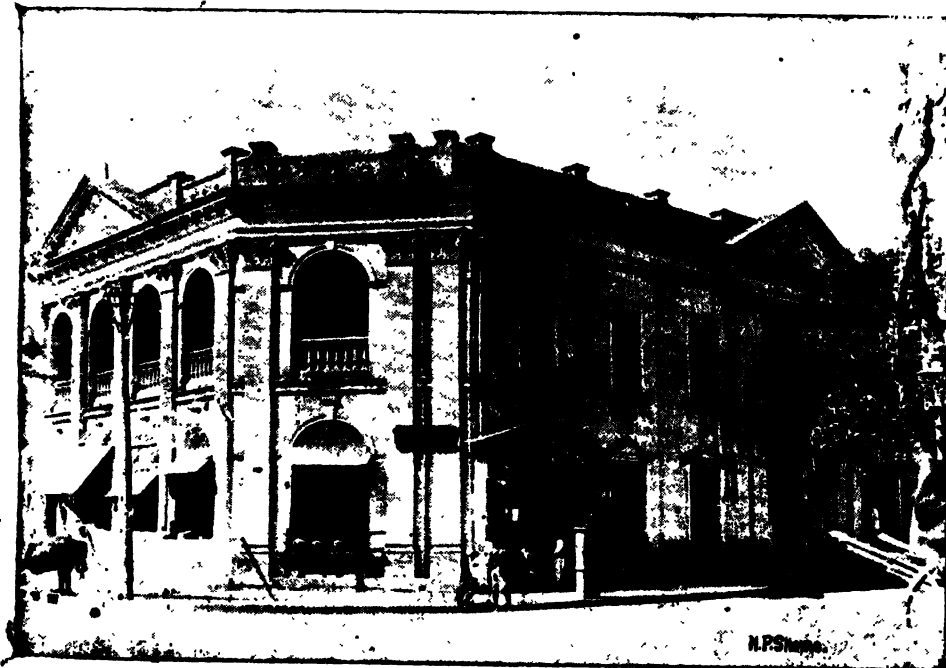
রাণী রাসমণির বাড়ী—জানবাজার রাজভবন

ভিন্নরূপ আয়োজনে ব্যস্ত। ঋতুর স্বধর্ম্মে স্বভাবের চাঞ্চল্য নর-নারীর শিরায় শিরায় সঞ্চালিত হয়। কি এক অনির্দ্দেশ্য প্রেরণা গৃহমেধী মানবকে গৃহের বাহির করিবার নিমিত্ত উত্তেজিত করে। এই জন্যই শাস্ত্রের বিধান—'বসন্তে ভ্রমণং পথ্যং।' সাধুপ্রকৃতি ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিগণ এই সময় তীর্থ-পর্য্যটন করেন।
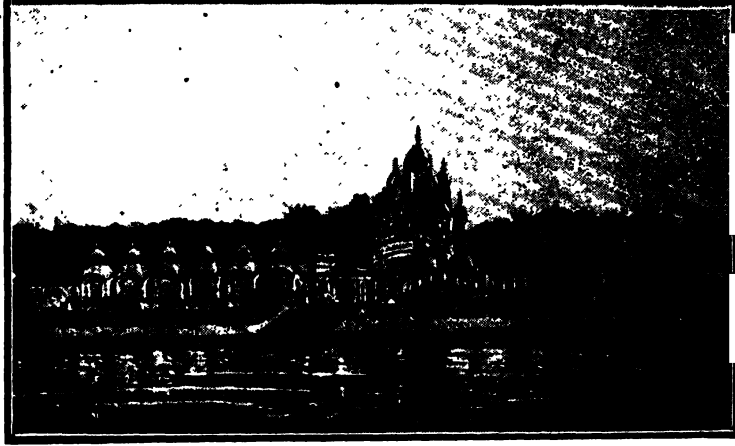
গঙ্গাবক্ষ হইতে দক্ষিণেশ্বরের দৃশ্য

স্বর্গীয়া রাণী রাসমণির জামাতা মথুরমোহন বহু দিন হইতে সস্ত্রীক তীর্থ-গমনের বাসনা অন্তরে অন্তরে পোষণ করিতেছেন। শুভ সঙ্কল্পে অনেক বিঘ্ন। একটা না একটা অপ্রত্যাশিত, আকস্মিক প্রতিবন্ধক তাঁহার পথ-রোধ করিয়াছে। এ বৎসর সদয় বিধাতা যে সুযোগ দিয়াছেন, কে জানে, আর তাহা ফিরিয়া আসিবে কি না! দিনের ত কথাই নাই, বর্ষের পর বর্ষ জলধারার ন্যায় ছুটিয়া চলিয়াছে। বয়স প্রৌঢ়ত্বে প্রতিষ্ঠিত। বৈতরণীর যে বাঞ্ছিত বন্দরে তিনি তরী ভিড়াইতে চাহেন, কে বলিতে পারে আর তাহা কত দূর? 'বিদ্যুচ্চলং জীবিতং।' সত্য বটে, সকল তীর্থের সার এই দক্ষিণেশ্বর দেবোদ্যান, সকল দেবতার দেবতা, সকল ইষ্টের ইষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণ প্রকট মহিমায় এই মন্দিরে বিরাজমান! কিন্তু অভিলষিত তীর্থ সকলে এই সজীব বিগ্রহের অধিষ্ঠান যে তাঁহাদিগকে অভাবনীয় মহিমা ও অভিনব প্রাণ দান করিবে, তাহাতে সন্দেহ কি? তাঁহার 'বাবা' এখন সম্মত হইলে হয়! তিনি রাজি না হইলে সকল আয়োজনই পণ্ড হইবে! তাঁহার পত্নী শ্রীমতী জগদম্বা দাসী সুস্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, বাবাকে ফেলিয়া তিনি এক পদও অগ্রসর হইবেন না।
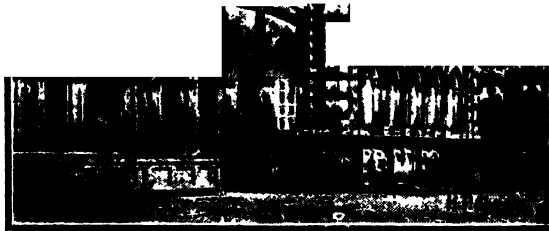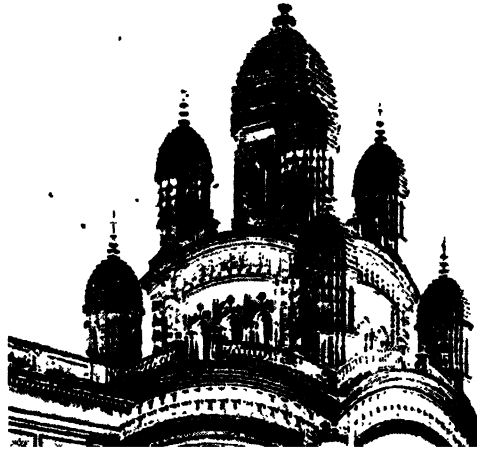
দক্ষিণেশ্বরের কালীমাতার মন্দির

মথুরমোহন প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণজননী চন্দ্রাদেবীর নিকট আবেদন করিলেন, ঠাকুরমা, তীর্থে চল।

ঠাকুরমা বলিলেন, "দাদা, আমি যে বাড়ী থেকে সঙ্কল্প ক'রে বেরিয়েছি, এ স্থান ছেড়ে আর কোথাও নড়ব না। গেলে যে আমার সত্যভঙ্গ হবে। তুমি কিছু মনে কোর না, দাদা!

সত্যনিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ-জননী বটে!

চন্দ্রাদেবীর উত্তরে মথুরের উভয়-সঙ্কট উপস্থিত হইল। যে 'বাবা' নিত্য নিবিষ্টচিত্তে বৃদ্ধা মাতার সেবা ও সর্ব্ববিষয়ে তত্ত্বাবধান করেন, তিনি কি তাঁহাকে সহজে ছাড়িয়া যাইতে সম্মত হইবেন?

কিন্তু ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পতরু মথুর ও শ্রীমতী জগদম্বার প্রস্তাবে সহজেই সম্মত হইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝিলেন যে, ধর্ম্মক্ষেত্রে আচার্য্যরূপে তাঁহার প্রকট হইবার সময় সন্নিকট। কেবল ভারতে কেন, সমগ্র জগতে যে ধর্ম্মগ্লানি উপস্থিত হইয়াছে, অবস্থা বুঝিয়া তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রকৃত রোগ ধরিতে না পারিলে চিকিৎসা হয় না। অতি প্রাচীন যুগ হইতে তীর্থ সকল শাস্ত্রে এবং সাধুমুখে আধ্যাত্মিকতার আকররূপে পরিকীর্ত্তিত। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে তাহাদের অবস্থা কিরূপ? তাহা জ্ঞাত হইতে হইলে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ প্রয়োজন। শুভদিনে তীর্থযাত্রা করা হইল।

দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের ভিতর উত্তরদিকের দৃশ্য

প্রথমে পরম শৈবতীর্থ বৈদ্যনাথ। কিন্তু সেকালে রেল হইতে অবতরণ করিয়া শ্রীধামে গমন করিতে হইলে এক দরিদ্র পল্লীর ভিতর দিয়া যাইতে হইত। শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিলেন, সেই গ্রামে প্রাণমাত্র অবশিষ্ট কতকগুলি চর্ম্মাবৃত কঙ্কাল ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। ইহাদের রুক্ষ কেশ, দীন বেশ, শীর্ণ-শুষ্ক কায় দেখিলে মনে হয়, ক্ষুদ্র গ্রামখানি যেন দুর্ভিক্ষের নিভৃত নিবাস। প্রকট-দশনা বুভুক্ষা যেন এখানে বিকট মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া উল্লাসে অট্টহাস্যে ঐশ্বর্য্য-বিলাসকে উপহাস করিতেছে। দৈন্যের এই জীবন্ত মূর্ত্তি দর্শনে প্রাচুর্য্যের অঙ্ক-লালিত মথুর শিহরিয়া উঠিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের গতি নিশ্চল হইল। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতেও প্রসাদপ্রার্থী কাঙ্গাল আসে। কিন্তু ইহাদের তুলনায় তাহারা রাজরাজেশ্বর! ইহারা কি বিধাতা-সৃষ্ট নরনারী, না, কোন প্রেতপুরী-উদ্গীরিত আবর্জ্জনারাশি! ইহারা কি শিববর্জ্জিত জীব? 'ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।' ইহাদের হৃদয়ে যদি নারায়ণ থাকেন ত লক্ষ্মী কোথায়? হায় মা! এ তোমার কি লীলা? তুমি কোথাও মণি-মালিনী, কোথাও কাঙ্গালিনী! কোথাও রাজরাজেশ্বরী, কোথাও দিগম্বরী! কাহারও মণি-রত্ন, ধন-ধান্য অপরিমিত সঞ্চিত, কেহ উদরান্নে বঞ্চিত! তুমি জগজ্জননী, ইহারা কি তোমার সন্তান নয়? হায় মা, ইহাদের প্রসব করিয়াছ, পেট পুরিয়া খাইতে দাও না? শ্রীরামকৃষ্ণের নয়নপ্রান্ত দিয়া শ্রাবণের ধারা বহিল। অশ্রুসিক্ত ভাবে মথুরমোহনকে কহিলেন,

পঞ্চবটী

মথুর, তুমি মায়ের দেওয়ান। যোগ্য পাত্রে দান করবার জন্য মা তোমাকে বিষয় দিয়েছেন। এক দিন এদের পেট পূরে খেতে দাও, এক মাথা তেল দাও, একখানি ক'রে কাপড় দাও।

ভক্ত হইলেও মথুর বিষয়ী লোক। বাবার এই অপ্রত্যাশিত আব্দারে একটু বিপন্ন বোধ করিয়া বলিলেন, বাবা, তীর্থে অনেক ব্যয় হবে। একটা আন্‌কা খরচ। তাও অল্প-স্বল্প হ'লে হ'ত। অনেকগুলি লোক, তাই ভাবছি, পাছে অনাটন হয়।

বাবা বলিলেন, তবে রইল তোর কাশী। এদের কেউ নেই, আমি এদের কাছেই থাক্‌ব।

কর্ম্ম-নিপুণ মথুর আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। কলিকাতা হইতে কাপড় আনাইয়া বাবার ইচ্ছামত সকল ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তাঁহাকে লইয়া এখন ভালোয়-ভালোয় কাশী পৌছাইতে পারিলে হয়।

কিন্তু বৈদ্যনাথ হইতে কাশীর পথে মাঝের কোন ষ্টেশনে আবার এক বিঘ্ন উপস্থিত হইল। উক্ত ষ্টেশনে গাড়ী থামিতেই শ্রীরামকৃষ্ণ শৌচে যাইবার নিমিত্ত অবতীর্ণ হইলেন। শৌচকার্য্য সমাধা করিয়া ফিরিবার মুখে শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিলেন, অদূরে দ্রোণপুষ্পের বন। একে ত বৈদ্যনাথ হইতে তাঁহার মন সারা পথই শিব-মহিমায় বিভোর হইয়া আছে। তার উপর মহাদেবের এই প্রিয় পুষ্প দর্শনে তাঁহার মনে যে ভাবাবেশ উপস্থিত হইল, তাহাতে একেবারে তন্ময় হইয়া গেলেন।

মহাকবি গিরিশচন্দ্রের মুখে শুনিয়াছি, শ্রীরামকৃষ্ণ তখন এক প্রকার বাহ্যজ্ঞানশূন্য। ও-দিকে গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িয়াছে। ভাগিনেয় হৃদয় ব্যস্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু কে তাহা লক্ষ্য বা গ্রাহ্য করে! প্রভু সেই ভাবাবেশে এক একটি করিয়া পুষ্প চয়ন ও মনঃকল্পিত মহাদেবকে উৎসর্গ করিতে লাগিলেন। ও-দিকে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। হৃদয় কিছুক্ষণ অবাক্ হইয়া গালে হাত দিয়া দেখিতে লাগিল; পুষ্পের একটি ঝাড় উজাড় হইবার পর বলিল, মামা, তোমার আক্কেলটা কি গো? এ ত আর তোমার ভবতারিণীর মন্দির নয় যে, দু'ঘণ্টা ধ'রে আরতি করবে, আর ঘণ্টা বাজাতে থাক্‌বে। গাড়ী যে চ'লে গেল, এখন থাক্‌বে কোথা? শোবে কোথা?

মথুরমোহন

হৃদয়ের তিরস্কারে শ্রীরামকৃষ্ণ বিচলিত হইয়া বলিলেন, তাই ত রে হৃদু, মা কি এমনিই করবেন?

মা যা করবার তা করেছেন, এখন চল, ষ্টেশনে গিয়ে বসি।

অতি সাবধানে হৃদয় মাতুলকে ষ্টেশনে আনিয়া বসাইল।

কিছুক্ষণ পরেই পরের ষ্টেশন হইতে তার আসিল, পরমহংসদেব ও হৃদয়কে যেন অতি সযত্নে ও সাবধানে পরের গাড়ীতে তুলিয়া দেওয়া হয়।

হৃদয় খবর লইল, পরের যাত্রি-গাড়ী আসিতে এখনও অনেক দেরী।

ইতিমধ্যে ষ্টেশনে একখানি গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। হৃদয় দেখিল, গাড়ীতে লোকজন বিশেষ নাই। চাকর-বাকর সঙ্গে একটিমাত্র বাবু বসিয়া আছেন। হৃদয় সংবাদ লইল, ইনি বাগবাজারনিবাসী রাজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

রেল্‌ওয়ে কোম্পানীর কাছে ইহার বিশেষ খাতির। প্রয়োজন হইলে 'স্পেশ্যাল্' গাড়ীতে ভ্রমণ করেন।

হৃদয় তাঁহার কাছে গিয়া অবস্থা বুঝাইতে রাজেন্দ্র বাবু অতি সমাদরে মাতুল ও ভাগিনেয়কে গাড়ীর মধ্যে স্থান দিলেন।

মায়ের অঞ্চলের নিধির জন্য যে 'স্পেশাল্' আসিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি ?

যথাসময়ে গাড়ী বারাণসীধামে পৌঁছিল। মথুর হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

কাশী পঞ্চগঙ্গা ঘাট

কাশী—দশাশ্বমেধ ঘাট
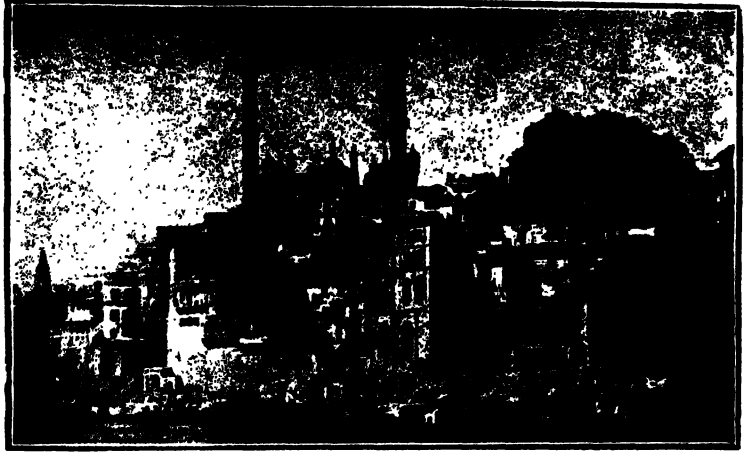
এই কাশী অন্তরের ভাবঘন মূর্ত্তির বহির্ব্বিকাশ। এই নিমিত্ত শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় পরম-হংস সাধু মহাত্মাগণ বহির্দৃষ্টি-তেও এই সমুজ্জল স্বর্ণপুরীর সুবর্ণময় রূপ প্রত্যক্ষ করেন।

মহাদেব এই আনন্দকাননে মোক্ষ-দায়িনী মহাশক্তির আবির্ভাব ও অধি-ষ্ঠানের জন্য মহা তপ করিয়াছিলেন। কিম্বদন্তী আছে, এইখানে ভ্রান্তমতি ব্যাস হরিহরভেদ করিয়া গঙ্গার পর-পারে ব্যাসকাশী প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশ্যে নিষ্ফল তপশ্চর্য্যায় রত হন।
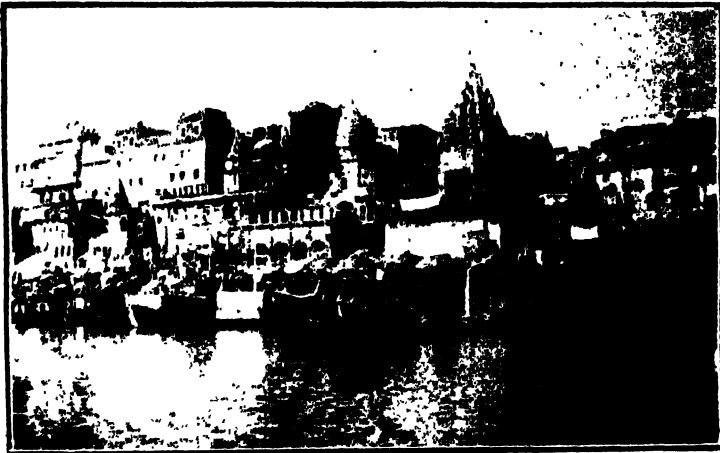
সে সময় রেল হইতে নামিয়া নৌকাযোগে কাশী পৌঁছিতে হইত। দূর হইতে সুরতরঙ্গিণী-বক্ষোবিলাসী, ভব-বন্ধন-বিনাশী, পরমপদ-পিয়াসীর পরম তীর্থ, সোপান-সৌধ-শোভিত, শূল-চক্র-মণ্ডিত-মন্দির-সমন্বিত এই স্বর্ণপুরী দেখিলে মনে হয়, ইহা যেন মৃন্ময়ী মেদিনীর অন্তর্গত নহে। অন্য কোন লোক হইতে আকর্ষিত হইয়া মর্ত্ত্যে অধিষ্ঠান করিতেছে। জগৎপিতা ও জগন্মাতার অনুপম মহিমারাশি ভব-ভবানীর অতুলনীয় সন্তান-প্রীতি-প্রকাশী

কাশী—সিন্ধিয়া ঘাট
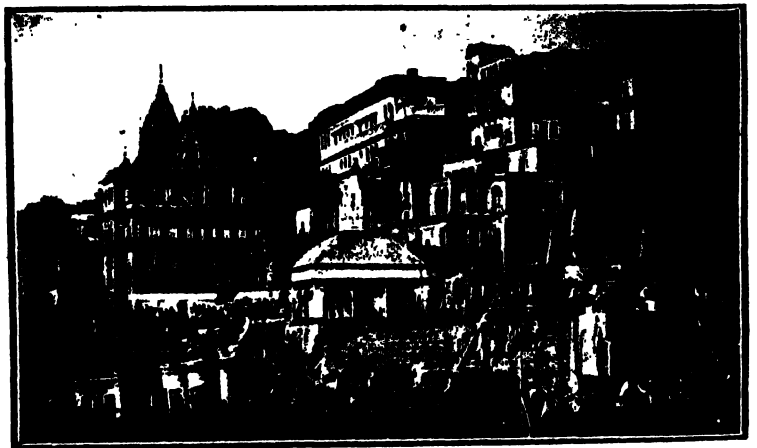
এই শিব-ভূমিতেই মায়াবাদী শঙ্কর মহাশক্তির কৃপায় ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তির একত্ব-জ্ঞান লাভ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ গঙ্গাবক্ষ হইতে গঙ্গাধরের এই নিত্যধাম প্রথম দর্শনে গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হইলেন। তাঁহার মনে হইল, কালভৈরব-রক্ষিত এই পুরীতে কাম-কাঞ্চনের প্রবেশাধিকার নাই। নিরন্তর শঙ্খ-ঘণ্টা-রোলের সঙ্গে সঙ্গে হর হর-বম্ বম্ রব উত্থিত হইয়া কাশীর আকাশ-বাতাস আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। এই স্বর্ণ-ভূমিতে প্রবেশ-

কাশী—বিশ্বনাথের মন্দির

কাশী—অন্নপূর্ণার মন্দির

মাত্র শরীর-মন পবিত্র হয়। ইহার পূত রজস্পর্শে জন্ম-জন্মার্জ্জিত পাতক নিঃশেষে বিনষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু কল্পনা ও প্রত্যক্ষে কি বিশাল ব্যবধান! এখানেও সেই আলু-পটল-বেগুন, সেই পঞ্চশরপূর্ণ তূণ! সেই হাট বাজারের গণ্ডগোল, কেনা-বেচার কলরোল! সেই বিষয়-বিলাস, পাপের প্রচ্ছন্ন প্রয়াস! মহাদেব-প্রতিষ্ঠিত মোক্ষপুরীর এই শোচনীয় পরিণাম দর্শনে শ্রীরামকৃষ্ণের মন হাহাকার করিয়া উঠিল। তিনি সাশ্রুনয়নে মহামায়া অন্নপূর্ণার চরণে নিবেদন করিলেন, মা, তুই হেথায় আমায় নিয়ে এলি কেন? আমি যে সেথা বেশ ছিলুম।

শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিলেন, বারাণসীতে বহু দণ্ডী, স্বামী, পরমহংস পথে পথে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছেন—অন্ন ও অর্থের চেষ্টায়। কিন্তু কাশীর গৌরব ও মাহাত্ম্য রক্ষা

শ্রীশ্রীমৎ তৈলঙ্গস্বামী
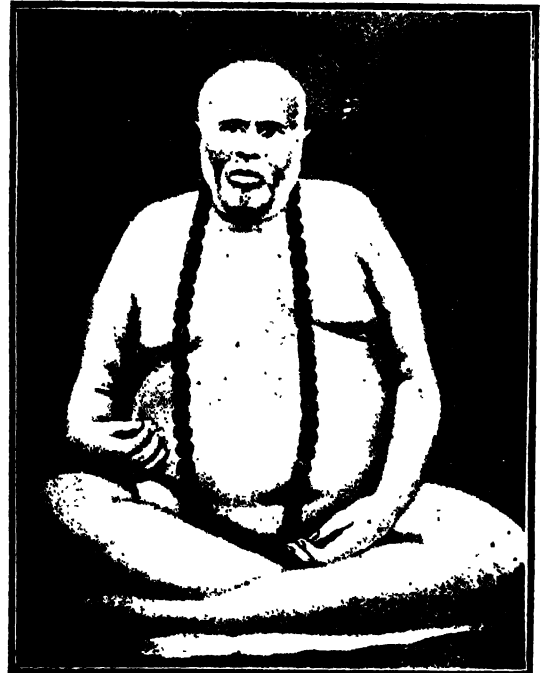
করিতেছেন—একমাত্র ত্রৈলঙ্গস্বামী। কাশীবাসী ইঁহাকে সচল বিশ্বনাথ জ্ঞানে শ্রদ্ধা-ভক্তি দান করিত।

এক দিন গঙ্গাবক্ষ হইতে মণিকর্ণিকা প্রমুখ পঞ্চতীর্থ দর্শন-মানসে মথুর 'বাবা' ও হৃদয়কে লইয়া নৌকারোহণে মণিকর্ণিকা-সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। পার্শ্বস্থ মহাশ্মশানে কোথাও রোগক্লিষ্ট, কোথাও ভোগপুষ্ট দেহ দগ্ধ করিতে করিতে উল্লাসে অট্টহাসে বম্ বম্ ভাবে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিয়া চিতা জ্বলিতেছে। কণ্টকিত-কলেবর শ্রীরামকৃষ্ণ দ্রুতপদে নর-কপালধারিণী এক দিগম্বর-নারী জীবত্বের সকল বন্ধন মোচন করিয়া দেহীকে পরমধামে প্রেরণ করিতেছেন।

কাম-কাঞ্চন-বিলাসী জীব এই মোক্ষধামে আসিয়া অসংযত প্রবৃত্তির পরিচালনা করিতেছে। কিন্তু বিশ্বেশ্বর-বিশ্বেশ্বরী অপার করুণায় তাহাকে মুক্তিদান করিয়া কাশী-মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, অমৃতকুণ্ডে ইচ্ছা করেই পড় বা কেউ ঠেলে ফেলেই দিক, অমরত্ব লাভ করবে।

কয়েক দিন বারাণসীধামে অবস্থান করিয়া মথুর বাবাকে
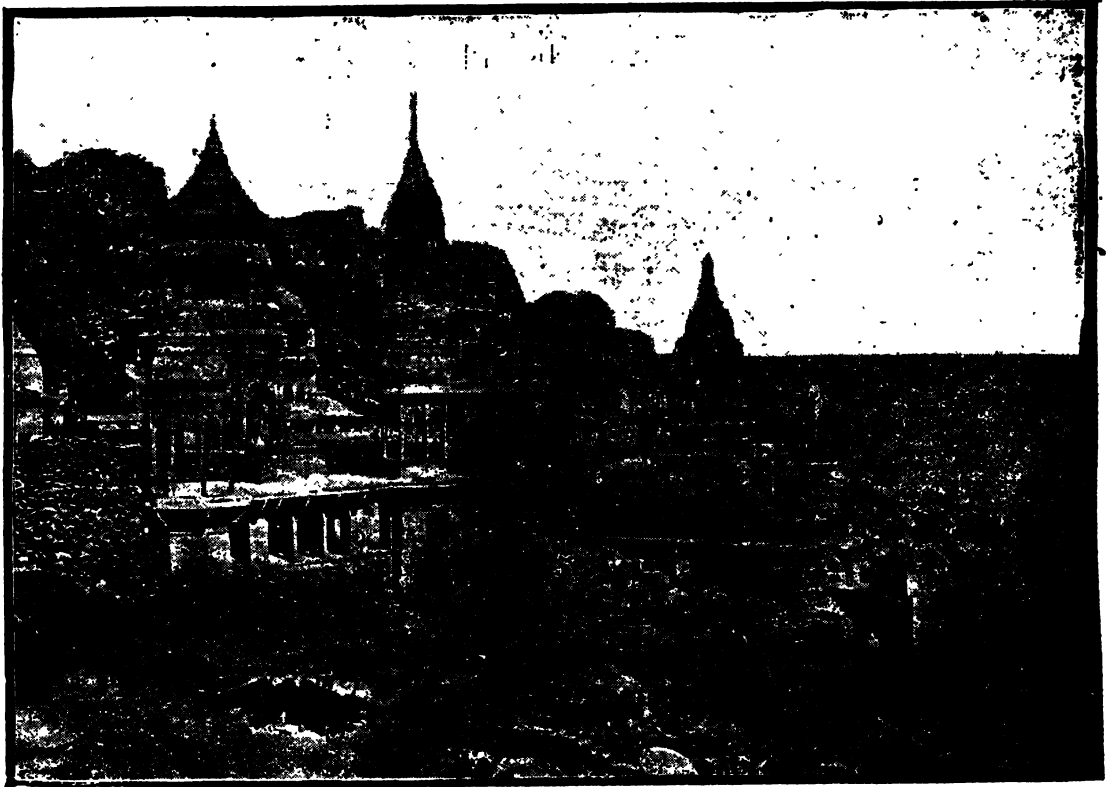
কাশী—মণিকর্ণিকার শ্মশান-ঘাট

তরণীর শেষ সীমায় আসিয়া সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। মথুর ও হৃদয় সাবধানে সন্নিকটে রহিলেন। সহসা শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে দিব্য জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল এবং এক অপূর্ব্ব দৃশ্য তাঁহার একাগ্র দৃষ্টিপটে প্রকটিত হইল। শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিলেন, অগ্নি-শিখা হইতে সমুন্নতশির, অনল-লাঞ্ছিত অঙ্গজ্যোতিঃসম্পন্ন এক জটিল, দিগম্বর পুরুষ ধীরপদে চিতায় চিতায় গমন করিয়া তারক-ব্রহ্ম মন্ত্র দান করিতেছেন এবং ঐ সঙ্গে ধূম্র-বরণী, লইয়া যুক্তবেণী প্রয়াগধামে গমন করিলেন। গঙ্গা-যমুনার এই সঙ্গম-স্থল যেন জ্ঞান-ভক্তির সমন্বয়-ক্ষেত্র। ভারতের বহু রাজন্যগণের অলোকসামান্য দানের পুণ্যস্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া আজিও অপূর্ব্ব মহিমা-মণ্ডিত হইয়া রহিয়াছে। মথুর বাবার সঙ্গে এখানে ত্রিরাত্রি বাস ও দান-ধ্যান করিয়া পুনরায় কাশীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কাশীতে এক পক্ষ বাস করিয়া শ্রীবৃন্দাবনযাত্রা করা হইল। [ক্রমশঃ।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

ইংলণ্ডের বর্ত্তমান রাজকবি মেস্‌ফিল্‌ড

জন মেসফিল্ড গত বৎসর ইংলণ্ডের রাজকবি নিযুক্ত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে এখনও যথেষ্ট আলোচনা হয় নাই। সম্প্রতি ইংলণ্ডের 'স্পেকটেটর' পত্রে তাঁহার সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে, এবং তাঁহার একটি ব্যঙ্গচিত্রও প্রকাশিত হইয়াছে। সেই আলোচনাটিকে উপলক্ষ করিয়া আমরা তাঁহার জীবন ও কবিত্ব সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়া লইব।

গত বৎসর ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ রামজে ম্যাক্‌ডোনাল্ড সাহেবের পরামর্শ অনুসারে ইংলণ্ডের রাজা মেস্‌ফিল্‌ডকে রাজকবির শূন্য পদের উপযুক্ত বলিয়া তাঁহাকে নির্ব্বাচিত করেন। এই নির্ব্বাচনের সময় কিন্তু সকলে এই মনোনয়ন সমর্থন করেন নাই। তিনি সর্ব্ববাদিসম্মতভাবে ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া স্বীকৃত হন নাই। কিন্তু তিনি যে কবিত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন, কবির সম্ভ্রম যে তাঁহার দ্বারা সংরক্ষিত হইবে, সমগ্র মানব-সমাজের প্রতি যে তাঁহার একটি গভীর শ্রদ্ধা আছে, এবং তাঁহার প্রাণ যে জনহিতৈষণার উদারতায় পূর্ণ, সে সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহমাত্র ছিল না।

রাজকবি নির্ব্বাচন করার প্রথাটি অতি পুরাতন। অতি প্রাচীনকালে গ্রীস দেশে সামান্য লরেল গাছের শাখা ও পল্লবের মুকুট পরাইয়া দেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর, যোদ্ধা, কবি, শিল্পী প্রভৃতিকে পুরস্কৃত ও সম্মানিত করা হইত। এই পাতার মুকুট লাভ করা চরম গৌরবের বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইত। এই প্রথা গ্রীস হইতে রোমে প্রচলিত হয়। প্রসিদ্ধ সনেট-লেখক কবি পেট্রার্ক ১৩৪১ খৃষ্টাব্দে রোমে লরেলের মুকুট দ্বারা সম্মানিত হন। রোম হইতে এ প্রথা পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে জার্ম্মাণীতে প্রবর্ত্তিত হয়, এবং ষোড়শ শতকে স্পেনে প্রচলিত হয়। ইংলণ্ডে রাজদরবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ কবি সভাকবি বা রাজকবি নামে অভিহিত হইতেন। রাজা চতুর্থ এডওয়ার্ড জন কে নামে এক কবিকে প্রথম পোয়েট লরিয়েট নামে অভিহিত করেন, এবং ঐ কবি কের কাব্য প্রথম মুদ্রাকর ক্যাকস্টনের ছাপাখানায় ছাপা হয়। কবি চসার যদিও তৃতীয় এডওয়ার্ড ও দ্বিতীয় রিচার্ড রাজাদের নিকট হইতে পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি পোয়েট লরিয়েট ছিলেন না। কবি স্পেনসারও রাণী এলিজাবেথের নিকট হইতে মাসহারা লাভ করিয়াও ঐ সম্মানিত নাম লাভ করিতে পারেন নাই। প্রথম জেমসের রাজত্বকালে বেন জন্‌সন প্রথম রাজকবিরূপে রাজার সনদ দ্বারা নিযুক্ত হন। তাঁহার পরে এই সম্মান ইংলণ্ডের বহু প্রসিদ্ধ কবি লাভ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রধান কয়েক জনের নাম করা যাইতে পারে—ড্রাইডেন, সাদে, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, টেনিসন এবং রবার্ট ব্রিজেস্‌। রবার্ট ব্রিজেসের পরেই জন মেস্‌ফিল্‌ড পোয়েট লরিয়েট বা রাজকবি নিযুক্ত হইয়াছেন। সুতরাং তিনি বিখ্যাত কবিকুলের যশোধারার উত্তরাধিকারী। যোগ্য উত্তরাধিকারী কি না, তাহাই এখন বিচার্য্য।

মেস্‌ফিল্‌ড ৫২ বৎসর বয়সে সভাকবি নিযুক্ত হন। কাজেই তাঁহার খ্যাতি যাহা হইবার, তাহা ইহার আগেই হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার জন্ম হয় ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে। তিনি ভাগ্যদেবী পিতামহীর আদরের দুলাল ছিলেন না, তাঁহাকে

প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া কেবলমাত্র নিজের প্রতিভার বলে নিজের উন্নতির পথ আবিষ্কার করিয়া লইতে হইয়াছে। তিনি প্রথম যৌবনে দারিদ্র্যের তাড়নায় নানা দেশে বিদেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে শেষে জাহাজের খালাসী হইয়া সমুদ্রযাত্রা করেন এবং আমেরিকার যুক্তরাজ্যে গিয়া উপনীত হন। সেখানে মদের দোকানে মদ বেচা খানসামার কাজ করিয়া তিনি কিছুদিন নিজের জীবিকা উপার্জ্জন করেন। জীবনের এই প্রথম অভিজ্ঞতা তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনে সাহিত্য-সাধনায় বিশেষ কাজে লাগিয়াছে। আমেরিকায় নানা কর্ম্মে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া তিনি দেশে ফিরিয়া আসেন, এবং এক সংবাদপত্রের সম্পর্কে পুস্তক-সমালোচকের কাজ গ্রহণ করেন। তখন সেই যুবক সাহিত্যিককে লোকে সামান্যই চিনিত, এবং যাহারা তাঁহার অল্প পরিচয় পাইয়াছিল, তাহারা এইটুকু মাত্র জানিত যে, ঐ তরুণ সাহিত্যিক সমুদ্রজীবন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। যখন তাঁহার বয়স ত্রিশের কোটায় পড়িয়াছে, তখন 'ইংলিশ রিভিউ' নামক পত্রিকায় তাঁহার দি এভারলাষ্টিং মার্সি (The Everlasting Mercy) নামে একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। কবি বায়রন সম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে যে, তিনি এক দিন প্রভাতে জাগ্রত হইয়া দেখিলেন যে, তিনি প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন; কবি মেস্‌ফিল্ডও অকস্মাৎ বিখ্যাত হইয়া পড়িলেন। 'ডেলি মেল' কাগজ তাঁহাকে প্রতিভাবান্ কবি বলিয়া সম্বর্দ্ধনা করিল, এবং দেশের সমস্ত ছাপাখানায় মাসিক পত্রের একটি কবিতা পুনর্মুদ্রণ করার ধুম লাগিয়া গেল। ঐ কবিতাটি একটি বর্ণনাবহুল কবিতা। লোকে সাধারণতঃ কবিত্বের বুকনি দেওয়া গল্পমূলক কবিতা পড়িতেই ভালোবাসে। তদ্ভিন্ন তাহা সরল ভাষায় সরল বিষয় লইয়া আবেগ ও উন্মাদনা মিলাইয়া লেখা হইয়াছিল, তাহাতে আবার একটু ধর্ম্মভাব সংমিশ্রিত ছিল, আর সর্ব্বোপরি তাহা লেখা হইয়াছিল এক সুখপাঠ্য মধুর ছন্দে। কাজেই সেই কবিতা লোকপ্রিয় হইবার সকল গুণপনা লইয়াই প্রকাশিত হইয়া কবিকে এক দিনে প্রথিত করিয়া তুলিল। যাঁহারা কবিতার মধ্যে ধর্ম্মকথার অবতারণা দেখিয়া একটু নাক সিঁটকাইয়াছিলেন, তাঁহারাও কবিতার স্থানে স্থানে প্রকৃত গীতিকবিতার সুর ও ঝঙ্কার শুনিয়া তারিফ না করিয়া পারেন নাই।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার লোনাজলের গান (Salt-water Ballads) নামে কবিতাপুস্তক প্রকাশিত হয়। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে পাল তোলার গান (A Mainsail Haul), ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে সমুদ্রযাত্রা (Dampier's Voyages) প্রকাশিত হইলে তাঁহার কবিযশ কায়েমী হইয়া যায়। এখন হইতে তিনি কাব্য রচনা ও সাহিত্যচর্চ্চাতেই মনোনিবেশ করিলেন।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ইউরোপের মহাযুদ্ধের সময় কবি দেশ-সেবকরূপে যুদ্ধক্ষেত্রে আহত ও পীড়িতদের সেবাকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া ফ্রান্সে যাত্রা করেন এবং পরে গ্যালিপলি ক্ষেত্রে গমন করেন। তাঁহার এই যুদ্ধক্ষেত্রের অভিজ্ঞতাও তাঁহার সাহিত্যসাধনাকে সমৃদ্ধি ও বৈচিত্র্য দান করিয়াছে।

মেস্‌ফিল্ডের প্রথম বয়সের কবিতায় কিপ্লিং কবির ছন্দোঝঙ্কার পাওয়া যায়। 'দি এভারলাষ্টিং মার্সি' নামক তাঁহার প্রথম কবিতায় এক জন মাতালের ধর্ম্মপথে প্রত্যাবর্ত্তনের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে।

১৯১২ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি ক্রমাগত কবিতা ও নাটকের বই প্রকাশ করিয়াছেন এবং সব বই খুব উচ্চ শ্রেণীর না হইলেও তাঁহার কবিযশকে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত ও স্থায়ী করিয়া তুলিয়াছে।

মহাযুদ্ধের পরিচয় লাভ করিয়া মেস্‌ফিল্ড যে বইগুলি লেখেন, তাহাতে এক দিকে যুদ্ধক্ষেত্রের প্রাকৃতিক শোভার পার্শ্বে মানবের নিষ্ঠুর বর্ব্বরতার চিত্র দেওয়াতে সেগুলি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল।

তাঁহার সকল বইয়ের মধ্যে 'Reynard the Fox' নামক শৃগাল শিকারের কাহিনীটি অনেকের মতে তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা। শিকারের উত্তেজনাপূর্ণ বিবরণ ও শান্ত জ্যোৎস্নাবিধৌত রজনীতে শিকারীদের গৃহে প্রত্যাগমনের ছবি বাস্তবিকই অতিশয় মনোরম হইয়াছে।

সকল কবিই লেখেন অনেক, কিন্তু তাহা হইতে বাছাই করিয়া অপকৃষ্টগুলি বাদ দিয়া কবির প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হয়। মেস্‌ফিল্ড সেই শ্রেণীর কবি—যাঁহার রচনা ছাঁকিয়া লইলেই পরম উপভোগ্য হয়। ইহার রচনা যেন আকরের হীরক, তাহাকে কাটিয়া ছাঁটিয়া লইলেই তাহার ঔজ্জ্বল্য অধিক প্রকাশ পায়।

মেস্‌ফিল্ডের চেহারা অতি সাধারণ ভদ্রলোকের মতন। আধুনিক যুগে আর বাহিরের আকৃতি দেখিয়া কাহাকেও কবি বলিয়া সনাক্ত করিবার উপায় নাই। আগেকার মতন অংসবিলম্বী কুঞ্চিত চিকুরদাম অথবা আলুথালু ভাব-ভোলা ঢং এখন লোকে বিদ্রূপের দৃষ্টিতে দেখে। কিন্তু প্রকৃত কবির বাহ্যবেশ এখন অসাধারণ না হইলেও তাঁহার নেত্রপ্রদীপে প্রতিভার যে জ্যোতি স্ফুরিত হয়, তাহা দেখিয়াই তাঁহার অসাধারণত্ব জানা যায়। মেস্‌ফিল্ডের দৃষ্টিতে সেই অসাধারণত্ব নিহিত আছে দেখিতে পাওয়া যায়।

মেস্‌ফিল্ডের কবিত্বের দর কষিতে সমালোচকরা বিশেষ সঙ্কোচ বোধ করে। কারণ, কবি তাঁহার সমালোচকদের উদ্দেশে আগে থাকিতেই বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের মুখ বন্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

They mark the height achieved, the main result,
The power of freedom in the perished cult,
The power of boredom in the dead man's deeds,
Not the bright moments of the sprinkled seeds.

কবি ভয় পাইয়াছেন যে, সমালোচকরা কেবল দেখিতে চাহিবে তাঁহার কাব্য নাটক কোন্ সালে কোথায় বসিয়া লেখা, তাহা কোন্ কাব্যধারার অন্তর্গত, কতখানি তাঁহার নিজস্ব ও কতটুকু তাঁহার ধারের কারবার। কিন্তু তাহারা তো এই কচকচিতে পড়িয়া শুনিতেই পাইবে না যে, কোন্ পংক্তিতে সমুদ্রের কলরোল ধ্বনিত হইতেছে, আর কোন্ পংক্তিতে বা স্পেনের ক্ষীণ মধুর ভিন্নদেশী সঙ্গীত বা গেঁয়ো ইংলণ্ডের কলকাকলি গুঞ্জন করিতেছে।

কিন্তু কবি এই সংশয় প্রকাশ করিয়া তাঁহার নিজের প্রতিভার শক্তিকে উচিত মূল্য দান করিতে পারেন নাই। তাঁহার Dauber বা Salt Water Ballads অথবা Poems and Ballads পড়িতে পড়িতে যে পাঠক সমুদ্রের কলরোল অথবা স্পেনের উপকূলের সঙ্গীত-প্রতিধ্বনি না শোনে, সে যে কাব্যবোধে বধির, তাহাতে আর কোন সংশয় নাই। সেইরূপে Daffodil Fields অথবা Reynard the Fox পড়িতে পড়িতে আমাদের মনের যবনিকা উদ্‌ঘাটিত হইয়া বসন্তের সৌন্দর্য্যভূষিত গেঁয়ো ইংলণ্ডের চিত্র প্রকট হইয়া উঠে। কবি তাঁহার পাঠকদের দিবা-স্বপ্নকে আরো প্রগাঢ় করিয়া তোলেন, তাহার মানসনেত্রের সম্মুখে পরীরাজ্যের ছবি ফুটাইয়া তোলেন। পাঠকের মনে সমুদ্রের ফেনহাস্য ভয়, বিস্ময় ও আনন্দ একসঙ্গে জাগাইয়া তোলে।

মেস্‌ফিল্ডের ভাষা সাহিত্যে এক মধ্য-পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছে। ভিক্টোরিয়া যুগের কবিরা আমাদের বাংলা-দেশের উনবিংশ শতাব্দীর লেখকদের মতন অত্যন্ত গুরু-গম্ভীর আভিধানিক শব্দের আড়ম্বড়ের পক্ষপাতী ছিলেন। ষ্টিফেন ফিলিপ্‌স্ এবং য়েট্‌স্ এখনো সেই ভূত ভিক্টোরিয়া যুগের কাব্যকানন হইতে স্খলিতপ্রায় পুষ্পমঞ্জরী চয়ন করিতে রত আছেন, এবং কিপ্লিং প্রমুখ কবিরা কথ্যভাষায় জঙ্গল হইতে হাতের কাছে যে আগাছা পাইতেছেন, তাহাতেই কবিতাকুঞ্জ সজ্জিত করিতে সচেষ্ট। মেস্‌ফিল্ড ঐ দ্বিবিধ ভাষার সুসমঞ্জস সমন্বয় করিয়া এক উজ্জ্বলমধুর ভাষা সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহা কেবলমাত্র পণ্ডিতের অথবা কেবলমাত্র সামান্য লোকের ভাষা নয়, পরন্তু যাহা সমস্ত ভব্য সমাজের ভাষা, যাহা সাহিত্যের নিজস্ব ভাষা। বাংলা ভাষায় যে কাজ বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ করিয়াছেন, ইংরেজী ভাষায় তাহা মেস্‌ফিল্ড করিয়াছেন। তিনি কথ্য অথবা লেখ্য যে ভাষাতেই লেখেন, তাহাতেই তিনি গ্রাম্যতাদুষ্ট অসুন্দর অশ্লীল শব্দ পরিহার করিয়া শুধু নয়, সুন্দর সুশ্রাব্য ভব্য শব্দ নির্ব্বাচন করিয়া নিজের ভব্য রুচির পরিচয় দিয়া থাকেন। তিনি প্রতিদিনের সাধারণ শব্দকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করিয়া সাহিত্য-মর্য্যাদা দান করিয়াছেন। আবার অভিধানের কঠোর শব্দকে চলিত কথার সঙ্গে মিলাইয়া তাহাদিগকেও একটি নূতন মাধুর্য্য দান করিয়াছেন। তাঁহার কাব্যের মধ্যে বাস্তবতার ছবি যথেষ্ট থাকাতে অনেকে মনে করেন যে, কবিতার ইন্দ্রজাল স্থানে স্থানে ছিন্নভিন্ন হইয়াছে। কিন্তু সেই সব স্থূল অভব্য উক্তির পার্শ্বে সূক্ষ্ম উজ্জ্বল সুন্দর কথাগুলি সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিবার অবকাশ পাইয়াছে। তাঁহার বর্ণিত পাত্রপাত্রীরা অভব্য গালি ও শপথ উচ্চারণ করে—ভব্য ব্যক্তির বাক্য ও চরিত্র, পবিত্রতা ও মাধুর্য্য পরিস্ফুট করিয়া তুলিবার জন্য। পাপীর চিত্র যত কৃষ্ণবর্ণে লিপ্ত হয়, পুণ্যাত্মার চিত্র তত শুভ্র বলিয়া প্রতিভাত হয়। মেস্‌ফিল্ডের বাস্তবতা যেন তাঁহার রোমান্টিক কবিতার পটভূমিকাস্বরূপ।

তাঁহার Everlasting Mercy কাব্যে "O damn the gin", "The room stank like a fox's gut" প্রভৃতি বাক্যের পার্শ্বে

O Christ, the plough, O Christ, the laughter
Of holy white birds flying after,
Lo, all my heart's field red and torn,
And thou wilt bring the young green corn,
The young green corn divinely springing,
The young green corn for ever singing.......

হে ভগবান্, দুঃখের কর্ষণরেখার অনুসরণ করিয়া পবিত্র শুভ্র পক্ষীর হাস্যকাকলি সঞ্চরণ করে, দেখ, আমার হৃদয়ক্ষেত্র ছিন্নভিন্ন রক্তাক্ত, কিন্তু তুমি নবীন শস্যের হরিৎ-শোভায় তাহা আচ্ছাদন করিয়া দিবে, নবীন হরিৎ শস্যরাজি দিব্যশোভায় ক্রমবর্দ্ধমান, নবীন হরিৎ শস্যরাজি নিরন্তর আনন্দগানে মুখর।

পংক্তিগুলি বসাইয়া বিচার করিলে আমাদের উক্তি সমর্থিত হইবে। যদিও তাঁহার বর্ণিত স্পেনের বন্দরে বন্দরে অতি অমানুষিক বর্ব্বর ব্যাপারের বর্ণনা আমরা দেখিতে পাই—

There's sand-bagging and throat-slitting,
And quiet graves in the sea slime,
Stabbing, of course, and rum-hitting,
Dirt, and drink, and stink, and crime,
In Spanish port,
Fever port,
Port of Holy Peter............

তথায় বালির বস্তায় বন্ধ করিয়া সলিলসমাধি আছে, কণ্ঠচ্ছেদন আছে, নীরব অনাড়ম্বরভাবে সমুদ্রকর্দ্দমে সমাধি আছে, খুনাখুনি ও দাঙ্গাফ্যাসাদ তো আছেই, নোংরামি, মাৎলামি, দুর্গন্ধ ও পাপও আছে সেই স্পেনের বন্দরে বন্দরে, জ্বর-বন্দরে, পতিতপাবন পিটারের বন্দরে।...

তথাপি আমরা তাঁহার শান্তস্নিগ্ধ গীতিকবিতার মধ্যে প্রকৃত কবিত্বের ও মাধুর্য্যের সাক্ষাৎলাভ করিয়া মুগ্ধ হই। (Beauty, Cargoes, The Gentle Lady, Lollingdon Downs). তিনি এমন করিয়া চিত্র অঙ্কন করেন যে, তাহা পাঠকের মনের পটে একেবারে মুদ্রিত হইয়া যায়। Beauty হইতে একটি দৃষ্টান্ত দেখা যাক—

I have seen dawn and sunset on moors and windy hills
Coming in solemn beauty like slow old tunes of Spain:
I have seen the lady April bringing the daffodils,
Bringing the springing grass and soft, warm April rain.
I have heard the song of the blossoms and the old chant of the sea,
And seen strange lands from under the arched white sails of ships;
But the loveliest things of beauty God ever has showed to me
Are her voice, and her hair, and eyes and the dear red curve of her lips.

আমি প্রান্তরপারে ও বাত্যাবহুল শৈলশিখরে ঊষার আগমন ও সূর্য্যের অস্তগমন দেখিয়াছি, সে যেন স্পেনের প্রাচীন সঙ্গীতের দূরাগত ক্ষীণ সুরের গম্ভীর সৌন্দর্য্য। আমি মহীয়সী বসন্তলক্ষ্মীর অঞ্জলিভরা ভূঁইচাঁপা ফুলের আবির্ভাব দেখিয়াছি, নবদূর্ব্বাদলের উদ্গম ও কালবৈশাখীর শীতলকরা কোমল বারিবর্ষণ দেখিয়াছি। আমি শুনিয়াছি, নবমঞ্জরীর আনন্দসঙ্গীত এবং সমুদ্রের চিরপুরাতন উদাত্ত গম্ভীর সঙ্গীত। আমি দেখিয়াছি, খিলানের মতন ফুলিয়া ওঠা জাহাজের পালের তলা দিয়া কত অচেনা অজানা দেশ। কিন্তু ভগবান্ তাঁহার বিচিত্র শোভায় ভূষিত ভূমণ্ডলে আমাকে যত শোভা দেখাইয়াছেন ও যত মাধুর্য্য অনুভব করাইয়াছেন, তাহাদের সকলের সেরা হইতেছে তাহার কণ্ঠস্বর, তাহার কেশকলাপ, তাহার চক্ষু, আর তাহারই লোভন মধুর আরক্ত অধরের বক্র ভঙ্গিমা।

আমরা জানি না এই যে, "Her voice, her hair, eyes and her lips" সেই লোকটি কে। প্রত্যেক প্রেমিকের দৃষ্টিতে তাহার প্রেমিকা সর্ব্ব-সুষমার আকর, এ তো মামুলি জানা কথা। তথাপি ঐ কবিতাটির মধ্যে আমাদের অজানা অচেনা কবিপ্রণয়িনীর প্রেমমাধুরীর সহিত আমাদের নিজেদের জানা চেনা ভালোবাসা সকল রমণীর প্রেমমাধুরী মিলিত হইয়া তাঁহাকেও আমাদের পরিচিত করিয়া তুলিতেছে।

মেস্‌ফিল্ডের সকল কবিতার মধ্যে সৌন্দর্য্যের সরলতা, আন্তরিকতা এবং মর্য্যাদা রক্ষিত হইয়াছে।

No rose but fades: no glory but must pass:
No hue but dims: no precious silk but frets.
Her beauty must go underneath the grass,
Under the long roots of the violets.
Maids that were redly-lipped and comely-skinned,
Friends that deserved a sweeter bed than clay,
All are as blossoms blowing down the wind,
Things the old envious villain sweeps away.
And though the mutterer laughs and church bells toll,
Death brings another April to the soul.

গোলাপ ফুটিলেই ঝরিয়া পড়ে, গৌরবমাত্রই ক্ষণস্থায়ী। রং কালে ফিকা হয়, মহার্ঘ্য রেশমী বস্ত্রও লাট খায়। তাহারও সুষমা ঘাসের তলায় যাইবেই যাইবে, ভায়োলেট ফুলের দীর্ঘ জটিল শিকড়ের তলে। রক্তাধরা ও গৌরবর্ণা রমণীও মৃৎশয্যা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট শয্যায় শয়নযোগ্য বন্ধু—সব যেন বাতাসের আঘাতে ঝরিয়া যাওয়া পুষ্পমঞ্জরী, যাহা সেই অতিবৃদ্ধ হিংসাকুটিল সয়তান (মৃত্যু) ঝাঁটাইয়া ফেলে। তথাপি শ্রাদ্ধের মন্ত্রপাঠক হাস্য করে ও মন্দিরের ঘণ্টা ধ্বনিত হয়, মৃত্যু প্রাণে নব-বসন্ত আনিয়া দেয়।

এই উদ্ধৃত কবিতাংশের মধ্যে মৃত্যুর নির্ম্মম কঠোরতা বেশী করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার পার্শ্বে সুন্দর প্রিয় বস্তু ও ব্যক্তিদের স্থাপিত করাতে। আমরা সকলেই কখনো না কখনও বন্ধু-বিয়োগে মনে করিয়াছি, Friends that deserved a sweeter bed than clay! কিন্তু মৃত্যু নিরবচ্ছিন্ন ধ্বংস নহে, তাহা নব-জীবনের নব-বসন্তের অগ্রদূত মাত্র, সে ফুলের পাপড়ি ঝরায় নূতন ফুল ফুটাইয়া তুলিবার জন্যই, তবে যাহা যায়, তাহার জন্য শোক করা বৃথা, যাহা আসিবে, তাহার দিকে তাকাইলে আর কোনো দুঃখের অবসর থাকে না।

উপরে উদ্ধৃত কবিতাংশ হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, কবি মেস্‌ফিল্ড শব্দ-চয়নে এক জন দক্ষ কারুশিল্পী। যে ভাব প্রকাশ করিতে হইবে, কবি তাহার উপযোগী শব্দ নির্ব্বাচনে যে কেবল দক্ষতা দেখাইয়াছেন, তাহা নহে, সেই সব শব্দের মধ্যে সঙ্গীতের ধ্বনি আশ্লিষ্ট হইয়া আছে। শব্দ-চয়নের শক্তির পরিচয় আরো পাওয়া যায় তাঁহার ভূষণভূয়িষ্ঠ বহু কবিতা হইতে। দৃষ্টান্তস্বরূপ Cargoes নামক কবিতাটির মধ্যে অল্প কয়েক পংক্তিতে প্রাচীন কালের প্রাচ্যদেশের বাণিজ্যসম্ভারের বৈচিত্র্য, ঐশ্বর্য্য, সুগন্ধ যেন ঘন হইয়া রূপ পাইয়াছে।

Quinquereme of Nineveh from distant Ophir
Rowing home to haven in sunny Palestine,
With a cargo of ivory,
And apes and peacocks,
Sandalwood, cedarwood and sweet white wine.

সুদূর ওফির দেশ হইতে নিনেভের পাঁচতলা দাঁড় বসানো নৌকায় করিয়া সূর্য্যকরোজ্জ্বল প্যালেষ্টাইনের বন্দরে পৌঁছিল হস্তিদন্ত, বানর, চন্দন, দেবদারু, এবং মধুর শুভ্র মদ্য।

পাঠক সহসা মনে করিতে পারেন যে, ইহা তো কেবলমাত্র নামাবলী, ইহার মধ্যে আবার কবিকৃতিত্ব কোথায় আছে? এই পংক্তি কয়েকটির পার্শ্বে কবি কিপ্লিংএর The Merchentmen কবিতার কয়েক পংক্তি বসাইয়া তুলনা করিলে আমরা সহজে বুঝিতে পারিব যে, সঙ্গীত-প্রাণ শব্দ চয়নে কোন্ কবির দক্ষতা কত।

King Solomon drew merchantmen
Because of his desire
For peacocks, apes, and ivory,
From Tarshish unto Tyre:
With cedars out of Lebanon
Which Hiram rafted down,
But we be only sailormen
That use in London town.

উভয় কবিই একই ভাব প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু মেস্‌ফিল্ডের শব্দচয়নকৌশলে তাঁহার চিত্র কিপ্লিংকল্পিত চিত্র অপেক্ষা অনেক অধিক সুস্পষ্ট ও সুন্দর হইয়াছে।

ললিংডন ডাউন্‌স্ নামক সনেটপরম্পরায় কবি দেখাইয়াছেন—বিরাট অনন্ত অসীম এবং তাহার কণামাত্র মানবের মহিমাতুল্য মহনীয়। অসীম-সীমার মধ্যে ও সীমা-অসীমের মধ্যে পরস্পরের সাহচর্য্যে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। মৃত্যু সৌন্দর্য্য হরণে তৎপর, আর সৌন্দর্য্য অনন্তের অংশ বলিয়াই অমর। এক দিকে হয় তো দেখিতেছি

............when the hour has struck, comes
death or change,
Which, whether good or ill we cannot tell,
But the blind planet will wander through
her range
Bearing men like us who will serve as well.
The suns will rise, the winds that ever
move
Will blow our dust that once were men in
love.

যথাকালে পরিবর্ত্তন ও মৃত্যু আসে। তাহা ভালো কি মন্দ, আমরা জানি না, কিন্তু অন্ধ ধারণা তাহার নির্দ্দিষ্ট কথায় আমাদের মতন মরণশীল মানবদের বহন করিয়া পরিভ্রমণ করিবেই। দ্বাদশ আদিত্য লোকে লোকান্তরে উদিত হইবেই, বায়ু প্রবাহিত হইবেই—আমরা যাহারা একদিন প্রেমিক প্রেমিকা ছিলাম, সেই আমাদের ধূলা উড়াইয়া সমীরণ সমীরিত হইবেই।

আবার তাহার বিপরীত দিকও দেখিতে পাইতেছি—

Wherever beauty has been quick in clay
Some difference of it lives, a spirit dwells,
Beauty that death can never take away.

* * * * *

But the still grass, the leaves, the trembling
flower
Keep through dead time, that everlasting
hour.

ধরণীর ধূলায় যেখানেই সৌন্দর্য্য প্রাণ পাইয়াছে, সেখানেই তাহার আর একেবারে বিনাশ নাই, কোনো না কোনো আকারে তাহার পরিবর্ত্তিত রূপ বিদ্যমান থাকে, তাহার ভাবরূপ অবিনাশী, মৃত্যু সৌন্দর্য্যকে কখনও অপহরণ করিতে পারে না—নিথর নিস্পন্দ তৃণফলক, পত্র, প্রকম্পিত পুষ্প ভূতকালের ভিতর দিয়া সেই অনন্ত মুহূর্ত্তকে ধারণ করিয়া রাখে।

উপরের ঐ কয়েক পংক্তির সহিত পারস্যের সুফী কবি জামীর লেখা সৌন্দর্য্যবন্দনার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।

মেসফিল্ডের গীতিকবিতা গাথা সনেট উনবিংশ শতাব্দীর রোমান্টিক কবিদের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। তাঁহার কবিতার কাহিনী চসারের ক্যান্টারবেরী কাহিনীর কথা স্মরণ করায়। ঐ কাহিনীগুলিতে মানবজীবন মানবচরিত্র ও প্রকৃতির নিসর্গ শোভার বৈচিত্র্য চমৎকার বিশ্লেষিত হইয়াছে। তাঁহার এভারলাষ্টিং মার্সি নামক কাহিনীতে মাতাল অসৎসঙ্গী সল কেন্ (Saul Kane), the drunken, poaching boozing brute, যে কেমন করিয়া মনে সাধুসঙ্কল্প সঙ্কল্প করিয়া flower to men হইতে চাহিয়াছিল, এবং কিরূপে তাহার মনের পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল, তাহার বিবরণ আশ্চর্য্য সহানুভূতি ও অভিজ্ঞতার সহিত লিখিত হইয়াছে। কবির দরদ দেখিয়া মনে হয়, ঐ সল কেন্ হয় তো বা কবির নিরবচ্ছিন্ন কল্পনার সৃষ্টি নহে, ঐরূপ কোন অসৎসঙ্গে নষ্ট হতভাগা মাতালের সঙ্গে হয় তো কবির মদের দোকানে কাজ করার সময় আলাপ-পরিচয় হইয়াছিল। তিনি সেই মাতালটাকে দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, মানুষ স্বভাবতঃ সাধু, সে সৎপথেই থাকিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে চায়, কেবল সঙ্গদোষে ও অবস্থা-বৈগুণ্যে সে অধঃপাতে যায়, এবং সে তাহার দুর্দ্দশার জন্য অনুতাপ অনুভব করে এবং সুযোগ পাইলে আবার সাধু সচ্চরিত্র হইয়া উঠিতে তাহার সাধ যায়।

ঐ সল কেনের চরিত্র-পরিবর্ত্তনের ব্যাপার অপেক্ষা সলের সহচর ও পারিপার্শ্বিক নরনারীর চিত্রগুলিও কম চিত্তাকর্ষক নয়। সলের সঙ্গে কথা কহিয়াছিল বলিয়া যে রমণী তাহার ছেলেকে প্রহার করিয়াছিল, অথবা বিময়-বুদ্ধিসম্পন্ন বৃদ্ধ পুরোহিত ও তাহার রঙ্গভরা উপদেশ—

Meanwhile, my friend, 'twould be no sin
To mix more water in your gin.
We're neither saints nor Philip Sidneys,
But mortal men with mortal kidneys.........

ইতিমধ্যে, হে বন্ধু, মদে আর একটু বেশী জল মিশাইলে কত আর বেশী পাপ হইবে? আমরা কেহই সাধু পুরুষ নহি, আমরা কেহই দাতা কর্ণ বা সার সিডনী নহি, আমরা মর্ত্ত মানব, আমাদের মরিবার কামনাও কম প্রবল নয়।

কিংবা সেই তরুণ সমাজসেবক যে সলের মন্দ স্বভাব সংশোধন করিবার হেতু হইয়াছিল ও সলের কুকর্ম্ম করিবার নেশা ছুটাইয়া দিতে পারিয়াছিল, তাহারা এক এক জন জীবন্ত লোকের ন্যায় আমাদের সম্মুখে স্থাপিত হইয়াছে।

অনেক সময় মেস্‌ফিল্ডের কাহিনীর প্রধান চরিত্র অপেক্ষা আনুষঙ্গিক অপ্রধান কোনো কোনো চরিত্র অধিক জীবন্তভাবে চিত্রিত হইয়াছে।

The Widow in the Bye Street নামক কাহিনীতে মন্দ সংসর্গে পড়িয়া উচ্ছন্ন যাওয়া বালকটির ছবি, সল কেনের ধর্ম্মনিন্দার প্রতিবাদকর্ত্তা পাদ্রীর নস্য লওয়ার চিত্র, পাঠককে কম মুগ্ধ করে না। Dauber কাহিনীতে প্রধান চরিত্র খালাসী বালকের চিত্রকর হইবার দুরাশার চেয়ে সমুদ্রের বিস্ময়কর ও গৌরবময় ছবি অধিক চিত্তাকর্ষক। তাঁহার বর্ণনাপটু প্রতিভা মনস্তত্ব অপেক্ষা বিষয়ের বর্ণনাতেই অধিক কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। তাহাতে তাঁহার কাহিনীগুলি আল্‌পনার চিত্রের মতন মনোহর হইয়াছে, এ যেন পারস্য দেশের কার্পেট, কত রং, কত প্যাটার্ণ, কত নক্সা তাতে আঁকা!

মেস্‌ফিল্ডের সূক্ষ্ম বিদ্রূপ করিবার ক্ষমতাও অসাধারণ। একটি অশিক্ষিতা অল্পবুদ্ধি সুন্দরী সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন,—

She had a wit for mockery
And sang mild, pretty, senseless songs
Of sunsets, Heav'n and lovers' wrongs,
Sweet to the Squire when he had dined.
A rosebud need not have a mind.
A lily is not sweet from learning.

তাঁহার ব্যঙ্গবিদ্রূপ করিবার বেশ শক্তি আছে। সে মৃদু মধুর অর্থশূন্য গান গায়, সূর্য্যের অস্তগমন, ভগবান বা প্রেমের বেদনা—যাহা হউক একটা কোনো বিষয় লইয়া। সে গান প্রচুর আহারতৃপ্ত জমিদার মহাশয়ের বেশ মধুরই লাগে। গোলাপকুঁড়ির নাই বা থাকিল মনের বালাই, কমল তো আর বিদ্যার জন্য মধুর নয়?

রেনার্ড দি ফক্স নামক কবিতার মধ্যে এইরূপ বহু লোকের চিত্র আছে, তাহারা যেন সাধারণ ইংরেজ নরনারীর হুবহু ছবি।

ডবার নামক কাব্যে সমুদ্রের যে মহিমান্বিত বর্ণনা আছে, তাহার তুল্য বর্ণনা সাহিত্যে নিতান্তই দুর্লভ। রেনার্ড দি ফক্স কাব্যে, ইংলণ্ডের গ্রাম্য দৃশ্যের বর্ণনাও নিপুণ দৃষ্টিতে দেখিয়া লেখা হইয়াছে।

Catkins were out; the day seemed tense.
It was so still. At every fence
Cow-parsely pushed its thin green fern.
White violet leaves showed at the burn.

বিড়ালল্যাজ ফুল ফুটিয়াছে, দিবস এমন স্তব্ধ যেন জমাট ঠাসা। বেড়ায় বেড়ায় গোপুচ্ছ ফুলের ঝালর ঝুলিতেছে। ভায়োলেট ফুলের পাতার শুভ্রতা নদীর ধারে দেখা দিয়াছে।

উপরে উদ্ধৃত বর্ণনা যাহার, তিনি যে সর্ব্ব প্রাণমন দিয়া প্রকৃতি-শোভা অনুভব করেন ও নিসর্গশোভার সকল কিছুই তাঁহাকে মুগ্ধ করে, তুচ্ছতমও যে তাঁহার দৃষ্টিতে মহিমা প্রকাশ করে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এমন বর্ণনা আমরা পদে পদে পাই।

Wind-bitten beech with badger barrows,
Where brocks eat wasp-grubs with their marrows,
And foxes lie on short-grassed turf,
Nose between paws, to hear the surf
Of wind in the beeches drowsily.

বায়ুতাড়িত বীচ গাছের গায়ে খটাসের কোটর, সেখানে খটাসে বোলতার বাচ্চার মেদমজ্জা চর্ব্বণ করে, শৃগাল নরম ঘাসের চামড়ার উপর পায়ের থাবার মধ্যে নাক রাখিয়া শুইয়া ঝিমাইতে ঝিমাইতে বীচ গাছের পাতার ভিতর বাতাসের সন্‌সনানি শুনিতেছে।

যে ছোকরা, চিত্রকর হইবার দুরাশার বশবর্ত্তী হইয়া, জাহাজের গায়ে রঙের পোঁচড়া দিবার কাজ লইয়া দুধের সাধ ঘোলেও নয়, দ্রোণাচার্য্যের মতন খড়িগোলা জলে মিটাইতে বাধ্য হইয়াছিল, এবং অবশেষে এক দিন মাস্তলের উপর হইতে পড়িয়া গিয়া ভবযন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিল, তাহার বিপৎসঙ্কুল করুণ কাহিনী আমরা ভুলিয়া যাইতে পারি, কিন্তু সমুদ্রযাত্রার নানা ছবি আমাদের মনে মুদ্রিত হইয়া থাকে।

They lost the Trades soon after; then came calm,
Light little gusts and rain, which soon increased
To glorious northers shouting out a psalm
At seeing the bright blue water silver fleeced;
Hornwards she rushed, trampling the seas to yeast............

Out of the air a time of quiet came,
Calm fell upon the heaven like a drowth;
The brass sky watched the brassy water flame.
Drowsed as a snail the clipper loitered south
Slowly, with no white bone across her mouth;
No rushing glory, like a queen made bold,
The Dauber strove to draw her as she rolled.

* * * * *

Mournful, and then again mournful, and still
Out of the night that mighty voice arose;
The Dauber at his foghorn felt the thrill.
Who rode that desolate sea? What forms were those?
Mournful, from things defeated, in the throes
Of memory of some conquered hunting-ground,
Out of the night of death arose the sound.

তাহারা বাণিজ্যবায়ু আর পাইল না। তাহার পরে সব থমথমে হইয়া অনতিপ্রবল দমকা বাতাস বহিতে লাগিল, বৃষ্টি আসিল, তাহা শীঘ্রই জমকালো কালবৈশাখীর ঝড় হইয়া উঠিল এবং উজ্জ্বল নীল জলে শুভ্র ফেনপুঞ্জ দেখিয়া বন্দনা গান জুড়িয়া দিল। জাহাজ পাশ ফিরিয়া ছুটিয়া চলিল, সমুদ্রকে মথন করিয়া তুলা ধুনিয়া গাঁজাফেনা উপ্‌চাইয়া।...আবার শান্ত সময় ফিরিয়া আসিল, আকাশে যেন অনাবৃষ্টির শুষ্কতা বিরাজ করিতে লাগিল। পিঙ্গলবর্ণ আকাশ পিঙ্গল জলের উজ্জ্বল কান্তি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। একটা তন্দ্রাতুর শামুকের মতন মন্থর গতিতে জাহাজ দক্ষিণমুখে চলিল...জাহাজ যখন দোল খাইয়া টাল খাইতেছিল, তখন সেই রংরাজ তাহাকে দড়াদড়ি করিয়া স্থির করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।...সমুদ্রের বিভীষিকাময়ী রাত্রির ও কোয়াসায় আচ্ছন্ন ঝটিকাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের ছবি কবির নিজের চোখে দেখিয়া অঙ্কিত।

অবশেষে সেই পালতোলা জাহাজ বহু বিপদ উত্তীর্ণ হইয়া এক বন্দরে প্রবেশ করিল। আমরাও যেন নাবিকদের সহিত মনে মনে ভ্রমণ সমাধা করিয়া বিপদে উদ্বেগ ও বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হওয়ার আনন্দ অনুভব করিতে করিতে বন্দরের নিরাপদ ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

And then the night fell dark, and all night long
The pointed mountain pointed at the stars

* * * * *

Then the sun's coming turned the peak to blood,
And in the rest-house the muleteers arose.
And all day long, where only the eagle goes,
Stones, loosened by the sun, fall; the stones falling
Fill empty gorge on gorge with echoes calling.

রাত্রি অন্ধকার হইয়া আসিল, এবং সারারাত্রি স্থচালো পর্ব্বতশিখর নক্ষত্রের দিকে চাহিয়া রহিয়া সূর্য্যোদয়ে রক্তাভ হইয়া উঠিল। সরাইখানায় বলদিয়ারা জাগিয়া উঠিয়া যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিল। উচ্চ পর্ব্বতচূড়ায় যেখানে কেবলমাত্র ঈগল পাখী যাইতে পারে, সেখান হইতে রৌদ্রতাপে আল্‌গা হইয়া সমস্ত দিন ধরিয়া পাথর খসিয়া খসিয়া পড়ে। স্খলিত শিলার পতনশব্দ পাহাড়ের দরী-গুহা প্রতিধ্বনিতে পূর্ণ করিয়া তোলে।

এই যে শান্ত সমাপ্তি, তাহা যেন সমস্ত মানব-জীবনের দুঃখ-দৈন্তের সহিত সংগ্রামের পর মৃত্যুর শান্ত ক্রোড়ে বিশ্রামলাভের রূপক ছবি বলিয়া মনে হয়।

মানবের জীবনযাত্রা যেন অজ্ঞাত সমুদ্রে তরী ভাসাইয়া কূলের সন্ধানে ঘুরিয়া মরা। মেস্‌ফিল্ডের এই কাব্য আমাদিগকে এক নিরুপদ্রব শান্ত সমাপ্তিতে পৌছাইয়া দেয়, কিন্তু নিপুণ শিল্পী কবি তাঁহার সুসঙ্গত শব্দ-চয়ন আর যথাযথ ভাববিন্যাসের দ্বারা এমন বিমোহিত করিয়া রাখেন, যেন আমরা পথক্লেশ কিছুমাত্র জানিতে পারি না। কবির নিজের কথাতেই বলিতে ইচ্ছা হয়, তাঁহার কাব্য পাঠ করিতে করিতে Beauty in the heart breaks like a flower. সৌন্দর্য্য ফুলের মতন অন্তরে ফুটিয়া উঠে।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিবেকানন্দ

এক পারে অনাচার, ব্যভিচার, ক্লীবতা, মূঢ়তা,
ধর্ম্মের দোহাই দিয়া মহাপাপ, খলতা, ক্রূরতা,
শ্মশানকুকুরসম ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়ে কোলাহল,
ভেদাভেদ দ্বন্দ্বদ্বেষে বিদলিত আত্মার মঙ্গল।

অন্য পারে পশুবলগর্ব্বোদ্ধত রজোদৃপ্ত জাতি,
স্রষ্টারেও তুচ্ছ গণে বৈজ্ঞানিক তেজোমদে মাতি;
বিশ্বেরে বঞ্চিত করি, লেলিহান লোল লালসায়,
ইহেরে সর্ব্বস্ব গণি আত্মসুখ ভোগ শুধু চায়।

মাঝখানে দাঁড়াইয়া দীর্ঘশ্বাস তেয়াগিলে, বীর,
গর্জ্জিয়া উঠিলে বজ্রে, নেত্রে তব ধারাসারে নীর।
এই ত সংসার, হায়, এর মাঝে কোথা তব ঘর?
কোথায় জুড়াবে তব সে বিরাট ব্যথিত অন্তর,
দেখিলে দুদিকে চাহি কোথাও ত নাই তব ঠাঁই,
সর্ব্বত্যাগী হে বৈরাগী তুমি মুক্ত সন্ন্যাসী কি তাই?

সন্ন্যাসী সাজিলে বটে, পশিলে না জটিল গহনে?
বসিলে না ধুনী জ্বালি অষ্টসিদ্ধির সাধনে!
লইয়া মমতামুগ্ধ স্নিগ্ধ প্রেম-গদ্‌গদ হৃদয়,
কোথায় লুকাবে তুমি? আত্মমুক্তি তব কাম্য নয়।

চারিদিকে অসহায় আর্ত্ত নর ডাকে 'ত্রাহি ত্রাহি',
'জল জল', 'বুক ফাটে' 'প্রাণ যায়' 'দুটি অন্ন চাহি',
উঠে শুধু হাহাকার কোলাহল ব্যর্থ আর্ত্তনাদ,
কে শুনিবে? কে শোনাবে কৃপাসিক্ত অভয় সংবাদ?
তাহাদের বক্ষ পিষি বলোদ্ধত চালাইছে রথ,
তব দেশবাসিগণ ঘৃণাভরে ছেড়ে যায় পথ,
নাসায় বসন চাপি! ডাকে তোমা নরনারায়ণ,
ঐ জনারণ্যে তুমি তপস্যায় করিলে গমন।

ব্যথার অবধি নাই,—দুঃখ-দৈন্য অনন্ত অপার,
হাহাকার করি চিত্ত খুঁজে কোথা এর প্রতীকার?
লক্ষ আর্ত্ত শয্যা মাগে একখানি তোমার কম্বল,
কোথা অর্থ, কোথা পথ্য, কোথা শক্তি সহায় সম্বল?
জনতা দাঁড়ায়ে দেখে স্তব্ধ, অশ্রুসিন্ধুর বেলায়,
ভাসিতে লাগিলে একা সে অকূলে প্রেমের ভেলায়।

গৈরিকসম্বল যোগী, যত দুঃখ করিতে হরণ
পারনি, সকলি নিজে একে একে করিলে বরণ,
পুঞ্জীভূত সে বেদনা মৃত্যুসম হইল জীবনে,
প্রাণপণে দিলে ডাক শ্রুতিহীন দেশবাসিগণে।
টলিল সে বেদনায় বিধাতার উদাসী হৃদয়
মুক্তি তোমা দিল তাই,—হে সাধক মৃত্যু তব নয়।

চ'লে গেছ শূরবর, চলিতেছে তোমার সংগ্রাম,
সাধনা কি ব্যর্থ হবে? পূরিবে না তব মনস্কাম?
ভূমার সাফল্য-পথে বিরাটের কোথা পরাজয়?
তোমার আদর্শমন্ত্র লক্ষ রূপ করেছে আশ্রয়।
থামিবে না যাত্রাপথে, আগাইয়া আসে সফলতা—
মধ্যপথে আলিঙ্গনে তাহাদের মিলিবার কথা।

পশুবলদৃপ্ত যারা মন্ত্রমুগ্ধ কেশরীর মত
জগদ্ধাত্রী মাতৃশক্তিপদতলে হবে অবনত।
আজ যারা মূঢ় দীন কাপুরুষ পতিত লাঞ্ছিত,
জয়শ্রী লভিবে তারা মনুষ্যত্বে হইবে মণ্ডিত।
যেই দিন ক্লৈব্য গ্লানি ভীরুতার হইবে বিলয়,
স্বর্গে রও, ব্রহ্মে রও,—জানিব সে তোমারি বিজয়।

শ্রীকালিদাস রায়।

কৃত্তিবাস

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

কৃত্তিবাস কোথায় কোন্ রাজার দরবারে উপস্থিত হইয়া রামায়ণ রচনার আদেশ পাইয়াছিলেন, এক্ষণে তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে। আত্মবিবরণে কৃত্তিবাস রাজার যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে পরাক্রান্ত হিন্দু রাজা বলিয়াই মনে হয়।

"নয় দেউড়ী পার হয়ে গেলাম দরবারে।
সিংহ সম দেখি রাজা সিংহাসনোপরে॥"

তিনি আবার পঞ্চগৌড়ের অধীশ্বর।

"পঞ্চগৌড় চাপিয়া গৌড়েশ্বর রাজা।
গৌড়েশ্বরে পূজা কৈলে গুণের হয় পূজা॥"

পঞ্চগৌড় বলিতে সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়, মিথিলা ও উৎকল বিন্ধ্যপর্ব্বতের উত্তরে অবস্থিত এই পঞ্চ প্রদেশ বুঝায়। এ সময়ে অবশ্য এই বিশাল জনপদের অধীশ্বর কাহাকে দেখা যায় না। তবে কৃত্তিবাসের গৌড়েশ্বর যে এক বিস্তৃত রাজ্যের অধিপতি ছিলেন, 'পঞ্চ গৌড় চাপিয়া গৌড়েশ্বর রাজা' কথা হইতে তাহা বুঝা যাইতেছে। ইঁহার পাত্র মিত্র সকলেই হিন্দু, তাঁহাদের নাম হইতে তাহা জানা যায়। কবিকে পুষ্পমাল্য প্রদান, তাঁহার মস্তকে চন্দনের ছড়া ঢালা এ সকলই হিন্দু প্রথা। * রাজা আবার তাঁহাকে রামায়ণ রচনা করিতে আদেশ দিতেছেন। সুতরাং এ সকল হইতে তাঁহাকে হিন্দু বলিয়াই জানা যাইতেছে। তাহা হইলে এ হিন্দু রাজা কে? অবশ্য কৃত্তিবাসের কথা অনুসারে ইঁহাকে গৌড়েশ্বর বলিয়া মনে করিতে হইবে।

মুসলমানগণ কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয় ও গৌড় বা লক্ষ্মণাবতীতে রাজধানী স্থাপনের পর আমরা রাজা গণেশ, মহেন্দ্রদেব ও দনুজমর্দ্দনদেব এই তিন জন হিন্দু রাজাকে গৌড়ের সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখিতে পাই, ইঁহাদের মধ্যে গণেশের সিংহাসনে আরোহণ করা সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক আছে। * গণেশের পুত্র যদু মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া জালাল উদ্দীন মহম্মদ শাহ উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাতে হিন্দু ভাবের অভাব। এক্ষণে এই তিন জনের মধ্যে কাহার দরবারে কৃত্তিবাস উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহা লইয়াই কথা। কৃত্তিবাস যে গৌড়ের হিন্দু রাজার দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার আত্মবিবরণ হইতে জানা যাইতেছে। আর এই তিন জন হিন্দু রাজাই গৌড়েশ্বর হইয়াছিলেন। গণেশের কথা কোন কোন হিন্দু গ্রন্থে ও মুসলমান ইতিহাসে লিখিত আছে। আর মহেন্দ্রদেব ও দনুজমর্দ্দনের কথা তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত মুদ্রা হইতে জানিতে পারা যায়। কোন কোন কুলগ্রন্থেও তাঁহাদের কথা আছে। আবার এরূপ একটি কথাও শুনিতে পাওয়া যায় যে, মহেন্দ্রদেব ও দনুজমর্দ্দনের কোনই অস্তিত্ব ছিল না। গণেশ দনুজমর্দ্দন ও তাঁহার পুত্র যদু মহেন্দ্রদেব উপাধি ধারণ করিয়া মুদ্রা অঙ্কিত করাইয়াছিলেন। তাহাই বা কতদূর সঙ্গত হইতে পারে, আমরা তাহারও আলোচনা করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিব। প্রথমে আমরা গণেশের কথাই বলিতেছি।

---

* কেদার খাঁ উপাধি দেখিয়া দীনেশচন্দ্র রাজার সভায় মুসলমানী প্রথা ছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কেদার খাঁ এই গৌড়েশ্বরের নিকট হইতে যে খাঁ উপাধি পাইয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না। পূর্ব্বে কাহারও নিকট হইতে তাহা পাইয়া থাকিতে পারেন। ফলতঃ এই গৌড়েশ্বরের সভায় হিন্দু প্রথারই পরিচয় পাওয়া যায়।

* দীনেশচন্দ্র লিখিতেছেন—মুসলমান বিজয়ের পর একমাত্র রাজা গণেশ গৌড়ের সিংহাসনে আসীন হইয়াছিলেন; সে কথা ঠিক নহে। মহেন্দ্রদেব ও দনুজমর্দ্দনও যে গৌড়েশ্বর হইয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত মুদ্রাই তাহার প্রমাণ। গণেশ সিংহাসনে বসিয়াছিলেন কি না, সে সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক আছে, কিন্তু মহেন্দ্রদেব ও দনুজমর্দ্দন সম্বন্ধে সে কথা বলা যায় না। গণেশ ও দনুজমর্দ্দনের অভিন্নত্ব সম্বন্ধে যে একটা মত প্রচলিত আছে, দীনেশচন্দ্র অবশ্য তাহার পক্ষপাতী নহেন। কারণ, তাঁহার মতে গণেশ ১৩৯৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন, পূর্ব্বে তিনি ১৩৯৮—১৪০৮ পর্য্যন্ত গণেশের রাজত্বকালের কথা বলিয়াছিলেন। মহেন্দ্রদেব ও দনুজমর্দ্দনের সময় ১৪১৭-১৮ খৃঃ অব্দ, তাঁহাদের মুদ্রা হইতে তাহা জানা যায়। শাস্ত্রী মহাশয় গৌড়ের সুলতান কর্ত্তৃক কৃত্তিবাসের অভ্যর্থনার কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু এ সুলতান যে মুসলমান নহেন, হিন্দু, তাহা অবশ্য আত্মবিবরণ হইতে বুঝা যায়। কেহ কেহ যে কৃত্তিবাসের কথিত গৌড়েশ্বরকে রাজা কংসনারায়ণ বলিয়াছেন, তাহা সম্ভব হইতে পারে না। কংসনারায়ণ এক জন জমীদার মাত্র, আর তিনি বহুপরবর্ত্তী।

গণেশ দিনাজপুরের রাজা ছিলেন। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ তাঁহাকে ভাতুড়িয়ার জমীদার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থ। কেহ কেহ তাঁহাকে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকেন, কিন্তু তাহার প্রমাণাভাব। গণেশ গৌড়ের সুলতানের দরবারে রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, ক্রমে ক্রমে তিনি প্রাধান্যলাভ করেন। ইলিয়াসবংশীয় সুলতান সমসউদ্দীনকে নিহত করিয়া গণেশ গৌড়ের সিংহাসনে উপবিষ্ট হন বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। এরূপও শুনা যায় যে, তাঁহার চক্রান্তে সমস্উদ্দীনের পিতামহ আজমশাহও নিহত হইয়াছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান গ্রন্থে মুসলমান সুলতানকে নিহত করিয়া গণেশের সিংহাসনে আরোহণের কথা আছে। কিন্তু মুদ্রাতত্ত্ব অনুসারে তাহাতে সন্দেহ উপস্থিত হয়। এক্ষণে গণেশ কোন সময়ে রাজা হইয়াছিলেন বা প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন আর কোন্ সময়ে তাঁহার দেহত্যাগ ঘটে, আমরা তাহার আলোচনা করিব। তাহারই সহিত এ প্রবন্ধের বিশেষ সম্বন্ধ।

গণেশের সময় সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত। রিয়াজুস সালাতীনের মতে ৭৮৮ হিজরী বা ১৩৮৬ খৃষ্টাব্দে গণেশের রাজত্বলাভ ও সাত বৎসর রাজত্ব। ঐতিহাসিক ষ্টুয়ার্ট ৭৮৭ হিঃ বা ১৩৮৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রাজত্ব আরম্ভ ও সাত বৎসর রাজত্বের কথা লিখিয়াছেন। তাহা হইলে সালাতীনের মতে ১৩৯৩ খৃষ্টাব্দে ও ষ্টুয়ার্টের মতে ১৩৯২ খৃষ্টাব্দে গণেশের রাজত্ব শেষ হয়। নগেন্দ্রনাথ বসু ১৩৮৫ খৃষ্টাব্দে গণেশের রাজত্ব আরম্ভ বলেন। দীনেশচন্দ্রের মতে ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে গণেশের রাজত্ব শেষ। পূর্ব্বে তিনি ১৩৯৮—১৪০৮ গণেশের রাজত্বকালের কথা বলিয়াছিলেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪১৪ খৃষ্টাব্দে গণেশের মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করেন। নলিনীকান্ত ভট্টশালী ও যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ১৪১৭ খৃষ্টাব্দে গণেশের রাজপদবী গ্রহণের সময় বলিতে চান এবং ইঁহারা গণেশ ও দনুজমর্দ্দনকে অভিন্ন মনে করেন। আবার কৃষ্ণদাসের বাল্যলীলাসূত্র নামক গ্রন্থানুসারে—

"গ্রহপক্ষাক্ষিশশধৃতিমতে শাকে সুবুদ্ধিমান্।
গণেশো যবনং জিত্বা গৌড়ৈকচ্ছত্রধৃগভূৎ॥"

অর্থাৎ ১৩২৯ শকে গণেশ যবনদিগকে জয় করিয়া গৌড়ের একচ্ছত্রত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ১৩২৯ শক ১৪০৭ খৃষ্টাব্দ। এই সকল মতের কোন্‌টি মানিয়া লওয়া যায়, আমরা তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব।

গৌড়ের সুলতানদিগের মুদ্রা আলোচনা করিলে জানা যায়, ৮১২ হিঃ বা ১৪০৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ৮১৭ হিঃ বা ১৪১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শাহাবউদ্দীন বায়জিদ শাহের নামে মুদ্রা অঙ্কিত হইয়াছিল, এবং অল্পদিনের জন্য আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহের নামেও মুদ্রা প্রচলিত হয়। তাহার পর ৮১৮ হিঃ ১৪১৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ৮৩৪ হিঃ বা ১৪৩১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জালালউদ্দীন মহম্মদ শাহের নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচলিত হয়। এই কয় বৎসরের মধ্যে ৮২০—৮২১ হিঃ ১৪১৭—১৪১৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার নামাঙ্কিত কোন মুদ্রা দেখা যায় না। ঐ দুই বৎসরে ১৩৩৯ ও ৪০ শকে মহেন্দ্রদেব ও দনুজমর্দ্দনদেবের প্রবর্ত্তিত মুদ্রার কথা জানা গিয়া থাকে। জালালউদ্দীন মহম্মদ শাহ গণেশের পুত্র যদুর মুসলমান উপাধি। তিনি যে মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ১৪১৫ খৃষ্টাব্দ হইতে তাঁহার রাজত্ব আরম্ভ হইলে ১৪১৪ খৃষ্টাব্দে গণেশের দেহত্যাগের কথা ধরিয়া লইতে হয়। রিয়াজুস সালাতীন তব—কাৎ-আকবরী, তারিখ-ই—ফেরেশ্‌তা এবং ষ্টুয়ার্টের মতে রাজা গণেশ ৭ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহা হইলে ১৪০৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রাজত্ব আরম্ভ হয়। কৃষ্ণদাসের বাল্যলীলাসূত্রে আমরা দেখিতেছি যে, ১৩২৯ শকে গণেশ গৌড়ের একচ্ছত্রত্ব লাভ করেন। ১৩২৯ শকই ১৪০৭ খৃষ্টাব্দ। এক্ষণে আলোচনা দ্বারা গণেশ যে ১৪০৭ খৃষ্টাব্দে রাজা হইয়া বা প্রাধান্য লাভ করিয়া ১৪১৪ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, ইহাই সমীচীন বলিয়া মনে হইতেছে।

এক্ষণে গণেশ রাজপদবী গ্রহণ করিয়াছিলেন কি মুসলমান সুলতানদিগকে ক্রীড়াপুত্তলস্বরূপ রাখিয়া প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিলেন, আমরা তাহারই আলোচনা করিতেছি। গণেশ যদি বাস্তবিক নিজে রাজা হইয়া থাকেন এবং ১৪০৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪১৭ পর্য্যন্ত তাঁহার রাজত্বকাল হয়, তাহা হইলে ইহার মধ্যে কিন্তু শাহাবউদ্দীন বায়জিদ শাহের এবং আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহের নামাঙ্কিত মুদ্রা দেখা যাইতেছে। কারণ, ৮১২ হিঃ হইতে ৮১৭ হিঃ ১৪০৯—১৪১৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শাহাবউদ্দীন বায়জিদ

শাহের মুদ্রা অঙ্কিত হইয়াছিল; এবং অল্পদিনের জন্য আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহের নামাঙ্কিত মুদ্রাও প্রচলিত হয়। তাহা হইলে উক্ত সময়ে কি করিয়া গণেশের রাজত্ব হইতে পারে? অবশ্য শাহাবউদ্দীন বায়জিদ শাহ কে, তাহা লইয়াও গোলযোগ আছে। ব্লকম্যানের মতে গণেশ রাজপদবী গ্রহণ করেন নাই, তিনি শাহাবউদ্দীন বায়জিদ শাহ নামে জনৈক মুসলমানকে সিংহাসনে বসাইয়া নিজে রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। রিয়াজুস সালাতীন অনুসারে শাহাবউদ্দীন সুলতান সমস্উদ্দীনের নামান্তর। রাখালদাস বলেন, গণেশ মুসলমানগণের প্রীত্যর্থে হিন্দু থাকিয়াও হয় ত শাহাবউদ্দীন বায়জিদ শাহ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি গণেশের রাজপদবী গ্রহণ সম্বন্ধেও সন্দেহ করেন। সম্প্রতি বায়জিদ শাহের পুত্র আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহের নামাঙ্কিত কয়েকটি মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া, শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী জানাইতেছেন। তাহা হইলে বায়জিদ শাহ ও ফিরোজ শাহ এই দুই জনই গণেশের ক্রীড়াপুত্তল ছিলেন। তাঁহার আর বায়জিদ শাহ উপাধি গ্রহণ স্বীকার করা যায় না। হিন্দু ও মুসলমান গ্রন্থকারগণের উক্তি অনুসারে গণেশ গৌড়ের সুলতানকে নিহত করিয়া রাজা হইয়াছিলেন, কিন্তু বায়জিদ শাহ ও ফিরোজ শাহের মুদ্রা হইতে গণেশের রাজপদবী-গ্রহণ সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। তবে তিনি যে সে সময়ে গৌড়রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।—গণেশ নিজেই শাহাবউদ্দীন বায়জিদ শাহ উপাধি ধারণ করিয়া সেই নামে মুদ্রা প্রচার করিয়াছিলেন, অথবা শাহাবউদ্দীন বায়জিদ শাহ ও আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ নামে মুসলমানদ্বয়কে ক্রীড়াপুত্তলরূপে সিংহাসনে বসাইয়া তাহাদের নামেই মুদ্রা অঙ্কিত করিয়াছিলেন, তাহাতে গণেশের সময় সম্বন্ধে কোনই গোলযোগ ঘটে না।

এইবার আমরা মহেন্দ্রদেব ও দনুজমর্দ্দন সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি। আমরা বলিয়াছি, মহেন্দ্রদেব ও দনুজমর্দ্দনের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়া তাঁহাদের কথা জানাইয়া দিয়াছে। কোন কোন কুলগ্রন্থেও তাঁহাদের উল্লেখ আছে। ১৩৩৯ ও ৪০ শকে মুদ্রিত মহেন্দ্রদেব ও দনুজমর্দ্দনদেবের অনেকগুলি মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। মুদ্রার এক দিকে তাঁহাদের নাম ও অন্য দিকে 'চণ্ডীচরণপরায়ণ' লিখিত আছে। মুদ্রাগুলি পাণ্ডুনগর, চাটিগ্রাম ও সুবর্ণগ্রাম হইতে মুদ্রিত। মহেন্দ্রদেবের মুদ্রার মধ্যে প্রায় সমস্তই ১৩৪০ শকে এবং দনুজমর্দ্দনের অধিকাংশই ১৩৩৯ শকে মুদ্রিত। তবে ১৩৪০ শকে অঙ্কিত দনুজমর্দ্দনদেবের মুদ্রাও আবিষ্কৃত হইয়াছে। পাণ্ডুনগরে মুদ্রিত মহেন্দ্রদেবের একটি মুদ্রার সময় রাখালদাস ও রাধেশচন্দ্র শেঠ ১৩৩৬ শক পড়িয়াছিলেন। তাহার পরে রাখালদাস তাহাকে ১৩৩৯ বলিতেছেন। সুতরাং ১৩৩৯ শকে মহেন্দ্রদেবের মুদ্রাও অঙ্কিত হইয়াছিল। * ১৩৩৯-৪০ শক ১৪১৭-১৮ খৃঃ অব্দ। আমরা দেখাইয়াছি যে, ১৪১৫ খৃঃ অব্দ হইতে ১৪৩১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত যদু বা জালালউদ্দীন মহম্মদ শাহের যে মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে ১৪১৭-১৮ খৃঃ অব্দে অঙ্কিত কোন মুদ্রা দেখিতে পাওয়া যায় না। জালালউদ্দীন মহম্মদ শাহের আবিষ্কৃত মুদ্রার মধ্যে অনেকগুলি ফিরোজাবাদে মুদ্রিত, মহেন্দ্রদেব ও দনুজমর্দ্দনের কোন কোন মুদ্রাও পাণ্ডুনগরে মুদ্রিত। ফিরোজাবাদ এই পাণ্ডুনগর বা পাণ্ডুয়ার নামান্তর। তাহা হইলে কি এইরূপ অনুমান হয় না যে, জালালউদ্দীন মহম্মদ শাহ ১৪১৫ খৃঃ অব্দে রাজত্ব আরম্ভ করিয়া ১৪১৭-১৮ খৃঃ অব্দে মহেন্দ্রদেব ও দনুজমর্দ্দন কর্তৃক রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন? আবার ৮২২ হিজরীর মুদ্রিত তাঁহার মুদ্রা দেখিয়া কি বোধ হয় না, তিনি আবার ১৪১৯ খৃঃ অব্দ হইতে রাজত্ব আরম্ভ করিয়াছিলেন? ফলতঃ মহেন্দ্রদেব ও দনুজমর্দ্দন যে জালালউদ্দীন মহম্মদ শাহকে রাজ্যচ্যুত করিয়া ১৪১৭-১৮ খৃঃ অব্দে পাণ্ডুয়ায় রাজত্ব করিতেছিলেন, তাঁহাদের মুদ্রা হইতে তাহাই জানা যাইতেছে। আবার বটুভট্ট-রচিত দেববংশ † নামক

---

* মিষ্টার ষ্ট্যাপলটন মহেন্দ্রদেবের যে সকল মুদ্রা আবিষ্কৃত করিয়াছেন, তাহার অনেকগুলির এককের অঙ্ক কাটিয়া গিয়াছে। সেই জন্য রাখালদাস সেগুলিকে ১৩৪০-৪১ শকের মুদ্রা মনে করেন। কিন্তু ১৩৪০ শক বা ১৪১৮ খৃঃ অব্দের পরই ১৪১৯ খৃঃ অব্দ হইতে যখন জালালউদ্দীন মহম্মদশাহের মুদ্রা দেখা যাইতেছে, তখন ১৩৪০ শকের পর মহেন্দ্রদেবের কোন মুদ্রা অঙ্কিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

† দেববংশের একখানিমাত্র পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। পুঁথিখানি ১৬২২ শক বা ১৭০০ খৃঃ অব্দে লিখিত। রাখালদাস ইহার অক্ষর বহুপূর্ব্ববর্ত্তী স্থির করিয়া পুঁথিখানিকে জাল বলিয়াছিলেন। কিন্তু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাহাকে সপ্তদশ শতকেরই অক্ষর মনে করেন। তবে ইহার লিখিত ব্যাপারের ঐতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে যে গোলযোগ আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

কুলগ্রন্থে এ কথার আভাস পাওয়া যায়। তাহাতে লিখিত আছে,—

"দেবেন্দ্র-ক্ষিতীন্দ্র-দেবৌ শ্রীশ্রীচণ্ডীপরায়ণৌ।
রণচণ্ডী-প্রাসাদাত্তাবভূতাং পাণ্ড্যরাধিপৌ॥
জ্যেষ্ঠশ্রেষ্ঠরসসম্ভূতঃ শ্রীমহেন্দ্রদেবঃ কিল।
দনুজারিতুল্যোঽয়ঞ্চ যস্য কুলে স হি জাতঃ॥
যবনাংশ্চ দূরীকৃত্য কংসকুলং নিহত্য চ।
পাণ্ডাবাথ দেবারাজ্যমনেনৈব প্রতিষ্ঠিতম্॥
অথামুষ্মিন্ নিহতে চ যবনৈর্দুষ্টঘাতকৈঃ।
দনুজমর্দনদেবো রাজাভবৎ তস্যাত্মজঃ॥

ইহা হইতে জানা যাইতেছে, দেবেন্দ্র ও ক্ষিতীন্দ্রদেব পাণ্ডুনগরের অধিপতি হন। জ্যেষ্ঠ দেবেন্দ্রের পুত্র মহেন্দ্র যবনদিগকে দূরীভূত ও কংসকুল নিহত করিয়া পাণ্ডুনগরে দেবরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি যবন দুষ্টঘাতক কর্তৃক নিহত হইলে তাঁহার পুত্র দনুজমর্দ্দন রাজা হন। কংসকুল গণেশবংশ, গণেশের কংস নামও প্রচলিত আছে। বিশেষতঃ মুসলমান ঐতিহাসিকগণ তাঁহাকে ঐ নামেই অভিহিত করিয়াছেন। তবে মহেন্দ্রদেব কর্তৃক কংসকুল নিহত ও দেবেন্দ্র ক্ষিতীন্দ্রের পাণ্ডুনগরের অধিপতি হওয়া ইতিহাস-সম্মত নহে। সে যাহা হউক, ইহা হইতে মহেন্দ্র ও দনুজ-মর্দ্দনের সহিত গণেশবংশীয়দের সংঘর্ষের কথা বুঝা যাইতেছে।

মহেন্দ্রদেব ও দনুজমর্দ্দনদেবের মধ্যে কে পিতা ও কে পুত্র, তাহা লইয়াও মতভেদ আছে। দেববংশানুসারে মহেন্দ্রদেব পিতা ও দনুজমর্দ্দন পুত্র। রাখালদাস দনুজ-মর্দ্দনকে পিতা ও মহেন্দ্রদেবকে পুত্র বলিতে চান, প্রথমে তিনি মহেন্দ্রদেবকে পিতা বলিয়াছিলেন, পরে মতপরিবর্ত্তন করেন। নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ও মহেন্দ্রদেবকে পুত্র বলেন। *

১৩৩৯ ও ৪০ শকে দুই জনেরই নামাঙ্কিত মুদ্রা দেখা যাইতেছে। একই সময়ে দুই জনের নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচলনের কারণ বুঝা যায় না। ইহাতে দুই জনকে একই ব্যক্তি এবং তাঁহাদের একটি নাম ও অপরটি উপাধি মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু কুলগ্রন্থে যখন তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন নাম ও পিতাপুত্র-সম্বন্ধ দেখা যায়, তখন দুই জনকে স্বতন্ত্র মনে করাই উচিত। পিতাপুত্রের একসঙ্গে রাজত্ব পরিচালনা কোন কোন ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। মহেন্দ্রদেব ও দনুজমর্দ্দনের মধ্যে দনুজমর্দ্দনের পুত্র হওয়াই সম্ভব। কারণ, তাঁহার সহিত পরে চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল বলিয়া কুলগ্রন্থ হইতে জানা যায়। মহেন্দ্রদেব সম্বন্ধে কোন কথাই জানা যায় না। দেববংশে ও বঙ্গজ-কায়স্থগণের কুলগ্রন্থে দনুজমর্দ্দনদেব কর্তৃক চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের প্রতিষ্ঠার কথা আছে। দেববংশে পাণ্ডুনগরের দনুজমর্দ্দনকেই চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বলা হইয়াছে। আর অন্য কুলগ্রন্থে দনুজমর্দ্দন-দেব তাহার প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। দ্বিতীয় দনুজমর্দ্দন সম্বন্ধে যখন ঐতিহাসিক প্রমাণাভাব, তখন ঐ সকল গ্রন্থের দনুজমর্দ্দনও যে পাণ্ডুনগরের দনুজমর্দ্দন, ইহা মনে করা যাইতে পারে। আর দনুজমর্দ্দন ও গণেশ যে এক নহেন, তাহা তাঁহাদের সময় হইতে জানা যাইতেছে। যদু বা জালালউদ্দীনের ১৪১৫ খৃঃ অব্দ হইতে রাজত্বারম্ভ হইলে তাহার পূর্ব্বে অবশ্য গণেশের দেহত্যাগ ধরিয়া লইতে হয়। তাহার পর ১৪১৭-১৮ খৃঃ অব্দে মহেন্দ্রদেব ও দনুজমর্দ্দনের আবির্ভাব। তাহা হইলে গণেশ ও দনুজমর্দ্দন কিরূপে অভিন্ন হইতে পারেন? কাযেই উভয়কে স্বতন্ত্র বলিয়া মনে করাই সমীচীন।

এই তিন জন হিন্দু গৌড়েশ্বরের মধ্যে কাহার দরবারে কৃত্তিবাস উপস্থিত হইয়াছিলেন, আমরা এখন তাহারই আলোচনা করিব। ইহাদের মধ্যে গণেশের সভায় যে মুসলমান আদবকায়দা থাকা সম্ভব, তাহা তাঁহার বিষয় আলোচনা করিলে বুঝা যায়। গণেশের মৃত্যুর পর তাঁহার

* মহেন্দ্রদেবকে পুত্র বলার কারণ এই যে, তাঁহার অধিকাংশ মুদ্রাই ১৩৪০ শকে মুদ্রিত। কিন্তু রাখালদাস নিজে রাধেশচন্দ্র শেঠ কর্তৃক আবিষ্কৃত মুদ্রার প্রথমে ১৩৩৬, পরে ১৩৩৯ শক পাঠ করিয়াছেন। দশকের অঙ্কে যখন স্পষ্ট ৩ রহিয়াছে, তখন তাহা যে, ৪০এর পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। রাখালদাস এই মুদ্রার সম্বন্ধে বলিতেছেন যে, ১৩৩৯ শকে মহেন্দ্রদেব হয় ত পিতার বিদ্রোহী হইয়া নিজ নামে মুদ্রা অঙ্কিত করিয়াছিলেন। মহেন্দ্রদেব সম্বন্ধে সে কথা বলিলে, দনুজমর্দ্দন সম্বন্ধে তাহা বলা যাইবে না কেন? সুতরাং রাখালদাসের এরূপ যুক্তির যে কোনই মূল্য নাই, তাহা অবশ্য সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। আর ভট্টশালী মহাশয় রাধেশচন্দ্রের মুদ্রার উল্লেখ করিয়াছেন বটে. কিন্তু তাহার বৎসর সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই। রাখালদাস নিজে যখন তাহা পাঠ করিয়াছেন, তখন তাঁহার কথা যে বিশ্বাস-যোগ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই।

শব লইয়া দাহ ও কবর দেওয়া সম্বন্ধে হিন্দু-মুসলমানের বিবাদ তাহা সুস্পষ্টরূপে জানাইয়া দেয়। ফেরেশ্‌তা ও ষ্টুয়ার্ট সে কথার উল্লেখ করিয়াছেন। গণেশের মুসলমান উপপত্নী থাকার কথাও প্রচলিত আছে। তবে তাঁহার হিন্দু ধর্ম্ম ও শাস্ত্রের প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। আর গণেশের সিংহাসনে আরোহণ সম্বন্ধেও সন্দেহ আছে। কৃত্তিবাস যে গৌড়েশ্বরের সভাবর্ণনা করিয়াছেন, তিনি যে হিন্দু পাত্র-মিত্র লইয়া সিংহাসনে বসিয়াছিলেন এবং হিন্দু প্রথা অনুসারে কৃত্তিবাসকে সমাদর করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার আত্মবিবরণ হইতে সুস্পষ্টরূপেই জানা যাইতেছে। একমাত্র অমাত্য কেদার খাঁর উপাধিতে তাঁহার সভায় মুসলমান প্রভাব ছিল বলা যায় না। কেদার খাঁ অন্য কাহারও কর্ত্তৃক খাঁ উপাধি পাইতে পারেন, সে কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সুতরাং মহেন্দ্রদেব অথবা দনুজমর্দ্দনের মধ্যে কাহারও সভায় কৃত্তিবাস উপস্থিত হইয়াছিলেন বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়। দনুজমর্দ্দনের সভায় কৃত্তিবাস উপস্থিত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। আত্মবিবরণের 'সিংহসম দেখি রাজা সিংহাসনোপরে' কথা হইতে তাঁহাকে পরাক্রান্ত রাজা বলিয়াই মনে হইয়া থাকে। দেববংশে মহেন্দ্রদেব ও দনুজমর্দ্দনের মধ্যে দনুজমর্দ্দনকেই পরাক্রান্তরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। তাহাতে দনুজমর্দ্দন সম্বন্ধে লিখিত আছে,—

> "অয়ঞ্চ দেবপুঙ্গবঃ শাণ্ডিল্যকুলতিলকঃ।
> সমরকুশলশ্চৈব শস্ত্রবিদ্যাবিশারদঃ॥
> মহাবাহুর্ম্মহাশক্তো রণচণ্ডীপরায়ণঃ।
> চন্দ্রেণৈব দীক্ষিতোঽসৌ বন্দ্যকুলোদ্ভবেন চ॥
> দনুজান্ যবনান্ রাজা মর্দ্দয়িত্বা বিধর্ম্মিণঃ।
> হর্ষযুক্তোঽভবন্নিত্যং যোগসিদ্ধশ্চায়ং দেবঃ॥"

সুতরাং কৃত্তিবাসের দনুজমর্দ্দনের সভায় উপস্থিত হওয়াই সম্ভব।

জীব গোস্বামীর লঘুতোষিণীতে লিখিত আছে যে, জীবের প্রপিতামহ পদ্মনাভ রাজা দনুজমর্দ্দন কর্ত্তৃক নবহট্টে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুরুষোত্তম, জগন্নাথ, নারায়ণ, মুরারি ও মুকুন্দ নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। শ্রীযুত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বলেন যে, কৃত্তিবাস গৌড়েশ্বরের নারায়ণ ও মুকুন্দ নামে যে পাত্রদ্বয়ের কথা বলিয়াছেন, তাঁহারাই পদ্মনাভের পুত্র। আর ঘোষ মহাশয়ের মতে গণেশ ও দনুজমর্দ্দন অভিন্ন। * অবশ্য লঘুতোষিণীর উল্লিখিত রাজা দনুজমর্দ্দনকে আমরা গণেশ হইতে বিভিন্ন প্রসিদ্ধ রাজা দনুজমর্দ্দনই মনে করি। কিন্তু পদ্মনাভের পুত্র নারায়ণ ও মুকুন্দের তাঁহার অমাত্য হওয়ার সম্ভাবনা নাই। নগেন্দ্রনাথ বসুর বিশ্বকোষে জীব গোস্বামীর বংশতালিকায় ১৩০৮ শকে পদ্মনাভের জন্ম বলিয়া উল্লেখ আছে। তাহা হইলে ১৩৪০ শকে তাঁহার পুত্র নারায়ণ ও মুকুন্দের দনুজমর্দ্দনের অমাত্য হওয়ার সম্ভাবনা কোথায়? †

যদি দনুজমর্দ্দনই কৃত্তিবাস-বর্ণিত গৌড়েশ্বর হন, তাহা হইলে কৃত্তিবাসের সময়নির্ণয় সেরূপ কষ্টকর হয় না। কৃত্তিবাস দ্বাদশ বৎসরের সময় বিদ্যা-শিক্ষার জন্য বড়গঙ্গা-পারে যান। বিদ্যা-শিক্ষা করিতে যদি তাঁহার পাঁচ ছয় বৎসর ধরা যায়, তাহা হইলে ১৭।১৮ বৎসরে তিনি গৌড়েশ্বর-সভায় উপস্থিত হন। দনুজমর্দ্দনের সময় ১৪১৭-১৮ খৃষ্টাব্দ হওয়ায় ১৪০০ খৃষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী কোন সময়ে কৃত্তিবাসের জন্ম স্থির করা যাইতে পারে। সুতরাং বিদ্যানিধি মহাশয় জ্যোতিষিক প্রমাণে ১৪৩২ খৃষ্টাব্দে যে কৃত্তিবাসের জন্ম হয় বলিতেছেন, ঐতিহাসিক প্রমাণের সহিত তাহার ঐক্য হয় না। ১৪৩২ খৃষ্টাব্দে কৃত্তিবাসের জন্ম হইলে, তাঁহার অষ্টাদশ বর্ষ বয়সের সময় ১৪৫০ খৃষ্টাব্দে জালালউদ্দীন মহম্মদ শাহের পুত্র সমস্‌উদ্দীন আহম্মদ শাহ অথবা ইলিয়াস-বংশীয় নাসিরউদ্দীন মহম্মদ শাহ গৌড়ের সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন বলিয়া ইতিহাস হইতে জানা যায়। ইঁহারা অবশ্য হিন্দু রাজা বা হিন্দু প্রথার পক্ষপাতী ছিলেন না। ইহার বহু বৎসর পরে ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কবিগণের উৎসাহদাতা আলাউদ্দীন হোসেন শাহ গৌড়ের সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। সুতরাং আত্মবিবরণ অনুসারে কৃত্তিবাসের হিন্দু রাজার সভায় উপস্থিতি ধরিলে ১৪৩২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয় না।

---

* পঞ্চপুষ্প ১৩৩৭ শ্রাবণ—দনুজ রাজা।

† নগেন্দ্র বাবু কিন্তু পদ্মনাভের প্রপিতামহ জগদ্গুরুকে ১৩০৩ শকে কর্ণাটের রাজা ও তাঁহার পুত্র অনিরুদ্ধকে ১৩৩৮ শকে রাজা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। উহা সম্ভবতঃ ১২০৩ ও ১২৩৮ হইবে। তিনি ১৪৩৫ শকে মতান্তরে ১৪৪৫ শকে জীব গোস্বামীর জন্ম বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন। ১৩৩৫

আত্মবিবরণে 'পূর্ণ মাঘ মাস' কথাটিতে অবশ্য গোলযোগ বাধাইয়াছে। দীনেশচন্দ্র বলেন যে, 'পূর্ণ মাঘ মাস' স্থলে 'পুণ্য মাঘ মাস' হওয়া সম্ভব। তিনি বলেন যে, প্রাচীন পুঁথিতে 'ণ্য' 'র্ণ' মত লিখিত হইত। তাহা হইলে মাঘ মাসের সংক্রান্তিতে কৃত্তিবাসের জন্ম বলা যায় না। *

আর এক দিক হইতে কৃত্তিবাসের সময় স্থির করার চেষ্টা করা যাইতে পারে। প্রাচীন কুলগ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, ১৪০২ শকে ১৪৮০ খৃঃ অব্দে দেবীবর মিশ্রের মেল বন্ধ হয়। ১৪০৭ শকে বা ১৪৮৫ খৃঃ অব্দে লিখিত ধ্রুবানন্দ মিশ্রের মহাবংশে কৃত্তিবাসের ভ্রাতা মৃত্যুঞ্জয়ের পুত্র মালাধর হইতে মালাধর খানী মেলোৎপত্তির উল্লেখ আছে। ইহাতে বোধ হয়, ১৪৮০ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে কৃত্তিবাস ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের অবসান ঘটিয়াছিল। নতুবা তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া মালাধরের নামে কখনও মেল প্রবর্ত্তিত হইত না।

শকে জীব গোস্বামীর জন্ম হইলে ১৩০৮ শকে পদ্মনাভের জন্ম সম্ভব হইতে পারে।

* ১৩৩৭ সালের ১লা ফাল্গুনের দৈনিক বসুমতী পত্রিকায় দেখিলাম যে, এবারে বিগত ২৫শে মাঘ রবিবার মহাকবির জন্মদিনে রাণাঘাটের অন্তঃপাতী ফুলিয়া সমাজে কবির ভিটায় বাৎসরিক স্মৃতির উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই জন্মদিন অবশ্য জন্মতিথি নহে, কারণ, এবার ৯ই মাঘ শুক্রবার শ্রীপঞ্চমী বা সরস্বতীপূজা হইয়াছে। তাহা হইলে ২৫শে মাঘ কবির জন্মতারিখ হয়। এই ২৫শে মাঘ উৎসবকারিগণ কোথা হইতে স্থির করিলেন এবং তাঁহারা কবির জন্ম-শক স্থির করিতে পারিয়াছেন কি না, তাঁহাদিগকে লিখিয়া তাহা জানিতে পারি নাই।

কৃত্তিবাসের পুত্রপৌত্রাদির উল্লেখ দেখা যায় না। সম্ভবতঃ অল্পবয়সেই তাঁহার দেহত্যাগ হইয়াছিল। দীনেশচন্দ্র লিখিয়াছেন, রামায়ণের একখানি প্রাচীন অরণ্যকাণ্ডের পুঁথির ভণিতায় কথিত আছে, তিনি অরণ্যকাণ্ড লেখার সময়ই রোগজীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুতরাং তিনি দীর্ঘায়ু হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। দীনেশচন্দ্রের এ কথা সঙ্গত বলিয়াই বোধ হয়।

আমরা যেরূপ ভাবে আলোচনা করিলাম, তাহাতে কৃত্তিবাস খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জন্মগ্রহণ করিয়া পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই লোকান্তরিত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। আর তিনি যে রাজার সভায় উপস্থিত হইয়া রামায়ণ রচনার আদেশ পাইয়াছিলেন, তাঁহাকে পাণ্ডুনগরাধিপ গৌড়েশ্বর দনুজমর্দ্দনদেবই বলিয়া বোধ হয়। সে সময় পাণ্ডুনগরই গৌড়ের রাজধানী ছিল। ইলিয়াস শাহের সময় হইতে জালালউদ্দীন মহম্মদ শাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পণ্ডুনগর বা পাণ্ডুয়া গৌড়ের রাজধানী ছিল। ফিরোজাবাদ পাণ্ডুয়ার নামান্তর। জালালউদ্দীন মহম্মদ শাহ আবার গৌড়ে রাজধানী লইয়া আসেন। এ পর্য্যন্ত যে সকল প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, আমরা সেই সকল আলোচনা করিয়া কৃত্তিবাস সম্বন্ধে এইরূপই অনুমান করিতে পারি। ইহার পর যদি আরও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ আবিষ্কৃত হয়, তাহা হইলে তাহার উপর নির্ভর করিয়াই অবশ্য কৃত্তিবাস সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত স্থির হইবে।

শ্রীনিখিলনাথ রায়।

কদম্ব

কবি মোরে রেখেছে বাঁচায়ে
শুধু তার ছন্দে গানে হাসায়ে কাঁদায়ে
শত বাঙ্গালীর প্রাণ যুগান্তর ধরি,
বহায়ে ভাবের বন্যা আনন্দলহরী।
আজো মোর শতাব্দীর মৃত্যুর শিয়রে
মৃত্যু-সঞ্জীবনী সুধা ঝরিছে নির্ঝরে।

কবে কালা কোন্ কালে কালিন্দীর কূলে
বাঁশরী বাজায়েছিল কদম্বের মূলে,
কবে খেলেছিল খেলা মদনমোহন,
শাখে মোর ঝুলাইয়া গোপীর বসন,

দুলেছিল কবে শাখে পূর্ণিমা-ঝুলনা
সে স্মৃতি নূতন আজো, কি দিব তুলনা!
শ্যামের প্রেমের গান রবে যত দিন
তত দিন রব আমি বিলয়-বিহীন।

শ্রীবিজয়মাধব মণ্ডল (বি-এ)।

ধর্ম্মদাস

[দ্বিতীয় ভাগ]

পরিচ্ছেদ—এক

ধর্ম্মদাস যে বাড়ী ছাড়িয়া একবারে চলিয়া যাইতে পারে, এ কথা কেহই কোন দিন ভাবিতে পারে নাই। বিশেষ করিয়া শক্তিপ্রকাশ ইহা স্বপ্নেও কোন দিন চিন্তা করেন নাই।

এমনই করিয়াই মানুষের চিন্তা নিজের সুবিধার দিক্ দিয়া সহজের পথে চলিতে থাকে। তাই আমাদের অনুমান, ভবিষ্যতের সহিত না মিলিলে, আমরা প্রথমে হই বিস্মিত; ক্রমে বিফলতা বাড়িলে, মর্ম্মাহত হই; তাহার পর নিরুৎসাহ হইয়া অদৃষ্টের দোহাই দিয়া বলি, বলং বলং দৈববলং। দেবতার বল হয় ত মানুষের বলের অপেক্ষা অনেক বড়; সে সম্পর্কে কোন তর্কই উঠিতে পারে না। কারণ, যে মানুষই দেবতার অস্তিত্ব স্বীকার করে, সেই তাঁহাকে বড় বলিয়াই স্বীকার করে। যিনি বৃহৎ, মহান্, তিনি কেনই বা বার বার মানুষের চেষ্টাকে বিধ্বস্ত করিয়া দিবেন? অদৃষ্টের সহিত মানুষের সত্যই বিরোধ নাই; বিরোধ সেইখানে—যেখানে মানুষ নিজের দোষেই যতখানি দেখা উচিত, তাহা না দেখিয়া চলে। অবশ্য সে দেখার সীমা থাকিয়াও মানুষের চেষ্টার বলে অপরিসীম বাড়িয়া চলিতে পারে।

শক্তিপ্রকাশ নিজের শিক্ষা-দীক্ষা জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে আশা করিতেন যে, পুত্ররাও তাঁহার মতই সত্যব্রত, কর্ত্তব্যপরায়ণ হইবে এবং তাহাদের আচরণে বিন্দুমাত্র ত্রুটি দেখিলে একবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিতেন।

সাবিত্রী দেবী মনে মনে জানিতেন, তাহা সম্ভবপর নহে; এবং বিরোধের স্থলে বুক দিয়া এক দিক রক্ষা করিতেন এবং পিঠ পাতিয়া দিতেন শক্তিপ্রকাশের দিকে। স্বামীর দুর্ব্বাক্য কি তাড়নাকে গ্রাহ্য করিলে সংসার অচল হয়, ইহা তিনি জানিতেন, সহ্য করিতেন; এবং সেই সহ্যশক্তির তুলনা ছিল না।

তাঁহার পুত্র হইয়া ধর্ম্মদাস কেন এমন করিবে, এই ছিল শক্তিপ্রকাশের অভিমান। ধর্ম্মদাস যে অপরিণতবয়স্ক বালক মাত্র, সবে যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে, এই কথাটি মনে করাইয়া দিবার লোক আর সে দিন এ সংসারে ছিল না।

শক্তিপ্রকাশ প্রথমে মনে করিলেন, মার খাইয়া ধর্ম্মদাস মামার বাড়ী গিয়াছে এবং দিন কতক পরে ফিরিয়া আসিবে। এমনই করিয়াই তাহার চৈতন্যোদয় হইবে।

কয়েক দিন কাটিয়া গেল। ধর্ম্মদাস ফিরিল না, কি তাহার সম্পর্কে কোন চিঠিপত্রও আসিল না।

শক্তিপ্রকাশ ক্রমে উদ্বিগ্ন হইতে লাগিলেন; ক্রোধ এবং অভিমান যেমন এক দিকে বাড়িয়া চলিল, অপর দিকে নিরাশা তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। অবশেষে তিনি শ্যালককে পত্র দিলেন। যথাসময়ে উত্তর আসিল, ধর্ম্মদাস তাঁহাদের বাড়ী যায় নাই।

তখন তিনি মনে করিলেন যে, একটা খোঁজ করা আবশ্যক।

প্রথমে ডাক পড়িল রামপ্রসাদের। সে যাহা জানিত এবং না জানিত, তাহা বলিল। তাহার মধ্যে নিজের দোষ যথাসাধ্য গোপন করিবার চেষ্টাই করিল। কারণ, বালক-বুদ্ধিতে সে মনে মনে ঠিক করিয়াছিল যে, তাহার প্রশ্ন-চুরি এই সকল বিভ্রাটের মূলে আছে। ধর্ম্মদাস মার খাইয়াছে, ঐ দোষে। পিতা যদি সত্য কথা জানিতে পারেন, তাহা হইলে কি তাহাকে আর আস্ত রাখিবেন?

কানাই বিশেষ কোন কথার উত্তর দিতে পারিল না। কথা কহিতে গেলেই সে কাঁদিতে থাকে। অগত্যা তাহাকেও ছাড়িয়া দিতে হয়।

স্কুলের হেডমাষ্টার ইতিমধ্যে কয়েকবার আসিয়াছিলেন। শক্তিপ্রকাশের বর্ণনা শুনিয়া তাঁহার নিঃসন্দেহ ধারণা জন্মিয়াছিল যে, ধর্ম্মদাস অভিমান করিয়া কাশী গিয়াছে—মামাদের নিকট।

সে দিন তিনি আবার আসিয়াছিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, ধর্ম্মদাস কবে ফিরছে?

শক্তিপ্রকাশ শ্যালকের চিঠি ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, দেখুন না, কাশীও সে যায় নি।

তবে? হেডমাষ্টার ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, একটা খোঁজ-খবর করা যে দরকার!

শক্তিপ্রকাশের মনে বহুবার এই কথাই জাগিয়াছিল;

কিন্তু ঐ কথা শুনিতেই সহসা মন বাঁকিয়া গেল; তিনি সক্রোধে বলিলেন, অমন ছেলের মুখ-দর্শন করতে নেই। ওকে ঘরে ফিরিয়ে এনে লাভ? বংশের কলঙ্ক, শত্রুর কাছে আমার মাথা নীচু ক'রে দিয়েছে!

হেড মাষ্টার বলিলেন, কাঁচা বয়েস, উত্তেজনায় একটা কায ক'রে বসেছে; কিন্তু তাই ব'লে তাকে ক্ষমা করা যায় না, এমন ত আর নয়!

শক্তিপ্রকাশ বলিলেন, আমি তাকে তাড়িয়েও দিইনি, আর ফিরে এলে স্থান দেব না, তাও নয়। যদি কোন দিন সুবুদ্ধি হয়, ফিরে আসবে। খুঁজতে গেলে, ও সব বেয়াড়া ছেলের শুধু আসকারা বাড়িয়ে দেওয়া হবে মাত্র।

হেড মাষ্টার পিতার কঠোর পণ শুনিয়া মনে মনে স্তম্ভিত হইয়া গৃহে ফিরিলেন। তিনি জানিতেন যে, শক্তিপ্রকাশ অতিশয় কঠিন প্রকৃতির মানুষ; তবুও তাঁহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না।

এই কঠিন মনটির ভিতরে যে কি হইতেছিল, তাহা কেবল শক্তিপ্রকাশ জানিতেন নিজে। তাঁহার আহারে আর রুচি ছিল না, রাত্রিতে বোধ হয় দুই চক্ষু মুদ্রিত করিতে পারিতেন না। বুকে শক্তিশেলের মত নিষ্ঠুর আঘাত নিত্য বহন করিয়াও তিনি কিছুতেই আর ধর্ম্মদাসের নাম পর্য্যন্ত উচ্চারণ করিতেন না। তাহাকে খুঁজিবার জন্য লোক পাঠান, কি কোন ব্যবস্থা করা ত দূরের কথা!

এ কথা লইয়া তাঁহাকে পরামর্শ দিবারও কাহারও সাহস ছিল না। এক হেড মাষ্টারের কথা তিনি হয় ত কিছু শুনিতেন, আর সকলকে মানুষ বলিয়া গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিতেন না। আর জ্ঞাতিদের তিনি দেখিবামাত্র জ্বলিয়া উঠিতেন।

অতএব সমস্ত লোক পিতার অপূর্ব্ব কাঠিন্য দেখিয়া অবাক্ হইয়া রহিল; কিন্তু মনে মনে সকলেই চাহিল যে, ধর্ম্মদাস ফিরিয়া আসুক।

শক্তিপ্রকাশের কঠোর চরিত্রকে মানুষ শ্রদ্ধা না করিয়াও থাকিতে পারিত না। পাথর কঠিন, তাহা আমরা জানি; কিন্তু সেই পাথরের কাঠিন্যের জন্য কি মানুষ তাহার প্রভূত মূল্য দেয় না? সাত রাজার ধন এক মাণিক, কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাও কি পাথর নহে?

অচিরে কিন্তু লোকের এই বিস্ময় দুশ্চিন্তায় পরিণত হইল। শক্তিপ্রকাশ সাংঘাতিকরূপে পীড়িত হইয়া পড়িলেন। সকলেই বুঝিল যে, এত বড় ব্যথা বুকের মধ্যে গোপনে চাপিয়া রাখিতে গিয়া শক্তিপ্রকাশের আজ সেই বুক ধসিয়া পড়িবার মতই হইয়াছে।

দেশের মাথা! সকলেই চাহিল যে, তাঁহার প্রাণ-রক্ষা হয়।

উপযুক্ত ডাক্তার আসিল, গ্রামের লোকরা প্রাণপণ যত্নে সেবা করিতে লাগিল। শক্তিপ্রকাশ বিকারের ঝোঁকে কেবলই বলিতে লাগিলেন, বাবা, ধর্ম্মদাস! ফিরে আয়, ফিরে আয়! বাপের ওপর কি রাগ করতে আছে, ধন?

হেড মাষ্টার চতুর্দ্দিকে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়া দিলেন—

ধর্ম্মদাস! তোমার পিতা তোমার শোকে সাংঘাতিক-রূপে পীড়িত হইয়াছেন। এই বিজ্ঞাপন দেখিবামাত্র ফিরিয়া আসিবে। এক দিনের জন্যও বিলম্ব করিও না।

অধীর প্রতীক্ষায় লোক চাহিয়া রহিল, এই বুঝি ধর্ম্মদাস ফেরে, এই বুঝি ধর্ম্মদাস আসে।

হায় মানুষের ব্যর্থ আশা! ধর্ম্মদাস আসিল না।

শক্তিপ্রকাশ বাঁচিলেন। প্রায় দেড় মাস পরে তিনি বিছানায় উঠিয়া বসিলেন। কিন্তু ধর্ম্মদাসের কথা আর জিজ্ঞাসা করিলেন না। সকলের মনে হইল, রোগের যন্ত্রণায় মনের সে দিকটা ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে বুঝি!

পিতাকে আর বড় কেহ দোষ দিল না। বজ্র-বেষ্টনের মধ্যে যে ক্ষত, তাহার যে জ্বালা, তাহা জানিতে আর কাহারও বাকি ছিল না।

সকলে বলিল, ধন্যি ছেলে বাবা! বাপের ব্যাটা বটে!

শুধু এক জন লোক ধর্ম্মদাসকে ক্ষমা করিল; সে কানাই। সে জানিত যে, পিতার অসুখের সংবাদ জানিলে ধর্ম্মদাস আর কোথাও থাকিতে পারিবে না। সে পাত্র সে নয়!

লোকের নিন্দাবাদে তাহার দুই কর্ণ ভরিয়া যাইলেও নিভৃতে গোপনে কানাই কাঁদিয়া বলিত, হয় দাদাবাবু জান্‌তে পারেনি; নয় ত সে আর বেঁচে নেই। শেষের ভয়ে সে কাঁটা হইয়া যাইত।

—

পরিচ্ছেদ—দুই

ধর্ম্মদাস কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিবার স্থির-লক্ষ্য লইয়া পথে বাহির হয় নাই। যে পথে লোক-চলাচল অধিক, সে পথ হইতে ধরা পড়িবার ভয়ে সে, কেমন যেন, আপনি হইতে দূরে চলিয়া গেল।

মাঠের পর মাঠ পাকা ধানে পূর্ণ। দুই এক জন চাষী ক্ষেত্রের পাশে বসিয়া আছে। তাহারা বোধ হয় রাত্রিতে ধান-চুরির ভয়ে সারা রাত জাগিয়া পাহারা দিয়াছে। ধর্ম্মদাস তাহাদের দেখিল, কিন্তু মন দিয়া দেখিল না। মন তাহার চলিয়াছে তীব্রবেগে ছুটিয়া, পথ দেখিবার অবসর নাই। কোথায় যাইবে, সে কথা ভাবিয়া দেখিবার প্রয়োজন নাই। শুধু আগাইয়া যাওয়া, শুধু অপমান-লাঞ্ছনা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা।

তাহার দীর্ঘ-পথ চলার অভ্যাস নাই; মধ্যে মধ্যে বসিতেছিল; কিন্তু অন্য দিক হইতে লোক আসিতেছে দেখিলে সে উঠিয়া আবার পথ চলে। বসিয়া থাকিলে লোক জিজ্ঞাসা করে, কোথা যাবে? তখনই তাহার বিপদ, সে জানে না, কোথায় যাইবে। ভাল রকম কৈফিয়ৎ না দিলে লোক সন্দেহের দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে। বলে, বাড়ী থেকে পালিয়েছ বুঝি? ফিরে যাও বাবু, ফিরে যাও।

কাছের গ্রামটির পর্য্যন্ত নাম জানে না—নিজের দুঃখের কথা কাহাকেও বলিতে ইচ্ছা হয় না; কেবল নিজেকে অপরাধী বলিয়া মনে হয়। মনে হয়, পিছনে তাহাকে ধরিতে লোক ছুটিয়াছে। আবার ধর্ম্মদাস জোরে জোরে পা ফেলিয়া অজানার পথে আগাইয়া চলে।

এমনই করিয়া বেলা দুপুরে শ্রান্ত-ক্লান্ত-দেহে ধর্ম্মদাস একটা গাছতলায় শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানে, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর, তবুও ঘুম আসিল। গাছতলায় শুধু মাটীতে ধর্ম্মদাস জীবনে এই প্রথম ঘুমাইল। এমন ঘুমাইল যে, মনে হয়, এমন নিদ্রা জীবনে আর কোন দিন হয় নাই।

নিজের বাহুকে বালিস করিয়া পথের মধ্যে একটি রাজপুত্রের মত ছেলে ঘুমাইতেছে দেখিয়া বহু লোক চলিয়া গেল। সকলেই নিজের বুদ্ধি, সংস্কার, কল্পনামত ঠাহর করিয়া, কেহ হাসিল, কেহ দুঃখ করিল; আবার কেহ বলিল, হয় ত নেশা-মেশা ক'রে প'ড়ে আছে।

ধর্ম্মদাসের ঘুম আর ভাঙ্গে না। ক্রমে সূর্য্য অস্তাচলের দিকে চলিয়া পড়িতেছেন। পাখীরা নিজেদের নীড়ে ফিরিবার জন্য ছুটিয়াছে।

এক বৃদ্ধা কাটা-ধান গ্রামে লইয়া যাইতে যাইতে বারকতক নিদ্রিত ধর্ম্মদাসকে লক্ষ্য করিয়াছিল। এইবার সে শেষ-বোঝা বহন করিতেছিল। ধর্ম্মদাসের কাছে আসিয়া সে বোঝা নামাইয়া রাখিল। তাহার পর পাশে দাঁড়াইয়া সে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, হাঁ গো বাছা! বেলা প'ড়ে গেল, রাত হয়ে আসছে। কোথায় যাবে তুমি? সে নিজের মনে মনে বলিল, কার আঁচলের ধন, ধুলোয় গড়িয়ে আছে। মা নেই নিশ্চয়; বাপ আর একটা বে' করেছে; এ ঠিক সেই আমাদের গৌরের দশা দেখছি।

বৃদ্ধার অনর্গল কথার শব্দে ধর্ম্মদাস উঠিয়া বসিল।

ধর্ম্মদাসের প্রথমে কোন কথাই ঠিক করিয়া মনে আসিল না; এবং তাহার মন বৃদ্ধার করুণার কথা শুনিয়া একবারে আর্দ্র হইয়া গেল।

গৌর বৃদ্ধার দৌহিত্র। কন্যার মৃত্যুর পর জামাতা আবার বিবাহ করিয়াছে; এবং বিমাতার অত্যাচারে গৌর গৃহ-হীন হইয়া বৃদ্ধার কাঁধে আসিয়া অবতীর্ণ।

নিজের ছোট কল্পনা, অশিক্ষিত মনে বৃদ্ধা এইটুকু কল্পনা করিয়া ধর্ম্মদাসের প্রতি সহানুভূতিতে আকৃষ্ট হইয়াছিল, এবং নিজের মনে যে কথা প্রতিভাত হইয়াছে, তাহা পরম সত্য, এ বিশ্বাসে সে ধর্ম্মদাসকে প্রশ্ন করিল;—"মা তোমার কদ্দিন হ'লো স্বগ্‌গে গেছেন বাছা?"

ধর্ম্মদাস মনে মনে অসীম বিস্ময় মানিল; এ কথা এই একান্ত অপরিচিতা বৃদ্ধা কেমন করিয়া জানিল? তবে সে কি তাহাকে চেনে?

ধর্ম্মদাস স্থিরই করিয়াছিল যে, সে নিজের ঠিক পরিচয় কাহাকেও কোন দিন দিবে না। তাহার উপর বৃদ্ধার এই অপূর্ব্ব প্রশ্নে সে দ্বিগুণতর সাবধান হইয়া গেল। কিন্তু একটা উত্তর ত দিতে হইবে, তাই ধর্ম্মদাস বলিল, কি জানি, অনেক দিন।

বৃদ্ধা নিজে নিজেই বলিতে লাগিল, তা' আমি জানি; ঐ ঠিক; গৌরের মত পোড়া কপাল।

মাতার মৃত্যুর পর পিতা বিবাহ করিয়াছে কি না, জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন বৃদ্ধার দিক হইতে একবারেই ছিল না; কারণ, সে জানিত, ইহার ব্যতিক্রম জগতে হয় না; হইলে অন্য কোন কারণ থাকে।

এইবার বৃদ্ধা বলিল, কোথায় যাবে, বাবা?

এ কথার কোন উত্তরই ধর্ম্মদাস দিল না। বৃদ্ধা বহু পীড়াপীড়ি করিয়া বলিল, যেখেনেই যাও বাবা, এ অবেলায় আর কোথাও যেও না, চল আমার ঘরে; কাল সকালে যেখেনে ইচ্ছে হয়, চ'লে যেও। এ রাতে, শীতে, গায়ে ভাল কাপড় নেই—এমন কায ক'রোনি ধন।

ধর্ম্মদাস ঘাড় নাড়িয়া জানাইয়া দিল, না।

বৃদ্ধা বহু অনুনয় করিল, বাবা আমার, ধন আমার, মাণিক আমার, আজকের জন্যে আমার কথা শোন।

ধর্ম্মদাসের সন্দেহ মন হইতে তিরোহিত হয় নাই; তাই সে কিছুতেই বৃদ্ধার সহিত যাইতে সম্মত হইল না।

বৃদ্ধা যখন বুঝিল, সে অচল অটল, তখন সে নিজের মনে বকিতে বকিতে ধানের বোঝা মাথায় করিয়া গ্রামের দিকে চলিয়া গেল।

দূরে গ্রামখানি দেখা যায়। খেজুর-গাছের সারির মধ্যে মধ্যে ঘরগুলি। তাহাদের মাথায় ধোঁয়ার একখানি আচ্ছাদন ঝুলিয়া আছে। তাহার পিছনে ভাঙ্গা দুই এক-খানি মেঘের মধ্যে শীতের সূর্য্য অস্তমিত। চোর-তারা জল্-জল্ করিতেছে।

ধর্ম্মদাস পিছন ফিরিয়া বসিয়া, গ্রামে যাইবার ইচ্ছাকে সংযত করিতে লাগিল।

বৃদ্ধার অনুনয়-বিনয় তাহার মনে তখনও ঝঙ্কার দিতেছে। সে ভাবিল, শীতের রাত গাছতলায় কাটান শক্ত জানি; কিন্তু আমি ত আর চুপ ক'রে ব'সে থাকব না; আমাকে আরও অনেক পথ যে এগিয়ে যেতে হবে।

মনেই প্রশ্ন উঠিল, কোথায়?

জানিনে, বলিয়া ধর্ম্মদাস উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু চলা যে যায় না! সমস্ত দেহ অবসন্ন। দুই পা অতিরিক্ত ভারি!

আহারের সময় ক্ষুধা পাইয়াছিল। সে পথের ধারে একটা পুকুর হইতে অঞ্জলি করিয়া জল পান করিয়াছিল মাত্র। তাহার পর আর ক্ষুধাবোধ করে নাই। তাহার শরীর যে ক্ষুধাতেই এমন অবসন্ন হইয়াছে, তাহা সে জানিতে পারে নাই। ক্ষুধায় যে মানুষকে এত কাতর করে, এ বার্ত্তা তাহার জানা ছিল না।

ধর্ম্মদাস পথের উপর আবার বসিয়া পড়িল।

বৃদ্ধা গ্রামে গিয়া শান্ত হইতে পারে নাই। সে ধানের বোঝা রাখিয়া পাঠশালার দিকে ছুটিল। পাঠশালায় গুরুমহাশয় আছেন। তিনি এই গ্রামের গুরু, পুরোহিত এবং মানুষের বিপদে আপদে পরামর্শ দিয়া থাকেন।

বৃদ্ধা গিয়া ডাকিল, দা'ঠাকুর, দা'ঠাকুর!

কে গা?

আমি গৌরের দিদিমা।

কেন?

বৃদ্ধা হাত নাড়িয়া বলিল, হোথায়, পাকুড়তলায়, একটি ছেলে, খাসা রাজপুত্তুরের মত ব'সে আছে। দুপুরে ওখানেই ঘুমুচ্ছিল। বল্লুম, গ্রামে চল, শীতের রাতে গাছতলায় থেকুনি, তা আমার কথা শোনে না। দা'ঠাকুর, রেতের হিমে ও সকালে জমে হিম হয়ে যাবে। বোধ করি বাড়ীতে ঝগড়া ক'রে এসেছে! তাহার পর বৃদ্ধা নিজের মনের উচ্ছ্বাস বাহির করিতে লাগিল—যাহাতে দা'ঠাকুরের দয়া হয়।

দাদাঠাকুর রন্ধন করিতেছিলেন, কাযেই একটু বিরক্ত হইলেন, বলিলেন, যত উটকো খবর তোমার, যাক্ গে, যাক। অমন কত শত পথে প'ড়ে মরছে!

বৃদ্ধা আর কথা কহিল না। বুঝিল, অসময়ে আসিয়াছে।

গুরুমহাশয় বলিলেন, খাওয়া-দাওয়ার পর যেতে পারি; এখন কেমন ক'রে যাই?

হাঁড়িতে কি চাল দিয়েছেন? বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করিল।

না, চাল এখনো ধোয়া হয়নি, ধুয়ে দেবে গা?

বৃদ্ধা বলিল, কায নেই ধুয়ে, আমার ঘরে চিঁড়ে করেছি, আর পাকা কলা আছে—আপনাকে দুধ দিয়ে যায় না?

কৈ, এখনো আনেনি। সে দিয়ে যাবে'খন।

তবে আর কি, বৃদ্ধা বলিল, দা'ঠাকুর রেতে ফলার করবেন, দুজনে। ওটিও বামুনের ছেলে বোঝায়।

দাদাঠাকুরের আপত্তি রহিল না। তিনি বলিলেন, রোস গো দেখি, গুড় আছে কি না।

বৃদ্ধা বলিল, না থাকে, আমি এনে দেব দোকান থেকে। আপনি চলুন, দেরী করলে কোথায় বা চ'লে যায়!

গুরুমহাশয় এবং গৌরের দিদিমা চলিলেন গ্রাম ছাড়িয়া পাকুড়তলায়।

ধর্ম্মদাস স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল। এ ধরণের বিপদে যে কি করিতে হয়, সে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না।

গুরুমহাশয় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, কোত্থেকে আসছ তুমি?

ধর্ম্মদাস কথার উত্তর দিল না।

গৌরের দিদিমা আর সবুর সহিতে পারিল না, সে বলিল, আপনার সব কথার উত্তর ও কাল দেবে, দাদা-ঠাকুর—আজ ও কথা বলতে পারছে না। বলিয়া সে ধর্ম্মদাসের হাত ধরিয়া বলিল, ছিঃ বাবা, উনি গুরুজন, উনি নিজে এসেছেন, ওঁর কথা মানতে হয়। এসো।

ধর্ম্মদাস ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। বৃদ্ধার হাতে হাত দিয়া সে জননীর করস্পর্শ যেন অনুভব করিল। আহ্বানের ঐকান্তিকতা শুধু নহে; এত বড় জোর দেখিয়া তাহার সাবিত্রী দেবীর কথা মনে পড়াতে দুই চক্ষু অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া গেল।

পরিচ্ছেদ—তিন

এই মীরপুকুর গ্রামখানি ছোট নহে। ব্রাহ্মণের বাস অল্প। কায়স্থ, বৈদ্য ও অন্যান্য জাতিও মন্দ নহে। মুসলমানও কয়েক ঘর ছিল।

মুসলমান অধিকারের সময় এই গ্রামের অবস্থা ভাল ছিল। তাহার পর ধীরে ধীরে সমাজের স্রোত সহরের দিকে ফিরিয়াছে। এখন যে বিদ্যায় কি অর্থে বড় হইয়া উঠে, সে সহরে চলিয়া যায়। এমনি করিয়া বহু ভিটা এখন শূন্য। কারণ, গ্রামের লোকের এমন অবস্থা নহে যে, সেগুলি উচিত মূল্যে বিক্রয় হয়।

যে সময়ের কথা হইতেছে, সে সময়ের সব চেয়ে বড় এবং ভয়ের কথা ম্যালেরিয়া। গ্রামে একজন হোমিওপ্যাথি ডাক্তার আছেন বটে; কিন্তু তিনি বলেন, পেটের অসুখে কায করিলেও, ম্যালেরিয়ার ইহা কথা কহে না। তাই গ্রামবাসী এই জ্বরে আক্রান্ত হইলে তিনি দু'হাতে কুইনাইন দিয়া কোন রকমে নিজের মুখ রক্ষা করেন।

কেহ তর্ক করিলে তিনি বলেন, হ্যানিম্যান হোমিওপ্যাথির গুরু; কিন্তু এই শাস্ত্রের উৎপত্তি হইল, কুইনাইন হইতে। কুইনাইনকে তিনি গুরুর গুরু কহিতেন।

কুইনাইনের চিকিৎসার মস্ত সুবিধা যে, জ্বরে দিলে জ্বর বন্ধ হয়। কিন্তু ডাক্তারের সর্ব্বনাশ করে না। অমা-বস্যা-পূর্ণিমায় জ্বর আবার ফোটে। অতএব কুইনাইনের চিকিৎসায় সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ লাভ যে, রোগী চট করিয়া হাত-ছাড়া হয় না।

এই ডাক্তারের সহিত পাঠশালার গুরুমহাশয়ের তেমন হৃদ্যতা ছিল না। তাহার কারণ, গুরুমহাশয় কিঞ্চিৎ কবি-রাজী জানিতেন এবং তাঁহার কাছে সব সময়ে মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং কুইনাইন-বর্জ্জিত জ্বরের মহৌষধি বর্ত্তমান থাকিত। কিন্তু লোকের কবিরাজীর উপর তেমন আস্থা ছিল না। তাই গুরুমহাশয়ের এই ব্যবসায় প্রায় অচল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

কিন্তু তিনি পৌরোহিত্যে পক্ক ছিলেন। তাহার উপর সাপের মন্ত্র জানিতেন, ভূতের মন্ত্রও তাঁহার অধিগত ছিল। ছিল না কেবল সেই জিনিষটি, যাহার জোরে তিনি করিয়া খাইতেছিলেন।

অতএব ধর্ম্মদাসকে পাইয়া তিনি মনে মনে পরম খুসী হইলেও মুখে তাহা কদাপি প্রকাশ করিতেন না।

ধর্ম্মদাস রাত্রিযাপন করিয়া সকালে চলিয়া যাইবে স্থির করিয়াছিল। কিন্তু মনের উদ্বেগ, দেহের শ্রান্তি ইত্যাদি নানা কারণে তাহার জ্বর হইয়া পড়িল। গুরুমহাশয় তাহাকে কিছুতেই ছাড়িলেন না। পুরাতন ঔষধগুলি একে একে প্রয়োগ করিয়া গৌরের দিদিমাকে মুগ্ধ করিতে লাগিলেন।

ধর্ম্মদাসও বাধ্য ছেলের মত খাইল; কারণ, সে তখন জীবনের উপর সম্পূর্ণ মমতাহীন হইয়াছিল।

জ্বরের ধমকে একটা মাদুরের উপর পড়িয়া ধর্ম্মদাস যে দিন প্রথম গুরুমহাশয়ের অধ্যাপনা শুনিল, সে দিন তাহার মনে একটা ইচ্ছা জাগিয়াছিল। এমনি পৃথিবীর একটি নির্জ্জন কোণে যদি নিরুদ্বেগে কয়েকটি ছাত্র লইয়া থাকিতে পায়, তাহা হইলে সে আর কিছুই চাহে না। সে দিন সে জানে নাই যে, তাহার অদৃষ্টে বিধাতাপুরুষ তখনি "তথাস্তু" বলিয়াছিলেন।

কিন্তু ব্যাপারটা দাঁড়াইল এই করিয়া:—পৌরোহিত্যের

ডাকে গুরুমহাশয়কে প্রায়ই পাঠশালার অধ্যাপনা ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইত। সে সময় ধর্ম্মদাস ধীরে ধীরে ছাত্রদের লইয়া পড়াইতে থাকিত।

এই শান্ত যুবকটির মার-ধোর করিবার প্রয়োজন হইত না। সে ছাত্রদের মনের মধ্যে যেন প্রবেশ করিয়া তাহাদের দুরূহতা দূর করিয়া পাঠে অগ্রসর করিয়া দিত। গুরুআহার করিয়া গুরুমহাশয় অবেলায় ফিরিয়া অবাক্ হইতেন—পাঠশালার শান্ত-মূর্ত্তি দেখিয়া। সকলেই নিবিড় আগ্রহে বসিয়া পড়িতেছে।

গুরুমহাশয় প্রসন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, হরিদাস, কিছু খেয়েছ ?

ধর্ম্মদাস নাম বদল করিয়াছিল।

সে ঘাড় নাড়িয়া বলিত, হাঁ, খেয়েছি।

গুরুমহাশয় জানিতেন, খাইবার কিছুই নাই। মনে মনে হাসিতেন, ছেলে ভাল, না খেয়ে কাযে লেগে গেছে।

চাদরে বাঁধা কলা-মূলা দেখাইয়া দিয়া বলিতেন, ওতে কিছু আছে, খাও গে। আমি দেখছি এদের। ধর্ম্মদাস উঠিয়া গেলে কিছুক্ষণের মধ্যেই চলিত সপাৎ, সপাৎ বেত।

ধর্ম্মদাস ক্রমে সমস্ত জিনিষটাকে একটা সুচারু ব্যবস্থার মধ্যে আনিয়া ফেলিল। প্রভাতে উঠিয়া সে গুরুমহাশয়কে তামাক সাজিয়া দিয়া রান্না-ঘরের কায নিমেষে সাঙ্গ করিয়া ফেলিত। জল-তোলা, বাসন-মাজা সে জীবনে করে নাই; ঘর পরিষ্কার করিয়া আগাগোড়া নিকাইয়া ফেলিতেও তাহার প্রথম প্রথম বাধ-বাধ ঠেকিত। কিন্তু পিছনে যখন ইচ্ছার বিজয়-কেতু লইয়া মন চলে, তখন কোন্ কাযেই বা দেরি হয় ?

ঝি আসিয়া হাসিয়া বলিত, দা'ঠাকুর, খুব তোমার সাকরেদ জুটেছে।

পড়ুয়ার দল আসিলে ধর্ম্মদাস তাহাদের লইয়া বসিয়া যাইত। গুরুমহাশয়কে বলিত, আপনি বসুন না, আমি দেখছি।

গুরুমহাশয় প্রসন্ন হইতেন, বাঃ, এই ত ছেলে!

ছেলেরা খাইতে যাইলে, ধর্ম্মদাস গুরুমহাশয়কে তাগিদ দিত, আপনি স্নান-আহ্নিক সারুন।

তাহার পর সে রাঁধিতে বসিত। দু-চার দিন একটু গোল হইয়াছিল। তাহার পর সে পাকা রাঁধুনীর মতই রাঁধিত। আহার করিয়া গুরুমহাশয় তামাক খাইতে খাইতে নিদ্রা দিতেন। সেই অবসরে ধর্ম্মদাস ছেলেদের লইয়া বসিয়া মধ্যাহ্নের কায সারিয়া তাহাদের বাগানের কাযে আহ্বান করাইয়া দৈহিক পরিশ্রমের সারবত্তা বুঝাইয়া দিত।

শেষ বেলায় গুরুমহাশয় উঠিয়া ধারাপাতের সূত্র অবলম্বন করিয়া খানিক মার-ধোর করিয়া ছেলেদের ছাড়িয়া দিতেন।

ধর্ম্মদাস সেই অবসরে সন্ধ্যার কায সারিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকিত।

নীলকণ্ঠ গুরু ধর্ম্মদাসের ব্যবহারে মনে মনে মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। এই বৃদ্ধবয়সে ভগবানের পরম দয়াতেই এমন একটি সাহায্যকারী মিলিয়াছে। কিন্তু এ কথা তিনি প্রকাশ করিয়া নিজেকে হাল্কা করিতেন না।

এমনি করিয়া শীতের অবসানে বসন্তের সমাগম হইল।

স্কুলের বাগানে ফুল ফুটিয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। ছেলেরা ডাকিয়া বলিত, হরি দাদা, আজ তোমার পারুল-গাছের শোভা দেখবে এস।

আমার নয়, তোমাদের, এ সবই তোমাদের পরিশ্রমের ফল। আমি কি আর করি ?

উঃ, তুমি ?—ছেলেরা হাসিত।

তাহারা নিজেদের মধ্যে বলা-বলি করিত। যদি গুরুমশাই চ'লে যায় তো বেশ হয়।

ফটিক সব চেয়ে সেয়ানা, সে বলিত, চ'লে আর কোন্ চুলোয় যাবে ওই বুড়োটা! যদি ম'রে যায়—

চুপ, চুপ, ম'রে যাওয়ার কথা বলতে নেই ভাই।

কি হয় রে ?

জানিস্, হরেন বলিল, পরের মন্দ করতে গেলে নিজের মন্দ হয়। আমি ও কথার মধ্যে নেই।

মণি বলিল, আচ্ছা ভাই, হরিদা কত দিন থাক্‌বেন ? উনি যদি চ'লে চান ?

সকলের ভয়ে মুখ কালো হইয়া যাইত।

উঃ! কি ভাল লোক ভাই, উনি!

এই বিষয়ে মতদ্বৈধ ছিল না।

কিন্তু ধর্ম্মদাসের আর বেশী দিন মীরপুকুরে থাকা হইল

না। পৃথিবীর নিভৃত কোণে বসিয়া সে যখন একদল পড়ুয়ার চিত্ত-বিনোদনে রত, তখন ভাগ্য-দেবতার অমোঘ বিধানে অন্য ব্যবস্থা স্থির হইয়া গিয়াছিল!

—

পরিচ্ছেদ—চার

সে দিন অতি প্রত্যুষেই নীলকণ্ঠ গুরু "কলে" বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। পৌরোহিত্যের আহ্বানের অপেক্ষা চিকিৎসার ডাক তাঁহার অনেক বেশী সম্মানের বলিয়া মনে হইত। প্রায় দেড় ক্রোশ দূরে এক জন অবস্থাপন্ন গৃহস্থ তাঁহার স্ত্রীর নাড়ী দেখিবার জন্য ডাকিতে আসিয়াছিলেন। গুরুমহাশয়ের ডাকগুলি প্রায় গঙ্গা-যাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বেরই হইত, তাই সঙ্গে মকরধ্বজ এবং মৃগনাভি থাকিতই।

সে দিন বোধ হয়, এই বিশ্ব-বিখ্যাত ঔষধগুলি কেমন অপ্রত্যাশিতভাবে সাড়া দিয়াছিল, তাই দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইলেও গুরুমহাশয় ফিরিলেন না।

তাহাতে পাঠশালারও কোনই ক্ষতি-বৃদ্ধি ছিল না।

কিন্তু বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হইল। একটি ছোট ঘোড়ায় চড়িয়া শিক্ষা-বিভাগের কর্ম্মচারী শ্রীমান্ সব-ইনেস্‌পেক্টর সাহেব আসিয়া পাঠশালার সম্মুখে অবতীর্ণ হইলেন।

ইহা যে একটা কি ব্যাপার, তাহা পড়ুয়ার দল ভাল করিয়াই জানিত। তাহারা জানিত যে, সর্ব্বশক্তিমান নীলকণ্ঠ গুরুমহাশয়ের একমাত্র ভয়ের কারণ ছিলেন এই টুপী-পরা, পাৎলুন-ধারী, খর্ব্বাকৃতি মহাপুরুষটি! ইঁহাকে দেখিয়া গুরুমহাশয়ের প্রবল প্রতাপ থরহরি কম্পান্বিত হইত। চক্ষু তাঁহার কপালে উঠিত এবং জিহ্বা নিষ্ঠুরভাবে তালুতে আঁটিয়া যাইত।

তাঁহাকে দেখিয়াই যেন পূর্ব্বজন্মের সংস্কারের মত, ছেলেরা দাঁড়াইয়া উঠিয়া কপালে হাত ঠেকাইয়া অত্যন্ত বে-সুরে গান ধরিল;—

ঈশ্বর সম্রাটে কর দীর্ঘজীবী,
দয়া ক'রে দাও তাঁরে সুদীর্ঘ জীবন—

ধর্ম্মদাস অবাক্ হইয়া গেল। এ কি! ব্যাপার কি? এবং পরের মুহূর্ত্তেই সে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল যে, ব্যাপার অত্যন্ত গুরুতর দাঁড়াইয়াছে!

ছেলের দলের সম্মুখে দণ্ডায়মান সাব-ইনেস্‌পেক্টর সাহেব বহুকালের রৌদ্র-বিদগ্ধ, জরা-জর্জ্জরিত টুপীটি খুলিয়া; গ্রীবাখানি ঈষৎ হেলাইয়া, মৃদু-মন্দ হাসিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

গান থামিল। ধর্ম্মদাসের প্রতি চাহিয়া সদানন্দ পাঠক বলিলেন, তুমি কে আবার? তিনি কোথায়? ধর্ম্মদাস যে কি উত্তর করিবে, তাহা ভাবিয়া পাইতেছিল না; ইতিমধ্যে সপ্রতিভ ফটিক, 'মরছে কি না' বলিয়া মহাশয় যে গ্রামে গিয়াছিলেন, সেই গ্রামের দিকে দেখাইল।

তাহার কথা সমাপ্ত না হইতেই সদানন্দ বলিলেন, মারা গেছেন, বুড়ো গুরু নীলকণ্ঠ হালদার?

ধর্ম্মদাস তাড়াতাড়ি বলিল, না, তিনি একটু কাযে গেছেন।

আর তুমি তাঁর কায ঠেকাচ্ছ?

এবার ধর্ম্মদাস মাথা নীচু করিয়া নিরুত্তর রহিল।

গ্রাম্য পাঠশালায় ইহা কিছু একটা নূতন ঘটনা নহে। মাসের পর মাস গুরু অনুপস্থিত; কিন্তু তাহার জন্য কি বা আসে যায়? ছাত্ররা পাততাড়ি বগলে করিয়া নিয়মিত পাঠশালায় যায় এবং হট্টগোল করিয়া বাড়ী ফেরে।

অভিভাবকদের দেখিবার সময় নাই, ইচ্ছা নাই, বুদ্ধি নাই। দূর বলিয়া স্কুল-কর্ত্তৃপক্ষ বৎসরে কোনরূপে একবার আসিয়া পাপক্ষয় করেন। অতএব, এই ব্যাপার লইয়া গোল করিলে উপরিতন ব্যক্তিকে উত্তেজিত করা হয় মাত্র। সদানন্দ পাঠক নিজের অভিজ্ঞতা হইতে ইহা ভাল করিয়াই জানিতেন। অতএব আর কোন গোল না করিয়া বলিলেন, নীলকণ্ঠ হালদারকে ডাকতে পাঠিয়ে দাও। আমি তিন ঘণ্টার বেশী থাকতে পারবো না। বলিয়া তিনি বাম হস্ত তুলিয়া চামড়াবাঁধা ঘড়িটি দেখিয়া লইলেন।

পাঠশালার কায দেখিয়া সদানন্দ কেবলমাত্র বিস্মিত নহে, মুগ্ধ হইলেন। কোথাও এমন সুন্দর করিয়া কায হয় না। কোথাও ছাত্রদের মধ্যে শিখিবার একটা তীব্র ইচ্ছা এমন করিয়া জাগাইয়া তোলা হয় না! এ কি! নীলকণ্ঠ গুরুর কর্ম্ম? এই আত্মীয়টিকে কোথা হইতে পাইলেন তিনি?

বাগানখানি হাসিতেছে; একটি দূর্ব্বা-ঘাস নাই। পথগুলি সুন্দর সরল রেখায় টানা হইয়াছে। এই কাযের মধ্যে আলস্য নাই, নবীনতার উদ্যমে যেন সর্ব্বত্রই একটি তাজা মনের পরিচয়!

ক্রমে সদানন্দের মনে যেন একটু লোভের সঞ্চার হইল।

নীলকণ্ঠ গুরু হাঁফাইতে হাঁফাইতে আসিয়া পড়িয়া,

কথায়, কাযে, এবং দুই হস্তের যুক্ত ব্যাকুলতায় মার্জ্জনা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

হিসাব-পত্র দেখা হইল। সদানন্দ নীলকণ্ঠকে ডাকিয়া বাগানের মধ্যে লইয়া গেলেন।

কঠিন দৃষ্টি হানিয়া সদানন্দ বলিলেন, পাঠশালা থেকে আপনাকে অচিরে সরিয়ে দিতে হবে ব'লে মনে হচ্ছে। আপনি ত আর কিছুই করেন না; ঐ ছেলেটি—কি ওর নাম?

নীলকণ্ঠ শুষ্ক কণ্ঠে কহিলেন, হরি, হরিদাস—

হুঁ, ওই ত সব কায করে। ওর কাযে আমি বড় সন্তুষ্ট হয়েছি। ওকেই আমি ফিরে গিয়ে বাহাল করবো। আপনার দ্বারা আর পাঠশালার কায চলবে না।

কুঞ্চিত ললাটের নীচে নীলকণ্ঠের দুই চক্ষু ঝক্-ঝক্ করিয়া উঠিল, জানেন ওকে, আপনি? ও আমারি আশ্রিত, তবে অজ্ঞাতকুলশীল; ওকে বিশ্বাস কি?

অজ্ঞাতকুল-শীল? তার মানে কি? আপনার আত্মীয় নয়? সদানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন।

বৃদ্ধ মাথা নাড়িয়া বলিলেন, কোথায় বাড়ী, কেন এলো, কত দিন থাক্‌বে, সাধ্যি কি ওর কাছ থেকে একটি কথা বার করে কেউ! তাতেই বড় সন্দেহ হয় ওকে! এক দিন পাখী উড়ে গেলেই হলো! তখন?

সদানন্দ খানিক চিন্তা করিয়া বলিলেন, আচ্ছা আপনি ওকে পাঠিয়ে দিন এখেনে, দেখছি ও কেমন ছেলে!

ধর্ম্মদাস আসিয়া শান্তভাবে দাঁড়াইল।

সদানন্দ পাঠক সস্নেহে তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া বলিলেন, তোমার কাযে আমি বড় তৃপ্ত হয়েছি; কি বল্লে নামটি তোমার, রামদাস?

ধর্ম্মদাস মৃদু হাস্য করিল, কথার উত্তর দিল না।

বেশ, বেশ, রামদাস! কত দূর পড়া-শুনো করেছ? ছাত্রবৃত্তি পাশ?

ধর্ম্মদাস ঘাড় নাড়িল, হাঁ।

ইংরাজী পড়নি কেন?

সে অতি সামান্য ··

তবুও? সদানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ ক্লাশ?

সেকেণ্ড।

আঃ! তবে পরীক্ষা দিচ্ছ না কেন? কোথায় তোমার বাড়ী? কোন্ স্কুলে পড়তে? বাপ-মা বুঝি বেঁচে নেই?

ধর্ম্মদাস স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সদানন্দ বলিলেন, সে কি হে, কথার উত্তর দাও না কেন?

ধর্ম্মদাস দুটি অশ্রুপূর্ণ লোচন তুলিয়া ধরিয়া, হাত জোড় করিয়া বলিল, আমার সহস্র অপরাধ, আপনি দয়া ক'রে মার্জ্জনা করুন। আমি এই সব প্রশ্নের উত্তর আজ বিশেষ কোন কারণে দিতে পারিনে—

সদানন্দ হাসিয়া বলিলেন, ভয় করে তোমার কথা শুনে যে হে রামদাস, বোমা-টোমা ছোড় না ত'।

আজ্ঞে না, আমার কারণ বিশেষ কোন পারিবারিক কারণ—ধর্ম্মদাস কথা শেষ করিবার পূর্ব্বেই পাঠক বলিলেন, বুঝেছি, বুঝেছি। বাড়ীতে ঝগড়া ক'রে পালিয়েছ; কিন্তু তোমাকে দেখে ত' তেমন প্রকৃতির মনে হয় না! কি জানি! আচ্ছা, দিনকতক তুমি আমার সঙ্গে ঘুরতে রাজি আছ?

হঠাৎ সদানন্দ ফিরিয়া বলিলেন, চল আমার সঙ্গে কলকেতা. বুঝেছ? আমার এক আত্মীয়ের বাড়ীতে থেকে তুমি বিনা পয়সায় লেখাপড়া করতে পাবে। দুটি ছোট ছোট ছেলেকে একটু ক খ পড়িয়ে দিতে আর পারবে না?

ধর্ম্মদাস ঘাড় নাড়িল।

আজ পারবে যেতে? মাইল চারেক দূরে ষ্টেশন। তা' রাত ৮টার সময় গাড়ী।

ধর্ম্মদাস বলিল, কিন্তু আমার সঙ্গে একটি পয়সাও নেই।

সে হয়ে যাবে'খন। নেও নেও কাপড়-চোপড় গুছিয়ে।

সে যাইবার পূর্ব্বে গুরুমহাশয়ের পায়ের ধুলা লইতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, পণ্ডিত-মশাই, আমার দোষ মার্জ্জনা করবেন।

নীলকণ্ঠের দীর্ঘকালের শুষ্ক-চক্ষু আর্দ্র হইয়া উঠিল; বাবা! তোমার মত ভাল ছেলে আমি জন্মে দেখিনি! বেঁচে থাক। সুখী হও। যদি কোন দিন মন চায় ত' এসো এখেনে!

নিশ্চয়, বলিয়া ধর্ম্মদাস পথে বাহির হইয়া পড়িল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

হতভাগিনী

চক্‌চক্ করিলেই সোনা হয় না, এই বাক্যটি অনেক বিষয়েই খাটে। বাহ্য চাকচিক্য দেখিয়া ভিতরে প্রকৃত বস্তু আছে, এইরূপ বোধ করার অপেক্ষা ভ্রান্ত বিশ্বাস আর হইতেই পারে না। হতভাগিনী বারবনিতার সম্বন্ধে এই কথা বিশেষরূপে খাটে। তাহাদের বাহ্য সৌন্দর্য্য দেখিলে মনে হয়, তাহারা না জানি কতই সুখে আছে! পয়সাতে যাহা পাওয়া যায়, সে সমস্তই বিশেষরূপ উপভোগ করিতেছে। তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে গেলে নামে ও কামে উভয়েই তাহারা অতিশয় হতভাগিনী। তাহাদের জীবন মরুভূমি অপেক্ষাও ধূ ধূ করিতেছে, কুত্রাপি সুখ-শান্তি নাই। দুই পাঁচ জন পুরুষকে তাহারা যেমন কুব্যবহার করে, অনেক পুরুষের ব্যবহারেও তাহাদের বিষময় জীবনকে আরও বিষময় করিয়া তোলে। অনেক অনভিজ্ঞ যুবক তাহাদের রূপের মোহে তাহাদের কবলে পতিত হয় এবং যথাসর্ব্বস্ব হৃত হয়। অপর পক্ষে তাহাদের যৎসামান্য স্বর্ণ-রৌপ্যের অলঙ্কার বদমায়েস ও খুনীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অনেক স্থলে এরূপ দেখা গিয়াছে, তিন জন চারি জন ও ততোধিক বদমায়েস একত্র হইয়া পরামর্শ করিতেছে, কি করিয়া চুরি-ডাকাতির দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিবে। এইরূপ বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তাহারা দেখিল—অর্থ-উপার্জ্জনের এক বিশেষ সহজ উপায় আছে। আত্মীয় বলিতে এ জগতে বেশ্যাদের কেহই নাই। অনেক সময়েই বেশ্যাদের যে মাতা থাকে, তাহারা উপমাতা অর্থাৎ গর্ভধারিণী মাতা নহে, পালন-কারিণী মাতা। এই শ্রেণীর মাতাকে স্নেহ-মমতা কখন পীড়া দেয় না। স্নেহ, ভালবাসা, মমতা কাহাকে বলে, তাহা তাহারা জানে না। জানে কেবল গোগ্রাসে আহার করিতে, আর বালিকাদের উপর অত্যাচার করিতে; আর কদর্য্য ব্যবহার করিয়া এই সব বালিকা আত্মবিক্রয় দ্বারা যে অর্থ উপার্জ্জন করে, সেই টাকা দিয়া তাহাদের ইচ্ছানুরূপ পশুবৃত্তির জন্য মানুষ ক্রয় করিতে। এই হতভাগিনীদের মধ্যে অধিকাংশ সরস্বতী ও লক্ষ্মী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা। জীবনের মধ্যভাগে কিঞ্চিৎ আভরণ সংগ্রহ করিয়া লয়, এবং সেই অলঙ্কারগুলি অধিক সময়ে অন্যত্র রাখিবার স্থানাভাবে নিজেদের শরীরের উপরই রাখিয়া দেয় অর্থাৎ জীবনব্যাপী পরিশ্রমের ফলে তাহাদের অর্জ্জিত অলঙ্কার-গুলি শরীরেই রাখিয়া দেয়। রাখিবার অন্য স্থান নাই, অপরকে বিশ্বাসও করে না, সেই হেতু নিজ শরীরে অলঙ্কারগুলি ধারণ করিয়া রাখে।

আজ প্রায় গত ২০ বৎসর ধরিয়া দেখিতেছি, কতকগুলি চোখা চোখা বদমায়েস অর্থ উপার্জ্জনের জন্য এই শ্রেণীর বার-বনিতাদের অলঙ্কারাদির উপর নজর দিয়াছে। এই দলের মধ্যে যাহারা নেতা, তাহারা ঘুরিয়া ফিরিয়া ইহাদের নামধামের তথ্য সংগ্রহ করে। তাহার পর যাহাদের সহিত একমত হইয়া কায করিবে, তাহাদের এক জন বা দুই জনকে এই সংবাদ-সংগ্রহের কথা বলে, উহাদের মধ্যে যখন ঠিক হয় যে, কোন্ কোন্‌টি তাহাদের বধ্য হইবে, তখন তাহাদের দলে তিন চার জন মিলিয়া প্রথম, কামিনীর ঘরে, তাহার পর জটিলার ঘরে দুই এক দিন আনাগোনা করে। আনাগোনা করিয়া ঠিক করিয়া লয়—কোন্ সময় ঐ বাটীতে আসিবে এবং কখন্ কার্য্য সমাধা করিয়া ঐ বাটী পরিত্যাগ করিবে। প্রথম দুই দিন বা তিন দিন কামিনীর ঘরে আসে, মদ্যাদি পান করে, কিঞ্চিৎ খাবারও খায় এবং এক জন বাবু সাজিয়া তথায় রাত্রির কিয়দংশ যাপন করে। অপর দুইটিকে তাহার বন্ধু বলিয়া পরিচয় দেয় এবং কামিনীর ঘরের মেঝের বিছানায় ঐ সময়টি কাটাইয়া দেয়।

অধিকাংশ সময়েই যে রমণীর অঙ্গে অনেকগুলি আভরণ আছে, তাহাকেই তাহাদের বধ্য বলিয়া ঠিক করিয়া লয়। দুই এক দিন কামিনীর ঘরে যাইবার পর শেষ দিনে তাহারা খাদ্যের সহিত ধুতুরা, ভাঙ্গ বা অন্য কোন বিষাক্ত পদার্থ মিশাইয়া দেয় এবং স্ত্রীলোকটি অজ্ঞান হইলে, তাহারা যাহা কিছু তাহার গাত্রে গহনা ছিল, সেই সব লইয়া ঐ স্থান পরিত্যাগ করে এবং গহনাগুলি হস্তগত হইবার অব্যবহিত পরেই সেইগুলি বেচিয়া যাহা হয়, নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লয়। এই সব লোকের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অধিকাংশ বাটীতেই বাড়ীওয়ালী রাত্রি ১২টার পর ভিতর দিক হইতে সদর-দরজায় চাবি লাগাইয়া দেয়, আর ভোর ৫টায় সে নিজে কিম্বা অপর কোন ভাড়াটিয়ার দ্বারা চাবি খুলিয়া দেয়। এই কারণে মধ্যরাত্রিতে বাড়ী হইতে কেহ বাহির হইয়া যাইতে পারে না। বদমায়েসরা দেখিয়া লয় যে, রাত্রিতে সদর-দরজায় চাবি দেওয়া হয় কি না এবং যদি জানিতে পারে, চাবি দেওয়া হয়, তবে সেই তালার একটি চাবি তৈয়ারী করিয়া তাহাদের নিজেদের কাছে রাখে।

পূর্ব্বে মোটামুটি এইরূপ ভাবেই ঐ বেশ্যাগুলিকে অজ্ঞান করা

হইত এবং তাহাদিগকে হৃতসর্ব্বস্ব করা হইত। কিন্তু অধুনা সর্ব্ব-বিষয়ের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই বেশ্যাদিগকে খুন করিবার পদ্ধতিও অনেক হইয়াছে। প্রয়োজন হইলে গলা টিপিয়া মারিয়া কাড়িয়া লয়, গলায় ফাঁস লাগাইয়াও মারিয়া ফেলে; তবে অনেক সময়েই তাহাদের চেষ্টা থাকে, শিকারকে অনেকক্ষণ অজ্ঞান রাখিয়া তাহাদের কার্য্যসিদ্ধি করা।

সব বিষয়ের একটা করিয়া মরশুম আসে। বারবনিতাকে অজ্ঞান করিয়া তাহাদের গহনা চুরিরও একটা মরশুম মাঝে মাঝে দেখা দেয়। উপর্য্যুপরি দুই চার পাঁচ মাস এইরূপ ঘটনা ঘন ঘন ঘটিয়া থাকে।০আবার দুই বৎসরের মধ্যেও এরূপ একটি ঘটনাও ঘটে না। কিন্তু যখন একবার প্রকৃতির প্রবাহ বহিতে থাকে, তখন বেশ্যা ও পুলিসকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। আজ রামবাগান, কাল সোনাগাছি, পরশ্ব রূপোগাছি, তার পর ভবানীপুর, হরিবর্দ্ধনের গলি, মাণিকতলা স্পার ইত্যাদি স্থানে স্থানে যেখানে এই শ্রেণীর হতভাগিনীরা বাস করে, সেই সকল স্থানে এই সব ঘটনা ঘটে।

পূর্ব্বে পূর্ব্বে খাদ্যের সহিত ধুতুরা মিশাইয়া ইহাদিগকে অজ্ঞান করা হইত এবং ইহাদের যথাসর্ব্বস্ব হরণ করা হইত। তার পর, মদের সহিত মর্ফিয়ার বড়ী মিশাইয়া ইহাদিগকে অজ্ঞান করাইবার চেষ্টা করা হইত, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই মদের সহিত মর্ফিয়া খাইয়া ইহারা অজ্ঞান হইয়া পড়িত না, বরং উত্তেজিত হইয়া অধিক মাত্রায় চেঁচামেচি চিল্লাচিল্লি করিত। অতঃপর আর একটা পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইল। ইহাদিগকে মদ খাওয়াইয়া মাতাল করিয়া শেষ গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলা হইত। কোন কোন ক্ষেত্রে বিয়ার মদের সহিত Potassium Cyanide মিশাইয়া ইহাদিগকে খাইতে দেওয়া হইত এবং অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহাদের জীবনলীলা শেষ হইত। Potassium Cyanide ভয়ঙ্কর বিষ। ডাক্তারদের মতে, যে হতভাগ্য বা হতভাগিনী ইহা গলাধঃকরণ করিয়াছে, সে মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যায়, এই বিষের কার্য্য খুব শীঘ্র হয়—২ হইতে ১০ মিনিটের মধ্যে কার্য্যশেষ। এই বিষটি মারাত্মক।

১৯২০ খৃঃ অব্দে লালমোহন কর্ম্মকার এবং শচীনন্দন শাহা ও আর এক জন জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক ওরফে জয়ন্তীকুমার ভৌমিক, এই তিন জন আসামী একসঙ্গে মতলব করিয়া ছয়টি খুন করার অপরাধে ধৃত হয় ও তাহাদিগকে আদালতে চালান দেওয়া হয়। তাহারা যে অপরাধগুলি করে, সেগুলির ঘটনা ১৯১৭ হইতে ১৯১৯ খৃঃ অব্দে। প্রত্যেক ঘটনার তারিখগুলি, ও যে ছয়টি স্ত্রীলোক খুন হয়, তাহাদের নাম ও ঠিকানা এইরূপ :—

(১) মানদাবালা দেবী, ৩০৭, অপার চিৎপুর রোড, ২-৯-১৭।
(২) সুরবালা, ৪০নং শিবতলা লেন, ঢাকাপটী, ২১-২-১৮।
(৩) কৃষ্ণ, ২৯৫এ, অপার চিৎপুর রোড, ৪-৬-১৮।
(৪) ননীবালা, ৪৪নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট, ৯-৪-১৯।
(৫) সুবাসিনী দাসী, ২০নং দয়াল মিত্র লেন, ৩-১২-১৯।
(৬) যামিনী, সত্যপীরতলা, কালীঘাট, ৪-১০-১৮।

ইহাদের প্রত্যেকেরই গায়ে অলঙ্কার ছিল, সেই জন্য দুর্ব্বৃত্তরা ইহাদিগকে বাছিয়া লইয়াছিল।

যেমন যেমন ঘটনাগুলি ঘটে, থানাতে রিপোর্ট হয়, কিন্তু কেহই তখন আসামীর নাম দিতে পারে নাই, শেষ ঘটনাটি সম্বন্ধে আসামীর নাম পাওয়া যায় এবং গোয়েন্দা বিভাগের ইন্‌স্পেক্টার মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, যিনি তার পর Assistant Commissioner, North District হন ও পরে রায়সাহেব হন, তিনি তদারক করিবার সময় দেখিলেন, সব ঘটনা একই রকমের। অর্থাৎ প্রত্যেকটিতেই অলঙ্কারাদি দেখিয়া বধ্যকে বাছিয়া লওয়া হয় এবং তাহাদিগকে প্রাণে হত্যা করিয়া সমস্ত অলঙ্কার চুরি করা হয়। আর প্রত্যেক নিহত নারীর ঘরে দুই তিন দিন দুই তিন জনে যাইয়া তবে এ কার্য্য সমাধা হয়। ১৯১৭ খৃঃ অব্দ হইতে এইরূপ খুন করিয়া চুরির যতগুলি মামলা হইয়াছিল, ততগুলি রিপোর্ট বাহির করিয়া তিনি পুনরায় নূতন করিয়া তদারক আরম্ভ করিলেন। যে যে বাড়ীতে এই ঘটনা-গুলি ঘটিয়াছিল, সেই বাটীর লোকরা ইহাদের আসামীদিগকে সনাক্ত করিল এবং তাহারা বলিল, "যে রাত্রিতে এই বাটীর স্ত্রীলোক খুন হয়, সেই রাত্রিতে ইহারাই সেই হতভাগিনীর ঘরে আসিয়াছিল।" কতকগুলি চোরাই গহনাও ইহাদের রক্ষিতা স্ত্রীলোকদিগের নিকট হইতে উদ্ধার করা হইল। আসামীদের মধ্যে এক জনকে সরকারী তরফের সাক্ষী করিয়া লওয়া হইল। সে তদারকের সময় সমস্ত স্বীকার করিল এবং অন্যান্য আসামীর সম্বন্ধে সকল কথা বলিয়া দিল।

এই মকদ্দমা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব Sessions (দায়রায়) সোপর্দ্দ করেন এবং সেখানে আসামীরা দোষ স্বীকার করিয়া ফাঁসির হাত হইতে অব্যাহতি পায় এবং যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের সাজা হয়। তাহারা বলে, "খুন করিব বলিয়া খুন করি নাই, খুন করিবার মতলবে খুন করি নাই, তবে এই খুনের জন্য আমরা দায়ী।"

এই মকদ্দমায় তৎসাময়িক পুলিস সার্জ্জেন মেজর এন্, পি, সিংহ যে এজাহার দেন, তাহা হইতে জানা যায়, প্রত্যেক বধ্যটিকে কিরূপ ভাবে বধ করা হইয়াছে। ইহা হইতে আরও জানা

যায়, সেই ছয়টি হতভাগিনী জীবিত অবস্থায় প্রত্যেকেই দুরারোগ্য পীড়ায় ভুগিতেছিল। আসামীরা এই ছয় জন স্ত্রীলোককে ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে বাছিয়া লয়। পুলিস সার্জ্জেনের রিপোর্টে যে সব লোকের বারটান আছে, তাহাদের চৈতন্য হওয়া উচিত। পুলিস সার্জ্জেন ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে যে এজাহার দিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্মানুবাদ প্রদত্ত হইল।

"আমি কলিকাতার পুলিস সার্জ্জেন (ডাক্তার)।

আমি গত ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯১৭ খৃঃ অব্দে মানদাবালা দেবী নাম্নী এক স্ত্রীলোকের শবদেহ পরীক্ষা করিয়াছিলাম। উহার বয়স প্রায় ৪৫ বৎসর। উক্ত লাস আমার নিকট জমাদার মহম্মদ সফি খাঁ কর্ত্তৃক সনাক্ত হইয়াছিল। দেহটি বেশ হৃষ্টপুষ্ট। তাহার নাসিকার ভিতর রক্ত দেখিয়াছিলাম, মুখমণ্ডল নীলবর্ণ এবং দাঁতের উপর দাঁত পড়িয়াছিল। মুখগহ্বরের ভিতর এক খিলি পান অচর্ব্বিত অবস্থায় ও এক সারি কৃত্রিম দন্ত আলগা অবস্থায় ছিল। গলার সামনে পৌনে দশ ইঞ্চি লম্বা সূত্রবন্ধনের অস্পষ্ট চিহ্ন বর্ত্তমান ছিল। বেশীর ভাগই ইহা বাম দিকে প্রতীয়মান হইয়াছিল, শবব্যবচ্ছেদের পরে দেখা গেল, ইহা শক্ত, শ্বেতবর্ণ এবং মোম-কাগজের ন্যায়। তাহার শরীরে কোন কালশিরার দাগ ছিল না, সূত্রবন্ধনীর চিহ্নের মধ্যস্থিত শিরার কিম্বা উপশিরার উপরে থেঁৎলে যাওয়ার কোনরূপ লক্ষণ ছিল না, কিম্বা চর্ম্মের উপর কেবলমাত্র দুই স্থান ব্যতীত আঁচড়ের দাগ ছিল না। বক্ষ এবং স্কন্ধের সম্মুখভাগস্থ শিরাগুলি অতি স্পষ্ট ছিল। শরীরের অভ্যন্তরস্থিত অন্ত্রগুলি রক্ত দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। হৃৎপিণ্ডটি চর্ব্বিযুক্ত এবং সুবিস্তৃত। পাকস্থলী সুরার গন্ধযুক্ত অর্দ্ধপরিপক্ব অন্নে এবং গাঢ় রক্তে পরিপূর্ণ। দেহে পুরাতন রোগের চিহ্ন বর্ত্তমান ছিল। আমার মতে ইহার মৃত্যুর কারণ শ্বাসরোধ—বলপ্রয়োগপূর্ব্বক গলনালী বন্ধ করার দরুণ শ্বাসরোধ হয়।

গত ১৯১৮ খৃঃ অব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে জমাদার রঘুবীর ওঝা কর্ত্তৃক সনাক্ত প্রায় ৩০ বৎসর-বয়স্কা সুরবালার মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়াছিলাম। দেহটি বেশ হৃষ্টপুষ্ট। নাক এবং মুখ ফেনযুক্ত রক্তে পূর্ণ ছিল। মুখমণ্ডল, বক্ষের সম্মুখভাগ, বাহুদ্বয় এবং হস্তের তালুদ্বয় নীলাভ ছিল। গলদেশ পরিহিত সাড়ীর দুই অঞ্চলের প্রান্ত দ্বারা আবদ্ধ ছিল। ইহা অপসারণ করিলে পরে দেখা গেল যে, দুইটি হরিদ্রাভবর্ণের চিহ্ন গলদেশ সম্পূর্ণভাবে বেষ্টন করিয়াছে এবং ঐ চিহ্নের মধ্যবর্ত্তী ½ ইঞ্চি অংশ বিস্তৃত একটি সেতু উক্ত দুই চিহ্নকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। গলদেশের দক্ষিণপার্শ্বস্থিত উক্ত ½ ইঞ্চি অংশ বিস্তৃত স্থানে ফোস্কা দেখা গেল। উহা ব্যবচ্ছেদের পর উহার ভিতর কোনরূপ রসবর্ষণ বা দুষ্টব্রণ দেখা যায় নাই। আভ্যন্তরিক ইন্দ্রিয়স্থ সমস্ত রক্ত জমাট হইয়া গিয়াছিল। অন্ননালীর ভিতর চর্ব্বিত পাণ বর্ত্তমান ছিল। পাকস্থলীতে কোনরূপ উল্লেখযোগ্য গন্ধহীন অপরিপক্ব ভাত, ডাল ও তরকারী ছিল। শ্বাসরোধই ইহার মৃত্যুর কারণ। এই স্ত্রীলোকের নাকে একটি মুক্তাসংযুক্ত সোনার নাকছাবি ছিল, তাহা উক্ত জমাদারের জিম্মা করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

গত ১৯১৮ খৃঃ অব্দের ৬ই জুন তারিখে জমাদার রামকুমার সিংহের দ্বারা সনাক্ত প্রায় ত্রিংশদ্বর্ষীয়া কৃষ্ণা-নাম্নী স্ত্রীলোকের মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়াছিলাম। মৃতদেহটি হৃষ্টপুষ্ট থাকা সত্ত্বেও পচিতে আরম্ভ করিয়াছিল। মুখমণ্ডল নীলাভ এবং স্ফীত। উপরার্দ্ধের উভয় পার্শ্বেই অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্ত নীলাভ, কিন্তু উহা বাম দিকে অতিশয় নিবিড়ভাবে দেখা গেল। নাসারন্ধ্রের ভিতর কৃষ্ণবর্ণের তরল শোণিত দৃষ্ট হইল। সাধারণ গামছার সাড়ে ৩ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য অংশ মুখগহ্বরের ভিতর রুদ্ধাবস্থায় পাওয়া গেল। ইহা অপসারণের পর দেখা গেল যে, সেই গামছার কতকটা অংশ রক্তরঞ্জিত এবং সেই গামছাটি প্রায় ½ ইঞ্চি পুরু করিয়া ভাঁজ করা। একটি লাল পাড়ওয়ালা নীলাম্বরী সাড়ীর এক অংশ তাহার কোমরের নিম্নাংশ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে এবং অপর অংশটি গলদেশকে সুদৃঢ় বেষ্টনীর দ্বারা আবদ্ধ করিয়া উহার দক্ষিণপার্শ্বে দুইটি সুদৃঢ় বন্ধনীর দ্বারা যুক্ত দেখা গেল। এই বন্ধনী খুলিয়া লইবার পর ত্বকের উপর কোনরূপ চিহ্ন দৃষ্ট হয় নাই, কিন্তু ব্যবচ্ছেদের পর দেখা গেল যে, উক্ত বন্ধনীর নিম্নস্থিত শিরাগুলি ছিন্ন হইয়া রক্ত বহির্গত হইতেছে। আভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয়স্থ সমস্ত রক্ত জমাট বাঁধিয়াছিল। পাকস্থলীতে সুরার গন্ধযুক্ত অর্দ্ধপক্ব অন্ন ও পীতবর্ণবিশিষ্ট তরল পদার্থ বর্ত্তমান ছিল। যকৃৎটি রোগগ্রস্ত। শ্বাসরোধে ইহার মৃত্যু সাধিত হইয়াছে। যদি কোন স্ত্রীলোকের মুখগহ্বরের ভিতর গামছা বলপূর্ব্বক প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া যায় এবং তৎসহিত যদি তাহার গলদেশ চাপিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে যতদূর সম্ভব মনে হয় যে, মুখগহ্বরের ভিতর বলপূর্ব্বক গামছা প্রবিষ্ট করিয়া শ্বাসরোধ করা অপেক্ষা কেবলমাত্র গলদেশ চাপিয়া রাখাতে মৃত্যু খুব শীঘ্র সাধিত হয়। শবব্যবচ্ছেদে দেখা যায় যে, গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিলে গলত্বকের নিম্নস্থ শিরা ও উপশিরার উপর যেরূপ কঠিন ক্ষত ও যেরূপ রক্তমোক্ষণ হইতে দেখা যায়, আর মৃত্যুর পরমুহূর্ত্তে যদি কোন লোকের গলদেশ বস্ত্র দ্বারা বন্ধন করা হয়, তাহা হইলে শবব্যবচ্ছেদের সময় একরূপই চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। সেইরূপ

কৃষ্ণা-নাম্নী এই স্ত্রীলোকটির প্রথমে গলদেশ পীড়নে এবং তৎসহিত মুখগহ্বরের ভিতর বলপূর্ব্বক কাপড় বা গামছা প্রবেশ করানর ফলে মৃত্যু হইয়াছে এবং মৃত্যুর পরক্ষণেই উক্ত সাড়ীর দ্বারা তাহার গলদেশ উত্তমরূপ বন্ধন করা হইয়াছিল। আমার মনে হয় যে, এইরূপ একই উপায়ে মানদার এবং সুরবালার মৃত্যু সাধিত হইয়াছে, অর্থাৎ প্রথমে তাহাদের শ্বাসরোধ করিয়া হত্যা করা হইয়াছিল এবং পরক্ষণেই সাড়ীর দ্বারা তাহাদের গলদেশ উত্তমরূপে বন্ধন করা হইয়াছিল।

গত ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ১০ই এপ্রেল তারিখে রামসুন্দর সিং নামক জমাদার কর্ত্তৃক সনাক্ত পঞ্চবিংশবর্ষীয়া ননীবালা নাম্নী জনৈকা বারবনিতার মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়াছিলাম। মৃতদেহটি অপরিপুষ্ট ছিল। মৃতের মুখবিবর হইতে চিবুকের বাম কোণের বরাবর পর্য্যন্ত শুষ্ক লালা বিদ্যমান ছিল। তাহার গলদেশটি একটি সাড়ীর প্রান্তভাগ ও একটি গামছার সহিত একত্র অবস্থায় পরিবেষ্টন ও গলদেশের সম্মুখভাগে গ্রন্থিযুক্ত অবস্থায় দেখিলাম। গ্রন্থি উন্মোচনের পর দেখা গেল যে, একটি প্রকাণ্ড বক্র ঘৃষ্টচিহ্ন গলদেশের চতুর্দ্দিক ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে এবং সম্মুখভাগে পূর্ব্ব-বর্ণিত বন্ধনীর চিহ্ন ব্যতীত অন্য কোন চিহ্ন দেখা যায় নাই। গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগে কোন উল্লেখযোগ্য চিহ্ন ছিল না। ব্যবচ্ছেদের পর উক্ত স্থানের নিম্নাবস্থিত শিরা বা উপশিরার উপর ঘর্ষণজনিত কোনরূপ ক্ষত বা তাহা হইতে শোণিতস্রাব হইতে দেখা যায় নাই। দেহের অন্য কোন স্থানে কোনরূপ আঘাতের চিহ্ন দেখা যায় নাই। অন্তরেন্দ্রিয় সমূহে রক্ত জমাট বাঁধিয়া গিয়াছিল। পাকস্থলীতে কোনরূপ গন্ধবিযুক্ত স্বল্প আম বর্ত্তমান। বস্ত্র ও গামছার সাহায্যে গলদেশ সম্পূর্ণরূপে বেষ্টন করিয়া শ্বাসনালী রোধ করত এই স্ত্রীলোকটির মৃত্যু সংঘটিত হইয়াছে। এক কথায় বলিতে হইলে শ্বাসরোধই ইহার মৃত্যুর কারণ। যদি এই স্ত্রীলোকটিকে প্রথমতঃ কেবলমাত্র হস্ত দ্বারা গ্রীবাদেশ নিপীড়ন পূর্ব্বক পরমুহূর্ত্তে বস্ত্র দ্বারা বন্ধন করা হইত, তাহা হইলেও শবব্যবচ্ছেদের সময়ে পূর্ব্ববর্ণিত অন্য কোন চিহ্ন পাওয়া সম্ভবপর হইত না। পূর্ব্ববর্ণিত উপায়ে যদি কোন স্ত্রীলোককে মৃত্যুপথের পথিক করা যায়, তাহা হইলে তাহার মৃত্যু ৫ মিনিট সময়ের মধ্যে সাধিত করা যায়।

গত ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে মহম্মদ খান্ নামক জনৈক জমাদার কর্ত্তৃক সনাক্ত ত্রিংশদ্বর্ষীয়া সুকুমারী নাম্নী জনৈকা বারবনিতার মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়াছিলাম। সাড়ীর অঞ্চলভাগ দ্বারা তাহার গ্রীবাদেশ সম্পূর্ণরূপ বেষ্টিত এবং নিম্ন চোয়ালের বামপ্রান্ত বরাবর উহার গ্রন্থি বিদ্যমান ছিল। উক্ত বন্ধনমোচনের পর দেখা গেল যে, একটি প্রশস্ত ঘর্ষণের চিহ্ন গলদেশকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। এই চিহ্ন কেবলমাত্র গ্রীবাদেশের উভয় পার্শ্বে ও সম্মুখভাগে সুন্দরভাবে বিদ্যমান, কিন্তু পশ্চাদ্ভাগে এই চিহ্ন অত্যন্ত অস্পষ্ট। সাড়ীটির এক প্রান্ত মৃতের কটিদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া বামস্কন্ধ পর্য্যন্ত বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে এবং অপর প্রান্তটি গ্রীবাদেশকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। নাসারন্ধ্রের ভিতর শোণিতখণ্ড এবং দক্ষিণ বাহুর পশ্চাদ্ভাগে একটি পুরাতন ক্ষত বিদ্যমান। শ্বাসনালী এবং তাহার শাখা-প্রশাখার মধ্যে শোণিতখণ্ড বিদ্যমান। পাকস্থলীতে শোণিত এবং কোনরূপ উল্লেখযোগ্য গন্ধবিযুক্ত অপরিপক্ব অন্ন, ডাল, মাংস, ডিম্ব, লঙ্কা এবং ব্যঞ্জনাদি সঞ্চিত ছিল। শ্বাসরোধেই এই স্ত্রীলোকের মৃত্যু হইয়াছে। এই ঘটনার উপর আমার পূর্ব্ব-বর্ণিত মন্তব্য বহাল রাখিলাম।

গত ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর তারিখে আলী মহম্মদ খাঁ নামক কনষ্টেবলের সনাক্তে ত্রয়োবিংশবর্ষীয়া সুবাসিনী দাসী নাম্নী জনৈকা বারবনিতার মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়াছিলাম। ইহার শরীরের গঠন মধ্যম প্রকারের। যাহা হউক, দেহটি পরীক্ষায় দেখা গেল যে, মৃতার মুখটি একটি তোয়ালের দ্বারা আচ্ছাদিত এবং গ্রীবাদেশ সাড়ীর প্রান্তভাগ দ্বারা বেষ্টন করা এবং গ্রীবার পুরোভাগে উক্ত বেষ্টনীর গ্রন্থিটি বিদ্যমান। গ্রীবার দক্ষিণ পার্শ্বে চারিটি আঁচড়ের চিহ্ন বর্ত্তমান এবং বামপার্শ্বে উক্ত প্রকারের পাঁচটি চিহ্ন বিদ্যমান। ঐ চিহ্নগুলি এত ক্ষুদ্র যে, উহার মাপ লওয়া একরূপ অসম্ভব। উক্ত চিহ্নে ত্বকের জমাট রক্ত দেখা গেল এবং আঁচড়ের ভিতরে অধস্ত্বাচ তন্তুগুলি দেখা গেল। বক্ষঃস্থলের বামপার্শ্বে উক্ত প্রকার আর একটি আঁচড় হইতে রক্তমোক্ষণ হইতে দেখা গেল। অন্তরেন্দ্রিয়গুলিতে শোণিত সঞ্চিত রহিয়াছে। বক্ষোদেশের দক্ষিণ গহ্বরে পুরাতন pleurisy রোগের চিহ্ন বর্ত্তমান। পাকস্থলীতে দুই আউন্স পরিমিত গন্ধহীন হরিদ্রাবর্ণের ঘন পদার্থ ছিল। শ্বাসরোধে ইহার মৃত্যু হইয়াছে। সম্ভবতঃ এই ঘটনায়ও স্ত্রীলোকটি গ্রীবাদেশ পেষণে এবং বন্ধনে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে এবং পরে তাহার গ্রীবাদেশে সাড়ীর প্রান্তভাগ বাঁধিয়া দেওয়া হইয়া-ছিল। মৃত্যুর অব্যহিত পূর্ব্বে যদি কেহ সুরা পান করে, তাহা হইলে শবব্যবচ্ছেদকালীন সেই সুরার গন্ধ পাক-স্থলীতে সকল সময় বিদ্যমান থাকে না।

স্বাক্ষর—এস, পি, সিংহ।"

এই ঘটনায় যে আসামীকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল, তাহার জবানবন্দি নিম্নে লিখিত হইল। তাহার জবানবন্দি হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়—ঘটনাটি কিরূপ।

নাম—জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক ওরফে জয়ন্তীকুমার ভৌমিক। আমি ২৬ নং হাটখোলায় থাকি, বর্ত্তমানে আমি বেকার।

১ নং আসামী লালমোহন কর্ম্মকারকে প্রায় ৭।৮ বৎসর যাবৎ জানি। সে তারক চট্টোপাধ্যায়ের গলিতে থাকে এবং সোনারূপার কার্য্য করে। ১৩ নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীটে (সোনাগাছি) তাহার দোকান। সন ১৩২৪ সাল হইতে আমি ২ নং আসামী শচীনন্দন শাহাকে জানি। পূর্ব্বে সে ১৩ নং অভয়চন্দ্র মিত্রের ষ্ট্রীটে থাকিত, কিন্তু বর্ত্তমানে সে ঢাকা জিলার অন্তর্গত তেরশ্রী গ্রামে বাস করে। সে আমায় বলিয়াছিল যে, সে কোন পাট-ব্যবসায়ীর অধীনে চাকুরী করে। আমি প্রবেশিকা ক্লাস পর্য্যন্ত পড়িয়াছি। ঢাকা জিলার অন্তর্গত তেজপুর নামক গ্রামে আমার বসতবাড়ী। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারায় এবং গ্রামে কোন একটি ফৌজদারী মামলায় জড়িত হওয়ায় আমি সে স্থান হইতে কলিকাতায় পলায়ন করিয়া আসি এবং এ স্থানে (কলিকাতায়) কার্য্যানুসন্ধানে ঘুরিতে ঘুরিতে আমার সহিত ১ নং আসামীর, তাহার সেই সময়কার ৭১।১ নং বেণিয়াটোলাস্থিত দোকানে সাক্ষাৎ হইল। সে বলিল যে, সে আমার পিতাকে ভালরূপ জানে; তিনি এক জন ডাক্তার। তাহার বাটী আমার স্বগ্রাম হইতে দুই মাইল দূরে ঢাকা জিলার অন্তর্গত দানিয়াপুং নামক গ্রামে। সে আমাকে আশ্রয় ও আহারাদি দিয়াছিল এবং তাহার সহিত আমি প্রায় দুই মাসকাল অতিবাহিত করিয়াছিলাম। কুমারটুলীতে জনৈক ইষ্টক-ব্যবসায়ীর অধীনে আমি একটি কর্ম্ম যোগাড় করিলাম এবং তথায় ফরিদপুরনিবাসী পূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস নামে এক জন লোকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। এই লোকটি একটি বারবনিতার গৃহে থাকিত এবং তথায় আর একটি বারবনিতার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল এবং তাহার ঘরে যাতায়াত করিতে লাগিলাম। পূর্ণর অনুরোধে ঐ চাকুরীতে ইস্তফা দিলে সে অন্য স্থলে আমায় আর একটি কার্য্যে বাহাল করিয়া দিল। সেই সময়ে অর্থাৎ বর্ত্তমানকাল হইতে প্রায় ৬।৭ বৎসর পূর্ব্বে, আমি ১ নং আসামী লালমোহনের নিকট ফিরিয়া যাই। লালমোহন মুরশিদাবাদের কোন এক জন রাজার অধীনে আমায় চাকুরীতে বাহাল করিয়া দেয় এবং প্রায় এক বৎসর পরে নায়েবের সহিত আমার মনোমালিন্য হওয়ায় আমি ঐ চাকুরী ছাড়িয়া দিই এবং কলিকাতায় ফিরিয়া আসি। লালমোহনও ঠিক ঐ সময়ে সেখানে গিয়াছিল এবং আমার কলিকাতায় চলিয়া আসার পর সে-ও ফিরিয়া আসিল। আমি নূতন কার্য্যানুসন্ধানের জন্য নানাস্থানে যাইতে লাগিলাম। কৃষ্ণনগর হইতে কলিকাতায় আসিবার সময় আমি একটি স্ত্রীলোককে আনিয়াছিলাম এবং আমাদের জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য তখন চুরি করিতে লাগিলাম। প্রায় ৩ বৎসর পূর্ব্বে কলুটোলা থানা হইতে চৌর্য্য অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া ৬ মাস যাবৎ কারাবাস করি। কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া আমি সেই স্ত্রীলোকটির নিকট ফিরিয়া আসি, (তাহার নাম সত্যবালা) এবং আমাদের জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য আমি অন্যান্য লোকের নিকট হইতে ধার করিতে আরম্ভ করি। প্রায় ৬ মাস পরে হঠাৎ এক দিন লালমোহনের সহিত রাস্তায় দেখা হইল এবং সে আমাকে তাহার সোনাগাছিতে দোকানের কথা বলিলে আমি সেখানে তাহার সহিত দেখা করিতে আরম্ভ করিলাম। ইতিপূর্ব্বে সত্যবালা আমাকে ত্যাগ করিয়াছিল এবং আমি সেই সময় হইতে সরোজিনী নামে একটি স্ত্রীলোককে চিৎপুর রোডে রক্ষিতা হিসাবে রাখিয়া বসবাস করিতেছিলাম। এক দিন লালমোহনকে আমি তথায় লইয়া যাইয়া আমার জীবনের ইতিহাস ও কষ্টের কথা বলিলাম। এই সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া লালমোহন আমায় অভয় মিত্রের ষ্ট্রীটস্থ ২ নং আসামী শচীনন্দনের গদীতে লইয়া যাইয়া তথায় তাহার সহিত আমার পরিচয় করিয়া দেয়। সে নিজেকে এক জন পাটব্যবসায়ী বলিয়া প্রচার করিয়াছিল, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সে কোনরূপ ব্যবসা করিত না। লালমোহন আমায় বলিল যে, সে শচীনন্দনকে অংশীদারী কারবারের জন্য কতকগুলি টাকা অগ্রিম দিয়াছে। আমি তাহাকে এ বিষয় কিছু পরামর্শ দিলাম। তৎপরে এক দিন আমি শচীনন্দনের গদীতে বাবুলাল এবং গঙ্গাপ্রসাদ নামে দুই জন মাড়োয়ারী ভদ্রলোককে দেখিলাম। তাহারাও আমার নিকট উক্ত কারবারের অংশীদার বলিয়া পরিচিত হইল। সেখানে আমি এক জন কার্য্যকারী অংশীদাররূপে নিযুক্ত হইলাম এবং শচীনন্দন আমায় এই পত্রখানি স্বহস্তে লিখিয়া দিয়াছিল। সন ১৩২৪ সালের ১লা আষাঢ় তারিখে এই ২ নং পত্রখানা বাবুলাল নামে উক্ত মাড়োয়ারী ভদ্রলোকটি আমায় দিয়াছিলেন। ইহার পরে লালমোহন প্রায় বেশী সময়ই গদীতে থাকিতে আরম্ভ করিল। এক দিন তাহারা আমার নিকট কারবারের জন্য কিছু টাকা চাহিলে পর আমি ২০৲ টাকা দিলাম। এক জন মাড়োয়ারীকে ২০ টিন ঘৃত সরাইয়া ঠকান হইয়াছিল এবং সেই টিনগুলি আমাদিগের মধ্যে ভাগ হইয়া গেল। লালমোহন ৬ টিন, শচীনন্দন ৬।৭ টিন পাইল এবং আমি ২ টিন পাইলাম। ইহার

জন্ত শচীনন্দনের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা আরম্ভ হইলে এই গদী ভাঙ্গিয়া যায়। তার পর আমি অবগত হইলাম যে, শচীর মা তারক চাটার্জ্জীর লেনের লালমোহনের বাড়ীর এক জন ভাড়াটে বা প্রজা, এবং লালমোহন আমায় অনুযোগ দিল যে, সে কোন ভাড়া দেয় না পরদিন লালমোহন শরৎচন্দ্র দাস নামে এক জন লোকের সহিত আমার বাসস্থানে আসিয়াছিল এবং আমি উক্ত শরৎচন্দ্রের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিলাম। এক দিন শরৎ আমাদিগকে মার্টিন কোম্পানীর কর্ম্মচারীর নিকট হইতে টাকা লুঠ করিবার কথা উত্থাপন করিলে আমি অস্বীকৃত হইলাম, কিন্তু লালমোহন ইহাতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল। তার পর কোনর অন্য এক প্রস্তাব উত্থাপিত হইল, কিন্তু তাহাও বাতিল হইল। তার পর ১০।১২ দিন পরে লালমোহন ও শচীনন্দন একসঙ্গে আমার বাসায় আসিয়াছিল এবং শচীনন্দন বন্দুক এবং রিভলবার সহযোগে ডাকাতি করার প্রস্তাব করিল। যদি সে ঐরূপ যোগাড় করিতে পারে, তাহা হইলে আমার কোন আপত্তি ছিল না। পরদিন তাহারা পুনরায় আমার নিকট আসিয়া বলিল যে, পূর্ব্বাপেক্ষা তাহারা অনেক সহজ উপায় স্থির করিয়াছে এবং সেই উপায়টি এই যে, আমরা সকলে মিলিয়া বেশ্যার গৃহে যাইয়া তাহাদিগকে বিষপ্রয়োগে হত্যা বা অচৈতন্য করিয়া তাহাদিগের সমস্ত অলঙ্কার অপহরণ করিব। আমি ইহাতে সম্মত হইলাম এবং শচীনন্দন গঙ্গাধর প্রামাণিকের ঔষধালয় হইতে মর্ফিয়া যোগাড় করার ভার গ্রহণ করিল। পরদিন তাহারা পুনরায় আমার নিকট আসিল। শচীনন্দনের নিকট দুটি শিশি ছোট গুলীতে ভর্ত্তি ছিল। সে বলিল যে, এই গুলী মদের সহিত মিশ্রিত করিয়া স্ত্রীলোককে উহা খাওয়াইয়া অজ্ঞান করান হইবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, এ সব হাঙ্গামা পোয়ায় কে? ইহাতে লালমোহন স্বীকৃত হইল। তার পর তাহারা শিকার অনুসন্ধানে বহির্গত হইল। এ পর্য্যন্ত এ সকল বিষয়ে আমি ইতস্ততঃ করিতেছিলাম, কিন্তু শেষে ঐ দলে যোগ দেওয়া স্থির করিলাম। পরদিন সন্ধ্যার সময় তাহারা আমার নিকট আসিল। তখন সম্ভবতঃ সন ১৩২৪ সালের শ্রাবণ মাস। আমি তাহাদের সহিত ফুলবাগানে সরলা নামে এক বেশ্যার নিকট গিয়াছিলাম। মদ আমাদের সঙ্গে ছিল, এবং সেই মদ আমরা চারজন মিলিয়া পান করিলাম। স্ত্রীলোকটিকে মদ দিবার সময় একবার এক গ্লাসের ভিতর শচীনন্দন দুইটি গুলী মিশাইয়া দিল। কিন্তু তাহাতে সামান্য ক্রিয়া হইতে দেখা গেল। ইহা দেখিয়া আমি শচীকে আরও বেশী গুলী মিশাইয়া দিতে বলিলাম। উহাতে লালমোহনও সম্মত হইল। রাত্রি প্রায় ১টার সময় ঐ বেশ্যাটি বড় অস্থির ও চঞ্চল হইয়া উঠিল; তবে তার জ্ঞানলোপ হয় নাই। সুতরাং আমাদের মতলব ফলদায়ক হইল না। শেষে আমরা চলিয়া আসিলাম। পরদিন রাত্রিতে আরও অধিক গুলী মিশাইয়া সরলাকে মদ্য পান করান হইবে, এই স্থির করিয়া পুনরায় সরলার গৃহে যাইলাম। কিন্তু সে রাত্রিতে সরলা আমাদিগকে গৃহে প্রবেশ করিবার অনুমতি দেয় নাই। পুনরায় আমরা পরদিন রাত্রিতে সরলার নিকট গিয়াছিলাম, আরও অধিক গুলী মিশাইয়া তাহাকে মদ্য পান করাইয়াছিলাম, কিন্তু সেবারেও আমরা অকৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। আমরা শুধু যে সরলাকেই মদের সহিত গুলী মিশাইয়া পান করাইয়াছিলাম, তাহা নহে, আরও ১০।১২টি বারাঙ্গনার উপর ঐ গুলী প্রয়োগ করিয়াছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সর্ব্বত্রই বিফল-মনোরথ হইয়া আমাদের ফিরিতে হইয়াছে। কারণ, ঐ গুলীর প্রয়োগে মনোমত ফল কাহারও উপর পাওয়া যায় নাই।

ক্রমে লালমোহন বিরক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। কারণ, এ পর্য্যন্ত সমস্ত খরচই লালমোহনকে বহিতে হইতেছিল, এবং তাহারই পকেট হইতে বহির্গত হইত। পরে, আর একবার পরামর্শ করিয়া আমরা আর একটিবার ঐ গুলী প্রয়োগ করিয়াছিলাম, কিন্তু সেবারেও পূর্ব্বেরই মত ফল হইল; অর্থাৎ সেটিও ফলদায়ক হইল না। তার পর আমরা পরস্পর মিলিয়া এক দিন এই স্থির করিলাম যে, যখন গুলী মদের সঙ্গে মিশাইয়া বহুবার পান করাইয়া কোন ফল হইল না, তখন এবার তাহাকে খুব মদ খাওয়াইয়া মাতাল করিয়া তাহার গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলাই ভাল। এই উপায়টি উদ্ভাবন করিল লালমোহন, তবে সে আমাদের নিকট প্রস্তাব করিলে আমরা তাহার প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছি।

ইহার ২ দিন পরে লালমোহন ও শচীনন্দন আমার নিকট আসিয়া আমাকে ব্রজদুলাল ষ্ট্রীটে লইয়া গেল। যখন ব্রজদুলাল ষ্ট্রীটে যাই, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, রাত্রি প্রায় ৮টা। আমরা সকলে দুলালী বলিয়া একটি বেশ্যাকে মনোনীত করিয়া তাহারই গৃহে প্রবেশ করিলাম। কিছুক্ষণ আলাপ ও আনন্দের পর আমরা একসঙ্গে মদ্যপান করিলাম, দুলালীর জন্য একটি গ্লাসে দুটি গুলী মিশাইয়া তাহাকেও পান করাইলাম এবং অন্য একটি গ্লাসে আরও দুটি গুলী মিশাইয়া রাখা হইল। মদ্যপান করিবার কিছুক্ষণ পরে দুলালী বড়ই ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল, উদ্দাম ও চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং আমাদের নিকট তাহার যে ঠিকা টাকা পাওনা ছিল, তাহার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। তখন ননীবালা ও অন্য এক জন বেশ্যা আসিয়া আমাদিগকে একটি শূন্য ঘরে

বসাইয়া বাহির হইতে তালা বন্ধ করিয়া রাখিল। সমস্ত রাত্রিটা ত আমাদের সেই ঘরে কাটিল; ভোরবেলা তাহার প্রাপ্য টাকা তাহাকে দিয়া আমরা ঐ আবদ্ধ গৃহ হইতে খালাস পাইলাম; খালাস পাইয়া আমরা চলিয়া আসিলাম। সে দিন চলিয়া আসিয়া পুনরায় বৈকালে আমরা বাহির হইয়া অপার চিৎপুর রোডে মানদা নামে একটি বেশ্যাকে পছন্দ করিলাম; অবশ্য তাহার শারীরিক সৌন্দর্য্যের দিক হইতে হউক বা নাই হউক, তাহার গায়ে যে মহামূল্য গহনাদি ছিল, তাহাই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল এবং সেই জন্যই আমরা মানদাকে পছন্দ করিয়া তাহার ঘরে যাইয়া বসিলাম। কিন্তু সে দিন আমাদের সঙ্গে কোন গুলী ছিল না। আমরা সকলেই যথেষ্ট মদ্যপান করিয়াছিলাম, কিন্তু আমাদের মতলব অনুযায়ী কোন কর্ম্মই করি নাই, পরদিন রাত্রিতেও আমরা সকলে মিলিয়া তাহার নিকট গিয়াছিলাম, কিন্তু সে রাত্রিতেও পূর্ব্বরাত্রির মত কেবল মদ্যপানেই কাটিল। ঐরূপে পরে আমরা আরও ৪।৫ রাত্রি তাহার নিকট গিয়াছিলাম এবং মদ্যপানও করিতাম। শেষে এক দিন লালমোহন বলিল যে,"আমি এইরূপে কত দিন অর্থব্যয় করিব, তোমাদের কি বল, তোমাদের ত অর্থব্যয় করিতে হইতেছে না, যার পকেটে হাত পড়ে, সেই বোঝে অর্থের কি মূল্য। আমি এইরূপভাবে আমার অর্থ "ন হোমায় ন যজ্ঞায়" ব্যয় করিতে পারি না।" যখন আমরা দেখিলাম যে, লালমোহন তাহার অর্থব্যয়ের জন্য বড়ই বিরাগ প্রকাশ করিতেছে, তখন আমরা আমাদের উদ্ভূত উপায়ের সম্যক্ ব্যবহারে কৃতসঙ্কল্প হইলাম। তখন ১৩২৪ সাল, ভাদ্র মাস। তারিখটা সঠিক আমার স্মরণ নাই, তবে রাত্রি সাড়ে ৮টার সময় আমরা কয়জনে মিলিয়া আমাদের সেই মানদার গৃহে প্রবেশ করিলাম; প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে ঠিক করিয়াছিলাম যে, শচীনন্দন তাহার কণ্ঠদেশ সজোরে চাপিয়া ধরিবে, লালমোহন তাহার পা'দুটি খুব কসিয়া ধরিবে এবং আমি তাহার গলার ভিতর বস্ত্র দিয়া পেষণ করিব। লালমোহন বাবু সাজিল, শচীনন্দন এবং আমি লালমোহনের বন্ধু ও অর্থরক্ষক হইলাম। রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত মদ খাইতে লাগিলাম। তখন দেখিলাম যে, সেই বাটীতে অন্য একটি গৃহে পুলিস আসিয়াছে। আমরা বাটী হইতে বাহিরে আসিবার প্রয়াস করিলাম, কিন্তু পুলিস আমাদিগকে আসিতে দিল না, বলিল, "তোমাদিগকে আমাদের এই তল্লাসের সাক্ষী হইতে হইবে।" পুলিস আমাদের নাম জিজ্ঞাসা করিল, আমরা সকলেই মিথ্যা নাম দিলাম। শচীনন্দনকে ঐ বাটীর কতক লোক চিনিত বলিয়া সে আমাদের অপেক্ষা কিছু বিলম্বে আসিত। পুলিসের সেই তল্লাসে কেবল আমিই একা সাক্ষী দিলাম। পুলিস তন্ন তন্ন করিয়া ঘরখানি অনুসন্ধান করিয়া প্রায় মধ্যরাত্রিতে চলিয়া গেল। তার পর আমি মানদার গৃহে ফিরিয়া আসিয়া দেখি যে,শচীনন্দন ও লালমোহন তখনও বসিয়া আছে। সে দিন রাত্রিতেও আমরা প্রাণ ভরিয়া মদ্যপান করিলাম,তবে আমাদের আসল উদ্দেশ্য সমাধানের কোন কিছুই হইল না। পরে উপর্য্যুপরি আরও দুই রাত্রি আমরা তাহার নিকট গিয়াছিলাম, কিন্তু আমাদিগকে তাহার বাটীর সদর-দরজা হইতেই ফিরিতে হইত, কারণ, তাহার সদর-দরজা সর্ব্বদাই তালা-বন্ধ থাকিত। এইরূপ দেখিয়া লালমোহন একটি চাবি ঠিক করিল, চাবিটি জোগাড় করিবার পর আমরা পুনরায় এক দিন সন্ধ্যা ৭টা ৮টার সময় মানদার নিকট যাইলাম। যাইয়া মানদাকে লইয়া একসঙ্গে মদ্যপান করিতে লাগিলাম। রাত্রি প্রায় ৯টার সময় একটি বৃদ্ধ আসিয়া আমাদের নাম জিজ্ঞাসা করিল। আমরা তাহাকে আমাদের ঠিক নাম না বলিয়া অন্য নামে পরিচয় দিলাম। মানদা বলিল যে, আমাদের পিতামহের মত বার্দ্ধক্যগ্রস্ত ও পক্বকেশযুক্ত যে ভদ্রলোকটি তাহার নিকট আসিয়াছিল, তিনি মানদার প্রেমের পুরাতন কাঙ্গাল। রাত্রি সাড়ে ৯টার সময় মানদার সেই পুরাতন বৃদ্ধ খরিদ্দারটি চলিয়া গেল। তখন আমরা আবার মদ্যপান সুরু করিলাম, রাত্রি প্রায় ২টা পর্য্যন্ত আমাদের মদ্যপান চলিল। তার পর শচীনন্দন বসিয়া বসিয়া মানদার গলদেশ টিপিয়া ধরিল, লালমোহন তাহার পা'দুটি সবলে ধরিয়া রহিল, আমি মানদার মুখের ভিতর তাহারই পরণের বস্ত্রখানি হউক, কি তাহার গামছাখানি পুরিয়া দিলাম। মানদা ১০।১২ মিনিটের ভিতর ইহলীলা সংবরণ করিল। তখন আমরা তাহার দেহ হইতে চুড়ি, রুলি, মাকড়ি, তাগা, নেকলেস প্রভৃতি একে একে সমস্ত খুলিয়া লইলাম। তবে গহনাদি খুলিবার পূর্ব্বে আমরা মানদার গলদেশ একখানি বস্ত্র দিয়া সজোরে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলাম, যাহাতে সে আর কোনরূপে বাঁচিয়া উঠিতে না পারে। গহনাদি লইবার পর লালমোহনের সেই চাবিটি দিয়া সদর-দরজা খুলিয়া চম্পট দিলাম। গহনাগুলি সমস্তই লালমোহনের সঙ্গে রহিল। শচীনন্দন তাহার বাসার দিকে চলিয়া গেল, লালমোহন এবং আমি দুই জনে কলুটোলায় লালমোহনের এক আত্মীয় হরেন্দ্রলাল কর্ম্মকারের দোকানে আসিলাম। যখন হরেন্দ্রের দোকানে আসিলাম, তখন প্রায় ভোর; দোকানে আসিয়া সেখানকার লোকজনের ঘুম ভাঙ্গাইয়া তুলিলাম; হরেন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র "গয়া" আসিল, আসিয়া গহনাগুলি কতকাংশ গলাইয়া ফেলিল। বাকী গহনাগুলি লালমোহনই লইয়া গেল।

গয়া যে গহনাগুলি গলাইল, তাহা ওজনে প্রায় সাড়ে ১৮ ভরি হইবে ; লালমোহনের অনুরোধে হরেন্দ্র কর্ম্মকার ঐ স্বর্ণটুকু ৭০০৲ টাকায় বিক্রয় করিয়া দিল ; পথে আমাকে দুই শত টাকা দিয়া বাকী সমস্তই লালমোহন লইল। হরেন্দ্রকে লালমোহন বলিল যে, ঐ স্বর্ণ লালমোহনের এক খরিদ্দারের। এই ঘটনার পর প্রায় এক মাস আমরা চুপচাপ রহিলাম। এক মাস অতিবাহিত হইবার পর আমরা আরও বেশ্যার নিকট যাতায়াত করিতাম এবং তাহাদের উপরেও ঐ পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়াছিলাম ; কিন্তু কোথাও আমাদের উদ্দেশ্য ফলবান্ হয় নাই। মানদাকে হত্যা করিবার দুই মাস পরেই শচীনন্দন দেশে চলিয়া গেল। শচীনন্দন চলিয়া যাইবার পরেও আমরা কোন কোন বেশ্যার নিকট যাইতাম, কিন্তু আমাদের মনোমত উদ্দেশ্য অনুসরণ করি নাই। এক দিন রাত্রিতে লালমোহন এবং আমি চাকাপটীতে সুরবালা নামে এক বেশ্যার নিকট যাইলাম। প্রায় ১৫।১৬ রাত্রি যাতায়াতের পর তাহাকেও হত্যা করিলাম। সেবারে আমি বাবু সাজিলাম এবং লালমোহন আমার ক্যাশিয়ার হইল। হত্যার দিন রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত আমরা সকলে মিলিয়া একসঙ্গে মদ্যপান করিলাম, সেই সময় এক জন বাবু "মোহিনী"-নাম্নী তাহার রক্ষিতাকে সঙ্গে করিয়া আমাদের নিকট আসিল ; সুতরাং তাহাদিগকে লইয়াও আমরা রাত্রি ২টা পর্য্যন্ত আরও মদ্যপান করিতে লাগিলাম। প্রায় রাত্রি ২টার সময় মোহিনীকে সঙ্গে লইয়া তাহার বাবুটি চলিয়া গেল ; যখন মোহিনী চলিয়া যায়, সুরবালা আপনার তুগাছি অনন্ত মোহিনীর নিকট দিল। মোহিনী চলিয়া যাইবার পর আমরা ৩'জনে আরও কিছুক্ষণ আমোদ-প্রমোদ করিতে লাগিলাম। আমোদ আহ্লাদে কিছুক্ষণ কাটিবার পর লালমোহন সুরবালার গলা টিপিয়া ধরিল, আমি তাহার মুখের ভিতর কাপড় গুঁজিয়া দিলাম, সুরবালা কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি করিয়া মরিয়া গেল। যখন দেখিলাম, সুরবালা মরিয়া গিয়াছে, আমি তাহার গলায় যত্নপূর্ব্বক একখানি কাপড় খুব জোরে বাঁধিয়া দিলাম, পরে সুরবালার আলমারি হইতে তাহার আরও অনেক গহনা লইয়া সরিয়া পড়িলাম। লালমোহনের বাড়ী যাইয়া গহনাগুলি ওজন করাইয়া লালমোহনের নিকটেই রাখিয়া আসিলাম। সুরবালার আলমারি হইতে আমরা যে সব গহনা চুরি করিয়াছিলাম, তাহার সহিত নগদ ২৪৲ টাকা ও ১৬খানি মোহর ছিল। লালমোহন আমাকে নগদ ১৩৲ টাকা ও ৭খানি মোহর দিল। দু তিন দিন পরে গহনাগুলি বিক্রীত হইলে লালমোহন আরও ৪ শত ৫০ টাকা দিল। এই অর্থ প্রভৃতি পাইবার দুই দিন পরে আমি সরোজিনীকে লইয়া কলিকাতা হইতে নবদ্বীপ পলাইলাম। নবদ্বীপে আমি প্রায় এক মাস ছিলাম, সেই সময় লালমোহনের সহিত আমার চিঠিপত্র চলিত। পরে লালমোহনের কথামত আমি নবদ্বীপ হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম এবং হাড়কাটা লেনে একটি বাসা লইলাম। তার পর শচীনন্দনের নিকট হইতে লালমোহন চিঠি পাইল, লালমোহন আমাকে লইয়া শচীনন্দনের দেশে যাইল ; সেখানে প্রায় ৮।৯ দিন অবস্থান করিয়াছিলাম। সেখানে থাকিবার সময় আমরা আর এক নূতন মতলব স্থির করিলাম যে, দেখিতে হইবে, কলিকাতার বাহিরে আমাদের পূর্ব্ববৎ কোন কার্য্য ঐরূপভাবে বেশ্যার উপর চালাইতে পারা যায় কি না ? শচীনন্দনের নিকট হইতে দশ টাকা লইয়া লালমোহন এবং আমি নারায়ণগঞ্জে যাইলাম। শচীর জন্ম আমরা ৭।৮ দিন অপেক্ষা করিবার পর লালমোহন এবং আমি মুক্তা নামে কোন বেশ্যাকে খুন করিয়া তাহার সমস্ত গহনা আত্মসাৎ করিয়া সকলে মিলিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম। তখন শীতকাল, ১৩২৪ সাল। লালমোহন তাহার একখানি খাতায় সমস্ত খরচাই লিখিত। ইহার পর যাহাকে খুন করিয়াছিলাম, তাহার নাম কৃষ্ণা। সে বেণেটোলা ও চিৎপুরের মোড়ে থাকিত। সেই খুনের ভিতর আমরা তিন জনেই লিপ্ত ছিলাম। প্রায় এক মাস পূর্ব্বে শচীনন্দন কলিকাতায় আসিয়াছিল এবং ঐ খুনটি ১৩২৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে হইয়াছিল। লালমোহন আমাদিগকে সংবাদ দিল যে, কৃষ্ণার বহু মূল্যবান অলঙ্কার আছে, কারণ, ঐ স্ত্রীলোকটি লালমোহনের খরিদ্দার ছিল। আমরা তিন জনে মিলিয়া পূর্ব্বের মত সন্ধ্যার সময় যাত্রা করিলাম। লালমোহন কৃষ্ণার নিকট আমাকে এক জন খুব ধনী ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত করাইল। আমরা দু'তিন দিন ধরিয়া কৃষ্ণার "কালবরণে" যত মোহিত হই বা নাই হই, তাহার নিকট যাতায়াত করিতে লাগিলাম এবং আমি তাহাকে আমার রক্ষিতা হিসাবে রাখিবার ভাণ করিলাম। যখন কৃষ্ণা দেখিল যে, আমি কৃষ্ণার রূপযৌবনে মুগ্ধ এবং তাহার জন্ম আমি নিতান্ত অনুরাগী, তখন কৃষ্ণা আমাকে বলিল যে, বরাহনগরে তাহার যে চুড়ি বাঁধা আছে, অন্ততঃ সেগুলি যতক্ষণ না আমি টাকা দিয়া খালাস করিয়া তাহাকে আনিয়া দিতে পারি, ততক্ষণ সে আমার রক্ষিতা হইতে মোটেই রাজি নয়। লালমোহনের পরামর্শ অনুসারে আমি তাহার চুড়ি খালাস করিয়া দিতে সম্মত হইলাম। পরদিন লালমোহন মনোমোহন সরকার নামে এক ব্যক্তিকে ৫০৲ টাকা দিয়া কৃষ্ণার চুড়ি খালাস করাইয়া কৃষ্ণাকে আনাইয়া দিল। যখন মনোমোহন চুড়িগুলি

আনিয়া দিল, তখন বেলা সাড়ে ৪টা কি ৫টা হইবে। সেই দিনই বৈকালে আমরা কৃষ্ণার নিকট যাইয়া দেখিলাম যে, কৃষ্ণার গায়ে অন্যান্য অলঙ্কারাদির সহিত পূর্ব্বোক্ত চুড়িগুলিও শোভা পাইতেছে। কৃষ্ণা চুড়িগুলি পাইয়া বড়ই প্রীত; আমরা কৃষ্ণার আনন্দে আনন্দিত হইয়া রাত্রি ১০টা ১১টা পর্য্যন্ত প্রাণ ভরিয়া মদ্যপান করিলাম; শুধু মদ ভাল লাগিল না, তখন মদের সহিত কিছু মিষ্টান্নের অর্ডার হইল। কৃষ্ণা এক ভৃত্যকে ডাকিয়া কিছু খাবার আনিতে বলিল। আমি কৃষ্ণার হুকুমমত ভৃত্যকে লইয়া দোকানে গিয়া দোকানদারকে খুব উত্তম মিষ্টান্ন ও অন্যান্য খাদ্যাদি ঠিক ওজন করিয়া দিতে বলিলাম। খাবার আনিয়া কৃষ্ণার হস্তে দিলাম। রাত্রি প্রায় ১টা ১৷৹ টা পর্য্যন্ত প্রাণ ভরিয়া মদ্যপানের সহিত ঐ খাদ্যাদি আহার করিলাম, কৃষ্ণাই আমাদিগকে খাদ্যাদি সাজাইয়া দিল, এবং তাহাকে লইয়া একসঙ্গে আমরা খাইতে লাগিলাম। যখন একটু অবসাদ আসিল, তখন আমরা সকলেই শুইয়া পড়িলাম। সেই দিন কৃষ্ণা খুব অধিক পরিমাণে মদ্যপান করিয়াছিল। কিছুক্ষণ কৃষ্ণার ভাবগতিক দেখিয়া আমরা সকলেই তাহাকে হত্যা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। তার পর সুযোগ বুঝিয়া আমি তাহার গলা টিপিয়া ধরিলাম, লালমোহন তাহার মুখের ভিতর কাপড় দিয়া মুখ ধরিয়া রহিল, এবং শচীনন্দন তাহার পা চাপিয়া ধরিল; কিছুক্ষণ এইভাবে থাকিয়া কৃষ্ণার জীবন শেষ হইল। আমরা তখন তাহার অঙ্গ হইতে সমস্ত অলঙ্কারাদি লইয়া আসিলাম এবং প্রায় রাত্রি সাড়ে ৪টার সময় লালমোহনের দোকানে যাইলাম। তখনই গহনাগুলি সেখানে ওজন করিয়া, শচীনন্দন এবং আমি দুই জনে তাহার দোকান হইতে চলিয়া আসিলাম। পরদিন লালমোহন আমাকে প্রায় ১ শত টাকা দিল। কৃষ্ণাকে হত্যা করিয়া আমরা যে ক্ষান্ত ছিলাম, এখন নহে, অন্যান্য বেশ্যার উপরও আমাদের উদ্দেশ্যসাধনের চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই। দুলালী ও আরও কয়েক জনের উপরেও চেষ্টা করিয়াছিলাম। লালমোহন এবং আমি দুই জনে মিলিয়া এক দিন রাত্রিতে চিৎপুর রোডের নগেন্দ্রবালাকেও হত্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। নগেন্দ্রবালা চীৎকার করিলে অন্যান্য লোকজন জমা হইল, তখন আমরা একটা অন্য কারণ দেখাইয়া সেই দিন-কার মত তাহাদের নিকট হইতে রেহাই লইয়া পলাইয়া আসিয়াছিলাম। লালমোহন নগেন্দ্রবালার নেকলেস ছিঁড়িয়া লইয়াছিল, কিন্তু সেটি সে নগেন্দ্রের শয্যার পার্শ্বেই রাখিয়াছিল, পাছে লোকজন তাহাকে ধরিয়া ফেলে এই ভয়ে। তার পর যাহাকে খুন করা হয়, তাহার নাম ননীবালা, ব্রজদুলাল ষ্ট্রীটের। তখন চৈত্র মাস, সংক্রান্তির কাছাকাছি। লালমোহন, শচীনন্দন এবং আমি তিন জনে মিলিয়াই তাহাকে হত্যা করি। ইহাকে হত্যা করিবার পূর্ব্বে আমরা কয়জন মিলিয়া ইহার বাটীতে তিন চার দিন গিয়াছিলাম। যে দিন তাহাকে হত্যা করি, তাহার ঠিক পূর্ব্বদিনে তাহার নিকট আমরা যাইলাম, এবং সেই দিন দিনের বেলায় এক জন গুণ্ডা আমাদের নিকট হইতে একটি মদের বোতল কাড়িয়া লইয়াছিল। ননীবালাকেও রাত্রি ২৷৹টার সময় হত্যা করিয়া, সমস্ত গহনা লইয়া আমরা পলাইয়াছিলাম। ননীবালার অঙ্গ হইতে একগাছি চেনহার, সোনার পাতায় মণ্ডিত চিরুণী, মাথার সোনার ফুল, এক জোড়া সোনার তাগা, ৮ গাছি চুড়ি, মাথার সোনার টিকলি, দুটি আংটী, দুটি পার্শি ইয়ারিং এবং অন্যান্য বস্ত্র ও জামা তাহার আলমারি হইতে লইয়া আমরা পলাইলাম। যাইবার সময় কাপড় প্রভৃতি আমি লইলাম ও অলঙ্কারাদি সমস্তই লালমোহন লইল। আমার নিকট একখানি বোম্বাই সাড়ী, দুইটি বডি জামা ও একটি আংটী ছিল, আমি ঐগুলি লইয়া আমার হাড়কাটা লেনের বাসায় আসিলাম। বাকি দ্রব্যাদি লালমোহন তাহার বাসায় লইয়া গেল এবং শচীনন্দন তাহার সঙ্গে সঙ্গেই চলিল। পরদিন আমি লালমোহনের নিকট আসিলে লালমোহন আমায় ১ শত টাকা দিয়া আরও দিবে অঙ্গীকার করিল। তার পর শচীনন্দনের নিকট যাইলাম, এবং শচীনন্দনকে লইয়া রামবাগানের সরোজিনীর নিকট যাইলাম। সরোজিনী ননীর হত্যাব্যাপার জানিত। আমি সরোজিনীর হাতে ঝপ্ করিয়া ৫৲ টাকা দিলাম, এবং আরও বলিলাম যে, শচী ও লালমোহন তাহাকে ৫৲ টাকা করিয়া আরও দিবে। পরে যে হত্যাটি করি, সেটি ভাদ্র মাসে, মাণিকতলা ষ্ট্রীটের সুকুমারীকে। সুকুমারীকে হত্যা করিবার পূর্ব্বে আমরা কুমারটুলীর কুসুমকুমারী ও চিৎপুর রোডের হরিমতিকেও হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু আমাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। লালমোহন এবং আমি দুই জনে মিলিয়া হাড়কাটা লেনের ননীবালার উপর ও আরও দুই এক জনের উপর আমাদের মতলব চালাইতে গিয়াছিলাম, কিন্তু উদ্দেশ্য ফলবান হয় নাই। আমি এবং লালমোহন, নাথের বাগানের শেখপাড়ার চারুবালার নিকট গিয়াছিলাম, তাহাকে খুব মদ্যপান করাইয়া জ্ঞানলোপ করিয়া তাহার অঙ্গ হইতে একজোড়া অনন্ত খুলিয়া লইয়া আসিয়াছিলাম। একগাছি তাগা লালমোহন লইল, আর একগাছি সে গালাইয়া সোনাটুকু ১০৲ টাকায় বিক্রয় করিয়া আমাকে টাকাটি দিল। কুমারটুলীতে আমরা আর এক স্থানে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। আমি সেখানে

যাইয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিলাম, শচীনন্দন এবং লালমোহন দুই জনে মিলিয়া ঘরের ভিতর যাইয়া তাহার গলা টিপিয়া ধরিল, কিন্তু তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইল। আমি ইন্স্পেক্টার সাহেবকে সমস্ত স্থানই দেখাইয়াছি। সুকুমারীকে হত্যা করিবার পূর্ব্বে শচীনন্দন ও লালমোহন কলিকাতা হইতে চলিয়া গেল, কলিকাতার বাহিরে হত্যা করিবে ও তাহাদের আরও সুবিধা হইবে এই আশায়। তাহারা ১০।১২ দিন পরে আবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল। তার পর, লালমোহন এবং আমি দুই জনে মিলিয়া কুষ্টিয়ায় যাইলাম, সেখানে সরোজিনী ও তাহার এক জন ভগিনীকে আমরা হত্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু হত্যা করিতে পারি নাই। বিফল-মনোরথ হইয়া আমরা কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। তার পর, সুকুমারীকে হত্যা করিবার প্রায় মাসখানেক পূর্ব্বেই আমরা নবদ্বীপ যাত্রা করিয়াছিলাম। সেখানে গিয়া সুকুমারীকে তাহার প্রেমিক ভোলানাথ দাসের সহিত দেখি। আমরা কিছুদিন নবদ্বীপে থাকিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলে ভোলানাথ দাস আমাকে এক দিন সুকুমারীর গৃহে লইয়া গেল। পরদিন আমি লালমোহনকে সুকুমারীর নিকট লইয়া আসিলাম। উপর্য্যুপরি দুই তিন দিন ধরিয়া আমরা সুকুমারীকে দর্শন করিতে যাইতে লাগিলাম। সুকুমারীর অঙ্গ অলঙ্কারে আবৃত ছিল ; লালমোহন ইহাকে তাহার মনোমত শিকার বলিয়া আমাকে জানাইল, এবং ইহাকে হত্যা করিবে, এইরূপ স্থির করিবার জন্য আমাকে জিজ্ঞাসা করিল। প্রথমে আমি রাজি হই নাই। কিন্তু লালমোহন আমায় পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। তখন আমি রাজি হইয়া সুকুমারীকে বলিলাম যে, আমি তাহাকে আমার রক্ষিতা হিসাবে রাখিব। কিছুদিন আমরা আর সুকুমারীর নিকট যাই নাই ; ইতিমধ্যে সে তাহার বাসা বদলাইয়া অন্য স্থানে চলিয়া গিয়াছিল। আমরা অনেক অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম যে, সুকুমারী মাণিকতলায় উঠিয়া গিয়াছে। এ সন্ধান ভোলানাথ দাসই আমাদিগকে আনিয়া দিল। লালমোহন এবং আমি দুই তিন দিন ধরিয়া সুকুমারীর নিকট যাইলাম। এই তিন দিন ধরিয়া যখন তাহার নিকট যাই, অনাথ গাঙ্গুলী বলিয়া একটি লোক এক দিন আমাদের সহিত তাহার গৃহে গিয়াছিল। যে দিন আমরা সুকুমারীকে হত্যা করি, সে দিন খুব বর্ষা ; লালমোহন এবং আমি দুই জনে রাত্রি ৯টার সময় সুকুমারীর গৃহে আসিয়া তাহাকে লইয়া যথেষ্ট মদ্যপান করি। প্রায় রাত্রি ২টা পর্য্যন্ত মদ্যপান করিলাম ; সুকুমারী ঘুমাইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ ধরিয়া যখন দেখিলাম যে, সে বেশ ঘুমাইয়াছে, তখন লালমোহন তাহার গলা টিপিয়া ধরিল এবং আমি তাহার মুখের ভিতর কাপড় গুঁজিয়া দিলাম। সে বহু চেষ্টা করিয়াও বাঁচিতে পারিল না, শেষে তাহার প্রাণনাশ ঘটিল। তখন আমরা তাহার সমস্ত অলঙ্কারাদি লইয়া পলায়ন করিলাম। পরদিন ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটের উপর আমাদের দেশের এক জন কবিরাজ অন্নদাপ্রসাদ বাবুর ঔষধালয়েই আশ্রয় লইলাম। সেইখানে আমার রক্ষিতা সরোজিনী যাইয়া আমায় বলিল যে, লালমোহন ধরা পড়িয়াছে। আমি সরোজিনীকে লালমোহনের বাসায় সন্ধান লইতে পাঠাইলাম। সে ফিরিয়া আসিয়া আমাকে কিছু কিছু সংবাদ দিল। অন্নদা কবিরাজের বাসায় প্রায় দুই মাস ছিলাম। সুকুমারীর হত্যার প্রায় ১০।১২ দিন পরে লালমোহন এক দিন আমায় অন্নদা কবিরাজের বাসায় দেখিয়াছিল এবং আমাকে বলিয়াছিল যে, সে জামিনে খালাস আছে। সে আমাকে এ স্থান হইতে পলাইতে বলিয়াছিল। ৫।৬ দিন পরে লালমোহনের সহিত আমার আর একবার দেখা হইয়াছিল। তখন আমি ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীটে ইন্দ্রমোহন শাহার গদিতে থাকি। তখন লালমোহন আমাকে দেখিয়া বলিল যে, কালীঘাটে একটি খুব ধনী বেশ্যা আছে, তাহাকে হত্যা করিবার জন্য আমার সম্মতি জিজ্ঞাসা করিল। আমি তখন লালমোহনের কথায় ইতস্ততঃ করিতেছিলাম, কারণ, লালমোহন তখন জামিনে রহিয়াছে। কিছুক্ষণ ধরিয়া কথা-বার্ত্তার পর আমি লালমোহনের সহিত একমত হইলাম। পরদিন লালমোহন অর্থ লইয়া আমার নিকট আসিয়া আমাকে লইয়া কালীঘাটে যাইল ; কিন্তু সে দিন সে স্ত্রীলোকটির সহিত সাক্ষাৎ হইল না, সে বাহিরে গিয়াছিল। প্রায় মাসখানেক পরে আর এক দিন রাত্রিতে লালমোহনের সহিত কালীঘাটে ঐ স্ত্রীলোটির উদ্দেশ্যে যাইলাম, যাইয়া দেখি যে, স্ত্রীলোকটি ঘরের মধ্যে বসিয়া আছে। আমরা মদ আনিতে বাহির হইলাম, ফিরিয়া আসিয়া আর এক জন বেশ্যাকে ধরিয়া ঐ বেশ্যাটির নিকট পৌঁছিলাম। আমরা দেখিলাম যে, সে দিন আমাদের উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমাদের সঙ্গে সে দিন টাকা না থাকায় একটি আংটি তাহার নিকট জামিনস্বরূপ রাখিয়া আসিলাম। দুই এক দিন পরে আমরা আবার তাহার নিকট যাইয়া প্রথমে আমাদের ঐ আংটী টাকা দিয়া খালাস করিয়া লইলাম। তার পর আমরা যামিনীকে আমাদের শিকার বলিয়া সাব্যস্ত করিলাম। যামিনীর নিকট কিছু দিন যাইতে লাগিলাম, তাহার সঙ্গে মদ্যপানও করিতাম, এইরূপে কিছুদিন যাওয়া আসা চলিল। কিছুদিন পরে অষ্টমী কি নবমী পূজার দিন আমরা পুনরায় যামিনীর নিকট যাইলাম,

লালমোহন এবং আমি, এই দুই জনে। সে দিন রাত্রি ১টা ২টা পর্য্যন্ত মদ খাইলাম, যামিনীকেও খাওয়াইলাম, শেষে আমাদের উদ্দেশ্যমত যামিনী ঘুমাইলে তাহাকে হত্যা করিলাম। তাহাকে হত্যা করিয়া তাহার মাকড়ি, অনন্ত, তাগা, হার প্রভৃতি সমস্ত লইয়া বাহির হইয়া আসিলাম; আসিয়া দেখি, সদর-দরজা বন্ধ. তখন মাটীর দেওয়াল দিয়া উঠিয়া রাস্তায় লম্ফ দিয়া নামিয়া পলাইলাম। আমি তাহার চিরুণী, ফুল লইয়াছিলাম; সেগুলি ইন্দ্রমোহন শাহাকে বিক্রয় করিয়াছি। সেইগুলি ত দেখিতেছি এই স্থানে হুজুরের টেবিলের উপর, এইগুলি পুলিস ইন্দ্রমোহন বাবুর নিকট হইতে পাইয়াছিল। কিছুদিন পরে লালমোহন আমায় ৪১৲ টাকা দিল। প্রায় এক মাস দেড় মাস পরে এক দিন লালমোহনকে লইয়া রাম-বাগানের সুবাসিনীর নিকট যাইলাম। সুকুমারীকে হত্যা করিবার পূর্ব্বে দুই এক দিন তাহার নিকট গিয়াছিলাম, সেই জন্যই তাহাকে চিনিতাম; সুবাসিনীকে সেই রাত্রেই হত্যা করিলাম। লালমোহন পলাইবার জন্য তাহার সহিত একগাছি দড়ি ও কিছু বড় পেরেক লইয়াছিল, কারণ, সদর-দরজায় তালা বন্ধ থাকিত। রাত্রি প্রায় ৩টার সময় সুবাসিনীকে হত্যা করিলাম। আমরা তাহার রুলি, তোড়া, বিছা, ইয়ারিং, পার্শি মাকড়ি এবং অন্যান্য দ্রব্য লইয়া ঐ পেরেক, রজ্জু ও একখানি কাপড়ের সাহায্যে দরজা বন্ধ থাকা সত্ত্বেও পলাইয়া আসিলাম। আমরা ফ্রী স্কুল ষ্ট্রীটে চলিয়া আসিলাম, আসিয়া ইন্দ্রমোহন শাহার নিকট ঐগুলি বিক্রয় করিতে দিলাম। ইন্দ্রমোহন পায়ের তোড়া জোড়াটি ৪৪৲ টাকায় বিক্রয় করিয়া ঐ অর্থ আমাকে দিল। এ কথা আমি পুলিসকে বলিয়াছি। সেগুলি উপস্থিত এই তোড়ারই মত,যাহা কোর্টে দেখিতেছি। তবে সেগুলি এত উজ্জ্বল নয়। এই-গাছি দেখিতেছি যে সেই বিছাটি, এই ত সেই রুলি জোড়া; ইন্দ্র-মোহন আমাকে তখন বলিয়াছিল যে, তাহার বাবু বিপিনবিহারী শাহা আমার নিকট টাকা পাইবে বলিয়া সেগুলি লইয়া রাখিয়া দিয়াছে, তাহাতে আমি লালমোহনকে সমস্ত বলিলাম; আমি লালমোহনকে এ কথা বলিলে লালমোহন ইন্দ্রমোহনকে ভয় দেখাইল যে, সে তাহাকে ঠকাইবার জন্য তাহার উপর নালিস করিবে। যাহা হউক, গহনাগুলি আর ফেরত পাওয়া গেল না। আমার সাক্ষাতে বিপিনবিহারী বাবু পুলিসের নিকট সমস্তই হাজির করিল। শেষে আমরা যে সুবাসিনীকে হত্যা করিয়া-ছিলাম, এইখানি তাহার ফটো। সুবাসিনীকে হত্যা করিবার প্রায় এক মাস দেড় মাস পরে এক দিন মতিশীল ষ্ট্রীটের উপর দিয়া যাইবার সময় ইন্‌স্পেক্টর মহেন্দ্র বাবু আমায় গ্রেপ্তার করিলেন। গ্রেপ্তার করিয়া আমার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি তাঁহাকে অন্য নামে পরিচয় দিলাম। আমাকে ধরিয়া লালবাজার থানায় লইয়া আসিলেন। তার পর এক দিন আমায় ইন্দ্রমোহন প্রভৃতি আরও ১০।১৫ জন লোকের ভিতর মিশাইয়া দিলে আমার এক ভাই এবং অন্যান্য সাক্ষী আমাকে চিনিয়া লইল। তখন আমি সমস্ত বৃত্তান্ত ইন্‌স্পেক্টার মহেন্দ্র বাবুর নিকট বলিলাম, বলিতে ইন্‌স্পেক্টর বাবু আমাকে ডেপুটী কমিশনারের নিকট লইয়া আসিলেন, তাঁহার নিকটেও আমি সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলাম। কালীঘাটে এক ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আমাকে লইয়া যাওয়া হইলে তাঁহার নিকটেও আমি যাহা যাহা করিয়া-ছিলাম, সমস্তই প্রকাশ করিলাম। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আমার বৃত্তান্ত শুনিয়া সমস্তই আমার কথামত লিখিয়া লইলেন। লিখিয়া আমায় পড়িয়া শুনাইলেন, আমি উহাতে আপনার নাম স্বাক্ষর করিয়াছি। এই বৃত্তান্ত সমস্ত যখন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট বলি, তখন এই একটি ভুল করিয়াছি, বলিয়াছি যে, সুরবালাকে কুক্ষার পর হত্যা করা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট যে সমস্ত কথা বলিয়াছি, সমস্তই স্বইচ্ছায় এবং আমাকে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সতর্ক করিয়া দিবার পর। সুকুমারীর অলঙ্কারের মধ্যে যে দুটি আংটী লইয়াছিলাম, সে দুটি ইন্দ্র-মোহনের নিকট বাঁধা দিয়াছি, শেষে সে দুটি ১৭৲ টাকায় তাহার নিকট বিক্রয় করিয়াছি। ঐ আংটী দুটির মধ্যে একটির ভিতর কৃষ্ণলাল মণ্ডল নাম লেখা ছিল এবং আর একটি পাথর বসানো দুমুখো সাপ পেটার্ণের। ননীর আংটীটি হাড়কাটা লেনের প্রমদার নিকট বিক্রয় করিয়াছি। সেটিও ত দেখিতেছি এইটি, ইহাতে নরেনের নাম লেখা আছে। আমরা যে সকল স্থানে আমাদের উদ্দেশ্যসাধন করিয়াছি, সমস্ত স্থানই ইন্‌স্পেক্টর মহেন্দ্র বাবুকে দেখাইয়াছি, কেবলমাত্র সুকুমারীর বাটীটিই দেখানো হয় নাই। আমি যাহা বলিয়াছি, সমস্তই খাঁটি সত্য। গত কল্যের এজাহারে আমি একটি ভুল করিয়াছি, মানদাকে হত্যা করিবার পর এবং সুরবালাকে হত্যা করিবার পূর্ব্বে আমি এবং লালমোহন নারায়ণগঞ্জে যাই, বাকি সমস্তটাই সত্য।

শ্রীতারকনাথ সাধু (রায় বাহাদুর)।

পাখীর প্রেম

১

বসন্তের হাওয়া ধরণীকে পুলকিত করিয়া তুলিয়াছে। আমাদের আঙ্গিনার দোলন-চাঁপার গাছে রাশি রাশি ফুল ফুটিয়াছে। যখন কর্ম্মহীন অলসভাবে বসিয়া থাকি, বারান্দায় বসিয়া দোলন-চাঁপার ঐশ্বর্য্য দেখি।

সে দিন ভোরের বেলা আমার ছোট বোন বলিল, "দাদা, ঐ দেখ না, এক জোড়া শালিক এসে ফুলের গাছে বাসা বাঁধছে।" 'রোমে রোঁলার 'জঁ। ক্রিষ্টফা' পড়িতেছিলাম। শক্তিশালী লেখকের বর্ণনা-চাতুর্য্যে অপূর্ব্ব রসলোকে বিচরণ করিতেছিলাম, শোভনার কথায় চমক ভাঙ্গিল, ধীরে কথার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া উত্তর করিলাম, "কৈ রে?"

শোভনা দুষ্ট মেয়ে, সকলের ছোট বোন, তাই একটু আদুরে। পড়া-শুনা তাহার ভাল লাগে না, রাত্রি-দিন খেলা করিয়া বেড়াইতে ভালবাসে, পাখী ও ফুল পাইলে তাহার আনন্দের সীমা থাকে না। দাদার মুখে ভৎর্সনার ভাব না দেখিয়া সে পরম খুসী হইয়া উঠিল। আঙ্গুল নাড়িয়া বলিল, "বা রে! ঐ দেখ না, ঐ যে থোপা থোপা ফুল ফুটেছে, তার নীচের ডালে এসে বসেছে।"

চাহিয়া দেখিলাম, এক যোড়া শালিক পাখী। পাখী দু'টি দেখিতে বড়ই সুন্দর, পলাশ-ফুলের মত রক্ত ঠোঁট দুটি বকুল-ফুলের মত সাদা বুকের উপর বেশ মানাইতেছিল, কাণের পাশে সাদা ফোঁটা দেখিয়া মনে হইতেছিল যেন, কাণের কোনও গহনা পরা হইয়াছে। আমি বলিলাম, "বেশ ত পাখী।"

শোভনার আহ্লাদ ধরে না, সে খুসী হইয়া বলিল, "দাদা, ওরা ঐখানে ডিম পাড়বে।"

ছোট বয়স হইতে বই-রোগ আছে, আর বর্ত্তমানের বন্ধুদিগের উক্তি 'বউ-রোগ' আমায় পীড়িত করিয়া রাখিয়াছে। বন্ধুদের কথা অবশ্য আমি প্রতিবাদ করি, আর মহিলা-মজলিসে গৃহিণী আমার অপ্রীতির জন্য যথেষ্ট দুঃখ করেন, তথাপি দুর্নাম বড় দুরন্ত জীব, মরিয়াও সে মরে না। যাক্, যে কথা বলিতেছিলাম। পাখীর জীবন লইয়া কৌতূহল কোনও দিন আমায় পাগল করিয়া তুলে নাই। এখন তাই মাঝে মাঝে শৈশবের মরা ঔৎসুক্য মাথা নাড়া দিতে চাহে। তাই শোভনার উল্লাসের সঙ্গে যোগ দিয়া বলিলাম, "তাই না কি?"

দাদাকে উৎসুক শ্রোতা পাইয়া শোভনার উৎসাহের সীমা নাই। বৌদির জবরদস্ত শাসন সমস্ত বাড়ীতে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুগত্যের অপ্রতিহত প্রভাব বজায় রাখিয়াছে। বৌদির কাছে তাই মনের দুরন্ত খেয়াল লইয়া মিতালি করা চলে না। দাদার উৎসাহ তাহাকে আনন্দ-বিহ্বল করিয়া তুলিল।

"ঠিক বলছি, দাদা। তুমি ত জান না, দোলন-চাঁপার পাশে ঐ আতা-গাছে ওতে এক জোড়া টুনটুনি বাসা করেছে, তার দক্ষিণ পাশে বাতাবি লেবুর গাছে দোয়েল বাসা বেঁধেছে।" বাহির-জগতের এ সমস্ত টুক্‌টাক খবর কেহ কোনও দিন জানায় না। বর্ত্তমানের যুগে ভগবানের দেওয়া চোখ বন্ধ করিয়া আমরা পুঁথিতে মন রাখি, খবরের কাগজ পড়িয়া তথ্য সংগ্রহ করি। শোভনার কাছে এ জগতের কোনও মূল্যই নাই। আরাকান সমুদ্রে জাহাজ ডুবুক, চীনে লড়াই বাধুক, আর ফরাসীদেশে এরোপ্লেন চূর্ণ হউক, তাহা লইয়া তাহার মাথা-ঘামান চলে না, সে শুধু পাখীর জগতের খবর লইয়া সন্তুষ্ট। আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া সে বলিল, "সত্যি বলছি। দেখবে?"

নীল আকাশের বুক ভরিয়া সোনালি রোদের আলো ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মন অকারণে খুসী হইয়া উঠিল। তাই বই ফেলিয়া পাখীর বাসা দেখিতে চলিলাম।

২

তাহার পরদিনের পরদিন শালিক পাখীর বাসায় নজর পড়ে। পুং-শালিক বাহির হইয়া যায়, খড়-কুটো বহিয়া আনে; স্ত্রী-শালিক বাসা বাঁধে। পাখী দুটিকে দেখাইয়া গৃহিণীকে বলিলাম, "দেখেছ, ওদের কেমন আদর্শ প্রেম।"

পতিপ্রিয়া সতী বলিলেন, "তোমার ত খালি প্রেম আর প্রেম! বাজে বইগুলি পুড়িয়ে ফেললে রক্ষা পাই।"

কৌতুক করিয়া বলিলাম, "মানুষের জগৎ হ'তে আজ-কাল সতী সাবিত্রীর যুগ গেছে, কিন্তু পাখীর জগতে আছে, ঐ যে শালিক-বধূ দেখছ, ও ঝগড়া করতে জানে না।"

অপ্রিয় সত্য বলিতে শাস্ত্রকারের নিষেধ, কিন্তু সে সত্য জীবনে মানিয়া চলিতে পারি না।

গৃহিণী রাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। ক্রোধভরে বলিয়া গেলেন, "বুড়ো হতে চল্লে, তবু ন্যাকামি গেল না।"

ভাবিতে বসিলাম, আমাদের দেশের মানুষ যৌবনের খেয়াল চাহে না।

কয়েক দিন পরে শোভনা আসিয়া বলিল, "দাদা, চল, শালিকরা ডিম পেড়েছে।"

দেওয়ালের পাশে পরিণতবয়স্ক দোলন-চাঁপার গাছে শোভনা অবলীলাক্রমে চড়িয়া গেল। বাসায় বসিয়া স্ত্রী-শালিক ডিমে তা দিতেছিল, শোভনাকে দেখিয়া কিচির-মিচির করিয়া উঠিল।

তাহার পর লক্ষ্য করিলাম, শালিক-প্রিয়া বাসায় বসিয়া প্রত্যহ ডিম পাহারা দেয়, শালিক দিগ্‌-দিগন্তরে খাবারের সন্ধানে বাহির হইয়া যায়। কয়েক দিন পরে অস্ফুট কাকলীতে শালিক-কুটীরে নবজাত শিশুর আবির্ভাব জানাইল। শোভনার আহ্লাদ দেখে কে? কেবলই ফাঁক খুঁজিতে থাকে, কখন্ পাখীর ছানাগুলি দেখিতে পাইবে।

তাহার বৌদি এক দিন রাগ করিয়া বলিলেন, "ধিঙ্গি মেয়ে কোথাকার, পড়া নেই শুনো নেই, কেবলই ফর-ফর ক'রে বেড়ানো হচ্ছে।"

শোভনা ভয়ে কাচু-মাচু হইয়া গেল, সে থামিয়া আত্ম-রক্ষার পথ খোঁজ করিতে লাগিল। আত্মাকে 'ধনৈরপি দারৈরপি' রক্ষা করিবে, এ কথা বই পড়িয়া শিখিতে হয় না, ইহা জন্মগত সংস্কার, শোভনা তাই মিথ্যার আশ্রয় লইল। ভয়ে ভয়ে বলিল, "সকালে যে পড়েছি।"

গৃহিণী নিজেকে খুব সত্যপ্রিয় বলিয়া বড়াই করেন, মিথ্যা শুনিলে না কি তাঁহার পিত্ত জলিয়া যায়। শোভনার মিথ্যা উক্তি তাই অগ্ন্যুদ্গার করিল। "সারা সকাল যে তুই বেলার সাথে খেলা করলি, বড় মিথ্যুক হয়েছিস, যা, এক্ষুণি বই নিয়ে পড় গে।"

ভয়ে মনোবেদনায় শোভনা পাণ্ডুর হইয়া উঠিল। তাহার কাতর মুখ দেখিয়া দয়া হইল, কিন্তু গৃহ-কলহ করিয়া লাভ নাই। তাই বলিলাম, "লক্ষ্মী বোন্। একটু পড়, তার পর তোমায় ছবির বই দেখাব।"

এ আদর কর্ত্রীর ভাল লাগিল না। তিনি এক ঢিলে দুই পাখী মারিলেন। "অমনি আদর দিয়েই তুমি ওর মাথা খেলে। ওকে যদি কেউ বিয়ে করে ত কি বলছি?"

মহা সমস্যা! ভাবী বরের জন্য দিনের পর দিন সাত ভাই বোনের ছোট বোনটিকে সমস্ত আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিব? এ কথায় মন সায় দেয় না।

পাখীর ছানাদের জন্য খাবার চাই, শালিক তাই বড় ব্যস্ত, উড়িয়া দূরে দূরে যায় আর ঠোঁট পুরিয়া খাদ্যকণা সংগ্রহ করিয়া আনে। শালিক-বধূ কচিৎ কদাচিৎ নীড় হইতে নামিয়া সামান্য কিছু আহারীয় আনে, মাঝে মাঝে বাতাবি-তরুর দোয়েল-বধূর সহিত আলাপ করে, দোয়েল-পরিবারেও ছানা হইয়াছে, টুনটুনিদের ডিম হইয়াছে।

কিন্তু জোয়ারের জল চিরকাল থাকে না। ভাঁটায় জল ফিরিয়া যায়। হাস্যোজ্জ্বল তীর হতাশায় হাহাকার করিতে বসে। নিয়তিই বল আর দুর্দ্দৈব বল, দিনের জ্যোতির্ম্ময় আলো নিশীথের গভীর তমিস্রায় মিশিয়া যায়।

৩

হঠাৎ কোথা হইতে সে-দিন আর একটা শালিক আসিয়া উৎপাত বাধাইল। পাখীর ছানার রোদন-কলরব শুনিয়া চাহিয়া দেখি, শালিক-বধূ আগন্তুকের সহিত বেশ আলাপ জমাইয়াছে। ছানাদের কান্না ভুলিয়া উভয়ে বেশ মনের আনন্দে সমস্ত উঠানে চলাফেরা করিয়া বেড়াইল। দোয়েল-বধূ উভয়ের মাঝে একবার উড়িয়া পড়িল। বোধ হয়, দয়ার্দ্র হইয়া মাতাকে শিশুদের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছিল, কিন্তু যুগলের মনে বোধ হয় তখন মোহ কর্ত্তব্য-চিন্তা ভুলাইয়া দিয়াছিল।

বেলা-শেষের সোনালি সূর্য্যের আলো দোলন-চাঁপার গাছ হইতে বিদায় লইবার পূর্ব্বে শালিক-বধূ আপন নীড়ে ফিরিয়া আসিল। শালিক যখন বাসায় ফিরিল, তখন বোধ হয়, সে কিছুই জানিতে পারিল না।

পরের দিন বিকালবেলা বাহিরের উঠানে চেয়ার পাতিয়া একটি কবিতা লিখিতেছিলাম। এক লাইন মাত্র লিখিয়াছি—'সব মানুষের মাঝে গাহি আজ সব মানুষের জয়'; এমন সময় পাখীদের কলহ কাব্য-প্রশ্ন ভাঙ্গিয়া দিল। দেখিলাম, আগন্তুক শালিকের সহিত শালিক-পিতার বিপুল

বিরোধ লাগিয়াছে। দোয়েল, টুনটুনি-পরিবার যুদ্ধে যোগ দিয়াছে। আগন্তুক যুদ্ধে পরাহত হইয়া পলাইয়া গেল। শালিক-বধূ নীরবে দোলন-চাঁপার শাখায় বসিয়া রহিল।

ঠোকরাইয়া ঠোকরাইয়া শালিক বিশেষ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তথাপি রণজয়ী বীর শাখায় বসিয়া বিজয়-আনন্দে গান আরম্ভ করিয়া দিল। নানা ভঙ্গীতে পাখা ও পুচ্ছ দোলাইয়া কত রকম রকম সুরে গান গাহিতে লাগিল। সে-দিন সন্ধ্যার বহু পরেও তাহার গান আমার পাঠ-কক্ষকে মুখর করিয়া রাখিয়াছিল।

পরের দিন সদ্যোবিবাহিত বন্ধু নীপেশের স্ত্রীর সহিত পরিচিত হইবার জন্য দল বাঁধিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। আমার বিশেষ উৎসাহ ছিল না, মেয়েদের লইয়া হাস্য-কৌতুক করা আমার ধাতুসহ নহে।

হাসি ও উল্লাস, রঙ্গ ও তামাসার শেষে অপরাহ্ণে যখন বাড়ী ফিরিলাম, তখন শোভনা দৌড়িয়া আসিয়া বলিল, "দাদা, শালিক-মেয়েটা ছানা ফেলে পালিয়েছে।"

আঙ্গিনায় ঢুকিয়া দেখিলাম, ছানাগুলি কাতর স্বরে কিচির-মিচির করিতেছে। দোয়েল-মেয়েটি আসিয়া কিছু খাবার দিয়া ছানাগুলিকে সান্ত্বনা দিতেছিল।

আমাকে দেখিয়া দোয়েল-পাখী পলাইয়া গেল। সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম। যাহাদের আদর্শ প্রেম এক দিন আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিল, যাহাদের মধুর প্রীতির উল্লেখ করিয়া পত্নীকে গঞ্জনা দিয়াছিলাম, তাহাদের এই ব্যবহার আমার মনকে কাতর করিয়া তুলিল।

বেলা-শেষে শালিক ফিরিল, তাহার মন শূন্যনীড় দেখিয়া কতখানি দুঃখভারাক্রান্ত হইয়াছিল, মানুষের মন লইয়া তাহার পরিমাপ করা সহজ নহে। সে ছানাগুলিকে খাওয়াইয়া টুনটুনি ও দোয়েলের বাসায় গেল।

পরের দিন শালিক আর আহার খুঁজিতে বাহির হইল না। ছানাগুলিকে পাহারা দিবার জন্য দোলন-চাঁপার শাখায় বসিয়া রহিল। মধ্যে মধ্যে নীচে নামিয়া যৎসামান্য খুদ-কুঁড়া সংগ্রহ করিয়া পুনরায় স্বস্থানে যাইয়া মিনতি-ভরা চোখে উদাস-দৃষ্টিতে বসিয়া রহিল।

দ্বিপ্রহরে শালিক-বধূ প্রণয়ীর সহিত আসিয়া উপস্থিত হইল, শালিক প্রিয়তমাকে উদ্ধার করিবার জন্য পুনরায় ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ করিল। কিন্তু যুদ্ধ বেশী দূর গড়াইল না, আততায়ী পলাইয়া আত্মরক্ষা করিল। শালিক ছানাগুলি ফেলিয়া দূরে যাইয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিল না।

নিরুপায় শালিক যেন বেদনার্ত্তস্বরে আপন প্রিয়াকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে মিনতি জানাইল, কি কাতর সে আকুতি! দেখিলাম, শালিক-প্রিয়া উড়িয়া গেল।

শালিক প্রিয়ার পশ্চাতে উড়িয়া গেল না। নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। দোলন-চাঁপার পাতা নীচে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। বাতাস আসিয়া শাখায় দোলা দিল, ছানার কাতর কলরব আমাকেও ব্যাকুল করিয়া তুলিল, তথাপি শালিকের যেন চৈতন্য হইল না।

উদাস বেদনায় মুহ্যমান হইয়া কি শালিক বসিয়া রহিল? দেখিলাম, দোয়েল আসিয়া ছানাগুলিকে কিছু খাবার দিয়া গেল, তখন শালিক সচেতন হইয়া উঠিল।

শালিক-বধূর পলায়নে শোভনার দয়া হইল, সে শালিকের জন্য কীট মারিয়া নাগকেশরের তলায় রাখিয়া দিল, খুদ ভিজাইয়া নারিকেলের মালায় ভরিয়া আনিল।

শালিকের কথা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আমাদের তরুণ মজলিসে একটি চমকপ্রদ প্রবন্ধ পড়িবার তাগিদ আসিয়াছিল, সেই জন্য পুথি ঘাঁটা-ঘাঁটি করিতেছিলাম।

শোভনা উৎফুল্ল হইয়া আমার পাঠের ব্যাঘাত করিয়া বলিল, "দাদা, চল দেখবে, ছানাদের মা ফিরেছে।"

প্রবন্ধ পড়িয়া রহিল, কৌতূহলের আতিশয্যে ছুটিয়া চলিলাম, যাইয়া দেখিলাম, সত্যই শালিক-বধূ ফিরিয়া আসিয়াছে, ছানাগুলিকে আদর করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

গৃহিণী আমাদের উৎসাহ ও চাঞ্চল্য দেখিয়া বলিলেন, "কি ছেলেমানুষি হয়েছে তোমাদের বুঝি না।"

কৌতুকভরে বলিলাম, "তোমাদের রীত দেখছি। চাণক্য যে বলেছেন—"

বাধা দিয়া তিনি বলিলেন, "তোমার চাণক্য রাখ, মেয়েমানুষের যেন সহস্র অপরাধ, কিন্তু আপনাদের দোষ যে তোমরা দেখতে পাও না, তার কি?"

বর্ত্তমানের নারী বলেন, আমরা নারীকে বাঁধিয়া রাখিয়াছি। তাহার উপর নানা ভাবে ও নানা প্রকারে অত্যাচার করিয়াছি, তাহাকে জীবন-সংগ্রামে যথার্থ স্থান অধিকার করিতে দেই নাই। এমন কত কি দুঃখ নারীর দাবীর লেখকগণ ভাবুক-সমাজে প্রত্যহ পেশ করিতেছেন।

কিন্তু পুরুষের দুঃখ লইয়া কেহ আর্ত্তনাদ করে না। পুরুষ যে দিনের পর দিন মাথার ঘাম পায় ফেলিয়া অর্থোপার্জ্জন করিয়া নারীর হাতে সমস্ত ছাড়িয়া দিয়া নিজগৃহে প্রবাসী হইয়া রহে, তাহার জন্য কাহারও মর্ম্মোচ্ছ্বাস জাগে না কেন, ভাবিয়া পাই না।

গৃহিণীর সহিত ইহা লইয়া বচসা করা সুবুদ্ধির কায নহে, তাই মিষ্ট শ্লেষের সহিত বলিলাম, "আমরা না হয় অন্ধ, কিন্তু তাই ব'লে তোমরা যে প্রতিশোধ নেবে, সেটাও ত তোমাদের মহত্ত্বের পরিচয় নয়।"

"যাও, তোমার সঙ্গে আনাড়ী তর্ক করবার সময় আমার নেই। কিন্তু তোমার নায়িকা ত বাসায় ফিরেছে।"

আমি বলিলাম, "সে পাখী ব'লে, মানুষ হ'লে কখনই ফিরত না।"

গৃহিণীর বোধ হয় দরকারী কায ছিল, তাই তর্ক না করিয়া চলিয়া গেলেন। আমি বসিয়া বসিয়া শালিকপ্রিয়ার রঙ্গ দেখিতে লাগিলাম। তাহাদের জীবনে যে কোনও পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এরূপ বুঝাইতেছিল না। স্ত্রীশালিক বসিয়া ছানাদের তদারক করিতে লাগিল, শালিক আবার মনের উল্লাসে আহারের সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িল। আশ্বস্ত হইয়া নিজের কাযে ফিরিলাম।

৪

এইখানে যবনিকা পড়িলে হয় ত পক্ষি-নাটকের একটি সুষ্ঠু সমাপ্তি হইত। কিন্তু সংসার কাব্য নহে, কাব্যের নায়ক-নায়িকার মত তাহারা ছন্দের তালে তালে পা ফেলিয়া চলে না।

দুই দিন পরে মধ্যাহ্নে কায ফেলিয়া প্রেম-চর্চ্চা করিতে-ছিলাম। কলিকাতায় যাইব নিজের একটু কাযে। কিন্তু গৃহিণীর ফর্দ্দের ভারে যাত্রার উৎসাহ একদম বন্ধ হইবার উপক্রম, তাই ফর্দ্দ আলোচনার জন্য দ্বিপ্রহরের বিরল অব-সরের সুযোগে প্রেমালাপ চলিতেছিল।

"ঠাকুরলালের দোকান থেকে এ আংটী আনলে ত অনেক দাম পড়বে।"

"তোমার হিসেবী বুদ্ধি রাখো। ননী দিদিকে কবে থেকে দেব দেব মনে করছি, তা তোমার পাটোয়ারী বুদ্ধির জন্য হবে না।"

"আমি যেন টাকা বাঁচিয়ে তোমার সতীনকে দেব?"

"কথার মধ্যে শিখেছ ত ঐ গা-জ্বালানে কথা। টাকা কিছুতেই যখন জমবে না, তখন তা নিয়ে আপশোষ কেন? সংসারে থাকতে হলে, মানুষ-মানষতা রাখতে হবে ত।"

সত্যই, মনুষ্যত্ব না রাখিয়া মানুষ-জন্মে কি লাভ? কিন্তু সে মনুষ্যত্ব কি কেবল তেলা মাথায় তেল ঢালিবার জন্যই হইয়াছিল? এ কথা লইয়া তর্ক তুলিব ভাবিতেছি, এমন সময় শালিকের কলরব প্রেমচর্চ্চার বিঘ্ন ঘটাইল। চাহিয়া দেখি, আতার ডালে বসিয়া সেই প্রেমিক শালিক ফিরিয়া ঘুরিয়া নাচিতেছে আর মধুর-স্বরে কূজন করিতেছে। টুনটুনি-পরিবার বাসায় ছিল, তাহারা আগন্তুকের উপস্থিতি বোধ হয় পছন্দ করিতেছিল না, কিন্তু নিরুপায় তাহারা আর্ত্তনাদ করিয়া তাহাকে তাড়াইবার জল্পনা করিতেছিল। কিন্তু শ্যামের বাঁশরী রাধাকে গৃহ-কর্ম্ম ভুলাইল। শালিক-প্রিয়া উড়িয়া নাগরের নিকট পৌছিল, আবার পরক্ষণেই নিজের বাসায় ফিরিয়া আসিল।

মনের মধ্যে তাহার দ্বন্দ্ব চলিতেছিল কি না, কে জানে? নবাগত শালিক সাহসী হইয়া দোলন-চাঁপার ডালে আসিয়া বসিল এবং নানা ভঙ্গীতে সুরের আগুন জ্বালাইয়া দিল।

মুনি-ঋষিরা পর্য্যন্ত যে আহ্বানকে জয় করিতে পারেন নাই, পক্ষিপ্রিয়ার পক্ষে তাহার গতিরোধ করা কি সম্ভব-পর? মোহ যখন তাহার অমোঘ রঙ্গীন স্বপ্নজাল বিস্তার করিয়া দেখা দেয়, তখন সমস্ত জ্ঞান সেই জালে আবদ্ধ হইয়া নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে না কি?

খানিক পরে দেখিলাম, তাহারা উড়িয়া পলাইল। তাহাদের দ্রুতগতি দেখিয়া মনে হইয়াছিল, যেন তাহারা স্থির হইয়া ভাবিতে ভয় পাইতেছে। বেগের অবাধ উচ্ছ্বাসে তাহারা যেন ভাসিয়া যাইতে চাহে।

আর তাহারা ফিরিল না। তাহার পর ছানাগুলি অযত্নে মারা পড়িল। শালিক কোথায় চলিয়া গেল, কাল-বৈশাখীর ঝড়ে শূন্যনীড় কোথায় উড়িয়া গেল, কে জানে!

তথাপি প্রতি বৎসর যখন ফাল্গুন দোলন-চাঁপার ডালে ফুলের বন্যা বহাইয়া দেয়, তখনই মনে এই শালিক-দম্পতির করুণ কথা ভাসিয়া উঠিয়া মনকে ব্যাকুল করিয়া তুলে।

শ্রীমতিলাল দাশ (এম এ, বি এল)।

সাধুর যোগবল না ইন্দ্রজাল ?

সত্য ঘটনা

দক্ষিণ-ভারতের কোন নগরে শ্বেতাঙ্গ রাজকর্ম্মচারীদের একটি ক্লাব আছে। এক দিন সায়ংকালে কয়েক জন ইংরাজ সেই ক্লাবে বসিয়া গল্প করিতেছিলেন। আমাদের 'কালা আদমীদের' ক্লাবে রাজা-বাদশা লইয়া আলোচনা চলে; কিন্তু সাহেব লোকের ক্লাবে সাধু, সন্ন্যাসী, পীর, ফকির কেহই বাদ পড়েন না। সুতরাং সে দিন প্রসঙ্গক্রমে ভারতীয় সাধু-সন্ন্যাসীর অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হইল। সাধু-সন্ন্যাসীরা সময়ে সময়ে যে অদ্ভুত শক্তির পরিচয় দিয়া থাকেন, অনেক ইংরাজের ধারণা, তাহা বুজরুকি মাত্র।

জোন্‌স দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "ফকিরগুলা 'হাম্‌বাগ' ভিন্ন আর কি ? তাহাদের অনেকেই ভয়ঙ্কর প্রবঞ্চক। তাহারা কুসংস্কারান্ধ, অজ্ঞ নেটিভগুলাকে বুজরুকিতে ভুলাইয়া জীবিকার সংস্থান করে। প্রবঞ্চনার সাহায্যে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া সুখে কাল কাটায়। তাহাদের কার্য্যে বিন্দুমাত্র সততা আছে—ইহা আমি বিশ্বাস করি না।"

সে মজলিসে একটি বৃদ্ধ ইংরাজ ডাক্তার উপস্থিত ছিলেন, তাঁহার নাম ডাক্তার ক্রডি। তাঁহার বয়স ৬১ বৎসর; তাঁহার কর্ম্মজীবনের সুদীর্ঘকাল ভারতেই অতিবাহিত হইয়াছিল।

জোনসের মন্তব্য শুনিয়া ডাক্তার ক্রডি বলিলেন, "তোমার এই উক্তির সমর্থন করিতে পারিলাম না, জোন্‌স। এ দেশে অসংখ্য সাধু-সন্ন্যাসী, ফকির আছে, তাহাদের অনেকেই যে বুজরুক, এ কথা স্বীকার করি; কিন্তু অনেকেই যে বিস্ময়কর দৈবশক্তিরও অধিকারী, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই। তাহারা পুরুষানুক্রমেই ঐরূপ অলৌকিক শক্তির অধিকারী। এ সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নিতান্ত অল্প নহে; আমি স্বয়ং এই সকল সাধু-সন্ন্যাসীর ঐরূপ অসাধারণ শক্তির পরিচয় পাইয়াছি। ঐ শক্তি তাহাদের যোগাভ্যাসের ফল বলিয়াই মনে হয় এবং তাহা এরূপ অসাধারণ যে, সেই শক্তির পরিচয় পাইলে এ কালের অনেক ম্যাজিকওয়ালা তাহাদের হিংসা করিবে; বিশেষতঃ—"

৬১ বৎসর বয়সের বুড়া ডাক্তারের কথা ছোকরা ইংরাজ জোন্‌সের ভাল লাগিল না; তিনি ডাক্তারের কথায় বাধা দিয়া ঈষৎ বিরক্তিভরে উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "থাক্, আর আপনাকে তাহাদের ওকালতী করিতে হইবে না, ডাক্তার! ঐ সকল প্রবঞ্চকের দৈবশক্তির গল্প শুনিতে শুনিতে আমার কাণ ঝালাপালা হইয়া গিয়াছে। শুনা কথা আমি বিশ্বাস করি না; তবে যদি চোখে দেখিতে পাই, তাহা হইলে অবশ্যই তাহা বিশ্বাস করিতে হইবে। তাহাদের দৈবশক্তির কোনও নিদর্শন আমাকে দেখাইতে পারেন কি ?"

জোন্‌সের বন্ধু ও তাঁহার মতের সমর্থক ইগার্টন নামক একটি যুবক তাঁহার পাশেই বসিয়াছিলেন। তিনি জোন্‌সের কথা শুনিয়া সোৎসাহে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "তাই বটে, তাই বটে! নিজের চোখে দেখিতে পাইলে তখন বিশ্বাস হইবে।"

তরুণ বন্ধুদ্বয়ের অবিশ্বাসপূর্ণ মন্তব্য শুনিয়া ডাক্তারের মনে আঘাত লাগিল, তিনি বিরক্তিভরে ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন, কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে আত্মসংবরণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "দেখ, তোমরা এ কালের ছোকরা, তোমাদের প্রধান দোষই এই যে, তোমরা ভয়ঙ্কর সংশয়বাদী, কিছুই বিশ্বাস করিতে চাও না! যাহা হউক, আমি তোমাদের সন্দেহভঞ্জনের ভার গ্রহণ করিলাম। কয়েক দিন পূর্ব্বে আমার একটি বন্ধু একটি সাধুকে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, সেই সাধুটির শক্তি অসাধারণ এবং এই জন্য সে এই অঞ্চলের বহু পল্লীতে যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করিয়াছে। যদি আমি তাহাকে দেখিতে পাই, তাহা হইলে এক দিন তাহার অনুষ্ঠিত অদ্ভুত কার্য্য তোমাদের প্রত্যক্ষ করাইব।"

দুই সপ্তাহ পরে এক দিন ডাক্তার ক্রডি স্থানীয় বাজারের ভিতর দিয়া তাঁহার ডিস্‌পেন্‌সারীতে যাইবার সময় পূর্ব্বোক্ত সাধুটিকে হঠাৎ দেখিতে পাইলেন। ডাক্তার সেই সাধুটির সহিত ৫ মিনিট আলাপ করিয়াই বুঝিতে পারিলেন, তিনি বুজরুক নহেন, এবং তিনি যে সম্প্রদায়ভুক্ত সাধু, সেই সম্প্রদায়ের সুনাম ও সম্মান যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, সে জন্য তাঁহার আন্তরিক আগ্রহও লক্ষিত হইল। ডাক্তার সাধুর নিকট বিদায় লইবার পূর্ব্বে তাঁহাকে বন্ধুগণের নিকট তাঁহার প্রতিশ্রুতির কথা জানাইয়া বলিলেন, সেই দিন সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার সময় ক্লাবে উপস্থিত হইয়া দুই একটি ক্রিয়া দ্বারা তাঁহাকে সংশয়বাদী বন্ধুগণের সন্দেহভঞ্জন করিতে হইবে। সাধু ডাক্তারের প্রস্তাবে সম্মতিজ্ঞাপন করিয়া প্রস্থান করিলেন।

সেই দিন সায়ংকালে ক্লাবের সভ্যগণ তাঁহাদের সুখ দুঃখের কথার আলোচনা করিতেছিলেন। ডাক্তার ক্রডি তখন সেখানে ছিলেন না, ঠিক সাড়ে ৬টার সময় তিনি সেখানে আসিলেন। কয়েক মিনিট পরে দেউড়িতে কাহার পদশব্দ হইল, তাহা

শুনিয়া তাঁহারা সেই দিকে চাহিয়া দেখিলেন—ক্লাবের পিয়ন একটি সাধুকে সঙ্গে লইয়া তাঁহাদের নিকট আসিতেছে।

পিয়ন ডাক্তারের সম্মুখে আসিয়া বলিল, "হুজুর, এই সাধু আপনার সঙ্গে দেখা করিতে চাহেন।"

ডাক্তার পিয়নকে বলিলেন, "আমি তাহা জানি, চন্দ্র ! উঁহাকে এখানে রাখিয়া তুমি যাইতে পার।"

অতঃপর ডাক্তার সাধুটিকে ক্লাবের সভ্যগণের সহিত পরিচিত করিবার জন্ত বলিলেন, "আমি তোমাদিগকে এই সাধুর কথাই বলিয়াছিলাম।"

ডাক্তারের কথা শুনিয়া সমবেত সভ্যগণ জোন্‌সের সন্ধানে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। জোন্‌স তখন সে দলে ছিলেন না ; তিনি তাঁহার অপরিহার্য্য সঙ্গী ইগার্টনকে পাশে লইয়া ধীরে ধীরে সেই দিকেই আসিতেছিলেন।

জোন্‌স নিকটে আসিলে ডাক্তার তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ওহে সংশয়বাদী ছোকরা ! আমি সেই সাধুটিকে সশরীরে এখানে হাজির করিয়াছি ; উনি তোমাদের চক্ষু-কর্ণের বিবাদভঞ্জন করিবেন।"

জোন্‌স উৎসাহভরে বলিলেন, "বাহবা ডাক্তার ! আমি উঁহার তামাসা দেখিবার জন্ত ছট্‌ফট্‌ করিয়া মরিতেছি।"

ডাক্তার ক্রডি সাধুকে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে সংস্থাপিত চেয়ারগুলির ঠিক সম্মুখে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন। সাধু নিকটে আসিলে তিনি দুই এক মিনিট দেশীয় ভাষায় অত্যন্ত তাড়াতাড়ি তাঁহাকে কি বলিলেন। তাঁহার কথা শেষ হইলে সাধু দর্শকগণের দিকে চাহিয়া গভীর সম্মানভরে তাঁহাদের অভিবাদন করিলেন, এবং মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার অন্তর্ভেদী কৃষ্ণ চক্ষুতারকা দ্বারা প্রত্যেকের মুখ পরীক্ষা করিলেন। সাধু অতগুলি ইংরাজকে সেখানে সমবেত দেখিয়া কিছুমাত্র সঙ্কোচ বা কুণ্ঠা প্রকাশ করিলেন না, তাঁহার সম্পূর্ণ সপ্রতিভ ভাব, আত্মপ্রত্যয় অটল।

সাধারণ ভিক্ষুক, সাধু ও ফকিরগণের দেহ কৃশ, অস্থিচর্ম্মসার ; তাহাদের কোন কোন অঙ্গ বিকৃত, গঞ্জিকাসেবনে চোখ-মুখের অবস্থা শোচনীয়, দেহ ভস্মাবৃত ; কিন্তু এই সাধুটি সেই শ্রেণীর সাধুসন্ন্যাসী নহেন। লোকটির দেহ দীর্ঘ, মাংসল ; তিনি রাজপুত যুবক বলিয়াই ডাক্তারের ধারণা হইল। সাধুটির পরিচ্ছন্নতাই বিশেষত্ব-পূর্ণ, এবং তাহা লক্ষ্য করিয়াই তাঁহারা বিস্মিত হইলেন। তাঁহার কৃষ্ণবর্ণ নিবিড় শ্মশ্রুরাশি বক্ষঃস্থল আবৃত করিয়াছিল। জাফ্রানী রঙ্গের আলখেল্লায় তাঁহার সুগঠিত দেহ আবৃত থাকিলেও তাহার অন্তরাল হইতে দেহের গঠন-সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। পরিচ্ছদ ও পেশায় তিনি সাধু বলিয়া পরিচিত হইলেও তাঁহার চেহারা দেখিয়া মনে হইত, তিনি ছদ্মবেশী যুদ্ধ-ব্যবসায়ী।

সাধুর কাঁধে একটি সুদীর্ঘ বংশদণ্ড, তাহার উভয় প্রান্তে দুইটি ঝুড়ি ঝুলিতেছিল। তিনি কাঁধের উপর হইতে সেই বংশদণ্ডটি মাটীতে নামাইয়া রাখিলেন। তাহার পর তিনি প্রচুর শিষ্টাচার সহকারে জোন্‌সকে তাঁহার সম্মুখে উঠিয়া আসিতে ইঙ্গিত করিলেন ; তিনি অন্ত কাহাকেও না ডাকিয়া সেই দল হইতে জোন্‌সকেই বাছিয়া লইলেন।

জোন্‌স সাধুর ইঙ্গিতে উঠিয়া আসিয়া হাসিয়া বলিলেন, "এখন কি শয়তানের শুভদৃষ্টিতে পড়িতে হইবে ?" তখনও তাঁহার ধারণা—সাধু বুজরুকি করিয়া তাঁহাকে প্রতারিত করিবার চেষ্টা করিবে ; কিন্তু তিনি বুজরুকিতে ভুলিবার পাত্র নহেন, সাধুর বুজরুকি তিনি শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া দিবেন। সাধু দৈবশক্তির অধিকারী, ইহা তখনও বিশ্বাস করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। কিন্তু সাধুর আকার ইঙ্গিতে এরূপ আত্ম-নির্ভরতা ও মর্য্যাদা পরিব্যক্ত হইতেছিল যে, জোন্‌স তাঁহার শক্তিতে সন্দিহান হইলেও তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাব উপেক্ষা করিতে পারিলেন না।

জোন্‌স দর্শকমণ্ডলীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলে সাধু কয়েক পা পশ্চাতে হটিলেন, তাহার পর সম্মুখে আসিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া তর্জ্জনী দ্বারা বালুকারাশির উপর একটি সরল রেখা অঙ্কিত করিলেন এবং পশ্চাতে আরও কয়েক পা হটিয়া গিয়া জোন্‌সের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহাকে সম্মুখে অগ্রসর হইতে ইঙ্গিত করিলেন। জোন্‌স অসঙ্কোচে সাধুর দিকে অগ্রসর হইলেন, তাঁহার গমনের কোন ব্যাঘাত ঘটিল না ; কিন্তু সাধু বালুকারাশির উপর যে সরল রেখাটি অঙ্কিত করিয়াছিলেন, সেই সরল রেখাটি অতিক্রম করিবার জন্ত জোন্‌স তাঁহার পা'খানি উর্দ্ধে তুলিবামাত্র তাঁহার পা আড়ষ্ট হইয়া গেল ; যেন কোন প্রচণ্ড শক্তি তাঁহাকে সেই রেখা অতিক্রম করিতে বাধাদান করিল। জোন্‌স হতবুদ্ধি হইয়া পাখানি নামাইয়া লইলেন এবং সেই রেখা পার হইবার জন্ত অন্ত পা তুলিলেন ; কিন্তু এবারও তাঁহার চেষ্টা বিফল হইল, অসাড় পা বহু চেষ্টাতেও সেই রেখা অতিক্রম করিতে পারিল না। সেই রেখা পার হইয়া সাধুর নিকট উপস্থিত হওয়া তাঁহার অসাধ্য হইল। কোন অদৃশ্য শক্তি যেন দুই পা চাপিয়া ধরিয়া তাঁহার গতিরোধ করিল ; তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। সেই সময় সাধু এক পাশে দাঁড়াইয়া হাত দুইখানি ভাঁজ করিয়া বুকের উপর রাখিয়া মৃদুহাস্ত সহকারে

জোন্‌সের দুর্গতি দেখিতে লাগিলেন, জোন্‌স সেই রেখা পার হইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম হইলেন; তাঁহার সকল চেষ্টাই বিফল হইল দেখিয়া দর্শকগণ অত্যন্ত আমোদ বোধ করিলেন, সাধুর শক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহাদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। কিন্তু এই স্থানেই শেষ নহে।

সহসা দর্শকগণের মধ্যে চাঞ্চল্যের সাড়া পড়িল; জোন্‌সের বন্ধু ইগার্টন নামক যুবকটি তাঁহার চেয়ারখানা সশব্দে এক পাশে সরাইয়া ফেলিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং পূর্ব্বোক্ত সরল রেখার নিকট লাফাইয়া পড়িলেন। দর্শকগণ কৌতূহলপূর্ণ হৃদয়ে সম্মুখে মাথা বাড়াইয়া ইগার্টনের কার্য্যপ্রণালী লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। ইগার্টন সবেগে সম্মুখে ধাবিত হইয়া সেই রেখাটি পার হইবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু রেখার নিকট উপস্থিত হইবামাত্র তিনি পশ্চাতে হটিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন, যেন কোন অদৃশ্য শক্তি তাঁহাকে সজোরে পশ্চাতে ঠেলিয়া দিল। পর-মুহূর্ত্তেই উভয় বন্ধু পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন; তাঁহাদের মুখ মলিন, চক্ষুতে উদ্বেগ পরিস্ফুট।

তাঁহারা উভয়েই সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ইহার মাথামুণ্ডু কিছুই যে বুঝিতে পারিলাম না; ঐ সর্ব্বনেশে 'লাইনটা' সম্মোহিত করা হইয়াছে!"

অবশেষে বৃত্তটি এরূপ সঙ্কীর্ণ হইল যে, তাঁহাদের কোন দিকেই পা বাড়াইবার স্থান রহিল না।

মুহূর্ত্ত পরে এক জন দর্শক "দেখ, দেখ" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল; একটি ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া দর্শকগণের হৃদয় স্তম্ভিত হইল। তাঁহারা সকলেই বিস্ফারিত-নেত্রে সেই সরল রেখাটির দিকে চাহিয়া দেখিতে পাইলেন—বালুকারাশির উপর দিয়া তাহা ধীরে ধীরে জোন্‌স ও ইগার্টনের নিকট সরিয়া যাইতেছিল। অবশেষে রেখাটি তাঁহাদের উভয়ের পায়ের আঙ্গুলের সম্মুখে আসিয়া স্থির হইলে জোন্‌স ও ইগার্টন উভয়েই পশ্চাতে সরিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন, যেন কোন অদৃশ্য শক্তি তাঁহাদিগকে সবলে পশ্চাতে ঠেলিয়া দিল।

কিন্তু তাঁহাদের কঠোর পরীক্ষা তখনও শেষ হয় নাই। সেই সরল রেখাটি হঠাৎ বক্রভাব ধারণ করিয়া জোন্‌স ও ইগার্টনের চতুর্দ্দিকে একটি বৃত্ত রচনা করিল। তাঁহারা উভয়ে হতাশ-হৃদয়ে সেই বৃত্তটি অতিক্রম করিয়া তাহার বাহিরে আসিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সেই বৃত্তের যে অংশ দিয়া তাঁহারা বাহিরে আসিবার চেষ্টা করিলেন, সেই অংশ হইতেই ধাক্কা খাইয়া বৃত্তটির মধ্যস্থলে সরিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। সেই বৃত্তের বাহিরে পদার্পণ করা তাঁহাদের অসাধ্য হইল। ক্রমাগত বিফল চেষ্টায় তাঁহারা অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইলেন; তাঁহাদের মন কি একটা অনিশ্চিত আতঙ্কে পূর্ণ হইল।

অতঃপর সেই মন্ত্রপূত বৃত্তটি তাঁহাদের অধিকতর আতঙ্কের কারণ হইয়া উঠিল। তাহার আকার ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইতে লাগিল এবং অবশেষে তাহার পরিধি এরূপ সঙ্কীর্ণ হইল যে, জোন্‌স ও ইগার্টনের কোন দিকেই পা বাড়াইবার স্থান রহিল না! আরও অধিকতর বিপদের কথা এই যে, বৃত্তের পরিধি যতই সঙ্কুচিত হইয়া আসিল, উভয় বন্ধুর ব্যবধানও সেই পরিমাণে কমিতে লাগিল; অবশেষে বৃত্তের ভিতর স্থানাভাব-বশতঃ জোন্‌সের পিঠে ইগার্টনের পিঠ ঠেকিল; উভয়কেই পরস্পরের পিঠে পিঠ বাধাইয়া সঙ্কুচিতভাবে দাঁড়াইতে হইল। কিন্তু ইহাতেই বিপদের শেষ হইল না, বৃত্তটি আরও সঙ্কুচিত, আরও ক্ষুদ্রতর হইল; তখন সেই ইংরাজ যুবকদ্বয় প্রাণভয়ে অধীর হইয়া পরস্পর জড়াজড়ি করিতে লাগিলেন, যেন তাঁহাদের উভয়ের পদচতুষ্টয় একত্র দৃঢ়রূপে রজ্জুবদ্ধ হইল! প্রাণভয়ে তাঁহারা আড়ম্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। এমন কি, যাঁহারা অদূরে বসিয়া এই ভীষণ তামাসা দেখিতেছিলেন, তাঁহারাও কি একটা অজ্ঞাত ভয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, তাঁহাদেরও ছটফটানি আরম্ভ হইল—পাছে সেই সর্ব্বনেশে বৃত্ত তাঁহাদিগকে ঐ ভাবে ঘিরিয়া ফেলিয়া বিপন্ন করে! তাঁহারা রুদ্ধ-নিশ্বাসে, বিস্ফারিতনেত্রে ও ব্যাকুল-হৃদয়ে যুবকদ্বয়ের দুর্দ্দশা দেখিতে লাগিলেন।

কিছু কাল পরে সংশয়বাদী ইংরাজ যুবকদ্বয়ের অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইয়া উঠিল যে, তাঁহাদের ভাব দেখিয়া মনে হইল—অসহ্য যন্ত্রণায় ও প্রাণভয়ে তাঁহাদের সংজ্ঞালোপের আর অধিক বিলম্ব নাই! সুতরাং তাঁহাদিগকে অবিলম্বে মুক্তিদান করা কর্ত্তব্য মনে করিয়া সাধু যেখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন, সেই স্থানেই নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া এবং কোন কথা না বলিয়া চক্ষুর নিমেষে সেই বৃত্তটির অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিলেন। তাহা সেই স্থান হইতে অদৃশ্য হইবামাত্র জোন্‌স্ ও ইগার্টন ঝোঁক সামলাইতে না পারিয়া মুখ গুঁজিয়া মাটীতে পড়িলেন; তাঁহাদের দুই হাত ও উভয় জানুর উপর দেহের ভার পড়িল। অতঃপর সাধু ঈষৎ হাসিয়া পরাজিত ও অপদস্থ প্রতিদ্বন্দ্বিযুগলের সম্মুখে অগ্রসর হইলেন।

ইংরাজ যুবকদ্বয় সাধুর শক্তির পরিচয় পাইবার পূর্ব্বে অবিশ্বাসভরে যেরূপ উপহাস ও বিদ্রূপ করিয়াছিলেন, তাহার উপযুক্ত প্রতিফল পাইলেন। তাঁহারা মাটীতে পড়িয়া হাতে ও জানুতে ভর দিয়া উঠিবার পূর্ব্বেই সাধুকে সহাস্যবদনে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া যেরূপ হতভম্বভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাহা দেখিলে অত্যন্ত গম্ভীরপ্রকৃতি লোকেরও হাস্য সংবরণ করা কঠিন হইত। দর্শকগণ রুদ্ধ-নিশ্বাসে স্তব্ধভাবে সাধুর অলৌকিক কার্য্যপ্রণালী নিরীক্ষণ করিতেছিলেন; যে বৃত্তটি যুবকদ্বয়কে পরিবেষ্টিত করিয়া তাঁহাদের আতঙ্ক ও যন্ত্রণাবৃদ্ধি করিতেছিল, তাহা হঠাৎ অদৃশ্য হওয়ায় তাঁহারাও নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন এবং জোন্‌স ও ইগার্টনের অবস্থা দেখিয়া সদলে হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিলেন। দাম্ভিক যুবকদ্বয় এই ভাবে অপদস্থ হইয়া লজ্জায় মুখ তুলিয়া তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিতেও পারিলেন না। তাঁহারা ভূমিশয্যা ত্যাগ করিয়া গায়ের ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে সেই স্থান হইতে চম্পটদান করিলেন; কয়েক মিনিট পরে সাধুও বিদায় গ্রহণ করিলেন।

এই ঘটনার পর এক সপ্তাহের মধ্যে জোন্‌স বা ইগার্টনকে সেই ক্লাবে আসিতে দেখা যায় নাই; তাহার পর তাঁহারা ক্লাবে যোগদান করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের সেই দম্ভ, বিদ্রূপ-প্রবণতা ও চাপল্য অন্তর্হিত হইয়াছিল, তাঁহাদের মেজাজও ঠাণ্ডা হইয়াছিল। তাঁহারা ডাক্তারের নিকট প্রকাশ্যভাবে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছিলেন, সাধু যে অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বুজরুকি বলিয়া সন্দেহ করিবার কারণ নাই। এই সাধুটির শক্তি সত্যই অসাধারণ!

যে ইংরাজ ভদ্রলোক উল্লিখিত সাধুর এই অসাধারণ শক্তির বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি দক্ষিণাপথের কোইম্বাটুর নগরের 'সিভিল ক্লাবের' সভ্য ছিলেন। তিনি এই বিস্ময়কর ঘটনা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, এই বর্ণনার এক বর্ণও অতিরঞ্জিত নহে, কেবল শিষ্টাচারের অনুরোধে তিনি নাম কয়টি গোপন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সেই ক্লাবের অন্যান্য সভ্য এখনও জীবিত আছেন; তাঁহারা সকলেই এই বিবরণ সত্য বলিয়া স্বীকার করিবেন। জড়বাদী য়ুরোপ সাধুর এই অলৌকিক শক্তিকে 'সম্মোহন শক্তি' বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিবে; কিন্তু তাঁহাদেরই মহাকবি বলিয়া গিয়াছেন—ইহজগতে ও পরলোকে এরূপ অনেক সামগ্রী আছে, যাহা তাঁহাদের মনোবিজ্ঞানের ধারণারও অতীত।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

নূতন খাতা

ব্যাপারটা অসাধারণ না হইলেও সংসারে সচরাচর ঘটে না। অন্তর-রাজ্যের ধূমান্বিত বহ্নিশিখা যে দিন প্রচণ্ড আলোড়নে সহসা বাহিরে আত্মপ্রকাশ করে, সে দিন শত কৌতূহলী বিস্ময়বিমূঢ় চক্ষু আগ্রহে অধীর হইয়া উঠে। ভাবে, এ কি ?

পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ শোণিতের সূত্রে বাঁধা। তথাপি এক অশুভক্ষণে সেই সূত্র ছিঁড়িবার উপক্রম হইল।

পাড়াগাঁয়ে বাস। আফিস, আদালত বা জমীদারী সেরেস্তার কায করিয়া সংসার চলে না। মোটা লাভের সুদী কারবার; বড় লোহার সিন্দুকটায় বহুকাল হইতেই লক্ষ্মীর অকৃপণ দৃষ্টি আবদ্ধ হইয়া আছে। পুরুষানুক্রমে চাষী গাঁয়ের মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় ব্যবসা ভালই চলিতেছে বলিতে হইবে। ধান-চালের দর নাই, পাটের ব্যবসা মন্দা, সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়িয়া ব্যবসায়ী-মহলে 'হা-হুতাশ'; কিন্তু ছোট গ্রামখানির মধ্যে নিবারণের পসার-প্রতিপত্তি একটুও কমে নাই। মুখখানিতে হাসি মাখানই ছিল, সম্প্রতি একটা ঘটনায় সেখানে কে যেন কালী লেপিয়া দিয়াছে।

একমাত্র পুত্র মনোরঞ্জন। বিদ্যা সামান্য হইলেও ছেলেটি শিষ্ট, শান্ত এবং পিতার আজ্ঞানুবর্ত্তী।

ও পাড়ার সুবল বাবুর ছেলের সঙ্গে তাহার বন্ধুত্ব আছে। বন্ধুত্ব প্রগাঢ়। এই প্রগাঢ় বন্ধুত্বের ফলস্বরূপ সে এক দিন রাত্রিতে যাহা করিয়া বসিল, তাহার তুলনা নাই।

সামান্য ঋণের দায়ে সুবল বাবুর বাস্তুখানি নিবারণের কাছে বন্ধক আছে।

সুদে আসলে ঋণের পরিমাণ এমনই বাড়িয়া গিয়াছে যে, সুবল বাবু ও তাঁহার পুত্রের আয়ে কোনকালে সে ঋণ শোধ হইবে কি না, সন্দেহ! তদুপরি একমাত্র কন্যা সুশীলা চতুর্দ্দশে পদার্পণ করিয়াছে। অর্থের সংস্থান নাই—তাহাকে পাত্রস্থা করিবার।

অনেক চেষ্টা-চরিত্র করিবার পর দূরগ্রামের এক প্রৌঢ়ের সঙ্গে সুবল বাবু বিবাহের কথা ঠিক করিয়া ফেলিলেন। বৃদ্ধের পণ-মর্য্যাদায় ১ শত টাকা দিতে হইবে।

মনোরঞ্জন হরিশের মুখে এই সংবাদ শুনিয়া বলিল, "তার চেয়ে হাত-পা বেঁধে বোনটিকে জলে ফেলে দাও না কেন ?"

হরিশ ম্লান হাসিয়া বলিল, "আমরা যে অকূল সমুদ্রে ভাসছি, ডাঙ্গা কোথায়, ভাই! জান ত, কত দেনা।"

মনোরঞ্জন গম্ভীর হইয়া বলিল, "জানি। তা ব'লে—আচ্ছা এক কায করলে হয় না ?"

"কি ?"

মনোরঞ্জন বলিল, "যদি তোমাদের আপত্তি না থাকে, আমার সঙ্গে—রাজী আছ ?"

হরিশ অতি বিস্ময়ে কয়েক মিনিট তাহার মুখের পানে চাহিয়া বলিল, "ঠাট্টা করছো ?"

হরিশের হাত স্নেহভরে চাপিয়া ধরিয়া মনোরঞ্জন বলিল, "ঠাট্টা! এ সব বিষয় নিয়ে কোন দিন আমায় ঠাট্টা করতে দেখেছ ?"

হরিশ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "অসম্ভব! তোমার বাবা—"

মনোরঞ্জন বলিল, "রাজী হবেন না ? আমি নিশ্চয় জানি, তিনি রাজী হবেন না। তবে শোন, তোমাকে মনের কথা বলি। তিনি গোপালগঞ্জে বাবুদের বাড়ী আমার বিয়ের সব ঠিক ক'রে ফেলেছেন। নগদ ৫টি হাজার টাকা, তা ছাড়া দান-সামগ্রী, গহনা। কিন্তু, সে মেয়েটিকে আমি দেখেছি। তেমন কালো এ গাঁয়ের মধ্যে কেউ নেই—থাকলে তুলনাটা দিতে পারতাম। শুনলাম—মেয়েটি খোঁড়া এবং কালা। তাই অর্থের উপঢৌকন দিয়ে তাঁরা সব ত্রুটি ঢেকে দিতে চান।"

হরিশ কোন কথা না বলিয়া নীরবে উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল। মনোরঞ্জন বলিতে লাগিল, "আমি বেশী কিছু বলতে চাই না। ভাই, আমার যায়গায় তোমাকে দাঁড় করিয়ে একবার ভাব দেখি,—এ সংবাদে আমার কতখানি আনন্দিত হওয়া উচিত! আমাদের অর্থের অভাব নাই। অথচ যে অভাব আছে,—বাবা তার দিকে চেয়েও দেখছেন না।"

হরিশ ম্লান হাসিয়া সংক্ষেপে বলিল, "ব্যাপারটা সত্যই দুঃখের।"

মনোরঞ্জন বলিল, "এ বিয়েতে মা'র মোটেই মত নেই। তবু বাবার ভীষণ জেদ। কিন্তু এ বিষ হজম করবার শক্তি আমার নেই। তার চেয়ে তোমার বোনটিকে বিয়ে করলে সব দিক রক্ষা হবে।"

হরিশ বলিল, "কিন্তু শেষ ফল ?"

মনোরঞ্জন হাসিয়া বলিল, "প্রথম প্রথম খেদ, আক্ষেপ, গালিগালাজ। শেষে শান্তি। ঘরের বউকে ত বাবা ফেলতে পারবেন না। তাতে যে তাঁরই নিন্দা হবে।"

হরিশ বলিল, "তবু এতে আমার মন নিচ্ছে না। কি জানি, শেষে যদি গণ্ডগোলটা না মেটে ?"

মনোরঞ্জন বলিল, "আরে—তুমি যে ভেবেই অস্থির! আমার বাবাকে আমি জানি না ? সংসার তাঁরও আছে।"

সুবল বাবুকে হরিশ সমস্ত বলিল। অনেক ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে তিনি সম্মত হইলেন।

গোপনে সমস্ত আয়োজন হইল।

বিবাহ-রাত্রিতে কথাটা কিন্তু অপ্রকাশ রহিল না।

নিবারণ গ্রামান্তরে তাগাদায় গিয়াছিলেন। সংবাদ শুনিয়া ছুটিতে ছুটিতে সুবল বাবুর বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন সম্প্রদান শেষ হইয়া গিয়াছে। বরকে বাসর-ঘরে লইয়া যাইবার জন্য নারীগণ ঘন ঘন হুলুধ্বনি দিতেছেন।

উন্মত্তের মত নিবারণ আসিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। হুলুধ্বনি থামিয়া গেল, কোলাহলমুখর বিবাহ-বাড়ী সহসা নিস্তব্ধ হইল।

নিবারণ অগ্নিভরা দৃষ্টিতে পুত্রের পানে চাহিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, "মনা, ভাল চাস্ ত চ'লে আয় বলছি। নৈলে—" অসহ্য ক্রোধে আর তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

মনোরঞ্জন মাথা নীচু করিয়া ধীরকণ্ঠে উত্তর দিল, "বিয়ে হয়ে গেছে, বাবা। এখন ফিরে যাওয়া—"

চীৎকার করিয়া নিবারণ কহিলেন, "পাজী, নচ্ছার, বদ্‌মাস। কোথায় সে জোচ্চোর সুবলে ? সে জানে না—কোম্পানীর আইন আছে,—আদালত আছে। ধানে চালে যদি ছুটি মাস না খাওয়াতে পারি ত আমার নামই নয়।"

তার পর যে সব কথা বলিলেন, তাহা শুনিয়া সমাগত নারী ও পুরুষ যে যেখানে পারিলেন পলাইয়া লজ্জা বাঁচাইলেন। শুধু বেপথুমতী বধূর হাত ধরিয়া কম্পিত অন্তরে মনোরঞ্জন মাথা নীচু করিয়া নীরবে সেই সব তীব্র হলাহল পান করিতে লাগিল।

জনকয়েক লোক আসিয়া নিবারণকে টানিতে টানিতে বলিল, "যা হবার হয়ে গেছে,—এখন আশীর্ব্বাদ করুন "

নিবারণ পাগলের মত হইয়া বলিলেন, "আশীর্ব্বাদ! করবো বৈ কি! ঐ মেয়ে এক বছরের মধ্যে যদি না মরে ত—আমার সব কিছু মিছে। এই আমি ব'লে যাচ্ছি, যেমন আমার প্রাণে ব্যথা দিয়ে এ কায হলো, তেমনি এ সুখ যেন ভোগ করতে না হয়। যেন সব জ্ব'লে যায়—পুড়ে যায়—"

ততক্ষণ নিবারণকে সকলে বহির্ব্বাটীতে টানিয়া লইয়া গিয়াছে।

হরিশ আসিয়া মনোরঞ্জনকে বলিল, "কাযটা ভাল হলো না, ভাই।"

মনোরঞ্জন হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "বাবার সব-তাতেই বাড়াবাড়ি। তুমি ভেব না। অতগুলি টাকার শোক, ঘা লাগবারই কথা।"

কথাগুলি বলিল বটে, প্রাণ তাহাতে ছিল না।

কল্পনায়, এই অভিশাপের ভয়াবহ মূর্ত্তি সে আনিতেই পারে নাই। কে জানে,—গুরুজনের অভিশাপ মাথায় লইয়া সুখী হওয়ার চেষ্টা সফল হইবে কি না ?

বিবাহ হইল, উৎসবের উল্লাস জমিল না। সকলেরই মনে হইল, ইহার চেয়ে সেই দ্বিতীয় পক্ষের অর্দ্ধবৃদ্ধের সঙ্গে বিবাহ হইলে হয় ত উৎসবের অঙ্গহানি হইত না।

মনোরঞ্জন বড়-মুখ করিয়াই বলিয়াছিল, তাহার পিতাকে সে ভালরূপেই জানে!

পরদিন প্রাতঃকালে সে লোকমুখে শুনিল, পিতা সারারাত্রি পাগলের মত উঠানময় পায়চারী করিয়া বেড়াইয়াছেন। মায়ের মিনতি, অশ্রু—কিছুই তাঁহাকে শান্ত করিতে পারে নাই। তিনি না কি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, এমন অবাধ্য পুত্রকে ত্যাগ করিয়া দত্তক লইবেন।

সারাদিন ধরিয়া মনোরঞ্জন কত কি ভাবিল। সন্ধ্যা-বেলা পিতার প্রসন্নতা লাভের জন্য সে ধীরে ধীরে আপনার

গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। হাতে পায়ে ধরিয়া যেমন করিয়া হউক,—এ বিষয়ের একটা নিষ্পত্তি করিবে।

সহসা দ্বার খুলিয়া গেল। সম্মুখেই পিতা। পুত্রকে দেখিয়া নিবারণ পুনরায় দ্বার বন্ধ করিবার উপক্রম করিতেই মনোরঞ্জন তাঁহার পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িয়া কাতরকণ্ঠে ডাকিল, "বাবা!"

নিবারণের গম্ভীর মুখে কয়েকটি ভ্রুকুটির রেখা ফুটিয়া উঠিল। পা দু'খানি টানিয়া লইয়া রূঢ়কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "আবার এখানে এসেছিস্ কেন, হতভাগা? যা, যেখানে মা পেয়েছিস্, বাপ পেয়েছিস্—সেইখানে যা।"

মনোরঞ্জন উঠিল না। তেমনই ভাবে বসিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল,—"আমায় মাপ করুন, বাবা।"

হো—হো করিয়া হাসিয়া নিবারণ বলিলেন, "মাপ! মাপ! তুই বুঝবি কি—এখানে কি জ্বালা!" বলিয়া দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া একটা প্রচণ্ড দীর্ঘনিশ্বাসকে দমন করিয়া সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন, "না, না, কিছুতেই না। তুই কুলাঙ্গার—আমার ত্যাজ্যপুত্র। ফের যদি এ বাড়ীতে পা দিস্ ত গুরুজনের রক্ত—"

মনোরঞ্জন ত্বরিতে উঠিয়া দুই হস্তে কর্ণ আচ্ছাদন করিয়া স্খলিত কণ্ঠে কহিল, "আমি যাচ্ছি—আমি যাচ্ছি।" সে আর দাঁড়াইল না,—টলিতে টলিতে দৃষ্টিপথের বাহির হইয়া গেল।

সম্বন্ধের পবিত্র মধুর ও দৃঢ় সূত্র এমনই অকস্মাৎ ছিঁড়িয়া গেল!

তার পর একটি বৎসর কাটিয়া গেলেও পিতাপুত্র কেহ কাহারও সন্ধান লয় নাই।

আজকাল করিয়া দত্তক লওয়া হয় নাই। টাকার সুদ গণিয়া অধমর্ণের কাছে রক্তচক্ষু লইয়া হাঁটিয়া—ক্লান্ত হইয়া সমস্ত দিনটা নিবারণের মন্দ কাটে না। সন্ধ্যাবেলা নূতন ঋণগ্রাহীদের চাটুবাদে চণ্ডীমণ্ডপ মুখরিত হইয়া উঠে। কিন্তু রাত্রির আহার সারিয়া শয্যায় আসিয়া তিনি যখন শয়ন করেন, তখন সর্ব্বক্লান্তিহরা নিদ্রাদেবী তাঁহার নয়ন-পল্লবও স্পর্শ করেন না। তিনি নিতান্ত নিষ্ঠুরের মত চিন্তাক্লিষ্ট হতভাগ্যের উত্তপ্ত ললাটে কয়েকটি রেখা ফুটিতে দেখিয়া, হয় ত, অলক্ষ্যে মৃদু হাস্য করিয়া থাকেন। মানুষের মন। বাহিরে অর্থ, আহার্য্যের প্রচুরতর উপঢৌকনে তৃপ্তিলাভ করিলেও, নিশীথের নিরালায় বঞ্চিত মনের কি যেন দারুণ ক্ষুধা চাপিয়া রাখা যায় না। কার জন্য এই স্বচ্ছলতা? এই অর্থ আহরণের সংগ্রাম? একটা দুর্নিবার হাহাকারের স্রোত সারা অন্তরকে উত্তাল করিয়া তুলে। তাহার অমোঘ আঘাতে নিদ্রাহীন নয়ন—নিপীড়িত বক্ষ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠে।

আরও কয়েক মাস পরে গৃহিণীর মুখে নিবারণ সংবাদ পাইলেন, তাঁহার নাতি হইয়াছে। শুনিবামাত্র তিনি চমকিয়া উঠিলেন। বোধ হয়, শতদীর্ণ অন্তরের মধ্যে হর্ষের ফল্গুধারা বহিয়া গেল। কিন্তু সে মুহূর্ত্তমাত্র। পর-ক্ষণেই তাঁহার সারা মুখে কে যেন কালি লেপিয়া দিল। সমস্ত দিন তিনি বাড়ীর বাহির হইলেন না, শরীর অসুস্থ বলিয়া কিছু আহারও করিলেন না। তাঁহার সিন্দুকভরা টাকা, ঘরভরা আসবাব-পত্র, চারিদিকে প্রচুর স্বচ্ছলতা। তবু এ সবের মধ্যে এই পরমানন্দের স্থান নাই। দুঃখ-দুর্দ্দশা-গ্রস্ত সংসারের প্রান্ত হইতে বিষাদ-বায়ু-প্রবাহে এই পরম কাম্য সংবাদ তাঁহার প্রাসাদ-অঙ্গনে প্রবেশ করিয়াছে। প্রাসাদ হইতে হৃদয়ের অভ্যন্তরে এবং তথা হইতে দেহের সর্ব্বশিরায়—রক্তস্রোতের ধারামুখে।

কিন্তু বৃথা—বৃথা! দারুণ যন্ত্রণায় দুটি হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া নিবারণ চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ওঃ!"

গৃহিণী ছুটিয়া আসিয়া কহিলেন, "কি?"

যন্ত্রণাক্লিষ্ট স্বরে নিবারণ কহিলেন, "বুকে বড় যন্ত্রণা, একটু হাত বুলিয়ে দাও ত।"

গৃহিণী হাত বুলাইতে বুলাইতে কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন, "হাজার হোক নাতি। তার ওপর আমাদের আর রাগ কি? এখন কি দিয়ে মুখ দেখবে বল।"

নিবারণ সবেগে মাথা তুলিয়া বলিলেন, "কিছু না। সে আমাদের ত্যাজ্যপুত্র। তার ছেলে—"

কথা শেষ না করিয়া তিনি মুখ গুঁজিয়া বুক চাপিয়া ধরিলেন।

নিবারণ নিত্য অভ্যাসমত সন্ধ্যাবেলা দাওয়ায় আসিয়া বসিয়াছিলেন। ছিদাম মুদী ১০ টাকার দুইখানি নোট

তাঁহার পায়ের কাছে রাখিয়া হাত যোড় করিয়া কহিল, "ষোল টাকা আসল, আর চার টাকা সুদ নিয়ে আমায় রেহাই দিতে হবে, বড় বাবু। গরীব মানুষ—"

নোট দুখানি পা দিয়া ঠেলিয়া ক্রুদ্ধ কণ্ঠে নিবারণ বলিলেন, "বটে, আমার সঙ্গে মস্করা ?"

কাঁদ-কাঁদ মুখে ছিদাম তাঁহার পায়ের কাছে উপুড় হইয়া পড়িতেই নিবারণ মুখ খিঁচাইয়া বলিলেন, "যা, যা, আর আমার মুখে চুণ-কালি মাখাতে হবে না। সুদ না দিতে পারিস, নেই দিবি। নোট ভাঙ্গিয়ে ষোলটা টাকা আমায় দিয়ে যা। তবু হাঁ ক'রে চেয়ে রইলো ? আমি কি মাথামুড় খুঁড়ে মরবো ? ওরে ব্যাটা, সুদ চাই না—চাই না—চাই না।"

গত ২০ বৎসরের মধ্যে ছিদাম নিবারণের এমন মূর্ত্তি দেখে নাই। সে সভয়ে প্রস্থান করিল।

সকাল সকাল চণ্ডীমণ্ডপের ঝাঁপ বন্ধ করিয়া নিবারণ বাড়ী আসিয়া গৃহিণীকে বলিলেন, "দেখ, কালই সব ঠিক ক'রে ফেললাম। ওই ন-হাটার ভূষণোর ছেলেকেই দত্তক নেব। মিছি মিছি সময় নষ্ট ক'রে লাভ কি ?"

ক্ষুদ্র একটি সংবাদে নিবারণের কঠিন হৃদয়তটে যে অবিশ্রান্ত তরঙ্গ উঠিয়াছিল, তাহা প্রতিরোধ করিবার কোন উপায় তাঁহার হাতে ছিল না। তাই তিনি তাড়াতাড়ি একটা কিছু করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

পরদিন কুলপুরোহিত আসিলেন। বৈশাখের প্রথমেই দত্তক লইবার শুভদিন স্থির হইয়া গেল।

কিন্তু এত বড় নিষ্পত্তির সম্ভাবনাতেও নিবারণের অশান্ত চিত্ত পরিতৃপ্ত হইল না। কি যেন অভাব, কোথায় সামান্য ত্রুটি সর্ব্বকার্য্যের মধ্যে কাঁটার মত খচ খচ করিয়া বিঁধিতেছে। না,—নিবারণ দিন দিন বড়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছেন।

বৈশাখমাস আসিল। একটা অতর্কিত দৈব-ঘটনায় দত্তক লওয়া লইল না। ছেলেকে বিষয়সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিলেও, রক্তের সম্পর্কটা সমাজ একবারে মুছিতে দিল কৈ ?

খোকা তখন ৬ মাসের। মাত্র কয়েক দিনের জ্বরে ভুগিয়া তাহার তরুণী মাতা—নিবারণের পুত্রবধূ অকালে প্রাণত্যাগ করিল। নিবারণের মর্ম্মান্তিক অভিশাপ এইরূপে ফলিয়া গেল।

কিন্তু নিবারণ এ সংবাদে তত উল্লসিত হইলেন না। যখন অভিশাপ দিয়াছিলেন, তখন ক্রোধে হিতাহিতজ্ঞান-শূন্য হইয়াছিলেন। সে দারুণ ক্রোধ কয়েক মাস পর্য্যন্ত অনির্ব্বাণ অবস্থায় ছিল। তার পর কখন্ এক সময় ধীরে ধীরে সাংসারিক কাযকর্ম্মের তলায় তাহা থিতাইয়া গিয়াছিল—তাহা তিনি জানিতেই পারেন নাই।

পুত্র ছাড়িয়া যাওয়ার পর অর্থ-আবদ্ধ দৃষ্টি অল্পে অল্পে অন্য দিকে প্রসারিত হইতেছিল। তিনি জানিয়াছিলেন, অর্থ আবশ্যক বস্তু হইলেও—ইহার অপেক্ষা অত্যাবশ্যক দ্রব্যও পৃথিবীতে আছে। পত্নী-পুত্র লইয়া যে সমাজবন্ধন, তাহারই তলে সংসারী মন আকাঙ্ক্ষার নব নব বর্ণচ্ছটা লইয়া প্রতিনিয়ত কত বিচিত্র চিত্রের রেখা টানিয়া আপনার আনন্দে আপনি মগ্ন হইয়া থাকে। অর্থ সেই রেখাদ্বয়ের তুলিকা, —মন চিত্রপট—আর সুকোমল বৃত্তিগুলি বর্ণের রশ্মিপাত। শুধু তুলিকা লইয়া চক্ষু মুদিয়া বসিয়া থাকিলে ভগ্ন আশার তরঙ্গ-তাড়নে সারা চিত্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে।

নিবারণ এই নিরপরাধিনী বধূটির মৃত্যুসংবাদে মনে মনে অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তথাপি মুখ ফুটিয়া কাহারও নিকটে সে দুঃখের কথা বলিতে পারিলেন না। অহঙ্কারী মন সত্যকে গোপন করিয়া চিরদিন এই মিথ্যা দুর্ব্বলতাকে পোষণ করিতে ভালবাসে। ইহাকে সে আত্ম-সম্মানের একটা মহৎ রূপ বলিয়াই জানে।

সুতরাং অশৌচ অবস্থায় দত্তক লওয়া হইল না।

নিবারণ সুদ আদায় করেন—খাতা লেখেন। গৃহিণীর সঙ্গে ব্যবহারে কোন বৈলক্ষণ্য নাই। কিন্তু অশৌচান্ত হইলেও শোকের ফল্গুধারায় দত্তক লওয়ার প্রসঙ্গ চাপা পড়িয়া গেল।

পূজার মুখে সে কথাটা আর একবার উঠিল। ষষ্ঠীর দিন নিবারণ এক বোঝা জামা-কাপড় কিনিয়া আনিয়া গৃহিণীকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ দেখি,—কেমন হ'ল ?"

পল্লীগ্রামের একটি বড় দোকানে যত বিচিত্র বর্ণের ও ফ্যাসানের সুন্দর সুন্দর জামা-কাপড় পাওয়া যায়—বোঝাটির মধ্যে সবগুলিই ছিল। খদ্দর হইতে ভেলভেট পর্য্যন্ত।

সেগুলি হাতে করিয়া নাড়িতে নাড়িতে ছল-ছল-নয়নে

গৃহিণী বলিলেন, "ওইটুকু ত ছেলে,—এত জামা কেন আনলে ?"

নিবারণ হাসিয়া বলিলেন, "মানে ? তুমি কি মনে করেছ, ম'নার ছেলের জন্ম ওই সব আনলাম ? তা নয় গো—তা নয়। অগ্রাণে ভুষণোর ছেলেটাকে আন্‌বো মনে করেছি—"

ক্ষণেকের তরে গৃহিণীর মুখের উল্লাস নিবিয়া গেল, কিন্তু পরমুহূর্ত্তে তাহা দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। স্বামীর এই আত্ম-গোপনের বৃথা প্রয়াস তাঁহার চক্ষুতে স্পষ্টতর হইয়া ফুটিয়া উঠিল। হাসিমুখে তিনি বলিলেন, "ভুষণোর চার বছরের ছেলেটার জন্যে এত ছোট ছোট জামা আনলে কেন ?"

নিবারণ চমকিয়া গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "কেন, এগুলো তার গায়ে হবে না ?"

গৃহিণী তাঁহার হাত ধরিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "সে ত আমার চেয়ে তুমিই ভাল জান। হ্যাঁগা, মিছে লুকিয়ে কি হবে ? পূজোর সময় মা-মরা ছেলেটাকে একবার আনাও না ?"

নিবারণ অবাধ্য অশ্রুকে অতি কষ্টে চক্ষুর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া কর্কশ কণ্ঠে কহিলেন, "তুমিও দেখছি পাগল হয়েছ ? কোন্ শালা জান্‌তো—এ জামাগুলো ছোট হবে, তা হ'লে কখনই কিনতাম না। ব্যাটা দোকানদার আবার ফেরৎ নেবে না, বলেই দিয়েছে। যাক্, মরুক গে,—আমার যেমন কপাল—তেমনি কতকগুলো লোকসান হলো।" এই বলিয়া বাণ্ডিলটা মেঝের উপর আছড়াইয়া বলিলেন, "কালই কেরোসিন তেল ঢেলে ওগুলো পুড়িয়ে দেব।"

তিনি দ্রুতপদে কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

পরদিন কিন্তু জামা পুড়াইবার কথা মনে হইল না। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমী চলিয়া গেল,—নিবারণ সে কথার উল্লেখমাত্র করিলেন না।

তার পর অগ্রহায়ণ মাস আসিল ও চলিয়া গেল,—দত্তক গ্রহণের কোন প্রশ্নই উঠিল না।

গৃহিণী সাহস পাইয়া ও বাড়ীর তত্ত্ব লইতে লাগিলেন। নিবারণ তাগাদায় বাহির হইয়া গেলে, গৃহিণী নাতিটিকে এ বাড়ীতে আনাইয়া, ভাল ভাল খাবার খাওয়াইয়া,—আদর করিয়া মনের সাধ মিটাইয়া লইতেন। কর্ত্তার জন্ম তাঁহার মনটা মাঝে মাঝে হাহাকার করিয়া উঠিত। আহা! এমন অমৃত-সিন্ধুর স্বাদ তিনি কি একটি দিনের তরেও পাইবেন না ?

ভগবানের নিকট প্রতিদিন কামনা করিতেন, "হে হরি! ওঁর সুমতি দাও—সুমতি দাও।"

মনোরঞ্জন এখানে ছিল না। পত্নী-বিয়োগের পর সে কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছিল এবং সেইখানেই কোন দোকানে কায করিতেছিল।

এইরূপে চৈত্রমাসও প্রায় শেষ হইয়া আসিল।

সে দিন বৎসরের হিসাব-নিকাশ লাভ-ক্ষতি মিলাইবার জন্ম নিবারণ চোখে চশমা আঁটিয়া মাদুরের উপর বসিয়া খাতাখানি খুলিলেন।

অকস্মাৎ ক্রোধে তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

গৃহিণী ছুটিয়া আসিতেই কর্কশ কণ্ঠে কহিলেন, "এ খাতায় কালি ফেলেছে কে ? পাতাগুলো ছেঁড়া কেন ?"

গৃহিণী আমতা আমতা করিয়া কি বলিলেন, কিছুই বোঝা গেল না। অধিকতর ক্ষুব্ধ হইয়া নিবারণ বলিলেন, "যত সব হয়েছে লক্ষীছাড়ার কাণ্ড! পরের ছেলেপুলে বাড়ী ঢুকৃতে দাও কেন ?"

গৃহিণী থাকিতে পারিলেন না। অশ্রু-ছল-ছল নেত্রে কহিলেন, "ওগো, পরের ছেলে নয়—তোমারই নাতি "

কয়েক মুহূর্ত্ত স্তম্ভিতভাবে থাকিয়া—এক সময়ে নিবারণ শ্লেষভরা কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "বটে! সে শালা নবাবপুত্তুর—আমার হিসেবের গোল সব মিটিয়ে দিয়েছে ? জান, এতে কত টাকা লোকসান হলো ? বলি, টাকাটা কি তার বাপ মনা চাকরী ক'রে আনবে,—না তার দাদা-মশায় ওই সুবলে জোচ্চোর দেবে ?"

গৃহিণীর মুখে বাক্য সরিল না।

নিবারণ ধমক দিয়া বলিলেন, "খবর্দ্দার বল্‌ছি—যে ত্যাজ্যপুত্র, তার ছেলেকে যেন এ বাড়ীতে আনা না হয়। অন্ততঃ আমি যত দিন বেঁচে থাকবো।"

আঁচলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে গৃহিণী চলিয়া গেলেন।

১লা বৈশাখ। একটা ধামায় কতকগুলি তেলা মেঠাই সাজাইয়া নিবারণ চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া বসিয়াছেন। তখনও খাতক কেহ আসে নাই।

কেমন একটু ঢুল আসিয়াছিল। সহসা শিশুর কণ্ঠের খিল খিল হাস্যধ্বনিতে চোখ চাহিতেই দারুণ ক্রোধে তাঁহার মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল।

নধর গঠন, প্রিয়দর্শন একটি ছেলে, তাঁহার এক ধামা মেঠাই উল্টাইয়া দিয়া সেই মিষ্টান্নগুলিকে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া তাহার উপর বসিয়া আছে, এবং তাঁহার সম্মুখের শূন্য খাতাখানি টানিয়া লইয়া দুটি হাতে পাতা ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে খিল খিল করিয়া হাসিতেছে। ছেলেটার স্পর্দ্ধা দেখিয়া তাঁহার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। তিনি অপরাধীর কাণ দুইটি ধরিবার জন্য হাত দুখানি প্রসারিত করিলেন।

অবোধ শিশু নিবারণের ক্রোধকে ভ্রূক্ষেপ করিল না। তেমনই খিল খিল করিয়া হাসিতে হাসিতে ঝাঁপাইয়া তাঁহার দুটি প্রসারিত বাহুর মধ্যে আশ্রয় লইয়া কলকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "দাদ্দা—দাদ্দা!"

প্রহারোদ্যত বাহুর বল নিমেষমধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল। নিবারণ ছেলেটিকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া অকস্মাৎ তাহার কচি গালে চুমার পর চুমা খাইয়া চলিলেন।

এই অতর্কিত সোহাগ-প্লাবনে শিশু হাঁফাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

গৃহিণী ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন, নিবারণ হাসিমুখে শিশুকে উদ্দেশ করিয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিতেছেন, "কেমন জব্দ—কেমন জব্দ।"

গৃহিণী বলিলেন, "ও যে তোমার নাতি।"

নিবারণ চমকিত হইয়া মুহূর্ত্তমাত্র গৃহিণীর পানে স্থির-দৃষ্টিতে চাহিলেন। পরে হাসিয়া বলিলেন, "বটে! তাই শালার এত সাহস। আমার মেঠাইয়ের ধামা উল্টে নতুন খাতাটাকে ছিঁড়ে দিয়েছে। তা দিক, আজ পয়লা বোশেখ, খাতা আমি খুলবোই। আর ঐ শালাকে কলম ক'রে তাতে দেনা-পাওনাগুলো লিখে রাখবো। কিন্তু, কোন্ ঘরে লিখবো বল দেখি?—জমার না খরচের?"

গৃহিণীর অশ্রুসিক্ত দৃষ্টি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়।

বর্ষাবৃত্তি

আবার বৈশাখ এল,—খুলে' দিল রহস্যের নবতন দ্বার।
বিশ্বের বিকাশ-বৃন্তে পুরাতন বর্ষ-পুষ্প গেল শ্লথ টুটি',
রাখিয়া নূতন বীজ অনাগত ভবিষ্যৎ সৃজন-ধারার।
পরিণতি ত্যজিছে নির্ম্মোক—প্রারম্ভ-জাতক-আঁখি উঠে ফুটি
যুগ-জননীর ক্রোড়ে। নীহারিকা-নীড়-ত্যাগী অপূর্ব্ব তারার
প্রথম সন্ধান পায় সন্ধানী জ্যোতিষী।—"স্বাগত হে,সুস্বাগত!"
তোমারেও নমস্কার,—কর আশীর্ব্বাদ,হে অতীত, হে বিগত!
এই যে নবীন যাত্রী জগতের যাত্রা-পথে আজি চলমান,
হোক্ এ অকুতোভয়, কৃচ্ছ্রসহ, দুঃখজয়ী, আত্মবলবান,
ঋজুগতি, ত্যাগব্রত, তপোনিষ্ঠ, উন্নত, উদার;—
অনৃতে অন্যায় বলি' কুণ্ঠাহীন স্পষ্টকণ্ঠে করি' প্রতিবাদ,
সত্য অমৃতের পানে বাড়াইয়া দিক তার ক্ষিপ্রদৃঢ় হাত;—

নিপীড়িয়া বজ্রগর্ভ ঘূর্ণ্যমান ঘনজটা কালবৈশাখীর
নিঙাড়িয়া আনি' দিক তাপদগ্ধা ধরিত্রীরে সুরধুনী-নীর॥

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী।

তিব্বতের বিভীষিকা

দ্বিতীয় প্রবাহ

প্রাচ্য ভূখণ্ডে যাত্রা

লণ্ডনের প্যাকার্স কোর্টের ধনাঢ্য চীনা বণিক মিঃ হং-লু-চু যে সময় সোহো স্কোয়ারের ডিটেক্‌টিভ ফেরী লকের গৃহে তাঁহার সহিত পরামর্শ করিতে আসিয়াছিলেন, সে সময় মিঃ লকের সহকারী জ্যাক্ ড্রেক কার্য্যোপলক্ষে বাহিরে গিয়াছিল।

মিঃ ফেরী লক রবার্ট ব্লেকের সমকক্ষ ডিটেক্‌টিভ। কলিকাতার মাড়োয়ারী সমাজ বাঙ্গালী ডাক্তার 'সার কৈলাসের' যেমন খাতির করিতেন, লণ্ডনের সম্ভ্রান্ত চীনাম্যানরা ইংরাজ ডিটেক্‌টিভ মিঃ ফেরী লকেরও সেইরূপ খাতির করে।

জ্যাক্ ড্রেক অপরাহ্ণে বাড়ী ফিরিয়া দেখিল—মিঃ লক দেরাজ খুলিয়া, দেরাজের জিনিষ-পত্র গুছাইয়া বাণ্ডিল বাঁধিতেছেন। তাঁহার এই কার্য্যে জ্যাক বিস্মিত হইল। সে জানিত—কর্ত্তা কোন দূরদেশে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে দেরাজ খুলিয়া বাণ্ডিল বাঁধিতে বসেন। সে ইহার কারণ জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কর্ত্তার যে উড়ু-উড়ু ভাব দেখিতেছি! সাগর-লঙ্ঘনের প্রয়োজন হইবে কি ?"

মিঃ লক বলিলেন, "একটি দুইটি নহে, অনেকগুলি সাগর পার হইতে হইবে। কাল আমরা চীনদেশে যাত্রা করিব। আজ রাত্রি জাগিয়া সকল জিনিষ গুছাইয়া লও, জ্যাক্! কাল বেলা ১১টা ২০ মিনিটে আমাদিগকে ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে ট্রেণ ধরিতে হইবে, বুঝিয়াছ ? ১১টা ২০ মিনিটের ট্রেণ। আমরা মার্শেল বন্দর পর্য্যন্ত ট্রেণে যাইব। সেখানে জাপানী জাহাজ মিলিতে পারে।

জ্যাক্ সবিস্ময়ে বলিল, "একদম্ চীনের মুলুকে পাড়ি ? বাপ্ রে ; সেখান হইতে শীঘ্র ফিরিব—সে আশা নাই, কর্ত্তা! সেখানে হঠাৎ কি কায পড়িল ?"

মিঃ লক বলিলেন, "সে সকল কথা পরে শুনিও, এখন আমার সময় নাই, তবে তোমার অনুমান মিথ্যা নহে, আমাদের দেশে ফিরিতে অনেক বিলম্ব হইবে।"

মিঃ লক ড্রেককে সঙ্গে লইয়া অল্পদিন পূর্ব্বে চীনদেশে গিয়াছিলেন। সেই দূরদেশে পুনর্ব্বার যাইতে জ্যাকের আপত্তি ছিল না, বরং চীনদেশের বহু বৈচিত্র্যে সে মুগ্ধ হইয়াছিল। সে ইংরাজনন্দন হইলেও প্রাচীন প্রাচীর চীনকে অবজ্ঞা করিত না ; চীনেদের কর্ম্ম-জীবনের বিচিত্র প্রবাহ তাহার ভালই লাগিত।

জ্যাক ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "চীনদেশ হইতে তার পাইয়াছেন না কি ?"

মিঃ লক বলিলেন, "তার ? না, তারও নয়, বেতারও নয়। হং-লু-চু আমার সঙ্গে দেখা করিয়া সকল কথা শেষ করিয়া গিয়াছেন, তুমি তখন বাহিরে গিয়াছিলে। যাও, তাড়াতাড়ি সকল আয়োজন শেষ করিয়া লও। এখন অন্য দিকে মন দিলে চলিবে না।"

জ্যাক আর কোন কথা না বলিয়া জিনিষপত্র গুছাইতে গেল। সন্ধ্যার পর সে প্যাকিং বাক্সে জিনিষপত্র পূরিয়া গাঁঠরীগুলি বাঁধিয়া মিঃ লকের সহিত পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ করিল। মিঃ লক তখন একখানি আরাম-কেদারায় বসিয়া অগ্নিকুণ্ডের দিকে পদদ্বয় প্রসারিত করিয়া কি চিন্তা করিতেছিলেন। তিনি জ্যাককে দেখিয়া বলিলেন, "তুমি সকল কথা জানিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছ, জ্যাক! আজ তুমি যখন বাহিরে গিয়াছিলে, সেই সময় হং-লু-চু আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট জানিতে পারিলাম—চীনদেশে একটা ভয়ানক বিভ্রাট ঘটিয়াছে ; তাহার প্রতীকারের জন্যই আমাদিগকে তাড়াতাড়ি চীনদেশে যাইতে হইবে।"

জ্যাক বলিল, "কি রকম বিভ্রাট, কর্ত্তা! শুনিয়াছি, চীনদেশে এখন রাজা নাই, সেখানে সাধারণ-তন্ত্রশাসন-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। চীনের জনসাধারণ পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করিয়া মরিতেছে, তাহাদের গৃহ-বিচ্ছেদ আরম্ভ হইয়াছে, ঘরে ঘরে যুদ্ধ চলিতেছে। আমরা কি এক দলের সঙ্গে মিশিয়া অন্য দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিব ?"

মিঃ লক বলিলেন, "ঠিক যুদ্ধ করিতে হইবে না, তবে প্রয়োজন হইলে হাতিয়ার ধরিতে হইবে বৈ কি! আমি ত তোমাকে চীনদেশের ধর্ম্ম ও সমাজনীতি-সংক্রান্ত অনেক

কথাই বলিয়াছি। চীনদেশে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচলিত; কেবল চীনের নহে, তিব্বতের অধিবাসীরাও বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী। কিন্তু এই একই ধর্ম্মের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্ম্মমতের এই বিভিন্নতার জন্য কয়েক শতাব্দী হইতে তিব্বতীয় বৌদ্ধগণের সহিত দক্ষিণ-চীনের বৌদ্ধগণের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছে।"

জ্যাক বলিল, "হাঁ, সে সংবাদ শুনিয়াছ কর্ত্তা! তিব্বতের দলাই লামার সহিত ক্যান্টনের প্রধান বৌদ্ধ মঠের মোহান্ত চুয়েন-তু-ইয়ানের না কি কিছুমাত্র সদ্ভাব নাই; উভয় দলের মধ্যে খুব মনোমালিন্য চলিতেছে।"

মিঃ লক বলিলেন, "মনোমালিন্য ত সামান্য কথা, একই ধর্ম্মের উভয় শাখার মধ্যে কি ভীষণ বিরোধ চলিতেছে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়! সুবিস্তৃত এসিয়াখণ্ডের পশ্চিমাংশে যে বৌদ্ধ মত প্রতিষ্ঠিত, তিব্বতের দলাই লামা সেই মতাবলম্বী বৌদ্ধগণের পরিচালক, পূর্ব্বাঞ্চলের বৌদ্ধগণ ক্যান্টনের প্রধান বৌদ্ধ মঠের মোহান্ত চুয়েন-তু-ইয়ানের মতাবলম্বী। ধর্ম্মমতের এই পার্থক্যের জন্য, দলাই লামা ও চুয়েন-তু-ইয়ানের মধ্যে যে শত্রুতার আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে—চীন-সাগরের সমস্ত জল ঢালিলেও সেই আগুন নিবিবার সম্ভাবনা নাই। অহিংসা যে ধর্ম্মের মূলমন্ত্র, সেই ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া বুদ্ধের শিষ্যরা পরস্পরের বুকে ছুরী মারিতেছে, এক দল আর এক দলকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে! বৌদ্ধধর্ম্মের পবিত্রতা কলুষিত হইয়াছে, নানাপ্রকার ব্যভিচার ও কুসংস্কার মিশিয়া উদার ধর্ম্মমত বিকৃত হইয়াছে, ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়; কিন্তু আমার বিশ্বাস, তিব্বতের বৌদ্ধগণের এখনও ততদূর অধঃপতন হয় নাই, ধর্ম্মের দোহাই দিয়া তাহারা এখনও মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন করে নাই, তবে আমার এই ব্যক্তিগত ধারণা সত্য না হইতেও পারে।"

জ্যাক বলিল, "একই ধর্ম্মের বিভিন্ন শাখার মধ্যে শত্রুতা, বিদ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি কোন্ ধর্ম্মেই বা কম? হিন্দু ও ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বীদের বিভিন্ন শাখার মধ্যে প্রেম ও মৈত্রী কি পরিমাণে বিরাজ করিতেছে, তাহা আমার জানা নাই; তবে যীশুর প্রেমের ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায় কিছুদিন পূর্ব্বেও পরস্পরের প্রতি যে প্রেমের পরিচয় প্রদান করিয়াছিল, খৃষ্টধর্ম্মের ইতিহাসে তাহার লোমহর্ষণ বিবরণ রক্তের অক্ষরে লিখিত আছে। সে জন্য দুঃখ করিয়া লাভ নাই।"

মিঃ লক এ সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া বলিলেন, "বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদের এই উভয় শাখার মধ্যে মত-ভেদ ও বিরোধ বর্ত্তমান থাকিলেও একটি বিষয়ে তাহারা একমত। ভগবান্ বুদ্ধকে তাহারা যেমন ভক্তি-শ্রদ্ধা করে, তাঁহার অনুশাসন-লিপিও তাহাদের নিকট সেইরূপ সম্মা-নার্হ, তাহা তাহারা জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ জ্ঞানে সযত্নে রক্ষার যোগ্য বলিয়া মনে করে। বুদ্ধদেবের সেই সুপবিত্র 'অনুশাসনলিপি' বৌদ্ধধর্ম্ম-জগতের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্য-বান্ ও দুর্লভ স্মৃতিচিহ্ন বলিয়া যুগ যুগ ধরিয়া সম্মানিত হইয়া আসিতেছে। সেই অনুশাসনলিপি সোনার পাতে মুড়িয়া গ্রন্থাকারে রক্ষিত হইয়াছে—এই জন্য তাহা বৌদ্ধ-জগতে 'হিরণ্ময় গ্রন্থ' নামে পরিচিত। রোমের পোপ ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগুরু বলিয়া যেমন বহুবিধ প্রাচীন স্মৃতিচিহ্ন তাঁহার প্রাসাদে তাঁহারই তত্ত্বাবধানে সংরক্ষিত আছে, সেই-রূপ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ—বুদ্ধদেবের সেই অনু-শাসনলিপি অর্থাৎ উক্ত হিরণ্ময় গ্রন্থখানিও বৌদ্ধধর্ম্মের যিনি সর্ব্বপ্রধান গুরু, তাঁহারই নিকট গচ্ছিত থাকিবার নিয়ম।

"চারি পাঁচ শতাব্দী পূর্ব্বে—ঠিক কতকাল পূর্ব্বে, তাহা আমার জানা নাই—বৌদ্ধধর্ম্ম-জগতের সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ—'হিরণ্ময় গ্রন্থ'খানি তিব্বতের দলাই লামার নিকট গচ্ছিত ছিল, কারণ, সমগ্র বৌদ্ধ-জগৎ সেই সময় তাঁহাকেই সর্ব্ব-প্রধান ধর্ম্মগুরু বলিয়া মানিয়া লইয়াছিল। কিন্তু পরবর্ত্তী যুগের কোন এক সময় সেই মহান্ গ্রন্থখানি দলাই লামার প্রাসাদস্থিত সুরক্ষিত সিন্দুক হইতে কোন কৌশলে অপহৃত হইয়া গোপনে চীনদেশে প্রেরিত হইয়াছিল। তাহা ক্যান্টননগরস্থিত প্রধান মঠে সংরক্ষিত হওয়ায়, সেই মঠের বর্ত্তমান মোহান্ত চিয়েন-তু-ইয়ান সেই গ্রন্থের অধিকারী হইয়া আপনাকে সমগ্র বৌদ্ধ-জগতের প্রধান গুরু বলিয়া ঘোষিত করিয়াছিল। 'হিরণ্ময় গ্রন্থ' চিয়েন-তু-ইয়ানের হস্তগত হওয়ায় বৌদ্ধগণ তাহারই শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে; তিব্বতের দলাই লামার এখন সে সর্ব্বপ্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। সে দলাই লামার প্রভাব, প্রতিপত্তি, প্রতিষ্ঠা ও গৌরব নষ্ট করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম-জগতে একাধিপত্য করিবে, ইহাই তাহার একমাত্র সঙ্কল্প।

"চিয়েন-তু-ইয়ানের এই আশা বিফল করিতে হইলে তাহাকে হিরণ্ময় গ্রন্থের অধিকারে বঞ্চিত করা প্রয়োজন। ঐ গ্রন্থ যত দিন তাহার অধিকারে থাকিবে, তত দিন তাহার বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা তাহাকে 'জগদ্গুরু' বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য। এই জন্য তিব্বতীয় বৌদ্ধরা সেই মহাগ্রন্থ ক্যান্টনের মঠ হইতে উদ্ধার করিয়া তিব্বতে লইয়া যাইবার জন্য নানাপ্রকার ষড়্‌যন্ত্র করিতেছিল। তাহারা জানিত, হিরণ্ময় গ্রন্থখানি তাহাদের নিজস্ব সামগ্রী, তস্করের কবল হইতে ছলে-বলে-কৌশলে তাহা উদ্ধার করা অন্যায় নহে, এজন্য অনেক শক্তিশালী ব্যক্তি এ বিষয়ে দলাই লামাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল; কিন্তু দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তাহাদের চেষ্টা বিফল হইয়াছিল। যাহা হউক, অনেক চেষ্টার পর কয়েক মাস পূর্ব্বে তাহা ক্যান্টনের মোহান্তের মঠ হইতে উদ্ধার করা হয়; কিন্তু এত দিনেও তাহা তিব্বতে প্রেরিত হয় নাই, এবং আমি এ সম্বন্ধে আর অধিক কথা জানিতে পারি নাই। আমার বিশ্বাস, হং-লু-ছু এবং আমার পুরাতন বন্ধু সার গর্ডন স্ঠাড্‌লার এ সম্বন্ধে সকল কথাই জানেন।"

সার গর্ডন স্ঠাড্‌লার বহুকাল হইতে চীনদেশে বাস করিতেছিলেন; তাঁহার জীবন রহস্যজালে আবৃত। তিনি ইংরাজ হইলেও চীনাম্যানের আচার-ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন এবং চীনাম্যানদের বেশেই কালযাপন করিতেন। তাঁহাকে দেখিলে চীনাম্যান বলিয়াই মনে হইত, এবং তিনি যে য়ুরোপীয়, ইহা অতি অল্প লোকই জানিত। অনেকেরই ধারণা ছিল, তিনি য়ুরোপীয় নহেন, চীনাম্যান। মিঃ লক কার্য্যোপলক্ষে চীনদেশে গমন করিয়া অনেকবার সার গর্ডনের সহায়তা করিয়াছিলেন। বহুবার তাঁহারা উভয়েই বিপন্ন হইয়াছিলেন, এবং সার গর্ডনের চেষ্টা-যত্নে ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে তাঁহাদের প্রাণরক্ষা হইয়াছিল। সার গর্ডন চীনদেশে লু-ইফ্‌সি নামে পরিচিত ছিলেন। সাংঘাই নগরে তাঁহার যে সুবৃহৎ বাসভবন ছিল, তাহা তিনি সম্ভ্রান্ত চীনাম্যানের বাড়ীর আদর্শে সজ্জিত করিয়াছিলেন। সেই বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া কেহই মনে করিতে পারিত না যে, তাহা কোন য়ুরোপীয়ের বাসভবন। কি দেশী, কি বিদেশী যে কোন ভদ্রলোক সেই বাড়ীতে প্রবেশ করিতেন, তাঁহারই ধারণা হইত—তাহা কোন 'মান্দারিণে'র বাড়ী।

সার গর্ডনের কথা স্মরণ হওয়ায় মিঃ লক ঈষৎ হাসিয়া জ্যাককে বলিলেন, "প্রায় ৬ সপ্তাহ পূর্ব্বে সেই হিরণ্ময় গ্রন্থখানি নদীপথে স্থানান্তরিত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। তখন চীনদেশের সর্ব্বত্র ঘোর অশান্তি বিরাজিত, অন্তর্বিপ্লবের আগুনে চীনের ধনী দরিদ্র সকল প্রজার সুখ-শান্তি দগ্ধ হইতেছিল, কাহারও জীবন নিরাপদ ছিল না; সেই দুর্দ্দিনে ঐরূপ মহামূল্য দ্রব্য নদীপথে স্থানান্তরে প্রেরণের চেষ্টা সঙ্গত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না; কিন্তু ঐরূপ চেষ্টা না করিয়াও উপায় ছিল না। অত্যন্ত গোপনে এই কায করা হইয়াছিল, এবং সংবাদ অন্য কাহারও কর্ণগোচর না হয়, তাহারও ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। উহা গোপনে স্থানান্তরিত করিবার জন্য একখানি জাহাজ ভাড়া করা হইয়াছিল, এবং যে ব্যক্তির উপর সেই জাহাজ পরিচালনের ভার ন্যস্ত হইয়াছিল, সে এরূপ কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ও বিশ্বাসী যে, কর্ত্তব্যপালনের জন্য প্রাণবিসর্জ্জনে তাহার বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা ছিল না। তাহার মত সুদক্ষ, সাহসী, চতুর কাপ্তেন চীনাম্যানদের মধ্যে আর এক জন আছে কি না সন্দেহ। তাহার উপর এই ভার দেওয়া হইয়াছিল যে, সে 'হিরণ্ময় গ্রন্থ'খানি সেই জাহাজে বহিয়া ইচাং মঠে পৌঁছাইয়া দিবে। সেই স্থান হইতে আর এক জন বিশ্বাসী লোক সেই গ্রন্থের ভার লইয়া চং-কিং নামক স্থানে উপস্থিত হইবে; এইরূপে বিভিন্ন ব্যক্তি তাহা কিছু কিছু দূর লইয়া গিয়া তিব্বতের প্রান্তসীমায় উপস্থিত করিলে, দলাই লামা সেই স্থান হইতে তাহা তাঁহার মঠে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিবেন, ইহাই স্থির হইয়াছিল।

"কিন্তু যাত্রারম্ভের অব্যবহিত পরেই ভীষণ বিপদ ঘটিল। জাহাজখানি নির্ব্বিঘ্নে ক্যান্টনী সীমা অতিক্রম করিয়া হাঙ্কো পার হইয়া গেল; অবশেষে হাঙ্কো ও ইচাংএর মধ্যবর্ত্তী নদীবক্ষে এক কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন অন্ধকার রাত্রে সেই জাহাজ অগণ্য শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইল।

"আততায়ীদের চেষ্টা সফল হইল। তাহারা জাহাজের নাবিক ও রক্ষিদলকে আক্রমণ করিয়া হত্যা করিল। নাবিক ও রক্ষীরা তাহাদের কবল হইতে জাহাজ উদ্ধার করিবার জন্য প্রাণপণে বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিল; কেবল এক জনমাত্র নাবিক আততায়ীদের অজ্ঞাতসারে নদীর জলে লাফাইয়া পড়িয়া অতি কষ্টে

প্রাণ বাঁচাইল। সে জাহাজের মেট। সে কোন উপায়ে সাংঘাই বন্দরে উপস্থিত হইয়া এই নিদারুণ দুঃসংবাদ জ্ঞাপন করিল। সে যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলে কোন সংবাদ কেহই জানিতে পারিত না।

"হং-লু-চু যে ভাবে এই সকল বিবরণ আমাকে বলিলেন, তাহা শুনিয়া আমার মনে হইল, সমস্ত ব্যাপারই যেন কোন দুর্ভেদ্য রহস্যজালে সমাচ্ছন্ন! গতবার আমরা যখন চীনদেশে গিয়াছিলাম, সেই সময় চেং-তু মঠের মোহান্তের যে অদ্ভুত কাহিনী শুনিয়াছিলাম, তাহা কি তোমার স্মরণ নাই? সেই মোহান্তটির সর্ব্বাঙ্গ কালো রঙের আলখেল্লায় ঢাকা; এবং এক বিকটাকার মুখোসে দিবা-রাত্রি তাহার মুখ আবৃত থাকে বলিয়া কেহ তাহার মুখ দেখিতে পায় না। তাহারও জীবনের সকল ঘটনাই রহস্যাবৃত।"

জ্যাক বলিল, "হাঁ কর্ত্তা, আপনি এক দিন সার গর্ডন স্যাড্লারের সঙ্গে গল্প করিতে করিতে তাঁহার কাছে সেই মুখোসধারী, কালো আলখেল্লাপরা মোহান্তের নাম বলিয়াছিলেন; সে কথা আমার স্মরণ আছে বটে, কিন্তু বেশী কিছু জানিতে পারি নাই।"

মিঃ লক বলিলেন, "সেই মোহান্ত সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য কোন কথা আমিও জানিতে পারি নাই। সে কোন উপকথার মোহান্ত কি না, তাহাও অনুমান করা অসাধ্য। কিন্তু এই মোহান্তটি যে সশরীরে বর্ত্তমান আছে এবং সে বহুসংখ্যক অনুচরে পরিবেষ্টিত হইয়া সেই জাহাজ আক্রমণ করিয়াছিল, জাহাজের ৯৯ জন প্রহরী ও নাবিকগুলিকে হত্যা করিয়া জাহাজের কোষাগার হইতে হিরণ্ময় গ্রন্থ লুণ্ঠন করিয়াছিল, ইহা অবিশ্বাস করিবার উপায় নাই। 'মেট' সাংঘাইএ উপস্থিত হইয়া জাহাজ আক্রমণ সম্বন্ধে যে গল্প বলিয়াছিল, হং-লু-চু বলিয়াছেন, তাহাতে কোন কোন অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ ছিল; এ জন্য তাহা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য না হইলেও এ কথা সত্য যে, সেই জাহাজে এক জন মুখোসধারী ও কালো আলখেল্লা-পরা লোকের আবির্ভাব হইয়াছিল এবং তাহারই আদেশে বহুসংখ্যক দস্যু জাহাজের রক্ষী ও নাবিকদলের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে হত্যা করিয়াছিল, বুদ্ধদেবের হিরণ্ময় গ্রন্থখানি সেই মোহান্ত লুঠিয়া লইয়া গিয়াছে। আমরা চীনদেশে উপস্থিত হইয়া সেই মুখোসধারী মোহান্তের প্রকৃত পরিচয় সংগ্রহ করিব, এবং তাহার কবল হইতে সেই মহামূল্য গ্রন্থখানি উদ্ধার করিব। কাযটি অত্যন্ত দুরূহ হইলেও আমি এই ভার গ্রহণ করিয়াছি, এবং এই জন্য কাল চীনদেশে যাত্রা করিতেছি।"

জ্যাক বলিল, "গল্পটি বেশ লোভনীয় বটে, কিন্তু কাযটা কি সহজ হইবে? এ যেন এক-গাড়ী বিচালীর ভিতর হইতে একটি ছুঁচ খুঁজিয়া বাহির করার মত অসাধ্য ব্যাপার! ৪০ কোটি চীনাম্যানের ভিতর হইতে সেই মুখোসধারী ভণ্ড মোহান্তটাকে কিরূপে চিনিয়া লইবেন? একে ত কেহ তাহার মুখ দেখিতে পায় না, তাহার উপর কালো আলখেল্লাপরা চীনাম্যান ফকির চীনের যে কোন সহরে শত শত দেখিতে পাইবেন; এই অবস্থায় মোহান্ত বেটাকে কি উপায়ে পাকড়াইবেন?"

মিঃ লক বলিলেন, "কাযটা অত্যন্ত কঠিন, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে; কিন্তু হিরণ্ময় গ্রন্থখানি যাহাতে ক্যাণ্টনী বৌদ্ধদের হাতে না পড়ে, তাহার উপায়াবলম্বন করিতেই হইবে। ক্যাণ্টনীরা অত্যন্ত বৃটিশ-বিদ্বেষী; তাহারা দীর্ঘকাল হইতে নানাভাবে আমাদের অনিষ্টের চেষ্টা করিতেছে; তাহাদের ব্যবহারে আমাদের মেজাজ বিগড়াইয়া গিয়াছে। হিরণ্ময় গ্রন্থখানি তাহাদের হস্তগত হইলে তাহাদের শক্তিবৃদ্ধি হইবে, অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসীরা তাহাদের আনুগত্য স্বীকার করিবে, অসংখ্য চীনাম্যানকে তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া আমাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবে। অন্যদিকে তিব্বতের দলাই লামা ইংরাজকে বন্ধু মনে করেন, আমরা এই উপলক্ষে তাঁহার উপকার করিতে পারিলে ভবিষ্যতে তাঁহাকে হাতে পাইব। তাঁহাকে সাহায্য করা আমাদের রাষ্ট্রীয় স্বার্থের অনুকূল। বিশেষতঃ, ভারতে এখন ভয়ানক গোলমাল চলিতেছে, ভারতের রাজনীতিক আকাশ এখন ঘনঘটাচ্ছন্ন; ইহার ভবিষ্যৎ ফল আমাদের অজ্ঞাত। ভারতের আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টার ফলে সমগ্র য়ুরোপের অর্থনীতিক সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে; এ অবস্থায় যদি আমরা তিব্বতকে হাতে করিতে পারি, সে জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেই হইবে। আমি আমাদের জাতীয় স্বার্থে উদাসীন থাকিতে পারিব না। ক্ষুদ্র

ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য যাহারা জাতীয় স্বার্থ উপেক্ষা করে, তাহারা দেশ-জননীর কুসন্তান।"

জ্যাক বলিল, "হাঁ, দেশের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই আমাদিগকে কায করিতে হইবে; কিন্তু চেং-তু মঠের সেই মুখোসধারী মোহান্তটাকে কি করিয়া কায়দা করিবেন?"

মিঃ লক বলিলেন, "কোন উপায়ে তাহাকে বশীভূত করিতেই হইবে। যতক্ষণ তাহাকে হাতে না পাইতেছি, তাহার মুখোস খুলিয়া ফেলিতে না পারিতেছি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার সম্বন্ধে কোন কথাই বলিতে পারিব না। তবে এইমাত্র জানিয়া রাখ, আমরা যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে যাইতেছি, সেরূপ বিপজ্জনক কার্য্যে আর কখন প্রবৃত্ত হই নাই। আমরা গৃহত্যাগ করিবার পর-মুহূর্ত্ত হইতে সকল দিকে দৃষ্টি রাখিয়া অত্যন্ত সতর্কভাবে না চলিলে যে কোন মুহূর্ত্তে বিপন্ন হইতে পারি, প্রাণ যাওয়াও অসম্ভব নহে।"

জ্যাক বলিল, "আপনার উপদেশ আমার স্মরণ থাকিবে, কর্ত্তা! আমরা পূর্ব্বে অনেক চতুর চীনাম্যানকে বুদ্ধির যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছি, এবারও কি তাহা করিতে পারিব না?"

জ্যাকের এই গর্ব্বিত উক্তি শুনিয়া মিঃ লক বিরক্তিভরে ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন; জ্যাককে দুই একটা কড়া কথা বলিতে ইচ্ছা হইল; কিন্তু তিনি মনের ভাব গোপন করিয়া ডেস্কের নিকট উপস্থিত হইলেন।

জ্যাককে সতর্ক করা প্রয়োজন ছিল, ইহার প্রমাণস্বরূপই যেন এক জোড়া ক্ষুদ্র চক্ষু সেই অট্টালিকার পশ্চাদ্বর্ত্তী বাগান হইতে মুক্ত বাতায়নপথে সেই কক্ষের ভিতর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সম্প্রসারিত করিতেছিল। এই চীনাম্যানটা কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতে হং-লু-চুর গতিবিধিও লক্ষ্য করিতেছিল। হং-লু-চু মিঃ লকের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সোহো স্কোয়ারে আসিলে সে তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিল, এবং লকের সহিত তাঁহার কি পরামর্শ হইয়াছিল, তাহাও অনুমান করিয়াছিল।

মিঃ লক পরদিন লণ্ডন ত্যাগ করিলেও তিনি জাপানী জাহাজে যাইবেন না স্থির করিলেন। হংকংএ উপস্থিত হইয়া তাঁহার দুই একটি বিষয় তদন্ত করিবার প্রয়োজন ছিল। প্রকাশ্যভাবে তাঁহার লণ্ডন ত্যাগ করিবারও ইচ্ছা ছিল না; তিনি বুঝিয়াছিলেন, হং-লু-চু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অব্যবহিত পরেই তিনি লণ্ডন ত্যাগ করিলেন, এ সংবাদ প্রকাশিত হইলে হং-লু-চুর বিরুদ্ধদল তাঁহার গতিবিধি লক্ষ্য করিবে। চীনদেশের অনেক ব্যাপারে তিনি যোগদান করিতেন, এ সংবাদ লণ্ডনপ্রবাসী চীনাম্যানদের অজ্ঞাত ছিল না। এজন্য তিনি স্থির করিলেন, জাহাজে উঠিবার সময় কেহ তাঁহার সন্ধান না পায়, তাহার ব্যবস্থা করিবেন। লণ্ডনত্যাগের পূর্ব্বে সেরূপ উপায় অবলম্বনের সুযোগ থাকিলে তিনি সেই সুযোগ ত্যাগ করিতেন না।

লণ্ডন হইতে মার্সেলে বন্দর পর্য্যন্ত যাইবার সময় পথে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিল না। কিন্তু মিঃ লক বা তাঁহার সহকারী জ্যাক জানিতে পারেন নাই যে, তাঁহাদের লণ্ডনত্যাগের পূর্ব্বদিন রাত্রিতে একটা চীনাম্যান তাঁহাদের বাসভবনের পশ্চাদ্বর্ত্তী বাগানে বসিয়া সারারাত্রি পাহারা দিয়াছিল, এবং তাঁহারা ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে যাত্রা করিলে সে একখানি ট্যাক্সি লইয়া ষ্টেশন পর্য্যন্ত তাঁহাদের অনুসরণ করিয়াছিল। তাঁহারা মুহূর্ত্তের জন্য সন্দেহ করিতে পারেন নাই যে, সেই চীনাম্যানটা তাঁহাদের লণ্ডনত্যাগের পর তাড়াতাড়ি ক্রয়ডনে উপস্থিত হইয়াছিল, এবং বহু অর্থব্যয়ে একখানি 'এরোপ্লেন' ভাড়া করিয়া সেই দিনই—ট্রেণ ছাড়িবার দুই ঘণ্টা পরে—মার্সেলে বন্দরে যাত্রা করিয়াছিল।

মার্সেলে বন্দরে উপস্থিত হইয়া মিঃ লক ও জ্যাক 'কিসুমারু' নামক জাহাজের আরোহী হইলেন। সেই জাহাজের আরোহীদের মধ্যে চীনাম্যানের সংখ্যা অল্প ছিল না। যে চীনাম্যানটা মিঃ লকের বাড়ী হইতে ভিক্টোরিয়া ষ্টেশন পর্য্যন্ত তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিল, এবং তাহার পর ক্রয়ডনে আসিয়া এরোপ্লেন ভাড়া করিয়া একাকী মার্সেলে বন্দরে অবতরণ করিয়াছিল, সে 'কিসুমারু' জাহাজে উঠিয়া জাহাজের চীনাম্যান আরোহীদের দলে মিশিয়া গিয়াছিল, মিঃ লক এ সংবাদও জানিতে পারিলেন না। কিন্তু সেই চীনাম্যানটার সতর্ক দৃষ্টি তিনি মুহূর্ত্তের জন্য অতিক্রম করিতে পারিলেন না। তাঁহার ভাগ্যাকাশে কিরূপ ভীষণ বিপদের মেঘ সঞ্চিত হইতেছিল, তাহা অনুমান করা তাঁহার অসাধ্য হইয়াছিল।

—

তৃতীয় প্রান্ত

হংকংএ

মিঃ লক যে কয়েক দিন জাহাজে ছিলেন, সে সময় তাঁহাকে বা তাঁহার সহকারী জ্যাক ড্রেককে কোন বিপদে পড়িতে হইল না, এবং কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনাও ঘটিল না; তথাপি মিঃ লককে অত্যন্ত সতর্ক থাকিতে হইল। তিনি জ্যাকের সঙ্গেও মন খুলিয়া আলাপ করিতেন না, তাঁহার মনে হইত, কেহ গোপনে থাকিয়া তাঁহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল, কে যেন ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুসরণ করিতেছিল, অথচ তিনি কাহাকেও সন্দেহ করিতে পারিতেন না। তিনি অনিশ্চিত আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া উঠিতেন।

অবশেষে হংকংএর বন্দরে জাহাজ ভিড়িলে তাঁহাদিগকে প্রকাশ্যভাবেই জাহাজ হইতে বন্দরে নামিতে হইল। তাঁহারা জাহাজের অন্যান্য আরোহীর ন্যায় তীরে নামিয়া 'হংকং হোটেলে' আশ্রয় লইতে চলিলেন। হোটেলটি বন্দর হইতে প্রায় আধ মাইল দূরে, একটি প্রকাশ্য পথের ধারে অবস্থিত। তাঁহারা উভয়ে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেই হোটেলে বিশ্রাম করিলেন, কিন্তু কেহ হোটেল পর্য্যন্ত তাঁহাদের অনুসরণ করিয়াছিল কি না, তাহা বুঝিতে পারিলেন না। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল, কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের কামরার বাহিরে আসিলেন না।

অবশেষে রাত্রি গভীর হইলে মিঃ লক জ্যাককে সঙ্গে লইয়া হোটেলের বাহিরে আসিলেন, তাঁহারা প্রায় আধ ঘণ্টা বিভিন্ন পথে ঘুরিয়া অবশেষে একটি সঙ্কীর্ণ গলির ভিতর প্রবেশ করিলেন। সেই গলিটি হংকংএর পশ্চিম বাজারের অদূরে অবস্থিত।

মিঃ লক গলিতে প্রবেশ করিয়া জ্যাকের কাঁধের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "বাঁচিবার ইচ্ছা থাকিলে আমার সঙ্গে দৌড়াইয়া চল।" সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া পাশের আর একটি গলির ভিতর প্রবেশ করিলেন। জ্যাক তাঁহার কথার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিলেও তাঁহার পাশে পাশে দৌড়াইতে লাগিল। কিন্তু মিঃ লক সম্মুখে অধিক দূর অগ্রসর না হইয়া হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইলেন এবং জ্যাকের হাত ধরিয়া পথের বাম পার্শ্বস্থ একটি অট্টালিকার প্রাচীরের আড়ালে লুকাইলেন; জ্যাক বিস্মিতভাবে তাঁহার পাশে দাঁড়াইয়া রহিল।

তাঁহারা উভয়ে সেই স্থানে লুকাইবার মুহূর্ত্ত পরেই দুই জন চীনাম্যান দ্রুতবেগে তাঁহাদের অদূরে উপস্থিত হইল। তাহারা তাঁহাদেরই সন্ধানে আসিয়াছিল; কিন্তু তাঁহাদিগকে দেখিতে না পাইয়া সেই স্থানে দাঁড়াইয়া, অতঃপর কি করিবে, তাহাই ভাবিতে লাগিল।

সেই সুযোগে মিঃ লক প্রাচীরের আড়াল হইতে বাহির হইয়া তাহাদের এক জনকে আক্রমণ করিলেন, দ্বিতীয় ব্যক্তি তাহার সঙ্গীকে সাহায্য করিতে উদ্যত হইল; তাহা দেখিয়া জ্যাক পশ্চাৎ হইতে তাহার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িল। অতঃপর সেই গলির ভিতর দুই দলে মুষ্টিযুদ্ধ আরম্ভ হইল; কাহারও মুখ হইতে কোন কথা বাহির হইল না, কিন্তু নিঃশব্দে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। মিঃ লক যাহাকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, তিনি তাহার সহিত মুষ্টিযুদ্ধ করিতে করিতে তাহার চুয়ালে এরূপ প্রচণ্ড বেগে ঘুসি মারিলেন যে, সে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া পথে লুটাইয়া পড়িল। মিঃ লক তৎক্ষণাৎ ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া দেখিলেন, জ্যাকের প্রতিদ্বন্দ্বী জ্যাককে হত্যা করিবার জন্য একখানি ছোরা ঊর্দ্ধে তুলিয়াছে। মিঃ লক তাহার উদ্যত হস্তে মুষ্ট্যাঘাত করিতেই ছোরাখানি তাহার হাত হইতে খসিয়া প্রাচীরের নীচে পড়িয়া গেল, মিঃ লক তৎক্ষণাৎ তাহার গলা টিপিয়া ধরিয়া তাহাকে ধরাশায়ী করিলেন। সে মাটীতে পড়িয়া কি বলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার গলা হইতে কোন কথা বাহির হইবার পূর্ব্বেই লক ও জ্যাক সেই স্থান হইতে পুনর্ব্বার দৌড়াইতে আরম্ভ করিলেন।

তাঁহারা উভয়ে প্রায় ২০ মিনিট বিভিন্ন পথ ও আঁকাবাঁকা গলির ভিতর ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে নগরপ্রান্তবর্ত্তী একটি উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। সেই উদ্যান হইতে তাঁহারা বন্দরস্থ জাহাজগুলির দীপালোক দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা চারিদিকে চাহিয়া মাথার টুপী কপালের উপর নামাইয়া দিলেন এবং সেই উদ্যানের বাহিরে আসিয়া একটি সুপ্রশস্ত আলোকিত পথ ধরিয়া যে পল্লীর দিকে অগ্রসর হইলেন, সেই পল্লীতে অনেক সম্ভ্রান্ত চীনাম্যান বাস করিতেন।

মিঃ লক সেই পথে চলিতে চলিতে সুদীর্ঘ ও

উচ্চপ্রাচীরবেষ্টিত একটি অট্টালিকার দেউড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সেই দেউড়ীর দরজার এক পাশে একটি হাতল ছিল, মিঃ লক সেই হাতলটি ধরিয়া সম্মুখে আকর্ষণ করিলেন, তিনি তাহা ছাড়িয়া দিতেই দেউড়ীর অভ্যন্তরে ঢং ঢং শব্দে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। দুই এক মিনিট পরে দেউড়ীর কপাটের ভিতর একটি ক্ষুদ্র গবাক্ষের দ্বার উন্মুক্ত হইল। মিঃ লক সেই দ্বারের ভিতর মস্তক প্রসারিত করিয়া একটি খর্ব্বকায় আর্দ্দালীকে দেখিতে পাইলেন। আর্দ্দালীটা চীনাম্যান।

মিঃ লক তাহাকে চীনাভাষায় বলিলেন, "মহামহিম কর্ত্তা এখন বাড়ীতে আছেন কি ?"

আর্দ্দালী বলিল, "হাঁ সাহেব, তিনি বাড়ীতেই আছেন, কিন্তু এখন তিনি উপাসনা করিতেছেন।" আর্দ্দালী সেই গবাক্ষের ভিতর দিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মিঃ লকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

মিঃ লক বলিলেন, "তাঁহার উপাসনা শেষ হইলে তাঁহাকে বলিবে, দেউড়ীর বাহিরে এক জন বিদেশী তাঁহার সাক্ষাতের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে, আজ রাত্রেই তাহাকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে। অত্যন্ত জরুরী কায, বুঝিয়াছ ?"

আর্দ্দালী বলিল, "আমার মনিব যদি আপনার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে কি বলিয়া আপনার পরিচয় দিব ?"

মিঃ লক বলিলেন, "তাঁহাকে বলিবে 'কাইলো।' এই কথাটি বলিলেই তিনি আমাকে চিনিতে পারিবেন।"

আর্দ্দালী বলিল, "আমি চলিলাম, হুজুর !"

আর্দ্দালী গবাক্ষদ্বার রুদ্ধ করিয়া প্রস্থান করিল; মিঃ লক ও জ্যাক দেউড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং অধীরভাবে গৃহস্বামীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

প্রায় ৫ মিনিট পরে সেই গবাক্ষদ্বার পুনর্ব্বার উদ্ঘাটিত হইল। কিন্তু মিঃ লক এবার আর সেই আর্দ্দালীকে দেখিতে পাইলেন না; একটি সৌম্যমূর্ত্তি সম্ভ্রান্ত মান্দারিণের সুগোল মুখ সেই গবাক্ষের বাহিরে প্রসারিত হইল। তিনিই গৃহস্বামী। তিনি মিঃ লকের মুখের দিকে চাহিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "বন্ধু, আপনি ? আসুন, আসুন, ভিতরে আসুন, সঙ্গে আর কে ?"

মিঃ লক বলিলেন, "ওটি আমার সহকারী। আমরা দুই জনেই আসিয়াছি।"

গৃহস্বামী তৎক্ষণাৎ দেউড়ীর ফটক খুলিয়া দিলেন। মিঃ লক ও জ্যাক দেউড়ীর ভিতর দিয়া একটি সুদৃশ্য পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিলেন। দেউড়ী পুনর্ব্বার তৎক্ষণাৎ রুদ্ধ হইল। স্থূলোদর মান্দারিণ মহাশয় উভয় বাহু প্রসারিত করিয়া মিঃ লকের দুই হাত ধরিলেন, এবং তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া কোমল স্বরে বলিলেন, "সম্মানিত বন্ধু, আপনি এ ভাবে আসিবেন, ইহা আমার ধারণার অতীত! মাননীয় হং-লু ছুর নিকট সংবাদ পাইয়াছিলাম, আপনি শীঘ্রই আসিবেন, কিন্তু এই অসময়ে এভাবে ?—আমার সঙ্গে চলুন, ঘরে বসিয়া সকল কথা শুনিব।"

মান্দারিণ মিঃ লক ও জ্যাককে সঙ্গে লইয়া উদ্যানের অপর প্রান্তস্থিত অট্টালিকায় প্রবেশ করিলেন। মিঃ লক দেখিলেন, সেই অট্টালিকার একতলার কক্ষগুলি য়ুরোপীয় প্রথায় সজ্জিত।

গৃহস্বামীর নাম উ-ফান-সন। ব্যবসায় উপলক্ষে হংকং-এর অনেক ইংরাজ বণিকের সহিত তাঁহার যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল, হংকং-প্রবাসী সম্ভ্রান্ত ইংরাজরা কার্য্যোপলক্ষে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেন; এজন্য তিনি য়ুরোপীয় আচার-ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন।

উ-ফান-সন মিঃ লক ও জ্যাককে সঙ্গে লইয়া একটি ক্ষুদ্র কক্ষে প্রবেশ করিলেন, তাহার কিয়দংশ আফিস এবং অপর অংশ বৈঠকখানার মত সজ্জিত। তিনি অতিথিদ্বয়ের সহিত আলাপ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে করতালি দিতেই একটি ভৃত্য সেই কক্ষে প্রবেশ করিল; তিনি তাহাকে চা আনিবার জন্য ইঙ্গিত করিলে সে দুই পেয়ালা চা আনিয়া টেবলের উপর রাখিল।

ভৃত্য প্রস্থান করিলে গৃহস্বামী তাঁহার অতিথিদ্বয়ের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "আপনারা এই গরীবখানায় নিরাপদে আসিতে পারেন নাই, বন্ধু!"

মিঃ লক বলিলেন, "হাঁ, দুইটি হিতৈষী বন্ধু আমাদের অনুসরণ করিয়াছিল, কিন্তু আমরা তাহাদিগকে কিঞ্চিৎ পুরস্কার দিয়া বিদায় করিয়াছি; তবে তাহারা সংখ্যায় দুই জনের অধিক হইলে বোধ হয় কিছু অসুবিধা হইত। আমরা হোটেলে না ফিরিয়া সোজা এখানে আসাই সঙ্গত মনে

করিলাম। আমরা কি উদ্দেশ্যে আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি, তাহা বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন।"

উ-ফান-সন মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে ইয়াংসিতে যে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার কিছু কিছু বিবরণ শুনিয়াছি বটে, মহামান্য হং-লু-ছু সকল কথা আমার নিকট প্রকাশ না করিলেও আমি সাংঘাই হইতে অনেক কথাই জানিতে পারিয়াছি; সুইফ-সি এখন সাংঘাই-এ আছেন, তিনিই সাঙ্কেতিক ভাষায় সেই সকল কথা আমাকে জানাইয়াছেন।"

মিঃ লক বলিলেন, "তিনি হিরণ্ময় গ্রন্থের কথা আপনাকে জানাইয়াছেন কি?"

উ-ফান-সন বলিলেন, "তিনি সাঙ্কেতিক বার্ত্তা পাঠাইয়া আমাকে সতর্ক করিয়াছেন। চেং-তু মঠের মুখোসধারী মোহান্ত সে সময় সেখানে ছিল। এ তাহারই কীর্ত্তি। সুইফ-সি আমাকে জানাইয়াছেন, এখন আপনি নদীতে যাইলে বিপন্ন হইতে পারেন। বড়ই ভীষণ ব্যাপার; অত্যন্ত বিশ্রী কাণ্ড!"

মিঃ লক বলিলেন, "কিন্তু সেই মুখোসধারী মোহান্ত লোকটি কে, তাহা তিনি জানিতে পারিয়াছেন কি?"

উ-ফান-সন বলিলেন, "না। তবে তাহার সম্বন্ধে নানা প্রকার জনরব শুনিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলে, ক্যাণ্টনের প্রধান মঠের মোহান্ত চুয়েন-তু-ইয়ানই এই মুখোসধারী মোহান্ত, সে ছদ্মবেশে আসিয়া এই অপকর্ম্ম করিয়া গিয়াছে। কিন্তু আমি এই জনরব বিশ্বাস করিতে পারি নাই, কারণ, সংপ্রতি আমি ক্যাণ্টনে গিয়াছিলাম; চুয়েন-তু-ইয়ান এখন ক্যাণ্টনে আছে এবং সে কয়েক বৎসরের মধ্যে মঠ ত্যাগ করে নাই, ইহারও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাইয়াছি।"

মিঃ লক বলিলেন, "হিরণ্ময় গ্রন্থের সংবাদ কি?"

উ-ফান-সন বলিলেন, "তাহা সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হইয়াছে। তাহা যে কোথায় গিয়া পড়িয়াছে, সুইফ-সিও এ সংবাদ জানিতে পারেন নাই; এমন কি, ইহা অনুমান করাও তাঁহার অসাধ্য। তবে তাহা যে নদীপথে স্থানান্তরিত হইয়াছিল, এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ হইয়াছেন।"

মিঃ লক বলিলেন, "আপনার কি ধারণা, তাহা চেং-তু মঠে প্রেরিত হইয়াছে?"

উ-ফান-সন বলিলেন, "অসম্ভব কি? এই মঠ সুরক্ষিত এবং সাধারণের দুরধিগম্য; বিশেষতঃ ইহা ক্যাণ্টনের মঠাধ্যক্ষ চুয়েন-তু-ইয়ানেরই হুদার ভিতর অবস্থিত। হিরণ্ময় গ্রন্থ যদি সেই মঠে নীত হইয়া থাকে, তাহা হইলে চারিদিকের গোলমাল না থামিলে তাহা ক্যাণ্টনের মঠে প্রেরিত হইবার সম্ভাবনা নাই।"

মিঃ লক বলিলেন, "তাহা হইলে আমরা কি তাহার সন্ধানে নদীপথে চেং-তু মঠে যাত্রা করিব?"

উ-ফান-সন মিঃ লকের কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া ফিস্-ফিস্ করিয়া কি বলিলেন। লকও কয়েক মিনিট নিম্নস্বরে তাঁহার সহিত কি পরামর্শ করিলেন। উ-ফান-সন মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, অবশেষে তিনি মিঃ লকের প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

উ-ফান-সন দুই তিন মিনিট চিন্তা করিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আপনার ফন্দীটি সঙ্গত বলিয়াই মনে হইতেছে; আপনার চেষ্টা সফল হইতেও পারে। আমার বিশ্বাস, যদি কিছু কায হয়, তবে ইহাতেই হইবে। আমি আনন্দের সঙ্গে আপনার অনুরোধ রক্ষা করিব; আপনার অভিপ্রায় অনুযায়ী সকল কাযের ব্যবস্থা করিব, কিন্তু যে পর্য্যন্ত এই কায শেষ না হইবে, সে পর্য্যন্ত আপনাকে আমার এখানেই থাকিতে হইবে; আপনি ও আপনার সহকারী হোটেলে ফিরিতে পারিবেন না। এই রাত্রে পুনর্ব্বার পথে বাহির হইলে আপনারা অধিক দূর যাইতে পারিবেন না, এমন কি, আপনাদের চিহ্ন পর্য্যন্ত থাকিবে না।"

মিঃ লক বলিলেন, "আমরা কায করিয়াই আপনার নিকট বিদায় গ্রহণ করিব। কিন্তু আপনার চাকররা জানিতে পারিলে কি গুপ্তকথা প্রকাশ হইবে না? তাহাদের দ্বারা অনিষ্টের আশঙ্কা নাই কি?"

উ-ফান-সন বলিলেন, "তাহারা প্রভুভক্ত ও বিশ্বাসী; তথাপি আমি যথাযোগ্য সতর্কতা অবলম্বন করিব। আপনি কি আজ রাত্রেই আপনার সঙ্কল্পিত কায আরম্ভ করিবেন?"

মিঃ লক বলিলেন, "হাঁ, আজ রাত্রেই। সময় নষ্ট করিয়া ফল কি? যাহা অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহা অবিলম্বেই আরম্ভ করা উচিত।"

উ-ফান-সন বলিলেন, "তাহা হইলে আমি বিজ্ঞ চিকিৎসককে ডাকিয়া আনিতে লোক পাঠাই?"

সেই রাত্রিতে এক জন চিকিৎসক আসিলেন। তাঁহার ব্যবস্থানুসারে মিঃ লককে ও জ্যাককে একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন কক্ষে আবদ্ধ থাকিতে হইল। তাঁহাদের উভয়ের চক্ষু ও মুখে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দেওয়া হইল। পরিচ্ছদ অপসারিত করিয়া তাঁহাদিগকে কৌপীন ধারণ করিতে হইল। দুই দিনের মধ্যে তাঁহারা সেই কক্ষ হইতে বাহির হইতে পারিলেন না। তাঁহাদের লোমকূপে একপ্রকার কৃষ্ণবর্ণ আরোক প্রয়োগ করা হইল। প্রত্যহ চারিবার সেই আরোক তাঁহাদের দেহে অনুপ্রবিষ্ট হইত, এবং প্রত্যহ দুই-বার আরোক-সিক্ত ব্যাণ্ডেজগুলি পরিবর্ত্তিত হইত। এতদ্ভিন্ন তাঁহাদের চক্ষু-তারকায় এক প্রকার আরোকের 'ফোট' দেওয়া হইত। ইহাতে তাঁহাদের চক্ষুর বর্ণ চীনাম্যানের চক্ষুর মত হইল। চীনাম্যান চিকিৎসক মোমের 'ইঞ্জেকসন' দিয়া তাঁহাদের মুখভাবেরও পরিবর্ত্তন করিলেন। কিন্তু ভৃত্যরা এ সকল কথা জানিতে পারিল না। দুই দিন পরে মিঃ লক ও জ্যাক জানিতে পারিলেন—অতঃপর তাঁহারা উ-ফান-সনের গৃহত্যাগ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিতে পারেন; তাঁহারা চীনাম্যান নহেন, অতঃপর এরূপ সন্দেহের কারণ রহিল না।

দ্বিতীয় দিন রাত্রিতে উ-ফান-সন তাঁহাদের সঙ্গে দেখা করিয়া বলিলেন, "এখন আপনাদের সঙ্কল্পসিদ্ধি সহজে হইবে। আপনাদের পরম বন্ধুও আর আপনাদিগকে চিনিতে পারিবে না।"

অতঃপর দীর্ঘকাল ধরিয়া উভয়ের পরামর্শ চলিল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

জীবনযজ্ঞ

দেহের সন্নিধে জন্ম কালচক্রে যে দিন জগতে,
জ্বলিতেছি এ বিশ্বের মহাযজ্ঞে সেই দিন হ'তে,
বিশ্বের জীবনকুণ্ডে মোরা করি আহুতি বহন,
এর বেশী কিছু নয়, জ্বলে তায় আত্মার দহন।
কেউ ধিকি ধিকি জ্বলি গুমে গুমে বহু দিন পুড়ি,
কেউ দাউ দাউ জ্বলি দুদিনেই ভস্ম হয়ে উড়ি।

কোটি কোটি শিখা লয়ে বিশ্বব্যাপী আগ্নেয় প্রসার,
আমাদের প্রাণশিখা কোথা ডুবে তাহার মাঝার।
ক্ষোভের স্ফুলিঙ্গ বৃথা, দু'দিনের জ্বলার উল্লাস
যদি বা ফুরায়ে যায়, তার সনে পায় ত বিনাশ
জ্বলার যাতনা-জ্বালা। মোরা শুধু ইন্ধন! ইন্ধন!!
আমরা যাজ্ঞিক নই,—এই কথা ভুলি অনুক্ষণ।

অভিমান, আশা, তৃষা, ধর্ম্মাধর্ম্ম, ইহ-পরকাল,
সবি হায় দহ্যমান ইন্ধনের ধোঁয়ার জঞ্জাল।
অনলে আলোক আছে, চারিদিকে ছায়া পড়ে তার,
অনল নিভিয়া গেলে কিছু নাই সবি অন্ধকার!
এ বিরাট যজ্ঞকুণ্ডে জ্বলি পুড়ি যত দিন পারি,
মহাকাল ভস্মস্তূপ একমুষ্টি শেষে যাবে বাড়ি।

শ্রীকালিদাস রায়।

তিব্বত

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

কয়লা এ দেশে আছে কি না, জানি না, থাকিলেও কোন কয়লার খনি আবিষ্কৃত হয় নাই। ভেড়া, ছাগল ইহাদের দুগ্ধ প্রদান করে। ঐ দুগ্ধে মাখনও হয় এবং ইহাদের রোম তিব্বতদেশীয় লোকদিগের লজ্জা ও শীত নিবারণের বস্ত্রের একমাত্র প্রধান উপকরণ। পালে পালে ছাগল এবং ভেড়া নদীর পারে শ্যামল ভূমিতে দেখিতে পাওয়া যায়। চুমরী গাইও অনেক বিচরণ করিতে দেখিয়াছি। নিম্নভূমি হইতে কাঠ এবং অল্পপরিমাণ কাপড়, কেরোসিন তৈল, সাবান এবং খয়ের-মরিচাদি সামান্য মসলা, অশ্বতর বা গাধা কি গরুর পৃষ্ঠে বাহিত হয়। মানুষও অশ্বতরপৃষ্ঠে চড়িয়া থাকে। তিব্বতে ঘোড়া কম। অশ্বতর ও গাধার সংখ্যাই অধিক। তিব্বত দেশে পাণ নাই। কাযেই কেহ পাণ খায় না; কিন্তু বাজারে বিস্তর খয়ের বিক্রীত হয়। খয়ের গুলিয়া স্ত্রীলোকরা মুখে লাগায়। কারণ, উহা মুখে লাগাইলে চামড়া শুষ্ক বাতাসে এবং শীতে ফাটে না, মুখও কাল হইয়া যায় না।

তিব্বতে চেং-টাঙ্গে অনেকগুলি লবণ-হ্রদ আছে। ঐ সকল হ্রদের জল হইতে যে লবণ হয়, তাহাই তিব্বতদেশীয় লোক ব্যবহার করে। বিলাতী লবণের কোন প্রয়োজন হয় না।

চা তিব্বতদেশীয় লোকের বড় প্রিয়। কিন্তু তিব্বতে চার চাষ নাই। দার্জ্জিলিং কি আসামের চা তিব্বত দেশের লোক পছন্দ করে না এবং কখনও পান করে না। চীনের চা-র প্রতি ইহাদের ভক্তি প্রগাঢ় এবং উহাই তাহারা পান করিয়া থাকে। চীনের ডেলা ডেলা চা চতুষ্কোণ চামড়ার আধারে রক্ষিত হইয়া তিব্বতে চালান যায়। মাটীর উনানে ঘুঁটের আগুন জ্বালাইয়া তদুপরি মাটীর পাত্রে জল চড়াইয়া তাহাতে চা ছাড়িয়া দিয়া সিদ্ধ করিতে থাকে। এইরূপে চা প্রায় সমস্ত দিনই চলে। তিব্বতদেশীয় লোক চা'র হাঁড়িতে একটু সোডা ফেলিয়া দেয়। তাহারা চা'র সহিত মাখন মিশাইয়া খাইতে ভালবাসে। সামাদা বাংলোর চৌকীদার দরজী দ্বারা পশমের জামা প্রস্তুত করিতেছিল। সে বেলা ২টা হইতে বেলা ৬ ঘটিকা পর্য্যন্ত জামা শেলাই করিল। এই সময়ের মধ্যে তাহাকে অন্ততঃ ৮।১০ বার কাঠের পেয়ালায় অর্থাৎ পানীয় পাত্রে চা ঢালিয়া পান করিতে দেখিলাম।

তিব্বতদেশীয় লোকের প্রধান খাদ্য যব-গমের ছাতু, মাংস ও মাখন। সময় সময় গমের রুটী এবং পিষ্টকও খাইয়া থাকে। কিন্তু ছাতুই ইহারা বেশী পছন্দ করে। ছাতুর সহিত মাখন মিশ্রিত করিয়া ডেলা ডেলা করিয়া চা'র সহিত খায়। মধ্যে মধ্যে মাংসের টুক্‌রা কাটিয়া কাটিয়া খাইয়া থাকে। তবে ইহাদের আমি মাংস রান্না করিয়া খাইতে দেখি নাই। শুষ্ক মাংস সিদ্ধ করিয়া বা অগ্নিতে ঝলসাইয়া কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া খাইতে দেখিয়াছি। সরিষা-শাক ইহারা খাইতে ভালবাসে, কিন্তু কি প্রকারে তৈরী করিয়া খায়, তাহা আমি দেখি নাই। মধ্যে মধ্যে আলুও পাওয়া যায়। ইয়াটুং এবং গৌচসা প্রভৃতি স্থানে মাঝে মাঝে আলুর চাষ হয়। গিয়াংসির বাজারে আলু বিক্রয় হইতে দেখিয়াছি। চুমরী গাইয়ের মাখনের ইহারা বড় ভক্ত। ভেড়া ও ছাগীর দুগ্ধের মাখন তিব্বতদেশীয় লোক খুব ভালবাসে। এই মাখন আমরা খাইয়া দেখিয়াছি। উহাতে একটু গন্ধ আছে এবং হজম করা আমাদের পক্ষে একটু শক্ত। এই মাখন বেশী খাইলে একটু মাথা ঘুরে।

উহাদের পরিচ্ছদ পশম-নির্ম্মিত। সাধারণ পুরুষ ও স্ত্রীলোক অবসরমত ছাগলের লোম লইয়া উলের সূতা তৈয়ার করিতে থাকে এবং ঐ সূতা দিয়া নিজে কিংবা লোক দিয়া নিজেদের পরিধেয় পোষাকের জন্য তাঁতে বস্ত্র ও কম্বল প্রস্তুত করে। বস্ত্রাদি দর্জ্জি দ্বারা শেলাই করাইয়া পরিবার জন্য পোষাক প্রস্তুত করে। রাত্রিতে আবরণের জন্য ঐ সূতা দিয়া মোটা অথচ সুন্দর কম্বল তৈয়ার করে। ইহাদের পোষাক আঙ্গরাখার মত ঢলঢলে হাঁটুর নীচ পর্য্যন্ত লম্বা; দুই দিকে ঢলঢলে ঝোলা হাতা। বনাতের জুতা পাদদেশে চামড়ায় মোড়া। উহা হাঁটুর নীচ পর্য্যন্ত যায়। স্ত্রীলোকের পোষাক অনেকটা ভুটিয়া স্ত্রীলোকদের মত। পুরুষরা সম্মুখ ও পশ্চাদ্‌ভাগের চুল কতক ছাঁটিয়া ফেলিয়া, মধ্যভাগে চুল রাখিয়া উহা বেণীবদ্ধ করে। সেই বেণী পৃষ্ঠদেশে বিলম্বিত থাকে। মাঝে মাঝে বৃত্তাকারে মাথার মধ্যদেশে বাঁধিয়া রাখে।

তিব্বতবাসীরা সকলেই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী; ঘরে ঘরে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া পূজা করিয়া থাকে। কোথাও যাইবার সময় ছোট বুদ্ধমূর্ত্তি কৌটায় করিয়া ঝুলাইয়া লইয়া যায়। আমি উহাদের আচার-ব্যবহার পরিজ্ঞাত হইতে পারি নাই। উহাদের ভাষায় ভালরূপ অধিকার না থাকিলে এবং কিছুকাল উহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠভাবে অবস্থান না করিলে উহা জানা সম্ভবপর নহে। আমার সে সুবিধা ও অবসর হয় নাই।

আমরা মহাভারতে পড়িয়াছি, দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী ছিল। দ্রুপদ-কন্যাকে পঞ্চ পাণ্ডব বিবাহ করিয়াছিল এবং ঐ বিবাহ মুনি-ঋষিদের অনুমোদিত। দ্রৌপদী সতী স্ত্রীলোকের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন। তিব্বতে এবং সিকিমের আদিমবাসী ভুটিয়ারা দুই, তিন, চারি বা ততোধিক ভ্রাতায় এক স্ত্রী বিবাহ করিয়া থাকে।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দাশ রায় বাহাদুর তিব্বত-ভ্রমণ-প্রসঙ্গে যে পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি বর্ণনা করিয়াছেন যে, এক দিন তিনি দলাই লামার মন্ত্রীর স্ত্রীর সহিত আহার করিতে যাইলে তাঁহার সহিত নিম্নলিখিত কথোপকথন হইয়াছিল:—"দ্বিপ্রহরে লাচেম-(মন্ত্রীর স্ত্রী) এর ঘরে প্রবেশ করিলে আমাকে খাদ্যদ্রব্য পরিবেষণ করা হইল এবং খাইতে খাইতে তিনি আমাকে য়ুরোপীয় ও ভারতীয় বিবাহবিধি সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করিলেন। যখন আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, ভারতবর্ষে এক স্বামীর বহু স্ত্রী থাকে এবং য়ুরোপবাসীদের মধ্যে এক পুরুষ মাত্র এক স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে, তিনি অপ্রচ্ছন্নভাবে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন এবং বলিয়া উঠিলেন, 'এক স্বামীর এক স্ত্রী! আপনি আমাদের তিব্বত-রমণীরা উহাদের চেয়ে আরও ভাল অবস্থায় আছে মনে করেন না? ভারতীয় রমণী তাহার স্বামীর ভালবাসার ও সম্পত্তির মাত্র কতক অংশের অধিকারিণী হয়; কিন্তু তিব্বত-রমণীরা একই মায়ের গর্ভজাত, এক রক্তমাংস-সম্ভূত সকল ভ্রাতৃগণের সমস্ত উপার্জ্জিত ও পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়া থাকে। আত্মা বিভিন্ন হইলেও সহোদরগণ এক। ভারতবর্ষে এক পুরুষ বহু স্ত্রী বিবাহ করিয়া থাকে সত্য, কিন্তু স্ত্রীগণ পরস্পর পরস্পরের অপরিচিত।' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনি কি বলিতে চান, বহু ভগিনীর এক স্বামী গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়?' লাচেম উত্তর করিলেন, 'আমার বলিবার উদ্দেশ্য তাহা নহে। আমার বক্তব্য যে, ভারতীয় স্ত্রীলোকদের চেয়ে তিব্বত রমণীরা অপেক্ষাকৃত সুখী। কারণ, ভারতবর্ষে পুরুষরা যে সুবিধা ভোগ করিয়া থাকে, তিব্বতে রমণীরা সে সুবিধা ভোগ করে'।"

আমি তিব্বতী ভাষায় অজ্ঞ বলিয়া ইহাদের সামাজিক প্রথা সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানিতে পারি নাই। তবে শুনিয়াছি যে, এই দেশে দুই কিংবা তিন বা চারি ভ্রাতা এক স্ত্রী বিবাহ করিয়া থাকে।

৯ই জুন।—অদ্য আমরা গিয়াংসি হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিব। পাশ পাইতে কিছু দেরী হইবে বলিয়া বৃটিশ ট্রেড এজেন্ট বলিয়া পাঠাইয়াছেন। ১০ ঘটিকার সময় রওনা হইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম, কিন্তু ডাণ্ডী-বাহকগণ অদ্য যাইতে নারাজ। উহাদের ৪ জনের বাড়ী গিয়াংসিতে। তাহারা বাজারের সন্নিকটে তাহাদের বাড়ীতে আছে। তাহাদের আনিবার জন্য লোক পাঠাইলাম। তাহারা কেহই আসিল না। বেলা ১০ ঘটিকার সময় খাওয়া-দাওয়া সমাপন করিয়া আমরা বসিয়া রহিলাম। দুই জন ডাণ্ডীবাহক আমাদের ডাক-বাংলোয় ছিল। তাহাদের দুই জনকে ও উত্তরোত্তর অন্য লোক পাঠাইয়া ঐ ৪ জন ডাণ্ডীবাহককে আনিতে পারিলাম না। অগত্যা জিনিষপত্র অশ্বতরের পৃষ্ঠে দিয়া আমি হাঁটিয়া বেলা ১টার সময় রওনা হইলাম। ২ জন ডাণ্ডীর কুলী কিছুক্ষণ পরে ডাণ্ডী লইয়া আমাদের সহিত মিলিত হইল। এ দিকে শ্রীসতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের ঐ ডাণ্ডীর ৪ জন বাহককে আনিবার পুনঃ পুনঃ চেষ্টা বিফল হওয়ায় সে বেলা ৩টার সময় আমার সহিত মিলিত হইল। আমি ইত্যবসরে প্রায় ৬ মাইলের উপর হাঁটিয়া এক স্থানে বিশ্রাম করিতেছিলাম। তখন চাকরের ঘোড়ায় আমি চড়িলাম। চাকর অশ্বতরের পৃষ্ঠে চড়িল। সতীশ অন্য একটি ঘোড়ায় চড়িল। আমরা আস্তে আস্তে রওনা হইলাম। গিয়াংসি অন্যান্য স্থানের ন্যায় এত বেশী শীতল নহে। রৌদ্রের তাপও প্রখর বোধ হইতেছিল। তাহার উপর পথের ধূলা আমাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। সৌভাগ্য যে বাতাস কম ছিল। আমরা আস্তে আস্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলাম। একে কুলীদের লইয়া গোলমাল, তাহার উপর প্রত্যাবর্ত্তনে হতাশ

না হইলেও আসিবার সময়ে দেখিবার যে উৎসাহ ছিল, এখন ফিরিবার সময় তাহা অনেক কমিয়া গিয়াছে। যাহা হউক, আমরা পূর্ব্ব-বর্ণিত রাস্তা দিয়া অগ্রসর হইতে হইতে বেলা প্রায় ৫।৬টার সময় সৌগাঙ্গ বাংলোয় পৌছিলাম।

আমরা গিয়াংসি হইতে রওনা হইবার পর বৈকালে অবশিষ্ট ডাণ্ডী-কুলীরা ডাকবাংলোয় আমাদের অনুসন্ধানে আসিয়াছিল। আমাদিগকে না দেখিয়া তাহারা সন্ধ্যার সময় রওনা হইয়া আমাদের নিদ্রা যাওয়ার অনেক পরে রাত্রিতে সৌগাঙ্গ বাংলোয় উপস্থিত হইল।

১০ই হইতে ১৭ই জুনের মধ্যে সৌগাঙ্গ হইতে যাত্রা করিয়া নানাস্থান ঘুরিয়া ইয়াটুংএ আসিয়া পৌছিলাম।

যাওয়ার সময় গন্তব্য পথের পার্শ্বস্থ ক্ষেত্রের কোথাও ছোট চারা এবং স্থানে স্থানে মাত্র চাষবাস করিতে দেখিয়াছিলাম। প্রত্যাবর্ত্তন-পথে দেখিলাম, ক্ষেত্রে যব ও গমের চারা-গাছ কোন স্থানে ছোট এবং কোন স্থানে বড় হইয়াছে। ইয়াটুং পৌছিয়া দেখিলাম যে, কোন কোন ক্ষেত্রে ফল ধরিতে সুরু হইয়াছে। ফারির পর হইতে, বিশেষতঃ টোনা পার হওয়ার পর আমরা যাইবার সময় তৃণটিও দেখিতে পাই নাই; এখন পাহাড়ের উপরে কোন তৃণ না হইয়া থাকিলেও উপত্যকার অন্যান্য স্থানেও তৃণ জন্মিয়াছে দেখিলাম। কিন্তু পাহাড়ের উপর টোনা পর্য্যন্ত এখনও কোন তৃণাদি জন্মে নাই। টোনার পর টেঙ্গলা পার হইয়া ফারির নিকটবর্ত্তী হইলে আমরা কিছু কিছু তৃণ পাহাড়ের গায়ে দেখিতে পাইলাম। ফারি ছাড়াইয়া কিছু দূর আসিলে যাইবার সময় যে সকল পাহাড়ে কেবল তৃণ দেখিয়াছিলাম, তথায় এখন ছোট চারা-গাছ হইয়াছে এবং তাহাতে ফুলও হইয়াছে। ফুলগুলি সুগন্ধী এবং চারা-গাছের পাতায়ও সুগন্ধ। এই পাতা তিব্বতদেশীয় লোকরা ও ভুটিয়ারা ধূপস্বরূপ ব্যবহার করে। ফিরিবার সময় শীত সামান্য কমিয়াছে; কিন্তু বাতাস পূর্ব্ববৎই আছে। তবে বাতাস পূর্ব্বে পশ্চিমদিক হইতে লাগিত; এখন সম্মুখদিক হইতে লাগিতেছে। কাযেই ফিরিবার সময় বাতাস অতি কষ্টদায়ক বোধ হইল। ফারি হইতে রওনা হইবার দিন সামান্য বৃষ্টি পাইলাম। ফারি ছাড়াইয়া প্রথম ৫।৭ মাইল পর্য্যন্ত চারা-গাছ নয়নগোচর হইল এবং আরও ৩।৪ মাইল পর্য্যন্ত যাইয়া ছোট ছোট গাছ দেখিলাম। আমরা যত গৌসার নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম, ক্রমে গাছ বড় ও জঙ্গল বেশী হইতে লাগিল।

১৮ই জুন। আমরা ইয়াটুংএ এক দিন বিশ্রাম করিলাম। ১৯শে তারিখে পুনরায় ইয়াটুং হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য যাত্রা করিলাম। আসিবার সময় জেলাপালার উপর দিয়া আসিয়াছি। ফিরিবার সময় নাথুকার উপর দিয়া ছাঙ্গু হ্রদ দেখিয়া যাইব মনে করিলাম। প্রভাতে ঘুম হইতে উঠিয়া যাইবার জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। ভোর হইতে বৃষ্টি আরম্ভ হইল, কাযেই আমরা বৃষ্টির জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলাম। কিন্তু বৃষ্টি ধরিতেছে না দেখিয়া এই মুষলধারার মধ্যেই বেলা ৯॥টার সময় বাংলো হইতে বাহির হইয়া আমচু নদীর পার দিয়া, শস্যশ্যামল ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া এবং গ্রামের ধার দিয়া ২ মাইল আসিয়া পৌছিলাম। রাস্তা কর্দ্দমময়, তাহার উপর বাতাস ও বৃষ্টিতে ভীষণ তাড়না করিতে লাগিল। ২ মাইল পর হইতে আমাদিগকে উপরের দিকে উঠিতে হইবে। উপরের দিকে উঠিতে কর্দ্দমে কেবল পা পিছলাইয়া যায়। কোন স্থানে এত খাড়াই ও পিচ্ছিল যে, রাস্তা ছাড়িয়া আমাদিগকে জঙ্গল দিয়া উঠিতে হইল। আবার কোন কোন স্থানে আমাদের উঠা এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিল। এই সকল কদর্য্য রাস্তায় কুলীদিগের সাহায্যে আমরা উপরের দিকে উঠিতে লাগিলাম। প্রায় ১॥ মাইল এই কদর্য্য রাস্তা উঠার পর রাস্তা কথঞ্চিৎ ভাল হইল। আরও অর্দ্ধ-মাইল উঠার পর কাচু গোম্ফার নীচে পৌছিলাম। এই স্থান হইতে নিম্ন উপত্যকায় গ্রাম, নদী, শ্যামলক্ষেত্র ইত্যাদি সুন্দর দেখাইতে লাগিল। এই স্থানটি ঘুরিয়া কাচু গোম্ফার সম্মুখ দিয়া ক্রমে উপরদিকে উঠিতে লাগিলাম। এই স্থানের পর রাস্তা খারাপ হইল। রাস্তা জঙ্গলের মধ্যে পাহাড়ের গা দিয়া। এক দিকে অভ্রভেদী পাহাড়—অপর দিকে অতলস্পর্শী উপত্যকা; আবার কোন কোন স্থানে পাহাড় ক্রমে ঢালু হইয়া নীচের দিকে চলিয়া গিয়াছে; আবার কোথাও বা উপত্যকার বাঁ দিকে কিছুদূর খাড়া নামিয়া পরে চটান; কিন্তু জঙ্গল সর্ব্বত্র সমভাবে চলিয়াছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, রাস্তা পাহাড়ের গা দিয়া। কোন কোন স্থানে রাস্তা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাহা গোল কাঠের খণ্ড দিয়া বাঁধাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং নীচে খণ্ড খণ্ড
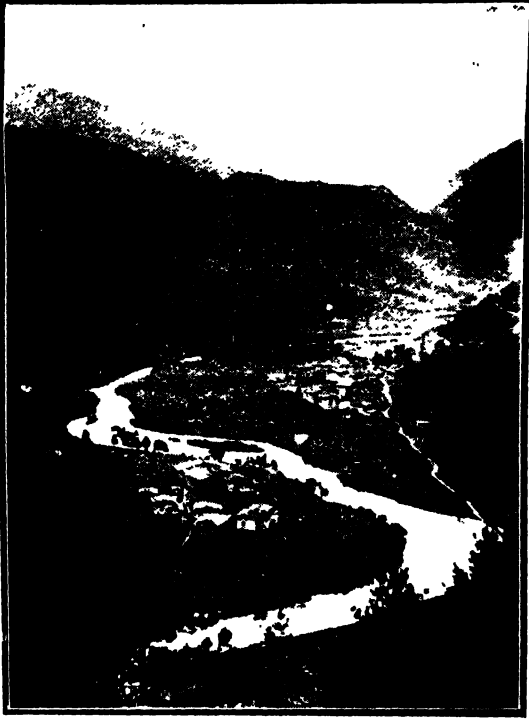
কাচু গোম্ফার সন্নিহিত ক্ষুদ্র নদী

কাঠের থাম্বা দিয়া সাঁকোর মত করা হইয়াছে। কোথাও বা রাস্তার কর্দ্দম নিরারণের জন্য গোল কাঠ সাজাইয়া রাস্তা বাঁধান হইয়াছে। কিন্তু এই সকল কাষ্ঠের উপর বৃষ্টির জলের সহিত মাটী আসিয়া রাস্তা কর্দ্দমাক্ত ও পিচ্ছিল করিয়া দিয়াছে। পা পিছলাইয়া পড়িয়া যাইবার ভয়ে রাস্তায় অতি সাবধানে চলিতে হয়। আমরা অতি সাবধানে কর্দ্দমের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিলাম। মধ্যে একটু বৃষ্টি থামিয়া পুনঃ বৃষ্টি আরম্ভ হইল। কতকদূর যাইয়া আমাদিগকে চন্দ্রাকৃতি হইয়া পাহাড়ের রাস্তা ঘুরিয়া যাইতে হইল।

যাহা হউক, আমরা অনেক কষ্টে বেলা প্রায় ৩ ঘটিকার পর চামদীটঙ্গ বাংলোয় পৌছিলাম। এই স্থানটি বড় ঠাণ্ডা বোধ হইতে লাগিল। ইহার উচ্চতা প্রায় ১ হাজার ৩ শত ৫০ ফুট হইবে। বাংলোয় আসিবার পর বৃষ্টি থামিল। তখন চারিদিক ঘুরিয়া দেখিবার বাসনায় বাংলো হইতে বাহির হইলাম। দেখিলাম, সম্মুখে রাস্তা ভারি কর্দ্দমময়। পা কেবল পিছলাইয়া যাইতে লাগিল। সুতরাং বাংলোয় ফিরিয়া আসিলাম। তৎপরে পাহাড়ের উপর দিকে উঠিতে চেষ্টা করিলাম। তাহাতেও জঙ্গল, কর্দ্দম ও কাঁটার জন্য অকৃতকার্য্য হইলাম। স্থানটিতে বড় বড় বৃক্ষ আছে। দূরস্থিত বৃক্ষ মেঘের জন্য নয়নগোচর হইল না। যাহা হউক, রান্নার উদ্যোগ হইল। কিন্তু অনেক চেষ্টাতেও ডাল সিদ্ধ হইল না। ইয়াটুঙ্গের হেড ক্লার্ক লিভিং কাজীর প্রদত্ত গাজর, মূলা ও সেলেড তরকারী এবং সঞ্চিত আলু দ্বারা ব্যঞ্জন প্রস্তুত করাইয়া আমাদের আহার সম্পন্ন করিলাম। রাত্রিতে কাঠ জ্বালাইয়া সুখে নিদ্রা গেলাম। বাংলোটি টিনের ঘর। ভিতরে কাঠের ছাদ, চারিদিকে কাঠের বেড়া এবং ডবল দরজা। দরজায় মোটা পশমের পর্দ্দা ঝুলান।

[ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রিয়নাথ রায়।

কাযের মোহে

চলার নেশায় যখন পথিক চলে,
সঙ্গী নাহি চায়;
ভাবের মোহে যখন পাগল কবি,
ছন্দ ভুলে যায়।

ফোটার নেশায় যখন কুসুম ফোটে,
বাসের আশে নয়;
কাযের সুখেই কর্ম্মী খেটে মরে—
বিশ্ব হেসে কয়।

শ্রীবিরামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

অন্ধকারের মানুষ

১

বামুনহাটী গ্রামে শিক্ষিত ভদ্রলোকের বাস। প্রায় সকলেই সঙ্গতিপন্ন। গ্রামে যে সকল প্রতিষ্ঠান থাকা আজকাল প্রয়োজন, বিশিষ্ট জমীদার দুর্গামোহন বাবুর চেষ্টা ও অর্থব্যয়ে তাহার কিছুরই অপ্রতুল নাই। রাস্তাঘাট, স্কুল, ডাকঘর—এক কথায় যে সকল প্রতিষ্ঠান না থাকিলে চলে না, সে সমস্তই আছে। আর আছে ঘর কয়েক মালো। কেমন করিয়া এই মালো বংশ এই প্রবল-প্রতাপান্বিত ভদ্রলোকের প্রকাণ্ড ইমারতের পার্শ্বে তাহাদের অতি ক্ষুদ্র কুঁড়েটুকু বাঁধিয়া মাথা গুঁজিবার অনুমতি পাইয়াছিল, সে এক ছোটখাট ইতিহাস বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

গ্রামের জমীদার দুর্গামোহন বাবু যখন কয়লার কারবারে ফাঁপিয়া উঠিয়া স্বগ্রামের ও আশপাশের চতুর্দ্দিকের জমীদারগার মালিক হইয়া দেশে বাস করিতে আরম্ভ করেন, তখন তিনিই বাড়ীর পাশের আমবাগানটার এক পার্শ্বে এই কয় ঘর প্রজা-পত্তন করেন।

একে ত অশিক্ষিত—বিচার-আচারের জ্ঞানকাণ্ড তাহাদের ছিল না। তার উপর তাহাদের বিষয়-সম্পত্তি হইল, একপাল ভোঁদড়, দুই চারিটা ছাগল-ভেড়া, এমনই কত কি জীব-জানোয়ার। গ্রামের লোক প্রথমটা নাক সিট্‌কাইলেন; পরে বিরক্ত হইয়া দুর্গামোহন বাবুর নিকট নিবেদন করিলেন—"মশাই! এ ত আর টেঁকা যায় না। ওদের অন্যত্র ব্যবস্থা করুন।"

দুর্গামোহন উত্তরে বলিয়াছিলেন, "মহাশয়দের বাড়ীর পাশে গোয়াল আছে না? বলি, গরু-বাছুর পুষছেন ত?" উপস্থিত ভদ্রসজ্জনরা কথাটা ঘাড় নাড়িয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। দুর্গামোহন মুখের নলটা হাতে করিয়া পুনশ্চ টিপিয়া টিপিয়া উত্তর দিয়াছিলেন, "একটু দুধ খাবার লোভেই ত? আর কোন সদিচ্ছা ত এর ভিতর নেই! কি বলেন?"

এ কথার প্রতিবাদে অবশ্য কাহারই কিছু বলিবার ছিল না। দুর্গামোহন অবশেষে মৃদু হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "এই জানোয়ার-গুলোকেও আমারও ঐ রকম একটা সুমতলবে আশ্রয় দেওয়া।" তার পর তাঁহার গূঢ় অভিপ্রায়টা সবিস্তারে বুঝাইয়া দিবার জন্য বলিয়াছিলেন, "সময়মত কাযকর্ম্মে মাছ যোগাবে বলেই ওগুলোকে আমি পুষ্‌ছি। বেলা ১০টার মধ্যে জীবিত মৎস্যের ঝোল সহযোগে চারিটি অন্ন যদি আহার করতে চান ত আর দ্বিরুক্তি করবেন না।"

দুর্গামোহন ছিলেন অতিশয় রাশ-ভারী মানুষ। সুতরাং অপর পক্ষ মাথা নত করিয়া যে যাহার ঘরে গিয়া নানাবিধ আন্দোলন করিয়াছিলেন। ইতিহাস এই কথাই বলে।

এ সকল বহুদিন পূর্ব্বের কথা। দুর্গামোহন স্বর্গীয় হইয়াছেন। তৎপুত্র কালীমোহন বাবুও বৃদ্ধ হইয়া পুত্র রাধা-মোহনের হস্তে বিষয়কার্য্যের ভারার্পণ করত নিজে এখন পরলোকের পাথেয় সংগ্রহ করিতেছেন। আর দুর্গামোহনের প্রতিষ্ঠিত ধীবর-বংশ ছ'য়ের স্থানে এখন আড়াই ঘরে আসিয়া ঠেকিয়াছে।

ইহাদেরই মধ্যে ষষ্ঠী মালো সে দিন জমীদারবাড়ীর অন্দরে ঢুকিয়া প্রণামান্তে কহিল—"পূজোর জন্যে জিনিষ-পত্তর যে কিছু চাই, বড়-মা।"

গরীব নিঃস্ব বলিয়া মেয়েরা সকলেই ষষ্ঠীকে সমধিক কৃপা করিতেন। সাড়া পাইয়া রাধামোহন বাবুর স্ত্রী কাত্যায়নী বাহির হইয়া আসিয়া হাসিমুখে প্রশ্ন করিলেন, "কি পূজো হবে রে তোর বাড়ী?"

ষষ্ঠী ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিয়া কহিল, "এজ্ঞে মাঠান, আমার পরিবারের—এই মন্নির মায়ের সন্তান হবেন কি না?"

মন্নীর বয়স ৮ বৎসর। সে তাহার পিতার পার্শ্বেই দাঁড়াইয়াছিল। কাত্যায়নী সহাস্যে তাহাকে কহিলেন, "কি রে? তোর ভাই না বোন্ হবে? ভাই—কেমন? কি বলিস?"

পিতাপুত্রী উভয়েই হাসিয়া আর বাঁচে না। মন্নী আনন্দে গদ্‌গদ হইয়া কহিল, "হিঃ।" বলিয়াই পিতার কটিদেশ দুই বাহু দ্বারা আবদ্ধ করিয়া কোলের ভিতর মুখ লুকাইয়া ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিতে লাগিল। বাপেরও সেই অবস্থা! সেও তেমনই ভাবে কহিল, "সেই আকিজ্ঞেই ত করি, মাঠান্!—আপনার পেরজা এক ঘর বজায় থাক্। এখন মুনিবের আশীর্ব্বেদ, আর পাগলা ঠাকুরের দয়া।" বলিয়াই প্রগাঢ় ভক্তি সহকারে পাগলা ঠাকুরের উদ্দেশে প্রণামান্তে কহিল, "সবই ত জান, মাঠান, তে রাত্তির বেশী একটিকেও রাখতে পারলাম না। হয়েছে কি অমনি ছোঁ মেরে নিয়ে চ'লে যায়।" বলিতে বলিতে ভয়ে ও ভাবনায় ষষ্ঠী একবারে নীলবর্ণ হইয়া কাঁপিতে লাগিল। পিতার মুখের দিকে তাকাইয়া মেয়েটিও কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিল, "বাবা, বাড়ী চল। ভয় করে।"

পিতা সস্নেহে মেয়েকে বুকে তুলিয়া গাঢ়স্বরে কহিল, "এই যে যাই, মা!" বলিয়া চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া পুনশ্চ কহিল—"আজ জোয়ান মদ্দ ছেলে সব চারপাশে আমার ঘুরবে!" বলিতে

বলিতে ক্ষুদ্র মরুণীকে বক্ষের উপর সবলে চাপিয়া ধরিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

ক্রন্দন শুনিয়া একটি ১৮ বৎসরের সুশ্রী মেয়ে বাহির হইয়া আসিয়া প্রশ্ন করিল, "কি হয়েছে মামীমা ?" মামীমারও চোখ দুইটি ছল ছল করিতেছিল। আর্দ্র কণ্ঠে তিনি কহিলেন, "সন্তান হয়ে বাঁচে না! আঁতুড়েই শেষ হয়ে যায়। তাই দুঃখ করছে।"

মেয়েটি সমবেদনা জানাইয়া কহিল, "কিন্তু ডাক্তাররা কি বলেন ? একটা কারণ ত নিশ্চয়ই বল্‌ছেন!"

মামীমা অবাক্ হইয়া কহিলেন, "ডাক্তার আবার কোথায় পেলি, হেম ?"

হেম রাধামোহন বাবুর ভাগিনেয়ী। হেমের পিতা মিঃ বাসু কলিকাতা হাইকোর্টের এক জন প্রসিদ্ধ এ্যাটর্ণী। শুধু ইহাই তাঁহার যথেষ্ট পরিচয় নহে। বাঙ্গালা দেশে তিনি এক জন মানুষের মত মানুষ বলিয়াই পরিচিত। অতি শৈশবেই হেম মাতৃহারা হইয়াছিল। সেই হইতে মিঃ বাসু কখনও কন্যাকে কাছছাড়া করেন নাই। এবার কি একটা বিশেষ জরুরী দরকারে মাস চারেকের জন্য সিমলায় যাইতে হইয়াছে। হেমও অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া এবার মামার বাড়ী বেড়াইতে আসিয়াছে। হেম নিজে সুশিক্ষিতা, ঘনিষ্ঠতাও তাহার উচ্চ-শিক্ষিত অবস্থাপন্ন মার্জ্জিতরুচি পরিবারদিগের সঙ্গে। কলিকাতার বাহিরে এই সে প্রথম পা দিয়াছে। রাস্তায় গরীব-দুঃখী যে তাহার চোখে পড়ে নাই, তাহা নহে। তবে তাহাদের প্রার্থিত বস্তু প্রদান করিয়াই কর্ত্তব্যটুকু শেষ করিয়াছে। কিন্তু তাহাদের আভ্যন্তরীণ অবস্থার সঙ্গে সে সম্পূর্ণ অপরিচিত। তাই কহিল, "ডাক্তার দেখান হ'ল না ? কেন মর্‌ছে, তা কেউ জানে না ? তবে আর কি হবে ?" বলিয়া মলিন-মুখে সে দাঁড়াইয়া রহিল। ষষ্ঠী ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "দিদিঠান্, ডাক্তার-বদ্দি করবে কি ? কিছু করবার যো নেই তাদের। এ যে ঐ উনির আক্রোশ!" বলিয়া তর্জ্জনীতে একটা কামড় দিয়া উঁচু করিয়া দেখাইয়া কহিল, "ঐ ওখানে ব'সে দৃষ্টি দিচ্ছেন, আর আমার বুক-চেরা ধন সব চ'লে যাচ্ছে।" বলিতে বলিতে টপ্ টপ্ করিয়া ফোঁটা কয়েক অশ্রু মাটীতে ঝরিয়া পড়িল।

হেমের অন্তরটি অতিশয় কোমল। কাহারও দুঃখ-কষ্ট, আপদ-বিপদ শুনিলেই সে কাঁদিয়া ফেলিত। আকুল হইয়া সে কহিল, "এবার ভাল ক'রে চেষ্টা কর, ষষ্ঠী। আমি বলছি, এবার নিশ্চয় বাঁচবে।"

ষষ্ঠী চোখ মুছিতে মুছিতে কহিল, "চেষ্টার ত কমি নেই আমার। যে যা বলছে, তাই করছি, দিদিঠান্! আট দশ আনার পয়সা এর মধ্যেই খরচা হয়ে গিয়েছে। এই সেদিনেও বুড়োনাথে স-পাঁচ আনার খরচা ক'রে পূজো দিয়ে এসেছি।"

এ সকল পূজাপাঠ সম্বন্ধে হেমের কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না। মামীমাকে প্রশ্ন করিতে তিনি যখন অপদেবতার দৃষ্টি ইত্যাদি বুঝাইয়া দিলেন, তখন হেম একবারে বিবর্ণ হইয়া গেল। একে সে শিক্ষিতা, তার উপর সহরের আবহাওয়ায় মানুষ। মানুষ যে আজও এতখানি অন্ধকারে আছে, এ যেন তাহার অসম্ভব বলিয়া মনে হইতে লাগিল। বিরক্ত হইয়া সে কহিল, "দেখ বাপু, ও পূজো-টুজোয় কিছু হবে-টবে না।"

ষষ্ঠী ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "হবে। এবার না হয়ে পারবার যো নেই, দিদিঠান্! মাথায় ক'রে এনেছি কাকে ? কমলাপুরের ছোট গোঁসাই স্বয়ং এসেছেন। আজ রাত্তিরে পূজো পেতে একটা ফুল মরির পোয়াতীর গায়ে ফেলুন। তার পর দেখি, একবার দৃষ্টি উনি দেয় কেমন ক'রে ?" বলিয়া ষষ্ঠী আনন্দে ও উৎসাহে বুক ফুলাইয়া হাসিতে লাগিল।

ইহার পর ঘণ্টাখানেক অবিশ্রাম যুক্তি-তর্ক এবং চতুর্দ্দিকের রাশি রাশি দৃষ্টান্ত দেখাইয়াও কোন ফল হইল না। সমস্তই স্বীকার করিয়া ষষ্ঠী যখন কহিল, "উপরের দৃষ্টি কাটাবার উপায় কি ? সে ত আর ডাক্তার-বদ্দির অষুধে মানবে না", তখন ষষ্ঠীর দিদি ঠাকুরাণী হতাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিল।

হেমের মামীমা মুখ টিপিয়া হাসিতেছিলেন। হেম বিরক্ত হইয়া কহিল, "আজীবন অন্ধকারে থেকে ওরা যদি অন্ধকারকেই ভালবাসে ত দোষ দেবারই বা আছে কি ? কিন্তু মামীমা, এর জন্যে যদি কেউ অপরাধী থাকে ত সে আমরা।" বলিয়াই গম্ভীর ও বিরক্তমুখে ষষ্ঠীর দিকে ফিরিয়া কহিল, "তা পূজোপাঠ যা খুসী কর গিয়ে তুমি, কিন্তু ডাক্তারও দেখাতে হবে।" বলিয়া পাঁচটি টাকা আনিয়া ষষ্ঠীর হাতে দিয়া কহিল, "দরকার হলে আরও দেব। কিন্তু ডাক্তারকে সেদিন আনতেই হবে, তা যেন মনে থাকে।"

মানুষ যে পাঁচ পাঁচটা টাকা উপযাচক হইয়া দান করিতে পারে, ষষ্ঠী মালো জীবনে কখনও দেখে নাই, শোনেও নাই। সে একবারে অভিভূত হইয়া এমন সব কাণ্ড আরম্ভ করিল যে, হেম শেষ পর্য্যন্ত তাড়া দিয়া কহিল, "ফের! ঐ সব বলে ?"

কাত্যায়নী প্রসঙ্গটা চাপা দিবার জন্য প্রশ্ন করিলেন, "ও ষষ্ঠী! মরির বিয়ের দিন কবে স্থির হ'ল।"

হেম নিজে তখনও অনূঢ়া। ঐ এক ফোঁটা মেয়ের বিবাহের

কথায় খিল্ খিল্ করিয়া সে হাসিয়া কহিল, "মামীমাও ওর সঙ্গে ক্ষেপে গিয়েছ না কি ?"

ষষ্ঠী তাহার ভাবী জামাতার নাম উল্লেখ করিয়া কহিল, "পের-বোল ত ঘুরে বেড়াচ্ছে, বড়মা! তা মনির মা খালাস হয়ে একটু সুস্থ সবল না হলে ত শুভকর্ম্মে হাত দিতে পারব না।"

হেমের হাস্যোজ্জ্বল মুখখানি এক নিমেষে বিবর্ণ হইয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত্ত মানুষটার মুখের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিয়া দ্রুতপদে সে পর্দ্দা ঠেলিয়া ঘরের ভিতরে চলিয়া গেল।

দিন তিনেক বাদে এক দিন সন্ধ্যাবেলা হেমের মাসতুতো ভাই মণি আসিয়া হাসিতে হাসিতে মামীমাদের শুনাইয়া শুনাইয়া কহিতে লাগিল, "আজ ষষ্ঠীর বাড়ী ভারী ধুম। ছেলে হয়েছে কি না! তাই ২ বোতল মদ এসেছে, আর পাঁচ সিকের গাঁজা। আজ সারা রাত্রিই চল্‌বে দেখছি! হরিনামের তাড়নায় আর ঘুমোন যাবে না।"

হেমের মুখখানা এ সংবাদে সহসা রক্তহীন হইয়া গেল। কহিল, "তা সারারাত্তির হরিনাম হবে কেন ?"

মণি হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া কহিল, "চিকিৎসে করাতে কে টাকা দিয়েছে, তাই এই সব ঘটা ক'রে ভূত তাড়াবে। অপদেবতার দৃষ্টিতে ওর ছেলে বাঁচে না কি না!"

হেম আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করিল না। নিঃশব্দে নিজের ঘরে গিয়া খিল বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িল। কোনমতেই সে রাত্রিতে তাহাকে আর খাওয়ান গেল না।

দিন পাঁচ ছয় বাদে এক দিন অতি প্রত্যূষে ষষ্ঠী প্রকাণ্ড একটা রোহিত মৎস্য ঘাড়ে করিয়া আসিয়া মনিব-বাড়ী হাজির হইল। মাঠাকুরাণীর পায়ের কাছে উহা রাখিয়া সে কহিল, "আজ আপনার পেরজার ষষ্ঠী-পূজো হবে কি না, বড়-মা!" বলিয়াই একটি পরিতৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিল। বড়-মা খুশী হইয়া কহিলেন, "তা ষষ্ঠী, তোমার ছেলে দেখতে কেমন হ'ল ?"

ষষ্ঠীর সমস্ত মুখখানা চাপা হাসিতে ভরিয়া গেল। গড় হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, "এজ্ঞে, ঠিক আপনাদের ভদ্রলোকের ঘরের মত শাদা! একেবারে ফুটফুট করছে!"

কাত্যায়নী হাসিয়া ফেলিয়া কহিলেন, "ছেলে ভাল আছে ত, ষষ্ঠী!"

ষষ্ঠী কহিল, "হয়েছিল একটুখানি গা গরম, তা বাবাঠাকুরের অষুধ এনে গলায় ধারণ করান হয়েছে। এখন বাবা মহাদেবেরও এগুবার আর একতার নেই।" বলিয়াই আড়চোখে একবার উপরের দিকে তাকাইয়া কহিল, "উনিরা ত দূরের কথা!"

রাত্রি তখন প্রায় ১০টা, বাড়ীর পুরুষদের আহারাদি শেষ হইয়া গিয়াছে। মেয়েরা কেবল গোছ-গাছ করিয়া আহারে বসিয়াছিল। অকস্মাৎ একটা করুণ আর্ত্তনাদ কাণে পৌঁছাইতেই সকলে চঞ্চল হইয়া পরস্পরের দিকে চাহিতে লাগিলেন। ঝি বাহিরে বসিয়াছিল। আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া সে কহিল, "আহাঃ হাঃ, ষষ্ঠীর ছেলেটা বুঝি এখন শেষ হয়ে গেল।"

মেয়েরা প্রায় সমস্বরে ব্যাকুল হইয়া প্রশ্ন করিলেন, "কখন্ ব্যামো হয়েছিল ?" ঝি কহিল—"সন্ধ্যা থেকেই ত যায় যায় হয়েছিল। গোঁসাইপুরের বাবাজী এসেছিলেন। কত ঝাড়-ফুক্ করলেন, তা কিছুতেই কিছু হ'ল না। ও কি আর বাঁচে!"

হেমের হাতের গ্রাস আর মুখে উঠিল না। ভাতের থালা ঠেলিয়া দিয়া ছুটিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

২

মাসখানেক বাদেই এক দিন ষষ্ঠী লাঠিতে ভর দিয়া কোনমতে কন্যাসহ জমীদারবাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। ইসারা করিয়া কন্যাকে কাছে ডাকিয়া কহিল, "বড়মার পায়ের ধূলো নে, মা!"

কাত্যায়নী ষষ্ঠীর রোগক্লিষ্ট মুখের পানে তাকাইয়া ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিলেন, "ও ষষ্ঠীচরণ! এই রোগা দেহ নিয়ে তুমি বাপু আবার এলে কেন ?"

ষষ্ঠীর আর দাঁড়াইবার ক্ষমতা ছিল না। ওখানেই অবসন্ন-ভাবে বসিয়া পড়িয়া ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া কহিল, "না এসে কি পারবার যো আছে! এই মেয়েটাই আমার সম্বল। সেই মেয়ের বিয়ের হুকুম কি যাকে তাকে দিয়ে নিতে পারি! মরুণীকে তুমি আশীর্ব্বাদ কর, মা!" বলিয়া একটুখানি দম লইয়া পুনশ্চ কহিল, "আশীর্ব্বাদ কর মা, যেন চার হাত এক হয়েছে, এই পোড়া চোখ দুটো দিয়ে আমি দেখে যেতে পারি। ভাগ্যি ত আমার ভাল না!" বলিয়াই কাঁধের গামছাখানা দিয়া চক্ষু মার্জ্জনা করিতে লাগিল।

একটা শুভকর্ম্মের সূচনাতেই চোখের জল ভাল নহে, তাই কাত্যায়নী প্রসঙ্গটা ঘুরাইয়া লইলেন। কহিলেন, "ও মরুণী, তোর বর দেখতে কেমন রে ? তোর পছন্দ হয়েছে ত ?"

মরুণী মুখখানা সাত রকমের ভঙ্গী করিয়া কহিল, "ভাল না!" বলিয়াই পলকের জন্য এধার ওধার দেখিয়া লইয়া নাক সিঁটকাইয়া কহিল, "বুড়ো—এই এত্ত বড় দাড়ি!" এমনই ভাব দিয়া কথাগুলি সে উচ্চারণ করিল যে, না হাসিয়া পারা যায় না। কাত্যায়নীও হাসিয়া ফেলিয়া কহিলেন, "দূর মুখপুড়ী, ও বলতে নাই। বল্‌বি, খুব ভাল। কাপড় দেবে, চুড়ী-সাবান, গন্ধ-তেল কত কি সব কিনে দেবে!"

মঙ্গলী আহ্লাদে আর বাঁচে না। কহিল, "দিয়াছে", বলিয়া নিজের পরিধেয় হরিদ্রারঞ্জিত নববস্ত্রের অঞ্চলপ্রান্ত উচ্চ করিয়া ধরিয়া কহিল, "এই দিয়েছে।" তার পর ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিয়া কহিল, "চুড়িও", বলিয়াই বাঁ হাতটা অগ্রসর করিয়া দেখাইয়া দিল।

কাত্যায়নী স্নিগ্ধহাস্যে কহিলেন, "কেমন, ভাল বর ত রে?" মঙ্গলী চুড়ি ও নববস্ত্রের আনন্দে মাতিয়াছিল, গদ্‌গদ হইয়া কহিল, "হিঃ, খুব ভাল" বলিয়াই পিতাকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার পিঠের উপর মুখ ঘষিতে লাগিল।

অকস্মাৎ হেম ঝড়ের মত আসিয়া এক মুঠা টাকা ষষ্ঠীর সম্মুখে ছড়াইয়া দিয়া কহিল, "যাও, এখন ঘটা ক'রে মেয়ের বিয়ে দাও গিয়ে।" বলিয়াই কাত্যায়নীকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, "তোমার তুটি পায়ে পড়ি মামীমা, ওদের একটু শীগ্‌গির ক'রে বিদেয় কর। তোমার ঐ ভক্ত তুটিকে দেখলেই আমার গায়ের রক্ত শুকিয়ে আসে।"

নিতান্তই কৃপার পাত্র সেই অক্ষমের উপর এই রূঢ় আচরণে কাত্যায়নী ব্যথিত হইলেন। তাকাইয়া দেখিলেন, এই অকাল-বৃদ্ধের কোটরগত চক্ষু হইতে অশ্রুর ধারা নামিয়া আসিতেছে। তাই ক্ষুব্ধ হইয়া কহিলেন, "ওদের জাতের এই নিয়ম। কচি বয়সেই বিয়ে-থাওয়া ওদের হয়। তুই কেন মিথ্যি মাথা গরম করছিস্, তাই বল্ ত!"

হেম কিছুমাত্র নরম হইল না। সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করিল, "দয়া ক'রে শুধু ব'লে দাও, এই নিয়মটা করেছেন কে?"

ষষ্ঠী চক্ষু মার্জ্জনা করিতে করিতে কহিল, "দিদি, কয়বার মালিক যিনি, তিনিই ক'রে রেখেছেন। মানুষের কি এতে হাত আছে নাকি আবার।"

হেম এ কথা কাণেও তুলিল না। কাত্যায়নীর দিকে তুই চোখ পাতিয়া কহিল, "তুমিই বল, মামীমা।" মামীমাও সহসা কোন উত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না। কহিলেন, "না, আমি জানিনে। তুই একটু এখান থেকে স'রে যা দেখি, হেম। আমি ওদের একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্ত ক'রে বাড়ী পাঠিয়ে দেই।"

হেম এক মুহূর্ত্ত ঐ বালিকার সরল শান্ত স্নিগ্ধ মুখের পানে তাকাইয়া থাকিয়া কহিল, "আচ্ছা মামীমা, ঐ এক বিন্দু মেয়েটার মুখখানার দিকে তাকালেও কি তোমাদের দয়া হয় না?" বলিয়াই দেখিল, কাত্যায়নীর গৌরবর্ণ মুখখানি বেদনায় নীলবর্ণ হইয়া গিয়াছে। হেম আর দাঁড়াইল না। ধীরে ধীরে মাথা নত করিয়া ঘরে ঢুকিয়া গেল।

ঘণ্টাখানেক বাদে হেম মামীমার তুই পায়ের উপর মাথা রাখিয়া কহিল, "আমায় মাপ কর মামীমা। আমার মায়ের ভালবাসা তোমার কাছে পাই বলেই আঘাত করতে পেরেছি।"

কাত্যায়নী হেমকে বক্ষে টানিয়া আকুল হইয়া কহিলেন, "ওরে পাগলী মেয়ে! তোর উপর কি কেউ রাগ করতে পারে না কি? আমি যে তোর বুকের ভিতরটা পর্য্যন্ত পড়তে পারি। কতখানি ব্যাকুল হয়ে ঐ কথা কয়টা যে তুই বের করতে পেরেছিস, সে আর কেউ না জানলেও আমি তা জানি।" বলিয়াই হেমের হাত ধরিয়া রান্নাঘরের দিকে টানিয়া লইয়া গেলেন।

ইহার পরদিন হইতে হেম তাহার এসরাজটা লইয়া গান-বাজনায় মন দিল। সে দিন সকালবেলা বাড়ীর ছোট ছোট মেয়েদের লইয়া সে গান শিখাইতেছিল। ম্যাসতুত ভাই মণি ছুটিয়া আসিয়াই প্রথমটা খুব খানিক হাসিয়া লইল। পরে দম লইয়া কহিল, "ও সেজদি, শীগ্‌গির আয়! একটা মজা দেখে যা!" বলিয়াই হেমের হাত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া তাহার পড়িবার ঘরের ওদিককার জানালার সম্মুখে দাঁড় করাইয়া কহিল, "ঐ দেখ্, জ্যামিতির সরল রেখা!" বলিয়াই অঙ্গুলীসঙ্কেতে এক জন প্রৌঢ়গোছের লোককে দেখাইয়া দিল। সরল রেখাই বটে! যেন সোজা উঠিয়া গিয়া উপরে একটি মাথা বসিয়া রহিয়াছে। হাঁপানির টানের জন্য "সরল রেখা" কখন আবার ঝড়ে দোলা বাঁশের মত তুলিতে লাগিল। তখন মণি আর সামলাইতে পারিল না; হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া কহিল, "এই রে, গেল বুঝি মাঝখান থেকে ভেঙ্গে।"

মণি এমন ভঙ্গী করিয়া "এই রে" বলিয়া উঠিল যে, হেমও সঙ্গে সঙ্গে হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, "তা ও লোকটাকে তোর এত মনে ধরল কেন?" বলিয়াই খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

মণি পরম গম্ভীর হইয়া কহিল, "বাঃ, উনি যে আমাদের ষষ্ঠী-চরণের ভাবী জামাতা। মঙ্গলীর বর হবেন।" বলিয়াই তাহার সেজদির মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিল, সে মুখে রক্তের চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই, কাগজের মত সাদা হইয়া গিয়াছে।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে সরল রেখার সম্মুখে একটু উচ্চ স্থানের উপর বসিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রবলকে প্রশ্ন করিলেন, "জমীদার ত না হয় হুকুম দিলেন, সে ত বুঝলাম। কিন্তু ঐ এক ফোঁটা মেয়ে বিয়ে ক'রে তুই হারামজাদা করবি কি? সেবাযত্ন দূরের কথা, তুমুঠো চাল যে তোকে ফুটিয়ে দেবে, সে প্রত্যাশাও ত নেই?"

প্রবল প্রবলবেগে কাসিতে কাসিতে কহিল, "এজ্ঞে ঠাকুর মশায়, সময়মত এক ছিলিম তামাক দিলিও যে সংসারের মস্ত

একটা কাষ। আর ধমক্-ধামক্ দিলে না ক'রে যাবে কোথায় ? আপনিই সোজা হয়ে আস্‌বে।"

উত্তর শুনিয়া সমবেত সকলেই হাসিয়া উঠিলেন। শুধু এ ঘর হইতে মণি সজোরে টেবলে একটা ঘুসি মারিয়া কহিল, "ব্রুট্", বলিয়াই তাকাইয়া দেখিল, হেম জানালার দুই গরাদে শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিয়া অস্থিভূতের মত দাঁড়াইয়া আছে। মণি আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়াও জবাব পাইল না। হেম এমনই ভাবে আরও মিনিটখানেক দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

পরদিন সকালবেলা হেমকে বাক্স, বিছানা গুছাইতে দেখিয়া সকলেই অবাক্ হইয়া গেল। কাত্যায়নী বার বার প্রশ্ন করিয়া কেবল এইটুকু বুঝিলেন যে, সে আজ কলিকাতা ফিরিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। সংবাদ শুনিয়া রাধামোহন বাবু নিজে আসিয়া অনেক প্রকারে বুঝাইয়া কহিলেন, "তুই একবার বল্ দেখি হেম, কি তোর অসুবিধা হচ্ছে ? তার প্রতীকার যদি না হয় ত তখন আমি নিষেধ করব না। তার পর প্রমথ এখনও সিমলা থেকে ফেরেন নি, এ অবস্থায় বাবা, খুড়ীমা এঁদেরই বা আমি কি বলব ? লক্ষ্মী মা আমার, বল্ দেখি কি হয়েছে ?"

হেম ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, "কহিল, এখানে আমি আর এক মুহূর্ত্ত তেষ্ঠাতে পারছি না। আমার প্রাণটা যেন হাঁপিয়ে উঠছে।"

রাধামোহন কহিলেন, "সেই কথাই ত আমি জানতে চাই, কেন এমন হচ্ছে ?"

হেম আকুল হইয়া কহিল, "ঐ বিয়ে তুমি বন্ধ ক'রে দাও। এত বড় অত্যাচার আমি এখানে ব'সে সইতে পারব না।"

অস্পৃশ্য মালোর মেয়ের বিবাহ-অনুষ্ঠান লইয়া তাঁহার ভাগিনেয়ী মাথা ঘামাইতে পারে, এ কথা রাধামোহন ভাবিতেই পারিলেন না; একবারে অবাক্ হইয়া গেলেন। মূঢ়ের মত হেমের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া কহিলেন, "কার বিয়ে বন্ধ করব রে ?"

হেম অধোমুখে অস্ফুট স্বরে কহিল, "ঐ ষষ্ঠীর মেয়ের।"

রাধামোহন হো হো করিয়া হাসিয়া কহিলেন, "এই ? এ ত তুইও ব'লে দিতে পারতিস্ রে।" বলিয়াই ভাগিনেয়ীকে সঙ্গে করিয়া নিজের বসিবার ঘরে নায়েবকে তলব করাইয়া যে কঠিন আদেশ প্রচার করিলেন, তাহাতে ষষ্ঠী সমস্ত দিন কান্নাকাটি করিয়াও কোন ফল পাইল না। প্রতিবাসীরা পরামর্শ দিল, "প্রবল কিছু নজর দিলেই জমীদার ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।" পরদিন ষষ্ঠীর ভাবী জামাতা প্রবল ১০টি টাকা গণিয়া গণিয়া জমীদারের পায়ের কাছে রাখিয়া কথাটা উত্থাপন করিতেই রাধামোহন পা দিয়া উহা সরাইয়া দিয়া দরোয়ান ডাকিয়া বাবাজীকে গলাধাক্কা দিয়া ফটকের বাহির করিয়া দিলেন।

দিন পাঁচেক বাদে বিন্দু ঝী আসিয়া সংবাদ দিল যে, ষষ্ঠী গত রাত্রিতে ও গ্রামে তাহার দূর-সম্পর্কে এক মাসীর বাড়ীতে পলাইয়া গিয়া কন্যার বিবাহ দিয়া আবার শেষ রাত্রিতে ফিরিয়া আসিয়াছে। এমন কি, ঘটনাটা ইতিমধ্যে বড় বাবুর কাণ পর্য্যন্ত পৌঁছিতেও বিলম্ব হয় নাই।

কাত্যায়নী অবাক্ হইয়া প্রশ্ন করিলেন, "তুই এত সব কথা শুনিস্ কার কাছে ?" ঝী গালে মুখে হাত দিয়া কহিল, "ও মা, এ কথা আবার না জানে কে, বড়মা ? চার পাঁচটা পাইক, বরকন্দাজ লাঠি নিয়ে ব'সে রয়েছে। এত লোকের ভিড়ে তার বাড়ীর উঠ'নে পা দেওয়াও ত যায় না।" বলিয়াই এত ভীড় ঠেলিয়া কেমন করিয়া সে এই তথ্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে, তাহাই সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া পুনশ্চ কহিল, "বড় বাবুর হুকুম, চাল কেটে গাঁয়ের বের ক'রে দিতে হবে। এখন মাগী মিনষে জামাই-মেয়ে নিয়ে ঘরের ভিতর খিল বন্ধ ক'রে মড়া কান্না কাঁদতে লেগেছে।" বলিয়াই আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া কহিল, "বড় বাবুকে ত চেন, বড়মা ! বেহ্মা বিষ্ণু এলেও ও-হুকুম রদ হবার যো নাই।"

কথাটা অতিশয় সত্য। কাত্যায়নী তাহা নিজেই তিন চারিবার দেখিয়াছেন। কোনও অনুরোধ-উপরোধেও যে ইহার ব্যতিক্রম হইবে না, এ কথা নিঃসংশয়ে বুঝিয়া কাত্যায়নী অবসন্নের মত বসিয়া পড়িলেন। হেম দাঁড়াইয়াছিল, ধীরে ধীরে সরিয়া গেল।

রাধামোহন অফিস-ঘরে বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে নায়েব মহাশয়ের সঙ্গে জমীদারী-সংক্রান্ত কাগজপত্র দেখিতেছিলেন। হেম ধীরে ধীরে আসিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। রাধামোহনের চোখ দুইটা ঠিক অগ্নিশিখার মত জ্বলিয়া উঠিল। কহিলেন, "তুই দুঃখু করিস্‌নে, হেমা, দেখ্ তোর এই মামা কি করে !" ইহার অধিক আর তাঁহার বলিবার প্রয়োজন ছিল না। হেম তাঁহার মাতুলের আরক্ত চোখ দুইটা দেখিয়াই ত্রাসে ও দুর্ভাবনায় শিহরিয়া উঠিল। কি রকম ব্যবস্থা হইয়াছে, নায়েব সবিস্তারে তাহার বর্ণনা করিতে যাইতেছিলেন। হেম মাতুলের বুকে মুখ লুকাইয়া অস্ফুট স্বরে কহিল, "ওকে এবার মাপ কর, বড় মামা" বলিয়াই ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। রাধামোহন ব্যতিব্যস্ত হইয়া কি যে করিবেন, ঠিক করিতে পারিলেন না। নিজের সহোদরার অকালমৃত্যুজনিত হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন সুগভীর-

ব্যথাটা আজ এই মুহূর্ত্তে তাঁহার বুকের ভিতর আলোড়িত হইয়া উঠিল। তিনি তাঁহার এই অত্যন্ত স্নেহের পাত্রীটিকে পাশে বসাইয়া পিঠে মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন, "বেশ ত, তাই হবে! তুই ত এতে খুসীই হবি, হেম ?"

হেম মামার বুকের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া মাথা নাড়িয়া কহিল, "হাঁ, বড্ড।" নায়েব শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, "আমার মায়ের আদেশ যখন, এক্ষুনি আমি সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি, না হয় আমি নিজেই," বলিতে বলিতে হুকুম পালন করিতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

৩

অসম্ভব বলিয়া এই হতভাগ্যদের ভাল করিবার আশা হেম ত্যাগ করিয়াছিল। এমন কি, মাসখানেকের ভিতর ইহাদের কথা সে এক রকম ভুলিয়াই গেল। কিন্তু সে ভুলিতে চাহিলে কি হয়, আর্ত্তের করুণ আর্ত্তনাদ যে বুকখানির ভিতর একবার দোলা দিতে পারিয়াছে, সাধ্য কি সে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিবে।

সে দিন হেম তাহার মামীমার কাছে নানারকম খাবার প্রস্তুত শিখিতেছিল, অকস্মাৎ প্রাঙ্গণের দিকে তাকাইয়াই হেম অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। কাত্যায়নী শব্দায়মান কড়াই হইতে মুখ ফিরাইয়াই কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিলেন, "ওরে, ও পোড়াকপালী, এ সর্ব্বনাশ তোর কবে হ'ল রে ?"

মরুণী ওখান হইতে কহিল, "তার আমি কি কোরব ? মা যে সিঁদুর মুছে দিল।" বলিয়া দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া কহিল, "এই দেখ না, মাঠান, ভাল ভাল চুড়িগুলো সকল খুলে খুলে নিয়ে টান মেরে উই—অত দূরে ফেলে দিয়েছে। সেই রাঙ্গা কেমন সুন্দর টুকটুকে শাঁখা দুটো তুমি দিয়েছিলে না। বল্লাম, ও দুটো থাক্। তা কিছুতেই শুনলে না। জোর ক'রে কেড়ে নিয়ে গেল। আর সকলে খালি আমায় এখন বকতে লেগেছে।"

কাত্যায়নী আর পারিলেন না; একবারে ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। হেমের বোধ করি কাঁদিবার শক্তিটুকু পর্য্যন্ত তখনকার মত অন্তর্হিত হইয়াছিল। সে একবারে নিশ্চল পাথরের প্রতিমার মত অপলক-নয়নে চাহিয়া রহিল। মরুণী দাঁড়াইয়াছিল, ওখানেই বসিয়া পড়িয়া কোমর হইতে কতকগুলি কড়ি বাহির করিয়া উঠানের উপরই খেলিতে বসিল। সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া এতক্ষণে হেমের চোখ ফাটিয়া জল গড়াইতে লাগিল। অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া কহিল, "ও মা গো! এ যে আর দেখতে পারি না।—"

মরুণী কড়ি চালিতে চালিতে কহিল, "চল না মাঠান একটিবার। বাবা যে দেখবার জন্তে হাঁ ক'রে ব'সে রয়েছে।" বলিয়াই একটা দান ফেলিয়া কহিল, "বল্লে যে, মরুণী, তোর দিদিঠান্ আর মাঠান্‌কে ডেকে নিয়ে আয়।"

কাত্যায়নী চোখ মুছিতে মুছিতে কহিলেন, "তোর বাবা আছে কেমন রে ?"

মেয়েটি মুহূর্ত্তমাত্র কাত্যায়নীর মুখের দিকে ছল্ ছল্ দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিয়া কহিল, "বাবা বলে কি জান, মাঠান্। বলে বাঁচবে না।" বলিয়াই হাউ হাউ করিয়া সে কাঁদিয়া কহিল, "ও দিদিঠান্, আমার বাবা যদি সত্যিই ম'রে যায় ?"

হেমের বুকের ভিতর ধড়াস করিয়া উঠিল। শ্রান্তকণ্ঠে সে কহিল, "ওখানে যাবার সময় আমাকে ডেকে নিয়ে যেও, মামীমা।" বলিয়াই আর দ্বিতীয় কথা না বলিয়া চলিয়া গেল। রাধামোহন বাড়ীতে ছিলেন না; জমীদারী পরিদর্শনে দিন পনরর জন্ত মফঃস্বলে গিয়াছিলেন। কাত্যায়নীও মেয়েটিকে বিদায় করিয়া শ্বশুরের অনুমতি লইতে চলিয়া গেলেন।

ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করিয়া হেম তাহার মামীমার উপরের ঘরে উপস্থিত হইয়া দেখিল, তিনি বালিসে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া আছেন, আর ঝুল-বারান্দার ও কোণে বসিয়া তাহার বৃদ্ধ মাতামহ সংসারবিরাগী পরমবৈষ্ণব কালীমোহন বাবু ভাগবত সম্মুখে খুলিয়া যে সব বাছা বাছা বুলি পুত্রবধূকে উদ্দেশ করিয়া ঝাড়িতে সুরু করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ না করাই ভাল। বৃদ্ধ ভক্ত মধু ঘোষাল পাশে বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে বোধ করি ভাগবত শুনিতেছিলেন। তিনিই কহিলেন, "বউমার এ কথা উত্থাপন করাই যে অন্যায়", বলিয়াই মৃদু হাস্তে কহিলেন,"বলি বংশটা কত বড়। ছিদাম পালের পৌত্তুর উনি, দুর্গামোহনের পুত্তুর, এঁরা কি একটা যে সে বংশ নাকি! সেই বংশের কুলবধূ হয়ে কোথায় কোন্ এক বেটা জেলের হয়েছে ব্যামো, তাই কি না উনি দেখ্‌তে যাবেন।" বলিয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে কহিলেন, "না! না! এ সব ত ভাল কথা নয়! এতে যে বংশগৌরবের হানি হয়।"

হেম আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিল না। অন্য দিন হইলে হেম অতখানি অবিচার বরদাস্ত করিতে পারিত না। কিন্তু আজ সে নিজেরই ভারে নিজেই ক্লান্ত। তাই এই দুইটি বৈষ্ণব-চূড়ামণিকে বংশগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রচুর সময় ও অবসর দিয়া বিছানায় আসিয়া পড়িয়া রহিল।

পরদিন হেম প্রস্তুত হইয়া আসিয়া কহিল, "মামীমা, আমি চল্লুম ঐ বক্রীর বাড়ী। ছিদাম-পৌত্র যদি আমায় তাড়িয়ে দিতেই চান ত ব'লে দিও, আশ্রয় পাবার মত যায়গা আমার আছে।" বলিয়াই প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা মাত্র না করিয়া মামাত ভাই কানুর হাত ধরিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

বৃদ্ধ উপর হইতেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন। গম্ভীরকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, "ও যায় কে হ্যাঁ?"

হেম বিদ্যুদ্‌বেগে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "আমি হেম, মালো-বাড়ী বেড়াতে চল্লুম।" বলিয়াই দৃক্‌পাত মাত্র না করিয়া বাহির হইয়া গেল।

ঘণ্টাখানেক বাদে হেম যখন ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার হাস্য-প্রফুল্ল মুখখানির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কাত্যায়নী দেখিলেন, পরম পরিতৃপ্তির একটা প্রগাঢ় ছাপ সে মুখে সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি কহিলেন, "একটু ভালই ত দেখে এলি, হেম?"

হেম সে প্রশ্নের জবাবই করিল না। সে নিজেরই আনন্দে মগ্ন হইয়াছিল। কহিল, "আজ যদি ও ডাক্তার দেখান স্বীকার না করত ত ভারী রাগ হত কিন্তু আমার।"

কাত্যায়নী হাসিয়া কহিলেন, "তা কোন্ ডাক্তারকে ডাক্‌বি, হেম? এখানকার ডাক্তারেই হবে, না কলকেতা থেকেই আনাবি?" বলিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিলেন।

হেম গম্ভীর হইয়া কহিল, "তুমি হাসছ, মামীমা; কিন্তু আমার যা ইচ্ছা হচ্ছে, তা আমিই জানি। সত্যি বলছি, ডাক্তার রায়কে যদি দরকার হয় ত তাঁকেও কলকেতা থেকে আনাব।" বলিয়াই মণিকে দিয়া ডাক্তার এবং পথ্যাদি আনাইবার ব্যবস্থা করিতে বাহির হইয়া গেল।

অপরাহ্ণে মণি নানা রকমের কৌটাভরা পথ্য এবং বেদানা, আঙুর ইত্যাদি কত কি ফল হেমের সম্মুখে স্তূপাকার করিয়া রাখিয়া কহিল, "এই নাও মেজদি, তোমার জিনিষপত্তর। ষষ্ঠে এ সব খাবে টাবে না। বলে, ও সব বাবুরা খায়। তার পেটে নাকি বরদাস্ত হবে না। মিথ্যে কতকগুলি পয়সা মাটী হ'ল।"

"কাত্যায়নী পাশেই দাঁড়াইয়াছিলেন। উৎসুক ব্যাকুলকণ্ঠে তিনি কহিলেন, "হ্যা রে, ডাক্তার কি বল্লেন? বাঁচবে ত?"

মণি বিরক্ত হইয়া কহিল, "ডাক্তারকে দেখতে দিলে ত সে বলবে। ঐ হারামজাদা পাজি নচ্ছারের জন্যে আবার কেউ কিছু করে! এমনি ক'রে চোখ উল্টে পড়ল যে, ওর বউ পায়ে ধ'রে কেঁদে ডাক্তারকে তাড়াল, তবে চুপ করল। বেশ হয়েছে! মেজদির যেমন খেয়ে দেয়ে আর কায নেই। পয়সা নষ্ট করবার যায়গা মেলে না। বল্লাম, আমাদের লাইব্রেরীতে কিছু চাঁদা দাও। তা বেশ হয়েছে!"

বলিতে বলিতে সে বাহির হইয়া গেল। কাত্যায়নী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কাযে চলিয়া গেলেন। আর এখানে হেম ঐ স্তূপাকার ফলমূল সম্মুখে করিয়া নিশ্চল বাক্যহীন অচেতন মূর্ত্তির মত বসিয়া রহিল।

পরদিন সকালবেলা ষষ্ঠীর বাড়ীতে পা দিয়াই যে দৃশ্য হেমের চোখে পড়িল, তাহাতে তাহার গায়ের রক্ত একবারে হিম হইয়া গেল। গ্রামের সকলেই উপস্থিত হইয়াছে। কেহ আর বাদ যায় নাই। এমন কি, মেয়েরা পর্য্যন্ত তামাসা দেখিতে এক পাশে দাঁড়াইয়া গিয়াছেন। ষষ্ঠীকে একটা জলচৌকীর উপর বসাইয়া জন দুই লোক ধরিয়া বসিয়া আছে। আর তাহার স্ত্রী কোমর বাঁধিয়া কলসী কলসী জল অদূরবর্ত্তী একটা ডোবা হইতে আনিয়া স্বামীকে স্নান করাইতেছে। শুনা গেল, বেলা আড়াই প্রহর পর্য্যন্ত স্নানের পর তবে অন্যান্য প্রক্রিয়া আরম্ভ হইবে। সাধুজী একটা বেল-গাছের অভাবে ডাল পুতিয়া তাহারই তলায় আসন করিয়াছেন, এবং মাঝে মাঝে কি একটা দুর্ব্বোধ ভাষায় এমন একটা বিকট চীৎকার করিয়া উঠিতেছেন যে, শুনিলে গায়ের লোম পর্য্যন্ত কাঁটা দিয়া উঠে। ষষ্ঠীর স্ত্রী দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া আসিয়া কহিল, "দিদিঠান্, সকলে বলছে, একটু ভালই দেখা যাচ্ছে।" বলিয়াই সে তাহার কাযে চলিয়া গেল।

শশী পাঠক চাঁদা করিয়া এই চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, অগ্রসর হইয়া আসিয়া কহিলেন, "কি রে দিদি! বলি তুই ত তামাসা দেখতে এসেছিস্? বেশ, বেশ, তা কেমন লাগছে বল দেখি!" বলিয়াই হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "করা গেল একটা ব্যবস্থা।" বলিয়াই দর্শকবৃন্দের কোথাও কোন অসুবিধা হইতেছে কি না, তাহাই তদারক করিয়া ঘুরিতে লাগিলেন। জমীদারবাড়ীর বৃদ্ধ কবিরাজ ও-পাড়ায় রোগী দেখিতে যাইতেছিলেন। হেম ডাকাইয়া কহিল, "একবার নাড়ীটা দেখুন ত, জ্যাঠাবাবু।" কবিরাজ ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন, "অবস্থা খুবই খারাপ দেখলাম, মা! তার পর যা চলছে, রাত ১২টার বেশীও আর টিঁক্‌বে না।" হেম আর দাঁড়াইতে পারিল না। মণির হাত ধরিয়া উর্দ্ধশ্বাসে বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

হেমের পিতা মিঃ বসু, গতকল্য সিমলা হইতে কলিকাতায় ফিরিয়াছিলেন। আজ কন্যার নিকট হইতে জরুরী তার পাইয়া সন্ধ্যাবেলা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হেম সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া ভগ্নকণ্ঠে কহিল, "বাবা, আর একটা রাত্রিও আমি এ গ্রামে তেষ্ঠাতে পারব না। উঃ, কি যে—" বলিতে বলিতে উচ্ছ্বসিত আবেগে তাহার বুকখানা ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল।

পিতা কন্যার মস্তকে সস্নেহে হাত রাখিয়া কহিলেন, "বেশ ত মা, তাই হবে।"

হেম কহিল, "কিন্তু বাবা, ফিরে যাবার পূর্ব্বে তোমাকেও যে একটিবার ওদের দেখে যেতে হবে।"

পিতা কহিলেন, "তুই না বল্লেও আমাকে যেতে হ'ত, হেম। যাদের দুঃখ্-কষ্টের সঙ্গে তুই এমন ক'রে নিজেকে জড়াতে পেরেছিস্, তাদের না দেখে কি তোর বাবা পারে ?"

হেম আর কথা কহিল না, নীরবে পিতার হাত ধরিয়া অগ্রসর হইয়া চলিল।

সন্ধ্যার অন্ধকার তখন গাঢ় হইয়াছিল। সঙ্গে কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীর অন্ধকার আকাশভরা মেঘের সঙ্গে মিশিয়া যেন জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। সকালের সে কোলাহল, সে লোকসমাগম, মানুষের জীবন-মরণ লইয়া সে উদ্দাম নৃত্য, সে কিছুই নাই। এখন সমস্ত বাড়ীটা যেন নীরব চাপা কান্নায় থম্ থম্ করিতেছে। ষষ্ঠীর মৃতকল্প দেহটাকে আর সরান হয় নাই। উঠানের মাঝখানে রাখিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করা হইতেছে। ও পাশে একটা চৌকা লণ্ঠন ভিতরের ঢিবিরার অপর্য্যাপ্ত ধূম উদ্গিরণের ফলে কাল হইয়া অন্ধকারকে যেন আরও গাঢ় করিয়া তুলিয়াছে। আর সেই অন্ধকারে দাঁড়াইয়া দুইটা লোক নীরবে কুড়ুল দিয়া কাঠ চিরিয়া গাদা করিতেছে। হেম ধীরে ধীরে তাহার পিতাকে সঙ্গে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। দরোয়ান মনিবের আদেশে একটা আলো লইয়া পিছনে পিছনে আসিতেছিল। তাহারই আলোকসম্পাতে দেখিতে পাইয়াই হেম পিতাকে টানিয়া আনিয়া ষষ্ঠীর মরণোন্মুখ দেহটার সম্মুখে দাঁড় করাইয়া কহিল, "ঐ দেখ বাবা, আমার সমস্ত চেষ্টা ঠেলে ফেলে দিয়ে কেমন ক'রে অন্ধকারের ভিতর আর এক অজানা দেশেই চলেছে।" বলিয়াই সে কাঁদিয়া ফেলিল। ষষ্ঠীর স্ত্রী স্বামীর পা দুইখানি কোলে করিয়া স্তব্ধের মত বসিয়াছিল। সে তাকাইয়াই একবারে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। মরুণী কাঁদিয়া কাঁদিয়া বাপের পাশেই পড়িয়াছিল, চোখ মেলিয়া চাহিয়াই বিদ্যুদ্বেগে ছুটিয়া আসিয়া হেমের পায়ের উপর আছড়াইয়া পড়িল, "ও দিদি! বাবা যে চ'লে যাচ্ছে।"

হেম প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে বুকে টানিয়া, অবরুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "ভয় কি, এই যে আমাদের বাবা।" মিঃ বসু ধীরে ধীরে উভয়ের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া আর্দ্র কম্পিত-কণ্ঠে কহিলেন, "মা, তোরই মত এমনি ক'রে যদি সবাই—ভাই ভাইকে, বোন্ বোন্কে দ্বিধা না ক'রে, বিতর্ক না ক'রে বুকের ভেতর সত্যি ক'রে টেনে নিতে পারত ত আজ শত শত অপরাধের বোঝা এই আমাদের মাথায় চাপিয়ে আমাদেরই এক অভাগা ভাইকে এমন ক'রে পরলোকযাত্রা করতে হ'ত না।" বলিয়াই উচ্ছ্বসিত আবেগে কন্যা দুইটিকে বুকের ভিতর টানিয়া আনিলেন। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে মুমূর্ষুর ক্ষীণ শেষ দৃষ্টি পলকের জন্য ইহাদের মুখের উপর স্থাপিত হইয়াই সঙ্গে সঙ্গে সব স্থির হইয়া গেল।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায়।

নির্ঝর-বিলাপ

পাষাণ—পাষাণ,
ও শিলা-পঞ্জর-মাঝে নাহি কি গো প্রাণ ?
কাঁদিলাম কত আমি গাহিলাম গান
আজীবন লুণ্ঠি বক্ষে রাত্রি-দিনমান
পাগলের পারা
তবু তুমি দিলে না ত সাড়া।
সত্য বটে আছি বুকে, এ কি বুকে থাকা ?
মনে হয় সবি যেন ফাঁকা।
কোথা হেথা সুনিবিড় বাহুর বন্ধন,
মরমের দুরু-দুরু পুলক-কম্পন।
কোথা সে চুম্বন সুধা-মধুর মদির,
মিলন-গুঞ্জনটুকু যুগল হৃদির।

আমি আছি অনাদৃত লাজে ভয়ে নত
ধনিগৃহে অযাচিত আত্মীয়ের মত।
তুমি আছ মহা মৌন চির-উদাসীন
বিস্তারি বিরাট বক্ষ স্পন্দন-বিহীন।
সুধালে না এক দিন মোর পানে চাহি,
কেন আমি কাঁদি হাসি কেন গান গাহি।
নিরাশার নিষ্পেষণ সহি আজীবন
লুপ্ত মোর সুখস্বপ্ন, শীর্ণ তনু মন,
দিগন্তে পড়িছে ঢলি জীবনের বেলা
চতুর্দ্দিকে হেরি আজি আঁধারের খেলা।
সহসা মিশায়ে যাবে এই ক্ষীণ ধারা
কালের সাগর-মাঝে হয়ে আত্মহারা।

তখনও কি রবে তুমি অমনি নিশ্চল—
হবে না কি হৃদিপিণ্ড রুধিরে চঞ্চল ?

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

"প্রলয়-নাচন নাচলে যখন আপন ভুলে, হে নটরাজ !
নটরাজ, জটার বাঁধন প'ড়লো খুলে।............" —রবীন্দ্রনাথ।

মাটীর স্বর্গ

৯

নাপিত-বৌয়ের জ্বর আরোগ্যের দিকে না গিয়া ক্রমেই বৃদ্ধির পথেই চলিল। জ্বর কোন সময়ের জন্যই মগ্ন হয় না। সকালের দিকে নামে মাত্র একটু কমিয়াই, যত বেলা বাড়িতে থাকে, জ্বরও ততই বাড়িতে থাকে, তাহার পর সন্ধ্যা হইতে সারা রাত্রি ভোগের আর অবধি থাকে না। তাহার শীর্ণ দেহে যে হাড় ক'খানি অবশিষ্ট ছিল, এবারকার এই কয়দিনের প্রবল জ্বরেই তাহা শয্যার সহিত একবারে মিশিয়া গেল।

সুবিধার মধ্যে, এই দুঃসময়ে নেপালের হাতে অর্থের অনটন ছিল না। অর্চ্চনার দেওয়া সেই এক শত টাকা প্রায় সবই তাহার কাছে ছিল। সুতরাং মাতার অসুখে নেপাল চিকিৎসার কোনই ক্রটি হইতে দিল না। হীরু ঠাকুরের বাড়ী হইতে দু'বেলা দুটি খাইয়া আসিয়া সে দিবা-রাত্রি মাতার শয্যাপার্শ্বে থাকিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

এক দিন নাপিতবৌ নেপালকে কহিল—"বড্ড অ-বিলির ভেতরই তোকে রেখে গেলুম, বাবা।"

তাহার কাতর মুখের দিকে চাহিয়া নেপাল বলিল,—"ও সব কথা তুমি কেন বলছ, মা! তোমায় আমি সারিয়ে তুলবোই। ডাক্তার আজ বলেছে, নাড়ীর অবস্থা কাল থেকে খুব ভাল হয়েছে!"

একটুখানি ম্লান হাসি নাপিত-বৌয়ের শুষ্ক মুখে দেখা দিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই বেদনার অতি ক্ষীণ একটি দীর্ঘশ্বাস তাহার বক্ষের পঞ্জর ভেদ করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইল।

নেপাল ডাকিল,—"মা!"

চক্ষু বুজিয়াই নাপিতবৌ সাড়া দিল—"কেন বাবা?"

"শরীরটা কি অন্য দিনের চেয়ে একটু ভাল বুঝছ না?"

"বুঝছি। কিন্তু বুঝেও যে কোন বিলি ক'রে যেতে পাল্লুম না, তাই বুকের ভেতরটা যে আমার ফেটে যাচ্ছে, নেপু! সংসারের কিছুই জানলি না, কিছুই বুঝলি না, বাবা রে আমার! আজ যদি সে——"

চোয়ালের হাড় বাহিয়া কোঁটা দুই চারি জল চক্ষু হইতে তাহার গড়াইয়া পড়িল। উত্তপ্ত গণ্ডদ্বয়ে অশ্রুর সেই ধারা দুইটি শুকাইয়া যাইতেও বেশী দেরী হইল না। কারণ, প্রবল জ্বরের তাপে তখন তাহার সর্ব্বাঙ্গ পুড়িয়া যাইতেছিল। তেমনই চক্ষু বুজিয়াই নাপিতবৌ আবার কহিল,—"আর কিছু না হোক, বৌটাও যদি বেঁচে থাকতো! তবু দু'বেলা দু'টি ভাত সেদ্ধ ক'রেও সে দিতে পারতো। ঠাকুর এমনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন যে, সব দিকেই ওলট-পালট হয়ে গেল। এত দিনে সে সোমত্ত হয়ে উঠত, তার হাতে সব ফেলে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে চ'লে যেতে পারতুম!"

নেপাল মাতার হস্তখানি তুলিয়া লইয়া, মণিবন্ধ ধরিয়া একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিল। সে কেমন করিয়া নাড়ী দেখিতে হয়, কিছুই জানিত না, শুধু দেখিল যে, হাতখানি বড়ই গরম। কপালেও একবার হাত রাখিয়া দেখিল, ভিতর হইতে যেন আগুন ফুটিয়া বাহির হইতেছে। একটা নিঃশ্বাস তাহার হাতে আসিয়া পড়িল, নেপালের মনে হইল, যেন তাহার হাতের সেই স্থানটা ঝলসাইয়া গেল। মাতার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, নিমীলিত নেত্র-কোণে দুই ফোঁটা জল দুইটি মুক্তার ন্যায় জমিয়া রহিয়াছে। প্রবল জ্বরের উত্তাপে চোখের ভিতর হইতে উহা গলিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে। নেপাল মাতার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া ডাকিল—"মা!" নাপিতবৌ কোন সাড়া দিল না, শুধু একবার চক্ষু মেলিয়া চাহিল মাত্র। সে চক্ষু জবাফুলের মত রক্তবর্ণ; মনে হয়, সেই রক্তিমাভা ভেদ করিয়া নিঃশ্বাসের তপ্ত ঝাঁজের মত একটা ঝাঁজ সেখান হইতেও বাহির হইতেছে। চক্ষু চাহিয়া নাপিতবৌ বেশীক্ষণ থাকিতেও পারিল না, সঙ্গে সঙ্গেই উন্মীলিত চক্ষুর্দ্বয় ধীরে ধীরে বুজাইয়া অচৈতন্যের মত পড়িয়া রহিল।

তখন অপরাহ্ণকাল। বৈশাখের রৌদ্র-দগ্ধ দ্বিপ্রহরের তপ্তশ্বাস তখনও পর্য্যন্ত ধরণীময় ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। কয় দিন হইতে এই সময়টায় কাল-বৈশাখীর একটুখানি ঝড়-জল অনেকখানি ঘটা-আড়ম্বর করিয়া আসিতে আরম্ভ করিয়াছিল। নেপাল তাহারই আশঙ্কা করিয়া ঘরের জানালা দুইটি সময় থাকিতে বন্ধ করিয়া দিল এবং পুনরায় মাতার শিয়রের ধারে আসিয়া বসিল।

কুমোরদের ঝড়ুর পিসী রোজ সন্ধ্যার সময় আসিয়া সমস্ত রাত নাপিতবৌয়ের কাছে থাকে, নেপাল

ঝড়-জল আসিবার পূর্ব্বে তাহার আসিবার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। সে আসিলে, তাহাকে রাখিয়া একবার সে ডাক্তারের কাছে যাইবে এবং ফিরিবার সময় অমনই হীরু ঠাকুরদার বাড়ী গিয়া সকাল সকাল আজ যাহা হয় দুটি খাইয়া একেবারে কায চুকাইয়া আসিবে। কিন্তু সে দিন সন্ধ্যায় ঝড়ও আসিল না, ঝন্তুর পিসীও আসিল না। সন্ধ্যার অনেক পরে ঝন্তু একবার জানাইতে আসিল যে, তাহার পিসী আজ আসিতে পারিবে না, ওপাড়ায় তেলীদের ছেলের ভাতে নাড়ু পাকাইতে যাইবে। নেপাল তাহাকে কহিল—"আজই আসতে পারবে না? মার জ্বর আজ যে বড্ড বেশী রে, ঝন্তু।" ঝন্তু আশ্বাস দিল— "আজ যে আমাবস্যে দাদামশাই, আজ একটুখানি বেশী হবেই। কিছু ভেব নাকো তুমি, কাল সকালেই জ্বর ইমিসন হোয়ে যাবে।"

রাত প্রায় এক প্রহরের পর হঠাৎ আকাশে ঘনঘটা করিয়া আসিল। অমাবস্যার ঘোরান্ধকার চিরিয়া ঘন ঘন বিদ্যুৎ-দীপ্তি প্রকাশ পাইতে লাগিল। একটা দমকা হাওয়ার ঝাপ্টা আসিয়া ঘরের প্রদীপ নিভাইয়া দিয়া গেল। নেপাল তাড়াতাড়ি দরজায় খিল লাগাইয়া পুনরায় প্রদীপ জ্বালিতেই নাপিতবৌ একটু যেন বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—"কি সব করিস তোরা?" ব্যস্ত হইয়া মায়ের কাছে আসিয়া নেপাল জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন মা?"

নাপিতবৌয়ের আর কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না, শুধু একবার পাশ ফিরিয়া শুইল। নেপাল মাতাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পাইল না, কিন্তু নাপিতবৌ তাহার সাহসের অপেক্ষা রাখিল না, মুহূর্ত্তখানেক পরেই আবার এ-পাশ ফিরিয়া শুইতে শুইতে সে কহিল,—"তোরা সব কি বাপু, আমি তোদের নিয়ে কি করি বল্ ত গা সব!" তাহার মাথার উপর হাত রাখিয়া নেপাল কহিল—"কি বলছ এ সব, মা?"

"জ্বালাতন আর করিস নি তোরা। এমন ব্যাটাও গভ্যে ধরেছিলুম যে, হাড় খেলে, মাস খেলে, চামড়া নিয়ে ডুগ্‌ডুগি বাজালে! ওরে, তুই দূর হয়ে যা, তুই বেরো, তুই যমের বাড়ী যা। সে নেই ব'লে এত বাড় তুই বেড়েছিস—না?" বলিতে বলিতে ধড়মড় করিয়া নাপিতবৌ একেবারে সোজা হইয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। জোর করিয়া তাহাকে শোয়াইয়া দিয়া নেপাল ভাবিল—এ কি!—বিকার!—প্রকাশ্যে কহিল—"মা, এ সব কি বকছ তুমি? চুপ ক'রে শুয়ে থাক, বেশী কথা বোলো না।"

নাপিতবৌ গর্জ্জাইয়া উঠিল—"কিসের ভয় দেখাস তোরা! আমি এক বেলার তরে কোথাও যাব না। সোয়ামী-শ্বশুরের ভিটে ছেড়ে আমি যাব গিয়ে—কেন বল্ ত? ওগো মেজ বৌমা, এস বাছা, আলতা পরিয়ে দি। ও নেপু, কুলুঙ্গী থেকে আমার আলতার পেতেটা দে ত, বাবা! আর একটি কায করতে পারিস? আমার বর্দ্ধমানের বৌমাকে একবার আনতে পারিস, আমার সেই লক্ষ্মী পিরতিমেকে,—আমার বেজরাণীকে? সে আমার সাতটি দিনের মা-জননী হয়েছিল! সাতটি দিন এসে সে আমার ঘর আলো করে'ছিল। ওগো, আমার সোণার সংসার!—আমার সোণার সোয়ামী, সোণার পুত্তুর, সোণার বৌ। আমার পাশ-করা ছেলে, ইংরিজি পাশ! হেট্—ম্যাড্—গুড্ মণি! হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ!"

"মা—মা!"

নেপাল যত তাহাকে ডাকিতে লাগিল, নাপিতবৌ ততই বকিয়া যাইতে লাগিল—"ঐ ভেড়ের ভেড়ে আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে! দূর হ—দূর হ—মুখপোড়া, তোর মুখে নুড়ো জ্বেলে দি। স'রে যা না—দূর হ না! হারামজাদা, পাজি, ছুঁচো কোথাকার!" তার পর গান ধরিল—"কানাই বলাই, ঐ দুটি ভাই, এসেছে রে!"

নেপাল মনে মনে প্রমাদ গণিল। এই রাত্রিতে, এই অবস্থায় সে কি করে। রুগীকে একলা ফেলিয়া সে ডাক্তারের কাছে যায়ই বা কি করিয়া, পাড়ার কাহাকেও বা খবর দেয় কি করিয়া! বাহিরে তখন কাল-বৈশাখীর ক্ষণিকের ঝড় ও জল চিরকালের প্রথা ভুলিয়া স্থায়িভাবেই যেন প্রলয়-যুদ্ধে মাতামাতি করিতেছিল। আজিকার এ দুর্য্যোগের প্রকৃতি যেন অন্য রকম। এ যেন তাহার আজিকার এই দুর্দ্দিনের বিপদ বাড়াইবার জন্যই পরামর্শ করিয়া আসিয়াছিল, কেন না, রাত্রি যত গভীর হইতে লাগিল, দুর্য্যোগও ততই বাড়িতে লাগিল। নেপাল মাতার দেহের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া ডাকিল—"মা!"

প্রবল একটা বাতাসের গর্জ্জনে নেপালের ডাক চাপা পড়িয়া গেল। নাপিতবৌ তাহার প্রসারিত

আরক্ত চক্ষুতে কট্‌মট্ করিয়া দরজার দিকে চাহিয়া কহিল—"খবরদার! ঐখেনে দাঁড়িয়ে থাক হারামজাদা, ঘরের ভেতর এসেছিস কি মরেছিস! মা লক্ষ্মী এখানে ছিল জানিস নি? মেজের ওপর তাঁর পায়ের দাগ দেখতে পাচ্ছিস নি?—আলতা? হ্যাঁ, আলতা আবার পরব না? না—না—ভুলে গেছি, পরব না—পরব না, রাঁড় হয়েছি যে!—অ নেপু, ওঁকে একবার ডাক ত।" সঙ্গে সঙ্গেই বিষম চীৎকার করিয়া উঠিল—"ওরে, ধর্ ধর্—ঝাপটে ধর্—ঐ এলো—ঐ এলো," বলিতে বলিতে আবার নাপিতবৌ চকিতে শয্যার উপর খাড়া হইয়া বসিল। নেপাল তাড়াতাড়ি তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া আবার শয্যায় শোয়াইয়া দিল। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই সে ভীষণ শক্তিতে আবার উঠিয়া বসিল। তখন নেপাল যতবারই তাহাকে বিছানায় শোয়াইয়া দেয়, ততবারই নাপিতবৌ ঝাঁকিয়া ঝাঁকিয়া উঠিয়া পড়ে। এই ভাবে প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরিয়া মাতা-পুত্রে শয়ান ও উত্থানের পালা চলিবার পর নেপাল ক্লান্ত হইয়া পড়িল, তাহার বলিষ্ঠ দেহে ঘর্ম্মের সঞ্চার হইল। অনাহার, অনিদ্রা, উৎকণ্ঠা, পরিশ্রম প্রভৃতিতে তাহার সবল দেহ দুর্ব্বল হইয়াই ছিল, এক্ষণে তাহা অবসন্ন হইয়া পড়িল। রাত্রি কত, আন্দাজ করিবার জন্য একটিবার জানালা খুলিয়া দেখিতে গিয়া, তাড়াতাড়ি তখনই বন্ধ করিয়া দিল। নৈশ প্রকৃতিতেও তখন যেন ঘোর বিকার চলিতেছিল। অমাবস্যার নিশা যেন সে দিন ক্ষেপিয়া গিয়া পৃথিবীকে রসাতলে দিবার প্রাণপণ আয়োজন করিতেছিল। নেপাল মনে ভাবিল, আজিকার এই দুর্য্যোগের পৃথিবীতে সে আর তাহার জননী ভিন্ন তৃতীয় আর কোন জীবের যেন অস্তিত্ব নাই। বাহিরের এই অবিশ্রান্ত বারিধারা আর বাতাসের হুঙ্কারের ভিতর সমস্ত জীবজগৎ যেন নিঃসাড় হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে। মাতার দিকে একবার চাহিয়া দেখিল, তেমনি ভাবেই সে কট্‌মট্ করিয়া ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে আড়ার দিকে চাহিয়া ঠায় বসিয়া রহিয়াছে। আর তাহাকে শোয়াইবার জন্য নেপাল চেষ্টা করিল না। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত শয্যার দুই দিকে দুই জন একভাবেই বসিয়া রহিল।

রাত্রি আটটা সাড়ে আটটার সময় একবার ঔষধ খাওয়াইবার কথা ছিল, কিন্তু নেপালের সে কথা মনেই ছিল না। এক্ষণে হঠাৎ মনে পড়াতে, সে ভাবিল, ঔষধটা পেটে পড়িলে যদি এ ভাবটা কিছু কমিয়া আসে। সে উঠিয়া ঔষধের শিশি ও গেলাস লইয়া প্রদীপের সামনে গিয়া বসিল এবং গেলাসে ঔষধ ঢালিয়া মাতাকে খাওয়াইবার চেষ্টায় তাহার পার্শ্বে আসিয়া বসিতেই নাপিতবৌ তাহার হাত হইতে গেলাসটা লইয়া সমস্ত ঔষধ নেপালের মাথায় ঢালিয়া দিল এবং পরক্ষণেই ধপ্ করিয়া শয্যার উপর শুইয়া পড়িল। নেপাল আর কোন দিকে কোন চেষ্টা না করিয়া চুপ করিয়া শয্যার এক প্রান্তে বসিয়া রহিল।

এইরূপ নীরবতার মধ্য দিয়া বহুক্ষণ কাটিয়া গেলে নেপাল এক সময় মায়ের গায়ে হাত দিয়া দেখিল, গা যেন জুড়াইয়া আসিতেছে। মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া মা মা বলিয়া বার দুই ডাকিল, কিন্তু মায়ের কোন সাড়া পাইল না। রাত্রি বোধ হয় তখন দেড়টা কি দুইটা। জ্বর ক্রমেই যেন কমিয়া আসিতে লাগিল। নেপাল অনেকটা আশ্বস্ত হইল। একবার দরজা খুলিয়া বাহিরের দাওয়ায় আসিয়া দেখিল, ঝড়-বৃষ্টির বেগ খুবই কমিয়া আসিয়াছে। মহাযুদ্ধের পর এ যেন আহতদের ক্ষীণ আর্ত্তনাদ ও চোখের জল। সহসা তাহার বুকের ভিতর যেন কাঁপিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি ভিতরে আসিয়া নেপাল দরজা বন্ধ করিয়া দিল এবং মাতার শয্যার একধারে নিঃসাড়ে শুইয়া পড়িয়া একখানি হাত তাহার বুকের উপর রাখিয়া, রাত্রি প্রভাতের অপেক্ষা করিতে লাগিল।

কয় দিনের রাত্রি-জাগরণ ও উদ্বেগ অনিয়মে তাহার শরীরের এমন অবস্থা হইয়াছিল যে, জাগিয়া থাকিবার জন্য প্রবল চেষ্টা সত্ত্বেও নেপাল কিছুক্ষণের জন্য তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। ঘণ্টা দেড়েক পরে এক সময়ে তাহার তন্দ্রা কাটিয়া গেলে দেখিল, তাহার ডান হাতখানি যাহা সে মায়ের বুকের উপর রাখিয়া শুইয়াছিল, তাহার তলায় যেন এক খণ্ড কঠিন বরফ জমিয়া আছে। সে লাফাইয়া উঠিয়া মায়ের মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল, দেখিল—কঠিন শীতল, ছাইএর মত সাদা মুখখানি কোন্ ফাঁকে ইতিমধ্যে চিরতরে নীরব হইয়া গিয়াছে, আর সেই মুখের উপরকার বড় বড় মৃত্যু-নিথর চক্ষু দুইটি তাহারই মুখের দিকে যেন চাহিয়া রহিয়াছে।

বহু বৎসর আগে তাহারই সম্মুখে এক দিন এই রকম

তাহার পিতার মৃত্যু হইয়াছিল, কিন্তু সে দিন সে বিপদের সময় তাহার মা ছিল, পাড়া-প্রতিবাসীরা ছিল, দিনের আলো ছিল। আজ দুর্য্যোগের এই নিশীথে কোন দিকেই তাহার কেহ নাই। আজ মাতার মৃতদেহ সম্মুখে লইয়া গৃহমধ্যে সে একা এবং গৃহের বাহিরে বিকট অন্ধকারের মধ্যে মৃত্যু-দূতরা যেন লাফালাফি দাপা-দাপি করিয়া চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বাহিরের চারিদিক হইতেই যেন তাহাদের নিঃশ্বাস ক্রমাগত তাহার কাণে আসিয়া লাগিতে লাগিল। নেপাল একবার দরজা ও জানালাগুলির খিলের দিকে চাহিয়া দেখিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মনে পড়িল যে, সন্ধ্যার পর ঝন্তু চলিয়া যাইলে সদরের দরজা আর দেওয়া হয় নাই। তাহার খুবই ভয় ভয় করিতে লাগিল। সে কিছুতেই আর ঘরের বাহির হইতে পারিল না, তাহার মনে হইতে লাগিল, বাহিরে দরজা ও জানালার ধারে মুখ লইয়া কাহারা যেন দলে দলে ফাঁক দিয়া ঘরের মধ্যে কেবলই উঁকি দিয়া দেখিতেছে!

ব্রাহ্মণপাড়ার একধারে তাহাদের ঘর হইলেও, নিকটে এমন কাহারও বাড়ী ছিল না যে, বদ্ধ-দুয়ার গৃহমধ্য হইতে ডাকিলে কেহ শুনিতে পায়। হয় ত বাহিরে দাওয়ায় দাঁড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিলে হীরু ঠাকুর্দ্দা শুনিতে পাইতে পারে, কিন্তু বাহিরেও সে যাইতে পারিবে না বা উচ্চকণ্ঠেও ডাকিবার তাহার সাধ্য নাই। সুতরাং নেপাল প্রদীপে মোটা মোটা দুই চারিটা সলিতা দিয়া মাতার মৃতদেহ সম্মুখে লইয়া বাকী রাতটুকু ঘরের মধ্যেই বসিয়া কাটাইল।

যখন ঊষার আলো পূর্ব্বদিকের পরলের ফাঁক দিয়া অল্প অল্প ঘরের মধ্যে আসিয়া দেখা দিল, তখন সে উঠিয়া দরজার খিল খুলিয়া বাহিরের দাওয়ায় আসিয়া দাঁড়াইল এবং বাটীর সর্ব্বাংশে গত রাত্রির ঝড়-জলের অত্যাচার-চিহ্ন দেখিতে দেখিতে খোলা দরজায় পিঠ দিয়া চৌকাঠের ধারে বসিয়া পড়িল।

অতি প্রত্যূষে সর্ব্বপ্রথম যে তাহার সংবাদ লইতে আসিল—সে হীরু ঠাকুর। গত রাত্রিতে সে খাইতে না যাওয়াতে আজ প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই শয্যা ত্যাগ করিয়া হীরু ঠাকুর তাহার খবর লইবার জন্য আসিল এবং দাওয়ার উপর উঠিয়া মুক্ত দ্বারপথে গৃহাভ্যন্তরে দৃষ্টি পড়িতেই তাহার মুখের প্রশ্ন মুখে রহিয়া গেল। দেয়াল ধরিয়া কিছুক্ষণ নীরবে মৃতের দিকে চাহিয়া থাকিবার পর মৃদুকণ্ঠে শুধু জিজ্ঞাসা করিল, "বোধ হয়, এই ভোরবেলায়?"

নেপাল কহিল—"হু।"

১০

তাহার পর বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে এক এক জন করিয়া পাড়ার অনেকগুলি স্ত্রী-পুরুষ গোপাল নাপিতের বাড়ী আসিয়া জমিল এবং সকলেই হতভাগ্য নেপালকে তাহার বর্ত্তমান শোকে সান্ত্বনা দান করিল। স্ত্রীলোকদের মধ্যে কেহ বলিল, "আহা! পুণ্যবতী, স্বগ্‌গে গেল!" কেহ বলিল,—"রাঁড় হয়ে থাকার চেয়ে—বেশ গেছে, বেশ গেছে!" কেহ বা বলিল—"গেছলো সে অনেক দিনই, শুধু দেহটা নিয়ে কোন রকমে ছেলেটার মুখ চেয়ে এদ্দিন পড়েছিল!" পুরুষরা প্রায় সকলেই নেপালকে সাহস দিয়া কহিল—"তুই কিছু ভাবিস না, নেপু, আমরা তোর রইলুম।" ভবিষ্যতের জন্য হয় ত সকলেই রহিলেন, কিন্তু বর্ত্তমানে একে একে প্রায় সকলেই যে যাহার গৃহে চলিয়া গেলেন। যে দুই চারি জন শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাঁহারা নেপালের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"তা হ'লে কি রকম ব্যবস্থাটা করতে চাও, বাবা?" এই ব্যবস্থার অর্থ এই যে, গ্রামের শ্মশানেই মৃতদেহ দাহ করা হইবে, কিংবা তাহা ত্রিবেণী লইয়া যাওয়া হইবে? ত্রিবেণী গঙ্গাতীরে দাহ করিতে হইলে অনেক ব্যয়ের আবশ্যক হয়। শ্যামসুন্দরপুর হইতে ত্রিবেণী ছয় ক্রোশ পথ। এই ছয় ক্রোশ পথ স্কন্ধে করিয়া মৃতদেহ বহন করিয়া লইয়া যাইতে হইলে একটি ছোট-খাট সৈন্যবাহিনীর আবশ্যক, এবং এই বাহিনীর যাবতীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করা খুব যে সোজা কথা, তাহা নহে; যেহেতু, এই যাবতীয়র ভিতর সৎকারাদির ব্যয় ছাড়া আরও অনেক প্রকারেরই ব্যয় আছে। সুতরাং দরিদ্রের ঘরের মৃতদেহ ত্রিবেণীর পুণ্যশ্মশানে দাহ হইতে না পাইয়া মৃতের সদ্গতিলাভ হয় না, তাহা গাঁয়ের শ্মশানেই পুড়িয়া ছাই হয় এবং তথা হইতে মৃতের চুলীর নীল ধুঁয়াটুকুই শুধু ঊর্দ্ধে স্বর্গের পথে যাইতে পায় মাত্র, চুলীর অধিকারীর আর স্বর্গগমনে কোন অধিকারই থাকে না। তাই

নেপালকে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া, ইহাদের মধ্যে এক জন পুনরায় কহিলেন—"দেখ বাবা, বেশ ক'রে বুঝে দেখ, সাহস কর কি? খুব কম ক'রেও জন দশেকের দরকার হবেই, তা হলেই মোটা-মুটি ধ'রে রাখ— পাঁচ দশকে পঞ্চাশ, তার ওপর ঘাট-খরচ ইত্যাদি আছে। সুতরাং ধ'রে রাখ ষাট, বরঞ্চ দুচার টাকা বেশী ত কম নয়।"

কিন্তু যাহাকে এই একই প্রশ্ন দুই দুইবার জিজ্ঞাসা করা হইল, তাহার মন তখন এ সব হইতে অনেক দূরে ছিল, সুতরাং দুইবারের কোন বারেরই প্রশ্ন তাহার কাণে পৌঁছায় নাই। তাহা না পৌঁছাইলেও, মুহূর্ত্তখানেক পরে তাহার চমক ভাঙ্গিল এবং ইহাদেরই এক জনের দিকে চাহিয়া সে কহিল—"তা হলে, ব্যবস্থাটা আপনারা ক'রে দিন চক্কোত্তি জ্যেঠা, ছ' কোশ পথ, একটু সকাল সকাল না বেরোলে———"

"আমিও ত সেই কথাই বলছি, বাবা। তা হ'লে আর বেশী বেলা বাড়িয়ে ফল কি? আমি লোকের যোগাড় করি।"

হীরু ঠাকুর এতক্ষণ একটি ধারে নীরবেই বসিয়াছিল, কহিল—"কিন্তু শুধু শুধু এক কাঁড়ি টাকা খরচ ক'রে ত্রিবেণী নিয়ে যাবার কি-ই বা দরকার? গাঁয়ে যখন একটা শ্মশান রয়েছে———"

তাহার কথায় বাধা দিয়া চক্কোত্তি জ্যেঠা কহিল—"তুমি হীরু খুড়ো, যা বল, তার কোন মানে হয় না। শ্মশান ত গাঁয়ে রয়েছে। শ্মশান থাকা না থাকার ত এখানে কথা হচ্ছে না। কথা হচ্ছে এই যে, নেপু যদি পারে ত ওর মাকে গঙ্গাতীরে সদ্গতি করবে না? ওর দ্বারা যদি এই মহৎ কাযটা———"

"মহৎ কায ত বটেই। মহৎ কাযে আমি বাধাও দিচ্ছি না। আমি শুধু বলছি যে, স্বর্গ কিম্বা নরক, যেখানে যাবার নেপুর মা এতক্ষণে চ'লে গিয়েছে; মিছে খরচ-পত্তর ক'রে তার মরা দেহখানা আর অত দূরে টেনে নিয়ে না গেলেই হয়।"

ওপাড়ার বারোয়ারীর পাণ্ডা সিদু ঘোষ মনে মনে একটু অসন্তুষ্ট হইয়া হীরু ঠাকুরের উদ্দেশ্যে কহিল—"দা'ঠাকুর, যদি নেপুর আমাদের সামর্থ্য থাকে ত বৌদির সদ্গতিটা হোতে দোষ কি?"

"কিছুই না। সদ্গতিটা বৌদির হোক না হোক, বৌদির বাহকদের যে ঘোল আনাই হবে, তার আর কোন সন্দেহ নেই" বলিয়া হীরু ঠাকুরও ভিতর ভিতর খুবই বিরক্ত হইয়া খিড়কীর তালগাছে বাবুই পাখীর বাসার দিকে তাকাইয়া রহিল।

আজ এতখানি বেলা হইলেও হীরু ঠাকুরের প্রাতঃকালীন ধূমযাত্রা ঘটিয়া উঠে নাই, সুতরাং মেজাজ তাহার প্রসন্ন ছিল না।

যাহা হউক, মৃতদেহ ত্রিবেণীই লইয়া যাওয়া স্থির হইল এবং সমস্ত যোগাড়-পত্র করিয়া বেলা প্রায় দেড় প্রহরের সময় জন দশ বারো মিলিয়া 'হরিবোল' দিতে দিতে ত্রিবেণীর পথে যাত্রা করিল। ব্রাহ্মণের মধ্যে চক্কোত্তি জ্যেঠাই দলের ক্যাপটেনস্বরূপ হইয়া সঙ্গে চলিলেন।

পরদিন সন্ধ্যার পর যখন দ্বাদশ জনের পানোন্মত্ত মিলিত কণ্ঠের বিকট হরিধ্বনি ষ্টেশনের পথের দিক হইতে গ্রামের ভিতর আসিয়া পৌঁছিল, তখন সকলেই জানিতে পারিল যে, ইহারা কার্য্য শেষ করিয়া সন্ধ্যার ট্রেণে সব ফিরিয়া আসিতেছে।

অনতিকালমধ্যেই সকলে আসিয়া নেপালের বহির্বাটীতে জমায়েত হইল এবং ত্রিবেণী হইতে ফিরিবার সময় আনীত ছয়টি বোতলের অবশিষ্ট দুইটি বোতলের সুরাটুকু সেইখানে বসিয়া প্রচণ্ড কলরবের সহিত নিঃশেষে পান করিবার পর বিজয়-গর্ব্বোদ্দীপ্ত বীরের ন্যায় সকলে স্ব স্ব গৃহে যাইবার উদ্দেশে উঠিয়া দাঁড়াইল।

গতকল্য ত্রিবেণী যাইবার সময় ইহাদের স্কন্ধে ছিল ভার, হস্ত ছিল শূন্য, আজ ইহাদের স্কন্ধ ছিল শূন্য—হস্তে ছিল ভার। প্রত্যেকেরই এক হস্তে ছিল নূতন গামছায় বাঁধা কচুরি-সিঙ্গাড়া-লুচি-সন্দেশ-মিহিদানা প্রভৃতির একটি করিয়া পুঁটুলী আর অপর হস্তে ছিল, কাহারও একটি নূতন হেরিকেন, কাহারও একটি বাল্তি, কাহারও একখানি মাদুর, কাহারও বা আবলুসের নলিচা লাগান একটি হুঁকা। পেট পুরিয়া পানাহারের উপর এগুলি তাহাদের সদ্গতির ফাউ। চক্কোত্তি জ্যেঠা যে কাল প্রভাতে হিসাব ধরিয়াছিলেন—পাঁচ দশকে পঞ্চাশ, তার উপর ঘাট-খরচ ইত্যাদি, সে হিসাব যথেষ্ট পরিমাণেই ছাপাইয়া গিয়াছিল এবং নেপালকে তিনি শেষকালে শুনাইয়া দিতেও

ভুলেন নাই যে, এষ্টিমেটের চেয়ে আসল খরচ বরাবরই কিছু বেশীই হইয়া থাকে। তবু, নেপাল সঙ্গতিপন্ন নহে বলিয়া সকলে যথাসম্ভব তাহার ব্যয় বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়াছে অর্থাৎ যেখানে জন পিছু চারি পাঁচ সের করিয়া শুধু মিঠাই খরচ হয়, সেখানে তাহারা প্রত্যেকে দুই সের আড়াই সেরের মধ্যেই কায সারিয়াছে এবং অন্যান্য খরচও সেই হিসাবে খুব কমই করিয়াছে। এ সব ছাড়া এ কাযে যাহা প্রধান খরচ, তাহাও তাহারা তেমন বেশী করে নাই, যাহা নহিলে নয়, তাহাই করিয়াছিল মাত্র এবং গা-গতরে ব্যথা না হইলে সেটুকুও তাহারা করিত না।

যাহা হউক, নেপালের মাতৃদায়োদ্ধারের প্রথম পর্ব্ব এইরূপে শেষ হইল, এবং এক মাস পরে ইহার দ্বিতীয় পর্ব্বও কোন প্রকারে শেষ হইল বটে, কিন্তু তাহার পর যে পর্ব্ব আসিল, তাহা আর শেষ হইতে চাহিল না, তাহাই হইল তাহার সমস্যা-পর্ব্ব। অর্থাৎ সে অতঃপর কি করিবে এবং কি করিয়া দেশে থাকিয়া সে দু-বেলা দু'মুঠা খাইতে পাইবে, এই কথাই প্রতিনিয়ত সে ভাবিতে লাগিল, কিন্তু ইহার কোন সদুত্তরই সে তাহার মনের মধ্য হইতে কোন দিন কোন দিক দিয়াই খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিল না। শুধু একটুখানি মাথা গুঁজিবার স্থান থাকিলে, তাহাতে শুধু মাথা গুঁজিয়া থাকাই চলে, নিত্য দু'বেলা কাহারও পেট তাহাতে চলে না।

মাতৃশোকের প্রবলতা একটু কমিয়া আসিলে নেপালের মনে তাহার পেটের চিন্তাই অন্য সকল চিন্তাকে ছাপাইয়া উঠিল। পৈতৃক জমী-জমার মধ্যে সামান্য ছিটছাট্ যাহা কিছু ছিল, মায়ের শ্রাদ্ধের সময় সেগুলিও তাহাকে বিক্রয় করিতে হইয়াছিল। সুতরাং বাহির হইতে উপায় করিয়া না আনিলে সামান্য দু'টি ডালভাতেরও তাহার যোগাড় হইবে না। সে দিন যাঁহারা বলিয়াছিলেন—"কিছু তুই ভাবিস নে নেপু, আমরা তোর রইলুম," তাঁহারা সকলে যে ঠিকই ছিলেন, নিঃসন্দেহেই সে কথা বলিতে পারা যায়, কিন্তু গ্রামে নেপুর নিজেরই থাকা সম্বন্ধে আজ দুই মাস পরে তাহার নিজের মনেই একটা ঘোর সন্দেহ জমিয়া উঠিল।

মাতার অসুখের সময় হইতে নেপাল সেই যে হীরু ঠাকুরের বাড়ীতে দু'বেলা খাওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছিল, হীরু ঠাকুর জোর করিয়া নেপালকে সে ব্যবস্থা এখনও পর্য্যন্ত ভাঙ্গিতে দেয় নাই। হীরু ঠাকুর নেপালকে বলে—"ভাই রে, তুই দু'বেলা দুটি খেলে কি আমার ভাত সব ফুরিয়ে যাবে? আমার ঘরে দু'টি শাক-ভাত নিত্যি যা জুটবে, তার এক মুঠো তুই খাবি, এক এক মুঠো আমরাও খাব।"

মায়ের শ্রাদ্ধের ঠিক পরেই নেপাল কলিকাতায় চলিয়া যাইবার ইচ্ছা করিয়াছিল, কিন্তু হীরু ঠাকুর তাহাকে জোর করিয়া যাইতে দেয় নাই। সে দিন হীরু ঠাকুর তাহাকে বলিল,—"তুই মুখ্যু নস নাতি, তোর ঐ চণ্ডীমণ্ডপে একটা পাঠশালা বসিয়ে দে, ওপরে ভগবান্ আছেন, দু'টি অন্নের ব্যবস্থা হয়ে যাবেই। তার পর একটি সুন্দর নাত-বৌর জন্যে একবার আমি কোমর বাঁধব।" মুখে এ কথা বলিলেও, মনে মনে হীরু ঠাকুর জানিত যে, কোমর খুব ভাল করিয়া বাঁধিলেও নেপালের বর্দ্ধমানের সেই বৌয়ের মত সুন্দরী মেয়ে তাহাদের নাপিতের ঘর হইতে খুঁজিয়া বাহির করা সহজ হইবে না। হীরু ঠাকুর মেয়েটিকে দুই চারিবার দেখিয়াছিল এবং আজ এত দিন পরেও মেয়েটির অনিন্দ্য-সুন্দর মুখখানি তাহার ভালরূপই মনে ছিল। পরিবার যে তাহার সুন্দর ছিল, তাহা নেপাল নিজেও জানিত এবং সেই সুন্দর মুখচ্ছবি খুব আবছাভাবে এখনও মাঝে মাঝে তাহার মনে পড়ে। বিবাহের পর সাতটি দিন মাত্র মেয়েটি তাহাদের এখানে ছিল এবং তখন সে ছয় সাত বৎসরের বালিকা মাত্র। সুতরাং স্বামি-স্ত্রীর আলাপ-পরিচয় ভাব-ভালবাসা তখন তাহাদের মধ্যে কিছুই হইবার অবকাশ পায় নাই। শুধু এই সাতটি দিনের ভিতর কয়েকবার মাত্র তাহার বালিকা স্ত্রীর মুখখানা সে আড়াল হইতে দেখিতে পাইয়াছিল। সে নিজেই তখন কিশোরবয়স্ক স্কুলের ছাত্র। মাতার মৃত্যুর পর কয়েকবার তাহার সেই স্ত্রীর কথা নেপালের মনে পড়িয়াছিল, সে ভাবিয়াছিল যে, আজ এ সময় তাহার সেই স্ত্রী ব্রজরাণী তাহার পার্শ্বে থাকিলে তাহার বর্ত্তমান বিশৃঙ্খল জীবনের দীনতা, নৈরাশ্য ও চিন্তা এমন করিয়া হয় ত মাথা খাড়া করিয়া উঠিতে পারিত না। কিন্তু যাহা নাই, তাহাকে লইয়া আকাশ-কুসুমের সৃষ্টি করায় ফল কি, সুতরাং নেপাল এ সব কথা আর আজকাল ভাবিত না। তবে এই বিষয়টা সে মনে মনে ঠিক করিয়া

রাখিয়াছিল যে, পুনরায় বিবাহ আর সে করিবে না। তাই সে দিন হীরু ঠাকুরের কথায় নেপাল কহিল,—"কোমর বেঁধে কোনই ফল হবে না, ঠাকুর্দ্দা। এই দুর্ব্বল ক্ষীণ হাতে আর কারও হাত ধ'রে নেবার এখন আর শক্তি নেই। এখন এ ভাবে ব'সে ব'সে তোমার ঘাড় ভাঙ্গার বদলে নিজের ঘাড়েই দু'টি অন্ন উপায়ের ভারটা তুলে নেবার ব্যবস্থাটা সর্ব্বাগ্রেই করতে হবে।"

নেপালের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া হীরু ঠাকুর আর তাহাকে এ সম্বন্ধে বেশী কিছু না বলিয়া শুধু কহিল,—"তা হলে তুই কি নাতি, কোলকাতা গিয়ে একটা কায-কর্ম্মের চেষ্টা করাই ঠিক করলি?"

নেপাল কহিল,—"হ্যাঁ ঠাকুর্দ্দা, আর তুমি বাধা দিও না। একবার ঝাঁপ দিয়েই দেখি, খড়-কুটো কিছু ধরতে পারি কি না।"

কিন্তু কলিকাতায় যাইবার পক্ষে তাহার প্রধান অন্তরায় হইল অর্থাভাব। রিক্ত হস্তে সে কলিকাতায় যাইয়া কোথায় দাঁড়াইবে? অর্চ্চনাদের বাড়ী একবার সে যাইতে পারে, ভবতোষ বাবু তাহাকে যাইবার জন্য বলিয়াও দিয়াছিলেন, কিন্তু দুই চারি দশ দিনের জন্য তথায় গিয়া সে থাকিতে পারে মাত্র; তাহাতেই বা কি ফল? কত দিন পরে যে তাহার কাযকর্ম্মের যোগাড় হইবে, তাহার যখন কোনই নিশ্চয়তা নাই, তখন কিছু অর্থ তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইতেই হইবে। কিন্তু কোথা হইতেই বা সে এখন এই অর্থের যোগাড় করে? এই লইয়া দিনের পর দিন যখন তাহার চিন্তাই শুধু বাড়িতে লাগিল, কোন দিকে কোন উপায় সে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিল না, তখন এক দিন হীরু-ঠাকুর আসিয়া তাহাকে বলিল,—"নেপু, আমার হাল্-চাল্, ঘরের খবর সবই ত তুই জানিস দাদা, নেশাখোর ব'লে সংসারের টাকা-কড়ি তোর ঠান্‌দি কিছুই আমার হাতে রাখতে দেয় না। সে-ই হোল গিয়ে যেন বাড়ীর কর্ত্তা—"

হাসিতে হাসিতে নেপাল তাহার কথার মধ্যেই বলিল, —"আর তুমি হলে গিয়ে ঘরের গিন্নী?"

"সত্যিই তাই। হপ্তায় হপ্তায় নেশার দরুণ ঐ গণ্ডা-কতক ক'রে পয়সাই আমার বরাদ্দ, তা ছাড়া আর কোন কিছুতেই আমার অধিকার নেই।"

"অধিকারটা তাই একটু বাড়াবার জন্যে ঠান্‌দির কাছে একখানা দরখাস্ত করবার মৎলব করছ না কি?"

"না রে ভাই, শুধু মৎলব নয়; কায একেবারে গুছিয়েই ফেলেছি। ক'দিন ধরেই তক্কে তক্কে ছিলুম, কাল সুবিধে পেয়ে তোর ঠান্‌দির বাক্স থেকে এই একশটা টাকা সরিয়ে ফেলেছি" বলিয়া হীরু ঠাকুর ভাঁজ করা দশখানা নোট নেপালের হাতের মধ্যে গুঁজিয়া দিয়া কহিল,—"তবু দু'চার মাস সেখানে একরকম চলবে এখন, উঠে-প'ড়ে একবার লাগ্‌ গে যা, ভাই। ভগবান্ তোর ভালই করবেন, হীরুদার এই কথাটা তুই কখনও ভুলিস নি, ভাই।"

নেপাল হাঁ করিয়া হীরু ঠাকুরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়।

বেঁচে থেকে মরা

"মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,"—
নাহি জানি, হেন কথা কেন বিশ্ব-কবি
শুনালেন আজি? ভেবে নাহি পাই মনে,
ভুলায় তাঁহারে কোন্ মুগ্ধ-করা ছবি?
যে ভুবন কা'রো দেয় দুই হাত ভরি'
বিপুল ঐশ্বর্য্য-রাশি,—কারো করে হায়
শূন্য দৈন্য-ভিক্ষাপাত্র চিরদিন ধরি,'
কেন দিব অর্ঘ্য আমি বৃথা তার পায়?
কাঙালের অন্তর্য্যামী, সত্য, হীন সে কি?—
সত্যই কি কিছু নাহি বলিবার?—বুক?
নির্ব্বিবাদে সব সয়?—হায় তাই দেখি
সুন্দর ভুবন দেয় বুঝি শুধু দুখ?

কে মোরে আনিলে হেথা?—নিয়ে চল ত্বরা,
রুদ্ধ হয় শ্বাস,—এ যে বেঁচে থেকে মরা!

শ্রীপ্রমথনাথ কুণ্ডার।

কৃষ্ণভাবিনী নারী-শিক্ষা-মন্দির *

প্রিয় ভগিনীগণ,

কৃষ্ণভাবিনী নারী-শিক্ষা-মন্দিরের প্রধান শিক্ষয়িত্রী প্রিয় ভগিনী শ্রীমতী নীহারিকার সাদর আহ্বানে এবং উহার প্রতিষ্ঠাতা জনপদহিতকারী নারী-হিতৈষী শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয়ের আমন্ত্রণে আজ এখানে উপস্থিত হইবার সুযোগ পাইয়া পরমানন্দ লাভ করিয়াছি, তাঁহাদিগকে এ জন্য কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতেছি।

আমাদের এই ভারতবর্ষের গৌরবের দিনে নারী ধর্ম্ম, কর্ম্ম, জ্ঞানে উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল, কিন্তু তাহার সেই উন্নত অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনের ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে। শিক্ষার কথা দূরে থাক্, যখন সমগ্র দেশ নারীকে জীবন্ত দগ্ধ করিতে, নারীর প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করিতে উৎফুল্ল, তখন একমাত্র এই মহামানবের মহান্ অন্তঃকরণ নারীর সর্ব্বপ্রকার দুঃখ দূর করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছিল। ভারতের নারীর প্রতি বিধাতার এ কি করুণা! ভাবিলে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইয়া যাই। আমার যেন মনে হয়, ভারতের বেদনাপীড়িত নারী-সমাজের পুঞ্জীভূত অশ্রুধারা ও দীর্ঘশ্বাস বিধাতার সিংহাসনতলে

মহাত্মা গন্ধী

শিল্পী—শ্রীমতী নির্ম্মলা পাল।
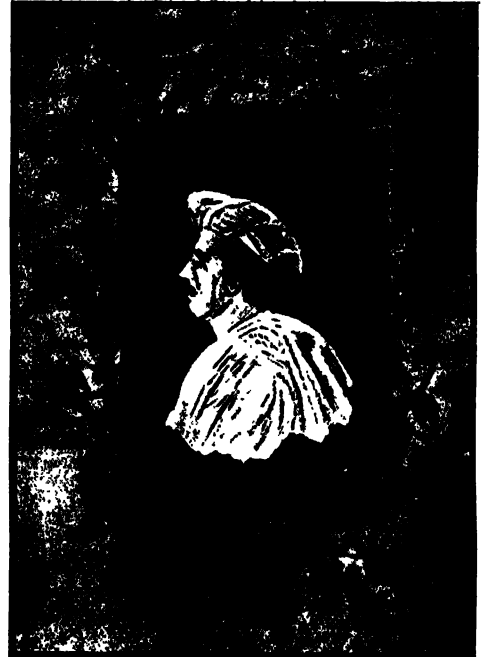
রাজা রামমোহন রায়

শিল্পী—শ্রীমতী সুরুচি প্রামাণিক

পৌঁছিয়া যখন তাঁহাকে কম্পিত করিয়া তুলিয়াছিল, তখনই তিনি রাজা রামমোহন রায়কে এ দেশে পাঠাইয়াছিলেন। তার পর

* গত ১৫ই মার্চ্চ কৃষ্ণভাবিনী নারী-শিক্ষা-মন্দিরের পঞ্চম বাৎসরিক উৎসব সভায় সভানেত্রীর অভিভাষণ।

তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের একনিষ্ঠ ভক্ত, দারিদ্র্যব্রতধারী সেবকদল দেশবাসীর শত নিন্দা, অপমান, নির্য্যাতন, বিদ্রূপ উপেক্ষা করিয়া নারী-সমাজের আজিকার এই উন্নত অবস্থা আনয়ন করিয়াছেন। এ দেশে এক সময় এমন ছিল, যখন লোক বলিত, নারী লেখাপড়া শিখিলেই বিধবা হইবে, এই লীলাবতী, গার্গীর দেশের এমনই অবস্থা হইয়াছিল। আজ আর সে কথা কেহ কল্পনাও করিতে পারে না। নারীশিক্ষার সে শৈশব, বাল্য, এমন কি, কৈশোর অবস্থাও কাটিয়া গিয়াছে, আজ নারী-শিক্ষার যৌবন। যৌবনের উদ্যম, উৎসাহ ও আনন্দের বেগে নারী-শিক্ষা দেশে খরস্রোতে প্রবাহিত হইতেছে। কিন্তু যৌবনকাল

শ্রীশ্রীসরস্বতী

শিল্পী—শ্রীমতী নির্ম্মলা পাল।

শ্রীশ্রীভারত-লক্ষ্মী

শিল্পী—রেণুকা সেন।

ম্যাকাউ পক্ষিযুগল

শিল্পী—রেণুকা সেন।

বড় বিষম কাল। এ সময় জীবন-বিধাতাকে জীবনের অগ্রে স্থাপন করিয়া উপযুক্ত অভিভাবক ও সৎপরামর্শদাতার অধীনে জীবন নিয়ন্ত্রিত না করিলে সে মানুষ দেবত্বে ও মহত্ত্বে অমর হইতে পারে না। ব্রাহ্মসমাজ নারীর সম্মুখে সর্ব্বোচ্চ জ্ঞানের যে দ্বার অবারিত করিয়া দিয়াছেন, আজ সমগ্র দেশের নারী-সমাজ তাহার ফললাভ করিয়া ধন্য হইতেছে। কিন্তু প্রকৃত নারী-হিতৈষী যিনি, তিনি একবাক্যে বলিবেন যে, এই পার্থিব শিক্ষার সহিত ধর্ম্ম, নীতি, পবিত্রতা, ভক্তির সম্মিলন হওয়া উচিত। নতুবা কেবল Secular জ্ঞানের এই খরপ্রবাহ নারীকে কোন্ অতলে লইয়া যাইবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই। ধর্ম্ম, নীতি, পবিত্রতা, ভক্তি সম্মিলিত সর্ব্বোচ্চ জ্ঞান এই ভারতের আর্য্য নারী-শিক্ষার আদর্শ। সুতরাং নারী-শিক্ষার এই যৌবনকালে সে বিষয়ে

পর কৃষ্ণকান্তের উইলকে ট্র্যাজিডি বলা যায় কি? কখনই নহে।

একটা প্রশ্নকে কিছুতেই বাদ দেওয়া যায় না যে, মানবজীবনে সত্যকার ট্র্যাজিডি আছে কি না এবং উহা যদি থাকিয়াই থাকে, তবে কোন একটা বদ্ধমূল সংস্কারবশে সাহিত্যকে বিয়োগান্তক না করিয়া মিলনান্তক করা সাহিত্যরস-সংহারের নামান্তর মাত্র। আমরা প্রথমেই বলিয়াছি যে, মানবজীবনে ট্র্যাজিডি নাই এবং তাহার প্রমাণে অধিক বিতণ্ডা বিশেষ দার্শনিক তত্ত্ব ইত্যাদির আলোচনা না করিয়া সরাসরি উত্তর দিব যে, অধিকাংশ মানুষ যে অতি দুঃখেও মরিতে চাহে না, ইহাতেই সপ্রমাণ হইতেছে যে, মানবজীবনে ট্র্যাজিডি নাই।

অবশ্য কেহই যে মরিতে চাহে না, এমন কথা বলিতে চাহি না; কেহ কেহ আত্মহত্যা করে। শতকের মধ্যে তাহা একক। এই এককের মৃত্যুর দ্বারা শতকের বিচার করিতে পারি না। এই জন্যই স্থিরসিদ্ধান্ত করিতে পারিলাম না যে, মানবজীবনে ট্র্যাজিডি একটা বড় জিনিষ। এই আলোচনা হইতে আমরা দ্বিতীয় প্রশ্নে উপনীত হইতেছি যে, গোবিন্দলালের মানসিক পরিণতি যে চরমে শুদ্ধপন্থা অবলম্বন করিয়াছিল, তাহা মনোবিজ্ঞানসম্মত কি না? গোবিন্দলালের মনোবৃত্তি যে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং হওয়া সম্ভব, তাহা কাহার কথায় পরিমাপ করিব?

"চোরের মন পুঁই-আঁদাড়ে" বলিয়া একটা কথা আছে। "আত্মবৎ মন্যতে জগৎ" বলিয়াও একটা কথা আছে। যে যেমন দেখে, যাহার মনোবৃত্তি যেরূপ, তাহাই তাহার psychology। কেহ পকেট কাটে, কেহ পকেট উজাড় করিয়া দান করে। কেহ রক্তস্রোতে রাজপথ ভাসাইয়া দেয়, কেহ ক্রুশে বিদ্ধ হইয়াও বলে, 'প্রভু, ইহাদের ক্ষমা কর।' কোন্‌টা psychological এবং কোন্‌টা তাহা নহে? কে ইহার উত্তর দিবে? পকেট কাটা যদি দাতার মনোবৃত্তিকে মনোবিজ্ঞানবিরুদ্ধ বলিয়া দম্ভ করে, তবে তাহার প্রতিবিধান কি?

আমরা যখন মানুষ, মানুষের স্বভাবসংস্কারেই যখন বর্দ্ধিত, তখনই সেই স্বভাবসংস্কারের বশেই মনোবৃত্তির স্বরূপ নিরূপণ করিব। মা বক্ষোরক্ত দিয়া সন্তানকে পালন করেন, পশুর প্রসূতি সন্তানকে হত্যা করিয়া ভক্ষণ করে। মানুষের কাছে প্রথমোক্তিটিই মনোবিজ্ঞাসম্মত এবং গ্রাহ্য। নাদির শাহের নিষ্ঠুরতা psychological বটে, কিন্তু তাহা পশুর মনোবিজ্ঞান। অমিতাভ বুদ্ধের মৈত্রী ও কৃপাকেই দেবমানবীয় মনোবৃত্তি বলিব এবং সেই জন্যই গোবিন্দলালের ভবিষ্যৎ মানসিক পরিবর্ত্তনকে নিঃসঙ্কোচে বলিব মনস্তত্ত্ব-সম্ভূত। একটা প্রশ্ন হইতে পারে, গোবিন্দলাল সাধু না হইতেও পারিতেন। কিন্তু নামিতে পারা যদি মনোবৃত্তিসঙ্গত হয়, তবে উঠিতে পারা মনোবৃত্তিবিরুদ্ধ হইবে কেন? সেই জন্যই এই সিদ্ধান্ত করিতেছি যে, বঙ্কিমচন্দ্র গোঁজামিল দিবার জন্য ট্র্যাজিডিকে এরূপ কমিডি করেন নাই। যাহা সত্যকার মানবীয় মনস্তত্ত্ব, যাহাতে মানুষ প্রকৃত মানুষ হইতে পারে, তাহাই তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন। Saul যদি St. Paul হইতে পারে,তবে গোবিন্দলাল অমন না হইবেন কেন?

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ট্র্যাজিডি মানবের স্বভাবসঙ্গত নহে। রাত্রির জঠরে সূর্য্যোদয় যেমন নিত্যকার ঘটনা, তেমনই বজ্রদাহী দুঃখের মাঝে সুখও নিত্যই আবির্ভূত হয়। দুর্ব্বল উহা দেখিতে পায় না, সবলে উহা দেখে, দেখিয়া ধন্য হয়। দুর্ব্বলের চিত্তবৃত্তি দিয়া মানুষের জগতের পরিমাপ করিব না।

নৈরাশ্যব্যাধি ও মানসিক অবসাদ বলিয়া মনের দুইটি রোগ আছে। আধুনিক জগতে tragic mind হওয়া যেন একটা ঢং হইয়াছে। বিশেষতঃ আধুনিক রুশসাহিত্যের আধিপত্যের দিনে সেই সৌখীন মনোবৃত্তির ফলে সাহিত্য ও কাব্যকে দুঃখবাদমূলক করা ও দেখা একটা রোগ হইয়াছে। কৃষ্ণকান্তের উইল গোড়ায় ট্র্যাজিডি বা বিয়োগান্তক। ইহা বড় বেশী কথা নহে; শেষে যে ইহা অমৃতায়মান হইয়া গেল, ইহাও অস্বাভাবিক নহে। দুঃখ ত আছেই, ইহা ত আর অস্বীকার্য্য নহে; সে দুঃখ আখ্যায়িকার অনেক চরিত্রকেই ব্যথা দিয়াছে। আখ্যানের প্রধান চরিত্র গোবিন্দলালকেও দুঃখজর্জ্জরিত করিয়াছে; এমন কি, শেষে গোবিন্দলাল যখন সন্ন্যাসিবেশে হরিদ্রাগ্রামে ফিরিয়া আসিলেন, তখনও তাঁহাকে বাহ্যদৃষ্টিতে দুঃখে ভস্মীভূত এক বনস্পতির মত বোধ হয়, কিন্তু ইহা বাহ্যদৃষ্টি।

বঙ্কিমচন্দ্র গোবিন্দলালের চরিত্র প্রস্ফুট করিয়াই তাঁহার বক্তব্যকে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছিলেন। এই বিকাশের পক্ষে ভ্রমর-রোহিণী, কৃষ্ণকান্ত প্রভৃতি পরিপ্রেক্ষার কায করিয়াছিল।

যে কাব্য তাহার সমাপ্ত বাণী উচ্চারণ করিয়াছে, "এই ভ্রমরের অপেক্ষাও যাহা পবিত্র, তাহা পাইয়াছি। আমি শান্তি পাইয়াছি", তাহা বিয়োগান্তক হইতে পারে না, নহেও। বিয়োগান্তক কিছু হইলে সে প্রকার ভাব-ভাবনা এবং আদর্শ রহিলে ঈশ্বরদ্রোহী হইতে হয়; ভারতীয় চিত্তবৃত্তি অমন ভ্রান্তপন্থী নহে। বঙ্কিমচন্দ্রও ছিলেন না। সেই কারণেই দুঃখের ঝঞ্ঝা-সংক্ষুব্ধ "কৃষ্ণকান্তের উইল"কে বিয়োগান্তক বলিলাম না।

শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা।

ভারত ইতিহাসে অনুকরণের প্রভাব

সাধারণতঃ অনুকরণ-বৃত্তিটি শিশুদিগের ভিতর অল্পবিস্তর লক্ষিত হইয়া থাকে। কারণ, শৈশবকালে তাহাদিগের বুদ্ধির বিকাশ ও বিচারশক্তি সম্যক্ পরিস্ফুট হইতে পারে না। সেই জন্য তাহারা কোনও দোষগুণ বিচার না করিয়া তখন অবাধে অনেক কাষ করিয়া থাকে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের ভিতর ভাল-মন্দ বিচার করিবার একটা ধারণা জন্মে এবং এই ভাবটি ক্রমশঃ সম্যক্ পরিস্ফুট হইয়া স্বাধীন চিন্তার অবকাশ দান করে। যে মানবশিশু তাহার অপোগণ্ড অবস্থায় পিতা-মাতা-ভ্রাতা ইত্যাদির হাব-ভাব, চলা-ফেরা অন্ধের মত অনুকরণ করিয়াছে, সেই আবার পরিণত বয়সে বিচার-বুদ্ধির আলোকের দ্বারা তাহার শৈশবের অতি আদরের অনুকরণের বিষয়গুলিকে অসত্য প্রতিপন্ন করিয়া বর্জ্জন করিয়াছে।

যেখানে মানুষ তাহার জ্ঞানের পূর্ণবিকাশ করিবার পরম সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে, সেইখানে তাহার স্বাধীন চিন্তার সূত্রপাত হইয়াছে। পক্ষান্তরে, যে অসভ্য মানুষ তাহার বুদ্ধিবৃত্তি সম্যক্ পরিচালনা করিয়া ইহাকে বিকশিত করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারে নাই, তাহাকে বাধ্য হইয়া অন্ধ অনুকরণের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। স্বভাব হইতে সে যাহা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা প্রকৃতির সাধারণ নিয়মানুসারে পালন করিয়া থাকে, ইহার মধ্যে যুক্তি-তর্কের কোনও স্থান নাই। এই অবস্থায় মানুষ জ্ঞানের হিসাবে পশুর সহিত কতকটা সমবস্থ।

অনুকরণ-বৃত্তিটি মানুষের হৃদয়ের দৌর্ব্বল্য সূচিত করে। যেখানে সে তাহার বিচারশক্তিকে বিসর্জ্জন করিয়াছে, সেইখানে সে অনুকরণকে আলিঙ্গন দান করিয়াছে। মানুষের মধ্যে যে প্রকার শৈশবকালে ইহার অপরিহার্য্য আধিক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে, সেই প্রকার কোনও জাতির ভিতর যখন সভ্যতার প্রথম আলোকপাত হইয়া থাকে, তখন ইহাকে একবারে বাদ দেওয়া চলে না, কারণ, জ্ঞানের প্রথম সোপান অতিক্রম করিতে হইলে ইহার কতকটা আবশ্যকতা আছে। কিন্তু যে দেশের মানুষ একবার চিন্তারাজ্যে স্বচ্ছন্দভাবে বিচরণ করিয়া জ্ঞানের চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে এবং মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ করিয়া একটি বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করিয়াছে,—যেখানে সমস্ত বিষয় বিচারবুদ্ধির আলোকের দ্বারা বোঝাপড়ার পর গৃহীত হইয়াছে, সেই দেশের ভিতর ইহার প্রাবল্য তাহার চিত্তের দীনতা, সমাজের পঙ্গুতা ও রাষ্ট্রীয় অধীনতা প্রকাশ করিতেছে।

স্বাধীনতা মনুষ্যত্বের চরম বিকাশের সাহায্য করে। যেখানে মানুষের জ্ঞান কোন অন্ধ বিধি-নিষেধের গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ নহে, সেইখানে মানুষ নিজেকে সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া স্বাধীনতার স্বাদ লাভ করিয়াছে। দিকে দিকে নিজেকে পূর্ণ বিকশিত করিয়া সে যে প্রকার এক দিকে জ্ঞানের উপর তাহার আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে,—আবার অন্য দিকে সেইপ্রকার স্বীয় বাহুবলের পরিচয় রাজ্যবিস্তারের ভিতর দিয়া প্রকাশিত করিয়াছে। দেশ-জয়-ব্যাপার শুধু মানুষের বাহুবলের পরিচায়ক নহে, পরন্তু ইহা তাহার চিত্তের স্বাধীন প্রকাশের সূচনা করে,—কারণ, প্রকৃত 'স্বাধীনতা' অন্তরের জিনিষ।

যখন মানুষের অন্তরে প্রকৃতভাবে স্বাধীনতা সঞ্চারিত হয়, তখনই তাহার প্রতিবিম্ব সমাজ, সাহিত্য ও শিল্পের ভিতর দিয়া প্রতিফলিত হইয়া তাহার প্রাণের একটি নিগূঢ় বার্ত্তা বহন করে। ভারতবর্ষ যে দিন এই প্রাণের আনন্দ-লীলার সন্ধান পাইয়াছিল, সেই দিন সে দেশ হইতে দেশান্তরে,—সাগর হইতে সাগরান্তরে তাহার প্রাচীন পিতামহগণের বাণী বহন করিয়া কত বর্ব্বর জাতিকে ভাষা, সভ্যতা ও জ্ঞানের বিমল আলোকদান করিয়াছে। গুপ্তসম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল ভারতবর্ষের একটি সুবর্ণ-যুগ,—এই সময়ে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষের ভিতর এক নূতন প্রাণের স্পন্দন অনুভূত হইল। ভারত তাহার ধর্ম্ম, সাহিত্য, দর্শন, শিল্প, সমাজকে নব নব সম্পদে ভূষিত করিয়া স্বীয় বাহুবলের চিহ্ন শত্রুর ললাটে অঙ্কিত করিল। এই স্মরণীয় যুগে উজ্জয়িনীর কলকণ্ঠ-কোকিল অমর কালিদাসের বীণার সুমধুর ঝঙ্কার সিপ্রার সাহিত্যকুঞ্জে ধ্বনিত হইতে লাগিল, —জ্যোতিষ, গণিত, ভাস্কর্য্য, সংগীত ইত্যাদি সুকুমার বিদ্যার চর্চ্চার দ্বারা তাহার অন্তরের স্বাধীনতা সূচিত হইতে লাগিল।

প্রাণের এই আনন্দ-লীলা, গুপ্তবংশের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত হওয়ায়, ভেদ-ঘৃণার সৃষ্টি করিল। প্রকৃত আর্য্যের উদার 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' আদর্শ ভারতের অন্তর হইতে লুপ্ত হইয়া সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হইল,—ফলে বহির্ভারতের হিন্দুর স্থাপিত সমৃদ্ধ উপনিবেশগুলি তাহাদিগের জন্মভূমি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। শীঘ্র ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আত্মকলহ দেখা দিয়া তাহাকে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করিল! তখন অন্ধ অনুকরণ তাহার জীবন-যাত্রার একমাত্র পাথেয় হইয়া দাঁড়াইল।

কালক্রমে মুসলমানগণ এই দেশে আগমন করিয়া তাঁহাদিগের শাসন বিস্তার করিতে লাগিলেন। হিন্দু-সমাজ ব্যবস্থার পর ব্যবস্থা রচনা করিয়া বিধি-নিষেধের দুর্ভেদ্য দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু

এই সমস্ত বিধি-নিষেধ তাহার চিত্তের দীনতা ও মানবাত্মার প্রতি সুস্পষ্ট অবজ্ঞা প্রকাশ করিল,—সমাজের নিম্নস্তরের নির্য্যাতিত অনেক হিন্দুসন্তান ইসলামের সাম্যমন্ত্রে দীক্ষিত হইল।

রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা হারাইয়া ভারতবর্ষ আপনাকে ভুলিয়া গেল। বিজেতার ভাষা, পরিচ্ছদ ইত্যাদি গ্রহণ করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতে লাগিল। যাহা ছিল তাহার নিজস্ব অন্তরের ধন, তাহা অনাবশ্যকবোধে পরিত্যক্ত হইল। অশন-ভূষণ ও ভাবধারার উপর বিজেতার জয়চিহ্ন অঙ্কিত হইল,—সাহিত্য, চিত্র, ভাস্কর্য্য, শিল্প ও স্থাপত্য হইতে সৃষ্টির শক্তি অন্তর্হিত হইতে লাগিল। কিন্তু এই মুসলমান আমলে ভারতসন্তান তাহার জাতীয় বৈশিষ্ট্য, ভাবধারা ও রাষ্ট্রীয় শক্তি বর্ত্তমান অপেক্ষা রক্ষা করিবার অনেকটা সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিল। মুসলমান নৃপতিগণ ভারতে আসিয়া বিজিতের আচার-ব্যবহার গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষকে আপনার করিয়া লইলেন। দেশের শাসনযন্ত্র এক রকম হিন্দুর হস্তে অর্পিত হইল, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ভূস্বামিগণ স্ব স্ব 'এলাকার' ভিতর স্বাধীনভাবে শাসন করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের কার্য্যের উপর মুসলমান নৃপতিগণ অতি অল্পই হস্তক্ষেপ করিতেন। তখন ভারতবাসীর দেহে স্বাস্থ্য ছিল, বাহুতে শক্তি ছিল, বর্ত্তমানের মত অস্ত্র-ব্যবহার হইতে বঞ্চিত হয় নাই।

ইংরাজ আমলে ভারতবর্ষ তাহার প্রকৃত স্বরূপ রক্ষা করিতে পারে নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষা-পদ্ধতি আমাদের ভিতর স্বদেশের প্রতি একটা অবজ্ঞার ভাব আনয়ন করিয়া ভারতবর্ষকে তাহার ভাবধারা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। বিলাসের নব নব উপকরণ ও অন্ধ অনুকরণের স্পৃহা আমাদের দেহ ও মনকে অধীনতার নাগপাশে যেন অষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকের কতকগুলি লিপিবদ্ধ বিকৃত বিবরণ পাঠ করিয়া দেশের অন্তর হইতে সরিয়া পড়িয়া আমরা জ্ঞানের পিপাসা মিটাইয়াছি। আমরা এতটা অধঃপতিত হইয়াছি যে, আমাদের সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম্ম ইত্যাদির মর্ম্মোদ্ধার করিতে হইলে আমাদিগকে Max Muler, Mac Donel, Levi ইত্যাদি য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের ব্যাখ্যা ও সমালোচনা অন্ধের মত অনুসরণ করিতে হয়,—বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সংস্কৃত সাহিত্য, দর্শন অধ্যয়ন করিতে হইলে সাগরের পরপারে ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী ইত্যাদি দেশে গমন করিতে হয়,—ইহা অপেক্ষা হৃদয়ের দুর্ব্বলতা আর কি হইতে পারে? পাশ্চাত্য শিক্ষার পরোক্ষ প্রভাবে আমরা দেশের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইয়া অন্ধ অনুকরণ ও বিলাসের পঙ্কিল স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া স্বরচিত অভাবের বহ্নিতে পতঙ্গের মত পুড়িয়া মরিতেছি। আমাদের প্রাচীন ঋষি-পিতামহগণ ত্যাগের ভিতর দিয়া মানবাত্মার গৌরব উপলব্ধি করিয়া ত্যাগের অনুশীলন দ্বারা প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জ্জনের পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। আমরা সেই আদর্শ ত্যাগ করিয়া, ভোগে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া স্বার্থ ও ব্যক্তিগত সুখ-চরিতার্থতাকেই মানুষের পরমার্থ মনে করিয়াছি। ভারতের প্রাচীন ঋষিকুলের পুঞ্জীভূত সাধনার শ্রেষ্ঠ সম্পদ—'আত্মৌপম্যদৃষ্টি' যাহা আমাদিগকে এক দিন বিশ্ব-মানবের বৃহৎ পরিবারের ছোট-বড় সকলের সুখ-দুঃখকে আপনার করিয়া লইবার শিক্ষা প্রদান করিয়া সমগ্র জগৎকে গাঢ় আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিয়াছিল, তাহা আমাদিগের জাতীয় জীবনের চরম দুর্দ্দিনে অন্তর্হিত হইয়া দেশাত্মবোধের উচ্ছেদ-সাধন করিয়াছে। এইভাবে ভারত আপনার স্বরূপ হারাইয়া সুপ্তির ক্রোড়ে বিশ্রাম লাভ করিল!

দীর্ঘ মোহনিদ্রার পর ভারত আবার চোখ মেলিয়া চাহিয়াছে, তাহার প্রত্যেক গিরি, প্রান্তর, নগর, নদী, উপবনের উপর দিয়া দেখা দিয়াছে তাহার নূতন প্রভাত। পূর্ব্বদিগন্তে অরুণ-কিরণ আকাশের নীলিমার উপর দিয়া ফুটিয়া উঠিয়া বৃক্ষের প্রতি পুষ্প ও পল্লবকে উজ্জ্বল স্বর্ণালোকে প্লাবিত করিয়াছে। বিহগ-কুলের সুমধুর কাকলী-বন্দনার ভিতর দিয়া অনুভূত হইতেছে—একটি তরুণ প্রাণের স্পন্দন। আলস্য ও তন্দ্রার পাশ কাটাইয়া সে যেন আবার তাহার স্বচ্ছন্দগতি লাভ করিয়াছে। চিরাভ্যস্ত মোহশয্যার মায়াপাশ কাটাইয়া সে জগতের সমক্ষে দাঁড়াইবার সাহস করিল, কিন্তু তাহার দুইটি পা বাঁকিয়া বসিল,—কারণ, সে তো এতদিন শুধু মস্তক ও দুইটি বাহুকে শ্রেষ্ঠ অঙ্গ মনে করিয়া, তাহাদিগের প্রতি সম্মানের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া দুইটি 'পা'কে অবজ্ঞার চোখে দেখিয়াছে। এখন সে বুঝিল যে, শুধু মস্তক ও বাহু তাহার বিরাট দেহের পক্ষে যথেষ্ট নহে, দাঁড়াইতে হইলে 'পা'রও আবশ্যকতা আছে। সেই জন্য মস্তক ও বাহুর সহিত 'পা'র সন্ধি স্থাপিত হইল,—সে এখন মাথা তুলিয়া কর্ম্মবহুল বৈচিত্র্যময় জগতের সমক্ষে দাঁড়াইল। সে দেখিল, সম্মুখে কর্ম্মের অনন্ত তরঙ্গমালার ঘাত-প্রতিঘাত তাহার চিত্তের ভিতর যেন একটি অশ্রান্ত প্রাণের বার্ত্তা বহন করিয়াছে, প্রাণের এই অবাধ-গতিপ্রবাহ তাহাকে এই নব অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করিল,—তাহার বিরাট দেহের প্রত্যেক শিরা-উপশিরার ভিতর যেন এক অপূর্ব্ব কর্ম্মশক্তি সঞ্চারিত হইল। তাহার সম্মুখে শোভা পাইতে লাগিল—বিধাতার নব নব সৃষ্টি ও অফুরন্ত প্রাণের লীলা; পশ্চাতে রহিল—তাহার স্বরচিত বিধি-নিষেধ, ভেদ-বুদ্ধি ও ঘৃণার শত সহস্র আবর্জ্জনা,—উন্নতির পথে বৃহৎ-বাধার অপূর্ব্ব সমাবেশ! একে একে তাহার অতীতের ব্যর্থতা,

দৈন্ত ও সঙ্কীর্ণতা তাহাকে পীড়িত করিতে লাগিল। অতীত হইল তাহার চিত্তের দীনতার ইতিহাস, সেই জন্ত অতীতের স্মৃতিগুলি শ্রদ্ধার আসন হইতে তাহাকে অনেকটা বিচ্যুত করিল, সঙ্গে সঙ্গে অন্ধবিশ্বাসের স্থান গ্রহণ করিল—যুক্তি। এইভাবে চিরপুষ্ট অনেক অর্থহীন বিশ্বাস যুক্তির তরঙ্গে ভাসিয়া অদৃশ্য হইল।

মুক্তির অমল সলিলে অবগাহন করিয়া সে আবার কর্ম্মের দীক্ষা গ্রহণ করিল, তাহার প্রত্যেক ধমনীর ভিতর একটা সুতীব্র উৎসাহের স্রোত প্রবাহিত হইয়া কোনও প্রকার সীমার ভিতর আবদ্ধ হইয়া থাকিতে চাহিল না। বিধি-নিষেধের দীর্ঘ কারাবাস হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বায়ুর মত অশান্ত ও আকাশের মত উদার ও বাধাহীন হইবার তাহার ইচ্ছা হইল। উৎকট উন্মাদনার আতিশয্যে যাহাই পুরাতন, তাহাই অনাবশ্যকবোধে পরিত্যক্ত হইতে লাগিল, অনেক ভাল জিনিষ আবর্জ্জনার ভিতর অদৃশ্য হইয়া একটা সাময়িক উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দান করিল। ক্রমশঃ এই ভাব তিরোহিত হইয়া কালোপযোগী সংস্কারের ভিতর দিয়া ভারতের বিরাট দেহের সংস্কার সাধন করিতে লাগিল।

সংস্কৃত ভারত তাহার জয়যাত্রায় বহির্গত হইয়াছে, তাহার কার্য্য ও মনে যে সংযম দেখা দিয়াছে, তাহা তাহাকে উত্তরোত্তর বীর্য্য দান করিতেছে। ভাষায়, শিল্পে, সাহিত্যে ও রাজনৈতিকক্ষেত্রে এই নবীন প্রেরণার সূচনা পাওয়া যাইতেছে। প্রাণের এই বিপুল প্রবাহে তাহার চরম গন্তব্যের পথে বাধা রাশি একে একে ভাসিয়া যাইতেছে। সে এখন তাহার মুক্তির পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছে। দীনতা ও অবরোধের বজ্রমুষ্টি হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্ত সে বীরসাধকের পবিত্র মন্ত্র গ্রহণ করিয়া নিজেকে কল্যাণের বেদিকায় উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে।

ভারত তাহার মুক্তির পন্থা আবিষ্কার করিয়াছে অহিংসনীতির ভিতর দিয়া। অতীতে একবার সে ত এই মন্ত্রের দ্বারা অর্দ্ধ-পৃথিবী জয় করিয়া কত দুর্দ্দান্ত বর্ব্বর জাতিকে মনুষ্যত্ব ও ধর্ম্মের শীতল ছায়া দান করিয়াছিল। পশুশক্তির তীব্র মদিরা এখনও তাহাকে আদিম বর্ব্বর মানবে পরিণত করিতে পারে নাই, ন্তায়কে পৃথিবী হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া কখনও সে অন্তায়ের প্রতিষ্ঠা কল্পনা করে নাই, ভগবান্‌কে অস্বীকার করিয়া কখনও সে সমাজ-রচনা ও জগতের ভিতর শান্তি স্থাপন করিবার স্পর্দ্ধা করে নাই, শুধু বাহুবলকেই কখনও সে ন্তায়-অন্তায় নির্দ্ধারণের একমাত্র কষ্টিপাথর মনে করে নাই!

ভারত তাহার বিরাট দেহের ভিতর একটি সুন্দর সামঞ্জস্য-বিধান করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার দেহের ভিতর বিরোধের স্থলে এখন পূর্ণ মৈত্রী রাজত্ব করিতেছে, আজ তাহার বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়া সমগ্র দেহের পুষ্টি-সাধন করিবার জন্ত প্রত্যেকে নিজেকে নিয়োজিত করিয়াছে। তাহার দেহের ভিতর এই প্রকারে অলক্ষ্যে এক প্রকৃত স্ব-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এখন সে তাহার আত্ম-নিয়ন্ত্রণের জন্মগত স্বত্ব লাভ করিবার জন্ত পূর্ব্বের মত আবেদন-নিবেদনকে সার-সর্ব্বস্ব মনে করে না; তাই আজ শক্তিমন্ত্রের সাধক হইয়া স্বকীয় শক্তির দ্বারা ইহা অর্জ্জন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে।

আজ ভারতের মুক্তি-তরণী তাহার শাদা পাখা মেলিয়া অনুকূল পবনে সম্মুখের দিকে ছুটিয়াছে,—একে একে তাহার "চলার পথে" ভীষণ ক্ষিপ্ত তরঙ্গের বাধারাশি ঘুচিয়া যাইতেছে, অগৌণে এই সুন্দর তরণী এক শুভক্ষণে "সব পাওয়া" দেশের চিরকাম্য বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইবে।

শ্রীউমেশচন্দ্র সিংহ চৌধুরী (বি-এ)।

শ্রীরাধিকা

প্রভুপাদ শ্রীযুত নীলকান্ত গোস্বামী, ভাগবতাচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত 'শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা' পাঠ করিয়া উহার 'ভাবসৌন্দর্য্যে, ভাবগাম্ভীর্য্যে এবং বিচারচাতুর্য্যে' বাস্তবিক, মুগ্ধ হইতে হয়। "শৃঙ্গাররসোল্লাসিত রাসলীলার অভ্যন্তরে" যে অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক তত্ত্ব প্রচ্ছন্ন আছে, তাহা প্রস্ফুট করা ভগবতাচার্য্য গোস্বামী মহাশয়ের ন্তায় ভক্ত পণ্ডিতের পক্ষেই শোভা পায়, আর তাঁহার অনন্তসুলভ সুমধুর ভাষালালিত্য অতি বড় পাষণ্ড পাঠকেরও মনকে ঐশী মহিমার তন্ময় করিয়া তুলে।

দুঃখের বিষয়, এরূপ সুবিমল প্রেমরসের মধ্যেও আমরা ঈষৎ শ্লেষের পূতিগন্ধের আভাস পাই। 'শ্রীকৃষ্ণরাসলীলা'র দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্ব্বিংশ শ্লোকের 'তাৎপর্য্য' ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে প্রভুপাদ লিখিয়াছেন—"অনেক সুবুদ্ধি সমালোচক শ্রীমদ্ভাগবতে রাধিকার নাম নাই বলিয়া তাঁহাকে উড়াইয়া দিতে চাহেন।" অনেকের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু এক জন 'সুবুদ্ধি সমালোচক' এ কথা বলিয়াছিলেন, আমরা এরূপ জ্ঞাত আছি; তিনি অন্ত কেহ নহেন—স্বনামধন্ত স্বর্গলোকগত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিম বাবু তৎকৃত 'কৃষ্ণচরিত্র' সমালোচনার দ্বিতীয় খণ্ডের দশম পরিচ্ছেদে স্পষ্টই বলিয়াছেন—"ভাগবতের এই রাসপঞ্চাধ্যায়ের মধ্যে 'রাধা' নাম কোথাও পাওয়া যায় না। * * রাসপঞ্চাধ্যায়ে কেন, সমস্ত ভাগবতে কোথাও রাধার নাম নাই। ভাগবতে কেন, —বিষ্ণুপুরাণে, হরিবংশে বা মহাভারতে, কোথাও রাধার নাম

নাই।" প্রভুপাদ গোস্বামী মহাশয় কর্তৃক উল্লিখিত শ্লেষোক্তি ভিন্ন, তৎকৃত সমালোচনায় কোথাও এ কথার খণ্ডন দেখিতে পাই নাই। পক্ষান্তরে, নিতান্ত পরিতাপের বিষয়, তিনি কেবল পূর্ব্বোক্তরূপ শ্লেষ প্রকাশ করিয়া স্থানান্তরে বলিয়াছেন—"কেবল সখের পাঠক হইয়া শব্দমাত্রে নেত্রপাত পূর্ব্বক পাঠ করিলে, শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শ্রীকৃষ্ণলীলায় রাধিকার নাম দেখিতে পাওয়া যায় না।" তাঁহার মতে "শ্রীবৃন্দাবনলীলা, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকার স্বরূপ ধারণা করিয়া, সাধকের ভাবে পাঠ করিলে, ভাবনেত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রীবৃন্দাবনলীলার ভিত্তিই রাধিকা।" এই যুক্তির সমর্থনকল্পে তিনি স্থানান্তরে বলিয়াছেন, "ভক্তির মূল বিশ্বাস—বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ, তর্কে বহু দূর।" আর এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই তিনি গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে "স্বাভাবিক" কৃষ্ণভক্তিবিবর্জ্জিত ব্যক্তিকে তাঁহার গ্রন্থ 'সংগ্রহ' (বা পাঠ ?) করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

প্রভুপাদের ন্যায় পণ্ডিত ব্যক্তির নিকটে আমরা এবম্বিধ উক্তি প্রত্যাশা করি নাই। যাহার হৃদয়ে স্বতঃই ভক্তিরস উচ্ছ্বসিত হইয়াছে—ভাবের বন্যা বহিয়াছে—তাহাকে আর ভক্তিতত্ত্ব শিখাইতে হইবে কেন ? আমরা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছি, গৌরাঙ্গ-ভক্ত এক ব্যক্তি, অন্য কর্তৃক অমিয় নিমাইচরিত পাঠকালে, চৈতন্যদেব শিশুকালে 'পাত্তাড়ি-বগলে' পাঠশালায় যাইতেছেন, শ্রবণ করিয়া অজস্র অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। এরূপ ভাবুক ভক্তকে আর শ্রীচৈতন্যের অবতারবাদ বুঝাইয়া তাঁহার অন্তরে ভক্তিসঞ্চার করিতে হইবে কেন ? পতিতের উদ্ধারসাধন, অবিশ্বাসীর অন্তরে বিশ্বাস-স্থাপন, অভক্তের হৃদয়ে ভক্তির উদ্দীপন করাই পণ্ডিতের কার্য্য ; জ্ঞানাঞ্জনশলাকার দ্বারা অজ্ঞানতিমিরান্ধ ব্যক্তির চক্ষুঃ উন্মীলিত করাই গুরুর কর্ত্তব্য। বিরুদ্ধবাদীর তর্কজাল ছিন্ন করিয়া সত্যের চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াই পরম জ্ঞানী শঙ্করাচার্য্য বিশ্ববিজয়ী পণ্ডিত,—আচণ্ডাল অজ্ঞজনে মধুর হরিনাম বিলাইয়া, জগাই-মাধাইয়ের ন্যায় পাষণ্ডের প্রাণে ভক্তির উন্মেষ করিয়া, যবনের হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেম জাগাইয়া মহাপ্রভু প্রেমাবতার। আর শব্দে নেত্রপাত ভিন্ন তাহার অন্তর্নিহিত সত্যে প্রবেশলাভ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? শব্দই ব্রহ্ম,— "হরের্নামৈব কেবলম্",—বাক্যস্বরূপই ভগবান্। 'রাসলীলা' শব্দটি না থাকিলে তাহার তাৎপর্য্য বুঝাইবার জন্য প্রভুপাদের ন্যায় পণ্ডিতের প্রয়োজন হইত না। অতএব আমাদিগের ন্যায় অজ্ঞের বিবেচনায় স্বর্গত বঙ্কিমচন্দ্র, কেবল 'সখের পাঠক' না হইয়া, 'সুবুদ্ধি সমালোচক'সুলভ সূক্ষ্মানুসন্ধান দ্বারাই 'শ্রীরাধা'তত্ত্ব বুঝিতে ও অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

বঙ্কিম বাবু বলিয়াছেন—"ভাগবতে কোথাও রাধার নাম নাই।" কোথা আছে—দেখাইয়া দিলেই, তাঁহার কথার অযৌক্তিকতা সহজে সাধারণের বোধগম্য হইত। 'শ্রীকৃষ্ণরাস-লীলা'র দ্বিতীয় অধ্যায়ান্তর্গত দ্বাবিংশ শ্লোকে 'বধ্বাঃ' পদ পাওয়া যায় ; 'বধ্বাঃ' শব্দের সাধারণ অর্থ—বধূর, এ স্থলে কৃষ্ণান্বেষণতৎপরা গোপাঙ্গনাগণের অলক্ষিতা অন্য কোন গোপীর। প্রভুপাদ গোস্বামী মহাশয় স্বকৃত অন্বয়ে উক্ত পদের প্রতিশব্দ দিয়াছেন—'শ্রীরাধায়াঃ' এবং তাহারই উপর ভিত্তিস্থাপন করিয়া ঐ শ্লোকের ও উহার পরবর্ত্তী কয়েক শ্লোকের তাৎপর্য্য বিবরণে শ্রীরাধার অস্তিত্ব নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বিরুদ্ধবাদী সমালোচকের প্রতি 'সুবুদ্ধি' বিশেষণে ও 'সখের পাঠক' অভিভাষণে, শ্লেষবর্ষণ করিয়াছেন—তাঁহাকে 'অ-জহুরী বলিয়া অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেও দ্বিধাবোধ করেন নাই। এক 'ভাবনেত্র' ভিন্ন ঐ প্রতিশব্দের প্রকৃত প্রমাণ (authority) নিরূপণ করা যায় না, মূল গ্রন্থেও না, ভাষ্যকার পরম ভক্ত ও ভাবুকপ্রবর শ্রীধরস্বামীর টীকাতেও না। চতুর্বিংশ শ্লোকে আছে—

"অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ।"

কৃষ্ণান্বেষণতৎপরা গোপীগণ স্থির করিলেন, "সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ হরি এই গোপী কর্তৃক যথার্থই আরাধিত হইয়াছেন",—আর এইরূপ সিদ্ধান্তের হেতু নির্দ্দেশ করিলেন, "যেহেতু গোবিন্দ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া প্রীতচিত্তে ইঁহাকেই নির্জ্জন স্থানে লইয়া গিয়াছেন।" ইহার মর্ম্মার্থ প্রভুপাদ যথার্থ ই বুঝাইয়াছেন, —"যিনি বিশুদ্ধ প্রেমে ভগবানের যথার্থ আরাধনা করেন, তিনিই রাধিকা।" এ কথা বঙ্কিম বাবু কোথাও অস্বীকার করেন নাই, বরং 'রাধিকা' শব্দের ইহাই প্রকৃত ব্যুৎপত্তি বলিয়া স্পষ্টই লিখিয়াছেন,—"রাধ্ ধাতু আরাধনার্থে, পূজার্থে। যিনি কৃষ্ণের আরাধিকা, তিনিই রাধা বা রাধিকা।" কিন্তু ইহার দ্বারা এরূপ প্রতিপন্ন হইতেছে না যে, ভাগবতে বা উহার অন্তর্গত রাস-পঞ্চাধ্যায়ে, শ্রীরাধিকা-নাম্নী কোন গোপনারীর উল্লেখ আছে। প্রভুপাদকল্পিত একান্ত 'ভাবনেত্রে' না দেখিলেও বঙ্কিমচন্দ্র কেবল 'ভাগবতে রাধার নাম নাই' বলিয়াই নিশ্চিন্ত হয়েন নাই—তিনি কৃষ্ণলীলাত্মক যাবতীয় পুরাণেতিহাস মন্থনপূর্ব্বক দর্শন-তন্ত্রাদির সহিত সমন্বয়সাধন করিয়া "রাধার সৃষ্টিকর্ত্তা" নিরূপণে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন এবং বাস্তবিক সুবুদ্ধি সমালোচ-কের পরিচয় দিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—"আদিম ব্রহ্মবৈবর্ত্তেই রাধার প্রথম সৃষ্টি এবং সেখানে রাধা কৃষ্ণারাধিকা আদর্শরূপিণী গোপী ছিলেন, সন্দেহ নাই।" শ্লেষকটাক্ষের পরিবর্ত্তে প্রভুপাদ

কর্তৃক এই সিদ্ধান্তের যথারীতি খণ্ডন দেখিলেই আমরা কৃতার্থ হইতাম।

প্রভুপাদ স্বয়ং বলিয়াছেন,—"প্রেম নামক পদার্থই স্ত্রীজাতি * *; সুতরাং পুরুষই হউক আর নারীই হউক, যাঁহার হৃদয়ে ভগবৎপ্রেম পরিপূর্ণ হইয়াছে, তিনি রাধিকা।" বঙ্কিমচন্দ্রও তাহাই বলিয়াছেন,—যিনি রাধা শব্দের (এই) প্রকৃত ব্যুৎপত্তির অনুযায়িক হইয়া রাধারূপক রচনা করিয়াছেন, তিনিই রাধার সৃষ্টিকর্তা। তিনি ভাগবতকার নহেন, তাঁহার বহু পরবর্তী ব্রহ্মবৈবর্ত্তকার, তাঁহার রাধা শ্রীকৃষ্ণের "অর্দ্ধাংশ-স্বরূপা মূলপ্রকৃতি।" (১) যেমন রাধার সহিত একীভূত কৃষ্ণই শ্রীকৃষ্ণ, তদ্রূপ কৃষ্ণের সহিত একীভূতা রাধাই শ্রীরাধিকা। "রাধা ঈশ্বরের শক্তি; উভয়ের বিধিসম্পাদিত পরিণয়, (২) শক্তিমানের শক্তির স্ফূর্ত্তি; এবং সেই শক্তির বিকাশই উভয়ের বিহার।"

রূপকরচনার এই রহস্যভেদ নিতান্ত 'অ-জহুরী'রও হৃদয়ঙ্গম হয়, নচেৎ, কূটতার্কিক অবিশ্বাসীর কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং মহারাজা পরীক্ষিতের মনেও ঘোর সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল—"অখিল জগতের নিয়ন্তা যে ভগবান্ ধর্ম্মসংস্থাপন ও অধর্ম্মদমনের নিমিত্তই অংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ধর্ম্ম-মর্য্যাদার উপদেষ্টা, প্রণেতা ও সর্ব্বতঃ পালয়িতা সেই ভগবান্ ধর্ম্মবিরুদ্ধ পরদারাভিমর্ষণ করিলেন কেন?" ইহার উত্তরে শুকদেব যাহা বলিলেন, তাহাতে মহারাজা পরীক্ষিতের সংশয় দূর হইয়াছিল কি না—গ্রন্থে প্রকাশ নাই; কিন্তু অ-জহুরী ও অবিশ্বাসীর নগ্ন দৃষ্টিতে তন্মধ্যে প্রশ্নের মীমাংসা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বরং পঞ্চমাধ্যায়ের উনত্রিংশ শ্লোক হইতে ষট্‌ত্রিংশ শ্লোক পর্য্যন্ত শুকদেব যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে প্রতীত হয়, কৃষ্ণের ন্যায় তেজস্বী ব্যক্তিদিগের এইরূপ ধর্ম্মের ব্যতিক্রম ও দুঃসাহস দেখিতে পাওয়া যায় বটে, তবে তিনি (বা তাঁহারা) জিতেন্দ্রিয় বলিয়া তাহা দোষের নহে, অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির পক্ষেই তাহা পাপজনক; মহাপুরুষরা যেরূপ করেন, স্থলবিশেষে তাহা করণীয় হইলেও, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা তাহা না করিয়া তাঁহাদের উপদেশমত চলিবে; নিরহঙ্কার পুরুষদিগের, বিশেষতঃ সর্ব্বনিয়ন্তার পাপ-পুণ্য নাই; গোপগোপীদিগের অন্তর্য্যামী লীলাবিগ্রহধারী শ্রীকৃষ্ণের আবার বন্ধন কোথায়? ভগবান্ ভক্তদিগকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত নরদেহ ধারণ পূর্ব্বক ঐরূপ লীলা করিয়া থাকেন।

ইহা হইতে দুইটি কথা পাওয়া যায়। যথা—

"ভগবানের সব লীলা-খেলা,—
যত দোষ মানুষের বেলা!"

নচেৎ, নরদেহধারণের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যিনি স্বয়ং বলিয়াছেন—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।"

আর যিনি ইতঃপূর্ব্বেই গোপনারীগণকে বুঝাইলেন—

"অস্বর্গ্যমযশস্যঞ্চ ফল্গু কৃচ্ছ্রং ভয়াবহম্।
জুগুপ্সিতঞ্চ সর্ব্বত্র হ্যৌপপত্যং কুলস্ত্রিয়াঃ।
শ্রবণাদ্দর্শনাদ্ধ্যানান্ময়ি ভাবোঽনুকীর্ত্তনাৎ।
ন তথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিযাত ততো গৃহান্।"

তাঁহার প্রতি উপরিলিখিত গুণারোপ নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। আর দ্বিতীয় যাহাকে ইংরাজীতে বলে—

"Do what I say, but do not do what I do."

কিন্তু মহাজনোক্ত "Precepts require examples" কথা যে অধিকতর মূল্যবান্, তাহা কোনমতে অগ্রাহ্য করা যায় না। আদর্শের অসঙ্গতি-প্রযুক্তই বঙ্গীয় বৈষ্ণবসমাজে ব্যভিচার প্রবেশ করিয়া নেড়ানেড়ীর দল সৃষ্ট ও পুষ্ট হইয়াছে, পরকীয় রসের প্রলোভনে মুগ্ধা অনেক কুলকামিনীকেও আত্মবিহ্বল হইয়া কৃষ্ণঃপ্রেমবিতরণের অগাধ প্রেমতরঙ্গে নিষ্কামভাবে ডুবিয়া যাইতে দেখা ও শুনা গিয়াছে।

"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" বিশ্বাস করিয়াই, আর সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতকারীদিগের বিনাশসাধন এবং ধর্ম্মসংস্থাপন ও সংরক্ষণই শ্রীভগবানের নরদেহধারণের উদ্দেশ্য বুঝিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বগুণাধার আদর্শপুরুষ বলিয়াছেন। "যদি ইচ্ছাময় ইচ্ছাপূর্ব্বক মনুষ্যশরীর ধারণ করেন, তবে দৈবী বা ঐশী শক্তির প্রয়োগ কদাচ তাঁহার উদ্দেশ্য ও অভিপ্রেত হইতে পারে না",—যাঁহার শক্তিবলে চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত হইতেছে, তাঁহাকে অনৈসর্গিক উপায়াবলম্বনে শক্তির পরিচয় দিতে হয় না, এই সুদৃঢ় যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া তিনি পুরাণাদির মধ্যে যাহা অতিপ্রকৃত, প্রক্ষিপ্ত ও মিথ্যার লক্ষণযুক্ত বুঝিয়াছেন, তাহা বর্জ্জনপূর্ব্বক সত্যে পৌঁছিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাকে বা তাঁহার মতানুসারীকে 'সুবুদ্ধি সমালোচক', 'সখের পাঠক' বা 'অ-জহুরী' আখ্যায় তাচ্ছীল্য না করিয়া শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও সুবিচারপদ্ধতি অনুসারে তাঁহার যুক্তির খণ্ডন ও উক্তির ভ্রমাপনোদন করাই আমরা প্রকৃত তত্ত্বানুসন্ধিৎসুর কার্য্য মনে করি।

শ্রীপাঁচকড়ি ঘোষ।

(১) ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ। শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড, ১৫।৬৭।

(২) ব্রহ্মবৈবর্ত্তের মতে রাধিকা (রায়াণপত্নী নহেন) বিধিবিধানানুসারে কৃষ্ণের বিবাহিতা পত্নী।

অভিসারিকা

১

অতি ঘোর অন্ধকার। অমানিশা মেঘে ঢাকা। অতি নিবিড় মেঘ, কোলে কোলে বিদ্যুৎ শিহরিতেছে। বজ্রগর্ভ মেঘ প্রসব-কাতরা প্রসূতির ন্যায় মাঝে মাঝে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিতেছে। অশান্ত বাতাস প্রান্তরময় হাহাকার করিয়া ফিরিতেছে। সন্ধ্যার পর এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। পল্লীপথ পিচ্ছিল। কয়েকবার পদস্খলন হইবার পর চন্দ্রনাথ চলিতে চলিতে ভাবিতেছিলেন, আমার নামটা যদি সার্থক হ'ত, সারা পথ আলো ক'রে যেতুম। আপনার রসিকতায় আপনি একটু হাসিলেন।

রাত্রি এক প্রহর অতীত হইয়াছে। গৃহদ্বারে ঘা দিতেই আলোক হস্তে গৃহিণী আসিয়া তাড়াতাড়ি কপাট খুলিয়া দিলেন। তাঁহার দৃষ্টি পড়িল স্বামীর সাজ-সজ্জার উপর।

ও-মা, এ কি! একেবারে যে কাদা মেখে ভূত সেজেছ! নেশা করেছ না কি?

ভোরপুর।

নাও, এখন রসিকতা রাখ। ঘরে চল, কাপড় ছাড়বে। টেরেণ ফেল্ হবে ব'লে সেই ত সাত-সকালে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলে। একখানা বাতাসা মুখে দেবার সময় হ'ল না। ফিরলে একপোর রেতে। কিছু খেয়েছ?

খুব।

কি খেয়েছ?

আছাড়।

কেন?

দেখলুম খেয়ে, কেমন লাগে।

তা বেশ! এখন কাপড়-জামা ছেড়ে ফেল। গা মোছ। আগে পা ধোও।

যথাদিষ্ট সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া চন্দ্রনাথ কক্ষে বসিলে গৃহিণী পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, হ্যাঁগা, ছেলে দেখলে কেমন?

তা মন্দ কি! সখের যাত্রায় ভাঁড় সাজে। তাদের আখড়া ওদের বাড়ী থেকে প্রায় এক ক্রোশ দূরে। তাঁকে ডাকতে পাঠান হ'ল। তিনি যাই যাই ক'রে যখন ফিরলেন, তখন বিকেলের ট্রেণ বেরিয়ে গেছে।

হ্যাঁগা, সারাদিন বসিয়ে রাখলে, একটু জলও খাওয়ালে না?

জল? তাদের পুকুর থেকে দু-আঁজলা খেয়ে এসেছি।

কোথাকার চামার! আহা, ক্ষিদেয় তেষ্টায় কি কষ্টই পেয়েছ!

মেয়ের বাপের আবার কষ্ট!

যা হবার হয়েছে। এখন দুটি ভাত মুখে দাও। ওগো, ও রাজকন্যে!

রাজকন্যে ওরফে সুশীলা তাঁর সতীন-ঝি।

চন্দ্রনাথ একটু হাসিয়া বলিলেন, আবার নূতন নাম বেরুল বুঝি? কেন, 'রাক্ষুসী,' 'ডাইনী' ত বেশ ছিল!

তাদের মত কি ত বললে না?

মত—ছেলে বে করবেন না। পাড়ায় খবর নিলুম, তাঁর একটি আস্তানা আছে, সেইখানেই রাত কাটান্।

পোড়া কপাল অমন সম্বন্ধের—বলিয়া গৃহিণী পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে হাঁক দিলেন, ওগো ও বাদ্শাজাদি, ছোট লোকের কথা কাণে উঠছে না?

খিড়কী হইতে অতি সুমিষ্ট স্বরে সাড়া আসিল, যাই নতুন-মা।

চন্দ্রনাথের মনে হইল, তাঁহার ক্ষুধা-তৃষ্ণা-ক্লেশ, সব যেন নিমেষে জুড়াইয়া গেল। কিন্তু নতুন-বৌ ভিন্ন মত প্রকাশ করিলেন—গলা শুনছ, যেন হুতুম-পেঁচা ডাকছে। সংসারের মঙ্গল হবে! লক্ষ্মী বলে বাপ-বাপ ক'রে পালাই।

এইবার তাঁহার কণ্ঠ সপ্তমে চড়িল—ওলো ও সর্ব্বনাশী!

এই পোড়াখানা মেজে যাই, মা।

বলি, সারাদিন খায়নি, তার হিসেব আছে?

চন্দ্রনাথ বলিলেন, নতুন-বৌ, এই আঁধার রেতে একলা খিড়কীর ঘাটে পোড়া মাজতে গেছে! এ ত ভাল কায হয় নি।

নূতন-বৌ ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন, আমি পাঠিয়েছি? পৈ পৈ ক'রে বারণ করেছি, ওলো সোমত্ত বয়েস, সন্ধ্যের পর একলা দোকলা খিড়কীতে যাস্নি। তা দাসী-বাঁদীর কথা কি রাজরাণী শোনেন!

চন্দ্রনাথ পত্নীর ঝঙ্কারে বুঝিতেছিলেন যে, বেসুর বাজিতেছে। কেবলমাত্র বলিলেন, সন্ধ্যের আগে সারা হয় না!

হবে না কেন? বিকেলবেলা সময় কোথা? ওঁর সৈ আসবে, শুয়ে এড়িয়ে-গড়িয়ে গল্প ক'রে তবে ত সংসারের কায হবে? তা না হয়, কাল থেকে আমিই মাজব।

গৃহিণী কথাটি গোপন করিলেন। আজই বৈকালে যে তাঁর পিত্রালয়ের দল আসিয়া চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় পরিপাটীরূপে ভোজন করিয়া গিয়াছে। সুশীলা একা রাঁধিয়া বাড়িয়া সকলকে পরিবেষণ করিয়া তার পর বাসন মাজিতে বসিয়াছে, স্বামী সে কথা ক্ষুণাক্ষরেও জানিতে পারিলেন না। এই সময় ভিজা কাপড়ে ভাতের থালা হাতে একখানি সচল লক্ষ্মীপ্রতিমা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। গৃহিণী অমনি বলিয়া উঠিলেন, ও মা, কোথাকার অলক্ষ্মী এসে জুটেছে গো! এড়া সক্‌ড়ী পোড়া মেজে সেই কাপড়ে হাঁড়ি-কুড়ি সৃষ্টি মজালে! আ আমার পোড়াকপাল! এই সে দিনে গেরণে হাঁড়ি ফেলেছি। আবার মজালে!

আবার হাঁড়ি কেন ফেল্‌তে হবে, নতুন-বৌ! দেখছ না ভিজে কাপড়। যাও, মা, তুমি কাপড় ছাড় গে।

দেখ, আমার কাছে স্পষ্ট কথা। আমার অত রস নেই যে শুক্‌নো কাপড়কে আমি ভিজে দেখব! তুমি ত তোমার আদরের মেয়ের জন্যে ওকালতি করবেই!

কিন্তু সমস্ত দিনের ব্যর্থতায়, ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় কর্ত্তারও মেজাজ আজ তিক্ত হইয়াছিল। নহিলে তিনি গৃহিণীর সহিত বাদানুবাদ করিতেন না। জানিতেন, তাহাতে সুশীলার উপর নির্য্যাতনের মাত্রা বাড়িবে বৈ কমিবে না। কিন্তু আজ হঠাৎ তাঁর মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, কি আশ্চর্য্য! আমি স্বচক্ষে দেখলুম, গা-কাপড় দিয়ে টস্‌ টস্‌ ক'রে জল ঝরছে, আর তুমি বলছ শুক্‌নো! এই ঠাণ্ডা রেতে মেয়েটা পুকুরে গা ডুবিয়ে এল, এখন নিউমোনিয়া না হ'লে বাঁচি!

গৃহিণী গজ্‌গজ্‌ করিয়া বলিতে লাগিলেন, সোয়ামী-খাগীর আবার নিমোনিয়া!

সুশীলা ভাতের থালাটি পিতার সম্মুখে ধরিয়া দিয়া অন্তরাল হইতে তাঁহার আহার লক্ষ্য করিতে লাগিল, যদি কিছুর প্রয়োজন হয়।

সুশীলা যাহাতে তাঁহার মন্তব্যটা ভাল করিয়া শুনিতে পায়, সেই জন্য নূতন-বৌ অপেক্ষাকৃত উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, ওঃ, ভয়ে ত ম'রে গেলুম, সোয়ামীখাগীর নিমোনিয়া হবে!

চন্দ্রনাথ বলিলেন, বাঃ, কি যে বল, নতুন-বৌ! মিত্তিরদের বিধবা মেজ বৌ তা হ'লে ম'ল কেন?

সে বুকে সর্দ্দি জ'মে।

চন্দ্রনাথ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, তারই নাম তাই। কি চক্ষে যে তুমি ওকে দেখেছিলে, নতুন-বৌ!

নূতন-বধূ আরও গরম হইয়া উঠিলেন। শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, তা দেখব কেমন ক'রে! আমার কুঁচের মতন চোখ, কোটরচোখী, আমি তোমার ঐ জগদ্ধাত্রী-প্রতিমা কি দেখ্‌তে পাই!

রাগ কোর না। ওর অপরাধ কি?

তবে শুন্‌বে অপরাধ! ও জন্মাতে তোমার চাকরী গেল।

সে ওর জন্যে নয়। আপিসে নতুন সায়েব এল, তারই দুর্ব্যবহারে আমি চাকরী ছেড়ে দিলুম। ভেবেছিলুম, দেশে যে জমী-জমা আছে, তাতে মোটা ভাত, মোটা কাপড় এক রকম চ'লে যাবে। তাতে ওর অপরাধ কি?

ডাইনী তার পর মাকে খেলে!

চন্দ্রনাথ একটু রসিকতা করিয়া এ অপ্রিয় প্রসঙ্গ নিবৃত্তি করিবার নিমিত্ত বলিলেন, সেটা কিছু মন্দ করে নি। তা নইলে ত তোমাকে পেতুম না।

দেখ, সব সময় ঠাট্টা ভাল লাগে না! অপরাধ! জমী-জমা-ভিটে বন্ধক রেখে বে দিয়েছিলে কার? পাঁচ হাজার টাকা খরচ ক'রে রাজা জামাই করলে, তেরাত্তির না হ'ক, তিনটি বছর পেরুল না, রাক্ষুসী সীঁতের সিন্দুর, হাতের নো খসিয়ে বাপের ঘর আলো করতে এলেন। অমন মেয়েকে ঝাঁটা মেরে বিদেয় করতে হয়!

চন্দ্রনাথ ক্রমে ক্রমে গরম হইতেছিলেন। বলিলেন, বিদেয় করবে কোথা শুনি?

কেন, ওর দেওর রয়েছে, তার কাছে যাক্‌ না।

সে কুচরিত্র মাতালের কাছে? নতুন-বৌ, সোমত্ত বিধবা মেয়ে, তা সে সুন্দরীই হ'ক্‌ আর কুৎসিতই হ'ক্‌, বাপ-মায়ের বুকের কাঁটা। বরং হাসতে হাসতে

ওকে আগুনে তুলে দোব, তবু সেই নেশাখোর চরিত্র-হীনের কাছে পাঠাতে পারব না।

ওঃ, কি আমার সতীর মেয়ে সতী এয়েছেন গো!

দেখ, নতুন-বৌ, যে ম'রে গেছে, তাকে নিয়ে গেল্‌না-চর্চ্চা কোর না। এ কথা আর যেন না বল্‌তে হয়, সাবধান!

কি, মার্‌বে না কি?

দেখ, গায় হাত দেওয়া দূরে থাক, একটা কড়া কথা কখন তোমাকে বলেছি? আজ তুমি ক্রমাগতই খোঁচা দিচ্ছ। দিন-রাত উঠ্‌তে-বস্‌তে লাঞ্ছনা! মুখটি বুজে সারাদিন খাটছে! খেলে কি না-খেলে, তুমি ত রাখই না, আমিও খবর রাখিনি। এমন দিন গেছে, আমি ওর মুখে তুলে না দিলে খাওয়াই হ'ত না।

তাই না হয় দাও! আমি ত বারণ করিনি। খবর কি রাখতে হবে? রাজরাণী খাবেন, সামনে ব'সে পাখা দিয়ে ভাতের মাছি তাড়াতে হবে, না, খড়কে আঁচাবার জল যুগিয়ে দোব? হা ভগবান্! আমার অদৃষ্টে এত খোয়ার ছিল! বলিয়া নূতন-বৌ নারীর ব্রহ্মাস্ত্র ত্যাগ করিলেন। চন্দ্রনাথ বলিলেন, আহা, কাঁদ কেন?

কে শুনে! নূতন-বৌ কপালে ও গণ্ডদেশে করাঘাত করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, হে হরি, আমার কপালে এই ছিল! সতীন-ঝির দাসীবৃত্তি করতে হবে! হে মা দুর্গা, আমার কপালে এত খোয়ার! হে মা কালি, আমার মরণ হয় না!

চন্দ্রনাথ ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। আহা, কি কর, কি কর।

এই সময় সুশীলা সহসা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, বাবা, আর ছুটি ভাত দোব?

চন্দ্রনাথ সুশীলার প্রতি অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলি-লেন, ভাত দেবে, না, আমার পিণ্ডি দেবে! হতভাগী, এত লোক মরছে, তোর মরণ হয় না! আমার হাড় জুড়োয়!

বলিতে বলিতে চন্দ্রনাথের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। চোখ দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

সুশীলা কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ভাবিতে লাগিল, এই যে তার লাঞ্ছনা, কেন? কোথায় তাহার অপরাধ? সে যে অল্পবয়সে মাতৃহীন হইয়াছে, সে কি তাহার অপরাধ? পিতা যে বিষয় বন্ধক দিয়া তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন, সে কি তার দোষ? যৌবনের কোন সাধ, কোন আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না হইতে তাহার যে সব ফুরাইয়া গেল, বিধাতা তাহাকে বৈধব্য-বেশ পরাইয়া দিলেন, এ কি তার ত্রুটি? সংসারে সে যে কেবল দু'টি ভাত-কাপড়ের প্রত্যাশায় খাটিয়া খাটিয়া অস্থি পিষিয়া ফেলিয়েছে, সকলের লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহিয়া সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে, এই তার দোষ? পাঁচী যে কুৎসিত, কদাকার, সেও তার অপরাধ? না না, এ সংসারে জন্মই তাহার মহা অপরাধ!

তাহাকে নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া চন্দ্রনাথ তীব্রকণ্ঠে বলিলেন, দাঁড়িয়ে রইলি যে! দূর হ, বেরো! চক্ষুশূল!

সুশীলা এক ফোঁটা চোখের জল ফেলিল না, অশ্রুর উৎস তাহার শুকাইয়া গিয়াছিল। ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

স্বামী যে স্ত্রীর উপর অভিমানে সুশীলাকে তিরস্কার করিলেন, নূতন বধূর এ কথা বুঝিতে বাকি ছিল না। তথাপি এই সূত্রে সন্ধি করিবার সুযোগও তিনি ছাড়িলেন না। বলিলেন, কিছুই খেলে না যে! তুমি যদি মাঝে মাঝে এমনি ক'রে একটু একটু ধম্‌কাও, ও খাণ্ডারণী সজুত থাকে।

চন্দ্রনাথ স্ত্রীকে শান্ত হইতে দেখিয়া বলিলেন, সে ভার ত তোমাকেই আমি দিয়ে রেখেছি। তোমার কথার ওপর আমি কোন কথা কই? কি জানো নতুন-বৌ, দু'জনে শাসন করলে যদি মনের ঘেন্নায় গলায় দড়ি দেয়, কি জলেই ডোবে?

ও মা, তোমার বুঝি সেই ভয়? মনের কোণেও ঠাঁই দিয়ো না, ও মরবে! তোমার বিষয়ে ত পাঁচীর অর্দ্ধেক ভাগ, তাই নেবে ব'লে দিন-রাত পাঁচীর মরণ কামনা করছে।

সত্যি না কি! কিন্তু সেবার পাঁচীর ব্যায়রামেও ত আহার-নিদ্রা ত্যাগ ক'রে সেবা করেছে।

পুরুষমানুষ, তোমরা মেয়েমানুষের মন বুঝবে কি ক'রে? সেবা করেছে লোক-দেখানে। তুমি ওকে মাঝে মাঝে ধোম্‌কো দিকি।

কি জান, নতুন-বৌ, দু' জনে প'ড়ে লাঞ্ছনা করলেও যদি পথেই গিয়ে দাঁড়ায়!

এমন রাজ-ঐশ্বর্য্য ছেড়ে তেমন কুমতি যদি হয়, ভিক্ষে ক'রে খাবে। বাঁশ-গাছের বাঁশ সব কি ঝাড়ে থাকে!

নূতন-বৌ মনে মনে প্রার্থনা করিলেন, হে হরি, এমন দিন কি হবে, ও পাপ বিদেয় হয়ে যাবে! পথে কখনই দাঁড়াবে না। কখন না। রাগ ক'রে বড় জোর একটা রাত আমাদের সেই পোড়ো বাড়ীখানায় গিয়ে প'ড়ে থাক্‌বে। কি দস্যি মেয়ে বাবা, ভয়-ডর নেই। সেটা ভূতের বাড়ী। তিনটে গলায় দড়ি দিয়ে, দুটো বিষ খেয়ে মরেছে। তারা সব সেখানে বাসা বেঁধে আছে। সেইখানে গিয়ে প'ড়ে থাকবে। উনি যাবেন সেধে পেড়ে আনতে। এবার আর তা হ'তে দিচ্ছিনি।

পরে স্বামীকে নিরতিশয় কোমল কণ্ঠে বলিলেন, সারাদিন ঘুরেছ, আছাড় খেয়েছ, শোও দিকি, একটু গা-হাত-পা টিপে দি। কত ব্যথা হয়েছে।

২

ইহার দুই তিন দিন পরে প্রকাণ্ড এক কুষ্মাণ্ড হস্তে চিনে পাগলা উঠানে আসিয়া ডাকিল, কৈ গো মা লক্ষ্মী কোথায়? ওরে পেঁচী, তোর দিদিমণি কৈ রে?

নূতন-বৌ কক্ষের বাহির হইয়া বলিলেন, মুখে আগুন মিন্‌ষের! তুই আমার মেয়েকে পেঁচী বলিস্ কেন রে?

তবে কি বল্‌ব? পেঁচা? পেঁচা ত পুরুষ, দিদিমা!

দিদিমা কি রে মিন্‌ষে? আমি কি বুড়ো হাবড়া যে দিদিমা!

তবে কি বলব—দোদমা? তা-ই হবে, দোদমা! এখন আমার মালক্ষ্মী কোথায় বল?

মালক্ষ্মী না আলক্ষ্মী! মুখপোড়া, হতচ্ছাড়া প্রভৃতি মিষ্টভাবে সম্ভাষণ করিতে করিতে নূতন-বৌ হাঁকিলেন, ওগো রাজরাণি! তোমার রাজপুত্তুর এসেছে।

দোদমা, তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক! মা আমার রাজরাণীই বটে!

ইহার উত্তর নূতন-বধূর ওষ্ঠাগ্রে আসিয়াছিল, সামলাইয়া লইলেন, পাছে কুমড়াটা বেহাত হইয়া যায়! বিশেষ তিনি কুষ্মাণ্ডের পক্ষপাতী। সুশীলা আসিতেই বলিলেন, ঐ নাও, তোমার রাজপুত্তুর সওগাদ এনেছেন।

সুশীলা বাসন নামাইয়া, কুমড়াটি হাতে লইয়া বলিল, বাবা, ভাল আছ?

ভাল ছিলুম না, মালক্ষ্মি, তোমাকে দেখে ভাল হলুম। ভাল ক'রে মুখখানি তোল, দেখি!

সুশীলা মৃদু হাসিয়া চিনুর মুখের পানে চাহিল।

চিনে পাগলা বলিল, ব্যস্! আজকের দিন কিনে নিলুম! এক মুঠো চাল বেশি নিয়ো, মালক্ষ্মি, আর কুমড়োর ছেঁচকী কোর।

কচি কুমড়ার ছেঁচকী নূতন বৌ ভালবাসেন, চিনে পাগলা তাহা জানিত।

নূতন-বৌ একটু সদয় হইয়া প্রসন্ন স্বরে বলিলেন, হ্যারে চিনু! হেথা সেথা ঘুরে বেড়াস্, আমার পাঁচুমণির একটা বর সন্ধান ক'রে দিতে পারিস্ নি?

তবে আর সাত-তাড়াতাড়ি কুমড়ো হাতে ক'রে এলুম কি করতে, দিদি? ফল হাতে এলে সুফল হয়, জান না? বর আমি ঠিক করেছি।

কোথায় রে?

এই গ্রামে। তোমায় বেশি দূর যেতে হবে না।

এই দেখ! কাযের মানুষ নৈলে হয়! আর আমাদের কর্ত্তা সে দিন উপস ক'রে, আছাড় খেয়ে চিৎপাত হয়ে এসে পড়লেন।

আরে রাম রাম! কর্ত্তার কথা ক'য়ো না, দিদি! কোন কর্ম্মের নয়! বিষয়-বাড়ী বাঁধা দিয়ে পাঁচ পাঁচ হাজার টাকা খরচ ক'রে রাজা জামাই ঘরে আন্‌লেন! পাঁচুমণির বে-তে তারা ছাড়বে কেন? এখন তাল সামলাও!

আচ্ছা, দেনা-পাওনার কথা পরে হবে, তারা মেয়ে দেখুক ত!

মেয়ে তারা দেখেছে, দিদি! ও পাড়া-বেড়ানী মেয়েকে আর কে দেখেনি! দিদি, কর্ত্তার ত আর সিকি পয়সার মুরদ নেই। প্রজারা ধান-চাল তরি-তরকারী দিচ্ছে, তাই কোন রকমে ডান হাত চলছে। তুমি তোমার দাদার কাছে যাও। তোমার অমন রাজা ভাই, হাতে-পায়ে ধ'রে দায় উদ্ধার কর। কিন্তু দিদি, পাঁচুমণি নাম রাখা তোমার ভাল হয় নি। আজকালকার ছেলেরা ও-সব নাম পছন্দই করে না!

কি নাম চায় তারা?

সে তুমি উচ্চারণই করতে পারবে না!

তবু বল্ না।

তারা চায় কি রকম জান?—রকম-ঝমক-ঠাট-ঠমক-চাঁদ-চমক-চৌদানী কন্যে উচ্ছুগ্গু করবার সময় কর্ত্তা উচ্চারণ করতে পারবে না। এই এত বড় নাম দাও, তার ওপর একটি কাঁড়ি টাকা!

নূতন-বৌ সভয়ে বলিয়া উঠিলেন, ওরে বাস্ রে। চৌদানী চায়?

চিনে বলিল, তুমি পাঁচু নাম রাখতে গেলে কেন?

কি করব, দাদা? পঞ্চানন্দের ওষুধ খেয়ে হয়েছিল।

ওঃ, তাই!

তা-ই কি বল্?

যেমন দেবতা, তেমনি রূপ দিয়েছেন। যদি মেয়ে হবার জন্যে কার্ত্তিকপূজ করতে, ময়ূরের মত রূপ হত! প্যাকম ধ'রে রসলে বর অমনি হুমড়ি খেয়ে পড়ত! নাম জিজ্ঞাসা করলে যখন ক্যাঁও ক'রে ষড়জে আওয়াজ ছাড়ত, বরের চোদ্দ পুরুষ মূচ্ছ যেত না? তুমি গেলে পঞ্চানন্দের দোরে! বড় দুঃখেই বল্‌ছি, দিদি! তারা বল্‌লে—

চিনে চোখ মুছিতে লাগিল।

কাঁদিস এখন। কি বললে, বল্ না?

চিনু সরোদনে কহিল, সে আর তোমার শুনে কাষ নেই, দিদি! তুমি টাকার যোগাড় করতে তোমার রাজা-দাদার কাছে যাও।

বল্‌ছে ত নন্দ নয়। সিকি পয়সার যোত্তর নেই, আবার বলেন ভিক্ষে করব!

চিনু জানিত, এই রাক্ষসীকে দিন কয়েকের জন্ত সরাইলে তাহার স্নেহময়ী মালক্ষ্মী অন্তত কয়েক দিনও স্বস্তি-শান্তিতে থাকিবে। বলিল, ও সব কথা শোন কেন, দিদি! তুমি সেখানে হ'ড়ে-প'ড়ে থেকে, হাতে-পায় ধ'রে পাঁচ-সাত হাজার আদায় ক'রে আনো দিকি।

নূতন-বৌ সবিস্ময়ে বলিলেন, পাঁ—চ—সা—ত—হা—জা—র! সে কত রে?

বেশি নয়। হাজার টাকার সাতখানা নোট।

তারা অত নেবে?

খুব নেবে।

তারা কি বলেছে, বল্ না?

নেহাতই শুন্‌বে? তারা বল্‌লে, বরাভরণ, দানসামগ্রী, ফুলশয্যা যা দেন, দেবেন। মেয়েকে দুধ-ঘি খাইয়ে খোদার খাসী করেছেন, সে মাংস ঝরাবার জন্যে এক হাজার চাই। দাঁত উঁচু—তার জন্যে এক হাজার ধ'রে দিতে হবে। খাঁদা নাকের ওপর এক হাজার। চোখের কোটর বোজাবার জন্য হাজার। আর আল্‌কাতরা রং—ঘষতে-মাজতে সাবানই পড়বে এক হাজার।

ও মা, মুখপোড়া বাড়ী বয়ে অপমান করতে এয়েছে!

তা আমায় বল্‌লে কি হবে, দিদি! গাল দাও পঞ্চানন্দকে—যিনি মেয়ে দিয়েছেন।

ঠাট্টা করতে এয়েছ?

এইবার দিদি হাসালে! কুমড় হাতে ক'রে কেউ ঠাট্টা করতে আসে?

তবে কি করতে আসে রে পোড়ারমুখো?

ছেঁচ্‌কী খেতে।

তোর কপালে আগুন আর তোর ছেঁচ্‌কীর কপালে আগুন!

এই সময় চন্দ্রনাথ প্রবেশ করিয়া বলিলেন, বাড়ী যে বেজায় সরগরম দেখছি! আরে, শ্রীনিবাস যে! কোথায় ছিলে এত দিন?

কল্‌কেতায়।

কল্‌কেতায় কেন হে?

পোলাও খেতে। হাঁ! খাওয়ালে বটে! এক-এক চাম্‌চে দেড়শো টাকা! সে কি, ভায়া, আমাদের পেটে তলায়! সব উগ্‌রে দিলুম।

ভাল! আরে বাঃ! নতুন ছাতা যে!

আরে না না! এ সেই পুরণোটা।

পুরণো কি রকম? বাঁট-কাপড় সব চক্‌চক্ করছে নূতন।

তা ত করবেই, ভায়া! সেই সে বছর বাঁট বদ্‌লেছিলুম। তার পরের বছর শিকগুলো। গত বছর কাপড় বদলেছি। এবার যশোদা বোসের বাড়ীতে পোলাওএর নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে সবটাই বদ্‌লে আন্‌লুম।

চন্দ্রনাথ হাহা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, তা বেশ করেছ!

নূতন-বৌ খুব ঝাঁঝালো কণ্ঠে কহিলেন, ও পোড়ারমুখো যাচ্ছে তাই বল্‌লে আর তুমি হাহা ক'রে হাস্‌ছ?

আরে ও পাগল।

পাগল না হাতী।

কিন্তু নূতন-বৌ মুখে যা-ই বলুন, মনে মনে পাগলের একটি কথা জপ করিতে লাগিলেন। রাজা ভাই, হ'ড়ে প'ড়ে, হাতে পায় ধ'রে টাকা আদায় ক'রে আন।

তিনি পরের পরদিনই পাঁচীকে লইয়া পিত্রালয়ে যাত্রা করিলেন। স্বামীর কাছে টাকার কথা ভাঙ্গিলেন না। দাদা যদি মুখ রক্ষা করেন, তখন একচোট হাত-মুখ নাড়িবেন। এক ভয়, সুশীলা যদি যত্নে আদরে কয়েক দিনের মধ্যে পিতাকে বশ করিয়া ফেলে। তা করুক, তিনি ত আর জন্মের মত যাইতেছেন না।

চন্দ্রনাথও যাত্রার সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, কিন্তু কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন না। সংসারের সকল দিকেই তাঁহার উৎসাহের অভাব। ঋণভার, কন্যাদায়, অপ্রিয়-বাদিনী ভার্য্যা, আর সর্ব্বোপরি সুশীলার উপর নিরর্থক নির্যাতন হেতু তিনি অন্তরে অন্তরে পলাই-পলাই ডাক ছাড়িতেছেন। কিন্তু পথ নাই!

স্বামী কোন প্রশ্নই করিলেন না। তথাপি নূতন-বৌ আপনা হইতেই বলিলেন, ও সোয়ামীখাগী এখানে থাকতে সব সম্বন্ধ ভেঙ্গে যাবে।

চন্দ্রনাথ গম্ভীর হইয়া বলিলেন, ও ত আর ভাংচি দেয় না।

ভাংচি দেয় না? কেউ দেখতে এলে যত বলি স'রে যা, হতচ্ছাড়ী ততই ছোঁক-ছোঁক ক'রে সেইখানে ঘুরবে। আমরা কিছু বুঝি নি বটে!

সুশীলা বিমাতাকে প্রণাম করিতে আসিলে নূতন-বৌ ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন, এই অযাত্রা! যাচ্ছি একটা শুভকাযে, সোয়ামীখাগী সামনে এসে দাঁড়ালেন। দূর হ!

সুশীলা নীরবে প্রস্থান করিলে নূতন-বৌ চন্দ্রনাথকে বলিলেন, দেখলে আক্কেল! অমনি ছোঁক-ছোঁক ক'রে ঘোরে। দুর্গা দুর্গা বলিয়া তিনি আঁচলে বাঁধা সিদ্ধি ও পঞ্চানন্দের ফুল-বিল্বপত্র পাঁচীর ও আপনার কপালে ঠেকাইয়া গাড়ীতে উঠিলেন।

নূতন-বৌ প্রস্থান করিবার পর বহির্দ্বারে ঘা পড়িল, চন্দ্রনাথ আছ?

চন্দ্রনাথের বুকটা একবার চমকিয়া উঠিল। তথাপি তিনি উৎসাহ প্রদর্শন করিয়া ডাকিলেন, কে রায়-মশায়, আসুন, আসুন!

রায়-মহাশয় গ্রামের জমীদার রমণ চৌধুরীর দেওয়ান। উঠানে দাঁড়াইয়া বলিলেন, আর বসব না। বড় অপ্রিয় কাযে এসেছি, ভাই! চৌধুরী মশায় ত আর থামতে চান্ না। তখন যদি জমী-জমা-ভিটে বাঁধা না রেখে বেচে ফেলতে, এখন সর্ব্বস্বান্ত হতে হ'ত না! চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ! এই ক'বছরে ডবলে দাঁড়িয়েছে। এখন টায়টোয় যদি সুদে আসলে আদায় হয়।

দাদা, তখন সব বেচে ফেল্‌লে দাঁড়াতুম কোথা? পেট চল্‌ত কি ক'রে?

সবই হ'ত, ভায়া! ভগবান্ সকলের উপায় করেন, তোমারও করতেন! বেচে-কিনে হাতে কিছু নগদ থাক্‌ত। বাড়ীখানা বাঁচত। একখানা দোকান-পাট কি তেজারতি করেও চ'লে যেত।

দাদা, দুঃসময়ে দুর্ব্বুদ্ধিই হয়; তখন যদি আপনার কথা শুন্‌তুম!

কিন্তু যে উদ্দেশ্যে চন্দ্রনাথ এই চাটুবাক্য প্রয়োগ করিলেন, তাহা সিদ্ধ হইল না। রায় মহাশয় বলিলেন, সে যা হবার হয়ে গেছে। এখন উপায় করছ কি?

দাদা, আর কিছু দিন সময় পাওয়া যায় না?

মিছে। তা'তে ফল কি? সময় পেলেই বা উপায় কি করবে? উনি ত বল্‌ছেন, এক সপ্তার ভেতর টাকা না দিলে ফোর্‌ক্লোজ করবেন।

এক সপ্তা! তাই ত দাদা, কি হবে?

কি বল্‌ব, ভাই! আমি এখন চল্লুম। কায ফেলে এসেছি।

সুখবরটি দিয়া রায় মহাশয় তাড়াতাড়ি প্রস্থান করিলেন।

চন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া উঠানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার মুখ অতি ভীষণ হইয়া উঠিল। তিনি রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়া সুশীলাকে বলিলেন, শুন্‌লে ত? রায় মশায় যা ব'লে গেলেন? আর সাত দিন মেয়াদ! তার পর গাছতলা! সর্ব্বনাশী! তো হতেই আমার এই সর্ব্বনাশ! মুখের পানে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে দেখছিস কি? কথা বুঝতে পারছ না? সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ! বুঝেছ?

শ্বশুরবাড়ীতে স্বামী খেয়ে পেট ভরেনি! এখানে এসেছ আমায় খেতে! মেয়ে ত নও—কালসাপিনী! আমি আর দুধ-কলা দিয়ে পুষতে পারব না। তুমি বিদেয় হও।

সুশীলা পিতার দুই পদ জড়াইয়া ধরিয়া অতি কাতর কণ্ঠে কহিল, বাবা, আমি অনাথা, কোথায় যাব?

পা ছাড় হারামজাদি! তোর স্পর্শে বিষ, নিশ্বেসে বিষ। সেই বিষে আমার অমন জামাই ম'ল! ডাক্তারও সন্দেহ করলে—বিষ খেয়েছে। হতভাগী! যেখানে যাবি, দাউ দাউ ক'রে আগুন জ্ব'লে উঠবে। ইটে-ভিটে বন্ধক দিয়ে তোর হিল্লে ক'রে দিলুম। রাজপুত্তুর স্বামী—রাখতে পারলি নি? সেখানে চিতের আগুন জ্বালিয়ে দিলি!

উত্তর দিবার জন্য সুশীলার ঠোঁট দুখানি একবার কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু দাঁতে দাঁত চাপিয়া জ্বলন্ত উনানের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

চন্দ্রনাথ চাপা সুরে আবার গর্জ্জিতে লাগিলেন, কোথা যাবে? হাটে বাজারে, যেখানে ইচ্ছে। পাচী মামার বাড়ী ঢুকেছে। তুমি তিন কুল খেয়েছ। এখন তোমার পথ তুমি দেখ। আমি বিবাগী হয়ে বেরুই। নতুন-বৌ ত বলে মিথ্যে নয়। অপয়াকে যে আশ্রয় দেবে, তারই সর্ব্বনাশ হবে। ভাত চড়িয়েছ? গাণ্ডে-পিণ্ডে পিণ্ডি গিলবে? এই গেলাচ্ছি!

চন্দ্রনাথ ফুটন্ত ভাতের হাঁড়ী পদাঘাতে ভূমিসাৎ করিলেন। সুশীলা পাথরের মূর্ত্তির মত বসিয়া রহিল।

ঐ দিন সন্ধ্যার সময় সুশীলা তাড়াতাড়ি কাপড় কাচিয়া ফিরিতেছিল। সকাল সকাল ভাত চড়াইতে হইবে। পিতা সারাদিন জলগ্রহণ করেন নাই। সাধিয়া পাড়িয়া যেমন করিয়া হ'ক, তাঁকে দু'টি খাওয়ান প্রয়োজন।

খিড়কীর পথে আচম্বিতে একটি আধা-বয়সী স্ত্রীলোক আবির্ভূত হইয়া সুশীলার হাতে একটুক্‌রা কাগজ দিল। স্ত্রীলোকটি যে এককালে সুন্দরী ছিল, তাহা তাহাকে দেখিলেই মনে হয়। ঐ যে বর্ণ দারিদ্র্য দগ্ধ করিয়াছে, চাঁপা-ফুলের মত না হউক, যৌবনে সুখের দিনে তাহা দর্শনীয় ছিল, সন্দেহ নাই। যে মুখ দুরদৃষ্ট আজ নির্ম্মম হস্তে বিকৃত করিয়াছে, এক দিন তাহা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত।

সুশীলা ইহাকে জানিত। এই পাড়ারই মেয়ে। যে রমণ চৌধুরী তাহার পিতাকে ও তাহাকে আশ্রয়হীন করিতে উদ্যত হইয়াছে, এই রমণী এক দিন তাহারই অনুগৃহীতা ছিল, আজ তাহারই দূতীরূপে আসিয়াছে। ইহার এখনকার আকৃতি দেখিয়া সুশীলা শিহরিয়া উঠিল। কাগজের টুক্‌রাটুকু পড়িল। মাত্র দুই তিন ছত্র লেখা—তুমি যদি রাত্রে তোমাদের খিড়কীর বাগানে আমার সঙ্গে একবার দেখা কর, সকল দিকে সুবিধা হইতে পারে।

লিপি পড়িয়া সুশীলা একবার চারিদিক, একবার আকাশ পানে চাহিল। সেখানে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছে। মনে মনে ভাবিল, এই ত মুক্তির পথ। জিজ্ঞাসা করিল, কে এ কাগজ দিয়েছে?

রমণী কহিল, ঐ রমণ চৌধুরী। কি বলব?

বোল, আচ্ছা। কাল।

রমণী এক গাল হাসিতে হাসিতে সুশীলার উপর একটা অগ্নি-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া যেন মায়া মন্ত্রে অন্তর্হিত হইয়া গেল। এ কাযে সে এখন অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। সুশীলা কাগজখানিকে ছিঁড়িয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া হাওয়ায় উড়াইয়া দিয়া গৃহে ফিরিল—ভাত চড়াইতে।

৩

পরদিন মধ্যাহ্নে রন্ধনকার্য্য সারিয়া কক্ষে বসিয়া সুশীলা আপন দুর্ভাগ্যের কথা ভাবিতেছিল, সেই সময় অপ্রত্যাশিত-ভাবে তাহার বাল্যসখী শৈল আসিয়া উপস্থিত হইল।

সুশীলা সহর্ষে বলিল, ও মা, শৈলি যে! কবে এলি?

শৈল সুশীলার গলা জড়াইয়া বলিল, এই মাত্র। বাবাকে মাকে প্রণাম করেই তোর কাছে ছুট্। হ্যাঁ-র্যা, রমণ চৌধুরী না কি তোদের সর্ব্বনাশ করছে?

আমার আর সর্ব্বনাশ কি, সই? সর্ব্বনাশ ত হয়েই আছে।

কথায় কথায় অনেক কথা হইল। শৈল সুশীলাকে সান্ত্বনা দিতে দিতে অনেক কাঁদিল। অবশেষে কহিল, এমন পোড়া কপাল করেও ভারতে এসেছিলি? তবু কি করবি! মেয়েমানুষকে অনেক সইতে হয়।

এত হয়? শিশুকন্যা ফেলে মা পালায়? বিয়ের জন্য

রাম-খোকা

রাম-খোকা ওই খেলনা নিয়ে
মত্ত অহর্নিশি—
বাপ বলেচে, 'নেইকো পড়া ?'
খোকা ডাকেন,—'পিশি !'
বাপ সে ডাকে ত্রস্তে পলায়,—
হাসচে যাদুমণি,—
কেমন মজা ! ঐ যে পিশি
আসচে নিয়ে ননী !

অভিনেতা—শ্রীচিত্তরঞ্জন গোস্বামী।

['রাম-ছাগল,' 'রাম-ছুঁচা' কথায় যেমন ছাগল ও ছুঁচার 'ধাড়িত্ব' বুঝায়, 'রাম-খোকা' কথায় তেমনি খোকার 'ধাড়িত্ব' বুঝিতে হইবে।]

মামলা-মন্ত্রী

ফন্দী-ফিকিরে মাথাখানি ভরা, মন বিষে মস্ত ভারী
মুখে-চোখে কিবা ব্যাচারীর ভাব! সাধু হিতব্রতধারী!

ছেলে-বাপে কোথা মন কষাকষি, ভায়ে-ভায়ে খিটমিট
ধীরে ধীরে সেথা উদয় অমনি মিটমিটি চাউনিটি!

মাথা নেড়ে শত উপদেশ, ডাকা 'শ্যামা', 'ও মা জগদ্ধাত্রী'
কাছারীর পথে হুঁশ বাৎলিয়ে—সেই পথে সহযাত্রী!

মামলার ফাঁশে অচিরে ফাঁশানো, তদ্বিরে তারি ব্যস্ত
ঘুঘু ছেড়ে দিতে ভিটেয় মরি রে দরাজ বিপুল হস্ত!

মুখে বুলি সদা 'শিব,' 'শিব'—ট্যাক ভরাতে নিপুণ দৃষ্টি—
টাউট-মুহুরি, উকীল-বাহন,—মামলা তোমারি সৃষ্টি!

অভিনেতা—শ্রীচিত্তরঞ্জন গোস্বামী।

বাপের সর্ব্বস্ব বাঁধা পড়ে? অকালে স্বামী মরে, দেওর কুৎসিত প্রসঙ্গ করে, সৎমা কথায় কথায় ঝাঁটা ধরে—এত হয়?

সুশীলার চোখ দিয়া বড় বড় ফোঁটা পড়িতে লাগিল। বলিল, এত হয়? উঠতে-বসতে লাঞ্ছনা, ঘুরতে-ফিরতে গঞ্জনা, পায় পায় ভয়, পাছে কি অপরাধ হয়? কোথায় যাব ব'লে কেঁদে বাপের পা জড়িয়ে ধরলে হাট-বাজারের পথ দেখিয়ে দেয়—এত হয়?

শৈল চোখের জল মুছিতে-মুছিতে ও মুছাইতে-মুছাইতে কহিল, সৈ, তোকে ত ছেলেবেলা থেকেই জানি! এত রূপ, এত গুণ এই কি তোর অপরাধ?

না, কৈ না! আমার মত অনাথা অভাগীর বেঁচে থাকাই অপরাধ। মা গেলেন, আমাকে নিয়ে গেলেন না কেন?

শৈল, শীতল হব ব'লে যে পুকুরে গা ডুবুতে গেছি, তার কানায় কানায় জল শুকিয়ে গেছে; ফল পাড়ব ব'লে যে গাছে হাত বাড়াই, তাই ফলশূন্য হয়! যার কল্যাণ চাই, সেই কর্পূরের মত উবে যায়! সংসারে একটি জিনিষ ধরেছিলুম—বাবার স্নেহ। তাও হারালুম! আর আমার নখ-স্থল নেই।

শৈলর বুকের ভিতর গুরগুর করিয়া উঠিল। দুঃখের জ্বালায় অভাগী কি আত্মঘাতী হবে না কি? বলিল, তোর অনেক সহ্য, ধৈর্য্য ধ'রে থাক্, চিরদিন কি এমনই যাবে?

ধৈর্য্য! মানুষ আর কত পারে? আমি ত অবলা। চিরদিন এমনি যাবে না বল্‌ছিস? তুই জানিস নি। অনাথার দুঃখের অন্ত নেই। বিধবার জ্বালা শেষ হয় আগুনে পুড়ে। শৈল, যে অতি দুঃখী, তারও আশা আছে, আমার তাও নেই।

না থাক্, ধর্ম্ম আছেন।

কি যে পাগলের মত বলিস! ধর্ম্ম! এই যে ধর্ম্ম রক্ষা করবার জন্যে ছেঁড়া কাপড়ে কোন রকমে লজ্জা বাঁচিয়ে, আধপেটা ভাত একবেলা খেয়ে, বঞ্চনা, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা স'য়ে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে দিন কাটাচ্ছি, কোথায় ধর্ম্ম! লোকে বলে, তাঁর কাছে চুল-চেরা বিচার। এই কি বিচার? আমাকে ছেঁড়া কাপড় পরতে দেখে চিনু-পাগল ভিক্ষে-সিক্ষে ক'রে এক জোড়া কাপড় কিনে এনে দিলে, রায়-বাঘিনীর মত এসে পড়ে সৎমা কেড়ে নিলেন। ধর্ম্ম তখন ছিলেন কোথা?

সৈ, দুঃখই ত ধর্ম্মের মর্য্যাদা। ধর্ম্মপথে যদি কাঁটা-খোঁচা না থাকৃত, ধর্ম্ম করলে যদি সুখ-সম্পদ্ হ'ত, কে না ধর্ম্মপথে চল্‌ত?

সৈ, ও-সব পাকামো কথা! ভরা পেটে পাণ চিবুতে চিবুতে ঢেঁকুর তোলা! আমার মত কাঠে-কাঠে যে ঠেকেছে, তার কাছে ওর কোন দর নেই। ধর্ম্ম নয়, সৈ, আমার এখন দাঁড়াবার স্থল চাই।

সৈ, একটা কথা বল্‌ব? তুই কেন আমাদের বাড়ী চ'-না? সেখানে ত আমার শ্বশুর-শাশুড়ী নেই। আমিই গিন্নী।

সুশীলা মুচকিয়া হাসিয়া কহিল, আর সয়া যদি তোকে ছেড়ে মোকে—

মরণ আর কি! এত দুঃখেও ঠাট্টা! তুই চ', সৈ! আমি আর ভাবতে পারিনি।

অমন কথাটি বোল না। বাবা ঠিক বলেছেন। আমি অপয়া, যেথা যা'ব, সর্ব্বনাশ আমার সঙ্গে সঙ্গে যাবে। সৈ, আমি কি মশাল হাতে নিয়ে জন্মেছিলুম! যেখানে যাই, ধূ ধূ ক'রে আগুন ধ'রে ওঠে!

তা হ'ক, তুই চ'।

না।

না, তবে কি করবি?

কেন, তোরাই ত বলিস, আমার রূপ আছে, বয়স আছে—আর মহাজন নেই?

ব্যবসা করবি না কি?

না করব কেন? ধর্ম্মকে যত দৃঢ় ক'রে ধরছি, তিনি আমাকে পথের পানে ঠেলে দিচ্ছেন। বাবার পা জড়িয়ে ধরলুম, হাট-বাজারের পথ দেখিয়ে দিলেন। আমি দাঁড়াই কোথা? কোথা আমার আশ্রয়?

সৈ, একটা কথা শুনেছি, যার কেউ নেই, তার হরি আছেন। তিনি প্রেমময়, তুই তাঁকে আশ্রয় কর। আমি ত জানি, এ বয়সে ভালবাসার তৃষ্ণা অফুরন্ত, সাগর শুষ্‌তে চায়। তিনি প্রেমের সাগর, যত চাইবি, পাবি। তুই তাঁর চরণে আপনাকে নিঃশেষে ঢেলে দে।

না, সৈ, তাও পারব না। জীবনে এক জনের পায়

আপনাকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়েছিলুম। তাঁর ভালবাসাও পেয়েছিলুম। এখন সেই স্মৃতিটুকু আমার বড় দুঃখের সম্বল। সে আমি আর কাউকে দিতে পারব না। তা তিনি হরিই হ'ন আর ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবই হ'ন।

তবে মর্!

বালাই!

শৈল চলিয়া গেল। সুশীলা রাত্রির জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। চন্দ্রনাথ আহারাদি করিয়া শয়ন করিলেন। বাড়ী নিস্তব্ধ হইলে সুশীলা নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে খিড়কীর বাগানে গিয়া দেখিল,রমণ চৌধুরী উৎকণ্ঠিতচিত্তে তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। সুশীলা আসিতেই রমণ বলিল, এত দেরি?

বাবা না ঘুমুলে ত আস্তে পারিনি। তার পর তোমার কি কথা বল। আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছ কেন?

সুশীলা, আমি তোমার জন্য পাগল হয়েছি।

কেমন ক'রে?

এ প্রশ্নে রমণ একটু থম্‌কিয়া গেল। একটা ঢোক গিলিয়া বলিল, কেমন ক'রে? তুমি ঘাটে ব'সে বাসন মাজ, আমি নিত্য আড়াল থেকে তোমায় দেখি। মনে করি, বিধাতা কি এই হাত বাসন মাজবার জন্য গড়েছেন? তুমি স্নান ক'রে ওঠ, তোমার ঐ কালো এলোচুল, তার কোলে চাঁদের মত মুখখানি আমার বুকে আগুন জ্বেলেছে।

কতখানি পুড়েছে? আমার ত আগুন-জ্বালান স্বভাব, যেখানে যাই, আগুন জ্বালাই।

সত্য, সুশীলা, তুমি জলন্ত আংরা। তোমার হাসি, চাউনী, চুল, রং, সব আগুনের ফিন্‌কি।

কৈ, আমি ত পুড়লুম না।

তুমি ঠাট্টা কোরছ! বিশ্বাস কর, আমি সত্যি পাগল হয়েছি।

তা আমি কি করব! আমি ত ডাক্তারও নই, বদ্যিও নই। কবিরাজ দেখাও, তেল মাখ, ভাল হয়ে যাবে।

না, সুশীলা, তুমিই আমার বৈদ্য, বলিয়া রমণ তাহার হাত ধরিতে অগ্রসর হইতেই সুশীলা দুই পদ পিছাইয়া গেল। বলিল, খবরদার! আমায় ছুঁয়ো না। কি চাও তুমি?

আমি তোমায় ভালবাসি।

ও কথা বোল না। ভালবাসলে আমাকে নষ্ট করতে চাইতে না। কি চাও, বল?

আমি তোমায় চাই।

মিছে কথা। আমাকেও চাও না, আমার দেহ চাও। তা তোমায় দোব, কিন্তু দাম নোব।

কি দাম চাও, বল। যা চাইবে, দোব। আমার প্রাণ রাখ।

শোন। বাবার বিষয়-বাড়ী সব তোমার কাছে বাঁধা আছে। রেজেষ্ট্রী কোয়ালা ক'রে খালাস দিতে হবে।

সে ত দোবই। তা হ'লে ত তোমায় পাব?

না।

তবে?

এ ত বাবাকে দিলে। আমাকে নগদ পাঁচ হাজার দিতে হবে।

তুমি আমার হৃদয়-সর্ব্বস্ব। আমার যা কিছু আছে, সব তোমার। পাঁচ হাজার কোন্ ছার!

তা জানি, পাঁচ হাজার তোমার কাছে কিছুই নয়। অনেকের সর্ব্বনাশ করতে অনেক টাকা উড়িয়েছ। তারা এখন তোমার ঐ দূতী সৈরভীর মত পথে পথে কেঁদে বেড়াচ্ছে। আমি কারু হাতে যাব না।

বেশ! তাতে যদি তোমার বিশ্বাস হয়, তা-ই দোব। পরশু এমনি সময় এইখানে সব পাবে। বন্ধক-খালাসী রেজিষ্টারি দলিল আর এক'শ টাকা ক'রে পঞ্চাশ কেতা নোট। তা হ'লে ত তোমায় পাব?

নিশ্চয়।

নির্দ্দিষ্ট দিনে প্রতিশ্রুতিমত দলিল ও নোট সুশীলার হাতে দিয়া রমণ কহিল, এইবার আমার ঘর আলো করবে চল।

আজ নয়। আগে দেখি, তোমার এ ধাপ্পাবাজি কি না। কাল যাব, কিন্তু তোমার ঘরে নয়।

তবে কোথায়?

আমাদের সেই পোড়ো বাড়ীতে।

ও বাবা! সেটা যে ভূতের বাড়ী বলে। সে পথ দিয়ে সন্ধ্যার পর লোক চলে না।

পাপ কাযে যার ভয় নেই, তার ভূতের ভয়! লোক চলে না, সেই ত ভাল! নির্ঝঞ্ঝাটে আমোদ করব। কেউ টেরও পাবে না। আমি এ পথের নতুন পথী, এ কাযে নতুন ব্রতী।

কেন, সুশীলা, আমার বাড়ী কি অপরাধ করলে?

তোমার যে দজ্জাল পরিবার! কোন রকমে যদি জান্তে পারে? শেষ কি গরবীর মত ঝাঁটা খেয়ে বেরুব। বেশ! তুমি রাজি না হও, তোমার টাকা দলিল ফিরে নাও, আমি চল্লুম।

না না, সুশীলা, তুমি যা বলবে, তাতেই রাজি।

শোন! আর এক কথা। কাল না পূর্ণিমা? এমনি এক পূর্ণিমার রাতে আমার বিয়ে হয়েছিল। কাল আবার নূতন ক'রে বাসর হবে। উত্তরের ঘরখানা বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ক'রে রাখিয়ো। পাড়া নিশুতি হলে আমি যাব।

একলা?

এ কাযে দোকলা কোথা পাব বল? নতুন-মা'র মুখের জালায় আমি কতবার সে বাড়ীতে একলা রাত কাটিয়েছি।

ধন্য সাহস! আমি হলে পারতুম না।

ছিঃ, তুমি না পুরুষমানুষ!

আলো রাখব ত?

একটি। পাপ কায অন্ধকারেই ভাল।

৪

আকাশে পূর্ণচন্দ্র হাসিতেছে। সমস্ত গ্রাম নিস্তব্ধ, নিঝুম। সুশীলা নিঃশব্দে শয়ন-কক্ষের বাহির হইল। সতৃষ্ণ-নয়নে একবার চারিদিক চাহিল। এই গৃহে তাহার জন্ম। ঐ তাহার সূতিকালয়। উহারই পার্শ্বে তাহার মাতার হস্ত-রোপিত একটি গুলঞ্চপুষ্পের বৃক্ষ ছিল, নূতন-মা আসিয়া সেটি কাটিয়া দিয়াছেন, তাহার গুঁড়ির কিয়দংশ এখনও [illegible]মান। ঐ পিঞ্জরে তাঁহার পালিত একটা পাখী ছিল, নূতন-মা সেটিকে মুক্তি দিয়াছেন। শূন্য পিঞ্জর পড়িয়া আছে। কাল হইতে তাহারও কক্ষ এমনি শূন্য পড়িয়া থাকিবে। কেহ সে অভাব অনুভবও করিবে না। যে গৃহ তাহার পক্ষে এত অত্যাচার, এত যন্ত্রণাময়, তবু তাহা ত্যাগ করিতে চোখে ধারা বয় কেন? যে বন্ধন সে ছিন্ন [illegible]রিয়া যাইতেছে, সে যেন আজ শত পাকে তাহাকে জড়াইতেছে!

নূতন-বধূ না থাকিলে চন্দ্রনাথ মুক্তকক্ষে শয়ন করিতেন। যার অর্থ আছে, তারই অর্গলের প্রয়োজন। সুশীলা পা টিপিয়া টিপিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া পিতার পায় প্রণাম করিল। এই কক্ষ তাহার মাতার শয়নকক্ষ। ঐ ফ্রেমে তাহার স্নেহময়ী জননীর ছায়াচিত্র ছিল। নূতন-মা তাহা জলসই করিয়াছেন। শূন্য ফ্রেম দেওয়ালে ঝুলিতেছে। এই কক্ষে সে মাতা-পিতার কত না আদর উপভোগ করিয়াছে! সুশীলা বস্ত্রখণ্ডে বাঁধা দলিল ও নোট পিতার শিয়রে রাখিল। তার পর আপনার শয়ন-কক্ষে আসিয়া একখানি খাম ও একখানি চাঁদর লইয়া বাহিরে পা বাড়াইতেই তীক্ষ্ণকণ্ঠে একটা কালপেঁচা ডাকিয়া উঠিল। সুশীলা আয়ত্ত লোচন আকাশপানে তুলিয়া মনে মনে বলিল, ভগবান, বড় অত্যাচার, বড় দাগা পেয়ে নিদারুণ যন্ত্রণায় কুলত্যাগ ক'রে যাচ্ছি! প্রভু, তুমি অন্তর্যামী, আমার মত ধূলিকণার বিদ্রোহ কি ক্ষমা করবে না? আকাশে নিশানাথ হাসিতে লাগিলেন। কি সুন্দর রাত্রি! কে জানে কাল কোন্ নরককুণ্ডে ইহার প্রভাত হইবে। ভাবিতে ভাবিতে সুশীলা ধীরে ধীরে নিঃশব্দপদ-সঞ্চারে রহস্যময় অভিসারে অগ্রসর হইল। সমস্ত গ্রাম সুষুপ্ত। কদাচিৎ কোন বৃক্ষ হইতে নিদ্রোত্থিত বিহঙ্গ ছি ছি বলিয়া তিরস্কার করিতেছে। সুশীলা দৃঢ়সঙ্কল্প। তথাপি শুষ্ক পত্রে আপনার পদশব্দে আপনি চমকিয়া উঠিতে লাগিল।

পোড়ো-বাড়ার নিকটে পৌঁছিতেই রমণ একটা বৃক্ষান্তরাল হইতে বাহির হইয়া কহিল, এসেছ? আমার ভয় হয়েছিল, বুঝি এলে না।

সুশীলা বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল, টাকাগুলো জলে গেল!

ছি ছি, তোমার তুলনায় টাকা! আমার সর্ব্বস্ব দিয়ে যদি তোমার ভালবাসা পাই—

সুশীলা ধমক দিল, আবার!

রমণ থতমত খাইয়া বলিল, না না। মনে মনে বলিল, এই সিংহীকে বশ করতে পারি, তবেই আমার নাম রমণ চৌধুরী।

এমন সময় কোথা হইতে একটা সকরুণ স্বর শুনা গেল। রমণ সুশীলার কাছে সরিয়া আসিয়া ডাকিল, সুশীলা, সুশীলা! কি ভাবছ? সাড়া দিচ্ছ না কেন?

কি ?

শুনছ, কে কাঁদছে ?

ও পেত্নীর ছানা।

না না, তোমার পায় পড়ি, আমায় ভয় দেখিও না।

এই সাহস নিয়ে তুমি—যাক্ সে কথা! ও শকুন-ছানা ডাক্‌ছে। ভিতরে চল। বলিয়া সুশীলা দ্রুতপদে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল।

উত্তরের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, একটি শয্যা পাতা। আলো জ্বলিতেছে। বলিল, শোন! তুমি একটুতে অমন আঁৎকে ওঠ কেন? আজ বড় আমোদের দিন! প্রাণ খুলে আমোদ করব! আমার অনেক দিনের তৃষ্ণা, বুক শুকিয়ে উঠেছে! তেষ্টা ভেঙ্গে জল খাবো। আমার সব আশা শুকিয়ে মরেছে, আজ নূতন ক'রে অঙ্কুরিত হবে। তুমি আমার মুখ-পানে ফ্যাল্-ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে দেখছ কি? আমোদ কর, স্ফূর্ত্তি কর! বোস, এই ঘরে একটু বোস। আমি কাপড়খানা ছাড়ি। একটু পরেই তোমায় ডাক্‌ব।

বেশি দেরি কোর না। আমার প্রাণ আর ধৈর্য্য ধরছে না।

আর একটু, বলিয়া সুশীলা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বার ভেজাইয়া দিল। নিরুপায় রমণ একটা জানালার পাশে বসিয়া তাহার আহ্বানের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তাহার পক্ষে সময় চলিতেছে যেন লৌহ-নিগড় পায়।

কিছুক্ষণ পরে কক্ষমধ্যে আহ্বান উঠিল; কোথায় তুমি! ঘোর অন্ধকার, আমি কিছু দেখতে পাচ্ছিনি। আমায় বুকে তুলে নাও, এস, এস।

এই যে যাই, সুশীলা!

কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া রমণ দেখিল, সুশীলা একখানি চাদর গায় শয্যার উপর শয়ন করিয়া আছে। অলসবিন্যস্ত একখানি হাত তাহার বাহিরে ভূমিতল-সংলগ্ন।

রমণ মনে মনে বলিল, আঃ, কত ঢং-ই জানেন! মুখে বলিল, সুশীলা, ওঠ, ওঠ, আমোদ করবে বললে যে! আমি বুঝেছি, ঘুম নয়, আমাকে ভয় দেখাবার জন্যে মটকা মেরে প'ড়ে আছ। সুশীলা!

নিদ্রা কি না, নিশ্চয় করিতে রমণ আলোক লইয়া সুশীলাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অ্যাঁ! বুকের ওপর কি? ফটো! কার ফটো? আলোয় ভাল করিয়া দেখিতে দেখিতে বলিল, অ্যাঁ! এ কে? ওর বর না? তাই ত! তাই ত! ঠিকই ত! ওর বে'র সময় দেখেছিলুম। সেই নরেন্দ্র বটে! সুশীলা, সুশীলা, বরের ফটো বুকে ক'রে ঘুমিয়ে পড়লে না কি? আমার রিষ হচ্ছে। ও স্থান আমি টাকা দিয়ে কিনেছি। সুশীলা! ও কি! হাতে আবার কাগজ কি? সুশীলা! দেখ, সত্যি আমার ভারি ভয় করছে। তোমার হাতে ও কি কাগজ? কারুর গুপ্ত পত্র। রোস দেখি!

আস্তে আস্তে কাগজখানি সুশীলার হাত হইতে টানিয়া লইয়া আলোর কাছে আনিয়া পড়িল—তুমি অনিন্দ্যসুন্দরী, পায় পায় তোমার বিপদ। যখন কোন রকমে আত্মরক্ষা করতে পারবে না, যখন অত্যাচার উৎপীড়নে সংসার বিষময় মনে হবে, এই মোড়কটি খেয়ো। ক্যান্সারের যন্ত্রণা আমি আর সহ্য করতে পারছিনি। অনেক চেষ্টায় এই মুক্তির উপায় সংগ্রহ করেছি। আমার যা কিছু, তোমার তাতে সমান অংশ। ভালবাসা, বিষ দু'এতেই। গভীর রাত্রিতে এরই আশ্রয় নিয়ে আমি মহা-যাত্রা করব। যন্ত্রণায় যখন ছট্‌ফট্ করবে, তুমিও কোর; আমি এসে তোমায় নিয়ে যাব।—নরেন্দ্র।

রমণের গা ছম্ ছম্ করিতে লাগিল। এ কি সত্যি বিষ খেলে! না না, এই নবীন বয়স, এমন রূপ! ও মরতে যাবে কেন? সুশীলা!

রমণের মনে হইল, কক্ষমধ্যে যেন বিকট হাস্যরোল উঠিল—হা-হ-া-হা-হা!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

চতুস্ত্রিংশ প্রবাহ

"মধুরেণ সমাপয়েৎ"

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর বহুদিন অতীত হইয়াছে; শীতের দিন হইলেও তাহা উৎকণ্ঠাপূর্ণ, অন্ধকারাচ্ছন্ন, বৃষ্টিধারাপাতে ও কুজ্ঝটিকারাশির প্রাদুর্ভাবে নিরানন্দময়।

আমি যোয়ানকে হারাইয়াছিলাম। মিঃ মেহিউ য়ুরোপের বিভিন্ন দেশের পুলিস-কর্ম্মচারীদের সাহায্যে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের সকল চেষ্টাই বিফল হইয়াছিল। যোয়ান কোথায়, কি অবস্থায় আছে, সে জীবিত আছে কি না, তাহা কয়েক মাসের মধ্যে জানিতে পারিলাম না।

অভাগিনী আইভি ফসেটের মৃতদেহ আবিষ্কৃত হওয়ায় তাহার মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে বেজ্‌ওয়াটারে অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। কিন্তু করোনারের জুরীগণের নিকট প্রকৃত বিবরণ গোপন করিয়া, পুলিস যে কাল্পনিক বিবরণ প্রকাশ করিল, তাহা কিছুমাত্র বিস্ময়কর বা কৌতূহলোদ্দীপক নহে; জুরীরা তাহাই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া যে রায় প্রকাশ করিলেন, তাহাতে নূতনত্ব বা বিশেষত্ব ছিল না। পরদিন আর এক জন করোনারের নিকট কুপের মৃত্যু সম্বন্ধে তদন্ত আরম্ভ হইল। ক্লীন ও বার্ণেস জুরীদের নিকট যে সাক্ষ্য দিল, তাহা হইতে সপ্রমাণ হইল, কুপের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছিল; প্রমাণস্বরূপ তাহারা তাহার অনেক রকম পাগ্‌লামীর দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিল; সুতরাং জুরীরা রায় দিলেন, পাগ্‌লামীর ঝোঁকেই কুপ আত্মহত্যা করিয়াছে। আত্মহত্যা সত্য বটে, কিন্তু প্রকৃত ঘটনা চাপা পড়িল। কুপের আত্মহত্যার মামলায় পুলিস সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত রহিল। 'রহস্যের খাসমহলে' নর-নারী-নির্য্যাতনের প্রমাণস্বরূপ যে সকল চিত্র সংগৃহীত হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে কোন কথা প্রকাশ করা হইল না। সাক্ষিগণের কৌশলপূর্ণ জবানবন্দী হইতে দ্বাদশ জন জুরী যে সত্য উদ্ধার করিলেন, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহাদের ধারণা হইল, কুপ তাহার ডেভেরো স্কোয়ারের বাড়ীর প্রসাধন-কক্ষে আত্মহত্যা করিয়াছিল। করোনার ইহাই বিশ্বাস করিলেন। সকল দিক্ বজায় রহিল।

করোনারের আদালতের কায শেষ হইলে আমি তাহার পরদিন ক্রেভেনহীলে উপস্থিত হইয়া আইভির পিসীর সঙ্গে দেখা করিলাম। কুপের গৃহে আইভির মৃতদেহ কিরূপে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, এবং কুপ কিরূপে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিল, তাহা তিনি পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু পুলিস যাহা জানিত, তাহা তাঁহার নিকট প্রকাশ করে নাই; কারণ, পুলিসের ভয় ছিল, কোন সংবাদপত্রের 'রিপোর্টার' কোন উপায়ে সন্ধান পাইয়া যদি তাঁহাকে জেরা করে, তাহা হইলে গুপ্তকথা প্রকাশিত হইতে পারে; তখন পুলিসের সকল সঙ্কল্প বিফল হইবে।

যাহা হউক, আমি সেই বৃদ্ধার নিকট সকল কথা সরলভাবে প্রকাশ করিলাম। তিনি পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন, আমারই প্রাণপণ চেষ্টায় রহস্যভেদ হইয়াছিল; এ জন্য তিনিও আমার নিকট কোন কথা গোপন করিলেন না। আমি তাঁহাকে জানাইলাম, কুপ এক দিন সেই বাড়ীর সম্মুখে তাহার গাড়ী থামাইয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিবে কি না ভাবিয়া ইতস্ততঃ করিতেছিল। তাহার পর সে আমাকে দেখিয়া কি ভাবে পলায়ন করিয়াছিল, তাহাও তাঁহাকে বলিলাম; আমি তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিলাম, ইহা সে জানিতে পারিয়াই পলায়ন করিয়াছিল, আমার কথা শুনিয়া বৃদ্ধা ইহাও বুঝিতে পারিলেন।

অতঃপর আমি বলিলাম, "সেই সময় আপনার ঘরের সম্মুখের বাতায়ন হইতে কোন জিনিষ হঠাৎ স্থানান্তরিত হইয়াছিল; কোন রকম সঙ্কেত করিবার উদ্দেশ্যেই কি ঐরূপ করা হইয়াছিল?"

বৃদ্ধা বলিলেন, "না, আপনার ঐ সন্দেহ সম্পূর্ণ অমূলক। আপনি এখানে আসিলে আনা আপনার সঙ্গে দেখা করিয়া আপনাকে যাহা বলিয়াছিল, এবং আপনি তাহাকে যে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহা সমস্তই আমি আনার কাছে শুনিয়াছিলাম, এবং তাহা আমার বেশ স্মরণ

আছে। সেই দিন দাসীরা ঘর পরিষ্কার করিবার জন্য ঘরের জিনিষ-পত্র স্থানান্তরিত করিয়াছিল, কোথায় কোন্ জিনিষ রাখিয়াছিল, তাহার স্থিরতা ছিল না; কিন্তু তাহা জানিতে না পারায় আপনার সন্দেহ হইয়াছিল—মতলব করিয়াই ঐরূপ করা হইয়াছিল।"

বৃদ্ধার কথা শুনিয়া আমার মনের একটা খট্‌কা দূর হইল। অতঃপর আমি শোকার্ত্তা বৃদ্ধার নিকট বিদায় লইলাম। কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া, এমন কি, সম্পূর্ণ মার্চ্চ মাসটাই যোয়ানের কোন সংবাদ না পাওয়ায় অত্যন্ত উদ্বেগ ও অশান্তিতে কাটাইলাম। কি এক অজ্ঞাত ভয়ে আমার মন অভিভূত হইয়া পড়িল। মনে হইল, পৃথিবী যেন মুখ-ব্যাদান করিয়া তাহাকে গ্রাস করিয়াছে, এই ভাবে সে অদৃশ্য হইয়াছে! সত্যই কি তাহার মৃত্যু হইয়াছে? সে জীবিত থাকিলে কি একখানিও পত্র লিখিত না?—এইরূপ নানা সন্দেহ ও চিন্তায় আমার হৃদয় অত্যন্ত বিচলিত হইল।

যেসি ইষ্টবোর্ণে প্রত্যাগমন করিলে তাহাকে একটি উৎকৃষ্ট বোর্ডিংস্কুলে প্রেরণ করা হইয়াছিল। ক্লীন ও বার্ণেস্ স্থানান্তরে চাকরী লইয়াছিল। কুপের উভয় বাড়ীই তালা-বন্ধ করিয়া পুলিস তাহাদের ভার গ্রহণ করিয়াছিল।

মার্চ্চ মাসের শেষভাগে এক দিন গভীর রাত্রিতে আমি সেই দিনের একখানি সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিলাম; আমার 'নাইট ক্যাপটি' ডেভিস্ আমার হাতের কাছে রাখিয়া-ছিল। আমি কাগজখানি টেবলে ফেলিয়া উঠিতে উদ্যত হইয়াছি, সেই সময় ঝন্-ঝন্ শব্দে টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। আমি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গিয়া টেলিফোনে সাড়া দিতেই মেহিউর পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। তিনি বলিলেন, "আপনি কি মিঃ কোল্‌ফাক্স?—শুনুন, প্যারিস-পুলিসের অধ্যক্ষের নিকট হইতে আমি এইমাত্র তার পাইলাম। তিনি জানাইয়াছেন, একটি যুবতী নাইসের 'হোটেল রয়ালে' বাসা লইয়া বাস করিতেছে। সে সেখানে মিস্ মড্ ব্যারেট বলিয়া আত্মপরিচয় দিলেও, মিস্ কুপারের চেহারার যে বর্ণনা পাইয়াছি, তাহার সহিত তাহার চেহারার সাদৃশ্য আছে। যুবতী ইংরাজ-মহিলা, সন্দেহ নাই।"

আমি উৎকণ্ঠিত স্বরে এবং অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে বলি-লাম, "সেখানকার পুলিস কি তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে?"

মিঃ মেহিউ বলিলেন, "না, ফরাসী পুলিসকে ত তাহার গ্রেপ্তারের জন্য অনুরোধ করি নাই; তাহাকে নজরবন্দী করিয়া রাখিতে বলিয়াছি; যেন সে তাহাদের দৃষ্টির অন্তরালে পলায়ন করিতে না পারে। পুলিস তাহার সন্ধান পাইয়াছে—ইহা সে বুঝিতে পারে নাই, তবে সে—সে-ই কি না, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইতে পারি নাই।"

আমি উৎসাহভরে বলিলাম, "সেই যে যোয়ান—এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আপনাকে অগণ্য ধন্যবাদ, আপনি আমার অনুরোধরক্ষার জন্য যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন।—আমি প্রভাতে সর্ব্বপ্রথমে যে ট্রেণ পাইব, সেই ট্রেণেই নাইসে যাত্রা করিব।"

দুই দিন পরে বেলা ১১টার সময় আমি নাইসের রেল-ষ্টেশন হইতে একখানি দ্রুতগামী গাড়ী লইয়া উজ্জ্বল রবিকর-সমুদ্ভাসিত 'প্রমিনেদ্ দি এংগ্লাইস্' নামক প্রশস্ত রাজপথ দিয়া আমার গন্তব্য পথে ধাবিত হইলাম। পথের দুই ধারে তালজাতীয় বৃক্ষের শ্রেণী এবং পুষ্পকানন। নীলা-কাশ মেঘসংস্পর্শহীন, চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ। অদূরে সমুদ্রের স্বচ্ছ নীলাম্বুরাশি উজ্জ্বল সূর্য্যকিরণে ঝল্‌মল্ করিতেছিল। ইংলণ্ডের প্রকৃতি সেই মার্চ্চ মাসে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, অবিরল বৃষ্টিধারায় পরিপ্লাবিত কিন্তু ভায়োলেট ও মিমোসা কুসুমে সুসজ্জিতা। নাইস, আনন্দ ও প্রফুল্লতার লীলা-নিকেতন নাইস, সেই মধ্যাহ্নে যেন উৎসবের সাজে সজ্জিত বলিয়া মনে হইল। প্রকৃতির নয়ন-মনোবিমোহন দৃশ্যরাজি দেখিতে দেখিতে আমি সেই প্রকাণ্ড হোটেলের শুভ্র দেউড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। গাড়ী হইতে নামিয়া হোটেলে প্রবেশ করিয়া হোটেলের ম্যানেজারকে আবেগ-স্পন্দিত হৃদয়ে মিস্ ব্যারেটের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলাম।

ম্যানেজার আমার প্রশ্ন শুনিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "এই মহিলাটি অল্পকাল পূর্ব্বে বাহিরে গিয়াছেন, মহাশয়!—এই প্রায় ৫ মিনিট পূর্ব্বে। তিনি সদর রাস্তা ধরিয়া নগরের দিকে গিয়াছেন।"

আমি উৎকণ্ঠিত স্বরে বলিলাম, "একাকিনী গিয়াছেন কি?"

ম্যানেজার বলিল, "হাঁ, মহাশয়!"

আমি তৎক্ষণাৎ হোটেল হইতে বাহির হইয়া জনাকীর্ণ সুপ্রশস্ত রাজপথে উপস্থিত হইলাম। এই পথটির ন্যায় সুদৃশ্য পথ সমগ্র পৃথিবীতে অতি অল্পই আছে; এমন কি,

বিলাসিতার লীলানিকেতন প্যারিসেও এরূপ সুন্দর পথ একটিও নাই ; কিন্তু তখন আমার পথের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার অবসর ছিল না। আমি আমার প্রিয়তমার সন্ধানে সেই পথে দ্রুতবেগে ধাবিত হইলাম।

মধ্যাহ্ন সমাগতপ্রায় হইলেও তখন প্রকৃতি-দেবীর প্রাভাতিক শোভা বিলুপ্ত হয় নাই ; চতুর্দ্দিক্ নিস্তব্ধ ও শান্তিপূর্ণ। প্রস্ফুটিত কুসুমরাশির সুমিষ্ট সৌরভ বহন করিয়া মুক্ত সমীরণ প্রবাহিত হইতেছিল, তাহা আমার উদ্বেগব্যাকুল ও তাপদগ্ধ হৃদয়ের সকল সন্তাপ হরণ করিতে লাগিল। আমি ক্যালে বন্দর হইতে 'মেডিটেরিয়ান এক্সপ্রেস' ট্রেণে নাইসে আসিয়াছিলাম, দীর্ঘকাল ট্রেণের কামরায় আবদ্ধ থাকায় আমি হাঁপাইয়া উঠিয়াছিলাম, নাইসের সেই পথে চলিতে চলিতে আমার মনে হইল, নরক হইতে স্বর্গে আসিয়াছি! সেই পথে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া আমি অনেকগুলি পথিককে দেখিতে পাইলাম, পুরুষ ও নারীরা শ্রেণীবদ্ধভাবে সেই পথে চলিতেছিল। আমি আগ্রহভরে তাহাদের মুখের দিকে চাহিলাম। কয়েক জনের মুখ পরিচিত বলিয়াই মনে হইল ; তাহাদের সহিত আমার আলাপ-পরিচয় না থাকিলেও আমি তাহাদিগকে লণ্ডনে দেখিয়াছিলাম। আমি জানিতাম, লণ্ডনের অনেক লোক যখন তখন নাইসে বেড়াইতে আসে, সুতরাং তাহাদিগকে সেখানে দেখিয়া বিস্মিত হইলাম না। অবশেষে একটি ভদ্রলোক আমাকে দেখিয়া অভিবাদন করিলেন। আমি তাঁহাকে আমাদের লণ্ডনের ক্লাবে অনেকবার দেখিয়াছি, তিনি সেই ক্লাবের মেম্বর।

জুন মাসে লণ্ডনের সেণ্টজেম্‌স ষ্ট্রীটে যেরূপ বহু সৌখীন ভদ্রলোককে বেড়াইতে দেখা যায়, সেইরূপ মার্চ্চ মাসের রবিকরোজ্জ্বল প্রভাতে নাইসের এই 'প্রমিনেদ দে এংগ্লাইসে' অনেকেই পরিভ্রমণ করিয়া বায়ুসেবন করেন। প্রাচীন রিভেরার আকর্ষণ এখনও প্রবল, তবে কিছু দিন হইতে বহু পর্য্যটক এই সুন্দরী নগরীকে উপেক্ষা করিয়া প্রাগৈতিহাসিক যুগের স্মৃতিবিমণ্ডিত কাইরো, লক্সর, আস্থয়ান প্রভৃতি নগরের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন করিতেছেন। শীতকালে একবার মিসরে না যাইলে অনেকেই মনে করেন, তাঁহাদের তীর্থভ্রমণ অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল ; অথচ সেই সঙ্গে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের এই লীলাকুঞ্জে পদার্পণ না করিলেও তাঁহারা তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না।

আমি রুদ্ধ-নিশ্বাসে দ্রুতপদে চলিতে লাগিলাম। পথে চলিতে চলিতে যদি কোন স্থানে যোয়ানকে দেখিতে পাই, এই আশায় আমার ব্যাকুল দৃষ্টি চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল, অবশেষে আমি সমুদ্রতটে জেঠীর প্রবেশদ্বারে উপস্থিত হইয়া যোয়ানকে দেখিতে পাইলাম। তাহার সুগঠিত দেহ একটি সুদৃশ্য কোটে আচ্ছাদিত, স্কার্টটি উৎকৃষ্ট সার্জ্জে নির্ম্মিত। সে একাকিনী চিন্তাকুলচিত্তে ধীরে ধীরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। আমি ব্যগ্রভাবে তাহার পশ্চাতে উপস্থিত হইয়া আকুল স্বরে ডাকিলাম, 'যোয়ান!'—তাহার পর টুপীটি হাতে লইয়া একটু হাসিলাম। তখন আমার মন কি আনন্দে পূর্ণ হইয়াছিল, তাহা আমি ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিব না।

যোয়ান আমার কণ্ঠস্বর শুনিয়া তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইল, মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার মুখ বিবর্ণ হইল ; তাহার চক্ষু দু'টি গভীর বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইল। সে কোন কথা বলিতে না পারিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার নির্নিমেষ দৃষ্টি ভাবহীন, ভাষাহীন ; কিন্তু তাহা অব্যক্ত বেদনায় পূর্ণ বলিয়াই আমার ধারণা হইল।

আমি যোয়ানকে নির্ব্বাক্ দেখিয়া আবেগভরে বলিলাম, "হাঁ প্রিয়তমে, তুমি যাহাকে সম্মুখে দেখিতেছ, সে আমি। আমি তোমারই সন্ধানে আসিয়াছি। তোমাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য আমি সারা য়ুরোপ ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি! কিন্তু এখানে দাঁড়াইয়া আলাপ করা চলিবে না, ইহা গল্প করিবার স্থান নহে ; সাধারণের ভ্রমণ ও বিশ্রামের জন্য ঐ যে উদ্যানটি দেখা যাইতেছে, চল, ঐ বাগানে যাই। ওখানে ছায়ায় বসিয়া নির্জ্জনে গল্প করিতে পারিব।"

আমরা উভয়ে সেই উদ্যানে প্রবেশ করিয়া গল্প আরম্ভ করিলাম। আমিই বক্তা, যোয়ান নির্ব্বাক্ শ্রোতা। সে গম্ভীরভাবে আমার কথাগুলি শুনিতে লাগিল, আমি অল্প কথায় তাহাকে তাহার পিতার শোচনীয় মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন করিলাম। তাহার পর, সে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে যোয়ানের কলঙ্কক্ষালন করিয়াছিল ; নরহন্ত্রী বলিয়া যোয়ানের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছিল, সেই

অপকর্ম্মের জন্য কুপই দায়ী, যোয়ানের চরিত্রে বিন্দুমাত্র কলঙ্ক স্পর্শে নাই—এ সকল কথা কুপের নিকট যেরূপ শুনিয়াছিলাম, সেই ভাবেই তাহা যোয়ানের গোচর করিলাম। তাহাকে বলিলাম, তাহার আর কোন আশঙ্কার কারণ নাই, সে সকল অভিযোগ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে, এখন সে মুক্ত, সম্পূর্ণ স্বাধীন, পুলিসের সন্দেহভঞ্জন হইয়াছে।

আমার কথা শুনিয়া যোয়ান উত্তেজিতভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং স্বপ্নাবিষ্ট দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বিচলিত স্বরে বলিল, "তিনি কি সত্যই তোমাকে ঐ সকল কথা বলিয়াছিলেন? তিনি স্বয়ং এডুইনকে হত্যা করিয়াছিলেন, ইহা কি তোমার নিকট স্বীকার করিয়াছিলেন? তুমি কি সত্য কথা বলিতেছ, সিড্‌নি?"

কুপ কি অবস্থায় কোন্ সময় সেই সকল কথা বলিয়াছিল, তাহা প্রকাশ করিয়া তাহার প্রত্যেক কথা যোয়ানের নিকট পুনরাবৃত্তি করিলাম। আমি যে সত্য কথা বলিয়াছি, তাহার প্রমাণস্বরূপ ডেনম্যানের নাম উল্লেখ করিলাম। ডেনম্যান পুলিস-কর্ম্মচারী, তাঁহার সম্মুখে কুপ ঐ সকল কথা বলিয়া নিজের অপরাধ স্বীকার করিয়াছিল। সুতরাং আমার কথাগুলি সম্পূর্ণ সত্য, তাহা অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই—ইহাও যোয়ানকে বুঝাইয়া দিলাম।

আমি তাহার বিচলিত ভাব লক্ষ্য করিয়া বলিলাম, "তোমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ হইয়াছিল, তোমার নির্দ্দোষিতার প্রমাণ পাইয়া পুলিস তাহা প্রত্যাহার করিয়াছে। আমার এ কথা সত্য, ইহার প্রমাণ চাও? ইহার প্রমাণ এই যে, তুমি এখানে আসিয়া 'হোটেল 'রয়ালে' আশ্রয় লইয়াছ, এ সংবাদ পুলিস দুই দিন পূর্ব্বে জানিতে পারিয়াছে। যদি তোমার বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগ প্রত্যাহার করা না হইত, তাহা হইলে পুলিস কি তোমাকে স্বাধীনভাবে হোটেলে বাস করিতে দিত? দুই দিন পূর্ব্বেই তোমাকে গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে পুরিত, অথবা প্রহরীর জিম্মায় তোমাকে লণ্ডনে পাঠাইয়া দিত।"

যোয়ান সভয়ে বলিল, "সত্যই কি পুলিস এখানে আমার সন্ধান পাইয়াছে?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, তাহারা তোমাকে সনাক্ত করিয়াছে, তুমি এখানে আছ, তাহাও জানিতে পারিয়াছে। —তাহারা তোমাকে সনাক্ত করিয়া সেই সংবাদ টেলিগ্রাম-যোগে লণ্ডনে পাঠাইয়াছে। লণ্ডনের পুলিসের নিকট তোমার সন্ধান পাইয়াই ত তোমার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি। পুলিসের নিকট সংবাদ না পাইলে আমি কি তোমার সন্ধানে এখানে আসিতে পারিতাম?—দীর্ঘকাল ধরিয়া তোমাকে কোথায় না খুঁজিয়াছি, অবশেষে পুলিসের অনুগ্রহেই আমার আশা পূর্ণ হইল, আমার হারানিধি আমি ফিরিয়া পাইলাম, আজ আমি কত সুখী, প্রিয়তমে!—তাহা তোমাকে কি করিয়া বুঝাইব? সে শক্তি আমার নাই।"

আমরা গল্প করিতে করিতে সুদৃশ্য তালীকুঞ্জ অতিক্রম করিলাম, এবং যেখানে ব্যাণ্ড বাজিতেছিল, তাহার অদূরে একটি নিভৃত কুঞ্জ দেখিয়া সেই স্থানে উভয়ে উপবেশন করিলাম। যোয়ানের সহিত পরিচয়ের পর আমি আর কোন দিন এরূপ শান্তিলাভ করিতে পারি নাই। আমার মনের সকল ভার অপসারিত হইয়াছে।

আমি একবার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কোন দিকে জনপ্রাণীকেও দেখিতে পাইলাম না, তখন আমি যোয়ানের দস্তানামণ্ডিত হাতখানি তুলিয়া ধরিয়া তাহা চুম্বন করিলাম। আগ্রহভরে তাহার মুখের দিকে চাহিলাম, সুন্দর পরিচ্ছদে তাহাকে স্বর্গের অপ্সরার ন্যায় সুন্দরী দেখাইতেছিল।

আমার কথা শুনিয়া নানা চিন্তায় তাহার হৃদয় কি ভাবে আলোড়িত হইতেছিল, তাহা তাহার মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম। আমি ধীরে ধীরে তাহার প্রতি আমার গভীর ভালবাসার কথা, তাহাকে বিপন্মুক্ত ও সুখী করিবার জন্য আমার প্রাণপণ চেষ্টার, আমার ত্যাগস্বীকারের কাহিনী তাহার গোচর করিলাম। তাহার পিতার অপরাধ স্বীকারের বিবরণ শুনিয়া তাহার বুকের উপর হইতে যেন একটা দুর্ব্বহ পাষাণভার নামিয়া গেল। তাহার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইল; এত দিন পরে সকল আশঙ্কা ও দুশ্চিন্তার অবসানে সে শান্তিলাভ করিল।

আমি বলিলাম, "যোয়ান, আমি জানি, আমার জীবন-রক্ষার যে দিন কোন আশা ছিল না, মৃত্যু অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল, সেই দিন আমার জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে তুমিই আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলে। তুমি আমাকে না বাঁচাইলে সেই রাত্রিতেই আমার মৃত্যু হইত। কিন্তু

আমার চেতনা বিলুপ্ত হইবার পর কি কাণ্ড ঘটিয়াছিল—তাহা তুমি কোন দিন আমার নিকট প্রকাশ কর নাই। সেই সকল কথা শুনিবার জন্য আমার বড়ই আগ্রহ হইয়াছিল, সেই আগ্রহ এখনও সমভাবে আছে। এখনও কি তুমি আমাকে সেই সকল কথা বলিতে কুণ্ঠিত হইবে ?"

যোয়ান ক্ষণকাল নীরব রহিল, যেন সেই অপ্রীতিকর পুরাতন প্রসঙ্গের আলোচনা কষ্টকর বলিয়া তাহার মনে হইল ; অথচ আমার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করাও সে সঙ্গত মনে করিল না, কিন্তু তাহাকে কুণ্ঠিত দেখিয়াও আমি জিদ্ ছাড়িলাম না ; সেই সকল কথা শুনিবার জন্য পুনর্ব্বার আগ্রহ প্রকাশ করিলাম। তখন সে নতমুখে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, "তোমার মৃত্যু হইয়াছে মনে করিয়া ইব্রাহিম তোমাকে ফেলিয়া গেল, কিন্তু আমাকে মাদকদ্রব্য-মিশ্রিত যে কফি পান করিতে দেওয়া হইয়াছিল, তাহা পান করিয়া আমার চেতনা বিলুপ্ত হইলেও, কতক্ষণ পরে জানি না, আমার চেতনা হইয়াছিল। আমি চেতনা লাভ করিয়াই, তুমি দোতলার যেখানে পড়িয়াছিলে—সেই কক্ষে উপস্থিত হইলাম। তোমার মুখ দেখিয়া আমার ধারণা হইল, দেহে তখনও জীবন ছিল। হাঁ, জীবনের একটি অতি ক্ষীণ স্ফুলিঙ্গ তোমার অসাড় দেহে তখনও বর্ত্তমান ছিল। তাহারা তোমাকে মৃত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেও তুমি ধীরে ধীরে চেতনা লাভ করিতেছিলে। সেই সময় আমার মনে হইল—আমি কি কোন উপায়ে তোমার জীবন রক্ষা করিতে পারিব না ? কিন্তু কি উপায়ে তোমাকে বাঁচাইব ? কয়েক মিনিট চিন্তার পর বাবাকে বলিলাম, 'এই যুবকের মৃতদেহটা আমিই ফেলিয়া দিয়া আসিব, তোমার আর কষ্ট করিয়া উহা ফেলিতে যাইবার প্রয়োজন নাই।' সেই রাত্রিতে বাবা এরূপ অপ্রকৃতিস্থ হইয়াছিলেন যে, আমার মনে হইল, তিনি ক্ষেপিয়া উঠিয়াছেন। তিনি আমাকে বলিলেন, মৃতদেহটি আমি নিজে লইয়া গিয়া ফেলিয়া আসিতে পারি, তাহাতে তাঁহার কোন আপত্তি নাই। আমাকে এই আদেশ দিয়া তিনি ইব্রাহিমকে সঙ্গে লইয়া গৃহত্যাগ করিলেন।

তাঁহারা উভয়ে অদৃশ্য হইলে আমি গ্যারেজ হইতে গাড়ী বাহির করিয়া আনিলাম। আমি নিজেই মোটরগাড়ী চালাইতে জানি ; আমি গাড়ী লইয়া এজওয়ার রোডের আর একটি 'গ্যারেজে' উপস্থিত হইলাম। সেই গ্যারেজে এক জন সোফেয়ারকে দেখিতে পাইলাম ; রাত্রিকালে গাড়ী চালাইবার ভার তাহার উপর ন্যস্ত ছিল। তাহাকে আমি চালাকি করিয়া বলিলাম, আমি বড়ই বিপদে পড়িয়াছি। আমি কি ভাবে বিপন্ন হইয়াছি, তাহা সে শুনিতে চাহিলে আমি তাহাকে বলিলাম, আমার প্রণয়ী খুব বেশী মদ খাইয়া বেহুঁস হইয়া পড়িয়াছে, তাহাকে তাড়াতাড়ি বাড়ী রাখিয়া আসিতে হইবে, কিন্তু কথাটা প্রকাশ হইলে আমার কলঙ্কের সীমা থাকিবে না, লজ্জায় আমি কাহাকেও মুখ দেখাইতে পারিব না। আমার অবস্থা বুঝিয়া তাহার দয়া হইল ; সে অঙ্গীকার করিল, এই গুপ্ত কথা সে কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না, এতদ্ভিন্ন সে গাড়ী চালাইয়া যাইতেও সম্মত হইল। সে আমার অনুরোধে তোমার অসাড় দেহ গাড়ীতে তুলিয়া লইল। তার পর আমরা উভয়ে গাড়ী লইয়া নদীর বাঁধের উপর উপস্থিত হইলাম এবং তাহার সাহায্যে তোমাকে বাঁধের সানের উপর নামাইয়া রাখিলাম। আমি জানিতাম, পুলিসের পাহারাওয়ালারা কয়েক মিনিটের মধ্যে তোমাকে দেখিতে পাইবে এবং তুমি মদের নেশায় বে-এক্তার হইয়া সেখানে পড়িয়া আছ মনে করিয়া তোমাকে হাঁসপাতালে লইয়া যাইবে। বিনা কৈফিয়তে তোমার প্রাণরক্ষা করি, এরূপ উপায় ইহা ভিন্ন আর একটিও ছিল না ; এ জন্য আমাকে এই উপায়ই অবলম্বন করিতে হইয়াছিল এবং সৌভাগ্যক্রমে আমার চেষ্টা সফল হইয়াছিল। পরমেশ্বরকে অগণ্য ধন্যবাদ—তিনি দয়া করিয়া আমার প্রার্থনায় কর্ণপাত করিয়াছিলেন, তাঁহারই অনুগ্রহে তোমার জীবন-রক্ষা হইয়াছিল, তুমি মৃত্যুর গহ্বর-দ্বার হইতে জীবনের রাজ্যে ফিরিয়া আসিতে পারিয়াছিলে। দেখ, যখন আমরা হতাশ হইয়া মনে করি, তিনি আমাদের প্রতি বিমুখ হইয়াছেন, আমরা তাঁহার করুণায় বঞ্চিত হইয়াছি, তখনও তাঁহার সকরুণ দৃষ্টি সংশয়-তিমিরাচ্ছন্ন সংসার-সাগরে স্থিরজ্যোতি ধ্রুব-নক্ষত্রের ন্যায় আমাদিগকে সুপথে পরিচালিত করে। আজ সকল বিপদের অবসানে তাঁহার চরণে আমার কোটি কোটি প্রণিপাত।"

আনন্দে, বিশ্বাসে যোয়ানের চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তাহা আমার হৃদয় আলোকিত করিল। আমি উৎসাহভরে

বলিলাম, "তোমার এ কথা সত্য, যোয়ান! তাঁহাকে জীবনের অবলম্বন করিলে বিপদে পড়িয়াও আমাদের বিপথে যাইবার ভয় থাকে না। জগদীশ্বরের করুণা ভিন্ন আমি জীবিত থাকিতে পারিতাম না; আমার মৃত্যু হইলে তোমার হতভাগ্য পিতা আরও কতকাল ধরিয়া ঐভাবে কত নিরীহ, নিরপরাধ নর-নারীকে হত্যা করিত—তাহা কে বলিতে পারে! এই উপায়ে তিনি অনেক নর-নারীর জীবন-রক্ষা করিলেন। আমি উপলক্ষমাত্র।"

যোয়ান গম্ভীর দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "সিডনি, সেই ভীষণ রাত্রি হইতে—যে রাত্রে গোল-ডার্স গ্রীণের অন্ধকারাচ্ছন্ন কক্ষে হতভাগ্য এডুইন নিহত হইয়া আমার পদপ্রান্তে ধরাশায়ী হইয়াছিল, সেই রাত্রি হইতে আমি অহরহঃ কিরূপ অন্তর্যাতনা ভোগ করিতেছিলাম, কিরূপ অনুশোচনার অনলে আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল, তাহা তুমি জানিতে না, তাহা তোমার বুঝিবারও শক্তি ছিল না। প্রতি মুহূর্ত্তে আমি মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি, নিজেকে অপরাধী মনে করায় আমার ধারণা হইয়াছিল—আমাকে ধরা পড়িতে হইবে, বিচারকের নিরপেক্ষ বিচারে আমার প্রাণদণ্ড হইবে, এবং তাহাই আমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত।"

আমি যোয়ানের সে কথা চাপা দিয়া বলিলাম, "যে সোফেয়ার আমাকে মোটর-গাড়ীতে তুলিয়া বাঁধের উপর লইয়া গিয়াছিল, সেই লোকটি কে, যোয়ান?—সে আমাকে ঐ ভাবে বাঁধের উপর ফেলিয়া আসিল, ইহা কি অত্যন্ত অদ্ভুত বলিয়া তাহার মনে হয় নাই?"

যোয়ান বলিল, "হাঁ, সে বিস্মিত হইয়াছিল, আমার নিকট সন্তোষজনক কৈফিয়ৎও চাহিয়াছিল, আমি তাহার মুখ বন্ধ করিবার কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া অগত্যা অবশেষে বাবাকে ধরিয়া তাহার চাকরী জুটাইয়া দিলাম। সে বার্ণেস, বাবা তাহাকে সোফেয়ার নিযুক্ত করিয়াছিলেন।"

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম, "বার্ণেস আমাকে বাঁধের উপর ফেলিয়া আসিয়াছিল? তাহা হইলে সে প্রথম হইতেই বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে, আমি তোমার প্রণয়ী?"

যোয়ান বলিল, "সেই জন্যই ত আমাকে সতর্কভাবে চলিতে হইয়াছিল। আমি তাহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলাম, বাবা তোমার উপর সন্তুষ্ট নহেন; এ জন্য সে বাবার নিকট আমাদের প্রেমের কথা প্রকাশ না করে, তাহাকে এই অনুরোধ করিয়াছিলাম। তোমার ছেঁড়া পোষাক দেখিয়া বার্ণেস তোমাকে আমার প্রণয়ী বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারে নাই; এ জন্য আমি বলিয়াছিলাম, তুমি ছদ্মবেশে আমাদের বাড়ী আসিয়াছিলে।"

আমি বলিলাম, "ভালই হইয়াছিল, বার্ণেস আমাকে কয়েকবার দেখিয়াছিল, ঐ জন্য কিন্তু চিনিতে পারে নাই।"

যোয়ান বলিল, "সে কথা সত্য; তুমি মূল্যবান্ পরিচ্ছদ পরিয়া তাহার সঙ্গে দেখা করায় সে সেই লোক বলিয়া সন্দেহ করিতে পারে নাই। তোমার মৃতদেহ কেহ সনাক্ত করিতে না পারে, এই উদ্দেশ্যেই ইব্রাহিম তোমাকে ছেঁড়া পোষাক পরাইয়াছিল।"

যোয়ান আমাকে আরও অনেক কথা বলিল; যে সকল গুপ্তকথা সে পূর্ব্বে কোন দিন আমার নিকট প্রকাশ করিতে সাহস করে নাই, তাহা সে নিঃশঙ্কচিত্তে সরলভাবে খুলিয়া বলিল। সে বলিল, পিতার ভয়েই সে সে সকল কথা পূর্ব্বে প্রকাশ করে নাই। তাহার পিতার মেজাজ ভাল থাকিলে সে তাহার প্রতি সস্নেহ ব্যবহার করিত, যখন মস্তিষ্ক বিকৃত হইত, তখন তাহাকে পিশাচের ন্যায় পীড়ন করিত। থরন্ডের ভূমিকায় সে সাধুপ্রকৃতি ভদ্রলোক, কিন্তু কার্ল কুপরূপে সে বিকৃতমস্তিষ্ক, নিষ্ঠুর দানব! পিশাচেরও অধম!"

যোয়ান আরও বলিল, তাহার পিতা যে দিন কোন নর-নারীকে কৌশলক্রমে ধরিয়া আনিয়া ফাঁদে ফেলিত, সেই দিনই ইব্রাহিম তাহার আদেশে কফি আনিয়া তাহাকে পান করাইত। সেই কফিতে একপ্রকার বিষাক্ত ভেষজ রস মিশ্রিত করা হইত। সেই রস সে সুদান হইতে সংগ্রহ করিয়াছিল। সেই কফি পান করিলে চেতনা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইত না, কিন্তু ইচ্ছার স্বাধীনতা সাময়িকভাবে নষ্ট হইত, অন্য একপ্রকার স্ফূর্ত্তি অনুভূত হইত; তাহা অনেকটা ভাঙের নেশার মত। কুপ তাহাকে নির্য্যাতনের ভয়প্রদর্শন করিয়া সেই কফি পান করিতে বাধ্য করিত। সে যখন যন্ত্রণায় অস্থির হইত, তাহার নিষ্ঠুর পিতা সেই সময় তাহার মুখের ছবি আঁকিত। সেই কফির স্বাদ কটু নহে, এবং তাহা পান করিয়া স্বাস্থ্যও নষ্ট হইত না। কিন্তু তাহার

পিতা ও ইব্রাহিম ভিন্ন তাহার প্রস্তুত-প্রণালী অন্য কেহ জানিত না।

প্রায় এক ঘণ্টা ধরিয়া আমরা সেখানে গল্প করিলাম। আমার মনে হইল, আমরা নবজীবন লাভ করিয়াছি; আমাদের দুঃখময় অভিশপ্ত জীবনের অবসান হইয়াছে। আমাদের আশা, বিশ্বাস, সুখ ও প্রেম অক্ষুণ্ণ হইবে।

অতঃপর আর আমাদিগকে প্রতারিত হইতে হয় নাই। কুপের মৃত্যুর পর এক বৎসর অতীত হইয়াছে, আমাদের প্রেম সেইরূপ গভীর, সেইরূপ অটুট। ছয় মাস পূর্ব্বে আমি যোয়ানকে বিবাহ করিয়াছি। আমরা এখন বার্ণেটে একটি বাড়ী লইয়া পরম সুখে বাস করিতেছি। আমাদের অপেক্ষা সুখী দম্পতি এ দেশে আছে, ইহা আমরা বিশ্বাস করি না।

যোয়ান তাহার পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়াছে। সেই সম্পত্তির পরিমাণ অল্প নহে। কিন্তু সে পুলিসের অনুরোধে তাহার পিতার অঙ্কিত চিত্রগুলি অগ্নি-কুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া ভস্মে পরিণত করিয়াছে।

বেসি এখনও পূর্ব্বোক্ত বোর্ডিংস্কুলে থাকিয়া লেখা-পড়া শিখিতেছে। ডাক্তার হ্যানসা আমাদের বিবাহে বরকর্ত্তা হইয়াছিলেন। তিনি এখনও চেয়ারিংক্রশ হাঁস-পাতালের চিকিৎসকের কার্য্যে ব্রতী আছেন।

কুপের 'রহস্যের খাসমহল' এখন নূতন সাজে সজ্জিত হইয়াছে। একটি সম্ভ্রান্ত পরিবার সেই বাড়ী ভাড়া লইয়া সেখানে বাস করিতেছেন। তাঁহারা সেই অট্টালিকার অতীত রহস্য অবগত নহেন।

গতকল্য আমি একখানি ট্যাক্সিতে সেই অট্টালিকার সম্মুখ দিয়া যাইতেছিলাম। রহস্যের খাসমহলের দিকে চাহিয়া পূর্ব্বকথা স্মরণ হওয়ায় মুহূর্ত্তের জন্য আমার যেন মোহ উপস্থিত হইয়াছিল; কিন্তু সেই অতীত কাহিনী এখন স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতেছে। তাই নামগুলি পরিবর্ত্তিত করিয়া এই বিচিত্র কাহিনী লিপিবদ্ধ করিলাম।

[সমাপ্ত।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

তীর্থ-স্মৃতি

স্বচ্ছ সুনীল, ব্রহ্মার কৃত মানস-হ্রদের তটে
সেই এক দিন কেটেছিল সুখ-রাত্রি,
স্বপ্নের মত সে মধুর স্মৃতি জাগ্রত হৃদি-পটে—
দুর্গম গিরি-গহন-পথের যাত্রী!

নীলাকাশ হ'তে আরো ঘন নীল উজ্জ্বল সুগভীর,
বারিধি সদৃশ মহান্ সরসী-বক্ষে
লহরীর লীলা কিবা অপরূপ। চির-পবিত্র নীর
হেরিনু সে দিন অপলক দুটি চক্ষে।

দক্ষিণে শোভে তুষার-ধবল মান্ধাতা গিরি যেথা
মৌনী তাপস! সাধনায় চির-মগ্ন,
মুক্তির লাগি যেন বৈরাগী ভস্ম মাখিয়া সেথা
সর্ব্বং-সহ শরীরে রেখেছে নগ্ন!

উত্তরে মহা নির্ব্বাণ-পীঠে মুক্তি-সৌধ শোভে
কৈলাস-গিরি-রজত-শুভ্র-শৃঙ্গ,
দেবতা ঋষির চির-বাঞ্ছিত পদারবিন্দ-লোভে
মত্ত যেখানে নিয়ত মানস-ভৃঙ্গ।

ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু নদের পবিত্র তোয়রাশি
যেথা হ'তে বহি মিশেছে সাগর সঙ্গে
শতদ্রুর শত ঊর্ম্মির মালা আসিয়াছে ভালবাসি
আর্য্যভূমির সিক্ত করিতে অঙ্গে।

সেই এক দিন ডুবাইয়া দেহ মানস-সরসী-জলে
করেছিনু স্নান, তর্পণ পিতৃ-জন্য
নিমেষ-পরশে শ্রান্ত শরীর শিহরে গো পলে পলে—
ভূলোক স্বর্গ মানে যে ধন্য ধন্য!

গিয়াছিনু ধীরে তেয়াগি সে তীর, তুষার-সমাধি পাশে
মহাযোগী যেথা বিরাজেন স্থির নিত্য,
নগ্ন শরীরে রজত-শুভ্র কিরীটী-অট্টহাসে
বিহ্বল, মহা পাগলের মত চিত্ত!

সেই এক দিন নোয়াইয়া শির মুক্ত বেদীর তলে
পড়েছিল লুটি ভার-দেহ পথশ্রান্ত,
অমল ধবল গৌরীকুণ্ডে তুষার-হ্রদের জলে
অঞ্জলি পানে হয়েছিনু উদ্‌ভ্রান্ত!

সে দিনের স্মৃতি মনে জাগে নিতি উজ্জ্বলতররূপে—
চির-দুর্গম গহন-পথের যাত্রী।
সন্ধ্যা-আঁধারে সে রূপের আলো নামিতেছে চুপে চুপে
হৃদাকাশ-মাঝে, ফুটিতে শারদ-রাত্রি!

কৈলাস কোথা? মানসোত্তরে! কতদূরে কোথা জাগে
হিমালয়-পারে, দুর্গম গিরিবক্ষে—
মনমাঝে যে গো হেরি সেই রূপ সহজে ও অনুরাগে
স্বর্গের ছবি কে আনিল আজ মর্ত্ত্যে!

শ্রীসুশীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

আকাশ নীল কেন?

সকলেই জানেন, আকাশ কোন একটা বাস্তব পদার্থবিশেষ নহে। দিগন্তপরিব্যাপ্ত শূন্যপ্রদেশকেই আমরা আকাশ বলিয়া থাকি এবং যে নীলপদার্থটিকে আমরা দেখি, তাহা কবিকল্পিত নীল-চন্দ্রাতপ বা তদ্বিধ কোন আবরণ নহে। প্রশ্ন হইতে পারে, আকাশ বাস্তব কিছু না হইলে ঐ নীল আবরণটি কি এবং উহা আমাদের চক্ষুতে নীল বলিয়াই বা প্রতীয়মান হয় কেন? এই সম্বন্ধে বলিতে গেলে আলোকবিজ্ঞানের কতকগুলি মৌলিক তত্ত্ব-কথা বলা দরকার। যে সূর্য্যালোক আমরা পাইয়া থাকি এবং যাহা আমাদের চক্ষুতে বর্ণহীন বলিয়া প্রতীতি জন্মে, বস্তুতঃ তাহা বিভিন্নবর্ণের সপ্তরশ্মির সমাবেশ। এই সপ্তরশ্মির অস্তিত্ব আমরা সহজেই প্রত্যক্ষ করিতে পারি। একটি ত্রিকোণ কাচফলকের ভিতর দিয়া শুভ্র (বর্ণহীন) সূর্য্যালোক আসিতে দিলে ইহা বিশ্লেষিত হইয়া যায় এবং কোন পর্দ্দার উপর পতিত হইলে নয়নাভিরাম বর্ণচ্ছত্র দৃষ্ট হয়। কৃত্রিম উপায় ভিন্নও প্রাকৃতিক জগতেও আমরা সর্ব্বদাই সপ্তরশ্মি বিশ্লেষিত হইতে দেখিয়া থাকি। রামধনুর মনোরম বর্ণবিন্যাস প্রায়শই দেখা যায়। এই স্থলে বলা দরকার যে, জলবিন্দুর উপর সূর্য্যরশ্মি পতিত হইলে সপ্তরশ্মি বিশ্লেষিত হয়, যেমন তৃণসংলগ্ন শিশিরবিন্দুতে সূর্য্যালোক পতিত হইয়া সপ্তবর্ণসম্বলিত মনোরম দৃশ্য সৃষ্ট হয়। জলের উপর তৈল ছাড়িয়া দিলে এবং তদুপরি সূর্য্যালোক পতিত হইলে সপ্তরশ্মি বিশ্লেষিত হইয়া যায়, ইহাও নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এবম্বিধ বহুপ্রকারে সূর্য্যালোক যে মূলতঃ বর্ণহীন নয়, পরন্তু বেগুনী (Violet), নীল (Indigo), আসমানী (Blue), সবুজ (Green), পীত (Yellow), কমলা (Orange) ও লোহিত (Red) এই বিভিন্ন বর্ণের সপ্তরশ্মির সমাবেশ, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। সূর্য্য হইতে সপ্তরশ্মি বহির্গত হইয়া এককালে আমাদের চক্ষুতে পতিত হইলে আমাদের বর্ণহীন আলোকের প্রতীতি জন্মে।

আলো এক স্থান হইতে অন্যত্র তরঙ্গাকারে প্রবাহিত হয়, ইহা আলোকবিজ্ঞানের গোড়ার কথা। এতদ্বিষয়ে কল্পনাকে সাহায্য করিতে আমরা একটি সহজ দৃষ্টান্ত লইতে পারি। মনে করা যাক্, কোন জলাশয়ের মধ্যস্থলে ঢিল ছুড়িয়া বা অন্য কোন উপায়ে তদ্দেশীয় জলকে আলোড়িত করা হইতেছে। আমরা দেখিয়া থাকি, ধীরে ধীরে এই আলোড়ন তরঙ্গাকারে সর্ব্বত্র ছড়াইতে থাকে এবং তরঙ্গাকারেই এই আলোড়নের সাড়া অন্য জলাশয়ের অন্যত্রাবস্থিত কোন ব্যক্তি বা বস্তুর সন্নিকটে পৌঁছায়। বৈজ্ঞানিকগণ বলিয়া থাকেন, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র 'ইথার' নামক এক প্রকার পদার্থ বিদ্যমান আছে। যদিও মানবের কোন ইন্দ্রিয় দ্বারাই ইহার অস্তিত্ব অনুভব করা যায় না, তবুও বৈজ্ঞানিকগণ ইহার অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া বলিয়া থাকেন যে, 'ইথারে' তরঙ্গ উত্থিত হইতে পারে। কোন স্থানে আলো প্রজ্বলিত হইলে এই আলোর শক্তিব্যয়ে ইথার-সমুদ্রে তরঙ্গসৃষ্টি হয় এবং যখন এই তরঙ্গ আমাদের চক্ষুতে পৌঁছায়, তখনই আমাদের দর্শনানুভূতি জন্মে অর্থাৎ আমরা ঐ আলো দেখিতে পাই। জলের উপর যেমন ঢিলের তারতম্যানুসারে ছোট বড় তরঙ্গ সৃষ্ট হয়, তদ্রূপ আলোর গুণানুসারে ইথার-সমুদ্রে উত্থিত আলোকতরঙ্গের দৈর্ঘ্যও ছোট বড় হয়। লোহিত বর্ণালোকের তরঙ্গই সপ্তরশ্মির ভিতর সব চেয়ে বড় এবং তৎপর কমলা, পীত, সবুজ, আসমানী, নীল, বেগুনী আলোকতরঙ্গের আকৃতি ক্রমান্বয়ে ছোট। তরঙ্গদৈর্ঘ্যানুসারে বর্ণচ্ছত্রের বর্ণের পর্য্যায় নির্ণীত হয়, যথা—সর্ব্বাগ্রে লোহিত, তৎপর কমলা, পীত, সবুজ, আসমানী, নীল ও সর্ব্বশেষে বেগুনী দৃষ্ট হয়। আলোকবিজ্ঞানানুসারে আমরা পদার্থকে স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ, এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকি। প্রকৃত-প্রস্তাবে কোন পদার্থই সম্পূর্ণ স্বচ্ছ নহে। কোন পদার্থের উপর আলো পতিত হইলে পদার্থের বিভিন্নতা অনুযায়ী আলোক-রশ্মির বিভিন্নাংশ বিভিন্নাবস্থা প্রাপ্ত হয়; কতকাংশ নির্গত

(transmitted হয়, কতকাংশ বিক্ষিপ্ত diffussed, scattered) হয় এবং অবশিষ্টাংশ বিনষ্ট হয়। সুতরাং কোন পদার্থের ভিতর দিয়া চলিয়া আসার পর আমরা একই রশ্মি হইতে দুইটি বিভিন্ন প্রকার আলোকরশ্মি পাইতেছি। নির্গত রশ্মি মূল রশ্মির পদার্থে প্রবেশকালীন পথের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া সামান্য পরিবর্ত্তিত বা কোন সময়ে অপরিবর্ত্তিত পথেই বহির্গত হইয়া আসে। বিক্ষিপ্ত রশ্মির কোন নির্দ্দিষ্ট পথ নাই, পদার্থটির ভিতর প্রবেশ করিবার পথে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া মূল আলোকরশ্মির কতকাংশ সর্ব্বদিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং এইগুলিকেই আমরা বিক্ষিপ্ত রশ্মি বলিয়া থাকি। একটি মূল রশ্মি হইতে একটিমাত্র নির্গত রশ্মি,কিন্তু ইহা হইতে বহু বিক্ষিপ্ত রশ্মির সৃষ্টি হয়। পদার্থের উপরিভাগের মসৃণতা অনুযায়ী বিক্ষিপ্ত রশ্মির কতকাংশ আলোক-বিজ্ঞানের কয়েকটি পদ্ধতি অনুসারে প্রতিফলিত হয় (Reflcted)। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার বিস্তৃত আলোচনা অনাবশ্যক। মোট কথা, আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কোন পদার্থের ভিতর দিয়া আলো গমনকালে পদার্থের ধর্ম্মানুসারে ইহার বিভিন্নাংশ বিক্ষিপ্ত ও প্রতিফলিত এবং বিনষ্ট হয়। একটি জলপূর্ণ কাচপাত্র লওয়া যাক্। অন্ধকার গৃহে রাখিলে ইহা দেখা যাইবে না। পাত্রটির এক পার্শ্বে একটি প্রদীপ প্রজ্বালিত করিয়া বিপরীত পার্শ্ব হইতে পাত্রটির ভিতর দিয়া সোজা-সুজি তাকাইলে প্রদীপটা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রদীপের আলোর শক্তিব্যয়ে ইথারে যে তরঙ্গ উত্থিত হইতেছে, তাহা কাচপাত্রের ভিতর প্রবেশ করিলে যে অংশ নির্গত হইতেছে, তাহাই অপর পার্শ্বে যাইয়া আমাদের চক্ষুতে পৌঁছাইলে আমরা প্রদীপটি দেখিতে পাই। প্রদীপ জ্বালিবার পর কাচপাত্রটি ও তাহার ভিতরে যাহা আছে, তাহা সমস্তই দেখা যাইতেছে। কাচপাত্রের বা তদভ্যন্তরস্থ জলের স্বকীয় কোন আলো নাই ; সুতরাং তরঙ্গসৃষ্টি করিবার শক্তি নাই, তবুও ঐগুলি দেখা যায় কেন ? যেহেতু প্রদীপ জ্বালিবার পূর্ব্বে এইগুলি দেখা যায় না, সেজন্য বলিতে হইবে, প্রদীপের আলোই কোনপ্রকারে এগুলির দর্শনানুভূতি জন্মায়। পাত্রের ভিতর প্রবেশ করিবার পথে যে রশ্মিগুলি চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতেছে, সেইগুলির সাহায্যেই আমরা পাত্রটি (অর্থাৎ যদ্দ্বারা বিক্ষিপ্ত হইতেছে) দেখিতে পাই। যাহাদের নিজের আলো নাই, তাহা এইরূপেই অন্য আলোকের বিক্ষিপ্ত ও প্রতিফলিত অংশ দ্বারা দৃষ্ট হয়। এখান হইতে আমরা বিক্ষিপ্ত ও নির্গত রশ্মির পার্থক্য বুঝিতে পারি। কোন পদার্থে প্রবেশ করিবার পর সকল বর্ণের রশ্মিই সমপরি-মাণে নির্গত বা বিক্ষিপ্ত হয় না। আলোর ধর্ম্মানুসারে কোন শুভ্রালোকরশ্মি যদি কোন ক্ষেত্র (medium) যাহাতে আলোক-তরঙ্গের আকৃতির তুলনায় ক্ষুদ্র পদার্থকণা বিদ্যমান আছে, তাহার ভিতর প্রবেশ করে, তবে নির্গত রশ্মিতে দেখা যাইবে যে, দীর্ঘতর তরঙ্গের আলোকের আধিক্য ঘটিয়াছে অর্থাৎ যে আলোক-তরঙ্গ যত বেশী দীর্ঘ, তাহা তত বেশী পরিমাণে নির্গত ও কম-পরিমাণে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। সুতরাং শুভ্রালোক এই জাতীয় ক্ষেত্রের ভিতর দিয়া কিছু বেশী পথ অতিক্রম করিয়া বহির্গত হওয়ার পর নির্গত রশ্মি পীতাভ এবং আরও বেশী পথ অতিক্রম করিবার পর রক্তিমাভ দেখা যাইবার সম্ভাবনা। উপরন্ত, যেহেতু তরঙ্গের হ্রস্বতানুযায়ী বিক্ষিপ্তাংশ বৃদ্ধি পায়, তজ্জন্য উক্ত প্রকার ক্ষেত্র হইতে বিক্ষিপ্ত রশ্মিতে ক্রমান্বয়ে আসমানী, নীল, বেগুণীর আধিক্য থাকা উচিত। মনে করা যাক্, কোন ছিদ্রপথ দিয়া কোন গৃহাভ্যন্তরে শুভ্রালোক প্রবেশ করিয়া উত্তর হইতে দক্ষিণে যাইতেছে। এই স্থলে বায়ুই আলোকবাহক ক্ষেত্র এবং মনে করা যাক্, ধূমরূপে গৃহাভ্যন্তরস্থ বায়ুতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থকণা বিদ্যমান আছে। ছিদ্রপথাগত আলোকরশ্মি এই ধূমজাল অতিক্রম করিয়া নির্গতরশ্মিরূপে উত্তর হইতে দক্ষিণে চলিতে থাকিবে ; কিন্তু বিক্ষিপ্তরশ্মি পূর্ব্ব পশ্চিম উর্দ্ধ অধঃ প্রভৃতি সকল দিকেই যাইবে। পূর্ব্ব বা পশ্চিমদিকে দাঁড়াইয়া আলোকরশ্মির দিকে তাকাইলে বিক্ষিপ্ত রশ্মিগুলিই আমাদের চক্ষুতে আঘাত করিবে, সুতরাং ঐ আলোকরশ্মি নীলাভ দেখা যাইবে। আমরা অহরহই এইরূপ ছিদ্রপথ দিয়া আগত আলোকের দিকে আলোকনির্গমপথ ভিন্ন অন্য দিক হইতে তাকাইয়া আলোক-রশ্মিকে নীলাভ দেখিয়া থাকি।

সূর্য্য আমাদের পৃথিবী হইতে বহু দূরে অবস্থিত। পৃথিবীর উর্দ্ধে প্রায় ৫০ মাইল পর্য্যন্ত বায়ু আছে। এই বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থকণা বিদ্যমান আছে। সূর্য্য হইতে উৎপন্ন আলোকতরঙ্গকে পৃথিবীতে আসিবার পথে এই বায়ুস্তর অতিক্রম করিতে হয়। উদয় বা অস্তকালে, যেহেতু সূর্য্য অনেক নিম্নে থাকে, তজ্জন্য সূর্য্যালোককে এই সময়ে অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী প্রশস্ত বায়ুস্তর অতিক্রম করিতে হয়। আমরা সূর্য্যের দিকে যখন তাকাই, তখন বায়ুস্তর অতিক্রম করিয়া নির্গত সূর্য্যালোকরশ্মিগুলিই আমাদের চক্ষুতে পতিত হয় এবং এই জন্য ইহাতে দীর্ঘতরঙ্গের আলোকের আধিক্য থাকা সম্ভব অর্থাৎ লোহিত, পীত প্রভৃতি বেশী থাকা সম্ভব। আমরা উদয় বা অস্তকালীন সূর্য্য লোহিতবর্ণ দেখিয়া থাকি ; এই সময়ে অনেক বেশী প্রশস্ত বায়ুস্তর অতিক্রম করিয়া যে রশ্মি নির্গত হয়, তাহাতে আলোর ধর্ম্মানুসারে

ও পদার্থকণা বিদ্যমান থাকার জন্ত লোহিতবর্ণালোক অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণে থাকে বলিয়াই সূর্য্য এই সময়ে রক্তিমাভ দৃষ্ট হয়। এই ত গেল নির্গতরশ্মির কথা। এক্ষণে বিক্ষিপ্তরশ্মি লইয়া আলোচনা করিলেই আমরা আকাশ নীলবর্ণ দেখায় কেন, তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হইব।

সূর্য্য হইতে আলোকতরঙ্গ উৎপন্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে বিকীরিত হইতেছে; কতক আমাদের পৃথিবীতে আসিতেছে এবং অন্তগুলি আকাশময় ছড়াইয়া পড়িতেছে। পৃথিবীর দিকে যেগুলি আসিতেছে, সেগুলিও বায়ুস্তর অতিক্রম করিয়া বিভিন্নদিকে আসিতেছে। এক্ষণে আমরা যে সকল রশ্মি সূর্য্য হইতে বরাবর আসিয়া আমাদের চক্ষুতে আঘাত করিতেছে, সেগুলি বাদ দিয়া অন্য দিকে যাইবার পথে যেগুলি বায়ুস্তর অতিক্রম করিতেছে, সেগুলি লইয়া আলোচনা করিব। এই শেষোক্ত রশ্মিগুলির প্রত্যেকটিরই কতকাংশ বায়ুস্তর অতিক্রম করিয়া নির্গত হইল এবং স্ব-স্ব পথানুযায়ী বিভিন্নদিকে গেল। অবশিষ্ট কতকাংশ বায়ুস্তরে প্রবেশ করিয়া বিক্ষিপ্ত হইল অর্থাৎ সর্ব্বদিকে ছড়াইয়া গেল। যেহেতু এই বিক্ষিপ্ত রশ্মিগুলি চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া যাইতেছে, সুতরাং ইহাদের কোন না কোনটি আমাদের চক্ষুতে আসিয়াও পৌঁছিতেছে। এইরূপ সোজাসুজি সূর্য্যের দিকে না তাকাইয়া অন্য যে দিকেই দৃষ্টিপাত করিব, সেই দিক হইতেই সূর্য্যালোকের বিক্ষিপ্ত রশ্মি আমাদের চক্ষুতে আঘাত করিবে। আমরা জানি, এই রশ্মিগুলির ভিতর হ্রস্বতর তরঙ্গের আলোকের আধিক্য ঘটে অর্থাৎ এই আলোকে লোহিত, কমলা, পীত, সবুজ, আসমানী, নীল, বেগুণীর ভাগ ক্রমান্বয়ে বেশী, অতএব দেখিতেছি, সূর্য্যের দিক ভিন্ন আকাশের অন্য সব দিক হইতে শেষোক্তবর্ণগুলির (আসমানী, নীল, বেগুণী) আধিক্যপূর্ণ আলোক আমাদের নিকটে আসিয়া পৌঁছিতেছে, সুতরাং আকাশের বর্ণে বেগুণী, নীল, আসমানীর আধিক্যই থাকা উচিত।

আকাশের প্রকৃত বর্ণনির্ণয় করিবার পূর্ব্বে আরও একটু ভাবিবার বিষয় আছে। আকাশ হইতে যে আলোক আমরা পাইয়া থাকি, তাহা বিক্ষিপ্ত রশ্মি, কিন্তু বিক্ষিপ্ত হইবার পূর্ব্বে ও পরে এই রশ্মি বায়ুস্তর ভেদ করিয়া নির্গত হয়। ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, আকাশের কোন স্থান হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া যে রশ্মি আমাদের নিকট পৌঁছিতেছে, তাহা বিক্ষিপ্ত হইবার পূর্ব্বে কিয়ৎপরিমাণে বায়ুস্তর ভেদ করিয়া নির্গত হওয়ার জন্ত যে রশ্মি বিক্ষিপ্ত হইতেছে, তাহা শুভ্রালোক নহে, তাহাতে দীর্ঘতর তরঙ্গের আলোকের অংশ বেশী। শুভ্রালোক প্রথমে কিয়ৎ-পরিমাণে বায়ুস্তর অতিক্রম করিতেছে, তৎপর বিক্ষিপ্ত হইয়া পুনরায় বায়ুস্তর অতিক্রম করিয়া নির্গত হইতেছে। এক্ষণে আমরা জানি, নির্গত রশ্মিতে হ্রস্বতর তরঙ্গের আলোক কম থাকে এবং বিক্ষিপ্ত রশ্মিতে দীর্ঘতর তরঙ্গের আলোকের অভাব হয়; সুতরাং আমরা বলিতে পারি, একপ্রকারে বিক্ষিপ্ত ও নির্গত-রশ্মিতে বর্ণচ্ছত্রের উভয়পার্শ্বস্থ আলোকের অভাব ঘটে এবং প্রধানতঃ আকাশ হইতে মধ্যস্থ আলোকগুলি (আসমানী, সবুজ) আমাদের চক্ষুতে আসিয়া পৌঁছিতে সমর্থ হয়। আকাশের প্রকৃতবর্ণ পদার্থকণার আকৃতি ও পরিমাণের উপর নির্ভর করিবে, যেমন যদি পদার্থকণা খুব বড় হয়, তবে সকল বর্ণের আলোকই সমভাবে বিক্ষিপ্ত হয় এবং বিক্ষিপ্ত রশ্মিও শুভ্রই হইয়া থাকে, তাহা আমরা অহরহঃ দেখিয়া থাকি। পদার্থকণার আকৃতি ও পরিমাণানুযায়ী আসমানী ও সবুজের ভিতর পূর্ব্বোক্ত আলোটিই বেশী পরিমাণে বিক্ষিপ্ত হইয়া আকাশের এই বিশিষ্টবর্ণের সৃষ্টি করে। আমরা আশা করিতে পারি যে, বায়ুস্তরের গভীরতা ও পদার্থকণার বাহুল্যানুসারে আকাশের বর্ণেরও তারতম্য হইবে। স্বভাবতঃই তাহা হইয়া থাকে, আকাশের বিভিন্ন অংশের বর্ণ এক নহে, দিবসের ও বৎসরের বিভিন্ন সময়ে আকাশের বর্ণের পার্থক্য ঘটিয়া থাকে।

শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (বি, এস, সি)।

নারদ

নাহি দুঃখ নাহি শ্রান্তি
হৃদয়ে পরমা শান্তি
দিবানিশি গাহে সে যে গান
মধুর বীণার স্বরে
অমৃত-মাধুরী ঝরে
পুলকিত করে দেব-প্রাণ।

ভক্ত-কুল-চূড়ামণি
জ্ঞানী, গুণী, প্রেমে ধনী
চির-যুবা রসিক-প্রধান,
ভাবে ভোলা ও যে কবি
মূর্ত্ত আনন্দ-ছবি
চিরন্তন—নাহি অবসান।

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

শাসন

১

কর্ম্মজীবনে ভাগ্যলক্ষ্মী যতটা প্রসন্ন হইয়াছিলেন, পারিবারিক জীবনযাত্রায় গৃহলক্ষ্মী লিলি ঠিক তাহার বিপরীত হইয়াই খৃষ্টবাহনের ক্ষুদ্র সংসারটিকে অশান্তিময় করিয়া তুলিয়াছিল।

খৃষ্টবাহনের পিতা রেভারেণ্ড রে বা রায় এবং লিলির পিতা কাপ্তেন সেম্ বা সোম চুনার ফোর্টের রেজিমেণ্টের সংস্রবে চুনারের অধিবাসী হইয়া পড়িয়াছিলেন। উভয়েই বাঙ্গালী খৃষ্টান, সমবয়সী, সৌহৃদ্যও ছিল পরস্পর অকৃত্রিম। পাশাপাশি দুইখানি বাংলোয় দুই বন্ধু বাসা পাতিয়াছিলেন। সে সময় যে সকল সরকারী কর্ম্মচারী রেজিমেণ্টের সংস্রবে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের আমোলে নির্ম্মিত প্রাসাদতুল্য বাংলোগুলিতে অধিষ্ঠিত হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন, তাঁহাদের সুখসমৃদ্ধির সীমা ছিল না। তার পর ভারত সরকার চুনার ফোর্টকে যুক্তপ্রদেশের বাল-অপরাধীদের চরিত্র-শোধনালয়ে পরিণত করিয়া, সামরিক শক্তি-সম্ভার ও রেজিমেণ্ট উঠাইয়া লইয়া যান। অধিকাংশ অফিসারকে বাধ্য হইয়া পেন্‌সন্ লইতে হয়। চুনারের স্বাস্থ্য, জলবায়ু এবং স্বল্পব্যয়ে আহার্য্যের প্রচুর উপাদান সংগ্রহের সুযোগ, এই শ্রেণীর অফিসারদের এতই প্রলুব্ধ করিয়া তুলিয়াছিল যে, তাঁহারা পেন্‌সন্ প্রাপ্ত হইয়া এই স্থানেই কায়েমীভাবে ঘর-সংসার পাতিয়া চুনারের 'বাসিন্দা' হইয়া পড়েন।

দুর্গের মধ্যে সেনাবারিকে সেনাদল থাকিলেও, বাহিরে, দুর্গের পাদদেশ হইতে লোয়ার লাইন পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানেই শতাধিক বাংলোয় রেজিমেণ্টের অফিসারগণ অবস্থান করিতেন। রেজিমেণ্ট তুলিয়া লইবার পরেই সরকার বাংলোগুলি নীলামে বিক্রয় করিয়া দিলেন। স্থানীয় অর্থশালী মহাজনরাই অধিকাংশ বাংলো ক্রয় করেন। তবে পেন্‌সনারদের মধ্যে যাঁহাদের হাতে অর্থ ছিল, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এ সুযোগ পরিত্যাগ করেন নাই।

রেভারেণ্ড রায় অত্যন্ত মিতব্যয়ী ও সঞ্চয়ী ছিলেন। তিনি জোড়া হাতা-সমন্বিত একখানি দুই মহলের বড় বাংলো ক্রয় করিলেন। কাপ্তেন সোম মোটা মাহিনা পাইলেও, কিছুই সঞ্চয় করিতে পারেন নাই, তিনি বন্ধু রায়ের ক্রীত বাংলোর একাংশ সুবিধায় ভাড়া করিয়া কন্যা লিলিকে লইয়া উঠিলেন।

রেভারেণ্ড রায় ছিলেন যেমন মিতব্যয়ী ও সঞ্চয়ী, তাঁহার স্ত্রী অনুপমাও ছিলেন তেমনই আদর্শ গৃহিণী। একমাত্র পুত্র খৃষ্টবাহনও সেই আদর্শে গঠিত হইয়াছিল। উপার্জ্জক্ষম গৃহস্বামী মিতব্যয়ী এবং সহধর্ম্মিণী সুগৃহিণী হইলে সে সংসারে যেমন বিশৃঙ্খলা আসে না, অভাবও কখনও আত্মপ্রকাশ করিবার অবকাশ পায় না। ফলে রেভারেণ্ড রায় কর্ম্ম হইতে অবসর পাইয়াও সুব্যবস্থায় ও অধ্যবসায়ের ফলে শীঘ্রই আয় বাড়াইয়া ফেলিলেন। কতিপয় পাথরের 'কোয়ারী' ইজারা লইয়া অল্পদিনের মধ্যেই তাহাতে লাভবান্ হইয়া উঠিলেন। পূর্ব্ব হইতেই তিনি পুত্র খৃষ্টবাহনকে কোয়ারীর কার্য্যে বিশেষজ্ঞগণের তত্ত্বাবধানে শিক্ষাধীন রাখিয়াছিলেন। যথাসময় শিক্ষাপটু পুত্রকেও এই প্রচুর লাভজনক প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত করিলেন। আয় প্রচুর হইলেও, তাঁহার ক্ষুদ্র সংসারে ব্যয়ের পরিমাণ এমন পরিমিত ছিল যে, তাহা বাহ্যাড়ম্বরজনক না হইলেও, জীবনযাত্রার পক্ষে যেগুলি অপরিহার্য্য ও স্বাস্থ্যপ্রদ, তাহার কোন অসদ্ভাবই ছিল না।

পক্ষান্তরে, কাপ্তেন সোম মাসিক পাঁচ শত টাকা পেন্‌সন পাইয়াও প্রায় প্রতি মাসের শেষভাগে অভাবগ্রস্ত হইতেন। সময় সময় তাঁহাকে বন্ধু রায়ের নিকটও হাত পাতিতে হইত। কাপ্তেন সোম ছিলেন বিপত্নীক,—সংসারে তাঁহার সুগৃহিণী বা সুপরিচালিকা কেহ না থাকায়, খরচের কোন বাঁধাধরা নিয়মও তাঁহার ছিল না। পেন্‌সনের টাকা হাতে আসিবামাত্র পিতা-পুত্রী উভয়েই এমন বিশৃঙ্খলভাবে খরচের ঘটা আরম্ভ করিতেন যে, লোয়ার লাইনের সর্ব্বসাধারণ এ জন্য কাপ্তেন সোমকে 'নবাব সাহেব' বলিয়া অভিহিত করিতেন। পিতা ও পুত্রীকে লইয়া সংসার হইলেও, পোষ্য ছিল একটি পাল। তাহাদের মধ্যে খানসামা, খিৎমতদার, বাবুর্চ্চি, আয়া, হাঁস, মুর্গী, ময়ূর, পাখী, কুকুর, বিড়াল, হরিণ, খরগোস প্রভৃতি কিছুরই অপ্রতুল ছিল না।

ভবিতব্যের বিধানে, অনুপমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও, খৃষ্টবাহনের সহিত লিলির বিবাহ যথারীতি সম্পন্ন হইয়া গেল। যখন এই বিবাহের প্রস্তাব উঠে, অনুপমা তখনই আপত্তি করিয়া বলিয়াছিলেন—"লিলিকে বিয়ে করলে খৃষ্ট কি সুখী হবে? আমার ত তা মনে হয় না। খৃষ্ট আমাদের যেমন শান্ত শিষ্ট সৎ ছেলে, লিলি যে ঠিক তার বিপরীত। শুধু রূপ থাকলে কি হবে?"

রেভারেণ্ড রায় পত্নী অনুপমার কথায় হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "বরাবর বাপের আদরে মানুষ হয়েছে। মায়ের আদর বা শাসন কখন পায়নি ত। আমার খুব বিশ্বাস আছে, তোমার কাছে এলে, লিলির বাপের মত খামখেয়ালী স্বভাব বা যে দোষগুলি ওর

আছে, সে সমস্তই চ'লে যাবে ; তুমি ওকে নিজের মনের মতন ক'রে চালিয়ে নিতে পারবে বলেই—আমি এ বিবাহে মত দিয়েছি।"

কিন্তু অদৃষ্টের চক্রে, অনুপমার হাতে পড়িয়া লিলির উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইবার আর অবকাশ পাইল না। শুভ বিবাহের ঠিক ২১ দিন পরেই লোয়ার লাইনে অকস্মাৎ বিসূচিকা এরূপ করালমূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিল যে, তাহার প্রকোপে পাঁচটি দিনের মধ্যেই অনুপমা, রেভারেণ্ড রায় ও কাপ্তেন সোম ইহলোকের অসমাপ্ত সাধে ইস্তফা দিয়া পরলোকের পথে মহাপ্রস্থান করিলেন।

২

খৃষ্টবাহনের মাতা অনুপমা যে ভয় করিয়াছিলেন, তাহাই ফলিয়া গেল। খৃষ্টবাহন লিলিকে পাইয়া সুখী হইতে পারিল না। রেভারেণ্ড রায়ের মৃত্যুর পর ৫টি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। এই ৫ বৎসরে খৃষ্টবাহন পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে ব্যবসায়ের প্রভূত উন্নতিসাধন করিলেও, স্ত্রীর সাহচর্য্য কি কর্ম্মজীবন বা গার্হস্থ্যজীবনে—কোনটিতেই পায় নাই।

লিলির উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি কিছুতেই সংযত হয় নাই। সে চায়—তাহার স্বামী চুনারের মত অনাড়ম্বর স্থান পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ্ণৌ বা কলিকাতায় গিয়া সংসার পাতে ; অর্থ কি শুধু সঞ্চয়ের জন্যই ? কিন্তু খৃষ্টবাহন পত্নীর সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে যতদূর সম্ভব লক্ষ্য রাখিলেও, তাহার খামখেয়ালী বা চিত্তের উচ্ছৃঙ্খলতার পোষকতা কখনই করে নাই। সুতরাং লিলির উচ্চাকাঙ্ক্ষা ইন্ধনের অভাবে স্বভাবতই প্রশমিত হইয়া যাইত।

খৃষ্টবাহনের আর্থিক আয় যথেষ্ট থাকিলেও, লিলির পিতার মত সে তাহার ক্ষুদ্র সংসারটিকে অনাবশ্যক আড়ম্বরে ভারাক্রান্ত করিবার অবকাশ প্রদান করে নাই। লিলির পিতার আমোলেরই এক আয়াকে সে আশ্রয় দিয়াছিল এবং সেই মহিলাটিই পাকশালার ভার গ্রহণ করিয়াছিল। খৃষ্টবাহনের ইচ্ছা ছিল, তাহার গুণবতী জননীর মত লিলিও স্বহস্তে নানাবিধ খাদ্য-সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া তাহাদের ক্ষুদ্র পারিবারিক জীবনকে সার্থক করে। কিন্তু এ সম্বন্ধে লিলিকে নিতান্ত উদাসীন দেখিয়া সে আর দ্বিতীয়বার অনুরোধ করে নাই। সংসারে লিলির তিনটিমাত্র কার্য্য ছিল,—দিবানিদ্রা, নভেল পড়া আর কারণে অকারণে স্বামীর সহিত কলহ। তবে খৃষ্টবাহন লিলির প্রকৃতির পরিচয় পাইয়াছিল, সুতরাং ইদানীং আর সে লিলির কথা একান্ত অনুচিত ও অমার্জ্জনীয় হইলেও, কোন প্রতিবাদই করিত না এবং তাহার এই উপেক্ষাই লিলির মনে যেমন প্রচণ্ড ক্রোধের সৃষ্টি করিত, তাহার স্পর্দ্ধাও তেমনই উত্তরোত্তর বাড়াইয়া দিত।

বাংলোর যে অংশ লিলির পিতা স্বতন্ত্র ভাড়া লইয়া থাকিতেন, তাঁহার মৃত্যুর পর সেই অংশটি অনেক দিন খালি পড়িয়াই ছিল। সম্প্রতি তাহা সুসংস্কৃত করিয়া খৃষ্টবাহন ভাড়া দিবার সঙ্কল্প করিল। সংবাদপত্রে এই বাংলো ভাড়া দিবার বিজ্ঞাপনও বাহির হইল।

মাসখানেকের মধ্যেই ভাড়াটিয়া জুটিয়া গেল। আনন্দমোহন দে নামে এক বাঙ্গালী খৃষ্টান বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য এই বাংলো ভাড়া লইয়াছিল। এক দিন প্রত্যূষে এই নূতন ভাড়াটিয়া সস্ত্রীক বাংলোয় আসিয়া উপস্থিত হইল। খৃষ্টবাহন নিজে উপস্থিত থাকিয়া তাহাদের ব্যবস্থাদি করিয়া দিয়া স্ত্রীকে বলিল, "আমি ত কারখানায় চলেছি, তুমি ওঁদের একটু দেখা-শুনা ক'র, নূতন এসেছেন, যেন অসুবিধায় না পড়েন। আর তুমিও একটি বেশ সঙ্গিনী পেলে, মিসেস দে তোমারই সমবয়সী।"

ফলতঃ মিসেস দেকে দেখিবার কৌতূহল লিলির খুব প্রবলই হইল। কলিকাতার মেয়ে না জানি কত আধুনিকাই হইবে, আর তাহারই আদর্শে সে তাহার স্বামীকে সভ্যতার দিক দিয়া আধুনিক জীবনযাত্রার গতি কোন্ পথে চলিয়াছে—তাহা দেখাইয়া দিবারও হয় ত সুযোগ পাইবে।—কলিকাতা হইতে ৫ শত মাইল তফাতে চুনারের মত পার্ব্বত্যপ্রদেশ এখনও যে কতটা পশ্চাতে পড়িয়া আছে, পাথরের ব্যবসায়ে প্রমত্ত সৌন্দর্য্য-দৃষ্টিহীন স্বামী তাহার সন্ধান না পাইলেও, নভেল ও ম্যাগাজিনের সহায়তায় সে ত তাহার পরিচয় পাইতেছে! প্রত্যেক আদর্শ দেখাইয়া যদি এখন এই অপদার্থ স্বামীর ভ্রম দূর করা যায়, মন্দ কি ?

পাশের বাংলোর দরদালানে পা দিয়াই লিলি দেখিতে পাইল, তাহারই সমবয়সী এক স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী তরুণী বস্ত্রাঞ্চল কোমরে জড়াইয়া পরম উৎসাহের সহিত বাংলোর ভোজনঘর ভিজা কাপড় দিয়া ধোওয়া-মোছা করিতেছে ও হাফ প্যাণ্ট-পরা কৃষ্ণকায় এক বালক ছোট একটি বালতি করিয়া জল ঢালিয়া দিতেছে।

লিলির সহিত চোখোচোখি হইবামাত্র মেয়েটি কায করিতে করিতেই জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি ?"

লিলি বলিল, "আমি পাশের বাংলো থেকে আসছি—"

মেয়েটি বেশ সহজভাবেই বলিল, "ওঃ, বুঝেছি, আপনিই তা হ'লে মিসেস রায় ; ধন্যবাদ। আপনাকে দেখে বড় আনন্দ পাচ্ছি, আমরা আপনারই আশ্রয়ে এসেছি। কিন্তু দেখছেন ত

আমার অবস্থা, আপনার উপযুক্ত অভ্যর্থনা করবার সৌভাগ্যও পেলুম না,—খোকন, যা ত বাবা—একখানা খুরসী ও ঘর থেকে—"

বাধা দিয়া লিলি বলিল, "না, না, খুরসী আনতে হবে না তোমাকে; আমার বসবারও এখন অবসর নেই। তিনি ব'লে গেলেন কি না, তাই আপনাদের খোঁজ-খবরটি একবার নিতে এসেছি। আপনিই তা হ'লে—"

লিলির জিজ্ঞাসা করিতেও বাধিতেছিল যে, এই কদর্য্য কার্য্যে প্রবৃত্তা মেয়েটি যথার্থই এ বাড়ীর গৃহিণী কি না? বুদ্ধিমতী মেয়েটি তাহার সেই সঙ্কোচপূর্ণ সংশয়টুকু অনুমান করিয়াই হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "হাঁ, আমিই মিসেস দে।"

অতি কষ্টে আত্মদমন করিয়া লিলি বলিল, "আপনাদের চিঠি পেয়েই ঘরগুলো সবই ধুয়ে রাখা হয়েছিল, তবু আপনি এসেই আবার এ সব করছেন কেন?"

মেয়েটি হাসিয়া উত্তর দিল, "আপনারা দয়া ক'রে সে সব ক'রে রেখেছেন, তা জানি, কিন্তু তবুও ঘরদোর না ধুলে গা যেন ঘিন্-ঘিন্ করে; বিশেষ, পশ্চিমের যে ধূলো, আপনারা ত দুটি বেলায় তার পরিচয় পান। তাই আর এক দফা প্রসাধনপর্ব্ব সুরু করেছি।—কিন্তু আপনি দাঁড়িয়ে থাকবেন, সেটা কি ভাল দেখায়?"

এই সময় পাশের ঘরের দরজা খুলিয়া মেয়েটির স্বামী অকুস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল। ভিতর হইতেই জানালার ফাঁক দিয়া সে সমস্তই দেখিতেছিল। শিষ্টাচার-রক্ষার জন্য এখন আত্মপ্রকাশ করিয়া বলিল, "আমিও সসম্ভ্রমে আপনাকে আমার নমস্কার জানাচ্ছি, মিসেস রায়। আমরা আপনাদেরই আশ্রয়ে এসে পড়েছি। আপনার স্বামী প্রাথমিক যা কিছু সাহায্য করবার সবই করেছেন, আপনিও দয়া ক'রে দেখা-শুনা করতে এসেছেন দেখছি। কিন্তু এ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে আমাদের মনে লজ্জা দেওয়া হবে, অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যও ও ঘরে এসে বসুন,—আমরা আশ্রিত, পর মনে করবেন না যেন।"

লিলি মুগ্ধনেত্রে এই বাক্‌পটু যুবাটির দিকে চাহিয়া রহিল। গৃহিণীকে দেখিয়া তাহার মনে যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার স্বামীর কেতাদুরস্ত হাবভাব, ফিটফাট চেহারা ও কথা কহিবার অভিনব কৌশলে সে বিসদৃশ ভাব কাটিয়া গেল,—দেহের সমস্ত রক্ত নিমেষের মধ্যে তাহার মুখের উপর উঠিয়া সেই সুন্দর মুখখানিকে আরক্তবর্ণ করিয়া তুলিল। গাঢ়স্বরে লিলি বলিল, "আপনিই তা হ'লে মিষ্টার দে?"

মিষ্টার দে উত্তর দিল, "আগেই আপনাকে জানিয়েছি; আমরা আপনার আশ্রিত।—এঁর গৃহকর্ম্ম শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত দয়া ক'রে এই ঘরে এসে বসুন—আশ্রিতের এই আর্জ্জী।"

সে আর্জ্জী অস্বীকার করে, এমন সাধ্য লিলির ছিল না। সে স্মিতবদনে আনন্দমোহনের সঙ্গে পার্শ্বের ঘরে প্রবেশ করিল। আনন্দমোহনের স্ত্রীর চক্ষু সে দিকে মুহূর্ত্তের জন্য আকৃষ্ট হইয়াই অবনমিত হইল।

৩

ঘণ্টাখানেক আলাপের পর সে দিন এই নবাগত দম্পতি সম্বন্ধে বহু অভিজ্ঞতা লইয়াই লিলি নিজের বাংলোয় ফিরিয়া আসিল। আনন্দমোহনের সহিত আলাপ করিয়া তাহার মন আনন্দে এমন ভরপূর হইয়াছিল,—জীবনে সে যাহা কখনও উপভোগ করিবার সুযোগ পায় নাই। পক্ষান্তরে, আনন্দমোহনের মুখে তাহার পত্নী শোভার অক্লান্ত পরিশ্রম, সাংসারিক সমস্ত কার্য্য—এমন কি, রন্ধনাদি পর্য্যন্ত সে নিজেই সম্পন্ন করে এবং এই সকল লইয়াই সে ব্যস্ত—আনন্দমোহনের সহিত বিশ্রম্ভালাপ বা আমোদ-প্রমোদে যোগদানের অবসর বা স্পৃহা তাহার মোটেই নাই,—এই সমস্ত শুনিয়া সে ভাবিয়াছিল,—এমন আনন্দময় স্বামীর কি দুর্ভাগ্য!

সেই দিনই এই নূতন ভাড়াটিয়াদের কথাপ্রসঙ্গে লিলি খৃষ্টবাহনকে বলিয়াছিল,—"মিঃ দে চমৎকার লোক;—এমন সুন্দর প্রকৃতির মানুষ সচরাচর দেখা যায় না;—সর্ব্বক্ষণই আনন্দ আর হাসি নিয়েই থাকেন। আর দুনিয়ার এত খবরও রাখেন!"—

খৃষ্টবাহন উত্তরে বলিয়াছিল,—"ওঁর স্ত্রীর প্রকৃতি কিন্তু আরও সুন্দর। ঘড়ির কাঁটা ধ'রে কায করেন,—নিজের হাতে সমস্ত তৈরী ক'রে কাঁটায় কাঁটায় খাবার ব্যবস্থা,—হোটেলকেও হারিয়ে দিয়েছেন। আর শিল্প-কাযও যে কত রকমের জানেন—বৈঠকখানা-ঘরে গিয়ে বসলেই তার পরিচয় পাওয়া যায়!"

শুনিয়া লিলি স্তব্ধ হইয়া গুমরাইতে লাগিল! আর কোন কথা কহিল না।

অল্পদিনের মধ্যেই আনন্দমোহনের সহিত লিলির ঘনিষ্ঠতা খুবই গাঢ় হইয়া পড়িল। অথচ আনন্দমোহনের স্ত্রী শোভার সহিত তাহার মোটেই বনিবনাও হইল না। শোভার মনটিকে দূষিত করিবার অভিপ্রায়ে সে যখন তাহার গৃহকর্ম্মে অক্লান্ত পরিশ্রমের দোষ ধরিয়া নিন্দা করিত, শোভা তখন গম্ভীর হইয়া উত্তর দিত,—"মেমদের ধর্ম্ম আমাদেরই ধর্ম্ম ব'লে, আচার-ব্যবহারেও যে আমাদের মেম-সাহেব হতে হবে, তার কোন মানে নেই। আমরা বাঙ্গালীর মেয়ে, বাঙ্গালীই থাকব। আমাদের

সুখ-দুঃখ আমোদ-উৎসব কর্ম্ম-কর্ত্তব্য গৃহের মধ্যে, গৃহের বাইরে নয়। সুগৃহিণী হব, এই আমাদের শ্রেষ্ঠ কামনা হওয়া উচিত। সুতরাং গৃহের কায-কর্ম্ম করা নিন্দার নয়, আনন্দের, আর তা প্রশংসার বিষয়।"

লিলি এই সব কথা শুনিলে আরও জলিয়া উঠে, কিন্তু প্রতিবাদ করিবার মত যুক্তি সে নির্ণয় করিতে পারে না ; জোর করিয়া যাহা বলে, শোভার হাসিমাখা অকাট্য উক্তিতে তাহা পাগলের প্রলাপের মত ভাসিয়া যায়। কাযেই সে আর শোভার সংস্রবে না আসিয়া তাহার স্বামী আনন্দমোহনের সাহচর্য্যই অধিক পছন্দ করে এবং তাহাতেই সে তৃপ্তি পায়। আর আনন্দমোহন,—সেও ভাবে, বায়ুপরিবর্ত্তনে আসিয়া তাহার যে এমন অবসর-সঙ্গিনী মিলিয়া যাইবে, তাহা সে কল্পনাও করে নাই ;—ঈশ্বরের অপার মহিমা, তাই যে যাহা কামনা করে, তাহাই তাহার অদৃষ্টে মিলিয়া যায়।

আনন্দমোহন ধনীর পুত্র হইলেও, সঙ্গদোষে পড়িয়া সমস্তই হারাইয়াছিল। পৈতৃক সম্পত্তির মধ্যে বাড়ীখানি মাত্র যখন অবশিষ্ট আছে দেখা গেল, তখন তাহার স্ত্রী শোভা স্বামীর খামখেয়ালীকে আর প্রশ্রয় না দিয়া নিজেই জোর করিয়া স্বহস্তে সংসারের সকল ভার গ্রহণ করিল। ঋণের দায়ে মুহ্যমান স্বামী তখন বাধ্য হইয়া পত্নীর ব্যবস্থামত চলিতে সম্মত হয়। শোভা বাড়ীখানির অধিকাংশ ভাড়া দিয়া, ভাড়ার টাকায় ঋণ পরিশোধের একটা বাঁধাবাঁধি ব্যবস্থা করিয়া স্বামীকে নিশ্চিন্ত করিল। শোভা ধনীর কন্যা, তাহার পিতা এক জন স্বনামখ্যাত ব্যবসায়ী। শোভাকে তিনি প্রতি মাসে যে হাত-খরচ দিতেন, শোভার সুবন্দোবস্তে তাহাতেই তাহাদের সংসার সচ্ছলভাবে চলিয়া যাইত। কিন্তু শোভা যেমন সংসারকে সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া লইল, আনন্দমোহনের আনন্দভোগের সুপ্তস্পৃহা আবার জাগরিত হইয়া উঠিল,—সঙ্গিগণ আবার তাহাকে প্রলুব্ধ করিয়া তুলিল। বুদ্ধিমতী শোভা অবস্থা বুঝিয়া, সহসা চুনারে বায়ুপরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করিল। উচ্ছৃঙ্খলস্বভাব স্বামীকে দীর্ঘকালের জন্য কলিকাতা হইতে সরাইয়া লইবার জন্যই সে এই সঙ্কল্প করিয়াছিল। আনন্দমোহন সহজেই সম্মত হইল। শোভা বাড়ীর একটি ঘরে নিজেদের জিনিষপত্র রাখিয়া সমস্ত বাড়ী ভাড়া দিয়া চুনারে স্বামীকে লইয়া আসে। সঙ্গে কেবল খোদন নামে একটি বালক-ভৃত্য আসিয়াছিল।

চুনারে আসিয়াই শোভা লিলির ভাবভঙ্গী দেখিয়া মনে মনে শিহরিয়া উঠিল। তাহার চঞ্চলপ্রকৃতি স্বামীকে যে সকল প্রলোভন হইতে সে এত দূরে লইয়া আসিল, সেই ভয় এখানেও? ক্রমে নানা প্রসঙ্গে শোভা বুঝিয়াছিল যে, লিলি তাহার স্বামীর প্রতি মোটেই অনুরাগিণী নহে এবং আনন্দমোহনের কথার চাতুরী এই বুদ্ধিহীনা তরুণীকে এমন আকৃষ্ট করিয়াছে যে, সে তাহাকে এক অনন্যসাধারণ অতিমানবরূপে বরণ করিয়া লইয়াছে!

শোভা যেমন বুদ্ধিমতী, তাহার মনের ধৈর্য্যও ছিল সেইরূপ অসাধারণ। সহসা কেলেঙ্কারীর ভয়ে কোনরূপ অপ্রীতিকর উপায় অবলম্বন না করিয়া সে তাহার স্বামীর উপর খর লক্ষ্য রাখিয়া চলিল। যাবতীয় সাংসারিক কার্য্যের মধ্যেও স্বামি-সাহচর্য্য তাহার ইদানীং এমন সুলভ হইয়া উঠিল যে, আনন্দমোহন তাহাতে পদে পদেই বিব্রত হইতেছিল। হয় ত লিলিদের বাংলোয় গিয়া, লিলির স্বামীর অনুপস্থিতিতেই হাস্য-পরিহাসে দুজনেই প্রমত্ত, এমন সময় শোভা তাহাদের ঠিক পশ্চাতে আসিয়া—হাসিখুসির নিতান্ত বাড়াবাড়ির সময়টিই সহজস্বরে বলে,—'খাবার দেওয়া হয়েছে, খাবে চল।' উভয়েই যুগপৎ চমকিত হইয়া উঠে,—শোভার চক্ষুর দিকে চাহিবারও সামর্থ্যটুকু তাহাদের থাকে না। বিনা প্রতিবাদে সুশীল ছেলেটির মত আনন্দমোহন নিজের বাংলোয় চলিয়া আসে। বাংলোর বাগানে বসিয়া দুজনেই আনন্দে অভিভূত,—কথা আর ফুরায় না ; লিলি আবেগভরে বলে,—"তোমার কথা আমার এত মিষ্টি লাগে—" ঠিক সেই সময় হয় ত শোভা আসিয়া বলিয়া উঠে,—"মিষ্টি কথায় ত পেট ভরবে না ভাই, তার জন্য খাবার দরকার হয় যে।" তাহার পর স্বামীর দিকে চাহিয়া বলে,—"তোমার চা আর জলখাবার এখানেই আনব কি?" উভয়েই স্তম্ভিত হইয়া ভাবে—এ কি! আনন্দমোহন বিনা বাক্যব্যয়ে শোভার সহিত চলিয়া যায়। লিলি লজ্জায় যেন মাটীর সহিত মিশিয়া পড়ে।—এই ভাবে প্রত্যহই তাহাদের লুকোচুরি অপ্রত্যাশিতভাবে প্রকাশ করিয়া দিয়া শোভা উভয়কেই বিব্রত করিয়া তুলিতে লাগিল।

কিন্তু ইহাতেও লিলি বা আনন্দমোহন কাহারও চৈতন্য হইল না। খৃষ্টবাহন সকালে চা ও জলযোগ সারিয়া পাহাড়ে যাইত, দ্বিপ্রহরে সেখান হইতে ফিরিয়া আহারাদি করিত,—আবার অপরাহ্নে আফিসে গিয়া রাত্রি নয়টা দশটার সময় বাড়ী ফিরিত। লিলি ও আনন্দমোহনের মাখামাখি ঘনিষ্ঠতার কথা তাহার শ্রুতি স্পর্শ করিত না। একটি মাস এই ভাবে কাটিয়া গেল।

৪

প্রত্যহই লিলিদের বাংলোয় গিয়া লিলির ঘর হইতে তাহার স্বামীকে আহারের সময় ডাকিয়া আনা শোভার দৈনন্দিন কার্য্যের অন্তর্গত হইয়া পড়িয়াছিল। সে দিনও আহারাদি প্রস্তুত করিয়া

ও বাংলোয় স্বামীকে ডাকিতে গিয়া—বাংলোর বৃদ্ধা আয়ার নিকট শুনিল—তাহার স্বামী ও লিলি সকালের ট্রেণে মির্জ্জাপুর গিয়াছে।

আয়াটি তখন জ্বরে ধুঁকিতেছিল,—বালিসের তলা হইতে একখানি পত্র সে শোভার হাতে দিল। শোভা দেখিল, তাহার স্বামী লিখিয়াছেন,—'বিশেষ দরকারে মির্জ্জাপুর চলেছি, সন্ধ্যায় ফিরব; এ বেলা আর আমার খাবার ব্যবস্থা ক'র না।'

শোভা আয়াকে জিজ্ঞাসা করিল, "কখন্ এ চিঠি তোমাকে দিয়েছিলেন তিনি?"

আয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিল, "সকালেই দিয়েছিলেন মা, কিন্তু জ্বরের যাতনায় উঠতে পারি নি। লিলিকে যেতে বারণ করেছিলুম, কিন্তু সে শুনলে না,—রান্নাবান্না কিছুই হয় নি,—ছেলে এসে যে কি খাবেন—" জ্বরের যন্ত্রণায় বৃদ্ধা আর বলিতে পারিল না, হাঁফাইতে লাগিল।

শোভা বলিল, "আমার খাবার-দাবার সব তৈরী হয়ে গেছে, মিষ্টার রায় এলে আমার নাম ক'রে বলো যে. তিনি আজ আমাদের বাংলোয় খাওয়া-দাওয়া করলে বড়ই খুসী হব। তিনি এলেই পাঠিয়ে দেবে, আর তোমার জন্ম সাগু তৈরী ক'রে পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

বাংলোয় আসিয়া সর্ব্বাগ্রে শোভা বৃদ্ধার জন্ম সাগু তৈয়ারী করিয়া খোদনকে দিয়া পাঠাইয়া দিল। তাহার পর আহারাদির ব্যবস্থায় মনোযোগ দিল। স্বামিসংক্রান্ত অমন অপ্রীতিকর সংবাদটি তাহার মনের মধ্যে কোনরূপ বিদ্রোহ উপস্থিত করিতেছিল কি না, তাহার কার্য্যে, ব্যবহারে বা তাহার প্রতিভাসমুজ্জল নির্ম্মল মুখখানির দিকে চাহিলে তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

খৃষ্টবাহন বাংলোয় ফিরিলে শোভা খোদনকে পাঠাইয়া তাহাকে আসিবার অনুরোধ জানাইল। সঙ্কুচিতভাবে খৃষ্টবাহন ভোজনগৃহে প্রবেশ করিল। শোভার সহিত তাহার এই প্রথম সম্ভাষণ। লজ্জানম্রভাবে শোভা পরম শ্রদ্ধার সহিত খৃষ্টবাহনকে পরিবেষণ করিতে লাগিল। শোভার বিনয়নম্র ব্যবহারে ও তাহার স্বহস্তে প্রস্তুত বিবিধ অন্নব্যঞ্জন ভোজন করিয়া খৃষ্টবাহন বলিল, "দেখুন, ঈশ্বরের এমনই মহিমা, বাড়ীতে আমার অদৃষ্টে আহার তিনি আজ মাপান নি.—কিন্তু এখানে যে এত ভূরি ভোজের ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন তিনি—তা কে জানত বলুন। আপনার হাতের রান্না খেয়ে, আজ আমার মা'র কথা মনে পড়ছে। তিনিও ঠিক এমনি রাঁধতে জানতেন, আর তাঁর আমোলে—আমাদের ঘরগুলোও এমনি গোছাল ছিল। মনে হচ্ছে, আমার মা বুঝি আজ ফিরে এলেন!"

সঙ্গে সঙ্গে খৃষ্টবাহনের দুই চক্ষু সজল হইয়া উঠিল,—শোভার চোখ দুটিও খৃষ্টবাহনের কথায় আর্দ্র হইয়া গেল।

আহারাদির পর খৃষ্টবাহন একটু সঙ্কোচের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, বলতে পারেন আপনি—এঁরা দুজনে হঠাৎ মির্জ্জাপুর গেলেন কেন?"

সহজ স্বরে শোভা বলিল, "আমি আপনার আয়ার কাছেই তাঁদের যাবার কথা শুনিছি। আপনিও কিছু জানতেন না?"

খৃষ্টবাহন গাঢ়স্বরে উত্তর দিল, "না। আমাকেও আয়াই খবরটা দেয়।"

শোভা কিয়ৎকাল নীরব থাকিবার পর সহসা খৃষ্টবাহনকে বলিল, "আমি যদি আপনার স্ত্রীর সম্বন্ধে কোন কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, সেটা আপনি প্রসন্নভাবেই গ্রহণ করবেন?"

খৃষ্টবাহন সবিস্ময়ে বলিল, "আপনার এ কথার অর্থ ত আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, আমাকে মাফ করবেন।"

শোভা বলিল, "আমার অনধিকারচর্চ্চা আপনি মার্জ্জনা করবেন। দেখুন, মেয়েদের উপর ভগবানের এমন একটু ক্ষমতা দেওয়া আছে, যার প্রভাবে তারা স্থিরচিত্তে একটু চেষ্টা করলেই পুরুষের প্রকৃতি নির্ণয় করতে পারে। আপনি এ কথা স্বীকার করেন কি?"

খৃষ্টবাহন অভিভূতের মত বলিল, "হাঁ, আমি এ কথা স্বীকার করি, আর বিশ্বাসও করি। কেন না, আমার মাকেও এ কথা বলতে শুনেছি।"

শোভা বলিল, "কতক্ষণই বা আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে, কিন্তু এরই মধ্যে আমি আপনার প্রকৃতির পরিচয় পেয়েছি; তাই এতটা অসঙ্কোচে আপনার সঙ্গে কথা কইতে সাহস পাচ্ছি।"

খৃষ্টবাহন শোভার নির্ম্মল মুখখানির উপর সপ্রতিভভাবে চাহিয়া বলিল, "আপনার কথাগুলি শুনে আমি মুগ্ধ হলেও, ঠিক অনুসরণ করতে পারছি না যে—"

শোভা খৃষ্টবাহনের কথার উত্তর না দিয়া নিজের মনেই বলিতে লাগিল,"কথায় কথায় আপনি আপনার স্বর্গীয় মা'র কথা তুলে আমার প্রশংসা করেছেন। এতে আপনি আমার গৌরব বাড়িয়ে দিয়েছেন। এখন আমি যদি আপনার পুণ্যময়ী মা'র মেয়ের মত—আদরিণী ভগিনীর অধিকারটুকু আপনার কাছে দাবী করি,—সেটা কি আমার পক্ষে ধৃষ্টতা হবে ব'লে আপনার মনে হয়?"

খৃষ্টবাহন গাঢ়স্বরে বলিল, "না,—আমার ভগিনী নাই; যদি থাকত, তা হ'লে আজ আমি নিজেকে সুখী মনে করতুম।—

আমার মাকে আপনি দেখেন নি, কিন্তু তাঁর আকৃতির সাদৃশ্য আপনাতে আছে। আপনাকে ভগিনী ব'লে সম্মান দেবার অধিকার পেয়ে আমি নিজেকেই ভাগ্যবান্ মনে করছি।"

সুন্দর মুখে নির্ম্মল হাসির লহর তুলিয়া শোভা এবার আব্দারের স্বরে বলিল, "তা হ'লে আর ভাই-বোনের মধ্যে ও সব কথার সঙ্কোচ রেখে দরকার কি, দাদা। এসো, এবার ভাই-বোনে ঘরসংসারের কথা কই—"

খৃষ্টবাহন স্তম্ভিত। এ কি সত্য? তাহার দুর্ব্বহ জীবন-ভার লাঘব করিতে, তাহার মরুময় সংসারে শান্তির কুসুমকুঞ্জ রচনা করিতে, আদরিণী ভগিনীর স্নেহ লইয়া, সত্যই কি এই অমৃতভাষিণী মহীয়সী নারী তাহার বাংলোয় পদার্পণ করিয়াছেন? মুগ্ধভাবে সে বলিল,—"তোমার কথাতেই বলছি, বোন্, এক দণ্ডে যখন ভাইটির পরিচয় পেয়েছ, তখন এর অনেক আগেই তার ঘর-সংসারের সমস্তই তোমার জানা-শোনা হয়ে গেছে নিশ্চয়ই। নয় কি?"

শোভা পূর্ব্ববৎ হাসিয়া বলিল, "নইলে কি সাধ ক'রে আগে ঘর-সংসারের কথা তুলি, দাদা? এই জন্তেই আগে আমার বোন্‌টির সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করেছিলুম। তুমি ঠিক বুঝতে পার নি, আর তখন অধিকার না পেয়েই কোনও কিছু অনধিকার-চর্চ্চা অন্যায় মনে করেই—বোনের অধিকারটুকু চেয়ে নিয়েছি। কিন্তু এখন আবার একটা মস্ত ভাবনা এসে জুটেছে যে, দাদা?"

সস্মিতভাবে খৃষ্টবাহন বলিল, "আবার কি ভাবনা হ'ল, শুনি?"

ডাগর চক্ষু দুটি বিস্ফারিত করিয়া শোভা বলিল, "লিলি যদি এ অধিকার স্বীকার না করে?—যদি ঝগড়া বাধিয়ে বসে?"

হাসিয়া খৃষ্টবাহন বলিল, "ভাই-বোনে যদি মিল থাকে, বউএর সাধ্য কি কিছু করে!"

শোভা এবার দুষ্টুমীর হাসি হাসিয়া বলিল, "কিন্তু দাদা, বউএর দোষ দেখে যদি আমি শাসন করি? তখন ত আমার ওপর রাগ করবে না?"

খৃষ্টবাহন বলিল, "আমার বোন্ এমন কোন অন্যায় কখনই করতে পারে না, যাতে আমি রাগ করতে পারি।"

"আচ্ছা দাদা, বউএর যদি কোন অন্যায় দেখি, আর সে অন্যায় থেকে তাকে কৌশলে ফেরাবার জন্ম তোমাকে কিছু বলি, তুমি তা শুনবে বল?"

"তোমার কথা আমি বাইবেলের প্যারার মত চিরদিন মানব, এ ভরসা আমার আছে।"

শোভা এবার কিছু কুণ্ঠার সহিত বলিল, "আর বোন্‌টি যদি তার নিজের সংসারে কোনও অনাচার দেখে তোমার কাছে সাহায্য চায়, তখন তাকেও দেখবে ত, দাদা?"

খৃষ্টবাহন হাসিয়া বলিল, "এ কি খুব বড় কথা হ'ল, বোন্?"

শোভা বলিল, "এতক্ষণ গৌরচন্দ্রিকা হ'ল, দাদা! এবার কা'যের কথা কইব। সে অনেক কথা দাদা, অনেকখানি সময় যাবে শুনতে। তুমি একটু বিশ্রাম কর গে, আমি দুটি খেয়েই যাচ্ছি, গিয়ে সব বলব।"

খৃষ্টবাহন সবিস্ময়ে বলিল, "তোমার এখনও খাওয়া হয় নি?"

শোভা হাসিয়া বলিল, "বা রে! খাব কখন্ বল! এখন না হয় দাদা হলে, তখনও ত নিমন্ত্রিত ছিলে। তার আগেই আমি খেয়ে ব'সে আছি—এ ধারণাটুকু তোমার কি ক'রে হল বল ত?"

খৃষ্টবাহন সপ্রতিভভাবে বলিল, "অন্যায় বলিছি, দিদি!—যাক্, অনেক বেলা হয়েছে; খেয়ে নাও।—ওবেলা ধীরে সুস্থে সব কথা শুনব তোমার।"

শোভা ভোজন-ঘরে যাইতে যাইতে বলিল,—"কিন্তু আমি ব'লে রাখছি দাদা, আমার কথা শুনে একটুও রাগ করতে পারবে না,—আমি যা যুক্তি দোব, সেইমত করা চাই।"

"আচ্ছা গো—তাই হবে। বোনের কথা তোমার দাদা কখনও ঠেলবে না—স্থির জেনো।"

৫

অপরাহ্নে দীর্ঘ দুইটি ঘণ্টা ধরিয়া ভাই ও ভগিনীর মধ্যে নানা কথা ও পরামর্শ হইল।

রাত্রি প্রায় ১২টার সময় লিলি ও আনন্দমোহন বাংলোয় ফিরিয়া আসিল। লিলি ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, খৃষ্টবাহন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ঘুমন্ত স্বামীর উদ্দেশ্যে গরলোদ্গার করিতে করিতে সেও শয্যা গ্রহণ করিল।

আনন্দমোহন কম্পিতপদে কক্ষে ঢুকিয়া দেখিল, শোভা তাহার খাবার বাড়িয়া বসিয়া আছে। আনন্দমোহন শোভার গম্ভীর মুখের উপর চাহিয়া প্রশ্ন করিল,—"আমার চিঠি পেয়েছিলে?"

সহজস্বরেই শোভা বলিল,—"হাঁ; বিশেষ দরকারের শেষ বুঝি এতক্ষণে হ'ল?"

আনন্দমোহন পোষাক ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল, "আর বল কেন! মির্জ্জাপুরে ইয়ংমেন এসোসিয়েসনের কনফারেন্স বসেছে না,—তাতে স্পীচ দেবার জন্ম রেভারেণ্ড মিটার ধ'রে নিয়ে গেল,—মিসেস রায়ও নাছোড়বান্দা,—তুমি তখন মার্কেটে গিয়েছ, এ দিকে সাতটায় ট্রেণ, কাযেই চিঠি লিখেই ছুটতে হয়েছিল—"

শোভা স্থিরদৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "এখন খেতে হবে ত ?"

আনন্দমোহন শয্যায় দেহভার প্রসারিত করিয়া উত্তর দিল. "ও পাট সেখানেই সেরে আসা গেছে। খুব খাইয়েছে তারা। খাওয়াবে না ? যে তোড়ে স্পীচ্ দিয়েছি, শুনে সবাই চকচকিয়ে গেছে—"

অধিক রাত্রিতে আনন্দমোহনের চীৎকার শুনিয়া শোভা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি আলো উজ্জ্বল করিয়া দিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিতেই সে বুঝিল, আনন্দমোহন ঘুমের ঘোরে কথা কহিতেছে। সে আড়ষ্ট হইয়া শুনিতে লাগিল। আনন্দমোহন বলিতেছিল, "চালাও পান্সী,—কেমন মজা! দরিয়ার মাঝে দুটি প্রাণী আমরা—তুমি আর আমি। একটি কীস্ লিলি—একটি মাত্র! লজ্জা কিসের ? ভয় কি ? কে দেখবে ?—ওরা দাঁড়ী-মাঝি—জানোয়ারের সামিল, ওদের দেখে লজ্জা ? কেউ জানবে না, শোভাকে বলব যে, কনফারেন্সে স্পীচ দিতে এসেছি।—হাঃ হাঃ হাঃ!"

উচ্চহাস্য করিয়া আনন্দমোহন আবার ঘুমাইয়া পড়িল। শোভা পূর্ব্ববৎ আড়ষ্ট হইয়া অপলকনেত্রে তাহার স্বামীর মুখখানির উপর চাহিয়া রহিল।

পরদিন একটু বেলাতেই আনন্দমোহনের ঘুম ভাঙ্গিল। শোভা তাড়াতাড়ি চা আনিয়া স্বামীর সম্মুখে ধরিল, কিন্তু কোন কথাই কহিল না। স্ত্রীকে আজ অতিরিক্ত গম্ভীর দেখিয়া আনন্দমোহনের মনে সন্দেহের রেখাপাত হইল। শোভাকে একটু নাড়া দিবার অভিপ্রায়ে সে নিজেই বলিল, "আজও আবার কনফারেন্স আছে, তবে আজ খাওয়া-দাওয়া সেরেই যাব মনে করছি—"

শোভা স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া স্বাভাবিকভাবেই জিজ্ঞাসা করিল, "আজকের কন্ফারেন্সটা বসছে কোথায় ?"

আনন্দমোহন চায়ের বাটিতে একটি চুমুক দিয়া উত্তর দিল, "সেইখানেই, কাল যেখানে বসেছিল—"

শোভা অসাধারণ ধৈর্য্যের সহিত অতি সহজ স্বরেই বলিল, "কালকের সেই পান্সীখানার ওপরেই ?"

আনন্দমোহনের সর্ব্বাঙ্গে কে যেন হুল ফুটাইয়া দিল। মনে মনে শিহরিয়া সে নির্ব্বাক্‌ভাবে শোভার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

শোভা কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া পূর্ব্ববৎ ধৈর্য্যের সহিত বলিল, "আর লিলিই ত আজও তোমার স্পীচ শোনবার শ্রোত্রী হয়েই যাবে ?"

এবার আনন্দমোহন আত্মসংবরণ করিয়া মহা বিস্ময়ের ভাব প্রকাশপূর্ব্বক অভিনয়ভঙ্গীতে বলিল, "তুমি পাগল হয়েছ না কি ? এ সব কি বলছ ?"

শোভা তাহার কথার উত্তর না দিয়াই পূর্ব্ববৎ স্বরে বলিল, "আমার শেষ প্রশ্নটাও ক'রে নিই,—কাল যে স্পীচ তুমি দিয়েছিলে, তার বকশিস্‌টি লিলি দিয়েছিল কি ? অন্ততঃ একটি কীস্ ?"

বিস্ময়ের সহিত ক্রোধের বিকাশ করিয়া আনন্দমোহন এবার অসহিষ্ণুভাবে বলিয়া উঠিল, "তোমার মুখে এ সব কি নোংরা কথা, শোভা ? তুমি কি স্বপ্ন দেখছ ?"

শোভা এবার ঈষৎ দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল, "স্বপ্ন আমি দেখিনি, দেখেছ তুমি। আর এ স্বপ্ন সত্য কি মিথ্যা, ঈশ্বরের নাম ক'রে তোমার অন্তরকে জিজ্ঞাসা করলেই তার উত্তর পাবে " বলিতে বলিতে তাহার স্বর গাঢ় হইয়া আসিল, পরক্ষণেই ছায়ার মত সে স্থান হইতে সে সরিয়া গেল।

আনন্দমোহন অপরাধীর মত শোভার গমন-পথের দিকে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। শোভা কি অন্তর্যামিনী ? কিম্বা, সত্যই সে স্বপ্নবশে সমস্ত প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে ?

কিছুক্ষণ পরেই শোভা আনন্দমোহনের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। শোভাকে দেখিয়াই সে তাড়াতাড়ি একখানি খবরের কাগজ টানিয়া লইল।

শোভা জানিত, তাহার স্বামীর দুর্ব্বলতা কখন্ কি ভাবে আত্মপ্রকাশ করে। সে বুঝিল, তাহার সহিত চোখোচোখি হইয়া কথা কহিবার সামর্থ্য এখন আনন্দমোহনের নাই। চরিত্রগত দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও, তাহার ভাবপ্রবণ প্রকৃতির পারিপার্শ্বিক সুকুমার প্রবৃত্তিগুলি শোভা এত প্রীতির দৃষ্টিতে দেখিত যে, তাহাদের প্রাবল্যে, স্বামীর অপরাধ অমার্জ্জনীয় হইলেও সে ভুলিয়া যাইত,—আনন্দমোহনকে অভিভূত দেখিলে বা তাহার উজ্জ্বল চক্ষু দুইটি সজল হইয়া উঠিলে, সে কিছুতেই আত্মসম্বরণ করিতে পারিত না।—নিজের এই দুর্ব্বলতাটুকু স্বামীর সমক্ষে অপ্রকাশ রাখিবার জন্য শোভাকে সময়ে সময়ে অন্তরের সহিত কঠোর সংগ্রাম করিতে হইত।

পাছে তাহাকে দেখিয়া লজ্জায় মুহ্যমান অপ্রস্তুত স্বামীর সুকুমার মনোবৃত্তিগুলি সহসা আত্মপ্রকাশ করিয়া শোভাকেও অভিভূত করিয়া ফেলে, এই আশঙ্কায় সে কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়াই বলিল,—"বিন্ধ্যাচলে দিন কতক থাকবার বড় ইচ্ছা হয়েছে, যাবে ?"

আনন্দমোহন কাগজের উপর হইতে চক্ষু তুলিয়া মহাবিস্ময়ে

বলিয়া উঠিল, "বিন্ধ্যাচল! সেখানে আবার মানুষে যায়—আমার ত মোটেই সহ্য হবে না,—চুনার ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারব না, তা ব'লে রাখছি কিন্তু—"

শোভা বলিল,—"তা হ'লে দিন কতকের জন্য আমাকে ছুটী দাও না,—আমি ঘুরে আসি। খোদন এখানে থাকবে, সে সব তোমার ক'রে কম্মে দেবে—"

আনন্দমোহন বলিল,—"কার সঙ্গে যাবে?"

শোভা বলিল,—"মিষ্টার রায় তাঁর কারবারের কি একটা দরকারে যাচ্ছেন কি না,—অষ্টভুজা পাহাড়ের ওপর ডাকবাংলো আছে,—সেটা নাকি ভাড়া করেছেন,—আর লিলিও সঙ্গে যাচ্ছে—"

আনন্দমোহন ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিল,—"তাই না কি?" পরক্ষণেই অভিনেতার মত কৌশলে নিজের ব্যগ্রভাব গোপন করিয়া বলিল,—"মিষ্টার রায় সে দিন বিন্ধ্যাচলের সুখ্যাতি করছিলেন বটে। আর শুনছি, অষ্টভুজার পাহাড়ের ওপর যে বাংলো আছে—চমৎকার না কি। তা বেশ, চল, দিন কতক ঘুরে আসা যাক।"

স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া, একটি গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া শোভা উঠিয়া গেল। আনন্দমোহন স্তব্ধভাবে সেই দিকে চাহিয়া রহিল। সুকৌশলে আত্মসম্বরণ করিতে সমর্থ হইলেও, সে যে স্ত্রীর চক্ষুকে প্রতারিত করিতে পারে নাই, তাহা শোভার দৃষ্টি ও গতি হইতেই অনুমান করিয়া লইতে তাহার বিলম্ব হইল না।

সেই দিনই অপরাহ্নে স্থির হইয়া গেল, উভয় পরিবার পরদিন প্রত্যূষেই বিন্ধ্যাচল রওনা হইবে।

৬

লোকালয়ের বাহিরে অভ্রভেদী পর্ব্বতের উপর সুন্দর বাংলো, নিম্নে সমতল হইতে দেখিলেই মনে হয়, যেন কতকগুলি শ্বেত পারাবত পাখা মেলিয়া পর্ব্বতশৃঙ্গে বসিয়া আছে।

খৃষ্টবাহন ও আনন্দমোহন সপরিবারে যথাসময় এই বাংলোয় আসিয়া উঠিল। বাংলোখানির অবস্থান-সৌন্দর্য্য ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা দেখিয়া সকলেরই আনন্দ হইল। ঘরগুলি দেখিতে দেখিতে শোভা লিলিকে বলিল, "এই দুখানি ঘর তোমার, এই ঘরে রান্না হবে, আর ভাঁড়ার থাকবে, এই ঘরখানিতে খাওয়া-দাওয়া করবে, এর পাশেই তোমাদের বৈঠকখানা, দিব্যি সাজান রয়েছে।"

লিলি মনে মনে শোভার নির্ব্বাচনের প্রশংসা করিয়া বলিল, "আর তুমি নিচ্ছ কোন্ ঘর কখানি?"

শোভা বলিল, "সে আমি আগেই দেখে রেখেছি; নিজের ব্যবস্থা আগে না ক'রে তোমার জন্যই যে লেগে পড়েছি, এতটা বোকা আমাকে ভেব না।"—বলিতে বলিতে বাংলোর অপরাংশে একখানি অপেক্ষাকৃত ছোট ঘর দেখাইয়া বলিল, "দেখছ ত, এই ঘরখানি আমি নিজের জন্য বেছে নিয়েছি; এই ঘরেই রান্নাও হবে, খাওয়াও চলবে।"

সবিস্ময়ে শোভার মুখের দিকে চাহিয়া লিলি বলিল, "এই ছোট্ট ঘরখানিতে তোমার কি ক'রে চলবে? কোথায় রাঁধবে, খাওয়া-দাওয়া করবে কোথায়, বসবেই বা কোন্‌খানে?"

শোভা বলিল, "কেন, এইখানে রান্নাবান্না করব; এই দুটো আলমারিতে ভাঁড়ার রাখব; আর খাবার যায়গা হবে এই ধারে। দুটি প্রাণীর সংসার, এত বড় ঘরে কুলবে না?"

লিলি শোভার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "উঠবে বসবে কোথায়?"

মুখ টিপিয়া হাসিয়া শোভা বলিল, "কেন, এইখানেই; মেয়েদের রান্নাঘরের চেয়ে ভাল বৈঠকখানা আবার কোথায়? ঐ যে দেখ না, বসবার জন্য একখানা ছোট টুলও এনে রেখেছি।"

মনে মনে জ্বলিয়া আরক্তমুখে লিলি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "শয়নটা কোথায় হবে শুনি! এই ঘরেই না কি?"

শোভা হাসিয়া বলিল, "ভাব থাকলে তাতেও আটকায় না। শোননি একটা প্রবাদ আছে—ভাব থাকলে এক কম্বলে সাত জন দরবেশ সুখে ঘুমোয়, আর ভাব না থাকলে পাশাপাশি দুই রাজ্যে দুজন রাজা ঘুমোতে পারে না।"

বিচিত্র মুখভঙ্গী করিয়া লিলি বলিল, "আমরা ত দরবেশ নই যে, তাদের উপমাটা দিলে—"

শোভা বলিল, "পাহাড়ে এসে যে কটা দিন কাটান যায়, না হয় তাদেরই মতন হলুম। তা বোন্, শোবার ঘরের জন্য আটকাবে না; বাইরের অত বড় সাজান হল-ঘর রয়েছে, তা ছাড়া—রাত্রিটুকু না হয় তোমার ঘরেই দুই বোনে একসঙ্গে কাটিয়ে দেব।"

লিলি অবাক্ হইয়া শোভার মুখের দিকে চাহিল। শোভা তাহার বিস্ময়-বিমুগ্ধ ভাবভঙ্গী দেখিয়া হাসিয়া বলিল, "মনে মনে আমি একটা বড় মজার মতলব এঁটেছি, হল-ঘরে চল, সেখানে সকলের সামনেই সেটা বলব। তোমারই তাতে বেশী লাভ, আর আমোদও পাবে খুব।"

বড় হলঘরখানিতে বসিয়া আনন্দমোহন ও খৃষ্টবাহন বিন্ধ্যাচল সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। শোভা লিলির হাত ধরিয়া সেই ঘরে আসিয়া বলিল, "আচ্ছা, এ কথা কি সত্য নয়

.য়, সংসারে যত কিছু বৈচিত্র্য, তার সৃষ্টি এই পাহাড় থেকেই ?"

সকলের চক্ষু শোভার মুখের ওপর পড়িল। খৃষ্টবাহন বলিল,—"আমার ত তাই মনে হয়। আপনি কি বলেন মিষ্টার দে ?—" বলিয়া আনন্দমোহনের মুখের দিকে তাকাইল।

আনন্দমোহন বলিল,—"হাঁ, কথাটা মিথ্যা নয়; তবে যত কিছু বৈচিত্র্য, তার সবই যে পাহাড়ের প্রাপ্য, তা নয়;—তাদের কতক নভোমণ্ডলে, কতক সমুদ্রের জলে, কতক বা পাহাড়ে।—" পরক্ষণে লিলির মুখের দিকে কটাক্ষ করিয়া বলিল,—"আপনি এ সম্বন্ধে কিছু বলবেন, মিসেস্ রায় ?"

লিলি অবিচলিত স্বরে বলিল,—"উপস্থিত ক্ষেত্রে আমি ত সব চেয়ে বড় বৈচিত্র্য দেখছি, আমাদের এই পাহাড়ে আসার ব্যাপারে।"

খৃষ্টবাহন অর্থপূর্ণ-নয়নে পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"তার মানে ?"

লিলি বলিল,—"কোনরকমে গলদ্‌ঘর্ম্ম হয়ে আমরা ত এখানে এসেছি, আমাদের জিনিষপত্রও সব ঠিকঠাক এসে পড়েছে, দেখছি—আসে নি কেবল লোকজন কেউ। আমার আয়াকেও দেখছি না, ওঁদের সেই চাকরটিরও পাত্তা নেই। এর চেয়ে বড় বৈচিত্র্য ত আমার চোখে কিছুই ঠেকছে না।"

আনন্দমোহন হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল। খৃষ্টবাহন অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে শোভার দিকে চাহিল। সঙ্গে সঙ্গে শোভার মুখের উপর এক ঝলক হাসির লহর খেলিয়া গেল। শোভা বলিল, "তোমার এই বৈচিত্র্যের মীমাংসা আমি ক'রে দিচ্ছি, আগে আমার প্রস্তাবটা বলতে দাও, বোন্।"

আনন্দমোহন জিজ্ঞাসুনয়নে শোভার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তোমার আবার প্রস্তাব আছে না কি ?"

শোভা বলিল,—"প্রস্তাব নিয়েই না আমি এসেছি। আমার প্রস্তাবটি এই—বৈচিত্র্যের আধার এই পর্ব্বত-প্রবাসে আমরা যে কটা দিন থাকি, আমাদের জীবনযাপনের ধারাটাও হোক্ বৈচিত্র্যময়।"

লিলি জিজ্ঞাসা করিল,—"সেটা কি রকম শুনি ? তোমার সেই দরবেশী উপমাটির মত না কি ? এক কথলে"—

শোভা বাধা দিয়া বলিল,—"সত্যই বোন্, এখানে যে কদিন আমরা থাকব, দরবেশের মতই পবিত্রভাবে জীবনযাপন করতে চাই; আর সেই জীবনযাত্রার ধারাটা হবে কি রকম, তাও বলছি শোন।"—

আনন্দমোহন ও লিলি যুগপৎ শোভার মুখের দিকে নির্ব্বাক্‌ভাবে চাহিল। শোভা বলিতে লাগিল, "এ ক'দিন আমার স্বামী ও সংসারের ভার নেবে তুমি; তোমার সংসার ও তোমার স্বামীর ভার নেব আমি।"

বিস্ময়-কৌতুকভরা নয়নে আনন্দমোহন লিলির মুখের দিকে চাহিয়াই পরক্ষণে খৃষ্টবাহন ও শোভার মুখের উপর দৃষ্টিস্থাপন করিল। লিলি অবাক্ হইয়া শোভার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ইতিপূর্ব্বে শোভা যে কথাগুলি রহস্যচ্ছলে বলিয়াছিল, সেইগুলিই তাহার কাণে ধ্বনিত হইতেছিল। সে ভাবিতেছিল, সত্যই কি এই অভিপ্রায়টি স্বাভাবিক ভাবেই শোভার অন্তর হইতে উদ্গত হইয়াছে ? কিম্বা তাহাকে সমস্যায় ফেলিয়া পরীক্ষা করিবার একটা অভিনব চাল চালিয়াছে ?

সকলকেই নীরব দেখিয়া খৃষ্টবাহন ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "দেখুন, যদি সকলের এতে মত হয়, আমার কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু আপনার কথাগুলি আরও একটু খোলাখুলিভাবে বলা উচিত। কি বলেন, মিঃ দে ?" আনন্দমোহন স্মিতমুখে বলিয়া উঠিল, "নিশ্চয়ই।"

শোভা বলিল,—"ভার নেওয়া বলতে দয়া ক'রে আপনাদের এইটুকু বুঝতে হবে যে, এখানে যে কদিন আমরা আছি,—আমাদের জীবনযাত্রার রোজনামচা হবে এই রকম—"

তিন জনেই শোভার মুখের দিকে চাহিয়াছিল। শোভা বলিতে লাগিল,—"ধরুন, এই আপনার চা, জলখাবার, দিনরাতের খাবার—যা কিছু ব্যবস্থা করব আমি নিজে,—কাপড়-চোপড় গুছিয়ে রাখা, ভাঁড়ার দেখা, বিছানাপত্র পাতা—সেও করব আমিই; লিলি এতে হাত দিতে পাবে না। এমনই লিলিও ওঁর সব ব্যবস্থা নিজে করবে, আমি তাতে হাত দেব না। রাত্রি ন'টার মধ্যে আমাদের খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে নিতে হবে। লিলি আর আমি রাত্রিতে এক বিছানায় শোব,—আর আপনারা দুই বন্ধুতে এই ঘরে রাত্রিবাস করবেন। আমরা এখানে পবিত্রভাবে জীবন যাপন করব। ঈশ্বর সাক্ষ্য ক'রে আমাদের শপথ করতে হবে।"

খৃষ্টবাহন ঈষৎ হাসিয়া আনন্দমোহনের দিকে চাহিয়া বলিল, "কি বলেন ?"

আনন্দমোহন হাসিয়া বলিল,—"মন্দ কি। আপনার ত আপত্তি কিছু নেই ?"

খৃষ্টবাহন সহাস্যে বলিল,—"কিছুমাত্র না। এ সম্বন্ধে চিরদিনই আমি উদারমতাবলম্বী।"

শোভা লিলির দিকে চাহিয়া বলিল,—"তুমি ত কিছু বলছ না, ভাই ?"

লিলি কিছু তপ্ত স্বরেই উত্তর দিল,—"তোমাদের তিন জনেরই যখন এক মত, আমার অমত হলেও ভোটে হেরে যাব। কিন্তু আমার একটা কথা বলবার আছে,—লোকজন ত কাউকে আনা হয় নি দেখছি,—তার ব্যবস্থাটা কি হবে ?"

খৃষ্টবাহন একটু দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল,—"সে ব্যবস্থা নিজেদেরই চালিয়ে নিতে হবে। যখন আসে নি, আর এই পাহাড়ে লোকজন পাওয়াও যখন সম্ভবপর নয়, তখন আর উপায় কি ?"

লিলি দৃপ্ত নয়নে স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। কোন উত্তর না দিলেও মনে হইতেছিল যে, তাহার দুই চক্ষুর তীব্রদৃষ্টি তীক্ষ্ণ কটূক্তির মত খৃষ্টবাহনকে বিদ্ধ করিতেছে।

শোভা এই সময় মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল,—"কিন্তু মিঃ রায়, অন্ততঃ জলের ব্যবস্থাটুকু ক'রে দিতে হবে যে! লিলি পাহাড়ে দেশে থাকে, পাতকো থেকে জল টানবার ক্ষমতাও হয় ত রাখে,—কিন্তু আমি যে একবারে খাস কলকেতার মেয়ে,—জল-টল টানতে পারব না, তা ব'লে রাখছি।"

খৃষ্টবাহন বলিল,—"জলের ব্যবস্থা ত আগেই ক'রে রাখা হয়েছে। বাংলোর জিম্মাদার নিজেই দরকারমত জল সরবরাহ করবে।"

শোভা যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"তা হলে ত বড় ভাবনাটাই কেটে গেল! তবে আর ভাবনা কিসের ভাই! চল—যে যার ভাঁড়ার গুছিয়ে নিই,—নূতন সংসারযাত্রা আরম্ভ করা যাক তা হ'লে!"

রাগে গস্ গস্ করিতে করিতে লিলি শোভার অনুসরণ করিল।—আর দুই বন্ধু বোধ হয় নূতন সংসারযাত্রার গতিপথ কল্পনার সাহায্যে চিত্রিত করিতে বসিল। কে জানে কাহার পরিণাম কি ?

৭

যদিও একটু বেলাতেই নূতন সংসার-পর্ব্ব আরম্ভ হইয়াছিল, তবুও শোভার অসাধারণ তৎপরতায় খৃষ্টবাহন বেলা ১২টার মধ্যেই মধ্যাহ্নভোজন সমাপন করিয়া পরিতৃপ্ত হইল।

খাইতে খাইতে শোভাকে সে কৌতুকভরে জিজ্ঞাসা করিল,—"ওপাড়ার খবর কিছু রেখেছ, বোন্ ?"

শোভা দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, "ও বাবা, এর ওপর খবর নিতে গেলে লিলি রক্ষা রাখবে, দাদা! একে ত সে আমার ওপর আগুন হয়ে আছে। তবে মাঝে মাঝে যে রকম সাড়া-শব্দ পাচ্ছি, তাতে মনে হচ্ছে, পাট উঠতে এখনও অনেক দেরী।"

খৃষ্টবাহন বলিল, "কিন্তু আমি অবাক্ হয়ে যাচ্ছি, এত অল্প-সময়ের মধ্যে এতগুলো তরকারী তুমি রাঁধলে কি ক'রে ?"

শোভা হাসিয়া বলিল, "তোমার কারবারে হঠাৎ কতকগুলো অর্ডার এসে পড়লে, অল্পসময়ের মধ্যেই তুমি কি ক'রে সে সব সরবরাহ কর, দাদা ?"

খৃষ্টবাহন উত্তর দিল, "তার সঙ্গে এর তুলনা! সে ত আমি একা করি না, এক পাল লোক আছে। কিন্তু তোমার কায যে অদ্ভুত।"

শোভা অপরাহ্নের জল-খাবার গুছাইতে গুছাইতে বলিল, "কোন কায করবার আগে ভাবতে বসলেই অদ্ভুত মনে হয়, কিন্তু আমোদ ক'রে লেগে পড়লে, সে খুব সোজা হয়ে যায়।"

খৃষ্টবাহন।—ও সব আবার কি ?

শোভা।—ওবেলার জলখাবার। সে পাটটা এবেলাই সেরে রাখলুম, শুধু চাটুকু করবার কায বাকি রইল! এক একবার মনে হয়, ছুটে গিয়ে লিলির রান্না-বান্নাগুলোও ক'রে দিয়ে আসি।

খৃষ্টবাহন হাসিয়া বলিল, "তা হ'লে এত হাঙ্গামার দরকার ছিল কি ? এরই মধ্যে এত দুর্ব্বল হয়ে পড়লে, বোন্!"

শোভা গাঢ়স্বরে বলিল, "আসল কথাটার খেই হারিয়ে ফেলি দাদা, ওদের যে শাসন করতে এত কঠিন হয়েছি, তা মনে থাকে না। তার ওপর, আমোদে যেমন ওঁর স্পৃহা, ভোজনটির বেলায়ও তেমনই। খাবার ওঁর কষ্ট হচ্ছে মনে হলেই—" বলিতে বলিতে শোভা অভিভূত হইয়া পড়িল।

খৃষ্টবাহন বলিল,"ছিঃ, এত দুর্ব্বল তুমি, শোভা। কঠিন না হলেও শাসন চলে না, বোন্, শেষে যে সবটাই প্রহসন হয়ে দাঁড়াবে।"

দৃঢ়ভাবে এবার শোভা বলিল, "না দাদা, আর দুর্ব্বল হব না, এবার খুব কঠিন হয়েই চলব।"

এ দিকে বেলা ২টার পর মধ্যাহ্নভোজনে বসিয়া আনন্দ-মোহন লিলির রন্ধননৈপুণ্যের পরিচয় পাইয়া চমৎকৃত হইল ভাতগুলি গলিয়া পিণ্ডের মত হইয়াছে, ডাল ধরিয়া গিয়া অখাদ্য হইয়াছে, ডিমের কালিয়ায় বার দুই নুণ পড়ায় মুখে দিবার উপায় নাই।

লিলি জিজ্ঞাসা করিল, "রান্নাগুলো হয়েছে কেমন ?"

আনন্দমোহন ডিমের ভিতরের কুসুমটুকু মুখে দিয়া বলিল "চমৎকার!"

লিলি অভিমানভরে বলিল, "বুঝিছি, ঠাট্টা হচ্ছে।"

আনন্দমোহন হাসিয়া বলিল, "ঠাট্টা-মস্করার সময় অনেক আছে, খাবার সময় ওটার ব্যবহার আমি বড় একটা করি না—"

লিলি বলিল, "এ বেলা তাড়াতাড়িতে রান্না হয় ত সুবিধের হয়নি, ও বেলা তোমাকে ভাল ক'রে খাওয়াব। তোমাকে কিন্তু কাছে থাকতে হবে, একলা একলা আমার কিছুই ভাল লাগে না। তুমি কাছটিতে ব'সে গল্প করবে, আমি তাই শুনতে শুনতে রাঁধব—কেমন ?"

আনন্দমোহন বলিল, "তোমার সঙ্গ ছেড়ে আমি এক দণ্ডও থাকতে ভালবাসি না। সেই বেশ কথা, ও বেলা তুমি রাঁধবে, আমি তোমাকে সাহায্য করব। বেশ আমোদেই কটা দিন কেটে যাবে।"

কোন রকমে কষ্টে-সৃষ্টে ক্ষুন্নিবারণ করিয়া আনন্দমোহন বাহিরে আসিয়া বসিল। খৃষ্টবাহন তখন আরাম-কেদারায় অঙ্গ ঢালিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিল। বন্ধুকে দেখিয়া বলিল, "খাওয়া বুঝি হ'ল এতক্ষণে ? কেমন তৃপ্তিতে খেলে ভাই ?"

আনন্দমোহন একটু গম্ভীর হইয়াই উত্তর দিল, "চমৎকার !"

রাত্রির আহারপর্ব্ব হইল আরও অপূর্ব্ব! হাণ্ডায় ঘী চড়াইয়া লিলি আনন্দমোহনের সহিত আনন্দের একটু বাড়াবাড়িই বোধ হয় করিয়া ফেলিয়াছিল, দুজনে কি একটা রহস্যজনক কথা লইয়া হাসিয়াই অস্থির, উনুনের দিকে আর খেয়াল ছিল না, কাযেই হঠাৎ হাণ্ডার ঘী জ্বলিয়া উঠিল, লিলি বা আনন্দমোহন এমন ব্যাপার আর কখনও দেখে নাই, আমোদ-প্রমোদ তাহাদের মাথায় গিয়া উঠিল, দুজনেই চীৎকার করিতে লাগিল, "নেবাও, নেবাও, অগ্নিকাণ্ড—অগ্নিকাণ্ড—"

সঙ্গে সঙ্গে নিজের ঘর হইতে শোভা ছুটিয়া আসিল, তখনও হাণ্ডার ভিতর ঘী জ্বলিতেছিল। শোভা ক্ষিপ্রহস্তে একখানা থালা লইয়া হাণ্ডার মুখে চাপা দিল, অগ্নিকাণ্ডও তৎক্ষণাৎ থামিয়া গেল। খৃষ্টবাহনও ঠিক এই সময় বাহিরের ঘর হইতে ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি ?"

শোভা হাসিয়া বলিল, "বিশেষ কিছু নয়, চায়ের পিয়ালায় একটু তুফান উঠেছিল।" তাহার পর লিলির দিকে চাহিয়া বলিয়া গেল, "হাঁড়ীতে ঘী চড়িয়ে গল্প করতে নেই, আর যদি কখনও এমন হয়, তখনি হাঁড়ীর মুখে চাপা দিতে হয়।"

শোভার কথা কাঁটার মত লিলির গায়ে বিঁধিলেও সে কোনও জবাব দিল না। এই আকস্মিক অগ্ন্যুৎপাতে সে এতটা বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে, তখনও তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল। সে রাত্রিতে তাহার আর রন্ধন হইল না, আর এক দফা চা ও কয়েকটা ডিম সিদ্ধ খাইয়াই তাহারা দুজনে রাত্রির ভোজনপর্ব্ব শেষ করিল।

এক দিনেই লিলির উদ্ভাসিত অতুলনীয় সৌন্দর্য্য আনন্দমোহনের নয়নে কেমন যেন বিসদৃশ ও ফ্যাকাসে বলিয়া অনুমিত হইল। শোভার শান্তশ্রীমণ্ডিত মুখখানি অনবরতই তাহার চক্ষুর উপর ফুটিয়া উঠিয়া তাহাকে আকুল করিয়া তুলিতে লাগিল। এক দিনেই সে উভয়ের পার্থক্য কতখানি, তাহার কতকটা পরিচয় পাইল।

রাত্রিতে হলঘরে দুই বন্ধুর শয়নের ব্যবস্থা হইয়াছিল। খৃষ্টবাহন জিজ্ঞাসা করিল, "লিলিকে লাগছে কেমন ?"

আনন্দমোহন উত্তর দিল, "সুন্দর! যেন ঠিক একটি তপ্ত পাঁজা! শোভাকে তুমি কেমন দেখছ ?"

খৃষ্টবাহন গম্ভীরভাবে বলিল, "চমৎকার! যেন একখানি বরফের পাহাড়।"

৮

লিলির হাতে আসিয়া তিনটি দিনের মধ্যেই আনন্দমোহনের পরিপূর্ণ চৈতন্য হইল। ভোজনবিলাসী আনন্দমোহন এই তিন দিনের নাম মাত্র কদর্য্য আহারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। লিলির সাহচর্য্য তাহার পক্ষে ক্রমে বিষের মত অসহ্য হইয়া পড়িল। সে যেন তাহার সংস্রব এড়াইতে পারিলেই বাঁচে। লিলিরও এই কয় দিনে চক্ষু ফুটিয়াছিল, আনন্দমোহনের ভিতরের মূর্ত্তি ক্রমশঃ সে চিনিতে পারিয়া বুঝিয়াছিল, তাহার ক্ষমাশীল সহিষ্ণু স্বামীর তুলনায় আনন্দমোহন কত নীচ, কত বড় স্বার্থপর। আর সঙ্গে সঙ্গে শোভার সহিত নিজেকে তুলনা করিয়া সে জানিয়াছিল, কত তফাতে সে পড়িয়া আছে, শোভার পদতলে বসিয়া সে এখনও কত বিষয়ই না শিখিতে পারে!

আনন্দমোহনের মলিন মুখখানি দেখিয়াই শোভার বুকের মধ্যে হাহাকার করিয়া উঠিল। খাবার ক্রটি কখনও যাহার জীবনে ঘটে নাই, আজ কয় দিন সে যে খাবার কষ্ট পূর্ণমাত্রাতেই পাইতেছে, স্বামীর ম্লান মুখখানি দেখিয়াই শোভা তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল। খৃষ্টবাহনের জন্য মধ্যাহ্ন-ভোজনের খাবার সাজাইতে সাজাইতে শোভা তাহার হতভাগ্য স্বামীর আহার্য্যের অবস্থা ভাবিয়া একবারে যেন মুসড়াইয়া পড়িতেছিল।

খৃষ্টবাহন ভোজন করিতে আসিয়া বলিল, "ও পাড়ার অবস্থা খুব কাহিল বলেই মনে হচ্ছে, শোভা! তোমার শাসনের ফল হাতে হাতে ফল্লো ব'লে!"

শোভা কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া খাবারের থালা খৃষ্টবাহনের সম্মুখে ধরিয়া দিল, কথার কোন উত্তর দিল না।

খৃষ্টবাহন শোভার মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ চমকিত হইয়া বলিল, "তোমার হয়েছে কি, বোন্! মুখখানি যে একবারে

শুকিয়ে গেছে দেখছি! ছি, ছি, আবার সেই দুর্ব্বলতাকে মনে মনে প্রশ্রয় দিয়েছ?"

শোভা বলিল, "আগে এতটা বুঝতে পারি নি, দাদা! শাসন করতে ব'সে, নিজেও তার মধ্যে যে জড়িয়ে পড়েছি—এখন তা বুঝতে পারছি! সব সইতে পারি, দাদা, কিন্তু যখন মনে হয়, সব থাকতেও, না খেতে পেয়ে—"

শোভার স্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল, দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। খৃষ্টবাহন ব্যস্ত হইয়া বলিল, "আমি তোমাকে বলছি, শোভা, আর একটি দিন কোন রকমে কাটিয়ে দাও, ওদের দুজনেরই মোহ কেটে গেছে, তোমারই শাসনে এমন অবস্থায় আমরা ওদের ফিরে পাব, যখন তাদের মধ্যে আর কোন ময়লা থাকবে না, একটি দিনের মত তুমি আর একটু শক্ত হও, বোন্।"

শোভা আত্মসম্বরণ করিয়া বলিল, "তুমি খেয়ে নাও, দাদা। আমার জন্যে ভেব না; তোমার কাছে দুর্ব্বলতাটুকু প্রকাশ করলেও, স্থানবিশেষে একে দমন করবার শিক্ষা আমার জানা আছে, দাদা।"

দুই বন্ধু হল-ঘরে শয্যার আশ্রয় লইয়াছিল। পরিতৃপ্ত ভোজনের ফলে খৃষ্টবাহন আরামে নিদ্রা দিয়াছিল। ক্ষুধার তাড়নায় আনন্দমোহনের জঠর জ্বলিতেছিল। শয্যা যেন কাঁটার মত তাহার অঙ্গে বিঁধিতে লাগিল। ক্ষুধার জ্বালা আর সহ্য করিতে না পারিয়া ধীরে ধীরে শয্যা ত্যাগ করিয়া আহার্য্যসন্ধানে চুপি চুপি সে শোভার খাবার ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। খুট করিয়া শিকল খোলার শব্দ পাইয়াই শোভা তাড়াতাড়ি ভাঁড়ারের দিকে ছুটিল। দ্বারটির পাশে দাঁড়াইয়া স্তব্ধ হইয়া সে দেখিল, আনন্দমোহন শোভার হাতে প্রস্তুত অপরাহ্নের জন্য রক্ষিত লুচি-তরকারীগুলি পরম পরিতৃপ্তির সহিত খাইতে আরম্ভ করিয়াছে। তাড়াতাড়ি উদরপূর্ত্তির জন্য সে কি ব্যগ্রতা,—ভোজনের আনন্দ ও ধরা পড়িবার আতঙ্ক—যুগপৎ এই দুইটি ভাবের সম্পাতে মুখখানি তাহার অনুরঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে।

অপলক দৃষ্টিতে শোভা স্বামীর সেই অপূর্ব্ব ভাবব্যঞ্জক মুখখানির উপর চাহিয়া রহিল। দেখিতে দেখিতে শোভার বিরস মুখখানি হাস্যোজ্জ্বল হইয়া উঠিল, স্বামীর তৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে মুখখানি তাহার যেমন দৃপ্ত হইল, পরক্ষণে আবার স্বামীর মুখে আতঙ্কের ছায়া দেখিয়া সেও যেন মুসড়াইয়া পড়িল, মুখের হাসি মুখেই মিলাইয়া গেল—দুই চক্ষু সজল হইয়া উঠিল।

আর ধৈর্য্য ধরিতে না পারিয়া শোভা দরজা ঠেলিয়া ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। সহসা শোভার আবির্ভাবে আনন্দমোহন সভয়-বিস্ময়ে একবারে অভিভূত হইয়া গেল। তাহার মুখের খাবার মুখেই রহিল, হাতের খাবার হাত হইতে খসিয়া ঘরের মেঝের উপর পড়িয়া গেল।

শিশিরসিক্ত স্থলপদ্মের মত শোভার সুন্দর মুখখানি টলটল করিতেছিল, দুইটি সজল চক্ষুর অপলক দৃষ্টি—কি মর্ম্মভেদ! চক্ষু দুইটিই যেন আর্ত্তস্বরে বলিতেছিল, তোমার এই দুর্দ্দশা আমাদের দেখতে হ'ল!

শোভার মুখের দিকে চাহিতে তাহার সহিত চোখোচোখি হইতেই আনন্দমোহন অভিভূত হইয়া শোকাবিষ্টের মত কাঁদিয়া ফেলিল। পরক্ষণে শোভার হাত দুটি ধরিয়া অপরাধীর মত আর্ত্তস্বরে সে বলিল, "এতকাল আমি অন্ধ ছিলুম, শোভা, তাই তোমার আসল রূপের সন্ধান পাইনি, তোমাকে চিনতে পারিনি। লিলি আমার চক্ষু ফুটিয়ে দিয়েছে, আমি আজ তোমাকে পরিপূর্ণরূপে পেয়েছি, আমাকে দয়া কর, শোভা, সমস্ত পাপ অপরাধ আমার মার্জ্জনা কর—"

শোভা তখন অঞ্চলখানি গলায় দিয়া স্বামীর পদতলে বসিয়া গাঢ়স্বরে বলিল, "তোমাকে শুচি করবার জন্য স্ত্রী হয়েও আমি যেটুকু বাড়াবাড়ি করেছি, তার জন্য ক্ষমা চাইছি।"

আনন্দমোহন আনন্দে অভিভূত হইয়া শোভাকে বক্ষে তুলিয়া লইল।

* * * *

সন্ধ্যার পর খৃষ্টবাহন সহসা লিলির ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। লিলি তখন চুপটি করিয়া জানালার ধারে বসিয়াছিল। খৃষ্টবাহনকে দেখিয়া নিতান্ত অপরাধিনীর মত ম্লানমুখে সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

খৃষ্টবাহন বলিল, "মিসেস্ দের সুব্যবস্থায় আমি ক'দিন পরম তৃপ্তির সঙ্গে খেতে পেয়েছি; কিন্তু মিঃ দে'র মুখে শুনলুম, তুমি ক'দিনই তাকে এক প্রকার অনাহারেই রেখেছ?"

লিলি স্বামীর মুখের দিকে ম্লানদৃষ্টিতে একবার চাহিয়াই মুখখানি নত করিল। খৃষ্টবাহন দৃঢ়স্বরে বলিল, "ভদ্রলোকের ওপর তুমি এ অত্যাচার করেছ কেন, আমি জানতে চাই। আমার ঘরে ত অভাব কিছুই ছিল না।"

লিলি সেইভাবেই দাঁড়াইয়া রহিল, কোনও কথাই বলিল না বা বলিবার সামর্থ্যও তখন তাহার ছিল না। তাহার বিক্ষুব্ধ অন্তর তখন যেন কঠোর শাস্তির জন্য প্রস্তুত হইয়া সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছিল।

খৃষ্টবাহন লিলিকে নিরুত্তর দেখিয়া, রুখিয়া তাহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল,—দুই হস্তে স্ত্রীর বাহুমূল ধরিয়া সজোরে প্রবল

ঝাঁকানি দিয়া কঠোর স্বরে বলিল, "চুপ ক'রে আছ যে—জবাব দাও!"

অতর্কিতভাবে প্রবল ঝাঁকানি-সংঘাতে মহা আতঙ্কে অভিভূত হইয়া লিলি এবার আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিল, "এ শাস্তি এত দিন আমাকে দাও নি কেন তুমি? কেন আমাকে মাথায় তুলে আমাকে এত প্রশ্রয় দিয়েছিলে? আমার ভুল আজ ভেঙ্গে গেছে,—তবু—তবু আমি শাস্তি চাই, আমাকে শাস্তি দাও!—আজ তোমার এই মূর্ত্তি সত্যই আমার চোখে সুন্দর—অতি সুন্দর হয়ে ভাসছে! কেন—এত দিন এ মূর্ত্তি আমাকে দেখাও নি,—তা হ'লে ত এ ভুল আমার হ'ত না!"

সুদীর্ঘ পাঁচটি বৎসরের মধ্যে লিলির সংস্পর্শে আসিয়া লিলির মুখে এমন কথা একটি দিনও খৃষ্টবাহন শুনিতে পায় নাই,—এ ভাবে নত হইতে কখনও তাহাকে দেখে নাই! মুগ্ধ হইয়া সে বলিল, "তাই যদি, তা হ'লে আমিও তোমাকে প্রসন্ন-মনে ক্ষমা করলুম, লিলি!"

* * * *

কলহাস্যে ঘরখানি মুখর করিতে করিতে শোভা আসিয়া বলিল, "দাদা, খাবার-দাবার সব তৈরী, আমার বোন্‌টিকে নিয়ে এস, বড় ঘরে ব'সে আজ আমরা সকলে একসঙ্গেই খাব!"

লিলি ঝড়ের মত ছুটিয়া গিয়া শোভাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "তুমিই আমাকে নিয়ে চল, দিদি। আজ থেকে ছায়ার মত আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরব, ছোট্ট বোন্‌টির মত তোমার কাছে সব শিখব। আমার সমস্ত দোষ ক্ষমা কর, দিদি!"

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

নূতন ও পুরাতন

সে দিন পথের প্রান্তে দাঁড়াইয়া হেরিলাম নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে
পুরাতন বর্ষ হায় বেদনায় আর্দ্র-চক্ষু মাগিছে বিদায়!
চরণ মন্থর-গতি, অন্তর স্পন্দন-হীন, দেহ লজ্জা-ভয়ে
একান্তই সঙ্কুচিত; অপরাধী বক্ষ তার যেন ক্ষমা চায়!

লতায় পল্লবে শত উপেক্ষার দৃষ্টি যেন দহিতেছে তারে;
নূতন আসিবে কাল তারি লাগি দিকে দিকে নব আয়োজন;
যে চলিল তারে কেহ নাহি কহে সান্ত্বনার বাণী বারে বারে;
সে যেন একান্ত পর; তারে বুঝি কারো আর নাহি প্রয়োজন!

আসিয়াছে নববর্ষ, হর্ষে লয়ে নব নব শত উপচার;
ধরণীর বক্ষ-পাত্রে আনন্দের রূপ-সুধা উচ্ছল চঞ্চল।
আশার উৎসুক-স্বপ্নে পৃথিবীর জীব জড় উন্মত্ত দুর্ব্বার;
আতাম্র আম্রের পত্রে তারি সুর স্বন্-স্বনি ধ্বনিছে কেবল।

কহিলাম, "হে বন্ধু বিগত-প্রায়! দুঃখ কেন—মিথ্যা তব শোক!
অতীত শীতের স্নেহ কে স্মরিবে বসন্তের হবে যবে জয়?"
সে কহিল, "আমি যা' দিয়াছি যত হর্ষ স্নেহ আনন্দ আলোক
সে কি সব উপেক্ষার? এতটুকু প্রীতি তরে সে কি কিছু নয়?"

অতীতের সর্ব্ব-স্মৃতি অবলুপ্ত ধরণীর শ্যাম গাত্র হ'তে;
বিহগের কলকণ্ঠে নব সুর নব ছন্দে নিত্য আন্দোলিত!
চৈত্রের বিদগ্ধ মাঠ ভ'রে গেছে সবুজের অন্তহীন স্রোতে!
বিশ্বের অন্তরে আজ অতীতের পদ-চিহ্ন বিস্মৃতি-আবৃত!

নূতনেরে কহিলাম, "হে সুন্দর বন্ধু মোর! হে বর্ষ নবীন!
তোমার আসার আগে যে জন বিদায় নিল চেন তুমি তারে?"
কহিল নূতন বর্ষ, "আজিও চিনি না তারে, চিনিব সে দিন
যে দিন ধরণী হ'তে মোর স্মৃতি মিলাইবে ঘন অন্ধকারে!"

শ্রীবিমল মিত্র।

ভারতে ব্রুস-শিল্প

ভারতের বন্য ও কর্ষিত উদ্ভিদ্‌-সমূহ হইতে যে নানাপ্রকারের তন্তু পাওয়া যায়, তৎসমূহের মধ্যে কয়েকটির সদ্ব্যবহারের উপায় ইতিপূর্ব্বে 'মাসিক বসুমতী'তে আলোচিত হইয়াছিল। দড়ি-দড়া, চট-থলে, আসন, পাপোশ্‌, ইত্যাদি নানাবিধ বস্তু প্রস্তুতে তন্তুর ব্যবহার হইয়া থাকে। ভারতে তন্তু-উৎপাদক উদ্ভিদের সংখ্যা অনেক; তন্মধ্যে কতকগুলির তন্তু ব্রুস ও সম্মার্জ্জনী প্রস্তুতের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। সম্পূর্ণভাবে দেশীয় উপাদানের উপর ভিত্তি করিয়া ভারতে কিরূপ সুবৃহৎ ব্রুস-শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তাহাই এ স্থলে বিবেচিত হইতেছে।

ব্রুস ও সম্মার্জ্জনী একই শ্রেণীর দ্রব্য। বস্তুতঃ বিশেষ বিশেষ কার্য্যের সুবিধার জন্য মানব সম্মার্জ্জনী হইতেই ব্রুসের উদ্ভাবনা করিয়াছে। পরিচ্ছন্নতা-জ্ঞানের উন্মেষের সহিত সম্মার্জ্জনী আবশ্যক হইয়াছিল এবং কালক্রমে সভ্যতার উন্নতির সহিত উহারও উন্নতি সাধিত হইয়াছে। সম্মার্জ্জনী এতদ্দেশে চিরকালই আছে; পাশ্চাত্য সভ্যতার বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে যেমন রুচির পরিবর্ত্তন হইতেছে, তেমনই ব্রুসের প্রচলনও বাড়িয়া চলিয়াছে। অতি দরিদ্র হইতে প্রভূত ধনশালী ব্যক্তি, সকলের বাড়ীতেই সম্মার্জ্জনীর আবশ্যক হয়। সম্মার্জ্জনীও নানা শ্রেণীর দেখিতে পাওয়া যায়। বন্য ডালপালা কাটিয়া ছাঁটিয়া গোয়াল অথবা বাগানের আবর্জ্জনা ঝাঁট দেওয়ার জন্য যে ঝাড়ু ব্যবহৃত হয়, তাহার মধ্যেও সূক্ষ্ম উদ্ভিদাংশ বিরচিত, রঞ্জিত, মার্জ্জিত ও পরিশোভিত গৃহের সাজ-শয্যা ঝাড়িবার সম্মার্জ্জনীর মধ্যে অনেক প্রভেদ এবং এই দুই শ্রেণীর অন্তর্বর্ত্তী নানাপ্রকারের সম্মার্জ্জনী রহিয়াছে। ভারতের কতিপয় স্থানের সম্মার্জ্জনী উচ্চ অঙ্গের চারুশিল্প-কার্য্যের জন্য প্রসিদ্ধ। সচরাচর যে অঞ্চলে যেরূপ উদ্ভিদ্‌ সুলভ, সে স্থলে সম্মার্জ্জনীও সেইরূপ শ্রেণীর হইয়া থাকে। সাধারণতঃ যে সমস্ত উপাদান হইতে সম্মার্জ্জনী প্রস্তুত হয়, তন্মধ্যে নানাবিধ ঘাসের পত্র ও পুষ্পদণ্ড, কয়েক প্রকার উদ্ভিদের দৃঢ় অথচ সহজে নমনীয় কাণ্ড ও পল্লব এবং নারিকেল ও তজ্জাতীয় গাছের পাতার শিরা অন্যতম। যে সকল গ্রামের সন্নিকটে সম্মার্জ্জনী প্রস্তুতের উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে জন্মিয়া থাকে, সে সকল স্থানের নিম্নশ্রেণীর লোকরা, বিশেষতঃ স্ত্রীলোক ও বালকবালিকাগণ, উক্তরূপ উপাদান সংগ্রহ ও সম্মার্জ্জনী তৈয়ারী করিয়া কিছু কিছু অর্থ উপার্জ্জন করে। কোল, ভিল, সাঁওতাল প্রভৃতি অর্দ্ধ-বনবাসী সম্প্রদায়-সমূহের মধ্যেও ঝাড়ু, ঝুড়ি, টুকরি ও কয়েক প্রকারের আধার ও পেটারা তৈয়ারী করা একটি আনুসঙ্গিক উপজীবিকা।

দেশীয় ও বিলাতী ধরণের সম্মার্জ্জনীর মধ্যে অনেক প্রভেদ আছে; বিলাতী ধরণের সম্মার্জ্জনী এ পর্য্যন্ত অধিক পরিমাণে এতদ্দেশে আমদানী হয় নাই; কারণ, উক্তরূপ সম্মার্জ্জনী ভারতীয় গৃহস্থের পক্ষে ঠিক উপযোগী নহে; কিন্তু প্রধান কারণ এই যে, যেরূপ সামান্য মূল্যে দেশীয় ঝাড়ু বিক্রয় হইয়া থাকে, কোন বিদেশীয় কোম্পানী তাহার সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া ভারতের বাজারে ঝাঁটা বিক্রয় করিতে পারেন না। ব্রুসের কথা স্বতন্ত্র; সম্মার্জ্জনীর ন্যায় ব্রুসেরও আকার ও প্রকার নানাবিধ। দন্ত-ব্যাধিতে ব্যবহারের জন্য বিশেষভাবে গঠিত ব্রুসের পরিসর ১ ইঞ্চির অধিক নয়; এই ক্ষুদ্রতম ব্রুস হইতে আরম্ভ করিয়া রাস্তা পরিষ্কার করিবার জন্য ৪০ ইঞ্চ লম্বা ও তদুপযুক্ত পরিধিযুক্ত অতিকায় ব্রুসও রহিয়াছে। কতিপয় সাধারণ রকমের ব্রুস এতদ্দেশে কয়েক বৎসর হইতে প্রস্তুত হইতেছে; কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষা, চিকিৎসা ও নানাবিধ শিল্পে যে বিভিন্ন প্রকারের ছোট বড় এবং সূক্ষ্ম ও মোটা ব্রুস বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে, সে সমুদয়ের অধিকাংশই বিদেশ হইতে আমদানী। অনেক স্থলে এইরূপ বিদেশীয় ব্রুসের কাঁচা মাল ভারতই সরবরাহ করিয়া থাকে; সরকারী হিসাবে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রতি বৎসর গড়ে প্রায় ২০ লক্ষ টাকা মূল্যের ব্রুস ও সম্মার্জ্জনী প্রস্তুতের উপাদান ভারত হইতে রপ্তানী হয়। পক্ষান্তরে, ভারতবাসিগণ এই শ্রেণীর দ্রব্যের জন্য বিদেশীয় বণিকগণকে বাৎসরিক প্রায় ১১ লক্ষ টাকা দিয়া থাকেন। সহজেই অনুমান করিতে পারা যায় যে, অন্য দেশের ব্রুস প্রস্তুত-কারকগণ ভারতের মালই

পরিবর্ত্তিত আকারে আবার তাহাকেই ফেরত দিয়া এই অর্থ উপার্জ্জন করেন।

ব্রুস-প্রস্তুতের উপাদান

যে সমস্ত উপাদান হইতে ব্রুস তৈয়ারী হয়, তাহাদিগের প্রকৃতি হিসাবে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারা যায়। যথা—খনিজ, প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ। তারের ব্রুস প্রথম ও শূকরকুঁচির ব্রুস দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই দুই শ্রেণীর ব্রুসের যথেষ্ট কাটতি আছে এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্রুস উচ্চ মূল্যেও বিক্রীত হয়। উক্ত প্রকার ব্রুস প্রস্তুতের উপাদানও ভারতে বিরল নহে, কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর অর্থাৎ উদ্ভিজ্জ উপাদানের তুলনায় অতি সামান্য; আমরা তজ্জন্য এই শেষোক্ত শ্রেণীর উপাদানের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। বন্য ও কর্ষিত এত প্রকারের ব্রুস প্রস্তুতোপযোগী উদ্ভিদ্ আপাততঃ সদ্ব্যবহারের অভাবে অপচয় হইতেছে যে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। অবশ্য ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, বিগত ৩০।৪০ বৎসরের মধ্যে স্থানে স্থানে ও সময়ে সময়ে দেশীয় ব্রুস প্রস্তুতের জন্য চেষ্টা হইয়াছে এবং বাজারেও কয়েক প্রকার দেশীয় ব্রুস দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এইরূপ চেষ্টার অনেকগুলিই বিফল হইয়াছে। যে দুই চারিটি কোম্পানী বর্ত্তমান সময়ে দেশীয় ব্রুস প্রস্তুত করিয়া লাভবান্ হইতেছেন, তন্মধ্যে অধিকাংশই বিদেশীয়-পরিচালিত। দেশীয় প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবার অন্যতম কারণ এই যে, উদ্যোক্তৃগণ উপাদান নির্দ্ধারণ ও ব্রুস-তন্তু প্রস্তুতের বৈজ্ঞানিক প্রথার উপর যথেষ্ট পরিমাণে মনঃসংযোগ করেন নাই, এবং তাহার ফলে উৎপাদিত ব্রুসও সুদৃশ্য ও দীর্ঘকাল ব্যবহারসহ না হইয়া সাধারণের সহানুভূতি অর্জ্জন অথবা সমশ্রেণীর বিদেশীয় পণ্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু অতীতে উদ্যম বিফল হইয়াছে বলিয়া ভবিষ্যতেও যে তাহাই হইবে, তাহার কোন কারণ নাই। বরং বিফলতার বিনিময়ে যে অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, তাহা ভবিষ্যৎ প্রচেষ্টার পথিপ্রদর্শকের কার্য্য করিবে। দেশের ব্রুস-তন্তু-উৎপাদক উদ্ভিজ্জ সম্পদ পূর্ব্বের ন্যায়ই প্রচুর রহিয়াছে। এখন আবশ্যক কেবল সতর্কতার সহিত অগ্রসর হওয়া এবং সম্পূর্ণভাবে বৈজ্ঞানিক প্রথা অবলম্বন করা। উপযুক্ত উপাদান নির্ব্বাচনের উপরেই ব্রুস-শিল্পের সাফল্য নির্ভর করে। আমরা এ স্থলে কয়েকটি প্রধান প্রধান ব্রুস-তন্তু-প্রস্তুতোপযোগী উদ্ভিদের উল্লেখ করিতেছি। কার্য্যক্ষেত্রে পরীক্ষিত হইয়া উহাদের তন্তু ব্রুস তৈয়ারীর উৎকৃষ্ট উপাদান বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে এবং সেইজন্য ভারতের বাহিরেও উহাদের চাহিদা ক্রমশঃ বাড়িতেছে।

ব্রুস-তন্তু-উৎপাদক উদ্ভিদ

যে সমুদয় উদ্ভিদবর্গ হইতে ব্রুস-তন্তু পাওয়া যায়, তন্মধ্যে তাল-বর্গকেই (Palmear) প্রথম স্থান প্রদান করিতে পারা যায়। বস্তুতঃ এই বর্গের অন্তর্ভুক্ত কতিপয় উদ্ভিদ হইতে তন্তু নিষ্কাশন করিয়া বহু পুরাকাল হইতে মানব সম্মার্জ্জনীর কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছে। আমরা সর্ব্বাগ্রে তালের উল্লেখ করিতে পারি। ভারতের অনেক স্থানেই তালবৃক্ষ সুলভ। মধ্যপ্রদেশে ও দাক্ষিণাত্যে বড় বড় তাল-জঙ্গল দেখিতে পাওয়া যায়। গৃহস্থালীর বিভিন্ন কার্য্যে তালবৃক্ষের বিভিন্ন অংশের যে প্রচুর প্রয়োগ হয়, তাহা বলা বাহুল্য। • তাল-তরু হইতে পাঁচ প্রকারের তন্তু পাওয়া যায়, তন্মধ্যে তরুণ গাছের পত্রবৃন্তের তন্তুই ব্রুস প্রস্তুতের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। গোদাবরী ও কৃষ্ণা জিলার উচ্চাংশ, তিনেভিলি জিলা, মালাবার উপকূলের পালঘাট মহকুমা ইত্যাদি অঞ্চল তালতন্তু প্রস্তুতের অন্যতম কেন্দ্র। প্রস্তুতীকৃত তন্তু রঞ্জিত ও অরঞ্জিত উভয় অবস্থাতেই বাজারে আইসে। দৈর্ঘ্য হিসাবে তাল-তন্তুকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়, যথা—ছোট ৮–১১ ইঃ, বড় ১৫-১৮ ইঃ এবং মধ্যম ১২-১৪ ইঃ। প্রতি বৎসর প্রায় ১৭ লক্ষ টাকা মূল্যের তালতন্তু কোকনদ, তুতিকোরিন, কলিকট ও কোচিন বন্দর হইতে রপ্তানী হইলেও দুঃখের সহিত ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, দেশমধ্যে এ পর্য্যন্ত তালতন্তুর ব্রুস প্রস্তুতের পক্ষে উপযোগিতা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি হয় নাই। বিদেশে ইহার যেরূপ আদর আছে, দেশে তেমন নাই।

নারিকেলও তালের ন্যায় সাধারণ উদ্ভিদ এবং ভারতের সুদীর্ঘ সমুদ্রতটে, বিশেষতঃ পূর্ব্ব উপকূলে নারিকেল-বৃক্ষের অভাব নাই। দাক্ষিণাত্যে নারিকেল-ছোবড়া প্রস্তুত একটি বিশিষ্ট শিল্প। নারিকেল-ফলত্বক্ হইতে বিভিন্ন কার্য্যোপযোগী যে কয়েক প্রকারের তন্তু নিষ্কাশিত হয়, তাহার মধ্যে ব্রুস-তন্তু এক প্রকার; এগুলি হ্রস্ব, দৃঢ় ও অপেক্ষাকৃত অনমনীয় বলিয়া মাদুর অথবা গদী প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু ব্রুস তৈয়ারীর পক্ষে ইহা উৎকৃষ্ট উপাদান। দড়ী-দড়া, মাদুর (matting) ও অন্যান্য নারিকেল-ছোবড়াজাত সাজ-সজ্জার কারখানায় ব্রুস-তন্তু বাজে মাল-(waste prodnct) রূপে পাওয়া যাইতে পারে। নারিকেলজাতীয় অন্যান্য গাছের মধ্যে বন্য খর্জ্জুরও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ইহার ও সমগণীয় উদ্ভিদ হেঁতালের পত্রবৃন্ত ও পুষ্পদণ্ড হইতে যে তন্তু পাওয়া যায়, তাহা অপেক্ষাকৃত কর্কশ হইলেও অশ্বগাত্র পরিষ্কার ও সমপ্রকার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ব্রুস প্রস্তুতের জন্য সম্পূর্ণ উপযোগী।

ভারতজাত যাবতীয় ব্রুসতন্তুর মধ্যে অনেকেই কিন্তু দেশীয় সাগুদানার গাছের তন্তুকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করেন। এই গাছ—Caryota Urens প্রধানতঃ গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলেই দৃষ্ট হয়। নেপালের পাদদেশস্থ তরাই, আসাম, পূর্ব্ববঙ্গ, উড়িষ্যা, মালাবার ও তিনেভিলি প্রভৃতি কতিপয় স্থানে ইহার যথেষ্ট প্রাচুর্য্য দেখা যায়। ইহা হইতে দুই প্রকারের তন্তু পাওয়া যায়—১ম পত্রাবরণের সংযোগস্থলে প্রাপ্ত লগ্ন তন্তুরাজি এবং পত্রবৃন্ত, পুষ্পদণ্ড ও কাণ্ডের অভ্যন্তরস্থ দীর্ঘ তন্তুগুচ্ছ। বাজারে এই সমুদয় তন্তু কিতল্ তন্তু (Kitul fibre) নামে পরিচিত। বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে এই তন্তু প্রথমতঃ পাশ্চাত্য বাজারে চালান যায়; সেই সময় হইতে ইহার ব্যবহার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। শূকরের কুঁচি ও মার্কিণদেশীয় পায়েসাবা (Piassava) তন্তু ব্রুস প্রস্তুতের উৎকৃষ্ট উপাদান। উহাদের মূল্য অধিক। সেই জন্য উহাদের পরিবর্ত্তে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যের কিতল্ তন্তুর প্রচলন বাড়িতেছে। গুণেও ইহা পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকার তন্তু হইতে হীনতর নহে। ইহা এক দিকে যেমন নানাবিধ শিল্পে প্রযুক্ত মোটা কলের ব্রুস ও অশ্ব-ব্রুস তৈয়ারীর উপযোগী, অন্য দিকে তেমনই কিছু সময় মসিনার তৈলে ভিজাইয়া রাখিলে কিতল্ তন্তু এত নরম ও নমনীয় হয় যে, ইহার দ্বারা সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর প্রসাধন-ব্রুস অনায়াসেই প্রস্তুত করা যায়। দেশীয় সাগুদানার গাছের আজকাল কিছু অধিক পরিমাণে সদ্ব্যবহার হইতেছে, কিন্তু উহা উদ্ভিদের প্রাচুর্য্যের অনুপাতে কিছুই নহে। রপ্তানীর জন্যও এই তন্তু যথেষ্ট মাত্রায় নিষ্কাশিত হয় না; সিংহল ও মালয় দ্বীপপুঞ্জ এ বিষয়ে অগ্রণী। উক্ত দেশসমূহে কিতল্ তন্তু প্রস্তুত, বনভূমির শিল্পের মধ্যে অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হয়। কিতল্ তন্তুর ন্যায় 'ইজু' তন্তুও (Eju fibre) বিলাতী বাজারে সুপরিচিত। ইহাও তালবর্গীয় Arenga Saccharifera নামক বৃক্ষ হইতে প্রাপ্ত। ব্রহ্মদেশে ও আসামের মণিপুরে ইহার কাণ্ড হইতে সাগুদানার ন্যায় শ্বেতসার নিষ্কাশিত হয়; অথবা তাল-খেজুরের ন্যায় রস বাহির করিয়া তাড়ি ও গুড় প্রস্তুত করা হয়; কিন্তু এ পর্য্যন্ত ইহার তন্তু ব্রুস প্রস্তুতের জন্য প্রয়োগ করা হয় নাই, কিম্বা হইলেও অতি সামান্য পরিমাণে হইয়াছে।

বাঁশ ও নল ইত্যাদি

তালবর্গীয় উদ্ভিদ ব্যতীত আরও অনেক শ্রেণীর উদ্ভিদ হইতে কোন না কোন প্রকার ব্রুস প্রস্তুতোপযোগী তন্তু পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতে পারা যায় যে, গৃহ ও রাস্তাদি ঝাঁট দেওয়ার জন্য যে মোটা ব্রুস আবশ্যক হয়, তাহার উপাদান কয়েক প্রকার নল ও বাঁশ হইতে পাওয়া যাইতে পারে। বাঁশের ১ ইঞ্চি চওড়া ও ৬ ইঞ্চ লম্বা কুচি দ্বারা এইরূপ ব্রুস প্রস্তুত করিয়া দেখা গিয়াছে, উহা সহরের আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিবার পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী ও খুব মজবুত। বঙ্গ মুর্গা অনেক স্থলে, বিশেষতঃ ছোটনাগপুরের কঙ্করময়, অনুর্ব্বর জমীতে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে এবং সুন্দরবন প্রভৃতি অঞ্চলে কেয়াগাছের বিস্তৃত জঙ্গল আছে। এতদুভয় উদ্ভিদ হইতেই কাপড় ঝাড়িবার ও ঘোড়ার গাত্র সাফ করিবার জন্য ব্যবহৃত ব্রুস অনায়াসে তৈয়ারী করা যাইতে পারে। অবশ্য এরূপ উদ্ভিদের সদ্ব্যবহার করিতে হইলে মোটা তন্তু বাহির করিয়া লইবার পর যে সূক্ষ্ম তন্তু থাকিয়া যায়, তাহাও কোনরূপ কার্য্যে প্রয়োগ করিবার ব্যবস্থা করা দরকার। তাহা না হইলে প্রস্তুতের খরচ অধিক হওয়া সম্ভব।

বর্ত্তমান কারখানা-সমূহ

অদ্যাবধি কয়েকটি স্থানে দেশজাত তন্তু ব্রুস প্রস্তুতের জন্য ব্যবহার করিবার চেষ্টা হইয়াছে বটে এবং বন-বিভাগের কোন কোন কর্ম্মচারী এক এক সময় এ বিষয়ে মনঃসংযোগও করিয়াছেন, কিন্তু এখনও ভারতীয় তন্তু-ব্রুস সম্বন্ধে কোন প্রকার বিশেষ অনুসন্ধান হয় নাই। এ সম্বন্ধে ধারাবাহিক ও বিস্তৃত অনুসন্ধান ব্যতীত ব্রুস-শিল্প সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভবপর হইবে না। নীলগিরি, কানপুর, ইন্দোর প্রভৃতি স্থানে যে সকল ক্ষুদ্র বৃহৎ ব্রুসের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে, সেগুলিতে কয়েক প্রকার দেশীয় উপাদান ব্যবহার করিয়া মন্দ ব্রুস প্রস্তুত হয় নাই, কিন্তু উক্ত কারখানা-সমূহের উৎপাদনের মাত্রা কম। উৎপাদিত ব্রুসের তন্তু পূর্ব্বোক্ত কয়েক প্রকার উদ্ভিদের এক বা অন্য হইতে লওয়া হয় এবং উহাদের কাঠাম দাক্ষিণাত্যের মাটিন্ কাঠ হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু উক্ত প্রকার কারখানা-সমূহে যে সকল ব্রুস প্রস্তুত হয়, সেগুলি প্রায়ই সমর-বিভাগের জন্য; সুতরাং সাধারণ কার্য্যের জন্য ঐ সকল কারখানায় অধিক পরিমাণে ব্রুস প্রস্তুত হয় না। নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারিলে দেশীয় উপাদান হইতে প্রায় সকল প্রকার ব্রুসই তৈয়ারী করা যাইতে পারে। আপাততঃ যে কারখানাগুলি রহিয়াছে, তাহাদিগের উৎপাদিত মালে সমধিক পরিমাণে বৈচিত্র্য প্রবর্ত্তন করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। ইহাও এ স্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, ভারতের অধিকাংশ ব্রুসের কারখানাই এখনও পর্য্যন্ত অতি পুরাতন প্রাচীন

প্রণালীতে পরিচালিত হইতেছে। সেরূপ ভাবে কার্য্য করিয়া আধুনিক কালে প্রস্তুত ক্রসের সহিত প্রতিযোগিতা সম্ভবপর নহে; সেই জন্য প্রস্তুত প্রণালীরও যে আমূল পরিবর্ত্তন একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহাও প্রত্যেক অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন।

ক্রস-শিল্পের ইদানীন্তন বহুল পরিমাণে উন্নতি সাধিত হইয়াছে। বিগত শতাব্দীর শেষভাগেও ক্রস-শিল্প প্রধানতঃ হাতের কাযই ছিল। ক্রসের আকার-প্রকার বহুবিধ; বিভিন্ন শ্রেণীর ক্রসে কুঁচি বসাইবার ছিদ্রগুলি বিভিন্নরূপ ব্যবধানে বিন্যস্ত এবং ছিদ্র প্রতি কুঁচির পরিমাণও সকল প্রকার ক্রসে সমান নহে। বস্তুতঃ এই সমুদয়ই ক্রস-শিল্পকে কলকব্জাসাপেক্ষ শিল্পে উন্নীত করার প্রধান অন্তরায় ছিল। একই প্রণালীতে ভূরি পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন না করিতে পারিলে কল প্রয়োগ করা লাভজনক হয় না। এই সমস্যা-সমাধানের জন্য শ্রমশিল্প-সম্বন্ধীয় কল-প্রস্তুতকারিগণ বহুদিবস মস্তিষ্ক পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন; তাহার ফলে আজকাল এরূপ কল প্রস্তুত হইয়াছে—যদ্দ্বারা সকল প্রকার ক্রসই তৈয়ারী করিতে পারা যায়। জর্ম্মণী এইরূপ কলকব্জা-নির্ম্মাণে অগ্রণী। আধুনিক ক্রস-কারখানায় কাঠামো কাটা-ছাঁটা ও পালিশ করা, ফ্রেমে ছিদ্র করা, কুঁচি সমান দৈর্ঘ্যে কাটিয়া ও গুচ্ছবদ্ধ করিয়া ছিদ্রে বিন্যাস করা—এ সমস্তই কলে হইয়া থাকে। কেবল ছোট বড় ক্রস হিসাবে কলের অংশ-সমূহের অনুরূপ বিন্যাস পূর্ব্ব হইতে করিয়া লইতে হয়। এই সমুদয় কল বাষ্প অথবা বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিচালিত হইয়া থাকে। কিন্তু ক্রস প্রস্তুতের বড় কলেরও যেমন উদ্ভাবনা হইয়াছে, ক্রস প্রস্তুতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতিরও তেমনই উন্নতি সাধিত হইয়াছে। যাঁহারা এখনও পর্য্যন্ত হস্ত-শিল্পরূপে ক্রস প্রস্তুত করিতেছেন, তাঁহারাও এইরূপ আধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা অনেক শ্রম লাঘব ও কার্য্যের উন্নতি-সাধন করিতে পারিবেন। কিন্তু বড় বড় কলওয়ালাগণের সহিত প্রতিযোগিতায় ক্ষুদ্র কারখানাওয়ালাগণ কত দিন আত্মরক্ষা করিতে পারেন, তাহা সন্দেহের বিষয়।

ভারতে ক্রস-কারখানা

ব্যবসায়ের হিসাবে সমৃদ্ধি লাভ করিতে হইলে ক্রস-কারখানা এরূপ স্থলে প্রতিষ্ঠিত করা উচিত—যথায় অথবা যাহার সন্নিকটে ক্রস-প্রস্তুতের উপাদান সুলভ। ক্রসের ফ্রেমের কাঠ ও কুঁচি বিশেষভাবে প্রস্তুত করিতে হয়, বস্তুতঃ কাঠ ও কুঁচি প্রস্তুত করিবার গুণ ও দোষের উপরই অবশেষে ক্রসের উৎকর্ষতা অথবা অপকর্ষতা নির্ভর করে। কাঠকে তাতবাতসহ (Season) করিবার দোষে উহা পরে ফাটিয়া যায়, অথবা ভাল পালিশ হয় না এবং কুঁচি বৈজ্ঞানিক প্রথায় প্রস্তুত না করিতে পারিলে উহা দৃঢ় ও নমনীয় না হইয়া ভাঙ্গিয়া যায় এবং অল্পদিনের মধ্যেই ক্রস কুঁচিশূন্য হইয়া পড়ে। এই সকল এবং এবম্বিধ অন্যান্য বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখিয়া উপাদান উপযুক্তরূপে প্রস্তুত করা প্রয়োজনীয়। তৎপরে উক্তরূপে উপাদান সহযোগে ক্রস প্রস্তুত কর্ত্তব্য। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, হস্ত সাহায্যে ক্ষুদ্র কারখানা পরিচালনায় বিশেষ লাভ নাই। অবশ্য ভারতের বিশেষ অবস্থা বিবেচনা করিলে বলিতে হয় যে, নিম্নশ্রেণীর ক্রস উৎপাদনের জন্য এরূপ কারখানা এখনও কিছু দিন চলিতে পারে, কিন্তু প্রসাধনের কিংবা স্বাস্থ্যরক্ষা অথবা চিকিৎসাদির জন্য সূক্ষ্ম ও উচ্চশ্রেণীর ক্রস আধুনিক কলকব্জা সাহায্যে প্রস্তুত না করিলে বিলাতী মালের সমকক্ষ হওয়া অসম্ভব। এরূপ কলকব্জায় প্রথমতঃ অধিক অর্থ-ব্যয় হয় বটে, কিন্তু মালের সর্ব্ববিধ প্রকারে উৎকর্ষতার জন্য যখন সেগুলির যথাযোগ্য মূল্যে কাটতি হয়, তখন প্রাথমিক ব্যয় পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াও যথেষ্ট লাভ থাকে। ক্রস প্রস্তুত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র শিল্প হইলেও ইহা সাধারণের প্রণিধানযোগ্য। বঙ্গদেশের কথা বিশেষ করিয়া বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশে তরাই ও ডুয়ার অঞ্চলে এবং দক্ষিণে সুন্দরবনে ক্রস-তন্তু উৎপাদনযোগ্য বহুসংখ্যক উদ্ভিদ্ আপাততঃ অনর্থক অপচিত হইতেছে। আমাদিগের সরকারী শ্রম-শিল্প বিভাগের হস্তে নানাবিধ অভিনব শিল্পের সংখ্যাতীত পরিকল্পনা রহিয়াছে শুনিতে পাওয়া যায়; তাঁহারা এ বিষয়ে কখন মনঃসংযোগ করিয়াছেন কি না, বলা যায় না। কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় যে, ক্রস-শিল্প ও সমশ্রেণীর তন্তুমূলক অন্য শিল্প গঠনের উপাদান বঙ্গদেশে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে রহিয়াছে। এ পর্য্যন্ত সেগুলির সামান্য ভগ্নাংশমাত্রেরই সদ্ব্যবহার হইয়াছে; অবশিষ্ট সমস্তই কেবলমাত্র মৃত্তিকার কলেবর পুষ্টি করিতেছে।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

কোমলা, অবলা, কুসুমপেলবা নারী,—সর্ব্বত্র মানুষের ধারণা এইরূপ। আধুনিক সভ্যতার প্রতীক প্রতীচ্য। সেখানে Militant Suffragist নারী কড়ায় গণ্ডায় আপনাদের ন্যায্য অধিকার পুরুষের কাছে বুঝাপড়া করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু তথাপি এখনও তথায় নারীকে weaker অথবা softer sex আখ্যা দেওয়া হয়!

যে ভাবে বর্ত্তমানে নারী প্রায় সকল বিষয়ে পুরুষের সমান অধিকার দাবী করিতেছেন, যে ভাবে তাঁহারা ঘরে বাহিরে সে দাবী নিজের কৃতিত্বে পূর্ণ করিয়া লইতেছেন, তাহাতে এ যুগে তাঁহাকে আর অবলা বা weaker sex বলা চলে না। অধিক কথা কি, যে প্রাচ্যের অধিকাংশ দেশে এ যাবৎ নারী অবরোধে অথবা অন্তঃপুরে অবগুণ্ঠনের অন্তরালে বসবাস করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যেও আশ্চর্য্য জাগরণ হইয়াছে, তাহাতে তাঁহাদিগকে অবলা বা softer sex বলিলে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়। কয়েক দিন পূর্ব্বে লণ্ডনে একটি মহিলা-বৈঠক বসিয়াছিল। বর্ত্তমান মুক্তির আন্দোলনে ভারতনারী কি অংশ গ্রহণ করিয়াছেন, এবং তাহাতে তাঁহাদের সাহস ও সঙ্কল্পের মহিমা কি ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহাই বৈঠকে বর্ণিত হইয়াছিল। মিসেস পেটিক লরেন্স তাঁহাদের কার্য্যকলাপের আলোচনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,—"আধুনিক জগতে এরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপার কেহ প্রত্যক্ষ করে নাই।" সত্যই তাই। আন্দোলনের নেতা মহাত্মা গন্ধীও ভারতীয় নারীর কার্য্যকলাপ দেখিয়া বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় নতশির হইয়াছিলেন। ভারতের এই নারীজাগরণ আশ্চর্য্যের বিষয়ই বটে! অসূর্য্যম্পশ্যরূপা অন্তঃপুরচারিণীরা এ যাবৎ স্বামী, পুত্র, সংসার, পরিজন লইয়াই কর্ত্তব্য পালন করিতেন, উহাই নারী-ধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু বর্ত্তমানে দেশের মুক্তি-সমরে পুরুষের সাহস, ধৈর্য্য ও দেশপ্রেমকে অতিক্রম করিয়া তাঁহারা যে কষ্টবিপদ ও অপমান-লাঞ্ছনা হাসিমুখে বরণ করিয়া লইতে পারেন, তাহা তাঁহারা নিঃসংশয়ে সপ্রমাণ করিয়াছেন। শ্রীমতী সিলভিয়া প্যাঙ্কহার্ষ্ট এই মহিলা-বৈঠকে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, "ভারতের রাজনীতিক, সামাজিক এবং আর্থিক উন্নতিকল্পে ভারতের নারীরা যে অদম্য সাহস, প্রতিভা ও দৃঢ়সঙ্কল্পতার পরিচয় দিয়াছেন, সে জন্য তাঁহারা আমাদের ধন্যবাদের পাত্র।" ইংলণ্ডের সফ্রেজিষ্ট আন্দোলনের প্রাণস্বরূপা মিস প্যাঙ্কহার্ষ্ট এক দিন স্বয়ং একটা মূলনীতির জন্য কি সংগ্রাম করিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় অনেকেরই স্মরণ আছে। তাঁহার মুখে এই প্রশংসা উপেক্ষার বিষয় নহে।

কি সমাজে, কি রাজনীতিক্ষেত্রে,—প্রায় সকল ক্ষেত্রেই নারীজাগরণ সুস্পষ্ট। সমাজে আধুনিক বিবাহের ধারা ও প্রকৃতি মাত্র স্বল্পকাল পূর্ব্বে প্রচলিত বিবাহ-সংস্কার হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। বিবাহের 'বন্ধন' নামটাই এখন অপ্রচলিত হইতেছে। সাহচর্য্য বিবাহ বা সাময়িক বিবাহ কোন কোন 'উন্নত' দেশে কেহ আর এখন বিস্ময়ের দৃষ্টিতে দেখিতেছে না। নারী কি শয্যার বা সংসারের সেবাদাসী? পুরুষ স্বেচ্ছামত সময়ে অসময়ে ক্লাবে, হোটেলে, ঘোড়দৌড় বা খেলার মাঠে, সমুদ্রে, পর্ব্বতে, বরফ-রাজ্যে সুখ-ভ্রমণে, সুনাম ও সুযশ অর্জ্জনে, সভা-সমিতি ও শোভাযাত্রায়, অথবা থিয়েটার সিনেমায় কাল-ক্ষেপ বা অবসর-বিনোদন করিবে, আর গৃহের সেবার ও সংসারধর্ম্মপালনের সমস্ত ভার নারী ঘরের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া অম্লানবদনে বহন করিবেন, ইহা কি ন্যায়-বিচার? তিনি কি গৃহের সেবাকারিণী বেতনভোগিনী নার্শ না মেড? অবিবাহিতা যুবতী কন্যারাও তাহাদের প্রাপ্তবয়স্ক ভ্রাতাদের মত বাহিরে যথেচ্ছা রাত্রিযাপনে আমোদ-প্রমোদ উপভোগ করিয়া মরজিমত মধ্য অথবা শেষ রাত্রিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেই কি মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যায়? এই গণতন্ত্র বা স্বাধীনতা-সাধনার যুগে নারীর এই অধিকারে পিতা, মাতা বা অন্য কোন অভিভাবকই বাধা দিতে পারেন না। পিতা, মাতা বা অন্য অভিভাবকদের স্বেচ্ছা-বিহারে তিনি যখন বাধা দেন না, তখন তাঁহাদের স্বাধীন মতের স্ফুরণে অভিভাবকরাই বা বাধা দিবেন কেন? পিতা-মাতা অথবা ভ্রাতার সাহচর্য্যের অভাবে গৃহসুখে বঞ্চিত কুমারীরা কি ঘরের বেতনভুক চৌকীদার?—এই মনোভাবটি সমাজে স্থায়িত্ব লাভ করিতেছে।

সাহিত্যেও এই চিন্তাধারার প্রভাব পূর্ণরূপে বিদ্যমান।

বর্ত্তমান সাহিত্যে—বিশেষতঃ কথা-সাহিত্যে নারীর স্বাধীন মনোবৃত্তির স্ফুরণ দ্বারা চরিত্র-চিত্র অঙ্কিত হইতেছে। স্বাধীনা নারীর আহার-বিহার, কথাবার্ত্তা, খেলাধূলা, ঘরে বাহিরে কর্ম্মপ্রচেষ্টা এ যুগে এক নব কলেবর ধারণ করিয়াছে, বিদেশের মত এ দেশের সাহিত্যেও ইহার প্রস্ফুট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। প্রতীচ্যে তাঁহাদের আখ্যা Modern girl.

আমাদের দেশীয় ভাষায় প্রতীচ্যের Modern girl কথার ঠিক কোন প্রতিশব্দ নাই। আমরা ইহার তর্জ্জমা করি,—আধুনিক বালিকা। এ কথায় কি বুঝায়? বোধ হয় কিছুই না। মনে হয়, 'স্বাধীনা' অথবা 'প্রগল্‌ভা' কথাটি এই স্থলে প্রযোজ্য। বাঙ্গালা অভিধানে 'প্রগল্‌ভ' শব্দটির এইরূপ ব্যাখ্যা আছে:—"ধৃষ্ট, নির্লজ্জ, বেহায়া, অবিনীত, উদ্ধত, সাহসী, নির্ভীক, প্রতিভান্বিত, প্রত্যুৎপন্নমতি। প্র—গল্‌ভ (ধৃষ্ট)+অন্।" 'প্রগল্‌ভ' কথার আর একটি ব্যাখ্যা আছে,—"গর্ব্ব, অহঙ্কার। প্র—গল্‌ভ +অন ভা।" প্রগল্‌ভা বলিলে ইহারই কোন না কোন গুণ বা দোষবিশিষ্টা নারীকে বুঝায়।

Modern girl বা প্রগল্‌ভা ইহার মধ্যে কোন্ গুণে বা দোষে বিশিষ্টতা অর্জ্জন করিয়াছেন? মনে হয়, সকল মানুষেরই মত তাঁহারা দোষে-গুণে জড়িতা, তাঁহারা দেবীও নহেন, দানবীও নহেন। নারীসুলভ দয়া, কোমলতা, লজ্জাশীলতা, শালীনতাও যেমন তাঁহাদের মধ্যে অল্পবিস্তর বিদ্যমান আছে, তাঁহাদের মধ্যে সাহস, নির্ভীকতা, প্রতিভা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বও যেমন অল্পবিস্তর মাত্রায় দেখা যায়,—তেমনই অল্পবিস্তর মাত্রায় তাঁহাদের মধ্যে দেখা যায় ধৃষ্টতা, নির্লজ্জতা, বেহায়ামি, গর্ব্ব ও অহঙ্কার। এই সমস্ত দোষ ও গুণের সমবায়েই যে Modern girl গঠিত, তাহা আধুনিক কথা-সাহিত্যের চরিত্রচিত্রের মধ্য দিয়া বিশেষরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

প্রতীচ্যের English, Continental এবং American কথা সাহিত্যের নানা Short stories, Romance বা Novelএর নারীচরিত্র এমন ভাবে অঙ্কিত, যাহাতে দেখা যায়, নারী পদে পদে পুরুষের প্রতিযোগিতা করিতেছেন, 'পুরুষোচিত' বলিয়া কোন একটা লাইন-টানা বা মার্কামারা পথ তাঁহারা রাখিতে চাহেন না, পুরুষের সহিত সমানের আসন অধিকার করিয়া সমান ওজনে পুরুষের কথার উত্তর দিতেছেন। এমনও চরিত্রচিত্র আছে, যাহাতে নারীর দুর্জ্জয় গর্ব্ব বা অহঙ্কার, প্রতিভা বা প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পার্শ্বে পুরুষ নায়ক সর্ব্বদাই নতমস্তক ও হীনপ্রভ হইয়া রহিয়াছে,—পুরুষটা নেহাৎ বোকা, নারীই তাহাকে অঙ্গুলী-সঙ্কেতে ঘুরাইতে ফিরাইতেছে। এই ভাবের চরিত্র অঙ্কনের এ দেশেও অনুকরণ হইয়াছে। তেজস্বিনী প্রগল্‌ভা নারী নায়িকা, আর 'মেদা-মারা' বোকা পুরুষের চিত্র এ দেশেও অঙ্কিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

কথা-সাহিত্যে এই নারীচরিত্রের আমদানী কিন্তু অধিক দিনের নহে। প্রাচীন আর্য্য সভ্যতার যুগে ঠিক এই ভাবের না হইলেও কতকাংশে এই চরিত্রের অনুরূপ চরিত্রচিত্র পাওয়া যায়। কয়টি দৃষ্টান্ত দিতেছি। আশ্রমপালিতা কণ্বদুহিতা কোমলকিসলয়সমা শকুন্তলা হস্তিনার রাজসভায় দুষ্মন্ত কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হইবার পর ক্রোধকম্পিত স্ফুরিত অধরে অরুণিত-লোচনে রাজাকে বলিয়াছিলেন, অনার্য্য, তোমার স্বভাবের অনুরূপ বুঝি তুমি সকলকেই দেখ! বনগমনকালে রামচন্দ্র পত্নীকে সহগমনে বাধা প্রদান করিলে আদর্শ সতী সীতা বলিয়াছিলেন,—আমার পিতা যখন আমাকে তোমার হস্তে সম্প্রদান করিয়াছিলেন, তখন জানিতেন না যে, এক কাপুরুষের হস্তে আমায় সমর্পণ করিতেছেন! স্বয়ং সতী পতির নিকটে পিতৃগৃহে যাইবার অনুমতি না পাইয়া তাঁহাকে দশমহাবিদ্যারূপ ধারণ করিয়া বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অন্য আদর্শ সতী সাবিত্রীর পিতা যখন কন্যার মনোনীত বর সত্যবানের স্বল্পায়ুর কথা অবগত হইয়া তাঁহাকে তাঁহার হস্তে সম্প্রদান করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তখন সাবিত্রী নানা শাস্ত্রবচন উদ্ধার করিয়া পিতার সহিত বাদানুবাদ করিয়াছিলেন, পরন্তু যমের হস্ত হইতে মৃত স্বামীকে ফিরাইয়া আনিবার উদ্দেশ্যে যমের সহিত বহুক্ষণ তর্ক-বিতর্ক করিয়াছিলেন। উভয়ভারতী প্রকাশ্যে বুধমণ্ডলীর সভায় জ্ঞানাবতার শঙ্করের সহিত শাস্ত্রবিচার করিয়াছিলেন। ইহা জ্ঞানহীনা, অবলা, ব্রীড়াবনতা, লজ্জাশীলা, কোমলা, অসূর্য্যম্পশ্যরূপা অন্তঃপুরচারিণীর লক্ষণ নহে। ইহাতে নারীর পক্ষে কিরূপ সাহস, নির্ভীকতা, প্রতিভা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও আত্মগরিমার প্রয়োজন, তাহা সহজেই অনুমেয়।

কিন্তু এ সমস্ত স্মরণাতীত যুগের কথা। আধুনিক যুগে প্রতীচ্যের কথা-সাহিত্যেই যে প্রথম প্রগল্‌ভা নারীর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কথা-সাহিত্যে 'ছোট গল্পের' প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন যে ফরাসী জাতি, তাহাতে সন্দেহ নাই। গি দে মোপাসাঁ, ব্যালজ্যাক, ডোডে,—এ সব নাম ছোট গল্প ও উপন্যাস সাহিত্যে অজর, অমর। তাঁহারাই ছোট গল্পের প্রকৃত প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা। তাঁহাদের মধ্যে কে এই 'প্রগল্‌ভা' নারীকে কল্পনালোকের তুলিকায় বাস্তব বস্তু-তান্ত্রিক জগতে আনিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন?

নিঃসন্দেহে বলা যায়, ব্যালজ্যাকই এই জগতের প্রজাপতি। অনোরে ডে ব্যালজ্যাক তাঁহার 'মোদেস্তে মিগনন' (Modeste Mignon) নামক বড় গল্প বা উপন্যাসে সর্ব্বপ্রথমে 'প্রগল্‌ভার' চরিত্র-চিত্রের অবতারণা করেন। ব্যালজ্যাকের সৃষ্টির (গল্প উপন্যাসের) মধ্যে 'মোদেস্তে মিগননের' স্থান অতি উচ্চে।

ব্যালজ্যাক ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার পর তিনি যে সকল গল্প উপন্যাস রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে একমাত্র "লে পেরেণ্টস্ পভ্‌রেস" (Les Parents Pauvres) ভিন্ন অন্য কোনখানিই 'মোদেস্তে মিগননের' মত প্রথম শ্রেণীর পর্য্যায়ে উন্নীত হয় নাই।

গ্রন্থখানি যে রচনার মাধুর্য্য হিসাবে প্রথম শ্রেণীর, এমন কথা বলিতেছি না, ইহার অভিনবত্বই ইহার শ্রেষ্ঠ গৌরব-পদক। ব্যালজ্যাক এই গ্রন্থে গতানুগতিক পন্থা পরিত্যাগ করিয়া ফরাসী উপন্যাস-রাজ্যে নূতন পন্থা দেখাইয়া গিয়াছেন,—Turned the usual scheme of the French novel upside down, to provide a rather timid hero for such a masterful heroine, অর্থাৎ তিনি ফরাসী উপন্যাসের ধারাটাকেই উল্টাপাল্টা করিয়া দিয়া নায়িকাকে জবরদস্ত ও নায়ককে ভয়ভীত করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন।

কেহ কেহ বলেন, ঠিক তাঁহারই সময়ে ইংলণ্ডে সার্লোট ব্রণ্টে এই ধারার Wilful unconventional heroine অথবা স্বেচ্ছাচালিতা প্রচলিত আচার-ব্যবহারের বিরুদ্ধাচারিণী নায়িকা কল্পনা করিতেছিলেন; সুতরাং এ বিষয়ে ব্যালজ্যাককে ঠিক পথিপ্রদর্শক বলা চলে না। কিন্তু ফরাসীর আদর্শ যেরূপ গতানুগতিক প্রথার কঠোর অনুবর্ত্তনসাপেক্ষ ছিল, তাহাতে "মোদেস্তের" চরিত্রাঙ্কনে ব্যালজ্যাক যে অসমসাহসিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

চার্লস মিগননের দুইটি কন্যা। প্রথমটি ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, নাম তাহার বেটিনা ক্যারোলাইন। ছোটটি মেরি মোদেস্তে, সে ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে জন্মিয়াছিল। মিগনন অভিজাতবংশীয়, কিন্তু রাজনীতিক কারণে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং প্রাচ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্য করিয়া ভাগ্যপরিবর্ত্তনের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার পত্নী ও কন্যা দুইটির তত্ত্বাবধানের ভার তাঁহার অনুরক্ত ভক্ত কর্ম্মচারী ডুমে দম্পতির উপর ন্যস্ত করিয়া যান; তদ্ব্যতীত মুসিয়ে ও ম্যাডাম লাটুরনেল তাঁহার পরিবারবর্গের বন্ধুরূপে নিত্য তাঁহাদের তত্ত্ব লইতেন।

দেশত্যাগের পূর্ব্বে তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা বেটিনা ক্যারোলাইন গৃহে কড়াকড়ি সত্ত্বেও একটি যুবকের সহিত গোপনে গৃহত্যাগ করিল। পিতামাতা দুঃখে অপমানে মৃতপ্রায় হইলেন। অনেক অনুসন্ধান হইল। অবশেষে বেটিনার প্রেমের পাত্র নানারূপ জুয়াচুরি করিয়া ধরা পড়িয়া জেলে গেল, বেটিনা ভগ্নহৃদয়ে ভগ্নস্বাস্থ্যে গৃহে ফিরিয়া আসিল। রটান হইল, তাহার স্বাস্থ্যের জন্য তাহাকে প্যারী সহরে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, সে যক্ষ্মারোগী। কিন্তু উপকার না হওয়ায় গৃহেই তাহাকে ফিরাইয়া আনা হইয়াছে।

মাত্র ২২ বৎসর বয়সে বেটিনা সত্যই ইহলোক ত্যাগ করিল। লম্পট, বিশ্বাসঘাতক, মিথ্যাবাদী প্রেমিকের ব্যবহার তাহাকে বালিকা-বয়সেই মৃত্যুপথের যাত্রী করিল। তখন তাহার পিতা বিদেশে। জননী একেই স্বামীর ভাগ্যবিপর্য্যয়ে হৃদয়ে দারুণ আঘাত পাইয়াছিলেন, তাহার উপর এই অপমান, কলঙ্ক ও শোকে তিনি শয্যাগ্রহণ করিলেন। সেই শয্যা হইতে তাঁহাকে আর পূর্ব্বস্বাস্থ্য লইয়া উঠিতে হয় নাই; পরন্তু তাঁহাকে দুইটি চক্ষুরত্ন হইতে বঞ্চিত হইতে হইল, তিনি অন্ধ হইলেন।

এই স্থান হইতেই প্রকৃতপক্ষে উপন্যাসের আরম্ভ। বেটিনাকে যখন তাহার ভণ্ড প্রেমিক কুলের বাহির করিয়া লইয়া যায়, তখন ব্যালজ্যাক বলিলেন,—

"The father of a family who has two

daughters ought no more to admit a young man to his house without knowing him than he should allow books or newspapers to lie about without having read them. The innocence of a girl is like milk which is turned by a thunder-clap, by an evil smell, by a hot day, or even by a breath"

নারীর সম্পর্কে যদি ইহাই ব্যালজ্যাকের অভিমত হয়, তাহা হইলে বলা যায়, ফরাসী গৃহস্থকে তিনি এমন ভাবে গৃহস্থালী পরিচালনা করিতে বলেন, যাহাতে তিনি অচেনা অজানা যুবককে অনূঢ়া যুবতী কন্যার সহিত যথেচ্ছা মিলামিশা করিতে না দেন এবং স্ত্রীকন্যার হস্তে কোন রচনা স্বয়ং পাঠ না করিয়া পড়িতে দেন। যে ফরাসী জাতির সামাজিক রীতিনীতি সম্বন্ধে এ দেশের অনেকের ধারণা ভাল নহে, সেই ফরাসী গৃহস্থের গৃহে এই শাসনের কড়াকড়ির চিত্র নিশ্চিতই সেই ধারণার পরিবর্ত্তন করিয়া দিবে।

বেটিনার শোচনীয় মৃত্যুর পর হইতে মোদেস্তের উপর কড়া নজর রাখা হইতে লাগিল। পিতা গৃহে নাই, মাতা অন্ধ, কাযেই ডুমে সেই ভার গ্রহণ করিল। সে ও তাহার পত্নী প্রভুকন্যাকে সন্তানের ন্যায় ভালবাসিত, কেন না, তাহারা নিঃসন্তান ছিল। কিন্তু তাহা হইলেও ডুমে পরিবার কি প্রভুর অনুপস্থিতিতে তাঁহার পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্যপালনে বিরত থাকিতে পারে? তাই ডুমে স্ত্রীকে গোপনে মোদেস্তের উপর নজর রাখিতে বলিল,—

'If ever any man, of whatever age or rank, speaks to her, if he looks at her, casts sheep's eyes at her, he is a dead man. If you do not wish to see me cut my throat, fill my place unfailingly when I am in town.' ফলে দাঁড়াইল, "Modeste was never alone for a moment."

কিন্তু এত কড়াকড়ি সত্ত্বেও প্রকৃতি তাহার কার্য্য করিয়া গেল, তরুণ হৃদয়ের প্রেমের বুভুক্ষা বেড়া দিয়া কেহ বাধিয়া রাখিতে পারিল না। মোদেস্তে অত্যধিক নাটক-নভেলের ভক্ত ছিল, সে অবসর পাইলেই নভেল ও পদ্যগ্রন্থ পাঠ করিত। সে ইহাতে এত অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল যে, অনেক সময়ে সে সেক্সপিয়ারের বা মলিয়ারের নায়িকা বলিয়া নিজেকে মনে করিত, তাহাদের সুখে দুঃখে হাসিত কাঁদিত, সহানুভূতি বা সমবেদনা অনুভব করিত। বাইরণ তাহার উপাস্য দেবতা ছিল। ফরাসী কবি কেনালিস তাহার মন মুগ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার কবিতা তাহার মনে বাইরণের কবিতার মত মাদকতা আনিয়া দিত। তাঁহার প্রকাশকরাও তাঁহাকে বাইরণের মত চিত্রিত করিয়া পথে ঘাটে পুস্তকের দোকানে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য রাখিয়া দিত। তাহাতেও এই ভাবপ্রবণা তরুণীর চিত্ত তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। শেষে এমন অবস্থা হইল যে, কোন এক পরিচিতা নারীকে অর্থলোভে বশীভূত করিয়া তাহার মারফতে কবির সহিত পত্র-বিনিময়ের বন্দোবস্ত হইল। কবির এক তরুণ বন্ধু সেই পত্রের সাহায্যে এই অনূঢ়া যুবতীর সহিত পত্র-সাহায্যে প্রেমের খেলা খেলিতে লাগিলেন। সরল বিশ্বাসী মোদেস্তে তাঁহাকেই কবি কেনালিস মনে করিয়া তাঁহাকে সমস্ত মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া বসিল। তাহার পর যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার সহিত আমাদের এই প্রবন্ধের সম্বন্ধ নাই। আমরা কেবল দেখাইব যে, এই অদ্ভুত অভিনব ধরণের গুপ্তপ্রেম ব্যক্ত হইবার পর মোদেস্তে কি ভাবে তাহার অভিভাবকগণের —বিশেষতঃ বিদেশ হইতে তাহার পিতা ধনকুবেররূপে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর, তাহার পিতার সহিত কথোপকথন করিয়াছিল। তাহা হইলেই ব্যালজ্যাকের অভিনব নারীচরিত্র সৃষ্টির সুযোগ গ্রহণ করিয়া আমরা প্রতীচ্য নারীর প্রথম বিদ্রোহের পরিচয় পাইবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করিব।

জ্যেষ্ঠা ভগিনী বেটিনা ভণ্ড প্রেমিক কর্ত্তৃক প্রতারিতা হইয়া মৃত্যুর অব্যবহিতপূর্ব্বে কনিষ্ঠা সহোদরা মোদেস্তেকে চুপি চুপি বলিয়া গিয়াছিল, "তোমার প্রেমিক তোমার পাণিগ্রহণ করিলে সঙ্গে সঙ্গে তোমার হৃদয় তাহাকে দিও, অন্যথা নহে। আর বাপ-মার অনুমতি না পাইয়া কখনও কোন পুরুষের প্রেমের কথায় কর্ণপাত করিও না।"

মৃত্যুশয্যায় শায়িতা পরমাত্মীয়ার এই উপদেশও প্রেমপিপাসু তরুণীর হৃদয়ের প্রবৃত্তিকে জয় করিতে পারে নাই। কেবল সহোদরা নহে, তাহার পরমপ্রিয়া জননীও তাহার হৃদয়ের প্রবৃত্তিকে সংযত করিতে পারেন নাই। তিনি এক দিন শঙ্কিত হইয়া কন্যার হস্ত ধারণ করিয়া বলিয়াছিলেন,

—"মোদেস্তে! আমার কাছে আবার শপথ কর, তোমার পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে না?" জননীর সেই মর্ম্মভেদী আবেদনের মর্ম্ম সে বুঝিয়াছিল; জননী যে তাঁহার পরলোকগতা জ্যেষ্ঠা কন্যার শোচনীয় পরিণাম স্মরণ করিয়া এই কথা বলিতেছেন, তাহা সে বুঝিয়াছিল। অমনই তাহার কোমল ভাবপ্রবণ হৃদয় বেদনায় ভরিয়া উঠিয়াছিল,—সে তখনই বলিয়াছিল, "আমি বাবার অনুমতি ব্যতীত কখনও বিবাহ করিব না।" কিন্তু সংকল্প কতকাল স্থায়ী হইয়াছিল? প্রভুভক্ত রক্ষক ডুমেকে সে এক দিন বলিয়াছিল,—"আমি আমার দিদি ও মাকে কথা দিয়াছি, আমি বাবাকে কথা দিয়াছি, শপথ করিয়াছি যে, আমি আমার বাবার আনন্দ, সান্ত্বনা ও গর্ব্বের কারণ হইব!—ইহা আমি হইবই, ইহা আমার প্রতিজ্ঞা।" তাহার পর তাহার জননী যখন কম্পিত শঙ্কিত হৃদয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শপথ কর, বল, কোন যুবকের সহিত কথা কহ নাই, দৃষ্টি-বিনিময় কর নাই," তখন সে অম্লানবদনে বলিল, "শপথ করিতেছি।" ইহা নিশ্চিত যে, তখনও তাহার প্রেমিকের সহিত তাহার সাক্ষাৎ বা দৃষ্টি-বিনিময় হয় নাই, তখন কেবল পত্র-বিনিময় চলিতেছে। কিন্তু তখনই ত সে তাহাকে হৃদয় দিয়া ফেলিয়াছে! তবে কি সে এই প্রতিশ্রুতি দিয়া জননীকে প্রতারিত করিল না?

মোদেস্তের পিতার স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন এবং সমস্ত অবস্থা জ্ঞাত হইবার পর তাঁহার হৃদয়ের আলোড়ন এবং কন্যার সহিত বুঝাপড়ার দৃশ্য আমাদিগকে প্রগল্‌ভার সান্নিধ্যে পৌঁছাইয়া দেয়। যখন চার্লস ম্যাগনন হৃদয়ে দারুণ শেলাঘাত পাইয়া আপন মনে গুঞ্জরিয়া উঠিতেছেন, "কন্যার বাপ হওয়া কি দুর্ভাগ্য! যেন হাত-পা বাঁধিয়া আপনাকে দুর্ভাগ্যের কবলে ফেলিয়া দেওয়া হয়। আমি যদি এই দেস্তোর্ণের (মোদেস্তের ভালবাসার পাত্র) দেখা পাই, তাহা হইলে স্বহস্তে উহাকে হত্যা করি। কন্যা! কে কন্যা চাহে? এক কন্যা একটা শয়তানের কবলে পড়িল। অপর কন্যা মোদেস্তে কাহার কবলে পড়িয়াছে? একটা কাপুরুষ, যে কবি কেনালিসের নামের মুখোস পরিয়া তাহাকে প্রতারণা করিতেছে। উঃ, যদি দেখা পাই, আমি তাহার গলা টিপিয়া মারি,"—তখন পিতার দলিত মথিত অপমানিত হৃদয়ের অন্তস্তলে প্রবেশ করিতে পারি।

তাহার পর পিতা ও কন্যার কথোপকথন।

মিগনন।—তোমার মা তোমায় এত ভালবাসেন, অথচ তুমি সেই মায়ের পরামর্শ না নিয়ে কেমন ক'রে এক অজানা অপরিচিত পুরুষকে পত্র লিখলে?

মোদেস্তে।—কারণ, তা না ক'রে যদি মাকে জিজ্ঞাসা করতে যেতুম, তা হ'লে তিনি অনুমতি দিতেন না।

মিগনন।—তুমি কি ব'লে যেচে চিঠি লিখে এক অজানা পুরুষকে আপনাকে বিলিয়ে দিলে? তোমার কি বিন্দুমাত্র আত্মসম্মানজ্ঞান নেই, বংশের অভিমান নেই? আমার কন্যা—তোমার এই প্রবৃত্তি? বেটিনা থেকে তোমার ব্যবহারের ত কোন প্রভেদই দেখতে পাচ্ছি না। প্রভেদ মাত্র এইটুকু যে, তাকে অপরে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, তুমি কুহকিনী মায়াবিনীর মত পুরুষকে ভুলিয়েছ।

মোদেস্তে।—আমার আত্মসম্মানজ্ঞান নেই?

মিগনন।—হাঁ, তুমি মা সত্যই ভুল করেছ। এই ভুলের ফলে তোমার মনের সুখশান্তি নষ্ট হবে—সংসারের সুখ-শান্তি ধ্বংস হবে, তা ত তুমি বোঝ নি। এ তোমার দুর্দ্দান্ত সাহস, ঘোর পাগলামি।

অন্যত্র অন্য এক চরিত্রের মুখ দিয়া গ্রন্থকার বলাইয়াছেন, —"ক্লারিমা হার্লো উৎসন্নের পথে গিয়াছিল, কেন না, সে তাহার পরিবারের মতের বিরুদ্ধে গিয়াছিল। তাহার পরিবারের অধিকার মানিতে চাহে নাই, ইহাই তাহার সর্ব্বনাশের কারণ। পরিবারই সমাজ।" সমাজের স্থিতির জন্য সংযম চাই, "অনূঢ়া অথবা বিবাহিতা যুবতীর গৌরব কি? তাহার দুর্দ্দান্ত বাসনা ও খেয়ালকে সংযত রাখা (restraining her ardent whims within the strictest limits of propriety."

কিন্তু পরিবারের সুখশান্তি, দুর্দ্দান্ত বাসনা ও সংযমের কথা উঠিবামাত্র মোদেস্তে আর সে মোদেস্তে রহিল না, পিতার মুখের উপরেই আপনার আত্মতৃপ্তির কথা বলিল,—"যদিই ইহা আমার দুর্দ্দান্ত সাহস হয়, তাহা হইলে উহার কৈফিয়তে বলিতে পারি যে, ইহা আমার আত্মসুখ আত্ম-তৃপ্তি আনিয়া দিয়াছে। এক দিন আমার মাও এই সাহস দেখাইয়াছিলেন।"

জগদ্বিখ্যাত ঔপন্যাসিক সার ওয়ালটার স্কট তাঁহার "ব্রাইড অফ ল্যামারমুরে" নায়িকা অ্যালিস ব্রিজনর্থের

চরিত্র-চিত্র কি ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন? নায়ক তরুণ র্যাভেনস্উডের সহিত অ্যালিসের পিতার রাজনৈতিক কারণে মতবিরোধ ছিল। অ্যালিস র্যাভেনস্উডকে প্রাণমন অর্পণ করিয়াও যখন এ কথা শুনিল, তখন আর নায়ককে প্রতিশ্রুতিমত প্রেমের প্রতিদান দিতে তাহার সাহসে কুলাইল না। সে অন্তরে গুমরিয়া মরিল, কিন্তু তথাপি পিতার মতের বিরুদ্ধে একটি কথা বলিতে তাহার সাহসে কুলাইল না। মোদেস্তের সহিত অন্য নায়িকার প্রভেদ এইখানে। এইখানেই নারী নীরবে সহ্য করে না, তাহার ব্যক্তিগত অধিকারের কথা মুক্তকণ্ঠে যথাতথা ব্যক্ত করে, আপনার নারীত্বের দাবী, আত্মসম্মানের দাবী করিতে কখনও বিস্মৃত হয় না।

পিতা কন্যাকে বলিলেন, "তোমার জননী এই সাহস দেখাইয়াছেন? তিনি ত তোমার মত অজানা অপরিচিত পুরুষকে পিতা-মাতার অগোচরে গোপনে আত্মসমর্পণ করেন নাই। তিনি আমার সহিত আলাপের পরেই তাঁহার পিতাকে মনের কথা বলিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ চাহিয়াছিলেন। বাপের অনুমতি লইয়া ভালবাসায় আর এক অপরিচিত পুরুষকে প্রেমপত্র প্রেরণ করা একই কথা?"

কন্যা বলিল, "অজানা পুরুষ? সে কি বাবা, তিনি যে আমার কল্পনার দেবতা, আমার জন্মভূমির শ্রেষ্ঠ কবি—সেই কবির আত্মা যেমন সুন্দর, তেমনই তিনি দেহেও যে দেখিতে সুন্দর, তাহা ত আমি কল্পনায় স্থির বুঝিয়াছিলাম।"

পিতা।—মা, তুমি বিবাহের সঙ্গে কবিতার কথা জড়াইয়া স্বপ্ন দেখিতেছ। কিন্তু যদি সকল যুগে কন্যাদিগকে পরিবারের পবিত্র ক্রোড়ে আশ্রয় দিয়া রক্ষা করা হইয়া থাকে, যদি ভগবান্ এবং সামাজিক আইন-কানুন তাহাদিগকে পিতা-মাতার অনুমতিরূপ শাসনাধীনে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, তবে তাহাতে বুঝিতে হইবে যে, কবিতার কল্পনা-রাজ্যের সর্ব্বনাশ হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই এই সকল ব্যবস্থা হইয়াছে। কবিতা জীবনের একটি অঙ্গ হইতে পারে; কিন্তু সবটা নহে।

কন্যা।—বাবা, জগতের ঘটনাবলীর দরবারে এ কথার এখনও মীমাংসা হয় নাই। কারণ, পরিবারের কর্তৃত্ব ও আমাদের হৃদয়ের বাসনার মধ্যে এখনও ঘোর যুদ্ধ চলিতেছে।

পিতা।—যে কন্যা এই কর্তৃত্বে বাধা দিয়া সুখ-শান্তির আশা করে, তাহার সর্ব্বনাশ হয়! এ ব্যাপারে পরিবারের অভিভাবকরাই সর্ব্বেসর্ব্বা।

কন্যা।—আচ্ছা, মানিয়া লইলাম, আমি কেতাদোরস্ত কায করি নাই, অন্যায় করিয়াছি। সাধারণের দৃষ্টিতে ইহা অন্যায় হইতে পারে, কিন্তু কাব্যের ও কারু-শিল্পের দিক হইতে নহে। দেখুন, আমাদের মত যুবতীদের দুইটি পথ আছে। আমরা কোন তরুণকে দেখাইতে পারি যে, আমরা তাহাকে ভালবাসি, আবার আমরা সোজাসুজি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি। এই শেষ পথই কি মহৎ ও প্রশস্ত নহে? কিন্তু আমাদের মত ফরাসী বালিকাদিগকে আমাদের পরিবারের অভিভাবকরা ব্যবসায়ীর মত ৩ মাসের সময় দিয়া বিলাইয়া দিয়া থাকেন (অর্থাৎ বলেন, ৩ মাস বাদে অমুকের সহিত তোমার বিবাহ দিব); হয় ত কোন কোন ক্ষেত্রে ইহার অপেক্ষা আরও অল্পসময় দেওয়া হয়। কিন্তু ইংলণ্ডে, সুইজারল্যাণ্ডে, জার্ম্মাণীতে কি হয়?

পিতা।—মা, ফরাসীরা সহজবুদ্ধি, ন্যায় ও যুক্তিতর্কের উপর নির্ভর করে বলিয়াই তাহাদের অন্যান্য জাতির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ হয়। তোমরা বালিকা, তোমরা এই বয়সে জগতের কি জান, ভবিষ্যতের সম্বন্ধে তোমাদের কি ন্যায়-বিচারের ক্ষমতা আছে? তোমাদের অতীতের বিচারের কি ক্ষমতা আছে? (আমরা) বাপ-মারা তোমাদের জীবনের সব কথা জানেন, অতীতের অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন, এই হেতু তোমাদের হৃদয়ের সুখ-শান্তিবিধানের ভার তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন, এই জীবনের দুঃখ-বিপদের আবর্ত্ত হইতে বাঁচাইয়া তোমাদিগকে নিরাপদে তটে পৌঁছাইয়া দিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। দোষ কাহার, আমাদের না তোমাদের? সন্তানগণকে লোহার যোয়ালের ভারে অবসন্ন করা কি উচিত? তাহাদের অনুক্ষণ মঙ্গল চিন্তা করার জন্য কি আমরা দণ্ডিত হইব?

কন্যা।—যে কন্যার হৃদয় মুগ্ধ করিয়াছে, সে কি তাহার মনোমত পতি নির্ব্বাচন করিয়া লইবার অধিকার পাইবে না?

এই কথাবার্ত্তা আরও দীর্ঘায়তন করা আমার উদ্দেশ্য নহে। ইহা হইতে আধুনিক পাঠকের সম্মুখে আমি এমন একটি চিত্র ধরিয়াছি, যাহা হইতে তাঁহারা বুঝিবেন, কিরূপে শনৈঃ শনৈঃ সাহিত্যে এই ভাবপরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে ও হইতেছে। প্রতীচ্যের আধুনিক কথা-সাহিত্যে এই নূতন ভাবের ধারা ক্রমশঃ দৃঢ়স্থান লাভ করিতেছে। প্রগল্‌ভার চরিত্রচিত্রে আধুনিক ইংরাজী, কন্টিনেণ্টাল ও মার্কিণ কথা-সাহিত্য ভরিয়া গিয়াছে। সামান্য দুই একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। ইংরাজ লেখিকা ভিক্টোরিয়া ক্রশের 'চেটাইওয়ালা' অথবা মার্কিণ লেখক রবার্ট ডবলিউ চেম্বার্সে'র 'কমন ল' এই শ্রেণীর উপন্যাস। এমন অসংখ্য উপন্যাস রচিত হইয়াছে। এই শ্রেণীর উপন্যাসে ও ছোট গল্পে প্রগল্‌ভা নারীর চরিত্র-চিত্র মোহময় তুলিকায় অঙ্কিত হইতেছে।

ইহা ভাল কি মন্দ, তাহার বিচারের স্থল ইহা নহে। এই সকল চরিত্র-চিত্র উপন্যাসকারের কল্পনা-রাজ্যেই অঙ্কিত হইয়া থাকিবে, কি সমাজে তাহার প্রভাব অনুভূত হইবে, তাহা সময়ই বলিয়া দিবে। তবে বর্ত্তমান নারী-জাগরণ অথবা নারী-প্রগতি যে ইহারই ফল, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। বিলাতে সফ্রেজিষ্ট আন্দোলনেই কি ইহার চরম পরিণতি হইয়াছে? এ দেশের নারীর পিকেটিং অথবা প্রভাত ফেরীতেই কি ইহার প্রথম বিকাশ হইতেছে? এ সব সমস্যার উত্তর কাল-সাপেক্ষ। প্রগল্‌ভা সাহিত্যে স্থান করিয়া লইয়াছেন, এখন সমাজে তাঁহার স্থান কিরূপ হইবে, তাহা ভাবিবার বিষয়।

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।

অহং ব্রহ্মাস্মি

আমি অনন্ত শক্তির আধার আমাতে পূর্ণ জ্ঞান,
আমাতে স্বাস্থ্য আমাতে শান্তি পূর্ণ বিরাজমান।
আমাতেই আছে অসীম বিত্ত বুদ্ধি ও বিজ্ঞান
আমিই ব্রহ্ম আমিই ব্রহ্ম আমিই ব্রহ্ম সমান॥

কেন আমি তবে ভাবিতেছি মনে দীন আমি হতজ্ঞান,
মিথ্যার ফেরে পড়িয়া রয়েছি ভুলেছি আত্মধ্যান।
আমিই সত্য আমিই ধন্য আমিই পূর্ণকাম,
আমিই ব্রহ্ম আমিই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম আমারই নাম॥
দেহের ভিতর হৃদয়-গুহায় উজল প্রকাশমান,
অন্তরে লভি সগুণ-ব্রহ্মে হও সবে আগুয়ান।
শাস্ত্র বলিছে আমরা শুনি না তাই সহি অপমান,
আমিই ব্রহ্ম আমিই ব্রহ্ম আমিই ব্রহ্মসমান॥
ব্রহ্মে অভাব কেবা শুনিয়াছে আমি ভাবি আমি দীন
বিফল চিন্তা ছেড়েও ছাড়ে না বুদ্ধিবৃত্তি ক্ষীণ।
আমাতে ব্রহ্ম পূর্ণ প্রকাশ কে বলে আমরা দীন—
শিক্ষার দোষে আমরা এখন ব্রহ্মশক্তিহীন॥
এ ঘোর মোহেরে দূর কর তবে জগতে পাইবে স্থান,
সত্যের শিখা জ্বালো অন্তরে নাশ তম-অজ্ঞান।
ভাব অহরহ আমিই ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান,
আমার সমান কেহ নাই আর বিশ্ব আমার স্থান॥

দম্ভের লেশ এ সাধনে নাই নাই, মদ অভিমান,
আছে নির্ভীক আত্মার মহা শকতির অভিযান।
দেবতা কখনো অধীন থাকে না এ নহে বিধি-বিধান,
সকলই ব্রহ্ম, তুমিও ব্রহ্ম আমিও ব্রহ্মসমান॥
তোমার ভিতরে দেবতার বাস জাগাও তাঁহারে ধীর,
তবেই বুঝিব মুক্ত হইতে করিয়াছ মন স্থির।
দেববল লয়ে যে দিন জাগিবে সে দিন হইবে বীর,
সে দিন তোমার দুঃখ ঘুচিবে উঠিবে উচ্চে শির॥
অনাত্মমোহে আমরা মত্ত বিরূপ দেবতা ম্লান,
আসে না শক্তি নাহিক ভক্তি ভ'রে গেছে অজ্ঞান।
আমরাই পারি পশুতে পারে না ধরিতে ব্রহ্মধ্যান,
আমিই ব্রহ্ম আমিই ব্রহ্ম আমিই ব্রহ্মসমান॥
দেবতার দানে বঞ্চিত হয়ে নিরাশে ভোরো না প্রাণ,
বরাভয় লয়ে দাঁড়ায়ে আছেন জাগ্রত ভগবান্!
তাঁহারে স্মরিয়া গাও উল্লাসে শক্তির নবগান—
আমিই ব্রহ্ম আমিই ব্রহ্ম আমিই ব্রহ্মসমান॥

শ্রীতারাভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সুবর্ণ-গর্দ্দভ

তার বাপ-মা তার নাম রেখেছিলেন মহেশ। কিন্তু আমরা যারা তার সঙ্গে স্কুলে এক ক্লাসে পড়তাম, তারা নামের উচ্চারণটা একটু বদ্‌লে দিয়েছিলাম। আমাদের কাছে সে নাম পেয়েছিল মহিষ। তার উপাধি ছিল পালিত। মহিষ পালিত আমাদের মধ্যে মাঝে মাঝে পালিত মহিষ নামেও বিঘোষিত হতো। তার এই নাম-পরিবর্ত্তনের একটু বিশেষ কারণ ছিল। মহেশের চেহারাটা ছিল ভীষণ কালো আর বিপুল মোটা; সে এমন অদ্ভুত রকমের কালো ছিল যে, তার চোখের সাদা অংশটা পর্য্যন্ত কালচে লাল রঙের ছিল এবং তাতে তার চোখের সাদা অংশও চোখের মণির সঙ্গে মিশে একেবারে একাকার হয়ে গিয়েছিল, দূর থেকে বুঝতে পারা যেত না যে, সে কোন্ দিকে তাকিয়ে আছে। তার দাঁতগুলিও নিরন্তর পাণ-চিবানোর জন্য পাণের ছোপ লেগে লেগে লালের থেকে কালোর দিকেই বেশি ঝুঁকেছিল, এবং তার পুরু পুরু ঠোঁট দুখানিও পাণের রক্তরাগে রঞ্জিত হয়ে আগুনধরা টিকের মত দেখাত। তার চেহারাতে কোথাও একটু সাদা রঙের লেশমাত্র দেখতে পাওয়া যেত না। এর উপর সে আবার একটা কালো রঙের কোট বারো মাস গায়ে দিত, আর শীতকালে ঐ কালো কোটের উপর একটা খয়েরী রঙের র‍্যাপার জড়াত। তাই তাকে হঠাৎ দেখলে জমাট অন্ধকারের একটি প্রকাণ্ড পিণ্ড ব'লে ভ্রম হতো। মোটের উপর তার আপাদমস্তক ছিল একরঙা এবং তার মেজাজটা ছিল একরোখা আর একগুঁয়ে—যাকে বলে বদমেজাজী আর বদরাগী। এই সব গুণ মিলে মহিষের সঙ্গে তার সাদৃশ্যের সম্ভাবনা আমাদের মনে জাগিয়ে তুলেছিল, এবং একবার এক জন যেই ঐ সাদৃশ্য-সম্ভাবনা-টাকে প্রকাশ্যে প্রচার ক'রে দিলে, অমনি সেই সাদৃশ্যটাকে মেনে নিতে কারও একটুও বিলম্ব বা দ্বিধা বোধ হ'লো না।

আমরা তাকে মহিষ ব'লে ডাকতে শুরু করলে প্রথম প্রথম সে খুব চটতো, মাষ্টারদের কাছে নালিশ করতো, আমাদের মারবে ব'লে শাসাতো, গালাগালি-মন্দ ত করতোই। তার ক্রুদ্ধ রূপ দেখবার কৌতুকের আনন্দে আমরা তার গালাগালি বা আস্ফালন কখনও গ্রাহ্যের আমলেই আনিনি, আর মাষ্টারদের কাছে নালিশ করাতেও তাঁরা কোন দিন আমাদের কিছুই বলেন নি, কেবল মহেশকে সান্ত্বনা দিয়ে বিদায় ক'রে দিতেন যে, তাঁরা আমাদের ধম্‌কে বারণ ক'রে দেবেন। মাষ্টারেরা আমাদের কোনও দিন কিছুই বলেন নি ব'লে আমাদের সাহস ক্রমশঃ বেড়ে চলেছিল। এক দিন মহেশ আমাদের সাদর-সম্ভাষণ শুনে সন্তুষ্ট হওয়ার বদলে অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে একেবারে হেড মাষ্টারের কাছে গিয়ে নালিশ করলে। হেড মাষ্টার তার নালিশ শুনে হেসে বল্‌লেন—'দেখো বাপু মহেশ, তোমাকে দেখলেই আমাদেরই ঐ রকম কিছু বল্‌বার ইচ্ছা প্রবল ও দুর্দ্দম হয়ে ওঠে, তা ওরা ত সব ছেলেমানুষ, ওদের আর কি বল্‌ব বলো।' সেই দিন থেকে আর কোনও দিন মহেশ কোন মাষ্টারের কাছে নালিশ কর্‌তে যায় নি, এবং আমাদেরও আর গালাগালি-মন্দ করে নি; কিন্তু সে অনুদ্গত আগ্নেয় গিরির মত অন্তরে অন্তরে জ্ব'লে জ্ব'লে উঠত, সেটা আমরা বেশ বুঝতে পারতাম—তার কালো পোড়া মুখখানা কৃষ্ণতর হয়ে উঠতে দেখে।

এর পর এক দিন আমাদের পণ্ডিতমশায় মহেশের সঙ্গে মহিষ ছাড়া আর একটি পশুর সাদৃশ্য অকস্মাৎ আবিষ্কার ক'রে ফেল্‌লেন। মহেশের লেখাপড়ার বুদ্ধিটা ছিল আকার-সদৃশ। পণ্ডিতমশায় সংস্কৃত শব্দরূপের পড়া জিজ্ঞাসা করছিলেন। তিনি মহেশকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"বাবা মহেশ, বলো ত লতা শব্দের ষষ্ঠীর একবচনে কি হবে ?" মহেশ অমনি তৎক্ষণাৎ চট ক'রে ব'লে ফেল্‌লে—"লতাস্য।" মহেশের বলবার সঙ্গে সঙ্গেই পণ্ডিতমশায়ও মুখ ভেংচে ব'লে উঠলেন—"তুমি একটি গাধাস্য।" আমরা সকলে হো হো ক'রে হেসে উঠলাম। আমি দমফাটা হাসির মধ্যে থেকে অনেক কষ্টে ছেঁকে কথা বাহির ক'রে পণ্ডিত মশায়কে বল্‌লাম—'পণ্ডিতমশায়, গাধা শব্দ ত পুংলিঙ্গ। তা হ'লে ত গোপা কিংবা বলদা শব্দের মত রূপ হবে।" পণ্ডিতমশায় মুচকি হেসে বল্‌লেন—"তাই ত হবে।" আবার ক্লাস শুদ্ধ ছেলে হেসে উঠল—আরও দু'দুটো জানোয়ারের সঙ্গে মহেশের সাদৃশ্য অকস্মাৎ ও অতর্কিতে

আবিষ্কৃত হয়ে উঠল দেখে। আমি পণ্ডিতমশায়কে বল্‌লাম, "গাধা শব্দে যদি গোপা আর বলদা শব্দের তুল্য রূপ হয়, তা হলে ত ষষ্ঠীর একবচনে গাধাস্য হবে না; গোপা আর বলদা শব্দের ষষ্ঠীর একবচনে ত হয় গোপঃ আর বলদঃ, তেমনি গাধা শব্দের ষষ্ঠীর একবচনের রূপ হবে গাধঃ।" পণ্ডিতমশায় আমার বুদ্ধিচাতুর্য্য দেখে খুশী হয়ে হাসতে হাসতে বল্‌লেন—"গাধাস্য ত গাধা শব্দের ষষ্ঠীর একবচনে রূপ নয়, ওটা একটা সমাসবদ্ধ পদ,—গাধঃ আস্যং মুখম্ ইব আস্যং যস্য সঃ গাধাস্য, অর্থাৎ গাধার তুল্য মুখখানি যার, সে গাধাস্য।" পণ্ডিতমশায়ের এই কথা শোন্‌বামাত্র ক্লাসে যে উচ্চ হাস্যরোল উত্থিত হলো, তাতে হেড মাষ্টার শুদ্ধ দৌড়ে দেখতে এলেন ব্যাপার কি।

মহেশ পণ্ডিতমশায়ের উপর ভয়ানক চ'টে গেল। পণ্ডিতমশায়ের উপর তার আগে থেকেই বিশেষ রাগ ছিল, তার কারণ ছিল, পণ্ডিতমশায়ের বালবিধবা মেয়ে খেঁদীর প্রতি তার অনুরাগ, এবং পণ্ডিতমশায়ের বাড়ীশুদ্ধ লোকের তার প্রতি বিষম বিরাগ ও বিরুদ্ধতা। এর ইতিহাসের কিঞ্চিৎ আভাস আমাদের জানা ছিল, তাই আমরা পণ্ডিত মশায় কর্তৃক মহেশের লাঞ্ছনায় বিশেষ কৌতুক অনুভব করেছিলাম। পণ্ডিতমশায়ের মেয়ে খেঁদী আমাদের চেয়ে ত বয়সে বড় ছিলই, এমন কি, আমাদের ক্লাসের পাণ্ডা আর সর্দ্দার পড়ো মহেশের চেয়েও বছর কয়েক বড়ই ছিল। মহেশ তখন যদিও স্কুলের ক্লাস টেনে পড়ত, তথাপি তার প্রণয়লালসা বেশ টন্‌টনেই ছিল এবং রমণী সম্বন্ধে তার পৌরুষ বেশ প্রবলই ছিল। এক দিন সে স্কুলে আসবার সময় কেমন ক'রে খেঁদীকে দেখে ফেলেছিল, আর অমনি সে মজেছিল। তার চক্ষুরাগ অনুরাগে পরিণত হতে খুব বেশী বিলম্ব হয়নি। সে সেই দিন থেকে রোজই স্কুলে আসা-যাওয়ার পথে খেঁদীকে একটিবার দেখতে পাওয়ার লোভে পণ্ডিতমশায়ের বাসার ধারে ঘুরঘুর করতে আরম্ভ করে। তার উপদ্রবে উত্যক্ত হয়ে খেঁদীই তার বাড়ীতে ব'লে দেওয়ার জন্যেই হোক অথবা খেঁদীদের ঝি নিজে থেকেই মহেশের মুগ্ধ নায়কত্ব দেখে বিরক্ত হয়েই হোক, এক দিন মহেশকে পরম সাদর সম্ভাষণ করেছিল—"আরে মলো মুখপোড়া বাঁদর ছোঁড়া, ঘুরঘুর করবার আর জায়গা পাও না? যমের বাড়ীর দরজা কি বন্ধ হয়ে গেছে? দাঁড়া'ত মুখপোড়া, তোর কালা মুখখানাকে পুড়িয়ে আরও কালো ক'রে দি! ঝেঁটিয়ে তোর ছোকৃছোকানি ঝেড়ে দেবো না?" তার পর মহেশ সেই পথ একেবারে ছেড়ে না দিলেও খুব ভয়ে ভয়ে সন্তর্পণে সেই পথ দিয়ে যাতায়াত করত।

যে দিন আমাদের ক্লাসে মহেশকে পণ্ডিতমশায় গাধাস্য ব'লে সম্ভাষণ করলেন, সেই দিনই তার পরের ঘণ্টায় হেড মাষ্টার আমাদের সেক্সপিয়ারের 'মিডসামার নাইটস্ ড্রিম' নাটকের কাহিনীটি পড়ালেন। এই গল্পের মধ্যে নিক বটমের গাধার মুখোস পরার বিবরণ যখন পড়া চল্‌ছিল, তখন আমাদের হাস্য সংবরণ ক'রে রাখা নিতান্তই দুঃসাধ্য হয়ে উঠল। আমরা এক এক জন মহেশের দিকে চেয়ে দেখি আর হাসির ধমকে আমাদের সকলের নাড়ী ছিঁড়ে যাবার উপক্রম হয়। হেড মাষ্টার সামনে থাকায় আমরা হাসি চাপতে চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু আমাদের হাসি চাপবার চেষ্টা সত্ত্বেও আমাদের হাসি ফোয়ারার জলের মতন দমকে দমকে ঝলকে ঝলকে বেরিয়ে আসছিল। হেড মাষ্টার মনে করছিলেন যে, আমরা হয় ত টাইটানিয়ার দুর্দ্দশা আর বটমের বোকামি দেখে হাসছি। কিন্তু আমরা যে কি জন্য হাসছিলাম, তা হাড়ে হাড়ে বুঝে মহেশ ক্রুদ্ধ মহিষেরই মত ভোঁষ ভোঁষ করছিল।

সেই দিন মহেশ স্কুল থেকে বাড়ীতে গিয়েই সঙ্কল্প কর্‌লে যে, সে আর আমাদের স্কুলে কিছুতেই পড়বে না, সে তার মামার কাছে চ'লে যাবে, তিনি গৌহাটীতে থাকেন। কিন্তু আবার গৌহাটী! গাধার অপবাদ থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে শেষকালে গৌহাটীতে যাওয়াও ত বিশেষ নিরাপদ নয়। সেই দেশটাকেই আবার কামরূপ-কামাখ্যা বলে,—যেখানে গেলে লোককে একদম ভেড়া বানিয়ে দেয়। কিন্তু ভেড়া ত বানায় সেখানকার সুন্দরী সব মেয়েরা! তা নেহাৎ মন্দ কি! আহা! খেঁদী যদি তাকে ভেড়া বানিয়ে পোষ মানিয়ে তার কাছে রেখে দিত, তা হ'লে আর সেই হাঁড়িমুখো খ্যাংরাখাকী ঝি মাগী মুখ-ঝাম্‌টা দিতে পার্‌ত না, আর সেও নির্ভয়ে খেঁদীর কাছে কাছে ঘুরঘুর করতে পার্‌ত।

মহেশ এই সব ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল, আর স্বপ্নে ইন্দ্রজালে অকস্মাৎ সে অভাবিতের রাজ্যে চ'লে গেল।

মহেশ আমাদের স্কুল ছেড়ে দিয়ে গৌহাটীতে চ'লে গেছে। সে কামরূপ-কামাখ্যা দেশে গিয়ে সুন্দরীর জাদুতে

প্রতিবিম্ব

[শিল্পী—শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ

ভেড়া বনবার জন্য আগ্রহ-ভরা মন নিয়ে গৌহাটীর পথে পথে ঘুরে বেড়াতে আরম্ভ করেছে। একটা গলির মধ্যে ঢুকেই সে দেখলে, একটা বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে আছে খেঁদীদের ঝি মোহিনী। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তাকে দেখবা-মাত্র মোহিনী আজ আগের মতন মার মার শব্দে তেড়ে এলো না, আর তার সেই কদাকার মোটা বুড়ো মূর্ত্তি আজ জাদুর দেশের মন্ত্রগুণে প্রকৃত মোহিনী মূর্ত্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে—সে ষোড়শী সুন্দরী, তার মাথার চুলগুলি কালো রেশমের গুচ্ছের মতন কুঞ্চিত তরঙ্গে তার কাঁধ-পিঠ আচ্ছন্ন ক'রে নিতম্ব ছাপিয়ে পড়েছে। তার সেই ফুলো-ফুলো লোল থল্‌থলে গাল দুটি আপেলের গায়ের মত লাল ও নিটোল হয়েছে। তার কপালতটটি ফুটির গায়ের মত গোলাপীতে হলুদে ছোপে মেশানো গৌরবর্ণ ধারণ করেছে। তার সেই কোটরগত কুকুরচোখ পটলচেরা চোখে পরিণত হয়েছে; সেই টানা টানা চোখের কোলে মিশমিশে কালো ঘন বক্রাগ্রপক্ষ্মপংক্তি চোখের কোলে কালো সুর্ম্মারেখার মতন মনোহর দেখাচ্ছে। তার বাঁ পায়ে আর সেই গোদ নেই, তার পা হয়েছে চরণকমল, আর তার গোবর-মাখা হাত দু'খানা হয়েছে কর-কিশলয়। তার খোঁপায় গোলাপফুল গোঁজা, মনে হচ্ছে, যেন তার গায়েরই রং করবার সময় বিধাতার তুলির মুখ থেকে এক ফোঁটা ছিট্‌কে গিয়ে চুলের উপর পড়েছে, চুলের কৃষ্ণত্ব আর গায়ের গৌরত্ব পরস্পরের তুলনায় সুন্দরভাবে ফুটে উঠবে ব'লে। তাকে দেখবামাত্র মোহিনী মন-ভুলানো মধুর হাসি তার আল্‌তাপাটী শিমের মত পাৎলা রাঙা টুকটুকে ঠোঁট দুখানিতে মাখিয়ে বল্লে,—"এসো, এসো, মহিষবাবু এসো।" আজকে মোহিনী তাকে মহিষ ব'লে সম্বোধন করলেও তার রাগ হলো না, সেও হেসে বল্লে,—"মোহিনি, তুমি এখানে কেমন ক'রে কবে এলে, আর এমন সুন্দরই বা হলে কেমন ক'রে?" মোহিনী আবার হাসলে। মহেশ দেখলে, মোহিনী অপরূপ রূপসী হলেও তার মুখের মধ্যে একটিও দাঁত নেই, সমস্ত মুখটা ফোঁকলা। এই দেখেই মহেশের সারা মনটা ঘিন-ঘিন ক'রে উঠল, তখন তার মনে হলো, মোহিনী যেন পোকা-ধরা পাকা আমটি—বর্ণ, বাস, রস মন ভুলায়, কিন্তু কিলবিলে পোকার কথা মনে হলেই আর সে দিকে তাকাতে প্রবৃত্তি হয় না। মোহিনী হাসিমুখে বললে,—"তোমার আসার আশাতেই ত আমাদের এতদূর আসা। আমরা ত জানি যে, "আসিবে তুমি আসিবে, খেঁদীর হৃদয়ে রাজিবে'।" মহেশ বললে,—"শুধু তুমি নও, খেঁদীও এসেছে তা হলে! খেঁদী কৈ?" মোহিনী বললে,—"অত উতলা কেন, খেঁদীকে ত পাবেই, কিন্তু আমাকে কি অমন্দ দেখতে যে পছন্দ হচ্ছে না?" মহেশ আমতা আমতা ক'রে বল্লে,—"না, তুমি ত মন্দ নও, তবে কি না যো যস্ত হৃস্তং—বুঝলে কি না মোহিনি।" মোহিনী বল্লে,—খেঁদী তো এখন বাড়ীতে নেই, সে গেছে কামাখ্যা দেবীর মন্দিরে তোমাকেই এখানে টেনে আন্‌বার মন্ত্র-তন্ত্র তুকতাক তাবিজ-কবচ জোগাড় করতে। তা সে অনেকক্ষণ গেছে, সে এলো ব'লে। তুমি ঘরে বস্‌বে এসো।" মহেশ ভয়ে ভয়ে মুখ শুকিয়ে বললে,—"কিন্তু পণ্ডিত মশায়। তিনি কিছু বলবেন না? সন্ধিবিচ্ছেদ করতে ব'লে হুঙ্কার করবেন না ত।" মোহিনী হাস্‌তে হাস্‌তে বললে,— "তিনি ত এখানে আসে নি, কেবল আমরা দুজনে এসেছি। যতক্ষণ খেঁদী না ফিরছে, ততক্ষণ ত আমিই আছি।" মহেশ মনে মনে ভাবতে লাগল—তা ত আছ, কিন্তু দাঁত কটা যদি গজাত, তা হলে আর আমার কোন আপত্তি থাকত না। সুন্দর হওয়ার এত আয়োজনই যদি করতে পেরেছিলে, তবে গোটা বত্রিশেক দাঁত যোগাড় করা তোমার পক্ষে এমন কি শক্ত ব্যাপার হয়েছিল? আসল নিজস্ব দাঁত না জুটুক, অন্ততঃ দু-পাটী দাঁত বাঁধিয়ে নিতে তেমন কি বেশী খরচ পড়ত? আর কথাগুলো যদি ওরই মধ্যে একটু সুশ্রাব্য আর বিশুদ্ধ রকমের ক'রে নিতে পারতে, তা হ'লে তোমারও লাভ আর আমারও লাভ একসঙ্গেই হতে পারত।

মহেশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছে দেখে মোহিনী ফোঁক্‌লা মুখে গান গেয়ে উঠল—

"এসো এসো বঁধু এসো, আধ আঁচরে বসো,
নয়ন ভরিয়ে তোমায় দেখি।"

মহেশ তার সর্ব্বদেহে মনে যেন একটা কিসের শুড়শুড়ি অনুভব করতে লাগল, তার অঙ্গ জরজর শিথিল অন্তর, মন বল্‌তে চাইছিল 'সখী আমায় ধরো ধরো।' তার মনে হতে লাগল, সর্ব্বাঙ্গে যেন হাজার হাজার পিঁপড়ে চ'লে বেড়াচ্ছে, সে গায়ের দিকে চেয়ে দেখেই শিউরে উঠল, তার সর্ব্বাঙ্গে কোঁকড়া কোঁকড়া লোম

গজাচ্ছে। সর্ব্বনাশ, তা হলে সে কি দেখতে দেখতে ভেড়া ব'নে যাচ্ছে না কি! হায় হায়, "কোথায় আনিলে আমারে, কোথা রইল মাতা পিতা বন্ধু সকলে।" মহেশের মনে একটা আতঙ্ক হলেও তার মনে একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দও অনুভূত হচ্ছিল, যে আনন্দ অনুভব করে, গ্রীষ্মজ্বালায় দগ্ধ শুষ্ক তৃণশূন্য পৃথিবী, যখন নব বর্ষার প্রথম বর্ষণে তার সর্ব্বাঙ্গে পুলক-সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে কোমল শষ্পের উদ্গম হতে থাকে। মোহিনীর মধুর হাস্যধারায় অভিষিক্ত হয়ে মহেশেরও সর্ব্বাঙ্গ পুলকে লোমহর্ষণে ছেয়ে যেতে লাগল। মহেশ দেখলে, তার দেহে যে লোমহর্ষণ কাণ্ড ঘটছে, তা পশুর লোম নয়, পাখীর পালক। মহেশ হর্ষ-বিষাদে বিস্ময়ে কৌতুকে বিহ্বল হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"আচ্ছা মোহিনি, তুমি কি বলতে পার, আমাকে তুমি বা তোমরা কি বানাচ্ছ, অথবা আমি কি প্রাণীতে পরিণত হতে চলেছি?" মোহিনী খিল্‌খিল্ ক'রে হেসে উঠল। মহেশ সবিস্ময়ে দেখলে যে, মোহিনীর মুখভরা দাঁত—মণিদর্পণের মতন ঝক্‌ঝক্ করছে, সে দাঁতের শোভার কাছে কোথায় লাগে ছার মামুলি কবিত্বের উপমার সামগ্রী দাড়িম্ব-বীজ আর মুক্তা-পংক্তি। সে ভাবতে লাগল, হয় ত বা সে যে মনে মনে মোহিনীর নির্দ্দন্ত মুখের প্রতি ঘৃণা অনুভব করেছিল, সেই কথা মন্ত্রশক্তিতে মোহিনী জানতে পেরে তাকে এই দণ্ড দিয়েছে। কিন্তু মহেশের এই রূপান্তর নেহাৎ মন্দ লাগছিল না। সে ছিল মানুষের আকৃতির, নাম পেয়েছিল মহিষের ও গাধার, আর এখন সে হতে চলেছে পাখী। এই অভিজ্ঞতার বিচিত্রতা মন্দ কি! মহেশ গান গেয়ে উঠল—

"ওগো বঁধু, তুমি কি মায়া জানো,
পলকে পালক গজায়ে আনো।"

মহেশ বললে—"আচ্ছা মোহিনি, আমাকে কি চিরকাল এই রকম পেঁচা হয়ে থাকতে হবে?"

মোহিনী বললে—"না, তুমি ইচ্ছে করলেই আবার তোমার কৃষ্ণকান্তি ফিরে পাবে, তার উপায়ও তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি। আমার চুলে যে রকম লাল গোলাপ দেখছ, সেই রকম গোলাপফুল যদি চিবোও, তা হলেই তুমি মানুষ হয়ে যাবে। কিন্তু সাবধান, গায়ে যেন ধূপের ধোঁয়া লাগে না, তা হ'লে পেঁচা থেকে আবার গাধা হয়ে যাবে।"

এতক্ষণে মহেশের গা-ময় পালক গজিয়ে উঠেছিল, তার পাখায় পাখায় ওড়বার আগ্রহ তাকে চঞ্চল ক'রে তুলছিল, সে আর নিজেকে স্থির ক'রে রাখতে পারছিল না। এমন সময় তাকে দেখে একটা কাক ছুটে এল তাকে ঠোক্‌রাতে, সেই কাকটার মুখখানা দেখতে ঠিক আমাদের পণ্ডিত মশায়ের মত, যিনি তাকে সব চেয়ে বেশী ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে জ্বালাতন করতেন। কাকের ভয়ে মহেশ আর সেখানে তিষ্ঠতে পারলে না, সে উড়ে যেতে যেতে ব'লে গেল—"মোহিনি, থেঁদীকে বোলো, আমি তার সঙ্গে দেখা ক'রে যেতে পারলাম না, রাত্রি হ'লে কাকগুলো চোখের মাথা খেয়ে বাসায় লুকালে আমি একবার এসে থেঁদীকে দেখে যাব, অবশ্য যদি আবার তোমাদের বাসা চিনে আসতে পারি।"

মহেশ পেঁচা হয়ে উড়ে চল্‌ল ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে না জানি সে কোন্ দেশে। সে উড়তে উড়তে গিয়ে উপস্থিত হলো কামাখ্যাদেবীর মন্দিরে। সেখানে গিয়ে দেখলে, থেঁদী ব'সে স্বয়ং কামাখ্যাদেবীর কাছে মায়া-মন্ত্র শিখছে। মহেশের মন খুশী হয়ে গেল যখন সে শুনলে যে থেঁদী কামাখ্যাদেবীকে বলছে—"মা, আমাকে এমন জোরালো মন্ত্র শিখিয়ে দাও যে, সেই মন্ত্র আওড়াবা মাত্র মহেশ এসে আমার কাছে উপস্থিত হয়।"

মহেশ এতক্ষণে বুঝতে পারলে, কেনই বা সে পেঁচা হয়েছে আর কেনই বা সে উড়তে উড়তে একেবারে কামাখ্যাদেবীর মন্দিরে এসে উপস্থিত হয়েছে। এ সমস্তই কামাখ্যাদেবীর বরের মহিমা; তিনি অন্তর্য্যামিনী, আগেই জেনেছিলেন যে, তাঁর আরাধিকা থেঁদী তাঁর কাছে মহেশের সঙ্গে সত্বর মিলনের বর চাইবে, এবং মহেশকে থেঁদীর সঙ্গে সত্বর মিলিত করতে হলে তাকে হয় এরারোপ্লেনে চড়িয়ে নয় উড়িয়ে আনা দরকার; কিন্তু দেবতাদের যদিও পুরাকালে পুষ্পক রথ ছিল, সে রথ তো এখন ময়দানবের বংশধর ইউরোপের লোকেরা একচেটে ক'রে নিয়েছে, দেবতাদের এখন পাখীর পাখাই একমাত্র সম্বল আছে। মহেশ যে পেঁচা ব'নে গিয়েছিল, তার জন্য তার মনে আর একটুও আফশোষ রইল না। মহেশ আনন্দে আত্মহারা হয়ে ব'লে উঠল—আমি এসেছি গো এসেছি, মন দিতে এসেছি।

মহেশের পেচক-কণ্ঠের গান শুনেই খেঁদীসুন্দরী গেয়ে উঠল—

"পেঁচার রূপে তোমার অভিসার,
পরাণ-সখা বন্ধু হে আমার।
আকাশ কাঁদে হতাশ সম,
নাই যে ঘুম নয়নে মম,
দুয়ার খুলি, হে প্রিয়তম,
চাই যে বারে বার।
পরাণ-সখা বন্ধু হে আমার।
অনেক দিন দেখিতে নাহি পাই,
তোমার পথ তাকায়ে ছিনু তাই,
সুদূর কোন্ নদীর পারে,
গহন কোন্ বনের ধারে,
গভীর কোন্ অন্ধকারে
হয়েছ তুমি পার,
পরাণ-সখা বন্ধু হে আমার!"

মহেশ খেঁদীকে দেখেই বিহ্বল হয়েছিল, তার উপর আবার স্বকর্ণে শুনেছিল যে, সে কামাখ্যাদেবীর কাছে বর চাচ্ছে তারই সঙ্গে ত্বরিত মিলন, তার উপর আবার খেঁদীর মধুর কণ্ঠের আহ্বান শুনলে একেবারে গানে। মহেশ আর আপনাতে আপনি থাকল না, সে আত্মহারা হয়ে আর আপনাকে সম্বরণ ক'রে রাখতে পারল না, সে উড়ে কামাখ্যাদেবীর মন্দিরের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

কিন্তু মন্দিরের মধ্যে খেঁদী ধূপ-ধুনা জেলে কামাখ্যা-দেবীর পূজা করছিল, কত কত কামাখ্যার উপাসক উপাসিকা বাসনার ধূপ জ্বালিয়ে মন্দিরটিকে ধূমাচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল, সে দিকে মহেশের মন দেবার মত হুঁস ছিল না। তাই সে মোহিনীর সাবধান হওয়ার উপদেশ একদম ভুলে গিয়ে ধূপের ধোঁয়ার মধ্যে প্রবেশ করল। কিন্তু যেই না তার গায়ে ধূপের ধোঁয়া লাগা, আর অমনি তার গায়ের পালক কটা কটা কড়া লোমে পরিবর্ত্তিত হয়ে গেল, তার ঠোঁট চেপ্টা মুখ লম্বা হয়ে গেল, তার কাণ ছুটো হলো খাড়া আর পায়ের নখগুলো গুটিয়ে হয়ে গেল শক্ত চারখানা খুর। সে হয়ে পড়ল ছোট্ট একটি গাধা।

গাধা হয়েই মহেশ ঘ্যাতো ঘ্যাতো ক'রে ডেকে বল্লে—"হায় হায় খেঁদী, এ আমার কি হলো, তুমি যদি রূপান্তরের মন্ত্র-তন্ত্র না জানো তো এই বেলা চট ক'রে কামাখ্যাদেবীর কাছ থেকে জেনে নাও, নইলে শেষে কি আমাকে তোমার জন্যে চিরজন্ম গাধা হয়েই থাকতে হবে না কি!"

খেঁদী বল্লে—"তোমার ভয় নেই, আমি কামাখ্যা-দেবীর কৃপাতে রূপ-বদলের সব তুক-তাকই জানি। আমি এখনই তোমাকে মানুষ বানিয়ে দিচ্ছি।"

কিন্তু দেবীর মন্দিরের ভিতর অপবিত্র জীব গাধাকে প্রবেশ করতে দেখেই মন্দিরের পাণ্ডারা বড় বড় লাঠি উঁচিয়ে দৌড়ে এলো, এবং সেই সময়ে খেঁদীর বাবা পণ্ডিত মশায়ও সেখানে এসে উপস্থিত হলেন, কাজেই খেঁদী আর মহেশকে মানুষ ক'রে দিতে পারলে না। যাই পাণ্ডারা গাধা অপবিত্র জীব ব'লে তাকে ছুঁলে না, তাই মহেশ এ যাত্রা কেবলমাত্র তাড়া খেয়েই বেঁচে গেল, নইলে ঐ নাদনা-পেটা হলে তার হাড় গুঁড়ো হয়ে যেত।

মহেশ মন্দিরের বাহির হয়ে মহা দুর্ভাবনায় পড়ল, সে কেমন ক'রে আবার মনুষ্যরূপ ধারণ করতে পারবে। সে যখন পেঁচা হয়েছিল, তখন মোহিনী তাকে মানুষ হওয়ার কৌশলটি জানিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু খেঁদী তাকে গর্দ্দভ-রূপ পরিবর্ত্তনের উপায় বলতে পারার আগেই তাকে তার কাছ থেকে তাড়িয়ে দিলে, এখন যদি তার সঙ্গে খেঁদীর আর দেখা না হয়, তা হ'লে তো এ জন্মটা গাধা হয়েই কাটাতে হবে।

খেঁদী তার পিছনে পিছনে তার সন্ধানে আসবে আশা ক'রে গর্দ্দভরূপী মহেশ ধীরে ধীরে চল্‌ছিল। এমন সময় এক জন ধোপা কাপড় নিয়ে ঘাটে কাচতে যাচ্ছিল। সে একটা ছুটো বে-ওয়ারিশ গাধা দেখেই তাকে ধ'রে তার পিঠে কাপড়ের বস্তাটা চাপিয়ে দিলে। ভদ্রলোকের ছেলে মহেশের মোট বওয়া অভ্যাস কোন কালেই ছিল না, বেচারা পিঠে বোঝার ভারে মন্থরগতিতে পথ চলতে লাগল। একেই গাধা শুধু মন্দমতি নয়, মন্দগতিও, তাতে আবার তার পিঠে অনভ্যস্ত ভার চাপানো হয়েছে। সে চলছে না দেখে ধোপা তাকে প্রথমে মুখে চ্যাঃ চ্যাঃ শব্দ ক'রে উৎসাহিত করবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু তাতেও তার পদক্ষেপ বিশেষ দ্রুত হলো না দেখে সেই ধোপা পথের ধারের একটা গাছ থেকে পাতাশুদ্ধ একটা ডাল ভেঙ্গে নিয়ে তাকে শপাশপ করে মারতে মারতে তাড়িয়ে নিয়ে চলল।

মহেশ যদিও গাধা হয়েছিল, তবু তার মানুষের বোধশক্তি লোপ পায় নি। সে সব কথা মানুষের মতনই বুঝতে পারছিল। ধোপার মার খেয়ে মহেশের অত্যন্ত অপমান বোধ হচ্ছিল, সে সুযোগ খুঁজতে লাগল, কেমন ক'রে ধোপাটাকে ক'ষে এক চাট লাগিয়ে দেবে।

ধোপা মহেশ-গাধাকে নিয়ে নদীর ঘাটে গেল। তখন মহেশ দেখলে যে, মোহিনী সেই ঘাটে স্নান করতে এসেছে। মহেশ ঘ্যাঁতো ঘ্যাঁতো ক'রে আকুল আগ্রহে ডাক্‌তে ডাক্‌তে মোহিনীর দিকে দৌড়ে চল্‌ল। গাধা পালায় দেখে ধোপা তার হাতের ছপটি নিয়ে তাকে তেড়ে মারতে মারতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতে লাগল। মহেশ চাট ছুড়ে চেঁচিয়ে অনেক ধস্তাধস্তি করলে, কিন্তু কিছুতেই ধোপার হাত থেকে অব্যাহতি পেলে না। ধোপা বেওয়ারিস গাধা পেয়ে গিয়ে তাকে আর ছেড়ে দিতে রাজি ছিল না।

মোহিনী কিন্তু মহেশকে দেখেই চিনতে পেরেছিল, সেও তো কামরূপের তত্ত্ব কিছু কিছু জানে। সে চেঁচিয়ে মহেশকে ব'লে দিলে—"রক্ত জবা গায়ে ঠেক্‌লেই নিজের রূপ ফিরে পাবে।"

মহেশকে নিয়ে ধোপা তার বাড়ীতে গেল।

সে দিন ধোপাপাড়ায় ছিল শীতলা-পূজা। ধোপা একটা গাধা ধ'রে এনেছে খবর পেয়ে পাড়ার মাতব্বর লোকেরা বল্‌লে—"গাধা তো মা শীতলার বাহন, ঐ গাধাটার পিঠে ঠাকুরকে চড়িয়ে চলো শহর-প্রদক্ষিণ ক'রে আসা যাক।"

এই প্রস্তাবটা সকলেরই মনঃপূত হলো। মহেশেরও মনঃপূত হলো, কারণ, তার আশা হ'তে লাগল, যখন শীতলা ঠাক্‌রুণ পিঠে চাপবেন, তখন তাঁর গলায় নিশ্চয় জবাফুলের মালা থাকবে, আর কোনো রকমে সেই মালা গায়ে ঠেকিয়ে নিতে পারলেই গাধার খোলস ছেড়ে মানুষ হতে পারা যাবে, আর চাই কি দেবীর উপযুক্ত বাহন করবার জন্য তাকেই জবাফুলের মালা গলায় দিয়ে সাজিয়ে দিতে পারে। তা হলে তো তাকে কোনো কষ্টই করতে হবে না।

মহেশকে ফুলের মালা দিয়ে সাজালে, কিন্তু সে মালা ঘেঁটু ফুলের। আর দেবী শীতলার বাহন তাকে করলে বটে, কিন্তু তার পিঠে শীতলা ঠাক্‌রুণকে চড়ালে না, তাকে জুতে দিলে একখানা ছোট রথে, আর সেই রথে বসালে শীতলা দেবীকে।

মহেশ আশার মোহে প্রলুব্ধ হয়ে শান্ত-শিষ্টভাবেই মা শীতলার রথ টেনে নিয়ে চলল। তার আশা হচ্ছিল যে, হয় তো কোথাও ঠাক্‌রুণকে নামিয়ে ফুল দিয়ে পূজা করবে, এবং সেই পূজার ফুলের মধ্যে নিশ্চয় জবাফুল থাকবেই। তখন সে কোনো সুযোগে নিজেকে রথের জোত থেকে মুক্ত ক'রে অথবা রথশুদ্ধই সেই জবাফুলের উপর গিয়ে লুটিয়ে পড়বে, এবং গর্দ্দভরূপ ছেড়ে মনুষ্যরূপ ধারণ ক'রে সকলকে তাক লাগিয়ে দেবে।

মহেশ গাধা হলেও তার মনুষ্যবুদ্ধি তাকে একেবারে ত্যাগ করে নি। তাই সে স্বেচ্ছায় নিজেকে শীতলার রথে জুততে দিলে। তার পর সে বিনা তাড়নাতেই রথ টেনে নিয়ে চলল। কিন্তু তার মন পড়ে রইল কখন্ কোন্ সুযোগে সে শীতলার নির্ম্মাল্য জবাফুলের উপর লুণ্ঠিত হয়ে পড়তে পারবে।

মহেশ দেখতে লাগল, এক জায়গায় একটা বেদীর উপর শীতলাকে বসিয়ে পুরোহিত পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে তাঁর পূজা করছে, এবং সেই পুষ্পসম্ভারের মধ্যে জবাফুলও আছে প্রচুর। কিন্তু ধোপারা তাকে রথ থেকে মুক্ত ক'রে দেয় নি, সে রথে জোতাই আছে। পূজা সাঙ্গ হওয়া পর্য্যন্ত তাকে ঐ অবস্থায় অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু মহেশ আর ধৈর্য্য ধ'রে বিলম্ব সহ্য করতে পারছিল না, তার চোখের সামনে রয়েছে রাশি রাশি জবা ফুল, যার স্পর্শমাত্রই সে মানুষ হয়ে যেতে পারে, অথচ তাকে বন্দীদশায় নিশ্চল হয়ে থাকতে হবে। মহেশ ভাবতে ভাবতে মোরিয়া হয়ে উঠল। সে হঠাৎ রথশুদ্ধ হুড়মুড় ক'রে শীতলার ঘাড়ের উপর গিয়ে পড়ল। কিন্তু এমনি তার দুরদৃষ্ট যে, তার উদ্যম দেখেই বহু লোক হৈ হৈ ক'রে লাঠি-ঠেঙা নিয়ে তার উপরে এসে মারমুখো হয়ে পড়ল, এবং তাকে গাধাপেটা ক'রে শীতলার কাছ থেকে ফিরিয়ে দিলে, তার ফল হলো এই যে, রথখানা গিয়ে পড়ল শীতলার প্রতিমার উপরে, আর প্রতিমা হলো চূর্ণ ও পূজার নির্ম্মাল্য হলো ছত্রাকার, এবং এই অপরাধের জন্য তার পিঠে যে যষ্টিবৃষ্টি হলো, তাতে তার মানুষ হওয়ার দুশ্চেষ্টা করবার সাহস আর একটুও অবশিষ্ট রইল না। হায় হায়, তার এমনি মন্দ ভাগ্য যে, শীতলার উপর গিয়ে পড়

না জড় রথখানা, আর তার উপরে এসে পড়ল জড় ষ্টির প্রচণ্ড প্রহার! জবাফুল যে দূরে, সেই দূরেই থেকে গেল!

মহেশকে প্রহারে জর্জ্জরিত ক'রে ধোপারা বাড়ীতে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে একটা খোঁটায় বেঁধে রেখে দিলে, সে দিন আর তার ভাগ্যে ঘাস-জল কিছুই জুটল না।

মহেশ মনে মনে নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে স্থির করলে, নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে, অতএব যত দিন না তার মানুষ হওয়ার সুযোগ তার কাছে আপনি এসে উপস্থিত হবে, তত দিন সে আর পুরুষকারের দ্বারা ভাগ্য-পরিবর্ত্তনের কোন চেষ্টাই করবে না।

পরদিন থেকে মহেশ অতি নিরীহ গর্দ্দভ হয়ে গেল। ধোপা তার পিঠে কাপড়ের বস্তা চপিয়ে দিলেই সে বিনা নির্দ্দেশে ও বিনা চালকে ঘাট থেকে ঘরে অথবা ঘর থেকে ঘাটে যাতায়াত করে, ধোপা যদি কোনো কাপড় বেছে বাহির করবার কথা মুখ ফুটে বলে, তবে মহেশ অমনি সেই কাপড় বেছে বাহির ক'রে দেয়, কোনো কাপড় কেউ চাইলে সে-ই এনে দেয়। এইরূপে তার বুদ্ধির খ্যাতি ধোপা-মহলে রাষ্ট্র হয়ে গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে তার সমাদরও বেড়ে চলল।

ধোপা যতই মহেশের বুদ্ধির পরিচয় পেতে লাগল, ততই সে মহেশকে বিশ্বাস ক'রে তার উপরে নির্ভর করতে লাগল। এক দিন সে বললে যে,—"এই গাধা, তুই একলা কাপড় নিয়ে প্রসন্ন পণ্ডিতের বাড়ীতে দিয়ে আসতে পারবি ?"

মহেশ মাথা নেড়ে জানালে, সে খুব পারবে। প্রসন্ন পণ্ডিত যে তার খেঁদীরই বাবা! তার বাড়ীতে সে আবার যেতে পারবে না? খেঁদীর কাছে একবার যেতে পাওয়ার আনন্দে ও খেঁদীকে ধ'রে তার মনুষ্যরূপ ফিরিয়ে পাওয়ার একটা কিছু বন্দোবস্তও ক'রে ফেলতে পারার আশায় মহেশ তাড়াতাড়ি নিজেই খেঁদীদের কাপড়গুলি বেছে বেছে ধোপার কাছে রাখতে লাগল। ধোপা গাধার এই ...রণ বুদ্ধি-বিবেচনা দেখে তো একেবারে অবাক্। সে ...র দাড়ি ধ'রে আদর ক'রে বল্‌লে—"তুই আমার ...র গাধা!"

...হেশ সব কাপড় একে একে বেছে এনে দিলে। ... কাপড়গুলি বোচকা বেঁধে মহেশের পিঠে চাপিয়ে দিলে। মহেশ অমনি গুট্‌গুট্‌ ক'রে খেঁদীদের বাড়ীর দিকে চলল। মহেশ কোথায় যায়, কি করে, দেখবার জন্য কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে ধোপাও পিছনে পিছনে দূরে দূরে থেকে গা-ঢাকা হয়ে মহেশকে অনুসরণ ক'রে চলল। ধোপা আশ্চর্য্য হয়ে দেখলে মহেশ প্রসন্ন পণ্ডিতের বাসার সামনে গিয়েই উচ্চরবে চিঁপো চিঁপো ক'রে ডেকে উঠল। সেই ডাক শুনেই বাড়ীর ভিতর থেকে তাড়াতাড়ি খেঁদী দিদিমণি বেরিয়ে এলো, আর অমনি মহেশের গলা জড়িয়ে ধ'রে তার মুখে চুমুর পর চুমু খেতে লাগল। ধোপা তো একেবারে অবাক্। বামুনের বিধবা মেয়ে খেঁদী, সে কি না গাধাকে শুধু ছোঁয়া নয়, তার মুখে চুমো খেতে লেগেছে!

মহেশের ইচ্ছা হচ্ছিল যে, সে মুখ ফুটে মানুষের মতন কথা কয়ে খেঁদীকে বলে যে, সে তার গাধার রূপ বদ্‌লে তাকে মানুষ বানিয়ে দেয়। কিন্তু সে কথা বলতে চেষ্টা করলেই তার মুখ থেকে গাধার ডাকই বাহির হয়, মানুষের কথা সে বুঝতে পারে, ভাবতে পারে, কিন্তু কিছুতেই বলতে পারে না কেন? এ কি দুর্দ্দৈব! কিন্তু গাধার চেহারা বদ্‌লাতে বল্‌তে না পারলেও, মহেশের মনে অপার আনন্দের ঢেউ খেলছিল, তার মনে হচ্ছিল—সে যেন মিড সামার নাইট্‌স্ ড্রিমের বটম, আর খেঁদী তার টাইটানিয়া। মনুষ্য-রূপে থাকতে এ সৌভাগ্য তো তার এক দিনও হয় নি। অতএব মনুষ্যরূপ লাভ করার চেয়ে এই গাধারূপে এ জন্মটা কাটিয়ে দিতে হ'লেও তার বিশেষ কোন দুঃখ নাই। কিন্তু তাকে আরো আনন্দিত ক'রে খেঁদী তার লম্বা কাণের কাছে মুখ এনে বললে—"মহেশ, তুমি কিছু ভেবো না, আমি তোমাকে ভেড়া বানিয়ে আমার কাছে রাখব, আর যখন কেউ দেখবে না, তখন তোমাকে মানুষ বানিয়ে আমরা সুখে ঘরকরণা করব। তুমি এখন কিছুদিন গাধা হয়ে ধোপার বাড়ীতেই থাকো।"

মহেশ মহানন্দে আবার রাসভকণ্ঠের চীৎকার ক'রে উঠল।

গাধার পুনঃ পুনঃ চীৎকার শুনে প্রসন্ন পণ্ডিত অপ্রসন্ন হয়ে লাঠি নিয়ে বাইরে তেড়ে এলো, গাধার উদ্দেশে ভর্ৎসনা করতে করতে—"আরে মোলো হতভাগা গাধা, চীৎকার কর্‌বার আর জায়গা পাও নি, তোর চীৎকারের জ্বালায় আমার জমাখরচের ঠিক দিতে ভুল হয়ে গেল।"

মহেশ পণ্ডিত-মশায়ের হাতে এর আগে ছ'চার-বার বেত খেয়ে তাঁর হাতের মারের আস্বাদ ক'রে রেখেছিল, তার পরে ধোপাদের হাতের লাঠির বাড়ি খাওয়ার আস্বাদটাও নিতান্ত সহ্য, তাই সে পণ্ডিত মশায়কে লাঠি নিয়ে তেড়ে আসতে দেখে পিঠের বোঝা ঝেড়ে ফেলে খেঁদীর মমতা ভুলে চোঁচা দৌড় দিলে।

বেচারার গর্দ্দভজীবনে সে কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছিল না। সে অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে চিন্তা করতে লাগল যে, আর সে গাধা হয়ে থাকবে না, যেমন ক'রেই হোক সে জবাফুল ছুঁয়ে আবার মানুষ হবে, তাতে যদি সে আর জীবনে কখনো খেঁদীকে না দেখতে পায় তবুও।

মহেশ ধোপার বাড়ীতে ফিরে যেতে যেতে দেখলে, পথের পাশে এক সাহেবের বাগানঘেরা বাংলাঘর রয়েছে। সেই বাগানে সারি সারি জবাগাছ লাল নীল হলদে সাদা নানা বর্ণের ফুলে সেজে ঝলমল করছে। মহেশ দেখলে, সাহেবের বাংলার গেটটাও খোলা রয়েছে। সে অমনি যা থাকে কপালে ভেবে বেগে বাগানে ঢুকে পড়ল। কিন্তু সেই গেটের পাশেই যে এক জন মালী গাছের আড়ালে ব'সে ফুলের কেয়ারী নিড়াচ্ছিল, তা মহেশ লক্ষ্য ক'রে দেখে নি। সে বাগানের মধ্যে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে কোদালের বাঁটের নিদারুণ আঘাত খেয়ে ধূলোপায়ে লগ্ন ক'রেই পালিয়ে আসতে হলো। সে পালিয়ে যেতে যেতে ভাবতে লাগল, গাছে অতগুলো জবা ফুল ফুটে রয়েছে, ওর মাত্র একটা পেলেই তার গর্দ্দভরূপ ঘুচে মনুষ্যরূপ হতে পারে, কিন্তু ঐ সামান্ত বস্তুটিও তার কপালগুণে এত দুর্লভ হয়ে উঠল!

সেই রাত্রে মহেশ যে খোঁয়াড়ে আটক ছিল, তারই পাশে মানুষের চাপা গলার ফিসফিস শব্দ শুনে চমকে গেল। সে তার লম্বা লম্বা কাণ দুটো খাড়া ক'রে শুনতে লাগল, কে কি কথা বলছে। সে একটু মনোযোগ দিয়েই বুঝতে পারলে, একটা স্বর হচ্ছে তারই পালক ধোপার মেয়ে পাঁচীর, আর অপর স্বরটা হচ্ছে পাঁচীদেরই পড়শী শীতল ধোপার। তাদের কথা শুনে মহেশ জানতে পারলে, শীতল পাঁচীকে ভালবাসে, আর পাঁচীও শীতলকে ভালবাসে; কিন্তু পাঁচীর বাবা পাঁচীর সঙ্গে এক বুড়ো বাহাত্তুরে ধোপার বিয়ের সম্বন্ধ করেছে। তাই আজ তারা দুজনে গোপনে মিলিত হয়ে কলকাতায় পালিয়ে যাবে স্থির করেছে।

তাদের কথা আর আগ্রহ শুনে মহেশের লোমাঞ্চ হলো। ধোপার ঘরেও রোমান্স, ধোপা-ধুপিনীর প্রাণেও কবিত্ব! মহেশের ডাক ছেড়ে একবার বাহবা দেবার প্রবল বাসনা হলো, কিন্তু তার রবে সকল সময় যে রকম অনর্থপাত হয়, তাতে সে তার রসনাকে দমন ক'রে ফেললে। সে শুনলে, পাঁচী বলছে- এটা যদি গাধা না হয়ে ঘোড়া হতো, তা হ'লে আমরা ওর পিঠে চেপে রাতারাতি কতদূরে পালিয়ে যেতে পারতাম।

শীতল বললে,—"তা না হোক ঘোড়া, ওকে নিয়েই আমাদের পালাতে হবে, পথে আমাদের মোটমাটরী বইবে, কখনও তুমি থকে গেলে তোমাকেও পিঠে চড়িয়ে নিয়ে যাবে, আর ওটার যেমন বুদ্ধি আছে, কলকাতায় ওকে দেখিয়ে দু'পয়সা রোজগারও করতে পারব।"

শীতল এসে মহেশের খোঁয়াড়ের আগড় খুলে দিতেই সে গিয়ে শীতলের পাশে দাঁড়াল, এবং তার পিঠে বোচকা চাপিয়ে দেওয়া মাত্র সে শীতল আর পাঁচীর পিছনে পিছনে চলল।

শীতল আর পাঁচী মহেশকে নিয়ে কলকাতায় পালিয়ে এসেছে। তারা মহেশকে নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় খেলা দেখিয়ে বেশ দু'পয়সা রোজগার করে।

এক দিন এক জন লোক মহেশের বুদ্ধির দৌড় দেখে শীতলের কাছ থেকে মহেশকে কিনতে চাইলে। শীতল প্রথমে মহেশকে হাত-ছাড়া করতে চাইলে না। কিন্তু সেই লোকটি যখন ক্রমে ক্রমে ৫০০ টাকা দাম চড়ালে, তখন শীতল আর পাঁচী আর লোভ সম্বরণ করতে পারলে না। পাঁচী শীতলকে পরামর্শ দিলে,—"একটা গাধার দাম ৫০০ টাকা পাচ্ছ, আর কি চাও? তার পর জন্তু-জানোয়ারের অসুখ আছে বিসুখ আছে, আর যদি ম'রে গেল তো মূলেই হাবাত। তাই বলি, এ দাঁও ফস্কাতে দিও না। যা পাচ্ছ ঢের পাচ্ছ মনে ক'রে ওকে ছেড়ে দাও।"

শীতল পাঁচীর পরামর্শ সমীচীন বিবেচনা ক'রে মহেশকে বেচে ফেললে, কিন্তু চোখের জল ফেলতে ফেলতেই একটা গাধাকে তারা বিদায় দিলে।

যে লোকটি মহেশকে কিনলে, সে এক জন সার্কাসের লোক। সে স্থির করলে, মহেশকে কিছু বুদ্ধির কৌশল শিখিয়ে বেশ দু পয়সা রোজগার ক'রে নেবে। সে মহেশকে

বাড়ীতে এনে তাকে অঙ্ক কষতে, নাম লেখা কাগজ চিনে বাহির করতে, বইয়ের পাতা উলটে একটা নির্দ্দিষ্ট পৃষ্ঠায় কোনো লেখা বাহির ক'রে দিতে শেখাবার চেষ্টায় মন দিল। কিন্তু সে মহেশের অশিক্ষিত পটুত্ব আর অগর্দ্দভোচিত বুদ্ধি দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেল। সে মহেশকে যা যা করতে বলে, মহেশ অমনি চটপট সেই কাজ ক'রে তাকে তাক লাগিয়ে দেয়। মহেশ স্কুলে যা কিছু শিখেছিল, এখন তার গাধারূপে সেই অল্প বিদ্যার পরিচয় দিয়েই সে বাহবা পেতে লাগল। সে ভাবতে লাগল, হায় রে মানুষ, যে বুদ্ধি ও বিদ্যা নিয়ে সে মনুষ্যরূপে গর্দ্দভ আখ্যা অর্জ্জন করেছিল, এখন তার চেয়ে ঢের কম বুদ্ধি-বিদ্যার পরিচয় দেবার অবসর পেয়েও সে সকলের কাছে পরম সমাদর ও বাহবা লাভ করছে। মহেশ গাধা চেহারায় যতদূর সম্ভব বুদ্ধির দৌড় দেখিয়ে তার নূতন মনিবকে খুশী করতে চেষ্টা করতে লাগল। কারণ, সে ঠিক বুঝেছিল যে, সে যে পরিমাণে বুদ্ধি ও বিদ্যার পরিচয় জানাতে পারবে, সেই পরিমাণে সে আদর-যত্ন পাবে, এবং যত দিন সে মানুষ হওয়ার সুযোগ না পাচ্ছে, তত দিন তাকে এমনি ক'রেই গাধাজন্মের যথাসম্ভব সুখস্বাচ্ছন্দ্য আদায় ক'রে নিতে হবে।

বাস্তবিক হলোও তাই। মহেশের জন্য পশুযোগ্য ঘাস-জলের বরাদ্দ তো হলোই, তা ছাড়া রোজ কিছু ভুষি, ভাতের ফেন, তরকারির ওঁচলা ব্যবস্থা হলো আর মাঝে মাঝে জিলাপি-কচুরী দেবারও ব্যবস্থা হলো। বহু কাল পরে মহেশ একটু মুখ বদ্‌লে বাঁচল। গাধা হওয়া ইস্তক সে ঘাস-জল ছাড়া আর কিছু খেয়ে মুখ বদ্‌লাবার অবকাশ পায় নি। এখন তার গাধাজন্মের রাজার হাল হলো।

সার্কাসওয়ালার পসার দ্বিগুণ বেড়ে গেল। গাধা হেন নির্ব্বুদ্ধি পশুর বুদ্ধির দৌড় দেখবার জন্য তার সার্কাসে লোকে লোকারণ্য হতে লাগল!

কল্‌কাতায় কিছু দিন খেলা দেখাবার পরে সার্কাস-ওয়ালা পশ্চিমে গেল। হাজিপুর গাজিপুর বেড়িয়ে সে মহেশকে নিয়ে কাশীতে গিয়ে হাজির হলো। অল্পদিনের মধ্যেই মহেশের সুখ্যাতি কাশীর মহারাজের কর্ণগোচর হলো। সার্কাসওয়ালার ডাক পড়ল মহারাজকে গাধার বুদ্ধির খেলা দেখাতে হবে।

মহারাজ তখন রামনগরের প্রাসাদে অবস্থান করছিলেন। সার্কাসওয়ালা মহেশকে নিয়ে রামনগরে গেল।

রামনগরের অপর নাম ব্যাসকাশী। ব্যাসকাশীতে মরলে মানুষ নাকি পরজন্মে গাধা হয়। মহেশের মহা দুর্ভাবনা হলো যে, এ জন্ম তো গাধা হয়ে কাটিতে চলেছে। এর পরের জন্মটাও কি গাধা হয়েই কাটাতে হবে? যদি কোনো দুর্ঘটনায় এখানে তার মৃত্যু হয়, তবেই তো সর্ব্বনাশ!

মহেশ মহারাজকে তার বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে বেশ মোটা রকমের বকশিশ আদায় ক'রে কাশীতে ফিরে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলে। কিন্তু সে এবার সঙ্কল্প করলে যে, যেমন ক'রেই হোক সে মানুষ হবে; আর গাধা হয়ে সে থাক্‌বে না।

এক দিন তার সুযোগও জুটে গেল। তার সহিস দুর্গা-বাড়ী থেকে একছড়া জবাফুলের মালা এনে তার আস্তাবলের দেয়ালের গায়ে একটা হুকে টাঙিয়ে রেখে দিয়েছিল। মহেশ অপেক্ষা ক'রে রইল, রাত্রে যখন সে আস্তাবলে একলা হবে, তখন কোনো রকমে সেই জবার মালায় গা ঠেকিয়ে গাধা-জন্ম থেকে অব্যাহতি পাবে। সে আগ্রহে আর ঔৎসুক্যে সে রাত্রে ভালো ক'রে খেতে পারল না।

রাত্রে যখন সে একাকী আস্তাবলে বন্ধ হলো, সে সতৃষ্ণ-নয়নে জবাফুলের মালাগাছটির প্রতি তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবতে লাগল, কেমন ক'রে সেই মালার নাগাল সে পেতে পারে। সে অনেক লাফালাফি দাপাদাপি ক'রেও কিছুতেই নাগাল পেলো না। তার দাপাদাপি আর লাফালাফির শব্দ শুনে সহিস ছুটে এলো। মহেশ তখন মোরিয়া হয়ে উঠেছে, সে চাট ছুড়ে চীৎকার ক'রে একটা মহামারি ব্যাপার ক'রে তুলল এবং বারম্বার হুকে টাঙানো জবার মালাটার দিকে চেয়ে তাকে নাগাল পাওয়ার জন্য লাফাতে লাগল। সহিসের প্রবল ইচ্ছা হলো, বেশ ক'রে দু ঘা লাঠি লাগিয়ে দিয়ে মহেশের আস্ফালন থামিয়ে দেয়। কিন্তু সেই সময় মহেশের মনিব এসে পড়াতে মহেশ সে যাত্রা বেঁচে গেল। মহেশের মনিব মহেশকে খুবই ভালবাসত। মহেশ জবার মালা দেখে বারম্বার লাফালাফি করছে দেখে সে মালাগাছি পেড়ে মহেশের মুখের কাছে ধরলে। সে মনে করেছিল যে, মহেশ জবাফুল খাবার জন্যে অমন অধীর হয়ে

পড়েছে। কিন্তু সে দেখে আশ্চর্য্য হলো যে, মহেশ মালাটা খেতে চেষ্টা না ক'রে ধীরে ধীরে মাথা নত ক'রে মালার গায়ে মাথা ঠেকাতে চেষ্টা করছে। সার্কাসওয়ালা মনে করলে যে, বুদ্ধিমান গাধা মালাগাছিকে দেবতার নির্ম্মাল্য জেনে ভক্তি দেখাবার জন্য অত অধীর হয়েছিল। কিন্তু সার্কাসওয়ালার আর সহিসের আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল—যখন তারা দেখলে যে, গাধার মাথায় মালা ঠেকবামাত্র গাধা হয়ে গেল একটা মানুষ। তারা বিস্ময়ে ও ভয়ে অভিভূত হয়ে মহেশের কাছ ছেড়ে দিল দৌড়। তারা আরো অনেক লোকজন ডেকে ঢুকে যখন ফিরে এলো, তখন অবাক্ হয়ে দেখলে, সেখানে না আছে গাধা আর না আছে কোন লোক। তারা পালিয়ে যেতেই মহেশ দিব্য সুযোগ পেয়ে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে লোকের ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়েছিল, তাকে কেউ আর চিন্তেই পারলে না যে, সেই এইমাত্র গাধা থেকে মানুষ হয়েছে।

মহেশ গাধা থেকে মানুষ হয়েই বাড়ী ফিরবে ব'লে সটান ষ্টেশনে এসে ট্রেণে চ'ড়ে বসল। সে যখন সার্কাসে খেলা দেখাত, তখনই সে কতকগুলা টাকা রোজ লুকিয়ে এনে এনে একটা জায়গায় জমা ক'রে রেখেছিল, আজ সেই পুঁজিতে সে বাড়ী রওনা হ'তে পারল।

মহেশ বাড়ীতে ফিরে এসেছে। তার যখন ঘুম ভাঙল, তখন সে দেখলে, সে নিজের বিছানাতেই শুয়ে আছে।

মহেশ আমাদের দৌরাত্ম্যে ও পণ্ডিত মশায়ের বিদ্রূপে অতিষ্ঠ হয়ে আমাদের স্কুল ছেড়ে দিয়ে তার মামার বাড়ীতেই চ'লে গেল। তার পর মহেশের সঙ্গে আর আমাদের দেখা হয় নি। অনেক দিন পরে শুনলাম, সে নাকি ঠিকাদারী কাজ ক'রে লক্ষপতি হয়েছে। তাকে মা সরস্বতী দয়া করেন নি ব'লে মা লক্ষ্মী তার উপর অজস্র করুণা বর্ষণ করেছেন।

আমরা সবাই চাকরী বা ব্যবসায় ক'রে কায়ক্লেশে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করি, আমাদের সংসারে খাওয়া-পরার লোকের সংখ্যা প্রতি বৎসরই বেড়ে চলেছে। কিন্তু শুনতে পাই, মহেশের অত টাকা বলেই তার সংসারে কেউ নেই। সে বিয়ে করে নি ; আর তার নাকি তিন কুলে কেউ নেই ; অত টাকা যে কে খাবে, তার ঠিক নেই। অত টাকা সে করবে কি ?

আমার মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। ছেলের বাপ মেয়ের বাপের পয়সায় জীবনের সকল অভাব আর সকল সাধ মিটিয়ে নেবার দৃঢ় সঙ্কল্প ক'রে দাঁতে দাঁত চেপে শক্ত হয়ে ব'সে আছেন। আমি চারিদিক অন্ধকার দেখছি। এমন সময় আমার নামে একখানা ইন্‌সিওর চিঠি এসে উপস্থিত হলো। হাতের লেখা অপরিচিত, চিঠির উপরে পোষ্টাপিসের ছাপ দেখে জানলাম, চিঠি আসছে দার্জ্জিলিঙ থেকে। হাজার টাকার ইন্‌সিওর। দার্জ্জিলিঙে আমার এমন কে বন্ধু আছে যে, আমার এমন দুঃসময়ে থোক হাজার টাকা আমাকে পাঠিয়ে দিলে!

আমি বিস্ময়ে অভিভূত ও মুহ্যমান হয়ে খামের উপর প্রেরকের নাম পড়লাম—মহেশচন্দ্র পালিত।

মহেশ! আমাদের সহপাঠী মহেশ! আমাদের অশেষ বিদ্রূপভাজন মহেশ! আমার অসময়ের বন্ধু সেই!

আমি তাড়াতাড়ি পত্র খুলে পড়লাম, মহেশ লিখেছে—

"প্রিয় দিব্যেন্দু,

আমাদের পুরাতন সহপাঠী বন্ধু অমরনাথ দার্জ্জিলিঙে বেড়াতে এসেছে, আমিও কার্য্য উপলক্ষে এখানে কিছুদিন থেকে আছি। হঠাৎ সে দিন ম্যালে অমরনাথের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, সে স্যানিটেরিয়মে আছে। তাকে আমাদের বন্ধুদের কথা জিজ্ঞাসা করতে করতে কথায় কথায় সে আমাকে জানালে, তুমি তোমার মেয়ের বিয়ে দেওয়ার জন্যে নাকি বড় বিব্রত হয়ে পড়েছ, একটি পছন্দসই পাত্র পেয়েছ, কিন্তু ছেলের বাপের খাঁইয়ের জন্যে সেই পাত্রটি হাতছাড়া হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। আচ্ছা দিব্যেন্দু, তোমার এই হতভাগা বন্ধুকে কি একবারও মনে করতে নেই? আমি যে তোমাদের নাম-দেওয়া গাধার মতন খেটে খেটে টাকা রোজগার করছি, তা কার জন্যে বলো তো? আমার তো আত্মীয় বলতে তোমরাই। আমার খরচ কি বলো তো? ঘি দুধ পেস্তা বাদাম পোষ্টাই খাদ্য খাওয়ার আমার কিছু প্রয়োজন আছে বলতে পারো? আজকাল আমার ওজন দু-মণ সতেরো সের। আর বপু বাড়াবার কিছু প্রয়োজন আছে কি? তবে এই টাকার বোঝা কি শুধু গাধার বোঝা হয়েই থাকবে? তোমার মেয়ে আমার স্নেহপাত্রী, তার বিবাহে আমার এই সামান্য যৌতুক দিয়ে তাকে আশীর্ব্বাদ কোরো।

আমাদের বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে কারো যদি টাকার বিশেষ আটক থাকে, তবে আমাকে স্মরণ কর্‌তে বোলো, আমার ব্যাঙ্কের চেকবই তাদেরই সেবায় নিবেদিত ক'রে রেখেছি।

দেশে অভাব-অনটনের সীমা নেই। কিন্তু যে সব লোককে আমি কস্মিন্‌কালেও দেখিনি, জানি নি, তাদের জন্যে আমার কোনো রকম দরদ বোধ হয় না। আমি হাঁসপাতাল করা, ধর্ম্মশালা করা, বিদ্যালয়ে দান করা প্রভৃতি পছন্দ করি না। কার জন্যে ঐ সব? যাদের চিনি না, জানি না, তাদের জন্যে তো? আমি অত্যন্ত সংসারাসক্ত স্বার্থপর বিষয়ী লোক, আমি আপনার লোক ছাড়া আর কারো কথা ভাবতেই পারি না। যাঁরা বুদ্ধদেব অথবা যীশুখৃষ্টের মতন বিশ্বপ্রেমিক, তাঁরা করুন হাঁসপাতাল আর ধর্ম্মশালা, আমি আমার আপনার লোকদের নিয়েই সন্তুষ্ট।

তোমার মেয়ের বিবাহ সুসম্পন্ন হওয়ার সংবাদ পেলে সুখী হবো। নিমন্ত্রণ করতে ভুলো না ভাই, যদি পারি, তোমার মেয়ের শুভবিবাহে উপস্থিত থাক্‌ব, আর তখন তোমাদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হবে।

তোমাদের বন্ধু—পালিত মহিষ
ওরফে শ্রীমহেশচন্দ্র পালিত।"

অবাক্ কর্‌লে মহেশ! আমাদের বন্ধু! আমরা তার আপনার লোক! সে আমাদের যেচে সাহায্য করে! ছি ছি! মানুষের কেবলমাত্র বাহিরটা দেখে বিচার করলে কি ভুলটাই করা হয়! ঐ কুৎসিত বিকট চেহারাটার মধ্যে যে এমন একটা উদার প্রাণ গোপন ছিল, তা কেউ কোনো দিন সন্দেহও করেনি। আমরা মহেশের সদাশয়তায় একেবারে অভিভূত হয়ে পড়লাম।

মহেশ আমার মেয়ের বিবাহে আমাদের বাড়ীতে এসেছিল। বয়স হয়ে সে যেন আরও মোটা আর কালো হয়েছে দেখলাম। আমি তাকে বললাম—"আচ্ছা ভাই মহেশ,—"

মহেশ আমার কথায় বাধা দিয়ে বল্‌লে—"মহেশ কি, তোমাদের কাছে আমি এখনও সেই মহিষই থাক্‌তে চাই, আমি তোমাদের কাছ থেকে স্থানের ব্যবধানে দূরে প'ড়েছি, তাই ব'লে আমাকে তোমাদের মন থেকেও দূরে ঠেলে রেখো না।"

আমি তার অমায়িকতা দেখে সন্তুষ্ট হয়ে বল্‌লাম—"আচ্ছা ভাই মহিষ, তুমি বিয়ে করো নি কেন?"

মহেশ হেসে বল্‌লে—"কেন যে করি নি, তা আমার নামেই তো তোমরা বুঝ্‌তে পারো। মহিষকে বিয়ে কর্‌তে পছন্দ কর্‌তে পারে, এমন মেয়ে ভূ-ভারতে কোথাও আছে কি? আমার টাকা দিয়ে অনেক মেয়ে কিন্‌তে মিল্‌ত জানি, অনেক মেয়ের বাবা মেয়ে খেতে পর্‌তে কষ্ট পাবে না ব'লে আমাকে মেয়ে গছাতে ঢের চেষ্টাও করেছেন। কিন্তু তোমরা আমার বন্ধুরা আমার প্রতি প্রীতির পক্ষপাত বশতঃ আমাকে যতখানি নিরেট গাধা ঠাউরে রেখেছ, বাস্তবিক পক্ষে আমি ততখানি গাধা নই। আমি জানি যে, আমাকে কোনো মেয়ে কস্মিন্‌কালে পছন্দ কর্‌তে পারে না। আমার আয়না তো আর একটুও খোসামোদ কর্‌তে জানে না যে, সে আমাকে ধারণা করিয়ে দেবে যে, আমি কন্দর্পেরই বিরাট্ রাজ-সংস্করণ। কাজেই আমি কেবলমাত্র টাকায় কেনা সেবাদাসী সংগ্রহ কর্‌তে চাই নি, সে রকম নীচ আর হীন প্রবৃত্তি আমার হয় নি। কাজেই বিয়েও হয় নি। আর আমি তো একে ভয়ানক স্বার্থপর আছিই, তার উপর আবার বিয়ে ক'রে নিজের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে আরো সঙ্কীর্ণ স্বার্থপর হয়ে সংসারে জড়িয়ে পড়্‌তাম। তার চেয়ে এ বেশ আছি, নির্ঝঞ্ঝাট।"

মহেশের এ কথার পর আর কিছু বল্‌বার কথা খুঁজে পেলাম না। মহেশ একটু হেসে অন্যপ্রসঙ্গ তুলে তার বিয়ের আলোচনা চাপা দিয়ে দিলে।

এর অল্পদিন পরেই শুন্‌লাম, আমাদের স্কুলের প্রসন্ন পণ্ডিত মশায় তাঁর নাৎনীর বিয়ে দেওয়ার জন্য বড় বিব্রত হয়ে পড়েছেন। তিনি আমার কাছে কিছু সাহায্যপ্রার্থী হয়ে এসেছিলেন। আমি কন্যাদায় যে কাকে বলে, তা বিলক্ষণ জেনেছিলাম, তাই আমার সাধ্যাতীত সাহায্য আমি তাঁকে কর্‌লাম, আর পরামর্শ দিলাম—মহেশকে চিঠি লিখে জানাতে। পণ্ডিত মশায় সন্দেহ প্রকাশ ক'রে বল্‌লেন—"জানো তো দিব্যেন্দু, মহেশ আমার উপর কি রকম চটা ছিল, সে কি আমাকে কিছু সাহায্য কর্‌বে?"

আমি তাঁকে ভরসা দিয়ে বল্‌লাম, "আমাকে সে যে-চিঠি লিখে যে-রকম দরাজ হাতে সাহায্য করেছিল, তার পর তাকে আর সন্দেহ করা চলে না। আমরা তো তার

পিছনে লাগতে কসুর করিনি। আমাদের তুলনায় আপনি আর তার কি করেছেন? আর যা তিরস্কার করেছিলেন, তা তার ভালোর জন্যেই। অতএব আপনি কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করবেন না। আপনি মহেশকে চিঠি লিখলেই আপনার সকল দুর্ভাবনা মিটে যাবে।"

পণ্ডিত মশায় মহেশকে পত্র লিখলেন। উত্তর এলো না। আমি পত্র লিখলাম—পণ্ডিত মশায়কে সাহায্য করতে অনুরোধ ক'রে। আমার পত্রের উত্তর এলো, কিন্তু তাতে পণ্ডিত মশায়ের কোন উল্লেখও নেই, যেন তাকে পণ্ডিত মশায়ের প্রসঙ্গে কিছুই লেখা হয় নি। পণ্ডিত মশায় রেজেষ্টারী ক'রে জবাবী মাশুল দিয়ে পত্র লিখলেন। তার একনলেজমেণ্ট বা প্রাপ্তিস্বীকার রসিদ ফিরে এলো, তাতে মহেশের সই করা, কিন্তু অনেক দিন অপেক্ষা করার পরও তার কোনো উত্তর এলো না।

তখন আমি পণ্ডিত মশায়কে পরামর্শ দিলাম যে, আপনি নিজে তার কাছে গিয়ে উপস্থিত হোন, আপনি সামনে থাকলে আপনাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না।

পণ্ডিত মশায় সন্দেহাকুল হয়ে কিছুতেই মহেশের কাছে নিজে যেতে সম্মত হচ্ছিলেন না। তিনি বলছিলেন যে,—"না বাবা, আমি যাব না, শেষে কি যাচ্ঞা করার অপমানের উপর প্রত্যাখ্যানের অপমান পেয়ে ফিরে আস্‌ব?"

কিন্তু আমি তাঁকে এক রকম জোর ক'রেই মহেশের কাছে পাঠিয়ে দিলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, সম্প্রতি মহেশের যে পরিচয় পেয়েছি, তাতে মহেশের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলে সে কখনও প্রার্থীকে বিমুখ ক'রে ফেরত দিতে পারবে না।

পণ্ডিত মশাই মহেশের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। মহেশ তাঁকে অভ্যর্থনা করা দূরে থাকুক, একটু বস্‌তে পর্য্যন্ত বলল না। পণ্ডিত মশায় মহেশের বৈঠকখানায় ঢুকেই বুঝলেন যে, মহেশ তাঁকে দেখেই অপ্রসন্ন হয়েছে, সে তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপ করবে না। তাই তিনি মহেশের ঘরে প্রবেশ ক'রে তাকে কোনো রকম সম্ভাষণ না ক'রেই চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন এই প্রতীক্ষায় যে, যা হোক কোনো কথা মহেশই আগে বলুক, তার পর তিনি কোনো কথা বলবেন কি না তা বিচার ক'রে দেখবেন। পণ্ডিত মশায় প্রায় মিনিটখানেক নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন, তিনি তখন ঘর থেকে পালাতে পারলে বাঁচেন। তিনি কেমন ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবেন ভাবছেন, এমন সময় সেই ঘরের সাম্‌নে দিয়ে এক জন চাকরকে চ'লে যেতে দেখে পণ্ডিত মশায় তাকে উদ্দেশ ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন,—"ওহে বাপু, তোমাদের বাবু কোথায় বল্‌তে পারো?"

ভৃত্যটি অবাক্ হয়ে পণ্ডিত মশায়ের মুখের দিকে চেয়ে দেখলে; লোকটা কাণা কি না। কাণা ব্যতীত অন্য লোকের চোখে বাবুর অত বড় চেহারাটা কি আর পড়ত না?

তখন শীতকাল, পৌষের মাঝামাঝি। মহেশ একখানি লাল রঙের শাল গায়ে জড়িয়ে ব'সে ছিল। সে পণ্ডিত মশায়ের অসঙ্গত প্রশ্ন শুনে ভয়ানক বিরক্ত হয়ে ব'লে উঠল—"আমাকে চিন্‌তে পারছেন না পণ্ডিত মশায়, আমিই সেই আপনার গাধাস্য মহেশ।"

পণ্ডিত মশায় তাঁর প্রতি মহেশের অনাদরের গ্লানি রসিকতা দিয়ে চাপা দেবার জন্য বল্‌লেন—"ও! ওখানে তুমি ব'সে আছ বাবা মহেশ, আমি মনে করেছিলাম, একটা প্রকাণ্ড বড় কুঁচ কে চেয়ারে রেখে দিয়েছে।"

মহেশ একেই পণ্ডিত মশায়ের উপর চ'টে ছিল, তার উপর আবার তার কালো রং আর লাল শালের সঙ্গে লাল কুঁচের তুলনা ক'রে ব্যঙ্গ করাতে তার পিত্ত আরো জ'লে গেল। সে রুষ্ট স্বরে ব'লে উঠল—"আপনি আমাকে বলেন গাধা, আর আপনার নিজের ঘটে এটুকু বুদ্ধি জোগাল না, যে, আমি আপনার অতগুলো পত্রের উত্তর দিচ্ছি না দেখেও বুঝতে পারেন যে, আমার কাছ থেকে আপনার কোনো রকম প্রত্যাশা করা বৃথা? আপনি আমাকে বরাবর যে রকম লাঞ্ছনা আর অপমান করেছেন, তাতে আমার কাছ থেকে কিছু প্রত্যাশা করাই নির্ব্বুদ্ধিতা!"

পণ্ডিত মশায় ম্লান-মুখে হাস্‌তে চেষ্টা ক'রে বল্‌লেন—"না বাবা মহেশ, আমি কিছু সাহায্যপ্রার্থী হয়ে তোমার দ্বারে আসি নি।

মাতা মে চ সরস্বতী প্রতিদিনং লক্ষ্ম্যা বিমাত্রা সহ
মৌখর্য্যং বিদধাতি সাপি চপলা রুষ্টা গৃহান্নির্গতা।
তাম্ অন্বেষয়তা ময়াত্র ভবতো দ্বারি প্রবিষ্টং মুদা
মন্যে ত্বদ্ বচসাত্র নাগতবতী স্থানান্তরং গম্যতে॥

মাতা মোর সরস্বতী, নিত্য লক্ষ্মী বিমাতার সহ
করে কথা কাটাকাটি, তাই নিয়ে দারুণ কলহ।
কোপনা চঞ্চলা লক্ষ্মী রুষ্টা হয়ে গৃহ তেয়াগিয়া
কোথায় গেলেন চ'লে, তাই তাঁরে ফিরি যে খুঁজিয়া।
তোমার দুয়ারে আসা বিমাতা সে লক্ষ্মীর সন্ধানে,
বুঝিনু তোমার বাক্যে হেথা নাই, যাই অন্যখানে॥"

পণ্ডিতমশায় তৎক্ষণাৎ পিছন ফিরে ঘর থেকে বেরিয়ে চ'লে যাচ্ছেন দেখে মহেশ তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল, এবং পণ্ডিতমশায়ের পিছনে পিছনে দ্রুতপদে তাঁর নাগাল ধরবার জন্য যেতে যেতে তাঁকে ডেকে বললে,—"আচ্ছা পণ্ডিত মশায়, আপনার কোন্ নাৎনীর বিয়ে?"

পণ্ডিত মশায় ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন,—"আমার তো একটিমাত্র সন্তান, এক কন্যা, তারই মেয়ে।"

মহেশ ব'লে উঠল—"কি! তবে কি সে খেঁদীর মেয়ে?"

পণ্ডিত মশায় বললেন,—"হ্যাঁ বাবা, সে আমার একমাত্র কন্যা খেঁদীরই মেয়ে। ঐ মেয়েটিকে গর্ভে ধারণ করেই সে বিধবা হয়। তাই তার নিতান্ত আকিঞ্চন যে, একটি সৎপাত্রে তার আদরের মেয়েকে সম্প্রদান করা হয়। দিব্যেন্দু আমাকে পীড়াপীড়ি ক'রে তোমাকে পত্র লেখালে, আর সেই আমাকে তোমার কাছে অপমান হওয়ার জন্য জেদ ক'রে পাঠাবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু আমি তার কথা উপেক্ষা ক'রে আসব না-ই স্থির ক'রে রেখেছিলাম, কিন্তু খেঁদী যখন কাঁদতে কাঁদতে আমাকে অনুরোধ করলে যে, তুমি একবার মহেশ বাবুর কাছে গিয়ে দেখই না, তুমি কাছে গেলে তিনি তোমাকে কিছুতে নিরাশ করতে পারবেন না, তখন আর আমার সঙ্কল্প টিক্‌ল না। বিধবা হতভাগা মেয়েটার একমাত্র সম্বল ঐ মেয়েটির বিবাহ দিতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিনি, এই কথা তাদের কারো মনে কোনো দিন না ওঠে, এই ভেবে আমি এই দৌত্য স্বীকার করতে সম্মত হয়েছিলাম। এখন খেঁদীকে গিয়ে বলতে পারব যে, আমি তার মেয়ের জন্য কোনো অপমান স্বীকার করতেই আর বাকি রাখিনি।"

মহেশ মুহূর্ত্তকাল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বললে, "পণ্ডিত মশায়, খেঁদী আপনাকে আমার কাছে আসতে বলেছিল?...আপনি অনুগ্রহ ক'রে আমার বাড়ীতে যদি পায়ের ধূলো দিলেন, তবে আপনাকে আমি অমনি শুধু হাতে ফিরে যেতে দেবো না। আর আপনাকে যা কিছু বললাম, তার জন্যে কিছু মনে করবেন না, সে কেবল আমার মনের অভিমানের ক্ষোভ মাত্র মনে ক'রে আমাকে আপনি মার্জ্জনা করবেন। আপনি ঘরে ফিরে আসুন।"

মহেশ পণ্ডিত মশায়ের পায়ের ধূলো নিয়ে তখনি একখানা চেক কেটে দিলে একেবারে পাঁচ হাজার টাকা।

পণ্ডিত মশায় একেবারে হতাশ হওয়ার পর আশাতীত দান পেয়ে প্রসন্নচিত্তে মহেশকে আশীর্ব্বাদ করলেন এবং তাকে তাঁর নাৎনীর বিবাহে উপস্থিত থাকবার জন্য বিশেষ ক'রে নিমন্ত্রণ ক'রে বিদায় নিলেন।

বিবাহের সময় মহেশ পণ্ডিত মশায়ের নাৎনীর সমস্ত অলঙ্কার গড়িয়ে তার এক গোমস্তাকে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিল, আর বিয়ের পর বরকনেকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে অনেক উপহার দিয়ে আদর-যত্ন করেছিল। সে পণ্ডিত মশায়ের নাৎজামাইকে নিজের ঠিকাদারী কাজের শূন্য বখরাদার ক'রে নিয়ে তাকে নিজের কাছে কাছে রাখে, পণ্ডিত মশায়ের নাৎনীটিকে সে নিজের মেয়ের মত ভালোবাসে। কিন্তু পণ্ডিত মশায় ও তাঁর নাৎনী নাতজামাই বিশেষ আগ্রহ ও অনুরোধ ক'রেও মহেশকে কখনো পণ্ডিত মশায়ের বাড়ীতে নিয়ে যেতে পারে নি। একবার পণ্ডিত মশায়ের নাৎনীর অসুখ হওয়াতে তার মা খেঁদী জামাইবাড়ীতে আসছে শুনেই মহেশ সমস্ত কাজকর্ম্ম ফেলে রেখে কাশ্মীর ভ্রমণ করতে চ'লে গিয়েছিল, এবং খেঁদী তার জামাইবাড়ী থেকে চ'লে গেছে খবর পেয়ে তবে সে বাংলা দেশে ফিরে এসেছিল।

মহেশ পণ্ডিত মশায়কে মাসহারা দেয়। আর পত্রের নীচে স্বাক্ষর করে—"আপনার গর্দ্দভাস্য"।

পণ্ডিত মশায় মহেশকে আদর ক'রে লিখেছিলেন—"তুমি আমার সুবর্ণ-গর্দ্দভ। হিব্রুদের যেমন ছিল গোল্‌ডেন কাফ, তুমি আমার তেমনি সুবর্ণ-গর্দ্দভ।"

মহেশ রসিকতা ক'রে লিখেছিল—"আপনি আমার প্রশংসা ক'রে ক'রে আমার অহঙ্কার বাড়িয়ে তুলতে চেষ্টা যতই করুন না কেন, আমার দর্পণ আমার দর্প নিত্য চূর্ণ ক'রে জানিয়ে দেয় যে, আমি গর্দ্দভ হলেও হতে পারি, কিন্তু আমি সু-বর্ণ কিছুতেই নই, আর সুবর্ণের স্তূপের মধ্যে ডুবে থাকলেও আমার বর্ণ কখনো সু হবার নয়।

অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি!"

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাক্ষী পরীক্ষা

আমেরিকার 'লিটারারী ডাইজেষ্ট' পত্রে আমেরিকার টুলেন ইউনিভারসিটির মনস্তত্বের অধ্যাপক কর্ত্তৃক মকদ্দমার সাক্ষীর সাক্ষ্য যে কতখানি বিশ্বাস্য ও নির্ভরযোগ্য, তাহার এক পরীক্ষার কৌতুকাবহ বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে।

এক দিন ইউনিভারসিটির ক্লাসে পড়া হইতেছে। একটি ছাত্র বেগে সেই ক্লাসের মধ্যে প্রবেশ করিল, তাহার মাথার চুল উস্কোখুস্কো, বেশ আলুথালু, চক্ষু বিস্ফারিত ও রক্তবর্ণ। তাহার হাতে একটা লাল রঙের লম্বা মতন কি অস্ত্র।

অধ্যাপক তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া ছাত্রটির হাত হইতে সেই অস্ত্রটি কাড়িয়া লইলেন, এবং তাহাকে ছাত্রদের সাহায্যে নিরস্ত করিয়া সেই ঘর হইতে বাহির করিয়া দিলেন। তাহার পরে তিনি ক্লাসের ছাত্রদের শান্ত করিয়া তাহাদের যথাস্থানে বসিতে অনুরোধ করিলেন, এবং তাহাদের প্রত্যেককে তাহাদের প্রত্যক্ষদৃষ্ট ঐ ঘটনার বিষয় লিখিতে বলিলেন।

ছাত্রদের এক জন লিখিল যে, সেই লোকটি ছিল পাগল, তাহার হাতে ছিল একটা কুঠার, এবং সে তাহা ঘুরাইয়া আর একটু হইলে কাহাকেও খুন করিয়া ফেলিয়াছিল আর কি। এক জন লিখিল যে, সেই লোকটি চীৎকার করিয়া গালাগালি দিতে দিতে ঘরে ঢুকিয়াছিল, এবং অধ্যাপক মহাশয় পিস্তল বাহির করিয়া আওয়াজ করাতে সে ভয় পাইয়া পলায়ন করিল, নতুবা সে খুন-জখমই করিয়া ফেলিত।

পরে প্রকাশ পাইল যে, সেই ছাত্রটির হাতে ছিল একটা লাল রঙের বাইসাইকেল পাম্প এবং সে ব্যক্তি পাগলও নয় অথবা খুনেও নয়, সে তাহাদেরই কলেজের এক জন ছাত্র।

ঠিক ঐ দিনে ওয়াশিংটন ইউনিভারসিটিতে মনস্তত্বের ও শিক্ষার অধ্যাপকও ঐরূপ একটি পরীক্ষা করিয়াছেন। ক্লাসের একটা দরজা অকস্মাৎ খুলিয়া গেল এবং ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল অতি বেগে দুই জন যুবক ও দুই জন যুবতী, এক জন যুবকের হাতে একটা লাল রঙের বড় কলা, এবং সে তাহা পিস্তলের ন্যায় আস্ফালন করিতে করিতে দাপাদাপি করিতে লাগিল। অধ্যাপক তাহাদিগকে এইরূপে ক্লাসে ঢুকিয়া পাঠে ব্যাঘাত ঘটানোর জন্য ভর্ৎসনা করিতে করিতে একটা ভুঁই-পটকা মাটিতে ফেলিয়া দিলেন। আগন্তুকেরা ঘর হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু একটি ছাত্র পটকার শব্দ শুনিয়াই চিৎপাত হইয়া পড়িয়া গেল ও আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল যে, তাহার গায়ে পিস্তলের গুলী লাগিয়া গিয়াছে, এবং সে মরিল বলিয়া। মাত্র ত্রিশ সেকেণ্ডের মধ্যে সমস্ত ব্যাপার ঘটিয়া গেল। সমস্ত ছাত্রই স্থির করিল, যাহা ঘটিল, তাহা একটা রীতিমত দাঙ্গা।

ছাত্রদের কাছে যখন ব্যাপারের তদন্ত করা হইল, তখন এক এক জন এক এক রকম বিবরণ দিতে লাগিল। কাহারও সহিতই কাহারও বর্ণনা মিলিল না—কেহ বলে, এইরূপ পোষাক পরা ছিল, লোকদের মধ্যে এত জন পুরুষ ও এত জন স্ত্রীলোক ছিল, তাদের আকৃতি এইরূপ ছিল। আবার কেহ বা অন্যরূপ বর্ণনা করিল। দু'জন সাক্ষী বলিল যে, তাহারা দেখিয়াছে, খুনেদের সঙ্গে একটা কুকুরও ঘরের মধ্যে ঢুকিয়াছিল, এবং সেটাও খুনেদের অপেক্ষা কম হিংস্র নয়। আট জন ছাত্র এমন কয়েক জন লোকের নাম করিল, যাহারা ঐ ঘরে মোটেই পদার্পণ করে নাই। আর ছয় জন ছাত্র কেবলমাত্র কয়েকজন লোককে হুড়মুড় করিয়া ঘরে প্রবেশ করিতে ও ছুটোপাটি করিয়া বাহির হইয়া যাইতে ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পায় নাই।

এইরূপ পরীক্ষার দ্বারা দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই জন মনস্তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত দেখাইয়াছেন যে, মকদ্দমায় প্রত্যক্ষদর্শী সত্যসন্ধ সাক্ষীরাও অনিচ্ছায় ও অজ্ঞাতসারে কি রকম মারাত্মক ভুল সাক্ষ্য দিতে পারে।

কথিত আছে যে, জার্ম্মাণ কবি শিলার যখন জেনা ইউনিভারসিটিতে অধ্যাপক ছিলেন, তখন তাঁহার বাড়ীর জানালার সাম্‌নে নেপোলিয়নের সহিত জার্ম্মাণদের যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধ 'জেনার যুদ্ধ' নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হইয়া আছে। যুদ্ধব্যাপার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার ইচ্ছা হয় যে, তিনি জেনার যুদ্ধের একটি ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিবেন। কিন্তু সমস্ত ঘটনা তিনি নিজে

যেরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহাই যথার্থ কি না নির্ণয় করিবার জন্য তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত এক জন সেনানীকে যুদ্ধের বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সেই সেনানী যাহা বলিল, তাহা তাঁহার প্রত্যক্ষদৃষ্ট ঘটনার সহিত মিলিল না। পরে তিনি আরও অন্য লোককে যুদ্ধবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিলেন যে, যদিও তাহারা সকলেই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিল, তথাপি কাহারও বর্ণনার সহিত অপরের বর্ণনার মিলের অপেক্ষা গরমিলই অধিক হইল। তখন ঐতিহাসিক কবি শিলার জেনাযুদ্ধের বিবরণ লিখিবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন। তিনি বলিলেন যে, নিজের চোখে দেখা ব্যাপার সম্বন্ধেই যদি এমন মতদ্বৈধ হয়, তবে অতীতকালের শোনা কথায় কে বিশ্বাসস্থাপন করিবে ?

এই সব কারণে এখন আমেরিকায় জজরা বিচারের সময় কেবল প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীদের কথার উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর ও বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারিতেছেন না, তাঁহারা মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদের সাহায্যে সাক্ষ্য যাচাই করিয়া তবে রায় দিতেছেন।

আমাদের দেশে শোনা যায়, মাঝে মাঝে সামান্য ও অসমর্থিত সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া লোকের প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত হইতেছে। ইহার প্রতিকার হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

স্বদেশী

ইটালীতে সিঞোর মুসোলিনী আজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন যে, ইটালীর কোনো জায়গায় কোনো সাইনবোর্ডে বিদেশী কথা ব্যবহার করিতে পারিবে না এবং কোন হোটেলের নামও কেহ বিদেশী ভাষায় রাখিতে পারিবে না। ভারত বা এসিয়ার পূর্ব্ব-দেশ হইতে য়ুরোপে যাইবার সোজা রাস্তা ইটালী। সুতরাং ইংরেজ, ফরাসী, ডাচ প্রভৃতি জাতি ও তাহাদের অধিকৃত প্রাচ্য দেশের লোকেরা ইংলণ্ড, ফ্রান্স অথবা হলাণ্ড প্রভৃতি দেশে যাইবার সময় ইটালীর উপর দিয়া যাতায়াত করে। এই সব লোকের সুবিধার জন্য সেখানে অনেক দোকানে ও হোটেলে বিদেশী ভাষায় লেখা সাইনবোর্ড আছে। সম্প্রতি ইংলণ্ডের 'দি নিউ ষ্টেটসম্যান এণ্ড নেশান' পত্রে একটি ব্যঙ্গ কবিতা বাহির হইয়াছে, পুলিসের জুলুম হইতে বাঁচিবার জন্য সে দেশে বিদেশী নামগুলিকে দেশী ভাষায় তর্জ্জমা করিলে কিরূপ অদ্ভুত শোনাইবে, তাহা লইয়াই ঐ কবিতা লেখা। আমাদের দেশে স্বরাজ গভর্ণমেণ্ট যদি ঐরূপ আজ্ঞা প্রচার করেন, তবে আমাদের সমূহ বিপদ উপস্থিত হইবে। কোন্ ভাষা আমাদের দেশের সার্ব্বজনীন ভাষা ? গন্ধীজী বলেন—হিন্দী, কংগ্রেসেও আজকাল হিন্দীপ্রীতি প্রবল। কিন্তু আমাদের দেশে বারো রাজপুতের তের চুলা, আর যোজনান্তর ভাষা, প্রত্যেক ভাষার আবার ভিন্ন ভিন্ন বর্ণমালা। কোন্ অক্ষরে কোন্ ভাষা লেখা চলিবে, তাহা সকলের এখন হইতে ভাবিয়া রাখিলে দূরদর্শিতার কায হইবে। যে মাসের 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রে রামানন্দ বাবু এই ভাষাবিভ্রাট সম্বন্ধে বহু সুচিন্তিত সমীচীন কথা বলিয়াছেন। সত্য বটে, নানান দেশে নানান ভাষা, বিনা স্বদেশী ভাষা মিটে না আশা। কিন্তু সব সময়ে স্বাদেশিকতার গোঁড়ামি পালনীয় কি না ও পালন সম্ভব কি না, তাহাও সুধীভির্বিভাব্যম্।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

বর্জ্জন

শ্রীযুক্ত চিন্তামণি মনীষী মডারেট নেতা। তিনি এ যাবৎ মহাত্মা গন্ধীর অহিংস আন্দোলনে যোগদান করেন নাই। এক কথায় তিনি তাঁহাদের নিয়মতান্ত্রিক আবেদন-নিবেদনের পথই ভারতের মুক্তিসাধনের পক্ষে একমাত্র পথ বলিয়া এ যাবৎ ধারণা করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু এইবারের আইন অমান্য আন্দোলনের পর তিনি উহার প্রভাবের ফলে যে কিয়ৎপরিমাণে মতপরিবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। না হইলে তিনি মহাত্মা গন্ধীর ও তথা কংগ্রেসের বর্জ্জন আন্দোলনকেই ভারতের মুক্তিসাধনের প্রধান অস্ত্র বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিতেন না। বর্জ্জন আন্দোলন—বিশেষতঃ বিলাতী বস্ত্র বর্জ্জন আন্দোলন যে ফলপ্রসূ হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

এই যে বিলাতে রব উঠিয়াছে, দিল্লীর গন্ধী-আরউইন চুক্তির সর্ত্তে কোনও কায হইল না, ইহার কারণ কি ? কারণ, আর কিছুই নহে, বিলাতী ব্যবসায়ীদের ক্রোধ ও ক্ষোভ। 'জাতও গেল, পেটও ভরিল না', বোধ হয়, তাঁহারা এই কথা ভাবিয়া এই নূতন আন্দোলনের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। চুক্তি হইল, 'গন্ধী ও কংগ্রেসওয়ালাদের জেল হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে, বিনিময়ে গন্ধী ও কংগ্রেসওয়ালারা ল্যাঙ্কাসায়ারের ব্যবসায়ীদের মাল কাটতিতে বাধা দিবে না।' কিন্তু কৈ, ল্যাঙ্কাসায়ারের কাপড় ত ভারতের বাজারে কাটিতেছে না!

সম্প্রতি খবর আসিয়াছে যে, ল্যাঙ্কাসায়ারের তুলাব্যবসায়ীরা ম্যাঞ্চেষ্টারের বণিক-সভার সহিত একযোগে পার্লামেণ্টের রক্ষণশীল দলের প্রতিনিধিদের সকাশে এক ডেপুটেশান পাঠাইয়াছিলেন। উদ্দেশ্য কি, তাহা সকলেই বুঝিতেছেন,—To acquaint them with the particulars of the Indian boycott, অর্থাৎ বর্জ্জন আন্দোলনের সর্ব্বনাশকর প্রভাবের বিষয়ে ভিতরের কথা জানাইবার জন্য। রক্ষণশীল দল সকল কথা শুনিয়া যে

ভারতের প্রতি খুবই খুসী হইয়াছেন, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। তাই চার্চ্চহিল স্পষ্টই প্রকাশ্যে রক্ষণশীলদলকে 'গন্ধীর' সহিত এক টেবিলে বসিতে নিষেধ করিয়াছেন, অর্থাৎ গোল টেবিল বৈঠকে তাঁহাদিগকে যোগদান করিতে বারণ করিয়াছেন, করিলে বোধ হয় 'জাত যাইবে!' চার্চ্চহিলের এই ফোঁসফোঁসানির তবু অর্থ করা যায়, কারণ, তাঁহার দ্বারা প্রচার করাইয়া লইবার জন্য বিলাতের ব্যবসায়ীর দল আর সাংবাদিক রদারমিয়ারের ও বিভারব্রুকের দল দস্তুরমত বন্দোবস্তই করিয়া ফেলিয়াছেন বলিয়া শুনা যায়। এই বন্দোবস্তের মধ্যে এ দেশের বৃটিশ ব্যবসায়ীরাও আছেন, এমন কথাও কেহ কেহ বলেন। কেবল চার্চ্চহিল নহেন, এবার তাঁহার দোসরও জুটিয়াছে ভাল। ইঁহার নাম কম্যাণ্ডার লকার-ল্যাম্পসন। এই লোকটি রক্ষণশীলদলের অন্যতম রত্ন, বিলাত হইতে 'লাল' (বলশেভিক রাসিয়ার প্রতিনিধিগণ) তাড়াইবার ব্যাপারে ইনি অগ্রণী ছিলেন। তিনি রক্ষণশীলদিগকে দলবদ্ধ করিয়া 'গন্ধীর' বিলাতে নিমন্ত্রণ পণ্ড করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন। তিনি চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিয়াছেন, "খবরদার, গন্ধী আর তার রাজদ্রোহী ভারতীয়দিগকে আমল দিও না, বিলাতে আসিলেই উহাদিগকে বর্জ্জন কর।"

এ উষ্মার কারণ কি? প্রকাণ্ড বৃটিশ কমাণ্ডারের ক্ষুদ্র এক 'উলঙ্গ ফকীরকে' এত ভয় কেন? গন্ধী বিলাতী বস্ত্র বর্জ্জন করিয়াছেন, গন্ধীকে বর্জ্জন কর, ইহাই ইহার অর্থ! ইঁহাদিগকে ভারতবাসী বলিবে, চুক্তির ফলে কেহ আর ভারতে বিলাতী বস্ত্র পিকেট করিতেছে না বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া স্বেচ্ছায় ভারতবাসী বিদেশের বস্ত্র ক্রয় করিবে কেন? কম্যাণ্ডার, জেনারল, এডমিরাল যিনিই হউন, কামান দাগিয়া ত কেহ ভারতবাসীকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিদেশী বস্ত্র ক্রয় করাইতে পারেন না।

প্রতিযোগিতার আশঙ্কা

অপবাদ, কলঙ্ক, মিথ্যা প্রচার,—সাম্রাজ্যবাদীরা রাসিয়ার সোভিয়েট সরকারকে জগতের দৃষ্টিতে হীন প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে কোন অস্ত্রই মন্দ বলিয়া বিবেচনা করেন নাই। জগতের প্রায় সমস্ত শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী সরকারই রাসিয়াকে নররাক্ষস, পিশাচ, অসভ্য, নিরক্ষর, নিষ্ঠুর, হত্যাকারী, দস্যু, পরস্বাপহারী বলিয়া প্রচার করিতে পশ্চাৎপদ হয় নাই। কিন্তু রক্তবীজের প্রাণ, 'মরিয়াও না মরে রাম এ কেমন বৈরী?'

এখন আবার রাসিয়া এক বিশেষ কারণে সকলের চক্ষুঃশূল হইয়াছে। এই 'নররাক্ষস' সোভিয়েট সরকার তাহাদের দেশের 'কাঁচা' ও 'পাকা' মাল (পণ্য) জগতের বাজারে কাটাইবার যে অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে, তাহাতে অন্যান্য ব্যবসায়ী জাতির গাত্রদাহ উপস্থিত হইবারই কথা। একেই ত জগতের সর্ব্বত্র মাল উৎপন্ন হইতেছে চাহিদার অনেক অধিক, তাহার উপর রাসিয়ার এই নূতন ব্যবস্থা, ব্যবসায়ীরা যে এখনও পাগল হইয়া যায় নাই, ইহাই আশ্চর্য্য! বিলাতের ব্যবসায়ী সমিতি-সমূহের সভ্য ইহাতে আঁৎকাইয়া উঠিয়াছেন, সার স্টাণ্ডেম্যান অ্যালেন বলিয়াই ফেলিয়াছেন যে, "রাসিয়ার পণ্য যে পরিমাণে প্রতি বৎসর উৎপন্ন হইতেছে, তাহাতে এই দ্রব্যের মূল্য হ্রাসের বাজারে জগতের সকল দেশের ব্যবসায়ীর অন্ন মারিবার যোগাড় হইতেছে। এ বিষয়ে আশু প্রতীকার-ব্যবস্থার প্রয়োজন হইয়াছে।" সে কি কথা? যে রাসিয়া একাধিকবার উৎসন্ন গেল, সে অধিক পরিমাণে পণ্য উৎপাদন করে কিরূপে?

রাসিয়ার যদি কেবল ধ্বংসলীলা অভিনয়ই উদ্দেশ্য থাকিত, তাহা হইলে সে গঠনকার্য্যে অগ্রণী হইত না। আজ যে সে ধ্বংসের মধ্য দিয়াও গঠনের শক্তি প্রদর্শন করিতেছে, ইহাতে তাহার সাম্রাজ্যশাসন ও নিয়ন্ত্রণের পরিচয় পরিস্ফুট হইতেছে না কি?

ভারতের মুক্তির আন্দোলনে মার্কিণ সংবাদপত্র

নিউ ইয়র্ক সহরের 'ডেলি নিউজ' পত্র মার্কিণ যুক্তপ্রদেশের একখানি শক্তিশালী সংবাদপত্র। এই পত্র সম্প্রতি ভারতের মুক্তির আন্দোলন সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার মর্ম্মার্থ ভারতবাসীর জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

এই পত্র লিখিতেছেন,—লর্ড আরউইনের সহিত মহাত্মা গন্ধীর সন্ধি গন্ধীর জয়লাভই অনুসূচিত করিতেছে। ওয়ারেণ হেষ্টিংস, লর্ড ক্লাইব এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্যান্য ইংরাজ বিজয়ী বীরগণ এই সন্ধির কথা শুনিয়া নিশ্চিতই কবরে অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন। গন্ধী যে দিন প্রথম বিদ্রোহধ্বজা উড্ডীন করেন, খুব সম্ভবতঃ তাঁহারা থাকিলে সেই দিনেই গন্ধীকে গুলী করিয়া হত্যা করিতেন। ঘটনাবলীর অন্তরালে কি রহস্য লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহা ভাবিয়া দেখা তাঁহাদের স্বভাব ছিল না।

গন্ধী বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে কি আদায় করিয়াছেন? তিনি ভারতের স্বরাজলাভ সম্পর্কে গভীরভাবে আলোচনা করার সম্বন্ধে বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষের সম্মতি আদায় করিয়া লইয়াছেন। বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ গন্ধীর ২০ হাজার অনুচরকে মুক্তি দান করিবেন এবং ভারতের কোন কোন অংশ হইতে আপত্তিকর লবণকর উঠাইয়া দিবেন, বিনিময়ে গন্ধী তাঁহার আইন অমান্য এবং বৃটিশ পণ্য বর্জ্জন আন্দোলন প্রত্যাহার করিবেন, ইহাই চুক্তির মূল সর্ত্ত! এই যুদ্ধবিরতির চুক্তি চলিবে তত দিন—যত দিন এক আপোষ

বৈঠকে উভয় পক্ষ ভারতের জন্য উভয় পক্ষের সম্মানকর এক শাসনতন্ত্র গঠন করিবার পরামর্শ করিবেন। যদি সেই পরামর্শ সফল হয়, তবেই ভাল, অন্যথা গন্ধী আবার তাঁহার অহিংস সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবেন।

যদি ইংরাজ বুঝিতেন যে, বিদ্রোহ উপশমিত হইয়াছে, তাহা হইলে ২০ হাজার বন্দীকে মুক্তি দিতেন না। গন্ধী বলিয়াছেন, যদি তাঁহার প্রস্তাব ইংরাজ গ্রহণ করেন, তবেই ভারতবর্ষ সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিবে।

পরিণামে কাহার জয় হইবে? গন্ধী ভারতীয়দের জন্য ক্ষমতা ও ইজ্জৎ চাহিয়াছেন। ইংরাজ যতটা বর্জ্জন আন্দোলন উঠাইবার জন্য ব্যগ্র, ততটা ইজ্জতের জন্য নহেন। কারণ, বর্জ্জন আন্দোলন তাঁহাদের ব্যবসায়-বাণিজ্যের সর্ব্বনাশ করিতেছে। গন্ধী-আরউইন চুক্তি উভয় পক্ষকেই তাহাদের কাম্যফল প্রদান করিয়াছে। উভয় পক্ষই জয়লাভ করিয়াছে, যদিও আমরা বস্তুতান্ত্রিক পাশ্চাত্য জাতিরা ইংরাজ যে জয়লাভ করিয়াছেন, তাহাই চাই, গন্ধীর জয়ের অপেক্ষা উহা বড়।"

ঠিক কথা। পাউণ্ড, সিলিং, পেন্স লইয়া নাড়াচাড়া করাই যাঁহাদের মতে পরমার্থ,তাঁহারা কড়ির জন্য মান, ইজ্জৎ, ক্ষমতা,—সমস্তই বিসর্জ্জন দিতে পারেন, ইহা কে না জানে? মহাত্মা গন্ধীর আত্মিক শক্তির মূল রহস্যের কথা তাই তাঁহাদের নিকট প্রহেলিকা বলিয়া অনুমিত। এই আত্মিক শক্তির জয় যে কোথায়, তাহা মার্কিণ বস্তুতান্ত্রিক লেখক কিরূপে বুঝিতে পারিবেন? তিনি প্রথমে মহাত্মা গন্ধীর জয়ের কথা স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু পরে এ কূল ও কূল দুকূল রাখিয়াছেন। তবে এই কুহেলিকার মধ্য হইতে যে সামান্য একটি ক্ষীণ সূর্য্যরশ্মির সন্ধান পাইয়াছেন, ইহাও তাঁহার কৃতিত্বের পরিচায়ক।

অশ্বেত জাতির জাতীয়তা

জার্ম্মাণ মহাযুদ্ধের পর হইতে আত্মনিয়ন্ত্রণ কথাটির বহুল প্রচার হইয়াছে। মার্কিণের প্রেসিডেণ্ট উইলসন বোধ হয় জগতের সমস্ত জাতির সম্বন্ধে এই অধিকারের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। জগতের প্রবল, দুর্ব্বল, স্বাধীন, পরাধীন—সকল জাতিই যদি আপনার ভাগ্যনিয়ন্ত্রণে অধিকারী হয়, তাহা হইলে জগতে গণতন্ত্রবাদ নিরাপদ হইবে এবং চিরশান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহাই ছিল তাঁহার ধারণা। তিনি জগতের সকল শক্তিশালী জাতিকেই এই মূলনীতি অনুসরণ করিয়া সকল যুদ্ধের অবসান করিতে আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বার্থচালিত, অধিকার ও প্রভুত্ব-প্রয়াসী জাতিরা তাঁহার কথায় কর্ণপাত করে নাই। সেই হেতু এখন জগতের প্রায় সর্ব্বত্রই অশান্তি ও হিংসা-দ্বেষ প্রবল পরাক্রমে রাজত্ব করিতেছে।

কিন্তু জগতের দুর্ব্বল বা পরাধীন অশ্বেত জাতিরা বহুকালের জাড্য ও নিদ্রা হইতে মুক্ত হইয়া সর্ব্বত্রই আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস পাইতেছে। তাহাদের মধ্যে অতি অল্পকালের মধ্যে জাতীয়তা, একতা ও দেশপ্রেম আশ্চর্য্যরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। প্রতীচ্যের আত্মম্ভরী সাম্রাজ্যবাদী জাতিরা এই জাগরণে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে। তাহারা দেখিতেছে, পরিবর্ত্তন-বিরোধী প্রাচ্য জাতিরা আপনাদের ভাগ্য-পরিবর্ত্তন করিবার জন্য প্রাণপণ প্রয়াস পাইতেছে। বিশেষতঃ প্রাচ্যের অসূর্য্যম্পশ্যরূপা পুরনারীর পরিবর্ত্তন তাহাদের দৃষ্টিতে আরও অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। কোন কোন স্থানে বলপূর্ব্বক এই মনোবৃত্তি দমন করিবার চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু দূরদর্শী প্রাচ্য মনীষী রাজনীতিকরা বুঝিতেছেন, 'নৈনং দহতি পাবকঃ ন শুষ্যতি মারুতঃ'—এই জাতীয়তাজ্ঞানের ও দেশপ্রেমের উন্মেষ বন্দুকবেয়নেটে রুদ্ধ হইবার নহে।

এ বিষয়ে ইংরাজ জাতির মধ্যে সার ফ্রান্সিস ইয়ংহাসব্যাণ্ড প্রতীচ্য জাতির মধ্যে বিশেষ অগ্রণী। ভারতের মুক্তির আন্দোলন সম্বন্ধে পূর্ব্বে তিনি এই ভাবেরই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতাবলম্বী আর যে কেহ নাই, তাহা নহে। কয়েক দিন পূর্ব্বে বিলাতে শ্বেত ও অশ্বেত অধিবাসীদের মধ্যে সদ্ভাব-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এক সভার অধিবেশনে সার ফ্রান্সিস সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ইংরাজ সামরিক পুরুষ বহুদিন ভারতবর্ষে ছিলেন এবং সেই হেতু প্রাচ্যের এই অশ্বেত জাতির বিষয়ে অনেক কিছু জানেন। সুতরাং তাঁহাকে এই সভার সভাপতি করা সমীচীনই হইয়াছিল। মিঃ চার্লস বডেন বাক্সটন সভার অন্যতম বক্তা ছিলেন। তিনি বক্তৃতাকালে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, "অশ্বেত জাতিদিগের দেশপ্রেম ও জাতীয়তার কথাটা আর উপেক্ষা করা চলে না। যতই দিন যাইতেছে, উহা ক্রমশঃ বর্দ্ধিতাকারে দেশ ছাইয়া ফেলিতেছে। ইহার বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করিলে কোন ফল হইবে না, বরং ইহার জন্য প্রাচ্যবাসীদের সহিত প্রকৃত বন্ধুত্ব-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতে হইবে, পরন্তু তাহাদের দেশ হইতে আমাদের শোষণ-ক্রিয়া (Exploitation) একবারে বন্ধ করিয়া দিতে হইবে।" তাঁহার সাম্রাজ্যগর্ব্বী দেশবাসীদের মধ্যে অনেকেই এ কথা বুঝেন। কিন্তু বুঝিলে কি হইবে,—স্বার্থ যে মস্ত চীজ! তাহার উপর বহুকালের একচেটিয়া অধিকার, প্রভুত্ব ও প্রতিপত্তি-প্রতিষ্ঠার প্রয়াস! এ প্রভাব হইতে মুক্ত হওয়া ত সহজ নহে!

চয়ন

অভিনব মোটর-বাস্

রেলপথ এবং সাধারণ রাস্তায় চলিবার উপযোগী একপ্রকার মোটর-বাস্ সম্প্রতি ইংলণ্ডে নির্ম্মিত হইয়াছে। সাধারণ রাস্তায় চলিবার উপযোগী চাকার পার্শ্বে রেল-লাইনের উপর দিয়া চলিবার উপযোগী চাকা সংলগ্ন থাকে। কোনও ট্রেনের সঙ্গে এই বাস্ সংযুক্ত করিয়া দিলে, অনায়াসে তাহা লক্ষ্যস্থানে নীত হইতে পারে। তিন মিনিটের মধ্যেই চাকা পরান বা চাকা খোলার কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে।
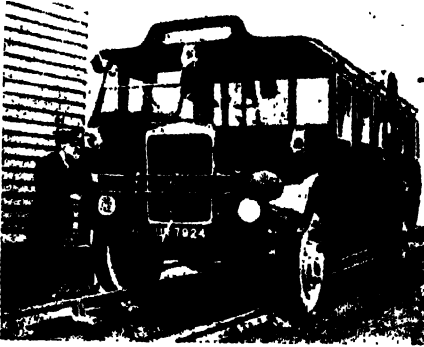
অভিনব মোটর-বাস্

আরণ্যপশুর আলোকচিত্র

শিকারীদিগের মধ্যে কেহ কেহ ক্যামেরাসাহায্যে বন্যপশুর স্বাভাবিক চিত্র তুলিবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন। পশুদিগকে প্রলুব্ধ করিয়া স্বাভাবিক অবস্থায় তাহাদের আলোকচিত্র গ্রহণ করা সহজসাধ্য নহে। মেজর সি, ট্রিয়াট এক জন প্রসিদ্ধ শিকারী ও পর্য্যটক। মিশর ও সুদান অঞ্চলে তিনি অনেক অনাবিষ্কৃত স্থান আবিষ্কার করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তিনি অরণ্যচর পশুকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য এক স্থানে 'টোপ' ফেলিয়া তাহার অনতিদূরে ক্যামেরা সাজাইয়া রাখেন। ক্যামেরা ও টোপের সহিত একটি সূক্ষ্ম রজ্জু সংলগ্ন থাকে। একবার অরণ্যচর একটি শৃগাল এই টোপ ধরিয়া টানিবামাত্রই ক্যামেরাতে তাহার তদবস্থার ছবি উঠিয়াছিল।

আরণ্যপশুর আলোকচিত্র

প্রাগৈতিহাসিক যুগের সরীসৃপ

টেক্সাসের ডালাস নামক অঞ্চলে ভূগর্ভসমাহিত একটি সরীসৃপের কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই জাতীয় জীব সমুদ্রচারী ছিল। এই সরীসৃপের মস্তক-কঙ্কাল প্রায় দেড় ফুট এবং গলদেশ ২৫ ফুট দীর্ঘ হইবে। এই জীবের সমগ্র দেহ ৭৫ ফুটের কম হইবে না। জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন যে, এই জাতীয় সরীসৃপ ২ কোটি বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীতে বিদ্যমান ছিল। ইহার ওজন প্রায় ৬শ-১০ মণ হইবে। সরীসৃপের কঙ্কাল যাদুঘরে রক্ষিত হইয়াছে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় সরীসৃপ

সম্মিলিত বাদ্যযন্ত্র

জনৈক সঙ্গীতাধ্যাপক বহুবর্ষের চেষ্টার ফলে চারি প্রকার বাদ্যযন্ত্রকে সম্মিলিত করিয়া একটি অভিনব বাদ্যযন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উহা হইতে একই কালে এক জন বাদকের দ্বারা ৪ প্রকার মিলিত সুরতরঙ্গের উদ্ভব হইয়া থাকে। পিয়ানো, মাণ্ডোলিন, গিটার ও সেলো এই ৪ প্রকার যন্ত্রের মিলিত ধ্বনি এই যন্ত্র হইতে নির্গত হইয়া থাকে। উদ্ভাবক যন্ত্রনির্ম্মাণের পর দীর্ঘকাল চেষ্টা করিয়া একই কালে মধুর সুরতরঙ্গ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

সম্মিলিত বাদ্যযন্ত্র

দুগ্ধসরবরাহের ব্যবস্থা

ইংলণ্ডে ইদানীং দুগ্ধপূর্ণ আধারের নির্দ্দিষ্ট ছিদ্রপথে উপযুক্ত মুদ্রা নিক্ষেপ করিলেই আনুমানিক দুগ্ধ আপনা হইতে আইসে। এক পেনী মূল্যের দুগ্ধ প্রয়োজন; ছিদ্রপথে পেনী নিক্ষেপ করিয়া হাতলটি ঘুরাইয়া দিলেই একপাত্র দুগ্ধ আধার হইতে বাহির হইয়া আসিবে। দরদস্তুরের প্রয়োজন নাই, বিক্রেতার উপস্থিতিও অনাবশ্যক।
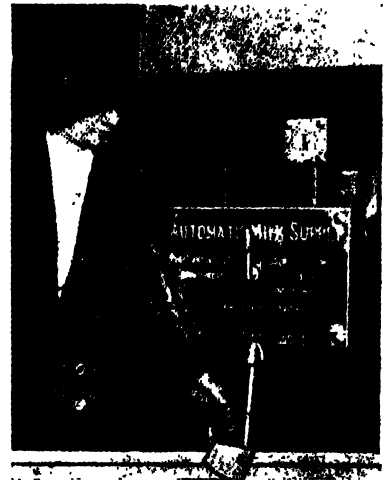
দুগ্ধসরবরাহের নূতন ব্যবস্থা

বায়ুপূর্ণ নৌকা ও বস্ত্রাবাস

জার্ম্মাণীতে সম্প্রতি রবার-নির্ম্মিত এক প্রকার নৌকা নির্ম্মিত হইয়াছে। উহা বায়ু দ্বারা পূর্ণ করিলে গুরুভারসহ অনায়াসে জলে ভাসিয়া চলে। রাত্রিকালে নৌকাকে বস্ত্রাবাসে পরিণত করিয়া সমুদ্র বা নদীতটে ভ্রমণ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে নিশাযাপন করিতে পারা যায়। বায়ু নির্গত করিয়া দিলে সমগ্র পদার্থটি সহজে বহনযোগ্য হইয়া থাকে। জার্ম্মাণীতে এইরূপ নৌকার ইদানীং বহুল প্রচলন হইয়াছে।

বায়ুপূর্ণ নৌকা ও বস্ত্রাবাস

পিস্তল-বিশারদের নৈপুণ্য

ডেট্রয়েব পুলিস বিভাগের এক জন দক্ষ পুলিস-কর্ম্মচারী পিস্তল-চালনায় সিদ্ধহস্ত। চিত্রপটের পরিবর্ত্তে একখানি দস্তার ফলকে পিস্তলের গুলী চালাইয়া তিনি একটি রেড ইণ্ডিয়ানের মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছেন। ১ শত ২৫টি গুলীর সাহায্যে তিনি পক্ষিপালক-শোভিত 'ইণ্ডিয়ানে'র মুখাবয়ব রচনা করিয়াছেন। ৪৫ ফুট দূর হইতে তিনি গুলী চালাইয়াছিলেন।

পিস্তলের গুলীতে মুখাবয়ব সৃষ্টি

ইস্পাত-রচিত ধর্ম্মভবন

য়ুরোপে ইদানীং কারু-কার্য্যপ্রীতি হ্রাস পাইতেছে। জার্ম্মাণীতে সম্প্রতি একটি ইস্পাত-নির্ম্মিত উপাসনা-মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। উহার কুত্রাপি কোন প্রকার কারুকার্য্য নাই। সাদাসিধাভাবে উহা সাধিত হইয়াছে।
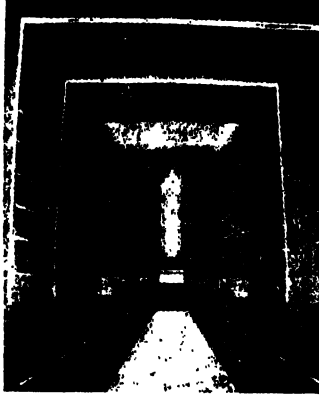
ইস্পাতরচিত ধর্ম্ম-ভবন

জলে শিকারের সুবিধা

যাহারা জলজপক্ষী অথবা মৎস্য শিকার করে, তাহাদের সুবিধার জন্য রবারনির্ম্মিত বায়ুপূর্ণ বৃত্তাকার পদার্থ নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহাকে বহন করিতে শিকারীর কোন ক্লেশ হয় না। কটিবন্ধের কাছে বায়ুপূর্ণ এই পদার্থটি বিদ্যমান থাকে। জলে নামিয়া শিকারী যখন অধিক জলে গিয়া পড়ে, তখন এই ভাসমান রবারের

বায়ুপূর্ণ রবারের বৃত্ত

বায়ুপূর্ণ বৃত্ত তাহাকে নিরাপদে ভাসাইয়া রাখে। বায়ু নির্গত করিয়া দিলে উহা অতি সামান্য স্থান অধিকার করে এবং বহন করিতেও কষ্ট বোধ হয় না।

পুরাতন চাকার কারবার

পুরাতন চাকার কারবার

আমেরিকা হইতে স্বয়ং চালিত গাড়ীর পুরাতন হাজার হাজার চাকা ভিন্ন দেশে চালান হইয়া থাকে। কিন্তু এ সংবাদ প্রকৃতই জনসাধারণের অগোচর ছিল। লস্ এঞ্জেলেস্ হইতে সম্প্রতি কয়েক জাহাজ বোঝাই পুরাতন চাকা জার্ম্মাণীতে যাইতেছে। প্রদত্ত চিত্র হইতে চাকার স্তূপের কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে।

অতিকায় কদলী

অতিকায় কদলী

চন্দননগরের প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয়ের জামাতা শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র কুণ্ডুর বাগানে কদলীর চাষ হইয়াছে। একটি ৭।০ ইঞ্চি পরিধিবিশিষ্ট ১৫ ইঞ্চ দীর্ঘ মর্ত্তমান-জাতীয় কদলী ফলিয়াছে। শেঠ মহাশয় উক্ত কদলীর ছবি পাঠাইয়াছেন। সাধারণতঃ মোচা পড়িবার পর কাঁদি দেখা দেয়; কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে মোচা না ফলিয়াই একবারে কলার কাঁদি বাহির হইয়াছিল।

যষ্টিশীর্ষে বিদ্যুতালোক

যষ্টিশীর্ষে বিদ্যুতালোক

ভ্রমণযষ্টির অগ্রভাগ হইতে বিদ্যুতালোক নির্গত হইয়া অন্ধকারে পথ নির্দ্দেশ করিবে, বিজ্ঞান সে ব্যবস্থাও করিয়াছে। যষ্টির প্রান্তভাগ ভূমিলগ্ন হইবামাত্রই আলোকশিখা নির্গত হইবে। চুরুটিকার নলেও অনুরূপ ব্যবস্থাও আছে। উহা যষ্টির শীর্ষদেশে সংলগ্ন করা যায়।

তুষার-পথে দ্বিচক্রযান ও শ্লেডগাড়ী

যুগ্ম দ্বিচক্রযান ও শ্লেডগাড়ী
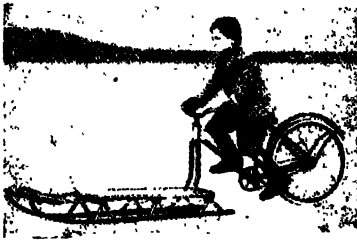
নিউজার্সির একটি দ্বাদশ বৎসর বয়স্ক বালক তুষার-রাশির উপর দিয়া চলিবার জন্য একখানি যান নির্ম্মাণ করিয়াছে, তাহার অর্দ্ধেক শ্লেডগাড়ী, অপরার্দ্ধ দ্বিচক্রযান। এই গাড়ীতে চড়িয়া দ্রুতগতিতে তুষাররাশির উপর দিয়া পথাতিক্রম করা যায়।

বিচিত্র বেহালা

কর্ণাকৃতি বেহালা

জনৈক জার্ম্মাণ সঙ্গীত-বিশারদ নূতন ধরণের এক প্রকার বেহালা যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উহার আকৃতি মনুষ্য-কর্ণের ন্যায়। এই বেহালা হইতে অতি চমৎকার সুরতরঙ্গ উত্থিত হইয়া থাকে।

স্থপতি-শিল্প-নৈপুণ্য
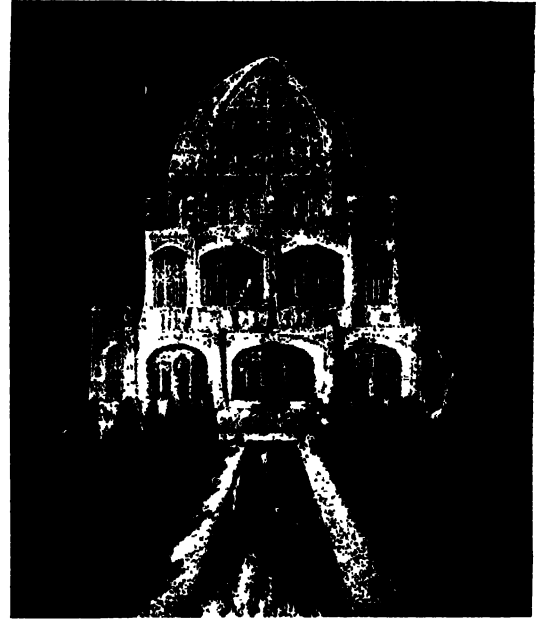
পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মন্দির

চিকাগোর সন্নিহিত "উইলমেটি ইল" নামক স্থানে একটি মন্দির নির্ম্মিত হইতেছে। উহার স্থপতি-শিল্পের অপূর্ব্বতা অসাধারণ। জগতে নাকি ইহার মত সুন্দর মন্দির অতি অল্পই আছে। স্থপতি-শিল্পী লুই বার্জ্জিও উহা অসম্পূর্ণ অবস্থায় রাখিয়া পরলোকগমন করিয়াছেন।

৭ ফুট দীর্ঘ কলার কাঁদি

মাদ্রাজ প্রদেশের ভেণ্টাগিরি অঞ্চলে কদলীর প্রচুর চাষ আছে। কোনও চাষীর ক্ষেত্রে কদলীবৃক্ষে ৭ ফুট দীর্ঘ কলার কাঁদি ফলিয়াছে। মাদ্রাজ এ বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী। বাঙ্গালার কোন কোন স্থানে চেষ্টা করিলে এই প্রকার কদলী ফলিতে পারে।

৭ ফুট দীর্ঘ কলার কাঁদি

দক্ষিণ-আফ্রিকা

ব্লুমফন্‌টেনের গো-মহিষাদির বাজার

দক্ষিণ-আফ্রিকার একাংশ 'বৃটিশ কমন্‌ওয়েল্‌থ্‌'এর অন্তর্ভুক্ত স্বায়ত্ত-শাসিত ভূভাগ। চারিটি প্রদেশ লইয়া "সম্মিলিত দক্ষিণ-আফ্রিকা" সভ্যসমাজে সুপরিচিত। এই চারিটি প্রদেশের নাম—উত্তমাশা (কেপ্ অব্ গুড্‌হোপ্), নেটাল, ট্রান্সভাল এবং অরেঞ্জ স্বাধীন রাজ্য। ট্রান্সভালের প্রধান নগর প্রিটোরিয়া 'কেপটাউনে'র রাজধানী। সম্মিলিত দক্ষিণ-আফ্রিকা রাজ্যে দুইটি কথ্য ভাষা প্রচলিত—ইংরাজী ও 'আফ্রিকান্'। এই শেষোক্ত ভাষা হল্যাণ্ডের প্রভাবপুষ্ট দক্ষিণ-আফ্রিকারই ভাষা। কানাডা যেরূপ স্বায়ত্তশাসনাধিকার লাভ করিয়াছে, দক্ষিণ-আফ্রিকার সম্মিলিত রাজ্যও ঠিক সেইরূপ স্বাধীনভাবে শাসনাধিকার পরিচালনা করিয়া থাকে।

কেমন করিয়া কয়েক শতাব্দী ধরিয়া য়ুরোপীয় শক্তিপুঞ্জের সংস্রবে আসিয়া অরণ্যসমাকীর্ণ আফ্রিকার এই ভূভাগ বর্ব্বরতা হইতে সভ্যতার যুগে উন্নীত হইয়াছে, য়ুরোপীয় ঐতিহাসিকগণের
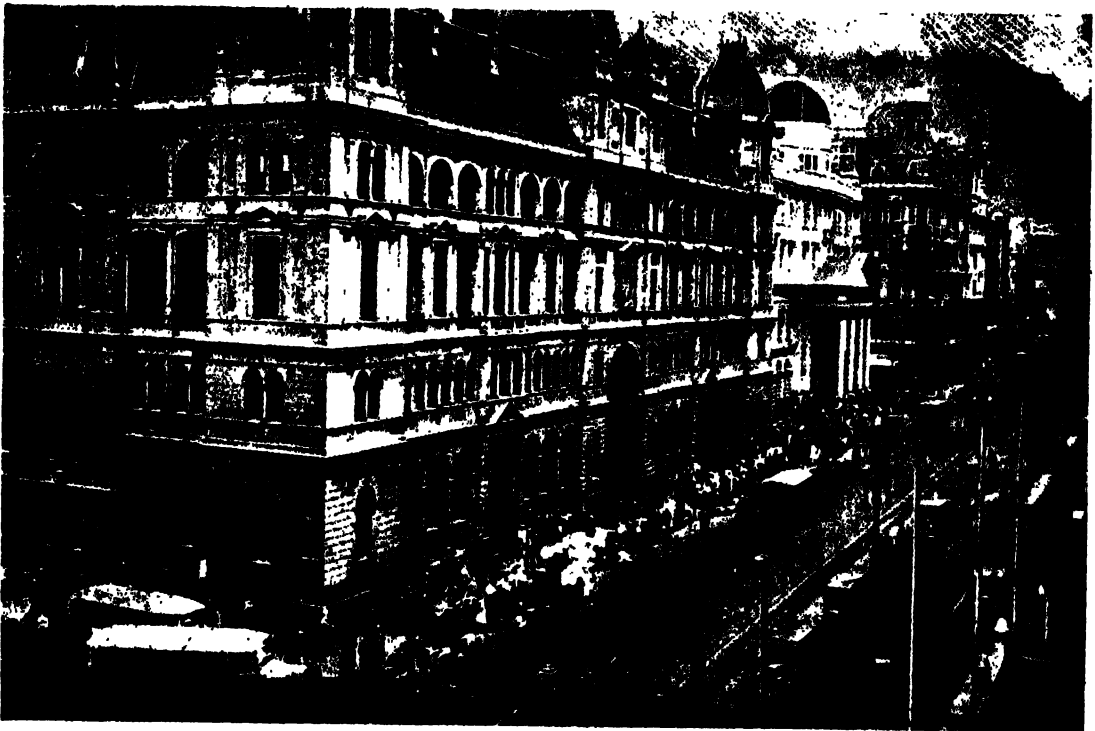
কেপটাউনের প্রসিদ্ধ রাজপথ

উটপক্ষীর দল

রচনা পড়িলে তাহা জানিতে পারা যায়। আদিমযুগের মানুষগুলি কেমন করিয়া য়ুরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিপুঞ্জের দ্বারা জীবন-সংগ্রামে পরাজিত হইয়াছিল, তাহার ঐতিহাসিকতত্ত্ব বর্ত্তমান প্রবন্ধের ক্ষুদ্র পরিসরে ব্যক্ত করিবার স্থান হইবে না। ইতিহাসপাঠকগণ তাহা উত্তমরূপেই অবগত আছেন। আমেরিকা এবং য়ুরোপের বিভিন্ন স্থানের পর্য্যটকগণ এতদঞ্চলে পরিভ্রমণ করিয়া বর্ত্তমান "ইউনিয়নের" যে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, "বসুমতীর" পাঠকবর্গের সমীপে তাহা সংক্ষেপে উপস্থাপিত করা যাইতেছে।

উত্তমাশা অন্তরীপ—প্রদেশেরও এই নামকরণ হইয়াছে—১৪৮৮ খৃষ্টাব্দে যখন আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তখন বার্থলোমিউ ডায়াজ্ উহার নাম রাখিয়াছিলেন, "কাবোটর্মেন্টোসো" (ঝটিকা অন্তরীপ)। কিন্তু পোর্ত্তুগালের রাজা জন্ উহার প্রতিবাদে বলিয়াছিলেন, "না, বরং উহাকে 'কাবো-দা-বোয়া এস্পারান্সা (উত্তমাশা অন্তরীপ) বলিতে পার।" তাঁহার বলিবার উদ্দেশ্য ছিল। প্রাচী ভূখণ্ডে গমন করিবার নূতন পথ আবিষ্কৃত হওয়ায়, তাঁহার মনে ভারতীয় বাণিজ্য-ব্যাপারে প্রচুর অর্থাগমের আশা জাগিয়া উঠিয়া থাকিবে।

গ্রাহাম্‌স্ সহর

এলিজাবেথ বন্দরে অশ্ব-প্রতিমূর্ত্তি-ক্ষোদিত প্রস্রবণ
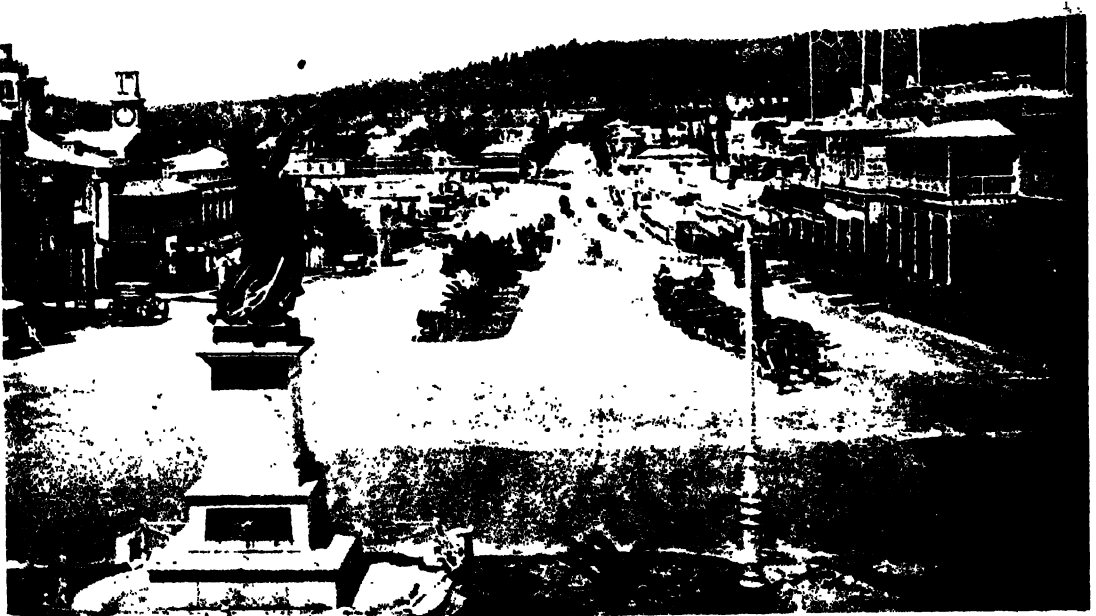
ডায়াজ্‌এর উত্তমাশা অন্তরীপ আবিষ্কারের পর প্রায় দেড় শত বৎসর ধরিয়া সমুদ্রমেখলা দক্ষিণ-আফ্রিকায় কেহই উপনিবেশ স্থাপন করিবার চেষ্টা করে নাই। তখন সমগ্র দেশ অরণ্যে পূর্ণ। ব্যাঘ্র-সমাকীর্ণ, বর্ব্বর-মনুষ্যসেবিত দেশে, সমুদ্রকূলে উপনিবেশস্থাপন সহজ ব্যাপারও ছিল না। শুধু সমুদ্রগামীরা উত্তমাশা অন্তরীপে দুই এক দিন জাহাজ থামাইয়া আবার অকূল সমুদ্রে পাড়ি দিত। তবে এই স্থানটিকে সে যুগের সমুদ্রচারীরা ডাকঘরের ন্যায় ব্যবহার করিত। পাথর সাজাইয়া তাহার অন্তরালে চিঠিপত্র রক্ষিত হইত। য়ুরোপগামী অর্ণবযান-সমূহ নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে পত্রগুলি সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইত। কেপটাউনে এখনও সেই সকল প্রস্তর সংরক্ষিত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যাইবে। তাহার উপরে এইরূপ ক্ষোদিত আছে,—"জন রোবার্টস্, লেসার জেম্‌সের অধ্যক্ষ, উপস্থিতিকাল ৮ই ডিসেম্বর হইতে ২৬শে, ১৬২২ খৃষ্টাব্দ। ইহার অন্তরালে পত্র আছে, তুলিয়া লও।"
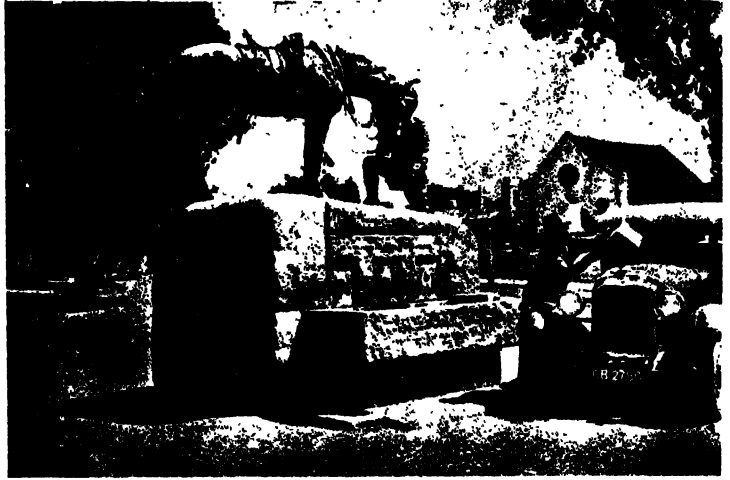
ক্রমে এখানে উপনিবেশ-স্থাপনের প্রচেষ্টা আরব্ধ হয়। ১৬৫২ খৃষ্টাব্দে এক দল লোক এখানে বসবাসের জন্য প্রেরিত হয়। ওলন্দাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কতিপয় কর্ম্মচারী, তাহাদের সংখ্যা ৭০ জন হইবে, কমাণ্ডার জান্, ভ্যান্ রেবেকের পরিচালনাধীনে দক্ষিণ-আফ্রিকায় পদার্পণ করে। স্বায়ত্তশাসিত আফ্রিকার অধিবাসীরা ভ্যান্ রেবেকের প্রস্তরমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছে। প্রতিমূর্ত্তির পাদপীঠের উপর নেদারল্যাণ্ডের পতাকা প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু ভ্যান্ রেবেক আজ যদি পুনরুজ্জীবিত হইয়া ফিরিয়া আসিতেন, তাহা হইলে বর্ত্তমান সহরটিকে দেখিয়া তিনি কখনই চিনিতে পারিতেন না যে, এইখানেই তিনি প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। এডারলে ষ্ট্রীটের দিকে চাহিলেই প্রাসাদোপম পার্লামেণ্ট-ভবন নেত্রপথে পতিত হইবে। পথের উভয় পার্শ্বস্থ সুদৃশ্য বিপণিসমূহ ক্রেতা ও বিক্রেতার সমাগমে মুখর ও ব্যস্ত। বিচিত্র পুষ্প-সম্ভার বিক্রয়ার্থ দোকানে সজ্জিত, রাজপথ মোটর-দ্বিচক্রযানের শব্দে মুখরিত। রেশমী মোজা-পরিহিতা তরুণীরা দ্রুতগতিতে পথ অতিক্রম করিতেছে। নগরের পশ্চাদ্ভাগে টেব্‌ল পর্ব্বতের ভীমকান্ত শ্রী।

উম্‌টাটার পার্লামেণ্ট ভবন

বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা এতদঞ্চলে বাড়িয়াছে। প্রিটোরিয়া হইতে কেপটাউন পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল প্রভৃতির সংখ্যা কম নহে। চারিটি প্রদেশের মধ্যে নানাপ্রকার

রোড্‌স্‌ স্মৃতিসৌধ

দক্ষিণ-আফ্রিকায় প্রচুর পুষ্প জন্মিয়া থাকে। কালেডন নামক নগরমধ্যে প্রবেশ করিতে গেলে বিস্তৃত তৃণশ্যামল ক্ষেত্র নয়নগোচর হইবে। পাহাড়ের সংখ্যাও কম নহে। উপতক্যা-ভূমি বিচিত্র পুষ্প-সম্ভারে রমণীয় রূপ ধারণ করিয়া থাকে। কারূরু নামক পল্লী-সহরটিও পুষ্পসমাকুল। বৃষ্টিপাতের পূর্ব্বে এই অঞ্চল মরুভূমির ন্যায় ধূ ধূ করিতে থাকে; কিন্তু প্রকৃতির লীলা এমনই বিচিত্র যে, এক পশলা বারিপাতের পরই সমগ্র স্থান পরীরাজ্যের শোভায় মনপ্রাণ হরণ করে—তৃণশ্যামল রূপ চারিদিকে ফুটিয়া উঠে।
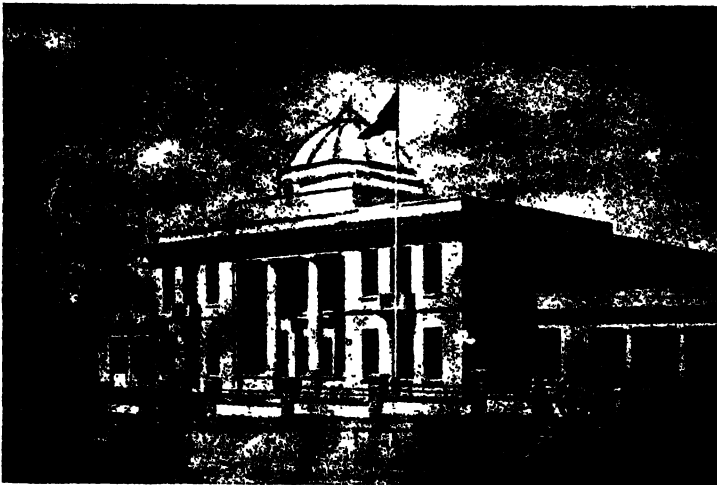
শ্রমশিল্প-সংক্রান্ত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৮ শত হইবে।

টেবল পর্ব্বতের সন্নিকটে 'রোড্‌স্‌' নামক স্থান। সম্মিলনের প্রধান মন্ত্রীর বাসভবন এইখানেই অবস্থিত। ভদ্রলোক গভীর স্বপ্নদর্শী এবং অক্লান্তকর্ম্মী। তাঁহার পুস্তকাগার কর্ম্মী মানবদিগের জীবনচরিত-সমূহে পরিপূর্ণ। প্রাচীরগাত্রে ত্রিবর্ণরঞ্জিত এক খণ্ড বস্ত্র দোদুল্যমান। সম্ভবতঃ উহা কোনও পতাকার নমুনা—ভবিষ্যতে হয় ত এই পতাকা কেপটাউন হইতে কায়রো পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র উড্ডীয়মান হইতে পারে।

এতদঞ্চলের অধিবাসীর সংখ্যা ১ কোটি ১০ লক্ষ। তন্মধ্যে প্রতি ৫ জন আফ্রিকা ও এশিয়াবাসীতে ১ জন য়ুরোপীয় এবং প্রতি ১০ বর্গ-মাইলে ১২ জন য়ুরোপীয়ের বাস। সমগ্র সম্মিলিত প্রদেশের মধ্যে—ভারত সমুদ্রের ধারে, দুইটি দেশীয় রাজ্য বর্ত্তমান। একটির নাম 'বাসুটো', অপরটির নাম 'সোয়াজি'। বাকী ভূভাগটি সম্মিলিত দক্ষিণ-আফ্রিকা নামে পরিচিত। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, উহা ৪টি প্রদেশে বিভক্ত। বিগত ১৯১০ খৃষ্টাব্দে এই সম্মিলন ঘটিয়াছিল। গ্রেটবৃটেনের তুলনায় এই সম্মিলিত ভূভাগ ৫ গুণ বড়।

কারূরু উপত্যকা-ভূমিতে কদাচিৎ বারিপাত হয়, তথাপি এতদঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে মেষ-লোমজাত বস্ত্রাদি উৎপাদিত হইয়া থাকে। লক্ষ লক্ষ মেষ এখানে পাওয়া যায়। জলের অভাব দূরীভূত করিতে পারিলে মেষ-প্রতিপালন বিষয়ে অন্য কোনও দেশ ইহার সমকক্ষতা করিতে পারিবে না বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন।

দক্ষিণ-আফ্রিকার নগরগুলি দূরে দূরে অবস্থিত। এক নগর হইতে অপর নগরের ব্যবধান কোন কোন ক্ষেত্রে ৫০ ক্রোশ। সমগ্র স্থানে ১৭ লক্ষ য়ুরোপীয়ের বাস।

অন্তরীপ প্রদেশের জলবায়ু অত্যন্ত উৎকৃষ্ট, শোভাও

৪ শত বৎসরের পুরাতন বৃক্ষ—এইখানে চিঠি রাখা হইত

কার্কুর চাষী-গৃহ

বিষাক্ত সর্প চুরি করিয়া থাকে। একবার তিনটি বালক রাত্রিকালে গোক্ষুর সর্প চুরি করিয়া পরদিন উহা সর্পোদ্যানের ডাইরেক্টারের নিকট নূতন সর্প বলিয়া বিক্রয় করিয়াছিল। তাহাদের চুরি ধরা পড়ায় সংশোধনাগারে তাহাদিগকে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

এলিজাবেথ বন্দর হইতে কিছু দূরে বাথর্ষ্ট ও গ্রেহামস্ টাউন নামক দুইটি সুন্দর নগর অবস্থিত। বাথর্ষ্ট সহরটিতে আনারসের চাষ অপর্য্যাপ্ত হইয়া থাকে। গ্রেহামস্ টাউন অধুনা শিক্ষার বড় কেন্দ্র।

'সম্মিলিত দক্ষিণ-আফ্রিকা' এই নামকরণের পূর্ব্বে বান্টু সম্প্রদায় ফিঙ্গোল্যাণ্ড, গ্যালিকাল্যাণ্ড, টেম্বুল্যাণ্ড,

পরম রমণীয়। বাতাস যেমন বিশুদ্ধ, তেমনই স্বচ্ছ। আকাশ গাঢ় নীল।

আউট স্বরন্ অঞ্চলে উটপক্ষীর প্রাচুর্য্য আছে। কিন্তু স্বয়ং-চালিত যানের প্রচলন-বাহুল্যে ইদানীং উটপক্ষীর ব্যবসায়ে ভাটা পড়িয়াছে। পূর্ব্বে নারীরা শিরোভূষণে উটপক্ষীর পালক ব্যবহার করিতেন; কিন্তু মোটর-গাড়ীর আমদানীর সঙ্গে সঙ্গে এ জাতীয় টুপীর ব্যবহার পরিত্যক্ত হইয়াছে। পোর্ট এলিজাবেথ বন্দরটি সর্পোদ্যানের জন্য বিখ্যাত। এখানে অসংখ্য সর্প প্রতিপালিত হইয়া থাকে। সর্পোদ্যানে অনেক সর্প অনশন-ব্রত অবলম্বন করিয়া থাকে। নানাবিধ উপায়ে তাহাদিগকে তুষ্ট করিতে হয়। যে অঞ্চলে তাহাদের বাস ছিল, তত্রত্য আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়া সর্পদিগকে অনশনব্রত ত্যাগ করাইতে হয়।

বিভিন্ন সর্পের বিষ মিশ্রিত করিয়া যে মিশ্রবিষ উৎপাদিত হয়, তদ্দ্বারা ম্যালেরিয়া ও মৃগীরোগ নিরাময় হইয়া থাকে।

পোর্ট এলিজাবেথ-এ সর্পচোর আছে। তাহারা সর্পোদ্যান হইতে রাত্রিকালে

প্রিটারমারিজবার্গের হাউইক জলপ্রপাত

পাণ্ডোল্যাণ্ড ও গ্রিকোয়াল্যাণ্ড অঞ্চলে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। তখন তাহারা সভ্যতার ধার ধারিত না। ইদানীং সে সকল স্থানে সভ্যতালোক প্রবেশ করিয়াছে। বান্টু সম্প্রদায় লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হইয়া উঠিয়াছে। উমৃতাতা নামক নগরে পার্লামেণ্ট-গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। এতদঞ্চলে প্রায় ১০ লক্ষ লোকের বাস, ২০ লক্ষাধিক মেষ সেখানে বিদ্যমান। অসংখ্য কৃষিবিদ্যালয়ে স্থানীয় অধিবাসীরা বিদ্যার্জ্জন করিয়া থাকে। ৭৭ হাজার ছাত্রকে শিক্ষকগণ শিক্ষা দিয়া থাকেন।

বান্টু-সম্প্রদায় এখনও তাহাদের জাতীয় জীবনধারার পরিবর্ত্তন না করিয়াও প্রতিনিধিমূলক শাসননীতির মর্য্যাদা বুঝিতে শিক্ষা পাইয়াছে। উমতাতার কাছে 'মিলেন্‌গামা' নামক একটি খণ্ডশৈল বিদ্যমান। কিম্বদন্তী অথবা ইতিহাস এইরূপ যে, পুরাকালে কোনও কোনও সর্দ্দারের খেয়াল অনুসারে সর্দ্দারের অপ্রীতিভাজন ব্যক্তিকে এই শৈলশৃঙ্গ হইতে ভূমিতলে ফেলিয়া দিয়া হত্যা করা হইত। যাহারা এই সকল বর্ব্বর অত্যাচার প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, তাহাদের প্রপৌত্রগণ ইদানীং পার্লামেণ্টে বসিয়া সাম্প্রদায়িক বর্ব্বরতা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছে।

বান্টু-সম্প্রদায়ের টার্পিয়ান্ শৈল—
ইহার উপর হইতে প্রাচীনকালে অপরাধী ভূমিতলে নিক্ষিপ্ত হইত

দক্ষিণ-আফ্রিকায় হীরকখনি আছে, এ সংবাদ ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রচারিত হয়। "অরেঞ্জ" নদের ধারে "হোপ-টাউন" নামক স্থানে একটি শিশু খেলা করিতে করিতে একখানি পাথর কুড়াইয়া পায়। উহার ওজন ২১$\frac{1}{4}$ ক্যারাট। তার পর হইতেই দলে দলে মানুষ সেই অঞ্চলে ধাবিত হইয়াছিল।

জুলু-বাসগৃহের অভ্যন্তরভাগ

বিবাহার্থী টঙ্গা যুবক

বাণবিদ্ধ তিন্দুর পরিক্রমণ

জুলুরাজ্যের গণ্ডার

কারুক-মালভূমির মেষপাল

ভবিষ্যতের পতাকা

জুলুতরুণীর প্রসাধন

ব্লুমফনটেনের উদ্যান

রোডস্ স্মৃতিসৌধে যাইবার সুদৃশ্য রাজপথ

কিম্বারলি প্রদেশে বস্ত্রাবাস ও কুটীর নির্ম্মাণের হুড়াহুড়ি পড়িয়া গিয়াছিল।

আধুনিক কিম্বারলির পরিধি ৩ মাইলব্যাপী। উহার চারিদিকে কাঁটাতার দিয়া ঘেরা। এই বেষ্টনীর মধ্যে খনি, শ্রমিকদিগের বাসভবন, স্নানাগার, কোম্পানীর গুদামঘর, হাঁসপাতাল প্রভৃতি অবস্থিত। ৫ হাজার বানটু জাতীয় শ্রমিক এখানে কায করিয়া থাকে।

এই বানটু শ্রমিকরা বৎসরে ৬ মাস কায করিবার চুক্তিতে স্বেচ্ছায় এখানে আসিয়া থাকে। তাহারা উপার্জ্জিত অর্থ কোম্পানীর সেভিং ব্যাঙ্কে জমা রাখে। প্রতি সপ্তাহে ৭০ হাজার টন নীলাভ মৃত্তিকা খনি হইতে উখিত হইয়া থাকে। সেই মৃত্তিকা চূর্ণ করিয়া স্রোতের জলে ধৌত করা হয়। তার পর বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আহৃত পদার্থগুলির পরীক্ষা চলিতে থাকে। ক্রমে দানা দানা হীরক আবিষ্কৃত হয়।

অরেঞ্জ স্বাধীন রাজ্য, মালভূমিতে পূর্ণ। যদি প্রচুর বারি-সংস্থানের উপায় থাকিত, তাহা হইলে এই মালভূমি স্বর্ণশস্য প্রসব করিতে পারিত। এ স্থানের জমীর উর্ব্বরতা-শক্তি অসাধারণ।

একপুরুষ ধরিয়া বৃটিশ ধর্ম্মপ্রচারকদিগের দক্ষিণ-আফ্রিকায় উদার ধর্ম্মপ্রচার ও আদর্শ জীবনযাত্রা গঠনের কার্য্য ব্যাহত

নেটালে কদলী বাগান

গোক্ষুর সর্প হস্তে সর্প-পরিচালক

স্বর্ণখনিতে দেশীয়দিগের নৃত্য

হইয়াছিল। উহার প্রধান কারণ—বুয়রদিগের প্রচেষ্টা। তাহারা ক্রীতদাস-সমূহের দ্বারা দক্ষিণ-আফ্রিকায় কৃষিকার্য্যাদি পরিচালনা করিতেছিল। যখন প্রথম ক্রীতদাসপ্রথা রহিত করিবার ঘোষণা উক্ত অঞ্চলে প্রচারিত হয়, তখন বুয়রগণ অতিমাত্রায় হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল। অন্তরীপ প্রদেশে প্রায় ৩৯ হাজার ক্রীতদাস মুক্তিলাভ করে। উহার আনুষঙ্গিক ক্রিয়ার ফলে তাহারা দলে দলে অন্তরীপ ত্যাগ করিয়া যায়।

একহস্তে বাইবেল গ্রন্থ, স্কন্ধদেশে বন্দুক তুলিয়া মাল বোঝাই গাড়ীসহ মুক্ত ক্রীতদাসগণ অন্তরীপ হইতে বাহির হইয়া অপরিচিত, অজ্ঞাত স্থানাভিমুখে যাত্রা করে। দলবদ্ধ হইয়া চলিতে চলিতে তাহারা রাত্রিকালে এক স্থানে বিশ্রাম করিত, অনেক সময় তাহারা পানীয় বা আহার্য্যের অভাবে নিদারুণ কষ্টভোগও করিত। অসভ্য জুলুদিগের আক্রমণের আশঙ্কা হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য রাত্রিকালে শকটগুলির অন্তরালে থাকিয়া বন্দুক-হস্তে পাহারা দিত। তাহাদের সঙ্গে গৃহপালিত পশুর দলও থাকিত।

জুলু-বাসভবন

ব্লুমফন্টেনের বিচারালয়

হইয়াছিল যে, তাহারা সকলেই স্বাধীন, কিন্তু স্থানীয় অধিবাসীদিগের জমীজমা বলপূর্ব্বক অধিকার করা হইবে না—ক্রীতদাস-প্রথাও চলিবে না। এজন্য গৃহপালিত পশুর বিনিময়ে তাহারা স্থানীয় অধিবাসীদিগের নিকট হইতে জমী সংগ্রহ করিতে লাগিল।

কিন্তু এই দল ক্রমেই যত অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই আর শান্তিপূর্ণ অগ্রগমনরীতি চলিল না। তখন যুদ্ধ ও হত্যার অভিনয় আরব্ধ হইল।
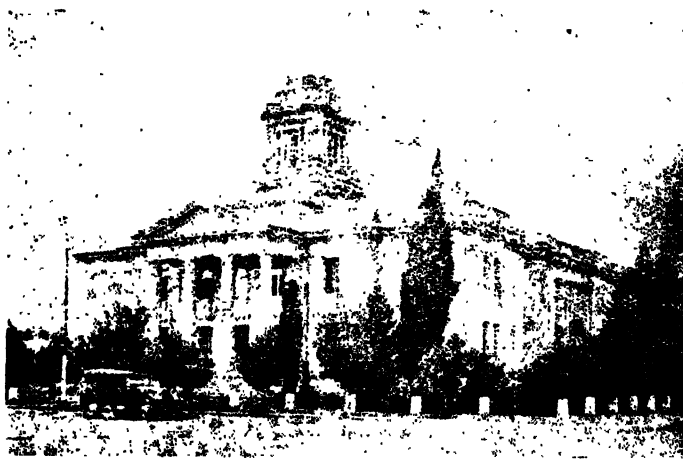
এইরূপে এক বৎসরকাল অরণ্য-প্রান্তরের মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে ভ্রাম্যমাণ বুয়রদলের প্রধান অংশ পায়েট রিটিফ, হেম্‌রিক পটজিটার প্রভৃতি শক্তিশালী নেতার অধিনায়কত্বে এক স্থানে উপনীত হইল। সেই স্থানের নামকরণ হইল 'ফ্রী ষ্টেট" বা স্বাধীন রাজ্য। এই দীর্ঘ দিনের মধ্যে দলের একটা শাসনরীতির ব্যবস্থা হইয়াছিল, কিন্তু ভগবানের আদেশই সর্ব্বপ্রধান বিধান বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল। ব্যবস্থা

ডিক্ কিংএর প্রতিমূর্ত্তি

ডার্ব্বানের মসজেদ
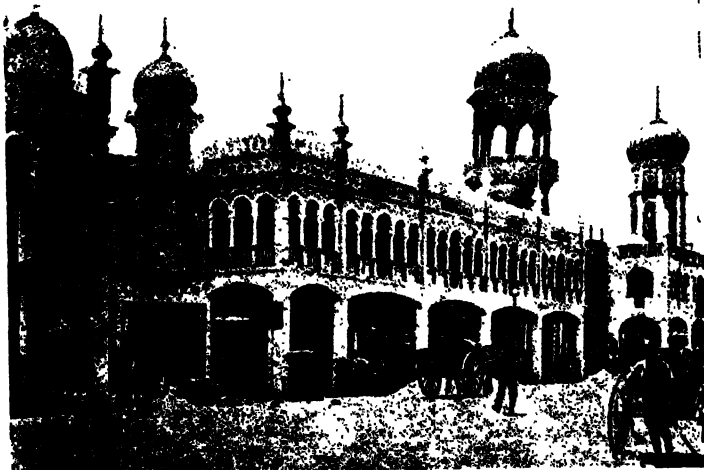
জুলুবাহিনী পুনঃ পুনঃ তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিল। সে আক্রমণে অনেক দ্রব্য লুণ্ঠিত হইল; বহু নরনারী ও বালক-বালিকার জীবন সমরানলে আহুতি প্রদত্ত হইল। জুলুগণ পশ্চাতে হটিয়া যাইবার সময় বনে আগুন দিয়া চলিয়া গেল। তখন এই ভ্রাম্যমাণ দলের সম্মুখে শুধু ক্ষুধাতৃষ্ণার বিভীষণ ভ্রূকুটি দানবের মত বিভীষিকার সঞ্চার করিয়া দাঁড়াইল।

ইতিহাস দৃষ্টে দেখা যায়, ১৮৩৩ হইতে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে অন্তরীপের ওলন্দাজ বন্দিগণের মধ্যে ১০ হাজার লো

অরেঞ্জ নদ পার হইয়া ফ্রীষ্টেট ও ট্রান্সভাল প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। এজন্য অনেক দলকে এক সহস্র মাইল পথ অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। কিম্বদন্তীর উপর আস্থা থাকিলে, ইহা প্রমাণিত হয় যে, এক দল লোক দক্ষিণ-ট্রান্সভালের পথে নীল নদ ভাবিয়া অগ্রসর হইয়াছিল। তাহারা মিশরে যাইতেছে মনে করিয়া নৌকা নির্ম্মাণ করিয়া জলে ভাসাইয়া দিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে তাহারা নদীপথে লিম্পুনদে উপনীত হয় এবং পরিশেষে ডেলাগোয়া উপসাগরে উপনীত হয়।

পিটারমার্টিজবার্গের প্রাচীন ধর্ম্ম মন্দির

ডার্ব্বানে হিন্দু-উৎসব
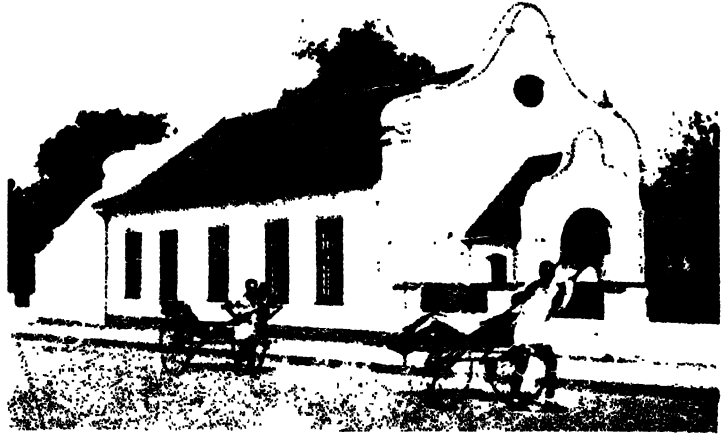
সহরের শেষভাগে 'ফন্‌টেন্‌' শব্দ যুক্ত, তাহার অর্থ তৃষ্ণাহর। কোন উৎস-ধারার জলে ভ্রাম্যমাণদিগের তৃষ্ণা নিবারিত হইয়াছিল। "রষ্ট" শব্দ হইতে বিশ্রাম বুঝাইবে। যেমন রষ্টেন্‌বর্গ (বিশ্রাম-স্থান)। রষ্ট-এন্‌-ভ্রড্‌ মানে বিশ্রাম ও শান্তি।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে অরেঞ্জ স্বাধীন রাজ্য বলিয়া স্থানের নাম বিঘোষিত হয়। বুয়রগণ নূতন স্থানে বসবাস আরম্ভ করিয়াই তথায় পার্লামেণ্ট বিধান অনুসারে

তথায় তাহারা ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হইয়া অথবা বিষাক্ত মশক-দংশনে প্রাণত্যাগ করে। পশু ও মানুষ কাহারই প্রাণরক্ষা হয় নাই।

এই "ভুরট্রেকার্শ" দলের অস্তিত্ব এখন নাই; কিন্তু তাহাদের কাহিনী দক্ষিণ-আফ্রিকার বিভিন্ন স্থানের স্মৃতির সহিত বিজড়িত। মুরড্রিফ্‌ট অর্থে হত্যাস্থান। উইনেস্‌ এক দলের স্মৃতি জাগ্রত রাখিয়াছে। এই সকল স্থানে ভীষণ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়াছিল। যে সকল

প্রিটোরিয়ার গবর্ণরের প্রাসাদ

ট্রান্সভালের তৃণপরিচ্ছদধারিণীর নৃত্য

করে। এখনও আডাম্ কক্এর প্রতিমূর্ত্তি কক্ষ্টাডে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

ব্লুম্‌ফন্‌টেন অরেঞ্জ স্বাধীন রাজ্যের প্রধান নগর। ইহা এ অঞ্চলের শিক্ষারও প্রধান কেন্দ্র। বড় বড় ইমারত, শাসকের মনোরম প্রাসাদ ও পুষ্পশোভিত উদ্যান এখানকার সৌন্দর্য্যকে নয়নমনোমনোহর করিয়া রাখিয়াছে। এখানে গৃহপালিত পশুর বাজার প্রসিদ্ধ। গো, মহিষ, মেষ প্রভৃতি পশুর শুধু সংখ্যা অধিক নহে, তাহারা যেরূপ যত্নের সহিত প্রতিপালিত হইয়া থাকে, তাহা অন্যত্র দুর্লভ।

শাসনরীতি প্রবর্ত্তিত করে। অর্দ্ধ-শতাব্দীকাল এইভাবেই ছিল।

আর এক দল লোক—মুক্ত ক্রীতদাস আডাম্ কক্এর নেতৃত্বে অন্তরীপ ত্যাগ করে। এই দলে শ্বেতকায় ও হটেন্‌টট-দিগের সংমিশ্রণজাত নরনারী ছিল। অন্তরীপ ত্যাগ করিয়া তাহারা 'নামাকোয়া-ল্যাণ্ড' অভিমুখে অগ্রসর হয়। ক্রমে বহু বৎসর পরে এই দল পূর্ব্ব-গ্রীকোয়াল্যাণ্ডে আসিয়া কক্ষ্টাড্ নামক নগরের পত্তন

ক্রুগার পার্কের জেব্রা

মডার নদ ব্লুম্‌ফন্‌টেনের কৃষিক্ষেত্র-গুলির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। মডার নদ হইতে খাল কাটিয়া অনেক কৃষিক্ষেত্রকে উর্ব্বর করিয়া তুলা হইয়াছে। কৃষিবিদ্যালয়গুলি এখানে ক্রমেই উন্নতির পথে চলিয়াছে।

[illegible]

নেটাল অঞ্চলকে একটা বিস্তৃত উদ্যানরাজ্য বলিয়া পর্য্যটকগণ বর্ণনা করিয়াছেন। এখানে চিরদিনই শ্যামলতা বিরাজমান। পর্ব্বতশীর্ষ হইতে অবতরণ করিয়া যে জলধারা নদীতে পতিত হইতে

প্রান্তর বা সমুদ্রপথে নেটালে প্রবেশ করিলেই সেই একই তৃণহরিৎ শ্যামলতার মধুর দৃশ্য দর্শকের নয়ন ও মনকে অভিভূত করিবে। শীতঋতুতেও শ্যামলতার দৃশ্য মুছিয়া যায় না।

নেটালে বহু ভারতীয় নরনারী বিদ্যমান। ক্রীতদাসপ্রথা রহিত হইবার পর ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে স্থানীয় ইক্ষুক্ষেত্রের য়ুরোপীয় মালিকগণ ভারতবর্ষ হইতে শ্রমিক আমদানী করিতে থাকেন।

ইদানীং নেটালের শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীর সংখ্যা পূর্ব্ব-ভারতীয়দিগের অপেক্ষা বিশেষ অধিক নহে। এসিয়াবাসী ও বান্টুদিগকে ধরিলে, তাহাদের সংখ্যা শ্বেতাঙ্গদিগের ৮ গুণ হইবার সম্ভাবনা।

জুলুরা ঢাল তৈয়ারীর চর্ম্ম পরিষ্কার করিতেছে

জুলু-চিকিৎসকের চিকিৎসাপ্রণালী

জুলুদিগের বাসভূমি ডার্ব্বান হইতে ১ শত মাইল উত্তরদিকে সমুদ্রকূলে অবস্থিত। বর্ষাকালে জুলুল্যাণ্ড জলপ্লাবিত হইয়া যায়। এই জলপ্লাবন অত্যন্ত আকস্মিকভাবে আবির্ভূত হয়। তাহার ফলে অনেকে জলে ডুবিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে।

না। তাহারা নদীর তীর ও পর্ব্বতশৃঙ্গের ভক্ত। জুলুদিগের মধ্যেও অতিধীরে সভ্যতার আলোক প্রবেশ করিতেছে। তাহাদের বেশভূষারও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। তবে উমফোলোজি নদের অপর তীরবর্ত্তী অরণ্যে খাঁটি জুলু দেখিতে পাওয়া যায়।

জুলুদিগের মধ্যে প্রেম-নিবেদনের এক প্রকার বিচিত্র পদ্ধতি আছে। জুলু তরুণ-তরুণীরা শ্বেত, পীত, রক্ত ও নীল

প্রভৃতি, বর্ণরঞ্জিত পুঁতির মালা পরিধান করিয়া প্রেম নিবেদন করিয়া থাকে। শ্বেতবর্ণের মালার অর্থ—"তোমার সহিত আমার প্রেম হইয়াছে।" যদি মালার মধ্যে কৃষ্ণবর্ণের পুথি সন্নিবিষ্ট থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, "প্রেম হইলেও মিলনের পথে কিছু কিছু বাধা আছে।" ঈষৎ লাল বা পাটলবর্ণ পুঁতির সমাবেশ থাকিলে, তাহার এই অর্থ হইবে যে, "বিবাহার্থী পুরুষের বা নারীর পক্ষ হইতে যৌতুকস্বরূপ গৃহপালিত পশু পাওয়া যাইবে না, সুতরাং বাধা আছে।" সবুজবর্ণ পুঁতির অর্থ, "সুতরাং আমার দুর্ব্বল মন তোমাকে গ্রহণ করিতে পারিতেছে না।"
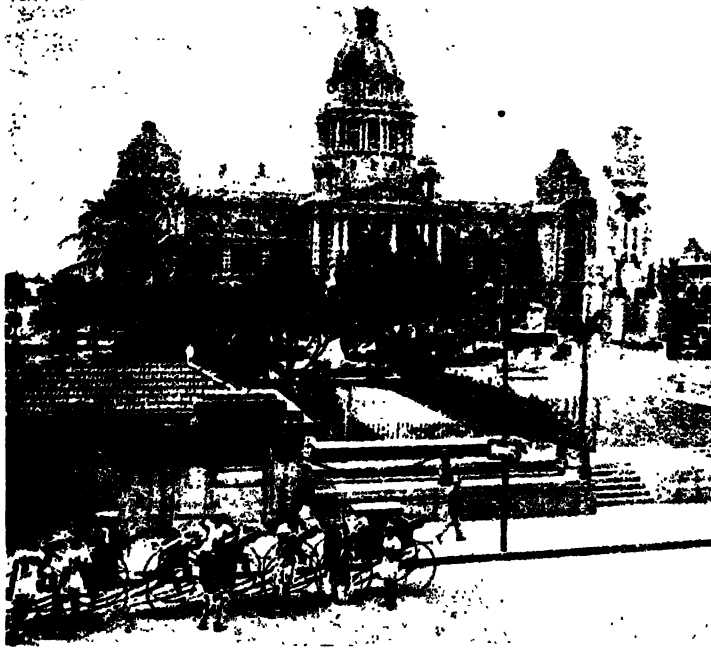
ডার্ব্বানের সাধারণ উদ্যান

প্রায় অর্দ্ধ-ডজন বিভিন্ন বর্ণ-বিশিষ্ট মালার সাহায্যে জুলু তরুণ-তরুণীরা তাহাদের প্রেমের দৌত্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে—ভাষার সাহায্যে প্রকাশ করিবার প্রয়োজন হয় না। ইহাদের বিবাহব্যাপার দুই দিবসব্যাপী হইয়া থাকে। উৎসবব্যাপারে নৃত্য ও গীতই
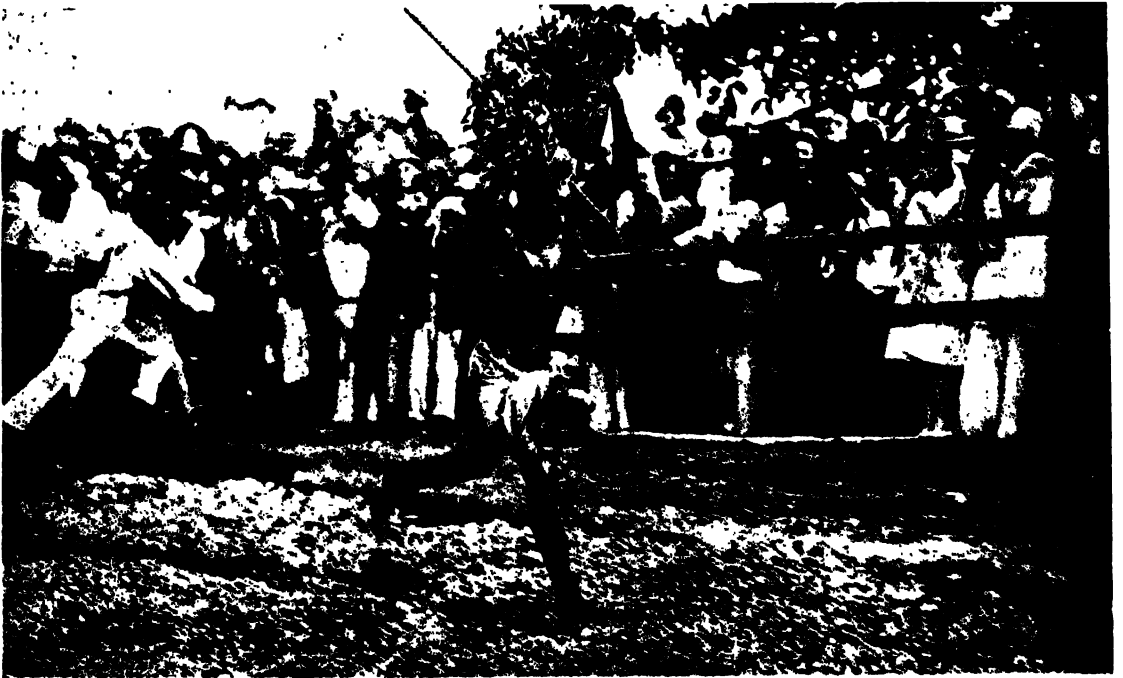
ডার্ব্বানে হিন্দুর অগ্নিপরীক্ষা

প্রধান। গানের মধ্যে, "আমি ইচ্ছা করিয়াই আমার আত্মীয়-স্বজনের নিকট হইতে বিদায় লইতেছি," পুনঃ পুনঃ গীত হইতে থাকে। কন্যা ও তাহার সহচরীরাই এই গান গাহে। বরপক্ষ হইতে গান শুনা যায়,—"বাঃ! গুলী মোটে নাই! তবে কি হইবে?"

জোহান্সবার্গের রাজপথ

বধূ প্রথমতঃ তাহার স্থান হইতে স্বামীর আবাস অভিমুখে কোনমতেই যাইতে চাহে না। পুনঃ পুনঃ দূতগণ আসিয়া তাহাকে যাইবার জন্য অনুরোধ জানাইতে থাকে। অতঃপর সে স্বামীর উপহৃত দ্রব্যাদি পরিদর্শনের জন্য গমন করে। একটি বৃক্ষশাখায় দ্রব্যগুলি ঝুলিতে থাকে। বিবাহ-সাজে সজ্জিতা, অলঙ্কার-ভূষিতা বধূ সমস্ত দ্রব্য পর্য্যবেক্ষণ করিবার পর বর-বধূর মধ্যে এই প্রকার বাক্যের বা প্রতিশ্রুতির আদান-প্রদান হইয়া থাকে। বধূ বলে, "আমি আসিয়াছি। তুমি আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করিবে ত? তুমি আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিবে,
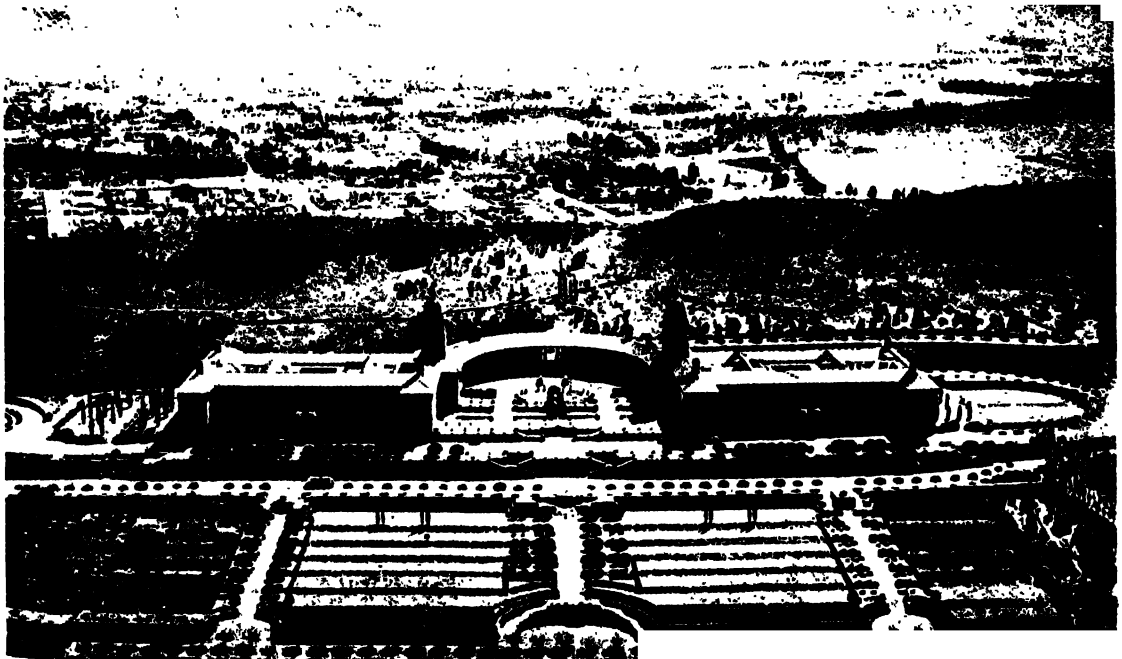
প্রিটোরিয়ার উদ্যান

আমিও তোমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পালন করিব।" বর তখন বলে, "সম্মত আছি। তুমিও আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করিবে ত ?"

ইহার পর নৃত্য-গীত চলিতে থাকে। সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিলে উৎসবভঙ্গ হয়। দ্বিতীয় দিবসে ভোজ হয়। বধূ তখন তাহার কুমারী-কালের কর্ণাভরণ-গুলি সমবেত কুমারীগণের ভিতর বণ্টন করিয়া দেয়। তার পর বিবাহের শেষ কার্য্য আরম্ভ হয়। বধূ অকস্মাৎ দৌড়িতে থাকে। বর স্বয়ং অথবা তৎপক্ষে নিয়োজিত কোনও ব্যক্তি

কিম্‌বারলির হীরকখনি

বধূকে দৌড়িয়া ধরে। তার পর উভয়ের বিবাহক্রিয়া যথারীতি সম্পাদিত হয়।

নেটাল—ডরবানের ইতিহাসে জুলুদিগের বিচিত্র কাহিনী পাঠ করা যায়। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে জুলু সর্দ্দার চাকা নিহত হয়। তাহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ডিঙ্গান্ শাসনদণ্ড গ্রহণ করে। ডিঙ্গানের সভায় পায়েট রিটিফ সদলবলে উপস্থিত হন। তাঁহারা বসবাস করিবার জন্য কিছু জমী ভিক্ষা করেন। ডিঙ্গান্ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বুয়রদিগকে নিরস্ত্র করে। তার পর তাহাদিগকে হত্যা

রক্ষিত অরণ্যের জিরাফ

উদ্যানবাসী সিংহ

হয়। ওলন্দাজগণ সঙ্গোপনে অগ্রসর হইয়া বৃটিশ শিবির আক্রমণ করে। এখন যেখানে পুরাতন দুর্গ স্থাপিত, সেই স্থানেই বৃটিশ শিবির অবস্থিত ছিল।

গ্রাহাম্‌স্‌ সহরে ইংরাজদিগের একটি সামরিক কেন্দ্র ছিল। অবরুদ্ধ ইংরাজগণ সেখানে সংবাদ পাঠাইতে পারিলে সাহায্য পাইতে পারেন; কিন্তু ৬ শত মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে কে সংবাদ লইয়া যাইবে? পথ অতি দুর্গম ও বিপৎসঙ্কুল। ডিক্‌ কিং নামক এক জন অসমসাহসী ব্যক্তি
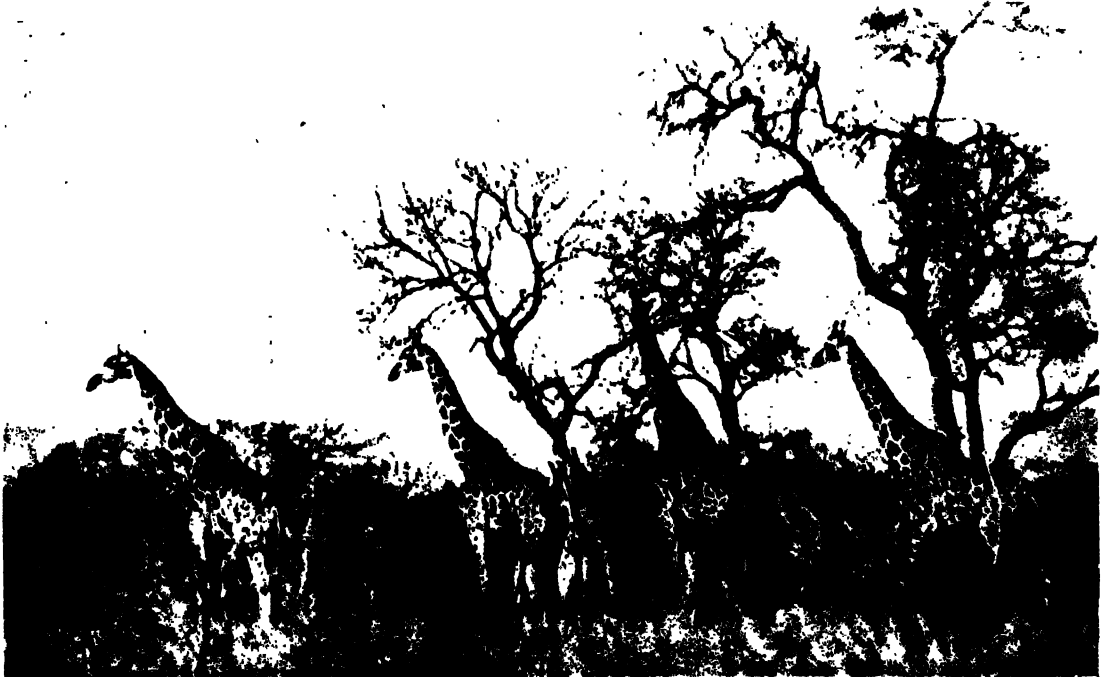
করে। এই ভীষণ ব্যাপারে নেটালে শ্বেতকায়দিগের বসবাস করা বিপজ্জনক হইয়া উঠে। আণ্ড্রিজ প্রোটোরিয়স্‌ একটি দল গঠন করিয়া জুলুরাজের ১০ হাজার সেনার বিরুদ্ধে অভিযান করেন এবং শোণিতনদের যুদ্ধে তাঁহাদিগকে পর্য্যুদস্ত করেন।

তার পর বিজয়ী ওলন্দাজগণ ও নেটালবন্দরের ইংরাজগণ পিটার মার্টিজ-বর্গে একটি সাধারণতন্ত্র স্থাপিত করেন। ইহার ফলে আন্তর্জ্জাতিক কলহ আরব্ধ

পচেফ্‌ষ্ট্রুমের কৃষি-বিদ্যালয়

এই দুরূহ কার্য্য-সম্পাদনের ভার গ্রহণ করেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের মে মাসের এক নিশীথকালে কিং জনৈক জুলু ভৃত্যের সহিত অশ্বারোহণে গ্রাহাম্‌স্‌ টাউনে যাত্রা করেন। সম্মুখে বিস্তৃত অরণ্য, সাতটি নদী। নদীর জলে কুম্ভীর ও সিন্ধুঘোটকের বাহুল্য। অশ্বারোহীরা অসমসাহসে ভর করিয়া নদী পার হইলেন। পথে খাদ্য নাই, পিস্তলের সাহায্যে যাহা কিছু শিকার করা হইত, তাহাতেই তাঁহাদিগকে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে হইত। অবশেষে ক্লান্ত জুলু বালক আর অগ্রসর

জোহান্সবার্গের পশুশালায় সিংহশিশুসহ বালকযুগল

হইতে না পারিয়া ফিরিয়া গেল। কিং ভগ্নোদ্যম না হইয়া আরও শত মাইল অগ্রসর হইলেন। চারিদিকে শত্রু। কিন্তু বীরহৃদয় উৎসাহহীন হইল না। প্রাণপণ চেষ্টায় তিনি অবশেষে গ্রাহামস্ টাউনে পৌছিয়া ইংরাজের বিপদের বার্ত্তা প্রদান করিলেন।

গ্রাহামস্ সহরের আনারস-ক্ষেত্র

এক মাসের মধ্যে এক দল সেনা নেটালবন্দর হইতে যাত্রা করিল। ইহার কয়েক বৎসর পরে ডার্ব্বান বৃটিশ সম্রাটের অধিকারভুক্ত হইল। ডিক্ কিংএর ব্রোঞ্জ-মূর্ত্তি ডার্ব্বান সহরে প্রতিষ্ঠিত হয়।

ট্রান্সভালএ স্বর্ণ-খনির সংখ্যা অপর্য্যাপ্ত, পচেফষ্ট্রম্ ট্রান্সভালের সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন সহর। এখানে শিক্ষার কেন্দ্র, বিশেষতঃ কৃষি-সংক্রান্ত বিদ্যার প্রভৃত আলোচনা এখানে হইয়া থাকে। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দ হইতে কৃষি-বিদ্যালয় এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়। বুয়র নেতা হেন্‌রিক্ পটজিটার সদলবলে এখানে প্রথম উপনীত হইয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। ৮০ হাজার মাটাবেলী জুলু সর্দ্দার চাকার সেনাপতি মাসিলি কেজীর অধীনতায় বুয়রদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু বুয়রগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য

রক্ষিত অরণ্যের সিংহদম্পতি

প্রতিষ্ঠা করিয়া ক্রমেই বলশালী হইয়া উঠে।

জোহানেস্‌বার্গ সহর স্বর্ণ-খনির জন্য প্রসিদ্ধ। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে জর্জ্জ ওয়াকার নামক এক ব্যক্তি এক স্থানে স্বর্ণের সন্ধান পান। সেই স্থানে যে পাহাড় ছিল, তাহার মধ্যে পরে ৭০ মাইল দীর্ঘ স্বর্ণ-পূর্ণ স্থান আবিষ্কৃত হয়। এই স্থানে জন-মানবের বসতি পূর্ব্বে ছিল না। কিন্তু এই ঘটনার পর এখানে ক্রমে সহর প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন জোহানেস্‌বার্গের অধিবাসীর সংখ্যা ৩ লক্ষ। এখানে মিউনিসিপ্যালিটী আছে, ৮৪ বর্গ মাইল স্থান মিউনিসিপ্যালিটীর অধিকারভুক্ত।

কেপটাউনের "সিটি হল"

হোয়াইট নদের পারে রক্ষিত অরণ্য আছে। এই অরণ্যে নানাপ্রকার জীবজন্তু প্রতিপালিত হয়। আমেরিকার প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও লেখক মেলভিলি চ্যাটার দক্ষিণ-আফ্রিকা পরিভ্রমণ-কালে এই রক্ষিত বিরাট অরণ্যের মধ্য দিয়া মোটরযোগে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার লেখায় দেখা যায় যে, এই অরণ্যে সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী, গণ্ডার, জিরাফ, জেব্রা প্রভৃতি বহুবিধ জীবজন্তু রক্ষিত আছে। এই অরণ্যে কাহারও শিকার করিবার অধিকার নাই এবং পর্য্যাপ্ত আহার-প্রাপ্ত জীবগণ সাধারণতঃ কাহারও হিংসা করে না। মিঃ মেলভিলি চ্যাটারের মোটর-গাড়ীর সম্মুখে প্রায় ৫০ গজ দূরে শাবকসহ এক সিংহী আসিয়া পড়িয়াছিল। পশুরাজমহিষী কয়েক মুহূর্ত্ত গর্ব্বিত দৃষ্টিতে আরোহী সহ মোটর-গাড়ীর দিকে চাহিয়া অরণ্যমধ্যে চলিয়া যায়। অরণ্যের মধ্য দিয়া মোটর চলিবার বিস্তৃত পথ বিদ্যমান। এই রক্ষিত অরণ্যের নাম "ক্রুগার ন্যাশনাল পার্ক।"
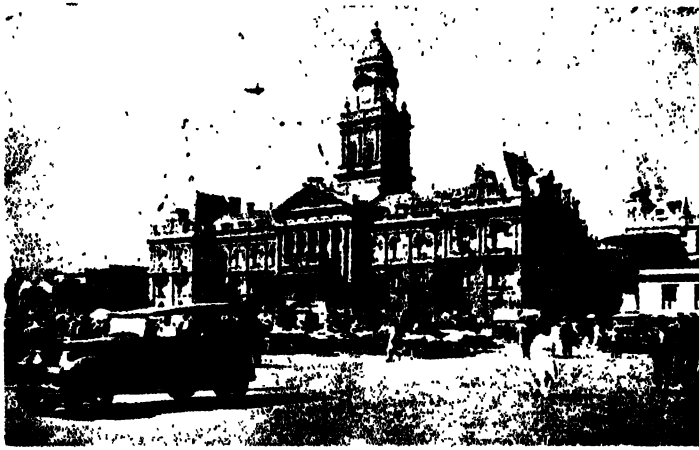
প্রেসিডেণ্ট ক্রুগার

শোণিত নদের যুদ্ধে আন্‌ড্রিস্ প্রেটোরিয়সের জয়লাভ হওয়ায় যে নগর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহারই নাম প্রিটোরিয়া। এই নগরের বয়ঃক্রম ৭৬ বৎসর, এই নগরে অতীতযুগের ও বর্ত্তমানকালের সহস্র স্মৃতিচিহ্ন সযত্নে রক্ষিত আছে। বুয়রযুদ্ধের সময় প্রিটোরিয়া ইতিহাসপ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

মহিলা-মঙ্গল

(আলোচনা)

বিগত ১৮ই বৈশাখ শুক্রবার অপরাহ্ণে কলিকাতার টাউন-হলে নিখিল বঙ্গনারী সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন হইয়াছিল। বঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে বহুসংখ্যক মহিলা এই অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীমতী মোহিনী দেবী অভ্যর্থনা সমিতির সভানেত্রীরূপে একটি অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি প্রসঙ্গক্রমে নারীর রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে যে সকল কথার আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার যুক্তির সারবত্তা ও দূরদর্শিতা পরিস্ফুট হইয়াছিল। কুমারী শান্তি দাস ও শ্রীমতী জ্যোৎস্না মিত্র এই সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে এই বিরাট নারী-সম্মেলন সম্পূর্ণ নূতন ব্যাপার। কিন্তু এই মহাসম্মেলনের সভানেত্রী শ্রীযুক্তা সরলা দেবী-চৌধুরাণী প্রদত্ত অভিভাষণে নারীর স্বার্থসংরক্ষণ প্রসঙ্গে পুরুষ-সমাজের প্রতি যে তীব্র কটূক্তি বর্ষিত হইয়াছিল, তাহা পাঠ করিয়া এ দেশের পুরুষ-সমাজকে স্তম্ভিত হইতে হইয়াছে। অভিভাষণটি ১লা মে'র পরিবর্ত্তে ১লা এপ্রিল তারিখে পঠিত হইলেই শোভন হইত এবং বঙ্গের হিন্দু-মুসলমান পুরুষ-সমাজ তাঁহার ন্যায় সুশিক্ষিতা, সুরুচিসম্পন্না, পাশ্চাত্য-ভাবাপন্না ব্রাহ্মমহিলার সুশাণিত বাক্যবাণগুলি শিরোধার্য্য করিয়া 'আহাম্মুখ' (এপ্রিল ফুল) সাজিতে আপত্তি করিত না। বিশেষতঃ গালিগালাজ নারীর মুখেই শোভা পায়, তা তিনি ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামের মৎস্যবিপণি হইতেই তাহা বর্ষণ করুন আর বঙ্গের প্রধান নগর কলিকাতা সহরের টাউনহলের বক্তৃতামঞ্চ হইতেই অজস্রধারায় খয়রাত করুন। যে গালিবর্ষণে নারীর জন্মগত অধিকার স্বীকার করিতে পুরুষ-সমাজ বাধ্য, তাহার পয়তারার ঘটা দেখিয়া আমরা কোন কথাই বলিতাম না—যদি তাঁহাকে নারীর পক্ষে ওকালতি করিতে গিয়া পুরুষের মিথ্যা কলঙ্কের বিশাল ধ্বজা চটুল বাক্যের ফাঁসে বাঁধিয়া টাউনহলের সৌধ-শিরে উড়াইতে না দেখিতাম। যে সকল বঙ্গ-মহিলা বঙ্গের অলঙ্কার, যাঁহাদের বিদ্যা-বুদ্ধির প্রখরতায়, সাহিত্যানুরাগে, সঙ্কল্পের দৃঢ়তায়, স্বদেশ-প্রেমের গভীরতায় সমগ্র বাঙ্গালী জাতি গৌরব অনুভব করেন, তাঁহারা যদি কাল্পনিক স্বার্থনাশের আশঙ্কায়, পুরুষ পদে পদে তাঁহাদের প্রতি অবিচার করিতেছে—এই অলীক অভিযোগ প্রকাশ্য বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইয়া সমগ্র পুরুষ-সমাজের বিরুদ্ধে কুটিলতা, স্বার্থপরতা, একদেশদর্শিতা, নারীনিগ্রহপ্রীতি, স্বেচ্ছাপরতন্ত্রতা ও আত্মসুখপরায়ণতা প্রভৃতি দোষের আরোপ করিয়া গালিবর্ষণ দ্বারা সমাগতা মহিলামণ্ডলী

শ্রীযুক্তা সরলা দেবী—নিখিল বঙ্গনারী মহাসম্মেলনের সভানেত্রী

কর্ণকুহরে সুধাসেচন করেন, তাহা হইলে "স্মারং স্মারং স্বগৃহ-চরিতং দারুভূতো মুরারিঃ"—আমাদের পুরুষ বেচারাগণের গৌরাঙ্গ কাঠ হইয়া যায় এবং আক্ষেপ করিয়া বলিতে ইচ্ছা হয়, 'গুণ হৈয়া দোষ হৈল বিদ্যার বিদ্যায়!'

কিন্তু কালের ইহা স্বধর্ম্ম।

শ্রীযুক্তা দেবী চৌধুরাণী মহাশয়া তাঁহার অভিভাষণের প্রারম্ভেই বলিয়াছেন, "এই কংগ্রেস (নারী-মহাসম্মেলন) বঙ্গনারীর আত্মচেতনার মূর্ত্ত বিকাশ, বাঙ্গালার পুরুষের আত্মচেতনার সহিত তাহার সম্পর্ক নাই।"—তাঁহার এই উক্তি কি সত্য? আজ বাঙ্গালার পুরুষ যদি স্বদেশপ্রেমে আত্মহারা হইয়া ত্যাগী সন্ন্যাসীর ন্যায় পথে আসিয়া না দাঁড়াইত, যদি তাহারা স্বদেশের ও স্বজাতির মঙ্গল-কামনায় স্বেচ্ছায় কারা-বরণ না করিত, যদি আমরা মহাত্মা গন্ধী, স্বর্গীয় দেশবন্ধু, সর্ব্বত্যাগী রিক্ত-সর্ব্বস্ব মতিলাল, তেজোবীর্য্যের অবতার পেটেল প্রভৃতিকে আদর্শ-রূপে না পাইতাম, পুরুষ যদি না জাগিত, তাহা হইলে কি এ দেশে নারী-জাগরণ সম্ভবপর হইত? গৃহলক্ষ্মীরা যদি তাঁহাদের স্বামী, ভ্রাতা, পুত্র প্রভৃতির সহানুভূতি ও সম্মতি না পাইতেন, তাহা হইলে কি তাঁহারা শুদ্ধান্তের উচ্চ অবরোধ লঙ্ঘন করিয়া রাজপথে—রাজদ্বারে—পল্লীর শ্মশান-প্রান্তে তাঁহাদের পাশে আসিয়া দাঁড়াইতেন? হাসিতে হাসিতে কারাবরণ করিতেন? শত নির্য্যাতনে অটল থাকিতেন? সুতরাং পুরুষকে খর্ব্ব করিয়া, আত্মনিগৃহীতা নারীর ত্যাগের মহিমা কীর্ত্তন দ্বারা তিনি নারীজাতিকে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করায় আমাদের মাতা, পত্নী ও ভগিনীর নিঃস্বার্থ অবদানের জন্য আমরা যতই গৌরব অনুভব করি—দেবী চৌধুরাণী সত্যের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে।

শ্রীযুক্তা গিরিবালা রায় এবং
শ্রীযুক্তা সুশীলাবালা সেন

শ্রীযুক্তা দেবী চৌধুরাণী ইহার পরই আর একটি অসার অশ্রদ্ধেয় উক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহা বঙ্গদেশের পুত্র-কন্যার জননীগণ সত্য বলিয়া স্বীকার করিবেন কি? তিনি বলিয়াছেন, "শৈশবে তাঁহার মাতা তাঁহাকে অনেক সুখাদ্য হইতে বঞ্চিত করিলেন। সেগুলি সঞ্চিত রহিল তাঁহার ভ্রাতাদের জন্য।"—মাতা কন্যাকে সুখাদ্যে বঞ্চিত করিয়া সেগুলি তাঁহার পুত্রদের জন্য সঞ্চিত রাখিলেন—ইহা কি তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফল? তিনি কি করিয়া বাঙ্গালার জননীদের বিরুদ্ধে এরূপ অসঙ্গত কথা বলিতে সাহস করিলেন? জননী কন্যাকে বঞ্চিত করিয়া সুখাদ্যগুলি পুত্রের মুখে তুলিয়া দিয়া থাকেন—এই অভিযোগ পুত্র-কন্যার জননীরা সত্য বলিয়া স্বীকার করিবেন কি? বরপণ-প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়ায় আজ বাঙ্গালার ঘরে ঘরে অশ্রুর ফল্গু-প্রবাহ প্রবাহিত হইতেছে। স্নেহময়ী কন্যাকে সুপাত্রে সম্প্রদান করিবার জন্য অনেক বাঙ্গালী পৈতৃক বাস্তু-ভিটা বন্ধক দিতেছেন, বিক্রয় করিতেছেন; আমরা অভিজ্ঞতা হইতে জানি, সমাজের কোন সম্মানিত ব্যক্তি তাঁহার প্রাণাধিকা কন্যাকে সুপাত্রে সম্প্রদানের জন্য উপযুক্ত অর্থের অভাবে তাঁহার বহুকষ্টে নির্ম্মিত পল্লীভবন বন্ধক দিতে উদ্যত হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহার পাঁচ পুত্রের সুশিক্ষার জন্য তাঁহাকে এতখানি স্বার্থত্যাগ করিতে হয় নাই। কিন্তু গরজ বড় বালাই! দেবী চৌধুরাণী মহাশয়া দেশের

শ্রীযুক্তা জ্যোৎস্না মিত্র
মহিলা ভলেণ্টিয়ারের কাপ্তেন

মহিলা কংগ্রেসের নারী সদস্যগণসহ শ্রীযুক্তা সরলা দেবী, শান্তি দাস, জ্যোৎস্না মিত্র

হৃৎপিণ্ডস্বরূপ বাঙ্গালার পল্লী-জীবন সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা লাভ না করিয়াই বালিকার পিতা-মাতার উপর নিষ্ঠুরতা ও পক্ষপাতের আরোপ করিয়াছেন, নতুবা তাঁহার যুক্তি শক্তিহীন হইয়া পড়ে! বঙ্গের সর্ব্বত্র গৃহস্থ পরিবারে নারীই গৃহের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। পুরুষ উদয়াস্ত পরিশ্রম করিয়া, মাথার ঘাম পায় ফেলিয়া উপার্জ্জন করে, গৃহিণী সাংসারিক শৃঙ্খলা-বিধানের জন্য সেই অর্থ সংসারের কার্য্যে ব্যয় করেন, নারী ঘরে বসিয়া সংসার চালাইবার ব্যবস্থা করেন; কদাচিৎ ইহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু বঙ্গের পনেরো আনা গৃহস্থের ঘরে এই ব্যবস্থা। পল্লীজীবন সম্বন্ধে অনভিজ্ঞা দেবী চৌধুরাণী মহাশয়া এই সকল অসার কথায় সমবেত মহিলাগণের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের ব্যবস্থার ফলে বাঙ্গালীর শান্তিপূর্ণ পরিবারে অশান্তির আগুন জলিয়া উঠিয়া ভবিষ্যতের গৃহসুখ, পারিবারিক শান্তি, আনন্দ বিধ্বস্ত করিতে পারে, তাহা তিনি ভাবিয়া দেখিবার সুযোগ লাভ করিতে পারেন নাই। বাঙ্গালীর সংসারে সুখশান্তির অস্তিত্বই যদি বিলুপ্ত হইল, তাহা হইলে নারীর ভুয়া স্বাধীনতার মূল্য কি? সমাজের উচ্চস্তরের পাঁচ জন নারী স্বাধীনতা লাভ করিলেই বা সুবিস্তীর্ণ বাঙ্গালী সমাজের কি ক্ষতি-বৃদ্ধি?

বস্তুতঃ শ্রীযুক্তা দেবী চৌধুরাণীর অভিভাষণের আদ্যোপান্ত যে বিদ্রোহের সুরে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে—দেশের পক্ষে, আমাদের সমাজের মেরুদণ্ড পল্লীজীবনের পক্ষে তাহা সম্পূর্ণ অনুপযোগী, অস্বাস্থ্যকর, অশান্তি-উৎপাদক। ইহা পাশ্চাত্য নারীর স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তার অতি কদর্য্য অনুকরণ। বঙ্গপল্লীর সতী সাধ্বী গৃহিণীগণ স্বামিপুত্র লইয়া সুখে শান্তিতে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। তিনি তাহাদিগকে খুঁচাইয়া তাহাদের স্বামি-পুত্রের বিরুদ্ধেবিদ্রোহী করিবার চেষ্টা করিতেছেন; তাহাদের সংসারে আগুন জালিবার জন্য বলিয়াছেন, "পুরুষ তাহার নিজ স্বার্থোদ্দেশ্যেই নারীকে ব্যবহার করিয়াছে, নারীর নিজ প্রয়োজন পূরণ করিতে

বিশেষ কোন সাহায্যই সে করে নাই, নারীর মনের ভাব পুরুষ কোন দিন অনুভব করে নাই" ইত্যাদি কি কালাপাহাড়ী উক্তি নহে? এই সকল উক্তি হয়ত সমাজের তথাকথিত উচ্চস্তরে বড় বড় নগরের সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য পরিবার সম্বন্ধে খাটিতে পারে, কিন্তু সমাজের যাহারা মেরুদণ্ড, তাহাদের সম্বন্ধে ইহা অত্যুক্তিমাত্র।

মহিলা কংগ্রেসে রামমোহন বালিকা-বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ কর্তৃক উদ্বোধন সঙ্গীত

তিনি আরও বলিয়াছেন, "বহু দিন হইতে মনের অন্তরালে বদ্ধমূল এই ধারণাগুলি প্রকাশ এবং সমাজের বুকে নিজেদের স্থান প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য বাঙ্গালার নারীগণ আজ ভারতে এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের নারীদের সহিত সমভূমে দণ্ডায়মান হইয়াছে।" কিন্তু কাহারা ঐ ভাবে দণ্ডায়মান হইয়াছে? বাঙ্গালার লক্ষ লক্ষ গৃহস্থ পরিবারভুক্তা, স্বামী পুত্র ভ্রাতা দেবর প্রভৃতির কল্যাণাভিলাষিণী, পারিবারিক সুখশান্তিপ্রয়াসিনী, অযুত বঙ্গনারীর, তাহাদের অপেক্ষা উচ্চস্তরে আরূঢ়া কতিপয় শিক্ষিতা, পাশ্চাত্য মনোভাবপ্রভাবিতা, স্বাতন্ত্র্যানুরাগিণী নারীর এইরূপ উচ্চাকাঙ্ক্ষা, আত্মসুখপরায়ণতা ও স্বাধীনতা-কামনার সহিত পরিচয় নাই; ইহা তাঁহারা প্রার্থনীয় বলিয়াও মনে করেন না।

মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকা—১নং

মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকা—২ নং

দেবী চৌধুরাণী মহাশয়া বাঙ্গালার সুখের সংসার ভাঙ্গিয়া সেখানে য়ুরোপীয় ভুয়া নারী-স্বাধীনতার বিকট কাঠামো প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যে দিবাস্বপ্নে বিভোর হইয়াছেন, তাহা কি কখন সত্যে পরিণত হইবার সম্ভাবনা আছে? তবে "বৃথা কেন খাল কেটে আনিবে কুমীরে?" বঙ্গের লক্ষ লক্ষ পল্লীরমণী তাহাদের সুখ-শান্তির আগার ক্ষুদ্র গৃহকোণ হইতে তাঁহাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারে না কি?

শ্রীযুক্তা দেবী চৌধুরাণী সুস্পষ্ট ভাষায় এ কথাও বলিয়াছেন যে, "পুরুষের মূল লক্ষ্য ছিল নারীর উপর সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করা। যে যত প্রকারে পারিয়াছে, নারীর আত্মশক্তিতে বিশ্বাস নষ্ট করিয়াছে, তাহার আত্মসম্মান খর্ব্ব করিতে, তাহাকে পরাধীন ও ঘৃণিত জীবনযাপনে রাজী করিতে চেষ্টা করিয়াছে। স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার শক্তি নারীর এরূপ ভাবে বিনষ্ট হইয়াছে এবং তাহাদিগকে এরূপ মোহমুগ্ধ পরাধীন জাতিতে পরিণত করা হইয়াছে যে, তাহাদের মধ্যে দুই চারি জন মোহনিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া অন্যান্যকে সতর্ক করিবার ও জাগাইবার চেষ্টা করিলেও নারীদের মধ্যেই কেহ কেহ তুমুলভাবে বাধা প্রদান করেন।"

আমাদের হিন্দু দেবদেবীদের নিন্দা করিবার প্রয়োজন হইলে সে কালে পাদরী-পুঙ্গবরা বক্তৃতায় যে ভাষা ব্যবহার করিতেন, আমাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যাইবার জন্য যে মামুলী বুলি আওড়াইতেন, তাহার সহিত দেবী চৌধুরাণীর এই উক্তিগুলির চমৎকার সাদৃশ্য দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি! কিন্তু তিনি পুরুষগুলার উপর যে স্বার্থপরতা ও শক্তির অপপ্রয়োগের আরোপ করিয়াছেন, তাহা মুষ্টিমেয় ধনী পরিবারে, স্বেচ্ছাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতার বিলাসক্ষেত্রে লক্ষিত হইলেও সমাজের সাড়ে পনের আনা গৃহস্থের সংসারে এ সকল কথা পূর্ব্বে কখনও খাটিত না, এখনও খাটে না। তাহাদের সংসারে নারীর স্থান কোথায়, এ সম্বন্ধে দেবী চৌধুরাণী মহাশয়ার শোচনীয় অজ্ঞতাই পরিস্ফুট হইয়াছে। তিনি কি জানেন না, কত ধনীর

সংসারে, বড় বড় জমীদার পরিবারে নারী কিরূপ যোগ্যতা ও তৎপরতার সহিত তাঁহাদের বৃহৎ সংসার, প্রকাণ্ড জমীদারী পরিচালিত করিতেন? অধিক দিনের কথা নহে, কাশিমবাজারের মহারাণী স্বর্ণময়ী, পুটিয়ার প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী শরৎসুন্দরী, সন্তোষের প্রথিতনাম্নী জাহ্নবী চৌধুরাণী প্রভৃতি ভূম্যধিকারিণীগণ যে ভাবে স্ব স্ব সুবিস্তীর্ণ জমীদারী পরিচালিত ও সুশাসিত করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী যুগে কোন্ পুরুষ জমীদার তাঁহাদের অপেক্ষা অধিকতর যোগ্যতার, সুপ্রতিষ্ঠিত, স্বচ্ছল অবস্থাপন্ন গৃহী, ইহা আমরা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণী মহাশয়ার প্রতি আমাদের ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা ও সম্মানের অভাব না থাকিলেও তাঁহার অত্যুক্তিপূর্ণ সমাজ-বিদ্রোহ-সূচক অভিভাষণের তীব্র প্রতিবাদ করিতে আমরা বাধ্য হইলাম। আমরা তাঁহার অনেক উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে পারিতাম, তিনি পুরুষজাতির প্রতি আক্রোশবশতঃ নারীর পক্ষাবলম্বন

প্রধান প্রধান সদস্যাগণসহ শ্রীযুক্তা সরলা দেবী

শাসনদক্ষতার পরিচয় দিতে পারিয়াছেন? দেবী চৌধুরাণী মহাশয়ার জানা না থাকিতে পারে, কিন্তু পল্লী অঞ্চলের নারী-সমাজে এই জনরব প্রচলিত আছে যে, মাতৃহীন একটি শিশুকে মানুষ করিয়া তুলিতে তাহার পিতার সামর্থ্যে কুলায় না বটে, কিন্তু বিত্তহীনা বিধবা পিতৃহীন পাঁচটি শিশুকে মানুষ করিয়া তুলিতে পারে। স্বামী তিন চারিটি অপোগণ্ড শিশু রাখিয়া অপরিণতবয়সে অকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার বিধবা স্ত্রী সেই শিশুগুলিকে দেহের রক্ত করিয়া যে সকল কঠোর উক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার একদেশদর্শিতা ও পুরুষের প্রতি দারুণ অবজ্ঞাই পরিস্ফুট হইয়াছে; ইহা আমাদের নীতি ও ধর্ম্মের সম্পূর্ণ প্রতিকূল, ইহা সমর্থনের অযোগ্য। তাঁহার অভিভাষণের কোন অংশে আমাদের প্রাচ্যভূখণ্ড-সুলভ মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। ইহা বিলাতী সফ্রেজী সম্প্রদায়ের পুরুষ-বিদ্বেষিণী, আত্মসুখ-প্রয়াসিনী, উদ্ধতা নারীর বিদ্রোহের আভাস জ্ঞাপন করিয়াছে। পুরুষের প্রতি

পক্ষে কল্যাণপ্রদ হইবে কি না, নারীর এই স্বাতন্ত্র্যে বাঙ্গালার গৃহস্থ পরিবার অধিকতর বিপন্ন ও বিধ্বস্ত হইবে কি না, তাহা তাঁহার পাণ্ডিত্যখচিত পক্ক মস্তিষ্কে বোধ হয় প্রবেশ করিবার অবসর পায় নাই। কিন্তু পল্লীজীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞা, আদর্শ গৃহিণী ও জননী, সুলেখিকা শ্রীমতী অনুরূপা দেবী ইহার ভবিষ্যৎ ফল বুঝিতে পারিয়াই এই সমাজবিধ্বংসী ব্যবস্থার আংশিক প্রতিবাদ করিয়া বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবনের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন ; এ জন্য তিনি বাঙ্গালী-সমাজের ধন্যবাদের পাত্রী। কিন্তু শ্রীযুক্তা দেবী চৌধুরাণী আমাদের গার্হস্থ্য জীবনের সুখ-শান্তির প্রতি

শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী

সম্পূর্ণ উদাসীন, তাঁহার সঙ্কল্প—বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবন ব্যর্থ হউক, বিরোধের ঝটিকায় সুখের সংসার ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হউক, নারীকে জীবনসংগ্রামে পুরুষের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়-লাভ করিতেই হইবে, নতুবা বাঙ্গালার নারীজীবন ব্যর্থ, নিষ্ফল! এইরূপ মনোভাব লইয়া তিনি নারীর স্বার্থরক্ষার জন্য তারস্বরে বক্তৃতা করুন, কংগ্রেসে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করুন, ভবিষ্যতের স্বরাজ্যপরিষদে নারীর কর্ত্তৃত্ব স্থাপনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করুন, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই ; কিন্তু তাঁহার এই বিলাতী-ছাঁচে ঢালা নারী-জাগরণের জন্য চেষ্টার ফলে যদি আমাদের সাধারণ গৃহস্থের সংসারে আগুন জ্বলিয়া উঠে, এবং সেই আগুনে বাঙ্গালীর সংসারের শান্তি, কল্যাণ ও মিলনের আনন্দ ভস্মীভূত হয়,

শ্রীযুক্তা মোহিনী দেবী

তাহা হইলে বাঙ্গালার নর-নারী তাঁহার এই পাশ্চাত্য আদর্শানুপ্রাণিত বিদ্রোহ-চেষ্টাকে কখন মার্জ্জনা করিতে পারিবে না ; আমাদের মাতা, স্ত্রী, কন্যা, ভগিনীগণ মুক্ত-কণ্ঠে বলিবে, "ভিক্ষায় কায নাই মা, তোমার কুকুর বাঁধো!"

মাধুরী-বোধন

আমার জীবনে শান্তি এসেছে, এসেছে আনন্দ!
কুঞ্জ-কুটীরে বহু দিন পরে হেসেছে বসন্ত!
আজি নীলাকাশে তারায় তারায়
কি জ্যোতি চমকে আঁখি-ইসারায়,
কি নবীন সুখে কুসুমের বুকে জাগিছে সুগন্ধ!

ঊষর জীবনে নেমেছে আষাঢ়, ধূসর প্রান্তরে,
শ্যামল মাধুরী ভরেছে বাহির, ভরেছে অন্তরে!
মিটে গেছে যত তৃষ্ণার জ্বালা
আজি এ জীবনে সুধারস ঢালা,
স্বপন-পুরীর খুলে গেছে দ্বার গোপন মন্তরে!

শ্রীরাজেন্দু দত্ত।

নারীর ভোটাধিকার

মহাত্মা গন্ধী বলিয়াছেন, নারী সত্যাগ্রহী ও বানরসেনা তাঁহার আইন অমান্য আন্দোলনকে সমধিক সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছে। কথাটা ঠিক। বস্তুতঃ দেশসেবিকাদের প্রভাতফেরী ও পিকেটিং অসাধ্যসাধন করিয়াছে। তাঁহাদের অসাধারণ ত্যাগ, ধৈর্য্য ও কষ্ট-সহনক্ষমতা জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। ভারতের কুসুম-পেলবা অন্তঃপুরচারিণী নারীর এই শক্তি কোথা হইতে আসিল?

এক বৎসরে তাঁহারা শত বৎসর অগ্রসর হইয়াছেন। তাহার প্রমাণ, নারীর ভোটাধিকারস্বীকারে। এক বৎসরের অহিংস সংগ্রামে নারী যে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন, দেশবাসী তাঁহাদের সেই গুণের পুরস্কার দিতেছে। যে ইংলণ্ডে কত যুদ্ধ, কত রক্তপাত, কত মারামারি ধস্তাধস্তি করিয়া সফ্রেজিষ্ট নারীরা ভোটাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, ভারতে মাত্র এক বৎসরের ত্যাগস্বীকারে নারীরা সেই অধিকার প্রাপ্ত হইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছেন।

অবশ্য মাত্র দুই একটি স্থানে এই অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, এ কথা স্বীকার্য্য, কিন্তু প্রত্যেক মহৎ কার্য্যের আরম্ভই এরূপ ক্ষুদ্র ব্যাপারে। এ স্থলে দিল্লীর দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। গত বৎসর জুলাই মাসে নারীকে ভোটাধিকার দিবার নীতি দিল্লী মিউনিসিপ্যালিটী মানিয়া লইয়াছিলেন। বর্ত্তমানে যাঁহারা এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধবাদী হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাই সমধিক। মুসলমান সদস্যরা যুক্তি দিয়াছেন যে, এই মন্তব্যের সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই, কারণ, এখনও মুসলমান-নারীরা তেমন শিক্ষাপ্রাপ্ত হন নাই—যাহাতে আগামী ১০ বৎসরের মধ্যে তাঁহারা হিন্দু নারীদের মত ভোটাধিকারের সুযোগ গ্রহণ করিতে সমর্থ হন। মুসলমান নারীদের শিক্ষার অভাব ও পর্দ্দাই প্রস্তাবের পূর্ণ অন্তরায়, এইরূপ বিবেচিত হইয়াছে।

কিন্তু এমন মুসলমান সদস্যও আছেন, যাঁহারা ইহাকে অন্তরায় বলিয়াই মনে করেন না। এডভোকেট মিঃ মহম্মদ সিদ্দিক বলেন, যদি নারীকে পুরুষের ন্যায় ভোটাধিকার দেওয়া হয়, তাহা হইলেই পর্দ্দা ও অশিক্ষা দূর হইবে। যাহা হউক, নানা বিচার-আলোচনার পর দিল্লী মিউনিসিপ্যালিটী নারীর ভোটাধিকারের জন্য এই কয়টি সর্ত্ত নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন,—

(১) মিউনিসিপ্যালিটীতে ভোটাধিকার প্রাপ্ত হইতে হইলে নারীর ২১ বৎসর বা তদূর্দ্ধ বয়স হওয়া চাই,

(২) নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে ১লা নভেম্বরে তিনি বাৎসরিক ১ শত ২০ টাকার ভাড়ার বাড়ীর মালিক ছিলেন, ইহার প্রমাণ তাঁহাকে দিতে হইবে,

(৩) অথবা তিনি নিরক্ষর নহেন, ইহার প্রমাণ দিতে হইবে,

(৪) অথবা তিনি নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে যে ১লা নবেম্বর, তাহার ৬ মাস পূর্ব্বে দিল্লীবাসিনী ছিলেন, তাহারও প্রমাণ দিতে হইবে,

(৫) অথবা তিনি যে ব্যক্তি বাৎসরিক ১ শত ২০ টাকা ভাড়া পাওয়া যায়, এমন গৃহস্বামীর পত্নী বা বিধবা উত্তরাধিকারিণী,

(৬) অথবা এমন লোকের পত্নী—যিনি নির্ব্বাচনের পূর্ব্বের বৎসরেও আয়কর দিয়াছেন।

ইহাই বীজ। এক দিনেই বীজ মহীরুহে পরিণত হয় না।

——

অনুন্নত জাতিদের অধিকার

হিন্দুসমাজের অনুন্নতদিগের প্রতি ভারতের প্রায় সকল স্থানেই মন্দ ব্যবহার হয়। সে ব্যবহার শাস্ত্রসম্মত কি অশাস্ত্রীয়, সে বিচারের স্থান ইহা নহে। দেশাচার এ জন্য কতটা দায়ী, তাহাও প্রত্নতত্ত্ববিদ্ বা ঐতিহাসিকের বিচার আলোচনার বিষয়। আমরা কেবল এইটুকু দেখিতে চাই, ভারতে কোথায় কোথায় এই ব্যবহারের পরিবর্ত্তন হইতেছে। এই ব্যবহারের ফলে যখন বিস্তর অনুন্নত হিন্দু ভিন্ন ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে এবং ভবিষ্যৎ দেশশাসনে আপনাদিগের বিশেষ অধিকারের দাবী করিতেছে, তখন যদি কোথাও কোন রাজ্যে তাহাদের প্রতি ব্যবহারে উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহা আমাদের লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। এই দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিলে অন্যত্র অনুসৃত হইবার সম্ভাবনা।

সম্প্রতি পঞ্জাবের কাপুরথালা রাজ্যের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের রাজ্যের অনুন্নতগণের সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা করিয়াছেন:—

(১) তাহাদিগকে বেগার খাটান হইবে না,

(২) রাজ্যের সরকারী কূপসমূহে তাহাদের জল ব্যবহারের অধিকার থাকিবে,

(৩) এ বৎসর তাহাদের শিক্ষাব্যপদেশে ৫ হাজার টাকা বরাদ্দ হইবে,

(৪) গ্রামের সাধারণ ব্যবহার্য্য মাঠে তাহারা গোচারণ করিতে পারিবে এবং নিজস্ব সার ব্যবহার করিতে পারিবে,

(৫) তাহাদের মৃতদেহের সৎকারের উপযোগী শ্মশানভূমি প্রত্যেক গ্রামে সংরক্ষিত রহিবে,

(৬) পঞ্চায়েৎ প্রভৃতি সাধারণ প্রতিষ্ঠানসমূহে তাহারাও প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার পাইবে কি না, তাহা বিবেচনা করা হইতেছে।

কাপূরথালা দরবার যে উদারনীতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা ভারতের সর্ব্বত্র অবলম্বনীয় নহে কি? যাহারা হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে গর্ব্বানুভব করে, তাহাদিগকে অপমানকর অবস্থায় ফেলিয়া রাখিলে হিন্দুর সংখ্যা যে ক্রমশঃ ধর্ম্মত্যাগের ফলে হ্রাস হইবে, তাহা কি ভাবিয়া দেখিবার সময় এখনও আসে নাই? অবশ্য অধিকারভেদ ও শুচি-শুদ্ধতার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে না, এমন কথা কেহ বলিতেছে না। কিন্তু তাহা বলিয়া মানুষের প্রতি পশুবৎ ব্যবহারও কি সমর্থনযোগ্য? বাঙ্গালায় এই ব্যবহার বিশেষ অনুদার নহে। কিন্তু মাদ্রাজে? সেখানে দেবমন্দিরের গর্ভগৃহে ব্রাহ্মণেতর জাতির ত কথাই নাই, আর্য্যাবর্ত্তের ব্রাহ্মণেরও প্রবেশাধিকার নাই। ইহা কি সমর্থনযোগ্য?

মুসলমান গোল টেবিল

মওলানা শওকৎ আলির নেতৃত্বে দিল্লী সহরে 'নিখিল ভারত মুসলিম' বৈঠকের অধিবেশন হইয়াছিল। সকলেই জানেন, বিলাতের গোল টেবিলে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার মীমাংসা হয় নাই। বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ আশা করিয়াছিলেন, এ দেশে ভারতীয় প্রতিনিধিরা ফিরিয়া গিয়া আপনাদের মধ্যে সেই সমস্যার মীমাংসা করিয়া লইবেন। কিন্তু সে আশাও বিফল হইয়াছে।

সার মহম্মদ সফি প্রমুখ সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক স্বার্থের সমর্থকরা বিলাতে সুবিধা করিতে না পারিয়া ভারতে আন্দোলনটা জাঁকাইয়া তুলিবার প্রয়াসী ছিলেন।

কিন্তু তাহাতেও বিশেষ সুবিধা হয় নাই। বৈঠকে নানা মুনির নানা মত গজাইয়া উঠিল, মুসলমানরাও একমত হইতে পারিলেন না, বৈঠক কোন সিদ্ধান্ত না করিয়াই ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু তাহা হইলেও বৈঠকে বিষোদ্গারের ত্রুটি হইল না। এক জন বলিলেন, হিন্দুরা নূতন ব্যবস্থায় সমস্ত লুটিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে, কংগ্রেস মুসলমানের শত্রু, কংগ্রেসে মুসলমানরা যেন যোগ না দেন, ইত্যাদি। আর এক জন বলিলেন, সরকার কংগ্রেসের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছে, আমরাও কংগ্রেসের সহিত যুদ্ধ করিব। মওলানা সাহেব আরও উপরে চড়িলেন। তিনি

মওলানা শওকৎ আলি

যাহা বলিলেন, তাহা কোন বিদেশী শত্রুও এ যাবৎ বলিতে সাহস করে নাই। যে মহাত্মা গন্ধীকে মার্কিণ যুক্তরাজ্যের খৃষ্টান পাদরীও জগতের শ্রেষ্ঠ মানব বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তিনি ভারতের সেই অবিসম্বাদী নেতা মহাত্মা গন্ধীর উপরেও অসাধুতা ও পক্ষপাতিতার অপরাধের বোঝা চাপাইতে কুণ্ঠা বা লজ্জা অনুভব করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে, "মিঃ গন্ধী কেবল হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরোধ বাধাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, মুসলমানদের মধ্যেও দলাদলি বাধাইয়া দিয়াছেন।" যিনি রাজনীতিক জীবন আরম্ভ করিবার পর হইতে এ যাবৎ বসুধাকেই কুটুম্ব বলিয়া মনে করিয়াছেন, যাঁহার মনে জগতের কোন প্রাণীর প্রতি রাগ, দ্বেষ বা ঈর্ষা-ঘৃণা নাই, যিনি তাঁহার নীতির অঙ্গ হিন্দু-মুসলমান-মিলন বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, আজ তিনি হঠাৎ আজন্মের ধারণা ত্যাগ করিলেন কেন, তাহা কিন্তু শওকৎ আলি বুঝান নাই। তিনি ত তাঁহার ভ্রাতার মত কূট-বুদ্ধি নহেন। হয় ত তাহা হইলে তিনি নানা যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিতেন। মওলানা শওকৎ আলির ঐ সকল আপদ-বালাই নাই। তিনি

একবারে খোলা তলোয়ার ঘুরাইয়া বলিয়াছেন, "যদি এক পক্ষ গন্ধীর বিপক্ষে লড়াই করিতে হয়, তাহা হইলে আমাদের স্বার্থরক্ষার জন্ত আমি তাহা করিব।" কে যে তাঁহাকে লড়াই করিতে ডাকিতেছে, তাহা কেহ জানে না, তিনি ডনকুইক্সোর মত বাতাসের বিপক্ষে তরবারি আস্ফালন করিতেছেন!

কিন্ত এক বিষয়ে তিনি উপকার করিয়াছেন। জাতীয় দলের মুসলমানরা এত দিন আইন অমান্ত আন্দোলনে নানা কষ্ট-বিপদ ভোগ করিতেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে কারারুদ্ধও ছিলেন। গন্ধী-আরউইন চুক্তির ফলে তাঁহারা অনেকে কারামুক্ত হইলেন। তাঁহারা দেশপ্রেমিক, তাঁহাদের নিকট দেশই বড়, বাহিরের ইরাণ-তুরাণের দিকে তাঁহাদের লক্ষ্য নাই। সীমান্তের নেতা খাঁ আবহুল গফুর খাঁ ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। তিনি বলিয়াছেন, 'আমরা প্রথমে ভারতবাসী, শেষেও ভারতবাসী।' জাতীয় দলের মুসলমানরা দেখিলেন যে, সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক স্বার্থ-সংরক্ষক কয় জন মুসলমান জগতের লোককে বুঝাইবার প্রয়াস পাইতেছে যে, তাহারাই ভারতের মুসলমান-সমাজের প্রতিনিধি, যেন ভারতে তাহারা ছাড়া অন্ত মতের মুসলমান নাই! এ ভ্রান্ত ধারণা তাঁহারা লোকের মনে বদ্ধমূল হইতে দিবেন কি? কখনই না। তখনই তাঁহারা যথার্থ দেশপ্রেমিক মুসলমানদের এক বৈঠক বসাইলেন। লক্ষ্ণৌএর সেই ইতিহাসপ্রথিত বৈঠক জগৎকে জানাইয়া দিল, ভারতের মুসলমানরা মিশ্র নির্ব্বাচন চাহেন, হিন্দুর সহিত একযোগে ভারতে স্বরাজ-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্রে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া যুদ্ধ করিবেন। সে সভায় সার আলি ইমাম সভাপতি ছিলেন। তিনি কংগ্রেসেরও লোক নহেন, সফির দলেরও লোক নহেন, তিনি কোনও দলের ধার ধারেন না। সুতরাং তাঁহার নিরপেক্ষ অভিমতই যে অধিকাংশ মুসলমানের অভিমত, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা গেল। ডাক্তার মামুদ, ডাক্তার আলাম, ডাক্তার কিচলু, ডাক্তার আনসারি, মিঃ হাসান ইমাম, মওলানা আজাদ, মওলানা আক্রাম খাঁ, মৌলভী মজিবর রহমান, মিঃ আসফ আলি, মিঃ মেহের আলি প্রমুখ মুসলমান নেতাদের অভিমত সকলেরই বিদিত। বোম্বাই ক্রনিকল পত্রের সম্পাদক মিঃ সৈয়দ আবহুল্লা ব্রেলভি কেবল স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনে সম্মত নহেন, তাহা নহে, তিনি এমনও বলিয়াছেন যে, যদি মহাত্মা সাম্প্রদায়িক স্বার্থান্ধ মুসলমানদের মনস্তুষ্টির জন্ত স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন সমর্থন করেন, তাহা হইলেও তিনি উহা সমর্থন করিবেন না, পরন্ত উহার বিপক্ষে আন্দোলন করিবেন। কারণ, তিনি মনে করেন যে, উহা মুসলমান-সমাজের পক্ষে অপমানকর ও ক্ষতিজনক। তাঁহার মতে কেহ কাহারও দয়ার আশ্রয়ে থাকিয়া আপনার ব্যক্তিত্ব প্রস্ফুটিত করিতে পারে না, বড় হইতে পারে না।

মুসলমান-সমাজের মধ্যে ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন সম্বন্ধে যখন এইরূপ মতানৈক্য, তখন তাঁহারা কিরূপে একযোগে তাঁহাদের দাবী উপস্থিত করিতে সমর্থ হইবেন? এই বিভ্রাট দেখিয়া স্বয়ং সার মহম্মদ সফি প্রস্তাব করিয়াছেন যে, বিলাতের গোল টেবিল বসিবার পূর্ব্বে মুসলমানরা যেন এক বৈঠকে সমবেত হইয়া আপনারা কি চাহেন, তাহা স্থির করেন, তাহার পর হিন্দু নেতাদের সহিত এ বিষয়ে একটা বন্দোবস্ত হইবে। এই ভাবে ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্তা মিটিয়া গেলে পর উভয় জাতিই প্রফুল্লমনে বিলাতে গোল টেবিলে যোগদান করিতে দ্বিধা বোধ করিবেন না। এখন সার মহম্মদের প্রস্তাবমত কার্য্য হয় কি না দেখিবার বিষয়।

ভারতীয় জীবনের মূল্য

মান্দ্রাজে পুঙ্গবনম নামক একটি কৃষ্ণকায় ভারতীয় কুলী এক শ্বেতকায়ের হস্তে নিহত হইয়াছে বলিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। শ্বেতকায় এক অষ্ট্রেলিয়ান, এ দেশে বিমানযোগে উপস্থিত হইয়াছিল, নাম তাহার ক্যাপ্টেন ডার্ব্বি। গত ২৬শে মার্চ্চ রাত্রি ১১টার সময় ক্যাপ্টেন ডার্ব্বি রিক্সাওয়ালা পুঙ্গবনমের রিক্সায় চাপিয়া মান্দ্রাজ সহরের এগমোর ষ্টেশনে উপস্থিত হয়। কোন সাক্ষী বলিয়াছে, ডার্ব্বি যে ভাড়া দেয়, কুলী তাহা হইতে আর দুই আনা অধিক চাহিয়াছিল। তাহার পরেই পিস্তলের আওয়াজ, হতভাগ্য কুলীরও পঞ্চত্বপ্রাপ্তি!

বিচারকালে প্রকাশ পাইয়াছে, উভয়ের মধ্যে কোন বচসা হয় নাই। আসামীও স্বয়ং বলিয়াছে, সে বিরক্ত বা ক্রুদ্ধ হয় নাই। তবে কেবল ৵০ আনা ভাড়া বেশী প্রার্থনা করাতেই কি আসামী এই কুলীকে গুলী করিয়া মারিল? আসামী সাফাই গাহিয়াছে, "সে তামাসা করিয়া পিস্তল তুলিয়া ফরিয়াদীকে ভয় দেখাইয়াছিল, এমন সময় অকস্মাৎ গুলী ছুটিয়া যায়!"

বিচারে তাহার ১ হাজার টাকা জরিমানা এবং আদালতের সেদিনকার অধিবেশনকাল পর্য্যন্ত আটকের দণ্ড হইয়াছে। অর্থদণ্ডের টাকাটা কুলীর বিধবা পত্নী ও সন্তানগণকে দেওয়া হইবে। ঐ জরিমানার টাকা আদায় না দিলে আসামীকে ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

এই ব্যাপারটির সহিত আর একটি মামলার যেন বিশেষ সৌসাদৃশ্ত আছে বলিয়া মনে হইতেছে। সে মামলাটা হইয়াছিল আসামে, তখন "ভারতবন্ধু" নামজাদা বিটসন

বেল ছিলেন তথাকার শাসক। এক চা-বাগিচার যুবক ইংরাজ কর্ম্মচারী এক জন কুলীকে গুলী মারার অভিযোগে ধৃত হয়। এই কুলীর একটি কন্যা ছিল, সে যুবতী, নাম তাহার হীরা আহিরিণ, কারণ, তাহার বাপ গঙ্গাধর জাতিতে ছিল আহিরী গোয়ালা। ফরিয়াদী পক্ষ বলে যে, সাহেব (রীড তাহার নাম) হীরার সঙ্গে আসনাই করিবার চেষ্টায় রাত্রিকালে গঙ্গাধরের বাসার (কুলী লাইনে) নিকটে আসিয়াছিল। সে 'হীরা ডেও' বলিয়া তাহাদিগকে ধমক দিয়াছিল। তাহারা বাধা দিতে গেলে গঙ্গাধরকে গুলী করিয়াছিল।

আসামী বলে, সে পথ ভুলিয়া রাত্রিকালে ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়াছিল এবং হঠাৎ পথ পাইয়া আনন্দে বলিয়াছিল, 'হিয়ার রোড হ্যায়'। ফরিয়াদীরা তাহাকে বিনাদোষে লাঠি-সোটা লইয়া তাড়া করিয়াছিল, সে আত্মরক্ষার্থে পিস্তল ব্যবহার করিয়াছিল।

বিচারে সে বেকসুর খালাস পায়। এই মামলার রায় লইয়া খুবই লড়ালড়ি হইয়াছিল। প্রদেশের প্রধান শাসকের সকাশেও দণ্ডের লঘুতার বিরুদ্ধে আপীল হইয়াছিল। শাসক বলেন, "রীড ২৩ বছরের যুবক। সে বিলাতের খৃষ্টান পরিবারের প্রভাব হইতে সবেমাত্র মুক্ত হইয়া এ দেশে আসিয়াছে; সুতরাং সে মিথ্যা বলে নাই!"

এ ব্যাপারেও ক্যাপ্টেন ডার্ব্বি বলিতেছে, সে তামাসা করিয়া পিস্তল দেখাইয়াছিল। বোধ হয়, তামাসা করিয়াই সে পকেটে গুলীভরা পিস্তল রাখিয়াছিল, এবং তামাসা করিয়াই সে কথাটা ভুলিয়া গিয়াছিল। রীড যেমন মিথ্যা কথা বলিতে পারে না, অথচ গঙ্গাধরের পক্ষের কুলীদের স্বভাবই ছিল মিথ্যা কথা বলা, এ ক্ষেত্রেও ক্যাপ্টেন ডার্ব্বি যখন খৃষ্টান পরিবারের প্রভাব হইতে আসিয়াছেন—তা অষ্ট্রেলিয়া হইতে হউক আর কামস্কাটকা পেরু হইতেই হউক, তখন তিনি কখনও মিথ্যা কথা বলিতে পারেন না, কিন্তু পুঙ্গবনমের পক্ষের সাক্ষী নিশ্চিতই মিথ্যা কথা বলিয়াছিল, যেহেতু, সে ভারতবাসী (ভারতীয়মাত্রেই মিথ্যাবাদী, লর্ড কার্জ্জন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ভাবের কথা বলিয়াছিলেন)! তবে এই ব্যাপার লইয়া এত হৈ-চৈ হুজ্জত-হাঙ্গামা কেন?

মহাত্মা গন্ধী ও ভারতীয় বিপ্লবী

প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত আসামী শুকদেব মহাত্মা গন্ধীকে একখানি খোলা চিঠি দিয়াছিল, দৈনিক পত্র-সমূহে এ কথা প্রচারিত হইয়াছে। শুকদেবের কথা এই,—"মহাত্মা গন্ধী বিপ্লবীদিগকে কিছু সময় দিতে বলিয়া দেশের মহা অনিষ্ট করিয়াছেন কেন না, মহাত্মা অহিংসার দ্বারা নিজে ত কিছুই করিতে পারিতেছেন না, উপরন্তু এই ভাবে বিপ্লবীদিগকে নিরস্ত হইতে বলিয়া লোকের মনে ধারণা করাইয়া দিতেছেন যে, বিপ্লবীদের কাযে দেশের কোন উপকার না হইয়া ক্ষতি হইতেছে। গন্ধীজী বিপ্লবীদিগকে হস্ত সংযত করিবার জন্য প্রকাশ্য আবেদন করিয়া তাহাদিগকে চূর্ণ করিবার ব্যাপারে আমলাতন্ত্র সরকারের সহিত যোগদান করিয়াছেন। হয় তিনি বিপ্লবীদিগকে তাঁহার যুক্তি বুঝাইয়া দিন, না হয় এই ভাবের আবেদন করিতে ক্ষান্ত হউন।"

প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত আসামী শুকদেব

মহাত্মা গন্ধী ইহার উত্তর দিয়াছেন। উত্তরটি বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য। ভারতের রাজনীতিক ভাগ্যপরিবর্ত্তনের সময়ে তাঁহার মত সর্ব্বজনমান্য নেতার পরামর্শ অবশ্য-গ্রাহ্য; সকলের পক্ষে গ্রহণীয় না হইলেও অধিকাংশের পক্ষে যে শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণযোগ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। মহাত্মা মোটের উপর বলিয়াছেন,—

ভারতে অহিংস সত্যাগ্রহ সংগ্রামের পরীক্ষা চলিতেছে। এ পরীক্ষার এখনও অবসান হয় নাই। দেশের অধিকাংশ লোক অহিংসা পথের পথিক, অতি অল্পসংখ্যক লোকই হিংসার পথ গ্রহণ করিয়াছে। উভয়ের উদ্দেশ্য এক, অর্থাৎ উভয়েই যে দেশপ্রেমিক এবং দেশের মুক্তিকামী, তাহা কেহ অস্বীকার করে না। সুতরাং উভয়ের মধ্যে মুক্তির পথ নির্ণয় করিয়া লওয়াই যুক্তিসঙ্গত। অধিকাংশ লোক যে পথ গ্রহণ করিয়াছে এবং

যে পথের পরীক্ষা এখনও শেষ হয় নাই, অল্পসংখ্যক দলের সেই পথের পরীক্ষার ফললাভের কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত।

সামরিক বিদ্যালয়

ডাক্তার মুঞ্জে বিলাতের ও য়ুরোপের কোন কোন স্থানে ভ্রমণ করিয়া সামরিক বিদ্যালয় সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া আসিয়াছেন। তিনি এখন এ দেশের প্রদেশসমূহে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন এবং কোথায় কি ভাবে তাঁহার সঙ্কল্পমত সামরিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুবিধা হয়, তাহা অবধারণ করিতেছেন।

ডাঃ মুঞ্জে
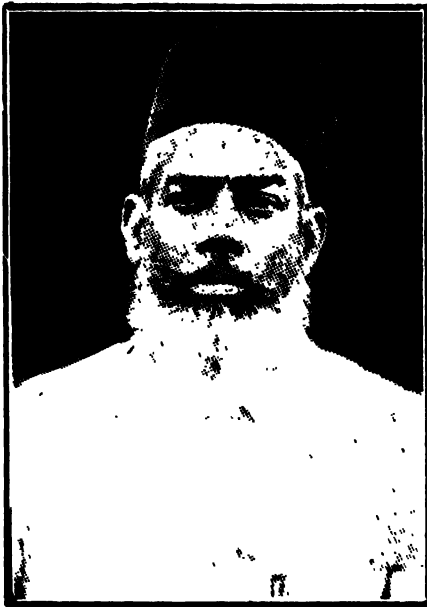
বাঙ্গালায় আসিয়া তিনি কলিকাতার সান্নিধ্যে যাদবপুর কারিগরি বিদ্যামন্দিরের আশ্রয়ে বাঙ্গালার জন্য সামরিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা পাড়িয়াছেন। তিনি বলেন, যাদবপুরে সামরিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার উপযোগী যথেষ্ট জমী পাওয়া যাইবে; তথায় সন্তরণের জন্য প্রকাণ্ড পুষ্করিণী আছে; ব্যায়াম ও ফুটবল কপাটি ইত্যাদি খেলিবার মত বিস্তীর্ণ মাঠ আছে; ড্রিল করিবারও কোন স্থানাভাব হইবে না। ইহা ছাড়া ছাত্রাবাস-সমূহ অনায়াসে প্রচুর বায়ু ও আলোক-সমন্বিত করিয়া নির্ম্মাণ করা যাইবে। কারিগরি, বৈদ্যুতিক, রাসায়নিক ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাগার-সমূহ (Laboratories) এই স্থানে নির্ম্মিত হইতে পারিবে। কারখানা (লোহার, ছুতারের ও অন্যান্য কাযের) সমূহেরও যথেষ্ট স্থান হইবে। সুতরাং যাদবপুরই বাঙ্গালায় প্রথম সামরিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আদর্শ স্থান বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

এ পর্য্যন্ত ত শুনিতে বেশ। কিন্তু তাহার পর? বর্ত্তমান আমলাতন্ত্র সরকার কি এরূপ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সম্মতি দিবেন? কেবল স্থল নহে, অন্তরীক্ষের রণবিদ্যাও এই স্থানে শিক্ষা দেওয়ার কথা হইতেছে। তবে?

ডাক্তার মুঞ্জে বলেন, সরকার ইহাতে কোনও আপত্তি করিবেন না। কেন না, তাঁহার নাগপুরের অভিজ্ঞতায় তিনি বলিতেছেন যে, তথায় রাইফেল এসোসিয়েশনে স্বয়ং গভর্ণর চাঁদা দিয়া থাকেন। তবে ত ভাল কথা। বাঙ্গালার সরকারের মনোভাব কি, এখন তাহাই নির্দ্ধারণ করা প্রথম কর্ত্তব্য।

অর্থকষ্ট

সারা দেশ ব্যাপিয়া লোকের দারুণ অর্থকষ্ট উপস্থিত। কি জমীদার, কি প্রজা, কি ব্যবসায়ী, কি শ্রমিক—কেহই এই কষ্ট হইতে পরিত্রাণলাভ করেন নাই। ইহা যে জগতের ব্যবসায়ের বাজারের সাধারণ দুর্দ্দশার ফল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার সহিত ভারতের বিশেষ অবস্থাও কতক পরিমাণে দায়ী। মোট কথা, জগতে টাকার বাজার বড় মন্দ, অথচ এবার কাঁচা মাল ও পণ্য এত অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইয়াছে যে, কোনটাই দামে বিকাইতেছে না। ইহারই ফলে মাল উৎপাদনকারী কৃষক ও শ্রমিকের ঘরে পয়সা নাই, আর তাহারই জন্য জমীদার ও সাধারণ মধ্যবিত্তদের ঘরেও পয়সা দেখা দিতেছে না।

বাঙ্গালার মফঃস্বলের কোন কোন স্থানে লোকের এ জন্য অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। অতি দরিদ্র অন্নকষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে অথবা আপনার সন্তানকে হত্যা করিয়াছে, এমন সংবাদ দৈনিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। এ দিকে যত্রতত্র চুরি-ডাকাতি বৃদ্ধি পাইয়াছে। এ সকল ডাকাতিতে নরহত্যা পর্য্যন্ত সংঘটিত হইতেছে। কলিকাতা সহরেও অনেক চাকুরীজীবী কার্য্যালয়ের শোচনীয় পরিণাম হেতু চাকুরী হারাইয়া বসিয়া আছে। কলের শ্রমিকের, রেলের কুলী প্রভৃতি শ্রমজীবী বেকারের সংখ্যাও অত্যধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। বোম্বাইএ একটি কুলী আপন কন্যা দুইটিকে অহিফেন খাওয়াইয়া হত্যা করিয়া পরে আত্মহত্যা করিয়াছে, এইরূপ সংবাদ দৈনিক সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত হইয়াছে। কথাটা শুনিলে চোখ ফাটিয়া জল আসে। ইহার

উপর সহরে ও মফঃস্বলে চোর-ডাকাতের ভয়ে নিত্যই অর্থ ও প্রাণনাশের আশঙ্কা—লোকের আর শান্তি-স্বস্তি নাই! সরকার ও নেতৃবর্গ এ সময়ে অবস্থা প্রতীকারের উপায়চিন্তা করিয়া আশু সুব্যবস্থা না করিলে ভবিষ্যতে এই কষ্ট আরও প্রবল হইবে।

রবীন্দ্র-জয়ন্তী

গত ২৫শে বৈশাখ ১৩৩৮, বিশ্ববরেণ্য কবি শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বয়স সপ্ততি বর্ষ পূর্ণ হইয়াছে। এ জন্য বোলপুর শান্তিনিকেতনে ও বিভিন্ন স্থানে সাহিত্য-সাধকগণ সম্মিলিত হইয়া আনন্দ-উৎসব করিয়াছেন। কলিকাতাতেও কবিবরের সম্বর্দ্ধনার জন্য সাহিত্যসেবী ও মনীষিগণ সমবেত হইয়া শ্রাবণ মাসে উৎসব করিবার জন্য পরামর্শ করিতেছেন জানিয়া আমরা প্রীতিলাভ করিয়াছি। সাহিত্য-জগৎ কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায়—দানে—চিন্তায় সমৃদ্ধ হইয়াছে। তিনি দীর্ঘ জীবন, পূর্ণ স্বাস্থ্য ও অনাহত শান্তি লাভ করিয়া ভাষা জননীকে আরও গৌরবান্বিত করুন, ইহাই আমাদের ঐকান্তিক বাসনা। আশা করি, দেশবাসী এই সম্বর্দ্ধনা উৎসবে যোগদান করিয়া কবির প্রতি সম্মান-শ্রদ্ধা নিবেদন করিবেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রায় রসময় মিত্র বাহাদুর

কলিকাতা হিন্দু স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক—সুধাকণ্ঠ কীর্ত্তন-গায়ক রায় রসময় মিত্র বাহাদুর গত ৬ই বৈশাখ প্রভাতে পরিণতবয়সে সাধনোচিতধামে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যু যেমন অতর্কিত, তেমনি ভক্তজনবাঞ্ছিত। শিক্ষাপ্রদান-কার্য্যে রসময় বাবুর অভিজ্ঞতা ও কৃতিত্ব যেমন অনন্যসাধারণ ছিল, তাঁহার কীর্ত্তন-গান তেমনি ভক্তির মাধুর্য্যে—ভাবের প্রাচুর্য্যে—পুলকাবেশে সম্মোহনে অতুলনীয় ছিল। তাঁহার শিক্ষানৈপুণ্যের প্রভাবে যেমন বহু মনীষীর উদ্ভব সম্ভব হইয়াছে, তেমনি কীর্ত্তনে নব নব আখর সংযোগকৃতিত্বে জগতে অতুল বৈষ্ণবপদাবলীতে নব নব রসধারার উচ্ছ্বাসে বহু ভক্ত-সাধকের মনপ্রাণ তৃপ্ত—সম্মোহিত হইয়াছে। কীর্ত্তন-গান তাঁহার সাধনা ছিল—কীর্ত্তন গান করিতে করিতেই তিনি ভাবাবেশে অচৈতন্য হইয়া পড়েন, অর্দ্ধ-ঘণ্টা পরেই চিরশান্তি লাভ করেন। পরিণতবয়সে আরাধ্য দেবতার নামসুধা পান করিতে করিতে তিনি অনন্তধামে চলিয়া গিয়াছেন—এমন শান্তিময় মৃত্যু হিন্দুর পরম বাঞ্ছনীয়।

দানশীলা বিধবার লোকান্তর

বিগত ১৪ই চৈত্র রামনবমীর দিন বিভিন্ন সদনুষ্ঠানে দানের জন্য পুণ্যবতী স্বধর্ম্মপরায়ণা পরমেশ্বরী দেবী সাধনোচিতধামে প্রয়াণ করিয়াছেন। শ্রীরামপুরের বিভিন্ন জনহিতকর অনুষ্ঠান—মাহেশের জলের কল—সাধারণ পাঠাগার—প্রাথমিক বিদ্যালয়—দাতব্য চিকিৎসালয়—ওয়ালস্ হাসপাতালে রোগীদের সেবার জন্য ৫০হাজার টাকা ব্যয়ে ১২টি শয্যার ব্যবস্থা—নাপিতপাড়া লেনের উন্নতি—কলিকাতা বাবুঘাটে মহিলাগণের স্নানের ঘাটের উন্নতিবিধান—শৌচাগার নির্ম্মাণ প্রভৃতির জন্য তাঁহার দান চিরপ্রসিদ্ধ এবং সর্ব্বথা প্রশংসার যোগ্য। নাপিতপাড়া লেনের নামটি এখন তাঁহার স্বামীর নামে—আশুতোষ চাটার্জ্জী লেন নামে অভিহিত হইয়াছে। এমন জনসেবায় দানশীলা পুণ্যবতীর চরিত্র-মহিমা চিরস্মরণীয়।

পরমেশ্বরী দেবী

সম্পাদক—শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী-রোটারী-মেসিনে শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বসুমতী প্রেস] ঝরা ফুল [শিল্পী—শ্রীচারুচন্দ্র সেনগুপ্ত

১০ম বর্ষ] জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮ [২য় সংখ্যা

শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা

যথাসময়ে মথুরমোহন বাবাকে লইয়া বারাণসী হইতে শ্রীবৃন্দাবনে আসিলেন।

গোবিন্দজীউর মন্দির—বৃন্দাবন

আমার পরম শ্রদ্ধেয় প্রিয় সুহৃদ্ শ্রীমান্ কুমুদবন্ধু ন মহাশয় অনুসন্ধানে জানিয়াছিলেন যে, বৃন্দাবনে ঈশ্বরদাস নামক জনৈক বৈষ্ণবের আখড়া-বাড়ীর দ্বিতলস্থ একটি কক্ষ শ্রীরামকৃষ্ণের নিভৃত বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।
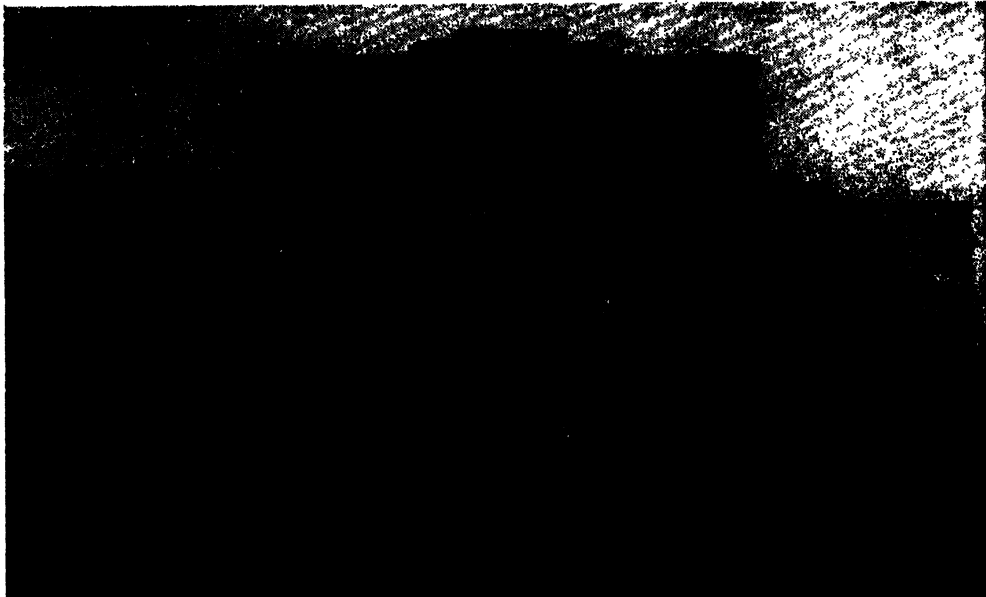
এই ঈশ্বরদাস ছিল দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর মেথর রসিকের শিষ্য। সম্ভবতঃ এই সূত্রেই তাহার আখড়া-বাড়ীর কক্ষ ভাড়া লওয়া হয়।

রসিক ঘোষপাড়ার শিষ্য, কালীবাড়ীতে ঝাড়ুদারের কায করিত। তাহার গলায় ছিল তুলসীর মালা এবং বাড়ীতে একটি ক্ষুদ্র তুলসী-কানন। এইখানে প্রতি সন্ধ্যায় সে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিত।

এক দিন শ্রীরামকৃষ্ণ ঝাউতলার দিকে শৌচে যাইতেছিলেন, সঙ্গে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত রামলাল চট্টোপাধ্যায়। ঠাকুরকে দেখিয়া রসিক সসম্ভ্রমে এক পাশে দাঁড়াইল। পরে শ্রীরামকৃষ্ণ ফিরিবার মুখে সে গলবস্ত্র হইয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিল।

হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই হবে। এখন হবে না, শেষ সময় হবে।

বাবা, আমায় কি করতে হবে?

যা করছিস, তাই করবি, আর কি করবি? তুই হীন কায কি বলছিস? দেখ দেখি কত বড় কায করছিস? এই মায়ের দরবার, রাধাকান্তের দরবার, দ্বাদশ শিবের দরবারে সেবা করছিস! কত সাধু সন্ত ভক্তের পায়ের ধূল ঝাঁট দিচ্ছিস! 'ধ্যানে মুনি পায় না যারে, রাণী ঝাঁট দিয়ে ঝাঁটাস তারে।' আবার কি চাস? যা করছিস, তাই করবি।

মদনমোহন জীউর মন্দির—বৃন্দাবন

শ্রীরামকৃষ্ণ তাহার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, কি রে রসিক, সব ঝাড়ুটাড়ু ঠিক দিচ্ছিস ত?

রসিক বলিল, হাঁ, বাবা।

মথুরমোহন ও রসিক ব্যতীত "বাবা" সম্বোধন করিবার অধিকার শ্রীরামকৃষ্ণ আর কাহাকেও দেন নাই।

হাঁ, বাবা, বলিয়া রসিক তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কি চাস্?

রসিক বলিল, বাবা, কত পাপে এই হীন জন্ম পেয়েছি, মেথরের ঘরে জন্মেছি। কিন্তু বাবা, আমাদের কি গতি-মুক্তি হবে?

রসিক বলিল, বাবা, তুমি আশ্বাস দিচ্ছ, তাই ভরসা হচ্ছে। তুমি বলছ, তাই হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, হবে, নিশ্চয়ই হবে। তবে এখন নয়, শেষ সময় হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের প্রায় দুই বৎসর পরে রামলাল এক দিন দেখিলেন, মন্দির-প্রাঙ্গণ রসিকের স্ত্রী ঝাঁট দিতেছে। প্রশ্ন করিয়া জানিলেন, রসিকের বড় অসুখ। ডাক্তার দেখে গেছে। কিন্তু কোন ওষুধ খাবে না।

কি অসুখ রে? ওষুধ খাচ্ছে না কেন?

রসিকের স্ত্রী বলিল, সর্দ্দি জ্বর, বড় শ্লেষ্মায় ঘিরেছে।

ওষুধ দিলে খায় না, বলে, ওষুধ আবার কি খাব ? গঙ্গাজল, তুলসী এনে দে। সেই মহৌষধ।

ইহার পাঁচ সাত দিন পরে রসিক কিম্বা রসিকের স্ত্রী দুজনের কেহই ঝাঁট দিতে আসিল না।

আরও কয়েক দিন পরে রসিকের স্ত্রী আসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

রামলাল প্রশ্ন করিলেন, কি রে, কাঁদ্‌ছিস কেন ? রস্‌কে কেমন আছে ?

সে দেহ ছেড়ে গিয়েছে।

কিছুক্ষণ জপ করবার পর হঠাৎ কেঁদে উঠল, তার পরেই হাসি। শেষ একেবারে স্থির হয়ে বল্‌লে, এই যে বাবা এসেছ। তাই ত বলি, তুমি আশা দিয়েছ, সেই আশা ধ'রে এত দিন কাটিয়েছি ! বাঃ বাঃ, কি সুন্দর, কি সুন্দর, কি চমৎকার ! বল্‌তে বল্‌তে ধীরে ধীরে চোখ বুজে যেন ঘুমিয়ে পড়্‌ল। কোন খিচ বা টান হয় নি। আশ্চর্য্য !

রামলাল বলিলেন, ঠাকুর রসিকের সম্বন্ধে বলেছিলেন যে, সে শাপভ্রষ্ট হয়ে মেথরের ঘরে জন্মেছে।

শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায় সর্ব্বক্ষণই ভাবে

শ্যামকুণ্ড—বৃন্দাবন
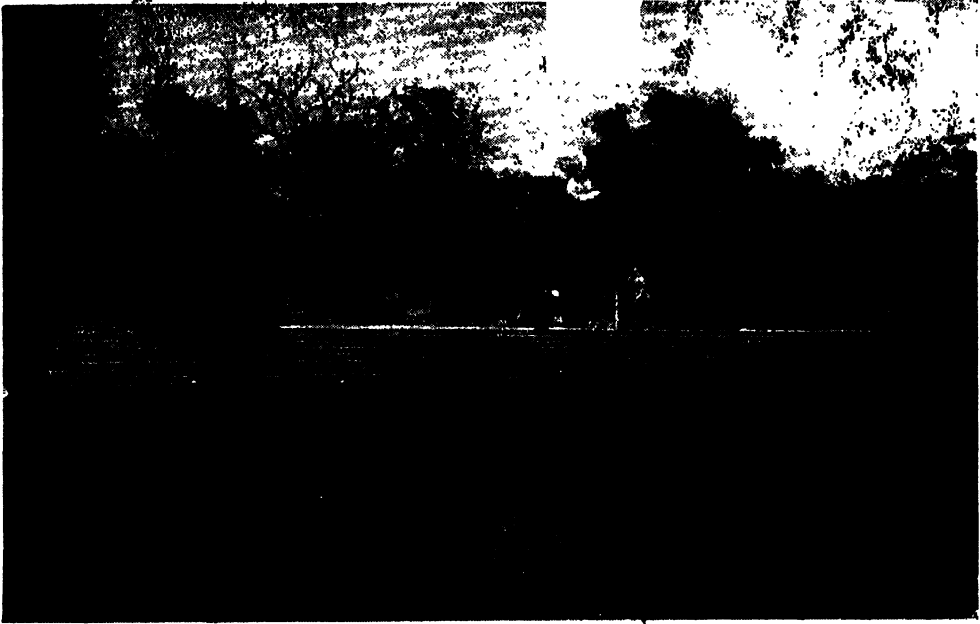
শ্রীরামকৃষ্ণের আশ্বাসবাণী রামলালের স্মরণ ছিল—শেষ সময় হবে। জিজ্ঞাসা করিলেন, রসিক কেমন ক'রে মারা গেল ?

রসিকের স্ত্রী বলিল, ঐ দিন আন্দাজ দশটার সময় কায ক'রে যখন ফিরে গেলুম, তখন সে বল্‌লে, তোরা খেয়ে নে, আর শীগ্‌গির তুলসীতলায় আমার বিছানা ক'রে দে। আমরা বল্‌লাম, কি বক্‌ছ ? কিন্তু সে চেঁচামেচি ক'রে জিদ্ করতে লাগল। তুলসীতলায় বিছানা পেতে ধরাধরি ক'রে তাকে শুইয়ে দিলাম। তার পর সে বল্‌লে, গঙ্গাজল আর জপের মালা নি'আয়। এনে দিতে নিজের হাতে বিছানায় আর তুলসীতলায় গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিয়ে জপ করতে লাগল।

তন্ময় এবং দিগম্বর হইয়া থাকিতেন। কখন নিরবচ্ছিন্ন প্রেমধারায় তাঁহার মুখ-বুক ভাসিয়া যাইত, কখন তাঁহার বদন-মণ্ডল আনন্দের উজ্জ্বল আভায় প্রভান্বিত হইয়া থাকিত। উন্মত্তবৎ এই উচ্চৈঃস্বরে রোদন, এই অট্টহাস। শ্রীরাধা-গোবিন্দজীর পুরাতন মন্দিরে বসিয়া এক দিন সহসা তাঁহার নয়নদ্বয়ে অশ্রুবান ছুটিল এবং কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ অট্টহাস্যে মন্দির মুখরিত করিয়া উঠিয়া আসিলেন। যে দিন ঠাকুর "বাঁকাবিকারী" মূর্ত্তি প্রথম দর্শন করিতে যান, সেই দিন ভাবে বিহ্বল হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে ছুটিয়াছিলেন। মথুরায় ধ্রুবঘাটে দেখিয়াছিলেন, বসুদেবক্রোড়ে সদ্যোজাত শ্রীকৃষ্ণ।

রাধাকুণ্ড—বৃন্দাবন
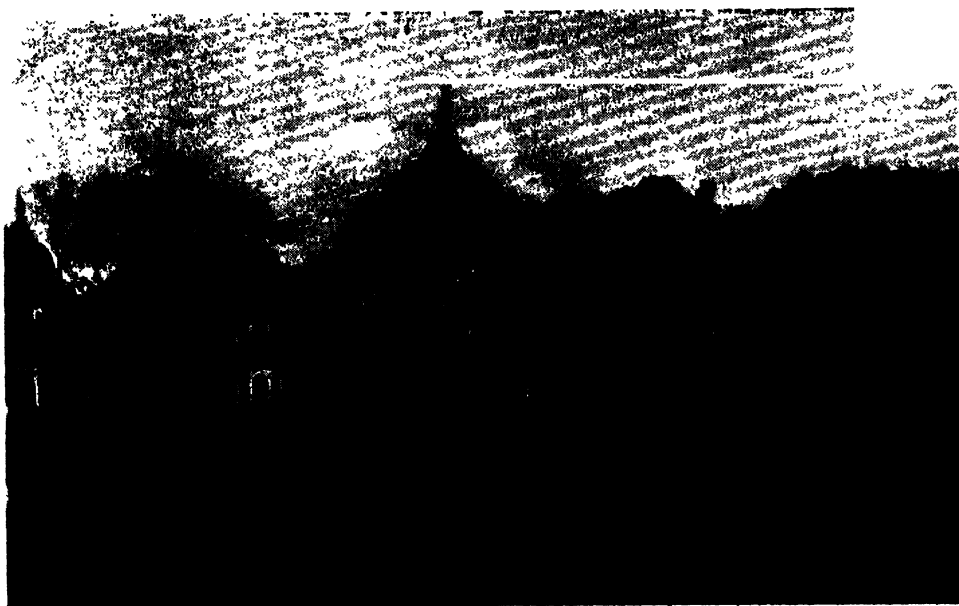
কুসুম সরোবর—গোবর্দ্ধন

সাহ বিহারীলাল টেম্পল—বৃন্দাবন
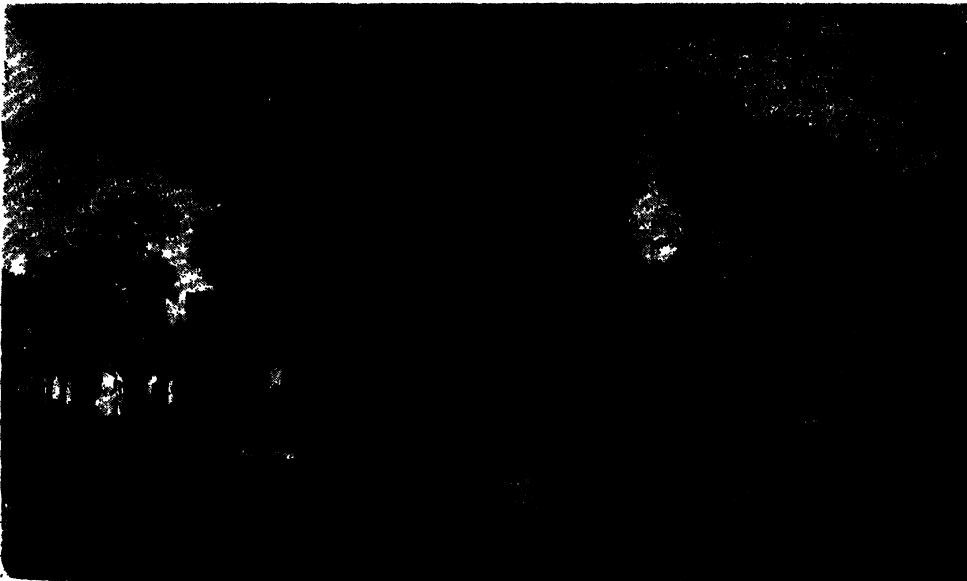
চীরঘাট—বৃন্দাবন

শ্রীরামকৃষ্ণ অধিকদূর চলিতে পারিতেন না। গোবর্দ্ধন, শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, দেবমূর্ত্তি মন্দির প্রভৃতি দর্শন ও বনভ্রমণের নিমিত্ত মথুরমোহন পাল্কীর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। হৃদয় পদব্রজে অনুগমন করিত।

ব্রজভূমি ব্রজরাজ ও ব্রজরাণীর নিত্যধাম। রাধাকৃষ্ণের নিত্য লীলাস্থল। এখনও নিধুবনে নিত্য নিশিতে নব নব ভাবে প্রেমকেলি অনুষ্ঠিত হয়। এই জন্যই শ্রীরাধার মহাভাবে বিভোর হইয়া বিদ্যাপতি গাহিয়াছিলেন,—

'কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়ায়নু
না বুঝনু কৈছন কেলি।'

প্রেমের আনন্দ-হিল্লোলে তমাল দোলে, বাঁশের বাঁশী বাজাইয়া রাখাল-বালকগণ গোচারণ করে, হরিণ-হরিণী স্বচ্ছন্দে বিহরে। যেন যুগের পর যুগ অতিবাহিত হয় নাই। তখনও যেমন ছিল, এখনও সব সেই আছে। গোলোক হইতেও আনন্দ-পুলকময় শ্যাম-প্রেমভূমি দর্শনে বিরহব্যাকুল-হৃদয় শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, ব্রজে সবই তেমনই আছে, কৃষ্ণ রে, কেবল তোকেই দেখতে পাচ্ছি নি।

প্রায় চারি শতাব্দী পূর্ব্বে এমনই এক দিব্যোন্মাদ পুরুষের হরিনাম-গানে বনের পশু-পক্ষিগণ প্রেমোন্মত্ত হইয়াছিল। সে দিনও এমনি হা কৃষ্ণ যো কৃষ্ণ রবে বৃন্দাবনের সমগ্র বনভূমি

ব্রহ্মচারী মন্দির—বৃন্দাবন
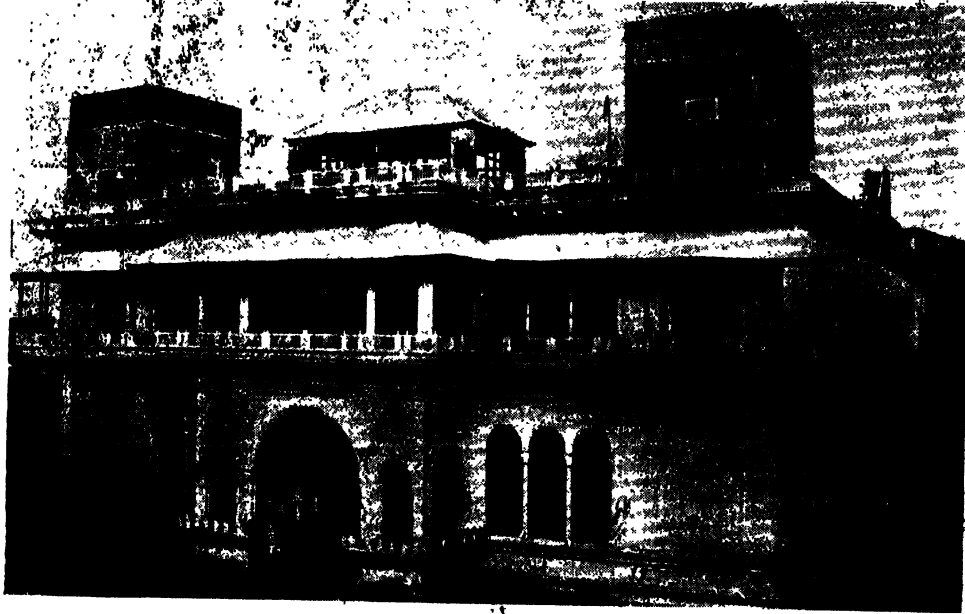
কৃষ্ণ-বিরহ-বেদনায় আকুল হইয়া উঠিয়াছিল। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বৃন্দাবনের লুপ্ত তীর্থ সকলের উদ্ধার করিয়া ব্রজভূমিকে অতুল মহিমায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন।

ভক্তের ভাবরাজ্য ব্রজভবন নিত্য লীলা-নিকেতন। নহিলে ভাবে উন্মত্ত হইয়া তরুলতা এখনও পরস্পরে কৃষ্ণকথা কয় কেন? প্রেমে মাতুয়ারা বিহগ-বিহগী কৃষ্ণগাথা গায় কেন? কার ভাবে বিভোর হইয়া শিখী সহ শিখিনী নাচিতেছে? মধুপানে বিভোর অলি কলির কাণে শ্যাম-গুণ গান করিতেছে? কার তরে আত্মহারা শ্যাম-ধারা যমুনা প্রেমের একতান তুলিয়া তরঙ্গ-ভঙ্গে নাচিতেছে? ব্রজের আকাশ-বাতাস শ্যাম-প্রেমে মাখা, ধরণীতল শ্যামরূপে ঢাকা, যমুনার বুকে শ্যাম ছবি আঁকা। এখানে এখনও শ্যাম-

ব্রজে এমন স্থান নাই, যেথায় কৃষ্ণস্মৃতি উদ্দীপিত হয় না। এখনও শ্রীবৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ব্রজাঙ্গনাগণের রক্ষয়িত্রী, মহামায়ী কাত্যায়নী ব্রজমণ্ডলে অধিষ্ঠান করিতেছেন। অদূরে গিরি গোবর্দ্ধন কৃষ্ণপদ-চিহ্ন ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান। অদূরে রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড। যাহার ছায়াশ্যামল তলে বসিয়া মুরারি মুরলীধ্বনি করিতেন—ঐ সেই সহস্রজট বংশীবট;

গোষ্পদ-চিহ্নিত যমুনাতট, যথায় পসারিণী গোপরমণী নবনীপণে নীলমণি কিনিত।

মধুর অক্ষয় নিবাস ঐ সেই নিধুবন, রাধা-শ্যামের মিলন-নিকেতন—যেখানে কত অনুরাগ, কত সোহাগ, কামগন্ধহীন প্রেমের কত আদান-প্রদান, কত মান লীলায় প্রকটিত হইত—যথায় নিষ্ফল প্রতীক্ষায়, তীব্র বিরহতাপে, হতাশ দীর্ঘশ্বাসে কত রমনীয় যামিনীর অবসান হইয়াছে।

কোথাও কৃষ্ণ-বিরহিণী শিথিল-কবরী বন-বল্লরী শ্যামাঙ্গিনী ধরণী-বক্ষে বিরহীর অশ্রুবিন্দুর ন্যায় একটি একটি করিয়া কুসুম বর্ষণ করিতেছে। সেই তমালকুঞ্জ; গুঞ্জরবপূরিত কৃষ্ণকণ্ঠ-লালসায় এখনও পথ চাহিয়া আছে। উগ্র কামনায় কামিনী এখনও সারা যামিনী জাগিয়া জাগিয়া ধরণীর শ্যাম-বক্ষে তেমনই করিয়া ঢলিয়া পড়িতেছে। ত্রিভঙ্গের অঙ্গসঙ্গ-বাসনায় কুন্দ-কলিকা আপনার অধরে তেমনই করিয়া শ্রীমতীর হাসি ফুটাইয়া তোলে। ব্রজের ভাব দেখিলে মনে হয়, মুরলী-সঙ্কেতের জন্য সমগ্র ব্রজভূমি এখনও যেন উৎকর্ণ হইয়া আছে

ব্রজে সবই কৃষ্ণময়। সমীরণ শ্যাম-শ্যাম করিয়া বন-বিচরণ করে। দুঃসহ বিরহ-বেদনায় কোকিল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া ফুকারিয়া উঠে। অধোমুখ সারী-শুক পক্ষ-আবরণে

কেশীঘাট নদী—বৃন্দাবন

নবমল্লিকা-কুঞ্জ—ব্রজাঙ্গনার কবরীভূষণ কুসুমরত্ন এখনও সতৃষ্ণকারে ধারণ করিয়া আছে। ঐ সেই কদম্ব-কানন—এখনও যাহার কুসুম-গোলক নবজলধর দর্শনে পুলকভরে শিহরিয়া উঠে। এখনও সেই কৃষ্ণকলি গোধূলি-সমাগমে কিশোর-কিশোরীর মিলন-প্রত্যাশায় তেমনই অপলক নেত্রে চাহিয়া থাকে। সেই কৃষ্ণচূড়—ময়ূর-পক্ষের সৌভাগ্য কামনা করিয়া নীলাম্বরের চক্ষুর উপর আপনার ঐশ্বর্য্য-গরিমা বিকাশ করে। কিশোরীর কাঞ্চন-বরণ অনুকরণ করিয়া চম্পক গৌরবে সৌরভে এখনও পরিস্ফুট। শ্যামাঙ্গিনী মধু-মালতী, মাধবপ্রিয়া মধুস্রাবী মাধবী, সুরভি জাতি যূথী ব্যথিত বুক ঢাকিয়া রাখে। বিচ্ছেদ-কাতর ভ্রমর নিরন্তর গুণ গুণ স্বরে এখনও কুঞ্জে কুঞ্জে শ্যামচাঁদকে খুঁজিয়া বেড়ায়।

ব্রজের এই মনোহর সৌন্দর্য্য দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, ব্রজে সবই সেই আছে, সবই সুন্দর, কেবল ব্রজ-সুন্দর নাই।

শ্রীবৃন্দাবন পরমপুরুষ ও পরমা প্রকৃতির প্রেমনিকেতন, বিলাস-বাসর। ইহাকে সুসজ্জিত করিতে একদিকে স্বভাব যেমন আপনার সৌন্দর্য্যসম্ভার মুক্ত হস্তে ঢালিয়া দিয়াছে, অন্যদিকে তেমনি ভাবুক, ভক্ত, কবি, শিল্পী, স্থপতি ভাস্কর

যেন পরস্পর প্রতিযোগিতা করিয়া যুগেযুগে এই পুরাণ-প্রসিদ্ধ স্থানকে আপন আপন অমর প্রতিভার অপরিসীম ঐশ্বর্য্যে মণ্ডিত করিয়া গিয়াছেন। একদিকে যেমন জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, লোচন, রূপ, জীব, সনাতন প্রভৃতি ভক্তকবিগণ কৃষ্ণলীলা-কীর্ত্তনে শ্রীধামকে চির-স্মরণীয় করিয়াছেন, অন্য দিকে তেমনই স্থপতি, ভাস্কর শ্রীরাধাকৃষ্ণের অপূর্ব্ব প্রেমময় মূর্ত্তি গঠন ও মন্দির বিরচন করিয়া ধন্য হইয়াছেন। একদিকে যেমন স্বভাব ও কাব্য, অন্য দিকে তেমনই সুচারু কারুসৌন্দর্য্যের বিচিত্র বিকাশ। একদিকে ভাবুক যেমন হৃদয়ের ভাবস্রোত বহাইয়াছেন, উল্লেখযোগ্য। ভারতবর্ষে বহু বিশাল দীর্ঘিকা আছে, কিন্তু ব্রজমণ্ডলের রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, মানসীগঙ্গা, কুসুমসরোবর প্রভৃতির ন্যায় ভগবৎপ্রীতি ও স্মৃতিপূত সরোবর আর কোথায় আছে? এই পুণ্যভূমিতে যে সকল দেবমন্দির ভক্তের অকাতর ব্যয় ও স্থপতির অপরূপ কারু-নৈপুণ্যের পরিচয় দেয়, তন্মধ্যে বঙ্কবিহারীর মন্দির, গোবিন্দজীর মন্দির, মদনমোহনের মন্দির, গোপীনাথের মন্দির, লালাবাবুর মন্দির, সাহ বিহারীলাল টেম্পল, ব্রহ্মচারী মন্দির, পুষ্করিণী লেক রাণজীর টেম্পল, সাহজীর মন্দির, শেঠদের মন্দির প্রভৃতি লোকপ্রসিদ্ধ।
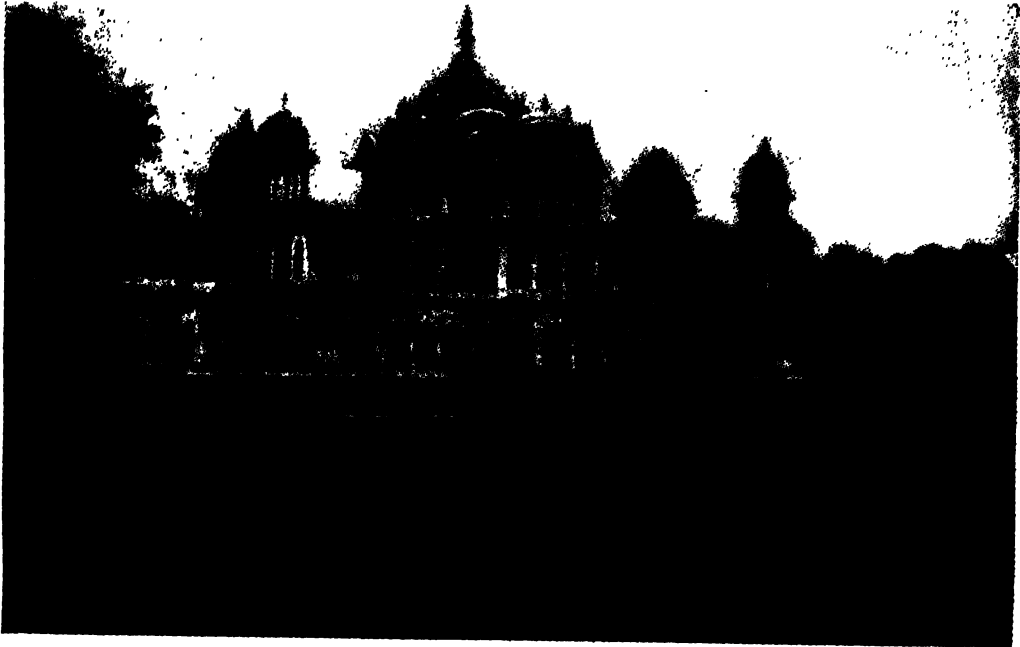
ছত্রী বলবন্ত সিং—গোবর্দ্ধন

অপর দিকে সম্পদ তেমনই জলধারার ন্যায় অজস্র অর্থ বর্ষণ করিয়াছে। কে না বলিবে মদনমোহন, বাঁকাবিহারী, রাধা-রমণ, গোপীনাথ, রাধাদামোদর, রাধাবিনোদ, গোকুলানন্দ, শ্যামসুন্দর প্রভৃতি বিগ্রহমূর্ত্তি সকল ভক্তের দৃষ্টিতে জগতে অতুলনীয়। শ্রীবৃন্দাবনের পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর তিন দিকেই শ্যামাঙ্গিনী যমুনা, ত্রিভঙ্গভঙ্গিম শ্যামসুন্দরের ন্যায় ত্রিভঙ্গে প্রবাহিত। ইহার কূলে কূলে পাথরে বাঁধান ঘাট, চবুতারা ও চাঁদনী। তন্মধ্যে মথুরার বিশ্রামঘাট বিশেষ বিখ্যাত। এই ঘাটে যমুনার আরতি হয়। তারপর কেশিঘাট,চীরঘাট বিশেষ

গোধূলি-সমাগমে শ্রীরামকৃষ্ণ এক দিন যমুনা-পুলিনে বিচরণ করিতেছিলেন, সঙ্গে হৃদয়। শ্যামকুন্তলা, শ্যামাঙ্গিনী, তরঙ্গ-মালিনী তরঙ্গিণী যেন কার আগমন-বারতা অধীর উল্লাসে কলভাষে প্রচার করিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, হৃদু, রাখালরাজ এমনই সময় গোধন চরিয়ে গৃহে ফিরতেন। বলিতে বলিতে আচম্বিতে দূরবংশীধ্বনি যেন তাঁহাকে অতি-মাত্রায় আকুল করিয়া তুলিল। ক্রমে তাঁহার নয়নতারা নিশ্চল হইয়া গেল। মানসদৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিলেন, দূর পরপার হইতে বিরাট শোভাযাত্রা যমুনা পার হইবার জন্য

পুষ্করিণী লেক রাণজী টেম্পল—বৃন্দাবন

মানসী গঙ্গা—গোবর্দ্ধন
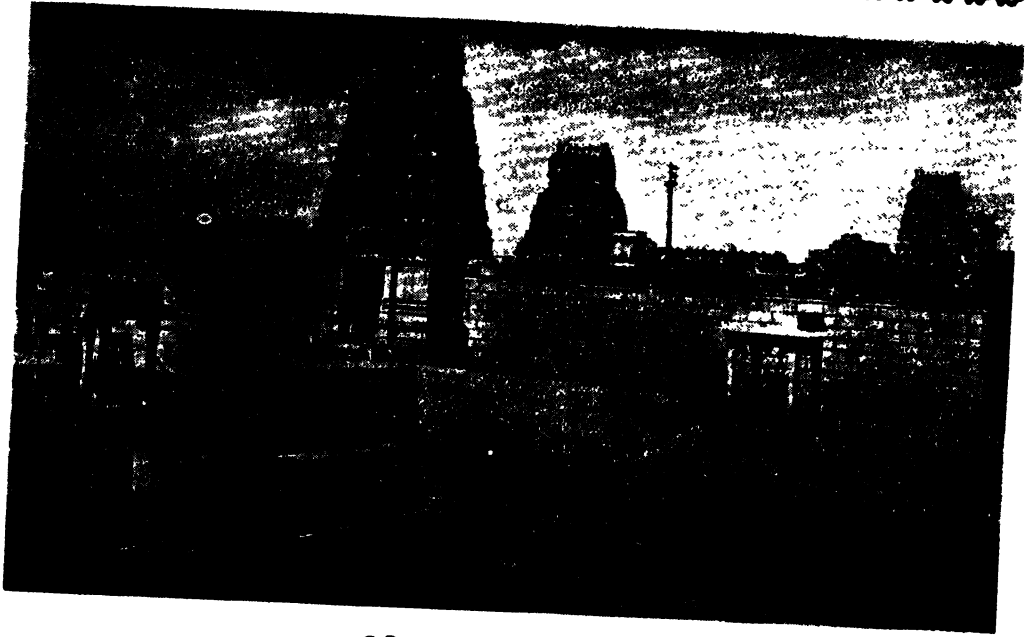
ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। তাঁহার অন্তশ্চক্ষুতে অস্পষ্ট ক্রমে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। দেখিলেন, অগ্রভাগে পত্রপুষ্প-শোভিত গোধন, পশ্চাতে বনমালা-ভূষণ রাখালগণ, তৎপশ্চাতে মোহন সাজ-সজ্জিত রাখালরাজ। শ্যামচাঁদের অধর-সুধাপানে মাতুয়ারা বাঁশরী স্বরলহরী-সঙ্কেতে গোধন চালন করিতেছে। ব্রজবালকগণের আনন্দ-কোলাহলে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত। ক্রমে গোধনের অগ্রভাগ যমুনায় অবতীর্ণ হইল এবং দেখিতে দেখিতে নীরপার হইয়া গোধূলির অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল।

শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায় সর্ব্বক্ষণই অলৌকিক ভাব-জগতে বাস করিতেন। এক দিন তিনি ভাবাবেশে নিধুবন-বিচরণ করিতেছিলেন। সহসা ঘন-পত্রাচ্ছাদিত একখানি ক্ষুদ্র কুটীর হইতে এক বর্ষীয়সী রমণী দুলালী দুলালী বলিতে বলিতে বাহির হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের হাত ধরিলেন।

দুলালী শ্রীমতীর আদরের নাম। তার পর পরস্পরের মুখে শ্যাম-প্রসঙ্গ, চোখে অশ্রুতরঙ্গ, প্রেমের বন্যা ছুটাইল। মথুর বুঝিলেন, সমূহ বিপদ। বলিলেন, হৃদু, এই বুড়ীকে ঠেকাও।
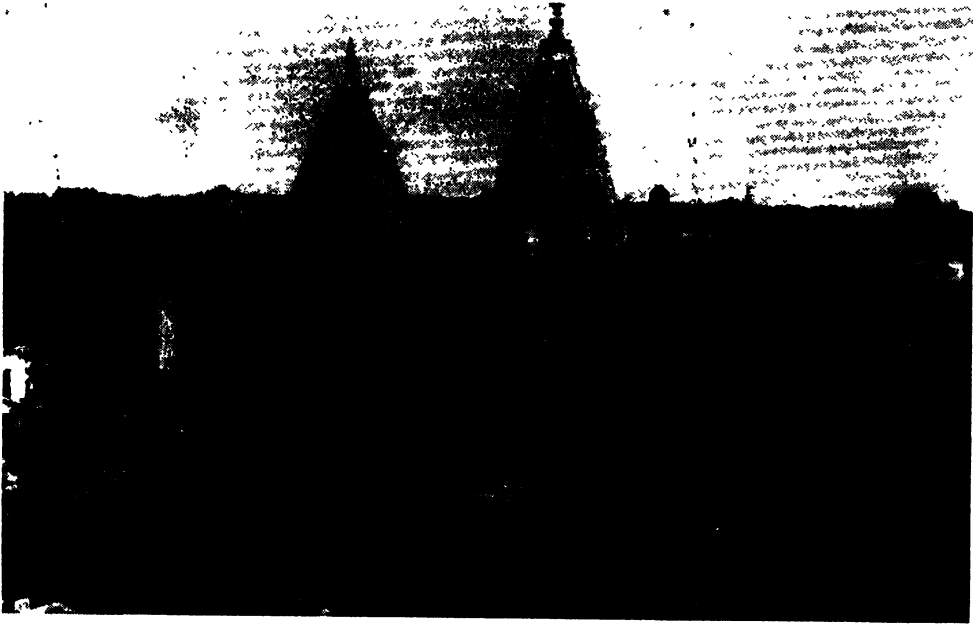
লালা বাবুর মন্দির---বৃন্দাবন

মাতুলের মুখে এই অলৌকিক বর্ণনা শুনিয়া হৃদয় মুগ্ধ বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। সে ত কিছুই দেখে নাই বা শুনে নাই। এ দৃশ্য চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের নহে। ইহা ভাব-জগতের অনুভূতি এবং মায়াসৃষ্ট ছায়ার জগৎ হইতে অধিকতর ঘনীভূত নিত্য সত্য। এই অলৌকিক অনুভূতিবলেই ভক্ত-ভাবুক, ভাবসমাধিসম্পন্ন সাধুমহাত্মাগণ বলেন, নিবিড় শষ্পাচ্ছন্ন ব্রজ-বক্ষে অভিসারিকা গোপিকার চরণ-রেখা এখনও সুস্পষ্ট লেখা রহিয়াছে। এখনও ব্রজধামে নিত্য নিশিতে বাঁশী বাজে, গোপী অভিসারে সাজে আর নিধুবন-মাঝে নিত্য মিলন-মান-বিরহের বিনোদলীলা অনুষ্ঠিত হয়।

কিন্তু ঠেকাব কাকে? কে এ?

হৃদয় অনুসন্ধানে জানিল, বৃদ্ধার নাম গঙ্গামায়ী, জনৈকা সিদ্ধ প্রেমিকা। কৃষ্ণলীলায় ইনি শ্রীমতীর প্রিয়সখী ললিতা। ব্রজবাসীদিগকে নিগূঢ় প্রেম-রহস্য বুঝাইবার নিমিত্ত ব্রজমণ্ডলে পুনরায় অবতীর্ণ হইয়াছেন।

নিধুবনে গঙ্গামায়ীর কুটীরে নিত্য আনাগোনা করিতে করিতে শ্রীরামকৃষ্ণ স্থির করিলেন, দক্ষিণেশ্বরে আর প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন না। এমন সঙ্গ—নিরবচ্ছিন্ন প্রেম-প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া বিষয়ীদিগের সাহচর্য্য!

হৃদয় দেখিল, মাতুলের ভাব দিন দিন এমনই গভীর

হইতে গভীরতর হইতেছে যে, অনতিবিলম্বে তিনি একেবারে তলাইয়া যাইবেন, আর তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। এখনই ত স্নান করাইবার, খাওয়াইবার, দু'টি কথা কহিবার জন্য তাঁহাকে চেতাইয়া তোলা দায়। সেই নির্ব্বিকল্প-সমাধি-সাধনের সময় নিরন্তর এমনই ভাবের ঘোরে ছয়মাসকাল কাটিয়াছিল। সে কি দিনই গিয়াছে! আর কালবিলম্ব নয়। বলিল, মামা, এইবার বাড়ী যেতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, সেখানে কেবল বিষয়ী লোকের সঙ্গ, এ স্থান ছেড়ে যেতে ইচ্ছা নেই।

যাবে না? তুমি পেটরোগা লোক। তোমাকে রেঁধে খাওয়াবে কে? তোমার সেবা করবে কে?

গঙ্গামায়ী কিছুতেই পশ্চাৎপদ নহেন। বলিলেন, কেন? আমি রেঁধে খাওয়াব, আমি দুলালীর সেবা করব।

হৃদয় বলিল, সেজবাবু বাসা উঠিয়ে চ'লে যাচ্ছে। তুমি থাকবে কোথা? শোবে কোথা?

গঙ্গামায়ী বলিলেন, কেন? আমার কাছে থাকবে। এক ধারে আমার বিছানা হবে, এক ধারে দুলালীর। আমি দুলালীকে কিছুতেই ছেড়ে দেব না। বলিয়া বৃদ্ধা দুলালীর হাত ধরিলেন।

ছেড়ে দেবে না? আমিও মামাকে ছেড়ে যাব না, বলিয়া হৃদয়ও মাতুলের অপর হাত ধরিল।

এই টানাটানির মাঝে শ্রীরামকৃষ্ণের মনে পড়িল, তাঁহার চিরশোকাতুরা মাতা দক্ষিণেশ্বরে নহবতের ঘরে তাঁহার প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন। বলিলেন, না, আমায় যেতে হবে, মা সেখানে আছেন।

ইহার পর আর কথা চলে না। দুলালীর মুখ চাহিয়া গঙ্গামায়ীর নয়নে শ্রাবণের ধারা নামিল। দেখিয়া হৃদয় ভাবিল, ওঃ, এত অশ্রু এই বার্দ্ধক্যশুষ্ক বক্ষে সঞ্চিত ছিল!

যতদূর দৃষ্টি চলে, গঙ্গামায়ী অশ্রুসিক্ত, একাগ্রনয়নে তাঁহার দুলালীকে দেখিতে লাগিলেন। বৃদ্ধার মরমের হা-হুতাশ, দীর্ঘশ্বাস বহিয়া বাতাস দুলালীর পিছনে পিছনে ছুটিয়া চলিল।

চারিমাস তীর্থভ্রমণ করিয়া মথুর বাবাকে লইয়া শুভদিনে কলিকাতা যাত্রা করিলেন।

আনন্দ-কল্লোল তুলিয়া ভাগীরথী দক্ষিণেশ্বরের চেতন বিগ্রহকে বরণ করিয়া লইলেন। পুলকে বৃক্ষ-বল্লী মুঞ্জরিত হইয়া উঠিল।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

অকাল-কুসুম

আবার মঞ্জরী কেন এ বৃদ্ধ রসালে
চির-চিত্ত বিত্ত মোর কোথা সে ভ্রমরী,
প্রেম-গুঞ্জরণে যার অলকানগরী—
ফুটিত নয়নে মোর পুষ্পমণি-জালে?

ইন্দ্র-ইন্দ্রাণীর গর্ব্ব ইন্দু ইন্দ্রধনু;
সুধা আর সৌন্দর্য্যের অক্ষয় ভাণ্ডার
চিত্রে যেন ফুটাইত তব নীল তনু,
মণির মুকুরে সূর্য্য-কিরণ প্রচার।

তুমি যে এসেছ বুকে কাব্যলক্ষ্মী মম,
তাই এ নবীন পুষ্প বিশুষ্ক শাখাতে,
মঞ্জুল পঞ্চমধ্বনি শুনি মধুরাতে,
মধুরার মাধুরীতে, প্রাণ সুধা সম।

তব পদরাগে লিপ্ত, অতৃপ্ত হৃদয়,
বসন্তের সমারোহ হোক মধুময়।

মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

টুকি-টাকি

মাষ্টারী করিলে কি হয়, তারাপদর বিষয়-বুদ্ধি বিলক্ষণ। ভুবনকে পূর্ব্ব হইতেই তিনি নানা প্রলোভনে হাত করিয়াছিলেন; নিজের জামাতার ভবিষ্যৎ গড়িবার বিচিত্র সঙ্কল্পের কথা পাড়িয়া ভুবনের চিত্তটুকুকে তিনি লোভাতুর করিয়াছিলেন খুব,—ঐ মেয়েই তাঁর সব—বিবাহ দিয়া জামাইকে বিলাতে পাঠাইয়া সেখান হইতে একটা দিগ্‌গজ কিছু বানাইয়া আনিবেন, তার উপর তাঁর যা কিছু স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ইত্যাদি—এমনি কথাবার্ত্তার পর যে দিন ভুবনকে গৃহে লইয়া গিয়া হুম্ করিয়া তার কাছে কথাটা পাড়িলেন, অর্থাৎ ভুবন ছেলেটকে বরাবর তিনি ভালোবাসেন—তার ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ চিরদিন এবং যদি তাঁর মেয়েকে ভুবনের পছন্দ হয়···এমনি দু চারি কথার পর এমন কথাও তিনি বলিয়া ফেলিলেন, ভুবন ইউনিভার্সিটির পরীক্ষা পাশ করিলেই অক্সফোর্ডে যাওয়ার সকল ব্যবস্থা করিয়া দিবেন, তখন ভুবন যেন একেবারে গলিয়া জল হইয়া গেল। মেয়েকে দেখাইয়া দিবার অবসরও তারাপদ ছাড়িয়া দিলেন না। আধুনিক প্রথামত মেয়ে মহিমাপ্রভাকে দিয়া চায়ের পেয়ালাও আনাইয়া ফেলিলেন এবং তার দু-একটি গানও ভুবনকে শুনাইয়া দিলেন।

ভুবনের চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবী অপূর্ব্ব রঙে রঙীন হইয়া উঠিল। বিলাত যাওয়া···ইহার চেয়ে কাম্য তরুণের আর কিছু থাকতে পারে না!

এদিকে আট-ঘাট এমনি করিয়া বাঁধিয়া তবে তারাপদ গিয়া জীবনের কাছে কথা পাড়িলেন; ভবিষ্যতের রঙীন ছবি জীবনের সামনেও মেলিয়া ধরিলেন। তা. দেখিয়া জীবন উল্লাসে মাতিয়া উঠিল—এ তো বেশ!···তবে নিজের পাওনা-গণ্ডাটুকু না ফাঁক পড়ে! ছেলেকে মানুষ করিতে তাঁর ব্যয়ও হইয়াছে—তার উপর ভুবন যা ছেলে, ভবিষ্যতে উহাকে নিজের তাঁবে রাখা সম্ভব নহে, তাকে একেবারেই হাত-ছাড়া করিতে হইবে, সুতরাং···

মেয়ে দেখার প্রয়োজনও ছিল না,—তবু একটা রীতি নাকি বরাবর চলিয়া আসিতেছে—বাড়ীতে মেয়েরা ছাড়িবে কেন? কালীঘাটে গিয়াই মেয়ে দেখা হইল। যোগমায়া দেবীর মন প্রসন্ন হইতে পারিল না—বৌ হইবে সুন্দরী। এ মেয়ের রূপের কোনো বালাই নাই, তা ছাড়া মনটুকুও যেন দেমাকে ভরা। উহাকে বশে আনিয়া ঘর-সংসার করিবেন, এ আশা তাঁর মনের কোণেও মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিল না!

জীবনের কাছে সে কথা তুলিতে জীবন কহিল,—এ কালে সে আশা করো না! আজকালের বৌ—বিশেষ অমন লেখাপড়া-জানা, তাকে বশ করা শক্ত!

যোগমায়া দেবী কহিলেন,—ছেলের বৌ নিয়ে শেষ বয়সে মানুষ সুখে সংসার-ধর্ম্ম করতে চায়! ছেলে-বৌ নিয়ে ঘর করা ভাগ্যের কথা!

জীবন কহিল—ভাগ্যে থাকে, ঘর করবে। কিন্তু তা ব'লে এ সম্বন্ধ ছাড়া উচিত নয়। গহনা-টহনা-বাদে নগদ যে হাজার টাকা দেবে, ঐ টাকায় ভাবচি, শান্তর বিয়ের কিনারা করবো।

যোগমায়া কহিলেন,—কিন্তু বৌ ময়লা···

জীবন কহিল—বয়ে গেল। ছেলে ওদিকে ঝুঁকেচে, সে খবর রাখো? এর পর বাড়ী ছেড়ে গিয়ে যদি নিজে থেকে বিয়ে করে, তখন যে একটি পয়সা পাবো না।

যোগমায়া দেবী কহিলেন,—বেশ, তুমি যদি ভালো বোঝো, বিয়ে দাও···

বিবাহ দেওয়াই স্থির হইল। ছোট-খাট বাদানুবাদে ভুবন একেবারে মার-মূর্ত্তি ধরিয়া বুঝাইয়া দিল, তার ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে আর সকলে যত উদাসীনই থাকুক, সে তা থাকিতে পারিবে না! জীবনে চান্স মানুষের নিত্য মিলে না। যদি এমন চান্স মিলিয়াছে, সে তা ছাড়িবে না!

অগত্যা বিবাহের কথা পাকা হইতে বিলম্ব ঘটিল না! এই এগজামিনের পরই···

অপূর্ব্বর ওদিকে আসিতে চার-পাঁচ দিন বিলম্ব হইল। পিশিমা কহিলেন,—একটা খবর দিতে হয়, বাবা···ভাবনায় বাঁচি না।

অপূর্ব্ব কহিল,—একটা কাজে হাত দিলে তার এত

ন্যাকড়া বেরোয়, যেন অজগরের ফণা! সব সেরে তবে আসচি…একটু বিশ্রাম করতে চাই এবার।

পিশিমা কহিলেন,—বিয়ের কথা সব বল্ বাবা…সেদিন তো কথাটুকু দিয়েই চ'লে গেলি।

অপূর্ব্ব কহিল—মেয়েটিকে মা আলমোরাতেই দেখেচে। তারা গেছলো সেখানে হাওয়া খেতে। কাশীতে থাকে। মেয়ের বাপ নেই…

পিশিমা কহিলেন,—কি রকম দেবে-থোবে?

অপূর্ব্ব কহিল,—কিছু চাওয়া হয়নি…তাদের যা-খুশী, তাই দেবে। মেয়ের মামা দাঁড়িয়ে বিয়ে দেবে। এলাহাবাদ থেকেই বিবাহ হবে।

পিশিমা কহিলেন,—গহনা কি তৈরী হলো?

অপূর্ব্ব কহিল,—কাল সকালে দেখতে পাবে। এখানকার ঠিকানা দিয়ে এসেচি। তারা নিয়ে আসবে।…ভালো কথা, এ ক'দিন মা'র কোনো চিঠি-পত্র আসেনি?

পিশিমা কহিলেন,—না।

অপূর্ব্ব কহিল,—আসা উচিত ছিল—মা এই ঠিকানাতেই চিঠি দেবে, বলেছিল।

বিন্দু স্নান করিতে গিয়াছিল, ফিরিতে অপূর্ব্ব কহিল,—এসো বিন্দু বোনটি…চান হলো বুঝি?

এক-মুখ হাসিয়া বিন্দু কহিল,—হাঁ।…বলিয়া সে আসিয়া অপূর্ব্বর পায়ের কাছে প্রণাম করিল।

অপূর্ব্ব কহিল,—এ আবার কি!…আশীর্ব্বাদ করতে হয় প্রণাম করলে,—না মা? কি আশীর্ব্বাদ করি, বলো তো?

পিশিমা কহিলেন,—আশীর্ব্বাদের পথ সাফ ক'রে রেখেচে এই বয়সেই…বরাত কেমন।

অপূর্ব্ব কহিল,—তাও কি হয়! আশীর্ব্বাদ করি, লক্ষ্মী হও…মানুষের সেবায় তোমার জীবন সার্থক হোক!

পিশিমা কহিলেন,—তাই বল্ বাবা…

তার পর পিশিমা বিষয়-সম্পত্তির কথা পাড়িলেন…যেটুকু জানিতেন, খুলিয়া বলিলেন।

শুনিয়া অপূর্ব্ব কহিল,—বেশ, বংশী বাবুর সঙ্গে দেখা করি তা হলে…ভালো কথায় না হয়, তখন যা করবার, করবো।

পিশিমা কহিলেন,—দেরী করা নয়। এক মাসের উপর হলো, এসেছিল…তার পর কোনো উচ্চ-বাচ্য নেই! এমন চুপ ক'রে আছে! ভয় হয়…

অপূর্ব্ব কহিল,—ঠিকানা দাও, আজই খাওয়া-দাওয়ার পর যাবো। শুভস্য শীঘ্রং।

পিশিমা কহিলেন,—কিছু নিতে চাও, নাও…বাকীও তা বলে দেবে না?

অপূর্ব্ব কহিল,—না, একটি পয়সা ছাড়া হবে না। ভোগা দেওয়ার প্রশ্রয় চলে না, তাতে পাপ হয়।

বিন্দু ঘরে গিয়া সিক্ত বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া আসিল।

অপূর্ব্ব কহিল,—কি খাওয়াবে, বিন্দু-বোন্? আজ এখানেই খাবো।

হাসিয়া বিন্দু কহিল,—যা ক্ষমতায় কুলোয়…

অপূর্ব্ব কহিল,—স্নেহের পরিচয় পাবো খাওয়ানোয়…

বিন্দু কহিল,—খাওয়ার আগে তো স্নেহের মাপ হয় না! স্নেহ মনের জিনিষ…মনের আগ্রহেই তার মাপ।

অপূর্ব্ব কহিল,—না, হারিয়ে দিয়েচে বটে!

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মনের ভার

পাঁচ দিনের জায়গায় দশ দিন কাটিয়া গেল। অপূর্ব্বকে থাকিতে হইল। মা'র নিকট হইতে কোন চিঠি-পত্র নাই। অপূর্ব্বর চিন্তার সীমাও নাই। ব্যাপার কি? দু'খানা টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছে, তারো কোনো জবাব নাই। অপূর্ব্ব কহিল,—কলকাতায় চল্লুম, জবাব চেয়ে টেলিগ্রাম করিগে। খবর নিয়ে তবে ফিরবো। না হলে আজই এলাহাবাদ যাবো…

পিশিমা উদ্বেগাকুল চক্ষে অপূর্ব্বর পানে চাহিয়া রহিলেন।

অপূর্ব্ব নিজের মনেই বলিতে লাগিল,—বংশী বাবুর নামে নোটীশ দিয়েচি, যদি আজ-কালের মধ্যে সব কাগজ-পত্র না পাই, তা হলে পুলিশ কোর্টে দরখাস্ত ক'রে একখানা ওয়ারেণ্ট নিতে হবে। সেই ওয়ারেণ্টের জোরে বাড়ী থানা-তল্লাসী ক'রে কাগজ-পত্র উদ্ধার করা চাই!…আমার থাকা দরকার। অথচ ওদিককার কোনো খপর নেই, মহা বিপদ ঘটলো!…

ডাকওয়ালা আসিল, আসিয়া চিঠি দিয়া গেল। অপূর্ব্ব কহিল,—আমার চিঠি?

বিন্দু কহিল—না।

—তবে?

বিন্দু কহিল,—আমার চিঠি। বলাইদা লিখেচে…

পিশিমা কহিলেন,—কি লিখেচে?

বলাই লিখিয়াছে—

আজ খুব ছোট্ট চিঠি, বিন্দু! সাহেবের একটা কাজ করিয়া দিয়াছি। সাহেব খুশী হইয়া একশো টাকা মাহিনা স্থির করিয়াছে। সাহেবের নজর পড়িয়াছে। উন্নতির সম্ভাবনা আছে। বোধ হয়, দু'চার দিন পরে রেঙ্গুন যাইব। কলিকাতা হইয়া যাইব। তা যদি হয়, তো দেখা হইবে। বাড়ীর খবর কি? মাকে বলো চিঠি লিখিতে। তোমার চিঠির সঙ্গে মা'র চিঠি পাঠিয়ো। মা'র হাতের দুটি লাইন পাইলে বড্ড আরাম বোধ করিব। কলিকাতায় যাই যদি তো কিছু উপহারও তোমাদের জন্য সঙ্গে যাইবে।

আমি ভালো আছি। তোমরা কেমন আছ? শম্ভু বাবুর খবর কি? কোনো উপায় হইল? জানাইয়ো। আমি অত্যন্ত চিন্তিত আছি।

ইতি

বলাইদা।

পিশিমাও চিঠি শুনিলেন, শুনিয়া কহিলেন,—এক কাজ কর্ মা। একবার দৌড়ে তোর জ্যাঠাইমাকে খবরটা দিয়ে আয়।

বিন্দু কহিল,—যাই।

বিন্দু চিঠি লইয়া তখনি ছুটিল।

সে চলিয়া গেলে পিশিমা বলাইয়ের কাহিনী অপূর্ব্বকে শুনাইলেন। অপূর্ব্ব কহিল,—এ ছেলেটি হঠাৎ আসামে গেল কেন?

পিশিমা কহিলেন,—সংসারে এতটুকু শান্তি নেই…বড় দুই ছেলে ভারী আত্মগর্জ্জে—কারো উপর দরদ নেই…মায়া নেই। তবে পড়াশুনায় ভালো। ছেলে এই বলাই… লেখাপড়া করলে না…পয়সার জন্য এই বয়সে কোথায় কোন্ বিদেশে চ'লে গেল।

অপূর্ব্ব কহিল—মা যেতে দিলে?

পিশিমা কহিলেন—নিরুপায় হয়েই, বাবা। মা বড় ভালো, সংসার মাথায় ক'রে আছে—কিন্তু সংসার তার পানে ফিরেও তাকায় না। বড় ছেলে বিয়ে করচে…কলেজের এক মাষ্টার…তার মেয়ে। সে নাকি জামাইকে বিলেত পাঠাবে!…মেয়ে কালো…

অপূর্ব্ব শুনিল, শুনিয়া কহিল,—দুটি বিয়ের যোগ্য মেয়ে আছে ঘরে?

পিশিমা কহিলেন,—আছে। এক হতভাগার সঙ্গে বাপ বিয়ের ব্যবস্থা করেছিল। তার কাছ থেকে কিছু টাকাও নিয়েছিল, বলাই সে-দায় উদ্ধার করে।…তার যে মর্জ্জি… কখন্ কি ক'রে বসে! করলে দেখবারও কেউ নেই! তাই তো ভয়, যো পেয়ে কি সর্ব্বনাশ ক'রে বসে।

অপূর্ব্ব চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। লেখাপড়া শিখিয়া নিজেদের ভবিষ্যতের রঙীন স্বপ্নে তারা মশগুল্—কিন্তু তাদের আশে-পাশে এমনি দুঃখ-দৈন্য-যাতনার অন্ত নাই। মানুষের বেদনার কি বিচিত্র ধারাই না গঙ্গার শত ধারার মত দিকে দিকে বহিয়া চলিয়াছে! এত দুঃখ-যাতনায় মগ্ন যে হাহাকারের বিরাম নাই!…কি বিচিত্র এ বিশ্বের লীলা!…

পিশিমা কহিলেন,—তুমি চান-টান করো, বাবা…বিন্দু আসুক—ঐ ঘোষালদের পুকুর আছে…ভালো জল। বিন্দু তোমায় সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবে। আমি ততক্ষণ উনুন ধরিয়ে ভাত চড়িয়ে দি…

পিশিমা চলিয়া গেলেন। অপূর্ব্ব চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। গাছে গাছে পাখীর গানের আসর তখনো ভাঙ্গে নাই।…

ক্ষণপরে বিন্দু আসিল, তার সঙ্গে শান্ত। শান্তর হাতে একটা থালা…থালায় কতকগুলা মিষ্টান্ন।

অপূর্ব্ব চাহিয়া দেখিল। বিন্দু ডাকিল,—পিশিমা…

রান্নাঘর হইতে পিশিমা কহিলেন,—কেন?

বিন্দু কহিল,—এই ছাখো, শানু কি এনেচে। ভুবনদার শ্বশুররা তত্ত্ব পাঠিয়েচে…

পিশিমা কহিলেন,—এইখানে আয় মা…

বিন্দু ও শান্ত রান্নাঘরের দিকে চলিল। অপূর্ব্ব তেমনি চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

তেলের বাটী লইয়া বিন্দু আসিল, কহিল,—নাইতে চলো, দাদা।

অপূর্ব্ব কহিল,—তাই তো···তুমি ব্যবস্থা ক'রে ফেলেচো!

বিন্দু কহিল,—পিশিমা যে বললে। জল বেশ ভালো··· ঐ ঘোষালদের পুকুর···জামা-টামাগুলো খুলে আমার হাতে দাও।

অপূর্ব্ব কহিল,—আমার খাওয়ার কি করচো?

বিন্দু কহিল,—ছাখো না—সব তৈরী হয়ে যাবে···

অপূর্ব্ব কহিল,—বেশ, তা হলে স্নান করা চাই!

অপূর্ব্ব স্নান করিয়া আসিলে পিশিমা কহিলেন,—ওদের ভুবনের বিয়ে তা হলে ঠিক হয়ে গেল। যাক্, ভালোই হোক···

বিন্দু কহিল,—আমাদের দেখা হবে না।

অপূর্ব্ব কহিল,—কেন? এলাহাবাদে যেতে হবে, বলে? তা নয় থেকেই যাও···

বিন্দু কহিল,—থাকবো কি ক'রে! ওখানে যে যেতেই হবে।

অপূর্ব্ব কহিল,—জোর তো নেই···।

বিন্দু হাসিয়া কহিল,—অমনি অভিমান হলো! বাপ রে বাপ, এত অভিমানও তোমরা করতে পারো! ভয় নেই দাদা, আমি এলাহাবাদেই যাবো—বৌদিকে দেখতে হবে··· না দেখে মন স্থস্থির করতে পারবো না। এখানে বৌ দেখবো ফিরে এসে···

আহারাদি সারিয়া অপূর্ব্ব কলিকাতায় গেল।···সারা দিন বিন্দু জীবনের গৃহেই কাটাইল। বিবাহের নানা কথা-বার্ত্তা···ভুবনও তার মধ্যে আসিয়া যোগ দিতেছে। সেই ভুবন···কাহারও পানে যে চোখ তুলিয়া চাহিতে জানে না··· সে আজ আসিয়া নানা কথা কহিতেছে! বিন্দুকেও শ্বশুর-বাড়ীর দু'চারিটি কথা শুনাইয়া দিল। বৌ গান গায়··· হার্ম্মোনিয়ম বাজায়···ভুবনের মুখে প্রসন্নতার কি দীপ্তি! বিন্দু কাঠ হইয়া শুনিল। সে কথায় সে কিছুমাত্র আগ্রহ দেখাইল না।

বৈকালে অপূর্ব্ব ফিরিল···পকেট হইতে টেলিগ্রাম বাহির করিয়া শুনাইল···মা'র টেলিগ্রাম। মা তার করিয়াছেন,— কালই সকলকে নিয়ে যাত্রা করো। কন্যাপক্ষ এলাহাবাদে আসিয়াছে।

অপূর্ব্ব কহিল,—তা হলে তো মা, কালই বেরুতে হচ্ছে। আমি সকালে গিয়ে উকিলকে বংশী বাবুর ব্যাপার সম্বন্ধে যা করতে হয় পরামর্শ দিয়ে আসবো! তার পর পাঞ্জাব মেলে বেরুবো···কি বলো?

পিশিমা কহিলেন,—বেশ।···

বিন্দুর মন মুষড়াইয়া গেল। বলাইদা লিখিয়াছে··· রেঙ্গুনে যাওয়ার পথে কলিকাতায় আসিবে! তারা তো এদিকে এলাহাবাদে চলিল—বলাইদার সঙ্গে দেখা হইবে না। যে মানুষ···যখন শুনিবে, বিবাহের নিমন্ত্রণে এলাহাবাদ গিয়াছে···তখন তার অভিমানের আর সীমা থাকিবে না! কত দিন দেখা হয় নাই, আরো কত কাল দেখা হইবে না। কিন্তু উপায় কি?···

যদি কাল সকালে আসে! আহা, তাই যেন হয়, ভগবান!

পরের দিন উদ্যোগ-আয়োজন চলিল। সে আয়োজন-কালে তার সমস্ত মন উদ্‌গ্রীব অধীর···দ্বারে কার বুঝি পরিচিত মুখখানি ঐ ভাসিয়া উঠে! সেই পায়ের ধ্বনি! বুঝি, বলাই পরিচিত কণ্ঠে এখনই ডাকে,—বিন্দু···

দিনের আলো সন্ধ্যার ম্লান অন্ধকারে ঢাকিয়া আসিল। সে মুখ ভাসিল না! সে স্বর জাগিল না! যথাসময়ে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে হইল এবং যোগমায়া দেবীর করুণ দৃষ্টি···এ সবের পরশ ঠেলিয়া যাত্রা করিতে হইল। বিন্দুর মনে যেন ভারী পাথর চাপিয়া রহিল! কাল যদি বলাইদা আসে?···

দেখা হইল না! প্রাণটা দেখা করিবার জন্য কতখানি আকুল!···

দুনিয়ায় মানুষের কটা আশা পূর্ণ হয়! এমনি নিরুপায়-তার মধ্যে কত নিমেষ বহিয়া যায়, মনে দীর্ঘ কালো রেখা টানিয়া!···

ম্লান চোখে বিন্দু ট্রেণের কামরায় বসিল, অপূর্ব্ব ও পিশিমাও সেই কামরায়!···

গাড়ী ছাড়িল। অপূর্ব্ব কহিল,—বিন্দু অমন গুম্ হয়ে রইলে যে!···

পিশিমা কহিলেন,—অসুখ করচে?

বিন্দু একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ম্লান কণ্ঠে কহিল,— মাথাটা বড্ড ধরেচে···

অপূর্ব্ব কহিল,—জানলায় মাথা রাখো। হাওয়ায় এখনি মাথা ধরা সেরে যাবে।···

বিন্দু সে আদেশ পালন করিল। সে জানলায় মাথা রাখিল, রাখিয়া চক্ষু মুদিল।

মুদ্রিত চোখের সামনে বলাইয়ের চিঠির অক্ষরগুলা ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল।...বলাই হয় তো গৃহের পথেই যাত্রা করিয়াছে। আর বিন্দু? গৃহ ছাড়িয়া কোথায় দূরে চলিয়াছে! বলাইদা জানেও না, এ-যাত্রায় তার বেদনা কতখানি! -

[ক্রমশঃ।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

হিমালয়ের পথে

শিলিগুড়ি হতে মটর ছাড়্ল—যাবে দার্জ্জিলিং
ছোট্ট গাড়ী, তার আরোহী আমরা ছিলাম যাত্রী তিন।
প্রথমটা পথ সোজাই গেছে—ডাইনে বাঁয়ে সবুজ ধান
দূর-বাগানে কোকিল শ্যামা প্রভাত আলোয় গাইছে গান।
আঁকাবাঁকা রেলের লাইন ভেদ করেছে পথটাকে
তারি পাশে চল্‌ছে হেসে ভুটান মেয়ে নথ নাকে।
মোট রয়েছে স্কন্ধে তাহার—পিঠে শিশু জোর বাঁধা
হাত দুটিতে তাল দিয়ে গায়—গান যেন তার রয় সাধা।
হঠাৎ যেন বোধ হল পথ উঠ্‌ছে এবার উচ্চেতে
সন্দেহ হয় বাধবে লড়াই মেঘে এবং সূর্য্যেতে।
এমনি সময় পড়্ল চোখে সুদূরব্যাপী 'সুকনা' বন
রৌদ্র সেথায় পায় নাক ঠাঁই হ'ক না বেলা খুব তখন।
ঘন সারে রয় সাজানো কতই না গাছ ভিন্ন নাম
উদ্ভিদেরি তত্ত্বনবীশ হয় ত জানেন গুণগ্রাম।
হরিণ-শিশু চরছে সেথা বাঘ-ভালুকের নাই অভাব
ডালে ডালে বুলবুলি গায়, প্রকৃতির যে এই স্বভাব।
পথ চলেছে এবার মোদের পাহাড় কেটে কোন্ সুরে
উচ্চে কেবল উঠ্‌ছে বেবাক—নিমন্ত্রণ আজ বুনপুরে।
মাঝে মাঝে খরস্রোতা ঝর্ণা ছুটে নামছে ভাই
আনন্দে তার উছল গতি স্পষ্ট যেন দেখতে পাই।
বৃত্তাকারে রাস্তা চলে যা দেখি আজ তাই ভালো
বাঁ দিক ঘেঁসে খাদ নেমেছে নীচুতে তার নাই আলো।
মেঘ জমেছে সেথায় যেন তাদের মত ঘরবাড়ী
মাঝে মাঝে যাচ্ছে দেখা ছোট্ট মজার রেলগাড়ী।
দিচ্ছি পাড়ি বহুৎ জোরে লাগছে গায়ে হিম হাওয়া
হাবুডুবু খাচ্ছি 'ফগে' নাই প্রয়োজন আর নাওয়া।
অনেকটা পথ পিছন ফেলে আসছে নূতন ইষ্টিশান
স্বল্পে সেথায় থামছে মটর, ছুটছে আবার ওই নিশান।
কতই না ফুল ফুটছে হেথায় নাম কাহারো নাই জানা
দুধের মত কেউ সাদা কার রাগে রাঙা মুখখানা।
কেউ করে না আদর তাদের তাও অমলিন হাস্যটুক
কি অমূল্য ধন পেয়েছে তাতেই যেন পূর্ণ বুক।
ভাবছি এবার পাহাড়টা শেষ হল বুঝি ওইখানে
পৌঁছে দেখি সে চলেছে নিরুদ্দেশের দিক পানে।
রঙ-বেরঙের মেঘগুলো সব এমনি মজার দল বাঁধে
উপর থেকে দেখলে ভাবি এ চড়েছে ওর কাঁধে।
ধোঁয়ার মত উঠছে যেন জলছে আগুন খাদের তল
তাই নিভাতে ছল-ছলিয়ে ছুটছে হুহু ঝর্ণা-জল?
খানিকটা পথ উঠেই দেখি এলাম যেটুক পার হয়ে
তা রয়েছে ঠিক তলাতে পাইন-বনের সার লয়ে।
চল্‌ল নাক গায়ের পরে পিরানটাকে আর রাখা
শিউরে ওঠে সকল দেহ, চাদর এবার দিই ঢাকা।
এমনি করেই আধেক সে পথ দিলাম পাড়ি কার্সিয়ঙ
নবীন তেজে ছাড়্ল মটর, লেগেছে তার চক্ষে রঙ।
কুয়াশাতে পূর্ণ হল একেবারে চারটি দিক
দৃষ্টি অচল—সূর্য্যদেবও কোথায় আছেন নাইক ঠিক।
হেথায় তাঁহার লুপ্ত প্রতাপ মেষের মতই শান্ত ভাব
স্তিমিত আলোয় করুণ আঁখি নাইক আদৌ ভীম স্বভাব।
দোকান-পশার যাচ্ছে দেখা অট্টালিকাও দু'একখান
সমুখ-পথে ভ্রমণ করেন রোমকদেশী খ্রীষ্টিয়ান।
বাঙালীদের নাইক অভাব ওই দেখা যায় যুবার দল
বৃদ্ধ, বালক, তন্বী-নারী চলছে ব'কে অনর্গল।
বায়ুবেগে 'ঘুমে' এলাম, সবার চেয়ে উচ্চদেশ
এখান থেকে সূর্য্য উদয় অতুল শোভায় দেখায় বেশ।
বৌদ্ধ বিহার খুব কাছে তার কারু কাজের নাইক শেষ
সিঞ্চলেরি হ্রদ হেরিতে পান্থরা নেয় বহুৎ ক্লেশ।
এক নিমেষের মধ্যে মোরা পৌঁছে গেলাম গম্যস্থান
চাঁদমারির এক গলির ধারে থামল হঠাৎ মটরখান।
এখন মোরা মেঘের দেশে করছি সুখে সন্তরণ
ধরার মানুষ? সে কথাটি ক্ষণেই হল বিস্মরণ।
যে সব ব্যাপার দেখছি চোখে চলবে না তার রোজলিপি
স্বভাব-রাণীর বর্ণনা দিই এমন আমার শক্তি কি?
স্বর্গ-শোভা মর্ত্ত্যে ঝরে অনুভবের জন্য সে
কালিদাসই হয় ত ভাবেন, লিখবে তাহা অন্য কে?

শ্রীসিতিকণ্ঠ দাঁ।

যমদ্বার হইতে প্রত্যাবর্ত্তন

(ভ্রমণ-বৃত্তান্ত)

পূর্ব্বে জলপথে ও স্থলপথে লোক পৃথিবী পরিভ্রমণ করিত, এখন গগনপথে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে মনের সুযোগ হইয়াছে। এখন অনেকেই এরোপ্লেনের সাহায্যে য়ুরোপ হইতে আমেরিকা, আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়ায় মনাগমন করিতেছেন, এসিয়ারও সর্ব্বত্র এরোপ্লেন উড়িতেছে; বিঘ্নসঙ্কুল দুর্গম মেরুপ্রদেশেও উড়িয়া যাওয়া এ যুগে অসাধ্য নহে; কিন্তু যাহারা জীবনের ভয় তুচ্ছ করিয়া এই ভাবে দেশদেশান্তরে ভ্রমণ করিতেছেন, তাঁহাদের কত জনকে যে কতবার কত বিপদে পড়িতে হইতেছে, মৃত্যুকে পর্য্যন্ত আলিঙ্গন করিতে হইতেছে, তাহা আমরা সকল সময় জানিতে পারি না। জীবন-মরণের যুদ্ধে তাঁহাদের ব্যর্থতার ইতিহাস অধিকাংশ সময়েই আলোচিত হয় না, বিজয়ী বীরগণের সাফল্যের কাহিনী শতমুখে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। আজ আমরা এক জন বিপন্ন খপোত-যাত্রীর যমদ্বার হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের কাহিনী পাঠক-সমাজের গোচর করিতেছি।

গতবর্ষে ম্যাথুস্ ও হুক নামক দুই জন ইংরাজ ইংলণ্ড হইতে গগন-পথে অষ্ট্রেলিয়ায় যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে এরোপ্লেন লইয়া উড়িয়াছিলেন, মিঃ জ্যাক ম্যাথুস্ সেই এরোপ্লেনের কর্ণধার ছিলেন। তাঁহাদের এরোপ্লেন ব্রহ্মদেশের একটি নিবিড় অরণ্যে নিক্ষিপ্ত হইলে ম্যাথুস্ ও হুক অরণ্যের বাহিরে কোন গ্রামে আশ্রয় গ্রহণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই অরণ্যের বাহিরে যাওয়া তাঁহাদের অসাধ্য হইয়াছিল; দীর্ঘকাল অনাহারে ও পথশ্রমে তাঁহারা অরণ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে মৃতবৎ হইয়াছিলেন; অবশেষে হুক সেই অরণ্যেই প্রাণত্যাগ করেন; প্রায় দুই সপ্তাহ পরে ম্যাথুসকে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় গ্রামের অরণ্যপ্রান্ত হইতে উদ্ধার করা হইয়াছিল। ম্যাথুস্ যমদ্বার হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাঁহাদের যে কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, পাঠক-পাঠিকাগণের মনোরঞ্জনের জন্য তাহা ভাষান্তরিত করিয়া নিম্নে প্রকাশিত হইল।

বিমানপোতসহ হুক ও ম্যাথুস্

মিঃ জ্যাক ম্যাথুস্ লিখিয়াছেন,—উড্ডো মন্ত্রিসমাজের বিশেষজ্ঞরা আমাদিগকে বলিয়াছিলেন—ইংলণ্ড হইতে অষ্ট্রেলিয়ায় উড়িয়া যাওয়া আমাদের পক্ষে সাংঘাতিক বিপজ্জনক হইবে। আমি খ-পোতের কর্ণধার, তাঁহাদের এই উক্তি যে সম্পূর্ণ সত্য—ইহা আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

কিন্তু পাশার দান অনুকূলে পড়িবে না, ইহা বুঝিয়াও জুয়াড়ী যেমন ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া পাশা ফেলিয়া থাকে, আমিও সেই ভাবে আকাশপথে অষ্ট্রেলিয়ায় গমন স্থির করিলাম। এরিক হুক ইহা অসমসাহসের কার্য্য বুঝিয়াও, আমার সঙ্কল্পের অনুমোদন করিলেন। বস্তুতঃ, আমাদের অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইল যে, আমাদের প্রতিজ্ঞাই হইল, "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর-পতন।"

এই কার্য্য বিপজ্জনক হইলেও আমার পক্ষে ইহা 'কাষ' মাত্র, কিন্তু হুককে এজন্য সর্ব্বস্বপণ করিতে হইয়াছিল। বিপদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য জীবিত থাকা তিনি আকাঙ্ক্ষণীয় মনে করিতেন। এই ভাবে উড়িতে গিয়া যদি সর্ব্বস্ব, এমন কি, জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে হয়, সে জন্যও তিনি প্রস্তুত ছিলেন। তিনি তাঁহার বৈষয়িক কার্য্যের গুরুত্ব বুঝিয়াই এই বিপজ্জনক অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার সেই বৈষয়িক কার্য্যের সহিত আমার কোনও সম্বন্ধ ছিল না। একটি নির্দ্দিষ্ট দিনে অষ্ট্রেলিয়ায় উপস্থিত হইবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়াছিলেন এবং আমাকে বলিয়াছিলেন, যদি আমরা নির্দ্দিষ্ট দিনে নিরাপদে সেখানে পদার্পণ করিতে পারি, তাহা হইলে আমরা উভয়েই বিপুল অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিব।

আমি জোরে সেই দিকে পোত চালাইলাম

একখানি এরোপ্লেন ক্রয় করিয়া তাহা অষ্ট্রেলিয়ায় উড়াইয়া লইয়া যাইবার জন্য যে অর্থব্যয় হইবার কথা, তাহা তিনি বিপুল উদ্যমে সংগ্রহ করিয়া সকল ব্যয় সঙ্কুলান করিলেন। তাঁহার এই সকল আর্থিক ব্যাপারের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ ছিল না। আমি তাঁহার এরোপ্লেনের চালক মাত্র; সোফেয়ার যেরূপ মোটর-গাড়ী চালাইয়া আরোহীকে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যায়, আমিও সেইরূপ এরোপ্লেনে তাঁহাকে গগনপথে অষ্ট্রেলিয়ায় লইয়া যাইবার ভার লইয়াছিলাম। কথা ছিল, আমি তাঁহাকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে অষ্ট্রেলিয়ায় নামাইয়া দিয়া যদি সেখানে অন্য কোন আরোহী পাই, তাহাকে লইয়া এরোপ্লেনেই ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিব।
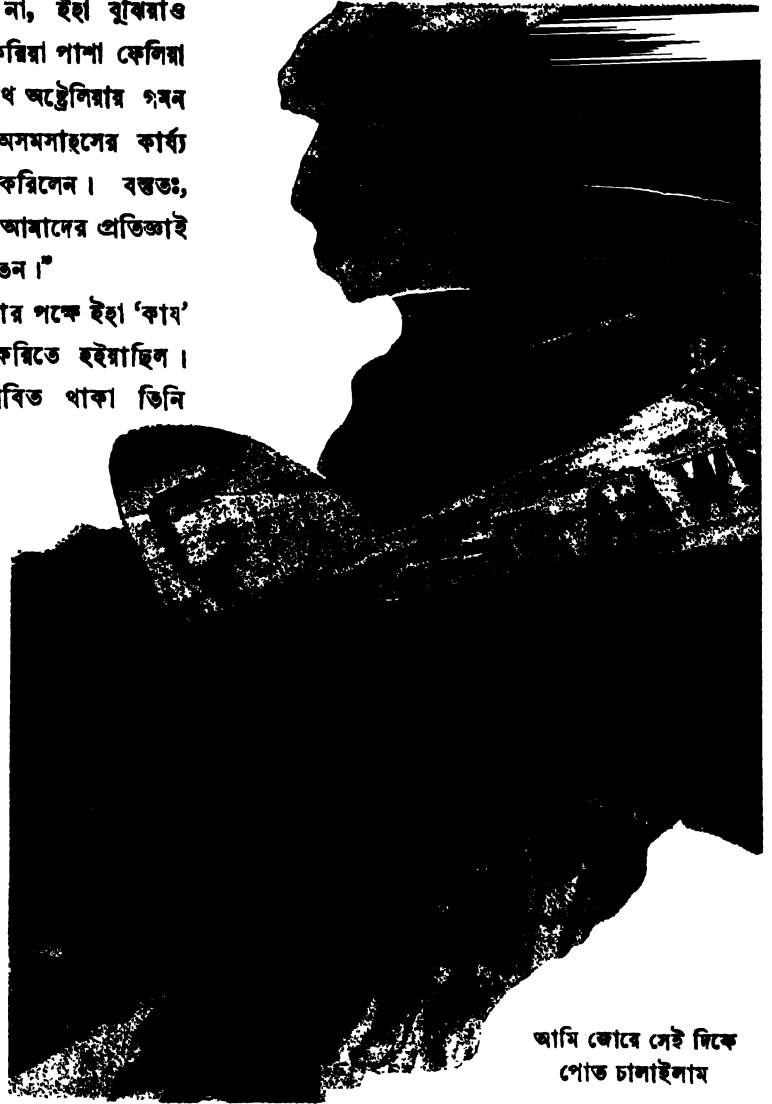
উড়িতে আরম্ভ করিবার কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতে আমি উড্ডো মন্ত্রিসমাজের দপ্তর হইতে আমার গন্তব্য পথের নক্সা এবং আবহ-বিভাগের (ঊর্দ্ধাকাশের বায়ুর গতি-প্রকৃতি প্রভৃতি সংক্রান্ত) 'রিপোর্ট' সংগ্রহে রত ছিলাম; ভবিষ্যতে আমাদের ভাগ্যে কি আছে, তাহা সেই রিপোর্ট দেখিয়াই কতকটা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। বিশেষজ্ঞরা মাথা নাড়িয়া আমাকে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে নিষেধ করিলে আমি মালিকের সঙ্কল্পের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহাদের উপদেশ

কাটানিয়া হইতে সোজা উড়িয়া উত্তর-আফ্রিকার বেন্‌গাজী পর্য্যন্ত পাড়ি দিলাম। তাহার পর আমরা নির্ব্বিঘ্নে করাচী অভিমুখে ধাবিত হইলাম।

করাচীর নিকট উপস্থিত হইয়া ভীষণ বর্ষা প্রত্যক্ষ করিলাম। আমরা আশা করিয়াছিলাম, নির্ম্মল আকাশে পরমানন্দে উড়িয়া চলিব; কিন্তু আমাদের সকল আশাই বিফল হইল। লঘু এরোপ্লেনে আশ্রয় লইয়া ঊর্দ্ধাকাশে বর্ষার মেঘের সহিত যুদ্ধ করা যে কি ভীষণ ব্যাপার, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্যের ধারণা করিবার সামর্থ্য নাই। ঝটিকা ক্ষিপ্তবৎ হইয়া প্রচণ্ডবেগে ও অশ্রান্তভাবে 'জয়ষ্টিক' ও 'রডারবার' চূর্ণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; অথচ প্রাণরক্ষার জন্য তখন তাহাই আমাদের আশ্রয়। সঙ্গে সঙ্গে তুষার-শীতল বৃষ্টিধারা মুষলধারে বর্ষিত হইয়া সবেগে প্রচুর পরিমাণে 'ককপিটের' ভিতর প্রবেশ করিতে লাগিল। প্রচণ্ড তরঙ্গাভিঘাতে বোটের অবস্থা যেরূপ শোচনীয় হয় এবং সেই ধাক্কা সামলাইয়া উঠা যেরূপ কঠিন হয়, আমাদের অবস্থাও সেইরূপ হইল। সেই অভিজ্ঞতা জীবনে বিস্মৃত হইবার নহে।

আমার মনে হইল, ডুবিতে আরম্ভ করিয়াছি! আমি চক্ষু মুদিত করিলাম; শ্বাস গ্রহণ করিতে না পারায় আমার শ্বাসনলী শীঘ্রই ফাটিয়া যাইবে বলিয়া মনে হইল। বৃষ্টির অশ্রান্ত ধারা একখানি পর্দ্দার মত হুকের ও আমার মধ্যে ব্যবধানের সৃষ্টি করিল। আমি দেহের সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়া 'জয়ষ্টিক' জড়াইয়া ধরিয়াছিলাম; কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তেই আমার আশঙ্কা হইতে লাগিল, গভীর গর্জ্জনশীল ঝটিকা-প্রবাহ তাহা আমার বাহুপাশ হইতে ছিন্ন করিয়া আমাদিগকে মৃত্যুকবলে নিক্ষেপ করিবে।

সেই ঝটিকার আক্রমণ হইতে আমরা আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইলাম বটে, কিন্তু হুকের অবস্থা দেখিয়া পরে বুঝিতে পারিয়াছিলাম,—তিনি সেই ধাক্কা সামলাইয়া স্বাভাবিক অবস্থা লাভ করিতে পারেন নাই।

হুক্ স্বভাবতঃই দুর্ব্বল-দেহ; আমরা করাচীতে অবতরণ করিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত অসুস্থ দেখিলাম। তাঁহার

অগ্রাহ্য করিলাম। খ-পোত-চালকগণ সাধারণতঃ অদৃষ্টবাদী। ভাবিলাম, ভাগ্যে থাকে, নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইতে পারিব; যদি ভাগ্যে মৃত্যুই লেখা থাকে, তাহা হইলে যে কোন দিন যে কোন স্থানে পড়িয়া মরিতে পারি; মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার জন্য এক্ষের অরণ্যে বা তাইমর সাগরে উড়িয়া যাইবার প্রয়োজন হইবে না।

হুক ও আমি যেরূপ বেগে উড়িয়া চলিলাম, সেরূপ বেগে পূর্ব্বে কেহ ঐ পথে এরোপ্লেন পরিচালিত করে নাই; এ জন্য আমাদিগকে বিপদ্‌রাশিকে আলিঙ্গন করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইল। আমাদের যাত্রারম্ভের অল্পকাল পরেই পেট্রলের ট্যাঙ্ক লইয়া অসুবিধায় পড়িতে হইল, এজন্য লিওঁর কিছু দূরে ধরাতলে অবতরণ করিতে বাধ্য হইলাম। আমরা সেই ট্যাঙ্কটি অদূরবর্ত্তী নগরে লইয়া গিয়া মেরামত করিলাম, তাহার পর ভূমধ্যসাগর অতিক্রম করিবার সঙ্কল্প করিলাম।

তদনুসারে আমরা মার্সেলে হইতে উড়িতে আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে সিসিলি দ্বীপের কাটানিয়ায় উপস্থিত হইলাম।

সাহসের অভাব না থাকিলেও কষ্ট সহ্য করিবার শক্তি ছিল না। বর্ষার অবিশ্রান্ত বারিধারা ও প্রচণ্ড ঝটিকার বেগ সহ্য করিয়া এবং উড়িবার সময় প্রত্যহ চারি ঘণ্টার অধিক নিদ্রার সুযোগ না পাওয়ায় ও অবিশ্রান্তভাবে উড়িতে থাকায় তাঁহার দেহ সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু তাঁহার মনের বল শিথিল হয় নাই। আমি তাঁহার মানসিক বলের পরিচয় পাইলেও তাঁহাকে করাচীতে জাহাজে চাপিয়া অষ্ট্রেলিয়ায় যাইতে অনুরোধ করিলাম। তাঁহাকে বলিলাম, আমি একাকী উড়িয়া গিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে তাঁহার প্রতীক্ষা করিব। আমার প্রস্তাব শুনিয়া তিনি মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না জ্যাক, আমি তোমার সঙ্গেই উড়িয়া যাইব; ভাগ্যে যাহাই থাক, আমরা শেষ পর্য্যন্ত এই ভাবেই চলিব।"

শেষ পর্য্যন্ত এই যাত্রার পরিণাম কি, তাহা কি তিনি তখন কল্পনা করিতে পারিয়াছিলেন?

করাচী হইতে আমরা পরদিন এলাহাবাদে যাত্রা করিলাম। সেই লঘু এরোপ্লেনে ভারী পেট্রলের বোঝা লইয়া উড়িতে আমাদের কষ্ট ও অসুবিধার সীমা ছিল না। পেট্রলট্যাঙ্কে আর একটি ছিদ্র হওয়ায় তাহা মেরামতের জন্য আমাদিগকে দুই দিন এলাহাবাদে বসিয়া থাকিতে হইল।

পুনর্ব্বার উড়িতে আরম্ভ করিয়া ৩রা জুলাই আমরা আকিয়াব অতিক্রম করিলাম। কিন্তু আমরা গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইতে পারিব, ইহা কেহই বিশ্বাস করিতে পারিল না; আমরা নিজেরাই তাহা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। কিন্তু আমাদের মনের ভাব পরস্পরের নিকট প্রকাশ করিলাম না। আমরা বর্ষার পূর্ণ প্রভাব সহ্য করিয়া অগ্রসর হইলাম। ঝটিকার বেগ ক্রমশঃ প্রবলতর হইতে লাগিল। কারণ, বঙ্গোপসাগর ঝড়-বৃষ্টির একটি কেন্দ্র। সেই স্থানেই তাহাদের উৎপত্তি। বিশেষতঃ আমরা যে স্থান দিয়া উড়িয়া যাইতেছিলাম, সেই স্থানে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরিয়া প্রত্যহ এত অধিক পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয় যে, ইংলণ্ডে সারা বৎসরেও সেরূপ বৃষ্টিপাত হয় না।

তখন আমাদিগকে অগত্যা দুইটির অন্যতর পন্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতে হইল। কিন্তু সেই উভয় পন্থাই সমান সঙ্কটসঙ্কুল। একটি পন্থায় সমুদ্রোপকূলের উপর দিয়া রেঙ্গুনে উপস্থিত হওয়া যায়, অন্য পন্থায় আরাকানের পর্ব্বতমালা অতিক্রম করিয়া ইরাবতীর তটভূমির দিকে ধাবিত হইতে হয়। আমাদের পথ সংক্ষেপ করিবার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়া এই শেষোক্ত পথই অবলম্বন করিলাম। কিন্তু ইহার ফল কিরূপ সাংঘাতিক হইবে, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না।

মিঃ হুকের সন্ধানে এক দল লোক প্রেরণ

আমরা উড়িতে উড়িতে এক ঘণ্টার পরেই যে উপত্যকার ঊর্দ্ধে উপস্থিত হইলাম, তাহার চতুর্দ্দিকে বিশালকায় পর্ব্বতমালাকে উন্নতমস্তকে দণ্ডায়মান দেখিলাম। আমরা প্রচণ্ড ঝটিকা দ্বারা আক্রান্ত হইলাম। সে কিরূপ ভীষণ অবস্থা, ভাষায় তাহা প্রকাশ করা অসাধ্য। এক দিকে ঝড় উঠিয়া অন্য দিকের ঝটিকার সহিত যোগদানের জন্য মহাবেগে ধাবিত হইতেছিল, তাহাদের সজ্ঘর্ষণে আমাদের ক্ষুদ্র এরোপ্লেনখানি চূর্ণ হইবার উপক্রম হইল। আমাদের পশ্চাতে যে সকল গিরিশৃঙ্গ ছিল, তাহাদিগকে পরিবেষ্টিত

করিয়া ঝটিকা এরূপ বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল যে, আমরা উড়িয়া গিয়া তাহাদের অন্তরালে আশ্রয়গ্রহণ করিব, তাহার উপায় রহিল না। আমাদের পলায়নের পথ রুদ্ধ দেখিলাম।

কোন পক্ষী কোন রুদ্ধ গৃহে আবদ্ধ হইলে পলায়নের চেষ্টায় যে ভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়, আমরাও সেই স্থানে সেই ভাবে কখন সম্মুখে, কখন পশ্চাতে ধাবিত হইয়া আত্মরক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলাম। আমাদিগকে জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া অন্ধভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইল। আমরা মেঘের অন্তরাল হইতে বাহিরে যাইবার জন্য যতই চেষ্টা করিতে লাগিলাম, রাশি রাশি মেঘস্তর ততই আমাদিগকে গ্রাস করিবার জন্য চারিদিক হইতে সবেগে ভাসিয়া আসিতে লাগিল। আমরা যেন ফাঁদে পড়িলাম; ঝটিকার বন্-বন্ শব্দ আমাদের এরোপ্লেনে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। বৃষ্টিধারা তীরের ন্যায় আমাদের চোখে মুখে বর্ষিত হইয়া আমাদের দৃষ্টি অবরুদ্ধ করিল। আমরা বুঝিতে পারিলাম, আর কিছুকাল পরেই ঝটিকা পূর্ণবেগে আমাদিগকে আক্রমণ করিবে।

কোন পক্ষী রুদ্ধ গৃহকক্ষে উড়িতে উড়িতে একটি অর্দ্ধোন্মুক্ত বাতায়ন দেখিয়া প্রাণরক্ষার জন্য যে ভাবে সেই বাতায়নের দিকে ধাবিত হয়, আমিও সেইরূপ একটি ফাঁক দেখিয়া সেই পথে পলায়নের জন্য সেই ভাবে ধাবিত হইলাম। সেই উপত্যকার এক প্রান্তে পাহাড়ের ভিতর একটি ফাঁক দেখিতে পাইয়াছিলাম। আমি উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে সেই দিকে এরোপ্লেন পরিচালিত করিলাম। আশা হইল, ১ শত ফুট ঊর্দ্ধে উঠিয়া যদি ৫ মিনিটমাত্র উড়িতে পারি, তাহা হইলে আমরা আকাশের মেঘনির্ম্মুক্ত অংশে উপস্থিত হইতে পারিব।

কিন্তু মৃত্যু আমাদিগকে উপহাস করিতে লাগিল। আমরা সেই ফাঁক দিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিতেই শৃঙ্খলমুক্ত দানবের মত আর একটা প্রচণ্ড ঝটিকার তরঙ্গ সমুদ্রতরঙ্গের ন্যায় আমাদিগকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। সেই সময় মুষলধারে বৃষ্টিরও স্রোত আরম্ভ হইল। আমাদের এরোপ্লেন বৃষ্টিধারায় প্লাবিত হইল। তাহার এঞ্জিন পর্য্যন্ত জলে সপ্ সপ্ করিতে লাগিল। আমি সভয়ে লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, আমাদের এরোপ্লেনের গতি-হ্রাস হইতেছিল এবং তাহা ক্রমশঃ নামিয়া পড়িতেছিল। আমি তাহার পতন-নিবারণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না, তাহা ক্রমেই নীচের দিকে নামিতে লাগিল। অবশেষে পাহাড়ের সহিত তাহার সংঘর্ষ-নিবারণের আশায় আমি এঞ্জিন বন্ধ করিলাম। এরোপ্লেন ধীরে ধীরে একটা বাঁশ-ঝাড়ের মাথায় নামিয়া পড়িল। এরোপ্লেনের ভারে বাঁশগুলির মাথা নামিয়া পড়িল। এরোপ্লেনের গতিরোধ হইলে আমি চাহিয়া দেখি, মাটীতে প্রায় আসিয়া পড়িয়াছি।

অরণ্যমধ্যে অনুসন্ধানকারীদিগের বিশ্রাম

আমি 'ককপিট' হইতে লাফাইয়া নীচে পড়িলাম। এরিক বেচারার তখন নড়িবারও শক্তি ছিল না, তাঁহার পা মচকাইয়া গিয়াছিল। তাঁহার দেহের অন্য কোথাও আঘাত লাগে নাই। কিন্তু তাঁহাকে ভয়ঙ্কর দুর্ব্বল বলিয়া মনে হইল। আমি তাঁহাকে আরোহীর আসন হইতে নীচে

নামাইয়া লইলাম। তিনি দাঁড়াইতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ মাটীতে শুইয়া পড়িলেন ; তাহার পর হতাশভাবে বলিলেন, "সকল আশাই শেষ হইয়াছে ; আমরা জীবিত অবস্থায় এই অরণ্যের বাহিরে যাইতে পারিব না।"

আমি হতাশভাব গোপন করিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করিবার চেষ্টা করিলাম, হাসিয়া বলিলাম, আহত না হইয়া যখন ধীরে ধীরে মাটীতে নামিয়াছি, তখন আর ভয় কি ? এই সঙ্কট হইতে আমরা নিঃসন্দেহে উদ্ধারলাভ করিব।— কিন্তু আমারও মন সকল অবস্থা বিবেচনা করিয়া নিরাশায় পূর্ণ হইয়াছিল। ভাগ্যবিড়ম্বনার কথা চিন্তা করিয়া আমার ক্ষোভের সীমা রহিল না। আমাদিগকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য অদৃষ্টের এ কি নিষ্ঠুর খেলা! যদি আমরা ১ শত ফুট ঊর্দ্ধে উঠিতে পারিতাম ও ৫ মিনিট মাত্র সময় পাইতাম, তাহা হইলে মৃত্যুর সহিত সংগ্রামে আমরা জয়লাভ করিতে পারিতাম, কিন্তু সেই তুচ্ছ ৫ মিনিটের জন্য সকলই বিফল হইল! সাফল্য ও নিষ্ফলতা, যশ এবং মৃত্যুর এই ব্যবধান কত সামান্য!

আমার অধিকতর ক্ষোভের কারণ, এরোপ্লেনখানির কোন ক্ষতি না হইলেও এবং তাহার এঞ্জিন তখন পর্য্যন্ত নিস্তব্ধ না হইলেও আমাদের অষ্ট্রেলিয়ায় গমনের আশা ত্যাগ করিতে হইল; কারণ,এরোপ্লেন সেই বাঁশবনে এ ভাবে আবদ্ধ হইয়াছিল যে, তাহার উদ্ধারের উপায় ছিল না। আমাদের প্রাণের হানি হইল না বটে, কিন্তু এরোপ্লেনখানি সভ্যজগৎ হইতে বহুদূরে দুর্গম অরণ্যে অচল অবস্থায় পড়িয়া থাকায় আমাদিগকে তাহার আশা ত্যাগ করিতে হইল।

আমি হুক্‌কে সেই স্থানে ত্যাগ করিয়া এরোপ্লেনখানি পরীক্ষা করিতে চলিলাম ; তাহার ভিতর যে সকল নক্সা এবং খাদ্যসামগ্রী সঞ্চিত ছিল, সেগুলি সংগ্রহ করিবার জন্য আমার আগ্রহ হইয়াছিল। আমি এরোপ্লেনের কম্পাসটি খুলিয়া লইলাম এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্রগুলি একটি ক্যানেস্তারায় সংগ্রহ করিলাম। কয়েক টিন মাংস ও ক্ষীর ছিল—তাহাও বাহির করিয়া লইলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সকল খাদ্য জলে ভিজিয়া নষ্ট হইয়াছিল। সুতরাং সেগুলি আমাদের কাযে লাগিল না।

যে সকল সামগ্রী অনায়াসে বহন করিতে পারা যায়, তাহা লইয়া আমি ও হুক সেই অরণ্য হইতে বাহির হইবার জন্য পথের সন্ধানে চলিলাম। আমরা পাহাড় পার হইয়া যাইবার জন্য প্রায় এক ঘণ্টা সেই অরণ্যে ঘুরিয়া পথ পাইলাম না ; ঘুরিয়া ফিরিয়া আমাদিগকে সেই এরোপ্লেনের নিকট উপস্থিত হইতে হইল! আমাদের শ্রম এইভাবে বিফল হওয়ায় আমরা অতঃপর উপত্যকার পাদদেশ দিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু আমরা বাঁশবন দ্বারা এ ভাবে পরিবেষ্টিত হইলাম যে, সেই দুর্ভেদ্য বেড়া অতিক্রম করা আমাদের অসাধ্য হইল। আমরা পুনর্ব্বার ভাগ্যবিড়ম্বনার পরিচয় পাইলাম।

সহসা অদূরে বন্যহস্তীর গর্জ্জন শুনিতে পাইলাম ; আমাদের এরোপ্লেনের এঞ্জিনের ঘস্ ঘস্ শব্দ শুনিয়া বন্য-হস্তীর দল ভয় পাইয়া দূরে পলায়ন করিতেছিল। তাহাদের গতিবেগে সেই অরণ্যের ভিতর যে পথ প্রস্তুত হইল, সেই পথে আমরা চলিতে লাগিলাম। যদি আমরা সেই পথ না পাইতাম, তাহা হইলে আমাদিগকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই সেই মহারণ্যে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে হইত। আমাদের এরোপ্লেনখানি অল্পসময়ের মধ্যেই অসংখ্য লালবর্ণ পিপীলিকা ও জোঁক দ্বারা আচ্ছন্ন হইল।

সেই ভয়ঙ্কর জোঁকগুলির কথা স্মরণ হইলে এখনও আমার হৃৎকম্প হয়। স্থানীয় অধিবাসীরা সেই জোঁকগুলির নাম দিয়াছে 'মোষে জোঁক।' জোঁকগুলি বাঁশগাছের ঊর্দ্ধদেশ হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে আমাদের দেহের উপর পড়িয়া দেহত্বক্ বিদীর্ণ করিতে লাগিল ; আমরা যন্ত্রণায় ক্ষিপ্তপ্রায় হইলাম। শোণিতধারায় আমাদের সর্ব্বাঙ্গ প্লাবিত হইল। যদি আমরা অবিলম্বে সেই স্থান ত্যাগ না করিতাম, তাহা হইলে তাহারা আমাদের দেহের সমুদয় রক্ত শোষণ করিত।

আমরা কম্পাস ধরিয়া হস্তিপদদলিত পথে চলিতে আরম্ভ করিলাম এবং অবশেষে একটি সুপ্রশস্ত নদীর তীরদেশে উপস্থিত হইলাম। আমি নক্সা দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম—এই নদী ইরাবতী নদীর সহিত সম্মিলিত হইয়াছে ; সুতরাং ইহার তীরে তীরে চলিলে কোন জনপদে উপস্থিত হইতে পারিব। এই স্থানে আমি ভারী কম্পাসটি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম। অবশিষ্ট কাগজপত্র ও নক্সাগুলি আমি এরিকের হাতে দিয়াছিলাম, সেই সময় তাহা তাঁহার হাত হইতে খসিয়া নদীর জলে নিক্ষিপ্ত

হইয়াছিল; সেগুলি নদীর প্রখর স্রোতে ভাসিয়া যাওয়ায় আর তাহা উদ্ধার করিতে পারি নাই।

আমরা পরিচ্ছদ উন্মোচিত করিয়া, যে দুই চারিটি জোঁক আমাদের দেহে লিপ্ত ছিল, তাহাদিগকে টানিয়া ফেলিয়া দিলাম এবং যথাসাধ্য চেষ্টায় রক্তপাত নিবারণ করিলাম। কিন্তু জোঁকের দংশনে আমাদের সর্ব্বাঙ্গ ঝাঁঝরা হইয়া গিয়াছিল। হুকের পাঁজরে কতকগুলা জোঁক পুঞ্জীভূত হইয়া দংশন করায় সেই স্থানে একখানি প্রকাণ্ড ক্ষত হইয়াছিল। আমি আমার পরিচ্ছদ ছিঁড়িয়া তদ্দ্বারা সেই ক্ষতস্থানটি বাঁধিবার চেষ্টা করিলাম; কিন্তু ক্ষত-মুখ হইতে ক্রমাগত রক্ত ঝরিতে লাগিল।

অবশেষে সন্ধ্যার অন্ধকারে চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন হইল। আমাদের বিপদের আশঙ্কা আরও অধিক প্রবল হইল। আমরা নিরস্ত্র, অথচ অসংখ্য হিংস্র জন্তু সেই অরণ্যে বিচরণ করিতেছিল। তাহাদের গম্ভীর গর্জ্জনে ও বিকট চীৎকারে সেই বনভূমি ভীষণ ভাব ধারণ করিল। মধ্যে মধ্যে আমরা তাহাদের চক্ষুর সবুজ আভা দেখিতে পাইলাম; তাহাদের পদশব্দও আমাদের কর্ণগোচর হইল। ঐ সকল অরণ্যচর জন্তু নদীতে জলপান করিতে আসিতেছিল।

নদীর কিছু দূরে একটি পাহাড় ছিল, আমরা প্রাণভয়ে অধীর হইয়া সেই পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হইলাম এবং সেই পাহাড়ে উঠিয়া রাত্রিবাস করিলাম। কিন্তু সেই রাত্রিতে আমরা ঘুমাইতে পারিলাম না। হুক যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন, তাঁহার শোণিতস্রাব তখনও বন্ধ হইল না। চতুর্দ্দিকে অসংখ্য বিপদ, তাহার উপর অশ্রান্তভাবে বৃষ্টিধারা বর্ষিত হইতে লাগিল, নদীর জল ক্রমশঃ স্ফীত হইয়া পাহাড় ছাপাইয়া উঠিল এবং তাহা আমাদিগকে আশ্রয়চ্যুত করিয়া ভাসাইয়া লইবার উপক্রম করিল। আমি তখন পাহারায় ছিলাম; হঠাৎ আমি চীৎকার করিয়া বলিলাম, "এরিক, দেখুন! একটা আলো দেখা যাইতেছে!"

হুক্ পাহাড়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আমাদের আশ্রয়-স্থানের কিছু ঊর্দ্ধে একটি আলো দেখিতে পাইলেন; আমি সেই আলোটির প্রতিই তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছিলাম। তিনি সেই আলোকটি দেখিয়া উৎফুল্লভাবে বলিলেন, কেহ একটা লণ্ঠন ঝুলাইয়া রাখিয়াছে! আমরা এরোপ্লেন হইতে মাটীতে পড়িয়াছি—ইহা জানিতে পারিয়া উহারা লণ্ঠন লইয়া আমাদিগকে খুঁজিতে আসিয়াছে।"

সেই আলোক দেখিয়া আমরা আনন্দে উৎফুল্ল হইলাম। সমুদ্রবক্ষে নিক্ষিপ্ত বিপন্ন নাবিক অদূরে কোন জাহাজের পাল বা ষ্টীমারের চোঙ দেখিতে পাইলে তাহার হৃদয়ে যেরূপ আশার সঞ্চার হয়, সেই আলো দেখিয়া আমরাও সেইরূপ আশ্বস্ত হইলাম। আমরা সেই পাহাড়ে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া সাড়া দিলাম; কিন্তু বৃষ্টির ঝম-ঝম শব্দ ও ভীত আরণ্য জন্তুর আর্ত্তনাদ ভিন্ন অন্য কোন শব্দ আমাদের কর্ণগোচর হইল না।

আমরা সেই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া সেই আলোর দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতেই চতুর্দ্দিকে সেইরূপ সহস্র সহস্র আলোক জ্বলিয়া উঠিল! সমগ্র পার্ব্বত্য প্রদেশ আলোক-স্ফুরণে প্রদীপ্ত হইল। কিন্তু পরে আমরা বুঝিতে পারিলাম, ভাগ্যদেবতা পুনর্ব্বার আমাদিগকে উপহাস করিলেন; সেই আলোকগুলি গুচ্ছ গুচ্ছ জোনাকিপুঞ্জের পুচ্ছজ্যোতিঃ। অল্পকাল পরে লক্ষ লক্ষ খদ্যোৎ সেই অরণ্য মৃদু আলোকে উদ্ভাসিত করিল।

যাহা হউক, উষালোকে চতুর্দ্দিক আলোকিত হইলে আমরা পাহাড়ের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার চলিতে আরম্ভ করিলাম। আমাদের সর্ব্বাঙ্গ বৃষ্টির জলে সিক্ত, দেহ দারুণ অবসাদে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, সকল আশার অবসান হইয়াছিল; তথাপি চলিতে হইল। এরিক অধিকতর দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। তিনি জীবনের আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন; আমি তাঁহাকে কোন প্রকারে ঠেলিয়া লইয়া চলিলাম। তিনি ক্রমশঃ চলৎশক্তিহীন হইয়া পড়িলেন, কিন্তু আমি তাঁহাকে পথিমধ্যে বসিতে বা শুইতে দিলাম না, কারণ, একবার যদি তিনি সেই স্থানে শয়ন করিতেন, তাহা হইলে আর উঠিতে পারিতেন না, তাহার পর কোন বন্য জন্তু তাঁহাকে আক্রমণ করিত, না হয় লক্ষ লক্ষ বিষধর কীট তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া তাঁহার দেহ কুরিয়া খাইত।

জোঁক ও পিপীলিকার দংশনে আমাদের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছিল; আমাদের পা ফুলিয়া গিয়াছিল। হুকের ক্ষতগুলি অধিকতর যন্ত্রণাদায়ক হইয়াছিল। তথাপি আমরা ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলাম, নদীতীরস্থিত কণ্টকাকীর্ণ

গুল্মের ভিতর দিয়া চলিবার সময় আমাদের পা ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত হইল। অবশেষে আমাদের আর যন্ত্রণাবোধের শক্তি রহিল না।

ইহার উপর বৃষ্টিধারার বিরাম নাই, তাহা আমাদের সর্ব্বাঙ্গে চাবুকের মত বর্ষিত হইতে লাগিল। আমাদের কথা কহিবারও শক্তি রহিল না, কেবলই মনে হইতে লাগিল, এই ভীষণ বৃষ্টিধারার কি অবসান হইবে না?

নদীতীর দিয়া হস্তীর যাতায়াতে যে পথ হইয়াছিল, সেই পথ ধরিয়াই আমরা চলিতে লাগিলাম। আমাদের আশা ছিল, সেই পথে আমরা লোকালয়ে উপস্থিত হইতে পারিব। অবশেষে হাতীগুলি যে স্থানে নামিয়া নদীপার হইয়াছিল, আমরাও নদীর সেই অংশে নামিয়া নদী পার হইলাম। নদীতে কোথায় অল্প জল এবং কোন্ স্থান দিয়া নদী পার হওয়া সহজ, সংস্কারবলে হাতীর দল তাহা জানিতে পারে। অবশেষে চলিতে চলিতে আমার ক্যাম্বিসের জুতা ছিঁড়িয়া গেল। আমাদের সঙ্গে আহার্য্য দ্রব্য ছিল না। এরোপ্লেন হইতে যাহা সংগ্রহ করিয়াছিলাম, তাহা কি ভাবে নষ্ট হইয়াছিল, সে কথা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। অরণ্যে নানা প্রকার ফল দেখিতে পাইলাম, কিন্তু তাহা বিষাক্ত কি না, বুঝিতে না পারায় ভক্ষণ করিতে সাহস হইল না। কয়েক প্রকার বৃক্ষপত্র চর্ব্বণ করিয়া জিহ্বা সরস রাখিলাম।

এইভাবে কয়েক দিন চলিবার পর আমাদের আহারের ইচ্ছা পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইল। আমাদের পিপাসাও রহিল না। আমরা জলের ভিতর দিয়া চলিতেছিলাম এবং দীর্ঘকাল আমাদের সর্ব্বাঙ্গ বৃষ্টিধারায় সিক্ত হইয়াছিল; যে জল আমাদের লোমকূপ দিয়া দেহে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাই বোধ হয় পিপাসা নিবারণ করিয়াছিল।

সুদীর্ঘকাল আমাদিগকে আলোকান্ধকারে চলিতে হইল; কারণ, সেই নিবিড় অরণ্যে সূর্য্যালোক প্রবেশ করিত না, সূর্য্যের মৃদুপ্রভায় আমাদিগকে পথ দেখিয়া চলিতে হইত। অরণ্য হিংস্র জন্তুতে পূর্ণ থাকিলেও তাহাদের ভয়ে আর আমরা বিচলিত হইলাম না, বরং তাহাদিগকে বন্ধু বলিয়াই মনে হইতে লাগিল। তাহারা আমাদের অনিষ্ট চেষ্টা করে নাই, এমন কি, কৃষ্ণসর্পগুলিও আমাদিগকে সম্মুখে দেখিয়া পথ ছাড়িয়া দূরে চলিয়া যাইতেছিল।

কিন্তু এক দিন আমি অত্যন্ত ভয় পাইলাম। সেই দিন- চলিতে চলিতে নদীতীরে রাত্রিযাপনের জন্য সায়ংকালে একটি আশ্রয়ের সন্ধান করিতেছি, সেই সময় নদীর ভিতর হইতে একটি বিশালকায় সরীসৃপ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহার দেহ পীত ও হরিদ্বর্ণে রঞ্জিত; আমি সভয়ে থমকিয়া দাঁড়াইলাম; সত্রাসে এরিককে বলিলাম, "কি ভয়ানক! এরিক, ওটা কুমীর!"

কিন্তু সরীসৃপটাও আমাদিগকে দেখিয়া ভয় পাইয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি জলে নামিয়া অদৃশ্য হইল। পরে বুঝিলাম, সেটি গোসাপজাতীয় প্রাণী, তাহার দেহ ৬ ফুট দীর্ঘ!

নদীতীরে উচ্চ ভূখণ্ডে আমরা শয়ন করিলাম। সেই স্থান নদীতল হইতে চারি ফুট ঊর্দ্ধে অবস্থিত। বৃষ্টিধারা হইতে আত্মরক্ষার জন্য আমরা বৃক্ষপত্রাদি দ্বারা একটি আচ্ছাদন নির্ম্মাণ করিলাম। আমরা এরূপ পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম যে,শয়নমাত্র নিদ্রিত হইলাম। হুকের যেন কেমন 'ধন্ধ'ভাব, তাঁহার দেহ-মন অবসাদে আচ্ছন্ন হইয়াছিল।

কয়েক ঘণ্টা পরে হঠাৎ আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল, মনে হইল, আমার সর্ব্বাঙ্গ জলে ভাসিতেছিল। তবে কি আমরা নদীবক্ষে নিক্ষিপ্ত হইয়াছি? আমি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলাম দেখিলাম, জলের ভিতর দাঁড়াইয়া আছি! আমি হুককে ডাকিলাম, তাঁহার কাঁধে হাত দিয়া ঠেলিলাম, কিন্তু সাড়া পাইলাম না! তখন আমি তাঁহাকে টানিয়া তুলিলাম; তিনি অতি কষ্টে আমার পাশে দাঁড়াইলেন।

আমি আবেগভরে বলিলাম, "আমরা যে ডুবিয়া মরিব!" এবং তাঁহার উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া তাঁহাকে টানিয়া তীরে তুলিলাম। পরে জানিতে পারিলাম, আমরা নিদ্রাঘোরে নদীবক্ষে নিক্ষিপ্ত হই নাই, অবিশ্রান্ত বর্ষণে নদী স্ফীত হইয়া কূল প্লাবিত করিয়াছিল এবং আমাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছিল। সে রাত্রিতে নদীর জল চারি ফুট উচ্চ হইয়াছিল।

তৃতীয় দিন আমার সঙ্গীর প্রলাপ আরম্ভ হইল; প্রলাপ-ঘোরে তিনি বলিতে লাগিলেন, "ঐ এক দল লোক আসিতেছে, তাহারা আমাদিগকে উদ্ধার করিবে।" তাঁহার আর চলিবার শক্তি রহিল না; তখন আমি অগত্যা তাঁহাকে পিঠে তুলিয়া বহিয়া লইয়া চলিলাম। তাঁহার দেহের সংঘর্ষণে আমার পিঠের যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া উঠিল।

সেই রাত্রিও আমরা বৃক্ষশাখার আচ্ছাদনের নীচে

অতিবাহিত করিলাম। এরিক তখনও প্রলাপের ঘোরে বলিতে লাগিলেন, 'ঐ যে কাহারা আমাদিগকে উদ্ধার করিতে আসিতেছে, তাহাদের পদশব্দ শুনিতে পাইতেছি।' আমারও মনে হইল, সত্যই কাহারও পদশব্দ শুনিতে পাইতেছি। পরদিন প্রভাতে আগ্রহভরে অনুসন্ধান করিয়া জনপ্রাণীকেও দেখিতে পাইলাম না। আরও এক দিন অসহ্য যন্ত্রণায় অতিবাহিত হইল।

সেই দিন হুকের বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইল, তাঁহাকে পিঠে লইয়া নদীতীরে চলা বা কণ্টকারণ্য ভেদ করিয়া অগ্রসর হওয়া অত্যন্ত কঠিন ও কষ্টকর হইল। অতি কষ্টে আমি ৫ মাইল পথ সারা দিনে অতিক্রম করিলাম, কিন্তু লোকালয়ের সন্ধান পাইলাম না; সুতরাং আহারও মিলিল না।

পঞ্চম দিন প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত হুককে পিঠে বহন করিয়া চলিলাম। কিন্তু আমার দুর্ব্বলতা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইল, ক্ষুধাতৃষ্ণা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইল। হুকের প্রলাপ-উক্তি আমার মনে গাঢ় বিষাদের ছায়া নিক্ষেপ করিল। আমার আশঙ্কা হইল, আমিও হয় ত তাঁহার মত ক্ষেপিয়া যাইব অথবা শ্রান্তিভরে শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইব, আর উঠিতে পারিব না।

ষষ্ঠ দিন বিপদ ঘনীভূত হইল; হুক অন্ধ হইলেন। তিনি পিঠে দুঃসহ বেদনা বোধ করিতেছিলেন; সেই বেদনার সহিত বোধ হয় তাঁহার এই দৃষ্টিহীনতার সম্বন্ধ ছিল। তিনি মাটীতে উপুড় হইয়া পড়িয়া ছটফট্ করিতে লাগিলেন; মধ্যে মধ্যে কাতর স্বরে বলিতে লাগিলেন, 'পরমেশ্বরের দোহাই, আমার পাঁজরটা ডলিয়া দাও।'

আমি কিছুকাল ধরিয়া তাঁহার পাঁজর ও পিঠ ডলিয়া দিলে তিনি কথঞ্চিৎ সুস্থ বোধ করিলেন। তাঁহার স্ত্রীর সহিত পরে যখন আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তখন তাঁহার নিকট জানিতে পারিয়াছিলাম, পূর্ব্বেও একবার তাঁহার স্বামী এক সপ্তাহের জন্য অন্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহার কারণ জানিতে পারি নাই।

সেই দিন আমি ২ ঘণ্টার অধিক চলিতে পারিলাম না; আমি এরূপ অবসন্ন হইয়া পড়িলাম যে, এরিককে বহন করা আমার অসাধ্য হইয়া উঠিল। তাঁহার দেহ তখন অস্থিচর্ম্মসার হইলেও তাঁহার দেহের ভার আমার পক্ষে দুর্ব্বহ হইয়াছিল।

মিঃ হুককে পিঠে বহন করিয়া লইয়া চলিলাম

অবশেষে আমি তাঁহাকে ধীরে ধীরে নদীতীরে শায়িত করিলাম এবং তাঁহার পাশে শ্রান্তদেহে বসিয়া পড়িলাম। মনে হইল, আমার অন্তিমকাল উপস্থিত। আমি উভয় হস্তে মুখ ঢাকিয়া রোদন করিতে লাগিলাম। কি করিব? রোদন না করিয়া থাকিতে পারি নাই।

হুকের তখন জ্ঞান হইয়াছিল, কিন্তু তখন তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা অচঞ্চল। আমি কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া তাঁহাকে বলিলাম, "যদি আমরা আরও কিছুকাল চেষ্টা করিবার সুযোগ পাইতাম, তাহা হইলে—"

হুক মাথা নাড়িয়া ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "আমার সব শেষ হইয়াছে, ভাই! আমার আর নড়িবার শক্তি নাই, তুমি একাকী চলিয়া যাও।"

সে সময় আমার মনে যে কষ্ট ও যন্ত্রণা অনুভব করিয়াছিলাম, তাহা জীবনে ভুলিতে পারিব না। আমি ভাবিলাম, আমি সেই স্থানে তাঁহাকে ত্যাগ করিলে অপেক্ষাকৃত দ্রুতবেগে চলিতে পারিব। হয় ত কিছু দূরেই কোন লোকালয় দেখিতে পাইব, সেখানে আমি সাহায্য পাইতে পারি। সেই স্থান হইতে লোকজন আনিয়া তাহাদের সাহায্যে এরিকের জীবন-রক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারি; কিন্তু তাহা না করিয়া যদি সেখানে হতাশভাবে বসিয়া থাকি, তাহা হইলে আমার চক্ষুর উপর তাঁহার মৃত্যু হইবে। সেখানে বসিয়া সেই শোচনীয় দৃশ্য কিরূপে দেখিব?

তিনি অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "প্রফুল্ল হও।" "প্রফুল্ল হউন" বলিয়া আমি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চলিলাম। তাঁহার মুখের দিকে ফিরিয়া চাহিতেও আমার সাহস হইলনা। আমি নদীর কূলে কূলে একাকী চলিতে লাগিলাম; আমি অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়াছিলাম বটে,

অবশেষে সাহায্য-লাভের আশায় আমি সেই স্থান ত্যাগ করাই সঙ্গত মনে করিলাম। আমি ছুকের দেহের উপর বৃক্ষপত্রের একটি আচ্ছাদন নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার মাথার কাছে একটি নিশান তুলিয়া দিলাম; তাঁহার একটা ছেঁড়া খাকীর জামা ঐ কার্য্যে ব্যবহৃত হইল। সেই স্থানটি ভবিষ্যতে চিনিয়া লইবার জন্যই আমাকে এইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইল।

আমি যে সকল কায করিলাম, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন, তিনি মাথা নাড়িয়া আমার কার্য্যের সমর্থন করিয়া বলিলেন, "চলিয়া যাও, ভাই! যদি কখন দেশে ফিরিতে পার, তাহা হইলে বাড়ীর সকলকে আমার ভালবাসা জানাইবে।" আমি তাঁহার নিকট শেষ বিদায় প্রার্থনা করিতে পারিলাম না, তাঁহার অসাড় হাতখানি হাতে লইয়া তাহাতে একটা ঝাঁকুনি দিলাম।

আমি আহার্য্য-পাত্র দুই হাতে চাপিয়া ধরিলাম

কিন্তু এরিককে বহন করিতে না হওয়ায় আমি পূর্ব্বাপেক্ষা তাড়াতাড়ি চলিতে পারিলাম। আমার একমাত্র সঙ্কল্প হইল, আমাকে অরণ্যের বাহিরে গিয়া প্রাণরক্ষা করিতেই হইবে।

অল্পকাল পরে আমি কুকুরের চীৎকার শুনিতে পাইলাম। কোন গ্রামের নিকট উপস্থিত হইয়াছি মনে করিয়া আমি সেই দিকে উন্মত্তের মত দৌড়াইতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়াও কোন লোকালয় দেখিতে পাইলাম না। তখন আমার মনে হইল, উহা আমার ভ্রান্তিমাত্র, কল্পনার ছলনা।

সন্ধ্যা অতীত হইল; সেই দিন সর্ব্বপ্রথম আমি সেই বিশাল অরণ্যে একাকী। হতভাগ্য এরিকের কথা পুনঃ পুনঃ আমার মনে পড়িতে লাগিল। সেই অরণ্যমধ্যে কত মাইল দূরে আমি তাঁহাকে ফেলিয়া আসিয়াছি; তিনি নদীকূলে একাকী অসহায় অবস্থায় পড়িয়া আছেন, দেহ অসাড়, উত্থানশক্তি রহিত। তাঁহার বিপদের কথা চিন্তা করিয়া আমার মন ব্যথিত হইল।

সপ্তম দিন প্রভাতে আমি পুনর্ব্বার সেই অরণ্য ভেদ করিয়া চলিতে লাগিলাম। এই বিশাল অরণ্যের কি শেষ নাই? তথাপি আমি কলের পুতুলের মত চলিতে লাগিলাম; স্থির করিলাম যে, সংশক্তিহীন হইয়া যতক্ষণ মাটীতে না পড়ি, ততক্ষণ চলিব, আর থামিব না।
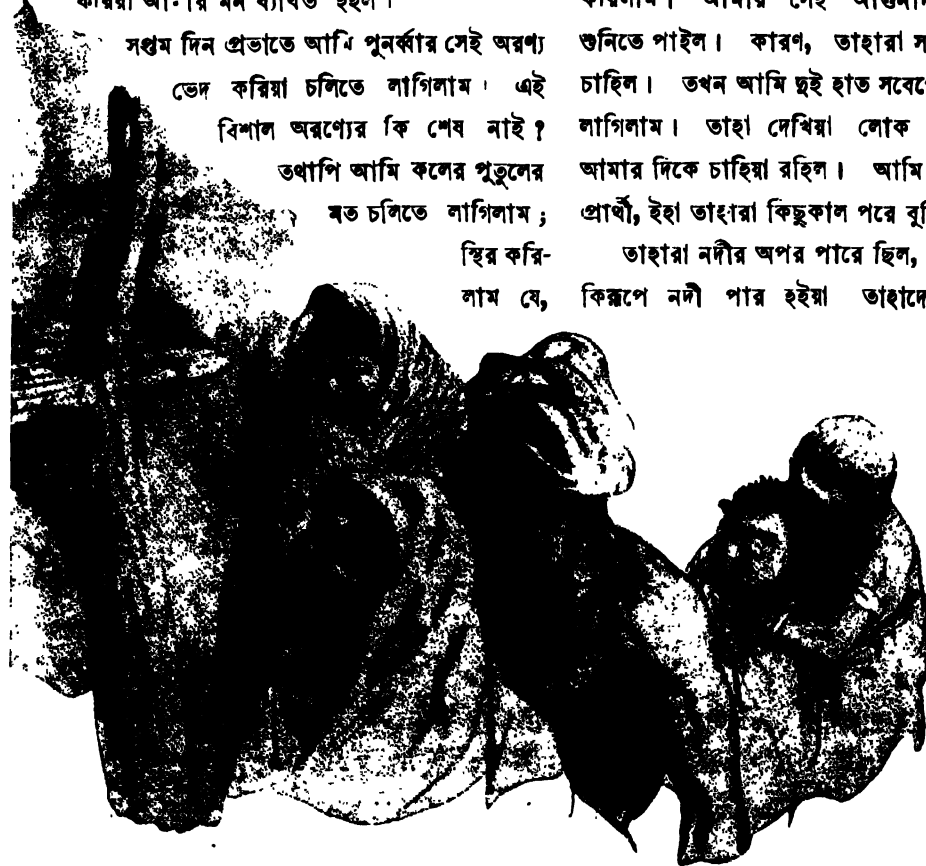
অষ্টম দিন পুনর্ব্বার কুকুরের চীৎকার শুনিতে পাইলাম। পূর্ব্বে একবার আমার ভ্রম হইয়াছিল, এবারও কি সেইরূপ হইবে? আমি কি পাগল হইব? কিন্তু কুকুরের চীৎকার পুনঃ পুনঃ শুনিতে পাইলাম। আমি হাঁপাইতে হাঁপাইতে সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া দৌড়াইতে লাগিলাম, অবশেষে নদী-তীরের একটি বাঁক ঘুরিতেই নদীর অপর তীরে দুই জন দেশীয় লোককে দেখিতে পাইলাম; তাহারা দূরে চলিয়া যাইতেছিল।

আমি তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে চেষ্টা করিলাম; কিন্তু চীৎকার করিতে পারিলাম না, একটা অস্ফুটধ্বনি মাত্র উচ্চারিত হইল। তাহারা পশ্চাতে দৃষ্টিপাত না করিয়া চলিতে লাগিল। তাহারা শীঘ্রই অদৃশ্য হইবে বুঝিয়া আমি ভয়ে আর্ত্তনাদ করিলাম। আমার সেই আর্ত্তনাদ বোধ হয় তাহারা শুনিতে পাইল। কারণ, তাহারা সভয়ে পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিল। তখন আমি দুই হাত সবেগে আন্দোলিত করিতে লাগিলাম। তাহা দেখিয়া লোক দুইটি বিস্মিতভাবে আমার দিকে চাহিয়া রহিল। আমি যে তাহাদের সাহায্য-প্রার্থী, ইহা তাহারা কিছুকাল পরে বুঝিতে পারিল।

তাহারা নদীর অপর পারে ছিল, নদী খরস্রোতা, আমি কিরূপে নদী পার হইয়া তাহাদের অনুসরণ করিব? তাহারা আমার সঙ্কট বুঝিতে পারিয়া আমাকে নদীর কূলে কূলে কিছু দূর অগ্রসর হইতে ইঙ্গিত করিল, তাহারাও সেই দিকে চলিল। অবশেষে যে স্থানে নদী পার হইবার উপায় ছিল, সেই স্থানে আসিয়া তাহারা নদী পার হইল। তাহারা আমার নিকট উপস্থিত হইলে আমি তাহাদিগকে হুকের বিপদের কথা বলিলাম, কিন্তু তাহারা আমার কথা বুঝিতে পারিল না। তখন আর আমার দাঁড়াইবার

শক্তি ছিল না, আমার আড়ষ্ট দেহ ধরাশায়ী হইল। তখন আমি এইমাত্র বুঝিতে পারিলাম যে, তাহারা আমাকে তুলিয়া লইয়া ধরিয়া রাখিয়াছে।

অরণ্যের ভিতর একটা ফাঁকা যায়গায় একখানি গ্রাম ছিল, সেই দুই জন লোক আমাকে বহন করিয়া সেই গ্রামে লইয়া গেল—ইহা আমি অনুভব করিতে পারিলাম। গ্রামে কয়েকখানি ক্ষুদ্র কুটীর ছিল, কুটীরগুলির খুঁটা বাঁশের ; তাহাদের চতুর্দ্দিকে ধান্যক্ষেত্র। তাহারা সিঁড়ির সাহায্যে আমাকে সেই কুটীরের বারান্দায় তুলিয়া ধীরে ধীরে সেই স্থানে শয়ন করাইল। গ্রামের লোকগুলির দয়ার পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইলাম। 'সাহেব লোক' সম্বন্ধে তাহাদের প্রায় কিছুই জানা ছিল না; তাহারা অত্যন্ত দরিদ্র, কিন্তু তাহাদের হৃদয় স্বভাবতঃই সভতাপূর্ণ।

অতঃপর তাহারা এক বাটি ভাতের ফেন আনিয়া আমার সম্মুখে ধরিল। ৮ দিন পর্য্যন্ত আমি অনাহারে ছিলাম; আমি আগ্রহভরে সেই বাটিটি দুই হাতে ধরিয়া অতি কষ্টে সেই ফেন গলাধঃকরণ করিলাম; তাহার পর আমার চেতনা বিলুপ্ত হইল।

কয়েক ঘণ্টা পরে আমার চেতনাসঞ্চার হইলে জানিতে পারিলাম, আমি যাহার কুটীরে শায়িত ছিলাম, তাহার নাম পো কুন। যে দুই জন আমাকে উদ্ধার করিয়াছিল, সে তাহাদের অন্যতর। আমি সেই কুটীর তাম্রকূট-ধূমে আচ্ছন্ন দেখিলাম। কারণ, সেই কুটীরবাসী পুরুষ ও রমণী সকলেই এবং সই জান (আমার অন্যতর উদ্ধারকর্ত্তা) তখন এক এক ফুট দীর্ঘ চুরুট মুখে গুঁজিয়া ধূমপান করিতেছিল, তাহারা আমার জন্যও একটি চুরুট প্রস্তুত করিল এবং একটি স্ত্রীলোক তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিয়া চুরুটটি আমার মুখে গুঁজিয়া দিল। সেই চুরুট আমার ভালই লাগিয়াছিল।

পরদিন গৃহস্বামী বহুদূরবর্ত্তী গ্রামে এক জন লোক পাঠাইয়া দিল, কারণ, সেই গ্রামে 'সাহেব লোকে'র খাদ্য-সামগ্রীর একখানি দোকান ছিল। সেই লোকটি আমার জন্য এক টিন বিস্কুট, জমান দুধ, চা, চিনি, সিগারেট, একটা খাকীর সার্ট এবং একখানি লুঙ্গী লইয়া আসিল।

আমার হতভাগ্য বন্ধুটি জঙ্গলে পড়িয়া ছিলেন, তাঁহার শোচনীয় অবস্থার কথা তাহাদিগকে জানাইবার জন্য দীর্ঘকাল ধরিয়া চেষ্টা করিলাম। তাহারা আমার কথা বুঝিতে না পারায় আমি হাত-মুখের নানাপ্রকার ভঙ্গী করিয়া তাহাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম যে, আমার মত আর এক জন সাহেব লোক ৮ মাইল দূরে জঙ্গলের ভিতর ঘুমাইয়া আছেন। তাহারা আমার অঙ্গভঙ্গী দেখিয়া আমার মনের কথা কতকটা বুঝিতে পারিল এবং তাহারা আমাকে যেখানে দেখিতে পাইয়াছিল, সেই স্থানে আমার সঙ্গীর সন্ধানের জন্য এক দল লোক পাঠাইল। পরে জানিতে পারিলাম, তাহারা অনুমান করিয়াছিল, আমি বন-বিভাগের কর্ম্মচারী, আমি অরণ্যমধ্যে শাল-গাছ নির্ব্বাচন করিতে গিয়া সঙ্গিগণের সঙ্গ হারাইয়া গিয়াছিলাম।

যাহা হউক, লোকগুলি ফিরিয়া আসিয়া মাথা নাড়িল, তাহা দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, তাহারা হুককে দেখিতে পায় নাই। আমি হতাশভাবে রোদন করিতে লাগিলাম। আমার শরীর তখন এরূপ দুর্ব্বল যে, আমি আর এক দল লোক সঙ্গে লইয়া হুকের সন্ধানে যাইব, আমার সেরূপ শক্তি ছিল না। আমি পরে জানিতে পারিলাম, তাহারা সেই নদী পার হইয়া অপর পারে যাইতে পারে নাই। কারণ, সেই এক রাত্রির মধ্যেই নদীর জল এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, তাহা পার হইবার উপায় ছিল না।

অবশেষে আমি গ্রামের লোকগুলিকে কোন প্রকারে বুঝাইয়া দিলাম, আমার কথা বুঝিতে পারে, এরূপ কোন লোকের সঙ্গে আমি দেখা করিতে চাই। জীবন-মরণের ব্যাপার উপেক্ষা করা চলিবে না। দশম দিনে আমার দেহে কিঞ্চিৎ বলসঞ্চার হইলে তাহারা আমাকে পরবর্ত্তী গ্রামের দোকানদারের সহিত আলাপ করাইবার জন্য তাহার নিকট লইয়া যাইবার সঙ্কল্প করিল।

সই জান ও পো কুন এবং তাহাদের পরিজনবর্গ প্রাণ-পণে আমার সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছিল। আমি ভিন্ন গ্রামে যাত্রা করিতে উদ্যত হইলে তাহারা আমার ব্যবহারের জন্য দেশীয় বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিল। কারণ, জল ভাঙ্গিয়া নদী পার হইবার জন্য সেইরূপ বস্ত্রের প্রয়োজন ছিল। আমার পরিচ্ছদগুলি তাহারা ভাঁজ করিয়া বাণ্ডিল বাঁধিয়া মাথায় লইয়াছিল, এবং সেই ভাবে নদী পার হইয়াছিল।

আমরা চলিতে চলিতে দুই জন ব্রহ্মদেশীয় পুলিসম্যানের সাক্ষাৎ পাইলাম। তাহারা কোন উপায়ে আমার অস্তিত্বের সংবাদ জানিতে পারিয়া খাদ্যসামগ্রী ও পরিচ্ছদাদি লইয়া

আমার সন্ধান লইতে যাইতেছিল। যাহা হউক, আমি পরবর্ত্তী গ্রামে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত দোকানদারের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম; সৌভাগ্যক্রমে সে ইংরাজী জানিত, আমি তাহাকে হুক সংক্রান্ত সকল কথা বুঝাইয়া দিলাম। সে সই জান ও পো কুনকে ব্রহ্মদেশীয় ভাষায় সেই সকল কথা বলিলে তাহারা উভয়ে পুলিসম্যান দুই জনকে সঙ্গে লইয়া হুকের অনুসন্ধানে চলিল।

অতঃপর আমাকে পাডাউংয়ে লইয়া যাওয়া হইল, সেই নগরের প্রধান কর্ম্মচারী এক জন বর্ম্মীজ। তিনি আমার ভার গ্রহণ করিলে আমি তাঁহার আতিথ্য স্বীকার করিলাম। অবশেষে তিনি আমাকে একখানি বোটে তুলিয়া নদী-পথে প্রোম নগরে প্রেরণ করিলেন। এই নগর ইরাবতী নদীর অপর তীরে অবস্থিত।

সেই দিন রাত্রি সাড়ে দশটার সময় আমি প্রোমের ডেপুটী কমিশনারের বাসগৃহে উপস্থিত হইলাম। তিনি তখন শয়ন করিয়াছিলেন; আমি তাঁহার দ্বারে করাঘাত করিয়া তাঁহাকে জাগাইলে তিনি শয়ন-কক্ষের বাহিরে আসিয়া সম্মুখেই একটি অর্দ্ধোলঙ্গ, ক্ষৌর-কর্ম্মবর্জ্জিত, ভূতের মত আকারবিশিষ্ট, জীবিত নরকঙ্কাল দেখিতে পাইলেন—ব্রহ্মের সকল লোক যাহার মৃত্যু সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়াছিল; কারণ, ব্রহ্মের অরণ্য সম্বন্ধে যাঁহাদের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহাদের কেহই এ কথা মুহূর্ত্তের জন্য বিশ্বাস করিতে পারেন নাই যে, আমাদের উভয়ের এক জনও জীবিত অবস্থায় সেই জঙ্গলের বাহিরে আসিতে পারিবে।

মিঃ ম্যাথুসকে ইহারাই খুঁজিয়া পাইয়াছিল

ডেপুটী কমিশনর মিঃ বিন্‌স্ দয়ার অবতার। তিনি আমাকে তাঁহার গৃহে আশ্রয় দান করিলেন এবং এক মাস-কাল আমাকে এক জন বর্ম্মীজ ডাক্তারের চিকিৎসাধীন রাখিলেন। এই ডাক্তার মাং থা ইউ প্রত্যহ আমাকে দেখিতে আসিতেন। বিষাক্ত জোঁকের ঝাঁক আমার পদদ্বয় আচ্ছন্ন করিয়াছিল, তাহাদের দংশনজনিত ক্ষতগুলির চিকিৎসার জন্য অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হইয়াছিল। ঐ ভাবে চিকিৎসা না হইলে আমাকে খোঁড়া হইতে হইত।

সই জান ও পো কুন কোথায় কি ভাবে আমাকে দেখিতে পাইয়াছিল এবং তাহারা হুকের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া কি ফল লাভ করিয়াছিল, তাহাদিগকে প্রোমে উপস্থিত হইয়া তাহা বলিতে হইল। তাহারা এ কথাও বলিল যে, তাহারা হুক সাহেবের সন্ধান পায় নাই এবং অরণ্যে প্রবেশ করিয়া তাহারা এরূপ আতঙ্কাভিভূত হইয়াছিল যে, সাহেব লোক বন্দুক লইয়া তাহাদের সঙ্গে না যাইলে তাহারা পুনর্ব্বার সেই অরণ্যে প্রবেশ করিবে না।

তাহাদের বর্ণনা হইতে প্রমাণ পাওয়া গেল যে, হুক ও আমি সেই অরণ্যে প্রায় ৪০ মাইল ভ্রমণ করিয়াছিলাম এবং আমি যে স্থানে আসিয়া উক্ত দুই জন ব্রহ্মবাসীকে দেখিতে পাইয়াছিলাম, সেই স্থানে উপস্থিত হইতে যদি আমার আর ৫ মিনিট বিলম্ব হইত, তাহা হইলে আমাকে মৃত্যুকবলে নিপতিত হইতে হইত। আমি যে সময় তাহাদিগকে আহ্বান করিয়াছিলাম, তখন তাহারা সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া প্রাণভয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিতেছিল। কারণ, কোন বর্ম্মীজ সন্ধ্যার পর অরণ্যে থাকিতে সাহস করে না। আমি দুর্ব্বল দেহে তাহাদের অনুসরণ করিতে পারিতাম না। তাহাদের বাসগ্রাম নদীতীর হইতে দূরে অবস্থিত বলিয়া আমি একাকী কোনক্রমে তাহা খুঁজিয়াও বাহির করিতে পারিতাম না।

অতঃপর সরকারের তরফ হইতে দুই দল লোক এরিকের সন্ধানে অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিল; কিন্তু তাহারাও অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল, সেই

স্থান তাহারা খুঁজিয়া বাহির করিলেও এরিককে দেখিতে পায় নাই।

স্থানীয় ইংরাজ অধিবাসিগণ সই জানের সঙ্গে আর এক দল লোককে এরিকের সন্ধানে পাঠাইয়াছিলেন। এই দল এরিকের মৃতদেহ যে স্থানে দেখিতে পাইয়াছিল, তাহারই প্রায় ১ শত গজ দূরে সই জান ও পো কুনের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। নদী স্ফীত হইয়া তাঁহার মৃতদেহ প্রায় ৭ মাইল দূরে ভাসাইয়া আনিয়াছিল।

তাহারা আমার হতভাগ্য বন্ধুর মৃতদেহ প্রোমে লইয়া আসিল। অতঃপর বীরের মৃত দেহের ন্যায় সমারোহের সহিত তাঁহার মৃতদেহ সমাহিত হইল। তাঁহার মৃত দেহের প্রতি সামরিক সম্মান প্রদর্শিত হইল। আমি তখন সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়ায় আমাকে একখানি গাড়ীতে তুলিয়া সমাধি-ক্ষেত্রে লইয়া যাওয়া হইল। সেই শোচনীয় দৃশ্য আমার স্মৃতিপটে অঙ্কিত রহিয়াছে!

মিঃ জ্যাক ম্যাথুস্ ও এরিক হুকের অষ্ট্রেলিয়াগামী এরোপ্লেন ব্রহ্মদেশে সহসা অদৃশ্য হইলে তাঁহাদের সম্বন্ধে এ দেশের সংবাদপত্রসমূহে যে আন্দোলন-আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় পাঠক-পাঠিকাগণের এখনও স্মরণ আছে। তাহার পর জ্যাককে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল এবং এরিকের মৃতদেহ বহু চেষ্টায় আবিষ্কৃত হইয়াছিল—এ সংবাদও আমরা সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছিলাম; এত দিন পরে জ্যাক ম্যাথুসের প্রবন্ধে তাঁহাদের দুঃখ-দুর্গতির আমূল বিবরণ প্রকাশিত হইল। ব্রহ্মদেশের প্রোম নগরে ও তৎসন্নিহিত স্থানসমূহে 'মাসিক বসুমতীর' যে সকল গ্রাহক ও পাঠক আছেন, এই কাহিনী তাঁহাদের পক্ষে অধিকতর কৌতূহলোদ্দীপক হইবে সন্দেহ নাই।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

স্বপনে

কাল রজনীতে এসেছিলে প্রিয়ে
আমার ঘরে,
বহুকাল পরে—নিদ্রার ঘোরে
ক্ষণিক তরে।

জীবনের সাধ না মিটিতে হায়
গিয়েছিলে চ'লে তুমি অবেলায়,
বিষাদের ছায়া ফুটেছিল তাই
মুখের পরে।

সজল ছিল গো নয়ন-যুগল
সীঁথির সিন্দুর তেমনি উজল
ম্লান হাসিটুকু লেগেছিল ছুটি
বিম্বাধরে।

ধীরে ধীরে বসি শয়ন-শিয়রে
আসিলে অধর মিলাতে অধরে,
সহসা চমকি ভাঙ্গিল স্বপন
শূন্য ঘরে।

নিবিড় বেদনে হৃদয়ের পরে
অতীতের স্মৃতি থরে থরে থরে
জলছবি সম ফুটিল আমার
নয়ন-জলে।

চারি ধারে মোর আঁধার পাথার
নাহি ছিল কূল নাহি পারাপার
তারি মাঝে আমি গিয়েছিনু ডুবে
অতল তলে।

বাহিরে তখন পাপিয়া কাঁদিছে
করুণ স্বরে,
হায় হায় করে উদাস বাতাস
মাঠের পরে।

তারায় তারায় তামসী রাত্রির
ঝরে ফোঁটা ফোঁটা নয়নের নীর,
উঠে হাহাকার ঝিল্লী-কণ্ঠে
কানন ভরে।

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

প্রতিক্রিয়া

১

শ্রান্ত-ক্লান্ত দেহভার কোনওরূপে বহন করিয়া ছায়াচ্ছন্ন অপরাহ্নে সুব্রত মেসের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল। তাহার দীর্ঘ, ব্যায়ামপুষ্ট, বলিষ্ঠ দেহ, সুন্দর গৌরকান্তি কিছু দিন ধরিয়া কঠোর জীবন সংগ্রামের ভীষণ সংঘর্ষে পূর্ব্বগৌরব ও শ্রী হারাইয়া ফেলিয়াছিল। সুব্রতের যে সকল পরিচিত-জন, বন্ধুবান্ধব এক বৎসর পূর্ব্বেও তাহার মাধুর্য্যপূর্ণ দেহ-কান্তি ও অঙ্গসৌষ্ঠবের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিল, এখন তাহাকে দেখিলে তাহারা নিশ্চয়ই বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া পড়িবে। হৃত-স্বাস্থ্য, হৃতশ্রী, রিক্তসর্ব্বস্ব সুব্রত যেন তাহার পূর্ব্বগৌরব ও সম্পদকে তীব্র বিদ্রূপ করিতেছে!

অর্দ্ধমলিন শয্যায় দেহভার এলাইয়া দিয়া সুব্রত নিমীলিতনেত্রে কি চিন্তা করিতে লাগিল। সন্ধ্যার স্বল্পান্ধকারে তাহার মুদ্রিত নেত্রযুগল হইতে মর্ম্মান্তিক বেদনার অশ্রুধারা গণ্ডদেশ প্লাবিত করিয়া শয্যাতল সিক্ত করিল।

না, সত্যই সে আর সহ্য করিতে পারিতেছে না।

এক বৎসর ধরিয়া সে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও এই বিরাট ভারতবর্ষের কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একটি শিক্ষকের পদও অধিকার করিতে পারিল না। তাহার আবেদন-পত্রের উত্তরে শুধু ব্যর্থতার সংবাদই আসিয়াছে।

অথচ তাহার পাণ্ডিত্যকে কে উপেক্ষা করিতে পারে? সে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাধি যোগ্যতার সহিত অর্জ্জন করিয়া সাগরপারে গিয়াছিল। সেখানেও প্রতিযোগী পরীক্ষায় সে অসামান্য যশঃ অর্জ্জন করিয়া উচ্চ উপাধিভূষণে অলঙ্কৃত হইয়াছিল। তরুণ দলের মধ্যে ইংরাজী সাহিত্যে তাহার সমকক্ষ কয় জন আছে?

তাহার পাণ্ডিত্যের পুরস্কারও সে জন্মভূমিতে ফিরিয়া আসিয়া পায় নাই, এমন নহে। ভারতবর্ষের কোনও বিশিষ্ট প্রদেশের উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সে উচ্চ বেতনে অধ্যাপকের পদলাভ করিয়াছিল। তাহার শিক্ষা-নৈপুণ্যে, পাণ্ডিত্যপ্রতিভায় শিক্ষক ও ছাত্রসমাজ মুগ্ধ হইয়াছিল।

কিন্তু নিষ্ঠুর ভবিতব্য!—

সুব্রত অস্থিরভাবে শয্যার উপর উঠিয়া বসিল।

ত্রিশ বৎসর বয়সে সবই ফুরাইয়া গেল? মান, সম্ভ্রম, যশঃ, অর্থ, প্রতিপত্তি—সবই কীর্ত্তিনাশার প্রবাহধারায় ধুইয়া মুছিয়া গেল?

আজ ভদ্রসমাজ তাহার প্রতি বিরূপ। পথে পূর্ব্ব-পরিচিতদিগের কাহারও সহিত দেখা হইলে, সে উপেক্ষা ও বিদ্রূপভরে তাহাকে এড়াইয়া চলিয়া যায়। পণ্ডিত-সমাজ, শিক্ষিতসম্প্রদায় তাহার নাম শুনিলে ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করে।

সুব্রত মানসিক উত্তেজনার আতিশয্যে কক্ষমধ্যে পায়চারী করিতে লাগিল।

তাহার কি নাই? পণ্ডিত, ধনবান্, যশস্বী পিতা আছেন। অগাধ স্নেহশালিনী জননী বিদ্যমান। গুণবতী সহোদরা, সহোদরের অভাব নাই। দেশে অসামান্য প্রতিপত্তি, সমাজে অখণ্ড আভিজাত্যসম্মান—সবই ত তাহার ছিল।

কিন্তু সকলেই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। আত্মীয়-স্বজনের গৃহদ্বার তাহার পক্ষে রুদ্ধ।

সঞ্চিত অর্থে এত দিন সে তাহার ক্ষুদ্র সংসারকে পরি-চালিত করিয়া আসিয়াছিল। অলকার সাময়িক অসুস্থতার জন্য তাহাকে দার্জ্জিলিঙ্গে পাঠাইয়া দিতে হইয়াছে। সে তথায় অন্ততঃ যাহাতে এক বৎসরকাল স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে, এজন্য তাহার শেষ সম্বল তাহার হাতে দিয়া সুব্রত ছদ্মপরিচয়ে এই সামান্য মেসে আসিয়া উঠিয়াছে।

আত্মীয়-বন্ধুবান্ধব সকলেই তাহাকে পরিত্যাগ করিলেও তাহার এক জন অকৃত্রিম বাল্য-সুহৃদ ছিল। তাহারই ঠিকানায় তাহার পত্রাদি আসিত। এই নিদারুণ দুঃসময়ে এই বন্ধুটি তাহাকে এখনও পরিত্যাগ করে নাই।

সুব্রত সেই বন্ধুর সন্ধানে যাইবার জন্য উদ্যত হইল। কোন একটি প্রাদেশিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে কর্ম্মখালির সংবাদ পাইয়া সেখানে সে আবেদন পাঠাইয়াছিল। যদি কোনও উত্তর আসিয়া থাকে।

"কি হচ্ছে, বন্ধু?"

সুব্রত চমকিয়া উঠিল। মণি নিজেই আসিয়া উপস্থিত।

আলো জালিয়া সুব্রত বন্ধুর দিকে চাহিল। অকস্মাৎ তাহার বক্ষ ঘন ঘন স্পন্দিত হইতে লাগিল।

মণি জামার পকেট হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া বন্ধুর হাতে দিল।

কম্পিত হস্তে কয়েক মুহূর্ত্ত সুব্রত পত্রখানি ধরিয়া রাখিল, তার পর খাম ছিঁড়িয়া ফেলিল।

মণি চাহিয়া দেখিল, সুব্রতের ললাট ঘর্ম্মসিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার পাণ্ডুর আনন আরও বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

"কি লিখেছে, ভাই ?"

নীরবে সুব্রত বন্ধুর হাতে পত্রখানি অর্পণ করিল। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ লিখিয়াছেন, "অধ্যাপনার যোগ্যতা আপনার আছে ; কিন্তু অনুসন্ধানে জানা গেল, সুকুমারমতি তরুণদিগের শিক্ষার ভার আপনার উপর অর্পণ করা নিরাপদ নহে। শিক্ষা চরিত্রের উৎকর্ষ-বিধান করে। আপনি শিক্ষক হিসাবে ছাত্রদিগের নিকট সে পবিত্র আদর্শের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারেন নাই। আপনার প্রশংসাপত্রগুলি পরীক্ষা-সাফল্যের গৌরব ঘোষণা করিলেও আপনার নৈতিক জীবন তদনুরূপ নহে। ক্ষমা করিবেন।"

মণিলাল বন্ধুর সকল সংবাদই জানিত। অন্য কোনও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হইতে এমন কঠোর, রূঢ় ও নির্ম্মম উত্তর আসে নাই। কিন্তু প্রতিবাদ করিবার কি আছে ?

সে নির্ব্বাক্‌ভাবে বসিয়া রহিল। সুব্রত তখন বাতায়নের দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

২

কাল-বৈশাখীর মেঘ সমস্ত আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। বাতাসের প্রচণ্ডতা, দামিনীর তীব্র দীপ্তি করকাপাতের সহিত মিলিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারকে ভীষণ করিয়া তুলিয়াছিল।

সুব্রত মেসের ঘরে একা বসিয়াছিল। গৃহান্তরে মেসের অন্যান্য সকলে জটলা করিতেছে।

আজ কয় দিন দার্জ্জিলিং হইতে সে অলকার কোন পত্র পায় নাই। বিগত জুন মাস হইতেই অলকা সেখানে বাস করিতেছে। সেপ্টেম্বর মাসে সে মৃত সন্তান প্রসব করিয়াছিল; কিন্তু তাহাতে অলকার সুদৃঢ় স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হয় নাই। দীর্ঘকাল মুসৌরী, আলমোড়া প্রভৃতি পাহাড়ে শীতের সময়েও বাস করার ফলে অলকা শীতকে ভয় করে না। সুতরাং দার্জ্জিলিঙ্গের শীত তাহার স্বাস্থ্যের প্রতিকূল না হইয়া অনুকূলই হইয়াছিল, সুব্রত অলকার পত্রে ইহাই অবগত হইয়াছিল।

অলকা বাঙ্গালীর মেয়ে হইলেও ইংরাজী স্কুল-কলেজে সে দীর্ঘকাল শিক্ষা পাইয়াছিল। তাহার সম্ভ্রান্ত ও ধনী পিতা য়ুরোপীয় শিক্ষয়িত্রী রাখিয়া তাহাকে বিলাতী আদব-কায়দা শিক্ষা দিয়াছিলেন, ইহা সুব্রত জানিত। তাই অলকাকে দার্জ্জিলিঙ্গে রাখিয়া সুব্রতের কোনও দুর্ভাবনা ছিল না।

কিন্তু সপ্তাহকাল সে নীরব কেন? এমন ত তাহার কখনও হয় না। অবশ্য প্রতি পত্রেই সুব্রত তাহার অসাফল্যের সংবাদ অলকাকে জানাইয়াছে, কিন্তু সম্পূর্ণ নৈরাশ্যজনিত যে দুঃখ ও বেদনা সে অন্তরে অনুভব করিতেছিল, তাহার আভাসমাত্রও সে অলকাকে জানিতে দেয় নাই।

বৃষ্টি ও বাতাসের ঝাপটায় অস্থির হইয়া সুব্রত জানালা বন্ধ করিয়া দিল। বজ্রের গুরু গর্জ্জনে বাড়ী কাঁপিয়া উঠিল।

সুব্রত পলকহীন নেত্রে বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। এমনই এক দুর্য্যোগময়ী নিশীথে অলকা তাহার কাছে আসিয়াছিল।

সুব্রত আর বসিয়া থাকিতে পারিল না। উঠিয়া ক্ষুদ্র কক্ষ মধ্যে পাদচারণা করিতে লাগিল।

দূরে অধ্যাপক বন্ধুর বাংলো। তরুণী পত্নীসহ সুদর্শন অধ্যাপক তাহাকে প্রতিদিনই সমাদরে অভ্যর্থনা করিতেন।

অধ্যাপনার অবকাশে মাধুর্য্যপূর্ণ বিচিত্র জীবনযাত্রা! তরুণ জীবনের বাধাবন্ধহীন আলোচনা, সম্মেলন!

যৌবন অন্ধ, উচ্ছৃঙ্খল, ভোগাকাঙ্ক্ষায় অধীর। প্রতীচ্য সভ্যতা ও শিক্ষার আদর্শ, প্রাচ্য সভ্যতার সংযম, ধর্ম্ম-বিশ্বাসকে বিদ্রূপ করে। উভয়ের মধ্যে মূল প্রকৃতিগত পার্থক্য। পাশ্চাত্যদেশের আধুনিক মনীষী—ইবসেন, বার্ণার্ড শ, ফ্রয়েড, শেকভ প্রভৃতি পুরাতন মনীষী কার্লাইল, ইমার্সন, ডিকেন্স, ভিক্টর হুগো, টলষ্টয় প্রভৃতিকেও নিষ্প্রভ করিয়া দেয় নাই? সুতরাং প্রাচ্যদেশীয় প্রাচীন সেকালের ঋষিগণ ত অপাংক্তেয় হইবেনই।

"বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি" এই প্রাচীন স্বতঃসিদ্ধ নীতিবাক্য আধুনিকের জ্ঞানেরও অগোচর। বস্তুতান্ত্রিকতাপূর্ণ শিক্ষা তাহাকে কখনই স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে।

বিংশ শতাব্দীর প্রগতিযুগে মনের ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ। আধুনিক মনীষীরা ঢক্কানিনাদ সহ প্রতীচ্যদেশে তাহারই জয়ঘোষণা করিতেছেন। বন্যার প্রবাহ প্রাচ্যদেশের তটভূমিতে না আঘাত করিয়া পারে না। প্রতীচ্যশিক্ষায় যে মন গড়িয়া উঠিতেছে, রুসিয়ার কম্যুনিজম্ তাহার কাছে লোভনীয় এবং শ্রেয়ঃ। ধর্ম্মবিশ্বাস, ঈশ্বর, মন্দির, সামাজিক ও ধর্ম্মসংক্রান্ত বন্ধনের রজ্জু নাগপাশের মত মানুষের কণ্ঠ রোধ করে। মানবের স্বাভাবিক মনের প্রসার তাহাতে হয় না। মন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে পঙ্গু হইয়া থাকে। আধুনিক নর-নারী সে অবস্থা কল্পনা করিতেও শিহরিয়া উঠিবে বটেই।

সুতরাং পাঁচ বৎসরের বিবাহিত জীবনকে নির্ব্বাসিত করিয়া অলকা সুব্রতের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। সুব্রত এ সুযোগ উপেক্ষা করিতে পারে নাই। কারণ, বাসনার অনলে সেও ত সামান্য ইন্ধন যোগায় নাই।

মন যাহাতে তৃপ্ত নহে, সমাজের কোন বন্ধনই তাহাকে তাহাতে শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিতে পারে না। সুব্রত জয়ধ্বনি সহকারে বলিল, "অধিকারও নাই। মানুষের মনের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু নাই। সে মুক্ত, স্বাধীন থাকিবে, ইহাই বর্ত্তমান সভ্যতা ঘোষণা করিতেছে। প্রগতির মূলমন্ত্র ইহাই।" নজীরের অভাব ছিল না, আধুনিক অনেক প্রতীচ্য ও প্রাচ্য পণ্ডিত তাহার মতের পোষকতা করিতে বাধ্য।

অলকা মন্ত্রপড়া স্বামীকে জানাইয়া দিল, সে যে পবিত্র প্রেমের পতাকাতলে আশ্রয় লইয়াছে, সপ্তাহের মধ্যে তিনি তাহার তলদেশে মিলিত হইতে পারেন, নচেৎ তথাকথিত বন্ধন হইতে সে মুক্তিলাভ করিবে।

নির্ব্বোধ অধ্যাপক স্বামী সে উদাত্তবাণীর মর্ম্ম বুঝিলেন না। সুতরাং কয়টি কথার সাহায্যে এক দিন নারায়ণ ও অগ্নি সাক্ষী করিয়া যে অনতিক্রমণীয় বন্ধন দুই জনকে শৃঙ্খলিত করিয়াছিল, তাহা খসিয়া গেল। সুব্রত আসিয়া অলকার পার্শ্বে অধিকার করিল। প্রতীচ্যদেশের অনবদ্য ব্যবস্থা-কৌশলে উভয়ে উভয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া দাম্পত্য-জীবনে প্রবেশ করিল।

পাশ্চাত্য সভ্যতা ইহাকে প্রেম আখ্যা দিয়াছে।

এরূপ অবস্থায় সুব্রত সমস্ত বিষয়ে জলাঞ্জলি দিয়া অলকার অঞ্চলই চাপিয়া ধরিল। পিতার দীর্ঘশ্বাস, মাতার অশ্রুধারা, সহোদর-সহোদরার কাতর মিনতি, বন্ধুবান্ধবগণের অনুরোধ—পাশ্চাত্যপ্রেমের কাছে পরাজিত হইয়া গেল।

যে প্রেরণার বলে অলকা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া তাহার কাছে আসিয়াছে, যাহার প্রেরণায় সুব্রত স্নেহময় পিতা, অপার স্নেহময়ী জননী এবং তাহার সমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সবই ত্যাগ করিতে পারিয়াছে, সেই অমোঘ শক্তির জয় সে অবশ্যই ঘোষণা করিবে। প্রাচ্য ইহাকে প্রথম রিপুর উন্মাদনা বলিয়া ঘোষণা করিলেও, প্রাচীন প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ ইহার নিন্দাবাদ করিলেও সে ভ্রূক্ষেপ করিবে না।

কিন্তু অলকার পত্র নাই কেন? উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিলে সে কালই দার্জ্জিলিং চলিয়া যাইত। কিন্তু সে উপায় ত নাই।

সুব্রত দ্রুত পাদচারণা করিতে লাগিল।

৩

ছুটীর দিন সকালে মণিলাল বন্ধুর মেসে আসিয়া উপস্থিত হইল। ইদানীং সুব্রত বন্ধুর গৃহে যাওয়াও বন্ধ করিয়াছিল। আত্মীয়স্বজনপরিবৃত বন্ধুভবনে তাহার সম্বন্ধে আলোচনা হয় না, ইহা সে বিশ্বাস করিতে পারিত না। সে আলোচনার অপ্রীতিকর আঘাতকে এড়াইয়া চলিবার জন্যই সুব্রত আপনাকে সংযত করিয়াছিল।

মণিলাল সুব্রতকে বলিল, "কাল সুরমার পত্র পেয়েছি। তোমার কাছেও সে এই পত্রখানা দিয়েছে।"

সুব্রত সহোদরার পত্রখানি খুলিয়া ফেলিল। তাহাতে লেখা ছিল—

"দাদা,

সময় আছে, এখনও ফিরিয়া আসিয়া বাবা ও মা'র চোখের জল তুমি মুছাইয়া দিতে পার। আমাদের আদর্শ দাদা, তুমি আজ কি হইয়া গিয়াছ? কলেজে আমরাও পড়িয়াছি, কিন্তু অলকার এ মনোবৃত্তির ও ব্যবহারের অর্থ আমরাও বুঝিতে পারি না।

পাঁচ বৎসর যাহাকে স্বামী বলিয়া ভাবিয়াছে, স্ত্রী হইয়া যাহার সহিত দীর্ঘকাল বাস করিয়াছে, মনের ভালবাসা হয় নাই বলিয়া তাহাকে ছাড়িয়া আসিয়া অন্যকে আবার স্বামিত্বে বরণ করিতে পারে, বাঙ্গালার কোন ভাল মেয়েই তাহা স্বীকার করিবে না। নারীর মন একনিষ্ঠ, ইহা ত সকল দেশের পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন। আমরা ত অন্য রকম ভাবিতেও পারি না। এ কি উচ্ছৃঙ্খল, বীভৎস, মিথ্যা আদর্শ তোমরা আমদানী করিতেছ ?

যে একবার সমস্ত বন্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া এমন করিতে পারে, সে আবারও তাহাই করিবে। চঞ্চল, ভোগবিলাসী অন্তর কিছুতেই তৃপ্ত নহে। তুমি পণ্ডিত, এ সহজ সত্যটা বুঝিতে পার না ? মনের লাগাম আল্‌গা করিয়া দিলে, সে খানায় পড়িবে না,—কর্দ্দমে, চোরাবালুতে পড়িয়া আরোহী সহ প্রাণে মরিবে না ?

নারীর মন লইয়া বুঝিতে পারি, অলকার মনোবৃত্তি ও ব্যবহার সমর্থনের অযোগ্য। তুমি ভুল করিয়াছ, দাদা। এখনও যদি ফিরিতে পার, জীবনের সহস্র অশান্তি, আঘাত ও বেদনার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পার। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, তুমি নিজে সুখী হইতে পার নাই, দেবতাতুল্য পিতামাতাকে মর্ম্মান্তিক বেদনা দিয়া মহাপাপ করিয়াছ। ছোট বোনের অনুরোধ রাখ। ফিরে এস, ফিরে এস।"

সুব্রত ধীরে ধীরে পত্রখানি মণিলালের হাতে দিয়া বলিল, "প'ড়ে দেখ।"

নিঃশব্দে সুরমার পত্রখানি পড়িয়া মণিলাল স্তব্ধভাবেই বসিয়া রহিল।

বন্ধুর দিকে চাহিয়া সুব্রত বলিল, "অলকার সম্বন্ধে সুরমার এ ধারণা মিথ্যা। তুমি কি বল ?"

মণিলাল দৃঢ়স্বরে বলিল, "তোমাকে ভালবাসি, সে কথা স্বতন্ত্র ; কিন্তু তোমাদের এ কার্য্যের সমর্থন কোন দিনই আমি করিনি। আমার মত নিয়ে কোন লাভ নেই।"

সুব্রত কিছুকাল নীরব থাকিয়া স্বপ্নাবিষ্টের মত বলিল, "ভালবাসাশূন্য বিবাহের সমর্থন তুমি কর ? যেখানে ভালবাসা নেই, সেখানে বন্ধন তাকে অনর্থক কেন শৃঙ্খলিত ক'রে রাখ্‌বে ? কি তার অধিকার ?"

মণিলাল কোন উত্তর করিল না। সে শুধু বন্ধুর মুখের দিকে চাহিয়া নীরবেই বসিয়া রহিল। তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া যে কেহ মনে করিতে পারিত, বিরুদ্ধ বিশ্বাসের নজীর তুলিয়া সে তাহার বন্ধুর উত্তেজিত হৃদয়কে আহত করিতে চাহে না।

সহসা মণিলালের দক্ষিণ হস্ত সবলে চাপিয়া ধরিয়া সুব্রত বলিল, "কৈ, তুমি ত কিছু বল্‌ছ না ? আমার যুক্তিকে কি তুমি খণ্ডন করতে পার ?"

মণিলাল মৃদুকণ্ঠে বলিল, "তোমার বোন্ সুরমার পত্রে তোমার যুক্তির উত্তর আছে। তবে একটা কথা ব'লে রাখি, কাম ও প্রেমকে প্রাচ্যদেশে এক পর্য্যায়ে ফেলেন না। তোমার পাশ্চাত্য শিক্ষার মাপকাঠি দিয়ে এর বিচার হবে না।"

সুব্রত কি বলিতে গিয়া সহসা থামিয়া গেল।

সে ইতিমধ্যে সহরের অনেক প্রথিতনামা লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল। সমাজ ও ধর্ম্মের সংস্কারে যাঁহারা উচ্চকণ্ঠে বক্তৃতা করেন, স্বাধীন প্রেমের যাঁহারা উপাসক, এমন অনেক মহারথ ও রথীর সহিত দেখা করিয়া সুব্রত কঠোর জীবন-সংগ্রামের পাথেয় সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছিল। যাঁহারা গৃহী বা সপত্নীক নহেন, তাঁহারা মুখে তাহার নৈতিক সাহসের প্রশংসা করিয়া বাহবা দিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু পরিচয়ের পর হইতেই তাঁহারাও সুব্রতকে এড়াইয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। আর যাঁহারা সংস্কারকামী গৃহী, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা লইয়া যাঁহারা বসবাস করেন, তাঁহারা তাহাকে আমোলও দেন নাই।

উপায়ান্তর না দেখিয়া সে মণিলালের সহায়তায় ছদ্ম নামে সম্প্রতি দুইটি ছাত্রকে দুই বেলা পড়াইবার সুযোগ পাইয়াছিল। বর্ত্তমানে উহাই তাহার সম্বল।

সুব্রত বলিল, "অলকার পত্র না পেয়ে মনটা বড় খারাপ আছে ; কিন্তু দার্জ্জিলিঙ্গে যাবার অর্থও নেই, আর পড়ান ছেড়ে এখন যাওয়াও কঠিন।"

মণিলাল বলিল, "তিনি বোধ হয় ভালই আছেন। অমন দুই এক সপ্তাহ বিলম্ব সকলেরই ঘ'টে থাকে। তা বরং কাল সকালে সেখানে একটা তার ক'রে দিলেই হবে। তুমি যদি বল, তোমার নাম দিয়ে কালই আমি সেটা পাঠিয়ে দেব।"

সুব্রত কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে বন্ধুর দিকে চাহিয়া বলিল, "সেই ভাল।"

৪

মণিলাল একটু ব্যস্তভাবেই বন্ধুর মেসের কক্ষে প্রবেশ করিল। দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে সুব্রত দার্জ্জিলিঙ্গ চলিয়া গিয়াছিল। অলকার নিকট হইতে তারের উত্তর না পাইয়া প্রকৃতই শঙ্কিতচিত্তে সুব্রত অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল। মণিলাল টাকার যোগাড় করিয়া বন্ধুকে অলকার সন্ধানে পাঠাইয়া দিয়াছিল। দার্জ্জিলিঙ্গ হইতে সুব্রত মণিলালকে প্রথমতঃ কোন পত্র লিখে নাই। শুধু গত কল্য বন্ধুর সংক্ষিপ্ত একখানি পত্র পাইয়া সে জানিয়াছিল, সুব্রত আজ কলিকাতায় আসিবে।

মেসের ঘরে প্রবেশ করিয়াই মণিলাল দেখিল, সুব্রত নিশ্চলভাবে শয্যায় শুইয়া আছে। তাহার বিবর্ণ ললাটে গভীর নৈরাশ্যের তীব্র বেদনা-সঞ্জাত রেখাগুলি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

মণিলাল বিস্মিতভাবে বন্ধুর দিকে চাহিতেই সুব্রত উঠিয়া বসিল।

"ব্যাপার কি, ভাই? অলকা কোথায়?"

জামাটা গায় দিয়া জুতা-জোড়ার মধ্যে পা গলাইয়া সুব্রত ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, "চল, বাইরে যাই। এ ঘরের মধ্যে আমার দম বন্ধ হয়ে আস্‌ছে।"

বন্ধুর হাত ধরিয়া উন্মত্তের ন্যায় সুব্রত তাহাকে এক প্রকার টানিয়া লইয়াই বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

কিয়ৎকাল উভয়ের মধ্যে কোন কথা হইল না। বন্ধুর হাত চাপিয়া ধরিয়াই সে অদূরবর্ত্তী পার্কের মধ্যে প্রবেশ করিল। মণিলাল বুঝিল, তাহার বন্ধুর হাত কাঁপিতেছে, প্রাণপণ চেষ্টায় সুব্রত আপনাকে সংবরণ করিবার ব্যর্থ প্রয়াস পাইতেছে।

উদ্যানের এক প্রান্তে কতিপয় বৃক্ষের অন্তরালে একটু ফাঁকা যায়গায় গিয়া সুব্রত বসিয়া পড়িল।

মণিলাল ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, "কি হয়েছে, শুনি?"

কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে উপরের আকাশের দিকে চাহিয়া সুব্রত বলিল, "অলকা নেই!"

মণিলাল চমকিয়া উঠিল। কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "তার মানে?"

সুব্রত বন্ধুর দিকে চাহিল। মণিলালের মনে হইল, বন্ধুর মুখে কোনও প্রকার ভাবের রেখামাত্রও নাই। সম্পূর্ণ ভাববর্জ্জিত বন্ধুর এমন প্রস্তরমূর্ত্তি সে কখনও দেখে নাই।

সুব্রত একবার হাসিবার চেষ্টা করিল। তার পর রস-লেশহীন কণ্ঠে উত্তর করিল, "দার্জ্জিলিঙ্গে কোথাও সে নেই। কেউ বল্‌তে পারে না, সে কোথায় গেছে!"

মণিলাল কিয়ৎকাল কি ভাবিল, তার পর বলিল, "কোন দুর্ঘটনা হয় নি ত?"

তিক্ত হাসির বিদ্যুৎরেখা এবার সুব্রতের ওষ্ঠ-প্রান্তে চমকিয়া উঠিল। সে বলিল, "দুর্ঘটনা কি সুঘটনা, তা জানিনে। তবে সেখানে দেহের অবসান ঘটে নি, এ প্রমাণ পেয়েছি।"

মণিলাল নীরবে বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

কিয়ৎকাল পরে সুব্রত সহসা উত্তেজিত হইয়া উঠিল। সে অনেক কথা বলিতে বলিতে সহসা ওষ্ঠে ওষ্ঠ চাপিয়া থামিয়া গেল। মণিলাল শুধু এইটুকু বুঝিল, অলকা যেখানে বাস করিতেছিল, সেখানে নাই। সমগ্র দার্জ্জি-লিঙ্গের কোন স্থানেই তাহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। সে ইদানীং বেশ সুস্থ ও সবল হইয়া উঠিয়াছিল। আনন্দ-জীবন-যাপনের কোন প্রকার বিঘ্ন ঘটিয়াছিল, এ সংবাদ সুব্রত সেখানে আদৌ সংগ্রহ করিতে পারে নাই। সুরেশ রায় নামক এক প্রিয়দর্শন ধনবান্ যুবকের সহিত মাঝে মাঝে অলকার দেখা হইত। ইহার অধিক সংবাদ সুব্রত সংগ্রহ করিতে পারে নাই। তবে দার্জ্জিলিঙ্গে সুরেশ রায় এখন অনুপস্থিত। জনশ্রুতি বলে, সে না কি বোম্বাইয়ের পথে বিলাতযাত্রা করিয়াছে।

সুব্রত ক্লান্তভাবে তৃণশয্যায় দেহ বিছাইয়া দিল।

মণিলাল বন্ধুর দিকে অনুকম্পাস্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, তার পর মৃদুকণ্ঠে বলিল, "তোমার একখানা চিঠি কালকের বিলাতী ডাকে এসেছে।"

সুব্রত নীরব দৃষ্টিতে বন্ধুর দিকে ফিরিয়া চাহিল।

"বোধ হয়, মিস্ রবিনসন্ লিখেছেন। কারণ, আমিও তাঁর একখানা পত্র পেয়েছি।"

উঠিয়া বসিয়া সুব্রত বৃদ্ধা রবিন্‌সনের পত্র পাঠ করিল। উহাতে লেখা ছিল,—

"প্রিয় পুত্র,

মণির পত্রে অনেক কথা শুনিয়াছি। অন্তত্র

হইতেও তোমার সংবাদ পাইলাম। এ কি নিদারুণ অধঃপতন তোমার ? এ কি করিয়াছ, পুত্র! বিবেকানন্দের পুণ্যভূমিতে তোমার জন্ম, রামকৃষ্ণের পবিত্র আবহাওয়ায় যে বাঙ্গালা দেশ অনুপ্রাণিত, তুমি সেই দেশের ছেলে! তাই বিলাতে যখন তুমি পড়িতে আসিয়াছিলে, পুত্রাধিক স্নেহে তোমাকে আমার কাছে রাখিয়াছিলাম। এ পৃথিবীতে আমার কোন আত্মীয়স্বজন নাই। আমার সমস্ত স্নেহ তুমি লুটিয়া লইয়াছিলে। তোমার চরিত্র ও শিক্ষার গুণে গর্ব্বে আমার চিত্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিত। এখানে যখন ছিলে, কৈ, তোমার চরিত্রের সংযমহীনতার কোন আভাস কখনও দেখি নাই!

পুত্র! স্বর্গ হইতে ধরাতলে এ কি মর্ম্মান্তিক পদস্খলন! ভারতবর্ষের হিন্দুর পবিত্র জীবনযাত্রার আদর্শ এক দিন সমগ্র পৃথিবী গ্রহণ করিবে! ভারতের হিন্দু নারীর অপূর্ব্ব পতিপ্রেম, বিশুদ্ধ জীবন ও একনিষ্ঠ আদর্শ যে পৃথিবীতে অতুলনীয়! সে দেশের মেয়ে, শিক্ষিতা, উচ্চবংশজাতা অলকার এ কি ঘৃণিত মনোবৃত্তি? আর অমন পিতামাতার জীবনাদর্শ যাহার সম্মুখে, আমার সেই প্রিয় পুত্রের এ কি শোচনীয় পরিণাম!—ইংলণ্ডের পবিত্রচেতা স্বাধীনা নারী যাহা কল্পনা করিতে পারে না, সেই অবস্থায় অলকার ন্যায় হিন্দুর মেয়ে কেমন করিয়া অসংশয়ে ঝাঁপ দিল?

তোমাদের এ মিলনে প্রকৃত প্রেম নাই, থাকিতে পারে না। আমি ইংরাজের মেয়ে হইয়াও এ কথা অসংশয়ে বলিব। ইহা শুধু জঘন্য ইন্দ্রিয়বৃত্তির মোহ। তোমাদের উপনিষদ্, তোমাদের বেদান্ত, তোমাদের রামায়ণ-মহাভারত এ মনোবৃত্তিকে তীব্র নিন্দা করিবেই। প্রতীচ্যের নীতিশাস্ত্রেও ইহার মার্জ্জনা নাই। আধুনিক বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতা, ভোগ ও লোভের জয়গান করিতেছে। প্রতিভাশালী বিকৃত রুচিসম্পন্ন আধুনিক প্রতীচ্য সাহিত্যের রচনা-প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া এ দেশের অনেক লোক জাহান্নমের পথে যাত্রা করিতেছে, তোমরা শিক্ষিত ভারতবাসীরাও আত্মহত্যা করিতে বসিয়াছ? এ পথ শ্রেয় নহে, প্রেয় ত কখনই হইবে না। আমার কথা বিশ্বাস কর, পুত্র, এ পথে অনন্ত নরক। মুক্তির বার্ত্তা তাহাতে মিলিতে পারে না!

তোমার অর্থ-কষ্ট বুঝিয়া এক শত পাউণ্ড পাঠাইলাম। ভগবান্ তোমাকে সুমতি দিন। ভাবিতেছি, সমস্ত অর্থ বেলুড়-মঠে শীঘ্রই দান করিয়া ফেলিব।"

এই অশীতিপরা চিরকুমারী রবিন্‌সন্ সত্যই তাহার মাতৃস্থানীয়া। গত বৎসরেও তিনি শুধু তাহাকে দেখিবার জন্য ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের তিনি অত্যন্ত ভক্ত ও অনুরাগিণী। ভারতবর্ষের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় প্রেম। প্রায় ৮০ হাজার স্বর্ণ-মুদ্রার তিনি মালিক। এক দিন তাহার বহুলাংশ তিনি পালকপুত্র সুব্রতকে দিয়া যাইবেন, ইহা অন্তরঙ্গগণের অজানা ছিল না।

স্তব্ধ ও বিমূঢ়ভাবে সুব্রত বসিয়া রহিল।

৫

চিকিৎসক অতি লঘুচরণে নিশীথ রজনীর নিস্তব্ধতাকে সামান্যমাত্র বিক্ষুব্ধ করিতে সাহসী না হইয়া রোগীর শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। স্থাণুর মত পিতা নিষ্পলকনয়নে রোগশীর্ণ পুত্রের পানে নিবদ্ধদৃষ্টি, জননীর বক্ষোদেশ মথিত করিয়া কি বিপুল শোক ও বেদনার তরঙ্গ আবর্ত্তিত হইতেছিল, শ্বেত মর্ম্মরপ্রস্তরের মত তাঁহার বর্ণহীন আনন দেখিয়া তাহা কল্পনা করা চলে না।

এক মাস ধরিয়া জীবন ও মৃত্যুর নিদারুণ সংঘর্ষ চলিয়াছে। কাহার জয়পতাকা উড্ডীন হইবে, সে সম্বন্ধে সহরের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক পর্য্যন্ত সংশয়ান্বিত।

রক্তের অসম্ভব আধিক্য—চাপ মস্তিষ্ককে বিকল করিয়া ফেলিয়াছিল, হৃদ্‌যন্ত্র যে কোন মুহূর্ত্তে স্তব্ধ হইতে পারে। শিরা বিদীর্ণ করিয়া শোণিতপ্রবাহ কখন্ নির্গত হইবে, কে জানে! যৌবন-মধ্যাহ্নে দেহ কখন্ শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িবে, কে বলিতে পারে!

বিদ্রোহী সন্তানের নির্ম্মম ব্যবহারে মর্ম্মপীড়িত, লাঞ্ছিত এবং অতিমাত্রায় বিরক্ত হইলেও, অসামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতা অথবা ব্যভিচারের পূতিগন্ধে চিত্ত বিরূপ হইলেও স্নেহপ্রবণ পিতা ও মাতার হৃদয় পুত্রের নিদারুণ পীড়া ও সহায়হীনতার সংবাদে স্থির থাকিতে পারে নাই। চিকিৎসকের পরামর্শে সহরের নির্জ্জনতম ও ফাঁকা অঞ্চলে বাড়ী ভাড়া লইয়া অচেতন পুত্রকে সেখানে আনিয়াছিলেন।

ভবিষ্যতের আশা, বার্দ্ধক্যের আনন্দ ও অবলম্বন বলিয়া

যাহাকে প্রতিপালন করিতে অর্থব্যয় ও যত্নের কোন ক্রটি ঘটিতে দেন নাই, পিতা ও মাতা সেই অকালবার্দ্ধক্য-পীড়িত পুত্রের শীর্ণ মুখমণ্ডলের প্রতি চাহিয়া ধৈর্য্য রাখিতে পারেন নাই।

শিক্ষার গর্ব্বে স্ফীত মন সত্যকে অনুসন্ধান করিতে আলেয়ার পশ্চাতে ছুটিয়াছিল, সংস্কারের শৃঙ্খলা ও বন্ধনকে চূর্ণ করিতে বিদ্রোহী হইয়াছিল। সত্য যে শৃঙ্খলার অনুবর্ত্তী, বিশৃঙ্খলার গোলকধাঁধায় তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না, এ সত্যপ্রতীতি অনেকের ভাগ্যে ঘটে না। প্রকৃতি নিয়মের অনুসরণ করিয়া চলে, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়ম-শৃঙ্খলার অধীন, নহিলে প্রলয় ঘটিয়া যাইত, ইহা বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক সত্য। মন শৃঙ্খলা ও সংযমের ধাপে ধাপে উঠিয়া কুলকুণ্ডলিনীর চক্ররেখা পার হইয়া সহস্রারে ব্রহ্মদর্শন করে—এতটুকু বিশৃঙ্খলা ঘটিলে সমগ্র জীবনব্যাপী সাধনা বিফল হইয়া যায়। বাহ্যজগতে ব্যষ্টি ও সমষ্টির সমাজবন্ধনেও সেই শৃঙ্খলা ও সংযমের বন্ধন। মানুষের খেয়াল তাহাকে অস্বীকার করিলে, ধ্বংসের পথে নামিয়া যায়—ধ্বংস হয়। খেয়াল নিয়ম নহে।

এই অনুভূতি কি সংশয়দোলায় দোদুল্যমান সুব্রতের অন্তররাজ্যে দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছিল? অলকার রহস্যপূর্ণ অন্তর্দ্ধানের পর হইতেই সে কি আরও নিবিড়ভাবে সত্যের সন্ধানে আত্মনিয়োগ করে নাই? দিন ও রাত্রির সমস্ত অংশ একান্ত নিক্রিয়ভাবে, মেসের ঘরের মধ্যে পড়িয়া থাকিত না? ছেলে পড়াইবার কায সে ছাড়িয়া দেয় নাই? বন্ধুর সহিত বাক্যালাপও সে বন্ধ করিয়া ফেলে নাই?

মণিলাল ত চিকিৎসকের কাছে এইরূপ বর্ণনাই করিয়াছিল। উৎকট চিন্তার আকস্মিকতা দুর্ব্বল দেহ ও মনকে সম্পূর্ণরূপে বিক্ষুব্ধ ও বিপর্য্যস্ত না করিলে এমন ...পূর্ণ ব্যাধির আক্রমণ ঘটিত না। চিকিৎসকগণের ... নির্দ্দেশ।

সামান্য শব্দ, অতি তুচ্ছ উত্তেজনা যে কোনও মুহূর্ত্তে তাহাকে চির-বিস্মৃতির রাজ্যে লইয়া যাইবে।

পিতা ও মাতার সস্নেহ সতর্ক দৃষ্টি, সহোদরা ও বন্ধুর প্রাণপণ শুশ্রূষা, চিকিৎসকের নৈপুণ্য, অভিজ্ঞতাকে ব্যর্থ করিয়া রোগের প্রকোপ চরম সীমায় উঠিয়াছিল। আজিকার রাত্রি যদি কাটিয়া যায়, তবে হয় ত—

চিকিৎসক অতি সন্তর্পণে রোগীর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। ৮ জোড়া চক্ষু সেই দিকে চাহিয়া রহিল। দৃষ্টিপথে আত্মার স্পন্দনবেগ অনুভূত হইতেছিল কি?

দূরে, কক্ষান্তরে প্রাচীর-বিলম্বিত-ঘটিকাযন্ত্রে ১টা বাজিয়া গেল। সে শব্দ নিস্তব্ধ রজনীতে কামান-গর্জ্জনের বিভীষিকার ন্যায়, চিকিৎসক ব্যতীত আর কয় জনের বক্ষকে স্পন্দিত ও শঙ্কিত করিয়া তুলিল। সঙ্কট-মুহূর্ত্ত চলিয়া যাইতেছে।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারি জনই চিকিৎসকের পরীক্ষাপ্রণালী লক্ষ্য করিতেছিল। রোগী তখন শান্তভাবে শয্যালীন।

চিকিৎসকের মুখমণ্ডল প্রসন্ন হইল। একবার তিনি ঊর্দ্ধপানে চাহিলেন। সকলের অগোচরে বোধ হয় তিনি কাহারও উদ্দেশে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার নতি জ্ঞাপন করিলেন। তার পর অতি অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "আ—ভগবানের অসীম দয়া। মণি বাবু, আপনি শুধু এ ঘরে থাকুন, আর কারও থাকবার দরকার নেই। এখন তিন চার ঘণ্টা রোগী ঘুমুবেন। এ যাত্রা রক্ষা পেয়ে গেলেন।"

মুক্তির বাণী কি ইহার অপেক্ষাও আনন্দপ্রদ?

মাতা যুক্তকর ললাটে রাখিয়া নয়ন নিমীলিত করিলেন। পিতার ব্যাকুল হৃদয় হইতে একটা অনাহত প্রার্থনার আবেদন নীরবে ঊর্দ্ধপথে ধাবিত হইল। সহোদরার নয়ন অশ্রুসিক্ত হইল। মণিলাল চঞ্চলভাবে প্রাচীরের দিকে মুখ ফিরাইল।

সুরমা পিতার অনুগামিনী হইল; কিন্তু জননীর স্থানত্যাগের কোনও লক্ষণই প্রকাশ পাইল না। তিনি নিশ্চলভাবে শয্যার পার্শ্বেই বসিয়া রহিলেন।

অনুরোধ নিরর্থক বুঝিয়া চিকিৎসক কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

* * * *

আরও এক মাস পরে সুব্রত দ্রুত পূর্ব্ব-স্বাস্থ্য আহরণ করিতে লাগিল। মধ্যাহ্নকালে সে আরাম-কেদারায় বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিল। পার্শ্বে টেবলের উপর কতকগুলি গ্রন্থ সজ্জিত। সে অবসরযাপনের জন্য একখানি বই টানিয়া লইয়া পড়িবার উপক্রম করিতেই একখানি খামে আঁটা চিঠি ভূমিতলে পড়িয়া গেল। তুলিয়া লইয়া সে দেখিল, তাহারই নাম পত্রখানির উপরে লিখিত।

হস্তাক্ষরে পত্রের লেখিকাকে চিনিতে বিলম্ব হইল না। বিলাতী ডাকে চিঠি আসিয়াছিল। এখনও পর্য্যন্ত কেহ তাহা খুলে নাই। দুই মাস পূর্ব্বের পত্র ডাকঘরের ছাপে তাহারই পরিচয়।

পত্র খুলিয়া পড়িল। মিস্ রবিন্‌সন্ লিখিতেছেন—

"পুত্র, লজ্জায় ও সঙ্কোচে তুমি আমায় পত্র লেখা বন্ধ করিয়াছ, তাহা বুঝিতেছি। যেখানে সঙ্কোচ ও লজ্জা আছে, সত্য ও ধর্ম্ম সেখানে নাই, থাকিতে পারে না। যাহা অসত্য, তাহার উপাসনা করা উন্নত মানবের ধর্ম্ম নহে। অন্যায়, অনাচার মানুষই করে, আবার সেই মানুষই আত্মকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পবিত্র হইয়া থাকে।

ভগবানের বাণী প্রত্যক্ষ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনেক ক্ষেত্রেই হয় না; কিন্তু মানুষের মন চেষ্টা করিলে সে ধ্রুব বাণী শুনিতে পায়। তোমার মঙ্গল হউক।

একটা মজার কথা বলি। সে দিন বিলাতে ভারতীয় সম্মেলনে গিয়াছিলাম। আমি সকল সভ্যকেই চিনি। এক জোড়া নূতন লোক দেখিলাম। পুরুষটির নাম মিঃ সুরেশ রায়, তাহার সঙ্গিনীর নাম শুনিলাম, অলকা। মেয়েটি দেখিতে অসামান্যা সুন্দরী। কিন্তু মুখে পবিত্রতার চিহ্ন পাইলাম না। দুঃখ হইল। 'অলকা' নাম শুনিয়াই বুকের মধ্যে একটা আলোড়ন অনুভব করিয়াছিলাম। বৃদ্ধা হইয়াছি, ইহা বয়সের দুর্ব্বলতা। কৌতূহল হইয়াছিল, কিন্তু মনের নিস্পৃহতায় তাহাদের পরিচয় লই নাই, লইতে প্রবৃত্তি হয় নাই। তোমার বুড়া মায়ের দুর্ব্বলতা ক্ষমা করিও।

আবার বলি, তুমি হিন্দুর ছেলে, ভারতবর্ষের পুত্র। তুমি মানুষ হও।"

নিষ্পলক নেত্রে সে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। সত্যের সন্ধান মিলিয়াছে কি?

মাতা আসিয়া পাশে বসিলেন। পুত্রের বিরস মুখের দিকে চাহিয়া উৎকণ্ঠিতা জননী বলিলেন, "বাবা, এবার হরি মুখুয্যের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে ঠিক করি?"

স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় সুব্রত চকিত হইয়া উঠিল। কয়েক মুহূর্ত্ত স্নেহময়ী জননীর দিকে চাহিয়া সে বলিয়া উঠিল, "বিয়ে আর আমি করতে পারব না। আমায় ক্ষমা কর, মা।"

"কেন, বাবা?"

দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সুব্রত বলিল, "ভোগের নরকে যে দেহ উচ্ছিষ্ট হয়েছে, পবিত্র গৃহধর্ম্মে তার প্রবেশের অধিকার নেই।"

সবিস্ময়ে মাতা বলিলেন, "তুই কি করতে চাস্, বাবা?"

"ডাক এসেছে, মা! যাদের দেহে নরক, মনে নরক, তারা কোটি কোটি আত্মার মঙ্গলের জন্য, সেবার ভার গ্রহণ করবে। আমাকে সেই পথে যেতে দাও। তুষানলের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা এ যুগে নেই। আর্ত্ত-পীড়িতের সেবায় ধন্য হতে দাও। যদি শেষকালে একটু শান্তি পেতে পারি।"

প্রাচীরগাত্রে স্বামীজীর অনবদ্য প্রতিমূর্ত্তি দুলিতেছিল, অর্দ্ধনগ্ন খদ্দরধারী সন্ন্যাসীর পবিত্র মুখশ্রী কি যেন ইঙ্গিত করিতেছিল।

সুব্রত সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া কি স্বপ্ন দেখিতেছিল, সেই জানে!

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

পথের শেষে

সাগর তীরে একলা পথিক,
ভাব্‌ছে বসে হায়;
কোন্ সে পথে যাত্রা করে,
মুক্তি বাসনায়!

আকাশ পাতাল ভাব্‌লো পথিক,
বিষ্ণ পলে পলে;
পথের শেষে যে পথ অসীম
সে পথ বেয়ে চলে।

শ্রীবিরামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

নয়া যুগের নাট্য-ঠাট

বাঙলায় নাটক নাই—তার কারণ, কোনো মনস্বী লেখক নাটক লিখিবার চেষ্টা করেন নাই। এ আমার কথা নয়। এ-কথা ছাপার অক্ষরে মাসিক-পত্রে এক দিগ্‌গজ লেখক লিখিয়াছেন। তিনি আরো লিখিয়াছেন, বাঙলায় নাটক লেখার শক্তি তাঁর আছে, আর আছে তাঁর দুটি বন্ধুর! এই ত্রিমূর্ত্তি ছাড়া নাটক লেখার শক্তি বাঙালীর মধ্যে আর কারো নাই! নাটক যে কি পদার্থ, তা এঁরাই শুধু জানেন। তাঁরা যে-সব আলোচনা করেন, সে আলোচনায় কি পাণ্ডিত্য! তাঁদের লেখা বাঙলা ঠিক বুঝা যায় না। কারণ, তাঁদের কলমের শক্তিতে ব্যাকরণ, idiom একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়! প্রতিভার লক্ষণই তাই।

আমি তাঁদের বক্তব্য প্রাণপণে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি। একটা কথা বেশ বুঝিয়াছি, অর্থাৎ যাহাই লেখো না কেন, প্রব্লেম্ থাকা চাই। জিওমেট্রির প্রব্লেম্ নয়, এ্যালজেব্রার প্রব্লেম্ নয়—এ প্রব্লেম্ বার্ণার্ডশ'র প্রব্লেম্, ইবশেনের প্রব্লেম্, ফ্রয়েডের প্রব্লেম্। [সম্পাদক মশায়, এঁরা ভাবেন, এই সব বড় বড় নাম ফাঁদিলে লোকের তাক্ লাগিয়া যাইবে! আমারো তাক্ লাগিয়াছিল—তারপর দেখি, হা ভগবান্, বার্ণার্ডশ, ইবশেন্ এঁদের লেখা বই বাজারে পাওয়া যায়; দামও বেশী নয়—এবং যে-ইংরাজী ভাষায় এ-সব বই লেখা, তা আপনি-আমিও পড়িয়া বুঝিতে পারি। আমি পড়িয়া দেখিয়াছি। অতএব নাটক লেখার বিদ্যা আমারি বা কেন না আয়ত্ত হইবে? ঐ সব বই পড়িয়া সেই সব বইয়ের প্রব্লেম বাঙলা ভাষায় নাট্যাকারে ছাড়িলেই তো বাঙলা নাটক বনিবে! সামাজিক নর-নারীর নাম থাকিলেই হইল,—তাদের dialogueএ হাইড্ পার্ক, হামবুর্গ যতই থাকুক—বাঙালীর মুখের কথা বাঙলায় দিলেই ব্যস্! তবে একটা কথা, এই যে বেচারা গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রভৃতি নাটক লিখিয়া গেলেন, সেগুলার কি গতি হইবে? নাটক কি, না বুঝিয়া তাঁরা কি লিখিয়া গিয়াছেন, কে তা বুঝাইয়া দিবে?]

এঁরা একটা কথা বলেন,—যে, বাঙলায় নাটকের আকারে ছাপা নাটক নাম ধরিয়া যে-সব মাথামুণ্ড বাহির হইয়াছে, তাহাতে শুধু সেই সীতা-সাবিত্রীর পা ধরিয়া টানা, নয় তো শিবাজী-প্রতাপসিংহ, আকবর-ঔরংজেবকে ঘোড়ায় চড়াইয়া চ্যাঁচামেচি আছে। এ-সবে নাটক হয় না! যদি বলেন সেক্সপীয়র, মার্লো, গ্যটে, ভিক্টর হুগো—তাঁরাও অমনি সব ব্যাপার লইয়া নাটক লিখিয়াছেন? কিন্তু আপনি কি এ খবর রাখেন, এই সব প্রতিভার বরপুত্ররা সেক্সপীয়রকে আমোল দিতে নারাজ? নাটক হয় বাঙালীর প্রাণ লইয়া মোচড় দিতে পারিলে। কিন্তু বাঙালীর জীবনে কোন্ সমস্যা প্রবল? আমরা জানি, অন্ন-সমস্যা সব চেয়ে বড় সমস্যা! কিন্তু হা-অন্ন যো-অন্ন করিলে নাটকে রস-বস্তুর সন্ধান মিলিবে না। Sex চাই। অথচ বিবাহের পূর্ব্বে বাঙালীর Love হয় না। মেয়েদের খুব ছেলেবেলায় বিবাহ দেওয়া হয়—এই জন্য বিবাহে সাহিত্যের বড় ক্ষতি হইতেছে। কিন্তু বক্তৃতা দিয়া যখন এ দোষ দূর করা যাইবে না, তখন থাকুক বাল্য-বিবাহ। সাহিত্যকে অগত্যা illicit love লইয়া তার কর্ত্তব্য-পালন করিতে হইবে। সেটাই হইবে প্রব্লেম। এ-সম্বন্ধে অনেক কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। অতএব বিশদ আলোচনা না করিয়া একেবারে ক'খানি প্রব্লেমাত্মক নাটকের আদ্রা আপনার পাঠক-পাঠিকার সামনে ধরিতে চাই। দেখা যাক নাটক-হীন বাঙলা সাহিত্যে বাঙলা নাটকের পত্তন তাহাতে করা যায় কি না। Sexই একমাত্র সমস্যা—ভারতবর্ষ আজ তা না মানুক, দুশো বছর, নয় পাঁচশো, নয় হাজার বছর পরে তাকে এ-সমস্যা মানিতেই হইবে। কেন মানিবে? সে জবাব পরে। কেন মানিবে না, আপনি আগে তার জবাব দিন্ তো!

আজগুবির সাধনা করা? ভুল। এ ভুল ধারণা ভুলিতে হইবে। যাহা আজ নাই, তাহা কাল আসিবে না—এ-কথা কে বলিতে পারে? কালো হ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী। এই যে এ দেশে এককালে নিউমনিয়া ছিল না, প্লেগ ছিল না, কালে আসিয়া উদয় হইয়াছে; ইনফ্লুয়েঞ্জা—তা'ও আসিয়াছে! এমনি কত নব নব রোগ আসিয়া আসন গাড়িয়া বসিতেছে। প্রব্লেমও তেমনি আসিবে। কবির কাজ কল্পনার সাহায্যে অনাগতকে 'স্বাগত' অভ্যর্থনা করা। অতএব আপনার যুক্তিতে সারবত্তা নাই! ভূমিকাস্তে নাটক কাঁদিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করা যাক্।

পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক নাটক কি লেখা চলে না? খুব চলে, তবে তাহাতে modern note চাই। যেমন, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তীর কাহিনী ধরা যাক্।

'সীতা'কে লইয়া নাটক লিখিতে গেলে চাই সীতাকে নব্যা নারী বানাইয়া তোলা। সীতাকে রাম অগ্নি-পরীক্ষা দিতে বলিলে সীতার অমন কাঁদিয়া পাতাল-প্রবেশ চলিবে না। নয়া যুগের নয়া আইনে সীতা ফোঁশ্ করিয়া বলিবে,—পরীক্ষা? আমার পরীক্ষা চাও তুমি? পরীক্ষা চেয়ে আমার নারীত্বের অপমান করবে? আমি দেবো না পরীক্ষা। সাম্‌নে এই বিপুলা পৃথ্বী…এই পৃথ্বীর বুকে বিচরণ করবো আমি আমার এই পিপাসু হৃদয় নিয়ে… ইত্যাদি।

'সাবিত্রী'কে লইয়া নাটক লিখিতে হইলে ঐ অন্ধ দ্যুমৎসেনকে কারাগারে পুরিয়া রাখিতে হইবে। সত্যবানকে ছাড়িয়া দাও সেনা সংগ্রহ করিতে বক্তৃতার সাহায্যে। সাবিত্রী তার বাপকে বলিবে,—আমার বিয়ের ভাবনা তুমি ভাববে কি জন্য? আমি নিজে স্বামী বেছে নেবো। এই কথা বলিয়া সাবিত্রী গৃহত্যাগ করিবে; নারীর অধিকার লাভের জন্য দেশে দেশে নারীর দল লইয়া উত্তেজক বক্তৃতা করিবে। তার পর হঠাৎ এ দলের সঙ্গে সত্যবানের দলের দেখা; এবং দু'দল মিলিয়া অন্ধ দ্যুমৎসেনকে উদ্ধার করিবে; এবং 'স্বরাজ'-প্রতিষ্ঠা হইলে সত্যবানের গলায় সাবিত্রী বরমাল্য দিবে—স্বরাজ-প্রতিষ্ঠার পুরস্কার-স্বরূপ।

'দময়ন্তী' নাটকে চাই হংস-মারফত নলের সহিত দময়ন্তীর প্রেম-পত্র চালানো—সে কথা ফাঁশ হইবার ভয়ে দময়ন্তীর পিতা কাজেই বিবাহের আয়োজন করিবেন, ইত্যাদি।

কিন্তু পৌরাণিক নাটক পরের কথা। আগে চাই রক্ত-মাংসের নাটক—সে নাটক লেখা চাই বাঙলার Slum-life লইয়া। নহিলে সবজান্তার দল গর্জ্জন তুলিবেন। তাঁরা রবীন্দ্রনাথকেও এ-ঔদাস্যের জন্য ছাড়িয়া দেন নাই। তা ছাড়া এ-পথে ধাঁ করিয়া পশার জমিবে।

নাটকের পাত্র-পাত্রীর তালিকা চাই সর্ব্বাগ্রে। আমি সে তালিকা গোপন করিব না।

মোধো ছুতার—নায়ক; তার স্ত্রী বিরাজী নায়িকা। মোধোর বিধবা মা আছে—সংসারের আবর্জ্জনা। নাটকে তার কাজ, চড়া সুর তোলা—যাহাতে নায়িকার চিত্তে Pathos জমাট বাঁধে, সেই উদ্দেশ্যে নাটকে তাকে স্থান দিতে হইবে। আরো কতকগুলা পল্লীবাসী জীব চাই—এরা নায়িকা-চরিত্র ফুটাইবে; আর থাকিবে এই অন্ধকারের মধ্যে ধ্রুবজ্যোতি ছিটাইতে তরুণ কবি বিজলীলাল।

প্রথম অঙ্ক

মোধো ছুতারের ঘর। সন্ধ্যাকাল। বিরাজী খোঁপা বাঁধিয়া তাহাতে ফুল গুঁজিতেছিল। এমন সময় মোধো মদ খাইয়া ঘরে ফিরিল।

ফিরিয়া ডাকিল,—কৈ…?

বিরাজী। কেনে?

মোধো। দুটো শসা কুচিয়ে দে তো!…আর এই বোতলটা রাখ্…

বিরাজী। (মুখ-ঝামটা দিয়া) আমায় কেনা বাঁদী পেয়েচিস্! বটে! ওই বিষ গিলে আসবি, আর…

মোধো। বিষ নয় রে এতে মজা আছে। সারাদিন খাটার পর এ খেলে আরাম মেলে! বোতল রাখ—

বিরাজী। (খোঁপায় ফুল গুঁজিতে গুঁজিতে) আমি পারবো না! কি হাওয়াই বইছে…আমি এখন ঘাটে যাবো…গা ধুতে!

মোধো। বটে! ঘাটে তোর কে আছে যে…

বিরাজী। ছোট লোকের মত বকো না বল্‌চি!

মোধো। ছোট লোক! কে ছোট লোক, বিরাজী? আমি? হাঃ—হাঃ—হাঃ—ওরে, এই ছোট লোকই রাজ্য চালাচ্ছে · এই ছোটলোকই মহাত্মা গন্ধীর মাথার মণি, আজ!

[এই কথায় Depressed classএর উপর দরদ জাগানো ইঙ্গিত সকলে লক্ষ্য করিবেন]

বিরাজী। তা হোক্। আমি তোর ইতরুমিতে সহায় হতে পারবো না।

মোধো। তার মানে?

বিরাজী। ও মদের বোতল ছোঁবো না।

মোধো। বটে! এ শিক্ষা কোথায় পেলি? বিরাজী…

বিরাজী। খবর্দ্দার! ডাকতে হয়, বিরাজ ব'লে ডাক্... বিরু বল্। বিরাজী নয়!...আমার চিত্ত আজ জেগেছে এই ফাগুনের হাওয়ায়! সে নিজেকে খুঁজে পেয়েচে... তার কি পিপাসা, কিসের ক্ষুধা...

[নেপথ্যে গান ; এ গান বিজলীলাল গাহিতেছিল]

(গান)

ফাগুন হাওয়ায় মন জলে রে, মন জলে।
বন্ধ ঘরের অন্ধকারে ছন্দহারে ঝল্‌ঝলে কৈ, ঝল্‌ঝলে!

[গান শুনিয়া বিরাজী চঞ্চল হইয়া উঠিল। দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল]

মোধো। কোথা যাস্?

বিরাজী। ঐ—ঐ আমার ডাক এসেচে...

(গান)

আমার মন মানে না রে
উধাও হয়ে ভাসচে সে যে
সুরের কিনারে!
ঘরে এই অন্ধকারের হাহাকারে
মন ভরে যে, মন ভরে।
হাঁপিয়ে মরে, হাঁপিয়ে মরে,
বাইরে যাই রে, চাই রে তাই রে
পরশ দিয়ে বাঁচাই তারে!

[আপনারা যদি বলেন, ছুতোরের ঘরে ছুতোরের বৌ এ গান গায় কি করিয়া? তার উত্তরে আমি বলি, ছুতোরের ঘরে থাকিলে কি হইবে, বিরাজী নারী, eternal নারী; তার বুকে ক্ষুব্ধ নারীত্ব ঘুমাইয়া ছিল; ঐ কবির গানে সে সুপ্ত নারীত্ব জাগিয়া উঠিয়াছে। জাগরণীর পালিশে ভাষায় জৌলুষ খোলে। দস্যু রত্নাকরের সুপ্ত চেতনা জাগিতে সেও একদিন গাহিয়া উঠিয়াছিল,—মা নিষাদ ইত্যাদি। নজীর আছে। তবে?]

মোধো। আরে মর্—ক্ষেপলি যে!

বিরাজী। এত দিন ক্ষেপেছিলুম—আজ ক্ষ্যাপামি সেরে গেছে। আমি চল্লুম...

মোধো। ঘর-দোর?

বিরাজী। প্রাণ যখন জেগেছে, তখন সে এই ছোট গণ্ডীর মধ্যে কি থাকতে পারে আর? আজ সারা দুনিয়ায় আমার ঘর...

[প্রস্থান।

মোধো। বাঃ—এ যে ভেল্‌কী! যাক্—কে কার! এ দুনিয়ায় এই বোতলই সার! (মদ্য পান)

(মোধোর মা শ্যামা প্রবেশ করিল)

শ্যামা। বৌ গেল কোথা রে?

মোধো। ওর প্রাণ জেগেছে...ওকে আটকো না...

শ্যামা। তা ব'লে ঘাটে ছুটবে—এই সন্ধ্যেবেলায়? বৌ মানুষ।

মোধো। বৌ নয়, মানুষ। আগে মানুষ, তার পর বৌ... মানুষকে মানো মা। মানুষের বড় কেউ নয়!

শ্যামা। কিছু বুঝি না এ-সব হেঁয়ালি। উনুন জ্বলে যাচ্ছে, ভাত চাপাবে, তা না বৌ চললো প্রাণ জেগেছে ব'লে। দেখি! [প্রস্থান।

মোধো। এ সংস্কার। কাটা সহজ নয়। বাঁধনের পর বাঁধন আসে। এ বাঁধন কাটতে পারলেই ফর্শা!...বাঃ!

(মদ্যপান)

দ্বিতীয় অঙ্ক

নদীর ঘাট। ঘাটের সিঁড়িতে বসিয়া বিজলীলাল বাঁশী বাজাইতেছে। বিরাজী আসিয়া দাঁড়াইল। বাঁশী থামিলে খোঁপা হইতে একটি ফুল লইয়া সে বিজলীলালের হাতে দিল। বিজলী উঠিয়া বিরাজীর হাত ধরিল। তার পর কথাবার্ত্তা সুরু।

বিজলী। তুমি এসেচো?

বিরাজী। এসেচি। ও গান, ও বাঁশী শুনলে কি আর ঘরে থাকা যায়?

বিজলী। ঠিক। এ মুক্তির ডাক! বাঁধন কাটার মন্ত্র!

বিরাজী। সে যুগে রাধার এই দশা ঘটেছিল। শ্যামের বাঁশী শুনে...

বিজলী। ঠিক তা নয়। সে বাঁশীর মধ্যে কামনার সুর ছিল। আমার এ সুর নিছক মুক্তির হাওয়া...

বিরাজী। ঐ হাওয়ার পরশ আমার সব বাঁধন শিথিল করেছে। দেখচো না, আমি কাঁপচি!

বিজলী। স্থির হয়ে বসো, বিরাজ!…আকাশের পানে চেয়ে ছাখো!…কি দেখচো?

বিরাজী। একটি, দুটি, তিনটি তারা…

বিজলী। ঠিক…তিনটি মাত্র তারা। চারটি নয়, দুটি নয়! এর মানে বোঝো?

বিরাজী। না। বলো…

বিজলী। নারী, নারীর স্বামী, আর প্রণয়ী…এই তিন জন।

বিরাজী। (বিহ্বল দৃষ্টিতে বিজলীর পানে চাহিল)

বিজলী। তাই নারীর চিত্তে দুটি ধারা অজর অমরকাল ধ'রে প্রবাহিত। একটি ধারা স্বামীর ঘরকর্ণার কাজে গিয়ে মিশেছে—যে স্বামী অন্ন জোগায়, বস্ত্র জোগায়, থাকার ঠাঁই দেয়; আর এক ধারা ঐ চিত্ত-সাগরে গিয়ে মিশেচে, প্রণয়ী—যে শুধু প্রাণ-মনের খোরাক দেবে, বচনে-চুম্বনে অনুরাগের পশরা বয়ে প্রাণ-মন পুলকে তৃপ্ত করবে। এই প্রণয়ীর সঙ্গেই নারীর যা কিছু প্রাণের কারবার। সংসারের কালি মুছে, সংসারের সব কলরব-কোলাহল ঠেলে রেখে দিনান্তে নিশীথে এই প্রণয়ীর পাশে নারী আসবে গ্লানিমুক্ত চিত্ত নিয়ে…শুধু আলো-হাসি-গানের উৎসব জাগাতে!

বিরাজী। (পুলক-দীপ্তিতে দুই চোখ ভরিয়া উঠিল) তাই হোক, কবি! আমি এসেছি…

বিজলী। এসেচো আমার প্রাণের প্রিয়া… আমার শত যুগের সাধনার হিয়া…এসো, এসো (বক্ষোলগ্ন করিয়া চুম্বন)

(নেপথ্যে মোধো। কোথা গেলি রে বৌ?)

বিরাজী। ঐ আসচে…ধরো, ধরো আমায়…(বিজলীকে আরো জোরে আঁকড়াইয়া ধরিল)

বিজলী। আসচে। তাই তো! উপায়?

মোধোর প্রবেশ

মোধো। হাঃ হাঃ হাঃ! আমি মাতাল…আমি স্বামী!… বিরাজী…

বিরাজী। তোমার সংসারের সব কর্ত্তব্য সেরে তবে এসেছি। আমার মন, নারীর মন…সেও তৃপ্তি চায়..

মোধো। চায়? বটে! এই নাও তৃপ্তির গেলাস… (মদ্য দান)

বিরাজী। যাতে পুরুষের তৃপ্তি, নারীর তৃপ্তি তাতে নয়… তাতে নয়…

মোধো। কিন্তু এর জন্য তৈরী ছিলুম না। তা…ভাবতে হলো…(মদ্য পান)

বিরাজী। তুমি ভাবো…আমরা এই গোধূলির রাগে প্রাণের কলগুঞ্জন…

বিজলী। বাঁশী শুনবে?

বিরাজী। না। গান…প্রাণের গান, এমন গান গাও কবি, যাতে আমি ভেঙ্গে চুরে তোমার বুকে মিশে যাই!

বিজলী। (গান ধরিল)

গান

বাঁশের বাঁশী…তার সুরে ফাঁসি…
ফাঁস লাগাই গো, নারীর প্রাণে!
কাজে লাজ দে, আর ছুটে সই
অকাজে আয় গানে গানে!
টাকার পিছে-পিছে ধাওয়া, মাথা খাওয়া,
মাথা তো অতি তুচ্ছ!
তার ইজ্জৎ কি, খুব বুঝেচি,
ভয় কি লোকের কুচ্ছ!
নারীর প্রাণের ভালোবাসা, চোখে তার ভাই,
চাউনি খাসা বাঁধি সব এই সুরের তানে!

শ্যামার প্রবেশ

শ্যামা। এ দেখেও মদ গিলছিস? কোথাকার নির্ঘিন্নে।

মোধো। চুপ কর্ মা…আমার সব গুলিয়ে যাচ্ছে!… কিছু বুঝতে পারছি না…বুঝতে দে (মদ্য পান)

বিরাজী। পিয়, পিয়…

বিজলী। পিয়া, পিয়া…

(বৃক্ষশাখে পাপিয়া ডাকিল—পিয় পিয় পিয়)

ঐ শোনো…সারা নিখিল পিয়ার জন্যে আকুল আর্ত্তর তুলচে! সুন্দর নিখিল! আমরাও সুন্দর হবো।

তৃতীয় অঙ্ক

রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। দৃশ্য—মোধোর গৃহ। দাওয়ায় বসিয়া মোধো, বিজলী, বিরাজী।

বিজলী। ভাবা শেষ হলো ?

মোধো। হয়েচে। তোমাদের কথাই ঠিক। নারীর চিত্তে দুই ধারা,—এক ধারা সংসারে, আর এক ধারা পরদেশী সেঁইয়ায়…

বিরাজী। নাথ, স্বামী…

মোধো। প্রিয়তমে, স্ত্রী।

বিরাজী। তুমি সত্যি মহৎ।

মোধো। এতে মহত্ব নেই, বিরাজী। এ কালের ভৈরী-রব। স্বামী সংসারের অভাব মেটাবার জন্য। প্রাণের সঙ্গে তার কোনো কারবার নেই। প্রাণ সেখানে সঙ্কুচিত হবে, সঙ্কীর্ণ হবে। প্রাণের কারবার বাইরে প্রণয়ী-জনের সঙ্গে—ঐ আকাশের মত যার দরাজ মুক্ত প্রাণ, তাকে এই ছোট্ট সংসারের মধ্যে বেঁধে রাখবার চেষ্টা মূঢ়তা !

বিজলী। তাই।…বিরাজ…

বিরাজী। বিজলী…আমার অন্ধকার প্রাণের আকাশে তুমি বিজলীর চকিত-চমক…তবু তার আলোয় দুনিয়া আমার আলো হয়ে উঠেচে।

মোধো। এ ভোরের আলো, বিরাজী ··

বিরাজী। আমার প্রাণ তাই বিভোর হয়েচে !…একটু পরে রবি-কর দীপ্ত প্রখর হবে…

বিজলী। সংসার এ দিবালোকে তোমায় ডাকচে, যাও… তার পর সংসারের দাবী চুকিয়ে তোমার কুটীর-প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ো সন্ধ্যায়, আমার প্রতীক্ষায়…চাঁদ আলোর হাসি হেসে কাণের কাছে গাইবে…জাগো, জাগো…

বিরাজী। তখন প্রণয়ের আহ্বান !…এইখানেই নারী নারী…থুড়ি, ভুল হচ্ছিল নব নারী।·· প্রেমের অভিষেক হয়েচে তার…এই রূপে নারী জেগে উঠুক পচা গলিত সংস্কারের বাঁধন কেটে মুক্তির ধারায় নব-স্নাত হয়ে…

বিজলী। তাই হোক…

মোধো। মাভৈঃ মাভৈঃ।

যবনিকা

—

এ নাটক লিখিবার শক্তি সম্যক্ বিকাশিত করিতে হইলে ছেলেদের নব-বর্ণ-পরিচয়ের প্রয়োজন। তারো একটি খসড়া পাঠাইতেছি। আমাদের নির্দ্দিষ্ট পন্থা অবলম্বনে নব-বর্ণপরিচয়ে পোক্ত হইলে অতি-তরুণ বয়সেই Sex-তত্ত্বে অসীম জ্ঞানলাভের সুযোগ মিলিবে। নিম্ন তপশীলে নব-বর্ণপরিচয়টুকু বর্ণিত হইল।

নবপর্য্যায় বর্ণ-পরিচয়

"অ—য় অজগর আসচে তেড়ে; আ—য় আমটি আমি খাবো কেড়ে"—অধুনা বাতিল হইয়াছে। তার বদলে—

(স্বরবর্ণ)

অলক ছুঁয়ে বইছে বাতাস।
আলতা পায়ে পরাণ মাতাস্॥
ইয়ারিং দুটি দুলছে কাণে।
ঈক্ষণে তীর-গুচ্ছ হানে॥
ঋতুরাজের মলয় ঝরে।
৯-লি ৯-লি প্রণয়-জ্বরে॥
এলা খোঁপায় মানস ভোলে।
ঐ বাঁশীতে হৃদয় দোলে॥
ও-বাড়ীর ঐ জান্‌লা খোলা।
ঔরং দোলায় প্রাণের দোলা॥

(ব্যঞ্জন-বর্ণ)

কাজল চোখে চাউনি মিঠে।
খোঁপার বাহার চিনির ছিটে॥
গজল-গানে লাগায় ফাঁশি।
ঘুলঘুলিতে ঠোঁটের হাসি॥
ঙ-ব্যাদ্‌ড়া-নেইকো ভাষা।
চুড়ির বাস্তে চিত্ত ঠাশা॥
ছাদের পানে চেয়েই আছি।
জান্‌লাতে মুখ দেখলে বাঁচি॥
ঝলক-হাসির আরাম কত।
এওর ব্যাদ্‌ড়া ঙ'র মত॥
টলটলে দুই নিটোল গাল।
ঠোঁট দু'খানি ডালিম লাল॥
ডগমগ বুক প্রেম-স্বপনে।
ঢল্ নামে কি তার যৌবনে ?

শয় নিজস্ব দিল্‌-পরাগ।
তরুণ প্রাণ সবজী-বাগ্‌॥
থমকে থামা চলার কালে।
দরদ জানায় পুরো চালে॥
ধন্য আমি তোমায় পেলে।
নয়তো দূর ছাই যাই জেলে!
পর-নারী গো, পরাণ-প্রিয়া।
ফরদা প্রাণ, দরাজ হিয়া॥
বাঁধন নাই, না মান্‌ বাধা।
ভরসা যুগ, আর প্রাণ সাধা॥
মন যে রূপের ধ্যান-পাগল।
যুগ-বাণী,—ভাঙ্গ্‌, ভাঙ্গ্‌ আগল॥
রঙ-নেশায় বুঁদ দিল্‌ ঘুমায়।
লাল ঠোঁটে তুই ভর্‌ চুমায়॥
বিলোল চোখ দিল্‌ তাতায়।
শাড়ীর পাড় চোখ মাতায়॥
ষাট বছর—তায় লজ্জা কি?
সঙ্গে চাই দিল্‌-সঙ্গিনী॥
হাত্‌মে হাত দে দিল্‌মে দিল্‌।
ক্ষয় না প্রেময় একটি তিল॥

এই ভাবে নব-পর্য্যায় বর্ণ-পরিচয় ঘটিলে বাঙালীর কামনা পূরিবে, অর্থাৎ ছ'সাত বৎসর বয়সেই বাঙালী বালক Sex-তত্ত্বে তত্ত্বভূষণ হইবে এবং তার ফলে যে গান, যে কবিতা, যে গল্প উপন্যাস বা নাটক সে গড়িবে, তার ধাক্কায় দুনিয়া ঘূর্ণীচক্রে দুলিয়া সেই বৈকুণ্ঠলোকে গিয়া ঠেকিবে—সে সম্বন্ধে অকুতোভয়ে ভবিষ্যৎ-বাণী প্রচার করিতে পারি।

শ্রীঅপ্রকাশ গুপ্ত।

মেঘ-মঙ্গল

ছলাৎ-ছল ছলাৎ-ছল নদীর জল আছাড় খায়।
পিছল পথ বিজন ঘাট নিবিড় মেঘ ভুবন ছায়।
ধবল ফুল অমল বাস জাগায় গায় কুর্চ্চি তার।
আকাশ ময় কেশের রাশ লুটায় কোন মূর্চ্ছিতার।

ঠক-ঠক ঠুকছে ঠায় নৌকা কার ঐ বাঁধা?
ঠিনিক্‌-ঠিন্‌ জলকে যায় কাঁকন কার সুর সাধা!
গৈরিকের বন্যা ধায় দুকূল ছায় পাল্লাতে
কদম নিম কাঁপছে হায় লাখ পাখীর কান্নাতে।

পাগল আজ ঝড়ের নাচ একাকার জল স্থল।
নদীর জল ঘাটের গায় আছাড় খায় ছলাৎ-ছল!
ছলাৎ-ছল ছলাৎ-ছল দিগ্বিদিক হারিয়ে যায়।
আঁচল তার বকুল যূঁই ঝরিয়ে দিয়ে বাদল ধায়!

পশ্চিমের রক্ত রাগ কই গো আজ ফুটলো কই?
মেঘ বেদের ছিড়ল ঝাঁপ অগ্নি নাগ ছুটলো অই!
রুদ্ধ দ্বার ভরল ঘর কোন কেয়ার গন্ধেতে!
দূর বাঁশীর সুরটি কার জলধারার ছন্দেতে?
নিশুত রাত নিরল পথে কচিৎ কোন পথিক যায়;
ছলাৎ-ছল ছলাৎ-ছল নদীর জল আছাড় খায়।

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

দীপ ও ধূপ

১

——ষ্ট্রীটের উপর একটি দোতলা বাড়ী। উপরের দেড়খানা ঘর লইয়া এক এক জন ভাড়াটিয়া থাকে। দেড়খানা মানে, একখানি ঘর ও তাহার সম্মুখের বারান্দাটুকু। বারান্দাগুলির প্রায় রাস্তার দিকে মুখ। বাহির হইতে আসিয়া ঘরের দুয়ার বন্ধ করিয়া দিলে ঠিক একটি বাড়ী বলিলেই হয়। একের সহিত অপরের কোন সম্পর্ক নাই। কবাটগুলি বেশ নূতন ও সুদৃঢ়। মাঝে একটুও ফাঁক থাকে না; দাগে দাগে একবারে বজ্রের মত বসিয়া যায়।

বেলা ৩টা বাজে। বাড়ীখানির কাছাকাছি আসিয়া এক যুবক বারকয়েক উপরের দিকে চাহিল। সে বোধ হয় কাহাকেও সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিবে আশা করিয়াছিল; কিন্তু সেখানে কাহাকেও না দেখিয়া একটু যেন ক্ষুণ্ণ হইল। বারান্দায় একটা দড়ির উপর কেবল একখানি মেঘ-রংয়ের শাড়ী শুকাইতেছিল। বাঞ্ছিতা মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে তাহার বসন বোধ হয় তাহাকে কথঞ্চিৎ তৃপ্তি দিল। একটু ঘুরিয়াই অপর একটি রাস্তায় বাড়ীটির যে দরজা ছিল, তাহা দিয়া যুবক ভিতরে প্রবেশ করিল। বাঁ-দিকে সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি বাহিয়া যুবক উপরে উঠিল। ভিতরের দিকেও অল্পপরিসর বারান্দা। দুই এক পা অগ্রসর হইয়াই যুবক একটি বন্ধ দুয়ারের উপর ধীরে ধীরে করাঘাত করিয়া বলিল,—"আছেন না কি?"

কোন উত্তর আসিল না। কিন্তু দুয়ারটা খুলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, এক গৌরাঙ্গ যুবক দাঁড়াইয়া। পশ্চাতে একটি শ্যামাঙ্গী কমলাক্ষী যুবতী মাথা তুলিয়া একবার দেখিয়া আবার মাথা নীচু করিল।

আগন্তুকের নাম নিশীথ। নিশীথ কক্ষমধ্যে যুবককে দেখিবামাত্র বলিল,—"এই যে রমেশ বাবু!"

রমেশ আগ্রহ দেখাইয়া বলিল, "আসুন, আসুন!"

নিশীথ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, "আমি ভাবলাম, আপনি বাসায় আছেন কি না! ঠিক ত জানা ছিল না।"

রমেশ বলিল, "বিলক্ষণ। নাই বা থাকলাম আমি! অবসর পেলেই আসবেন। কবিতা ত থাকবেন।"

যুবতীর নাম কবিতা। সে বলিল, "তা বৈ কি। আমি ত সব সময়েই আছি।"

যুবতীর কথাগুলি প্রাণহীন হইলেও তাহার কণ্ঠস্বর বড় কোমল ও মধুর।

নিশীথ একটু সাহস পাইয়া বলিল, "আপনার সে দিনের গানটি বড় মধুর ছিল। তাই ভাবলাম, একবার এখান দিয়ে যাই,—যদি সেই গানটি শোনার আর একবার সৌভাগ্য হয়।"

কবিতা বলিল, "ভারি ত গান—তার আবার শোনার সৌভাগ্য।"

রমেশ নিশীথের দিকে চাহিয়া বলিল, "বড় গায়িকাদের এই রকম কথা বলাই দস্তুর। কি বলেন?"

নিশীথ কিছু না বলিতেই কবিতা বলিল, "ঘা দিয়ে কথা বল কেন? গায়িকাদের কি লক্ষণ আমাতে দেখলে?"

রমেশ উত্তর দিল, "গলাটা কেমন ধ'রে গেছে। ঐ হ'ল গায়িকাদের প্রথম উত্তর। তুমিও ত প্রথম বল্লে, ভারি ত গান—ইত্যাদি। দুটি উক্তির মধ্যে ভাষার প্রভেদ থাকলেও ভাবের প্রভেদ বড় একটা নেই।"

নিশীথ এবার কথা কহিল। বলিল, "না, ভাবেরও প্রভেদ আছে। ইনি যা বল্লেন, তাতে সুধু বিনয় প্রকাশ পায়। আর আপনার বড় বড় গায়িকাদের উক্তির মধ্যে থাকে একটু গোপন অহঙ্কার। তা হ'লে দাঁড়াচ্ছে এই যে, বিনয় ও অহঙ্কারের মধ্যে যে পার্থক্য, ঐ দুই উক্তির মধ্যেও তাই আছে।"

কবিতা কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে নিশীথের পানে চাহিল।

রমেশ বলিল, "আপনি কবি। আপনি যখন এ কথা বলছেন, তখন আমারই হার হয়েছে স্বীকার করছি এবং আমার বাক্য প্রত্যাহার করছি।"

নিশীথ বলিল, "কথার মারপেচ শুনে শুনে কাণ ঝালাপালা হয়ে গেল। আপনি একটু 'মিষ্টি কাণ' করিয়ে দিন।"

কবিতার মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটিয়া আবার মিলাইয়া গেল।

রমেশ বলিল, "বেশ বলেছেন। তা 'মিষ্টি কাণ' না ব'লে 'মিষ্টি মুখ' বল্লেই হ'ত।"

নিশীথ হাসিয়া বলিল, "না, সেটা অনধিকারচর্চ্চা।"

কবিতার মাথা নত হইয়া পড়িল।

নিশীথ প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন করিয়া বলিল, "দেখেছেন, কথার মারপেঁচ ছাড়তে ব'লে নিজেই তাতে জড়িয়ে পড়ছি। এবার আর কথা নয়। আপনি দয়া ক'রে সেই গানটি একটিবার গান।"

"কোন্‌টি, তা' হ'লে বলুন"—কবিতা তাহার লজ্জানত সুন্দর চক্ষু দুইটি মুহূর্ত্তের জন্য নিশীথের দিকে ফিরাইল।

নিশীথ বলিল, "রবীন্দ্রনাথের সেই গানটি—

নিতি নিতি কত রচিব শয়ন
আকুল নয়ন রে!"

কবিতা আর বিলম্ব না করিয়া মধুর কণ্ঠে গান ধরিল।

কক্ষটির এক কোণে একটি এস্রাজ ছিল। রমেশ তাড়াতাড়ি সেটি টানিয়া লইয়া তাহাতে সুর দিতে উদ্যত হইল। নিশীথ হাত যোড় করিয়া ইঙ্গিতে নিষেধ করিল।

কবিতা কোন দিকে না চাহিয়া গাহিয়া চলিল। দীর্ঘ গান, কিন্তু তবু কোথাও যেন ক্লান্তি আসে না। মধুর সুরে গাহিয়া যুবতী গান শেষ করিল।

রমেশ এতক্ষণে কথা কহিবার সুযোগ পাইয়া বলিল, "আচ্ছা, বাদ্যকরের প্রাপ্য সম্মানটাও আমায় দিতে কেন কুণ্ঠিত হলেন বলুন ত? গায়িকার সম্মান আপনি করুন, তাতে আমার ক্ষোভ নেই একটুও। কিন্তু বাজিয়ে কি আপনার কাছে একেবারে অখাদ্য হ'ল?"

নিশীথ বলিল, "তবে আপনাকে সত্য কথা বলি। আজকাল বাজনার চাপে গানের কণ্ঠরোধ হ'তে বসেছে। গান যেন ভগবান্ মানুষের কণ্ঠে দেননি—দিয়েছেন ডোয়ার্কিনের বাড়ীতে। যেন বাদ্যরূপ চামচে দিয়ে কণ্ঠ থেকে গানকে টেনে না বার কর্‌লে কণ্ঠের মধ্যেই তার সমাধি হয়ে যাবে।"

রমেশ যেন ভয়ে ভয়ে বলিল, "আমার ত মনে হয়, মধুর বাদ্য গানকে আঘাত না ক'রে পুষ্টই ক'রে থাকে।"

নিশীথ বলিল, "না, আমার তা মনে হয় না। বাদ্যের মধ্যে আমরা গানের সবখানিকে পাইনে। সে গান যেন গোলাপফুলের তোড়া;—উপরে ফুলের কেবল মুখখানি দেখতে পাই; আশে পাশে, নীচে যত বাজে জিনিষ, হাতে ধরবার যায়গায় ক্রোটনের পাতা। আর শুধু গান একেবারে সদ্যফোটা গোলাপের ঝাড়! তাতে কুঁড়ি আছে, পাতা আছে, কাঁটা আছে, ডাঁটিও আছে,—কিন্তু সবগুলি গোলাপের।"

রমেশ বলিল, "যাক্, ক্রোটনের পাতা যখন আপনার ফুলকে ভারাক্রান্ত করেনি, তখন আর দুঃখ কিসের? ক্রোটন এক কোণেই ঘেঁসে বস্‌লেন।"

বলিয়া সে এস্রাজটি ঠেলিয়া দিয়া আপনি একটু দূরে সরিয়া বসিল।

"না, এবার ক্রোটন গোলাপের কাছেই এগিয়ে আসুন। আমি উঠি" বলিয়া নিশীথ উঠিতে উদ্যত হইল।

রমেশ তাহাকে ধরিয়া বসাইল। বলিল, "সে কি হয়? একটু মিষ্টি-মুখ ক'রে যেতেই হবে। আপনার ত এখন চায়ের সময়, না হয়, এখান থেকেই একটু চা খেয়ে যান।"

কবিতা তখন মাথা নীচু করিয়া ষ্টোভ জালিতেছিল।

ষ্টোভ জ্বলিল। চায়ের জল চড়িল। রমেশ কি একটা ছুতা করিয়া চট করিয়া নীচে চলিয়া গেল। নিকটেই খাবারের দোকান। কিছু খাবার লইয়া রমেশ যখন ফিরিল, তখন কবিতা চায়ে জল দিয়া উষ্ণ জলে পেয়ালা কয়টি ধুইয়া লইতেছিল।

'চা-যোগ' সমাপ্ত হইলে নিশীথ হাসিয়া বলিল, "ব্রাহ্মণ বাদল বান দক্ষিণা পেলেই যান। কাযেই দক্ষিণা পাওয়া মাত্রই আমার যাবার অধিকার আছে, যে হেতু আমি ব্রাহ্মণ।"

রমেশ ত্বরিতে কবিতার পানে একবার চাহিল। কবিতা নিশীথকে ছোট একটি নমস্কার করিয়া কহিল, "আবার আস্‌বেন কিন্তু!"

রমেশ খুব দীনভাব দেখাইয়া বলিল, "আমি ত কিছু বল্‌ব না; কারণ, আমার ত কোন গুণই নেই—যার বলে আপনার মত গুণী লোককে এখানে আহ্বান কর্‌তে পারি।"

একবারমাত্র কবিতার মুখের পানে চাহিয়া দেখিয়া উভয়ের অভিবাদন নিঃশব্দে ফিরাইয়া দিয়া নিশীথ কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

রমেশ বলিল, "এই ত বেশ শিখে গিয়েছ।"

কবিতা কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "কেন আমায় এমন ক'রে বল? আমায় দুঃখ দিয়ে কি তুমি আনন্দ পাও?"

রমেশ উত্তর করিল, "এতেই দুঃখ হ'ল অমনি? তুমি যা তা না হয়ে তোমার হওয়া উচিত ছিল কাহারও তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী।"

কবিতা ক্ষুব্ধ হইয়া বলিল, "কেন, আমি তোমার কাছে কি বেশী চেয়েছি যে, তুমি এ কথা বল্‌ছ? যেটুকু তুমি দেবে বলেছিলে, তাও দাওনি; তবু তার জন্য ত কোন দিন তোমাকে দূষিনি।"

রমেশ বলিল, "তা ক্ষোভটুকু না রেখে দূষলেই পার। কে তোমাকে বারণ করেছে?"

কবিতা বলিল, "আমি ক্ষোভের কথা বল্‌ছিনে। মনকে আমি এই ব'লে প্রবোধ দিই, সে অধিকার আমার ভাগ্যে নেই।"

রমেশ বলিল, "অধিকারের দাবী যখন ছেড়েই দিয়েছ, তখন আর ও কথা তুল্‌ছ কেন?"

কবিতা উত্তর দিল, "তুল্‌ছি এই জন্য যে, তোমার দয়া হ'ল না, অধিকার দিলে না; কিন্তু তাই ব'লে আমাকে দিয়ে এ সব কেন করিয়ে নেবে?"

রমেশ জানিয়াও জিজ্ঞাসা করিল, "কি সব?"

কবিতা ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে কহিল, "তোমার নিত্য নূতন বন্ধু-বান্ধবের কাছে কেন তুমি আমায় এমনি ক'রে অপমান করছ? কি এমন অপরাধ করেছি আমি—যে জন্য তুমি দিনরাত আমায় এই কঠিন শাস্তি দিচ্ছ?"

রমেশ।—একে তুমি বল শাস্তি? আমোদ-আহ্লাদ করবে, লোকের সঙ্গে স্বাধীনভাবে মিশবে, কথাবার্ত্তা কইবে—এ ত অসাধারণ সৌভাগ্যের কথা।

কবিতা।—আমি ত এ অসাধারণ সৌভাগ্য চাই নি। আমি চেয়েছিলাম একা তোমায় নিয়ে থাকার সাধারণ সৌভাগ্য। তা থেকে কেন তুমি আমাকে বঞ্চিত করলে? সর্ব্বক্ষণ তোমাকে দেখেও আমার আশা মিটত না; আর এখন দিনান্তে একবার তোমার দেখা পাওয়া ভার। যদি বা আস, সঙ্গে ক'রে রাজ্যের লোক ডেকে নিয়ে আস। তারা তোমায় আড়াল ক'রে দাঁড়ায়। তোমায় দেখা আমার আর হয় না।

রমেশ।—দেখ, এ সব নিছক্ কাব্যের কথা। তোমার নাম কবিতা, তোমায় এ সব মানাতে পারে। কিন্তু আমি যে মূর্ত্তিমান্ গদ্য, আমার পক্ষে এ সব হজম করা যে বড়ই কঠিন।

কবিতা।—আমার নামের জন্য তুমি দায়ী নও মানি। কিন্তু আমার ভিতরে যদি কিছু কাব্য এখনও থাকে, সে ত তোমারই দেওয়া। কাব্যের ফুল তুমিই আমার অন্তরে ফুটিয়ে তুলেছ;—আর তুমিই এখন তারই জন্য আমায় দোষী করছ।

রমেশ।—না, তুমি আজকাল বড়ই বাড়াবাড়ি ক'রে তুলেছ। এ রকম কল্লে আমার পক্ষে আরও কঠিন হয়ে উঠবে। জান ত আমি আনন্দ চাই—সৌন্দর্য্য ভালবাসি। অশান্তি, অভিযোগ এ সব আমি সইতে পারিনে।

কবিতা।—আমার যা কিছু ছিল, সবই নিঃশেষ ক'রে তোমায় দিয়েছি। এত দিন ভালবেসে সে সব গ্রহণ করেছিলে—আমি ধন্য হয়েছিলাম। আজ যদি সে সব তোমার ভাল না লাগে, তাতে আমার কি দোষ বল? আমি ত চাই, আজও আমি তোমাকে সেই আগেকার মত আনন্দ দিয়ে, সঙ্গীত দিয়ে—যা কিছু সুন্দর, তাই দিয়ে ঘিরে রাখি। কিন্তু তা যে পারি না, সে যে আমার বড় দুঃখের অক্ষমতা—আমার অনিচ্ছা ত নয়। এক দিন যা সুন্দর ছিল, তা যে আজ তোমার কাছে অসুন্দর হয়ে গেছে, যা প্রিয় ছিল, তা যে আজ অপ্রিয় হয়ে পড়েছে, তার জন্য কি আমি দায়ী?

রমেশ।—কত দিন দুজনে একসঙ্গে পড়েছি মনে নেই?

> যেখানে থামিয়া যায় থেমে যাক্ গীতি,
> তার পর থাক্ তার পরিপূর্ণ স্মৃতি।

এই পরম সত্যটুকু মনে ক'রে কেন তুমি সান্ত্বনা পাও না জানিনে। তোমার ভালবাসার আতিশয্য আজ যদি ক'মে যায়,—আজ যদি আমাকে তোমার আগেকার মত ভাল না লাগে,—তার জন্য আমি কোন ক্ষোভ রাখব না। অথচ তুমি যে এক দিন আমাকে ভালবেসেছিলে, সেইটুকু আমি পরম লাভ ব'লে মনে রাখব।

কবিতা।—তার কারণ, ভালবাসাটা তোমার কাছে

অনেকটা সখের জিনিষ। আমার কিন্তু ও জীবনের সঙ্গে মিশে আছে। সখ ফুরিয়ে গেলে তোমার কাছে ও জিনিষের আর কোন দাম নেই; কিন্তু আমার কাছে ও যে চিরদিন অমূল্য। ঐটুকু একেবারে ফুরিয়ে যাবার আগে আমার জীবনের যেন শেষ হয়ে আসে।

রমেশ।—দুঃখ কল্পনা ক'রে কষ্ট না পেয়ে—যা গিয়েছে, তার জন্য দুঃখ না ক'রে, যা আছে, তাই নিয়ে একটু কেন আনন্দ কর না। আজকাল পুরাণো কথা তুলে তুমি কেবলই আমাকে তিরস্কার কর। তাই ত আস্‌তে ভয় হয়। এ কি? এই কথাতেই চোখে জল?

কবিতার চক্ষু সত্যই জলে ভরিয়া আসিয়াছিল। অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া সে তাহা মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, "চোখের জল ত আমি ইচ্ছা ক'রে ফেলি না। কিন্তু এই যদি তোমার তিরস্কার হয়, আর কখন—"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া কথাটা অসমাপ্ত রাখিয়াই দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কবিতা উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে কাঁদিয়া ফেলিল।

রমেশ একটু বিচলিত হইয়া তাহার কাঁধের উপর হাত রাখিল। তাহার পর ধীরে ধীরে কবিতার হাত সরাইয়া চোখ মুছাইয়া দিতে দিতে বলিল, "শান্ত হও, চুপ কর; তোমায় আমি দুঃখ দিতে চাই নে, তা ত জান।"

ধীরে ধীরে কবিতা শান্ত হইল। চোখের জলের চিহ্ন পর্য্যন্ত নিজ হাতে মুছিয়া ফেলিল। তার পর সে রমেশের কথামত গান গাহিল। রমেশ গানের প্রশংসা করিল; আদর করিল। কবিতা তাহার দুঃখ তখনকার মত প্রায় ভুলিয়া গেল।

রমেশ চলিয়া যাইতেই কবিতার মুখে ও মনে আবার বিষণ্ণতা নামিয়া আসিল।

খানিক পরে ঠিকা ঝি আসিয়া তাহার কাযকর্ম্ম করিয়া দিল ও বাজার হইতে জিনিষপত্র আনিয়া রাখিয়া চলিয়া গেল।

দুয়ার বন্ধ করিয়া কবিতা বিষণ্ণ-বদনে আপনার ভাগ্যের কথা ভাবিতে লাগিল। ঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বলিল না।

২

যখন কবিতার পিতার মৃত্যু হয়, তখন সে অতি বালিকা। মাতার তত্ত্বাবধানে থাকিয়াই তাহাকে লেখাপড়া শিখিতে হয়। ম্যাট্রিকুলেশান পাশ করার পর সে মায়ের ইচ্ছাক্রমে ক্যাম্বেল স্কুলে ভর্ত্তি হইল। সেইখানেই রমেশের সহিত তাহার পরিচয়। রমেশ তাহার চেয়ে এক শ্রেণী উপরে পড়িলেও এক দিন অকস্মাৎ তাহার সহিত পরিচয় হইয়া গেল। একটি রোগীকে 'ইন্‌জেক্‌শান' দিতে আসিয়া কবিতা বড়ই বিপদে পড়িয়াছিল। রোগী কিছুতেই ইন্‌জেক্‌শান দিতে দিবে না; অথচ কুলী ডাকিয়া ধরিয়া বাঁধিয়া দিবার ইচ্ছাও কবিতার ছিল না। সে তখন কি করিবে ভাবিতেছে, এমন সময় রমেশ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। ব্যাপার দেখিয়া সে রোগীর কাছে আসিয়া তাহাকে একটু ভর্ৎসনা করিল ও কবিতাকে বলিল, "দিন আপনি ইন্‌জেক্‌শান,—আমি রোগীকে সাম্‌লাচ্ছি।"

কবিতা কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে রমেশের পানে চাহিয়া ইন্‌জেক্‌শান দিল। রোগী শান্ত হইল।

এই হইল তাহাদের প্রথম পরিচয়।

এই পরিচয় ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হইয়াছিল। আপন আপন কর্ত্তব্যের অবসানে ও অন্তরালে দুই জনে মিলিত হইত; কথা কহিত। কোন দিন বিলম্ব হইলে, দৈবাৎ দেখা না হইলে অধীর হইত।

কবিতা এক দিন বলিল, তাহার মায়ের অসুখ, হয় ত কয় দিন ছুটী লইতে হইবে। তাহার পরদিন সে আসিল না। উপর্য্যুপরি কয়েক দিনই সে অনুপস্থিত রহিল। রমেশ খুব ব্যস্ত হইল; কিন্তু কবিতার ঠিকানা জানা না থাকায় কিছুই করিতে পারিল না। প্রতিদিন রমেশ আশা করিতে লাগিল, হয় ত আজ কবিতা আসিবে বা কোন সংবাদ পাঠাইবে। কিন্তু কয়েক দিন বৃথা আশায় কাটিয়া গেল।

এক দিন 'ডিউটি' করিয়া রমেশ কলেজ হইতে বাহির হইতেছে, এমন সময় দ্বারবান্ তাহার হাতে একখানি চিঠি দিল। কবিতার চিঠি। রমেশ ক্ষিপ্রহস্তে খুলিয়া পড়িল, —"রমেশ বাবু, মায়ের বড় অসুখ। জীবনের আশা বড়ই অল্প। যদি পারেন, উপরের ঠিকানায় একবার আসিবেন। —কবিতা।"

রমেশ সেই অবস্থাতেই চিঠি হাতে করিয়া নির্দ্দিষ্ট ঠিকানায় গিয়া উপস্থিত হইল। জেলেটোলার এক প্রান্তে একখানি ছোট পুরাণো দোতলা বাড়ী। তাহারই নীচের দুইখানি ঘরে কবিতা তাহার মাতাকে লইয়া থাকে।

রমেশ আসিয়া দুয়ারের কড়া নাড়িতেই কবিতা আসিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল ও রমেশকে ভিতরে লইয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া দিল। তাহার মাতার চেহারা একবারে শয্যার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল। কবিতা আসিয়া মাতার কাণের কাছে মুখ আনিয়া খুব আস্তে আস্তে বলিল, "রমেশ বাবু এসেছেন।"

কবিতার মাতা অতিকষ্টে বলিলেন, "এখানে ডাক্, তুইও বস্।"

রমেশ কাছে আসিয়া বসিলে কবিতার মাতা অতিকষ্টে বলিলেন, "বাবা, আমার আর সময় নেই। ভগবান্ তোমায় আনিয়ে দিয়েছেন। কবিতার আর কেউ রইল না, তাকে আমি তোমার ভরসায় রেখে যাচ্ছি। এর ভার তোমার। তোমায় গুটিকতক কথা ব'লে যাই—"

হয় ত অনেক কথাই তাঁহার বলিবার ছিল। কিন্তু সে সমস্ত কথা অসমাপ্ত রাখিয়াই হঠাৎ তিনি স্তব্ধ হইয়া গেলেন। প্রথমটা কেহই কিছু বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু একটু পরেই কবিতা উদ্বিগ্ন হইয়া ঝুঁকিয়া মায়ের মুখের পানে চাহিবামাত্র আর্ত্তস্বরে ডাকিয়া উঠিল—'মা—মা—ও মা!" তার পর কঠিন সত্য রূঢ় আঘাতের সঙ্গে তাহার বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টির সম্মুখে প্রতিভাত হইল। কবিতা বুঝিল, মা তাহার আর বাঁচিয়া নাই।

প্রথম প্রথম শোকটা বড়ই বেশী লাগিল। তার পর যেমন হইয়া থাকে—ধীরে ধীরে সব সহিয়া গেল। ইহার পর কবিতা পড়া ছাড়িয়া দিল।

রমেশ ধনীর পুত্র। সে অনেক অনুযোগ করিল। বলিল, পড়ার জন্য সে পিতার কাছ হইতে যে খরচ পায়, তাহাতে দুজনের পড়ার খরচ চলিয়া যাইবে। কবিতা সে কথা মানিল না। কিছু দিন পরে সে শুনিল যে, কবিতা সেই হাঁসপাতালেই নার্শের কাযের জন্য চেষ্টা করিতেছে।

শুনিয়া রমেশ প্রথমে বিস্মিত ও পরে ক্রুদ্ধ হইল। বাধা করিবার তাহার যে কি অধিকার, তাহা সে নিজেই জানে না। কবিতার মাতা ত তাহারই উপর কবিতার ভার দিয়া গিয়াছেন। তবে কেন সে রমেশের কথা শুনিবে না?

সে স্থির করিল, ইহা বন্ধ করিতেই হইবে।

সন্ধ্যার সময় সে মনে মনে এক সংকল্প করিয়া কবিতার কাছে উপস্থিত হইল। কবিতা আলোকের সম্মুখে বসিয়া একটা জামা সেলাই করিতেছিল। রমেশকে দেখিয়া সে জামাটি খুলিয়া লইয়া ভাঁজ করিয়া সম্মুখের পুঁটুলীর মধ্যে রাখিল ও রমেশকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল।

রমেশ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কবিতার দিকে চাহিয়া দেখিল, সে কয়েক দিনেই খুব শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। মুখখানি শীর্ণ, বিশেষ করিয়া তাহাতে একটা উদ্বেগের চিহ্ন সুস্পষ্ট। জামার দিকে চাহিয়া রমেশ সহজেই বুঝিল, এ সব জামা তাহার নিজের ব্যবহারের জন্য নহে—জীবিকার জন্য। কিন্তু ইহার কি প্রয়োজন ছিল? সে কি স্বেচ্ছায় কবিতার সমস্ত ব্যয় বহন করিতে স্বীকৃত হয় নাই?

সহসা রমেশ জিজ্ঞাসা করিল—"এ সব জামা কি পয়সার জন্য সেলাই কচ্ছেন?"

কবিতা মৃদুস্বরে বলিল, "হ্যাঁ।"

রমেশ আর একবার জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, আর একটা কথা যা শুনলাম, সত্যি?"

কবিতা জিজ্ঞাসুভাবে রমেশের পানে চাহিল।

রমেশ বলিল, "আপনি কি নার্শের কাযের জন্য ক্যাম্বেলেই চেষ্টা কচ্ছেন?"

কবিতা একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "হ্যাঁ।" তার পর সঙ্গে সঙ্গে মাথা নীচু করিল।

রমেশ রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

কবিতা মাথা নীচু রাখিয়াই উত্তর দিল—"জীবিকার জন্য।"

রমেশ ক্ষিপ্রহস্তে ঘরের দুয়ারটা বন্ধ করিয়া দিল, তার পর ক্ষিপ্তের মত প্রায় কবিতার উপর লাফাইয়া পড়িয়া বামহস্তের বজ্রমুষ্টিতে তাহার একখানি হাত ধরিয়া পকেট হইতে একখানা তীক্ষ্ণধার ছোরা বাহির করিয়া বলিল, "আমার সাম্‌নে আপনি নার্শের কায করবেন, ও আমি সহ্য করতে পারব না। তার আগে আপনাকে আমি হত্যা করব।"

কবিতা একটুও বিচলিত হইল না, একটুও পিছাইল না, হাত ছাড়াইবার একটু চেষ্টাও করিল না; শুধু তাহার অশ্রু-সিক্ত চক্ষু দুটি তুলিয়া বলিল, "তাই করুন, তা হ'লে আপনি আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধুর কায করবেন। আমার সব দুঃখ দূর করবেন।"

রমেশ কবিতার অশ্রুপ্লাবিত মুখের পানে কিছুক্ষণের জন্য চাহিয়া রহিল; তার পর ছুরিকা মাটীতে ফেলিয়া দিয়া যুক্তকরে বলিল, "আপনি অমন কায করবেন না—দোহাই আপনার। আপনার যা দরকার, সমস্ত আমি নিজে এনে দেব।"

কবিতা একবার কি ভাবিল। তার পর অশ্রু মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, "কি অধিকারে আমি আপনার সাহায্য নেব?"

উন্নতদেহে রমেশ কবিতার আরও সমীপবর্ত্তী হইয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "আমি তোমাকে ভালবাসি, আমি তোমাকে বিবাহ করব। স্ত্রীর অধিকারে তুমি আমার সাহায্য নেবে। বল নেবে?"

কবিতা সাশ্রুনেত্রে তাহার মুখের পানে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিল,—"আচ্ছা!"

তাহার পরের ঘটনাগুলি শীঘ্র শীঘ্র ঘটিয়া গেল। এক-তলা, অপরিচ্ছন্ন ও স্বল্পালোক ঘর রমেশের ভাল লাগিল না। তখন—ষ্ট্রীটের উপর দ্বিতলের এই ঘর ঠিক করিয়া কবিতাকে সেখানে আনিল। কবিতা ডাক্তারী পড়া ছাড়িয়া এই বিচিত্র সংসারে প্রবেশ করিল। রমেশকে কবিতা নিতান্তই আপনার মনে করিতে পারিয়া ইহাতে আপত্তি করিল না। কিছুকাল ধরিয়া সে তাহার অবসরমুহূর্ত্তগুলি এইখানেই কাটাইতে লাগিল। কবিতার সেবা ও কবিতার প্রেম লাভ করিয়া সে পরম আনন্দিত হইল। সুখস্বপ্নে বৎসর-খানেক কাটিয়া গেল। অসম্পন্ন বিবাহের কথাটা কবিতার কখন কখন মনে হইত, কিন্তু রমেশ কি ভাবিবে, এই মনে করিয়া কথাটা মুখে আনিতে পারিত না। এক দিন কবিতা কথাটা প্রকারান্তরে তুলিল। রমেশ হাসিয়া বলিল, "আমার উপর তোমার তা হ'লে বিশ্বাস হয় নি এখনও?"

কবিতা লজ্জায় মরিয়া গেল।

ক্রমে রমেশ পাশ করিয়া বাহির হইল ও বাড়ীর সম্মুখে প্রস্তর-ফলকে নাম ইত্যাদি ক্ষোদিত করাইয়া লাগাইয়া দিল। রোগীর প্রত্যাশায় নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া রহিল।

এক দিন হঠাৎ রমেশ আসিয়া গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার মা তোমাকে নিয়ে তোমার বাবার কাছ হ'তে পৃথক্ বাস করতেন?"

কবিতা উত্তর দিল, "হ্যাঁ, আমি তখন ৫ বৎসরের, সেই সময়ে মা এক শিক্ষয়িত্রীর কায খুঁজে নেন ও আমাকে নিয়ে চ'লে আসেন।"

রমেশ একটু রুক্ষস্বরে বলিল, "চ'লে আসার কারণ?"

কবিতা।—মায়ের গর্ভে ছেলে হয় নি ব'লে বাবা পুনরায় বিবাহ করতে উদ্যত হয়েছিলেন, তাই।"

রমেশ।—বিবাহ করেছিলেন?

কবিতা।—হ্যাঁ। কিন্তু বিবাহের কয়েক মাস পরেই বাবা মারা যান। সেই থেকেই মা ঐ বাসায় ছিলেন।

রমেশ:—কথাটা আমাকে তোমার পূর্ব্বেই বলা উচিত ছিল।

কবিতা।—তুমি ত কোন কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করনি বলবার সুযোগ পর্য্যন্ত দাও নি।

রমেশ।—সে জন্য আমাকে এ রকম অন্ধকারে রাখা তোমার উচিত হয় নি। এখন যদি বাবা এ কথা শোনেন, তিনি কি বল্‌বেন, তাই ভাবছি। তিনি যে রকম নিষ্ঠাবান্ হিন্দু।

ইহাতে যেটুকু ইঙ্গিত ছিল, তাহা বুঝিয়া কবিতা স্তব্ধ হইয়া গেল। সেই হইতে বিবাহের কথা সে আর উত্থাপন করিতে পারিল না।

দিন কাটিতে লাগিল। রমেশ যথারীতি খরচপত্র দিত; কিন্তু যাত য়াত তাহার কিছু কম হইয়া গেল।

এ সঙ্কোচটা যখন কাটিয়া গেল, তখন কি ভাবিয়া সে দুই এক জন বন্ধুবান্ধব লইয়া আসিতে লাগিল।

কোন দিন দৈবাৎ কবিতা তাহার সম্মুখে কাঁদিয়া ফেলিলে রমেশ বুঝাইত, সে ত কবিতাকে তাচ্ছীল্য করে না; তবে যতখানি আকর্ষণ সে এক দিন কবিতার উপর অনুভব করিয়াছিল, চিরদিন ততখানি আকর্ষণ থাকা স্বাভাবিক নহে এবং তাহার জন্য তাহাকে দোষ দেওয়া বৃথা। কবিতা সেই হইতে আর কোন অনুযোগ না করিলেও রমেশ মনে মনে আপনাকে কতকটা অপরাধী মনে করিত। সে জন্য একা কবিতার সঙ্গে থাকিলেই তাহার মনে একটা লজ্জা ও অস্বস্তি জাগিত—যদিও ঐ সব মনোবৃত্তিকে সে বেশীক্ষণ অন্তরে থাকিতে দিত না। দুই এক জন বন্ধুবান্ধব লইয়া যখন সে আসিত, তখন সে অনেকটা স্বস্তি বোধ করিত। এক দিন কবিতাকে প্রসঙ্গক্রমে এ কথাও সে বলিয়াছিল যে, সে চিরদিন অন্ততঃ

তাহার বন্ধু হইয়া থাকিবে। কবিতা তাহার অনুরাগিণী এবং আজ পর্য্যন্ত তাহাকে বিবাহ না করিলেও সে রমেশকেই একান্তভাবে কামনা করিয়া আসিতেছে, এটুকু তাহার বন্ধু-মহলে দেখাইয়া দিতে পারায় সে মনে মনে বেশ একটু গর্ব্ব অনুভব করিত। পাখী ছাড়িয়া দিলেও উড়িয়া যায় না, খাঁচা আগলাইয়া খাঁচা ভালবাসিয়া পড়িয়া থাকে, ইহাতে পাখীর মালিক যেমন গর্ব্ব অনুভব করে, রমেশের গর্ব্বও অনেকটা সেই ভাবের।

রমেশের আরও একটু উদ্দেশ্য ছিল যে, এ ভাবের জীবনটা তাহার অভ্যাস হইয়া গেলে কবিতা তাহারই থাকিবে অথচ এজন্য অনুযোগ করিবে না। কবিতা যে কিছুতেই আর কোথাও যাইবে না ও তাহার প্রতি কবিতার যে অনুরাগ, তাহা কিছুতেই কখন শিথিল হইবে না, সে বিষয়ে রমেশের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল।

৩

সপ্তাহখানেক পরে সন্ধ্যাকালে নিশীথ আসিয়া না ডাকিয়া দুয়ারের কড়া নাড়িল। একটু পরেই দুয়ার খুলিতে নিশীথ ভিতরে প্রবেশ করিল। কিন্তু ভিতরে গিয়া কবিতার অশ্রুবিগলিত মুখের পানে চাহিতেই সে অত্যন্ত বিস্মিত ও কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। পরক্ষণে দুয়ার বন্ধ করিয়া দিয়া নিশীথ ব্যথিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি! কি হয়েছে আপনার? আপনাকে এত বিচলিত দেখছি কেন?"

কবিতা চোখের জল মুছিতে লাগিল, কিছু বলিল না।

ব্যাপার কি অনুমান করিতে না পারিয়া নিশীথ আবার জিজ্ঞাসা করিল, "রমেশ বাবু কোথায়? তিনি আসেন নি?"

এবার কবিতা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল।

নিশীথ অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। ব্যথায় তাহার অন্তর ভরিয়া গেল। কবিতার সম্মুখে বসিয়া পড়িয়া সে সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "কি হয়েছে, দয়া ক'রে বলুন। আমায় দিয়ে যদি কোন উপকার হয়, আমি প্রাণপণে তা করব। রমেশ বাবু ভাল আছেন ত?"

কবিতা অশ্রুপ্লাবিত চক্ষু নিশীথের পানে উঠাইয়া বলিল, "তিনি আমাকে পরিত্যাগ করেছেন।"

অত্যন্ত বিস্ময় বোধ করিয়া নিশীথ বলিল, "পরিত্যাগ করেছেন! পরিত্যাগ করবার তাঁর কি অধিকার?"

কবিতা আর আপনাকে সম্বরণ করিতে পারিল না। অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে তাহার জীবনের ইতিহাস বলিয়া গেল। তার পর বলিল, "আজ একটু আগে তিনি ব'লে গেলেন, তাঁকে বাধ্য হয়ে অন্যত্র বিবাহ করতে হচ্ছে। তাঁর পিতার আদেশ।"

শুনিয়া ক্রোধে, ক্ষোভে ও দুঃখে নিশীথের অন্তর পূর্ণ হইল। সে বলিয়া ফেলিল, "ছি, ছি, তিনি এমন, তা আমি জান্‌তাম না। জান্‌লে তাঁর সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখতাম না। কিন্তু এতে আপনি এত মুষড়ে পড়ছেন কেন? এত লজ্জাই বা পাচ্ছেন কেন? যদি কারও লজ্জিত হবার কথা থাকে ত সে রমেশ বাবুর—আপনার নয়। আপনি আপনার দাবী ছাড়বেন কেন? রমেশ বাবু আপনাকে বিবাহ করতে বাধ্য। আপনি আমাকে বিশ্বাস করুন, আমি সব ব্যবস্থা ক'রে দেব। আপনাকে কিছু করতে হবে না।"

কবিতা বলিল, "সে চেষ্টায় কি হবে, নিশীথ বাবু! এ ত অন্য জিনিষ নয় যে পাইয়ে দেবেন। না চাইতে যদি মেলে, তবেই ও জিনিষ পাওয়া যায়। নইলে এ ত জোর ক'রে চেয়ে নেবার জিনিষ নয়।"

নিশীথ বলিল, "তাই ব'লে আপনি এই অপমান—এই অবিচার সহ্য ক'রে নিশ্চেষ্ট হয়ে থাক্‌বেন? আপনি তার উপর এত অনুরক্ত আর রমেশ বাবু স্বচ্ছন্দে ঐ কথা ব'লে গেলেন! না, এতখানি অন্যায় আপনি কিছুতে সহ্য করতে পাবেন না। ওর প্রতিবাদ আপনাকে করতে হবেই।"

কবিতা নিরাশকণ্ঠে কহিল, "কি হবে? তাতে যে অপমান দ্বিগুণ হবে।"

নিশীথ খানিকক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া হঠাৎ বলিল, "তা হ'লে যদি আমাকে অধিকার দেন ত আমি একটা কথা বলি।"

কবিতা নিশীথের মুখের পানে জিজ্ঞাসুভাবে চাহিল।

নিশীথ কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "আমার গৃহলক্ষ্মীর আসন এখনও শূন্য, আপনি দয়া ক'রে যদি সেখানে উপবেশন করেন, কৃতার্থ হব। যোড়-করে আমি আপনাকে প্রার্থনা কচ্ছি। সংসারে আমার আর কেউ নেই—কাযেই কা'রও

অনুমতি বা সম্মতির প্রয়োজন নেই। আপনি শুধু শাস্ত্র ও বিধিসঙ্গত এই অধিকারটুকু আমায় নিতে দিন।"

নিশীথের কথার আন্তরিকতা ও কাতরতা বোধ হয় কবিতার অন্তর স্পর্শ করিয়াছিল। কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া সে গাঢ়স্বরে বলিল, "আমি আপনার এ দয়া কখন ভুলব না। আপনি যে আমার জন্য এতখানি করতে প্রস্তুত, এ আপনার অসাধারণ মহত্ত্ব। কিন্তু এর উত্তর আমি আজ দিতে পারছি না। কাল আমি এর উত্তর দেব। আজ আমাকে ক্ষমা করুন্।"

নিশীথ শান্তস্বরে বলিল, "কাল কেন, আপনি এক বৎসর পরে সম্মতি দিলেও আমি অস্থির হব না। স্থিরচিত্তে এক বৎসরকাল আমি আপনার অপেক্ষা ক'রে রইব। কিন্তু এখানে এই দুশ্চিন্তা ও মনস্তাপের মধ্যে আপনাকে রেখে যেতে আমার বড়ই দুঃখ হচ্ছে।"

কবিতা বিনয় করিয়া বলিল, "আমি সব কথার উত্তর কাল আপনাকে দেব। আজ আমাকে মার্জ্জনা করুন।"

নিশীথ তখন তাহার নির্ব্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া বলিল, "আপনাকে বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে। আপনি বিশ্রাম করুন। আমি তা হ'লে এখন যাই।"

বলিয়া নিশীথ আর একবার কবিতার পানে চাহিয়া, দুয়ার খুলিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল ও বাহির হইতে দুয়ার টানিয়া দিল। ভিতর হইতে কবিতা দ্বার অর্গলবদ্ধ করিল।

ইহার পরেও নিশীথ কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া দুয়ারে কাণ পাতিয়া রহিল। তারপর নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ করিল।

৪

পরদিন সন্ধ্যার সময় নিশীথ আসিয়া দুয়ারের কড়া নাড়িয়া দুয়ার সামান্য ঠেলিতেই দুয়ার খুলিয়া গেল। নিশীথ কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া সবিস্ময়ে দেখিল,—কক্ষ শূন্য—কবিতা নাই; দ্রব্যাদি যথাস্থানে বিদ্যমান। মেঝের উপর খামে করা দুইখানি চিঠি পড়িয়া আছে। একখানিতে তাহার নিজের নাম লেখা। নিশীথ সেখানে বসিয়া পড়িয়া খাম হইতে চিঠিখানি বাহির করিয়া পড়িল—

"নিশীথ বাবু, আপনার দয়া ও উদারতা আমি সমস্ত অন্তর দিয়া অনুভব করিয়াছি ও করিব। আপনার কথা আমি সমস্ত রাত্রি ধরিয়া ভাবিয়াছি; কিন্তু কোন পথ দেখিতে পাই নাই। ইহার কারণ এ নহে যে, আপনার মহত্ত্ব, আপনার গুণাবলী আমি বুঝি নাই। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, আমি কায়মনোবাক্যে অপরের হইয়া পড়িয়াছি। জানি, আমাকে তিনি আর চাহেন না, আমার প্রতি তাঁহার আর পূর্ব্বের অনুরাগ নাই,—তথাপি তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্যের হইবার আমার সাধ্য নাই। তাঁহার অনুরাগের স্মৃতির চিতা বুকে রাখিয়া আমাকে চিরজীবন জ্বলিতেই হইবে। আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি, কিন্তু স্বামীর প্রাপ্য ভালবাসা আপনাকে দিবার সঙ্গতি নাই। তাই আপনাকে স্বামিরূপে লাভ করা আমার ভাগ্যে নাই।

এত দিন তিনি অপরকে বিবাহ করিবার কথা বলেন নাই; সে ইচ্ছাও হয় ত এত দিন তাঁহার ছিল না। সেজন্য ভাবিতাম, প্রকাশ্যে স্বীকার না করিলেও অন্তরে অন্তরে তিনি আমাকে স্ত্রী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু যে দিন তিনি আসিয়া বলিলেন, বাধ্য হইয়া তাঁহাকে অন্যত্র বিবাহ করিতে হইতেছে, সে দিন হইতে এ সান্ত্বনাটুকুও চলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে কর্ত্তব্য কঠিন মূর্ত্তি ধরিল। এখন কিসের জোরে আমি তাঁহার দেওয়া অর্থসাহায্য গ্রহণ করিব? তাই আজ তাঁহার দেওয়া সব জিনিষ রাখিয়া দিয়া একাকিনী পথে বাহির হইলাম। কোন একটা কায খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। কি করিব, কোথায় যাইব, তাহা নিজেই এখন স্থির করিতে পারি নাই। সে জন্য আপনাকে জানাইতে পারিলাম না।

আমি জানি, আপনি কাল সন্ধ্যাকালে নিশ্চয়ই এখানে আসিবেন। তাই আপনার জন্য একখানি চিঠি এখানে রাখিয়া চলিলাম। তাঁহাকেও একখানি লিখিলাম। কিন্তু তাঁহার বাড়ীর ঠিকানায় চিঠি দিতে নিষেধ করিয়াছিলেন; দিলে না কি তাঁহার সমূহ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। যে নিষেধ এত দিন নির্ব্বিচারে মানিয়া আসিয়াছি, আজ যাইবার সময়ে সে নিষেধ লঙ্ঘন করিয়া কি হইবে? চিঠিখানি রাখিয়া গেলাম। আপনি তাঁহার হাতে চিঠিখানি দয়া করিয়া দিবেন।

ব্যর্থ প্রণয়ের কি যে যাতনা, তাহা আমি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছি। এই হতভাগিনীর জন্য সে যাতনা যেন আপনাকে অনুভব না করিতে হয়, ইহাই আমি যুক্তকরে প্রার্থনা করিতেছি। আপনি যেন সর্ব্বসুখে সুখী হন্। যিনি আমাদের সকলের অন্তর দেখিতেছেন, তাঁহার হাত হইতে আপনি যেন আপনার মহৎ হৃদয়ের অনুরূপ প্রসাদ লাভ করেন।

হতভাগিনী কবিতা।"

পত্র পড়িয়া নিশীথ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। কক্ষমধ্যে চারিদিতে চাহিয়া দেখিল, কবিতার দ্রব্যাদি প্রায় পূর্ব্বমতই সজ্জিত আছে। যে একা অনেক দিনের স্মৃতিমণ্ডিত গৃহখানি ছাড়িয়া গিয়াছে, সে যে কি গভীর বেদনার বোঝা বহিয়া বিদায় লইয়াছে, তাহা ভাবিতে নিশীথের নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইল।

কিন্তু বসিয়া থাকিলে চলিবে না। কবিতার মঙ্গল করিতে হইলে এখনই তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

রমেশের নাম-লেখা খামের চিঠিখানি উঠাইয়া লইয়া বাহির হইতে দুয়ার টানিয়া বন্ধ করিয়া দিয়া নিশীথ ধীরে ধীরে বাহিরে আসিল। প্রথম কথা চিঠিখানির ব্যবস্থা করিতে হইবে। নিজে গিয়া রমেশের হাতে চিঠি দিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। কিন্তু তাহার মনে হইল, চিঠিতে এমন কোন কথা আছে—যাহা হয় ত এখনই রমেশের জানা প্রয়োজন এবং সে কথা জানিলে হয় ত কবিতার সন্ধান মিলিতে পারে।

বরাবর রমেশের বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া সেখান হইতে নিশীথ দেখিল, রমেশ আপনার ডাক্তারখানাতে বসিয়া আছে। একটু দূরে আসিয়া একটা মুটিয়া ঠিক করিয়া সে রমেশকে দেখাইয়া বলিল, "এই চিঠিখানা ঐ ডাক্তার বাবুর হাতে দিয়ে এখনই চ'লে আসবি; একটুও দাঁড়াবিনে। এর জন্য আট আনা মজুরী ও আট আনা বকশিস্।"

বলিয়া একটা আধুলি দিয়া চিঠিখানি তাহার হাতে দিল। চিঠি দিয়াই তাহার কাছে ফিরিয়া আসিলে বাকী আধুলি পাইবে, ইহাও তাহাকে বলিয়া দিল।

মুটিয়া আধুলি ও চিঠি লইয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল ও রমেশের হাতে চিঠিখানি তুলিয়া দিয়া দ্রুতপদে ফিরিয়া আসিল। নিশীথ নিজেও দূর হইতে লক্ষ্য করিয়া লইল যে, পত্র যথাস্থানে পৌঁছিয়াছে। মুটিয়া আসিলে তাহার হাতে আর একটা আধুলি দিয়া বলিল, "তুই এইবার একটু ঘুরে পালা, বাবু যেন তোকে খুঁজে না পান।"

মুটিয়া নিশীথের আদেশ যথাযথভাবে পালন করিল। নিশীথও সঙ্গে সঙ্গে ত্বরিতপদে সে স্থান ত্যাগ করিল।

৫

রমেশকে কবিতা যে পত্রখানি লিখিয়াছিল, তাহাতে লেখা ছিল—

"প্রিয়তমেষু—

তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিলেও তুমি আমার প্রিয়তম, সে জন্য আজ শেষবার তোমাকে সে সম্বোধন করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

কত আশা দিয়া তুমি আমাকে আনিয়াছিলে, কত ভরসা দিয়া আমাকে নিরাশার পথ হইতে ফিরাইয়াছিলে, সকল নির্ভর ছাড়িয়া একমাত্র তোমারই উপর নির্ভর করিতে শিখাইয়াছিলে, আজ সে সব স্বপ্ন মনে হয়!

বলিয়াছিলে, আমার প্রতি তোমার যে অনুরাগ, তাহা ধ্রুবতারার মত স্থির অবিচল। আজ মনে হয়, কোথায় গেল তাহা—কেন গেল?

মৃত্যুশয্যায় মা তোমার হাতে আমাকে সঁপিয়া দিয়াছিলেন। তাই তোমাকে স্বামী জানিয়া অসঙ্কোচে তোমার সঙ্গে আসিয়াছিলাম। তখন ভাবি নাই, এক দিন আমি এই অবস্থায় উপনীত হইব।

তোমার গৃহে গৃহিণীর গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইব, তোমার পিতা আমার পিতা হইবেন, জীবনে পিতার সেবা করিতে পারি নাই, তাঁহার সেবা করিয়া ধন্য হইব, আমি আপন মনে সংসারের সব কায শেষ করিয়া তোমার পথ পানে চাহিয়া রহিব। তুমি যে খাদ্য খাইতে ভালবাস, তাহা রাঁধিয়া রাখিব, যে শয্যা ভালবাস, তাহাই রচনা করিয়া রাখিব, যে সঙ্গীত তোমার প্রিয়, কণ্ঠে তাহারই সুর ভরিয়া রাখিব, যে বসন, যে আভরণ তোমার ভাল লাগে, তাহাই পরিয়া রহিব। ক্লান্ত হইয়া যখন তুমি ফিরিয়া আসিবে, তখন আমার সেবা, আমার প্রেম, আমার সঙ্গীত,

আমার আনন্দ দিয়া তোমার সকল ক্লান্তি ধুইয়া দিয়া নিত্য তোমাকে নবীন করিয়া রাখিব। জীবনের সে সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা পথের ধূলায় লুটাইয়া গেল।

অপ্রত্যাশিত বজ্রাঘাতের মত তুমি আমাকে জানাইয়া দিয়া গেলে, তোমার হৃদয়ে আমার আর স্থান নাই, তোমার গৃহে আমার স্থান হইবার নহে। দয়া করিয়া বলিয়া গেলে, আমার অন্নবস্ত্রের জন্য আমাকে ভাবিতে হইবে না। সে ব্যয়ভার তুমি চিরদিন বহন করিবে। পিতার অমত হইবে, তাই তুমি আমাকে বিবাহ করিতে পারিলে না। তাঁহারই আদেশে তোমাকে অন্যকে বিবাহ করিতে হইবে।

এ কথাটি আমাকে আগে কেন বল নাই? তাহা হইলে ত আমি এখন অকূলে ভাসিতাম না। এত আশা রাখিতাম না—নিরাশার যাতনাও কম হইত।

কিন্তু এ সব কথা থাক। আজ তোমাকে ভর্ৎসনা করিতেও চাহি নাই, প্রেমের কথা বলিয়া তোমাকে ফিরিয়া পাইবার স্বপ্নও দেখিতে চাহি নাই!

তুমি বিবাহ করিবে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, আজ পর্য্যন্ত অন্য স্ত্রী গ্রহণ কর নাই—তাই ভাবিতাম, তুমি এ পর্য্যন্ত প্রকাশ্যে গ্রহণ না করিলেও অন্তরে আমাকে স্ত্রী বলিয়াই লইয়াছ। তাই তোমার দেওয়া অর্থ-সাহায্য এত দিন বিনা দ্বিধায় লইতে পারিয়াছি।

কিন্তু আজ আমার সে সান্ত্বনাটুকুও নাই। আজ আর কিসের জোরে এখানে থাকিব বা তোমার নিকট হইতে অর্থ-সাহায্য লইব?

তাই আজ তোমার নিকট হইতে—তোমার দেওয়া আশ্রয় হইতে বিদায় লইলাম। একটা কায খুঁজিয়া লইব। তাহাতেই জীবনটা কাটাইয়া দিব।

ভগবানের কাছে প্রার্থনা, তুমি যেন দুঃখ না পাও। তোমাকে যেন নিরাশার দুঃখ সহিতে না হয়। যে মুখখানি দেখিয়া মজিয়াছিলাম—জগৎসংসার সব ভুলিয়াছিলাম, যাইবার সময় তোমার সেই সুন্দর মধুর মুখখানি আর এক-বার দেখিবার—

কিন্তু থাক্। তোমার মঙ্গল হউক, তুমি সুখী হও, তোমার নূতন জীবনের পথের কাঁটা সরাইয়া লইলাম।

অভাগিনী পরিত্যক্তা
কবিতা।"

পত্রখানি শেষ করিয়া রমেশ স্তম্ভিত হইয়া রহিল। কবিতা যে এত দিন তাহাকে মুখ ফুটিয়া একটা ভর্ৎসনার কথাও বলে নাই, তীব্র উপেক্ষাতেও যাহার অনুরাগ এতটুকু ম্লান হয় নাই, সেই কবিতা এত সহজে, এত অতর্কিতে তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে! ইহা কি সম্ভব? কবিতার সেবা, কবিতার প্রেম—সে যে তাহার স্মৃতির সমুদ্র পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে।

রমেশের মনে পড়িল, যে দিন সে প্রথম কবিতাকে দেখিয়াছিল, প্রথম তাহার চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল সে দিনকার ছবি, যে দিন সে প্রথম কবিতাদের গৃহে গিয়াছিল, তাহার মায়ের কাছ হইতে তাহাকে মনে মনে গ্রহণ করিয়াছিল। আর সেই কবিতা আজ চলিয়া গেল! অনাদরে আজ সে কবিতার মত নারীকে হারাইল! কবিতা এত দিন পরে তাহার নয়নে অপূর্ব্ব ত্যাগ, সেবা এবং আত্ম-বিসর্জ্জনের বিচিত্র মাধুর্য্য-মণ্ডিত মধুর মূর্ত্তিতে ফুটিয়া উঠিল।

পত্র পড়িয়া রমেশ তীরবৎ আসন ত্যাগ করিয়া উঠিল।

হয় ত তখনও কবিতা চলিয়া যায় নাই! হয় ত বা এখনও যাইলে তাহাকে বাধা দেওয়া যায়!

হঠাৎ তাহার মনে পড়িল, যে পত্র আনিয়াছিল, তাহাকে ত জিজ্ঞাসা করা হয় নাই—কোথায় সে এ পত্র পাইল? পত্র পকেটে ফেলিয়াই রমেশ পথে বাহির হইয়া পড়িল—যদি পত্রবাহককে দেখিতে পায়। তাহাকে দেখিতে না পাইয়া সে কবিতার সন্ধানে প্রথমেই কবিতার বাসায় আসিল।

এতদিনকার পরিচিত কক্ষ আজ শূন্য দেখিয়া রমেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। সে কক্ষমধ্যে চাহিয়া দেখিল, তাহার দেওয়া সকল দ্রব্যই পড়িয়া আছে; একটিও সে সঙ্গে লইয়া যায় নাই। শয্যা, বস্ত্র, প্রসাধন, আভরণ সবই যথাস্থানে পড়িয়া আছে। কবিতার মায়ের একটি পুরাতন বাক্স ছিল, কেবল সেইটিই সেখানে নাই, বোধ হয়, কেবল সেই বাক্সটি সঙ্গে লইয়াই সে চলিয়া গিয়াছে।

সুরচিত শয্যার উপধানের নীচে চাবির কিয়দংশ দেখা যাইতেছিল। চাবি লইয়া বাক্স খুলিয়া রমেশ দেখিল, সেই মাসের খরচের টাকা যাহা সেই দিন সে কবিতাকে দিয়া গিয়াছিল তাহার প্রায় সমস্তই পড়িয়া আছে।

রমেশ ইদানীং ভাবিয়াছিল, বুঝি তাহার অন্তরে কবিতার আর সে পূর্ব্বস্থান নাই। আজ মনে হইল, ইহা

তাহার বিষম ভুল। ইদানীং কতবার সে ভাবিয়াছিল, কবিতা যদি স্বেচ্ছায় তাহাকে ছাড়িয়া যায় বা অন্য কাহাকেও বিবাহ করে, তাহা হইলে তাহার ঘাড় হইতে একটা বোঝা নামিয়া যায়। আজ তাহার মনে হইল, এ বোঝা যে তাহার রত্নের বোঝা! কেমন করিয়া এই অমূল্য বোঝা সে অপরের হাতে তুলিয়া দিবার কথা ভাবিয়াছিল?

কিছুক্ষণ হতবুদ্ধি ও বাক্যহীন হইয়া থাকিবার পর রমেশ সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া তাহা তালাবন্ধ করিল। তাহার পর গৃহস্বামীর কাছে গিয়া বলিল যে, কিছুদিন ঐ ঘরটিতে কেহ থাকিবে না; কিন্তু তবু ঘরটি সেই রাখিবে। ছয়মাসের অগ্রিম ভাড়া সে কালই পাঠাইয়া দিবে, ঘরটি যেন অন্য কাহাকেও ভাড়া দেওয়া না হয়।

গৃহস্বামী স্বীকৃত হইলেন।

ইহার পরক্ষণ হইতে রমেশ কবিতার সন্ধানে মনোনিবেশ করিল। রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত নানাস্থানে খুঁজিয়া ব্যর্থতার বোঝা লইয়া রমেশ গভীর রাত্রিতে বাড়ী ফিরিল। আবার প্রভাতে উঠিয়া খুঁজিতে বাহির হইল, সন্ধ্যায় ফিরিল। এইভাবে কয়েক দিন কাটিবার পর ব্যাপারটা রমেশের পিতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

রমেশের পিতা চন্দ্রনাথ বিপত্নীক মানুষ। ধর্ম্মগ্রন্থ, সৎসঙ্গ, হরিসভা ইত্যাদি লইয়াই থাকেন। প্রথমে রমেশ বিবাহ করিতে রাজী ছিল না, সেজন্য তিনিও কোন জোর করেন নাই। ইদানীং তাঁহার ভগিনীর অনুরোধে এবং হয় ত আরও কোন কারণে রমেশের বিবাহে মত হয়। তথাপি তিনি রমেশকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিয়া তবে বিবাহ স্থির করেন।

পাত্রীপক্ষ আগামী সপ্তাহে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিবেন, এই সংবাদটা রমেশকে দিবেন ভাবিয়া রাত্রি ৯টার পর তাহার খোঁজ করিতে গিয়া শুনিলেন, রমেশ তখনও ফিরে নাই। ভাবিলেন, হয় ত রোগী দেখিতে বা অন্য কোন কাযে গিয়া থাকিবে। পরদিন ভোরে খোঁজ করিতে গিয়া শুনিলেন, সে অনেকক্ষণ বাহির হইয়া গিয়াছে। দুপুরে নিশ্চয়ই দেখা হইবে ভাবিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সারাদিনের মধ্যে রমেশ ফিরিল না। সন্ধ্যার পর পুত্র ফিরিতে তিনি সংবাদ পাইলেন ও তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

পুত্র আসিলে তিনি তাহার মুখ পানে চাহিয়া বলিলেন, "রমেশ, তাঁরা আগামী সপ্তাহে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করতে আসছেন। কিন্তু এ কি! তোমাকে এত ক্লান্ত দেখছি কেন? কি হয়েছে?"

রমেশ ক্ষণেকের জন্য কি ভাবিল। তার পর বলিল, "বাবা, আমি বড় অন্যায়—বড় পাপ করেছি। আমার এ বিবাহ করার অধিকার নেই!"

চন্দ্রনাথ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "তোমার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না ত, রমেশ।"

রমেশ আপনার জামার বুক-পকেট হইতে কবিতার চিঠিখানি বাহির করিয়া পিতার সম্মুখে রাখিয়া বলিল, "আমি সব কথা মুখে বলতে পারব না। আপনি এই চিঠিখানি প'ড়ে দেখবেন।"

বলিয়া রমেশ ত্বরিতপদে কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।

চন্দ্রনাথ পরম বিস্ময়ে চিঠিখানি খুলিয়া এক নিশ্বাসে পড়িয়া ফেলিলেন। সরল কথায় সরল হৃদয়ের অভিব্যক্তি, বিপ্রলব্ধা সতী নারীর গভীর দুঃখের মর্ম্মন্তুদ ইতিহাস স্বল্পকথায় পত্রের প্রতি ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। স্ত্রীর অধিকারের ভরসায় আসিয়া তাহা না পাইয়াও যে নারী কোন দিন তাহার প্রতিবাদ করে নাই, সে আজ তাহার একমাত্র আশ্রয়স্থল কেন ত্যাগ করিল, তাহার কারণটুকু পড়িয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের চক্ষু সজল হইল, বক্ষঃ রুদ্ধ বেদনায় আলোড়িত হইয়া উঠিল। চক্ষু মুছিয়া তিনি ধীরে ধীরে কিয়ৎক্ষণ পাদচারণা করিয়া আপনার হৃদয়বেগ শান্ত করিলেন। তার পর দৃঢ়পাদক্ষেপে পুত্রের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। পিতাকে কক্ষে প্রবেশোদ্যত দেখিয়াই রমেশ মাথা নত করিয়া দাঁড়াইল; পিতার মুখের পানে চাহিবার সাহস পাইল না।

চন্দ্রনাথ বলিলেন, "রমেশ, তুমি যে এমন কায করতে পার, আমি তা কোন দিন ধারণাও করতে পারিনি। তুমি ছাড়া পৃথিবীতে আমার কেউ নেই। তুমি কেন এমন নীচ কায করতে গেলে?"

রমেশ নত দৃষ্টিতে বলিল, "আমি প্রথমে ভেবেছিলাম, আপনাকে সব কথা প্রকাশ ক'রে ব'লে বিবাহের জন্য অনুমতি চাইব। আমায় ক্ষমা করুন।"

চন্দ্রনাথ বলিলেন, "তুমি যুবক, গুণান্বিতা রূপবতী অনুরাগিণী নারী দেখলে তার কাছে বিবাহের প্রস্তাব

করাতে তোমার কোন দোষ দেখি না। কিন্তু সে কথা তুমি আমাকে না ব'লে সে অভাগিনীকে প্রবঞ্চনা করলে কোন্ প্রাণে? কি তার অপরাধ? কোন্ অধিকারে তাকে ফেলে তুমি স'রে দাঁড়িয়েছিলে? আমায় তুমি কেন সে কথা বলনি?"

রমেশ কাঁদিয়া ফেলিল। মুখ তুলিয়া অশ্রু মুছিয়া বলিল, "আপনি পরম হিন্দু, আপনি অসন্তুষ্ট হবেন, মত দেবেন না, হয় ত আমার সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ রাখবেন না—এই আশঙ্কায় আমি বলি বলি করেও বল্‌তে পারিনি।"

অত্যন্ত ক্ষোভের সহিত চন্দ্রনাথ বলিলেন, "পরম হিন্দু মানে যে নারীনির্য্যাতনকারী ও অবিচারক, এ কথা আমার জানা ছিল না, রমেশ। আমার মধ্যে কি এমন দেখলে তুমি যে, নিঃসংশয়ে মেনে নিলে যে, আমি এমন হৃদয়হীন হতে পারতাম! ছিঃ রমেশ! আমি আজ বড় দুঃখ পেলাম। তোমার মায়ের মৃত্যুর পর এমন দুঃখ আমি আর কোন দিন পাইনি।"

রমেশ পিতার পদতলে পড়িয়া বলিল, "বাবা, আমায় ক্ষমা করুন।"

চন্দ্রনাথ বলিলেন, "রমেশ, ওঠো। এ দুঃখে ত কোন লাভ নেই। কাল থেকে দ্বিগুণ উৎসাহে তাঁর খোঁজ আরম্ভ কর। তাঁকে পাওয়া মাত্র আমি নিজে মন্ত্র পড়িয়ে তোমাদের বিবাহ দেওয়াব। আমি যে তোমার নির্ব্বাচিতা বধূকে অন্তরের সঙ্গে তখনই মা ব'লে গ্রহণ করতাম—এ কথাটা তুমি আমার এত কাছে থেকেও বুঝলে না, এই আমার পরিতাপের বিষয়। যাও, ওঠো; কাল থেকে কি ক'রে, কোন্ পথ অবলম্বন ক'রে কায সুরু করবে, তারই চিন্তা কর গে।"

রমেশ উঠিয়া দাঁড়াইতে চন্দ্রনাথ কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

৬

কয়মাস ধরিয়া ক্রমাগত সন্ধান করিয়াও কেহ কবিতার কোন সন্ধান পাইল না। তবুও যদি দৈবাৎ কোন দিন চোখে পড়িয়া যায়, কাণে যদি দৈবাৎ একটা সংবাদ পৌঁছিয়া যায়, এই আশায় রমেশ ও নিশীথ স্বতন্ত্রভাবে প্রায় আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিতে লাগিল।

শ্যামপুকুর অঞ্চলে ছোট একটি গলীর সম্মুখে নিশীথ এক দিন প্রভাতে দাঁড়াইয়াছিল, এমন সময় এক প্রৌঢ়া বিধবা ব্যস্তভাবে গলীর দিক হইতে আসিয়া সম্মুখে নিশীথকে দেখিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে কহিল, "হ্যাঁ বাবা, এখানে নিকটে ডাক্তার কোথায় থাকেন, বল্‌তে পার? একটি মেয়ের বড় অসুখ; হয় ত বাঁচবে না। যদি একটিবার দেখিয়ে দাও।"

নিশীথ বলিল, "ডাক্তার বড় রাস্তার ধারে এক জন আছেন। কি অসুখ মেয়েটির?"

প্রৌঢ়া বলিল, "এক মাস থেকে জ্বরে ভুগছিল। আজ সকালে উঠতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে। কি জানি এতক্ষণ আবার কি হ'ল। তা তুমি বাবা যদি ডাক্তারকে একটিবার ডেকে আন, আমি ততক্ষণ মেয়েটির কাছে যাই। এই গলীর একেবারে শেষে যে খোলার ঘর, সেইখানেই মেয়েটি আছে। ওখানে গিয়ে লক্ষ্মীর মা ব'লে ডাক্‌লেই আমি বেরিয়ে আসব। যাও বাবা, ভগবান্ তোমার ভাল করবেন।"

নিশীথ কি ভাবিয়া একটু যেন অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছিল। তাহা দেখিয়া প্রৌঢ়ার ভাবনা হইয়াছিল, হয় ত সে আপত্তি করিবে। এ কথায় সচেতন হইয়া নিশীথ বলিল, "আপনি ফিরে যান তাঁর কাছে। আমি যত শীঘ্র পারি, ডাক্তার নিয়ে আসছি।"

বলিয়া নিশীথ দ্রুতবেগে বড় রাস্তার দিকে গেল। প্রৌঢ়াও গলীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

মিনিট পনেরোর মধ্যে নিশীথ এক জন ডাক্তারের সঙ্গে সেই গলীর শেষে খোলার ঘরের সম্মুখে আসিয়া লক্ষ্মীর মাকে ডাকিল।

ডাক শুনামাত্র লক্ষ্মীর মা ছুটিয়া আসিয়া দুয়ার খুলিয়া দিয়া কহিল, "শীগ্‌গির এস বাবা। মেয়েটি বুঝি মারা যায়।"

ব্যস্ত হইয়া দুই জনে মাথা নীচু করিয়া সাবধানে ক্ষুদ্র দ্বার দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

ছোট ঘর। মেঝের উপর একটি সামান্য শয্যা বিছানো: নিশীথ সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, সেই শয্যায় কবিতার সংজ্ঞাহীন দেহ শায়িত। কবিতাকে এ অবস্থায় দেখিয়া নিশীথের মুখ হইতে একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ বাহির হইল।

ডাক্তার নিশীথের মুখের পানে চাহিয়া বলিল, "আপনি এঁকে জানেন ?"

নিশীথ বলিল, "হ্যাঁ, ইনি আমার বিশেষ আত্মীয়া। বড় অভিমানে ইনি সুখের সংসার ছেড়ে এসে এত কষ্ট পাচ্ছেন। ছ'মাস ধ'রে আমি এঁর সন্ধানে ঘুরছি।"

আর কোন কথা না কহিয়া ডাক্তার রোগিণীর পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমে তাহার বক্ষঃ পরীক্ষা করিয়া ব্যাগ হইতে একটি ঔষধ বাহির করিয়া ধীরে ধীরে তাহা রোগিণীর দেহে প্রয়োগ করিলেন। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাটিয়া গেল ক্রমে কবিতা একবার চক্ষু মেলিল। প্রথমটা সে কিছুই বুঝিতে পারিল না। পরে নিশীথকে চিনিতে পারিয়া বড় বড় চক্ষু মেলিয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিল। রোগিণী সম্বন্ধে দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিয়া ঔষধ লিখিয়া দিয়া ডাক্তার উঠিলেন। কাগজখানি হাতে লইয়া নিশীথ ডাক্তারের সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িল। বলিয়া গেল, ঔষধ লইয়া সে এখনই ফিরিবে।

বাহিরে আসিয়া ডাক্তার বলিলেন, "অবস্থা ভাল নয়। হার্ট অত্যন্ত দুর্ব্বল। এ দিকে এনিমিয়া (রক্তাল্পতা) বড়ই বেশী। তার উপর এত দিন ধ'রে রোগ অগ্রাহ্য ক'রে আসা হয়েছে। চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা হয় নি।"

নিশীথ জিজ্ঞাসা করিল, "একেবারে কি কোন আশা নেই, এমন অবস্থা ?"

ডাক্তার বলিলেন, "কোন আশা নেই, এ কথা বলিনে। তবে আশা বড় কম। যদি কিছু আশা থাকে, সেও সুচিকিৎসা, সুপথ্য ও সুব্যবস্থার উপর নির্ভর করে।"

নিশীথ বলিল, "আপনি রোগিণীকে যে ভাবে রাখতে বলবেন, আমি সেই ভাবেই ব্যবস্থা করব।"

নিশীথ ডাক্তারের বাসা পর্য্যন্ত আসিয়া তাহার হাতে ফিএর টাকা দিল ও একটু ঘুরিয়া ঔষধ ও পথ্য কিনিয়া যখন ফিরিল, দেখিল, কবিতা একটু সুস্থ হইয়াছে।

নিশীথ আসিয়া প্রথমে কবিতাকে এক দাগ ঔষধ খাওয়াইয়া দিল। পরে বেদানার রস করিয়া চামচ করিয়া ধীরে ধীরে মুখে দিতে লাগিল। কবিতা ক্ষীণ কণ্ঠে আপত্তি করিতে যাইতেছিল, কিন্তু নিশীথ তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া বলিল, "এখন আপনার কোন কথা শুনব না। আপনি আমাকে বড় কষ্ট দিয়েছেন ; নিজেও ততোধিক কষ্ট পেয়েছেন। আর নয়।"

প্রৌঢ়া বুঝিল, নিশীথ কবিতার বিশেষ আত্মীয়। ভগবান্ এই সঙ্কটের সময় ইহাকে মিলাইয়া দিয়াছেন। এতক্ষণে একটু আশ্বস্ত হইয়া সে আপন কার্য্যে উঠিয়া গেল।

সর্ব্বকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া নিশীথ কবিতার সেবায় মন দিল। দিনান্তে কেবল একটিবার বাড়ীতে যাইত। বৃদ্ধ ভৃত্যের হাতে গৃহের সমস্ত ভার ছাড়িয়া দিয়া বাকি সমস্ত সময় সে কবিতার কাছেই থাকিত।

এই সময়ের মধ্যে প্রৌঢ়ার কাছ হইতে নিশীথ জানিয়া লইল, কবিতা একটি মেয়েকে লেখাপড়া ও গান-বাজনা শিখাইত ও চারি ঘণ্টা পরিশ্রমের ফলে সে মাসে মাসে ১৫ টাকা উপার্জ্জন করিত। ইহা হইতে ৫ টাকা ঘর-ভাড়া দিয়া বাকি ১০ টাকায় সে নিজের সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিত। কায করিতে করিতে সে বড়ই অসুস্থ হইয়া পড়িল। শেষে কবিতার আর চলিবার সামর্থ্য রহিল না। তখন সে শয্যা গ্রহণ করিল।

মাসখানেক চিকিৎসার পর কবিতার বাঁচিবার আশা হইল।

কবিতা এক দিন বলিল, "এত কষ্ট ক'রে কেন আমাকে বাঁচালেন ? আমার জীবনে কারও কোন দরকার নেই। মরণ হলেই যে আমি অনেক দুঃখ—অনেক কষ্টের হাত থেকে বাঁচতাম।"

নিশীথ তাহার মুখে হাত দিয়া কথা বন্ধ করিয়া দিল। বলিল, "আপনি ও কথা বল্‌বেন না। আপনার জীবনে আমার যে কত দরকার, সে কথা আপনাকে কি ক'রে জানাব ? আজ হতে আপনার সমস্ত ভার বইবার অধিকার আমাকে দয়া ক'রে দিন। আমি তা হ'লে ধন্য হব। আপনি আমাকে যে সংবাদ দিয়ে পালিয়ে এসেছিলেন, তাতে আমার মতের এতটুকুও পরিবর্ত্তন করতে পারে নি। আমি এখনও আপনাকে পাবার জন্য তেমনই উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি। ভালবাসা থেকেই ভালবাসার উদ্ভব। আপনাকে সারাজীবন ভালবেসে যদি আমার জীবনের শেষক্ষণটিতেও আপনার ভালবাসা পাই, তা হলেই আমার যথেষ্ট।"

কবিতা সমস্ত কথা শান্ত হইয়া শুনিল; কিন্তু কোন উত্তর দিল না।

নিশীথ আবার বলিল, "কিন্তু যদি আপনার এখনও এতে আপত্তি থাকে, তা হ'লে আমি কোন জোর করতে চাইনে। আপনার কাছে আমার প্রার্থনা যে, আমার ভয়ে আপনি আর পালাবেন না। আর কোন অধিকার আমাকে না দেন, অন্ততঃ আপনাকে সম্পূর্ণ সুস্থ ক'রে তোলবার অধিকারটুকু আমাকে দেবেন। বেশী চাইতে গিয়ে একবার আপনাকে হারাতে বসেছিলাম, আর বেশী চাইব না।"

এবার কবিতার চোখে জল আসিল। বলিল, "আমার সব চেয়ে বড় দুঃখ যে, আপনাকে আমি বড় দুঃখ দিইছি।"

নিশীথ কবিতার চক্ষু মুছাইয়া দিয়া বলিল, "আপনি চোখের জল ফেলবেন না। আপনার চোখের জল আমি সইতে পারি নে। আপনার মুখের একটি কথাও যদি আমি পাই, তাই আমি পরম লাভ ব'লে মনে করব। বেশী লোভ আমি আর করব না।"

কবিতা নীরবে বাতায়নের দিকে কয়েক মুহূর্ত্ত চাহিয়া রহিল। তার পর নিশীথের দিকে মুখ ফিরাইয়া মৃদুস্বরে বলিল, "আমি বড় অভাগিনী। সব জেনেও আপনি আমাকে যে পবিত্র অধিকার দিতে চাইছেন, তার যোগ্য আমি নই। তবে আপনার অবাধ্য হবার শক্তি আমি হারিয়েছি।"

নিশীথ এই স্বল্প কথায় উল্লসিত হইয়া উঠিল। তাহার সাধ মিটিবে? ভগবানের দয়া কি সে পাইবে? অশ্রুসিক্ত নয়নে সে কবিতার দিকে চাহিয়া চাহিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

৭

নিশীথ এত আনন্দ জীবনে কখন পায় নাই। কবিতা প্রকারান্তরে তাহাকে বিবাহ করিতে স্বীকার করিয়াছে, এ আনন্দ তাহার রাখিবার স্থান নাই। প্রথম দৃষ্টিতেই সে কবিতাকে ভালবাসিয়াছিল। কিন্তু সে ভালবাসা নিষিদ্ধ বুঝিয়া তাহা অতি সঙ্গোপনে তাহার হৃদয়ের অন্তস্থলে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। কবিতাকে দেখা, তাহার মুখের অমৃত-মধুর বাণী শোনা—ইহাই তাহার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখ বলিয়া মানিয়া লইয়াছিল।

বিবাহের জন্য কেহ বড় একটা বলিবার ছিল না। পুরাতন ভৃত্য কেবল মাঝে মাঝে জ্বালাতন করিত। তাহাকে সে একবারে হতাশ করিত না। বলিত, সুযোগ পাইলে—সুবিধা হইলে বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু কবিতাকে দেখিয়া অবধি সে বিবাহের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়াছিল। কিন্তু যখন সে জানিল, রমেশ হৃদয়হীনের মত কবিতাকে একপ্রকার পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহাকে বিবাহ করিতে সে পারিবে না, ইহাও বলিয়াছে, এবং কবিতাও ইহার কোন প্রতীকার চাহে না, সেই ক্ষণেই তাহার সঙ্গোপনে লুকায়িত ভালবাসা প্রথম আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। প্রতিদান পাইবে না জানিয়াও সে নিরাশ হয় নাই। পরম ধৈর্য্যের সহিত খুঁজিয়া খুঁজিয়া এক দিন কবিতাকে সে বাহির করিয়াছে। তাহার ভালবাসা পায় নাই, কিন্তু তাহাকে সেবা ও সাহায্য করিবার সুযোগ পাইয়া সে ধন্য হইয়া গিয়াছে। দিনের পর দিন তাহাকে সে দেখিয়াছে, তাহার মুখের কথা শুনিয়াছে, তাহাকে শুশ্রূষা করিয়া সুস্থ করিয়া তুলিয়াছে। ইহাই তাহার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা বড় সৌভাগ্য। তাহার পর আজ তাহার অসীম ধৈর্য্য ও অবিচল প্রেমের জয় হইয়াছে। আজ কবিতা তাহার প্রস্তাবে উপেক্ষা প্রকাশ করে নাই। সে তাহার অবাধ্য আর হইবে না বলিয়াছে।

এ আনন্দ আর নিশীথকে এক স্থানে স্থির থাকিতে দিল না। কবিতার কাছ হইতে উঠিয়া দ্বিপ্রহরে সে একবার বাহিরে আসিল। পথ চলিতে চলিতে ভাবিল, সংসারে তাহার কেহই নাই। কাহাকে আজ সে এই অপূর্ব্ব অপ্রত্যাশিত আনন্দের ভাগ দিবে? বাড়ীতে একমাত্র পুরাতন বৃদ্ধ ভৃত্যই তাহার বহুদিনকার সাথী। তাহাকেই আজ সে এই সংবাদ শুনাইবে। কতবার বিবাহের অনুরোধ করিয়া সে বিফল হইয়াছে; আজ সে এ সংবাদে নিশ্চয়ই আনন্দিত হইবে।

নিশীথ ব্যগ্রভাবে বাসার দিকে চলিল। বড় রাস্তায় পড়িয়াও তাহার ট্রাম ধরিবার কথা মনে হইল না। কবিতার কথা ভাবিতে ভাবিতে সে দ্রুতবেগে পথ বাহিয়া চলিতে লাগিল।

হঠাৎ পিছন হইতে তাহার পিঠে কে হাত রাখিয়া ডাকিল,—"নিশীথ বাবু!"

চমকিত হইয়া নিশীথ পিছন ফিরিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার বিস্ময়ের অন্ত রহিল না। দেখিল, রমেশ তাহার পিছনে দাঁড়াইয়া। "এ কি, আপনি কোথা থেকে" বলিয়া নিশীথ লক্ষ্য করিয়া দেখিল, রমেশ অত্যন্ত শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। এই কয় মাসেই তাহার শরীরে এত পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে, তাহাকে দেখিলে আর পূর্ব্বের রমেশ বলিয়া বোঝা যায় না।

রমেশ কহিল, কত দিন থেকে আপনাকে খুঁজছি, দেখতে পাইনে।"

নিশীথ একটু রুক্ষস্বরে বলিল, "কি দরকার, বলুন।"

রমেশ একটু যেন থতমত খাইয়া গেল। বলিল, "চলুন না, হেদুয়ার মধ্যে গিয়ে একটু বসি গে!"

উভয়ে আসিয়া হেদুয়ার মধ্যে একখানি বেঞ্চ অধিকার করিয়া বসিল।

রমেশ জিজ্ঞাসা করিল,"কবিতার কোন খবর জানেন?"

নিশীথ ক্ষণেকের জন্য কি ভাবিয়া লইল। পরে বলিল, "কেন, তাঁর কি হয়েছে?"

রমেশ বলিল, "আমারই দোষে আমি কবিতাকে হারিয়েছি।"

নিশীথ জিজ্ঞাসা করিল, "তার মানে?"

রমেশ একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "কবিতাকে বিবাহ করব ব'লে শেষে অস্বীকার করেছিলাম। তার উপর অন্যত্র বিবাহ করতে চেয়েছিলাম; তাই সে মনের দুঃখে কোথায় চ'লে গেছে।"

নিশীথ বলিল, "এ কথা কি ক'রে আপনি জানলেন?"

রমেশ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "যাবার আগে কবিতা আমার জন্য একখানা চিঠি রেখে যায়।"

"কেন?"

"বিবাহের কথা অস্বীকার ক'রে আমি অতি পাষণ্ডের [illegible] করেছিলাম। সে পত্রে লিখে গিয়েছিল যে, স্নে[illegible] ভাবে আর আমার অন্ন খেতে অনিচ্ছুক। সে জন্য [illegible] চেষ্টায় নিজের অন্ন উপার্জ্জন করতে সে বা'র [illegible]ছে। সে পত্র পেয়ে আমার আর বিবাহে প্রবৃত্তি [illegible] না। নিজে যে কত বড় অন্যায় করেছি, এত দিন পরে তা চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠল। বাবাকে সব কথা বললাম এবং তিনি অসন্তুষ্ট হবেন, এই ভয়ে কথাটা গোপন করেছিলাম, তাও তাঁহাকে বললাম।"

"তিনি কি বললেন?"

"তিনি বললেন, তুমি মহা অন্যায় করেছ। এখন থেকে তোমার এই চেষ্টা করা উচিত—যাতে সেই অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করতে পার। তুমি তাঁকে খুঁজে বা'র কর, আমি নিজে মন্ত্র পড়িয়ে তোমাদের বিবাহ দেব।"

নিশীথ সব শুনিয়া গেল; কোন উত্তর দিল না। আর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া রমেশ বলিল, "বাবার কথা শুনে অবাক্ হয়ে গেলাম। তিনি এত উদার, আর আমি এত নীচ! ধিক্কারে হৃদয় ভ'রে গেল। সেই দিন থেকে দিন-রাত্রি কবিতার খোঁজ ক'রে বেড়াচ্ছি। তিন চার মাস কেটে গেল, কোন সন্ধানই পেলাম না। হাতের কাছে পেয়ে যে লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেলেছিলাম, আজ মাথা খুঁড়েও তাঁকে পাচ্ছিনে।"

অশ্রুবাষ্পে রমেশের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

নিশীথ আনমনে কি ভাবিতে লাগিল। তার পর বলিল, "তা হ'লে এখন উঠি।"

রমেশও সঙ্গে সঙ্গে উঠিল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "যদি পারেন, কবিতার একটু সন্ধান নেবেন।"

"বেশ" বলিয়া নিশীথ দ্রুতপদে সে স্থান ত্যাগ করিল।

বড় আনন্দেই নিশীথ আসিতেছিল। অর্দ্ধপথেই তাহার সকল আনন্দ নিভিয়া গেল। অবসন্ন দেহ ও মন লইয়া সে বাড়ী ফিরিল। শুভের পথে বিঘ্ন আসিয়া দেখা দিল। বৃদ্ধ ভৃত্যকে আর শুভ সংবাদটা দেওয়া হইল না।

বাড়ী ঢুকিয়াই সে যেন আপনাকে নির্জ্জীব বলিয়া মনে করিল। কিছুক্ষণ বিশ্রামের জন্য সে শয্যায় শুইয়া পড়িল। কিন্তু তাহার উত্তেজিত মস্তিষ্ক তাহাকে একটুও বিশ্রাম করিতে দিল না। এই প্রশ্ন কেবলই তাহার মনে জাগিতে লাগিল—এখন সে কি করিবে? মনের মধ্য হইতে সে প্রথমতঃ কোনও উত্তর পাইল না। কিন্তু পরে তাহার মন জোর করিয়া বলিল, কেন? কবিতা সুস্থ হইলেই নিশীথ তাহাকে বিবাহ করিবে। তাহার কি দোষ? সে ত

কোন জোর করে নাই। কবিতা যখন স্বেচ্ছায় নিজে হইতে বলিয়াছে, আর সে তাহার অবাধ্য হইবে না, তখন ত চিন্তার কিছুই নাই। রমেশ যখন বিবাহ করিবে বলিয়া কবিতাকে প্রবঞ্চনা করিয়াছে, তাহাকে বিবাহ করিতে অস্বীকার করিয়াছে, তখন হইতেই সে কবিতার উপর সকল অধিকার হারাইয়াছে। ইহা কি সত্য নহে?

নিশীথ ভাবিতে লাগিল।

না, সে ত কাহাকেও প্রবঞ্চনা করে নাই, কোন মিথ্যা কথাও বলে নাই। শুধু হৃদয়ের প্রেরণায় কবিতার দুঃখকে সহনযোগ্য করিবার প্রয়াস পাইয়াছে। ইহাতে তাহার কোন অপরাধ হইতে পারে কি?

নিশীথ নয়ন মুদ্রিত করিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সহসা তাহার মনে হইল, কিন্তু এখন রমেশ কবিতাকে ফিরিয়া পাইলেই বাঁচিয়া যায়, ইহা জানিয়াও ত সে কবিতার সংবাদ প্রকাশ করিতে চাহে না। আজ যদি কোন ক্রমে রমেশ কবিতার সন্ধান পায় এবং সেখানে গিয়া কবিতার কাছে ক্ষমা চাহে, তাহা হইলে কবিতার অনুরাগ কি নবীভূত হইবে না—তখন কি আর তাহার কথা কবিতার মনের কোণেও থাকিবে?

কিন্তু কেনই বা এ কথা সে কবিতাকে বলিতে যাইবে? নিজের স্বার্থ—জগতে কে না চাহে? সে ত কবিতাকে পাইবার জন্য এ পর্য্যন্ত কোন প্রবঞ্চনার আশ্রয় লয় নাই। এখন যখন সব কথা শেষ হইয়া গিয়াছে, কবিতা যখন তাহাকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইয়াছে, তখন সে ব্যবস্থা কেন সে উলট-পালট করিয়া দিবে? না, সে এ কথা বলিতে বাধ্য নহে—ধর্ম্মতঃ ন্যায়তঃ কোন প্রকারেই নয়।

চক্ষু মুদিয়া এইরূপ নানা চিন্তা করিতে করিতে দিন শেষ সীমায় আসিয়া পৌঁছিল। সন্ধ্যা হইতেই নিশীথ আবার বাড়ী হইতে বাহির হইল। অন্য দিন সে শীঘ্র কবিতার কাছে পৌঁছিবার জন্য ব্যগ্র হইত, আজ আর সে ব্যগ্রতা নাই। হাঁটিয়া সে ধীরে ধীরে কবিতার বাসার দিকে অগ্রসর হইল।

অন্য দিন সে কবিতার ঘরের সম্মুখে আসিবামাত্র অধীর আগ্রহে কবিতাকে ডাকিত ও ডাকিবামাত্র কবিতা দুর্ব্বল শরীরে দুয়ার খুলিয়া দিত। আজ আর তাহার ডাকিতে সাহস হইল না।

ক্ষুদ্র স্বল্প পরিসর পথ, লোকেরও কোন দেখা-শোনা নাই। নিশীথ দুয়ারের সম্মুখে আসিয়া ক্ষণকাল স্থির হইয়া দাঁড়াইল। কিছু পরে ডাকিতে যাইবে, এমন সময় একটা ক্রন্দনের আভাস তাহার কাণে আসিল। নিশীথ কাণ পাতিয়া রহিল।

প্রৌঢ়া বলিল, "কেঁদো না মা, শান্ত হও। ভগবান্ যাকে দিচ্ছেন, তাকে নিয়েই সুখে থেকো, মা। ছেলেটি তোমায় সত্যিই ভালবাসে!"

কবিতার গলা শুনা গেল। সে বলিল, "তিনি যে কত বড়, কত মহৎ, তা কি আমি বুঝিনে! কিন্তু এখনও যে আমি তাঁকে একটুও ভুলতে পারি নি।"

প্রৌঢ়া বলিল, "কি করবে, মা! সে যে তোমাকে বিবাহ করব ব'লে শেষে চোরের মত স'রে দাঁড়াল। যে এত বড় অমানুষ, তার কথা মনে ক'রে আর কষ্ট পেও না। সে মানুষ নয়।"

কবিতা কাঁদিয়া বলিল, "তবু যে তাঁর উপর আমি রাগ করতে পারি নে, মা। এত যে দুঃখ দিয়েছে, তবু সে নিষ্ঠুর একবার যদি কাছে এসে বলে—এস, অমনি ছুটে তার পায়ের কাছে যাবার পথ পাই নে। আর দু'দিন পরে তার কথা পর্য্যন্ত ভাবা আমার উচিত হবে না—এই কি আমার কম দুঃখ। অথচ এই আমাকে করতে হবে। আমার যে অন্য পথ নেই।"

এই কথাবার্ত্তা নিশীথ আর সহিতে পারিল না। ইহার প্রত্যেক অক্ষরটি যেন তাহার বুকে তীক্ষ্ণ ছুরিকার আঘাত করিতেছিল। অথচ প্রত্যেক কথাটি সত্য। ইহার জন্য কবিতাকে একটুও দোষ দেওয়া যায় না।

নিশীথ নিঃশব্দে দুয়ারের কাছ হইতে সরিয়া গেল। পথ বাহিয়া আবার বড় রাস্তায় পড়িয়া জনস্রোতে মিশিয়া গেল। এইরূপে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরিয়া কিছুক্ষণ কাটাইয়া দিল। তার পর আবার সেই গলীর মধ্যে ঢুকিয়া দ্রুতপদে কবিতার ঘরের সম্মুখে আসিয়াই দুয়ারের কড়া নাড়িল। নিশীথের মনে ভয় হইতেছিল, পাছে আবার পূর্ব্বের মত কোন অতি অপ্রিয় সত্য কাণে আসে।

একটু পরেই কবিতা আসিয়া দুয়ার খুলিয়া দিয়া আবার শয্যায় ফিরিয়া গেল। নিশীথ শয্যার কাছে মেঝের

উপর বসিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কেমন আছেন ?"

কবিতা ক্লান্তস্বরে বলিল, "ভালই আছি।"

নিশীথ জিজ্ঞাসা করিল, "ঔষধ খেয়েছেন ?"

ঔষধের কথা মনে পড়ায় কবিতা লজ্জিত হইয়া বলিল, "সেই দুপুরে খেয়েছিলাম, তার পর ভুলে গেছি।"

নিশীথ সামান্য একটু অনুযোগ করিয়া তৎক্ষণাৎ এক দাগ ঔষধ খাওয়াইয়া দিল।

ঔষধ-সেবনের সময় নিশীথের মুখের প্রতি কবিতার দৃষ্টি পড়িল। নিশীথকে আজ অত্যন্ত শ্রান্ত দেখাইতেছিল।

কবিতা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার শরীর কি আজ ভাল নেই ?"

নিশীথ চমকিত হইয়া বলিল, "কেন, ভালই ত আছি। তবে একটু ঘুরতে হয়েছিল ; তাই একটু ক্লান্ত আছি।"

কবিতা বলিল, "কোথায় গিয়েছিলেন ? বেড়াতে বুঝি ?"

নিশীথ বলিল, "না, এমনই আজ হাঁটতে হাটতে গিয়েছিলাম।"

কবিতা বিস্মিত হইয়া বলিল, "এই এতটা পথ দুপুর রোদে হেঁটে গেলেন কি ব'লে ?"

নিশীথ নিরুপায় হইয়া বলিল, "দুই এক জন বন্ধুলোকের সঙ্গে পথে দেখা হ'ল, কথা কইতে কইতে অনেক দূর চ'লে গেলাম। শেষে আর একটুখানির জন্য আর ট্রামে উঠলেম না।"

কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা না হইলেও আংশিক মিথ্যা। সত্যকে আংশিক গোপন করিবার যে চেষ্টা, তাহা মিথ্যারই নামান্তর। তাই এই যত্নরচিত মিথ্যার গ্লানিতে তাহার [illegible] ভরিয়া গেল।

আর ঘণ্টাখানেক বাদে নিশীথ কবিতাকে পথ্য দিল। তার পর কবিতা ধীরে ধীরে ঘুমাইয়া পড়িল।

কবিতার অসুখের বাড়াবাড়ির সময় নিশীথ ঐ ঘরেই [illegible]ত, অনেক সময় প্রৌঢ়া নারীও থাকিতেন। আজ- [illegible] কবিতা কিছু কিছু সুস্থ হইয়াছে, তাই কবিতার কক্ষের [illegible] বাহির হইতে বন্ধ করিয়া দিয়া দুয়ারের সম্মুখের বারান্দায় চৌকি পাতিয়া নিশীথ শয়ন করিত। আজিও [illegible] করিল।

রাত্রি বাড়িয়া চলিল। শুক্লাষ্টমীর চন্দ্র তাহার শেষ জ্যোৎস্না দিয়া কুটীরের ক্ষুদ্র অঙ্গন ধৌত করিয়া ধীরে ধীরে অস্ত গেল। তখনও নিশীথ তাহার নিদ্রাহীন নেত্রে চাহিয়া রহিল। হঠাৎ একটা অর্দ্ধস্ফুট ক্রন্দনের শব্দে চমকিত হইয়া নিশীথ দাঁড়াইয়া উঠিল। শব্দ কক্ষের ভিতর হইতে আসিতেছিল। ব্যস্ত হইয়া নিশীথ দুয়ার আস্তে আস্তে খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। কক্ষমধ্যস্থ মন্দীভূত আলোকে নিশীথ দেখিল, কবিতা পাশ ফিরিয়া শুইয়া নিম্নস্বরে কাঁদিতেছে আর তাহার চক্ষু হইতে বিন্দু বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে। সস্নেহে গায়ে হাত দিয়া কবিতাকে সান্ত্বনার কথা বলিতে যাইবে, এমন সময় কবিতা চক্ষু মুদ্রিত রাখিয়াই বলিল, "কি করব, ক্ষমা করো। এখন আর আমার ফিরে যাবার উপায় নেই। নিশীথ বাবুর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার ঋণের অন্ত নেই। নইলে—"

ঘুমঘোরে এই পর্য্যন্ত বলিয়া কবিতা স্তব্ধ হইল। তাহার আননে স্বপ্নের আভাস মিলাইয়া গেল। আবার সে নিদ্রাভারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

নিশীথ ক্ষণকাল কবিতার নিদ্রিত মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ধীরে ধীরে বাহিরে আসিল।

বাহিরে তখন আর জ্যোৎস্নার কোন চিহ্ন পর্য্যন্ত ছিল না। কে যেন তখন ধরিত্রীর বক্ষঃ হইতে সমস্ত জ্যোৎস্না নিঃশেষে মুছিয়া লইয়া ধীরে ধীরে অন্ধকার বিছাইয়া দিতেছিল। নিশীথের অন্তরের জ্যোৎস্নাও আজ নিঃশেষে ফুরাইয়া গিয়া এমনই অন্ধকারে ভরিয়া গিয়াছিল।

শয্যায় শুইয়া পড়িয়া তাহার কর্ত্তব্য কি, নিশীথ তাহাই ভাবিতে লাগিল। জাগ্রত অবস্থায় কবিতা বলিয়াছে—এখনও যদি সে নিষ্ঠুর আসিয়া আমাকে ডাকিয়া বলে, 'এস,' অমনি ছুটিয়া তাহার পায়ে পড়বার পথ পাই না। স্বপ্নের ঘোরে বলিয়াছে—"নিশীথ বাবুর কাছে যে আমার কৃতজ্ঞতার ঋণের অন্ত নেই। নইলে—"

হায় রে কৃতজ্ঞতার ঋণ! ভালবাসার কাছে যে তাহার মাথা তুলিবারও শক্তি নাই! এই তুচ্ছ কৃতজ্ঞতার ভারে কি শেষটা সে কবিতার জীবন দুর্ব্বহ করিয়া তুলিবে ? এমনই করিয়া কি কৃতজ্ঞতা ভালবাসার কণ্ঠরোধ করিয়া রাখিবে ? কবিতার যে ভালবাসা এত অনাদরেও মলিন হয় নাই, যাহা

এখনও শুধু একটিবারমাত্র ক্ষুদ্র একটি আহ্বানের জন্য উৎকর্ণ হইয়া আছে, সে ভালবাসাকে কৃতজ্ঞতার আলেয়ায় পথহারা করিয়া কি লাভ? তাহার অপেক্ষা কবিতাকে সুখিনী করাই কি উচিত নহে? রমেশের অবহেলা যখন তাহার অনুতাপের অশ্রুতে ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে, তখন আর এই স্রোতস্বতীর বেগভরা ভালবাসাকে কৃতজ্ঞতার দুর্ব্বল বাঁধ দিয়া আড়াল করিবার ব্যর্থ-চেষ্টা করিয়া কি লাভ? তাহার চেয়ে কবিতার ভালবাসাই সার্থক হউক, তাহার দুঃখ দূর হউক, কৃতজ্ঞতার বন্ধন হইতে সে মুক্তিলাভ করুক —সে সুখিনী হউক!

অনুচ্চস্বরে সে বারকয়েক আপন মনে বলিল,— "কবিতার দুঃখ দূর হোক্—কবিতার ভালবাসা সার্থক হোক্ — কবিতা মুক্তিলাভ করুক!"

সঙ্গে সঙ্গে নিশীথের উদার চিত্তের প্রসার বাড়িয়া গেল। সমস্ত মন দিয়া সে অনুভব করিল যে, রমেশের চিত্ত-পরিবর্ত্তনের কথা কবিতার কাছ হইতে গোপন রাখিবার প্রবৃত্তি আর ক্ষণকালের জন্যও যেন তাহার না হয়।

এতক্ষণে নিশীথের হৃদয়ের ভার বহু পরিমাণে লঘু হইয়া গেল। ভোরের শীতল বাতাস তাহার তপ্ত অঙ্গে যেন মায়ের স্নেহ-হস্ত বুলাইয়া দিল। উষার স্নিগ্ধ আলোকের প্রথম রশ্মিরেখা যেন তাহার অবজ্ঞাত ললাটে জয়টীকা পরাইল।

আবেগে তাহার দুটি চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল।

৮

প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের পর কবিতা উঠিয়া বসিল। গত রাত্রির স্বপ্নের প্রভাব তখনও তাহার অন্তর হইতে মুছিয়া যায় নাই। কবিতার ক্লিষ্ট মুখের পানে চাহিয়া নিশীথের চিত্ত অনুশোচনায় ভরিয়া গেল।

ঔষধ সেবন করাইয়া নিশীথ কবিতার সঙ্গে সহজ ভাবেই কথাবার্ত্তা কহিল। বেলা ১০টার মধ্যে কবিতাকে পথ্য দিয়া নিশীথ হঠাৎ বলিল, "কাল রমেশ বাবুর সঙ্গে আমার হঠাৎ দেখা হয়েছিল; আপনাকে বলতে পারি নি।"

কবিতা চমকিত হইয়া বিস্মিত দৃষ্টিতে নিশীথের পানে চাহিল। দেখিতে দেখিতে তাহার চক্ষু দুইটিতে কাতরতা ফুটিয়া উঠিল।

নিশীথ বলিল, "আপনি এখনও যে তাঁকে ভুলতে পারেন নি—তা আমি বুঝিছি। এত অবিচার ও অবহেলাতেও আপনার ভালবাসা ম্লান হয় নি, তাই আপনার ভালবাসার জয় হয়েছে। রমেশ বাবুর অন্তরে অনুতাপ এসেছে। এখন তিনি আপনাকে ফিরে পাবার জন্য অস্থির হয়েছেন।"

এবার কবিতার চক্ষু দিয়া অবিরলধারে অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

নিশীথ আবার বলিল, "কাল আমি বড় আশায় আশান্বিত হয়েছিলাম। ব্যস্ত হয়ে বাড়ী যাচ্ছিলাম। এমন সময় পথেই তাঁর সঙ্গে দেখা। কালই প্রথম জেনেছি যে, তাঁর মনের এত পরিবর্ত্তন হয়েছে। কিন্তু তখনই সবে আমি অমূল্য সম্পদের প্রতিশ্রুতি পেয়েছি, তখনই তা নিঃস্বত্ব হয়ে ছেড়ে দিতে মন চাইল না। তাই তাঁকে আমি কাল আপনার কোন খবর দিতে পারি নি। আমার এই দুর্ব্বলতাকে আপনি ক্ষমা করবেন। কালকের পাপের আজই আমি প্রায়শ্চিত্ত করব।"

বলিয়া নিশীথ উঠিয়া দাঁড়াইল ও কবিতা কিছু বলিবার পূর্ব্বে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। বাহিরে আসিয়া প্রৌঢ়াকে এ বিষয়ে কিছু আভাস দিয়া এবং সে না আসা পর্য্যন্ত আজ কবিতার কাছে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিয়া নিশীথ পথে আসিয়া দাঁড়াইল।

* * * *

সন্ধ্যার সময় একখানি গাড়ী সেই গলীর সম্মুখে আসিয়া থামিল এবং সেই গাড়ী হইতে রমেশ ও তাহার পিতা চন্দ্রনাথের সহিত নিশীথ নামিল। তিন জনেই নগ্নপদ। রমেশের হাতে একটি কাগজের বড় মোড়কে বাঁধা কতকগুলি জিনিষপত্র; চন্দ্রনাথের হাতে শালগ্রাম-শিলা। নিশীথের হাতে দুইগাছি সাদা ফুলের মালা ও পূজার উপকরণ।

বোধ হয়, ইঁহাদেরই আগমনের অপেক্ষায় দুয়ার ভিতর হইতে অর্গলমুক্ত ছিল। চন্দ্রনাথ ও রমেশকে লইয়া নিশীথ ভিতরে প্রবেশ করিয়া দুয়ার রুদ্ধ করিয়া দিল। রমেশকে বাহিরে রাখিয়া চন্দ্রনাথকে সঙ্গে লইয়া নিশীথ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। নিশীথের সঙ্গে অপরিচিত সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ চন্দ্রনাথকে দেখিয়া সম্ভ্রম ও বিস্ময়ভরে কবিতা উঠিতে যাইতেছিল, চন্দ্রনাথ স্নেহস্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "শুয়ে থাক মা, ব্যস্ত হয়ো না। আমি রমেশের পিতা। রমেশ

তোমার উপর যে অন্যায় করেছে, আজ আমরা তারই প্রতিবিধান করতে এসেছি, আর আমার মুর্খ ছেলের হয়ে ক্ষমা চাইতেও এসেছি। কেন মা আমার কাছে একটিবার আসনি? যদি আসতে, তা হ'লে ত মা, জানকীর মত তোমাকে নির্ব্বাসনে থাকতে হ'ত না।"

বাক্যহতা কবিতার অশ্রুবাষ্পাচ্ছন্ন দৃষ্টির সম্মুখে চন্দ্রনাথ আসন-শুদ্ধ শালগ্রামশিলা রক্ষা করিয়া সামনাসামনি দুইখানি ও পাশে একখানি আসন পাতিলেন ও পূজার উপকরণাদি গুছাইয়া রাখিলেন। তাহার পর কবিতার পানে চাহিয়া বলিলেন, "একটুখানির জন্য উঠে বসতে হবে যে, মা! পারবে না?"

মন্ত্রমুগ্ধার মত কবিতা ধীরে ধীরে উঠিয়া চন্দ্রনাথের নির্দ্দিষ্ট আসনে বসিল। তাঁহার আহ্বানে রমেশও আসিয়া কবিতার সম্মুখের আসনে নতমুখে বসিল। তার পর চন্দ্রনাথ মন্ত্র পাঠ করিলেন। মন্ত্র বলিয়া কবিতা তাঁহার নির্দ্দেশমত আপনাকে আপনি সম্প্রদান করিল। রমেশ অনুতাপশুদ্ধ চিত্তে পিতার কথামত মন্ত্র পড়িয়া কবিতাকে গ্রহণ করিল। নিশীথ আপনার হৃদয়-ধূপ পুড়াইয়া মুগ্ধ চিত্তে শুনিল, দুজনেই দুজনকে বলিতেছে—যদস্তি হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব।

"এবার মা তুমি বিশ্রাম কর" বলিয়া রমেশ ও কবিতাকে সেই কক্ষে রাখিয়া চন্দ্রনাথ বাহিরে আসিলেন। আবার পর-দিন প্রভাতে আসিয়া তিনি তাহাদিগকে লইয়া যাইবেন, সে কথাও জানাইয়া গেলেন। নিশীথও সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসিল।

কবিতার বক্ষ তখন দুরু দুরু করিয়া কাঁপিতেছিল। তাহার সর্ব্বদেহ বেতসপত্রের মত দুলিতেছিল। কিছুক্ষণ কাহারও মুখে কোনও কথা আসিল না। ক্ষণ পরে রমেশ তাহার নতনেত্র তুলিয়া দুটি কর জুড়িয়া বলিল, "আমি বড় অন্যায় করেছি। আমায় ক্ষমা কর।" প্রতিবাদের মত কি একটা বলিতে গিয়া কবিতা সংজ্ঞা হারাইয়া সেখানে লুটাইয়া পড়িল। রমেশ আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল।

নিশীথ বাহিরেই দাঁড়াইয়াছিল। রমেশের আর্ত্তস্বর শুনিবামাত্র ছুটিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। সযত্নে কবিতাকে তুলিয়া শয্যায় শোয়াইয়া দিল ও পরে নিকটস্থ জলপাত্র হইতে জল লইয়া কবিতার চোখে মুখে জলের ছিটা দিয়া পাখার বাতাস করিতে লাগিল। রমেশ শুধু বিস্ময়হত দৃষ্টিতে উভয়ের দিকে চাহিয়া রহিল।

বহুক্ষণ পরে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কবিতা চক্ষু মেলিল। ধীরে ধীরে তাহার সব কথা মনে পড়িল। দুজনের পানেই কবিতা তাহার স্নিগ্ধ শান্ত চক্ষু মেলিয়া চাহিল। তখন তাহার এক চক্ষুতে স্বামীর জন্য অপূর্ব্ব ক্ষমা ও অবিচল প্রেম, অপরটিতে নিশীথের জন্য অগাধ শ্রদ্ধা ও সুপবিত্র করুণা ফুটিয়া উঠিতেছিল।

নিশীথ যে দীপের মত আপনি জ্বলিয়া তাহার অন্তরের অন্ধকার দূর করিয়াছে, ধূপের মত আপনি পুড়িয়া তাহার জীবনের গৃহ পবিত্র ও সুরভিত করিয়া দিয়াছে—এই কথাটাই বেশী করিয়া মনে পড়ায় তাহার নয়ন দুটি জলভরে টলমল করিয়া উঠিল—দৃষ্টি ঝাপসা হইয়া গেল।

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য।

নারীত্ব

যে নারীর অঙ্কে কম কমল-কলিকা
নাহি শোভা পায়—তার ব্যর্থ এ জনম
হ'ক সে সম্রাজ্ঞী—সর্ব্ব ঐশ্বর্য্য-মণ্ডিতা
দীনা, ভিখারিণী চেয়ে সে যে গো অধম।

যে নারীর অঙ্গ শিশু-মলমূত্র-রসে
নাহি হয় অভিষিক্ত দিবস-রজনী—
হলেও সে নিষ্ঠাবতী, চন্দন-চর্চ্চিতা—
অস্পৃশ্যার মধ্যে আমি তারে চির গণি।

ইষ্ট-দেবতার পদ পূজিবার লাগি
তীর্থে তীর্থে ঘুরিবার নাহি প্রয়োজন—
ওগো হিন্দুনারি! এস গৃহতীর্থে বসি
পাল গৃহস্থের ধর্ম্ম—সন্তান-রতন

গড়ি তোল নিজহাতে—যার যশোভাতি
দেশের দশের পথে জ্বালাইবে বাতি।

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় (বি-এ)।

রবীন্দ্রনাথ

য়ুরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে এবং সংঘাতে ভারতবর্ষের জীবন-ধারায় যে নব জাগরণ হইয়াছিল, যে নব-যুগের জ্যোতিশ্ছটায় সমস্ত দেশ পুলকিত ও ভাস্বর হইয়াছিল, রবীন্দ্রনাথ সেই অভ্যুদয়ের মূর্ত্ত প্রতীক। প্রতীচীর কর্ম্ম-চঞ্চল আবেগের সহিত প্রাচীর ধ্যান-তন্ময়তা মিশিয়া ভারতবর্ষে যে সাধনা স্ফূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে, রবীন্দ্রনাথ সেই সাধনার বাণী শুনাইয়া জগজ্জয়ী হইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথকে বুঝিতে হইলে তাই গত শত বর্ষের সাধনাকে বুঝিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথের সেই বিরাট অবদান, সেই বিচিত্র অবচার ও বিপুল সৃষ্টির কথার সম্যক্ আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে।
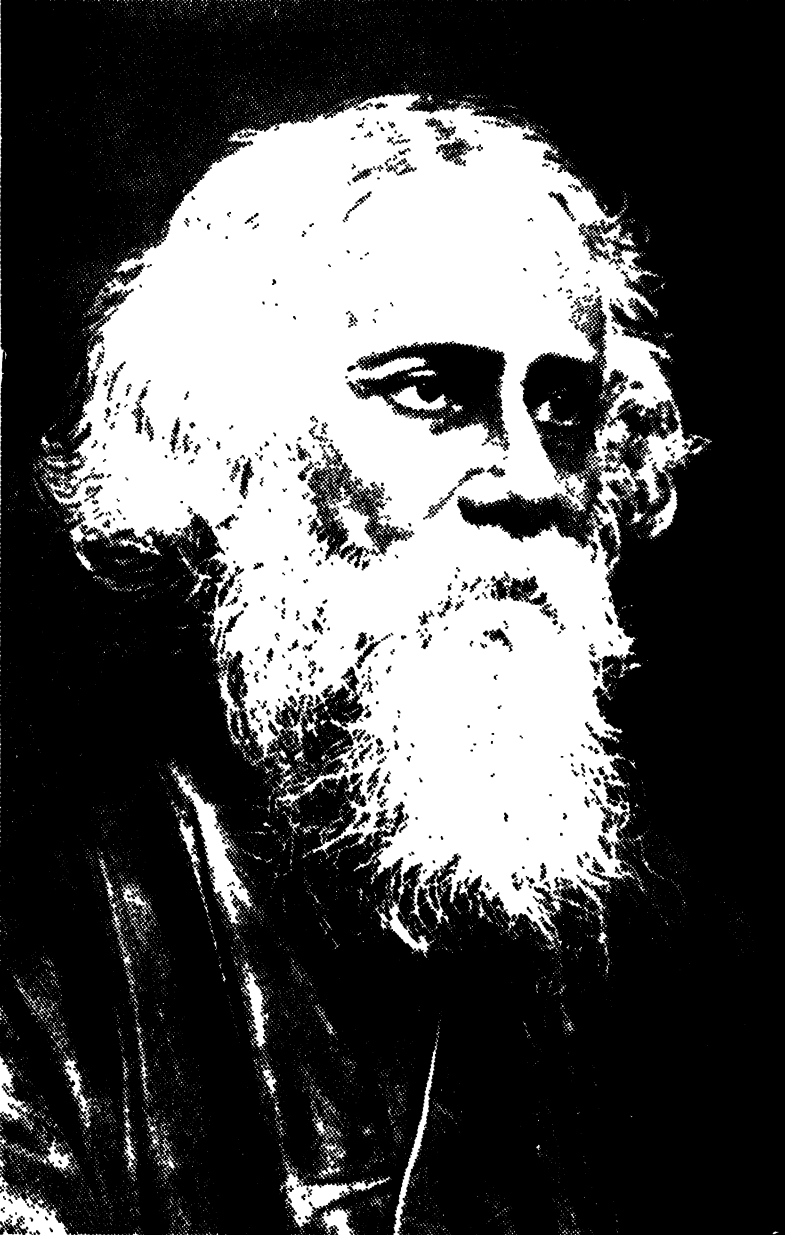
কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ

আজ তাঁহার সপ্ততিতম জন্মোৎসবের বাসরে কেবল শ্রদ্ধার অঞ্জলি দিয়া তাঁহাকে নমস্কার করি। যিনি বাঙ্গালার মাঠকে—বাঙ্গালার বাটকে পুণ্য, ধন্য ও সঙ্গীতমুখর করিয়াছেন, ভক্তিনতচিত্তে তাঁহার ঋণের কথা স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

আমাদের দেশের জীবন-স্রোতে কেমন করিয়া রবীন্দ্র-প্রতিভার বিচিত্র শতদল প্রস্ফুটিত হইয়াছে, তাহা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। রবীন্দ্র-সাহিত্য একটি অপূর্ব্ব সৃষ্টি। গত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া তিনি সাহিত্য-সেবা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার লেখনী কেবল পরিচিত পথে একটানা বহিয়া চলে নাই। তাঁহার নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি রসের নব নব ক্ষেত্র এ… সৌন্দর্য্যের নব নব রূপ সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। তাঁহার রচনার এই বৈচিত্র্য, … বহুমুখী প্রগতি নিত্য ন… উদ্ভাবন করিয়া রসিক সমাজকে মুগ্ধ ও চকিত করিয়াছে। কেবল কাব্যের ও গানের মাঝে নহে, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ প্রভৃতি সকল রকম রস-রচনায় কবির সপ্রস্ব…

বীণা মৌলিকতায় ও অনবদ্য কমনীয়তায় কেবলই নব নব সুরের সৃষ্টি করিয়াছে।

সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আপন প্রতিভার অনির্ব্বাণ জ্যোতিতে দীপ্ত ও দ্যুতিমান্ করিলেও রবীন্দ্রনাথ সর্ব্বোপরি কবি। দ্রষ্টার ভাবময় অনুভূতি দিয়া তিনি জীবনকে দেখিয়াছেন, তাই তাঁহার সমস্ত লেখার মধ্যে কবির ভাবুকতা দেখি। ভাবুকতার শান্ত জ্যোতিঃশিখা তাঁহার সমস্ত কাব্য-সাধনাকে উদ্ভাসিত করিয়াছে। জীবনের দ্বন্দ্ব ও কোলাহল, রুদ্রের ও ভৈরবের প্রলয় তাণ্ডবের উন্মত্ত আহ্বান, সংসারের নির্ম্মম নিষ্ঠুর পথযাত্রা, আপন উচ্ছ্বাস ও বিপ্লব দিয়া তাঁহার রচনাকে ফেনিল করে নাই, সহজ আনন্দের সাবলীল গতিই তাঁহার বৈশিষ্ট্য। সত্যের এবং সুন্দরের যে রূপ বাহিরের আবর্জ্জনার আড়ালে লুকাইয়া থাকে, কবি তাঁহার দৃষ্টির গভীরতা দিয়া সেই সত্যকে আপন করিয়া লন। রবীন্দ্রনাথ তাই Idealist তাঁহার সমগ্র রচনায় এই ভাবুকতার গভীর ছাপ অঙ্কিত আছে। তাঁহার রচনার বিষয়-বস্তু, প্রকাশভঙ্গী, শব্দযোজনার সৌষ্ঠব ও ছন্দোল্লাস সবরই অনুভূতির আবেগ-সঞ্জাত এই ভাবুকতা দেখিতে পাই। রসবোধের এই গভীরতা, দৃষ্টির এই প্রসার, অনুভূতির এই অনির্বচনীয় ভাবে কবি নিজের বহু রচনায় অজ্ঞেয় এক শক্তি বলিয়া অনুভব করিয়াছেন। "অন্তর্যামীতে" কবি বলিতেছেন—

আমি চেয়ে আছি বিস্ময় মানি
রহস্যে নিমগন।
এ যে সঙ্গীত কোথা হ'তে উঠে
এ যে লাবণ্য কোথা হ'তে ফুটে
এ যে ক্রন্দন কোথা হ'তে টুটে
অন্তর-বিদারণ।

নূতন ছন্দ অন্ধের প্রায়,
ভরা আনন্দে ছুটে চ'লে যায়,
নূতন বেদনা বেজে ওঠে তায়,
নূতন রাগিণীভরে।
যে কথা ভাবিনি বলি সেই কথা,
যে ব্যথা বুঝি না জাগে সেই ব্যথা,
জানি না এসেছি কাহার বারতা
কারে শুনাবার তরে।

কবির অন্তরে বসিয়া যে গুণী গান করিয়া সুরের আলোকে ভুবন ছাপাইয়া ফেলেন, সুরের সুরধুনী বহাইয়া দেন, কবি অবাক্ হইয়া তাঁহার গান শুনেন, আর সেই সুরোচ্ছ্বাসকে ভুবনে আনিবার কাযে প্রবৃত্ত হন। কবির এই সব গান ও কবিতা পড়িয়া আমরা বুঝি যে, রবীন্দ্রনাথ স্বতঃ উৎসারিত প্রেরণার বলে গান গাহিয়াছেন। এই ভাব-বিহ্বলতা—সুরের ও রসের নিকট এই আত্মসমর্পণ রবীন্দ্রনাথের লেখায় যুগপৎ প্রাঞ্জলতা ও অলৌকিক অতীন্দ্রিয় জগতের ধ্বনি জাগাইয়াছে।

এই রসমধুর ভাবলোকের পুষ্পপেলব পথ ত্যাগ করিয়া কবি কখনও কখনও ধূলি-ভরা জীবনের মলিন ছবি লইয়া সত্যকার জীবনের ভিড়ের মাঝে নামিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার ভীরু-প্রকৃতি জীবনের রূঢ়কঠোরস্পর্শকে সহিতে পারে না, তাই তিনি ফিরিয়া ঘুরিয়া রসসমুদ্রের মধুতেই ডুবিয়া রহিয়াছেন।

চিত্রার 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় কষ্টের সংসার দেখিয়া কবি ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছেন। অন্নহীন, আলোহীন মানুষের জীবনের বদ্ধ অন্ধকার দেখিয়া ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছেন, শত শতাব্দীর বেদনায় করুণ-কাহিনী লেখা মূক মূঢ় জনের পরিত্রাণের ভাবনায় ব্যথিত হইয়া তিনি বলিতেছেন :—

এবার ফিরাও মোরে, লয়ে যাও সংসারের তীরে
হে কল্পনে রঙ্গময়ি! দুলায়ো না সমীরে সমীরে
তরঙ্গে তরঙ্গে আর ভুলায়ো না মোহিনী মায়ায়
বিজন বিষাদ ঘন অন্তরের নিকুঞ্জ-ছায়ায়
রেখো না বসায়ে।

ঝড়ঝঞ্ঝা, বজ্রপাতে কাতর, এই সব মানুষকে মৃত্যুঞ্জয় আশার সঙ্গীতে উদ্বোধিত করিবেন বলিয়া কবি সংকল্প করিলেন। কবি মনে করিলেন, দুঃখকে ও বেদনাকে ভাষা দিয়া, ধরণীতে স্বর্গের অমৃত আনয়ন করিবেন। কবির এ আশা সফল হয় নাই, কারণ, ভাবৈকরস কবি রসমাধুরীর মাঝে আপনাকে নিয়তই হারাইয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু যাহা পাই নাই, তাহার জন্য দুঃখ করিয়া লাভ নাই। রসস্রষ্টা, রূপদক্ষ প্রত্যেকেরই বৈশিষ্ট্য আছে, এক জনের ব্যক্তিত্বের সহিত অপরের ব্যক্তিত্বের তুলনা করিতে যাওয়াই ভুল। প্রত্যেক কবিই আপন জন্ম, কর্ম্ম, আবেষ্টনের মধ্যেই আপনার চিন্তাধারা ও অনুভূতির স্বাতন্ত্র্য অর্জ্জন করেন। ঠাকুর-পরিবারের রসাশ্রয়তার আবহাওয়ার মাঝে কবির বাল্য-জীবন গড়িয়া উঠে। শৈশবে ধরিত্রীর শস্যশ্যামল রূপ কবির দূরে ছিল, তাই তাঁহার সমস্ত রচনায় ধরিত্রীর প্রতি প্রেম আবেগে উচ্ছল, অনুভূতির তীব্রতায় বিহ্বল হইয়া দেখা দিয়াছে। পরিণত জীবনেও সংসারের উৎপীড়ন ও আঘাতের বাহিরে কবির জীবন কাটিয়াছে, কাযেই কবির বীণায় দুঃখ ভাষা পায় নাই, ক্রন্দনীর ক্রন্দন ধ্বনিত হয় নাই। কিন্তু আপন নিভৃত নিরালয় কবি যে নন্দন বনমধু আহরণ করিয়াছেন, তাহা যে অমূল্য, সংসারের দাবদগ্ধ তৃষিত নরনারী পুলকিত বিস্ময়ে সে মধুপানে ব্যাকুল

হইয়া ওঠে। এই পৃথিবীর রূপ, রং, রসের প্রতি আমাদের দেশের মানুষের প্রীতি নাই, আমাদের সমস্ত বাসনা পরলোকের দিকে নিবদ্ধ বলিয়া পৃথিবীর স্বর্ণমাধুরী আমাদের নয়ন এড়ায়। কিন্তু কবি বলিতেছেন :—

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে
মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গে কবির ঘুমন্ত কবিমানস যখন জাগিয়া উঠিল, তখন নির্ঝরের মুখ দিয়াই কবি আপনার সাধ জানাইতেছেন :—

এত সুখ কোথা, এত রূপ কোথা
এত খেলা কোথা আছে
যৌবন বেগে বহিয়া যাইব
কে জানে কাহার কাছে!
ওরে অগাধ বাসনা, অসীম আশা
জগৎ দেখিতে চাই
জাগিয়াছে সাধ চরাচরময়
প্লাবিয়া বহিয়া যাই।

ঋতুচক্রের সম্পদ-ভরা এই পৃথিবীর লাবণ্য, ফুল, ফল ও তরুলতার বিভূতি কবির চিত্তে অমৃত হইয়া দেখা দিয়াছে। কবি আপন গভীর ভাবনা দিয়া, আপন রস-সংবেদনা দিয়া প্রকৃতিকে গভীর করিয়া ভালবাসিয়াছেন। বসুন্ধরা কবিতায় এই ভালবাসার পরিচয় পাই। কবি বলিতেছেন :—

হে সুন্দরী বসুন্ধরে, তোমা পানে চেয়ে,
কতবার প্রাণ মোর উঠিয়াছে গেয়ে
প্রকাণ্ড উল্লাস-ভরে; ইচ্ছা করিয়াছে
সবলে আঁকড়ি ধরি, এ বক্ষের কাছে
সমুদ্র-মেখলা পরা তব কটিদেশ
প্রভাত-রৌদ্রের মত অনন্ত অশেষ
ব্যাপ্ত হয়ে দিকে দিকে; অরণ্যে ভূধরে
কম্পমান পল্লবের হিল্লোলের পরে
করি নৃত্য সারা বেলা, করিয়া চুম্বন
প্রত্যেক কুসুমকলি, করি আলিঙ্গন
সঘন কোমল শ্যাম তৃণক্ষেত্রগুলি
প্রত্যেক তরঙ্গ পরে সারাদিন দুলি
আনন্দ-দোলায়।

প্রথম বয়সের এই প্রীতির শেষ হয় নাই। পরিণত বয়সের বলাকাতেও এই প্রীতির উল্লেখ দেখিতে পাই।

আমি যে বেসেছি ভালো এই জগতেরে
পাকে পাকে ফেরে ফেরে
আমার জীবন দিয়ে জড়ায়েছি এরে,
প্রভাত-সন্ধ্যার
আলো অন্ধকার
মোর চেতনায় গেছে ভেসে;
অবশেষে
এক হয়ে গেছে আজ আমার জীবন, আর
আমার ভুবন।
ভালোবাসিয়াছি এই জগতের আলো,
জীবনেরে তাই বাসি ভালো।

বিরাট বিশ্বপ্রকৃতির সহিত রবীন্দ্রনাথের একটি অন্তরঙ্গ যোগ আছে। কেবল কবিতায়, গানে নহে, লেখকের গল্পে ও উপন্যাসেও ইহার প্রভাব আমরা অনুভব করি। ঘটনা-বৈচিত্র্যকে রবীন্দ্রনাথ কখনও বিশেষভাবে আমল দেন নাই, প্রকৃতির ছায়া-রৌদ্র-ভরা আবেষ্টনের নিস্তব্ধ নীরব উপলব্ধি তাঁহার লেখায় বারে বারে বিচিত্ররূপে বিচিত্র বেশে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে। ছিন্নপত্রে রবীন্দ্রনাথ যে চিঠিগুলি লিখিয়াছেন, তাহা পড়িলে দেখিতে পাই যে, কবি প্রকৃতির হৃৎস্পন্দন অনুভব করিবার লালসায় পাগল। আপন গল্প লেখার উল্লেখ করিয়া কবি এক চিঠিতে বলিয়াছেন :—

'আমি যে সকল দৃশ্য, লোক ও ঘটনা কল্পনা করচি, তারই চারিদিকে এই রৌদ্রবৃষ্টি, নদীস্রোত এবং নদীতীরের শরবন, এই বর্ষার আকাশ, এই ছায়াবেষ্টিত গ্রাম, এই জলধারা-প্রফুল্ল শস্যের ক্ষেত ঘিরে দাঁড়িয়ে তাঁদের সত্যে ও সৌন্দর্য্যে সজীব ক'রে তুলচে। কিন্তু পাঠকেরা এর অর্দ্ধেক জিনিষও পাবে না আমার গল্পের সঙ্গে যদি এই মেঘমুক্ত বর্ষাকালের স্নিগ্ধ রৌদ্র-রঞ্জিত নদীটি ও নদীর তীরটি, এই গাছের ছায়া এবং গ্রামের শান্তিটি এমন অখণ্ডভাবে তুলে দিতে পারতুম, তা হ'লে সবাই তার সত্যটুকু একেবারে সমগ্রভাবে এক মুহূর্ত্তে বুঝে নিতে পারত।' বহির্জগতের সহিত প্রীতির এই অচ্ছেদ্যযোগ রোমাণ্টিক যুগের ইংরাজ কবিদের মধ্যে দেখিতে পাই। রবীন্দ্রনাথ নূতন আকৃতি দিয়া এই প্রেমের যোগকে ফুটাইয়াছেন। রবীন্দ্র-পূর্ব্ব ভারতীয় সাহিত্যে প্রকৃতির বর্ণনা দেখিতে পাই। কবিরা প্রকৃতির মাধুর্য্য দিয়া আপন আপন কাব্যের পট-ভূমি অলঙ্কৃত ও উজ্জীবিত করিয়া দেন, কিন্তু তাহার মধ্যে অন্তরের সে যোগ নাই, যাহাতে কবি গাহিতে পারেন :—

আকাশভরা সূর্য্য তারা, বিশ্বভরা প্রাণ
তাহার মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।
অসীম কালের যে হিল্লোলে
জোয়ার ভাঁটায় ভুবন দোলে
নাড়ীতে মোর রক্তধারায় লেগেছে তার টান—
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার প্রাণ
ঘাসে ঘাসে পা ফেলেছি বনের পথে যেতে
ফুলের গন্ধে চমক লেগে মন উঠেছে মেতে
ছড়িয়ে আছে আনন্দেরি দান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার প্রাণ।
কাণ পেতেছি, চোখ মেলেচি
ধরার বুকে প্রাণ ঢেলেছি
জানার মাঝে অজানারে করেছি সন্ধান
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার প্রাণ।

প্রকৃতির সহিত কবির সুনিবিড় মৈত্রী কবির ভাষায় বিচিত্র বর্ণ ও সুর যোগাইয়াছে।

শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি
ছড়িয়ে গেল ছাপিয়ে মোহন অঙ্গুলি,
শরৎ তোমার শিশির-ধোওয়া কুন্তলে
বনের পথে লুটিয়ে পড়া অঞ্চলে
আজ প্রভাতের হৃদয় ওঠে চঞ্চলি।

ভাষা ও ছন্দের এই অমোঘ সৌষ্ঠব, ভাবের ও কল্পনার এই সুসঙ্গত সুষমা পাঠকের অন্তরে যাদু-ভরা মোহ জাগাইয়া তোলে। [illegible]কল পাঠকের নয়নে শরৎ-লক্ষ্মীর অনিন্দ্য মূর্ত্তি যেন বর্ণনার সূক্ষ্মতায় ও প্রকাশের সৌকুমার্য্যে ভাসিয়া যাইতে থাকে। মুগ্ধ-চিত্তে আমরা কবির ভাবনিগূঢ় অনুভূতির কথা উপলব্ধি করি। কাব্যে প্রকাশকে অবজ্ঞা করা চলে না। কবির মানস রসবোধ প্রকাশের মধ্য দিয়াই আমাদের প্রাণে সাড়া দেয়। যে সত্য রসের ও প্রকাশের ভিতর দিয়া অনুপ্রেরণা না জাগায়, কাব্য-লোকে তাহার স্থান নাই। বহিঃপ্রকৃতির বিচিত্র রূপ, বিচিত্র [illegible]শ কবির রচনায় নব নব রূপে গন্ধ, বর্ণ ও গানের সৃষ্টি করিয়া [illegible]াহিত্যের আসরে ক্ষণকালের নিবিড়-নন্দনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। [illegible]বনের গন্ধভরা শ্রাবণ-বেলা, আষাঢ় আঁধারে মেঘের মেলা, [illegible]রভ-বিহ্বল বসন্ত-রজনী ধৌতশ্যামল আলো-ঝলমল শরৎ-[illegible]মা, ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ার লুকোচুরি খেলা, দিনান্তের [illegible]ঘর মায়া, ধূলা-ওড়া হাওয়ার ডাক অন্তরতম অনুভূতি কল্পনার [illegible]রূপ রূপে কবির কাব্যের বিশেষ প্রেরণা জাগাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথকে জানিতে হইলে বাহিরের সহিত কবির অন্তরের এই একান্ত নিবিড় মিতালিকে ভুলিলে চলিবে না।

প্রকৃতির ও মানুষের প্রেম-সাধনার এই তপস্যা রবীন্দ্রনাথের লেখায় একটি পরিপূর্ণতার নিবিড় শান্তির উদ্ভব করিয়াছে। কিন্তু স্থিতির অচলায়তনে কবির মন মুগ্ধ নহে। কবি মানুষকে চির-পথিক করিয়া দেখিতে চাহেন। চলাই মানুষের নিয়ত মুক্তি। প্রগতির এই যুগমন্ত্রটি রবীন্দ্রনাথের লেখায় বার বার ধ্বনিত হইয়াছে। বৈরাগ্যের নিঃশব্দ ধ্যান-গম্ভীর আসন তাঁহার নহে, চলার আনন্দই কবিকে প্রবুদ্ধ করিয়া তুলে।

বাহির হলেম কবে সে নাই মনে
যাত্রা আমার চলার পাকে
এই পথেরই বাঁকে বাঁকে
নূতন হলো প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।
যত আশা, পথের আশা
পথে যেতেই ভালোবাসা
পথে চলার নিত্য রসে
দিনে দিনে জীবন ওঠে মাতি।

পথের বাণীই কবির বাণী। চিরযুবা চিরজীবী সবুজকে ডাক দিয়া তিনি বলিতেছেন :—

আন রে টেনে বাঁধা-পথের শেষে
বিবাগী কর অবাধ গানে
পথ কেটে যাই অজানাদের দেশে।
আপদ আছে, জানি আঘাত আছে,
তাই জেনে তো বক্ষে পরাণ নাচে,
ঘুচিয়ে দে ভাই পুঁথি পড়োর কাছে,
পথে চলার বিধি-বিধান যাচা,
আয় প্রমুক্ত আয় রে আমার কাঁচা।

আবার কখনও তাঁহার যাত্রী মন যাত্রার আধ্যাত্মিক কল্যাণময় রূপ দেখিয়া চলার গান গাহিতেছেন :—

পান্থ তুমি, পান্থজনের সখা হে
পথে চলাই সেই ত তোমায় পাওয়া
যাত্রাপথের আনন্দগান যে গাহে
তারি কণ্ঠে তোমারি গান গাওয়া।
চায় না সেজন পিছন পানে ফিরে
বায় না তরী কেবল তীরে তীরে
তুফান তারে ডাকে অকূল নীরে
যার পরাণে লাগলো তোমার হাওয়া
পথে চলাই সেই ত তোমার পাওয়া।

আমাদের দেশের জীবনে কবি গতি ও দ্রুতি আনিয়া আমাদিগকে উদ্বোধিত করিতে চাহিয়াছেন। দ্বারের শিকল ভাঙ্গিয়া নিরুদ্দেশের দেশে সর্ব্বনাশের গান শুনিতে কবির আহ্বান। মৃত্যুর গর্জ্জন তুচ্ছ করিয়া, ঝড়-তুফান না মানিয়া কবি জীবনের প্রলয়-পারাবার অতিক্রম করিতে ডাক দিতেছেন।

কবি যে অপরিমেয় বিশ্বাসের সহিত চলার বাণীর জয়গান করেন, তাহাতে তাঁহার লেখার প্রত্যেকটি বর্ণ যেন বিদ্যুৎশক্তিপূর্ণ হইয়া অন্তর প্রবুদ্ধ করিয়া তুলে। যুগদেবতার বাণী প্রগতির বাণী, মানুষ চলিতে চাহে অপ্রাপ্যের চক্রবাল ভেদিয়া অশেষের দেশে তাহার যাত্রা। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে, গানে ও নিবন্ধে এই গতির সুর আন্তরিকতায় ও ভাবোচ্ছ্বাসে উচ্ছল হইয়া উঠিয়াছে। এই চলার পথে কবি শুধু লক্ষ্মীর প্রসাদ চাহেন নাই, অলক্ষ্মীকেও জীবনের বরদাত্রী বলিয়াছেন।

বাঁধন ছেঁড়ার সাধন হবে
ছেড়ে যাব তীর মাভৈঃ রবে
যাঁহার হাতের বিজয়মালা
রুদ্রদাহের বহ্নিজ্বালা
নমি নমি নমি সে ভৈরবে
কালসমুদ্রে আলোর যাত্রী
শূন্যে যে ধায় দিবস রাত্রি
ডাক এল তার তরঙ্গেরি
বক্ষে বাজে বজ্রভেরী
অকূল প্রাণের সে উৎসবে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেলী প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—"বিচিত্র সুখ-দুঃখময় মানুষের এই জীবনটাকেও শেলী যেন একটি পর্দ্দার মত ক'রে দেখেছিলেন। এর খণ্ডতা—এর স্থূলতা যেন সত্যকে আবৃত ক'রে রয়েছে। এই কুহেলিকার পর্দ্দাখানা ছিঁড়ে ফেলে সত্যের অখণ্ড নির্ম্মল মূর্ত্তি দেখবার জন্যে কবির ভারি একটা ব্যাকুলতা ছিল।" রবীন্দ্রনাথের নিজের সম্বন্ধে এ কথাও বিশেষভাবে প্রযোজ্য। শেলীর চিত্তে অরূপের জন্য গভীর বেদনাপূর্ণ আকূতি ছিল, কিন্তু এই অদৃশ্য শক্তির বিরাট ছায়া শেলীর জীবনে প্রতিভাত হয় না। কিন্তু মরমী কবি রবীন্দ্রনাথ অতীন্দ্রিয়কে একবারে আমাদের মনের দ্বারে উপস্থিত করিয়াছেন।

কবি মানুষের জীবনের ঘটনার তরঙ্গলীলায় কখনও বিহার করেন নাই। তিনি দৃশ্যবস্তুর বিক্ষোভের অন্তরালে যে অতীন্দ্রিয় সুন্দর প্রকাশমান, বার বার তাহারই চরণে অর্ঘ্য দিয়াছেন। উপনিষদের মহোচ্চ সত্যের অনুভূতি কবির জীবনে ফলবান হইয়া কবির পিপাসাকে প্রবুদ্ধ করিয়াছে। বিশ্বের বাহিরের রূপ যেন তাঁহার কাছে সত্য নহে, বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরাত্মার সঙ্গে যেন কবির লেনা-দেনা। জার্ম্মাণীর Transcendental Philosophy শেলীর মনের ভাবের রসদ যোগাইয়াছিল, কিন্তু সে বাণী শেলী কখনও নিজস্ব করিতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথ এই সহজ সুরকে একান্ত আপন করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দী হইতে য়ুরোপের সাধক ও কবিগণ জগতের এই মর্ম্মনিহিত সুরের সন্ধানে বাহির হইয়াছেন। সসীমের সহিত অসীমের মিলন-বেদনাভরা গান লইয়া গীতাঞ্জলি যে দিন য়ুরোপের ভাবের হাটে দেখা দিল, সে দিন তাই য়ুরোপের মনীষীরা সেই নিবিড় উপলব্ধির প্রকাশ দেখিয়া কবির কাব্যকে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য দিয়া বরণ করিয়া লইলেন। দৃশ্যের অপেক্ষা অদৃশ্যের প্রতি এই আকূতি, রূপের তুলনায় অরূপের প্রতি আকুল আকর্ষণ, পরিচিতের অপেক্ষা অপরিচিতের প্রতি আকুলতা রবীন্দ্রনাথের লেখার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। মনের সাত-মহল ভবনের বিচিত্র ছন্দের অনুভূতির মধ্যে যে রহস্যের শিল্পরূপ, কবির লেখায় তাহাই মুখর হইয়া উঠিয়াছে।

আমাদের দেশের ভাবুকতায় ও সাহিত্য-সাধনায় আধ্যাত্মিকতা বরাবরই বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু অজানিতের প্রতি এমন বিপুল আকুলতা, অতীন্দ্রিয়ের এমন আকর্ষণ রবীন্দ্র-পূর্ব্ব ভারতীয় সাধনায় এমন অপূর্ব্ব ভঙ্গিমায় প্রকাশ পায় নাই। মানুষের জীবনে এমন এমন মুহূর্ত্ত জাগে, যখন অব্যক্ত আসিয়া প্রকাশ পায়, অনুভূতির সেই মাহেন্দ্রক্ষণের ভাব কথায় রচনা করিতে গেলে ধোঁয়া ধোঁয়া না হইয়া যায় না। এই অস্পষ্টতা, এই অবোধ্যতা স্বাভাবিক, অনেকে কবির কাব্যের এই রসাস্বাদন করিতে না পারিয়া রবীন্দ্রনাথের প্রতি দোষারোপ করেন। রবীন্দ্রনাথকে বুঝিতে হইলে তাঁহারই মত অতীন্দ্রিয়ের রসে রসিক হইতে হইবে।

পথ হারাইয়া কবি অভাবিতের দেখা পান। 'চলে যেতে যেতে' কবির অন্তরে চমক লাগে। বনের কোণে হাওয়াতে কার গন্ধ জাগে—তখন কবি নিমেষেই চিরকালের জানা-শোনা ভুলিয়া অজানাকে অনুভব করেন, আর বলেন—

সকল জানার বুকের মাঝে
দাঁড়িয়েছিল অজানা যে
তাই দেখে আজ বেলা গেলো
নয়ন ভরে আসে
পসরা মোর পাসরিলাম
রইলো পথের পাশে।

কবি অরূপকে পাইয়াও যেন পান না। সংসারের কোলাহল

ভুলিয়া তিনি বঁধুর সহিত গানে গানে প্রাণের আলাপ করিতে চান। কবি মনে করেন, তাঁহার প্রিয় কাছেই নদীর পারে বাস করেন, ফুলের গন্ধ তাঁহার খবর বহিয়া আনে, কিন্তু

শুধু যে দিন দখিণ হাওয়ায়
বিরহ-গান মনকে গাওয়ায়
পরাণ উন্মাদনি
পাতায় পাতায় কাঁপন ধরে
দিগন্তরে ছড়িয়ে পড়ে
বনান্তরের কাঁদনি।
সে দিন আমার লাগে মনে
আছো যেন কাছের কোণে
একটুখানি আড়ালে
জানি যেন সকল জানি
ছুঁতে পারি বসন খানি
একটুকু হাত বাড়ালে।

বাস্তবের কুয়াসাজালের মধ্য দিয়া অজানার আভাস মিলে! কবি আপন জীবনে সেই অরূপের পদধ্বনি শুনিয়া পুলকিত ও বিস্মিত। অবিশ্বাসীকে ডাকিয়া তাই বলিতেছেন—

তোরা শুনিসনিকি শুনিস নি তার পায়ের ধ্বনি
ঐ যে, আসে, আসে, আসে
যুগে যুগে পলে পলে দিন-রজনী
সে যে আসে আসে আসে।

প্রাণপ্রিয় বঁধুর অভিসার চলে। ফাগুন দিনের গন্ধমদির বনের পথে, শ্রাবণের ঘনান্ধকারে এই প্রেমের পুলকোজ্জ্বল লীলা চলিয়াছে। এ লীলার সমাপ্তি নাই—কবি তাই গাহিতেছেন—

তোমার অন্ত নাই গো অন্ত নাই
বারে বারে নূতন লীলা তাই
আবার তুমি জানি না কোন্ বেশে
পথের মাঝে দাঁড়াবে নাথ হেসে
আমার এ হাত ধরবে কাছে এসে
লাগবে প্রাণে নূতন ভাবের ঘোর
তোমায় খোঁজা শেষ হবে না মোর।

জীবনের অন্ধকারের অন্তরে সুন্দর আসিয়া দেখা দেয়। কবির আসনের ডাহিনে বাঁয়ে ফুল ফুটিয়া উঠে, স্পর্শরাগে কবির চিত্ত রঞ্জিত হয়, কবি নিজেকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করেন। এমন সহজ সরল মাধুর্য্যে, এমন একান্ত নিবিড় আন্তরিকতায়, এমন অপূর্ব্ব রসসংবেদনায় আর কোনও কবি সীমা ও অসীমের, রূপ ও অরূপের মিলনের বিচিত্র লীলা দেখাইতে পারেন নাই। ভারতবর্ষের সাধনার বিশেষ সুর কবি গভীরভাবে এবং সত্যরূপে উপলব্ধি করিয়া আনন্দমগ্ন, তাই তাঁহার গানে গানে এই রসানন্দের উৎসধারা উদ্বেল হইয়া উঠে। রবীন্দ্রকাব্যের অতীন্দ্রিয় অনুভূতি তাঁহার রূপক নাটকগুলিতে বিশেষ দ্যোতনায় ও অপূর্ব্ব রসমাধুরীতে প্রকট হইয়াছে। জীবনের জটিলতার অন্তরালে আনন্দময় যে দেবভাব লুক্কায়িত আছে, এই নাটক-গুলিতে তাহার পরিপূর্ণ প্রকাশ দেখিতে পাই। সীমার মধ্যে অসীম যে সুর বাজাইতেছেন, তাহার প্রতি গভীর আকুলতা কেমন স্বতঃবিকশিত মাধুর্য্যে রূপায়িত হইয়াছে। ডাকঘরের অমল, অচলায়তনের পঞ্চক ক্ষুদ্র বাধিবিধির বেদনায় মুহ্যমান হইয়া মুক্ত আকাশের ব্যাপকতার জন্য কেমন লালায়িত হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রদ্ধাবান হইয়া কবির এই ভাবস্রোতের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেই আমরা রবীন্দ্রনাথের এই সব লেখার মর্ম্মকথা অনুধাবন করিতে পারিব। অধ্যাত্ম অনুভূতির যে উচ্চস্তরে উঠিয়া রাজা নাটকের সুরঙ্গমা শরণাপত্তি মাগিয়াছে, সেই অনুভূতির কিঞ্চিৎ না পাইলে কবির বাণী আমাদের মর্ম্মে প্রবেশ করিবে না। 'শরণাপত্তি' ভারতবর্ষীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের বড় দরের জিনিষ। কবি নিপুণতার সহিত, সুরঙ্গমার মুখে আত্মদানের বার্ত্তা বলিতেছেন—

আমি তোমার প্রেমে হব সবার, কলঙ্ক-ভাগী
আমি সকল দাগে হব দাগী।
তোমার পথের কাঁটা করব চয়ন
যেথায় তোমার ধূলায় শয়ন
সেথা আঁচল পাতব আমার
তোমার রাগে অনুরাগী।
আমি শুচি আসন টেনে টেনে
বেড়াব না বিধান মেনে
যে পঙ্কে ঐ চরণ পড়ে
তাহারি ছাপ বক্ষে মাগি।

কবি পিতা দেবেন্দ্রনাথের সাধনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। কিশোরবয়সে সাধক পিতার সাহচর্য্য তাঁহার অন্তরে উপনিষদের মর্ম্মবাণী জাগরূক করিয়াছিল। বয়সের সহিত অনুভূতির সহজ পথে কবি উপনিষদুক্ত পূর্ণতার ও ভূমার বাণী, আত্মসমর্পণ ও নিবেদনের বাণী একান্ত নিজস্ব করিয়া লইয়াছেন। রূপদক্ষ রসশিল্পী রবীন্দ্র-নাথের সৃষ্টি-শক্তি অফুরন্ত, তাই ত তাঁহার জীবনের রসচ্ছায়ে

ফাগুন আসে ফিরে ফিরে দখিণ বায়ে
নতুন সুরে গান উড়ে যায় আকাশ-পারে
নতুন রঙে ফুল ফুটে তাই ভারে ভারে।

তথাপি যে সবগুলি আধ্যাত্মিকতার মোহন যাদুতে ভরা, যেখানে

মানবত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন-কথা গীত হইয়াছে, সেই কবিতাগুলিই আমাদের বেশী ভাল লাগে। এই কবিতাগুলি তত্ত্ব উপদেশ হইয়া দাঁড়ায় নাই, ভাবের সহজ প্রবাহে ও রসের আকৃতিতে সেগুলি রসলোকের অমৃতে নিষিক্ত।

শান্তিনিকেতনে নববর্ষের উৎসবে পঠিত এক নিবন্ধে কবি লিখিয়াছেন :—"সৃষ্টির ইতিহাসে এই যে নিত্যের লীলা, সীমার মধ্যে অসীমের আবির্ভাব, এর আর অবসান নাই। সেই লীলার সঙ্গে আত্মার সৃষ্টিকর্ম্মের যদি সুর-তাল মেলাতে পারি, তা হ'লে প্রত্যেক নিমেষেই অমৃতের স্বাদ পাব।" তাঁহার আধ্যাত্মিক কবিতাগুলিতে রবীন্দ্রনাথ এই উক্তির যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

আনন্দের উৎস জ্যোতিঃস্বরূপের জন্য কবির যে ভালবাসা, সে একান্ত গভীর। কবি তাই বলিতেছেন :—

পুষ্প যেমন আলোর লাগি
না জেনে রাত কাটায় জাগি
তেমনি তোমার আশায় আমার
হৃদয় আছে ছেয়ে
সে ত আজকে নয় সে ত আজকে নয়।

কতরূপে, কত রসে এই প্রিয়তমের জন্য গান গাহিয়াছেন। শিউলিতলার পাশে পাশে ঝরা ফুলের রাশির মধ্যে কবির নয়ন-ভুলানো আসেন, শ্রাবণ-ঘন গহন মোহে গোপন চরণ ফেলিয়া সেই একা সখার আবির্ভাব হয়, ঝড়ের রাতে দয়িতের অভিসারের আশায় কবি ব্যগ্র হইয়া রহেন, জীবনের ছোট বড় নানা কাজের মাঝে বঁধুর আনাগোনা চলে। সুধাময় সুরে, সুমধুর বাণীতে কবি প্রিয়তমের প্রতি আপন ভালবাসা জানাইবার আবদার করেন। কবির প্রেম গভীর হইয়া উঠে, কবি অনুভব করেন, প্রিয়তম তাঁহারও মিলন জন্য ব্যাকুল।

আমার মিলন লাগি তুমি
আসচ কবে থেকে
তোমার চন্দ্র সূর্য্য তোমায়
রাখবে কোথায় ঢেকে
কত কালের সকাল সাঁঝে
তোমার চরণ-ধ্বনি বাজে
গোপনে দূত হৃদয়-মাঝে
গেছে আমায় ডেকে।

গীতাঞ্জলি, গীতালি, গীতিমাল্যের যুগের কবির কাব্যে যে উন্মাদন-ভরা ভগবৎপ্রীতি দেখিতে পাই, বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহা একবারে নূতন নহে। কৃষ্ণ ও রাধার ভালবাসার রূপকের মধ্য দিয়া ভাব-বৈচিত্র্যে তাহা আমাদের দেশের মর্ম্মের বস্তু। রবীন্দ্রনাথের হাতে তাহা পৌরাণিক লীলার বিশেষ অবচার ছাড়িয়া সমস্ত মানুষের সমস্ত দেশের অন্তরতম বাণীরূপে দেখা দিয়াছে। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি যেমন এক দিন ভারতবর্ষের শান্তরসাস্পদ আশ্রম-চ্ছায়ে উপনিষদের সত্য উপলব্ধি করিয়া মানুষের মধ্যে অমৃত ও অভয়ের বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, কবিবর রবীন্দ্রনাথও সেইরূপ শান্ত ও অনন্তের মিলন-কথা গাহিয়াছেন। ঋষিদের বাণী সাধকদের জন্য দর্শনের অগম্য অন্তরালে সাধারণ মানুষের নাগালের বাহিরে আপন অপূর্ব্ব মাহাত্ম্যে ভাস্বর ছিল, কিন্তু কবির বাণী গানের সহজ সুরে সমস্ত মানুষের মর্ম্মদ্বারে আঘাত দিয়াছে, এইখানেই কবির বিশেষত্ব।

নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময় এই আত্মনিবেদনের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্র-নাথের কাব্যে ও রচনায় আর একটি বিশেষ ভাবের দেখা পাই, সে তাঁহার বিশেষত্ব-বোধ। স্বাদেশিকতা উদ্বোধন করিবার জন্য কবি কতকগুলি প্রাণস্পর্শী গান ও কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ক্ষুদ্রত্বের বোধের মাঝে সংকীর্ণতার গণ্ডীতে কবির বর্দ্ধমান চিত্ত বদ্ধ থাকিতে পারে নাই। বৃহৎ ও ভূমার আহ্বান কবিকে সমস্ত ভেদ ও ছেদের নাগপাশ হইতে মুক্ত করিয়া বিশ্বপ্রেমের উদার উদাত্তসুরে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। ভারতীয় সাধক তপস্যায় জানিয়াছিল যে, মানুষের অন্তরতম ধন যিনি, তিনি সকলের। কিন্তু তথাপি আশ্চর্য্যের বিষয় এই, আমাদের দেশের অচলায়তনের প্রাচীর যেমন দুর্ভেদ্য হইয়াছে, অন্য দেশে কোথাও তেমন হয় নাই। কবি অচলায়তনের এই অভেদ্য প্রাচীর মুক্তির ঝড়ো হাওয়া দিয়া ধূলিসাৎ করিতে চাহিয়াছেন, আনন্দময় দেবতার অনু-প্রেরণায় সবাইকে এক করিতে চাহিয়াছেন। কবি বলিতেছেন—

বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে কে মোর আত্মপর ?
আমার বিধাতা আমায় জানিলে কোথায় আমার ঘর ?

খণ্ডতার বেদনা কবির সহে না। অখণ্ড পূর্ণতার আবেশের মাঝেই রবীন্দ্রনাথ মুক্তির স্বপ্ন দেখেন। যে বৈরাগ্য মানুষকে বিধিনিষেধের গুহাতলে নিষ্পেষিত করিয়া ফেলে, সে বৈরাগ্য কবির নহে। ভোগের মধ্যে যে ত্যাগ, ত্যাগের মধ্যে যে ভোগ, কবি তাহারই জয়গান করিয়াছেন। তাঁহার নাটকের 'ঠাকুরদাদা' চরিত্রে এই আইডিয়াটি কবি বিশেষভাবে প্রতিফলিত করিয়া-ছেন। ধূলির ধরায় সব মানুষের মাঝে যে মিলন, সেই মিলনই মানুষের আকাঙ্ক্ষিত ধন, তাই ত কবি গাহিতেছেন :—

বিশ্ব সাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো
নয়কো বনে নয় বিজনে
নয়কো আমার আপন মনে

সবার যেথায় আপন তুমি, হে প্রিয়
সেথায় আপন আমারো।
সবার পানে যেথায় বাহু পসারো
সেইখানেতেই প্রেম জাগিবে আমারো
গোপনে প্রেম রয় না ঘরে,
আলোর মত ছড়িয়ে পড়ে
সবার তুমি আনন্দধন হে প্রিয় !
আনন্দ সেই আমারো।

কবি তাঁহার জীবনে এই বিশ্বমৈত্রীর ও বিশ্বপ্রীতির সুর বিশেষভাবে ফুটাইয়াছেন। এই কল্পনা ও প্রেরণা তাঁহার অন্তরে বিশ্বভারতীর রূপ জাগাইয়াছিল। সমগ্র জগতের কৃষ্টির ছন্দের তালে তালে চলিয়া ভবিষ্যতের যে বিরাট সভ্যতা গড়িয়া উঠিবে, তাহারই জন্য কবি আপন শক্তি ও চেষ্টাকে নিয়োজিত করিয়াছেন।

যখন অসহযোগের ভাববন্যায় সমস্ত দেশ প্লাবিত, সে দিন সকল নিন্দা ও গ্লানি তুচ্ছ করিয়া কবি বলিয়াছিলেন, "এ যুগের মহাবাণী হইতেছে সমানপদে দাঁড়াইয়া সকলে সকলের সহযোগী হওয়া। পৃথিবীর সমস্ত জাতির সহকর্ম্মিতাই ভবিষ্যৎ সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করিবে। এখন আমাদের সম্মুখে যে সমস্যা, তাহা কোন ক্ষুদ্র ভূখণ্ডের সমস্যা নহে, উহা সেই একটিমাত্র অখণ্ড দেশের সমস্যা, তাহার নাম বিশ্ব।"

বিশ্বমৈত্রীর এই সাধনা ভারতবর্ষের ধ্যানলব্ধ ধন। তপোবনের ছায়ায় ঋষি এক দিন বলিয়াছিলেন—যো বৈ ভূমা তং বৈ সুখম্ নাল্পে সুখমস্তি। ক্ষুদ্রতার পরিধির মাঝে মানুষের অন্তরাত্মা ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে, মানুষ তাই বৃহতের স্পর্শ চায়। জগতের সমস্ত মনীষীর মন আজ বিশ্বমানবের ঐক্য ও মিলনের চিন্তায় বিভোর, রবীন্দ্রনাথের অবদান তাই জগজ্জনের নিকট অপূর্ব্ব সম্পৎ বলিয়া প্রতিভাত হইবে।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সজীব সৃষ্টির মত নিত্য নূতন রূপে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে। ভাবের সূক্ষ্ম লীলা-চাতুর্য্য-ভরা তাঁহার উপন্যাসগুলি, হীরকখণ্ডের মত সমুজ্জ্বল তাঁহার গল্পগুচ্ছ, নির্ম্মল স্বচ্ছ কৌতুক-ভরা তাঁহার কৌতুক-নাট্যগুলি রস-সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে, কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে ইহাদের আলোচনা সম্ভবপর নহে। যখনই যে বিষয় লইয়া তিনি রস-সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছেন, সেখানেই তিনি অসাধারণ সাফল্য-লাভ করিয়াছেন। সত্যেন্দ্রনাথ যে বলিয়াছেন—

জগৎ কবি সভার মোরা তোমার করি গর্ব্ব
বাঙালী আজ গানের রাজা, বাঙালী নহে খর্ব্ব।

সে কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। তিনি যে সুরের আগুন ছড়াইয়াছেন, তাহা ছড়াইয়া পড়িয়া মরা গাছের ডালে ডালে তালে তালে অগ্নি-নাচ জাগাইয়াছে। কবির ভাষা যেই পুরাতন হইয়া উঠে, অমনি কোথা হইতে যেন নব গান জাগিয়া উঠে, কবির অন্তঃসলিলা নবীনতা নিত্য নবরসের স্রোত জাগাইয়া তুলে।

রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালা সাহিত্যে যে সত্য, শিব ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালীর অক্ষয় ঐশ্বর্য্য। অনাবিল রসামৃত অজস্র প্রাচুর্য্যে দান করিয়া কবি আমাদের অন্তরকে প্রফুল্ল ও সমৃদ্ধ করিয়াছেন। বাঙ্গালী যত কাল রহিবে, তত কাল রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালীর মনের উপর অটুট আধিপত্য করিবেন। আজ তাঁহার সপ্ততিতম জন্ম-তিথিতে ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, কবি দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া নূতন নূতন সৃষ্টিতে বাঙ্গালা ভাষায় নূতন নূতন প্রেরণা জাগাইয়া তুলুন। কবির সার্ব্বজনীন সার্ব্বভৌমিক উদারতার মন্ত্র বাঙ্গালীকে প্রবুদ্ধ করিয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দের গান আমাদিগকে সঞ্জীবিত করুক, আমরাও যেন ভারতের কল্যাণ-ময় মৈত্রী ও ঐক্যের সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের বাণী অনুভব করিয়া কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া বলিতে শিখি :—

তোমার কাছে আরাম চেয়ে
পেলেম শুধু লজ্জা
এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে
পরাও রণসজ্জা।
ব্যাঘাত আসুক নব নব
আঘাত খেয়ে অচল রবো
বক্ষে আমার দুঃখে, তব
বাজবে জয়ডঙ্ক
দেবো সকল শক্তি, লবো
অভয় তব শঙ্খ। *

শ্রীমতিলাল দাশ (এম্-এ, বি-এল)।

---

* পটুয়াখালি জুবিলি স্কুলে রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসবে লেখক কর্ত্তৃক ২৪শে বৈশাখ তারিখে পঠিত।

মাটীর স্বর্গ

(উপন্যাস)

১১

আষাঢ়ের শেষ ভাগ। কিন্তু তাহা হইলেও ইতিপূর্ব্বে বৃষ্টির কোন লক্ষণই কোন দিন প্রকাশ পায় নাই। মাত্র সেই দিনই প্রভাত হইতে কলিকাতায় বহু দিনের অনাবৃষ্টির পর বৎসরের প্রথম বর্ষা নামিয়াছিল। সকালে প্রবলবেগে বহুক্ষণ ধরিয়া বর্ষণ হইল, দ্বিপ্রহরের পর হইতে বৃষ্টির বেগ ক্রমশঃই ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু কোন সময়ের জন্যই তাহা একবারে ক্ষান্ত হয় নাই। সমস্ত আকাশ জুড়িয়া জমাট মেঘ সঞ্চিত থাকায়, তখন অপরাহ্ণকালেই চতুর্দ্দিক আঁধার করিয়া যেন সন্ধ্যা সূচিত হইয়া আসিতেছিল এবং দিগ্‌দিগন্ত ঝাপসা করিয়া ক্ষীণ বৃষ্টির ধারা তখনও অবিশ্রান্ত ঝর্ ঝর্ করিয়া ঝরিতেছিল।

বালিগঞ্জে একটি দ্বিতল বাটীর উপরের একখানি ঘরে বসিয়া অর্চ্চনা মুক্ত জানালার ফাঁকে একান্তমনে নব-বরষার এই বৃষ্টিধারা দেখিতেছিল। এই দিক্‌টায় তাহাদের বাটী আসিবার পথের পার্শ্বেই কিছু দূরে খুব বড় একটা পোড়ো মাঠ ছিল, তাহার পরেই কাহাদের খান দুই তিন চালা-বাড়ী, তাহার পরেই বহু পুরাতন একখানি ছোট একতলা বাড়ী; তাহার বাহিরের দেওয়ালগুলিতে কখনই বালি ধরান হয় নাই, নোণা-ধরা ইটগুলি বহু বৎসরের রৌদ্র ও জলে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া এক্ষণে যেন মুখ বাড়াইয়া দেওয়াল হইতে সব খসিয়া আসিবার উপক্রম করিতেছিল। গৃহপার্শ্বস্থ গুটি দুই তিন সু-উচ্চ নারিকেল-বৃক্ষ গভীর তৃপ্তিতে যেন বহুদিনের ঈপ্সিত স্নান সমাধা করিতেছিল ও স্বল্প বায়ুতাড়নে আন্দোলিত হইয়া যেন আনন্দে অল্প অল্প দুলিতেছিল। বৃষ্টিধারায় সম্মুখস্থ পথ, পার্শ্বে মাঠ, চালা-ঘর কয়খানি, দূরের সেই জীর্ণ একতলা বাটী এবং তৎপার্শ্বস্থ নারিকেল-গাছগুলি সবই তখন ঝাপসা হইয়া অর্চ্চনার দৃষ্টির সম্মুখে ভাসিতেছিল। বহুক্ষণ হইতেই বসিয়া বসিয়া সম্মুখের দিকে চাহিয়া অর্চ্চনা নিবিষ্টমনে এই সব দেখিতেছিল। ছেলেবেলা হইতেই সে বৃষ্টি দেখিতে অত্যন্ত ভালবাসিত। তাহার বাল্যকালে, যে দিন হঠাৎ সারা আকাশ কাল-মেঘে ভরিয়া গিয়া মাঠ-ঘাট-পথ অন্ধকারে ছাইয়া আসিত, তখন সে তাহাদের পাড়া-গাঁয়ের সেই বাড়ীর উঠানে ছুটিয়া আসিয়া সানন্দে হাত তালি দিয়া নাচিতে থাকিত, কিম্বা ছুটিয়া বাড়ীর বাহিরে মাঠের ধারে আসিয়া দাঁড়াইত এবং সেখান হইতে মহানন্দে সম্মুখের দিগন্তব্যাপী শস্যপূর্ণ মাঠের দিকে চাহিয়া থাকিয়া তাহার সবুজ রঙ্গের সহিত ঘনান্ধকারের কাল রংয়ের মেশা-মিশি দেখিতে দেখিতে আত্মহারা হইয়া পড়িত। কিছু পরে চতুর্দ্দিক্ ভাসাইয়া যখন বৃষ্টি নামিত, তখন দাওয়ার এক ধারে আসিয়া উৎফুল্ল-মনে সে সেই বৃষ্টি দেখিত, তার পর সে বড় হইয়াছে, অনেক বর্ষার অনেক বৃষ্টি সে দেখিয়াছে এবং আনন্দে বিভোর হইয়া হাত-তালি দিয়া না নাচিলেও, একান্তে ঘরের মধ্যে বসিয়া তন্ময়চিত্তে বর্ষার এই রূপ বহুবার সে উপভোগ করিয়াছে।

আজও অপরাহ্ণে নির্জ্জন ঘরের মধ্যে বসিয়া একান্তমনে সে এই দৃশ্যই দেখিতেছিল, কিন্তু সহসা তাহার দেখার বাধা জন্মাইয়া সম্মুখের সেই পথের উপর একটি পরিচিত মূর্ত্তি তাহার চোখের সম্মুখে দেখা দিল এবং সে ছুটিয়া যাইয়া পার্শ্বের ঘরে ভবতোষ বাবুকে জানাইল,—"নেপাল বাবু আসছেন, বাবা।"

সামান্য একটু বিস্মিত হইয়া ভবতোষ বাবু কহিলেন,—"এই বৃষ্টিতে?"

"হ্যাঁ, বাবা, জামা-কাপড় সব একেবারে ভিজে একাকার!"

ভবতোষ বাবু কয় দিন হইতে অসুস্থ ছিলেন। শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া কহিলেন,—"যা মা, ভিজে কাপড়-চোপড় সব ছেড়ে ফেলতে বল গে যা, তার পর এইখানে নিয়ে আয়।"

মিনিট পনর কুড়ির মধ্যেই নেপাল বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া এ ঘরে আসিল এবং ভবতোষ বাবুর পায়ের কাছে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল। ভবতোষ বাবু কহিলেন,—"এত দিন গিয়েছ, নিজেও একখানা চিঠি দাও নি, আর আমি যে চিঠি দিলুম, তারও কোন জবাব দিলে না। যাই হোক, কেমন আছ, বল দেখি বাবা?"

'ভাল আছি' বলিয়াই নেপাল সর্ব্বপ্রথমে তাহার মাতার মৃত্যু সংবাদ জানাইল এবং তৎপরে সংক্ষেপে নিজের সম্বন্ধে অন্যান্য কথা জানাইয়া এ বাটীর কুশল জিজ্ঞাসা করিল। তাহার মাতার মৃত্যুর সংবাদ শুনিয়া ভবতোষ বাবু যথেষ্ট দুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং তাহাকে অনেক সান্ত্বনার কথা বলিয়া, অবশেষে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"সমস্ত দিন বোধ হয়, খাওয়া-দাওয়া কিছুই হয় নি। এই বৃষ্টি মাথায় ক'রে কি ঘর থেকে আজ বেরুতে আছে, বাবা ?"

নেপাল কহিল,—"বাড়ী থেকে খুব ভোরে যখন বেরিয়েছিলুম, তখন বৃষ্টির কোন লক্ষণই ছিল না, ষ্টেশনে এসে পৌঁছবার পর বৃষ্টি পেলুম। আপনার কি কোন অসুখ করেছে ? চেহারা বড্ডই খারাপ দেখাচ্ছে।"

"হ্যাঁ বাবা, ক'দিন ধরেই একটু একটু জ্বর হচ্ছে, আজ আবার বুকটায় যেন একটু ব্যথা বোধ কচ্ছি। আচ্ছা, তোমাদের শ্যামসুন্দরপুর ত্রিবেণীর ঐ দিকে ত ? ত্রিবেণী থেকে কতটা যেতে হয় ?"

"অনেকটা ; মাইল চৌদ্দ পনর হবে, কিন্তু আজকাল হাটতে হয় না, ছোট রেল হয়েছে।"

"তোমার বিবাহ হয়েছে কোন্ গ্রামে, বাবা ?"

নেপাল সত্য গোপন করিয়া কহিল—"সাত-শিমুল।"

"সেটা কোন্ জেলা ?"

"বাঁকুড়ো।"

বৌমাকে এখন একলা বাড়ীতে রেখে এলে ত ?"

মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া নেপাল কহিল,—"আজ্ঞে হ্যাঁ, এক বিধবা পিস্-শাশুড়ীকে নিয়ে এসে রেখে দিয়ে এসেছি।"

টপ্ করিয়া এই নিছক মিথ্যাগুলি নেপালের মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল। ইহা যে সে ভাবিয়া চিন্তিয়া বা কোন উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া বলিল, তাহাও নহে। গয়ারামের সংস্রবে আসিয়া অবধি এইরূপ ধরণের উদ্দেশ্যবিহীন মিথ্যা বলা যেন তাহার স্বভাবই হইয়া দাঁড়াইল এবং সে অভ্যাসের হাত হইতে এখনও সে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারে নাই।

ভবতোষ বাবু বলিলেন,—"তা বেশই করেছ, চ'লে এসেছ। শীগ্‌গিরই তোমার কাযকর্ম্মের ব্যবস্থা আমি ক'রে দিচ্ছি, কিছু ভেব না। এইখানেই এখন থাক; আমি একটু সুস্থ হয়ে নি আগে। যাও বাবা, এখন একটু জল-টল কিছু খাও গিয়ে," বলিয়া অর্চ্চনার মুখের দিকে চাহিলেন। অর্চ্চনা ঘর হইতে বাহির হইয়া নীচে চলিয়া গেল এবং কিছু পরেই ঝি আসিয়া নেপালকে জল খাইবার জন্য ডাকিয়া লইয়া গেল।

নেপাল জল খাইয়া ফিরিয়া আসিলে ভবতোষ বাবু অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহার সহিত অনেক কথা বলিলেন। সমস্ত শুনিয়া মোটের উপর নেপাল এই বুঝিল যে, ভবতোষ বাবুর কাছেই তাহার কায হইল। কলিকাতায় তাঁহার খান পাঁচ-সাত বাড়ী, কিছু জমী-জমা প্রভৃতি আছে। সেই সমস্ত দেখা-শুনা করা এবং সাধারণতঃ সকল প্রকার বৈষয়িক কর্ম্মে তাঁহাকে সাহায্য করা, ইহাই তাহার কায। অবিনাশ বাবু এই সব কায করিতেন, বার্দ্ধক্যের জন্য তিনি আর কার্য্যাদি করিতে অপারগ হইয়া স্বেচ্ছায় কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সম্প্রতি দেশে চলিয়া গিয়াছেন। বহুদিনের পুরাতন ও বিশ্বস্ত এই কর্ম্মচারীটি যাহাতে দেশে থাকিয়া শেষ-বয়সে অর্থাভাবে না কষ্ট পান, সে জন্য ভবতোষ বাবু তাঁহাকে ৫শত টাকা দিয়া সাহায্যও করিয়াছেন।

যাহা হউক, ভবতোষ বাবুর কাছেই নেপালের কায হইল, ইহাতে নেপালও মনে মনে সুখী হইল, ভবতোষ বাবুও সুখী হইলেন। কিন্তু সামান্য একটু জ্বর ও একটুখানি বুকের ব্যথা মস্ত বড় অসুখের সৃষ্টি করিয়া প্রায় মাসাবধিকাল তাঁহাকে শয্যাগত করিয়া ফেলিয়া রাখিল। এক মাস পরে তিনি কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া উঠিলেন এবং চিকিৎসকরা তখন তাঁহার সাগু, বার্লি, হর্লিকের রুটী, বেদানা ও কমলানেবুর রস প্রভৃতি বাতিল করিয়া মাছের ঝোল, ভাত, সুরুয়া, সুজির রুটী, পশ্চিমের হাওয়া প্রভৃতি খাইবার ব্যবস্থা করিয়া গেলেন।

ভবতোষ বাবুর অসুখের সময় নেপাল আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া তাঁহার সেবা শুশ্রূষায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। তাহার ক্লান্তিশূন্য পরিশ্রম, যত্ন, সেবার ঐকান্তিকতা দেখিয়া অর্চ্চনাও মনে মনে বিস্মিত না হইয়া পারে নাই। এক্ষণে সারিয়া উঠিবার পর এক দিন তিনি নেপালকে কহিলেন,— "হয় ত তুমি আর জন্মে আমার ছেলেই ছিলে, বাবা। নইলে প্রথম থেকেই তোমার উপর এতটা স্নেহ আমার পড়বে কেন ?" অন্য এক সময়ে অর্চ্চনাকে ডাকিয়া বলিলেন,— "নেপালকে ঠিক ভাইয়ের মতই মনে করিস, মা। হীরের

টুকরো ছেলে, যেমন সুন্দর ও বাইরে, তেমনি সুন্দর ও ভেতরে। আমার ৬৫ বছরের অভিজ্ঞতায় লোক চেনবার যে শক্তিটুকু পেয়েছি, তাতে ক'রে ওর ঐ সুন্দর চোখের শান্ত দৃষ্টির ভেতর দিয়ে আমি একটি নিষ্কলঙ্ক পবিত্র অন্তরেরই পরিচয় পাই।"

পিতার অসুখের জন্য এই এক মাসকাল অর্চ্চনা তাহার নিত্যকার জপ-তপ-পূজায় বেশী সময় দিতে পারে নাই। এমন এক এক দিন গিয়াছে, যে দিন সে পূজার ঘরে ঢুকিতে পর্য্যন্ত অবসর পায় নাই। এক্ষণে অবসর পাইয়া সকাল-সন্ধ্যায় সে এই ক্ষতিপূরণের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল।

সে দিন সন্ধ্যায় অনেকক্ষণ ধরিয়া পূজার ঘরে কাটাইয়া বাহিরে আসিতেই সে দেখিল, তাহাদের বুড়া চাকর চিন্তামণির ছেলেটি তাহার অপেক্ষায় বারান্দায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। অর্চ্চনা তাহাকে কহিল,—"কি রে কেষ্ট?" সে কহিল,—"ম্যানেজার বাবু অনেকক্ষণ চা চেয়ে পাঠিয়েছেন, ঠাকুর মশাই কইলে—বাইরে আর চা নেই, দিদিমণির কাছ থেকে চায়ের টিন মেঙ্গে নিয়ে আয়।"

অর্চ্চনা দেরাজ হইতে চায়ের টিন বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া বরাবর নীচে নেপালের ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। নেপাল তখন কি একটা হিসাবের কাগজ দেখিতেছিল, অর্চ্চনা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবাকে হাওয়া বদলাবার জন্যে কোথায় নিয়ে যাওয়া যায় বলুন ত?"

নেপাল কাগজখানি দেখিতে দেখিতেই কহিল,—"আসাম।"

"কি বলছেন, নেপাল বাবু?"

"তবে দার্জ্জিলিং, না হয় জলপাইগুড়ি।"

খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া অর্চ্চনা বলিল,—"সত্যি, বলুন না ঠিক ক'রে?"

কাগজখানি টেবলের এক পাশে রাখিয়া দিয়া নেপাল কহিল,—"ঠিক ক'রে কিছু বলবার এখন শক্তি নেই, কারণ, কেষ্টকে চায়ের জন্য ভেতরে পাঠিয়েছি প্রায় আধ ঘণ্টা, চা-ও এল না, কেষ্টও ফিরল না, তাই মনেরও ঠিক নেই—মাথারও ঠিক নেই।"

সেইরূপ সহাস্যে অর্চ্চনা বলিল,—"তাই বুঝি চা চা করতে করতে মনটা এখন আপনার খালি আসাম-দার্জ্জিলিং-জলপাইগুড়ির—"

"চা-বাগানে চা-বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

"বাবা! ভাল চা-খোর আপনারা! আচ্ছা, এক মিনিটের ভেতর আপনার চা পাঠিয়ে দিচ্ছি, বলুন এখন, বাবাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া যায়?"

"আমিও তা' হলে এক সেকেণ্ডের মধ্যেই বলছি—গিরিডি।"

প্রফুল্ল-মুখে হাসিয়া অর্চ্চনা কহিল,—"আমিও ঠিক তাই ভেবেছি, নেপাল বাবু।" বলিয়া অর্চ্চনা চলিয়া গেল।

ইহারই কয়েক দিন পরে এক দিন সকালবেলায় স্নানান্তে তাহার লালপাড়ের মটকার সাড়ীখানি পরিয়া অর্চ্চনা পূজার ঘরে প্রবেশ করিল, প্রায় এক ঘণ্টা পরে বাহির হইয়া বারান্দার একাংশে দাঁড়াইয়া যখন কপালের রাশীকৃত এলোচুলের উপর যুক্ত কর ঠেকাইয়া সূর্য্যের উদ্দেশে প্রণাম করিতে লাগিল, তখন ভবতোষ বাবুর ডাকে তাড়াতাড়ি সূর্য্য-প্রণাম শেষ করিয়া তাঁহার ঘরে আসিয়া কহিল,—"কেন বাবা?" ভবতোষ বাবু কহিলেন—"যদি গিরিডিই যেতে হয়, তা হ'লে দেরী ক'রে ফল কি, মা?"

অতিমাত্র বিস্ময় প্রকাশ করিয়া অর্চ্চনা কহিল,—"কি বলছেন বাবা? এই ভরা ভাদ্দর মাসে আপনাকে নিয়ে ঘর থেকে বেরুব?"

একটুখানি হাসিয়া ভবতোষ বাবু কহিলেন,—"নেপাল ঠিক এই কথাই বলছিল যে, ভাদ্রমাসে যেতে তুই কিছুতেই মত করবি নি;—কিন্তু এক দিন যে আমায় চিরকালের জন্য ছেড়ে দিতে হবে, সে দিন তোর তিথি-নক্ষত্র, দিন-ক্ষণ, পৌষ-ভাদ্র কোন কথাই যে টিকবে না, মা!"

অর্চ্চনার প্রফুল্ল মুখভাব নিমেষে ব্যথায় ভরিয়া উঠিল, চক্ষুও যেন সঙ্গে সঙ্গে একটু সজল হইয়া আসিল; দেওয়ালের দিকে চাহিয়া সে কিছু যেন বলিতে যাইতেছিল, ভবতোষ বাবু তৎপূর্ব্বেই একটু হাসিয়া পুনরায় কহিলেন,—"আচ্ছা মা, তাই হবে, এ ক'টা দিন কেটেই যাক্ তা হ'লে।"

দুই হাতে চক্ষু মুছিতে মুছিতে অর্চ্চনা ধীরপদে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

১২

গিরিডি হইতে উত্তরমুখী হইয়া যে রাস্তাটি বরাবর পচম্বার দিকে গিয়াছে, তাহারই উপর একটি নাতিবৃহৎ বাড়ী ভাড়া লইয়া আজ প্রায় এক মাসেরও উপর ভবতোষ বাবু আসিয়া

রহিয়াছেন। এক মাসের মধ্যেই তাঁহার দুর্ব্বল শরীর অনেকটা ভাল হইয়াছে। অর্চ্চনার ইচ্ছা যে, আরও মাস দেড়েক এখানে থাকিয়া তাহারা কলিকাতায় ফিরিয়া যায়। সঙ্গে নেপাল, বামুন ঠাকুর ও কেষ্ট আসিয়াছে এবং স্থানীয় এক জন ঠিকা ঝি রাখা হইয়াছে। এখানে আসিয়া এক কেষ্ট ছাড়া সকলকারই স্বাস্থ্যের বেশ উন্নতি হইয়াছে। অর্চ্চনা এক দিন কেষ্টকে জিজ্ঞাসা করিল,—"এখানে এসে সকলেরই চেহারা ভাল হ'ল, তোর চেহারা এমন দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে কেন রে, কেষ্ট ?"

কেষ্ট বলিল,—"না দিদিমণি, এ যায়গা ভাল নয়। চারদিককের এই সব পাহাড়-পব্বত আর উঁচু-নীচু কাঁকরের মাঠ দেখলে কেমন আমার মনের ভিতর হু-হু করতে থাকে ; তার উপর কি হুজ্জয়ে শীত পড়েছে, দিদিমণি !"

"বামুন-ঠাকুরের চেহারা তবে ভাল হ'ল কেমন ক'রে ?"

"কেন হবে না দিদিমণি, দিনরাত ও আগুনের তাতে গরম হয়ে ব'সে আছে, ওকে ত আর পাতকুয়োর ঐ হিম জল নাড়া-চাড়া করতে হয় না। আর তা ছাড়া"—বলিয়া গলার স্বর খুব নরম করিয়া কহিল,—"ও খায় কত দিদিমণি ! ভালমন্দ তোমরা যা খাও, ও-ও ঠিক তাই খায় !"

হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া অর্চ্চনা বলিল,—"বটে ! আর তোকে বুঝি ভাল-মন্দ কিছু দেয় না ? দাঁড়া, ঠাকুরকে এই কথা ব'লে দিচ্ছি।"

"হেই দিদিমণি, তোমার দুটি পায়ে চারটি গড় করি, তা হ'লে ঠাকুর আর আমায় রাখবে না ! ব্যাগগতা করি দিদিমণি, কিছু বোলোনিক।"

অর্চ্চনা হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। কেষ্ট অপ্রস্তুতের মত সেই দিকে চাহিয়া হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

দ্বিপ্রহরে যখন ভবতোষ বাবু ও নেপাল খাইতে বসিয়াছিল, তখন অর্চ্চনা একধারে বসিয়া সকলের জন্ম আলাদা করিয়া বাটিতে বাটিতে দুধ ঢালিতেছিল। সেই সময় ঠাকুর কি একটা দিতে আসিলে অর্চ্চনা তাহাকে কহিল,—"ঐ যে একটা একরত্তি ছেলে সঙ্গে এসেছে, ও কিছু খেতে-টেতে পায়, ঠাকুর ?"

ঠাকুর তাহার দিকে চাহিয়া চক্ষু কপালে তুলিয়া কিছু বলিতে যাইতেছিল, তৎপূর্ব্বেই অর্চ্চনা কহিল,—"না, ও সব কথা শুনতে চাই না। ওকে মাছ-টাছ, তরকারি সব ভাল ক'রে দেবে। ছেলেটা যা এসেছিল, তার চেয়েও রোগা হয়ে গেছে। ওর জন্মে আমার কাছ থেকে একটু একটু দুধ রোজ মনে ক'রে চেয়ে নিয়ে যাবে,—বুঝলে ?"

"হুউ। মাছ ত রোজই দেউচি পারা।"

"দেউচি, ত ছেলেটা দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছে কাঁইকি ?"

ঠাকুর চলিয়া গেল। ভবতোষ বাবু ও নেপাল পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন। অর্চ্চনাও মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

অপরাহ্লে অর্চ্চনা দ্বিতলে বারান্দার একাংশে আরাম-কেদারায় বসিয়া সম্মুখের দিগন্ত-প্রসারিত প্রান্তরের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিতেছিল। কোথাকার কোন্ অখ্যাত অজ্ঞাত পাহাড় হইতে অতি ক্ষুদ্র একটি ঝরণা বাহির হইয়া তাহাদের বাড়ীর নিকট দিয়াই আঁকিয়া-বাঁকিয়া বহিয়া গিয়াছে। অন্ত সময়ে হয় ত তাহাতে মোটেই জল থাকে না, কিন্তু এবার এখানে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত বর্ষা থাকায় এই শীর্ণকায় ঝরণাটির অপ্রশস্ত বালির বুক চিরিয়া ক্ষীণ জলস্রোত সূর্য্য-করে চিক-চিক করিতেছিল। পাহাড়ের উপর অসংখ্য ছোট-বড় প্রস্তরখণ্ড ভূগর্ভ হইতে মাথা-খাড়া করিয়া উঠিয়াছে, আর তাহাদিগকে পাহারা দিবার জন্য নিকটেই বৃহদায়তন একখণ্ড প্রস্তর যেন বিকট দৈত্যের মত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। অদূরে কতকগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট শালবৃক্ষ খানিকটা স্থান ছায়া করিয়া রাখিয়াছিল এবং তাহার ও-দিকেই এক স্থানে, গুটি-দুই চার মহুয়া ও শিরীষ গাছের পর হইতেই কঙ্করময় উচ্চ-ভূমি একবারে নীচের দিকে নামিয়া গিয়াছে। বামদিকে কিছু দূরে ছোট একটি টিলার উপর কয়েকটি দেবদারু, শিশু, বনঝাউ, পিংড়ী, উনার প্রভৃতি বৃক্ষের মাথায় মাথায় অস্তোন্মুখ সূর্য্যের নিস্তেজ রৌদ্র পড়িয়াছিল। টিলার পার্শ্ব দিয়া একটি সঙ্কীর্ণ পায়ে-চলা পথ প্রান্তর ভেদ করিয়া নিকটের কোন সাঁওতাল-পল্লীতে যাইয়া মিশিয়াছে। পশ্চিমে—দূরে কয়লার খাদগুলির উপর ছোট-বড় অনেকগুলি বিচিত্র বাংলো অস্পষ্ট ছবির মত দেখাইতেছিল এবং তাহাদেরই চারিপার্শ্বে অসংখ্য প্রস্তরময় উচ্চ স্তূপ অগণিত বন্যবৃক্ষ-পরিবৃত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বেলাশেষের আকাশে খণ্ড-মেঘগুলির উপর পড়ন্ত সূর্য্যের শেষ রশ্মি পড়িয়া তথায় যে অপরূপ বিচিত্র চিত্রের সৃষ্টি হইয়াছিল, মনে

হয়, নিম্নে ভূ-পৃষ্ঠের এই সকল অনির্ব্বচনীয় দৃশ্যের প্রতিবিম্বই উপরে আকাশের গায় প্রতিফলিত হইয়াছে। সম্মুখে আরও দূরে, সুবিশাল পাহাড়িয়া প্রান্তরের একবারে শেষ সীমায় পরেশনাথের সু-উচ্চ পাহাড়শ্রেণী অস্পষ্ট মেঘরাশির মত দেখাইতেছিল।

বহুক্ষণ পরে এই সব দৃশ্যের উপর হইতে অর্চ্চনা যখন তাহার দৃষ্টি ফিরাইয়া আনিল, তখন সম্মুখের সেই ক্ষুদ্র ঝরণাটির শীর্ণ জলধারার উপর ছায়া পড়িয়া আসিয়াছে এবং তীরের উপরকার একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তরের উপর বসিয়া তাহাদের ঝি নোনিয়ার মা'র আট নয় বছরের ছেলে নোনিয়া আপন মনে নানাপ্রকার সুরের কসরৎএর সঙ্গে সঙ্গীতচর্চ্চা করিতেছে। ঝরণার পাড়ের উপরেই তাহাদের একখণ্ড শাক-সব্জীর ক্ষেত এবং তাহারই এক অংশে তাহাদের শুইবার ছোট একখানি ঘর। ঘরখানির চারি পার্শ্বের দেওয়াল সুন্দররূপে গোবর-মাটী দিয়া লেপা ও তাহার উপর চূণ দিয়া নানা রকমের নক্সা কাটা। অর্চ্চনা দেখিল, দাওয়ার উপর বসিয়া নোনিয়ার মা বৃহৎ যাঁতাতে গম ভাঙ্গিতেছে। অর্চ্চনা উঠিয়া নীচে আসিল এবং খিড়কীর দরজা দিয়া বরাবর নোনিয়ার মা'র ঘরের দিকে চলিল।

হঠাৎ উঠানের মধ্যে অর্চ্চনাকে দেখিয়া নোনিয়ার মা যাঁতা বন্ধ করিয়া উঠিল এবং একখানি ছোট চেটাই দাওয়ায় বিছাইয়া দিয়া তাহার নূতন প্রভুকন্যাকে অভ্যর্থনা করিল। অর্চ্চনা বসিল না, দাঁড়াইয়া থাকিয়াই জিজ্ঞাসা করিল,—"আচ্ছা, নোনিয়ার মা, নোনিয়ার বাবা রোজ কত রাত্রে কায থেকে ঘরে ফেরে ?"

নোনিয়ার মা উঠানে নামিয়া আসিয়া কহিল,—"এক পৌহর দেড় পৌহর রাত হইয়ে যায়, অভ্‌র্ (অভ্র) কা কাম আছে দিদিমণি, জান নিকাল্‌কে তব্ পনরঠো রুপেয়া দে দেয়।"

"আচ্ছা, অত রাত পর্য্যন্ত তোর একলা থাকতে ভয় করে না ?"

"কুছ ডর্ এখানে নেই, দিদিমণি। সাত বরিষ যখন হামার উমের, তবসে এখানে আছি। বহুৎ রোজ আগাড়ি থোড়া থোড়া বাঘ এখানে ছিল, এখন সব ভাগ গিয়েছে।"

"আরে—পোড়ারমুখী, বাঘের ভয়ের কথা বলছি না, আর কোন কিছুর ভয়-টয় করে না ?"

"চোর বদ্‌মাসকা বাত বলছো, দিদিমণি ? ওসব কুছ এখানে নেই।"

"দূর পোড়াকপালী ! যতক্ষণ না নোনিয়ার বাপ ঘরে আসে, ততক্ষণ একলা ঘরের ভেতর থাকতে তোর গা ছম্‌ছম্ করে না ?"

মুখ ও চোখের অদ্ভুত একটা ভঙ্গী করিয়া নোনিয়ার মা কহিল,—"আরে, রাম-রাম ! সে সব ডর্ হিঁয়া কভি নেই, দিদিমণি। তবে বহুৎ রোজ আগাড়ি, নোনিয়া তখন হামার হুয়া নেই, এক রাতমে, মুখ হাত ধোনে কা আস্তে হামি এই উঠোন পার এসে খাড়া হয়েছি,—তখন শাওন মাস, চাঁদনী রাত,—ঐ যাঁহা নোনিয়া অভি বৈঠকে গান গা'তা হায়, ঐ পাথরকা উপর, দিদিমণি——"

অর্চ্চনা দাওয়ার চেটাইখানির উপর আসিয়া বসিল এবং একবার সেই পাথরখানার দিকে চাহিয়া কহিল,—"পাথরখানার ওপর কি দেখলি ?"

"পাথরকা উপর, সাদা দুধকা মাফিক লুগা পিনকে, এই এৎনাতক্ ঘোমটা দে কে——"

নোনিয়ার মা'র মুখের বাকী কথাগুলি বাহির হইবার পূর্ব্বেই ঝরণার দিক হইতে একটি প্রৌঢ়বয়স্কা স্ত্রীলোক সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইল। সে দাঁড়াইবামাত্রই নোনিয়ার মা দাওয়ার উপর উঠিয়া গিয়া তাহার সদ্য-ভাঙ্গা আটা হইতে প্রায় অর্দ্ধসের আন্দাজ আটা কাপড়ে করিয়া তুলিয়া আনিয়া স্ত্রীলোকটির হাতের একখানি পিত্তলের সরার মধ্যে ঢালিয়া দিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই স্ত্রীলোকটি যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথেই আবার চলিয়া গেল।

সে চলিয়া গেলে অর্চ্চনা জিজ্ঞাসা করিল,—"কে নোনিয়ার মা ?"

"নন্দহরি বাবুকা লেড়কী, দিদিমণি; তোমাদের বাঙ্গালী আছে।"

অতঃপর অর্চ্চনার জিজ্ঞাসার উত্তরে সে আঙ্গুল বাড়াইয়া ঝরণার পরপারে অদূরের একটি অতি ক্ষুদ্র মঠ দেখাইয়া কহিল,—"ওহিখানে ও থাকে।" তার পর নন্দহরি বাবুর এই লেড়কীর পরিচয়ে সে তাহার সম্বন্ধে হিন্দী ও বাঙ্গালায় মিশাইয়া যাহা বলিল, সংক্ষেপতঃ তাহা এই :—

বহুকাল আগে বাঙ্গালা দেশ হইতে নন্দহরি বাবু এই গিরিডিতে আসেন এবং অভ্রের কাযে খুব ধনী হইয়া

অরুণোদয়

বসুমতী প্রেস]

[শিল্পী—শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য

পড়েন। তাঁর ছেলে ছিল না, একটি শুধু মেয়ে। খুব গরীবের ঘরে মেয়েটির বিবাহ দিয়াছিলেন। নন্দহরি বাবু জামাইটিকে কাছে রাখিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই শ্বশুরের কাছে সে থাকিতে রাজি হয় নাই। তাই শুধু তিনি মেয়েটিকেই নিজের কাছে রাখিতেন, জামাইয়ের কাছে কখন তাহাকে পাঠাতেন না। ঐ যে গির্জ্জার কাছে উস্‌রি নদীর ধারে রাজবাড়ীর মত মস্ত বাড়ী, ঐ ছিল তাঁহার বাড়ী। তার পরে, একবার জামাইয়ের খুব কঠিন ব্যায়রাম হয়, তখন সে তাহার শেষ সময় বুঝিতে পারিয়া শ্বশুরবাড়ীতে তাহার স্ত্রীর কাছে চলিয়া আসে। কিন্তু নন্দহরি বাবু তাহাকে বাড়ীতে ঢুকিতে না দিয়া ফটক থেকেই তাড়াইয়া দেন। সঙ্গে সঙ্গে নন্দহরি বাবুর মেয়েও বাড়ী থেকে চলিয়া আসে। ঐ যেখানে এখন মঠটা রহিয়াছে, ঐখানে কেষ্ট কাহারের তখন ঘর ছিল। কেষ্ট ছিল নন্দহরি বাবুর অভ্রের কারখানার আগেকার চাকর। সংসারে তাহার কেহ ছিল না। নন্দহরি বাবুর মেয়ে তাহার স্বামীকে লইয়া কেষ্টর ঐ বাড়ীতে এসে আশ্রয় লইল। তার পর স্বামীকে বাঁচাইবার জন্য সে অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু স্বামী তাহার বাঁচিল না। মেয়েও আর বাপের কাছে ফিরিল না। অনেক চেষ্টা করিয়াও নন্দহরি বাবু মেয়েকে আর নিজের বাড়ীতে লইয়া যাইতে পারিল না। তার পর অনেক দিন পরে কেষ্ট কাহার মরিয়া গেল। সে কিছু টাকা জমাইয়াছিল, সেইগুলি নন্দহরি বাবুর মেয়েকে সে দিয়া যায়। সেই টাকা দিয়ে নন্দহরি বাবুর মেয়ে ঐখানে ঐ ছোট্ট মঠটি তোলে। ঐ সেই নন্দহরি বাবুর মেয়ে। এখনও পর্য্যন্ত ঐখানেই সে একলা বাস করিতেছে।

ইতিমধ্যে কখন্ যে সন্ধ্যার অন্ধকার চারিদিকে ছাইয়া গিয়াছিল, গল্প শুনিতে শুনিতে অর্চ্চনার সে দিকে লক্ষ্যই ছিল না। তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া অর্চ্চনা কহিল,—"সেই নন্দহরি বাবু এখনও আছে?"

"না দিদিমণি, সে বহুৎ রোজ মারা গিয়েছে। তাহার বাড়ী-ঘর, পয়সা-টাকা, সব গিয়েছে—কুছ্ছুভি নেই।"

"আচ্ছা, নন্দহরি বাবুর মেয়ের কি ক'রে চলে?"

"পাগল ছাগল মানুষ, দিদিমণি, ভগওয়ান কই ফিকিরসে চালিয়ে দেন।"

"ও কি পাগল?"

"আদ্‌মি মরবার পর ওর খুব বেমার হয়, তার পর থেকেই মাথা খারাপ হোয়ে গেছে। আমার কাছে কভি কভি আসে, চারটি চারটি আটা হামি ওকে দিয়ে দি।"

উঠানের মধ্যে নামিয়া আসিয়া অর্চ্চনা একবার ওপারের সেই ক্ষুদ্র মঠটির দিকে চাহিয়া দেখিল। অন্ধকারে কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না, শুধু নোনিয়ার সঙ্গীতের ধ্বনি তখনও সেই পাথরখানার দিক হইতে তাহার কাণে আসিতে লাগিল।

"নোনিয়ার মা?"

"কি দিদিমণি?"

"আমায় একটু দাঁড়াবি? কেন তোর গল্প শুনতে গেলুম, দেখ না কি রকম অন্ধকার!"

"চল. আমি দাঁড়াচ্ছি,—তোর বড্ড ডর, দিদিমণি।"

"হ্যাঁ লো, এই রকম অন্ধকারে তোর ডর্ করে না?"

পরদিন দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর অর্চ্চনা খিড়কীর দরজা খুলিয়া ধীরে ধীরে নোনিয়ার মা'র উঠানে গিয়া দাঁড়াইল এবং সেখান হইতে এক পা এক পা করিয়া চলিয়া ঝরণার ধারে আসিল। একবার সেই বড় পাথরখানির দিকে চাহিয়া দেখিল, কিন্তু পরক্ষণেই সে চোখ ফিরাইয়া লইয়া ঝরণার জলে নামিয়া পড়িল; কি জানি, সাদা ধবধবে কাপড় পরিয়া, বুক পর্য্যন্ত ঘোমটা দিয়া, শ্রাবণের সেই জ্যোৎস্নারাতে নোনিয়ার মা যাহাকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছিল, এখনও পাথরখানার উপর তাহার কোন মায়া আছে কি না, কে বলিতে পারে! পাথরখানির দিকে অর্চ্চনা আর চাহিয়া দেখিল না। সে বরাবর ঝরণা পার হইয়া ও পারের সেই মঠের দিকে চলিল।

খানিক পরেই সে মঠের সম্মুখে আসিয়া পৌছিল এবং খোলা দরজা দিয়া দেখিল, ভিতরে সেই স্ত্রীলোকটি মেঝের উপর শুইয়া রহিয়াছে। অর্চ্চনাকে দেখিতে পাইয়াই সে হাতছানি দিয়া ডাকিল এবং অর্চ্চনা মঠাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে, তাহাকে বসিতে বলিয়া কহিল,—"ভাল আছ ত, বোন্? তোমরা আর ক'দিন এখানে থাকবে?"

অর্চ্চনা মেঝের একধারে বসিয়া পড়িয়া কহিল,—"আমাকে আপনি জানেন?"

"তোমরা ঐ 'শিব-নিবাসে' এসে রয়েছ ত, বাবা তোমার সেরেছেন? ঐ নোনিয়ার মা'র কাছেই তোমাদের কথা শুনিছি।"

"হ্যাঁ দিদি, বাবা একটু সেরেছেন।"

"সারবে বৈ কি। তোমার মত সতী-লক্ষ্মী পবিত্র মেয়ে যাঁর, তাঁকে কি কখনও অসুখে ভোগাতে পারে? ভালর যে ভগবান্ আছে, বোন্।"

অর্চ্চনা বুঝিতে পারিল না, কাল কেন ইহাকে নোনিয়ার মা পাগল বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল। বরঞ্চ কিছুক্ষণ কথা-বার্ত্তার পর অর্চ্চনা জানিল যে, এই সৌভাগ্যবঞ্চিতা, দীন-হীনা রমণীটি শিক্ষায় দীক্ষায় স্ত্রী-জাতির আদর্শস্বরূপা। প্রায় এক ঘণ্টাকাল ধরিয়া স্ত্রীলোকটি অর্চ্চনার সহিত নানা-বিষয়ে কথা কহিল,—ধর্ম্মের কথা, সমাজের কথা, নারীর কর্ত্তব্যের কথা, প্রেম ও ভক্তির কথা, শ্রীচৈতন্যের আদর্শ, রাধাকৃষ্ণের লীলাতত্ত্ব;—অর্চ্চনা তাহার সব কথা ভাল করিয়া বুঝিতে না পারিলেও তন্ময় হইয়া বসিয়া বসিয়া শুনিতে লাগিল। তাহার পর এক সময়ে শীতের স্বল্পপ্রাণ বেলার দিকে চাহিয়া দেখিয়া অর্চ্চনা যখন গৃহে ফিরিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল, তখন স্ত্রীলোকটি কহিল,—"আচ্ছা বোন্, বেলা গেছে, এস আজ। যদ্দিন এখানে থাক, তোমার এই গরীব দিদির কাছে এসো মাঝে মাঝে। আমার বড় একটা কোথায় বেরুবার উপায় নেই, ভাই। বাপ নেই, মা নেই, ভাই-বোন নেই, শ্বশুর-খাশুড়ী-দেওর-ননদ নেই, শুধু আমাদের স্বামি-স্ত্রীর সংসার, তাও ছেলের কোনই ঝক্কি নেই, তবু ভাই এক তিল কোথাও গিয়ে নিশ্চিন্দি হয়ে থাকতে পারি না। কি জানি, কখন্ কোন্ সময় হয় ত এসে পড়বেন, ঘরে আমায় দেখতে পাবেন না।"

"কে দিদি?"

কাণের কাছে মুখ লইয়া আসিয়া স্ত্রীলোকটি ফিস্-ফিস্ করিয়া কহিল,—"তোর ভগ্নীপতি,"—বলিয়াই মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল। পরমুহূর্ত্তেই কহিল,—"এমন যে লোক, কবে যে আসবে, ঠিক ক'রে কিছুই ব'লে যায় নি। তাই আমারও আর ঘর ছেড়ে বেরোন হয় না। বল্ না ভাই, বেরোতে পারি?"

এইবার অর্চ্চনা নোনিয়ার মা'র কালকের কথা কতকটা বুঝিতে পারিল। সে ৫টি টাকা আনিয়াছিল। আঁচল হইতে তাহা খুলিয়া তাহার হাতে দিতে যাইতেই সে কহিল,—"টাকা নিয়ে কি করব, সে এই টাকা-কড়ি নিয়ে ফিরে এসে পড়লো ব'লে। টাকার কি আমার অভাব ছিল? বাপের কুবেরের সম্পত্তি দু' হাত দিয়ে ঠেলে চ'লে এসেছি। ওরে, তার কাছে আবার টাকা" বলিয়া হঠাৎ যেন অন্যমন হইয়া পড়িল এবং মুহূর্ত্ত পরেই বাহিরের দিকে চাহিয়া যেন একদৃষ্টে কি দেখিতে লাগিল। অর্চ্চনা টাকা কয়টি জোর করিয়া তাহার হাতে গুঁজিয়া দিয়া কহিল,—"আজ আসি, আবার সময় পেলেই আসবো। তোমার একটু পায়ের ধুলো আমার মাথায় দাও ত, দিদি!" নুইয়া পড়িয়া অর্চ্চনা তাহার পায়ের ধুলা লইয়া মাথায় দিল। স্ত্রীলোকটি আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিল,—"মাথার ঐ সিঁদুর তোমার অক্ষয় হোক বোন্; রাজরাণী হয়ে স্বামিপুত্তুর নিয়ে ঘর-সংসার কর।" অর্চ্চনা কিছু একটা বলিতে যাইয়া সামলাইয়া লইল এবং সে দিনের মত বিদায় লইয়া তাড়াতাড়ি গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

অর্চ্চনা যখন ফিরিয়া আসিল, তখন ভবতোষ বাবু, নেপাল ও অক্ষয় বাবু নামে এখানকার একটি ডাক্তার, তিন জনে বসিয়া কি একটা কথার আলোচনা সম্পর্কে বাহিরের ঘরখানিকে মুখর করিয়া তুলিয়াছিলেন। অক্ষয় বাবু প্রবীণ চিকিৎসক, বহুদিন হইতেই গিরিডিতে আছেন, নিকটেই তাঁহার বাটী। সময় পাইলেই তিনি ভবতোষ বাবুর নিকট আসেন, গল্প-আলাপ করেন, চা খান এবং তাঁহার শারীরিক ও অন্যান্য সংবাদ লইয়া চলিয়া যান। অর্চ্চনা দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই অক্ষয় বাবু তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"কোথায় যাস্, বল্ ত মা? বাবা তোর ঠাকুরকে ডেকে চায়ের কথা বলছিলেন। আমি বললুম,—মা-লক্ষ্মী আমার আসুক, তার হাতের চা না খেলে আমার তৃপ্তি হবে না।"

অর্চ্চনা আর না দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে ভিতরে চলিয়া গেল এবং কিছু পরেই তিন কাপ চা তৈয়ারী করিয়া যখন পুনরায় গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল, তখন অক্ষয় বাবু জীবের ভাগ্য সম্বন্ধে যে কথা একটু আগে তুলিয়াছিলেন, তাহারই অনুসরণ করিয়া কহিলেন,—"এই দেখুন না কেন, এই গিরিডিতে বাঙ্গালীর মধ্যে ল্যাঙোহরি আর আমি প্রায় এক সময়েই আসি। উঃ, সে কি আজকের কথা! তখন গিরিডির নামই কেউ জানতো না। কিন্তু সে কথা যাক, ভাগ্যের ব্যাপারটা দেখুন একবার। একই সময়ে দু'জনে এলুম। আমি ত রীতিমত পয়সা-কড়ি কিছু সম্বল নিয়েই

..সেছিলুম, কিন্তু ল্যাণ্ডোহরি এখানে এসেছিল চৌদ্দগণ্ডা পয়সা হাতে ক'রে। তার পর সেই ল্যাণ্ডোহরি সতের বছরের ভেতর পাঁচ-সাত লাখ টাকার মালিক হয়ে গেল, আর আমি—যে অক্ষয় ডাক্তার, সেই অক্ষয় ডাক্তার,—তখনও যে ঘাস-জল—এখনও সেই ঘাস-জল। করবার মধ্যে ঐ বাড়ীটুকুই যা করতে পেরেছি, আর ঐ হাজার দশেক টাকার লাইফইনসিওর। একে ভাগ্য বলব না ত কি বলব বলুন?"

নেপাল জিজ্ঞাসা করিল,"ল্যাণ্ডোহরি কথার মানে কি?"

অক্ষয় ডাক্তার কহিলেন,—"ওঁর নামটা হ'ল নন্দহরি, এখানকার হিন্দুস্থানীরা ওঁকে ল্যাণ্ডোহরি ব'লে ডাকতো, নন্দটা ঠিক উচ্চারণ করতে পারতো না আর কি।"

অর্চ্চনা কহিল, "তাঁর মেয়েটি ও-পারের ঐ ছোট মঠটিতে রয়েছেন না?"

"হ্যাঁ; ঐ কালী মেয়েটিই ছিল ত ল্যাণ্ডোহরি বাবুর ঘরের লক্ষ্মী। কালীও বাপকে ছেড়ে এল, আর লক্ষ্মীও যেন সংসার ত্যাগ ক'রে বেরিয়ে গেলেন। আশ্চর্য্য মশাই, অত যে টাকা-কড়ি বিষয়-সম্পত্তি, দেখতে দেখতে যেন ভানুমতীর বাজির মত কোথায় উড়ে গেল।" এই সূত্রে অক্ষয় বাবু নন্দহরি বাবুর মোটামুটি একটা ইতিহাস বর্ণনা করিয়া শেষে কহিলেন,—"কিন্তু বলি হারি যাই এই কালীকে, অমন স্বামিভক্তি মশাই, আমার এতটা বয়সে খুবই কম দেখেছি। একটু মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। এই সে দিন পথে দেখা হ'ল, বললুম—সত্যনারায়ণের কথা শুনতে আসিস কালী, প্রসাদ নিয়ে যাস। তা মুখ সিঁটকে জবাব দিয়ে গেল—'আমার যে সত্যিকারের নারায়ণ, সে আমার স্বামী, সে আমার ঘরে, সে আমার বুকে, তোমাদের ও মিথ্যা নারায়ণ, ও সবের কথা শোনবার আমার কোন দরকার নেই'—বলেই একটু হেসে হন্-হন্ ক'রে চ'লে গেল।"

ভবতোষ বাবু কহিলেন,—"পাগলের মুখের কথা হলেও আদর্শ স্বামিভক্তি বটে। এ জিনিষটা আমাদের দেশ ছাড়া জগতের আর কোন দেশে নেই, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, ক্রমেই আদর্শটা নষ্ট হয়ে আসছে।"

অক্ষয় বাবু কহিলেন,—"তা সত্যি, তবে এ বিষয়ে আমার মত একটু অন্য রকম, ভবতোষ বাবু। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ভক্তি খুবই যে ভাল, সন্দেহ নেই; কিন্তু অন্ধভাবে অচলা ভক্তি, তার দোষ-গুণ দেখব না, তার উপযুক্ততা অনুপযুক্ততা দেখবো না,—সেই 'রাখিলে রাখিতে পার, মারিলে মারিতে পার' গোছ হয়ে থাকা, সেটা যেন আমার কাছে কেমন কেমন ঠেকে। অর্থাৎ, লক্ষহীরার আদর্শকে আমি কোন-মতেই আমল দিতে চাই না।"

"স্ত্রী যদি স্বামীকে মনে প্রাণে দেবতা বলেই জ্ঞান করে, তা হলে সে দেবতা কি করে না করে, স্ত্রীর তা দেখবার কোন দরকার নেই, তার ভাল-মন্দ বিচার করবারও কোন অধিকার সে রাখে না, সে শুধু তার সেই দেবতাকে সেবা ক'রেই আর তুষ্ট রেখেই ধন্য হয়।"

"কিন্তু সব স্বামীই ত দেবতা নয়, আর মেয়েমানুষও মানুষ; সুতরাং তারা যে নির্ব্বিচারে পুরুষের পায়ের তলায় মুখটি বুজে যুগ যুগ ধ'রে দাসী হয়ে প'ড়ে থাকবে, এতে সমাজের বা দেশের যে কি কল্যাণ, তা ত আমার মাথায় আসে না।"

অক্ষয় বাবুর কথাগুলি অর্চ্চনার কাণে বিষ ঢালিতেছিল। এই আলোচনাকে বন্ধ করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে সে কহিল,—"মাথায় আপনার কিছুই আসে না, কাকাবাবু, আর এলেও সব ভুলে যান। উস্রি প্রপাত দেখবার জন্যে একটা গাড়ীর কথা, তাও নিশ্চয়ই ভুলে ব'সে আছেন?'

"না মা-লক্ষ্মি, ভুলি নি; সেই খবর দেবার জন্যেই ত আজ এসেছিলুম। খুব ভাল গাড়ীরই ঠিক করিছি। ভাড়াও সুবিধে হয়েছে।"

"যাবার আসবার ভাড়া ঠিক করেছেন ত?"

"হ্যাঁ; যাবার আসবার ভাড়া হচ্ছে সাড়ে চার টাকা। কাল ১২টা ১টার ভেতরেই সে গাড়ী নিয়ে আসবে, তোমরা সব তৈরী হয়ে থেকো।"

সন্ধ্যা হইয়া আসিলে অক্ষয় ডাক্তার সেদিনকার মত বিদায় লইয়া গৃহে চলিয়া গেলেন।

[ক্রমশঃ।

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়।

মণিপুর-ভ্রমণ

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

মণিপুরের রাজধানী ইম্ফাল। মণিপুর সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে ঐ দেশের সামান্য পৌরাণিক কাহিনী ও ইতিবৃত্ত বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

মহাভারতে বর্ণিত আছে যে, তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের দ্বাদশ বৎসর বনবাসকালে তিনি মণিপুরে উপস্থিত হন। তখন মণিপুর-রাজ চিত্রভানু মণিপুর-সিংহাসন অলঙ্কৃত করিতেন। চিত্রভানুর চিত্রাঙ্গদা নাম্নী একটি সুন্দরী কন্যা ছিল। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন ইহার রূপে মুগ্ধ হইয়া ইহার পাণিপীড়নে অভিলাষী হন এবং মহারাজা চিত্রভানুর নিকট তাঁহার সহিত চিত্রাঙ্গদার বিবাহের প্রস্তাবাদি উত্থাপিত করেন। চিত্রভানু অর্জ্জুনের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এই সর্ত্তে যে, চিত্রাঙ্গদার গর্ভে যে পুত্র-সন্তান হইবে, সেই মণিপুরের রাজা হইবে। অনন্তর অর্জ্জুন এক বৎসরকাল মণিপুরে অবস্থান করিলেন এবং তাঁহার ঔরসে চিত্রাঙ্গদার গর্ভে বভ্রুবাহন নামে এক পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করিল। অতঃপর অর্জ্জুন স্বদেশে প্রতিগমন করিলেন, চিত্রাঙ্গদা মণিপুরেই রহিলেন।

কিছুকাল পরে যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধযজ্ঞকালে অর্জ্জুন যজ্ঞীয় অশ্বরক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে পুনরায় মণিপুরে উপস্থিত হইলেন, অশ্ব লইয়া পুত্র বভ্রুবাহনের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। মহাভারতে এই যজ্ঞীয় অশ্বের ও তাহার অপহরণের বৃত্তান্ত মণিপুরের দুইটি স্থানের নাম দ্বারা এখনও সমর্থিত হয়। যথা—'সাগলবান্' (সাগল অর্থে মণিপুরীরা অশ্বকে বুঝায়) যথায় যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞীয় অশ্ব বন্ধন করিয়া রাখা হইয়াছিল, এবং 'সাগলমণ্ড' যে স্থান হইতে যজ্ঞীয় অশ্ব অপহৃত হইয়াছিল। এই সাগলমণ্ড, বর্ত্তমান ইম্ফাল নগরের ৬।৭ মাইল উত্তরপূর্ব্বে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। যুদ্ধে অর্জ্জুন পরাজিত ও হতচেতন হন, এই সংবাদ শ্রবণে নাগা পর্ব্বতবাসী ঐরাবতকুলসম্ভূত কৌরব্য নামক নাগরাজের কন্যা অর্জ্জুনের অন্যতমা পত্নী উলূপী পতির চৈতন্য-সম্পাদনের নিমিত্ত তথায় আসেন। উলূপীর জন্মস্থান নাগা পর্ব্বত (বর্ত্তমান কহিমা) অসংখ্য বন্য ভেষজাদিতে পরিপূর্ণ, এবং তিনিও তাহার যথেষ্ট ব্যবহার জানিতেন। তিনি স্বামীর সংজ্ঞা ফিরাইবার আশায় নাগা পর্ব্বত হইতে মৃতসঞ্জীবনী ভেষজ আনিয়া অর্জ্জুনের চৈতন্য সম্পাদন করেন। মতান্তরে অর্জ্জুন অশ্বের রক্ষকরূপে মণিপুরে উপস্থিত হইলে বভ্রুবাহন তাঁহাকে পিতা বলিয়া মহা সমাদরে অভ্যর্থনা করেন। অর্জ্জুন ইহাতে বিরক্ত হইয়া পুত্রকে ক্ষত্রিয়োচিত কার্য্য না করার জন্য তিরস্কার করেন। বিমাতা উলূপীর উত্তেজনায় বভ্রুবাহন পিতার সহিত রণে প্রবৃত্ত হন। অর্জ্জুন পরাজিত ও হত-চেতন হইলে উলূপী পাতাল হইতে মৃতসঞ্জীবনী মণি আনিয়া স্বামীকে পুনর্জ্জীবিত করেন, তখন চিত্রাঙ্গদা স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। অনন্তর যথাকালে ইনি হস্তিনায় গিয়া পতিসহ বাস করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার পুত্র বভ্রুবাহন মণিপুরে রাজত্ব করিতে লাগিল। এই পাতালে যাইবার সুড়ঙ্গ এখনও মণিপুরে বর্ত্তমান আছে। ইহা ঠিক পুরাতন রাজ-দুর্গের সম্মুখেই। অনেকে বলেন, এই সুড়ঙ্গ ব্রহ্মদেশে গিয়াছে এবং পূর্ব্বে যখন ব্রহ্মদেশের সহিত মণিপুর রাজাদের খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল, তখন এই সুড়ঙ্গ গুপ্ত সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হইত। কিছুকাল পূর্ব্বে কয়েক জন পরিব্রাজক কৌতূহলপরবশ হইয়া উহার ভিতরে প্রবেশ করেন। কিন্তু আর বাহির হইতে পারেন নাই।

নাগা-যোদ্ধা
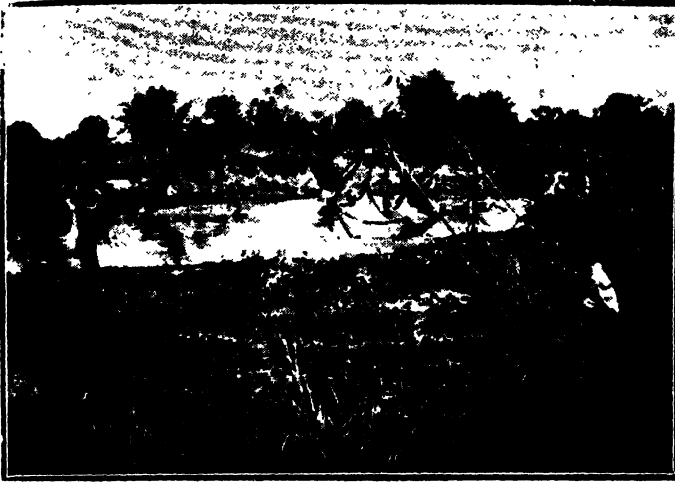
মণিপুরী জেলেরা মাছ ধরিতেছে

ঐ সুড়ঙ্গটির নাম কাংলা। বহু পূর্ব্বে ঐ সুড়ঙ্গটির পার্শ্বেই রাজসিংহাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। জনপ্রবাদ যে, ঐ সুড়ঙ্গের ভিতর মণিপুররাজের ভাগ্যদেবতা 'পাখাম্বা' নাগ (সর্প) বাস করেন। ইংরাজরা এক্ষণে ঐ গুহার মুখ একখণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। মণিপুরীদের বিশ্বাস যে, যিনি মণিপুরের রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করিবেন, তিনি ঐ প্রস্তরের উপর বসিলে খুব উত্তাপ অনুভব করিবেন এবং যে রাজা যতক্ষণ বসিতে পারিবেন, তাঁহার রাজত্বকাল ততই দীর্ঘ হইবে। বর্ত্তমান রাজা চূড়াচাঁদ না কি বহুক্ষণ বসিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান মণিপুরীরা যদিও নিজেদের অর্জ্জুনের বংশধর বলিয়া দাবী করেন, এবং সেই কারণে আর্য্যপর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া নিজেদের অভিহিত করেন, কিন্তু তাঁহাদের খর্ব্বাকৃতি চেহারা, চেপ্টা মুখ, থ্যাবড়া নাক, উচ্চ হনু ও ভাষায় সানুনাসিক স্বরের প্রাধান্য তাঁহাদের Indo-Chinese পর্য্যায়ে আনিয়া ফেলে বলিয়া অনুমান হয়। মণিপুরীদের আচারব্যবহারে ও নামের সাদৃশ্যেও আমরা তাহাদের বংশপরিচয়ের কতক সাহায্য পাই।

এখনও মণিপুর-রাজগণের অভিষেকের সময় তাঁহাদের কেবল-মাত্র নাগাদের পোষাক পরিধান করিবার নিয়ম আছে। আরও দেখা যায় যে, 'উলুপী' বা 'চিত্রাঙ্গদা' শব্দ অনেক মণিপুরীই উচ্চারণ করিতে পারে না। আমরা যতদূর অনুধাবন করিয়া দেখিয়াছি, তাহাতে বেশ বুঝা যায় যে, 'উলুপী'র প্রকৃত নাগা শব্দ হইতেছে 'উল-পাও' এবং 'চিত্রাঙ্গদার' নাগা শব্দ হইতেছে 'চি-নাং-গাও'। নাগারা মদ, মাংস, শুষ্ক মাছ খুবই খায় ও পথে বাহির হইলে চুবড়ী করিয়া রাঁধা ভাত সঙ্গে করিয়া লয়। লোকপ্রবাদ যে, পুরাকালে মণিপুর-রাজারা যখন ব্রহ্মদেশের নৃপতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন, তখন তাঁহাদের অনুচররা রাজার জন্য ছোট ছোট চুবড়ী করিয়া রাঁধা ভাত ও মুখশুদ্ধির জন্য শুষ্ক মাছপোড়া সঙ্গে লইয়া যাইত।

এখনও নাগারা কোথাও যাইতে হইলে "চাকইয়োম" অর্থাৎ ভাতের পুঁটলি ও পোড়া মাছ বা মাংস সঙ্গে লয়, কারণ, ইহাই নাগাদের প্রধান খাদ্য। নাগারা ভাতকে 'চাক্' বলে, মণিপুরীরাও ভাতকে 'চাক্' বলে। মণিপুরীরা বর্ত্তমান কালে পুরা বৈষ্ণব এবং বেশ গোঁড়া বলাও চলে। উহারা মদ-মাংস খাওয়া দূরে থাক, উহাদের পাড়ার ভিতর কোন বিদেশীও যদি ঐ সব দ্রব্য খায়, তাহাতে উহারা বড়ই বিরক্ত হয়। কিন্তু এত গোঁড়ামি সত্ত্বেও উহাদের চিরাচলিত কথাবার্ত্তার মধ্যে এমন ভাব প্রকাশ পায়, যাহাতে উহাদের আদি আচার-ব্যবহার ও বংশের ধারা প্রকাশ হইয়া পড়ে। আমরা যেমন খাদ্যদ্রব্যাদির দাম চড়িলে সাধারণতঃ বলিয়া থাকি যে, "আজকাল ভাত-ডাল বড় মাগ্‌গি।" মণিপুরীরাও ঠিক সেই ভাব প্রকাশ করিতে হইলে বলে ভাত-মদ "বড় আক্রা হয়েছে।" ইহা আমি শিক্ষিত মণিপুরীর মুখেও শুনিয়াছি, এই সকল আলোচনা করিয়া দেখিলে মণিপুরীরা যে আর্য্য নহে এবং নাগাদেরই বংশধর ও কিঞ্চিৎ সভ্যতাপ্রাপ্ত, তাহা অনুমান করা অসম্ভব নহে।

মহাভারতে বর্ণিত যজ্ঞীয় অশ্ব ধারণ উপলক্ষে অর্জ্জুনের সহিত বভ্রুবাহনের যুদ্ধ ও অর্জ্জুনের পরাজয় ও সংজ্ঞালোপ

মণিপুরী-রমণী বাজারে দ্রব্য বিক্রয় করিতেছে

হয় এবং উলূপী কর্ত্তৃক তাঁহার পুনর্জ্জীবনলাভ হয়, তাহার পর বভ্রুবাহন মণিপুর-সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, ইহাই আমরা শেষ শুনিয়াছি। ইহার পর বহু শতাব্দী যাবৎ মণিপুরের ইতিহাস ঘোর তমসাচ্ছন্ন। পংদেশস্থ সান-রাজ্যের বন্ধুরূপে এক স্থানে মণিপুরের উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐ সময় খুব সম্ভবতঃ ব্রহ্মদেশের নৃপতিগণের সহিত মণিপুর-রাজগণের আদান-প্রদান ছিল। কারণ, বহু পূর্ব্বে পাইখোমবা (মণিপুরী) বর্ম্মারাজের সাহায্যে মণিপুরে রাজত্ব করিত এবং ব্রহ্মনৃপতির মতের বিরুদ্ধে যাইলেই বর্ম্মারা মণিপুর আক্রমণ করিত। জনপ্রবাদ ও মণিপুরীদের আচার-ব্যবহার, এমন কি, চলতি কথাবার্ত্তায়ও
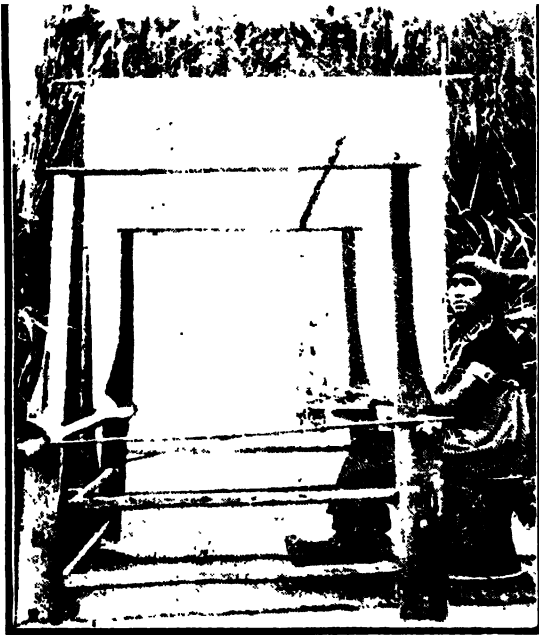
মণিপুরী বালিকা তাঁত বুনিতেছে

দুই একটি শব্দে মণিপুরীদের উপর বর্ম্মাদের যে এককালে প্রাধান্য ছিল, তাহা বেশ বুঝা যায়।

প্রায় ৩ শত বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মণিপুরীদের উপর বর্ম্মাদের অভিযান চলিত। বর্ম্মারা দক্ষিণদেশ হইতে আসিয়া মণিপুরীদের শিলচর, গৌহাটী, ডিব্রুগড় ও বড়পেটা পর্য্যন্ত ধাওয়া করিত এবং মণিপুরীদিগকে পরাজিত করিয়া অনেক মণিপুরীকে ক্রীতদাসরূপে ব্রহ্মদেশে বিক্রয় করিত। ব্রহ্মদেশের মাণ্ডালে সহরে এখনও বহু পুরাতন মণিপুরী উপনিবেশ আছে, যদিও তাহারা আচার-ব্যবহারে সমস্তই প্রায় বর্ম্মাদের মত হইয়া গিয়াছে, তথাপি তাহারা নিজেদের মণিপুরী বলিয়া প্রকৃত পরিচয় দেয়।

১৭১৭ খৃষ্টাব্দে পামহেইবা নামক এক নাগা মণিপুর-সিংহাসন অধিকার করেন এবং হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া গরিব নওয়াজ নাম ধারণ করেন। মণিপুরে গরিব নওয়াজের সময় হইতেই বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচলন হয়। গরিব নওয়াজের আর এক নাম "চিন্ ত্রেণ নোং ত্রেণ খোম্বা" অর্থাৎ খুব প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি, যাহার আকাশ-পাতালে প্রভুত্ব আছে। ইহার পূর্ব্বে মণিপুরীরা বর্ত্তমান নাগাদের মতই বড় বড় গাছ ও পাথর পূজা করিত, তাহার সম্মুখে নৃত্য করিত ও মুরগী, শূকর প্রভৃতি বলি দিত। মণিপুরীদের মধ্যেও এখনও দেখা যায় যে, কাহারও কঠিন রোগ হইলে তাহারা মন্ত্রপাঠ করে, জলে মাছ ও মুরগীর ডিম কলাপাতায় মুড়িয়া ভাসাইয়া দেয় ও মুরগী কিনিয়া গ্রামের পাশে ছাড়িয়া দেয়। তাহাদের বিশ্বাস যে, ইহাতে রোগী অচিরে রোগমুক্ত হইয়া উঠিবে। গরিব নওয়াজ বিদেশে গিয়া শিক্ষা ও সভ্যতাপ্রাপ্ত হইয়া দেশশাসন ও সংস্কারে লাগিয়া যান। ইনি ব্রহ্মরাজের সহিত অনেকবার যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহার মৃত্যুর পরে জয়সিংহের রাজত্বকালে—১৭৬২ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মরাজ পুনরায় মণিপুর আক্রমণ করিলে জয়সিংহ ইংরাজের সাহায্য গ্রহণ করেন। খৃঃ ১৮২৪ প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধ আরম্ভ হইলে ব্রহ্মসৈন্য আসাম ও কাছাড় প্রদেশ আক্রমণ করে। তখন মহারাজ গম্ভীরসিংহ মণিপুর-সিংহাসনে আসীন। গম্ভীরসিংহ ইংরাজের সাহায্যে অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বর্ম্মাদিগকে দেশ হইতে বিতাড়িত করেন। ইহার রাজত্বকালে ইংরাজরা মণিপুরে একটি 'আড্ডা' স্থাপন করেন, ক্রমে উহা ইংলিশ রিজার্ভরূপে পরিণত হয়।

১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের সহিত ব্রহ্মরাজের সন্ধি স্থাপিত হয় এবং মণিপুর স্বাধীন রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হয়। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে গম্ভীরসিংহ পরলোকগমন করেন। সর্পাঘাতে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুকালে তাঁহার এক রাণী গর্ভবতী ছিলেন; তাহার পুত্র চন্দ্রকীর্ত্তিসিংহ পরে রাজা হন। চন্দ্রকীর্ত্তির জন্মের পূর্ব্বে নরসিংহ নামে এক রাজকুমার (গরিব নওয়াজের প্রপৌত্র এবং চন্দ্রকীর্ত্তির পিতৃব্য) মহারাজ গম্ভীরসিংহের পারিষদরূপে ছিলেন। ঐ সময়ে তদানীন্তন রাজ-জ্যোতিষীরা মত প্রকাশ করেন যে, মহারাজ গম্ভীরসিংহের ১ বৎসর সময় খুব খারাপ এবং তাহার প্রতীকারকল্পে, মহারাজকে এক বৎসর এরূপভাবে নির্জ্জনবাস করিতে হইবে—যাহাতে ঐ সময় চন্দ্র-সূর্য্য পর্য্যন্ত তাঁহার দৃষ্টিগোচর না হয়। এই কারণে তিনি সাঙ্গচর 'ল্যাংথাবাল' নামক স্থানে বর্ত্তমান ইম্ফাল নগরের প্রায় ৫ মাইল দক্ষিণে এক পাহাড়ে একটি সুড়ঙ্গ প্রস্তুত করাইয়া তাহার ভিতরে গহ্বরে

বাস করেন, তথায় কিছুকাল অতিবাহনের পর এক রাত্রিতে ঐ গুহার মধ্যেই তাঁহার নাভিস্থলে সর্প দংশন করে ও তাহাতেই তাঁহার নিশ্চয় মৃত্যু জানিয়া তিনি নরসিংহকে বলেন যে, তাঁহার অমুক রাণী গর্ভবতী এবং তাঁহার গর্ভে এক পুত্রসন্তান হইবে, সেই পুত্র সাবালক না হওয়া পর্য্যন্ত নরসিংহ তাহার অভিভাবকরূপে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিবেন এবং সে সাবালক হইলেই তাহাকে সম্পূর্ণরূপে রাজ্যভার ছাড়িয়া দিবেন। যথাসময়ে চন্দ্রকীর্ত্তির জন্ম হইল এবং নরসিংহ রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। পর-বৎসরে মণিপুররাজ্য সম্বন্ধে জনৈক ইংরাজপক্ষীয় পলিটিক্যাল এজেণ্ট নিযুক্ত হন। চন্দ্রকীর্ত্তি বয়ঃপ্রাপ্ত ও উপযুক্ত হইলেও নরসিংহ তাহাকে রাজ্যভার ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন না, ইহাতে চন্দ্রকীর্ত্তির মাতা অত্যন্ত কুপিতা হইলেন এবং তাঁহার কয়েক জন বিশ্বস্ত অনুচর ও ভৃত্যবর্গের প্ররোচনায় ও সহায়তায় নরসিংহকে হত্যা করিবার এক আয়োজন চলিতে লাগিল; ইহাই ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে নরসিংহকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র বলিয়া কথিত হয়। ষড়যন্ত্রকারীরা ধৃত হইলেন এবং চন্দ্রকীর্ত্তি সিংহের মাতা এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকায় তিনি পুত্রসহ কাছাড় দেশে শ্রীহট্টে পলায়ন করিলেন এবং সেখানে নরসিংহ মহারাজের অভিপ্রায়মত তাঁহারা মাতাপুত্রে একরূপ বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নজরবন্দী থাকেন। সেখানে ৬।৭ বৎসর বাস করিবার পর তাঁহারা সংবাদ পান যে, নরসিংহ মহারাজ অত্যন্ত পীড়িত এবং মণিপুর-সিংহাসনের জন্য রাজবংশীয় আরও কয়েক জন ব্যক্তি যুদ্ধের আয়োজন করিতেছেন। নরসিংহ সিংহাসন গ্রহণ করিয়া ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। উক্ত অব্দে তাঁহার দেহাবসান হইলে তাঁহার ভ্রাতা দেবেন্দ্রসিংহ রাজা বলিয়া ইংরাজ কর্ত্তৃক স্বীকৃত হন। ঐ সময় চন্দ্রকীর্ত্তিকে তাঁহার অনুচরগণ মণিপুর যাইতে অনুরোধ করেন। ঐ অনুচরগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান থাঙ্গাল, পরে যিনি জেনারেল পদে অভিষিক্ত

মণিপুরী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি

হইয়াছিলেন। দেবেন্দ্রসিংহের রাজ্যভার গ্রহণের তিন মাস পরেই থাঙ্গাল চন্দ্রকীর্ত্তি ও তাঁহার মাতার সহিত প্রায় ২ শত অনুচর লইয়া মণিপুর আক্রমণ করেন। পথিমধ্যে মণিপুর হইতে মণিপুরী সিপাহীরা চন্দ্রকীর্ত্তিকে নিজেদের যথার্থ রাজা বলিয়া অভিনন্দিত করিয়া মণিপুরে লইয়া আসে, দেবেন্দ্রসিংহ কাছাড় অভিমুখে পলায়ন করেন। ইহার পর প্রজারাই উদ্যোগী হইয়া মহারাজ চন্দ্রকীর্ত্তি সিংহকে মণিপুর-রাজতক্তে অভিষিক্ত করেন।

১৮৫১ খৃঃ ফেব্রুয়ারী মাসে চন্দ্রকীর্ত্তি সিংহই আবার মণিপুরের রাজা বলিয়া ইংরাজ কর্ত্তৃক স্বীকৃত হন। চন্দ্রকীর্ত্তি প্রায় ৩৫ বৎসর অপূর্ব্ব দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য পরিচালনা করেন। প্রজাদের সুখ-ঐশ্বর্য্যের সুবিধার জন্য তাঁহার মন সততই ব্যস্ত থাকিত। ইনি বড়ই প্রজাবৎসল ছিলেন, দেশের শিক্ষা, অর্থ, শিল্প, ব্যবসায় প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার উন্নতির চেষ্টা করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণগণকে বেদ অধ্যয়নের জন্য কাশীধামে প্রেরণ করিয়াছিলেন, খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতের প্রণালী শিক্ষার জন্য বঙ্গদেশ, নবদ্বীপ ও বিভিন্ন স্থানে লোক পাঠাইয়াছিলেন। মণিপুরী নাগাদিগকে জুতা প্রস্তুত শিক্ষার জন্য কানপুরে পাঠাইয়াছিলেন। বিভিন্ন দেশজাত ফল ও পুষ্পাদির বৃক্ষ মণিপুরে আনয়ন করিয়াছিলেন এবং যাহাতে তাহা দেশের মধ্যে সহজপ্রাপ্য হয়, তাহার জন্য ঐ সব বৃক্ষাদি সাধারণে বিতরণ করিয়াছিলেন, মণিপুরে গোলাপফুল বা আম্র ছিল না। মহারাজ চন্দ্রকীর্ত্তি সিংহই ইহা মণিপুরে প্রথম আমদানী করেন। এই জন্য মণিপুরীরা আমকে 'হৈইনৌ' বলে। 'হৈই' অর্থে ফল এবং 'নৌ' অর্থে নূতন, অর্থাৎ নূতন ফল।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে নাগা যুদ্ধের সময়ে মহারাজ চন্দ্রকীর্ত্তি সিংহ ইংরাজকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যুর পর ইহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শূরচন্দ্র সিংহ সিংহাসন গ্রহণ করেন ও অন্যতম ভ্রাতা কুলচন্দ্রকে যুবরাজপদে বরণ করেন। চন্দ্রকীর্ত্তির ৮ সন্তান;—(১) শূরচন্দ্র, (২) কুলচন্দ্র, (৩) টীকেন্দ্রজিৎ, (৪) গোলাপসিংহ, (৫) পাকাসানা, (৬) থাবৌসানা, (৭) আংরৌসানা ও (৮) জিলাগাম্বা বা জিলাসানা। শূরচন্দ্র প্রায় ৪ বৎসর রাজত্ব করিবার পরই তাঁহাদের ৮ ভাইয়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয় ও তাঁহারা দুই দলে বিভক্ত হন। ১৮৯০ খৃঃ সেনাপতি টীকেন্দ্রজিৎ সিংহ শূরচন্দ্রকে সিংহাসনচ্যুত করেন। শূরচন্দ্র অপর ৩ ভ্রাতার সহিত কলিকাতায় আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন।

সিংহাসন-বিষয়ক বিবাদ ভঞ্জনার্থে ১৮৯১ খৃঃ মার্চ্চ মাসে আসামের চিফ কমিশনার কুইণ্টন সাহেব ৪ শত গুর্খা লইয়া মণিপুর গমন করেন। ইহাতে ইংরাজের সহিত টীকেন্দ্রজিতের বিরোধ ঘটে। নূতন রাজাকে স্বীকার করা ও

সেনাপতিকে স্থানান্তরিত করাই চিফ কমিশনারের অভিপ্রায় ছিল। সেনাপতিকে প্রথমে আত্মসমর্পণ করিতে বলা হয় ও পরে তাঁহাকে ধৃত করিবার চেষ্টা হয়, কিন্তু কোন চেষ্টাই সফল হইল না। টীকেন্দ্রজিৎ পলায়ন করিলেন এবং তাঁহার অনুগত মণিপুরীরা ইংরাজের রেসিডেন্সি আক্রমণ করিল। কুইণ্টন কিছু সময় লইয়া কয়েক জন কর্ম্মচারী সহ নিরস্ত্রভাবে কথাবার্ত্তা কহিবার অভিপ্রায়ে মণিপুরের দুর্গমধ্যে প্রবেশ করেন এবং সেই স্থানে কুইণ্টন প্রমুখ ৫ জন ইংরাজকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। এই সংবাদ অবগত হইয়া তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল লর্ড ল্যান্সডাউন মণিপুর আক্রমণার্থে সৈন্য প্রেরণ করেন।

মে মাসে টীকেন্দ্রজিৎ ও কুলচন্দ্র প্রভৃতি ধৃত হন। বিচারান্তে টীকেন্দ্রজিৎ ও অনেক সৈন্যাধ্যক্ষের ফাঁসি হয় এবং কুলচন্দ্র স্বেচ্ছায় প্রথমে হাজারীবাগে, পরে শ্রীবৃন্দাবনধামে নির্ব্বাসনদণ্ড গ্রহণ করেন। টীকেন্দ্রজিৎ সিংহই মণিপুর রাজ্যের শেষ বীর। পরে রাজবংশের অনেক পঞ্চমবর্ষীয় শিশু শ্রীচূড়াচাঁদ সিংহকে মণিপুরের রাজা বলিয়া ঘোষণা করা হয় এবং ইংরাজের তত্ত্বাবধানে রাজকার্য্য পরিচালনার ব্যবস্থা হয়। ১৯০৭ খৃঃ মে মাসে চূড়াচাঁদের হস্তে পূর্ণ রাজ্যভার অর্পণ করা হয়। এখন ইঁহার বয়ক্রম ৪৫ বৎসর। বর্ত্তমানে মণিপুর রাজ্য দরবার দ্বারা শাসিত হয়। উহার সভ্যসংখ্যা ৬ জন। ইহার মধ্যে এক জন য়ুরোপীয় আই, সি, এস্ আছেন। তিনিই স্থায়ী প্রেসিডেণ্ট। নাম এ, জি, ম্যাক্‌কফি। বর্ত্তমানে মণিপুরের পলিটিক্যাল এজেণ্ট মিঃ জে, সি, হিগিন্‌স্। মণিপুর দরবার ও বিভিন্ন বিচারপদ্ধতির বিষয়ে আমরা পরে বলিব।

বর্ত্তমান মণিপুর রাজ্য ল্যাটিটিউড্ ২৩°-৫০' এবং ২৫°-৩০' উত্তর ও লন্‌জিটিউড ৯৩°-১০' এবং ৯৪°-৩০' পূর্ব্ব মধ্যে অবস্থিত। ইহার উত্তরে মাও, দক্ষিণে শিবোং, পূর্ব্বে চাযাদ বুকি বস্তী এবং পশ্চিমে জিরি ঘাট ও জিরি নদী। মণিপুরের মধ্য দিয়া ইম্ফাল, নম্বুল, ইরিল, থোবাল ও নম্বুলনদী বহিয়া যাইতেছে। ইহার মধ্যে ইম্ফাল ও নম্বুল ইম্ফাল সহরের বক্ষ বহিয়া প্রবাহিত হইতেছে। উল্লিখিত সবগুলিই একটানা পার্ব্বত্য নদী, এবং বর্ষার শেষ বলিয়া বোধ হয় এক্ষণে জল ঘোলা।

আমরা পূর্ব্বে ইম্ফালের জন্মস্থান দেখিয়াছি। সেখানে কিন্তু ইম্ফাল স্বচ্ছকায়া ও ভীষণ বেগবতী, ক্রমে জনপদের মধ্য দিয়া আসিয়া পড়ায় ইহার জল স্বচ্ছ নহে, গতিবেগ মন্দীভূত হইয়াছে। মণিপুরের উত্তরে ডিমাপুর মণিপুর রোড, পশ্চিমে মণিপুর কাছাড় রোড, দক্ষিণে মণিপুর বর্ম্মা রোড এবং পূর্ব্বে পাহাড়, নাম নোমাই জিং রেঞ্জ। এই রাজ্যের পরিমাণফল ৮৪৫৬ বর্গ-মাইল। ইহার মধ্যে ৭৬৫০ মাইল দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বতমালায় পরিবেষ্টিত এবং দুর্দ্ধর্ষ নাগা ও কুকী জাতির আবাসস্থল। মণিপুরের চারি দিকে নাকি পর পর সাতটি পাহাড়-শ্রেণী আছে। ইহাতে প্রকৃতি দেবী মণিপুরকে স্বভাবতই একটি দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করিয়া তুলিয়াছেন। প্রধানতঃ এই গিরিশ্রেণীর মধ্যেই প্রকৃতির অপর সন্তানগুলির ন্যায় নাগারাও পুত্রকলত্রাদি লইয়া বসবাস করে। নাগারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত এবং প্রত্যেকেরই ভাষা স্বতন্ত্র।

[ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (এম-এ, বি-এল)।

নৈদাঘী

তুমি উদ্ধত কঠোর কিশোর,—
বেণু নাহি তবু করে,
বন-তৃণদল দলি' পদতলে
নেমেছ নীরসোথরে।
পরাগ-ধূসর ফুলহার হরি'
কে দিল পরিয়ে বহ্ন্যুত্তরী,
জাগে জ্বালাময় রৌদ্র-দীপক
রুদ্র ভেরীর স্বরে।

এ কি উদগ্র উন্মাদনায়
দিকে দিকে ঘরে ঘরে
উঠে কোলাহল,—টুটে অর্গল
দুর্ব্বার গতি-ভরে।
তরু-হীন পথে মরু-মায়া ঝলে,
জীবন-আহবে যাত্রীরা চলে,
গগন-কোণায় কালিমা ঘনায়
মহাকাল-জটা' পরে!

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী।

মাতৃহীনা

১

নিস্তব্ধ, নিশীথ রাত্রি। অমানিশার ঘনান্ধকারে পল্লীর আকাশ-বাতাস আচ্ছন্ন। শুধু বহু দূর হইতে মাঝে মাঝে হরিধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছিল।

"মা!—মা!—মা!"—

দেড় বৎসরের রাণুর কণ্ঠে শুধু 'মা' বুলিই ফুটিয়াছিল।

রুগ্ন শয্যায় স্নেহময়ী জননীর কাতর দৃষ্টি যে রাণু প্রত্যক্ষ না করিয়াছিল, এমন নহে, কিন্তু অসীমার মৃত্যু-মলিন দৃষ্টির ভিতর দিয়া তাহার পরলোকগামী আত্মার যে কি মর্ম্মন্তুদ জ্বালা আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, সে কি তাহা এতটুকুও অনুভব করিতে পারিয়াছিল? রাণু,—তাহার সংসারের শ্রেষ্ঠ, দৃঢ়তম বন্ধন,—বিরাট সন্তান-ক্ষুধার সে-ই একমাত্র তৃপ্তি! তাহাকে সে কিছুতেই যে ছাড়িয়া যাইতে পারে না! অশ্রুসিক্ত আননে সে বিদায়ের দিনেও কতবার যে তাহাকে বুকে করিয়াছে!

কিন্তু নিয়তি অজেয়।

ক্ষুদ্র রাণুর অলস নয়নে নিদ্রার আলিঙ্গন তখনও অন্তর্হিত হয় নাই। সুরবালা তাহাকে বুকের উপর চাপিয়া ধরিলেন। সান্ত্বনা দিবার শক্তি তাঁহার নাই। অসীমাকে যে দিন তিনি বধূরূপে বরণ করিয়া গৃহে তুলিয়াছিলেন, সে দিনের স্মৃতি তাঁহার অন্তরে এখনও সুস্পষ্ট জাগ্রত। আজ স্বহস্তে সেই স্বর্ণপ্রতিমার ললাটে শেষ সিন্দুর পরাইয়া দিতে হইয়াছে!

সত্যই কি চিতাগ্নি সেই স্বর্ণকান্তিকে লেলিহান জিহ্বার উন্মত্ত আক্রমণে ভস্মীভূত করিতেছে?

সুরবালা শিহরিয়া উঠিলেন। কেমন করিয়া তিনি এই মাতৃহারাকে—

"মা!—মা!—"

"এই যে মা—" বলিতে গিয়া তাঁহার রুদ্ধ কণ্ঠ যেন [illegible]রিয়া গেল।

বালিকার চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। তাহার দৃষ্টিতে কি [illegible]শয়, দুঃখ, ক্ষোভ ও অভিমানের ছায়াপাত হইয়াছিল? [illegible]রবালার কোলে সে কত দিন উঠিয়াছে, কিন্তু তাহার মা [illegible]থায়? আকুল চীৎকারে তাহার বুক ফাটিয়া যাইতেছে। কিছুতেই সে শান্ত হইবে না। সুরবালা তাহাকে কোলে লইয়া অস্থিরভাবে পাশের ঘরে প্রবেশ করিলেন।

শয্যা শূন্য। কিন্তু গৃহের প্রতি দ্রব্যে যেন অসীমার আত্মা তখনও বিরাজিত। কত অপূর্ণ সাধ, কত বিচিত্র আকাঙ্ক্ষা, কত প্রাণঢালা ভালবাসা—দাম্পত্য-জীবনের শত সুমধুর স্মৃতি গৃহের প্রতি সজ্জার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। স্বামিগৃহ—শ্বশুরের ভিটা, হিন্দু স্ত্রীর আবাল্য মধুর কল্পনা! যৌবনের প্রথম উন্মেষে বুক-ভরা আশা ও নানা মধুর কল্পনার ডালি সাজাইয়া সে এই গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল! স্বামীও তাহার সকল সাধই পূর্ণ করিয়া দিত।

সুরবালার বুক ছাপাইয়া নিরুদ্ধ অশ্রুবন্যার স্রোত ছুটিল। সহসা সুরবালা দেখিলেন, রাণুর চোখের তারা দুইটি আরও যেন কালো হইয়া উঠিল। নিষ্পলকনেত্রে শূন্য শয্যার দিকে চাহিয়া সে কি দেখিতেছে? কাহাকে খুঁজিতেছে? কাহার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া স্তন্য-সুধাপানে উত্তপ্ত বক্ষ শীতল করিবে?

পাগলিনীর ন্যায় সুরবালা রাণুকে লইয়া সে গৃহ হইতে দ্রুতপদে পলায়ন করিলেন।

আদরিণী স্বর্ণলতাকে আপন হাতে সহস্রজিহ্ব চিতাগ্নির আলিঙ্গনে বিসর্জ্জন দিয়া শিশিরকুমার যখন গৃহে ফিরিল, তখন তাহার স্ফীত, আরক্ত নেত্রযুগল অশ্রুহীন, হৃদয়ের রক্তরাশি বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া যেন আকস্মিকতার হিমশীতল স্পর্শে জমিয়া তুষাররাশিতে পরিণত হইয়াছে! তাহার ইচ্ছা হইতেছিল যে, এই জমাট অশ্রুকে একবার সে প্রবলবেগে বর্ষণ করে। তাহা হইলে হয় ত একবারও সে চিন্তা করিয়া দেখিবার অবকাশ পাইতে পারে; কিন্তু অশ্রু ত নাই!

ঐ সেই চিরপরিচিত গৃহ! অসীমার দীর্ঘায়ত নয়নের উজ্জ্বল দৃষ্টি ঐ বুঝি জানালার ফাঁকে জাগিয়া উঠিয়াছে! ঐ সেই মধুর স্মৃতিবিজড়িত কুটীর—অসীমার অসীম প্রেমের

অনবদ্য ঝঙ্কারে অনুপ্রাণিত। কিন্তু আজ সেখানে গিয়া সে কি দেখিবে? শ্মশান হইতে সে আর এক শ্মশানে ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু এখানে চিতাগ্নি নাই, আছে কেবল মর্ম্মন্তুদ স্মৃতির অসংখ্য তীব্র দহনজ্বালা।

সহসা শিশিরকুমার বৃশ্চিকদষ্টের ন্যায় অধীর হইয়া উঠিল।

অস্ফুট কণ্ঠে "মা, মা" বলিয়া কে কাঁদিয়া উঠিল? রাণু, তাহার সদ্যোমাতৃহারা কন্যার মর্ম্মভেদী ক্রন্দন নহে কি?

শিশিরকুমার দুই হস্তে বক্ষোদেশ চাপিয়া ধরিল। উঃ! অসহ্য! অসহ্য!

"কোথায় রেখে এলে, ঠাকুরপো? আমার অসীমা কোথায় গেল রে?"

শিশিরকুমার নিরুত্তরে ভূমিশয্যা গ্রহণ করিল।

পাছে তাঁহার নয়নে অশ্রুবন্যা দেখিয়া রাণু অস্থির হইয়া উঠে, এ জন্য সুরবালা সমস্ত রাত্রি এক ফোঁটা অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে পারেন নাই। এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তাঁহার বয়স যেন দশ বৎসর বাড়িয়া গিয়াছে।

তাঁহার বড় আশা, বড় সাধ,—ছোট বধূর হাতে এক দিন সংসারটি তুলিয়া দিয়া তিনি সানন্দে পরপারে যাত্রা করিবেন। কিন্তু আজ সেই ছোটবৌ জীবন-যুদ্ধে জয়ডঙ্কা বাজাইয়া চলিয়া গেল, আর তাহারই পরিত্যক্ত কঠোর দায়িত্ব পালন করিবার জন্য তাঁহাকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। কি নির্ম্মম বিধিলিপি!

শিশিরকুমার বারান্দার এক পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল। শোকস্তব্ধ মানসপটে অন্ধকার ভেদ করিয়া অতীতের সহস্র দৃশ্য সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

সে বরবেশে চেলাঞ্চলা অসীমাকে পার্শ্বে লইয়া এই বারান্দার এই স্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। স্পন্দিত বক্ষে তখন কত আশা, কত আনন্দের তরঙ্গ!

সুদূর অতীতের গভীর অন্ধকার ভেদ করিয়া একটা অতি করুণ স্মৃতি ক্রমশঃ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

অসীমার সদাহাস্যময় আননে এক দিনও মুহূর্তের জন্য অতৃপ্তির ক্ষীণ রেখাও সে ফুটিয়া উঠিতে দেখে নাই! হাস্য-চঞ্চলা, রহস্যপরায়ণা তরুণীর মুখে আনন্দ-প্রস্রবণ অনুক্ষণই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। তবে সে অকস্মাৎ এমন ভাবে চলিয়া গেল কেন?

শিশিরকুমার ভাবিতে লাগিল।

জ্ঞানচর্চ্চার প্রবল আগ্রহে অনেক সময় সে বাহ্য-জগৎ বিস্মৃত হইত। সে সময় অসীমার সম্বন্ধে যে অনেক কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিত না। সেই অভিমানেই কি সে এত শীঘ্র তাহাকে ছাড়িয়া গেল?

শিশিরকুমারের দোলায়মান চিত্ত আরও আকুল হইয়া উঠিল।

কিন্তু রাণুকে পাইয়া সে ত সকলই ভুলিয়াছিল। তাহার মায়া সে অনায়াসে—

"মা!—মা!—মা!—"

শিশিরকুমার ছুটিয়া গিয়া রাণুকে বুকের উপর চাপিয়া ধরিল।

৩

শিশিরকুমার নিষ্ঠাবান্‌, ধর্ম্মভীরু, পণ্ডিত ও ভাবুক বলিয়া সে অঞ্চলে পরিচিত ছিল। তাহার অসীম খ্যাতি। নিকট-বর্ত্তী একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে সে প্রধান শিক্ষক। অল্প-বয়সে শিক্ষকতাকার্য্যে তাহার যথেষ্ট সুনাম হইয়াছে এবং তাহার অসামান্য চরিত্রমাধুর্য্যে ছাত্রগণ তাহাকে দেবতা-জ্ঞানে ভক্তি করিত। এই শিক্ষকতাকার্য্য, সাহিত্যচর্চ্চা এবং কিছু কিছু কাব্যরচনা ভিন্ন তাহার আর কোন লক্ষ্যই ছিল না। ভারতীর সেবক হইলে রাজসম্মান লাভ হইতে পারে, কিন্তু লক্ষ্মীর কৃপা দুষ্প্রাপ্য। শিশিরকুমারের তাহাতে প্রয়োজনও ছিল না। সুতরাং স্বীয় সাধনার ভিতর সমা-বিস্থ রহিয়া তাহার শান্তির অভাব এতটুকুও হইত না। কিন্তু গৃহলক্ষ্মীর আকস্মিক অন্তর্ধানে সে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল।

"ঠাকুরপো, আজ ত রাণুর শুদ্ধ হবার দিন!"

নিশীথ রাত্রির ভীষণ ঝড়ে সঙ্কটাপন্ন পথিক যদি অকস্মাৎ মাথার উপর একটা দারুণ বজ্রনির্ঘোষ শুনিতে পায়, তাহা হইলে তাহার মানসিক অবস্থা যেরূপ শোচনীয় হইয়া পড়ে, সুরবালার ক্রন্দনজড়িত অস্ফুট কণ্ঠের এই মর্ম্মান্তিক সংবাদে তাহার অবস্থা ঠিক তদ্রূপই হইল।

"বৌদি, আমার শেষ কবে হবে?"

সুরবালা ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিলেন।

কিন্তু তথাপি সামাজিক—লৌকিক কর্ত্তব্য পালন করিতে হইল।

সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে শিশিরকুমার তাহার চির-পরিচিত শয়নকক্ষের এক প্রান্তে আপনাকে নির্ব্বাসিত রাখিয়াছিল। এই ঘর ছাড়িয়া সে কোথাও তিলার্দ্ধ থাকিতে চাহে না। যদি একবার, অন্ততঃ মুহূর্ত্তের জন্যও সে তাহার প্রিয়তমার ছায়ামূর্ত্তিও দেখিতে পায়!

প্রাচীরগাত্রে অসীমার একখানি আলোকচিত্র দুলিতে-ছিল। স্বল্পান্ধকারে নির্নিমেষনেত্রে সে সেই দিকে চাহিয়া রহিল। ঐ মূর্ত্তি কি জীয়ন্ত হইয়া উঠিতে পারে না? তাহার যদি এমন শক্তি থাকিত, তাহা হইলে আলোকচিত্রে প্রাণ-সঞ্চার করিয়া সে অসীমাকে জিজ্ঞাসা করিত, "কেন তুমি এমন করিয়া অকস্মাৎ চলিয়া গেলে? কি অপরাধ করি-য়াছি, যাহার জন্য এই নির্ম্মম শাস্তি? বলিয়া যাও, একবার মুহূর্ত্তের জন্য শরীরিণী হইয়া বলিয়া যাও, কোন্ দুঃখে তুমি এমন করিয়া চলিয়া গেলে?"

এমন সময় তাহার বড়-দাদা রাণুকে কোলে লইয়া আলোক হস্তে সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। রাণুর ক্রন্দন কিছুতেই থামিতেছিল না।

শিশিরকুমারের বুকের ভিতরটা ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইতে লাগিল। বালিকার ক্রন্দনে, তাহার মা-ডাকে কে উত্তর দিবে? সে তাহাকে বুকের উপর তুলিয়া লইল।

দাদা খানিক নির্ব্বাক্‌ভাবে দাঁড়াইয়া মন্থরপদে চলিয়া গেলেন।

কি উপায়ে এই অবোধ বালিকাকে মানুষ করা যায়? সে ত কিছুই জানে না। সে শুধু আদর করিতেই শিখিয়া-ছিল। কন্যার ক্রন্দনস্ফীত অধরে ঘন ঘন চুম্বন, বুকে চাপিয়া ধরা, দুই চারিটি মিষ্ট কথা বলা, ইহার অধিক কি করিতে হয়, এত দিন সে ত তাহার অধিক আর কিছুই জানে নাই!

পিতার বিশাল বক্ষে ক্রন্দনশ্রান্ত রাণু মাথা রাখিয়া কিছুক্ষণের জন্য চুপ করিল। শিশিরকুমার ভাবিতে লাগিল, কেমন করিয়া এই দুগ্ধপোষ্য বালিকাকে সে লালনপালন করিবে? অসীমা এই রত্ন তাহার কাছে গচ্ছিত রাখিয়া গিয়াছে, রাণু তাহাদের মিলন-মন্দিরের বিগ্রহ। ইহা শুধু ...নবস্তু নহে, অপূর্ব্ব!

রাণু আবার "মা, মা" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

শিশিরকুমার তাহাকে কোলে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, প্রাচীর-বিলম্বিত আলোকচিত্রের কাছে কন্যাকে লইয়া গেল।

ক্রন্দনরতা বালিকা সেই চিত্রের দিকে চাহিতেই তাহার দীর্ঘ চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। তার পর আকুল চীৎকারে কাঁদিয়া উঠিল,—"মা!—মা!—মা!—"

"হাঁ, ঐ তোর মা, ঐ তোর মা;—ডাক্—ডাক্—রাণু, যদি তোর ডাকে ঐ মূক প্রতিচ্ছবি সজীব হয়ে ওঠে।"

শিশিরকুমার বালকের ন্যায় কাঁদিয়া উঠিল।

৪

জীবিতাবস্থায় মানুষের সম্বন্ধে মানুষ বিচার করে একরকম, কিন্তু কেহ জীবনের পরপারে চলিয়া গেলে এই কঠিন সংসারে তাহার স্বপক্ষে বলিবার প্রায় কেহই থাকে না। সুতরাং অনেক সময় বিচারের ধারাটাও তখন পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। তাই অসীমার মৃত্যুর পর তাহার সম্বন্ধে অনুরূপ ব্যবস্থা হইলে বিস্ময়ের অবকাশ কোথায়?

যে ভাসুর এক দিন কনিষ্ঠ ভ্রাতৃজায়ার গুণগানে পঞ্চমুখ ছিলেন, 'ছোট বৌমা' বলিতে প্রায় হতচেতন হইতেন, তিনিই অসীমার স্মৃতিকে অন্যের দ্বারা পরিপূর্ণ করিবার জন্য সর্ব্বপ্রথম প্রস্তাব উত্থাপিত করিলেন। শিশিরকুমার দ্বিতীয়বার বিবাহ না করিলে বংশলোপ হইবে, রাণুকে কে প্রতিপালন করিবে প্রভৃতি যুক্তি প্রদর্শন করিলেন।

বিশেষতঃ শিশিরকুমার এখনও যুবা। যৌবনের প্রবল ক্ষুধা মানুষমাত্রকেই অধীর করিয়া তুলে। গৃহী যুবার পক্ষে সন্ন্যাসীর ন্যায় ব্রহ্মচর্য্য দুঃসাধ্য ব্যাপার। তাহা ছাড়া পিতৃকুলের পিণ্ডলোপের ভীষণ আশঙ্কা। তিনি এ পর্য্যন্ত স্বয়ং নিঃসন্তান—ভবিষ্যতে সম্ভাবনাও নাই। শিশিরকুমারের যদি পুত্র-সন্তান না জন্মগ্রহণ করে, তাহা হইলে বংশলোপ হইবে। ইহা সমর্থনেরও অযোগ্য। চিন্তা করিতেও মন অবসন্ন হয়।

দাদার মন্তব্য শুনিয়া শিশিরকুমার স্তম্ভিত হইল। তাহার শিক্ষিত হৃদয় কোনমতেই এ যুক্তির অনুমোদন করিতে পারিল না। সে ভাবিল, বংশরক্ষার সম্ভাবনা থাকিলে দাদা নিঃসন্তান হইতেন না, অসীমা মুকুলিত যৌবনেই এমন অকস্মাৎ ঝরিয়া পড়িত না।

দাদার প্রস্তাব শুনিবার পর সে শয্যায় শয়ন করিয়া ভাবিতে লাগিল, এ সংসারে প্রাণের কি কোন মূল্য নাই? কোনও সার্থকতা নাই? চিতাভস্মের বিরাট স্তূপে কি স্নেহ, মায়া, মমতা, ভালবাসা, ভক্তি, শ্রদ্ধা, সেবা, যত্ন সকলই চাপা পড়িয়া গেল? যদি আত্মা অবিনশ্বর হয়, মানুষের এই হীন কল্পনার আভাসে লোকান্তরবাসিনী অসীমা কি ভাবিতেছে? নারীর পক্ষে যাহা ব্যভিচার, পুরুষের পক্ষে কি তাহা ব্যভিচার নহে? স্মৃতির কি কোনই মর্য্যাদা নাই?

রাণুর সুখের জন্য? এ যুক্তিও কি আত্মপ্রবঞ্চনা নহে? যে আসিবে, তাহার কাছে রাণু কি কণ্টকস্বরূপ বিবেচিত হইবে না?

শিশিরকুমার চিন্তাভারে অবসন্ন হইয়া উঠিল। বেশী দিন নহে, দুই মাস পূর্ব্বেও অসীমা যে তাহারই সর্ব্বস্ব ছিল।

আর একটি অন্তর, নারীদেহের অন্তরলক্ষ্মী এমন কুৎসিত প্রস্তাবে শিহরিয়া উঠিল। নারী-হৃদয়ের অনন্ত দুঃখের সংবাদ তিনি রাখেন। তাই তাঁহার চিত্ত ব্যথিত, মর্ম্মাহত হইল।

বড়দার মনের কথা মুখে আসিবার বহু পূর্ব্বেই শিশির-কুমারের অসংখ্য বিবাহ-প্রস্তাব চারিদিক্ হইতে আসিতে-ছিল। অনেক পাত্রীই সুন্দরী। আবার উপযুক্ত যৌতুক দিতেও অনেকে প্রস্তুত। বাঙ্গালাদেশে কন্যার বাজারে ভাটা পড়িবার লক্ষণ এ যুগেও নাই।

বড়দার স্বভাব নিন্দনীয় বলিলে তাঁহার উপর অবিচার করা হইবে। তবে ভাবপ্রবণতা তাঁহার কোনও কালেই নাই। সংসারকে একটা কঠিন বাস্তব বস্তুজ্ঞানে তিনি এত দিন পর্য্যন্ত এই বিরাট পরিবারের কর্ণধার। স্নেহ, মায়া, দয়া, কর্ত্তব্য সকলই তাঁহার আছে, কিন্তু কঠোর দায়িত্বের জন্য সর্ব্বসময়ে সে সকল বৃত্তি তিনি বাহিরে প্রকাশ করিতে পারেন না।

অসীমাকে তিনি কাহারও অপেক্ষা কম স্নেহ করিতেন না। তথাপি তাহাকে ভুলিতে হইবে। উপার্জ্জনক্ষম, ভাবুক, সুস্থ, সবল যুবা। সংসারে অসংখ্য প্রলোভন। যদি তাহার মহান্ চরিত্র কখনও স্খলিত হয়? পবিত্র বসু-বংশের সে কলঙ্ক আর কখনও দূরীভূত হইবে না। বিবাহের ধর্ম্মগণ্ডীর আবেষ্টন তাহাকে অবশ্যই রক্ষা করিবে।

বড়দা একাকী বাহিরের বারান্দায় বসিয়া চিন্তিত-মনে ধূমপান করিতেছিলেন। ঊষার নবীনালোক তখনও শীতের কুজ্ঝটিকা দূরীভূত করিতে পারে নাই।

যদি শিশিরকুমার বিদ্রোহ করে? যদি সে বিবাহের প্রস্তাবে ঠিক সে দিনের মত ঘৃণাভরে মুখ ফিরাইয়া লয়? তাঁহার অনুরোধে যদি সে সাশ্রুলোচনে তাঁহাকে নিরস্ত হইতে অনুরোধ করে?

বড়দা উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

না, শিশিরকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতেই হইবে। তাঁহার অনুরোধ সে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে; কিন্তু তাঁহার আদেশ সে অবশ্যই অবনত-মস্তকে পালন করিবে। সে বিশ্বাস তাঁহার আছে।

"বোস্‌জা মশাই বাড়ী আছেন?"

আগন্তুক আসিতেই বড়দার মুখ অপেক্ষাকৃত প্রফুল্ল হইল।

আগন্তুক বলিলেন,—"তা হ'লে চণ্ডী বাবুকে আপনার অভিমত জানাই গে,—কি বলেন?"

বড়দা প্রথমতঃ একটু ইতস্ততঃ করিলেন; কিন্তু পরক্ষণেই দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন,—"তা জানাতে পার,—মেয়ে ভালই।"

কিন্তু হঠাৎ পশ্চাতে দরজার শব্দে তিনি যেন চমকাইয়া উঠিলেন।

৫

শিশিরকুমার গুন্ গুন্ শব্দে গাহিতেছিল,—

"সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।"

আজ রবিবার। সমস্ত সপ্তাহের কঠিন পরিশ্রমের পর অবসর। কিন্তু শান্তি কোথায়? যে রবিবারের প্রতীক্ষায় সে অধীর হইয়া থাকিত, সেই ঈপ্সিত প্রতীক্ষিত দিন যেন কাটিতেই চাহে না।

অশ্রুবাষ্প মেঘের আকারে অন্তরাকাশকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। মাঝে মাঝে নয়নপথে দুই চারি বিন্দু ঝরিয়া পড়ে। অন্তরের দাবদাহ তাহাতে শীতল ত হয় না।

কক্ষান্তরে "মা মা!" শব্দে রাণু কাঁদিয়া উঠিল। শিশির-কুমার ত্রস্ত-চরণে সেই দিকে চলিল।

সুরবালা বুকের উপর চাপিয়াও বালিকাকে শান্ত করিতে পারিতেছিলেন না।

"ঠাকুরপো, তুমি মাঝে মাঝে রাণুকে কোলে নিও, তা হ'লে পরে হয় ত তোমার কোলে বেশ থাকবে। এ বুকভাঙ্গা কান্না যে আর সহ্য করা যায় না।"

"তা দিও, বৌদি! কিন্তু সেও ত এই রবিবারেই শুধু আমায় পাবে।"

শিশিরকুমারের সমস্ত হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠিল। সন্তান-পালনের কঠিন নিয়মাবলী সে অসীমাকে বহুবার বুঝাইয়া দিয়াছে, কিন্তু স্বহস্তে কখনও করে নাই। কে জানিত, ভাগ্যনিয়ন্তা এই কাযটুকু তাহার জন্য অতি সযত্নে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলেন? রাণুকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে।

সাগ্রহে সে তাহাকে বুকের উপর টানিয়া লইল।

"রাণু, রাণু, মা আমার—" বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। উত্তপ্ত হৃদয়ের সমস্ত আবেগ বাধা না মানিয়া অশ্রুর আকারে ধারায় ধারায় নামিয়া আসিল।

বাহুযুগল সন্তর্পণে কন্যার কণ্ঠকে আলিঙ্গন করিল। শিশিরকুমার দুর্ব্বলতা গোপনের জন্য সন্তানের বুকের উপর মুখ লুকাইল।

আঃ, কি তৃপ্তি! এ যে সুধার সমুদ্র!

"শিশির, শিশির!"

শিশিরকুমার যেন স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় জ্যেষ্ঠের দিকে মুখ ফিরাইল।

"তোমার সঙ্গে একটা বিশেষ কথা আছে।"

কিন্তু কনিষ্ঠের মুখের দিকে চাহিয়া বড়দার কঠিন হৃদয়ও যেন একটু ধাক্কা খাইল। উচ্চারণের সুযোগ্য ভাষা ঠিক যেন যোগাইতেছিল না! শত চেষ্টাতেও তিনি সেই চাঞ্চল্য দমন করিতে পারিলেন না।

"কি কথা, বড়দা?"

একটা অনিশ্চিত আশঙ্কায় শিশিরকুমারের হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল। স্বল্পভাষী—বুদ্ধিমান্ ও স্থিরচিত্ত বড়দা না জানি কি গুরু বিষয় তাহার নিকট ব্যক্ত করিবেন! উৎকণ্ঠায় তাহার বুক ভরিয়া উঠিল।

"দেখ শিশির, আমরা অনেক ভেবে দেখেছি; তোমার এ অবস্থায়—সঙ্গহীন জীবন বাঞ্ছনীয় নয়। এর বিরুদ্ধে তোমার যুক্তি—তর্ক—"

কিন্তু বড়দার কণ্ঠেও বক্তব্যটা অবশেষে বাধিয়া গেল।

তাহা হইলেও বক্তব্য বিষয়টা অস্পষ্ট রহিল না। পিতৃসম অগ্রজ কি বলিতে চাহিতেছিলেন, তাহার মর্ম্ম শিশিরকুমারের দুর্ব্বোধ্য নহে। প্রস্তাবের আঘাতে সে অত্যন্ত বিচলিত হইল। তাহার পায়ের নীচে সমস্ত পৃথিবী যেন ভীমবেগে আবর্ত্তিত হইতে লাগিল।

রাণু তখনও তাহার বুকের উপর! উঃ! কি নির্ম্মম অশোভন কল্পনা!

"দেখ, ভেবে দেখ;—সংসারে বেঁচে থাকতে হ'লে—"

"বড়দা, বেঁচে থেকে আমার কোন লাভ নেই। বেঁচে থেকে যদি এই মহাপাপ করতে হয়, মরণেই আমার এক-মাত্র শান্তি।"

"এত অধীর হ'লে চলবে কেন, ভাই?"

বলিতে বলিতে বড়দার মুখ সহসা গম্ভীর হইয়া উঠিল।

"আমায় ক্ষমা কর বড়দা, আমি—"

"তা আর হয় না শিশির, আমি কথা দিয়েছি।"

বড়দা দৃঢ়চরণে বাহিরে চলিয়া গেলেন।

শিশিরকুমার স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

৬

প্রেমের সুদৃঢ় বন্ধন হয় ত ছিঁড়িয়া গেল। কেন? তাহার দুর্ব্বলতা? কিন্তু সে ত দুর্ব্বল নহে। তবে কি যৌবনের দুর্দ্দম বাসনার অগ্নিকে নির্ব্বাপিত করা সাধ্যাতীত বলিয়াই আজ সে আপনাকে তাহাতে আহুতি দিয়াছে? এ অবস্থা অনিবার্য্য—তাহা কি সে জানিত না? তবে, এমন ধনুক-ভাঙ্গা পণ করিয়া অবশেষে লোকসমাজে সে হাস্যাস্পদ হইল কেন? বড়দা পিতৃতুল্য—আশৈশব তাঁহার স্নেহময় ক্রোড়ে বর্দ্ধিত, তাঁহার আদেশ-লঙ্ঘন নিতান্ত অসম্ভব। তাহা হইলে তাহার আবাল্য সংস্কার শিথিল করিতে হয়, অকৃতজ্ঞতার চরম-বিকাশ হয়। কিন্তু পূজানিষ্ঠ অন্তরের কি কোনও সম্মান নাই? একনিষ্ঠ প্রেমের কি এতটুকু মর্য্যাদার অবকাশ নাই?

প্রবল তরঙ্গ তুলিয়া সজোরে শঙ্খ বাজিয়া উঠিল। শিশিরকুমার তাহার আন্দোলিত দেহকে সবলে সংবরণ

করিল। কয় বৎসর পূর্ব্বে উৎসব-মুখর এই প্রাঙ্গণেই শঙ্খ এমনই করিয়া অপরাহ্নের বাতাসে অনুরণিত হইয়া উঠিয়াছিল। সে দিনের স্মৃতি, আজিকার এই দৃশ্যকে কি ব্যঙ্গ করিতেছে না?

সুরবালা রাণুকে কোলে করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। অন্যান্য আত্মীয়ারা তাঁহাকে নব বধূ-বরণ করিবার জন্য আহ্বান করিতেই তিনি অশ্রুসিক্ত আননে কক্ষান্তরে দ্রুত চলিয়া গেলেন।

শিশিরকুমারের দেহ থর থর করিয়া একবার কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু তাহার বাম হস্তে নির্ম্মলার দক্ষিণ করপুট আবদ্ধ।

সহসা তাহার মনে হইল, সম্মুখের শয়ন-গৃহের বাতায়ন-পার্শ্বে মুখে হাত দিয়া অসীমা যেন তাহার দিকে চাহিয়া আছে। তাহার আননে চাপা হাসির তীব্র কটাক্ষ। ক্রোড়ে রাণু—অপলকনেত্রে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া সে কি যেন দেখিতেছে!

"বৌদি—বৌদি!"

শিশিরকুমারের দেহ শিথিল হইল; সে ধীরে ধীরে মাটীর উপর বসিয়া পড়িল। বাড়ীময় একটা বিপুল কোলাহল উত্থিত হইল।

"কি—কি, ঠাকুরপো?"

"আমার রাণু কোথায়, বৌদি?"

"এই যে তোমার রাণু,—কি হয়েছে ঠাকুরপো? ও কি? অমন কচ্ছ কেন?"

রাণুকে বুকের উপর টানিয়া লইয়া শিশিরকুমার কতকটা প্রকৃতিস্থ হইল। তার পর ধীরে ধীরে বলিল,—"বৌদি, একটু জল।"

সুরবালা তাড়াতাড়ি এক পাত্র জল আনিয়া তাহার মুখের কাছে ধরিতেই সে এক চুমুকে তাহা নিঃশেষ করিল।

নব-বধূ নির্ম্মলা বালিকা নহে। এই আকস্মিক ঘটনা বোধ হয়, তাহার চিত্তে প্রচণ্ড রেখাপাত করিল। সূক্ষ্ম ওড়নার অন্তরাল হইতে স্বামীর বক্ষোলগ্ন সপত্নী-তনয়ার মুখের প্রতি সে করুণ নয়নে চাহিয়া দেখিল। মাতৃহারা শিশুর বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে তখনও অশ্রুরেখা বিলুপ্ত হয় নাই।

স্বামীর এই বিহ্বল, চঞ্চল, বিমূঢ় ভাব, কন্যার প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিপাত—সমবেত নরনারীর উৎকণ্ঠা, স্বামিগৃহে প্রবেশ-মুহূর্ত্তে যে অভিনব, করুণ ও মর্ম্মন্তুদ দৃশ্যের অভিনয় ঘটিয়া গেল, তাহাতে তরুণীর মর্ম্ম অনাহত রহিল না। এ ঘটনার জন্য সেই দায়ী, তাহার আগমন উপলক্ষেই এমন একটা ব্যাপার ঘটিয়া গেল—যাহা চিরদিন সকলের মনেই হয় ত জাগ্রত হইয়া থাকিবে।

ধীরে ধীরে তাহার মাথা নত হইল। তাহার লাবণ্য-মণ্ডিত মুখমণ্ডলে দুঃখ ও নৈরাশ্যের মেঘ যেন ঘনাইয়া উঠিল। মুহূর্ত্তের জন্য তাহার মনে হইল, তাহার পিতা কেন এমন কার্য্য করিলেন? কেন তিনি তাহার তরুণ জীবনে তিক্ততার রস ঢালিয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন?

সে দিনের ফুলশয্যায় শিশিরকুমার প্রথম নির্ম্মলাকে ভাল করিয়া দেখিল। নির্ম্মলা সত্যই সুন্দরী। সে সৌন্দর্য্য দৃষ্টিকে আহত করে, প্রাণে এক অপূর্ব্ব বিস্ময়ের সৃষ্টি করে, বুঝি সে রূপবহ্নিতে পুরুষকে বিদগ্ধ হইতেই হয়।

শিশিরকুমার চঞ্চল হইয়া উঠিল। স্পন্দিত হৃদয়কে সংযত করিতে তাহাকে আয়াস স্বীকার করিতে হইল। তাহার ভগ্ন হৃদয়ে এই তরুণীর আসন বোধ হয় উপযুক্ত হইবে না। ইহা বিবাহ না ব্যভিচার? তাহার জীবনে এ ব্যাপার নিষ্ঠুর পরিহাস নহে কি?

মুক্ত বাতায়ন-পথে জ্যোৎস্নার মাধুর্য্যসিক্ত বাতাস প্রবেশ করিতেছিল। গৃহমধ্যে ফুলের মালা, চূর্ণ-পুষ্পের অপ্রাচুর্য্য ছিল না।

ফেন-শুভ্র শয্যার এক প্রান্তে নবজীবনের যাত্রাপথে বেপথুমতী তরুণী।

উৎসব-কোলাহল ক্রমেই নীরব হইয়া আসিতেছিল।

কেমন করিয়া কথা আরম্ভ করিবে, বোধ হয় শিশির-কুমার তাহাই চিন্তা করিতেছিল।

নির্ম্মলাও বোধ হয় স্পন্দিত-হৃদয়ে প্রথম স্বামি-সম্ভাষণের প্রতীক্ষায় ব্রীড়ানত আননে উদ্‌গ্রীব হইয়াছিল।

সহসা পার্শ্বের কক্ষ হইতে বালিকার কণ্ঠে "মা,—মা" রব উত্থিত হইয়া উভয়কেই চকিত করিয়া তুলিল।

মুহূর্ত্ত—মুহূর্ত্তমাত্র ইতস্ততঃ করিয়া তরুণী নির্ম্মলা দ্রুত চরণে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

ফুলশয্যার পুষ্পমাল্য বিস্রস্ত, ছিন্ন হইয়া গেল কি না, সে দিকে তাহার লক্ষ্য ছিল না। মাতৃহারা কন্যার আহ্বান ধ্বনি তাহার অন্তরকে শুধু স্পর্শ করিল না, তাহার হৃদয়ে

যেন মাতৃত্বের মধুর, পবিত্র, অপূর্ব্ব ব্যঞ্জনা ফুটাইয়া তুলিল।

আবেগভরে সে রাণুকে বুকে তুলিয়া লইয়া শতচুম্বনে তাহাকে সান্ত্বনা দিবার প্রয়াস পাইল।

শিশিরকুমার বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া এই বিচিত্র দৃশ্য দেখিতে লাগিল। আনন্দের প্রবল উচ্ছ্বাসে তাহার নয়নযুগল আর্দ্র হইয়া উঠিল।

৭

সে দিনও পূর্ণিমার চাঁদ নীলাকাশে আনন্দের তরঙ্গ তুলিয়াছিল। মুক্ত গবাক্ষের ভিতর দিয়া অম্লানোজ্জ্বল আলোক-প্রবাহ তাহাদের শয্যার উপর যেন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল।

শিশিরকুমার হঠাৎ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ডাকিল,—"নির্ম্মলা!"

নির্ম্মলা স্বামীর দিকে তাহার দীর্ঘায়ত নয়নের দৃষ্টি ফিরাইল।

স্ত্রী যত সহজে স্বামীর অন্তরের পরিচয় পায়, স্বামীর পক্ষে স্ত্রীর অন্তর-রহস্য ভেদ করা তত সহজ কি?

কয়েক মাসের মধ্যে নির্ম্মলা বোধ হয় শিশিরকুমারের অন্তরের দুর্ব্বল স্থানগুলির—মনোবৃত্তিগুলির পরিচয় পাইয়াছিল। সপত্নীর স্মৃতিবিজড়িত, পরিত্যক্ত দ্রব্যগুলি যেমন ভাবে গৃহশোভা বৰ্দ্ধিত করিত, নির্ম্মলা সশ্রদ্ধভাবে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিত, সযত্নে সেগুলি তেমনই ভাবে গুছাইয়া ঝাড়িয়া মুছিয়া রাখিত। লোকান্তরিতা সপত্নীর প্রতি তাহার বাক্য বা ব্যবহারে বিন্দুমাত্র ঈর্ষা বা অশ্রদ্ধার ভাব প্রকাশ পাইত না। কিন্তু সে বুঝিতে পারিত, তাহার স্বামী ইহাতে বিচলিত হইয়া উঠেন, কক্ষ হইতে সেগুলিকে নির্ব্বাসন করিতে পারিলেই যেন তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারেন।

নির্ম্মলা মূর্খ ছিল না। সপ্তদশ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত সে যথাসাধ্য বিদ্যার্জ্জন করিয়াছিল। সে জানিত, তাহার দেহে রূপের ঐশ্বর্য্য আছে, যৌবনের চঞ্চলতা তাহার সর্ব্বাঙ্গে উচ্ছ্বসিত হইয়া রহিয়াছে। শিশিরকুমার তাহাতে অনাহত থাকিতে পারে না। সে বুঝিয়াছিল, স্বামী অতীতকে ভুলিয়া বর্ত্তমানের মধ্যে আত্মবিসর্জ্জন করিতে চাহেন।

কিন্তু রাণুর কথা মনে করিয়া স্বামীর এই ক্রমবর্দ্ধমান প্রেমতৃষ্ণা সম্বন্ধে সে প্রকৃতই সুখী হইতে পারে নাই।

আহা! মাতৃহারা, ভাগ্যবিড়ম্বিতা দুধের মেয়ে!

বোধ হয়, সেই কথাটাই সে আজ নিবিষ্ট-মনে চিন্তা করিতেছিল।

শিশিরকুমারের নয়নে যে তীব্র দীপ্তি সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, চন্দ্রালোকে তাহা নির্ম্মলার দৃষ্টি এড়াইল না। সে মৃদু হাসিয়া বলিল,—"রাণুকে আমাদের কাছে নিয়ে এলে হয় না?"

"সে ত বৌদির কাছেই থাকে।"

"কেন, আমায় বুঝি বিশ্বাস হয় না?"

শিশিরকুমারের আনন লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল। এমন প্রায়ই হইত।

নেশার ঝোঁক অন্তরের সকল কথাকে চাপা দিয়া শুধু নেশার কথাকেই সজাগ রাখে। শিশিরকুমারের বোধ হয় তাহাই ঘটিয়াছিল। নির্ম্মলার অসামান্য রূপ-লাবণ্য, অটুট স্বাস্থ্য এবং ভাদ্রের নদীর মত ভরা যৌবন তাহার সমস্ত সত্তাকে অভিভূত করিয়াছিল। শিক্ষকতা, কাব্যরচনা প্রভৃতি ইদানীং তাহার ভালও লাগিতেছিল না। কাহারই বা লাগে? বিগতা স্ত্রীর কথা বোধ হয় আর মনেই নাই। যে অতীত, তাহার কথা মনে করিয়া লাভ আছে কি? রাণু?—তা সেও নিরাপদ—বৌদির স্নেহাঞ্চলের সে অমূল্য নিধি!

পুরাতন দৃশ্যের সংস্রবে আসিয়া মাঝে মাঝে পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিলে নির্ম্মলার রূপের ধ্যানে তাহা অপসারিত হইত। তজ্জন্য পরিশ্রম স্বীকারের প্রয়োজন হইত না। পৃথিবীর ইতিহাসে ইহা আদৌ নূতন তথ্য নহে।

সে দিন গৃহে কেহই ছিল না। নীলাম্বরপরিহিতা নির্ম্মলা দ্রুতবেগে সম্মুখের বারান্দা দিয়া যাইতেছিল। মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিতেই কবির চিত্ত অধীর হইয়া উঠিল। সে দ্রুতগতিতে সম্মুখে আসিয়া তাহার গতিরোধ করিল। তার পর মৃদুকণ্ঠে সুর করিয়া বলিয়া উঠিল,—

"চলে নীল সাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি
পরাণ সহিত মোর।"

স্বামীর এ অভিব্যক্তি যে কোনও তরুণীর চিত্তে হয় ত বিক্ষোভসঞ্চার করে—পুলক-স্পন্দন জাগাইয়া তুলে; কিন্তু নির্ম্মলা যুক্তকরে বলিয়া উঠিল—

"ওগো, তোমার পায় পড়ি, ছেড়ে দাও; রাণুর বড্ড জ্বর!"

রাণুর জ্বর ? কিন্তু সে ত দেখিয়াছে, সামান্যমাত্র গা গরম হইয়াছে !

শিশিরকুমার বলিয়া উঠিল,—"তা সে জন্য এত ব্যস্ত কেন ? অমন একটু আধটু গা গরম হয়ে থাকে।"

"না—না, খুব বেশী জ্বর ! তুমি পথ ছাড়।"

নির্ম্মলা পাশ কাটাইয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

শিশিরকুমার স্তম্ভিত, নির্ব্বাক্‌ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। এক মুহূর্ত্তে অনেক কথাই বোধ হয় তাহার অন্তরে ভাসিয়া উঠিল। রাণু নির্ম্মলার কে ? সতীনকন্যা নহে কি ? তবে তাহার জন্য এত ব্যস্ততা কেন ? রাণু তাহারই সন্তান, তাহারই রক্তমাংসে গঠিত স্নেহের পুত্তলী। কৈ, সে ত রাণুর জন্য তেমন ব্যস্ত হইয়া উঠে নাই।

সে বহুদিন হইতেই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে, রাণুর জন্য নির্ম্মলার চিত্ত অনুক্ষণই বিব্রত। যেন সে নির্ম্মলার গর্ভজাত সন্তান। রাণুকে কেমন করিয়া সাজাইবে, আনন্দ ও তৃপ্তি দিবে, এই চিন্তাতেই তরুণী তাহার অধিকাংশ সময় ক্ষেপণ করিয়া থাকে।

দাম্পত্য-জীবনের মাধুর্য্যরস—তরুণ যৌবনের উচ্ছল তরঙ্গাবর্ত্ত হইতে সে যেন সযত্নে আপনাকে দূরে রাখিতে চাহে। শিশিরকুমার প্রেমের পুষ্পাঞ্জলি নানা বিচিত্রভাবে প্রতিদিন নির্ম্মলার উদ্দেশে অর্পণ করিতেছে, কিন্তু কৈ, তরুণী ত তাহা সমগ্র অন্তর দিয়া গ্রহণ করিতেছে না !

যখনই সে উচ্ছ্বসিত আবেগে প্রেম নিবেদন করিতে যায়, সমগ্র অন্তর দিয়া সুন্দরীকে অর্চ্চনা করিতে উদ্যত হয়, তখনই রাণুর অজুহাত ব্যবধান সৃষ্টি করে।

রাণুর সেবা, রাণুর যত্ন, রাণুর রোগের জন্য নির্ম্মলার মনে কি এমন স্বাভাবিক আবেগ উত্থিত হইবার অবকাশ সম্ভবপর ?

শিশিরকুমারের মনে হইল, এ সমস্তই নির্ম্মলার অভিনয় মাত্র। এ শুধু তাহাকে এড়াইয়া চলিবার এক অভিনব পন্থা। নির্ম্মলা নিশ্চয়ই তাহার সমাগত প্রৌঢ়ত্বকে ঘৃণা করে,—অবহেলা করে। তাহার এই আচরণ—

"ওগো, শোন, রাণুর জ্বর বড্ড বেড়ে চলেছে। নিশ্বাস নিতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। আজ ৩ দিন বাছা কিছুই খাচ্ছে না। এক জন বড় ডাক্তার—"

তরুণীর সুন্দর আননে উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছিল। শিশিরকুমার দেখিল, সত্যই নির্ম্মলার মুখে ইহাতে এক বিচিত্র মাধুর্য্য-দীপ্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। কণ্ঠস্বরে যেন বীণার গুঞ্জন ! কথা কহিবার ভঙ্গীতে কি লীলায়িত গতি !

"নির্ম্মলা, তুমি কি সুন্দর ! আমি তোমার যোগ্য নই, তা জানি, কিন্তু তা ব'লে এ প্রাণের আকুল নিবেদন কি—"

স্বামীর উচ্ছ্বসিত আবেগে বাধা দিয়া নির্ম্মলা বলিয়া উঠিল, "তুমি কি বল ত ? রাণুর এমন অসুখ, আর তোমার মুখে—"

কে যেন শিশিরকুমারের পৃষ্ঠে নির্ম্মমভাবে কশাঘাত করিল। নির্ম্মলার চোখে অশ্রুবিন্দু ? অস্থিরভাবে শিশিরকুমার বলিয়া উঠিল, "সত্যি জ্বর বেশী হয়েছে ?"

"নিজে দেখবে এস। এক জন ভাল ডাক্তার আনাও। সহর থেকে বড় ডাক্তারকে ডেকে পাঠাও।"

শিশিরকুমার ঈষৎ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিয়া উঠিল,—"তোমাদের সবতাতেই বাড়াবাড়ি ;—আচ্ছা, চল দেখি গে।"

আজিকার এ প্রেম-নিবেদন এমন ভাবে ব্যর্থ হইবে, বেচারা শিশিরকুমার পূর্ব্বে হয় ত অনুমান করিতেও পারে নাই। বিধিলিপি !

৮

মানবমনোবৃত্তির মহাসমুদ্র শুধু অতলস্পর্শী নহে, তাহার বিরুদ্ধ বা অনুকূল স্রোতোধারা কেমন ভাবে বহিতে থাকে, আজিও তাহা মানব-মনের অগোচর।

পিতা স্বীয় সন্তানকে ভালবাসে, স্নেহ করে, বুকে তুলিয়া রাখে। তাহার ক্ষণিক অদর্শনে পিতৃহৃদয় শঙ্কায়, উৎকণ্ঠায় মুহ্যমান হইয়া পড়ে। সন্তান-বাৎসল্যের এই বিচিত্র তত্ত্বের মূলে মানবমনোবৃত্তির যে স্পন্দন বিদ্যমান, তাহা যেমন মধুর, তেমনই স্বচ্ছ ও পবিত্র।

কিন্তু শিশিরকুমারের সম্বন্ধে নির্ম্মলা দিন দিন ইহার বিপরীত পরিচয় পাইয়া শুধু শঙ্কিত হয় নাই, লজ্জায় ও কুণ্ঠায় অধীর হইয়া উঠিল। লজ্জা ও কুণ্ঠার সহিত বিরক্তি ও ঘৃণার ব্যবধান কতটুকু, তাহা মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণও এ পর্য্যন্ত পূর্ণরূপে নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই।

শয্যালগ্না রাণুর শিয়রে বসিয়া নির্ম্মলা মুগ্ধহৃদয়ে ভাবিত, এই কি পিতা ? মাতৃহারা কন্যার প্রতি এই কি উপযুক্ত ব্যবহার ? ছি—ছি—ছি ! স্বামীর এই নির্ম্মম ঔদাসীন্যের জন্য নির্ম্মলা লজ্জায় মরিয়া যাইতেছিল। তাহার

ইচ্ছা হইতেছিল যে, এই হীন জীবনের যেন অবিলম্বে অবসান হয়। ভগবানের কাছে সে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিল, যেন এ জীবনে কখনও সে সন্তানবতী না হয়।

* * * *

সে দিন শনিবার। সন্ধ্যার যবনিকা টানিয়া দিয়া ধীরে ধীরে সমগ্র আকাশ চাঁদের আলোয় ভরিয়া গিয়াছে। শিশিরকুমার গৃহে ফিরিতেছিল। তাহার প্রাণে অফুরন্ত আনন্দ! সপ্তাহান্তে নির্ম্মলার সৌন্দর্য্য-জ্যোৎস্নায় অবগাহন করিয়া সে তাহার কর্ম্মক্লান্ত, অবশ দেহকে সতেজ করিয়া তুলিবে। নির্ম্মলার উদ্দেশে আজ সে সমস্ত অন্তরের মাধুর্য্য ও প্রেমের সমবায়ে একটি কবিতাও রচনা করিয়াছে। নির্ম্মলা কি তাহা সাদরে গ্রহণ করিবে না? তাহার অন্তরের রক্তরাগ-রঞ্জিত অর্ঘের বিনিময়ে সে একবারও কি তাহার প্রাণকে দরদী করিয়া তুলিবে না? রাণু—রাণু—রাণুই কি তাহার ধ্যান ও জ্ঞান? রাণু ভিন্ন তাহার মুখে আর কোন কথাই নাই? রাণুই সর্ব্বস্ব? সে কি কিছুই নহে? না, রাণুই তাহার প্রেমের কণ্টক।

শিশিরকুমার গৃহে প্রবেশ করিয়াই একটা অস্পষ্ট ক্রন্দনের শব্দ শুনিতে পাইল।

দ্রুতপদে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়াই সে দেখিল সুরবালা উচ্ছ্বসিত শোকে ক্রন্দন করিতেছেন। নির্ম্মলার কোন সাড়াই নাই। সে রাণুকে কোলের মধ্যে রাখিয়া স্পন্দহীন-নেত্রে বালিকার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে।

স্তব্ধভাবে শিশিরকুমার তথায় দাঁড়াইয়া রহিল। অস্থিচর্ম্মসার রাণুর ক্ষীণ কণ্ঠে সে যেন একবার শুনিতে পাইল,—"মা—মা—"

নির্ম্মলা তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া বাষ্পগদ্গদকণ্ঠে বলিতে লাগিল—"এই যে মা—কি মা?"

নয়নে তাহার অশ্রুসিন্ধু উছলিয়া উঠিল।

রাণুর বেদনাক্লিষ্ট মুখখানি যেন একবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। শীর্ণ হাতখানি নির্ম্মলার মুখের উপর রাখিয়া আবার বলিয়া উঠিল—"মা!—মা!—"

"ওগো, তোমার পায় পড়ি, এক জন বড় ডাক্তার ডাক। একবার চেয়ে দেখ, বাছা আমার কেমন কচ্ছে!"

"তোমাদের সবতাতেই বাড়াবাড়ি। হয়েছে কি? ডাক্তার ত দেখছে।"

বাড়াবাড়ি? সন্তান ধীরে ধীরে মৃত্যুর পথে চলিয়াছে, মাতৃহারা অভাগী বালিকা লোকান্তরবাসিনী জননীর ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া শান্তিলাভের জন্য ছুটিয়াছে, জন্মদাতা পিতার কি সে সম্বন্ধে কোন কর্ত্তব্য নাই? যাহাদের সহিত রক্তের কোন সম্বন্ধ নাই, তাহারা ব্যাধিপীড়িতা শিশুর জন্য আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছে, ইহা কন্যার পিতার কাছে বাড়াবাড়ি?

নির্ম্মলা সোজাভাবে শয্যার উপর বসিল; নিষ্পলক-নেত্রে স্বামীর দিকে চাহিল। তাহার নেত্রপথে তখন যেন বহ্নিজ্বালা নির্গত হইতেছিল। সুন্দরীর নাসারন্ধ্র স্ফীত হইয়া উঠিল। চাপা, দৃপ্তকণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল, "তুমি মানুষ?"

"নির্ম্মলা!—"

মুখ ফিরাইয়া নির্ম্মলা বলিল, "দিদি!"

সুরবালা অশ্রুসিক্ত-নয়নে ফিরিয়া চাহিলেন।

"দিদি, ভাসুর ঠাকুর আজও ফিরলেন না। আপনি ও বাড়ীর নরেশ ঠাকুরপোকে ডাকান।"

সুরবালা স্পন্দহীনভাবে দাঁড়াইয়াই রহিলেন।

চাবির গোছা অঞ্চল হইতে খুলিয়া লইয়া নির্ম্মলা মৃদুকণ্ঠে বলিল, "দিদি, আমার ছোট হাতবাক্সটা আনুন না।"

সুরবালা কক্ষান্তর হইতে নির্দ্দিষ্ট বাক্সটি আনিলে, সাশ্রুনেত্রে নির্ম্মলা বলিল, "দিদি, বাবার দেওয়া হাজার টাকার গহনা এতে আছে। সহরে বড় ডাক্তারকে ডাকতে পাঠান, দিদি!"

অজস্র অশ্রুধারায় তাহার বক্ষের বসন সিক্ত হইতেছিল। রাণুর মাথা কোলে তুলিয়া লইয়া সে দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "আমিই রাণুর মা। দেখি, কে তাকে আমার কোল থেকে কেড়ে নেয়!"

অপূর্ব্ব মহিমশ্রীতে, মাতৃত্বের বিমল দীপ্তিতে নির্ম্মলার আনন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

বেত্রাহত কুকুরের ন্যায় শিশিরকুমার ঘর হইতে নির্গত হইয়া বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইল।

তাহার অন্তরতম প্রদেশে কি তখন সেই পুরাতন, জীর্ণ স্মৃতির ক্ষীণ আলোকরেখা ক্রমশঃ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল?

শ্রীসুধাংশুকুমার রায় চৌধুরী (বি, এস-সি)।

"সুবিধাবাদ—রাজনীতিক্ষেত্রে।"

পূর্ব্বকালে কোন রাজা রাজ্যেশ্বর হইয়া প্রজাপালন করিতেন। তাঁহার পরামর্শদাতা বা মন্ত্রী থাকিত, কিন্তু অধিকাংশ সময়েই তিনি যাহা নিজে ভাল বোধ করিতেন, সেইরূপই করিতেন। তবে কার্য্য করিবার পূর্ব্বে প্রকাশ্যভাবে বা গোপনে প্রজাবৃন্দের মত জানিয়া লইতেন এবং প্রজারা যাহা বলিত, তাহা বিশেষ করিয়া মনঃসংযোগের সহিত শ্রবণ করিতেন এবং বিবেক ও বিচারের দ্বারা কিংকর্ত্তব্য নিরূপণ করিয়া লইতেন। যদি রাজা অত্যাচারী হইতেন, প্রজারা দরখাস্ত ও অভিযোগের দ্বারা তাহার প্রতীকারের প্রার্থনা করিত। রাজাদের চক্ষু ও কর্ণ সর্ব্বসময়েই উন্মুক্ত থাকিত। চক্ষু বা কর্ণের সাহায্যে কোন বিষয় তাঁহাদের গোচরীভূত হইলে বিবেক ও বিচারের দ্বারা কর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়া লইতেন।

লোকসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাধারণের ধারণা ও স্পৃহা হইতে লাগিল,—ক্ষমতা এক জনের হাতে না থাকিয়া বহু লোকের হস্তে অর্পিত হউক। যত লোকবৃদ্ধি, তত বহু লোকের হস্তে ক্ষমতাবিস্তারের স্পৃহা। ক্রমে একতন্ত্র রাজ্যপদ্ধতির পরিবর্ত্তে নিয়মতন্ত্র রাজ্যপদ্ধতি প্রচলিত হইতে লাগিল। মূল উদ্দেশ্য—একের হাতে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত না হইয়া বহু লোকের হস্তে স্থাপিত হইলে সাধারণ প্রজার সুবিধা হইবে, এই কারণে Absolute monarchy (একাধিপত্যের) পরিবর্ত্তে Constitutional or limited monarchy (নিয়মতন্ত্র রাজ্যপ্রথা) বিস্তারিত হইতে লাগিল। ক্রমে সাধারণতন্ত্র বা গণতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র রাজত্ব সুরু হইল। ক্রমে রাজশক্তি গণতন্ত্র বা জনশক্তিতে পরিণত হইতে লাগিল। কিন্তু তাহাতে ফল কি হইল ? সর্ব্বসময়েই যে গণতন্ত্র বা সাধারণতন্ত্র নিয়মতন্ত্র রাজ্য অপেক্ষা অধিক সুবিধাজনক, তাহা বলা যাইতে পারে না।

প্রত্যেক রাজতন্ত্রে ভাল মন্দ দুই দিকই আছে। রাজা ভাল হইলে রাজতন্ত্র বা একতন্ত্র রাজ্যপদ্ধতি ভালই হইবে। রাজা নিজে উৎপীড়ক বা অত্যাচারী হইলে একতন্ত্র রাজ্যপদ্ধতি সাধারণ লোকের পীড়াদায়ক। প্রজাপীড়ন একচ্ছত্র রাজাও করিতে পারে, নিয়মতন্ত্রী রাজাও করিতে পারে, আর প্রজাতন্ত্র রাজত্বেও অত্যাচার হইতে পারে। যে বা যাহারা রাজ্য চালাইবে, তাহাদের ভাল বা মন্দ স্বভাবের উপরেই সমস্ত নির্ভর করে। প্রজাতন্ত্র বা সাধারণতন্ত্র রাজত্বেও চালক বা ক্ষমতার ধারক যদি অত্যাচারী হয়, তাহা হইলে প্রজাদের জীবন অতিষ্ঠ হয়।

রাজ্যশাসনের পদ্ধতি অনেকগুলি আছে, সেই বিশেষ বিশেষ পদ্ধতির উপর প্রজাদের সুখ-দুঃখ অনেক নির্ভর করে বটে, কিন্তু ক্ষমতার শীর্ষস্থানে অভিষিক্ত ব্যক্তি অত্যাচারী হইলে প্রজার সুখ একবারেই থাকিতে পারে না।

অনেক সময় দেখা যায়, প্রজাতন্ত্রবাদীদের মধ্যেই Autocrat (স্বৈরনৃপতি, স্বয়মীশ্বর) দেখিতে পাওয়া যায়। আর, একবার এক জনের হস্তে ক্ষমতা গিয়া পৌঁছিলে, তাহার নিকট হইতে সেই ক্ষমতা কাড়িয়া লইতে হইলে অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহের দ্বারা তবে সেই কার্য্যে সার্থক হওয়া যায়।

মিসর, চীন, রোম, গ্রীস, রাসিয়া, স্পেন, ফ্রান্স, ইংলণ্ড ইত্যাদি রাজ্যের ইতিহাস পাঠ করিলে বুঝা যায়, যে ব্যক্তির হস্তে ক্ষমতা নিহিত হয়, যে নামেই হউক, সেই ব্যক্তি সর্ব্বশক্তিমান হন। তাহাকে Consul ই বল, Proconsul ই বল, Tribune ই বল, Khedive ই বল, Mehdi ই বল, Czar ই বল, President ই বল, বা Minister ই বল, যে নামেই বল না কেন, সেই সময়ের জন্য সেই ব্যক্তিই সর্ব্বশক্তিমান।

প্রত্যেক সর্ব্বশক্তিমান ব্যক্তিকেই কতকগুলি লোককে তাহার সহকারিরূপে রাখিতে হয়। সেই সহকারীকে যে নামেই আখ্যায়িত কর না কেন, ক্ষমতাশালী লোকের সাহায্যের জন্যই এই সব লোক নিয়োজিত থাকে।

৩ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রাজনীতিজ্ঞ লোকদিগের মধ্যে কে অধিক শক্তিশালী, ইহা স্থির করিতে হইলেই যুদ্ধের প্রয়োজন হইত। যুদ্ধ বিনা কে বড়, কে ছোট, কে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমতা পাইবার অধিকারী, আর কে তাহা নহে, তাহা বিনা যুদ্ধে কিছুতেই ঠিক হইত না, এমন কি, দেশের দুই দলের মধ্যে কোন্ দল ক্ষমতাশালী হইবে, তাহা স্থির করিতে হইলেও যুদ্ধের প্রয়োজন হইত। Cæsar ও Pompeyর শেষ যুদ্ধই ইহার উদাহরণস্থল। Pompey ও Caesar দুজনেই রোমক, দুই জনেই রোমীয় সৈন্য লইয়া লড়াই করিতেন, অথচ যখন দুই জনে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইলেন, পরস্পরের

মধ্যে যুদ্ধ করিয়া রোমেরই বলক্ষয় করিলেন। কিন্তু আজ স্পেনের রাজা আলফান্সোর ব্যবহার দেখুন। যদিও এক দেশের মধ্যে পরস্পর দুই দলের অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া লড়াই—গৃহবিবাদ বন্ধ হইয়াছে, ভোটযুদ্ধই সেই সশস্ত্র যুদ্ধের স্থান অধিকার করিয়াছে। উচ্চ রাজকর্ম্মচারীর পদ অধিকার করিবার জন্য ৩ হাজার বৎসর পূর্ব্বে রোমের জনশক্তি তাহাদিগকে নিজ নিজ মত দ্বারা মনোনীত করিতেন।

এখনও অনেক স্থলে সেইরূপ পদ্ধতিতেই উচ্চ রাজকর্ম্মচারী মনোনীত করা হয়। তবে সব সময়েই যে নিজ নিজ বিবেক ও বিচারশক্তি-প্রণোদিত হইয়া ভোট প্রদান করা হয়, তাহা বলা বড়ই কঠিন। বর্ত্তমান সময়ে চেষ্টা হইতেছে, যাহাতে বিভিন্ন দেশ-শাসকগণ একত্র বসিয়া ভোটের দ্বারা তাহাদের নিজ নিজ পার্থক্য-বিষয়ের মীমাংসা করিয়া লয়। এইরূপ চেষ্টা বিশেষভাবে করা হইতেছে। আর জেনিভাতে যে বিভিন্ন জাতি ও শক্তি একত্র মিলিয়া তাঁহাদের মতভেদের বিষয় মীমাংসা করিয়া লইতেছেন, তাঁহারা বিনা অস্ত্র-প্রয়োগে কেবলমাত্র ভোটের দ্বারা কার্য্য সমাধা করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

স্পেন রাজ্য আজ ১৫ শত বর্ষ ধরিয়া রাজতন্ত্র-পদ্ধতির (Monarchical) অধীনে। ইদানীং ইহা নিয়মতন্ত্র রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল (Constitutional monarchical) এই স্থানের রাজা ১৫ শত বৎসর ধরিয়া সুখে-দুঃখে, বিপদে-সম্পদে, অর্দ্ধকৃচ্ছ্রতার ভিতর দিয়া প্রজাদিগকে শাসন করিয়া আসিতেছিলেন। এই ১৫ শত বৎসর রাজত্বের পর হঠাৎ এক দিন দেখা গেল, প্রজারা রাজা আলফান্সোকে চাহেন না। যখন রাজা আলফান্সো দেখিলেন যে, প্রজারা তাঁহাকে চাহেন না, তিনি যুদ্ধ দ্বারা রক্তপাত না করিয়া রাজত্ব ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। অনেক সৈন্য তাঁহার দিকে ছিল, তথাপি তিনি ঘরোয়া যুদ্ধ করিয়া স্পেনের শক্তিক্ষয় করিলেন না।

তিনি চলিয়া যাইবার সময় অনেক প্রজা যখন চীৎকার করিতে লাগিল, "রাজার জয় হউক", তিনি প্রজাদিগের "রাজার জয় হউক" এই উচ্ছ্বাসের প্রতি-উত্তরে বলিলেন, "স্পেনের জয় হউক।" তিনি স্পেনকে শক্তিহীন করিয়া রাজত্ব করিতে চাহিলেন না। আর ৩ হাজার বৎসর পূর্ব্বে যখন Pompey the Great আর Cæsarএর সহিত যুদ্ধ হইয়াছিল, তখনকার ইতিহাসে আমরা কিরূপ দেখিতে পাই? দুই জনেই রোমক, উভয়েই প্রবল সৈন্যদলের নেতা, দুই জনেরই রোমক সৈন্য, অথচ দুই জনে যুদ্ধ করিলেন—ফল,—Pompey the Great যুদ্ধে পরাজিত হইলেন, দেশত্যাগ করিলেন, এবং মিশরে তাঁহার পূর্ব্ব-অনুগৃহীত Ptolemyর কাছে আশ্রয় লইতে গিয়া জীবন হারাইলেন। তাঁহার অনুগ্রহ-ভিখারী তিন জন পূর্ব্ব-কর্ম্মচারীর হস্তেই তাঁহার হত্যা সাধিত হয়।

বর্ত্তমান সময়ে দুই বা অধিক জন প্রতিদ্বন্দ্বী রাজশক্তির অভিলাষী Pompey ও Caesarএর ন্যায় নিজ নিজ দলস্থ সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিয়া না মরিয়া ও না মারিয়া ভোট-যুদ্ধের দ্বারা ঠিক করিয়া লন, দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে কোন্ ব্যক্তি রাজশক্তি পরিচালন করিবে।

এই ভোট-যুদ্ধে অর্থক্ষয় ও সময় নষ্ট হয় বটে, কিন্তু প্রাণক্ষয় হয় না। তর্জ্জা লড়াইয়ের দুই দলের মত এক দল গাহিয়া আসর ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া বসেন ও অপর দল আসরে নামিয়া তাঁহাদের কেরামতি দেখান। বাগ্‌যুদ্ধ হয় বটে, হারজিতও হয় বটে, কিন্তু যোদ্ধৃদল প্রাণে মরে না। এখন যেমন লোক ভোট সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধে জয়লাভ করেন, ৩ হাজার বৎসরের অধিক পূর্ব্বে রোমকগণ বা গ্রীকরা সাধারণ লোকের সহানুভূতি ক্রয় করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। সাধারণ লোক-শক্তি বা জনশক্তি যাহাকে পছন্দ করিত, তিনি ক্ষমতা চালাইবার অধিকারী হইতেন। রোমকদের রাজত্বকালে তাঁহারা নিজেদের ছাড়া অপর সকলকেই অসভ্য বলিতেন। রোমের বাহিরে যাহারা বাস করিত, তাহারা সকলে অসভ্য ছিল। প্রত্যেক বিখ্যাত রোমক যোদ্ধা এই অসভ্যদের রাজ্য জয় করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রত্যেক যোদ্ধাই যদিও অসভ্যদিগকে নির্ব্বিচারে হত্যা করিতেন, রোমকদিগকে কিন্তু সর্ব্বদাই সন্তুষ্ট রাখিতেন। এই সন্তুষ্টিসাধনের জন্য রোমের জয়যুক্ত সেনানায়ককেও অনেক অত্যাচার ও অন্যায় সহ্য করিতে হইত। মনের ভিতর যাহাই থাকুক, প্রকাশ্যে রোমীয় জনশক্তিকে কোনরূপেই অবজ্ঞা করিতে পারিতেন না।

সাধারণ জনশক্তিকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, রোমীয় কমন্স প্রধান শাসনকর্ত্তা বা প্রধান বিচারক ট্রিবিউন (রোমের উচ্চকর্ম্মচারী বা জনসাধারণের নির্ব্বাচিত বিচারকমণ্ডলী) সেনানায়ক সকলেই সেই সকল কার্য্য করিতেন। জনশক্তির মত লইয়া কন্সল, প্রোকন্সল, ট্রিবিউন, এডিলি (তামাসা-প্রদর্শনী পুলিস বিভাগ বা সরকারী অট্টালিকা-সমূহের তত্ত্বাবধায়ক) এবং অন্যান্য রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত হইত। রোমীয় জনশক্তিকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য কমন্স ও ট্রিবিউনরা যতদূর সম্ভব আমোদ-প্রমোদের দ্বারা তাহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিতেন। সিজার ও পম্পের সময়ের কতকগুলি ঘটনা এই স্থানে বিবৃত করিব।

জুলিয়স্ সিজার খৃঃ শতাব্দীর এক শত বৎসর পূর্ব্বে জুলাই মাসে জন্মগ্রহণ করেন। অতীত কালের মধ্যে তিনি এক জন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন, সর্ব্ববিষয়েই তাঁহার প্রতিভা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তিনি এক জন বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ্ ও সেনানী ছিলেন। তিনি অনেক পুস্তকের গ্রন্থকার ছিলেন। তাঁহার লেখনীধারা অতি সুন্দর ছিল এবং লাটিন ভাষায় নির্ভুলভাবে তাঁহার বইগুলি রচিত হইয়াছিল। জুলিয়স সিজার খৃঃ শতাব্দীর ৫৪ বৎসর পূর্ব্বে ঘাতকের হস্তে নিহত হন।

পম্পি সিজার অপেক্ষা কিয়দ্বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠঃ। ক্ষমতা হিসাবে পম্পি ধীমান্, বলবান্, যোদ্ধা ও বিশেষরূপ রাজনীতি-কুশল। কেটোও সেই সময়ের এক জন বিশেষরূপ শিক্ষিত লোক এবং শ্রেষ্ঠ বাগ্মী। তিনি যদিও রাজনীতিতে যোগ দিয়াছিলেন, তথাপি রাজনীতির কোন পঙ্কই তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই। যাহারা রাজনীতিতে নিমজ্জমান, ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞান তাহাদের অতিশয় সীমাবদ্ধ। যেমন করিয়াই হউক, রাজনীতিজ্ঞের নিজ কার্য্যসিদ্ধি চাই। যুদ্ধে ও প্রেমে পথাপথের বিচার নিষ্প্রয়োজন। রাজনীতি-বিশারদের পক্ষেও কিছুই অকর্ত্তব্য নাই, তাঁহাদের নিজ নিজ সুবিধার জন্ম সমস্তই তাঁহারা করণীয় বলিয়া মনে করেন। মিথ্যা বলা তাঁহাদের অঙ্গের ভূষণ। নিজের দলকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার জন্ম সকল কুকর্ম্ম করিতে তাঁহারা রাজী। তাঁহারা কুকর্ম্মকে কুকর্ম্ম বলিয়া ধরেন না, কার্য্যসিদ্ধির সোপান বলিয়া মনে করেন। কেটো এই সময়ের লোক হইয়াও ধর্ম্মপথ হইতে বিন্দুমাত্র স্খলিত হইতেন না। তাঁহার বিবেক যাহা বলিত, তিনি তাহাই করিতেন, তাহাতে ভালই হউক, আর মন্দই হউক। রাজনীতিকদের বিবেক নাই বলিলেই চলে। যদি কিছু থাকে, তাঁহাদের সুবিধাবাদের সুবিধার জন্ম।

দেশের ও দশের সুবিধার ভাণ করিয়া তাঁহারা নিজের সুবিধার বন্দোবস্ত করিয়া লন। যোল আনা ভণ্ডামী, সব সময়েই উদ্দেশ্য মহৎ, নিজের সুবিধা করিয়া লওয়া। তাঁহাদের মুখে সব সময়েই শুনিবেন, "দেশের জন্ম করিতেছেন, দশের জন্ম করিতেছেন," কিন্তু আসল কথা, যাহা কিছু করিতেছেন, তাহা নিরবচ্ছিন্ন আত্ম-সুবিধার জন্ম। ধর্ম্মের বেড় তাঁহার কোন অসুবিধা করে না। কারণ, তিনি ঈশ্বরও মানেন না, লোকের সুখ-দুঃখ কিছুই মানিতে প্রস্তুত নহেন, খালি ভাবিতেছেন নিজস্ব—আত্ম-সুবিধা। বিবেক বলিয়া তাঁহার কাছে কিছু নাই, ঈশ্বর বলিয়া তাঁহার নিকট কোন শক্তিই নাই, সর্ব্বদাই তিনি নিজ শক্তি সংগ্রহে ব্যস্ত, সর্ব্বদাই চিন্তিত, কি করিয়া শক্তি সঞ্চয় করিবেন।

৩ হাজার ১ শত বৎসর পূর্ব্বে রোমের রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিরা কোন কার্য্যেই পশ্চাৎপদ ছিলেন না। প্রতারণা, জুয়াচুরি, মিথ্যাবাদ তাহাদের অঙ্গের ভূষণ ছিল। হত্যাকার্য্যেও তাঁহারা পশ্চাৎপদ ছিলেন না। বিবেককে কথায় কথায় তাঁহারা বলিদান দিতেন, আত্মসম্মানকে রাইন্এ ভাসাইয়া দিতেন। কেবলমাত্র চিন্তা—কিরূপ করিয়া শক্তিশালী হইবেন, কিরূপ করিয়া রোমরাজ্যে প্রতিভাশালী ব্যক্তি হইবেন, কিরূপ করিয়া সাধারণ লোককে নিজের অধীনে রাখিতে পারিবেন। রাজশক্তি অর্জ্জন করিবার জন্ম কিছুতেই তাঁহারা পশ্চাৎপদ হইতেন না। এই কয়টি কথা বুঝাইয়া দিবার জন্য তৎসময়ের প্রধান শক্তিশালী ব্যক্তির ও তৎসময়ের কয়েকটি ঘটনার বিষয় বর্ণনা করিব।

পাঠক-পাঠিকাগণ বাল্যকালাবধি শুনিয়া আসিতেছেন, "সিজারের স্ত্রী সন্দেহের বহির্ভূত।" এই প্রবাদটি কত দূর সত্য বা অতিরঞ্জিত বা কিরূপ অবস্থায় বলা হইয়াছিল, তাহাই লিপিবদ্ধ করিব। আর আপনারা নিজ নিজ বুদ্ধিমত্তার গুণে ইহাই বিশ্লেষণ করিয়া লইবেন।

রোমসূর্য্য যখন আকাশের মধ্যস্থলে উঠিয়াছিল, সেই সময়ে পম্পি, আলেকজান্দার, সিজার ইত্যাদি রাজনীতিবিশারদ ব্যক্তি রোমের প্রতিভাবান্ কর্ম্মচারী বলিয়া খ্যাত ছিলেন। সে সময়ে রোমে অনেকগুলি দল ছিল, তন্মধ্যে দুইটি প্রধান দল সর্ব্বাপেক্ষা বলশালী;—উচ্চবংশীয়দের দল ও সাধারণ লোক-দিগের দল। প্রত্যেক দলটির মধ্যে আবার অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল ছিল। সে সময়ে রোমীয় সাধারণতন্ত্র অতিশয় ভোগবিলাসী ছিল। যে ভোগবিলাসের দ্বারা তাহাদিগকে তুষ্ট করিতে পারিত, এই জনতন্ত্র দল সেই লোকের বেশী বাধ্য থাকিত। সে সময়ে এমন লোক ছিল না যে, সাধারণ গণতন্ত্রের কৃপা-ভিখারী হইত না। প্রত্যেক উচ্চপদাভিলাষী ব্যক্তি সাধারণ গণতন্ত্রকে নিজ পক্ষে আনিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। ইহাদের মত না হইলে কোন উচ্চ পদই তাঁহারা আয়ত্ত করিতে পারিতেন না।

এই সময়ে রাজনীতিবিশারদের প্রধান চেষ্টা, সাধারণ প্রজা-তন্ত্রের মনোরঞ্জন করা, যেমন করিয়াই হউক, তাহাদের খুসী করা, তাহা নাচ, তামাসা, খেলাধূলা, শোভাযাত্রা ও ভোজের দ্বারাই হউক বা উৎকোচের দ্বারা বা অন্য কোন উপায়ের দ্বারাই হউক। কোন এক উচ্চপদপ্রার্থী রোমান এইরূপ ভাবিয়া একটি কার্য্য করিবার মনস্থ করিয়াছেন, সাধারণ লোক আসিয়া চোখ রাঙাইয়া দাঁড়াইল এবং প্রকাশ্যে ও ভাবে বুঝাইয়া দিল যে, তাহারা সেটি

চাহে না। তখন সেই তথাকথিত জননায়ক ভালই হউক বা মন্দই হউক, যাহা সাধারণ লোক চাহে, তাহাই করিতে বাধ্য হইলেন। Pompey the Great, Alexander the Great, Caesar ইঁহাদের সকলেরই জীবন-চরিত ভাল করিয়া পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, সাধারণ লোককে খুসী রাখিবার জন্ম এমন কার্য্যই ছিল না, যাহা তাঁহারা করেন নাই। অবশ্য ইহা রোমবাসীদের জন্ম, অপর দেশের লোকরা তাহাদের কাছে অসভ্য ছিল, চাবুকের আঘাত ও তরোয়ালের খোঁচায় ঠিক থাকিত।

জুলিয়স সিজার সম্বন্ধে দুইটি মাত্র ঘটনা এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিব। তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, রোমান নাগরিকগণকে খুসী করিবার জন্ম তিনি তাঁহার নিজের বিবেককে পদদলিত করিতে একটুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। রোমক ও গ্রীক দুই জাতিতেই দেখা যায়, ভগবানের আশীর্ব্বাদ না লইয়া তাঁহারা কোন কার্য্য করিতেন না এবং ভগবানের আশীর্ব্বাদের উপযুক্ত হইবার জন্ম প্রভূতভাবে বলি প্রদান করিতেন এবং সেই বলির প্রসাদে সাধারণ লোককে ভূরিভোজন করাইতেন। অর্থের দ্বারা ধর্ম্ম অর্জ্জন করিতেন এবং সাধারণ লোককে দেব-সমীপে বলির প্রসাদ দিয়া তাহাদের প্রসাদ অর্জ্জন করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে আর একটি প্রথা ছিল, কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে দেবতাদের মতামত গ্রহণ করা। ঈশ্বরের প্রতি তাঁহাদের অগাধ বিশ্বাস ছিল, একেশ্বরবাদী না হইয়া তাঁহারা বহু দেবতার পূজা করিতেন। দেশ হইতে বাহিরে গিয়া (তাঁহাদের মতে) অসভ্য লোকদিগকে জয় করিয়া রোমে রাজ্যবিস্তার করিয়াছিলেন এবং সেই সকল দেশের লুণ্ঠিত সম্পত্তি দ্বারা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তৎকালীন জননায়করা Oracleএর সহিত পরামর্শ না করিয়া কোন কার্য্যই করিতেন না এবং কার্য্য আরম্ভের পূর্ব্বে দেবতাদিগকে পূজার দ্বারা সন্তুষ্ট না করিয়া কোন কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করিতেন না। প্রত্যেক যুদ্ধেই তাঁহারা দেবতাদিগের সাহায্য-ভিখারী ছিলেন। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল, দেবতারা সহায় না হইলে কোন কার্য্যেই কৃতকার্য্য হওয়া যায় না। জননায়করা দুই শক্তিকে সর্ব্বদা খুসী রাখিতে চেষ্টা করিতেন ;—দেবশক্তি ও সাধারণ জনশক্তি।

জুলিয়স সিজার রোমক দণ্ডনায়ক নিযুক্ত হয়েন। দণ্ডনায়ক [illegible] অন্ত বিষয়ে বিশেষ সুখী হইলেও সাংসারিক বিষয়ে [illegible] বিশেষ অসুখী ছিলেন। Publius Claudius নামক এক ব্যক্তি উচ্চ বংশের সন্তান। বংশ হিসাবে তিনি Patrician ছিলেন, প্রভূত ধনশালী, আর বিশিষ্ট বক্তা; কাজেই বংশমর্য্যাদা হিসাবে, ধনমর্য্যাদা হিসাবে, বক্তৃতাশক্তি হিসাবে তিনি এক জন শ্রেষ্ঠ লোক ছিলেন। কিন্তু অনেক সময়েই দেখা যায় এ তিনটি গুণ থাকিলেও মানুষ ধার্ম্মিক, হৃদয়বান্ ও ন্যায়বান্ হয় না, বরং অনেক সময়ে তাহার বিপরীতই হয়।

ক্লডিয়স্ অতিশয় ইন্দ্রিয়পরায়ণ লোক ছিলেন। আর সেই সময়ে লম্পটদিগের মধ্যে হঠকারিতায় তিনি সকলের অগ্রণী ছিলেন। সিজারের তিনটি বিবাহ হইয়াছিল। পম্পিয়া তাঁহার তৃতীয়া পত্নী। এই নরাধম ক্লডিয়স্ পম্পিয়ার বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন, আর পম্পিয়াও সে ভালবাসা প্রত্যাখ্যান করেন নাই। কিন্তু একটি প্রবাদ আছে, স্থান ও সময়ের সুযোগ না হইলে ইচ্ছা অনেক সময়ে কার্য্যে পরিণত করা যায় না। ক্লডিয়সের ইচ্ছা সেইরূপ স্থান ও সময়ের সুযোগ না পাইয়া কার্য্যকরী হয় নাই। সিজারের জননী Aurilia অতিশয় বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক ছিলেন। তিনি পম্পিয়ার ঘরগুলির উপর বিশেষরূপে পাহারা রাখিতেন। আর এরূপভাবে সর্ব্বসময়েই পুত্রবধূর প্রতি নজর রাখিতেন যে, পম্পিয়া ও ক্লডিয়সের সাক্ষাৎ হওয়া অতিশয় কষ্ট-সাধ্য ও বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অনেক সময়েই দেশ-কালপাত্রভেদের উপর ইচ্ছার সাফল্য নির্ভর করে।

ক্লডিয়সের ধন, যৌবন, বংশমর্য্যাদা সকলই ছিল। তাহার সহিত আবার অকুতোসাহস। কোন দুষ্কার্য্যেই সে পশ্চাৎপদ ছিল না। সর্ব্বসময়েই Auriliaর শ্যেন-চক্ষু তাহার আর পম্পিয়ার উপর থাকিলেও সে পম্পিয়ার সহিত গোপনে সাক্ষাতের আশা একবারেই পরিত্যাগ করে নাই। ইহার আরও বিশেষ কারণ, পম্পিয়া রূপজমোহে আকৃষ্ট হইয়া কোন সময় Claudiusএর সম্ভাষণ প্রত্যাখ্যান করে নাই।

রোমকদের মধ্যে অনেক দেবদেবী। Bonna তাহাদের মধ্যে একটি দেবী। এই Bonnaকে গ্রীকরা Gynaecia, Phrygius, বা তাহাকে Midas এর মাতা বলিয়া জানিতেন। গ্রীকরা বলিত যে, Bonna, Bacchusএর মাতা, তাহার নাম উচ্চারণ করা উচিত নহে। এই কারণে স্ত্রীলোকরা Bonnaর পূজা করিত, তাহারা Vineএর শাখা দিয়া তাহার ঝাঁবুটি ঢাকা দিত এবং ইহা আরও কথিত আছে যে, ঐ দেবীর পার্শ্বে একটি সাপ রাখা হইত। তবে এই পূজার একটু বিশেষত্ব ছিল; পুরুষ ও স্ত্রীলোকের অধিকার এক ছিল না। তাহার পূজায় স্ত্রীলোকদের অধিকার ছিল, কিন্তু পুরুষদের অধিকার ছিল না। এমন কি, পুরুষরা এই পূজার স্থানে যাইতে পারিত না এবং যে বাটীতে পূজা হইত, উহা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সে বাটীতে আসিতে পারিত না। আজকাল প্রায় শুনা যায়, যে অধিকার পুরুষের

আছে, সে অধিকার স্ত্রীলোকের থাকিবেই, যে অধিকার স্ত্রীলোকের আছে, সন্তান প্রসব ছাড়া, সে অধিকার পুরুষেরও থাকা প্রয়োজন। স্ত্রীলোকরা নিজেদের মধ্যে এই পূজাকার্য্য সম্পাদন করিতেন। Orphiusএর পূজাতে যে সব পূজাপদ্ধতি ব্যবহৃত হয়, সেই সমস্তই Bonnaর পূজার ব্যবহৃত হইত। এই উৎসব সুরু হইলে গৃহস্বামী, যিনি সেই বৎসরের Consul বা Praetor ছিলেন, তিনি নিজে এবং তাঁহার পুরুষ আত্মীয়-স্বজনকে লইয়া সেই গৃহ পরিত্যাগ করিতেন। সেই বাড়ীর গৃহকর্ত্রী সেই উৎসবের পূজা-পদ্ধতি নিজের হাতে লইতেন। এই উৎসবের প্রধান ক্রিয়াকলাপগুলি রাত্রিযোগে সাধিত হইত। স্ত্রীলোকরা নিজেদের মধ্যে রাত্রিজাগরণ করিত এবং উৎসবের ক্রিয়াকলাপগুলি যাহাতে নিখুঁতভাবে সাধিত হয়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিত। সমস্ত রাত্রিব্যাপী নানাপ্রকার গীতবাদ্য সকল স্ত্রীলোককে আনন্দে মত্ত রাখিত।

সিজারের তৃতীয়া পত্নী পম্পিয়া সেই রাত্রিতে Bonnaর উৎসবের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন। কৌশলী ক্লডিয়স্ এই রাত্রিতে পম্পিয়ার সহিত সাক্ষাতের মতলব করিল। কেবল স্ত্রীলোকেরা সেখানে থাকিবে, এই সুযোগে পম্পিয়ার সহিত স্ত্রীবেশে সাক্ষাৎ করিলে শ্যেনচক্ষু Auriliusও তাহাকে ধরিতে পারিবে না। ক্লডিয়সের তখন পর্য্যন্ত দাড়ি গজায় নাই। অতএব সে মনস্থ করিল যে, নর্ত্তকীর পোষাক ও অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া সেই স্থানে যাইলে কেহই তাহাকে ধরিতে পারিবে না। এইরূপ মতলব করিয়া একটি যুবতীর পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া স্ত্রীলোকের ভানে সেই স্থানে উপস্থিত হইল। তখন নাচ-গান ও উৎসব চলিতেছে, দরজাগুলি সবই খোলা, যে স্ত্রীলোকটি সেই রাত্রির জন্য দ্বাররক্ষক, পূর্ব্ব হইতেই ক্লডিয়স্ তাহাকে হাত করিয়াছিল এবং সেও এই ষড়যন্ত্রের বিষয় জানিত। সে তাড়াতাড়ি দৌড়িয়া পম্পিয়াকে বলিতে গেল, তাহার নাগর আসিয়াছে। কিন্তু সেই স্ত্রীলোকটি প্রত্যাবর্ত্তনে দেরী করিয়াছিল অথবা ক্লডিয়স্ মনে করিতেছিল যে, সে দেরী করিতেছে। এ অবস্থায় নাগরের পক্ষে এক পল এক বৎসর বলিয়া বোধ হয়। ক্রমে নটবর পম্পিয়ার জন্য অপেক্ষা করিতে করিতে অধীর হইয়া পড়িল। ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া সে সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া এক স্থান হইতে অপর স্থানে ঘুরিতে লাগিল। তখনও পর্য্যন্ত যাহাতে আলোর সম্মুখে না পড়ে, সে বিষয়ে ক্লডিয়স্ বিশেষরূপে লক্ষ্য রাখিয়াছিল। কিন্তু অনেক সময়েই আমাদের ব্যস্ততাই আমাদিগকে বিপদের মধ্যে টানিয়া লইয়া যায়। এক কক্ষ হইতে অপর কক্ষে যাইবার সময় Auriliaর পরিচারিকা তাহাকে দেখিতে পাইল, তাহাকে স্ত্রীলোক মনে করিয়া তাহার সহিত খেলিবার জন্য অনুরোধ করিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এ উৎসবে স্ত্রীলোকরা আপনাদের মধ্যে আমোদ-আহ্লাদ করে কিন্তু ক্লডিয়সের সমস্ত চিন্তাই পম্পিয়াতে কেন্দ্রীভূত। কাযে এই স্ত্রীলোকের কথায় সে অস্বীকার করিল। কথায় বলে "নিজ কোটে পাই ত চিঁড়ে কুটে খাই।" কাযেই এই পরিচারিকা ছাড়িবার পাত্র নহে, সে অমনই তাহাকে টানিয়া লইল, সে কে এবং কোথা হইতে আসিতেছে, সেই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিল পাপী অনেক সময়েই তাহার পাপচিন্তায় নিজেই ধরা দেয় ক্লডিয়স্ পরিচারিকাকে বলিল, সে পম্পিয়ার পরিচারিকা Ebra জন্য অপেক্ষা করিতেছে। Ebra একটি গ্রীক শব্দ, যাহার মানে "প্রিয় পরিচারিকা", আর এই স্থলে পম্পিয়ার পরিচারিকার নামও Ebra। যেমন এই কথা বলা, স্ত্রীলোকের পোষাক সত্ত্বেও তাহার কণ্ঠস্বরেই সে ধরা পড়িয়া গেল। এই কথা শুনিয়াই Auriliaর পরিচারিকা যেখানে আলোর তলায় অনেক স্ত্রীলোক ছিল, সেইখানে দৌড়িয়া গেল এবং চীৎকার করিয়া বলিল, "ভগিনীগণ, আমাদের মধ্যে আমি এক জন পুরুষমানুষকে চিনিতে পারিয়াছি।" সকল স্ত্রীলোকই অতিশয় ভীত হইল। Aurilia সমস্ত পবিত্র জিনিষকে ঢাকিয়া ফেলিলেন, আর তাঁহাদের উৎসব বন্ধ করিয়া দিলেন। তিনি দরজাগুলি বন্ধ করিয়া দিতে হুকুম দিলেন এবং আলো লইয়া ক্লডিয়সকে খুঁজিতে লাগিলেন। পরিচারিকার যে ঘরের ভিতর দিয়া সে আসিয়াছিল, সেই ঘরের মধ্যেই সে ধৃত হইল। স্ত্রীলোকরা অনেকেই তাহাকে চিনিত এবং তাহাকে বাটীর দরজার বাহির করিয়া দিল, সেই রাত্রিতেই তাহারা নিজ নিজ স্বামীকে রাত্রির ঘটনার কথা বিদিত করিল। পরদিন প্রভাতে সেই ঘটনাটি সকলের নিকটেই প্রচারিত হইয়াছিল। ক্লডিয়স কিরূপ অবৈধ, নীচ, অন্যায় কার্য্য করিতে চেষ্টা করিয়াছিল এবং কিরূপভাবে তাহার সাজা হওয়া উচিত, সকলেই এই কথা লইয়া ব্যস্ত। সে যে শুধু স্ত্রীলোকদিগকে অপমানিত করিয়াছে, তাহা নহে, সাধারণ জনশক্তিকে ও দেবতাকে অপমান করিয়াছে! এই সমস্ত উত্তেজনার ফলে এক জন Tribune (উচ্চ রাজকর্ম্মচারী) ধর্ম্মবিষয়ে অন্যায় ব্যবহারের জন্য তাহার নালিস রুজু করিল, আর অনেকগুলি প্রধান প্রধান Senator একমত হইয়া তাহার বিপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিল। তাহাদের সাক্ষ্যে প্রমাণ হইল যে, সে অনেক লোমহর্ষণ পাপাচরণ করিয়াছে, এমন কি, তাহার এক সহোদরা Luculusএর সহিত যাহার বিবাহ হইয়াছিল, তাহার সহিতও সে কুকার্য্য করিতে পশ্চাৎপদ হয় নাই। উচ্চবংশীয় রোমীয়রা, যাহাদের স্ত্রীলোকের

প্রতি ক্লডিয়স অনেক প্রকার পাপাচরণ করিয়াছিল বা পাপাচরণের চেষ্টা করিয়াছিল, তাহারা সম্মিলিত হইল। কিন্তু সাধারণ জনশক্তি ক্লডিয়সের পক্ষে দাঁড়াইয়া গেল। কারণ, ক্লডিয়স থিয়েটার, নাচ, ভোজ, দেবার্চ্চনার দ্বারা তাহাদের মনোরঞ্জন করিয়াছিল। বিচারকদল যখন দেখিল, সাধারণ জনশক্তি তাহার পক্ষাবলম্বন করিতেছে, তখন তাহারা ভীত হইল। লোকদিগকে উপেক্ষা করিবার সাহস তাহাদের হইল না। জজরা ভীত হইল, এই লোকারণ্যকে উত্তেজিত করিবার সাহস পাইল না। পম্পিয়া সাক্ষ্য দিবার জন্য সেই আদালতে উপস্থিত থাকিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। সিজার জনসঙ্ঘের এই মনোভাব দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ক্লডিয়সের বিপক্ষে তাঁহার কোন নালিশ নাই।" ইহা স্ববিরোধী উক্তি বলিয়া অনুভূত হওয়ায়, যে ব্যক্তি নালিশ রুজু করিয়াছিল, সে সিজারকে জিজ্ঞাসা করিল, কেন তিনি তাঁহার স্ত্রীকে বাটীতে ফিরাইয়া দিয়াছেন? শুনিয়া সিজার বলিয়া উঠিলেন, "I wish my wife not so much as suspected." সিজারএর গৃহলক্ষ্মী সন্দেহের বহির্ভূত।

অনেকেই বুঝিতে পারিল, সাধারণ জনশক্তিকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য সিজার এই কথা বলিয়াছেন। তিনি স্পষ্টই বুঝিয়াছিলেন, জনশক্তি ক্লডিয়সকে বাঁচাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত। ক্লডিয়স মুক্তি পাইল।

জনশক্তি সে সময়ে এরূপ প্রভূত বলশালী ছিল যে, বিচারকরা এরূপ ভাবে হিজি-বিজি কাটিয়া তাহাদের মত প্রকাশ করিয়াছিল যে, তাহারা কি লিখিয়াছে, তাহা পড়া বা বুঝা না যায়। যদি তাহারা ক্লডিয়সকে দোষী সাব্যস্ত করে, তাহা হইলে জনশক্তি চটিয়া তাহাদের বিরুদ্ধ হইবে, আর যদি ক্লডিয়সকে ছাড়িয়া দেয়, তাহা হইলে অভিজাত সম্প্রদায়কে অপমান করা হইবে।

পম্পির উপর দৃঢ়তর আধিপত্য রাখিবার জন্য সিজার তাহার কন্যা জুলিয়সের সহিত পম্পির বিবাহ দিবার ব্যবস্থা করিলেন। এই জুলিয়সের সহিত Servilius Caepioর বিবাহ স্থির হইয়াছিল; কথাবার্ত্তাও সমস্তই ঠিক। সিজার Caepioকে বলিলেন যে, তাহাকে Pompeyর কন্যার সহিত বিবাহ দেওয়া হইবে, কিন্তু পম্পির কন্যা পূর্ব্ব হইতেই বাগ্দত্তা ছিলেন। Sullaর পুত্র Fantusএর সহিত Pompeyর কন্যার বিবাহের ঠিক হইয়া গিয়াছিল। নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই বিবাহগুলি স্থিরীকৃত হইয়াছিল। সিজার নিজেও কিছু দিন পরে Pisoর কন্যা Calpurniaকে বিবাহ করিলেন আর তাহার পর-বৎসরের জন্য Pisoকে Consul করিয়া দিলেন।

এই সব দেখিয়া কেটো ইহার বিরুদ্ধে বিশেষ কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করেন এবং খুব জোরের সহিত বলিতে লাগিলেন, এই সব বিবাহ দ্বারা রাজত্ব পরিচালন করা অতিশয় হেয় ও অন্যায়। তিনি উচ্চৈঃস্বরে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, এই সকল বিবাহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়া শাসনব্যাপারে এইরূপ ব্যভিচারের সৃষ্টি নিতান্ত অসহ্য হইয়া পড়িয়াছে, তাহারা স্ত্রীলোকের সহায়তায় পরস্পরের মতলব হাঁসিলের সুবিধা করিয়া লইতেছে। স্ত্রীলোকদিগের সাহায্যেই সেনা পরিচালন, দেশ শাসন এবং অপরাপর রাজকার্য্যের আয়ত্তসাধন করিয়া লইবে।

এই সময়ে রোমে যে কোন লোক ক্ষমতার প্রার্থী থাকিতেন, তাঁহাকে সর্ব্বরকমে রোমক নাগরিকগণকে সন্তুষ্ট রাখিতে হইত। তাহাদিগকে সন্তুষ্ট না রাখিলে কোন কার্য্যেই কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা থাকিত না। রোমে বয়স্থা স্ত্রীলোকদিগের চিতায় সুখ্যাতি করিয়া বক্তৃতা করিবার নিয়ম ছিল। কিন্তু যুবতী স্ত্রীলোকের মৃত্যু হইলে এরূপ নিয়ম প্রবর্ত্তিত ছিল না। কিন্তু সিজার তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যুতে এইরূপ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এইরূপভাবে স্ত্রীর প্রতি স্নেহ ও ভালবাসা দেখাইয়া তিনি সাধারণ লোকের অন্তঃকরণ আকৃষ্ট করিতে পারিয়াছিলেন। জনসাধারণ সকলেই দেখিল যে, তাঁহার অন্তঃকরণ অতি দয়ার্দ্র এবং কোমল। তাঁহার স্ত্রীর সৎকারের পর তিনি Vetas বলিয়া এক জন Praetorএর অধীনে Quaestorরূপে স্পেনে গিয়াছিলেন। এই Vetasকে তিনি তাঁহার জীবনে বিশেষ মান্য করিতেন এবং যখন তিনি নিজে Praetor হইয়াছিলেন, তখন Vetasএর পুত্রকে নিজের Quaestor করিয়াছিলেন। স্পেন রাজ্যে Quaestorএর পদ শেষ হইলে পর, তিনি পম্পিয়াকে বিবাহ করেন। Cornelia তাঁহার প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত কন্যা। তাহাকে Pompey the Great এর সহিত বিবাহ দেন। অর্থব্যয়ে তিনি এতদূর মুক্তহস্ত ছিলেন যে, সরকারী কোন কার্য্য পাইবার পূর্ব্বেই তাঁহার ১৩০০ Talent দেনা হইয়াছিল। এই অর্থব্যয়ে তিনি লোকসাধারণকে তাঁহার দিকে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন, সামান্য স্বল্পস্থায়ী আয়ের উপর নির্ভর না করিয়া সাধারণ লোকদিগের ভালবাসা আকৃষ্ট করিবার জন্য সামান্য খরচে নিজের জন্য অনেক সুবিধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। Appian Way Surveyor নিযুক্ত হইবার পর, তিনি শুধু রাজকোষের অর্থব্যয় করিয়া সন্তুষ্ট না হইয়া, তাঁহার নিজ তহবিল হইতে অনেক অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। আর যখন তিনি Aedile নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তিনি অনেকগুলি Gladiator (যোদ্ধা)

রাখিয়াছিলেন। এই Gladiatorরা পরস্পর যুদ্ধ করিয়া এক জন অপর জনকে হত্যা করিত এবং ব্যাঘ্র, সিংহ প্রভৃতি বন্য পশুর সহিত যুদ্ধ করিয়া, হয় তাহাদের নিজ প্রাণ হারাইত, না হয় পশুদিগকে হত্যা করিত।

রোমক নাগরিকগণ এই সব লড়াই দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইত। লোকদিগকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য ৩ শত ২০টি Gladiator রাখিয়া লড়াই দেখাইয়াছিলেন। আর থিয়েটার, শোভাযাত্রা আর সাধারণকে ভোজ দিয়াও বহু অর্থ ব্যয় করিয়া লোকদিগকে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে উচ্চ রাজপদ-প্রার্থীরা যত কিছু খরচ করিয়া লোকদিগকে তাহাদের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল, তিনি তাহাদের সকলের অপেক্ষা অধিক করিয়া সাধারণ লোকের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন। ফলে, লোক তাঁহার প্রতি এত আকৃষ্ট হইয়াছিল যে, প্রত্যেকেই চেষ্টা করিত, তাঁহার জন্য নূতন কি রাজপদ দেওয়া যাইতে পারে, কিরূপে তাঁহার প্রতি নূতন নূতন মান্য দেখান যায়। প্রচুর অর্থব্যয়ে তিনি জনশক্তিকে এতদূর আকৃষ্ট করিয়াছিলেন যে, প্রত্যেকেই তাঁহার জন্য কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য সকল কার্য্য করিতেই রাজি। কিসে তাঁহার অধিক অর্থাগম হয়, তাহার জন্য সকলেই ব্যস্ত ছিলেন। দুই পাঁচ জন লোক Senate এ তাঁহার বিপক্ষে বক্তৃতা করিতে প্রস্তুত এবং বক্তৃতা করিতেনও। এক দিন Catulus Lutatus সেই সময় রোমানদের মধ্যে এক জন প্রধান লোক—তিনি Senateএ দাঁড়াইয়া সিজারের বিপক্ষে বক্তৃতা করিলেন। সিজারকে বিশেষরূপে আক্রমণ করিলেন। তিনি এই বলিয়া তাঁহার বক্তৃতা শেষ করিলেন, সিজার কেবল যে খনি খুঁড়িতেছিলেন, তাহা নয়, তিনি রোমরাজ্য ধ্বংস করিবার জন্য Battery প্রোথিত করিতেছিলেন।

কেটো এক জন মনীষী ও বক্তা। তিনি সত্য বলিতে পশ্চাৎপদ ছিলেন না। মনের আবেগে প্রাণ খুলিয়া সকল কথাই বলিতেন! তাঁহার বক্তৃতার কি ফল হইবে, কখনই ভাবিতেন না। যদিও তিনি সাধারণ জনশক্তিকে ভোজ দিয়া নিজের দলে আকৃষ্ট করেন নাই, তথাপি সত্যনিষ্ঠা ও ধর্ম্মনিষ্ঠার গুণে সকলেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট থাকিত। উচ্চ রাজপদ কিম্বা প্রভূত অর্থ ঘুষ দিয়া কেহ তাঁহাকে তাহাদের নিজ নিজ দলে টানিতে পারে নাই। যাহা তিনি ভাল বিবেচনা করিতেন, তাহার জন্য প্রাণপাত করিয়া কার্য্য করিতেন। যখন সিজার খুব প্রতাপশালী, কেটো দেখিলেন, গরীব রোমক নাগরিকরা সকলেই সিজারের উপর তাহাদের আশা-ভরসা স্থাপন করিয়াছে। কেটো জানিতেন যে, লোক ক্ষেপাইতে হইলে গরীব নাগরিকরাই প্রথম অশান্তির অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রদান করে। সিজারের হস্ত হইতে রাজত্ব রক্ষা করিতে হইলে লোকদিগকে সিজারের আন্তরিক অভিসন্ধি কি, তাহা বুঝাইয়া দিতে হইবে, সেই কারণে Senateকে বুঝাইয়া সুঝাইয়া রাজি করিলেন যে, মাসে মাসে প্রত্যেক নাগরিককে কতক পরিমাণে শস্য দান করিতে হইবে। এই প্রদানের দ্বারা রোম-রাজত্বকে প্রত্যেক বৎসরে সাত মিলিয়ান পাঁচ শত হাজার Drachmas খরচ করিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলে সে অবস্থায় তৎসাময়িক বিপদ হইতে রাজত্বকে রক্ষা করা হইল এবং সিজারের ক্ষমতাকেও খর্ব্ব করা হইল।

আর এক সময়ে সিজারের সহকর্ম্মী বিবুউলস্ যখন দেখিলেন যে, তাঁহার আইনের বিরুদ্ধবাদী হওয়ায় কোন ফল নাই, বরং তাঁহার এবং কেটোর দুই জনেরই জনসাধারণের মিলনস্থানে হত হইবার আশঙ্কা ও সম্ভাবনা আছে, তখন তিনি আপনাকে বাটীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া তাঁহার Consulshipএর শেষ সময়টুকু অতিবাহিত করিলেন। পম্পি বিবাহের পরেই সাধারণ রাজকার্য্য ও বিচারস্থান সৈন্যসামন্তে ছাইয়া ফেলিল এবং জনসাধারণের নূতন আইনের প্রচলনে সহায় হইল। সিজার আল্পসের দুই দিকে ইলিক্রিয়মের সহিত গলের সমস্ত রাজ্য এবং চারিটি সৈন্যদলের প্রভুত্ব পাঁচ বৎসরের জন্য আয়ত্তাধীন করিয়া দিল। কেটো এই সব কার্য্যে বাধা দিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সিজার তাঁহাকে পথিমধ্যেই গ্রেপ্তার করেন এবং গ্রেপ্তার করিয়াই কারাগারে পাঠাইয়া দেন। সিজার মনে করিয়াছিলেন যে, কেটো (Tribune) সাধারণের নির্ব্বাচিত জনমণ্ডলীতে আপীল করিবে। কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন যে, কেটো কোন কথা না বলিয়া নীরবেই চলিয়া গেলেন এবং সম্ভ্রান্ত জনমণ্ডলী ক্ষুব্ধ হইলেন এবং জনসাধারণও কেটোর ধর্ম্মনিষ্ঠায় অভিভূত হইয়া মাথা নত করিয়া নিঃশব্দে শ্রদ্ধাভরে ও অবসন্নমনে তাহার অনুগামী হইল, তখন সিজার নিজেই, এক জন Tribuneকে কেটোর উদ্ধারসাধনের জন্য গোপনে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অন্যান্য Senatorদের মধ্যে কেহ কেহ পৌরপরিষদে যোগদান করিলেন,অবশিষ্ট কয়েক জন বিরক্ত হইয়া Senate এ অনুপস্থিত রহিলেন ; Caesidius বলিয়া এক বৃদ্ধ সুবিধামত এক দিন সিজারকে বলিলেন যে, পৌরপরিষদগণ উপস্থিত না হওয়ার কারণ যে, তাহারা সৈন্যগণের জন্য বিশেষ ভীত। এই শুনিয়া সিজার বলিলেন, "বেশ, যদি সৈন্যগণই সভ্যগণের অনুপস্থিতির কারণ, তখন আপনিই বা সেই ভয়ে ঘরের ভিতর না থাকিয়া বাহিরে আসেন কেন ?" Caesidius সিজারের এই কথার উত্তরে বলিলেন যে, তাঁহার পরিণত বয়সই

নীতির বিপক্ষে তাঁহার প্রহরিস্বরূপ কার্য্য করিতেছে, তিনি আর কদিনই বা বাঁচিবেন, এই জন্য তাঁহার অবশিষ্ট জীবনে বিশেষ সাবধান হইবার কিছু কারণ নাই। যে Claudius এক দিন তাঁহার সহধর্ম্মিণীর সতীত্বকে কলুষিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল এবং চুপে চুপে নিঃশব্দে গুপ্ত নৈশ উপাসকদিগের নিকট অনাহূত-ভাবে অনধিকারপ্রবেশ করিয়াছিল, তাহারই Tribuneship প্রাপ্তির সহায়তা করা Caesarএর Consulshipএর সময়ে সর্ব্বাপেক্ষা হেয় কর্ম্ম। Ciceroর অবনতিসাধন করিবার উদ্দেশ্যে Claudiusকে এই কার্য্যে মনোনীত করা হইয়াছিল। যত দিন না তিনি Ciceroকে পরাভূত করিয়াছিলেন, তত দিন পর্য্যন্ত তিনি রোমনগরী ত্যাগ করিয়া নিজের সৈন্যমণ্ডলীর মধ্যে গমন করেন নাই।

সিজার তাঁহার Praetorship শেষ হইলে পর Province of Spainএ অধিকার পাইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার উত্তমর্ণরা তাঁহাকে অতিশয় ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিল, যখন তিনি Spainএ যাইবার জন্য প্রস্তুত, তাহারা জোর তাগাদা করিতে লাগিল এবং অতিশয় নাছোড়বান্দা হইয়া পড়িল। সেই সময় রোমে Craesus নামে এক জন ধনী লোক ছিলেন। তিনি রোমের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিত্তশালী। Pompeyর বিরুদ্ধে কার্য্য করিবার জন্য Caesarএর ন্যায় এক জন যুবককে দলে লইবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন। Creasus তাঁহার উত্তমর্ণদিগকে টাকা দিয়া সন্তুষ্ট করিলেন, সর্ব্বশুদ্ধ তাঁহাকে আট শত তিরিশ Talent দিতে হইল। এই দেনা পরিশোধ করিলেই তাঁহার Spain Provinceএ যাইবার কোন বাধা রহিল না।

পথিমধ্যে যখন তিনি আল্পস্ পার হইতেছিলেন এবং অসভ্য-দিগের একটি ক্ষুদ্র গ্রামের পাশ দিয়া চলিতে চলিতে দেখিতে পাইলেন যে, কয়জন মাত্র লোক সেই গ্রামে বাস করে, আর সকলেই অতি দরিদ্র। বিদ্রূপচ্ছলে তাঁহার সহগামীরা নিজেদের মধ্যে এই কথা বলাবলি করিতে লাগিল, এই ক্ষুদ্র গ্রামেও কি রাজকার্য্যে উচ্চপদের জন্য লোক ঘুরিয়া বেড়ায়? এখানেও কি প্রতিষ্ঠিত লোকরাও পরস্পরের মধ্যে কলহ করিয়া মরে? এই কথা শুনিয়া সিজার গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আমি এই সব অসভ্য-দিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হইতে পারিলে, সুসভ্য রোমেও দ্বিতীয় লোক হইতে চাহি না।"

এক দিন স্পেনে Caesar কোন কার্য্যে বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন না, মনঃসংযোগ করিয়া Alexanderএর ইতিহাস পড়িতে-ছিলেন। কিয়ৎক্ষণ পাঠের পর, তিনি বিশেষ ভাবান্বিত ও হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিলেন। তাঁহার বন্ধুরা আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এরূপ কাঁদিবার কারণ কি? ইহা শুনিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "তোমরা কি মনে কর, আমার কাঁদিবার বিশেষ কারণ নাই? Alexander আমার বয়সে কত জাতিকে জয় করিয়াছিলেন, আর আমি, ভবিষ্যতে লোকের স্মরণ থাকিবে, এমন কোন কার্য্যই করি নাই।"

Gantএ অনেকগুলি যুদ্ধ জয় করিবার পর রোমে তাঁহার সুনাম ও ক্ষমতা বিশেষরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। যে কেহ উচ্চ-পদপ্রার্থী ছিল, সকলেই তাঁহার সাহায্যভিক্ষা করিত, তিনি আপনার নিকট হইতে পদপ্রার্থিগণকে টাকা দিয়া সাধারণ লোকদিগকে দূষিত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অর্থেই জনশক্তির ভোট ক্রয় করা হইয়াছিল। যখন পদপ্রার্থীরা তাঁহার সাহায্যে ও অর্থে নির্ব্বাচিত হইত, তাহারাও Caesarএর উন্নতির জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহাই করিত। তাঁহার হস্তে এতদূর ক্ষমতা হইয়াছিল যে, রোমের বিশিষ্ট ক্ষমতাশালী লোক Lucca তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল। Pompey, Craessus, Aepius, Sardiniaর Nepusএর শাসন-কর্ত্তা, Spainএর Pro-Consul সকলেই তাঁহার দ্বারস্থ হইত। তাঁহার বাটীতে এক সময়ে বহুসংখ্যক Senator ও Lictors একত্র হইয়াছিল। একটি মন্ত্রণা-সভায় ইহাই স্থির করা হইয়াছিল যে, Pompey ও Craesus পর-বৎসরেও Consul নিযুক্ত হইবে, Caesarকে আরও অধিক টাকা দেওয়া হইবে, আরও ৫ বৎসরের জন্য তিনি সেনানায়ক থাকিবেন। যে সকল লোককে তিনি টাকা দিয়া বশ করিয়া-ছিলেন, তাহারাই Caesarকে আরও অধিক টাকা দিবার জন্য Senateকে অনুরোধ করিলেন, সমস্ত চিন্তাশীল মনীষী এইরূপ অর্থদান অমিতব্যয় বলিয়া মনে করিলেন। Senate যে এইরূপ টাকা দিল, তাহা লোকের অনুরোধে নহে, Caesarএর হাতের বাধ্য থাকিয়া, দুঃখে ও মর্ম্মবেদনায় প্রপীড়িত হইয়া এই স্বত্বের সপক্ষে মত দিল।

কেটো সে সভায় উপস্থিত ছিলেন না। কারণ, সিজারএর দল সময়মত তাঁহাকে রোম হইতে সাইপ্রসে পাঠাইয়া দিয়াছিল। Favorius, Catoর প্রাণপণে অনুকরণ করিত। যখন সে দেখিল যে, এই প্রস্তাবের বিপক্ষে দাঁড়াইয়া সে কিছুই করিতে পারিবে না, সে ঐ স্থান পরিত্যাগ করিল এবং বাহিরে আসিয়া লোকসমূহকে বলিতে লাগিল, Senateএ কি অন্যায় কার্য্য হইতেছে; কিন্তু কে তাহার কথা শোনে? সকলেই Consulকে খুসী করিবার জন্য ব্যস্ত। কারণ, Caesar খুসী হইলে তাহাদের নিজ নিজ আশা ফলবতী হইবে।

Gallic যুদ্ধগুলি তাঁহার ক্রীড়াভূমি করিয়া তিনি নিজের এবং সৈন্যদিগের ক্ষমতার উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। প্রধান প্রধান যুদ্ধে জয়ী হইয়া তিনি তাহার গরিমার আরও উন্নত হইয়াছিলেন। মোটের উপর তিনি এখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, Pompeyর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার তাঁহার এখন ক্ষমতা হইয়াছে। রোমের অরাজকতা, উচ্চরাজকীয় পদপ্রার্থীদের প্রকাশ্যভাবে রোমক নাগরিকদিগকে উৎকোচ প্রদানে নিপুণতা, যে সব লোকদিগের উচ্চরাজপদ পাইবার জন্য সাহায্য করিবার ক্ষমতা আছে, তাহাদের ঈপ্সিত কর্ম্মে নির্লজ্জভাবে প্রকাশ্যে অর্থদান আর Pompey নিজে, অপর সকলে আর এই অরাজক সময়ে Caesar যে সব সুবিধা পাইয়াছিলেন, তাহার প্রত্যেকটিরই তিনি সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। নাগরিকরা উৎকোচস্বরূপ অর্থ পাইয়া তাহাদের উপকারার্থে শুধু ভোট দিয়া ক্ষান্ত হয় নাই, তীর ও তরোয়ালের আঘাতও দিয়াছিল। উচ্চ রাজকর্ম্মচারীদের নির্ব্বাচনস্থানে অনেক লোক খুন হইত এবং সাধারণ নির্ব্বাচনস্থান রক্তে প্লাবিত হইয়া যাইত, ফলে রোম নগরে কোনরূপ রাজতন্ত্র ছিল না। রোমরাজতরী হালবিহীন ও কাণ্ডারীবিহীন অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। সকলেই বুঝিতে পারিতেছিল, এরূপ সাধারণতন্ত্র অপেক্ষা একেশ্বর রাজার রাজত্ব অনেক ভাল।

সিজার সুবিধামত তাঁহার অধীনের লোকদিগকে নির্ব্বাচনস্থানে পাঠাইয়া দিতেন। Senateএ কি হইতেছে, কি না হইতেছে, তাহারও তত্ত্ব লইতেন। Forumএ সদা-সর্ব্বদাই তাঁহার লোক থাকিত। যখন তিনি রোমের বাহিরে থাকিতেন, তাঁহার অধীনস্থ লোকরা রোমে থাকিয়া তত্ত্ব লইতেন। এক দিবস তাঁহার এক জন সেনানায়ক রোমের Senate Houseএর সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি শুনিলেন যে, Senate সিজারকে অধিক দিন রাজকর্ম্ম চালাইবার সময় দিবেন না। ইহা শুনিয়া তিনি তাঁহার কটিবিলম্বিত তরবারির অগ্রভাগ চাপড়াইয়া বলিয়া উঠিলেন, "কিন্তু এইটি তাঁহাকে সময় দিবে (খড়্গ)।"

সিজার মুখে যাহা বলিতেন, কার্য্যে তাহা করিতেন না এবং করিবার মনন করিতেন না; কিন্তু প্রায় বলিতেন, মিষ্ট কথা বলায় কোন ক্ষতি নাই, মিষ্ট কথাতে তাঁহার কোন কার্য্যেরই ব্যাঘাত হইবে না। এক সময় Caesar যখন সাধারণ অর্থকোষ হইতে টাকা লইবার মনন করিয়াছিলেন, তৎকালীন Tribune Metellus তাঁহার কার্য্যে বাধা দিবার ইচ্ছায় কতকগুলি আইন তাঁহার সম্মুখে ধরিলেন। Caesar বলিয়া উঠিলেন, "আইন আর অস্ত্র, দুইটিরই পৃথক্ পৃথক্ সময় আছে, আমি যাহা করিতেছি, তাহা যদি তোমার ভাল না লাগে, তুমি এই স্থান পরিত্যাগ করিতে পার, যুদ্ধের সময় স্পষ্ট কথার সময় নয়। যখন আমি আমার অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিব, শান্তি সংস্থাপিত হইবে, তখন ফিরিয়া আসিব এবং যেরূপ ইচ্ছা, সেইরূপ বক্তৃতা করিব।" তিনি আরও বলিলেন, "আমার সম্পূর্ণ ক্ষমতা সত্ত্বেও আমি বলিতেছি, তুমি, তোমরা এবং অপরাপর সকলে, যাহারা আমার বিপক্ষে দাঁড়াইয়াছিলে এবং এখনও যাহারা আমার বিপক্ষে আছ, এক্ষণে সকলেই আমার ক্ষমতার অধীনে, এখন আমি যেমন ইচ্ছা তোমাদের ব্যবহার করিতে পারি।" Metellusকে এই সব কথা বলিয়া তিনি রাজকোষ-ভাণ্ডারে গমন করিলেন এবং যখন ভাণ্ডারের চাবি পাইলেন না, দরজা ভাঙ্গাইবার জন্য কামারকে ডাকাইলেন। Metellus পুনরায় বাধা দিবার চেষ্টা করিলেন, অপর কয় জনও Metellusকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া ও শুনিয়া Caesar আরও উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "সে যদি তাহাকে আরও বাধা দেয়, তিনি তাহাকে বধ করিবেন।" Metellusকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "যুবক, তুমি বেশ জেনো, এইরূপ বিষয় বলিতে যত কষ্ট, কার্য্যে পরিণত করিতে তত কষ্ট নয়।" এই সব শুনিয়া Metellus ভয়ে সরিয়া পড়িল। ভবিষ্যতে Caesar Metellusকে যাহা কিছু হুকুম দিতেন, Meetllus বিনা বাক্যব্যয়ে তাহাই করিত।

এই সব ঘটনা যখন ঘটিয়াছিল, তখন হইতে আজ ৩ হাজার বৎসরের অধিককাল চলিয়া গিয়াছে।

উচ্চপদাভিলাষীদের উচ্চপদ পাইবার পন্থা কি ফিরিয়াছে ?

শ্রীতারকনাথ সাধু (রায় বাহাদুর)।

স্বভাবতঃ আনন্দরূপিণী এই ভাগবতী রতি রাগদ্বেষরহিত নির্ম্মল চিত্তবৃত্তিতে প্রতিফলিত হয় এবং সেই চিত্তবৃত্তিতে প্রতপ্ত লৌহপিণ্ডে প্রবিষ্ট অগ্নির ন্যায় ইহা অভিন্নভাবে প্রতীত হইয়া থাকে, ইহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই স্বয়ংপ্রকাশ রতিতাদাত্ম্যাপন্ন-ভক্তজনমনোবৃত্তিই ভক্তি শব্দের মুখ্য অর্থ। এই ভক্তিই রস বা পারমার্থিক রস বলিয়া ভক্তিশাস্ত্রে অভিহিত হয়, ইহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

এই রতিই হইল পরমার্থ-রসের স্থায়ী ভাব, লৌকিক রতিরূপ স্থায়ী ভাব—যেমন আলম্বন, উদ্দীপন ও অনুভাবের বৈচিত্র্য বশতঃ বিচিত্রভাবে অভিব্যক্ত হইয়া সঞ্চারী ভাবনিচয়ের বিচিত্র সমাবেশে বিভিন্ন প্রকারে আস্বাদিত হয় এবং নানাবিধ রসরূপে পরিণত হয়, পরমার্থ-রসও সেইরূপ আলম্বন, উদ্দীপন, অনুভাব ও সঞ্চারী ভাবনিচয়ের বৈচিত্র্য বশতঃ নানাপ্রকারে আস্বাদিত হয় এবং নানাপ্রকার রস বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। ভক্তিশাস্ত্রের আচার্য্যগণ প্রধানভাবে এই পারমার্থিক রসকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন। যথা—শান্ত দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। এই ভাবে পঞ্চধা বিভক্ত পারমার্থিক রসের স্বরূপ এইক্ষণে যথাক্রমে আলোচিত হইতেছে।

শান্ত ভক্তিই ইহাদের মধ্যে প্রথম।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শ্রীরূপগোস্বামিপাদ শান্তভক্তিরসের এই ভাবে নিরূপণ করিয়াছেন, যথা—

"বক্ষ্যমাণৈর্বিভাবাদ্যৈঃ শমিনাং স্বাদ্যতাং গতঃ।
স্থায়ী শান্তিরতির্ধীরৈঃ শান্তভক্তিরসঃ স্মৃতঃ॥"

ইহার বিভাব প্রভৃতি কি প্রকার, তাহা অগ্রে বলা যাইতেছে। শমনিরত ধীর ব্যক্তিগণ ঐ সকল বিভাবাদি দ্বারা শান্তি নামে প্রসিদ্ধ ভাগবতী রতিকে যখন আস্বাদন করেন, তখন সেই শান্তিরতিরূপ স্থায়ী ভাবই শান্তভক্তি-রস বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

সংসারে যাঁহাদের তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হইয়া থাকে, তাঁহারাই শমী বা শান্তিনিরত। মায়িক—পরিণামবিরস ও অচিরস্থায়ী শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধাদি ভোগ্য বস্তুনিচয় যাঁহাদিগের হৃদয়রঞ্জন করিতে সমর্থ হয় না। তাঁহারা দুঃখময় সংসার হইতে ঐকান্তিকভাবে নিষ্কৃতি পাইবার আকাঙ্ক্ষায় প্রথমতঃ নির্গুণ নিরাকার সচ্চিদানন্দরূপ পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকারলাভের জন্য যোগমার্গের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধিরূপ অষ্টাঙ্গ যোগের অনুষ্ঠান করিতে করিতে দীর্ঘকাল অতীত হইবার পর তাঁহাদের বুদ্ধি স্বচ্ছ ও স্থির হয়, সেই স্বচ্ছ ও স্থির অন্তঃকরণে সচ্চিদানন্দরূপ পরব্রহ্মবিষয়িণী যে অখণ্ড বৃত্তি সমুদিত হয়, তাহাই বেদান্তশাস্ত্রে নির্ব্বিকল্পক সমাধি বলিয়া অভিহিত হয়। এই নির্ব্বিকল্পক সমাধিযুক্ত সাধকগণই শমী বা শমনিষ্ঠ শব্দের দ্বারা অভিহিত হইয়া থাকেন। এই প্রকার নির্ব্বিকল্পক সমাধি যাঁহাদের প্রায় সর্ব্বদাই হইয়া থাকে, তাঁহাদিগকেই বৈদান্তিক আচার্য্যগণ 'জীবন্মুক্ত' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। জীবন্মুক্তের স্বরূপ কি, তাহার নিরূপণ করিতে যাইয়া বেদান্তসার-প্রণেতা সদানন্দ যতি বলিয়াছেন—

"জীবন্মুক্তো নাম স্বস্বরূপাখণ্ডব্রহ্মজ্ঞানেন তদজ্ঞানবাধনদ্বারা স্বস্বরূপাখণ্ডব্রহ্মণি সাক্ষাৎকৃতেঽজ্ঞানতৎকার্য্যসঞ্চিতকর্ম্মসংশয়বিপর্য্যাসাদীনামপি বাধিতত্বাদখিলবন্ধবিরহিতো ব্রহ্মনিষ্ঠঃ।"

যাহা নিজের বাস্তবরূপ, সেই নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের জ্ঞান হওয়ায়, যাহার অজ্ঞান বাধিত হইয়াছে অর্থাৎ আত্মস্বরূপ নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হইয়াছে বলিয়া যাহার অজ্ঞান নিবৃত্ত হইয়াছে, অজ্ঞানের কার্য্য পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্ম (অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মকৃত শুভাদৃষ্ট ও দুরদৃষ্ট) সকল প্রকার সংশয় ও বিপরীত জ্ঞানও যাহার বাধিত হইয়াছে, সুতরাং সংসারের সকল প্রকার বন্ধন হইতেও যাহার নিষ্কৃতিলাভ ঘটিয়াছে, সেই নির্ব্বিকল্পক ব্রহ্মসমাধিসম্পন্ন ব্যক্তিই জীবন্মুক্ত বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

এই প্রকার জীবন্মুক্তের স্বরূপ উপনিষদেও এইরূপে অভিহিত হইয়াছে, যথা—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"

সেই পরাবর ব্রহ্মের দর্শন হইলে দর্শনকারীর হৃদয়গ্রন্থি

ছিন্ন হয়, সকল সংশয়ও ছিন্ন হয় এবং সকল সঞ্চিত কর্ম্ম ক্ষয়-প্রাপ্ত হয়।

জীবন্মুক্ত ব্যক্তির সমাধিসময়ে যে প্রকার মানসিক অবস্থা হয়, তাহার বর্ণন করিয়া, যে সময় ব্যুত্থানদশা বা সমাধিভঙ্গ হইয়া থাকে, সে সময় তাহার মনোবৃত্তি কি প্রকার হয়, তাহাও বেদান্তসারে লিখিত হইয়াছে, যথা—

"অয়ং তু ব্যুত্থানসময়ে মাংসশোণিতমূত্রপুরীষাদিভাজনেন শরীরেণ আন্ধ্যমান্দ্য পটুত্বাদিভাজনেন ইন্দ্রিয়গ্রামেণ অশনা-পিপাসা-শোক-মোহাদি-ভাজনেন অন্তঃকরণেন চ পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-বাসনয়া ক্রিয়মাণানি কর্ম্মাণি ভুজ্যমানানি জ্ঞানাবিরুদ্ধানি পশ্যন্নপি বাধিতত্বাৎ পরমার্থতো ন পশ্যতি। যথেন্দ্রজালমিতি জ্ঞানবান্ তদিন্দ্রজালং পশ্যন্নপি পরমার্থমিদমিতি ন পশ্যতি। 'সচক্ষুরচক্ষুরিব সকর্ণঃ অকর্ণ ইব' ইতি শ্রুতেঃ।"

উক্তঞ্চ—

"সুষুপ্তবজ্জাগ্রতি যো ন পশ্যতি
দ্বয়ং চ পশ্যন্নপি চাদ্বয়ত্বতঃ।
তথা চ কুর্ব্বন্নপি নিষ্ক্রিয়শ্চ যঃ
স আত্মবিন্নান্য ইতীহ নিশ্চয়ঃ॥"

এই জীবন্মুক্ত ব্যক্তির যখন সমাধিভঙ্গ হয়, তখন তাহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব চিরাভ্যস্ত সংস্কার বশতঃ দেহ, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ স্ব স্ব কার্য্যে সংসারী জীবের ন্যায়ই ব্যাপৃত হইয়া থাকে; মাংস, শোণিত, মল ও মূত্রাদিভাজন শরীর, অন্ধতা, দুর্ব্বলতা বা পটুত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মযুক্ত ইন্দ্রিয়-সমূহ ও অশনা পিপাসা শোক মোহ প্রভৃতির আশ্রয় অন্তঃকরণও তাহার পূর্ব্ববৎ সংস্কার বশতঃ নানা প্রকার কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়; তত্বজ্ঞানের সহিত যে সকল প্রারব্ধ কর্ম্মফল-ভোগের আত্যন্তিক বিরোধ নাই, এইরূপ ফলভোগ বা সুখ-দুঃখসাক্ষাৎকার তাহার সেই সময়ে হইলেও এ সকলই তাহার নিকট বাধিত অর্থাৎ মিথ্যা বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে; সুতরাং ঐ সকল ব্যবহার ও সুখদুঃখাদির দ্রষ্টা হইয়াও সে উহাদিগকে সংসারী জীবের ন্যায় পরমার্থতঃ দেখে না; যেমন 'ইহা ইন্দ্রজাল বা মিথ্যা' এইরূপ জ্ঞান যাহার আছে, সে সেই ইন্দ্রজালদর্শনকালেও ইহা পরমার্থ বা সত্য, এইরূপ বোধ করে না অথচ তাহা দেখিয়াও থাকে, জীবন্মুক্ত ব্যক্তির সংসারদৃষ্টিও সেইরূপই হইয়া থাকে। এই কারণে ব্যুত্থানদশাতে প্রাকৃতজনের ন্যায় সে সকল কার্য্যই করিয়া থাকে, অথচ কোন কার্য্যই সে করে না। তাহার প্রপঞ্চদর্শন হয় বটে, কিন্তু সেই প্রপঞ্চ-দর্শনে তাহার ভেদদর্শন হয় না; কিন্তু অদ্বয় ব্রহ্মদর্শনই হইয়া থাকে। ব্যুত্থানকালে যাহার এইরূপ অবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহাকেই আত্মবিদ্ বা জীবন্মুক্ত বলা যায়। ইহাই হইল অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের নির্ণয়।

এইপ্রকার জীবন্মুক্ত ব্যক্তি কিন্তু শাস্তভক্ত নহে, ইহাকে ব্রহ্মনিষ্ঠ জ্ঞানী বলা যাইতে পারে। এই প্রকার জীবন্মুক্তাবস্থা লাভ হইবার পর শ্রীভগবানের অনুগ্রহে কাহার কাহারও ভাগ্যে জ্ঞাননির্ম্মলীকৃত অন্তঃকরণবৃত্তিতে ভাগবতী রতির স্ফুরণ হইয়া থাকে। যাহাদের এইরূপ স্ফুরণ হইয়া থাকে, তাঁহা-দিগকেও ভক্তিশাস্ত্রের আচার্য্যগণ শান্ত ভক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। নির্গুণ ব্রহ্মবিষয়িণী মনোবৃত্তি যখন পূর্ণভাবে স্থিরতা লাভ করে, তখন সর্ব্বোপাধিবিরহিত সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হয়, এইরূপ সাক্ষাৎকারই হইল অদ্বয়ব্রহ্মবাদীর চরম লক্ষ্য। ইহার অপেক্ষা অধিক আরও কিছু ধ্যেয় বা জ্ঞেয় আছে বা থাকিতে পারে, ইহা অদ্বৈত-বেদান্তিগণ স্বীকার করেন না। ইহাই হইল জ্ঞানের চরম উৎকর্ষ, ইহাই তাঁহাদের সিদ্ধান্ত। সাধকবিশেষের পক্ষে ইহাই চরম সিদ্ধান্ত হইতে পারে, কিন্তু ভাগবত প্রভৃতি ভক্তিশাস্ত্রে দেখা যায় যে, এইরূপ নির্গুণ ব্রহ্মাত্মসাক্ষাৎকারের পরও ইহা অপেক্ষা অধিক আরও কিছু ধ্যেয়, জ্ঞেয় বা আস্বাদ্য বস্তু বিদ্যমান আছে। সেই ধ্যেয়, জ্ঞেয় ও আস্বাদ্য বস্তুই হইতেছেন শ্রীভগবান্। তাই ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—

"শ্রেয়ঃস্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥"

হে বিভো, শ্রেয়োলাভের একমাত্র উপায়স্বরূপ তোমার প্রতি ভক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া যাহারা কেবল অদ্বয় ব্রহ্মবোধের জন্য ক্লেশ অঙ্গীকার করিয়া থাকে, তাহাদের পক্ষে তণ্ডুলবিরহিত তুষ-সমূহের অবঘাতের প্রযত্নের ন্যায় সেই অদ্বয়জ্ঞানলাভের প্রয়াস কেবল ক্লেশেরই কারণ হয়, অর্থাৎ মানবজন্মের চরম চরিতার্থতা তাহাদের ঘটিয়া উঠে না। ভগ-বদ্গীতাতেও ইহাই বিস্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে, যথা—

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্‌ভক্তিং লভতে পরাম্‌॥
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্‌ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্‌॥"

ইহার অর্থ—যখন চিত্তশুদ্ধিবশতঃ আত্মা প্রসাদ লাভ করে, তত্ত্বসাক্ষাৎকারের ফলে অজ্ঞ জীব ব্রহ্মস্বরূপকে আবার ফিরিয়া পায়, তখন তাহার শোক নিবৃত্ত হয়, কোন প্রকার ভোগ্য বিষয়ের প্রতি আকাঙ্ক্ষাও থাকে না এবং সকল প্রাণীর প্রতি সমতা লাভ করে, এইরূপে জীবন্মুক্ত ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিই আমার (অর্থাৎ শ্রীভগবান্‌ বাসুদেবের) প্রতি পরা বা প্রেমলক্ষণা ভক্তিকে লাভ করিয়া থাকে, সেই ভক্তির প্রভাবেই আমার যাহা বাস্তব স্বরূপ ও মহিমা, তাহা সে অবগত হইয়া থাকে, তাহার পর সে নির্গুণ নিরাকার মদীয় প্রভারূপ অদ্বয় ব্রহ্মেরও আশ্রয়স্থানীয় যে রসঘন আনন্দস্বরূপ আমার চৈতন্যজ্যোতির্ম্ময় বিগ্রহ, তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া যায়।

সগুণা চিদ্রূপ অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশিষ্ট নিখিল সৌন্দর্য্যের সার, সকল মাধুর্য্যের সার, প্রতিক্ষণ নূতন ও সর্ব্বাশ্চর্য্যময় সেই ভক্তিমাত্রলভ্য শ্রীভগবদ্বিগ্রহই যে ভূমা নির্গুণ নিরাকার অদ্বয় ব্রহ্মের আশ্রয়, তাহাও গীতাতে শ্রীভগবান্‌ স্পষ্টভাবেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা—

"ব্রহ্মণোহস্মি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥"

আমি অর্থাৎ শ্রীভগবান্‌ বাসুদেবই অনাদি ও অনন্ত সচ্চিদানন্দরূপ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আধার, অপরিবর্ত্তনস্বভাব সনাতন ধর্ম্ম ও আত্যন্তিক সুখেরও আমিই আশ্রয়।

নির্ব্বিকল্প সমাধির প্রভাবে সিদ্ধিপ্রাপ্ত জ্ঞানীর নিকট যখন সমস্ত সংসারই একমাত্র ব্রহ্মরূপে প্রতীত হইতে থাকে, শত্রু, মিত্র ও উদাসীন সকল জীবই যখন আত্মরূপেই প্রতিভাত হইয়া উঠে, তখনই তাহার প্রতি শ্রীভগবানের প্রতি প্রেমলক্ষণা ভক্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে। এই সিদ্ধান্তই উপরে উক্ত কয়টি শ্লোকের দ্বারা গীতা প্রতিপাদন করিতেছে। প্রেমলক্ষণা ভক্তির উদয় যখনই প্রথমে অদ্বয় ব্রহ্মনিষ্ঠের হৃদয়ে আরব্ধ হয়, তখন হইতেই তাহার অদ্বৈতব্রহ্মপ্রবণতা শিথিল হইতে আরম্ভ করে। শ্রীমদ্‌ভাগবতে ইহা আরও স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, যথা—

"তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ॥"

অক্ষরোপাসকগণ নির্গুণ, নিরাকার ও অখণ্ড ব্রহ্মবিষয়ক সমাধিতে নিমগ্ন হইয়া আত্মভূত ব্রহ্মানন্দসাক্ষাৎকারে যখন তন্ময় হইয়াছিলেন, এমন সময় হঠাৎ অনন্ত সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের একান্ত আধার সচ্চিদানন্দঘনরসরূপ শ্রীভগবানের পাদপদ্মে ভক্তগণ কর্ত্তৃক প্রেমভরে অর্পিত মঞ্জরী-মিশ্রিত তুলসীদলনিবহের মধুর মকরন্দ-সুরভিত দিব্য গন্ধময় বায়ু নাসাবিবর দিয়া অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া, তাঁহাদের অন্তঃকরণ ও সমস্ত শরীরকে চঞ্চল করিয়া তুলিল।

এই শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ শ্রীরূপগোস্বামিপাদ অতি সুন্দরভাবে বর্ণন করিয়াছেন, যথা—

"ঋদ্ধা সিদ্ধিব্রজবিজয়িতা সত্যধর্ম্মা সমাধি-
র্ব্রহ্মানন্দো গুরুরপি চমৎকারয়ত্যেব তাবৎ।
যাবৎ প্রেম্নাং মধুরিপুবশীকারসিদ্ধৌষধীনাং
গন্ধোঽপ্যন্তঃকরণসরণীপান্থতাং নৈব যাতি॥"

নিরতিশয় ঐশ্বর্য্যপ্রভৃতি সিদ্ধিনিচয় সেই পর্য্যন্তই বিজয় লাভ করিয়া থাকে, পরমার্থসদ্ভাবাপাদক নির্ব্বিকল্প সমাধিও সেই পর্য্যন্ত অবস্থান করিতে পারে, সকল প্রকার বৈষয়িক সুখের অবধিস্বরূপ গুরু ব্রহ্মানন্দও সেই কাল পর্য্যন্ত হৃদয়ে চমৎকার উৎপাদন করিতে প্রভু হইয়া থাকে, যে পর্য্যন্ত শ্রীমধুসূদনকে বশীভূত করিয়া রাখিবার সিদ্ধৌষধিস্বরূপ প্রেমভক্তির গন্ধ অন্তঃকরণপথে পথিকরূপে সমুদিত না হয়।

ব্রহ্মসমাধিনিমগ্ন জীবন্মুক্তগণের এই ভাবের সঙ্কল্পবিচ্যুতি ও চিত্তবিক্ষোভের হেতু হইয়া থাকে—করুণাময় শ্রীহরির নিরুপাধিক করুণা। এই করুণাকটাক্ষপাতেরই পরিণামস্বরূপ হইয়া থাকে—শ্রীভগবানের মধুর সুন্দর ও সর্ব্বাশ্চর্য্যময় শ্রীবিগ্রহ-দর্শন। সকল জীবন্মুক্তের ভাগ্যে এইরূপ দর্শন ঘটে না, তবে কাহার ভাগ্যে ঘটে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রবৃত্ত উপনিষদ্‌ বলিতেছে—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্॥"

সমস্ত অধ্যাত্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যানপটুতা দ্বারা সকলের আত্মভূত এই পরম পুরুষকে পাওয়া যায় না, ধারণাশালিনী তীক্ষ্ণবুদ্ধির দ্বারাও ইঁহার দর্শন পাওয়া যায় না, সমগ্র জীবন ভরিয়া সমস্ত শ্রুতির অনুশীলন করিলেও ইঁহার স্বরূপোপলব্ধি হয় না, তিনি কিন্তু যাহাকে আপনার জন বলিয়া বাছিয়া লন, সেই তাঁহার নিজজন হইয়া থাকে এবং সেই নিজজনের নিকটেই তিনি নিজের শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

জীবন্মুক্তিলাভের পর প্রেমভক্তির আবির্ভাবের হেতুস্বরূপ এই ভগবদ্রূপদর্শন ও তাহার প্রভাববর্ণন প্রসঙ্গে শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন, –

"শ্যামাকৃতিঃ স্ফুরতি চারুচতুর্ভুজোহয়ং
আনন্দরাশিরখিলাত্মতরঙ্গসিন্ধুঃ।
যস্মিন্ গতে নয়নয়োঃ পথি নির্জ্জিতাতে
প্রত্যক্পদাৎ পরমহংসমুনের্মনোঽপি॥"

মনোহর চারিটি বাহুতে সুশোভিত শ্যামসুন্দর আকৃতি দীপ্তি পাইতেছে, দেখিলে বোধ হয়—সমস্ত সংসারের সকল আনন্দ যেন রাশীভূত হইয়া ইহাতে একত্র সমাবিষ্ট হইয়াছে, এ যেন সেই মহাসিন্ধু—যে সিন্ধুর অপার ও অনবধি বক্ষে জগতের সমস্ত জীবাত্মা তরঙ্গমালার ন্যায় উঠিতেছে, খেলিতেছে এবং বিলয়প্রাপ্ত হইতেছে। এই সর্ব্বাশ্চর্য্যময় মনোহর মূর্ত্তি একবারও নয়নপথের পথিক হইলে জীবন্মুক্ত পরমহংসপদভাক্ মুনির মনও নির্গুণ নিরাকার সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মপদ হইতে অতি দূরে সরিয়া পড়ে। এই চিদানন্দঘন ভগবদ্‌বিগ্রহ দর্শনের সময় হইতেই জীবন্মুক্তগণ ভক্তিসুধাস্বাদের অধিকারী হইয়া থাকেন, এইরূপ অবস্থার উদয় হইলে জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণ শান্ত ভক্তশ্রেণীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন, তাঁহাদের তাৎকালিক মনোবৃত্তির পরিচয় তাঁহাদের মুখেই শুনা যাক্—

"সমস্তগুণবর্জ্জিতে করণতঃ প্রতীচীনতাং
গতে কিমপি বস্তুনি স্বয়মদীপি তাবৎ সুখম্।
ন যাবদিয়মদ্ভুতা নবতমালনীলদ্যুতে-
র্মুকুন্দসুখচিদ্ঘনা তব বভূব সাক্ষাৎকৃতিঃ॥"

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

হে মুকুন্দ! সে এক দিন ছিল—যে দিন নিখিলগুণবর্জ্জিত সুতরাং সকল প্রকার প্রমাণের অবিষয় কোন এক তত্ত্ব স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া সুখরূপে আমার নিকট প্রকটিত হইয়াছিল, কিন্তু সে দিন এই অত্যাশ্চর্য্যকর নবতমালনীলদ্যুতি জগন্মোহিনী অথচ ঘনীভূত চিদানন্দরূপিণী তোমার মূর্ত্তি প্রত্যক্ষের গোচর হয় নাই, আজ কিন্তু ইহার প্রকাশে সেই অদ্বয় তত্ত্বের স্ফূর্ত্তিময় সুখও আর স্পৃহণীয় হইতেছে না এবং তাহাও যেন এই ঘনীভূত চিদানন্দময় শ্রীমূর্ত্তিপ্রকাশের মধ্যে কোথায় বিলীন হইয়া গিয়াছে। নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বসাক্ষাৎকারের পর এই সমস্ত গুণগণমণ্ডিত নিত্য নূতন সর্ব্বাশ্চর্য্যময় শ্রীবিগ্রহ বিশুদ্ধ চিত্তবৃত্তিতে পরিস্ফুরিত হইবামাত্র জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণের হৃদয়ে যে উল্লাসময়ী ভাগবতী রতির উদয় হইয়া থাকে, সেই রতিকেই শান্ত ভক্তি বলা যায়। ইহাতে আকাঙ্ক্ষা আছে, সে আকাঙ্ক্ষা কেবল নির্নিমেষনেত্রে দেখিবারই আকাঙ্ক্ষা, যতই দর্শন হয়, ততই সে আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়া যায়। তাহার ফলে সেই আকাঙ্ক্ষাময় উল্লাসময় শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশ আরও যেন ঘনীভূত হইতে থাকে, তৃপ্তিরও সীমা থাকে না। এই অনুপম সৌন্দর্য্যানুভূতিতে মমতার স্ফূর্ত্তি নাই, উন্মাদনা নাই, সম্বন্ধস্থাপনের জন্য কোন অভিলাষও নাই। এই কারণে এই ভক্তি রাগময়ী হইয়াও সম্বন্ধানুগা হয় না। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুররসরূপা প্রেমভক্তি হইতে ইহাই হইল ইহার বিলক্ষণতা।

[ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ (মহামহোপাধ্যায়)।

সরলা

১

"দেখ, তুমি আমার স্বামী, তুমি আমায় উপদেশ দিবে, আমি শুনিব। কিন্তু আজ তোমাকে আমায় উপদেশ দিতে হইতেছে। ছিঃ—"

"তুমি যে আমার গুরুমশায়, উপদেশ দেবে বৈ কি। ছেলেবয়সে গুরুমশায়কে যত ভয় করি নি, তোমায় তত করি।"

"ঠাট্টা রাখ, কায-কর্ম্মের চেষ্টা দেখ।"

"কাযকর্ম্ম ত করছি, তোমার খোঁপা বাঁধা দেখলেই খুলে দিই—"

"আবার ঠাট্টা?"

"এইবার চুপ করেছি, গুরুমশায়।"

বর্দ্ধমানের নিকটবর্ত্তী সোনাপুর নামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রামে স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে কথোপকথন চলিতেছিল। তাহাদের অবস্থা স্বচ্ছল নহে—কোনও রকমে ভাতটা চলিয়া যায়—কাপড়টা ঠিক চলে না। স্ত্রী সরলার ইচ্ছা, স্বামী কোন চাকরী-বাকরি করে। তা শ্রীমান্ নগেন্দ্রনাথ কোন-মতেই বিদেশে যাইতে সম্মত নহেন। দেশে চাকরী পাওয়া সম্ভব নহে। গ্রামখানি ক্ষুদ্র। সকলেই চাষ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। কে চাকরী দিবে? নগেন্দ্রনাথ জীবনের ৩০টি বৎসর নির্ব্বিকারচিত্তে কাটাইয়া দিলেন।

কিন্তু আর কাটে না। স্ত্রীর গহনাগুলি একে একে গিয়াছে; হালের জমীও বাধা পড়িয়াছে। ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়—আলোকপরিশূন্য। চিন্তার ভার স্ত্রীর উপর ন্যস্ত করিয়া স্বামী নিশ্চিন্ত।

গৃহে পোষ্যের মধ্যে চারিটি প্রাণী। স্বামী, স্ত্রী, একটি টিয়া পাখী, আর একটি শুভ্রকায়া মার্জ্জারী। সরলা দিবা-রাত্র কাযে ঘুরিয়া বেড়ায়; নগেন্দ্রনাথ তাহার নানা অবস্থার নানা চিত্র দেখেন। পাখীটি "সরলা" "সরলা" ব'লে সময়ে অসময়ে চীৎকার করে; মার্জ্জারী আহারান্বেষণ ছাড়া আর কোনও কার্য্যে মনঃসংযোগ করে না।

"আমি যা' বলি, তাই শুন।"

নগেন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন, "কি শুনব, সরলা? আমি তোমায় ছেড়ে কোথাও যেতে পারব না। আমার গৃহে কেউ নেই, পৃথিবীতে কেউ নেই; আমি কার কাছে আমার সর্ব্বস্বধনকে রেখে যাব?"

সরলার আঁখিপল্লব অশ্রুসিক্ত হইল। সরলা মুখ ফিরাইয়া বলিল, "আমাদের নেই কে? মাথার উপর আমাদের দয়াময়ী মা আছেন—তোমার আমি আছি—আমার তুমি আছ, আবার চাই কি?"

নগেন্দ্র।—এখনও চাই অনেক, সরলা। আমি ঈশ্বরে বিশ্বাসহীন, নিয়তির উপাসক, আমার চাই অনেক।

সরলা।—যার চাই অনেক, তার পুরুষকারও থাকা চাই অনেক। নিশ্চেষ্ট হয়ে ঘরে ব'সে থাকলেই কি সব পাবে?

নগেন্দ্র।—আমার বিশ্বাস, ঘরে ব'সে থেকেই পাব—

এমন সময় দ্বারে একটা লোক হাঁকিল, "বাবু, চিঠি।"

পিয়ন চিঠি দিয়া গেল। সেখানি লিখিয়াছিলেন সরলার পিতা—জামাইকে। তিনি বহরমপুরে রাজ-ষ্টেটে চাকরী করেন, একটি চাকরী যোগাড় করিয়া তিনি জামাইকে সত্বর আসিতে লিখিয়াছিলেন। নগেন্দ্রনাথ পত্র-খানা পড়িয়া স্ত্রীকে পড়িতে দিলেন, স্ত্রী কহিল, "যাচ্ছ ত?"

"না।"

"কেন?"

"ছি!"

"দেখ, তোমার অহঙ্কার আছে, কিন্তু পুরুষকার নেই। বাবার কাছ হ'তে একটু সাহায্য নিতে তোমার মাথাটা কি এমন হেঁট হয়ে যাবে?"

"তুমি তা কি বুঝবে সরলে—?"

"অভিনয় রাখ—কার্য্যে ব্রতী হও।"

"তুমি কোথায় থাকবে?"

"কেন, বাপের বাড়ী।"

"আর আমি?"

"আপাততঃ সেইখানে—"

"আমার দ্বারা তা' হবে না। আমি ভিক্ষা ক'রে খাব, কিন্তু তোমার পিতার অন্ন খেতে পারব না।"

স্ত্রীর মন রোষে অভিমানে পূর্ণ হইল, একটু তেজের সহিত কহিল, "যার এক পয়সা রোজগার করবার ক্ষমতা নেই, তার এতটা তেজ ভাল নয়।"

"ক্ষমতা আছে সরলা, পারি সব, কিন্তু তুমি আমাকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছ।"

স্ত্রী রাগিয়া গর-গর করিতে করিতে প্রস্থান করিল।

২

সরলা অনেকক্ষণ নগেন্দ্রনাথের সহিত কথা কহিল না। নগেন্দ্র অস্থির হইয়া পড়িলেন, যখন দেখিলেন, মান কিছুতেই ভাঙ্গে না, তখন বেহালা লইয়া আসিলেন। তারগুলা আঁটিয়া লইয়া তারে ছড়ির ঘা দিলেন। ক্ষুদ্র কুটীর শব্দ-তরঙ্গে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল।

বেহালাখানি নগেন্দ্রনাথের হৃদয় অনেকটা অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। জগতে তাহার ভালবাসিবার জিনিষ দুইটি ছিল;—একটি সরলা, দ্বিতীয়টি বেহালা। দুইটিই সচেতন; কেন না, সরলা বেহালাটিকে তাহার সতীন বলিয়া ডাকিত। বেহালা কখন কাঁদিত, হাসিত; কখন বা মান করিত, আবার কখন মানও ভাঙ্গাইত। বেহালারও হৃদয় নগেন্দ্রময়। নগেন্দ্র যখন সোহাগ করিয়া তাহার অঙ্গ-স্পর্শ করিতেন, তখন সে কত সুরে কত কথা কহিত; আবার নগেন্দ্র যখন তাহাকে রাখিয়া সরলাকে ধরিতেন, তখন বেহালা নীরবে পড়িয়া থাকিত। একটু অনুযোগও করিত না।

সরলার মান ভাঙ্গিতে না পারিয়া নগেন্দ্রনাথ বেহালাকে ধরিলেন। বেহালার হৃদয়-তন্ত্রী আনন্দে নাচিয়া উঠিল। নগেন্দ্র শব্দতরঙ্গে ঝঙ্কার তুলিয়া বেহালার সাহায্যে গান ধরিলেন :—

"তারে দেখা হ'ল না।
জনম জনম একই দুঃখ রয়ে গেল
তারে দেখা হ'ল না।
নয়ন না পালটিতে
জীবন বহিয়া গেল;
(তারে) দেখিবার অবসর
এ জনমে হ'ল না।
কত যুগ যুগান্তর বহে গেল,
কত জনম জীবন চ'লে গেল,
তবু তারে দেখা হ'ল না।
দেখি দেখি ক'রে তারে
দেখা হ'ল না॥"

গান থামিল, কিন্তু সুর থামিল না। সুর তখনও নগেন্দ্রনাথের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। নগেন্দ্রনাথ কাঁপিতেছেন, বেহালা কাঁপিতেছে, চারিদিকে তখনও ঝঙ্কার উঠিতেছে,—'তারে দেখা হ'ল না।' সরলা ফিরিয়া দেখিল। দেখিল, নগেন্দ্রনাথের অর্দ্ধনিমীলিত নয়ন বহিয়া অশ্রু গড়াইতেছে। সরলা আর স্থির থাকিতে পারিল না; সে ঝটিতি আসিয়া অঞ্চল দ্বারা নগেন্দ্রনাথের চক্ষু মুছাইয়া দিল। নগেন্দ্রনাথের চক্ষু দুইটি হাসিতে ভাসিয়া উঠিল। তিনি হাসিতে হাসিতে বেহালা উঠাইয়া আবার গান ধরিলেন :—

"গিরি-সুতা গিয়েছিল, সাধনায় ভুলে
তাই পুনঃ ভিখারীরে—"

এমন সময় মার্জ্জারী ভীতকণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল। নিকটে একটা কুকুর শুইয়াছিল, সেও মহা কলরব করিয়া উঠিল। দূরে কতকগুলা শৃগাল এককালে ভয়ঙ্কর চীৎকার করিয়া উঠিল। তখনও কিন্তু সন্ধ্যা হয় নাই—একটা অন্ধকারের সঞ্চার হইতেছিল মাত্র। আকাশে নিবিড় মেঘ—মেঘের উপর মেঘ—অচ্ছিদ্র অনন্ত মেঘ। দিগন্তে কেমন একটা করাল ছায়া—কেমন একটা অবগুণ্ঠনাবৃত অন্ধকার। কয় দিন হইতে সূর্য্যদেব অদৃশ্য। বৃষ্টিধারার বিরাম নাই। মাঠ-ঘাট জলে পূর্ণ। তার উপর আবার জল।

শৃগাল-কুকুরের চীৎকার-শব্দে চমকিত হইয়া নগেন্দ্রনাথ গান বন্ধ করিলেন। তিনি ঘরের দাবায় বসিয়াছিলেন, সেইখানে কুকুর বিড়াল—জানি না কেন—ভীত হইয়া উঠিয়া আসিল। নগেন্দ্রনাথও কেমন একটা অজ্ঞাত ভয়ে পিষ্ট হইয়া আকাশ পানে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, সমস্ত আকাশে যেন একটা কিসের বিরাট ছায়া পড়িয়াছে—সমস্ত পৃথিবীতে কেমন একটা বিভীষিকার সঞ্চার হইতেছে। নগেন্দ্রনাথ একটু ভীত হইয়া বলিলেন, "সরলা, আলো জালো।"

সরলা আলো জালিল। নগেন্দ্রনাথ বেহালাখানি হাতে করিয়া ঘরের ভিতর আসিলেন।

৩

রাত্রি এক প্রহর অতীত হইতে না হইতে স্বামি-স্ত্রী আহারাদি করিয়া শয়ন করিলেন। উভয়েরই হৃদয়ে কেমন একটা বিষাদ—কেমন একটা অজ্ঞাত অমঙ্গলের আশঙ্কায় উভয়েই নিপীড়িত। উভয়ে দীপ নিবাইয়া শুইয়া রহিলেন। কাহারও নিদ্রাকর্ষণ হইল না। এইরূপে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। তার পর নগেন্দ্রনাথ শয্যার এক প্রান্ত হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সরলা, ঘুমুলে ?"

শয্যার অপর প্রান্ত হইতে সরলা উত্তর করিল, "না।"

নগেন্দ্র।—একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছ ?

সরলা।—পাচ্ছি।

নগেন্দ্র।—কিসের শব্দ বলতে পার ?

সরলা।—আমার মনে হয়, যেন দূরে—অনেক দূরে—কি একটা ভয়ঙ্কর জানোয়ার চীৎকার করছে।

নগেন্দ্রনাথ ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন, "সরলা, আলো জ্বাল।"

সরলা আলো জ্বালিল। নগেন্দ্রনাথ পালঙ্ক হইতে নামিয়া মেঝের উপর শুইলেন এবং মাটীতে কাণ লাগাইয়া শুনিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে উঠিয়া সরলার মুখ পানে চাহিলেন। সরলা ভীতি-কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কি শুনিলে ?"

নগেন্দ্র সহসা উত্তর করিলেন না। একটু ভাবিয়া বলিলেন, "ঠিক বলিতে পারি না, তবে—"

"তবে কি ?"

"আমার অনুমান যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তোমাতে আমাতে আজিকার সাক্ষাৎই শেষ।"

সরলা লম্ফত্যাগে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং বলিল, "বল্‌ছ কি ?"

"আমার মনে হয়, দামোদরের বাঁধ ভাঙ্গিয়াছে—জলরাশি ছুটিয়া আসিতেছে; সরলা, আর রক্ষা নাই।"

"সর্ব্বনাশ ! চল, আমরা পালিয়ে যাই।

"কোথায় পালাব সরলা ? অন্ধকার আকাশ, জলময় পৃথিবী, অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারা, কোথায় যাব সরলা ?

"দামোদরকে পিছনে ক'রে চল না কেন আমরা দূরে চলে যাই।"

"আমরা গ্রাম ছাড়াতে না ছাড়াতে জলতরঙ্গ আমাদের উপর এসে পড়বে।"

"তবে উপায় ?"

"উপায় নাই, সরলা।"

"উপায়হীনের উপায় যিনি, তিনি ত আছেন।" বলিয়া সরলা উঠিল এবং দ্বিতীয় দীপ জ্বালিয়া ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিল। সরলা প্রভাতে ভগবতীর পূজা করিয়াছিল। ফুল, বিল্বপত্র তখনও পড়িয়া রহিয়াছে। সরলা বসিল এবং নিমীলিতনয়নে ধ্যানস্থ হইল।

শয়নঘরের পাশেই ঠাকুরঘর, মধ্যে প্রাচীর। নগেন্দ্রনাথ ক্ষণকাল সরলার প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলেন। সরলা আসিল না। নগেন্দ্রনাথ পুনরায় ভূপৃষ্ঠে কর্ণ সংলগ্ন করিলেন। অল্পক্ষণ পরেই উঠিয়া ব্যস্ততাসহ ডাকিলেন, "সরলা !"

উত্তর নাই।

নগেন্দ্রনাথ ঘরের বাহিরে আসিলেন, ঠাকুরঘরের দ্বারের উপর দাঁড়াইয়া দেখিলেন, সরলা গললগ্নীকৃতবাসে যুক্তকরে বসিয়া আছে। সরলার ধ্যানে বাধা দিতে ঈশ্বরে বিশ্বাসহীন নগেন্দ্রনাথেরও কেমন একটু সঙ্কোচ হইল। তিনি মৃদুস্বরে ডাকিলেন, "সরলা !"

সরলার দেহ নড়িয়া উঠিল। ক্রমে সে চাহিয়া দেখিল। পরে ঠাকুরের নির্ম্মাল্য লইয়া নগেন্দ্রনাথের সমীপস্থ হইল। নগেন্দ্রনাথ কি করেন, নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সরলা সেই নির্ম্মাল্য স্বামীর মাথায় ঠেকাইয়া তাঁহার যজ্ঞোপবীতে বাঁধিয়া দিল এবং বলিল, "এই নির্ম্মাল্য তোমার অক্ষয় কবচ হউক।"

"আর তোমার কি হবে, সরলা ?"

"আমার ? মায়ের ইচ্ছা হয়, আমাকে রক্ষা করবেন। আমি কেন তাঁর কাছে তুচ্ছ জীবন ভিক্ষা করতে যাব ?"

নগেন্দ্রনাথ সরলার মুখ পানে ক্ষণকাল নীরবে চাহিয়া রহিলেন। সরলা, জিজ্ঞাসা করিল, "দেখছ কি ?"

নগেন্দ্র।—দেখছি সরলা তোমাকে। তুমি যাঁর পূজা কর, উপাসনা কর, তিনিও কি তোমার মত ?

সরলা।—আমি তাঁর চরণধূলা পাইবারও যোগ্য নহি।

নগেন্দ্র।—অত উঁচু আমি কল্পনা করতে পারি না; তুমিই আমার কল্পনার শেষ।

সরলা।—ছি, ছি!

নগেন্দ্র।—সরলা, তোমার মা, তোমার ভগবতী যদি তোমার মত হন, তা হ'লে তাঁকে আমি ভালবাসতে পারি।

সরলা।—তাঁকে ভালবাস, দেখবে, তিনি কত সুন্দর, কত মধুর।

৪

দূরে ভীষণ গর্জ্জন শ্রুত হইল। উভয়ে চমকিত হইয়া উঠিলেন।

নগেন্দ্র বলিলেন, "সরলা, মৃত্যু আসছে—"

"তোমার মৃত্যু নাই।"

"মৃত্যু আসে আসুক, বিচ্ছেদ না আসে।'

মানুষের কোলাহল, জীব-জন্তুর আর্ত্তনাদ চারিদিকে উত্থিত হইল। নগেন্দ্র বলিলেন, "সরলা, আর সময় নেই—কাপড় শক্ত ক'রে পর।"

দ্বিতীয় বস্ত্র আনিয়া নগেন্দ্র সরলার কোমরে জড়াইয়া নিজের কোমরে বাঁধিবার উপক্রম করিলেন। সরলা বলিল, "একটু অপেক্ষা কর।"

সরলা দ্রুতপদে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল, এবং বেহালা-খানি তুলিয়া লইয়া বুকের বস্ত্রের সঙ্গে উত্তমরূপে বাঁধিল। তখন বান আসিয়া পড়িয়াছে। জলের গর্জ্জন ডুবাইয়া নগেন্দ্রনাথ চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, "সরলা!"

সরলা টিয়া পাখীটিকে খাঁচার ভিতর হইতে টানিয়া বাহির করিয়া চালের উপর উড়াইয়া দিল। সযত্নপালিত মার্জ্জারীর কাণ ধরিয়া তুলিয়া তাহাকে চালের উপর বসাইয়া দিল। তার পর সরলা নগেন্দ্রনাথের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। নগেন্দ্র বলিলেন, "সরলা, চালের উপর উঠ।"

"আমি কেমন ক'রে উঠব?—তুমি উঠ।"

নগেন্দ্রনাথের গৃহ-প্রাঙ্গণের প্রাচীর সশব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িল। উঠান জলে পরিপূর্ণ হইল।

নগেন্দ্রনাথ চালের উপর লাফাইয়া উঠিয়া সরলার হাত ধরিয়া টানিয়া লইলেন। চালের উপর ভাল করিয়া বসিতে না বসিতে ঘরখানি পড়িয়া গেল। নগেন্দ্র ও সরলা ছিটকাইয়া প্রাঙ্গণে পড়িলেন। প্রাঙ্গণে তখন অনেক জল; তাঁহাদের বিশেষ আঘাত লাগিল না। নগেন্দ্র উঠিয়াই সরলাকে উঠাইলেন, এবং তাহাকে বক্ষোমধ্যে ধারণ করত ক্ষিপ্রতা সহকারে ভগ্ন চালের উপর উঠিলেন।

চাল তখনও ভাসে নাই, ভাসিবার উপযোগী জল পায় নাই। কিন্তু ক্ষণমধ্যেই চাল নাচিয়া উঠিল, এবং ভাসিতে আরম্ভ করিল। নগেন্দ্রনাথ বুঝিলেন, বন্যা বড় সহজ নহে, তাঁহার ঘর-দ্বার, প্রাচীর মুহূর্ত্তমধ্যে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া কোথায় অন্তর্হিত হইল। চারিদিকে ঘর-দ্বার পতনের শব্দ। বড় বড় গাছ ঝপ-ঝপ শব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। মানুষের চীৎকার, জীবজন্তুর আর্ত্তনাদ, জলের কল্লোল চারিদিক্ হইতে উত্থিত হইয়া গম্ভীর মেঘগর্জ্জনের সহিত মিশাইয়া যাইতেছে। নগেন্দ্রনাথ আকাশ পানে চাহিয়া দেখিলেন; দেখিলেন, কোথাও একটু আলো নাই; নক্ষত্র নাই। মাথার উপর নিবিড় অন্ধকারময় চন্দ্রাতপ। পৃথিবীর দিকে ফিরিয়া দেখিলেন; দেখিলেন, চারিদিকে ঘনীভূত, স্তূপীকৃত অন্ধকার—আলো নাই—দীপ্তি নাই—শুধু একটা বিরাট বিশাল অন্ধকার। পৃথিবী, আকাশের কোন চিহ্নও পরিদৃষ্ট হইতেছে না—কোথায় গাছ, কোথায় ঘর, কিছুই দেখা যাইতেছে না; স্থল, জল, ব্যোম সব বিলুপ্ত হইয়া শুধু একটা অচ্ছিদ্র অনন্ত অন্ধকারের সৃষ্টি হইয়াছে। মানুষের দেখিবার কিছু নাই—শুনিবার সব আছে। নগেন্দ্রনাথ ডাকিলেন, "সরলা!"

সরলা চমকিয়া উঠিল তাহার মনে হইল, নগেন্দ্রনাথ যেন কত দূর হইতে তাহাকে ডাকিতেছেন। সরলা উত্তর না দিয়া নগেন্দ্রনাথের হাত একটু টিপিল। নগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "সরলা, যে জীবনটাকে নিয়ে তোমায় নিত্য দেখতুম, সে জীবনটা বেশ ছিল।"

সরলা উত্তর না দিয়া নগেন্দ্রনাথকে বাহু দ্বারা বেষ্টন করিল। বাতাস চারিদিকে হুহু শব্দে বহিয়া চলিয়াছে। বাতাসের ভাষা শুনি নাই, কিন্তু নিশ্বাসের ভাষা শুনিয়াছি। দুই দিন পরে বাতাসের অস্তিত্ব থাকিবে না; কিন্তু নিশ্বাস অবিনশ্বর।

৫

চাল ভাসিয়া চলিতে লাগিল, নগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "সরলা, সত্যই কি জন্মান্তর আছে?"

"তুমি কি সত্যই ভাব, ভালবাসাটা সম্বন্ধের উপর নির্ভর করে? আমি তোমার স্ত্রী বলিয়াই কি তুমি আমাকে ভালবাস? এ জন্মেই কি তোমার হৃদয়ে এ ভালবাসার সৃষ্টি হয়েছে? জন্ম-জন্মান্তরের কি স্মৃতি নাই?"

নগেন্দ্রনাথ ক্ষণকাল পরে বলিলেন, "কথাটা সত্য; এমন অনেক দেখা যায়, স্বামী স্ত্রীকে ভালবাসে না, স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসে না; ছেলে বাপকে হত্যা করে, ভাই ভাইকে খুন করে। ঠিক বলেছ সরলা, জন্ম-জন্মান্তরের স্মৃতি আছে।"

খড়ের চাল দ্রুতবেগে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। সরলা বলিল, "তবে আর ভয় কি?"

নগেন্দ্র উত্তর করিলেন, "তবু এ জীবনটা বেশ ছিল, সরলা।"

গ্রাম ছাড়িয়া তাঁহারা মাঠে পড়িলেন, জলের বেগ বাড়িয়া উঠিল। আগে বাধা পাইতেছিলেন, এখন আর বাধা নাই। অদৃশ্য শক্তি কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া তৃণখণ্ডের ন্যায় তাঁহারা জলরাশির উপর ভাসিয়া যাইতে লাগিলেন। সরলা জিজ্ঞাসা করিল,"আমরা এ কোথায় কোন্ দিকে চলিয়াছি?"

"অজ্ঞাত রাজ্যে।"

"এ পথের কি শেষ নাই?"

"না।"

সহসা সজোরে চালে এক ধাক্কা লাগিল। নগেন্দ্রনাথ ও সরলা চালের উপর হইতে ছিটকাইয়া পড়িলেন। যেখানে পড়িলেন, সেখানে ডুব-জল নহে, গলা-জল। নগেন্দ্রনাথ সরলাকে ধরিয়া বসিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহারা বিচ্ছিন্ন হইলেন না। যে বস্তুর ধাক্কা লাগিয়াছিল, সেটা একটা বড় বট-গাছ। নগেন্দ্রনাথ সহজেই গাছের সন্ধান পাইলেন, কিন্তু চালখানির সন্ধান পাইলেন না। সম্ভবতঃ স্রোতোপথে ভাসিয়া গিয়া থাকিবে। নগেন্দ্রনাথ দেখিলেন, মাটীতে দাঁড়াইয়া থাকা অসম্ভব, জল ক্রমেই বাড়িতেছে। স্রোতও অতিশয় প্রবল। নগেন্দ্রনাথ বিষণ্ণচিত্তে বলিলেন, "সরলা, ঘর হারাইলাম, এখন এস গাছকে ধরি।"

"আমি কেমন ক'রে গাছে উঠব?"

"আমি তোমায় উঠিয়ে দিচ্ছি।"

"আমি পারব না, তুমি উঠ।"

তখন জল সরলার চিবুক পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। নগেন্দ্রনাথ ব্যাকুলকণ্ঠে বলিলেন, "সরলা, এখন সঙ্কোচ ছাড়—গাছের উপর উঠ।"

"আচ্ছা, আগে তুমি উঠ, উঠিয়া হাত বাড়াইয়া দিও, আমি উঠিব।"

"তাই বেশ, আমি তোমায় টেনে তুলে নেব।"

নগেন্দ্রনাথ গাছের উপর উঠিলেন, উঠিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইল। অন্ধকারে গাছের কোন অংশই দেখা যাইতেছিল না। যাই হউক, কোন রকমে উঠিলেন। উঠিয়া ডাকিলেন, "সরলা, হাত দাও।"

উত্তর নাই।

"সরলা!"

উত্তর নাই।

"সরলা, সরলা!"

বায়ু কাঁদিতে কাঁদিতে কাণের কাছে মৃদু কণ্ঠে বলিয়া গেল, "সরলা নাই।"

নগেন্দ্রনাথ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, গাছের উপর হইতে লাফাইয়া পড়িলেন এবং বৃক্ষের তলদেশ অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। চতুর্দ্দিক অন্বেষণ করিলেন, চীৎকার করিয়া কত ডাকিলেন, কোথাও সরলা নাই। নগেন্দ্রনাথ ক্ষিপ্তপ্রায় হইলেন; পুনঃ পুনঃ চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন, "সরলা, সরলা!"

উত্তর নাই, সব সুপ্ত। আকাশ পৃথিবী কেহ উত্তর দিল না। উপরে ছিদ্রশূন্য অনন্ত অন্ধকার—ধরাপৃষ্ঠে বিভীষিকাময় অসীম অন্ধকার। নগেন্দ্রনাথের সহসা মনে হইল, সরলা ত সাঁতার জানে না! তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল। তিনি একটু স্থির হইয়া বুঝিয়া দেখিলেন, সরলার ভাসিয়া যাওয়াই সম্ভব। জল ক্রমে বাড়িতেছে, নগেন্দ্রনাথের চিবুক পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। সে অবস্থায় সরলার চক্ষু পর্য্যন্ত জল উঠিয়া থাকাই সম্ভব। তাই বুঝি সরলা কথা কহিতে পারে নাই? তাই বুঝি সরলা আমায় ডাকিতে পারে নাই? হায় হায়, কেন আমি তাহাকে ফেলিয়া গাছে উঠিলাম? সরলা, সরলা! শত সর্প-দংশনের জ্বালা তিনি অনুভব করিতে লাগিলেন। উন্মত্তপ্রায় নগেন্দ্রনাথ স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া সরলার অন্বেষণে যাত্রা করিলেন।

ক্রমে পূর্ব্বদিক একটু পরিষ্কার হইয়া আসিল। নিকটের গাছ-পালা দেখা যায়। নগেন্দ্রনাথ সাঁতার দিয়া যাইতে লাগিলেন; সহসা তাঁহার অঙ্গে কি স্পৃষ্ট হইল। তিনি ভাবিলেন, বুঝি সরলা। আশাকুলিত হৃদয়ে তাহাকে জড়াইয়া ধরিলেন। দেখিলেন, একটা মৃত গাভী। তাহাকে ছাড়িয়া আবার চলিতে লাগিলেন। সহসা সম্মুখে একটা

মনুষ্যদেহ দেখিলেন। তিনি সাগ্রহে তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। দেখিলেন, একটি বালকের মৃত দেহ। তিনি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া আবার চলিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে সম্মুখে একটা বড় শিবমন্দির দেখিলেন। মন্দিরের ভিতর তখনও জল উঠে নাই। নগেন্দ্রনাথ মন্দিরের রোয়াকে উঠিলেন, এবং চারিদিকে ঘুরিয়া সরলার অন্বেষণ করিলেন, কোথাও সরলা নাই। অনেকগুলি সাপ নগেন্দ্রনাথের পায়ে ঠেকিল, কিন্তু তাহারা নির্জীব অবস্থায় পড়িয়া আছে। নগেন্দ্রনাথ একবার চীৎকার করিয়া সরলাকে ডাকিলেন, তার পর রোয়াক হইতে জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন।

নগেন্দ্রনাথের শরীর ক্রমে অবসন্ন হইয়া আসিল; তাঁহার সে দিকে লক্ষ্য নাই। তিনি পাগলের মত সরলার অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কোথাও একটা মরা কাক দেখিয়া ভাবেন, সরলার চুল; কোথাও একটা মৃত গাভী দেখিয়া মনে করেন, সরলার বসন। কোন নর-দেহ ভাসিয়া যাইতে দেখিলে ভাবেন, সরলা ভাসিয়া যাইতেছে; কোন ভগ্নমূল বৃক্ষকাণ্ড দেখিলে মনে করেন, সরলা বৃক্ষাশ্রয়ে ভাসিতেছে। অবশেষে নগেন্দ্রনাথের ভ্রান্তি সকল দ্রব্যেই হইতে লাগিল। সম্মুখে যাহা কিছু দেখেন, সেইটাকেই সরলা বলিয়া মনে করেন। ক্রমে জলে, আকাশে সকল স্থলেই সরলাকে দেখিতে লাগিলেন। বিশ্ব সরলাময় হইয়া উঠিল।

৬

আট বৎসর পরে একদা বৈশাখের মধ্যাহ্নে রৌদ্রতপ্ত কঙ্করময় পথ বহিয়া একটি ছিন্নবসনা রমণী শ্রান্তচরণে দুবরাজপুরের দিকে চলিয়াছে। দুবরাজপুর গ্রাম সিউড়ি হইতে বড় বেশী দূরে নয়—সাত ক্রোশের মধ্যে হইবে। কিন্তু পথ বড় নির্জ্জন; মাঝে মাঝে দুই চারখানা গ্রাম, এই যা; নতুবা পথের ভূরিভাগ প্রান্তর বা জঙ্গলের উপর দিয়াই গিয়াছে। ছিনপাই গ্রাম প্রত্যুষে ত্যাগ করিয়া হেতমপুরের সন্নিকটবর্ত্তী হইতে রমণীর মধ্যাহ্ন হইয়া গেল। তাহার চরণ আর চলিতে চাহিতেছিল না। পথিপার্শ্বে লোকালয় নাই যে, একটু জল চাহিয়া খাইবে; কোন বৃক্ষ নাই যে, তাহার ছায়ায় একটু বসিবে। কোন উপায় না দেখিয়া রমণী শ্রান্ত চরণ, ক্লান্ত দেহ টানিয়া লইয়া চলিল।

তাহার বয়স বড় বেশী নহে - ত্রিশ বত্রিশ হইবে। রমণী শীর্ণা, কিন্তু সুন্দরী। হাতে 'নোয়া', ললাটে ক্ষীণ সিন্দুর-রেখা। বসন ছিন্ন হইলেও একটা লজ্জা তাহার দেহকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে।

রমণী হেতমপুর বামে রাখিয়া দুবরাজপুর গ্রামপ্রান্তে যখন উপনীত হইল, তখন সে আর চলিতে পারিল না,—একটা গাছের ছায়ায় বসিয়া পড়িল। যেখানে বসিল, তাহার অনতিদূরে একখানি কুটীর ছিল। রমণী শুনিল, একটি ছোট ছেলে ডাকিতেছে, "বাবা, কাবে এছ—মা ডাকচে।" বাপ বোধ হয় ঘরের পাশে বাগানে কিছু কায করিতেছিলেন। তিনি কাযে বিরত না হইয়া উদ্যান হইতে কহিলেন, "এই জমীটুকু কেটে যাচ্ছি।"

রমণী উঠিয়া দাঁড়াইল—ছায়া ছাড়িয়া কুটীরের দিকে সরিয়া আসিল। শিশুকে দেখিল, শিশুর বাপকেও দেখিল। তাহার চোখের তেমন জোর নাই, ভাল দেখিতে পাইল না। আরও একটু অগ্রসর হইয়া কুটীর-প্রাঙ্গণে দাঁড়াইল। শিশু তখন পিতাকে কহিতেছিল, "দেলি কলো না, বাবা!" তাহার পিতাকে দেখা যাইতেছিল না, তিনি গৃহের অপর পার্শ্বে ছিলেন। শিশুকে তিনি দেখিতে পাইতেছিলেন না, কিন্তু তাহার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইতেছিলেন। পিতা উত্তর করিলেন, "যাচ্ছি বাবা।"

রমণীকে দেখিয়া বালক জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি ভাত কাবে?"

"না, আমি তোমাকে দুটো চুমো খাব।"

"কাবে এছ।"

রমণী শিশুর দিকে আনন্দে অগ্রসর হইল। এমন সময় ঘরের ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া শিশুর জননী স্বামীর উদ্দেশে কহিল, "তুমি কি আজ ভাত খাবে না?"

"এইটুকু কেটেই যাচ্ছি।"

"রোদ মাথার উপর এসেছে, এখনও বলছ এইটুকু কেটে যাচ্ছি? আর কাটতে হবে না, চ'লে এস।"

"যাচ্ছি।"

"একে কি খাটুনি বলে! দিন-রাত একটু বিশ্রাম নেই—"

"না খাটলে চলবে কেন? ব'সে থাকলে খাব কি?"

"ভগবানের ইচ্ছা হয়, দয়া হয়, খেতে পাব—"

"পুরুষকার দেখলে তবে তিনি কৃপা করেন। তোমাকে বলব কি, ইচ্ছে করে, রাতে না ঘুমিয়ে মাঠে কায করি।"

"নিজে বাঁচলে, তবে জমী—"

"জীবনটাকে তুচ্ছ জ্ঞান করতে না পারলে কিছুই হয় না। আমি যখন নিজেকে বিপন্ন ক'রে রাজা বাহাদুরের ক্ষিপ্ত ঘোড়ার সম্মুখে দাঁড়ালুম, তখন সিদ্ধি, আমার পুরুষকার দেখে আমাকে বরণ করলে। আমি ঘোড়া ধরলুম, রাজার আত্মীয়কে বাঁচালুম, রাজা দয়াপরবশ হয়ে আমাকে পঞ্চাশ বিঘা জমী দান করলেন। এই পুরুষকার—"

"তোমাকে আর রোদে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করতে হবে না—চ'লে এস।"

গৃহস্বামিনীর চক্ষু সহসা রমণীর উপর পড়িল। প্রথমে তিনি মনে করিয়াছিলেন, কোন ভিখারিণী হইবে; পরে মুখের দিকে চাহিয়া মনে করিলেন, কোন ছদ্মবেশী রাজরাণী হইবে। কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি চাও?"

"শিশুকে ছুটো চুমো খেতে চাই।"

"তা' খেও এর পরে; এখন ছুটো ভাত খাবে?"

"তোমরা ব্রাহ্মণ?"

"হ্যা।"

"তবে খেতে পারি—আজ দু'দিন পেটে কিছু পড়ে নি।"

"আহা! এস দিদি, দাওয়ায় এসে ব'স—আমি হাত-পা ধোবার জল আনি।"

অতিথি দাওয়ায় আসিয়া বসিল। তাহার পৃষ্ঠে একটা দীর্ঘ ঝুলি ছিল, তাহা দাওয়ায় রাখিল এবং একটু আরামের নিশ্বাস ফেলিল। গৃহস্বামিনী সত্বর জল ও গামছা আনিলেন। সেই সময়ে গৃহস্বামীও যন্ত্রাদি হস্তে দাওয়ার নীচে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রমণী তাঁহাকে দেখিল; দেখিয়া ধীরে ধীরে উঠিল—দাওয়ার নীচে নামিল এবং একটু একটু করিয়া গৃহস্বামীর সমীপস্থ হইল। তার পর চীৎকার করিয়া উঠিল, "এত দিনে তোমাকে পেয়েছি গো!"

"কে, সরলা?"

"এইবার প্রাণ, তুমি এ দেহ ছেড়ে যেতে পার, তোমার কায শেষ হয়েছে।"

সরলা নগেন্দ্রনাথের পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল। গৃহস্বামিনী মাঝে পড়িয়া সরলাকে উঠাইলেন এবং আনন্দকম্পিত কণ্ঠে ডাকিলেন, "দিদি, দিদি!"

সরলা তাঁহার মুখ পানে চাহিল। তিনি কহিলেন, "আমাকে চিনতে পারছ না, দিদি? আমি যে তোমার আদরের ছোট বোন্ বিমলা—বিলা।

"তুই সেই বিলা?"

নগেন্দ্রনাথ কহিলেন, "হাঁ, এই তোমার আদরের বিলা, যার কথা তুমি প্রতিদিনই বলতে। আমি তোমাকে হারিয়ে তোমার যেটুকু কুড়ায়ে পাই, সেই লোভে—সেই আশায় বিলাকে বিয়ে করেছি।"

দাওয়া হইতে শিশু কহিল, "বাবা, তোমার বাজনাটার মত এই ঝুলির ভেতর একটা বাজনা রয়েচে।"

সরলা কহিল, "তোমার সেই বেহালা—"

বিমলা কহিল, "দিদি, ওঠ, তোমার ঘরে তুমি এস।"

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

দরদী

মনের মানুষ নাই রে আমার নাই দরদী নাই,
ব্যথার ব্যথী চাই রে আমি মনের মানুষ চাই।
না জানি সে আসবে কখন্
করবে সফল সোণার স্বপন
দিন-রজনী চেয়ে থাকি পথের পানে তাই,
অবুঝ আমার মনের কোন ঠিক-ঠিকানা নাই।

ওই শাওনের নূপুরধ্বনি
গাইছে তাহার আগমনী,
ডাকছে দেয়া ফুটল কেয়া খোঁজ ত তাহার নাই।
আজ যে আমার ভাঙ্গা ঘরে
অঝোর ধারে বাদল ঝরে
হঠাৎ যদি আসে সে জন কোথায় দেব ঠাঁই!

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

কাব্য-সাহিত্যে বিহারীলাল

আজ সাহিত্যজগতে বাঙ্গালার কাব্য-সাহিত্য যে একটা বিশিষ্ট গৌরবময় স্থান অধিকার করিয়াছে, সে কথা অকুণ্ঠিতভাবে স্বীকার করিতেই হইবে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অসামান্য প্রতিভা ও একনিষ্ঠ সাহিত্য-সাধনার দ্বারা বঙ্গসাহিত্যকে সকল দিক দিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কিন্তু প্রতিভা থাকিলেও প্রেরণা আবশ্যক। সেই সুপ্রেরণা রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের অপূর্ব্ব রচনার মধ্যে পাইয়াছেন এবং তিনি সুকবি বিহারীলালকে তাঁহার "কাব্যগুরু" বলিয়া সসম্মানে স্বীকারও করিয়াছেন।

যাহা হউক, বাঙ্গালার কাব্য-সাহিত্যে বিহারীলালের দান সুপ্রচুর না হইলেও যাহা তিনি দিয়াছেন, তাহা তাঁহার অন্তরের অনবদ্য দান। বিহারীলালের কাব্য কোন্ শ্রেণীর এবং কাব্য-সাহিত্যে তাঁহার স্থান কোথায়, ইহা নির্ণয় করা সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। কিন্তু এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, তৎকালীন কবিদিগের মধ্যে বিহারীলালের স্থান সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ না হইলেও একটি দিকে তিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন—সেটি তাঁহার অপূর্ব্ব সুষমামণ্ডিত ভাব-সৃষ্টির ক্ষমতা এবং সঙ্গে সঙ্গে সহজ, সুন্দর এবং সরল কবিতার বিকাশ। বিহারীলালের রচনার মধ্যে কোথাও একটুকু কৃত্রিম বা কষ্টার্জ্জিত ভাব নাই—রচনাগুলি আপনাদের সহজ সৌন্দর্য্যে পরিপুষ্ট। এই প্রসঙ্গে বিশ্ববরেণ্য রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "বিহারীলালের ছন্দে মিলের এবং ভাষার দৈন্য নাই। তাহা প্রবহমান নির্ঝরের মত সহজ সঙ্গীতে অবিশ্রাম ধ্বনিত হইয়া চলিয়াছে। ভাষা স্থানে স্থানে সাধুতা পরিত্যাগ করিয়া অকস্মাৎ অশিষ্ট এবং কর্ণপীড়ক হইয়াছে, ছন্দ অকারণে আপন বাঁধ ভাঙ্গিয়া স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু সে কবির স্বেচ্ছাকৃত; অক্ষমতাজনিত নহে। তাঁহার রচনা পড়িতে পড়িতে কোথাও এ কথা মনে হয় না যে, এইখানে কবিকে দায়ে পড়িয়া মিল নষ্ট বা ছন্দ ভঙ্গ করিতে হইয়াছে।" ("বিহারীলাল" সাধনা, ১৩০১ আষাঢ়) রবীন্দ্রনাথের উপরি-উক্ত কথাগুলিই বিহারীলালের সহজ সৃষ্টির সুন্দর পরিচয়।

কবিতার সৃষ্টি সার্থক হয় তখনই—যখনই তাহা উচ্চ চিন্তার ধারার সহিত সাবলীল ছন্দে গ্রথিত হয়। বিহারীলালের রচনার মধ্যে এইরূপ সার্থক এবং শ্রেষ্ঠ কবিতার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার রচনা পাঠকালে অতি অনায়াসেই বিহারীলালকে এক জন উচ্চদরের কবি বলিয়া ধারণা হয়। পূজনীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সত্যই বলিয়াছেন—"বিহারী বাবু সর্ব্বদাই কবিত্বে মশগুল থাকিতেন, তাঁহার হাড়ে হাড়ে, প্রাণে প্রাণে কবিত্ব ঢালা থাকিত; তাঁহার রচনা তাঁহাকে যত বড় কবি বলিয়া পরিচয় দেয়, তিনি তাহা অপেক্ষাও অনেক বড় কবি ছিলেন।" ("বিহারীলালের গ্রন্থাবলী" নামক পুস্তকে "জীবনী ও সমালোচনা" প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।)

বিহারীলালের রচনার মধ্যে "বঙ্গসুন্দরী" ও "সারদামঙ্গল"—তাঁহার অপরূপ ও গৌরবময় কীর্ত্তি। এই দুইখানি কাব্য পড়িবার সময় পাঠকের মন স্বতঃই উচ্চভাবে ধ্বনিত হইতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে দরদী কবির বিরাট মনুষ্য-হৃদয়ের প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা আপনি নত হইয়া আসে। কবি 'বঙ্গসুন্দরী'র প্রথম সর্গে লিখিয়াছেন :—

"কভু ভাবি সমুদ্রের ধারে,
যথা যেন গর্জ্জে একেবারে
প্রলয়ের মেঘসজ্ঞ ;
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভঙ্গ
আক্রমিছে গর্জ্জিয়া বেলারে।"

* * *

"কভু ভাবি পল্লীগ্রামে যাই,
নাম ধাম সকল লুকাই,
চাষীদের মাঝে রয়ে,
চাষীদের মত হয়ে,
চাষীদের সঙ্গেতে বেড়াই।"

উপরে উদ্‌ধৃত শ্লোকগুলির মধ্যে কবির হৃদয়ের এমন একটা নিরুত্ত সুর ঝঙ্কৃত হইতেছে, যাহা তৎকালীন কবিদিগের মধ্যে দুর্লভ ছিল। বিহারীলালের কবিতার মধ্যে এক দিকে সরলতার ছোট ছোট হাসি আনন্দ এবং অন্য দিকে সংসারের গভীর বিষয়ে অপূর্ব্ব অনুসন্ধিৎসা। এই দুইয়ের সমাবেশে বিহারীলালের কাব্যজগৎ এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। বিহারীলালের "বন্ধুবিয়োগ" নামক কাব্য হইতে সামান্য একটু রঙ্গরসের নমুনা নিয়ে দেওয়া গেল :—

"তুলার বস্তার মত উঠিতেছে ঢেউ,
ঝাঁপাতেছে, লাফাতেছে, গড়াতেছে কেউ।
আহ্লাদের সীমা নাই, হো হো ক'রে হাসি,
নাকে মুখে জল ঢুকে চক্ষু বুজে কাসি।"

এই কয়টি কথার ভিতর কেমন একটি অনাবিল আনন্দের শুভ্র স্বচ্ছ হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

বিহারীলাল সাংসারিক মানুষ হিসাবে এক জন আত্মনির্ভরশীল, সৎসাহসী এবং অমিততেজঃশালী লোক ছিলেন। তিনি তাঁহার জীবনে নিজের নিজত্বকে পরিপূর্ণভাবে বজায় রাখিয়াছিলেন এবং সেই নিজ স্বভাব তাঁহার রচনার মধ্যে আমরা বেশ পরিপূর্ণভাবেই অনুভব করি। বিহারীলালের নিজস্বভাব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"বিহারীলাল তখনকার ইংরাজী ভাষায় নব্যশিক্ষিত কবিদিগের ন্যায় যুদ্ধবর্ণনাসঙ্কুল মহাকাব্য, উদ্দীপনাপূর্ণ দেশানুরাগমূলক কবিতা লিখিলেন না এবং পুরাতন কবিদিগের ন্যায় পৌরাণিক উপাখ্যানের দিকেও গেলেন না—তিনি নিভৃতে বসিয়া নিজের ছন্দে নিজের মনের কথা বলিলেন। তাঁহার সেই স্বগত উক্তিতে বিশ্বহিত, দেশহিত অথবা সভামনোরঞ্জনের কোন উদ্দেশ্য দেখা গেল না। এই জন্য তাঁহার সুর অন্তরঙ্গরূপে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া সহজেই পাঠকের বিশ্বাস আকর্ষণ করিয়া আনিল।" (সাধনা—১৩০১ আষাঢ়)। কবির নিজস্ব ভাবের এবং সারল্যের পরিচয় 'বঙ্গসুন্দরী'র নিম্নলিখিত শ্লোকগুলিতে বেশ পাওয়া যায়—

"বাজাইয়ে বাঁশের বাঁশরী
শাদা সোজা গ্রাম্য গান ধরি,
সরল চাষার সনে
প্রমোদ-প্রফুল্লমনে
কাটাই আনন্দে শর্ব্বরী।"

* * *

"বরষার ঘোর নিশায়,
সৌদামিনী মাতিয়ে বেড়ায়,
ভীষণ বজ্রের নাদ,
ভেঙে যেন পড়ে ছাদ,
বাবু সব কাঁপেন কোঠায়।"

* * * *

"সে নিশায় আমি ক্ষেত্র-তীরে,
নড়্‌বোড়ে পাতার কুটীরে,
স্বচ্ছন্দে রাজার মত,
ভূমে আছি নিদ্রাগত
প্রাতে উঠে দেখিব মিহিরে।"

কি সুন্দর সারল্যের মধ্য দিয়া কবি তাঁহার হৃদয়ের অনাবিল স্বচ্ছতা ও শুভ্রতা প্রকাশ করিয়াছেন!

"প্রেম কত ত্যাগী—কত পরবশ"—"নারী কত মহীয়সী!"—ইহার পরিচয় "বঙ্গসুন্দরী"র ছত্রে ছত্রে পাওয়া যায়। নারীজাতিকে বিহারীলাল সমগ্র অন্তর দিয়া শ্রদ্ধা করিতেন এবং মিথ্যা আচারের দোহাই দিয়া নারীজাতির প্রতি অবিচার করাকে তিনি কাপুরুষতা মনে করিতেন। ইহার প্রমাণ বিহারীলালের রচনার মধ্যে বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়। "বঙ্গসুন্দরী"র মধ্যে 'নারীবন্দনা' কবিতাটি একটি শ্রেষ্ঠ রচনা। 'নারীবন্দনা'র কিয়দংশ নিম্নে উদ্‌ধৃত হইল।—

"জগতের তুমি জীবিত-রূপিণী
জগতের হিতে সতত রতা,
পুণ্য তপোবন-সরলা হরিণী,
বিজন-কানন-কুসুম লতা।"

* * *

"প্রেমের প্রতিমা, স্নেহের সাগর,
করুণা-নির্ঝর, দয়ার নদী,
হতো মরুময় সব চরাচর,
না থাকিতে তুমি জগতে যদি।"

* * *

"আননে, লোচনে, কপোলে, অধরে,
সে হৃদি-কানন-কুসুম-রাশি—
আপনা আপনি আসি থরে থরে,
হইয়ে রয়েছে মধুর হাসি।"

* * *

"অয়ি ফুলময়ী প্রেমময়ী সতী,
সুকুমার নারী, ত্রিলোক-শোভা,
মানস-কমল কানন-ভারতী,
জগজন-মন-নয়ন-লোভা!"

নারীজাতি নানা রূপে এবং নানা ভাবে এই বাস্তবের বিশ্বটিকে যে একটি মায়াপুরী করিয়া রাখিয়াছেন, ইহার পরিচয় আমরা আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাপনের মধ্যে বেশ অনুভব করি। কবি বিহারীলাল 'বঙ্গসুন্দরী'তে নারীজাতির পবিত্র মূর্ত্তিগুলিকে চিত্রিত করিয়া তাঁহার অপূর্ব্ব রূপদক্ষতার পরিচয়ই দিয়াছেন। 'সুরবালা'-শীর্ষক কবিতাটিতে কবি বলিয়াছেন—

"এক দিন দেব তরুণ তপন,
হেরিলেন সুরনদীর জলে;
অপরূপ এক কুমারী-রতন,
খেলা করে নীল-নলিনী-দলে।"

* * * *

"বিকসিত নীল-কমল-আনন,
বিলোচন নীল-কমল হাসে;
আলো ক'রে নীল-কমল-বরণ,
পূরেছে ভুবন কমল-বাসে।"

উচ্চধারার চিন্তার সহিত উচ্চাঙ্গের ভাষার কি অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ। 'চিরপরাধীনী' কবিতাটিতে কবি বাঙ্গালার সহনশীলা রমণীগণের হৃদয়ের গোপন ব্যথার একটু ইঙ্গিত দিয়াছেন। সমাজের মিথ্যা শাসনের চাপে নারীজাতি দেহে মনে পঙ্গু হইয়া থাকুক—কোন প্রতীকারের প্রয়োজন নাই, এ মনোভাবকে বিহারীলাল অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। নিম্নলিখিত উদ্ধৃত অংশগুলিতে উদার মনুষ্যহৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়—

"অনায়াসে দাসী ছেড়ে চ'লে যায়,
খামকা গঞ্জনা সহিতে নারি;
অভাগীর নাই কিছুই উপায়,—
কেনা-দাসী আমি কুলের নারী।"

* * * *

"শুনেছি পুরাণে রাজা ভগীরথ,
অনেক কঠোর তপের বলে,
পূরায়েছিলেন নিজ মনোরথ,
গঙ্গারে আনিয়ে এ মহীতলে।"

* * * *

"সেই ভাগীরথী পতিত-পাবনী
দুয়ারের কাছে বলিলে হয়;
শুনি ঘরে থেকে দিবস-রজনী,
কুলু কুলু ধ্বনি করিয়ে বয়।"

* * * *

"তাঁহার পাবন দরশ পরশ,
কপালে আমার ঘটেনি কভু,
স্নান করিবারে চাহি যে দিবস,
ধমকায়ে মানা করেন প্রভু।"

নারীজাতির দুঃখ প্রাণ দিয়া অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি অতি সহজভাবে তাঁহাদের প্রাণের কথা বলিতে পারিয়াছেন।

"বিরহিণী" নামক কবিতাটিতে পরম প্রণয়িনী তাঁহার পরম প্রেমাস্পদকে ধ্যান করিতে করিতে বলিতেছেন—

"পবন তোমায় চামর ঢুলায়,
কানন যোগায় কুসুমভার;
পাখীরা ললিত বাঁশরী বাজায়,
ধরায় আমোদ ধরে না আর।"

মনুষ্যহৃদয়ের সঙ্গে প্রকৃতির কিরূপ নিবিড় সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে, উপরে উদ্ধৃত অংশই তাহার পরিচয়।

কবির অসামান্য কাব্য "বঙ্গসুন্দরী"র সামান্য কিছু আলোচনার পর তাঁহার আর একটি কাব্যকীর্ত্তি "সারদামঙ্গল" সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা বোধ হয় অশোভন হইবে না। "বঙ্গসুন্দরী" পড়িতে পড়িতে একটা বেশ সামঞ্জস্যের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু "সারদামঙ্গল" পড়ার সময় কেমন যেন মাঝে মাঝে একটু পথহারা হইতে হয়। তথাপি এ কথা বলা যায় যে, "সারদামঙ্গলে" সামঞ্জস্যের বিশেষ ধারা না পাইলেও ইহা কাব্যের উপাদানে "বঙ্গসুন্দরী" অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে, বরং ইহার দাবী আরও বেশী। কবি কোন উদ্দেশ্য লইয়া "সারদামঙ্গল" রচনা করেন নাই, এ কথা তাঁহারই লিখিত এক পত্রে পাওয়া যায়। (বিহারীলালের গ্রন্থাবলীতে কবির একখানি পত্র দ্রষ্টব্য)। যাহা হউক, যদিও কবি কোন কিছুকে কেন্দ্র করিয়া "সারদামঙ্গল" রচনা করেন নাই, তথাপি এই কাব্যের মধ্যে বেশ একটি স্বর্গীয় সুরের সন্ধান পাওয়া যায়। কবি "সারদামঙ্গলে"র তৃতীয় সর্গে লিখিয়াছেন—

"বিচিত্র এ মত্তদশা,
ভাবভরে যোগে বসা,
হৃদয়ে উদার জ্যোতি কি বিচিত্র জ্বলে!
কি বিচিত্র সুরতান
ভরপূর করে প্রাণ,
কে তুমি গাহিছ গান আকাশমণ্ডলে!"

উপরে উদ্ধৃত শ্লোকটি কবির নিজের সম্বন্ধে অবিকল বলা যায়। বিহারীলালের রচনার মধ্যে (বিশেষতঃ "সারদামঙ্গলে") 'ভাবভরে যোগে বসা'র চিত্র আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়। অনন্ত আকাশের দিকে চাহিয়া যোড়-হস্তে বাস্তবিকই বলিতে ইচ্ছা করে—'কে তুমি গাহিছ গান আকাশমণ্ডলে!' 'সারদা-মঙ্গলে'র কবির আজও যেন গান গাওয়া শেষ হয় নাই। এই কাব্যটি যদিও একটি সীমাকে কেন্দ্র করিয়া বিকাশ পাইয়াছে, তথাপি ইহা অসীম সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি। ভিন্ন ভিন্ন উচ্চ চিন্তার ধারার ভিতর দিয়া 'সারদামঙ্গলে' যেন একটি স্বর্গীয় সৌরভের সন্ধান মিলে। "সারদামঙ্গলের" অসামান্য মহিমার সম্বন্ধে মনীষী রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়াছেন—"সারদামঙ্গল এক অপরূপ কাব্য। প্রথম যখন তাহার পরিচয় পাইলাম, তখন তাহার ভাষার ভাবে এবং সঙ্গীতে নিরতিশয় মুগ্ধ হইতাম, অথচ তাহার আদ্যোপান্ত একটা সুসংলগ্ন অর্থ করিতে পারিতাম না। যেই একটু মনে হয়, এইবার বুঝি কাব্যের মর্ম্ম পাইলাম, অমনি তাহা আকার পরিবর্ত্তন করে। সূর্য্যাস্তকালের সুবর্ণ-মণ্ডিত মেঘমালার মত সারদামঙ্গলের সোনার শ্লোকগুলি বিবিধ রূপের আভাস দেয়, কিন্তু কোন রূপকে স্থায়িভাবে ধারণ করিয়া রাখে না, অথচ সুদূর সৌন্দর্য্য-স্বর্গ হইতে একটি অপূর্ব্ব পূরবী রাগিণী প্রবাহিত হইয়া অন্তরাত্মাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতে থাকে।" ("বিহারীলাল"—সাধনা, ১৩০১, আষাঢ়)।

"সারদামঙ্গলের" প্রথমেই কবি উষার অপূর্ব্ব বর্ণনা করিয়াছেন।

"হয় হয় প্রায় ভোর,
ভাঙো ভাঙো ঘুমঘোর
সুস্বপ্ন-রূপিণী উনি, উষারাণী সবে বলে!
বিরল তিমির-জাল,
শুভ্র অভ্র লালে লাল
মগন তারকারাজি গগনের নীল জলে!
তরুণ কিরণাননা
জাগে সব দিগঙ্গনা,
জাগেন পৃথিবী দেবী সুমঙ্গল কোলাহলে!"

উষার অরুণ আলো পাইয়া পৃথিবীর 'সুমঙ্গল কোলাহলে' [illegible]গিয়া উঠার কি পবিত্র ও বিচিত্র বর্ণনা! 'সারদামঙ্গলের' [illegible]ীয় সর্গে কবি হিমাদ্রির দৃঢ়তা সহ বলিতেছেন—

"ধর, আত্মা, ধৈর্য্য ধর,
ছি ছি এ কি কর কর,
মর যদি, মরা চাই মানুষের মত;
থাকি বা প্রিয়ার বুকে,
যাই বা মরণ-মুখে,
এ আমি আমিই রব, দেখুক জগত।"

কি বীরত্বব্যঞ্জক মনুষ্যত্বের গুরু গম্ভীর ঝঙ্কার! আত্ম-নির্ভরতার উপর হৃদয়ের কি সশ্রদ্ধ নিবেদন!

কবি বিহারীলালের উচ্চ ধারার চিন্তার সহিত পরিষ্কার ভাষা-সৃষ্টির ক্ষমতার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কবি যখনই নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করিয়াছেন, তখনই তিনি সরল সহজ ভাষার ভিতর দিয়া প্রকৃতিকে এক অপূর্ব্ব কমনীয়তায় আমাদের কাছে মূর্ত্ত করিয়াছেন। নিম্নে উদ্ধৃত শ্লোকগুলিই তাহার প্রমাণ:—

"ঝটিকা দুরন্ত মেয়ে,
বুকে খেলা করে ধেয়ে,
ধরিত্রী গ্রাসিয়া সিন্ধু লোটে পদতলে।
জলন্ত অনল ছবি
ধ্বক্ ধ্বক্ জলে রবি,
কিরণ জলন-জ্বালা মালা শোভে গলে।"

*　　　*　　　*

"কিবা ওই মনোহারী,
দেবদারু সারি সারি
দেদার চলিয়া গেছে কান্তারে কান্তার।
দূর দূর আলবালে,
কোলাকুলি ডালে ডালে,
পাতার মন্দির গাঁথা মাথায় সবার।"

মোট কথা, বিহারীলালের রচনাগুলি বাঙ্গালা সাহিত্যে এক অমূল্য সম্পদ। তাঁহার প্রত্যেক কাব্যের মধ্যে যেন একটি যোগসম্ভূত ভাবের সন্ধান পাওয়া যায়। "এমন নির্ম্মল সুন্দর ভাষা, এমন ভাবের আবেগ, কথার সহিত এমন সুরের মিশ্রণ আর কোথাও পাওয়া যায় না।" কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিহারীলালের অসামান্য কাব্যপ্রতিভা বাঙ্গালার সাহিত্যানুরাগী-দিগের নিকট তাহার যথার্থ সম্মান পায় নাই। সুকবি অক্ষয়-কুমারের কথায় বলিতে ইচ্ছা করে—

"এসেছিল শুধু গায়িতে প্রভাতী,
না ফুটিতে উষা, না পোহাতে রাতি—
আঁধারে আলোকে, প্রেমে মোহে গাঁথি,
কুহরিল ধীরে ধীরে;
ঘুম-ঘোরে প্রাণী, ভাবি স্বপ্নবাণী,
ঘুমাইল পার্শ্ব ফিরে।"

"দেখিল না কেহ, জানিল না কেহ,—
কি অতল হৃদি, কি অপার স্নেহ!
হা ধরণী, তুই কি অপরিমেয়,
কি কঠোর, কি কঠিন!
দেবতার আঁখি কেন তোর লাগি
রহে জাগি নিশিদিন?"

'দেখিল না কেহ, জানিল না কেহ'—'কি অতল হৃদি, কি অপার স্নেহ'—এই যে আক্ষেপের সুর, ইহা এক দিন অবশ্যই বিদায় লইবে। প্রতিভার অসামান্য বরপুত্র রবীন্দ্রনাথ সত্যই বলিয়াছেন,—"এক কথা সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি, সাধারণের পরিচিত কণ্ঠস্থ শত সহস্র রচনা যখন বিনষ্ট এবং বিস্মৃত হইয়া যাইবে, সারদামঙ্গল তখন লোকস্মৃতিতে প্রত্যহ উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিবে এবং কবি বিহারীলাল যশঃস্বর্গে অম্লান বরমাল্য ধারণ করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের অমরগণের সহিত একাসনে বাস করিতে থাকিবেন।" ('বিহারীলাল'—সাধনা ১৩০১ আষাঢ়) রবীন্দ্রনাথের এ ভবিষ্যদ্বাণী নিশ্চয়ই সফল হইবে। বিহারীলালের 'ভাবভরে যোগে বসা' বৃথা নহে।

শ্রীসুধীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

—

নারী-ধর্ম্ম

নিখিল মানব-বিশ্বের যুগল জ্যোতিষ্ক নরনারী—সূর্য্য ও চন্দ্র। একটি জাগরণ-দীপ্তিতে জ্যোতিষ্মান্, অপর শান্তির ঔজ্জ্বল্যে জ্যোতির্ম্ময়ী। পুরুষ উৎসাহ উদ্দীপনা, নারী তৃপ্তি। একটি কর্ত্তব্য, অপরটি স্নেহমায়া। একের মধ্যে যুক্তি, অন্যের অন্তরে অনুরাগ। প্রথমতঃ স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই সমজাতীয় অর্থাৎ মানব! কিন্তু জাতিত্বের ঐক্য থাকিলেও উভয়ের মধ্যে মূলতঃ অনৈক্য রহিয়াছে। পরস্পর বিপরীতধর্ম্মী। প্রকৃতি-নির্দ্দিষ্ট যে শক্তি নর-চরিত্রের বিশিষ্টতা সম্পাদন করিয়াছে, স্ত্রী-স্বভাবে তাহার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। উভয়ের আভ্যন্তরীণ পার্থক্য, শারীরিক বিভেদেও অভিব্যক্ত। পুরুষের দেহে দার্ঢ্য এবং কঠোরতা বিদ্যমান; যাহা সংগ্রামেরই একান্ত উপযুক্ত। নারীর দেহ-কান্তিতে ললিত কমনীয়তা লীলায়িত, যাহা পৌরুষের সম্পূর্ণ বিপরীত। নারীরূপে কোমলতাই পরিস্ফুট। উহা যেন লতার মত পর-আশ্রয়-অপেক্ষী। ঐ ললিত-ভঙ্গিমা নারীর স্নেহপরায়ণতারই পরিচায়ক। নর-নারী উভয়ে মানব। যাহা মানব-ধর্ম্ম, তাহাই উভয়ের ধর্ম্ম। তবুও পরস্পরের কর্ত্তব্যে বিভিন্নতা বর্ত্তমান।

প্রত্যেক ব্যষ্টি-মানব দেখিতে একটি একক জীব। যেন প্রত্যেকে পরস্পর বিভিন্ন। বাস্তবতঃ মানব-সমাজে এক হইতে অন্যটি সংস্রব-শূন্য; কাহারও সহিত কাহারও কোন সংযোগ —কোন বন্ধনমাত্র নাই; বস্তুতঃ তাহা নহে। সমষ্টির সহিত ব্যষ্টি মানবের নিগূঢ় ঐক্য রহিয়াছে। এক এক জন ব্যক্তি সমষ্টির অংশ ও অঙ্গ। তাই মণ্ডলীর সহিত এককে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে হয়। ব্যক্তি জীবনের দৈহিক এবং মানসিক স্বাতন্ত্র্য থাকিলেও বাস্তবিক পক্ষে কাহারও চিন্তায় ও আচরণে, কার্য্যে এবং কামনায় বিন্দুমাত্র স্বাধীনতা নাই। যে স্বাধীনতাটুকু আছে, তাহা একটা নির্দ্দিষ্ট শৃঙ্খলতাকে কেন্দ্র করিয়া।

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজ মানবতার সংরক্ষক ও পরিপোষক। আবার সমাজও মানবকে ছাড়িয়া একটা অতিরিক্ত বিশেষ কোন সত্তা নহে। ব্যক্তি মানবের সুখ সুবিধার প্রণালী-বদ্ধ নৈতিক প্রতিষ্ঠানই সমাজ। ইহার স্থূল কোন আকার না থাকিলেও ব্যবহারিক অবয়ব আছে। ব্যক্তি যখন নিয়মভঙ্গ করিয়া শৃঙ্খলার মাঝে অসামঞ্জস্য ঘটায়, তখনই উহা বিধিরূপে প্রকটিত হইয়া সমষ্টি মানবের শান্তিরক্ষা করে। অপর সময়ে প্রত্যেক চিত্তটিই সমাজ-শক্তির দ্বারা গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত। নিয়মানুবর্ত্তী মানব-মন সমাজেরই সৃষ্টি।

নর হউক বা নারীই হউক, সকলেই সমাজের অন্ত হইতে বাধ্য। এই বাধ্যতা সমাজের জন্য নহে, ব্যক্তির মঙ্গলের জন্যই। প্রবৃত্তির অবাধ গতিকে সংরুদ্ধ না করিলে দশের মধ্যে স্থানলাভ সুকঠিন। আবার দশকে বর্জ্জন করিয়া একাকী থাকিলেও স্বেচ্ছাচারিতায়, কামনার উচ্ছৃঙ্খলায় সুখ-প্রাপ্তি অসম্ভব। মানব-মন নিয়ম-নিয়ন্ত্রিত, বিধিবদ্ধ। এই নীতি-নিয়ম আবার স্ত্রী-পুরুষভেদে বিভিন্ন। পুরুষের যাহা আচরণীয়, স্ত্রীলোকের তাহা অকর্ত্তব্য। ইহা স্বভাবসঙ্গতও বটে, সমাজ-শৃঙ্খলার জন্য অপরিহার্য্যও বটে।

জীবনযাত্রায় নানা স্তর, নানা অধিকার, নানাবিধ কার্য্য। এই বিবিধ বিষয় বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে শক্তির অনুযায়ী বিভাজ্য। সকলের এক প্রকার কার্য্য-কুশলতাও নাই, শক্তিও নাই। পুরুষ তাহার জন্মগত যে বীর্য্য, যে ওজস্বিতা লাভ করিয়াছে, তাহাতে সে সর্ব্ববিধ কঠিন কার্য্যেরই উপযুক্ত। নারী আবার তাহাতে অক্ষম। যদি সমর্থ হইতে চাহে, তাহা কৃচ্ছ্র কর্ম্ম;—একান্তই অস্বাভাবিক।

...দ্ধ-কর্ম্ম রমণী-জাতির স্বভাব-বিরুদ্ধ। সেই প্রকার সন্তান-পালনও পুরুষের পক্ষে একান্তভাবে অসাধ্য। ইহা যে কেবল অনভ্যাসের ফল, তাহা নহে। ইহা একান্ত প্রকৃতি-সম্মত। জলের শীতলতা ও অগ্নির উত্তাপ স্বাভাবিক। ইহা বিধাতৃবিধান এবং অপরিবর্ত্তনীয়। পুরুষ জনক, রমণী জননী। পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব দুইটিই ভিন্ন ধর্ম্ম। পরস্পর পরিবর্ত্তন চলে না। জোর করিয়াও একটি অন্যটির স্বভাব ও শক্তি আয়ত্ত করিতে পারে না। বিদ্রোহী হইয়া এমন করিতে চাহিলে পরস্পরের চরিত্রে একটি কর্কশতা জন্মায়—যাহাতে জীবনের সহজ গতি বিকৃত হইয়া একান্ত অস্বাভাবিক হয়।

জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই মাতৃত্বের শক্তি স্ত্রী-চরিত্রের অঙ্গীভূত হইয়া যায়। তাই নারীর জননীত্বের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য অস্বীকার করা জীবনকেই অস্বীকার করার মত অস্বাভাবিক। ক্ষুধা-তৃষ্ণা, হাসি-কান্না যেমন স্বাভাবিক, জীবনধর্ম্মে মাতৃত্বও তেমনই সহজ। অন্য দিকে নেতৃত্ব ও পৌরুষতা নরধর্ম্ম। নরজন্ম যে লাভ করিয়াছে, সেই ইহার অধিকারী। প্রবৃত্তির উত্তেজনায় ইহার বিরুদ্ধতা অসম্ভব এবং অকল্যাণকর। পুরুষের স্ত্রীত্ব ও নারীর পৌরুষ সৃষ্টির প্রতিকূল অবস্থা। নর-নারীর ধর্ম্ম বিধিনির্দ্দিষ্ট। জন্মেই উহা সুনিয়ন্ত্রিত। জনকত্ব এবং মাতৃত্ব পরস্পরের কর্ত্তব্য ও জীবনধর্ম্মকে স্থির নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে।

স্ত্রীত্বের সঙ্গে সঙ্গেই জননীত্ব বিদ্যমান। মা হইবার একটি বিশেষ গুণ, বিশেষ স্বভাব আছে—যাহা শুধু নারী-জন্মেই সম্ভব। মাতৃধর্ম্মের প্রকৃতি সমস্ত বহির্মুখীনতার, সমস্ত চাঞ্চল্যের, সর্ব্ববিধ কাঠিন্যের বিরোধী। সন্তানপালনের জন্য যে একাগ্রতা, যে আত্ম উৎসর্গযুক্ত মনোভাবের প্রয়োজন, পুরুষের পৌরুষে এবং প্রসারিত জীবনে তাহা একান্ত অসম্ভব। বিক্ষিপ্ততা স্নেহের পরিপন্থী। বাহিরের উন্মুক্ত ক্ষেত্রে চিত্তটি জুড়াইয়া ও জড়াইয়া থাকিলে একের প্রতি ঐকান্তিকতা থাকিতে পারে না। অথচ এই ঐকান্তিকতাই স্নেহের উপজীব্য।

মাতৃত্বের প্রাণ একনিষ্ঠতা—নিগূঢ় কেন্দ্রানুগতা। বাড়াইবার জন্য, বাঁচাইবার জন্য, জীবনের অমৃতরসে পুষ্ট করিয়া তুলিবার জন্যই স্নেহের এই নিষ্ঠাপূর্ণ স্থিতিশীলতা—মমতার একমুখীনতা স্বভাবজনিত। ইহা নহিলে মাতৃত্ব ও সন্তান-সংরক্ষণ সম্ভব হয় না। পুরুষের অধিকার বাহিরের মুক্ত ক্ষেত্রে। কারণ, জীবন-সংগ্রাম বাহিরেরই কাষ। নারীর প্রতিষ্ঠাপীঠ গৃহাঙ্গন। স্ত্রী গৃহলক্ষ্মী ও গৃহদীপ্তি।

বাঁচিবার আয়োজন করিতে দশ দিকে ছুটিতে হয়। উহার জন্য শান্ত নির্ভাবনায় জীবনযাপন করা অসম্ভব। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, রাষ্ট্রকার্য্যে এ সমস্তই সংগ্রামমূলক ও গৃহ-প্রতিষ্ঠার বাহিরে। ইহাতে জনকত্বের বাধা ঘটায় না। মা হইবার কিন্তু ইহা নিতান্তই বিরুদ্ধ। শিশু-পালনের জন্য যে শান্ত ভাব, যে কোমলতার প্রয়োজন, বহির্মুখ পৌরুষপূর্ণ কার্য্যে তাহা লোপ পাইয়া অন্তঃকরণ কর্কশ হইয়া যায়।

নারী স্নেহ-প্রতিমা—মমতার প্রতীক। ভালবাসার স্বভাব শান্ত, জয়বিতৃষ্ণ। প্রীতি বিশ্বের সমস্ত শ্রেয়ঃকে উপেক্ষা করিয়া প্রেয়ের মধ্যেই সমগ্র ঐশ্বর্য্যকে লাভ করিতে চাহে। স্নেহের কাছে সমগ্র আশা ও উৎসাহ, বিলাস ও বৈভব, জয়-প্রতিষ্ঠার যাবতীয় প্রচেষ্টা একান্তই তুচ্ছ। ক্ষুদ্র স্নেহের পাত্রটিই অনন্ত অমৃতের উৎস। জগতের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ, উদার আলোক এবং উৎসব সমারোহ হইতে আপনাকে সঙ্কুচিত করিয়া, বঞ্চিত করিয়া নারী যে গৃহের সঙ্কীর্ণ আয়তনে আপনাকে আবদ্ধ রাখিয়াছেন, তাহা কাহারও ভয়ে, শাসনে, বাহিরের কোন বাধ্যতায় নহে। তাহা আপনার অন্তর্য্যামীর প্রেরণা-বশেই। ইহা জীবস্থিতির বৈধ নিয়ম, একবারে কৃত্রিমতা-শূন্য। পুং-বিহঙ্গম যখন নীল নভোমণ্ডলে স্বাধীনপ্রাণে উল্লাসভরে গাহিয়া গাহিয়া বিচরণ করে, পক্ষিণী তখন নীড়ের মধ্যে শাবককে পক্ষ-আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত করিয়া বসিয়া থাকে। পুরুষ কীর্ত্তি ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি লাভের জন্য যখন উন্মত্তভাবে জগৎকে মথিয়া বেড়ায়, মা তখন সন্তানের মুখের পানে তাকাইয়া স্তন্যদান করেন। কোনও শক্তি, কোনও উত্তেজনা, কোনও আশা-আকাঙ্ক্ষা জননীকে সন্তানবিমুখী করিয়া বাহিরে আকর্ষণ করিতে পারে না। পুরুষের কাছে উৎসব ও প্রমোদ লোভনীয়, রত্ন পরম বাঞ্ছনীয়, জয় পরমাভীষ্ট, সম্মান ও প্রতিষ্ঠা ইহসংসারে অমৃততুল্য; মায়ের কাছে কিন্তু সন্তানের হাসি ও প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গিমাই এবং তাহার সেবা-যত্নই গরিষ্ঠ আনন্দ। স্নেহের কাছে স্নেহাস্পদই পরম রত্ন, হীরকও নহে, বিজয়-গরিমাও নহে।

মাতৃত্বেই স্ত্রীজাতির অধিকার এবং কর্ত্তব্য স্থির হইয়া রহিয়াছে। রাজনীতি, কৃষি, শিল্প প্রভৃতি বাহিরের কোন কাযই নারীর অবশ্যকরণীয় নহে। গৃহই নারী-জাতির নিখিল বিশ্ব, সন্তান পালনই পরম কর্ত্তব্য, স্নেহই পরমা তৃপ্তি। সমাজ-শৃঙ্খলার জন্য কর্ম্ম এবং অধিকারভেদের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। শান্তিময় জীবনযাপন করিতে হইলে সকলকেই কিছু কিছু বলি দিতে হয়। জিগীষায়, প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, বিপ্লবে সমাজশৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া যায়। সেই জন্যই একটা ব্যবস্থিত কর্ম্ম-বিভাগ। কাহারও কৃষি, কাহারও শিল্প, কাহারও বা বাণিজ্য এবং কাহারও শিক্ষকতা।

কর্ম্ম লইয়া নর-সমাজে নিত্য বিরোধ। স্ত্রীজাতি আবার তাহাতে অধিকার চাহিলে ব্যাপারটা নিতান্তই প্রলয়ঙ্কর হয়। ইহাতে গৃহ ও সমাজ উৎসন্ন যায়। কাযেই ব্যবহারিক শান্তির জন্যও নারী ও পুরুষে কর্ম্মভেদ থাকা প্রয়োজন। সংসারে বড় জিনিষ—প্রীতি প্রেম; দুর্লভ বস্তু—ভালবাসা। জড় দেহের পোষণের অভাব হয় না, হয় স্নেহ-মমতার। নারী ভালবাসার প্রস্রবণ। কর্ম্মের বালু-মরুতে নামাইয়া তাহাকে শুকাইয়া ফেলা নিতান্তই অকল্যাণকর। নারীর পক্ষেও তাহা আনন্দের নহে, পুরুষের পক্ষেও সুখকর নহে। কর্ম্ম অপেক্ষা ভালবাসায় তৃপ্তি অধিক; জয় অপেক্ষা শান্তিতে সমধিক তৃপ্তি। ইহা একান্ত কল্পনা নহে, নিত্য প্রত্যক্ষ ব্যাপার। স্নেহপ্রবণে হৃদয় সর্ব্বদাই পরিতৃপ্ত এবং সংগ্রাম-বিতৃষ্ণ হইয়া থাকে।

বাঁচিয়া থাকিবার জন্য কর্ম্মচাঞ্চল্যও প্রয়োজন। পুরুষের থাকুক কর্ম্মাধিকার, স্ত্রীলোকের মমতা। নারীর দিক হইতে এইরূপ একটা আপত্তি উঠা সম্ভব যে, কেন, ইহার বিপরীত হউক না? কিম্বা ঘর ও বাহিরে সমানাধিকার থাকুক। এই আপত্তির সহজ উত্তর, নারীমুখেই নারীর হৃদয়েই নিত্য রণিত হইতেছে। মাতৃত্বই নারী-জীবনের চরম সার্থকতা। মা ইহা অবগত আছেন এবং অহরহ অনুভব করেন। সন্তান হইতে বিচ্যুত করিয়া জননীকে স্বর্গের প্রতিও প্রলুব্ধ করা যায় না। তাহার পর যে পরিবর্ত্তনের কথা হইয়াছে বা হইতে পারে, তাহাতে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে, রমণী-দেহই ঘোষণা করিতেছে যে, উহা সংগ্রামসংঘর্ষ বা পারুষ্যের অনুপযুক্ত।

অভাবে সকলই সম্ভব। বাহিরের কাযে লোকাভাব হইলে সমাজের সুবিধার জন্য নারীকে সহযোগিনী করিলেও ক্ষতি ছিল না। অবস্থার মত ব্যবস্থায় কখনও কোন বাধা নাই বা হইতে দেওয়া উচিত নহে। যখন বাহিরের কাযে পুরুষের অত্যন্ত অভাব ঘটিবে, তখন সমাজের প্রয়োজনই একটা সুমীমাংসা করিয়া ফেলিবে এবং তাহা একান্তই স্বাভাবিক হইবে। আগে হইতে জোর করিয়া স্ত্রীজাতিও মানুষ, এই যুক্তিতে স্ত্রী-পুরুষের মাঝে সাম্যস্থাপনপ্রচেষ্টা সমাজবিপ্লবমূলক এবং প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ, লাভক্ষতি বিচার করিয়া দেখিলেও স্ত্রীজাতির বহির্মুখীনতায় কোনই কল্যাণ নাই। যে রমণী মাতৃকর্ত্তব্য অবহেলা করিয়া পুরুষের অধিকার গ্রহণ করিতে চাহেন, তাঁহার দ্বারা তাহা সুসম্পন্ন ত হয়ই না এবং তাহাতে সুফলও ফলে না। বাহিরের উত্তেজনা সাময়িক ও অস্থায়ী।

নারীর পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক, অত্যন্ত সহজ—এক জনকে মানুষ করিয়া তোলা, একটি লোকোত্তর চরিত্রের সৃষ্টি করা। সেটি নিজ সন্তান সম্বন্ধেই সম্ভবপর। অক্লেশে গভীর আনন্দের আবেগে স্তন্যধারার সঙ্গে সঙ্গে সকল সদ্গুণে সন্তান-চরিত্রকে সমৃদ্ধ করা যায়। ইতিহাস ইহার জাগ্রত সাক্ষী। জগতের অনেক মহৎপ্রাণ—জননীরই সৃষ্টি। নারী আদর্শ-জননী হইলেই সংসারের প্রকৃত ও প্রভূত মঙ্গল সংসাধিত হয়। রাজনীতিক, বৈজ্ঞানিক, সমাজতত্ত্ববিদ্ হইলে যতখানি সমাজ-কল্যাণ হয়, তদপেক্ষা অনেক বেশী হয় একটা পুষ্ট-চরিত্র মানুষ হইলে। মাতৃত্ব নারী-জীবনের পরিণতির অবস্থা, স্ত্রীলোকের বিশেষ ধর্ম্ম। এই বিশেষত্বের পরিপুষ্টির জন্য নারীজাতির জীবন-গঠনেও একটা বৈশিষ্ট্য আছে। পুরুষের যাহা শিক্ষা-দীক্ষা, নারীর শিক্ষা দীক্ষা তাহা হইতে ভিন্ন।

অধিকারের উপযুক্ত শিক্ষাই আবশ্যক। যাহাকে যেমন কায করিতে হইবে, তাহার তেমনই ভাবে প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। উভয়েই মানুষ বলিয়া স্ত্রী-পুরুষকে একই প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া অনুচিত। তাহাতে স্বধর্ম্মের কুশলতা অর্জ্জন হয় না। স্ত্রীলোকের শিক্ষা এমন ধারায় পরিচালিত হওয়া উচিত, যাহা মাতৃত্ব-বিকাশের অনুকূল। যাহাতে নারী-চরিত্রকে স্নেহ-কোমল ও গৃহধর্ম্মে আস্থাবান্ করিয়া তোলে, তাহাই যথার্থ নারীশিক্ষা। রাষ্ট্রক্ষেত্রে এবং জীবনের অন্যান্য স্তরে পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার যে শিক্ষা, তাহা নারীর পক্ষে একান্তই অনুচিত।

নর হউক, নারী হউক—মানুষের সম্পূর্ণতা প্রীতির বিকাশে। যে ভালবাসিতে পারে, সেই সার্থকজন্মা। প্রীতি-প্রবণ যে, তাহার জ্ঞানের, কোন শিক্ষার অভাব থাকিলেও ক্ষতি হয় না। আনন্দের সম্পূর্ণতা এবং জ্ঞানের সার্থকতা ভালবাসায়। তবে জীবনের অবসর আছে। চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি জীবন-ধর্ম্ম। জ্ঞানের পিপাসা মিটাইবার জন্য অবসর ও সামর্থ্য অনুসারে স্ত্রী-শিক্ষাও প্রসারিত হইতে পারে; তবে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখা উচিত, ইহাতে যেন মাতৃত্বের বাধা না ঘটায়, বাধা ঘটিবার সম্ভাবনা না থাকে। ভোগ-প্রবৃত্তিটা বড়ই প্রবল; শিক্ষা শুধু চিত্ত-বিনোদনের জন্য হইলে, তাহা অন্য প্রবৃত্তিকে গ্রাস করিয়া ফেলে। ভোগপরায়ণতা স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের পক্ষেই অমানুষোচিত।

জ্ঞানের আর একটা প্রয়োজনীয় দিক্ ধর্ম্ম, আধ্যাত্মিকতা, তত্ত্বজিজ্ঞাসা। মনুষ্যমাত্রেরই উহা শিক্ষণীয়। কিন্তু আক্ষরিক বিদ্যায় যাহা হয়, তাহা প্রায়ই মানসিক বিলাস। ধর্ম্ম আচরণে এবং আদর্শেই সত্যরূপে শিক্ষা হয়। আর জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে উত্থিত তত্ত্বজিজ্ঞাসাই প্রকৃত জিজ্ঞাসা। ইহার জন্য দর্শন শাস্ত্রের বড় বেশী আবশ্যকতা নাই। তবে পূর্ব্ব-মনস্বীদের

চিন্তার সাহায্য লওয়া স্বাধীন চিন্তার পক্ষেও সহায়ক। সেই জন্য আধ্যাত্মিক শিক্ষার অধিকার নর-নারী-নির্ব্বিচারে সকলেরই সমান। ধর্ম্মে কখনও কোন বিপদ নাই। প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা কখনও বিলাসের বিষয় হয় না। সত্য-জিজ্ঞাসু হইয়া মননের পথ অনুসরণ করিলে কাহারও স্বধর্ম্মত্যাগপ্রবৃত্তি জন্মায় না। বরং তাহাকে দৃঢ় করে।

নারী-পুরুষের অধিকার লইয়া একটা সন্দেহ হয় যে, বিশাল বিশ্বের বিস্তারিত প্রাঙ্গণ হইতে ছিনাইয়া আনিয়া গৃহ-প্রাচীরে আবদ্ধ করা নারী-জীবনের বিষম বন্ধন। বিশ্বটা বিশাল, মানুষ কিন্তু আসে ক্ষুদ্র হইয়া এবং ক্ষুদ্র গৃহ-কোলেই। মানব-জীবনের অমৃত-রস বিশ্ব-বারিধিতে বহিয়া যায় না। ছোট ঘরের বদ্ধতার মধ্যেই তাহা নিত্য সহস্রধারায় উৎসারিত হয়। মানবের প্রতিষ্ঠাভূমি—গৃহ। গৃহের জন্যই জগতের আর সমুদয়ের প্রয়োজন। ঘর যাহার নাই, তাহার কিছুই নাই। মনুষ্যত্বের প্রস্ফুরণ প্রীতি, স্নেহ, করুণা প্রভৃতি মহৎ বৃত্তির প্রকাশ। আর ইহার জন্মভূমি গৃহ। গৃহের মমতা আছে বলিয়াই কর্ত্তব্যবোধ ও দায়িত্ব-জ্ঞান। গৃহের প্রতি যে আস্থাহীন, সে সকল মহৎ কর্ম্মের অনুপযুক্ত। জাতীয়তা, রাষ্ট্র, সাহিত্য সমুদয়েরই আবশ্যকতা ঐ গৃহের জন্য।

গৃহধর্ম্মে যে নিবিষ্ট, সে আবদ্ধ নহে, অসম্পূর্ণও নহে। সে সত্যেরই সেবক ও সেবিকা। নারীর প্রতিষ্ঠা একমাত্র গৃহে। মনুষ্যের মর্ম্মস্থানটিরই তিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবী। যেখানে আত্মীয়-স্বজন, যেখানে পূজার, সেবার ও স্নেহের সামগ্রী নিত্য বিদ্যমান, সেই স্থানকে অবহেলা করিয়া বাহিরে মত্ত হইতে যাওয়া সহৃদয়তার কায নহে, আর তাহাতে বড় বেশী ঔদার্য্যও প্রকাশ পায় না। মানবজীবনের আর একটা বড় বিষয় দাম্পত্য-সম্বন্ধ—পরিণীত জীবন। বিবাহ কেবলমাত্র যৌন আকর্ষণ নহে; উহার ভিত্তি সৃষ্টি এবং সৎ ও শোভন সৃষ্টি। যৌন আকর্ষণের ফলে স্ত্রী-পুরুষ মিলিত হয়; তাহাতে কিন্তু বংশধারার পরিপুষ্টি হয় না। এই জন্য স্ত্রী-পুরুষের মিলনব্যাপারে সংযম ও পুণ্যই হইতেছে একমাত্র ভিত্তি, হওয়াও উচিত। পরিণয়ে স্বেচ্ছাবৃত্তির ঠাঁই নাই। কারণ, উদ্দেশ্য ত ভোগ নহে—আত্মসম্প্রসারণ। আপনাকে কালের বক্ষে সংস্থাপন। মানুষ মরে, কিন্তু অমর হইয়া থাকে—সন্তানে—বংশপরম্পরায়। বিবাহ এই বংশরক্ষারই উপায়। কাযেই ইহাকে শুদ্ধমাত্র রিরংসার বিষয় করিলে লোকস্থিতির পক্ষে সমূহ অমঙ্গলজনক হইয়া থাকে।

পরিণয়-ব্যাপারেও স্ত্রী-পুরুষে বিস্তর পার্থক্য। নারীর দাম্পত্য-বন্ধন একনিষ্ঠতার উপর প্রতিষ্ঠিত। এমন না হইলে মাতৃত্বে ব্যাঘাত ঘটে। মাতৃত্ব বিপর্য্যস্ত বা উন্মার্গ-আচারী হইলে সমাজের ভিত্তি ধ্বংস হইয়া যায়। তাই পাতিব্রত্যের এমন দৃঢ়প্রতিষ্ঠা। সমাজের একটি বন্ধন অটুট থাকা উচিত। বর্ণ-সাঙ্কর্য্যে মনুষ্যত্বের বিকৃতি ঘটে। জননীর পাতিব্রত্য হইতেই পিতৃপরিচয়। নারী স্বৈরিণী হইলে বৈজিক শক্তির সাঙ্কর্য্য উপস্থিত হয়। তাহাতে চরিত্রহীন, বিকৃতবুদ্ধি সন্তান-সন্ততির উদ্ভব হয়। সেই জন্যই নারীর পাতিব্রত্যের ঐকান্তিক নিষ্ঠা, ব্রহ্মচর্য্যের দৃঢ়তা। মাতৃত্ব অব্যভি-চারিণী থাকিলে পিতৃ-বৈশিষ্ট্যও নিষ্কলুষ থাকে। প্রায়ই প্রতিবাদ উঠে যে, ইহা নিষ্ঠুরতা, পুরুষের পক্ষপাতিত্ব। পুরুষের ভোগের দিক শিথিল; নারীর কিন্তু বিষম বন্ধন। ঐ বন্ধনের কথা পূর্ব্বেই কহিয়াছি।

এই যে আপত্তি, ইহা নিতান্তই বালকোচিত। তুমি যখন অন্যায় করিতেছ, তখন আমি না করিব কেন? ইহা যুক্তি নহে, সহৃদয়তার কথাও নহে। অসংযম সকলের পক্ষেই অন্যায়। একে অন্যায় করিতেছে বলিয়া অন্যেও করিবে, ইহা দুর্ব্বুদ্ধির উপদ্রব। আর প্রবৃত্তিপরায়ণতার যে স্বাধীনতা, তাহা নিছক পাশবিকতা। মানবমাত্রেরই নিয়মে ও সংযমে সংযমিত থাকা উচিত। যেমন-প্রবৃত্তি স্বৈরিণী; উহাকে কখনই অবাধ হইতে দিতে নাই। পুরুষেরও নহে, নারীজাতিরও নহে। তাই পুরুষের নিয়মাধীনে সুস্থ ও সংযমিত জীবনযাপন নারীর পক্ষে দাস্য নহে, প্রকৃত স্বাধীনতার তপশ্চর্য্যা।

নারী—জননী, ভগিনী, কন্যা, জায়া। সংসারের ইহাই ত শ্রেষ্ঠ সম্বন্ধ। এত মর্য্যাদা, এমন অভ্যর্থনা আর কাহার রহিয়াছে? পুরুষ-হৃদয়ের সকল শ্রদ্ধার অধিকারিণীই নারী। নারী গৃহলক্ষ্মী, স্নেহের অমৃত উৎস, বিশ্ব-শক্তির প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি, প্রেম-প্রীতির জীবন্ত বিগ্রহ!

শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা।

ধর্ম্মদাস

(উপন্যাস)

পরিচ্ছেদ পাঁচ

সদানন্দ পাঠকের আত্মীয়, ধর্ম্মদাসের ভার লইতে স্বীকৃত হইলেন না। বলিলেন, সামান্য মাইনেতে ইস্কুল-মাষ্টারি ক'রে খাই, ও হাতী পুষতে আমি পারব না ভাই, তা ছাড়া বেনো জল ঘরে ঢোকাতে ভয় করে।

কিন্তু সে দিনের জন্য ধর্ম্মদাস সেখানে আশ্রয় পাইল। সদানন্দ তাড়াতাড়ি আহার করিয়া বাহির হইয়া গেলেন—ধর্ম্মদাসের অন্য কোন একটা ব্যবস্থা করিবার জন্য।

ধর্ম্মদাস বাহিরের ঘরে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। মনের মধ্যে কিন্তু তাহার একটুও নিশ্চিন্ততা ছিল না।

গ্রামের মাঠ-ঘাট, দরিদ্রের কুটীর সে সম্পূর্ণ একটি স্বতন্ত্র জগৎ; কিন্তু কলিকাতার বাড়ী-ঘর দেখিয়া হঠাৎ ধর্ম্মদাসের মনে কি যেন একটা ব্যাকুলতা মনকে অসুস্থ, চঞ্চল করিয়া তুলিল। বিদেশে গিয়া বাড়ীর জন্য যখন মন কেমন করে, তখন সহস্র আনন্দের মধ্যেও মানুষের মনটি আর কিছুতেই সাড়া দেয় না। কোথায় তলাইয়া গিয়া অতীতের চাপা-পড়া, অন্ধকারে আচ্ছন্ন প্রদেশটাতে হাৎড়াইয়া হাৎড়াইয়া ডুবুরীর মত হারান রত্ন খুঁজিতে থাকে!

ধর্ম্মদাস আজ তেমনই করিয়া মনের চতুর্দ্দিক হাৎড়াইয়া দেখিতেছিল যে, সত্য করিয়া তাহা কি চায়। যাহা চায়, তাহার কথা মনে হইলে সে লজ্জায় অধোবদন হইয়া যায়। মনকে দৃঢ় করিবার জন্য বলে, অসম্ভব, অসম্ভব! হ'তেই পারে না তা!

ধর্ম্মদাস দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, তার চেয়ে গাড়ী-চাপা প'ড়ে মারা পড়া ঢের সহজ, শুধু সহজ নয়, সম্মানের।

বাড়ী ফিরে যাওয়া? অসম্ভব, হ'তেই পারে না!

বেলা দুপুরের সময় ঝি ডাকিল: ধর্ম্মদাস ভিতরে গিয়া দেখিল, একটা নোংরা পিতলের থালায় কড়কড়ে শুকনা ভাত: তাহার পাশে একটু ডাল এবং কচু-ঘেঁচুর একটা ঘাঁট তরকারি। তাহার উপর রাজ্যের মাছি বসিয়া আছে!

খাইতে বসিবার পূর্ব্বেই তাহার সমস্ত পেট ঘুলাইয়া গা-বমি করিয়া আসিল।

খাওয়ার পর ধর্ম্মদাসের মনে সহসা যেন একটা ভাবের বন্যা আসিল। অবহেলার অন্ন তাহাকে নিদারুণ পীড়া দিয়াছিল। সে অন্ন গিলিতে তাহার চক্ষুতে অনেকবার জলও আসিয়াছিল।

সে এবার ধীর-স্থির হইয়া বসিয়া ভাবিল, মা যে কথা স্বপ্নে বলিয়াছেন, তাহা এখনও কাযে লাগাইতে পারি নাই। তাই এই দুঃখ।

সে নিজে নিজে বলিল, দুঃখকে বরণ করতে হবে, কথাটির বোধ হয় গভীর অর্থ আছে! ধীরে ধীরে সেই অর্থ আমার মনে যেন পরিষ্কার হয়ে উঠছে। দুঃখ আছেই, এমন মানুষ পৃথিবীতে বিরল, যার দুঃখ নেই। যে মানুষ এই দুঃখের দ্বারা নিপীড়িত হয়ে নিজেকে বিধ্বস্ত মনে করে, সেই দুঃখের কাছে হার স্বীকার করে। তখন জীবনে সে আর চলে না, দুঃখই তাকে চালায়!

কিন্তু—ধর্ম্মদাস বলিল, কিন্তু, আমার অভাব, আমার দৈন্য যদি আমাকে চালিয়ে নিয়ে চলে ত আমার মনুষ্যত্ব আর রইলো কোথায়? তা হ'লে ত চোর-ডাকাতের সঙ্গে এক হয়ে গেলুম—ওইখানেই নিজেকে বড় ক'রে তুল্‌তে হবে। আচ্ছা, এ কথাটা মনে করছিনে কেন? যে, যে অন্ন আজ আমার মুখে রুচল না, সেই অন্ন ত আর এক জনের কাছে রাজভোগ ব'লে মনে হ'তে পারে! পারে না? যে তিন দিন অন্ন স্পর্শ করতে পায় নি, সে যদি আজ ঐ পেত?

তাহার শুষ্ক বিরস মুখখানি সহসা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল সে দুই হাত যোড় করিয়া বলিল, যে পথে নেমেছি, এই মুক্তির পথ, এই মর্য্যাদার পথ, এখানে এক মুঠো খেলুম কি না খেলুম, এটা গ্রাহ্যের মধ্যেই নয়: মানুষ ঢের বড়, মানুষ মনে করলে নিজেকে বিরাট ক'রে তুল্‌তে পারে কি করেছিলেন ধ্রুব, কি করেছিলেন প্রহ্লাদ, কি করেছিলেন রাণা প্রতাপ, শিবাজী মহারাজ?

ধর্ম্মদাসের মনের মধ্যে শত হস্তীর বল আসিল। সে হাসিতে হাসিতে বলিল, মাতৃবাক্য শিরোধার্য্য, দুঃখকে বরণ করতে হবে; জীবনের সকল অবস্থাকে অতিক্রম ক'রে আমি বড় হবই।

সদানন্দ ফিরিয়া আসিলেন। ধর্ম্মদাস কোন প্রশ্ন করিতে সাহস করিল না। তাহার মনটি শুধু ব্যগ্র কৌতূহলতা লইয়া অধীর প্রতীক্ষায় রহিল।

চৌকির উপর শুইয়া পড়িয়া হাত-পাখা করিতে করিতে সদানন্দ বলিলেন, আমি একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছি, বুঝেছ রামদাস? ঘণ্টাখানেক পরে তোমাকে নিয়ে যাব একবার ভবানীপুরে; দেখি, সেখেনে যদি কিছু করতে পারি। বলিতে বলিতে তিনি হাই তুলিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন; এবং অচিরে সশব্দে তাঁহার নাক ডাকিয়া উঠিল।

ধর্ম্মদাস বুঝিল যে, তিনি অতিশয় পরিশ্রান্ত; এই পরিশ্রম এবং শ্রান্তি তাহারই জন্য। সে ধীরে ধীরে হাত-পাখাটি তুলিয়া লইয়া সদানন্দকে বাতাস দিতে লাগিল।

ভবানীপুরের নাম ইতিপূর্ব্বে সে হয় ত আরও শুনিয়াছে। কিন্তু এবার সদানন্দের মুখে তাহা বড় মধুর শুনাইল। মনে হইল, সেইখানেই তাহার আশ্রয় নিশ্চয় মিলিবে, এবং যাঁহারা আশ্রয় দিবেন, তাঁহারা আনন্দের সঙ্গে তাহাকে গ্রহণ করিবেন।

ঘণ্টা দুই ঘুমাইয়া সদানন্দ উঠিয়া বলিলেন, উঃ, দেরি হয়ে গেল, আরে, আমি তোমায় ব'লে শুলুম, আমায় ডেকে দিলে না?

আপনি বড় পরিশ্রান্ত—ধর্ম্মদাস কহিল।

তা হোক গে; সে আবার বেরিয়ে না যায়। তা হ'লেই মুস্কিল। বেশ ছিলে তুমি সেখেনে। এক করতে এক হয়। তোমাকে নিয়ে বিপদে প'ড়ে গেলুম দেখছি!

ধর্ম্মদাস মুখ হেঁট করিয়া রহিল।

পথে বাহির হইয়া সদানন্দ বলিলেন, ট্রামে যেতে হবে; নইলে তাকে পাওয়া যাবে না, নিশ্চয়। আঃ, আবার একগুলো পয়সা খরচ।

ধর্ম্মদাস পিছনে পিছনে চলিতেছিল, সদানন্দ ফিরিয়া বলিলেন, এসো, এসো, পা চালিয়ে চল। ট্রাম এসে পড়েছে, দেখছ না?

বড় বড় বাড়ী, দোকানপাট ধর্ম্মদাসের চোখের উপর দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। হয় ত অন্য সময় হইলে, কত না বিস্ময়, কত না আনন্দ তাহাকে সেগুলি দিত; কিন্তু আজ মন এমন ভারাক্রান্ত যে, তাহার সেগুলির দিকে ফিরিয়া চাহিবারও ইচ্ছা হয় না।

যেন পৃথিবীর সহিত সকল যোগ তাহার ছিন্ন হইয়া গিয়াছে; প্রাণের মধ্যে শুধু একটিমাত্র আশার বাণী ধুক্ ধুক্ করিতেছিল।

ভবানীপুর! ভবানীপুর! ভবানীপুর!

ট্রাম হইতে নামিয়া ত্রস্তপদে কয়েক মিনিট চলিয়া সদানন্দ একটি ছোট্ট দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ডাক দিলেন, মণিময়, মণিময়, মণিময়—

নীচের খড়খড়ি তুলিয়া একটি অল্পবয়সের মেয়ে উত্তর দিল, বাবা যে এই বেরিয়ে গেলেন।

সদানন্দ হতাশ হইয়া পাশের রোয়াকে বসিয়া পড়িয়া বলিলেন, আঃ, আর পারিনে! কি যে করি! বলিয়া কোঁচা দিয়া কপালের ঘাম মুছিয়া ফেলিলেন।

দরজার অন্তরাল হইতে সেই মেয়েটি আবার জিজ্ঞাসা করিল, আপনার নাম কি সদানন্দ বাবু?

হাঁ, হাঁ—কেন?

এই চিঠিটা বাবা রেখে গেছেন।

সদানন্দ সাগ্রহে চিঠি পড়িতে লাগিলেন। চিঠিতে লেখা ছিল:—

ভাই সদানন্দ,

তোমার দেওয়া সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেল। এ দিকে আমাকে বেরুতেই হচ্ছে। ছেলেটিকে রেখে যেও। আমি তার সঙ্গে বোঝা-পড়া ক'রে নিতে পারবো বোধ হয়। তুমি কাযের লোক, তোমাকে রেহাই দেওয়া দরকার।

কাল ত টুরে যাচ্ছ। পার ত ফিরে এসে খবর নিও।

ইতি তোমার মণিময়।

চিঠি পড়িয়া তিনি স্বস্তির হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

তাহার পর মেয়েটির দিকে চাহিয়া বলিলেন, খুকি, তোমার নাম কি?

কমলা, আমার ভাল নাম। মেয়েটি উত্তর করিল। তাহার পরই তাহার মনে হইয়া গেল যে, আর একটা নামও তাহার আছে, তাই সে আবার বলিল, কিন্তু সবাই আমাকে কমলা ব'লে ডাকে না, বলে, মিণ্টু।

তা হ'লে, তুমি আমার মিণ্টু মাসী? সদানন্দ আদর করিয়া বলিল।

দূর, আমি কি বিধবা? বলিয়া মিণ্টু পলাইয়া গেল।

সদানন্দ আর অপেক্ষা করিতে পারিতেছিলেন না।

তাঁহাকে আবার ট্রেণ ধরিতে হইবে। অতএব তিনি ধর্ম্মদাসের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, তা হ'লে রামদাস, তুমি ঠিক ক'রে নিতে পারবে? এখুনি সে ফিরে আস্‌বে, বুঝেছ?

সদানন্দকে প্রণাম করিয়া ধর্ম্মদাস বলিল, আমাকে মার্জ্জনা করবেন। আমার জন্যে কত কষ্ট আপনার হ'লো।

কিছু না, কিছু না, তুমি মানুষ হয়ে উঠো, এই আশীর্ব্বাদ করি। দিন কয়েক পরে, এক দিন এসে দেখে যাবো তোমায়। বলিয়া সদানন্দ হন্ হন্ করিয়া চলিতে লাগিলেন।

ধর্ম্মদাস যত দূর পর্য্যন্ত চোখ চলিল, তাঁহাকে দেখিল। যেন সে দেখার শেষও নাই, তৃপ্তিও নাই।

পরিচ্ছেদ—ছয়

সদানন্দ চলিয়া যাওয়ার পর মিণ্টু আসিয়া ধর্ম্মদাসের কাছে দাঁড়াইয়া বলিল, আপনাকে আমি চিনি!

এই কথা শুনিয়া হঠাৎ তাহার নাক-মুখ হইতে যেন আগুনের হল্‌কা বাহির হইয়া গেল। মুখ হইতে আর কথা বাহির হয় না অনেকক্ষণ।

ধর্ম্মদাস অবশেষে ভাল করিয়া মিণ্টুকে দেখিয়া বলিল, তুমি আমাকে চেন? কি ক'রে চিন্‌লে? কে আমি বল ত?

মিণ্টু বলিল, খুব সহজ, আপনি এসেছেন সদানন্দ বাবুর সঙ্গে, আর কেন এসেছেন, তাও আমি জানি। বলব?

বল দিকি? ধর্ম্মদাস একটু হাসিয়া বলিল।

বাবা বলেছেন,—গিন্নীর মত ঢং করিয়া মিণ্টু বলিল, আপনি আমার নতুন মাষ্টার মশাই হবেন কি না? তাই আমি মনে করেছি, আপনাকে নূতন দাদা ব'লে ডাকবো!

তা বেশ! বলিয়া ধর্ম্মদাস হাসিল; কিন্তু মিণ্টু ভাই, দাদাকে কেউ কি আপনি, আপনি বলে? বলে, দাদা, তুমি।

মিণ্টু কি একটা ভাবিল। তাহার পর বলিল, আজকে থেকে নয়, কালকে থেকে—বলিয়া লজ্জায় সে ছুটিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

ধর্ম্মদাসের ছোট ভগিনী ছিল না। সে আজ মনে মনে একটি অপূর্ব্ব সুখ অনুভব করিল। অবসন্ন মন আশা পাইয়া যেন মাথা উঁচু করিতে চায়!

এবার মিণ্টু ফিরিয়া ধর্ম্মদাসের হাত ধরিয়া বলিল, ভেতরে চলুন, নতুন দাদা, বড়মা তোমায় ডাক্‌ছে।

ধর্ম্মদাস বলিল, বড়মা ডাক্‌ছে। আর আমাকে চলুন? তা হ'লে যাব না আমি।

মিণ্টু বলিল, আচ্ছা বল্‌ছি; চলো, চলো, চলো। হ'লো ত এবার?

আর সে অপেক্ষা না করিয়া ধর্ম্মদাসের হাত ধরিয়া টানিয়া ভিতরে লইয়া গেল।

ভিতরে গিয়া ধর্ম্মদাস দেখিল, দুইটি রেকাবে জলখাবার দেওয়া আছে, দুইটি হাতের কাযের আসন তাহার পাশে পাতা, এবং অদূরে এক বর্ষীয়সী দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি আগাইয়া আসিয়া বলিলেন, এসো বাবা, হাত-মুখ ধুয়ে কিছু খাও। সদানন্দ চ'লে গেলেন! বল্‌ছি মিণ্টুকে ডাক্, ডাক্; তা' ওর কাণে কি কথা যায়? সকাল থেকে নাচ্চে; আমার নতুন মাষ্টার আস্‌বেন। মাগুড়া মেয়ে, যা নিয়ে, যতটুকু ভুলে থাকে!

সহসা কোন কথার উত্তর দিতে ধর্ম্মদাসের লজ্জা করিল। সে হাত-মুখ ধুইয়া মাথা গুঁজিয়া খাইতে লাগিল।

বাহিরে জুতার শব্দ শুনা গেল এবং অচিরে মিণ্টু তাহার পিতার হাত ধরিয়া নাচিতে নাচিতে টানিয়া আনিয়া বলিল, ঐ দেখ, বাবা!

মণিময় অগ্রসর হইয়া বলিলেন, সদানন্দ বুঝি আর দাঁড়াতে পারলেন না? যা চাক্‌রী ওদের!

ধর্ম্মদাস মাথা তুলিয়া দেখিল, মণিময় সৌম্যমূর্ত্তি, সুপুরুষ!

মণিময় মিণ্টুকে বলিলেন, চল্, কাপড় ছেড়ে, তো[illegible] নতুন দার সঙ্গে গল্প করি গে—মা! মা!

মা আগাইয়া আসিলেন, কি গা?

মণিময় বলিলেন, তোমার লজ্জা দেখে আর বাঁচিনে. ওকে দেখেও—ছোট ছেলে!

মা হাসিলেন। সে হাসির অর্থ গভীর। যেন বলি[illegible] চাহে, মণি, এ লজ্জা নয়, এ নারীর সম্ভ্রম; এ যে আমাদে[illegible] অঙ্গের ভূষণ!

দিবা ও সন্ধ্যা

বসুমতী প্রেস] [শিল্পী—জি, এম, রাজিন

বাহিরে আসিয়া আলো, পাখা খুলিয়া দিয়া মণিময় সে দিনের কাগজ উল্টাইতে লাগিলেন। কাছে মিণ্টু তাহার ই খুলিয়া বসিল।

ধর্ম্মদাস ধীরে ধীরে আসিয়া ফরাসের এক পাশে বসিল।

মণিময় বলিলেন, মিণ্টু, এখন খাও গে যাও।

মিণ্টু বলিল, ভাত কি এখন হয়েছে ?

না হয়ে থাকে, মাকে সাহায্য কর্ গে যা ; মা যে একলা য়েছেন ;

মিণ্টু বলিল, কেন, ষোড়শী ত আছে ?

এবার মণিময় একটু ধমকের মত করিয়া বলিলেন, বলছি, তুই যা, তা' মিষ্টি কথা ত শুনতে নেই, না ?

মুখ ভারি করিয়া মিণ্টু চলিয়া গেল।

মণিময় মৃদু হাসিয়া বলিলেন, ছোট ছেলে-পুলেদের জানার অসীম আগ্রহ, ও থেকে শুনতে চায়, কি কথাবার্ত্তা হয় আমাদের মধ্যে

ধর্ম্মদাসও সামান্য হাসিল।

মণিময় বলিলেন, তোমার সম্বন্ধে সদানন্দের সঙ্গে আমার যে কথা হয়েছে, তাতে এই আমি বুঝেছি যে, তিনি তোমার কাযকর্ম্ম দেখে বুঝেছেন যে, তোমাকে লেখাপড়া করালেই ভাল হয়, তোমার মেধা আছে, তুমি ধীমান্। কিন্তু তার পরের কথা, একটু গোলমেলে ; আমি ভাল বুঝিনি, আর মনে হয়, সদানন্দও ভাল ক'রে ধরতে পারেন নি। কিন্তু কথা সব পরিষ্কার হওয়া দরকার। বুঝতে পারছ ?

ধর্ম্মদাস ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে, সে সব বুঝিয়াছে। কিন্তু কথার উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিল।

মণিময় আবার কাগজে মন দিলেন।

মণিময়কে দেখার পর ধর্ম্মদাসের মনে এই কথাই বহু- হইয়াছে যে, ইনি সকল সাধারণ মানুষের মত নন। র কোথায় এমন একটি বিশেষত্ব আছে, যাহাতে আপনা তেই মনে হয়, ইহার ভদ্রতা, সৌজন্য সকলের মধ্যে দেখা না। কিন্তু, ধর্ম্মদাস ভাবিল, কিন্তু তাই ব'লে আমার কথা এক দিনের চোখের দেখা পরিচয়ে কেমন ক'রে বলি ?

মণিময় কাগজ হইতে চোখ তুলিয়া বলিলেন, অনেক বিবেচনার বিষয় আছে, না ? বেশ, আজ তুমি ভেবে চিন্তে স্থির কর, আমি তোমাকে চল্লিশ ঘণ্টার সময় দিচ্ছি। কাল এই সময়ে তোমার সব কথা আমি জেনে স্থির করব, তোমার সম্পর্কে আমি কি করতে পারি, না পারি। তার আগে, তোমাকে কয়েকটা কথা বলতে চাই ; তোমার বয়স কম, হয় ত এদিক দিয়ে ভেবে দেখনি—

ধর্ম্মদাস তাহার উজ্জ্বল দুইটি চক্ষু মণিময়ের মুখের উপর ফেলিয়া চাহিয়া রহিল। মণিময় বলিতে লাগিলেন, তুমি নিজেই ভেবে দেখ, তোমায় জানিনে, শুনিনে, কোথায় দেশ, কার ছেলে, কেন এমন অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছ—সে কথা শুনেছি, সদানন্দ জানতে চাইলে, তুমি বলনি। নিশ্চয়ই তোমার খুব গুরুতর কারণ আছে, বুঝি ; কিন্তু আমাদের দিক্ থেকেও অনেক বিবেচনার ব্যাপারও থাকতে পারে।

মণিময় কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, পরস্পরের মধ্যে যোগ-সূত্র পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে। যদি তুমি আমাকে বিশ্বাস না কর ত আমিই বা তোমাকে কেন বিশ্বাস করবো ?

ধর্ম্মদাসের দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল, সে গদ্‌গদকণ্ঠে বলিল, আপনাকে অবিশ্বাস নয়, বলতে আমার সাহস হয় না।

বুঝেছি, মণিময় বলিলেন, কিন্তু সেই সাহসের অভাবের মূলে ভয়ই আছে, যদি আমি প্রকাশ ক'রে দি। আচ্ছা, তোমায় আমি কথা দিচ্ছি, তোমার ইতিহাস শুনে, তোমায় আশ্রয় দেব, সে বিবেচনা আমার নিজের হাতে রইল ; কিন্তু তোমার গোপন কথা, কোন দিন কাউকে, তোমার অমতে, কি অজ্ঞাতে প্রকাশের অধিকার আমার রইল না। কি বল ?

বাষ্প-বিজড়িত-কণ্ঠে নিজের আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কাহিনী মণিময়ের নিকট নিবেদন করিয়া ধর্ম্মদাস যখন শুইতে গেল, তখন রাত্রি ২টা বাজিয়াছে। বিছানায় শুইতেই সে গভীর নিদ্রামগ্ন হইয়া গেল।

—

পরিচ্ছেদ—সাত

দিন কতক পরে হঠাৎ এক দিন মণিময় ধর্ম্মদাসকে ডাকিয়া বলিলেন, ধর্ম্মদাস, তোমায় একটা কথা রোজই বলি বলি করি, বলা হয়ে উঠে না ; আজ তোমার শরীর ভাল আছে ? মন ভাল আছে ?

তাঁহার কণ্ঠ স্নেহে গাঢ় !

ধর্ম্মদাস মৃদু হাসিল, বুঝিল যে, কথাটা খুব সহজ নহে, তাই মণিময় ভূমিকা করিতেছেন।

সে বলিল, বলুন, কি বলবেন।

দেখ, মণিময় বলিলেন, তোমার দিক দিয়ে তোমার বাবার সঙ্গে ব্যবহার যেটা হয়েছে, সেটাতে তোমার ছোট-খাটো দোষ-ত্রুটি হয় ত কিছু কিছু হয়েছে; কিন্তু মোটের উপর আমার মনে হয়, তুমি খুব একটা বড় কিছু অন্যায় কর নি।

ধর্ম্মদাসের মুখ সহসা লাল হইয়া উঠিল। তাহার ইতিহাস শোনার পর মণিময় এই প্রথম মতামত দিলেন। অবশ্য ব্যবহারে ইহার প্রকাশ বহু পূর্ব্বেই হইয়াছিল সত্য। এই কয় দিনের মধ্যে ধর্ম্মদাস বুঝিয়াছিল যে, মণিময় একটিও বাজে কথা কহিবার লোক নহেন, এবং মিথ্যা আচরণও তিনি করেন না।

কথাটা আর কেউ শুনলে নিশ্চয়ই আশ্চর্য্য হয়ে যাবে, বলিয়া মণিময় হাসিতে লাগিলেন। কেন না, তুমি পিতৃদ্রোহ ক'রে বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছ, আর আমি তার সমর্থন করছি! আমার বয়স হয়েছে, লোকে শুনলে ভারি আশ্চর্য্য হয়ে যাবে না? কি বল ধর্ম্মদাস?

এই কথাগুলির মধ্যে বহু সত্য কথাকে পরিহাসের লঘুতায় জড়াইয়া দিয়া মণিময় হাল্কা করিয়া দিবারই চেষ্টা করিতেছিলেন।

বাস্তবিক কথাই ত। পিতা পিতা: পুত্র পুত্র। পিতার বিচার করিবার পুত্রের অধিকার আছে কি না? ইহা হয় ত চিরদিনের তর্কের বিষয় হইয়া থাকিবে।

ধর্ম্মদাস কিছুই বলিল না, শুধু নিরুত্তরে মণিময়ের কথা শুনিয়া যাইতে লাগিল।

তিনি হাস্যমুখে আবার কহিতে লাগিলেন :—

এই ভারতবর্ষের পুরাণ এবং ইতিহাস-কাহিনীর মধ্যে পরশুরাম, রামচন্দ্র এবং ঔরঙ্গজেবের কথা আমরা পাই। এক জন পিতৃ-আদেশে মাকে হত্যা ক'রে বসলেন, এক জন চৌদ্দ বৎসর বনে গেলেন, আবার তৃতীয় ব্যক্তি পিতাকে কারাগারে নিক্ষেপ করতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করলেন না। সব মানুষের আদর্শ কিছু সমান হয় না! কিন্তু পুত্রের দিক থেকে পিতার প্রতি কর্ত্তব্য একটা আছেই আছে। এ কথা অস্বীকার করা চলে না।

ধর্ম্মদাস ধীরে ধীরে বলিল, কিন্তু বাবাকে ত আমি বিচার করি নি!

মণিময় হাসিলেন, সে হয় ত তোমার মনের গোপন কথা; কিন্তু যা কাযে তুমি করেছ, যা ফলে এসে দাঁড়িয়েছে, তাতে আমার মত এক জন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ তৃতীয় ব্যক্তি এ কথা বলতে বাধ্য যে, প্রকারান্তরে তুমি তোমার বাবার মনে কম দুঃখ দেও নি। হয় ত এক দিন তোমার বাবার সঙ্গে দেখা হবে, সে দিন এ কথা তুমি বুঝবে।

ধর্ম্মদাস একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল।

মণিময় বলিলেন, তাই বলছিলুম তোমাকে, বিবেচনা ক'রে দেখ, ভাল ক'রে—আমার যুক্তি তোমার ভাল বোধ হয়, গ্রহণ ক'রো। আমি তোমাকে জোর ক'রে কিছু করিয়ে নিতে চাই নে। শুধু পরামর্শের মতই বলছি—

কি পরামর্শ আপনি দেন?—ধর্ম্মদাস জিজ্ঞাসা করিল।

মণিময় বলিলেন, যেমন ক'রে আগা-গোড়া তুমি তোমার পক্ষের কথা আমাকে বলেছ; আমার বিশ্বাস, তেমন ক'রে কোন কথাই তুমি তোমার বাবাকে কোন দিনই বল নি। তিনি তাঁর মতন ক'রে বুঝেছেন, তুমি তোমার মত ক'রেই বুঝেছ। পৃথিবীর বহু কলহ-বিবাদ ঠিক এমনি ক'রে গ'ড়ে উঠে। দুই পক্ষই উভয়কে ভুল বুঝে ব'সে থাকে। দীর্ঘ-দিন পরে যখন ভুলটা পরিষ্কার হয়, তখন উভয় পক্ষই অনু-তাপ করে, বলে যে, বিবাদ যে হয়েছে, এটাই আশ্চর্য্য; বিবাদের সত্যকার কোন কারণই ছিল না।

নয় কি ধর্ম্মদাস?

ধর্ম্মদাস বলিল, মনে হয়, আপনি ঠিক কথা বলছেন।

তবে? মণিময় বলিলেন, তবে, তোমার কোন আপত্তি ত হ'তে পারে না তোমার বাবাকে একখানা চিঠিতে সব কথা জানাতে। চিঠি পেয়ে তাঁর মন হয় ত ফিরে যেতে পারে: হয় ত তিনি এসে প'ড়ে তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। আর যদি ক্ষমা না করেন ত চিঠির উত্তর পর্য্যন্ত দেবেন না। চিঠির উত্তর না পেলে, তুমি যা' করছ, তা' করার আরও মনে মনে জোর পাবে। তোমার বয়স অল্প, তা ছাড়া মনে মনে এত তুমি ক্ষুব্ধ,আহত হয়েছিলে যে, উত্তেজনার বশে যে কায ক'রে বসেছ, সেটা হয় ত একটা পরিপূর্ণ ভুল। জিদের উপর আজীবন সেই ভুলের জের টেনে যেতে হবে, তার কি মানে আছে? নিজের ভুলকে

সংশোধন করার মধ্যে একটা বড় কাল্‌চারের পরিচয়ই থাকে, ধর্ম্মদাস।

ধর্ম্মদাস স্বীকৃত হইয়া বলিল, আমি লিখতে রাজী আছি; কিন্তু সব কথা কি গুছিয়ে লিখতে পারব?

কেন পারবে না? একবারে না পার, অনেকবার চেষ্টা কর, আমি তোমায় সাহায্য করব।

ধর্ম্মদাসের মুখ সহসা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

নিয়মিত কর্ম্মের অবসানে ধর্ম্মদাস পত্র লিখিতে বসিল। ইহার পূর্ব্বে কাহাকেও পত্র দিবার বড় প্রয়োজন হয় নাই, তাই প্রকৃতপক্ষে সে কি লিখিবে, কেমন করিয়া লিখিবে, কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না।

কলম লইয়া অনেকক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। অবশেষে লিখিল :—

পরমপূজনীয় শ্রীশ্রীচরণকমলেষু,

বাবা,

আর কোন কথাই মনে আসে না! শুধু চক্ষু জলে ঝাপসা হইয়া উঠে এবং বুকের মধ্যে খালি বোধ হয়।

ধর্ম্মদাস এত দিন বাড়ী ছাড়িয়া বাহির হইয়াছে, আজিকার মত পিতার বিচ্ছেদ সে আর কোন দিন অনুভব করে নাই।

সে মণিময়কে চিনিয়াছিল, এবং ভাল করিয়া জানিত যে, পত্র লিখিবার জন্য আর দ্বিতীয়বার অনুরোধ তিনি করিবেন না; না লিখিলে যে তিনি গভীর দুঃখিত হইবেন, সে বিষয়েও তাহার কোন সন্দেহ ছিল না। তাই বহু চেষ্টা করিয়া পত্র শেষ করিল। সে লিখিল,—

আপনাকে পত্র দিতেছি, আমার নিজের বুদ্ধিতে নয়। যিনি আমাকে আশ্রয় দিয়াছেন, তাঁহারই পরামর্শে।

আপনাকে না বলিয়া চলিয়া আসা আমার অন্যায় হইয়াছে। বলিয়া আসার সাহস আমার হয় নাই।

আমি কাহারও সাহায্য লইয়া উত্তর লিখি নাই এবং প্রশ্ন-পত্র চুরি আমি করি নাই। এ কথা আপনার মুখের উপর বলিতে আমার সাহস হয় নাই। কারণ, আমি অন্য দিকে আপনার কথা না শুনিয়া নিজেকে অপরাধী মনে করিতাম।

সে কথা আজ এইজন্য বলিতেছি যে, নবকিশোর বাঁচিয়া নাই। সে থাকিলে হয় ত এ কথা বলিতে আমার সাহস হইত না।

নবকিশোরকে কেন জানি না, আমার ভাল লাগিত; তাই এক দিন গোপনে আমার কাপড় হইতে কয়েকখানি কাপড় লইয়া চুরি করিয়া দিয়া আসিয়াছিলাম।

আর তাহার অসুখ হইলে যে টাকা মা আমাকে জন্মদিনে দিয়াছিলেন, সেই টাকা হইতে চিকিৎসার জন্য কিছু দিয়াছিলাম।

সে দীর্ঘ দিন স্কুল হইতে অনুপস্থিত ছিল, তাহার পাশ করিবার আশা ছিল না। তাই তাহাকে স্কুলের নোট ও আমার নিজের লেখা নোট এবং আমার বইগুলি ধার দিয়াছিলাম।

এই সকল কায আমি গোপনে করিয়াছি। আমার মনে হইত, আপনি জানিলে হয় ত মনে মনে এক দিন সন্তুষ্ট হইবেন। তাহাদের প্রতি অপ্রসন্নতা, সেটি আপনার মনের সত্য জিনিষ নয়।

এই আমার দোষ; কিন্তু সব চেয়ে বড় দোষ চলিয়া আসা। আমাকে মার্জ্জনা করিবেন। আমার প্রণাম জানিবেন। আর ভালবাসা রামপ্রসাদকে দিবেন।

ইতি সেবক

শ্রীধর্ম্মদাস।

পরিচ্ছেদ—আট

ধর্ম্মদাস পত্রখানি মণিময়ের হাতে দিতে পারিল না। তাঁহার লেখা-পড়ার টেবিলের উপর কাগজ-চাপা পাথরের তলায় রাখিয়া দিয়া নিস্পন্দ প্রতীক্ষায় সেই কালটা পাশের ঘরে বসিয়া সে মিণ্টুকে পড়াইতেছিল।

মণিময় সকালে বাহিরের ঘরে বসিয়া কলেজের অধ্যাপনার জন্য পাঠ ও নোট তৈয়ারি করিতেছিলেন। হঠাৎ পত্রখানি তাঁহার চোখে পড়িল।

ধর্ম্মদাসের মুক্তার মত অক্ষর, এবং পত্রখানির মধ্যে যথেষ্ট আত্ম-মর্য্যাদার নিদর্শন দেখিয়া মণিময় অবাক্ হইলেন। মনে মনে বলিলেন, চিঠিখানায় বাজে কথা নেই; তার উপর সে সংযত-শ্রদ্ধায় নিজের বক্তব্য বলিয়াছে।

তাঁহার মন বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ফিরিয়া অবশেষে আসিয়া পিতা-পুত্রের সম্বন্ধের কথা ভাবিতে বসিল।

কি অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন, দ্রুতগতিতে দেশের লোকের মনে আসিতেছে! এই সবই ইংরাজী শিক্ষার ফল। মণিময় মনে মনে বলিলেন, রক্ষণশীল দল কলরব করিয়া উঠিবেন যে, দেশ সর্ব্বনাশের মুখে চলিয়াছে; কিন্তু সত্যই কি তাই? হইতে পারি আমি পিতা, আমি স্বামী, কিন্তু সেই জন্য আমার পুত্রের প্রতি, আমার পত্নীর প্রতি কোনরূপ অমর্য্যাদার, অসম্মানের ব্যবহার করিবার তিলমাত্র অধিকার ন্যায়ত, ধর্ম্মত থাকিতেই পারে না।

মাথা নাড়িয়া তিনি বলিলেন, নাঃ, আমার যতটুকু জ্ঞান-বুদ্ধি আছে, তা দিয়ে বিচার ক'রে দেখে ত একে কিছুতেই মন্দ বল্‌তে পারিনে। এই যে ব্যক্তি-স্বাধীনতা, এর বিশেষ মূল্য এ দেশে আছে! আমাদের দেশে এর উল্টো পরীক্ষা হয়ে গেছে। ব্যক্তি তার সমস্ত স্বাধীনতা রাজার হাতে, পিতার হাতে, পতির হাতে সমর্পণ ক'রে বসেছিল, তুমিই কর্ত্তা, তুমিই প্রভু, তুমিই ভর্ত্তা। কিন্তু সেই অসীম ক্ষমতার অপব্যবহার হ'লো। রাজা গেলেন তলিয়ে! পিতা আর পরিবারের মধ্যে সে প্রবল প্রতাপ নিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত নন। পতিকে আর পতিব্রতা দেবতা ব'লে মেনে নিতে চান না।

এটা ঠিক যে, ক্ষমতার অপব্যয় এক জনের হাতে হ'লে হবেই হবে। নৈলে অবাক্-কাণ্ড এমন ছেলে ধর্ম্মদাস, সে এলো কি না বাড়ী থেকে পালিয়ে! ভারি শুভ লক্ষণ কিন্তু—সে জমীদারের ছেলে, ঘরে সুখৈশ্বর্য্যের অন্ত নেই—কিন্তু তার কোন তোয়াক্কা না রেখে সে লাফিয়ে পড়ল অন্ধকার অনিশ্চিতের মধ্যে! সে কিসের জন্যে—শুধুই কি ওতে যুবকের স্বেচ্ছাচারিতা, আর ঔদ্ধত্য দেখব? আর কিছু নেই?

মাথা নাড়িয়া মণিময় বলিলেন, না না, অমন অন্ধ হ'লে চল্‌বে কি ক'রে? মুক্তি, স্বাধীনতা—মানুষের আত্মার যে সত্যিকার ক্ষুধা। তারই আশায়, তারি আকাঙ্ক্ষায়, তারি প্ররোচনায় আজ ধর্ম্মদাসের মত এক জন নিরীহ ছেলে নিতান্ত অসহায় হয়ে পথে দাঁড়াতে একটু ভয় পায়নি!

এ শুধু আমাদের দেশের নয়, সমস্ত পৃথিবীর অশেষ কল্যাণের সূচনা। এতে দুঃখ আছে, অশান্তি আছে—এবং অপব্যবহার আছে; তবুও এর মূল্যকে অস্বীকার করলে আত্ম-প্রতারণা করা হয় মাত্র!

ঘড়ীতে ৯টা বাজাতে মণিময়ের চমক ভাঙ্গিল। তারিখের কার্ডে দেখিলেন, সে দিন শুক্রবার—বলিলেন, তাই ত! আজ যে সকাল সকাল ক্লাশ; এখুনি উঠতে হ'লো।

ধর্ম্মদাস, আছ?

ধর্ম্মদাস কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

তোমার চিঠি আমি প'ড়ে দেখেছি, সুন্দর লেখা হয়েছে। তুমি যে তত ছোটর মধ্যে এমন গুছিয়ে লিখতে পারবে, তা আশা করিনি।

এই নাও বলিয়া দেরাজ হইতে ভাল চিঠির কাগজ এবং টিকিট-আঁটা খাম দিয়া বলিলেন, এটাকে পরিষ্কার ক'রে লিখে ফেল। আমি কলেজ যাবার সময় নিজের হাতে পোষ্ট ক'রে দেব। যাতে আর কোন সন্দেহ কারুর মনে না আসে!

বলিয়া মৃদু হাসিলেন। হাসির অর্থ ধর্ম্মদাস বুঝিয়াছিল। সে লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া রহিল।

মণিময়ের কথার মধ্যে ইঙ্গিত ছিল যে, চিঠি নাও ডাকে দেওয়া হইতে পারে।

পত্রখানি মণিময়ের হাতে দেওয়ার পর ধর্ম্মদাসের মনে একটা ভাবান্তর আসিল। সে বাড়ী ফিরিবার কোন কল্পনাই মনে রাখিত না। তাই শুধু, আগের পথের ভাবনাই তাহার ছিল। এখন আবার পিছু হটিবার দুশ্চিন্তা তাহার মনকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিল।

পিতার সহিত বুঝিয়া চলিতে তাহার আপত্তি ছিল না, পরন্তু তাহা যে পুত্রের জীবনে কর্ত্তব্য, তাহাও সে বুঝিত; কিন্তু তাঁহার চলার ছন্দ ছিল বিষম। তাঁহার সহিত কোথায় যে হঠাৎ গরমিল বাধিয়া যাইবে, তাহা সে কেন, স্কুলের প্রধান শিক্ষক পর্য্যন্তও জানিতেন না, এবং সর্ব্বদা ভয়ে ভয়ে জীবন-যাপন করার গ্লানি মানুষের মনকে আকণ্ঠ তিক্ত করিয়া তোলে।

সেই তিক্ততার স্বাদ যেন জিহ্বাগ্রে অনুভব করিয়া ধর্ম্মদাসের এত দিন পরেও সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

সে চুপ করিয়া পড়িয়া পড়িয়া ভাবিতে ভাবিতে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। মিণ্টু ঘরে ঢুকিয়া দেখিল যে, ধর্ম্মদাস ঘুমাইতেছে। ধর্ম্মদাস দুপুরে কিছুতেই ঘুমাইত না, এবং মিণ্টুকে অনেক করিয়া বুঝাইয়াছিল যে, দুপুরে ঘুমাইতে নাই। বেশী ঘুমাইলে মানুষ নির্ব্বোধ এবং অলস হইয়া যায়। রাতই ঘুমাইবার সব চেয়ে ভাল সময়।

তাই মিণ্টু মনে করিল সে, ধর্ম্মদাসের নিশ্চয় অসুখ করিয়াছে। সে বই-শ্লেট রাখিয়া ফিরিয়া অন্দরে গিয়া বলিল, বড়মা, নতুন দাদার নিশ্চয় অসুখ করেছে।

বড়মা সবে খাইয়া উঠিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন; ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বলিলেন, কি হয়েছে? কেন?

নূতন দাদা যে কেমন ক'রে শুয়ে আছে; ঘুমিয়ে পড়েছে।—মিণ্টু মুখটা গম্ভীর করিয়া বলিল।

বড়মা বলিলেন, থাক্, তুমি গিয়ে আর গোল কর না। তুমি ততক্ষণ এখেনে ব'সে পড়া তৈরী কর।

বই আনিতে বাহিরের ঘরে সে চলিয়া গেল। কিন্তু তাহার ফিরিতে দেরি দেখিয়া বড়মা উদ্বিগ্ন হইয়া বাহিরে আসিলেন।

তিনি দেখিলেন, দূরে মিণ্টু দাঁড়াইয়া আছে এবং ধর্ম্মদাস ঘুমাইতেছে। তাহার মুখখানি টক্‌টকে রাঙ্গা।

তিনি ধীরে আগাইয়া আসিয়া তাহার কপালে হাত দিলেন। ধর্ম্মদাস চোখ খুলিবার চেষ্টা করিল। জ্বরে তাহার কপাল পুড়িয়া যাইতেছে।

কখন্ জ্বর এলো, ধর্ম্মদাস?

ধর্ম্মদাস ধড়মড় করিয়া উঠিয়া পড়িল, বলিল, না, জ্বর নয়, এ সেরে যাবে এক্ষুনি।

তা হোক গে, তুমি গিয়ে নিজের ঘরে শোও। বলিয়া তিনি ধর্ম্মদাসের শুইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

ধর্ম্মদাসের জ্বর সে রাত্রিতে যে কত উঠিয়াছিল, তাহা আর দেখা হয় নাই: কিন্তু পরের দিন সকালে ডাক্তার ডাকিতে হইল। সে আর সহজ কথাবার্ত্তা বলিতেছিল না।

ডাক্তার আসিয়া বলিলেন, জ্বর সহজ নয়, গায়ে আসল বসন্তই বা'র হয়েছে। ওকে হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দিন।

মণিময় স্তব্ধ হইয়া ডাক্তারের কথা শুনিলেন; বলিলেন, দেখি মা'র সঙ্গে পরামর্শ ক'রে।

ডাক্তার অত্যন্ত সহজ ভাবে বলিলেন, এর কোন পরামর্শ নেই। ওর উচিত চিকিৎসা বাড়ীতে হয় না, তা ছাড়া ভীষণ ছোঁয়াচে রোগ; কেন বাড়ীতে রেখে একটা বিভ্রাট ঘটাবেন?

ডাক্তার চলিয়া গেলেন।

মণিময় মা'র কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

ডাক্তার যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা মা পাশের ঘর হইতে শুনিয়াছিলেন, কিন্তু সে কথা মণিময়কে বলিলেন না। কি বলেন, শুনিবার অপেক্ষায় চুপ করিয়া রহিলেন।

খানিক পরে মণিময় বলিলেন, মা, ধর্ম্মদাসের আসল বসন্ত দেখা দিয়েছে। ডাক্তার বলেন হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দিতে।

মা গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, তা হ'তে পারে না, মণি! তা আমি হ'তে দেব না!

মণিময় বলিলেন, কিন্তু টাকা খরচ করলে হাঁসপাতালে ত ভাল ব্যবস্থা হ'তে পারে, মা?

আচ্ছা, তবে তাই ব্যবস্থা কর গে; কিন্তু তুমি আজ ফেরার পথে, ললিতাকে নিয়ে এস।

কেন মা?—মণিময় জিজ্ঞাসা করিলেন।

কেন কি? এ বাড়ীতে কে থাকবে? আমি ধর্ম্মদাসের সঙ্গে হাঁসপাতালে—

মা! তুমি রাগ ক'রে কথা বলছ—

রাগ করিনি মণি, তুই ভুল বুঝিস্ নি, বলিয়া মা মৃদু হাসিলেন।

মণিময় তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন।

মা বলিলেন, আমি ত হাঁসপাতালের ব্যবস্থা দেখিনি? যদি দেখি যে আমার থাকার কোন দরকার নেই ত কি করতে গিয়ে থাক্‌বো? কিন্তু হাঁসপাতালের ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ীতে থাকার লোকের ব্যবস্থা করতে হয় ত? তাই ললিতাকে আন্‌তে বলি।

ললিতা মিণ্টুর একমাত্র মাসী এবং সে বিধবা। তাই মিণ্টু জানিত যে, মাসী মাত্রেই বিধবা।

সন্ধ্যার পর মণিময় ললিতাকে লইয়া ফিরিলেন।

ধর্ম্মদাসকে যখন হাঁসপাতালে সরান হইল, তখন সে ঘোর বিকারে লাল কাপড়-পরা শীতলা দেবীকে দেখিতেছে।

সঙ্গে ডাক্তার ছিলেন, তিনি হাসিয়া বলিলেন, ভারী আশ্চর্য্য! সব বসন্ত-রোগীকেই প্রায় এই কথা বলতে শুনি। মনে হয়, এর মধ্যে বোধ হয় কোন সত্যি আছে।

মণিময় সবিনয়ে ডাক্তার বাবুকে প্রশ্ন করিলেন, কোন সাহেব রুগীকে বল্‌তে শুনেছেন?

ডাক্তার একটু অপ্রস্তুতের হাসি হাসিলেন। বলিলেন, কিন্তু তারাও বোধ হয় লাল পোষাকের কথা বলে। ওদের দেবীই নেই ত দেখবে কি?

ডাক্তার বাবু এই কথা বলিয়া খুব খানিকটা হা হা করিয়া হাসিয়া লইলেন। [ক্রমশঃ।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

বিহগদিগের প্রণয়-রীতি

ইতর জীবের মধ্যে প্রণয়ের আরোপ করিলে অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু জনন-ঋতুতে পশুপক্ষীরা যেরূপ আচরণ করে,তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিলে উহাদের যৌন-সম্মিলনে প্রণয়ের উল্লেখ অসমীচীন বলিয়া বোধ হইবে না। অন্ধ বৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হইলেও ইতর প্রাণীরা প্রজননকালে কণ্ঠস্বর, অঙ্গভঙ্গী ও নৃত্যাদি দ্বারা যে সকল অভিব্যক্তির পরিচয় দেয়, তাহা অবলোকন করিলে ইতর জীবের মধ্যেও প্রণয়ের উল্লেখ করিতে প্রবৃত্তি আসিয়া থাকে। পশুপক্ষীর এই প্রণয়ব্যাপার সম্যক্ অনুধাবন করিতে না পারিলেও অনেকেই অবশ্য ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন। আলিসায় গৃহপালিত কপোতের অবিরাম কূজন, অলিন্দে চটকের কলরব, অঙ্গনে মোরগের মদদীপ্ত ভাব, কাননকুঞ্জে কোকিলের কুহুতান, প্রান্তরে শালিকের সংগ্রাম প্রভৃতি এই প্রণয়লীলার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। বসন্তের অনিল কাননের লতাপাদপকে স্পর্শ করিলেই পশুপক্ষীর প্রাণে প্রজনন-বৃত্তি উদ্‌বুদ্ধ হইয়া উঠে এবং যৌন-সমাগমের উদ্দেশে ইহারা স্ব স্ব স্ত্রীর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। পশুপক্ষীর এই নীরব-গুণ্ঠিত প্রণয় প্রকৃতির কাননমঞ্চে উন্মুক্তভাবেই সংঘটিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি যৌন-সমাগমে বিহগ-দিগের প্রাবরণবিহীন প্রণয়রীতির বিষয়ই আলোচনা করিব।

বিহগদিগের প্রণয়রীতির কথা বলিতে গেলে প্রথমেই কোকিল ও ময়ূরের কথাই আমার মনে পড়ে। কোকিলকে শুধু যে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও লোগানের কবিতায় চিনিয়াছি বা "কৃষ্ণকান্তের উইল" বঙ্কিমচন্দ্রের লিপিচিত্রে জানিয়াছি, তাহা নহে, কোকিলার চিত্তহরণে ইহার কণ্ঠভঙ্গিমা ও প্রগাঢ় পিরীতি লক্ষ্য করিতে করিতে আমি "কালামুখো" পাখীকে নির্লজ্জ বায়স বা নীচ চিলের মতই অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছি।

দিগ্‌দিগন্তে প্রতিধ্বনিত ক্রমোচ্চ কুহুরবের মধ্যেই কোকিলের প্রণয়রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। মধুমাসে সহকার-শাখা, অশোকের ডাল, বকুলের পত্রান্তরাল প্রভৃতি হইতে যে অবিশ্রান্ত কুহুরব শুনা যায়, তাহা কোকিলার অন্বেষণে কোকিলের প্রণয়সঙ্কেত মাত্র। কবি এ গীতের মধ্যে যে ভাবের রসই পান না কেন, উহা "কাল পাখীর" শুধু মন-মাতান গান নহে, উহা অপূর্ব্ব প্রণয়ের বিচিত্র পরিভাষা। সে কুহুতান যে শুধু বিরহীকে ব্যাকুল করিয়া তুলে, তাহা নহে, বনান্তরালে বনফলভোজননিরতা কোকিলাও সে ইঙ্গিতে সন্তপ্তা হইয়া পড়ে। অন্য কোনও কালে কোকিলের এ সুরলহরী শ্রুতিগোচর হয় না। প্রজননকালে মাত্র প্রণয়িনীলাভার্থে পিকের কণ্ঠ মুখর ও মধুর হইয়া উঠে।

কোকিল যখন ভাবী প্রিয়ার সন্নিকটে রসালের শাখায় অমৃতবর্ষণ করিতে থাকে, তখন কোকিলাকে বড়ই অরসিকা বলিয়া বোধ হয়। প্রেমিকের প্রণয়-কাকলীতে আদৌ কর্ণপাত না করিয়া তাহাকে অনেক সময়েই মৌনভাবে অবস্থান করিতে দেখা যায়, কিম্বা কিয়ৎক্ষণ শ্রবণের পরেই কোকিলাকে কোকিলের আবেদন অগ্রাহ্য করিয়া বৃক্ষান্তরে উড়িয়া যাইতে দেখা যায়। অনেক সময়ে একই কোকিলার সন্নিকটে বিভিন্ন শাখা বা বিভিন্ন বিটপীতে একাধিক পিককে অবস্থান করিয়া গীতোৎকর্ষতার পরিচয় দিতেও দেখা যায়। বসন্তের স্নিগ্ধ প্রভাতে বা শ্যামায়মান সন্ধ্যার প্রাক্কালে কোকিলদিগের এই ক্রমোচ্চ স্বর ও সুরের প্রতিযোগিতা অনেকেই বোধ হয় লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। গান শুনিতে শুনিতে কোকিলা উড়িয়া যাইলে কোকিলরাও মহাকলরবে তাহার অনুসরণ করিয়া থাকে এবং কাননের কুঞ্জান্তরে পুনরায় গীতের বৈঠক আরম্ভ হয়। কুরূপা প্রণয়িনীর মনস্তুষ্টির জন্য কোকিলের এত উদ্বেগ, আয়োজন এবং এরূপ নিরতি অনাবশ্যক বলিয়া বোধ হইলেও প্রাঙ্‌মিথুন-লীলায় পরভৃৎকে বড়ই বিব্রত হইতে দেখা যায়। পরিশেষে প্রণয়ীর পীড়নে যেন বাধ্য হইয়াই কোকিলাকে কাননের সে স্বয়ম্বর-সভায় পতি নির্ব্বাচন করিয়া লইতে হয়। প্রণয়ীদিগের মধ্যে যাহার কণ্ঠস্বর সমধিক মধুর এবং পতত্রের চাক্‌চিক্য অধিক, কোকিলা তাহার সহিতই উড়িয়া পলায়ন করে এবং অপর কোকিলরা নিরাশভাবে দারান্তরের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়।

এই প্রকার নির্ব্বাচনে বিহগীদিগের সৌন্দর্য্যজ্ঞানের সুন্দর আভাস পাওয়া যায়। পক্ষিতত্ত্ববিদ্‌রা পরীক্ষায় দেখিয়াছেন যে, পক্ষিণীরা পুচ্ছহীন, শিখাহীন বা বহুমলিন বিহঙ্গকে পছন্দ করিতে চাহে না। পিঞ্জরাবদ্ধ একটি বিহগীর

নিকট একই জাতীয় পুচ্ছহীন পুচ্ছযুক্ত, শিখাহীন শিখা-সমন্বিত এবং বর্ণমলিন ও বর্ণোজ্জ্বল দুইটি পক্ষীকে ছাড়িয়া দিলে বিহগী শিখাপুচ্ছসমন্বিত বর্ণোজ্জ্বল বিহঙ্গকেই পছন্দ করিয়া তাহার পার্শ্বগামিনী হইয়া থাকে। মোরগের চূড়া ও পুচ্ছ ছিন্ন করিয়া ছাড়িয়া দিলে প্রণয়লাভে তাহাকে কিরূপ নিরাশ হইতে হয়, তাহা অনেকেই দেখিতে পারেন।

কিন্তু এরূপ ভাবে উড়িয়া যাইবার পূর্ব্বে কোকিলা আবার অনেক সময় কোকিলকে বহুবার ছলনা করিতেও ছাড়ে না।

মিঃ মুলার তাঁহার "Play of animals" নামক গ্রন্থে কোকিলার চতুরালির বিষয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কোকিলা যেন প্রণয়ীকে ছলনা করিবার উদ্দেশেই বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে উড়িয়া পলায়ন করে এবং সন্তপ্ত পিকও তাহার অনুগামী হইয়া প্রণয় নিবেদন করিতে ক্ষান্ত হয় না। পরিশেষে অনেক উড়াউড়ির পর কোকিলা বঁধুর অনুরাগে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকে। আমাদের পরিচিত মাছরাঙ্গাদের মধ্যেও প্রণয়ের এ "লুকোচুরি" দেখিতে পাওয়া যায়। কোন জলাশয়ের সন্নিকটে লুকাইয়া থাকিলে মাছরাঙ্গাদের প্রণয়-রীতি লক্ষ্য করা কঠিন হইবে না। মাছরাঙ্গা যখন প্রণয়-ব্যথিত চিত্তে উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া উঠে, স্ত্রী-মাছরাঙ্গা বঁধুর সে ডাকে সাড়া দিয়া অনুমোদন জ্ঞাপন করিলেও সহজে সন্তপ্ত দয়িতকে নিকটে আসিতে দেয় না। দিবসের প্রায় অর্দ্ধভাগ সরোবরের আশে-পাশে প্রণয়ীকে ছলনা করিয়া স্ত্রী-মাছরাঙ্গা শেষে প্রণয়িপাশে আসিয়া ধরা দেয়।

অনেক সময়ে কাননকুঞ্জে গানের আসরে ক্ষুদ্র সমরেরও অভাব থাকে না। গানের উৎকর্ষতা দেখাইতে যাইয়া প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের মধ্যে মহা কলহ উপস্থিত হয় এবং চঞ্চু ও নখরের আঘাতে পালক ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যায়। কোকিল-দের এই প্রণয়-সমর আমি একবার লক্ষ্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। তখন উহাদের যুযুৎসা এতই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, খুব সন্নিকটে উপস্থিত হইলেও উহারা উড়িয়া পলায়ন করে নাই। এ প্রাণপাত সমরেও কোকিলাকে নির্ব্বিকারচিত্তে অবস্থান করিতে দেখা যায়। প্রণয়ীরা একে একে বিধ্বস্ত হইয়া পড়িলে কোকিলা বিজয়ীর প্রতিই আসক্তি জ্ঞাপন করিয়া থাকে এবং সেইখানেই আহবের পর্য্যবসান হইয়া যায়। মিলনের পরেও জায়ার মনস্তুষ্টির জন্য পরভৃৎকে অনেক সময়েই উৎকোচস্বরূপ পক্ব ফলাদি চঞ্চুপুটে সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দিতে দেখা যায়। বিহঙ্গরা যৌন-সম্মিলনকালে প্রণয়িনীদিগের প্রীতির জন্য এইরূপ খাদ্যাদি বা নীড়োপকরণ যে আনিয়া দেয়, তাহা পরে বিবৃত করিব। কণ্ঠস্বরের সাহায্যে কোকিল ব্যতীত আরও অনেক পক্ষী স্ত্রীর মনোহরণ করিতে চেষ্টা করে। বিলাতের লাইম গ্রোভের নাইটিংগেল, পারস্যের গোলাপ ও যূথি-বীথিকার বুলবুল, এ দেশের উষা-নীহার-স্নাত উচ্চবংশচূড়ার সুকণ্ঠ শ্যামা, ছায়াস্নিগ্ধ শ্যামল পল্লী-উপবনের দধিয়াল এবং চম্পকশাখার বিনিদ্র পাপিয়া প্রভৃতি পরভৃতের মতই সঙ্গীতের প্রতিযোগিতা করিয়া ভাবী বনিতার মনোহরণ করিতে প্রয়াস পায়। এই প্রকার সঙ্গীত ব্যতীত প্রাঙ্-মিথুন-লীলায় বিহগরা নৃত্যকলা, অঙ্গভঙ্গী দ্বারা কায়িক সৌন্দর্য্য বা রূপসম্পদ প্রদর্শন, মল্লযুদ্ধাদি দ্বারা শারীরিক বল প্রভৃতির পরিচয় দিয়া প্রণয়িনীর প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকে। সুরগরিমায় যে সকল বিহগ পত্নীলাভে প্রয়াসী হয়, সাধারণতঃ তাহাদের পতত্র-সৌন্দর্য্য থাকে না এবং যে সকল পক্ষী কণ্ঠগৌরবহীন, তাহাদের অঙ্গ-গৌরব সমধিক হইতে দেখা যায়। পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত কোকিল এবং শেষোক্ত শ্রেণীর বিহগ ময়ূর। কলাপীর অঙ্গ-সৌন্দর্য্য যতই মনোহর, ইহাদের কণ্ঠস্বর ততই বিকৃত। সুতরাং পত্নীলাভে পিকের পন্থা অবলম্বন না করিয়া শিখীকে ভিন্ন উপায় অবলম্বন করিতে হয়। পিকের কলতানের মত শিখীর ষড়্‌জসংবাদিনী কেকা প্রণয়িনীর চিত্তে কোনও রেখাপাত করিতে পারে না। সেই জন্যই কায়িক সৌন্দর্য্য অর্থাৎ পতত্রের বর্ণচ্ছটা ও পুচ্ছসম্ভারের চন্দ্রকাবলী বনিতার সমক্ষে বিস্তার করিয়া বর্হী তাহার মনোহরণে প্রয়াসী হইয়া থাকে। নীরবে পুচ্ছ বিস্তার করিয়া ধরিলে তাহা প্রিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ নাও করিতে পারে, ভাবিয়া ময়ূর মাঝে মাঝে বিস্তৃত কলাপ কম্পন করিয়া নৃত্য করিয়া থাকে। পুচ্ছের কম্পনজনিত এই অনুচ্চ মর্ম্মর শব্দেই প্রণয়িনীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়া থাকে।

শিখীর প্রণয়োদ্দীপক নৃত্য প্রথম দেখিয়াছিলাম আলিপুর পশুশালায়। সে নৃত্য যেন প্যাভ্‌লোভার নৃত্যকেও লজ্জা দিয়াছিল। তখন গগনে কোনও কাদম্বিনী ছিল কি

না, লক্ষ্য করি নাই, তবে আকাশে নীরদের সঞ্চার না হইলেও নৃত্যের ভিন্ন কারণ বুঝিতে পারিয়াছিলাম এবং মেঘ থাকিলেও যে তাহা তখন কলাপীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিত না, তাহাও বুঝিয়াছিলাম। ময়ূর তখন প্রণয়িনীর মনোহরণার্থে কলাপের চন্দ্রশতক বিস্তার করিয়া ইন্দ্রসভায় গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথের মত নৃত্য করিতেছিল। শিখীর নৃত্য দেখিতে দেখিতে আমার বিরহী যক্ষবধূর কথাই মনে পড়িতেছিল। কিন্তু তাহার প্রণয়রীতি লক্ষ্য করিতে করিতে আমি মেঘদূতের কাব্যকথা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলাম। এই শৃঙ্গার-নৃত্যের তাল ও রীতি দেখিয়া আমার মনে হইল, স্বর্গে দেবপরিণয়ে বোধ হয় গন্ধর্ব্ব-কিন্নররাও কখন এমন সুন্দর নৃত্য করিতে পারে নাই। এই নৃত্যের সময়ে কণ্ঠ একবারে নীরব থাকে বলিয়াই ময়ূর পতত্রকম্পনে অনুচ্চ মর্ম্মর শব্দের সৃষ্টি করিয়া থাকে। ময়ূরের এই পেখম বিস্তার ও নৃত্য কেবলমাত্র তাহার পত্নীলাভের সহায়ক। ময়ূর যে কেবল মেঘ দেখিয়াই নৃত্য করে, তাহা নহে; আকাশে ঘনোদয় তাহার অন্তরে যৌন-সম্মিলনের আকাঙ্ক্ষা জাগরূক করে মাত্র এবং সে ভাব অন্তরে দীপ্ত হইলে শিখী প্রণয়িনীর উদ্দেশেই পুচ্ছ বিস্তার করিয়া নৃত্যপরায়ণ হইয়া থাকে।

ময়ূরের কথায় মায়ূর জাতীয় Argus pheasant এবং মৃনালের কথা আমার মনে পড়িল। বহুকাল পূর্ব্বে কলিকাতার চিত্রশালিকায় এই দুইটি পাখীর সযত্নরক্ষিত দেহ আমি দেখিয়াছিলাম। Argus pheasantটি আজিও কাচের আধারে যৌনসম্মিলনের প্রাক্-সজ্জায় দয়িতার পার্শ্বে মস্তকোপরি পক্ষ ও পুচ্ছ-সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়া অবস্থান করিতেছে। ময়ূরের মত ইহাদের প্রণয়রীতিও অতি সুন্দর। ইহারা মালাক্কা ও শ্যামরাজ্যের বনস্থলীতে বাস করে। যৌনসমাগমকালে বনের একটি নিভৃত স্থল পরিষ্কার করিয়া পুংপক্ষীরা যেন বাসকসজ্জভাবেই তথায় অবস্থান করে এবং স্ত্রীর দর্শন পাইলেই তাহার সমক্ষে পক্ষ ও পুচ্ছ বিস্তার করিয়া নৃত্য করে। পক্ষের যে সকল পালক সমুজ্জ্বল চন্দ্রকে ভূষিত ও পুচ্ছের যে অংশ বিশেষভাবে চন্দ্রকে চিহ্নিত, ইহারা সেই সকল স্থানই স্ত্রীর সমক্ষে উন্মুক্ত করিয়া অঙ্গসৌন্দর্য্যে তাহাকে আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করে। ইহাদের সে শৃঙ্গার-ভাবের অবস্থা যে শুধু স্ত্রী-পক্ষীর মনোহরণ করে, এমত নহে, সে ভাব সকলেরই চিত্তাকর্ষক। একান্ত সৌন্দর্য্যহীনা নিরলঙ্কৃতা নারীর মনোহরণে পক্ষীর পতত্র-সম্ভারের এই আড়ম্বর অতিরিক্ত ও অনাবশ্যক বলিয়াই অনুমিত হইয়া থাকে।

গোল্ডেন ফেজাণ্ট এবং লেডী আমহার্ষ্ট ফেজাণ্ট অতি সুন্দর পক্ষী। চীন দেশের পশ্চিম ও দক্ষিণ ভাগে এবং তিব্বতের পশ্চিমে ইহাদের বাসভূমি। নিরাভরণা নারীর প্রণয়লাভের আকাঙ্ক্ষায় নিসর্গসুন্দর বিহগ পুচ্ছ ও মস্তকের সুরঞ্জিত পালকগুলি স্ত্রীর প্রতি কম্পিত করিয়া তুলিয়া দেয়। নিউগিনির বার্ড অফ প্যারাডাইস্ (Bard of paradise)কে অনেকেই আলিপুর পশুশালায় দেখিয়া থাকিবেন। এই মনোরম বিহঙ্গ বায়স-জাতীয়। ইহাদের পক্ষদ্বয়ের নিম্নে সুরঞ্জিত পালকের গুচ্ছ ও পুচ্ছে দুইটি সুদীর্ঘ পালক ফিতার মত ঝুলিয়া থাকিতে দেখা যায়। যৌনসম্মিলনকালে বার্ড অফ প্যারাডাইস্ বা নন্দন পক্ষীরা পক্ষবিস্তার পূর্ব্বক নিম্নের পালকগুচ্ছ অসুন্দরী স্ত্রীর নয়নপথবর্ত্তী করিয়া তাহাকে তুষ্ট করিতে চেষ্টা করে।

নিউ সাউথ ওয়েলসের বাওয়ার বার্ডের প্রণয়রীতি অত্যন্ত অদ্ভুত। কোকিল যেমন গান গাহিয়া এবং ময়ূর যেরূপ পেখমের সৌন্দর্য্য দেখাইয়া স্ব স্ব স্ত্রীর অনুরাগ আকাঙ্ক্ষা করে, ইহারা তেমনই স্বরচিত বাওয়ার বা কেলিকুঞ্জের সম্পদ ও সৌন্দর্য্য স্ত্রীকে দেখাইয়া তাহার প্রণয়লাভে প্রয়াসী হইয়া থাকে। এই বাওয়ার বার্ডদিগের বিশেষ কোনও অঙ্গ সৌন্দর্য্য নাই এবং নীড়ের মধ্যেও কোন রচনা-বৈচিত্র্য বা নির্ম্মাণ-কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায় না। কুলায় যেমন তেমন করিয়া নির্ম্মাণ করিলেও প্রমোদকুঞ্জ বা বাওয়ার (Bower)এর রচনায় ইহারা বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দি[illegible] থাকে। স্ত্রীর চিত্তবিনোদনার্থে পুংপক্ষীরা নীড়ের অনতিদূরে কোনও বৃক্ষমূলে অল্পপরিসর স্থান পরিষ্কার করিয়া অ[illegible] কুশলতার সহিত শৈবালাদির দ্বারা কুঞ্জভবন নির্ম্মাণ করি[illegible] থাকে। এই কুঞ্জভবনে প্রবেশ ও বহির্গমনের নিমিত্ত ইহা[illegible] কতকগুলি দ্বার রাখিয়া দেয়। কুঞ্জনির্ম্মাণ শেষ হই[illegible] তাহার অঙ্গনে বহুবিধ চিত্রিত ঝিনুক, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্বেত প্রস্[illegible] খণ্ড, অস্থির টুক্‌রা প্রভৃতি সজ্জিত করিয়া রাখে। কুঞ্জদ্বারে[illegible] চারি পার্শ্বে ও কুঞ্জভবনের গাত্রে রঙ্গিন ফুল, রক্তবর্ণের [illegible] সুরঞ্জিত পালক, নানাবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বর্ণোজ্জ্বল শম্বুক [illegible] রাংতার টুক্‌রা আনিয়া সুসজ্জিত করিয়া রাখে। কুঞ্জসজ্জ[illegible]

কোনও ফুল বা ফল শুষ্ক বা মলিন হইয়া যাইলে ইহারা শুষ্ক ফুল বা ফল অপসারিত করিয়া তৎস্থানে নূতন ফুল ও ফল আনিয়া সাজাইয়া রাখে। এইরূপে বিচিত্র প্রমোদবাটিকার নির্ম্মাণ শেষ হইলে ইহারা বাটিকার অঙ্গনে উহার শ্রীবর্দ্ধনেই যত্নবান্ থাকে। স্ত্রীর উপস্থিতিতে এই অঙ্গনেই পরস্পর পাল্লা দিয়া ইহারা নৃত্যাদি করিয়া থাকে। স্ত্রী-পক্ষীরা কোনও পক্ষীর লীলোদ্যানে আসিয়া উপস্থিত হইলে পুংপক্ষী অতি সম্ভ্রম ও যত্নসহকারে পক্ষিণীকে কুঞ্জাভ্যন্তরে লইয়া গিয়া এবং কুঞ্জশোভা প্রদর্শন করাইয়া তাহার মনোহরণ করিতে চেষ্টা করে। পক্ষিণী হয় ত অনেক সময় সে বেশগৃহের শোভায় মুগ্ধা না হইয়া আর এক পক্ষীর বিলাসগৃহে গিয়া উপস্থিত হয় এবং সে কুঞ্জের শ্রীসম্পদে বিমুগ্ধা হইয়া তাহারই প্রণয়ভাগিনী হইয়া পড়ে। বিহঙ্গ-জগতে ঘর-সংসারের সম্পদ্ দেখাইয়া স্ত্রীর মনোহরণ করিতে আর কোথাও দেখা যায় না।

বহু পক্ষীর মধ্যে পক্ষিণীর আবির্ভাব ঘটিলে কুঞ্জভবনের পরিচ্ছন্ন প্রাঙ্গণে নৃত্যের প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। নৃত্যাদির মাঝে আবার কখনও বা ভীষণ দ্বন্দ্বযুদ্ধের সমাবেশ হইয়া থাকে, তাহাতে দেহ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেলেও অপর পক্ষীরা পরাজিত হইয়া পলায়ন না করিলে বিজয়ী পক্ষী রণে নিবৃত্ত হয় না এবং প্রণয়ের প্রাগভিনয়েরও পর্য্যবসান ঘটে না। আলিপুর জীবনিবাসে বহু বার্ড অফ প্যারাডাইস্ সমাদরে রক্ষিত হইলেও একটি বাওয়ার বার্ড আমি দেখিতে পাই নাই। লণ্ডন এবং প্যারীর পশুশালায় এই পক্ষী সমাদরে রক্ষিত হইয়াছে। অবরোধের মধ্যেও তাহারা প্রণয়িনীর চিত্তবিনোদনের নিমিত্ত শৈবালাদি দ্বারা ভূষিত করিয়া কেলি-কুঞ্জ নির্ম্মাণ করিতে বিস্মৃত হয় নাই।

সুপরিচিত কুক্কুটের প্রণয়রীতি হয় ত অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। কুক্কুট বহুপত্নীক বিহঙ্গ। বন্যকুক্কুট-কে বহু স্ত্রীর প্রণয়ভাগী হইতে দেখা যায়। মস্তকের শিখা, গলদেশের লোল লোহিত চর্ম্মশোভা, পুচ্ছের রক্ত পিঙ্গল বা কৃষ্ণবর্ণের সমুন্নত পালকসমূহ ও পদের পশ্চাদ্ভাগের বক্র নখর (Spur) প্রভৃতিই ইহাদের প্রণয়-সমরের প্রধান অঙ্গ। ইহাদের সাহায্যে প্রণয়িনীর চিত্ত জয় করিতে না পারিলে কুক্কুট বীর্য্য প্রকাশ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না, বরং প্রথম হইতেই নারীমণ্ডলীর মাঝে বিজয়ীর মত চীৎকার করিয়া কুক্কুট স্পর্দ্ধার সহিত প্রেম-সম্ভাষণের সূচনা করিয়া থাকে এবং প্রণয়ক্ষেত্রে কোনও প্রতিদ্বন্দ্বীকে দেখিতে পাইলেই তাহার সহিত তুমুল রণে মত্ত হইয়া পড়ে। বর্ণোজ্জ্বল শিখা-পুচ্ছরূপ প্রণয়-পরিচ্ছদে ভূষিত হইলেও অসভ্য নরদিগের মত মোরগ দৈহিক বলের পরিচয় দিয়াই পত্নীলাভ করিয়া থাকে। এই প্রণয়সমরে পদের পশ্চাদ্ভাগের নখর বা Spurই ইহাদের প্রধান অস্ত্র; সুতরাং যে কুক্কুটের এই নখর নাই, প্রণয়িনীর প্রেমলাভে তাহাকে বড়ই বিব্রত হইতে হয়।

আরণ্য কুক্কুটকে সর্ব্বদাই রণজয়ী হইয়া বহু পত্নীর প্রেম-লাভ করিতে হয় বলিয়া গৃহপালিত কুক্কুট অপেক্ষা ইহাদের এই নখর (Spur) দীর্ঘ ও তীক্ষ্ণ হইতে দেখা যায়। গৃহ-পালিত অবস্থায় ইহাদিগকে সে প্রকার প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে পড়িতে হয় না বলিয়া এই নখরের আকার হ্রস্ব বা প্রয়োগের অভাবে অনেক স্থলে ইহা একবারেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কলিকাতার যাদুঘরে রক্ষিত মোরগদিগের মধ্যে আমি পরেশনাথ পাহাড়ের জঙ্গলজাত বন্য মোরগের পায়ে এই নখর খুব দীর্ঘ ও তীক্ষ্ণ দেখিয়াছিলাম। গৃহপালিত কুক্কুট-দিগের মধ্যে অনেক স্থলে এই নখর থাকিলেও তাহার আকার এত খর্ব্ব যে, তাহাকে প্রণয়-সমরের আয়ুধরূপে গণনাই করা যায় না।

আমাদের পরিচিত বলিভুক্ বায়স এ বিষয়ে অনেক উন্নত এবং তাহার প্রণয়রীতিও পরিমার্জ্জিত। চরিত্র লঘু বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও প্রণয়ব্যাপারে কাক কখনই হীনতার পরিচয় দেয় না। শুকের মত কাক এক পত্নীতে আসক্ত থাকিতে ভালবাসে। বিহঙ্গমণ্ডলে আর কোনও পক্ষীর এক পত্নীতে এরূপ চিরাসক্তি প্রত্যক্ষ করা যায় কি না, জানি না। সারস ও ধনেশের দাম্পত্য-প্রেম প্রগাঢ় হইলেও কাকের মত এক ভার্য্যায় চিরানুরক্তি থাকে কি না সন্দেহ। কাকের কথা আমি বহু পূর্ব্বে "নবযুগে" "কাকচরিত্র" শীর্ষক প্রবন্ধে বিবৃত করিয়াছিলাম; কিন্তু কাকের প্রণয়রীতির কথা বিশেষ করিয়া কিছু বলি নাই। প্রণয়-ব্যাপারের অঙ্গস্বরূপ কণ্ঠস্বরের মাধুর্য্য, পতত্রের বর্ণগৌরব, নৃত্যাদি অঙ্গভঙ্গী প্রভৃতি কোনটিই কাকের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং কাককে প্রণয়-ব্যাপারে বড় বিব্রতও হইতে হয় না। প্রায়শঃই সহজ উপায়ে—কাকের প্রণয়িনী মিলিয়া যায়।

কাকী মাত্র ঈষৎ পক্ষ বিধূনন করিয়া কাকের নিকট প্রণয়াকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। সহধর্ম্মিণী জুটিয়া গেলে কাক আমরণ তাহার প্রতি আসক্ত থাকে। আভিজাত্যহীন কাক এ বিষয়ে পিক হইতে অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। অণ্ড-প্রসবের পর পিকের সহিত পিকবধূর সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলেও বায়স-দম্পতির সম্বন্ধ অবিচ্ছেদী। বায়সমিথুনের মধ্যে একটির মৃত্যু না ঘটিলে দাম্পত্যসম্বন্ধে বিচ্ছেদ ঘটে না। কাকমিথুনকে প্রায়ই একসঙ্গে চলাফেরা করিতে দেখা যায়।

বিহঙ্গ-জগতে সারস অপত্য-স্নেহের নিমিত্ত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। সারসের দাম্পত্য-জীবনও বেশ শান্তিপূর্ণ। বন্য-কুক্কুট, নানাজাতীয় ফেজান্ট এবং কতক শ্রেণীর নন্দন পক্ষীর মত ইহাদের মধ্যে বহু বিবাহ বা গোষ্ঠীবিবাদ দেখা যায় না। ভেক,সর্প প্রভৃতি নানা জাতীয় সরীসৃপ এবং মূষিকাদি হইতে বিষ্ঠা পর্য্যন্ত গলাধঃকরণ করিয়া ইহারা লোকালয়ের উপকার-সাধন করে বলিয়া হলাণ্ড, জার্ম্মাণী প্রভৃতি দেশে ইহাদের বিশেষ সমাদর দৃষ্ট হইয়া থাকে। তত্রত্য লোকরা নিজ নিজ বাটীর ছাদে সারসের নিমিত্ত বড় বড় পীপা রাখিয়া সারসকে তথায় নীড় বাঁধিতে প্রণোদিত করে। আকৃতি ও আবাসের মত সারসের প্রণয়-রীতিও অদ্ভুত। যৌন-সম্মিলনের পূর্ব্বে ঊর্দ্ধমুখে কর্কশ চীৎকার করিয়া এবং পক্ষবিস্তার পূর্ব্বক ছুটাছুটি করিয়া সারস সারসীর অন্তরে যৌন-সম্মিলনের আকাঙ্ক্ষা প্রবুদ্ধ করিয়া থাকে। গোনন্দদিগের তৎকালীন চীৎকারে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত হইয়া উঠে। আলিপুর পশু-শালায় আমি শৃঙ্গারোন্মত্ত সারসদিগের এরূপ "পাগ্‌লা নাচ" বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

পারাবত-মিথুনের প্রেম কবিতা-প্রসিদ্ধ। মুখোমুখী হইয়া, পক্ষে পক্ষ মিলাইয়া, গোপনে প্রণয়-সম্ভাষণ করিতে আর কোনও বিহগকে দেখা যায় না। বিলাতী ক্রেষ্টেড গ্রীব (Crested Grebe) জলাশয়ের উপর মুখোমুখী হইয়া প্রণয়াসক্ত হইলেও সে প্রেম পারাবত-প্রেমের মত নিবিড় নহে। ঈষৎ পক্ষবিধূনন করিয়া কাকীকে যেরূপ কাকের প্রতি প্রণয় জ্ঞাপন করিতে দেখিয়াছিলাম, এক পারাবত-মিথুনের মধ্যে কপোতীকেও সেইরূপ কপোতের চঞ্চুমধ্যে নিজ চঞ্চু প্রবিষ্ট করাইয়া দয়িতকে শৃঙ্গারে উদ্রিক্ত করিতে দেখিয়াছি। কপোতীর ভাব দেখিয়া আমার বোধ হইয়া-ছিল, যেন শৃঙ্গারে তাহার ঔৎসুক্যই অধিক।

"গোলা" পায়রারাই সাধারণতঃ এইরূপ মুখোমুখী হইয়া প্রণয়াসক্ত হইয়া থাকে। "মুক্‌খি" "লক্কা" প্রভৃতিরা ময়ূর রীতিতে অর্থাৎ পুচ্ছ তুলিয়া ও গ্রীবা হেলাইয়া স্ত্রীকে আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করে।

চড়াই যে লড়াই করিয়া বিবাহ করে, তাহা বোধ হয় সকলেরই জানা আছে। রণে নিরত না হইলে চটক স্ত্রীর সমক্ষে অঙ্গের পালক ফুলাইয়া বিলোলপক্ষে নৃত্য করিতে করিতে অনুচ্চ মধুর কূজন করিয়া শৃঙ্গাররসের অভিনয় করে। এইকালে প্রণয়ক্ষেত্রে অপর চটক আসিয়া উপস্থিত হইলেই শৃঙ্গারোন্মত্ত চটক বিবাহ-বেশ পরিত্যাগ করিয়া যোদ্ধৃবেশ ধারণ করিয়া থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্রণয়িনীর সমক্ষে ভীষণ সমর বাধিয়া যায়। প্রণয়ের মাঝে বা পূর্ব্ব-রাগের সময় চটকদিগের এইপ্রকার অভিনয় প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। চটক যখন গৃহবলভীতে বনিতার নিকট গোপনে প্রেম নিবেদন করে, চটকী তখন অধিকাংশ বিহগীর মত ঔদাস্য প্রকাশ না করিয়া সন্তপ্ত প্রণয়ীর প্রতি আসক্তি জ্ঞাপন করিয়া থাকে।

শালিকের প্রণয় আসুরিক। রণ না করিয়া ইহাদের বিবাহ হয় না। পূর্ব্বকালে রাজপুতরা যেমন যুদ্ধ করিয়া প্রণয়িনীর পাণিগ্রহণ করিত, শালিকরাও সেইরূপ দ্বৈরথ-রণে বিজয়ী হইয়া প্রণয়িনীর করপ্রার্থী হইয়া থাকে। গড়ের মাঠের অনেক স্থলে ৭।৮টি শালিকের মধ্যে আমি বহুবার এই প্রকার প্রণয়রীতি লক্ষ্য করিয়াছি।

চটক ও শালিকের কথায় আমার ছাতারিয়ার কথা মনে পড়িল। "সাত ভাই" বা ছাতারিয়া বাঙ্গালা দেশের অতি পরিচিত পাখী। ভেচোখো মাছ ও হাঁসের মত মশার ডিম ভক্ষণ করিয়া ইহারা পল্লীর যে কত উপকারসাধন করে, তাহা বলা যায় না। ইহাদের আগমনে বাগান-বাগিচা ক্ষণিকের নিমিত্ত যে শ্রুতিকঠোর কলরবে কিরূপ মুখর হইয়া উঠে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। এই কলরবকে অনেকে "সাতভাই"দের বিবাদ-বিসম্বাদ বলিয়া অনুমান করিতে পারেন, কিন্তু এই কলরবের মধ্যেই অনেক সময়ে উহাদের প্রণয়-সমস্যার সমাধান হইয়া যায়। যখন ৫।৬টি ছাতারিয়া ঘাসের উপর মুখোমুখী হইয়া পুচ্ছ কাঁপাইয়া মহা কলরবে আত্মগরিমা প্রকাশ করিতে থাকে, তখন সন্নিকটস্থ কোন বৃক্ষের শাখায় স্ত্রী ছাতারিয়া নীরবে বসিয়া পুরুষ সাতভাইদে

কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকে। ছাতারিয়াদের কলহের মধ্যে এই প্রণয়-প্রতিযোগিতা আমি আমার বাটীর পার্শ্বস্থিত ক্ষুদ্র বাগানে ২।৩ বার লক্ষ্য করিয়াছি।

আমেরিকার হামিং বার্ড বা ভ্রামর পক্ষী বিহঙ্গ-জগতের ক্ষুদ্রতম জীব। ইহাদের আকার এ দেশের ভ্রমরের অপেক্ষা বড় নহে। ব্রেজিল ও মধ্য-আমেরিকার পুষ্পবহুল বনস্থলীতে ইহারা ফুলে ফুলে পরিভ্রমণ করিয়া মধু পান করিয়া থাকে। ইহাদের অঙ্গশোভা এতই মনোরম যে, দেখিলে মনে হয়, বুঝি বা বনের মধ্যে পরীদের রাণী কোনও উদাসী রাজপুত্রের সন্ধান লইবার নিমিত্ত ইহাদিগকে রঙ্গীন সাটিনের পোষাক পরাইয়া চরের মত ছাড়িয়া দিয়াছে এবং ইহারা প্রতি ফুলের ঘরে প্রবেশ করিয়া সেই "ঘুমন্ত" রাজকুমারের সন্ধান লইতেছে। ইহাদের পতত্র-শোভা এতই মনোরম এবং আকার এত ক্ষুদ্র যে, উড়িবার কালে ইহাদিগকে নানাবর্ণের প্রজাপতি বলিয়াই ভ্রম হইয়া থাকে। প্রাঙ্‌মিথুনকালে ইহাদের নিসর্গসুন্দর পতত্রের সৌন্দর্য্য বিশেষরূপে প্রবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। তৎকালে প্রণয়িনীলাভার্থে ইহারা যে কেবল অঙ্গ-সৌন্দর্য্যের উপরেই নির্ভর করে, এমত নহে; এদেশের চড়াই, শালিক, বুলবুল প্রভৃতির মত লড়াই করিতে পশ্চাৎপদ হয় না। প্রণয়িনীর নিকট অপর এক বিহগ আসিয়া উপস্থিত হইলেই প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া যায়। পক্ষ ও চঞ্চু ভাঙ্গিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত সে প্রণয়-সমরের অবসান হয় না। যুদ্ধ করিবার কোনও কারণ না থাকিলে হামিং বার্ডরা স্ত্রীর সমক্ষে ইন্দ্রধনুরাগদীপ্ত সুরঞ্জিত পক্ষশোভা ও সমুদয় অঙ্গসৌন্দর্য্য বিকশিত করিয়া ইতস্ততঃ উড্ডয়ন করিতে করিতে তাহার মনোহরণ করিতে চেষ্টা করে।

ক্ষুদ্র ক্যানারি বার্ডের প্রণয়-রীতিতে বিশেষ লক্ষ্য করিবার কিছু না থাকিলেও হামিং বার্ডের প্রসঙ্গে ইহাদের বিষয়ে বলিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আফ্রিকার পশ্চিম কূলে ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জ এই ক্ষুদ্র বিহগদিগের জন্মভূমি। ম্যাডিরা দ্বীপের বনভূমিতে যে সকল ক্যানারি স্বভাবসৌন্দর্য্যের মধ্যে মুক্তপক্ষে বিচরণ করিতে দেখা যায়, তাহারা বৎসরের প্রায় ৯ মাস কাননস্থলীকে মৃদু-মধুর কূজন-গীতিতে পূর্ণ করিয়া রাখে। ইহাদের গানের মধ্যে অনেক প্রাণিতত্ত্ববিদ্ বিলাতী নাইটিংগেল ও স্কাইলার্কের সুরের আভাস পাইয়াছেন। ইহাদের এই মধুর কূজন জননঋতুতে আরও মধুর এবং সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। তখন ইহারা নানা সুরে কূজন করিতে করিতে বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে উড়িয়া বিহগীদিগের মধ্যে প্রণয়রীতি জ্ঞাপন করিয়া থাকে। বনের মধ্যে ইহাদের এক একটি স্বতন্ত্র ঝাঁক দেখা যায় এবং প্রত্যেক শ্রেণীর কূজনের মধ্যেও কিঞ্চিৎ সুর-বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইয়া থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় বিহগদিগের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহের তত প্রচলন না থাকিলেও ক্যানারি বার্ডের মধ্যে অনেক সময় এই প্রকার বিবাহ হইতে দেখা যায়। এই প্রকার পরিণয়ের নিমিত্ত ক্যানারিদিগের স্ত্রীরাই অধিক দায়ী। বিহগীরা শুধু যে স্ব স্ব শ্রেণীর বিহগদিগকেই কণ্ঠস্বরের মাধুর্য্যে বরণ করিয়া লয়, এমন নহে, অন্য জাতীয় বিহগদিগকেও তাহারা পতিত্বে বরণ করিতে কুণ্ঠিতা হয় না। পালিতাবস্থাতে ইহাদের মধ্যে অসগোত্র বিবাহের রীতি স্পষ্ট লক্ষিত হইয়া থাকে। একই পিঞ্জরের মধ্যে Gold finch, Bull finch, Green finch, Linnet প্রভৃতি ছাড়িয়া দিলে স্ত্রী ক্যানারিরা তাহাদের প্রণয়-নিবেদন বড় একটা প্রত্যাখান করিতে চাহে না। এইরূপ অবাধ-মিলনের ফলে ক্যানারিদিগের মধ্যে কুকুর, কুক্কুট কপোত ও শশকের মত বহুপ্রকার বর্ণসঙ্করের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণের যে ক্যানারিকে সখ করিয়া পালন করা হয়, তাহা এই প্রকার অসবর্ণ পরিণয়সম্ভূত অনুলোমজ পতগ ব্যতীত কিছুই নহে। বন্য ক্যানারির বর্ণ একবারেই বিভিন্ন।

কলিকাতার যাদুঘরে আর্গস ফেজান্টের সহিত পুং মুনালকে শৃঙ্গারভাবোদ্দীপ্ত বেশেই দেখিয়াছিলাম। মুনাল ক্ষুদ্র পুচ্ছকে তুলিয়া প্রলিতপক্ষে অবস্থান করিতেছিল। বাস্তবিক মুনালের গাঢ় নীলোজ্জ্বল বর্ণ ও সুঠাম অঙ্গের প্রণয়ব্যঞ্জক ভাব দেখিলে বিহঙ্গী কেন, নারীর মনও আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। মানবশিল্পজাত বহুমূল্য সাটিন বা মখমলের শোভাও বোধ হয় নীলিমময় মুনাল-লাবণ্যের মত মনোরম নহে। মুনাল হামিং বার্ডের মত শুধু অঙ্গশোভা দ্বারাই স্ত্রীকে আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করে।

স্ত্রীর প্রণয়লাভে যে সকল পক্ষীকে শুধু অঙ্গ-শোভার উপরেই নির্ভর করিতে হয়, জনন-ঋতুতে তাহাদের পালকের বর্ণ উজ্জ্বল হইয়া থাকে। এ দেশে পল্লীগ্রামে তালগাছে মাঝে মাঝে বাবুইদের নীড় বিলম্বিত থাকিতে দেখা যায়।

নীড়-নির্ম্মাণে বিহগস্থাপত্যের এমন উৎকৃষ্ট পরিচয় খুব বিরল বলিয়াই বোধ হয়। আমি একবার রাজগঞ্জের ষ্টীমার-ঘাটের কিছু দূরে একটি সুদীর্ঘ তালবৃক্ষে বাবুইদের বাসা দেখিয়াছিলাম। বাবুইদের ক্ষুদ্র দেহে অঙ্গসম্পদ কিছু নাই বলিলেই হয়। জনন-ঋতুর সমাবেশে পুরুষ বাবুই-এর দেহের নিষ্প্রভ বর্ণ রূপান্তরিত হইয়া যায়। তৎকালে ইহাদের মস্তক ও বক্ষের বর্ণ পিঙ্গল হইতে পীতে এবং কণ্ঠ ও চঞ্চুর বর্ণ গাঢ় কৃষ্ণবর্ণে পরিণত হইতে দেখা যায়। সখ করিয়া যাঁহারা মুনিয়া পাখী পুষিয়া থাকেন, তাঁহারা প্রজননকালে অর্থাৎ বসন্ত-সমাগমে পিঞ্জরে রক্ষিত মুনিয়াদিগের অঙ্গ-রাগের প্রতি লক্ষ্য করিলে এই বর্ণ-পরিবর্ত্তন অনেকটা বুঝিতে পারিবেন।

প্রণয়ের প্রাগুক্ত রীতি ব্যতীত কতকগুলি বিহঙ্গ নীড়াদির উপকরণ আনিয়া দিয়া স্ত্রীর মনোহরণ করিতে চেষ্টা করে। নীড়-নির্ম্মাণ যৌন-সম্মিলনের পরবর্ত্তী ব্যাপার হইলেও বকরা শুষ্ক ডাল-পালা আনিয়া দিয়া স্ত্রীর মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিতে চেষ্টা করে। দক্ষিণ আণ্টার্টিক মহাসমুদ্রের শূন্য দ্বীপপুঞ্জের পেঙ্গুইন সমূহ উপকূল হইতে চঞ্চুপুটে ক্ষুদ্র উপলখণ্ড আনিয়া দিয়া স্ত্রীর চিত্তবিনোদনে প্রয়াসী হইয়া থাকে। আরও কতকগুলি জলচর পক্ষী কুলায় রচনার নিমিত্ত স্ত্রীসমীপে জলজলতাদি আনিয়া উপস্থিত করে।

রাজহংসরা যৌনসম্মিলনের পূর্ব্বে পক্ষের পালক চঞ্চু দ্বারা মাজিয়া সুবিন্যস্ত করিয়া লয় এবং হংস সরোবর-বক্ষে জলের মাঝে ডুব দিয়া হংসীর নিকট প্রণয় জ্ঞাপন করিয়া থাকে। হংসের এই জলক্রীড়া যে সকল সময়েই প্রণয়জ্ঞাপক, এমত নহে। ইহারা অনেক সময় জলের মধ্যে ডুবিয়া শম্বুক ও জলজ কীটাদি ধরিয়া ভক্ষণ করে। শ্যেন পক্ষীরা প্রণয়ব্যাপারে তত সুরসিক নহে বলিয়াই বোধ হয় পূর্ব্বোক্তপ্রকারে প্রণয়িনীর মনস্তুষ্টি সম্পাদন না করিয়া সহসা তীরবেগে স্ত্রীর সমীপে আসিয়া উপস্থিত হয়। শ্যেন-স্ত্রীও সহসা সমুপস্থিত আগন্তুক প্রণয়ীকে বর্জ্জন করিতে পারে না।

পারাবতপ্রসঙ্গে যে Crested Grebe-এর বিষয় উল্লেখ করিয়াছিলাম, তাহারা স্ত্রী-পুরুষে জলাশয়ের মধ্যে মুখোমুখী হইয়া পক্ষ কাঁপাইয়া প্রণয়াসক্ত হইয়া থাকে। হংস যেরূপ হংসীর উপর সংসারের যাবতীয় ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে, ক্রেষ্টেড গ্রীবের পুরুষরা সেরূপ করে না। যৌন-সম্মিলনের পর নীড় নির্ম্মাণ, অণ্ড রক্ষণ ও শাবক-পালনে পুরুষ গ্রীবরা স্ত্রীর সহিত সমভাবে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে। সুতরাং কোনও কারণে পুরুষের মৃত্যু হইলে অণ্ডাদির পক্ষে সমূহ ক্ষতি হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত বায়সও এ বিষয়ে বায়সীর সংসারে বিশেষ সহায়তা করিয়া থাকে। বায়সীর অনুপস্থিতিতে বায়স যে শুধু অণ্ডের উপর বসিয়া তাপ দেয়, এমত নহে, গৃহকর্ম্মনিরতা পত্নীর আহার যোগান হইতে গৃহের যাবতীয় কর্ম্মই বায়স কর্ত্তব্যপরায়ণ পতির মত সম্পাদন করিয়া থাকে।

শ্রীঅশেষচন্দ্র বসু (বি-এ)।

মৃত্যু-মিলন

এসো মৃত্যু, এসো শান্তি,—প্রিয় সহচরি,
নীল কণ্ঠে ভরি' আনো, আনো প্রিয়ে আনো
মুগ্ধ-করা গীতিগুচ্ছ,—না যেতে শর্ব্বরী
শুনাও কবিরে তব যত সুর জানো।
না হ'তে মূর্চ্ছনা শেষ অঞ্চল বিছায়ে
আজনম জ্বলে'-মরা এই তনুখানি
শোয়াবে যতনে অতি। মৃদু কর-বায়ে
চির-নিদ্রালস দিয়ো চক্ষে হে কল্যাণি!
তার পর শুভ্র প্রাতে বিশ্বজনে ডাকি'
অমৃত-আত্মাটি মোর ধরি' বক্ষো-মাঝে
নিঃসঙ্কোচে বলে' যেয়ো,—"আমি তার সাকী,
সে আমার প্রিয়তম,—লাজের কি আছে?"
কল্পনার স্বপ্ন নহে,—সত্য চাহি আমি;
জীবন-সঙ্গিনী মোর—চিত্তে এসো নামি'।

শ্রীপ্রমথনাথ কুণ্ডার

বিজ্ঞানের বাহাদুরী

বিজ্ঞান এখনও রক্তমাংসসমন্বিত মানুষ সৃষ্টি করিতে পারে নাই; কিন্তু ধাতব মানবমূর্ত্তি সৃষ্টি করিয়া তাহার দেহে এমন কলের মস্তিষ্ক সন্নিবিষ্ট করিয়াছে যে, বিধাতার সৃষ্ট মানবের আদেশমত মানবরচিত এই ধাতব মূর্ত্তি কখনও বসিবে, উঠিয়া দাঁড়াইবে, কথা কহিবে, গান গাহিবে, বিজলী পাখা খুলিয়া দিবে অথবা বন্ধ করিবে। বিজ্ঞানে ইহা সম্ভবপর হইয়াছে। আমেরিকার "ওয়েষ্টিংহাউস্ ইলেক্ট্রিক এণ্ড ম্যানুফ্যাক্চারিং কোম্পানী" এইরূপ একটি ধাতব মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাহার নাম দিয়াছেন—"মিঃ ভোকালাইট।" এই ধাতবমূর্ত্তি মানবের মুখের আদেশ শ্রবণ করিবামাত্র, তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া থাকে। বিদ্যুতের সহিত কোন কারবার নাই। ধাতব শরীরে তারের দ্বারা টেলিফোনে কথা কহিবার একটি যন্ত্র সংলগ্ন আছে। মিঃ ভোকালাইটের মস্তকের অভ্যন্তরে যেখানে চিন্তা করিবার যন্ত্রটি সন্নিবিষ্ট আছে, টেলিফোনের কথা কহিবার যন্ত্রে মনুষ্যকণ্ঠধ্বনি উচ্চারিত হইলেই তথায় একটা বৈদ্যুতিক স্পন্দন জন্মে। চিন্তা করিবার যন্ত্রে আলোকপাত হইবার ব্যবস্থা আছে। শব্দ ও আলোক-স্পন্দনের সাহায্যে মস্তিষ্ক-যন্ত্রে ক্রিয়া হয়। তাহারই ফলে ধাতবমূর্ত্তি উঠে, বসে, দাঁড়ায়, গান করে—মনুষ্য-প্রভুর যাবতীয় নির্দ্দেশ পালন করে।
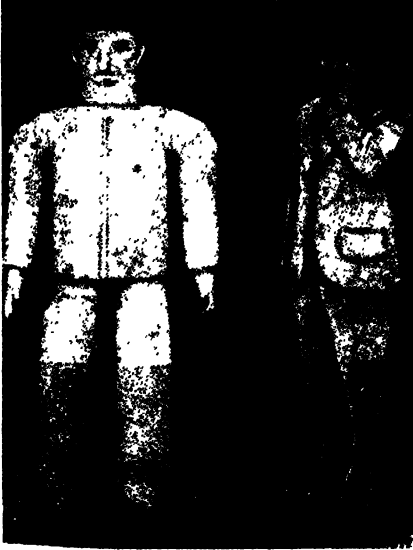
বিজ্ঞানের বাহাদুরী

অশ্বারোহণ-কৌশল

ফোর্ট মেয়ার ভা'র জনৈক অশ্বারোহী অপূর্ব্ব অশ্বারোহণ-কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন। ৭ জন মানুষ একটি বৃত্ত রচনা করেন। ৪ জন মানুষের স্কন্ধে ২ জন আরোহণ করেন এবং উল্লিখিত ৪ জন আর এক জনকে আড়াআড়ি ভাবে ধরিয়া রাখেন। ইহাতে যে মনুষ্য-বৃত্ত রচিত হয়, তাহার মধ্য দিয়া অশ্বারোহী নিম্নস্থ মনুষ্যকে উল্লঙ্ঘন করিয়া যান।

অশ্বারোহণের বিচিত্র কৌশল

কাচের বিদ্যালয়

হল্যাণ্ডের আমষ্টার্ডাম সহরে একটি প্রকাণ্ড বিদ্যালয়ের প্রাচীর কাচ দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। এই কাচ-প্রাচীরগুলি সহজে
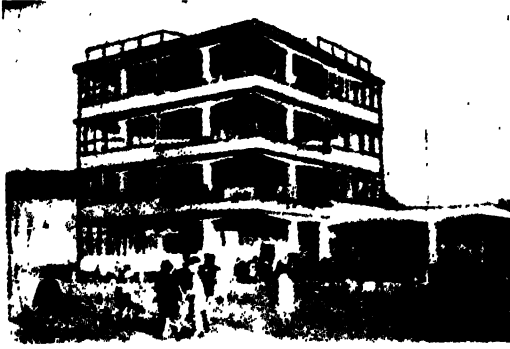
কাচের বিদ্যালয়

খুলিয়া দেওয়া যায়। মেঘ-নির্ম্মুক্ত অথবা কুজ্ঝটিকাবিহীন দিনে, কাচ-প্রাচীর সরাইয়া দিলে বাহিরের সহিত ঘরের কোন পার্থক্যই থাকে না।

শব্দহীন বন্দুক

বারুদের পরিবর্ত্তে ইদানীং তরল গ্যাসের সাহায্যে বন্দুকের

শব্দহীন বন্দুক

দ্বারা লক্ষ্যভেদ-শিক্ষা প্রদত্ত হইতেছে। ইহাতে বিন্দুমাত্র শব্দ হয় না, গ্যাসের দুর্গন্ধও নির্গত হয় না। অথচ গুলী পূর্ণ-গতিতে লক্ষ্যভেদ করিয়া থাকে।

নৌকাযোগে পোলো খেলা

ক্যালিফে ইদানীং জলের উপর পোলো খেলা চলিতেছে। উচ্চ বালিকা-বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা ঘোড়ার পরিবর্ত্তে নৌকায় চড়িয়া জলের উপর পোলো খেলিতেছে। প্রত্যেকেই এক একখানি নৌকায় চড়িয়া ভাসমান গোলার পশ্চাতে নৌকা চালাইয়া দেয়। প্রত্যেকেরই হাতে যে দাঁড় থাকে, তাহার

নৌকাযোগে পোলো খেলা

দুইটি মুখ। জলের উপর এই ভাবে পোলো খেলায় নাকি ছাত্রীরা অধিক আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে।

কাঠের ভেলা ও বিমানপোত

মিয়ামিতে কাঠের ভেলা চড়িয়া এক ব্যক্তি জলের উপর ভাসিতেছিলেন। "মেফ্লাওয়ার" নামক একটি ছোট বিমান-পোতের সহিত উক্ত কাঠের ভেলাটি বাঁধিয়া দেওয়া হয়।

কাঠের ভেলা ও বিমানপোত

...কাশমার্গে বিমানপোত ধাবিত হইতে থাকিলে আরোহী সহ ভেলা দ্রুতবেগে জলের উপর দিয়াই চলিয়াছিল।

ধূম্র-যবনিকা

জলপথে শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করিতে হইলে আক্রমণকারী পক্ষের রণপোত প্রভৃতির গতিবিধি যাহাতে শত্রুপক্ষের জ্ঞানের অগোচর থাকে, ইহা বর্ত্তমান যুগের বিশিষ্ট সামরিক নীতি।

ধূম্র-যবনিকা

সুতরাং অগ্রগামী পোত হইতে গাঢ় ও বহুদূরব্যাপী ধূম-যবনিকা সৃষ্টি করিয়া তাহার অন্তরালে স্বপক্ষের রণপোত, বিমানপোতবাহী অর্ণবযান প্রভৃতিকে পরিচালিত করা রণকৌশলের দ্যোতক। পানামায় সম্প্রতি মার্কিণ নৌ-বহর হইতে এই কৌশলের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে।

বিচিত্র কৃষিপদ্ধতি

...ও অঞ্চলে জনৈক চাষী একটি কাচ-নির্ম্মিত কৃষিক্ষেত্র ...ত করিয়াছেন। এই কৃষিক্ষেত্রের উপরে কাচের ছাদ ... চারিদিকে কাচের প্রাচীর। শীতের প্রভাবে এই ...ত্রর চারাগুলি নষ্ট হয় না। এই ক্ষেত্রমধ্যে অপর্য্যাপ্ত ...ও লেটুস্ প্রভৃতি উৎপাদিত হইয়া থাকে। মোটর-...ত লাঙ্গল প্রভৃতির দ্বারা মৃত্তিকা কর্ষিত হইয়া থাকে।
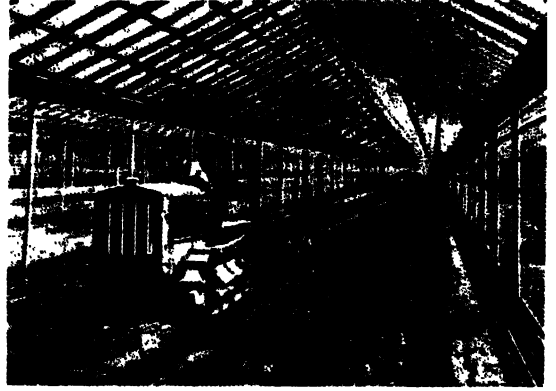
বিচিত্র কৃষিপদ্ধতি

এই কাচময় কৃষিক্ষেত্রে ৪ বার ফসল উৎপাদিত হইয়া থাকে।

শিশু-রক্ষায় কৃত্রিম শ্বাসযন্ত্র

চিকাগোর কোনও হাসপাতালে সম্প্রতি একপ্রকার কৃত্রিম শ্বাসযন্ত্র ব্যবহৃত হইতেছে। শিশুদিগের জন্যই এই শ্বাসযন্ত্রের সম্যক্ প্রয়োজনীয়তা আছে। যে সকল শিশুর শ্বাসকৃচ্ছ্রতা

কৃত্রিম শ্বাসযন্ত্র-সাহায্যে শিশুরক্ষা

উপস্থিত হয়, তাহাদিগকে এই যন্ত্রের সাহায্যে নিরাময় করিয়া তুলা হয়। অনেক নবজাত শিশু প্রসূত হইবার পর শ্বাস-প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে পারে না। এই নব উদ্ভাবিত যন্ত্রের সাহায্যে অতি সহজে তাহাদের শ্বাসযন্ত্র ক্রিয়া করিতে থাকে—শিশু বাঁচিয়া যায়। এই যন্ত্রের সাহায্যে বহু শিশুর জীবন রক্ষা পাইয়াছে।

ক্রেতা আকর্ষণের কৌশল

হলিউডের জনৈক পুষ্প-বিক্রেতা পথের ধারে একটি ফুলের দোকান খুলিয়াছেন। এই ফুলের দোকানটি প্রকাণ্ড একটা
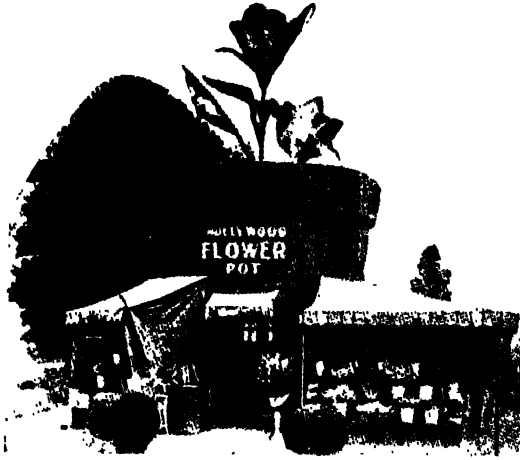
টবের আকারে ফুলের দোকান

ফুলের টবের আকারে নির্ম্মিত। বহুদূর হইতে এই দোকান দৃষ্টিগোচর হয় এবং উহা যে ফুলের দোকান, সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহই থাকে না। নানাপ্রকার ফুলের তোড়া এখানে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। ফুলের গাছও মিলে।

উভচর নৌকা

নিউ-জার্সির জনৈক বৈজ্ঞানিক শিল্পী স্বয়ংচালিত এক জলযান নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উহার নিম্নভাগে চক্রসমূহ সন্নিবিষ্ট

উভচর মোটর নৌকা

আছে। হ্রদের জলে এই নৌকা মোটরশক্তিতে চালিত হয়। আবার স্থলের উপরও ইহা অনায়াসে দ্রুত চলিতে পারে। জলে এই নৌকা ঘণ্টায় ২৫ মাইল বেগে ধাবিত হয়। স্থলপথে ইহার গতিবেগ আরও বেশী—ঘণ্টায় ৪০ মাইল বেগে ইহা পথাতিবাহন করিয়া থাকে। জল হইতে এই নৌকা আপন বেগেই স্থলের উপর অনায়াসে আরোহণ করিয়া থাকে।

বিমানপোতে কামান

প্যানামা খালের সন্নিহিত দুর্গ হইতে সম্প্রতি ১ শত ৫০ মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে বিমানপোতের সাহায্যে কামান ও
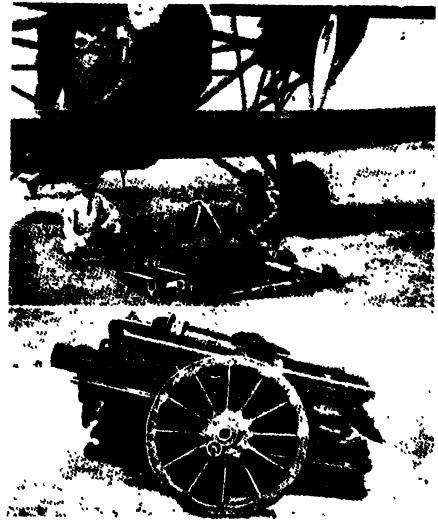
বিমানপোতে কামান

গোলন্দাজ সৈন্য নীত হইতেছে। এক ঘণ্টার মধ্যে এই উপায়ে তিনটি হাউইটজার কামান ও তাহার উপযুক্ত রসদ স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। বর্ত্তমানে যে ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তদনুসারে ঐ কামানগুলি পাঠাইতে হইলে ৪।৫ দিনের পূর্ব্বে উক্ত কার্য্য কখনই সম্পূর্ণভাবে সম্পন্ন হইতে পারিত না।

তিব্বতের বিভীষিকা

চতুর্থ প্রবাহ

মুখোসধারী মোহান্ত

দ্বিতীয় দিন গভীর রাত্রিতে মিঃ লক ও জ্যাক গৃহস্বামীর নিকট বিদায় লইয়া তাঁহার গৃহ ত্যাগ করিলেন। তাঁহারা উ-ফান-সনের বাসভবনের পশ্চাদ্বর্ত্তী দ্বার দিয়া পথে আসিলেন। সেই সময় যদি কেহ তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইত, তাহা হইলে তাহার ধারণা হইত, উ-ফান-সনের বাগানের দুই জন চীনা মালী কোন কাযে বাহিরে যাইতেছিল।

তাঁহারা বহু দূরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন; তাঁহাদের গন্তব্য স্থান হংকং হইতে ৬ শত মাইল দূরবর্ত্তী সাংঘাই। মিঃ লক কুলীর ছদ্মবেশে কোন ষ্টীমারে সাংঘাই গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে উ-ফান-সন পূর্ব্বেই তাহার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন।

তাঁহারা বন্দরে আসিয়া দুই জন কুলীর মত ষ্টীমারে উঠিলেন; ষ্টীমারের স্থূলকায় মেটের ধারণা হইল, তাঁহারা উভয়েই সাধারণ চীনা কুলী মাত্র। তাঁহারা ছদ্মবেশী য়ুরোপীয়, ইহা বুঝিবার উপায় ছিল না।

জ্যাকের মনে হইল, সে নিদ্রাঘোরে কোন দুঃস্বপ্ন দেখিতেছে! তাঁহাদের অসুবিধা ও কষ্টের সীমা রহিল না। রাত্রিকালে তাঁহাদিগকে ষ্টীমারের কুলীর দলে মিশিয়া তক্তার উপর শয়ন করিতে হইল; কুলীরা এরূপ নোংরা যে, তাহাদের সঙ্গে বাস করিতে তাঁহাদের অত্যন্ত ঘৃণা হইল; কিন্তু ষ্টীমার সাংঘাইএ উপস্থিত হইলে মুক্তিলাভ করিবেন, এই আশায় তাঁহারা সকল কষ্টই ধীরভাবে সহ্য করিতে লাগিলেন। মিঃ লক জানিতেন, তিনি যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহাতে সাফল্য লাভ করিতে হইলে তাঁহাদিগকে আরও অনেক দুঃখকষ্ট সহ্য করিতে হইবে, তাঁহাদের জীবন বহুবার বিপন্ন হইবে। সেই সকল কার্য্যের কথা জ্যাকের ধারণা করিবারও শক্তি ছিল না; অল্প কষ্টেই সে অধীর হইয়াছিল। উ-ফান-সন মিঃ লককে বলিয়াছিলেন, তাঁহারা সাংঘাই বন্দরে উপস্থিত হইয়া যে জঙ্ক পাইবেন, তাহার মাঝি স্যুইফ-সিরই এক জন অনুচর।

তাঁহারা অত্যন্ত পরিশ্রান্তভাবে অবসন্ন-দেহে সাংঘাইএ উপস্থিত হইলেন। ষ্টীমার যে রাত্রিতে সাংঘাই বন্দরে নঙ্গর করিল, সেই রাত্রিতেই তাঁহাদের প্রাপ্য কুলীভাড়া দিয়া তাঁহাদিগকে ষ্টীমার হইতে বিদায় করা হইল। তাঁহারা ষ্টীমার ত্যাগ করিয়া বিশ্রামের জন্য আশ্রয়ের সন্ধানে চলিলেন। তাঁহারা নগরে প্রবেশ করিয়া নগরের একটি আবর্জ্জনাপূর্ণ নোংরা পল্লীতে একখানি জীর্ণ ও নির্জ্জন কুটীর দেখিয়া সেই কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, শয্যার অভাবে তাঁহাদিগকে মাটীতেই শয়ন করিতে হইল। তাঁহারা এরূপ পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন যে, শয়নমাত্র গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলেন; পরদিন মধ্যাহ্নে তাঁহাদের নিদ্রাভঙ্গ হইল।

উ-ফান-সন মিঃ লককে বলিয়াছিলেন, তিনি সাংঘাইএ উপস্থিত হইয়া যেন স্বাতোর (সোয়াতো) সারেঙের সন্ধান করেন; তিনি দেখিতে পাইবেন, সেই সারেঙ তাহার জঙ্কের জন্য কুলী সংগ্রহ করিতেছে। কোন্ স্থানে উপস্থিত হইলে সেই সারেঙের সন্ধান পাওয়া যাইবে, তাহাও তাঁহাকে বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। তদনুসারে সেই দিন অপরাহ্ণে তাঁহারা উভয়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাত্রা করিলেন।

তাঁহারা কয়েকটি পথ অতিক্রম করিয়া একটি ফটকের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সেই ফটক পার হইয়া যে 'বস্তী' দেখিতে পাইলেন, তাহার প্রায় ১ শত গজ স্থান ব্যাপিয়া দেশীয় দোকানদারদের অনেকগুলি দোকান ছিল। সেই সকল দোকানের কিছু দূরে একটা খোলা যায়গায় বহু লোকের জনতা দেখিয়া তাঁহারা সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। এক জন সারেঙ সেখানে দাঁড়াইয়া তাহার জঙ্কের জন্য কুলী সংগ্রহ করিতেছিল; সে যথেষ্ট পারিশ্রমিকের লোভ দেখাইয়া জনতার সম্মুখে বক্তৃতা করিতেছিল। নিম্নশ্রেণীর চীনাম্যানরা দল বাঁধিয়া তাহার চারিদিকে দাঁড়াইয়া তাহার কথা শুনিতেছিল।

আরও কিছু দূরে নদীতীরে আর এক দল লোক হাত-মুখ নাড়িয়া তর্ক-বিতর্ক করিতেছিল, মিঃ লক সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, স্বাতোর এক জন স্থূলকায় সারেঙ একটি উচ্চ প্যাকিং বাক্সের উপর দাঁড়াইয়া, তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ জনতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছিল, তাহার জঙ্ক অবিলম্বে ইয়াংসি নদের উজানে যাত্রী লইয়া যাইবে; যদি কোন

আরোহী তাহার জঙ্কে যাইতে চাহে, তাহা হইলে অল্প ভাড়ায় সে গন্তব্য স্থানে যাইতে পারিবে।

মিঃ লক জ্যাককে সঙ্গে লইয়া সেই সারেঙের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন; তাঁহার দীর্ঘ দেহ ও পরিপুষ্ট অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখিয়া সারেঙ বলিল, তাহার কুলীরও প্রয়োজন আছে এবং বলবান্ কুলী পাইলে সে তাহাকে প্রচুর পারিশ্রমিক দিতে প্রস্তুত আছে। কিন্তু মিঃ লক কোন মতামত প্রকাশ না করায় সে তাঁহাকে ডাকিয়া চাকরী লইবার জন্য অনুরোধ করিল।

মিঃ লক তখনও কোন কথা না বলিয়া কোনরূপ ইঙ্গিতের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কয়েক মিনিট পরে এক জন লোক তাঁহার পশ্চাৎ হইতে হাত বাড়াইয়া তাঁহার মুঠার ভিতর কি গুঁজিয়া দিয়া সরিয়া গেল! মিঃ লক পশ্চাতে চাহিয়া আর তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। তিনি সবিস্ময়ে মুঠা খুলিয়া করতলে কৃষ্ণবর্ণ তিনটি বীজ দেখিতে পাইলেন। তাহা তরমুজের বীজ!

সেই বীজ তিনটি কে কি উদ্দেশ্যে তাঁহার হাতে গুঁজিয়া দিয়া অদৃশ্য হইয়াছিল, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। লোকটিকে দেখিতে পাইলে তিনি তাহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেন; কিন্তু সেই জনতার ভিতর হইতে তাহাকে চিনিয়া বাহির করিবার উপায় ছিল না। পৃথিবীতে এত জিনিষ থাকিতে তাঁহার হাতে তরমুজের বীজ কেন দেওয়া হইল এবং তিনটি বীজ দেওয়ারই বা কারণ কি?

মিঃ লক বীজ তিনটি মুঠায় পুরিয়া সারেঙের কথা শুনিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি জ্যাককে সঙ্গে লইয়া সেই স্থান ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন, সেই সময় পূর্ব্বোক্ত সারেঙ একখানি লাল কাগজ উর্দ্ধে তুলিয়া ধরিল; তিনি সারেঙএর উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া সেই কাগজখানি লক্ষ্য করিয়া তাহাতে স্বর্ণাক্ষরে তিনটি সংখ্যা অঙ্কিত দেখিলেন। তাঁহার হাতে তরমুজের তিনটি বীজ, এবং সারেঙের হাতের লাল কাগজে তিনটি সংখ্যা অঙ্কিত! এ কি রহস্য? তিনি রহস্যভেদ করিতে না পারিয়া প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে সারেঙের মুখের দিকে চাহিলেন। সারেঙ কোন কথা না বলিয়া যে সকল কুলী নদীর দিকে যাইতেছিল, তাহাদের দিকে অঙ্গুলী প্রসারিত করিল। সেই দিকে নদীকূলে একখানি বৃহৎ জঙ্ক ছিল। যে সকল জঙ্ক, সাম্পান প্রভৃতি জলযান নদীকূলে শ্রেণীবদ্ধভাবে সংরক্ষিত হইয়াছিল, সেই জঙ্কখানি তাহাদের কিছুদূরে ছিল; তাহা এরূপ বৃহৎ যে, দেড় শত টন অর্থাৎ প্রায় চারি হাজার মণ বোঝাই লইতে পারিত। সেই জঙ্কের মাস্তুলে মিঃ লক কয়েকখানি লাল কাগজ পতাকার ন্যায় আন্দোলিত হইতে দেখিলেন। একখানি কাগজে স্বর্ণাক্ষরে তিনটি সংখ্যা মুদ্রিত ছিল; তাহা দেখিয়া মিঃ লক বুঝিতে পারিলেন, তাঁহাদিগকে সেই জঙ্কেই আরোহণ করিতে হইবে।

সহসা পশ্চাতে ভীষণ কোলাহল শুনিয়া মিঃ লক চলিতে চলিতে ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন। জ্যাকও ফিরিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে পাইল, এক দল লোক মার মার শব্দ করিয়া পূর্ব্বোক্ত সারেঙের সম্মুখে রুখিয়া আসিতেছিল। কিন্তু সারেঙ মুহূর্ত্তমধ্যে প্যাকিং বাক্স হইতে নামিয়া সেই নবাগত জনতার দিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইল এবং অন্য এক জন সারেঙের সহিত তুমুল বচসা আরম্ভ করিল।

মিঃ লক ও জ্যাক তাহাদের কলহ শুনিয়া বিবাদের কারণ কতকটা বুঝিতে পারিলেন। তাহারা চেং ও অন্যান্য ক্যাণ্টনী দলপতির নাম উচ্চারণ করিয়া কোলাহল করিতেছিল, এবং নবাগত সারেঙ উত্তরাঞ্চলের দলপতিদের লক্ষ্য করিয়া অশ্লীল ভাষায় গালিবর্ষণ করিতেছিল। তাহাদের গালাগালি শুনিয়া মিঃ লকের ধারণা হইল, যে অন্তর্বিপ্লবে চীনদেশে অরাজকতার স্রোত বহিতেছিল, সাংঘাইএর জনসাধারণের এই বিরোধ তাহারই অভিব্যক্তি। ইহা রাজনীতি-সংক্রান্ত দলাদলির ফল। কিন্তু বিরোধ প্রবল হইয়া উঠিলে মিঃ লক বুঝিতে পারিলেন, এই বিরোধের মূলে অন্য কারণ প্রচ্ছন্ন আছে। এক দল সশস্ত্র গুণ্ডা 'মার মার' শব্দে স্বাতোর সারেঙ ও তাহার দলের লোকগুলিকে আক্রমণ করিতে আসিলে মিঃ লক তাহাদের পশ্চাতে কৃষ্ণবর্ণ আলখেল্লাধারী একটি দীর্ঘদেহ পুরুষকে দেখিতে পাইলেন। তাহার মুখ একখানি বিকটাকার মুখোসে আবৃত। গুণ্ডা দল তাহারই ইঙ্গিতে পরিচালিত হইতেছিল। এই ব্যক্তিকে দেখিয়া মিঃ লকের অনুমান হইল, সেই ব্যক্তিই চেং মঠের মুখোসধারী মোহান্ত!

কয়েক মিনিট পরে উভয় পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হইল; সে যুদ্ধ অতি ভীষণ! স্বাতোর সারেঙের প্রতি আততায়ীদের

রোধ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিয়াই মিঃ লকের ধারণা হইল। স্বাতো বা সোয়াতোতে ক্যাণ্টনীগণের অসাধারণ প্রভাব, সেই স্থানের এক জন সারেঙ তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া তাহাদের স্বার্থের প্রতিকূলে ইয়াংসি-বক্ষে জঙ্ক পরিচালিত করিতে উদ্যত হইয়াছে দেখিয়া ক্যাণ্টনীরা তাহাকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছিল। দাঙ্গা দীর্ঘকাল চলিলে স্বাতোর সারেঙকে নিহত হইয়া সেই স্থানে পড়িয়া থকিতে হইত, এবং সম্ভবতঃ এই অত্যাচারের প্রতীকার হইত না।

মিঃ লক পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন যে, সেই সারেঙ সুইফ-সির অনুচর; তাহার নিকট সাঙ্কেতিক চিহ্ন দেখিয়া মিঃ লকের এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল। তিনি সারেঙকে বিপন্ন দেখিয়া তাহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলে তাঁহাকেও আক্রান্ত হইতে হইবে, তিনি কি উদ্দেশ্যে তাহার পক্ষসমর্থন করিতেছেন, তাহাও প্রকাশ হইয়া পড়িতে পারে; এ অবস্থায় তিনি এই বিরোধে নির্লিপ্ত থাকিবেন কি সারেঙকে সাহায্য করিবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু তাঁহার কর্ত্তব্য স্থির করিতে অধিক বিলম্ব হইল না। মুহূর্ত্ত পরেই শত শত চীনাম্যান দাতুং মুন অর্থাৎ সাংঘাইএর চীনা পল্লী হইতে বাহির হইয়া মার মার শব্দে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইল। তাহাদের সকলেই বংশদণ্ড ও তরবারি লইয়া যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিল। সুতরাং শীঘ্রই যে শোণিতস্রোত প্রবাহিত হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ ছিল না।

আততায়ীরা সবেগে অদূরবর্ত্তী হোয়াংপু নদীর তীর লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইল। মিঃ লক ও জ্যাক সেই বিপুল জনস্রোতের গতিরোধ করা অসাধ্য বুঝিয়া এবং সেই জনতার ভিতর সারেঙ অদৃশ্য হওয়ায় তাহাকে দেখিতে না পাইয়া একখানি সাম্পানে আশ্রয়গ্রহণের জন্য নদীর দিকে দৌড়াইতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু দুই তিন মিনিটের মধ্যেই তাঁহাদের গতিরোধ হইল। তাঁহাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে শত শত ক্রুদ্ধ চীনাম্যান যেন তাঁহাদিগকে নিষ্পেষিত করিতে উদ্যত হইল; তাঁহাদের কে বন্ধু, কে শত্রু, তাহা বুঝিবার উপায় ছিল না। তাঁহারা উভয়েই আত্মরক্ষার জন্য ব্যাকুল হইলেন। মিঃ লক দুই জন আততায়ীর হাত হইতে দুইখানি বংশ ও ছিনাইয়া লইয়া একখানি জ্যাকের হাতে দিলেন এবং তাহার সাহায্যে জ্যাককে আত্মরক্ষা করিতে আদেশ দিলেন।

তাঁহার কথা শুনিয়া আট দশ জন চীনাম্যান লাঠি তুলিয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিল। মিঃ লক ও জ্যাক তাঁহাদের লাঠির সাহায্যে তাহাদের আঘাত ব্যর্থ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের লাঠি চালাইবার কৌশল দেখিয়া আততায়ীরা কিছু দূরে সরিয়া যাইতে বাধ্য হইল। কিন্তু চীনাম্যানগুলা ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিল, তাহারা সদলে পুনর্ব্বার তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। দশ পনেরখানি বাঁশের লাঠি তাঁহাদের মাথার উপর ঘুরিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে 'ঠকাঠক' 'ঠকাঠক' শব্দ! সেইরূপ ভীষণ দাঙ্গা চীনদেশের অন্তর্ব্বর্ত্তী কোন পল্লীবক্ষে সংঘটিত হইলে বিস্ময়ের কারণ ছিল না; কিন্তু বর্ত্তমান যুগের সুরক্ষিত সাংঘাই বন্দরে—যেখানে ধূসরবর্ণ বৃটিশ ডেষ্ট্রয়ারগুলি নানাবিধ যুদ্ধাস্ত্র সহ বিরাজিত ছিল এবং কলের কামান হইতে গোলা বর্ষিত হইয়া সেই জনতা কয়েক মিনিটেই বিধ্বস্ত করিতে পারিত, সেই স্থানে ঐ ভাবে দাঙ্গা চলিতে পারে দেখিয়া মিঃ লক বিস্মিত হইলেন।

মিঃ লক চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সেই জনতার ভিতর স্বাতোর সারেঙকে দেখিতে পাইলেন; সে অগণ্য আততায়ী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়ায় মিঃ লক তাহাকে সাহায্য করিতে তাহার পাশে যাইবার জন্য চেষ্টা করিলেন। তাঁহার সন্দেহ হইল, শত্রুপক্ষ তাঁহার সাংঘাই গমনের কথা জানিতে পারায় এবং স্বাতোর সারেঙ সুইফ-সির অনুচর, ইহা বুঝিতে পারায় তাহারা তাঁহার সঙ্কল্প ব্যর্থ করিবার জন্য কোন ষড়যন্ত্র করিয়াছে, এবং চেং-তু মঠের মোহান্ত তাহার অনুচরবর্গকে উৎসাহিত করিয়া দাঙ্গা বাধাইয়াছে; সুতরাং তিনি নদীপথে চেং-তু মঠে যাইবার চেষ্টা করিলেও নির্ব্বিঘ্নে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। তাঁহার গমনে বাধা-দানের জন্য নানাভাবে চেষ্টা করা হইবে।

চেং-তু মঠের মুখোসধারী মোহান্ত চি-সেন জাহাজ হইতে হিরণ্ময় গ্রন্থখানি অপসারিত করিয়া থাকিলে সে যে গুপ্তচরের নিকট চি-সেন জাহাজে উহা প্রেরণের সংবাদ জানিতে পারিয়াছিল, ইহাও মিঃ লক বুঝিতে পারিলেন। যে ব্যক্তি এরূপ গোপনীয় সংবাদ জানিতে পারে, তাহার গুপ্তচর-নিয়োগের প্রণালী যে কিরূপ নিখুঁত ও কৌশলপূর্ণ, তাহাও তাঁহার অনুমান করা কঠিন হইল না। উভয় পক্ষই পরস্পরের গোপনীয় কার্য্যের সন্ধান লইয়া পরস্পরের সঙ্কল্প

ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করিতেছিল, ইহা বুঝিতে পারিয়া মিঃ লক অধিকতর সতর্কভাবে কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণের সঙ্কল্প করিলেন।

তিনি সারেঙের পাশে আসিবার জন্য চেষ্টা করিবার সময় এই সকল কথাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। সেই সময় দলে দলে শত্রু নগর হইতে আসিয়া দাঙ্গায় যোগদান করিতেছিল। যে সকল লোক স্বাতোর সারেঙের চারিদিকে সমবেত হইয়া তাহাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছিল, আততায়ীদের সংখ্যা তাহাদের অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল; এ জন্য তাহাদের কবল হইতে তাহাকে উদ্ধার করা কিরূপ কঠিন হইবে বুঝিয়া মিঃ লক অত্যন্ত হতাশ হইলেন।

মিঃ লক মুখোসধারী মোহান্তকে সেই দলের ভিতর ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিলেন; সে তাহার অনুচরবর্গকে উৎসাহিত করিবার জন্য কোন কথা না বলিলেও দলপতিকে অদূরে উপস্থিত দেখিয়াই তাহাদের সাহস ও উৎসাহ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। মোহান্তর কথা বলিবার প্রয়োজন হয় নাই, সে মধ্যে মধ্যে হাত নাড়িয়া যে ইঙ্গিত করিতেছিল, তাহার অনুচররা তাহাই যথেষ্ট বলিয়া মনে করিতেছিল।

কিন্তু আততায়ীদের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণের জন্যই লক ও জ্যাকের মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিল। স্বাতোর সারেঙের নিকট উপস্থিত হইবার জন্য তাঁহাদের প্রবল আগ্রহ হইলেও শত্রুদল তাঁহাদের চতুর্দ্দিকে এরূপ দুর্ভেদ্য ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়াছিল যে, তাঁহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও পদমাত্র অগ্রসর হইতে পারিলেন না। মিঃ লক পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিতেই মুখোসধারী মোহান্তকে অদূরে দেখিতে পাইলেন। সে তাহার মুখোসের অক্ষি-কোটরের অন্তরাল হইতে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে তাঁহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতেছিল। তাহার সহিত দৃষ্টি-বিনিময় হইতেই সে কটমট করিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিল, মিঃ লকের ধারণা হইল, সে তাঁহাকে সন্দেহ করিয়াছে। তাঁহার মুখের যে পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহাকে ইংরাজ বলিয়া বুঝিবার উপায় ছিল না; তথাপি তিনি কি কারণে তাহার সন্দেহভাজন হইলেন, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহার দীর্ঘ দেহ, বলিষ্ঠ গঠন এবং লাঠি-প্রয়োগের কৌশল দেখিয়া তাহার ধারণা হইয়া থাকিবে, তিনি অসাধারণ ব্যক্তি, অথচ তিনি নূতন লোক; সুতরাং তাহার সন্দেহ হইবারই কথা।

মিঃ লক সাহসী পুরুষ হইলেও মুখোসধারী মোহান্তের চক্ষুর দিকে চাহিয়া কি এক অজ্ঞাত ভয়ে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল, তাহার সেই সুগোল ক্ষুদ্র ও উজ্জ্বল চক্ষুতে যে বিভীষিকা পরিস্ফুট হইত, তাহা কেবল অনুভবযোগ্য, তাহা অতি সহজেই অন্যের হৃদয়ে আতঙ্ক সঞ্চার করিতে পারিত; কোন কোন হিংস্র শ্বাপদ জন্তুর চক্ষুতেও এই বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। মোহান্তের দৃষ্টিতে মিঃ লকের হৃদয়ে এই ভাব অনুপ্রবিষ্ট হইল যে, যদি তিনি তাহার বিরুদ্ধাচরণের চেষ্টা করেন, তাহা হইলে সে তাঁহাকে ক্ষুদ্র কীটের ন্যায় পিষিয়া মারিবে, তাঁহাকে অসহ্য নির্য্যাতন সহ্য করিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে হইবে, তাহার কবল হইতে তিনি কোন উপায়ে মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন না। মিঃ লক সেই স্থান ত্যাগ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

জ্যাক কিছু দূরে দাঁড়াইয়া আততায়িগণের আক্রমণ প্রতিহত করিতেছিল। সে বুঝিতে পারিল, মিঃ লক আততায়ী-দের কবল হইতে মুক্তি লাভ করিয়া নিরাপদ স্থানে আশ্রয়-গ্রহণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন; জ্যাকও সেইরূপ চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু সে তাহার হস্তস্থিত বংশদণ্ডের সাহায্যে তাহার সম্মুখস্থিত শত্রুদলকে বিতাড়িত করিয়া পদ-মাত্র অগ্রসর হইতে পারিল না। চারিদিক হইতে তাহার উপর লাঠি পড়িতেছিল এবং সে অতি কষ্টে আত্মরক্ষায় সমর্থ হইলেও সকল আঘাত সে প্রতিহত করিতে পারিল না। তাহার কাঁধে, পিঠে, পাঁজরে মধ্যে মধ্যে লাঠি পড়িতে লাগিল।

যাহা হউক, তাঁহারা উভয়েই যথাসাধ্য চেষ্টায় সম্মুখে কিছু দূর অগ্রসর হইলেন; আর দুই গজ যাইতে পারিলে তাঁহারা সেই উন্মত্ত জনতার বাহিরে উপস্থিত হইতেন। মুখোসধারী মোহান্ত বুঝিতে পারিল, তাঁহারা উভয়েই পলায়নের চেষ্টা করিতেছেন এবং তাঁহাদের চেষ্টা অবিলম্বে সফল হইবে। তাঁহারা পলায়ন করিতে না পারেন, এই উদ্দেশ্যে সে তাহার অনুচরগণকে পরিচালিত করিবার জন্য হাত তুলিয়া কি ইঙ্গিত করিল। তাহার সেই ইঙ্গিত অনু-সারে প্রায় ৫০ জন চীনাম্যান বিকট চীৎকার করিয়া দুই পাশ হইতে তাঁহাদের সম্মুখে সরিয়া আসিল এবং দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরের ন্যায় তাঁহাদের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। তাহারা অধিকতর উৎসাহে লাঠি ও ছোরা চালাইয়া তাঁহাদিগকে পশ্চাতে ঠেলিয়া লইয়া চলিল। সেই আক্রমণে জ্যাক কিছু

...র গিয়া পড়িল ; সে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও মিঃ লকের ...কট আর আসিতে পারিল না। মিঃ লক ক্রোধে ক্ষোভে ...প্তপ্রায় হইয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইতেই সেই মুখোসধারী ...হান্তকে পশ্চাতে দেখিতে পাইলেন ; তিনি তৎক্ষণাৎ ...হার মস্তক লক্ষ্য করিয়া লাঠি ছুড়িলেন ; সেই লাঠি ...হান্তের ললাট স্পর্শ করিবামাত্র তাহার এক জন অনুচর ...ত বাড়াইয়া তাহা টানিয়া লইল।

কিন্তু সেই আঘাতে মোহান্তের ললাট বিদীর্ণ হওয়ায় ক্ষতস্থান হইতে রক্ত ঝরিতে লাগিল, মোহান্ত উভয় করতলে ললাট আবৃত করিলে, তাহার অঙ্গুলীর ফাঁক দিয়া রক্ত গড়াইয়া পড়িয়া তাহার কালো আলখেল্লা সিক্ত করিল। তাহার পর সে মুখ তুলিয়া মুখোসের ভিতর হইতে আরক্ত-নেত্রে মিঃ লকের মুখের দিকে চাহিল ; তাহার চক্ষু হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষিত হইতে লাগিল, মিঃ লক বুঝিতে পারিলেন, সে তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে।

দলপতি মোহান্ত আহত হওয়ায় তাহার অনুচররা অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল ; তাহারা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া মোহান্তের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মুহূর্ত্তের জন্য তাহারা যুদ্ধে নিরস্ত হইল। মিঃ লক সেই সুযোগে তাঁহার সম্মুখস্থ আততায়ীর হাত হইতে তরবারি কাড়িয়া লইয়া কয়েক জন চীনাম্যানকে প্রচণ্ডবেগে আক্রমণ করিলেন ; তাঁহার তরবারি বিদ্যুদ্বেগে পরিচালিত হইতে লাগিল এবং তাহার আঘাতে কাহারও মস্তক বিদীর্ণ হইল, কাহারও কাণ কাটিল, কাহারও বাহু স্কন্ধচ্যুত হইল। তিনি ব্যূহভেদ করিয়া সম্মুখে ধাবিত হইলেন। কেহই তাঁহার গতিরোধ করিতে পারিল না।

মিঃ লক আততায়ীদের ব্যূহভেদ করিয়া প্রায় বাহিরে আসিয়াছেন, সেই সময় তিনি পশ্চাতে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া জ্যাককে দেখিতে পাইলেন না। তিনি জানিতেন, জ্যাক কিছু দূরে থাকিয়া তাঁহার অনুসরণ করিতেছিল ; তিনি তাহাকে দেখিতে না পাইয়া উৎকণ্ঠিত হইলেন। তিনি আর অগ্রসর না হইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তাঁহার আশঙ্কা হইল, জ্যাক কোন আততায়ীর অস্ত্রাঘাতে আহত হইয়া ধরাশায়ী হইয়াছে। কাহারও তরবারি তাহার বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ হইয়াছে কি না, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না।

জ্যাককে ত্যাগ করিয়া তিনি স্বাধীনতাও প্রার্থনীয় মনে করিলেন না ; তিনি পুনর্ব্বার আততায়ীদের দলের ভিতর ফিরিয়া চলিলেন। মুক্তিলাভের জন্য আর তিনি কিছুমাত্র ব্যাকুলতা প্রকাশ করিলেন না। জ্যাককে সেই পিশাচ-গুলার কবলে নিক্ষেপ করিয়া আত্মরক্ষার জন্যও তাঁহার আগ্রহ হইল না।

কিছু দূরে আসিয়া তিনি জ্যাককে দেখিতে পাইলেন ; জ্যাক ধূলার উপর অসাড়ভাবে পড়িয়াছিল। তরবারির আঘাতে তাহার দেহ শোণিতাপ্লুত। তাহার অবশ হস্ত হইতে তরবারি খসিয়া পড়িয়াছিল। সে এক জন চীনাম্যানের তরবারি কাড়িয়া লইয়া যতক্ষণ শক্তি ছিল, আততায়ীদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। তাহার পর ধূলিরাশির উপর আহত দেহভার প্রসারিত করিয়াছিল।

মিঃ লক তাহার দেহপ্রান্ত হইতে তরবারিখানি তুলিয়া লইয়া উভয় হস্তে তরবারি চালাইতে লাগিলেন। উভয় তরবারি তাঁহার মস্তকের চারিদিকে বৃত্তাকারে ঘুরিতে লাগিল। শত্রুগণ দূরে সরিয়া দাঁড়াইল। জ্যাক জীবিত আছে কি না, তাহা পরীক্ষার জন্য তখন তিনি তাহার দেহের উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন ; কিন্তু তিনি তাহার দেহ স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই প্রায় এক শত চীনা কুলী দলবদ্ধ হইয়া সবেগে তাঁহার উপর আসিয়া পড়িল ; তিনি সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া তাহাদের গতিরোধের চেষ্টা করিবার পূর্ব্বেই এক দল কুলী তাঁহার হাত-পা ধরিয়া তাঁহাকে শূন্যে তুলিল এবং তাঁহার হাত হইতে তরবারি কাড়িয়া লইল।

মিঃ লক তাহাদের কবল হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তিনি হতাশভাবে ভূপতিত জ্যাকের মুখের দিকে চাহিলেন, কিন্তু মুহূর্ত্ত পরে আর তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। কুলীরা তাঁহাকে শূন্যে ঝুলাইয়া নদীতীরে উপস্থিত হইল।

নদীকূলে শ্রেণীবদ্ধ অসংখ্য সাম্পান, বজরা, জেলে ডিঙ্গি ; সেগুলি বহুদূর পর্য্যন্ত নদীজল আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। সেই সকল তরীর পর এক সারি জঙ্ক। কুলীরা মিঃ লককে বহন করিয়া সেই সকল সাম্পান, ডিঙ্গি প্রভৃতি অতিক্রম করিল, এবং একখানি জঙ্কে আরোহণ করিল। সেই মুহূর্ত্তে পাঁচ সাত জন লোক জঙ্ক হইতে হাত বাড়াইয়া কুলীদের হাত হইতে তাঁহাকে লুফিয়া লইল। তিনি বুঝিলেন, তাঁহার মৃত্যুর অধিক বিলম্ব নাই।

পঞ্চম প্রবাহ

সুইফ-সির আশ্রয়ে

ডিটেক্‌টিভ মিঃ লকের সহকারী জ্যাক ড্রেক আততায়িগণের আক্রমণে দেহের বিভিন্ন অংশে আঘাত পাইলেও মিঃ লক তাহার আঘাত যেরূপ গুরুতর মনে করিয়াছিলেন, প্রকৃত-পক্ষে তাহা সেরূপ গুরুতর হয় নাই।

আততায়িবর্গের আক্রমণে জ্যাক মিঃ লকের নিকটে থাকিতে না পারায় তাহাকে কিছু দূরে সরিয়া যাইতে হইয়াছিল। জ্যাক যখন আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া ধরাশায়ী হইল, তখন সে বুঝিতে পারিল, যদি সে মাটীতে পড়িয়া মাথা বাঁচাইবার চেষ্টা না করে, তাহা হইলে সমাগত লোকগুলি তাহার মস্তক পদদলিত করিয়া চলিয়া যাইবে, তাহার ফলে প্রাণরক্ষা করা তাহার অসাধ্য হইবে। এই জন্য সে পথের মধ্যস্থল হইতে সরিয়া গিয়া পথের পাশে যে খোলা ড্রেণ ছিল, তাহার ভিতর মাথা ঝুলাইয়া দিয়া স্থিরভাবে পড়িয়া ছিল। সেই অবস্থায় অনেকে তাহার দেহ পদদলিত করিয়া চলিয়া গেল, কিন্তু তাহার মাথায় কাহারও পা পড়িল না।

অবশেষে জনতা হ্রাস হইলে জ্যাক ভীড় ঠেলিয়া মিঃ লকের নিকট উপস্থিত হইবার আশায় ধীরে ধীরে উঠিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু তাহার চেষ্টা সফল হইল না। তাহার সর্ব্বাঙ্গ তখন আড়ষ্ট হইয়াছিল, উঠিবার শক্তি ছিল না। অগত্যা তাহাকে পড়িয়া থাকিতে হইল। সে অতি কষ্টে মাথা তুলিয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিল, কিন্তু মিঃ লককে জনতার ভিতর দেখিতে পাইল না। সে স্থির করিল, আততায়ীরা সেই স্থান ত্যাগ করিলে সে ধীরে ধীরে উঠিয়া মিঃ লকের অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিবে।

কিছু কাল পরে মিঃ লক তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার দেহ পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, তিনি তাহাকে সেই স্থান হইতে তুলিয়া লইয়া নিরাপদ স্থানে আশ্রয় লইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু এক দল লোক সবেগে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া মিঃ লককে শূন্যে তুলিল এবং তাঁহাকে লইয়া হোয়াং-পুর তটের দিকে ধাবিত হইল। তাহার পর তাঁহাকে কতকগুলি সাম্পান ও উপানের উপর দিয়া একখানি বৃহৎ জঙ্কের দিকে লইয়া যাওয়া হইল। সেই সময় জ্যাক উঠিয়া দাঁড়াইয়া মিঃ লককে দেখিতে পাইল। সে দেখিল, তিনি আততায়ীদের হস্তে বন্দী হইয়াছেন, এবং তিনি নদীতীরস্থ শ্রেণীবদ্ধ সাম্পান ও উপানগুলির উপর দিয়া স্থানান্তরে নীত হইতেছেন। যাহারা তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল, জ্যাক কৃষ্ণবর্ণ আলখেল্লা-মণ্ডিত মুখোসধারী মোহান্তকে তাহাদের দলে দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত ভীত হইল। সে বুঝিতে পারিল, মোহান্তের ইঙ্গিতেই মিঃ লককে স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া হইতেছিল; সেই দুর্দান্ত মোহান্তের কবল হইতে তাঁহার মুক্তিলাভের আশা নাই ভাবিয়া জ্যাক অত্যন্ত ভীত হইল।

মিঃ লককে নদীতে ভাসমান শ্রেণীবদ্ধ জঙ্ক-সমূহের দিকে নীত হইতে দেখিয়া জ্যাকেরও সেই দিকে যাইবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ হইল; কিন্তু সে একাকী, অসংখ্য শত্রুর বিরুদ্ধে ধাবিত হইয়া কোন লাভ নাই বুঝিতে পারিয়া জ্যাক হতাশ হইল। সে বুঝিতে পারিল, কোন প্রবল-পরাক্রান্ত ব্যক্তির সহায়তা ব্যতীত মিঃ লককে শত্রু-কবল হইতে উদ্ধার করিবার উপায় নাই।

জ্যাক নির্নিমেষ-নেত্রে নদীবক্ষস্থিত জঙ্কগুলির দিকে চাহিয়াছিল, কারণ, মিঃ লককে সেই দিকেই লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। সে দেখিতে পাইল—যে জঙ্কখানির মাস্তলে লাল কাগজের পতাকা উড়িতেছিল, তাহারই পার্শ্বস্থিত একখানি বৃহৎ জঙ্কের ডেকে দাঁড়াইয়া কয়েক জন চীনাম্যান মিঃ লককে তাঁহার বাহকগণের হাত হইতে লুফিয়া লইল সেই লোকগুলি মুহূর্ত্তমধ্যে লককে কোথায় লইয়া গেল, জ্যাক তাহা জানিতে পারিল না; মিঃ লক অদৃশ্য হইলেন।

জ্যাক সেখানে দাঁড়াইয়া ছিল, সেই স্থানের কয়েক গজ দূরে পূর্ব্বোক্ত সোয়াতো সারেঙ আহত-দেহে ধরাশায়ী হইয়াছিল। জ্যাক সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, কয়েক জন অনুচরের সাহায্যে সারেঙ উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। সারেঙও জ্যাককে সেই স্থানে দেখিতে পাইল; কিন্তু সারেঙ তাহাকে দেখিয়া যেন চিনিতে পারে নাই, এইভাবে অন্য দিকে মুখ ফিরাইল। জ্যাক আশা করিয়াছিল, সে সারেঙের সাহায্যপ্রার্থী হইলে সারেঙ তাহাকে সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইবে না, এবং সম্ভবতঃ সে তাহার অনুচর বর্গের সাহায্যে মিঃ লককে তাঁহার শত্রু-কবল হইতে উদ্ধারের চেষ্টা করিবে। কিন্তু সোয়াতোর সারেঙের ভাবভঙ্গী দেখিয়া

জ্যাক তাহার সহায়তা-লাভের আশা ত্যাগ করিল। এই অপরিচিত স্থানে সে আর কাহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিবে, কে মিঃ লকের উদ্ধারের জন্য প্রবল শত্রুর সহিত বিরোধ করিবে, তাহা সে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। অবশেষে হঠাৎ স্লুইফ-সির কথা তাহার স্মরণ হইল।

কিন্তু জ্যাক জানিত, সার গর্ডনের সহিত মিঃ লকের সাক্ষাৎভাবে জানাশুনা নাই। এ অবস্থায় জ্যাক কিরূপে সার গর্ডনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মিঃ লকের উদ্ধারের জন্য তাহার সাহায্য প্রার্থনা করিবে? তিনি তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিবার জন্য মহাপরাক্রান্ত মুখোসধারী মোহান্তের সহিত বিরোধ করিতে সম্মত হইবেন, তাহারই বা সম্ভাবনা কোথায়? বিশেষতঃ স্থানীয় অধিবাসীরা কি উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল, জ্যাক তাহা বুঝিতে না পারিলেও তাহারা যে চেং-তু মঠের মোহান্তর দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিল, এ বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ হইয়াছিল, এবং মোহান্তর পরাক্রমেরও সে পরিচয় পাইয়াছিল।

জ্যাক কিছুকাল সেই নদীর ধারে চিন্তাকুল চিত্তে ঘুরিয়া বেড়াইল। সে বুঝিয়াছিল, মিঃ লককে অদূরবর্ত্তী জঙ্গে কয়েদ করিয়া রাখা হইয়াছে; তাহার সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া দূরে যাইতে তাহার ইচ্ছা হইল না। কিন্তু সেই স্থানে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিয়াই বা সে মিঃ লকের কি উপকার করিবে? অথচ সে সেই স্থান ত্যাগ করিলে মিঃ লক কি ভাবে বিপন্ন হইবেন, তাহা সে জানিতে পারিবে না। কয়েক মিনিট পরে সে মুখোসধারী মোহান্তকে একখানি জঙ্কের দ্বার পুনর্ব্বার দেখিতে পাইল। তাহার মনে হইল, আর সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সময় নষ্ট না করিয়া মিঃ লকের উদ্ধারের চেষ্টা করাই সঙ্গত; কিন্তু স্লুইফ-সির সহায়তা ভিন্ন যখন এই চেষ্টা সফল হইবে না, তখন তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে বিলম্ব করা অসঙ্গত ভাবিয়া জ্যাক নদীকূল ত্যাগ করিল।

জ্যাক কিছুকাল নদীর ধারে ধারে দৌড়াইয়া চলিল। তাহার পর সে নগরতোরণের পাশ দিয়া ফরাসী ঔপনিবেশিকগণের অধিকার-সীমার দিকে অগ্রসর হইল। সে ফরাসী সীমা অতিক্রম করিয়া ইংরাজের অধিকারসীমা দেখিতে পাইল, কিন্তু তাহার ভিতর প্রবেশ না করিয়া সে বামদিকে চলিতে লাগিল।

বৃটিশ ফরাসী উপনিবেশদ্বয়ের ব্যবধানে ঘোড়দৌড়ের ময়দান। জ্যাক সেই ময়দান পৌঁছিয়া উত্তর-পশ্চিমদিকে চলিল। তাহার পর ধূলিধূসর সুবিস্তীর্ণ সমতলক্ষেত্র। ইহা 'মধ্য বিভাগ' নামে পরিচিত। জ্যাক সেই স্থান অতিক্রম করিয়া সুচাও খালের ধারে উপস্থিত হইল। সেই খালের অপর দিকে সুচাও রোড নামক পথের ধারে সার গর্ডনের অধিকারসীমা। তাঁহার অধিকৃত সুবিস্তীর্ণ ভূখণ্ড উচ্চ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত।

সুচাও রোড দিয়া চলিলে অতি সহজে ও অল্পসময়ের মধ্যে সার গর্ডনের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইতে পারা যায়; কিন্তু জ্যাক সেই পথে অগ্রসর হইল না। পাছে কেহ তাহাকে দেখিতে পায় ও তাহার অনুসরণ করে, এই আশঙ্কায় সে সোজা পথ ছাড়িয়া খালের ধার দিয়া সার গর্ডনের বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইবার সঙ্কল্প করিল এবং চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া খালের পাশ দিয়া সার গর্ডনের অট্টালিকার যে দিকে চলিল, সে দিকে তাঁহার বাড়ীর খিড়কি। যদি সে খালের ধারে সাম্পান ভাড়া করিয়া সেই সাম্পানে খাল পার হইত, তাহা হইলে তাহাকে অধিক দূর হাঁটিতে হইত না, কিন্তু ধরা পড়িবার ভয়ে সে সাম্পান ভাড়া না করিয়া খালের ধারে ধারে চলিতে লাগিল। কিন্তু খাল পার না হইলে সার গর্ডনের খিড়কিতে উপস্থিত হইবার উপায় ছিল না; পদব্রজে বহুদূর চলিয়া গিয়া সে খালের ধারে দাঁড়াইল এবং দাঁড়ি-মাঝিহীন সাম্পানের সন্ধান করিতে লাগিল। কিন্তু সেই দেশে সেরূপ সাম্পান সংগ্রহ করা সহজ নহে; কারণ, সে দেশের অধিকাংশ লোক নদীবক্ষে নৌকাতেই বাস করে। তাহাদের আহার, নিদ্রা, কাযকর্ম্ম সমস্তই নৌকার উপর এবং নৌকাগুলিই তাহারা গৃহের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করে। যাহা হউক, জ্যাক অনেক অনুসন্ধানের পর কতকগুলি বোটের একধারে একখানি ছোট সাম্পান দেখিতে পাইল, তাহার উপর মাঝিমাল্লা বা কোন লোক ছিল না। জ্যাক সেই সাম্পানখানিতে আরোহণ করিল। তাহার পর হাল ধরিয়া তাহা খালের অপর পারে লইয়া চলিল।

তাহার আশঙ্কা হইল, সাম্পানের মাঝি হঠাৎ সেখানে আসিয়া তাহাকে সাম্পান হইতে নামিয়া যাইতে আদেশ করিবে, অথবা তাহাকে চোর বলিয়া ধরিয়া বাঁধিয়া লইয়া

যাইবে ; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে কেহই তাহাকে বাধা দিল না। সে সেই সাম্পানে নির্ব্বিঘ্নে খালের অপর তীরে উপস্থিত হইল।

সাম্পান হইতে নামিয়া সে একটি সেতুর উর্দ্ধস্থিত খিলান দেখিতে পাইল। সে সেই খিলান পার হইয়া প্রায় ১৫ মিনিট চলিয়া সার গর্ডন স্মাডলারের বাসভবনের প্রান্তবর্ত্তী ধূসরবর্ণ পুরাতন প্রাচীর দেখিতে পাইল। সেই প্রাচীরের ভিতর তাঁহার বাগান, বাগানের অন্য ধারে বাসভবন। সেই প্রাচীরের যে ফটক ছিল, তাহা সে রুদ্ধ দেখিল। প্রাচীরটিও অত্যন্ত উচ্চ। সে কি উপায়ে প্রাচীর লঙ্ঘন করিবে, প্রাচীরের নীচে দাঁড়াইয়া তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল।

কিন্তু সেই উচ্চ প্রাচীর লঙ্ঘনের কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া জ্যাক চিন্তাকুলচিত্তে সেই প্রাচীরের পাশ দিয়া চলিতে লাগিল। কিছু দূর গমন করিয়া সে দেখিল, বাগানের একটি গাছের কয়েকটি শাখা প্রাচীরের বাহিরে প্রসারিত হইয়া মাটীর উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। জ্যাক সেই শাখাটি দুই হাতে ধরিয়া ফেলিল এবং তাহার সাহায্যে প্রাচীরে উঠিয়া বাগানের ভিতর লাফাইয়া পড়িল।

জ্যাক সেই স্থানে দাড়াইয়া বাগানের অন্য প্রান্তস্থিত অট্টালিকা দেখিতে পাইল। তাহার শরীর তখনও দুর্ব্বল, তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছিল। সে মাতালের মত টলিতে টলিতে বাগানের ভিতর দিয়া সুইফ-সির অট্টালিকার দিকে অগ্রসর হইল।

সুইফ-সি অর্থাৎ সার গর্ডন স্মাডলার এবং তাঁহার একটি পাদরী বন্ধু সেই সময় গল্প করিতে করিতে দোতলার ছাদে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। তাঁহারা জ্যাককে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিতভাবে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সার গর্ডনের বয়স তখন ৮৮ বৎসর ; এই সুদীর্ঘকালে তাঁহার মাথার উপর দিয়া অনেক ঝড় বহিয়া গিয়াছিল, তিনি নিরুপদ্রবে শান্তিপূর্ণ জীবন বহন করিতে পারেন নাই ; তথাপি এই বয়সেও তাঁহার কর্ম্মশক্তি বিলুপ্ত হয় নাই ; তাঁহার বয়স এত অধিক হইয়াছিল, ইহাও বুঝিবার উপায় ছিল না। এই বয়সেও তাঁহার দেহ সুস্থ ও সবল। তিনি জ্যাককে দূর হইতে দেখিয়া তাহার ছদ্মবেশ সত্ত্বেও বুঝিতে পারিলেন, সে জ্যাক ভিন্ন অন্য কেহ নহে। কারণ, তিনি মিঃ লকের ও জ্যাকের আগমন-সংবাদ পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন, এবং তাঁহারা বিপন্ন হইয়াছেন, তাহাও বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

সার গর্ডন তাড়াতাড়ি দোতলা হইতে নীচে নামিয়া আসিলেন। তিনি করতালি দিয়া বারান্দা হইতে বাগানে প্রবেশ করিতেই পাঁচ ছয় জন ভৃত্য বিভিন্ন কক্ষ হইতে বাহির হইয়া ব্যগ্রভাবে তাঁহার অনুসরণ করিল। সার গর্ডন সেই সময় সেরূপ ব্যস্ত হইয়া কখন নীচে আসিতেন না, এই জন্য চাকররা তাঁহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া, হয় ত কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে ভাবিয়া অত্যন্ত ভীত হইল ; কিন্তু তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে কাহারও সাহস হইল না।

বারান্দার নিকট আসিবার পূর্ব্বেই জ্যাক কাঁপিতে কাঁপিতে মাটীতে পড়িয়া গেল। তাহার দেহ তখন অত্যন্ত অবসন্ন, আর তাহার চলিবার শক্তি ছিল না। সে মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া গিয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিল ; কিন্তু তাহার চেতনা বিলুপ্ত না হওয়ায় সে মাটীতে পড়িয়াই উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে পুনর্ব্বার পড়িয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার চেতনা বিলুপ্ত হইল।

সুইফ-সি জিহ্বা ও কণ্ঠতালুর সংস্পর্শে একটা অস্ফুট শব্দ উচ্চারণ করিলেন। সেই শব্দে তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া ভৃত্যরা সকলেই তাড়াতাড়ি তাঁহার সম্মুখে আসিয়া জ্যাককে তুলিয়া লইল, এবং তাঁহার ইঙ্গিতে জ্যাককে ধরাধরি করিয়া সিঁড়ি দিয়া দোতলায় লইয়া চলিল। সার গর্ডন নীচের হলঘরে প্রবেশ করিয়া টেবিলের উপর হইতে একটি শিশি তুলিয়া লইলেন, তাহার পর তাড়াতাড়ি দোতলায় চলিলেন।

তৎপূর্ব্বেই দোতলার বারান্দায় জ্যাককে একখানি সোফায় স্থাপন করা হইয়াছিল। সোফার উপর সে চিৎ হইয়া পড়িয়াছিল ; তাহার উভয় চক্ষু নিমীলিত। সার গর্ডনের ভৃত্যরা তাহাকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়া অত্যন্ত বিস্মিতভাবে ভাবিতেছিল—এ কি অদ্ভুত ব্যাপার ! তাহাদের মহামান্য মনিব অসাধারণ ব্যক্তি। অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার সাধ্যসাধনার পর তাঁহার সহিত সাক্ষাতের অনুমতি লাভ করে। সাধারণ চীনাম্যানেরা তাঁহার ছায়া স্পর্শ করিতে সাহস করে না। এমন কি, নগরের সাধারণ অধিবাসীরা তাঁহার সম্মুখীন হইতে সাহস করে না ! সেই সার গর্ডন একটা

সাধারণ কুলীকে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িতে দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন, তাহার পরিচর্য্যার জন্য তাহাকে তুলিয়া দোতলায় পাঠাইয়াছেন, স্বয়ং তাহার শুশ্রূষা করিতে আসিতেছেন! ইহা অত্যন্ত অদ্ভুত ও রহস্যপূর্ণ ব্যাপার বলিয়াই তাহাদের ধারণা হইল। এরূপ অসম্ভব কাণ্ড তাহারা আর কখন প্রত্যক্ষ করে নাই। তাহারা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বিস্ময়বিহ্বল-চিত্তে দাঁড়াইয়া রহিল।

স্মইফ-সি সেই বারান্দায় উপস্থিত হইয়াই চাকরগুলিকে সেই স্থান হইতে তাড়াইয়া দিলেন; তাহার পর জ্যাকের দেহের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাঁহার হস্তস্থিত সবুজ শিশির কয়েক বিন্দু আরোক তাহার মুখের ভিতর ঢালিয়া দিলেন। দুই তিন মিনিটের মধ্যেই জ্যাকের চেতনা-সঞ্চার হইল; সে চক্ষু মেলিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। তখন তিনি জ্যাকের হাত ধরিয়া তাহার ধমনীর বেগ পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাহার পর তিনি অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "তুমি জ্যাক ?"

জ্যাক মাথা কাঁপাইয়া ভগ্নস্বরে বলিল, "হাঁ কর্ত্তা, আমি আমার মনিবও -"

স্মইফ-সি হাত তুলিয়া তাহাকে নীরব থাকিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন, তাহার পর তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমি সব জানি, হাঁ, সব। তুমি এখানে আসিয়া ভাল করিয়াছ; কয়েক মিনিটের মধ্যেই সুস্থ হইতে পারিবে। আমি তোমাকে যে ঔষধ দিয়াছি, তাহা বিলক্ষণ উপকারক। তুমি একটু সুস্থ হইয়া সকল কথা আমাকে বল; তোমার মনিবের সংবাদ শুনিবার জন্য আমার আগ্রহ হইয়াছে।"

স্মইফ-সি জ্যাকের অবসাদ দূর করিবার জন্য যে ঔষধ দিয়াছিলেন, তাহা যথেষ্ট বলকারক হইলেও মিঃ লককে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তাহার যে আগ্রহ হইয়াছিল, তাহা অপেক্ষাকৃত অধিক উত্তেজনাজনক। সে সকল কথা চিন্তা করিয়া সোফার উপর আর পড়িয়া থাকিতে পারিল না, সে আর সময় নষ্ট না করিয়া তাড়াতাড়ি সোফার উপর উঠিয়া বসিল এবং তাহাদের সাংঘাই বন্দরে উপস্থিত হইবার পর যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা ধীরে ধীরে স্মইফ-সির নিকট প্রকাশ করিল। বলিতে বলিতে মানসিক উত্তেজনায় তাহার কণ্ঠস্বরের জড়তা বিলুপ্ত হইল।

জ্যাক সকলের শেষে পূর্ব্বোক্ত দাঙ্গার ও সোয়াতো সারেঙের প্রতি আক্রমণের বিবরণ বলিয়া মুখোসধারী মোহান্তের আবির্ভাবের সংবাদটি তাঁহার গোচর করিল। স্মইফ-সি এই সংবাদ শুনিয়া হঠাৎ চমকিয়া উঠিলেন এবং তাঁহার মুখ হইতে বিস্ময়সূচক অস্ফুট ধ্বনি নিঃসারিত হইল।

স্মইফ-সি বিচলিত স্বরে বলিলেন, "তাহার পর লকের কি হইল, শীঘ্র বল।"

জ্যাক বলিল, "আমি আহত হইয়া মাটীতে পড়িলাম। কর্ত্তা যতক্ষণ পারিলেন, একাকী সেই গুণ্ডার দলের সহিত যুদ্ধ করিলেন। তিনি পরাজয় স্বীকার করেন নাই; কিন্তু তিনি যুদ্ধ করিতে করিতে সেই জনতা ভেদ করিয়া বাহিরে যাইবেন, সেই মুহূর্ত্তে নূতন এক দল লোক জোয়ারের জলের মত তাঁহার উপর আসিয়া পড়িল, তাহারা তাঁহাকে ধরিয়া মাথায় তুলিল, তাহার পর নদীকূলে লইয়া গিয়া একখানি জঙ্কে উঠিল, সেই জঙ্কে যে সকল লোক ছিল, তাহারা কর্ত্তাকে লুকিয়া লইল। তাহার পর তাহারা তাঁহাকে লইয়া কি করিল, তাহা দেখিতে পাই নাই। তবে সেই মুখোসধারী কালো আলখেল্লা-পরা মোহান্তটাকে সেই দলে দেখিতে পাইয়াছিলাম।"

স্মইফ-সি রুদ্ধ নিশ্বাসে বলিলেন, "সেই জঙ্কখানা দেখিয়াছিলে ত? সেখানি আবার দেখিলে চিনিতে পারিবে?"

জ্যাক বলিল, "আমি সেই জঙ্কখানির আগাগোড়া দেখিয়া চিনিয়া রাখিয়াছি, পরে দেখিলেই তাহা চিনিতে পারিব।"

স্মইফ-সি বলিলেন, "তবে আর মুহূর্ত্তমাত্র সময় নষ্ট করা হইবে না। যদি আমরা আজ রাত্রে সেই জঙ্ক চিনিয়া বাহির করিয়া তোমার মনিবকে উদ্ধার করিতে না পারি, তাহা হইলে পরে সেই চেষ্টা বিফল হইবে। কিন্তু কি উপায়ে তাঁহাকে উদ্ধার করা যাইবে, তাহা কেবল ঈশ্বরই জানেন।"

[ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

চন্দন

চন্দন ভারতের নিজস্ব দ্রব্য। বহু পুরাকাল হইতে চন্দন-কাষ্ঠ উৎপাদন ও ব্যবসায়ের একমাত্র কেন্দ্র বলিয়া ভারত জগতে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান সময়েও এতদ্দেশোৎপাদিত যাবতীয় বায়া তৈলের মধ্যে চন্দন-তৈলই প্রধান স্থান অধিকার করে। কিন্তু চন্দনের নানাবিধ ব্যবহার, উহার ইতিহাস ও বর্ত্তমান সময়ে চন্দন-তৈল-শিল্পে ভারতের প্রতিষ্ঠালাভ সম্বন্ধে অনেক পাঠকেরই সামান্য জ্ঞান আছে। আমরা তাঁহাদিগের অবগতির জন্য চন্দনকাষ্ঠ ও তৈলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এ স্থলে প্রদান করিতেছি।

পুরাবৃত্ত ও পরিচয়

দক্ষিণাত্যের যে চিরশ্যামল ও নিবিড় অরণ্যে চন্দনতরু জন্মিয়া থাকে, অতীতকালে যে তাহা আরও নিবিড়তর ও দুর্গম ছিল, তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। আর্য্যগণের এতদ্দেশে আগমনের পূর্ব্বেও যে অনার্য্যগণ চন্দনের সহিত পরিচিত ছিল, তাহার অল্পবিস্তর প্রমাণ পাওয়া যায়। চন্দনের উৎপত্তিস্থানজ্ঞাপক সংস্কৃত নাম মলয়জ অর্থাৎ মলয়-পবনের লীলাভূমি মলয়াচল-জাত। ইহার কাষ্ঠ সংগ্রহ এক শতাব্দী পূর্ব্ব পর্য্যন্তও প্রধানতঃ অরণ্যবাসী আদিম জাতিগণের হস্তেই ন্যস্ত ছিল। বর্ত্তমান সময়ে জাপান যেরূপ কর্পূর-বন অধিকার করিবার জন্য ফরমোজা দ্বীপের নর-মুণ্ড-লোলুপ বন্য আদিবাসিগণের সহিত খণ্ড-যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইতেছেন, পুরাতনকালে দাক্ষিণাত্যের রাজগণকেও চন্দনভূমি করায়ত্ত করিবার জন্য সময়ে সময়ে সেইরূপ যুদ্ধ করিতে হইত। প্রাচীন গ্রন্থাদির মধ্যে অথর্ব্ববেদেই সর্ব্বপ্রথম চন্দনের বিশেষ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। উহা ৩ হাজার বৎসর পূর্ব্বে রচিত বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। জলপথে বাণিজ্যবিস্তারের পূর্ব্বে মধ্য-এসিয়ার পুরাতন ও প্রসিদ্ধ বাণিজ্যপথ দ্বারা পূর্ব্বে মহাচীনে ও পশ্চিমে আরব, পারস্য, মিসর ও য়ুরোপে ভারতীয় চন্দন প্রবেশলাভ করিয়াছিল। অবশ্য প্রাচীনকালে ইহা রাজভোগ্য দ্রব্যই ছিল এবং মণি-মুক্তার সহিত মূল্যবান্ পণ্যের মধ্যে পরিগণিত হইত। পুরাতন গ্রীক, রোমক, আরবীয় ও পারসীয় লেখকগণ অনেক স্থলে ভারতীয় চন্দনের উল্লেখ করিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদ ও ধর্ম্মগ্রন্থাদিতে চন্দনের দুইটি ভেদ—শ্বেত ও পীত দৃষ্ট হয়; কিন্তু শেষোক্তটি যে কি, তাহা ঠিক বুঝিবার উপায় নাই। হরিচন্দন সম্বন্ধেও সেই মন্তব্য প্রয়োগ করিতে পারা যায়।

উদ্ভিদশাস্ত্রে চন্দনের নাম Santalum album L.; ইহা যে গণের অন্তর্ভুক্ত, সেই গণে আরও কয়েকটি জাতি রহিয়াছে; সে সমুদয় অন্য দেশে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রকৃত চন্দন ভারত ব্যতীত অন্য কোন দেশে নাই বলিলেও চলে। মালয় দ্বীপপুঞ্জের দুই একটি দ্বীপে সামান্য পরিমাণ চন্দন আছে বটে, কিন্তু গাছগুলি এত বিক্ষিপ্ত ও উহাদের মোট সংখ্যা এত কম যে, ব্যবসায়ের হিসাবে উহাদের বিশেষ মূল্য নাই। ভারতেও চন্দনবৃক্ষ খুব প্রচুর নহে। মহীশূরের অরণ্য-সমূহই চন্দন উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র; তৎপরে প্রাচুর্য্যের অনুপাতে যথাক্রমে কুর্গ রাজ্য এবং মাদ্রাজ প্রদেশের সালেম ও কোইম্বাটোর জিলার উল্লেখ করিতে পারা যায়। পূর্ব্বে নিকটবর্ত্তী অন্যান্য স্থানেও চন্দন-তরু পাওয়া যাইত, কিন্তু অবিবেচনার সহিত কাষ্ঠ সংগ্রহের জন্য

...ন চারা রোপণের ব্যবস্থা না থাকায় চন্দন-তরু আজকাল অপেক্ষাকৃত বিরল হইয়া পড়িয়াছে।

বৃক্ষের প্রকৃতি

চন্দন সুপ্রসিদ্ধ ও বহু মূল্যবান্ বৃক্ষ হইলেও ইহার গাছ কর্পূরের ন্যায় সুদৃশ্য অথবা বড় নহে। ইহা মধ্যমাকৃতি তরু ...ং ইহার শাখা-প্রশাখাও বিশেষ দূরপ্রসারী হয় না। চন্দন খুব শীঘ্র শীঘ্রও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না এবং ইহার পরজীবী অভ্যাসও আছে। যে সকল গাছে মূল সংলগ্ন করিয়া চন্দন-গাছ রস সংগ্রহ করে, তন্মধ্যে শিরীষ, বন্য তুলা ও করঞ্জা বৃক্ষ অন্যতম। বস্তুতঃ ইহার পরজীবী অভ্যাস এত অধিক যে, যেখানে পূর্ব্বোক্ত প্রকারের আশ্রয়দাতা বৃক্ষ (Host tree) বিরল, সেখানে চন্দন-গাছের সংখ্যাও কম। বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টির গতি নিতান্ত মন্দ বলিয়া ২০ বৎসরের পূর্ব্বে চন্দন-গাছ কাষ্ঠ সংগ্রহের উপযুক্ত হয় না। মহীশূর রাজ্যের বন-বিভাগ বিশেষ বিবেচনার সহিত প্রতি বৎসর কাটিবার উপযুক্ত গাছ নির্বাচন করিয়া চিহ্নিত করিয়া দিয়া থাকেন। পূর্ব্বে গাছ কাটা হইলে উহা সঙ্গে সঙ্গে স্থানান্তরিত করা হইত না। কর্ত্তিত গাছ জঙ্গলেই পড়িয়া থাকিয়া ক্রমশঃ কাণ্ডের বহিস্তর ক্ষয়প্রাপ্ত হইত। কেবলমাত্র যখন কাণ্ডের অন্তস্তর (heart wood) অবশিষ্ট থাকিত, তখনই উহাকে চালান দেওয়া হইত। কারণ, এই অন্তস্তরই চন্দন-তৈলের আবাসস্থল কিন্তু যে কাষ্ঠ চেরাই করিবার জন্য করাত-কলে লইয়া যাওয়া হয়, তাহা যে বিশুদ্ধ অন্তস্তরের কাঠ, তাহা বলা যায় না; তাহাতে অল্পবিস্তর বহিস্তরও (sap-wood) থাকে দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ গাছের মোট ওজনের ...তীয়াংশ অন্তস্তরের কাঠ পাওয়া গিয়া থাকে। পূর্ব্বে ...ে বড় বড় খণ্ড-সমূহ বেপারীগণকে বিক্রয় করা হইত; তাহারা আবার উহাকে ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্ত করিয়া ...র চালান দিত। এখন কিন্তু মহীশূর রাজ্যে চন্দন-কাষ্ঠ সংগ্রহ ও তৈলনিষ্কাশনের উপযোগী করিয়া প্রস্তুত করার কার্য্য বিশেষ বিভাগের উপর ন্যস্ত হইয়াছে এবং সমস্ত কার্য্যই বৈজ্ঞানিক প্রথায় পরিচালিত হইয়া থাকে। এখন আর কর্ত্তিত গাছ জঙ্গলে পড়িয়া থাকে না; গাছ কাটার পর উহার ত্বক্ ও বহিঃকাষ্ঠ ছাঁটিয়া বাদ দেওয়া হয়। তৎপরে কাষ্ঠ বড় বড় খণ্ডে পরিণত করিয়া ও রৌদ্রে অৰ্দ্ধশুষ্ক করিয়া গুদামজাত করা হইয়া থাকে। কিছু দিবস গুদামে থাকিলে কাষ্ঠের গন্ধ সমধিক পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। উপযুক্ত সময়ে গুদাম হইতে কাষ্ঠ বাহির করিয়া ক্ষুদ্র করাতকলে পাতলা ও অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত করিলে তখন উহা তৈলের কারখানায় ব্যবহারের উপযোগী হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে, কাঠ কাটিবার সময় যে সমস্ত গুঁড়া বাহির হয়, সেগুলি ফেলিয়া দেওয়া হয় না। তাহাতেও কিয়ৎপরিমাণে গন্ধতৈল থাকে এবং করাত-গুঁড়ারও নির্দ্দিষ্ট মূল্য আছে।

তৈল-শিল্প

যেরূপ অন্যান্য ভারতীয় কাচা মাল দেশমধ্যে সদ্ব্যবহৃত না হইয়া বিদেশে চালান যায়, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে চন্দন-কাষ্ঠের অবস্থাও সেইরূপ ছিল। বিদেশীয় তৈল-প্রস্তুতের কারখানা-সমূহ বহু পরিমাণে ভারতীয় চন্দন-কাঠ লইয়া গিয়া তৈল চোলাই করিতেন এবং উক্ত চন্দন-তৈলের বহুলাংশ আবার ভারতের বাজারে আসিয়া বিক্রয় হইত। জর্ম্মণীর সুপ্রসিদ্ধ বাসী তৈল-ব্যবসায়ী সিমেল কোম্পানীরই চন্দন-তৈলের কারবার অধিক পরিমাণে ছিল। এইরূপ অবস্থা আরও কত দিন চলিত বলা যায় না। কিন্তু বিগত মহাযুদ্ধের সময় চন্দন-কাষ্ঠের রপ্তানী ও তৈলের আমদানী একবারে বন্ধ হইয়া যায়। মহীশূর রাজ্যে বহুপরিমাণে কাষ্ঠ অবিক্রীত অবস্থায় জমিয়া যাওয়ায় তাঁহারা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েন। সুখের বিষয় যে, সেই সময়ে মহীশূরের শিল্পবিভাগের তদানীন্তন অধ্যক্ষ সার আল্‌ফ্রেড চ্যাটারটনের মস্তিষ্কে ভারতে চন্দন-তৈল প্রস্তুতের কল্পনা প্রবেশ করে। তাহার ফলে বহুবিধ পরীক্ষাদির পর ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালোরে প্রথম চন্দন-তৈল-কারখানা স্থাপিত হয়। কারখানার উত্তরোত্তর উন্নতি হইয়া উৎকৃষ্ট তৈল প্রস্তুত হইতে থাকে। বাজারে মহীশূর-চন্দন-তৈলের চাহিদা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। অবশেষে বাঙ্গালোর কারখানা দ্বারা বাজারের চাহিদা সম্পূর্ণরূপে পূরণ করা যায় না দেখিয়া, মহীশূর সহরে দ্বিতীয় চন্দন-তৈল-কারখানা স্থাপিত হয়। উভয় কারখানাই আধুনিকতম কলকব্জা দ্বারা ও বৈজ্ঞানিক প্রথায় পরিচালিত। দুইটি কারখানায় প্রতি মাসে ৫০ হাজার পাউণ্ড তৈল প্রস্তুত হইতে পারে। মহীশূর রাজ্য এই দুইটি কারখানা স্থাপন করিয়া শুধুই যে নূতন শিল্প-প্রতিষ্ঠা দ্বারা ভারতবাসীমাত্রেরই

ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন, তাহা নহে, অধিকন্তু তাঁহারা জগতের বাজারে চন্দন-তৈলের ব্যবসা একচেটিয়া করিয়াছেন। ভারতে উৎপাদিত প্রায় সমস্ত চন্দন-কাঠই তাঁহাদের কারখানায় সদ্ব্যবহৃত হইতেছে। চন্দন-কাষ্ঠের রপ্তানী প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। তদ্ভিন্ন দেশমধ্যেও অন্যত্র তৈল চোলাই উদ্দেশ্যে আর চন্দন-কাঠ পাওয়া যায় না। বলা আবশ্যক যে, মহীশূরে যে তৈল প্রস্তুত হইতেছে, তাহা, পূর্ব্বে যে বিলাতী তৈল আমদানী হইত, তদপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে।

চন্দন-কাষ্ঠ হইতে তৈল নিষ্কাশন করিবার আধুনিক প্রণালী কতকটা জটিল; এ স্থলে তাহার বর্ণনা অনাবশ্যক। মূলতঃ ইহা বলিতে পারা যায় যে, কাষ্ঠে তৈলের পরিমাণ শতকরা ৫ হইতে ৭ ভাগ এবং ১ শত পাউণ্ড তৈল বাহির করিতে হইলে ১ টন (২৭৷৷০ মণ) কাঠ আবশ্যক হয়। ইহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায় যে, বিভিন্ন স্থানের চন্দন-গাছে তৈলের মাত্রা বিভিন্নরূপ। কিন্তু ইহা সচরাচর দেখা যায় যে, বন্ধুর অনুর্ব্বর স্থানের তরু শ্যামল ও সরস বনভূমির তরু অপেক্ষা অধিক তৈল প্রদান করে। মহীশূর-তৈল ব্যতীত বাজারে বর্ত্তমান সময়ে অন্য যে সকল চন্দন-তৈল পাওয়া যায়, সেগুলি অবিমিশ্রিত নহে। বিশুদ্ধ চন্দন-তৈলের আপেক্ষিক গুরুত্ব ০·৯৬৫ হইতে ০·৯৮০ ডিগ্রী; ইহা গাঢ় এবং ঈষৎ পীতাভ বর্ণযুক্ত। চন্দন-তৈলের দুইটি প্রধান উপাদান—স্যাণ্টালোল এবং স্যাণ্টালাল (Santalol & Santalal); তন্মধ্যে প্রথমোক্তের প্রাচুর্য্যই অধিক; তৈলে ইহার অনুপাত শতকরা ৯০ ভাগ পর্য্যন্তও হইয়া থাকে।

অন্যান্য কার্য্যে ব্যবহার

অপূর্ব্ব গন্ধযুক্ত তৈলের জন্য চন্দনের মূল্য ও আদর হইলেও চন্দন-তৈলকে আধুনিক বস্তু বলিতে পারা যায়। চন্দনের আতর মোগল বাদশাহদিগের সময় সামান্য মাত্রায় প্রস্তুত হইত; প্রকৃত চন্দন-তৈল ইংরাজের আমলেই এতদ্দেশে দেখা দিয়াছে। সে যাহাই হউক, চন্দনের কাষ্ঠ, চন্দনের গুঁড়া ও লেপ বহু পুরাকাল হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। অগুরু, চন্দন, চুয়া শুধু দেবপূজাতেই নহে, অন্তবিধ সামাজিক ব্যাপারেও আবশ্যক হইত। এখনও কাষ্ঠরূপে ভারতের বাজারে সামান্য পরিমাণে চন্দন বিক্রয় হয় না। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, চন্দনকাষ্ঠ বলিয়া যে কাষ্ঠ বিক্রয় হয়, তাহার সহিত চন্দনের সম্পর্ক নগণ্য। প্রকৃত চন্দন-কাষ্ঠের বহির্ভাগ পীতাভ এবং ভিতরের স্তর-সমূহে পীতাভ রক্তবর্ণ অথবা রক্ত ও ধূসর বর্ণের সংমিশ্রিত রেখা-সমূহ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। অন্যান্য গন্ধদ্রব্যে ভেজাল দেওয়া প্রথার ন্যায় চন্দনে ভেজালের জন্যও চন্দনের সহিত সাদৃশ্যযুক্ত অপর কাঠের খণ্ড-সমূহ সামান্য পরিমাণে চন্দন-কাঠের সহিত কিছু দিবস গুদামে বন্ধ করিয়া রাখা হয়। তাহাতে অন্য কাষ্ঠখণ্ডগুলি চন্দনের বায়ী তৈল সেবন করিয়া অল্পবিস্তর পরিমাণে চন্দনগন্ধবিশিষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ কাষ্ঠ ব্যবহার করিলে দেখা যাইবে যে, ক্রমশঃ উহার গন্ধ কমিতে থাকে এবং অবশেষে কিছুই থাকে না। প্রসাধনকার্য্যে চন্দনের ব্যবহারের মধ্যে কেশতৈলে, সুগন্ধে (Essences) ও সাবানে উহার প্রয়োগের উল্লেখ করিতে পারা যায়। মূল্যবান্ ধূপ-সমূহ, যদ্দ্বারা মন্দির অথবা গৃহ সুরভিত করা হয়, প্রধানতঃ চন্দন-কাঠের গুঁড়া হইতেই প্রস্তুত হয়। দেবমূর্ত্তি, দেবালয় ও গৃহের নানাবিধ আসবাব, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্স ও তৎশ্রেণীর দ্রব্যাদি প্রস্তুতেও অনেক পরিমাণে চন্দনকাঠ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দাক্ষিণাত্যে, বিশেষতঃ মাদ্রাজ প্রদেশের বিজয়পত্তন অঞ্চলে চন্দনকাষ্ঠ-শিল্পের এখনও যথেষ্ট প্রাধান্য আছে। চন্দন-কাষ্ঠের উপর গজদন্ত-রচিত নক্সা-করা যে সমস্ত দ্রব্য দাক্ষিণাত্যে আজও প্রস্তুত হয়, তাহার সূক্ষ্ম কারুকার্য্যে বিদেশীয় পর্য্যটকগণও বিমোহিত হইয়া থাকেন। চন্দনকাষ্ঠ-নির্ম্মিত দেবালয়ের আসবাব প্রসঙ্গে পুরাকালের প্রসিদ্ধ সোমনাথ-মন্দিরের তোরণদ্বারের উল্লেখ করিতে পারা যায়। শিল্প-শোভায় ও ওজনের গুরুত্বে ইহা এত মূল্যবান্ দ্রব্য ছিল যে, গজনীর মহম্মদ উহাকে উঠাইয়া কত নদী, পর্ব্বত ও দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া নিজ দেশে লইয়া যাইতে নিরস্ত হন নাই।

যতদূর প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, হিন্দুগণই সর্ব্বপ্রথমে চন্দন চিকিৎসায় ব্যবহার করেন আয়ুর্ব্বেদে চন্দন-তৈলের কটু ও স্নিগ্ধকারক গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে প্রমেহ ও কতিপয় প্রকার মূত্ররোগে ডাক্তারগণ চন্দন-তৈলকে মূত্রধারক, স্নিগ্ধকারক ও ঈষৎ উত্তেজকরূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহা ব্রুটি

ফারমাকোপিয়ার অন্তর্ভুক্ত ঔষধ। ফলতঃ ঔষধ হিসাবে চন্দন-তৈলের কাটতি নিতান্ত কম নয়।

পরিবর্ত্ত কাষ্ঠ

যে সময় হইতে মহীশূর রাজ্য চন্দন-তৈলের কারখানা স্থাপন করিয়া দেশমধ্যে তৈল প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, সেই সময় হইতেই বিদেশীয় বণিকগণ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, চন্দন-তৈলের ব্যবসায় তাঁহাদিগের হস্তচ্যুত হইয়াছে। ক্রমশঃ তাঁহারা চন্দনের ন্যায় গুণবিশিষ্ট কাষ্ঠ আবিষ্কারের জন্য পৃথিবীর সর্ব্বত্রই অনুসন্ধান করিতেছেন। এ পর্য্যন্ত সেরূপ কোন কাষ্ঠ পাওয়া যায় নাই, কিন্তু দুই একটি কাঠের তৈল সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া চন্দনতৈলরূপে চালাইবার চেষ্টা চলিতেছে। এ পর্য্যন্ত চন্দন-কাষ্ঠের পরিবর্ত্তে যে সকল কাষ্ঠ অথবা তৈল প্রবর্ত্তন করিবার চেষ্টা হইয়াছে, তন্মধ্যে চারিটি বৃক্ষ উল্লেখযোগ্য :—১। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জের Amyris balsamifera ; কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তিই কিন্তু ইহার তৈলকে চন্দন-তৈল বলিয়া ভ্রম করিতে পারেন না, কারণ, ইহার গন্ধ ও বর্ণ উভয়ই স্বতন্ত্র প্রকারের। ২। ম্যাডাগাস্কার দ্বীপজাত Osyris tenuifolia ; ইহার তৈলের আপেক্ষিক গুরুত্ব চন্দন-তৈল সদৃশ হইলেও ইহার বর্ণ উজ্জ্বল লাল। ৩। পশ্চিম-অষ্ট্রেলিয়ায় প্রাপ্ত Eucaria Spicata এবং দক্ষিণ-অষ্ট্রেলিয়াজাত Santalum lanceslatum। এই শেষোক্ত দুইটি তরু হইতে নিষ্কাশিত তৈলকে সংমিশ্রিত করিয়া বৃটিশ ফারমাকোপিয়া অনুমোদিত তৈলরূপে প্রবর্ত্তনের প্রয়াস চলিতেছে। এই পরিবর্ত্তন-তৈল প্রস্তুতের মূলে একটু বৈজ্ঞানিক চাতুরী আছে। বৃটিশ ফারমাকোপিয়ায় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, Santalum album হইতে চন্দন-তৈল প্রস্তুত করিতে হইবে। সেরূপ তৈলের অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে তিনটি প্রধান অর্থাৎ আপেক্ষিক গুরুত্ব ০·৯৬৫ ; স্যান্টালোলের মাত্রা শতকরা ৯০ ভাগ এবং optical rotation ১৩·১ Eucarya Spicataর তৈলে মাত্র শতকরা ৪৫ অংশ স্যান্টালোল পাওয়া যায় এবং ইহার optical rotation ৮ ; কিন্তু ভগ্নাংশিক পরিস্রবণে প্রাপ্ত Eucarya তৈলের একটি অংশের প্রকৃত চন্দন-তৈলের সহিত কিছু সাদৃশ্য আছে। পক্ষান্তরে, Santalum lanceslatumএর তৈল আদৌ চন্দন-তৈলের মত নহে, কিন্তু উহার optical rotation ৪০°। চতুর ব্যবসায়িগণ Eucarya তৈলের চন্দন-তৈলের গন্ধযুক্ত ভগ্নাংশ S. lanceslatum তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া থাকেন। তাহাতে যে তৈল দাঁড়ায়, তাহা কতকটা বৃটিশ ফারমাকোপিয়ায় নির্দ্দিষ্ট লক্ষণযুক্ত। বলা বাহুল্য যে, প্রাকৃতিক গুণের কতক সাদৃশ্য থাকিলেও কৃত্রিম চন্দন-তৈলের ভৈষজ্যগুণ প্রকৃত চন্দন-তৈলের মত নহে। ফরাসী ফারমাকোপিয়ায় কতিপয় বিশেষ কার্য্যে ইহার ব্যবহার অনুমোদিত হইলেও মার্কিণে ইহার ব্যবহার একবারেই নিষিদ্ধ। অন্যান্য ক্ষেত্রে যাহাই হউক, ঔষধের ক্ষেত্রে অষ্ট্রেলিয়ার চন্দন-তৈল যে ভারতীয় চন্দন-তৈলের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে, তাহা বোধ হয় না।

সুবিধা ও অসুবিধা

চন্দন-তৈলের কারখানা ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া এক দিকে যেমন দেশজাত কাষ্ঠের সদ্ব্যবহার হইতেছে ও ধনাগমের আর একটি পন্থা উন্মুক্ত হইয়াছে, তেমনই চন্দন-কাষ্ঠ দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় অন্য দেশেরও কতক পরিমাণে অসুবিধা হইয়াছে। পূর্ব্বে প্রতি বৎসর অর্দ্ধ-লক্ষ মণের উপরেও চন্দন-কাঠ ভারত হইতে রপ্তানী হইত ; এখন দেড় হাজার মণের অধিক কাঠ বিদেশে চালান যায় না। এই প্রসঙ্গে বলিতে পারা যায় যে, সামান্য পরিমাণে চন্দনের পরিবর্ত্ত কাঠ অন্য দেশ হইতে, বিশেষতঃ অষ্ট্রেলিয়া হইতে ভারতে আমদানী হয়। মূল্যবান্ দারু-শিল্পেই ইহার প্রধান ব্যবহার। প্রকৃত চন্দন-কাঠের রপ্তানী ও পরিবর্ত্ত কাঠের আমদানী পরিমাণে প্রায় সমান। চন্দন-কাঠের রপ্তানীর হ্রাসের সহিত চন্দন-তৈলের রপ্তানীর পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে ১ লক্ষ ৩৮ হাজার পাউণ্ডেরও অধিক তৈল বিদেশে চালান গিয়াছিল। অবশ্য বর্ত্তমান জগৎময় ব্যবসায়ের অধোগতির জন্য চন্দন-ব্যবসায়েরও যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। কিন্তু আশা করিতে পারা যায় যে, আবার স্বাভাবিক সময় ফিরিয়া আসিলে জগতের বাজারে চন্দন-তৈলের কাটতিও অধিক হইবে।

চন্দন-কাষ্ঠের দুষ্প্রাপ্যতার জন্য বিদেশীয়গণের যত অসুবিধা হউক আর না হউক, এতদ্দেশে কনৌজের যথেষ্ট অসুবিধা হইয়াছে। অনেকেই অবগত আছেন যে, বিদেশীয়

অথবা বিদেশীয় প্রথায় প্রস্তুত গন্ধদ্রব্য যতই অধিক প্রচলিত হউক না কেন, দেশমধ্যে একশ্রেণীর অভিজাত সম্প্রদায় এখনও দেশীয় আতর ও সমশ্রেণীর দ্রব্য ব্যবহারের পক্ষপাতী। কনৌজের গন্ধদ্রব্য প্রস্তুতকারকরা বহুকাল হইতে তাঁহাদিগের অভাব মোচন করিয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে তাহারা বৎসরে প্রায় ১ শত মণ কাঠ চোলাই করিত; বলা দরকার যে, কনৌজে চন্দন-কাঠ স্বতন্ত্রভাবে চোলাই হয় না; সাধারণতঃ চন্দন-কাঠ অন্য দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে। এখন তাহারা মহীশূর হইতে সামান্য কাঠই পায়; বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে মহীশূর-তৈলই ব্যবহার করিতে হইতেছে। ইহাতে প্রস্তুতীকৃত গন্ধের গুণ উৎকৃষ্ট হয় না বলিয়া তাহাদিগের বিশ্বাস।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

ছেলে-মেয়ে

মারলে ওরা মরবে না ক
নাইক ওদের ধ্বংস,
চেষ্টা ক'রে দেখলে কত
হেরড এবং কংস।
ক্ষুদ্র ওরা তেজের অণু
বিদ্যুৎ এবং ইন্দ্রধনু,
মহাকাল ও চামুণ্ডারি
ছট্‌কে পড়া অংশ।

ওরাই সীতা করলে চিতা
সাগর-ঘেরা লঙ্কা,
ওরাই যে ভীম কীচক বধে
নাইক কোনো শঙ্কা,
হরের ধনু ভঙ্গ করে,
যমকে নিয়ে রঙ্গ করে,
দেশে দেশে সদাই বাজে
ওদের বিজয়-ডঙ্কা।

রাজার হাতীর পা ওঠেনি
দলতে ওদের ডাব্‌লে,
পাথর বেঁধে ফেল্‌লে যখন—
সাগর বুকে রাখলে!
বিষও ওদের কদর জানে,
অমৃত হয় আস্বাদনে,
হিংসা করা দূরের কথা
ব্যাঘ্র রাখে আগ্‌লে!

ওরা যেমন কোমল কচি
তেমনি ওরা শক্ত,
লবকুশ ওরা, তুচ্ছ করে
অযোধ্যা রাজতক্ত,
যজ্ঞ-তুরগ আট্‌কে রাখে,
রাঘবকে হায় যুদ্ধে ডাকে,
মায়ের পায়ে নোয়ায় শুধু
উচ্চ ও শির ভক্ত।

নালন্দাতে ওরাই মরে
পাঠের পুঁথি বক্ষে,
মাথায় ঝরে রক্তধারা
জল নাহিক চক্ষে;
ধীর যে ওরাই, ওরাই ধ্রুব,
অশুভেরি মধ্যে শুভ,
ওরাই গোপাল, মুক্তি আলো
আন্‌লে কারার কক্ষে।

ওরা বামন নেহাৎ খাঁটো
নয়কো মোটেই মন্দ,
বলী রাজার মাথায় বসায়
তবু শ্রীপাদপদ্ম।
সিংহাসনের পুত্তলিকা,
ভালে ওদের জয়ের টীকা,
কতই হবুচন্দ্র হলো
ওদের কাছে হদ্দ।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম

(গল্প)

১

চৈত্র মাসের শেষ; কাজেই পরিণাম-রমণীয়াঃ দিবসাঃ। সন্ধ্যার একটু আগে ওয়ালফোর্ডের দোতলা বাস আসিয়া থামিল গোলদীঘির ধারে। তিন-চারিজন যাত্রী উঠিল; তাদের মধ্যে একজন তরুণী! তরুণীর হাতে একটি ব্যাগ; পরণে ধূপছায়া রঙের মারহাট্টি শাড়ী, গতির ভঙ্গী সলীল, স্বচ্ছন্দ; মুখে-চোখে প্রসন্ন দীপ্তি। তরুণী একেবারে দোতলায় উঠিয়া আসিলেন। সামনের চেয়ারে বসিয়া ছিল সিদ্ধেশ্বর ওরফে সিধু। তরুণীকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া শীট ছাড়িয়া সে দু'শীট পিছাইয়া দুর্গন্ধ কাপড়-পরা এক মাড়োয়ারীর পাশে বসিল। তরুণী স্মিত হাস্যে তাকে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সামনের শীটে বসিল; বসিয়া ব্যাগ খুলিয়া ছোট একখানি রুমাল বাহির করিল, রুমালে মুখ মুছিয়া সেখানি আবার ব্যাগে রাখিয়া ব্যাগ বন্ধ করিল। বাস তখন চলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

বাসের দোতলায় সিধুকে লইয়া যাত্রী ছিল প্রায় দশ-বারো জন। ষ্টীমার চলিয়া গেলে নদীর স্থির জলে যেমন একটা চাঞ্চল্য ওঠে, তরুণীর সান্নিধ্য যাত্রীগুলির বুকে নিমেষের জন্য তেমনি চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিল। সে চাঞ্চল্য তখনি থামিল, আজ-কাল এ ব্যাপারে বৈচিত্র্য বিশেষ নাই, কাজেই—

সিদ্ধেশ্বরের বুকের চাঞ্চল্য কিন্তু চট্ করিয়া থামিল না। না থামার একটু কারণ আছে।

পাঁচ বছর পূর্ব্বে ল' পাশ করিয়া সে গিয়াছিল রঙপুরে ওকালতি করিতে। তার এক মামা সেখানে ওকালতির ফাঁদে বহু মক্কেলকে কাবু করিয়া ফেলিয়াছেন, তাই। মন কিন্তু [illegible]ণীর কমল-বনের পাশেই অহরহ ছুটিতে চায়। তা ছাড়া [illegible]কাল কলিকাতায় কাটাইয়া এখন রঙপুরে পরিমিত গণ্ডীর [illegible] মন কোনমতে বসিতে রাজী নয়। ওকালতিতে পসার [illegible]বার কাজেই কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না। তাই সে [illegible] দিনের ছুটীতে গৃহে ফিরিয়াছে, এবং রঙপুরে আর যায় না; জানুয়ারি মাস হইতে কলিকাতার ছোট আদালতে [illegible]র হইতেছে।

কণ্ডাক্টর আসিলে তরুণী মান্থলী টিকিট দেখাইলেন।

বসন্তের হাওয়ায় কবি কালিদাস সেই কোন্ অতীত যুগে যে দিনের পরিণাম-রমণীয়তা কাব্যের ছন্দে গাহিয়া গিয়াছেন, সে রমণীয়তা আজ এই সভ্যতার প্রচণ্ড কলরব-কোলাহল, কল-কারখানার বিপুল সমারোহের মধ্যেও তেমনি অটুট আছে! ভাগ্যে অটুট আছে, তাই তরুণ প্রাণে ভাবের ফুল বর্ণ-গন্ধের অজস্রতায় আজও ভরিয়া ওঠে। বাস চৌরঙ্গী ছাড়াইয়া ভবানীপুর মাড়াইয়া হাজরা রোডের মোড়ে আসিলে তরুণী নামিলেন। সিধুও থাকিতে পারিল না, উঠিল; এবং একটু দূরে নামিয়া ত্বরিত পায়ে আসিয়া সেও ঐ হাজরা রোড ধরিল।

তরুণী? পথে সন্ধ্যার অস্পষ্ট অন্ধকার। গ্যাস জ্বলিয়া উঠিয়াছে। এই আলো-ছায়ায় গা ঢাকিয়া বহু পথিক পথে চলিয়াছে; কিন্তু সে তরুণী? সিধুর বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল। মায়া? স্বপ্ন? মতিভ্রম? না। এই বাস্তবতার যুগে স্বপ্ন বা মায়া এমন বিভ্রম রচনা করিতে পারে না!

হাজরা রোডের মোড় অবধি ঘুরিয়াও কোনো ফল হইল না। তরুণীর চিহ্ন নাই! ঘর্ম্মাক্ত দেহে সিধু আসিয়া পুনর্মূষিক হইল, অর্থাৎ একখানা চলন্ত বাসের দোতলায় চড়িয়া গৃহে ফিরিল।

পরের দিন কোর্টে একটু কাজ ছিল, ভুষি-মালের মকর্দ্দমা, তার মধ্যে Defenceএ একটু মজাও! সিনিয়র চাঁদমোহন বাবু সেটুকু ভাল করিয়া বুঝাইয়া সিধুকে বলিয়া-ছিলেন, এই পয়েন্টে একটু জোর জেরা করিলেই, ব্যস্! সিধুও সে কায়দাটুকু রপ্ত করিয়াছিল। চাঁদমোহন বাবু বলিয়াছিলেন, এ মামলায় তুমিই জেরা করিবে, নহিলে মুখ খুলিবে কেন? এবং মুখ না খুলিলে ওকালতিতে কোনো আশা ইত্যাদি···

জোরালো পয়েন্টগুলা দস্তর-মত আয়ত্ত করিয়া সিধু কোর্টে আসিল। যথাসময়ে মামলার ডাক পড়িল—কিন্তু ছোট আদালতের সনাতন প্রথামত উভয় পক্ষ উকিল-সমেত খাড়া হইবার পূর্ব্বেই সে মামলার শুনানি রাখিয়া আরও পাঁচ-সাতটা মামলা টপকাইয়া আট নম্বরের মামলা লইয়া প্রচণ্ড তর্ক সুরু হইয়াছে! সিধুর মামলার শুনানির সুযোগ মিলিতে···সেই বেলা তিনটা, সাড়ে তিনটা।

মন অস্থির হইয়া উঠিল—সে চায় বৈকালে গোলদীঘির ধারে গিয়া দাঁড়াইতে—এবং সেই তরুণী! তিনি আজও আসিবেন, তার কোন স্থিরতা নাই, তবু একটা চান্স! এই চান্সের জোরেই নেপোলিয় দিগ্বিজয় করিয়াছেন, এই চান্সের জোরেই রবার্ট ব্রুশ, জেনারেল লরেন্স—সে কালে যুধিষ্ঠির, শ্রীরামচন্দ্র—ইতিহাসে-পুরাণে সর্ব্বত্র এই চান্স কি সাফল্যই না আনিয়া দিয়াছে!

বেলা সাড়ে তিনটা বাজিয়া গেল। সিধু কাছারি-ঘরে বসিয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে, হাকিম ওদিকে একদল মাড়োয়ারি এবং তাদের প্রায় পঞ্চাশখানা খাতা লইয়া এমন তন্ময় যে, আরও যে-সব মোকর্দ্দমা তাঁর ফাইলে আছে, সে দিকে খেয়াল নাই; তারিখই নয় দাও···তাও না! অপর পক্ষের উকিল কহিল,—ওহে সিধু, এসো না, একটা তারিখ—সিধু বাঁচিয়া গেল, সে কহিল,—বেশ!

কিন্তু মাড়োয়ারির খাতা এমন আড়াল তুলিয়া রাখিয়াছে যে, ফাঁক মিলে না, যে ফাঁকে ছোট্ট নিবেদনটুকু হাকিমের সামনে তুলিয়া ধরে!

বেলা সাড়ে চারিটায় সুযোগ মিলিল। অপর পক্ষের উকিল কহিল—একটা তারিখ দিন—মামলা চালাইব না—মিটাইয়া লইব।

—All right! সিধুর যেন ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল। মক্কেলের পানে চাহিয়া সে কহিল,—চাঁদবাবুকে বলো—আমি চল্লুম, ভারী জরুরি দরকার! কিন্তু মক্কেল—সে কাঁঠালের আঠা—ছাড়িবে কেন? সিধু কোনমতে তার উদ্যত প্রশ্নগুলার পাশ কাটাইয়া টপাটপ সিঁড়ি টপকাইয়া নামিয়া লালদীঘির ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। ঘড়িতে—নাঃ, গৃহে ফিরিয়া পোষাক ছাড়িয়া গোলদীঘিতে আসিতে—হয় তো চান্স ফস্‌কাইবে! তার চেয়ে এই পোষাকেই···

গোলদীঘির ধারে আসিয়া সে বাস্ হইতে নামিল। নামিয়া আশুতোষ বিল্ডিংয়ের কোণে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বহুক্ষণ···তারপর···ঐ যে ধূপছায়া রঙের শাড়ী-পরা, ছোট ব্যাগ হাতে সেই তরুণী! তরুণী আসিয়া গোলদীঘির ধারে···

একখানা বাস্ আসিতেছিল, সিধু ক্ষিপ্র পায়ে আগাইয়া গিয়া সেনেটের সামনে বাসে চড়িয়া একেবারে *দোতলায়···তার পর গোলদীঘির কোণে বাস্ থামিলে তরুণীও—*

কালিকার মত তরুণী আসিয়া দোতলায় চড়িল। সামনের শীট ভরতি, তারা জায়গা ছাড়িল না। স্বরাজ্যদলের নেতাদের লইয়া বিষম তর্কে সব বিভোর! তরুণী তিন-শীট পিছাইয়া বসিলেন, তাঁর পাশে এক ব্যক্তি একখানা বাঙলা সাপ্তাহিক পাঠে তন্ময়! রাগে সিধুর গা জ্বলিয়া উঠিল—ইচ্ছা হইল, ও লোকটার কাগজ টানিয়া ফেলিয়া দেয়—দিয়া বলে, শুধু প্রৌঢ়কে নয়, ঐ ছোকরার দলকেও—মেয়েটিকে পুরা শীট্ ছাড়িয়া অন্য শীটে বসিতে পারো না? স্বরাজ চাহিতে চলিয়াছ! সামান্য কার্টশীর জ্ঞান নাই? দেশের নারীকে সম্ভ্রম করিতে জানো না? ইত্যাদি···

কিন্তু চিন্তার সূত্র বাড়িয়া চলিল—কার্য্যে পরিণতির কোন আশা না জাগাইয়া। বাস্ আবার সেই চৌরঙ্গী ছাড়াইল, সেই ভবানীপুর···অবশেষে সেই হাজরার মোড় উপস্থিত। সিধু আগে হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল—তরুণী সেই জায়গায় নামিল, সিধুও সঙ্গে সঙ্গে···তার বুকের মধ্যে কে যেন হাতুড়ি ঠুকিতেছিল, বুক ঢিপ ঢিপ করিতেছিল।

হাজরা রোডের একটু আগে একটা গলি···তরুণী গলি পথে প্রবেশ করিল। সিধুও···পাঁচ-সাতখানা বাড়ীর পর একখানা একতলা বাড়ী। তেমন সৌষ্ঠব নাই, তবে পরিচ্ছন্ন! তরুণী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল, সিধু অদূরে দাঁড়াইয়া নিশ্বাস ফেলিতেছিল। একটা উড়িয়া কুলী মই কাঁধে লইয়া পথে গ্যাস জ্বালিতেছিল।

২

তার পর সারা হপ্তা···এই স্রোতেই সিধুর মন ভাসিয়া চলিয়াছে। এ যে কি মোহ! সারাদিন বৈকালের এই ক্ষণটুকুর চিন্তাতেই কাটিয়া যায়, বৈকালে তরুণী ঠিক সেই জায়গাটিতে আসিয়া বাসে চড়ে এবং নামে ঠিক সেই হাজরা রোডের মোড়ে। সিধুর দুই চোখ আনন্দে প্রদীপ্ত হয়; মন আনন্দে মাতিয়া উঠে···যেন ও-তরুণীর সঙ্গে তার নিত্যকালের পরিচয়। কল্পনা মনের পটে রঙের তুলি দিয়া কত ছবিই যে আঁকিতে থাকে!

সেদিন শনিবার—দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সিধু আকুল, ... তরুণীর দেখা মিলিল না! সন্ধ্যা গাঢ় গভীর হইলে সিধুর বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল—কেন আসিল না? কোনো অসুখ…? তাই তো…যদি অসুখ শক্ত হয়? চিন্তায় তার মন একেবারে উদ্বেল হইয়া উঠিল। কি করিবে সে? খবর লইবে? তাই…নহিলে বৈকালের বেলাটুকু ব্যর্থ হইয়াছে, রাত্রে ব্যথা অসহ্য হইয়া উঠিবে। সে বাসে চড়িল এবং আকুল চিত্তে দুশ্চিন্তা বহিয়া আসিয়া নামিল হাজরার মোড়ে।

সেই গলি,…সেই গৃহ…ভিতরে কলরব নাই। বাড়ীটার সামনে দিয়া কতবার যে পায়চারি করিল… কতবার মনে হইল, দ্বারে করাঘাত করিয়া সংবাদ লয়—সেই তিনি? গোলদীঘির ধারে বাসে চড়িয়া এই মোড়ে আসিয়া নামেন, সেই আনন্দরূপিণী তরুণী—তিনি কেমন আছেন? তার অজ্ঞাতে দুই পা টানিয়া তাকে ঐ গৃহের দ্বারে আনিয়া কখন্ যে দাঁড় করাইয়া দিয়াছে, এবং একটা হাত ঐ পায়ের সঙ্গে যোগ দিয়া কখন্ যে দ্বার স্পর্শ করিয়াছে…তার খেয়াল নাই…দ্বারে অতি মৃদু আঘাতও…

কাণে সে আঘাত বাজিল বাজের মত! ধিক্কারে মন ভরিয়া উঠিল। ছি ছি, এ সে কি করিতেছে! অপরিচিতা তরুণী…তার পর ভালো লাগে তাঁর সান্নিধ্য…লাগুক …তা বলিয়া এত-বড় স্পর্দ্ধা!

সিধু সরিয়া আসিল ধীরে ধীরে। হাজরার মোড়ে… ল্যাম্প-পোষ্টের পাশে ষ্টাচুর মত দাঁড়াইয়া রহিল। সামনে ঐ আলো, কলরব,…আকাশে ঐ ত্রয়োদশীর চাঁদ সব যেন পটে আঁকা ছবির মত নিস্পন্দ, প্রাণহীন!

রবিবার যে কি ভাবে কাটিল…মন বার বার বলিতে লাগিল, কিসের লজ্জা! চলো হাজরা রোডে। যদি সত্যই অসুখ হইয়া থাকে? সংবাদ লইবে…তাহাতে কিসের দোষ! মানুষের প্রতি মানুষের এ দরদ…

সোমবার বৈকালে আবার দেখা। সেই সময়…সেই দোতলা বাস, তরুণীর দৃষ্টি তার দৃষ্টির সহিত মিলিল…তরুণীর ওষ্ঠে যেন হাসির বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল…চকিতের জন্য। সে হঠাৎ সিধুর মনকে আলোয় আলো করিয়া দিল! তারও আনন্দের সীমা নাই। মন বলিয়া উঠিল, আঃ বাঁচিলাম। কি দুশ্চিন্তায় এ দু'দিন কাটাইয়াছি! তুমি ভালো আছ— ভালো আছ! আঃ!

কল্পনা তাকে লইয়া কি পুষ্পিত পথে যাত্রা করিল… এ পথে রাজ্যের আরাম আর শান্তি!…উদ্‌ভ্রান্ত মনে এ পথে সে চলিয়াছে…সীমাহীন পথ…ফুরাইতে জানে না… হঠাৎ একসময় খেয়াল…! খেয়াল হইতেই সামনের সীটে চাহিয়া দেখে, তরুণী নাই…সীটে একখানা বাঁধানো খাতা পড়িয়া আছে…এবং বাস কালীঘাটের ডিপোর সামনে আসিয়াছে! বাসের দোতলা খালি; প্যাসেঞ্জারের মধ্যে শুধু সে একা।

ধড়মড়িয়া সে উঠিয়া পড়িল; খাতাখানা হাতে লইল— লইয়া বাস হইতে নামিল। বুকের মধ্যে আনন্দ ঢেউ তুলিয়া দিয়াছে…একরাশ বসন্তের হাওয়ায় সে ঢেউয়ের মাতনের সীমা নাই! আলোয় খাতা খুলিয়া দেখে, পরিষ্কার হরফে লেখা, গায়ত্রী দেবী…হাজরা রোড। খাতার মধ্যে …ইংরাজীতে লেখা Notes. রাজ্যের কবিতার ব্যাখ্যা…

মন বলিল, তোমারই সাধনায় তৃপ্ত হইয়া তোমাকে দিয়াছে…হাতের ঐ লেখা রাখিয়া দাও…

তাই! তাই…এ মণি…মণি ফিরাইয়া দিয়া কাজ নাই!

পরক্ষণে আবার—না, ফিরাইয়া দি…ফেলিয়া গিয়াছেন। হয় তো কত অসুবিধা হইবে…তা ছাড়া আলাপের চমৎকার সুযোগ…না, ছাড়া হইবে না! খাতা লইয়া উদ্বেল বক্ষে সেই গৃহপ্রান্তে আসিয়া সিধু দ্বারে করাঘাত করিল। ভিতর হইতে সাড়া উঠিল,—কে?

সঙ্গে সঙ্গে দ্বার খুলিয়া সামনে দাঁড়াইল…এ কি? তিনি নন্…আর এক তরুণী।

তরুণী কহিল,—কি চান?

সিধু ভড়কাইয়া গেল। যে কথা বলিবে ভাবিয়াছিল— তার সবটুকু কোথা উবিয়া গেল!…বাড়ী ভুল হইয়াছে? না…

তরুণী মুখের পানে চাহিয়া—তাঁর চোখে একরাশ বিস্ময় ও কৌতূহল!

সিধু কহিল—এ খাতাখানা বাসে ফেলে এসেছিলেন… নাম লেখা, গায়ত্রী দেবী…

—ওঃ। হ্যাঁ—এই বাড়ীতেই থাকে…আমারি সম্পর্কে বোন্ হয়।

কথার সঙ্গে সঙ্গে তরুণী হাত বাড়াইল। সিধুর মনে অন্ধকার নামিল। এত বড় সুযোগ—সব ব্যর্থ হইল! অথচ উপায় কি? খাতাখানা সে তরুণীর হাতে দিল…তরুণী কহিল—ধন্যবাদ!…বলিয়া দ্বার ভেজাইয়া দিল।

সিধুর মনে হইল, বুঝি, পৃথিবী নিশ্চল হইয়া গিয়াছে… জীবনও ফুরাইয়া গিয়াছে! সে কাঠের মত স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল! একরাশ নিশ্বাস বুকটাকে এমন বলে চাপিয়া ধরিল যে প্রাণ বুঝি সে চাপে…

সহসা দ্বার খুলিয়া আবার সেই তরুণী…তরুণী কহিল,—এই যে আপনি! এখনও যান নি…ভালো হয়েচে! একবার ভিতরে আসুন…একটু চা…গায়ত্রী স্নান করতে গেছে। সে নিজে ধন্যবাদ না দিলে কর্ত্তব্য খর্ব্ব হবে! আসুন…

আঃ! পৃথিবী আবার চলা সুরু করিল—বাতাস আবার বহিল…ঐ যে বাড়ীর উঠানে ফোটা ফুলের রাশ বাতাসে দুলিয়া তাকেই সম্বর্দ্ধনা করিতেছে!

সিধুর পা কাঁপিতেছিল। কম্পিত পায়ে সে বাড়ীর মধ্যে পদার্পণ করিল।

সামনেই ছোট একটু বাগান—দু'চারিটা ক্রোটনের গাছ—একধারে হাস্নাহানার ঝাড়; ক'টা বেল, যুঁই, রজনীগন্ধার গাছও আছে। বড় বড় ফুল ফুটিয়াছে। গন্ধে দিক্ মশগুল্! ছোট্ট বাগানখানির পর একটু রোয়াক। রোয়াকের দু'দিকে বাঁখারির বেড়া। বেড়ার গায়ে মালতী-লতার বাহার এবং এই বেড়া-ঘেরা জায়গায় ছোট একটি টেবিল, চারখানা চেয়ার, টেবিলের উপর হাতে-বোনা টেবল্-ক্লথ—তার উপর রবি বাবুর মোটা 'চয়নিকা' বই পড়িয়া আছে।

তরুণী কহিল—বসুন। গায়ত্রী আসচে। আমি ততক্ষণ চায়ের জোগাড় করি। চা খাবেন তো?

হৃষ্ট চিত্তে সিধু ঘাড় নাড়িয়া জানাইল,—খাইবে।

তরুণী কহিল—আমার নাম গীতা। গায়ত্রী আমার বোন্…

গীতা চলিয়া গেল। সিধুর মনের মধ্যে ইংরাজী আর বাঙলা সাহিত্যের যত কথা ঘুরপাক খাইতে সুরু করিল—Seventh heaven, নন্দন-ফুল-হার—ইত্যাদি!

কোনোমতে উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তকে আয়ত্ত করিয়া সে চয়নিকার পাতা খুলিয়া কাব্যে মন দিল। সহসা এক ঝলক মিষ্ট গন্ধ… চমকিয়া চোখ তুলিয়া সিধু দেখে, সামনে দাড়াইয়া… মূর্ত্তিমতী সন্ধ্যা? না,—সেই তরুণী…শ্রীমতী গায়ত্রী দেবী।

দাঁড়াইয়া সিধু অভ্যর্থনা করিল। গায়ত্রী বলিল,—বসুন। অশেষ ধন্যবাদ…খাতাখানা হারালে ভারী ক্ষতি হতো…এই অবধি বলিয়া সে অন্য দিকে চাহিয়া কহিল,—গীতা চা তৈরী করচে।…ও কি, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন…

সিধু কহিল—আপনি বসুন আগে…কথাটা বলিয়া সিধু চমকিয়া উঠিল—এ যেন কার কণ্ঠস্বর! সেই যে কবে কোথায় কি বইয়ে পড়িয়াছিল—স্বর ফুটে ফুটে ফুটে না,—অবিকল তেমনি!

গায়ত্রী বসিল এবং সিধুকেও বসিতে হইল। তার পর দুজনে চুপ…সিধুর বুকের মধ্যে শুধু একটা দুপ দুপ শব্দ… তার বিরাম নাই, বিচ্ছেদ নাই!

গীতা আসিল। হাতে চায়ের কাপ। হাসিয়া গীতা কহিল,—বিশুদ্ধ কৃতজ্ঞতায় অতিথির অভ্যর্থনা করেচিস্, গায়ত্রী?

গায়ত্রী কহিল—উনি চয়নিকা পড়চেন…ওঁর পড়ার ব্যাঘাত হয় যদি?

ছাই চয়নিকা! বইখানা ঠেলিয়া দিয়া সিধু গীতার পানে চাহিল, কহিল,—এ কি…আপনি সত্যই চা নিয়ে এলেন! কেন এ কষ্ট করা…

গীতা হাসিয়া কহিল,—বাঃ, আপনি কতখানি কষ্ট করেচেন, বলুন তো, ঐ খাতা বয়ে এনে…

চা পান করিতে হইল। তার পর আলাপ! গীতা ও গায়ত্রী…বেশ নাম দুটি। গীতা যেন মূর্ত্তিমতী বাণী…তার রূপে কথায় হাসিতে বিদ্যুৎ বহিয়া চলিয়াছে! আর গায়ত্রী? ধ্যানের স্তব্ধ মৌনতা…এই সন্ধ্যার মতই স্থির গম্ভীর মূর্ত্তি!

গায়ত্রী বলিল,—আপনাকে বাসে প্রায় দেখি…না?

সিধুর বুকটা ধড়াশ করিয়া উঠিল তার মনের গোপন রহস্যটুকুও ধরা পড়িয়াছে তাহা হইলে! কিন্তু…

তাড়াতাড়ি সিধু কহিল,—হ্যাঁ। আমি বেড়াতে বেরুই ঐ সময়…কথাটা বলিয়া সে দুজনের পানেই চাহিয়া দেখিল। গীতার মুখে হাসি, গায়ত্রীর মুখেও যেন…!

গীতা বলিল,—গায়ত্রী টীচারী করে, পটলডাঙ্গা গার্ল

স্থলে।…বি, এ দেবে আসচে বারে। এবারেই দিত। শরীর ভালো ছিল না, তাই হলো না!…

সিধু কহিল,—ও খাতায় নোট্‌স্ দেখলুম তাই…

গীতা কহিল,—খাতা দেখেচেন তা হলে?

সিধু কহিল,—নাম-ঠিকানা আবিষ্কার করবার জন্যই… তার পর চোখে পড়লো।

গীতা কহিল,—তার জন্য লজ্জার কারণ নেই। কিছু অন্যায় হয়নি!

তার পর আরো দু'চারিটা কথা; অবশেষে ধন্যবাদের ঘটা! সিধু উঠিল, কহিল,—চমৎকার ফুলগুলি। এত বড় বেল! বাঃ!

গায়ত্রী কহিল,—বাগান গীতার তৈরী। নেবেন ফুল?

গীতা কহিল,—আমি দিচ্ছি।

পাঁচ-সাতটি বড় বেলফুল ছিঁড়িয়া গীতা সিধুর হাতে দিল। সিধুর হাত কাঁপিতেছিল। ফুলের ঘ্রাণ লইয়া সে কহিল, —চমৎকার! বাঃ!—আমি ফুল ভারী ভালোবাসি।

গীতা হাসিল, হাসিয়া কহিল,—আপনি কবিতা লেখেন না কি?

সিধু কহিল,—কেমন ক'রে জানলেন?

গীতা কহিল,—ফুলের উপর অনুরাগ…তার পর ঐ 'চয়নিকা' দেখেই তার পাতা উল্টোচ্ছিলেন। এইটুকু বলিয়াই গীতা কহিল,—আসবেন মাঝে মাঝে। আলাপ হলো যখন…নিঃসঙ্গ থাকি আমরা।

সিধু মাথা নাড়িয়া সহর্ষ সম্মতি জানাইল।

৩

পাঁচ-সাত দিনে পরিচয় আরো নিবিড় হইয়া উঠিল।

সেদিন সন্ধ্যায় গীতা গম্ভীরভাবে কহিল,—আপনি উকিল তো! তাই বলচি…

সিধু কহিল,—বলুন…

গীতা কহিল,—গায়ত্রীকে এই যে টীচারি করতে হয়… ওর টীচারি করবার মত অবস্থা সত্যই নয়। ও একটু বিপন্ন হয়েই শুধু…

সিধু উৎসুক দৃষ্টিতে গীতার পানে চাহিল। গীতা কহিল,—ওর এক খুড়তুতো ভাই আছেন। থাকেন চুঁচড়োয় …ভারি একরোখা মানুষ। অদ্ভুত চরিত্র। গায়ত্রী যখন ছোট, তখন মেশোমশাই মারা যান। মাশিমা তার আগেই মারা গেছেন। অনেক টাকার শেয়ার, তবে আরো পাঁচটা সম্পত্তি, নগদ টাকা ভাইয়ের হাতে। একটি পয়সা উপুড়-হস্ত করে না। গায়ত্রী সাবালিকা হতে চেয়েছিল। সে হাঁকিয়ে দেছে। তা আমরা মেয়েমানুষ…লেখাপড়া যতই শিখি, বিষয়-সম্পত্তি-উদ্ধারের হদিশ তো জানি না। বিশেষ এ হলো আইনের ব্যাপার। উকিল-মোক্তারের সঙ্গেও জানা-শোনা নেই। কে দেখে? কে করে? তা আপনি যদি এ ভারটুকু…

আনন্দে সিধুর বুক দুলিয়া উঠিল। সিধু কহিল—বেশ, নিশ্চয় করবো। সে কি কথা! আপনি সব particulars দিন্…আর সে ভদ্রলোকের নাম, কি করেন, সে-সব খবর…

গীতা কহিল—খুড়তুতো ভাইয়ের নাম তারাপদ গাঙ্গুলি। থাকেন চুঁচড়োর বড়-বাজারে। ঐ যে ফেরিঘাট আছে—তার কাছেই। তার প্রত্নতত্ত্বের সখ আছে…সিধে পথে গোল-যোগ হবে—শঠে শাঠ্য-নীতি অবলম্বন ক'রে যদি পারেন…

সিধু হাসিল; হাসিয়া কহিল,—কিছু ভাবতে হবে না। ওকালতি ব্যবসায় যখন নেমেচি, তখন এ বিষয়ে ভাববেন না…

গীতা কহিল—এ যদি করতে পারেন, তা হলে গায়ত্রী আপনার কেনা হয়ে থাকে!

পারিশ্রমিকের কথাটা ভারী চমৎকার শুনাইল!… কেনা…কেনা…! কিন্তু কিনিতে কে চায় গায়ত্রীকে! সিধু নিজেকে তার কাছে বিকাইতে পারিলে ধন্য হইয়া যায়! তার এ জন্মটা…কিন্তু তা কি হইবে?…

তারাপদর নাম-ধাম টুকিয়া লইয়া সিধু আশ্বাস দিল,— কাল থেকে সচেষ্ট হবো।

গীতা কহিল—কিন্তু দু'চার দিন বেশ ঘনিষ্ঠতা ক'রে তবে…বুঝলেন—ভারী বুদ্ধি ক'রে কাজ হাসিল করা চাই। আইন-আদালত না করতে হয়!

সিধু কহিল—বুঝেচি।

… … … …

পরের দিন কোর্টে আর যাওয়া ঘটিল না। কি হইবে মিছা গিয়া…পশার তো ভারী! শুধু সিনিয়ার চাঁদমোহন বাবুর ফরমাশ খাটা—এই New Trialএর দরখাস্তটা

লিখিয়া ফেলো···ঐ জবাবখানা, হরমুখ রামের একখানা চিঠি draft···তার চেয়ে তারাপদর হাত হইতে গায়ত্রীর বিষয় যদি···

সাজিয়া গুজিয়া সিধু হাওড়ায় গিয়া ট্রেণ ধরিল। সে বায়োস্কোপ দেখিয়াছে, বহু নভেল পড়িয়াছে—তারি স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া বহু অভিসন্ধি সে মাথায় বহিতেছে কাল রাত্রি হইতে। তারি একটা···দেখা যাক্ !

বড়বাজারে তারাপদর গৃহ মিলিল। তারাপদ কতকগুলা নুড়ি লইয়া বসিয়াছিল। পাশে ছিল মোটা একখানা ইংরাজী কেতাব। সিধু আসিয়া কহিল—নমস্কার, মশায়।

তারাপদ কহিল—কে ?

সিধু কহিল—আমার একটু এদিকে taste আছে। আপনার নাম শুনে আসচি। দয়া ক'রে আমায় আপনার শিষ্যত্বে গ্রহণ করতে হবে !···

তারাপদ লোকটা রোগা—হাড় জিব্‌-জিব্ করিতেছে—নাক লম্বা। নাকের উপর চশমা জোড়া ফিট্ করিয়া বিস্ফারিত চক্ষে তারাপদ সিধুর পানে চাহিল, কহিল—এ সম্বন্ধে কিছু পড়াশুনা করেচো ?

—আজ্ঞে, ঐ সাহিত্য-পরিষদে ঘোরাফেরা করেচি কিছুকাল। তার পর সুনীতি চাটুয্যের সঙ্গেও ঘুরেচি। মানে, যবদ্বীপে সুনীতি বাবু যত কিছু রিসার্চ্চ করেচেন—জানি। কাগজে তার সিকির সিকিও তিনি প্রকাশ করেন নি—তবে আমি বহু তথ্য জেনে ফেলেচি।

তারাপদ সিধুর পানে চাহিয়া রহিল—দৃষ্টিতে একরাশ বিস্ময়-কৌতূহল !

সিধু ভাবিল, নুড়ি-নোড়ায় যার এতখানি তন্ময়তা, বিষয়-সম্পত্তির দিকেও তার এমন লালচ যে, ভাইঝীর সম্পত্তি অসঙ্কোচে গ্রাস করিতে চায় ! পাজী, শয়তান ! নোড়া-নুড়ি ঘাঁটিয়া প্রাণটাকেও নোড়া-নুড়ির মত কঠিন করিয়া ফেলিয়াছে ! গীতার কথাই ঠিক—অদ্ভুত চরিত্র !

সিধু কহিল—জানেন, যবদ্বীপে মহাকবি কালিদাসের লেখা নতুন নাটক পাওয়া গেছে, হর-পার্ব্বতী অর্থাৎ কুমার-সম্ভবখানা ভদ্রলোক dramatise করেছিলেন। তার পর সেখানে ব্যাটাভিয়ায় একটি কালী-মন্দির আছে—তার পুরোহিত বাঙালী শ্রীযুত ভবানীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য, এখন নাম ব্যাউনি ব্যাটাচিয়ারিয়া। লোকটা বাঙলা জানে না। সুনীতি বাবু তাকে বাঙলা শিখিয়ে এসেচেন—এবং এখান থেকে এখনও ডাকে lessons পাঠাচ্ছেন। অভিপ্রায়, অপরেশবাবুকে দিয়ে ঐ হর-পার্ব্বতীর বাঙলা নাট্যানুবাদ ষ্টারে প্লে করাবেন ! জাভার এক বাঙালী কবি ছিল গদাধর পাল—লোকটা যেমন মাটীর পুতুল তৈরী করতো, তেমনি কবিতা লিখতো। এ সব তথ্য সুনীতি বাবু ছাপার হরফে বার করেন নি—তবে সংগ্রহ ক'রে রাখচেন—হুম্ ক'রে কবে সবার তাক্ লাগিয়া দেবেন। তাই আমার মতলব···অর্থাৎ···

তারাপদ কৌতূহলের তীব্রতায় মুখব্যাদান করিল।

সিধু কহিল—কতকগুলো তথ্য আপনাকে এনে দেবো—আপনি সে সম্বন্ধে কিছু লিখে কাগজে ছাপিয়ে দিন···। আপনি নিজেকে এমন গোপন রাখবেন না। কীর্ত্তি কাগজে জাহির করা দরকার···না হলে আপনার জীবনের সঙ্গে সঙ্গে আপনার আবিষ্কৃত তথ্য যে-তিমিরে সেই তিমিরে থেকে যাবে !

তারাপদ একটু চিন্তাবিষ্ট হইল ; পরে ঘাড় নাড়িয়া কহিল—হুঁ !···

সিধুকে তারাপদর ভালো লাগিল। তারাপদ এ অভাব অনুভব করিত···পাঁচজনে আসিয়া যখন নানা তথ্য আবিষ্কারের গল্প করিত—ঐ পাহাড়পুর, তক্ষশীলা···তখন তারাপদ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিত—এই দ্যাখো, আমার কাছে সে সব ছক আছে···যাবে কোথা ? আমি জানি সব···

তারা বিদ্রূপ করিত, তারাপদ রাগিয়া গালি দিত···। আজ তারাপদ ভাবিল, এই ছোকরাকে পাশে পাইয়া বহু দিনের সাধ পূরণ করিতে পারিবে। কলমে তার লেখা আসে না বলিয়াই না সে এমন অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে' নহিলে সে না জানে কি !

৪

গায়ত্রীর গৃহে বৈঠক বসিয়াছিল। গীতা কহিল—আসল কথাটা পাড়লেন ?

সিধু কহিল,—আগে একটু বিশ্বাস জমিয়ে নি। আমায় indispensable বুঝুন আগে···

আকাশের পানে সহসা শূন্য দৃষ্টি মেলিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া গীতা কহিল,—দেখুন···আপনার দ্বারা যদি সম্পত্তির উদ্ধার হয়···

কথা শেষ হইল না। কথার সঙ্গে সঙ্গে সিধুর মনও আকাশে উঠিয়াছিল—কিন্তু শেষের দিকে আশা বা আশ্বাসের অবলম্বন মিলিল না বলিয়া ঝুম্‌ করিয়া পড়িল একই পাতালে! একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সিধু কহিল,—ইনি কোথায়?

—কে? গায়ত্রী?

—হ্যাঁ। এঁকে দেখচি না তো···

গীতা কহিল,—ওদের স্কুলের মিটিং আছে। লেডি কম্যকার হলেন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট···তাঁরই বাড়ীতে মিটিং—সেখানে গেছে।

—ওঃ!

সব উৎসাহ কমিয়া আসিল। সিধু চুপ করিয়া রহিল। ছোট্ট বাগানের একধারে বাতাসে রজনীগন্ধার ঝাড় দুলিতে-ছিল···যেন বাতাসের মিনতি কাণে তুলিবে না! রজনীগন্ধা তাই যেন মাথা নাড়িয়া বলিতেছে, না, না, না। সিধু ভাবিল, চমৎকার আইডিয়া মাথায় আসিয়াছে তো! ক'ছত্র কবিতা যদি এই অবসরে···

সামনে পড়িয়াছিল প্যাড। টানিয়া সে কবিতা লিখিতে বসিল। গীতা কহিল,—কবিতা লিখচেন?

সলজ্জ হাসি-মুখে সিধু কহিল,—আপনার ঐ বাগানটুকু প্রচুর ভাব জোগায়।

—বটে! গীতা হাসিল।

সিধু কবিতা লিখিতেছিল, সহসা একটা নিশ্বাসের শব্দ। চমকিয়া সিধু গীতার পানে চাহিল! গীতার মুখের হাসি কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে! কি ভাবিতেছে? কেন ও নিশ্বাস?

গীতা কহিল,—একটা আলমারি দেখেচেন?

আলমারি! সিধু চারিদিকে চাহিল। কৈ? গীতা কহিল,—এখানে নয়। চুঁচড়োয় তারাপদ বাবুর ঘরে?

সিধু কহিল,—দেখেচি।

—সেই আলমারির মধ্যে যত কিছু বৈষয়িক কাগজপত্র···

—হুঁ! বলিয়া সিধু চুপ করিল। রজনীগন্ধার গন্ধ-শ্মশানে কবিতার ভাব-ভাষা সে গাম্ভীর্য্যের চাপে পিষিয়া মরিয়া গেল।

পরের দিন। তারাপদ আলমারি খুলিয়া অত্যন্ত সতর্ক-ভাবে কি সব কাগজ-পত্র নাড়িতেছিল। এ যেন ভবিতব্য উপন্যাসেও এমন সুযোগ দেখা যায় না! সিধু ভাবিল, ইহাকেই সাহিত্যে বলে golden opportunity! ভাব গাঢ় হইল। কারণ, তারাপদ সিধুর আবির্ভাবে আলমারী বন্ধ করিল।

সিধু কহিল,—দেখুন, একটু কাজের কথা আছে।

—কি? তারাপদর চোখে কেমন এক দৃষ্টি! মনে মনে হাসিয়া সিধু ভাবিল, এবার তোমায় দেখিতেছি!

সিধু কহিল,—গায়ত্রী দেবী আপনার ভাইঝী?

তারাপদর মুখ বিবর্ণ হইল, তারাপদ একটা ঢোক গিলিয়া কহিল,—হ্যাঁ, তা···

সিধু হাসিল, আর ঝোপের পিছনে থাকা নয়। সাফ কথাই কহা যাক্! সে কহিল,—কেন অনর্থক তাঁর বিষয়-সম্পত্তি আটকে তাঁকে হয়রাণ করচেন!

বিষয়-সম্পত্তি! তারাপদ যেন আকাশ হইতে পড়িল!

সিধু কহিল,—হ্যাঁ। শেয়ার, টাকাকড়ি! নালিশ করলে তিনি পাবেন না, ভাবেন?

তারাপদর মুখ আরো বিবর্ণ হইল! সিধু হাসিতেছিল। তারাপদ কহিল,—ও সব চাল্‌ চলবে না। বেরোও এখনি, বেরোও এখান থেকে···

সিধুর বিস্ময় সীমা ছাড়াইল। এমন বিদ্বেষ! সিধু কহিল, —আমি উকিল।

তারাপদ কহিল,—তাই এসেচো এখানে! ও প্রত্নতত্ত্ব বুজরুকি···?

সিধু কহিল,—তাই!

তারাপদ কহিল,—উকিলে আমার প্রয়োজন নেই। স'রে পড়ো। আমি তোমার মক্কেল নই।

সিধু কহিল,—আপনি মক্কেল নন্‌, জানি। কিন্তু আমি এসেচি আমার মক্কেল শ্রীমতী গায়ত্রী দেবীর কাছ থেকে।

তার পর যা ঘটিল, অপূর্ব্ব! কোনো আজগুবি উপ-ন্যাসেও তেমন ঘটিয়াছে কি না, জানি না! তবে বাঙলা বায়োস্কোপের গল্পেও এমন তীব্র উত্তেজনা কখনো দেখি নাই!

তারাপদ বাঘের মত ঝাঁপাইয়া সিধুর ঘাড়ে পড়িল,··· তার চোখের দৃষ্টি এমন অস্বাভাবিক ভাব ধারণ করি-য়াছে যে, সিধুর মনে হইল, বায়োস্কোপের পর্দ্দায় একগাদা ইংরাজী অক্ষর নাচিয়া ভাসিয়া উঠিল, সে অক্ষরগুলা DESPERATE!

সিধু কবিতাই লেখে, ডন্-কশরৎ করে না, কাজেই সে নিমেষে কাবু হইল। তারাপদ তাকে মাটিতে ফেলিয়া বজ্রস্বরে হাঁকিল,—ভোঁদা…

ভোঁদা তারাপদর ভৃত্য, বেশ জুয়ান চেহারা। সে মূর্ত্তি সিধুর অপরিচিত নয়। তারাপদর আহ্বানে ভোঁদা তার দীর্ঘ বপু লইয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। তারাপদ হাঁকিল,—মোটা দড়িগাছটা আন্। একে বাঁধবো। এ চোর—তার পর রাত্রে গঙ্গার জলে ফেলে দেবো!

সিধুর দুই চোখ কপালে উঠিল। সর্ব্বনাশ! Desperateness-এর মাত্রা সীমা ছাড়াইয়াছে! অসঙ্কোচে মানুষ খুন করিতে চায়!

একটা ধস্তাধস্তি। কিন্তু তারাপদর গায়ে বেশ জোর! ভোঁদার সাহায্যে সিধুকে রজ্জুবদ্ধ করা হইল এবং পাশের ছোট ঘরে সে বন্দী রহিল।

প্রাণের মায়ায় মানুষ নাকি অসাধ্য সাধন করিতে পারে…বিশেষ সে প্রাণ যদি আশার রঙে রঙীন থাকে! ওকালতিতে পশারের আশা না থাকুক, জীবনে ওকালতিই পরম কাম্য নয়! গায়ত্রী দেবী! যদি তাঁর সম্পত্তিটুকু উদ্ধার করিতে পারে, তাহা হইলে সিধুর ভাগ্য-গগন চাঁদের আলোয় ঝলমলিয়া উঠিবে! প্রেম না হোক্, কৃতজ্ঞতাও তো একটা…বিশেষ গায়ত্রী দেবী শিক্ষিতা, তরুণী!

নানা উপায় সে চিন্তা করিতে লাগিল। বায়োস্কোপ দেখিয়াছে বহুবার! দড়ি-বাঁধা হাত-পা, ছোট ঘরে বন্দী… সিধু গড়াগড়ি খাইতে লাগিল। কিন্তু বৃথা প্রয়াস! দড়ি ছিঁড়িল না। এ তো বায়স্কোপের অভিনয় নয় যে, ইঙ্গিতে দড়ি ছিঁড়িবে, তা সে যত কঠিন হউক! হাত-পা নাড়িয়া হাতে-পায়ে ব্যথা ধরিল, দড়ি হাতে আরো চাপিয়া বসিল, বাঁধন শিথিল হইল না!

বাহিরে সহসা চাবি খোলার শব্দ! রাত্রি হইয়াছে না কি! সিধু শিহরিয়া উঠিল।

দ্বার খুলিয়া ঘরে প্রবেশ করিল, এক তরুণ যুবা। সিধু হতাশ নিরুপায় দৃষ্টিতে তার পানে চাহিল।

তরুণ দ্রুত সিধুর হাত-পায়ের বাঁধন খুলিয়া দিল, খুলিয়া কহিল,—শীগগির স'রে পড়ুন,—না হলে রক্ষা নাই। যে হাতে পড়েছেন! ভাগ্যে ভোঁদা গিয়ে আমায় খপর দিলে।

বন্ধন-মুক্তি! কিন্তু পলাইবে? পলাইলে কি করিয়া হাজরা রোডে গিয়া মুখ দেখাইবে! এত বড় কাপুরুষ সে! কাপুরুষকে সকলে ঘৃণা করে…বিশেষ তরুণী নারীর দল, এবং এ যুগে!

তবু সাবধানের বিনাশ নাই। কাজেই সিধু সরিয়া পড়িল। সরিয়া সে গঙ্গার ধারে গিয়া বসিল। তার পর মনে চকিতে একটা কল্পনার উদয় হইল। সে ধীরে ধীরে তারাপদর গৃহের পথে ফিরিল।

ঐ উঠান। সদরের দ্বার খোলা। খোলা দ্বার-পথে চাহিয়া সিধু দেখে, রোয়াকে গীতা দেবী এবং সেই তরুণ! গীতা দেবীও আসিয়াছেন! তার মনে সাহসের সঞ্চয় হইল। সে গিয়া গৃহমধ্যে ঢুকিল।

গীতা দেবী কহিল—আমায় মাপ করবেন, সিধু বাবু!

মাপ! সিধু কহিল—না, না, আপনার কোন অপরাধ নেই। আমারি বোকামি।

গীতা কহিল—তা ঠিক নয়। তবে আপনার সঙ্গে এ-রকম নির্ম্মম কৌতুক করা উচিত হয় নি।

কৌতুক! সিধু এবার আকাশ হইতে পড়িল!

গীতা কহিল,—আপনার ভাব-গতিক দেখে বুঝেছিলুম, আপনি গায়ত্রীকে ভালো বেসেচেন।

সিধু মাথা নামাইল।

গীতা কহিল—ব্যাপারটা খুবই করুণ। কারণ আশা নেই। গায়ত্রীর বিবাহের কথা পাকা। কুমার বাবুর নাম শুনেচেন? কুমার ঘোষাল…ইউনিবার্সিটির রত্ন। তিনি বিলাত গেছেন—অক্সফোর্ডের এম-এ হবেন বলে! তিনি ফিরলে, তাঁর সঙ্গে গায়ত্রীর বিবাহ হবে।

আকাশে মেঘ জমিতেছিল। সিধু তা লক্ষ্য করে নাই! দিনের আলোও নিবিয়া আসিতেছিল। সে মেঘের চাপে যেন তার দম্ বন্ধ হইয়া যাইবে, এমন দশা!

সেই তরুণ যুবা কহিল—উইলের কথা বলেছিল আপনাকে? তার মধ্যে সত্য এইটুকু যে তারাপদ বাবু গায়ত্রীর খুড়তুতো ভাই নয়। সম্পর্কে খুড়তুতো ভগ্নীপতি…বিপত্নীক…গায়ত্রীকে বিয়ে করতে চান্ মাঝে মাঝে!

একটু ছিট্ আর কি! তাই ওকে ক্ষ্যাপায় সকলে, গায়ত্রীও। সেই ক্ষ্যাপামি…বিষয়-সম্পত্তির অর্থ, গায়ত্রীর চিত্ত! এইখানেই ওঁর মস্ত দুর্ব্বলতা…গায়ত্রীর নাম করলে সহ্য করতে পারেন না। তাই এই সম্পত্তির ফন্দী আর

ক! ভোঁদা খবর না দিলে আপনার পীড়ন কতদূর হ'তো, জানি না—পাগলের হাতে পড়েছিলেন তো!

পাগল! নিরাশ প্রেমের জ্বালায়! কড়্‌কড় করিয়া মেঘ ডাকিয়া উঠিল। সিধু পড়িয়া যাইতেছিল; কোনোমতে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া সে দ্বার-পথে অগ্রসর হইল।

গীতা আসিয়া তার হাত ধরিল, কহিল -গায়ত্রী এসেচে। একবার দেখা করুন।

সিধুর অন্তরাত্মা কাঁদিয়া ফাটিয়া পড়িল। একটা বড় নিশ্বাস সবলে চাপিয়া সে কহিল,—না, মাপ করবেন আমায়।

গীতা কহিল—বলুন, আপনি মাপ করলেন।

সিধু গীতার পানে চাহিল। অনেক কথা বুকের মধ্যে ঠেলিয়া উঠিল; কিন্তু গীতার চোখে যে মিনতি-ভরা দৃষ্টি! তার মুখে কথা আর বাহির হইল না।

গীতা কহিল—আমাদের ভুলবেন না, ত্যাগ করবেন না—বন্ধু ধ'লে···

আবার মেঘের সেই তীব্র হুঙ্কার-যেন আকাশ ফাটিয়া তার বিদ্রূপের অট্টহাস্য জাগিল। সিধু কহিল,—বেশ! আপনি কিছু মনে করবেন না। আমার উচিত শিক্ষাই হয়েচে। নারীর স্বচ্ছন্দ বিচরণ দেখে যে ভুল পথে ছুটেছিলুম···

তরুণ যুবা কহিল,—ভারী কঠিন এই নারী জাত। স্বাধীন হয়ে বেড়ালেও হৃদয়-দুর্গ এমন মজবুত যে, চট্‌ ক'রে সে দুর্গে প্রবেশ করবে, এমন সাধ্য কারো নেই!

সিধু কহিল, —জানি আমি।

গায়ত্রী আসিয়া দাঁড়াইল, কহিল,—একটু চা খেয়ে যান। আমি তৈরি করেচি।

আশার রঙীন ফানুষ ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে, তবু গায়ত্রীর কথায় 'না' বলিবার শক্তি সিধুর ছিল না। বুকের মধ্যে যা ঘটিতেছিল, অন্তর্য্যামীই শুধু বুঝিতেছিলেন।

গীতা কহিল,—আসবেন আবার আমাদের বাড়ী?

সিধু গায়ত্রীর পানে চাহিল, গায়ত্রীর চোখে করুণ ছায়া। আতুরের প্রতি সমবেদনা? না, টম্‌-ফুলের প্রতি কৃপা-বর্ষণ!

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সিধু কহিল,—চেষ্টা করবো।

গীতা কহিল,—আমার কিন্তু আপনাকে ভালো লাগে ভারী। ভারী সরল মন আপনার।

সিধুর কিছু ভালো লাগিতেছিল না। সে কহিল,—আসি।

গায়ত্রী কহিল,—আকাশ ভেঙে জল আসচে যে!

সিধু হাসিল, ম্লান হাসি! গায়ত্রী কহিল,—আমরাও ফিরবো। এসেছিলুম, এই নলিন বাবুর বাড়ী। গীতার সঙ্গে ওঁর এই মাসে বিবাহ হবে। সে বিবাহে একটি কবিতা আপনাকে লিখে দিতে হবে!

এখনো কৌতুক! এবং সে কৌতুকের তীর ছুড়িতেছে গায়ত্রী···তার বুক লক্ষ্য করিয়া! হায় নারী, ইউনিবার্সিটির শিক্ষায় নারীত্ব একেবারে বিসর্জ্জন দিয়াছ! সিধু গায়ত্রীর পানে চাহিল। সে দৃষ্টিতে গভীর দরদ!

তা হোক! ও মরীচিকা! সিধু কহিল,—চেষ্টা করবো।

বলিয়া সে নিমেষ প্রতীক্ষা করিল না; সোজা সেই দ্বার-পথে বাহির হইয়া গেল।

আকাশ উদ্দাম নৃত্যে মাতিয়া উঠিল। জল-ঝড়···সে যেন প্রমত্ত শঙ্করের ভৈরব তাণ্ডব লীলা!

* * * *

তার পর সিধু কাছারি ছাড়িয়া, চাঁদমোহন বাবুকে ছাড়িয়া, কাটোয়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত শশিভূষণ ভট্টাচার্য্যের কন্যা শ্রীমতী অমলা দেবীকে এক গোধূলি লগ্নে সুতহিবুক-যোগে বিবাহ করিয়া কাটোয়ায় ওকালতি করিতে বসিয়া গেল। এবার আশার কথা এই যে, অমলা দেবী শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বাবুর একটিমাত্র সন্তান এবং ওকালতিতে শশিভূষণ বাবুর পশার বিলক্ষণ!

আর একটি কথা,—গীতা-গায়ত্রীর সঙ্গে সে আর দেখা করে নাই এবং দেখা যে ভবিষ্যতে কখনো হইবে, এমন সম্ভাবনাও দেখি না।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

ক্যামেরুন্

পল্লীর সর্দ্দারদিগের শোভাযাত্রা

আফ্রিকা মহাদেশের এমন অনেক স্থান আছে, যাহা এখনও অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে। যে সকল স্থান আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং য়ুরোপীয় শক্তিপুঞ্জ যে সকল স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন, তাহার বিবরণ এখনও পর্য্যাপ্ত সকল সুসভ্য ভাষায় লিপিবদ্ধ হয় নাই। ক্যামেরুন্ আফ্রিকার অন্তর্গত একটি জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ স্থান। বর্ত্তমানে ফরাসী সরকার এই স্থানের অভিভাবকত্ব পাইয়াছেন।

ক্যামেরুন্ নামটির বানান সম্বন্ধে ইংরাজ, জার্ম্মাণ ও ফরাসীর মতভেদ আছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর কোন এক সময়ে জনৈক পোর্ত্তুগীজ নাবিক পশ্চিম-আফ্রিকার কোনও নদীতে মৎস্য ধরিতে গিয়াছিলেন। তিনি উপর্য্যুপরি অনেকগুলি চিংড়ী মাছ ধরেন। চিংড়ী মাছকে পোর্ত্তুগীজ ভাষায় 'ক্যামারোস্' বলিয়া থাকে। নাবিকটি যেখানে মাছ ধরিতেছিলেন, তাহার নাম জানিতেন না। তিনি চিংড়ী মাছের নামে অর্থাৎ ক্যামেরোস্ বলিয়া ঐ স্থানের নামকরণ করেন। তদবধি ঐ নামেই য়ুরোপীয় জাতি ঐ ভূভাগকে অভিহিত করিতে লাগিলেন। অবশ্য বানান্ বিভিন্ন হইলেও ফরাসীরা ক্যামেরুন্ বলিয়াই ইহাকে অভিহিত করিতেছেন। এই ভূভাগের এক প্রান্তে যে পর্ব্বতমালা আছে, তাহার নামও ক্যামেরুন্।

আফ্রিকার নারীর কেশপ্রসাধন

ক্যামেরুন্ প্রকাণ্ড দেশ। গিনি উপসাগরের এক প্রান্ত হইতে এই স্থানের আরম্ভ। উহার উত্তর প্রান্ত সাহারা মরুভূমিকে স্পর্শ করিয়াছে। ক্যামেরুনের পূর্ব্বভাগে আউব্যাঙ্গুই নদ; দক্ষিণাংশে গ্যাবন্ উপনিবেশ।

মিঃ জন্, ডব্‌ল্ ভ্যাণ্ডারকুক্ নামক জনৈক মার্কিণ ঐতিহাসিক এতদঞ্চলে পরিভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার মতে ক্যামেরুন্ বিশেষভাবে দর্শনীয় স্থান।

দোয়ালা ক্যামেরুন্ অঞ্চলের একটি বড় সহর। এই সহরে ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষের বাসভবন আছে। আম্র, তাল প্রভৃতির কুঞ্জ নয়নাভিরাম। বহু কলকারখানাও এই সহরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

পশ্চিম-আফ্রিকায় যে সকল নগর বিদ্যমান, তন্মধ্যে দোয়ালার শোভা অতি

ক্যামেরুন্ পর্ব্বতমালার সন্নিহিত উদ্যান

রমণীয়। দোয়ালা অন্তরীপে জার্ম্মাণরা অনেক বাসোপযোগী অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিল। প্রত্যেক বাড়ীর সম্মুখে প্রমোদোদ্যান, ব্যাণ্ড বাজাইবার ঘর প্রভৃতি বিদ্যমান। রাজপথগুলি বৃক্ষচ্ছায়াচ্ছন্ন, মনোরম। ফরাসী সরকার জার্ম্মাণদিগের অনুসৃত প্রণালীতে চলিতেছেন, প্রত্যেক প্রমোদোদ্যানের মধ্যে পানালয় প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যাইবে।

এই নগরটি ক্রমশঃ ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতিলাভ করিতেছে। ত্রিশ বৎসরে নগরের অধিবাসীর সংখ্যা ২৫ হাজার হইয়াছে। তন্মধ্যে য়ুরোপীয়ের সংখ্যা ১ সহস্র। দোয়ালা বন্দরটিও উৎকৃষ্ট। কিন্তু এ স্থানের আবহাওয়া বিশেষ স্বাস্থ্যপ্রদ নহে। নিদাঘে দোয়ালার গ্রীষ্ম অসহ্য। অনেক সময় নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আইসে। শীতকালেও ৮০ ডিগ্রীর নিম্নে তাপমান যন্ত্র নামে না। বর্ষাকালে অনুক্ষণ ধারাবর্ষণ হয়। তখন পথ চলা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, মুষলধারে বৃষ্টি হইলেও উত্তাপ হ্রাস পায় না। বৎসরে এই সহরে ১৩ ফুট বারিপাত হইয়া থাকে। দোয়ালার কিছু দূরবর্ত্তী কোনও স্থানে বৎসরে ৩৬ ফুট বারিপাত হইয়া থাকে।

ক্যামেরুনে দুইটি রেলপথ আছে। দুই রেলপথ দোয়ালায় কেন্দ্রীভূত। একটি রেলপথ উত্তরদিকে ১ শত মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এন্‌কংসাম্বা নগরে গিয়া উহা শেষ হইয়াছে। অপরটি পূর্ব্বদিকে ১ শত ৯০ মাইল পর্য্যন্ত প্রসৃত। নূতন রাজধানী যাউণ্ডিতে এই রেলপথ আসিয়াছে। প্রথমটির সহিত শেষোক্তটির কোনই সংস্রব নাই।

প্রত্যহ রাত্রিশেষে ট্রেণ ছাড়ে। ঘণ্টায় ১০ মাইল বেগে লৌহশকট পথ অতিবাহিত করিয়া থাকে। ষ্টেশন-মাষ্টারের দায়িত্ব প্রায়ই দেশীয় ব্যক্তিদিগের উপর অর্পিত। এঞ্জিনে কয়লা ব্যবহৃত হয় না। কাঠ কয়লার কার্য্য করিয়া থাকে। এমন কি, আবলুস ও মেহগ্নি কাঠও এঞ্জিনের বিপুল জঠরে স্থান পায়। প্রচুর ধূম নির্গত হয় বলিয়া যাত্রিগণ কামরার মধ্য হইতে বাহির হইতে পারে না।

এন্‌কংসাম্বা নগরে পৌছিতে গেলে রেলপথ ধীরে ধীরে উপরে উঠিতে থাকে। কারণ, স্থানটি শৈলসমাকুল। প্রথম ৬ ঘণ্টা অরণ্যের মধ্য দিয়াই লৌহশকট ধাবিত হইয়া থাকে। তার পর এন্‌কংসাম্বা যতই নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে, অরণ্য ততই হ্রাস পাইতে থাকে।

উল্লিখিত নগর হইতে একটি রাজপথ ১ শত ৩৭ মাইল পর্য্যন্ত প্রসৃত। এই পথে মোটর-গাড়ী চলিয়া থাকে। দেশীয় নগর ফাউম্বান্ পর্য্যন্ত এই পথ বিদ্যমান। এই

পথের প্রাকৃতিক দৃশ্য অত্যন্ত মনোরম বলিয়া য়ুরোপীয়গণের ধারণা। চারিদিকে যত দূর দৃষ্টি চলে, শুধু উচ্চাবচ তৃণ-হরিৎ ক্ষেত্র। তাহার শেষে পাহাড়ের নীলিমা।

এ দৃশ্যে দর্শকের চিত্তে প্রগাঢ় নীরবতার সঞ্চার হয়। মনে হইবে, যেন অনাদিকাল ধরিয়া নীরব শূন্যের মধ্যে মানবের চিত্ত সমাহিত হইয়া আছে। মধ্য-আফ্রিকায় গেলেই য়ুরোপীয়গণ এইরূপ নীরবতা অনুভব করিয়া থাকেন। একাধিক পরিব্রাজকের রচনায় ইহা পাওয়া গিয়াছে।

গ্রাম্য কুটীর

উপরে মোটর-গাড়ী চলার উপযোগী যে পথের বিবরণ প্রদত্ত হইল, তাহার ধারে ধারে দেশীয়দিগের ছোট ছোট গ্রাম অবস্থিত। এই সকল গ্রামের অধিবাসীরা সম্পূর্ণ উলঙ্গ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।
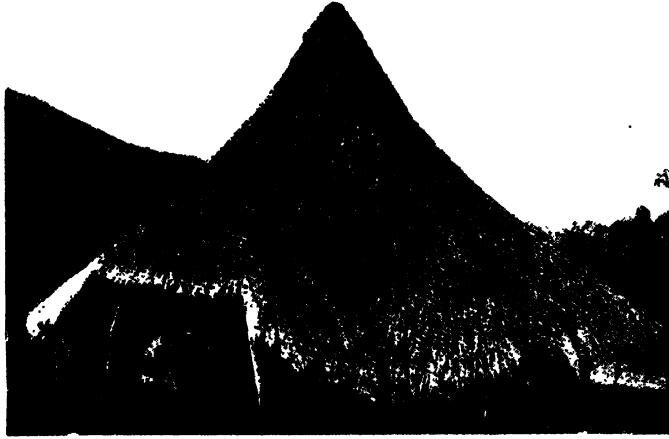
ইহারা এতদঞ্চলের আদিম অধিবাসী। বন-জঙ্গল হইতে নির্গত হইয়া ক্রমশঃ এই সকল স্থানে বসবাস আরম্ভ করিয়াছে। এই সকল পল্লীবাসিনী রমণী সমুজ্জ্বল রক্তবর্ণ মৃত্তিকার দ্বারা দেহ অনুরঞ্জিত করিয়া থাকে। মোটরগাড়ী দেখিলে এই সকল পল্লীবাসী ভয়ে পথ ছাড়িয়া দেয় না; বরং অনেক দূর পর্য্যন্ত মোটরের সম্মুখে দৌড়াইতে থাকে।

দেশীয় নগর ফাউম্বান্ একটি পাহাড়ের উপর নির্ম্মিত; নগরের চারিদিকে গড়খাই। ফুলা আক্রমণের সময় হইতে নগরকে সুরক্ষিত করিবার জন্য এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল।

ফাউম্বানের নর-সুন্দর

ফাউম্বানের দারু-শিল্প

তাম্র ও দারু-নির্ম্মিত মুখোস

ফাউম্বানের একতারা-বাদক

নগরের রাজপথগুলি বৃক্ষচ্ছায়াচ্ছন্ন। নগরটি দেখিলেই মনে হইবে, এখানে শৃঙ্খলা, উন্নতি ও সভ্যতা বিরাজিত।

নগরের অধিকাংশ ভবনই রৌদ্রপক্ক ইষ্টকে নির্ম্মিত। উপরে দেশীয় খোলা বা তৃণের আচ্ছাদন। প্রত্যেক ভবনের চারিদিকে বেড়া। তাহাতে শৃঙ্খলা, পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্য্যবোধের পরিচয় পরিস্ফুট।

এখানে বাজার ... আধুনিক ইষ্টক ...র দ্বারা বাজার ... কোথাও ... আবর্জ্জনা ... সহরের ঠিক ... একটি ত্রিতল ... বস্তৃত উদ্যানের ... এই ভবনের ...কে বিরাজিত। ...নের অধিপতি ...ম্ অঞ্চলের ...ন এনুজয়ার ... প্রাসাদ।

প্রাসাদটি প্রিয়দর্শন, সযত্ন-রচিত। ফাউম্বান্ অতি প্রাচীন স্থান। যখন শ্বেত জাতির অস্তিত্বও মানুষের কল্পনার অতীত ছিল, তখনও ফাউম্বান্ বিদ্যমান ছিল। বাহিরের প্রভাব এখনও পর্য্যন্ত এখানে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তনসাধন করিতে পারে নাই।

সুলতান স্বয়ং এবং তাঁহার প্রজাবর্গের অধিকাংশই মুসলমান। একটা বিচিত্র বিধান দেখিতে পাওয়া যায়—আফ্রিকার মরুভূমি ও মালভূমির অধিবাসীরা মহম্মদের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম সহজে গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু আফ্রিকার অরণ্যবাসীরা তাহা আদৌ করে নাই। বামায়ুম্ অঞ্চলের অধিবাসীরা এমন কোন দিনের কল্পনাও

সুলতান্ এনুজয়ার যাদুঘর

যখন তাহারা আরবীয় বিশ্বাসের প্রভাবের অতীত ছিল।

সুলতান্ এন্জয়া

সুলতানের প্রাসাদের সম্মুখে—নগরের মধ্যভাগে মূর প্রণালীতে নির্ম্মিত একটি মস্জেদ আছে। বামায়ুম্ অঞ্চলের অভিজাত ও শিক্ষিত সম্প্রদায় এখানে প্রতি শুক্রবারে সম্মিলিত হইয়া থাকেন।

প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সর্দ্দার সুলতানের অপেক্ষা শক্তিশালী। তাঁহারা সদলবলে পল্লী অঞ্চল হইতে নগরে সমবেত হইয়া থাকেন। ক্যামেরুন্ মালভূমির অভিজাত সম্প্রদায় সমুজ্জ্বল বেশভূষা ধারণ করিয়া অশ্বারোহণ করিয়া থাকেন। কাহারও শিরোদেশে শ্বেত উষ্ণীষ, কাহারও বা নীল বর্ণের পাগড়ী। কাহারও কাহারও মস্তকে ফুলা মেষপালকদিগের ন্যায় তৃণনির্ম্মিত টুপী। প্রত্যেকেরই ব্যবহারে যেন আভিজাত্যগন্ধ অল্পাধিক পরিমাণে বিদ্যমান।

তাঁহাদের ধারণা, তাঁহারা বিজেতা। সুতরাং যাহাদের উপর আধিপত্য করিতেছেন, তাহাদের তুলনায় তাঁহারা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ। অবশ্য দেশীয়দিগের সহিত বহুকাল তাঁহারা রক্ত সম্বন্ধে মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে আরবীয় কোন নিদর্শনই এখন আর ফাউম্বান অঞ্চলের কোন ব্যক্তির মধ্যেই কিন্তু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বামায়ুমগণকে দেখিলে তাহারা যে নিগ্রো জাতিতে পরিণত হইয়াছে, তাহারই পরিচয় সুস্পষ্ট।

সুলতানের অন্তঃপুরিকাগণ

উল্লিখিত সর্দ্দারগণ স্ব স্ব পদমর্য্যাদানুযায়ী অনুচর-পরিবৃত হইয়া সহরে আসিয়া থাকেন। প্রত্যেক সর্দ্দারের পরিবারস্থ আত্মীয় পুরুষগণ অশ্বারোহণ করিয়া থাকেন। প্রত্যেক অশ্বের বল্গা রক্ত ও পীত বর্ণের চর্ম্মে নির্ম্মিত। অশ্বারোহী-দিগের হস্তে দীর্ঘ বর্শা। উহার দণ্ডাগ্রভাগ রৌপ্য অথবা দেশীয় ব্রোঞ্জ-মণ্ডিত। তাহাদের পশ্চাতে তাহাদের পত্নীর দল। উহাদের মস্তকে গৃহজাত বিক্রেয় পণ্যপূর্ণ
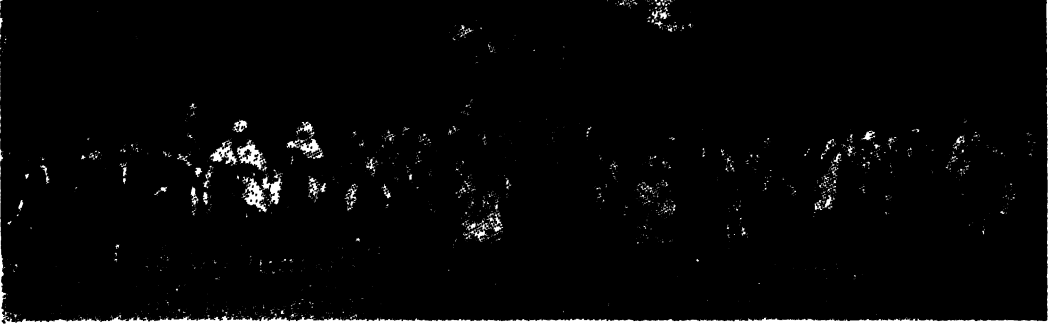
সুলতান্ এন্‌জয়ার অশ্বারোহী সেনাদলের ক্রীড়া

আধার। বাজারে সেই সকল পণ্য বিক্রীত হইবে। এই পত্নীদলের পশ্চাৎ গ্রামের নিম্ন সম্প্রদায়ের পুরুষ। তাহাদেরও মস্তকে বোঝা। তবে তাহা নারীদিগের বোঝার মত গুরুভার নহে।

মস্‌জেদে যখন পুরুষগণ নমাজ পড়িতে থাকে, নারীর দল এবং গ্রাম্য চাষীরা উহার বাহিরে সম্ভ্রমভরে বসিয়া থাকে। পুরুষগণ নমাজ সারিয়া বাহিরে আসিলেই নগর যেন সচকিত হইয়া উঠে। চারিদিকে কর্ম্ম-কোলাহল ও ব্যস্ততা দেখিতে পাওয়া যায়। পরদিবস পল্লীবাসীরা যতক্ষণ না গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে, ততক্ষণ এই উৎসাহ, কোলাহল, উদ্দীপনা চলিতে থাকে।

বাজারে যাবতীয় দ্রব্য বিক্রয়ার্থ প্রদর্শিত হয়। চর্ম্মপাদুকা, ছাতা, তরবারি, নানা-[illegible] নক্সা-খচিত অশ্ব-সজ্জ, গৃহনির্ম্মিত বিবিধ [illegible] বস্ত্র, কাষ্ঠনির্ম্মিত [illegible] তৈজসপত্র সবই প্রচুর পরিমাণে আনীত হইয়া থাকে।

বাজারের যে অংশে খাদ্যদ্রব্যাদি বিক্রীত হয়, সেখানে কিন্তু এমন বৈচিত্র্য দৃষ্ট হইবে না। নানাবিধ খাদ্য শস্য অবশ্য দেখিতে পাওয়া যাইবে। উহা প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হইয়া থাকে। তবে রসনাতৃপ্তিকর উপাদেয় খাদ্য তেমন পাওয়া যায় না।

বাজারে সহস্রাধিক লোকের সমাগম হইয়া থাকে। মানুষের কলরব বাজারকে মুখরিত করিয়া রাখে। আহার্য্য দ্রব্যের গন্ধ পবনে প্রবাহিত হয়, দৃশ্যের বৈচিত্র্য মনকে অভিভূত করে।

মিঃ ভ্যাণ্ডারকুক্ লিখিয়াছেন, "এখানে শ্বেত সভ্যতার বিষদোষ অনুপ্রবিষ্ট হয় নাই। তাই এতদঞ্চলে এখনও আফ্রিকার উন্নতজীবনযাত্রার পরিচয় পাওয়া যায়।"

শুক্রবারে উপাসনা বা নমাজের দিন। রবিবার প্রভাতের মধ্যে অধিকাংশ চাষীই গৃহে ফিরিয়া যায়। তাহাদের ক্রয়বিক্রয়কার্য্য ইহারই মধ্যে সমাপ্ত হয়। কিন্তু [illegible]

সুলতানের সংরক্ষিত একটি প্রাচীন মূর্ত্তি

জার্ম্মাণ দুর্গ—ক্যামেরুন্

করিতেছিলেন। তন্মধ্যে ৩ জন তথাকার স্থায়ী অধিবাসী ছিলেন। শ্বেতাঙ্গগণ সুলতান এন্‌জয়ার চারিপার্শ্বে উদ্যানমধ্যে বসিয়া ক্রীড়া দেখিতেছিলেন। বাদক, গায়ক, পতাকাবাহী, ভাঁড় এবং অশ্বারোহীরা তখন উদ্যানের অপর প্রান্তে সমবেত হইয়াছিল। মিঃ ভ্যাণ্ডারকুক লিখিয়াছেন,—

"পদাতিকগণ শ্রেণীবদ্ধভাবে অগ্রসর হইল তখন বাঁশী ও শৃঙ্গধ্বনি হইতে লাগিল; ঢক্কানিনাদ শ্রুতিগোচর হইল। দলের পুরোভাগে তারের যন্ত্র লইয়া বাদকগণ সঙ্গত করিতে লাগিল। অবশ্য ইহা যুদ্ধের বাদ্য।
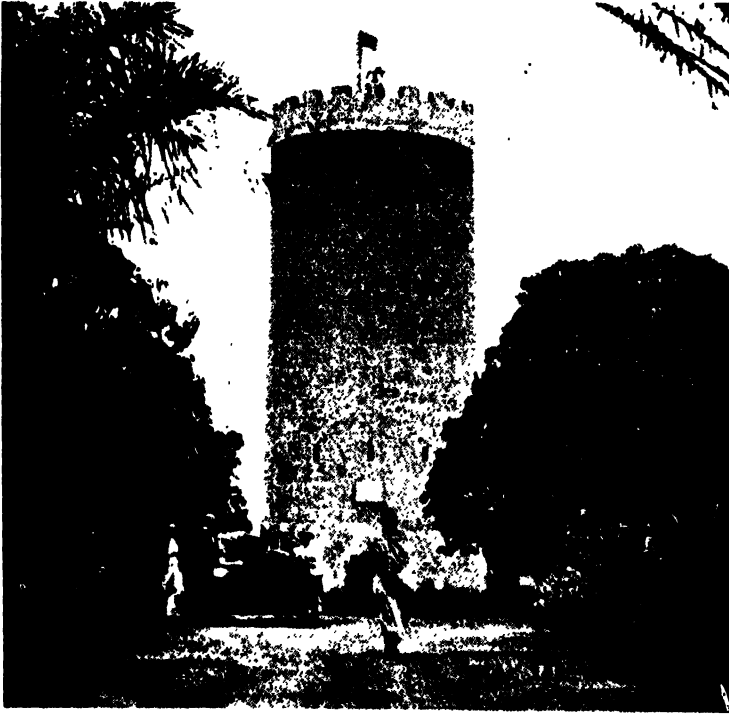
"সর্ব্বাগ্রে ভাঁড়ের দল নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিল—কেহ ডিগবাজি খাইতে লাগিল। বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী সহকারে সুলতানের দরবারস্থ ভাঁড়গণ তাহাদের কৃতিত্বের পরিচয় দিতে আরম্ভ করিল"

থাকিয়া যান। সামান্য ভাবে উত্ত্যক্ত হইলেই তাঁহারা কৃত্রিম যুদ্ধাভিনয় করিয়া থাকেন। ইহাতে সাম্প্রদায়িক জীবনের বৈচিত্র্যহীনতা কিয়ৎপরিমাণে দূরীভূত হয়।

শ্বেতকায় নবাগতগণকে মালভূমির শাসকগণ বিশেষ সম্মান করেন না বটে, তবে তাঁহাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি বড় একটা গ্রাহ্য করেন না। সুতরাং বৈদেশিক শ্বেতকায়গণের উপস্থিতিতে সর্দ্দারগণ কৃত্রিম যুদ্ধাভিনয়ে বিরত হন না।

মিঃ ভ্যাণ্ডারকুকের বর্ণনায় দেখা যায়, তিনি যখন উক্ত অঞ্চলে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন, তখন এক রবিবারে সর্দ্দারদিগের এইরূপ খেলা বা লীলা হইবে বলিয়া তিনি সংবাদ পান। তখন ফাউম্বানে মাত্র ৮ জন শ্বেতকায় ব্যক্তি অবস্থান

বাজারে ফুলা-দল

দলের পশ্চাতে পতাকাবাহী ও গায়কগণ।

"ফাউম্বানের প্রমোদোদ্যান দীর্ঘে ২ শত গজ মাত্র। উদ্যানমধ্যে ১ শত অশ্বারোহী সমবেত হইয়াছিল। প্রত্যেকেরই দেহে ঢিলা অঙ্গাবরণ—নানাবিধ বর্ণসমাবেশে নক্সার পোষাকগুলি নয়নরঞ্জক। শত অশ্বারোহীর কাহারও হস্তে দীর্ঘ বর্শা অথবা বন্দুক। তাহারা ভীমবেগে ঐ সকল অস্ত্র মস্তকোপরি আন্দোলিত করিতেছিল।

"সহসা ভীষণ চীৎকার-ধ্বনি

বামায়ুম্ গায়ক

ক্যামেরুনের বীণা-বাদক

শ্রুত হইল। উদ্যানের অপর প্রান্ত হইতে পূর্ণবেগে অশ্বারোহীরা প্রায় আমাদের উপর আসিয়া পড়িল। অশ্বক্ষুরোত্থিত ধূলিজাল, তীক্ষ্মমুখ বল্লমের উজ্জ্বল দীপ্তি, ভীষণ চীৎকার এবং অশ্বারোহীদিগের বিবিধবর্ণ বসনের সমন্বয়ে দৃশ্যটি রোমাঞ্চকর হইয়া উঠিল।

"ভয়ে আমরা কয় জন শ্বেতাঙ্গ আসনে স্থাণুর মত বসিয়া রহিলাম। আমাদের সমগ্র দেহ শঙ্কায় স্পন্দনরহিত হইয়া পড়িল। ভাবিলাম, মুহূর্ত্তমধ্যে আমরা উন্মত্ত অশ্বপদতলে পিষ্ট হইব। তখন সে স্থান হইতে সরিয়া যাইবারও অবকাশ ছিল না।

"কিন্তু আমরা যেখানে বসিয়াছিলাম, তাহার ৪ হস্ত দূরে আসিয়া অশ্বসাদী থমকিয়া দাঁড়াইল। আরোহীর বল্গার আকর্ষণে প্রত্যেক অশ্ব সোজা হইয়া দাঁড়াইল; তাহাদের গতিবেগ রুদ্ধ হইল। পরমুহূর্ত্তে পাশ ফিরিয়া অশ্বসমূহ অন্যদিকে চলিয়া গেল।"

মরুভূমির সন্নিহিত স্থানে তাহাদের বাস, অশ্বারোহণ-বিদ্যায় তাহারা অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জ্জন

টিনগুয়েরির সুলতান

টিন্‌গুয়েরির শিশুত্রয়

করিয়া থাকে। মানুষকে বিস্ময়ে বিমূঢ় করিয়া দিবার জন্যই এতদঞ্চলের অশ্বারোহীরা সর্ব্বদা চেষ্টা করিয়া থাকে। ক্যামেরুন মালভূমির উচ্চস্তরের অধিবাসীরা এইরূপ প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে।

বামায়ুমে নৃত্য বিশেষভাবে প্রচলিত আছে। নর্ত্তকগণ মুখোস ধারণ করিয়া নৃত্য করিয়া থাকে। সুলতান এন্‌জয়ার যাদুঘরে অনেক প্রকার মুখোস রক্ষিত আছে। উহা তাম্র, কাষ্ঠ অথবা উভয়ের মিশ্রণে নির্ম্মিত হইয়া থাকে। কোন কোন মুখোসের নক্সা

অতি বিচিত্র। অশ্ব, বানর, কুম্ভীর প্রভৃতি বিভিন্ন পশুর মুখোসও প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সুলতান এনজয়ার যাদুঘর ফাউম্বানের একটা বিশেষত্ব। সুলতান দীর্ঘাকার ব্যক্তি, উচ্চে ৬ ফুট। তাঁহার দেহের বর্ণ মসীনিন্দিত। কিন্তু তাঁহার মুখে শিশুর ন্যায় সরল হাসি। যাঁহারা বামায়ুমের এই সুলতানের সহিত আলাপ-পরিচয় করিয়াছেন, তাঁহারা দৃঢ়তা-সহকারে নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন যে, এন্‌জয়া নিজের দেশের ঐতিহ্যের অত্যন্ত অনুরাগী। এ জন্য তিনি নিজের দেশের

অরণ্যচারীরা নদীতে মাছ ধরিতেছে

যাবতীয় পদার্থ তাঁহার যাদুঘরে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন। য়ুরোপীয় সভ্যতার মোহ এ অঞ্চলে এখনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই, কাযেই সে দেশের লোক এমন কথা মনে করে না, যাহা কিছু য়ুরোপীয় নহে, তাহাই ঘৃণার ও উপেক্ষার বস্তু।

ফাউম্বান্ ছাড়াইয়া যদি কেহ আরও অগ্রসর হইতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহাকে পদব্রজেই পথাতিবাহন করিতে হইবে। খাদ্য-দ্রব্য ব্যতীত সকল ব্যবহার্য্য বস্তুই তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইতে হইবে। পথিমধ্যে বৃষ্টির

বাজারের নারী-বিক্রেত্রী

বিশেষ সম্ভাবনা, সুতরাং জলনিবারক বস্ত্র দ্বারা শয্যা, পরিধেয় প্রভৃতি আচ্ছাদিত করিয়া না রাখিলে, ভিজিয়া যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা। আফ্রিকার মোটবাহীরা প্রায় ৩০ সের আন্দাজ ওজনের মোট বহন করিতে পারে। তাহার অতিরিক্ত ওজনের বোঝা তাহারা বহন করিবে না।

আফ্রিকাবাসীরা সাধারণতঃ প্রত্যুষে ৫টায় গাত্রোত্থান করিয়া থাকে। ভারবাহী কুলীরাও সেই সময় আসিয়া পরিব্রাজকের মোট পৃষ্ঠে বা মস্তকে তুলিয়া লইয়া পথ চলিতে থাকে। সাধারণতঃ একটা বড় সহর হইতে অপর বড় সহরের ব্যবধান ২ শত মাইল। এই দীর্ঘপথ প্রত্যেক যাত্রীকে পদব্রজে চলিতে হয়।

পল্লী-সর্দার সপরিবারে সহরের বাজারে চলিয়াছে

বাজারের একটি দৃশ্য

আফ্রিকায় সূর্য্যদেব ৬টায় উদিত হন; কিন্তু ৭টা না বাজিতেই রৌদ্রের তেজ প্রখর হইয়া উঠে। ফাউম্বান হইতে অন্যত্রগামী [illegible]ক উচ্চাবচ পথের উপর দিয়া, অরণ্য অতিক্রম করিয়া চলিতে হয়। বনের মধ্যে পাখীর কূজন, প্রজাপতির নৃত্য, বিবিধ বর্ণের [illegible] মনোরম শোভা পর্য্যটকের পথিশ্রম [illegible] করিয়া দেয়।

পথমধ্যে বৃষ্টি হইলে ক্ষুদ্র নদীর জল ২২ ফুট পর্য্যন্ত বাড়িয়া যায়। তখন সে নদী উত্তীর্ণ হইবার উপায় থাকে না। দারুনির্ম্মিত সেতুগুলি জলের তীব্রস্রোতে ভাঙ্গিয়া ভাসিয়া যায়। নদীর জল যেখানে অপেক্ষাকৃত অল্প, কুলীরা মোট লইয়া সেইখান দিয়া অপর পারে উত্তীর্ণ হয়; পরে পর্য্যটককে স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া পার করে। যেখানে নদী পার হইবার উপায় থাকে না, তথায় যাত্রীকে নদীর তীরে বসিয়া থাকিতে হয়। জল কমিলে তখন পার হইবার ব্যবস্থা হয়।

এক নগর হইতে অন্য নগরে যাইবার

এনগাউণ্ডারী সম্প্রদায় বিকল গাড়ী ঠেলিতেছে

কুলীর পৃষ্ঠে নদী পার

ক্যামেরুনের শাখামৃগ

সময় পর্য্যটকের সহিত অনেক সময় কোন পথবাহীরই দেখা-সাক্ষাৎ হয় না। দীর্ঘ, আঁকা-বাঁকা, অপ্রশস্ত নির্জ্জন পথ অজানার দিকে চলিয়াছে! শুধু যেখানে গ্রাম আছে, তাহারই পথের ধারে ছোট বাজার বসে। সেখানে

অশ্ব সহ নৌকায় নদী পার

দৌয়ালার ঢক্কাবাদক

রাজবেশে টিন্‌গুয়েরির সুলতান

শিশুক্রোড়ে বামায়ুম্ নারী

নারীরা শিশুক্রোড়ে করিয়া খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করিতে সমবেত হয়। অবশ্য য়ুরোপীয় পর্য্যটক কদাচিৎ এ সকল অঞ্চলে গমন করেন।

এতদঞ্চলের অরণ্যে শিকার কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। শিকারের অভাব নাই, কিন্তু মানুষের দৃষ্টির অগোচরে তাহারা সাধারণতঃ আত্মগোপন করিয়া

মধ্য ক্যামেরুনের নারী—ক্রোড়ে শিশু

সুলতানের ভাঁড়

রাজপথের ধারে নারী খাদ্য-বিক্রেত্রী

ফাউম্বানের সুলতানের তুলনায় ইনি শক্তিশালী! এন্‌জয়ার শরীররক্ষক অশ্বারোহী সৈন্যের সংখ্যা ২ শত; কিন্তু নাগাওন্‌ডেরির সুলতান ইচ্ছা করিলে বহু সহস্র অশ্বারোহী শরীররক্ষী সৈনিক সংগ্রহ করিতে পারেন।

ক্যামেরুনের নূতন রাজধানী যাউণ্ডি হইতে নাগাওন্‌ডেরি পর্য্যন্ত যে প্রশস্ত মোটরপথ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার দৈর্ঘ্য ৫ শত মাইল। এই পথ বিস্তৃত এবং মোটরযান চলাচলের পক্ষে সুদৃঢ়ভাবে নির্ম্মিত। এই দীর্ঘ ৫ শত মাইল পথের মধ্যে ৬টির অধিক গ্রাম নাই। গ্রামগুলি পথের ধারেই অবস্থিত।

ক্যামেরুন অঞ্চলে শ্বেতাঙ্গ অভিযান ভালরূপে আরব্ধ হয় নাই। কিন্তু প্রচণ্ড গ্রীষ্মাধিক্য সত্ত্বেও এখানে শ্বেতকায়ের অর্থার্জ্জনের প্রকৃষ্ট সুযোগ আছে বলিয়া য়ুরোপীয় বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। জমীর উর্ব্বরাশক্তি এখানে অপূর্ব্ব। যে কোনও প্রকার চাষ আবাদ এখানে স্বর্ণ প্রসব করিবে।

রাজধানী যাউণ্ডি ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে। দোয়ালায় অসহ্য গ্রীষ্ম বলিয়া ফরাসী সরকার এইখানে রাজধানীর

থাকে। ক্যামেরুন অঞ্চলে একজাতীয় শাখামৃগের প্রাদুর্ভাব আছে।

ফাউম্বান সহরের পর বানিও নগর। তার পর গালিম, টিন্‌গুয়েরি ও নাগাওন্‌ডেরি। এই শেষোক্ত নগরটিই সর্ব্বাপেক্ষা বড়। ফরাসী সরকার সম্প্রতি এখানে মোটর চলাচলের জন্য একটি পথ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সামরিক প্রয়োজনের জন্যই ইহা রচিত হইয়াছে। ফাউম্বান সহরের সহিত অন্য সহরের বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। তবে নাগাওন্‌ডেরিতে সাপ্তাহিক বাজারের পরিবর্ত্তে দৈনিক বাজার বসিয়া থাকে। এখানকার সুলতানের খাস বাদ্যকরের সংখ্যাও অধিক—প্রায় ১ শত হইবে। প্রভাত হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত তাহারা ঐক্যতান বাদন চালাইয়া থাকে। এখানকার সুলতান স্বর্ণখচিত শাদা মখমলের পোষাক পরিধান করিয়া থাকেন।

সুলতানের অভ্যর্থনায় সেনাদল

সুলতানের বংশীবাদক

ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছে।

যাউণ্ডি হইতে ১ শত মাইল দূরবর্ত্তী আইয়স্ নামক স্থানে উল্লিখিত ব্যাধির চিকিৎসার জন্য ফরাসী সরকার হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। নিদ্রারোগ সংক্রামক ব্যাধি। বিশেষজ্ঞগণ বলেন, এই পীড়ার বীজাণু একজাতীয় মক্ষিকার দ্বারা বাহিত হইয়া থাকে।

এই ব্যাধির স্থিতিকাল ৩ বৎসর। পীড়ার প্রথম অবস্থায় উহা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক হয়। চরম অবস্থায় আক্রান্ত মানুষ ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে থাকে। রোগ যখন শেষ সময়ে উপনীত হয়, তখন মানুষ ক্রমাগত গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইতে থাকে।

গত ৫০ বৎসরে এই রোগে প্রায় ১০ লক্ষ লোক প্রাণ হারাইয়াছে। বর্ত্তমান কালে যে বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যাইবে যে, ফরাসী চিকিৎসকগণ ৪৭ হাজার ৫ শত রোগীর চিকিৎসা করিয়াছেন। তন্মধ্যে ২৬ হাজার ৭ শত ৮০ জনকে তাঁহারা অন্তিমকালে পরীক্ষা করিয়াছিলেন।

পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে এই নগরের প্রতিষ্ঠা হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার্থ সরকার নানাপ্রকার সুযোগ দিতেছেন। কালে এই রাজধানী প্রাধান্য লাভ করিতে পারে।

এখানকার জলবায়ু উত্তম, গ্রীষ্মাধিক্যও অপেক্ষাকৃত কম। নগরের স্থানে স্থানে বড় বড় ইমারত নির্ম্মিত হইতেছে।

যাউণ্ডি সহরের দক্ষিণ ভাগে বিস্তৃত অরণ্য বিদ্যমান। এই অরণ্য গরিলা-পরিপূর্ণ। অরণ্যের মধ্যে বহু নদ-নদী। সহসা তাহা উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। অরণ্যের কোন কোন স্থানে হস্তিযূথ বিদ্যমান। লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায়, অরণ্যের মধ্যে অতিকায় সরীসৃপও আছে। অবশ্য বিশ্বস্ত প্রমাণ এ সম্বন্ধে এখনও পাওয়া যায় নাই।

অরণ্যের মধ্যে বান্টু জাতির বাস আছে। তাহাদের কুটীরসমূহ তৃণাচ্ছাদিত। বান্টুরা অলস-প্রকৃতির। অতিরিক্ত গ্রীষ্মই নাকি তাহাদের উৎসাহ হরণ করিয়াছে। এই অরণ্যবাসী মানুষগুলি সর্ব্বদাই ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া থাকে। অতিরিক্ত নিদ্রাপীড়া নামক দুরারোগ্য ব্যাধি তাহাদিগকে

ক্যামেরুনে দেশীয় পদ্ধতিতে চাষ

আইয়স্ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইবার পর বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ ক্যামেরুন্ অঞ্চলের অরণ্যবাসীদিগকে চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করায় পীড়ার গতিবেগ অনেকটা প্রতিহত হইয়াছে। ডাঃ জামো এই রোগের অদ্বিতীয় চিকিৎসক। তিনি নিদ্রা রোগের প্রতিষেধক উদ্ভাবনে মনঃসংযোগ করিয়াছেন।

আইয়সে দ্বাদশটি হাঁসপাতাল খোলা হইয়াছে। আরও অনেকগুলি হাঁসপাতাল-ভবন নির্ম্মিত হইতেছে। বহু অভিজ্ঞ চিকিৎসক রোগ-দমনের জন্য এখানে কার্য্য করিতেছেন।

ক্যামেরুন্ সরকারের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য—এই ভীষণ ব্যাধির গতিরোধ করা। এজন্য স্থানীয় ফরাসী সরকার অন্য সকল কার্য্যকে ফেলিয়া রাখিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে খুব সম্ভবতঃ এক দিন হতভাগ্য আফ্রিকাবাসীরা পুনর্জীবন লাভ করিতে পারে।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

ফিরে আয়

ফিরে আয় ওরে ফিরে আয়,—
দুলাল আমার, পল্লী-মাতার শ্যাম অঞ্চল-ছায়!
সবুজের মায়া ভুলিলি কেমনে ওরে ও সবুজ প্রাণ,
বিস্মরণীর মোহন-মদিরা কে তোরে করালো পান।
কোন্ মায়াবিনী রাক্ষসী তোরে মায়ায় ভুলালো আজ
চিন্তায় মোর কাটে দিবা-রাতি, প'ড়ে রয় যত কাজ।
মা'র কোল ছেড়ে কেমনে আছিস, কিছু নাহি ভেবে পাই
বক্ষের সুধা নিঙাড়িয়া সেথা নিতি যে পাঠাই তাই।
তাও বুঝি সব পাস্ নাকো খেতে, হাঘরে পাড়ার ছেলে
লুটে পুটে নেয় পারে যতটুকু, দুহাতে তোদের ঠেলে।
মা'র প্রাণ কেন কাঁদে সে ব্যথায়, কি তার বুঝিবে তারা,
নাড়ীছেঁড়া ধন সন্তানে হায়, পেটেতে ধরেনি যারা।

বেণু-বনে বনে ওঠে হাহাকার, পাতা ঝরি ঝরি যায়,
শ্বসিয়া শ্বসিয়া কাঁদে বরষায় উদাস পুবালী বায়।
তোদের ডাকিছে আজিকে অথই 'কাজল দীঘির জল',
তোদের লাগিয়া কাঁদিছে দুপুরেবট অশথের তল।
বটের দোলনা খসে গেছে হায় গভীর মনের দুখে,
পদ্মবিলের মাঠ কাঁদে খালি ঘুড়ির কাঠিটি বুকে।
কালোজাম আজ আগের মতন ফলে না তেমন আর
দস্যি ছেলের মাতামাতি হায় নাই যে ডালেতে তার!

পাঠশালাটির উড়ে গেছে চাল, দেয়াল পড়েছে খ'সে,
কেবল তাদের মাথার তেলের দাগটি রয়েছে ব'সে।
আস্‌শ্যাওড়ায় ভ'রে গেছে মোর উঁচু সে দীঘির পাড়,
হাডু ডুডু আর বৈকালে কেউ খেলে নাকো সেথা আর!
উঠানে ভিটায় জন্মেছে কত আগাছা কাঁটার গাছ,
পুকুরে বেড়েছে পানাই কেবল, ম'রে গেছে তার মাছ।
রূপকথা-বলা ঠাকুমা মরেছে কাঁদিয়া তোদের তরে,
'ঘুম পাড়ানিয়া মাসী-পিসী' হায়—তারাও গিয়াছে ম'রে!
একবার যদি দেখে যাস্ এসে, তোদের লাগিয়া আজ
কি দশা হয়েছে এ বুকে আমার—দেখে তোরা পাবি লাজ!

তবু আজো ফোটে দোপাটি ও যূঁই, ফোটার সময় হ'লে,
মনে ভাবে, তোরা তাদের মায়ায় হয় তো আসিবি চ'লে।
আজো বরষায় জমাট মেঘের কবাট ঠেলিয়া হায়!
তোদের দেখিতে ঘন ঘন ঘন চপলা চমকি চায়!
নারিকেল-পাতা ফাঁকে ফাঁকে আজো রূপালি চাঁদের রেখা,
উঁকি দিয়া চায়—ঘুমন্ত ঠোঁটে হাসি যদি যায় দেখা।

* * * * * *

স্মৃতি আগুলিয়া ব'সে আছি এই শূন্য শ্মশান-তীরে,
মায়ের দুলাল, মা'র কোলে আজি আয় রে আয় রে ফিরে!

শ্রীবিজয়মাধব মণ্ডল।
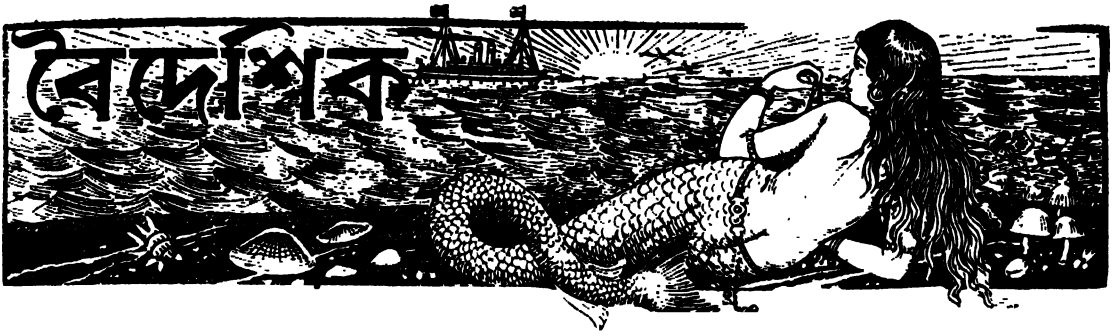
বিলাতের বস্ত্র-শিল্পীর আর্ত্তনাদ

গত মে মাসের প্রথম সপ্তাহে ম্যাঞ্চেষ্টারের বস্ত্র-শিল্পের শীর্ষ-স্থানীয়রা তাঁহাদের রয়্যাল এক্‌সচেঞ্জে এক বিচিত্র অভিনয়ের আয়োজন করিয়াছিলেন। ভারতের বর্জ্জন আন্দোলনে বিলাতের ব্যবসায়ের কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে এবং সে জন্য বিলাতের বেকার-সংখ্যা কিরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাই অভিনয়ের (অর্থাৎ সভা ও মন্তব্য গ্রহণের) উদ্দেশ্য। যাহাতে বিলাতবাসীর সে দিকে দৃষ্টি পড়ে এবং ক্রোধের উদ্রেক হয়, এবং তাহার ফলে শ্রমিক সরকারের প্রবর্ত্তিত নীতি পরিত্যক্ত হয় ও গোল টেবিল বৈঠক কাঁচিয়া যায়, তাহাই তাঁহাদের মনোগত অভিপ্রায়!

রয়্যাল এক্‌সচেঞ্জের সেই সভায় সভাপতি হইয়াছিলেন সার আর্থার হওয়ার্থ, এবং সমবেত হইয়াছিলেন ন্যূনাধিক ৮ হাজার বিলাতী বণিক ও ব্যবসায়ী শিল্পী। রয়্যাল এক্‌সচেঞ্জে বক্তৃতা দিবার নিয়ম নাই, তাই সভাপতি একটি মন্তব্য উপস্থাপিত করেন। মন্তব্যটি দেড়গজী, প্রায় একটি বক্তৃতারই সমতুল। মন্তব্যের সারাংশ এই :—

"ভারত সরকার বর্ত্তমানে যে অর্থনীতিক নীতি অবলম্বন করিয়া ভারত শাসন করিতেছেন এবং ভারতীয় ন্যাশান্যাল কংগ্রেস ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্রশিল্প পণ্যের বিরুদ্ধে যে বর্জ্জন আন্দোলন চালাইতেছেন, তাহাতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সমূহ ক্ষতি হইতেছে।" মন্তব্যে ভারতীয়ের স্বায়ত্তশাসন-প্রাপ্তির জন্য আইনসঙ্গত উচ্চাভিলাষের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শিত হইয়াছে, অথচ ভারতীয় ক্রেতাদিগের স্বায়ত্তশাসনপ্রাপ্তি সহজ-সাধ্য ও সুগম করিয়া দিবার সম্বন্ধে কোন যুক্তি প্রদর্শিত হয় নাই। অর্থাৎ যেহেতু ল্যাঙ্কাশায়ারের পণ্য বৃটিশ সাম্রাজ্যের পণ্য, অতএব ভারত সরকারের উহার বিপক্ষে অতিরিক্ত শুল্ক নির্দ্ধারিত করা কর্ত্তব্য হয় নাই, সুতরাং উহা উঠাইয়া দেওয়া অবিলম্বে কর্ত্তব্য : এইরূপ হইলে ভারতের স্বায়ত্তশাসন-প্রাপ্তিতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব হইবে না। মন্তব্যে আরও বলা হইয়াছে যে, বৃটিশ জাতি বংশানুক্রমে ভারতের স্বায়ত্তশাসনপ্রাপ্তির সহায়তা করিয়া আসিতেছে, অথচ ভারতীয়রা উহার প্রত্যুত্তরে শত্রুতা প্রদর্শন করিতেছে। ল্যাঙ্কাশায়ারের পণ্যবর্জ্জনে উহার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। এ বর্জ্জন অর্থনীতির দিক হইতে কিছুতেই সমর্থনযোগ্য নহে। এমন কি, ভারতীয়রা অন্য বিদেশীর পণ্য গ্রহণ করিবে, তথাপি বৃটেনের পণ্য লইবে না!

রাজার জাতির ইহা কি সহ্য হয়? তাই মন্তব্যে সরকারকে উপদেশ দেওয়া হইতেছে যে, যেহেতু বৃটিশ জাতি ও বৃটিশ সরকার ভারতের জাতীয় দাবীর প্রস্তাব অনুমোদন করিতেছেন, সেই হেতু ভারতীয়েরও এই শত্রুতার ভাব অবিলম্বে পরিহার করা কর্ত্তব্য। পরন্তু বৃটিশ সরকার যেন ভারত সরকারকে অবিলম্বে বর্জ্জনান্দোলন দমন করিতে বলেন এবং ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্রের উপর নির্দ্দিষ্ট আমদানী শুল্ক কমাইয়া দেন। দুঃখের বিষয়, ভারত সরকার এ কথায় কর্ণপাত করেন নাই, তাহার কারণও বিলক্ষণ আছে। যদি বর্জ্জন আন্দোলন দমন করা সম্ভব হইত, তাহা হইলে ভারত সরকার এক বৎসর দমন-নীতি চালাইয়া তাহাতে সফলকাম হইতেন। তাহার পর ভারতের স্বার্থ বলি দিয়া ল্যাঙ্কাশায়ারের স্বার্থ-সমর্থনে আমদানী শুল্ক কমাইয়া দেওয়াও একালে সম্ভবপর নহে। ভারতের লোক যদি স্বদেশী বস্ত্র ক্রয় করে, তবে তাহাদিগকে বন্দুক-বেয়নেট দিয়া উহা হইতে নিবৃত্ত করা সম্ভব হইবে না,—এ কথা স্বয়ং প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোনাল্ডও এক দিন মুক্তকণ্ঠে পার্লামেণ্টে ঘোষণা করিয়াছেন।

পার্লামেণ্টের কমন্স সভাতে এই কথা লইয়া বাদানুবাদের চরম হইয়া গিয়াছে। চার্চ্চহিল কোম্পানী ল্যাঙ্কাশায়ারের ওকালতী করিতে উঠিয়া চীৎকারে গগন সে দিন ফাটাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ফল কিছুই হয় নাই। সার ফিলিপ কাণলিফ-লিষ্টার অভিযোগ করেন, দিল্লীর চুক্তি পালিত হইতেছে না, আর ভারতের গুদামে মজুত বৃটিশ পণ্য বিলাতে ফিরাইয়া দেওয়ার কথায় চুক্তিভঙ্গের প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সার হার্ব্বার্ট স্যামুয়েল বলেন, "জাপানী প্রতিযোগিতা ও ভারতের ক্রয়শক্তিহ্রাস বিদ্যমান থাকিলেও প্রধানতঃ ভারতীয়ের বর্জ্জন আন্দোলন ও ভারত সরকারের আমদানী শুল্কবৃদ্ধি ল্যাঙ্কাশায়ারের সর্ব্বনাশ করিতেছে; তবে দমননীতির দ্বারা এ অবস্থার

পরিবর্ত্তন হইবে না, এ জন্য গোলটেবিলে ভারতীয়ের ন্যায্য দাবী পূর্ণ করা চাই।" সার হার্ব্বার্ট উদারনীতিক দলের, কিন্তু তাঁহার মাথাতেও পোকা আছে, নতুবা তিনি দিল্লীর চুক্তির পরেও বর্জ্জনে বিভীষিকা দেখিতেন না, ভারতের স্বার্থের জন্য সরকার বিদেশী বস্ত্রের উপরে যে শুল্ক ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতেও আপত্তি তুলিতেন না।

মিঃ চার্চ্চহিল ত একবারে ক্ষেপিয়া গিয়াছেন। এ ক্ষেপামির মূলে কিছু রহস্য আছে। সে যাহাই থাকুক, তিনি ল্যাঙ্কাশায়ারের ওকালতী করিতে গিয়া বলিয়াই বসিয়াছেন যে, "মিঃ গন্ধী ভারতীয় কাপড়ের কলওয়ালাগণের সহিত যোগাযোগ করিয়া ল্যাঙ্কাশায়ারের বিপক্ষে বর্জ্জন আন্দোলন চালাইতেছেন, এখনও চুক্তির সর্ত্ত মানিতেছেন না।" আকাশে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিলে আপনার অঙ্গেই নিপতিত হয়, মিঃ চার্চ্চহিল বোধ হয় তাহা জানেন না। এ মিথ্যা অপবাদে মহাত্মা গন্ধীর কিছুই আসিয়া যাইবে না, বরং মিঃ চার্চ্চহিলকেই জগতের লোক কৃপাদৃষ্টিতে দেখিবে। মহাত্মা চুক্তি পালন করিতেছেন কি না, তাহা ভারত সরকার ও বোম্বাই সরকারই বলিয়া দিবেন।

আসল কথা, চুক্তির পরেও ল্যাঙ্কাশায়ারের কাপড়ের ব্যবসায়ের সুবিধা হইতেছে না, তাহাতেই বিলাতে এই চীৎকার উঠিয়াছে এবং এ দেশেও প্রচারকারীরা ভেদনীতি চালাইবার উদ্দেশ্যে স্বার্থান্ধদিগকে প্ররোচিত করিতেছে। এ দেশের 'ক্যাপিট্যালের' মত বিলাতের 'টেক্‌সটাইল রেকর্ডার' কাগজে ল্যাঙ্কাশায়ারের একটা হিসাব দেওয়া হইয়াছে। ঐ হিসাব দেখিলে জানা যায়, ১৯১৩ খৃঃ ল্যাঙ্কাশায়ার ভারতে কাপড় রপ্তানী করিয়াছিল ৩ শত ৫ কোটি ৭৩ লক্ষ ৫ হাজার ৬ শত গজ। মহাযুদ্ধের অবসানে ১৯২২ খৃঃ ঐ রপ্তানী দাঁড়ায় ১ শত ৩০ কোটি ৭৬ লক্ষ ৪৪ হাজার ১ শত গজে। তাহার পর হইতে ১৯২৯ খৃঃ পর্য্যন্ত গড়পড়তা প্রতি বৎসর ১ শত ৪১ কোটি ৬২ লক্ষ ১৬ হাজার গজ কাপড় রপ্তানী হইয়াছে। ১৯৩০ খৃঃ উহা দাঁড়াইয়াছে ৭৭ কোটি ৪০ লক্ষ ৭৯ হাজার ৫ শত গজে।

সুতরাং ১৯১৩ খৃঃ তুলনায় গত বৎসরের রপ্তানীর পরিমাণ এক-চতুর্থাংশ মাত্র। ইহাতেই এই চীৎকার উঠিয়াছে, 'গেল রাজ্য গেল মান' রবে আকাশ-মেদিনী প্রকম্পিত হইতেছে। কিন্তু এই সুযোগে জাপান এই কয় বৎসরে ভারতে ৩ হাজার ১ শত ৪০ লক্ষ গজ কাপড়ের রপ্তানী দাঁড় করাইয়াছে। ভারতে যত বিদেশী বস্ত্র আমদানী হইত, তন্মধ্যে ল্যাঙ্কাশায়ার হইতে আসিত ৭২.৬ ভাগ। ১৯৩০ খৃঃ মাত্র ২১.২ ভাগ আসিয়াছে।

এ দিকে ভারতীয় দেশীয় কলে ১৯১৩ হইতে ১৯৩০ খৃঃ পর্য্যন্ত ১৫ হাজার ৭ শত ৪০ লক্ষ গজ কাপড় তৈয়ার হইয়াছে। জার্ম্মাণ যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারত ঘরের বস্ত্রের দ্বারা চাহিদার ২৭.২ ভাগ পূর্ণ করিত, এখন উহা ৭০ ভাগে দাঁড়াইয়াছে। বোম্বাই কলওয়ালা সমিতি একটি রিপোর্টে দেখাইয়াছেন যে, এই কয় বৎসরে বিদেশী বস্ত্রের আমদানী ৮০ কোটি ৯০ লক্ষ গজ কমিয়াছে, তন্মধ্যে বৃটিশের কমিয়াছে শতকরা ৫৮ গজ আর জাপানীর শতকরা ৪২ গজ। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, দেশবাসীর স্বদেশীক্রয়ের প্রবৃত্তি বদ্ধমূল হইয়াছে এবং পণ্যক্রয়ের ক্ষমতা হ্রাস হইয়াছে বলিয়াই এইরূপ হইয়াছে। জগতের সর্ব্বত্র অর্থকষ্টের জন্য শেষোক্ত অবস্থার অভ্যুদয় হইয়াছে, ইহা বলাই বাহুল্য।

সুতরাং মহাত্মা গন্ধী বা কংগ্রেস চুক্তিভঙ্গ করিয়া বর্জ্জন আন্দোলন চালাইয়া সাম্রাজ্যের সর্ব্বনাশ করিতেছেন, অতএব আইন দ্বারা বর্জ্জন বন্ধ করা প্রয়োজন, এ চীৎকার ও আবদার করিলে চলিবে কেন ?

ভারত ব্যতীত অন্যান্য দেশেও বিলাতী বস্ত্রের রপ্তানীর হিসাবটা ধরা যাউক। ১৯০৯ হইতে ১৯১৩ খৃঃ মধ্যে চীনদেশের হংকংদ্বীপে বিলাতের বস্ত্রের রপ্তানী হইয়াছিল ৫৮ কোটি ৭০ লক্ষ গজ। ১৯৩০ খৃঃ হইয়াছে ৩৯ কোটি গজ। আরও একটা বিষয় লক্ষ্য করিবার এই যে, ১৯১৩ খৃঃ চীনের বাজারে বৃটিশ রপ্তানী পণ্যের মূল্যের পরিমাণ জাপানী পণ্যের ৪ গুণ ছিল, কিন্তু ১৯৩০ খৃঃ এই বাজারে জাপানী পণ্যের মূল্যের পরিমাণ বৃটিশ পণ্যের ৬ গুণ হইয়াছে। সুতরাং ল্যাঙ্কাশায়ারের যদি কাহারও বিপক্ষে অভিযোগ করিবার থাকে, তাহা হইলে সে জাপান। তবে ভারতের মহাত্মা গন্ধী ও কংগ্রেসের বিপক্ষে এ চীৎকার কেন ?

লিঙ্গ-পরিবর্ত্তন

জীবতত্ত্ববিদরা জানেন যে, নানা শ্রেণীর জীব নিজেদের লিঙ্গ-পরিবর্ত্তন করিতে পারে, অর্থাৎ পুরুষ হইয়া যায় স্ত্রী এবং স্ত্রী হইয়া যায় পুরুষ। কিন্তু সাধারণ লোকের জ্ঞান মানব ও মানব-পালিত পশুপক্ষীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ বলিয়া তাহারা এই লিঙ্গ-পরিবর্ত্তনের ব্যাপারকে অস্বাভাবিক ও আশ্চর্য্য বিবেচনা করে।

সাধারণ লোকের কাছে কোন জীব হয় পুরুষ, নয় স্ত্রী, এবং উভয়ের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ পৃথক্। তাহাদের ধারণা যে, যদি কোন প্রাণী পুরুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করে, তবে সে আজীবন পুরুষই থাকে, এবং স্ত্রী হইয়া যাহার জন্ম হইয়াছে, সে আর পুরুষ হইতে পারে না। যদি কখন সে ইহার ব্যতিক্রম দেখে বা শোনে, তবে সে ইহাকে আশ্চর্য্যজনক মনে করে।

তাই মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে দেখা যায় যে, অমুক জায়গায় এক জন লোক ছিল পুরুষ অথবা স্ত্রী, কিন্তু এখন তাহার লিঙ্গ-পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ঐ ব্যাপার ঠিক লিঙ্গ-পরিবর্ত্তন যাহাকে বলে, তাহা নয়, উহা লিঙ্গের অস্বাভাবিক বিকৃতির স্বাভাবিক সংশোধন মাত্র।

সম্প্রতি বিলাতের স্পেক্‌টেটর কাগজে এডিনবারা ইউনিভার্সিটির জীব-জনন-তত্ত্বের অধ্যাপক ডক্টর ক্রু জীবের লিঙ্গ-পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আমরা তাহার সার সঙ্কলন করিয়া দিতেছি।

মানুষের লিঙ্গ-পরিবর্ত্তন ঘটিলে সেই দম্পতির অত্যন্ত অসুবিধা ঘটিবে ও জীবতত্ত্বানুসন্ধিৎসুর অত্যন্ত আনন্দের কারণ হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু এইরূপ ঘটনা কস্মিন্‌কালেও কোথাও ঘটিয়াছে কি না সন্দেহ। ভ্রূণ অবস্থায় উচ্চ শ্রেণীর জীবের দৈহিক অথবা রাসায়নিক কারণে লিঙ্গ-পরিবর্ত্তন ঘটিলেও ঘটিতে পারে, কিন্তু পূর্ণপরিণত জীবের লিঙ্গ-পরিবর্ত্তন ঘটা এক রকম অসম্ভব।

মানুষ বা অপর উচ্চ শ্রেণীর জীবদের মধ্যে কখন লিঙ্গ-পরিবর্ত্তন না ঘটিলেও এমন জীবের অভাব নাই, যাহাদের মধ্যে কালে ভদ্রে লিঙ্গ-পরিবর্ত্তন ঘটে আকস্মিক বিপর্য্যয়-স্বরূপ, অথবা তাহাদের জীবনের স্বাভাবিক ব্যবস্থা অনুসারেই সম্ভব হয়।

জীবতত্ত্বের পরিভাষায় পুরুষ তাহাকেই বলে—যে বীর্য্য-কোষ ধারণ করে, এবং স্ত্রী তাহাকেই বলে—যে ডিম্বকোষ ধারণ করে। মানুষ এবং তাহার গৃহপালিত পশু-পক্ষীর মধ্যে এই দুই চিহ্ন দুই সম্পূর্ণ পৃথক্ আকৃতির। কিন্তু স্তন্যপায়ী জীব হইতে কেহ যদি পক্ষী, সরীসৃপ, মৎস্য ও আরও নিকৃষ্ট জীবকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখেন, তবে তিনি দেখিবেন যে, পুং ও স্ত্রী সংজ্ঞা-নির্দ্দেশক চিহ্ন ক্রমশঃই পার্থক্যহীন ও একাকার হইয়া আসিতেছে। ক্রমে একই শরীরে পুং ও স্ত্রী-লিঙ্গ ধারণ করিয়া নিকৃষ্ট জীবরা হর-গৌরীর ন্যায় অর্দ্ধনারীশ্বরমূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। অর্দ্ধনারীশ্বর জীবপর্য্যায়ে সাধারণের পরিচিত কয়েকটি প্রাণীর নাম করা যাইতে পারে—ফিতা বা চেপ্টা কৃমি, কেঁচো, জোঁক, শামুক, গুগ্‌লি, চিংড়ি জাতীয় জলজন্তু ইত্যাদি।

অনেক অর্দ্ধনারীশ্বর জীবদেহে একই সময়ে পুং ও স্ত্রী-লিঙ্গ বিদ্যমান থাকে না, পর্য্যায়ক্রমে দ্বিবিধ লিঙ্গের আবির্ভাব হইতে থাকে। সাধারণতঃ সেই জীবগুলি যৌবনকালে পুরুষরূপে আচরণ করে, এবং বৃদ্ধাবস্থায় স্ত্রীবৃত্তি অবলম্বন করে।

যৌবনকাল উদ্যম উৎসাহের কাল, এবং বার্দ্ধক্য স্থবিরতা ও নিশ্চলতার সময়। তাই এক রকমের ঝিনুক যৌবনকালে পুংবদ্‌ভাব প্রাপ্ত হয়, এবং বয়স বাড়িলেই তাহারা স্ত্রীধর্ম্ম লাভ করে। ঐ ঝিনুকের যুবারা বৃদ্ধ ঝিনুকের গায়ে সংসক্ত হইয়া পুরুষপ্রক্রিয়া অবলম্বন করে যে পর্য্যন্ত না তাহারা বৃদ্ধ হইয়া স্ত্রী হইয়া পড়ে, এবং তখন আবার কোন নবযুবা তাহাকেই স্ত্রীরূপে পাইয়া বসে। ঐ ঝিনুক কেবল যে বয়সধর্ম্মে আপনার লিঙ্গ-পরিবর্ত্তন করে, তা নয়, মধ্য-বয়সে প্রৌঢ়াবস্থায় তাহারা একই দেহে যুগপৎ উভয় লিঙ্গ ধারণ করিয়া অর্দ্ধনারীশ্বরমূর্ত্তিতে ইচ্ছানুসারে কখন বা পুরুষ-সহবাসে, আবার কখন বা স্ত্রী-সহবাসে বিহার করে।

অনেক প্রকারের মৎস্য, ভেক, কচ্ছপ এবং এমন কি, শূকর, ছাগল ও মানুষ পর্য্যন্ত অর্দ্ধনারীশ্বররূপ পরিগ্রহ করিয়া যুগপৎ পুং ও স্ত্রীধর্ম্ম পালন করিয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত পরীক্ষিত সত্য বলিয়া পরিজ্ঞাত আছে। এমন কি, পরীক্ষার জন্য ঐরূপ উচ্চ শ্রেণীর জীবের দেহেও একদা একত্র দ্বিবিধ লিঙ্গ উৎপন্ন করিয়া তোলা সম্ভব হইয়াছে। এরূপ অঘটন-ঘটনা বহুবার সম্পাদন করিয়া দেখা হইয়াছে। অনেক মাছের শরীরে একই সঙ্গে অণ্ডকোষ ও ডিম্বকোষ বিদ্যমান থাকিতে দেখা যায়। মাছেরা অনেক সময় স্ত্রীরূপে জন্মিয়া স্ত্রীধর্ম্ম পালন করিয়া বহু সন্তান প্রসবের পর বৃদ্ধাবস্থায় অল্পে অল্পে পুংবদ্‌ভাব প্রাপ্ত হয়, তাহাদের ডিম্বকোষ তখন শুষ্ক সঙ্কুচিত হইয়া লুপ্ত হইয়া যায়, এবং অণ্ডকোষ উদ্ভূত হইতে থাকে। বেঙও বহু সন্তানের জননী হইয়া অবশেষে আবার বহু সন্তানের জনক হইয়া থাকে। বিড়ার নামে এক জীবতত্ত্ববিৎ পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বেঙের শরীরে পুরুষের অণ্ডকোষের এক প্রান্তে একটি ইন্দ্রিয় সংলগ্ন থাকে; আবিষ্কর্ত্তার নামানুসারে তাহা বিড়ারের ইন্দ্রিয় নামে পরিচিত হইয়াছে। যদি অস্ত্র করিয়া ভেকের অণ্ডকোষ কাটিয়া বাদ দিয়া ফেলা হয়, তবে সেই বিড়ারের ইন্দ্রিয় দু তিন বৎসরের মধ্যেই ডিম্বাশয়ে পরিণত হইয়া পুরুষকে স্ত্রী করিয়া তোলে। রোগেও যদি কখন ভেকের অণ্ডকোষ নষ্ট হইয়া যায়, তবে তাহারা সহজেই স্ত্রীলিঙ্গ ধারণ করিয়া সন্তান প্রসবে নিযুক্ত হয়।

পায়রা, মুরগী, হাঁস প্রভৃতি গৃহপালিত পক্ষীদের দেহে কেবলমাত্র বাম দিকের ডিম্বাশয় ক্রিয়া করে, ডাহিন দিকের ডিম্বাশয় পরিপুষ্ট হয় না। যদি রোগে সেই বাম দিকের ক্রিয়াশীল ডিম্বাশয় নিষ্ক্রিয় হইয়া যায় বা তাহা অস্ত্র করিয়া অপসারিত হয়, তবে ডাহিন দিকের অপুষ্ট ডিম্বাশয় পুষ্ট হইতে থাকে; কিন্তু পুষ্ট হইয়া তাহা আর ডিম্বাশয় থাকে না, তাহা অপরিণত অণ্ডকোষের আকার ও ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়।

ইহা হইতে এই প্রমাণ হয় যে, প্রত্যেক জীবদেহে উভলিঙ্গত্বের সম্ভাবনা বিদ্যমান আছে, এবং অনুকূল অবস্থায় তাহারা লিঙ্গ-পরিবর্ত্তন করিতে পারে। কোন্ জীব পুং বা স্ত্রীলিঙ্গ ধারণ করিবে, তাহা স্থির করে তাহার ভ্রূণকালের প্রবৃত্তি ও অবস্থা। জৈবরসায়ন নির্ণয় করিয়াছে যে, ঐ প্রবৃত্তি ও অবস্থার নিয়ামক শক্তি হইতেছে রাসায়নিক শক্তি। যে সময়ে জীবের ভ্রূণদেহে লিঙ্গোৎপত্তি হইতে থাকে, সেই সময়ে যদি লিঙ্গনির্ণায়ক শক্তির বা পদার্থের পরিবর্ত্তন ঘটে, তবে তাহার লিঙ্গেরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়া যায়। নিম্নশ্রেণীর জীবশরীরে এই ক্রিয়া পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের প্রাকৃতিক রাসায়নিক প্রক্রিয়ার প্রভাবে ঘটিয়া থাকে। এইজন্য ইহাদের লিঙ্গ-পরিবর্ত্তন সাধারণ ব্যাপার, এমন কি, তাহাদের স্বভাবগত, এবং ঋতুপরিবর্ত্তনে অথবা বয়োধর্ম্মে তাহাদের লিঙ্গ-বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।
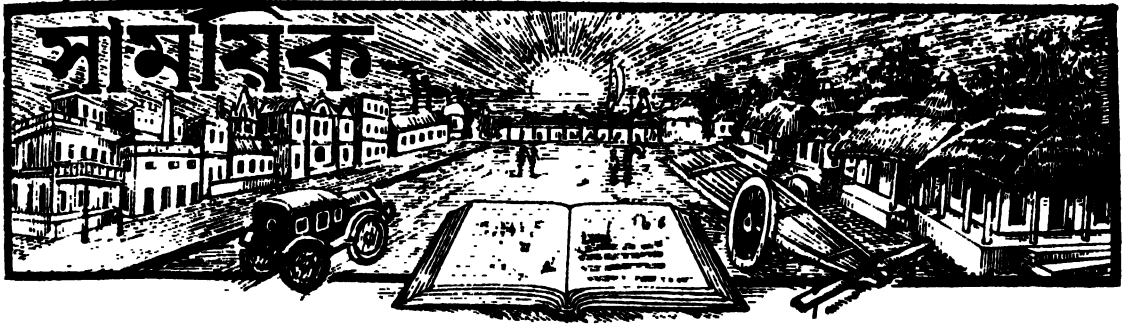
বাঙ্গালায় জন্ম-মৃত্যু

গত ১৯২৯ খৃষ্টাব্দটি বাঙ্গালার স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালই ছিল বলিতে হইবে। গত ২০ বৎসরের মধ্যে এমনটি আর হইয়াছে কি না সন্দেহ। এই বৎসর মৃত্যুর হার কমিয়াছে, জন্মের হার বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা বাঙ্গালার পক্ষে অভিনব।

এই বাঙ্গালায় প্রায় সাড়ে ৪ কোটি লোকের বাস। প্রতি বৎসর এই লোকসংখ্যার মধ্যে গড়পড়তায় ১১ লক্ষ হইতে ১৭ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালায় মোট ১৭ লক্ষ ২৭ হাজার ৬ শত লোক নানা রোগে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিল। গত ২০ বৎসরের মধ্যে এত অধিক লোক আর কখনও মরে নাই। মরণের হার হইয়াছিল হাজারকরা ৩৮ জনেরও অধিক। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুর সংখ্যা হইয়াছিল ১৬ লক্ষ ৪২ হাজার ১ শত ১১, আর মৃত্যুর হার হইয়াছিল হাজারকরা ৩৬ জনেরও অধিক।

কোন সভ্য উন্নত স্বাধীন দেশে মৃত্যুর হার এত অধিক হয় না। তবুও এ দেশের সরকারী আদমসুমারীর হিসাব প্রায় থানা-চৌকীদারের প্রদত্ত ফিরিস্তির উপর নির্ভর করে! যে রূপ নিরক্ষর এবং যে ভাবে ইহাদের যে হিসাব সংগ্রহ করা, তাহাতে গণনায় ভুল থাকিয়া যাইবারই কথা। যাহা হউক, এই হিসাব ধরিয়া বিচার করিলে দেখা যায়, বাঙ্গালার মত মৃত্যুর হার জগতে বোধ হয় কোন সভ্যদেশেই নাই। গ্রেট-ব্রিটেনের মৃত্যুর হার হাজারকরা মাত্র ১৩ জন হইতে ১৫ জন। জার্ম্মাণী, মার্কিণ, ফ্রান্সের মৃত্যুর হার বাঙ্গালা হইতে অনেক কম।

গত ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালায় ১০ লক্ষ ৯৮ হাজার ২ শত ৬৩ জন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। গত ২০ বৎসরের মধ্যে মরণের এত অল্প হার আর কখনও হয় নাই, অর্থাৎ হাজারকরা ২৩ জন। এ বৎসরে জন্মের হার মৃত্যুর হার অপেক্ষা হাজারকরা সাড়ে [illegible] জনেরও অধিক হইয়াছিল। বাঙ্গালার মৃত্যুর হার ব্রহ্ম এবং আসাম ব্যতীত আর সকল প্রদেশ অপেক্ষা কম। বাঙ্গালায় ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে ৬টি জেলায় জন্মের হার অপেক্ষা মৃত্যুর হার অধিক হইয়াছিল—(১) যশোহর, (২) কলিকাতা, (৩) রাজসাহী, (৪) নদীয়া, (৫) দিনাজপুর। যশোহরেই সর্ব্বাপেক্ষা মৃত্যুর হার অধিক।

জ্বর রোগেই বাঙ্গালার অধিক লোক আক্রান্ত হয়, মৃত্যুও ইহাতে হয় অধিক। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কিছু কম হইয়াছিল। আর একটি সর্ব্বনাশা রোগ ক্রমে ক্রমে বাঙ্গালা-দেশকে গ্রাস করিতেছে, এ রোগ রাজরোগ যক্ষ্মা বা ক্ষয়রোগ। এই রোগে বাঙ্গালার ৫০ হাজারেরও অধিক লোক আক্রান্ত হইয়া ভুগিতেছে। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে এই রোগে বাঙ্গালার প্রায় ১১ হাজার লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। বাঙ্গালায় নিত্যই এই রোগ ভীষণ আকার ধারণ করিতেছে। জাতীয় দৈন্য—স্বাস্থ্যের অভাব—খাদ্যের অভাব—সংযমের অভাবই এই রোগ-বিস্তারের অকালমৃত্যুর কারণ। যাহারা জাতীয় শক্তি উদ্-বোধনের কামনা করেন—জাতির স্বাস্থ্যসংরক্ষণে—অকালমৃত্যু-নিবারণে যত্নবান্ হওয়া তাঁহাদের সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

শিশু মৃত্যু

ভারতবর্ষের শিশু-মৃত্যুর হার ভয়াবহ, বোধ হয়, জগতের কোন সভ্যদেশে এই হারে শিশু-মৃত্যু হইলে সরকারকে অতিষ্ঠ হইতে হইত। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে স্বাস্থ্যকর্ত্তৃপক্ষ যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে এই হিসাব আছে :—

প্রদেশ	হাজারকরা শিশুমৃত্যু	প্রদেশ	হাজারকরা শিশুমৃত্যু
বাঙ্গালা বিভাগ	১৭৭'৯	মধ্যপ্রদেশ	২৪০'৪৯
মাদ্রাজ „	১৮০'০৪	বেহার ও উড়িষ্যা	১৩৫'০
বোম্বাই „	১৮৯'৩৯	উত্তরপশ্চিম সীমান্ত	১৬৭'৬৫
যুক্তপ্রদেশ	১৬৮'৬১	ব্রহ্মদেশ	২২৫'৯৭
পঞ্জাব	১৮৬'২০	আসাম	১৫৭'৪৪

এই হিসাব হইতে বুঝা যায় যে, ব্রহ্মদেশেই সর্ব্বাপেক্ষা শিশু-মৃত্যুর হার অধিক। যাঁহারা বাল্য-বিবাহের বিরোধী, তাঁহারা বলিয়া থাকেন, শিশু-মৃত্যুর জন্য বাল্য-বিবাহই মূলতঃ দায়ী। ভারতের পয়নালা তদারক মিস মেয়ো বড় গলায় এই কথা

রটাইয়া ভারতবাসীকে জগতের দৃষ্টিতে ঘৃণিত ও অবজ্ঞাত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল। ব্রহ্মে বাল্য-বিবাহ নাই, তবে ভারত অপেক্ষা তথায় অধিক শিশু-মৃত্যু হয় কেন? তাহার পর খাস ভারতের উড়িষ্যা ও যুক্তপ্রদেশে যত অধিক বাল্য-বিবাহ হয়, তত আর কোন প্রদেশেই নহে। অথচ ঐ দুই প্রদেশে শিশু-মৃত্যুর হার অধিক না হইয়া বরং কম কেন? আসল কথা, ইহার উত্তর অন্যত্র অনুসন্ধান করিতে হইবে। যদি অপরিচ্ছন্নতার দোষ ধরা যায়, তাহা হইলে বলা যায়, উড়িষ্যা ও যুক্তপ্রদেশের মত অপরিচ্ছন্নতা ও ধূলা-কাদা ময়লার বাহুল্য বোধ হয় কোথাও নাই। তবে যদি দারিদ্র্যের কথা ধরিলে বলা যায়, এই দুই প্রদেশ, বিশেষতঃ উড়িষ্যা 'ভিখারীর' রাজ্য, এত অধিক ভিখারী ও অভাবগ্রস্ত লোক কুত্রাপি নাই। তবে সেখানে শিশু-মৃত্যুর হার কম কেন? এ সমস্যার সমাধান করে কে?

সম্প্রতি মাতৃমঙ্গল ও শিশু-কল্যাণ স্বাস্থ্য-প্রদর্শনী ভারতের বিভিন্ন সহরে অনুষ্ঠিত হইয়া চিত্রে, আদর্শে, বক্তৃতায় শিশু-মৃত্যুর হার কমাইবার প্রয়াস পাইতেছেন। ইহা আনন্দের ও আশার কথা সন্দেহ নাই।

ব্রহ্মের বিদ্রোহ

গত খৃষ্টমাস পর্ব্বের পূর্ব্ব হইতে ব্রহ্মের থারাওয়াডি জেলা ও পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকটি স্থানে ব্রহ্মবাসীদের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক বিদ্রোহী হইয়া বৃটিশ রাজ্যের রাজকর্ম্মচারী ও প্রজার ধনপ্রাণ বিপন্ন করিয়াছে। সেই বিদ্রোহ ক্রমে নানা স্থানে বিসর্পিত হইয়াছে এবং বহু লোকের ধন-প্রাণ নষ্ট হইয়াছে। প্রথমে ব্রহ্ম সরকার ইহাকে তুচ্ছ ডাকাতি বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তদনুসারে বিদ্রোহ-দমনে সামরিক ও বে-সামরিক পুলিস নিযুক্ত করাই যথেষ্ট বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহে যখন পানি পান নাই, তখন তাঁহারা দীর্ঘ ঘোষণা দ্বারা জনসাধারণকে জ্ঞাত করিয়াছিলেন যে, "এই বিদ্রোহ বৃটিশ-রাজ্যের উচ্ছেদার্থে আরম্ভ করা হইয়াছে। আর্থিক কষ্ট ইহার অন্যতম কারণ। এখন এই বিদ্রোহ-দমনের জন্য রীতিমত চেষ্টা হইতেছে।" ইহার পর ভারত হইতে সৈন্য প্রেরিত হয়। দুই একটা সংঘর্ষে বিদ্রোহীদের সমূহ ক্ষতি হয় বটে, কিন্তু বিদ্রোহীরাও সরকার পক্ষের অনেক ক্ষতি করে। শেষাশেষি বিদ্রোহীদের ক্রোধ ও হিংসার লক্ষ্য হয় প্রবাসী ভারতবাসী। পাঠকের স্মরণ আছে, পূর্ব্বে রেঙ্গুনে ভারতীয় ও চীনা কুলীদের সঙ্গে বর্ম্মী কুলীদের ভীষণ দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইয়াছিল। তাহার কারণ বর্ম্মীরা ভারতীয় ও চীনা কুলীদের সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারিতেছিল না। বর্ম্মীরা অলস ও অমিতব্যয়ী, চীনা ও ভারতীয়রা তদ্বিপরীত। বর্ম্মীদের ক্রোধ ও হিংসা ভারতীয়দের উপরে শতধা পড়িতেছে, তাহারা স্পষ্টই ভারতীয়দিগকে বলিতেছে, "ভারতে ফিরিয়া যাও, না হইলে বিপদ হইবে।" হাজার হাজার ভারতীয় প্রাণভয়ে ভারতে পলাইয়া আসিয়াছে ও আসিতেছে, রেঙ্গুনের জাহাজ-ঘাট ভারত-প্রত্যাগমনপ্রয়াসী যাত্রীতে পূর্ণ।

ভারতীয়ের প্রতি বিদ্বেষ এই বিদ্রোহের গৌণ কারণ হইতে পারে, কিন্তু অর্থকষ্টই যে বিদ্রোহের মুখ্য কারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। বহুদিন হইতে ব্রহ্মবাসীরা এই কষ্ট সহ্য করিয়া আসিতেছে। সরকার ঘোষণায় এ কথা অস্বীকার করিতে পারেন নাই। 'নিউ বার্ম্মা' পত্র লিখিয়াছেন, "থারাওয়াডিতে প্রথম অশান্তি দেখা দিবার পর হইতে সরকার নির্ম্মম দমননীতি চালাইয়া আসিতেছেন।......শুধু মেসিন্ গানের নীতি এই অশান্তি দমন করিতে পারিবে না, কেন না, অশান্তি দমিত না হইয়া বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে।...বিদ্রোহীরা যদি কেবল সাময়িক উত্তেজনায় প্ররোচিত হইয়া কার্য্য করিত, তাহা হইলে সরকারের সেনাদল অতি অল্পসময়ের মধ্যেই বিদ্রোহীদিগকে দমন করিতে সমর্থ হইত; কিন্তু দারুণ আর্থিক দুর্দ্দশার জন্য বিদ্রোহীরা মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে বলিয়াই অশান্তি নিবারিত হইতেছে না।"

সত্যই এই অবস্থা ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হওয়া বিচিত্র নহে। সরকার যদি দিন থাকিতে প্রতীকারব্যবস্থা করিতেন, তাহা হইলে এই সঙ্গীন অবস্থা উপস্থিত হইত না, অনর্থক রক্তপাতও হইত না। যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, এখন সরকার অবস্থার প্রতীকারে মনোযোগী হইয়াছেন। সে ব্যবস্থা যাহাতে অসম্পূর্ণ রহিয়া না যায়, ব্রহ্মে যাহাতে ভারতবাসীর স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকে, সর্ব্বশেষে তাহাই দেখা কর্ত্তব্য।

মহাত্মা গন্ধী

পাদরী হোমস্ প্রমুখ প্রতীচ্যবাসী বহু মনীষী চার্চ্চিলের 'উলঙ্গ ফকীর' মহাত্মা গন্ধীকেই আধুনিক জগতের শ্রেষ্ঠ মানব বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। যতই দিন যাইতেছে, ততই দেখা যাইতেছে, মহাত্মা গন্ধীর আত্মিক শক্তির প্রতি প্রতীচ্যবাসী বস্তুতান্ত্রিকরা ক্রমশঃ আকৃষ্ট হইতেছেন। ইতিমধ্যে মহাত্মা গন্ধী মার্কিণ যুক্তরাজ্য হইতে একাধিক নিমন্ত্রণপত্র পাইয়াছেন। তাঁহার

...র সত্যাগ্রহ ও আত্মিক শক্তির ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য ইতি-মধ্যেই মার্কিণে বন্দোবস্ত হইয়া যাইতেছে, সেই প্রচারকার্য্যের জন্য এখনই হাজার হাজার মুদ্রা ব্যয়িত হইতেছে এবং ভবিষ্যতে আরও অনেক মুদ্রা ব্যয়িত হইবে বলিয়া ঘোষিত হইতেছে।

মহাত্মা গন্ধীকে স্বার্থান্ধ সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্ব ও ক্ষমতা-প্রয়াসী প্রতীচ্যবাসী যে দৃষ্টিতেই দেখুন, যথার্থ পণ্ডিতরা কিন্তু তাহাকে আধুনিক বস্তুতন্ত্রের ও বলসেভিকবাদের পরম শত্রুরূপে দেখিতেছেন এবং প্রকাশ্যে না হইলেও গোপনে বলিতেছেন যে, তিনি বর্ত্তমানের স্বেচ্ছাচারী দুর্নীতিপরায়ণ সমাজের এবং ধর্ম্মভীরু আত্মিক শক্তির পূজারীদের মধ্যে দাঁড়াইয়াছেন বলিয়াই জগৎ এখনও ধ্বংস হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইতেছে। মার্কিণ মিশনারী মিঃ বয়েড টাকার ইহাদেরই অন্যতম। তিনি বর্ত্তমানে বোলপুরের শান্তিনিকেতনে অধ্যাপকতা করিতেছেন। সুতরাং বর্ত্তমান ভারতের মুক্তির আন্দোলন অথবা মহাত্মা গন্ধীর আন্দোলনের কথা তিনি ভালরূপই জানেন। তিনি তাঁহার অভিজ্ঞতা অনুসারে বলিয়াছেন,—"আমি মহাত্মা গন্ধীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছি, কারণ, বর্ত্তমান জগতে আমি তাঁহাকেই একমাত্র জীবন্ত আত্মিক শক্তিতে বলীয়ান্ মানুষ বলিয়াই জানি। কোন কোন বিষয়ে স্বয়ং যীশু দেশকালপাত্রের যোগাযোগের অভাবে যে বাণী দিয়া যাইতে পারেন নাই, মহাত্মা গন্ধী সেই বিষয়ের অভাব পূর্ণ করিতেছেন। আমার বিশ্বাস, জগতের মহা প্রয়োজনকালে মহাত্মা গন্ধীর মধ্য দিয়া ভগবৎ অনুপ্রেরণা জগতে প্রভাবিত হইতেছে। জগতে দুইটি প্রবল প্রতি-দ্বন্দ্বী শক্তির সংঘর্ষ চলিতেছে,—গন্ধী-নীতি ও বলসেভিক-নীতি। বলসেভিক নীতি শ্রেণীভেদের মন্ত্র প্রচার করিতেছে। কিন্তু মহাত্মা গন্ধী যুক্তি ও ভালবাসার সম্মোহন মন্ত্র-প্রভাবে জনগণকে তাঁহার মহান্ আদর্শের লক্ষ্যে সঞ্চালিত করিতেছেন। সেই কর্ত্তব্যপথ সাম্যের সাম্রাজ্য—কোন ভেদাভেদ নাই। জগতের সামরিকতা, শ্রেণীভেদের যুদ্ধ, বলসেভিক-বাদ এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে দ্বেষ ও হিংসার পক্ষে মহাত্মা গন্ধী একমাত্র আশার জ্যোতির্ম্ময় স্তম্ভস্বরূপ দণ্ডায়মান।"

স্বার্থ ও সাম্রাজ্যবাদ কিন্তু তাঁহাকে জগতের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী ও অপরাধী বলিয়া গণ্য করিতেছে। ইহা চিরদিনই হইয়া আসিতেছে। হিরণ্যকশিপু, রাবণ, শিশুপাল, কংস, জরাসন্ধের ত কোনও কালে অভাব হয় নাই!

কংগ্রেসে আত্মকলহ

'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রে মহাত্মা গন্ধী, কংগ্রেসে অনাচার আচরণের বিপক্ষে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। এরূপ করিবার বিশেষ কারণ উপস্থিত হইয়াছে। কোন কোন স্থানে কংগ্রেস-কর্ম্মীদের মধ্যে ব্যক্তিবিশেষের অথবা দলবিশেষের প্রতিপত্তি, প্রভুত্ব ও ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য অধুনা বিশেষ চেষ্টা হইতেছে; বিশেষতঃ কংগ্রেস নির্ব্বাচনের সময় এই ভাবের অনাচার অত্যধিক পরিমাণে দেখা দিতেছে। যাহাতে নির্ব্বাচন প্রতিযোগিতায় ব্যক্তি বা দলবিশেষের সংখ্যাধিক্য বজায় থাকে, তাহার জন্য ঘৃণিত পন্থাও অবলম্বিত হইতেছে। মহাত্মা স্বয়ং সত্যাশ্রয়ী, তিনি কখনও এই কার্য্যের প্রশ্রয় দিতে পারেন না। তাই তিনি এই প্রতিবাদ করিয়া সকল কংগ্রেসকর্ম্মীকেই সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি বলিয়াছেন যে, "কংগ্রেসের নির্ব্বাচনকালে প্রার্থী স্বয়ং চাঁদা দিয়া নূতন সদস্য তালিকাভুক্ত করিতে পারেন, এ জন্য তিনি প্রচার ও তদ্বির উপলক্ষে ভোট-দাতাদিগকে গাড়ী ভাড়া ও আহার্য্য সরবরাহও করিতে পারেন; কংগ্রে-সের আইনে এরূপ ব্যবস্থা নিষিদ্ধ নহে। এরূপ ব্যবস্থা নিন্দনীয় হইলেও যাঁহারা সর্ব্বদা খদ্দর পরি-ধান করেন না, তাঁহাদিগকে ভোট দিতে দেওয়া উচিত নহে। অসাধু উপায়ে উৎকোচ ও প্রলোভন দ্বারা ভোট সংগ্রহ করা কংগ্রেসকর্ম্মীর পক্ষে কোনমতেই কর্ত্তব্য নহে। যে সকল কংগ্রেস কমিটী অসাধু উপায়ে ভোট সংগ্রহ করিয়া দেশসেবার ভার লইয়াছেন, তাঁহাদের সে দেশসেবা—দেশসেবা নহে, দেশের অকল্যাণরূপেই গণ্য।"

মহাত্মা গন্ধী

মহাত্মা গন্ধী কেন এ সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা সংবাদপত্র-পাঠ-অভিজ্ঞ পাঠকমাত্রেই বুঝিয়াছেন। যুক্তপ্রদেশ ও পঞ্জাব প্রমুখ কয়েকটি প্রদেশে নির্ব্বাচন উপলক্ষে নানারূপ অনাচার আচরিত হইতেছে বলিয়া শুনা গিয়াছে। বিশেষতঃ বাঙ্গালার ব্যাপার আরও বিষম। বাঙ্গালায় কংগ্রেসের দলাদলির ফলে পরস্পর ঈর্ষা, দ্বেষ ও হিংসার হলাহল সারা দেশের আকাশ-বাতাস কলুষিত করিয়া তুলিয়াছে। বিবদমান পক্ষদ্বয়ের প্রত্যেকেই নিজের সাধুতার কথা জাহির করিয়া অপর পক্ষের দোষের কথা পঞ্চমুখে গাহিতে-ছেন। তাঁহাদের দলের মুখপত্রগুলি 'পাড়াকুঁদুলীর' মত কোন্দ

বাঁধিয়া আসরে নামিয়াছেন। কবির লড়াইয়ের অনুকরণে তাঁহারা পরস্পর চিতেন উতোর গাহিতেছেন। ব্যাপার দেখিয়া জগতের লোক বিদ্রূপের হাসি হাসিতেছে।

যাঁহারা নিরপেক্ষ অথচ দেশের ও দশের সেবক এবং কংগ্রেসের অনুরাগী, তাঁহারা তাঁহাদিগকে ক্ষমা-ঘৃণা করিয়া কিছু কিছু ত্যাগ স্বীকার করিয়া কলহ মিটাইয়া লইতে বহুবার অনুরোধ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের অরণ্যে রোদনই সার হইয়াছে। ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও প্রভুত্বের স্বার্থ নিশ্চিতই তাঁহাদের নিকট দেশসেবা হইতেও বড়! যাঁহারা দেশজননীকে যথার্থ মাতৃরূপিণী বলিয়া মনে করেন, যাঁহারা দেশকে মনে প্রাণে ভালবাসেন, তাঁহারা নীরব কর্ম্মিরূপেই দেশসেবা করিয়া থাকেন, প্রয়োজন হইলে আপনাকে তৃণাদপি নীচ করিয়া অপরকে সানন্দে নেতার শিরোপা পরাইয়া থাকেন। পরলোকগত দেশপ্রেমিক দেশবন্ধু দাশ যথার্থই দেশকে ভালবাসিতেন, দেশের কথা উঠিলে তাঁহার নয়নাশ্রু বিগলিত হইত। স্বরাজের স্বপ্নে তিনি বিভোর হইয়া থাকিতেন। তাঁহার বিশাল ব্যক্তিত্বের প্রভাবে যে শক্তিশালী স্বরাজ্য দল গড়িয়া উঠিয়াছিল, আজ তাহার হস্তে কংগ্রেসের পরিচালনভার ন্যস্ত রহিয়াছে বটে, কিন্তু সেই দলের একতা ও শক্তি আজ কোথায়? এক দিন কংগ্রেস-কর্ম্মিগণের কাউন্সিল-প্রবেশ সমস্যা লইয়া ভারতের অবিসংবাদী নেতা মহাত্মা গন্ধীর সহিত দেশবন্ধুর মতবিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। মহাত্মা গন্ধী গৃহ-বিবাদের আশঙ্কায় দেশবন্ধুকে কংগ্রেসের নেতৃত্ব ছাড়িয়া দিয়া স্বয়ং তাঁহার অনুবর্ত্তিরূপে দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তাঁহার দ্বারা দেশের মুক্তিসাধনা যাহাতে সম্ভব হয়, তাহার অবসর ও সুযোগ দিয়াছিলেন। ইহাকেই বলে নেতৃত্ব, ইহাই প্রকৃত দেশসেবা!

বর্ত্তমানে বাঙ্গালার স্বরাজী কংগ্রেস নেতাদের বিরোধ চরমে চড়িয়াছে দেখিয়া মহাত্মা গন্ধী তাঁহাদের উভয়কেই সালিসি দ্বারা বিবাদ মিটাইয়া লইতে বলিয়াছেন। এ কলঙ্ক-কালিমা বাঙ্গালার মুখে লিপ্ত হইবার অবসর দিয়াও তাঁহারা বিরোধে ক্ষান্ত হন নাই। নিত্য তাঁহাদের মুখপত্রসমূহে পরস্পরের প্রতি বিষ উদ্গীরিত হইতেছে। উভয়েই বলিতেছেন, অধিকাংশ জেলা কংগ্রেস কমিটীই তাঁহাদের দলে। কিন্তু যদি এক পক্ষের দলে বাঙ্গালার ৩২টি জেলা কংগ্রেস কমিটীর ২৬টি থাকে, তাহা হইলে অপর পক্ষের দলে সেই একই সংখ্যা থাকা কিরূপে সম্ভবপর হয়? সত্যের উপর কংগ্রেসের ও তথা স্বরাজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত না করিলে কিরূপে দেশের মুক্তি সাধিত হইবে?

একবার বাঙ্গালার এই কংগ্রেসী কলহে মধ্যস্থতা করিবার জন্য বাহিরের লোককে নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল। পরলোকগত পণ্ডিত মতিলাল নেহরু মাদ্রাজের কংগ্রেসকর্ম্মী পট্টভি সীতারামিয়াকে বাঙ্গালার কলহে মধ্যস্থ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উহাতে কি বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর মুখ খুবই উজ্জ্বল হইয়াছিল? যে বাঙ্গালা এক দিন ভারতের অন্যান্য প্রদেশকে জাতীয়তার মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিল, যে বাঙ্গালার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া অন্যান্য প্রদেশ স্বরাজ সাধনা করিতে শিখিয়াছে, যে বাঙ্গালার বাঙ্গালীকে এক দিন মহামতি গোখলে নব ভারতের মুক্তিমন্ত্রের গুরু এবং মনীষা ও প্রতিভার আকরস্থান বলিয়া ব্যবস্থা-পরিষদে তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছিলেন, আজ স্বার্থ ও ক্ষমতার লোভে সেই বাঙ্গালাকে বর্ত্তমান কংগ্রেস স্বরাজীরা কোথায় নামাইয়া আনিতেছেন?

অপবাদ

জগতে মহতের অপবাদ প্রচার নূতন নহে, সৃষ্টির অবিচ্ছিন্ন কাল হইতেই ইহা হইয়া আসিতেছে। মহাত্মা গন্ধী অধুনা জগতের শ্রেষ্ঠ মানব বলিয়া পরিগণিত। প্রতীচ্যের একাধিক মনীষী খৃষ্টান ধর্ম্মযাজক, দার্শনিক ও সাহিত্যিক মুক্তকণ্ঠে সে কথা স্বীকারও করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে বিশ্ব-বিশ্রুত ফরাসী মনীষী রোমে রোঁলা এবং মার্কিণ পাদরী হোমসের নাম উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু কথায় বলে, 'গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না'। মহাত্মা গন্ধীর দেশবাসী হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যেও এমন লোক আছেন, যাঁহারা মহাত্মাকে কপট, মিথ্যাশ্রয়ী এবং প্রতিশ্রুতিভঙ্গকারী বলিয়া কলঙ্ক রটনা করিতে দ্বিধাবোধ করেন না।

সার চিমনলাল শীতলবাদ হিন্দু, সরকারী দরবারে তাঁহার খুবই খাতির, তিনি নাইট উপাধিধারী মডারেট নেতা। তিনি সম্প্রতি অযথা মহাত্মার স্কন্ধে কতকগুলি অপরাধের বোঝা চাপাইয়া দিয়াছেন। তিনি বিদ্বান, বুদ্ধিমান, অবস্থাভিজ্ঞ রাজনীতিক, সুতরাং তাঁহার নিকট এটুকু আশা করা যায় যে, তিনি বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া কোন লোকের সম্বন্ধে ঝটিতি মতামত প্রকাশ করিবেন না, বিশেষতঃ মহাত্মা গন্ধীর মত সর্ব্বজনবরেণ্য মহৎ লোকের সম্বন্ধে। কিন্তু তিনি হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন যে, "মিঃ গন্ধী কথার খেলাপ করেন, তিনি দিল্লীর চুক্তি মানেন নাই, তিনিই শান্তিপ্রতিষ্ঠার অন্তরায়, ইত্যাদি।" অথচ যে

সার চিমনলাল শীতলবাদ

লোকের সম্বন্ধে তিনি এমন অপবাদ রটাইলেন, তাঁহাকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখেন নাই যে, সত্যই তিনি কথার খেলাপ করিয়াছেন কি না, অথবা শান্তিভঙ্গের চেষ্টা করিতেছেন কি না? আমাদের দেশে কাণের জন্য কাকের পশ্চাদ্ধাবন করাই অধিকাংশ লোকের স্বভাব। মহাত্মা গন্ধী গোল টেবিল বৈঠকের সংহিত রাষ্ট্র-শাসন-তন্ত্র গঠন সাব-কমিটীর জুন মাসের অধিবেশনে যোগদান করিতে পারিবেন না, এই কথা রটিয়াছিল বলিয়াই সার চিমনলালের এত উষ্মা! কিন্তু মহাত্মা গোল টেবিলে যাইতে অস্বীকার করিয়াছেন কি না অথবা কেন যাইতে সম্মত হইতেছেন না, তাহা কি সার চিমনলাল তাঁহাকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া অপবাদ রটাইলে ভাল করিতেন না? মহাত্মার এ অপবাদের প্রতিবাদ করিবার প্রয়োজন হয় নাই, আর এক জন গণ্যমান্য বিশিষ্ট নাইট একটা দেশীয় রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী সার প্রভাশঙ্কর পট্টনীই এ কথার জবাব দিয়াছেন। তিনি স্বয়ং বারদোলিতে ছিলেন এবং তথাকার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, "মহাত্মা গন্ধী ও কংগ্রেস দিল্লীর চুক্তি পালন করিবার জন্য প্রাণপণ প্রয়াস পাইতেছেন। মহাত্মা কখনও কথার খেলাপ করেন না।" স্বয়ং বোম্বাই সরকার ও তাঁহাদের প্রধান কর্ম্মচারীরাও স্বীকার করিয়াছেন যে, মহাত্মা গন্ধী চুক্তির সত্ত পালন করিতেছেন। পার্লামেণ্ট মহাসভায় স্বয়ং ভারত-সচিব মিঃ বেনও বলিয়াছেন যে, [illegible] গন্ধী ও কংগ্রেস সাধ্যমত চুক্তিপালন করিতেছেন। সার চিমনলাল কিন্তু বিনা প্রমাণেই মহাত্মাকে একবারে কথার খেলাপ করা অপরাধে অপরাধী করিয়া বসিলেন!

সার প্রভাশঙ্কর পট্টনী

কোন সাংবাদিকের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া মহাত্মা গন্ধী সে দিন বলিয়াছেন, "সার চিমনলাল মহৎ লোক, তাঁহার কথার প্রতিবাদ তিনি করিতে চাহেন না। তবে তিনি মনে প্রাণে জানেন যে, তিনি ঘুণাক্ষরেও চুক্তি ভঙ্গ করেন নাই। কংগ্রেসকে গোল টেবিলে যোগদান করিতেই হইবে, এমন কথা দিল্লীর চুক্তিতে নাই। তবে তাঁহার ঐ বৈঠকে যোগদান করিবার সম্পূর্ণ ইচ্ছা আছে, কেন না, তিনি আপোষে শান্তি-প্রতিষ্ঠার জন্য অতিমাত্র [illegible]। তবে সাম্প্রদায়িক সমস্যার অবসান এবং দিল্লীর চুক্তি [illegible]রূপে পালিত না হওয়ার পূর্ব্বে বৈঠকে যাওয়া যুক্তিযুক্ত বা [illegible]র্থক হইবে না বলিয়া তিনি জুন মাসে যাইতে ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস, তাঁহার উপস্থিতি চুক্তি-পালনের পক্ষে প্রয়োজনীয়। তাঁহার আশা আছে, শীঘ্রই এই দুই সমস্যার অবসান হইবে। তখন সেপ্টেম্বরে বৈঠকে যাওয়ার আপত্তি থাকিবে না। তিনি সে জন্য বিশেষ ব্যগ্র, কেন না, তিনি বিলাতের রাজনীতিকদিগকে এবং অন্যান্য সকলকে কংগ্রেসের পক্ষের কথা বুঝাইয়া দিতে বিশেষ অভিলাষী। তিনি বা কংগ্রেস যে সাম্রাজ্যের শত্রু নহেন, তাহা তিনি মিঃ চার্চ্চহিল ও তাঁহার দলকে জানাইতে চাহেন। এ কথার পর সার চিমনলালের কি উত্তর আছে?

কেবল হিন্দু পক্ষ নহে, মুসলমান পক্ষ হইতেও মহাত্মা গন্ধীকে অযথা আক্রমণ করা হইয়াছে। মওলানা শৌকৎ আলি ত তাঁহাকে মুসলমানদের মধ্যেও ঘর ভাঙ্গাইবার আদি কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং হিন্দু-মুসলমান-সমস্যা সমাধানের প্রধান অন্তরায় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি লক্ষ গন্ধীর বিপক্ষে যুদ্ধ করিতেও প্রস্তুত!

ক্যাপ্টেন সের মহম্মদ খাঁ গোল টেবিলে এক জন 'প্রতিনিধি'রূপে মনোনীত হইয়াছিলেন। তিনি অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, মহাত্মা গন্ধীই আপোষের ও শান্তির প্রধান অন্তরায়। যেহেতু, মহাত্মা পঞ্জাবের মুসলমান ও শিখদিগকে তাঁহাদের দাবী প্রস্তুত করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। হিন্দুরা শিখদের মত পঞ্জাবে সংখ্যাল্প। তাহাদিগকে তিনি সে অনুরোধ করেন নাই, অথচ মুসলমানরা যখন সংখ্যায় অধিক, তখন সংখ্যাল্প হিন্দুরাই দাবী জানাইতে অধিকারী। ইহাই মহাত্মার অপরাধ! বীর সেনানী গর্জ্জিয়া উঠিয়াছেন,—"মিঃ গন্ধী শিখদিগকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি লাহোর কংগ্রেসে সে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে ক্ষেত্রে তিনি সর্দ্দার খড়্গ সিংকে বলিয়াছিলেন, "যখন শিখ ও মুসলমান উভয়েই সামরিক জাতি, তখন তাহারা উভয়ে আপনাদের মতবিরোধ মিটাইয়া লইতে পারে।" কিন্তু মজা এই, মাষ্টার তারা সিং এ কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন, "মহাত্মা গন্ধী এমন কথা কখনও বলেন নাই! আমি সেই সময়ে উপস্থিত ছিলাম।"

অ্যাংলো-ইণ্ডিয়া স্বার্থসাধনোদ্দেশে মহাত্মা গন্ধীর বিপক্ষে এমন মিথ্যা প্রচার করিয়া থাকে, কিন্তু ভারতীয় হিন্দু মুসলমান একপ মিথ্যা প্রচার দ্বারা কি স্বার্থসাধন করিতে পারিবেন?

আমাদের মনে হয়, ভারতের জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতাকামী

মুসলমানরা যতই পুষ্ট ও শক্তিশালী হইতেছেন (এত দিন আইন অমান্য করিয়া তাঁহাদের মধ্যে অনেকে জেলে ছিলেন), ততই সাম্প্রদায়িক স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনবাদী মুসলমানদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতেছে, আর তাহারই ফলে তাঁহারা যথেচ্ছা কদর্য্য প্রচারকার্য্য চালাইতেছেন। কিন্তু তাহার ফল কি শুভ হইবে?

হিন্দুরা জাতীয়তাবাদী, জননী জন্মভূমির মুক্তিকামী। তাহারা যেখানে সংখ্যায় অল্প, সেখানেও দেশের কল্যাণের জন্য স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন চাহে নাই। পরন্তু যখন সিন্ধু, বেলুচিস্থান এবং সীমান্তপ্রদেশকেও স্বায়ত্তশাসনতন্ত্র দিবার প্রস্তাব হইল, তখনও সীমান্তে এই প্রবল মুসলমান-রাজ-প্রতিষ্ঠার আশঙ্কা থাকিলেও তাহারা তাহাতে আপত্তি তুলে নাই, পাছে যারা ভারতের মুক্তিতে অন্তরায় উপস্থিত হয়! জাতীয় দলের মুসলমানরাও মনে প্রাণে জন্মভূমির মুক্তিকামী, তাই কাহারও অনুগ্রহ-নিগ্রহের মুখ না চাহিয়া নির্ভীকভাবে কংগ্রেসের দাবী অনুমোদন করিতেছেন। কেবল সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক স্বার্থান্ধ স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনপ্রার্থী মুসলমানরা সে পথে জুজুর ভয় দেখিতেছেন! স্বয়ং জমিয়তে-উল-উলেমার মত মুসলমানের প্রধান ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের দাবী সমর্থন করিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা 'উলেমাদের' চেয়েও বোধ হয় বড়!

বঙ্কিম সাহিত্য-সম্মেলন

আগামী ৬ই আষাঢ় সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের পদরেণুপূত কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিম সাহিত্য-সম্মেলনের নবম বার্ষিক অধিবেশন হইবে। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছেন রায় শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য বাহাদুর, সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী। শ্রীমতী অনুরূপা দেবী সভানেত্রীত্ব করিবেন বলিয়া সম্মতি দিয়াছেন। রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর দর্শন শাখার নেতৃত্ব করিবেন। বন্দে মাতরম্ মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালী সাহিত্যরসপিপাসু সাহিত্যামোদীর আরাধ্য দেবতা, সাহিত্যের আদর্শ—তাঁহার পুণ্য অবদানে বাঙ্গালা সাহিত্য চির-সমৃদ্ধ। তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার পূজা যে এখনও তাঁহার কয়েকটি অনুরক্ত ভক্ত অবিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছেন, ইহা বাঙ্গালীর সৌভাগ্য। বঙ্কিম-সাহিত্যানুরাগী বাঙ্গালীমাত্রেই যে পূজা ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদন করিবার জন্য তাঁহার স্মৃতি উৎসবে যোগদান করিবেন, এমন আশা আমরা অবশ্যই করিতে পারি।

বাঁধন-কষণের রক্ষাকবচ

কংগ্রেস কি গোলটেবিলে নির্দ্দিষ্ট বাঁধন-কষণ মানিয়া লইয়াছে,—প্রায়ই এই ভাবের প্রশ্ন পার্লামেণ্টে উত্থাপন করা হইতেছে। ল্যাঙ্কাশায়ারের প্রধান উকীল মিঃ চার্চ্চহিল ত এ কথা লইয়া সকলের কাণ ঝালাপালা করিয়া তুলিয়াছেন। ভারতের প্রতি মধুবর্ষী তাঁহার যে সব বক্তৃতা বাহির হইয়াছে, তিনি সেগুলি এক পুস্তিকার আকারে সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন,—উদ্দেশ্য, মিস মেয়োর মত ভারতের বিরুদ্ধে তাঁহার দেশবাসীকে উত্তেজিত করা, গোলটেবিল বৈঠক কাঁচাইয়া দেওয়া এবং নিছক রুদ্রনীতি ভারতে প্রবর্ত্তন করা। এই সাম্রাজ্যবাদী উদ্ধত ইংরাজটাই মহাত্মাজীকে নেংটা ফকীর বলিয়া গালি পাড়িয়াছিল এবং তাঁহাকে ও কংগ্রেসকে দূরে রাখিতে তাহার দেশবাসীকে পরামর্শ দিয়াছিল! এই চার্চ্চহিল রদারমিয়ার শ্রেণীর স্বার্থসর্ব্বস্ব সাম্রাজ্যবাদীদের মুখের বুলিই হইতেছে,—ভারতে যে শাসন ব্যবস্থা করা হউক, আগে যেন কাড়াইয়া লওয়া হয় যে, বাঁধনকষণগুলি অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

কিন্তু কংগ্রেসকে যদি বাঁধন-কষণগুলি মানিয়া লইতেই হয়, তবে আর এত খরচপত্র ও ঘটা করিয়া গোলটেবিলে যাওয়ার প্রয়োজন কি? প্রথম বৈঠক সম্পূর্ণ হয় নাই বলিয়াই ত কংগ্রেসকে আমন্ত্রণ করিয়া আপোস করিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। সুতরাং কংগ্রেসের সহিত বিচার আলোচনা না করিয়া কিরূপে পূর্ব্বাহ্নে বাঁধনকষণের কড়ার করাইয়া লওয়া হইবে?

সংহিত রাষ্ট্র-তন্ত্র-শাসন সমিতি যে রিপোর্ট দাখিল করেন, তাহার এক স্থানে আছে,—"যদিও অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়ে সাব-কমিটীর অধিকাংশ সদস্য একমত হইয়াছেন, তথাপি ইহা স্পষ্ট করিয়া জানা আবশ্যক যে, এই চুক্তি সাময়িক। যখন তাঁহারা রাষ্ট্রগঠন কমিটীর পূর্ণাবয়ব প্রস্তাবসমূহ আলোচনা করিবেন, তখন তাঁহারা এ যাবৎ যে সাময়িক চুক্তির ব্যবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, তাহা রদবদল বা পরিবর্দ্ধন সংশোধন করিতে পারিবেন।"

ইহাতে কি প্রথম বৈঠকে ধার্য্য প্রস্তাব পরিবর্ত্তন-পরিবর্জ্জন করিবার কথা নাই? তবে?

এই বাঁধনকষণের রক্ষাকবচ সম্বন্ধে লর্ড আরউইন একটি সুন্দর কথা বলিয়াছেন। তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমনের পর এক সভায় বলিয়াছিলেন, "ভারতবাসীর সন্তোষ ও শান্তিই আমাদের শ্রেষ্ঠ বাঁধনকষণ—শ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ।" চার্চ্চহিল ও রদারমিয়ার প্রমুখ সাম্রাজ্যগর্ব্বীরা যত দিন এ কথা মনে প্রাণে অনুভব না করিবেন, তত দিন কোন শান্তি পাইবেন না।

রবীন্দ্র জয়ন্তী

পূর্ব্বগগনে যে রবি সমুদিত হইয়া প্রতিভাকিরণ-সম্পাতে ভারতাকাশ ভাস্বর করিয়া চিন্তা-রশ্মি-রেখা সম্প্রসারণে প্রতীচ্য জগৎ প্রভাম্বিত করিয়াছে; যে বিশ্বপ্রেমিক কবির সৌন্দর্য্য অনুভূতির পুলক-জ্যোৎস্নায়—প্রেমের সম্মোহন রাগিণী-ঝঙ্কারে—কাব্যনন্দনের পারিজাত-সুষমায় সাহিত্য-রস-সুরসিক সুধীজন-সমাজ পুলক-আবেশে আত্মহারা—পাশ্চাত্য মনীষিগণ তন্ময়;—যাঁহার প্রতিভা-নৈপুণ্যে বিশ্ব-সাহিত্যের সত্তায় বঙ্গসাহিত্য সসম্মানে প্রতিষ্ঠা-গৌরবলাভে সমর্থ হইয়াছে, তাঁহারই কল্পনার লীলাকুঞ্জ শান্তিনিকেতনে আম্রকাননে চন্দ্রাতপতলে—আলিপনা-সুচিত্রিত—কমলদল-সুশোভিত—প্রাতঃসূর্য্য-প্রভাসিত বেদীর উপর বিশ্বকবির সপ্ততিতম জন্মোৎসব—রবীন্দ্র-জয়ন্তী ২৫শে বৈশাখ সুসম্পন্ন হইয়াছে। শুভ্রকেশ শুভ্রশ্মশ্রু পীতবাসপরিহিত—চন্দন-চর্চ্চিত-ললাট কবির প্রতিভাদীপ্ত সুগৌর মূর্ত্তি যেন প্রাচীন ভারতের যাজ্ঞিক ঋষির পরিকল্পনা পরিস্ফুট করিয়াছিল। বৈদিক মন্ত্রে সম্বর্দ্ধনা—আশীর্ব্বাদ-প্রশস্তি—চীনের কবি ও চিত্রশিল্পীর চৈনিক কবিতাচিত্রে অভিনন্দনের পর মহিলাগণ মাঙ্গলিক দ্রব্য পূজা-উপকরণ-সম্ভার লইয়া কবিবরকে বরণ করিয়াছেন। সমবেত সাহিত্য-সাধক ও মনীষিগণের শ্রদ্ধা-ভক্তি অর্ঘ্য—সম্মান উপহার ভারতগৌরব বিশ্বকবি সাদরে—সসম্মানে গ্রহণ করিয়াছেন। উৎসব-প্রাঙ্গণে কবিবর যে অভিভাষণটি প্রদান করিয়াছেন, নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত সঙ্কলন প্রদত্ত হইল।

"নিজের সত্য পরিচয় পাওয়া সহজ নয়। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভিতরকার মূল ঐক্যসূত্রটি ধরা পড়তে চায় না। বিধাতা যদি আমার আয়ু দীর্ঘ না করতেন—সত্তর বৎসরে পৌঁছিবার অবকাশ না দিতেন, তা হ'লে নিজের সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করবার অবকাশ পেতাম না। নানাখানা ক'রে নিজেকে দেখেছি—নানা কাজে প্রবর্ত্তিত করেছি—ক্ষণে ক্ষণে তাতে আপনার অভিজ্ঞান আপনার কাছে বিক্ষিপ্ত হয়েছে। জীবনের দীর্ঘ চক্রপথে প্রদক্ষিণ করতে করতে

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ

আজ বিদায়কালে আজ সেই চক্রকে সমগ্ররূপে যখন দেখতে পেলাম, তখন একটা কথা বুঝতে পেরেছি যে, একটিমাত্র পরিচয় আমার আছে। সে আর কিছুই নয়, আমি কবি মাত্র।

"আমার চিত্ত নানা কর্ম্মের উপলক্ষে ক্ষণে ক্ষণে নানাজনের গোচর হয়েছে। তাতে আমার পরিচয়ের সমগ্রতা নেই। আমি তত্ত্বজ্ঞানী—শাস্ত্রজ্ঞানী—গুরু বা নেতা নই। এক দিন আমি বলেছিলাম, 'আমি চাইনে হ'তে নববঙ্গে নবযুগের চালক'।—সে কথা সত্য বলেছিলাম। শুভ্র নিরঞ্জনের যাঁরা দূত, তাঁরা পৃথিবীর পাপক্ষালন করেন—মানবকে নির্ম্মল—নিরাময়—কল্যাণব্রতে প্রবর্ত্তিত করেন, তাঁরা আমার পূজ্য, তাঁদের আসনের কাছে আমার আসন পড়েনি। কিন্তু সেই এক শুভ্রজ্যোতি যখন বহুচিত্রিত হন, তখন তিনি নানা বর্ণের আলোকরশ্মিতে আপনাকে বিচ্ছুরিত করেন, বিশ্বকে রঞ্জিত করেন, আমি সেই বিচিত্রের দূত। আমরা নাচি, নাচাই, হাসি, হাসাই, গান করি, ছবি আঁকি, যে আবিঃ বিশ্বপ্রকাশের অহৈতুক আনন্দে অধীর, আমরা তাঁরি দূত। বিচিত্রের লীলাকে অন্তরে গ্রহণ ক'রে তাকে বাহিরে লীলায়িত করা—এই আমার কাজ। মানবকে গম্য স্থানে চালাবার দাবী রাখিনে, পথিকদের চলার সঙ্গে চলার কাজ আমার। পথের দুধারে যে ছায়া, যে সবুজের ঐশ্বর্য্য, যে ফুলপাতা, যে পাখীর গান, সেই রসের রসদে জোগান দিতেই আমরা আছি। যিনি বিচিত্র বহু হয়ে খেলে বেড়ান—দিকে দিকে, সুরে গানে, নৃত্যে চিত্রে, বর্ণে বর্ণে, রূপে রূপে, সুখ-দুঃখের আঘাতে সংঘাতে, ভালোমন্দের দ্বন্দ্বে, তাঁর বিচিত্র রসের বাহনের কাজ আমি গ্রহণ করেছি। তাঁর রঙ্গশালার বিচিত্র রূপকগুলিকে সাজিয়ে তোলবার ভার পড়েছে আমার উপর, এই-ই আমার একমাত্র পরিচয়।

"অন্য বিশেষণও লোকে আমাকে দিয়েছেন, কেউ বলেছেন, তত্ত্বজ্ঞানী, কেউ আমাকে স্কুলমাষ্টারের পদে বসিয়েছেন। কিন্তু বাল্যকাল থেকেই কেবলমাত্র খেলার ঝোঁকেই স্কুলমাষ্টারকে এড়িয়ে এসেছি—মাষ্টারী পদটা আমার নয়। বাল্যে নানা সুরের ছিদ্রকরা বাঁশী হাতে যখন পথে বেরলুম, তখন ভোরবেলায় অস্পষ্টের মধ্যে স্পষ্ট ফুটে উঠতে চাচ্ছিল, সেই দিনের কথা মনে পড়ে। সেই অন্ধকারের সঙ্গে আলোর প্রথম শুভদৃষ্টি; প্রভাতের বাণীবন্যা যে দিন আমার মনে তার প্রথম বাঁধ ভেঙ্গেছিল,—দোল লেগেছিল চিত্তসরোবরে—ভালো ক'রে বুঝি বা না বুঝি, বলতে পারি বা না পারি, সেই বাণীর আঘাতে বাণীই জেগেছে। বিশ্বে বিচিত্রের লীলায় নানা সুরে, চঞ্চল হয়ে উঠেছে নিখিলের চিত্ত, তারি তরঙ্গে বালকের চিত্ত চঞ্চল হয়েছিল—আজো তার বিরাম নেই।

"সত্তর বৎসর পূর্ণ হ'ল, আজো এ চপলতার জন্য বন্ধুরা অনুযোগ করেন, গাম্ভীর্য্যের ত্রুটি ঘটে। কিন্তু বিশ্বকর্ম্মার ফরমাসের যে অন্ত নাই। তিনি যে চপল, তিনি যে বসন্তের অশান্ত সমীরণে ভাবলেশে ভাবলেশে চিরচঞ্চল। গাম্ভীর্য্যে নিজেকে গড়পাই' ক'রে আমি তো দিন পোয়াতে পারিনে। এই সত্তর বৎসর নানাপথ আমি পরীক্ষা ক'রে দেখেছি। আজ আমার আর সংশয় নেই, আমি চঞ্চলের লীলা-সহচর। আমি কি করেছি, কি রেখে যেতে পারব, সে কথা জানিনে। স্বাসিদ্ধের আবদার করব না, খেলেন তিনি, কিন্তু আসক্তি রাখেন না; যে খেলা-ঘর নিজে গড়েন, তা আবার নিজেই ঘুচিয়ে দেন। তাঁর খেলা-ঘরের যদি কিছু খেলনা জুগিয়ে দিয়ে থাকি, তা মহাকাল সংগ্রহ ক'রে রাখবেন, এমন আশা করিনে। ভাঙ্গা খেলনা আবর্জ্জনা স্তূপে যাবে। যত দিন বেঁচে আছি, সেই সময়টুকুর মতই মাটীর ভাঁড়ে যদি কিছু আনন্দরস জুগিয়ে থাকি, সেই যথেষ্ট। তার পরের দিন রসও ফুরোবে, ভাঁড়ও ভাঙ্গবে। কিন্তু তাই ব'লে শোক ক'রে দেউলে হবে না।

"সত্তর বৎসর পূর্ণ হবার দিন আজ আমি বসন্তের দোহাই দিয়ে সবাইকে বলি যে, আমি কার চেয়ে বড় কি ছোট, সেই বার্থ বিচারে খেলার রস নষ্ট হয়। পরিমাপকের দল মাপকাঠি নিয়ে কলরব করচে, তাদেরকে ভোলা চাই। সেকালের প্রাচীর যে হবির লুঠ ধূলোয় ধূলোয় লোটায়, তা নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে চাইনে। মজুরীর হিসেব নিয়ে চড়া গলায় তর্ক করবার বুদ্ধি যেন আমার না ঘটে।"

অতঃপর শান্তিনিকেতনের পরিকল্পনা প্রসঙ্গে কবি বলেন :—

"এই আশ্রমের কর্ম্মের মধ্যেও যেটুকু প্রকাশের দিক, তাই আমার, এর যে সঙ্কেত দিক— যাঁরা তা চালনা করচেন। মানুষের আত্মপ্রকাশের ইচ্ছাকে আমি রূপ দিতে চেয়েছিলাম। সেই জন্যেই তার রূপ-ভূমিকার উদ্দেশে একটি তপোবন খুঁজেছি। নগরের ইটকাঠের মধ্যে নয়, এই নীলাকাশ উদয়াস্তের প্রাঙ্গণে এই সুকুমার বালক-বালিকাদের লীলা-সহচর হ'তে চেয়েছিলাম। এই আশ্রমের প্রাণ-সম্মিলনের যে কল্যাণময় সুন্দর রূপ জেগে উঠেছে, সেটিকে প্রকাশ করাই আমার কাজ। এর বাহিরের কাজও কিছু প্রবর্ত্তন করেছি, কিন্তু সেখানে আমার চরম স্থান নয়, এর যেখানটিতে রূপ, সেখানটিতে আমি। গ্রামের অব্যক্ত বেদনা যেখানে প্রকাশ—খুঁজে ব্যাকুল, আমি তার মধ্যে। এখানে আমি শিশুদের যে ক্লাস করেছি, সেটা গৌণ—প্রকৃতির লীলাক্ষেত্রে শিশুদের সুকুমার জীবনের এই যে প্রথম আরম্ভরূপ, এদের জ্ঞানের অধ্যবসায়ের আদি সূচনায় যে উষাকণ-দীপ্তি, যে নবোদ্গত উদ্যমের অঙ্কুর, তাকেই অবারিত করবার জন্য আমার প্রয়াস, না হ'লে আইন-কানুন 'সিলেবাসে'র জঞ্জাল নিয়ে মরতে হ'ত। এই সব বাহিরের কাজ গৌণ, সে জন্য আমার বন্ধুরা আছেন। কিন্তু লীলাময়ের লীলার ছন্দ মিলিয়ে এই শিশুদের নাচিয়ে গাইয়ে—কখনো ছুটি দিয়ে এদের চিত্তকে আনন্দে উদ্বোধিত করবার চেষ্টাতেই আমার আনন্দ—আমার সার্থকতা।

"এর চেয়ে গম্ভীর আমি হ'তে পারব না, শঙ্খঘণ্টা বাজিয়ে যাঁরা আমাকে উচ্চমঞ্চে বসাতে চান, তাঁদের আমি বলি, আমি নীচেকার স্থান নিয়েই জন্মেছি, প্রবীণের প্রধানের আসন থেকে খেলার ওস্তাদ আমাকে ছুটি দিয়েছেন। এই ধূলোমাটি ঘাসের মধ্যে আমি হৃদয় ঢেলে দিয়ে গেলাম—বনস্পতি ওষধির মধ্যে। যারা মাটির কোলের কাছে আছে, যারা মাটির হাতে মানুষ, যারা মাটিতেই হাঁটতে আরম্ভ ক'রে শেষকালে মাটিতেই বিশ্রাম করে, আমি তাদের সকলের বন্ধু—আমি কবি।"

বিশ্বপ্রেমে আত্মহারা চিরনবীন কবি, এই ত তোমার যোগ্য কথা—তুমি শুধু কবি—গুরু নয়—নেতা নয়। মঙ্গলময়ের অনুপ্রেরণা তোমার ধ্যানে সঞ্চালিত—সমাহিত; তোমার ছন্দের লাস্য-লীলায় সেই সত্য-শিব-সুন্দরেরই বিচিত্র বিকাশমাধুরী। তোমার মহনীয় চিন্তার দান জাতীয় সাহিত্যের অতুল্য সম্পদ—জাতীয় জীবনের মৃতসঞ্জীবনী সুধা। সাহিত্যের অক্ষয় আধারে সংরক্ষিত এ চিরবরণীয় সাধনার প্রভাবে জাতি যুগে যুগে উপকৃত—শান্তি ও তৃপ্তি-লাভে ধন্য হইবে। তোমার প্রতিভার প্রোজ্জ্বল প্রভা, উদ্দীপন সঙ্গীতের দীপকরাগিণী কত নেতাকে প্রবুদ্ধ—দেশাত্মবোধে উদ্বোধিত—অনুপ্রাণিত করিবে। তোমার অনন্ত সৌন্দর্য্যের আনন্দ অনুভূতি—স্বর্গীয় প্রেমের বিমল দ্যুতি কত শত জীবনকে সুষমা-মাধুর্য্যে সম্মোহিত—প্রভান্বিত করিবে। তুমি নিন্দা স্তুতি, সমালোচনা প্রশংসা, অভিনন্দন আশীর্ব্বাদ, পরিমাপ পরিমাণ, তুলনা উপমার অতীত। তোমার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার বৈচিত্র্যময় সৃষ্টি-নৈপুণ্যের সীমানির্দ্দেশের যোগ্য সমালোচক কোথায়? তুমি উপনিষদের ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ—আমাদের প্রণাম গ্রহণ কর।

———

পরলোকে লক্ষ্মণ শাস্ত্রী

...শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার পবিত্র বারাণসী তীর্থে পণ্ডিত-...বেদান্ত দ্রাবিড়ী মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ শাস্ত্রী মহাশয় দেহ-রক্ষা করিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং সংস্কৃত কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপনা করিতেন। তাঁহার ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত অধুনা বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; বিশেষতঃ বৈদিক সাহিত্যে তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। বিচারপতি উডরফ তাঁহার নিকটে সংস্কৃত সাহিত্য ও তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া-

লক্ষ্মণ শাস্ত্রী
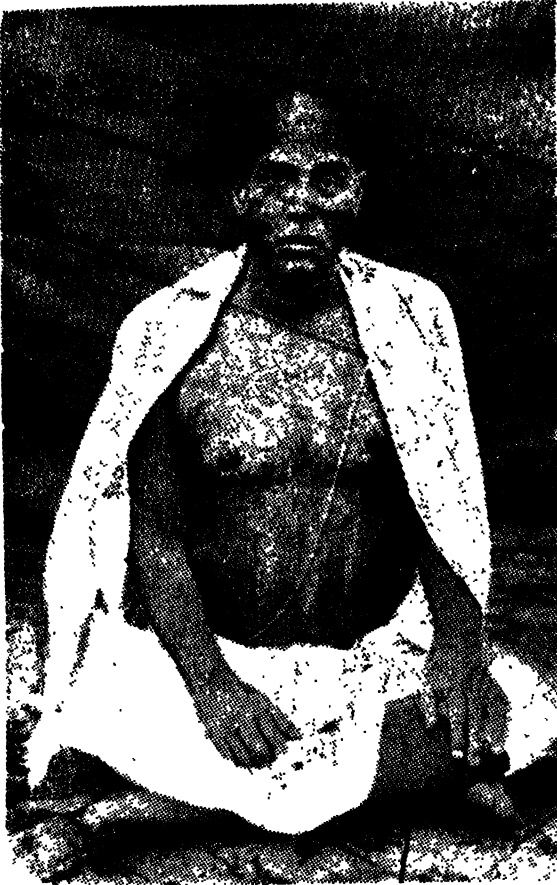
...লেন। কর্মক্ষেত্রেও শাস্ত্রী মহাশয়ের কীর্ত্তিকলাপ অনন্যসাধারণ। ...কুমার ভবন তাঁহারই কীর্ত্তির নিদর্শন। বারাণসীধামে ...ন একটি সংস্কৃত বেদবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। ...ভিন্ন তিনি বারাণসীর নিখিল ভারতীয় বর্ণাশ্রম এবং দাতব্য ...সালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। আর্য্য-হিন্দুর হিন্দুত্ব রক্ষা—আনুষ্ঠানিক হিন্দুধর্ম্মের গৌরব প্রচার—ব্রাহ্মণ্য-গৌরবের উদ্বোধন তাঁহার জীবনব্রত ছিল। কাশীর ব্রাহ্মণ-মহাসম্মেলনের তিনি অন্যতম প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। প্রতিভায়, পাণ্ডিত্যে, ধর্ম্মপ্রাণতায়, ব্রাহ্মণত্বের গৌরবে এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় তাঁহার সমতুল্য লোক অধুনা খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর।

পরলোকে সতীশচন্দ্র মিত্র

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক এবং অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মিত্র ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। অধ্যাপক হিসাবে তিনি দৌলতপুর কলেজের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। অক্লান্ত ঐতিহাসিক গবেষণা, পরিশ্রম এবং সাহিত্যসেবা সতীশচন্দ্রকে বাঙ্গালী জাতির স্মৃতিপথে চিরদিন জাগরূক রাখিবে। তাঁহার রচিত "যশোহর-খুলনার ইতিহাস" বাঙ্গালী জাতির বহু বিস্মৃতপ্রায় অতীত ঘটনার অবদানপরম্পরায় মহিমান্বিত হইয়া নবজাগ্রত জাতিকে আত্মবিশ্বাসিরূপে গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছে। সতীশ বাবুর বিয়োগে বাঙ্গালা সাহিত্যের—বিশেষতঃ ইতিহাস-সাহিত্যের যে ক্ষতি হইল, তাহা কত দিনে পূর্ণ হইবে, জানি না। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে অনেক শিক্ষিত বাঙ্গালী প্রতীচ্য ভাবধারায় আত্মহত্যা করিয়া থাকেন; কিন্তু সুপণ্ডিত সতীশচন্দ্র কায়মনোবাক্যে হিন্দু ছিলেন। ধর্ম্মে তাঁহার অচলা মতি ও বিশ্বাস ছিল। তাঁহার মত খাটি মানুষের অভাব বাঙ্গালীকে অনুভব করিতেই হইবে।

মামুদাবাদের লোকান্তর

মামুদাবাদের মহারাজা সার মহম্মদ আলি মহম্মদ খাঁ, খাঁ বাহাদুর, গত ১৩শে তারিখে ৫৪ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি যুক্তপ্রদেশের বিশিষ্ট তালুকদার; ১৯২১ খৃষ্টাব্দে যুক্তপ্রদেশ সরকারের শাসনপরিষদের স্বরাষ্ট্রসচিব হইয়াছিলেন। তিনি নিখিল ভারত শিক্ষা বৈঠকের প্রেসিডেণ্ট, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার, মুসলিম লীগেরও প্রেসিডেণ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু এ সকল কারণে তাঁহার নাম ভারতবাসীর স্মরণীয় হয় নাই। তিনি জন্মভূমির অনুরক্ত ভক্ত জাতীয়তাবাদী মুক্তিকামী মুসলমান দলের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন এবং অবস্থাপন্ন ব্যক্তি হইয়াও দেশের মুক্তিযুদ্ধে অগ্রণী ছিলেন বলিয়াই আজ তাঁহার অকাল-মৃত্যুতে সমগ্র দেশ শোকাচ্ছন্ন হইয়াছে। তিনি স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের ঘোর বিরুদ্ধবাদী ছিলেন এবং উহা তাঁহার সমাজের পক্ষে মহা অনিষ্টকর বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। বস্তুতঃ দেশের এই সঙ্কটসঙ্কুল সন্ধিক্ষণে তাঁহার ন্যায় দেশ-প্রেমিক নেতার অতর্কিত মৃত্যু দেশের সমূহ ক্ষতির কারণ।

মহাচীন

চীন সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট জেনারল চিয়াং কাইসেক যে সময়ে নানকিং সহরে সুপ্রতিষ্ঠ হইয়া বসিয়া চীনদেশ হইতে বিদেশীর অন্যায় অধিকার লুপ্ত করিয়া দিবার আয়োজনে বদ্ধপ্রতিজ্ঞ হইয়া ঘোষণাপত্র প্রচার করিতেছেন, ঠিক সেই সময়ে দক্ষিণ-চীন, সাধারণতন্ত্র সরকারের বিপক্ষে বিদ্রোহধ্বজা উড্ডীন করিয়াছে। ক্যাণ্টনের সৈন্যদল সাধারণতন্ত্রের সেনাদলকে রণে পরাস্ত করিয়া রাজধানী নানকিং অধিকার করিতে দ্রুত ধাবমান হইয়াছে, এই ভাবের সংবাদ আসিয়াছে।

চিয়াং কাইসেক

চাং-সুয়েলিয়াং

মাত্র ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে নানকিং-এর সাধারণতন্ত্র সরকারের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, কিন্তু এই কয় বৎসরেই উহার কত ভাগ্যবিপর্য্যয় হইয়াছে! ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে নানকিং কর্তৃপক্ষ উত্তর-চীনের মিত্র জঙ্গীলাটদিগকে পরাজিত করিয়া বিরাট চীন সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। এই যুদ্ধজয়ের ফলে নানকিং সরকার (১) মাঞ্চুরিয়ার উপর কর্তৃত্ব অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছেন, (২) বিদেশীদের অন্যায় অধিকার নাকচ করিবার পথ প্রশস্ত করিয়াছেন, (৩) বৃটেনের নিকট হইতে ওয়াই-হাই-উই ফিরিয়া পাইয়াছেন, (৪) জাপানের সহিত নূতন বাণিজ্য-সন্ধি স্বাক্ষরিত করিয়া লইয়াছেন।

ফেঙ্গ-উসিয়াং

চাং-সোলিন

১৯৩১ খৃষ্টাব্দও যে জাতীয় চীন সরকারের পক্ষে ঘটনাবহুল হইতেছে, ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। মার্কিণ ও জার্ম্মাণী হইতে বিরাট ঋণ গ্রহণের ব্যবস্থা হইতেছে। বলা বাহুল্য, এই ঋণের অর্থে চীন দেশের অনেক সংস্কারকার্য্য সাধিত হইবে বলিয়া শুনা যাইতেছে। দক্ষিণ-মাঞ্চুরিয়া রেল এখন জাপানের হস্তে আছে। চীন সরকার এই হেতু ঋণের টাকা হইতে মাঞ্চুরিয়ায় নিজস্ব রেলপথ নির্ম্মাণের কল্পনা করিতেছেন। জাপান ও বৃটেনের সহিত চীন সরকার নূতন নূতন আন্তর্জ্জাতিক সন্ধিসর্ত্তের আলোচনা করিতেছেন। জার্ম্মাণীর সহিত বন্দোবস্ত করিয়া বার্লিন হইতে সাংহাই পর্য্যন্ত বিমানপোত যাতায়াতের ব্যবস্থা করিতেছেন।

কিন্তু ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে যে গৃহযুদ্ধ হইয়াছিল, তাহার ফলে চীনের প্রায় ২৫ কোটি ইয়েন ব্যয়িত হইয়াছে এবং ৩ লক্ষ লোক হতাহত হইয়াছে। সে ক্ষতি পূরণ করিতে চীনের এখনও বহুদিন লাগিবে। প্রেসিডেণ্ট চিয়াং কাইসেক এই হেতু এখন গঠনকার্য্যে মনোযোগ দিয়াছিলেন।

কিন্তু তাঁহার কার্য্যে বিষম অন্তরায় উপস্থিত হইল। চীনের বিখ্যাত খৃষ্টান সেনাপতি ফেঙ্গ উসিয়াং ও জেনারল ইয়েন ক্যাণ্টনের বিদ্রোহীদের সহিত যোগদান করিয়াছেন। এই দুই সেনাপতি পূর্ব্বে মাঞ্চুরিয়ার 'ওয়ার লর্ড' চাং-সোলিনের পুত্র জেনারল চাং-সুয়েলিয়াং-এর সহিত যোগদান করিয়া নানকিং সরকারের জেনারল চিয়াং কাইসেকের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু চাং-সুয়েলিয়াং যখন চিয়াং কাইসেকের সহিত সন্ধি করিয়া নানকিং সরকারের বশ্যতা স্বীকার করেন, তখন তাঁহারা চীনের কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এখন আবার সুযোগ বুঝিয়া তাঁহারা গৃহবিবাদে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন। এ গৃহযুদ্ধের পরিণাম কি, তাহা কে বলিতে পারে?

সম্পাদক—শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী-রোটারী-মেসিনে' শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

১০ম বর্ষ] আষাঢ়, ১৩৩৮ [৩য় সংখ্যা

শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা

(ভ্রম-সংশোধন)

।-মোহ-জটিল, অনিত্য, পরিবর্ত্তনশীল জগতে নিত্য সত্য ঃর সন্ধান দিবার নিমিত্ত যিনি অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এই পরম সত্যকে স্বয়ং উপলব্ধি করিবার নিমিত্ত যাঁহার প্রাণপাত সাধনা এই সত্য-বিমুখ যুগকে মহামহিমান্বিত করিয়াছে, সেই সত্যময় পুরুষ-প্রবরের জীবনাখ্যানে যদি কোনখানে অণুমাত্র অসত্য লিপিবদ্ধ হয়, তুচ্ছাদপি তুচ্ছ হইলেও তাহা নিরতিশয় ক্ষোভ, দুঃখ ও লজ্জার কারণ হইয়া উঠে। মাসিক বসুমতীর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা' প্রবন্ধে এমনি একটি ভ্রান্তির ছায়াপাত হইয়াছে। উক্ত প্রবন্ধে লেখা আছে, ঈশ্বরদাস র‍্যাকের শিষ্য। এ কথা সম্পূর্ণ ভুল। ঈশ্বরদাস ঈশান-দের শিষ্য এবং ইঁহারা ব্রজবাসী।

শ্রীরামকৃষ্ণ যখন শ্রীবৃন্দাবন-দর্শনে গমন করেন, তখন রদাস যুবা পুরুষ। বলিষ্ঠকায় ছিলেন বলিয়া তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের শরীররক্ষকের কার্য্য করিতেন। তাহার অ-শুকও ছিল। বালক-স্বভাব শ্রীরামকৃষ্ণ আপনাকে নি সামলাইতে পারিতেন না। হৃদয় সর্ব্বসময় মাতুলের ের থাকিলেও ভিক্ষার্থিগণের উপদ্রব হইতে তাঁহাকে করিবার জন্ত অপর এক জন বলবান্ ব্যক্তির প্রয়োজন হইত। রাণী রাসমণির বংশের যে কেহ যখন বৃন্দাবনে যাইতেন, এই ব্রজবাসীদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন।

ভুল নগণ্য হইলেও শ্রীরামকৃষ্ণ-কথায় তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া লেখক আন্তরিক ক্ষুব্ধ, দুঃখিত এবং লজ্জিত। যিনি কোন দিন সত্যের সেই সজীব বিগ্রহ দর্শন করিয়া চক্ষু সার্থক ও জীবন ধন্য করিয়াছেন, তিনিই জানেন, সেই সত্যময় পরমপুরুষের পরিবেষ্টনীর ভিতর কোনরূপ অসত্যের প্রবেশাধিকার ছিল না। সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেন মহাশয় সেই অসত্যের প্রতি লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করায় সকৃতজ্ঞ-হৃদয়ে তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, সত্যকথা কলির তপস্যা। যার সত্যের আঁট আছে, সে সত্যের ভগবান্‌কে পায়।

তিনি শ্রীশ্রীজগদম্বার চরণে ভাল-মন্দ, জ্ঞান-অজ্ঞান, পাপ-পুণ্য, ধর্ম্ম-অধর্ম্ম, সমস্তই সমর্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সত্য দিতে পারেন নাই। এই জন্যই দেখিতে পাওয়া যায়, কি ছোট কি বড় সকল ব্যাপার ও বিষয়েই শ্রীরামকৃষ্ণের সত্যনিষ্ঠা সকল সময় সমভাবে স্বপ্রকাশ। তাঁহার যখন নবম বর্ষ বয়স, সেই সময় তাঁহার উপনয়ন হয়। ইতিপূর্ব্বে কোন সময় ধাত্রীমাতা ধনী কামারিণীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে

বালক গদাধর প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল, উপনয়নে তিনি তাহার ভিক্ষামাতা হইবেন। অশূদ্র-প্রতিগ্রাহী বংশে কখন এরূপ ব্যভিচার হয় নাই। জ্যেষ্ঠের সহস্র অনুযোগ, তিরস্কার সত্ত্বেও নবমবর্ষীয় বালক বিচলিত হন নাই। বলিলেন, যে সত্যরক্ষা না করে, সে যজ্ঞসূত্র ধারণের অযোগ্য।

তার পর কিশোর-বয়স্ক গদাধর যখন টাকা-মাটী—মাটী-টাকা বলিতে বলিতে সর্ব্বলোককাম্য লক্ষ্মীর ঐশ্বর্য্য জলসই করিলেন, তখন হইতে টাকা বা কোন ধাতব দ্রব্য স্পর্শ করা দূরে থাক, অজ্ঞাতসারে তাঁহার অঙ্গ-স্পৃষ্ট হইলে শ্বাস রুদ্ধ ও

বলিতেন, যার সত্যনিষ্ঠা আছে, মা তার কথা কখন মিথ্যা হতে দেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে গোপালের মা তাঁর এক জন চিহ্নিত সেবিকা। এক দিন স্থির হইল, দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া ভাত রাঁধিয়া তিনি ঠাকুরকে খাওয়াইবেন। রন্ধন শেষ হইল, যথাসময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ আহারে বসিলেন। কিন্তু ভাতে হাত দিয়াই দেখিলেন, শক্ত রহিয়াছে। অন্ন সুসিদ্ধ হয় নাই। সহসা তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইল, এ ভাত কি আমি খেতে পারি? ওর হাতে আর কখন ভাত খাব না।

গোপালের মা

শ্রীশ্রীমা

শরীর কুঞ্চিত হইত। লক্ষ্মীনারায়ণ মাড়োয়ারী যখন তাঁহাকে অর্থ গ্রহণ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন, তখন তিনি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়াছিলেন।

মন-মুখ এক, এই অদ্ভুত সত্যাশ্রয়ী, সত্য-সঙ্কল্প পুরুষের তুচ্ছ, ছোট-খাট কাযে ও কথায় কখন কোন বৈলক্ষণ্য দেখা যাইত না। অমুকের কাছ থেকে অমুক জিনিষ নোব বলিয়াছেন, সে ভিন্ন অন্য কেহ কাতর মিনতি করিলেও গ্রহণ করিতে পারেন নাই। যখন যেখানে যাব বলিয়াছেন, ঠিক সেই সময় সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন।

গোপালের মা'র প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের অপার করুণা অসীম স্নেহের কথা স্মরণ করিয়া তখন সকলেরই মনে হইয়াছিল, কথাগুলি সাময়িক উত্তেজনার প্রয়োগ; কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা গেল, তাহাই ঘটিল। এই ঘটনার স্বল্পকাল পরেই শ্রীরামকৃষ্ণের গল-রোগের সূচনা, অনতিপরে অন্নাহার বন্ধ। মা যে এমন করিয়া তাঁর সাময়িক উত্তেজনার কথা সত্যে পরিণত করিবেন, কে ভাবিয়াছিল?

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত-জননী শ্রীশ্রীমা তখন দক্ষিণেশ্বরে নহবতে

দক্ষিণেশ্বরের নহবতের ঘর

ঘরে বাস করেন এবং ঐখানেই ঠাকুরের আহার্য্য প্রস্তুত হয়। এক দিন শ্রীরামকৃষ্ণের কক্ষে অন্ন-ব্যঞ্জন আনিতে আনিতে মা শুনিতে পাইলেন, ভাবাবেশে ঠাকুর বলিতেছেন, এর পরে আর অন্য কোন জিনিস খাব না, কেবল পায়সান্ন। মা জানিতেন, তাঁহার অলৌকিক স্বামীর মুখ দিয়া একবার যে কথা বাহির হয়, তাহার আর অন্যথা হয় না। বলিলেন, পায়েস কেন? আমি ঝোল-ভাত ক'রে দোব, খাবে। শ্রীরামকৃষ্ণ সেই ভাবাবস্থায় বলিলেন—না, না, পায়সান্ন। এ ঘটনাও গল-রোগের অব্যবহিত পূর্ব্বে। অন্নাহার বন্ধ হইয়া গেল। পরে দুধ-বালি, সাগু, ভার্মিসিলি খাইতে খাইতে শ্রীরামকৃষ্ণ এক দিন বলিয়াছিলেন—মা, এই কি পায়েস খাওয়া!

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের কেমিক্যাল এগজামিনার রামচন্দ্র দত্ত শ্রীরামকৃষ্ণের পরম ভক্ত ছিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে ঠাকুরকে নিজ বাসভবনে লইয়া গিয়া উৎসবাদি করিতেন। ইতিপূর্ব্বে শ্রীরামকৃষ্ণ কোন সময় বলিয়াছিলেন, লুচি খাবুনি। দত্ত মহোদয়ের বাটীতে আহারে বসিয়া লুচিগুলি একপাশে ঠেলিয়া রাখিয়া কেবল মিঠাই দিয়া পেট ভরাইলেন। প্রভু কি করেন! এক দিকে সত্যরক্ষা, অন্য দিকে বেজায় ক্ষুধা!

শম্ভুচন্দ্র মল্লিক

রাণী রাসমণির জামাতা মথুরমোহনের ন্যায় কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী, দানবীর শম্ভুচন্দ্র মল্লিকও শ্রীরামকৃষ্ণের এক জন চিহ্নিত সেবক ও রসদ্দার ছিলেন। দক্ষিণেশ্বর দেবোদ্যানের পার্শ্বে ইঁহার একখানি রমণীয় উদ্যান ছিল। ঠাকুর মধ্যে মধ্যে তথায় যাইয়া শম্ভুচন্দ্রের সহিত ভগবচ্চর্চা করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ উদরাময় পীড়ায় কষ্ট পাইতেছেন শুনিয়া শম্ভু বলিলেন, তুমি যাবার সময় আমার কাছ থেকে একটু আফিং চেয়ে নিয়ে গিয়ে খেয়ো,

কলিকাতার পুরাতন মেডিক্যাল কলেজ

রামচন্দ্র দত্ত

সেরে যাবে। কিন্তু কথায় কথায় উভয়েই সে কথা ভুলিয়া গেলেন এবং রাত্রি অধিক হইয়াছে দেখিয়া শম্ভু অন্দরে গমন করিলেন। . পথে আসিতে আসিতে আফিমের কথা শ্রীরামকৃষ্ণের স্মরণ হইল। ঠাকুর ফিরিয়া গিয়া শম্ভুর জনৈক কর্ম্মচারীর নিকট হইতে উক্ত দ্রব্য চাহিয়া লইয়া নিজ বাসাভিমুখে পুনরায় অগ্রসর হইলেন। কিন্তু কিছু দূর আসিয়াই দেখিলেন, পথ ভুল হইয়াছে। এমনি দুই তিনবার হইল। অভ্যস্ত পথে এই ভুল তাঁহাকে বিশেষভাবে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। কেন এমন হইতেছে? কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া স্থিরচিত্তে ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার মনে পড়িল, কথা ছিল শম্ভুর নিকট হইতে আফিং চাহিয়া লইয়া আসিবেন। তাহা না করিয়া তিনি কর্ম্মচারীর নিকট হইতে চাহিয়া আনিয়াছেন। এ ত অন্যায় হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ কর্ম্মচারীর অনুসন্ধানে গেলেন। কিন্তু সে তখন দ্বার বন্ধ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। উপায়ান্তর না দেখিয়া ঠাকুর জানালা গলাইয়া আফিমের মোড়কটি ফেলিয়া দিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, এই গো, তোমাদের আফিং রইল। এবার রাসমণির উদ্যানাভিমুখে ফিরিতে আর পথভ্রম হইল না।

শ্রীরামকৃষ্ণের পিতা ক্ষুদিরাম ছিলেন পরম সত্যাশ্রয়ী। জমীদারের স্বপক্ষে মিথ্যাসাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করায় তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইয়াছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ এক দিন বলিয়াছিলেন, সত্য কথা কওয়া নিয়ে আমার কি শেষে শুচিবাই দাঁড়াল না কি, যদি হঠাৎ বলে ফেলি খাব না ত হাজার ক্ষিদে পেলেও উপসী থাক্‌তে হবে। এ কি রে বাপু!

য়াহুদি পুরোহিতগণের অমানুষী অত্যাচারে বিচারালয়ে নীত হইয়া ঈশা বলিয়াছিলেন—"To this end was I born, and for this cause came I into the world, that I should bear witness into *the* truth."—এই পরিণামের জন্য আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি। সত্যের সাক্ষিস্বরূপ (সত্য হেতু প্রাণদানের নিমিত্ত) আমার সংসারে আগমন।

ঈশামষির উক্তিতে পরিহাস-রসিক প্রাড়্‌বিবাক পাইলেট্ প্রশ্ন করিলেন—What is truth—সত্য কি?

সম্ভবতঃ যীশু-কথিত the truth পারমার্থিক সত্য। বিচারকের লক্ষ্য জাগতিক সত্য। কিন্তু জাগতিক সত্য হইলেও তাহার ব্যবহারিক সত্তা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সৎ, সত্য, সত্তা একই ধাতু হইতে উৎপন্ন এবং মূলতঃ একই পদার্থ আর সে পদার্থ ব্রহ্ম। সৎ-চিৎ-আনন্দ, অস্তি-ভাতি-প্রিয়, সত্য-শিব-সুন্দর, যাহাই বল না কেন, সেই এক অদ্বয় ব্রহ্মবস্তুরই স্বরূপ। ব্রহ্ম নাম-রূপের আবরণে জড়িত হইলেই জগৎ নামে অভিহিত হন। কিন্তু ব্রহ্মবস্তুর ন্যায় জগৎ নিত্য নহে—নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। মধুভরে টলমল, সুষমায় ঢলঢল, আজি যাহা প্রফুল্ল কুসুম, কালি তাহা বালিকার কলিকা আঁখি। এ সৃষ্টি বাজিকরের বাজি—মিথ্যা। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, একমাত্র বাজিকরই সত্য।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

আষাঢ়-পূর্ণিমায়

কাজল মেঘের পাশে হাসে জ্যোৎস্না-ফুলের মঞ্জরী,
আজকে প্রাণে উঠছে কেন সুর-ফোয়ারা গুঞ্জরি?
বাদল রাতের মোহ-ভরা, পূর্ণা নিশি মনোহরা,
হৃদয় আজি উতল হল পুলক-দোলায় সঞ্চরি,
হেনার ঝাড়ে বয় সুরভি, আজও কি গো ঘরে রবি,
বৃথায় যাবে ফুল-গরবি মধুমাখা শর্ব্বরী?

কাজল মেঘের বাতায়নে দৃষ্টি মেলে অপ্সরী,
জ্যোৎস্না ঝরে অঝোর ধারে কে রবে আজ মৎসরী?

পুষ্পমদির কদম-শাখে পবন মৃদু সন্দোলে,
বাঁধবি দোলা আয় রে ওরে হিল্লোলেরি হিন্দোলে।
মেঘেরা সব লক্ষ ফণা, করছে নভে নীরাজনা,
এমন রাতে বাহির হ রে নর্ম্মমুখর কল্লোলে,
হাসি-গানের হবে মেলা, কৌতুকেরি চলবে খেলা,
মন ভুলাবে চাঁদনী রাতি সুধা-স্রোতের হিল্লোলে।

কাজল মেঘের মাঝে আজি চন্দ্র যেন আন্দোলে,
দুলবি যদি আয় রে ছুটে ফুল-বিছানো হিন্দোলে।

শ্রীমতিলাল দাশ (এম-এ, বি-এল)।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

শান্তার ভাগ্যসূত্র

অপূর্ব্বর মা বিবাহের বন্দোবস্ত পাকা করিয়া বসিয়াছিলেন। বিন্দু ও বিন্দুর পিশিমাকে পাইয়া বর্ত্তাইয়া গেলেন, কহিলেন—তোমার ছেলে···তুমি না এলে কি বিয়ে হয় ছেলের? কিন্তু এক বিপদ বেধেচে।

পিশিমা দুই চোখ কপালে তুলিয়া কহিলেন,—বিপদ!

অপূর মা কহিলেন,—হ্যাঁ। ওরা এসে লায়াল রোডে এক মস্ত বাড়ী ভাড়া নিয়েচে। বাড়ীটা বহুকাল প'ড়ে ছিল, অত বড় বাড়ী সহজে ভাড়া হয় না! তা সকালে লোক এসে খপর দিয়ে গেল যে, রাত্তির থেকে মেয়ের খুব জ্বর—চোখ চাইতে পারচে না। কি বিভ্রাট বলো তো, ভাই! জ্বর-গায়ে বিয়ে হতে পারে না।

তাই তো! জ্বরের নাম শুনিয়া পিশিমার বুক কাঁপিয়া উঠিল। এমনি জ্বর-গায়ে আর একটা বিবাহ হইয়াছিল। তার ফল···

পিশিমা বিন্দুর পানে চাহিলেন।

অপূর মা জগদ্ধাত্রী দেবী কহিলেন—এটি সেই ভাইঝী? অপূ চিঠিতে লিখেছিল। বেশ বরাত, বটে!—একরত্তি মেয়ে ···এই বয়সেই সব চুকিয়ে ব'সে আছে!

জগদ্ধাত্রী দেবী একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন;··· তার পর অপূকে কহিলেন,—তুই একবার লায়াল রোডে যাস্ বাবা, খাওয়া-দাওয়ার পর···খপরটা নেওয়া দরকার। আমাকেও নিয়ে যাবি!

অপূর্ব্ব কহিল,—বেশ।

পিশিমা কহিলেন,—আমিও দেখতে যাবো, বৌ···

জগদ্ধাত্রী কহিলেন—একসঙ্গেই সকলে যাবো।··· মনটা এমন খারাপ হয়ে আছে, কোনো কাজে মন লাগচে না। শুভ কাজ···এ কি বিঘ্ন বলো দিকিনি!

পিশিমা কহিলেন—ভয় নেই। জ্বর হয়েচে, সেরে যাবে।···মেয়ের স্বাস্থ্য ভালো তো?

জগদ্ধাত্রী কহিলেন,—তা ভালো। বরাবর পশ্চিমেই থাকে কি না।

দুপুরবেলা মাকে ও পিশিমাকে লইয়া অপূ লায়াল রোডে চলিল। মেয়ের অসুখ বেশ শক্ত—ডিপ্‌থিরিয়া। শুনিয়া সকলে শিহরিয়া উঠিলেন।

অপূর মা এ বাড়ীতে রহিয়া গেলেন, পিশিমাকে কহিলেন,—তুমি দিদি, ওখানে থাকো। ওদের দেখাশুনার ভার তোমার। কি বরাত নিয়েই এসেছিলুম। ছেলেটার বিয়ে দেবো নিশ্চিন্ত হয়ে, তাতেও এমন বাদ!

বাদ ক্রমে বিষম হইয়া উঠিল। যমের সঙ্গে অহোরাত্র যুদ্ধ করিয়া পাঁচ-সাত দিন পরে মেয়ে একটু সুস্থ হইয়া উঠিল, ডাক্তাররা বলিলেন,—ভয় এখনো কাটেনি।

ভয় যে কাটে নাই, মেয়ের মুখে-চোখে সে প্রমাণ জ্বলজ্বল করিতেছিল। দু'দিন না যাইতে দুম্ করিয়া আবার একটু জ্বর দেখা দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে আরো দু-চারিটা উপসর্গ। সে উপসর্গ আর কাটিতে চায় না।

অবশেষে অপূর্ব্বর এলাহাবাদে আসার ঠিক বাইশ দিনের দিন রাত্রি-প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে রোগজীর্ণ ছোট্ট প্রাণটুকু অনন্ত বায়ু-তরঙ্গে মিশিয়া গেল। বাড়ীতে কান্নার রোল উঠিল।

চার-পাঁচ দিন পরের কথা। পিশিমার সঙ্গে জগদ্ধাত্রী দেবীর কথা হইতেছিল। জগদ্ধাত্রী কহিলেন,—কত কি ভেবেছিলুম···এ জন্মের কর্ত্তব্য চুকিয়ে তৈরী হয়ে থাকবো—সব ভেঙ্গে গেল!

পিশিমা কহিলেন,—অপূর খুব লেগেচে। ও একেবারে গুম্ হয়ে আছে।

জগদ্ধাত্রী দেবী কহিলেন—একেই বিয়েয় ওর রুচি ছিল না—একালের যেমন হাওয়া! শুধু আমায় খুশী করবার জন্য রাজী হয়েছিল। আমি বলেছিলুম, একটিমাত্র সাধ আছে, অপূ, তোর বৌয়ের হাতের সেবা···তা থেকে আমায় বঞ্চিত করিস্ নে, বাবা। যে দিন তোকে কোলে পেয়েচি, সে দিন থেকে এই একটিমাত্র চিন্তা···ছেলে বড় হবে, মানুষ হবে, তার বিয়ে দেবো—দিয়ে ছেলে-বৌকে থিতু ক'রে সংসার থেকে ছুটী নেবো!

পিশিমা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন,—আখে' ধীরে-সুস্থে ভালো আর একটি পাত্রী···

জগদ্ধাত্রী কহিলেন,—পাত্রী পাওয়া কত শক্ত···

পিশিমা কহিলেন,—ছেলে ডাগর হয়েচে। তার সঙ্গে কথা কও।

জগদ্ধাত্রী কহিলেন,—আমার বাধচে বিয়ের কথা মুখে আনতে। এ মেয়েটিকে কি ভালোই বেসেছিলুম! আল-মোরায় থাকতে প্রায় কাছে আসতো, কত যত্ন-আত্তি যে করতো! আমার চোখের সামনে সেই ছবি···

সে-ছবি চোখের সাম্‌নে দীপ্ত বর্ণে জাগিয়া উঠিল। জগদ্ধাত্রী একটা নিশ্বাস ফেলিলেন।

বিন্দু আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। জগদ্ধাত্রী কহিলেন,—এসো মা, বসো। তোমার দাদা কোথায়?

বিন্দু কহিল,—নীচে কে মক্কেল এসেচে···বাইরের ঘরে গেল!

জগদ্ধাত্রী কহিলেন—বড্ড কাতর দেখলে? কথাবার্ত্তা কইছিল?

বিন্দু কহিল—আমি কাছে ছিলুম, আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা হচ্ছিল। আমায় বললে, শ্বশুরুর টুম্ব দেখতে যাবে? বড় করুণ গল্প তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। আমি বললুম, যাবো। তা বললে···ওবেলায় কাছারি থেকে এসে ছুজনে যাবো'খন। দিব্যি পরিষ্কার জ্যোৎস্না রাত্রি—বেশ দেখবে।

নিশ্বাস ফেলিয়া জগদ্ধাত্রী কহিলেন—বড় চাপা ছেলে। কিছু বোঝবার জো নেই।

পিশিমা কহিলেন,—মেয়েটির কথা কিছু বলছিল?

বিন্দু মুখ নত করিয়া রহিল, কোনো উত্তর দিল না।

জগদ্ধাত্রী কহিলেন—বলো মা···

বিন্দু ঘাড় নাড়িয়া কহিল,—বলছিল।

পিশিমা উদ্‌গ্রীব কণ্ঠে কহিলেন—কি বলছিল?

বিন্দু কহিল,—বলছিল, কি রকম আমার কোষ্ঠী—দেখলে! বিয়ের কথা মাত্র হতে সুস্থ জলজ্যান্ত মেয়েটা ধড়ফড় ক'রে ম'রে গেল!

জগদ্ধাত্রী কোনো কথা কহিলেন না—পিশিমাও নীরব। এ যে কত-বড় মর্ম্মান্তিক বেদনার কথা, ছুজনেই বুঝিলেন। ও কথায় কতখানি ধিক্কার আর গ্লানি বিজড়িত আছে!···

তা বলিয়া হাল ছাড়িয়া দিলেও তো চলে না!···আরো পাঁচ-সাতদিন পরে জগদ্ধাত্রী কহিলেন—আমি ছুটী চাই··· আর ওর বিয়ে না হওয়া ইস্তক সে ছুটী কিছুতেই মিলবে না।

পিশিমা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে জগদ্ধাত্রী দেবীর মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন।

জগদ্ধাত্রী কহিলেন,—জানা মেয়ে আছে দিদি, সন্ধানে?···তা হলে ঠিক করো তুমি, সত্যি। ভদ্রঘরের মেয়ে···দেখতে-শুনতে ভালো···হোক্‌ গরীব, তাতে কিছু এসে যাবে না···

পিশিমা ছুই চোখের দৃষ্টি স্থির করিয়া তাঁর জানা পৃথিবীটুকুর মধ্যে মেয়ের সন্ধান করিতে লাগিলেন।

বিন্দু ডাকিল—পিশিমা···

পিশিমা বিন্দুর পানে চাহিলেন। বিন্দু কহিল—শান্তুর সঙ্গে বিয়ে দিলে কি হয়? মেয়ে তো ভালো,—চেহারায়, কাজে-কর্ম্মে···

পিশিমা কহিলেন,—ঠিক বলেচিস্‌ রে!···হ্যাঁ বৌ, মেয়ে আছে। আমার ওখানে···বাপ বড় গরীব। কিন্তু মা···বড় ভালো মা। সে-মার মেয়ে কোনো দিন ছুঃখ দেবে না। যত্নে-সেবায় সারা পৃথিবীর সে মন ভোলাতে পারে। বশ মানবে···আহা, কি কষ্টেই থাকে! কোথায় কার ঘরে পড়বে, চিরদিন হয়তো জ্বলবে···বাপ দারিদ্র্যের জ্বালায় পাগল হয়ে বেড়াচ্ছে···

জগদ্ধাত্রী কহিলেন—মেয়েটি দেখতে কেমন?

পিশিমা কহিলেন—নিন্দার নয়। তবে গরীবের ঘর, না পায় ভালো খেতে, না পায় ভালো কিছু পরতে। রান্না-বান্নায়, সংসারের কাজে মার ডান হাত···সংসারটিও ছোট নয়···তোমার ঘরে এসে আদর-যত্ন পেলে ঐ মেয়েই ছু'দিনে পদ্মিনী হয়ে উঠবে। মার অতগুলি ছেলেমেয়ে, তবু এখনো কি শ্রী···অত ছুঃখ-দারিদ্র্যেও যেন মা দুর্গার প্রতিমা! অপূও দেখেচে সে মেয়েকে।

জগদ্ধাত্রী কহিলেন,—বেশ দিদি, তুমি আজই চিঠি লিখিয়ে কথা আরম্ভ করো। তঁ[illegible]র যদি মত থাকে···

পিশিমা কহিলেন—তারা [illegible] [illegible]বে!··· [illegible] ভার আমার।

বিন্দু কহিল—পিশিমা যা করবে, জ্যাঠাইমা তাতে কখনো অমত করবে না। তারা স্বর্গ হাতে পাবে।

জগদ্ধাত্রী কহিলেন—তাহলে বিন্দু-মা, তুমি একখানা চিঠির কাগজ আনো···লেখো তোমার জ্যাঠাইমাকে এখনি [illegible]দির জবানীতে। আমি স্থির হতে পারচি নে। যা হবার হয়ে গেছে, চারা নেই, তাতে কারো হাত নেই। যারা আছে, তাদের যাতে কোথাও না বাধে, যতক্ষণ আছি, সেটুকু আমায় দেখতে হবে।

পিশিমা কহিলেন—বটেই তো! চিঠির কাগজ আন্ মা বিন্দু···

জগদ্ধাত্রী কহিলেন—এখন অপুকে ঘুণাক্ষরে কিছু বলো না যেন মা। আগে আমরা সব ঠিক করি, তার পর··· তুমি চিঠি লিখে ফ্যালো। আমি বলচি, কি লিখতে হবে।···

যথাসময়ে চিঠি লেখা হইল এবং তার উত্তরও আসিল। যোগমায়া দেবী জানাইলেন, এ তো পরম ভাগ্যের কথা। শান্তা রাজরাণী হইবে···এত বড় কথা তিনি স্বপ্নেও যে ভাবিতে পারেন নাই!—তোমার ভাইয়ের খুব মত আছে। তিনি পাকা কথা পাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া আছেন। জানোই তো অবস্থা! যোগমায়া দেবী আরো লিখিয়াছেন, ভুবনের বিবাহের কথা পাকা। বৈশাখের গোড়াতেই বিবাহ হইবে। সে সময় তাঁর ও বিন্দুর আসা চাই। চিঠির শেষে ঢুটি ছত্রে লেখা আছে, বলাই আসিয়াছিল। ত্ন'দিন ছিল; রেঙ্গুনে গিয়াছে। ভুবনের বিবাহে সে আসিতে পারিবে না। তোমাদের সঙ্গে দেখা হয় নাই বলিয়া সে ভারী মন-মরা।

বিন্দুর বুকের মধ্যে বেদনার নিশ্বাস পুঞ্জিত হইয়া উঠিল। সে যা ভাবিয়াছিল, তাই। বলাইদা আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছে···দেখা হইল না! কবে হইবে, কে জানে! তা ছাড়া···

এই যে দেখা হইল না, ইহাতে বলাইদা খুব চটিয়াছে··· হয় তো এই রাগে চিঠিও দিবে না, কোনো উদ্দেশ লইবে না!···বিন্দু তো জানে, লোকটি কেমন!···সে গুম্ হইয়া [illegible]···

অপূকে ওদিকে বিবাহে রাজি করাইতে বেগ পাইতে [illegible]ইল। সে বলিয়া বসিল, [illegible] ব্যাপারে যে গিয়াছে, তার সেই [illegible] থেকে ফেরবা[illegible] [illegible]াকা থাকিবে। জীবনের পথে [illegible] [illegible]রবে!

জগদ্ধাত্রী কহিলেন,—শোনো ছেলের কথা! বিয়ে তো [illegible]য় নি বাবা···

অপূ কহিল,—শুধু মন্ত্র পড়তে বাকী ছিল, মা···না হলে কত তত্ব করেচে, তাবাস্ করেচে কত দিন থেকে···

জগদ্ধাত্রী কহিলেন,—তা হয় না। তোর এ অনাসৃষ্টি আপত্তি!

অপূ কহিল,—অনাসৃষ্টি নয় মা। বিয়ে করলে আমার সে-আনন্দে তার রোগ-কাতর চোখের দৃষ্টি আমায় আকুল ক'রে তুলবে!

জগদ্ধাত্রী কহিলেন,—কি যে বলিস!

অপূ কহিল,—বিয়ে আমার সইবে না মা। কোষ্ঠীতে আছে রাক্ষসগণ। মরা নয়, একেবারে তাজা, জীবন্ত রাক্ষস। তার প্রমাণ হাতে হাতে পেলে!

জগদ্ধাত্রী কহিলেন, —না, তোর কোনো কথা শুনবো না। আমি মা···জগদ্ধাত্রীর স্বর বাষ্পার্দ্র হইয়া আসিল। তিনি কহিলেন,—আমায় সুখী হতে দিবি নে? এই বুক-ভরা নিশ্বাস-শুদ্ধ ইহলোক থেকে বিদায় নিতে হবে!···কেন আমার থাকা, বলতে পারিস্ অপূ? আমার তো সব ফুরিয়ে গেছে তাঁর সঙ্গে···তবু যে প'ড়ে আছি, এ তোর মুখ চেয়ে! তোকে সংসারে থিতু দেখলেই আমার ইহ-জীবনের সব কর্ত্তব্য শেষ হবে। তাতে বাদ সাধিস নে, বাবা। তা হলে মরেও আমি শান্তি পাবো না।

অপূ কহিল,—আমায় বড় ক'রে দেছো, মানুষ ক'রে দেছো,—নিজের পায়ে ভর ক'রে আমি দাঁড়াতে পারচি··· এর চেয়ে কামনার আর কি আছে, মা! কারো কাছে কোনো দায় নেই, দায়িত্ব নেই, নিজেকে নিয়ে পরম নিশ্চিন্ত মনে পরমানন্দে দিন কাটিয়ে চলেছি, এর মধ্যে একটা উপসর্গ টেনে এনে কেন আবার ভার বাড়াবে!···চেয়ে ছাখো তো বিন্দুর দিকে···এইটুকু বয়সেও যদি এমন থাকে···

পিশিমা কহিলেন,—ও মেয়েমানুষ···

অপূ কহিল,—ঐখানেই তোমরা মস্ত ভুল করো। মেয়ে-ছেলেয় মনের দিক থেকে কোনো তফাৎ নেই। তফাৎ শুধু দেহের শক্তিতে, দেহের কাজে। মন দুজনের সমান।

জগদ্ধাত্রী কহিলেন,—তা হলে বিয়ে করবিনে? আমি যে তাদের সঙ্গে ঠিক করলুম

পিশিমা কহিলেন,—গরীবের কন্যাদায় বাবা, এ মস্ত দায়। মেয়েটাকে আশ্রয় দাও···

অপূ কহিল,—আশ্রয় দেবার হাজার ঘর আছে···

পিশিমা কহিলেন,—তোমার মার মুখের পানে চাও, বাবা। তুমি তো আত্মসুখী নও…নিজের স্বাচ্ছন্দ্য একটু যায় যদি, তবু মার সুখ…

বিন্দু কহিল,—লক্ষ্মী দাদা আমার…শানু বড় ভালো মেয়ে…

মিনতি ও নিবেদনের অন্ত রহিল না।…বিন্দুর অশ্রু-ভরা দুই চোখের দৃষ্টি…

অপু কহিল,—তুমিও এমন ক'রে বলচো, বিন্দু! তোমায় তো বলেচি, কেন আমি…কোথায় বাধা…

বিন্দু কহিল—সে মস্ত আদর্শ, মানি। কিন্তু আদর্শকে শ্রদ্ধাই করতে পারে মানুষ—তা নিয়ে জীবন-যাত্রায় চারি-ধারে বাধে। মানুষ রক্ত-মাংসের জীব—কর্ত্তব্যের বাণ্ডিল নয়।

অপু স্থির দৃষ্টিতে বিন্দুর পানে চাহিয়া রহিল—তার পর কহিল,—এত কথা কোথায় শিখলে, বিন্দু?

বিন্দু কহিল—জীবনের অভিজ্ঞতায়।

অপু কহিল—এই বয়সে এত বড় শিক্ষা!

বিন্দু কহিল—বয়সটাই কি শিক্ষা-গুরু,দাদা?…তা নয়। ও কথা থাক্। দাদা, লক্ষ্মীটি, তোমায় রাজী হতেই হবে। খুড়িমার বেদনার অন্ত নেই! তার উপর কত-বড় দায়ে একজনকে উদ্ধার করবে…শানুর জীবনের সব ভার…

অপু আবার কিছুক্ষণ নীরব রহিল, তার পর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—তোমাদের সকলের মুখেই ঐ কথা। বেশ, মাকে বলো, আমি কুপুত্র নই…বিয়ে করবো!

বিন্দু তখনি ছুটিল, এবং সেই দিনই পরামর্শান্তে যোগমায়া দেবীকে পিশিমার জবানীতে চিঠি লেখা হইল—

বিবাহের কথা পাকা। এক সপ্তাহের মধ্যেই আমরা ফিরিতেছি। ফিরিয়া বন্দোবস্ত করিব। শানুর বিবাহের কথা আর কোথাও কহিয়ো না। এখানে মেয়ে রাজ-রাণী হইবে। ছেলে খুব ভালো।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

মন্ত্রবল

আশ্বিন মাস। পূজা এবার কার্ত্তিকের প্রথমে। শারদশ্রীতে শ্যামলা বাঙলা ঝলমলিয়া উঠিয়াছে।

বিন্দু রামায়ণ পড়িয়া পিশিমাকে শুনাইতেছিল। পিশিমা ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন দেখিয়া সে বই বন্ধ করিল; তার পর ধীরে ধীরে আসিয়া উঠানে দাঁড়াইল। উঠানের কোণে একটা শিউলী গাছ…বেশ ঝাঁকড়া হইয়া উঠিয়াছে; এবং সে গাছে অজস্র ফুল। মনে পড়িল, এ গাছের চারা বোসেদের বাড়ী হইতে আনিয়া বলাইদা ওখানে পুঁতিয়া দেয়…পুঁতিবার সময় বলিয়াছিল—এতে যা ফুল হবে, তার বোঁটায় ছোপাস্ বিন্দী, পুতুলের কাপড়-চোপড় কত ছোপাতে চাস্!

সে গাছ আজ বড় হইয়াছে। সে গাছে ফুলও ফুটিয়াছে। কিন্তু ফুল ফোটার সঙ্গে সঙ্গে তার পুতুল খেলার শেষ হইয়া গিয়াছে। বিন্দু একটা নিশ্বাস ফেলিল, ফেলিয়া যোগমায়া দেবীর গৃহে চলিল।

যোগমায়া দেবী খাইতে বসিয়াছেন। কমলী কাছে বসিয়া; জীবনের বিধবা পিশি ও বিধবা বোন গিয়াছে কালীঘাটে।

যোগমায়া দেবী বিন্দুকে দেখিয়া কহিলেন—আয় মা… বোস্।

বিন্দু বসিল। যোগমায়া কহিলেন—পিশিমা কি করচে?

বিন্দু কহিল—ঘুমিয়েচে।

যোগমায়া কহিলেন—শানুর চিঠি পেয়েচি আজ। অপু বোধ হয় সামনের হপ্তায় আসবে—তোমার কি কাজে!…

সে কথা বিন্দুর মনে ঠিক পৌছিল কি না সন্দেহ—তার মনে যে-কথা বাজিতেছিল…

বিন্দু কহিল—ভুবনদার খপর কি জ্যাঠাইমা? বাড়ী আসবে না?

যোগমায়া হাসিলেন। ম্লান হাসি! পরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন,—বড়লোক শ্বশুর…বলে, পড়াশুনার সুবিধে, তার উপর শাশুড়ীর শরীর ভালো নয়, মেয়ে-জামাইকে চোখের আড় করতে প্রাণ হাঁফিয়ে উঠবে…

বিন্দু কহিল,—মন্দ নয়! মা-বাপ ভাই-বোন সব ভেসে গেল! শাশুড়ীর হাঁফানিই এত বড় হলো! এদিকে যে-মার পেটে জন্মালো, সে মা যে হাঁফিয়ে মরে…

যোগমায়া কহিলেন—থাক্ মা—যেখানে থাকে, ভালো থাকলেই হলো! এখন বড় হয়েচে, হাত-পা হয়েচে, চোখ ফুটেচে…এখন মা রইলো-গেল, তাতে কি এসে যাবে!…

যোগমায়া আর একটা নিশ্বাস ফেলিলেন। বিন্দু কহিল—বৌ তোমায় চিঠিপত্র লেখে?

—না। সে বড়লোকের মেয়ে…তা ছাড়া ঐ তো

ভাবা! আবার যা দরদ মা-বাপের উপর, সে তো তাই দেখে শিখবে!

কমলা কহিল—বাবা, কি ঘেন্না আমাদের উপর! একটিবার তার ল্যাভেণ্ডারের শিশিতে হাত দিয়েছিলুম—কি রকম ভাবে কেড়ে নিলে···বললে, ভেঙ্গে যাবে, ভেঙ্গে যাবে, রেখে দাও—ও আমার ভারী সাধের জিনিষ!

বিন্দু কহিল—সে সেই বিয়ের সময়, না? সে তো আমি জানি। আমি তখন সেখানে বসে!

কমল কহিল—জামাইবাবুর কত পয়সা, অথচ অহঙ্কার আছে?···দিদি আমায় দু'শিশি ল্যাভেণ্ডার কিনে দিয়ে গেছে। ওঁর তো ঐ একটি শিশি ছিল। কত কি ভাবতুম, বৌদি হবে, কত আদর করবে, গল্প করবে···

বিন্দু কহিল—ভুবনদার মাথা ঘুরে গেছে বড়মানুষ দেখে···

যোগমায়া দেবী কোনো কথা কহিলেন না। কমলা কহিল—মা কত মানা করেছিল, বড়লোকের মেয়ে এনো না···শুধু বাবার আর বড়দার ধনুক-ভাঙ্গা পণ বলেই না বিয়ে হলো।

যোগমায়া দেবী কহিলেন—ছেড়ে দে মা, ও-সব কথা!···

বিন্দু কহিল—তোমার মন কেমন করে না ছেলের জন্য?

যোগমায়া দেবী নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—পড়েচিস তো বইয়ে, কুপুত্র যদি বা হয়, কুমাতা কখনো নয়! মার কাছে ছেলে কি পর হয় মা কখনো···তা সে ছেলে যত তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যাই করুক্!···

যোগমায়া দেবী স্তব্ধ হইলেন। বিন্দু কহিল—বলাইদার চিঠি পাও?

যোগমায়া দেবী কহিলেন—দিন দশ-বারো আগে পেয়েচি, একটি লাইন—মা, আমি ভালো আছি। শুধু এইটুকু···

বিন্দু কহিল—কোথায় আছে এখন?

যোগমায়া দেবী কহিলেন—আসামে ফিরেচে। সেই যে রেঙ্গুন থেকে ফেরবার মুখে হঠাৎ এসে হাজির। রাত তখন দশটা···আমার হাতে একশো টাকা দিলে, দিয়ে বললে, রেখো···বিন্দুর সেই গহনার ধার, খরচ করো না, বাকীটা পেলেই শুধে দিয়ো। তার পর ভোরের আলো ফোটবার আগেই বেরিয়ে গেল, বললে—সকালেই রেঙ্গুনের জাহাজ ছাড়বে কলকাতা থেকে!···তোর সঙ্গে বুঝি দেখাও করে নি? তুই তখন···? না, এলাহাবাদ থেকে তুই ফিরেচিস্। অপূরা তখনো এসে পৌছয়নি।

বিন্দু কোনো জবাব দিল না। তার বুকের মধ্যে অশ্রুর সিন্ধু যেন উথলিয়া উঠিল! কষ্টে সে নিশ্বাস চাপিল।

যোগমায়া দেবী কহিলেন—কেন বল্ দিকিনি? তোকে চিঠি-পত্র লেখে না আর?

কম্পিত স্বরে বিন্দু কহিল—না!

ছোট্ট কথাটুকু—তবু তাহাতে কতখানি ব্যথা!

যোগমায়া দেবী কহিলেন—রাগ হয়েচে, বুঝি? তিনি বিন্দুর পানে চাহিলেন। বিন্দুর চোখ তখন অশ্রুর বাষ্পে ভরিয়া উঠিয়াছে।

বিন্দু কহিল—কি জানি!

যোগমায়া দেবী কহিলেন—হুঁ···কিন্তু এ রাগ কেন? তোর সঙ্গে সেই প্রথম আসাম যাবার আগে দেখা···বটে! আর দেখা হয়নি?

বিন্দু কহিল—না!

—তবে? জানিস্ না?···ঐ এক পাগল ছেলে···

বিন্দু কোনো কথা কহিল না। সে জানে, কেন এ রাগ! রাগ ঠিক নয়। অভিমান! তার এলাহাবাদে যাইবার পূর্ব্বে সেই চিঠি আসিয়াছিল,—আমি শীঘ্র যাইব, দেখা হইবে··· তার পর বিন্দু চলিয়া গেল। এদিকে বলাইদা আসিয়া উপস্থিত···শুনিয়াছে, বিন্দু বিবাহের নিমন্ত্রণে গিয়াছে! অমনি অভিমান! সন্ধানও লইল না···একখানা চিঠিতে একটু প্রশ্ন, কেন গিয়াছিল? তা'ও না! বিন্দুরও কি অভিমান হয় নাই? হইয়াছে। বিনা-দোষে তাকে এ শাস্তি দেওয়া—একখানি চিঠি অবধি না! তার পর সেদিন বাড়ী আসিয়াছিল···রাত দুপুরে! তা হোক! তুমি এ-কথা জানিতে, তাদের দ্বারে একটি মৃদু আঘাত দিলে কেহ তর্জ্জন তুলিত না! পিশিমা ও বিন্দু দুজনেই কত খুশী হইত! তা গেলে না, দেখাও করিলে না! নিঃশব্দে ভোর হইবার আগেই পলানো হইল!···বিন্দু কি বোঝে না, অমন্ নিঃশব্দে রাতদুপুরে আসার অর্থ কি! পাছে বিন্দু টের পায়, পাছে টের পাইলে ছুটিয়া আসিয়া সে দেখা করে!···

বেশ! দেখা করিয়ো না, চিঠি লিখিয়ো না! বিন্দুর মনে কি তেজ নাই? অভিমান নাই? তুমিই শুধু রাগ করিতে আর অভিমানে গোঁজ হইয়া থাকিতে জানো!…

কিন্তু এ-কথার আলোচনাও চলে না! তাই এ আলোচনা ফিরাইয়া দিবার উদ্দেশে বিন্দু বলিল,—সুবলদার বিয়ে দেবে না, জ্যাঠাইমা?

যোগমায়া দেবী কহিলেন,—আমি সখ ক'রে দেবো না। নিজে বড়র মত খুঁজে-পেতে আনে সম্বন্ধ, বাধা দেবো না। ও দুটিকে বিধাতা এক ছাঁচে গড়েচেন।

বিন্দু কহিল,—সামনে পুজো, কুটুম-বাড়ী তত্ব করতে হবে তো!…সে সময় বৌকে আনবে?

যোগমায়া দেবী কহিলেন,—তত্ব করতে হবে। তোমার জ্যাঠামশাই আজ-কালের মধ্যে সেখানে যাবেন, প্রথম তত্ব—যত আত্মীয়-কুটুমকে কাপড়-চোপড় দিতে হবে তো!… আর বৌ আনা? কে বাছা ও কথা তুলে অপমান হবে! বৌ আসবে না, তারাও পাঠাবে না,—একটা না একটা অছিলে তুলবে'খন—হয়, বেয়ানের শরীর খারাপ, নয়, বৌমার নিজের অসুখ! বড়মানুষের ঐ দুটি চাল,—শুনেচি তো!

বিন্দু কহিল, —ভুবনদা নিশ্চয় আসবে।

কমলা ফোঁশ করিয়া উঠিল—হায় রে! সে জামাই-আদর ছেড়ে এখানে আসবে আমাদের সঙ্গে শাক-ভাত খেতে! বড়দাকে চিন্‌লে না এ্যাদ্দিনেও! এখানে পড়েছিল, নেহাৎ নাকি উপায় ছিল না, তাই!

হাসিয়া বিন্দু কহিল,—তুই চুপ কর্, কমলী…দাদা, গুরু লোক…

কমলা কহিল,—ওঃ, ভারী আমার গুরুগিরি করেচে কি না! ভাত দেবার কেউ নয়, কিল মারবার গোসাই!

বিন্দু হাসিয়া একেবারে গড়াইয়া পড়িল, তার পর কহিল,—তোমার বৌ এখানে কি ক'রে আসবে, জ্যাঠাইমা! এই ননদ, একরত্তি পুঁচকে মেয়ে…তার মুখের কথা শুনচো! কি ব্যাখ্যাই করচে!…

যোগমায়া দেবী কহিলেন,—দেখে-শুনে ওদের এই বয়সেই চোখ-মুখ ফুটেচে, মা! এই জন্যই বলে, গরীবের ঘরে যেমন শিক্ষা হয়, এমন শিক্ষা আর কোথাও নয়!…

আরো দশ-বারো দিন পরের কথা।

ঘরে বসিয়া বিন্দু পিশিমার তুলসীর মালা-ছড়ায় নূতন সূতা পরাইতেছিল, হঠাৎ দ্বার-প্রান্তে কে ডাকিল,—ও বিন্দু, বিন্দু-বোনটি, ঘরে আছো?

এ যে অপুর কণ্ঠ। বিন্দু ধড়মড়িয়া ছুটিয়া আসিল, আসিয়া দেখে, দ্বারে অপূর্ব্ব।

বিন্দু কহিল,—দাদা! এসো, এসো, কি ভাগ্যি!

অপূর্ব্ব কহিল,—ভাগ্যি সত্যি! বুঝলে বিন্দু…তোমার সম্পত্তি-উদ্ধারের চূড়ান্ত! তাদের সঙ্গে চিঠি চালাচালি ক'রে সব তাতে মঞ্জুরী পেয়েচি। আপোষ হয়ে গেছে।

বিন্দু কহিল,—তুমি একলা এলে?

অপু কহিল,—না।

বিন্দু কহিল,—শান্তকে এনেচো?

অপু কহিল,—আনলুম বৈ কি। তাকে তাদের বাড়ীতে নামিয়ে দিয়ে আমি এসে উঠলুম আমার বাড়ী।

বিন্দু কহিল,—জ্যাঠাইমার সঙ্গে দেখা করেচো?

অপু কহিল—না।…গাড়ীভাড়া চুকিয়ে একদম্ এ দোরে এসে মাথা গলালুম।

বিন্দু কহিল—সে কি! শ্বশুর-বাড়ী?

অপু কহিল—শ্বশুর-বাড়ীতে বিনা-নিমন্ত্রণে ফশ ক'রে কি যেতে আছে? তায় আমি হলুম নতুন জামাই। এখনো বিয়ের এক বছর পোরে নি!…মা কোথায়?

বিন্দু কহিল,—পিশিমা নাইতে গেছে।

অপু কহিল,—চলো, জামাটামা ছাড়ি, মুখ-হাত ধুই তুমি যোড়া চা পিলাও…আমার এই হাত-ব্যাগে চায়ের টিন আছে।

বিন্দু কহিল,—আমাদের এখানে পাছে বক্-পাত সিদ্ধ ক'রে খাওয়াই, তাই বুঝি সঙ্গে এনেচো!

অপু কহিল,—না দিদি, তা নয়। জানি, এখানে ও পাট নেই…সকালেই দোকানে ছুটোছুটি করতে হয় পাছে, তাই এনেচি।…আর কি এনেচি, জানো? কিন্তু সে এখন নয়—আহারাদির পর।…

—কি দাদা? বলিয়া বিন্দু সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে অপুর পানে চাহিল।

অপু কহিল,—কৌতূহল দমন করো, বোন্। সে কথা এখন বলবো না।

অপু ঘরের মধ্যে গিয়া জামা-জুতা ছাড়িয়া রাখিল তার পর মুখ-হাত ধুইয়া আসিয়া ডাকিল,—বিন্দু…

বিন্দু রান্নাঘরে গিয়া কাঠের উনান ধরাইয়া উনানে চায়ের জল চাপাইতেছিল। অপু কহিল,—আগে চা, না, আগে চান? বলো তো…আমি সমস্যায় পড়েচি।

বিন্দু কহিল,—চা আগে…চা খেতে খেতে গল্প বলো। ম কেমন আছেন? বৌ কেমন হলো? বৌয়ের সঙ্গে ... কেমন হলো? সব কথা শুনবো ব'সে ব'সে…বলতে হবে।

হাসিয়া অপু কহিল,—বৌ ভালো…তোমরা হাতে ক'রে ... জিনিস দেবে, তা কি মন্দ হতে পারে, ভাই!………

... পুর বেলায় বংশী বাবুরা, সদলে আসিয়া হাজির। মুখ গম্ভীর। পিশিমা অভ্যর্থনা করিলেন—বাড়ীর কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। বংশী বাবু সংক্ষেপে উত্তর দিলেন,—ভালো।

তার পর অপুর সঙ্গে বৈষয়িক কথাবার্ত্তা সুরু হইল ... উকিলও উপস্থিত ছিলেন। বেলা চারিটার সময় ... বিদায় লইলে পিশিমা ও বিন্দুকে ডাকিয়া অপু কহিল,— ... লেখাপড়া হলো। কোম্পানির কাগজ অর্থাৎ ... বাড়ী বিন্দুর নামে পাকা হলো যেমন, তেমনি ... ছেড়ে দিতেও হলো। পার্ক ষ্ট্রীটে একখানি বাড়ী, ... একখানি আর বৈদ্যনাথে একখানি। তা ছাড়া ... হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ আর ঐ দামের ...। এগুলো বিন্দুর শাশুড়ী ও শঙ্করের এক ভাগিনেয় ...। বিন্দু যা পাইতেছে, সেগুলায় তার সম্পূর্ণ ... অধিকার। সে সম্পত্তি সে যথা-ইচ্ছা দান-বিক্রয় করিতে পারিবে এবং পোষ্যপুত্র লওয়ার অধিকারও তার বাহাল রহিল। অর্থাৎ রিভার্শনারদের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া আপোষ হইল।

অপু কহিল,—সব বাড়ী ভাড়া আছে। তাদের কাল ... দেওয়া হবে, উভয় পক্ষ থেকে—তারা ভাড়া আমার কাছে পাঠাবে। কোম্পানির কাগজ তুমি রাখতে পারো— ... কাছেও থাকতে পারে। আমার ব্যাঙ্কের সঙ্গে ... ব্যবস্থা করচি—সে সব বিন্দুর নামে জমা থাকবে, ... কড়ি ইত্যাদি। বিন্দু এবার ইংরিজিটা শিখে নাও… ... ইচ্ছা, চার-পাচ দিন পরে আমি এলাহাবাদ যাচ্ছি—তোমরা দুজনেও আমার সঙ্গে চলো। আমি যে ব্যবস্থা ক'রে দেবো, বিন্দু তা বুঝে নেবে এবং একটু লেখাপড়া শিখে নিলে ও নিজেই সব দেখা-শুনা করবে। আমি চাই, কারো হাতে না গিয়ে বিন্দু নিজে থেকে নিজের বিষয়-সম্পত্তি ম্যানেজ করুক!

বিন্দু বিস্ময়ে নির্ব্বাক! এ যে কি মন্ত্রবলে কতখানি বিরোধ-বিশৃঙ্খলা মিটিয়া গেল।

অপু কহিল,—কি ভাবচো, বিন্দুরাণী?

বিন্দু কহিল,—তুমি কি ম্যাজিক জানো, দাদা…এক নিমেষে ওদের এমন বশ করলে!

অপু কহিল,—এক নিমেষ নয়, দিদি…দীর্ঘ ক-মাস ধ'রে চিঠিতে কেবলি হুঙ্কার আর বিভীষিকা জাগিয়েচি… একটি ফৌজদারী মোকদ্দমাও সেই সঙ্গে ফাঁদা হয়েছিল। বংশী বাবুর গোষ্ঠী মন্ত্রে বশ হবার নয়! এতখানি আয়োজন সতেজে চলেছিল বলেই…

বিন্দু কহিল,—তার খরচ…?

অপু কহিল,—সেটা না হয় বড় ভাই নিজের পকেট থেকেই দিলে! সে তো একেবারে নিঃস্ব নয়!…তা হলে এলাহাবাদে যাওয়ায় অমত হবে না তো? ধ'রে রাখবো না। ভয় নেই। কিন্তু সব বুঝে নেওয়া দরকার। তোমার নিজের কোনো স্বার্থ নেই, জানি। তবে হাতে পয়সা থাকলে সে পয়সায় অনেক গরীবের চোখের জল মুছোতে পারবে!

বিন্দু সেই কথাই ভাবিতেছিল। এই পয়সা…এই পয়সার জন্য বলাইদা ঘর-বাড়ী, আত্মীয়-স্বজন ছাড়িয়া কোথায় কতদূরে আসামের কোন্ কোণে আজ পড়িয়া আছে, অসুখ হইলে কে দেখে, খাওয়া-দাওয়া কেমন হইতেছে! এই পয়সার অভাবে শানুর কি অনিষ্ট ঘটিতে বসিয়াছিল।… আর আজ…

বিন্দু হঠাৎ অপুর পায়ের কাছে ঢিপ করিয়া প্রণাম করিল।

অপু কহিল,—এ কি রে?

বিন্দু কহিল,—আশীর্ব্বাদ করো, সিন্দুকে-পড়া মরচে-ধরা এ পয়সা সত্যই যেন গরীবের চোখের জল মুছোতে পারে, দাদা। [ক্রমশঃ।
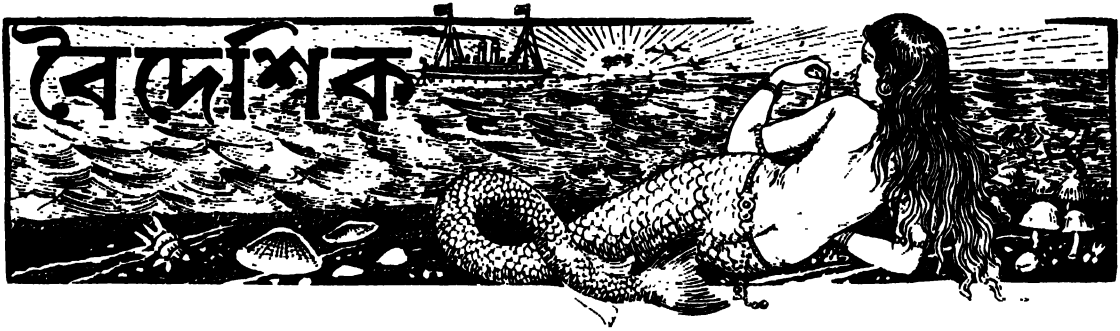
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

সোজা পথ

সম্প্রতি বিলাতে মি. উইনষ্টন চার্চ্চিলের দল পুষ্ট হইতেছে। এখন রক্ষণশীল দলের একাধিক সদস্য ভারতের সম্পর্কে তিনটি রাজনৈতিক দলের ঐকমত্যের বন্দোবস্ত হইতে সরিয়া দাঁড়াইবার মত কথা বলিতেছেন। কেবল যে ল্যাঙ্কাশায়ারের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁহারা মহাত্মা গন্ধীকে ও কংগ্রেসকে দিল্লীর চুক্তি-ভঙ্গের অপবাদে অভিযুক্ত করিতেছেন, তাহা নহে, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ পার্লামেণ্টে প্রশ্ন করিতেছেন,—'কেন আইন অমান্য আন্দোলনের প্রারম্ভে মিঃ গন্ধীকে সর্ব্বাগ্রে ধরা হয় নাই, কেন তাঁহার বিচার করিয়া দণ্ড দেওয়া হয় নাই?' আবার কেহ কেহ বলিতেছেন, গোড়ার গোল টেবিলে যে বাঁধন-কষণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহা যেন শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখা হয়, মি. গন্ধী কংগ্রেসের পক্ষ হইতে এবারকার গোল টেবিলে আসিলে যেন পূর্ব্বে যতটুকু কথাবার্ত্তা স্থির হইয়াছে, তাহা তাঁহাকে মানিয়া লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে স্পষ্ট বলিয়া দেওয়া হয়। আবার এমনও রাজনৈতিক আছেন, যাঁহারা বলিতেছেন, ফেডারেশন বা সংহিত রাষ্ট্রশাসন এখনও বহুদূর, এখন সাইমন কমিশনের নির্দ্দেশ অনুসারে চলা হউক, তাহার পরে উপযুক্ত সময়ে ফেডারেশনের কথা ভাবিয়া দেখিলে চলিবে, এখন স্যর জন সাইমনকেও গোল টেবিলে লওয়া হউক, ইত্যাদি। এই ভাবে আপোষের কথাটাকে চাপা দিবার চেষ্টা চলিতেছে। মি চার্চ্চিল ও লর্ড রদারমিয়ারের সঙ্গে এই বাক্সমরে লর্ড লয়েড, স্যর রেজিনাল্ড ক্রাডক, লর্ড মেষ্টন প্রমুখ ঝুনা সাম্রাজ্যবাদীরা অবতীর্ণ হইয়াছেন।

বিশেষরূপে লক্ষ্য করিবার এই যে, রক্ষণশীল দলের বড় কর্ত্তা মি. বলড্উইন পূর্ব্বের প্রতিশ্রুতিমত গোল টেবিলের সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত হইতে পারিতেছেন না বটে, তবে তিনিও এমনভাবে বাঁধন-কষণের কড়াকড়ি রাখিবার জন্য নির্ব্বন্ধাতিশয্য প্রকাশ করিয়াছেন, যাহাতে বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে, এই নির্ব্বন্ধের পশ্চাতে অনেক কিছু গুপ্ত রহস্য লুক্কায়িত আছে। প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের সহিত তাঁহার যে পত্র-বিনিময় হইয়াছিল, উহা প্রকাশিত হইয়াছে। উহা হইতেই তাঁহার মনোভাব স্পষ্টই বুঝা যায়। মিঃ ম্যাকডোনাল্ডও দলাদলির ভয়ে এমনভাবে জবাব দিয়াছেন, যাহাতে তিনি স্পষ্ট করিয়া কিছু বলিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না, তবে তিনিও যে রক্ষণশীল দলের মন রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে বাঁধন-কষণ সম্বন্ধে দৃঢ় হইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। দেশ-রক্ষা, সিভিলিয়ান রক্ষা, বণিক রক্ষা ও সংখ্যাল্প সম্প্রদায় রক্ষা,—তাঁহারও বুলী। যদি তাহাই স্থির হয়, তবে কংগ্রেস ও মহাত্মা গন্ধীকে গোল টেবিলে আমন্ত্রণ করিবার কি প্রয়োজন ছিল? পূর্ব্বের গোল টেবিলে তাঁহারা নিমন্ত্রিত হন নাই; তথায় যে সকল ভারতীয় 'প্রতিনিধিকে' লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, তাঁহাদের সম্মতিতে কোন কায হয় নাই বলিয়াই কংগ্রেসকে ও মহাত্মা গন্ধীকে পরে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। এখন যদি বলা হয়, পূর্ব্বে যে বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে, তাহা আর আলোচিত হইবে না, তবে মহাত্মা গন্ধী ও কংগ্রেস সে সিদ্ধান্ত মানিয়া লইবেন কেন? সে বিষয়েও ত তাঁহাদের মতামত জানা প্রয়োজন। তবে?

মিঃ ম্যাকডোনাল্ড

সমস্যা এইখানেই। মহাত্মা গন্ধী বা কংগ্রেস দিল্লীর চুক্তির সর্ত্ত সাধ্যমত পালন করিতেছেন। গুজরাটের বোরসাদ ও অন্যান্য তালুকের প্রজাদিগকে তাঁহারা খাজনা দিতে সম্মত করিয়াছেন। এখন মাত্র কয়েক হাজার টাকার খাজনা দিতে বাকী আছে। পিকেটিং শান্তিপূর্ণ না হইলে পিকেটিং একবারে মহাত্মা তুলিয়া দিতে বলিয়াছেন। হিন্দুমুসলমান সমস্যার সমাধান না হইলে মহাত্মা গোল টেবিলে যাওয়া নিরর্থক মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর অনুজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া ইচ্ছার বিরুদ্ধেও কার্য্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। এ সকল হইতে বুঝা যায়, কংগ্রেস ও মহাত্মা গন্ধী প্রাণপণে চুক্তির সর্ত্ত পালন করিতেছেন এবং বৃটিশ জাতির সহিত গোল টেবিল বৈঠকে আপোষ

কথা কহিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছেন। তাঁহাদের পক্ষ হইতে যে কোন ত্রুটি হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষমাত্রেই বলিবে।

এ অবস্থায় বৃটিশ জাতির কি করা কর্ত্তব্য, তাহা তাঁহারা এখন না বুঝিলে ভবিষ্যতে আর কোনও ফল হইবে না। ভারতের দুই জন মেধাবী ও শক্তিশালী রাজপ্রতিনিধি সম্প্রতি তাঁহাদের মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। লর্ড রেডিং ও লর্ড আরউইনের মত বড়লাট বহুদিন ভারতে পদার্পণ করেন নাই। ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিত তাঁহারা যত পরিচিত হইয়াছিলেন, এত আর কেহ নহেন। কম্যুনিষ্টরা বলে, লর্ড আরউইন আর বেন, ম্যাকডোনাল্ড মিষ্টমুখ বটে, কিন্তু অন্তরে গরল; আর চার্চ্চহিল স্পষ্টবাদী! তাহা বলুক, আমাদের কিন্তু মনে হয়, লর্ড আরউইন ও লর্ড রেডিং ইংরাজকে ভারতের সম্পর্কে যে পথ দেখাইয়া দিয়াছেন, তাহাই তাহাদের পক্ষে প্রকৃষ্ট। লর্ড আরউইন বলিয়াছেন, ভারতে শ্বেতজাতির ইজ্জৎ চিরতরে নষ্ট হইয়াছে। প্রথমতঃ ক্ষুদ্র এসিয়াবাসী জাপানীর হস্তে বিরাট য়ুরোপীয় রুসিয়ার পরাজয়, তাহার পর চলচ্চিত্রের প্রভাব ও জার্ম্মাণযুদ্ধে য়ুরোপের রণক্ষেত্রে ভারতীয় সেনা নিয়োগ,—লর্ড আরউইনের মতে এই তিনটি কারণে শ্বেতজাতির ইজ্জৎ এসিয়ায় নষ্ট হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, শ্বেতজাতির cultural conquestএর মোহভঙ্গ হওয়াতে এসিয়াবাসী এখন আপনাকে চিনিতে পারিয়াছে, তাহার আত্মসম্মানজ্ঞান উদ্‌বুদ্ধ হইয়াছে, সে তাই সকল জাতির সহিত সমান আসনের দাবী করিতেছে, তাই শ্বেতজাতি মনে করিতেছে, তাহাদের ইজ্জৎ নষ্ট হইয়াছে। যাহাই হউক, যখন ভারতশাসনে অভিজ্ঞ রাজপ্রতিনিধি মনে করেন, অবস্থা এইরূপ হইয়াছে, তখন ইংরাজ ভারতকে কিরূপে বন্ধু করিয়া রাখিতে পারেন, তাহাই তাঁহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য নহে কি? লর্ড রেডিংও বলিয়াছেন, "আমাদের কর্ত্তৃত্ব বজায় রাখিয়া যতদূর সম্ভব, শান্তি, সদ্ভাব, আপোষ ও সদিচ্ছার উপরে নির্ভর করিয়া ভারতবাসীকে বন্ধু করিয়া রাখা যায়, তাহাই করা কর্ত্তব্য।"

লর্ড আরউইন

লর্ড রেডিং

সোজা কথা। সাম্রাজ্যবাদীরা এক দিন জিদের জন্য আমেরিকা হারাইয়াছিল। সুবুদ্ধি হইয়াছিল বলিয়া দক্ষিণ-আফরিকা ও আয়ারল্যাণ্ড এখনও সাম্রাজ্যের মধ্যে আছে। ভারতেও সে সুবুদ্ধি দেখা না দিলে শান্তির সম্ভাবনা বোধ হয় সুদূরপরাহত।

—

প্রবাসে ভারতবাসী

ভারতবাসী বৃটিশ সাম্রাজ্যের নাগরিক, সাম্রাজ্যের অন্যান্য প্রজার সহিত তাহাদের সমান অধিকার,—এ কথাটা প্রায়ই বৃটিশ রাজনীতিকদের মুখে শুনা যায়। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে ইহার বিপরীতই দেখা যায়। দক্ষিণ ও পূর্ব্ব-আফরিকার প্রবাসী ভারতবাসীর সে দেশে স্থান কোথায়? ইহার জন্য বহুদিন যাবৎই বাদ-বিসম্বাদ চলিয়া আসিতেছে। মহাত্মা গন্ধী এক সময়ে ইহার জন্য দক্ষিণ-আফরিকায় যে সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু জেনারল স্মাটসের সহিত তাঁহার আপোষ-বন্দোবস্তের পর কয়েক বৎসরের মধ্যেই আবার অবস্থা যথা পূর্ব্বং তথা পরং হইয়া দাঁড়ায়। এজন্য আবার আন্দোলন আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহাশয় ভারত সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া হাই কমিশনাররূপে দক্ষিণ-আফরিকার ভারতীয়দের জন্য অনেক সংগ্রাম করিয়াছিলেন এবং কতক পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। এখনও দক্ষিণ-আফরিকার ভারতীয় প্রবাসীর অবস্থা যে খুবই উন্নত হইয়াছে, তাহা বলা যায় না।

শ্রীযুত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী

পূর্ব্ব-আফরিকায় ভারতীয় প্রবাসীর অবস্থা আরও মন্দ বলিয়া মনে হয়। তাহারাই পূর্ব্ব-আফরিকায় পথিপ্রদর্শকরূপে গিয়া, সেখানে বনজঙ্গল কাটিয়া, রেল বসাইয়া উপনিবেশ-স্থাপনে সাহায্য করিয়াছিল। আজ তাহাদিগকে সেজন্য বৃটিশ ঔপনিবেশিক সরকার যে 'পুরস্কার' দিয়াছেন, তাহা ভাবিলে কথামালার বাঘ

ও বকের গল্পই মনে পড়ে। এ বিষয়ে আন্দোলন হওয়ার ফলে সরকার হইতে একটি মিশ্র কমিশন নিযুক্ত হইয়াছে, এই কমিশনের প্রকৃত তথ্যানুসন্ধান করিয়া পার্লামেণ্টের সকাশে রিপোর্ট দিবার কথা।

শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহাশয় এই কমিশনের সমক্ষে সাক্ষ্যদানকালে বলিয়াছেন, "ভারত সরকার কিছু দিন পূর্ব্বে এই প্রদেশের ভারতীয়দের অধিকারাদির সম্বন্ধে যে যে ডেসপ্যাচ প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে ভারতবাসীর সন্তোষলাভ করিতে পারে নাই।" ভারতে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত থাকিলে বর্ত্তমান ভারত সরকার যাহা করিয়াছেন, জাতীয় সরকার আরও অধিক কিছু জাতীয়তার দিক হইতে করিতে পারিতেন। তাই এখন বোধ হয়, শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় সরকারের পক্ষ হইতে সেই ত্রুটি সারিয়া লইবার জন্য সাক্ষ্যে বলিয়াছেন, "ভারত সরকার তাঁহাদের ডেসপ্যাচের কিছু পরিবর্ত্তন করিতে চাহেন। তাঁহারা এইরূপ নিয়ম করিতে চাহেন :—

(১) বাঁধন-কষণ না রাখিয়া কয়টি খাসমহল ও উপনিবেশের সম্মেলন হইতে পারিবে না,

(২) তাই কমিশনারের কাউন্সিলের অতঃপর আর কার্য্য করিবার ক্ষমতা থাকিবে না, তাঁহারা পরামর্শই দিতে পারিবেন,

(৩) দেশীয় প্রতিনিধিদিগকে দেশীয়দের স্বার্থ দেখিবার জন্য নির্ব্বাচন করিতে হইবে ; যদি তাহাও না হয়, তাহা হইলে সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্য হইতে লোক নিযুক্ত হইবেন, তাঁহারা দেশীয়দের স্বার্থ দেখিবেন ; যদি এই দুইটিই করা না হয়, তাহা হইলে ভারতীয়রা দেশীয়দের মনের ইচ্ছার বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান আছে বলিয়া তাহাদের প্রতিনিধিরূপে কথা কহিতে পারিবে,

(৪) ভারতীয়দের পদমর্য্যাদা ও সামাজিক সম্মান অন্য কোন সম্প্রদায়ের অপেক্ষা হীন হইবে না,

(৫) নির্ব্বাচনের তালিকা সকল সম্প্রদায়ের পক্ষে সমান হইবে।"

শাস্ত্রী মহাশয় যে সাক্ষ্য দিয়াছেন, উহা ভারত সরকারেরই সাক্ষ্য বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে, কেন না, তিনি ভারত সরকারেরই প্রতিনিধিরূপে সাক্ষ্য দিয়াছেন। এখন বৃটিশ উপনিবেশ সরকার যে কমিশন নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহারা এই সাক্ষ্যের কিরূপ মর্য্যাদা রক্ষা করেন, তাহা দেখিবার বিষয়। তাঁহাদের জানা উচিত, সমগ্র ভারতবর্ষের লোকের দৃষ্টি এ দিকে নিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

প্রচারের কেরামতি

আজকাল ভারতের এবং ভারতবাসীদের বিপক্ষে প্রচারকার্য্য কাহারও কাহারও জীবনের ব্রত হইয়াছে। অবশ্য, এই ব্রতগ্রহণের মূলে যে নিঃস্বার্থ পরোপকারিতার চিহ্নমাত্র নাই, তাহা বোধ হয়, কাহাকেও বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। মার্কিণের মিস মেয়ো যে "যত দোষ নন্দ ঘোষ"-রূপে একাই এ পথের যাত্রী, তাহা নহে, এমন অনেক মিস মেয়োই আসরে নামিয়াছেন।

মহাত্মা গন্ধীর নামে মিথ্যা গ্লানি ও কুৎসা প্রচার করাও কাহারও কাহারও বাতিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ক্রোধে, ক্ষোভে চার্চ্চহিল মহাত্মা গন্ধীকে 'উলঙ্গ ফকীর' আখ্যা দিলেও তাঁহার নামে মিথ্যা অপবাদপ্রচারে বিশেষ কেরামতি দেখাইতে পারেন নাই। কিন্তু এক শ্রেণীর লোক মহাত্মার নির্ভীকতা ও সাহসিকতার প্রশংসা হইলে একবারে ক্ষেপিয়া উঠেন। তাঁহারা অমনই সাজাইয়া বিনাইয়া তাঁহার মিথ্যা কলঙ্ক রটাইতে লাগিয়া যান। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি।

মহামতি এণ্ড্রুজ বিলাতে কোন এক ক্ষেত্রে মহাত্মা গন্ধীর নির্ভীকতার ও বীরত্বের প্রশংসা করিয়াছিলেন। তিনি দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখাইয়াছিলেন যে, বুয়র-যুদ্ধের সময় কোলেনজোর যুদ্ধে আহতদিগের উদ্ধারসাধন করিয়া এবং লর্ড রবার্টসের একমাত্র আহত পুত্রকে রণস্থলের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে স্থানান্তরিত করিতে সাহায্য করিয়া মহাত্মা গন্ধী তাঁহার বীরত্ব ও মনুষ্যত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। 'মর্ণিং পোষ্ট' পত্র ভারতীয়বিদ্বেষী হইলেও এই প্রশংসার কথা মুদ্রিত করিয়াছিল এবং উহার উপর মন্তব্য করিয়া বলিয়াছিল, "আমরা এই কথা প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে ইহার সত্যাসত্য সম্বন্ধে অতীব বিশ্বাসযোগ্য সূত্র হইতে প্রমাণ পাইয়াছি।" সার টমাস গলওয়ে নামক এক সাম্রাজ্যগর্ব্বী বৃটিশ সেনানীর ইহা সহ্য হইল না। তিনি তাড়াতাড়ি ইহার প্রতিবাদ করিয়া লিখিলেন, "মিঃ গন্ধী কোলেনজোর যুদ্ধে ত উপস্থিতই ছিলেন না, পরন্তু সময়ে ডুলীবাহকগণকে সংগ্রহ করিতে পারেন নাই বলিয়া লর্ড রবার্টসের পুত্রকে উদ্ধার করিবার সম্পর্কে কোন অংশই গ্রহণ করেন নাই। মিঃ গন্ধীর বীরত্বের প্রশংসা গল্প কথা। আমি যখন তাঁহাকে এম্বুলেন্স কোরে নিযুক্ত করি, তখন তিনি আমার সহিত এই সর্ত্ত করিয়া লইয়াছিলেন যে, তিনি কেবল সংবাদ আদানপ্রদানের পক্ষে কার্য্য করিবেন, প্রকৃত রণক্ষেত্রে থাকিবেন না। প্রকৃতপক্ষে তিনি কখনও রণক্ষেত্রে ছিলেন না।" কিন্তু সত্যকে মিথ্যা করা যায় না। মিঃ এণ্ড্রুজ সাক্ষ্যপ্রমাণ দাখিল করিয়া

দেখাইয়া দিলেন যে, মহাত্মা গন্ধী ও তাঁহার ডুলীবাহকরা যথার্থই রণক্ষেত্র হইতে আহত বৃটিশ সেনাগণকে সরাইয়া আনিয়াছিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা চমৎকার এই যে, মহাত্মা গন্ধী এ বিষয়ে কোন সাংবাদিক কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিয়াছেন, "আমাদের ভারতীয় এম্বুলেন্স কোরের সংখ্যা ছিল ১ হাজার ১ শত জন। এ যুদ্ধে লেফটানেণ্ট রবার্টস আহত হন, আমরা সেই যুদ্ধের পর স্থলে ছাউনীতে উপস্থিত হই। উপস্থিত হইবামাত্রই কর্ণেল গলওয়ে আমাকে লেফটানেণ্ট রবার্টসের দেহ স্থানান্তরিত করিবার আদেশ দেন। আমরা সাত জন ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবক (কুলী নহে) অধিক রাত্রিতে আদেশ পালন করিয়া ছাউনীতে ফিরিয়া আসি। তখনই ঝটিতি আদেশ পালন করার জন্য কর্ণেল গলওয়ে আমাকে বিশেষ ধন্যবাদ প্রদান করেন। পরদিন ডাক্তার বুথের মারফতে আমি কর্ণেল গলওয়ের তাম্বুতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত আমন্ত্রিত হই।"

এরূপ আশ্চর্য্য বিস্মৃতির কথা নাটক-নভেলেই পড়া যায় বটে! যে গলওয়ে স্বয়ং মহাত্মা গন্ধীকে বীরত্বের জন্য ধন্যবাদ দিয়াছিলেন, সেই গলওয়েই আজ সে কথা একবারে ভুলিয়া গেলেন! ইহাকে কি বৃদ্ধবয়সের বুদ্ধিভ্রংশ বলা যায় না? মহাত্মা তাহার পর বলিয়াছেন, "আমরা প্রকৃত যুদ্ধক্ষেত্রে কামান-গোলাবৃষ্টির মাঝে কাম করিতে ব্যগ্র হইয়াছিলাম, কিন্তু আমাদিগকে সে অনুমতি দেওয়া হয় নাই।" তথাপি তিনি যে রণক্ষেত্রের গোলাবৃষ্টির মাঝে উপস্থিত ছিলেন, তাহারও প্রমাণ আছে। মহাত্মা স্বয়ং বলিয়াছেন, "স্পিয়ানকোপের যুদ্ধে পরাজয়ের পর অবস্থা যখন অত্যন্ত সঙ্কটসঙ্কুল হয়, তখন জেনারেল বুলার আমাদের তাম্বুতে আসিয়া বলেন, 'যদি আপনি গোলাবৃষ্টির মাঝে স্পিয়ানকোপ পাহাড়ের পাদমূলে আহত জন বৃটিশ সেনাকে সরাইয়া লইয়া আসিতে পারেন, তাহা হইলে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকিব।' আমি ও আমার সহচররা এই সুযোগ পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম এবং মেজর ব্যাপটির সঙ্গে আমরা নৌসেতু পার হইয়া রণক্ষেত্রের গোলাগুলীবৃষ্টির মধ্যস্থলে উপনীত হইয়া আহতগণকে সরাইয়া আনিলাম। আহতদের মধ্যে জেনারল গুডগেট, মেজর স্কট মনক্রিফ ও অন্যান্য অনেক সেনানী ছিলেন। আমরা ষ্ট্রেচারে করিয়া তাঁহাদিগকে ২৫ মাইল লইয়া গিয়াছিলাম। আমরা স্পিয়ানকোপের পর ভেয়াল-ক্রান্ঞ্চ প্রভৃতি স্থানের যুদ্ধেও গোলাগুলীর মধ্যে গিয়াছিলাম। জেনারল বুলার তাঁহার ডেসপ্যাচে এ সকল কথার উল্লেখ করিয়াছিলেন।"

অতঃপর কর্ণেল গলওয়ে বোধ হয় আকাশে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিয়া আপনার অঙ্গকে কলুষিত করিতে সাহস করিবেন না!

মার্কিণ জাতির সহানুভূতি

জগতে এক জাতি অপর জাতিকে তাহাদের মুক্তি-যুদ্ধে প্রত্যক্ষে সাহায্য প্রদান করিলে অপর জাতি মুক্ত হইবে, যদিও এ ধারণা আমাদের নাই, তথাপি মুক্তিকামী দুর্ব্বল জাতি যদি পরোক্ষে জগতের অন্য কোন প্রবল শক্তিশালী জাতির সহানুভূতি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে সেই সহানুভূতির মূল্য নিতান্ত সামান্য হয় না। কেন না, উহা হইতে অপর জাতি অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ লাভ করিতে পারে।

এই হিসাবে অধুনা মার্কিণ জাতির কোন কোন লোক ভারতীয়ের মুক্তিযুদ্ধে সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেছেন বলিয়া ভারতবাসীরাও তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিতেছে। মধ্যে শুনা গিয়াছিল, মহাত্মা গন্ধী মার্কিণের একাধিক প্রতিষ্ঠান হইতে তথায় যাইতে আমন্ত্রিত হইয়াছেন। মহাত্মা গন্ধী কিন্তু জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিয়াছেন, তিনি এ যাবৎ কোন নিমন্ত্রণ প্রাপ্ত হন নাই। সুতরাং এরূপ ভাবের সংবাদে সহসা আস্থা স্থাপন করিতে সাহস না হওয়ারই কথা।

কিছু দিন পূর্ব্বে সংবাদ আসিয়াছে যে, মহাত্মা গন্ধী যখন বিলাতে যাইবেন, তখন মার্কিণ দেশ হইতে তাঁহার নিকটে একটি ডেপুটেশান প্রেরিত হইবে। যে সকল দেশপ্রেমিক মার্কিণ ভারতের মুক্তির কল্যাণকামী, তাঁহারা এই ডেপুটেশানে থাকিবেন। তাঁহারা স্বয়ং লণ্ডনে গিয়া মহাত্মা গন্ধীকে মার্কিণ জাতির সহানুভূতির কথা জানাইয়া আসিবেন। তিনি যে দেশের মুক্তির জন্য অদ্ভুত যুদ্ধ করিতেছেন, তাহাতে আমেরিকাবাসী মুগ্ধ এবং সে জন্য তাহারা তাঁহাকে স্বাধীনতার কাম্য প্রাপ্ত হইবার জন্য যথাসাধ্য সাহায্যদান করিতে প্রস্তুত।

কথাটা সত্য হইলে আনন্দের বিষয়। মহাত্মার অহিংসার যুদ্ধে জগতের শ্রেষ্ঠ জাতিগণের সহানুভূতি থাকে, ইহা কোন্ ভারতীয় কামনা করে না?

প্রেসিডেণ্ট হুভারের দূরদর্শিতা

মহাযুদ্ধের পর এ যাবৎ কোন জাতিই যুদ্ধের আঘাত-ক্ষত শুষ্ক করিতে পারে নাই। পৃথিবীর ব্যবসায়-বাণিজ্যের বাজার ক্রমশঃ মন্দ হইতে মন্দতরই হইয়া আসিতেছে। বিশেষতঃ জার্ম্মাণ জাতিকে ত একবারে শুইয়াই পড়িতে হইয়াছে। ফরাসীর ধ্বংসপ্রাপ্ত অঞ্চলের পুনর্গঠনের অজুহতে জার্ম্মাণীর নিকট যে ক্ষতিপূরণের অর্থ আদায় করা হইতেছে, জার্ম্মাণীর তাহা দিবার সামর্থ্য নাই, কেবল জার্ম্মাণী কেন, য়ুরোপের অন্যান্য

দেশও মার্কিণের নিকট বহুল পরিমাণে ঋণী, তাহাদেরও নিয়ম ও সময়মত ঋণের সুদই পরিশোধ করিবার সামর্থ্য নাই। ঋণ পরিশোধের চাপে ব্যবসায়-বাণিজ্যের পুনরুদ্ধার হওয়া দূরে থাকুক, ব্যবসায়-বাণিজ্য ক্রমশঃ অধোগতিই প্রাপ্ত হইতেছে।

জগতের এই অবস্থা দেখিয়া মার্কিণ যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্ট হুভার বহু গবেষণার পর এক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। তিনি জগতের জাতিগণকে আশ্বাস দিয়াছেন যে, এক বৎসরের জন্য কাহাকেও মার্কিণের নিকট দেয় দেনা পরিশোধ করিতে হইবে না, এবং যে টাকাটা বাঁচিয়া যাইবে, তাহা সকলে ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতিসাধনে নিয়োজিত করিবেন।

বলা বাহুল্য, দেনদার জাতিরা ইহাতে পরম আনন্দ লাভ করিয়াছেন। বিশেষতঃ জার্ম্মাণী বোধ হয় দুই হাত তুলিয়া প্রেসিডেণ্ট হুভারকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। তাঁহাদের শ্বাস রুদ্ধ হইবার দশা উপস্থিত হইয়াছিল, এখন প্রেসিডেণ্ট হুভারের এই বদান্যতায় আবার তাঁহারা ধড়ে প্রাণ পাইলেন। ইহাও বলা বাহুল্য যে, প্রেসিডেণ্ট হুভারের প্রস্তাবে য়ুরোপের শক্তিপুঞ্জ সানন্দে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন।

কিন্তু ফরাসী সরকার প্রথমে এই প্রস্তাবে আদৌ সম্মতি প্রদান করেন নাই, প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন মতামতই প্রকাশ করেন নাই। তবে ফরাসী জাতি বে-সরকারী ভাবে ইহার বিরুদ্ধে অনেক কথা কহিয়াছিলেন। কথা হইয়াছিল, মার্কিণ যেমন এই উদারতা প্রদর্শন করিতেছেন, তেমনই অন্যান্য জাতিও পরস্পরের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করিবেন। ফরাসী সাংবাদিকরা বলিলেন, তাহা কিরূপে হইতে পারে? সে ক্ষেত্রে জার্ম্মাণী যদি ফরাসীর ঋণ পরিশোধ না করে, তাহা হইলে ফরাসীর ধ্বংসপ্রাপ্ত অঞ্চলের পুনর্গঠন হইবে কিরূপে?

যাহা হউক, ফরাসী সরকার পরে মার্কিণের প্রস্তাবে কতকটা সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। তবে তাঁহারা বলিয়াছেন, এক বৎসরের জন্য তাঁহারা চুপ করিয়া থাকিতে পারিবেন বটে, কিন্তু তাই বলিয়া জার্ম্মাণী যেন অন্য হিসাবে যে সকল টাকা পাওনা আছে, তাহা ফরাসীকে দেওয়া বন্ধ না করেন। পরন্তু জার্ম্মাণীর অর্থকৃচ্ছ্রতা যেরূপ সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে এক বৎসরের জন্য টাকা শোধ দেওয়া বন্ধ রাখিলেও জার্ম্মাণীর বিশেষ কোন সুবিধা হইবে না। জার্ম্মাণীর বিপদ দূর করিতে হইলে ধারে কারবার আরও বাড়াইতে হইবে। সেরূপ করিতে হইলে আন্তর্জাতিক দেনা-পাওনা মিটাইবার জন্য ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। এই ব্যাঙ্কে ফরাসী সরকার জার্ম্মাণীর সুবিধার জন্য টাকা গচ্ছিত রাখিতে সম্মত আছেন। কারণ, এইরূপ ব্যাঙ্ক স্থাপন না করিলে মধ্য-য়ুরোপে অর্থনীতিক বিপ্লব ঘটিবার সমধিক সম্ভাবনা। মধ্য-য়ুরোপের অর্থনীতিক ব্যাপারে ফরাসী সরকার বিশেষভাবে জড়িত বলিয়াই এত দিন প্রেসিডেণ্ট হুভারের প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। জার্ম্মাণীর সহিত বিভিন্ন দেশীয় বণিকগণ যদি বিস্তৃতভাবে ধারে কারবার না করেন, তাহা হইলে জার্ম্মাণীর ঋণ-পরিশোধের কাল এক বৎসরের জন্য স্থগিত রাখিলে বাণিজ্যব্যাপারে জার্ম্মাণীর কি সুবিধা হইবে? এখন ফরাসী সরকারের প্রস্তাব কি ভাবে গৃহীত হয়, তাহাই দেখিবার বিষয়।

আষাঢ়

(১লা আষাঢ় 'রেডিওতে' পঠিত)

দগ্ধ ধরণী করিয়া শীতল তপ্ত ধূলার 'পরে
সজল মেঘের কাজল নয়নে তরল করুণা ঝরে!
ঝরে আঁখিজল লক্ষ আঁখির যক্ষের দুখে কাঁদে রামগিরি
কাঁদে নীল নভে নীরদ অধীর, অলকার লিপি করে!

এসেছে আষাঢ়, এসেছে আবার, গুরু-গুরু রব তুলে,
জোলো হাওয়া এনে দিয়েছে আষাঢ় পূবের জানালা খুলে!
দেহ শিহরয় শীত সমীরণে কে ফিরে ঘুরিয়া বেণু বনে বনে
কে সেই উদাসী বাজাইছে বাঁশী আঁধারে আপনা ভুলে!

বিরহী বালিকা বাদলের সাঁঝে গেঁথেছে যূথীর মালা,
শয়ন-শিয়রে নিভানো প্রদীপ, নয়ন-তারাটি জ্বালা!
তারি ব্যথারাশি ঐ বুঝি ভাসে বাদলের হু হু বাতাসের শ্বাসে
তাহারি প্রাণের আকুতি বুঝি বা বরষা-ধারায় ঢালা!

নীরব নিশীথে মন্থিয়া ওঠে নিখিল বুকের ব্যথা
তমালের বুকে লুকাইয়া মুখ কাঁদিছে মাধুরী-লতা!
দূরে দূরে যারা রয়েছে একেলা কি করিয়া কাটে তাহাদের বেলা
কাছে কাছে যারা রয়েছে তাদের কি করিয়া ফুটে কথা!

আজিকে আষাঢ়, সজল আষাঢ়, মেঘদূত চ'লে যায়
কে তোরা পাঠাবি প্রেয়সীরে লিপি, ছুটে আয়! ছুটে আয়!

ঝরিতেছে বারি ঝর-ঝর ধারে বিজলী চমকে মেঘের ওপারে!
হেন দুর্দ্দিনে সে রবে কেমনে যদি লিপি নাহি পায়!
(ওরে) এসেছে আষাঢ়, সজল আষাঢ়, মেঘদূত চ'লে যায়!

শ্রীবামেন্দু দত্ত।

অকিঞ্চনের দাদা

১

গ্রামে বারোয়ারী হইবে।

তাহারই সম্বন্ধে অন্য পাণ্ডাদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া বেলা প্রায় দেড় প্রহরের সময় অকিঞ্চন বাহির হইতে বাড়ী ফিরিলে, স্ত্রী ক্ষান্তমণি রান্নাঘরের ভাতের হাঁড়ির কাছ হইতে উঠিয়া আসিয়া, মুখখানাকে ভাতের হাঁড়িরই মত করিয়া বলিয়া উঠিল,—"যার রাজ্যি শুদ্ধ দেনা, সে যেন চব্বিশ ঘণ্টা বাড়ীতেই ব'সে থাকে। কেন না, পাঁচ জনে তাগাদা করতে এসে তাকে পাবে না দেখতে, আর আমায় দশটা কথা শুনিয়ে যাবে, সে আমি সইতে পারব না।"

অকিঞ্চন হুঁকার মাথা হইতে কলিকা লইয়া তামাক সাজিতে সাজিতে কহিল,—"তাগাদা করতে এসে কে তোমায় দশটা কথা শুনিয়ে দিয়ে গেল শুনি?"

—"গাঁ শুদ্ধ পাওনাদার, ক'জনের নাম করব? আর তাদেরই বা দোষ কি? তারা দিয়ে রেখেছে, আর চাইতে আসবে না? তবে, তোমায় আমি ব'লে রাখছি, আমার কাছে কেউ যেন না এসে মুখনাড়া দিয়ে দশখানা ব'লে যায়। নেবার সময় সব নিয়ে রেখেছ, আর এখন দেবার বেলা বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ালে ত হবে না। সক্কালবেলা বিনে জেলের মা ... মুখনাড়াটাই না আমায় দিয়ে গেল!"

বৎসর দুই আগেও অকিঞ্চন প্রত্যহ স্নানান্তে গীতাপাঠ করিত, মিথ্যা কথা কহিত না এবং ফেলী বামনীর গচ্ছিত গহনা ও টাকা, ... গয়া-কাশী হইতে ফিরিয়া আসার পর কড়ায় গণ্ডায় তাহাকে বুঝাইয়া ফেরৎ দিয়াছিল।

অকিঞ্চন কি একটা বলিতে যাইতেছিল, সহসা মুক্ত সদর-দরজার বাহিরে দৃষ্টি পড়ায় তৎক্ষণাৎ সেইখানেই সে লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িল, কাঁধের গামছাখানি মাথায় দুই তিন পাক জড়াইল এবং সাজা তামাক ও টীকা মাটীতে ঢালিয়া ফেলিয়া, হুঁকা উল্টাইয়া তাহারই খানিকটা জল তাহাতে ঢালিয়া একটা প্রলেপের মত করিয়া কপালে ও ঘাড়ে বেশ করিয়া মাখাইয়া, শুইয়া শুইয়া গোঙাইতে লাগিল।

মুহূর্ত্ত পরেই সদর-দরজায় লাঠির ঠক্ ঠক্ শব্দ হইল এবং অকিঞ্চনেরই ঠাকুরমশাই, ও-পাড়ার রাজু ঘোষাল ধীরে ধীরে প্রাঙ্গণের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল।

বৃদ্ধ ঘোষালমশায় চোখে একটু কম দেখেন। লাঠি-গাছটি পৈঠার পাশে ঠেসাইয়া রাখিয়া দাওয়ার উপর উঠিয়া আসিতেই, ঘরের ভিতর হইতে ক্ষান্তমণি একখানি কম্বলের আসন হাতে করিয়া বাহিরে আসিল এবং সেখানি সেইখানে পাতিয়া দিয়া তাঁহার পায়ের কাছে ঢিপ করিয়া প্রণাম করিল। অকিঞ্চন কহিল,—"ঠাকুরমশাই, স'রে এসে
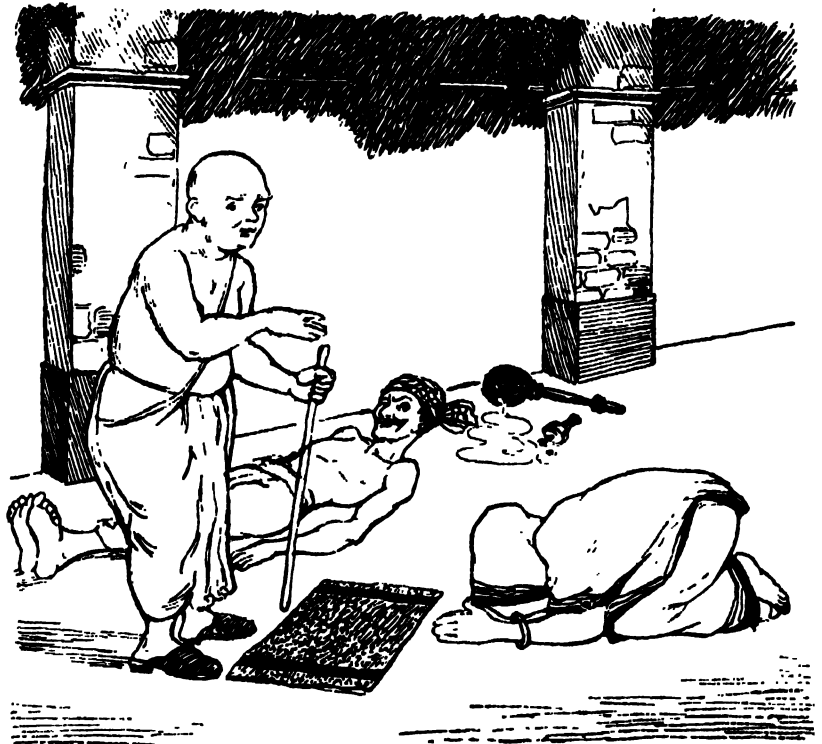
ক্ষান্তমণি পায়ের কাছে ঢিপ করিয়া একটা প্রণাম করিল

পা'টা একটু এগিয়ে দিন, আমার আর মাথা তোলবার ক্ষমতা নেই।"

ঘোষালমশায় তাহার কাছে আগাইয়া আসিলেন এবং ক্ষীণ দৃষ্টিতে তাহার মাথার দিকে দেখিয়া কহিলেন, "কি হয়েছে বাবা, পড়ে-টড়ে গেছিস না কি ?"

—"পড়ে যাইনি ঠাকুরমশাই, লাঠির চোট! আপনার আশীর্ব্বাদে যে ফিরে এসেছি, এই যথেষ্ট।"

সপ্তাহখানেক আগে অকিঞ্চন ঘোষালমশায়ের বাড়ী গিয়া কথায় কথায় তাঁহাকে বলিয়াছিল যে, সে দুই এক দিনের মধ্যেই কোন একটা বিশেষ দরকারে একবার কলিকাতায় যাইবে। ঘোষাল মশাই ইহা শুনিয়াই তাঁহার দুই নাতিনীর জন্য দুইখানি ভাল দেখিয়া আলপাকার ছাপা শাড়ী আনিয়া দিবার জন্য, শিষ্য অকিঞ্চনের হাতে তখনি দশটি টাকা গছাইয়াছিলেন। কয় দিনের পর আজ তাহারই খোঁজ লইতে বৃদ্ধ প্রায় অর্দ্ধ-ক্রোশ পথ হাঁটিয়া গ্রামের পূর্ব্ব প্রান্ত হইতে পশ্চিম প্রান্তে শিষ্যের কাছে আসিয়াছেন।

অতঃপর লাঠির চোটের কাহিনী বলিতে গিয়া অকিঞ্চন কহিল, —"আয়ু ছিল, তাই ফিরে এসেছি, নইলে —ঠিক সন্ধ্যেটি সবে হয়েছে। আপনার টাকা দশটা পকেটে নিয়ে কাপড় দুখানা কেনবার জন্যে বেরুলুম। আমাদের রামবাগানের গলির ভেতরটায় তখনও গ্যাস জ্বালা হয়নি, খুবই অন্ধকার। গলি থেকে বড় রাস্তায় পড়ব, এমন সময় পেছন থেকে মাথার ওপর এক লাঠি। তখুনি ঘুরে পড়লুম। কিন্তু টাকা দশটা তবুও ছাড়িনি, পকেটশুদ্ধ প্রাণপণে মুঠো ক'রে ধরেছিলুম। তার পর হাতের ওপর আর এক লাঠি। তার পর—ব্যস্!"

—"বলিস্ কি রে ?"

—"সেইখানেই শুয়ে প'ড়ে ভাবলুম যে, ঠাকুরমশায়ের টাকা, যেমন ক'রে হোক কোন সময়ে তাঁকে এ ফিরিয়ে দিতেই হবে, নইলে মহাপাতকী হতে হবে।"

—"সে টাকা আর তোকে দিতে হবে না। ধরতে গেলে আমারই জন্যে এত বড় এই বিপদটা তোর ঘটলো। সে টাকা আবার আমি তোর কাছ থেকে গণ্ডা নেব ? হ্যাঁ বাবা, মাথা ফেটে রক্ত-টক্ত বেরোয় নি ত ?"

—"বোধ হয়, তা'ও বেরিয়েছিল, অন্ধকারে আর অতটা ঠাওর করতে পারিনি। এখন আশীর্ব্বাদ করুন, শীগগীর যেন ভাল হয়ে উঠি" বলিয়া আর একবার অকিঞ্চন তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল।

তার পর উভয়ে আরও দুই চারিটি কথা হইল, ঠাকুরমশাই তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, ভাবনা করিতে নিষেধ করিলেন এবং টাকা দশটি যে তিনি কিছুতেই তাহার কাছ হইতে লইবেন না, বার বার সে কথা জানাইলেন এবং তৎপরে লাঠিগাছটি তুলিয়া লইয়া ঠক্ ঠক্ করিতে করিতে প্রাঙ্গণ পার হইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

কান্ত ঘর হইতে বাহির হইয়া কহিল, "গুরুর কড়ি ফাঁকি দিয়ে খেলে, পাপের যে আর সীমে-পরিসীমে নেই। আমার ইচ্ছে হচ্ছিল, ঘর থেকে ছুটে এসে বলি যে, ঠাকুরমশাই, সব মিছে কথা। উঃ! কি হ'লে গো তুমি ?"

মুখখানাকে বিকৃত করিয়া অকিঞ্চন বলিল, "এক ঘটি জল নিয়ে এস আগে, মুখটা ভাল ক'রে ধুয়ে ফেলি। পাপের যে সীমে-পরিসীমে নেই, তা একবার নয়, লাখোবার সে কথা সত্যি। দুর্ভোগ কি কম! তামাক আর হুঁকোর জলের পচা গন্ধে অন্নপ্রাশনের ভাত পর্য্যন্ত উঠে আসবার যোগাড় হচ্ছে!"

বেশ করিয়া মুখ ধুইয়া ফেলিয়া অকিঞ্চন পুনরায় কলিকা লইয়া তামাক সাজিল এবং হুঁকাটি লইয়া সদরের দরজার বাহিরে আসিয়া বসিল।

কাপড়ের দোকানের শরৎ নন্দী স্নান করিয়া ফিরিতেছিল, কহিল,—"পালের পো, গামছার দরুণ ক'গণ্ডা পয়সা অনেক দিন থেকে বাকী প'ড়ে রয়েছে, ওটা দিয়ে দিলেই ভাল হয়।"

অকিঞ্চন হুঁকায় একটা টান দিয়া কহিল,—"খুচরো বলেই আর মনে থাকে না। ওর জন্যে ভয় বা তাগাদার কোন দরকার নেই। পাঁচ আনা বুঝি ?"

—"পাঁচ আনা কি হে ? দু'খানা চার হাতি গামছা—সাড়ে দশ আনা। তা, খুচরোটা আর বেশী দিন ফেলে রেখো না হে, দিয়ে দিও। বাঁড়ুয্যের কাছে তোমার বাকী দেনার কি হ'ল ? শুনলুম, সুদ নাকি আসল ছাপিয়ে উঠেছে ?"

অকিঞ্চন নীরব থাকিয়া তামাক টানিয়া যাইতে লাগিল। নন্দী চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলে কহিল,—"যত হোক, সুদে আসলে শ' চারেক হয়েছে। চার শ' টাকা

...আবার দেনা ? কোলকাতা গিয়ে চার মাস থাকতে পেলেই শোধ ক'রে দেবো। কিন্তু বেরুতেই যে পারছি না, সেই হয়েছে মুস্কিল।"

সদর-দরজার কবাট বন্ধ করিয়া অকিঞ্চন বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতেই দেখিল, স্বয়ং মহাজন কালী বাঁড়ুয্যে মহাশয় এক হাতে একটি লাউ ঝুলাইয়া খিড়কী দিয়া বাটী ঢুকিতে-ছেন। অকিঞ্চনকে দেখিয়া কহিলেন, "কি রে বাপু, ব'লে ব'লে ত হার মানলুম। দু'শ টাকার আড়াইশ' টাকা সুদ হয়ে গেল। নালিশটা ঠুকে দিলে হাকিমই বলবে কি, আমিই বা বলব কি? আর তুই দিবিই বা কোত্থেকে? তাই ত বলি যে, অনর্থক আর সুদ না বাড়িয়ে, জমীটা না হয় রেজেষ্টী করেই দিয়ে দে, বিশ পচিশ টাকা ওর ওপর না হয় আরও দিয়ে দেব এখন।"

হাতজোড় কপালে ঠেকাইয়া অকিঞ্চন কহিল,—"কি বলছেন, খুড়ো ঠাকুর! পনর বিঘের জমীটা ঐ টাকাতে —"

মুখের কথা চাপা দিয়া বাঁড়ুয্যে মহাশয় কহিলেন, "শুনতে ত ঐ পনর বিঘে, কিন্তু জমীটার ভেতর কি আছে বাপু! একেবারে ফোঁপরা জমী! ধানের ত মুখ দেখবার যো নেই, না হয় দু'চার আঁটি হয় খড়। তা, তাই বা তোর দেখবার ... কি আছে? টাকা কিন্তু আমি আর ফেলে রাখতে পারব না, এই আষাঢ় কিস্তির ভেতরেই বেবাক ... সব আমায় চুকিয়ে দিয়ে দিতে হবে, নইলে —"

উঠানের একটি চারা আমগাছ হইতে গোটা দুই চারি পাতা ছিঁড়িয়া লইয়া অকিঞ্চন কহিল, "বোশেখ মাসের এই ... আর মাথা গরম করবেন না, খুড়ো ঠাকুর, আসুন, ... খান। লাউটি বাগালেন কোত্থেকে?"

পরন্তু বাঁড়ুয্যে মশায় কাণে তুলিলেন না। অকিঞ্চনের পিছন পিছন তিনি দাওয়ার উপর উঠিয়া খুঁটি ঠেস দিয়া ... আমপাতার নল পাকাইতে মনোযোগী হইলেন।

সেই দিনই সন্ধ্যার পর বাঁড়ুয্যের এই দেনা লইয়া অকিঞ্চনের সহিত ক্ষান্তর খুব একচোট ঝগড়া হইয়া গেল এবং অকিঞ্চন রাগের মাথায় প্রদীপ, পিলসুজ, জলের ঘড়া, ... ভাঁড়, লক্ষ্মীর হাঁড়ি, হুঁকা, কলিকা, লণ্ঠন, বালতি ... ছুঁড় দিয়া ভাঙ্গিল, আমকাঠের সিন্দুকের উপর শাবলের ... করিল, দা দিয়া ক্ষান্তকে কাটিতে যাইয়া উঠানের সেই ... আমগাছটির উপরই দুই চারি কোপ বসাইয়া দিল এবং প্রতিজ্ঞা করিল যে, সে যদি যথার্থ ই ছিমস্ত পালের ছেলে হয় ত কালই সে বাড়ী হইতে চলিয়া যাইবে এবং দেনার টাকা হাতে না করিয়া আর কখনও সে বাড়ী ফিরিবে না।

২

কিন্তু কালই তাহার যাওয়া হইল না।

পরের দিন সমস্ত সকালটা অকিঞ্চনকে ঘরেও দেখা গেল না, গাঁয়েতেও সে ছিল না। বেলা প্রায় এক প্রহরের সময় পাশের গ্রাম হইতে সে ফিরিতেছিল।

কলিকাতা যাইতে হইলে অন্ততঃ গোটা পাঁচেক টাকা তাহার দরকার এবং এ টাকা সে গাঁয়ের কাহারও কাছে হাত পাতিলে যে পাইবে না, তাহা সে ভালরূপই জানিত, তাই প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিয়াই সে মামুদপুর গিয়াছিল। কিন্তু যাহার কাছে সে গিয়াছিল, সেখান হইতেও তাহাকে ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিতে হইয়াছে।

নদীর ঘাটে আসিয়া অকিঞ্চন দেখিল যে, দুইটি লোক বটগাছের ছায়ায় বসিয়া জলপান খাইতেছে। তাহাদের সহিত দুই একটি কথায় সে জানিতে পারিল যে, তাহারা ছাগলের পাইকার, গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরিয়া ছাগল কিনিয়া তাহারা চালান দেয়। অকিঞ্চন তাহাদের সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইল এবং তাহাদের জলপান খাওয়া শেষ হইলে তাহা-দিগকে সঙ্গে করিয়া নদীর ধার দিয়া আসিতে আসিতে এক-স্থলে আসিয়া হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িয়া আঙুল দিয়া দেখাইয়া কহিল,—"ঐটি।"

পাইকার দুইটি সেইখানে একটি গাছের তলায় আসিয়া দাঁড়াইল। অকিঞ্চন যাহাকে দেখাইয়া বলিয়াছিল, ঐটি, এক্ষণে কৌশলে সেই খাসী ছাগলটিকে ধরিয়া পাইকারদের কাছে টানিয়া আনিল। তাহারা তাহার মাজা টিপিয়া সর্ব্বাঙ্গ ভাল করিয়া দেখিয়া শুনিয়া, দর-দস্তুর করিয়া শেষে পাঁচ টাকায় তাহার মূল্য রফা করিল, এবং কোমরের গেঁজে হইতে এক জন পাঁচটি টাকা অকিঞ্চনের হাতে গণিয়া দিয়া খাসীটির গলায় একগাছি দড়ি বাঁধিয়া তাহাকে টানিতে টানিতে উভয়ে মামুদপুরের দিকে অগ্রসর হইল।

সে দিন অকিঞ্চন গৃহ হইতে বাহির হইল না। সন্ধ্যার সময় ঘরে বসিয়াই শুনিল, ফকীর হাড়ির বড় ছাগলটি খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না।

পরদিন পাঁচটি টাকা, দুইখানি কাপড় ও একখানি গামছা সম্বল করিয়া অকিঞ্চন আড়াই ক্রোশ দূরবর্ত্তী বর্দ্ধমানের ষ্টেশনে আসিয়া প্রথম ট্রেণ ধরিবার জন্য অতি প্রত্যুষে গৃহ হইতে যাত্রা করিল। ক্ষান্ত জিজ্ঞাসা করিল, "রাগ ক'রে কোথায় যাওয়া হচ্ছে শুনি?" প্রত্যুত্তরে অকিঞ্চন সদর্পে ও সলম্ফে দাওয়া হইতে প্রাঙ্গণে পড়িল এবং সশব্দে সদরের দরজা খুলিয়া নিশা-শেষের অল্পান্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া পড়িল।

ষ্টেশনে পৌঁছিয়া গামছা-জড়ান কাপড়খানির খুঁটে বাঁধা পাঁচটি টাকা হইতে একটি টাকা খুলিয়া লইয়া অকিঞ্চন কলিকাতার টিকিট কিনিল। ১৫ আনা ১ পয়সা টিকিটের দাম বাদে তিনটি পয়সা যাহা ফেরৎ পাইল, তাহা জামার পকেটে রাখিয়া বেঞ্চির উপর বসিতেই গাড়ীর ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল।

বর্দ্ধমানে ১০ মিনিট গাড়ী থামিয়া থাকে।

গাড়ী আসিলে অকিঞ্চন গাড়ীর ভিতর আসিয়া বসিয়া চা-ওলাকে ডাকিল এবং কাপের শেষ বিন্দুটুকু পরম তৃপ্তিতে পান করিয়া বিরক্তমুখে চা-ওলাকে পকেটের সেই তিনটি পয়সা দিয়া কহিল, "একেবারে ঠাণ্ডা আর তেত, এসামাকিক চা আর কারুকে মৎ দেও, পুলিসমে দেগা।" অকিঞ্চন কট্‌মট্ করিয়া তাহার দিকে এমন ভাবে চাহিয়া রহিল যে, সে চায়ের বাকী একটি পয়সার কথা আর উত্থাপন করিতেই অবসর পাইল না এবং নীরবে অন্য দিকে চলিয়া গেল।

চায়ের পর পাণ এবং বিড়িও অত্যাবশ্যক; কিন্তু অকিঞ্চনের পকেটে এই অত্যাবশ্যক ব্যয়ের জন্য খুচরা পয়সা আর ছিল না। দুইটা পয়সার জন্য টাকা ভাঙ্গাইতেও সে পারে না। সুতরাং সম্মুখ দিয়া অসংখ্য পাণ বিড়িওয়ালা যাইলেও সে ডাকিল না। গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা এবং গার্ডের বাঁশী বাজিয়া উঠা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া, গাড়ী যখন অল্প অল্প চলিতে সুরু করিল, তখন অকিঞ্চন মুখ বাড়াইয়া এক জন পাণ-বিড়িওয়ালাকে ডাকিল। এক পয়সার পাণ ও এক পয়সার বিড়ি লইয়া, দুই দিককার পকেটে অকিঞ্চনের পয়সা খুঁজিতে খুঁজিতেই পাণওয়ালা ও গাড়ী একসঙ্গে ছুটিতে ছুটিতে প্ল্যাটফরমের সীমান্তে আসিয়া পড়িল এবং গাড়ীর ভোঁস্-ভোঁসের সঙ্গে পাণওয়ালার ফোঁস্-ফোঁস্ বৃথাই বায়ুর সঙ্গে মিশিয়া গেল।

"গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে পাণওয়ালা ছুটিতে লাগিল—"

সকাল বেলাকার গাড়ী, প্যাসেঞ্জারের তত ভিড় ছিল না। মগরাতে দুই এক জন লোক অকিঞ্চনের কামরায় আসিয়া উঠিল এবং গাড়ী ছাড়িবার ঠিক পূর্ব্বক্ষণে একটি আধা-বয়সী স্ত্রীলোক হাঁফাইতে হাঁফাইতে দরজা ঠেলিয়া এই কামরাটিতে উঠিয়া অকিঞ্চনের বেঞ্চের একধারে আসিয়া বসিল।

স্ত্রীলোকটি শ্যামবর্ণা, দোহারা, মুখখানি ঢল-ঢল, চোখ দু'টি আয়ত, দৃষ্টি উজ্জ্বল। পরনে একখানি দেশী তাঁতের তাবিজপাড় শাড়ী, নাকে ওপ্যালের নাকছাবি, কাণে কাণ-ফুল, কপালে উল্কী, মুখে দোক্তা-দেওয়া পাণ এবং তাহারই রসে ঠোঁট দুইটি টুকটুকে। মাথায় একটুখানি যে ঘোমটা ছিল, বসিতে গিয়া সেটুকু খসিয়া পড়িয়াছিল। তাহাই আবার তুলিয়া দিবার সময় অকিঞ্চন দেখিল, তাহার বাহুতে উল্কীতে লেখা রহিয়াছে,—পটল—হরিনাম সত্য।

অকিঞ্চন তাহাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, "মেয়েদের গাড়ীতে উঠলে না কেন বাছা? কোথায় নামবে?"

"হাওড়ায়। আপনি?"

"আমিও হাওড়ায়।"

স্ত্রীলোকটি লজ্জা ও সঙ্কোচশূন্য হইলেও খুবই স্বল্পভাষী। কিন্তু একটি দুইটি করিয়া অকিঞ্চন অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহার

হ'ত অনেক কথারই আলাপ করিল, তাহার ফলে জানিতে পারিল যে, পটল শুষ্ক কিংবা শস্যহীন নহে, তাহা যথেষ্ট রসবান এবং সরস, অর্থাৎ টাকা-কড়ি, গহনাপত্র তাহার যথেষ্ট। আত্মীয়-পরিজন তাহার কেহই নাই, এক দূর-সম্পর্কীয় বোন্‌-পোকে আনিয়া কিছু দিন নিজের কাছে রাখিয়াছিল, কিন্তু সে নেশা-টেশা করিতে শেখায় তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছে।

অকিঞ্চন কহিল,"তোমার কোন ভয় নেই বাছা, হাওড়ায় নেমে তোমার বাসায় আমি পৌঁছে দিয়ে না হয় যাব'খন। তুমি স্ত্রীলোক, এটুকু উপ্‌গার ও যদি না করি—"

গাড়ী লিলুয়াতে আসিয়া থামিল।

কিছু পরেই টিকিট-কলেক্টার বাবু গাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া সকলের টিকিট চাহিয়া লইল। যাইবার সময় দেখিল, পাইখানার দরজা ভিতর হইতে বন্ধ! এক মিনিট অপেক্ষা করিয়া দরজায় দুইটি ধাক্কা দিল! অকিঞ্চন কহিল, একটি মেয়ে লোক গেছে। আরও কয় সেকেণ্ড দাঁড়াইয়া থাকিয়া টিকিট-বাবু অকিঞ্চনের দিকে চাহিয়া বলিল,"পাশের গাড়ীতে আমি থাকলুম, টিকিটখানা বার ক'রে রাখতে বলবেন, আমি আসছি।"

কিন্তু পুনরায় তাহার আসিবার পূর্ব্বেই ঘণ্টা দিয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিল এবং পটল আসিয়া তাহার আসনে বসিল। অকিঞ্চন টিকিটের কথা বলিলে বলিল, "টিকিট আমাদের লাগে না, পাশ আছে।"

হাওড়ায় নামিয়া অকিঞ্চন জিজ্ঞাসা করিল, "তা হ'লে সঙ্গে যেতে হবে কি?"

একটুখানি হাসিয়া পটল কহিল, "যেতেও পারেন, না গেলেও কোন ক্ষতি হবে না। একখানা গাড়ী করলেই হবে'খন! তবে আমার এই গামছাখানা দয়া ক'রে একটু ভিজিয়ে এনে দিন। সেই ওদিকে বোধ হয় কল আছে।"

পটল তত্রত্য একখানি বেঞ্চের উপর বসিয়া পড়িল। অকিঞ্চন তাহার কাপড়ের পোঁটলাটা তাহার পার্শ্বে রাখিয়া গামছা ভিজাইতে চলিয়া গেল এবং মিনিট পাঁচ সাত পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, তথায় পটল কিংবা পোঁটলা দুইটির কোনটিই নাই। সেইখানে দাঁড়াইয়া অকিঞ্চন চারিদিকে একবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল, কিন্তু কোনখানেই পটলকে দেখিতে পাইল না। নিমেষে তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল। তাহার কাছে যে আর একটি পয়সাও নাই! এই বিদেশে একেবারে রিক্তহস্তে—পটলের ভিজা গামছাখানি উত্তপ্ত মস্তকে দিয়া অকিঞ্চন তখন চারিদিকে ঘুরিয়া তাহার সন্ধান করিতে লাগিল।

৩

হাটখোলার ডালপটি ছাড়াইয়া একটু উত্তরে রাস্তার উপর একখানি টীনের মাঠগুদাম-দোতলা। তাহারই নীচে বারান্দার একাংশে কেহ পুণ্যসঞ্চয়োদ্দেশে এই বৈশাখে জলসত্রের ব্যবস্থা করিয়াছিল। অকিঞ্চন ঘুরিতে ঘুরিতে ক্লান্ত হইয়া সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইল এবং চারিটি ভিজা ছোলা ও একরত্তি গুড় হাত পাতিয়া লইয়া, তাহাই চিবাইয়া এক পেট জল পান করিবার পর একটু বিশ্রাম করিবার অভিপ্রায়ে সেই বারান্দারই এক প্রান্তে বসিয়া পড়িল।

ভিতরের ঘরখানির এক ধারে একখানি তক্তাপোষ পাতা ছিল। তদুপরি গৃহের অধিকারী দে মহাশয় একটি কাঠের বড় বাক্স সম্মুখে লইয়া দেয়াল ঠেস দিয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহার খর্ব্ব দেহের উপরকার ক্ষুদ্র মস্তকটি ক্ষুর দিয়া মুণ্ডিত, কণ্ঠে তিন হালি তুলসীর মালা, নাসাগ্রে তিলক, বক্ষে ও কপালে গঙ্গামৃত্তিকার ছাপ।

"যেতেও পারেন, না গেলেও কোন ক্ষতি হবে না।"

দে মহাশয়ের সদর নীচের তলার এই ঘরখানি, অন্দর দ্বিতলে। তথায় তাঁহার নিঃসন্তান গৃহিণী কর্ত্রীরূপে সর্ব্বদা বিরাজ করেন।

বহু দিন পাটের আড়তে কয়ালের কার্য্য করিয়া দে মহাশয় বেশ দু'পয়সা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। এক্ষণে প্রৌঢ় বয়সে অর্থ-সঞ্চয়ের বাসনা ত্যাগ করিয়া পুণ্যসঞ্চয়ের দিকে মনোযোগী হইয়াছেন। প্রত্যূষে উঠিয়া গঙ্গাস্নান করেন, সকাল-সন্ধ্যায় নাম জপ করেন, বৎসর বৎসর জলসত্র দেন এবং প্রতিবাসী কুলী, মজুর, কারিকর, গাড়োয়ান, ফেরি-ওয়ালা, দোকানদার প্রভৃতিকে চোটায় ও খতে টাকা কর্জ্জ দিয়া এক দিকে তাহাদের সাহায্য করেন ও অপর দিকে নিজের সময় কাটান। বন্ধকী কারবারও কিছু কিছু তাঁহার আছে।

প্রায় মিনিট পনর বসিয়া থাকিবার পর অকিঞ্চন উঠিয়া দরজার পাশ হইতে উঁকি দিয়া দেখিতেই দে মহাশয় তাহাকে ভিতরে ডাকিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোথায় থাক বাপু?"

অকিঞ্চন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল, "একটু থাকবার স্থানই খুঁজে বেড়াচ্ছি। দেশ থেকে আজই এখানে এসেছি। গাড়ীতে এক মেয়ে জোচ্চোরের পাল্লায় প'ড়ে পোঁটলা-শুদ্ধ টাকা-কড়ি সব খুইয়ে বসেছি। তাই ঘুরে ঘুরে ক্ষিদেও যেমন পেয়েছে, তেষ্টাও তেমনই লেগেছে।"

অকিঞ্চন দে মহাশয়ের কাছে তাহার অদ্যকার কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণন করিল। সমস্ত শুনিয়া দে মহাশয় কহিলেন, "এইখানেই থেকে যাও, বাপু। এ শুনে কি ক'রে আর মুখটি বুজে থাকি বল। নিজের দিকে ত কখনই চাই না, পরের দিকে কিন্তু না চেয়ে থাকতে পারি না। কারুর কষ্ট-বিপদের কথা শুনলেই মনটা অমনি ধড়ফড় ক'রে ওঠে।"

অকিঞ্চন তক্তপোষের এক ধারে বসিয়া পড়িল। দে মহাশয়ের সহিত তাহার অনেক কথা হইল এবং সেই দিন হইতে তাঁহার আশ্রয়ে নিঃসম্বল নিরাশ্রয় অকিঞ্চনের স্থান-লাভ হইল।

দে মহাশয় কহিলেন,—"ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণং গতি, শূদ্রস্য শূদ্রণং গতি। কে কারে খাওয়ায় বাপু, নারায়ণই সব করেন, করান।"

অকিঞ্চন দুর্ভাবনার হাত হইতে কিয়ৎপরিমাণে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া মনে মনে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল।

সন্ধ্যার পর অকিঞ্চন দেখিল, দে মহাশয়ের চোটার কারবারটি নেহাৎ সামান্য নহে। অনেক টাকাই তাঁহার এই কারবারে আসিতেছে, যাইতেছে। একটি টাকা কেহ চোটায় ধার করিলে, দে মহাশয়কে প্রত্যহ একটি করিয়া পয়সা দিয়া যাইতে হয়। এইরূপ দুই মাস পনর দিন দিলে ঐ টাকাটি উসুল যায়। এক টাকা লইলে যেমন প্রত্যহ এক পয়সা, তেমনই পাঁচ টাকা লইলে প্রত্যহ পাঁচ পয়সা, পঁচিশ টাকা লইলে প্রত্যহ পঁচিশ পয়সা, এই হিসাবে দিবার রীতি। কিন্তু সময় দুই মাস পনর দিন। যে যত টাকা লউক না কেন, তত পয়সা হিসাবে তাহাকে ঐ দুই মাস পনর দিন দিয়া যাইতে হইবে। তবে দে মহাশয়ের আর একটি নিয়ম আছে। টাকা কর্জ্জের সময়, গৃহীত টাকা হইতে সিকি অংশ অর্থাৎ টাকা প্রতি চারি আনা দে মহাশয়কে তখনি দিয়া দিতে হয়। দে মহাশয় বলেন, ঐ চারি আনার মধ্যে দুপাই দালালী, দু' পাই বারোয়ারী, দু' পাই বৃত্তি, দেড় পাই আফিস খরচ, আর বাকী ২॥ গণ্ডা দরিদ্র ভাণ্ডার অর্থাৎ দে মহাশয়ের ঘরের দেওয়ালে ঝোলান, পয়সা ফেলিবার ছিদ্রযুক্ত, চাবি-তালা-লাগান একটি ক্ষুদ্র টীনের বাক্স। টাকা কর্জ্জ দিবার সময়, খাতকের নিজ হাত দিয়াই দে মহাশয় একটি করিয়া আধলা উহার মধ্যে ফেলাইয়া দেন, নিজে তাহা স্পর্শ করেন না। কাণা-খোঁড়াকে দান, ভিখারীদের মুষ্টিভিক্ষা, বৈশাখ মাসের জলসত্র প্রভৃতি ইহা হইতেই হয়।

যাহা হউক, দে মহাশয়ের আশ্রয়ে প্রথমদিন অকিঞ্চনের একরূপ কাটিয়া গেল। দ্বিতীয় দিনে সে একটু নাকমুখ সিঁটকাইল। তৃতীয় দিনে বুঝিল যে, এখানে তাহার থাকা চলিবে না। পাঁচ সাত দিন পরে সে একেবারেই অতিষ্ঠ হইয়া পড়িল। এই কয় দিনেই দে মহাশয় তাহাকে যে যে কাযের ভার দিয়াছিলেন, তাহা এই :—অতি প্রত্যূষে উঠিয়া সর্ব্বাগ্রে তাহাকে গঙ্গা হইতে বড় এক ঘড়া গঙ্গাজল আনিতে হয়। কারণ, রৌদ্রাধিক্য বশতঃ দে মহাশয় হাঁটিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতে পারেন না, বাড়ীতেই গঙ্গাজলে প্রাতঃস্নান করেন। গঙ্গাজল আনিয়া দিয়াই অকিঞ্চনকে রাস্তার কল হইতে জল তুলিয়া জলসত্রের বড় বড় জালা দুইটি ভরিতে

তাহার পর আফিস-ঘর, বারান্দা, অন্দর, সদর সর্ব্বত্র ঝাঁট দিয়া পরিষ্কার করা, বাজার যাওয়া ও বাজারের হিসাব বুঝাইয়া দেওয়া। বাজার করা অপেক্ষা, দে মহাশয়ের কাছে বাজারের হিসাব দেওয়াই কঠিন কার্য্য। একটি করিয়া সিকি তাহার বাঁধা দৈনিক বাজার-খরচ ছিল। এই এক সিকির হিসাব দিতেই অকিঞ্চন বাহিরে যেমন ঘামিয়া উঠিত, ভিতরে তেমনই ফুলিয়া উঠিত। যাহা হউক, বাজারের হিসাব দিবার পরই তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া সেই বাজার হাতে লইয়া তাহাকে রান্নাঘরে ঢুকিতে হয়। কারণ, তাহার আসিবার পর হইতেই দে-গৃহিণী সকাল বেলাটায় আর আগুনের তাতে যান না, কারণ, দুবেলা আগুনের তাত তাঁহার সহ্য হয় না। সুতরাং রন্ধন শেষ করিয়া কর্ত্তা-গৃহিণীর আহারের পর তাহার খাইতে প্রত্যহই দুইটা আড়াইটা বাজিয়া যায়। তাহার পর কোন দিন মশারি, কোন দিন বালিসের ওয়াড়, কোন দিন বিছানার চাদর, কোন দিন বা দে গৃহিণীর পরনের শাড়ী কিংবা দে মহাশয়ের আট হাত ধুতি বা ফতুয়া এবং তৎসহ ছুঁচ ও সূতা তাহার কাছে আসিয়া পড়ে। দে মহাশয় তাহাকে বলেন, "কাযকে ভয় করতে নেই, কাযই হচ্ছে লক্ষ্মী। আমি তোমায় আলস্যে বসে ব'সে থাকতে কখনই দিচ্ছি না: পর ব'লে ত তোমাকে আমি মনে করি না।" তাহার পর সন্ধ্যা হইলেই দে মহাশয়কে তাঁহার বাক্স এবং টাকা-পয়সা, চোটা, দাদনী, বারোয়ারী, বৃত্তি প্রভৃতি লইয়া এবং অকিঞ্চনকে হিসাবের খাতাপত্র দোয়াত কলম লইয়া ব্যস্ত থাকিতে হয়।

লেখাপড়া, হিসাবপত্রের কায এখন সমস্তই অকিঞ্চনের উপর পড়িয়াছে। প্রত্যহ সন্ধ্যা হইতে সুরু করিয়া টাকার লেন দেন, জমা-খরচ, বকা-বকি প্রভৃতি যখন শেষ হয়, তখন ঘড়ীর বড় বড় ঘণ্টাগুলি সবই বাজিয়া যায়। তাহার পর দে মহাশয়ের পিছন পিছন, তাঁহার সেই প্রকাণ্ড বাক্সটি বহন করিয়া দ্বিতলে তাঁহার ঘরে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিবার পরে তবে অকিঞ্চন অব্যাহতি পায়। রাত্রিতে শুধু দুটি ভাত গৃহিণী নিজেই রাঁধিয়া লয়। তরকারি সকালেরই থাকে, তাহা গরম করিয়া লওয়া হয় মাত্র।

সে দিন ঠিক সন্ধ্যার পরই একটি প্রৌঢ় বয়সের স্ত্রীলোক ঘোমটা দিয়া দরজার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। দে মহাশয় তাহাকে দেখিতে পাইয়া কহিলেন, "কালীর মা বুঝি, কিছু খবর আছে গা?"

স্ত্রীলোকটি দরজার ধারে একটু সরিয়া আসিয়া কহিল, "হাঁ বাবা! গয়নাগুলো দিতে হবে, নিয়ে যাব।"

এক পা এক পা করিয়া কালীর মা ভিতরে যাইয়া দাঁড়াইল।

দে মহাশয় তাহার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "টাকা সব হিসেব ক'রে এনেছ?"

"হিসেব আপনি কর না, বাবা। কার্ত্তিক মাসের ২০শে ত আমি টাকা নিয়ে গেছি। কার্ত্তিক ছেড়ে দিলে তা হ'লে ছ'মাস হয়। একশ টাকা আসল আর ছ' মাসে ছ টাকা সুদ—"

"তা কি হয়? কার্ত্তিকের ২০শে হলে কি আর কার্ত্তিক বাদ দিতে পারি?"

"তা, যেমনেই ধর বাবা, একমাস ত বাদ যাবে। কার্ত্তিক ধ'রে নাও ত বোশেখের সুদ বাদ যাবে।"

"তা কি হয়, কালীর মা? বোশেখেরও ত অর্দ্ধেক হয়ে গেল। ও সাত মাসের সাত টাকাই তোমার দিতে হবে বাছা।"

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কালীর মা কি ভাবিতে লাগিল। তাহার পর কহিল,—"আচ্ছা বাবা, যা নিলে ভাল হয়, তাই নাও। কত কষ্ট ক'রে যে এই সুদের টাকা দেওয়া, তা ওপরের ঐ যিনি রাতদিনের কর্ত্তা, তিনিই জানেন। নেহাৎ দায়ে ঠেকে বউটার গা থেকে খুলে এনে তখন দিয়েছিলুম, তাই এই ছ' মাস না খেয়ে না দেয়ে ঋণ শোধ করতে এসেছি।"—বলিয়া আঁচলের গেরো খুলিয়া দশখানি দশ টাকার নোট ও ছয়টি টাকা দে মহাশয়ের সম্মুখে তক্তপোষের উপর রাখিয়া কহিল,—"একটা টাকা কাল সকালে তা হ'লে দিয়ে যাব।"

নোট কয়খানি ও টাকা কয়টি গণিয়া লইয়া দে মহাশয় বাক্সর মধ্যে রাখিয়া বন্ধ করিলেন এবং তৎপরে খাতা খুলিয়া কালীর মা'র হিসাবটা একবার দেখিয়া লইয়া, অকিঞ্চনকে টাকাটা জমা করিয়া লইতে বলিয়া উপরে চলিয়া গেলেন।

খানিক পরেই কয়েকটি সোনার জিনিষ আনিয়া দে মহাশয় কালীর মা'র হাতে দিলেন। কালীর মা সেগুলি ভাল করিয়া দেখিয়া কহিল,—"হার ছড়াটা?"

দে মহাশয় কহিলেন,—"হার? হার-টার ত কিছু ছিল না বাপু। যেমন দিয়েছিলে, তেমনই—"

"সে কি বাবা! আমার নাতির গলার সরু বিচে-হার? আপনি ভাল ক'রে দেখ গিয়ে। হার যে আমি এর সঙ্গে দিয়ে গেছি। দোহাই বাবা, ভাল ক'রে খুঁজে——"

"কি মুস্কিল! ভাল ক'রে আর খুঁজবো কোথায়? দেখি হে খাতাখানা। এই দেখ—২০শে কার্ত্তিক, মারফত কালীর মা, এক জোড়া সোণার বালা, ২টা আংটী, একখানা চিরুণী, এক জোড়া মাকড়ি। লেখার কড়ি কি কখনও বাঘে খায় বাছা। হার যদি দিয়ে যেতে ত এই খাতাতেই আমার থাকতো। তোমাদের মেয়েমানুষের এই সব হাঙ্গামে কাযে——সেবার হরিপদর পিসী এই রকম মিছি মিছি কি রকম হৈ-চৈটা বাধালে, কিন্তু ভাগ্যে আমার খাতা ছিল, তাই ত রক্ষে পেয়ে গেলুম।"

কালীর মা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল,—"বাবা, ওপরে ভগবান্ আছেন, এখনও চন্দর-সুয্যি উঠছে, এর সঙ্গে আমার নাতির গলার নতুন বিচেহার দিয়ে গেছি। এক ভরি দশ আনা দিয়ে আমার কালী যে দিন তৈরী ক'রে আনলে, তার দু'দিন পরেই দিয়ে গেছি বাবা! বাছা আমার আর গলায় দিতে পারে নি। খাতা তোমার ভাল ক'রে দেখ, ঠিকই লেখা আছে। না থাকে, লিখতে ভুলে গেছ, নিশ্চয়ই ভুলে গেছ।"

"কিছু ভুল হয় নাই—ভুল হয় নাই, খাতায় যে লেখা নাই।"

কালীর মা'র কাদাই শুধু সার হইল। অনেক তর্ক, অনেক কথা, অনেক চোখের জল ফেলার পর, চোখের জল মুছিতে মুছিতেই কালীর মা চলিয়া গেল।

দে মহাশয় বহুক্ষণ পর্য্যন্ত নীরবে বসিয়া রহিলেন। তাহার পর সেইখানেই তাকিয়ায় মাথা দিয়া শুইয়া পড়িয়া কহিলেন, "ভাল হাঙ্গামা যা হোক, মাগী শাপ-মন্দ কতকগুলো দিয়ে গেল। আস্পর্দ্ধা দেখ একবার, ছোট লোক কোথাকার!"

পরদিন প্রাতঃকালে দোতলার বারান্দায় রাঁধিতে রাঁধিতে উঁকি দিয়া অকিঞ্চন দেখিল, ছেলেদের গলার এক গাছি নূতন বিচাহার হাতে লইয়া দে-গৃহিণী দে মহাশয়ের সহিত ফিস্-ফিস্ করিয়া কি কথা কহিতেছে।

সেই দিন রাত্রিতে খাতকদের দেনা-পাওনার কায-কর্ম্ম শেষ হইলে অকিঞ্চন দে মশাইকে কহিল, "আট ন' দিন হয়ে গেল, আমার একটা মাইনে ঠিক ক'রে তা হলে——"

চমকিত হইয়া দে মহাশয় কহিলেন, "মাইনে?—মাইনে-টাইনের ব্যবস্থা ক'রে পরের মত তোমায় আমি দেখতে পারব না। কোন্ দিন গিন্নী হয় ত তা হ'লে ব'লে বসবেন মাইনে। ছেলে-পুলে থাকলে, তারাও যদি—আমি ত সবই তোমায় বলেছি বাপু। আমার ছেলে-পুলে, ভাইপো, ভাগনে কোথাও কেউ নেই। টাকা-কড়ি যা হোক কিছু করেছি। চিরকাল আর এ সব নিয়ে অবিশ্যি থাকবো না। হয় ত শীগগীরই দু'জনে আমরা বৃন্দাবনে চ'লে যাব। এইগুলো স্থির হয়ে ভাল ক'রে বুঝে দেখো। এর বেশী আর আমি কিছু বলব না।"

অকিঞ্চন আর বেশী কিছু বলিল না।

অনেকক্ষণ পরে কি একটা বলিতে যাইয়া দেখিল, অর্দ্ধশায়িত অবস্থাতেই দে মহাশয়ের নাক ডাকিতেছে। অকিঞ্চন একটু উচ্চকণ্ঠে কহিল, "আপনি কি ঘুমুলেন?"

একটু নড়িয়া উঠিয়া দে মহাশয় কহিলেন, "বেশ ঝির-ঝিরে হাওয়া দিচ্ছে, চোখ দু'টো যেন ঘুমে জড়িয়ে আস্ছে। একটু শুই। তুমি ততক্ষণ বাক্সটা ওপরে দিয়ে এস আর আমাদের ভাত বাড়তে বল গে।"

অকিঞ্চন তক্তপোষ হইতে নামিয়া মেজের উপর দাঁড়াইল। ঘড়ীটার দিকে একবার চাহিয়া দেখিল যে, দশটা বাজিতে আর কয়েক মিনিট মাত্র বাকী আছে। তাহার পর একবার বাহিরের দিকে দেখিয়া, উপরে দিয়া আসিবার জন্য বাক্সটি দুই হাতে তুলিয়া ঘর হইতে বাহির হইল।

ঝির্-ঝিরে হাওয়াতে সে দিন দে মহাশয়ের নাক ডাকার শব্দ ক্রমেই পর্দ্দার পর পর্দ্দায় চড়িতে লাগিল। সুতরাং তাহার বাক্স যে সে দিন আর উপরে পৌছাইল না, বহুক্ষণ অবধি সে সংবাদ আর তিনি জানিতে পারিলেন না।

৪

বেলা পাচটা তেইশ মিনিটের সময় কলিকাতা হইতে যে গাড়ী বর্দ্ধমানে আসিয়া থামে, সেই গাড়ী হইতে নামিয়া অকিঞ্চন ফটকে টিকিট দিয়া প্লাটফরমের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার পায়ে চীনাবাড়ীর বার্ণিস জুতা, পরনে

নূতন কোরা ধুতি, গায়ে ধব-ধবে লংক্লথের নূতন কামিজ। এক হাতে নানা দ্রব্যপূর্ণ একটি বড় পোঁটলা, অপর হাতে ক্যাম্বিসের একটি নূতন ব্যাগ।

বাহিরে আসিয়া সে একখানি ছই-দেওয়া গরুর গাড়ী ভাড়া করিল এবং গাড়োয়ানকে গাড়ী প্রস্তত করিতে বলিয়া সম্মুখের একখানি মিঠাইয়ের দোকানে প্রবেশ করিল।

আড়াই ক্রোশ কাঁচা মেঠো পথ গো-যানের সাহায্যে মন্থরগতিতে আসিতে রাত প্রায় এক প্রহর হইল। ক্ষান্ত তখন প্রদীপ নিভাইয়া শুইবার উপক্রম করিতেছিল। অকিঞ্চনের ডাকাডাকিতে সদরের খিল খুলিয়া দিয়া কহিল, "ভাল যা হোক, রাগ এত দিনে পড়ল ?"

অকিঞ্চন কোন কথা না বলিয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া বসিল এবং পোট্‌লাটা ক্ষান্তর দিকে আগাইয়া দিয়া কহিল, "উনুন ধরিয়ে আগে একটু চা ক'রে দাও, দেহটা বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সারা দিনটা এই রোদে গাড়ীতে কেটেছে। তার পর ঘোরা-ঘুরিও বড় কম হয় নি ত !"

ক্ষান্ত পোট্‌লাটা খুলিতে খুলিতে কহিল, "তা দিচ্ছি, কিন্তু এই রকম ক'রে যে আমায় একলা ফেলে গেলে, কি হয় বল দেখি আমার ? কি ক'রে যে এই ক'দিন কাটিয়েছি, তা নারায়ণ জানেন। দুর্ভাবনায় মুখে অন্ন দিতে পারি নি, চোখে নিদ্রে আসে নি। তার ওপর বাঁড়ুয্যে মশায়ের তাগাদা। ক'দিন ধ'রে বাড়ীর মাটী আর রাখে নি। রোজ তিনবেলা এসে বামুন খোঁজ নিয়েছে যে, তুমি ফেরার হয়ে পালিয়েছ, না ফিরে এসেছ।"

"খবর নেওয়াচ্ছি আমি। টাকা আর নোটের চাবুক তৈরী ক'রে তাই দিয়ে বামনার হাতে গুণে গুণে মারবো।"—বলিয়া পেটকাপড় হইতে কি একটা রুমালে বাঁধা জিনিষ ক্ষান্তর কপোল লক্ষ্য করিয়া ছুড়িল।

চমকিত হইয়া ক্ষান্ত তাহা তুলিয়া লইয়া খুলিয়া দেখিতে দেখিতে কহিল, "এ কি গো,—এ যে নোটের তাড়া ! কত টাকার নোট ?"

"গুণে দেখ।"

তিনবার গণিয়া, হিসাব করিয়া ক্ষান্ত চোখ কপালে তুলিয়া কহিল, "এই ক'দিনে তিনশ টাকা এনেছ তুমি ?"

ব্যাগের মধ্যে হাত দিয়া টাকার শব্দ করিতে করিতে অকিঞ্চন কহিল, "তিনশোর স্যাঙ্গাৎ ভাইরা আবার এখানে সব আছে।"

"ও কত ?"

"তা প্রায় শ'খানেক।"

চমকের বেগ কতক কাটিয়া গেলে, ক্ষান্ত স্বামীর সহিত আরও দুইচারিটি কথা কহিয়া চা তৈয়ারী করিবার জন্য উঠিয়া গেল।

পরদিন প্রাতে বাঁড়ুয্যে মহাশয় আসিয়া উঠানে দাঁড়াইতেই, অকিঞ্চন কহিল, "টাকা আপনাকে সবই এখনই শোধ ক'রে দিতে পারি, কিন্তু দেব না। কেন না, আপনিই বলেছেন যে, আষাঢ় মাসের ভেতর দিতে। তাই দেব আপনাকে। তবে, সুদ কিছু না হয় দিয়ে দেবো এখন, ওবেলা একবার আসবেন। পরশু এদের সব নিয়ে আমায় আবার যেতে হবে। সেখানে বিস্তর কায ফেঁদে এসেছি, বেশী দিন ত আর এখানে প'ড়ে থাকতে পারব না।"

বৈকালের দিকে বাঁড়ুয্যে মহাশয় আবার আসিলেন এবং অকিঞ্চন তাঁহাকে সুদের বাবত ৫০ টাকা দিয়া কহিল, "হয় ত আষাঢ় মাসও লাগবে না ; ওমাসেই আপনার বেবাক দিয়ে ফেলবো।"

পরদিন গোছগাছ করিতেই কাটিয়া গেল এবং তৎপরদিন ক্ষান্তকে লইয়া অকিঞ্চন কলিকাতা রওনা হইল।

কলিকাতায় সে কোনও বাসার ঠিক না করিয়াই ক্ষান্তকে লইয়া গেল, সুতরাং হাওড়ায় নামিয়া সে একখানি ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া বরাবর কালীঘাটে মন্দিরের নিকটবর্ত্তী এক যাত্রিনিবাসে গিয়া উঠিল. সেখানে দৈনিক ৮ আনা হারে ৭ দিনের জন্য একখানি ঘর ভাড়া করিয়া থাকিবার পর অনেক অনুসন্ধান করিয়া চেতলার হাটের ঐ দিকে ১৫ টাকা ভাড়ায় একটি ছোট টীনের বাড়ী ভাড়া করিল।

অতঃপর অকিঞ্চন সুবিধামত একটি কাযের সন্ধানে প্রত্যহ খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখিতে লাগিল এবং সকাল-সন্ধ্যায় পাঁচ যায়গায় যাতায়াত করিতে লাগিল।

৫

আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের উপর 'দৈনিক জগৎ' সংবাদপত্রের সুবৃহৎ কার্য্যালয়। প্রকাণ্ড ফটকের মধ্যে ঢুকিয়া যেখানে উভয় পার্শ্বে প্রত্যেক দিনের কাগজ কাঠের বোর্ডে আঁটা হইয়া

ঝুলিতে থাকে, সেখানে সদা-সর্ব্বদাই অসংখ্য পাঠকের সমাবেশে বাহির হইতে ভিতরে প্রবেশ করা দুষ্কর হয়। কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন পাঠের জন্যই অধিকাংশ পাঠক ব্যস্ত। এইখান হইতেই বামপদে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া অকিঞ্চন দুই দিন চলিতে পারে নাই।

দ্বিতলে সুবিস্তৃত হলে শ্রেণীবদ্ধভাবে অসংখ্য কর্ম্মচারী নিজ নিজ কার্য্যে নিযুক্ত। তাহারই এক দিকে সম্পাদকের গৃহ, বিজ্ঞাপন বিভাগ, সহকারী সম্পাদক, চিত্র-বিভাগ, ক্যাশ প্রভৃতি এবং অপর দিকে প্রকাণ্ড সুসজ্জিত ঘরে স্বত্বাধিকারী যতীশ বাবুর খাস আফিস।

খস্‌খসের পর্দ্দা ঠেলিয়া বাহির হইতে একটি ভদ্রলোক এই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "কি খবর, হঠাৎ তলব কেন?"

যতীশ বাবু কিসের একটা হিসাব দেখিতেছিলেন, তাহা বন্ধ করিয়া রাখিয়া কহিলেন, "বসুন, কয়েকটা নালিশ রুজু ক'রে দিতে হবে।"

ভদ্রলোকটি যতীশ বাবুরই উকীল এবং বন্ধু। জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাড়ীভাড়ার নালিশ ত?"

"শুধু ভাড়া নয়। ভাড়া আছে, হ্যাণ্ডনোট আছে, মর্টগেজ আছে, চিটিং আছে—"

"ঠ'কে ঠ'কে এত সাবধান হয়েও আবার চিটিংএর কেশ?"

"কি করি বলুন, মতি বাবু। সাবধান হয়েও পারি না। মানুষ হয়ে মানুষকে কত অবিশ্বাস করি বলুন? খুব সাবধান হয়েই কায করি, তাই রক্ষে, নইলে আমাকেই এত দিনে কেউ না কেউ 'চিট' ক'রে নিয়ে গিয়ে মানুষ বেচার দেশে হয় ত বিক্রী ক'রে দিয়ে আসতো।"

একটু থামিয়া যতীশ বাবু আবার কহিলেন,—"কিন্তু জুচ্চুরী, বাটপাড়ি, ঠকামী করেও ত কেউ কিছু সুবিধে করতে পারে না, আগেও যেমন তাদের হা-ভাত, পরেও ঠিক তাই। তবু এরা সৎপথে চলে না কেন, তাই শুধু আমি ভাবি।"

—"সৎপথের প্রথম দিকটায় চলতে বড্ড হোঁচট লাগে কি না! যাক্, আপনার হরেকেষ্টর খবর কি?"

—"তার কথা আর বলবেন না। বাপের শ্রাদ্ধ-ট্রাদ্ধ সব মিছে কথা। ঐ ব'লে এক মাসের মাইনে ফাঁকি দিয়ে একবারেই স'রে পড়েছে। খবর নিলুম, তার বাপই ছিল না।

হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া মতি বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাপই ছিল না কি রকম?"

—"বাস্তবিকই ওর বাপ ছিল না। ওর জন্মের ৩।৪ মাস আগেই নাকি ওর বাপ মারা যায়। কিন্তু হরেকেষ্টর যায়গায়, মতি বাবু, এত দিনে খুব ভাল একটি লোক পেয়েছি; সত্যই ভাল।"

—"কিন্তু তার ঐ চেয়ারের গুণে শেষ পর্য্যন্ত কি দাঁড়ায়, তা বোধ হয় বলা যায় না।"

—"এর বিষয়ে খুব পারা যায়। এ লোকটির চেহারা, কথাবার্ত্তা, হাবভাব, কাযকর্ম্ম দেখলেই বলা যায় যে, এর দ্বারা কোন অন্যায় কায হতে পারে না। সংসারের টান নেই, কারণ, সংসারে এর কেউ নেই। সন্ন্যাসীর মতই থাকে। তবে ভগবানের ওপর এর বড় অভিমান।"

—"তার কারণ?"

—"তার কারণ, চিরকাল ভগবান্‌কে ডেকেই এর দিন কেটেছে, অথচ বছর কতক হ'ল, সাত দিনের মধ্যেই কলেরায় এর পরিবার, ছেলে, মেয়ে, এক বিধবা ভগিনী, গুষ্টীশুদ্ধ সব মারা যায়। তার পরে, পাড়া-প্রতিবাসীরা একজোট হয়ে এর দু'চার বিঘে জমী-জমা যা ছিল, তা'ও ফাঁকি দিয়ে নেয়। সেই ধিক্কারে লোকটি দেশ ছেড়ে চ'লে এসেছে। তাই ভগবানের ওপর এর যত নালিশ আর অভিমান। অভিমান বটে, অথচ দিনের ভেতর পঞ্চাশ-বার তাঁর নাম করতেও ছাড়বে না।"

এই সময়ে একটি লোক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। যতীশ বাবু তাহার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পাওয়া গেল?"

গোটা চারেক কলের মুখের 'ষ্টপকক' টেবিলের উপর রাখিয়া লোকটি কহিল, "খুব ভাল মেকই এনেছি বটে, তবে ঘুরে ঘুরে আঠার আনার কমে কোথাও আর পেলুম না। চারটেতে সাড়ে চার টাকা নিয়েছে।"

চকিত হইয়া যতীশ বাবু কহিলেন,—"বল কি হে? হরেকেষ্ট বরাবর দু'টাকা ক'রে এনেছে! বোধ হয়, দু'এক-বার ন'সিকে করেও নিয়েছে। যা'ক। তা হ'লে দশ টাকার সাড়ে পাঁচ টাকা ফিরেছে বলো?"

পকেট হইতে একখানা ১০ টাকার নোট ও সাড়ে পাঁচটি টাকা বাহির করিয়া যতীশ বাবুর সম্মুখে রাখিয়া লোকটি কহিল,—"সাড়ে পনর টাকা ফিরেছে।"

বিস্ময়পূর্ণ নেত্রে যতীশ বাবু তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দশ টাকা দিলুম, সাড়ে পনর টাকা ফিরল কি রকম ?"

—"দু'খানা নোট দিয়েছিলেন, বাবু! বোধ হয়, তাড়াতাড়িতে ভুল হয়েছিল। নতুন নোট, গায়ে গায় চেপে বসেছিল আর কি,"— বলিয়া লোকটি ঘরের বাহির হইয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিয়া আসিয়া অত্যন্ত বিনীতভাবে কহিল,—"একটা পয়সা আমায় দিন, বড্ড তেষ্টা পেয়েছে, এক পয়সার বাতাসা এনে একটু জল খাই।"

যতীশ বাবু টেবিলের উপর হইতে একটি আনি তুলিয়া তাহার হাতে দিয়া কহিলেন,—"তেষ্টা পেয়েছিল ত এই থেকেই পয়সা নিয়ে সরবৎ খেয়ে এলে পারতে।"

—"তা কি পারি বাবু; আপনার বিনা অনুমতিতে কি সেটা কখন সম্ভব হয় ?"

লোকটি চলিয়া গেলে মতি বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "এরই কথা আপনি বলছিলেন বোধ হয় ?"

"হ্যাঁ।"

"এর বাড়ী কোথায় ?"

"বীরভূম জেলা। এখানে শ্যামবাজারের ওদিকে টীনের একখানা ঘর ভাড়া নিয়ে আছে।"

"কি নাম ?"

"ধর্ম্মদাস মিত্তির।"

* * * *

মাসখানেক পরে হঠাৎ এক দিন যতীশ বাবুর নিকট হইতে সংবাদ পাইয়া মতি বাবু ব্যস্ত হইয়া আসিয়া কহিলেন,—"কি খবর, যতীশ বাবু ?"

যতীশ বাবু কহিলেন,—"আরে মশাই, বেটা একরাশ টাকাকড়ি নিয়ে ভেগেছে।"

"কে ?"

"সেই ভণ্ড, বিটলে, বাটপাড়, র‍্যাসকাল্—"

"আপনার সেই ধর্ম্মদাস মিত্তির ?"

"আরে, হ্যাঁ মশাই! বেটা মহা জোচ্চোর, ধড়ীবাজ! চোর শিরোমণি!"

"কি নিয়ে সরেছে ?"

"তা বেশ ভাল রকমই নিয়ে গেছে। খান সাত আট বিল আদায় ক'রে প্রায় শ' পাঁচেক টাকা নিয়েছে। দত্ত কোম্পানীর দোকান থেকে বারো ভরির এক ছড়া সোণার হার তাকে দিয়েই কাল আনতে পাঠিয়েছিলুম, সেটা নিয়েছে, আমার সোণার ঘড়ীটা এই ড্রয়ার থেকে নিয়েছে, জামা থেকে সোণার বোতাম সেটটা—"

"ভগবানের ওপর অভিমান করেই নিয়েছেন আর কি, নইলে ধর্ম্মদাস কখনও এতটা অধর্ম্ম করতে পারেন কি ?"

"আরে ও নামই বোধ হয় ওর নয়। তার একখানা গীতা তার ডেস্কের মধ্যে ছিল, সেখানা সে প্রায়ই পড়তো। গীতাখানা সে ফেলে গেছে। তাতে নাম লেখা—অকিঞ্চন পাল।"

"শ্যামবাজারে তার বাসায় খোঁজ নিয়েছিলেন ?"

"সে সবই মিথ্যে, মতি বাবু, সবই মিথ্যে। সেখানে খোঁজ নিতে গিয়ে দেখা গেল, টীনের বাড়ী-টাড়ী নেই, রাজসাহীর কে এক জন জমীদারের প্রকাণ্ড চারতলা এক বাড়ী!"

মতি বাবু যতীশ বাবুর মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

৬

সকাল ৭টা ২৭ মিনিটের সময় আগরা ক্যাণ্টনমেণ্ট এক্সপ্রেস হাওড়া হইতে ছাড়িয়া দিবার জন্য যখন তৃতীয় ঘণ্টা পড়িল, তখন এক হাতে ক্ষান্তর একখানা হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে ছুটিতে ছুটিতে অকিঞ্চন তাড়াতাড়ি কাছের যে তৃতীয় শ্রেণীর কামরা পাইল, তাহাতেই উঠিয়া পড়িল। সঙ্গের কুলী প্রকাণ্ড এক ষ্টীলের তোরঙ্গ ও বিছানার একটা মোট তাড়াতাড়ি গাড়ীর মধ্যে ঢুকাইয়া দিয়া পয়সা লইয়া গেলেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

সেখানি মেয়েদের গাড়ী। অকিঞ্চন দেখিল, সকল আরোহীই পশ্চিমা স্ত্রীলোক। কি একটা কথা লইয়া সকলেই মহা কলরবের সৃষ্টি করিয়াছে। ও-দিককার খালি বেঞ্চে ক্ষান্তকে বসাইয়া দিয়া অকিঞ্চন তাহার মুখের দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "ব্যস্, কায ফতে, আর আমায় পায় কে, এইবার হরদম ফুর্ত্তি"—বাকী কথা মুখের

ভিতরই রাখিয়া, পকেট হইতে বিড়ি দেশলাই বাহির করিয়া অকিঞ্চন বিড়ি ধরাইল।

গাড়ী শ্রীরামপুর আসিলে, এক জন চেকার আসিয়া কহিল, "এটা মেয়েদের গাড়ী, আপনাকে অন্য গাড়ীতে যেতে হবে।" অকিঞ্চন একটা যুক্তি দেখাইয়া কি বলিতে গেল, চেকার মাথা নাড়িয়া কহিল, "না না,—মেয়েদের গাড়ীতে পুরুষ থাকবে কি রকম, নেমে যান, নেমে যান।" অগত্যা অকিঞ্চন অন্য গাড়ীতে গিয়া উঠিল। সে কামরাটিতে প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে তখন এক মহা তর্ক চলিতেছিল। তর্ক—পুরুষদের জুয়াচুরি ও মেয়েদের জুয়াচুরি সম্বন্ধে। অবশ্য এ দেশের নহে—বিলাতের। অকিঞ্চন মাঝখানে আসিয়া তর্ককে আরও প্রবল করিয়া তুলিল; কহিল,—"মশাই, ও জাত পুরুষের ঘাড়ে—বুঝতে পেরেছেন ত? তার সাক্ষী, আরব্য উপন্যাস পড়েছেন ত? সুতরাং—"

তর্ক আলোচনা তুমুলভাবে চলিতে লাগিল। গাড়ীও ষ্টেশনের পর ষ্টেশন অতিক্রম করিতে লাগিল।

* * *

স্যাওড়াফুলি ষ্টেশনে একটি আধাবয়সী স্ত্রীলোক মেয়ে কামরায় উঠিয়া ক্ষান্তর সম্মুখে আসিয়া বসিল।

স্ত্রীলোকটি শ্যামবর্ণা, দোহারা, মুখখানি ঢল-ঢল, চোখ দু'টি আয়ত, দৃষ্টি উজ্জ্বল। তাহার পরনে শান্তিপুরী একখানি কানিসপাড় শাড়ী, নাকে ওপ্যালের নাকছবি, কাণে কাণফুল, কপালে উল্কি, মুখে দোক্তা দেওয়া পান, এবং তাহারই রসে ঠোঁট দু'টি টুক্‌টুকে।

স্ত্রীলোকটি বসিয়া ক্ষান্তকে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা যাবে ভাই?"

ক্ষান্ত কহিল, "বর্দ্ধমান।"

"আমিও যাব। সেখানে আমার ভাই রেলেতেই কায করে। তোমাকে যেন কোথাও দেখেছি ভাই, কোন্ গাঁয়ে বাড়ী বল ত?"

"বর্দ্ধমান থেকে আড়াইকোশ তিনকোশ যেতে হয়,—তালচটী।"

"তালচটী? তালচটীতে যে আমি প্রায়ই যাই,—আমার মাসতুত বোনের শ্বশুরবাড়ী।"

"কাদের বাড়ী, দিদি?"

"সরকারদের বাড়ী জান?"

"সরকারদের? না দিদি।"

"চিনবে কি ক'রে বোন্, বৌ-মানুষ ত?"

তখন উভয়ে অনেক কথা, অনেক গল্প হইল। ক্ষান্ত কহিল,—"হ্যাঁ দিদি, একলা এই রকম গাড়ীতে যেতে তোমার ভয় করে না?"

"ভয় কিসের? আমরা ত ধরতে গেলে একরকম রেলেরই লোক। তবে, আজকাল ভাই মেয়ে গাড়ীতে বড্ড চুরি হতে আরম্ভ হয়েছে। প্রায় রোজই হচ্ছে। এই সে দিন, গাড়ী মগরার ষ্টেশনে এসে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই দু'জন লোক হঠাৎ ঢুকে, চক্ষের নিমেষে একজনদের তোরঙ্গ তুলে নিয়ে চ'লে গেল, কেউ ধরতেও পারলে না।"

"বল কি দিদি?"

"কালও ব্যাণ্ডেলে ঐ রকম ব্যাপার হয়ে গেছে। তোমার ও তোরঙ্গে খালি কাপড়-চোপড় আছে ত? পয়সা-কড়ি কিছু থাকে ত বার ক'রে নিয়ে পেটকাপড়ে বেঁধে রাখ।"

"অ্যাঁ! টাকা-কড়ি? হ্যাঁ—না—আমার ক্যাশবাক্স ওর মধ্যে আছে।"

"সেটা বোন্, বার ক'রে কোলে ক'রে ধ'রে নিয়ে ব'স কি জানি, বিপদ হ'তে বেশীক্ষণ লাগে না।"

ক্ষান্ত তোরঙ্গ খুলিয়া, ষ্টীলের ছোট ক্যাশবাক্সটি বাহির করিয়া কোলের উপর লইয়া বসিল।

দিদি কহিল, "আমি থাকতে অবিশ্যি কোন ভয় নেই, কেন না, আমরা রেলেরই লোক, ভাই আমার রেলের সব চেয়ে বড় বাবু, এই যেখানকার যত মাষ্টার, সক্কলের ওপরে; তবুও ভাই সাবধানের মার নেই"—বলিয়া দিদি প্রস্রাবের ঘরে যাইয়া ঢুকিল, ফিরিয়া আসিয়া বসিতেই ক্ষান্ত উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "আমিও একবার—"

"যাবে? যাও। এই ব্যাণ্ডেলে এসে পড়ল। এখানে বড্ড ভিড় হবে ভাই, এই বেলা সেরে এস।"

বাক্সটি দিদির হাতে দিয়া ক্ষান্ত প্রস্রাব করিবার ঘরে প্রবেশ করিল, সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীও মন্থরগতিতে আসিয়া ষ্টেশনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্ল্যাটফরমের কোলে আসিয়া পড়িল।

ব্যাণ্ডেলে গাড়ী পাঁচ মিনিট থামিবে জানিয়া অকিঞ্চন স্ত্রীর খোঁজ লইবার জন্য মেয়ে গাড়ীর সামনে একবার আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, ক্ষান্ত অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া, জানালায় মুখ বাড়াইয়া চারিদিকে কি যেন খুঁজিয়া দেখিতেছে। অকিঞ্চনকে সম্মুখে দেখিয়া কহিল,—"শীগ্‌গীর এস, সর্ব্বনাশ হয়েছে!"

তখনি গাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া পড়িয়া অকিঞ্চন কহিল,—"কি হয়েছে?"

অধীরভাবে হাউ-মাউ করিয়া উঠিয়া ক্ষান্ত কহিল,—"ক্যাশ-বাক্স নিয়ে চ'লে গেছে! ওগো, কি হোল গো! ওরে বাবা রে!"

দুই চোখ কপালে তুলিয়া অকিঞ্চন চীৎকার করিয়া কহিল,—"ক্যাশবাক্স? ক্যাশ-বাক্স নিয়ে চ'লে গেছে! কে—কে—কে নিয়ে গেল?"

"আমি কি চিনি ছাই! নাকে নাক-ছাবি, কপালে উল্‌কী, বাঁ হাতে নাম লেখা, পটল—হরি নাম সত্য।—ওগো, বাক্স নিয়ে দিদি কোথায় গেল গো!"

'দিদি নয়, দিদি নয়, সে তোমার ভাসুর!'

"পটল? হরিনাম সত্য?"—দুই হাতে মাথার দুই পাশ চাপিয়া ধরিয়া অকিঞ্চন সেইখানে নির্জ্জীবের মত বসিয়া পড়িয়া অনুচ্চ কণ্ঠে আপন মনে কহিল,—"দিদি নয়, দিদি নয়, সে তোমার ভাসুর—ভাসুর—আমারই সে দাদা!"

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়।

চন্দ্রালোক

চন্দ্র ঢালিতেছে শুভ্র অমৃত মদিরা,
শ্বেত পদ্ম-মধু যেন পড়িছে ঝরিয়া—
চঞ্চল চকোর মত্ত, সুধা-মুগ্ধ হিয়া
নিসর্গ করিছে পান কি জ্যোৎস্নাধারা!

আম্র-মুকুলের গন্ধে ভুবন সুরভি।
নিদ্রাহীন কোকিলের সুধাকলধ্বনি,
কামবেদ-মন্ত্রে মুগ্ধা বিবশা অবনী
চিত্ত চিত্রময় আজি চিত্রাসঙ্গ লভি!

কি অমৃত মিশে আজি কোন্ হলাহলে—
ছায়াপথ রত্নধারা বিথারিছে মায়া,
প্রাণের মাঝারে জাগে এ কি স্বপ্নচ্ছায়া!—
স্বর্ণ-অলিম্পনে মনে কার স্মৃতি জ্বলে?

এ কোন্ অচ্ছোদতীর, পুষ্পবাণাহত
কারে খুঁজি, কারে চাই ব্যাকুল সতত।

মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

হিন্দুসমাজে সমাজতন্ত্রবাদ

বিগত ভাদ্র মাসের "মাসিক বসুমতী"তে আমি "হিন্দুসমাজ ও সমাজতন্ত্রবাদ" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। সেই প্রবন্ধে এই সম্বন্ধে অধিক কথা বলা হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে সেই প্রবন্ধে সমাজতন্ত্রবাদের উদ্দেশ্যসাধক ব্যবস্থা হিন্দুসমাজে যাহা আছে, কেবল তাহার মুখবন্ধ মাত্র করা হইয়াছে। সেই জন্য বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি ঐ সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা বলিতে ইচ্ছা করিয়াছি। পূর্ব্ব-প্রবন্ধেই বলা হইয়াছে যে, স্বল্প শ্রমে বহু পণ্য উৎপাদক মহাযন্ত্র প্রবর্ত্তন করিতে মনু প্রভৃতি সামাজিক ব্যবস্থাপকগণ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। ঐরূপ নিষেধ করিবার কারণ এই যে, ঐরূপ যন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইলে সমাজে বেকার-সমস্যা প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। কলের সাহায্যে যদি এক ব্যক্তি ১ শত ব্যক্তির সাধ্য পণ্য প্রস্তুত করে, তাহা হইলে সমাজে ৯৯ জন বেকার অবস্থায় পতিত হইবেই। সে কালের ভারতীয় বুধমণ্ডলী ইহার অপকারিতা বিলক্ষণ উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়াই উহা নিষিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। মহাযন্ত্র-প্রবর্ত্তনই যখন নিষিদ্ধ, তখন তজ্জাত পণ্যের ব্যবহারও যে নিষিদ্ধ, তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। সকল আকরে বা খনিতে এক জনের অথবা কোন এক জনসঙ্ঘের অধিকারস্থাপন ঐ জন্যই নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল। অতিথি-সেবার দ্বারা ও মুষ্টিভিক্ষাদানের দ্বারা যে তাঁহারা সমাজে বেকার-সমস্যা সমাধানের আংশিক চেষ্টা করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ সকল কথা পূর্ব্ব-প্রবন্ধে বলা হইয়াছে বলিয়া আর এই প্রবন্ধে বলা হইল না। ইহা ভিন্ন সমাজ পরস্পর পরস্পরকে বিপদে সম্পদে সাহায্য করিবার যে ব্যবস্থা পূর্ব্ববর্ত্তী সামাজিকগণ করিয়া গিয়াছেন, আমি অদ্য তাহার বিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করিব। পাঠক! সেই কথাগুলির আলোচনা করিলে বুঝিতে পারিবেন যে, তখন সমাজে যে ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত ছিল, তাহার ফলে সমাজস্থ দরিদ্র লোকদিগের বিশেষ কষ্ট হইবার সম্ভাবনা ছিল না। উহার ফলে ব্যক্তিত্ববাদের (Individualism) এবং সাকল্যবাদের (Collectivism) উভয়ের মর্য্যাদা সমভাবেই রক্ষিত হইত। য়ুরোপীয় সমাজতন্ত্রবাদের তথা সর্ব্বস্বত্ববাদের জন্য ব্যষ্টিত্ব যেরূপ সমষ্টিত্বের পীড়নে বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে, প্রাচীন আর্য্যগণের ব্যবস্থায় সেরূপ হইবার কোন আশঙ্কাই ছিল না।

হিন্দুসমাজের কতকগুলি বিশেষ ব্যবস্থা এই আছে যে, সেই ব্যবস্থা অনুসারে সকলেই পরিচালিত হইলে, লোক যতই দরিদ্র হউক না কেন, তাহাতে কাহারও কোনরূপ কষ্ট হয় না। সকল গৃহস্থের সকল কার্য্যেই পরস্পরের সহায়তা করিবার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। বিপদে সম্পদে সকলকেই সেই ব্যবস্থা মানিয়া চলিতে হইত। এই সম্বন্ধে আমি কতকগুলি বিশেষ দৃষ্টান্ত দিতেছি। কোন গৃহস্থের যদি কোন লোকের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে সেই গৃহস্থকে বড়ই বিপদে পড়িতে হয়। তাহাকে দাহ করিবার একটা ব্যয় আছে। তন্মধ্যে কাষ্ঠ আহরণ একটি প্রধান কার্য্য। সেই জন্য সমাজপতিরা ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, মৃত ব্যক্তির স্বজাতীয় ব্যক্তিরাই তাহাকে শ্মশানে বহন করিয়া লইয়া যাইবেন এবং তাহাকে দাহ করিবার জন্য প্রত্যেকে সাত-খানি করিয়া কাষ্ঠ দিতে বাধ্য থাকিবেন। ইহা ধর্ম্মব্যবস্থা, সুতরাং উহা মানিতেই হইত। এখন সে ব্যবস্থা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। এখন বহু লোক অন্য ব্যক্তির নিকট হইতে কাষ্ঠ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না। কিন্তু তাহা হইলেও দাহকারীরা সেই প্রাচীন রীতির সম্মানরক্ষার জন্য মৃত ব্যক্তির চিতায় 'সপ্তকাষ্ঠিকা' দিয়া থাকেন অর্থাৎ প্রত্যেক দাহকারী ছোট ছোট সাতখানি কাঠের টুকরা সেই চিতায় নিক্ষিপ্ত করিয়া থাকেন। ইহা সেই প্রাচীন সপ্তকাষ্ঠ প্রদানের অবশেষ। তাহার পর মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন, বিশেষতঃ পুত্রাদিকে অশৌচকালে সাত্ত্বিকভাবে আহারাদি করিতে হয়। পুত্রাদি শ্রাদ্ধাধিকারীরা হবিষ্য করিয়া থাকেন। এই হবিষ্যের দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে দরিদ্র লোকদিগের বিশেষ কষ্ট হইতে পারে। যাহারা অতি দরিদ্র, তাহাদের কষ্ট হইয়াই থাকে। কিন্তু লোককে তাহাদের দারিদ্র্য স্মরণ করিতে না দিয়া কিরূপভাবে তাহাকে সাহায্য করিবার ব্যবস্থা হিন্দুসমাজে প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে, তাহা সকলে চিন্তা করিয়া দেখুন। ধনীই হউন আর নির্ধনই হউক, সকলকেই তাঁহার জ্ঞাতি এবং কুটুম্বগণ হবিষ্যের প্রধান উপকরণ দুধ, কলা প্রভৃতি উপঢৌকন দিবেন। ইহা হইল লৌকিকতা। পল্লীগ্রামে এখনও এ প্রথা প্রচলিত আছে। এই লৌকিকতা গ্রহণে প্রতিগ্রহজনিত কোন দোষ হয় না। তাহার পর শ্রাদ্ধকালেও নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ—বিশেষতঃ আত্মীয়-স্বজন জ্ঞাতি-কুটুম্ব প্রভৃতি—যাঁহার যেমন সাধ্য, তিনি সেইরূপ লৌকিকতাস্বরূপ অর্থ দিয়া থাকেন। ঐ অর্থ-গ্রহণে প্রতিগ্রহ-জনিত পাপ নাই। ইহাতে দরিদ্রের বিশেষ সাহায্য হয়,—অথচ ইহাতে গ্রহীতার আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হয় না। কারণ, উহা ধর্ম্মকার্য্য। ইহার ফলে কাহাকেও ঋণগ্রস্ত হইতে হয় না। ইহা ভিন্ন পীড়ায় লৌকিকতা ছিল। কেহ পীড়িত হইলে তাহার আত্মীয়স্বজনগণ তাহাকে তাহার পথ্যাদি দ্রব্য দিয়া

লৌকিকতা করিয়া থাকেন। এখন এই লৌকিকতাটি উঠিয়া গিয়াছে। সুদূর পল্লীগ্রামে কোন কোন সমাজে ইহার অবশেষ এখনও কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়।

কেবল যে বিপৎকালেই এইরূপ ভাবে লৌকিকতা দিবার রীতি আছে, তাহা নহে। সম্পদেও এইরূপ ভাবে লৌকিকতা দিবার ব্যবস্থা আছে। বিবাহের সময় পাকস্পর্শে কন্যাকে যে যৌতুক দিবার ব্যবস্থা আছে, তাহাতে অলঙ্কার এবং অর্থ দিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। ঐ টাকা ও অলঙ্কার বধূর স্ত্রীধন বলিয়া গণ্য হয়। উহাতে অন্যের অধিকার নাই। বালিকা নূতন সংসারে প্রবেশ করিতেছে—সেই জন্য তাহার সাহায্যার্থ তাহাকে একটা মূলধন করিয়া দিবার জন্য সমাজপতিরা এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন। এখন যেমন বধূর স্বামীর বন্ধু-বান্ধবরা বধূকে কতকগুলি নভেল-নাটক উপহার দিয়া থাকেন, তখন তাহা ছিল না। তখন অলঙ্কার, সুবর্ণ-মুদ্রা বা রজত-মুদ্রা দিবার রীতি ছিল,—এখনও পল্লী অঞ্চলে তাহা আছে। আয়ুর্ব্বৃদ্ধ্যন্নকালে বস্ত্র দিবার ব্যবস্থা আছে। তবে এখন সেই ব্যবস্থা লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়াতে দানের কিছু বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। এইরূপ সন্তানের জন্মে, তাহার অন্নপ্রাশনে, চূড়াকরণে, উপনয়নে প্রভৃতি সকল কার্যেই স্বজাতীয় ব্যক্তিবর্গের দ্বারা সাহায্য করিবার ব্যবস্থা আছে। ইহাতে এক একটি জাতির ধন ঠিক কার্ল মার্কসের সেই জাতীয় সকলের Collective Capital বা সমষ্টিকৃত ধন না হইলেও পরস্পর পরস্পরের ধন দ্বারা সাহায্যলাভ করিয়া থাকেন। ইহাতে (Individualism) (ব্যক্তিত্ব) এবং Collectivism (সমষ্টিত্ব) এর সম্মান যথাযথভাবে রক্ষিত হইত। আজকাল এই সকল ব্যবস্থা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া উঠিয়া যাইতেছে বলিয়া সমাজে দরিদ্র ব্যক্তিদিগের ঘোর কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। আমরা প্রাচীন ব্যবস্থাগুলির উদ্দেশ্য বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া উহা কুসংস্কার বলিয়া অবহেলা করিতেছি, সুতরাং আমাদের সমাজ কক্ষচ্যুত গ্রহের ন্যায় দ্রুত ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতে চলিয়াছে। শিক্ষা-বিভ্রাটই আমাদিগকে আমাদের সামাজিক ব্যবস্থাগুলির উপর শ্রদ্ধাহীন করিয়া তুলিয়াছে।

কুশিক্ষার ফলে আমাদের মনোবৃত্তি এইরূপ হইয়া পড়িয়াছে যে, আমাদের যে সকল সামাজিক ব্যবস্থা আছে,—তাহার সমর্থনে কেহ কোন কথা বলিতে যাইলে আমরা তাহা শুনিতে চাহি না,—বরং উহা কুসংস্কারেরই সমর্থন বলিয়া সমর্থনকারীকে অবজ্ঞা করিয়া থাকি। আজ আমাদের দেশের এক শ্রেণীর লোক পাশ্চাত্যদেশ হইতে সমাজতন্ত্রবাদ আমদানী করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। সমাজতন্ত্রবাদের প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, সমাজ হইতে দুঃখ-দৈন্যের পীড়ন বিলুপ্ত করা। আমাদের যে সমাজ আজ আট দশ হাজার বৎসর চলিয়া আসিতেছে, সেই সমাজে যে কস্মিন্‌কালেও সে চেষ্টা হয় নাই, ইহা মনে করা বিষম ভুল। সুতরাং আমাদের সেই পুরাতন পদ্ধতি আধুনিক অবস্থায় এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহিত সমঞ্জসীভূত করিয়া কতদূর প্রবর্ত্তন করা সম্ভবে, তাহাও চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক। যাহা অচল, তাহা অবশ্য বর্জ্জন করিতে হইবে। কিন্তু কোন্ ব্যবস্থাগুলি অচল আর কোন্ ব্যবস্থাগুলি বর্ত্তমান অবস্থার সহিত সমঞ্জসীভূত করিয়া চালান যাইতে পারে, তাহা বিচার করিবার পূর্ব্বে প্রত্যেক ব্যবস্থা কি জন্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, শ্রদ্ধার সহিত তাহা বিচার করিয়া দেখা বিশেষ কর্ত্তব্য। প্রথম হইতে যিনি ঐ ব্যবস্থাগুলি অবজ্ঞার সহিত দেখিয়া আসিতেছেন, তিনি যত বড়ই মেধাবী এবং প্রজ্ঞাশালী লোকই হউন না কেন, তিনি সে সম্বন্ধে বিচার করিবার সম্পূর্ণ অযোগ্য। আবার যিনি নিতান্তই গোঁড়ামি করিয়া চলেন, তাঁহার অযোগ্যতাও ঐরূপ শ্রদ্ধাবুদ্ধিহীন লোক অপেক্ষা কোন অংশেই অল্প নহে। এখানে বলা আবশ্যক যে, শ্রদ্ধাবুদ্ধি আর গোঁড়ামি এক নহে। গোঁড়ামি মানুষের বিচার-বুদ্ধিকে স্তব্ধ করিয়া দেয়,—কিন্তু শ্রদ্ধাবুদ্ধি তাহা করে না।

য়ুরোপে যে সমাজতন্ত্রবাদ বা সমীকরণবাদ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার একটা অত্যন্ত গুরু দোষ এই যে, তাহা ব্যক্তিত্ববাদের (Individualism) সহিত সমষ্টিবাদের বা সাকল্যবাদের সামঞ্জস্যসাধন করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। অথচ সমাজে উহার উভয়েরই প্রয়োজন আছে। রুসিয়ায় সোভিয়েট সরকার সেই জন্য প্রথমে ব্যক্তিত্ববাদ বর্জ্জন করিয়া পুনরায় তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এখন তথায় ক্ষেত্র-বিশেষে ব্যক্তিত্বের দাবীকেই বড় করা হয়; কিন্তু তাহা হইলেও য়ুরোপ এ পর্য্যন্ত ব্যষ্টির দাবীর সহিত সমষ্টির দাবীর সামঞ্জস্যবিধানে সমর্থ হয় নাই। তাঁহারা কোথাও ব্যক্তিত্বের বা ব্যষ্টির দাবীকে এত বড় করিয়া তুলিয়াছেন যে, তাহার ফলে সমষ্টির বা সমাজের স্বার্থ যেন কোণ-ঠাসা হইয়া পড়িয়াছে, সামাজিক উন্নতি প্রতিহত হইয়া গিয়াছে। আবার কোথাও সমষ্টির বা সাধারণের স্বার্থ-রক্ষার ব্যবস্থাকে এতই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে যে, তাহার ফলে ব্যক্তিত্বের বিকাশ-সাধন অনেকটা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। কি উপায়ে এই উভয়ের সামঞ্জস্যসাধন করা যাইতে পারে, এখন তথাকার সামাজিকদিগের তাহাই গুরু চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বলসেভিকবাদ সমষ্টিগত স্বার্থরক্ষার জন্য এতই কড়া ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, তাহার ফলে ব্যষ্টিগত বা ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং

স্বাধীনতা-রক্ষা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। ব্যক্তিত্ব যেন তথায় পূর্ণমাত্রায় স্ফূর্ত্তি পাইতেছে না। ব্যক্তিগত গুণাবলীও অবসরের অভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে পারিতেছে না। আবার অষ্ট্রীয়া, জার্ম্মাণী, ডেনমার্ক, এমন কি, ইংলণ্ডে এবং ফ্রান্সেও ব্যক্তিগত স্বার্থকে এখনও প্রবল রাখা হইয়াছে। এই সকল দেশে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার (Individual liberty) সহিত সমাজের কর্ত্তৃত্বের (Social authority) বিরোধ প্রায়ই বাধে। কাহার সীমা কতখানি, তাহা লইয়াও প্রায়ই তর্ক উঠে। কিন্তু তাহার নিব্যূঢ় মীমাংসা এখনও হয় নাই। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সহিত সামাজিক শাসনের যে বিরোধ আছে, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। এ পর্য্যন্ত সে বিবাদের সন্তোষজনক মীমাংসাও হয় নাই। সেই জন্য বেঞ্জামিন কিড তাঁহার "Social Evolution" নামক গ্রন্থে এই কথাই বলিয়াছেন যে, যেখানে সমাজদেহের মঙ্গলাধীনে থাকিয়া ব্যক্তিগত মানবের স্বার্থ সাধিত হইতেছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে যতদূর সম্ভব প্রত্যেক মানবের ব্যক্তিগত গুণাবলী বিকশিত করা যাইতে পারে, সেই সমাজই সর্ব্বাপেক্ষা ফলপ্রদ সমাজ। অর্থাৎ এক দিকে যেমন সমাজস্থ সর্ব্বলোকের সমষ্টিগত স্বার্থ রক্ষা করা আবশ্যক, অন্য দিকে তেমনই প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত গুণাবলির পূর্ণ বিকাশসাধন প্রয়োজনীয়। ইহার কোনটিকেই খর্ব্ব করা বাঞ্ছনীয় নহে। কিন্তু ইহারা পরস্পর পরস্পরের বিরোধী। য়ুরোপীয় মনীষীরা এই পরস্পর-বিরোধী মতের সামঞ্জস্য করিবার উপায় এখনও স্থির করিতে পারেন নাই।

কিন্তু য়ুরোপীয় মনীষীরা যে সমস্যা-সমাধান অসম্ভব বলিয়াই মনে করিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় মনীষীরা সে সমস্যার সমাধান করা বিশেষ কঠিন বলিয়া মনে করেন নাই। তাঁহারা হাতে-হাতিয়ারে কায করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন যে, ঐ সমস্যার সমাধান সম্ভবে। তাঁহারা মানুষের ব্যক্তিত্ব যতদূর বিকাশলাভ করিতে পারে, তাহা বিকাশিত করিবার পথ সম্পূর্ণ খোলসা রাখিয়া তাহারই হাত দিয়া সমাজের বা সমষ্টির মঙ্গলসাধনের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। ব্যক্তিগত চেষ্টার এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পথ তাঁহারা বিন্দুমাত্রও সঙ্কুচিত না করিয়া সমষ্টির কল্যাণসাধনের একটা বড় রাস্তা প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। তুমি প্রতিভাশালী ব্যক্তি। প্রতিভার প্রভাবে এবং অনুশীলনে তুমি সমাজস্থ সকলের অগ্রণী হইবার যোগ্যতা রাখ। সমাজ তোমাকে সেই প্রতিভার অনুশীলন করিয়া উহা উজ্জ্বলতম করিতে বাধা দিবে না। তুমি যে ভাবে ভাল বুঝিবে, যে ভাবে তোমার সুবিধা হইবে, তুমি সেই ভাবেই তোমার গুণাবলীর বিকাশসাধন করিতে পার, কেহ তাহাতে বাধা দিবে না,—কিন্তু তুমি যখন তোমার চরিত্রের গুণাবলী বিকশিত করিয়া তাহা হইতে ফললাভ করিবে, তখন তুমি সেই ফল একাকী ভোগ করিতে পারিবে না। তোমার কর্ত্তব্যবুদ্ধির প্রেরণায়—ধর্ম্মবুদ্ধির প্রেরণায়—সেই ফলের ভাগ সকলকেই দিতে হইবে। তুমি কি ভাবে উহা দান করিবে,—কিরূপ কার্য্যে উহা দান করিবে,—সে বিষয়ে তোমার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থাকিবে, এমন কি, তুমি কতখানি দান করিবে, তাহার নির্দ্ধারণেও তোমার কতকটা অধিকার ও স্বাধীনতা থাকিবে,—কিন্তু সমাজকে তোমার পরিশ্রমলব্ধ ফল না দিয়া তুমি সমস্ত ফল স্বয়ং লইতে পারিবে না। ইহাই হইতেছে হিন্দুর ব্যবস্থা। হিন্দু তোমার ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সঙ্কোচ-সাধন না করিয়া তোমাকে সামাজিক কর্ত্তব্যে প্রবর্ত্তনা দেয়। তুমি স্বয়ং পরিশ্রম করিয়া, তোমার মনোমত কর্ম্মপদ্ধতি অবলম্বন করিয়া অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইতে পার,—তুমি তোমার কর্ত্তব্য পথ স্বয়ং বাছাই করিয়া লইতে পার,—কিন্তু তুমি যদি প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হও, তাহা হইলে তোমাকে বারো মাসে তের পার্ব্বণ করিতে হইবে, তোমার গ্রামের সকলকেই বৎসরে বহু দিন অন্ন যোগাইতে হইবে। ইহাতে কোনরূপ বাহ্য বলপ্রয়োগ নাই,—কিন্তু নৈতিক বলপ্রয়োগ আছে। তুমি কি করিয়া দশের সহিত তোমার লাভের অংশভাগী হইবে,—তাহা নির্দ্ধারিত করিবার পক্ষে তোমার যথেষ্ট স্বাধীনতা আছে,—কিন্তু সমস্ত লাভের অংশ, উপার্জ্জনের সমস্তটাই, তুমি স্বীয় ভোগে লাগাইতে পারিবে না,—তোমাকে তোমার দরিদ্র পল্লীবাসীকে তাহার কিছু অংশ দিতে হইবে। তুমি অপরকে না দাও, অন্ততঃ তোমার স্বজাতিকে দিবে। তুমি তোমার উপার্জ্জিত অর্থে দুর্গোৎসব করিবে, কি পুষ্করিণী খনন করিবে,—সে বিষয়ের ভার তোমার হাতে ন্যস্ত,—সমাজ বা রাষ্ট্র সে বিষয়ে তোমার স্বাধীনতায় কিছুমাত্র হস্তক্ষেপ করিবে না। এ সকল বিষয়ে সমাজ ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করিবার পথ সম্পূর্ণ অনর্গল রাখিয়া তাহাকে নিজ প্রয়োজনে লাগাইতে বাধ্য করিয়াছেন। পাশ্চাত্য খণ্ডে বেঞ্জামিন কিড যথার্থই বলিয়াছেন যে, এক দিকে সমাজ তাহার ন্যায্য প্রাপ্য আদায় করিবার অধিকার স্বহস্তে রাখিবে, আর এক দিকে ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করিয়া তুলিবার পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হইবে,—এই দুইটি ভিন্নমুখ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার কোন উপায়ই খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। অথচ উন্নত সমাজপদ্ধতি তাহাই—যাহাতে এই অসম্ভব সমস্যার সমাধান হইয়াছে। সেরূপ সমাজ য়ুরোপে নাই। য়ুরোপ এই উভয় বিপরীতমুখ উদ্দেশ্য সাধিত

হা যে সম্ভব, তাহা কল্পনাতেও আনিতে পারে নাই। পরাধীন ভারতের সমাজপদ্ধতি নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া দেখিবার তাহাদের অবসর বা প্রবৃত্তি হয় নাই। কারণ, প্রথম হইতে তাহাদের মনে এইরূপ একটা কুসংস্কার জন্মিয়াই রহিয়াছে যে, ব্রাহ্মণ-শাসিত হিন্দু-সমাজে ভাল কিছুই নাই। উহা কেবল কতকগুলি কুসংস্কার দ্বারাই চালিত হয়। য়ুরোপীয়রা যদি মনে মনে সেই ভাব পোষণ করেন, তাহা হইলে তাহাতে বড় যায় আসে না, কিন্তু আমাদের দেশের অকালকুষ্মাণ্ডগণ যে ঐরূপ বিদ্বেষদিগ্ধ দৃষ্টিতে তাঁহাদের পূর্ব্বজগণের ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন,—ইহা অপেক্ষা লজ্জার বিষয় কি হইতে পারে? অবশ্য এ ক্ষেত্রে ধর্ম্মের কতকগুলি অনুশাসন দ্বারা সমাজ তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া লইতেছে। খৃষ্টীয় মিশনরীরা এ দেশে আসিয়া এই ধর্ম্মকে আগাগোড়া কুসংস্কারমাত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়া আসিতেছেন। আমাদের দেশের তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিরা তাহাই আপ্তবাক্য বলিয়া মনে করিতেছে। এ দিকে আমাদের প্রাচীন সামাজিক ব্যবস্থাগুলিও কাল-সহকারে অনেকটা বিকৃতভাব-প্রাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই সহজে অর্থাৎ বিনা অনুসন্ধানে, উহার স্বরূপ বুঝিতে পারাও কতকটা কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু আমাদের শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মনে মনে বুঝা উচিত যে, ঐ সকল সামাজিক ব্যবস্থা যত কাল প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা অনেক অল্পকালের মধ্যে অনেক প্রবল-পরাক্রান্ত জাতির উত্থান, পতন, বিলয় হইয়া গিয়াছে, এরূপ অবস্থায় এত দীর্ঘকালে ভারতের কতকগুলি সামাজিক ব্যবস্থা যে কেন্দ্রচ্যুত এবং বিকৃত হইয়া পড়িবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি হইতে পারে?

এ দেশের লোকের মনে ধর্ম্মবুদ্ধি এরূপ দৃঢ় হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহারা ধর্ম্মের নামে ত্যাগস্বীকার করিতে পারে, অন্য কিছুরই জন্য তাহা পারে না। ইহার দৃষ্টান্ত দিকে দিকে দেদীপ্যমান। গত দশহরার দিন গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া দেখিয়াছি, যে সকল নারীর কোন উপায়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে, যাহাদিগকে মাসের মধ্যে অন্ততঃ ৩।৪ দিন একবারে উপবাসী থাকিতে হয়, তাহারাও ভিখারীকে এক মুষ্টি চাউল বা দুই একটি আধলা পয়সা দিতেছে। আমি তাহার মধ্যে একটি মহিলাকে বিলক্ষণ চিনি। তিনি উহার তিন দিন পূর্ব্বে বাজারের পয়সা অভাবে খাইতে পান নাই, তাহাও আমি জানি। তিনি চারি জন ভিখারীকে চারিটি পয়সা দিলেন, ইহা আমি নিজ নয়নে দেখিলাম। আমি তাঁহার বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,—'মা, তুমি উহাদিগকে পয়সা দিলে কেন, তোমারই ত সকল দিন অন্ন জুটে না।' মহিলাটি উত্তর করিয়াছিলেন, "বাবা! দশহরার জন্য আমি পয়সা দুইটি অতি কষ্টে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলাম। আজ আমি তাহা এই সকল কাঙ্গাল-গরীবকে দিয়া যে তৃপ্তি বোধ করিলাম, উহা না করিলে আমি কখনই সে তৃপ্তি পাইতাম না। আমার কষ্ট আছে বলিয়া কি আমি পরকালের কায করিব না?" এইরূপ মনোবৃত্তি আধুনিক শিক্ষার প্রভাবে তিরোহিত হইয়া যাইতেছে। আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, "মা, আমি তোমায় আর কয়েকটি পয়সা দিতেছি, তুমি উহা গরীবদিগকে দান কর।" মহিলাটি ঐখানে তাহা গ্রহণ করেন নাই। বলসেভিক-শাসিত রুসিয়া বহু সৈন্য রাখিয়া কামান-বন্দুকের সাহায্যে যে সাম্য রক্ষা করিতেছে, ভারত ধর্ম্মবুদ্ধির প্রেরণায় দরিদ্রদিগের দুঃখ-লাঘবের জন্য সেই দানের ব্যবস্থা করিয়াছে। এখন জিজ্ঞাস্য, ইহার কোন্‌টি ভাল?

আমাদের এই বর্ণ-বিভাগের দ্বারাও সমাজে সমানভাবে ধন-বণ্টনের যে একটা ব্যবস্থা করা হইয়াছে, নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে তাহা বেশ বুঝা যায়। এই বর্ণ-বিভাগের দ্বারা প্রত্যেক জাতির জন্য এক একটা বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। হিন্দু-সমাজে চারি বর্ণ বিদ্যমান। প্রত্যেক বর্ণের জন্য এক একটি স্বতন্ত্র বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এক বর্ণ সাধারণ সময়ে অন্য বর্ণের বৃত্তি গ্রহণ করিতে পারিতেন না। কাযেই বৃত্তি লইয়া বিবাদ ঘটিবার সম্ভাবনা অতি অল্পই ছিল। প্রত্যেক বর্ণ নিজ নিজ বৃত্তির উৎকর্ষসাধন করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। পুরুষ-পুরুষানুক্রমে একই বৃত্তি অবলম্বন হেতু প্রত্যেক বর্ণ তাহাদের বৃত্তির উন্নতিসাধনে সমর্থ হইত। সেই জন্য ভারতীয় শিল্পী জাতির শিল্প যত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, পৃথিবীর অন্য কোন দেশের শিল্প তাদৃশ উন্নতিলাভে সমর্থ হয় নাই। আধ্যাত্মিক দর্শনবিজ্ঞানে হিন্দু জাতি যত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, এত আর কোন জাতি তাহা করিতে পারিয়াছেন কি না সন্দেহ। কিন্তু যেরূপ সামাজিক ব্যবস্থা ছিল, তাহাতে একমাত্র বৈশ্যজাতি ভিন্ন অন্য কোন জাতিরই ধনাঢ্য হইবার উপায় ছিল না। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে অধিক পরিমাণে ধনার্জ্জন করা অসম্ভব ছিল। এ সকল কথা আমি বর্ণাশ্রমী সমাজের কথা আলোচনা উপলক্ষে বিশেষভাবে বলিব। তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, প্রাচীন হিন্দু-সমাজে ধনবণ্টনের গুরু বৈষম্য একবারেই হইতে পারিত না। যাহারা দরিদ্র এবং উপার্জ্জনে অসমর্থ, তাহাদেরও বিশেষ কষ্ট হইত না। তাহারা আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সংসারে বেশ চলিতে পারিত। এক কথায় প্রকৃত হিন্দু-সমাজের যে ব্যবস্থা ছিল, তাহাতে সমাজতন্ত্রবাদের উদ্দেশ্য অতি সুন্দরভাবে সাধিত হইত, অথচ ব্যক্তিগত স্বাধীনতাও অক্ষুণ্ণ ছিল।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)।

ভূতুড়ে গাছ

(অলৌকিক ঘটনা)

প্রকৃতির লীলা-নিকেতন যবদ্বীপে বহুসংখ্যক রবারের আবাদ আছে। এইরূপ একটি আবাদের ইংরাজ অধ্যক্ষ তাঁহার বন্ধু মিঃ বডলির নিকট তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে যে গল্প বলিয়াছিলেন, মিঃ বডলি তাহা সংপ্রতি কোন প্রসিদ্ধ ইংরাজী মাসিক পত্রে প্রকাশিত করিয়াছেন। এই কৌতূহলোদ্দীপক বিস্ময়াবহ কাহিনীর কোন অংশ অতিরিক্ত নহে; কিন্তু এই অলৌকিক ঘটনার কারণ নির্ণীত হয় নাই। মিঃ বডলির লিখিত বিবরণ পাঠক-পাঠিকাগণের মনোরঞ্জনে সমর্থ হইবে, এই আশায় তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

"যবদ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে বান্টাম প্রদেশ অবস্থিত। বান্টামের গভীর অরণ্যময় অংশে রবারের আবাদ আছে। এই সকল আবাদের অধ্যক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আমি বুইটেন্‌জর্গের রেল-ষ্টেশন হইতে মোটরযোগে দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলাম। সেই সময় আমি যবদ্বীপের আরণ্য প্রকৃতির যে শোভা সন্দর্শন করিয়াছিলাম, তাহা অতুলনীয় বলিয়াই মনে হইয়াছিল।

যাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছিলাম, তাঁহার সহিত কিছু দিন পূর্ব্বে বাটাভিয়ায় একটা ভোজের মজলিসে হঠাৎ পরিচয় হইয়াছিল। পূর্ব্বে তাঁহার সহিত আমার পরিচয় না থাকিলেও তাঁহার ব্যক্তিগত বিশেষত্বে আমি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। যবদ্বীপ সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতার পরিচয় পাইয়া আমি এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলাম যে, তিনি আমাকে তাঁহার আতিথ্য-গ্রহণের জন্য নিমন্ত্রণ করিলে আমি আগ্রহের সহিত তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলাম।

আমি চলিতে চলিতে নারিকেল-কুঞ্জের অন্তরালস্থিত বংশনির্ম্মিত-কুটীর-শোভিত গ্রামগুলি দেখিতে পাইলাম; তাহাদের চতুর্দ্দিকে রৌদ্রোদ্ভাসিত ধান্য-ক্ষেত্র; স্থানে স্থানে স্বচ্ছসলিলা প্রবাহিণী। প্রকৃতির এই সকল মনোহর দৃশ্যে আমার নয়ন পরিতৃপ্ত হইল। আমার সওয়ানীজ সোফেয়ার প্রবলবেগে শকট পরিচালিত করায় ধান্যক্ষেত্রগুলি ক্রমশঃ অদৃশ্য হইল, গ্রামগুলি বিরল হইয়া আসিল, পথও অধিকতর দুর্গম হইয়া উঠিল।

কিছু কাল পরে ধান্যক্ষেত্রের সকল চিহ্ন বিলুপ্ত হইল এবং চতুর্দ্দিকের অরণ্যানী নিবিড়তর হইয়া উঠিল। আমরা অরণ্যের ভিতর দিয়া দ্রুতবেগে ধাবিত হইলাম। তাহার পর সুদীর্ঘ বক্র পথ অতিক্রম করিয়া আরও বহু দূর অগ্রসর হইয়া যখন অরণ্যের প্রান্তভাগে উপস্থিত হইলাম, তখন সম্মুখেই সুপরিচ্ছন্ন রবারের আবাদগুলি দৃষ্টিগোচর হইল। আমাদের শকট প্রধান পথ ত্যাগ করিয়া সঙ্কীর্ণ গলী-পথ দিয়া অপেক্ষাকৃত ধীরে চলিতে লাগিল। অতঃপর একটা মোড় ঘুরিতেই তৃণরাশি-সমাবৃত একটি ময়দানের মধ্যে সেই আবাদের অধ্যক্ষের বাসভবন দেখিতে পাইলাম। আমাদিগকে দেখিয়া এক পাল দো-আঁসলা কুকুর চীৎকার করিতে করিতে ঘর হইতে বাহিরে আসিল, মুহূর্ত্ত পরেই গৃহস্বামীর আবির্ভাব। গৃহস্বামী দীর্ঘদেহ, সদানন্দ পুরুষ; রৌদ্রপ্রভাবে তাঁহার মুখের বর্ণ লোহিতাভ। তিনি আমাকে দেখিবামাত্র সমাদর সহকারে গৃহমধ্যে লইয়া চলিলেন। তাঁহার বাংলো বাঁশের বাখারী-নির্ম্মিত, তাহা বিলাতী মাটীর পলস্তারা দ্বারা আবৃত, করোগেট-লোহার ছাদ; কিন্তু তাহা এরূপ পুরু রং দিয়া ঢাকা যে, দেখিলে মনে হয়, তাহা প্রস্তর-নির্ম্মিত কুটীর।

গৃহস্বামী বলিলেন, 'আপনি ঠিক সময়েই আসিয়াছেন; আমার আশঙ্কা হইয়াছিল, আপনি পথে বৃষ্টিতে কষ্ট পাইবেন।'

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম, 'বৃষ্টি!'

গৃহস্বামী বলিলেন, 'হাঁ, ১০ মিনিটের মধ্যেই বৃষ্টি আরম্ভ হইলে জঙ্গলের ভিতর দিয়া মোটর চালাইয়া আসা তেমন সুখকর হইত না।'

আমি মুক্ত দ্বারপথে বাহিরে চাহিয়া আকাশের চেহারা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। দেখিলাম, আকাশ গাঢ় মেঘস্তরে সমাচ্ছন্ন, দূরবর্ত্তী পাহাড়গুলি কুয়াসায় ঢাকিয়া গিয়াছিল; বায়ু-প্রবাহ পূর্ব্বাপেক্ষা সুশীতল।

গৃহস্বামী বলিলেন, 'দিবসের প্রায় এই সময়টিতেই সাধারণতঃ বৃষ্টি হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে বৎসরের এই ঋতুতে অপরাহ্ণে এমন নিয়মিতভাবে বৃষ্টি আরম্ভ হয় যে, তাহা দেখিয়া ঘড়ী ঠিক করিয়া লওয়া চলে। ঐ শুনুন, বৃষ্টি আসিতেছে।'

আমি মেঘের দিকে চাহিলাম, দূরে বৃষ্টিপাতের শব্দ আমার কর্ণগোচর হইল। প্রথমে দূরের নদী-কল্লোলধ্বনিবৎ শব্দ শুনিতে পাইলাম, ক্রমশঃ সেই শব্দ বর্দ্ধিত হইল। অবশেষে মনে হইল, অরণ্যের ভিতর দিয়া ভীষণ বেগে বৃষ্টির স্রোত আসিতেছে। গগনমণ্ডল গাঢ়তর অন্ধকারে আবৃত হইল; তাহার পর মুষলধারে বর্ষণ আরম্ভ হইল।. চক্ষুর সম্মুখে সকলই যেন মুছিয়া গেল; করোগেট-লোহার ছাদে এরূপ বেগে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল যে, সেই শব্দে কর্ণ বধির হইবার উপক্রম!

গৃহস্বামী বলিলেন, 'মিনিটখানেকের মধ্যে বৃষ্টির তোড় কমিয়া যাইবে। ইতিমধ্যে আপনি স্নানাদি শেষ করুন, তাহার পর পানের সময় গল্প করা যাইবে।'

আমি পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়া আমার চাষী বন্ধুর পাশে বসিয়া ধূমপান ও সুরাপান করিতে করিতে নানা কথার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

বন্ধু আমার প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, 'নির্জ্জনতা অনুভব করি কি না জিজ্ঞাসা করিতেছেন? না, আদৌ তাহা অনুভব করি না। আমার হাতে এত কায যে, নির্জ্জনতা অনুভব করিবার অবসর কোথায়? রাত্রিকালে আমার হিসাবপত্র শেষ হইলে শয়নের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠি।'

আমি বলিলাম, 'কিন্তু আপনার বাংলোর চতুর্দ্দিকে এই ত বহুক্রোশব্যাপী অরণ্য, নিকটে লোকালয় নাই; আপনি এখানে একাকী থাকেন, কোন বিপদের আশঙ্কা নাই ত?'

বন্ধু বলিলেন, 'না, কোন দিন কোন বিপদে পড়ি নাই, এবং সতর্ক থাকিবার প্রয়োজন হইতে পারে, এরূপ কোন বিপদের আশঙ্কাও করি না। এখানে প্রায় ১০ বৎসর কাটাইলাম; এই দীর্ঘকালের মধ্যে একবার একটা সঙ্কটে পড়িয়াছিলাম; কিন্তু আমার বুদ্ধির দোষেই আমাকে সে ভোগ ভুগিতে হইয়াছিল।'

আমি বলিলাম, 'সে কিরূপ সঙ্কট, আমাকে খুলিয়া বলুন; এ দেশে আসিয়া কোন আপদ-বিপদের সঙ্গে আমার পরিচয় হইল না; আপনার সঙ্কটের কাহিনী আপনার মুখে শুনিলে ভবিষ্যতে ভাবার কথা মনে পড়িবে।'

বন্ধু হাসিয়া ক্ষণকাল চিন্তার পর নিম্নলিখিত গল্পটি বলিতে লাগিলেন,—

আমি তখন অস্থায়িভাবে এই আবাদের কর্ত্তৃত্ব-ভার পাইয়াছিলাম। স্বদেশে থাকিতে আমাদের অনেকেই এই ধারণা পোষণ করেন যে, এই সকল দেশের 'নেটিভ'গুলা পশু অপেক্ষা অতি অল্পই শ্রেষ্ঠ; আমারও তখন সেইরূপ ভুল ধারণা ছিল। কিন্তু এখন সকল বিষয়েরই পরিবর্ত্তন হইয়াছে, ভ্রমপূর্ণ ধারণাগুলিও পরিত্যক্ত হইয়াছে।

সেই সময়ে যিনি আবাদের কর্ত্তা ছিলেন, তিনি এই স্থান ত্যাগ করিবার সময় রবারের একটা নূতন বাগান করিবার অভিপ্রায়ে জঙ্গলের কিয়দংশ পরিষ্কৃত করিবার জন্য আমাকে আদেশ করিয়াছিলেন। তিনি এখান হইতে চলিয়া যাইবার পূর্ব্বেই সেই কায আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু সেই জঙ্গল কিছু দূরে থাকায় আমি কোন দিন তাহা দেখিতে যাই নাই। কর্ত্তার আদেশে আমি তাঁহার আরব্ধ কায শীঘ্রই শেষ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। প্রথমে কোন বাধা-বিঘ্ন ঘটিল না। অবশেষে এক দিন লক্ষ্য করিলাম, সেই জঙ্গলের মধ্যস্থলে যে পাহাড় আছে, তাহার মাথার কাছে আসিয়া কায অগ্রসর হয় নাই। কুলীরা কাযে গাফিলী করিতেছিল, এমন কি, হাজিরা লইবার সময়েও তাহাদিগকে হাজির পাওয়া যাইতেছিল না।

প্রথমে ভাবিলাম, আমাকে নূতন লোক পাইয়া এবং আমি কাযকর্ম্ম বুঝি না ভাবিয়া তাহারা ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করিতেছিল। এজন্য আমি খুব কড়া হইয়া উঠিলাম, এবং কাহাকেও গালি দিয়া, কাহাকেও বা দুই এক ঘা বেত মারিয়া তাহাদিগকে কাযে পাঠাইলাম। কিন্তু আমি যতক্ষণ সেখানে উপস্থিত থাকিয়া তাহাদের খাটাইতাম, ততক্ষণ কিছু কিছু কায হইলেও, যে মুহূর্ত্তে আমি আবাদের অন্য অংশে কায দেখিবার জন্য সেই স্থান ত্যাগ করিতাম, সেই মুহূর্ত্তেই তাহারা কায বন্ধ করিত।

আমি তাহাদের এই রকম বদমায়েসী যত দিন পারিলাম সহ্য করিলাম; অবশেষে তাহাদের 'মান্দুর'কে (দেশী ওভারসিয়ার—যাহার উপর কায বুঝিয়া লইবার ভার ছিল)

ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কাযে এ রকম গাফিলী করিবার কারণ কি ?

'মান্দুর' দুই এক মিনিট কোন কথা না বলিয়া স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। সে অবনত-নেত্রে বোধ হয় কোন কৈফিয়ৎ আবিষ্কারের চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার পর সে হঠাৎ মাথা তুলিয়া যে কৈফিয়ৎ দিল, তাহার মর্ম্ম এই যে, আমরা যে পাহাড়ের উপর কায করাইতেছিলাম, ভূতের আড্ডা বলিয়া সেই স্থানটির বদনাম আছে। সে বলিল, গভীর রাত্রিতে স্থানীয় অধিবাসীরা সেই জঙ্গলের ভিতর অদ্ভুত আলো দেখিতে পায়। ছেলেরা দৈবাৎ সেখানে উপস্থিত হইলে যে সকল অদ্ভুতাকৃতি লোক দেখিতে পায়, স্থানীয় অধিবাসীদের আকারের সঙ্গে তাহাদের আকারের সাদৃশ্য নাই। সেই লোকগুলির গায়ের রং বাদামী; তাহারা খর্ব্বাকৃতি, এবং দেখিতে বানরের মত।

সে আরও বলিল, প্রাচীন লোকরা তাহাদের পিতা-পিতামহের নিকট শুনিয়াছে, সেই পাহাড়ের চূড়ায় এক জন যাদুকর বহুকাল পূর্ব্বে বাস করিত। সেই যাদুকরের মৃত-দেহ যে গাছের তলায় সমাহিত হইয়াছিল, সেই গাছটি অরণ্যের অন্য সকল গাছ অপেক্ষা বৃহৎ। এক দিন কয়েক জন সাহসী বালক গ্রাম হইতে বাহির হইয়া সেই গাছটি দেখিতে গিয়াছিল। তাহাদের দলের এক জন মাত্র ফিরিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু সে এরূপ হতজ্ঞান হইয়াছিল যে, সে কোন কথাই বলিতে পারে নাই; সে প্রলাপঘোরে বিড়-বিড় করিয়া এই মাত্র বলিয়াছিল—ছোট ছোট বাদামী রঙের মানুষগুলা সেই যাদুকরের কবর পাহারা দিয়া থাকে।

'মান্দুর' আমাকে এই আষাঢ়ে গল্প বলিয়া কয়েক মিনিট নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর অত্যন্ত কাতরভাবে আমার নিকট প্রার্থনা করিল, আমি যেন পাহাড়ের সেই অংশের কায বন্ধ করি, সেই স্থানের জঙ্গল পরিষ্কার না করাই। অতঃপর প্রতিদিন কুলীর সংখ্যা হ্রাস হইতে লাগিল। কায ধীরে অগ্রসর হইলেও গ্রামের লোকরা দূরে দাঁড়াইয়া, আতঙ্ক-বিস্ফারিত-নেত্রে সেই অরণ্যস্থিত ভুতুড়ে গাছটির দিকে চাহিয়া আমাদের কায দেখিত। মান্দুর আমাকে এ কথাও বলিয়াছিল যে, যদি আমাদের কায আর কিছু দূর অগ্রসর হয়, তাহা হইলে প্রেতাত্মাগুলি আমাদের সকলকে অতি কঠিন শাস্তি দিয়া প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করিবে, গ্রামের বৃদ্ধ লোকগুলির নিকট সে এ কথাও শুনিয়াছিল। সুতরাং অরণ্যের যে অংশ অকর্ত্তিত আছে, তাহা যেন আর ছেদন করা না হয়।

ওভারসিয়ার এই সকল কথা বলিয়া নীরব হইলে আমি দেখিলাম, কুলীর দল চারিদিক হইতে নিঃশব্দে আসিয়া আমাদিগকে পরিবেষ্টিত করিয়াছে। আমার মন্তব্য শুনিবার জন্য তাহারা ব্যাকুলভাবে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিতে পারিলাম, তাহারা আতঙ্কে অধীর হইয়াছে।

আমি ভাবিলাম, কি করি ? যে কারণেই হউক, কুলীরা ভয় পাইয়াছে, ইহা বুঝিতে পারিলাম, সুতরাং তাহাদের কুসংস্কার অগ্রাহ্য না করিয়া প্রকৃত ব্যাপার কি, তাহার সন্ধান না হওয়া পর্য্যন্ত কায বন্ধ রাখাই সঙ্গত মনে হইল।

কিন্তু এই চিন্তা আমার মনে উদিত হইবার অব্যবহিত পরেই ঐরূপ সঙ্কল্প মন হইতে বিতাড়িত করিলাম। কারণ, অরণ্যের সেই অংশ পরিষ্কৃত করিবার জন্য আমি যে আদেশ পাইয়াছিলাম, তাহা আমার অগ্রাহ্য করিবার উপায় ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, অন্যান্য আবাদের মালিকরা যখন শুনিবে, আমি একটা জাভানী যাদুকরের গোরস্থান-সংক্রান্ত একটা উদ্ভট গল্প শুনিয়া কায বন্ধ করিয়া দিয়াছি, তখন আমাকে তাহাদের বিদ্রূপভাজন হইতে হইবে, ইহাও বুঝিতে পারিলাম। ভাবিলাম, আমি নূতন লোক বলিয়াই কি সেই নেটিভ কুলীগুলার যুক্তিহীন খেয়াল মানিয়া চলিব ? আমি উপরওয়ালার আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া কেন তাঁহার তিরস্কার সহ্য করিব ? আমি মান্দুরকে বলিলাম, আমি যে আদেশ পাইয়াছি তাহা, যেরূপে হউক পালন করিতেই হইবে। যদি সে তাড়াতাড়ি কায শেষ করিতে না পারে, তাহা হইলে আমি তাহাকেই দায়ী করিব।

মান্দুর প্রকাশ্যতঃ আমার আদেশের প্রতিবাদ না করিয়া প্রস্থান করিল; আমিও যথেষ্ট দৃঢ়তা প্রদর্শন করিতে পারিয়াছি ভাবিয়া প্রসন্ন-চিত্তে বাংলোয় ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু পরদিন আমি সেই জঙ্গলের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখি, কায আরম্ভ হয় নাই; মান্দুরকে বা কোন কুলীকে সেখানে দেখিতে পাইলাম না।

অতঃপর আমি কামুলংএ (গ্রামে) প্রবেশ করিয়া আমার নেটিভ সহকারীকে আহ্বান করিলাম। সে আমার

সকল কথা শুনিয়া এই ব্যাপারের তদন্ত করিতে প্রতিশ্রুত হইল। সেই দিন সায়ংকালে সে আমার সঙ্গে দেখা করিয়া বলিল, মান্দুর পলায়ন করিয়াছে এবং কুলীরা একবাক্যে বলিয়াছে, আমার খাতিরেই হউক আর টাকার লোভেই হউক, তাহারা অরণ্যের ঐ স্থানে যাইবে না। সে এ সম্বন্ধে তাহার ব্যক্তিগত অভিমত প্রকাশ করিতে সম্মত না হইলেও আমি তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, কুলীদের অবাধ্যতা সমর্থনযোগ্য বলিয়াই তাহার ধারণা হইয়াছে।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমারও জিদ হইল, যত টাকা খরচ হউক, ঐ কায আমাকে শেষ করিতেই হইবে। যথেষ্ট কষ্টভোগের পর বহু চেষ্টায় আমি অন্য এলাকার কয়েক জন কুলীকে ঘুস দিয়া, কাযটা শেষ করিয়া দিবার জন্য তাহাদিগকে ডাকিয়া আনাইলাম। কিন্তু তাহাদের কার্য্য পরিদর্শনের জন্য আমার অধীন কোনও মান্দুরকে পাইলাম না। অগত্যা আমাকেই সেই ভার গ্রহণ করিতে হইল। এই নবাগত কুলীদের কুঠারাঘাতে সেই ভুতুড়ে জঙ্গলের অবশিষ্ট গাছগুলি ধরাশায়ী হইতে লাগিল।

আমার জিদ বজায় রাখিতে পারিয়াছি ভাবিয়া আমি বিলক্ষণ আত্মপ্রসাদ লাভ করিলাম। এই সময় এক দিন দেখি, আমার মজুরগুলা সকলেই সেই নির্ম্মূলপ্রায় অরণ্যের নিকট উপস্থিত হইয়াছে। তাহাদিগকে দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। তাহারা আমাকে অভিবাদন করিলে আমি তাহা অগ্রাহ্য করিয়া নবাগত কুলীদিগকে অবশিষ্ট গাছগুলি কাটিয়া ফেলিতে আদেশ করিলাম।

কয়েক মিনিট পরে পশ্চাতে কাসির শব্দ শুনিয়া আমি ফিরিয়া চাহিলাম, দেখিলাম, মজুরগুলা আমার পশ্চাতে আসিয়া দল বাঁধিয়া মাটীতে বসিয়া আছে।

আমি তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া সক্রোধে বলিলাম, 'ব্যাপার কি? এখন ত তোমরা বুঝিতে পারিয়াছ, আমি তোমাদের ভুতগুলার চেয়ে বেশী বলবান্? ইহা বুঝিয়াই এখন কাযে যোগ দিতে আসিয়াছ; কিন্তু আমি আর তোমাদিগকে কাযে লাগাইব না। নূতন কুলীরা কায শেষ করিবে।'

আমার কথা শুনিয়া কেহ কোন কথা বলিল না; শেষে মজুরদের সর্দ্দার তাহার সহযোগীদিগকে পশ্চাতে রাখিয়া আমার সম্মুখে সরিয়া আসিল এবং প্রার্থনার ভঙ্গীতে হাত যোড় করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, 'তুয়ান (হুজুর), আপনি জ্ঞানী, আপনি আমাদের সকলের চেয়ে ভাল বোঝেন। আপনি এই জঙ্গল কাটিয়া প্রায় পরিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছেন, তথাপি ভুতের দল আপনার কোন ক্ষতি করে নাই, এই জন্যই অনুমান হইতেছে, আপনি তাহাদের অপেক্ষা বলবান্ কিন্তু তুয়ান, আপনি সেই যাদুকর অপেক্ষা বলবান্, ইহা স্বীকার করিতে পারিতেছি না। ঐ বড় গাছটি অতি প্রাচীনকাল হইতে এই অরণ্যে মাতব্বরি করিতেছে, ঐ গাছটি আপনি রক্ষা করুন, তুয়ান! আপনার যাহা কিছু প্রিয় বস্তু আছে, তাহার দোহাই দিয়া বলিতেছি, আপনি সতর্ক হউন।'

তাহার কথা শুনিয়া আমার মন একটু দমিয়া গেল। আমি আশা করিয়াছিলাম, পেটের দায়ে তাহারা কাতরভাবে বশ্যতা স্বীকার করিবে; কিন্তু তাহা না করিয়া আমাকে ভয় দেখাইয়া কায বন্ধ করাইবার চেষ্টা করিতেছে!

আমি বলিলাম, 'সেটা কোন্ গাছ?'—কোন্‌গাছ, তাহা আমি বিলক্ষণ জানিতাম; কিন্তু আমার কিছু বলা চাই ত, এই জন্যই ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলাম।

সদ্দার মান্দুর বলিল, 'ঐ বড় গাছটা,—যাহার নাম 'যাদুকরের গাছ'।' —সে গাছটির দিকে অঙ্গুলী প্রসারিত করিল। আমি চাহিয়া দেখিলাম, পাহাড়ের মাথায় যে গাছগুলি ছিল, তাহাদের অধিকাংশই নির্ম্মূল হইয়াছে; কেবল একটি বৃহৎ বৃক্ষ তাহার বিশাল শাখা-বাহু প্রসারিত করিয়া ছিন্নমূল বৃক্ষগুলির অদূরে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সেরূপ বিরাট বনস্পতি পূর্ব্বে কখন আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

সদ্দার মান্দুর বলিল, 'তুয়ান, আপনি ঐ গাছটি কাটিবেন না; উহা রক্ষা করিলে আপনার মঙ্গল হইবে।'

পুনর্ব্বার মনে হইল—কি করি?—এই একটিমাত্র গাছ না কাটিয়া রাখিয়া দিলে তেমন কি অসুবিধা হইবে? কিন্তু তখনই বৃথা দর্প আমার সুবুদ্ধির উপর আধিপত্য বিস্তার করিল। আমাকে বন্ধু-সমাজে হাস্যাস্পদ হইতে হইবে, এই আশঙ্কায় আমার জিদ বাড়িয়া গেল। আমি সংক্ষেপে বলিলাম, 'না, ও গাছ কাটিতেই হইবে; গাছটা রাখিয়া দিলে অসুবিধা হইবে।'—নবাগত কুলীরাও আমার এ কথায় বাঁকিয়া বসিয়া মাথা নাড়িতে লাগিল। তখন আমি

তাহাদিগকে আরও অধিক পারিশ্রমিক দানের অঙ্গীকার করিয়া বলিলাম, 'গাছটি কাটা হইলে সেই বুড়া যাদুকরের আত্মার সন্তোষের জন্য পূজা দিব। তোরা গাছ কাট।'— আমার কথা শুনিয়া তাহারা গাছটি কাটিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু সে গাছ কি সহজে কাটে? তাহাদিগকে কি পরিশ্রমই না করিতে হইল! যেন কোন অশরীরী আত্মা এই কার্য্যে প্রতিমুহূর্ত্তে বাধা দিতে লাগিল! যে সকল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লতা সেই গাছটিকে ঘিরিয়া রাখিয়াছিল, তাহারাও যেন একযোগে এই কার্য্যে বাধা দিতে লাগিল। স্থূল লতাগুলি নির্ম্মূল করা সহজ হইল না। ক্রমাগত এক সপ্তাহকাল কুঠার চালাইয়া গাছটি কাটা হইল। সেই সপ্তাহকাল মজুররা এবং গ্রামের সমস্ত লোক দূরে থাকিয়া নানাপ্রকার বলি মানত করিতে লাগিল; স্তবস্তুতিও চলিল। অবশেষে গাছটি ধরাশায়ী হইবার সময় গ্রামবাসীরা সমস্বরে এরূপ আর্ত্তনাদ করিল যে, তাহা শুনিয়া আমার হৃৎকম্প হইল, আমার দেহের ভিতর যেন বিদ্যুৎতরঙ্গ প্রবাহিত হইল!

কুঠারাঘাতে বিরাট বৃক্ষ ভূপতিত হইল এবং গ্রামবাসীরা সকলে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল

যাহা হউক, যাহা হইবার, তাহা হইয়া গেল; সুখের বিষয়, আমরা সকলেই বাঁচিয়া রহিলাম। অতঃপর আমাদের আবাদের বেতনভোগী কুলীরা ফিরিয়া আসিয়া কার্য্যে যোগদান করিল; কিন্তু আমি আবাদের যে অংশে যাইতাম, সেই স্থানের সকল লোক সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া থাকিত, তাহা বেশ বুঝিতে পারিতাম। প্রতিদিন প্রভাতে আমাকে জীবিত দেখিয়া মজুররা বিস্মিত হইত, যেন কতকটা স্বস্তিবোধ করিত।

সেই গাছটি কাটিবার দুই সপ্তাহ পরে এক দিন আমি সারাদিনের পরিশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া সন্ধ্যার অল্পকাল পরেই শয়ন করিলাম এবং শয়নমাত্র নিদ্রাভিভূত হইলাম। কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম, তাহা স্মরণ নাই; কিন্তু কি একটা শব্দ শুনিয়া হঠাৎ আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। যেন একই শব্দ পুনঃ পুনঃ কর্ণগোচর হইতেছিল। কিছু কাল কাণ পাতিয়া শুনিয়া তাহা স্যাকরা পাখীর 'ঠক্-ঠক্' শব্দ বলিয়া বুঝিতে পারিলাম। অরণ্যের নানা প্রাণীর মিশ্র ধ্বনির সহিত মিশিয়া সেই শব্দ আমার শ্রবণবিবরে প্রবেশ করিতে লাগিল।

আমি উঠিয়া বসিলাম। ইচ্ছা হইল, একবার বাহিরে

গা চারিদিক দেখিয়া আসি; কিন্তু এতই ঘুম আসিল যে, শয্যাত্যাগ করিতে পারিলাম না। আমার পিস্তলটা হাতের কাছেই থাকিত; কিছু আশঙ্কার কারণ ছিল না। এ দেশের লোক এতই নিরীহ যে, তাহারা চুরি করিবার উদ্দেশ্যে কাহারও গৃহে প্রবেশ করিত না। সুতরাং আমি বালিসে মাথা দিয়া শুইয়া পড়িলাম। বোধ হয়, পুনর্ব্বার ঘুমাইয়া পড়িলাম।

কিন্তু কতক্ষণ আমি সুপ্তিঘোরে আচ্ছন্ন ছিলাম, বলিতে পারি না। হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইলে বুঝিতে পারিলাম, কোন একটা অস্বাভাবিক ব্যাপারে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে।

আমি হাত বাড়াইয়া ম্যাচ জ্বালিবার চেষ্টা করিলাম; কিন্তু হাত নড়াইতে পারিলাম না! এ কি ব্যাপার? ভয় পাইয়া আমি উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু বালিস হইতে মাথা তুলিবার শক্তি হইল না! একটা সুমিষ্ট উগ্র গন্ধ আমার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিতে লাগিল, এবং ক্রমশঃ তাহার উগ্রতা বর্দ্ধিত হইল। আমি আতঙ্কে বিহ্বল হইয়া আর্ত্তনাদ করিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু আমার গলা হইতে কোন শব্দ বাহির হইল না। আমি তখন বুঝিতে পারিলাম, আমার সর্ব্বাঙ্গ অসাড় হইয়াছে এবং বাক্‌শক্তিও রহিত হইয়াছে। আমি ভয়ে অভিভূত হইলাম।

জানি না, কতক্ষণ আমি সেই অবস্থায় পড়িয়া ছিলাম; কিন্তু প্রতি মিনিটেই আমার চেতনা বিলুপ্ত হইতেছিল, তাহা বুঝিতে পারিলাম। আমার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইবার পূর্ব্বমুহূর্ত্তে একটা আলো আমার চক্ষুর সম্মুখে যেন নাচিতে লাগিল। সেই সময় সেই কক্ষের দ্বার ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হইল, এবং দ্বারের নিকট বাদামী রঙের একখানি ছোট হাত দেখিতে পাইলাম; হাতখানি লোমরাশি দ্বারা আবৃত। মুহূর্ত্ত পরে সমগ্র বাহু আমার দৃষ্টিগোচর হইল।

দ্বার খুলিবার সঙ্গে সঙ্গে আমার আড়ষ্ট পেশী-সমূহে যেন একটা ধাক্কা লাগিল; সেই ধাক্কায় আমার মাথা ঘুরাইবার সামর্থ্য হইল; মাথা ঘুরাইবামাত্র একটি খর্ব্বাকৃতি মূর্ত্তিকে সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিলাম। তাহার হাতে একটি জ্বলন্ত মশাল! প্রথমে আমার মনে হইল—সেটা বানর। কিন্তু দ্বিতীয়বার চাহিয়া, তাহার হাত-পা দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, আগন্তুকটি মানুষ। সেই বামনটি চতুর্দ্দিকে চঞ্চল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দ্বারের বাহিরের কাহাকে কি ইঙ্গিত করিল। তাহা দেখিয়া আমি নড়িবার ও চীৎকার করিবার চেষ্টা করিলাম, কারণ, ভয়ে আমার রক্ত জমিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল।

কিন্তু আমার মুখ দিয়া কোন শব্দ বাহির হইল না এবং কোন অঙ্গ নড়াইতে পারিলাম না; তখনও তাহা পূর্ব্ববৎ অসাড়।

সেই পীতবর্ণ বামনটি আমার শয্যাপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল। সে গম্ভীরভাবে আমার দিকে নির্নিমেষ-নেত্রে চাহিয়া রহিল। মশালের আলো তাহার মুখের উপর নৃত্য করিতে লাগিল; সেই আলোকে তাহার মুখের হিংস্রভাব যেন বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। সেই কয়েক মিনিট সময় কয়েক ঘণ্টার মত দীর্ঘ মনে হইল। সেই সময় আমি কাহারও খালি পায়ের শব্দ শুনিতে পাইলাম, সঙ্গে সঙ্গে অবিকল ঐ রকম আর একটা বামন আসিয়া প্রথমটির সহিত যোগদান করিল। মুহূর্ত্ত পরে সেই স্থানে তৃতীয় বামনের আবির্ভাব হইল!

তাহারা একত্রে মিলিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু তাহারা আমার অসহায় অবস্থা লক্ষ্য করিতেছিল, কি, যে ব্যক্তির সন্ধানে আসিয়াছিল—আমি ঠিক সেই লোক কি না, তাহাই পরীক্ষা করিতেছিল, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক, তাহাদের উদ্দেশ্য যাহাই থাক, তাহারা একযোগে আমার শয্যাপ্রান্ত হইতে কিঞ্চিৎ দূরে চলিয়া গেল এবং অস্ফুটস্বরে কি পরামর্শ করিতে লাগিল।

আমার মানসিক জড়তা তখন অনেকটা হ্রাস হওয়ায় আমি পূর্ব্বাপেক্ষা প্রকৃতিস্থ হইয়াছিলাম। আমার আশা হইল, আমি কয়েক মুহূর্ত্তমধ্যেই পিস্তল ব্যবহার করিবার উপযুক্ত বল লাভ করিতে পারিব, এবং চীৎকার করিয়া বাড়ীর সকলকে জাগাইতেও পারিব। কিন্তু আমি ঐরূপ কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বেই সেই পীতবর্ণ বামনগুলার একটা সেই ঘর হইতে বাহিরে চলিয়া গেল। এক মিনিট পরেই সেই সুমিষ্ট উগ্র গন্ধ পুনর্ব্বার আমার নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইল। আমার চেতনাও ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া আসিল।

অন্য বামন দুটি বসিয়াছিল, তাহারা উঠিয়া দাঁড়াইয়া নিষ্ঠুর দৃষ্টিতে কটমট করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। আমিও তাহাদের সহিত দৃষ্টি-বিনিময়ের চেষ্টা করিলাম, কিন্তু আমার চোখের পাতা বুজিয়া আসিল। আমি যথাসাধ্য চেষ্টায় চক্ষু মেলিয়া দেখিতে পাইলাম—প্রথম বামনটা আমার পরিচ্ছদের আলমারির সম্মুখস্থ পর্দ্দায় অগ্নিসংযোগ করিল! সেই আগুনে আমার ঘরের বাঁশের দেওয়াল ধরিয়া উঠিল। শুষ্ক বাঁশের বাখারীতে আগুন লাগায় ফট ফট শব্দ হইতে লাগিল। সেই অগ্নিরাশির দীর্ঘ শিখা অবশেষে ঘরের মটকা পর্য্যন্ত প্রসারিত হইল। আমি চীৎকার করিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু হায়, বৃথা

ধীরে ধীরে মুক্ত দ্বারপথে একখানি লোমশ বাহু দেখা গেল

...! আমার মস্তিষ্ক যেন ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল। তাহার পর কি হইল, স্মরণ নাই।

প্রত্যূষে আমার চেতনাসঞ্চার হইল। চাহিয়া দেখি, আমি আমার ঘরের সম্মুখে ঘাসের উপর পড়িয়া আছি! মস্তিষ্কে অসহ্য বেদনা। আমি অতি কষ্টে মাথা ফিরাইয়া আমার চাকরটাকে এই ঘরের সম্মুখস্থ সোপানে বসিয়া থাকিতে দেখিলাম। আমাকে নড়িতে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি আমার নিকট উপস্থিত হইলে আমি ক্ষীণস্বরে সকল ঘটনার কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম।

সে আমাকে যাহা বলিল, তাহার মর্ম্মার্থ এই যে, রাত্রি তিনটার সময় হঠাৎ তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইলে সে আগুনের গন্ধ পায়। বাহিরে আসিয়া সে দেখিতে পায়, আমার ঘরের ভিতর হইতে আগুনের হল্কা বাহির হইতেছিল। সৌভাগ্যবশতঃ সে হতবুদ্ধি না হইয়া আমার আগুন নিবাইবার কলের সাহায্যে সেই আগুন নিবাইতে পারিয়াছিল। তাহার পর সে আমাকে ঘরের বাহিরে লইয়া গিয়াছিল, বাড়ীর অন্যান্য অংশেও আগুন লাগিয়াছে ভাবিয়া সে অত্যন্ত ভীত হইয়াছিল।

সে আমাকে বলিল, 'কিন্তু তাহারা তুয়ানের টাকাকড়ি লইতে পারে নাই; আমি পূর্ব্বেই তাহা ভাল যায়গায় সরাইয়া রাখিয়াছিলাম।'

আমি অস্ফুট স্বরে বলিলাম, 'তাহারা কাহারা? কাহারা আসিয়াছিল?'

ভৃত্য বলিল, 'আবার কাহারা? যাহারা ঘরের বেড়া ফুটা করিয়া কচুবং (ধুতুরাজাতীয়) ফুলের গুঁড়া ঘরের ভিতর চালান করিয়াছিল।'

আমি তাহার কথা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া বলিলাম, 'ঘরের ভিতর কি চালান করিয়াছিল বলিলে?'

ভৃত্য বলিল, 'কচুবং ফুলের গুঁড়া। তাহা ঘরের ভিতর উড়াইয়া দিলে তাহার গন্ধে নিদ্রিত ব্যক্তি অসাড় হইয়া পড়ে, তখন চোর নির্ব্বিঘ্নে চুরি করিতে পারে। তুয়ানকে মৃতবৎ পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াই আমি প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারিলাম। বদমায়েসগুলা আমার সাড়া পাইয়া মশাল ফেলিয়া তাড়াতাড়ি পলায়ন করায় তাহাদের মশালের আগুনে ঘর জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। আমি তাড়াতাড়ি না আসিলে কর্ত্তাকে পুড়িয়া মরিতে হইত।'

সে আমাকে ঘাড়ে করিয়া বাহিরে লইয়া গেল

আমি বলিলাম, 'আমাকে খানিক কফি তৈয়ারী করিয়া দাও।'

সে কফি আনিয়া দিলে আমি তাহা পান করিয়া তাহাকে বলিলাম, 'যে চোরগুলা আমার ঘরে বিষাক্ত ফুলের গুঁড়া উড়াইয়া দিয়াছিল, তাহারা কি ভিন্ন জাতীয় লোক?'

ভৃত্য বলিল, 'না, তুয়ান, সকল চোরই যে এই বিষ ব্যবহার করে, এরূপ নহে; তবে অনেকে ইহা ব্যবহার করে, কারণ, ইহাতে মানুষ নেশায় বেহুঁস হইলেও মারা পড়ে না। মানুষ ঘুমাইয়া থাকিলে এই গুঁড়া উড়াইয়া কিরূপে তাহাকে অজ্ঞান

করিতে হয়, তাহা প্রায় সকল জাভানী চোরেরই জানা আছে।'

আমি তাহাকে বলিলাম, 'কিন্তু কাল রাত্রে যাহারা আমার ঘরে আসিয়াছিল, তাহারা জাভানী নহে; এই জেলার লোক ত নহেই। তাহারা বামন, দেখিতে ছোট ছেলের মত, আর বানরের মত তাহাদের চেহারা।'

আমার কথা শুনিয়া আমার ভৃত্য সবিস্ময়ে আমার মুখের দিকে চাহিল, তাহার চক্ষুতে কৌতূহল পরিস্ফুট; কিন্তু সেই ভাব মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হইল। সে মাথা নাড়িয়া বলিল, 'জাভায় ত সে রকম লোক নাই!'

ইহার পর আমি তাহাকে অন্য কোন কথা জিজ্ঞাসা করি নাই; আমার আততায়িগণের কোন সন্ধান পাই নাই।

আমি সেই বিষাক্ত পুষ্প ও তাহার ব্যবহার সম্বন্ধে সকল তথ্যই সংগ্রহ করিয়াছিলাম, কিন্তু সেই রাত্রিতে আমি যে অদ্ভুতাকৃতি বামনগুলাকে আমার শয়নকক্ষে বিচরণ করিতে দেখিয়াছিলাম, অন্যান্য রবার-ক্ষেত্রের সাহেবরা তাহাদের কথা শুনিয়া আমার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিয়াছিলেন, ঐরূপ লোক নাই। যদি আমার ঘরে আগুন না লাগিত এবং আমার স্নায়ুর ঐ প্রকার অবসাদ না ঘটিত, তাহা হইলে সমুদয় ব্যাপার স্বপ্ন বলিয়াই আমার ধারণা হইত।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা স্বপ্ন নহে; আমি জানি, উহা সত্য, স্থানীয় অধিবাসীরাও উহা সত্য বলিয়াই বিশ্বাস করে; এবং আমারও মনে হইত, ঐ বাদামী বামনগুলা অস্তিত্ব আমার অজ্ঞাত থাকিলেও আমি ভূতুড়ে গাছটা কাটাইয়াছি, এই অপরাধে এক দিন তাহারা আমাকে হত্যা করিয়া প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করিবে।"

লেখক রবার-ক্ষেত্রের অধ্যক্ষের এই অদ্ভুত কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া বিষাক্ত ধুতুরা-পুষ্পের বিশেষত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "সণ্ডানীরা এই ফুলগুলিকে 'কেৎজোয়ে বোয়েং' বলে। কাহাকেও অবশাঙ্গ করিতে হইলে স্থানীয় লোকরা ইহার সাহায্য গ্রহণ করে। ইহার প্রয়োগে সর্ব্বাঙ্গ অসাড় হইলেও চেতনা বিলুপ্ত হয় না। আমি আর এক জন লোকের কথা জানি, তিনি যখন আফিসে বসিয়াছিলেন, সেই সময় এই বিষপ্রয়োগে তস্করর। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ এরূপ অসাড় করিয়াছিল যে, তাহারা তাঁহার চাবি লইয়া তাঁহার চক্ষুর উপর তাঁহার আফিসের সিন্দুক খুলিয়া সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহাদের কার্য্যে বাধা দিতে পারেন নাই!"

আমাদের বঙ্গদেশের পল্লী অঞ্চলেও প্রবাদ আছে, অনেক চোর রাত্রিকালে গৃহস্থের গৃহে প্রবেশ করিয়া গৃহস্বামীকে 'নিদেন' দিয়া অর্থাৎ নিদ্রাভিভূত করিয়া তাহার সর্ব্বস্ব অপহরণ করে। সাধারণের বিশ্বাস, তাহারা মন্ত্রবলে এই কার্য্য করিয়া থাকে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহারা দ্রব্যগুণে গৃহস্বামীকে নিদ্রাভিভূত করে কি না, তাহা পরীক্ষার বিষয়।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

কেন?

ওরে আমার মন রে আমার ও খেয়ালী মন,
না পারি হায় বুঝতে তোরে ক'রেও প্রাণপণ।
চাইলি না তুই জগৎ পানে,
রইলি মেতে কেবল গানে,
দিনে দিনে পর হ'ল তোর যতেক পরিজন,
কেন রে তুই সব-খোয়ান করলি এ সাধন?
এই দুনিয়ার হাট-বাজারে,
রইলি রে তুই একটি ধারে,
জান্‌ল না কেউ চিন্‌ল না কেউ রইলি সঙ্গোপন,
গান গেয়ে তুই দিন কাটাবি এই কি রে তোর পণ?
করলি না কাজ দেখলি স্বপন,
এম্‌নি ক'রেই কাটল জীবন,
এই দুনিয়ায় এলি কেন কিসের প্রয়োজন,
এমনি ক'রেই হবে কি তোর জীবন সমাপন?

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

নারায়ণীর অদৃষ্ট

১

[illegible] কারবারে প্রতাপ গাঙ্গুলী সর্ব্বস্বান্ত হইলে, কাশীর সকল সমাজেই বেশ একটু চাঞ্চল্য দেখা গেল। এই ব্যবসায়সূত্রে সুসময়ে গাঙ্গুলী মহাশয় বাঙ্গালী অ-বাঙ্গালী সকল সমাজেরই সংস্পর্শে আসিয়া নানা অনুষ্ঠানে যে বদান্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ করিয়া গুণগ্রাহিগণ তাঁহার পতনে ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হইলেন। আবার ব্যবসায়সূত্রে যাঁহারা তাঁহার প্রতিষ্ঠায় ঈর্ষা করিতেন, তাঁহারা গাঙ্গুলী মহাশয়ের সর্ব্বস্বনাশে স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

অথচ গাঙ্গুলী মহাশয় সকল ব্যাপারেই ব্যয়বাহুল্যে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার নির্ম্মল মনটির কোনখানেই অহঙ্কারের ছায়ামাত্র পড়িত না। এ কথা সকলে জানিলেও দুর্দ্দিনে এ অপবাদ হইতে তিনি মুক্তি পাইলেন না।

সুসময়ে গাঙ্গুলী মহাশয়ের বন্ধুধুরন্ধরদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন—প্রাণকৃষ্ণ মজুমদার মহাশয়। ইনি শুধু টাকার কুমীর ছিলেন না, বুদ্ধিরও ছিলেন—মানোয়ারী জাহাজ! গৃহীর অলক্ষ্যে ঊর্ণনাভ যেমন ঘরের চারিধারে জাল পাতে, ইনিও তেমনই গাঙ্গুলী মহাশয়ের অলক্ষ্যে তাঁহার ব্যবসায়টির উপর নিপুণভাবে বুদ্ধির জাল অনেক দিন ধরিয়াই পাতিতেছিলেন। যে দিন গাঙ্গুলী মহাশয় সহসা তাহার সন্ধান পাইলেন, তখন আর মুক্তিলাভের তাঁহার কোনও উপায় ছিল না—তিনি নিজেই সেই জালে জড়াইয়া পড়িলেন এবং অবশেষে ব্যবসায়টি তাঁহার সুহৃদ্‌রূপী সেই মজুমদার-কুম্ভীর মহাশয়ের জঠরে সমর্পণ করিয়া কোনওরূপে রক্ষা পাইলেন।

গাঙ্গুলী মহাশয়ের সত্যরূপী সুহৃদ্ ছিল, তাঁহার প্রতিবেশী নিরক্ষর কাহার, গোয়ালা, জোলা প্রভৃতি অন্ত্যজ সমাজ। আপদে-বিপদে গাঙ্গুলী মহাশয় এই সমাজের সহিত অসঙ্কোচে [illegible]তেন, তাহাদের কাযকর্ম্মে নিজের পরিবারবর্গকেও দেখা-শুনা [illegible] পাঠাইতেন। তাঁহার এই সহৃদয়তা ও উদারতা সম্বন্ধে [illegible]কেই অপ্রকাশ্যে ঘোঁট পাকাইলেও, ইন্ধনের অভাবে তাহা [illegible] বা সাফল্যমণ্ডিত হইত না। কেন না, তখন গাঙ্গুলী মহাশয়ের সুসময়,—লোকবল, অর্থবল, মিত্রবল অপরিমেয়। তাঁহার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে তর্জ্জনী তুলিবার সামর্থ্য তাঁহার শত্রুদেরও ছিল না।

গাঙ্গুলী মহাশয়ের এই বিপদ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ব্যথা দিল তাঁহার গুণমুগ্ধ এই সকল কাহার, গোয়ালা ও জোলার নির্ম্মল অন্তরে। তাহারা হাহাকার করিয়া উঠিল। ঘোট বাঁধিয়া তাহারা যেন বিশ্বনাথের সঙ্গেই যুঝিতে চায়। কি অপরাধে এমন পরোপকারী পুণ্যাত্মার সর্ব্বস্ব গেল! বিশ্বনাথের এ কি বিচার!—দেনার দায়ে গাঙ্গুলী মহাশয়ের সুসজ্জিত বাসভবন ও মূল্যবান্ আসবাবপত্র যখন নীলামে উঠিল,—তখন ইহাদের কি আক্রোশ, কি মর্ম্মভেদী উচ্ছ্বাস! দলে দলে হিন্দু-মুসলমান লাঠি হস্তে গাঙ্গুলী মহাশয়ের বাড়ী ঘিরিয়া দাঁড়াইল। হিন্দুরা বলে,—এ দেউল; মুসলমান বলে,—এ আমাদের দরগা;—গাঙ্গুলী বাবুর এ আস্তানা দখল করে কে?—তার একটি চীজ যে ছোঁবে—আমরা তার শির নেব!—সে কি সঙ্কটসঙ্কুল অবস্থা!—কোতোয়ালীতে খবর গেল, বাঙ্গালীটোলায় সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা আরম্ভ হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে অকুস্থলে লাল পাগড়ীর পল্টন ছুটিল। গাঙ্গুলী মহাশয় সমস্ত শুনিয়া তৎক্ষণাৎ দলের চৌধুরীদের ডাকাইয়া অতি কষ্টে তাহাদিগকে নিরস্ত করিলেন।—দুর্দ্দিনে যেমন এই গণ-দেবতাদের আসল রূপটি গাঙ্গুলী মহাশয় দেখিয়া বিস্ময়ানন্দে স্তব্ধ হইলেন, তেমনই তাঁহার বন্ধুরূপী পরম হিতৈষী ভদ্রাসুরদের মুখের মুখোস খুলিতে দেখিয়া মনে মনে হাসিলেন!—গাঙ্গুলী মহাশয়ের বহুমূল্যের আসবাবগুলি মাটীর দরে 'লুঠ' করিবার জন্ম তাহাদের তখন কি আকুলি-ব্যাকুলি!

সর্ব্বস্ব হারাইয়া প্রতাপ গাঙ্গুলী বাঙ্গালীটোলা হইতে বাস তুলিয়া বেনিয়া পার্কের ধারে একখানি খোলার ঘরে বাসা পাতিলেন। যে পল্লীতে তিনি আসিয়া আশ্রয় লইলেন, তাহার অধিবাসীদের অধিকাংশই মুসলমান, দুই চারি ঘর হিন্দুও ছিল; কিন্তু সকলেই প্রায় নিরক্ষর, কৃষী বা কারিকর শ্রেণীর। দুর্দ্দিনের ঘনান্ধকারে গণ-দেবতাদের যে রূপজ্যোতি তাঁহার চক্ষুর উপর প্রতিফলিত হইয়াছিল, তাহা তিনি ভুলিতে পারেন নাই, তাই চিরপরিচিত বরেণ্য ভদ্রপল্লীর মোহ কাটাইয়া নগণ্য গণদেবতাদের মধ্যেই আশ্রয় লইতে মনে তাঁহার কিছুমাত্র দ্বিধা বা সঙ্কোচ বোধ হয় নাই।

ব্যবসায়সূত্রে এই দরিদ্র-পল্লীর গোয়ালাদের চৌধুরী ভজুল এবং মুসলমান মিস্ত্রীদের মুরুব্বী আবদুল গাঙ্গুলী মহাশয়ের বিশেষ অনুগত ছিল। ইহাদেরই সহায়তায় তিনি বাসস্থান সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং নূতন বাসায় অপরিচিত পল্লীতে আসিয়া কোন বিষয়েই যে তাঁহাকে অসুবিধা ভোগ

করিতে হয় নাই, তাহার মূলেও ইহাদের আন্তরিক চেষ্টা, যত্ন ও সহযোগিতা। ফলতঃ গাঙ্গুলী মহাশয়ের এই ভাগ্যপরিবর্ত্তনে—অসঙ্কোচে সর্ব্বস্বুখী গাঙ্গুলী পরিবারকে এ ভাবে দারিদ্র্যকে বরণ করিতে দেখিয়া, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবসায়ীদের অন্তরও আর্দ্র হইয়া গেল,—আর গুণমুগ্ধ প্রকৃত সুহৃদ্গণ—যাঁহারা অন্তরঙ্গরূপে না মিশিয়াও তফাতে থাকিয়াই বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতেন, তাঁহারা প্রতাপ গাঙ্গুলীর এই শোচনীয় পরিণামে হায় হায় করিয়া উঠিলেন। খোলার ঘরে আসিয়া তাঁহাদের অনেকেই সমবেদনা জানাইয়া গেলেন। গাঙ্গুলী মহাশয় এত দিনে এই 'আড়-আড়-ছাড়-ছাড় ভাবাপন্ন' বন্ধুদের চিনিলেন।—আবার বিশ্বনিন্দুক যাহারা, তাহারা গাঙ্গুলী মহাশয়ের এই নূতন বাসা-নির্ব্বাচনের ছিদ্র ধরিয়া তখনও অসঙ্কোচে যত্রতত্র বলিয়া বেড়াইতেছিল,—"যে যা চায়, সে তা পায়, গাঙ্গুলীরও হ'ল শেষে তাই! একবারে ভাটপাড়ায় গিয়ে বাসা বেঁধেছেন! যাদুধন এর মজা শীঘ্রই দেখতে পাবেন,—তখন ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি—ডাক ছাড়তে হবে!'—ফলতঃ, পাড়ায় বসিয়া বাঙ্গালী পরিবারের দুর্দ্দশার জীবনযাত্রাটা দেখিবার সুযোগটি দূরে সরিয়া গেল—ইহাই তাহাদের মনস্তাপের মূল তথ্য!

২

প্রথম প্রথম খোলার ঘরে গাঙ্গুলী মহাশয় ও তাঁহার চির-সুখে প্রতিপালিত পরিবারবর্গের কষ্ট যে খুবই হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু অসাধারণ ধৈর্য্যশীল গাঙ্গুলী মহাশয় ও তাঁহার আদর্শ সহধর্ম্মিণী নারায়ণীর ঐশ্বর্য্যে যেমন বিলাস ছিল, দারিদ্র্যেও তেমনই বিরাগ আসে নাই। তবে ছেলে-মেয়েগুলি ত কখনও দুঃখের মুখ দেখে নাই, দারিদ্র্য যে কি, তাহার পরিচয়ও কখন পায় নাই, তাহারা জানে, খোলার ঘরে যাহারা থাকে, তাহারা গরীব, তাহারা ভাল জিনিষ খাইতে পায় না, তাহাদের ছেলে-মেয়েরা ভাল কাপড়-জামা পায় না, তাই তাহাদের মা-বাপ পার্ব্বণের সময় পাড়ার গরীবদের ভাল করিয়া খাওয়াইতেন, ছেলে-মেয়েদের কত কি পোষাক দিতেন!—শেষে যখন তাহারাই বাপ-মা'র সঙ্গে খোলার ঘরে আসিয়া উঠিল, তাহাদের দামী জিনিষগুলি অপরে লইয়া গেল,—শুধু কিছু কাপড়-চোপড়, বিছানা আর খানকতক বাসন তাহাদের সঙ্গে আসিল, তখন তাহারা নিজেরাই পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল,—"আমাদের কি হয়েছে ভাই?"—যেটি বয়সে একটু বড়, সে সুন্দর মুখখানি ম্লান করিয়া বলিল,—"জানিস না, আমরা যে এখন গরীব হয়ে গেছি, তাই না খোলার ঘরে এসে উঠেছি।" শুনিয়া সবারই মুখ শুকাইয়া গেল। মনে মনে সকলেই ভাবিল—কেন আমরা গরীব হয়ে গেলুম? আমাদের সে বাড়ী কি হ'ল? অত লোকজন, গাড়ী-ঘোড়া, তারা সব কোথায় গেল?—খেলিতে গিয়া খেলার উপযুক্ত যায়গা না পাইয়া ছেলেরা বাবার কাছে আসিয়া নালিশ করিল, "আমরা কোথায় খেলব, বাবা! এ বাড়ীতে না আছে ছাদ, না আছে দালান, উঠান পর্য্যন্ত নেই—কি ক'রে খেলি বল ত?"

গাঙ্গুলী মহাশয় শিশুদের বুকে টানিয়া আনিয়া বলিলেন,—"কেন বাবা, সামনে অত বড় মাঠ রয়েছে, দেখতে পাচ্ছ না?—ঐখানে গিয়ে খেলবে তোমরা।"

উল্লাসভরে ছেলেরা বলিল,—"ও ত কোম্পানীর বাগান বাবা—ওখানে গিয়ে খেলব আমরা?"—পিতার সম্মতি পাইয়া আনন্দে করতালি দিয়া কোলাহল করিতে করিতে তাহারা ছুটিয়া গেল।—মুগ্ধনয়নে সেই দিকে গাঙ্গুলী মহাশয় চাহিয়া রহিলেন—অতীতের কত স্মৃতিই তাঁহার মানসপটে তখন ছায়া-চিত্রের মত উঠিয়া তাঁহাকে অভিভূত করিল।

গাঙ্গুলীর সর্ব্বস্ব গ্রাস করিয়াও টাকার কুমীর প্রাণকৃষ্ণ মজুমদারের মনস্কামনা সিদ্ধ হয় নাই। জীবনসংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে দলিতদেহ প্রতাপ গাঙ্গুলীর শোচনীয় অবস্থার পরিচয় পাইয়াও মজুমদারের মনে কিছুমাত্র সহানুভূতি আসে নাই—বরং গাঙ্গুলী পরিবারের উপর তাহার আক্রোশ ও বিদ্বেষ উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিতেছিল।

গাঙ্গুলীর সর্ব্বস্ব গ্রাস করিবার পর মজুমদার দেখিল, গাঙ্গুলীর গুণমুগ্ধের দল তাহাকে এক রকম 'বয়কট' করিয়া বসিয়াছে। গাঙ্গুলীর যাহারা শত্রু ছিল বা যাহারা কারণে অকারণে গাঙ্গুলীর নিন্দা করিত, তাহারাও এখন মজুমদারের নিন্দায় শতমুখ হইয়াছে। গাঙ্গুলীর ঘৃতের কারবারটি আশ্রয় করিয়া অনেকগুলি লোক অন্নসংস্থান করিতেছিল, মজুমদার সেই কারবারের মালিক হইয়াই পুরাতন সকলকেই বরখাস্ত করিয়া নিজে, ছেলে ও বাড়ীর একটি চাকরকে লইয়া কারবার চালাইতে লাগিল। নিন্দুকরা দোকানের সম্মুখে আসিয়াই বলিতে লাগিল,—"ধর্ম্ম সইবেন না মজুমদার, এটা মনে রেখ।—দাতা ভোক্তা ব্রাহ্মণকে পথে বসিয়েছ,—এ শুধু প্রতাপ গাঙ্গুলীর টাট নয়,—তার ব্রহ্ম-রক্ত এখানে আছে। সহ্য হবে না বাবা।"—মজুমদার ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া পুলিস ডাকিয়া নিন্দুকদের তাড়াইবার চেষ্টা করিল, ফলে এই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গটি আরও প্রবল হইবার সুযোগ পাইল।—ইহার ফলে, মজুমদারের নিষ্ফল আক্রোশ নিরীহ নিরপরাধ নিত্য অভাবগ্রস্ত গাঙ্গুলীর উপর গিয়া পুঞ্জীভূত হইল

শুধু গাঙ্গুলী কেন, তাঁহার পরিবারবর্গ পর্য্যন্ত মজুমদারের আক্রোশের 'হেতু' হইয়া পড়িয়াছিল এবং ইহার মূলতত্ত্বটুকু আবিষ্কার করিতে গেলে, গাঙ্গুলী মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী নারায়ণীর প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। আমাদের সমাজে অধিকাংশ মেয়েরই মনে একটা বড় রকমের দুর্ব্বলতা দেখা যায়। এই দুর্ব্বলতাটুকু নানাভাবেই তাঁহাদের মনের ভাবধারাকে সঙ্কুচিত করিয়া দেয়। এই দুর্ব্বলতা আর কিছু নহে, চক্ষুলজ্জা বা উচিত কথা বলিতে কুণ্ঠা। নারায়ণীর এই দুর্ব্বলতা মোটেই ছিল না,—স্পষ্ট কথা শুনিতে সে যেমন ভালবাসিত, প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে অনুচিত হইলেও তেমনই স্পষ্ট উচিত কথা শুনাইতে লজ্জা পাইত না, এবং তজ্জন্য স্থানকাল বা পাত্র-পাত্রীর দিকে দৃক্‌পাতও করিত না। বিদ্যার অতিবিদ্যা যেমন গুণ হইয়াও দোষে দাঁড়াইয়াছিল, নারায়ণীর এই স্পষ্টবাদিতাও শেষে তাহার পক্ষে একটা রূঢ় অপবাদের—কাহারও কাহারও কাছে আলোচনার বস্তু হইয়া পড়িয়াছিল। নানাজনে নানাভাবে তাহার আলোচনা করিত, কেহ বলিত অহঙ্কার, কাহারও মতে তেজ, কেহ কেহ বলিত, ওটা বড়মানুষী চাল। এই রকম নানা জনে নানা কথা বলিত, কথাগুলি অলঙ্কৃত হইয়া নারায়ণীর কাণে আসিয়াও উঠিত, কিন্তু স্পষ্ট কথা শুনাইতে যেমন সে দৃক্‌পাত করিত না, তাহার অসাক্ষাতে তাহার সম্বন্ধে আলোচনাও তেমনই গ্রাহ্যের মধ্যে আনিত না।

৩

একবার কাশিমপুরের রাজনন্দিনী মেয়েদের একটি প্রীতিভোজ দেন। অনেকেই তাহাতে নিমন্ত্রিতা হয় ও রাজনন্দিনী স্বয়ং বাড়ী বাড়ী গিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া আসেন। নারায়ণী রাজবাড়ীতে গিয়া দেখিল, লম্বা দরদালানে মেয়েদের খাইবার যায়গা হইয়াছে, দুই সারির সমস্ত আসনে মেয়েরা বসিয়া পড়িয়াছে, স্থানাভাবে দশ বারোটি মেয়ে হলঘরের দ্বারটির কাছে দাঁড়াইয়া আছে, আর কাশীর একটি সর্ব্বচিন্ চেড়ীবিশেষ প্রৌঢ়া নারী—সেই দ্বারটি আগুলিয়া তখন বলিতেছিল,—"একটু দাঁড়াও বাছারা, ও দিকের দালানে তোমাদের পাতা হচ্ছে।"

নারায়ণীকে দেখিবামাত্র প্রৌঢ়াটি তাহাকে সাদরে আহ্বান করিয়া হলের মধ্যে যাইবার পথ দিল। তথায় আসিয়া নারায়ণী দেখিল, অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়েদের জন্য সেখানে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হইয়াছে, রাজনন্দিনী যত্ন করিয়া স্বয়ং তাহাদের খাইতেছেন। নারায়ণীও তাঁহার সেই যত্ন হইতে বঞ্চিত হইল না।

কিন্তু আসনে বসিয়া নারায়ণী যখন দেখিল, সে ঘরে অনেকগুলি আসন খালি থাকা সত্বেও, বাহিরে অতগুলি মেয়েকে বৃথা দাঁড় করাইয়া রাখা হইয়াছে এবং দরজায় পাহারার ব্যবস্থা,—তখন নিমন্ত্রিতাদের মধ্যে যে একটা রীতিমত পার্থক্যের সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। অথচ সে দেখিয়াছিল, বাহিরে যাহারা দাঁড়াইয়া আছে, গরীব হইলেও, তাহাদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েও কয়েক জন রহিয়াছে।—বাহিরের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিয়া নারায়ণী তৎক্ষণাৎ আসন হইতে উঠিয়া পড়িল। রাজনন্দিনী ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন,—"কি হ'ল ভাই, আপনি উঠ্‌ছেন কেন?"

নারায়ণী হাসিয়া বলিল,—"উঠছি এই জন্যে রাজনন্দিনি, এ ঘরের যায়গা যখন শুধু বড় লোকের মেয়েদের জন্যে, আর বাইরের দালান গরীবদের, তখন আমাকেও ঐখানে গিয়ে বসতে হবে, কেন না, আমিও গরীবের মেয়ে।"

ঘরশুদ্ধ সমস্ত মেয়ে একবারে স্তব্ধ! রাজনন্দিনী অপ্রতিভের মত বলিলেন,—"আমি ত পার্থক্যের কোন ব্যবস্থা করিনি, সকলকেই আমি নিমন্ত্রণ ক'রে এনেছি, সবাই আমার কাছে সমান—"

নারায়ণী তাহার বড় বড় উজ্জ্বল চক্ষু দুইটি রাজকন্যার নিষ্প্রভ চক্ষুর উপর তুলিয়া অসঙ্কোচে বলিল,—"আপনার কথা শুনে যেমন আনন্দ পাচ্ছি, কাযের ব্যবস্থা দেখে তেমনই লজ্জা আসছে। আপনি নিজে বাড়ী বাড়ী গিয়ে নিমন্ত্রণ করেছেন ব'লে আমরা সকলেই এসেছি, কিন্তু বাড়ীতে ডেকে এনে এ অপমান করা কেন? সবাই আপনার কাছে যদি সমান, ঘরের বাইরে ওঁরা যায়গা না পেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন, অথচ এ ঘরে এতগুলো আসন খালি প'ড়ে রয়েছে!"

দুই চক্ষু নত করিয়া অপরাধিনীর মত রাজনন্দিনী নারায়ণীর হাত দুটি ধরিয়া বলিলেন,—"সত্যই আমার অপরাধ হয়েছে, দিদি, আমাকে আপনি ক্ষমা করুন, আপনি বসুন, আমি নিজে ওঁদের এই ঘরে এনে বসাচ্ছি।"

বাহিরে যে মেয়েগুলি দাঁড়াইয়া ছিল, রাজনন্দিনী যত্ন করিয়া তাহাদিগকে ভিতরে আনিয়া বসাইয়া দিলেন। নিজের ভুল বুঝিয়া ভয়ে ভয়ে রাজনন্দিনী খাওয়া শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত ঘরে বাহিরে সমানভাবে নিমন্ত্রিতাদের পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন।

চক্ষুলজ্জা ত্যাগ করিয়া এই যে দশের মাঝে উচিত কথা বলা, ইহা উপযুক্ত হইলেও, কতকগুলি মেয়ে নারায়ণীর এই কাণ্ডটিকে একটা 'কেলেঙ্কারী করা' বলিয়া পরে অপবাদ দিয়াছিল। সৌভাগ্য-জীবনে দশের মাঝে অসঙ্কোচে এই ভাবে

উচিত কথা শুনাইয়া নারায়ণী অনেকেরই অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল।

৪

নারায়ণীর এই সব ব্যাপারে মেয়েদের মধ্যে যাহারা ঘোঁট পাকাইত, মজুমদার-গৃহিণী নিরুপমাই ছিল তাহাদের মধ্যে প্রধান। নিরুপমা ধনীর একমাত্র কন্যা, এবং তাহাকে বিবাহ করিয়াই যে প্রাণকৃষ্ণ মজুমদার 'টাকার কুমীর' হইয়াছেন, এ কথা সাধারণে বিদিত ছিল, নিরুপমাও তজ্জন্য মনে মনে গর্ব্ব পোষণ করিত। নিরুপমার রূপ ছিল, শিক্ষা ছিল, মেয়ে-মহলে মিশিবার ক্ষমতা ছিল, আর পয়সা ত তাহার ছিলই,—তবুও সকল বিষয়েই সে যেন নিজেকে নারায়ণীর তুলনায় অনেক নিম্নে মনে করিয়া ঈর্ষায় জ্বলিত। মেয়েদের সভায় দশ জনের মাঝে গিয়া দেখিয়াছে, নারায়ণীর স্থান সবার আগে, শ্রেষ্ঠস্থান তাহার, নানা কারণে সকলেরই দৃষ্টি তাহার উপরে পড়ে। নারায়ণী কখনও সত্যাগ্রহীদের দলে মিশে নাই, পিকেটিং করিতে বাহির হয় নাই, কোন সভায় গিয়া বক্তৃতাও দেয় নাই, অথচ ইহাদের মধ্যেও নারায়ণীর প্রভাব বড় সামান্য নহে।

নিরুপমা একটু ঘটা করিয়াই ছেলের অন্নপ্রাশন দিয়াছিল। উৎসবের দিন দেউড়ীতে নহবৎ বসিয়াছিল। দিনে পুরুষদের ও রাত্রিকালে মেয়েদের প্রীতিভোজের ব্যবস্থা ছিল। নারায়ণী ছেলেমেয়েদের লইয়া যখন নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিল, তখন ছাদের উপর মেয়েরা খাওয়া আরম্ভ করিয়াছে। নিরুপমা তাড়াতাড়ি নারায়ণী ও তাহার ছেলেমেয়েদের যত্ন করিয়া ঘরে বসাইল। বলিতে লাগিল,—"দেরী ক'রে এসেছ দিদি, কত কষ্ট হবে হয় ত?"

নারায়ণী হাসিয়া উত্তর দিল,—"আমি ত পর নই, দিদি, আমার জন্য ব্যস্ত হয়ো না, তবে ছেলেদের খিদে পেয়েছে, দালানের ঐ চাতালে ওদের বরং বসিয়ে দাও।"

নিরুপমা ছুটিয়া তাহার ব্যবস্থা করিতে গেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই নারায়ণী ও তাহার ছেলেমেয়েদের পাতা পরিপূর্ণরূপে সাজাইয়া নিরুপমা বসিবার জন্য ডাকিতে আসিল। নারায়ণী একটি গিনি দিয়া নিরুপমার ছেলেটিকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ছেলে-মেয়েদের সহিত বাহিরের চাতালে আসিল। পাতে বসিয়াই নারায়ণী দেখিতে পাইল, একটি মলিনবসনা বিধবা দুটি ছোট ছোট ছেলের হাত ধরিয়া উঠানের এক ধারে ঠিক তাহার সম্মুখেই দাঁড়াইয়া আছে। নারায়ণী নিরুপমার দিকে চাহিল। নিরুপমা রূঢ়স্বরে বলিয়া উঠিল,—"তোমরা এখানে কে গা?"

মেয়েটি অতি করুণস্বরে বলিল,—"আমরা গণেশমহল্লা থেকে আসছি মা, আপনার ছেলের ভাতে খুব ঘটা হয়েছে শুনে, আমার ছেলে দুটিকে এনেছি মা,—এদের হাতে দুখানা ক'রে যদি লুচি দাও মা—অনাথা হলেও—আমি মা ব্রাহ্মণের মেয়ে—"

আগুনের উপর কে যেন ঘি ঢালিয়া দিল। বাড়ীর উঠানে ইহাদের দেখিয়াই নিরুপমা জ্বলিয়াছিল, কথা শুনিয়া এবার রাগ তাহার সপ্তমে চড়িল; তর্জ্জন করিয়া বলিল,—"আস্পর্দ্ধাও তোমার কম নয় বাছা, একেবারে বাড়ীর ভেতরে চ'ড়ে এসছ! লোকজন সব করছে কি বাইরে—একটু লক্ষ্য রাখে না কেউ! যাও এখান থেকে, বাইরে যাও—"

অভাগিনী যেন মাটীর সঙ্গে মিশিয়া গেল—লজ্জায় ও অপমানে; আর তাহার ক্ষুধাতুর ছেলে দুটির লোলুপ দৃষ্টি নারায়ণী ও তাহার ছেলে-মেয়েদের লুচি ও নানাবিধ মিষ্টান্নপূর্ণ সাজান পাতাগুলির উপর পড়িয়াছিল!—সে দৃশ্য দেখিয়া নারায়ণীর নারী-হৃদয় আর্ত্ত হইয়া উঠিল। স্থান-কাল-পাত্র ভুলিয়া নিজের সাজান পাতখানি আস্তে আস্তে তুলিয়া বিধবাকে বলিল,—"ধর ত মা, আঁচলখানা না হয় পাত।"

বিধবা অবাক্ হইয়া হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল, তাহার নড়িবার সামর্থ্যটুকুও সে তখন হারাইয়াছিল। নারায়ণী তখন নিজে উঠিয়া তাহার আঁচলখানি টানিয়া খাবারগুলি বাঁধিয়া দিতে দিতে গাঢ়স্বরে বলিল,—"যাও মা, বাড়ীতে গিয়ে ছেলে দুটিকে খাওয়াও গে!"—অপমানের সকল জ্বালা ভুলিয়া—দুটি বিস্ফারিত নেত্রে নারায়ণীর উজ্জ্বল মুখখানির দিকে চাহিতে চাহিতে ছেলে দুটির হাত ধরিয়া বিধবা চলিয়া গেল।

নিরুপমা তখন কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহারা চলিয়া গেলে সে একটু অস্বাভাবিক স্বরেই বলিল,—"কাযটা কি রকম হ'ল, দিদি?"

নারায়ণী সহজভাবেই উত্তর দিল,—"তোমার ছেলের কল্যাণ করা হ'ল, দিদি! ভগবান্ নিজের হাতে ত খান না, গরীবের ছেলেদের মুখেই তিনি খান। খোকার অন্নপ্রাশন এইখানেই সার্থক হ'ল, দিদি।"

নিরুপমা একটু উষ্ণ হইয়াই বলিল,—"গরীবের ছেলেদের মুখে দেবার মত সামর্থ্য যদি আমার না থাকে?"

নারায়ণী হাসিয়া উত্তর দিল,—"তা হ'লে এত ঘটা ক'রে দরজায় ন'বৎ বসিয়েছ কেন, দিদি? আমরা পাড়াগাঁয়ের মেয়ে হলেও, ছেলেবেলা থেকেই শুনে এসেছি, কাযকর্ম্মে ন'বৎ বসালে বা সামাজিক দিলে, আহূত অনাহূত সকলকে পেটপুরে খেতে দিতে হয়। কাউকে ফেরাতে নেই।"

অন্তরের অসহ্য ক্রোধ কোনরকমে দমন করিয়া, কথার পর আর কথা না বাড়াইয়া, নিরুপমা বলিল,—"আমি যে ওদের খেতে দিতুম না, তা নয়, তবে একেবারে লোকের খাবার মুখের ওপর এসে দাঁড়িয়েছিল বলেই—সে যা হোক, তুমি ভালই করেছ বোন্,—তোমার খাবার আবার এনে দিই, তুমি খেতে ব'স,—ছেলেরাও হাত গুটিয়ে ব'সে আছে !"

ছেলেমেয়েরা মায়ের প্রকৃতি চিনিত। অমন ব্যাপারটি দেখিয়া তাহারা খাবারের একটি কণাও মুখে তুলে নাই ; মা'র মুখখানির দিকে চাহিয়া চুপটি করিয়া সকলেই বসিয়াছিল।

নারায়ণী বাধা দিয়া হাসিয়া বলিল,—"ছেলেদের আমি ব'সে ব'সে খাওয়াচ্ছি দিদি, আমার জন্যে তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না ; আমার খাওয়া হয়ে গেছে।"

অবাক্ হইয়া নিরুপমা বলিল,—"সে কি, আমার ওপর রাগ ক'রে না খেয়েই চ'লে যাবে তুমি ?"

নারায়ণী স্থির দৃষ্টিতে নিরুপমার মুখের দিকে একটিবার চাহিয়াই ছেলেদের পাতের লুচি ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে বলিল,—"রাগের কথা ত হয় নি দিদি,—রাগ যদি করতুম, ছেলেদের খাওয়াতে বসতুম না তা হ'লে।"

নিরুপমা বলিল,—"তুমি ত অভুক্ত আমার বাড়ী থেকে যাবে, তাতে অকল্যাণ আমার হবে না ?"

আবার পূর্ব্ববৎ স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া নারায়ণী উত্তর দিল,—"কল্যাণ তোমার পূর্ণভাবেই হয়ে গেছে, দিদি, অকল্যাণের কথা মুখেও এনো না। আর আমার খাবার কথা যদি বল,—সেই মেয়েটির আঁচলে আমার পাতের সমস্ত খাবার বেঁধে দেবার সময় পেট আমার ভ'রে গেছে, নিমন্ত্রণ খেতে এসে এমন তৃপ্তি আমি আর কখনও পাই নি। দোহাই তোমার, রাগ ক'র না আমার উপর,—খাবার জন্য আর বল না—লক্ষ্মীটি !—আমি বরং আর এক দিন এসে তোমার পাতে ব'সে একসঙ্গে খেয়ে যাব।"

নিরুপমা নারায়ণীকে খাইবার জন্য আর পীড়াপীড়ি করিল না বটে, কিন্তু এ দিনের এই ঘটনাটি হাড়ের মত তাহার বুকের ভিতর ফুটিয়া রহিল। মনে মনে সেই রাত্রিতেই সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, এ অপমানের প্রতিশোধ সে এক দিন লইবেই।

তাই গাঙ্গুলী-পরিবারের অবস্থা-পরিবর্ত্তনে সকলেই যখন তাহাদের দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিত, নিরুপমার মনে তখন বহুদিন পূর্ব্বের সেই অপমানের কাঁটাটি খোঁচা দিয়া তাহাকে সমস্ত কথা স্মরণ করাইয়া দিত,—আর সে তখন সেই অপমান-বিদ্ধ অন্তরে উন্মাদিনীর মত কল্পনা করিত—যেন নারায়ণী সেই মলিন-বসনা বিধবাটির মত শিশুপুত্রদের হাত ধরিয়া একমুষ্টি অন্নের জন্য তাহার পদপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার সেই স্থির-সৌদামিনীর মত উজ্জ্বল দৃষ্টি দারিদ্র্যের সংঘাতে ম্লান, মলিন, অশ্রুমুখী, অনাহারে অবসন্ন তাহার ছেলেমেয়েগুলির —দু'টি ভাতের জন্য কি আকুলি-ব্যাকুলি ! আর সে তখন—নিরুপমার কল্পনা উত্তেজনার উল্লাসে ভাঙ্গিয়া যাইত ! সেই ভিখারিণী প্রতিদ্বন্দ্বিনী আর তাহার শিশুদের লইয়া সে তখন কি করিবে—তাহা আর স্থির করিয়া উঠিতে পারিত না !

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মজুমদার ছিলেন বুদ্ধির জাহাজ-বিশেষ ! স্ত্রীর প্রকৃতি তিনি খুব ভাল রকমই চিনিয়াছিলেন। তাঁহার সংসারে নামে মাত্র প্রভু যদিও তিনি ছিলেন, কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে প্রভুত্বের রাশটি যে নিরুপমা টানিয়া রাখিত, তাহা কাহারও অবিদিত ছিল না। নিরুপমাকে চটাইয়া বা তাহার সম্মতি না লইয়া কোন কায করিবার ক্ষমতা বা স্বাধীনতা মজুমদারের মোটেই ছিল না,—বরং স্ত্রীকে খুসী করিবার মত উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিলে তাঁহার উল্লাসের সীমা থাকিত না। স্ত্রীর অন্তর্নিহিত অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই, গাঙ্গুলী-পরিবারের উপর তাঁহার আক্রোশের উপশম কিছুতেই হয় নাই, বরং তাহা তাহাদের দুরবস্থার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়াই চলিয়াছিল। মজুমদার যে দিন স্ত্রীকে অতিমাত্রায় প্রসন্ন করিবার জন্য বলিয়াছিলেন,—'তুমি দেখে নিও নিরু, গাঙ্গুলীর বউকে রাঁধুনী রেখে যদি তোমার ভাত না রাঁধাতে পারি, তা হ'লে আমি প্রাণকৃষ্ণ মজুমদার নই !'—সে দিন নিরুপমা যে মধুর দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়াছিল, প্রথম-বিবাহ-জীবনের পর, পত্নীর চক্ষু দুটিতে এত মাধুর্য্য মজুমদার এ পর্য্যন্ত আর দেখিবার সৌভাগ্য পান নাই ! শুধু তাই নয়, সেই দিন নিরুপমা লোহার সিন্দুক খুলিয়া, পাঁচ হাজার টাকার একখানি কাগজ এন্‌ডোর্স করিয়া স্বামীর হাতে দিয়া গদ্‌গদস্বরে বলিয়াছিল,—'কারবারের জন্যে ক'দিন ধরেই চাইছিলে না ? দিচ্ছি, নাও, বুঝে খরচ ক'র, আর—"

সর্ব্বস্বের মালিক ছিলেন যদিও মজুমদার, কিন্তু তাঁহার চাবিটি ঝুলিত নিরুপমার অঞ্চলে। ঘিয়ের কারবার বাড়াইবার জন্য একটি মাস সাধ্যসাধনা করিয়াও মজুমদার যাহা আদায় করিতে পারেন নাই, স্ত্রীর প্রকৃতি বুঝিয়া একটি চালেই তাহা অনায়াসে সিদ্ধ করিয়া লইয়াছিলেন।

৫

দুর্দ্দশাপন্ন হইলেও গাঙ্গুলী-পরিবারের দিনগুলি কোনও রকমে চলিতেছিল,—অভাবের সহিত অভাবগ্রস্তের সাথী আধিব্যাধি

আসিয়াও এই পরিবারকে মুহ্যমান করিতে পারে নাই। ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হইলে, গাঙ্গুলী মহাশয় স্বয়ং বিশ্বনাথের চরণামৃত আনিয়া অখণ্ড বিশ্বাসে রোগীকে পান করাইতেন; বলিতেন,—'সুদিনে অম্বপ-বিম্বপে ঘটা করিয়া চিকিৎসা করাইয়াছি, দুর্দ্দিনে দীননাথই ভরসা, তাঁর চরণামৃতই মহৌষধ।' রোগীও পরম বিশ্বাসে এই পরমৌষধ সেবন করিত,—ব্যাধির প্রকোপ দূরে পলাইত। সুসময়ে অবসরকালে জ্যোতিষের আলোচনা গাঙ্গুলী মহাশয়ের বাতিকের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল,—অনেকেই তাঁহাকে কোষ্ঠী দেখাইতে আসিত, তাঁহার গণনার ফল নাকি সর্ব্বত্রই অভ্রান্ত বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। গণনার ফল যাহাই হউক, এই রেগারের ফলে পরিদর্শনের অভাবে তাঁহার ব্যবসায়টি কিন্তু ক্রমশঃ অবনতির পথে নামিয়াছিল। আবার অদৃষ্টের এমনই বিচিত্র গতি যে, দুর্দ্দিনে সুদিনের সেই রেগারই এই বিপন্ন পরিবারের অন্নসংস্থানের অবলম্বনস্বরূপ হইয়াছিল।—সখের এই নির্ম্মল বিদ্যাটির সহায়তায় জীবিকার সংস্থান করিতে তাঁহার বুকে ব্যথা বাজিলেও, অভাবের মসীময় মূর্ত্তি চক্ষুর উপর পড়িবামাত্র তাঁহার এই সঙ্কোচের বেদনা ধীরে ধীরে অপসৃত হইত।

নারায়ণী সে দিন আসিয়া হঠাৎ স্বামীকে বলিল,—"অনেকের অদৃষ্টই ত গণনা করছ, একবার আমার হাতখানা দেখ দেখি।"

গাঙ্গুলী মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, "হঠাৎ এ সখ হ'ল যে তোমার?"

নারায়ণী হাসিয়া বলিল, "কাল বড় এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি, শুনবে?"

গাঙ্গুলী মহাশয় বলিলেন, "স্বপ্নে ত তুমি নিত্যই গঙ্গাস্নান কর শুনতে পাই, এবার বুঝি সমুদ্রস্নানের স্বপ্ন দেখেছ?"

গম্ভীর হইয়া নারায়ণী বলিল,—"না গো, তা কেন? শোন না বলি, কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখলুম, যেন আমাদের সেই বাড়ীতে আবার আমরা ফিরে গেছি; সেই ঘর, সেই খাট, সেই বিছানা, সেই লোকজন, সেই সব! বল না, কেন এমন স্বপ্ন দেখলুম? এর ফল কি রকম—"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া পরক্ষণে জোর করিয়া হাসিয়া গাঙ্গুলী মহাশয় বলিলেন,—"মা অন্নপূর্ণার মায়া! স্বপ্নে নিত্য গঙ্গাস্নান ক'রে খুব শুচি হয়ে গেছ কি না, তাই তোমাকে তিনি ঐশ্বর্য্যের ছায়া দেখিয়েছেন; কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, এই খোলার ঘরখানি থেকেও আমাদের সংসারটুকু তুলতে না হয়।"

বিস্মিতভাবে নারায়ণী জিজ্ঞাসা করিল,—"তার মানে?"

হঠাৎ নারায়ণীর হাতখানি টানিয়া লইয়া গাঙ্গুলী মহাশয় ব্যগ্রভাবে বলিলেন,—"দেখি তোমার হাতখানা।" নিবিষ্টভাবে তিনি নারায়ণীর হাতের রেখাগুলি দেখিতে লাগিলেন, আর সে সংশয়াকুলচিত্তে স্বামীর ভাবপূর্ণ মুখখানির দিকে চাহিয়া রহিল।

সকল রেখা পরীক্ষা করিয়া আপন মনেই গাঙ্গুলী মহাশয় বলিলেন,—"সে রকম ত কিছুই দেখছি না!"

সবিস্ময়ে নারায়ণী জিজ্ঞাসা করিল,—"কি রকম, সেটা বলই না শুনি—"

গাঙ্গুলী মহাশয় বলিতে লাগিলেন,—"দেখছিলুম, তোমার অদৃষ্টে সত্যই দাসীত্ব আছে কি না!"

নারায়ণীর মুখের উপর বুঝি শরীরের সমস্ত রক্ত উঠিয়া আসিল, মুখ হইতে কথা বাহির হইল না, স্বামীর মুখখানির উপর চাহিয়া রহিল। গাঙ্গুলী মহাশয় স্ত্রীর সেই ভাব দেখিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"কথা বলবার একটু মানে আছে। মজুমদার-গৃহিণী দিন গুণছেন, কবে তুমি পেটের দায়ে তাঁর কাছে গিয়ে হাত-পাত—রাঁধুনীর বৃত্তি নিয়ে তাঁকে তৃপ্তি দাও।"

কথাটি শুনিবার সঙ্গে সঙ্গেই উত্তেজনায় কাণ দুটি লাল হইয়া উঠিলেও মুখে তাহার কোন লক্ষণ প্রকাশ না করিয়া নারায়ণী বলিল,—"মজুমদার-গিন্নী বুঝি এই কামনাই করছে এখন? আর অত ঠোকা-ঠুকিতেও আমাকে না বুঝে আমার সম্বন্ধে এই ধারণা মনে এঁটে রেখেছে এখনও, যে আমি—"

গাঙ্গুলী মহাশয় বলিলেন,—"আমাদের অবস্থার গতি যে ভাবে নেমে চলেছে, তাতে এ ধারণা মনে আনা তার পক্ষে ত আশ্চর্য্য কিছু নয়! কে জানে, আমাদের পরিণাম কি!"

দৃপ্তস্বরে নারায়ণী একার বলিয়া উঠিল,—'পরিণাম আমাদের আর যাই হোক, তবে এটা ঠিক যে, মা অন্নপূর্ণা আমাকে কাশীতে এনেছেন অন্ন বিলুতে, অন্ন ভিক্ষে করতে নয়। যদি মা এ গরব না রাখেন, তাঁর মন্দিরে গিয়ে মাথা খুঁড়ে মরব, তবু মাথা হেঁট করব না, এ কথা আমি জোর ক'রে ব'লে রাখছি।"

স্ত্রীর দৃপ্ত মুখখানির দিকে মুগ্ধভাবে চাহিয়া গাঙ্গুলী মহাশয় বলিলেন,—"মজুমদার তা জানে, সেই জন্যে সে এখন আমাদের আষ্টে-পৃষ্টে বাঁধবার জন্য উঠে প'ড়ে লেগেছে। আমার কিছু নেই জেনে যে কজন মহাজন নালিশ করেনি, মজুমদার তাদের কাছ থেকে আমার দেওয়া হাতচিঠিগুলো কিনে নিয়েছে—"

নারায়ণী বলিল, "সেই হাতচিঠিগুলো নিয়ে নালিশ করবার মতলব বোধ হয় এঁটেছে?"

"হ্যাঁ,—শীঘ্রই নালিশ দায়ের করবে। এই সূত্রে আমাকে

ন্স্তানাবুদ ক'রে বা জেলে পাঠিয়ে সে তখন তোমাদের নিয়েই ছবে।"

নারায়ণী স্বামীর ম্লান মুখের দিকে নিজের অম্লান মুখখানি তুলিয়া সহানুভূতির স্বরে বলিল, "তাই বুঝি তোমাকে ক'দিন থেকে কেমন অন্যমনস্ক দেখছি ? ছিঃ ! কখন্ কি হবে, কে কি করবে, এই ভাবনা তুমি মনে টেনে এনে নিজের মাথাটাকে দুর্ব্বল করতে বসেছ ? তুমি না জ্যোতিষী হয়েছ ? তোমার জ্যোতিস কি বলে ?"

গাঙ্গুলী মহাশয় বলিলেন,—"ডাক্তারের বাড়ীতে রোগ হলে ডাক্তার নিজে তার চিকিৎসা করতে সাহস পায় না। তেমনই নিজের ভাগ্যও নিজে গণনা করতে ভয় হয়।"

নারায়ণী দৃঢ়কণ্ঠে বলিল,—"তুমি কি মনে কর, ঐ সুদখোর মজুমদারই আমাদের ভাগ্য-বিধাতা ? বিশ্বনাথ কি নিদ্রিত ? আমাদের নিয়ৎ যদি শুদ্ধ থাকে, শত মজুমদার হাজার কারসাজি ক'রেও কিছুই করতে পারবে না, নিজের জালে শেষে নিজেই জড়িয়ে মরবে, এ তুমি স্থির জেনো।"

প্রশংসমান নয়নে পত্নীর সেই উৎসাহ-প্রদীপ্ত মুখখানির দিকে গাঙ্গুলী মহাশয় চাহিয়া রহিলেন।

৬

তিন মাসের স্থলে নয়টি মাস কাটিয়া গেল, তবুও গাঙ্গুলী-পরিবারের চরম দুরবস্থার কথা নিরুপমার কাণে আসিল না বা নারায়ণী ছেলেপুলেদের হাত ধরিয়া তাহার দ্বারে ভিক্ষা করিতে আসা দূরের কথা, দায় জানাইয়া সাহায্য চাহিতেও কোন দিন আসিল না। তখন সে মনে মনে স্থির করিল, এক দিন নারায়ণীকে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া দেখিবে, তাহার সে তেজ এখন কতটা শুকাইয়াছে এবং তাহার হালই বা এখন কোন্ ভাবে চলিয়াছে !

উত্তেজনার বশে নিরুপমা স্বামীর প্ররোচনায় এক একখানি করিয়া অনেকগুলি কাগজ বাহির করিয়া দিয়াছিল। মজুমদার তাহার কতক ভাঙ্গাইয়া গাঙ্গুলী মহাশয়ের মহাজনদের নিকট হইতে হাতচিঠাগুলি আধা দামে খরিদ করিয়াছিলেন এবং বক্রী টাকা হাতে লইয়া বড় রকম লাভের প্রত্যাশায় প্রচুর পরিমাণ ঘৃত আড়তে ধরিয়া রাখিয়াছিলেন। ঘৃতের কারবারের সঙ্গে কাপড়ের এক কারবার খুলিবার সঙ্কল্প হঠাৎ মজুমদারের মাথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। নিরুপমা এবার আর কাগজ বাহির করিয়া দিল না, স্বামীকে যুক্তি দিল, কাগজ ভাঙ্গাইয়া লোকসান খাওয়া অপেক্ষা বাড়ী বাঁধা দিয়া অল্প সুদে টাকা কর্জ্জ করা বরং ভাল। পরে কাগজের দর যদি কিছু উঠে, তখন তাহা বিক্রয় করিয়া ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করা যাইবে।—নিরুপমার যুক্তি লঙ্ঘন করিবার সাধ্য মজুমদারের ছিল না, কাজেই বসতবাটী বন্ধক দিয়া ১০ হাজার টাকা লইয়া এক কাপড়ের দোকান খোলা হইল। বাজার-সম্ভ্রম থাকায় দুই কারবারেই ধারে বহু সহস্র টাকার মাল সংগ্রহ করা মজুমদারের পক্ষে কঠিন হয় নাই। বাঙ্গালীটোলায় বাঙ্গালী সমাজের সহানুভূতির অভাবে, বুদ্ধিমান্ মজুমদার বড় গঙ্গের সান্নিধ্যে হনুমানফটকায় তাঁহার ব্যবসায় খুব বড় করিয়া ফাঁদিয়াছিলেন। কাশীর ষ্টেশন ও গঙ্গা নিকটে পড়ায়, মালপত্রের আমদানী-রপ্তানীর পক্ষে বেশ সুবিধাই হইতেছিল। নূতন স্থানে আসিয়া অল্পদিনের মধ্যেই কারবার বেশ জাঁকিয়া উঠিতেছিল। সুসময় দেখিয়া মজুমদার এইবার গাঙ্গুলীর সর্ব্বনাশের জন্য অস্ত্র শাণাইতে আরম্ভ করিলেন।

গাঙ্গুলী মহাশয় সে দিন বাহিরের ঘরখানিতে বসিয়া একখানি কোষ্ঠী দেখিতেছিলেন, এমন সময় ভণ্ডুল গোয়ালা আসিয়া বলিল,—"গাঙ্গুলী বাবু, শুনেছেন ত, মজুমদার আপনার সাবেক দোকান থেকে টাট তুলে নিয়ে হনুমানফটকায় কারবার চালিয়েছে। সে ঘর খালি আছে, আপনি আবার কারবার লাগিয়ে দিন, আপনার জন্য বহুৎ মদৎ দেব জানবেন।"

ঠিক এই সময় আবদুল আসিয়াও ভণ্ডুলের কথার পোষকতা করিল। অধিকন্তু সে বলিল,—"হামি লোক ত আপনার কারবারের খাতে টিন বানাতে সুরু করিয়েছি—আমাদের সবাইকার দিল্ মাঙ্গতেছে—গাঙ্গুলী বাবুর কারবার ফিন্ কায়েম হোক্—আপনি ইমানদার, হামি লোক আপনার খাতিরে জান কবুল করব।"

গাঙ্গুলীকে নিরুত্তর দেখিয়া, শেষে দুই মুরুব্বী জোর করিয়া ইহাও জানাইল যে,—গাঙ্গুলী বাবুর হাতে টাকা যদি না থাকে, তাহারা তাহারও জোগাড় করিয়া দিবে, মহাজনদের হাতে পায়ে ধরিয়া মাল দেওয়াইবে,—সাবেক ঘর দখল করা চাই-ই।

গাঙ্গুলী মহাশয় তাঁহার এই ভক্ত দুইটিকে চিনিতেন, সুতরাং তাহাদের কথায় বিস্মিত না হইয়া, ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,— "আচ্ছা, দেখা যাবে ; তাঁর ইচ্ছা যদি হয়ে থাকে, তাই হবে। আমি ভেবে চিন্তে তোমাদের জানাব।"

তাহারা চলিয়া গেলে, নারায়ণী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,— "হাগা, কি বলতে এসেছিল ওরা ?"

গাঙ্গুলী মহাশয় হাসিয়া বলিলেন,—"মজুমদার সাবেক ঘর থেকে কারবার তুলে নিয়ে আলাইপুরার দিকে খুব বড় ক'রে আড়ং করেছে কি না, তাই এরা বলতে এসেছিল—সাবেক ঘর ভাড়া নিয়ে আমি আবার কারবার সুরু করি।"

কথাটা শুনিয়াই যেন এক অপ্রত্যাশিত আনন্দে নারায়ণীর মুখখানি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে সহসা বলিয়া ফেলিল,—"আমারও অনেক সময় এই কথা মনে হয়। এই কারবারে আমরা পড়েছি, আবার এর উপরই ভর দিয়ে আমরা উঠ্‌ব।"

স্ত্রীর মুখের দিকে সকৌতুকে চাহিয়া গাঙ্গুলী মহাশয় বলিলেন,—"তুমি যে দেখছি আজকাল জ্যোতিষীর ওপরেও টেক্কা দিয়ে চলেছ! 'না বিইয়েই কানায়ের মা' হওয়ার মত, একবারে যে হঠাৎ গণৎকার হয়ে উঠলে দেখছি!"

নারায়ণী কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়াই উত্তর দিল,—"গণৎকার বলে—গ'ণে,—সে সব সময় খাটে না, ভুলচুক হয়ে যায়। আমি যে কথা বলি হঠাৎ, সেটা আমার মনের,—মায়ের ইচ্ছায় আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে; এ মিথ্যে হবার নয়। দেখে নিও তুমি,—কারবার আমাদের হ'ল ব'লে!"

হাসিয়া গাঙ্গুলী মহাশয় বলিলেন,—"তা হ'লে মজুমদারের অস্ত্রগুলো শাণান অন্ততঃ সার্থক হয় বটে,—শাঁখের করাতের মত দুদিক দিয়েই কাট্‌বার তার সুবিধেটা হয়ে যায়।"

ছোট মেয়ে আসিয়া বলিল, "খাবার যায়গা করেছি, মা।" নারায়ণী প্রসঙ্গটি পরিত্যাগ করিয়া বলিল,—"বেলা অনেক হয়েছে, আমি ভাত বাড়তে চললুম, তুমিও হাত-পা ধুয়ে বসবে এস—"

নারায়ণী পাথরের থালায় ভাত বাড়িতেছে,—গাঙ্গুলী মহাশয় হাত-মুখ ধুইতেছেন, এমন সময় নিরুপমার দাসী আসিয়া হাসিমুখে বলিল,—"চিনতে পার, দিদিমণি?"

নারায়ণী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সহজভাবেই জিজ্ঞাসা করিল,—"মজুমদার-বাড়ীতে তুমি ছিলে না?"

হাসিয়া দাসী বলিল,—"হাঁগো দিদিমণি, এখনও সেইখানেই আছি। আহা, তখন কি ইন্দিরের ঐশ্বয্যই না ছ্যাল তোমাদের—কি দেখেছিমু আর কি দেখছি—"

গম্ভীর হইয়া নারায়ণী জিজ্ঞাসা করিল,—"কি মনে ক'রে হঠাৎ এই উৎকণ্ঠার সময় আসা হয়েছে শুনি?"

দাসী বলিল,—"দিদিমণি পাঠালেন কি না, আসবার ত আর সময় পাই না—এই সময় একটু ফুরসুৎ পাই, তাই এসেছি। হাঁ—যা বলতেছিলুম,—আপনাদের অনেক দিন না দেখে দিদিমণির ভারি মন কেমন করছে কি না, তাই তিনি ব'লে পাঠিয়েছেন—কাল দুপুরবেলায় ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ক'রে তেনার ওখানে গিয়ে দুটি শাক-ভাত খাবে। আমি এসেই নিয়ে যাব তোমাদের।"

ক্ষমতার অহঙ্কারে মানুষ যে নির্লজ্জের মত এতটা অগ্রসর হইতে পারে, তাহা ভাবিতেও নারায়ণীর দেহ-মন তপ্ত হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু দাসী-পরিচারিকার কাছে উদ্বেল হৃদয়-দ্বার উদ্ঘাটিত না করিয়া সে তাহার স্বভাবসিদ্ধ সতেজ স্বরেই বলিল—"তোমার দিদিমণিকে ব'ল—যে মনে ক'রে তিনি আমাদের তলপ করেছেন, এখন ছেলেমেয়েদের হাত ধ'রে তাঁর সামনে গিয়ে আমি যদি দাঁড়াই—তাঁর মন কেমন করাটা কমবে না, আরও বাড়বে তাতে। কাযেই সময় হ'লে, আমি নিজেই তাঁর কাছে যাব।—বুঝলে?"

ঠিক এই সময় বড় ছেলে ছুটিয়া আসিয়া বলিল,—"মা, বাইরে এক জন অতিথি এসেছে। সে কেবল মুখ আর পেট দেখিয়ে ইসারা ক'রে বলছে—ভুখ লেগেছে, খাব।"

গাঙ্গুলী মহাশয় তখন সবে মাত্র বসিবার জন্য আসনখানির উপর গিয়া দাঁড়াইয়াছেন,—তৎক্ষণাৎ তিনি তাড়াতাড়ি বাহিরে চলিয়া গেলেন।

দাসী বেজার হইয়া বলিল,—"আ মরণ, ঠিক দুপুরবেলায় এসে বলেন—খাব, পিণ্ডি যেন তাঁর এখানে—"

নারায়ণী দুই চক্ষুতে অগ্নির ঝলক তুলিয়া তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিল,—"তুমি চুপ কর ত বাছা,—এসেছ, ব'সে থাক চুপ ক'রে, তোমার মুখে এ সব কথা কেন বল ত?"

গাঙ্গুলী মহাশয় আসিয়া ব্যস্তভাবে বলিলেন,—"কথা কিছু কইলেন না,—আমাদের ভাত-তরকারী সবই খাবেন,—আমি তাঁকে বসিয়েছি, তুমি শীগ্‌গীর ভাত-তরকারী নিয়ে যাও, তিনি ভারি ব্যস্ত—"

বাহিরের ঘরখানির পাশে, অন্দরের পথটির ধারে, অলিন্দের মত একটু স্থান ছিল। সেইখানেই অতিথি বসিয়াছিলেন। দেখিলে তাঁহাকে পরিচ্ছদের দিক দিয়া সাধু-সন্ন্যাসী বলিয়া মনে হয় না,—পরনে ছিল একখানি আধময়লা লালপেড়ে ধুতি, গলায় যজ্ঞোপবীত, মাথায় একখানা গামছা পাগড়ীর মত বাঁধা, বাহুমূলে এক ছড়া রুদ্রাক্ষের তাগা, ললাটে রক্তচন্দনের একটি ফোঁটা, শ্মশ্রু-গুম্ফে মুখখানি আচ্ছন্ন হইলেও, মুখে একটা উদাসভাব প্রকাশ পাইতেছিল, সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক তাঁহার দুইটি উজ্জ্বল চক্ষুর দৃষ্টি।

নারায়ণী একখানি শ্বেত পাথরে অন্ন-ব্যঞ্জনাদি সাজাইয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিয়া দিয়া, গলবস্ত্রে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। তাহার পর উঠিয়া গাঢ়স্বরে বলিল,—"অতিথি বিশ্বনাথের সেবা ইচ্ছামত করবার শক্তি আজ আমাদের নেই, বাবা! অভাব-গ্রস্তের শাক-অন্নই তৃপ্তি ক'রে গ্রহণ কর!"

অতিথির তীব্রদৃষ্টিপূর্ণ নয়ন দুইটি যেন অশ্রুতে ভরিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে তিনি আর্ত্তস্বরে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন! সে কি করুণ রোদন!—সকলেই স্তব্ধ, সন্ত্রস্ত;—গাঙ্গুলী মহাশয় ও নারায়ণী যতই জিজ্ঞাসা করেন,—কি অপরাধ আমাদের হ'ল বাবা!—কেন কাঁদছ? বল—বল? বলিবে কে? ক্রন্দন আর থামে না!—নারায়ণীর অন্তর পর্য্যন্ত হাহাকার করিয়া উঠিল, দিবা দ্বিপ্রহরে অন্ন-ভোজ্য ক্রোড়ে লইয়া অতিথির এ রোদন কেন? হে বিশ্বনাথ! এ কি লীলা!—হঠাৎ সেই উচ্ছ্বসিত রোদনের ভিতর হইতে হো হো শব্দে বিকট হাসির ধ্বনি উঠিল! তাহার পরেই ভোজনের পালা স্বরু হইল। সমস্ত অন্নব্যঞ্জন নিঃশেষ করিয়া, ইঙ্গিতে পরম পরিতৃপ্তি জানাইয়া এই অদ্ভুত অতিথি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আচমনান্তে যাইবার সময় সহসা ফিরিয়া নারায়ণীর দিকে চাহিয়া অতিথি বলিলেন,—"সব দুঃখ তোর দূর হয়ে গেল, সুখ এল ব'লে!—" পরক্ষণেই উন্মত্তের মত অতিথি টলিতে টলিতে চলিয়া গেলেন, ফিরিয়াও তাকাইলেন না।

বাড়ীশুদ্ধ সকলেই স্তব্ধ, আনন্দও যে হয় নাই, তাহাও নহে। তবে বেশী আনন্দ হইয়াছিল সেই দাসীটির, দিদিমণির কাছে গিয়া নূতন সমাচার দিবার মত অনেক কিছুই সে আয়ত্ত করিয়াছিল।

৭

আহারান্তে বাহিরের ঘরে বসিয়া পাণ চিবাইতে চিবাইতে গাঙ্গুলী মহাশয় ধূমপান করিতেছিলেন, এমন সময় ডাক-পিয়ন আসিয়া বলিল, "একটা ইনসিওর আছে, গাঙ্গুলী বাবু—"

সবিস্ময়ে গাঙ্গুলী মহাশয় বলিলেন,—"ইনসিওর? আমার নামে?"

পিয়ন বলিল,—"হ্যাঁ, বাবুজী, এই তার ইনটিমেশন,—বড় ডাকখানা থেকে ছাড়িয়ে আনবেন। বেশী টাকার ইনসিওর ত আমাদের বিলি করতে দেয় না।"

রসিদ সহি করিয়া, পিয়নকে বিদায় দিয়া, গাঙ্গুলী মহাশয় ইনটিমেশনখানির উত্তরাংশ পড়িয়া দেখিলেন—পাঁচ শত টাকার ইনসিওর! ভাবিলেন, হয় ত নাম ভুল হইয়াছে! তাঁহার নামে পাঁচ শত টাকা পাঠাইবার ত কেহ নাই! কিন্তু বার বার কয়েকবার পড়িয়া দেখিলেন, নাম ও ঠিকানার কিছুমাত্র ভুল-ও হয় নাই! তবে? কে এই টাকার প্রেরক? কৌতূহলের সহিত পড়িলেন—এস, কে, রায়, এটোয়া!

কিন্তু এটোয়ায় এই নামের এমন কোনও লোককেই তাঁহার মনে পড়িল না, যাহার সঙ্গে তাঁহার বিন্দুমাত্র পরিচয় আছে!—তখন সহসা তাঁহার মনে হইল, এই ভাবের মিথ্যা ইনসিরও পাঠাইয়া একটা জুয়াচুরি ব্যাপার তিনি কাগজে পড়িয়াছিলেন বটে! ইহাও হয় ত সেই ভাবের কিছু হইবে। যাহা হউক, তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া বড় ডাকঘরের উদ্দেশে তখনই বাহির হইয়া পড়িলেন।

ঘণ্টাখানেক পরে গাঙ্গুলী মহাশয়কে কিছু উৎকণ্ঠিতভাবেই ফিরিতে দেখিয়া নারায়ণী জিজ্ঞাসা করিল, "খেয়ে-দেয়ে একটু না জিরিয়েই এই রদ্দুরে বেরিয়েছিলে কোথায়?"

গাঙ্গুলী মহাশয় নিজের স্থানটিতে বসিয়া স্ত্রীকে বলিলেন, "ব'স, কথা আছে।"

নারায়ণী স্বামীর মুখে একটা অপ্রত্যাশিত ভাবান্তর দেখিয়া স্বামীর কথা শুনিবার জন্য ব্যগ্রভাবেই তক্তপোষখানির এক ধারে বসিয়া পড়িল।

গাঙ্গুলী মহাশয় বলিলেন,—"বছর বারো আগে সত্যকুমার ব'লে একটি ছেলে ঘিয়ের কায শেখবার জন্যে আমাদের কারবারে এসেছিস মনে পড়ে?"

নারায়ণী বলিল,—"পড়ে বৈ কি। তুমি তাকে ছেলের মতন যত্ন ক'রে কারবারে নিয়েছিলে ব'লে মজুমদার মশায়ের কি লাগানি-ভাঙ্গানি—"

গাঙ্গুলী মহাশয় বলিলেন, "শেষে আমি ত্যক্ত হয়ে ছেলেটিকে আলাদা দোকান খুলতে পরামর্শ দিয়েছিলুম, আর অনেক টাকার মালও তখন তাকে ধারে দিই। ছেলেটি বছর তিন বেশ ভাল রকমেই কায চালিয়েছিল, তার পর কি ভেবে, দোকান-পাট তুলে দিয়ে আমার হিসেব-পত্র মিটিয়ে দিয়ে চ'লে যায়। তখন শুনেছিলুম—কানপুরে গিয়ে কাযকর্ম্ম করবে। তার পর আর কোন পাত্তাই তার পাওয়া যায় নি।"

নারায়ণী বলিল,—"আজ যে হঠাৎ তার কথা নিয়ে এত চর্চ্চা? ব্যাপারখানা কি?"

গাঙ্গুলী মহাশয় গম্ভীরভাবে বলিলেন, "ব্যাপার একটু আছে বৈ কি। এটোয়া থেকে সে হঠাৎ আমার নামে পাঁচশো টাকার এক ইনসিওর পাঠিয়েছে।"

সবিস্ময়ে নারায়ণী জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন, বল ত?"

গাঙ্গুলী মহাশয় ইনসিওর করা লম্বা লেফাফাখানি বাহির করিয়া তাহার ভিতর হইতে একশো টাকার পাঁচকেতা নোট ও সেই সঙ্গে একখানি কয়েক পৃষ্ঠাব্যাপী দীর্ঘ পত্র বাহির করিলেন। তার পর বলিলেন, "পত্রখানি পড়ি—শোন, ব্যাপার সব বুঝতে পারবে।—পত্রের সবটা তুমি সময়মত প'ড়,—আমি শুধু শেষ-টুকুন পড়ছি।—"

গাঙ্গুলী মহাশয় পত্রখানির শেষাংশ পড়িতে লাগিলেন। তাহাতে লেখা ছিল,—"কানপুরে তিনটি বৎসর কাটাইয়া ঘিয়ের এনালাইজ করা শিক্ষা করিয়া এটোয়ায় আসিয়া উপস্থিত হই। আপনার আশীর্ব্বাদে, আপনারই শিক্ষায় শিক্ষিত ও আপনার নিকট অপরিশোধ্য ঋণপাশে আবদ্ধ, আপনারই শিষ্যস্থানীয় সত্যকুমার রায় আজ এটোয়ায় ঘিয়ের ব্যাপারে সর্ব্বেসর্ব্বা। অসংখ্য অ-বাঙ্গালীর মধ্যে বাঙ্গালীর এই প্রতিষ্ঠার কথা শুনিয়া আপনার ন্যায় মহানুভব নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হইবেন সন্দেহ নাই। আপনার ভাগ্যবিপর্য্যয়ের কথা সংবাদপত্রে অবগত হই। আপনার উদ্দেশে কয়েকখানি পত্রও লিখিয়াছিলাম; কিন্তু কোনও উত্তর পাই নাই। শেষে সম্প্রতি আপনার সেই বিখ্যাত ডাক্তার-বন্ধু অমিতাভ বাবু এখানে চেঞ্জে আসেন। তিনি এখনও সপরিবারে এই স্থানেই আছেন। তাঁহার নিকট সমুদয় শুনিয়া, আপনার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই আমি এক ওয়াগন ঘি আপনার বরাবর ডেসপ্যাচ করিতেছি। ইহাতে আপনার লোকসানের কোনও দায়িত্ব নাই,—আড়তদার হিসাবে আপনি ইহা কাটাইবার ব্যবস্থা করুন। আমি নিজ হইতে মাশুল দিয়াই মাল পাঠাইলাম। চুঙ্গী কর, ওয়াগন হইতে ঘিয়ের টিনগুলি গুদামে লইয়া যাওয়া, গুদামভাড়া, আফিস প্রভৃতির জন্য আমি পাঁচ শত টাকা অগ্রিম পাঠাইতেছি। আমার এই কার্য্যে বিস্মিত হইবার বা আমাকে ধন্যবাদ দিবার কিছুই নাই। পাশ্চাত্যদেশে শুনা যায়, কেহ কোনও কারবার করিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিলে, সেই কারবারটি সূচনা করিবার সময়,যাহাদের নিকট সাহায্যপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহাদের সম্মান রক্ষা করিতে বিস্মৃত হয় না। আমি যদি কাশীতে আপনার সংস্পর্শে না আসিতাম, আজ হয়ত হইলে এত বড় প্রতিষ্ঠা লাভের অবকাশ পাইতাম কি না, কে জানে। আমার এই প্রতিষ্ঠার মূলই যে আপনি গাঙ্গুলী মহাশয়! রেলের রসিদ ও চালান রেজেষ্টারী করিয়া সত্বর পাঠাইতেছি।"

পড়িতে পড়িতে গাঙ্গুলী মহাশয়ের দুই চক্ষু অশ্রুময় হইয়া উঠিল,—আর নারায়ণীর দুইটি আর্দ্রনেত্রের উপর তখন শুধু প্রতিফলিত হইতেছিল,—করুণাময়ী জগজ্জননীর সেই রক্তিমাময় অভয় হাতখানি!

৮

মজুমদারের উদ্ধত ব্যবহার তরুণসঙ্ঘকে সহসা ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল। নানাদিকেই তাঁহার শত্রুবৃদ্ধি হইতেছিল। হঠাৎ এক দিন সহরময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল, সহসা ঘিয়ের বাজার নামিয়া যাওয়ায়, মজুমদার ভয়ঙ্কর লোকসান খাইয়াছেন এবং তজ্জন্য তিনি দেউলিয়া খাতায় নাম লিখাইতেছেন।—ফলতঃ লোকসান খাইবার কথাটি সত্য হইলেও, দেউলিয়া হইবার প্রসঙ্গটি সম্পূর্ণ অলীক। কিন্তু এই মিথ্যা অপবাদ যাহারা প্রচার করিয়াছিল, তাহাদের অপূর্ব্ব তৎপরতায় কথাটি এমন ভাবে সর্ব্বত্র প্রচার হইয়া পড়িল যে, অতবড় বুদ্ধির জাহাজ মজুমদার মহাশয়কে এক দিনেই মাৎ হইতে হইল। দোকান খুলিতে সমস্ত পাওনাদার একসঙ্গে আসিয়া টাকার তাগাদা আরম্ভ করিল। বাড়ীতে বসিয়া সমস্ত শুনিয়া মজুমদার প্রমাদ গণিলেন। তাঁহার পরামর্শদাতা উকীলের শরণাপন্ন হইলে, তিনি অবস্থার কথা শুনিয়া, কলিকাতার এক নজীর টানিয়া বলিলেন যে, এক নামী ব্যবসায়ীরও নাকি এইরূপ বিপদ আসিয়াছিল। তাঁহার দেনার পরিমাণ ছিল কয়েক লক্ষ টাকা, কিন্তু তিনি তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্কে সিকিউরিটি রাখিয়া সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেন। পুলিস পাহারায় থলিবন্দী কাঁচা টাকা তাঁহার দোকানে লইয়া ঝম্ ঝম্ শব্দে ঢালা হইতে লাগিল, আর মালিকের দরোয়ানরা দেউড়ী হইতে তর্জ্জন করিয়া এক এক পাওনাদারের নাম ধরিয়া হাঁকিতে লাগিল এবং মালিক তাহার হিসাব কড়ায় গণ্ডায় চুকাইয়া দিয়া বলিতেছিলেন,—'রাম—রাম! আর আমার দোকানে তুমি মাথা গলিও না!'—পাঁচ সাত জন পাওনাদারের হিসাব এই ভাবে চুক্তি হইতে না হইতেই, অন্যান্য পাওনাদাররা বুঝিলেন, মালিকের দেউলিয়া হইবার সংবাদ মিথ্যা; তখনই তাহারা সেলাম বাজাইয়া হিসাব না লইয়া চলিয়া গেল এবং যাহারা হিসাব চুকাইয়া লইয়াছিল, ভবিষ্যতে ঘর মারা যাইবার ভয়ে, তাহারাও ত্রুটি স্বীকার করিয়া—টাকা ফেরৎ দিয়া মহাজনদের পন্থা অনুসরণ করিয়াছিল।

এই নজীরসূত্রে সেই বিখ্যাত ব্যবসায়ীর নামটি শুনিয়া, বুদ্ধিমান্ মজুমদার মহাশয়ও তাঁহার পন্থা অবলম্বন করিতে প্রস্তুত হইলেন। নিরুপমাকে রাজী করাইয়া, সমস্ত সম্পত্তি কোম্পানীর কাগজ, এমন কি, নিরুপমার মূল্যবান্ অলঙ্কারগুলি পর্য্যন্ত ব্যাঙ্কে সিকিউরিটি রাখিয়া সত্বর হাজার টাকা সংগ্রহের ব্যবস্থা হইল। কাঁচা টাকা সে দিন পাওয়া গেল না, স্থির হইল, পরদিন বেলা তিনটার মধ্যে এই টাকা মজুমদার মহাশয় বুঝিয়া লইবেন ও দুই জন কনেষ্টবলের পাহারায় তাঁহার আড়তে লইয়া যাইবেন। এই অনুসারে পাওনাদারদের বলিয়া দেওয়া হইল যে, তাহারা যেন পরদিন অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় আড়তে আসিয়া তাহাদের হিসাব চুকাইয়া লইয়া যায়।

এই দিন সন্ধ্যার পর এই অঞ্চলে এক ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান হইল। পাঁচ সাতখানি বিলাতী কাপড়ের দোকানের

মালিক আগা খাঁ নামে এক পঞ্জাবী ধনী মুসলমান দোকান বন্ধ করিয়া যখন বাসায় ফিরিতেছিল, হঠাৎ কে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলী করে। তাহার ফলেই হতভাগ্য ইহলীলা সম্বরণ করে। সঙ্গে সঙ্গে এই হত্যাকাণ্ডের কথা সন্নিহিত মুসলমান-প্রধান পল্লীসমূহে প্রচারিত হইয়া পড়িল। লুণ্ঠনপ্রিয় নিষ্কর্ম্মা বদমাইস গুণ্ডার দল এই ব্যাপারটিকে তাহাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির একটি চমৎকার উপায়রূপেই বরণ করিয়া লইল। রাতারাতিই নানা-স্থানে গুণ্ডাদল সমবেত হইয়া এই হত্যাসূত্রে লুঠতরাজের পরামর্শ আঁটিতে লাগিল। অথচ এই সলা-পরামর্শ এমনই গোপনে সম্পন্ন হইল যে, বাহিরের কেহই এ সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারে নাই।

পরদিন অপরাহ্নে এক বিরাট মিছিল করিয়া নিহত আগা খাঁর মৃতদেহ ষ্টেশনে নীত হয় এবং স্পেশাল ট্রেণে তাহা সরাসরি লাহোরে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা থাকে। শবযাত্রা সমাধা করিয়া এই মিছিল সহসা উত্তেজিত হইয়া সমগ্র আলাইপুরা মহল্লায় ছড়াইয়া পড়িল। মুসলমান দোকানগুলি সমস্তই এদিন বন্ধ ছিল, কিন্তু হিন্দু দোকানদারবা দোকান বন্ধ করিবার কোনও যুক্তিযুক্ত হেতু না দেখিয়া এবং এমন একটা আসন্ন বিপদ্ সম্বন্ধে কোনও কিছু না জানিয়াই, তাহারা দোকান খুলিয়া রাখিয়াছিল। মিছিলের সেই উত্তেজিত জনতা সন্নিহিত হিন্দু দোকানগুলির উপর আপতিত হইয়া বলপূর্ব্বক দোকান বন্ধ করিয়া দিবার প্রসঙ্গে গায়ে পড়িয়া বিবাদ বাধাইল। দেখিতে দেখিতে দোকানগুলি লুঠ হইতে লাগিল।

মজুমদার মহাশয় তিনটার পূর্ব্বেই সুশৃঙ্খলে টাকার থলিগুলি পুলিস পাহারায় আনাইয়া আড়তের গদি-ঘরে সাজাইয়া রাখিয়া-ছিলেন। আড়তের সকলেই টাকার রক্ষণাবেক্ষণে গদি-ঘরে আসিয়া সমবেত হইয়াছিল। পাছে পুলিস অতিরিক্ত পারিশ্রমিক দাবী করে, তজ্জন্য কনেষ্টবল দুই জনকে সঙ্গে সঙ্গে বিদায় করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। মজুমদার মহাশয় তাঁহার কর্ম্মচারীদিগকে শিখাইতেছিলেন,—যেমন পাওনাদারের দল আড়তের হাতায় আসিয়া উঠিবে, অমনই তিন চারটি থলির মুখ খুলিয়া টাকাগুলি একসঙ্গে মেঝের উপর ঢালিয়া দিবে। আওয়াজ শুনিয়াই যেন তাহাদের দিল্ ঘাবড়াইয়া যায়!

ঠিক পাঁচটার সময় আড়তের চারিধারেই গোলমাল উঠিল এবং কয়েক জন মুসলমান আড়তের হাতার মধ্যে প্রবেশ করিল। মজুমদারের শিক্ষামত তাহাদিগকে পাওনাদার মনে করিয়া কর্ম্মচারীরা একসঙ্গে পাঁচটি থলির টাকা ঢালিয়া ফেলিল,—টাকার গম্ভীর ঝম্ ঝম্ শব্দে আড়ত মুখর হইয়া উঠিল। আর যায় কোথায়, দেখিতে দেখিতে পঙ্গপালের মত লাঠি, শড়কি, শাবল, ভোজালি, তরবারি, টাঙ্গি প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত গুণ্ডার দল আড়তে প্রবেশ করিয়া মজুমদারের সযত্নে সংগৃহীত অর্থরাজি লুঠ করিতে লাগিল!

৯

আগা খাঁর হত্যা কাশীর সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার মূলতত্ত্ব হইলেও এক দল মুসলমান গুণ্ডাই যে দাঙ্গাহাঙ্গামার সৃষ্টি করিয়াছিল এবং মুসলমানপ্রধান স্থানে প্রবল হইয়া হিন্দুদের যাবতীয় দোকান, দেবায়তন প্রভৃতি লুণ্ঠন করিয়াছিল, বহু হিন্দুকে লাঞ্ছিত ও হতাহত করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহের অবকাশমাত্র ছিল না। বাঙ্গালীটোলা ও অন্যান্য স্থানের সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রবল হিন্দুসঙ্ঘও দলবদ্ধ হইয়া স্ব স্ব মহল্লার রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া, বিপন্ন হিন্দু-সমাজের সহায়তার জন্য উত্তেজিত হইয়া উঠে। পক্ষান্তরে, আলাইপুরা ও তৎসন্নিহিত সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান-সঙ্ঘ এই সব অঞ্চলের অবরুদ্ধ মুসলমানদের সাহায্যকল্পে আসিবার জন্য পাঁয়তারা করিতে থাকে। ঠিক এই সময় সৈন্যদল ও প্রচুর পুলিসবাহিনী সংযোগস্থলসমূহে সমবেত হইয়া উভয়পক্ষকেই নিরস্ত করে। ফলে মুসলমান-প্রধান স্থানসমূহে মুসলমানগণ যেমন অত্যাচার চালাইতেছিল, হিন্দু-প্রধান স্থানসমূহে হিন্দুগণও তেমনই তাহার পাল্টা জবাব দিতেছিল। ইহাদেরই মধ্যে ন্যায়নিষ্ঠ, সত্যাশ্রয়ী হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই বিপন্নগণকে যথাশক্তি সাহায্য ও তাহাদের রক্ষার জন্য প্রাণপণে সচেষ্ট হইয়াছিলেন।

বেনিয়া পার্কের সন্নিহিত পল্লীগুলির অধিকাংশই মুসলমান-প্রধান এবং এক দল মুসলমান গুণ্ডা হাঙ্গামার সূচনার সঙ্গে সঙ্গে চেৎগঞ্জ হইতে বেনিয়া পার্ক পর্য্যন্ত স্থানে সমবেত হইয়া ষ্টেশন হইতে সমাগত যাত্রীদের মালপত্র লুণ্ঠন ও নিষ্ঠুরভাবে নির্য্যাতন করিতেছিল। আবদুল ও ভগুল আসিয়া গাঙ্গুলী মহাশয়কে জানাইল,—"আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন গাঙ্গুলী বাবু, আপনার কোনও ডর নেই।"

গাঙ্গুলী মহাশয় বলিলেন,—"যদি আমাকে নিশ্চিন্ত করিতে চাও আবদুল, তা হ'লে তুমি তোমার দলবল নিয়ে বাগানের মোড়ে মওড়া নাও,—নিরীহ যাত্রীদের রক্ষা কর।" গাঙ্গুলী মহাশয়ের কথা শেষ হইতে না হইতে বাগানের মোড়ে রাস্তার উপর এক দল গুণ্ডা হল্লা করিয়া উঠিল,—লাঠির ঠকাঠক শব্দ উঠিল,—দেখা গেল,—একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ীকে ঘিরিয়া এক দল গুণ্ডা গাড়ীর উপর লাঠি চালাইতেছে। আবদুল বাহিরে

আসিয়া জোরে একটা আওয়াজ দিতেই লাঠি হাতে বিশ পঁচিশ জন জোয়ান ছুটিয়া আসিল, তাহাদের মধ্যে ভণ্ডুল ও কয়েক জন আত্মীয়ও ছিল।—আবদুলের সহিত সকলেই অকুস্থলে ছুটিয়া চলিল, গাঙ্গুলী মহাশয়ও ছুটিলেন।

অকুস্থলে গিয়া দেখা গেল, ঘোড়াটা জখম হইয়া গিয়াছে, গাড়ীর নানাস্থান ভাঙ্গিয়াছে, হিন্দু গাড়োয়ান ও তাহার সঙ্গী সাংঘাতিকরূপে জখম হইয়াছে। গুণ্ডার দল তখন ঘোড়ার মুখ ধরিয়া গাড়ী থামাইয়াছে, গাড়ীর ভিতরে এক জন সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধ মাড়োয়ারীর উপর ছোরা চালাইয়া, দুই জন গুণ্ডা সালঙ্কৃতা মাড়োয়ারী মহিলা ও তাহার শিশু পুত্রটিকে টানিয়া বাহিরে আনিতেছে। ঠিক এই সময় আবদুলের দল আসিয়া তাহাদের ঘিরিয়া ফেলিল। আবদুল ও ভণ্ডুলকে দেখিয়াই গুণ্ডারা সেলাম বাজাইল।

আবদুল কি একটা ইসারা করিতেই তাহারা সদলবলে ঝড়ের মত চলিয়া গেল। গাঙ্গুলী মহাশয় ভণ্ডুলের সহায়তায় মাড়োয়ারী মহিলা ও তাহার ছেলেটিকে নিজের বাড়ীতে লইয়া গেলেন,—নারায়ণীর হাতে তাহাদের শুশ্রূষার ভার দিয়া, পুনরায় যথাস্থানে আসিয়া দেখিলেন, বৃদ্ধের অবস্থা সাংঘাতিক, গাড়োয়ান ও তাহার সঙ্গী দুই জনেরই মাথা ফাটিয়াছে, হাত ভাঙ্গিয়াছে, রক্তে রাস্তা ভিজিয়া গিয়াছে। সে ভয়াবহ দৃশ্য দেখিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। গাড়ীতে যে মালপত্র ছিল, তাহাও রক্ষা পাইয়াছিল। ভণ্ডুলের জিম্বায় সে সব দিয়া, গাঙ্গুলী মহাশয় আহতদিগকে সেই গাড়ীতেই কবিরচৌড়ায় সরকারী হাঁসপাতালে লইয়া চলিলেন। আবদুল ও কয়েক জন আত্মীয় সঙ্গে চলিল, আবদুলের এক অনুচর ঘোড়ার মুখ ধরিয়া কোনরূপে গাড়ীখানিকে টানিয়া লইয়া চলিল। হাঁসপাতালে গিয়া দেখা গেল, অত বড় বাড়ী এই ব্যাপারে একবারে পরিপূর্ণ,—যেন যুদ্ধের হাঁসপাতালে পরিণত হইয়াছে। অতিকষ্টে আহতদের জন্য যথাসম্ভব সুব্যবস্থা করিয়া দিয়া, গাঙ্গুলী মহাশয় গাড়ী-ঘোড়া হাঁসপাতালের জিম্বাতেই রাখিয়া দিলেন। তাহার পর পুনরায় বৃদ্ধ মাড়োয়ারীর শয্যার নিকট গিয়া আশ্বাস দিয়া বলিলেন,—"আমি বাঙ্গালী, আপনি তাঁদের জন্য উদ্বিগ্ন হবেন না। প্রাণ দিয়েও আমি তাঁদের রক্ষা করব, তাঁরা আমার বাড়ীতেই আছেন।—আমি নিত্য এসে আপনার সন্ধান নেব।"

বৃদ্ধ সাংঘাতিকভাবে বক্ষে জখম হওয়ায় বাক্‌শক্তি হারাইয়াছিলেন। তিনি অশ্রুপূর্ণলোচনে গাঙ্গুলী মহাশয়ের প্রশান্ত মুখখানির উপর গভীর মর্ম্মস্পর্শী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন মাত্র।

মাড়োয়ারী মেয়েটির দেহে যদিও কোন আঘাত পড়ে নাই, কিন্তু সেই ভয়াবহ ব্যাপারে সে এতদূর ভয়াতুরা হইয়া পড়িয়াছিল যে, ঘন ঘন তাহার মূর্চ্ছা হইতেছিল, ছেলেটি যদিও ছেলেদের দলে মিশিয়া গিয়াছিল, কিন্তু মায়ের অবস্থা দেখিয়া সেও মাঝে মাঝে কাঁদিতেছিল। নারায়ণী একখানি স্বতন্ত্র ঘরে তাহাদের শয্যা পাতিয়া দিয়া স্বহস্তে সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

পাঁচদিনব্যাপী ভয়াবহ দুর্যোগের পর শান্তির হাওয়া বহিল। নেতৃবর্গের উপস্থিতি, স্থানীয় সম্ভ্রান্ত হিন্দু-মুসলমানদের চেষ্টা এবং খোদাইচৌকীর সুযোগ্য দারোগার অক্লান্ত পরিশ্রমে উভয় পক্ষই শান্ত সংযত হইল।

হনুমান-ফটকায় হিন্দুর যে সব দোকান ও আড়ত ছিল, তন্মধ্যে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল মজুমদার মহাশয়ের সুবৃহৎ ব্যবসায়। নগদ ১০ হাজার টাকা ত প্রথম দিনেই লুণ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার পর দোকানের সমস্ত মালপত্র, শত শত ঘৃতপূর্ণ টিন, কাপড়ের বড় বড় বস্তা—সমস্তই প্রকাশ্য দিবালোকে লুঠ হইয়া যায়। তৃতীয় দিনে দোকানের আফিস-ঘর ও গুদামে গুণ্ডারা অগ্নি সংযোগ করিয়া দেয়,—ফলে আফিসের কাগজপত্র, হাতচিঠা, খাতা, খতিয়ান, চেয়ার, টেবল, আলমারি প্রভৃতি সমস্তই ভস্মীভূত হইয়াছিল। নগদ টাকাগুলি লুণ্ঠনকারীদের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য মজুমদার মহাশয় ও তাঁহার লোকজন মরিয়া হইয়া উঠিলেও, গুণ্ডাদের সংখ্যাধিক্যে লাঞ্ছিত ও প্রহৃত হইয়াছিলেন। মজুমদার মহাশয়ের মাথায় একটা বড় রকমের চোটও লাগিয়াছিল। আহত অবস্থায় যখন তিনি বাড়ীতে নীত হন, তখন তাঁহার সংজ্ঞা ছিল না। লোকজনের মুখে সবিশেষ শুনিয়া, নিরুপমা কপালে করাঘাত করিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। স্বামীর সাংঘাতিক অবস্থা অপেক্ষা সর্ব্বস্বনাশের দুশ্চিন্তা তাহাকে অধিকতর মুহ্যমান করিয়া ফেলিয়াছিল!

১৭

মাড়োয়ারী মহিলাটি ক্রমে সুস্থ হইয়া প্রকাশ করিলেন যে, গাড়ীর ভিতরে যে বৃদ্ধটির উপর গুণ্ডারা ছোরা চালাইয়াছিল, তিনি তাঁহার পিতা। বিকানীর হইতে পিতার সহিত একমাত্র পুত্রকে লইয়া কাশীতে তিনি সেই দিনই আসিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি আর কখনও কাশীতে আসেন নাই। তাঁহার স্বামী কাশীতেই কারবার করেন। তাঁহার ঠিকানা পিতার জানা আছে, মহিলাটি সে সম্বন্ধে কিছুই জানেন না।

সেই দিন সহরে শান্তির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। পাঁচটি দিন পরে কাশীবাসী মুক্তবাতাসে বাহির হইয়া নিশ্বাস ফেলিয়া

...য়াছে। সে দিন আবার শিবরাত্রির পর্ব্ব!—অন্যান্য বৎসর ...দিন বারাণসী আনন্দোৎসবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত—...খ্য ভক্তসমাগমে শিবপুরী যেন টলমল করিত, এবার সে ...াস নাই,—পরিত্যক্ত নগরীর মত সবই যেন নিঝুম, নিস্তব্ধ!

গাঙ্গুলী মহাশয় আবহুলকে লইয়া হাঁসপাতালে সেই ভদ্র-লোকটির সংবাদ লইতে চলিলেন। হাঁসপাতালের বিস্তৃত প্রাঙ্গণ ...জ আহতদের পরিজনে পরিপূর্ণ। বহু চেষ্টার পর সেই ভদ্রলোকটির শয্যার নিকট গিয়া, পরিচিত এক ধনাঢ্য মাড়োয়ারীকে সেই স্থানে উপস্থিত দেখিয়া গাঙ্গুলী মহাশয় চমকিয়া উঠিলেন। এই মাড়োয়ারীটি তাঁহার বিশেষ পরিচিত, বহু লক্ষ টাকার কারবার ইহার সহিত হইয়া গিয়াছে, শেষে তাঁহার দুর্দিন যখন ঘনাইয়া আসে, হাজার পনের টাকার জন্য তাঁহার এই পুরাতন মহাজনই প্রথম নালিশ করিয়া তাঁহার বসত-বাটীখানি নীলামে তুলেন ও শেষে কৌশলপূর্ব্বক নিজেই দেনার টাকাটুকুতেই ডাকিয়া লন। গাঙ্গুলী মহাশয়কে দেখিয়াই মাড়োয়ারী মহাশয়টি বলিয়া উঠিল, "রাম, রাম, বাবুসাহেব, কি হালচাল আছে?"

গাঙ্গুলী মহাশয় গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, "দেখতেই পাচ্ছেন, হালচালের ঘটা!"—এই লোকটির কাছে দাঁড়াইতেও তাঁহার অমন প্রশান্ত মনটিও যেন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল,—শয্যাশায়ী সেই মুমূর্ষু বৃদ্ধটির মুখের দিকে একটিবারমাত্র চাহিয়াই তিনি চলিয়া আসিলেন। বাহিরের দালানে আসিয়া সবে মাত্র দাঁড়াইয়াছেন, এমন সময় সেই মাড়োয়ারী ভদ্রলোকটি ঝড়ের মত বেগে ছুটিয়া আসিয়া একবারে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া আর্ত্তস্বরে ডাকিল—'বাবুজী!'

গাঙ্গুলী মহাশয় স্তব্ধ হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মাড়োয়ারী গাঢ়স্বরে বলিল, "ঐ ভদ্রলোকটি আপনাকে ডাকছেন—যাকে আপনি গুণ্ডাদের হাত থেকে রক্ষা ক'রে এইখানে ভর্ত্তি ক'রে দিয়ে গেছেন। আসুন একবার অনুগ্রহ ক'রে—"

বৃদ্ধের তখনও বাক্‌শক্তি ফিরিয়া আসে নাই। গাঙ্গুলী মহাশয়কে দেখিবামাত্র দুই চক্ষু তাঁহার জলে ভরিয়া গেল। হাত দুটি তাঁহার তখনও ব্যাণ্ডেজ করা ছিল, হাত তুলিতে না পারিলেও দুই চক্ষু ও কম্পিত ওষ্ঠ নীরবে যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছিল, তাহা কাহারও দুর্ব্বোধ্য ছিল না।

মাড়োয়ারী ভদ্রলোক গাঙ্গুলী মহাশয়ের দুইটি হাত ধরিয়া সাশ্রুনয়নে বলিতে লাগিলেন,—"ইনি আমার শ্বশুর। ...হা ত এঁর দেখতে পাচ্ছেন। এতক্ষণে অন্ধকারেই ছিলুম,—আভাসে কোন রকমে ইনি আমাকে দুর্ঘটনাটি জানিয়েছেন। আপনি সেই সময় হঠাৎ এসে পড়াতেই ইনি জানালেন যে, দেবদূতের মত আপনি কি কাণ্ডই না আমাদের জন্য করেছেন।—এখন বলুন বাবুসাহেব, দোহাই আপনার, দয়া ক'রে বলুন—আমার স্ত্রী—আমার—তারা—"

গাঙ্গুলী নিজের বিস্ময়ভাব অতি কষ্টে সংযত করিয়া সহজ-ভাবেই উত্তর দিলেন,—"তাঁদের জন্য আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আমি যদি তাঁদের কাছে সঠিক ঠিকানা পেতুম, তা হ'লে সেই দুর্য্যোগ মাথায় ক'রেই তাঁদের আপনার বাড়ীতে পৌঁছে দিতে পারতেম। কিন্তু আমার স্ত্রীর কাছে তিনি আপনার যে নাম বলেছিলেন—"

মাড়োয়ারী ব্যগ্রতার সহিত বলিল,—"সে নামের সঙ্গে ত আপনার পরিচয় নেই, বাবুসাহেব! আমাদের বাড়ীতে এক নাম, আবার কারবারক্ষেত্রে আলাদা নাম যে!—এখন আমার আর্জ্জী শুনুন। শিবরাত্রির মধ্যেই এঁদের আসবার কথা ছিল। বিকানীর থেকে রওনা হবার দুদিন আগেই চিঠি দিয়েছিলেন। তার পর আগ্রা ষ্টেশন থেকে তারও করেছিলেন। সেই চিঠি আর তার এত দিন পাইনি। আজ সকালে সিটি পোষ্ট আফিসে গিয়ে খুঁজে পেয়েছি। বুঝতেই পারছেন, আমার হাল তখন কি হয়েছিল! আমার মত এমনই অবস্থায় যাঁরা যাঁরা পড়ে-ছিলেন, হাঁসপাতালে খবর নেওয়া ভিন্ন আর উপায় ছিল না। প্রথমে ছুটি—মাড়োয়ারী হাঁসপাতালে, তার পর এখানে আসি। এঁকে দেখেই যেন একবারে আসমান থেকে পড়লুম। একটি ঘণ্টা কাছে ব'সে, এঁর এই অবস্থাতেও—হাল কতকটা মালুম হই। তার পর আপনি এসে উপস্থিত হন। বাবু সাহেব! বাবু সাহেব! আপনাকে আর কি বলব,—আপনার কাছে আমি বেইমান,—আপনার সর্ব্বনাশ করেছি আমি—তাই আপনি আমাকে দেখেই মুখ ফিরিয়ে চ'লে যাচ্ছিলেন,—ঠিক সেই সময় শ্বশুর সাহেব আমাকে ব্যগ্র হয়ে আপনাকে ডাকতে বললেন—তাঁর হাল-চাল দেখে বুঝলুম—আপনি—আপনি বাবু সাহেব—সেই লোক আপনি, আমার জান্ মান সর্ব্বস্ব যিনি বাঁচিয়েছেন!"

মাড়োয়ারী মহাজনের আর্ত্তস্বরে অভিভূত হইয়াই গাঙ্গুলী মহাশয় বলিলেন, "বাঁচাবার মালিক যিনি, তিনিই বাঁচিয়েছেন। আমি তাতে উপলক্ষ হয়েছি মাত্র। যাক্, এখন আপনি আমার বাসায় চলুন,—তাঁরা অধৈর্য্য হয়ে উঠেছেন।"

মাড়োয়ারী মহাজন বদরীনারায়ণ বাসার বাহিরের ঘর-খানিতে উঠিয়াই বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "এই আপনার বাসা, বাবু সাহেব?"

গাঙ্গুলী মহাশয় অবিচলিত স্বরে বলিলেন, "নারায়ণজী এখন এইখানেই এনে ফেলেছেন বটে! আমি এই ঘরটিতেই বাসা নিয়েছি।"

বদরীনারায়ণ এক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া রহিল। তার পর গাঢ়স্বরে বলিল, "আপনি তাকে যখন রক্ষা করেছেন, তার বাপ হয়েছেন, সে ত আপনার মেয়ে। শুধু তাই নয়, আপনি এখন থেকে আমারও বাবা—"

গাঙ্গুলী মহাশয় মেয়েকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, "ওঁদের বল, মাড়োয়ারী বাবু এসেছেন। তাঁদের সঙ্গে দেখা করবেন।"

একটু পরেই মেয়ে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "আপনি আমার সঙ্গে আসুন।"

* * *

প্রায় অর্দ্ধ-ঘণ্টা পরে বদরীনারায়ণ বাহিরের ঘরে আসিয়া হঠাৎ গাঙ্গুলী মহাশয়ের পা দুইখানি চাপিয়া ধরিয়া ভাব-গদ্‌গদ-স্বরে বলিয়া উঠিল, "বাবু সাহেব! আমাকে রক্ষা করুন!"

ব্যস্তভাবে গাঙ্গুলী মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "করেন কি আপনি—উঠুন, উঠুন!"

বদরীনারায়ণ বলিতে লাগিল, "এঁদের কাছে যা শুনলেম, আর চোখেও যা দেখলেম, তাতে জেনেছি বাবু সাহেব! আপনি মানুষ নন, দেবতা; আর আপনার স্ত্রী—স্বয়ং মা অন্নপূর্ণা! আপনি এঁদের রক্ষা করেছেন, আশ্রয় দিয়েছেন, একটি জিনিসও তছরুপ হতে দেননি! ঐ তোরঙ্গটির ভেতর নোটে টাকায় পঞ্চাশটি হাজার—"

হাসিয়া গাঙ্গুলী মহাশয় বলিলেন, "তা আমি জানি। মা-লক্ষ্মী নিজেই তা ব'লে রেখেছিলেন যে! আর সেই জন্যই ভাবনা আমার আরও বেশী হয়েছিল, বদরীনারায়ণজী! নারায়ণ আমার মুখ রক্ষা করেছেন।"

হাত দুইখানি যুড়িয়া, চক্ষু অশ্রুসিক্ত করিয়া বদরীনারায়ণ এবার বলিল, "এক আর্জ্জী আপনাকে রক্ষা করতে হবে, বাবু সাহেব! নইলে আমি এখান থেকে উঠব না।"

তাহার মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া গাঙ্গুলী মহাশয় বলিলেন,—"বলুন।"

আপনার সাবেক বাড়ীখানি প'ড়ে আছে। কোন ভাড়াটে সে বাড়ীতে তিষ্ঠাতে পারে নি। আপনি আবার আপনার বাড়ীতে চলুন।"

"সে বাড়ীতে যাবার মত অবস্থা আমার এখনও আসেনি, বদরীনারায়ণজী! তবে যদি দিন পাই, আর আপনি তখন সদয় থাকেন, বাড়ী তখন ফিরিয়ে নেব।"

বদরীনারায়ণ এবার অধৈর্য্যভাবে বলিয়া উঠিল,—"আপনি সদয় হয়ে এখনই সেটা ফিরিয়ে নিন, বাবুসাহেব! আমাকে বাঁচান। ঐ বাড়ী নিয়ে অবধি আমি কারবারে মার খাচ্ছি, এ দিকেও জানে মরতে বসেছি।—এতে টাকার কথা কিছু নেই, বাবুজী!"

গাঙ্গুলী মহাশয় মর্ম্মস্পর্শী দৃষ্টিতে বদরীনারায়ণের মুখের দিকে তাকাইতেই সে সেই দৃষ্টির অর্থ বুঝিয়া বলিল,—"সে স্পর্দ্ধা আমি করি না বাবু সাহেব, যে আপনাকে খয়রাত করব! আমি আপনাকে চিনি।—আপনি আমাকে ঐ টাকার হাতচিঠি বানিয়ে দিন—মাসে মাসে যা পাবেন দেবেন,—আমি কিন্তু কালই বিক্রীর কোবালা রেজেষ্টারী ক'রে দেব। বলুন, এতে আপনার আপত্তি নেই?"

গাঙ্গুলী মহাশয় পারিপার্শ্বিক অবস্থা বুঝিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—"বিশ্বনাথের যদি এই ইচ্ছাই হয়,— হবেও তাই।"

* * *

শিবরাত্রির ছুটীর পর রেজিষ্টারী আফিস খুলিতেই বদরী-নারায়ণ মাড়োয়ারী প্রতাপ গাঙ্গুলীর নামে তাঁহার সেই সাবেক বাড়ীখানির বিক্রয়পত্র সম্পাদন করিয়া দিল।—গাঙ্গুলী মহাশয়ও এক হাতচিঠিতে টাকাটা তুলিয়া দিলেন।

বদরীনারায়ণ হাতচিঠাটি হাতে লইয়া হাসিয়া বলিল,—"এই জিনিষটি সে দিনের স্মরণচিহ্নের মত আমার স্ত্রীর সেই তোরঙ্গের মধ্যেই তোলা থাকবে। বাইরের কেউ এর হদীস পাবে না। তার পর আমার স্ত্রীর যা ইচ্ছা হবে, সে তার মা-বাপের জন্যে তাই করবে। তা ছাড়া আমার তরফ থেকে আমি আপনাকে অনুরোধ করছি,—আবার আপনি কারবার সুরু করুন। আমার কারবার আপনাকে চোখ বুজিয়ে মাল দিয়ে যাবে। আমি চাই, আপনি আবার দাঁড়িয়ে ওঠেন, আপনার খ্যাতি আবার ফিরে আসে।"

* * *

সাবেক বাড়ীতে গাঙ্গুলী পরিবার আবার প্রত্যাবর্ত্তন করায় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কারবারটিও আত্মপ্রকাশ করায়, সহরময় পুনরায় আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল এবং তখন নিন্দুকরাও বলিতেছিল,—গাঙ্গুলীর স্ত্রীর ভাগ্যেই এটা হ'ল! —দুর্ভাগ্যের অচ্ছেদ্যজালে বিজড়িত হইয়া মজুমদার-গৃহিণী নিরুপমাও তখন সমস্ত শুনিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিতেছিল —নারায়ণীর অদৃষ্ট!

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৭

এলাচি খেলা

পুরুষের ভাগ্য এবং স্ত্রীলোকের চরিত্র দেবতাদেরই জানা নাই, মানুষের অজ্ঞেয় ত বটেই। কত মানুষ সামান্য অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিয়া কত উন্নতিসাধন করিতেছে;—বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, ধর্ম্মনিষ্ঠায়, ঈশ্বরজ্ঞানে কত উন্নতিলাভ করিতেছে, আর কত কুলাঙ্গার ঈশ্বরপরায়ণ, ধর্ম্মভীরু, উন্নতমনা বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া সেই বংশমর্য্যাদাকে উচ্চস্থান হইতে টানিয়া আনিয়া পঙ্কে ডুবাইয়া দিতেছে। এইরূপ হইবার কারণ নিরাকরণ করা অসম্ভব। মানুষ যেখানে বিচারের দ্বারা কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারিবে না, সেইখানেই ভাগ্যের দোহাই দিবে। ভাগ্যের দোহাই দেওয়া আর কারণ-নির্দ্দেশের অক্ষমতা এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য নাই।

কন্দর্প আচার্য্য কলিকাতার এক বিখ্যাত পল্লীতে আচার্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। চরম উৎকর্ষের পূর্ব্বতন ভাবের মতে আচার্য্যবংশে ১২ মাসে ১৩ পার্ব্বণ হইত। ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও অপর অপর জনসাধারণের সেবার জন্য এই বংশ বিশেষ বিখ্যাত ছিল। পল্লীস্থ অভুক্তদের দৈনিক সেবার অবস্থার সংবাদ না লইয়া কর্ত্তা ও গৃহিণী কখন জলগ্রহণ করিতেন না। তাঁহাদের পরিচিত বা অপরিচিত প্রতিবাসী এক জনও অভুক্ত থাকিলে, তাঁহারা তাহাকে ভোজন করাইয়া, তবে নিজেরা ভোজন করিতেন। এই বংশের দানের কথা অনেক শুনা যায়। তাঁহারা গোপনে দুঃস্থের দুঃখ হরণ করিতেন, অভাবগ্রস্তের অভাব মোচন করিতেন। নিঃশব্দে দানকার্য্য হইত। যাহাকে দান করিতেন, সেই-ই দানের কথা জানিত, অন্য কেহ জানিত না। এক টাকার বিজ্ঞাপন জারি করিয়া আধ পয়সার দান দিতেন না। গুপ্তদান মহাপুণ্য, এ কথার সারবত্তা আচার্য্য-বংশের লোক বুঝিয়াছিলেন।

সেই আচার্য্য-বংশের যশোরবি যখন সেই বংশের শিরোপরি বিরাজিত হইয়াছিল, সেই সময়ে এক দিন কন্দর্প আচার্য্য জন্মগ্রহণ করিল। অতি সুপুরুষ ছিল বলিয়াই পিতামাতা ও আত্মীয়রা তাহার নাম রাখিলেন কন্দর্প। সে বাস্তবিকই কন্দর্পবৎ রূপবান্ ছিল।

আচার্য্য-বংশের যে শুধু সুনাম ছিল, তাহা নহে, তাঁহাদের সম্পত্তিও যথেষ্ট ছিল। যে পল্লীতে তাঁহারা বাস করিতেন, সেই পল্লীর অনেকগুলি বাটী, বস্তি ও ভূসম্পত্তি তাঁহাদেরই ছিল। মোটের উপর অন্যত্র অপর আচার্য্য-পরিবার থাকিলেও আচার্য্য-গোষ্ঠীর কথা হইলেই, সাধারণে এই আচার্য্য-পরিবারের কথা বলিয়া ধরিয়া লইত। সৎ ও উচ্চবংশে কেহ জন্মগ্রহণ করিলে, সেই লোকের অনেক সুবিধা হয়। প্রথমতঃ মানুষ ধরিয়া লয় যে, উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করা হেতু তিনিও এক জন উচ্চমনা ও উচ্চকর্ম্মে অভ্যস্ত ব্যক্তি। সাধারণতঃ নীচকর্ম্ম করা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব। যেমন নিঃস্ব বংশে জন্মগ্রহণ করিলে মানুষের অনেক অসুবিধা, প্রথম হইতেই ধরিয়া লওয়া হয়, সে ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত, সেই কারণে অন্যায় কার্য্য করিতেও পশ্চাৎপদ হইবে না।

জন্মগ্রহণের পর হইতেই উচ্চ সম্ভ্রান্তবংশীয় বালকদের সহিতই কন্দর্পের বন্ধুত্ব হইতে লাগিল। বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাসকালেও উচ্চবংশীয় বালকদের সহিত তাহার মেলামেশা। এই সব সুবিধা সত্ত্বেও পাঠ্যাবস্থায় কতকগুলি নীচমনা যুবকের সহিত তাহার আলাপ হইল এবং আলাপসূত্রে কতকটা ঘনিষ্ঠতা জন্মিল। এই সব যুবকের মধ্যে এক জন যুবক ধনী জুয়াড়ির বংশধর। ঘনিষ্ঠতা হেতু সে জুয়ার অমোঘ ও ঐন্দ্রজালিক শক্তির কথা তাহার নিকট হইতে অবগত হইতে লাগিল এবং কন্দর্প মনে মনে স্থির করিল, অর্থ উপার্জ্জনের ইহা একটি বিস্তৃত পথ। যদিও সাধারণতঃ লোক বলে, "যেমন বীজ, তার তেমনই গাছ," কন্দর্পের পক্ষে কিন্তু এ কথাটি খাটিল না। উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ সত্ত্বেও বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার মতিগতি অতিশয় নীচপথগামী হইল। সময়ে বা অসময়ে কন্দর্পের পিতার মৃত্যু হইল। কন্দর্প আচার্য্য-বংশের সম্পত্তির ও সুনামের প্রতিনিধির স্থান অধিকার করিল। কিন্তু তাহার নীচ প্রবৃত্তিগুলি তাহাকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়াছিল। সেই কারণে আচার্য্যবংশের প্রতিনিধি হইয়াও ঐ বংশের উন্নতমনের অধিকারী সে হইল না।

যদিও আচার্য্যবংশের বাসবাটী কলিকাতার এক পল্লীতে, কিন্তু তাহাদের পুরাতন বাসস্থান কলিকাতার বাহিরে বল্লভপুর উপনগরে। কন্দর্প কখনও সেখানে থাকে, কখনও কলিকাতার থাকে।

তাহার এক বন্ধু জুটিল, তাহার নাম সর্ব্বভুক্। পাটনা নগরে তাহার জন্মস্থান। উচ্চবংশে সে জন্মগ্রহণও করিয়াছিল, কিন্তু নিজ দোষে তাহার সমস্ত প্রবৃত্তি নীচগামী হইয়াছিল। তাহার পিতার মৃত্যুর পর সে অনেক অর্থের মালিক হইয়াছিল।

কিন্তু প্রবৃত্তির অগ্নিতে সমস্ত সম্পত্তি ইন্ধন দিয়া সে রিক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। যে সময়ে সে কন্দর্পের বন্ধুরূপে আবির্ভূত হইল, তখন তাহার কিছুই ছিল না। ছিল কেবল পূর্ব্ব-স্মৃতি আর আত্মগ্লানি। জুয়া খেলিয়াই এই সমস্ত সম্পত্তি সে নিঃশেষ করিয়াছিল। অন্য লোক তাহাকে প্রতারণা করিয়া তাহার যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিয়া লইয়াছিল। সুতরাং তাহার মন মনুষ্য-জাতির প্রতি বিরূপ হইয়াছিল। মানুষমাত্রকেই সে শত্রু বলিয়া মনে করিত। সে সংকল্প করিয়াছিল, অপরকে প্রতারণা করিয়া ধ্বংস করিলে তাহার কোন অপরাধ হইবে না; বরং প্রতিশোধ লওয়া হইবে।

এই মনোবৃত্তির দ্বারা প্রভাবিত হইয়া সে কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিল এবং কন্দর্পের উপর তাহার চোখা চোখা বাণ নিক্ষেপ করিল। অপরিণামদর্শী কন্দর্প শ্যেনদৃষ্টি সর্ব্বভুকের কাছে কতক্ষণ টিকিবে? কাযেই সর্ব্বভুক্ ও তাহার শ্রেণীস্থ লোকের হাতে পড়িয়া কন্দর্প যথাসর্ব্বস্ব হারাইল।

শ্রীভ্রষ্ট ও সর্ব্বভ্রষ্ট হইয়া তাহারা উভয়ে মিলিয়া এক "নওসেরিয়া" দল সৃষ্টি করিল। এ দলে অনেকগুলি লোকের প্রয়োজন—বৈঠক অর্থাৎ রাজা, খাতাঞ্চী, ম্যানেজার, Try-man অর্থাৎ যে লোক বৈঠকের কাছে আসিয়া সর্ব্বপ্রথম খেলার প্রস্তাবনা করে, বৈঠককে সর্ব্বপ্রথম তাহার ভাগ্য পরীক্ষা করিতে উত্তেজিত করে, দালাল অনেকগুলি করিয়া দরকার। Trymanও একের অধিক প্রয়োজন, কেন না, এক লোক ক্রমান্বয়ে এ কার্য্য করিলে লোকের সন্দেহ উদ্রেক করিতে পারে। প্রত্যেক দলে দুই জন কিম্বা তিন জন করিয়া Tryman থাকে। চার জন কি পাঁচ জন করিয়া দালাল থাকে। ম্যানেজারও সময়ে সময়ে একের অধিক থাকে, বৈঠকও সময়ে সময়ে একের অধিক থাকে।

জুয়া অনেক রকম আছে। বিভিন্ন দল বিভিন্ন নামে আখ্যাত হয়। সাধারণতঃ এই দলগুলিকে "নওসেরিয়া" দল বলে, অর্থাৎ একশত রকম জুয়াচুরির ফন্দী। নওসেরিয়া দলের মধ্যে একশত প্রকার জুয়ার পদ্ধতি আছে।

আজ এই প্রবন্ধে যে জুয়ার কথা বলিব, তাহা এলাচি খেলা বা Chinese Table Race নামে অভিহিত। এলাচি খেলা আর Chinese Table Raceএর মধ্যে তফাৎ এই যে, এলাচি খেলায় ঘুঁটিগুলির পরিবর্ত্তে এলাচি ব্যবহার হয়, আর Chinese Table Raceএ ছোট ছোট কাচের বিড (Bead) ব্যবহৃত হয়। নওসেরিয়া দলের খেলার মধ্যে পিতলকে স্বর্ণ বলিয়া চালান, কাগজের একখানি নোটকে তাহা অধিকতর মূল্যবান্ করিবার ভানে যে ঠকান হয়, তাহাকে সচরাচর Note-doubling trick খেলা বলে।

প্রায় দেখা যায়, এলাচি খেলা বা কাচের বিডের ঘোড়দৌড় খেলায় যাহারা সিদ্ধহস্ত, তাহারা জীবনের প্রথম সময়ে ভদ্র-বংশজাত, শিক্ষিত ও বিত্তসম্পন্ন, পরে তাহাদের অপেক্ষা অধিকতর ধূর্ত্ত লোকের হস্তে হৃতসর্ব্বস্ব। বাল্যকাল হইতে সুখে লালিত-পালিত, অল্পশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত, পরে বিত্তহীন, এরূপ অবস্থায় আর অন্য কিছু কর্ম্ম করিতে অনভিজ্ঞ হেতু যে খেলায় তাহারা নিজে হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াছে, সেই খেলাকেই জীবনের অপর ভাগে গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় বলিয়া অবলম্বন করে।

এই সব দলে যাহারা রাজা সাজে, তাহারা সকলেই সুপুরুষ ও সুন্দর। কন্দর্প তাহার দলের রাজা বা বৈঠক ছিল, সর্ব্বভুক্ সেই দলের ম্যানেজার। দলের সব লোকই খুব চালাক, এবং বাল্যকাল হইতে অপর কোন পেশা না শিখিয়া যে খেলায় তাহারা সব হারাইয়াছে, সেই খেলার দ্বারাই জীবিকা উপার্জ্জন করিয়া লয়। ইহাদের ম্যানেজারের (সর্ব্বভুক্) সহিত আমার একবার কথাবার্ত্তা হয়। কথোপকথনে জানিলাম, লোকটি ভদ্রবংশজাত, মোটামুটি শিক্ষিত, এক সময়ে বিত্তশালী ছিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার এ প্রবৃত্তি কেন হইল?" তাহাতে সে ব্যক্তি উত্তরে আমায় বলিল, "মহাশয়, প্রবাদবাক্য আছে, 'যে মাটীতে পড়ে লোক, উঠে তাই ধ'রে,' আমিও তাহাই করিয়াছি। ভদ্রসন্তান, অন্য কোন কাযকর্ম্ম শিখি নাই, অল্প-বয়স হইতেই জুয়া খেলিয়া সব হারাইয়াছি। জীবনযাপনের অন্য কোন উপায় জানি না, কাযেই যে ক্রীড়ায় হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াছি, সেই ক্রীড়ার দ্বারাই অপরকে বিত্তহীন করিয়া নিজের গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতেছি। এইরূপ ক্রীড়া অন্যায় ও বে-আইনী বলিতে পারেন, কিন্তু তাহা অপেক্ষা অধিক কিছু বলিতে পারেন না। কারণ, উদ্দেশ্য দুপক্ষেরই মহৎ। প্রত্যেক পক্ষই অপর পক্ষকে ঠকাইবার জন্য ব্যস্ত। সকল ধর্ম্মই বলে, পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিবে। বিনা পরিশ্রমে এক পক্ষকে ঠকাইয়া অর্থার্জ্জনকে সৎ অবলম্বন কখনই বলা যাইতে পারে না। যে আমার সহিত খেলিতে আসিতেছে, তাহারও উদ্দেশ্য ফাঁকি দিয়া অর্থোপার্জ্জন করা। এই অন্যায় যুদ্ধে যদি এক জন অপর জনকে হারায়, তবে কেন আপনি এক পক্ষকে দোষ দিবেন, অপর পক্ষকে দোষ দিবেন না? এক পক্ষকে ভক্ষ্য বলিবেন, অপর পক্ষকে ভক্ষক বলিবেন? বাস্তবিক বলিতে গেলে, দুপক্ষই ভক্ষক, দুপক্ষই ভক্ষ্য। তবে আপনাদের আইন একচোখো; এক পক্ষের জন্য; দুপক্ষের জন্য নয়। তাহা

যদি হইত, তবে জুয়া খেলার দরুণ দুপক্ষেরই সাজা হওয়া উচিত। আইনে দুপক্ষকেই সাজা দেওয়া উচিত ছিল, কারণ, দুপক্ষেরই উদ্দেশ্য এক, অতি হীন, অতি নীচ ও অতি অন্যায়। সেই কারণে আইন এ রকম হওয়া উচিত—যাহাতে দুপক্ষেরই সাজা দেওয়া হয়।"

আমি তাহার কথার সারগর্ভতা অস্বীকার করিতে পারিলাম না। বাস্তবিক, এই প্রকার জুয়া ও Note Doubling case এ দুপক্ষেরই সাজা হওয়া উচিত। কারণ, দুপক্ষই অন্যায় ও অবৈধ উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, প্রত্যেক পক্ষের উদ্দেশ্য অপর পক্ষকে ঠকাইবে। আর যাই ঠকাইতে পারিল না, বরং ঠকিয়া গেল, অমনি কাঁদুনে ছেলের মত আদালত ও আইনের আশ্রয় লইতে গেল।

যাহা হউক, সর্ব্বভুক্ ও কন্দর্প দুজনে মিলিয়া এক দল পাকাইল। এইরূপ দল করিতে গেলে, আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আট দশ জন লোকের প্রয়োজন, আর একটি উত্তমরূপে সজ্জিত, প্রশস্ত, মনোমুগ্ধকর খেলিবার স্থানের প্রয়োজন। প্রায় দেখা যায়, যিনি খেলিবার পাণ্ডা, তাঁহার নিজের খুব ভাল বাড়ী আছে, ধন-সম্পত্তি সব গিয়াছে, কেবলমাত্র বাড়ীটি রহিয়া গিয়াছে, আর না হয়, সম্ভ্রান্ত-বংশোদ্ভূত কোন ভদ্রলোকের রাজপ্রাসাদস্বরূপ অট্টালিকা খুব মোটা ভাড়ায় প্রত্যহ দুঘণ্টা করিয়া ব্যবহারের জন্য ভাড়া লওয়া হয়। যে ব্যক্তি তাঁহার সেই রাজপ্রাসাদের ন্যায় বাটী ভাড়া দেন, তিনি হয় ত সব সময় মোটা ভাড়া দিয়া অল্পসময়ের জন্য কেন লইতেছেন, তাহার কারণ জানেন না। জুয়াড়িদের দলপতি এই সুন্দর ও প্রশস্ত অট্টালিকার মালিকের কাছে গিয়া বলে, আমরা সায়ংকালে দুই ঘণ্টা করিয়া পাঁচ জন ভদ্রলোক লইয়া তোমার বৈঠকখানায় আমোদ আহ্লাদ ও ক্রীড়াদি করিব। মাসে ১ হাজার টাকা করিয়া ভাড়া দিব। যে বাটীর মালিকের নিকট এই প্রস্তাব হয়, প্রস্তাবের সময়েও হয় ত তাঁহার অবস্থা ভাল, তবে অবস্থাকে অধিকতর ভাল করিবার জন্য এই টাকার লোভ সংবরণ করেন না। অনেক সময় উচ্চ বংশধরের অবস্থা মলিন হইয়াছে, অর্থের প্রয়োজন, প্রত্যহ দুই ঘণ্টা ব্যবহারের জন্য মাসিক হাজার টাকা, এ লোভ সংবরণ করিতে পারেন না; ভাড়া দিয়া বসেন। রাজপ্রাসাদের ন্যায় অট্টালিকা, সুন্দরভাবে সজ্জিত, আসবাব-পোষাক খুব ভাল; অনেক সময় বাড়ীর নাম-ডাকও আছে। সুতরাং কেহ সন্দেহও করে না যে, এখানে কোন অপকর্ম্ম হইতে পারে। শিকার সহজেই জালে পড়ে।

শিকার সংগ্রহ করিবার জন্য অনেকগুলি করিয়া দালাল থাকে। সেই দালালদের অধীনে আবার ছোট ছোট দালাল থাকে, তাহারাও শিকার সংগ্রহ করে।

যত দিন মানুষের অবৈধ ধনলিপ্সা থাকিবে, তত দিন শিকারের কোন অভাব হইবে না। পতঙ্গ যেমন প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা বা আলোকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করে, মানুষও তেমনই নিজে এই জুয়াড়িদের স্থানে গিয়া পৌঁছিবে। দালাল যাইয়া এক জন ডাক্তারকে তাহাদের আড্ডায় লইয়া গিয়া তুলিল। তাঁহার নিকট যাইয়া বলিল, "মহাশয়, চিকিৎসা বিষয়ে আপনার বেশ পাণ্ডিত্য ও সুখ্যাতি আছে। আমার রাজা বা জমীদার আপনার সুখ্যাতির কথা লোকমুখে শুনিয়াছেন, তাঁহার বাড়ীতে পীড়িত লোক আছে, আপনাকে যাইয়া তাহার চিকিৎসা করিতে হইবে।"

সেই ডাক্তার বাবু এই সব কথা শুনিয়া গলিয়া গেলেন,—তাঁহার সুখ্যাতির কথা ও রোগী হাতে পাইবার আশু সুবিধা ভাবিয়া মাতোয়ারা হইলেন। পাড়ার লোক তাঁহাকে ২৲ টাকা দিয়াও ডাকে না, দালাল তাঁহাকে বুঝাইয়া দিল, তিনি ৮৲ টাকা হিসাবে ফি পাইবেন।

প্রথম দিন রাজার বাটীতে গিয়া, রাজার সহিতও দেখা হইল না, রোগীর সহিতও দেখা হইল না, তথাপি তিনি তাঁহার ফি পাইলেন। ডাক্তার আনন্দে অধীর হইয়া নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। ক্রমে পাঁচ সাত দিন ঐরূপ যাইয়া আর ফাঁকি দিয়া ৬।৭টি ফি পাইয়া তিনি সেই নওসেরিয়া দলের শিকার হইলেন। সেইরূপ এঞ্জিনিয়র, কন্‌ট্রাক্টর ও অন্যান্য পেশার লোক, যাহাদের কাযকর্ম্ম ভাল চলে না, সেইরূপ লোক ধরিয়া আড্ডা-স্থানে আনিয়া জোটায়। অভাবগ্রস্ত এঞ্জিনিয়রকে বুঝাইয়া দেয়, রাজার অনেকগুলি বাড়ী তৈয়ারী হইবে, তাঁহাকে এঞ্জিনিয়র রাখা হইবে। যে পারিশ্রমিক তিনি পাইবেন, তাহাও প্রচুর। কন্‌ট্রাক্টরকেও ঐরূপ প্রলোভন দেখাইয়া সংগ্রহ করা হয়। প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদ প্রস্তুত হইবে কিম্বা বাজার বসান হইবে, তাহার মাল তাঁহাকে জোগাইতে হইবে। তবে সে যে মাল জোগাইতে পারিবে, ইহার কারণে অর্থ গচ্ছিত রাখিতে হইবে, না পারিলে তাহার গচ্ছিত টাকা হইতে তাহার খেসারত কাটিয়া লওয়া হইবে। ডাক্তার যেরূপভাবে সংগ্রহ করা হয়, কবিরাজগণকেও ঠিক সেইরূপভাবে সংগৃহীত করা হয়।

সাধারণতঃ যেরূপভাবে শিকারকে ধোঁকা দেওয়া হয়, তাহা এই স্থানে দেখাইতেছি। ধরুন, এক জন কবিরাজকে শিকার স্থির করা হইয়াছে। দালাল রামচন্দ্র ইহাকে জালে ফেলিবার ভার লইল। কবিরাজের নাম কৈলাসচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ। বেচারী

একখানি ভাড়াবাড়ীতে থাকেন। টাকা কুড়ি বাটীর ভাড়া দেন। ঔষধ বেচিয়া ও রোগী দেখিয়া কষ্টেস্থষ্টে জীবনযাপন করেন। সংসারে ছেলে-মেয়ে লইয়া ৪।৫টি; দুইটি মেয়ের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। মেয়েগুলি দেখিতে ভাল, কাযেই অবস্থাপন্ন ঘরে পড়িয়াছে।

দালাল রামচন্দ্র সেই অখ্যাত কবিরাজের পাড়ায় গিয়া উপস্থিত। খবর লইয়া জানিল, সেই পাড়ায় এক জন কবিরাজ বাস করেন। তাঁহার নিজ অবস্থা ভাল না হইলেও তাঁহার অনেকগুলি আত্মীয়স্বজনের অবস্থা ভাল। কবিরাজটি প্রবীণ। দুই পাঁচটি পুরান ঘর আছে; সেই সব বাটীর লোকরা তাঁহাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে।

রামচন্দ্র এক দিন কবিরাজ মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইল। কবিরাজ মহাশয় বাহিরের ঘরে বসিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি কৈলাস শাস্ত্রী কি না?" কবিরাজ মহাশয় বলিলেন; "হাঁ, আমারই নাম কৈলাস শাস্ত্রী।"

রামচন্দ্র একটি ৯০ ডিগ্রীর প্রণাম ছাড়িল এবং বলিল, "মহাশয়, আজ আমার সুপ্রভাত, আমি ক'দিন ধ'রে আপনার খোঁজ করিতেছিলাম, কিন্তু কিছুতেই আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ হই নাই। লোকমুখে আপনার গুণগ্রামের কথা শুনিয়াছি, আর আপনার হাতযশের কথাও শুনিয়াছি। পরিতাপের বিষয়, জনসাধারণ আপনাকে এখনও চিনিল না, আপনি মহাশয় এক জন সুচিকিৎসক। তবে নিজের ঢোল নিজে বাজাতে পারেন না, সেই কারণে আপনাকে এখনও লোকে চিনিল না। কয়েক জন লোক আমাকে বলে, চড়কবাগানের কৈলাস শাস্ত্রী মহাশয় এক জন বিচক্ষণ পণ্ডিত। আমার মনিব রাজা ভছনছ সিং সারসবাগানে থাকেন। তাঁহার এক আত্মীয়ের রক্ত-আমাশয়ের পীড়া, বহুদিন হইতে ভুগিতেছেন। তাঁহাকে কে বলিয়া দিয়াছে, চড়কবাগানের কৈলাস শাস্ত্রী এইরূপ ব্যারামে ধন্বন্তরি। তা কবিরাজ মহাশয়, আপনি বেশ জানেন, বড় লোকের খেয়াল, যাহা যখন ধরিবেন, তাহা আর ছাড়িবার নয়। তাহা না হইলে ধরুন না কেন, ভিখারীর কন্যা এলাহিজান ইন্দ্রনারায়ণ সিংহের নজরে পড়িবে কেন? খেয়াল, মশাই, খেয়াল। শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয় তাঁহার সংসারে দেখেন। তা সত্ত্বেও তিনি ধরিয়া বসিয়াছেন, কৈলাস শাস্ত্রীকে চাই। আর দেখুন, তাঁহার কতকগুলি নিজেরও ব্যারাম আছে, সেই কারণে তিনি কতকগুলি আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুত করাইবেন। সোনা, হীরা, পান্না, পলা ইত্যাদি অনেকগুলি দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন। তা যদি মহাশয়ের সুবিধা হয়, শ্যামাদাস বাচস্পতিকে দিয়া কেন, আপনাকে দিয়াই ঔষধ প্রস্তুত করান হইবে। বাচস্পতি মহাশয় প্রভূত অর্থের মালিক, তিনি ত এখন আর নিজে আগুন-তাপে যাইবেন না। আপনি এখনও বাচস্পতি মহাশয়ের সমান ধনবান্ হন নাই, অতএব আপনার দ্বারা এ সব ঔষধ প্রস্তুত করান ভাল।"

কৈলাস।—তা বাপু, তোমার রাজাবাবু যখন আমাকে পছন্দ করিয়াছেন, আমার দ্বারা যতদূর সম্ভব, তাঁহার কার্য্যে সহায়তা করিব। তবে বাপু, আমার হাতে রোগী খুব কম মরে।

রামচন্দ্র।—তা নিশ্চয়ই। বড় বড় ডাক্তার-কবিরাজরা বিনা ওজরে ও বিনা আপত্তিতে যত লোক মারিবার সুবিধা পায়, তত সুবিধা ত সকলেই পায় না? কথায় বলে, "সহস্রমারী চিকিৎসক।" তবে কবিরাজ মহাশয়, আসুন, রোগী দেখা হয় ভালই, না হ'লে আপনার ফি ত আর মারা যাবে না?

এই বলিয়া রামচন্দ্র কবিরাজ মহাশয়কে সঙ্গে করিয়া একখানা ট্যাক্সি চড়িয়া সারসবাগানের রাজপ্রাসাদে আসিয়া উপস্থিত। কবিরাজ মহাশয় ও রামচন্দ্র ট্যাক্সি হইতে নামিলেন। দ্বারে সেপাই জমী স্পর্শ করিয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিল। দুজনে আসিয়া একটি প্রকাণ্ড সুসজ্জিত কামরায় উপস্থিত হইলেন। খবর লইয়া জানিলেন, রাজাবাবু ভিতরে আছেন, তবে তাঁহার শরীর একটু বে-একতার, সে দিন তিনি আর বাহিরে আসিবেন না। শুনিয়া তিনি ম্যানেজার রসিকলাল বাবুকে (সর্ব্বভুক্‌কে) জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, জাঁহাপনা কি আর আজ বাহিরে আসিবেন না?" তাহা শুনিয়া ম্যানেজার উত্তর করিলেন—"না।"

রামচন্দ্র।—আমি সেই কৈলাস শাস্ত্রী কবিরাজ মহাশয়কে আনিয়াছি।

রসিক।—আরে ভাই,—মহারাণীর সহিত জাঁহাপনার কি খিটিমিটি হইয়াছে। বড়লোকের বাড়ীতে একটু খিটিমিটি হইলেই সব বিষয়ে গোলযোগ। গৃহিণীর সহিত মনকষা হইলেই জজ-ম্যাজিষ্ট্রেটদের আদালতে লোকের প্রাণ ওষ্ঠাগত। এমন কি, উকীল বাবুদেরও রক্ষা নাই। অফিসের বড় বাবুর তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী গোঁসাঘরে গেলেন, গরীব কেরাণী-কুলের সে দিন প্রাণ অতিষ্ঠ। এ মেজাজে কি আর কবিরাজ মহাশয়ের সহিত দেখা করিবেন? যাহা হউক, কবিরাজ মহাশয়কে তাঁহার দর্শনী দিয়া আজকের মত বিদায় দাও, পুনরায় পরশ্ব ৪টার সময় আসিতে বলিয়া দাও। কেমন হে, ইহার ফি ত ৮৲ আট টাকা?

এই বলিয়া রসিক ক্যাসিয়ারকে ৮৲ দিতে হুকুম দিলেন।

কবিরাজ মহাশয়কে কেহ কখন দুই টাকার অধিক দেয় নাই। আজ রাজবাড়ীতে আসিয়া ৮৲ টাকা ফি পাইলেন। মনে

...ন মহাখুসি! ভাবিতে লাগিলেন, আজ কাহার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিলাম?

এইরূপ ভাবে কবিরাজ মহাশয় আরও তিন দিন, সারস-বাগানে রাজার নন্দনকাননে আসিলেন। এক দিনও রাজার সহিত দেখা হইল না, তবে দর্শনী পাইলেন প্রত্যেক দিনে। কবিরাজ মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, রাজারাজড়া হবে এই রকমের। পঞ্চম দিনে কবিরাজ মহাশয় নন্দনকাননে আসিয়া দেখিলেন, রাজা সশরীরে উপস্থিত। রামচন্দ্র কবিরাজ মহাশয়কে দেখিয়াই, 'আসুন আসুন' বলিয়া অভ্যর্থনা করিল, আর রাজা বাহাদুরকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিল—"রাজা বাহাদুর! কবিরাজ কৈলাস শাস্ত্রী মহাশয় আসিয়াছেন, তিনি আজ পাঁচ দিন ধরিয়া আনাগোনা করিতেছেন, আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইতেছে না, বিমল বাবুর চিকিৎসারও বন্দোবস্ত হইতেছে না।"

রাজাবাবু।—তোমরা সকলে মিলে দেখছি আমাকে আর বাঁচতে দেবে না। দাঁড়াও বাপু, একটু সুস্থ হই, তার পর কবিরাজ মহাশয়, ডাক্তার মহাশয়, সকলকার সহিত সাক্ষাৎ করিব। দেখিতেছ ত শেষ বৈশাখে কি দুর্দ্ধর্ষ গরম! বেঁচে থাকাই অতি কষ্টদায়ক, তার উপর রাজকার্য্য!

(রমেন বাবুকে লক্ষ্য করিয়া)—কেমন হে রমেন, ঐ গঙ্গা-মণ্ডলের জমীদারীর যে অংশ বিক্রীত হবে, তা কিনবার বন্দোবস্ত কি করলে? টাকার জন্য ভেব না। সম্পত্তিটি চাই।

(অভয় নন্দনকে লক্ষ্য করিয়া)—ওহে, সেই নেকলেসটা সওয়া লক্ষ টাকা বলিলাম, তাতেও ঠিক করিতে পারিলে না? বাজারে ঐরূপ নেকলেস সচরাচর পঁচাত্তর হাজার বা একলক্ষ টাকায় পাওয়া যায়। তোমাদের রাণীমার ঐটি পছন্দ হইয়াছে। আমি সওয়া লক্ষ টাকা পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম, দেড় লক্ষ পর্য্যন্ত উঠিতে রাজি আছি।

(রমণ চোবেকে লক্ষ্য করিয়া)—গঙ্গার ধারের বাগানটা কি হইল? দেড় লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত দিতে রাজি, আজকাল এত দামের খ'দ্দের পাইবে না।

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় অজাতশত্রু শিবরাম (Tryman) আসিয়া উপস্থিত। আসিয়াই ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম ও রাজাবাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—"রাজাবাহাদুর, আজ এক নূতন খেলা শিখিয়া আসিয়াছি, আপনাকে দেখাইয়া জীবন সার্থক করিব। ইহা glass bead (কাচের ঘুঁটি) লইয়া খেলিতে হয়। ইহাকে Chinese Table Race বলে।"

রাজাবাহাদুর।—শিবরাম, আজ যাও, মনটা তত ভাল নয়, আর এক দিন আসিও।

শিবরাম।—তাও কি হয় হুজুর? ভাল কিছু পাইলেই প্রাপ্তমাত্রেণ ভক্ষয়েৎ। আপনাকে এ খেলা দেখাবই।

রাজাবাহাদুর।—আমি ১০ মিনিটের অধিক সময় দিতে পারিব না। ইহাতে হারই হউক, জিতই হউক।

রাজাবাহাদুর শিবরামের সহিত খেলিলেন, প্রথমবারেই ৫ হাজার টাকা হারিলেন। আর ম্যানেজার বাবুকে বলিয়া দিলেন, উহাকে ৫ হাজার টাকা দিয়া দাও। বলিবামাত্র ম্যানেজার বাবু ৫ হাজার টাকার নোটের বাণ্ডিল বাহির করিয়া দিলেন, আর সঙ্কেত করিয়া তাঁহার প্রাপ্য বকশিস চাহিলেন। শিবরাম টাকাগুলি হাতে করিয়া বলিল, "রসুন না মশাই, দিচ্ছি।"

রাজাবাহাদুর বলিলেন, "আমার আর সময় নাই, আমি আর আজ খেলিব না।" সকলের প্রতি ফিরিয়া বলিলেন, "তোমরা আজ সকলে বিদায় হও, অন্য এক সময়ে সুবিধামত আসিয়া সাক্ষাৎ করিও।"

এই বলিতে বলিতে কবিরাজের দিকে একটি কটাক্ষ করিলেন। মুখে কিন্তু কিছু বলিলেন না। সকলেই তখন গাত্রোত্থান করিল। কবিরাজও গাত্রোত্থান করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় ম্যানেজার বাবু ইঙ্গিত করিয়া তাঁহাকে বসিতে বলিলেন।

রাজাবাহাদুর চলিয়া গেলে ম্যানেজার শিবরাম বাবুর নিকট হইতে তাঁহার বকশিসের টাকা প্রার্থনা করিলেন। তখন শিবরাম কথঞ্চিৎ গরম হইয়া বলিয়া উঠিল, "আমি খেলিয়া টাকা উপার্জ্জন করিয়াছি, তোমাকে তার বখরা দিব কেন? হারিলে কি তুমি আমাকে দিতে?"

এই বলিয়া শিবরাম সে স্থান পরিত্যাগ করিল। তখন রসিক-লাল কৈলাস শাস্ত্রী মহাশয়ের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "দেখলেন মশাই, কলির ধর্ম্ম দেখলেন? যাতায়াত লইয়া পাঁচ মিনিটের মধ্যে পাঁচ সহস্র টাকা উপায় করিয়া লইলেন, আর আমার বেলাই ফাঁকি! দেশে আর ধর্ম্ম নাই! মশাই, দেশে আর ধর্ম্ম নাই! আর চাকরীর চেয়ে হীনকার্য্য জগতে আর কিছু নাই। আমি যদি রাজা বাহাদুরের চাকর না হইতাম, উঁহার সহিত খেলিতে পারিতাম, আর এই সব টাকা অন্য লোকে না পাইয়া আমিই পাইতাম। মাড়োয়ারীরা বলে, নকরি করা আর নসীব বেচডালা দুই-ই এক জিনিষ। যাঁহাতক নকরি করিয়াছ, তাঁহাতক নসীব বেচিয়াছ। এ কার্য্য অতি নীচ। দেখুন না মশাই, আমাদের দেশে গন্ধবণিকরা কোন অবস্থায় নকরি করিবে না। ফিরি করিয়া দাঁতের মাজন, কুসুম-ফুলের রং বেচিবে, তবু চাকরি করিবে না। দেখুন মশাই, আপনাকে দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, আপনি এক জন বিশিষ্ট ভদ্রলোক। আধুনিক দাগাবাজি ও

জুয়াচুরি আপনাকে এখনও স্পর্শ করে নাই। আপনি কিছু টাকা লইয়া আসুন, আপনাকে আমি সাহায্য করিব। এই বোকচন্দ্র রাজাবাহাদুরের নিকট হইতে কিছু টাকা উপায় করিয়া যান, আমাকে কিঞ্চিৎ দিবেন, আমি তাহা হইলেই সন্তুষ্ট হইব। আমি নিজের জন্য ভাবি না, আমার এক চৌদ্দ বৎসরের অবিবাহিতা কন্যা। যেখানেই যাই, সাত আট হাজারের কম কেহ বলে না। কলির ব্রাহ্মণ চণ্ডাল অপেক্ষাও অধম। বরের বাপের পায়ে ধরিয়া কাঁদিলেও কিছু দয়ার উদ্রেক হয় না।"

কৈলাস শাস্ত্রী।—প্রথম, আমি খেলা জানি না। দ্বিতীয়, টাকা কোথায় পাইব ?

রসিকলাল।—মশাই, খেলার কথা যাহা বলিলেন, আমি আপনাকে শিখাইয়া দিব। অতি সহজ জিনিস। আপনার ন্যায় তীক্ষ্ণবুদ্ধি বিচক্ষণ লোক ১০ মিনিটের মধ্যেই শিখিয়া লইবেন। আর যে টাকার কথা বলিলেন, উদ্দেশ্য মহৎ হইলে টাকার কখন অভাব হয় না। আমার ন্যায় সৎব্রাহ্মণের কন্যাদায়ের সাহায্য করিবেন, আপনার টাকা জুটিয়া যাইবেই যাইবে। আর টাকা প্রয়োজন চার পাঁচ ঘণ্টার জন্য। আপনি টাকা লইয়া আসিবেন, খেলিবেন, জিতিবেন আর বাড়ী ফিরিয়া গিয়া সুদ সমেত যাহার টাকা, তাহাকে গিয়া ফেরত দিবেন।

কৈলাস।—মশাই, অল্পসময়ের জন্য টাকা কোথায় পাইব ? স্ত্রীর গায়ে তত অলঙ্কারপাতি নাই—যাহা হইতে চার পাঁচ হাজার টাকা হইতে পারে। দুইটি বিবাহিতা কন্যা আমার বাড়ীতে আসিয়াছে, তাহাদের গহনাপত্র আছে : কিন্তু তাদের গা হইতে ত গহনা খুলিয়া লইব না।

রসিক।—কেন মশাই, তাতে দোষটা কি ? আপনি ত একেবারেই লইতেছেন না। মনে করিবেন, বাক্সতেই তোলা আছে। আর এ খেলায় হারজিত নাই ; নিরবচ্ছিন্ন জিত। যেমন মৃত্যুই ধ্রুব সত্য, মানুষ জন্মালে মরিবেই মরিবে, তেমনই এই হবচন্দ্র রাজার সহিত খেলিলে জিত ধ্রুব সত্য—জিত হইবেই হইবে। আপনি জানেন, দুই আর দুইয়ে চার হয়, কখন সাড়ে তিনও হয় না, সাড়ে চারও হয় না, ইহা গণিত শাস্ত্রের অভ্রান্ত সত্য। সেইরূপ আপনি ৫ হাজার টাকা লইয়া আসিলে ৪ বাজী খেলিয়া ১০ হাজার টাকা। ১ হাজার টাকা আমার কন্যাদায়ের জন্য, বাকি হাতে থাকিবে ৯ হাজার টাকা। যাহাদের নিকট হইতে টাকা লইয়া আসিবেন, তাহাদের পুরো টাকা ফেরৎ দিলেও ও সুদ দিলেও প্রায় কিছু কম চার সহস্র টাকা আপনার কাছে থাকিবে। দেখুন মশাই, আপনি যদি ৫ হাজার টাকা পূরা জোগাড় করিতে না পারেন, ৪ হাজার টাকা জোগাড় করিয়া লইয়া আসুন। আমি এই হবচন্দ্র রাজার তহবিল হইতে হাজার টাকা আপনাকে ধার দিব। যাক্ মশাই, কার্য্য হতে। জয় মা তারা ব্রহ্মময়ী ! পরশ্ব বেলা ৩টার সময় আসিবেন। ইতিমধ্যে টাকা যোগাড় করিয়া আনিবেন। আর আপনার কেন ক্ষতি হইবে ? অদ্যকার দর্শনী ৮৲ আট টাকাও লইয়া যান।

কৈলাস শাস্ত্রী এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া বাটী যাইবার সময় অনেক কথা ভাবিতে লাগিলেন। পাঁচ হাজার টাকা ! এ ত কখন শোনা যায় নাই। আমি চির-জীবনে ৫ হাজার টাকা সংস্থান করিতে পারি নাই, আর ঐ আগন্তুকটি আসিল, খেলিল, জিতিল, পাঁচ হাজার টাকা লইয়া গেল। যাহাই হউক, আমি যেমন করিয়াই পারি, টাকা জোগাড় করিব। গৃহিণীকে বলিয়া তাহার গহনা ও কন্যা দুইটির গহনা বন্ধক দিয়া ৪ হাজার টাকা সংগ্রহ করিব। সুদ খালি এক দিনেরই যাবে। যাহারা টাকার বাচ্ছা পাড়ায়, সুদখোর মহাজন, তাহারা ত তাহাদের প্রাণ ছাড়িতে পারিবে, কিন্তু সুদ ছাড়িতে পারিবে না। তাহারা ত আর দু ঘণ্টার সুদ লইবে না, এক দিনেরই পূরা সুদ লইবে। যাহা হউক, রাজাবাহাদুরের সংসারটি ধর্ম্মের সংসার। লোকগুলিও সব খুব ভাল। আজকের দর্শনী আমি চাহি নাই, তবু দিলে।

এই ভাবিয়া তিনি বাড়ী ফিরিলেন এবং তাঁহার স্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া ৪ হাজার টাকা সংগ্রহ করিলেন। স্থিরীকৃত দিনে রাজাবাহাদুরের প্রাসাদে আসিলেন ; ম্যানেজারের (রসিক বাবুর) সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি পূর্ব্ব-কথামত কবিরাজ মহাশয়কে ১ হাজার টাকার নোট দিলেন। আর খেলাটি শিখাইয়া দিলেন। আরও বলিলেন, "আমি পাশেই থাকিব, আপনার খেলার ভুল হইলে তাহা সংশোধন করিয়া দিব।" তার পর রাজাবাহাদুরকে খবর দেওয়া হইল। পূর্ব্বেকার দিনের মত দালাল সব সেইখানে অপেক্ষা করিতেছিল—বাড়ীর দালাল, জমীদারীর দালাল, জহরতের দালাল, নানাবিধ পণ্যদ্রব্যের দালাল উপস্থিত ছিল।

রাজাবাহাদুর আসিলে পর খেলা আরম্ভ হইল। প্রথমেই রাজাবাহাদুর হারিলেন। কবিরাজ মহাশয় ২ হাজার টাকা জিতিলেন। তাহার পর দানে রাজাবাহাদুর পুনরায় হারিলেন ৬ সহস্র টাকা, দুই দফা খেলায় ৮ হাজার টাকা লাভ। রাজাবাহাদুর বলিলেন, "আমি নিশ্চয়ই খেলায় ভুল করিতেছি, দুবারই হারিলাম, আজ আর খেলিব না, আপনি আগামী কল্য আসিবেন।"

রসিক বাবু কৈলাস শাস্ত্রীর কাণে কাণে বলিলেন, "এ সুযোগ

ছাড়বেন না। খবরদার খবরদার, রাজাকে খেলিবার জন্ত পুনরায় অনুরোধ করুন, আমরাও বলিতেছি।" শেষ অনেক ধস্তাধস্তির পর রাজাবাহাদুর আর দুবার খেলিতে রাজি হইলেন। খেলা হইল। প্রথমবারে রাজাবাহাদুর ৮ হাজার টাকা জিতিলেন। দ্বিতীয়বারের জিতও ৮ হাজার টাকা। কবিরাজ মহাশয়ের মোট জিত ৮ হাজার টাকা, নিজের পাঁচ হাজার টাকা, একুনে জমা তের হাজার, হার ১৬ হাজার, ফাজিল ৩ হাজার অর্থাৎ ৩ হাজার টাকা দেনা।

ঠিক এই সময়ে ৬ ফুট ৫ ইঞ্চি লম্বা ৩ ফুট চওড়া, কাল, মিশমিশে এক বৃহদাকার পুরুষ আসিয়া উপস্থিত হইল। হাতে লোহাবাঁধান লাঠি। সে নিঃশব্দে সেই স্থানে দণ্ডায়মান হইল। কবিরাজ মহাশয় তাহাকে দেখিয়া একবারে হতভম্ব। তখন ম্যানেজার রসিক বাবু বলিলেন, "আজ যা হবার, তা হইয়া গেল, বাকি টাকার একটি লেখাপড়া করিয়া দিন। রাজাবাহাদুরের নিয়মমত এই বৃহদাকার লোকটি আপনার স্বাক্ষরিত লেখাপড়াটি লইতে আসিয়াছে। দেরী করিবেন না, শীঘ্র লিখিয়া দিন। ভগবান্ মুখ তুলে চান ত অপর কোন দিন জিতিয়া অন্ধকার শোধ লইবেন।"

কৈলাস শাস্ত্রী মহাশয় দেখিলেন, বাগ্‌বিতণ্ডা করা বৃথা। এই যমদূতের হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে শীঘ্র লেখাপড়া করিয়া দেওয়াই ভাল। কৈলাস শাস্ত্রী মহাশয় কাঁদিয়া ফেলিলেন। রসিক বাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ম্যানেজার মশাই, এ কি হইল? আমি এ টাকা কোথা হইতে দিব? আমাকে বেচিলেও এ টাকা হইবে না। আর আপনার কথামতই গৃহিণীর ও কন্যাদের গহনা বন্ধক দিয়া টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি। কন্যা দুইটি চার দিন বাদে শ্বশুরবাড়ী যাইবে। কোথা হইতে তাহাদের গহনাগুলি ফেরত আনিয়া দিব? ম্যানেজার বাবু, এ কি হইল? ভগবান্ এ কি করিলেন?"

ম্যানেজার।—কবিরাজ মহাশয়, যা হবার, তা হইয়া গিয়াছে। আর এক দিন হৃত অর্থের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করুন। এই ব্যবস্থার নিয়মমত একখানি হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিন। ইহাতে লেখা থাকিবে, আপনি স্ব-ইচ্ছায় এই খেলা খেলিয়াছেন। কাহারও অনুরোধে উপরোধে নয়। ৩ হাজার টাকা আপনার ধার, সেই জন্ম হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিতেছেন, সুবিধা হইলে আপনি টাকা দিয়া হ্যাণ্ডনোট উদ্ধার করিবেন। শাস্ত্রী মহাশয়, এ ধর্ম্মের বিচার, হ্যাণ্ডনোটের যাহাতে শীঘ্র নালিশ না হয়, তাহা দেখিব। আর এক দিন খেলিয়া এই টাকা শোধ দিবেন। আর নগদও পাঁচ দশ হাজার লইয়া যাইবেন। কি বলেন?

শাস্ত্রী মহাশয় হতভম্ব হইয়া রহিলেন এবং খাজাঞ্চী মহাশয় ৩ হাজার টাকার একটি হ্যাণ্ডনোট প্রস্তুত করিয়া আনিলে যমদূতের দিকে চাহিলেন আর বিনা বাক্যব্যয়ে হ্যাণ্ডনোটটি সই করিয়া দিলেন।

এই খেলাটি এইরূপ যে, ঠিক খেলা হইলেই বাহিরের খেলোয়াড় প্রত্যেক দানেই জিতিবে; কিন্তু খেলার ঘুঁটির মধ্যে দুই একটি সরাইয়া লইলে আগন্তুকের অব্যর্থ হার, রাজাবাহাদুরের অব্যর্থ জিত। কিরূপ করিয়া প্রত্যেক আগন্তুক হারিয়া যায়, তাহা বুঝাইয়া দিবার জন্ত খেলার বিস্তৃত বিবরণ নিম্নে দিলাম।

এমন কোন সংখ্যা—যাহাকে ৪ দিয়া ভাগ দেওয়া যায় এবং কোন অবশিষ্ট থাকে না, সেইরূপ সংখ্যার ঘুঁটি লইয়া খেলা আরম্ভ হয়। তাহার মধ্যে একটি ঘুঁটি প্রথম নম্বর ঘোড়া, দুইটি ঘুঁটি দ্বিতীয় নম্বর ঘোড়া এবং তিনটি ঘুঁটি তৃতীয় নম্বর ঘোড়া বলিয়া ধরা হয়। যথা—৪৮টি ঘুঁটি লওয়া হইল। ইহা হইতে একটি ঘুঁটি এক নম্বর, দুইটি দুই নম্বর, তিনটি তিন নম্বর। এই ১ নম্বর, ২ নম্বর, ৩ নম্বর মিলিয়া ৬টি ঘুঁটি ৪৮টি ঘুঁটি হইতে লইয়া তিনটি পৃথক্ পৃথক্ থাকে টেবিলের উপর রাখা হইল। অবশিষ্ট ৪২টি ঘুঁটি রাজাবাবুর কোঁচড়ে থাকিল। টেবিলটিকে ঘোড়দৌড়ের মাঠ হিসাবে ধরা হইল। যে বাবুটি খেলিতে আসিল, তাহাকে ঐ ১, ২, ৩ নম্বর ঘোড়ার যে কোনটি ধরিতে বলা হইল। এখন তিনি যদি ১ নম্বর ঘোড়া ধরেন, এই একটি ঘুঁটি অন্য ঘুঁটির (যাহা কোঁচড়ে ছিল) সহিত মিশাইয়া দেওয়া হয়। ইহাকেই Running the race বলে। কোঁচড়ের ৪২টি ও ১ নম্বর ১টি মিশাইয়া ৪৩টি হইল। এখন এই ৪৩কে যদি ৪ দিয়া ভাগ করা হয়, তাহা হইলে ৩ অবশিষ্ট থাকে। অর্থাৎ ৩ নম্বরের ঘোড়া মাঠে পড়িয়া রহিল। অতএব বাবুটি ১ নম্বর ঘোড়া ধরায় এবং সেই ঘোড়া মাঠে পড়িয়া না থাকায় তিনি খেলায় জিতিলেন।

এখন যদি তিনি ২ নম্বরের ঘোড়া ধরেন, তাহা হইলে সেই দুইটি ঘুঁটি ৪২টি ঘুঁটির সহিত মিলিয়া ৪৪টি হইল। ইহাকে ৪ দিয়া ভাগ দিলে ভাগশেষ কিছুই থাকে না। এ ক্ষেত্রে কেহই জিতিল না। কারণ, কোন ঘোড়াই মাঠে পড়িয়া রহিল না।

এখন ধরুন, বাবুটি ৩ নম্বরের ঘোড়া ধরিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে ৪২টি আর ৩টি ঘুঁটি লইয়া ৪৫টি হইল। ইহাকে ৪ দিয়া ভাগ করিলে ১ অবশিষ্ট থাকে। অর্থাৎ ১ নম্বরের ঘোড়া মাঠে পড়িয়া রহিল, বাবুটি ৩ নম্বরের ঘোড়া ধরায়, তিনি জিতিলেন।

তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে, বাবুটি ১ নম্বরের কিম্বা ৩ নম্বরের ঘোড়া যেটিই ধরুন, সেইটাতেই জিতিবেন। আর যদি

২ নম্বরের ঘোড়া ধরেন, তাহাতে তাঁহার কোন লোকসান হইবে না। বাবুটি যখন দেখিলেন যে, তাঁহার হারিবার কোন রকম সম্ভাবনা নাই, তখন তিনি খেলিতে রাজি হন।

এইবার রাজাবাবুর দলের লোক রাজাকে খেলিবার জন্য সাধ্যসাধনা করিয়া ডাকিয়া আনে। যদি বাবুটির কাছে নগদ টাকা থাকে, তবেই রাজাবাবু খেলাতে মত দেন। তখন বাবুটির সঙ্গে রাজাবাবুর খেলা আরম্ভ হয়। প্রথম প্রথম প্রতি খেলাতেই আগন্তুক বাবুটি স্বতঃসিদ্ধভাবে জিতিতে থাকিলে, তিনি একটু বিশেষ উত্তেজিত হইয়া পড়েন। তখন ম্যানেজার বাবু বাবুটিকে ঘুঁটি গুণিতে এবং ৪ দিয়া ভাগ করিতে সাহায্য করেন। এই সময় ম্যানেজার বাবু কয়েকটি ঘুঁটি সরাইয়া ফেলেন। কয়টি ঘুঁটি সরাইতে হইবে, তাহা ম্যানেজার বাবুর ভালরূপেই জানা আছে। যেমন উল্লিখিত কোঁচড়ের ৪২টি ঘুঁটি হইতে ম্যানেজার বাবু ২টি ঘুঁটি সরাইলেন, কেন না, বাকী ৪০টি ঘুঁটি ৪ দিয়া ভাগ দিলে ভাগশেষ কিছুই থাকে না। এ ক্ষেত্রে বাবুটি যদি এক নম্বরের ঘোড়া ধরিয়া থাকেন, তাহা হইলে এই ৪০টি ঘুঁটির সহিত তাঁর ঘোড়াটি অর্থাৎ একটি ঘুঁটি মিশাইলে ৪১টি হয়। ইহাকে ৪ দিয়া ভাগ দিলে ভাগশেষ এক থাকে অর্থাৎ এক নম্বরের ঘোড়া মাঠে পিছাইয়া পড়িয়া রহিল এবং কাযেই বাবুটিকে হারিতে হইল।

তিনি যদি ২ নম্বরের ঘোড়া ধরিতেন, তাহা হইলে সর্ব্বসমেত ৪০+২=৪২ রহিল, ইহাকে ৪ দিয়া ভাগ দিলে ২ই অবশিষ্ট থাকিল, অর্থাৎ ২ নম্বরের ঘোড়া মাঠে পিছাইয়া পড়িয়া রহিল, এ ক্ষেত্রেও বাবুটি হারিলেন।

যদি ৩ নম্বরের ঘোড়া ধরিতেন, তাহা হইলে ঐরূপ ৪০+৩=৪৩, ইহাকে ৪ দিয়া ভাগ দিলে ৩ ভাগশেষ থাকে, অর্থাৎ ৩ নম্বরের ঘোড়া পিছাইয়া পড়িল। বাবুটি আবার হারিলেন।

এ ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে, বাবুটি যে কোন ঘোড়াই ধরুন, দুইটি ঘুঁটি সরাইয়া লওয়ার দরুণ প্রতিবারেই বাবুটি হারিলেন।

কন্দর্প আচার্য্য ও সর্ব্বভুক্ অনেক দিন ধরিয়া এইরূপ নওসেরিয়া দল চালাইল। সব বিষয়ে সুবন্দোবস্ত রাখার এইরূপে দিনে ডাকাতি করিয়াও ধরা পড়িল না। এইরূপ অসদুপায়ে বহু লোককে ঠকাইয়া প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিল। কিন্তু অসৎ উপায়ে উপার্জ্জিত অর্থ প্রায় থাকে না। যখন তাহাদের নাম বিশেষ জাহির হইয়া পড়িল, অবস্থাবিশেষে তাহাদের নামে দুই একটি মামলাও রুজু হইল, কিন্তু প্রমাণ অভাবে এবং যথেষ্ট অর্থ খরচের বলে তাহাদের অব্যাহতিলাভ হইল। ১৫।১৬ বৎসর ধরিয়া এইরূপ জুলুম করিয়া তাহারা দুজনে বেশ কারবার চালাইয়া দিল। কিন্তু ভগবানের রাজত্বে ইহা প্রায় দেখা যায়, ঘোর পাপী ও নারকী আইনের হাত হইতে অনেকবার অব্যাহতি পাইয়াছে, অনেক ঘোরতর পাপ করিয়া মনুষ্য-বিচারালয়ে খালাস পাইয়াছে; কিন্তু যখন পাপের বোঝা পূর্ণ হইল, তখন সামান্য অপরাধে অধিক সাজা পাইল।

যখন পাপী ভাবিতেছে, আমি ক্রমান্বয়ে মানুষ-বিচারককে ফাঁকি দিয়া আসিতেছি, মানুষের চোখে ধূলা দিয়া ক্রমান্বয়ে অব্যাহতি পাইয়া আসিতেছি, যখন পাপী এই ভাবে বিভোর, আত্মপ্রসাদে মজগুল হইয়া আছে, তখন একটা অতি সামান্য অপকর্ম্মে সে সাজা পায়। ক্রমান্বয়ে গুরুপাপে অব্যাহতি পাইয়া শেষে অতি সামান্য—লঘুপাপে গুরু দণ্ড প্রাপ্ত হয়। পাপের বোঝা ক্রমান্বয়ে ভরপূর হইয়া সে সামান্য একটা ভুলে আজন্ম-পাপের সাজা একবারে পায়। কর্ম্মের ফল ভুগিতেই হইবে। তবে দুদিন পূর্ব্বে কিম্বা দুদিন পরে। ১৬ বৎসর ধরিয়া মানুষ ঠকাইয়া কন্দর্প অব্যাহতি পাইল। সর্ব্বশেষে এক জন চীনা কনট্রাক্টরকে রাজপ্রাসাদ প্রস্তুতকরণার্থে বল্লভপুরে লইয়া গেল এবং গঙ্গার গর্ভে এক প্রকাণ্ড জমীখণ্ড দেখাইয়া দিয়া বলিল, ইহাতে অট্টালিকা প্রস্তুত হইবে। সেই চীনা মিস্ত্রীকে কাঠের কাযের জন্য Contract দেওয়া হইবে। তবে পূর্ব্ব হইতে তাহাকে জানা নাই, সেই কারণে কন্দর্পের কাছে তাহার ৩ হাজার টাকা গচ্ছিত রাখিতে হইবে। এইরূপ টাকা জমা লইয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিল। লেখাপড়া হইবার কথা ছিল, কিন্তু হয় নাই। চীনা কনট্রাক্টরটি অনেক দিন ঘুরিয়া ফিরিয়া যখন দেখিল, টাকা আদায়ের কোন সুবিধা হইল না, তখন ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে নালিশ করিয়া দিল—প্রতারণার অজুহাতে।

নালিশও রুজু হইল, ওয়ারেণ্টও বাহির হইল; কিন্তু আসামী আর ধরা পড়ে না। আমি ফরিয়াদীর উকীল ছিলাম। ৩ মাস ধরিয়া যখন আসামী ধরা পড়ে না, তখন আমি ডিটেক্টিভ ডিপার্টমেণ্টের ডেপুটী কমিশনার স্বর্গীয় বার্ড (Mr. L. N. Bird) সাহেবকে সমস্ত কথা বলিলাম এবং তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম, যখন পুলিস-কর্ম্মচারীদের প্রত্যেক মাসিক অধিবেশনে হুগলী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সহিত দেখা হইবে, তখন যেন এই ওয়ারেণ্টের জারি না হওয়ার কথা তাঁহার কর্ণগোচর করেন। বার্ড সাহেব তাহাই করিলেন। ফলে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব হুকুম দিলেন যে, স্থানীয় ইন্‌স্পেক্টার যদি ৭ দিনের মধ্যে কন্দর্পকে গ্রেপ্তার না করে, তবে তিনি বিশেষ রুষ্ট হইবেন। এই হুকুমের ফলে ৩ দিনের মধ্যে কন্দর্প কোর্টে হাজির হইল।

মোকর্দ্দমা চলিল। তাহার জবাব হইল, চীনেম্যান ৩ হাজার টাকা জুয়ায় হারিয়া গিয়াছে, কাষ্যের জন্ম জমা দেয় নাই।

প্রথমে শুনা গেল, জুয়া প্রমাণ করিতে এক জন বিশিষ্ট ভদ্রলোক আসামীর সাক্ষিরূপে আসিতেছেন, কিন্তু কার্য্যকালে তাহার সরকার আসিল, তিনি নিজে আসিলেন না। জেরায় সরকারটি মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রমাণিত হইল। কন্দর্পের সহিত আমার পরিচয় ছিল। কোন এক সভায় আমরা দুজনেই ছিলাম। কন্দর্প আসিয়া এই মামলার কথা তুলিলে আমি বলিলাম,—কন্দর্পবাবু, আমাকে মাপ করিবেন। আমি ফরিয়াদীর উকীল হইয়া এ মামলার কথা কহিতে পারিব না। তবে আপনার খাতিরে আমি এইটি করিতে পারি, যদি আপনি চীনাকে ১৫ শত টাকা দেন, আমি অনুরোধ করিয়া মামলা তুলিয়া লইতে পারিব। কিন্তু যদি আপনি মনে করেন যে, আমি ফরিয়াদীর উকীলরূপে আপনার উপর চাপ দিয়া এই টাকাটি আদায় করিয়া দিলাম, তাহা হইলে এই টাকা দিবেন না।

সে আম্‌তা আম্‌তা করিয়া চলিয়া গেল, কিন্তু আর কোন দিন আসিল না। শেষে মামলা চলিল। কন্দর্প দোষী সাব্যস্ত হইল এবং তাহার সশ্রম ১৮ মাস কারাদণ্ডের আদেশ হইল। এই রায়ের বিরুদ্ধে কন্দর্প হাইকোর্টে আপীল করিয়াছিল এবং আরও কিছু খরচ হইয়াছিল; কিন্তু ফলে কিছুই হইল না। নিম্ন আদালতের রায় বজায় রহিল। নিম্ন আদালত ও উচ্চ আদালত মিলাইয়া তাহার প্রায় ৮ হাজার টাকা খরচ হইয়াছিল। অধিকাংশ ঘৃণিত পাপীদের শেষ সাজা এইরূপই হইয়া থাকে।

পাঠক-পাঠিকাগণ বলিতে পারেন, প্রকাশ্যভাবে এই জুয়াচুরি চলিতেছে, হাজার হাজার লোক ঠকিতেছে, সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে, তথাপি ইহার দমন হইতেছে না, এত বড় রাজার রাজত্বে এই পাপকার্য্য বন্ধ হইতেছে না কেন? তাহার কারণ—

প্রথম।—এই নওসেরিয়া দলের লোকরা এমনভাবে কার্য্য করে, সে ব্যতীত অন্য কেহ তাহার দলের লোক এখানে উপস্থিত থাকে না। কাযেই সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাব হয়। জুয়া খেলা প্রমাণ করিতে হইলে যে সব সাক্ষ্যের প্রয়োজন, তাহার অভাব। কারণ, সব লোকই অপর পক্ষের।

দ্বিতীয়।—প্রতারণার ধারায় (Section 420 I. P. C.) তাহাদের চালান দিলেও প্রমাণের অভাব। কারণ, জুয়ারীরা দুই জনের অধিক অপর পক্ষের লোককে সে স্থানে রাখে না।

তৃতীয়।—যাহাদের মনে মনে নিজেকে বুদ্ধিমান্ বলিয়া অভিমান আছে, তাহারা ঠকিয়াও প্রকাশ করিতে চাহে না যে, তাহারা ঠকিয়াছে। কিল খাইয়া কিল চুরি করিতে চায়। সেয়ানা বলিয়া অভিমান, কাযেই প্রতারিত হইয়াছে বলিয়া কাহারও নিকট নিজ স্বল্পবুদ্ধিমত্তা প্রকাশ করিতে চায় না।

চতুর্থ।—এই নওসেরিয়া দলের চর চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে, তুমি থানায় যাইতেছ, তুমি উপরওয়ালাদের নিকট নালিশ করিতেছ, সব তাহারা খবর রাখে। যতদূর পারে, প্রতারিতকে স্তোক দিয়া রাখে। যখন দেখে "শিকার" কিছুতেই বাগ মানিতেছে না, কিম্বা তাহার পিছনে লোক জুটিয়াছে, তখনই বলে, "মাছি লাগিয়াছে, জাল তোলো।" লুণ্ঠিত সম্পত্তির কিঞ্চিৎ অংশ ফিরাইয়া দিয়া প্রতারিত ব্যক্তিকে ঠাণ্ডা করে।

পঞ্চম।—আইন ঠিক আছে, কিন্তু সেই আইনটি বলবৎ করিতে হইলে যে সব কার্য্য করিতে হইবে, তাহার লোকের অভাব কিম্বা সেই সব লোক অন্য কার্য্যে অধিক ব্যস্ত থাকার দরুণ এ সবগুলি দেখিতে সময় পায় না।

ষষ্ঠ।—জুয়া খেলিয়া সকলেই হৃতসর্ব্বস্ব হয়, ইহা সকলেই জানে। সকল সময়েই সকল যুগেই শকুনির আধিপত্য আছে। মহাভারতের সময়ে যে শকুনির প্রাদুর্ভাব ছিল, তাহা নয়, এখনও পর্য্যন্ত প্রাদুর্ভাব আছে। ভদ্রলোকও জুয়া খেলিতে ব্যস্ত। মহাভারতের সময় কুরুপাণ্ডব ছিল, এখন তাঁহাদের বংশধররা বা স্বল্পাভিষিক্ত লোকরা আছেন। জুয়া খেলিবার জন্য সকলেই ব্যস্ত, ইচ্ছা করিয়া পতঙ্গরূপে আগুনে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। সেই কারণে যত দিন না মানুষের শিক্ষার উন্নতিলাভ হয়, যত দিন না মানুষ বিশেষরূপে ধর্ম্মশিক্ষা পায়, তত দিন কোন আইনই এই বহ্নিমুখবিবিক্ষু পতঙ্গগুলিকে রক্ষা করিতে পারিবে না। যত দিন না মানুষ বুঝিবে, ভগবানের ইহা অভিপ্রেত নহে যে, মানুষ বিনা পরিশ্রমে, বিনা চেষ্টায়, বিনা কর্ম্মে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিবে, তত দিন মানুষ লাভ করিতে গিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইবেই হইবে।

এই জুয়াচুরি খেলায় হার ত নিশ্চয়। তাহার উপর প্রহার, কাড়িয়া লওয়া, ভীতিপ্রদর্শন ইত্যাদি। দুঃখের বিষয়, প্রত্যহ লোক শুনিতেছে, জানিতেছে, হারিতেছে, তথাপি এই নওসেরিয়া দলের "শিকারের" অভাব হইতেছে না; তাহার কারণ, লোকের প্রভূত ধনলিপ্সা, ধর্ম্মহীন শিক্ষা, যেন তেন প্রকারেণ অর্থ উপার্জ্জনের স্পৃহা, ভগবানে বিশ্বাসের অভাব, নিজের বুদ্ধিমত্তার উপর অগাধ বিশ্বাস। ধারণা, যেন তেন প্রকারেণ কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিলেই সুখী হইতে পারিবে। তাহা হয় না, তাহা হইবার নহে। জগদীশ্বরের বিশ্বরাজ্যে অধর্ম্মের উপর অধিষ্ঠিত ভিত্তিতে সাময়িক কিছু সুবিধা হইতে পারে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বিশেষ শান্তিপ্রদ ফল পাওয়া যায় না।

শ্রীতারকনাথ সাধু (রায় বাহাদুর)।

ধর্ম্মদাস

(উপন্যাস)

পরিচ্ছেদ—নয়

শক্তিপ্রকাশ শরীরে সুস্থতা লাভ করিলেও, মনে মনে তিনি কিছুমাত্র সুস্থতা লাভ করিতে পারেন নাই। আহারে তাঁহার রুচি হইত না এবং রাত্রিতে দুই চক্ষু বুজিয়া বোধ করি ঘণ্টাখানেকের জন্য গভীর নিদ্রা যাইতে পারিতেন না।

সর্ব্বদাই তাঁহার মনে হইত, ধর্ম্মদাস নিঃশব্দে যেমন করিয়া চলিয়া গিয়াছে, আবার এক দিন তেমনই করিয়াই সে ফিরিয়া আসিবে। তাই রাত্রিতে বাতাসের শব্দে তিনি বিছানায় তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া, দুই চক্ষু আয়ত করিয়া চাহিয়া দেখিতেন, যদি তাহার ছায়াটিও একবার দেখিতে পান!

মনের মধ্যে পারাবার তোলপাড় করিতেছে; কিন্তু বাহিরে হিমালয়ের মতই বিরাট কঠিন গাম্ভীর্য্য। যেন ধর্ম্মদাসের চলিয়া যাওয়াতে তাঁহাকে কোন দিক দিয়া তাহার অভাব স্পর্শ করিতে পারে নাই!

লোক ধর্ম্মদাসের কথা তাঁহার কাছে বলিতে সাহস করিত না। এত বড় নিষ্ঠুর ঔদাসীন্য ইতিপূর্ব্বে কেহ কখন পিতার পুত্র সম্বন্ধে আর দেখিয়াছিল কি না সন্দেহ। লোক বলিত, মানুষ নয়, ইস্পাত, ইস্পাত! পাথর, পাথর!

সেই পাথরের বজ্র-কাঠিন্য ভেদ করিয়া যে ধারা প্রবাহিত হইত, তাহা ফল্গুর মত অন্তঃসলিলা! লোক ত ঐ কথা বলিবেই!

জমীদারী দেখিতেন বটে শক্তিপ্রকাশ; কিন্তু কি দেখিতেন, তাহা নিজেই জানেন না। কর্ম্মচারীদের ধমক দিতে গিয়া মনে হইত না, কেন ধমকাইতেছেন। শুধু অভ্যাসের নিয়মে চলিয়াছে তাঁহার দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার ব্যাপার। প্রকাণ্ড খড়্গখানায় ধার নাই, তবুও কাটে, সে কেবল ভারে!

বাহিরের মানুষরা হয় ত ইহার কতক বুঝিত; কিন্তু তাঁহার প্রতাপের দুর্গের এত বড় নাম-ডাক জমিয়া গিয়াছিল যে, তাহারই ভয়ে চলিয়াছিল কায-কর্ম্ম মন্থর গতিতে, চিরাচরিতের পথে!

এই পরিবর্ত্তনের খবর শুধু একমাত্র জানিত রামপ্রসাদ, এবং সেই ফাঁকে ফাটলের মধ্যে যেমন অশ্বত্থগাছ বাড়ে, তেমনই করিয়া নিজের দুষ্কৃতির মধ্যে সে বিনা বাধায় বাড়িয়া চলিয়াছিল। তাহাকে শাসন করিবারও কেহ ছিল না এবং তাহার সম্বন্ধে শক্তিপ্রকাশকে নালিশ করিবার কাহারও সাহসে কুলাইত না।

ইদানীং সকালে শক্তিপ্রকাশের উঠিতে দেরি হইত। চিঠিপত্র আসিত কিন্তু সকালেই। বাহিরের টেবিলের উপর একটি ছোট বাক্সের মধ্যে সেগুলিকে রাখিয়া পোষ্টাফিসের লোক চলিয়া যাইত। এই ব্যবস্থার আরম্ভে এই বাক্সটিতে দুইটি চাবি ছিল, একটি থাকিত ডাকঘরে এবং অপরটি থাকিত শক্তিপ্রকাশের নিকট। কালক্রমে চাবির ব্যবস্থা ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল। তথাপি তাহাতে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই; কারণ, সকলেই জানিত যে, বাবু ছাড়া ঐ বাক্স প্রথমে খোলার অধিকার আর কাহারও নাই। এইরূপ বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছিল।

ধর্ম্মদাসের চলিয়া যাওয়ার পর হঠাৎ রামপ্রসাদ মনে মনে অনেকটা সাবালক হইয়া উঠিয়াছিল। সে প্রত্যহ আসিয়া ডাকের বাক্স নাড়াচাড়া করিয়া দেখিত। তাহাতে অন্য কোন ফল হউক আর না হউক, তাহার মনে হইত যে, তাহার ক্ষমতা অব্যাহত।

ইহাতে জমীদারীর কর্ম্মচারিগণের কিছু সুবিধা ছিল। তাহাদের নামে নালিশ করিয়া যে সকল বে-নামী চিঠি আসিত, কর্ত্তার হাতে পড়িলে তাহার কৈফিয়ৎ দিতে দিতে তাহাদের প্রাণান্ত হইত। তাই তাহারা রামপ্রসাদকে ধরিয়া সময়ে সময়ে সেই সকল পত্র সরাইয়া ফেলিবার সুযোগ বাহির করিয়াছিল। রামপ্রসাদ মনে করিত যে, এইরূপ করিলে কর্ম্মচারিগণ তাহাকে ভালবাসিবে এবং অর্থের প্রয়োজন হইলে তাহাদের দিবার কোন আপত্তি থাকিবে না; এবং প্রকৃতপক্ষে এইরূপ হইতে আরম্ভ

হইয়াছিল। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ করিয়া কুসংসর্গ করিলে পয়সার প্রয়োজন হয়।

রামপ্রসাদ ইতিমধ্যে সিগারেট টানিতে শিখিয়াছিল এবং তাহা নিজের বন্ধুদের মধ্যে বিতরণ করিয়া সে নিজেকে দাতাকর্ণ মনে করিত।

সে দিন হঠাৎ বাক্স খুলিয়া ধর্ম্মদাসের হাতের লেখা দেখিয়া প্রথমে রামপ্রসাদের খুব ভাল লাগিল; কিন্তু তাহার পরই মনে নানা কথা আসিল। সে তাড়াতাড়ি চিঠিটা নিজের পকেটের মধ্যে লুকাইয়া লইল। পড়িয়া দেখিবে, তাহার পর আবার রাখিয়া দিলেও চলিতে পারে।

কিন্তু চিঠিখানি খামে মোড়া ছিল। আগ্রহাতিশয্যে খামখানি চিঠি খুলিবার সময় এমন ছিঁড়িয়া গেল যে, তাহাকে কোন প্রকারেই আর মেরামত করিয়া রাখিয়া দেওয়া চলে না। ছেঁড়া খাম দেখিলে শক্তিপ্রকাশ যে কি করিবেন, তাহা রামপ্রসাদ ভাল করিয়াই জানিত। অতএব সব চেয়ে সোজা কথা, পত্রখানি গোপন করা ছাড়া আর উপায়ান্তর রহিল না।

পত্র পড়িয়া রামপ্রসাদ খুসী হইল; কারণ, প্রশ্ন চুরি যে রামপ্রসাদ করিয়াছিল, ধর্ম্মদাস তাহা পত্রেও বলে নাই। দ্বিতীয়তঃ, সে আসিবার কথাও লেখে নাই। ধর্ম্মদাস আসিলে হয় ত সে এক দিক দিয়া খুসী হয়; কিন্তু ইতিমধ্যে বহুতর ভাবে, বিশেষ করিয়া—পিতার ঔদাসীন্যের জন্য তাহার চাল-চলন এমন বিগড়াইয়া গিয়াছিল যে, সে আর এক মন দিয়া চাহিত যে, ধর্ম্মদাস না ফেরে। ইহার উপর কর্ম্মচারিগণের উল্লাস যে, জমীদারীর ষোল আনাই তাহার হইল, এবং কস্মে সে কাহারও কাছে ছোট হইবে না, তাহার মনে ধর্ম্মদাসের প্রত্যাবর্ত্তনের বিরুদ্ধে একটা চাপা মনোভাবের সৃষ্টি করিয়াছিল।

ঘরে ফিরিয়া রামপ্রসাদ পত্রখানা আর একবার পড়িয়া একখানা বইয়ের মধ্যে রাখিয়া দিল। মনে মনে ইচ্ছা ছিল যে, সময়মত সেটাকে খুব ভাল করিয়া লুকাইবে; কিন্তু দৈবাত তাহা আর ঘটিয়া উঠিল না।

সে পত্রখানি ক্রমে সহপাঠীর মধ্যে কেহ কেহ দেখিল, এবং দুই এক দিনের মধ্যে স্কুলে জানা-জানি হইয়া গেল যে, ধর্ম্মদাস পত্র দিয়াছে, এবং শীঘ্রই সে ফিরিয়া আসিবে। অবশ্য এ সংবাদের শেষের অংশটি বালকদিগের কল্পনা-প্রসূত।

ক্রমে কথা গিয়া প্রধান শিক্ষকের কাণে উঠিল। তিনি রামপ্রসাদকে ডাকিয়া পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। সে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিল। কিন্তু কয়েক জন বালক বলিল যে, তাহারা সে পত্র রামপ্রসাদের পুস্তকের মধ্যে দেখিয়াছে। কথাটা এইরূপ করিয়া একটা গোলমালের মধ্যে চাপা পড়িয়া রহিল।

কথাটার স্থিরনিশ্চয় না করিয়া হেডমাষ্টার শক্তিপ্রকাশের কাছে যাইতে সাহস করিলেন না। এমনই করিয়া পাঁচ-সাত দিন কাটিল।

এক দিন প্রভাতে তিনি স্কুলের মালীর কার্য্য পরিদর্শন করিতে আসিয়া পত্রখানিকে হঠাৎ কাগজের আবর্জ্জনার মধ্যে কুড়াইয়া পাইলেন। তিনি ধর্ম্মদাসের হাতের লেখা ভাল করিয়াই চিনিতেন।

পত্রখানি পকেটে করিয়া তিনি শক্তিপ্রকাশের কাছে উপস্থিত হইলেন, এবং এ-কথা সে-কথার পর ধর্ম্মদাসের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

শক্তিপ্রকাশ উত্তরে বলিলেন, "আমার বিশ্বাস, সে আর ফিরিবে না, কেন না, সে এত দিনে মারা গেছে!"

কথাগুলি শক্তিপ্রকাশ এমন অবহেলা এবং ঔদাসীন্যের সহিত বলিলেন যে, পকেট হইতে পত্র বাহির করিয়া তাঁহাকে দেখান আর হেডমাষ্টারের সমীচীন মনে হইল না। তিনি স্তব্ধ হইয়া বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, কি করা যাইতে পারে।

চলিয়া আসিবার সময় কেবল বলিয়া আসিলেন যে, তাঁহার মনে হয়, ধর্ম্মদাস অচিরে বাড়ী ফিরিবে।

শক্তিপ্রকাশ হঠাৎ যেন রাগ করিলেন। কোন কথার উত্তর দিলেন না।

পরের দিন প্রভাতে শক্তিপ্রকাশের হাতে এই পত্রখানি আসিল:—

"শ্রদ্ধাভাজনেষু,

আপনার পুত্র ধর্ম্মদাস কিছু দিন হইতে আমাদের কাছে ছিল। সম্প্রতি সে অতিশয় পীড়িত হইয়াছে। তাহার সর্ব্বাঙ্গ আসল বসন্তে ভরিয়া গিয়াছে। তাহার জ্ঞান নাই। বিকারে সে সর্ব্বদাই আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার কথা বলে।

কিছু দিন পূর্ব্বে সে নিজের হাতে একখানি পত্র

আপনাকে দিয়াছিল ; আমরা আশা করিতেছিলাম, তাহার উত্তর আসিবে।

আমার পক্ষ হইতে ধর্ম্মদাসের পীড়ার সংবাদ আপনাকে দেওয়া অবশ্য-কর্ত্তব্য বিবেচনা করায় এই পত্র দিতেছি। অনুগ্রহ করিয়া ধর্ম্মদাসের পূর্ব্ব-অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া আপনার শ্রীচরণে তাহাকে আশ্রয় দিবেন, এই আমার সবিনয় নিবেদন, ইতি।

বিনীত

শ্রীমণিময় রায়।"

পত্রখানি পড়িয়া শক্তিপ্রকাশের সর্ব্বশরীর থর-থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল এবং তাঁহার দুই চক্ষু বহিয়া অঝোরে অশ্রু বহিতে লাগিল।

কানাই অদূরে কি কায করিতেছিল, সে ছুটিয়া আসিয়া কাছে দাঁড়াইতে তাহার দিকে চাহিয়া শক্তিপ্রকাশ কাঁদিয়া ফেলিলেন :—"কানাই, কানাই! ধর্ম্মদাস আমার -"

আর কিছু বলিতে পারিলেন না। শক্তিপ্রকাশ অচৈতন্য হইয়া চেয়ার হইতে পড়িয়া যাইতেছিলেন, কানাই ধরিয়া তাঁহাকে মাটীতে শুয়াইয়া দিল।

অচিরে ডাক্তার আসিয়া শক্তিপ্রকাশের মাথায় বরফের ব্যাগ দিবার জন্য ষ্টেশনে লোক পাঠাইলেন, এবং কানাইকে বলিলেন, মাথায় হাওয়া এবং জল অবিশ্রান্ত দিতে হইবে।

এই সংবাদ চতুর্দ্দিকে আগুনের মত ছুটিয়া গেল।

বৈকালে স্কুল ভাঙ্গার পর হেড মাষ্টার দেখিতে আসিলেন। ডাক্তার উপস্থিত ছিলেন। তিনি ডাক্তারকে এক দিকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিলেন, "ডাক্তার বাবু, এর কি কারণ অনুমান করেন?"

ডাক্তার বলিলেন, "সেই একই কারণ, পুত্রশোক। তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই।"

হেড মাষ্টার কানাইকে ডাকিলেন। সে আসিলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন ক'রে কি অবস্থায় তোমার বাবুর এই অসুখ হলো? কিছু কি বলতে পার? সকালে কেমন ছিলেন?"

কানাই বলিল, "সকালে ভাল ছিলেন। ঐ বাক্স থেকে চিঠি পড়ার পর বাবুকে আমি কাঁপতে দেখে ছুটে আসি।"

বাক্স খুলিতেই মণিময়ের চিঠি পাওয়া গেল। অন্য চিঠিগুলি তখনও খোলা হয় নাই।

সেই দিনই হেড মাষ্টার মণিময়ের পত্রের উত্তর দিলেন। শক্তিপ্রকাশ বাবু একটু ভাল হইলে এক দিন তিনি ও ডাক্তার বাবু গিয়া ধর্ম্মদাসকে আনিবেন। ধর্ম্মদাসের কুশল, এবং আসিবার অবস্থা হইয়াছে কি না, তাহা অবিলম্বে জানাইবার জন্য লিখিয়া দিলেন।

এই ধাক্কা সাম্‌লাইতে শক্তিপ্রকাশের প্রায় মাসখানেক লাগিল।

পরিচ্ছেদ—দশ

ধর্ম্মদাস ফিরিয়া নিজেদের বাড়ী প্রথমে আসিল না। তাহার দুইটি কারণ ছিল। প্রথম গুটী-রোগে তাহাকে দেখিতে কদাকার করিয়া দিয়াছিল। দ্বিতীয় কারণ, ডাক্তার মনে করিলেন যে, শক্তিপ্রকাশ হয় ত ধর্ম্মদাসকে অকস্মাৎ দেখার আবেগ সহ্য নাও করিতে পারেন।

তাই ধর্ম্মদাস পাল্‌কী করিয়া গিয়া উঠিল ডাক্তার বাবুর বাড়ীতে। সঙ্গে মণিময় আসিয়াছিলেন। হেড মাষ্টার যাইতে পারেন নাই।

শক্তিপ্রকাশকে সংবাদ দিবার ভার পড়িল হেড মাষ্টারের উপর। তিনি প্রত্যহই যাইতেন, সে দিনও গিয়া বসিলেন।

শক্তিপ্রকাশ একখানা প্রকাণ্ড ইজি-চেয়ারে শুইয়া কাগজ পড়িতেছিলেন। কানাই অদূরে বসিয়াছিল। রামপ্রসাদ পাশের ঘরে মাষ্টারের কাছে পড়িতেছিল। সে শব্দ একটু-আধটু শোনা যায়।

হেড মাষ্টারকে দেখিয়া শক্তিপ্রকাশ মৃদু হাস্য করিয়া চেয়ারে সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন, "আর আমি সেরে উঠেছি! ডাক্তার বাবু দু'দিন আসেন নি, অবশ্য আমার আর ডাক্তারের দরকার নেই।"

হেড মাষ্টার সুযোগ বুঝিয়া বলিলেন, "ডাক্তার বাবুকে আমরা কল্‌কেতা পাঠিয়েছি কি না, ধর্ম্মদাসকে দেখে আসতে, কেমন সে আছে।"

শক্তিপ্রকাশ গুম হইয়া রহিলেন। তাঁহার মুখ হইতে কোন কথা বাহির হইল না। শুধু কাগজের দিকে উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে তাঁহার দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

হেড মাষ্টার বলিলেন, "ধর্ম্মদাস সেরেছে, ভাল আছে।"

কিন্তু সে কথা যেন শক্তিপ্রকাশের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল না।

মাষ্টার আবার বলিলেন, "ডাক্তার বাবু ফিরেছেন, ধর্ম্মদাস ভাল আছে।"

শক্তিপ্রকাশ যেন একটু অবিশ্বাসের হাসি হাসিলেন; তাহার পর উন্মনা হইয়া কি বলিতে গিয়া না বলিয়া, কাগজখানি রাখিয়া সাশ্র-নয়নে হেড মাষ্টারের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমি কি শিশু? ধর্ম্মদাস ইহ-জগতে নেই—"

এমন সময়ে বাহিরে ডাক্তার বাবুর বুটের শব্দ শোনা গেল। তাহার মধ্যে মানুষটির অসঙ্কোচ নিশ্চয়তার অভ্রান্ত পরিচয়।

তিনি হাসিতে হাসিতে ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "কি, কেমন বোধ করছেন?" পিছনে পিছনে আর একটি মানুষ শান্ত পদবিক্ষেপে আসিয়া দূরে দাঁড়াইল।

শক্তিপ্রকাশ তাঁহার দিকে চাহিতে তিনি দুই হাত তুলিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলেন।

শক্তিপ্রকাশ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইনি?"

ডাক্তার বাবু একখানা চেয়ার আগাইয়া দিয়া বলিলেন, "বসুন মণিময় বাবু, আমি আলাপ করিয়ে দিচ্ছি।"

"মণিময়! মণিময়! আমি যে কোথায় শুনেছি ওঁর নাম" বলিয়া শক্তিপ্রকাশ স্মৃতির অন্ধকার গহ্বর অন্বেষণ করিবার সময়ে কপাল কুঞ্চিত করিলেন।

ডাক্তার বাবু চেয়ারে বসিয়া বলিলেন, "ধর্ম্মদাস শেষ কালে গিয়ে এঁরই আশ্রয়ে ছিল। ধর্ম্মদাসের জীবনদান ইনিই করেছেন।"

মণিময় লজ্জায় শির অবনত করিলেন, মুখে কি বলিলেন, তাহা না শুনা গেলেও সকলেই বুঝিল।

হেড মাষ্টার আবেগভরে উঠিয়া মণিময়ের সহিত কোলাকুলি করিয়া বলিলেন, "আপনার সঙ্গে আমার পত্রে জানা-শুনো হয়েছে।"

মণিময় প্রতিনমস্কার করিয়া বলিলেন, "আপনি রমেশ বাবু?"

সকলে বসিলেন।

শক্তিপ্রকাশের দুই চক্ষু যেন ঘরের সর্ব্বত্র কি খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিল; কি প্রশ্ন যেন বার বার ওষ্ঠাগ্রে আসিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া যায়; অবশেষে তিনি বলিলেন, "ধর্ম্মদাস? ধর্ম্মদাস কোথায়?"

ধর্ম্মদাস ধীরে আসিয়া পিতাকে প্রণাম করিল।

তাহার দিকে শক্তিপ্রকাশ বিস্ময়ে চাহিয়া বলিলেন, "এ ছেলেটি কে?"

ধর্ম্মদাসের সমস্ত মুখ বসন্তের দাগে ভরিয়া গিয়া কালো হইয়া গিয়াছিল। সে তপ্ত-কাঞ্চনের মত রং কোথায়? জীর্ণ-শীর্ণ, যেন মানুষ নয়, মানুষের প্রেত!

সকলে নিরুত্তর হইয়া রহিলেন।

শক্তিপ্রকাশ তীক্ষ্ণ-নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, "এই ধর্ম্মদাস?"

তাঁহার ওষ্ঠাধর কাঁপিতে লাগিল; দুই চক্ষু ভরিয়া চক্ষুর জলও যেন স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল।

ধর্ম্মদাস পিতার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "বাবা! আমায় ক্ষমা করুন।"

শক্তিপ্রকাশ ধর্ম্মদাসকে দুই বাহুতে বেষ্টন করিয়া বলিলেন, "ক্ষমা? ধর্ম্মদাস, ক্ষমা?"

কানাই জানালার ফাঁক দিয়া এই দৃশ্য দেখিয়া আর অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিল না। পাছে কান্নার শব্দ হয়, তাই সে দ্রুতপদে বাড়ীর উঠানে নামিয়া গেল।

[দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত]

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

নারী-জাগরণ

আপনাদের এই মহিলা-সভা আমার প্রতি স্নেহ ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন জন্যই অধিবেশিত হইয়াছে; ইহাতে আমি এক দিকে যেমন গৌরব বোধ করিতেছি, অপর দিকে আবার আমায় ইহা তেমনই কুণ্ঠিত ও লজ্জিত করিতেছে।

আপনারা আমার কাছে কিছু জানিতে চাহেন, কিছু দাবী করেন; কিন্তু আমি যা দিব, সে আপনাদের দানের কাছে তুল্যমূল্য হইবে কি না, বলিতে পারি না।

যা হোক, আমার দেশের মায়েদের এবং মেয়েদের কাছে আমার যাহা বলিবার আছে, সরলভাবেই বলিব। আমাদের পরস্পরের মধ্যে যে একটা বলাবলির দিন আসিয়াছে, তা যেমন আমি, তেমনই আপনারাও অনুভব করিতেছেন।

আমাদের দেশে 'নারী-জাগরণ' বলিয়া খুব একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, এ কথাটার অর্থ আমি সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। জাগরণ কথাটার আভিধানিক অর্থ--নিদ্রাভঙ্গ হওয়া। ঘুমাইলেই ঘুম ভাঙ্গে, তাহা হইলে নারী-জাগরণের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, ভারতবর্ষের মেয়েরা এত দিন নিদ্রামগ্না ছিলেন, এক্ষণে তাঁদের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। আচ্ছা, ধরিয়া লইলাম, তাঁরা এত দিন ঘুমাইতেছিলেন, এক্ষণে যে রকম করিয়াই হউক, তাঁদের সেই সুখনিদ্রাটি ভঙ্গ হইয়াছে; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, সুপ্তোত্থিত হইয়াই তাঁরা হঠাৎ এমন মানোয়ারী মূর্ত্তি ধরিয়া উঠিলেন কেন? সুনিদ্রার পর মানুষ সুস্থ ও শান্ত হইয়া জাগ্রত হয়, শরীর-মনে নূতন বল, নবীন শক্তি লইয়া জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রে তখনই আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্মগুলি শান্ত-সমাহিত-ভাবে সুচারুসম্পন্ন করিয়া লইবার অবকাশ ঘটে। দেহে ক্লান্তি নাই, মনে শ্রান্তি নাই। সদ্যোনিদ্রোত্থিত নারীরা শুচিশুদ্ধ পবিত্রাচারে প্রথম উষায় সর্ব্বপ্রথম দেবারাধনার জন্য পুষ্প চয়ন, পূজার নৈবেদ্য রচনা প্রভৃতি পুণ্যকার্য্যে রত না হইয়া, একবারে রুদ্রাণীরূপ ধারণ করিয়া পতি-পুত্র, পিতা-ভ্রাতার পৃষ্ঠে কশাঘাত আরম্ভ করিয়া দিলেন কেন? ঘুম তাঁহাদের যদি ভাঙ্গিয়াই থাকে, সে ত ভাল কথাই, তা সেটাকে অত চীৎকার গালাগালি করিয়া জানাইবার প্রয়োজন কি ছিল? যখন হইতেই নারীরা জাগিতেছেন, তখন হইতেই এই হট্টগোলটি শুনা যাইতেছে যে, আর তাঁরা পুরুষের দাসী নহেন, পাষণ্ড পুরুষের পাপ উদ্দেশ্য মেয়েরা বুঝিয়াছেন, পুরুষরা তাঁদের নাকি কেবলমাত্র ভোগের দাসী এবং বিলাসের সখী করিয়া চির-অত্যাচারে জর্জ্জরিত করিতেছিলেন, এবার তাঁরা আর তাঁদের তোয়াক্কা রাখিবেন না, স্বাধীন হইবেন।

শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী

ব্যাপারটা ঠিকমত আজও বুঝিলাম না, অনেক গালি খাইয়াও নয়। কিছুকাল পূর্ব্বেই যেন ঐ হতভাগ্য পুরুষরাই আমাদের কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ করিবার জন্য 'জাগো জাগো' রব তুলিয়াছিলেন না?—'না জাগিলে এই ভারত-ললনা, এ ভারত আর জাগে না জাগে না।' এ সব উক্তি ও যুক্তি পুরুষেরই। রামমোহন, কেশব, ভূদেব, বিদ্যাসাগর এঁরা পুরুষই ছিলেন বোধ হয়? নারী জাগাইতে এঁদের লেখনী ও কার্য্য অল্প ব্যয় করিতে হয় নাই। এখন দুপুরুষ বাদে মেয়েরা হঠাৎ যেন আপনা হইতেই বা জাগিয়া উঠিয়া স্বপ্নে স্বাধীনতা লাভ করিলেন, এমনই ধারা তাঁদের ভাবখানা দেখিতেছি।

এ বৃথা মদান্ধতায় লাভটা কি? পূর্ব্বেও বহুবার বলিয়াছি, এখনও বলি, পরেও বলিব, যে সব নারী পিতার কন্যা, ভ্রাতার ভগিনী, পতির পত্নী, পুত্রের মাতা, তাঁরা জাতি তুলিয়া পুরুষের প্রতি অকথ্য কলঙ্কারোপ কেমন করিয়া করিতে পারেন, তাহা আমার বুদ্ধির অগম্য। নারীর প্রতি অত্যাচার কাপুরুষেই করে, পুরুষে করে না। যে সব

বিধান ও বিধি সমাজের অবস্থাবিশেষে প্রয়োজনীয় থাকে, কালক্রমে তাহা ক্রমেই লয় প্রাপ্ত হয়—প্রথার পরিবর্ত্তন হয়। সকল প্রথারই একটা দিকে শুভ, একটা দিকে অশুভ থাকে, তার ভিতর যাহার মধ্যে মঙ্গলের অংশ অধিকতর, তাহাই দীর্ঘকালস্থায়ী হয়। পুরুষের বহু বিবাহ প্রভৃতি যে দিনে প্রয়োজন ছিল, সে দিন বহু পূর্ব্বেই বিগত হইয়া গিয়াছে, আজ এই দুর্মূল্যের কালে একটা বিবাহেই লোক ভারগ্রস্ত বোধ করে, দেশে বহু প্রজননের প্রয়োজন এ দিনে একবারেই নাই, তাই বহু বিবাহ আপনিই উঠিয়া গিয়াছে। যে প্রয়োজনে বিশ্ববিশ্রুত নেপোলিয়ন যোসেফিনকে পরিত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় বিবাহ করিয়াছিলেন, এবং যেরূপ চরিত্রের লোক বলিয়া অষ্টম হেনরী বার বার পত্নীত্যাগ করিয়া নূতন নূতন দারপরিগ্রহ করেন, এই দুই শ্রেণী ব্যতীত ভদ্রসমাজে দুইবার বিবাহ শোভা পায় না। মাতাল চরিত্রহীন যে নিজের প্রতি মমতা রাখে না, নিজের আত্মাতে যে মসীলেপন করে, সে তার স্ত্রীর প্রতি সুব্যবহার করিবে, এ আশা বাতুলেই করিতে পারে। "মেয়েরা মাছের মুড়া খাইতে পায় না, মাছের কাঁটা খায়" বলিয়া অনেক নারী, এমন কি, তা শুনিয়া শুনিয়া কোন কোন পুরুষও আজকাল চোখের জল ফেলিতেছেন, সে দোষটা কিন্তু পুরুষের নয়, মেয়েদেরই। তাঁরাই তখন বোধ করি আধ-ঘুমন্ত অবস্থায় ঐ রকম উল্টা ব্যবস্থা করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এখনকার মত তখন ত বেহার-উৎকলবাসী পুরুষ ব্রাহ্মণ ঠাকুররা রান্নাঘরের অধিকার পান নাই। এখন ও ভুলটা ভাঙ্গিয়া দিলেই চলিবে, কিন্তু অনেক দোষে দোষী হইলেও যে দোষটায় তাঁরা দোষী নন, সেটা শুদ্ধ ওঁদের ঘাড়ে আর নাই চাপাইলাম! সে কালের শিক্ষা জিনিষটা নেহাৎ সেকেলে বলিয়াই আমাদের দিদিমা-ঠাকুরমারা মেয়েদের ছোটবেলা হইতেই সংযম ও ত্যাগ শিখাইতেন, ও নিয়মটা তারই কুফল। তবে ভাই মুড়া পাইলেও বোন্ "লেজা" খাইয়া হাসিমুখেই রাজা হইত। "পুরুষদের হইয়া কেনই বা ওকালতী করি", এ কথাও আমায় অনেকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, উত্তর আমার বরাবরই এক। পুরুষ ও প্রকৃতি আমাদের দেশে অভিন্নরূপেই পূজিত হইয়া থাকেন। প্রকৃতি যখন পুরুষ হইতে বিচ্ছিন্ন, তখনই তাঁর দুর্দ্দশার কাল। আমাদের দেশের মেয়েরা যে পুরুষের সহিত সর্ব্ববিষয়ে তুল্যাধিকার চাহেন, প্রাকৃতিক নিয়মে তাহা কখনই ঘটিতে পারে না। পুরুষ নারীকে সর্ব্বথা বর্জ্জন করিয়া যেমন সংসারক্ষেত্রে টিকিতে পারে না, নারীরও ঠিক তাই। ঈশ্বর হয় ত আমাদের অপেক্ষা একটুখানি বেশী বুদ্ধিমান্ বা কৌশলী। তিনি নারী-পুরুষের অবস্থাটি এমন জটিল-ভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন যে, ইহাদের পক্ষে অনন্যসহায় হওয়াই দায়। অতএব মাসিক সাপ্তাহিকের পাতায় বা বক্তৃতার মঞ্চে দাঁড়াইয়া পুরুষকে তারস্বরে গালি না পাড়িয়া তাঁদের সঙ্গে যেমন ঘরের মধ্যে, তেমনই ঘরের বাহিরের নূতন কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁদেরই হাত ধরিয়া, যে হাত ধরিয়া এত দূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছি, সেই বাহুকেই আশ্রয় পূর্ব্বক দূরে বহুদূরে যে পথ তাঁদের যাত্রাপথ, সেই পথেই অগ্রসর হইতে থাকা যাক। তাঁরা আমাদেরই জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া, মনিবের গালি, লাথি-জুতা খাইয়াও উপার্জ্জন করিতেছেন, আমাদেরই গর্ভের ছেলের শিক্ষার, বিশেষতঃ কন্যার বিবাহে সর্ব্বস্বান্ত, এমন কি, কখনও কখনও দেনার দায়ে শ্রীঘরবাস পর্য্যন্ত করিতেছেন। যিনি নিজে শিখিয়াছেন, তিনি পত্নী-কন্যাকেও সেই শিক্ষার আস্বাদ জানাইতেও কার্পণ্য করেন নাই, এই এত বড় ব্যাপারে রাজনীতিক্ষেত্রে নারীকে বহু পুরুষ নিজের স্বেচ্ছা-সঙ্গিনী করিতেও দ্বিধাগ্রস্ত হন নাই। অন্ততঃ আর যা করুন, আমাদের মত গলা ছাড়িয়া মেয়েদের নীচ বিশেষণে বিশেষিত করিতে করিতে ভাষার চাবুক মারিয়া বক্তৃতা করেন না। তুলসীদাস বা শঙ্করাচার্য্য শতাব্দী শতাব্দী পূর্ব্বে সংসারত্যাগীকে কামিনী-কাঞ্চনে লোভ না রাখিবার জন্য যে সকল কড়া উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, সেইগুলি আমরা যে আজও কথায় কথায় 'কোট' করিতে ছাড়ি না। আর আমাদের ভাষাকে কেন আমরা অসংযত করিয়া তাঁদেরও সেই সুযোগ দিই? যদি চ তুলসী শঙ্কর কোন পতির পত্নীকে 'নরকস্য দ্বার' বা "দিনকো মোহিনী রাতকো ডাকিনী" বলিতে ভরসা করেন নাই, যেহেতু, হিন্দুশাস্ত্রমতে গৃহস্থাশ্রম সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আশ্রম, ওঁরা দুজনেই সনাতনধর্ম্মী ছিলেন, আধুনিক আলোকপ্রাপ্ত ইংরাজীশিক্ষিত ছিলেন না।

আমার বক্তব্য এই যে, আমরা অধীন জাতি, সদ্য অধীনতার নাগপাশবিমুক্ত হইবার জন্য চেষ্টিত হইতেছি, এখন আমাদের চারিদিক দিয়া কত মায়া কত ছায়ামূর্ত্তি

ধরিয়া আমাদের একনিষ্ঠ শক্তিকে কেন্দ্রানুগা হইতে বাধা দিবে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ভারতে তেত্রিশ কোটি লোকের বাস, এই বিশাল লোকসংখ্যার শতকরা তিন জনও শিক্ষিত নয়! এ অবস্থায় সমস্ত প্রাচীন প্রথাকে দায়ী না করিয়া লোকশিক্ষার ব্যবস্থা করাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। কিন্তু অধীনতাশৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত জাতির সে উপায় নাই, সে ইচ্ছাও নাই। এ দেশের বিপুল জনসংখ্যার মধ্যে বহুধর্ম্মী বহুজাতীয় লোকের বাস, ইহারা পরস্পরে যাহাতে মিলিত না হয়, এর জন্য বহু দিন হইতেই বিস্তর কল-কৌশল চলিতেছে। মিস্ মেয়ো প্রভৃতির আবির্ভাব এই সূত্রেই হইয়াছে, আমাদের নিজের দেশের শিক্ষিত ছেলে-মেয়েদের মধ্যেও এই উত্তেজনাকারীদের কৌশলে খুব একটা উন্মাদনা দেখা দিয়াছে। তাঁরাও এঁদের কাছে শুনিয়া শুনিয়া নিজের দেশের সমুদয় বিধিব্যবস্থাকেই ঘোরতর কুসংস্কাররূপে দেখিতেছেন। অসবর্ণ বিবাহ, অহিন্দু বিবাহ, হিন্দুবিবাহ-বিচ্ছেদ প্রভৃতি জাতীয় জীবনের মূলস্বরূপ অত্যন্ত গূঢ় বিষয়গুলিকে লইয়া যথেচ্ছাচারে হিন্দুসমাজের যে কত বড় সর্ব্বনাশসাধন করা যাইতে পারে, জগতের চক্ষুতে এই হীন অনুকরণ (যাহা দাস-জাতিরই একমাত্র সাজে) আমাদের সত্যকার স্থানকে যে আরও কতই নীচে নামাইয়া দিবে, বহুদিন ধরিয়া পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়াও কোন্ রক্ষাকবচের সহায়তায় হিন্দু জাতি আজিও নিজের অস্তিত্ব বিলোপ করিতে বাধ্য হয় নাই, সে ধারণা জন্মিবার বয়স, অভিজ্ঞতা, শিক্ষা কোন কিছু না থাকিলেও তাঁরা হঠাৎ একটি ছদ্মবেশী সভা ডাকিয়া জনকতক স্কুল-টিচার, স্কুল-ইনস্পেক্টর, অথবা হিন্দুশাস্ত্রের স্পর্শ ছাড়িয়া অতিশয় স্থূল-তত্ত্ব, বাহ্যাহার-পদ্ধতিতেও উত্তমরূপে শিক্ষাবিহীনা ভয়ঙ্করী অল্পশিক্ষায় মদগর্ব্বিতা, নতুবা প্রলয়ঙ্করী নব্য শিক্ষার প্রতাপে দর্পিতা এবং পুরাতন হিন্দুসমাজের বাহিরে পালিতা অবিবাহিতা কিম্বা সদ্যোবিবাহিতা কিশোরী ইত্যাদির দ্বারা হাত উত্তোলনের ভোটের বলে ছাব্বিশ কোটি হিন্দুর মধ্যের অন্ততঃ তের কোটি হিন্দু মেয়ের সম্মতি স্বীকার করিয়া লইয়া এত বড়, না, শুধু এত বড়ই নয়, সমাজস্থিতির সর্ব্বপ্রধান বিষয়কে চূর্ণ করার ব্যবস্থাকে আইনে পরিণত করিতে চেষ্টা করার ভরসা করেন। এ যে তাঁহারা কোন্ সাহসে করেন, ভাবিয়া পাই না। এক শত বা এক সহস্র অথবা এক লক্ষ (যদিও নারী-মহাসম্মিলনীর দুইবারের অধিবেশনেই এই প্রস্তাব অর্থাৎ বিবাহ-বিচ্ছেদ-প্রস্তাব অপর পক্ষের সবিশেষ যত্ন সত্ত্বেও ভোটে অগ্রাহ্য হইয়াছিল, শেষবারের প্রস্তাবের স্বপক্ষে মাত্র সাত আট, বিপক্ষে সমস্ত ভোটই পাওয়া গিয়াছিল, যদিও সংবাদপত্রে এই ভোটসংখ্যার সংবাদটি উহ্য রাখা হইয়াছিল, তথাপি এরূপ চেষ্টা অত্যন্তই নিন্দার্হ, তাহাতে সংশয় নাই। এ বিষয়ে চেষ্টা করার যিনি একান্তই প্রয়োজন অনুভব করিবেন, তাঁর প্রত্যেক পল্লীতে পল্লীতে সভা ডাকিয়া প্রথমে লোকমত সংগ্রহ করা উচিত। সহরের বড় সভায় যাঁরা ডেলিগেট হইয়া আসেন, বাস্তবপক্ষে তাঁদের 'জন-নায়িকা' নাম লওয়ার অধিকার অল্পই থাকে এবং তাঁরা এ সকল বিষয়ে তাঁর সমস্ত দেশের মেয়েদের মতামত জানিয়া আসেন না; এমন কি, নির্ব্বাচনও তাঁদের যথারীতিক্রমে হয় না। এ সকল সভার কার্য্যপ্রণালীও কিরূপ হইবে, তাহাও সর্ব্বদা অজ্ঞাত থাকে) নারীও হিন্দু-বিবাহের বিচ্ছেদ বা উচ্ছেদকামী হইয়াই থাকেন, (যদিও আমার এ বিষয়ে যথেষ্ট সংশয় আছে) তথাপি কোটি কোটি হিন্দু-নারীর বর্ত্তমানে হিন্দু-বিবাহকে লইয়া যদৃচ্ছা ব্যবহার করিবার অধিকার কাহারও নাই। ইহা একবারে সুনিশ্চিত। আপনাদের মধ্যের কেহ কেহ সেই দিন সেই মহাসভায় উপস্থিত থাকিয়া এই বীভৎস কাণ্ড হইতে হিন্দু-সমাজের মেয়েদের নাম বাঁচাইতে আমায় উৎসাহিত করিয়াছিলেন এবং এখনও আমায় আপনাদের মধ্যে সাগ্রহে ডাকিয়া আনিয়া আমার প্রতি অপরিসীম স্নেহ প্রদর্শন করিতেছেন, এর জন্য আমি আপনাদের ধন্যবাদ দিই। আমার মতামত আমি ত সর্ব্বদাই আপনাদের জানাইতেছি। দ্ব্যর্থব্যঞ্জক কোন শব্দ প্রয়োগ করিয়া আমি ত কোন দিনই নিজেকে অন্যের অবোধ্য করিয়া রাখি নাই। স্পষ্ট সরল ভাষাতেই আমার সমস্ত মতামতই যথাসাধ্য প্রকাশ করিয়া আসিয়াছি। নিজেকে সেকেলে গোঁড়া এবং জানি না, আর যা যা বলিলে আমার মতের বিরুদ্ধবাদীরা সন্তুষ্ট হন, আমি সেগুলি সবই বলিবার জন্য তাঁদের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছি, কিন্তু মনের মধ্যে আসল মতটি উহ্য রাখিয়া মুখে জাল-সংস্কারক সাজিয়া দাঁড়াই নাই। আমি আমার সন্তানদের অহিন্দু বিবাহ দিই নাই বা দিতে ইচ্ছুক নই, অন্যের বেলায় সংস্কারকের বাহবা লইব আমি কোন্ অধিকারে? যা ভাল মনে করি না, করিতে পারি না,

সঙ্গিসঙ্গতভাবেই জানি যাহা অনুচিত, অসংযত, স্বেচ্ছাচার এবং হীনতাজনক, তার জন্য লক্ষ হাতের হাততালি আমার প্রেয় নয়। সত্যের জন্য সহস্র লোকের ধিক্কার শুনিতেও আমি সম্মত আছি। শুধু আমি কেন, সমস্ত হিন্দু-সমাজই স্বধর্ম্মী বিধর্ম্মীর অজস্র অজস্র অকথ্য কুকথ্য গালি খাইয়াই বাঁচিয়া আছে। হিন্দু-সমাজ যেন বেওয়ারীশ মাল! অন্য যে কোন ধর্ম্মের সম্বন্ধে, সমাজের সম্বন্ধে প্রত্যেক বাক্যটিকে ওজন করিয়া ব্যবহার করিবার প্রয়োজন থাকে, তাদের ধর্ম্মশাস্ত্র বা ধর্ম্মের বিধি সম্বন্ধে এতটুকু শিথিলভাবে অথবা তাহার আভাসমাত্রেই, খোলা তরবারির সম্বর্দ্ধনা-লাভ ঘটে, কিন্তু একমাত্র এই উদার, অত্যুন্নত, ক্ষমাশীল সনাতন ধর্ম্মসমাজই ধৃষ্টতায় চির-উপেক্ষা প্রদর্শনে নিজের মহত্ত্বকে খর্ব্ব করেন নাই। তার ফলে এই যথেচ্ছাচার এত বড় হইয়া উঠিয়াছে যে, এখন আর নিশ্চিন্ত নীরব থাকা সঙ্গত হয় না। এ সহিষ্ণুতা মূর্চ্ছাবসাদের মতই আসন্নমৃত্যুর অভিমুখী করিতেছে বলিয়া অন্ততঃ বাহিরের দিক হইতে প্রতীয়মান হইতেছে। কিন্তু না, হিন্দু-সমাজ এখনও মরে নাই, হিন্দুনারী এখনও সতীই আছে, আমি জোর করিয়াই নব্যসংস্কারিকাদের বলিতে চাই যে, স্বেচ্ছাতন্ত্রতার অনেক পথই পড়িয়া আছে, উদার বিশাল হিন্দু-সমাজে কাহারও স্থানাভাব নাই। মূল সমাজের প্রতি আপনাদের ঐ কৃপা-কটাক্ষটুকু বর্ষণ করিবেন না, দোহাই আপনাদের। ব্রাহ্মসমাজ বৈষ্ণব-সমাজ আপনাদের অভীষ্টসিদ্ধি করিতে পারে, হিন্দুর মেয়ে জানে, তার সৌভাগ্য দুর্ভাগ্য তার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল, তাই তার ভাগ্যকে লইয়া সে বিদ্রোহ জাগায় না। হিন্দুর মেয়ে ভাবে, যদি কু-পিতা, কু-পুত্রকে সহ্য করা যায়, তবে পতির বেলাতেই বা জীর্ণ তৈজসের মত তাঁহাকে বদলাইতে হইবে কেন? হিন্দুর মেয়ে স্বীয় সহিষ্ণুতার বশে ও ক্ষমাগুণে কুক্রিয়াশীল পতিকে সুচরিত্র করিতে প্রাণপণ করে। হিন্দুর মেয়ে নিতান্ত অসহনীয় হইলে পতিবিযুক্তা হইয়াও তাঁহারই মঙ্গলকামনায় একনিষ্ঠিতে তপস্যাপরায়ণা হইয়া জীবনাতিপাত করিয়া যায়, হিন্দুর মেয়ে ভোগকে ত্যাগের পদানত করিতে শিখিয়াছে। হিন্দুর মেয়ে ইহকালকেই সর্ব্বময়ত্ব প্রদান করে নাই, পরকালের শান্তিতে বিশ্বাস করে, হিন্দু-বিবাহের পবিত্রতা কাহারও বা কাহাদেরও খেয়াল-খেলার তুচ্ছ বস্তু নয়। এই কথা দৃঢ়তার সহিত আমি আপনাদের স্মরণ রাখিতে বলি। সকল সমাজের সংযমপ্রবণতা এক প্রকার নয়, পূর্ব্বসংস্কার-শিক্ষা, সূক্ষ্মানুভূতি কখনই সমান হয় না। দেশভেদে, প্রাকৃতিক বিচিত্রতাভেদে তাহাদের প্রকৃতিভেদ হয়, না হইয়া থাকিতেই পারে না। আজ দু'দিন হয় ত পশ্চিমের রুদ্র তাণ্ডবের ডমরুনিনাদ আপনাদের কাহারও কাহারও মনের মধ্যে একটা উন্মত্ততা, শোণিতের ভিতর একটা উন্মাদনা জাগাইয়া তুলিতে চাহিতেছে। দু'দিন পরে আর এ ভাব থাকিবে না। আপনাদের প্রপিতামহীর সতী-মহিমার বিশুদ্ধতা আপনাদের এই আগন্তুক প্রবৃত্তির তাড়নাকে নিরোধ করিবেই। সুরাসুরের যুদ্ধে অসুর যতবারই সুরকে বিজয় করিয়াছে, কোনবারই সে শেষ রক্ষা করিতে পারে নাই, পতন অনিবার্য্য হইয়াছে। জগতের নিয়মই এই। ধর্ম্ম যেথায়, জয় সেইখানেই। প্রবৃত্তিমূল কর্ম্ম আপাততঃ মনোহর মনে হইলেও নিবৃত্তিমূল সাত্ত্বিক কর্ম্মের ফলই শান্তিপ্রদায়ী এবং জীবমাত্রেরই জীবনযুদ্ধের পরিণামে শান্তিই একমাত্র কাম্য।

জীবনযুদ্ধ? হাঁ, তা জীবনটাকে সাধারণতঃ যুদ্ধের সঙ্গেই তুলনা করা হয় বটে, এ দুইয়েতেও সাদৃশ্য অনেকটা আছে। তবে যুদ্ধেরও প্রকারভেদ থাকে। প্রবৃত্তিমূল জীবনগঠনে যে যুদ্ধ জীবকে করিতে হয়, তাহা রীতিমত struggle বা ধ্বস্তাধ্বস্তি। আর নিবৃত্তিমূলক জীবন-সংগ্রামকে এই আমাদের নূতন যুদ্ধনীতি অসহযোগ-সংগ্রামের সহিত তুলনা করা অসঙ্গত হয় না। একটিতে এরোপ্লেন হইতে জ্বলন্ত অগ্নিবর্ষী বোমার নিক্ষেপে আবালবৃদ্ধবনিতার বিলোপ, বিষবাষ্পে, মেসিনগানে সমুদয় জাতি, ধর্ম্ম, সমাজ, সভ্যতার ভিত্তিমূল পর্য্যন্ত টলটলায়মান হওয়া, পৃথিবীকে নিঃক্ষত্র করা—আর অন্য পক্ষে কতকগুলি মহাপ্রাণ দেশভক্তের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত আত্মোৎসর্গ। সমষ্টির জন্য ব্যষ্টির আত্মত্যাগ। ইহার জন্য নগর শ্মশান হয় না, ঘরে ঘরে শত্রুমিত্র মর্ম্মবিদারী হাহাকার রব করে না। এ যুদ্ধে সবিষাদে যোদ্ধাকে প্রশ্ন করিতে হয় না—"স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব।"

এ যুদ্ধে সমস্যা আসে না,

"কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত॥"—গীতা।

পরিশেষে আপনাদের কাছে সনির্ব্বন্ধ নিবেদন, নারী-পুরুষের অসঙ্গত বিসম্বাদকে প্রাধান্য না দিয়া ("পুরুষ" এই অপরাধে অসহযোগ না করিয়া) যুগপুরুষের অধীনতা স্বীকার করিয়া লউন এবং সমচিত্তে সমান আকুতিতে বিদেশিবর্জ্জন, স্বদেশিগ্রহণ, তাঁত, চরকা—কুটীরশিল্পের প্রচুরতররূপে উৎপাদন-চেষ্টা, সন্তান ও সন্তানোপম দেশবাসীকে মাদকদ্রব্য-বর্জ্জন, বিলাসিতাবর্জ্জন করিতে শিক্ষা দিন, দেশব্রতী, চরিত্রবান্ করুন, নিজ নিজ সমাজের উন্নতিসাধন, নিজ নিজ ধর্ম্মে আস্থাস্থাপন—যাহাতে হিন্দু মুসলমান উভয়েই "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ" বোধ করিতে সমর্থ হন, যাহাতে পরধর্ম্মবিদ্বেষ দুর হয়, যাহাতে ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মাচরণ অথবা ধর্ম্মের স্থানে অধর্ম্মের স্থাপনা এ দুইটিই প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে থাকুন। হঠকারিতার এ সময় নয়; যাহাতে দলাদলি ও সন্দেহ বর্দ্ধিত হয়, তেমন সমাজসংস্কার এখন বাকী থাক্। সে চেষ্টায় পুরাতন হিন্দুসমাজ ঘোর অসন্তোষ বোধ করিয়াই হয় ত বা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ হইয়া দাঁড়াইবে। এখন মিলনের চেষ্টাই প্রয়োজন, বিচ্ছেদের ব্যবস্থা নয়। যাহাতে হিন্দু "হিন্দু" থাকিয়াই স্বাধীনতাসংগ্রামে যোগ দিতে পারেন, মুসলমান "মুসলমান" থাকিয়াই স্বাধীনতা-সংগ্রামের দলবর্দ্ধন করিতে পারেন, হিন্দুমুসলমান উভয়েই ভারতমাতার যুগ্মসন্তানের মতই মায়ের দাসীত্ব-মোচন-চেষ্টায় চেষ্টিত হইতে পারেন, সেই চিন্তাই এ যুগের প্রধান চিন্তা। একাকারের যে কল্পনা, সে একটি চিন্তার বিলাসমাত্র! জগতের বিচিত্রতার তাহা সম্পূর্ণরূপেই বিরোধী। সকল দেশে সকল সমাজে কোন না কোন আকারে জাতিভেদ বা বর্ণভেদ আছেই আছে। আমাদের যা আছে, তা আমাদের পক্ষে শুভ, অন্যের যা আছে, তা অন্যের পক্ষে অশুভ নয়, এই ভাবে বিচার না করিয়া ইংরাজী প্রবচনমত "ভাজনা খোলা হইতে আগুনে পড়ায়" লাভ মিলিবে না। ব্রাহ্মণ আজ অবনত, তাকে উন্নত করার শক্তি না থাকে, অবনতির অন্ধকূপে টানিয়া ফেলিও না। চণ্ডালকে উন্নত করিতে সামর্থ্যে কুলায়, বুকে বল থাকে, অগ্রসর হও, টানিয়া তোল। নীচে অন্ধকূপে স্থান অপরিসর; ঊর্দ্ধে উন্মুক্ত ভূমি, এখানে পাশাপাশি বহুর স্থান সঙ্কুলান হইবে। উচ্চকে নীচ করিবার প্রয়োজন করে না, নীচকে উচ্চ কর। রাজনীতিক্ষেত্রে মিলাইবার জন্য হিন্দুমুসলমানের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ একবারেই অপ্রয়োজনীয় এবং তাঁরাও নিশ্চয়ই তা দাবী করেন না। যে হেতু, ভারতবর্ষীয় হিন্দুদের মধ্যে সকল ব্রাহ্মণে, সকল কায়স্থে, বৈদ্যে, নবশাখের মধ্যে বিবাহ প্রচলিত নাই। এ স্থলে মুসলমান ভাইয়েরাই বা কেন মনে করিবেন, তাঁদেরই ঘৃণা করিয়া এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে? প্যাক্ট বা বৈবাহিক সংমিশ্রণ কোন কৃত্রিম উপায়ে নয়, পরন্তু অকৃত্রিম, প্রেম-মৈত্রী, পরস্পরের মেলামেশা, সুখ-দুঃখের অংশগ্রহণই প্রকৃত সম্মিলনের মূল। কুলারী যুগের পূর্ব্বে এই সম্মিলন ক্রমবর্দ্ধিতই হইতেছিল। আবার যদি হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন হইবেন মনে করেন, দুজনের যে আজ একই বিপদ, একই স্বার্থ, ইহা স্মরণে আনেন, প্রকৃত মৈত্রীই লাভ করিতে পারিবেন। ভিন্ন সমাজের বিরুদ্ধশিক্ষায় বর্দ্ধিত দাম্পত্যের দুঃখভোগ কাহাকেও করিতে হইবে না। বিবাহই যদি জাতীয় মিলনের একমাত্র সেতু হইত, তবে আজ যুগযুগান্ত ধরিয়াই ইংরাজ-ফরাসী, ফরাসী-জর্ম্মণ এবং জর্ম্মণ-ইংরাজে সংঘর্ষণ চলিত না।

আপনারা সকলেই আজ জাতীয় পতাকা উত্তোলনকালে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত সুভাষ বাবু জাতীয় পতাকার সম্মানের জন্য প্রাণোৎসর্গ করাও যে আবশ্যক, সে তথ্য আপনাদের বুঝাইয়াছেন। আমিও তেমনই বলি, জাতীয় বৈশিষ্ট্য, জাতীয় সম্মান, হিন্দু সতীর যুগযুগান্তরক্ষিত সতীমহিমা এগুলি খর্ব্বীকৃত করার জন্য, উচ্ছেদ করার জন্য যতই প্রচেষ্টা চলুক না কেন, আপনারা নিজ নিজ কর্ত্তব্যে অটল থাকিবেন। ইহাই আপনাদের জাতীয় পতাকা; প্রত্যেক জাতির যেমন এক একটি জাতীয় পতাকা আছে এবং তার সম্মানরক্ষার জন্য সে জাতির প্রত্যেকেরই যেমন জীবন পণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য, তেমনই আপনারাও আপনাদের সতীমহিমারূপ জাতীয় পতাকার মর্য্যাদারক্ষার জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে স্থিরসঙ্কল্প হউন। ভারতসতীর বিশ্ববন্দিত গৌরবকে কাচমূল্যে বিক্রয় করিতে সম্মত হইবেন না; পরন্তু মার্জ্জিত, ধৌত করিয়া উজ্জ্বলতর করিয়া তুলুন, তার জন্য জীবন পণ করুন।*

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

* বগুড়া জিলা মহিলা-সম্মিলনে সভানেত্রীর অভিভাষণ।

সুধা-কণা

[এই তাপ-দগ্ধ সংসার-মরুভূমিতে মাঝে মাঝে কোন কোন নর নারীর ভিতর দিয়া ভগবানের বিচিত্র বিভূতি প্রকাশ পায়। লেখক এইরূপ অপূর্ব্ব প্রকাশের কতকগুলি সত্য কাহিনী সংগ্রহ করিয়াছেন, কাহিনীগুলি মূলতঃ সত্য। তবে নায়ক-নায়িকার সত্য নাম গোপন রাখা হইয়াছে।—বসুমতী-সম্পাদক।]

(১) বিশ্বাসের ফল

ষোল বৎসর বয়সে যখন সুরমা তার স্বামীকে হারাল, তখন সত্যই যেন সে অগাধ জলে পড়ল। স্বামিকুলে কেউ এমন নেই যে, তার চিরজীবনের দুর্বহ ভার গ্রহণ করে এবং তার বাপ-মাকেও সে হারিয়েছে—যাঁদের পায়ের কাছে এই অবস্থায় কেঁদে পড়লে সে সান্ত্বনা আর সহানুভূতি দুই পেত। থাকবার মধ্যে এক বড় ভাই আর তাঁর স্ত্রী, তাঁদের কাছে যাওয়া ছাড়া আর উপায় নেই।

সন্ধ্যার এক ঝাপসা অন্ধকারে যখন সে মানভূম জিলার এক গাঁয়ে তার বাপের বাড়ীতে এসে পৌঁছল, তখন তার চোখের সামনে তার বাকী দুর্বহ জীবনটারই মত সমস্ত অস্পষ্ট আবছায়া দেখাতে লাগল, আর অদূরে বাঁশ-ঝাড়ের মধ্য থেকে শিয়ালের কর্কশ চীৎকার তাকে যেন উপহাস ক'রে উঠল। ষোল বৎসরে যার জীবনের আশা-প্রদীপ নিভে গিয়ে বাকী জীবনটা রৈল শুধু গভীর অন্ধকার ঠেলে ঠেলে চলবার জন্যে, তার পক্ষে উপযুক্ত আহ্বানই বটে!

এই তার ছেলেবেলার ঘর, যেখানে সে তার মা'র স্নেহের ক্রোড়ে, পিতার ভালবাসার দৃষ্টির মধ্যে বেড়ে উঠে, কৈশোরে তাঁদের আশীর্ব্বাদ নিয়ে নূতন যাত্রাপথে চলেছিল। মাত্র এক বৎসরের ভেতরেই তার সমস্ত উড়ে-পুড়ে ছাই হয়ে গেল, সীঁথির সিঁদুর মুছে অভাগিনীকে ফিরে এসে দাঁড়াতে হ'ল আবার সেই দুয়ারে, যেখান থেকে সে এক দিন আশা-পূর্ণ-হৃদয়ে, প্রসন্নমনে নূতন পথে চলবার সস্নেহ বিদায় নিয়েছিল। দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে তার সমস্ত অন্তর লুটিয়ে লুটিয়ে কাঁদতে লাগল।

তার স্বামীর যে দূর-আত্মীয় তাকে সঙ্গে ক'রে এনেছিল, সে নির্বাক্ হয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়েছিল। খানিক পরে যখন চটকা ভাঙ্গলো, তখন দরজায় ঘা দিয়ে বাড়ীর লোককে ডাকলে।

সেই শব্দে যিনি বেরিয়ে এলেন, তিনি সুরমার দাদা নিশীথ। ঘর থেকে বেরিয়েই তার এই নূতন অকল্যাণের মূর্ত্তিতে তাকে দেখে তিনি চমকে উঠলেন। তার পর গলাটি পরিষ্কার ক'রে নিয়ে বল্লেন, "কে, সুরমা এসেছিস্, আয় দিদি!"

এই স্নেহের আহ্বানে সুরমার বুকের ভেতর কান্নায় ভ'রে গেল, সে তার দাদার পায়ে মাথা রেখে নমস্কার করতে গিয়ে যেন ভেঙ্গে পড়ল।

তার হাত ধ'রে তাকে বাড়ীর ভেতর নিয়ে যেতে দাদারও দুই চোখ জলে ভেসে যেতে লাগল। এই তাঁর ছোট বোন্‌টি, তাকে কত স্নেহে কত আদরে তিনি বড় হ'তে দেখেছেন; আজ নূতন জীবনের গোড়াটিতেই যে দুর্ভাগ্য বহন ক'রে সে ফিরল, তার জন্যে পৃথিবীতে যে কি সান্ত্বনা থাকতে পারে, তা খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি ঘরের ভেতর নিয়ে গিয়ে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন, এবং তাঁর চোখের সামনেই সেই মুহূর্ত্তে ভেসে উঠল—বাল্য-জীবনের কথা, যখন দুই ভাই-বোন্ কত হাসি কত আনন্দের মধ্যে দিন কাটিয়েছেন। আজ সে দৃশ্যপট একেবারে বদলে গেছে।

ভাই-বোনের এই নিস্তব্ধ বেদনার মধ্যে যে তৃতীয় ব্যক্তিটি প্রবেশ করলে, সে নিশীথের স্ত্রী কমলা। কণ্ঠে কোমলতার লেশ নেই, বল্লে, "কতক্ষণ আর দু'জনে এমনি ক'রে ব'সে থাকবে। ঠাকুর-ঝি, ওঠো, মুখ-টুখ ধোবে।"

সুরমাকে উঠতে হ'ল।

বাঙ্গালার গৃহে আজ তৃতীয় ব্যক্তির স্থান ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে আসছে, বিশেষ সে তৃতীয় ব্যক্তি যদি দুর্ভর বিধবা হয়। এ পরিবারেও তার ব্যতিক্রম ঘটল না; এই নবাগত তৃতীয় ব্যক্তিটিকে কমলা কিছুতেই স্নেহের দৃষ্টিতে দেখতে পারলে না।

সুরমা তার অবস্থা ভাল রকমেই বুঝত। এ কথা জানত যে, সারা দুনিয়ায় তার মাত্র এইটুকু স্থানই রয়ে গেছে, এবং যত অপ্রীতিকর হক না কেন, একে হারালে তার কিছুতেই চলবে না।

সেই জন্যে সে বিনা দ্বিধায় এই পরিবারের সেবিকার স্থান নিলে, যা করলে তার ভার লঘু হয়, তার কোন ত্রুটিই

সে হ'তে দিলে না। রান্নার কায থেকে আরম্ভ ক'রে দাসীর কায সে একাই ক'রে যেতে লাগল বিনা বাক্যব্যয়ে, যদি তাতেও তার ভ্রাতৃজায়ার মন পায়।

তার এই অকপট এবং নিরলস সেবায় ভ্রাতৃজায়ার সময় কাটানো দায় হ'য়ে উঠল, সুতরাং সে তার সদ্ব্যবহার করতে লাগল সুরমার ওপর কঠিন বাক্যবাণ বর্ষণ ক'রে।

রাগের কারণ ছিল বৈ কি! কোথাকার কোন্ পরিবারের এই একটি হতভাগিনী, সে সারা জীবনের জন্য ভার হ'য়ে রৈল তার এবং তার স্বামীর, এ কি সহ্য যায়? বিশেষতঃ সে তার স্বামীর স্নেহ-ভাগিনী।

এ বেলার মাছ ওবেলা কমলার চর্ব্ব্য-চোষ্য ভোজনের জন্য রাখা ছিল, কোথা থেকে একটা বেরাল এসে তার সদ্ব্যবহার ক'রে গেছে। ও বেলার রান্না রাঁধতে গিয়ে সুরমা এই ব্যাপার দেখতে পেলে।

কমলাকে বলতেই সে তেলে-বেগুণে জ্ব'লে উঠল, মৎস্য আস্বাদনের পরম সুখ থেকে বঞ্চিত হওয়ায় ক্রোধে দিগ্বিদিক্‌জ্ঞান হারিয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল, বল্লে, "মাছ বেরালে খাবে কেন, কে খেয়েছে, তা আমি ভাল রকমই জানি।"

"কে খেয়েছে, বৌ-দিদি?"

"কেন, তা আর তুমি জান না—নিজে খেয়ে এখন বেরালের নামে দোষ?"

সুরমার দুই চোখে জল এলো, বল্লে, "আমি কি মাছ খাই বৌ-দিদি, মাছ কি আমার খেতে আছে?"

তার উত্তরে ঝঙ্কার দিয়ে কমলা যে সব কথা বল্লে, তার পুনরাবৃত্তি না করাই ভাল।

চেঁচিয়ে কাঁদবার সাধ্যটুকুও ভগবান্ রাখেন নি, সেইখানে ব'সে প'ড়ে সুরমা গোপন ব্যথায় লুটিয়ে লুটিয়ে কাঁদতে লাগলো।

আপিস থেকে বাড়ী ঢুকতেই নিশীথ এই দৃশ্য দেখে ব্যাপার বুঝতে পারলেন; বোনের দুই হাত ধ'রে আপনার ঘরে নিয়ে যেতে যেতে বল্লেন, "আয়, আমার কাছে আয় দিদি!"

একে মাছের অন্তর্দ্ধান, তার উপর স্বামীর আদর, এ দিকে ঝঙ্কারের উচ্চতা গৃহকোণ ছাড়িয়ে পাড়ায় গিয়ে পৌছল।

এমনি করেই চলছিল দিন। দাদার স্নেহের অভাব ছিল না, কিন্তু তাঁর স্নেহের অবসর কতটুকুই বা? দিবসের বেশী ভাগ সময় যার সঙ্গে কাটাতে হয়, তার আঘাতের শক্তির যে সীমা-পরিসীমা নেই। সুরমার দু'বেলা দু'মুঠো খাওয়া ছাড়া অন্য প্রয়োজন ছিল না, সুতরাং কমলার শ্লেষ ঐ খাওয়া নিয়েই প্রয়োগ হ'ত সময়ে অসময়ে। "হতভাগী কেবল গিলতেই জানে।" "খেয়ে খেয়ে সর্ব্বস্বান্ত করলে," "এমন রাক্ষসের মত খাওয়াও ত' দেখিনি" ইত্যাকার।

শুনে শুনে নিজের উপর ধিক্কার হ'ত, সুরমা চোখের জলে ভাস্‌তে ভাস্‌তে বার বার বলত, "হে জগন্নাথ, হে জগবন্ধু, তুমি আর আমায় যা করো তা করো, আমার এই খাওয়া ঘুচিয়ে দেও—আর যে এ গঞ্জনা সইতে পারি না, ঠাকুর!"

সে দিনও কি একটা সামান্য কারণে বা অকারণেই বিষম গোলযোগ বেধে গেল, এবং কমলা ঠাকুরাণী সুরমার সর্ব্বগ্রাসী খাওয়ার বহু নিন্দা ক'রে নিজে চর্ব্ব্য-চোষ্য ভোজন ক'রে সুরমাকে অভুক্ত রেখেই গোসা-ঘরে প্রবেশ করলেন।

সুরমাও সে দিন তার আহার স্পর্শ করলে না, নিজের ঘরে গিয়ে দুয়ার বন্ধ ক'রে ডাকতে লাগল, "হে জগন্নাথ, হে দীনবন্ধু, আর আমি পারি না, তোমার এত দয়া এত লোকের উপর, আমাকেও আজ দয়া করো, আমার খাওয়া চিরদিনের জন্য ঘুচিয়ে দাও, ঠাকুর!"

তার সমস্ত মন কেঁদে কেঁদে উঠতে লাগলো, বিছানায় শুয়ে ঘুম হ'ল না, চক্ষুর সামনে ভেসে উঠতে লাগল—সূর্য্য ওঠবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার সেই দৃশ্য, সেই মর্ম্মান্তিক শ্লেষ, সেই গঞ্জনা।

বাড়ীর আর সকলে যখন ঘুমিয়ে পড়েছে জানতে পারলে, তখন গভীর রাত্রিতে সে তার শয্যা ত্যাগ ক'রে উঠল, তার পর সদর-দরজা খুলে রাস্তায় গিয়ে পড়ল।

তার মনে দৃঢ় সঙ্কল্প জেগেছে এই যে, সে যেমন ক'রেই হ'ক, জগন্নাথক্ষেত্রে গিয়ে জগবন্ধুর কাছ থেকে এই বর চাবে যে, তার খাওয়া যেন চিরদিনের জন্য ঘুচে যায়, এই মনুষ্যদেহ ধারণ ক'রে তার যেন পরের কাছে আর আহারের প্রত্যাশা না করতে হয়। সেই সর্ব্বশক্তিমান এই ভিক্ষা যদি তাকে দেন ত' ভালই, যদি না দেন ত' সে আর ফিরবে না, তাঁরই বরমূর্ত্তির সামনে অভুক্ত থেকে প্রাণ বিসর্জ্জন করবে।

সামান্য অসহায়া নারী সে, অথচ কোথায় সেই তীর্থক্ষেত্র, কত দূরের পথ, কেমন ক'রে যে সেখানে যেতে হয়, তাও জানে না। অথচ এই সব অনিশ্চয়তা তাকে কিছুমাত্র

বসুমতী প্রেস]　　　　অপরাহ্ণে　　　　[শিল্পী—শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ

শঙ্কিত করলে না, মনে যে উদগ্র আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল, তারই তীব্র আলোকে সমস্ত ভয়-ভাবনা দূর হয়ে গেল।

তাঁর অসীম পথ ত দিকে দিকে প্রসারিত রয়েছে। তারই যে কোন একটা ধ'রে গেলে নিশ্চয়ই তাঁর কাছে গিয়ে পৌছবে, এই সুদৃঢ় বিশ্বাসে সামনে যে পথ পেলে, তাই ধ'রে সে চ'লে যেতে লাগল।

আকাশের চাঁদ তাকে আলো দিলে—আকাশের তারা পথ দেখিয়ে নিয়ে চল্লো তাকে—যে বেরিয়েছে জগবন্ধুর খোঁজে!

কতদূর চলেছে, তা জানে না, রাত তখনও শেষ হয়নি, কিন্তু শেষ হতেও দেরী নেই। ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস বইতে সুরু করেছে, পূর্ব্বাকাশে প্রকাণ্ড শুকতারা সধবার সীমন্ত-বিন্দুর মত নিশীথিনীর কপালে জ্বল্‌জ্বল্ ক'রে জ্বল্‌ছে।

পরিশ্রান্ত বোধ হ'ল, তাই পথিকের আশ্রয়-স্বরূপ পথিপার্শ্বে একটা বিরাট গাছতলায় সে বসল। মনের তীব্র বেদনা ও চিন্তায় সমস্ত রাত কেটেছে, দুই চোখ ঘুমে বুজে আসতে লাগল, সেই গাছতলাতেই আপনার আঁচল পেতে সুরমা শয়ন করলে, তার পরে ধীরে ধীরে ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ল।

স্পষ্ট প্রত্যক্ষ স্বপ্ন। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ধ'রে তার আকাঙ্ক্ষ্য দেবতা জগবন্ধু তার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর কোটি-চন্দ্রবিনিন্দিত স্বচ্ছ সুনির্ম্মল রূপে দিগ্‌দিগন্ত উজ্জ্বল, মুখে স্মিত-সুন্দর হাস্য। বল্লেন, "কোথায় যাচ্ছ, বাছা?"

সুরমা স্তব্ধ-চকিত হয়ে সেই আশ্চর্য্য রূপ দেখছিল। প্রণাম ক'রে বল্লে, "তোমারই ক্ষেত্রে যাচ্ছিলাম ঠাকুর, তোমারই কাছে ভিক্ষা চাইতে।"

ঠাকুর আবার হাসলেন, বল্লেন, "তুমি কি একা এতটা পথ যেতে পার বাছা, সে যে অনেক দূর। তাই আমি এসেছি। তোমাকে আর যেতে হবে না!"

সুরমা দুই হাত যোড় ক'রে বল্লে,"—প্রভু, দেবতা—"

তিনি বল্লেন, "তোমার কামনা পূর্ণ হবে বাছা, যে প্রার্থনা এত সত্য, এত আন্তরিক, সে কি আমি অপূর্ণ রাখতে পারি? আজ থেকে তোমার আহারের আর প্রয়োজন হবে না, অথচ সর্ব্বোৎকৃষ্ট আহার যে পুষ্টি, শক্তি ও লাবণ্য দেয়—তা তোমার থাকবে। নিশ্চিন্তমনে ঘরে ফিরে যাও বাছা।"

সুরমা বল্লে, "প্রভু—"

তিনি হাসলেন, বল্লেন, "জীবনের নির্দ্ধারিত সময় ত কাটাতে হবে, কিন্তু সে তোমার কাটবে পরমানন্দে, ভগবৎ-সান্নিধ্যের নিয়ত অনুভূতি লাভ ক'রে।"

ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে সুরমা চোখ চেয়ে দেখলে, সামনেই নবোদিত সূর্য্যের রক্তচ্ছবি। দুই হাত যোড় ক'রে সেই নবীন ভাস্করকে প্রণাম ক'রে সে বাড়ীর পথে ফিরে চল্লো।

সেই থেকে আজ পর্য্যন্ত দীর্ঘ ৩০ বৎসর সুরমার আহারের ক্ষুধা এবং প্রয়োজন দুই নিবৃত্ত হয়েছে;—অথচ তার আহারহীন দেহ এমনই লাবণ্য-শ্রীতে মণ্ডিত যে, তাকে দেখলে সহজেই উপলব্ধি হয় যে, এ যেন তাঁরই লীলা-মন্দির।

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

দ্যূত-ক্রীড়া করে ঋতু মানবের বুকে

ষড় ঋতু ক্রমান্বয়ে কল্প্রপদে আসি'
বসুধার গণ্ডে করি' চুম্বন অঙ্কিত,
পুলকে কম্পিত কভু ত্রাসে সশঙ্কিত—
করে তারে, বুকে তার তোলে কান্না হাসি।

নিয়মে আবদ্ধ ঋতু নিসর্গের সাথে!
মানবের বক্ষে কিন্তু বাঁধি' তারা বাসা,
অনিয়মে যুগপৎ ক্রীড়া করে পাশা,
ফলে নর যত হাসে, তার বেশী কাঁদে!

মেঘহীন শরতের, হেমন্তের নভে—
সহসা বরষা তার আঁখি-যুগে ঝাঁপে,
বিশ্বের ভ্রুকুটি-শীতে হিয়া সদা কাঁপে,
গ্রীষ্ম-জ্বালা জ্বলে পুনঃ নিন্দুকের রবে।

শিশুর নির্ম্মল হাস্য জয় করি আনে,
বসন্তের শিহরণ ক্ষণ তরে প্রাণে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় (এম, এ)।

কীট-পতঙ্গের প্রণয়-রীতি

পশুপক্ষীর মত কীট-পতঙ্গরাও যে মানবচক্ষুর অন্তরালে লতা-গুল্ম-তৃণাদির মধ্যে যৌনসম্মিলনের উদ্দেশে প্রণয়াসক্ত হইয়া থাকে, তাহা বোধ হয়, অনেকেই অনুমান করিতে পারেন। ইহাদের প্রণয়-রীতির মধ্যে বড় কম বৈচিত্র্য লক্ষিত হয় না। জ্যৈষ্ঠের "মাসিক বসুমতীতে" "বিহগদিগের প্রণয়-রীতি" লিখিবার সময় কীট-পতঙ্গের প্রণয়-রীতির বিষয়ও কিছু বলিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। কীট-পতঙ্গের প্রণয় সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলে প্রথমেই গৃহ-কোণশায়ী মাকড়সার কথাই মনে আসে। পিপীলিকা, মধুমক্ষিকা, এমন কি, প্রজাপতি অপেক্ষাও যেন ইহাদের প্রণয়-রীতির মধ্যে একটু বিশেষত্ব লক্ষিত হইয়া থাকে। শুধু প্রণয়-রীতি কেন, ঊর্ণনাভের সমস্ত জীবনটাই রহস্যপূর্ণ। এখন দেখা যাক্, ইহাদের প্রণয়-রীতির মধ্যে বিচিত্রতা কিরূপ।

গৃহ-কোণে মাকড়সারা মশা, মাছি প্রভৃতি ধরিবার উদ্দেশে যে জাল রচনা করে, বিশেষ মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিলে তাহার আর একটি গোপন উদ্দেশ্য বুঝিতে পারা যায়। এই জালের সূক্ষ্ম সূতার সাহায্যেই পুরুষ-মাকড়সারা স্ত্রীর প্রতি প্রণয় জ্ঞাপন করিয়া থাকে। এই সকল গৃহচারী মাকড়সার দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত হীন, সুতরাং অঙ্গভঙ্গী দ্বারা প্রণয়-জ্ঞাপন অসম্ভব হওয়ায় পুরুষরা জালের সূত্রে নাড়া দিয়াই স্ত্রীর প্রতি প্রেম নিবেদন করিয়া থাকে। মাকড়সার জালের প্রতি লক্ষ্য রাখিলেই মাকড়সাকে অনেক সময় জালের একটিমাত্র সূত্রকে নাড়াইতে দেখা যায়। টেলিগ্রাফে সংবাদ পাঠানর মত মাকড়সারা ঊর্ণাবাসের বহির্দ্বার হইতে ঊর্ণা কম্পিত করিয়া অন্তঃপুরবাসিনী লূতার নিকট উহাদের বিচিত্র "মর্সকোডে" প্রণয়বার্ত্তা প্রেরণ করে। স্ত্রী-মাকড়সা কিন্তু প্রণয়ীর ইঙ্গিত বুঝিয়াও বড় একটা সাড়া দিতে চাহে না, সুতরাং পুরুষ-মাকড়সাকে স্ত্রীর দ্বারে ধৈর্য্য ধরিয়া বহুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হয়। স্ত্রীর এই প্রকার অনাসক্তিভাব ও পরুষ আচরণেও পুরুষ-মাকড়সার ধৈর্য্যচ্যুতি বড় একটা ঘটে না। শেষে যেন তাহারই আগ্রহাতিশয্যে স্ত্রী-মাকড়সা জালের কেন্দ্র হইতে বাহির হইয়া প্রণয়ীর সম্মুখে উপস্থিত হয়। স্ত্রীর এই প্রকার আবির্ভাবে যে পুরুষ-মাকড়সার মনোরথ সহজে পূর্ণ হয়, তাহা নহে। অনেক সময় স্ত্রী বাহির হইয়াই পুরুষ-মাকড়সাকে গলাধঃকরণ করিয়া ফেলে এবং কখনও বা প্রণয়ের মাঝেই স্ত্রীর হস্তে শৃঙ্গারোন্মত্ত প্রণয়ীর অকস্মাৎ লীলাবসান হইয়া যায়। এই কারণে প্রণয়কালে বিপুলকায়া রোষপরায়ণা স্ত্রীর নিকট ক্ষুদ্রকায় দুর্ব্বল পুরুষ ঊর্ণনাভকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। মিলন নির্ব্বিঘ্নে ঘটিলেও যৌন সম্বন্ধের পর পুরুষের আর নিষ্কৃতি থাকে না। স্ত্রী-বৃশ্চিকের মত রাক্ষসী স্বীয় প্রণয়ীকে অভিভূত করিয়া ধীরে ধীরে তাহার দেহস্থ রস শোষণ করিয়া ফেলে। মাকড়সার জালে যে দুই চারিটা শুষ্ক মৃত মাকড়সার বিলম্বিত দেহ লক্ষিত হয়, তাহা এই প্রকার গুপ্ত হত্যার ফল ব্যতীত আর কিছুই নহে।

বাগান-বাগিচায় যে আর এক প্রকার শ্বেত, সবুজ বা ঈষৎ রক্তাভ মাকড়সা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের প্রকৃতি কিন্তু গৃহী মাকড়সা হইতে বিভিন্ন। এই বুনো মাকড়সারা জাল বুনিতে জানে না বলিয়া ইহাদিগকে নিয়মমত শিকার করিয়া উদরপূর্ত্তি করিতে হয়। কীটাদি লক্ষ্য করিলে অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হইয়া শেষে ইহারা শিকারের উপর লাফাইয়া পড়ে। দেহের অনুপাতে ইহাদের লম্ফপ্রদান করিবার শক্তিও বড় কম অদ্ভুত নহে। দশ ইঞ্চি পরিমিত স্থান ইহারা অবলীলাক্রমে লঙ্ঘন করিয়া থাকে। ইহাদের দৃষ্টিশক্তি বেশ প্রখর এবং দেহের উপরেও সুন্দর বর্ণ-সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ মাকড়সাই বর্ণের সাহায্যে সুন্দরভাবে আত্মরক্ষা করিয়া থাকে। বুনো লতা-পাতা একটু বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলেই তাহাদের উপর ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যাইবে। সবুজ ও পীতাভ মাকড়সারা এমন ভাবে গাছের পাতার সহিত বর্ণ মিলাইয়া অবস্থান করে যে, অনেক সময় উহাদিগকে চিনিতেই পারা যায় না। এই বুনো মাকড়সাদের প্রণয়-রীতি পূর্ব্বোক্ত গৃহী মাকড়সা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ইহারা অঙ্গভঙ্গী দ্বারা দৈহিক সৌন্দর্য্য স্ত্রী-সমক্ষে বিকসিত করিয়া প্রণয় জ্ঞাপন করিয়া থাকে। দেহের যে সকল অংশ উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত বা অঙ্গের যে সকল স্থান নিবিড়কৃষ্ণ রোমা-বলীতে শোভিত, ইহারা সেই সকল অংশই স্ত্রী-সমক্ষে ঘুরাইয়া

নৃত্য করিতে থাকে। এই নৃত্যে অনেক সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া যায়, কিন্তু তাহাতেও স্ত্রীর মনস্তুষ্টি হয় না। কখনও বা স্ত্রীর প্রণয়লাভে প্রতিযোগিতা করিতে যাইয়া একাধিক মাকড়সার মধ্যে বিবাদ বাধিয়া যায়। তখন পুরুষদের মধ্যে অঙ্গভঙ্গী দ্বারা দৈহিক সৌন্দর্য্যাদি প্রদর্শনের বিশেষ আগ্রহও লক্ষিত হইয়া থাকে। স্ত্রী-মাকড়সা প্রণয়ীদের মল্লযুদ্ধ ও নৃত্যাদি মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিয়া তাহাদের মধ্য হইতে অভিমত পতি নির্ব্বাচন করিয়া লয়। এই সময়ে স্ত্রীর সমক্ষে দক্ষতার সহিত নৃত্যাদি করিতে না পারিলে বা প্রণয়ের মাঝে হঠাৎ বিরত হইলে স্ত্রী-হস্তে পুরুষদিগের জীবননাশের সম্ভাবনা থাকে। এই কারণে পুরুষরাও দীর্ঘক্ষণব্যাপী প্রণয়ব্যাপারের মাঝে বড় একটা ক্ষান্ত হয় না। পরিশেষে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী ও দেহের বর্ণসম্পদ দ্বারা নারীর মনোজয় করিলেও যৌনসম্মিলনের শেষেই পুরুষরা স্ত্রীর ভক্ষ্যরূপেই গৃহীত হইয়া থাকে। স্ত্রী-মাকড়সার অন্তরে প্রবল অপত্যস্নেহ থাকিলেও পতিঘাতিনী বলিয়া তাহার প্রণয় কলুষিত!

যে সকল বন্য মাকড়সার দেহ পূর্ব্বোক্ত প্রকারের শোভা-সম্পদবিহীন, তাহারা একটি মক্ষিকা বা মশক শিকার করিয়া এবং ঊর্ণা দ্বারা উহা আবৃত করিয়া স্ত্রীর সমক্ষে উপহার-স্বরূপ আনয়ন করে এবং আহার-প্রদানে সন্তুষ্ট করিয়া তাহার চিত্ত জয় করিতে প্রয়াসী হয়। এক জাতীয় ক্ষুদ্র মক্ষিকার মধ্যেও এই প্রকার প্রণয়-রীতি লক্ষিত হইয়া থাকে। যৌন-সম্মিলনের পূর্ব্বে দেহজাত রসে বুদ্‌বুদ উৎপন্ন করিয়া এবং তন্মধ্যে শিকার ভরিয়া পুরুষরা স্ত্রীর সমীপে উহাকে উপহারস্বরূপে উপস্থিত করে। এই বুদ্‌বুদ দেহাপেক্ষা বৃহৎ ও উজ্জ্বল হওয়ায় পুরুষমক্ষিকা সহজেই স্ত্রীর নয়নপথবর্ত্তী হইয়া থাকে। আর এক শ্রেণীর মক্ষিকারা শিকারের পরিবর্ত্তে ঐ প্রকার বুদ্‌বুদের মধ্যে রঙ্গীন ফুলের পাপড়ি বা রঙ্গীন কাগজের টুকরা ভরিয়া স্ত্রীর মনোরঞ্জন করিতে প্রয়াস পায়।

স্ত্রী-মাকড়সার পতিহনন-প্রসঙ্গে কাঁকড়া-বিছার কথা মনে পড়িল। মাকড়সা-পত্নীর মত কাঁকড়াবিছার স্ত্রীদের মধ্যেও অপত্যস্নেহ বেশ প্রবল দেখিতে পাওয়া যায়। বৃশ্চিক-জননী লূতামাতার মতই শিশুদিগকে কিছুকাল বিশেষ সযত্নে পৃষ্ঠের উপর লইয়া বহন করিয়া বেড়ায়। এই প্রকার অপত্যস্নেহের প্রাবল্য থাকিলেও কাঁকড়াবিছার পত্নীরা স্ত্রী-মাকড়সাদের মতই রুক্ষস্বভাবা ও পতিঘাতিনী। যৌন-সম্মিলনের পরেই পুরুষকে প্রবলা নারীরা পরাভূত করিয়া উদরস্থ করিয়া ফেলে। লূতাগোত্রভূত বৃশ্চিকদের যৌন-সম্মিলন যেরূপ বীভৎস-রসে পূর্ণ, উহাদের যৌন-সম্মিলনের রীতিও তদ্রূপ উৎকট। দাড়ায় দাড়া আটকাইয়া ইহারা যখন প্রণয়াসক্ত হয়, তখন প্রণয়ের পরিবর্ত্তে মল্লযুদ্ধের কথাই মনে আসে।

প্রেমাভিসারে প্রণয়ীকে পথিনির্দ্দেশ করিবার উদ্দেশেই জোনাকী বাদলরাতে কাননমাঝে প্রণয়প্রদীপ জ্বালিয়া থাকে। প্রাবৃটের মসীময়ী নিশায় বনের মধ্যে এ মায়াময় দীপশোভা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। প্রাচীন গ্রীক উপকথার রতি-পূজারিণী হীরো যেমন তাহার প্রণয়ী লিয়াণ্ডারকে পথ দেখাইবার নিমিত্ত প্রতি-নিশীথে সাগর-পারে বাতায়নপথে প্রদীপ জ্বালিয়া রাখিত, কাননের মধ্যে স্ত্রী-জোনাকীও সেইরূপ অনুসন্ধিৎসু দয়িতকে আকৃষ্ট করিবার নিমিত্ত পত্রাবলীর অন্তরালে প্রণয়-মশাল জ্বালিয়া বাসকসজ্জভাবেই অবস্থান করে। শৈশবে যখন নিষ্ঠুর ক্রীড়ায় প্রণোদিত হইয়া খদ্যোৎ ধরিতাম, তখন বুঝি নাই, এ আলোর উদ্দেশ্য কি? তখন বুঝিলে বোধ হয়, পতঙ্গের নির্ম্মল প্রণয়ে বাধা দিতে পারিতাম না। ব্রহ্মদেশের কুমারীদের মতই পক্ষবিহীন স্ত্রী-জোনাকীরা সবুজ পাতার ঘরে স্নিগ্ধ প্রেমদীপ প্রজ্বালিত করিয়া প্রণয়ীর আগমন প্রত্যাশা করে। পুরুষ-জোনাকী স্ত্রী-জোনাকীর বিবাহ-বাসরের এই বাতি লক্ষ্য করিয়াই তৎসমীপে উপস্থিত হইয়া থাকে।

অন্যান্য পতঙ্গের মত ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে পত্নীর অন্বেষণ না করিয়া জোনাকীরা যে দর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্যে স্ত্রীর অঙ্গনিঃসৃত আলো দেখিয়াই তাহার সমীপে উপস্থিত হয়, তাহা প্রতীচ্যের এক জন পতঙ্গবিদ্ (Prof. C. Emery) প্রতিপন্ন করিয়া দিয়াছেন। এই আলো স্ত্রী-জোনাকীর উদরের নিম্নে ছোট ছোট জাপানী ফানুসের মতই জ্বলিয়া থাকে। পুরুষ জোনাকীর উদরের নিম্নে যে আলো জ্বলে না, এমন নহে; তবে সে আলোর পরিসর অল্প। স্ত্রী-জোনাকীরা উড়িতে পারে না বলিয়াই এক স্থানে বসিয়া দীপসঙ্কেত করিয়া থাকে এবং সেই আলোর

নিশানায় পুরুষরা উড়িয়া আসিয়া স্ত্রীর যৌনসম্মিলনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়া দেয়। মধ্য-আমেরিকার নিবিড় অরণ্যে যে সকল জোনাকী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের আলোর প্রকৃতি এ দেশের জোনাকী হইতে বিভিন্ন। সে আলো জোনাকীর মাথার উপর জ্বলিয়া থাকে এবং তাহা এ দেশের জোনাকীর আলোর মত জ্বলিয়া নিভিয়া যায় না। নিবাত-নিষ্কম্প দীপশিখার মতই তাহা জ্বলিয়া থাকে। সে সকল জোনাকীর আলো এমন উজ্জ্বল যে, কতকগুলিকে ধরিয়া একত্র করিলে তাহাদের আলোর সাহায্যে অন্ধকারে পাঠ করা দুরূহ হয় না। আমেরিকার আদিম নিবাসীরা রাত্রিকালে পথ চলিবার সময় এই সকল জোনাকীকে বাতির মত ব্যবহার করে। ঐ সকল জোনাকীর স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের অঙ্গেই আলো জ্বলিয়া থাকে। শুধু স্ত্রী-পুরুষ কেন, শিশু ও অণ্ডদের দেহ হইতেও অপার্থিব স্নিগ্ধ আলোক বিচ্ছুরিত হইতে দেখা যায়। এই সকল জোনাকীর দেহ চূর্ণ করিয়া রাখিলেও তাহা আঁধারে জ্বলিয়া থাকে।

জোনাকীরা সুপ্ত বা নিষ্ক্রিয়ভাবে অবস্থান করিলে এই আলোর দীপ্তি কমিয়া যায়। শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়ার হ্রাস-বৃদ্ধির সহিত উহাদের অঙ্গ-নিঃসৃত আলোকেরও বৈলক্ষণ্য হইয়া থাকে। যৌন-সম্মিলনের সহায়তা ব্যতীত এই আলোকের আরও দুইটি উদ্দেশ্য বুঝিতে পারা যায়। গাঁধি পোকার দেহের দুর্গন্ধের মত জোনাকীর আলো উহাদের আত্মরক্ষায় কম সহায়তা করে না। দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেই অপর পোকারা জোনাকীকে ভয়ে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত আঁধারে বনের মধ্যে আহার অন্বেষণে পথ নির্দ্দেশ ও শিকার খুঁজিয়া দিতেও এই আলোর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যায়। জোনাকীর শত্রুরা যেমন এই আলো দেখিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেয়, জোনাকীর ভক্ষ্য শিকারও সেইরূপ এই আলো দেখিয়া ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়ে। তখন জোনাকীর পক্ষে শিকার ধরাও সহজ হইয়া উঠে।

স্ত্রী-জোনাকী যেমন আলো জ্বালিয়া যৌন-সম্মিলনের ইঙ্গিত করে, ঝিল্লীরাও সেইরূপ পক্ষে পক্ষ ঘর্ষণ করিয়া যৌন-মিলনের সূচনা করিয়া থাকে। এই ঝিল্লীরব বা ঝিঁঝিঁর ডাকের পরিচয় অনাবশ্যক। তবে স্ত্রীকে আহ্বান করিবার জন্য ঝিল্লীরা যে বেহালা বাদন করে, সে যন্ত্রের কিঞ্চিৎ পরিচয় বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ঝিল্লীদের সম্মুখের কঠিন পক্ষ দুইটাই উহাদের মিলনগাথার বাদিত্র। ইহার পশ্চাতেই উহাদের উড়িবার আসল পাখা থাকে। সুতরাং এই কঠিন পক্ষদ্বয়কে উড্ডয়ন-পক্ষের আবরণ বা কোষ বলিয়া ধরিতে পারা যায়। এই পক্ষের নিম্নে তন্ত্রীর ন্যায় কঠিন শিরা ও স্নায়ু থাকিতে দেখা যায়। ইহাদের বাম আবরণ-পক্ষের নিম্নে করাতের দাঁতের মত অনেকগুলি খাঁজ থাকে। এক জন পতঙ্গবিদ্ এই খাঁজের গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, উহাদের সংখ্যা এক শত ত্রিশ। ঝিল্লীরা যৌন-সম্মিলনের উদ্দেশে স্ত্রীকে আহ্বান করিবার কালে গর্ত্তের মুখের কাছে উঠিয়া আসিয়া বাম পক্ষের নিম্নস্থিত খাঁজগুলি দক্ষিণ পক্ষের নিম্নস্থিত কঠিন স্নায়ুর উপর বারংবার ঘর্ষণ করিতে থাকে। দক্ষিণ পক্ষের তলে আবার স্নায়ুর মধ্যস্থিত অল্প-পরিসর স্থান পাতলা স্বচ্ছ পর্দ্দায় আবৃত থাকিতে দেখা যায়। পক্ষ-ঘর্ষণজনিত শব্দ-তরঙ্গ এই পর্দ্দায় লাগিয়া আরও তীব্র হইয়া উঠে। ঝিল্লীর পক্ষের তলে এই প্রকার সরঞ্জাম না থাকিলে উহাদের তথাকথিত "ডাক" বা রব এত মুখর হইত না। আবার কোনও শ্রেণীর ঝিল্লীদের পিছনের পদের নিম্নদেশে এইরূপ খাঁজকাটা থাকে। যৌন-সমাগমের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার উদ্দেশে উহারা চরণ-যুগলের ঐ অংশ সম্মুখের পক্ষদ্বয়ের নিম্নস্থিত কঠিন তন্ত্রীতে অবিরত ঘর্ষণ করিয়া পূর্ব্বরাগের মিলন-রাগিণী নিশীথ-পথের পথিককে শুনাইয়া থাকে।

ঝিঁঝিঁর ডাকের সহিত হাইল্যাণ্ডারদের ব্যাগপাইপের যেন একটু মিল আছে বলিয়া বোধ হয়। প্রাবৃটের সন্ধ্যায় গড়ের মাঠের বৃক্ষতলস্থিত বেঞ্চের উপর বসিয়া ময়দানে ঝিল্লীদের সুরবৈচিত্র্যবিহীন ঐক্যতানবাদনের সহিত দুর্গ-প্রাকারনিঃসৃত দূরাগত ব্যাগপাইপের করুণ সঙ্গীতের বিচিত্র সুরের সাদৃশ্য অনুভব করিতে করিতে তন্দ্রাসুখ অনুভব করিয়াছি। পুরুষ-ঝিল্লীরা মাঠে পৃথক্ পৃথক্ গর্ত্ত খনন করিয়া স্বতন্ত্রভাবে বাস করিতে ভালবাসে। এই গর্ত্ত কখনও কখনও ছয় ইঞ্চি গভীর হইতেও দেখা যায়। এই গর্ত্তের মধ্যে ইহারা দিবসে বিনিদ্রভাবে কাটাইয়া সন্ধ্যায় শিকারে বাহির হইয়া থাকে। এই সময় স্ত্রী-সাক্ষাতের দিদৃক্ষা জন্মিলেই ইহারা ক্ষুদ্র বিবরমুখে উঠিয়া আসিয়া এবং পক্ষে পক্ষ ঘর্ষণ করিয়া পূর্ব্ববর্ণিত অনুচ্চ মধুর শব্দের

সৃষ্ট করিয়া থাকে। সম্মুখ-পদের নিম্নভাগস্থিত শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে সে মিলনসঙ্কেত অনুভব করিয়া ঝিল্লী-পত্নী প্রণয়ীর আবাসদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হয়। ঝিল্লিকার আগমনে ঝিঁঝিঁর মুখর রব ধীরে ধীরে স্তিমিত হইয়া আসে এবং স্ত্রীকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত ঝিঁঝিঁর ডাকে স্ত্রীর সাড়া দেওয়ায় ইহাদের সমুন্নত শ্রবণশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এই শ্রবণেন্দ্রিয় আবার কোনও শ্রেণীর উদরের নিম্নভাগের দুই পার্শ্বে থাকিতে দেখা যায়।

গাছের গুঁড়ি প্রভৃতির মধ্যে যে সকল ঝিল্লী বাস করে, যৌন-সম্মিলনকালে তাহাদের পৃষ্ঠস্থিত একটি গ্রন্থি বা গ্লাণ্ড হইতে এক প্রকার মিষ্ট রস নিঃসৃত হইয়া থাকে। পুরুষ-ঝিল্লীরা পৃষ্ঠজাত মিষ্ট রস স্ত্রীকে পান করাইয়া তাহার প্রণয়প্রার্থী হইয়া থাকে।

প্রজাপতির মধ্যে প্রেমপ্রবণতা অতিমাত্রায় লক্ষিত হইয়া থাকে। ইহাদের আচরণ দেখিলে মনে হয়, যেন প্রণয়ের আস্বাদ গ্রহণ করিবার নিমিত্তই ইহাদের সৃষ্টি হইয়াছে। কোষনির্ম্মুক্ত পূর্ণাবয়ব প্রজাপতির প্রণয় ব্যতীত আর কোনও আকাঙ্ক্ষা এবং প্রিয়ার চিত্তাণুরঞ্জন ব্যতীত আর কোনও বৃত্তিই বড় একটা লক্ষিত হয় না। ভোজন-ব্যাপার ইহারা শুককীটাবস্থাতেই একরূপ সম্পন্ন করিয়া পরবর্ত্তী অবস্থা প্রণয়ব্যাপারেই পর্য্যবসিত করিয়া থাকে। অলি যেমন সর্ব্বদাই পুষ্পের মধু সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত, প্রজাপতিরা সেইরূপ সকল সময়েই স্ত্রীর প্রেমাহরণে তৎপর। পুষ্পের পরিমল অপেক্ষাও প্রণয়িনীর প্রেম ইহাদের নিকট বাঞ্ছনীয় বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। প্রিয়ার প্রেম-পরাগের সন্ধানেই প্রজাপতিরা তাহাদের স্বল্প-পরিসর জীবনের অবশিষ্টকাল নিঃশেষ করিয়া ফেলে। বাগানে বা বনপথের পার্শ্বে যে সকল শ্বেত ও পীতাভ প্রজাপতিকে অনেক সময়েই উড়িয়া বেড়াইতে দেখা যায়, তাহারা যে ফুলের মধু পানার্থেই এই ভাবে সঞ্চরণ করে, তাহা বোধ হয় না; প্রণয়িনীর মনোরঞ্জনার্থেই তাহারা তাহার অনুগামী হইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা অশ্রান্তপক্ষে আকাশে এইভাবে বিচরণ করিয়া থাকে। প্রজাপতিদের এই প্রকার প্রণয়-প্রণোদিত বিমানবিহার চৈত্র ও বৈশাখ মাসে বোধ হয় অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। এই সময়ে স্ত্রী-প্রজাপতির অনুগমন করিতে করিতে ইহাদিগকে সুদীর্ঘ পাদপচূড়ের উপরেও উঠিয়া যাইতে দেখা যায়।

যৌন-সম্মিলনকালে স্ত্রী-প্রজাপতির গাত্র হইতে যে এক প্রকার গন্ধ বাহির হয়, তাহা পূর্ব্বে আমি গত সনের চৈত্রমাসের "মাসিক বসুমতীতে" "ইতর জীবের ঘ্রাণশক্তি" শীর্ষক প্রবন্ধে আভাস দিয়াছি। সে গন্ধ মানব-নাসার অতীন্দ্রিয় বস্তু হইলেও পুরুষ-প্রজাপতিরা তাহা বহু দূর হইতে অনুভব করিয়া স্ত্রীসকাশে আসিয়া উপস্থিত হয়। স্ত্রীসকাশে কতকগুলি পুরুষ প্রজাপতি আসিয়া জুটিলেই পূর্ব্বোক্ত প্রকারের বিমান-বিহার আরব্ধ হইয়া থাকে। এই কালে পুরুষ-প্রজাপতিরা আত্মপ্রতিষ্ঠা দ্বারা স্ত্রীর অনুরাগলাভে সচেষ্ট হইয়া থাকে।

যে সকল প্রজাপতি বর্ণ সম্বন্ধে গরীয়ান্, তাহাদের স্ত্রীর মধ্যে বর্ণপ্রিয়তা ও সৌন্দর্য্যজ্ঞানের বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। স্ত্রী-অঙ্গের গন্ধে অনেকগুলি পুরুষ-প্রজাপতি আসিয়া জুটিলেই স্ত্রীলাভের উদ্দেশে তাহাদের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ বাধিয়া যায়। স্ত্রী-প্রজাপতি সর্ব্বাপেক্ষা সুরঞ্জিত ও সমধিক সুচিত্রিত প্রণয়ীকেই বরণ করিয়া প্রেমজ কলহের অবসান করিয়া দেয়। কিন্তু এই মিলন বড় সহজে সংঘটিত হয় না। ইহার নিমিত্ত পুরুষকে বহুক্ষণ সহগুণের পরিচয় দিতে হয়।

প্রজননকালে কতকশ্রেণীর প্রজাপতির মধ্যে প্রসাধনের উদ্যোগও দেখিতে পাওয়া যায়। এই কালে উহাদের পক্ষস্থিত ক্ষুদ্র শল্কের মধ্যে একপ্রকার সুগন্ধ দ্রব্যের উদ্ভব হইয়া থাকে। স্ত্রীর মনোহরণ করিতে পুংপ্রজাপতিরা পক্ষ সঞ্চালন করিয়া এই গন্ধ প্রণয়িনীর নিকট ছড়াইয়া তাহার মনোহরণ করিতে চেষ্টা করে। প্রজাপতির পক্ষের এই শল্ক নগ্ন-নয়নে দেখা যায় না। প্রজাপতির পাখা ধরিলে এই শল্কই রেণুর মত আঙ্গুলে লাগিয়া যায়। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্যে এই শল্কের আকার অনেকটা তালপত্রের মত দেখাইয়া থাকে। এই শল্কের উপরেই সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত হইয়া প্রজাপতির পাখার মনোরম বর্ণের সৃষ্টি করিয়া থাকে। প্রজাপতির ডানার উপরিস্থিত এই শল্ক বা রেণুর মধ্যে যে কোনও রঞ্জনবস্তু নাই, তাহা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। এই পাখনার উপরিস্থিত শল্কের অমসৃণ পৃষ্ঠে প্রতিহত হইয়াই সূর্য্যকিরণ, নয়নরঞ্জন বর্ণচ্ছটার সৃষ্টি করে।

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্যে নিরীক্ষণ করিলে এই সকল শঙ্কের উপর বহু খাঁজ ও অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানা বা পুঁথির মত পদার্থ থাকিতে দেখা যায়। ঝাড়ের কলমের উপর রৌদ্র পড়িয়া যেমন বর্ণচ্ছটার সৃষ্টি করে, সূর্য্যালোক সেইরূপ শল্কমধ্যস্থিত ঐ সকল দানার ও খাঁজের উপর পড়িয়া নানাবর্ণে প্রতিফলিত হইয়া পড়ে।

আর এক শ্রেণীর পুংপ্রজাপতির উদরের পার্শ্বে প্রজননকালে গন্ধকোষের আবির্ভাব হইয়া থাকে। সে সময় প্রজাপতিরা উহাদের পিছনের পা দুইটি অনেক সময়েই মদগন্ধী কোষের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া রাখে। যৌন-সম্মিলনের পূর্ব্বে পশ্চাতের চরণ দ্বারা সুরভি পরাগ ঐ কোষের মধ্য হইতে বাহির করিয়া এবং উড়িবার কালে তাহা স্ত্রী-অঙ্গে ছড়াইয়া দিয়া উহারা তৎপ্রতি প্রণয় জ্ঞাপন করে।

এ দেশের মালপোকার মত আকৃতিসম্পন্ন বিলাতী ষ্ট্যাগ বিটলরা যৌন-সম্মিলনকালে ভীষণ রণে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। ইহাদের পুরুষদের দেহ দুই ইঞ্চি দীর্ঘ হইলেও ইহাদের দাড়া দুইটি অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া থাকে। এই দাড়া অনেকটা হরিণের শৃঙ্গের মত। ওকবৃক্ষের কাণ্ডের মধ্যে ইহারা বাস করিতে ভালবাসে। সন্ধ্যায় ওকবনের মধ্যেই ইহাদিগকে উড়িয়া বেড়াইতে দেখা যায়। প্রণয়রণে সুদীর্ঘ দাড়াই ইহাদের প্রধান অস্ত্র। ইহারই সাহায্যে ইহারা পরস্পরকে পরাজিত করিয়া স্ত্রীর প্রণয়লাভ করিয়া থাকে। যৌন-সম্মিলনের পর ইহাদের কোন কোনটির দেহে, দাড়ায় বহু ক্ষতচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

পিপীলিকারা ভূতলচারী হইলেও তাহাদের প্রণয় অন্তরীক্ষে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই প্রণয় আকাশে সম্পন্ন করিবার উদ্দেশেই প্রজননকালে উহাদের পক্ষের উদ্ভব হইয়া থাকে এবং শূন্যে যৌন-সম্মিলন-ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া গেলেই উহারা ভূতলে নামিয়া পক্ষ কর্ত্তন করিয়া ফেলে। যৌন-সম্মিলনোদ্দেশে পিপীলিকাদের এই বিমানবিহার সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এই কালে শুধু পুরুষ ও নারীদেরই পাখা গজাইয়া থাকে; কর্ম্মীরা ক্লীব বলিয়া তাহাদের পাখার প্রয়োজন হয় না।

চক্রনির্ম্মাণের মধ্যে বিশেষ কিছু বৈচিত্র্য থাকিলেও মধুমক্ষিকাদিগের প্রণয়রীতির মধ্যে বিশেষ কিছু বৈচিত্র্য লক্ষিত হয় না। চক্রে শত শত পুরুষের মধ্যে মাত্র একটি রাণী বা স্ত্রীমক্ষিকা থাকে। এই স্ত্রীই সহস্র সহস্র শাবকের জননী হইয়া মধুলিট্দিগের বংশ বিস্তৃত করিয়া থাকে। চক্রে একাধিক স্ত্রীর আবির্ভাব ঘটিলেই শান্তরসাস্পদ আবাসে প্রাণঘাতী সমরের সমাবেশ হইয়া থাকে। তৎকালে কর্ম্মী মক্ষিকারা সে তুমুল রণের মূকদ্রষ্টা হইয়া মল্লস্থল হইতে মৃত মধুমক্ষিকাদিগকে নীরবে স্থানান্তরিত করিয়া থাকে।

মধুমক্ষিকা ও পিপীলিকার মাঝামাঝি এক শ্রেণীর পতঙ্গের (mutilla) প্রণয় যথার্থ-ই লক্ষ্য করিবার বিষয়। ইহাদের মধ্যে কেবলমাত্র স্ত্রী ও পুরুষ দেখিতে পাওয়া যায়। পুরুষদিগের দেহ গাঢ় নীলবর্ণের, মস্তক হইতে উদরের উপরের অংশটি লালবর্ণের হইয়া থাকে। ইহাদের স্ত্রীরা পক্ষবিহীন এবং আকারে পুরুষ অপেক্ষা ক্ষুদ্র। মাটীর মধ্যে গর্ত্ত খুঁড়িয়া ইহারা বাসা প্রস্তুত করে। পক্ষহীনা স্ত্রীদিগকে মাটীর উপরেই পিপীলিকার মত চলা-ফেরা করিতে দেখা যায়। প্রণয়কালে পুরুষরা ক্ষীণাঙ্গী স্ত্রীকে প্রগাঢ় অনুরাগ সহকারে বহন করিয়া উড়িয়া বেড়ায় এবং পরাগ ও পরিমল ভক্ষণ করাইবার নিমিত্ত সুরভি-কুসুমের পাপড়ীর উপর লইয়া ছাড়িয়া দেয়। এইকালে অপর পুরুষ-পতঙ্গরা আসিয়া উপস্থিত হইলে পূর্ব্ব-প্রণয়ী উহাদের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় এবং রণে উহাদিগকে পরাজিত করিতে না পারিলে প্রণয়িনীকে বধ করিয়া উদরস্থ করিয়া ফেলে।

স্বচ্ছন্দ নিদ্রার প্রধান অন্তরায় মশক ও মাছির মধ্যেও প্রণয়রীতির আভাস পাওয়া যায়। মশকরা উড়িবার সময় যে ভোঁ ভোঁ শব্দ করে, সেই শব্দের মধ্যেই তাহাদের প্রণয়ের ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন থাকে। অতি দ্রুত পক্ষকম্পন হইতেই এই তীব্র মধুর শব্দ উৎপন্ন হয়। এক জন পতঙ্গবিদ্ অনুমান করিয়াছেন যে, প্রতি মিনিটে মশকরা ন্যূনাধিক তিন সহস্রবার পক্ষকম্পন করিয়া থাকে। পক্ষ-বিধূনন-জনিত এই শব্দের মধ্যে শ্বাসপথে সমুৎপন্ন আর এক প্রকার উচ্চ শব্দ সংমিশ্রিত থাকে। এই শব্দসঙ্কেতেই রসপায়ী মশকরা রুধিরপায়িনী মশকীর নিকট যৌন-মিলনোদ্দেশে উড়িয়া আসে।

সাধারণ গৃহ-মক্ষিকাদিগের উড্ডয়ন-রীতির মধ্যেও প্রণয়সঙ্কেত সূচিত হইয়া থাকে। যৌন-সম্মিলনোদ্দেশে স্ত্রীকে আকৃষ্ট করিতে ইহারা এক বিচিত্র প্রথায় পক্ষসঞ্চালন করিয়া থাকে।

শ্রীঅশেষচন্দ্র বসু (বি, এ)।

১৩

উস্রি জলপ্রপাত দেখিতে যাইবার জন্য পরদিন গাড়োয়ান যখন গাড়ী লইয়া আসিল, তখন বেলা প্রায় দেড়টা। অর্চনা সকাল হইতেই সকলকে তাড়া দিয়া কাযকর্ম্ম সব শেষ করিয়া রাখিয়াছিল এবং নিজেও প্রস্তুত হইয়া গাড়ী আসিবার অপেক্ষায় বসিয়াছিল। গাড়োয়ানের ডাক কাণে পৌছিবামাত্রই অর্চনা তাড়াতাড়ি অক্ষয় ডাক্তারকে ডাকিয়া আনিবার জন্য কেষ্টকে পাঠাইয়া দিয়া বাহিরের দিকে বারান্দায় আসিয়া দেখিল যে, অক্ষয় ডাক্তার আপনা হইতেই আসিয়া পড়িয়াছে এবং ফটকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া গাড়োয়ানের সঙ্গে কি সব কথা বলিতেছে।

বামুন ঠাকুরকে বাড়ী চৌকি দিবার জন্য রাখিয়া মিনিট পনর কুড়ির ভিতর সকলে গিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

উস্রি জলপ্রপাত-সংলগ্ন সেই বিশাল পার্ব্বত্য ভূমির নিম্নদেশে, যে স্থানটায় গাড়ী হইতে নামিয়া যাইতে হয়, এইখান হইতে সেই স্থানটি নয় দশ মাইলের কম নহে। পচম্বার বড় রাস্তা অতিক্রম করিয়া গাড়ী প্রথমে ষ্টেশনের রাস্তায় এবং পরে তাহাও পার হইয়া, বড় কয়লাখাদের পার্শ্ব দিয়া তাহা উস্রির সড়কে আসিয়া পড়িল। এই দীর্ঘ পথটি অশ্বযুগলের বিশেষরূপই পরিচিত ছিল। শোণপুর হরিহরছত্রের মেলা হইতে এই গিরিডিতে আসিয়া অবধি আজ পর্য্যন্ত অসংখ্যবার এই পথটি তাহাদের পাড়ি দিতে হইয়াছে, তাই চির-পরিচিত এই পথটিতে আসিয়া পড়িবার পরই তাহারা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিল যে, তাহাদের আজিকার যাত্রা অল্পে শেষ হইবার নহে, তাহা যেমন সুদূরের, তেমনই দীর্ঘকালব্যাপী, সুতরাং যে উৎসাহে এবং বেগে এতক্ষণ তাহারা ছুটিয়া আসিতেছিল, এক্ষণে হঠাৎ তাহাতে ভাটা পড়িয়া গেল।

পথ অতিমাত্রায় বন্ধুর, সুতরাং দুর্গম। কোথাও বা কঙ্করময় পথ প্রস্তরময় ভূমির মধ্য দিয়া একবারে চড়াইয়ের উপর উঠিয়াছে, আবার কোথাও বা তাহা ঢালু হইয়া একবারে নীচের দিকে নামিয়া গিয়াছে। কোনও স্থানে মুক্ত প্রান্তরের মধ্য দিয়া, কোনও স্থানে বনভূমি অতিক্রম করিয়া, কোথাও বা ক্ষুদ্র পার্ব্বতীয় ঝরণার পার্শ্ব দিয়া, কোথাও বা সাঁওতাল-পল্লীর ভিতর দিয়া, মুহুর্মুহুঃ সারথির কশাঘাত উপভোগ করিতে করিতে, রথাশ্বযুগল শম্বুকনীতি অবলম্বন করিয়া মন্থরগতিতে গন্তব্য স্থানাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল।

এক স্থানে দুই পার্শ্বের প্রস্তরময় প্রান্তরমধ্যে একই জাতীয় অসংখ্য বন্য বৃক্ষের চারা জন্মিয়া সমগ্র প্রান্তরকে সবুজবর্ণে মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছিল। সেই স্থান হইতে প্রায় মাইল দুই ব্যাপী এক নিবিড় অরণ্য সুরু হইয়াছিল। গাড়ীখানি এই অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিলেই হঠাৎ সকলে একটা অসহ্য শৈত্যানুভব করিল। এই বনভূমি অতিক্রম করিয়াই গাড়ীখানি ক্রমশঃই অল্প অল্প করিয়া উপরের দিকে উঠিতে লাগিল। তথায় বন্ধুর পার্ব্বত্য ভূমির উপর দিয়া যেন ক্রমাগত তরঙ্গের পর তরঙ্গ চলিয়া গিয়াছে এবং সম্মুখের দিকে সেই ভূ-তরঙ্গ যেখানে আসিয়া শেষ হইয়াছে, তাহার পর হইতেই সুদূর-বিস্তৃত উচ্চ ভূমি, ঘন-সন্নিবিষ্ট অসংখ্য বন্য বৃক্ষ বক্ষে ধারণ করিয়া যেন তপস্যারত মহর্ষির ন্যায় যুগ যুগ ধরিয়া পরম গাম্ভীর্য্যে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহারই নিম্নদেশে একস্থানে কয়েকটি শাল ও দেবদারু গাছের ছায়ার তলায় আসিয়া অশ্বযুগল যখন আপনা হইতেই থামিয়া দাঁড়াইল, তখন অক্ষয় ডাক্তার অর্চ্চনার দিকে চাহিয়া কহিল,—"এইখেনেই নেমে পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যেতে হবে মা, গাড়ী আর যাবে না। মাইল-খানেক পথ হবে, চলতে পারবি ত ?"

বরষার বৃষ্টিধারা এবং আকাশের ঘনান্ধকারের মধ্যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের বিকাশ দেখিয়া যাহার চিত্ত তন্ময় হইয়া পড়িত, সেই অর্চ্চনা পার্ব্বত্য প্রদেশের এই মহান্ ও গাম্ভীর্য্যময় দৃশ্য দেখিয়া একবারে মুগ্ধ হইয়া গেল, অক্ষয় ডাক্তারের প্রশ্ন তাহার কর্ণেই পৌছাইল না, সে শুধু চতুর্দ্দিকের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে সকলের অনুসরণ করিয়া চলিল মাত্র।

যেখানে উস্রির বিশাল জলধারা উচ্চ পর্ব্বতমালা হইতে ভীম-গর্জ্জনে নিম্নে প্রস্তররাজীর উপরে অবিরাম পড়িতেছে, সেইখানে আসিয়া অর্চ্চনা একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তরের উপর বসিয়া পড়িয়া ভবতোষ বাবুর দিকে চাহিয়া কহিল,—"কি

সুন্দর, কি চমৎকার! এ দেখলে আর ক্ষিধে-তেষ্টা পায় না বাবা, ঘরের কথা আর মনে থাকে না, মনে হয়, দিন-রাত এইখানে ব'সে ব'সে শুধু এই দেখি।"

অক্ষয় ডাক্তার কহিল,—"তবে এই দেখেই তুই পেট ভরা বেটী, আমাদের সব ক্ষিধে পেয়ে গেছে, আমরা ষ্টোভ জ্বালিয়ে একটু চায়ের যোগাড় করি।"

"সত্যিই কাকা বাবু, পেট ভরুক না ভরুক, মন ভ'রে যায় বটে, পেটের কথা আর মনেই থাকে না।" বলিয়া অর্চ্চনা একদৃষ্টে ও একান্তমনে শৈলরাজিমধ্যস্থ জল-প্রপাতের সেই অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিল এবং প্রায় মিনিট পনের পরে দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল,—"কাকা বাবু, এইবার আপনাদের চা ক'রে দি।" কিন্তু ফিরিয়া দেখিল, ঠিক তাহার পার্শ্বে যাহারা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তাহারা তাহার কাকা বাবু নহে, বাবাও নহে, তাহারা অপর ব্যক্তি, তাহাদেরই মত দর্শক দুই চারি জন স্ত্রী পুরুষ। তাহার কাকা বাবু প্রভৃতি তখন অদূরে, যেখানে প্রপাতের ফেনময় জল-স্রোত উপলরাশি ভেদ করিয়া নিম্নমুখে নদীর আকারে বহিয়া যাইতেছে, সেইখানে দাঁড়াইয়া কি যেন দেখিতেছে।

অর্চ্চনাও সেই স্থানে গিয়া দাঁড়াইল, দেখিল, সম্মুখে পরপারে জলের উপর হইতেই কয়েকটি বৃহদাকার প্রস্তর একসঙ্গে গায়ে গায়ে থাকিয়া বহু উচ্চে খাড়া হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহাদের পৃষ্ঠদেশে খড়ি, পেন্সিল, কয়লা বা অন্য কিছু দিয়া ইংরাজী ও বাঙ্গালায় অসংখ্য নাম লেখা রহিয়াছে। জলপ্রপাত দেখিতে আসিয়া দর্শকদের দ্বারাই এই সমস্ত নাম লিখিত হইয়াছিল। নেপাল সঙ্কীর্ণ জল-স্রোত হাঁটিয়া পার হইয়া গেল এবং পকেট হইতে ক্ষুদ্র একটি লাল-নীল পেন্সিল বাহির করিয়া এক স্থানে তাহার নিজের নাম মোটা মোটা করিয়া লিখিয়া রাখিল। তাহার দেখাদেখি অর্চ্চনাও সন্তর্পণে সেই স্থানে গিয়া পৌঁছিল এবং নেপালের হস্ত হইতে পেন্সিলটি চাহিয়া লইয়া কহিল,—"আসল জিনিষটাই লিখলেন না? সন-তারিখটা লিখতে হয়, যদি আবার কখনও আসি, তা হ'লে—।" বলিতে বলিতে নেপালের নামের পার্শ্বে তাহার নিজের নামটি লিখিয়া নীচে সেই দিনের তারিখ ও সন লিখিয়া দিয়া কহিল,—"কিন্তু বর্ষার বৃষ্টিতে নামগুলো ত সব মুছে যায় নি, ঠিক রয়েছে, নেপাল বাবু।"

নেপাল উপরের দিকে দেখাইয়া কহিল,—"দেখছেন না, এখানে বৃষ্টির ঝাপটা লাগবার কোনই উপায় নেই।" কিন্তু তাহা দেখিবার পূর্ব্বেই ভবতোষ বাবুর ডাকাডাকিতে উভয়কে পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসিতে হইল এবং একটি সুবিধা-মত স্থানে গিয়া অর্চ্চনাকে চায়ের যোগাড়ে মনোযোগ দিতে হইল।

সামান্য কিছু জলযোগের সহিত সকলের যখন চা খাওয়া শেষ হইল, তখন সূর্য্য অস্ত না গেলেও, বৃক্ষ-লতা-গুল্ম-পরি-বৃত নিভৃত শৈলশিখরদেশে অন্ধকার ঘনাইয়া উঠিতেছিল। সুতরাং আর তথায় অপেক্ষা না করিয়া সকলে ফিরিবার পথে যাত্রা করিল এবং সেই প্রায়ান্ধকারে দুর্গম পথাতিক্রম করিয়া যখন সকলে গাড়ীর কাছে আসিয়া পৌঁছিল, তখন কৃষ্ণপক্ষের ঘোরান্ধকারের মধ্যে পথ, প্রান্তর, আকাশ, কানন সব হারাইয়া গিয়াছিল। অপর যাহারা সব আজ জল-প্রপাত দেখিতে আসিয়াছিল, সকলেই বহু পূর্ব্বে ফিরিয়া গিয়াছে, তাহারাই সর্ব্বশেষে পড়িয়াছে। এজন্য গাড়ো-য়ানের নিকট হইতেও কিছু অনুযোগ আসিল, যথা,—পথ অত্যন্ত বিশ্রী, তাহাতে বিকট অন্ধকার, জন্তু-জানোয়ারের ভয়টাকেও একবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না, ইত্যাদি ইত্যাদি। যাহা হউক, সেই বিকট অন্ধকারে শকটের ক্ষুদ্র আলো দুইটি ভরসা করিয়া গাড়োয়ান তাহার গাড়ী ছাড়িয়া দিল এবং ফিরিবার পথে ঘরমুখী হইয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয় যথাসম্ভব দ্রুতবেগে সেই নিবিড় অন্ধকার ভেদ করিয়া ছুটিল।

প্রায় ক্রোশ দুই আড়াই পথ আসিবার পর, যে স্থলে সড়কের উভয় পার্শ্বে সেই একই জাতীয় অগণিত বন্যবৃক্ষের চারা জন্মিয়া দুই দিকের দূর-ব্যাপী প্রান্তরকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল, সেইখানে আসিয়া অশ্বযুগল একবারে দাঁড়া-ইয়া পড়িল। কয়েক ঘা চাবুকের উপর চাবুক আসিয়া পড়িলেও তাহারা ভ্রূক্ষেপমাত্র করিল না এবং অগ্রসর হইবার পরিবর্ত্তে যখন তাহারা ক্রমাগতই পিছনের দিকে হটিতে সুরু করিল, তখন অক্ষয় ডাক্তার ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করিল,—"কি হ'ল রে?" গাড়োয়ান অনুচ্চকণ্ঠে ফিস্ ফিস্ করিয়া জবাব দিল,—"বাত-চিজ করবেন না বাবু,—বাঘ দেখা হায়।"

বাত-চিজ আপনা হইতেই সকলের বন্ধ হইয়া গেল এবং

দেখা হায়'টা ঠিক যে কোথায়, অর্থাৎ খুব নিকটে কিম্বা একটু দূরে, সেই কথাটা জানিবার জন্য যদিও সকলেরই মনে একটা প্রবল ইচ্ছা হইতে লাগিল, কিন্তু কণ্ঠ হইতে কাহারই কথা বাহির হইল না এবং সকলেই আড়ষ্ট হইয়া একটা বিকট হুঙ্কারের অপেক্ষামাত্র করিতে লাগিল। কিন্তু অর্চ্চনা কিছু না জিজ্ঞাসা করিয়াও থাকিতে পারিল না; জানালার বন্ধ পাখীর কাছে মুখ লইয়া গিয়া চাপাকণ্ঠে গাড়োয়ানের উদ্দেশে কহিল,—"তোম্ নিজে কিছু দেখতে পাতা হায়?" তেমনই ফিস্ ফিস্ করিয়া গাড়োয়ান কহিল,—"চুপসে রয়রো মায়জি, আঁধারকো ভিতর দোঠো আঁখ জলতা মালুম হোতা হায়।"

ভবতোষ বাবু কন্যাকে কথা কহিতে নিষেধ করিলেন। অক্ষয় ডাক্তার গাড়ীর দরজা-জানালাগুলি ভাল করিয়া বন্ধ আছে কি না, আর একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিল। নেপাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া এতক্ষণ একটি কোণে হেলান দিয়া বসিয়াছিল, এক্ষণে হঠাৎ নড়িয়া উঠিল এবং নিজের আলোয়ানটিকে তাল পাকাইয়া তাহাতে ষ্টোভের সমস্ত কেরোসিনটুকু ঢালিয়া, পকেট হইতে দিয়াশালাইটি হাতে করিয়া বসিল। অক্ষয় ডাক্তার অস্ফুটস্বরে কহিল,—"সকলের কাছে এক একটা ছাতা থাকলে এ সময় অনেকটা কাযে লাগতো।" ভবতোষ বাবু স্বভাবতঃ স্বল্পভাষী ছিলেন, তিনি কহিলেন,—"ভগবানের নাম ছাড়া বিপদের সময় কিছুই কাযে লাগে না অক্ষয় বাবু, তাঁর ভরসাই ভরসা।" অর্চ্চনা চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া কিছু একটা সেও বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সকলের সকল পরামর্শ ও আয়োজন ব্যর্থ করিয়া দিয়া সহসা একটা প্রচণ্ড শব্দে গাড়ীখানি আন্দোলিত হইয়া উঠিল এবং চক্ষুর নিমেষে তাহা পাক খাইয়া ঘুরিয়া গিয়া যে পথে এতক্ষণ আসিয়াছিল, সেই উস্রির পথেই আবার তীরবেগে ছুটিয়া চলিল। গাড়ীর ভীষণ বেগে, ঝাঁকানিতে ভিতরের আরোহীদের প্রাণ কণ্ঠাগতপ্রায় হইয়া পড়িল এবং সকল শব্দকে ছাপাইয়া অর্চ্চনার ভয়কাতর কণ্ঠস্বর শুধু শুনিতে পাওয়া গেল,—"এর চেয়ে যে বাঘে খাওয়া ছিল ভাল; এই গাড়োয়ান, কেয়া করতা হায় উল্লুক, জল্‌দি গাড়ী থামাও।" কিন্তু থামাইবে কে? এখন অশ্বযুগলকে সংযত করা গাড়োয়ানের পক্ষে সম্ভবও নয়—কর্ত্তব্যও নয়, সুতরাং জল্‌দী ত গাড়ী থামিলই না, বরঞ্চ সেই সূচীভেদ্য অন্ধকাররাশি ভেদ করিয়া যেরূপ দুর্দ্দমনীয় বেগে প্রাণপণ করিয়া তাহারা ছুটিতেছিল, সেইভাবেই তাহারা ছুটিয়া চলিল এবং আরোহীদের প্রতিক্ষণেই তখন মনে হইতে লাগিল যে, গাড়ীর লোহা-লক্কড় কাঠ-কব্জা সবই বুঝি ভাঙ্গিয়া চূরমার হইয়া খসিয়া খসিয়া পড়িতেছে। এইবার তাহারাও একস্থানে হাত-পা-মাথা ভাঙ্গিয়া ছিট্‌কাইয়া পড়িবে! হয় ত বাঘটা তাহাদের গাড়ীর পিছনে পিছনেই তাড়া করিয়া আসিতেছে এবং তাহারা ছিট্‌কাইয়া পড়িলেই সে আসিয়া সকলকেই একসঙ্গে দখল করিবে। এই ভাবে আন্দাজ বিশ মিনিটকাল ছুটিয়া হঠাৎ যে যায়গাটিতে আসিয়া গাড়ীখানি একবারেই থামিয়া পড়িল, তাহা পথ কি মাঠ, কি বন, কি বৃক্ষতল, কিম্বা রসাতল, কিছুই কেহ ঠিক করিতে পারিল না। কিছুকালের জন্য জড়ের ন্যায় সকলে বসিয়া রহিল এবং তাহার পর অক্ষয় ডাক্তার একদিককার জানালার পাখী একটুখানি তুলিয়া ধরিলে যখন একটুখানি ক্ষীণ আলোর রেখা চিক্ করিয়া করিয়া গাড়ীর মধ্যে আসিয়া পড়িল, তখন নেপাল দুই হাতে গাড়ীর দরজা খুলিয়া ফেলিতেই দেখিল, তাহারা প্রকাণ্ড একটি মাঠের মধ্যে আসিয়াছে এবং সম্মুখে অদূরেই একটি বৃক্ষতলে দুই চারি জন সাধু ধুনী জ্বালাইয়া বসিয়া রহিয়াছে ও তাহাদের গাড়ীখানির দিকে তাকাইয়া পরস্পর কি সব বলাবলি করিতেছে।

এ দিকে ভজনগাঁও নামে ক্ষুদ্র একটি গাঁও আছে। উস্রি আসিবার রাস্তা হইতে বাঁ দিকে একটি কেঁকড়ি বাহির হইয়া এই ভজনগাঁওয়ে আসিয়া শেষ হইয়াছে। গাড়ীখানি যে স্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহা এই ভজনগাঁওয়েরই সন্নিকটস্থ একটি মাঠ। প্রতি বৎসর ভজনগাঁওয়ের এই মাঠটির মধ্যে আশ্বিন মাসের সংক্রান্তিতে একটি মেলা বসে এবং কার্ত্তিক মাসের কয়েক দিন পর্য্যন্ত থাকিয়া উহা ভাঙ্গিয়া যায়। এ বৎসরও যথারীতি ঐ সময়ে মেলা বসিয়া আজ দিন কয়েক হইল শেষ হইয়া গিয়াছে, দোকানপত্র হাট-বাজার সব উঠিয়া গিয়াছে, শুধু গাছতলার ঐ সাধু বাবাজীর আশ্রমটি কোন অজ্ঞাত কারণে এখনও পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকিয়া নিকটবর্ত্তী গাঁওয়ের অধিবাসীদিগকে আশীর্ব্বাদ ছড়াইতেছে।

গাড়োয়ান গাড়ী হইতে নামিয়া আসিয়া অক্ষয়

ডাক্তারকে কহিল,—"দেখিয়ে হুজুর, কেয়া তক্‌লিফ! সবের্‌ সবের্‌ নেহি ফির্‌নেসে এৎনা ঝঞ্ঝাট হুয়া।"

গাড়ীর বাহিরে মুখ বাড়াইয়া অর্চ্চনা কহিল,—"বাঘ বেরায়া ত আমরা কেয়া করেগা? বাঘকে আস্‌তে হামলোক বোল্‌ দিয়া?"

অক্ষয় ডাক্তারের মুখের দিকে চাহিয়া পুনরায় গাড়োয়ান কহিল,—"অভ্‌ভি হাম্‌ কেয়া করে, ওহি বাতলাইয়ে।"

অক্ষয় ডাক্তার গাড়ী হইতে অবতরণপূর্ব্বক একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল,—"কি করবি বাবা, সকলকেই ত আমাদের খুব কষ্ট পেতে হ'ল। গাড়ী ঘুরিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে আবার চালা। কিন্তু কাছের ঐ গাঁও থেকে দু-দশ জন লাঠিওলা লোক আর আলো—"

"ঘোঁড়ে ত আউর এক পাঁও নেহি চলে গা, ডগটর্‌ বাবু।"

অর্চ্চনা নামিয়া পড়িয়া সম্মুখস্থ সাধুর আশ্রমের দিকে চাহিয়া কহিল,—"আলবৎ চলে গা। রাত কো এই তেপাগুর মাঠকা মধ্যে হামলোক রহেগা নাকি? দোস্‌রা ভাল রাস্তা দেকে চলো, ও রাস্তামে আর আমরা কিছুতেই নেহি যায়ে গা।"

কিন্তু রাস্তা দোস্‌রাও আর ছিল না, ভালও ছিল না, যাইতে হইলে ঐ পথ ভিন্ন আর উপায় নাই। আর উপায় থাকিলেও, যাহাদের পায়ে উপায়, তাহারা যে আর এক পাও যাইতে কিছুতেই রাজী হইবে না, গাড়োয়ানের সে কথাও ধ্রুব সত্য। সুতরাং এই অবস্থা-সঙ্কটে পড়িয়া যখন সকলে মিলিয়া তর্ক-বিতর্ক, পন্থা, কর্ত্তব্য প্রভৃতি লইয়া নিষ্ফল আলোচনা করিতেছিল, তখন অদূরের সেই বৃক্ষতল হইতে সাধুর এক জন চেলা সেইখানে আসিয়া কহিল,— "ওহি সাধু মহারাজ আপলোককে আশীর্ব্বাদ করনেকো-ওয়াস্তে বোলাতেহেঁ।"

সাধুর আশীর্ব্বাদে যদি তাহাদের আজিকার এ বিপদের কোন কিনারা হয়, এই আশা করিয়া সকলে সম্মুখের সেই বৃক্ষতলে আসিয়া দাঁড়াইল। স্থানটির তিন দিক কাপড় ও চট্ ইত্যাদি দ্বারা যথাসম্ভব ঘিরিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। সম্মুখের দিকেও একখানি মোটা পর্দ্দা খাটানো ছিল, কিন্তু তখন তাহা ফেলা হয় নাই, সেই দিক্‌ দিয়াই ধুনীর ক্ষীণ আলোকটুকু সম্মুখের পথে আসিয়া পড়িয়াছিল। মাথার উপর কতকগুলি গাছের ডালপালা বাঁধিয়া দিয়া তদুপরি খান দুই তিন ছেঁড়া কম্বল বিছাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

ভিতরে সাধু মহারাজ পাড়ওয়ালা একখানি বেগুনি রংয়ের চেলির কৌপীন পরিয়া ও মাথায় একটি কাণঢাকা গরম টুপী পরিয়া প্রজ্বলিত ধুনীর ঠিক সম্মুখভাগেই বসিয়াছিলেন। তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া এক জন চেলা তাঁহার সহিত আলাপে রত ছিল এবং কিঞ্চিৎ দূরে এক জন একখানি বড় পিতলের থালায় একতাল আটা মাখিয়া ঠাসিতেছিল এবং তাহারই পার্শ্বে আর এক জন একটি বড় য়্যালুমিনিয়ম পাত্রে একরাশ তরকারী কুটিয়া রাখিতেছিল। মধ্যস্থলে হেরিকেনের অল্পালোক ধুনীর আলোর কাছে পরাভব মানিয়া যেন মরমে মরিয়া গিয়া ধূঁয়ার মধ্যে আত্মগোপন করিবার চেষ্টা করিতেছিল। সম্প্রতি বোধ হয় সকলের চা খাওয়া শেষ হইয়াছিল, কারণ, পানাবশিষ্ট স্বল্পপরিমাণ পরিত্যক্ত চা-সমেত একটি এনামেলের এবং তিনটি পিতলের বাটি ও সিদ্ধ চায়ের পাতাগুলি একটি জলপূর্ণ বালতির পার্শ্বে অবহেলায় পড়িয়া রহিয়াছিল। বাহিরে দুই একটি সুপুষ্ট সারমেয় একধারে শুইয়া বিশ্রামসুখ ভোগ করিতেছিল। কার্ত্তিকমাসের হিমে কেন যে তাহারা পল্লী ছাড়িয়া সন্ন্যাসীর আশ্রমে আসিয়া আশ্রয়লাভ করিয়াছিল, তাহা অন্তর্যামী সাধু মহারাজ ছাড়া আর কাহারও জানিবার উপায় ছিল না।

সকলে ভিতরে প্রবেশ করিলে ভবতোষ বাবু সাধুর সম্মুখে মাটীতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিলেন ও তাঁহার পায়ের ধূলা লইলেন। তাঁহার দেখাদেখি প্রথমে অর্চ্চনা ও পরে নেপাল ও অক্ষয় ডাক্তারও তদ্রূপ করিল। সাধু-মহারাজ ভবতোষ বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেয়া রে বেটা, কেয়া হুয়া তেরা সব্‌?"

মহারাজকে সকল কথাই সংক্ষেপে বলা হইল। বাহিরে দাঁড়াইয়া গাড়োয়ান সাধুকে উদ্দেশ করিয়া যোড়-হাতে কহিল,—"লেকেন আজ রাতকো ঘোড়া মেরা উসি রাস্তেপর কোই সুরতসে নেহি যায়েগা, মহারাজ!"

তখন মহারাজ ভবতোষ বাবুর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "কুচ ডর নেহি বেটা, আজ রাতকোয়াস্তে সব হিঁপর ঠার্‌ যা। সাধুকা আস্তানামে কুচ তেরা তক্‌লিফ নেই হোগা, বেটা।"

ভবতোষ বাবু মুখে বিশেষ কিছু না বলিলেও, মনে মনে

ভাবিলেন, তকলিফ হোক্ বা নাই হোক্, ইহা ছাড়া অন্য উপায়ও নাই। তিনি অর্চ্চনার মুখের দিকে একবার চাহিলেন, অর্চ্চনা কহিল,—"তাই হোক বাবা, আজ আর ও রাস্তা দিয়ে গিয়ে কায নেই।" অক্ষয় ডাক্তারেরও তাহাই মত হইল, নেপালেরও তাহাই মত হইল। সুতরাং তিনি সকলকে লইয়া একখানি কম্বলের উপর বসিয়া সাধু মহারাজের কথা শুনিতে লাগিলেন। কথা সবই তাঁহার নিজের সম্বন্ধেই। কবে দ্বাদশ বৎসর বয়সের সময় তিনি দৈবাদেশে সংসার ত্যাগ করেন; এখন তাঁহার বয়স ১ শত ১৫ বৎসর; তাঁহার গুরুদেব আছেন, নর্ম্মদাতীরের কোন এক দুর্গম পর্ব্বত-গুহায় তিনি তপস্যায় রত, তাঁহার বয়ঃক্রম ৩ শত বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে; তাঁহার দুইবার দাঁত পড়িয়া গিয়া আবার নূতন করিয়া উঠিয়াছে; ভ্রূর উপর হইতে মাংস ঝুলিয়া পড়িয়া চক্ষু ঢাকা পড়িয়াছে; হাতে-পায়ের নখ পাঁচ সাত হাত লম্বা হইয়া গুটাইয়া গিয়াছে; এইবার তিনি দেহরক্ষা করিবেন, তাই সেই নিভৃত স্থানে তাঁহার দর্শনে তিনি যাইতেছেন; তিনি নিজেও এখন যোগে বসিয়া শূন্যের উপর বহুদূর উঠেন; বহুবার তামাকে সোনা করিয়া বিলাইয়া দিয়াছেন; মরা মানুষকে তিনি মন্ত্রের দ্বারা তিন চারিদিন অবধি বাঁচাইয়া রাখিতে পারেন,—ইত্যাদি ইত্যাদি।

কথা শেষ করিয়া সাধুমহারাজ এক জন চেলাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"আট্টা আউর ভি লে বেটা, সব কইকো আজ হিঁইপর পরসাদ্ মিলনে হোগা।"

এ পক্ষ হইতে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট আপত্তি আসিলেও সাধুমহারাজ সে কথায় কর্ণপাতমাত্র করিলেন না, সুতরাং আহারাদির আয়োজন ভালরূপই চলিতে লাগিল। তখন অর্চ্চনা এক কোণে যাইয়া তাহার প্রাত্যহিক সান্ধ্য জপে প্রবৃত্ত হইল। সাধুমহারাজ ভবতোষ বাবুর দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"ইয়ে লেড়কী তেরা জগদ্ধাত্রী হ্যায়।"

যাহা হউক, ঘণ্টা দুই তিন পরে সকলকেই কিছু না কিছু প্রসাদ লাভ করিতে হইল। কিন্তু গোলমাল বাধিল শয়নের ব্যবস্থা লইয়া। ভবতোষ বাবুর রুগ্ন শরীর লইয়া এই মাঠের মধ্যে সন্ন্যাসীর এই বস্ত্রাবাসে সারারাত্রির ঠাণ্ডা খাওয়ান অর্চ্চনা মোটেই পছন্দ করিল না, অথচ অন্য উপায়ই বা কি? অক্ষয় ডাক্তার কহিল,—"অর্চ্চনা আর আপনি দাদা গাড়ীর ভেতর গিয়ে শুলেই ভাল হয়, দরজা দুটো বেশ ক'রে বন্ধ ক'রে দিলেই দিব্বি কৌটোর মত হবে'খন।"

সাধু মহারাজ কহিলেন,—"আরে কুচ ডর মত করো বেটা, এ যায়গা বহুৎ গরম হ্যায়। রাতভোর ধুনী জলতা রহেগা। ওহি দোনো কম্বলকা উপর শো যাও, সবেরমে উঠকে ফুর্ত্তিসে ঘর চলা যাও গে—ব্যস্।"

তাহাই হইল। সেই ছিন্ন বস্ত্রাবাসের চারি কোণে চারিখানি কম্বল বিছান হইল। দুইখানিতে সাধুমহারাজ ও তাঁহার চেলা-চতুষ্টয় এবং বাকী দুইখানার একখানাতে অর্চ্চনা ও ভবতোষ বাবু এবং অপরখানিতে অক্ষয় ডাক্তার শুইলেন। নেপাল ভবতোষ বাবুর বার বার নিষেধ সত্ত্বেও তাহার আলোয়ানখানি লইয়া গাড়ীর অভিমুখেই যাইল। কিন্তু বাকী আর এক জনের কথা এ পর্য্যন্ত কাহারই মনে আসিল না। গাড়োয়ান বহুক্ষণ হইল, সেই যে চারিখানি রুটী, একরত্তি দাল, কিছু তরকারী ও একটু হালুয়া লইয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহার পর আর তাহার কোন সাড়াশব্দই পাওয়া যায় নাই। গাড়ীর ভিতরেই সে আস্তানা গাড়িয়াছে, ইহা মনে করিয়া নেপাল বাহির হইতে তাহাকে ডাকাডাকি করিল; কিন্তু কোন সাড়াশব্দ না পাইয়া গাড়ীর দরজা খুলিয়া ফেলিতে দেখিল, তন্মধ্যে কেহই নাই। এই গভীর রাত্রিতে, নির্জ্জন মাঠের মধ্যে সে বেচারা যে কোথায় গিয়া রহিল, ইহাই নেপাল শূন্য গাড়ীর মধ্যে শুইয়া ভাবিতে লাগিল। কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে যাহার দুইটা আঁখ সে অন্ধকারে বনমধ্যে জ্বলিতে দেখিয়াছিল, তাহাদেরই কেহ আসিয়া তাহার নিরুদ্বেগ নিদ্রার সুব্যবস্থা করিয়া দিবার জন্য তাহাকে ত লইয়া যায় নাই? সমস্ত রাত ধরিয়া নেপালের চক্ষুতে নিদ্রা আসিল না, আসিল শুধু কতকগুলি বাঘ, ভালুক, নেকড়ে, চিতা, ভূত, প্রেত, দৈত্য, দানব প্রভৃতি। ইহারা যেন পর পর তাহার নিদ্রাতুর চক্ষুর সম্মুখে অনবরত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। এই সমস্ত দেখার ফাঁকে যদি বা কখন তাহার একটু তন্দ্রার মত আসে ত তাহার আলোয়ানের বিকট কেরোসিনের গন্ধে তাহার সে তন্দ্রা তখনই ছুটিয়া যায়।

এই ভাবে সমস্ত রাত নেপালের কাটিয়া যাইবার পর অতি প্রত্যূষে গাড়োয়ানের ডাকাডাকিতে গাড়ীর দরজা

খুলিয়া বাহিরে আসিতেই দেখিল, ভবতোষ বাবু, অর্চ্চনা, অক্ষয় ডাক্তার সকলেই শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়াছে এবং গৃহে ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। গাড়োয়ান কোথায় গিয়া রাত্রিযাপন করিয়াছে, জিজ্ঞাসা করাতে সে অদূরবর্ত্তী ক্ষুদ্র গাঁওয়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া মৃদুকণ্ঠে কি বলিল, তাহার একটি বর্ণও বুঝা গেল না, শুধু তাহার মুখ হইতে একটা বিশ্রী গন্ধ যাহা বাহির হইল, তাহার পরিচয় বেশই বুঝা গেল এবং তাহাকে এক্ষণে সশরীরে সম্মুখে দেখিয়া ইহাও বুঝা গেল যে, তাহাকে ব্যাঘ্রে আক্রমণ করে নাই, তাহার পরিবর্ত্তে আর কিছুতে আক্রমণ করিয়াছিল।

যাহা হউক, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই গাড়ী জোতা হইল এবং সকলে সাধু মহারাজকে প্রণাম করিয়া গাড়ীর মধ্যে আসিয়া বসিল। ভবতোষ বাবু মহারাজকে প্রণামান্তে তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় লইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পাঁচটি টাকা অসীম ভক্তির সহিত তাঁহার পদপ্রান্তে ধূলার উপর রাখিয়া আসিলেন।

১৪

সেই দিন বাসায় ফিরিয়া ভবতোষ বাবুর শরীর একটু খারাপ হইয়া পড়িল। পথে আসিতে আসিতেই তিনি গাড়ীর মধ্যে নিজেকে একটু অসুস্থ বোধ করিয়াছিলেন, তখন সকালবেলা অল্প অল্প তাঁহার গা-ভার মাথা-ভার হইয়াছিল। তাহার পর দ্বিপ্রহরে সমস্ত সময়ই শয্যা গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং অপরাহ্ণে তাঁহার বেশ একটু জ্বর প্রকাশ পায়।

অর্চ্চনা চিন্তাযুক্ত হইয়া কহিল,—"আমি যা ভয় করেছিলুম, ঠিক তাই হ'ল। কার্ত্তিক মাসের এই হিম, তাতে একেবারে ফাঁকা মাঠের মাঝে, এ কি কখনও এই নূতন শরীরে সহ্য হয়?"

ভবতোষ বাবু কহিলেন,—"হঠাৎ ঠাণ্ডাটা লেগে জ্বরটা হয়ে পড়েছে, দু'একদিন একটু শুকুলেই জ্বরটা যাবে এখন।"

"জানি না বাবা। আমার সে বরাত নয়। ছাই উস্রি দেখতে না গেলেই হ'ত।"

"তুই অরু, একটুতেই একেবারে অধীর হয়ে পড়িস্! সামান্য একটুখানি জ্বর হয়েছে, তার আর হয়েছে কি?"

অর্চ্চনা আর কোন কথা না বলিয়া অন্য ঘরে চলিয়া গেল, মনে মনে বলিল, "তাই যেন হয় ঠাকুর, একটুখানি জ্বর, একটুতেই যেন সেরে যায়।" কিন্তু ঠাকুর তাহার এ নিবেদন শুনিলেন না। পরের দিন জ্বরের আর বিরাম হইল না, বরঞ্চ পূর্ব্বদিনাপেক্ষা বেশী করিয়াই হইল। তৃতীয় দিনে বুকে ও পার্শ্বে অল্প অল্প বেদনা অনুভূত হইল। অক্ষয় ডাক্তার ঔষধ দিতে লাগিল, কিন্তু বিশেষ কোন ফল হইল না। তখন অর্চ্চনা আর এক জন বড় ডাক্তারকে ডাকাইয়া আনাইল। তিনি পরীক্ষা করিয়া কহিলেন,—নিউমোনিয়া হইয়াছে এবং দুই পাশেই আক্রান্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। উভয় চিকিৎসকের মিলিত ব্যবস্থানুসারে রীতিমত চিকিৎসা চলিতে লাগিল, কিন্তু রোগের উপশম না হইয়া ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। চিকিৎসকরা দুই জনেই বিশেষরূপ চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন, অর্চ্চনার দুর্ভাবনা ও উৎকণ্ঠার সীমা রহিল না, নেপালের আহার-নিদ্রা বন্ধ হইল।

রোগের দশম দিবসে অক্ষয় ডাক্তারের পরামর্শে মধুপুর হইতে এক জন অবসরপ্রাপ্ত সিভিল সার্জ্জনকে আনা হইল। তিনি দেখিয়া শুনিয়া কহিলেন যে, চিকিৎসা ঠিকই হইতেছে, তবুও নূতন করিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। নেপাল তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"এ অবস্থায় রোগীকে আমরা কলকাতায় নিয়ে যেতে পারি কি না?" ইহার উত্তরে তিন জনেই একমত হইয়া কহিলেন,—"কিছুতেই না। এ অবস্থায় নাড়া-নাড়ি করলে হয় ত ট্রেণের মধ্যেই কোন বিপদ ঘটতে পারে।"

ইহারই মধ্যে এক দিন ভবতোষ বাবু অর্চ্চনাকে কহিলেন,—"মা, গিরিডিতেই আমার মাটী কেনা আছে, এইখানেই আমার শেষ। তোরা এত ক'রেও আর আমায় এবার কিছুতেই ধ'রে রাখতে পারবি না, অরু।"

অর্চ্চনা নীরবে বসিয়া রহিল, নীরবে তাহার চোখ দিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। ভবতোষ বাবু কহিলেন,—"মা রে, কাঁদিস নিক। চিরকালই কি তুই তোর বাপকে ধ'রে রাখবি, পাগলী? এক কায কর, কাশীতে শান্তকে একখানা টেলিগ্রাম ক'রে দে, সে একবার এই সময় আসুক। তোর একটা ব্যবস্থা না ক'রে এ অবস্থায় একলা ফেলে রেখে

যার যেতে পারি না, এর জন্যে শান্ত ছাড়া আর দ্বিতীয় কা'কেও ত খুঁজে পাচ্ছি না, মা।"

শান্তময়ী ভবতোষ বাবুর জ্ঞাতি-ভগিনী। সে বিধবা। বয়স তাহার বছর ত্রিশ বত্রিশের বেশী হইবে না। সধবা এবং বিধবা উভয় অবস্থাতেই সে তাহার শ্বশুরবাটীর কাহারও সহিত কখনও মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে পারে নাই। ফলে, স্বামীর জীবিতকাল পর্য্যন্ত যদিও বা কোন-প্রকারে সংসারের মধ্যে তিষ্ঠিয়া ছিল, কিন্তু বৈধব্য প্রাপ্ত হইবার পর আর একটি দিনও তথায় সে তাহার অধিকার বজায় রাখিতে সমর্থ হয় নাই। পরন্তু শ্বশুরবাটীর কেহই আর তাহার বড় একটা খোঁজ-খবর রাখিত না। অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের সাহায্য হইতেও সে চিরকাল বঞ্চিত ছিল। একমাত্র ভবতোষ বাবুর সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়াই এ যাবৎ তাহার কাশীবাসের দিন কাটিয়া আসিতেছিল।

কাশীতে যাঁহার বাটীতে এবং তত্ত্বাবধানে শান্ত থাকিত, তাঁহার নাম নিমাই বাবু। নিমাই বাবু শান্তর দূরসম্পর্কীয় এক মাতুলপুত্র। শান্ত তাঁহাকে নিমাই দাদা বলিয়া ডাকিত। আত্মীয়-অনাত্মীয়, আপনার ও পর কাহারও সহিত শান্তর বনিবনা না হইলেও, নিমাই বাবুর সহিত তাহার সদ্ভাব ও সৌহৃদ্যের অভাব ছিল না। নিমাই বাবু ইদানীং কোন কাযকর্ম্মও করিতেন না এবং তাঁহার বিষয়-সম্পত্তিও কিছুই ছিল না, অথচ বেশ স্বচ্ছলেই তাঁহার সংসার চলিয়া যাইত। কাশীর প্রত্যেক লোকের নিকটেই নিমাই বাবু বিশেষরূপ পরিচিত ছিলেন এবং সকল রকম কাযের মধ্যেই তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যাইত। তিনি প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিতেন, সন্ধ্যাহ্নিক করিতেন, বিশ্বেশ্বরের মাথায় জল দিতেন, অবসর এবং পাত্র জুটিলে শাস্ত্রালাপ করিতেন এবং প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে আরও নানাবিধ কার্য্য করিতেন। এই সব কারণে কাশীতে তাঁহার প্রশংসা করিবার লোকও যেমন ছিল, গোপনে নিন্দা করিবার লোকেরও তেমনই অভাব ছিল না।

বর্ত্তমানে নিমাই বাবু কোন কাযকর্ম্ম না করিলেও, বছর আষ্টেক আগে পর্য্যন্ত তিনি যাত্রী-তোলার ব্যবসা করিতেন। সেই সময় শান্ত যখন তাহার শ্বশুরবাটীর গ্রামের কয়েক স্ত্রীলোকের সঙ্গে তীর্থ-ভ্রমণোদ্দেশে কাশী আসে, তখন সে তাহার সঙ্গিনীগণের সহিত আর দেশে ফিরিয়া না গিয়া নিমাই বাবুর আশ্রয়েই স্থায়িভাবে কাশীবাস করিতে থাকে এবং সাহায্যের জন্য জ্ঞাতি-ভ্রাতা ভবতোষ বাবুর শরণাপন্ন হইয়া পত্র দেয়। ভবতোষ বাবু তখন হইতে এই আট বৎসরকাল শান্তকে মাসে মাসে দশটি করিয়া টাকা সাহায্য করিয়া আসিতেছেন। এই কয় বৎসরের ভিতর ভবতোষ বাবু অর্চ্চনাকে লইয়া কয়েকবার কাশী গিয়াছিলেন এবং শান্তর নিকটেই উঠিয়াছিলেন। নিমাই বাবুও মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আসিলে ভবতোষ বাবুর সহিত দেখা না করিয়া যাইতেন না। নিমাই বাবুর ধর্ম্মানুরক্তি, ভদ্রতা, সদাচার প্রভৃতি দেখিয়া ভবতোষ বাবু তাঁহার প্রতি যথেষ্টই শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন।

যাহা হউক, সেই দিনই কাশীতে শান্তকে টেলিগ্রাম করা হইল এবং টেলিগ্রাম পাইয়াই নিমাই বাবুকে সঙ্গে লইয়া শান্ত কাঁদিতে কাঁদিতে গিরিডি ছুটিয়া আসিল। ভবতোষ বাবু তাহাকে কাছে বসাইয়া কহিলেন,—"দিদি, কাযের সময় কাঁদলে কোন কায হয় না। সারা জীবন ধরেই ত তুই কেঁদেই কাটাচ্ছিস্—আর কেন?"

কাঁদিতে কাঁদিতেই শান্ত কহিল,—"জীবন ভোর কাঁদতে কাঁদতে তোমার মুখের দিকে চেয়েই যে আমার কেটে যাচ্ছিল, দাদা; কিন্তু এখন চোখের জলের সঙ্গে দিনও যে আমার আর কাটবে না।"

"অধীর হোস্ নি, শান্ত। দিন যাতে তোর কাটে, তার ব্যবস্থা আমি ক'রে যাচ্ছি। এর পর হয় ত আর কথা কইবার শক্তি থাকবে না, এই বেলা তোকে একটু ব'লে রাখি। অর্চ্চনাকে একলা রেখে গেলুম, তোরই ওপর তার দেখবার শোনবার ভার রইল। ওকে একলা ফেলে রেখে তুই আর কোথাও থাকিস নি, দিদি। আর তোরও দিন কাটবার ভার অর্চ্চনার ওপর রইল।"

শান্ত কহিল,—"এ সব অলুক্ষণে কথা তুমি কেন বলছ, দাদা? এই শোনাবার জন্যেই কি তুমি আমায় টেলিগেরাম ক'রে নিয়ে এলে?"

অজস্রধারে শান্ত কাঁদিতে লাগিল।

ভবতোষ বাবু আর তাহাকে কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

সেই রাত্রিতেই ভবতোষ বাবুর যন্ত্রণা বাড়িল, শরীরের গ্লানি খুবই বৃদ্ধি পাইল, কথা কহিবার শক্তি পর্য্যন্ত আর

বড় রহিল না, সারা রাত অস্থিরতার সহিত যাপন করিলেন। পরদিন ডাক্তাররা নেপালকে অন্তরালে ডাকিয়া যাহা বলিয়া গেলেন, নেপাল বিষণ্ণ-চিত্তে তাহা নিজেই শুনিল, অর্চ্চনা বা শান্তকে সে কথা আর শুনাইতে পারিল না। সে দিন এবং সে রাত্রিও ভবতোষ বাবুর এক ভাবেই কাটিয়া গেল। সম্পূর্ণ সংজ্ঞাশূন্য অবস্থাতেই তাঁহার রাত্রি কাটিল। একটিবারের জন্য চক্ষুও চাহেন নাই, কথাও কহিতে পারেন নাই। ভোরের দিকে একটিবার চক্ষু চাহিতেই অর্চ্চনা ঝুঁকিয়া পড়িয়া ডাকিল,—"বাবা!"

অত্যন্ত দুর্ব্বল কণ্ঠে ভবতোষ বাবু কহিলেন,—"মা! শান্ত কোথায়? নেপাল, বাবা, একটু কাছে এসে বোস। তুমি কে মা?"

অর্চ্চনা তেমনই ভাবে ঝুঁকিয়া পড়িয়া, চোখ-ভরা জল লইয়া কহিল,—"বাবা, উনি কালী দিদি, তোমায় দেখতে এসেছেন।"

"দেখতে এসেছ, দেখ মা। তোমার সব কথা আমি অর্চ্চনার কাছে শুনেছি। অর্চ্চনাকে আশীর্ব্বাদ ক'রে যেও মা, ওর আমার যেন কিনারা হয়।"

তার পর তিনি ধীরে ধীরে ক্ষীণকণ্ঠে অনেকক্ষণ ধরিয়া অনেক কথা কহিলেন। নেপালকে কহিলেন যে, অর্চ্চনাকে সে যেন মনিবের মত না দেখে, সে যেন তাহাকে নিজের ছোট ভগিনীর মতই জ্ঞান করে, আর দেশ হইতে যেন সে তাহার স্ত্রীকে আনিয়া অর্চ্চনার কাছেই রাখিয়া দেয়। অর্চ্চনাকেও সেই কথা বার বার করিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন। তাহার একখানি হাত নিজের রক্তশূন্য ক্ষীণ হাতের মধ্যে লইয়া, বুকের সঙ্গে তাহা চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে নানাপ্রকার বৈষয়িক উপদেশ দিতে লাগিলেন। সমস্ত সময় অর্চ্চনা কেবলই চোখের জল মুছিতে লাগিল। কালীর দিকে চাহিয়া ভবতোষ বাবু কহিলেন,—"ছেলেকে দেখতে এসেছিস্ মা, কিন্তু যাবার বেলা যেন তোর দেখা পাই, সে সময় একটু সামনে থাকতে ভুলিস নি।"

ইহার পর হইতে ক্রমেই যত বেলা বাড়িতে লাগিল, ততই তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতে লাগিল। অক্ষয় ডাক্তার এই সময় কি একটা ঔষধ খাওয়াইতে গেলে জড়িত কণ্ঠে শুধু কহিলেন,—"আর এ সব নয়।" তাহার পর শান্তর দিকে চাহিয়া কি বলিতে গেলেন, বোধ হয়, স্বর বাহির হইল না। মিনিট কয়েক চুপ করিয়া থাকিয়া নিমাই বাবুকে ইসারা করিয়া কাছে ডাকিলেন এবং তিনি ব্যস্ত হইয়া মুখের কাছে তাঁহার কাণ লইয়া গেলে অত্যন্ত মৃত্ এবং অস্পষ্ট উচ্চারণে যাহা বলিলেন, তাহার মর্ম্ম এই যে, শান্ত যেন এখন থেকে কাশী ছেড়ে অর্চ্চনার কাছে কাছেই থাকে, কিন্তু মুমূর্ষুর এই অস্পষ্ট ও অর্দ্ধোচ্চারিত কথাগুলি আর কেহই শুনিতে বা বুঝিতে পারিল না।

বেলা বারোটা একটা পর্য্যন্ত এইভাবে সকলের সহিত কথা কহিবার পর ভবতোষ বাবু শ্রান্ত হইয়া যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন। তাঁহার শ্বাস ক্রমশঃই দীর্ঘ হইতে লাগিল।

সমস্ত মধ্যাহ্ন এমনই ভাবেই কাটিল। অপরাহ্নে একবার চক্ষু চাহিলেন এবং সম্মুখে অর্চ্চনাকে দেখিয়া অত্যন্ত সহজ ও সুস্পষ্ট কণ্ঠে কহিলেন,—"মা, দিন এখনও শেষ হয় নি ত? পশ্চিমের জানালাটা খুলে দে অর্চ্চনা, দিনের শেষ আলো শেষের দিনে সর্ব্বাঙ্গে আমার ভাল ক'রে এসে পড়ুক।"

নেপাল উঠিয়া পশ্চিমের জানালাটি খুলিয়া দিতেই নিস্তেজ রবিকর ঘরের মেঝের উপর আসিয়া পড়িল ভবতোষ বাবু নেপালের মুখের দিকে চাহিয়া অত্যন্ত অস্ফুটে কি বলিলেন, বুঝা গেল না। অর্চ্চনা তাঁহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,— "কি বলছ, বাবা?"

একবার ইতস্ততঃ চাহিয়া ভবতোষ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমার কালী মা?" কালী সরিয়া আসিয়া তাঁহার সম্মুখে বসিতেই ভবতোষ বাবু কহিলেন,—"মা গো, একটু গীতা প'ড়ে শোনাবি?—একাদশ অধ্যায়। তোর মুখে শুনবো। একটু শোনা মা—একটু শোনা।"

নেপাল একখানি গীতা আনিয়া কালীর হাতে দিল। সুশিক্ষিতা কালীর মুখ হইতে গীতার শ্লোকগুলি সুস্পষ্ট ও সুন্দরভাবে উচ্চারিত হইতে লাগিল। সকলে নীরবে বসিয়া রহিল। সেই নিরানন্দ নীরবতার মধ্যে বিষাদের বাতাসই শুধু গাঢ় হইয়া জমিয়া উঠিতে লাগিল এবং গীতার পুণ্য-শ্লোকগুলি, আর কাহারও না হউক, হয় ত মুমূর্ষু ভবতোষ বাবুর অন্তরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার মরণোন্মুখ চিত্ত স্পর্শ করিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে একটু একটু করিয়া কখন্ যে অন্তর্যামী

সূর্য্যের শেষ রশ্মিটুকু ঘরের মেঝের উপর হইতে দেওয়ালের গায় উঠিয়া পড়িয়াছিল এবং সেখান হইতে অল্পে অল্পে একবারে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল, এবং তাহারই সঙ্গে সঙ্গে ভবতোষ বাবুর জীবনগীতার শেষ অধ্যায়টিও কখন্ যে অল্পে অল্পে নিঃসাড়ে সমাপ্ত হইয়া গিয়াছিল, তাহা কাহারও জানিবার অবসর হয় নাই। অবসর যখন হইল, তখন অক্ষয় ডাক্তার চম্‌কাইয়া উঠিল, কালীর হাত হইতে গীতাখানি খসিয়া পড়িল এবং উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিয়া সেই গীতার উপরই শান্ত ও অর্চ্চনা আছাড় খাইয়া পড়িল। নোনিয়ার মা বাহিরের বারান্দা হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাহাদের দুই জনকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া বসিল।

সে রাত্রিতে কালী ও নোনিয়ার মা অর্চ্চনাকে লইয়া এ বাটীতেই কাটাইল। অক্ষয় ডাক্তারও এই বিদেশে অর্চ্চনার এই বিপদে তাহার অনেক সাহায্য করিল। দুই দিন পরে অর্চ্চনা তাহাকে কহিল,—"কাকাবাবু, এখানে আর এক তিল আমার থাক্‌তে ভাল লাগছে না, আপনি অনুমতি করুন, আমরা কলকাতায় চ'লে যাই।"

অর্চ্চনার কলিকাতা যাইবার কথা শুনিয়াই নিমাই বাবু শান্তকে বিরলে ডাকিয়া লইয়া গিয়া কি সব বলিলেন, শান্ত মনোযোগ দিয়া তাহা শুনিল এবং সে দিন মৃত্যুর পূর্ব্বে ভবতোষ বাবু তাঁহাকে চুপে চুপে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, সেই কথার উল্লেখ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এতক্ষণ ধ'রে কি বললেন? উইলের মধ্যে কি আমায় কিছু দিয়ে-টিয়ে গেছেন, তাই কি কিছু ব'লে কয়ে গেলেন?" নিমাই বাবু মুখটাকে যৎপরোনাস্তি বিকৃত করিয়া কহিলেন, "তোর সেই বরাত কি না! তবে, আমিও নিমাই দত্ত! যাক, তুই আর এ সব নিয়ে যেন কারুর কাছে কিছু বলিস নি। দেখা যাক কি করতে পারি, কিন্তু মেয়েটাও ধূর্ত্ত কম নয়।"

পরদিন সকলে কলিকাতায় চলিয়া আসিবার জন্য যখন ব্যবস্থা করিতে লাগিল, তখন শান্ত সে ব্যবস্থায় রাজী হইল না। সে অর্চ্চনার মনকে একটু সুস্থ করিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে লইয়া দিন কতক কাশী থাকিবার প্রস্তাব করিল।

শান্তর প্রস্তাবানুযায়ীই কার্য্য হইল। বামুন ঠাকুর ও গোপালকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিয়া তাহারা কেষ্টকে সঙ্গে লইয়া কিছু দিন কাশী যাইয়া থাকিবে, ইহাই স্থির হইল। কালীকে অর্চ্চনা ধরিয়া বসিল,—"দিদি, তুমি যদি আমাদের সঙ্গে কাশী যাও, তা হ'লে মন আমার কতটা যে ভাল থাকে, তা আর বলবার নয়, তোমাকে যেতেই হবে, দিদি।"

অর্চ্চনার কথায় কালী নীরবে যেন কিছু ভাবিতে লাগিল। অর্চ্চনা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল,—"যাবে না, দিদি? তোমার ওপর আমার কোনই জোর নেই, কিন্তু মনে হয়, আমার সব আবদারই তোমার ওপর খাটবে। এই দুদিনের মেলা-মেশায় তোমায় আমি এত বেশী ক'রে আঁকড়ে ধরেছি যে, আর তুমি আমায় ঝেড়ে ফেলে দিতে পারছ না। চল দিদি, তোমার পায়ে পড়ি।"

কালী কহিল,—"তোর সঙ্গে যেতে বোন্, আমার কোন আপত্তিই নেই, কিন্তু কখন আমি যে কোথাও যাই নি। ঘর ছেড়ে যে যাবার আমার যো নেই বোন্! তোর ভগ্নীপতির জন্যেই ত যত ভাবনা, কি জানি কখন্ এসে পড়ে।" বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মুখের ভাব পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। উদাস চোখের দৃষ্টি বাহিরের চারিদিকে যেন কাহার শুভাগমন খোঁজ করিতে লাগিল। যেন যুগান্তর পরে তাহার নিরুদ্দেশ হৃদয়দেবতার প্রত্যাবর্ত্তন আসন্ন হইয়া আসিতেছে, তাই আশা ও আনন্দ, উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতা, চিন্তা ও ব্যগ্রতা সঙ্গে সঙ্গেই তাহার চোখে-মুখে ফুটিয়া উঠিল। তেমনই বাহিরের দিকে একাগ্র শূন্য দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ ধরিয়া নীরবেই তাকাইয়া রহিল।

অর্চ্চনার পীড়িত বক্ষ ভেদ করিয়া মুখ হইতে বাহির হইল, "তা হ'লে যাবে না, দিদি?" পরদুঃখকাতর কালীর কোমল অন্তর অর্চ্চনার এই ব্যথার ডাকে সাড়া না দিয়া আর পারিল না, কহিল—"যাব বোন্, আমি গেলে যদি তোর মন ভাল থাকে, তাই যাবো। কিন্তু টপ ক'রে যদি এসে পড়েন, তা হলেই—নোনিয়ার মা'র কাছে ঘরের চাবি রেখে, ভাল ক'রে ব'লে কয়ে যেতে হবে, এলেই যেন আমায় একখানা চিঠি লিখে দেয়। তা হ'লে কবে যাবি ভাই, বল্?"

যাইতে বেশী দিন আর দেরী করা হইল না। দিন তিন চারেকের মধ্যেই নেপাল বামুন ঠাকুরকে লইয়া

কলিকাতায় চলিয়া গেল এবং নিমাই বাবু শান্ত, অর্চ্চনা, কালী ও কেষ্টকে লইয়া কাশীযাত্রা করিলেন।

যাইবার পূর্ব্বক্ষণে সকলের সম্মুখে নিমাই বাবু কহিলেন,—"চলুক দিন কতক মেয়েটা, পাঁচটা ঠাকুর-দেবতা দেখে, হেথা-সেথা বেড়িয়ে, মনটা যদি ওর একটু ভাল হয়। আহা! কি বস্তুই যে হারিয়ে ফেললুম, তা আর বলবার নয়। কি মন, কি মেজাজ! আত্মীয়-বান্ধব সকলের জন্য কি দরদ! অরুকে আর শান্তকে যে কি ভালই বাসতেন দাদা আমার!"

হঠাৎ তাঁহার গলার স্বর ভারি হইয়া পড়িল—"মরবার আগে পর্য্যন্ত ডেকে আমায় চুপি চুপি শান্তর জন্যে কত কথাই ব'লে গেলেন—'উইল কিছু ক'রে যেতে পারি নি, সময় আর পেলুম না, শান্তকে যেন ৫ হাজার টাকা অরু দেয়। আর কথা কইতে পাচ্ছি না, অরুকে ব'লে আপনি এটা দিয়ে দেওয়াবেন।'—কথা কইবার শক্তি নেই, তবু শান্তকে ৫ হাজার টাকা দেবার কথাটুকু আমায় না ব'লে যেন দাদা আমার মরতেও পারছিলেন না! এইটুকু ব'লে যাবার জন্য কি আকুলি-বিকুলি!" বলিয়া নিমাই বাবু কোঁচার খুঁটে ঘন ঘন চক্ষু মার্জ্জনা করিতে লাগিলেন।

অতঃপর বহুক্ষণ ধরিয়া রাস্তার উপর দণ্ডায়মান গাড়ীর চালকের বার বার আহ্বানে সকলে বাটী হইতে বহির্গত হইয়া গাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়।

ঝরার কাহিনী

খেয়ালী সে অন্ধ দেবতার—
নিষ্ঠুর খেয়াল যবে প্রিয় হৃদে তুলি হাহাকার
সে দিন ছিনায়ে নিল প্রিয়-বক্ষ হইতে প্রিয়ারে,
বেদনার ভারে
ভগ্ন বুক প্রিয় তার মরিল সে বিয়োগ-ব্যথায়—
শোক-দীর্ণ ক্ষীণ তনু মাটী হয়ে মিশিল ধূলায়!

জানি না সে নিঠুর দেবতা
সে দিনের কোন্ স্বর্গে চেয়েছিল দিতে সবে স্থান,
নিয়ে কোন্ ভুলাবার মোহিনী বারতা—
ভুলাতে চাহিয়াছিল প্রিয়হারা বিরহিণী-প্রাণ!

দেখিলাম চেয়ে—
অভিশপ্তা ধরণীর মেয়ে
চেয়ে আছে ধরা পানে,—চেয়ে আছে স্পন্দহীন আঁখি—
মাটীর মায়া যে তারে পরায়েছে সোহাগের রাখী।
কোনো স্বর্গ—কোনো দেব পারিল না রাখিতে তাহায়,
আবার এ মাটীর মায়ায়
ফিরিয়া সে জন্ম নিল, ফুল হয়ে উঠিল ফুটিয়া—
শত বাধা, শত বিঘ্ন ছিঁড়িয়া টুটিয়া!

ধূলি বুকে প্রিয় তার চেয়ে থাকে মিলন-আকুল—
বেদনায় শাখে কাঁদে ফুল!
নিশীথের বিজন বাসরে—
অশ্রুর শিশির সে যে ঢালে তাই প্রিয়-বক্ষপরে!
অতীত স্বপন জাগে, জাগে কত তৃপ্তিহীন আশা
জাগে প্রাণে দুর্নিবার মিলন-পিপাসা!
দেশ কাল ভুলে যায় বিরহিণী বিরহ-ব্যাকুল—
মোরা কহি—ধূলিপরে ঝ'রে প'ল ফুল!

বিজয়মাধব মণ্ডল

মণিপুর ভ্রমণ

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

নাগা জাতি নানাভাগে বিভক্ত ;—(১) কুকি (খোংজাই), ইহারা পূর্ব্বে নরভুক্ ছিল, এখন ইংরাজের সংস্পর্শে ইহারা ক্রমশঃ সভ্যতা প্রাপ্ত হইতেছে। ইহারা মণিপুরের দুর্লঙ্ঘ্য গিরিমালার মধ্যেই অবস্থান করে ; সমতল ভূমিতে গৃহ রচনা করে না। ইহাদের পুরুষরাও মেয়েদের মত দীর্ঘ কেশ রাখে। গলায় একটি মোটা দড়ি পাকাইয়া পরে এবং উক্ত দড়িতে মুর্গীর পালক, বাঘের দাঁত প্রভৃতি ঝুলাইয়া রাখে। আমার কোন এক বন্ধু কোন কুকি-নাগাকে তাহাদের এই দড়ি বাঁধার উদ্দেশ্য এবং বাঘের দাঁত ঝুলাইবার কারণ কি জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে ঐ কুকি-নাগা বলে যে, যখন কোন অসুখ হয়, তখন ভূত-প্রেতের উদ্দেশে তাহাদের প্রীত্যর্থে মুর্গী বলি দেওয়া হয় এবং ঐ রোগের প্রতীকারের জন্য যে অপযোনির তুষ্ট্যর্থে একবার করিয়া বলি দেওয়া হইয়াছে, তাহার সাক্ষিস্বরূপ মুর্গীর পালক দড়িতে বাঁধিয়া গলায় ঝুলাইয়া রাখা হয়। ইহাতে আর সেই অপদেবতারা পুনরায় ঐ রোগের দ্বারা আক্রমণ করে না। কুকিদের বিশ্বাস, সব রোগই অপদেবতার সৃষ্টি।

ব্যাঘ্রদন্ত ঝুলাইবার কারণ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। যদি কোনও কারণে কোন লোকের সহিত শপথ করিতে হয়, তাহা হইলে বিবাদকালে উভয় ব্যক্তিই নিজ নিজ অঙ্গস্থিত ব্যাঘ্র-দন্ত কামড়াইয়া সাক্ষ্য দিবে যে, যদি উহাদের মধ্যে কেহ মিথ্যা কথা বলে, তবে যেন বাঘের কামড়ে তাহার মৃত্যু হয়। গলায় যতগুলি দড়ি আছে, উহা গণনা করিলে বুঝা যায়, ঐ নাগার কতবার বড় অসুখ করিয়াছে।

(২) কবুই নাগা—ইহারা সাধারণতঃ সমতল ভূমিতে বাস করে এবং প্রায় সকল রকমেই মণিপুরীদের অনুকরণ করিতে চেষ্টা করে। তবে তিলক-চন্দন ধারণ করে না। ইহারা অপরাপর নাগাদের মত মদ, মাংস, মুর্গী ও শুষ্ক মৎস্য খায়। ইহারা বড়ই অনুকরণপ্রিয়, অনেকে অধুনা কলিকাতার বাবুদের ফ্যাশানে চুলও ছাঁটিতেছে। ইহারা সাধারণতই অশিক্ষিত। কবুই নাগাদের মেয়েরা উপর হাতে পাকান পিত্তলের অনন্ত পরে।

(৩) চিরু—ইহারা সাধারণ নাগাদের মত গিরিগাত্রে পর্ণকুটীর রচনা করিয়া স্ত্রী, পুত্র, কন্যা লইয়া বসবাস করে। ইহারা অনেকটা উৎকলবাসীদের মত কেশবিন্যাস করে এবং মাথার মধ্যস্থলে বাঁশের একটি বেত বাঁধে। পরিধানে একখানি ধনীই সম্বল।

(৪) কোম্—ইহারাও চিরুদের মত, তবে মাথার চুল উহাদের অপেক্ষা কিছু দীর্ঘ রাখে।

(৫) খোয়রাও—ইহারাও চিরুদের মত। চিরু, কোম ও খোয়রাও জাতীয় নাগারা ভীরু ও মিথ্যা কথা বেশ বলে।

(৬) আঙ্গামি বা আঙ্গামি নাগা—ইহারাই নাগা জাতির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সভ্য। মাথার চুল ইহারা গোল করিয়া ছাঁটে ও ঘাড় কামায়। ইহাদের মধ্যে যাহারা অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন, তাহারা হাতীর দাঁতের খুব মোটা অনন্ত পরে। গলার পিছনে ঠিক চুলের নীচে একটি বড় ধপধপে শাঁখ ঝুলাইয়া রাখে। সম্মুখে গলায় ও বুকে তারে গাঁথা রঙ-বেরঙের কাচ, পুঁথি, হাড় ও বাঘের দাঁতের গহনা পরে। ইহারা যে পুরাকালের শঙ্খচূড় অসুরের বংশধর নহে, তাহা কে বলিতে পারে? কুকি ও আঙ্গামি নাগাদের প্রকৃতি অত্যন্ত ভীষণ, কিন্তু উহারা সাহসী, বীর ও সত্যবাদী।

(৭) তাংখুল—ইহারা একটি অদ্ভুত জাতীয় নাগা। ইহারা সম্পূর্ণরূপে উলঙ্গ। ইহাদের মাথার চুল স্কচদেশীয় হাইল্যাণ্ডারগণের টুপীর আকারে ছাঁটা, এবং মাথার মধ্যস্থলে একটি খুব মোটা টিকি রাখে। হাতে খুব মোটা একগাছা চ্যাপটা বালা পরে। কোথাও যাইতে হইলে সামান্য একটি নেংটী সম্মুখে ঝোলায়। ইহারা যখন ঘরে থাকে, তখন উক্ত কৌপীন উহাদের পরিবার প্রয়োজন হয় না। স্ত্রীলোকরাও সম্পূর্ণ উলঙ্গ বলিলেই চলে ; মাত্র সামান্য এক টুকরা কাপড় কটিতটে ঘুরাইয়া ঝুলাইয়া দেয়, উহাতে লজ্জা-নিবারণ হওয়া অসম্ভব। স্ত্রীলোকরা বসিবার কালে পা মুড়িয়া পিছনদিকে ছড়ায় এবং এক পায়ের উপর অপর পা দিয়া চাপিয়া একপাশে বসে। বুকে কোন বস্ত্র থাকে না। ঘর ছাড়িয়া সহরে বা কোথাও যাইতে হইলে একখণ্ড পৃথক্ বস্ত্র ঘুরাইয়া বুকে বাঁধে। তাংখুল নাগারা শ্মশ্রু-গুম্ফাদির লোম ছিঁড়িয়া পরিষ্কার করিয়া রাখে। উহারা একটি করিয়া লোহার বল্লম সদাসর্ব্বদা হাতে করিয়া বেড়ায়। ইহারা অত্যন্ত মিথ্যাবাদী, ভীরু, নিষ্ঠুর ও চোর। ইহাদের আচার-ব্যবহার দেখিয়া পুরাকালের নন্দীভৃঙ্গীদের কথা মনে পড়ে। ইহারা পূর্ণমাত্রায় অসভ্য, অধুনা ইংরাজগণের সংস্পর্শে এবং মিশনারীদের কল্যাণে ইহারা ক্রমশঃ সভ্যতার আলোক প্রাপ্ত হইতেছে, এবং বর্ত্তমানে ইহাদের মধ্যে ২ জন ম্যাট্রিকুলেট ও এক জন সাব এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন হইয়াছেন।

(৮) মরিং—ইহারা খুব লম্বা লম্বা চুল রাখে, এবং সম্মুখদিকে সীঁথি না কাটিয়া পিছনে সীঁথি কাটিয়া চুলগুলি সামনে আনিয়া কপালের উপর ঝুঁটী বাঁধে ও উহাতে একটি লম্বা লোহার শিক এড়োভাবে বাঁধিয়া রাখে। আহারাদি মদ, মাংস, শুষ্ক মৎস্য, মুর্গী, ভাত। তংখুল নাগাদের মত ইহারা উলঙ্গ থাকে না। একখানি করিয়া গামছা পরিধান করে। কপালের উপর চুলের ঝুঁটীতে ঐরূপ এড়োভাবে লোহার শিক রাখার উদ্দেশ্য কি—এক মরিং নাগাকে জিজ্ঞাসা করা হয়। উত্তরে সে বলে যে, আমরা পাহাড়ী জাতি, পর্ব্বতে জঙ্গলে যাইতে হইলে, পায়ে কাঁটা বিঁধিতে পারে, তখন অন্য অস্ত্র খুঁজিয়া পাওয়া মুস্কিল, সেই জন্য ঐ লোহার শিকটিকে গহনার সামিল করিয়া রাখা হইয়াছে। ঐ শিকটি প্রায় ৮ ইঞ্চি লম্বা। মরিং'রা মাথায় কোন গুরুভার বহন করিতে পারে না, উহারা বাঁক বহিতে অভ্যস্ত।

(৯) আনাল—ইহারা মণিপুর রাজ্যের দক্ষিণ ও বর্ম্মার উত্তরপ্রান্তস্থিত পার্ব্বত্য অঞ্চলে পুত্রকলত্রাদি সহ বসবাস করে। মদ, মাংস প্রভৃতি অন্যান্য নাগাদের মত সমস্ত দ্রব্যই আহার করে। ইহারা অপেক্ষাকৃত সভ্য এবং অনেকে বর্ম্মাদের অনুকরণে লুঙ্গী পরে। শিক্ষার আলোক এখনও এই স্থানে পৌঁছায় নাই। তবে ইহাদের গৃহস্থালী অন্যান্য নাগাদের অপেক্ষা উন্নত ধরণের। ইহারা নিজেরা সূতা কাটে ও তাঁত বুনিয়া থাকে। নিজেদের ব্যবহার্য্য মদও নিজেরা প্রস্তুত করে। কোন নাগা বিবাহ করিতে যাইলে, কন্যার পিতাকে মহিষ, মিথুন, গরু, গঙ (বাজনা-বিশেষ) প্রভৃতি কিছু পণস্বরূপ দিতে হয়। বিবাহের প্রধান অঙ্গ মদ্যপান, উহা সমাপ্ত হইলেই বর বধূ লইয়া নিজগৃহে যায়। বিবাহকালে নাগাপল্লীর সমস্ত মণ্ডল উপস্থিত থাকে, এবং যুবকদল নানা কাযকর্ম্মে ও মদ্যপরিবেষণে ব্যস্ত থাকে। সাধারণতঃ 'পাগাংফাল' নামক গৃহে বিবাহসভা হয়; উহা গ্রাম্য সাধারণ সভা-গৃহের মত একটি আড্ডা-ঘর। নাগা মেয়েরা কপালে জরির বা বেতের চওড়া বুনানি করা একটি লম্বা 'সামলি' অর্থাৎ রশি পিছনে ঝুলাইয়া দেয়, এবং ঐ 'সামলিতে' একটি চৌকা ও লম্বা আকারের ঝুড়ি বাঁধিয়া পিঠের উপর স্থাপন করে। ঐ ঝুড়ি করিয়া চাউল, কাষ্ঠ প্রভৃতি দ্রব্যাদি বহন করে। আনাল ও মরিংদের স্বভাবও অনেকটা চিরুদের মত। সব নাগাই তাহাদের মৃতদেহ কবর দেয়, এবং স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ কবরের উপর প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড স্থাপন করে। মণিপুর যাইবার পথে পাহাড়ের উপর এইরূপ স্মৃতিচিহ্ন বহু দেখা যায়। আমরা সংক্ষেপে পার্ব্বত্য বিভিন্ন নাগা জাতির বিষয়ে কিছু বলিলাম, এক্ষণে মণিপুরী জাতিরা কিরূপে অবস্থান করে, তাহা আলোচনা করা যাউক।

এই দুর্গম গিরিমালা-পরিবেষ্টিত প্রদেশের মধ্যস্থলে ৭ শত বর্গমাইল উপত্যকা প্রদেশে মণিপুরী বা মৈতৈরা বাস করেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারীতে দেখা যায় যে, এই রাজ্যের মোট লোকসংখ্যা, ৩,৮৪,০১৬। ইহার মধ্যে মণিপুর উপত্যকায় ২,৫৯,৬১৪ লোক বাস করে এবং বাকি ১,২৪,৪০২ লোক পার্ব্বত্য-প্রদেশে অবস্থান করে।

এই রাজ্যের বর্ত্তমান বাৎসরিক রাজস্ব গড়ে ৭ লক্ষ ৭৫ হাজার ৩ শত ৫৫ টাকা। ইহা হইতে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টকে বাৎসরিক

মণিপুরের মহারাজ চূড়াচাঁদ সিংহ, সি, বি, ই

৫ হাজার টাকা চুক্তি অনুযায়ী কর দিতে হয়। মণিপুরের বর্ত্তমান অধীশ্বর হিজ হাইনেস্ মহারাজ চূড়াচাঁদ সিংহ সি, বি, ই। ইঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ৪৬ বৎসর। মহারাজ মণিপুরী ক্ষত্রিয়-বংশোদ্ভব। ইঁহার ছয়টি মহিষী যথা—(১) নাঙ্গমবম ধনমঞ্জরী আইবেমাচা, (২) চিংগাখম্ সেইরামাসখি, (৩) ছোং তাম চেতনা মঞ্জরী, (৪) নাঙ্গমবম প্রিয়সখী, (৫) হাওবম লীলাবতী এবং (৬) মাইসনাম সুবদনী। মহারাজার দ্বিতীয়া মহিষীর গর্ভে তিন পুত্র, প্রথমা মহিষীর

পক্ষে চারিটি কন্যা, (ইহার একটি দত্তক পুত্র আছে), চতুর্থ মহিষীর দ্বারা ২ কন্যা এবং পঞ্চম ও ষষ্ঠ মহিষীর দ্বারা প্রত্যেকের ১টি করিয়া কন্যা সন্তান হইয়াছে। মহারাজের জ্যেষ্ঠ পুত্রের বয়ঃক্রম ২৩।২৪ বৎসর। ইনি এখন রাজ্যের শিক্ষা-বিভাগের Standing Committeeর এক জন সভ্য। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে মহা ধূমধামের সহিত ইহার শুভ পরিণয়-কার্য্য সমাধা হইয়াছে।

মহারাজকুমার প্রিয়ব্রত সিং এলাহাবাদ ইউইং ক্রিশ্চিয়ান কলেজে আই, এ পড়িতেছেন এবং মহারাজকুমার লোকেন্দ্র সিংহ এক্ষণে রায়পুর রাজকুমার কলেজে বিদ্যাশিক্ষা করিতেছেন।

বর্ত্তমানে মণিপুর দরবার দ্বারাই শাসিত হয়। আইন-কানুনও এই দরবারেই বিধিবদ্ধ হয়। এই দরবারের সভ্যসংখ্যা ৬ জন, ইহার মধ্যে এক জন য়ুরোপীয় আই, সি, এস স্থায়িরূপে বিরাজ করেন। মহারাজ দরবারে বসেন না। দরবারের প্রস্তাবগুলি মঞ্জুর ও সহি করার জন্য মহারাজের নিকট প্রেরণ করা হয়। তিনি উহা তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী অনুমোদন বা নামঞ্জুর করিতে পারেন এবং সেই মর্ম্মে পুনরায় দরবারের কার্য্য হয়। এই দরবারই মণিপুররাজ্যের সর্ব্বোচ্চ বিচারালয়, ইহার নিম্নে চিরাব কোর্ট। ইহাতে ৬ জন সভ্য এবং সকলেই মণিপুরী। ইহাতে নিম্ন-পঞ্চায়েৎ কোর্টের আপীল শুনানী হয়। ফৌজদারী মামলার এবং ২ শত টাকার উর্দ্ধের দাবী দেওয়ানী মামলার বিচার হয়। এই সব মামলার সময় পক্ষরা কোন উকীল বা আইনজ্ঞ ব্যক্তিকে নিয়োগ করিতে পারেন। বিচার জুরীর মত হয় এবং অধিকাংশের মতই সাব্যস্ত হয়।

ইহারই পরে সদর পঞ্চায়েৎ কোর্ট। ইহাতে ১ শত টাকা পর্য্যন্ত দাবীর দেওয়ানী মামলার বিচার হয় এবং ফৌজদারীতে ২ মাস জেল ও ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা করিবার ক্ষমতা প্রদত্ত আছে। ইহাতেও ৬ জন সভ্য আছেন, আর সবাই মণিপুরী।

ইহারই নীচে গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ আছে। তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র [illegible] বিবাদের মীমাংসা হয়। উল্লিখিত সকল বিচারালয়েই [illegible] মণিপুরীর সহিত মণিপুরীর যে বিবাদ, তাহারই মীমাংসা [illegible]। কিন্তু হত্যাপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তির ফাঁসি দিতে [illegible] আসাম গভর্ণমেণ্টের অনুমতি-সাপেক্ষ। ইংরাজের প্রজার [illegible] মণিপুরী প্রজার কোন বিবাদ বা মামলা উপস্থিত হইলে [illegible] পলিটিকেল এজেণ্ট বিচার করেন। পলিটিকেল এজেণ্টের [illegible] এক জন রেজিষ্ট্রার থাকেন। তিনি ৫ শত টাকার দাবী [illegible] দেওয়ানী মোকর্দ্দমার বিচার করেন। অধুনা শ্রীযুক্ত মনোমোহন কুণ্ডু মহাশয় এই পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। মণিপুরীরা হিন্দু আইন অনুসরণ করেন না। তাঁহাদের নিজেদের পৃথক্ আইন আছে। কেবল ফৌজদারী মামলায় ভারতীয় দণ্ডবিধি ও ফৌজদারী কার্য্যবিধি অনুসরণ করা হয়।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিচার করিতে হইলে 'নবরত্ন সভা' বলিয়া ব্রাহ্মণদের একটি সভা আছে। তাহাতে ৯ জন পণ্ডিত সভ্যপদ অলঙ্কৃত করেন। ইহাতে ধর্ম্ম, জাতি ও সমাজের বিচার হয়। এই সভার বিচারের উপর আর আপীল নাই। এই নবরত্ন সভা বোধ হয়, উজ্জয়িনীশ্বর মহারাজ বিক্রমাদিত্যের 'নবরত্ন' সভার অনুকরণে গঠিত হইয়া থাকিবে, কিন্তু আসলে সভায় রত্নের বড়ই অভাব। মেকির বেগই প্রবল বলিয়া শুনা যায়। ব্রাহ্মণ-সভায় পণ্ডিত থাকিবেন, ইহাই সাধারণতঃ আশা করা যায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 'বামনাই' বা 'বামুন পণ্ডিতের' আধিক্য, 'ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত' নাকি দুর্ল্লভ। উপযুক্ত কাঞ্চনমূল্যে নাকি সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম, জাতি বা সামাজিক জটিল সমস্যার প্রকৃষ্ট সমাধান হইয়া যায় এবং কাঞ্চনবিতরণকারীর জয় ঘোষিত হয়। মণিপুরী ব্রাহ্মণরা বলেন যে, তাঁহারা পুরাকালে বঙ্গদেশ ও কনোজ হইতে আসিয়াছিলেন এবং এক্ষণে মণিপুরী হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইহার কোন প্রকৃত বিবরণ বা ইতিহাস নাই। খুব সম্ভব, পুরাকালে হয় ত বঙ্গদেশ বা কনোজ হইতে কতিপয় ব্রাহ্মণ মণিপুরে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের বংশধররা মণিপুরী স্ত্রী গ্রহণ করিয়াছিলেন। শাস্ত্রোক্ত বিবাহাদিরও কোন প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। এইরূপে ক্রমে একটি সম্প্রদায় গড়িয়া উঠে এবং পরে উহাদের মধ্যে যে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেয়, সেই ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হয়। বর্ত্তমান মণিপুরী ব্রাহ্মণরা তাঁহাদেরই বংশধর। এক্ষণে তাঁহাদের সমাজ প্রসার পাওয়ায় নিজেদের মধ্যেই বিবাহাদি হইতেছে। মণিপুরীদের তিলক, চন্দন, ফোঁটাদি ধর্ম্মের আড়ম্বরের অভাব নাই, আবার রাস্তাঘাটে ব্রাহ্মণ দেখিলেই অব্রাহ্মণ মণিপুরীরা একবারে ভূমিষ্ঠ হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করেন।

মণিপুরীদের মধ্যে দুইটি বড় বিভাগ আছে;—মৈতৈ ও ময়রাণ। ইহারা সকলেই নিজেকে মণিপুরী বলিয়া পরিচয় দেয়। মৈতৈ ও ময়রাণ উভয়েরই কিন্তু মূল হইতেছে নাগা। বর্ত্তমান মণিপুরীরা বহুজাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাতে আসামী, বর্ম্মা, বাঙ্গালী, টিপারী ও নাগা প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়েরই কিছু না কিছু অংশ আছে। মণিপুরীর মধ্যে আবার 'চক্পাকাইয়েং', 'সেকুমাই' ও 'অন্দ্রেয়া' নিবাসী জাতিগণকে 'লোয়' অর্থাৎ নিম্নশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করা হয়।

ইহারা নাগাদের মত এখনও মুর্গী-শূকর পালন করে, মদ খায়, আবার বাহিরে যাইবার সময় মণিপুরী বৈষ্ণবদিগের মত তিলক ধারণ করিয়া, পৈতা পরিয়া, নিজেদের মণিপুরী বলিয়া পরিচয় দেয়। আরও দেখা যায় যে, ইহাতে মণিপুরীরা কোন আপত্তি প্রকাশ করে না, তবে আহারাদি অচল, এই যা। মণিপুরীরা প্রথমে রামানন্দী তিলক (দীপশিখার আকারে) ধারণ করিত, পরে চৈতন্যদেবের মতানুলম্বী হওয়ায় ত্রিশূল-শিখায় অভ্যস্ত হইয়াছে।

মণিপুরীদের মধ্যে দশকর্ম্মের প্রচলন আছে, কিন্তু বৈদিক মতে কোন ক্রিয়াই হয় না। ইহাদের আদি ও অন্তকর্ম্ম হরি-সংকীর্ত্তন, এবং উহা সকল সংস্কারেই বর্ত্তমান, অথবা মাত্র

মণিপুরী কীর্ত্তন

হরিসংকীর্ত্তনই প্রধান। কোন মণিপুরীর জন্ম হইলে ১২ দিন পরে প্রথম সংস্কার ষষ্ঠীপূজা হয়। তার পর ৬ মাসে অন্নপ্রাশন, দেড় বৎসরে চূড়াকরণ, ৭ হইতে ৯ বৎসরে উপনয়ন এবং ১৬ বৎসরের পর বিবাহ হয়। মৃত্যু হইলে ব্রাহ্মণের ১০ দিন ও ক্ষত্রিয়ের ১২ দিন অশৌচ। শ্রাদ্ধাদিতে পিণ্ডদান হয় এবং এই সকল কর্ম্মেই হরিসংকীর্ত্তনই প্রধান উপকরণ। হরি-সংকীর্ত্তনে নবদ্বীপ ও মুরশিদাবাদের গোস্বামীদের অনুকরণে বাঙ্গালা ভাষায় গান হয়, কিন্তু তাহা মণিপুরী জাতীয় সুরে গাওয়া হয়। ঐ কীর্ত্তনে বাঙ্গালা সুরের কোন মাধুর্য্যই প্রকাশ পায় না। সুরের ভিতর সানুনাসিক স্বরের প্রাধান্যই প্রবল। উহা এমনই বিচিত্র ও শ্রুতিকটু যে, ধৈর্য্য ধারণ করাই অসম্ভব হইয়া পড়ে। মধুর হরিনাম যে এমন কঠোর হইতে পারে, তাহা মণিপুরী হরিসংকীর্ত্তন না শুনিলে কেহ উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। এই হরিনাম শুনিলে শ্রোতার মনে স্বভাবতই এই দ্বিধার উদয় হয় যে, ইহাতে শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীবৃন্দাবনধাম হইতে এখানে আহ্বান করা হইতেছে বা তাঁহার লীলার মহিমা কীর্ত্তন করা হইতেছে বা তাঁহাকে শ্রীবৃন্দাবনধাম হইতে এই বীভৎস চীৎকারের দ্বারা আরও দূরতর প্রদেশে তাড়াইবার আয়োজন হইতেছে!

এই হরিসংকীর্ত্তনের প্রধান অঙ্গ হইতেছে পুরুষদের মস্তকে একটি প্রকাণ্ড সাদা কাপড়ের পাগড়ী, ইহাতে অনায়াসে ৩।৪টি মস্তকের স্থান সঙ্কুলান হয়। একটি পাঁকাটীর মাথায় একটি প্রকাণ্ড সাদা ওলকপি বিঁধিলে তাহা যেরূপ দেখিতে হয়, এই সুবৃহৎ শ্বেত পাগড়ীযুক্ত হরিসংকীর্ত্তনওয়ালাদিগকেও অনেকটা সেইরূপ দেখায়। প্রতিদলে ৩০ হইতে ৪৫ জন কীর্ত্তনীয়া থাকেন। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে মৃদঙ্গ ও করতাল থাকে। সংকীর্ত্তনে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমের অভিব্যক্তি থাকুক আর নাই থাকুক, কর্ণপীড়া যে প্রবলতর হইয়া উঠে, তাহা বেশ অনুভব করা যায়। গায়কদল কীর্ত্তনের সময় কতকগুলি পেশাদার শ্রোতা সংগ্রহ করেন। উহার মধ্যে কপট ভক্তের আধিক্যই দেখিতে পাওয়া যায়; এবং শ্রোতার দল শ্রীহরির মহিমা যত বুঝুক না বুঝুক, তাহারা যে হরিপ্রেমে একবারে আত্মহারা হইয়া গিয়াছে, ইহা বুঝাইবার জন্য হঠাৎ কোন শ্রোতৃবর একবারে গায়কদলের মধ্যে গিয়া একটি প্রচণ্ড দণ্ডবৎ করিয়া কান্না জুড়িয়া দেন। এই কপট কান্নার স্বর তখন কীর্ত্তনীয়াদের সেই তুমুল চীৎকারকেও ছাপাইয়া উর্দ্ধে উঠে এবং বহুদূর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। তিলক-ধারণের আড়ম্বরও খুব, বস্তুতঃ উহা একটা পোষাকেরই অন্তর্গত। এখানে ধর্ম্মের বাহ্যাড়ম্বর প্রচুর আছে, কিন্তু প্রকৃত ধার্ম্মিকের দর্শন মেলা বড় দুরূহ।

মণিপুরীরা মধ্যস্থানে উঠান রাখিয়া চতুষ্পার্শ্বে বেশ উচ্চ দাওয়ার উপর 'উচাল' কাঠের মোটা ও গোল ফ্রেমের উপর খড় দিয়া ছাইয়া অতি সুন্দর গৃহ রচনা করে। গৃহের দেওয়ালগুলি ও অঙ্গনটি মাটী দিয়া লেপিয়া পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে করিয়া রাখে। অঙ্গনের মধ্যস্থলে একটি তুলসীমঞ্চ স্থাপন করে এবং তাহারই পাশে একটি যুঁইগাছও রোপিত হয়।

মণিপুরী পুরুষরা অনেকটা পশ্চিমা ধরণে কাপড় পরে, আজ কাল কিন্তু অনেকেই পুরা বাঙ্গালী সাজিতেছেন। মেয়েরা বথ

গৃহে থাকেন, তখন সাধারণতঃ এক টুকরা মধ্যে জোড় দেওয়া নিজেদেরই স্বহস্তে প্রস্তুত সাদা থান লুঙ্গীর আকারে গোল করিয়া অনেকটা বর্ম্মীদের মত, বুকের উপর দিয়া পরেন ও পিছনে বা পাশে গ্রন্থি দেন। কিন্তু বাহিরে যাইবার সময় প্রচুর তিলক-চন্দনসেবা করিয়া একখানি খুব চওড়া সূচিকার্য্যযুক্ত পাড়-সম্বলিত সাড়ী ঐ ভাবে বুকের উপর দিয়া পরিধান করেন। ঐ সাড়ী গুল্ফ পর্য্যন্ত পৌঁছায় না, জানুর ঈষৎ নিম্নে ঝুলিতে থাকে। আর উপর-অঙ্গে একখানি অত্যন্ত মিহি 'ইনিফি' (উড়ানি) উড়াইয়া মণিপুরী সুন্দরীরা ভ্রমণে বহির্গত হন। সাধারণতঃ হরিদ্রাবর্ণই মণিপুরীদের প্রিয়, এবং তাঁহারা প্রায়ই ঐ বর্ণের 'ইনিফি' পরিধান করেন।
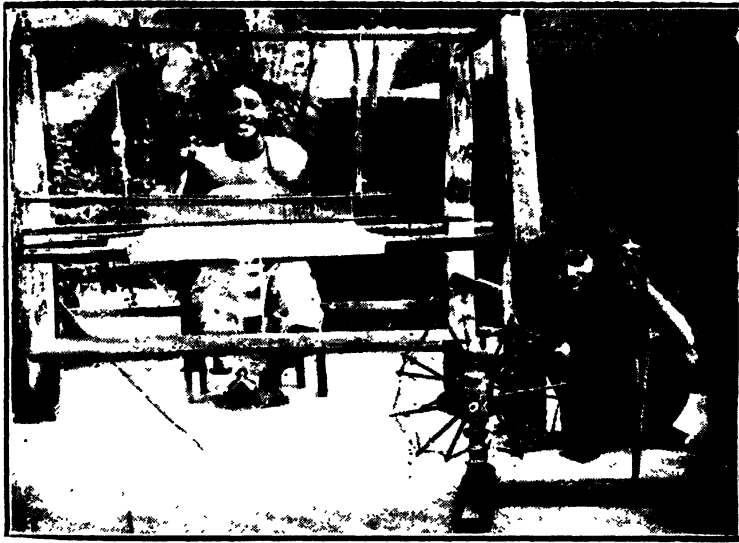
মণিপুরী বালিকারা চরকা কাটিতেছে ও তাঁত বুনিতেছে

মণিপুরী মেয়েদের মধ্যে পর্দ্দার বালাই নাই। ইঁহাদের গতি অবাধ, মুক্ত ও স্বাধীন। বাজার-হাট অধিকাংশ মেয়েরাই করেন। আবার প্রত্যেক গৃহেই মেয়েরা প্রতিদিন চরকায় সূতা কাটেন, তুলা পেঁজেন ও বস্ত্র বুনেন। ইহা মণিপুরের একটি বহু প্রাচীন শিল্প এবং এখনও বেশ জোরের সহিত চলিতেছে। কার্পাস-শিল্পের সহিত সূচির কার্য্যেরও বেশ চলন ও আদর মণিপুরে দেখিলাম। এই সব কাযই মেয়েরা করেন। মেয়েরা ঝাঁট দেওয়া, বাসন মাজা, জল তোলা, রান্না প্রভৃতি সাংসারিক সব কাযই করেন, আবার গরুর সেবা, বাগান দেখাও আটকায় না। অবসরসময়ে সূতা কাটা, তাঁত বোনা, সূচির কার্য্যও চলে। এ দেশে মেয়েরাই বেশী কর্ম্মিষ্ঠা দেখিলাম। মণিপুরীরা এই বিষয়ে আমাদের অপেক্ষা অনেক অগ্রগামী ও স্বাধীন। এই বস্ত্র-শিল্পের প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের ন্যায় উহাদের কোন আন্দোলনের আবশ্যক হয় নাই। ইহা উহাদের দৈনিক আহারাদি কার্য্যের ন্যায় একটি নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্য। বস্ত্রের জন্য মণিপুরীদের পরের মুখ চাহিয়া থাকিতে হয় না। মণিপুরীদের এই কার্পাস-শিল্পটি আমাদের বাঙ্গালা দেশের প্রতিঘরের মা-লক্ষ্মীদের দৈনন্দিন কার্য্যতালিকাভুক্ত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

মণিপুর ক্ষত্রিয়প্রধান দেশ। এই দেশে পুরাকালে বিদেশ হইতে ব্রাহ্মণের ন্যায় অনেক ক্ষত্রিয়ও আসিয়াছিল। ঐ বিদেশী ক্ষত্রিয়দের সহিত মুসলমান ও কাছাড়ের বিষ্ণুপুরিয়ারা আসে। ক্ষত্রিয়রা সাধারণতঃ লেখাপড়া ও কেরাণীর কার্য্যে নিযুক্ত হয়; এবং বিষ্ণুপুরিয়ারা রাজার হস্তী ও অশ্বশালার ভার লয়। মুসলমানরা মণিপুরে কিছু সভ্যতা আনয়ন করে, এবং দেশে চিনি, শাকসব্জী ও তামাকের প্রচলন করে। এক্ষণে মণিপুরে তামাকের প্রচলন খুব বেশী। এ দেশে মেয়ে, পুরুষ, বৃদ্ধ, যুবা, বালক সকলেই তাম্রকূটসেবী। অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরা রূপা-বাঁধান হুঁকায় রবারের নল সংযোগ করিয়া তাম্রকূটদেবীর সেবা করেন। হুঁকা বসাইবার জন্য একটি মাটীর বৈঠক থাকে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মধ্যে নিঃসঙ্কোচে এমন অবাধ তাম্রকূটের প্রচলন এক ব্রহ্মদেশ ব্যতীত আর কোথাও আছে কি না, বলিতে পারি না। মেয়েরা ঘরসংসারের কাযও দেখে, আবার ব্যবসা-বাণিজ্যও করে। পুরুষরা চাষ আবাদ ও গৃহাদি নির্ম্মাণে ব্যস্ত, আর বড় বেশী কিছু তাহাদের দ্বারা হইয়া উঠে না। মণিপুর 'হট্টমালার' দেশ কি না, জানি না, তবে ইহারা 'গাই-বলদে চষে,' যদিও 'হীরের দাঁত ঘষার' কোন পরিচয় পাই নাই। মণিপুরী চাষীরা বেশ তিলক-সেবা ও ধর্ম্মের আড়ম্বর করে, আর কীর্ত্তনে মত্ত হইয়া যায়; কিন্তু গরুচুরী বিদ্যায় ইহারা না কি অগ্রগণ্য এবং উহা ইহাদের একটা খুব বড় গুণ বলিয়া গণ্য হয়।

মণিপুরীদের বিবাহ পাত্র-পাত্রী নিজেরাই স্থির করেন, পরে উভয় পক্ষের পিতামাতা পাত্রীর গৃহে উপস্থিত হইয়া একটা

মামুলি অনুমতি দেন। বিবাহ-রাত্রিতেই বর বধূ লইয়া নিজ গৃহে চলিয়া যান।

বিবাহের পূর্ব্বেই বর ও বধূর প্রেমালাপ হইয়া যায়; আর 'চৈরাওবা'—চৈত্রসংক্রান্তি, 'ইয়াওসাং'—দোল, রাসলীলা, 'লাইহারাওবা,' কার্ত্তিকপূর্ণিমা, 'কাংসানাবা' প্রভৃতি উৎসব যুবক-যুবতীর সারা দিনরাত অবাধ মেলা-মেশার সুযোগ আনিয়া দেয়। অভিভাবকগণও যুবকযুবতীর এই উৎসাহে বাধা দেন না, বরং নির্ব্বিকারভাব প্রকাশ করেন। ইহাতে যুবক-যুবতীরা নিজ নিজ প্রেমপাত্র মনোনয়ন ও নির্ব্বাচন করিয়া ফেলেন। মেয়েরা 'লেইসাবি' অর্থাৎ কৈশোরপ্রাপ্ত হইলে তাহাদের মস্তকের কেশ ঘোড়ার ঝুঁটীর মত লম্বা করিয়া ছাঁটিয়া দেওয়া হয়, যেমন অধুনা মেম সাহেবরা "বব্‌ড্" ফ্যাসানে ছাঁটেন। পরে 'মৌ' অর্থাৎ যৌবন প্রাপ্ত হইলে তাহাদিগকে ঐ সব উৎসবে যোগদান করিতে দেওয়া হয়। ইহাতে 'নুংশিনাবাব' অর্থাৎ প্রেমিক-প্রেমিকা পরস্পরকে ভালবাসিবার যথেষ্ট সুযোগ পায়। ইহার পর এক দিন প্রেমিক প্রেমিকাকে লইয়া 'নুপিচেন্‌বা' করেন, অর্থাৎ (elopement) পলায়ন করেন। এই পলায়নে যুবক যুবতীকে নিজগৃহে লইয়া যায় এবং যুবকের অভিভাবককে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যুবতীর অভিভাবকের নিকট ঐ সংবাদ প্রেরণ করিতে হয়। ঐ নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সংবাদ না পাঠাইলে বড় নিন্দার কথা হয়, এবং অনেক স্থলে উভয় পক্ষে মারপিটও হইয়া যায়। ঐ সংবাদ পাইবার পর পাত্রীর পিতার যদি ঐ বিবাহে অমত না হয়, তাহা হইলে উহাদের বিবাহ হইয়া যায়। এই 'নুপিচেন্‌বার' পূর্ব্বে যদি অপর কোন যুবকের সহিত ঐ যুবতীর বিবাহের কথা স্থির হইয়া থাকে, তাহা হইলে কন্যার পিতা পঞ্চায়েৎ ডাকিয়া পূর্ব্ব-সম্বন্ধ নাকচ করেন, এবং নূতন বরকে এজন্য মেয়েটির পূর্ব্ব-প্রেমিককে ৫০৲ টাকা অর্থদণ্ড দিতে হয়। এ দেশে বিধবা, সধবা বলিয়া কিছু নাই, তবে এক পুরুষের সহিত অবস্থানকালে স্ত্রী পুরুষান্তর গ্রহণ করিলে তাহার নূতন প্রেমিককে ঐ স্ত্রীর পূর্ব্বস্বামীকে ৫০৲ টাকা দিলেই বিবাহ-বন্ধনচ্ছেদ সাব্যস্ত হয়। পুরুষরা কিন্তু এক স্ত্রী বর্ত্তমানে বহু স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে, এবং এই জন্য তাহাদের কোনরূপ অর্থদণ্ড দিতে হয় না।

ইহাদের বিবাহও যেমন নিজেরা স্থির করে, বিবাহবন্ধনচ্ছেদও (divorce) তেমনই নিজেরাই করে, এবং মুখের কথায়ই ইহা সাব্যস্ত হয়। স্বামী স্ত্রীকে পিত্রালয়ে পৌঁছাইয়া দিয়া বলে যে, 'আমি আর উহাকে চাই না', ইহাতেই বিবাহবন্ধনচ্ছেদ হইয়া যায়, পরে কন্যার পিতা পঞ্চায়েৎ ডাকিয়া উহা পাকা করিয়া লয়েন এবং সেই কন্যার পুনরায় বিবাহ হয়। বিবাহের পর মণিপুরী কোন স্ত্রীলোকই ললাটে সিন্দুর-বিন্দু ধারণ করেন না।

এ দেশে সধবা, বিধবা বা পতিব্রতা বলিয়া নারীর কোন বিভিন্ন সংজ্ঞা নাই। আমার এক বন্ধু পরিহাস করিয়া বলিলেন, মণিপুরীরা হিন্দু ব'লে নিজেদের পরিচয় দেয়, অথচ সধবা স্ত্রীর প্রধান চিহ্ন সিন্দুর উহাদের সীমন্তে নাই দেখিয়া বিস্মিত হইতেছেন কেন? এই দেশে——

"সধবা বিধবা নাস্তি নাস্তি নারী পতিব্রতা।"

[ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

শাশ্বতী

কালের জলধি বিদলি' বিমথি'
কাহার ও তরী চলে,—
উঠিছে পড়িছে জীবন-মরণ
আকুল লহরী-ছলে।
পছিমে কাঁদিছে কাজল-যামিনী,
পূরবে হাসিছে দিবা—
কিবা— সমুদ্ভাসিছে বিভা;
আলো ও আঁধার মিলিয়া খেলিছে
কি খেলা উহারি তলে!

বামে মেঘ-বুকে বিজলী-বহ্নি,
দক্ষিণে নব রূপ—
ইন্দ্রধনুর বর্ণ-বিভাতি
বিচিত্র অপরূপ!
পিছনে প্রবল ঝটিকা, সমুখে
শীকরসীধুনিলয়—
বয়— মধুর-মৃদু মলয়;
অসীম সরণি—কাহার তরণী
নৃত্যে শিহরি' চলে!

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী।

বর্ষা-সমাগম

একেবারে মেরু-সন্নিহিত স্থান ব্যতীত ষড় ঋতুর প্রাদুর্ভাব অল্প-বিস্তর পরিমাণে প্রায় সকল প্রদেশেই প্রত্যক্ষ হয়—যদিও বিভিন্ন ঋতু সকল স্থানে সুস্পষ্ট নহে। বর্ষাও পৃথিবীর অধিকাংশ স্থলে হইয়া থাকে, কিন্তু গ্রীষ্মমণ্ডল ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কুত্রাপি ইহার প্রভাব অধিক নহে। জল জীবনধারণের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়; শরীরের উপাদান-সমূহের মধ্যে জলের ভাগই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। প্রাণী অথবা উদ্ভিদ্‌বিশেষে অতি সামান্য-পরিমাণ সলিল হইলেই কায চলিতে পারে বটে, কিন্তু আকাশ, বাতাস ও মৃত্তিকা আর্দ্রতাশূন্য হইলে সে স্থানে কোন জীবই বাস করিতে পারে না। তাহার সাক্ষ্য মধ্য-এসিয়ার মরুভূমি। গ্রীষ্মমণ্ডলে প্রচণ্ড রৌদ্রোত্তাপে যে সময় তরুলতা অর্দ্ধশুষ্ক ও পত্র-বিহীন হইয়া পড়ে, প্রাণিসমূহ তীব্র-তাপের জ্বালায় ছায়াচ্ছন্ন ও সুশীতল স্থান অন্বেষণে ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখন দেশ রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করে। এই প্রাণান্তকর গ্রীষ্মই গ্রীষ্ম-মণ্ডলবাসীর বর্ষা-প্রীতির আকর বলিয়া বিবেচনা করিতে পারা যায়। বর্ষার প্রকৃত মহিমা বুঝিতে হইলে গ্রীষ্মের দারুণ দাহ উপলব্ধি করা আবশ্যক। হিম ও নাতি-শীতোষ্ণ মণ্ডলের অধি-বাসিগণ তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না বলিয়াই বর্ষা সমাগম তাহাদিগকে উৎফুল্ল করিয়া তুলে না; তাহাদিগের বর্ষা-সম্বর্দ্ধনার জন্য কোন উৎসব নাই এবং তাহাদিগের বালক-বালিকাগণও প্রাণের অনাবিল আনন্দে 'আয় বৃষ্টি চেপে' ইত্যাদি গান গাহি-বার কোন প্রেরণা পায় না।

ভারতের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ

গ্রীষ্মমণ্ডলবাসী ব্যক্তিবর্গকে জীবনধারণের জন্য অনেক পরিমাণে বর্ষার উপর নির্ভর করিতে হয়; কিন্তু ভারতের লোকের ভাগ্য বৎসরের পর বৎসর যেরূপ বর্ষার উপর নির্ভর করে, অন্য কোন দেশে প্রায় সেরূপ ঘটে না। মৌসুম-বায়ু-বাহিত মেঘরাশির আগমন প্রতীক্ষা করিয়া লক্ষ লক্ষ লোক প্রতি আষাঢ়ে উৎকণ্ঠার সহিত দিনযাপন করে। যখন ইহা স্মরণ করা যায় যে, এতদ্দেশের জনগণের মধ্যে শতকরা ৭৩ ভাগ কৃষিজীবী, তখন বুঝিতে আদৌ বিলম্ব হয় না যে, দুই দিক্ হইতে প্রবাহিত মৌসুম বায়ু-স্রোতই প্রকৃতপক্ষে ভারতের ভাগ্যবিধাতা। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে যে ঝড়-ঝাপটা, বজ্রাঘাত ও বারিপাত হইয়া থাকে, তাহা কাল-বৈশাখী শ্রেণীর; তাহাদের উৎপত্তি ও প্রভাব বিশেষ বিশেষ স্থানে সীমাবদ্ধ। বর্ষার অগ্রদূত হইলেও সেরূপ বারিপাত প্রকৃত বর্ষা নহে। যে বর্ষা দেশব্যাপী, যাহার অভাবে অগণিত জীবের প্রাণ সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠে, তাহা মৌসুম-বায়ুবাহিত মেঘমালা-সম্ভূত এবং সাধারণতঃ আষাঢ় মাসেই তাহার আবির্ভাব হইয়া থাকে। মৌসুম-বায়ু-স্রোতের বেগ, গতি ও পরিমাণ নানাবিধ কারণের উপর নির্ভর করে এবং উহার আগমনের সময়েরও অগ্রপশ্চাৎ হইয়া থাকে। প্রাচীন হিন্দু জ্যোতিষে মৌসুম-বায়ুর উল্লেখ অস্পষ্ট; কিন্তু বর্ষাসঞ্চার-সম্বন্ধীয় যে সকল গণনা দেখা যায় এবং তৎ-সমুদয়কে ভিত্তি করিয়া যে সমস্ত প্রবাদ ও 'বচন' প্রচলিত রহিয়াছে, সেগুলি হইতে অনুমান করিতে পারা যায় যে, মৌসুম-বায়ুর প্রভাব পূর্ব্বেও পরিলক্ষিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে মৌসুম-বায়ুর গতিবিধি, মেঘ-সঞ্চার, বারিপাত ইত্যাদি পর্য্যবেক্ষণ সরকারী আবহাওয়া বিভাগের অন্যতম কার্য্য। ঝড়-বৃষ্টির সঠিক পূর্ব্বাভাস প্রদান করিতে পারিলে কৃষি ও বাণিজ্যের বিশেষ উপকার হয়। এখন পর্য্যন্ত আবহাওয়া বিভাগ কার্য্যতঃ সাধা-রণের সেরূপ উপকার করিতে পারেন নাই; কিন্তু আশা করা যায় যে, বহু বৎসরব্যাপী পর্য্যবেক্ষণের ফলে উক্ত বিভাগ অদূর-ভবিষ্যতে কৃষি ও বাণিজ্যের ঝড়-বৃষ্টি-জনিত ক্ষতি নিবারণের সহায়তা করিতে সমর্থ হইবেন।

বর্ষায় জীবন-বিকাশ

জাতীয় জীবন প্রতিবিম্বিত করা যদি সাহিত্যের সাধারণ ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে ভারতের প্রায় সকল ভাষার সাহিত্যে বর্ষা-মহিমা-কীর্ত্তন স্বাভাবিক। ইহা প্রাণের স্ফূর্ত্তির স্বতঃ বিকাশ মাত্র। গ্রীষ্মের প্রখর উত্তাপে প্রকৃতির জীবনী শক্তির বিকাশ হয় না। মনুষ্য ও গৃহপালিত জীব-জন্তুর ত কথাই নাই, আরণ্য পশুপক্ষিগণও গ্রীষ্মের প্রভাবে মৌন ও অলসগতি হইয়া পড়ে; তাপদগ্ধ বৃক্ষলতাদির শুষ্ক পত্রপল্লবাদিও গ্রীষ্মের ঘূর্ণী ও উত্তপ্ত বায়ুপ্রবাহ উড়াইয়া লইয়া যায়। তখন সেই নীরব, নিশ্চেষ্ট ও মুমূর্ষু দেশে বর্ষা আবার নবজীবনসঞ্চার করে; সেই জন্যই তাহার এত আদর! সম্বর্দ্ধনা এরূপ মর্ম্মস্পর্শী!

জীব ও উদ্ভিদ-জগতে বর্ষা মহিমামণ্ডিত সময়। অনেক জাতীয় জীব-জন্তুর ইহাই সন্তানোৎপাদনের কাল; বহু উদ্ভিদও বর্ষাকালে পুষ্প প্রসব করিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন এতদ্দেশীয় নানা প্রকার মূল্যবান্ ফসলের বীজ-বপন অথবা চারা-রোপণ-কার্য্য বর্ষারম্ভেই সম্পাদিত হয়। যে প্রকৃতি গ্রীষ্মে অবসাদগ্রস্ত, মূক

ও মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাই বর্ষার অমৃতময় স্পর্শে আবার চঞ্চল, মুখর ও প্রাণময় হইয়া উঠে। বারিধারার সহিত গ্রীষ্মমণ্ডলে জীবনের এমনই সম্পর্ক। জীবতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ বলেন, জীবনের প্রথম বিকাশ জলেই হইয়াছিল। তৎপরে কি প্রাণী, কি উদ্ভিদ, স্থলে প্রসার লাভ করিয়াছে। মহাসমুদ্রের গভীর সলিলচারী জীব-সমূহের কথা বাদ দিলে জলচর ও স্থলচর উভয় প্রকার জীবই গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপ সমভাবে অনুভব করে এবং আত্মরক্ষার জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। বর্ষার বারিধারা সুতরাং সকলের পক্ষেই আশ্বাসবাণী আনয়ন করে।

জীব-জীবন

গ্রীষ্মমণ্ডলে অনেক জীবেরই বর্ষা বংশ-বিস্তারের মুখ্য সময়। আমরা যে সমস্ত জীব-জন্তুর সহিত বিশেষ পরিচিত, তাহাদিগের জীবন-ইতিহাসেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। নিম্নশ্রেণীর জীবের মধ্যে শামুক, কাঁকড়া, চিংড়ি ও কীট-পতঙ্গাদির বিষয় এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। প্রবল বর্ষার সময় গঙ্গার স্রোতে কাঁকড়া ও চিংড়ির ক্ষুদ্র পোনা এত অধিক পরিমাণে জন্মিয়া থাকে যে, স্নান করিয়া উঠিয়া আসিবার সময় অনেক পোনা বস্ত্র-সংলগ্ন হইয়া উঠিয়া আসে। ইহার অধিকাংশই অন্যান্য জলচর জীবের আহার্য্য হয় অথবা নষ্ট হইয়া যায়। কেবলমাত্র যেগুলি শাখা-নদী অথবা সংরক্ষিত জলে প্রবেশ করিতে পারে, সেইগুলিই সময়ে বড় হইয়া মনুষ্যের ভক্ষ্য হইয়া থাকে। বর্ষায় কীট-পতঙ্গের প্রাদুর্ভাবের আধিক্য সহরবাসীরা ততটা উপলব্ধি করিতে না পারিলেও পল্লীবাসীরা বিলক্ষণ জানেন। বস্তুতঃ এই সময়ে কীটের সংখ্যা এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় যে, তাহা দেখিলে অনেকেই চমৎকৃত হইবেন। স্থানে স্থানে সন্ধ্যার পর আলো জ্বালাইলে বিভিন্ন জাতীয় এত অধিকসংখ্যক কীট আসিতে আরম্ভ করে যে, অবশেষে দীপ-নির্ব্বাণ ব্যতীত তাহাদিগের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইবার অন্য কোন উপায় থাকে না। বর্ষাকালে কিন্তু কীট দ্বারা যে উদ্ভিদের অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতি হইয়া থাকে, তাহার প্রধান কারণ এই যে, বর্ষা অনেক কীটের যৌন-মিলনের সময়। মিলনান্তে ডিম্ব প্রসব করিয়াই ইহাদের ক্ষণিক জীবনের অবসান হয়। বর্ষাশেষে ইহাদিগের বংশধরগণই পুষ্টিলাভ করিয়া ফসলের সমূহ অনিষ্টসাধন করিয়া থাকে। বর্ষার অন্তিমভাগে উই ও পিপীলিকাশ্রেণীর কীটের পক্ষোদ্গম হয়; উহা যৌন-মিলনের সাজসজ্জা। এই সময়ে স্ত্রী-পুরুষ সম্মিলিত হওয়ার জন্য এই শ্রেণীর কীট ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িতে থাকে; মিলনের সমকালে পক্ষগুলি স্খলিত হয় এবং কীটদম্পতি মৃত্তিকাবিবরে অথবা বৃক্ষাদিতে আশ্রয় গ্রহণ করে। এবম্প্রকার পতঙ্গ-ঝাঁক বাহির হইলে অনেক পশুপক্ষীর সুখাদ্য সংগ্রহের অপূর্ব্ব সুযোগ উপস্থিত হয়।

কীটের পর জলচর ও উভচর জীব-সমূহের বর্ষায় বংশবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য। মৎস্যের কথা বলা বাহুল্য; সকলেই জানেন যে, মৎস্যের পোনা এই সময়ে অসংখ্য পরিমাণে উৎপাদিত হয়। নূতন বর্ষার জল পাইলেই মৎস্যকুল কিরূপ প্রফুল্ল হয়, তাহা বোধ হয় অনেকেই দেখিয়াছেন। গ্রীষ্মকালে অনেক মৎস্যকেই অতি কষ্টে যাপন করিতে হয়। কয়েক জাতীয় মৎস্যের গ্রীষ্ম অতিবাহন করিবার জন্য বিশেষ প্রত্যঙ্গ রহিয়াছে—যেমন মাগুর, সিঙ্গি প্রভৃতি। মাছ সাধারণতঃ কান্‌খো (Gill) দ্বারা জল হইতে বায়ু সংগ্রহ করিয়া জীবন ধারণ করে; কিন্তু এই প্রকার মাছের কান্‌খো ব্যতীত বায়ুস্থলীও আছে, যদ্দারা ইহারা মৃত্তিকায় সামান্য আর্দ্রতা থাকিলেই বাঁচিয়া থাকিতে পারে। সেই জন্য শুষ্ক পুষ্করিণীর তলভাগে মৃত্তিকাভ্যন্তরেও এই শ্রেণীর মাছ দেখিতে পাওয়া যায়। যে সমুদয় বড় বড় নদী গ্রীষ্মকালে শুষ্ক হইয়া যায়, সেরূপ নদীগর্ভেও কর্দ্দমাক্ত সুড়ঙ্গের মধ্যে বড় বড় মাছ লুকাইয়া থাকে। সামান্য বৃষ্টিপাত হইলেই উহারা বাহির হইয়া আসে। পঞ্চনদের বাথর নদী ও অন্যান্য পার্ব্বত্য নদীতে এরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায়। কোন কোন মাছ জল অন্বেষণে বহুদূর গমন করে—কই তাহার উদাহরণ।

বর্ষায় ভেকের উল্লাস সর্ব্বজনবিদিত। গ্রীষ্মকালে যে সমস্ত স্থানে একটিও ভেক দেখা যায় না, বর্ষার জল সেই স্থানে সামান্য পরিমাণে জমিলেই কোথা হইতে শত শত ভেক আসিয়া উপস্থিত হয়। ভেক দুই জাতীয়;—প্রকৃত ভেক অথবা সোনা বেঙ (Frog) এবং কুণো বেঙ (Toad); যদিও উভয়ের বেঙ্গাচিই জলে পরিপুষ্ট হয়, তথাপি পূর্ব্বোক্ত প্রকারের ভেক জলবাসী এবং শেষোক্ত প্রকার স্থলবাসী। সোনা বেঙ্গ আকারে খুব বড়, প্রায় অর্দ্ধহস্ত-পরিমিত হইতেও দেখা গিয়াছে; সোনা বেঙ মাংসাশী ও অতিশয় পেটুক; মাছের পোনা ও কুণো বেঙের ব্যাঙ্গাচি ইহারা বহু পরিমাণে ভক্ষণ করে।

পক্ষিকুলের বর্ষারম্ভে নীড় বাঁধার আগ্রহ অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। বহু জাতীয় পক্ষীর এই সময়ে শাবক হইয়া থাকে। বর্ষাকালে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, আকাশপথ আচ্ছন্ন ও মুখর করিয়া পাখীর বড় বড় ঝাঁক এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চলিয়াছে। অন্যান্য কতিপয় উচ্চ শ্রেণীর জীবেরও মিলনের সময় বর্ষাকাল। হরিণ, বাঘ, শৃগাল, নেকড়ে প্রভৃতি যে স্বরে সহচর-সহচরীগণকে আহ্বান করিয়া থাকে, তাহা তাহাদিগের সাধারণ স্বর হইতে বিভিন্ন। বর্ষার সময় অরণ্যমধ্যে প্রায়ই

এইরূপ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। বর্ষাকাল মিলনের সময় বলিয়া উক্ত সময়ে বিশেষ বিশেষ জাতীয় পশুপক্ষী-শিকার নিষিদ্ধ।

উদ্ভিদ-জীবন

গ্রীষ্ম অতিবাহন করিবার জন্য যেমন কয়েক শ্রেণীর প্রাণীর বিশেষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে, উদ্ভিদেরও তদ্রূপ রহিয়াছে। অনাবৃষ্টিসহ গাছের গঠন তাহাদিগের পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপযোগী। সাধারণ গাছের পত্র-মুকুলের বিশেষ প্রকার আবরণ এবং পত্র ও কাণ্ডত্বকের স্থূল বহিস্তর প্রচণ্ড গ্রীষ্মোত্তাপ হইতে উদ্ভিদকে অনেক পরিমাণে আত্মরক্ষা করিতে সহায়তা করে। মনসা ও অন্যান্য জাতীয় সিজ অধিক কিম্বা একবারেই পত্র প্রসব করে না; সবুজ ও বিশেষভাবে গঠিত কাণ্ড দ্বারা তাহারা একাধারে কাণ্ড ও পত্রপল্লবের কার্য্য সমাধা করিয়া লয়। তাহা কেবলমাত্র মিতব্যয়িতার পরিচায়ক নহে, প্রখর সূর্য্যোত্তাপ এবং অনাবৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষা করারও তাহা অন্যতম উপায়। ভারতের স্বল্পবারি অঞ্চলে যে সমস্ত ক্ষুদ্র উদ্ভিদ জন্মে, তাহাদিগের অনেকেরই গ্রীষ্ম ও বর্ষার পত্রপল্লবের মধ্যে প্রভেদ আছে। গ্রীষ্মে যাহাদের ক্ষীণ কাণ্ড মৃত্তিকায় শায়িত এবং পত্রপল্লব মলিন, ধূলিবর্ণ ও শুঁয়ায় আবৃত থাকে, বৃষ্টিজল পাইলে সেই সকল উদ্ভিদই আবার সরস, স্থূল ও ঋজুকাণ্ড এবং বৃহত্তর, সবুজ ও মসৃণ পত্রাদি লইয়া শূন্য মাঠ-সমূহকে শ্যামল শোভা প্রদান করে। বর্ষার জলে উদ্ভিদ দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বিলের জলবৃদ্ধির সহিত ধানগাছও যে বাড়িতে থাকে, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। সচরাচর ধানের কাণ্ড ন্যূনাধিক ৩ হাত পরিমিত হইয়া থাকে; সে স্থলে জলার ধানের কাণ্ড চতুর্গুণেরও অধিক লম্বা হয়। কোন কোন জাতীয় বাঁশের বৃদ্ধি আরও আশ্চর্য্যজনক। এক বৎসর-মধ্যেই তাহারা ১৫।২০ হাত উচ্চতা লাভ করে। যে সকল স্থলে বারিপাত অনিয়মিত, সেরূপ অঞ্চলের উদ্ভিদ-সমূহ বর্ষাকালেই এক প্রকার সমস্ত বৎসরের বৃদ্ধির কার্য্য শেষ করিয়া লয়। অন্য ঋতুতে তাহারা পরিপুষ্টি লাভ করে মাত্র।

বঙ্গদেশে জলজ উদ্ভিদের সংখ্যা সামান্য নহে। ইহাদের ফুল ও বর্ষাকালেই ফুটিয়া থাকে এবং ফল বর্ষান্তে পরিপক্ক হয়। জল-পরিপূর্ণ জলাশয়রাজিকে এই প্রকার উদ্ভিদ অপূর্ব্ব শ্রী দান করে। বস্তুতঃ জলে স্থলে সর্ব্বত্রই উদ্ভিদ-সমূহ এত দ্রুত-বংশবিস্তার করিতে থাকে যে, বর্ষার শেষভাগে বঙ্গের প্রায় কোন স্থানই উদ্ভিদশূন্য থাকে না। প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় উদ্ভিদে তায় মাঠ-ঘাট সমাকীর্ণ হইয়া উঠে। কিন্তু উদ্ভিদবংশের এই অপরিমিত বৃদ্ধি সব সময়ে মঙ্গলের কারণ হয় না। স্বতঃ-উৎপাদিত উদ্ভিদরাশি বিবর্দ্ধমান বর্ষার জলে নিমজ্জিত হইয়া পচিতে থাকে; জল-নিকাশের উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাবে সেই উদ্ভিদ-ধ্বংসাবশেষ ক্ষেত্রে বাহিত হইয়া সারের কার্য্য না করিয়া গ্রামে পানীয় জলের জলাশয়-সমূহকে দূষিত করে। বলা বাহুল্য যে, যে সমস্ত জমী ও গৃহপ্রাঙ্গণ অন্য ঋতুতে অযত্নে অনাবাদী অবস্থায় পড়িয়া থাকে, সেই সমুদয় ভূমিই বর্ষা আগমনে আগাছা-পূর্ণ হইয়া যায়। এরূপ অবাঞ্ছনীয় আগাছা পরিহার করিতে হইলে উক্তরূপ জমীতে কোন না কোন প্রকার ফসল উৎপাদন করা আবশ্যক। কিন্তু তাহা প্রায়ই হয় না এবং তাহার ফলে প্রতি বর্ষায় গলিত উদ্ভিজ্জ পদার্থ গ্রামের স্বাস্থ্যহানির একটি কারণ হইয়া দাঁড়ায়। বঙ্গদেশে বর্ষার ও অতিবৃষ্টির উপযোগী বিশেষ ফসল প্রবর্ত্তন করার এখনও যথেষ্ট অবসর রহিয়াছে। কিন্তু সে বিষয়ে সরকারী কৃষি-বিভাগ আদৌ দৃক্‌পাত করিতেছেন না।

বর্ষা-উৎসব

মানবের সমস্ত পূজা, পার্ব্বণ, উৎসব প্রভৃতি অধিকাংশ স্থলেই প্রকৃতির কোন প্রকার বৈচিত্র্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রাকৃতিক নিয়ম অমোঘ ও অনুল্লঙ্ঘ্য হইলেও মানুষ কৃতজ্ঞতাভরে আহার্য্যের জন্য প্রকৃতির উপাসনা করিয়া থাকে। বর্ষা নামিলেই ধান্য ও সমশ্রেণীর শস্য বপন করিবার সুবিধা হয়, বৃষ্টির জলেই সেই সমস্ত ফসল বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টি লাভ করে এবং উক্ত ফসল-সমূহই জীবনধারণের প্রধান উপায়, এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া গ্রীষ্মমণ্ডলের মানব বহু পুরাকাল হইতে বৎসরে বৎসরে বর্ষার সম্বর্দ্ধনা করিয়া আসিতেছে। বর্ষা ও ধানের মধ্যে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ; 'আয় বৃষ্টি চেপে, ধান দিব মেপে'—এই শিশু-গাথায় সেই সম্বন্ধের প্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। দক্ষিণ-পূর্ব্ব-এসিয়ার অধিকাংশ জাতিরই মুখ্য খাদ্য—চাউল। ধান্যের আদিম জন্মভূমিও দক্ষিণ-চীন ও উত্তরবঙ্গ এবং আসামের মধ্যবর্ত্তী আর্দ্র অঞ্চল বলিয়া উদ্ভিদ্‌বিদ্‌গণ অনুমান করেন। কিন্তু শুধু ধান্য নহে, অন্যান্য খাদ্য ফসল চাষেরও সূত্রপাত বর্ষা-কালেই হইয়া থাকে। সেই কারণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভারত, মালয়, শ্যাম, চীন ও জাপানে কোন না কোন প্রকারে নব-বর্ষার সম্বর্দ্ধনা করিবার রীতি আছে। বহু প্রাচীনকালে, প্রায় ৩ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, মহাচীনের সম্রাট বর্ষার আবির্ভাব হইলেই কয়েকটি প্রধান শস্যের বীজ নিজহস্তে বপন করিতেন। সে উৎসব এখন নাই, কিন্তু বৎসরের প্রথম শস্য-বপন চীনে অদ্যাপিও একটি পর্ব্বের মধ্যে পরিগণিত হয়।

ভারতে এক সময় সমারোহের সহিত বৎসরের প্রথম শস্য বপন করা হইত; তাহার শেষ চিহ্ন এখন পাঁজির পৃষ্ঠায় আবদ্ধ রহিয়াছে। কিন্তু বর্ষা-উৎসব এখন বঙ্গদেশে না হইলেও ভারতের অন্যত্র বিদ্যমান। বিহার, যুক্তপ্রদেশ ও পঞ্চনদে ভরা বর্ষার সময় যে 'কাজরী' উৎসব হয়, তাহা প্রকৃতপক্ষে বর্ষা-উৎসব। ভাদ্র মাসে ঝুলনের সময় এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায়। সহরে দলে দলে সুসজ্জিতা রমণীবৃন্দ পরস্পরের বাড়ীতে যাতায়াত করে, তত্ত্বতল্লাস দ্বারা আত্মীয়-স্বজনকে পরিতুষ্ট করা হয় এবং সুবিধামত উন্মুক্ত স্থান পাইলে সাধারণের জন্য নৃত্য, গীত, বাদ্যেরও আয়োজন করা হইয়া থাকে। কিন্তু পল্লীগ্রামে, বিশেষতঃ পার্ব্বত্য অঞ্চলে এই বর্ষা-উৎসবের দৃশ্য অতীব মনোরম। দূরে মেঘমণ্ডিত পর্ব্বতমালা, চতুর্দ্দিকে ঘন-শ্যাম বৃক্ষরাজি নবপল্লব-শোভায় সুশোভিত, সম্মুখে তৃণাচ্ছাদিত ও স্থানে স্থানে বিশাল পাদপযুক্ত উন্মুক্ত প্রান্তর—গ্রামের এই সমুদয় দৃশ্যের মধ্যে বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার অবকাশে যখন জনপদবধূগণ বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া বৃক্ষশাখা-বিলম্বিত দোলনায় দুলিতে থাকে এবং প্রান্তরমধ্যে তরুণীগণের নৃত্যগীত আরম্ভ হয়, তখন বাস্তবিকই মনে হয় যে, আমরা কালিদাসের যুগে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছি।

দক্ষিণ-ভারতে উত্তর-ভারতের মত ঠিক একই প্রকারের বর্ষা-উৎসব না থাকিলেও, দাক্ষিণাত্যে বর্ষার সম্বর্দ্ধনার জন্য কতিপয় স্থানীয় উৎসব রহিয়াছে। ভাদ্র মাসে সমুদ্রে নারিকেল নিক্ষেপ করিয়া বর্ষাগমের জন্য আনন্দ প্রকাশ করিবার প্রথা তন্মধ্যে অন্যতম। এক সময়ে বোম্বাইয়ের বিদেশীয় শাসনকর্ত্তা পর্য্যন্ত সমারোহের সহিত এই উৎসবে যোগদান করিতেন ও একটি সুবর্ণনির্ম্মিত নারিকেল জলধিবক্ষে প্রক্ষিপ্ত হইত। বাঙ্গালা, হিন্দী, গুরুমুখী, গুজরাটী, মারাঠী, তেলেগু প্রভৃতি সমস্ত প্রধান ভারতীয় ভাষায় এই সমুদয়ের যথেষ্ট প্রাচুর্য্য আছে এবং অনেক গানেরই প্রধান অঙ্গ মেঘের ঘনঘটা, বিদ্যুৎস্ফুরণ ও অবিরল বারিপাত-বর্ণন।

বর্ষার সহিত স্বাস্থ্যের সম্বন্ধ

আমরা বর্ষা-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বলিলাম। কিন্তু বর্ষার কল্যাণদায়ক রূপ ভিন্ন অন্য রূপও আছে—তাহা ধ্বংসকারী। যখন উচ্চ অঞ্চলের বারিধারা প্রবলবেগে নিম্নে নামিতে থাকে এবং নদীতট উল্লঙ্ঘন করিয়া, জনপদসমূহ প্লাবিত করিয়া ফেলে, তখন বর্ষার রুদ্রমূর্ত্তি স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়। যে বর্ষা জীবন দান করে, তাহাই আবার অবস্থা হিসাবে প্রাণ সংহার করিয়া থাকে। তাহার জন্য কিন্তু ঠিক প্রকৃতিকে দায়ী করা যায় না। প্রকৃতির কার্য্যে মানবের অন্যায় ও অসমীচীন হস্তক্ষেপের জন্য এইরূপ ঘটিয়া থাকে। পার্ব্বত্য অঞ্চলে বারিপাত হইলে তাহা অরণ্যাবৃত ভূমির উপর দিয়া ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইয়া নদীতে আইসে এবং বন্যার জল মন্দ-গতিতে নদীর উভয় পার্শ্বস্থ ক্ষেত্রের উপর দিয়া প্রবাহিত হইবার সময় যে পলিস্তর রাখিয়া যায়, তাহা জমীর উর্ব্বরতা-সাধন করে। মানব দ্বারা অরণ্য-ধ্বংসের ফলে কিন্তু তাহা হইতে পারে না। অরণ্য অভাবে বারিপাতের মাত্রা হ্রাস পায় এবং যে বৃষ্টিও হয়, তাহার জল উপর হইতে নীচে নামিবার পথে কোন বাধা প্রাপ্ত না হইয়া প্রচণ্ডবেগে ও একসঙ্গে অধিক পরিমাণে নদীতে আসিয়া পড়ে। নদীর খাত সেই জলরাশি ধারণ করিতে না পারায় উহা আরও বিবর্দ্ধিতবেগে জনপদে প্রবেশ করে এবং মনুষ্য, গৃহপালিত পশ্বাদি ও শস্যের সমূহ অনিষ্ট সাধিত হয়। এরূপ জলরাশি গতিবেগের আধিক্য বশতঃ পলিস্তর রাখিয়া যাওয়ার পরিবর্ত্তে ভূমির উপরিভাগের উর্ব্বরস্তর ধুইয়া লইয়া যায় এবং তাহাতে ক্ষেত্রের বরং অপকার হয়। পক্ষান্তরে, পলি নদীগর্ভে সঞ্চিত হইয়া নদীর আয়ুর্হ্রাসের সহায়ক হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ইহাও আজকাল স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে যে, রেল, খাল ও অন্যান্য উদ্দেশ্যে প্রস্তুত বাঁধসমূহ বর্ষার জলের স্বাভাবিক গতিপথ রোধ করিয়া শুধুই যে আর্থিক ক্ষতির কারণ হয়, তাহা নহে; ঐরূপ আবদ্ধ জলই ম্যালেরিয়া, আমাশয়, উদরাময় প্রভৃতি রোগের প্রকোপবৃদ্ধির অন্যতম কারণ। প্রসিদ্ধ জলসেচন-বিশেষজ্ঞ সার উইলিয়ম্ উইলকক্স ও বাঙ্গালার স্বাস্থ্য-বিভাগের ভূতপূর্ব্ব কর্ত্তা ডাক্তার বেণ্টলি স্পষ্টই দেখাইয়াছেন যে, বর্ষার জলের সদ্ব্যবহারের জন্য প্রাচীন বঙ্গে যেরূপ নদী ও খালের বন্দোবস্ত ছিল, যত্নাভাবে তৎসমুদয়ের অধোগতি হওয়ায় এক দিকে বঙ্গদেশে যেমন অর্থকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, অন্য দিকে তেমনই নিবারণ-অসাধ্য ব্যাধিসমূহের প্রাদুর্ভাব বাড়িয়া চলিয়াছে। পুরাতন জলপ্রণালী-সমূহের সংস্কার ও আবশ্যকমত নূতন জলপ্রণালী-নির্ম্মাণ দ্বারা পলিবাহী বর্ষাজলের পূর্ণ সদ্ব্যবহার ব্যতীত বাঙ্গালার আর্থিক অবনতি ও ক্রমশঃ বিবর্দ্ধমান লোকক্ষয় নিবারণের অন্য কোন সদুপায় দৃষ্ট হয় না।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

স্বামী ও স্ত্রী

১

মানুষের ভাগ্যচক্র মানুষের জীবন লইয়া কত খেলা খেলে। সে খেলা কোথাও দুঃখে করুণ, কোথাও ব্যথায় আনত, কোথাও অশ্রুসিক্ত, কোথাও বা হাস্যোজ্জ্বল হইয়া উঠে। এই ছোটখাটো ইতিহাসগুলির, এই হাসি-কান্নার হীরা-পান্নার কে বা খতিয়ান করিয়া রাখে?

এমনই ছোট একটি কাহিনী। যে মহাজন হিসাবের পাতা লিখিয়াছিল, তাহারই ছেঁড়া দুইচারিখানি পাতা জোড়া-তাড়া দেওয়া কথা।

সে দিন রাত্রিতে নীল আকাশে তারার মেলা বসিয়াছে। নীপেশ বাতায়নের পাশে আপন কক্ষে বসিয়া সেই শোভা দেখিতেছিল। কিন্তু তাহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল— গৃহকর্ম্মরতা একটি তরুণীর জন্য।

সদ্যোবিবাহিত৷ নীপেশ এক বৎসর পরে বাড়ী আসিয়াছে। পত্নী-সমাগমোৎসুক নীপেশের মনে হইতেছিল যে, ঘড়ির কাঁটা যেন চলিতেছে না।

বহুক্ষণ পরে দরজায় শব্দ হইল। রেবা ঘরে প্রবেশ করিল—ষোড়শী বধূ, যৌবন-লাবণ্য সমস্ত অঙ্গে হিরণ্য-জ্যোতি ছড়াইয়া দিতেছিল।

নীপেশ আবেগোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ডাকিল, "রেবা!"

পত্নীকে সম্বোধন করিবার জন্য সে বাছাই করা কত মধুর শব্দ-সম্ভার মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু কার্য্যকালে সকলগুলিই তাহার প্রবঞ্চক মন ভুলিয়া বসিল।

পত্নীর কাছ হইতে কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। নীপেশ রেবার হাত ধরিয়া পাশে আনিয়া বসাইল। 'বিশ্ববার্ত্তায়' তাহার "প্রিয়া" নামে একটি কবিতা ছাপা হইয়াছে, তাহার প্রাণের কূলহারা প্রেমের অজস্র স্রোতোধারা এই কবিতার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। রেবাকে কবিতা শোনাইবার জন্য তাহার বিলম্ব সহিতেছিল না।

"রেবা! রাণী আমার! আমার একটি কবিতা বেরিয়েছে।"

"কোথায়?"

"কলকাতার সেরা কাগজ বিশ্ববার্ত্তায়; লোকে প'ড়ে খুব প্রশংসা করেছে। শুনবে?"

"আচ্ছা, আর এক সময় প'ড়ে দেখব'খন। তা তোমার পরীক্ষা কেমন হয়েছে?"

বাস্তব আর স্বপ্ন!—আকাশ আর পাতাল! প্রেমের যে মায়াপুরী রচনা করিয়া নীপেশ জীবনের দুঃখকে দূরে রাখিতে চাহিতেছিল, নিষ্ঠুরা পত্নী সে কাব্যলোক ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলিতে চাহে? বেদনাকর বটে, তবে সংসারের ধারাই এই।

"রাণু! আজকের দিনের মত পড়া আর পরীক্ষা চুলোয় যাক—আজ উপরে ঐ মাণিক-ভরা আকাশ, আর নীচে প্রেম-ভরা তুমি। আজ তুমি জগতের ছোট-খাটো কথা ভুলে যাও, আজ তুমি আর আমি মুখোমুখি—সম্মুখে অনন্ত আশা, পিছনে অনন্ত ব্যবধান।"

রেবা নীপেশের তপ্ত বাহুস্পর্শ হইতে হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিল, "নাও, বাজে বকো না, যা বল্লাম, তার কি? ও বাড়ীর ন'ঠাকুরপোর কাছে শুনলাম, তোমার পাশের আশা নেই। সত্যি?"

নীপেশের সারা মুখ ক্ষণেকের জন্য শ্রাবণের কালো মেঘে ছাইয়া গেল; অনেক চেষ্টায় মুখের হাসি ফিরাইয়া আনিয়া অভিমানের সুরে বলিল, "যদি তাই বা হয়, রেবা?"

রেবা ক্রুদ্ধা ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া বলিল, "তাই বা হবে কেন? বাবা কত কাল আর তোমায় খরচ দেবেন? তুমি কাব্য লিখে সময় নষ্ট করবে, আর লোকে আমায় অপয়া বলবে, তা আমার সহ্য হবে না বলছি।"

"তুমি অপয়া হবে কেন, লক্ষ্মী আমার! আমি নিজে নিজেই ফেল করতে পারি, এটুকু ক্ষমতা আমার আছে, লোকে নিশ্চয়ই তা অবিশ্বাস করবে না—"

"আবার তোমার ন্যাকামি, যাও—"

"আচ্ছা, ও সব এখন থাক, এস, কবিতাটা প'ড়ে শোনাও না আমায়?"

রেবা কথা কহিল না। মিলন-ব্যাকুল দুইটি হিয়া,

তথাপি মধ্যে গভীর ব্যবধান। নীপেশের মন ক্রোধে, ক্ষোভে, অভিমানে জ্বলিয়া উঠিতেছিল। কিন্তু তথাপি নর চিরকাল নারীকে প্রণয় নিবেদন করিয়া আসিতেছে। কৃষ্ণ চিরকাল রাধাকে বলিয়াছেন, 'দেহি পদপল্লবমুদারম্।'

নীপেশ বলিল, "রাগ করলে, রেবা! একটিবার পড় রাণি! তোমার মুখে শুনলে আমার লেখা সার্থক হবে। পড়বে না?"

"না, ও সব আমার ভাল লাগে না। ছাড়, আমি শুতে যাই।"

আবার কয়েক মুহূর্ত্ত নিশ্চল নিস্তব্ধতা। নীপেশ পুনরায় অনুরোধ করিল, "আচ্ছা, না হয় আমি পড়ি, তুমি শোনো।"

"না, রাত হয়ে গেছে, ও সব পাগলামী এখন থাক।"

এই বলিয়া রেবা বিছানায় শুইয়া পড়িল। নীপেশ বসিয়া রহিল—তাহার হাতে "বিশ্ববার্ত্তা" যেন বার্ত্তাহীন হইয়াই রহিয়া গেল। সে বাহির আকাশ পানে চাহিয়া রহিল। পূর্ব্বাসার তীরে তখন কালপুরুষ মৃগয়া আরম্ভ করিয়াছেন। প্রোজ্জ্বল শ্বা নক্ষত্রের দিকে চাহিয়া নীপেশ এই মৃগয়ার কাহিনী মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিল। ছোট বয়সে পড়া গ্রীক পুরাণের গল্প আজ যেন তাহার সম্মুখে অভিনীত হইতেছে বলিয়া মনে হইল।

রেবা শুইয়া শুইয়া ভাবিল, নীপেশ এখনই আসিবে। কিন্তু নীপেশের নড়িবার লক্ষণ দেখা গেল না। রেবার মনে হইল, একবার ডাকে। কিন্তু আপনার গর্ব্ব নষ্ট হইবে, এই ভয়ে সে চুপ করিয়া রহিল।

মানুষের শুভেচ্ছা সব সময়েই আপন পথ রচনা করিয়া লইতে পারে না। নীপেশের সে দিকে দৃষ্টি ছিল না। সে শুধু বাহিরের দিকে চাহিয়াই রহিল।

তারার গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে নীপেশ কখন্ যে চেয়ারের উপর ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, তাহা নিজেও অনুভব করিতে পারে নাই। যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল, তখন প্রভাতের জ্যোতির লালিমা সমস্ত ঘরকে ঝল-মল করিয়া তুলিয়াছে।

সদ্যোজাগ্রত নয়নে সে শয্যার দিকে চাহিয়া দেখিল, বিছানা শূন্য। একটা বিরাট হাহাকার তাহার সমস্ত প্রাণ কাঁদাইয়া তুলিল। সে কথা না বলিয়া বিছানায় যাইয়া শুইয়া পড়িল।

২

কয়েক বৎসর পরের কথা। নীপেশের এম, এ পাশ করা হয় নাই। কাব্যচর্চ্চা ছাড়িয়া এখন কর্ম্মচর্চ্চা করিতে হয়। দৈনিক জ্যোতির সে সহ-সম্পাদক। মাসে ৫০৲ টাকা মাহিনা পায়। তাহাতেই কলিকাতার বাসাখরচ চালাইতে হয়।

অল্প বেতনে সংসার ভালভাবে চলে না। কাযেই মুখরা পত্নীর গঞ্জনা জীবনের বহুবিধ লাঞ্ছনার অন্যতম হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

রাত্রি ৮টা। কলিকাতার রাস্তায় তখন হাস্য-আনন্দের প্রবাহ বহিয়া যাইতেছে। কর্ম্মক্লান্ত নীপেশ সবে মাত্র জ্যোতি আফিস হইতে বাহির হইয়া বাহিরের মুক্ত আকাশের মধ্যে আপনাকে মেলিয়া ধরিল।

সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অতীত দিনের কথা মনে করিল। তখন সম্পাদক ও লেখক হওয়ার কি দুরন্ত আকাঙ্ক্ষা তাহার অন্তরে ছিল। সে লিখিবে, আর বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে রসজ্ঞ পাঠক-পাঠিকা তাহার লেখা পড়িবে, ইহার অপেক্ষা প্রিয়তর বস্তু আর কি হইতে পারে? কিন্তু আজ সেই অভীষ্ট বস্তু করতলে, তাহার লেখা চারিদিকে উন্মাদনা জাগায়, নূতন আশার সৃষ্টি করে, নূতন মানুষ গড়ে, তবুও তাহার মনে সে আনন্দ, সে উল্লাস নাই।

সে লেখা ছিল—সৃষ্টি ও খেলা। আজিকার লেখা—বন্ধন ও চাকুরী। পুরাতন সেই তৃপ্তির জন্য তাহার সারা মন বুভুক্ষু হইয়া উঠিয়াছিল। তাই একবার কলেজ স্কোয়ারে বেড়াইতে চলিল। ঘুরিতে ঘুরিতে বন্ধু নরেশপ্রসাদের সহিত দেখা হইল।

"বাঃ, নীপেশ যে, কেমন আছিস? তার পর?"

"পূবের সূর্য্য পশ্চিমে চলছে, আমাদের দিনও কাটছে। ঐ যে সংস্কৃত বচন আছে—

'লোকঃ পৃচ্ছতি সদ্বার্ত্তাং শরীরে কুশলন্তব?
কুতঃ কুশলমস্মাকমায়ুর্যাতি দিনে দিনে॥'

আমাদের সেইমত ভাই।"

"এ কি বলিস? তোর লেখা প'ড়ে আমার মনে হয়, তুই বেশ সুখে আছিস। ইবসনের Doll's House নিয়ে তুই যে দীর্ঘ প্রবন্ধগুলি লিখেছিস, নারীকে জননী ও গৃহিণীর

মর্য্যাদাসী কীর্ত্তিতে ভূষিত করেছিস্, তা প'ড়ে ত মনে হয়, তোর জীবন আনন্দের একটানা স্রোতে ভেসে চলেছে।"

"থাক্ ও সব আলোচনা, বর্ত্তমান যুগের আদব-কায়দা-মাফিক নয়। পারিবারিক জীবন নিয়ে আলোচনা নেহাৎ অভদ্র হবে। তার পর তোর খবর কি বল্ ?"

"আমাদের কি ভাই, ম্যাকমিলনের বাড়ীতে কায করছি। ভাল কথা, আমাদের আফিস থেকে 'ভারতীয় সাময়িক সাহিত্যের ইতিহাস' সম্বন্ধে বই লিখবার জন্য এক জন লোক খুঁজছে। এ কায তুই খুব পারবি, রাজী হস ত তোর জন্য চেষ্টা ক'রে দেখি।"

"হঠাৎ কি ক'রে মত দেই ভাই, অনেক ঝঞ্ঝাটের মধ্যে আছি, পারি যদি পরে তোকে জানাবো। অনেক পরিশ্রম করতে হবে—"

"সে জন্য তোর ভয় নেই, ওদের এ সব বিষয়ে কৃপণতা নেই, ভাই। ভালো জিনিষ পাবে জান্‌লে ওরা মুক্ত-হস্তে টাকা খরচ করতে রাজী—হাজার দশেক তোকে জুটিয়ে দিতে পারি।"

"বেশ, যা হয়, তোকে পরে জানাবো।"

"ভাল কথা, তোর বাসার ঠিকানাটা দে। বিয়ের পরে ত বৌ দেখালি না, এবার যেয়ে বৌদির হাতের রান্না খেয়ে আসবো।"

অলক্ষ্যে এক বিন্দু অশ্রু নীপেশের গণ্ড বাহিয়া গড়াইয়া গেল। কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া সে বলিল, "বাসার ঠিকানা নিয়ে কি করবি ভাই, জ্যোতি কার্য্যালয়ে আসিস্, সেখানেই আমার দেখা পাবি।"

"ফাঁকি দিলে চলবে না। ওখান থেকেই আমি তোর বাসায় যাবো।"

"আচ্ছা যাস, কিন্তু এখন আসি ভাই, আমায় আবার একটু বাজার ক'রে ফিরতে হবে।"

বাসায় খোকার অসুখ। তাহার জন্য প্রাসুমন এরারুট কিনিতে হইবে। একটি সুদৃশ্য মনোহারী দোকানে ঢুকিল। দোকানে ভিড়, নীপেশ দাঁড়াইয়া লোকজনের সওদা দেখিতে লাগিল। একটি লোক ছোট ছেলেদের জন্য একটি পুতুল কিনিয়া লইয়া যাইতেছে। জার্ম্মাণী হইতে নূতন আমদানী, দম দিয়া ছাড়িয়া দিলে পুতুল মানুষের মত কয়েক পা দৌড়িয়া বেড়ায়। নীপেশের মনে হইল, খোকার জন্য একটি কিনিয়া লয়। পরক্ষণে ভাবিল, না, এখন টানাটানির সময়, পরে কিনিয়া দিবে। কিন্তু রোগপাণ্ডুর পুত্রের মুখে হাসি আনিবার লোভ বার বার মনে জাগিতে লাগিল। সে দোকানীকে ভয়ে ভয়ে দাম জিজ্ঞাসা করিল—"আড়াই টাকা দাম, আজকের দিন পর্য্যন্ত দু টাকায় দিচ্ছি, নিয়ে যান, খুব ভাল জিনিষ।" অবশ্য এই 'আজকের দিন' দোকানীর ফুরায় না। নীপেশের মনে সস্তায় সুন্দর খেলনাটি লইবার প্রলোভন জাগিল। সে দিন একটু বাজে কায করিয়া দুই টাকা উপরি আয় হইয়াছিল, তাহাই দিয়া খেলনাটি লইয়া সে বাসায় ফিরিল।

একটু রাত হইয়াছিল। ফিরিতেই রেবা রুদ্রমূর্ত্তিতে দেখা দিয়া বলিল, "আক্কেল যদি থাকে, তখন পই-পই ক'রে ব'লে দিয়েছি, সন্ধ্যার মধ্যেই ফিরবে, খোকার এরারুট ফুরিয়েছে, এত রাত কোথায় ছিলে ?"

ইহার জবাবদিহি করা সুবুদ্ধির পরিচায়ক নহে। নীপেশ তাই এ কথা এড়াইয়া কুণ্ঠানম্র স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "খোকন কেমন আছে ?"

"একটু ভাল আছে।"

"আজ একটা বাজে কায পেয়েছিলাম। তাই দুটাকা উপরি আয় হয়েছিল, তাই দিয়ে এই খেলনাটি কিনে এনেছি। খুব ভাল খেলনা, দামেও আট আনা কম হয়েছে, এই দেখ, কি সুন্দর,—"

রেবা সংসার-জ্ঞানহীন স্বামীর অবিবেচনায় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। অভাবের সংসারে দুইটি টাকা অপব্যয়! স্বামীর হাত হইতে খেলনাটি লইয়া সে মেঝের উপর আছাড় মারিয়া ফেলিল, আর ভর্ৎসনার সুরে বলিল, "তোমার ঘটে কবে যে বুদ্ধি হবে, বল্‌তে পারি না।"

সাধের খেলনাটি পাকা মেঝেতে পড়িয়া চুরমার হইয়া গেল। স্নেহবান্ অক্ষম পিতা শুধু শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

সে দিন রাত্রিতে কাহারও আহার হইল না। নীপেশ ক্ষোভে ও দুঃখে বিছানায় যাইয়া শুইয়া পড়িল। রেবা আপন ব্যবহারে লজ্জিত হইয়া দুই একবার খাইতে বলিল। কিন্তু নীপেশ উঠিল না, কাযেই রেবাও অনাহারে রহিল।

আনন্দের বার্ত্তা দুঃখের অভিঘাতে ফিরিয়া গেল। হামেশাই যায়। তবু যে দিন যায়, সে দিন সহিয়া থাকা কষ্টকর হইয়া উঠে।

পরের দিন এই কালো যবনিকাটুকু যেন সরিয়া গেল। নীপেশ সস্মিত দৃষ্টিতে রেবার পানে চাহিয়া বলিল, "শুনছ গিন্নি! একটা ভাল কায পেতে পারি, তুমি যদি জীবন বীমার টাকা কয়টি দিয়ে দাও। তা হ'লে বেশী খাটুনী খাটতে হয় না, আর সেই অবসরে এই নূতন কাযটির জন্য একটু পড়াশোনা করতে পারি।"

"কি কায শুনি?"

"একটা বই লিখতে হবে, ভাল ক'রে লিখে দিলে হাজার দশেক টাকা পেতে পারি,—"

"তা এর জন্য পড়াশোনার কি দরকার?"

"অত টাকা দেবে, তার জন্য ত অনেক পড়তে শুনতে হবে, আমি আগে খানিকটা পড়াশোনা করতে চাই, পারবো কি না, সেটা ত নিজে বুঝে নিতে চাই—"

"তা হলে এটা কোন কাযেই আসবে না। না, এর জন্য তোমায় টাকা দিতে পারি না, তার পর টাকাই বা কোথায়?"

"হাতে কি কিছুই নেই, লক্ষ্মি!"

"অবিশ্বাস! বেশ, অমন যদি কর, নেও তোমার হিসেব-পত্র, তোমার সংসার তুমি চালাও।"

এ ব্রহ্মাস্ত্রের উত্তর ছিল না। নীপেশ চুপ করিয়া রহিল। খানিক পরে ভয়ে ভয়ে নীপেশ বলিল, "তোমার সোনার চুড়ী গড়াবার জন্য যে টাকাটা রেখেছ, তার থেকে—"

"সোনার চুড়ী তোমার চক্ষুঃশূল হয়েছে? তা অমন ক'রে না ব'লে, বল্লেই হত যে, তোমার গহনা প'রে কায নেই।"

"থাক্ তবে, রাণু!"

রেবা চুপ করিয়া খানিক ভাবিল। তার পর সে বলিল, "আচ্ছা, দেখ, যেমন ক'রে পারি, আমি গোটা কুড়ি টাকা তোমায় দিচ্ছি, বাকীটা তোমায় আয় করতে হবে! আচ্ছা, আমার কি ইচ্ছে তুমি বেশী খাট, তবে চলে না তাই—"

"আচ্ছা তাই—তবে শরীরটা ভাল চলছিল না—"

"সেই বেদনা বেড়েছে। আচ্ছা, তেলটা মালিস করতে তোমায় ছুশোবার বলি, কিছুতেই ত হবে না। তা গরীবের কথা বাসি হলে কাযে লাগে।"

নীপেশ আর উত্তর দিল না; অন্যমনে বাহির হইয়া গেল। শরীরের বেদনাই কি জীবনে সব? মনের ব্যথার মালিস ত কোনও ডাক্তারখানায় মিলে না।

৩

মানুষের জীবনে ব্যথার প্রয়োজন আছে। কাঁটার মাঝেই গোলাপ আপন মাধুরী বিলায়, কমল আপন সৌরভ ছুটায়। নীপেশের হৃদয় সংসারের নিষ্ঠুরতায় যতই মুহ্যমান হইয়া পড়িতেছিল, ততই তাহা হইতে সুধার ধারা ক্ষরিত হইতেছিল। সাহিত্যিক সমাজে তাহার প্রতিপত্তি ও মর্য্যাদা বাড়িয়াই চলিল। সাহিত্য-সঙ্ঘে তাহার একটি বিশেষ স্থান হইল।

মনোবিজ্ঞানবিদ বলিবেন যে, প্রেমের ব্যর্থতায় সাহিত্যের সার্থকতা। কিন্তু তাহার কাছে যাহা খেলা, অপরের কাছে তাহা মৃত্যু।

সে দিন নরেশ আসিয়াছিল। আলাপ-প্রিয় হাস্যচটুল নরেশ রেবার কাছে সহজ হৃদ্যতায় পরম প্রিয়জনের আসন করিয়া লইল। নীপেশ দেখে আর ভাবে। ঈর্ষ্যা? সন্দেহ? না, তাহার মন অত ছোট নহে। তবে তাহার দুঃখ হয় যে, আনাড়ী সে, রেবার বিকচোন্মুখ হৃদয়-শতদল ফুটাইতে পারে নাই।

নরেশ বলিল, "দেখুন, বৌদি, দাদার দিকে একটু দৃষ্টি দিবেন। শরীরটা বড় কাহিল হয়ে যাচ্ছে।"

খোসগল্পের ও মজাদারী রঙ্গের মধ্যে কথাটা একবারে বেসুরা বাজিল। উষ্ণ হইয়া রেবা উত্তর করিল, "সব শিয়ালের দেখছি এক রা। আপনার দাদা বলেন আর ভাবেন যে, আমি তাঁকে দেখতে পারি না। আপনিও তাই বলছেন, ঠাকুরপো? এ পৃথিবীতে মেয়েমানুষ হয়ে জন্মানোর চেয়ে আর শোচনীয় দুঃখ কি আছে?"

নরেশের অন্তর এই দাম্ভিকা নারীর উক্তিতে জ্বলিয়া উঠিল। প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে যে, নীপেশ তিলে তিলে মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইতেছে, অথচ রেবার তাহাতে মোটেই চিত্ত-চাঞ্চল্য নাই! সে বিদ্রূপ করিয়া বলিল,—"সে কথা ঠিক। আপনি নীপেশদার অযত্ন করছেন, শত্রুতেও এ দোষ আপনাকে দিতে পারবে না। তবে দাদা যে শুকিয়ে যাচ্ছে, এ দাদারই নিজের দোষ। কি বল ভাই, নীপেশ?"

নীপেশ উত্তর করিল না, শুধু কাষ্ঠ-হাসি হাসিল। রেবা কথা ফিরাইয়া লইয়া বলিল, "ও সব তর্ক-বিতর্ক থাক, ঠাকুরপো। এই শনিবারে ষ্টারে 'বিদ্যাপতির' অভিনয় হবে, আমায় নিয়ে যেতে হবে, আপনার কায নেই ত?"

"কায বিশেষ কিছুই নেই, তবে এর মধ্যে যদি জরুরী কিছু—"

"ওজর দিতে আপনার দেরী হয় না, ঠাকুরপো।"

নরেশ সে কথার উত্তর না দিয়া নীপেশকে জিজ্ঞাসা করিল,—"তার পর বই লেখা কত দূর হচ্ছে?"

"বেশী দূর কিছু হয় নি, যোগ্যতর লোকের হাতে কাযটা দাও, ভাই। আমার শরীরের যে অবস্থা, তাতে দায়িত্ব-পূর্ণ কাযের ভার আমি নিতে পারি না।"

"না না, সে কি হয়? নিরুৎসাহ হয়ো না ভাই, পারবে—"

রেবা ঝঙ্কার দিয়া বলিল, "ও সব কাযের কায ওঁর দ্বারা কিছুই হবে না, তা ঠিক জানি—"

নীপেশ সে কথায় মন না দিয়া কহিল, "না ভাই নরেশ, তুমি অন্য লোকের চেষ্টা দেখ।"

"আচ্ছা, সে হবে'খন।"

নরেশ চলিয়া গেলে, রেবা আসিয়া সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিল, "শরীরটা কি বড়ই খারাপ লাগছে?"

"হাঁ রেবা, ডাক্তাররা বলছিল যে, কিছু দিন কাযে ছুটী নিয়ে হাওয়া পরিবর্ত্তন করলে ভাল হ'ত—"

ব্যগ্রনেত্রে সে পত্নীর মুখের পানে চাহিল। তাহার অতৃপ্ত প্রেম রেবার মাঝখানে যেন তরুণ বয়সের আধ-জানা আধ-চেনা কিশোরী প্রিয়ার সন্ধান করিতেছিল।

"সে ত অনেক টাকার দরকার। আচ্ছা, বইটি লেখা শেষ করো। আমিও কিছু জমিয়ে নিই, তার পর যাওয়ার যোগাড় করা যাবে।"

যে মিথ্যা আশা নীপেশের ভাবপ্রবণ চিত্তের চারিধারে এক মোহময় জগৎ সৃষ্টি করিতেছিল, তাহা সূর্য্যোদয়ে কুয়াসার মত উবিয়া গেল। নীপেশ শুধু আর্ত্তস্বরে কহিল, "আচ্ছা।"

নীপেশের মনের চারিধারে যেন বিষাদের বিষবাষ্প ঘনীভূত হইতে লাগিল। বহুদিন অধীত শঙ্করের মোহ-মুদগর মনে পড়িয়া গেল,—

"যাবৎ বিত্তোপার্জ্জনশক্ত-
স্তাবন্নিজপরিবারো রক্তঃ।
তদনু চ জরয়া জর্জ্জরদেহে
বার্ত্তাং পৃচ্ছতি কোঽপি ন গেহে॥"

তাহার মনে হইল, কবিরা বসিয়া বসিয়া যে প্রেমের কথা বর্ণনা করেন, তাহা মিথ্যা, ক্ষণ-ভঙ্গুর ভাব-বুদ্‌বুদ্ মাত্র।

যে প্রিয়াকে শ্রেয়সী দয়িতারূপে সে দেখিতে চাহে, সে ত প্রেম চাহে না। কাঞ্চনই তাহার কাছে প্রিয়, প্রীতির কাতরতা নহে।

রেবা গৃহকর্ম্মে চলিল। নীপেশ খোকাকে লইয়া বসিল। খোকন কথা বলিতে শিখিয়াছে। তপ্ত বক্ষে তাহাকে চাপিয়া ধরিয়া সে বার বার খোকার মুখে চোখে চুম্বন করিল। পিতার এই অত্যধিক আদরে খোকা বিস্মিত ও ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

"খোকন সোনা! আমায় মনে রাখবে, আমি ম'রে গেলে আমায় মনে রাখবে?"

আধ আধ ভাষে খোকা উত্তর দিল, "আখবো বাবা! আখবো।"

নীপেশ তাহাকে দৃঢ়তর আগ্রহে জড়াইয়া ধরিল। হায় অন্ধ পিতৃস্নেহ!

"আমার লেখা বই পড়বে?"

"পলূবো।"

"তাই পড়ো বাবা, তোমার জন্যই বই লিখবো, যাদুধন!"

"লিখবে বাবা?"

"লিখবো, বাবা।"

খোকা ঘুমাইয়া পড়িল। পুত্রবৎসল পিতা ভবিষ্যতের এক সুখস্বর্গ গড়িয়া তুলিতে লাগিল। কল্পনার ছবি, একবার আঁকে, তৃপ্তি হয় না, পুনরায় রেখাঙ্কন করে, পুনরায় রঙ্গের তুলি বুলায়।

"যে মাটীতে পড়ে লোক, ওঠে তাই ধ'রে।" আশা-নিরাশার এই দ্বন্দ্বই ত নিত্য জীবনের চলচ্চিত্র!

রেবা আসিয়া ডাকিল, "চল, খেতে যাবে।"

নীপেশ জাগিয়া দেখিল, ছবি কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে। আবার সেই স্যাঁতসেঁতে ঘর, সেই অভাব, সেই অনাটন!

৪

সে দিন রেবার বন্ধু বেড়াইতে আসিয়াছিল। রেখা ও রেবা পাঠশালা হইতেই সখীত্ব স্থাপন করিয়াছিল। জীবনের ঘুরপাকে কত দিন দেখা হয় নাই। পত্র-বিনিময়ের মধ্য দিয়া দুই সখী আপনাদের সৌহৃদ্য বজায় রাখিয়াছিল। রেখার স্বামী সম্প্রতি কলিকাতায় বেড়াইতে আসিয়াছেন, তাই রেখা রেবাকে দেখিতে আসিয়াছে।

রেখা ধনীর কন্যা ও ধনীর পত্নী। রেবা ধনীর কন্যা, কিন্তু দরিদ্রের অঙ্কশায়িনী। ঐশ্বর্য্যগর্ব্বিতা সখীর কাছ হইতে আপন দারিদ্র্য গোপন করিতে রেবার প্রয়াস তাহার ব্যবহার ও কথাবার্ত্তাকে অসরল করিয়া তুলিল।

রেখা সখীর ভাবান্তর দেখিল, কিন্তু তাহার ঋজু-প্রাণ কোনও কারণ খুঁজিয়া পাইল না।

খোলা-প্রাণ রেখা গল্পগুজব করিয়া চলিল।

"তোর স্বামীর লেখা যা ভাই! এমন মন-মাতানো লেখা আর কারও হয় না। সমস্ত লেখাটা যেন প্রাণের রক্তে তাজা—প্রতিদিন জ্যোতির আসবার পথ চেয়ে থাকি। পড়তে পড়তে সে লেখা এমন পরিচিত হয়ে গেছে যে, বেনামী লেখাগুলিও আমি চিনে নিতে পারি। সব লেখা ত তোর কণ্ঠস্থ, কি বলিস ভাই?"

স্বামীর এই প্রশংসায় রেবার মন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কিন্তু রেখার প্রশ্ন তাহাকে অপ্রস্তুত করিয়া দিল। কারণ, স্বামীর কোনও লেখা কোন দিনই সে পড়ে নাই।

"না ভাই, সংসারের কাযকর্ম্ম ক'রে অবসর কোথায়? ওসব পড়া আমাদের সাজে না।"

"তুই অবাক্ ক'রে দিলি রেবা। স্বামীর এমন সুন্দর লেখা, শতকাযের মধ্যেও পড়া যায়। কথা কি 'গেঁয়ো যুগী, ভিখ পায় না', আমার ভয় হয়, তুই স্বামীর লেখার কদর করিস্ না।"

রেবা আহত হইয়া চুপ করিয়া রহিল।

"এমন স্বামী তপস্যা না করলে কি পাওয়া যায়? ওঁর কাছে শুনছিলাম যে, তোর স্বামীর একটা বই বিলাতী সাহেব কোম্পানীতে ছাপা হবে, তারা নাকি অনেক টাকা দেবে।"

"কৈ, আমি ত কিছুই জানি না।"

"ন্যাকামি করিস না, রেবা। স্বামীর সাথে তোর মনপ্রাণের যোগ নেই, তাই কি তুই বল্‌তে চাস্? তোর ভগ্নীপতির সু হক আর কু হক, সমস্ত মতলব অভিসন্ধি যে আমার ঠোঁটস্থ।"

"আমি থাকি আমার কায নিয়ে, উনি থাকেন ওঁর কায নিয়ে—"

"চুপ কর, রাক্ষসী! এমনি ক'রে তুই জীবন কাটাতে চাস্? একেবারে জীবনটা ঊষর ক'রে তুলিস্ না। স্বামীর মনে যদি স্থান না পেলি, তা হ'লে ত জীবনই বৃথা।"

"থাক্, তোর বক্তৃতা রাখ। চল্, রান্নাঘরে বস্‌বি, দুখানা লুচি ভেজে দেই,—"

"না ভাই, বেশী সময় দেরি করতে পার্‌ব না। বেশী দেরী হলে তোর ভগ্নীপতি চ'টে যাবে। রাগ করিস্ না ভাই, আর এক দিন না হয় আসবো। দে তোর ছেলেটিকে, একটু কোলে ক'রে যাই।"

গাড়ী চড়িবার সময় রেখা রেবাকে বলিল, "দূরে থেকে বঞ্চিত হয়ে র'স না, প্রেমকে অমর্য্যাদা করিস্ নি।"

রেখা চলিয়া গেল, রেবা আসিয়া শূন্য গৃহতলে বসিল। তাহার মনে হইল, চারিদিকে একটা বিরাট শূন্যতা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। রেখার মধ্যে পরিতৃপ্তির একটি পূর্ণতা টলমল করিতেছে, আর তাহাদের বিবাহিত জীবন নীরস ও শুষ্ক। রেবার মনে হইল, সে চেষ্টা করিয়া স্বামীর হৃদয় অধিকার করিবে।

স্বামীর জন্য রেবা জলখাবার করিতে বসিল। খাওয়ানোর ভিতর যে পরম তৃপ্তি আছে, এত দিন সে তাহা অনুভব করে নাই। পরিপাটী করিয়া আসন বিছাইয়া স্বামীর পাদুকা, তোয়ালে গুছাইয়া রাখিয়া সে পথপানে চাহিয়া রহিল। তাহার মধ্যে যে প্রেমপরায়ণা নারী সুপ্ত ছিল, রেখার আগমনে তাহা জাগ্রত হইয়া উঠিল।

জ্যোতি-কার্য্যালয় হইতে ফিরিতে নীপেশের রাত হইত। রোজই হয়, অন্য দিনে লক্ষ্যই হয় না। আজ স্বামীর বিশুষ্ক মুখের পানে চাহিয়া রেবার কান্না পাইতে লাগিল। যত্ন করিয়া স্বামীকে খাওয়াইয়া রেবা সপ্রেমভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "এত রাত কর কেন? কাল থেকে কিন্তু একটু সকাল আসা চাই।"

নীপেশ অবাক্ হইয়া ভাবিল, এ কি কৌতুক! কি উত্তর দিবে, ঠিক করিতে পারিল না।

"কি, কথা বলছ না? আমার মাথা খাও, যদি কাল দেরী করো।"

"আচ্ছা, চেষ্টা করবো, পরের কায, ঠিকঠাক বলতে পারা যায় না ত।"

রুদ্ধ দ্বারের অর্গল আজি খুলিল। আজ নানা আলাপ চলিল। মধ্যে রেবা জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বই কত দূর কি হ'ল?"

"সে কথা শুনে তোমার কি লাভ? যে দিন টাকা পাব, এনে তোমার হাতে দেবো।"

"কেন? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের লোক তোমার কথা শুনবে, তোমার খবর রাখবে, আর আমিই আঁধারে রইবো?"

দুঃখবিনম্রস্বরে নীপেশ বলিল, "সে আমার ভাগ্য।"

অভিমানে রেবা ফুলিয়া উঠিল। "বলবে না? আমি কি অপরাধ করেছি, তুমি এমন ক'রে আমায় অপমান করো?"

"অপমান কিসের রেবা? সমস্ত অপরাধের বোঝা আমারই।"

"বেশ, তা হ'লে আমি তোমার কোনও কথা শুনবার অধিকারী নই?"

"বড্ড শক্ত কথা, কতখানি তোমার অধিকার, কতটুকু নয়, সে বিচার সহজ নয়। আর তা নিয়ে মাথা ঘামানো আজ আর চলবে না। শরীরটা বড় কাহিল বোধ হচ্ছে, যাই, একটু নিশ্চিন্ত-মনে শুয়ে পড়ি গে।"

রেবা প্রস্তরমূর্ত্তির মত নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিল। যাহা সহজ ও ঋজু, আজ তাহা কেন তাহার কাছে বক্র ও কঠোর হইয়া দাঁড়াইয়াছে? এক দিন স্বামীর তরফ হইতে অশান্ত প্রীতির অমৃতধারা তাহার দিকে উন্মদ আবেগে ছুটিয়া আসে নাই?

নিরপেক্ষ উদাস রাত্রি বহিয়া চলিল। রেবা বসিয়া রহিল। খোকার কান্না যখন অসহ হইয়া উঠিল, তখনই সে উঠিয়া গেল।

৫

দিন দিন নীপেশের শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল।

শরীরে বল নাই, মনের তেজ নাই, কাযে কোনও উৎসাহ নাই। তাহার মনে মাঝে মাঝে প্রশ্ন উঠিত, সত্যই কি তাহার দিন ক্রমেই সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিতেছে?

রেবা আজকাল আদর-যত্নের চেষ্টা করে। নীপেশের মনে বাঁচিয়া থাকিবার সাধ প্রবল হইয়া উঠে। ধরণীর উজ্জ্বল আনন্দোৎসব ত্যাগ করিয়া কোথাও যাইতে তাহার মন সরে না।

বায়ুপরিবর্ত্তনের কথা মাঝে মাঝে মনে উদিত হয়, কিন্তু রেবাকে বলিতে মন সরে না।

রেবা নিজেই এক দিন বলিল, "চল, পুরী কি ওয়াল-টেয়ার যাই।"

পাণ্ডুর গণ্ডে এক ঝলক রক্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। ভরা-যৌবনে ইদানীং সে বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল।

নীপেশ বলিল, "দু চার দিন থাক। এই মাসটার শেষাশেষি নাগাৎ দেখা যাবে—"

নরেশ আসিয়া এক দিন বলিল, "না ভাই, যা, বেড়িয়ে আয়। টাকার অকুলান হয় ত আমিই দিচ্ছি।"

নীপেশ হাসিয়া বলিল, "আমার আঁধার ঘরে তুই-ই মণিদীপ!"

"না, সে কথায় আমি রাজী নই, বৌদি তা হ'লে আমায় সম্মার্জ্জনী-প্রহার করবেন।"

রেবা হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "না ঠাকুরপো, আমরা কোথাও আলো জ্বালাতে পারলুম না।"

"না ভাই, তোদের তর্ক থাক। এত চুল-চেরা বিচার করবি, তা জানলে কি আর কথা বলা চলবে?"

নরেশ বলিল, "তা হ'লে এই মাসেই—"

"আচ্ছা, ওবেলা আফিসে ব'সে ঠিক করা যাবে, ভাই।"

নীপেশ ভাবিল, তাহার বই-লেখা টাকাটা পাওয়া গেলে সে একবার দীর্ঘপথ-ভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িবে।

আসে আসে করিয়াও সে শুভদিন তখনও আসিল না। কিন্তু শরীর এ বিলম্ব সহিতে অনিচ্ছুক।

তাহার স্বভাব রুক্ষ হইয়া উঠিল। রেবার সহিত নিত্য কলহ হয়। খোকার মধুর সঙ্গ আর ভাল লাগে না। তাহার মনে হইতে লাগিল, জগদ্ব্যাপী একটা মহা অবিচার তাণ্ডবলীলা করিতেছে।

এই ঘোর অবিচার, সে দুর্দ্ধর্ষ শক্তিবলে প্রতিহত করিবে। এই অন্যায়ের রাজত্বের অবসান করিতে পারিলেই তাহার শান্তি। কিন্তু কল্পনা প্রিয় হইলেই ফলপ্রসূ হয় না।

ফাল্গুনের সন্ধ্যায় নীপেশ আফিসে বসিয়া আছে।

এক জন কম্পোজিটর এক গুচ্ছ চাঁপা-ফুল আনিয়াছিল, তাহার মদির-মোহ সমস্ত ঘরখানিকে সুরভিত করিয়া রাখিয়াছিল।

এমন সময় সম্পাদক ঘরে আসিয়া বলিলেন, "মাপ করবেন নীপেশ বাবু, আপনার একটি রেজিষ্টারী খাম এসেছিল, নিয়ে রেখেছিলাম, কাযের ভিড়ে দিতে দেরী হ'ল।"

"না না, তার আর কি?"

"এখন কেমন আছেন? শরীরটা ভাল বোধ করছেন কি?"

"হাঁ, বসন্তের হাওয়ায় শরীরে খানিকটা বল পাচ্ছি।"

সম্পাদক চলিয়া গেলে নীপেশ চিঠি খুলিল, তাহার ভিতর ১০ হাজার টাকার একখানি চেক। আনন্দে নীপেশের মাথা ঘুরিয়া গেল। সারা বিশ্ব তাহার চারিদিকে যেন নাচিতে লাগিল।

সে কি করিবে, ভাবিয়া পাইল না। চেকখানি বুক-পকেটে সযত্নে রাখিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। আফিসের মাহিনা সেই দিন পাইয়াছিল। পকেটে তাহার টাকা ভরা ছিল। জ্যোতি আফিসের বাহিরে আসিয়া দেখিল, একটি ট্যাক্সিওয়ালা দাঁড়াইয়া আছে।

সে প্রভুত্বব্যঞ্জক স্বরে ডাকিল, "ট্যাক্সি, ইধার আও।"

ট্যাক্সি আসিল। সোফার বলিল, "সেলাম হুজুর! কাঁহা যানা হোগা?"

"হগ সাহেবের বাজার, মুন্সীপাল মার্কেট।"

বাজারে যাওয়ার পথে তাহার মনে হইল, সমস্ত বাড়ীগুলি যেন আনন্দের তালে তালে নাচিতেছে। হগ সাহেবের বাজারে এক গাড়ী ফুল কিনিয়া মোটর বোঝাই করিল।

বাড়ী আসিয়া সে রেবাকে ডাকিল, "যাও, আমার বিছানায় ফুল বিছিয়ে দাও।"

রেবা স্তম্ভিত বিস্ময়ে স্বামীর আদেশ মানিয়া লইল।

"আহা, তোড়াটা খুব সাবধানে নাও, আমার টেবলের ফুলদানীতে ভাল ক'রে সাজিয়ে রেখ।"

রেবা প্রতিবাদ না করিয়া স্বামীর অনুজ্ঞা পালন করিল। বিপুল উত্তেজনায় নীপেশের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল। তথাপি সে শয্যা ফুল-সাজে সাজাইতে লাগিল, এক-বার সাজায়, মনোমত হয় না, আবার নূতন করিয়া আরম্ভ করে।

"খোকা কোথায়?"

"ঘুমিয়ে আছে।"

"আচ্ছা ঘুমোক—এ দিকে শোন।"

রেবা আসিল, নীপেশ তাহাকে আবেগে জড়াইয়া ধরিল। তাহার পর কম্পিত-হস্তে কোটের পকেট হইতে চেকখানি বাহির করিয়া রেবার হাতে দিয়া বলিল, "এই নাও, আমার বইয়ের জন্য ১০ হাজার টাকা পেয়েছি। রেখে এসো, আজ আমাদের ফুলের বাসর, যাও লক্ষ্মি!"

মাতালের মত টলিতে টলিতে সে বিছানায় যাইয়া শুইয়া পড়িল। রেবা যাইতেছিল, নীপেশ তাহাকে পুনরায় ডাকিল। রেবা কাছে আসিলে, শয্যা হইতে একগাছি ফুলের মালা রেবার গলায় ফেলিয়া দিয়া বলিল, "রেবা, আজ আমাদের ফুলশয্যা।" বলিতে বলিতে সে বিছানায় শুইয়া পড়িল। উত্তেজনায় তাহার ঘন ঘন শ্বাস বহিতে লাগিল, "যাও, তাড়াতাড়ি এস। আজ আমাদের ফুলশয্যা।"

ভাবাতিশয্যে নীপেশ বিহ্বল হইয়া পড়িল। রেবা ফিরিয়া আসিয়া ডাকিল—"ওগো, শুনছ?"

কিন্তু নীপেশ কোন উত্তর দিল না।

ভয়ে ও বিস্ময়ে রেবার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। পরমুহূর্ত্তে সে স্বামীর দেহ আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া আকুল আগ্রহে বলিল, "আমি এসেছি, শোন।"

কিন্তু চৈতন্য তখন স্তিমিত—ম্লান।

সত্যই কি রুদ্রের বিষাণ বাজিয়া উঠিয়াছে? প্রলয়-ঝঞ্ঝা দুর্ম্মদ হইয়া শ্বসিতেছে?

না, তাহা হইতে পারে না। স্বামীকে অন্তরের সর্ব্বস্ব দিয়া সে সত্যই ভালবাসে। তাঁহাকে সে যাইতে দিবে না। তাহার প্রাণের ফল্গুধারার অমৃত-প্রবাহে সে বিলুপ্ত-চেতন স্বামীর দেহে প্রাণস্পন্দন ফিরাইয়া আনিবে।

কিন্তু কৃষ্ণা নিশীথিনীর জমাট অন্ধকার সমস্ত ভুবন কালোয় কালো করিয়া তুলিয়া তাহার সম্মুখে নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

শ্রীমতিলাল দাশ (এম, এ, বি, এল)।

স্বাস্থ্য-পরীক্ষা

বাঙ্গালায় একটা প্রবাদ-বচন আছে,—"গতরের নাম আদরমণি।" এই বচনটির অর্থ এই যে, যতক্ষণ তোমার দেহ সুস্থ ও সবল, ততক্ষণ সকলেই তোমাকে আদর করিবে। আজ যদি তুমি কায করিতে ক্ষণেকের জন্যও অপারগ হও এবং তজ্জন্য তোমাকে কাহারও গলগ্রহ হইতে হয়, তবে সে ব্যক্তিকে তোমার সেবা করিতে হইবে বা যাহাকে তোমার অন্ন যোগাইতে হইবে, সে কখনও তোমার প্রতি বেশী দিন প্রসন্ন থাকে না। এই জন্যই সকলে প্রার্থনা করে, যেন হাত-পা সবল থাকিতে থাকিতে ও চোখ-কাণ সজাগ থাকিতে থাকিতে মরিতে পারে।

কিন্তু, মরিবার সময়ে কি ভাবে স্বাস্থ্য থাকিবে, যে জাতি চিন্তা করে, সেই জাতিই জীবন্তে স্বাস্থ্যকে অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করে। "তুচ্ছ দেহটার জন্য," "তুচ্ছ পেটটার জন্য" প্রভৃতি বচন ত শুনিতে পাওয়া যায়ই; পরন্তু কার্য্যেও দেখা যায় যে, দেহের প্রতি অযত্ন করা এ দেশের লোকদের স্বাভাবিক মনোবৃত্তি। শিশু কি খাইলে ভাল থাকে, কি পরিলে অসুস্থ হয়,—কোন মাতা-পিতা তদ্বিষয়ে মাথা ঘামান না;—অথচ, একটা কুকুর কি পাখী পুষিলে তন্ন তন্ন করিয়া পাঁচ জনের কাছে জানিয়া লয়েন যে, ঐ জীবটি কিসে ভাল থাকে বা কিসে মন্দ থাকে! এ দেশের লোকরা বিবাহাদি উৎসবে, "নারদের নিমন্ত্রণ" দিয়া, দেশী মোগলাই ইস্তক বিলাতী খানা ও বাটীর ক্ষণিক সাজসজ্জায় কত টাকা অনর্থক ব্যয় করেন; কিন্তু সেই বাঙ্গালীর ঘরের কয় জন নবাগত বধূমাতার স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য, তাঁহাকে মাতৃত্বের উপযোগী করিবার জন্য—এক কপর্দ্দক বেশী ব্যয় করা দূরে থাকুক, তদ্বিষয়ে যে তাঁহাদের চিন্তনীয় বা বিশেষ কর্ত্তব্য যে কিছু আছে, সে কথা ভাবেন? অথচ মাতৃত্বই হইল নারী-জীবনের পূর্ণ সার্থকতা। বংশবৃদ্ধি হইল জীবজন্মের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং জাতির শ্রেষ্ঠত্ব মাতৃত্বের উপরেই নির্ভর করিতেছে। আরও দুঃখের বিষয় এই যে, এ দেশের মেয়েরাই ঘর-সংসার করেন বলিয়া, সকলকে খাওয়াইয়া যে দিন যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা খাইয়াই তাঁহাদিগকে চালাইতে হয়। দুধ-ঘি, ক্ষীর-সর, কালিয়া-পোলাও পুরুষরা যখন ইচ্ছা ও যত ইচ্ছা খাইতে পারেন; কিন্তু ঐ সব "ভাল জিনিষ কি মেয়েমানুষের খাইতে আছে?" কাযেই, পিঞ্জরাবদ্ধ থাকিয়া আজীবন অহর্নিশ শ্রম করিয়া, বৎসরে বৎসরে সন্তান প্রসব করিয়া আমাদের মেয়েদের স্বাস্থ্য ও আয়ুঃ যে ক্রমশঃই ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে—আমরা সে দিকে আর কত দিন উদাসীন থাকিব?

বাড়ীর "ছেলেরা," আবশ্যক-অনাবশ্যক জামাজোড়া পরে, জুতার উপরে তাহাদের জুতা সরবরাহ হয়, তাহারা বায়স্কোপ সার্কাস যথেষ্ট দেখে, গাড়ী করিয়া স্কুলে যায়,—এক কথায় তাহাদিগকে আমরা মমতা বশতঃ অন্ধ হইয়া ক্রমাগতই ভোগের পথে ঠেলিয়া দিয়া স্বার্থপর ও বিলাসী করিয়া তুলিতেছি। কিন্তু কোনও অভিভাবক সংবাদ রাখেন না যে, ছেলেদের স্বাস্থ্য, মানসিক বৃত্তি ও চরিত্র এই তিনটি জিনিষ ভোগের ঠেলায় কোন্ মুখে যাইতেছে! স্বাস্থ্যই সকল মানুষের সকল জিনিষের বনিয়াদ। ত্যাগে ও সংযমে স্বাস্থ্য গড়িয়া উঠে, ভোগে স্বাস্থ্য দূরে পলায়! দেহের স্বাস্থ্য ভাল হইলে, "মানসিক স্বাস্থ্য" ভাল হইতে দেরী হয় না এবং মানসিক স্বাস্থ্য ভাল হইলে, তবে "চরিত্র" গড়িয়া উঠে। অর্থাৎ, শিশুদের পক্ষে জন্মকাল হইতেই তাহাদের স্বাস্থ্য প্রত্যেক জনক-জননীর অহর্নিশ লক্ষ্যের বিষয় হওয়া চাই। কিন্তু তাই কি আমাদের হয়? শিশু কি খায় ও কেন খায়, শিশু কেন খাইল না, শিশু আজ পাঠে অমনোযোগী কেন, শিশুর আজ মনটা প্রফুল্ল নহে কেন—ইত্যাকার সংবাদ আমরা ভুলিয়াও লই না। শিশু যতক্ষণ রীতিমত পীড়িত হইয়া শয্যা না লয়, ততক্ষণ আমরা খোঁজও লই না যে, তাহার স্বাস্থ্য বলিয়া একটা জিনিষ আছে! শিশু কাঁদিলে আমরা তাহাকে "কাঁদুনে" অপবাদ দিয়া তৃপ্ত হই। শিশু ভাল করিয়া না খাইলে, "ওর আজ ক্ষিধে নাই" বলিয়া মনকে প্রবোধ দিই! শিশুর কোষ্ঠ রোজ শুদ্ধ হয় কি না, তাহার সংবাদও লই না; এবং কোষ্ঠকাঠিন্য হইলে, তাহার "বিকৃত ধাতুকে" দোষ দিয়া চরিতার্থ হই! এক কথায়, আমাদের দেশে, "শিশুপালন" গোঁজামিল দিয়াই হয়—তাহার একমাত্র কারণ, অজ্ঞতা।

বাঙ্গালীর সংসার, অধুনা ভোগ-সর্ব্বস্ব ও পরমস্বার্থপর হওয়ার ফলেই আজ বাঙ্গালাদেশে একান্নবর্ত্তিতা ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। কাযেই আমরা স্ব-স্ব-প্রধান হইয়া, আহারে-বিহারে, সকল বিষয়ে স্বেচ্ছাচারিতা যথেষ্টই করি। কাযেই ব্যারাম আজকাল যথা তথা। কথাটা সত্য না হইলেও, তর্কের খাতিরে ধরিলাম, ম্যালেরিয়া, বসন্ত, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি যে যে ব্যাধি ব্যাপক-ভাবে হয়, তাহার প্রতীকার করা আমাদের সকল সময়ে ব্যষ্টির সাধ্যায়ত্ত নহে; কিন্তু, ডিস্‌পেপসিয়া, ডায়াবিটিজ, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি প্রত্যেকটিই ব্যক্তিগত দোষ-ত্রুটির ফল; এগুলিও আমরা নিবারণ করিতে পারি না;—তাহারও কারণ, ঐ অজ্ঞতা।

দীর্ঘকায়, সবল, "দোহারা," সুস্থদেহ বাঙ্গালী—আজ প্রত্যেক পাড়াতেও একটা মিলে কি না সন্দেহ! ছেলেরা রোগা ও রুগ্ন; যুবকরা স্বল্পদৃষ্টি, ক্ষীণকায় ও রোগপ্রবণ; স্ত্রীলোকরা অম্ল বা ডিস্‌পেপসিয়াগ্রস্তা;—এই ত আজ বাঙ্গালীর অবস্থা! আজ স্বাস্থ্য কোথায়? এখন অঙ্কের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, অস্বাস্থ্য বাঙ্গালা; রোগা ও রুগ্ন বাঙ্গালী।

একবার বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীকে ছাড়িয়া পাশ্চাত্য দেশের লোকদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাউক। যে জাতিকে আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়া আমরা তুচ্ছ জ্ঞান করি, যে জাতির 'বেণেতিবুদ্ধির' দোহাই দিয়া আমরা টিট্‌কারী করি, যাহাদের ভোগের লালসাকে আমরা নিন্দা করিলেও মনে প্রাণে নিজস্ব করিতে ক্রটি করি নাই, সেই পাশ্চাত্য জাতির ইতিহাস কি? স্বাস্থ্য বল, মানসিক বৃত্তি বল, চরিত্র বল—সবই তাহাদের আছে এবং বেশী মাত্রায় আছে। পাশ্চাত্য জাতিরা স্বাস্থ্যের মূল্য বুঝে, আবশ্যক হইলে পয়সা খরচ করিয়া স্বাস্থ্য ক্রয় করিতেও পশ্চাৎপদ হয় না। "স্বাস্থ্য ক্রয়" করার কথা শুনিয়া অনেকে হয় ত আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন এবং হয় ত হাসিবেন। "স্বাস্থ্য ক্রয় করা" অর্থে এই বুঝিতে হইবে যে, স্বাস্থ্য অটুট রাখিবার জন্য যত ব্যয়ই হউক, অকুণ্ঠিতচিত্তে তাহা করিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। এই জন্য পাশ্চাত্যরা কি খাইতে আছে ও কি খাইতে নাই, কেমন করিয়া ছেলে মানুষ করিতে হয় প্রভৃতি সম্বন্ধে পুস্তক ক্রয় করিয়া, বক্তৃতা শুনিয়া, সুচিকিৎসকের নিকটে বারম্বার পরীক্ষা করাইয়া যত উপায়ে সম্ভব, তাহা জানিয়া সেইমত কায করেন। শরীর খারাপ হইলে তাঁহারা চিকিৎসা ত করানই, পরন্তু যাহাতে শরীর খারাপ না হয়, তদুদ্দেশ্যে অনেকে বৎসর বৎসর সুচিকিৎসক দ্বারা স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান। মাঝে মাঝে ছুটী লইয়া বিদেশে যাইয়া হাওয়া খাইয়া শরীরকে তাজা করেন। তাঁহারা পরের বাড়ীতে বাস করিলেও নিজের গাঁটের কড়ি ব্যয় করিয়া সেই বাড়ীখানিকে ইন্দ্রপুরীতুল্য করিয়া রাখেন। আর আমাদের দেশের ধনীরা আবর্জ্জনার মধ্যে বাস করিয়া সেই সব ভাল যায়গার ভাল বড় বাড়ীগুলি সাহেবদিগকে ভাড়া দিয়া ভাড়া খাওয়াটাই পরমার্থ জ্ঞান করেন।

পৃথিবীতে যত রকম জীব আছে, তন্মধ্যে মানব-শিশুর মত অসহায় অবস্থায় কেহই জন্মায় না। এই জন্য মানব-শিশুর প্রতিপালনে ভুলচুক হইলে ছেলেবেলাতেই অনেক শিশু মারা যায় এবং যাহারা সেই সকল ফাঁড়া কাটাইয়া উঠে, তাহাদের দেহের বনিয়াদ তেমন মজবুৎ হয় না। কাযেই উত্তরকালে যত অকর্ম্মণ্য, ক্ষীণ, রুগ্ন ও স্বল্পায়ু শিশুই আমরা সমাজকে দিয়া যাই। যত দিন একান্নবর্ত্তিতা আমাদের মধ্যে ছিল এবং প্রত্যেক গৃহস্থ গাভীর সেবা করিতেন, তত দিন আমাদের শিশুপালন সম্বন্ধে ততটা কষ্ট ছিল না। কারণ, বর্ষীয়সীরা বহু শিশুপালন করিয়া শিশুপালন সম্বন্ধে এক রকম মোটামুটি জ্ঞানসঞ্চয় করিতে পারিতেন। তাহা হইলেও সে জ্ঞান কতকটা ধোঁয়াটে জ্ঞান ছিল—সে জ্ঞানের মূলে অভিজ্ঞতা থাকিলেও মূলতথ্য তাঁহাদিগের সকলের জানা ছিল না। এই জন্য প্রায়ই দেখা যায় যে, যত দিন শিশুরা নিজ নিজ শারীরিক অবস্থা বুঝিয়া চলিতে না শিখে, তত দিনই তাহারা উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া ভোগে; ক্রমে তাহারা যত বড় হয় ও তাহাদের জ্ঞানবুদ্ধি বাড়ে, তাহারা তত কম ব্যারামে ভোগে। জন্ম হইতে ৫।৬ বৎসর বয়স—এই কালটুকু শিশুদের পক্ষে মারাত্মক কাল। অথচ শিশুর দেহ, শিশুর স্বাস্থ্য, শিশুর খাদ্য প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়ে ঘোর অজ্ঞ থাকিয়া এ দেশের মেয়েরা জননীর দায়িত্ব ঘাড়ে লইয়া বসেন। না পিতা, না মাতা, না স্বামী, না শ্বশুর-শাশুড়ী—কেহই এই গুরু বিষয়ে কন্যা বা বধূকে এতটুকু শিখাইবার চেষ্টা করেন! দেশের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানেও নারীদিগকে মাতৃত্বের অনুকূলে শিক্ষা দিবার কোন আয়োজনই নাই! পুরুষের পক্ষে পিতৃত্বটা তাঁহার জীবনের অপ্রধান ঘটনা হইলেও রমণীর পক্ষে মাতৃত্বই তাঁহার জীবনের সার্থকতা—এ কথা আমরা ভুলিয়া যাই কেন?

আজ তাই দেশবাসীকে কতকগুলি কথা ভাবিতে বলি। এ সকল কথা অনেকবার অনেক রকমে পূর্ব্বে বলিয়াছি—ফল যে কিছু হয় নাই, তাহা বলিতে পারি না। দেশের মধ্যে একটু হাওয়া ফিরিয়াছে; চারিদিকে স্বাস্থ্যকথা শুনিবার আগ্রহও বাড়িয়াছে। খাদ্য সম্বন্ধে যত লিখিয়াছি, তাহার দশ গুণ বক্তৃতাও করিয়াছি। আজ বায়ু কতকটা অনুকূল বলিয়া গোড়ার কথা দুই একটা বলিতে চাই। প্রবন্ধ পড়িয়া বা বক্তৃতা শুনিয়া হুজুকে মাতার মত দুই এক দণ্ড এ বিষয়ের আলোচনা করিলে ফল হইবে না। বাস্তবিক আমি ভাবিয়া পাই না, কোন্ প্রাণে ও কি সাহসে আমার রোগজর্জ্জরিত দেশের ভাই-ভগিনীরা রোগের কথা ও স্বাস্থ্যরক্ষার কথা অবহেলার সঙ্গে শোনেন! তাঁহারা শুনুন আর নাই শুনুন, আমার কর্ত্তব্য করিয়া যাই।

গত মহাযুদ্ধের সময়ে কি স্ত্রীলোক, কি পুরুষ, কি পণ্ডিত, কি মূর্খ—সকলেই যুদ্ধের কথা অত্যন্ত আগ্রহ করিয়া শুনিয়াছেন ও পড়িয়াছেন। সেই জন্য এখন বোধ হয়, যুদ্ধের ভাষায় এই স্বাস্থ্যকথা বুঝাইলে সকলেরই সহজে তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে।

যুদ্ধে থাকে দুই পক্ষ—এক পক্ষ আত্মরক্ষায় নিযুক্ত, অপর পক্ষ আক্রমণে ব্যস্ত। আমরা আত্মরক্ষায় নিযুক্ত, রোগ বা রোগজীবাণুরা আমাদিগকে আক্রমণে উদ্যত—কাযেই রোগ আমাদের শত্রু। যুদ্ধে জয়ী হইতে হইলে তিনটি কায করা চাই,—প্রথম শত্রুর বল-বিক্রম, শত্রুর দুর্ব্বলতা, শত্রুর আশ-পাশ প্রভৃতি সম্বন্ধে নিখুঁতভাবে তথ্য সংগ্রহ করা চাই। শত্রুর সম্বন্ধে সকল রকম জ্ঞানসঞ্চয় করাই প্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান কায। জ্ঞানই পরম অস্ত্র, অজ্ঞতাই মৃত্যুর ফাঁদ। দ্বিতীয়, নিজের ঘর-দ্বার সামলান। উত্তম দুর্গ, পরিখা বা প্রাকার দ্বারা নিজ ঘর-দ্বারকে দুর্ভেদ্য করিয়া রাখিতে হয়। তাহা ছাড়া কামান প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারাও ঘর-দ্বারকে রক্ষা করা চাই। তৃতীয়, অগ্রসর হইয়া শত্রুর শিবির পর্য্যন্ত ধাওয়া করিয়া যাইতে হয়—যাহাতে শত্রু আমার ঘরের দিকে আদপে অগ্রসর হইতে না পারে। মোটামুটি শত্রুনাশের এই তিনটি উপায় গত মহাযুদ্ধের সময় হইতে সকলেই অবগত আছেন।

এখন যুদ্ধের কথা ছাড়িয়া, আমাদের দেহের কথা ধরা যাউক। আমাদের দেহ হইল আমাদের যথা-সর্ব্বস্ব—ঘর বল, বাড়ী বল, অর্থ বল, সামর্থ্য বল, মান বল, সম্ভ্রম বল—এই দেহই একাধারে সব। রোগ হইল আমাদের শত্রু। কাযেই রোগের হাত হইতে দেহকে রক্ষা করিতে হইলে অর্থাৎ রোগে না পড়িয়া সুস্থ ও সবল থাকিতে হইলে—আমাদের কর্ত্তব্য ঐ পূর্ব্বোক্ত তিনটি উপায় অবলম্বন করা। যথা,—প্রথমতঃ, শত্রুর (রোগের) সকল তথ্য সংগ্রহ করা, অর্থাৎ কি কি করিলে রোগে পড়িতে হয়, তাহা জানা। রোগটা আমাদের শরীরের একটা অস্বাভাবিক অবস্থা। "অস্বাভাবিক" অবস্থাটা ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, শরীরের "স্বাভাবিক" অবস্থাটাকে আগে বোঝা দরকার। এতদর্থে মোটামুটি "অ্যানাটমী ও "ফিজিওলজী" সকলেরই কিছু কিছু জানা চাই। খুব সহজ ভাষায়, মোটামুটি শারীর তত্ত্ব বা অ্যানাটমীর বহু পুস্তক স্বল্পদামে পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া, "ম্যানিকিন্ অ্যাটলাস্" নামে ২।০ টাকা দামের খুব সুন্দর সারা দেহের গঠনের ও যন্ত্রপাতির অতীব সুন্দর চিত্র কিনিতে পাওয়া যায়। এই চিত্রগুলি শুধু উল্টাইয়া পাল্টাইয়া একবার দেখিলেই অ্যানাটমী পড়ার কায অনেকটা হয়। কিন্তু হায়! সেই মনোবৃত্তি, সেইটুকু অনুসন্ধিৎসাও কি এ দেশীয় জাতির আছে? অ্যানাটমী-ফিজিওলজী কোনও বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকাভুক্ত নহে। অথচ, পাশ্চাত্য দেশে, ছেলেরা যাহাই পড়ুক না কেন, তাহারা সেই সঙ্গে ঐ বিদ্যা এক রকম শৈশব হইতেই শিখে। Domestic Economy Readers (Longman Green & Co.) নামক এক রকম পাঠ্য পুস্তক দেখিয়াছিলাম, তাহাতে ঐ সব কথা বেশ জলের মত ভাষায় লেখা আছে। এ দেশের কোনও পাঠ্যপুস্তকে ঐ সব শিখাইবার বালাই নাই! তথাপি, ম্যাট্রিকুলেশন শ্রেণীর ছাত্ররা বুঝিতে পারেন, এমন সরল ইংরাজী ভাষায়, একখানি স্বাস্থ্যপুস্তক রচনার কালে, আমি তন্মধ্যে প্রচুর চিত্র-সম্বলিত অ্যানাটমী ও ফিজিওলজীর স্থূল কথাগুলি সংযোজিত করিয়াছি। সেখানির নাম দিয়াছি, "ম্যাট্রিকুলেশন হাইজীন্।" "ফিজিওলজীর" বাঙ্গালা অনুবাদ—শারীরতত্ত্ববিধান। অর্থাৎ, দেহের সুস্থাবস্থায়, কোন্ কোন্ উপাদান কি কি কায করে, তাহাই ফিজিওলজীতে বর্ণিত থাকে। পাঠকালে, লোমহর্ষক কোনও নাটক-নভেলের অপেক্ষা ফিজিওলজী কম চিত্তাকর্ষক নহে। সহজ কথায় ইংরাজীতে নানা রকমের ফিজিওলজী পাওয়া যায়। যেমন, Huxley, Foster, Sterling, Hill প্রভৃতি প্রণীত। সাধারণ পাঠাগারে, ঐ সকল পুস্তক থাকা খুব উচিত। যাহাতে সামান্য শিক্ষিতা মেয়েরাও কিছু কিছু অ্যানাটমী ও ফিজিওলজী জানিতে পারেন, তাহার উপায় করা খুব উচিত। পল্লীগ্রামে ও সহরে পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। মাংস খাইবার আগে, পাঁঠার দেহের ভিতরটা তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া লইলেও কত শিক্ষা হয়! কিন্তু ঐ যে বলিতেছিলাম—সে চেষ্টা কি কাহারও আছে? অথচ, জ্ঞান না লাভ করিলে কখনও ব্যারামের সঙ্গে যুদ্ধ করা যায় না।

যুযুৎসুর পক্ষে দ্বিতীয় কর্ত্তব্য—ঘর-দ্বার সামলান। ব্যারামের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইলে, স্বাস্থ্যতত্ত্বানুমোদিত উপায়ে জীবনযাত্রা করা চাই। তদর্থে দেহের প্রতি, বাটীর প্রতি, বাটীর প্রত্যেক ঘরের প্রতি, বাটীর আশ-পাশের প্রতি যাহা যাহা কর্ত্তব্য, তাহা ত করিতেই হইবে। সেই সঙ্গে, প্রথমে প্রতিবেশিগণকে ও তৎপরে পল্লীর ও গ্রামের সকলকে সঙ্গে লইতে হইবে। অর্থাৎ, যদি আমি সাবধান হই, কিন্তু আমার প্রতিবেশী, পল্লীবাসী ও গ্রামবাসীরা আমার মত সাবধানে না থাকেন, তবে শুধু আমার সতর্কতায় বেশী কিছু কায হয় না। এখন লোকসংখ্যা, যানাদি ও লোকচলাচল এত অধিক মাত্রায় বাড়িয়াছে ও বাড়িতেছে যে, এখন "একালষেঁড়ের মত" আপনার গর্ব্বে স্বতন্ত্র থাকিয়া, সমাজে সুস্থ হইয়া বাঁচা এক প্রকার অসম্ভব। সেকালে "বামুনপাড়া" ও "ডোমপাড়া" এক যোজন ব্যবধানে থাকিতে পারিত, এবং "বামুন" ও "ডোমের" পরস্পর দেহের ছায়াপাতের দূরত্বের মধ্যেও আসা অসম্ভব থাকিলেও, এ কালে আর তাহা হইবার যো নাই। এখন ছত্রিশজাতি দিনের মধ্যে ছত্রিশবার

ছত্রিশকারণে এত ঘনিষ্ঠভাবে যানে, আদালতে, ষ্টেশন প্রভৃতিতে গা-ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া মিলিতে বাধ্য হয় যে, এখন সমাজে প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির কর্ত্তব্য, এই কথাটি মনে প্রাণে অনুভব করা যে, এখন তাঁহাদেরই উপরে সমগ্র জাতিটার শিক্ষার গুরুভার স্বয়ং ভগবান্ কর্ত্তৃক ন্যস্ত। অর্থাৎ আমি নিজে স্বাস্থ্যতত্ত্ব শিখিলে ও স্বাস্থ্যানুমোদিতভাবে থাকিলেই যথেষ্ট হইল না—সেই সঙ্গে আমার প্রতিবেশীকে, পল্লীবাসীকে ও ক্রমশঃ সমগ্র গ্রামবাসীকে তদ্রূপ করিতে লওয়ান আমার কর্ত্তব্য। ভালবাসায়, স্নেহে, শ্রদ্ধায়, মায় খোসামোদ করিয়া,—কথায় যাহাকে বলে, "ছলে, বলে, কলে-কৌশলে" সকলকেই স্বাস্থ্যানুমোদিত পন্থা অবলম্বন করিতে লওয়ান এখন হইতেছে আমাদের বাঁচিবার দ্বিতীয় পন্থা। তজ্জন্য বক্তৃতা, ছায়াচিত্র প্রদর্শন, ব্যবহারিকভাবে কায করিয়া, সংঘবদ্ধ করিয়া, অর্থব্যয় বা গতর খাটান—নানারকম উপায়ে কায করিতে হইবে। এটিও শিক্ষিতদের কর্ত্তব্য।

যুদ্ধে জয়ী হইবার তৃতীয় উপায়—ঘরে বসিয়া শত্রুকে প্রতীক্ষা না করিয়া, অগ্রসর হইয়া, শত্রুর শিবিরের দ্বারে যাইয়া তাহাকে উৎসন্ন করা। শত্রুর শিবিরে যাইতে হইলে, শত্রুর দেশের ও শিবিরের অবস্থা জানা থাকা চাই, শত্রুর বলাবল জানা থাকা চাই। কাযেই ব্যারামের কারণভূত যে যে জীবাণু, তাহাদিগের সম্বন্ধে সকল তথ্য জানিয়া, যাহাতে জীবাণুরা বাঁচিয়া থাকিতে না পারে, যাহাতে তাহারা বংশবৃদ্ধি করিতে না পারে, তৎসমুদয় করা চাই। বলা বাহুল্য যে, "জীবাণুরা" অধিকাংশ ব্যারামের কারণ হইলেও, সকল ব্যারাম জীবাণুঘটিত নহে। খাওয়ার দোষে, কদভ্যাসের ফলে, শরীরে অন্য কোন প্রকারে বিষ ঢুকিলেও ব্যারাম হয়। সে সকল কথার আলোচনা আর এ প্রবন্ধে করিব না।

আমরা এ পর্য্যন্ত যত কথা বলিয়াছি, সকল কথা বেশ বুঝিয়া প্রণিধান করিলে দেখা যায় যে, রোগ-নিবারণের সকল উপায়ের মূলে সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা—জ্ঞানসঞ্চয় করা। দেহের গঠন কি, তাহা প্রথমে জানা চাই। সেটা না জানিলে, দেহের সুস্থাবস্থায় কায কি ভাবে চলে (অর্থাৎ দেহের ফিজিওলজী), তাহা বুঝিতে পারা যাইবে না। দেহের ফিজিওলজী না বুঝিলে, দেহের সুস্থাবস্থা কি, তাহার সম্যক্ ধারণা হইবে না। দেহের সুস্থাবস্থা কি, তাহা জানা না থাকিলে, রোগ কখন্ কি আকারে দেহকে আক্রমণ করে, তাহা বুঝা যাইবে না। কাযেই জ্ঞানসঞ্চয়ই গোড়াকার কথা।

তাহার পরে, শুধু নিজে জ্ঞান লাভ করিলেই যথেষ্ট হয় না। দ্বারে দ্বারে ঘাড়ে করিয়া, যেন তেন প্রকারেণ সেই জ্ঞান বিতরণ করিয়া চারিদিকের লোককে শিখাইতে হইবে, নতুবা নিস্তার নাই। তাহার পরে রোগ ও রোগের কারণ জানিতে হইবে। রোগজীবাণুদের আবাসস্থান, অভ্যাস প্রভৃতিও জানিয়া লইতে হইবে। কাযেই জ্ঞানলাভ গোড়ার কথাও বটে, আবার শেষের কথাও বটে। তবুও এখন সব শেষের কথা বলি নাই। সেইটাই আসল কথা—সেটা, মাঝে মাঝে নিয়ম করিয়া স্বাস্থ্য-পরীক্ষা করান।

বাড়ী যেমন মাঝে মাঝে সারাইতে হয়, ঘড়ী যেমন মাঝে মাঝে মেরামত করিতে হয়, বৎসরান্তে জমা-খরচের যেমন কৈফিয়ৎ কাটিতে হয়, তেমনই প্রত্যেক বৎসরান্তে সমস্ত শরীরটারও একবার হিসাব-নিকাশ লওয়া খুবই উচিত। পাশ্চাত্যদেশীয়রা "গতরের" মূল্য বুঝেন বলিয়া, বহু লোকই নিয়মিতভাবে এটা করেন। আর এ দেশে "তুচ্ছ দেহটার" জন্য আমরা কিছুই করি না বলিয়া, আজ বাঙ্গালাদেশে অ-বাঙ্গালীরা বাঙ্গালীকে চাকর রাখিতেছে! প্রত্যেক বৎসরান্তে "ভাল" থাকিলেও, সমগ্র দেহের পরীক্ষা করিলে, সময় থাকিতে অনেক ব্যারাম অঙ্কুরেই চিকিৎসিত হয়, অনেক দোষ-ত্রুটি সামান্যাবস্থা হইতেই সংশোধিত হয় এবং দেহের উৎকর্ষলাভের দিকে একটা চেতনা জন্মায়। আমরা যদি ঐ ভাবে দেহপরীক্ষা করাই, তাহা হইলে বৎসর বৎসর পরীক্ষার ফল দেখিতে দেখিতে শরীর-সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা আপনা হইতেই আসে, কি করিলে, কি খাইলে, কোথা যাইলে শরীর বলিষ্ঠ, কর্ম্মঠ ও নীরোগ হয়, তাহা করিবার জন্য প্রেরণাও সেই সঙ্গে আসে, এবং নিজের শরীরের দিকে দৃষ্টি পড়িলেই, বাটীর ছেলে-পুলে, মায় দাস-দাসীর স্বাস্থ্যের দিকেও দৃষ্টি পড়ে, ফাঁকি দিয়া জাতিটার স্বাস্থ্যের উন্নতির পথ মুক্ত হইয়া যায়। রীতিমত স্বাস্থ্য-পরীক্ষার ফল বারম্বার দেখিতে দেখিতে মনে স্বতঃই প্রশ্ন উঠে—"আমি রোগা কেন? আমি খর্ব্বাকৃতি কেন? আমি স্বল্পায়ু কেন? অর্থাৎ আমার কোন্ ত্রুটির ফলে আমি মানুষ হইয়াও মানুষের মত মানুষ হইতেছি না?" তখন আর "ঐ রকমই আমাদের দেহের আড়া; আমরা রোগা ও রুগ্ন ত বটেই; ওটা হয়েই থাকে; এটা আমার বরাতের দোষ;" এই সব কথা—সব জিনিষটাকেই অকারণে মানিয়া লওয়া ও সেই মনোবৃত্তি অনুসারে গোঁজামিল দিয়া চলাটা বন্ধ হইয়া যায়। আমরা ভাবিতে শিখি, অনুকূল অবস্থাকে মাথা পাতিয়া না লইয়া তদ্বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইতে পারি।

এ কথার জলন্ত দৃষ্টান্ত, বর্ত্তমান সময়ে ছাত্রদিগের স্বাস্থ্য-পরীক্ষার ফলে কেমন চারিদিকে ছাত্রস্বাস্থ্য-সম্বন্ধে সাড়া পড়িয়াছে ও সুফলও ফলিয়াছে। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে সমগ্র ভারতবর্ষের

নাগে এই কাযের আমিই পথ দেখাই ও স্যাডলার কমিশনকে বিশেষ করিয়া এই দিকে মনোযোগ দিতে বলি! আজ যদিও স্যাডলার কমিশনের সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য হইয়াছে, কিন্তু উল্টা-ভাবে। অর্থাৎ আমি চাহিয়াছিলাম, স্কুলের ছাত্রদিগের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া তাহাদিগের জন্য নানা রকম খাদ্য ও ব্যায়াম-কসরতের ব্যবস্থা প্রভৃতি দ্বারা মানুষ করিয়া তুলিতে; আর আরম্ভ হইল কি না শিক্ষাজীবনের লেজের দিকে! যাহা হউক, তাহাতেও ফল ফলিয়াছে, সেইটাই পরম লাভের ও সুখের বিষয়। এই ভাবে, ঘরে ঘরে, জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে বয়স ও স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে স্বাস্থ্য-পরীক্ষার প্রবর্ত্তনা হউক!

যে বস্তুটি আমাদিগের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা নিকট ও প্রিয়, সেই দেহ রীতিমত পরীক্ষা করানর সুফল যে কতদূর প্রসারী, তাহার আভাস দিয়াছি। কিন্তু এ দেশে সে কথা বলার সময় আসিয়াছে কি না, জানি না। কারণ, পাছে প্রস্রাব-পরীক্ষান্তে ডাক্তার বলেন যে, ডায়াবিটিজ বা মধুমেহ ধরিয়াছে—সেই ভয়ে অনেক তথাকথিত "শিক্ষিত" ব্যক্তিও প্রস্রাব পরীক্ষা করান না! পাছে "ক্ষয়কাস" ধরিয়াছে, এই কথা চিকিৎসকের মুখে উচ্চারিত হয়, এই ভয়ে অনেকে ব্যারাম চাপিয়া নিজের সর্ব্বনাশ ত করেনই, পরন্তু অপরেরও সর্ব্বনাশ করেন! অথচ সকল ব্যারামই প্রথমাবস্থায় যত সহজে জব্দ হয়, একটু বাড়িয়া গেলে অনেক স্থলে আর তেমন হয় না! কাযেই রীতিমতভাবে বৎসরান্তে সকল ব্যক্তির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান যে কত বুদ্ধিমানের মত কায, তাহা আর বুঝাইতে হইবে না। ঐ ভাবে স্বাস্থ্য-পরীক্ষার ফলে অনেক ব্যারাম ধরিতে পায় না, বহু ব্যাধি অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয় এবং সময়ে সুব্যবস্থার ফলে পরমায়ু বাড়ে, কর্ম্ম-শক্তির উপচয় হয়—এক কথা, বাঁচার ষোল আনা সার্থকতা হয়।

নানারূপ বীমার (Insurance) কারবারের মধ্যে Health Insurance বা স্বাস্থ্যবীমা কোম্পানী স্থাপিত হওয়া প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। এরূপ কোম্পানী বাৎসরিক স্বাস্থ্য-পরীক্ষার ভার লইবেন, আবশ্যক উপদেশ দিবেন এবং স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য ব্যয়ভূষণ করিবেন। এ দেশে বহুসংখ্যক পাশ-করা চিকিৎসক সহরে গুঁতাগুঁতি করিয়া সুবিধা করিতে পারিতেছেন না; তাঁহারা এ বিষয়ে একটু ভাবিয়া দেখিবেন কি? কারণ, সহরে একটা সৎকার্য্য প্রারব্ধ হইলে মফঃস্বলে তাহার অনুকূল হাওয়া বহিতে বিলম্ব হয় না।

শ্রীরমেশচন্দ্র রায় (এল, এম, এস)।

কদম্ব

সরণির প্রান্তে ঐ সঙ্গিহীন কদম্বের চারা
আষাঢ়ের মেঘচ্ছায়ে আর্দ্রবায়ে কাঁপে দিশাহারা;
প্রান্তরের পথ বেয়ে জনস্রোত ছুটে অবিশ্রাম
গ্রামান্তে হাটের কাজে; চাঞ্চল্যের নাহিক বিরাম।

এত কাছে তবু কেহ কোনও দিন চক্ষু তার তুলে'
অবান্তর বৃক্ষপানে অবজ্ঞায় চাহে নাক ভুলে'।
বর্ষা নামে, বর্ষা থামে; ফুল ফুটে, ফুল ঝরে যায়,
শ্যামল পল্লব কাঁপে বর্ষে বর্ষে বিচিত্র ব্যথায়।

কেহ চাহেনিক তারে, আপনি সে প্রয়োজন-হীন
বাড়িয়াছে পথিপার্শ্বে প্রকৃতির অনুজ্ঞা-অধীন;
নাহি তার শস্য জল, উদাসীন তাই যত প্রাণী
চাহে না তাহার পানে করুণার অপব্যয় মানি'।

আসন্ন আষাঢ় মেঘে যে দিন ঘনায়ে আসে ছায়া,
সজল বাদল বায়ে কাঁদে দিক্ অবলুপ্ত কায়া;
সে শুধু কুটায় ফুল অবিশ্রান্ত ধারাজলে ভিজে
শ্যাম বনভূমি-বক্ষে না বুঝি নিজের ব্যথা কি যে!

সে দিন নাহিক আর, মনে যবে ফুটিত মুকুল!
আদিম মানব মর্ম্মে, কদম্ব ছিল না শুধু ফুল!
বরষার শ্যামাঞ্জন সমারোহ প্রকৃতিরই সাথে
হৃদয়ে বাঁধিত বাসা যে দিন উদার বেদনাতে।

শাখায় নাচিত শিখী পাখায় আঁকায়ে ইন্দ্রধনু,
কদম্ব-কেশর সাথে ভরিয়া উঠিত বরতনু
নেহারি বিটপী পানে ব্যাকুলিত ব্রজ-বালিকার,
ঝুলিত ঝুলন-দোলা কুঞ্জে কুঞ্জে বৃন্দা বিশাখার।

সত্য হোক্ মিথ্যা হোক্ নিরঙ্কুশ কবির রচনা
মানি তাহা; রাধাশ্যাম-রস-কথা হয় ত কল্পনা!
মুরলীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে কি সুর ফুটিত নাহি জানি,
যমুনার জলধারা বহিত না বহিত উজানী।

আনন্দ ফুরায়ে গেছে অন্তরের বৃন্দাবন সাথে,
এ কথা পরম সত্য, বুঝিয়াছি আজি বেদনাতে।
কদম্ব সে পুষ্প মাত্র, বাঁশী সে ত শত ছিদ্র-ভরা,
ভাণ্ডীর বিলুপ্ত আজি—ভাঁটির জঙ্গলে পূর্ণ ধরা।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

মরীচিকা

১

কলিকাতার সুদীর্ঘ রাজপথের এক পার্শ্বে এক অন্ধ পেটের উপর একটি মাটীর হাঁড়ি রাখিয়া তাহার উপর তবলার তাল তুলিয়া গাহিতেছিল,—

"ওরে পাগল মন,
সংসারে নেই আপন জন রে
যতই ভাবিস আপন আপন।"

আশ্রয়হীন, কপর্দ্দকশূন্য, তিন দিন উপবাসী, শ্রান্ত মনোজকুমার সহসা থমকিয়া দাঁড়াইল।

অন্ধের কণ্ঠোত্থিত অপূর্ব্ব সঙ্গীত-সুধার অন্তরালে কি গভীর সত্য সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে!

সংসারে আপনার বলিতে কে আছে? প্রকৃত সহানুভূতি কোথায়? প্রাণস্পর্শী দরদ শুধু কবির কল্পনা নহে কি? তাহা না হইলে আজ—

"মনোজ!—"

সহসা চিন্তাজাল ছিন্ন হইল। ফিরিয়া চাহিয়াই সে ক্লান্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"কে?—দাদা!"

"হাঁ ভাই, এখানে দাঁড়িয়ে কেন?"

উত্তর দিতে গিয়া মনোজ ওষ্ঠে ওষ্ঠ চাপিয়া ধরিল।

কনিষ্ঠের মুখের দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া জ্যেষ্ঠ তাহার একখানি হাত ধরিয়া স্নেহকোমল কণ্ঠে বলিলেন,—"ভাই, চল, বাড়ী যাই।"

"না দাদা, সেখানে আমার স্থান নেই!"

পঙ্কজকুমার তাহার অপেক্ষা বিশ বৎসরের বড়! মনোজ মেদিনীপুর পরিত্যাগ করিবার পর-মুহূর্ত্তেই জ্যেষ্ঠ ব্যাকুল-হৃদয়ে তাহার অন্বেষণে কলিকাতা অভিমুখে রওনা হইয়াছিলেন।

"ছিঃ, ভাই! তাঁর কথায় তুমি বিরূপ হ'চ্ছ! জান, তিনি আমাদের কত স্নেহ—"

"তা হ'তে পারে, দাদা! কিন্তু বিনা প্রমাণে তিনি আমায় লম্পট—ছিঃ!—দাদা! আমায় ক্ষমা কর।"

আশৈশব পিতৃভক্ত পঙ্কজকুমার পিতার আদর্শে দৃঢ় আস্থাবান্। তাই, মনোজের এই উক্তিতে তাঁহার মন ব্যথিত হইল। কিন্তু মনের চাঞ্চল্য দমন করিয়া তিনি শুধু সজোরে মনোজের হস্তদ্বয় চাপিয়া ধরিয়া আবেগভরে বলিয়া উঠিলেন,—"মনোজ! পিতামাতার উপর দোষারোপ করবার অধিকার আমাদের নেই।"

মনোজের ক্ষুব্ধ অন্তর যেন ভৎসনার তীব্র কশাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল। কম্পিত ওষ্ঠাধরকে সে অতিকষ্টে সংযত করিয়া বলিল,—"তা হ'তে পারে দাদা, কিন্তু ভগবানের দেওয়া এই হৃদয়কে এতখানি কলুষিত ব'লে প্রচার করবার অধিকারও কি তাঁর আছে?"

"আমার বিশেষ অনুরোধ, মনোজ, একবার তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে আয়!"

"না—দাদা—না! আমি গৃহতাড়িত! তাঁর ইচ্ছানুযায়ী আমি আমার সেবাব্রত ত্যাগ করতে পারব না;—না—কিছুতেই না।"

পঙ্কজকুমারের অসীম ধৈর্য্যও যেন সহসা টলিয়া উঠিল! এই মনোজকুমারকে তিনি আশৈশব বুকে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছেন; আজও তাহার শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য তাঁহার কত চিন্তা, কত উৎকণ্ঠা! তাহার এই অশিষ্ট উক্তি? এ যুগের শিক্ষার কি এই পরিণাম?

পিতা কেন তাহার উপর বিরূপ হইয়াছেন? করুণার স্নেহশীতল প্রস্রবণ তিনি, জ্ঞানী, পণ্ডিত—সংসার-সমুদ্রে বহু ঝঞ্ঝাবাত্যা তিনি বুক পাতিয়া লইয়াছেন! তাঁহার অসাধারণ ধর্ম্মপ্রাণ অন্তর কখনও কি সেবাধর্ম্মের বিরোধী হইতে পারে? কেন তিনি এই সেবকদলের সহিত সংস্রব ত্যাগ করিবার জন্য মনোজকে এমন নিষ্ঠুরভাবে নিষেধ করিয়াছেন? অপরিণতবুদ্ধি যুবক তাহা কি একবারও বুঝিবে?

সেবকদলের য়ুরোপীয়া বা য়ুরেশীয়া যৌবনমদদৃপ্তা সেবিকাগণের সহিত অবাধ মেলামেশার ফলে অপরিণতবুদ্ধি তরুণ যুবকের নৈতিক চরিত্র অক্ষুণ্ণ থাকা সম্ভবপর কি?

পিতা তাঁহার অবশ্য-কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন—সন্তানকে নিশ্চিত ধ্বংসের পথ হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে রূঢ়তার অভিনয় করিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার—

"দাদা, আমি চল্লাম!"

সহসা গুরুগম্ভীর নাদে গগনমণ্ডল আলোড়িত হইয়া উঠিল। শ্রাবণের মেঘরাশি দৈত্যের ন্যায় আকাশের বুকের

উপর দ্রুততরবেগে ছুটিতে লাগিল। নিদারুণ ঘূর্ণিবায়ু বাগার ধূলিরাশিকে উড়াইয়া দিয়া, দৃষ্টিকে তমসাচ্ছন্ন করিয়া তুলিল। পঙ্কজকুমার অতি কষ্টে চক্ষু বাঁচাইয়া মনোজের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"না—না মনোজ!"

হঠাৎ প্রবল-ধারায় বৃষ্টি নামিয়া আসিল—কড়-কড় শব্দে একটা দারুণ বজ্রনির্ঘোষ যেন শ্রবণেন্দ্রিয়কে বধির করিয়া ফেলিল।

পঙ্কজকুমার সন্ধ্যার সেই ভীষণ মুহূর্ত্তে দেখিতে পাইলেন, মনোজ দ্রুতগতিতে একটি গলির ভিতর ছুটিয়া গেল।

২

"হরি, তামাক দিয়ে যা।"

জমীদার হরকুমার চট্টোপাধ্যায় অধীরভাবে দ্বিতলের বারান্দায় পাদচারণা করিতেছিলেন;—কিন্তু বিক্ষিপ্ত চিত্ত কিছুতেই শান্ত হইতেছে না।

মেদিনীপুর অঞ্চলে তাঁহার অসীম প্রতাপ এবং জ্ঞানী, সুরুচি-সম্পন্ন ও সত্যনিষ্ঠ বলিয়া তাঁহার খ্যাতিও যথেষ্ট।

ভৃত্য হরিচরণ এক হস্তে গড়গড়া ও অপর হস্তে একখানি চিঠি লইয়া প্রবেশ করিতেই হরকুমার বাবু চিঠিখানিই অগ্রে হাতে লইলেন।

কাহার পত্র?

আরাম-কেদারায় ঠেস্ দিয়া বসিয়া তিনি পড়িতে লাগিলেন। গম্ভীর মুখ ক্রমশঃ আরক্ত হইয়া উঠিল। ললাটের রেখাগুলি স্ফীত, নাসারন্ধ্র কম্পিত হইতে লাগিল। অবশেষে চিঠিখানিকে বজ্রমুষ্টিতে পিষ্ট করিয়া তিনি সোজাভাবে উঠিয়া বসিলেন।

এতদূর স্পর্দ্ধা! তিনি ভ্রান্ত? সে তাঁহার ভ্রান্তি দূর করিতে চাহে? সন্তান তাঁহাকে উপদেশ প্রদান করিবার স্পর্দ্ধা রাখে?

ইহা কি যুগ-প্রগতি?—যদি তাহাই হয়, তবে ইহা অমার্জ্জনীয় অপরাধ। সন্তানকে চিরকালের জন্য হারাইতে হইলেও এবম্বিধ মনোবৃত্তির পোষকতা করা যে কোনও পিতার সাধ্যাতীত।

তাঁহার আহত অভিমানক্ষুব্ধ পিতৃস্নেহ ক্রমে জ্বলন্ত ক্রোধে পরিণত হইল, সর্ব্বাঙ্গ থর-থর কাঁপিতে লাগিল।

"বাবা, নাড়াজোলের কুমারের সঙ্গে আজ—"

"এই চিঠি প'ড়ে দেখ, পঙ্কজ!"

পিতার অস্বাভাবিক চাঞ্চল্য দর্শনে পঙ্কজকুমার বিচলিত হইয়া পড়িলেন। সাগ্রহে তিনি চিঠিখানি পাঠ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মুখ হইতে একটি কথাও নিঃসৃত হইল না।

সজোরে একবার গড়গড়ায় টান দিয়া হরকুমার বাবু বলিলেন,—"এখন কি করা যায়?"

"কি বল্‌বো বলুন? কত অনুরোধ করলাম। সে কিছুতেই আমার কথা রাখলে না।"

"সেবকদলের কর্ত্তা জোন্স তাকে একটি চাকরী ক'রে দিয়েছেন। সে তাতেই তার মেডিক্যাল কলেজের খরচ চালিয়ে নেবে। এ চিঠির উদ্দেশ্য আমাকে অপমান করা—সে যে স্বাবলম্বী, এই কথা ব'লে আমার উপর তাচ্ছীল্যের ভাব প্রকাশ করা।"

পঙ্কজকুমার নীরব রহিলেন। মনোজের সে দিনের ভাবগতি দেখিয়া প্রতিবাদের ভাষাও তাঁহার মুখ হইতে আজ নির্গত হইল না। কনিষ্ঠের তরফ হইতে তাঁহার বলিবার ত কিছুই নাই।

কিন্তু জোন্সের আশ্রয়ে রহিয়া মনোজের কি নৈতিক দুর্গতি হইবার সম্ভাবনা, তাহা কল্পনা করিতেও তিনি শিহরিয়া উঠিলেন।

"বাবা!"

"কি, বাবা!"

"আপনি একবার মনোজকে—"

"পঙ্কজ!"

সে বজ্রগম্ভীর স্বরে পঙ্কজকুমার থত-মত খাইয়া গেলেন।

"পঙ্কজ! পুত্র অপেক্ষা আমার বিশ্বাস বড়—ধর্ম্ম বড়।"

সসঙ্কোচে অতি নিম্নকণ্ঠে পঙ্কজকুমার বলিলেন,—"কিন্তু সেই কুসংসর্গে যদি সে ধ্বংসের পথে—"

"যায় যাক্! আমার সমস্ত শিক্ষাকে যদি সে এমন নিষ্ঠুরভাবে অবমাননা ক'রে উচ্ছন্নের পথে যায়, আমি কি করব? দুর্ব্বলের ন্যায় তার কাছে মিনতি জানাতে পারি নে।"

"যদি একবার আপনি শুধু—"

"পঙ্কজ! পিতারও একটা মর্য্যাদা আছে!"

পঙ্কজকুমার নির্ব্বাক্‌ভাবে বসিয়া পড়িলেন।

বহুক্ষণ নীরবে কাটিয়া গেল।

"বাবা!"

"কি পঙ্কজ?"

দারুণ অভিমানে হরকুমার বাবুর নয়নদ্বয় আর্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল।

"মনোজের বিয়ে দিলে বোধ হয়—"

"না পঙ্কজ, তা হবে না। আমি তার অন্তরকে লক্ষ্য করেছি। মন তার নিশ্চয়ই কলুষিত হয়েছে। নতুবা আমার ঐকান্তিক নিষেধ সত্ত্বেও সে সেই সেবকদলে যোগদান করবার জন্য এমন উন্মত্ত কেন? এই বিশ্ব-সংসারে কি সেবা-ধর্ম্মের আর স্থান নেই? এ অবস্থায় কোনও পবিত্রা কন্যার পাণিগ্রহণে তার অধিকার নেই।"

অকম্পিত-চরণে স্বল্পভাষী পিতা কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন।

কলিকার তামাক ও আগুন অনাদরে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল।

৩

ছোট ষ্টীমার দ্রুত চলিয়াছে। আনন্দের মলয়-হিল্লোলে যাত্রীর দল যেন দোল খাইতেছে। তাস খেলা, সঙ্গীত, পান, আহার, গল্প ও চীৎকারে তরুণ-তরুণীর দল যেন মাতিয়া উঠিয়াছে।

সেবা-সমিতির বাৎসরিক পর্ব্ব উপলক্ষে জাহাজ ভাড়া করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ গঙ্গাবক্ষে আনন্দের ফোয়ারা ছুটাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

দ্বিতলের ডেকের এক পার্শ্বে মনোজকুমার স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়াছিল। সেবা-ধর্ম্মের প্রতি প্রচণ্ড আকর্ষণ থাকিলেও এরূপ অসংযত স্ফূর্ত্তির পক্ষপাতী সে কোন কালেই নহে। তাহার আজন্ম-সংস্কার ও শিক্ষা এরূপ আচরণের ঘোরতর বিরোধী। স্ত্রী-পুরুষের এরূপ অবাধ সম্মেলন তাহার সমস্ত অন্তরকে যেন দারুণ তিক্ততায় পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু উপায় নাই! তাহার পৃষ্ঠপোষক, অন্নদাতা—যাঁহার অসীম কৃপায় সে আজ স্বাবলম্বী—পিতার বিনা সাহায্যে যাঁহার আনুকূল্যে সে এখন অতি স্বচ্ছন্দে তাহার শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করিতে সমর্থ, তাঁহাকে পরিতুষ্ট রাখিতেই হইবে। এ অনুষ্ঠানের তিনিই উদ্যোক্তা এবং পরিচালক। সুতরাং এই উৎসবব্যাপারে তাহাকে যোগদান করিতেই হইবে। কিন্তু তাহার অন্তর এইরূপ উদ্দাম ও উচ্ছৃঙ্খল—

"মনোজ!"

মিঃ জোন্সের আহ্বানে সে চমকিয়া উঠিল।

বহুকাল বাঙ্গালাদেশে অবস্থান ও ভাষাচর্চ্চার ফলে বাঙ্গালা ভাষাকে তিনি বিশেষরূপে আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাঁহার স্নেহ-শীতল হাতখানি মনোজের গলদেশে ন্যস্ত হইল।

স্নিগ্ধকণ্ঠে মিঃ জোন্স বলিলেন,—"তুমি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে কেন? Go and enjoy."

মনোজ তাহার অন্তরের আপত্তি প্রকাশ করিতে পারিল না; স্মিতহাস্যে সিঁড়ি বাহিয়া ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া গেল।

রাজগঞ্জ হইতে ফিরিতে রাত্রি হইয়া গেল। আনন্দের প্রবল আতিশয্য তখন যেন অনেকটা শান্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

মনোজ একান্তে বসিয়া গঙ্গাবক্ষে চন্দ্রালোকের বিচিত্র লীলা দর্শন করিতেছিল। অসংখ্য তরঙ্গমালার উপর চন্দ্রকরলেখা শতধা বিদীর্ণ হইয়া অগণিত রজত-কাঞ্চনের ন্যায় ঝল-মল করিতেছে।

অকস্মাৎ সে চমকিয়া উঠিল। লীলায়িত গতিতে শ্বেতাম্বরা জোন্স-কন্যা নেলি তাহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। জ্যোৎস্নালোকে মনোজ দেখিল, নেলির আবেশময় নীল নয়নযুগলে এক বিচিত্র দীপ্তি—তাহার সুন্দর আননে মধুর, স্নিগ্ধ হাস্যরেখা। সান্নিধ্যহেতু তাহার পুষ্পসারচর্চ্চিত দেহ হইতে যে মৃদু গন্ধ নির্গত হইতেছিল, তাহাতে যেন মাদকতা আছে।

মনোজের বিক্ষুব্ধ চিত্ত যেন হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিল; উত্তপ্ত শোণিতধারা সহসা বিপুল উচ্ছ্বাসে সর্ব্বাঙ্গে প্রবাহিত হইয়া গেল।

এ কি বিচিত্র অনুভূতি! এমন ত তাহার কখনও হয় নাই!

সে তাহাকে প্রত্যহ কতবার দেখিতে পায়। তাহার বাসগৃহের উপরেই তাহারা থাকে। নেলি দিনের মধ্যে কতবার আসিয়া তাহার নিকট হইতে লাইব্রেরীর পুস্তক লইয়া যায়; কিন্তু কখনও ত তাহাকে মনোজ এমন সুন্দরী দেখে নাই!

নেলি অসঙ্কোচে পার্শ্বে বসিয়া মনোজের দিকে স্থির-দৃষ্টিতে চাহিল। তার পর পরিষ্কার বাঙ্গালায় মৃদুকণ্ঠে বলিল,—"আপনার মুখ এমন বিষণ্ণ কেন?"

মনোজের বুকের ভিতরটা দুরু-দুরু কাঁপিয়া উঠিল। সে ভাবিল, এই ইংরাজ-ললনাও পিতার ন্যায় বাঙ্গালা ভাষা আয়ত্ত করিয়াছে! সে একটু দূরে সরিয়া বসিয়া মৃদুহাস্যে বলিল, "না মিস্ জোন্স, বিষণ্ণ হবার বিশেষ কোন কারণ ত নেই!"

নেলি মধুরভাবে হাসিয়া বলিল, "কিন্তু এমন নিরালায় ব'সে থাকলে, সেই কথাটাই ত আগে মনে আসে, মনোজ বাবু!"

মনোজ তরুণী নেলির দিকে চাহিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল।

৪

মনোজকুমার ডাক্তারী পাশ করিয়া ধীরে ধীরে পসার জমাইয়া লইতেছিল। রেভারেণ্ড জোন্সের চেষ্টায় ফিরিঙ্গী-মহলে তাহার প্রভূত পসারও হইয়াছিল। পিতৃগৃহের সহিত তাহার সকল সম্বন্ধই রহিত হইয়া গিয়াছিল। আত্মীয়-স্বজন বলিতে জোন্স ও তাঁহার পরিবারবর্গই এখন সে স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

নিঃসঙ্গ জীবনধারার অন্তরালে, যৌবন-পুষ্পিতা তরুণীর সুন্দর মুখখানি মাঝে মাঝে হৃদয়পটে একটা মোহ—একটা ইন্দ্রজাল রচনা করিয়া তুলে। প্রমোদোৎসবের চন্দ্রালোকিত সন্ধ্যায় নেলির বিচিত্র মাধুর্য্যপূর্ণ স্বল্পক্ষণস্থায়ী সঙ্গের স্মৃতি, মমতাপূর্ণ আলাপ-আলোচনার মোহকে সে অন্তর হইতে নির্ব্বাসিত করিতে পারে নাই।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য! দিনের মধ্যে বহুবার দেখা হইলেও সেই দিনের পর হইতে আর ত নেলির পক্ষ হইতে এমন কোন ইঙ্গিত আসিল না—যাহাতে মনোজ কোন আশা করিতে পারে। নারীর হৃদয়ের সংবাদ দুর্জ্ঞেয় সত্য, কিন্তু তাহার প্রতি নেলির এতটুকু আকর্ষণ থাকিতে পারে, ব্যবহারে ত তাহার কোনও প্রকাশই নাই!

বিশেষ কোন ডাকে আজ তাহাকে বাহিরে যাইতে হয় নাই, তাই একাকী 'ড্রয়িং-রুমে' বসিয়া মনোজকুমার আজ শুধু নেলির চিন্তাতেই সমাহিত হইয়া পড়িয়াছিল। নেলির উচ্ছল যৌবন, স্বচ্ছন্দ গতি, লীলায়িত রূপতরঙ্গ তাহার মনকে আকৃষ্ট, অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল, ইহা মনোজ অস্বীকার করিতে পারে না। নেলিকে জীবনসঙ্গিনী করিলে কেমন হয়?

"সাব!—"

ধ্যান টুটিয়া গেল। মনোজ বিরক্তিভরে বলিয়া উঠিল, "কোন্ হ্যায়?"

বেয়ারা চিঠিখানি টেবলের উপর রাখিয়া চলিয়া গেল। মনোজ পত্রখানি তুলিয়া লইল।

"পরম-কল্যাণীয়,"—নিশ্চয়ই মাতার পত্র।

ডাক্তার মনোজ একটু বিচলিত হইয়া পড়িল। জননী—গর্ভধারিণীই এখনও তাহার সংসারের একমাত্র বন্ধন। কলিকাতার মাতুলালয়ে তাহার মাতা মাঝে মাঝে আসিয়া থাকেন। তখন সে জননীকে দেখিয়া আসে—তাঁহার চরণধূলা মাথায় লইয়া এখনও সে পরম তৃপ্তি, আনন্দ ও শান্তি লাভ করিয়া থাকে।

মনোজ কম্পিতহস্তে চিঠিখানি খুলিয়া পড়িতে লাগিল,—

"বাবা মনোজ,

অনেক দিন তোর কোন সংবাদ পাই নাই। মন বড় ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে। বিনা দুঃস্বপ্নে এক রাত্রিও কাটে না। সর্ব্বদা এক শঙ্কা যে, আমার কোল হইতে কে যেন তোকে কাড়িয়া লইতেছে। বাবা, আমি তোর মা, দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধারণ করিয়াছি, আশৈশব বুকের রক্তে তোকে লালন-পালন করিয়াছি। আমার একটা কথা শোন্, বাবা! একবার আসিয়া তাঁহার কাছে ক্ষমা-ভিক্ষা কর্। তিনি তোর পিতা—জন্মদাতা—মর্ত্ত্যে জগদীশ্বর। বাহিরে তিনি রূঢ় হইলেও অন্তরে তাঁহার অসীম স্নেহ। তাঁহার সে দেহ আর নাই। জগদম্বা-মূর্ত্তির কাছে মাথা খুঁড়িয়া সর্ব্বদা যে কি বিড়বিড় করেন, বলিতে পারি না। আর বোধ হয় তাঁহাকে বেশী দিন ধরিয়া রাখিতে—"

মনোজকুমার আর পড়িতে পারিল না। তাহার দৃষ্টি

ঝাপসা হইয়া আসিল। কূল ছাপাইয়া নদীর উচ্ছল জলরাশি যেমন তটভূমি প্লাবিত করে, তেমনই ভাবে অশ্রুবন্যা গণ্ডদেশ সিক্ত করিয়া ধারায় ধারায় নামিয়া আসিল।

সত্যই কি তাহার পিতা—সুস্থ, সবলদেহ, দীর্ঘাকার বৃদ্ধের জীবনপ্রবাহ শেষ হইয়া আসিয়াছে? কিন্তু সে জন্য দায়ী কে? গৃহ-বিতাড়িত সে—পিতৃস্নেহের কাঙ্গাল সে। পিতা তাহাকে নির্ম্মমভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন; সংসার-সমুদ্রের আবর্ত্তমধ্যে সে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। স্বীয় ক্ষমতাবলে সে সকল ঝঞ্ঝাবাত্যা অতিক্রম করিয়া কোনও প্রকারে এখন কূল পাইয়াছে। তাই কি পিতা এখন তাহাকে স্নেহ প্রদর্শন করিতে উন্মুখ? কিন্তু এক দিন তাহার অকলঙ্ক চরিত্রের উপর মিথ্যা দোষারোপ করিতেও—

মনোজের চিন্তাপ্রবাহ সহসা স্তব্ধ হইল। অন্তরতম প্রদেশ হইতে অকস্মাৎ ধ্বনিত হইয়া উঠিল,—

নেলির রূপের ধ্যানে চরিত্র বোধ হয় অটুটই থাকে!

দুই হস্ত মস্তকে চাপিয়া ধরিয়া মনোজ নিস্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল।

৫

পঙ্কজকুমার বিনা বাক্যব্যয়ে বরাবর আপনার শয়নকক্ষে গিয়া শয্যা গ্রহণ করিলেন।

তাঁহার গৃহিণী উদ্বিগ্নভাবে কতবার আসিয়া তাঁহাকে কত প্রশ্ন করিলেন; কিন্তু কোনও উত্তর নাই।

পঙ্কজকুমার নিস্পন্দভাবে শয্যায় পড়িয়া রহিলেন। অবশেষে বাধ্য হইয়া বধূ ব্যাপারটি শ্বশ্রূমাতার কর্ণগোচর করিলেন।

কলিকাতায় ভ্রাতার সন্ধানে গিয়া তিনি যে দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছেন, তাহার স্মৃতি প্রতি মুহূর্ত্তেই তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিতেছিল। তাঁহারই সহোদর, পবিত্র ব্রাহ্মণবংশের সন্তান—যুবতী, কুমারী, শ্বেতাঙ্গ-নারীর কর-স্পর্শ করিয়া ব্যাকুলভাবে প্রেম নিবেদন করিতেছে! যে অবস্থায় তিনি উভয়কে দেখিয়াছেন, তাহাতে অন্য কোন ভাবই দর্শকের মনে স্থান পাইতে পারে না। তাহাকে লইয়া সে এত মত্ত যে, একবার তাঁহার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পরীক্ষায় তিনিও এক দিন যশোমাল্য লাভ করিয়াছিলেন, আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবগণের অনেকেই ত উচ্চশিক্ষিত বলিয়া সম্মান পাইয়া আসিতেছেন; কিন্তু কয় বৎসরের মধ্যে প্রতীচ্য শিক্ষাপদ্ধতি এমনই ধর্ম্মহীন, ঈশ্বর-বিমুখীন হইয়া উঠিয়াছে যে, তাঁহারই সহোদর কোনরূপ নৈতিক ও সামাজিক বন্ধনকে অঙ্গীকার না করিয়া অনায়াসে একটি যুবতী নারীর অঙ্গস্পর্শ করিবার মত নির্লজ্জতা প্রকাশ করিতে পারে?

না! এ হীন কল্পনাকে আর হৃদয়ে স্থান দেওয়া যায় না! অসহ্য! অসহ্য!

মনোজের সতীর্থ ও বন্ধুবর্গের নিকট হইতে তিনি যে সংবাদটুকু আহরণ করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, মনোজ সমাজ, ধর্ম্ম—সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া তাহার উদগ্র বাসনার যূপকাষ্ঠে শীঘ্রই আত্মহত্যা করিবে। এই প্রচণ্ড শোক সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার স্নেহময় ধর্ম্মপ্রাণ পিতা, মমতাময়ী জননী নিশ্চয়ই প্রাণ বিসর্জ্জন করিবেন। পুত্রের পক্ষে—

"পঙ্কজ!"

"মা!"

বৃদ্ধা জননীর ম্লান মুখ, বিশুষ্ক, জ্যোতিহীন চক্ষুর্দ্বয় পঙ্কজকুমারের হৃদয়ে যেন কশাঘাত করিল। তিনি শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন।

"কখন্ এলে, বাবা?"

"এই কিছুক্ষণ!"

মাতার মুখ ঈষৎ প্রফুল্লভাব ধারণ করিল। তিনি ব্যগ্রভাবে বলিলেন,—"মনোজ ভাল আছে?—সে কি বল্লে?"

পঙ্কজকুমার নিরুত্তরে স্থাণুর মত বসিয়া রহিলেন।

মাতা বলিলেন,—"চুপ ক'রে রৈলে কেন, বাবা? কি হয়েছে, বল শুনি?"

পঙ্কজকুমারের দেহ শিহরিয়া উঠিল। মনোজ জননীর কত আদরের, তাহা কি তিনি জানেন না? এ নিদারুণ সংবাদ মাতা কি সহ্য করিতে পারিবেন?

বৃদ্ধা মাতা ব্যাকুলভাবে জ্যেষ্ঠ পুত্রের সম্মুখে অগ্রসর হইয়া বলিলেন,—"সে ভাল আছে ত?"

পঙ্কজকুমার বলিলেন,—"শরীর তার খুব ভাল আছে, মা—"

জ্যেষ্ঠ সন্তানের কণ্ঠস্বরে চমকিত হইয়া মা বলিলেন, "তুমি কি যেন লুকোতে যাচ্ছ, বাবা। সব খুলে বল আমাকে।"

পঙ্কজকুমার একটু ইতস্ততঃ করিয়া ধরা গলায় বলিলেন, "এত দিন পরে মনোজ জন্মের মত আমাদের ছেড়ে যেতে চলেছে। সে ইংরেজ-মেয়ে বিয়ে করবে—"

এই সাংঘাতিক সংবাদ নিষ্ঠাবতী ব্রাহ্মণকন্যার হৃদয়ে শেলের মত বিদ্ধ হইল। মুহূর্ত্তমধ্যে বৃদ্ধার মূর্চ্ছিত দেহ ধূলায় লুটাইয়া পড়িল। পঙ্কজ চীৎকার করিয়া উঠিলেন। দাসদাসীরা চারিদিক হইতে ছুটিয়া আসিল।

কর্ত্তার কাছে সংবাদ গেল। পূজার আসন ত্যাগ করিয়া তিনি ত্রস্ত-চরণে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন।

কথাটা ক্রমশঃ প্রকাশ পাইল। হরকুমার বাবু স্তম্ভিত-ভাবে দাঁড়াইয়া জ্যেষ্ঠপুত্রের নিকট হইতে সব কথা শুনিলেন। তাঁহারও সর্ব্বদেহ থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। ক্রোধে না অপমানের আশঙ্কায় ?

এও কি সম্ভব ? হিন্দুসন্তান হইয়া সে কোন্ লোভে আপনার আভিজাত্য গর্ব্ব, ধর্ম্ম, নীতি, সমাজবন্ধন, সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হইয়াছে ? নিষ্কলঙ্ক পিতৃকুল, মাতৃকুল !—এত কালের মধ্যে অনাচার, মিথ্যাচার অথবা অসংযমের মলিনতা যাঁহার শুভ্র ললাটকে কলঙ্কিত করিতে পারে নাই, এত দিনে তাঁহারই সন্তানের অসংযত লালসার পঙ্কে তাহা মলিন হইতে চলিয়াছে ! উন্নতশিরে আর ত তিনি লোকসমাজে দাঁড়াইতে পারিবেন না !

যে নয়নপথে এতক্ষণ অগ্নিদেবতা রাজত্ব করিতেছিলেন, সহসা সেখানে বরুণদেব আবির্ভূত হইলেন।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ প্রকৃতির গতিবেগকে প্রতিহত করিবার জন্য দ্রুত পাদচারণা করিতে লাগিলেন।

গৃহিণীর সংজ্ঞাও ফিরিয়া আসিয়াছিল। তাঁহার পাণ্ডুর মুখের দিকে চাহিয়া হরকুমার বাবু কি বলিতে গেলেন ; কিন্তু চারিদিকে আত্মীয়স্বজন ও দাসদাসীর ভিড় দেখিয়া তিনি আপনাকে সংযত করিলেন। তাঁহার তীব্র দৃষ্টিপাতে একে একে সকলে সরিয়া গেল। তখন অর্দ্ধস্ফুটকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "পঙ্কজ, সে আজ থেকে আমাদের কাছে মৃত। তার কুশপুত্তলিকা দাহ করবার ব্যবস্থা কর, বাবা !"

৬

মনোজকুমার সাগ্রহে নিমন্ত্রণ-পত্রখানি পাঠ করিতেছিল। আজ নেলির জন্মতিথির উৎসব, তাহাকে অবশ্যই যাইতে হইবে। এ নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিবার নহে।

মনোজ ভাবিতে লাগিল। নেলির পক্ষে কি উপঢৌকন মনোজ্ঞ হইবে ? উপহারের মধ্য দিয়া তাহার অন্তরের একাগ্র প্রার্থনা নিবেদন করিবার ইহাই উৎকৃষ্ট সুযোগ।

হৃদয়ের সকল কথা আজ মনোজকুমার নেলিকে খুলিয়া বলিবে—কি দারুণ তৃষ্ণাকে বুকে চাপিয়া সে এত দিন কত কষ্টে কালাতিপাত করিয়াছে, আজ তাহা সে অকপটে সুস্পষ্ট ভাষায় নিবেদন করিবে। নেলিই তাহার জীবনের ধ্রুবতারা —সংসার-মরুভূমে একমাত্র পান্থপাদপ। তাহাকে তাহার অদেয় কিছুই থাকিতে পারে না—নাই-ও। জোন্স তাহার পিতৃস্থানীয়—বিধাতার অসীম করুণায় জীবনের সেই অতি দুর্দ্দিনে তিনি তাহাকে স্নেহের মঙ্গল আবেষ্টনে বুকে তুলিয়া লইয়াছিলেন। তাহার প্রার্থনা শুনিয়া নেলিও কি তাহার গৃহলক্ষ্মীর আসন গ্রহণ করিবে না ?

মনোজকুমার উৎকণ্ঠিতভাবে গৃহমধ্যে পাদচারণা করিতে লাগিল।

সহসা প্রাচীর-বিলম্বিত চিত্রের প্রতি তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল।

ঐ ত তাহার মা ! ঐ ত জননী, যিনি তাহাকে দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধারণ করিয়াছেন, যাঁহার বক্ষঃসুধা পানে তাহার দেহের প্রতি কণা সঞ্জীবিত হইয়াছে।

নেলিকে বিবাহ করিলে, সেই মমতাময়ী জননীর বক্ষে প্রচণ্ড আঘাত লাগিবে না কি ?

মনোজের হৃদয়াকাশে আবার শ্রাবণের কালো মেঘ ঘনাইয়া উঠিল।

হঠাৎ ঘড়ীর দিকে চাহিয়া সে বুঝিতে পারিল যে, প্রার্থিত মুহূর্ত্তের আর বড় বেশী বিলম্ব নাই। সে দ্রুতগতিতে 'ড্রেসিং রুমে' প্রবেশ করিল।

* * * *

উৎসবান্তে সুসজ্জিত হলঘরের এক পার্শ্বে স্বল্পান্ধকারে মনোজকুমার ও নেলি উপবিষ্ট। উভয়েরই দৃষ্টি বাতায়ন-পথে সুবিস্তীর্ণ গড়ের মাঠের উপর নিবদ্ধ।

আকাশে খণ্ডমেঘরাশি মাঝে মাঝে শুক্লা পঞ্চমীর চাঁদকে ঢাকিয়া ফেলিতেছে। মনোজের হৃদয়াকাশেও কি তেমনই আলো ও অন্ধকারের অবিশ্রান্ত ক্রীড়া চলিতেছিল ?

"নেলি !—"

"বলুন !—"

"তোমার আপত্তি নেই ?"

"অন্য কোন বাধা ত দেখছি না। কিন্তু আপনি কি ধর্ম্মত্যাগ করতে পারবেন ?"

"ধর্ম্মত্যাগ ?—কি বলছ তুমি, নেলি ?"

"খৃষ্টান-ধর্ম্মে দীক্ষা নিতে আপনার আপত্তি নেই ত ?"

মনোজ কয়েক মুহূর্ত্ত নিষ্পলক-নেত্রে তরুণী, সুন্দরী নেলির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

না, এ কথাটা ত এক দিনও সে চিন্তা করিয়া দেখে নাই! বিবাহের সঙ্গে ধর্ম্মত্যাগের সম্পর্ক কোথায় ? ভালবাসা—পরস্পরের মধ্যে যেখানে প্রগাঢ় প্রণয়ের সঞ্চার হইয়াছে, সেখানে অনুষ্ঠানের যুক্তি ব্যবধানের প্রাচীর তুলিয়া দাঁড়াইবে কেন ?

অস্ফুটস্বরে মনোজ বলিল,—"তুমি আমাকে ভালবাস, নেলি ?"

প্রস্ফুটিত গোলাপের তোড়াটা দক্ষিণ কর-পল্লবে ধারণ করিয়া নেলি সুস্পষ্ট স্বরে বলিল,—"বাসি, কিন্তু আগে আমার নিজের ধর্ম্ম। আপনি দীক্ষা গ্রহণ করলে, সানন্দে আমি আপনাকে স্বামিত্বে বরণ ক'রে নেব।"

কণ্ঠস্বরে কোথাও অস্পষ্টতা নাই। সহজ, সরল ধর্ম্ম-বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া তরুণী সুন্দরী অকপটে তাহার মনের কথা দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছে।

মনোজের মানস-নেত্রের সম্মুখে তাহার আজন্ম-সংস্কারের গর্ব্ব যেন বিদ্যুৎপুঞ্জের ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। এই তরুণী তাহাকে ভালবাসে, তাহার গৃহলক্ষ্মীর আসন গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিতা নহে; কিন্তু তাহার কাছে ভালবাসার অপেক্ষাও ধর্ম্ম বড়! তাই মনোজকে সে আপনার ধর্ম্মমতে দীক্ষিত করিতে চাহে!

সত্য—নিষ্ঠুর সত্য! প্রেমের কাছে ধর্ম্ম তুচ্ছ নহে। তাহার প্রাণঢালা ভালবাসাকে সে উপেক্ষা করিবে, যদি সে তরুণীর ধর্ম্মমতে আত্মসমর্পণ না করে!

অন্ধকারে মনোজের নিষ্প্রভ মুখমণ্ডলের পাণ্ডুরতা নেলির দৃষ্টিকে অতিক্রম করিয়া গেল।

সময় চলিয়া যাইতেছে—মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত! নেলি অস্ফুট গুঞ্জনে বলিল,—"মনোজ বাবু—"

বাহির হইতে বেহারা হাঁকিয়া বলিল, "এক্‌ঠো তার, সাব!"

মনোজকুমারের বেহারা তখনও হাঁপাইতেছিল।

আলোয় 'টেলিগ্রাফের' খামখানি কম্পিতহস্তে ছিঁড়িয়া প্রথম শব্দটি পড়িতেই তাহার সর্ব্বদেহ থর-থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

উৎকণ্ঠাভরে নেলি বলিয়া উঠিল, "কি হয়েছে ?"

"পিতা মৃত্যুশয্যায়,—আমি চল্লাম, মিস্ জোন্স।"

৭

সুবিখ্যাত জমীদার-বাটীর উপর আসন্নশোকের যবনিকা দুলিতেছিল।

অন্তঃপুরে থাকিয়া থাকিয়া চাপা ক্রন্দনের শব্দ গুমরিয়া উঠিতেছিল। সকলের মুখে কেবল এক কথা—'এই পুত্র হইতেই এত বড় সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল!'

সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিয়াছে। হরকুমার বাবু কি নিমীলিত-নেত্রে গায়ত্রী জপ করিতেছিলেন ?

তাঁহার পাদদেশে সেবাপরায়ণা, সংসারের মঙ্গলদাত্রী গৃহিণী আর শিয়রে জ্যেষ্ঠ তনয়—পঙ্কজকুমার।

দক্ষিণের বাতাস 'হু-হু' শব্দে বাতায়নপথে প্রবেশ করিতেছে। কৃষ্ণপক্ষের মলিন অন্ধকার ক্রমশঃ বিশ্বকে ছাইয়া ফেলিতেছে। অতি ক্ষীণকণ্ঠে হরকুমার বাবু ডাকিলেন, "প—ঙ্ক—জ!"

"বাবা!"

"সে আস্‌বে না ?"

"জরুরী তার করা হয়েছে, বাবা।"

"একবার শুধু তাকে দেখতে চাই!—শুধু একবার দেখবো!"

পঙ্কজকুমার দুই হস্তে চক্ষু মার্জ্জনা করিলেন।

কঠোর প্রতিজ্ঞা, অমার্জ্জনীয় অপরাধের স্মৃতি, অপরাধীর প্রতি নির্ম্মম বিরূপতা, অমোঘ পিতৃস্নেহের প্লাবনধারায় বুঝি অন্তিমমুহূর্ত্তে ভাসিয়া যায়!

"যাদু আমার!—"

গৃহিণী বসনাঞ্চলে মুখ চাপিয়া খোলা জানালার ধারে ত্বরিতপদে ছুটিয়া গেলেন।

অকস্মাৎ দরজার পর্দ্দা দুলিয়া উঠিল।

সঙ্কোচভরে, লঘুচরণে কাহার দীর্ঘমূর্ত্তি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে ?

রুদ্ধবাক্ পঙ্কজকুমার সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন।

"পঙ্কজ, বাবা, তাকে না দেখে প্রাণ দেহ ছাড়তে চাচ্ছে না!—"

অপরাধীর ন্যায় নতমস্তকে আগন্তুক শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া শয্যালগ্ন বৃদ্ধের দিকে চাহিল।

"কে?"

"বাবা!"—

এ কাহার কণ্ঠস্বর?

মরণোন্মুখ বৃদ্ধের দীর্ঘায়ত নয়নযুগল বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। হৃদয়ের উদ্দাম গতি কি সহস্র অশ্বের তাণ্ডব-নৃত্যে পরিণত হইল?

"বাবা—বাবা!"

দৃঢ়বলে সহসা মনোজ আপনাকে সংবরণ করিল। সে চিকিৎসক, অপ্রত্যাশিত আনন্দ অথবা শোকবেগ সংবরণ করা পীড়িতের পক্ষে সম্ভবপর নহে।

"মনোজ, তুমি?—"

"হাঁ, বাবা! আপনার চরণে আশ্রয় নিতে এসেছি।"

ঘনান্ধকারে যেন বিদ্যুৎদীপ্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। নিস্তব্ধ, মৃত্যুমলিন প্রকৃতির মুখে আবার কি হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিতেছে?

বৃদ্ধ পিতা তাহার মুখের উপর উজ্জ্বল দৃষ্টি ন্যস্ত করিয়া অপলক-নেত্রে কি যেন দেখিতেছিলেন।

মনোজকুমার ধীরে ধীরে শয্যা-পার্শ্বে উপবেশন করিয়া বলিষ্ঠ করপল্লবে পিতার বাহু সন্তর্পণে ধারণ করিয়া বলিল,—"আপনাকে এখন যেতে দেব না, কখনই না। বাবা, আমি বিধর্ম্মী নই। আপনার আশিস-ধারা আমায় অনিবার্য্য পতন হ'তে রক্ষা করেছে। আমায় ক্ষমা করুন।"

পিতা নীরবে পুত্রের শিরোদেশে আপনার মঙ্গল হস্ত স্থাপন করিয়া সস্নেহে তাহাকে বুকের উপর টানিয়া লইলেন।

নারীর, গৃহিণীর, জননীর উচ্ছ্বসিত মর্ম্মের নিরুদ্ধ অশ্রুবাষ্প কক্ষের নীরবতাকে শব্দতরঙ্গে মুখর করিয়া তুলিল।

শ্রীসুধাংশুকুমার রায় চৌধুরী (বি, এস্-সি)।

আমার কবিতা

মনের মাধুর্য্য দিয়া জীবনের দীর্ঘ-পথে
রচিয়াছি অপূর্ব্ব কবিতা;
বিশ্বের অন্তর হ'তে নিঃশেষে আহরি' সুধা
ব্যগ্র-বক্ষে করেছি সঞ্চয়।
আমার হৃদয়-তীর্থে অমৃতের চিত্ত-বীণা
গাহে নব আনন্দের গীতা;—
তোমরা শুনিতে পাও সে সুরের নৃত্য-রেশ—
নিত্য নব অতুল অক্ষয়।
আমার ছন্দের স্বপ্নে ফাল্গুনের ফুল্ল-রাত্রি
কল্পনায় করেছি অমর;
ঝর্ণার ঝর্ঝর নৃত্য সে ছন্দের অন্তহীন
আবর্ত্তনে হয়েছে চঞ্চল;
বসন্তের অন্তরের স্তব-মন্ত্র সে স্বপ্নের
সুষমায় করেছি সুন্দর।
আমি কবি, আমার কল্পনা দিয়া বিধাতারে
সৃজিয়াছি পবিত্র নির্ম্মল।

সন্ধ্যার সন্ধিব ক্ষণে আকাশের শেষ প্রান্তে
সে বিচিত্র বর্ণ-সমারোহ;
যে সুন্দর রামধনু রঙে রঙে নিত্য নব
বর্ষার সে সীমাহীন নভে;
অরণ্যের গম্ভীরতা সে সঙ্গীতে মর্ম্মরিছে
অসীমের উৎসুক-আগ্রহ;—
আমার কাব্যের স্বরে সবারে করেছি পূর্ণ
মৃত্যুহীন সৌন্দর্য্য বৈভবে!
আমার স্বপ্নের স্বর্গে আমূর্চ্ছিত গীতরব,
রূপ রস গন্ধ অহরহ;
আমার প্রাণের পুষ্পে পুঞ্জীভূত পরাগের
অন্তহীন উর্দ্ধায়িত প্রীতি;
বিধাতার মত আমি কবিতার ছন্দে-নৃত্যে
নিত্য রচি সৃষ্টি সমারোহ;
আমি কবি; সুন্দরের স্পর্শ চাহি—তাই
মোর কণ্ঠে বাজে অনন্তের গীতি।

শ্রীবিমল মিত্র।

কবির পরীক্ষা

প্রাচীনকালে রাজারাই ছিলেন দেশের পণ্ডিতদের নেতা। রাষ্ট্রনৈতিক বা অর্থ-নৈতিক ব্যাপারে যেমন তাঁহাদের পৃথক্ মন্ত্রিবর্গ ও সভাগৃহ ছিল, কাব্যচর্চ্চা ও শাস্ত্রচর্চ্চার জন্যও সেই রকম তাঁহাদের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ছিল। রাজারা প্রায়ই নিজেরা বড় পণ্ডিত—বড় দার্শনিক—এমন কি, অনেক সময় বড় কবিও হইতেন; কাযেই তাঁহারা পাণ্ডিত্যের ও কবিত্বের ঠিক ঠিক মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া সম্মান করিতে পারিতেন। তাঁহাদের সভায় নিজেদের দেশের কবি ও পণ্ডিতরা ত থাকিতেনই, অধিকন্তু দেশ-বিদেশেরও অনেক কবি ও পণ্ডিত আসিতেন। তাঁহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য রাজা নিজে বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন। রাজকার্য্যের মধ্যে অবসরক্রমে রাজা এই সকল কবি, পণ্ডিত ও শিল্পী প্রভৃতি লইয়া সভা করিয়া বসিতেন। পণ্ডিতগণের মধ্যে কে বড়, কে ছোট, তিনি তাহার বিচার করিতেন। তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে কোনও বিষয়ে বিচার চলিলে, তিনি মধ্যস্থতা করিতেন।

উপনিষদের মধ্যে আমরা এইরূপ দুই একটি ঘটনার উল্লেখ দেখিতে পাই। ছান্দোগ্যোপনিষদে আছে—আরুণি উদ্দালকের পুত্র শ্বেতকেতু একবার পাঞ্চালদের সভায় গিয়াছিলেন। সেখানে ক্ষত্রিয় ব্রহ্মবিৎ পাঞ্চালরাজ জৈবলি প্রবাহণ তাঁহাকে পঞ্চাগ্নি সম্বন্ধে পাঁচটি প্রশ্ন করেন। শ্বেতকেতু উত্তর দিতে না পারিয়া ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার পিতাকে সে কথা বলেন। তাহা শুনিয়া গৌতম-গোত্রীয় উদ্দালক রাজার নিকটে গেলেন। রাজা তাঁহাকে খুব সম্মান করিয়া বলিলেন—"আপনি দয়া করিয়া আমার নিকট হইতে কিছু বিত্ত গ্রহণ করুন।" উদ্দালক বলিলেন—"রাজন্, ঐহিক বিত্ত আপনারই থাকুক, আপনি আমার পুত্র শ্বেতকেতুকে যে প্রশ্ন কয়টি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমাকে তাহাই বলুন।" অনন্তর রাজার সহিত তাঁহার বাদানুবাদ চলিতে লাগিল। (১) ছান্দোগ্যোপনিষদের এই কাহিনীটি বৃহদারণ্যকোপনিষদেও আছে (২)।

(১) ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৫ম অধ্যায়, ৩য় খণ্ড, বসুমতী সংস্করণ।

(২) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ২য় ব্রাহ্মণ, বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির সংস্করণ।

বৃহদারণ্যকে আর একটি সুন্দর ঘটনার উল্লেখ আছে। তাহা বোধ হয়, বর্ত্তমান কালের ফিলজফিক্যাল কংগ্রেস অপেক্ষাও ভাল। পুরাকালে বিদেহাধিপতি রাজর্ষি জনক একটি বহুদক্ষিণ যজ্ঞ করেন। তাহাতে কুরু, পাঞ্চাল প্রভৃতি দেশ হইতে অনেক ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন। রাজর্ষি জনক নিজে ব্রহ্মবাদী ছিলেন; স্বভাবতঃই তাঁহার মনে হইল—এই সকল ব্রাহ্মণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কে? এই বিষয় পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি একটি কৌশল অবলম্বন করিলেন। তিনি এক হাজার দুগ্ধবতী গাভী পৃথক্ করিয়া রাখিলেন; প্রত্যেক গাভীর প্রতি শৃঙ্গে পাঁচ পাঁচ পাদ সোনা বাঁধিয়া দিলেন। সাধারণ হিসাবে তিন তোলা, আট রতি, দুই মাসা অর্থাৎ প্রায় চারি তোলা ওজনে এক পল হয়; এক পলের চারি ভাগের এক ভাগকে এক পাদ বলে; তাহা হইলে এক পাদ প্রায় এক তোলার সমান। সুতরাং এক একটি গাভীর শৃঙ্গে প্রায় দশ তোলা করিয়া সোনা বাঁধা রহিল।

এইরূপ করিয়া মহারাজ জনক সমস্ত ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"আপনাদের মধ্যে যিনি ব্রহ্মবিদ্যায় শ্রেষ্ঠ, তিনিই এই সুবর্ণমণ্ডিত গাভীগুলি গ্রহণ করুন।" এক হাজার দুগ্ধবতী গাভী, আর তাহার সহিত প্রায় দশ হাজার তোলা সোনা—পুরস্কারটা নিতান্ত সামান্য নহে। কিন্তু তথাপি কেহ তাহা লইতে সাহস করিলেন না। অবশেষে যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার শিষ্যকে বলিলেন—"বৎস সামশ্রব, তুমি গাভীগুলিকে আশ্রমে লইয়া যাও।" ইহাতে ব্রাহ্মণরা একটু চঞ্চল হইলেন। জনকের ঋত্বিক্ অশ্বল বলিলেন—"আপনিই কি আমাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ?" যাজ্ঞবল্ক্য বিনীতভাবে বলিলেন—"ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার, এই সকল গাভী লইবার অধিকার আমার আছে।" তার পর ব্রাহ্মণরা অনেকেই একে একে তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। জনকের হোতা অশ্বল, জরৎকারু-গোত্রীয় আর্ত্তভাগ, লাহ্যের পুত্র ভুজ্যু, চাক্রায়ণ উষস্ত, কুষীতকের পুত্র কহোল, বচক্নু মুনির কন্যা গার্গী, আরুণি উদ্দালক ও পণ্ডিতবর শাকল্য—ইহারা এক এক করিয়া যাজ্ঞবল্ক্যকে অনেক প্রশ্ন করিলেন, তিনিও তাঁহাদের ঠিক ঠিক উত্তর দিলেন। গার্গী একটি জটি-

প্রশ্ন করায় যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহাকে ধমকাইয়া কায সারিবার চেষ্টায় ছিলেন। গার্গী কিন্তু দমিবার পাত্রী ছিলেন না; তখনকার মত চুপ করিলেন বটে, কিন্তু কিছু পরেই ব্রাহ্মণগণের অনুমতি লইয়া সেই প্রশ্ন আবার জিজ্ঞাসা করিলেন; তখন যাজ্ঞবল্ক্যকে তাহার ঠিক উত্তর দিতেই হইল (১)।

বৌদ্ধজাতক-মালার মধ্যেও বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সম্মুখে আচার্য্য ও তাঁহার অন্তেবাসীর মধ্যে এইরূপ প্রতিযোগিতার কথা উল্লেখ আছে। একটি উপাখ্যানে এই পরীক্ষা-সভার সুন্দর বর্ণনা আছে। (২)

কবিরাজ রাজশেখর তাঁহার কাব্যমীমাংসা নামক গ্রন্থে এই পরীক্ষা-সভা কেমন ভাবে রচিত হইবে, সভার মধ্যে রাজার আসন কোথায় ও কেমন হইবে, কবি, পণ্ডিত, শিল্পী প্রভৃতি গুণীদের ভিতর কাহার কোথায় স্থান হইবে—ইত্যাদি পরিষ্কার-ভাবে লিখিয়াছেন (৩)।

সভাগৃহটি লম্বায় চওড়ায় সমান; চারিদিকে চারিটি দরজা; প্রত্যেক দরজার দুই পাশে দুইটি করিয়া জানালা; ঘরের ভিতর সবশুদ্ধ ষোলটি থাম, বারটি চারপাশে আর চারিটি মাঝখানে। মাঝের এই থাম চারিটির মধ্যে রাজার বসিবার যায়গা;—মাত্র একহাত উঁচু একটি বেদী—মণিমাণিক্য বসান, তার উপর রাজার আসন। রাজার প্রমোদ-উদ্যান, ক্রীড়াগৃহ প্রভৃতি এই সভা-গৃহের সংশ্লিষ্ট থাকিবে।

বিদ্যার কমবেশী অনুযায়ী রাজার চারিপাশে পণ্ডিতদের বসিবার যায়গা দেওয়া হইত। উত্তরে প্রথমেই বসিবেন—সংস্কৃত কবিরা। এখানে আগেই বলিয়া রাখা ভাল যে, এক জন যদি অনেকগুলি ভাষায় পণ্ডিত হন, তাহা হইলে যে ভাষায় তাঁহার নৈপুণ্য বেশী, তাঁহাকে সেই ভাষারই কবি বলিয়া ধরিতে হইবে, এবং সেই দলের পণ্ডিতদের সহিতই তাঁহাকে বসিতে হইবে। যদি কেহ এমন থাকেন, যিনি অনেক ভাষাতেই সমান পণ্ডিত, তিনি আপনার ইচ্ছামত যে কোন পণ্ডিতের দলে গিয়া বসিতে পারেন। উত্তরদিকে প্রথমেই সংস্কৃত কবি, তার পর বেদজ্ঞ, তার পর নৈয়ায়িক, তার পর পৌরাণিক, তার পর স্মার্ত্ত, তার পর চিকিৎসক, তার পর জ্যোতিষী—এইরূপে পরপর পণ্ডিতরা বসিবেন। পূর্ব্বদিকে প্রথমে প্রাকৃত কবি, তার পর প্রধান অভিনেতা, তার পর নর্ত্তক, তার পর গায়ক, তার পর বাদক, তার পর বাগ্-জীবন বা বাক্যরসিক ভাঁড়, তার পর সাধারণ অভিনেতা ইত্যাদি। পশ্চিমদিকে প্রথমে অপভ্রংশ বা গ্রাম্যভাষার কবি, তার পর পটুয়া, তার পর মণিকার, তার পর নক্সাকার, তার পর সেকরা, তার পর ছুতার, কামার ইত্যাদি। তার পর দক্ষিণদিকে প্রথমে পৈশাচিক ভাষার কবি, তার পর যাদুকর, বাজীকর, কুস্তীগির, পেশাদার সৈন্য ইত্যাদি। এতগুলি ভিন্ন ভিন্ন রকমের লোক লইয়া তবে রাজার পণ্ডিত-সভা পূর্ণ হইত। মোট কথা, শাস্ত্রে যে চৌষট্টি কলার কথা বলা আছে, তাহার যে কোন বিষয়ে নিপুণ লোকই এই সভায় স্থান পাইত। গ্রাম্য বা কথিত ভাষার উন্নতির জন্য আজকাল চারিদিকে যে চেষ্টা চলিতেছে, অনেকে মনে করেন, উহা আমাদের পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল; কিন্তু রাজার এই পণ্ডিত-সভার বর্ণনাটি পড়িলে বেশ বুঝা যায়, তখন গ্রাম্য ভাষায় শিক্ষিত লোকদের এখনকার অপেক্ষা অনেক বেশী সম্মান ছিল। পৈশাচিক ভাষার এক জন কবি গুণাঢ্য 'বৃহৎ-কথা' নামে একখানি অদ্ভুত গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। (১) গুণাঢ্যের বৃহৎকথার পুথি বহুদিন হইতেই পাওয়া যায় না। (২) কিন্তু তাহাকে অবলম্বন করিয়া কথা-সরিৎসাগর প্রভৃতি যে সকল পুথি সংস্কৃতে লেখা হইয়াছিল, সেগুলি এখনও আছে। সেগুলি এক একখানি অতি উপাদেয় গ্রন্থ।

এইরূপ পণ্ডিত-সভার পারিভাষিক নাম ছিল, ব্রহ্মসভা। কাব্য ও অন্যান্য শাস্ত্র বিষয়ে আলোচনা প্রভৃতির মত, কাব্যপরীক্ষাও এই সভার একটি প্রধান কায ছিল। দেশের কোন পণ্ডিত কোন শাস্ত্রবিষয়ে একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন, কি কোন কবি একখানি কাব্য রচনা করিয়াছেন, তিনি তাঁহার শাস্ত্রখানি বা কাব্যখানি এই পণ্ডিতদের সভায় আনিয়া হাজির করিলেন। তখনকার দিনে ছাপাখানা ছিল না; যে কোন লোক যাহা ইচ্ছা তাহা লিখিয়া তাহার হাজার কাপি ছাপাইয়া দেশময় ছড়াইয়া দিতে পারিতেন না। দেশের পণ্ডিতদের অনুমোদিত না হইলে—তাঁহারা নিজেদের টোলে না পড়াইলে, তাঁহার পুস্তক-রচনাই বিফল হইত। সুতরাং তাঁহার বইখানির প্রচারের জন্য তাঁহাকে এই সভার দ্বারস্থ হইতেই হইত। সভার সভ্যগণ সকলেই রাজার স্নেহদৃষ্টিবশতঃ অবস্থা হিসাবে বেশ তুষ্ট ও পুষ্ট ছিলেন; রাজা নিজে এই সভার সভাপতি; কাজেই ইহাতে নিরপেক্ষভাবেই

(১) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৩য় অধ্যায়, পৃঃ ৭৩৮-১০২৩, পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ-সম্পাদিত।

(২) উপানজ্জাতক ও গুত্তিলজাতক।—ঈশানচন্দ্র ঘোষ অনূদিত জাতকমালা ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৩৯-১৪০, ১৫৪-১৬১।

(৩) কাব্যমীমাংসা, ১০ম অধ্যায়।

(১) "ভূতভাসাময়ী প্রাহুরদ্ভুতার্থাং বৃহৎকথাম্।"—কাব্যাদর্শ, ১ম পরিচ্ছেদ, ৩৮ শ্লোক।

(২) "অপূর্ব্বা বৃহৎকথা ময়া শ্রুতা, প্রত্যক্ষীকৃতা চ।"—বাসবদত্তা P123 Srirangam edition.

কাব্যের বিচার হইত। কাব্যখানি যদি বিচারে না টিকিত, তাহাতেও লেখকের অপমানের কারণ ছিল না। কারণ, সভার সকলেই প্রায় এক এক জন দিগ্গজ পণ্ডিত। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে ত কথাই ছিল না; সকলের আনন্দধ্বনির মধ্যে রাজা তাঁহাকে যথাযোগ্য সম্মান ও অর্থ দান করিতেন। কখনও রাজা তাঁহাকে শিরোপা পুরস্কার দিতেন, ব্রহ্মরথে চড়াইয়া তাঁহাকে সসম্মানে নগরের চারিদিকে ঘুরাইয়া আনা হইত; এই উদ্দেশ্যে একপ্রকার রথ ব্যবহার করা হইত, তাহাকে বলা হইত—ব্রহ্মরথ। বিদেশ হইতে আগত যে সকল পণ্ডিত এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেন, তাঁহারা পুরস্কার ও সম্মান লইয়া আবার স্বদেশে ফিরিতেন; যাঁহারা বৃত্তিভোগী হইয়া সেই রাজার সভায় থাকিতে ইচ্ছুক হইতেন, রাজা তাঁহাদিগকে উপযুক্ত বৃত্তি দিয়া আপনার সভায় রাখিতেন।

মধ্যে মধ্যে কৌতুক করিবার জন্যও রাজা সভায় তর্ক লাগাইয়া দিতেন। ইহাতে পণ্ডিতদের উৎসাহ ও আগ্রহ বাড়িয়া উঠিত; তর্কের ফলে নূতন নূতন সিদ্ধান্ত পাওয়া যাইত। মোগল সম্রাট আকবর শাহও এইরূপ একটি সভা করিয়াছিলেন। তাহাতে সকল ধর্ম্মের লোককেই নিজ নিজ মত স্পষ্ট ভাবে বলিবার অনুমতি দেওয়া ছিল; সম্রাট নিজে ইহার সভাপতিত্ব করিতেন। তর্কবিতর্কে এই সভায় অনেক সময় রাত্রিই কাটিয়া যাইত। (১) বাসুদেব, সাতবাহন, শূদ্রক, সাহসাঙ্ক (বিক্রমাদিত্য) প্রভৃতি রাজারা এইরূপ সভা করিতেন; তাঁহারা পণ্ডিতদিগকে প্রচুর দান ও সম্মান দিতেন। রাজশেখরের মতে প্রত্যেক রাজারই উচিত, এই বিষয়ে তাঁহাদের অনুকরণ করা। (২)

বড় বড় নগরীতে এইরূপ পরীক্ষার জন্য বিশেষ বিশেষ সভা বসিত। কালিদাস, মেণ্ঠ, অমর, রূপ, সুর, ভারবি, হরিচন্দ্র, চন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতি কবি উজ্জয়িনীর সভায় পরীক্ষিত হইয়াছিলেন। (৩)

মগধের রাজধানী পাটলিপুত্রে বর্ষ, উপবর্ষ, পাণিনি, পিঙ্গল, ব্যাড়ি, বররুচি, পতঞ্জলি প্রভৃতি পণ্ডিত পরীক্ষা দিয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন (৪)। বর্ষ এক জন প্রাচীন পণ্ডিত। উপবর্ষ বিখ্যাত ব্যাকরণকার পাণিনির গুরু। পাণিনির পরিচয় অনাবশ্যক। ইঁহারা তিন জনেই ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের লোক। খৃষ্টপূর্ব্ব ৫ম শতকে যখন পারসীকদের উপদ্রবে তক্ষশিলার শিক্ষাকেন্দ্রটি নষ্ট হইয়া গেল ও মগধে পাটলিপুত্রের অভ্যুদয় হইল, সেই সময় তাঁহারা পাটলিপুত্রে পরীক্ষা দিতে আসেন। পিঙ্গল বৃদ্ধাবস্থায় সম্রাট অশোকের পৌত্রগণের শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন; তাঁহার প্রণীত ছন্দঃসূত্র একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ। ব্যাড়ি এক জন বিখ্যাত পরিভাষাকার; তিনি পাণিনির মাতামহপক্ষে ৩।৪ পুরুষ পরের লোক; বিখ্যাত বার্ত্তিককার কাত্যায়ন তাঁহার গ্রন্থ হইতে অনেক প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। বররুচি কাত্যায়নেরই আর একটি নাম। ইনি মৌর্য্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক। ইনি কৌশাম্বীর অধিবাসী। "প্রাকৃতপ্রকাশ"-প্রণেতা বররুচি অনেক পরের লোক। পতঞ্জলি প্রসিদ্ধ মহাভাষ্যকার। শুঙ্গবংশের প্রতিষ্ঠাতা পুষ্যমিত্রের অশ্বমেধযজ্ঞে ইনি পৌরোহিত্য করেন। (১) ইঁহার মহাভাষ্যকে অবলম্বন করিয়াই পাণিনি ব্যাকরণের টীকাটিপ্পনীতে এক বিশাল ব্যাকরণশাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। মহাভাষ্য ছাড়িয়া শব্দবিদ্যা অধ্যয়ন করা সম্পূর্ণ বিফল (২)। ইঁহারা ভিন্ন ভিন্ন সময়ের লোক; কাজেই বেশ বুঝা যায়, এইরূপ সভা প্রায়ই হইত।

মঙ্খক এক জন কাশ্মীরদেশীয় কবি। কাশ্মীররাজ জয়সিংহের রাজত্বসময়ে ইঁহার প্রাদুর্ভাব হয়। রাজা জয়সিংহ ১১২৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১১৪৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। মঙ্খক তাঁহার "শ্রীকণ্ঠচরিত" নামক কাব্য রচনা করিয়া এইরূপ একটি সভায় পরীক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহার কাব্যের ২৫শ সর্গে তিনি তাঁহার এই পরীক্ষা-বর্ণনার সময় সভাস্থ পণ্ডিতগণের একটি বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। এই সভায় সভাপতি ছিলেন—তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা লঙ্খক; লঙ্খকের আর একটি নাম ছিল—অলঙ্কার। তাঁহাকে রাজা জয়সিংহের পিতা সুস্সলদেব স্বয়ং সন্ধিবিগ্রহাধিকারে অর্থাৎ পররাষ্ট্র-সচিবের পদে নিযুক্ত করেন। তিনি নিজে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং গুণের আদর জানিতেন। মঙ্খক বলিয়াছেন—"রাজহংসরা যেমন মানস-সরোবরে নিরুদ্বেগে বাস করে, পণ্ডিতগণ সেইরূপ আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সভায় থাকেন; এই পণ্ডিতগণ সমস্ত কাব্যশাস্ত্রের কষ্টিপাথরস্বরূপ; অতএব

(১) Promotion of Learning in India during Mahomedan rule. Dr. Narendranath Law. P145.

(২) কাব্যমীমাংসা, ১০ম অধ্যায়।

(৩) ঐ ঐ

(৪) ঐ ঐ

(১) Preface to the Catalogue of Sanskrit MSS in the collection of the Asiatic Society of Bengal. Vol VI Grammar, by MM. Haroprosad Shastri, C. I. E. PP. XIV—XVI.

(২) "শব্দবিদ্যেব নো ভাতি রাজনীতিরপস্পশা।"—মাঘ ২য় সর্গ ১১২ শ্লোক।

...র পরিশ্রম সার্থক হইল কি না, বুঝিবার জন্য তাঁহাদের ...কট আমার কাব্যখানি লইয়া যাইব (১)। তার পর তিনি ...কে একে সেই সভার পণ্ডিতদের নাম ও গুণের বর্ণনা ...য়াছেন। সংস্কৃত কবিগণের কালনির্ণয় করা প্রায়ই কঠিন; ...হার বর্ণিত এই তালিকা হইতে অনেকের সময় সহজেই স্থির হইয়াছে। একটু দীর্ঘ হইলেও তালিকাটি এখানে দিলাম।

১। নন্দন।—ইনি এক জন বড় নৈয়ায়িক ও ব্রহ্মবাদী।

২। রুয্যক।—ইনি ছিলেন পরীক্ষার্থী কবি মঙ্খকের গুরু (২)। ইঁহার রচিত অলঙ্কারসর্ব্বস্ব ও সহৃদয়লীলা নামক দুইখানি গ্রন্থ এখন পাওয়া যায়।

৩। রম্যদেব।—এক জন বড় নৈয়ায়িক।

৪। লোষ্টদেব।—ইনি ছয়টি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন।

৫। শ্রীগর্ভ—ইনি প্রভাকরাচার্য্যের মতবাদী।

৬। মণ্ডন।—ইনি শ্রীগর্ভের পুত্র; চতুর্দ্দশ বিদ্যায় পারদর্শী, কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য ইঁহার মধ্যে সমানভাবে বিজড়িত।

৭। শ্রীকণ্ঠ।—মণ্ডনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

৮। গর্গ।—ইনি বয়সে প্রবীণ এবং বেদবিদ্যায় নিপুণ ছিলেন। রাজতরঙ্গিণীতেও ইঁহার নামোল্লেখ আছে।

৯। দেবধর।

১০। নাগ।—ইনি বয়সে প্রৌঢ় হইলেও জ্ঞানে বৃদ্ধ ছিলেন। ইনি পাণিনির ব্যাকরণে ও সাহিত্যে পটু ছিলেন।

১১। ত্রৈলোক্য।—ইনি যুক্তিবাদে ভট্টকুমারিলের অবতার-স্বরূপ ছিলেন।

১২। দামোদর।

১৩। ষষ্ঠ।

১৪। জিন্দুক।—ইনিও ভট্টপ্রভাকরের মতবাদী; সুভাষিতা-...লী নামক সংগ্রহ-গ্রন্থে ইঁহার শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

১৫।—জহ্লণ।—ইনি কাশ্মীরদেশসংলগ্ন রাজপুরী, রাজবেরী ...নজৌরী নামক দেশের লোক, সেখানকার রাজা সোমপালের ...বিগ্রহাচার্য্য ছিলেন। ইঁহার রচিত সোমপালবিলাস নামক ... কাশ্মীরে খুব চলে। ইনি মুরারিমিশ্র ও রাজশেখরের রীতি ...সরণ করিয়াছেন।

১৬। শ্রীগোবিন্দ।

১৭। কল্যাণ।—অলকদত্ত নামক অপর এক জন সান্ধিবিগ্রহিক ইঁহাকে কাব্যপরীক্ষার জন্য নিযুক্ত করেন; ইনি বিহ্লণ-কবির গ্রন্থের বিচার করিয়াছিলেন।

১৮। ভুড্ড।— } ইঁহারা দুই জন সহাধ্যায়ী।
১৯। শ্রীবৎস।— }

২০। আনন্দ।—তর্কশাস্ত্রে নিপুণ।

২১। পদ্মরাজ।

২২। শ্রীগুহ্ন।—ইনি প্রভাকর শাস্ত্রের অধ্যাপক।

২৩। লক্ষ্মীদেব।—যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ।

২৪। জনকরাজ—যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ ও মহাভাষ্যের অধ্যাপক।

২৫। প্রকট।—ইনি আগম ও তন্ত্রশাস্ত্রে পারদর্শী। বিখ্যাত কাশ্মীরী পণ্ডিত অভিনবগুপ্তকে তর্কে পরাজিত করেন।

২৬। আনন্দ—অন্যোক্তিমুক্তালতা, রাজেন্দ্রকর্ণপূর প্রভৃতি গ্রন্থ-রচয়িতা শম্ভু মহাকবির পুত্র।

২৭। সুহল (১ম)।

২৮। সুহল (২য়)।—ইনি পাণিনি ব্যাকরণে সুপণ্ডিত। কান্যকুব্জরাজ গোবিন্দচন্দ্রের দূত হইয়া কাশ্মীরে ছিলেন। গোবিন্দচন্দ্র খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের প্রথমার্দ্ধে কান্যকুব্জে রাজ্য করিয়াছিলেন (১)।

২৯। জোগরাজ।—ইনি বালকদিগের উপাধ্যায়রূপে খ্যাতি-লাভ করিয়াছিলেন।

৩০। তেজকণ্ঠ।—কোঙ্কণরাজ অপরাদিত্য ইঁহাকে দৌত্যে নিযুক্ত করিয়া কাশ্মীরে পাঠান (২)।

৩১। বাগীশ্বর।

৩২। পটু।

সভাতে সভাপতির স্তুতিবাদ করিয়া অনেক কবিই শ্লোক বলিলেন। কান্যকুব্জেশ্বরের দূত সুহল একটি শ্লোকের প্রথম দুই চরণ বলিয়া মঙ্খক কবিকে অবশিষ্টটুকু পূরণ করিয়া দিতে বলিলেন; তিনিও অবিলম্বে তাহা পূরণ করিয়া দিলেন (৩)। তার পর কোঙ্কণেশ্বরের দূত তেজকণ্ঠ তাঁহাকে বলিলেন—

(১) শ্রীকণ্ঠ-চরিত, ২৫শ সর্গ, ১৫-১৬ শ্লোক।

(২) শ্রীকণ্ঠ-চরিত, ২৫শ সর্গ, ৬০, ১৩৫ শ্লোক।

(১) The Bhadavana grant of Govinda Candra Deva of Kanouj - Epigraphica Indica vol XIX, No. 52 pp 291-294 and Bashahi plate of Govinda Candra—Journal of the Asiatic Society of Bengal. vol XLII (1873) pt, I. pp, 314-328, Indian Antiquary vol XIV pp, 101-104.

(২) অনেকে মনে করেন—এই অপরাদিত্যই যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতির 'অপরার্ক' নামে টীকা নিজে করেন বা পণ্ডিত রাখিয়া করান।

(৩) শ্রীকণ্ঠ-চরিত, ২৫শ সর্গ, ১০৩-১০৫ শ্লোক।

"অনেক কবিই অর্থপ্রাপ্তির আশায় রাজার গুণগান করিয়া কাব্য রচনা করিয়া থাকেন ; আপনি যে তাহা না করিয়া জগৎপতি মহাদেবের স্তুতিগান করিয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন, ইহাতে সমস্ত কবিরই ভিক্ষাপবাদ দূর হইয়াছে। তথাপি আমার প্রীতির জন্য আপনি রাজস্তুতিমূলক দুই চারিটা কবিতা বলুন।" মঙ্খকও এক এক করিয়া সাতটি শ্লোক বলিলেন। (১) তার পর কবির গুরু শ্রীরুয্যক সেই সভায় তাঁহার কাব্যখানি পড়িতে বলিলেন ; কাব্যখানি পড়া হইলে সভার সমস্ত পণ্ডিতই তাঁহার কাব্যের প্রশংসা করিলেন (২)

বিখ্যাত মহাকাব্য নৈষধচরিতের রচয়িতা শ্রীহর্ষও কাশ্মীর-দেশে তাঁহার কাব্যখানির প্রচলনের জন্য এইরূপ একটি সভায় পরীক্ষার্থী হইয়াছিলেন (৩)। নৈষধ-চরিতের ১৬শ সর্গের সর্গভঙ্গ শ্লোকে তিনি এই কথাই বলিয়াছেন।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙ্গালী পণ্ডিত চিরঞ্জীব শর্ম্মা তাঁহার রচিত মাধবচম্পূ নামক গদ্যখানির প্রচারের জন্য নবদ্বীপে এইরূপ একটি পণ্ডিত-সভার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন (৪)।

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার "বেণের মেয়ে" নামক উপন্যাসখানির মধ্যে এইরূপ একটি পণ্ডিতদের পরীক্ষা-সভার কথা বলিয়াছেন। হয় ত উহা শাস্ত্রী মহাশয়ের কল্পনা-প্রসূত, কিন্তু উপন্যাসখানিতে যে যুগের চিত্র অঙ্কিত করা হইয়াছে, তাহাতে এইরূপ পরীক্ষাসভার বর্ণনাটি খুবই সময়োপযোগী হইয়াছে।

জগতের ইতিহাসে বর্ত্তমান যুগ বৈজ্ঞানিক যুগ বলিতে পারা যায়। সভ্য-জগতের নানা দেশে ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিত-সমাজে বৈজ্ঞানিক শাস্ত্রের পরীক্ষা লইবার জন্য যেমন অনেক মহা সভা আছে, কাব্য বা সাহিত্যশাস্ত্রের পরীক্ষা লইবার জন্যও তেমনই কতগুলি সভা আছে, জানি না ; থাকিলেও তাহাতে সমাজের ভাবকেন্দ্রকে ঠিক রাখিয়া, অথচ জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে গুণের আদর ও পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা আছে কি না, জানি না। প্রাচীন ভারতে কিন্তু একটিমাত্র সভাতেই সমস্ত কায চলিত। ভারতের রাজা শুধু দেশের রাষ্ট্রীয় নেতা ছিলেন না, দেশের সামাজিক, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি সকল বিষয়েই তিনি নেতা ছিলেন। এই জন্যই ভারতবর্ষে যে একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, সুপরিপুষ্ট সমাজশরীর গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা জগতের অন্য কোন দেশেই দেখা যায় না।

শ্রীনিত্যধন ভট্টাচার্য্য (এম্, এ, কাব্যসাংখ্যতীর্থ)

(১) শ্রীকণ্ঠ-চরিত, ২৫শ সর্গ, ১১১-১২৬ শ্লোক।

(২) শ্রীকণ্ঠ-চরিত, ২৫শ সর্গ, ১৪৪-১৪৮ শ্লোক।

(৩) "কাশ্মীরৈর্মহিতে চতুর্দ্দশতয়ীং বিদ্যাং বিদদ্ভির্মহা"—নৈষধচরিত, ১৬শ সর্গ।

(৪). মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখিত "চিরঞ্জীব শর্ম্মা"।—সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা,সপ্তত্রিংশ ভাগ,৩য় সংখ্যা,১৩৩৭।

জাতক

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ছয় খণ্ডে বিভক্ত বৌদ্ধ জাতক গ্রন্থের সুললিত ও সরল বঙ্গানুবাদ লিখিয়া, এত দিনে প্রকাশিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন,—ইহা যে শিক্ষিত বাঙ্গালী ও বঙ্গভাষা-প্রেমিক ব্যক্তিমাত্রের পক্ষে বড়ই সন্তোষের ও গৌরবের বিষয় হইয়াছে, তাহা সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন, ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। জাতকের ন্যায় অমূল্য গ্রন্থের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অনুবাদ করিয়া সুন্দরভাবে ছাপাইয়া যথাসম্ভব স্বল্প-মূল্যে বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকার হস্তে উপহার দেওয়া বর্ত্তমান সময়ে যে সুসাধ্য ব্যাপার, তাহা নহে, প্রত্যুত ইহা অতিশয় কৃচ্ছ্রসাধ্য, তাহাতেও অণুমাত্র সন্দেহ নাই। প্রকৃত কথা এই যে, পরিণতবয়সে অনন্যসাধারণ অধ্যবসায়, পরিশ্রম ও প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া ঘোষ মহাশয় বঙ্গভাষা-জননীর বিশাল রত্ন-ভাণ্ডারে আজ যে মহার্ঘ রত্নহার সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তাহার সমুজ্জ্বল প্রভায় অনেককালসঞ্চিত অজ্ঞানান্ধকার বিধ্বস্ত হইবে, এবং তাহাতে অনেক অবশ্যজ্ঞেয় সত্যের দর্শন-লাভে অভ্যুদয়োন্মুখ বঙ্গীয় হিন্দু-সমাজ বিশেষ লাভবান্ হইবে।

দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতীয় হিন্দু-সমাজের প্রকৃত অবস্থা কি ছিল, আমাদের তদানীন্তন পূর্ব্বপুরুষগণ কি আহার করিতেন, কি পরিতেন, কি ভাবে নগরে বা গ্রামে বাস করিতেন, নগর, গ্রাম ও পল্লীসমূহের গঠনপ্রণালী কি প্রকার ছিল, ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রকৃত অবস্থা কিরূপ ছিল, ব্রাহ্মণ ও শ্রমণগণের আচার-ব্যবহার ও পরস্পর সম্বন্ধ কি প্রকার, এই সকল বিষয়ের প্রকৃষ্ট পরিচয় জাতকের সাহায্যে যেমন বিস্পষ্ট ও বিস্তৃতভাবে জানিতে পারা যায়, অন্য প্রাচীন গ্রন্থে তাহা দুর্লভ। এতদ্ব্যতীত রাজার সহিত প্রজার সম্বন্ধ, রাজাদিগের নৈতিক চরিত্র, রাজপুরুষগণের ব্যবহার, নারীচরিত্র, ভিক্ষু-সঙ্ঘের আভ্যন্তরীণ বৃত্তান্ত, ভগবান্ গৌতমবুদ্ধের লোকোত্তর চরিতাবলী এমন সুন্দর ও সরলভাবে জাতক গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহা পড়িতে পড়িতে মনে হয় যে, দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বের বৌদ্ধভারত যেন জীবিতভাবে পাঠকগণের মানসনেত্রে প্রতিভাত হইতেছে।

কালবশে পারিপার্শ্বিক অবস্থা-নিচয়ের প্রভাবে হিন্দু-সমাজ নূতনভাবে গঠিত হইতেছে, প্রাচীন আচার-ব্যবহার প্রতিপালন নানা কারণে আর সম্ভবপর নহে বলিয়া অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি-গণের বিশ্বাস দৃঢ়বদ্ধ হইতেছে, নব্য শিক্ষিতবৃন্দ প্রতীচ্য সভ্যতার চশমা নয়নে আঁটিয়া, সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া প্রাচীন ভারতীয় সমাজের রীতিনীতি আচার-পদ্ধতিকে ঘৃণা ও উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, অথচ প্রাচীন সমাজের প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে তাঁহাদের ঔৎসুক্যও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। তত্ত্বানুসন্ধিৎসা-বিহীন পাশ্চাত্যভাবের অনুকরণের প্রবল বন্যায় বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ প্লাবিত হইয়া যাইতেছে। এই বন্যায় ভাসিয়া পরে হিন্দুসমাজ কোথায় দাঁড়াইবে, তাহার চিন্তা অতি অল্পলোকই করিয়া থাকেন। প্রাচীনপন্থিগণ এই বন্যায় বাধা দিতে যতই সচেষ্ট হইতেছেন, বন্যার বেগ ততই প্রবল হইয়া যাইতেছে। কেবল সংস্কৃত ভাষায় রচিত স্মৃতি, পুরাণ বা ইতিহাস প্রাচীনপন্থিগণের একমাত্র অবলম্বন, কিন্তু তাহাদের সাহায্যে হিন্দু-সমাজের যে প্রাচীন মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সম্পূর্ণ নহে, পরন্তু একদেশমাত্র, এই ধারণা দেশের নব্য-শিক্ষিতবৃন্দের হৃদয়ে যতই দৃঢ়মূল হইতেছে, ততই সংস্কৃত-মাত্রোপজীবী প্রাচীনপন্থীদিগের প্রতি শিক্ষিত লোকের আস্থা কমিতেছে, হিন্দু-সমাজের সনাতন আত্মার পূর্ণ স্বরূপ জানিতে হইলে কেবল সংস্কৃতের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না, পালি ও প্রাকৃত ভাষায় লিখিত প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থের যথাবিধি অনুশীলন ব্যতিরেকে বহুসহস্রব্যাপী বিরাট হিন্দু-সমাজের স্বরূপ-জ্ঞান একান্ত অসম্ভব, এই জাজ্বল্যমান ধ্রুব সত্যের প্রতি যাঁহাদের আস্থা নাই, তাঁহারাই প্রাচীনপন্থী দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া তত্ত্বানুসন্ধিৎসু শিক্ষিত সমাজহিতৈষিগণ তাঁহাদের প্রতি আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছেন না। এই সকল কারণে প্রাচীনপন্থী ও নব্যপন্থিগণের যে বিষম মত-বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে এবং তাহা উত্তরোত্তর বাড়িয়া যাইতেছে, ইহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই বুঝিতেছেন, এই বিরোধের শান্তি না হইলে কোন প্রকার সামাজিক সংস্কার স্থায়ী ও হিতকর হইবে, এইরূপ সম্ভাবনা অতি বিরল। হিন্দু-সমাজের ন্যায় অতিপ্রাচীন সমাজ পৃথিবীতে আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—নানাপ্রকার বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন বহু বৈদেশিক জাতি-সমূহের সহিত মিলিত হইয়া ইহা কি প্রকারে সহস্র সহস্র বর্ষ ব্যাপিয়া নিজের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহা সম্যগ্‌ভাবে হৃদয়ঙ্গম না করিয়া এই বিরাট হিন্দু-সমাজের ভবিষ্যদ্‌গতি নির্ণয় করিতে যাওয়া বিড়ম্বনামাত্র, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। এই প্রকার অবস্থায় কি নব্যপন্থী কি প্রাচীন-পন্থী উভয়বিধ সমাজহিতৈষিগণের পক্ষে হিন্দু-সমাজের কি বৈশিষ্ট্য, তাহা বুঝিবার জন্য প্রাচীন হিন্দু-সমাজের ইতিহাস ভাল করিয়া বুঝিতেই হইবে। তাহা বুঝিবার প্রধান সাধন দুইটি ;—প্রথম সংস্কৃতভাষায় নিবদ্ধ সমাজ-স্বরূপ-পরিচায়ক শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণাদির সম্যক্ পর্য্যালোচনা ; দ্বিতীয় পালি ও প্রাকৃত ভাষায় নিবদ্ধ এইরূপ বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থ-সমূহের যথাযথ অনুশীলন। সংস্কৃত ঐ সকল গ্রন্থের অনুবাদ বঙ্গভাষায় অনেক হইয়াছে, এবং তাহা উত্তরোত্তর বাড়িয়া যাইতেছে ; কিন্তু পালি ও প্রাকৃত ভাষায় নিবদ্ধ ঐ সকল গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য অনুবাদ এ পর্য্যন্ত আমাদের মাতৃভাষায় একখানিও হয় নাই বলিলেও চলে। এই অভাব পূরণ করিবার জন্য রায় সাহেব শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের এই সাধু উদ্যম যে সর্ব্বথা প্রশংসনীয় ও একান্ত অপেক্ষিত, তাহা কে অস্বীকার করিবে ?

তাঁহার এই মহান্ ও সাধু উদ্যম সর্ব্বথা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। অনুবাদের ভাষা যেমন সরল, তেমনই মধুর হইয়াছে। মূল গাথাগুলির অনুবাদ পদ্যে করিয়া ঈশান বাবু মূলের সৌন্দর্য্য অনুবাদে অক্ষুন্ন রাখিতে বহুলপরিমাণে সমর্থ হইয়াছেন, সেই সঙ্গে নিজের কবিত্ব-শক্তির প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এই পরিণতবয়সে বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের মঙ্গলের জন্য অকাতরে অর্থ-ব্যয় ও পরিশ্রম অঙ্গীকার পূর্ব্বক জাতকের ন্যায় সুবৃহৎ গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া এবং মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে তাহা সুন্দরভাবে প্রকাশিত করিয়া তিনি যে স্বজাতি-হিতৈষী বঙ্গীয় হিন্দু-মাত্রেরই বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আশা করি, তাঁহার জাতকের বঙ্গানুবাদ বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে যত্নের সহিত সমাদৃত ও সুরক্ষিত হইবে। *

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ (মহামহোপাধ্যায়)।

---

* রায় সাহেব শ্রীযুত ঈশানচন্দ্র ঘোষ অনূদিত জাতক ১১৩ নং প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট, কলিকাতা প্রকাশকের নিকট প্রাপ্তব্য।

ভারতীয় ভাবধারা ও স্বাধীনচিন্তা

আপনারা আমাকে আপনাদের দর্শন-শাখার সভাপতি-রূপে মনোনীত করিয়া যে সম্মান প্রদান করিলেন, তাহার জন্য আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিব কি না, স্থির করিয়া উঠিতে পারি নাই। আপনারা হয় ত অনেকে জানেন, আমি আজ কয়েক বৎসর দর্শনের রসাল বনবীথিকা হইতে নির্ব্বাসিত জীবন যাপন করিতেছি। প্রিয়সমাগম হইতে বঞ্চিত হইলে মন যেমন গুমরিয়া উঠে, আমারও অবস্থা তাহা হইতে বড় বেশী বিভিন্ন নহে। আপনাদের আহ্বান পাইয়া আমার প্রিয়বিরহবিধুর হৃদয় আষাঢ়ের প্রথম দিবসে মেঘালোকে বিভ্রান্ত-চিত্ত যক্ষেরই ন্যায় আশা ও বেদনায় দোলায়িত হইয়া উঠিয়াছে। আপনারা আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন।

আজ যে স্থলে আমরা সমবেত হইয়াছি, তাহার পূত স্মৃতি-বিজড়িত রজোরাশি অঙ্গে মাখিয়া ধন্য হইব, এই আশায় উৎফুল্ল হইয়া নিজের যোগ্যতা অযোগ্যতা ভাবিবার সময় পাই নাই। পুণ্যশ্লোক বঙ্কিমচন্দ্র, 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্গসাহিত্য-নন্দনের কল্পবৃক্ষ বঙ্কিমচন্দ্রের আবাসভূমিতে দাঁড়াইয়া দর্শনের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিব, ইহা সামান্য সুকৃতীর কথা নহে। আমি এ গৌরব-জনক অধিকারের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিব কি না, তাহা যিনি নিখিল কল্যাণের বিধাতা, একমাত্র তিনিই বলিতে পারেন। তবে মূলাযোড়, ভট্টপল্লী, নৈহাটী, হালিসহরের মধ্যস্থানে দাঁড়াইয়া কোনও দার্শনিক আলোচনার অবতারণা করা শুধু আমার কেন, যে কোনও ব্যক্তির পক্ষে এক অগ্নিপরীক্ষা। এই সকল স্থান এক সময়ে বিদ্যাগৌরবে সমুজ্জ্বল ছিল। এই স্থানকে একটি 'বিদ্বন্মণ্ডল' বলিলেও অত্যুক্তি হইত না। এখনও ভট্টপল্লী বঙ্গের বিদ্বৎসমাজের মুকুটমণিরূপে শোভা পাইতেছে। এরূপ স্থলে আমার ন্যায় ব্যক্তির অনধিকারপ্রবেশজনিত অপরাধ আপনারা নিজগুণে মার্জ্জনা করিবেন।

আমাদের দেশের দার্শনিক চিন্তার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইহার মধ্যে আত্মতত্ত্ব বহু বিস্তৃত স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। আত্মার স্বরূপ কি? জগতের সহিত দেহের সহিত আত্মার সম্বন্ধ কি? এই সকল প্রশ্নই ভারতের চিন্তা-শক্তিকে আলোড়িত, প্রলুব্ধ করিয়াছে। দৃশ্যমান জগতের অনিত্যতা যতই হৃদয়ে ছায়াপাত করিয়াছে, ততই আত্মার দিকে তত্ত্বান্বেষীদিগের সতৃষ্ণ দৃষ্টি পতিত হইয়াছে। বস্তুতঃ এই পরিণামশীল জগতের সত্যতা যত থাক্ বা না থাক্, আত্মার সত্যতা সম্বন্ধে কোনও সংশয় উদিত হইতে পারে না। সমস্ত তত্ত্বপদার্থের মধ্যে আত্মাই সর্ব্বাপেক্ষা নিঃসংশয় বস্তু। কারণ তত্ত্ব সম্বন্ধে আত্মা যাহাই হউক না কেন, আত্মা যে আমাদের পক্ষে একটি পরম সৎ পদার্থ, সে বিষয়ে কেহ সন্দিহান হইতে পারে না। কারণ, 'সন্দেহ'রূপ চিত্তবৃত্তি আত্মা ব্যতীত অন্যপাত্রে থাকিতে পারে না। আত্মার সম্বন্ধে আমরা যতই সন্দেহ করি, তত নিবিড় হইতে নিবিড়তরভাবে আত্মা আমাদের জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিকশিত হইয়া উঠে। নিজের ছায়াকে যেমন উল্লঙ্ঘন করা যায় না, তেমনই আত্মাকেও সত্যের কোটি হইতে বহিষ্কৃত করা চলে না। তার পর আত্মা আমাদের নিকট হইতেও নিকটতম, প্রিয় হইতে প্রিয়তম, গূঢ়াতিগূঢ় সত্য পদার্থ। আত্মার সুখ-দুঃখ, শুভাশুভ, জয়-পরাজয়, লাভালাভ যেমন আমাদিগের অনুসন্ধানের বিষয়, তেমন আর কিছুই নয়। আত্মাই মানবের পরম প্রিয়তম।

"ন কশ্চিৎ কস্যচিৎ কামায় প্রিয়ো ভবতি,
আত্মনস্তু কামায় প্রিয়ো ভবতি।"

সেই আত্মাই আমাদের শ্রোতব্য, মন্তব্য ও ধ্যেয়। এইখানেই আমাদের ও পাশ্চাত্য দেশের মধ্যে বেশ একটু প্রভেদ দেখা যায়। পাশ্চাত্য দর্শনে যে আত্ম-তত্ত্বের অনুশীলন নাই, তাহা বলিতেছি না। তবে আমাদের দেশে যেমন এই আত্মতত্ত্ব সমস্ত তত্ত্বানুসন্ধানের মূল প্রপা[illegible] স্বরূপ, উহাদের দেশে সেরূপ কোনও দিন হয় নাই। আত্মতত্ত্বের এই মূল উৎস হইতে নানাদিকে নানাধা[illegible] প্রবাহ ছুটিয়াছিল। আত্মা যদি মূল জিজ্ঞাস্য হয়, ত[illegible] যাহা কিছু আত্মার হিত বা অহিতবিধান করে, তাহ[illegible] অনুসন্ধানের বিষয়ীভূত হয়। কিন্তু আত্মাই মুখ্য প্রয়োজ[illegible], অন্য সমস্ত গৌণ। বস্তুতঃ আত্মাকে কেন্দ্র করিয়াই আম[illegible]দের জ্ঞানের জগৎ গঠিত হয়। কৌতূহল যেখানে বহির্মু[illegible], সেখানে জ্ঞানের দীপালোক গিয়া পড়ে বাহিরের ব[illegible]

...র। বহির্মুখী জিজ্ঞাসা হইতে রসায়ন, জ্যোতিষ, ভূতত্ত্ব, পদার্থবিদ্যা, অর্থনীতি প্রভৃতি বিজ্ঞান জন্মলাভ করে। অন্তর্মুখী জিজ্ঞাসা হইতে আত্মতত্ত্ব, বস্তুতত্ত্ব বা তত্ত্ববিদ্যা, চরিত্রনীতি, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি নানা জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্ম হয়। মানবের জ্ঞানের ইতিহাসে রসায়ন, ভূতত্ত্ব প্রভৃতির স্থান নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। পরন্তু আজকাল মানবীয় সভ্যতা যেরূপ দ্রুত বহির্মুখত্ব প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাতে ইহা কিছুই বিচিত্র নহে যে, বাহ্যবস্তুর বিচারই আমাদের জ্ঞান-জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিবে। ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল হইতে মনীষী মুনিঋষিগণ অধ্যাত্মবিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা বা পরাবিদ্যার অনুশীলনেই যত্নশীল ছিলেন বলিয়া মনে হয়। যাহা জানিলে সব জানা হয়, কিছুই আর অজানা থাকে না, যাহা জানিলে সমস্ত সংশয় নিরস্ত হয়, যাহা জানিলে সকল রহস্যের সার জন্মমৃত্যু-রহস্যের আঁধার যবনিকা চিরতরে উদ্ঘাটিত হয়, যাহা জানিলে মায়ামোহময় সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণের অপরিসীম ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় না, তাহার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কর—'তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্ম।' ইহাই ভারতীয় সার সত্য।

ভারতবর্ষেই সম্ভবতঃ আত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য সর্ব্বপ্রথম প্রতিপাদিত হইয়াছিল। সেই অতি প্রাচীনকাল হইতেই 'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়াঃ' শুনিয়া আসিতেছি। একই দেহে যে জীবাত্মা ও পরমাত্মারূপ দুইটি পক্ষীর বসতি, তাহা আমরা প্রথম হইতেই স্বীকার করিয়া লইয়াছি। দেহকে আমরা কোনও দিনই ধর্ত্তব্যের মধ্যে আনি নাই। সেই ইন্দ্র-বিরোচন-সংবাদ হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত আমরা দেহাত্মবাদকে আসুরিক মত বলিয়াই উপেক্ষা করিয়া আসিতেছি। দেহ জড়প্রকৃতির অন্তর্গত, সুতরাং অনিত্য। জড়প্রকৃতি সর্ব্বথা অনিত্য, জীবের জীবন অনিত্য, সংসার অনিত্য—এই অনিত্যতার অপার পারাবারে প্রকাশ্য ...হাই বটপত্রলীন নারায়ণের ন্যায় ভাসিতেছে। সেই মায়া বা ...ত্যতার সাগর-তরঙ্গে আত্মা দোলা খাইলেও নিমগ্ন হয় নশ্বরতার মহাপ্রলয়ে এই আত্মা বিনাশ প্রাপ্ত হয় না।

"অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।"
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।

গীতা, ২য় অধ্যায়।

অবয়ব নাই বলিয়া আত্মা অচ্ছেদ্য ও অক্লেদ্য; অমূর্ত্ত বলিয়া অদাহ্য; দ্রবত্বরহিত বলিয়া অশোষ্য; অবিনাশী বলিয়া নিত্য; চিরস্থির বলিয়া স্থাণু। ইহার রূপান্তর হওয়া অসম্ভব। ইহা একরূপভাক্, নিজের রূপ কখনও পরিত্যাগ করে না বলিয়া আত্মা অচল। ইহার আদিও নাই, অন্তও নাই, এই জন্য আত্মা সনাতন। আত্মা চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অতীত, এই জন্য ইহা অব্যক্ত। ইহা শুধু চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর নহে, ইহা মনেরও অগোচর। আত্মাতে কোনও বিকার বা পরিবর্ত্তন সংঘটন করা যায় না, এই জন্য ইহা অবিকার্য্য বলিয়া কথিত হইয়াছে।

আত্মার এই নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত স্বভাব যতক্ষণ বুঝিতে না পারা যায়, ততক্ষণ ইহার বন্ধন। একবার আত্মার স্বরূপ বুঝিতে পারিলে আর বন্ধন থাকে না, দুঃখ-শোক থাকে না, জন্মমৃত্যু থাকে না—'তত্র কঃ শোকঃ কঃ মোহঃ অভেদমনুপশ্যতঃ।' ইহার নাম মোক্ষ। আমাদের প্রায় সমস্ত দর্শনশাস্ত্রই মোক্ষপর। মোক্ষ, কৈবল্য, নির্ব্বাণ আমাদের নিকট পরম নিঃশ্রেয়ঃ, পরমপুরুষার্থ। পাশ্চাত্য দার্শনিকরা এই জন্য মনে করেন, হিন্দুরা দুঃখবাদী বা pessimist এবং এই পেসিমিজিম্ হিন্দুদের সর্ব্বকর্ম্মশক্তিকে ক্ষুণ্ণ, খর্ব্ব করিয়াছে। কিন্তু আমার তাহা মনে হয় না। আমাদের মুক্তিসাধনা আত্মতত্ত্বেরই নির্গলিত ফল। আত্মাই যদি একমাত্র সত্য বস্তু হয়, তাহা হইলে আত্মা-ব্যতিরিক্ত জগতের যাবতীয় বস্তুজাতই অসৎ। সুতরাং এই সদসৎবুদ্ধি যত দিন না হয়, যত দিন আত্মাকে স্বরূপতঃ না জানা যায়, তত দিনই অসতের সংসারে বাস করিতে হয় এবং অসৎসংসর্গের যাহা দোষ—বন্ধন, সেই বন্ধন ঘটে। তত্ত্বজ্ঞানলাভ হইলেই বন্ধন টুটিয়া যায়, বন্ধন টুটিয়া গেলেই মোক্ষ। সাংখ্যদর্শনে অবশ্য ত্রিবিধ দুঃখের কথা আছে এবং সেই দুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তি পরমপুরুষার্থ, এই কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু এই দুঃখবাদ কি পরিমাণে প্রকৃতপক্ষে সাংখ্যদর্শনের অন্তর্গত, তাহা লইয়া এখনও পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। প্রকৃত সাংখ্যমত এই যে, নৃত্যপরা প্রকৃতির রূপ পুরুষের চোখে পড়িলেই আর অভিনয় থাকে না। অলঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া সহজ ভাষায় বলিলে বলিতে হয়, তত্ত্বজ্ঞান হইলেই প্রকৃতির খেলা ঘুচিয়া যায়। একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, সাংখ্যের মতেও আমরা দুঃখ হইতে

পলায়ন করিবার জন্যই যে মোক্ষ খুঁজি, তাহা নহে। আত্মার স্বরূপ কি, তাহা জানিতে গিয়াই মোক্ষের অনুসন্ধান আসিয়া পড়ে। কারণ, তত্ত্বতঃ আত্মাকে লাভ করা আর মোক্ষকে প্রাপ্ত হওয়া একই কথা। কাযেই আমি ইহাকে দুঃখবাদ বলিতে প্রস্তুত নহি।

আরও বিবেচনা করিয়া দেখুন, দুঃখকে বরণ করিতে আমরা কখনও কুণ্ঠিত হই নাই। সুখের অনুসন্ধানে আমাদের কোনও দিন তেমন তৎপরতা দেখা যায় নাই। পৃথিবীর ধারণায় যাহা সুখের উপাদান, মান যশঃ অর্থ বিত্ত পুত্র কলত্র—ইহা অল্পই হউক আর বেশীই হউক—কোনও দিন আমাদের চিত্তকে প্রলুব্ধ করিতে পারে নাই। পুরাণ আমাদিগকে স্বর্গের যে ছবি আঁকিয়া দেখাইয়াছে, তাহা সুখের মানস-সরোবর, ভোগের বিলাস-কানন, আরামের স্বপ্নমণ্ডিত কল্পলোক। সেখানে চিরবসন্ত হইতে উর্ব্বশী, রম্ভা, তিলোত্তমা পর্য্যন্ত কিছুরই অভাব নাই। কিন্তু ভারতের আত্মা তাহাতে মজে নাই। আমরা জানি, দেবতাদেরও স্বর্গসুখ চিরস্থির নহে। কল্পান্তে হউক আর কোটি কল্পান্তে হউক, স্বর্গ-সুখেরও শেষ আছে। অতএব কায নাই ও স্বর্গ-সুখে। 'নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্।' কোথায় সেই ভূমা, কোথায় সেই আনন্দ—যাহা কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে। বেদান্ত বলেন, ভূমাই ব্রহ্ম, সেই আনন্দই ব্রহ্ম। সেই আনন্দ হইতেই এই সমস্ত ভূতবর্গ জন্মলাভ করিয়াছে, আবার সেই আনন্দেই প্রবেশ করিবে।

আপাত-দৃষ্টিতে মনে হয়, জীব ও ব্রহ্ম সম্পূর্ণ পৃথক্। জীব পরিচ্ছিন্ন, ব্রহ্ম অপরিচ্ছিন্ন। আত্মা বা পুরুষ বহু। পরমাত্মা এক, অদ্বিতীয়, বিরাট। মনে হয়—

"ভিন্নোঽচিন্ত্যঃ পরমো জীবসঙ্ঘাৎ
পূর্ণঃ পরো জীবসঙ্ঘো হ্যপূর্ণঃ।
যতস্ত্বসৌ নিত্যমুক্তো হ্যয়ং চ
বন্ধান্মোক্ষং তত এবাভিবাঞ্ছেৎ॥"

জীবসমূহ হইতে পরমাত্মা ভিন্ন এবং অচিন্ত্য। পরমাত্মা পূর্ণ, জীবসমূহ অপূর্ণ। পরমাত্মা নিত্যমুক্ত, আত্মা বন্ধন হইতে মোক্ষের অভিলাষী। কিন্তু তত্ত্বের দিক্ দিয়া এই ভেদবাদ টিকিতে পারে না। কারণ, যাহা মায়াও নহে, ব্রহ্মও নহে, যাহা প্রকৃতিও নহে, চৈতন্যও নহে, এরূপ কোনও সত্তা আমরা স্বীকার করি না। পরমাত্মা ও আত্মা তত্ত্বতঃ অভিন্ন। সেই জন্য গীতা বলেন—'ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।' এই ঈশ্বর বা পরমাত্মা সর্ব্বথা সর্ব্বপদার্থের মধ্যে অনুস্যূত। কোনও একটি মুক্তার মালা যেমন শুধু মুক্তার সমষ্টিমাত্র নহে, তাহাদের মধ্যে একটি সূত্র প্রলম্বিত থাকাতেই যেমন 'মালা' সম্ভব হইয়াছে, এই জাগতিক পদার্থের মধ্যে সেইরূপ একটি সূত্র থাকাতেই ইহা সংসাররূপ বিচিত্র অথচ সমঞ্জসীভূত বিশ্বে পরিণত হইয়াছে।

'ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব।'

তিনি সকলের অন্তরাত্মা। তিনি সকলের সাক্ষিভূত। তিনি

"মমান্তরাত্মা তব চ যে চান্যে দেহসংস্থিতাঃ।
সর্ব্বেষাং সাক্ষিভূতোঽসৌ ন গ্রাহ্যঃ কেনচিৎ কচিৎ॥"

উপাধি, অবিদ্যা, মায়া তিরোহিত হইলেই জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত এক হইয়া যায়।

'ইদং জ্ঞানং সমাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ'—গীতা
'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি'—মুণ্ডকোপনিষৎ
'তদ্ভাবভাবমাপন্নস্তদাসৌ পরমাত্মনা।'—বিষ্ণুপুরাণ

ইহাই তত্ত্ববিদ্যার মীমাংসা। অদ্বৈতবাদিগণের মতে জীবাত্মা ও পরমাত্মায় যে ভেদ পরিলক্ষিত হয়, তাহা অবিদ্যার ফলে। 'পরিচ্ছেদ' 'প্রতিবিম্ব' বা 'আভাসে'র জন্য জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া মনে হয়। পরিচ্ছেদের দৃষ্টান্ত যথা—সূচীরন্ধ্র দিয়া আকাশ দেখিলে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকাশ দেখা যায়। জীবাত্মা সেইরূপ সার সত্যের কণিকামাত্র। প্রতিবিম্বের উদাহরণ যথা,—বালুকা-কণায় সূর্য্যতেজ প্রতিফলিত হইলে যেমন সেই বালুকাই খণ্ড-সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল দেখায়। এইরূপ প্রতিবিম্বযোগে অন্য বস্তুতে যে চাক্‌চিক্য দৃষ্ট হয়, তাহা আভাসের দৃষ্টান্ত। পরিচ্ছেদই হউক, প্রতিবিম্বই হউক, আর আভাসই হউক, আমরা দেখিতেছি যে, পৃথিবীতে এক চৈতন্যস্বরূপ বস্তুসত্তা আছে—তাহাই আত্মা। অবস্থাবিশেষে ইহা খণ্ড খণ্ড চৈতন্যরূপে প্রতিভাত হয়; সেই খণ্ড-চৈতন্যই জীবাত্মা।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তত্ত্ব হিসাবে এই যে মতবাদ, ইহার স্থান অতি ঊর্দ্ধে। গ্রীক্ ও আধুনিক য়ুরোপীয় দর্শনে ইহার অল্পাধিক পরিচয় মিলিলেও, ভারতবর্ষীয় দর্শনে এই আত্মতত্ত্ব যেরূপে উপদিষ্ট বা আলোচিত হইয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত অন্য কোনও জাতির চিন্তাধারায় আমরা পাই না।

ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাপ্রণালী যখন অধ্যাত্মবিদ্যার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া এক অপ্রতিহত চৈতন্য, অদ্বিতীয় সত্য উপলব্ধি করিল, তখন ধর্ম্মতত্ত্ব সেই সত্যকে আত্মসাৎ করিয়া লইল। তত্ত্ববিদ্যা যেখানে এক ধ্যানগম্য পরতত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তৃপ্তিলাভ করিল, ধর্ম্মতত্ত্ব সেখানে সেই পরতত্ত্বকে উপাসনা ও আরাধনার বিষয় করিয়া তুলিল। বলা বাহুল্য যে, তত্ত্ববিদ্যা ঔপপত্তিকভাবে যাহা গ্রহণ করিল, তাহার সহিত সাধ্যসাধনের কোনও সম্বন্ধ নাই। ধর্ম্মতত্ত্ব চাহে আত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন ঘটাইতে। ইহাতে আত্মা উপকৃত হইতে পারে, সন্দেহ নাই। কিন্তু যাহা সত্য, তাহা অণু হইতে পারে, পরমাণু হইতে পারে, বাষ্প হইতে পারে, চেতন হইতে পারে, অচেতন প্রধান হইতেও ক্ষতি নাই। তাহার সহিত আত্মা যে একটি নিবিড় পরম ঘনিষ্ঠ আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ পাতাইবে, এমন কোনও কথা নাই। পরকালের সুবিধা বা অসুবিধার কোনও কথাই চরম সত্য পদার্থের প্রসঙ্গে উঠিতে পারে না। আমাদের আদর্শ-চরিত্র নীতি স্থির করিয়া দেয়, অথবা আমাদের পক্ষে বিধি-নিষেধ স্থির করিয়া দেয় ধর্ম্মশাস্ত্র। তত্ত্ববিদ্যা কেবল নিখিল বিশ্বের একমাত্র বস্তু-সত্তা বা চরম সত্য পদার্থ কি, তাহা জানাইয়া দেয়। সুতরাং চরিত্রনীতি, ধর্ম্মশাস্ত্র বা তত্ত্ববিদ্যার ক্ষেত্র বিভিন্ন হইলে কিছু ক্ষতি নাই। কিন্তু ভারতবর্ষে প্রকৃতপক্ষে যাহা ঘটিল, তাহা এই ;—দর্শনশাস্ত্র বলিয়া দিল, 'সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ।' আমরা ধর্ম্মতত্ত্বের ভাষায় প্রণব জুড়িয়া বলিলাম, 'ওঁ তৎসৎ।' আমরা বলিলাম, তিনি আমাদের বুদ্ধির প্রয়োজক,—'ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ'—তিনি সূর্য্য-মণ্ডলমধ্যবর্ত্তী দেবাদিদেবতা, আমরা তাঁহাকে প্রণাম করি। দর্শনশাস্ত্র বলিল, সৎপদার্থ উপাধি-বিরহিত, মন বা বাক্য তাহাকে ধরিতে পারে না। আমরা বলিলাম, 'নির্ব্বিকল্পং নিরাকারং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্।' আমরা তাহাকে প্রণাম করি। দর্শনশাস্ত্র বলিলেন, প্রকৃতির সঙ্গে চৈতন্যময় পুরুষ বর্ত্তমান। পুরাণ-কাব্যে সেই পুরুষ-প্রকৃতির লীলাকে পরম মধুর যুগল উজ্জ্বল রসে সিক্ত করিয়া পরিবেষণ করিল। তত্ত্ববিদ্যার দিক্ দিয়া আত্মা পরম শ্রেষ্ঠ, আত্মা অপেক্ষা প্রিয় বস্তু জগতে কি আছে ?

পুরাণ বলিল, ঠিক। 'কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্।' তিনি আত্মারও আত্মা। কাব্যের ভাষায় আরও ভাল করিয়া বলা হইল :—

"অন্যের আছয়ে অনেক জনা
আমারি কেবলি তুমি।
পরাণ হইতে শত শত গুণে
প্রিয়তম করি মানি॥"

এই যে ধর্ম্মতত্ত্বের সহিত পরাবিদ্যার যোগ, ইহাতে আমি নিন্দা করিতেছি না। ইহা যে অস্বাভাবিক, তাহাও নহে। পরাবিদ্যা যেখানে অন্ধকারের পরপারে জ্যোতিঃস্বরূপ এক অনির্ব্বচনীয় সত্যের সাক্ষাৎ পায়, সেখানে ধর্ম্মতত্ত্ব সেই সত্য ও আত্মার মধ্যে যে এক অবিচ্ছেদ্য স্নেহসূত্র রচনা করিবে, তাহা আর বিচিত্র কি? আমাদের ব্রহ্ম শুধু তত্ত্ব-বিদ্যার শেষ মীমাংসা নহে, ব্রহ্ম আমাদের উপাস্য, আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের আদর্শ, সংসার সাগরে কাণ্ডারী, আমাদের প্রিয়াদপি প্রিয় পরম দেবতা। সৎ, চিৎ, আনন্দ যেখানে মূল সত্তার উপাদান, সেখানে সচ্চিদানন্দ-ঘন বিগ্রহ মুরলীধর পিঙ্গমৌলি ঠাকুর আমাদের নিত্য পূজার বিষয়।

জগতের অন্যান্য ধর্ম্মমতগুলি পর্য্যালোচনা করিলে দেখিবেন যে, অন্য কোথাও দেবতা ও সার সত্যে, ধ্যান ও অর্চ্চনায় এরূপ একাত্মভাব দেখিতে পাওয়া যায় না। প্লেটোর Ideaকে কেহ পূজা করে নাই, স্পিনোজার Infiniteকে বা হেগেলের Absoluteকে কেহ আরাধ্য দেবতা করিয়া তুলে নাই। এই সকল তত্ত্বকে ভগবানের সঙ্গে গাঁথিয়া দিলেও জগতের কোনও ধর্ম্মমত (Religion) তাহা নত-মস্তকে গ্রহণ করে নাই। আমাদের দেশে তত্ত্ববিদ্যা ধর্ম্মশাস্ত্রে ডুবিয়া গেল। ধর্ম্মশাস্ত্রের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে বাদানুবাদের অবসর তেমন নাই। সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বাগবিতণ্ডা যতই থাক, সম্প্রদায়ের মধ্যে মতবৈষম্যের অবকাশ অত্যন্ত অল্প। ধর্ম্মমত সহজেই সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠানে পর্য্যবসিত হয়। স্বাধীন চিন্তা তাহাতে ব্যাহত না হইয়া পারে না। কোনও সম্প্রদায় বলিল ব্রহ্ম ; কোনও সম্প্রদায় বলিল আত্মা। কেহ মাঝখান হইতে বলিয়া দিলেন, ঐ একই তত্ত্ব, ভেদ কিছুই নাই। 'ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।' এইরূপ

সমন্বয়-চেষ্টায় স্বাধীন চিন্তাকে আরও ব্যাহত সীমাবদ্ধ করিয়া তুলে। আমার বক্তব্য এই যে, ভারতীয় স্বাধীন চিন্তার ধারা ধর্ম্মমতের সহিত মিশিয়া গিয়া যেন বালুকারাশির মধ্যে হারাইয়া গিয়াছে। য়ুরোপীয় দর্শনেও সময়ে সময়ে এইরূপ আত্ম-বিস্মৃতির যুগ আসিয়াছিল। ধর্ম্মমতের প্রাবল্যে দর্শনের অমল, শুভ্র ধারাটি হারাইয়া গিয়াছিল। আমাদেরও সেইরূপ একটি নিষ্প্রভতার যুগ আসিয়াছে। আমাদের ধর্ম্মমত লইয়া যতই গর্ব্ব করি না কেন, যতই তাহার দার্শনিক ভিত্তি থাক না কেন, ধর্ম্মমত দর্শন নহে। ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় চিন্তা, পারলৌকিক চিন্তা আর নিঃস্বার্থ দার্শনিক চিন্তা বিভিন্ন। আমাদের দার্শনিক চিন্তাধারাকে পুনরায় জীবন্ত উৎসে পরিণত করিতে হইলে, ধর্ম্মমতের সাম্প্রদায়িক সীমার মধ্য হইতে বাহির করিয়া লইতে হইবে। অন্যথা নূতন নূতন তথ্য উদ্ঘাটন করিবার জন্য চেষ্টা হইবে কেন? কৌতূহল জাগ্রত হইবে কেন? শ্মশানে বসিয়া শক্তির আরাধনা করিয়া সাধক কৈবল্য লাভ করিতে পারেন বটে; কিন্তু বিজ্ঞান প্রত্যেক পরমাণুকে শক্তির কেন্দ্ররূপে গণনা করিয়া তবেই ত নূতন নূতন রহস্যের সন্ধান লাভ করিতে পারেন।

ভারতের দার্শনিক চিন্তা যে বর্ত্তমানে অনুর্ব্বর হইয়া পড়িয়াছে, সে সম্বন্ধে আশা করি, মতভেদ হইবে না। ব্যাধির সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই, তবে আমি তাহার যে কারণ অথবা প্রতীকারের উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাহার সম্বন্ধে অবশ্য যথেষ্ট মতভেদ থাকিতে পারে। আধুনিক কালে বিজ্ঞানে যাঁহারা বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে দুই চারি জন ভারতীয়ের নামও করা যাইতে পারে। কিন্তু দার্শনিক জগতে আমরা বহুদিন যাবৎ কিছুই দিতে পারি নাই। এখনও পাশ্চাত্য জগতে হুইলে, বার্গসন, ক্রোচে, অয়কেন, বার্ডর‍্যাণ্ড রাসেল, আইনষ্টাইন প্রভৃতির নাম সকলেরই পরিচিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, অধ্যাত্মবিদ্যার জন্মভূমি ভারতবর্ষ আজ তন্দ্রাগত। অথচ পাণ্ডিত্যের যে কিছু অভাব আছে, তাহা ত বোধ হয় না। আমাদের মধ্যে এখনও অনেক মনস্বী, প্রতিভাবান্ কবি ও বিদ্বজ্জন আছেন। কিন্তু তাঁহাদের চিন্তার ফল উল্লেখ করিবার মত আমরা কিছুই পাই না। ইহার কারণ কি?

আমাদের যে মৌলিক চিন্তাশীলতার অভাব ঘটিয়াছে, তাহার আর একটি কারণ—আমাদের শিক্ষাপ্রণালী। আমাদের মধ্যে যাঁহারা দার্শনিক শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহারা হয় সংস্কৃতে, না হয় ইংরাজীতে চিন্তা করেন। যাঁহারা হিন্দু ষড়দর্শন অধ্যয়ন বা অধ্যাপনা করেন, তাঁহারা সকলেই যে সে সকলের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিবেন, সে সম্বন্ধে কোনও কথা নাই। কিন্তু ঐ সকল দর্শনশাস্ত্রে যে শেষ কথা বলা হইয়াছে, আর কিছুই বলিবার, বুঝিবার বা জানিবার নাই, এরূপ যাঁহারা ভাবেন, তাঁহাদের সংখ্যা বোধ হয় বেশী নহে। শাঙ্করভাষ্য প্রতিভার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হইতে পারে, কিন্তু শাঙ্কর মত যে সকলেরই গ্রহণীয়, এ কথা মনে করিবার হেতু নাই। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে বহু দার্শনিক মতবাদের উদ্ভব হইয়াছিল। সে সময়ে লোকের মনের স্বাধীনতা সঙ্কুচিত হয় নাই। মৌলিক চিন্তার অভাব ঘটে নাই। মাধবাচার্য্যের সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে অন্ততঃ ষোলটি দার্শনিক মতের পরিচয় পাওয়া যায়—বেদান্তকে বাদ দিয়া। তাহার পরেও অনেক দার্শনিক মতের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে দেখা যায়। কিন্তু এক্ষণে আমাদের মধ্যে নব নবোন্মেষশালিনী প্রতিভার একান্ত অভাব ঘটিয়াছে। সংস্কৃত কোনও কালে চলিত ভাষা ছিল কি না সন্দেহ। কিন্তু চলিত ভাষা না হইলেও ইহা দেশের বিদ্বন্মণ্ডলীর ভাষা যে ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাহাতে ফল এই হইত যে, আলোচনা, বিচার, অনুশীলনের অনেক সুবিধা হইত। এক্ষণে সে সুবিধার একান্ত অভাব। দর্শনশাস্ত্র পঠন-পাঠন একান্ত পরিমিত। কয় জনেই বা পড়েন আর কয় জনেই বা আলোচনা করেন? নবদ্বীপের অবস্থা সে দিন দেখিয়া আসিয়াছি। যে নবদ্বীপ টোলের ছাত্রদিগের বাদ-বিতণ্ডায় এক সময়ে কোলাহলময় ছিল, এখন সেখানে দুই চারি দশটি ছাত্র দেখা যায়। টোলের সংখ্যাও কমিয়া গিয়াছে, পণ্ডিতও বিরল। এইরূপ সর্ব্বত্র। সুতরাং আলোচনার অভাবে, প্রয়োগের অভাবে স্বাধীন চিন্তার প্রবাহ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আমরা যাহারা ইংরাজীতে দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছি, তাহারা বিদেশীয় ভাষার পেষণে মৌলিকতা হারাইয়া ফেলিয়াছি। স্বাধীন চিন্তা, মৌলিকতা, নবতথ্যাবিষ্কারিণী প্রতিভা মনের স্বাভাবিক সহজ স্বচ্ছন্দ গতিতেই স্ফূর্ত্তি লাভ করে।

মাতৃভাষার সাহায্যে যেমন বস্তুজ্ঞান হয়, বস্তুর সহিত সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে পরিচয়লাভ হয়, ভিন্ন ভাষায় তাহা হয় না। জানি না, সংস্কৃতভাষা তাহার পুরাতন বিভব ফিরিয়া পাইবে কি না। সে সৌভাগ্য যে আর হইবে, এরূপ সম্ভাবনা দেখা যায় না। বরং বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যদি সংস্কৃত ভাষাকে অবশ্য-পাঠ্য বিষয় হইতে নির্ব্বাসিত করা হয়, তাহা হইলে সংস্কৃত ভাষার ভবিষ্যৎ সহজেই অনুমেয়। যদি সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত শিক্ষার পুনরভ্যুত্থান সুদূরপরাহত হয়, তাহা হইলে আমাদের মাতৃভাষার আশ্রয়—অবলম্বন করাই যুক্তিযুক্ত মনে করি। সর্ব্বদেশে সর্ব্বজাতির মধ্যে মাতৃভাষায়ই মৌলিক চিন্তার বিকাশ দেখা যায়। আমরা ইংরাজীর সাহায্যে শুধু দৈনন্দিন ব্যাপার নির্ব্বাহ নহে, আমাদের যত রকম জ্ঞানানুশীলন আছে, তাহাও এই বিদেশীয় ভাষার সাহায্যে করিতে বাধ্য হইয়াছি। ইহা স্বাভাবিক নহে। ইহা কখনই সুফল প্রসব করিতে পারে না। সংস্কৃত ভাষা ঠিক এই হিসাবে আমাদের পক্ষে অপরিচিত না হইলেও ইহা ধ্রুব সত্য যে, মাতৃভাষায় আমরা যে সকল স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ ভাববিকাশের সুযোগ পাই, অন্য কোনও ভাষায় সেরূপ হইতে পারে না। আমি জানি, ইহাতে সংস্কৃতাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ নিশ্চয়ই আপত্তি করিবেন। তাঁহারা জানেন—এবং আমরাও স্বীকার করি যে, সংস্কৃত বাঙ্গালা ভাষার জননী এবং সংস্কৃত সাহিত্য-দর্শনেতিহাসের আলোচনায় আমরা এতই অভ্যস্ত হইয়াছি যে, ইহা আর আমাদের পক্ষে অপরিচিত বা নূতন ভাষা বলা চলে না। ইংরাজীর মোহে যাঁহারা মুগ্ধ, তাঁহাদেরও যুক্তি ঐ একই। কিন্তু আমার মত আমি পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়াছি। সংস্কৃত ভাষা বঙ্গভাষার যতই নিকট-আত্মীয়া হউক, আমাদের মাতৃভাষার তুলনায় তাহা যে একটু দূরসম্পর্কীয়া, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। সেই জন্যই ইচ্ছা হয়, কবে সংস্কৃত ও বিশ্বের সমস্ত চিন্তাধারাকে আত্মসাৎ করিয়া আমাদের মাতৃভাষা বাঙ্গালা রাজরাজেশ্বরীরূপে জগতের সভায় বিরাজ করিবে! আমি আশা করি, তখন হয় ত জগতের জ্ঞানভাণ্ডারে আমরা বহু মণিমুক্তা প্রদান করিতে সমর্থ হইব। *

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র (এম্-এ)

* ১৩৩৮ সালের বঙ্কিম-সাহিত্য-সম্মেলনে দর্শনশাখার সভাপতির অভিভাষণ।

যাত্রা-পথ

বহুপথ প'ড়ে আছে বসুধার মাঝে
কোন তার সংখ্যা নাই—নাহিক নির্দ্দেশ ;
বন্ধুর অজানা পথে অনাগত কাযে
হোক্ মোর যাত্রা সুরু—জড়তার শেষ।
ঊর্দ্ধমুখী লক্ষ্য মম্ আছে দিবা-যামি
গিরি-পথ লঙ্ঘিবারে প্রশান্ত স্বপন—
মনে হয়, পথাশ্রয়ী বীর্য্য লয়ে আমি
সার্থক করিয়া লব ক্ষণিক-স্খলন।

পথিকের সাথী সম বন্ধু অযাচিত,
অগণিত বৈরী যদি জোটে মোর পাশে,
আমি মোর লক্ষ্য লয়ে উচ্চ করি' শির
বিজয়ীর মত কব—'এস অজানিত।'
বিশ্বপথে বাহিরিনু যেই রত্ন আশে
যাত্রাশেষে আজি তাহা খুঁজে লব স্থির।

শ্রীবিরামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

পক্ষবিশিষ্ট পোত

ইটালীর গার্ডন অঞ্চলের জনৈক ইতালীয় এক জাতীয় মোটর-চালিত পোত নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই মোটর-পোতের দুই

পক্ষবিশিষ্ট মোটর-পোত

পার্শ্বে দুইখানা ডানা আছে। জলের উপর দিয়া যখন মোটরবোট দ্রুতবেগে চলিতে থাকে, তখন তাহাকে ধাবমান বিমানপোতের ন্যায় দেখায়। এই পোতের গতিবেগ ঘণ্টায় প্রায় ৪৬ মাইল হইবে।

অভিনব সন্তরণ-যন্ত্র

বিবাটদেহ ভেকের আকারবিশিষ্ট এক প্রকার সন্তরণ-যন্ত্র সম্প্রতি নির্ম্মিত হইয়াছে। যাহারা সাঁতার জানে না, তাহারা

নূতন সন্তরণ-যন্ত্র

এই যন্ত্রের সাহায্যে নিরাপদে প্রথম শিক্ষালাভ করিতে পারে। এই যন্ত্র এমনই ভাবে নির্ম্মিত যে, মানুষের ভারে সহসা উল্টাইয়া যায় না। যন্ত্রের দুই পার্শ্বে দুইটি রবারের নল বায়ুপূর্ণ অবস্থায় সংলগ্ন থাকে। ভেক-যন্ত্রের পশ্চাতের দুইটি এল্যুমিনম্-নির্ম্মিত চরণ হাতের দ্বারা চালিত "লিভারের" সাহায্যে পরিচালিত হয়। সম্মুখের হাত দুইটি স্বাধীনভাবে কার্য্য করে। সন্তরণকারী যদৃচ্ছা গতি পরিবর্ত্তিত করিতে পারেন, তাহাতে কোন বাধা হয় না। সলিলরাশি বিক্ষুব্ধ হইলেও ভেক-যন্ত্র উল্টাইয়া যায় না। ইহার সাহায্যে জলমগ্ন ব্যক্তিকে উদ্ধার করা চলে।

পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ সেতু

আরকান্সাস্ নদীর উপর যে সেতু নির্ম্মিত হইয়া সম্প্রতি লোক-চলাচলের জন্য উন্মুক্ত হইয়াছে, তাহার মত উচ্চতা কোন
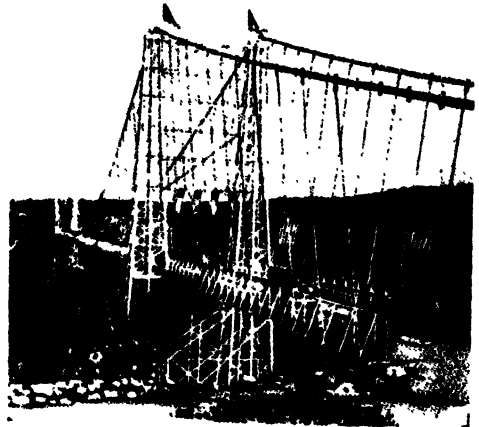
উচ্চতম সেতু

সেতুরই নহে। নদীগর্ভ হইতে উহা ১ হাজার ৫৩ ফুট ঊর্দ্ধে অবস্থিত। এই সেতুপথে কোলোরাডোর ভাবীয় প্রমোদোদ্যানে গমন করা যায়।

প্রাচীনতম প্রস্তরলিপি

প্রায় ৬ হাজার বৎসর পূর্ব্বে লাগাশের রাজা এনটেমেনা বাটালী সহযোগে প্রস্তরগাত্রে একখানি লিপি ক্ষোদিত করিয়াছিলেন।' ডেভিড্ ও জোনাথান্ নামক দুই জন প্রাচীনতম নৃপতির বন্ধুত্ব সম্বন্ধে বিবৃতি এই শিলালিপিতে বিদ্যমান। উভয়ের প্রীতির এই কাহিনী ইতিপূর্ব্বে পৃথিবীতে অপরিজ্ঞাত ছিল। যে শিলাখণ্ডে এই লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল, অধুনা তাহা আমেরিকায় আনীত হইয়াছে। চিকাগোর জনৈক সংগ্রাহকের অধিকারে উহা রহিয়াছে। শিলাখণ্ডটি অনেকটা ত্রিকোণাকৃতি; উহার গাত্রে উৎকীর্ণ লেখমালা সুমেরীয় ভাষায় লিখিত।

প্রাচীনতম শিলালিপি

প্রদীপ্ত টুপীধারী পথের পুলিস

প্যারী নগরীর জনযান-নিয়ন্ত্রণকারী পুলিস সম্প্রতি প্রদীপ্ত টুপী পরিয়া থাকে। এই শিরোভূষণ বহু দূর হইতে পথিক ও মোটর-চালকের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ইহা দেখিয়া তাহাদের গতিবেগ নিয়ন্ত্রিত হয়। পুলিসের শিরোভূষণে এক প্রকার উজ্জ্বল বর্ণের প্রলেপ দেওয়া হয়। অন্ধকারে উহা জ্বলিতে থাকে। পথিকরাও পুলিস-প্র...ের সাহায্যপ্রার্থী হইলে উক্ত প্রদীপ্ত শিরোভূষণের সহায়... তাহাদিগকে সহজে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে।

প্রদীপ্ত টুপীধারী পুলিস

বিরাট ঔষধ-প্রদর্শনী

আগামী ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে চিকাগো সহরে বিরাট প্রদর্শনী বসিবে। এই মেলা-ক্ষেত্রে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি ও ঔষধ-সমূহ প্রদর্শিত হইবে। মিচিগান হ্রদের তীরে সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে মেলার গৃহ-সমূহ নির্ম্মিত হইতেছে। এই প্রদর্শনীতে গৃহাদি নির্ম্মাণে প্রায় ১৭লক্ষ ৮৩হাজার টাকা ব্যয়িত হইবে। হ্রদতীরে বৈদ্যুতিক আলোক-সমুজ্জ্বল প্রদর্শনী-ক্ষেত্রকে নয়নমনোরঞ্জক করিবার সর্ব্ববিধ ব্যবস্থা হইয়াছে। মেলাক্ষেত্রের নমুনা-চিত্র এই সঙ্গে প্রদত্ত হইল।
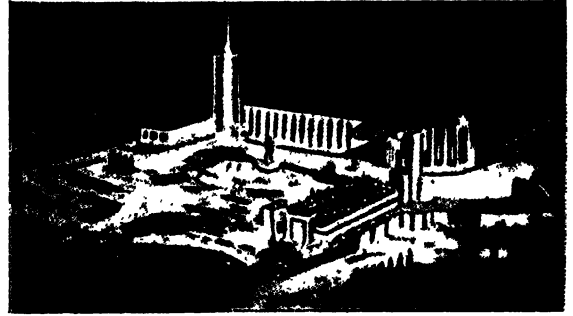
মার্কিণের বিরাট ঔষধ-প্রদর্শনী

নূতন চশমা

মোটর-গাড়ীর পরিচালক বা পরিচালিকা, গাড়ী চালাইবার সময় আসনে বসিয়া যাহাতে পশ্চাতের দৃশ্য দেখিতে পায়, তাহার ব্যবস্থা সম্প্রতি প্রতীচ্যদেশে হইয়াছে। চশমার ফ্রেমের দুই পার্শ্বে দুইখানি ক্ষুদ্র দর্পণ এমন ভাবে সন্নিবিষ্ট থাকে যে, তাহাতে পশ্চাদ্ভাগের দৃশ্য প্রতিবিম্বিত হয়। সুতরাং পশ্চাতে না চাহিয়াও পরিচালক অনায়াসে সতর্কভাবে গাড়ী চালাইতে পারে।

মোটর-পরিচালকের নূতন চশমা

বিচিত্র ঘুঁড়ি

কাগজের অপেক্ষাও পাতলা এলুমিনম্ নির্ম্মিত একপ্রকার ঘুঁড়ি প্রতীচ্যের বাজারে বাহির হইয়াছে। ইহা অত্যন্ত লঘু হইলেও

বিচিত্র ঘুঁড়ি

কাগজের ঘুঁড়ির অপেক্ষা আঘাত-সহ। গাছে পড়িলে ইহা ছিঁড়িয়া যায় না। যদি কোনও কোনও স্থান বাঁকিয়া যায়, স্বল্প পরিশ্রমেই আবার তাহা পূর্ব্বাবস্থায় ফিরাইয়া পাওয়া যায়। এলুমিনম্-ঘুঁড়ির জন্য সামান্য বাতাসের বেগের প্রয়োজন।

কেন্দ্রীভূত সূর্য্যরশ্মি

ক্যালিফোর্ণিয়ার "টেক্‌নলজি" প্রতিষ্ঠানের বৈজ্ঞানিকগণ দর্পণ-সাহায্যে সূর্য্যরশ্মিকে কেন্দ্রীভূত করিয়া একটি উনান তৈয়ার

কেন্দ্রীভূত সূর্য্যরশ্মি

করিয়াছেন। তাঁহাদের ধারণা, এই উপায়ে সূর্য্য-তাপের শতকরা ৮০ ভাগ মনুষ্যের ব্যবহারে লাগাইতে পারিবেন। বর্ত্তমান যন্ত্রের সাহায্যে তাঁহারা ৪ হাজার ৫ শত ডিগ্রীর তাপ উৎপাদন করিয়াছেন। এই উত্তাপে হীরকও গলিয়া বাষ্পে পরিণত হয়। এই যন্ত্রে ১৯টি দর্পণ আছে। এই উনবিংশ দর্পণে প্রতিফলিত সূর্য্যরশ্মি কেন্দ্রীভূত হইয়া নিম্নস্থ আর একটি দর্পণে প্রতিফলিত হয়। এই কেন্দ্রীভূত সূর্য্যরশ্মির এমনই প্রচণ্ড শক্তি যে, পৃথিবীতে এমন কোন পদার্থ নাই—যাহা ইহার দ্বারা পরিবর্ত্তিত আকার না ধারণ করিবে।

প্যারাসুট-সংলগ্ন আলোকবর্ত্তিকা

নাবিকগণের সুবিধার জন্য সমুদ্রবক্ষে শূন্যবিহারী আলোকবর্ত্তিকা হইতে কিরণপাতের ব্যবস্থা হইয়াছে। প্যারাসুট বিমানপথে দেহ বিস্তার করিয়া উড়িতে থাকে; তাহার নিম্নদেশে প্রজ্বলিত

প্যারাসুট-সংলগ্ন আলোকবর্ত্তিকা

আলোকবর্ত্তিকা হইতে সমুজ্জ্বল রশ্মিজাল নির্গত হইয়া সমুদ্রবক্ষকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলে। পিস্তলের মধ্যে প্যারাসুট-সংলগ্ন আলোকাধার গুলীর মত রাখিয়া আওয়াজ করিলে প্রায় ২ শত ফুট ঊর্দ্ধে উহা নিক্ষিপ্ত হয়। শূন্যপথে বর্ত্তিকা প্যারাসুটের আশ্রয়ে থাকিয়া আলোক বিকীর্ণ করিতে থাকে। এই আলোকবর্ত্তিকা ৩০ হাজার বাতির শক্তি বিশিষ্ট। সুতরাং ২৫ মাইল দূর হইতেও উহা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

—

তপশ্চর্য্যা

১

"উজ্জ্বলা" সাপ্তাহিক কাগজ। তাই বলিয়া রাজ্যের খবরই শুধু ছাপা হয় না; 'উজ্জ্বলায়' ধারাবাহিক উপন্যাস, ছোট গল্প, কবিতা, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রবন্ধ—সবই ছাপা হয়। সেই সঙ্গে পশার জমাইবার উদ্দেশ্যে থিয়েটার-বায়োস্কোপের আলোচনাও রীতিমত প্রতি সপ্তাহে ছাপা হয়। এই বিভাগের লেখক শ্রীপদ চক্রবর্ত্তী। "কুটুস্-কামড়" বিভাগে থিয়েটার-বায়োস্কোপের আলোচনা চলে; এবং শ্রীপদ স্বনামে এ বিভাগের দণ্ড-মণ্ড পরিচালনা করে, তেমন ধারণা যদি কাহারো থাকে তো সে ভুল। এ বিভাগ-পরিচালনায় ছদ্ম-নাম ব্যবহারের প্রয়োজন, এবং তা অকারণও নয়। শ্রীপদর সে ছদ্ম-নামটুকু "শ্রীবৃশ্চিক শর্ম্মা।"

ছদ্ম নাম কাগজে ছাপা হইলেও রঙ্গ-জগৎ-সংশ্লিষ্ট সকলেই জানেন, এ শ্রীবৃশ্চিক শর্ম্মা শ্রীমান্ শ্রীপদ চক্রবর্ত্তী।

শ্রীপদ তিন-বার বি, এ পরীক্ষা দিয়াছিল, কিন্তু···

সে কথার আলোচনার প্রয়োজন নাই। বি, এ পাশ করিলেই কিছু সর্ব্ব-বিদ্যায় বিশারদ হওয়া যায় না, তার ভূরি-ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে বাহিরে সে প্রমাণের জন্য না ছুটিয়া শ্রীপদকে দেখিলেই আমরা বুঝিতে পারি, তার রোগা দেহ এবং ছোট্ট মাথাটুকুর মধ্যে বিশ্বের সকল সাহিত্য, সকল আর্ট এবং সমালোচনাযোগ্য মিষ্ট ও ঝাঁঝালো ভাষা একেবারে ঠাশা! পাবলোভার নাচ দেখিয়া আসিয়া কাগজে সে এমন আলোচনা ছাপাইয়া দিল, এত [illegible]শনে ভরিয়া যে, লোকের তাক লাগিয়া গেল! নাচ দেখিয়া দর্শক যে আনন্দ পাইয়াছিল, তার সমালোচনার [illegible]ত্যের নীচে সে আনন্দ হাঁফাইয়া মরিল এবং 'উজ্জ্বলা'য় নাচের আলোচনা পড়িয়া কণ্টকিত বিস্ময়ে তারা ভাবিল, [illegible]জ্ঞান, এমন ব্যাপার ঐ নাচের মধ্যে···আর তারা তা [illegible]য়া শুধু দেখিয়া আসিল কতকগুলা বিচিত্র ভঙ্গী··· [illegible] শুধু মুগ্ধ করিয়াছিল—নাচে এনসাইক্লোপিডিয়ার [illegible]র আভাসও জাগায় নাই!

[illegible] পাবলোভা কেন? বাঙলা থিয়েটারের অভিনয়! [illegible]নয় দর্শকের ভালো লাগে, বৃশ্চিক শর্ম্মার দংষ্ট্রার আঘাতে তাহাই দাঁড়ায় 'কিস্সু নয়'! এবং যে-অভিনয় তাদের অসহ্য ঠেকে, তাহারি ব্যাখ্যা করিতে বৃশ্চিক শর্ম্মা রুশ, জার্ম্মান, সুইডিশ অভিনেতার নাম পাড়িয়া এমন হেঁয়ালি গড়িয়া তোলে যে, বেচারা দর্শকের দল রীতিমত ভয় পাইয়া যায়। অভিনয় দেখার সহজ আনন্দ তাদের বিলুপ্ত হইয়াছে। কোনো জায়গা ভালো লাগিলে তারা আর আনন্দ পায় না, ভাবে, ওগুলা হয় তো ফাঁকি! যেখানটা অসহ্য বোধ হয়, সেখানটায় চুপ করিয়া থাকে, 'উজ্জ্বলায়' না-জানি কি গভীর গবেষণা বাহির হইবে! অর্থাৎ 'উজ্জ্বলা' কাগজ বাহির হইবার আগে যে-আনন্দ রঙ্গমঞ্চে দর্শকের অনায়াস-লভ্য ছিল, এখন তাহা বিভীষিকায় রূপান্তরিত হইয়াছে!

'উজ্জ্বলার' বিজ্ঞাপন দেওয়ার উদ্দেশ্যে এ-কথা বলিতে বসি নাই। এ কথা খুলিয়া না বলিলে শ্রীপদর পরিচয় পাছে অসম্পূর্ণ থাকে, শুধু এই উদ্দেশ্যেই দু'চারি কথা বলা।

অর্থাৎ সাহিত্যের বিশেষ ক্ষেত্রে শ্রীপদর বেশ একটু প্রতিপত্তি জমিয়া গিয়াছে। ইহার উপর রেডিও-ব্রডকাস্টিংয়ে সে গিয়া মাঝে মাঝে উদয় হয় এবং কনটিনেণ্টাল সাহিত্য সম্বন্ধে এমন সব নূতন তথ্য শুনাইয়া দেয় যে, 'লিস্নাররা' হতভম্ব হইয়া উঠে!

উজ্জ্বলার প্রতাপ দোর্দ্দণ্ড হইয়া উঠিয়াছে। যাদের সঙ্গে সম্পাদক-সঙ্ঘের পরিচয় নাই, তারা এ দলটিকে ভয় করে। কারণ, এমন বেপরোয়া—উজ্জ্বলা-দলের মতে নির্ভীক—মতামত চালাইতে তৎপর আর কেহ নাই! যাদের সঙ্গে এ-দলের ঘনিষ্ঠতা, তারা বলে, বাঙলা সাহিত্যে প্রাণ বহিয়া আনিয়াছে উজ্জ্বলা! সমাজ-সাহিত্য এবারে একদম্ স্বর্গে না উঠুক, ও-পথে দু'চারি ধাপ যে ঠেলিয়া উঠিবে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই!

২

'উজ্জ্বলা'য় কয়েকটি মহিলা-লেখিকার লেখা কবিতা ও সন্দর্ভ নিয়মিত ছাপা হয়। শ্রীমতী শিখরিণী দেবীর কবিতা, তপস্বিনী দেবীর সামাজিক আলোচনা, বিশ্বজিতা দেবীর গল্প এবং মার্কণ্ডেয়ী দেবীর সাহিত্যিক সন্দর্ভ—ইহাদের লেখা

নহিলে 'উজ্জ্বলা'র পাঠক-পাঠিকার দলে হাহাকার ওঠে। এ আমাদের অনুমান নয়—'উজ্জ্বলা'তেই মাঝে-মাঝে চিঠি-পত্রে পাঠক-পাঠিকার বিলাপ মর্ম্মরিয়া ওঠে! কেহ লেখেন, এ সপ্তাহে শিখরিণী দেবীর কবিতা নাই কেন? বিশ্বজিতা দেবীর শরীর ভালো তো? তাঁর গল্প দেখিলাম না যে? আর মার্কণ্ডেয়ী দেবী কি এখনো ট্রিচিনোপলি হইতে ফেরেন নাই? তাঁর লেখা 'ভঙ্গ-সমাজ' উপন্যাসের সমালোচনা উজ্জ্বলায় এখনো ছাপা হইল না? ইত্যাদি।

ইঁহাদের মধ্যে শ্রীমতী তপস্বিনী দেবী উজ্জ্বলা-অফিসে মাঝে মাঝে আসিয়া উদয় হন। পরণে খদ্দর, পায়ে নাগরা জুতা—ভঙ্গিম দেহ-লতা—ভারতীয় চিত্রের সঠিক মডেল না হোক, কতকটা তারি গা ঘেঁষিয়া যায়! বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম বলা চলে, পক্ষপাতিতার বলে! তবে দুই চোখে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা! তিনি অনর্গল বকিতে পারেন। নিজের মত সুপ্রতিষ্ঠ করিতে, বিরুদ্ধ মতকে শ্লেষ-জর্জ্জর বাণে বিঁধিতে এতটুকু বাধে না! অবশ্য, বাঙলার নারী পুরুষকে চিরদিনই তর্কে পরাস্ত করিয়া আসিতেছেন—এটা তপস্বিনীর পক্ষে খুব বড় সার্টিফিকেট নয়…তবে তাঁর তর্কে বহ্নি জ্বলিলে মিনতির অজস্র বর্ষণেও তা নিবিতে জানে না, তাঁর সম্বন্ধে এইটাই সব চেয়ে বড় কথা!

আলোচনা-সূত্রে শ্রীপদর সঙ্গে তপস্বিনী দেবীর ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। জন্মিলেও শ্রীপদ তাঁর পরিচয়-গ্রহণে কখনো সাহসী হয় নাই। অর্থাৎ তাঁর কে আছে, তাঁর জীবনের কি লক্ষ্য, এ সব উজ্জ্বলা-কোম্পানির অবিদিত ছিল। শ্রীপদ ভাবিত, সামাজিক আলোচনা লইয়া যতই মাতিয়া থাকুন, তপস্বিনী দেবীর পারিবারিক আদর্শ…

জানিবার জন্য মন উৎসুক হইয়া উঠিত; কিন্তু জানিবার উপায় ছিল না। অন্য লোককে বহু প্রশ্ন করিয়া শুধু এই-টুকু জানিয়াছিল, তপস্বিনী দেবীর বাবার পয়সা-কড়ি আছে। তিনি থাকেন বালিগঞ্জ ষ্টেশনের পূর্ব্বে কশবা গ্রামে। ট্রেণে করিয়া তপস্বিনী উজ্জ্বলা-অফিসে আসেন। নারীর যে স্বাভাবিক কুণ্ঠা—স্বাধীন আবহাওয়ায় যে কুণ্ঠা মারা যায় নাই, দেখে, সে কুণ্ঠা ইঁহার কোথাও নাই। এই জন্যই বুঝি সকলের শ্রদ্ধা তপস্বিনী দেবী একটু বেশী রকম আয়ত্ত করিয়াছিলেন।

সে দিন সন্ধ্যার সময় উজ্জ্বলা-কোম্পানির সকলে ম্যাচ দেখিতে গিয়াছিল; শ্রীপদ একা অফিসে বসিয়া 'কুটুস্-কামড়ে'র লেখনী-দংষ্ট্রা শাসাইতেছিল, অর্থাৎ প্রুফ দেখিতে-ছিল, তপস্বিনী দেবী আসিয়া ডাকিলেন,—শ্রীপদবাবু…

শ্রীপদ প্রুফ হইতে চোখ তুলিল, চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল—আপনি! আসুন…

তপস্বিনী দেবী কহিলেন,—আপনার প্রুফ দেখতে কত সময় লাগবে আরো?

শ্রীপদ কহিল,—কেন, বলুন তো…

তপস্বিনী দেবী কহিলেন,—আপনার সঙ্গে একটু কথা ছিল…মানে, আজ ভিড় নেই। ক'দিন থেকেই কথাটা বলবো বলবো ভাবচি…খুব গোপন কথা! একেবারে মনের নিভৃত কোণের…

শ্রীপদর বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। এ-বয়সে তরুণীর মুখ হইতে এতখানি বিশ্বস্ততার আভাসে তরুণের বুক ছাঁৎ করিবে, ইহা খুবই স্বাভাবিক! 'কুটুস্ কামড়' হইতে তার মন একেবারে কাব্যলোকে উধাও হইল। সে তপস্বিনীর পানে চাহিল।

তপস্বিনীর মুখে ও কি লজ্জার রক্তিম আভাস…না?

শ্রীপদ মুখ নামাইল; তার পর একটা ঢোক গিলিয়া কহিল,—থাকুক প্রুফ…অনেক লাইন বদলাতে হবে। একটু চিন্তার কথা!…

তপস্বিনী দেবী প্রুফগুলার পানে চাহিয়া কহিলেন—কাকে কামড় দিচ্ছেন এবার?

শ্রীপদ কহিল—ঐ যে গবলিন্ থিয়েটারে নতুন নাটক খুলেচে, ঘটোৎকচ…

তপস্বিনী কহিলেন—সুখ্যাতি ক'রে ফেলেছিলেন বুঝি? এখন…

শ্রীপদ কহিল—হ্যাঁ। এখন দেখচি, নতুন লেখককে বড্ড বাড়িয়ে দেওয়া হয়েচে! চিনি না—খামোকা তাকে বাড়িয়ে দেবো? এ আমাদের পলিশির বিরুদ্ধে কিনা…

তপস্বিনী হাসিলেন, হাসিয়া কহিলেন,—তা ব'লে বেচারীর প্রাপ্য সুখ্যাতি থেকে তাকে বঞ্চিত করবেন!

শ্রীপদ হাসিয়া কহিল—দেখুন তপস্বিনী দেবী, আপনি আমাদেরি একজন। আপনার কাছে কথাটা গোপন করবো না। কাগজ বার করলেই তার একটা principle এবং policy থাকা দরকার। সঙ্ঘ-বদ্ধ না হলে শক্তি-সঞ্চ

আবদার

বসুমতী-ব্লকবিভাগ]

শিল্পী—এ, কে, চাটার্জ্জী।
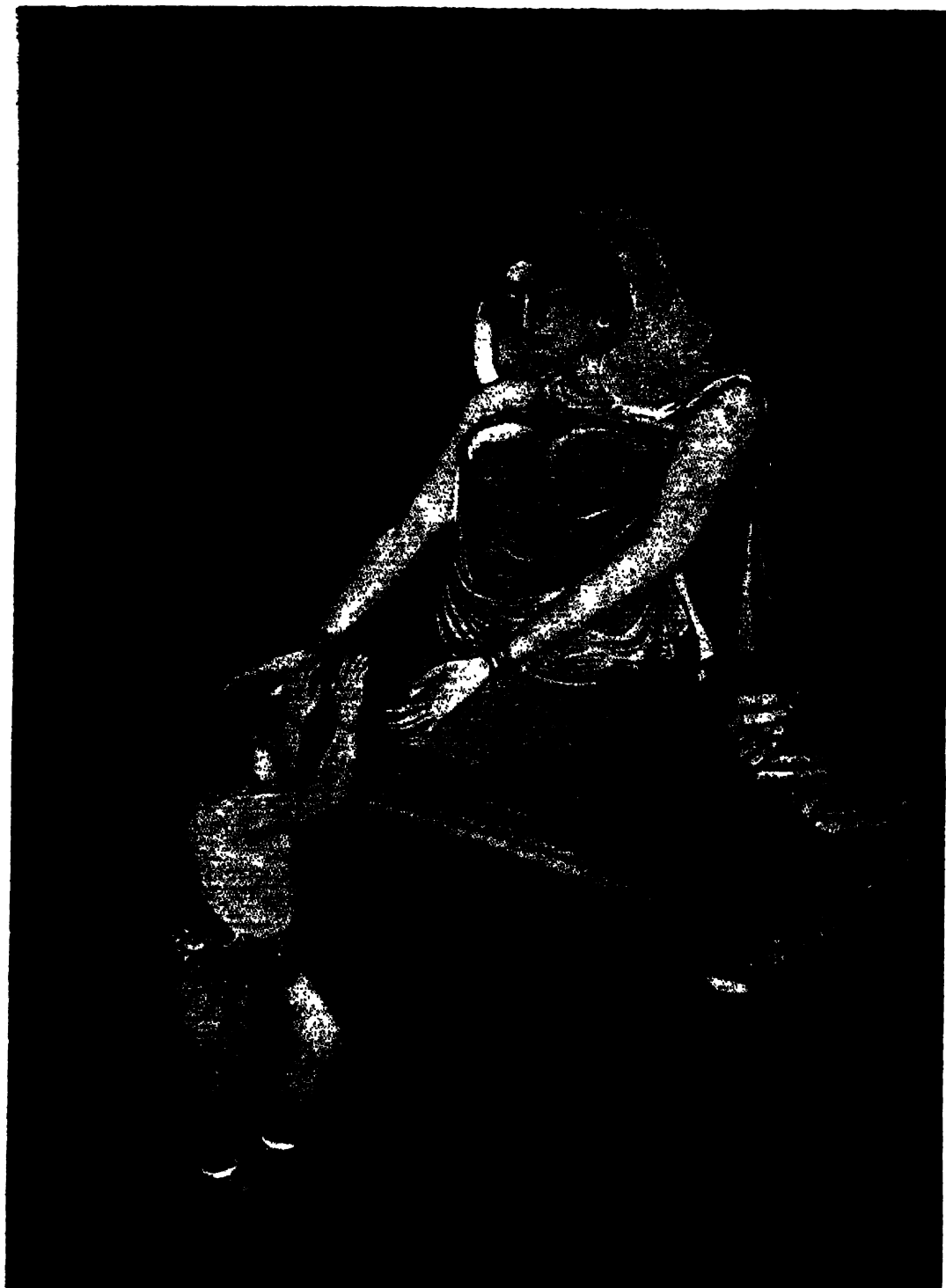
সম্ভব নয়। কাজেই···অর্থাৎ জাইগ্যাণ্টিক থিয়েটার প্রতি সপ্তাহে আধ-পাতা বিজ্ঞাপন দিচ্ছে আমাদের কাগজে··· তা ছাড়া যাকে পাশ দি, তাকেই শীট্ দিয়ে honour করে। তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হলো এই গবলিন্ থিয়েটার।···জাইগ্যান্টিকে নতুন বই খুলেচে, 'গন্ধমাদন'···তেমন জমচে না··· আমরা তার বহুৎ তারিফ ছাপাচ্ছি। যদি এর মধ্যে এদের 'ঘটোৎকচ'টা জমে ওঠে, তা হলে 'গন্ধমাদন' একদম fail করবে, তাই···

—ওঃ! বলিয়া তপস্বিনী দেবী হাসিয়া মুখ ফিরাইলেন।

শ্রীপদ কহিল—চা আনতে বলি?

—চা! আচ্ছা বলুন···কিন্তু আমার কথাটা···বেশ নিরিবিলি ছিল আজ। তপস্বিনী চারিদিকে চাহিলেন।

শ্রীপদর বুকটা আবার ছাঁৎ করিল। শ্রীপদ কহিল,—গোপনীয় কথা?

—হুঁ। বলিয়া তপস্বিনী কেমন একটু দ্বিধা-জড়িত চিত্তে চুপ করিয়া রহিলেন।

শ্রীপদর সর্ব্বাঙ্গে একটা শিহরণ···! শ্রীপদ ডাকিল—রঘুয়া···

বেয়ারা রঘুয়া আসিল। শ্রীপদ কহিল—চা আন্ এক পেয়ালা।

তপস্বিনী কহিলেন,—এক পেয়ালা? আপনি খাবেন না?

—খাবো? শ্রীপদ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তপস্বিনীর পানে চাহিল; তার পর কহিল,—আচ্ছা···ওরে, দু'পেয়ালাই আন্···কথাটা বলিয়া একটা স্লিপ টানিয়া 'দু পেয়ালা চা' লিখিয়া তার তলায় নিজের নাম সই করিয়া তারিখ লিখিয়া শ্রীপদ রঘুয়ার হাতে স্লিপখানা দিল। স্লিপ লইয়া রঘুয়া চলিয়া গেল।

শ্রীপদর মন অধীর হইয়া উঠিল। কি কথা? গোপন কথা! গোপন?···তার মনে একটা বাসনা ধীরে ধীরে সম্প্রতি উদয় হইতেছিল···একটু আশা···কিন্তু থাবড়া দিয়া সে আশা, সে বাসনাকে সে বসাইয়া দেয়। তাই কি?···

সিঁড়িতে দুপদাপ কতকগুলা শব্দ···জুতার শব্দ! কারা আসে না কি?···

তাই।

কবি বেচারাম নন্দী, চিত্রশিল্পী মনসাচরণ গুঁই, আর নবীন পাব্লিশার জনার্দ্দন সাধুখাঁ।

শ্রীপদ কহিল,—ব্যাপার কি হে?

বেচারাম কহিল,—একটা বক্স আজ চাই আমাদের শ্রীপদবাবু···ঐ জাইগ্যাণ্টিকে···

শ্রীপদ কহিল,—বক্স কেন? অন্য শীট নাও।

মনসা কহিল,—নীচের শীটে ঢের বসেচি। বক্সই চাই। মানে, একটি মহিলা-বন্ধুও যাবেন সঙ্গে।

মহিলা-বন্ধু! শ্রীপদ মনসার পানে চাহিল।

বেচারাম কহিল,—শ্রীমতী বিম্ববতী পাল···ঐ যে ফিল্মে নামচেন···ট্রান্স গ্যাঞ্জেটিকদের নতুন ছবি উঠবে,—উর্ব্বশী··· তাতে উনি সাজচেন উর্ব্বশী। তিনি থিয়েটার দেখতে চান্। তাই···

মনসা গুঁই কহিল,—ওদের আর্ট-ডিরেক্টর হয়েচি আমি ···অবশ্য মাহিনা পাবো না—তবে একটা publicity···

শ্রীপদ তাড়াতাড়ি একখানা স্লিপ লিখিয়া দিল। পাপগুলা বিদায় হইলে সে বাঁচে!

পাশ লইয়াও তারা নড়িল না। জনার্দ্দন সাধুখাঁ কহিল, —তপস্বিনী দেবী দেখেচেন ওদের গন্ধমাদন?

তপস্বিনী কহিলেন,—না।···

বেচারাম কহিল,—এসো। বিম্ববতী পালকে খবর দিতে হবে। তা হলে আজ আসি। নমস্কার তপস্বিনী দেবী, নমস্কার শ্রীপদবাবু···

তারা বিদায় লইল। এদিককার আব-হাওয়াটুকুও যেন ও বদ্ হাওয়ায় কাঁসিয়া ছিঁড়িয়া গিয়াছে! তপস্বিনী চুপ! শ্রীপদ ভাবিল, আবার যেন নূতন করিয়া কথার খেই ধরিতে হইবে!···কিন্তু কথা তোলা যায় কি করিয়া···?

তপস্বিনীই কথা পাড়িলেন; কহিলেন,—এখানে সে কথা সম্ভব নয় দেখচি। কখন্ কে আসে!···আপনি এক কাজ করতে পারেন?

—বলুন।

—কাল কোনো সময় আমার বাড়ী আসতে পারেন? সন্ধ্যার দিকে?

শ্রীপদর মন উল্লাসে মাতিয়া উঠিল। সকালে যদি হয় তো সন্ধ্যা অবধি ধৈর্য্য ধরার কি প্রয়োজন? সে কহিল,—বেশ। কাল সকালেও···না, কাজ কিছু ছিল না।

তপস্বিনী দেবী কি ভাবিতেছিলেন···শ্রীপদ তাঁর পানে চাহিয়া···যেন সে ডকের আসামী···আর তপস্বিনী দেবী

ম্যাজিষ্ট্রেট। তাঁর মুখের কথা যেন ম্যাজিষ্ট্রেটের রায়··· তেমনি অধীরতা শ্রীপদর বুকে!

তপস্বিনী দেবী কহিলেন,—সন্ধ্যায় হলেই ভালো হয়··· বুঝলেন! আলো-আঁধারি! আমার ওখানেই তা হলে নৈশ ভোজন সম্পন্ন করবেন!

শ্রীপদ কহিল,—এ মস্ত অনুগ্রহ···শিরোধার্য্য করলুম।···

সিঁড়িতে আবার জুতার শব্দ! আঃ!

শ্রীপদ ভাবিল, ইহারা সকলে যেন সড় করিয়াছে!

তপস্বিনী দেবী কহিলেন—আজ তা হলে উঠি···এই কথাই রইলো তবে।

তিনি উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকিল এক তরুণ যুবা। সে কহিল,—একটি লেখা এনেচি, উজ্জ্বলার জন্য···

শ্রীপদ বিরক্ত হইয়া কহিল রেখে যান ঐ টেবিলে!

তপস্বিনী দেবীও দ্বিতীয় কথা না তুলিয়া বিদায় লইলেন।

৩

গবলিন্ থিয়েটারের 'ঘটোৎকচে'র ভাগ্য ভালো। শ্রীপদ তাকে হত্যা করিতে পারিল না, যে-হেতু তার মাথায় এমন সব রকমারি ফুল ফুটিতে লাগিল···তার পাপড়িতে পাপড়িতে শ্রীমতী তপস্বিনীর মুখ! সেই ফুলে সে পুষ্পাঞ্জলি দিল ঘটোৎকচের শিরে! কল্পনা-নেত্রে শ্রীপদ দেখিল, ছোটখাটো ফুলের বাগান···তারি সঙ্গে এক কম্পাউণ্ডে ফ্লোরের উপর পরিচ্ছন্ন একখানি একতলা বাড়ী···ইলেকট্রিক ফিটিং, মোটর গেরাজ্—সব আছে। বারান্দায় বেতের আর্মচেয়ার—তাহাতে বসিয়া শ্রীমতী তপস্বিনী দেবী কবিতা লিখিতেছেন; আর সে নামিল মোটর হইতে, তার হাতে প্রুফ!

প্রথম যৌবনে এমন ছবি অনেকে আঁকে—ঐ একতলা বাড়ী, বাগান, আলো, মোটর-গেরাজ্ সেই সঙ্গে···

নিশ্বাস ফেলিয়া শ্রীপদ ভাবিল, কি সাধে এমন নিঃসঙ্গ জীবন বহিয়া মরি! থিয়েটারে-বায়স্কোপে ঘুরিয়া ফিরি··· আমোদের জন্য নয়···কারো মন রক্ষা, কারো দফা রফা ···একটি চিন্তা সেই সঙ্গে বিজড়িত—অর্থ! ষ্টেজে অভিনয়, পর্দ্দায় ছবি চলে, মন তখন লাগ্সই টিপ্পনীর জন্য ভাষার গহনে দিশাহারা ঘুরিতে থাকে,···এই থিয়েটার দেখিয়া, বায়োস্কোপ দেখিয়া তাকে পয়সা রোজগার করিতে হইবে! আমোদ আজ আর আমোদ নাই—সে সেই ট্রিগনমেট্রির অঙ্ক কষা! কর্ত্তব্য!···

পরের দিন···কি করিয়া কাটিল, বলিবার নয়। লিখিতে বসিলে ভাব-ভাষা কাঁপিয়া সরিয়া যায়···কি লিখিবে শ্রীপদ ভাবিয়া পায় না।

উজ্জ্বলা অফিসের দিকে পা বাড়াইল না—কি জানি, কি ফরমাশ সাড়া দেয়, কি কাজে লিপ্ত হইতে হয়!

বেলা পড়িবামাত্র মুখে-হাতে সাবান ঘষিয়া, মাথায় ব্রশ চালাইয়া ফিটফাট সাজিয়া সে আসিয়া ট্রেণে চাপিয়া বসিল এবং নামিল বালিগঞ্জ ষ্টেশনে।

বুকটা বারেকের জন্য ধড়াস্ করিয়া উঠিল। বাঁ-চোখটা নাচিয়া উঠিল না কি? না, কয়লা পড়িয়াছে বলিয়া বোধ হয় কর্-কর্ করে। তবু কে জানে···কেমন কুসংস্কার!

তপস্বিনীর গৃহে শ্রীপদ কখনো আসে নাই, তবে খুঁজিতে কষ্ট হইল না। তপস্বিনী বলিয়া দিয়াছিলেন, ষ্টেশনে নামিয়া সোজা পূব্ দিকে মিনিট পনেরো চলা, তার পরই একটা মন্দির; মন্দিরের গায়ে ফুলের বাগান, বাগানের লাগাও একতলা বাড়ী···ফটকে পাথরের ছোট ফলকে সোনালি অক্ষরে বাঙলায় লেখা 'তপোবন'। শ্রীপদ ফটকে ঢুকিল। তার কল্পনা ছলনা করে নাই! ফ্লোরের উপর বারান্দা··· বারান্দায় বেতের চেয়ার···এবং সে-চেয়ারে তপস্বিনীও! বাঃ! শ্রীপদকে দেখিয়া তপস্বিনী কহিল,—আসুন···

শ্রীপদ বারান্দায় উঠিয়া চেয়ারে বসিল। তপস্বিনী কহিল,—আমি ঘড়ির কাঁটার পানে চেয়ে ব'সে আছি।

এমন অধীর প্রতীক্ষা! শ্রীপদ একটা নিশ্বাস ফেলিল।

তপস্বিনী কহিল,—বসুন···চা দিতে বলি। তার পর চা খাওয়া হলে সে কথা বল্‌বো···

শ্রীপদ কহিল,—বেশ!···মোদ্দা, কি নতুন কবিতা লিখলেন? পড়াবেন?

তপস্বিনী কহিল,—কবিতা-টবিতার কথা রাখুন। ও-সব ছেলে-খেলা আর নয়। তপস্বিনী নিশ্বাস ফেলিয়া দ্রুত ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল।···

শ্রীপদ ভাবিল, তাই! নিশ্চয়, তাই। কিন্তু সম্পাদক মারুতি-দা, অমন যে ব্যোম্-ভোলানাথ কবি মধুর রক্ষিত—তাদের টপকাইয়া তপস্বিনীর চিত্ত শ্রীপদকে বাছিয়া লইল! ···'কুটুস-কামড়ের' 'হিটে' রস-বোধ তার কতখানি, তপস্বিনী সে পরিচয় পাইয়াছে, তাঁরও রস-বোধ আছে তো! সুতরাং ইহাতে বিস্ময়ের কি আছে!···

চায়ের পেয়ালা শেষ হইলে তপস্বিনী কহিল,—ঐ ঘরে চলুন।

ঘরে আসা হইল। শ্রীপদ কোনো মতে কুণ্ঠা কাটাইয়া প্রশ্ন করিল,—বলুন আপনার মনের গোপন কথা···

তপস্বিনী লজ্জায় এতটুকু হইয়া গেল! বলিবার বহু প্রয়াস···তবু কোথা হইতে কি-লজ্জা আসিয়া যে কণ্ঠ চাপিয়া ধরে! মুখে সলজ্জ মৃদু হাসি! তপস্বিনী কহিল,—না—কি মনে ভাববেন আপনি! আমার ভারী লজ্জা করচে···না। আমি লিখে জানাই···

শ্রীপদর মনে কোনো সংশয় রহিল না, মনস্তত্ত্বের সংবাদ সেও বড় অল্প রাখে না! দেশী নাটক, বিদেশী ফিল্‌ম্‌ এ তো মনস্তত্ত্বেরই লীলা-ক্ষেত্র! আর সে লীলা-ক্ষেত্রে তার কি অবাধ অধিকার! অতএব···

তপস্বিনী উঠিয়া গেল। শ্রীপদ যোগ্য কি উত্তর দিবে, তরুণী তপস্বিনীর প্রণয়-নিবেদনে···ষ্টেজে-দেখা নাটকের পাতা হইতে সেই-সব কথা-সংগ্রহে সে মত্ত হইল।···

কম্পিত হাতে চিঠি আসিল। চিঠি দিয়া তপস্বিনী কহিল,—দাঁড়ান, আমি স'রে যাই আগে। তার পর। আমার সামনে চিঠি খুলবেন না···

শ্রীপদর মনে হইল, তপস্বিনীর দুই হাত ধরিয়া তাকে একেবারে বুকে টানিয়া বলে, চিঠির প্রয়োজন কি, তপস্বিনী? ···আমিও তোমার প্রণয়-তাপে তপস্বী! কিসের লজ্জা তোমার! কিন্তু কথাগুলা ঠিক করিয়া লইবার পূর্ব্বেই তপস্বিনী সরিয়া গেল। শ্রীপদ খাম ছিঁড়িয়া চিঠি বাহির করিয়া পড়িল। চিঠি নেহাৎ ছোট নয়। উপরে কোন সম্বোধন নাই। চিঠিতে লেখা আছে,—

আমি মস্ত-বিপত্তি ঘটাইয়াছি—নিজের পায়ে হয় তো কুড়ুল [illegible]ছি। কবিতাকে বিদায় দিয়াছি। কিসের লোভে? [illegible] বলিবেন, এ আমার বাতুলতা! এ আশা দুরাশা! [illegible] এ দুর্ব্বার লোভ রোধ করা গেল না।

আমি উপন্যাস লিখিয়াছি। Sex-সমস্যা লইয়া। আপনি [illegible] আপনার মত চাই। যদি বলেন, ছাপিলে নাম হইবে, [illegible] ছাপিব।

'উজ্জলায়' ছাপা যায় কি? যদি যায়, তবে ছদ্ম-নামে ছাপিতে [illegible] সমালোচকরা পুরুষ—তাই বড় হৃদয়-হীন। আপনার [illegible]ও অজ্ঞাতে পাছে নির্ম্মম আঘাত করে,—তাই আপনার কাছে এ গোপন কথা প্রকাশ করিলাম। যদি বোঝেন, চলন-সই, তবে খুব দুন্দুভি-নাদ করা চাই···বন্ধু-কৃত্য। এ ঋণ শুধিতে আমি কৃপণতা করিব না!

খাতাখানি দয়া করিয়া লইয়া যাইবেন। কিন্তু সাবধান, এ সম্বন্ধে একটি কথাও এখন তুলিবেন না!···আপনাকে পাশে দাঁড়াইয়া আমার সহায় হইতে হইবে, সাহিত্যক্ষেত্রে আমার এই প্রথম প্রবেশ-মুখে।

উপন্যাসের নাম দিয়াছি—"প্রাণ-চক্র"। অথরের ছদ্ম-নাম লইয়াছি "শ্রীমতী উন্মত্তা দেবী"। ব্যবসা হিসাবে মন্দ? সাহিত্য আর ব্যবসা-বুদ্ধি একসঙ্গে মিশিলে তবেই বাঙলা-সাহিত্য বিশ্ব-সাহিত্যে আসন পাতিতে পারিবে। নয় কি?

এই! উপন্যাস লেখা! প্রণয় নয়—তার আভাস-মাত্র না!

শ্রীপদ যেন দোতলা-বাশ্‌ হইতে দুম্‌ করিয়া পথে পড়িয়া গেল!···চোখে তখন তবে কয়লা পড়ে নাই, বাম চক্ষু সত্যই নৃত্যই করিয়াছিল!···সে তবে কুসংস্কার নয়!···

মন তিক্ত হইয়া গেল। তরুণ বয়সেও নারী স্বার্থ ভোলে না···হায় রে!

৪

'প্রাণ-চক্র' বাহির হইল। মহাদেব সতীদেহকে যেমন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন, তেমন টুকরা-টুকরা ভাবে মাসিক-পত্রের পৃষ্ঠা বহিয়া সে দেখা দিল না—দেখা দিল, একেবারে বিলাতী বাধাইয়ে-ঘেরা মোটা এ্যান্টীক কাগজে পাইকা অক্ষরে ছাপিয়া গ্রন্থাকারে।

প্রকাশকের নামও ছদ্ম-বেশে দেখা দিল। বই বাহির হইবামাত্র স্ব-নামে, বে-নামে, বন্ধু-নামে তার সমালোচনা ছাপাইয়া শ্রীপদ এমন কলরব তুলিল যে, বাঙলা দেশের নর-নারীর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। অস্থির হইয়া তারা ভাবিল, ভালো জ্বালা···কি এমন উপন্যাস রে বাপু, যে, যে-কাগজ খুলি, 'প্রাণ-চক্র' আর 'প্রাণ-চক্র'—লেখিকা শ্রীমতী উন্মত্তা দেবী! বিরক্তি, কৌতূহল, সবগুলা যখন একসঙ্গে তাল-গোল পাকাইয়া বসিয়াছে, তখন 'উজ্জলায়' সম্পাদকীয় মন্তব্য বাহির হইল,—

"এ কি শুনি?—চোর, না, খুনী?
বক্র করে 'প্রাণ-চক্র' ভাগ্য!
অশ্লীলতার আইনে, আদালতের ফাইনে
সাহিত্যের হবে বিচার? দেশবাসী, তোরা জাগ্‌ গো!"

সম্পাদক মারুতি-দার ষ্টাইলের এইটুকুই বিশেষত্ব—এই ছড়ায় টিপ্পনী! এ টিপ্পনী তার শিষ্যেরা একত্র জড়ো করিয়া রাখিতেছে—ইচ্ছা আছে, এমনি হাজার ছড়া জমিলে "মারুতি-কথামৃত" নামে ছাপাইয়া মফঃস্বল হইতে দু'পয়সা কামাইয়া লইবে।

কিন্তু এ কথা নিতান্ত অবান্তর। আমরা "মারুতি-চরিত" লিখিতে বসি নাই তো!

উজ্জ্বলায় এ টিপ্পনী বাহির হইবামাত্র 'প্রাণ-চক্র' হুড়-হুড় করিয়া বিক্রয় হইতে লাগিল।

শ্রীপদ আসিয়া সকালে তপস্বিনীর সঙ্গে দেখা করিয়া কহিল,—যে চাল চেলেছি,—কেমন বিক্রী বেড়েচে, বলুন…

তপস্বিনী কহিলেন,—আপনাকে ধন্যবাদ! মোদ্দা বিপদও ঘটেচে একটু।

—বিপদ আবার কি?

তপস্বিনী কহিল,—এমন অভদ্র হয়ে গেল বইখানা…যে, ও ছদ্ম নাম থেকে নিজের নামকে উদ্ধার করতে পারবো না কোনো দিন।

শ্রীপদ কহিল—ওটা বিজ্ঞাপনী চাল। একে স্ত্রীলোকের লেখা, তার উপর অশ্লীলতার ইঙ্গিত! ও বইয়ের বিক্রী কি বন্ধ থাকে! তা ছাড়া ভাববেন না। দ্বিতীয় সংস্করণের বেলায় আমি উজ্জ্বলায় বেশ খানিকটা Sex-pshychologyর নোট দেবো'খন।…অর্থাৎ পাঠক-পাঠিকারা নিজেদের যত বুদ্ধিমানই ঠাওরান, আমরা জানি, তাঁরা ভোলেন শুধু কাঁশর-ঘণ্টার কলরোলে।* আমরা ফতোয়া দিয়ে যে-বইকে বলবো ভালো, সে-বই তারা শিরোধার্য্য করবে। তা যদি না হতো, তবে সাধ্য থাকতো আমাদের এই অনিন্দ্য দত্ত, মার্ত্তণ্ড বোসদের মাথা তুলে দাঁড়াবার? রবিবাবুর বইয়ের চেয়েও এদের বই বিক্রী হয় বেশী, সে খোঁজ রাখেন?……

'প্রাণ-চক্র' লইয়া তপস্বিনীর সহিত শ্রীপদর অন্তরঙ্গতা ক্রমে এমন বাড়িয়া উঠিল যে, উজ্জ্বলার সম্পাদক-সঙ্ঘ তা লইয়া দু'চারিটা বক্র ইঙ্গিত করিতে ছাড়িল না। সে ইঙ্গিত শ্রীপদর ভালো লাগিল। মুখে সে বলিত,—কি ফাজলামি করো!

মারুতি-দাও শেষে গাম্ভীর্য্য ভাঙ্গিয়া কহিল,—পয়সা-কড়ি আছে ওঁর…যদি নিবিড়-ভাবে বাঁধতে পারো তো উচ্ছল প্রবাহে জীবন-তরী ভাসিয়ে যেতে পারবে!

শ্রীপদ তা বোঝে, কিন্তু 'প্রাণ-চক্র' লইয়া নানা আলোচনার মধ্যেও নিজের প্রাণের আশা-আকাঙ্ক্ষার কোনো পরিচয় সে তপস্বিনীকে দিতে পারিল না। তপস্বিনীর দিক হইতেও তেমন আভাস কোন দিন পাইল না। উদ্‌গ্রীব হইয়া তপস্বিনীর প্রতি কথা সে বিশ্লেষণ করিত, তার মধ্য হইতে এতটুকু ইঙ্গিত যদি পায়! কিন্তু কিছু না!…

সেদিন শ্রীপদ আসিলে তপস্বিনী কহিল,—জনার্দ্দন সাধুখাঁ নতুন পাবলিশার, তার পয়সা অনেক—না?

শ্রীপদ কহিল,—শুনেচি, কিন্তু সে কথা…?

তপস্বিনী কহিল,—বেচারাম নন্দী তার ম্যানেজার…তারি কথায় জনার্দ্দন ওঠে বসে…

শ্রীপদ কহিল,—বটে! উত্তর খুব সংক্ষিপ্ত!

তপস্বিনী কহিল,—ওরা প্রাণ-চক্রর দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপবে। আমায় একেবারে এক হাজার টাকা দেবে। বইয়ে আমার নিজের নাম দিতে হবে। ছদ্ম-নাম নয়।

শ্রীপদ কহিল,—নিজের নাম? কেন—উন্মত্তা দেবী?

ঘাড় নাড়িয়া তপস্বিনী কহিল,—না।…একেবারে শ্রীমতী তপস্বিনী…

শ্রীপদ গম্ভীর হইয়া রহিল। তপস্বিনী কহিল,—বেচারাম বাবু নিত্য দু'বেলা আসচেন। ওঁদের একান্ত সাধ, আমার 'প্রাণ-চক্রর' দ্বিতীয় সংস্করণ বার করেন—তার উপর বলচেন, সেকণ্ড উপন্যাস যা লিখবো, তাও…

শ্রীপদ ফোঁশ করিয়া উঠিল, কহিল,—অমন কাজও করবেন না। এখন থেকে কেন বাঁধা-ধরার মধ্যে যাবেন! মোদ্দা 'প্রাণ-চক্রর' দ্বিতীয় সংস্করণ ওদের দেবার আগে আমার সঙ্গে একবার পরামর্শ করলে পারতেন। বইখানার খ্যাতিপ্রচারে আমার কিছু হাত ছিল।

তপস্বিনী কহিল,—সে ঋণ শোধ হবার নয়!…

শ্রীপদ একটা নিশ্বাস ফেলিল, অজ্ঞাতে প্রাণের কোণে বুঝি কি বেদনা মাথা তুলিল। শ্রীপদ কহিল,—কত বড় ওস্তাদ! একে তো মেয়েদের লেখা বই ছাপানো ভারী

* সুধী পাঠক-পাঠিকা ক্ষমা করিবেন। এ মন্তব্য শ্রীপদ চক্রবর্ত্তী ওরফে বৃশ্চিক শর্ম্মা ও তাদের 'উজ্জ্বলা' দলের। আমার নয়।—লেখক

আমাদেরও নহে।—বসু-সং

নিরাপদ ; যেহেতু তার কঠিন তীব্র সমালোচনা হবে না। সে বইয়ের কোনো গুণ না থাকলেও মুখ ফুটে তা বলা চলে না, বাধে। তার উপর আপনার 'প্রাণ-চক্র'র একটা খ্যাতি বেরিয়েচে…কাজেই আপনাকে পাশ-বদ্ধ করতে উদ্যত!… চট্ ক'রে ওদের কথায় ভোলা আপনার উচিত হয় নি। তপস্বিনী সে-কথার কোনো জবাব দিল না।

শ্রীপদ কহিল,—আপনার লেখা মোদ্দা 'উজ্জ্বলায়' অনেক দিন পাই নি।

তপস্বিনী কহিল,—তার মানে, কবিতা লিখবো না, ভেবেচি।

শ্রীপদ কহিল—বেশ, গল্প দিন, উপন্যাস দিন।

তপস্বিনী কহিল,—দেখি…লেখা হোক্।

তার পর চা আসিল, রুটী ও টোষ্ট সেই সঙ্গে …একালে আতিথ্যের যা প্রধান উপকরণ।

শ্রীপদ ফিরিল,—মনে তীব্র দাহ লইয়া। তার আড়ালে এমন করিয়া প্রকাশকের সঙ্গে এতখানি বন্দোবস্ত! অথচ বইয়ের এ-নাম, এ শুধু তারি জন্য। নিজে সে সমালোচনা লিখিয়াছে—এবং সাপ্তাহিক-দল তারি উদ্দীপনা-মন্ত্রে…

হিংসা জাগিল ঐ সাধুখাঁ-কোম্পানির উপর! মনে হইল, তপস্বিনীকে সতর্ক করা উচিত ছিল—উহাদের সঙ্গে এ অন্তরঙ্গতা ঠিক নয়!

পরদিন অফিসে শ্রীপদ কাজ করিতেছে, বেচারাম আসিয়া হাজির, ডাকিল—শ্রীপদ বাবু…

শ্রীপদর আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। শ্রীপদ কহিল—কেন?

বেচারাম কহিল—আপনাদের 'উজ্জ্বলার' পুরোনো ফাইলটা আমি একবার দেখতে চাই। কতকগুলো কবিতা টুকে নেবো!

কবিতা টুকিবে! শ্রীপদ বেচারামের পানে চাহিল।

বেচারাম কহিল—তপস্বিনী দেবীর কবিতা…কতক-গুলো পাওয়া যাচ্ছে না। উনি বললেন, এখানকার ফাইল থেকে টুকে নিতে…চিঠিও দিয়েচেন…

বেচারাম চিঠি দিল।

শ্রীপদ পড়িয়া দেখে, তপস্বিনী লিখিয়াছে…

একখানা কবিতার বই ছাপচি। নাম দিয়েচি, হৃদয়-শিখা। বেচারাম বাবুরা ছাপবেন। কতকগুলো কবিতা হারিয়েচে—ফাইল থেকে সেগুলো এঁদের কাপি ক'রে নিতে দেবেন। ধন্যবাদ!

শ্রীতপস্বিনী দেবী।

হুঁ! আবার কবিতার বই! বেচারাম খুব চাল চালিয়াছে!

নিশ্চয় কোনো গূঢ় অভিসন্ধি আছে! চোখে অগ্নি-দৃষ্টি ভরিয়া শ্রীপদ বেচারামের পানে চাহিল। পৌরাণিক তেজ এ যুগে লোপ পাইয়াছে। থাকিলে সে দৃষ্টি-স্পর্শে বেচারাম নিশ্চয় ভস্মসাৎ হইয়া যাইত!

৫

শ্রীপদ ভাবিয়া সারা হইয়া গেল, তপস্বিনীকে ইহাদের হাত হইতে রক্ষা করে কি উপায়ে? তরুণ দলে শ্রীপদরাই প্রগতির অগ্রদূত। বেচারাম কোম্পানি বয়সে আরো তরুণ, এবং প্রগতির দৌত্যে নিজেদের অগ্রতর ভাবে! অতএব…কিন্তু কি করা যায়? তপস্বিনী তার কেহ নয়…কি বলিয়াই বা সতর্ক করিবে? তপস্বিনী যদি বলিয়া বসে যে, বাঃ, আপনাদের সঙ্গে মিশিব, আর ইহাদের আমোল দিব না,—তার কারণ?…

এক অতি সহজ উপায় মাথায় উদয় হইল। তখনি সে বালিগঞ্জে ছুটিল।

তপস্বিনী কহিল,—আসুন। কি খপর, বলুন।

আসার উদ্দেশ্য? একটা উত্তর সে ভাবিয়া রাখিয়াছিল; কহিল,—আপনার উপন্যাসের প্রুফগুলো আমার কাছে পাঠাবার কথা ব'লে দেবেন। তাই বলতেই আসা।

তপস্বিনী কহিল,—মিছে আর আপনাকে কেন কষ্ট দি! বেচারাম বাবুই দেখে দেবেন, বলেচেন।

এত দূর! শ্রীপদ কহিল,—ওরা কায়দা-কানুন ঠিক জানে না। প্রুফ দেখা তো শুধু আকার কেটে ইকার, আর ক কেটে খ করা নয়। ওর মধ্যে একটা আর্ট আছে রীতিমত!…

তপস্বিনী কহিল,—তিনি আগ্রহ করচেন, তাতে আপত্তি তোলা ভদ্রতা হবে কি?

এদিকেও যে রীতিমত দরদ! এ মমতা! শ্রীপদ কহিল,—তবু…মানে, আপনার বই বলেই বলচি। ওদের ব'লে দেবেন, অন্ততঃ অর্ডার-প্রুফটা যেন আমায় দেয়। সাজানো ব্যাপারটা লেটেষ্ট আমেরিকান ষ্টাইলে করতে চাই।

—বলবো।···

তার পরই তপস্বিনী কহিল,—আপনি বসুন, আমি আসচি।

শ্রীপদ কহিল,—এম্পায়ারে যাবেন? নতুন টকি এসেচে···splendid···দুখানা টিকিট পেয়েচি···

তপস্বিনী কহিল,—আজ?

—হ্যাঁ! শ্রীপদর কণ্ঠস্বরে কি আগ্রহ!

তপস্বিনী কহিল,—আজ আর হয় না।

শ্রীপদর হাসি-ভরা মুখ নিমেষে মলিন হইল।

তপস্বিনী কহিল,—আজ জনার্দ্দন বাবুরা নিমন্ত্রণ করেচেন, ব্যাকাশ্ থিয়েটারে "খোরাশান্" নাটক দেখতে যাবার জন্য!

হায় ভাগ্য!···

শ্রীপদ কহিল,—হুঁ···সঙ্গে সঙ্গে একটা দীর্ঘশ্বাস!

তপস্বিনী কহিল,—বসুন, আমি এখনি আসচি···

শ্রীপদ কহিল,—না, বসতে পারবো না, আমার কাজ আছে।···উঠি।

তপস্বিনী কহিল,—কাজ থাকে তো বসতে বলি কি ক'রে?

শ্রীপদ উঠিয়া দাঁড়াইল···ফটক অবধি চলিয়া গেল, তার পর ফিরিল, ভাবিল, স্পষ্ট বলিয়া যাই, ও-দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতায় যদি একটা কুৎসা ওঠে তো সে বিচিত্র হইবে না···

কিন্তু সামনেই দেখে, তপস্বিনী, চোখো-চোখি হইল।

তপস্বিনী কহিল,—ফিরলেন যে?

শ্রীপদ কহিল,—ছাতাটা?···না, কৈ দেখচি না তো··· তা হলে ট্রেনেই ফেলে এসেচি, বোধ হয়! হারালো···

শ্রীপদ এক দণ্ড দাঁড়াইল না···দ্রুত পায়ে 'তপোবন' ত্যাগ করিল।

তার ইচ্ছা হইল, বেচারাম-জনার্দ্দন কোম্পানিকে এই মুহূর্ত্তে···

ঐ বেচারামের কবিতার সে কত খ্যাতি গাহিয়াছে! সেজন্য রবীন্দ্রনাথকেও টিট্‌কারী করিতে ছাড়ে নাই! ছাপার অক্ষরে বলিয়াছে, প্রাণের তাজা ভাব বেচারামের কবিতায় এই প্রথম আত্মপ্রকাশ করিয়াছে; রবীন্দ্রনাথের কবিতায় এ তাজা প্রাণ পাওয়া যায় না!

যাকে সে বড় করিয়াছে দশের সামনে—সে-ই আজ গোপনে রন্ধ্র রচিয়া শ্রীপদকে পাড়িতে চায়! বেইমান! অকৃতজ্ঞ!

শ্রীপদ ভাবিল, আচ্ছা, এবার শিক্ষা পাইলাম, আসিয়ো আমার কাছে আবার কাজ বাগাইতে!

তপস্বিনীর উপর অভিমান হইল!···শ্রীপদকে তুমি চিনিলে না, নারী!···

চার দিন পরের কথা। জাইগান্টিক থিয়েটারে বসিয়া শ্রীপদ পৌরাণিক অপেরা 'ভানুমতীর খেল' দেখিতেছিল···একেবারে সামনের কুশন্ শীট। প্রেক্ষাগৃহের আলো নিবানো···হঠাৎ সামনে দিয়া একটা ভিড় চলিয়া গেল··· পাঁচ ছ'জন। তারা গিয়া পাশের খালি কুশন অধিকার করিল।···

আলো জ্বলিলে শ্রীপদ দেখে, ঐ জনার্দ্দন সাধুখাঁ কোম্পানি। আর সে কোম্পানির সঙ্গে তপস্বিনীও আসিয়াছে! রাগে তার সারা অঙ্গ জ্বলিল। সে মুখ ফিরাইল। বেচারাম আসিয়া কহিল,—তপস্বিনী দেবী আপনাকে ডাকচেন, শ্রীপদ বাবু···

তীব্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শ্রীপদ বেচারামের পানে চাহিল মনে হইল, বলে—যাবো না। আমি কি ওঁর গোলাম? কিন্তু সে কথা বলা গেল না; মুখে বাহির হইল,—বটে! কোথায়? চলো।

পাশের কুশন। তপস্বিনী কহিল,—একটা জরুরি কথা ছিল।

—কি কথা?

তপস্বিনী কহিল,—বেচারাম বাবুর বাহাদুরি আছে, এ-থিয়েটারের প্রোপ্রাইটরের সঙ্গে কথা পাকা করেচেন। এঁরা আমার 'প্রাণ-চক্র' নাট্যাকারে রূপান্তরিত করিয়ে প্লে করবেন। রিহার্শাল এই সোমবার থেকে সুরু হবে। আগাম টাকাও কিছু দেছেন···

শ্রীপদ কহিল—কে ড্রামাটাইজ করলে?

তপস্বিনী কহিল—এঁদের কে লোক আছে,—ঐ যে "পাঁচফোড়ন" সাপ্তাহিকের সম্পাদক···যিনি ঐ 'কচ্ছপ' পৌরাণিক নাটক লিখেচেন, দিব্যদাস বাবু।

শ্রীপদ কহিল—আমায় একবার দেখালেন না?

তপস্বিনী কহিল—আমি পড়েচি। হয়েচে ভালো।··· আর দিব্যদাস বাবুর খুব সুখ্যাতি, তাঁর নাট্য-রসজ্ঞতার

প্রচর স্তুতি আপনার 'উজ্জ্বলা' কাগজে আপনিই তো ছাপিয়েচেন।

শ্রীপদ কহিল—যতই স্তুতি করি, ওদের এখনো শিখতে ঢের বাকী। ঐ 'গজকচ্ছপের' কটা দৃশ্য তো আমিই লিখে দিছি। বিদ্যে তো জানি সবার।

—বটে! তা বেশ, আমি ব'লে দেবো, আপনাকে দেখাবে'খন।...কিন্তু আপনাকে একটি কাজ করতে হবে। কাগজে এখন থেকেই 'বুম্' করা চাই...যাতে আগে থেকেই হৈ-চৈ পড়ে যায়! বুঝলেন...!

স্বার্থ! শুধু স্বার্থ! হায় রে! তবু শ্রীপদর অভিমান জল হইয়া গেল। আশা আবার কোন্ মেঘের পর্দ্দা সরাইয়া হাসে! বুঝি আবার চান্স আসিল! বাঃ!

শ্রীপদ কহিল—বেশ।...

পর্দ্দা তুলিয়া 'ভানুমতীর' তৃতীয় অঙ্ক সুরু হইল। শ্রীপদ বিদায় লইয়া একেবারে প্রোপ্রাইটর বংশধর বাবুর ঘরে আসিয়া ঢুকিল। "প্রাণ-চক্র'র কথা পাড়িল। বংশধর কহিল—ভারী dull বাজার। ঐ জনার্দ্দন সাধুখাঁ বইখানার দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপচে। আমায় শ'পাঁচেক টাকা দিয়েচে। ও বইটা নাট্যাকারে করার দরুণ। অবশ্য দিব্যদাসকে কিছু দিতে হয় নি। তা ছাড়া তপস্বিনী দেবীকেও আমার হাত দিয়ে আড়াইশো আগাম দেওয়া হয়েচে...বাকী একটা বেনিফিট্ দেবো। আমার কি? দু'পয়সা নগদ হাতে পেলুম। দেখা যাক, 'প্রাণ-চক্র'র নাম আছে তো...ওদেরও স্বার্থ আছে—'বুম্' করবে। বেচারাম বলে—এ হলো আমেরিকান ষ্টাইল পাবলিশিটির। নভেলটা এতে হুড়-হুড় ক'রে বিক্রী হবে।... তাই অন্য বিজ্ঞাপন না দিয়ে ষ্টেজে এই নাট্যরূপে publicity...বিজ্ঞাপনেও তো খরচ হয়।...ওদের আইডিয়া আছে হে...

শ্রীপদ শুধু গম্ভীরভাবে কহিল—হুঁ!

এমন চাল চালিয়াছে! বই লইয়া যা খুশী করুক—কিন্তু এ চালে তপস্বিনী দেবীর চিত্তখানি যদি অধিকার করিয়া বসে? সে সুযোগ...না, দেওয়া হইবে না! এ মিল ভাঙা চাই। তার কত বড় আশা...অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ।

এবার রীতিমত যুদ্ধ চাই। এ দলের টাকা আছে। টাকার বল মস্ত বল। কিন্তু তার হাতে কলম—'কুটুস-কামড়ে'র কলম! সে-কলমের শক্তি তুচ্ছ করিবার নয়। কত মহারথীকে কাবু করিয়াছে এই কলম। আজ সে কলমের মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—'প্রাণ-চক্র।'

চমৎকার সুযোগ মিলিয়াছে!...সুযোগই!...

এ সুযোগে শ্রীপদর ঘন ঘন ডাক পড়িতে লাগিল, বালিগঞ্জের তপোবনে!...সেখানে শ্রীপদ যায়। বেচারাম-কোম্পানিও হাজিরা দেয় নিত্য। তা ছাড়া বেচারামদের দলে ভিড়িয়া 'রূপ-তরাসী','রূপ-পিয়াসী','রূপ-দখলি' প্রভৃতি রঙ্গ-জগতের আরো উদীয়মান অজাতশ্মশ্রু নবীন সমালোচক!...

ষ্টেজে 'প্রাণ-চক্র'র রিহার্শাল চলিয়াছে পুরা দমে। সাপ্তাহিক কাগজগুলায় বিশ্বের খবর বিলুপ্ত। পাঠক-পাঠিকা কাগজ খুলিয়া দেখে, এত-বড় দুনিয়ার কোথাও আর কোনো খবর নাই—শুধু জাইগাণ্টিকে 'প্রাণ-চক্র!' সারা দুনিয়া যেন হাঁ করিয়া আছে ঐ জাইগাণ্টিক থিয়েটারের যবনিকার পানে, 'প্রাণ-চক্র', 'প্রাণ-চক্র'! কবে ঐ 'প্রাণ-চক্র' যবনিকা ছিঁড়িয়া ঘর্ঘর-রবে ঘূর্ণন-লীলা সুরু করে! তপস্বিনীর উত্তেজনার অন্ত নাই...শ্রীপদর তেমনি পরিশ্রম। আর জনার্দ্দন-বেচারাম কোম্পানি। তারা রুখিয়া পথ চলে...পরিচিত কাহাকেও দেখিলে পকেটের মধ্যে হাত ঢুকাইয়া দেয়, ব্যাগ টানিয়া বাহির করিয়া বলে,—দাও টাকা,—জাইগাণ্টিকে শীট রিজার্ভ ক'রে রাখবো... 'প্রাণ-চক্র'র প্রথমাভিনয় রজনীর মহা-উৎসবে।...

'প্রাণ-চক্র' অবশেষে এক সন্ধ্যায় ষ্টেজের পর্দ্দা ফাঁশাইয়া দর্শক-সমক্ষে আত্মপ্রকাশ করিল।...

শ্রীপদর কলম চলিল...পৃথিবীর মত বিরাম-হীন গতিতে!

সপ্তাহান্তে প্রায় পঁচিশখানা সাপ্তাহিক সংগ্রহ করিয়া শ্রীপদ তপোবনে আসিয়া উদয় হইল। তপস্বিনী ঘরের মধ্যে বসিয়া। ঘরে আলো নাই। তপস্বিনীর সে উৎসাহ যেন নিবিয়া গিয়াছে!

শ্রীপদ কহিল—ব্যাপার কি?

তপস্বিনী দেবী কহিল—মহা-বিপদে পড়েচি...

—কি বিপদ?

তপস্বিনী কহিল,—আটজন পাব্লিশার এসে আগাম টাকা দিয়ে গেছে। আর বারোখানি নূতন মাসিক-পত্র চেক্ পাঠিয়েচে। সকলেই লেখা চায়—নিত্য তাগিদ। সকলকে বলেছিলুম, 'প্রাণ-চক্র' খোলা হয়ে গেলেই লেখা দেবো...

শ্রীপদ কহিল,—দিন্ লেখা...

তপস্বিনী কহিল—কোথা থেকে লেখা দেবো? কি লিখবো? মাথায় কিছু আসচে না। তা ছাড়া এতগুলো লেখা···আটখানা উপন্যাস, আর বারোটা গল্প!

শ্রীপদ কহিল,—তবে কি টাকা ফিরিয়ে দেবেন?

—তা ছাড়া উপায় দেখচি না।···

শ্রীপদ কহিল—হুঁ!···

তপস্বিনী কহিল—কিন্তু আমার এই খ্যাতি···এর লোভ প্রচণ্ড। অথচ লেখার কিছু পাচ্ছি না। একটা ইজ্জৎ··· কোনো উপায় বলতে পারেন?

শ্রীপদ কহিল—পারি···

ব্যগ্র কণ্ঠে তপস্বিনী কহিল—কি উপায়?

শ্রীপদ কহিল—একটি মাত্র···যদি অভয় দেন তো বলি, ও টাকাও ফেরত দিতে হবে না, অথচ ইজ্জৎ রক্ষা পাবে···সকলকে সন্তুষ্ট করতে পারবেন। এবং সকলকে সন্তুষ্ট রাখার উপর আপনার সাহিত্যিক খ্যাতি নির্ভর করচে। অবশ্য যদি বলেন, কি হবে এ খ্যাতিতে···

তপস্বিনী যেন অন্ধকারে বিদ্যুতের আলো দেখিল। কহিল—কি উপায়, বলুন···এ খ্যাতি আমি রক্ষা করতে চাই, বাড়াতে চাই।

শ্রীপদ কহিল—আমার ইতিহাস তবে বলি, শুনুন।··· এই 'কুট্স্-কামড়' লেখার আগে আমি দশখানি উপন্যাস লিখি, এবং প্রায় পঁচিশ-ত্রিশটে গল্প। কোনো সম্পাদক তা ছাপেনি। ঢের খোসামোদ করেচি···তারা অটল চিত্তে আমার লেখা ফিরিয়ে দেছে। সেই দুঃখে আমি আজ ক্রিটিক। আমার সেই লেখাগুলি সব মজুত আছে··· আপনাকে দেবো। আপনার নাম রটে গেছে···তা ছাড়া মহিলা লেখিকা···ঐ লেখাই আপনার নামে তোফা চ'লে যাবে···চারিদিকে জয়ধ্বনি উঠবে।

তপস্বিনী কহিল—কিন্তু আপনি···?

শ্রীপদ কহিল—আপনার ঐ লেখার জয়ধ্বনি তোলায় আমি আপনার সহায় হবো!···এতে অবশ্য একটু স্বার্থ আমার আছে তপস্বিনী দেবী··· আমি আপনাকে ভালোবাসি। ঐ লেখা আপনাকে দিচ্ছি, তার পর পাশে থাকবো বরাবর···সামনে মস্ত ভবিষ্যৎ···আপনি লিখবেন, আমি সে-লেখার সমালোচনা করবো···

তপস্বিনী কহিল—লিখতে আমি পারবো ব'লে মনে হয় না। এতে বড় পরিশ্রম···আর এ খ্যাতিটুকুকে জাগিয়ে রাখতে হলে লেখাও চাই···

শ্রীপদ কহিল—ঠিক···always before the public gaze··· দেখুন, আমি···আমি আপনাকে যথার্থ ভালোবাসি। আমি গরীব হতে পারি···কিন্তু শক্তি আমার তুচ্ছ নয়। তবে অর্থ? আপনার যা আছে···আমায় আপনার একান্ত বিনীত স্বামী ব'লে জানবেন···আপনার ব্যক্তিত্ব অক্ষুণ্ণ অটুট থাক্‌বে।···যেহেতু যুগ-মন্ত্রে আমি দীক্ষিত।

তপস্বিনী দেবী নিরুত্তর রহিল—কি ভাবিতেছিল। পরে কহিল,—কিন্তু অপরের লেখা নিজের ব'লে চালানো···

শ্রীপদ কহিল—যে সম্পর্ক প্রস্তাব করেচি, তাতে তা বাধবে না। কিন্তু এ কথাও মনে রাখবেন, যে যশ, যে খ্যাতি আজ পেয়েচেন, তা রক্ষা করতে গেলে চুপ ক'রে থাকাও চলবে না। লেখার পর লেখা চালিয়ে যেতে হবে···

তপস্বিনী কহিল—সেই লেখার শক্তি আর নেই। ঐ একখানি বইয়েই আমার পুঁজি নিঃশেষ হয়েচে।

শ্রীপদ কহিল—এ দৃষ্টান্ত বাঙলা সাহিত্যে আরো আছে। তা হলে···

তপস্বিনী কহিল—কাল সকালে আমার চিঠি পাবেন··· একটু ভাবতে দিন আমায়···

শ্রীপদ কহিল—বেশ, এক বিষয়ে সতর্ক করতে চাই আপনাকে। ঐ বেচারাম, কিম্বা জনার্দন···they are fools. তাদের সঙ্গে···

তপস্বিনী কহিল,—ছি, ছি, তারা আমায় বড় বোনের মত দেখে।

পরের দিন।

শ্রীপদ উজ্জ্বলা-অফিসে। বেয়ারা একখানা চিঠি আনিয়া দিল। চিঠি পড়িয়া শ্রীপদ তখনি ছুটিল এ্যাসোসিয়েটেড প্রেসে···এবং···

পরের দিন কাগজে-কাগজে ছোট একটু খবর ছাপিয়া বাহির হইল,

'প্রাণ-চক্রে'র লেখিকা শ্রীমতী তপস্বিনীর বিবাহ-পাত্র আমাদের বন্ধু প্রসিদ্ধ ক্রিটিক্ শ্রীযুক্ত শ্রীপদ চক্রবর্তী। আর্ট ও ক্রিটিকের শুভ-মিলনে বঙ্গ-সাহিত্য শ্রীসম্পন্ন হউক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

বিচিত্র মালভূমি

গগনস্পর্শী হিমগিরি-শ্রেণীর পরপারে এক বিস্তীর্ণ ভূভাগ বিদ্যমান। এই মালভূমির এক দিকে ভারতবর্ষ, অপর দিকে রুসিয়া এবং চীন সাম্রাজ্য। এই তিনটি বৃহৎ সাম্রাজ্য-সীমার অন্তর্বর্ত্তী বিস্তীর্ণ মালভূমি কাহারও সম্পত্তিভুক্ত নহে, কোন মানুষই এতদঞ্চলে স্থায়িভাবে বসবাস করিবার সাহস করে নাই। এই উচ্চতম মালভূমির আরও উত্তর-দিকে অগ্রসর হইতে পারিলে দেখা যাইবে, মালভূমি ক্রমশঃ ঢালু হইয়া চীন-তুর্কীস্থানের বিরাট মরুভূমিতে মিশিয়া গিয়াছে। মরুভূমির এই অংশ গোবি মরুভূমির পশ্চিমাংশ বলিয়া কথিত, প্রাচীন ক্যাথে বলিয়া মার্কোপোলোর দিন-লিপিতে ইহার উল্লেখ আছে।

প্রতীচ্য জাতি নব নব আবিষ্কারের জন্য অসাধারণ পরিশ্রম করিয়া থাকে, অর্থ-ব্যয়েও কুণ্ঠিত নহে। ... প্রাচীন জনপদ ... স্তূপের মধ্য ... আবিষ্কৃত হই-..., বহু ঐতিহাসিক ... ও তত্ত্ব পুরাতত্ত্ব-...গণের প্রচেষ্টায় বর্ত্তমান সভ্যজগতের জ্ঞানভাণ্ডারে পুনরায় সঞ্চিত হইতেছে। মরুভূমির মধ্য হইতে বিস্মৃত দেশ ও জাতির প্রাচীন সভ্যতা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে। উল্লিখিত প্রাচীন ক্যাথে মরুভূমির বালুকা-স্তূপের অন্তরালে অতীতযুগের মানব-সমাজের
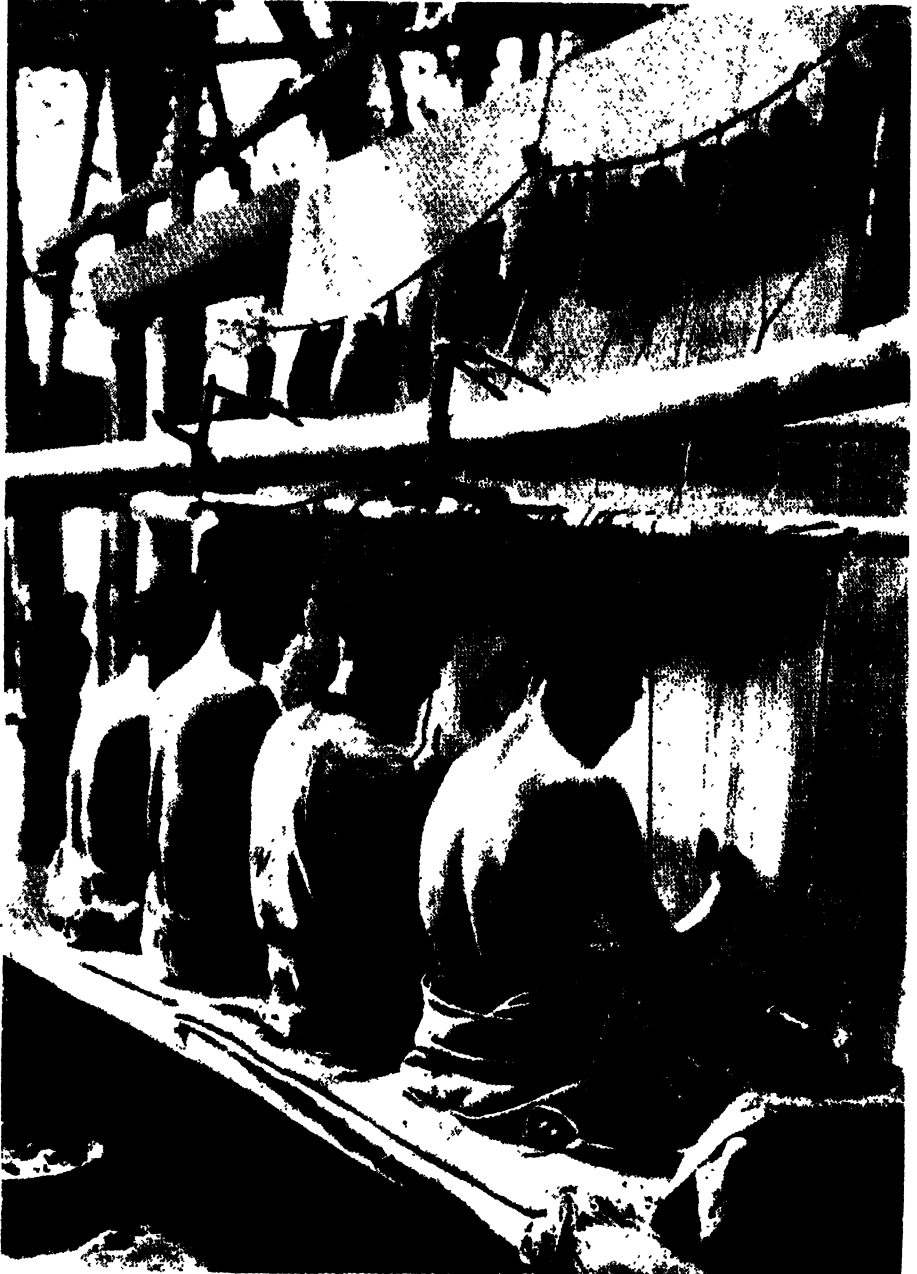
খোটানের কার্পেট-বয়ন-পদ্ধতি

কাশ্মীরী পাচকের রন্ধন

কীর্ত্তি-কাহিনী আত্মগোপন করিয়া আছে কি না, তাহা জানিবার জন্য "মধ্য-এসিয়া অভিযান" নামক দল গঠিত হয়। এম্, হেলমট্ দে টেরা, জুরিচের মিঃ ডবল্যু বসার্ড, মিউনিক্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ এমিল্ টিংক্লার প্রভৃতি ভারতবর্ষের পথে অভিযান করিয়াছিলেন।

অভিযানকারীরা ভারত সরকারের নিকট ছাড়পত্র লইয়া কাশ্মীর হইতে পশ্চিম তিব্বতে লাডকের রাজধানী লে'র পথে যাত্রা করেন। তাঁহাদের ধারণা ছিল, যে প্রদেশের অভিমুখে তাঁহারা যাইতেছেন, তথায় বিরাট মরুভূমির গর্ভে প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন লুক্কায়িত আছে। বিজ্ঞ ঐতিহাসিকগণ মনে করেন, প্রাগৈতিহাসিক এবং ঐতিহাসিক যুগের যাযাবর মানবগণ—নানা-জাতি ও সম্প্রদায় বিরাট মরুভূমির বক্ষে তাহাদের স্মৃতিচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে, প্রাচীন নগর ও বহু বৌদ্ধ-মন্দির বালুকা-সমুদ্রে আত্মগোপন করিয়া আছে। মানুষ চেষ্টা করিলে এই সকল ব্যাপার আবিষ্কৃত হইতে পারিবে।

১৯২৭ খৃষ্টাব্দে এই অভিযান আরব্ধ হয়। ২৪শে মে

কাশ্মীর ও লাডকের মধ্যবর্ত্তী স্থানের ডাকঘর

ভূতপূর্ব্ব রাজা, রাজমাতা ও সকন্যা রাণী

বিপর্য্যস্ত করিয়াছিল। আঁকা-বাঁকা গিরিসঙ্কটের মধ্য দিয়াও তুষার-বাত্যা অপ্রতিহত-গতিতে চলিয়াছিল। পথিপার্শ্বে একটি কুটীরে তাঁহারা আশ্রয়-লাভ করেন। এই কুটীরটি তার-বিভাগের অন্তর্গত।

কিছু দিন পরে অভিযানকারীগণ সিন্ধুনদের উপত্যকাভূমিতে পৌছেন। এই-খানে 'হিমস্' মঠ অভিমুখে যাত্রিদলের সহিত তাঁহারা সম্মিলিত হন। পশ্চিম-তিব্বতে এই মঠই অতি পবিত্র এবং শক্তিশালী বলিয়া পরিগণিত।

তারিখে তাঁহারা কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর ত্যাগ করেন। জোজি গিরিবর্ত্ম দিয়া তাঁহারা অগ্রসর হইতে থাকেন। এই পথে চলিবার সময় অকস্মাৎ তুষার-ঝটিকা তাঁহাদিগকে

লাডক রমণীর বস্ত্রবয়ন

গতিপথের মধ্যে লাডকের পূর্ব্বতন রাজন্যবৃন্দের প্রাচীন প্রাসাদ অবস্থিত। অভিযানকারী-দিগের পূর্ব্বপরিচিত বন্ধু বিশপ পিটার এই-খানে অবস্থান করিতেছিলেন। লে'র মোরাভিয়ান মিশনের ইনিই প্রধান ধর্ম্মযাজক। বিশপ পিটার তাঁহাদিগকে ষ্টক্

প্রাসাদে লইয়া গিয়াছিলেন। দূর হইতে এই প্রাসাদের অত্যুচ্চ প্রাচীর বিশেষ হৃদয়গ্রাহী বলিয়া তাঁহাদের মনে হইয়াছিল। কিন্তু প্রাসাদকে বেষ্টন করিয়া যে ক্ষুদ্র গ্রামখানি দেখা যাইতেছিল, তাহার সন্নিহিত হইবামাত্র তাঁহাদের সে স্বপ্ন টুটিয়া গিয়াছিল।

পাষাণ-রচিত এই সুপ্রাচীন প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া তাঁহারা দেখিয়াছিলেন, কাল-ধর্ম্মের প্রভাবে প্রাসাদের অনেক ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রাসাদের সোপানাবলী এমন অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, উহা বাহিয়া আরোহণ করা বিপজ্জনক। বাতায়নগুলি দেশীয় কাগজ দ্বারা আবৃত। প্রাসাদের কক্ষগুলি এরূপ ধূলিমলিন যে, মনে হইবে, দারুণ দারিদ্র্য প্রাসাদমধ্যে রাজত্ব করিতেছে।

দ্বিতলের একটি অপেক্ষাকৃত সুসজ্জিত বিস্তৃত কক্ষে ভূতপূর্ব্ব রাজা চা-স্কিং নাম্‌গয়াল (ধর্ম্মের শাশ্বত রক্ষাকর্ত্তা) সকন্যা রাজমহিষী এবং বৃদ্ধা রাজমাতা সহ তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। তিব্বতীয় রীতি অনুসারে অভিনন্দনের কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

গিরিশীর্ষে মুলবেক মঠ

প্রস্তাব করিয়াছিলেন; কিন্তু বৃদ্ধা রাণীমাতা তাঁহার পৌত্রের ছবি কোনমতেই তুলিতে দেন নাই। ক্যামেরার কাচচক্ষু তাঁহার কাছে ভূতযোনির চক্ষু বলিয়া প্রতীতি হইয়াছিল। অভিযানকারীরা পরে প্রাসাদের

ভূতপূর্ব্ব রাজার বয়স ৩১ বৎসর। তাঁহার দেহে পীতবর্ণের রেশম-নির্ম্মিত একটি চৈনিক পরিচ্ছদ, কর্ণে কুণ্ডল এবং মস্তকে প্রবাল-নির্ম্মিত মুকুট। তাঁহাকে অনেকটা নারীর মত দেখাইতেছিল। তাঁহার বামপার্শ্বে রাণী বসিয়াছিলেন। তাঁহার গলদেশে নয়নরী মূল্যবান্ হার। ৪ বৎসরের কন্যার শিরোদেশে সন্ন্যাসিনীর টুপী।

অভিযানকারীরা শিশু রাজপুত্রের একটি আলোকচিত্র গ্রহণের

লাডকের ভূতপূর্ব্ব রাজার প্রাসাদ (দক্ষিণাংশে)

কারাকোরম্‌ উপত্যকাভূমিতে তুষার-নদী

রক্ষকের নিকট অবগত হইয়াছিলেন, পাছে প্রেতযোনি সন্ধান পায়, এজন্য নবকুমারের জন্ম হইবার পর কয়েক মাস পর্য্যন্ত এ সত্যকে গোপন করিয়া রাখা হইয়াছিল। রাণীমাতার বিশ্বাস, জন্ম-সংবাদ না পাইলে দুষ্ট আত্মা কোন অনিষ্ট করিতে পারে না।
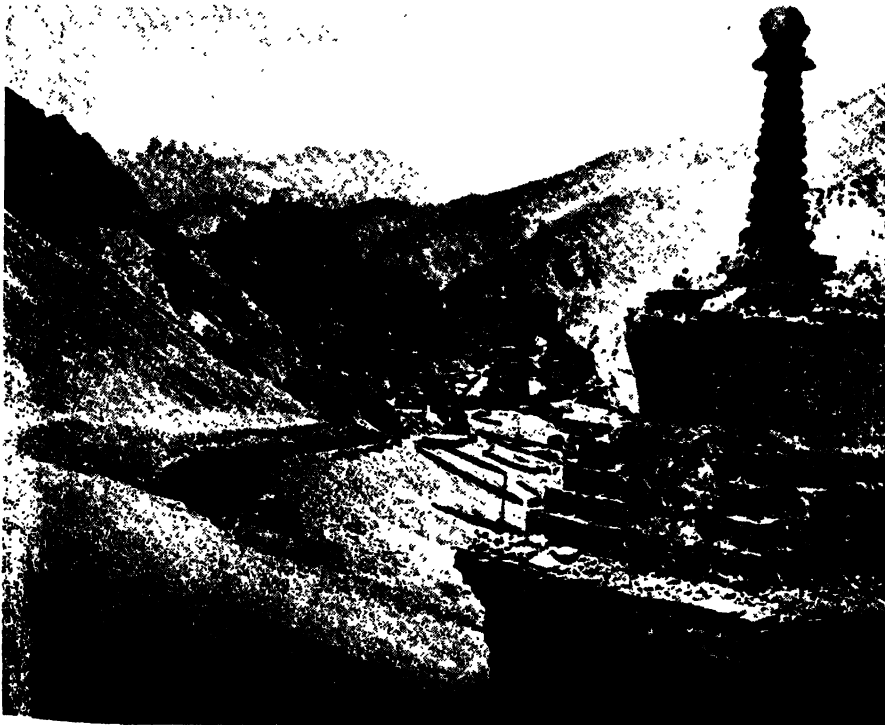
হিমিস্ মঠে অবস্থানকালে অভিযানকারীরা মঠাধ্যক্ষ ষ্টাক্‌জান রাগ্‌পা স্কুসক্‌এর সহিত বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হন। ইনি তাঁহাদিগকে নানা বিষয়ে সহায়তা করিয়াছিলেন।

এই মঠে কয়েক দিন যাপনের পর তাঁহারা চলাপথ ত্যাগ করিয়া গন্তব্য স্থান অভিমুখে অগ্রসর হইবার আয়োজন করিলেন। কিন্তু তাঁহারা মনুষ্যাধিকারবর্জ্জিত মরুভূমির দিকে যাত্রা করিতেছেন শুনিয়া কুলীরা তাঁহাদের অনুগমন করিতে স্বীকৃত হইল না। অবশেষে দ্বিগুণ পারিশ্রমিক দিবার অঙ্গীকারে এক মাসের বেতন অগ্রিম প্রদান করিয়া তাঁহারা কয়েক জন তিব্বতীয় কুলী সংগ্রহ করেন।

যাত্রারম্ভের পর তাঁহারা ক্রমশঃ ট্যাংক্‌সিতে উপনীত হন। ইহা একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। একটি সুন্দর প্রাচীন মঠ এখানে বিদ্যমান। অনুসন্ধানফলে অভিযানকারীরা এখানে প্রাচীনতম যুগের খৃষ্টধর্ম্মের কোন কোন পরিচয় প্রাপ্ত হন। পর্ব্বতগাত্রের অনুশাসন-লিপি অনুসারে তাঁহারা জানিতে পারেন, খৃঃ অষ্টম শতাব্দীতে এখানে এক দল খৃষ্টধর্ম্ম-যাজক আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা মধ্য-এসিয়া এবং চীন দেশের অনেক স্থানে খৃষ্ট-ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

আরও দুই দিন যাত্রার পর তাঁহারা প্যাংগং হ্রদের দর্শন পান। এই হ্রদের দৈর্ঘ্য ১ শত মাইল, বিস্তৃতি ২ হইতে ৩ মাইল হইবে। উত্তর-হিমালয় অঞ্চলে এরূপ প্রকাণ্ড হ্রদের সংখ্যা

তিব্বতীয় মঠের পথে স্মৃতিস্তম্ভ

অল্পই বিদ্যমান। হ্রদে মৎস্যও অপর্য্যাপ্ত নহে, জলও বেশ স্বচ্ছ।

হ্রদতীরে অভিযানকারীরা শিবির সন্নিবেশ করেন। রাত্রি-কালে তাঁহারা বিশ্রামের জন্য শয়ন করিয়াছেন, অকস্মাৎ পার্ব্বত্য ঝটিকা ভীমবেগে প্রবাহিত হইল। তাঁহাদের বস্ত্রাবাস-সমূহের সুদৃঢ় রজ্জুবন্ধন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল, শিলাখণ্ড ও বালুকারাশি উন্মত্ত ঝটিকাবেগে তাঁহাদের উপর আপতিত হইতে লাগিল। হ্রদের শান্ত জল-রাশিতে প্রচণ্ড তরঙ্গ উত্থিত হইতে লাগিল। আকাশের বক্ষ চিরিয়া বিজলীদীপ্তি ও ভীম অশনি-সম্পাত অভিযানকারীদিগকে শঙ্কিত, বিচলিত করিয়া তুলিল—ধারাবর্ষণে তাঁহারা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। কয়েক দণ্ড পরে ঝটিকা নিবৃত্ত হইল।

হিমালয়ের ডাকবাহক

কুলী ব্যতীত অনেকগুলি মেষ এবং যাক্ তাঁহারা মোট-বহনের জন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। প্রত্যেক মেষ প্রায় ১৬ সের আন্দাজ ভার অনায়াসে বহন করিবার উপযোগী।

মার্সিমিক গিরিবর্ত্ম অতিক্রম-কালে তাঁহারা এক দল বন্য গর্দ্দভ দেখিতে পান। এই গিরি-সঙ্কটের উচ্চতা ১৮ হাজার ৪ শত ২০ ফুট। তিব্বতীরা এই বন্যগর্দ্দভকে "কিয়াং" নামে অভিহিত করিয়া থাকে।

আরও কয়েক দিন অগ্র-গমনের পর তাঁহারা লানক্ লা নামক গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করিলেন। তিব্বত-সীমান্তের ইহাই শেষ গিরিবর্ত্ম। এই গিরিসঙ্কট অতিক্রম করিলেই পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ মালভূমিতে পদার্পণ করা যায়। এই

হিমিস্ মঠের অধ্যক্ষ

ভূতের নৃত্য-পরিচালক

স্থানের উপত্যকাভূমির উচ্চতা ১৮ হাজার ফুট। তুষার-কিরীটী যে অত্যুচ্চ অদ্রিমালা এখানে বিরাজিত, তাহাদের নামকরণ এখনও হয় নাই। মানব-নিশ্বাস এখানে কখনও পতিত হয় নাই। মনুষ্য-কণ্ঠধ্বনি এই বিরাট মালভূমির বক্ষে কখনও শ্রুতিগোচর হয় নাই। অভিযানকারীরাও নীরবে ইহার বক্ষের উপর দিয়া চলিতে লাগিলেন—মনুষ্য-কণ্ঠস্বরে ইহার বিরাট নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করিতে তাঁহাদের সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল।

এখানকার প্রাকৃতিক অবস্থা এমনই বিচিত্র যে, আবহ-বিদ্যার সমস্ত তত্ত্বই এখানে নিষ্ফল হইয়া যায়। কখন্ সূর্য্যকিরণের প্রচণ্ড তেজ মানুষকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবে, আর কখনই বা শিলা-বৃষ্টি সহ ঝটিকা বহিবে, তাহা পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতার দ্বারা ... করা সুকঠিন। ...র মধ্যে ৫।৭ ... তুষারপাত, ... আকস্মিক-... তাঁহাদিগকে ...র করিয়া ...তে লাগিল। ...নক গিরি-...টের কাছেই অভিযানকারীদিগের দেশীয় কুলীর মধ্যে ৩ জন তাহাদের যাক সহ স্বদেশে ফিরিয়া গেল। তাহারা কোনমতেই আর অগ্রসর হইতে সম্মত হয় নাই। আবদুল্লা নামক এক জন ভৃত্য ও এক জন রাখাল পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিল। অভিযানকারীরা এই দুই জনকে তাহাদের

হিমিস্ মঠ

সঙ্গে পাঠাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু এ প্রস্তাবে তাহারা কর্ণপাত করে নাই।

পীড়িত দুই জনকে অগত্যা তাঁহারা সঙ্গে করিয়া লইলেন। কয় দিন পর্য্যটনের পর তাঁহারা সিরিগ্ জিল্‌গানাং (পীত উপত্যকার হ্রদ) নামক হ্রদতীরে উপনীত হন। দূরবর্ত্তী কারাকোরম গিরিশ্রেণীর প্রতিবিম্ব এই হ্রদসলিলে প্রতিফলিত হইতেছিল।

অভিযানকারীদিগের সঙ্গে যে মেষদল ছিল, তাহাদের মধ্যে মড়ক দেখা দিল। এক দিন দুইটি ভেড়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল। অস্ত্রোপচার করিয়া তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, তাহাদের পাকস্থলীতে কীট প্রবেশ করিয়া উহা বিদীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে।

পশু হইতে শেষে মানুষের উপরও মৃত্যু তাহার প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। এক জন রাখাল সহসা পীড়ায় আক্রান্ত হইল। ঔষধপত্র-প্রয়োগে কোনও সুফললাভ হইল না। নিউমোনিয়ার আক্রমণে বেচারা মেষপালক অবশেষে দেহরক্ষা করিল।

অভিযানকারীরা শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু যে উদ্দেশ্য লইয়া তাঁহারা যাত্রা করিয়াছেন, তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা কাহারও হইল না। অগ্রে চলিতেই হইবে, ভাগ্যে যাহাই ঘটুক না কেন।

ক্রমে তাঁহারা উল্লিখিত হ্রদের পূর্ব্বপার্শ্ব দিয়া চলিতে লাগিলেন। পর্ব্বতময় প্রদেশে প্রবেশ করিয়া তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, তৃণগুল্ম পর্য্যন্ত কোথাও নাই—পানীয় জলও সম্ভবতঃ আর মিলিবে না। কিন্তু উদ্যম হইতে তথাপি তাঁহারা ভ্রষ্ট হইলেন না। অনুযাত্রীরা বিরস-বদন, নিরুৎসাহ হইলেও অভিযানকারীরা অসীম ধৈর্য্যবলে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

অক্‌সাই চীন মালভূমিস্থিত বিরাট লবণ-হ্রদের কাছে যখন তাঁহারা উপনীত হইলেন, তখন দলের অনেকগুলি ঘাক্ যমরাজের কাছে দেহ উৎসর্গ করিয়াছে। ৩১টির মধ্যে তখন ১৯টি অবশিষ্ট আছে। এখানে আসিয়া তাঁহারা পানীয় জল ও ঘাস দেখিতে পাইলেন।

লানক্ গিরিসঙ্কট হইতে লবণহ্রদ পর্য্যন্ত যে বিস্তীর্ণ ভূভাগ তাঁহারা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছিলেন, পূর্ব্বে কোনও শ্বে[illegible] জাতীয় লোক তথায় পদার্পণ করে নাই। ডাঃ টিংক্‌লা[illegible] নূতন পার্ব্বত্য জগতের মানচিত্র অঙ্কিত করিয়া লইলেন। কোন সভ্য জাতি ইতিপূর্ব্বে এ সকল পর্ব্বতের অস্তি[illegible] অবগত ছিল না।

জোজি লা গিরি-সঙ্কট

অভিযানকারীরা বুঝিতে পারিলেন, এই উচ্চ মালভূমি—মরুভূমি তাঁহাদিগকে নিরুপদ্রবে অবস্থান করিতে দিবে না। তাঁহাদিগকে বিতাড়িত করিবার জন্য তাহার ক্রোধ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে। সুতরাং তাঁহারা কুন্‌লুন্ অতিক্রম করিয়া চৈনিক তুর্কীস্থানের মরু-উদ্যানের অভিমুখেই যাত্রা করিলেন। কিছু দূর গেলেই হয় ত আবার তাঁহারা মানুষের বসতিস্থানে উপনীত হইতে পারিবেন।

কিন্তু তাঁহাদের এই কল্পনার কথা, উদ্দেশ্যের বিষয় তাঁহারা অশ্বেত সহযাত্রীদিগের নিকট সম্পূর্ণ গোপন করি-

জলের সন্ধানে

লেন। কারণ, তাহাদিগকে তাঁহারা লে'নগরে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। যত দিন সম্ভব, তাহাদিগকে তাঁহারা কাছে রাখিতে চাহেন। কিন্তু তাহাদিগের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহারা সংকল্প করিয়াছিলেন যে, চীন-সীমান্তে পৌছিতে পারিলেই উহাদিগকে তাঁহারা লে'নগরে ফেরৎ পাঠাইবেন।

এ দিকে তাঁহাদের কুলী-সর্দারের অভিপ্রায় ছিল যে, শীতের প্রারম্ভে চীন-সীমান্তে উপনীত হইতে না পারিলে, অভিযানকারীরা আর এক বৎসরের জন্য তাহাদিগকে অবশ্যই নিযুক্ত রাখিবেন। এ জন্য সর্দার গোপনে কুলীদিগকে এমন ভাবে পরামর্শ দিতেছিল যে, অভিযানকারীরা যেন কোনমতেই দ্রুত-গতিতে অগ্রসর হইতে না পারেন। দেশীয় ভৃত্যগণের মধ্যে কেহ কেহ পীড়ার ভাণ করিতে লাগিল, কেহ কেহ কায করিতেও অসম্মতি জানাইতে লাগিল।

অবশেষে নানা কৌশলে তাঁহারা কুলীদিগকে সন্তুষ্ট করিলেন; কিন্তু বৃহৎ বস্ত্রাবাস ও অন্যান্য ভারী আসবাবপত্র লইয়া এই নূতন পথে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব দেখিয়া তাঁহারা ঐ সকল দ্রব্য একটি তাঁবুর বস্ত্রে সুদৃঢ়রূপে জড়াইয়া তাহার উপর ভারী প্রস্তরখণ্ডসমূহ চাপাইয়া দিলেন। আরণ্য জন্তুর দ্বারা এই সুরক্ষিত বোঝা নষ্ট হইবার কোন সম্ভাবনাই আর রহিল না। এইরূপে তাঁহারা চীন-তুর্কীস্থানের সীমান্ত অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

১৪টি যাক্ সহ তাঁহারা শিবির হইতে বাহির হইলেন। জলের আধারগুলি পানীয় জলে পূর্ণ করা হইল। উল্লিখিত লবণ-হ্রদের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে উপনীত হইতে পারিলে মিষ্ট জল পাওয়া যাইতে পারে, এইরূপ অনুমান তাঁহারা করিয়াছিলেন। কিন্তু নির্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইয়া তাঁহারা

দেখিতে পাইলেন যে, নদীর গর্ভ শুষ্ক, বিন্দুমাত্র জল কোথাও নাই। কুলীরা সঞ্চিত জল সমস্তই ব্যবহার করিয়া ফেলিয়াছিল। অভিযানকারীরা ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে এক বিন্দু পানীয় জল পাইলেন না।

দরগার সন্নিহিত বিশ্রামাগারে পারাবতের দল

অনুমানমত যেখানে জল পাইবার সম্ভাবনা ছিল, অর্থাৎ যেখানে মাটী খনন করিলে জল মিলিবার কথা, সেই স্থানে গিয়া জল ত মিলিলই না। অধিকন্তু এই ব্যাপারে তাঁহাদের দলের ৯টি যাক্ মারা পড়িল। কুলীরা আতঙ্কে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—নক্ষত্র-চিত্রিত আকাশতলে, রাত্রিকালে তাহাদের কণ্ঠে ধর্ম্মমূলক সঙ্গীতধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল।
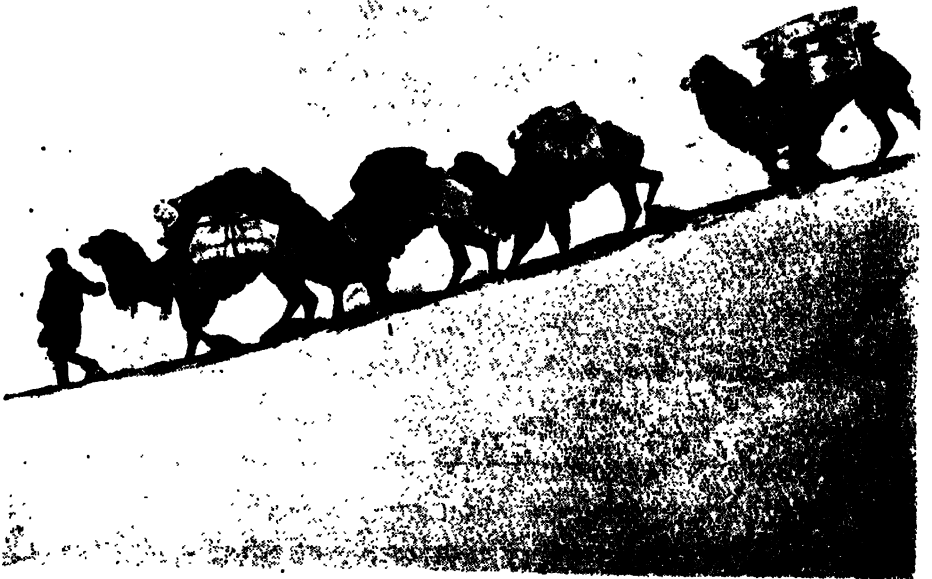
টাক্লা মাকান্ মরুভূমির পথে উষ্ট্রদল

অভিযানকারীরা চলা বন্ধ করিলেন না। সেই অবস্থাতে তাঁহারা ১৭ হাজার ৫ শত ফুট উচ্চ উপত্যকাভূমির উপর দিয়া চলিতেছিলেন। যদি কোথাও এক ফোঁটা জলের সন্ধান পাওয়া যায়, সকলেরই দৃষ্টি তাহারই সন্ধানে ব্যস্ত। সকলেরই শরীর ক্রমশঃ দুর্ব্বল ও অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছিল। জল—জল চাই!

তাঁহারা যেখানে পূর্ব্বে শিবিরস্থাপন করিয়াছিলেন, লবণ-হ্রদের তীরে সেই শিবিরে তাঁহারা দ্রুততর বেগে

টাক্‌লা মাকান্‌ বালুকাস্তুপের অন্তরালবর্ত্তী আবিষ্কৃত বৌদ্ধ দেবস্থান
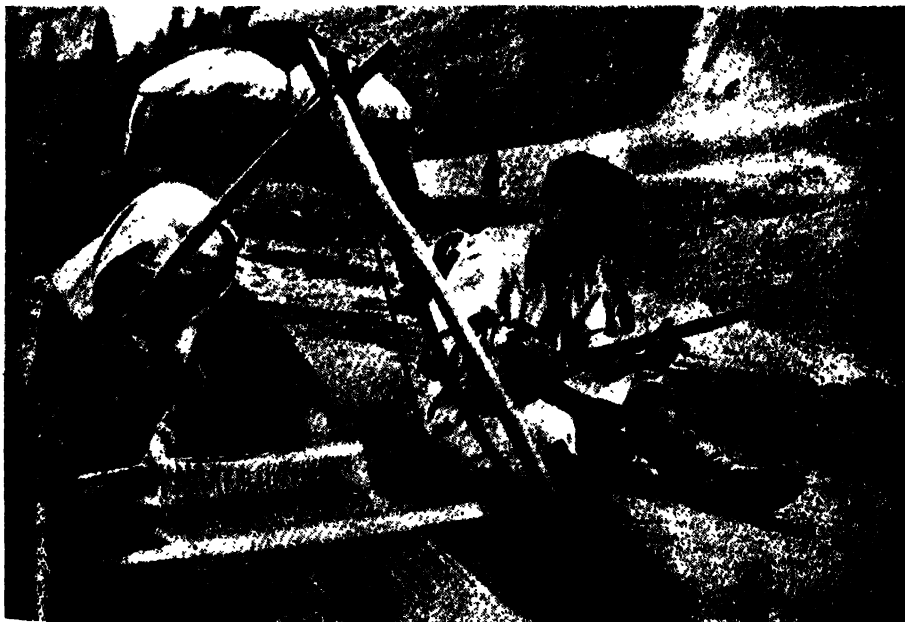
খিরগিজ যুবতী তাঁত বুনিতেছে, স্বামী বীণা-বাদন করিয়া স্ত্রীর শ্রম লাঘব করিতেছে

ফিরি[illegible] আসিলেন। হ্রদের জলের নিম্নভাগ হইতে জমাট বরফ-স্তূপ তুলিয়া অবশিষ্ট যাকগুলির পৃষ্ঠে বোঝাই দেওয়া হইল। তার পর তাঁহারা কুন্‌লুন্‌ পর্ব্বতমালা অভিমুখে [illegible]ত্রা করিলেন।

প্রতিদিন ১২ হইতে ১৬ মাইল পথ চলিয়া চতুর্থ দিবসে তাঁহারা চীন-তুর্কীস্থান সীমান্তে প্রবেশ করিলেন। খতাই দাওয়ান নামক গিরিসঙ্কট অতিক্রম করিবার দুই দিন পরে তাঁহারা মনুষ্যের আবাসস্থানের আভাস পাইলেন। উহা একটি কৃষক-কুটীর। দূর হইতে এই পর্ণকুটীর দেখিয়াই কুলীর দল উল্লাসে আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল। সকলেরই মনে আশার সঞ্চার হইল যে, আর দুই চারি দিনের মধ্যে লোকালয়ের সন্ধান মিলিবে।

এক দিন প্রভাতে সত্য সত্যই দূরে বস্ত্রাবাসের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইল। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, খিরগিজ বেদিয়াগণ বস্ত্রাবাস স্থাপন করিয়াছে। দূর হইতে নদী-তীরবর্ত্তী বস্ত্রাবাসের সম্মুখে নরনারীর মেলাও তাঁহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল।

দীর্ঘ ১০ দিন পরে অভিযানকারীরা মানব-মুখ দর্শন করিলেন। সকলেরই হৃদয়ে আশা ও আনন্দের সঞ্চার হইল।

চরকায় ইয়র্কন্দ রমণী সূতা কাটিতেছে

বেদিয়ারা তাঁহাদিগকে আসিতে দেখিয়া অভিনন্দন জ্ঞাপন করিল। দলের সর্দ্দার স্বয়ং আসিয়া এই অবসন্ন, শ্রান্ত অভিযানকারীদিগকে তাহাদের বস্ত্রাবাসে লইয়া গেল।

নর-নারীরা কৌতূহলভাবে এই সকল শ্মশ্রুল, মলিনবেশ শ্বেতাঙ্গদিগকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। সর্দ্দারের স্ত্রী ও সর্দ্দার দুগ্ধ ও মাখন দ্বারা তাঁহাদের ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নিবারিত করিল। নদীর কলতান তাঁহাদের কর্ণেন্দ্রিয়কে কত কাল পরে আবার পরিতৃপ্ত করিয়া দিল।

৭ই অক্টোবর তারিখে তাঁহারা সুগেট্ কারাউল নামক স্থানে উপনীত হইলেন। চীন-সীমান্তে কারাকাস উপত্যকা-ভূমিতে ইহাই চীনদিগের প্রথম থানা। ভারতবর্ষ হইতে সার্থবাহদল এই তোরণপথেই চীন-তুর্কীস্থানে প্রবেশ করিয়া থাকে। এই থানার চারিপার্শ্বে মৃৎপ্রাচীর। মাত্র ৬ জন সৈনিক এই থানার রক্ষক। এখানে অবস্থান করিয়া তাঁহারা এক দল লোক নিযুক্ত করিলেন। তাহারা উষ্ট্রসহ লবণহ্রদের সমীপস্থ পরিত্যক্ত দ্রব্যসমূহ আনিবার জন্য প্রেরিত হইল। ইয়ারকন্দে পৌঁছিবার পর তিব্বতীয়

যাকৃপৃষ্ঠে অভিযানকারীরা কুন্‌লুন্ পর্ব্বত অতিক্রম করিতেছেন

কিরগিজ যাযাবর কুটীর

কুলীদিগকে তাঁহারা বিদায় দিলেন। সেখান হইতে টাট্টু ঘোড়া সংগ্রহ করিয়া তাঁহারা চীন-তুর্কীস্থানের মরু-উদ্যান অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

গিরি-সঙ্কট অতিক্রম করিবার পর, সন্নিহিত নগরের চীন-ম্যাজিষ্ট্রেট কয়েক জন রক্ষি-সৈনিককে তাঁহাদের রক্ষার জন্য প্রেরণ করিলেন। সাঞ্জু উপত্যকা পার হইয়া চলিবার পথে প্রতি গ্রাম হইতে দুই এক জন করিয়া সরকারী কর্ম্মচারী তাঁহাদের দলে যোগ দিতে লাগিলেন এইরূপে গুমা নগরে পৌছিবার পূর্ব্বে তাঁহাদের দলে ২৪ জন রক্ষি-সৈনিক জুটিয়াছিল।
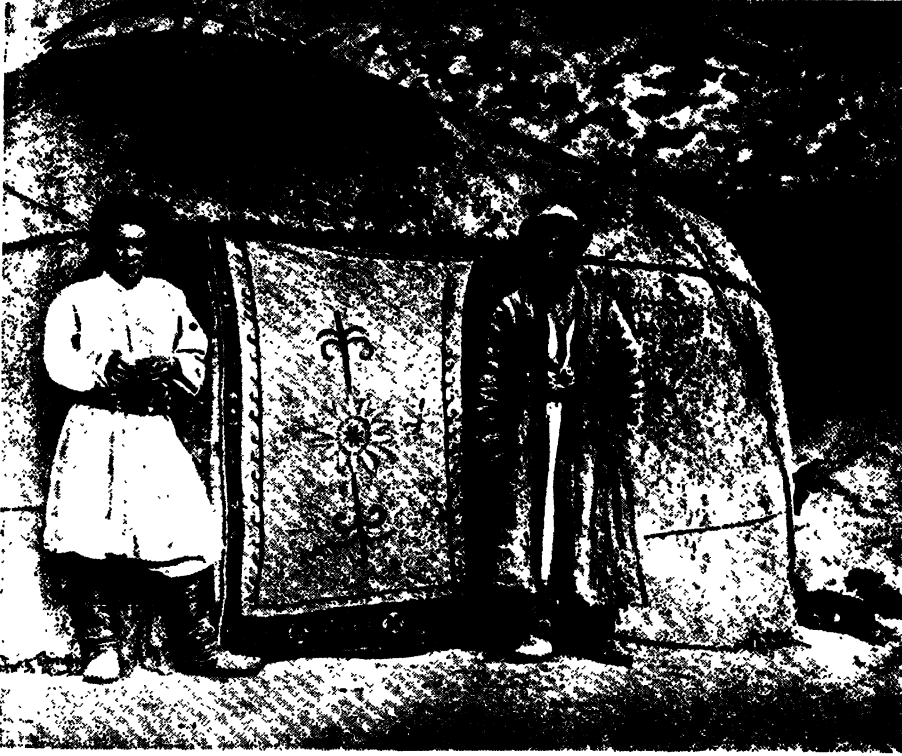
অনুসন্ধানকারীদিগের চিকিৎসক খোটান রমণীর চিকিৎসা করিতেছেন

চীন-ম্যাজিষ্ট্রেটের আলয়ে তাঁহারা সমাদরে অভ্যর্থিত হইলেন। কিন্তু সে অঞ্চলের গভর্ণর জেনারেলের আদেশ না আসা পর্য্যন্ত ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাদিগকে আর অগ্রসর হইতে দিলেন না। পিশান্ নগর হইতে ইয়ার্কন্দের অভিমুখে অবশেষে তাঁহারা যাইবার আদেশ পাইলেন। এই দিকে 'টাক্‌লা-মাকান' মরুভূমি বিদ্যমান।

ইয়ার্কন্দ যাইবার পথে অসংখ্য ভ্রাম্যমাণ বালিয়াড়ি আছে। দেখিলেই মনে হইবে, মরু-সমুদ্রে বিরাটাকার তরঙ্গগুলি যেন স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া আছে। এই বালুকা-তরঙ্গগুলি উত্তরে টিন্-সিন্ পর্ব্বতমালা ও পূর্ব্বভাগে গোবি মরুভূমি পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বিগত দেড় সহস্র বৎসর ধরিয়া এই মরুভূমি কেবল বাড়িয়াই চলিয়াছে। যে দিকে এই বৈচিত্র্যহীন বালুকা-স্তূপগুলি বিস্তৃত হইতেছে, এককালে সেই

সকল স্থান মনুষ্যের আবাসভূমি ছিল—ফলফুলে সুশোভিত উদ্যান-সমূহও তত্রত্য শোভাবর্দ্ধন করিত। ভ্রাম্যমাণ বালুকা-স্তূপ সেগুলিকে ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছে, ইহাই বিশেষজ্ঞ-গণের অভিমত।

ইয়ার্কন্দে কয়েক দিন অবস্থান করিবার সময় সুইডিস্ ধর্ম্মপ্রচারকগণের একটি দলের সহিত অভিযানকারীদিগের সাক্ষাৎ হয়। সাড়ে চারি মাস পরে তাঁহারা সর্ব্বপ্রথম শ্বেতাঙ্গ মানুষের সাক্ষাৎ পাইলেন।

মধ্য-এসিয়ার দূরবর্ত্তী অঞ্চলে সুইডিস্‌গণ অনেকগুলি বিদ্যালয় ও ঔষধালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। স্থানীয় অধিবাসীদিগের সাহায্য কল্পেই এই ব্যবস্থা।

চীন-তুর্কীস্থানের অধিবাসীদিগকে দেখিলে মনে হইবে, এখানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মিশ্রণ ঘটিয়াছে এ কথা সত্য নহে যে, এ দেশে শুধু অর্দ্ধ-মঙ্গোলীয়, অর্দ্ধ-তুর্কী বা তিব্বতীয়রাই অধিকার করিয়া রহিয়াছে। এমন প্রচুর ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে যে, এই স্থানের প্রথম অধিবাসীরা ভ্রাম্যমাণ আর্য্যদিগের অন্তর্গত ছিল। প্রাচীন আর্য্যদিগের শিক্ষা, দীক্ষা ও সভ্যতার বহু নিদর্শন সমগ্র চীন-তুর্কীস্থানে ছড়াইয়া আছে। ইদানীং এ অঞ্চলে চীনা-লোকের সংখ্যা অত্যল্প। কিন্তু তাহারা প্রত্যেক বড় বড় পদ অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

কাসগড়ে আসিয়া অভিযানকারীরা দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়েন। এক দল কাসগড় ও পূর্ব্ব-খোটানের দিকে যাত্রা করেন। অপর দল পশ্চিম কুন্‌লুন্ পর্ব্বতমালার দিকে অগ্রসর হইলেন।

মঠ-সন্নিহিত পর্ব্বতগাত্রে লামাগণ নানাবিধ চিহ্ন ক্ষোদিত করিয়াছেন

শেষোক্ত দল যে পথের অভিমুখে যাত্রা করিলেন, সপ্তাহ পরে তাঁহারা কার্গালিক হইতে পর্ব্বতমালার রাজ্যে পৌছিলেন। মধ্য-এসিয়ায় ২ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে অধুনা-বিস্মৃত জাতি রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহাদের পশুপাল এই খানে চরিয়া বেড়াইত। এতদঞ্চলে ইদানীং 'পাচপুস্' বা 'পাখপুলক্‌স্' নামক গৌরবর্ণ, রক্তকেশ এক জাতি আছে।

তাহাদের জীবনযাত্রার প্রণালী প্রাচীন যুগের গুহাবাসী মানবদিগের ন্যায়। তাহারা গিরিগুহায় অথবা প্রস্তররচিত সাধারণ কুটীরে বাস করে। মেষপালন ও মৃগয়ার দ্বারা তাহাদের জীবিকার্জ্জন হইয়া থাকে। পূর্ব্ব-তুরস্কের কথ্য ভাষার সহিত তাহাদের ভাষার বিশেষ পার্থক্য বিদ্যমান। অভিযানকারীরা তাহাদের ভাষা বুঝিতে পারেন নাই।

কার্গালিকের বিচারসভা

ইয়র্কন্দের গায়কদল

পুরাতন গাদা বন্দুক ধারণ করিয়া, মেষচর্ম্মে দেহাবৃত করিয়া তাহারা যখন তাঁহাদের শিবিরে আগমন করিল, তাঁহারা তাহাদের উদ্দেশ্য বুঝিতে সমর্থ হইলেন না।

তাহাদের দলের দুই জনকে পথি-প্রদর্শক হিসাবে তাঁহারা নিযুক্ত করিলেন। এক-জাতীয় মৃগ শিকারের পর শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে অভিযানকারীরা পুরস্কারস্বরূপ অর্থ দিতে চাহিলেন; কিন্তু চীনের রৌপ্য-মুদ্রা তাহারা লইতে স্বীকৃত হইল না। তাহাদের ব্যবহারে এইটুকু সুস্পষ্ট হইল যে, জীবনে তাহারা এইরূপ মুদ্রা দেখে নাই। মুদ্রার পরিবর্ত্তে নিহত মৃগের চর্ম্ম লইয়া তাহারা সন্তুষ্ট হইল। উহার দ্বারা তাহারা জুতা তৈয়ার করিয়া লইবে। ইহারা এমনই দরিদ্র যে, চিনি ব্যবহার করাও বিলাসিতার পরিচায়ক!

খোটানের নৃত্যকারী দরবেশ

অভিযানকারীরা এক দিন এক জন লোককে লইয়া একটি গুহাদর্শনে গমন করেন। ঐ গুহাদর্শনে তাঁহাদের মনে হইয়াছিল যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে এই গুহায় মানুষের বাস ছিল। গুহার পাষাণগাত্রে যে ভাষায় অনুশাসন-লিপি ছিল, পাচপু জাতীয় লোকটিও তাহা পড়িয়া উঠিতে পারে নাই। গুহার নিম্নদেশে কর্দ্দম সঞ্চিত হইয়াছিল। প্রাচীর-গাত্র নানাবিধ কারুকার্য্যে সুশোভিত। পশু ও মানুষের বিভিন্ন মূর্ত্তিও পাষাণ-গাত্রে ক্ষোদিত ছিল। যে জাতির লোক এখানে বাস করিত, সে জাতিও পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে ইহাও অভিযানকারীরা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ আর্য্যজাতি মধ্য-এসিয়ায় আসিবার পূর্ব্বে এই জাতি এতদঞ্চলে বিদ্যমান ছিলেন।

ডাঃ টিংক্লার ও বসার্ড মরুভূমি অঞ্চলে যাত্রা করিয়াছিলেন। তথায় তাঁহারা সন্ধান করিতেছিলেন, প্রাচীন যুগের শিক্ষা ও সভ্যতার কোনও নিদর্শন সেখানে আবিষ্কার করিতে পারেন কি না। বালুকা-সমুদ্রের সহিত সংগ্রাম করিয়া উষ্ট্র-বাহনে তাঁহারা দশ দিন চলিবার পর একটি স্থান আবিষ্কার করেন। বর্ত্তমানে সার্থবাহগণ যে পথে চলিতে থাকে, তাহার ২০ মাইল উত্তরে এই স্থানটি অবস্থিত। তথায় তাঁহারা একটি বৌদ্ধ মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পান। তন্মধ্যে কয়েকটি বর্ণানুরঞ্জিত মূর্ত্তি ও কতিপয় চৈনিক

কাসগড়ের বাজার

মুদ্রা আবিষ্কার করেন। এই মুদ্রাগুলি খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর। সে-যুগে এই অঞ্চলে একটি বাণিজ্যপথ ছিল। এই পথে বণিকগণ রেশম লইয়া গতায়াত করিত। চীনের পূর্ব্বাঞ্চলে এই ব্যবসা তখন প্রচলিত ছিল। এই পথের সাহায্যে শুধু ব্যবসা-বাণিজ্য নহে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার বিনিময়ও ঘটিয়াছিল।

বাকট্রিয়ার অভিমুখে সেকন্দর শাহ অভিযান করিয়াছিলেন। সেই সঙ্গে এতদঞ্চলে গ্রীক্ প্রভাবও অনুভূত হইয়াছিল। তাহার ফলে তদানীন্তন সভ্যজাতিদের মধ্যে শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাবও বিস্তৃত হইয়াছিল। খোটান সহরের আশে-পাশে খনন-কার্য্য দ্বারা অভিযানকারীরা প্রাচীন যুগের কতিপয় গ্রীক্ ও বৌদ্ধ মন্দির আবিষ্কৃত করেন। বালুকাস্তূপের নিম্নে যে সকল মূর্ত্তি প্রভৃতি প্রোথিত ছিল, তাহাতে বৌদ্ধ মূর্ত্তিগুলির দেহে গ্রীক্ স্থপতি-শিল্পের বহু নিদর্শন বিদ্যমান।

মরুভূমিপথে চীন-দুর্গাবশেষ

খননকার্য্য আরও অগ্রসর হইলে আরও অনেক মূল্যবান্ পদার্থ আবিষ্কৃত হইত। কিন্তু নূতন বিধান অনুসারে চীন সরকার তাঁহাদের খননকার্য্যে বাধা প্রদান করেন। চীনদেশে সম্প্রতি একটি আইন রচিত হইয়াছে যে, চীন অধিকারের কোথাও খননকার্য্য করিতে হইলে চীনদেশীয় কোনও প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় তাহা সম্পন্ন করিতে হইবে।

খননকার্য্যে বাধা পাইয়া অভিযানকারীরা বাধ্য হইয়া কাসগড়ে প্রত্যাগমন করেন। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে তাঁহারা উক্ত স্থান হইতে পুনরায় কাশ্মীরে ফিরিয়া আসেন। এই ব্যাপারে তাঁহারা ৩ হাজার মাইল পথ ভ্রমণ করিয়াছিলেন

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

আর্ণল্ড্ বেনেট

ইংলণ্ডের নামকরা ঔপন্যাসিক এনক্ আর্ণল্ড বেনেট সম্প্রতি মারা গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পর বিলাতী বহু কাগজে তাঁহার সম্বন্ধে বহু লেখা প্রকাশিত হইয়াছে। নিউ ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্ এণ্ড নেশান এবং স্পেক্‌টেটর পত্রে ছুটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিরাও অনেকে বেনেটের পরিচয় পাইয়াছেন তাঁহার রচনার ভিতর দিয়া, কিন্তু সাধারণ পাঠক-পাঠিকারা তাঁহার বিশেষ পরিচয় এখনও পান নাই। তাই আমরা বেনেটের জীবনকথা, প্রতিভার বিশেষত্ব ও রচনার উৎকর্ষের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিলাম।

বেনেট ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের যে জেলায় জন্মগ্রহণ করেন, সেই জেলায় অনেক কুম্ভকারের বাস, এবং সমস্ত জেলা কুম্ভকারের কারখানা আর পোয়ানে ভরা। এই কুম্ভকারদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া ও বর্দ্ধিত হইয়া তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন এবং কুম্ভকারদের জীবনের ও তাহাদের সুখদুঃখের যে পরিচয় পাইয়াছিলেন, তাহা তিনি তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনে তাঁহার রচনাবলীর মধ্য দিয়া অতি নিখুঁতভাবে প্রকাশ করিয়া দেশের দরিদ্র লোকদের সহানুভূতি ও দেশে বিদেশে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন।

বেনেট লেখাপড়া শিখিয়া তাঁহার পিতার কাছে আইন অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন এবং অপর এক এটর্ণীর নিকটে শিক্ষা সমাপ্ত করেন। কিন্তু অল্পবয়সেই তাঁহার লেখার ঝোঁক হয়, এবং ইংলণ্ডের বিখ্যাত টিটবিট্‌স্ (Titbits) কাগজে একটি রচনা করিয়া দিয়া তিনি প্রাইজ পান, এবং তাহার পরে "দি ইয়োলো বুক" (The Yellow Book) নামক পত্রিকায় তাঁহার একটি গল্প মনোনীত হইয়া ছাপা হয়। এই উৎসাহ পাইয়া তিনি ওকালতী ব্যবসায় ছাড়িয়া দিয়া সংবাদপত্রের কায অবলম্বন করিলেন। তিনি ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের 'দি উওম্যান' (The Woman) নামক সাপ্তাহিক পত্রের সহকারী সম্পাদক এবং পরে তাহার সম্পাদক হইয়া সাহিত্যচর্চ্চা করেন।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'অ্যানা অফ দি ফাইভ টাউন্‌স্' (Anna of the Five Towns) প্রকাশিত হইলে কুম্ভকারদের সামাজিক, বৈষয়িক, ব্যবসায়িক ও পারিবারিক জীবনের দক্ষ চিত্রকর বলিয়া তাঁহার খ্যাতি রটিয়া গেল। তাহার পরে ক্রমে ক্রমে 'ফাইভ টাউন্‌স্' নামক মহকুমায় কুম্ভকারদের পোয়ানের ধোঁয়ার মধ্যেই তাঁহার অনেকগুলি উপন্যাস লেখা ও প্রকাশিত হয়—'ক্লে-হ্যাঙ্গার (Clayhanger) ১৯১০ খৃষ্টাব্দে, 'হিল্‌ডা লেস্‌ওয়েজ' (Hilda Lessways) ১৯১১ খৃষ্টাব্দে, 'দি কার্ড' (The Card) ১৯১১ খৃষ্টাব্দে, 'দি ম্যাটাডোর অফ দি ফাইভ টাউন্‌স' (The Matador of the Five Towns) ১৯১২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

পরবর্ত্তী কালে তিনি নানা বিষয়ে রচনা করিতে আরম্ভ করেন, এবং যাহা লিখিতেন, তাহাতে বিশেষ চিন্তাশীলতা ও গভীর জ্ঞানের পরিচয় প্রকাশ পাইতে লাগিল। তাঁহার পলিটিক্যাল প্রবন্ধাবলীর মধ্যে তাঁহার অকপট বিশ্বাস ফুটিয়া উঠিত। তাঁহার থিয়েটারের সমালোচনা থিয়েটারগুলিকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করিত। সামাজিক ও নৈতিক বিষয়ে তাঁহার মতামত সকলে শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল।

তিনি মতে ও ধারণায় অতি আধুনিক দলের লোক ছিলেন এবং তাঁহার লেখা কুসংস্কারবর্জ্জিত—প্রমুক্ত বুদ্ধি-বিচারের আলোকে প্রদীপ্ত হইত বলিয়া তিনি শীঘ্রই সমাদৃত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার রচনার মধ্যে প্রচুর হাস্যরস, ব্যঙ্গবিদ্রূপ, রসিকতা থাকিত বলিয়া তিনি অতি শীঘ্র বহু পাঠকের পরিচিত ও প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন।

বেনেটের প্রধান প্রধান নভেল ও নাটকের নাম ও প্রকাশের তারিখ আমরা নিম্নে দিলাম,—

A Great Man, 1904; Buried Alive, 1908; The Old Wives' Tale, 1908; The Price of Love, 1914; These Twain, 1916; The Pretty Lady, 1918; (Plays) What the Public Wants, 1909; Milestones, 1912; The Titie, 1918.

আর্ণল্ড্‌ বেনেট

এনক্‌ আর্ণল্ড বেনেট এক জন তাজা জীবন্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁর প্রভাব সকলে মনে মনে অনুভব করিত। জীবন্ত থাকিয়া সকলের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করার শক্তির বিষয়ে তিনি বিশেষ সচেতন ছিলেন, এবং এই সম্বন্ধে তিনি মনে মনে গর্ব্বও অনুভব করিতেন। দরিদ্র অবস্থায় জন্মিয়া ধনী হইয়া উঠা, কেবলমাত্র নিজের চেষ্টায় বিখ্যাত হইয়া পড়া, এবং প্রৌঢ়বয়সে যৌবনের স্বপ্নকে জীবনে সফল হইতে দেখার সৌভাগ্য খুব অল্প লোকের জীবনে ঘটে। বেনেট এই সৌভাগ্যের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিবার পথের কষ্টের মধ্যেও আনন্দ উপলব্ধি করিয়া দুঃখের ভিতরেও মজা উপভোগ করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি ধন উপার্জ্জন করিয়া তাহা সম্ভোগ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার অসদ্ব্যবহার দ্বারা অর্জ্জিত অর্থকে ও আপনার অর্জ্জন-সামর্থ্যকে কখনো কলুষিত বা নিন্দিত করেন নাই। টাকা তিনি উপার্জ্জন করিতেন, যাহাদের নাই, তাহাদের নিকটে টাকা থাকার সুবিধা কত, তাহা দেখাইয়া দিতে তিনি কৃপণতা করিতেন না। মানুষের জীবন সুখে স্বচ্ছন্দে যাপন করিতে হইলে যে টাকার কত দরকার, তাহা তিনি বেশ উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাই কেহ তাঁহার কাছে কোন লেখা চাহিলেই তিনি বলিতেন—আমার লেখার জন্য এত দাম দিতে হইবে। এ সম্বন্ধে তাঁহার চক্ষুলজ্জা কিছুমাত্র ছিল না। তাঁর দাম খুব চড়া ছিল, কিন্তু তাঁহার অপেক্ষা কে অমন সুন্দর করিয়া দামের উপযুক্ত বস্তু দিতেই বা পারিত। তাঁহার লেখা হইত জোরালো, রসালো, সুপাঠ্য, এবং তিনি যে দিন যখন লেখা দিবার প্রতিশ্রুতি

দিতেন, তাহা রক্ষা করিতেন, কখনো তাঁহার ওয়াদা খেলাফী ত্রুটি ঘটিত না। তাঁহার অসাধারণ অধ্যবসায় ছিল, কোন কায হাতে লইলেই তাহাতে তিনি কোমর কষিয়া লাগিয়া যাইতেন, কবে তাঁহার অন্তরে অনুপ্রেরণা আসিবে, তাহার জন্য তিনি অপেক্ষা করিয়া বিলম্ব করিবার পাত্র ছিলেন না। এক দিন তাঁহার পুস্তক-প্রকাশক তাঁহাকে বই লিখিয়া দিবার জন্য তাগাদা করিলে তিনি তখনই জামার আস্তিন গুটাইয়া লিখিতে লাগিয়া গেলেন, এবং তাঁহার নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একেবারে ঠিক ছই লক্ষ কথায় লিখিয়া তাঁহার প্রধান উপন্যাস বৃদ্ধা স্ত্রীদের কাহিনী (The Old Wives' Tale) শেষ করিয়া ফেলিলেন।

লোকের সম্বন্ধে তাঁহার পছন্দ অপছন্দ আমাদের দেশের কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মত সুস্পষ্ট অথচ সংক্ষিপ্ত ছিল, "ঐ লোকটাকে আমি দেখিতে পারি না," অথবা "উহার লেখা ছাই" ছাড়া অধিক কিছু বলার প্রয়োজন তিনি অনুভব করিতেন না।

তিনি শক্তিশালী নবীন লেখকদিগকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উৎসাহ দিতে প্রস্তুত ছিলেন, তাঁহার উৎসাহ জোসেফ কন্‌র‍্যাডের প্রতিভাকে অভিনন্দন করিয়াছিল।

তিনি পুস্তকপ্রিয় ছিলেন, তাঁহার নিজের রচনার উপরও তাঁহার বেশ শ্রদ্ধা ও মমতা ছিল; তিনি নিজের বই লিখিতেন খুব ভালো কাগজে সাবধানে সুন্দর করিয়া হাতের লেখাকে সাজাইয়া গুছাইয়া এবং বই লেখা হইয়া গেলে হাতের লেখা কাগজগুলিকে তিনি সুন্দর করিয়া বাঁধাইয়া নিজের লাইব্রেরীতে রাখিয়া দিতেন।

বেনেট ৩৫ বৎসর বয়সে একখানি বই লেখেন The Truth About An Author, সেটি তাঁহারই জীবনস্মৃতি। এই পুস্তকে তিনি নিজের সম্বন্ধে যে সব কথা লিখিয়াছেন, তাহার মধ্যে তিনটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য। (১) আমি বিশ্রী রকমের সৌন্দর্য্যলোলুপ ছিলাম, যেখানে সৌন্দর্য্য নাই, সেখানেও আমি সৌন্দর্য্যের সন্ধান করিতে ব্যস্ত হইতাম। (২) আমি ২১ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত স্কট, জেন অষ্টেন, ডিকেন্‌স্‌, থ্যাকারে, ব্রণ্টে এবং জর্জ্জ ইলিয়টের কোনো বই-ই পড়ি নাই। (৩) আমি ফরাসী উপন্যাসের রসে একেবারে ডুবিয়া ছিলাম, টুর্গেনেভের বইও আমি ফরাসী অনুবাদে পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম, টুর্গেনেভ মোপাসাঁ আমার কাছে দেবতুল্য মনে হইত। তাঁহাদের রচনারীতি আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল, এবং আমি ইংরেজ লেখকদের লেখার ধরণকে সেই যে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, তাহা আর জীবনে দূর করিতে পারি নাই।

ঐ তিনটি উক্তি মনে রাখিলে বেনেটের লেখা বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইবে। তিনি কুৎসিততম পদার্থের ভিতরেও সৌন্দর্য্য সন্ধান করিতেন বলিয়া অতি সাধারণ তুচ্ছতম বস্তুও তাঁহার বর্ণনার গুণে সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে; শহরের ধোঁয়া, ট্রামগাড়ী, রেষ্টুরাঁ, অপরিষ্কার গলি প্রভৃতির ভিতর হইতেও তিনি সৌন্দর্য্য আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি মানুষের কিছু করিয়া তুলিবার চেষ্টার মধ্যে সৌন্দর্য্য দেখিয়াছেন, তা হোক না সেই কায কদর্য্য অথবা অন্যায়, মানুষের আশা, আগ্রহ, উৎসাহ তাঁহার চোখে সুন্দর হইয়া প্রতিভাত হইয়াছে।

ফরাসী লেখকদের প্রভাব তাঁহার রচনাকে নানা গুণে ভূষিত করিয়াছে, তাহা আমরা তাঁহার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস "বৃদ্ধা স্ত্রীদের কাহিনী" আলোচনার সময় দেখিব। তাঁহার সমস্ত বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া খুঁটাইয়া বর্ণনা করিবার অসাধারণ শক্তি ফরাসী নভেল পাঠেরই ফল। তিনি তাঁহার কল্পনার সৃষ্টি, সকল লোকের স্বভাব-চরিত্র সম্পূর্ণ জানেন, তাহারা কি করে বা না করে, তাহারও সমস্ত খুঁটিনাটি খবর তাঁহার জানা। তাঁহার মনের উপরে মোপাসাঁ, ফ্লোবেয়ার ও বালজাকের প্রভাব প্রবল ছিল।

বেনেট ৩২ বৎসর বয়সে তাঁহার প্রথম পুস্তক রচনা করেন। আর জীবনের বাকী ৩৩ বৎসরে তিনি যতগুলি নভেল, নাটক, প্রবন্ধ, সমালোচনা, ভ্রমণকাহিনী লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

বেনেট ৬৫ বৎসর বয়সে মারা গিয়াছেন, কিন্তু তিনি কখনো বৃদ্ধ হন নাই, যৌবনের উৎসাহ আনন্দ তাঁহাকে ত্যাগ করে নাই।

বোধ হয়, এমার্সন প্রতিভার বিশেষত্ব নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তির কষ্ট স্বীকার করিবার অসীম ক্ষমতা থাকে, সেই লোককে প্রতিভাবান্ বলা যাইতে পারে। এই সংজ্ঞা অনুসারে আমরা বেনেটকে প্রতিভাবান্ যে বলিতে পারি, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়া আসিয়াছি বেনেট স্বভাবতঃই জগতের সকল বিষয়ে ও বস্তুতে লক্ষ্য

নিবদ্ধ করিয়া তাহার খুঁটিনাটি জানিয়া লইবার শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। যাহা তাঁহার ছিল স্বভাবজ শক্তি, তাহার সহিত তাঁহার অধ্যবসায় যুক্ত হইয়া তাঁহাকে এক অনন্য-সাধারণ প্রতিভা দান করিয়াছিল। এই সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ-শক্তির ফলে তাঁহার সকল রচনাই প্রায় বস্তুগত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার নিজের মনের অনুভব বিশেষ আভা ফেলে নাই। যদিও তিনি তাঁহার সৃষ্ট নর-নারীদের সুখ-দুঃখ সম্বন্ধে উদাসীন নহেন, তথাপি তাহাদের ভাগ্যবিপর্য্যয় তাঁহাকে বিচলিত করে নাই, তিনি কেবলমাত্র দ্রষ্টারূপে তাহাদের অদৃষ্টের কথা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার সৃষ্ট লোকগুলিকে আমাদের চেনা নিতান্ত আধুনিক লোক মনে হইলেও তাহাদিগকে তাঁহারই প্রতিভার অনবদ্য সৃষ্ট বলিয়া চিনিতেও বিলম্ব হয় না। অতি আধুনিক মানব-জীবনের হুবহু ছবি তাঁহার পুস্তকে যত সুন্দরভাবে চিত্রিত হইয়াছে, এমনটি সাহিত্যে দুর্লভ।

টমাস হার্ডির সমস্ত নভেলের ঘটনা যেমন ওয়েসেক্স্ জেলার ব্যাপার, এণ্টনী ট্রোলোপ যেমন বার্চেষ্টার প্রদেশের সহিত সংযুক্ত, এবং যেমন ডিকেন্স্ লণ্ডন ও কেণ্ট জেলার মধ্যে আপনার রচনার ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ রাখিয়াছিলেন, তেমনি বেনেটকে তাঁহার আবাল্যের পরিচিত পাঁচ পরগণা "ফাইভ টাউন্স্" নিতান্ত আপনার করিয়া রাখিয়াছিল।

বেনেটের প্রধান নভেল বৃদ্ধা স্ত্রীদের কাহিনী ফাইভ টাউন্সের লোকেদেরই জীবন-কথা লইয়া লেখা। ঐ পুস্তকে বেনেট স্বভাব ও মানুষের রচিত সমস্ত বস্তুর সৌন্দর্য্য ও কুশ্রীতা, মানব-জীবনের ক্ষুদ্রতা, সঙ্কীর্ণতা ও মহত্ব, দুর্ব্বলতা ও শক্তি, তুচ্ছতা ও মহার্ঘতা অতি নিপুণ শিল্পীর ন্যায় সমস্ত খুঁটিনাটির সহিত দেখাইয়াছেন।

বার্স্লী শহরের সেণ্ট লিউক স্কোয়ারের কাপড়ের দোকানে মিঃ বেন্স্ ও তাহার দুই কন্যা কন্স্ট্যান্স্ ও সোফিয়ার সহিত আমাদের প্রথম পরিচয় ঘটাইয়া গল্প আরম্ভ হইয়াছে।

আমাদের শাস্ত্রে বলিয়াছে যে—

স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং
দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।

ঐ উক্তি কাহারও কাহারও বেলা সত্য হইলেও তাহা সকলের বেলা খাটে না। পাঠক সহজেই বুঝিয়া লইতে পারেন যে, আর্ণল্ড্ বেনেটের মানস সৃষ্টি কন্স্ট্যান্স্ কেমন প্রকৃতির মেয়ে, এবং সে কখন্ কি করিবে। কিন্তু সোফিয়াকে বুঝা মানুষের তো সাধ্যাতীত বটেই, তাহার মন দেবতারও পক্ষে বোঝা অসাধ্য। সোফিয়া এক দিকে অত্যন্ত আবেগময়ী, কিন্তু আবেগপ্রবণ লোকেরা সাধারণতঃ যে রকম হয়, সে আবার তার উল্টা; আবেগময় লোকেরা আবেগের বশবর্ত্তী হইয়া কি করিবে, তাহা অতি সহজেই আগে থাকিতেই বলিয়া দেওয়া যায়, কিন্তু সোফিয়া যে কোন্ আবেগের বশে কি করিবে, তাহা তো অপরের জানিবার উপায় নাই। কারণ, সে নিজেই জানে না যে, সে কি করিয়া বসিবে। কিন্তু ভাগ্যে সোফিয়া বেনেটের মানস সৃষ্টি, তাই তিনি কিছু কিছু জানেন যে, সোফিয়া কখন্ কি করিবে এবং বিধাতা যেমন মানুষকে জানিতে দেন না যে, কাহাকে লইয়া তিনি কি খেলা খেলিবেন, বেনেট ততদূর রহস্যপ্রিয় নিষ্ঠুর ভাগ্য-বিধাতা নহেন। তিনি মাঝে মাঝে তাঁহার পাঠকপাঠিকাদের আগে থাকিতে সোফিয়ার মনের একটু একটু পূর্ব্বাভাস দিয়া দয়া করেন।

বেনেটের সৃষ্ট সমস্ত চরিত্রই জীবন্ত কোনও লোককে দেখিয়া চিত্রিত বলিয়া মনে হইলেও কাহাকেও দেখিয়া সনাক্ত করা যাইবে না যে, সে অমুক লোক। কাহারও সহিত কোনো চরিত্র হুবহু মিলাইয়া দেওয়া যাইবে না। দুজন চারজন চেনা লোকের সমষ্টি যেন বেনেটের সৃষ্ট এক একটি চরিত্র।

সোফিয়া অত্যন্ত চঞ্চলা, স্ফূর্ত্তিবাজ মেয়ে। এই স্ফূর্ত্তির স্পৃহা সে পাইল কোথা হইতে, তাহা বলা শক্ত। নিশ্চয়ই তাহার জনক-জননীর নিকট হইতে নহে। তাহারা কাপড়ের দোকানদার, নিতান্ত গতানুগতিক প্রকৃতির লোক, প্রথা মানিয়া, সমাজবিধি মানিয়া চলিতেই ব্যস্ত। সুতরাং সোফিয়াকে ঠিক তাহাদের নিজেদের সন্তান বলিয়া মনে হয় না। সে যেন অপর কাহারও কন্যা, তাহাদের বাড়ীতে পালিত হইতেছে এবং তাহাকে তাহাদেরই মেয়ে বলিয়া তাহারা চালাইয়া দিতে চেষ্টা করিতেছে।

সোফিয়ার পিতা পক্ষাঘাতগ্রস্ত শয্যাগত রোগী। সোফিয়ার মাতাই এখন বাড়ী ও দোকানের সর্ব্বে-সর্ব্বা সর্ব্বময়ী কর্ত্রী; তাই সে কর্ম্মিষ্ঠা, মমতাময়ী অথচ আদেশ করিয়া নিজের ইচ্ছা প্রতিপালিত দেখিতে সে উৎসুক;

সে নিজেকে মনে মনে তারিফ করে যে, সে তাহার মেয়ে দুটিকে একেবারে মুঠার মধ্যে করিয়া রাখিয়াছে, এবং তাহাদের মতিগতি কিছুই তাহার কাছে অজানা নাই, সে তাহাদিগের মন জানা ভাষার খোলা বইয়ের মত অতি সহজেই পড়িয়া তাহাদের মনের বাসনা কামনা ইচ্ছা সব জানিয়া লইতে পারে। কিন্তু কিছু দিন পরেই বেচারী দেখিতে লাগিল যে, তাহার ছোট মেয়েটির মন বোঝা তাহার পক্ষে ক্রমশঃ অসাধ্য ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইতেছে। সে যতই কৈশোর ছাড়াইয়া যৌবনের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, তাহার মন ততই যেন এমন একখানি বই হইয়া উঠিতেছে—যাহার ভাষা তাহার জানা নাই, যাহার অক্ষরও সে কস্মিন্‌কালেও চোখে দেখে নাই, কাযেই তাহার এক বর্ণও তাহার বোধগম্য নয়।

মিসেস বেন্‌স্ হুকুম প্রচার করিল যে, তাহার দুই কন্যা স্কুল ছাড়িয়া এখন দোকানে কাযকর্ম্ম করিবে। বড় মেয়ে কন্‌স্ট্যান্‌স্ মায়ের বাধ্য, সে হুকুম মানিয়া স্কুল ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইল। কিন্তু সোফিয়া মাকে আশ্চর্য্য করিয়া ভয় লাগাইয়া দিয়া স্পষ্ট বলিয়া দিল যে, সে স্কুল ছাড়িবে না, সে ভালো করিয়া লেখাপড়া শিখিয়া স্কুলের মাষ্টারণী হইবে। মা তো একেবারে অবাক্ হইয়া গেল।

পুরুষে পুরুষে মতবিরোধ উপস্থিত হইলে তাহারা তর্ক করিয়া, যুক্তি দেখাইয়া অপরকে আপনার মতে আনিতে চেষ্টা করে; কিন্তু স্ত্রীলোকের স্বভাবই আলাদা, তাহারা যুক্তিতর্কের ধার ধারে না, হয় আমার মত মানিয়া লও, না হয় তো আমি যেমন করিয়া পারি দেখিয়া লইব, আমার মত মানাইতে পারি কি না। অতএব পিতাপুত্রে মতদ্বৈধ হইলে যে প্রণালীতে সহজে মীমাংসা হইয়া যাইতে পারিত, মাতাকন্যার মতদ্বৈধ সেরূপ সহজে মিটিল না। দুজনেই নিজের নিজের কোট বজায় রাখিবার সঙ্কল্প মনে দৃঢ় করিয়া রাখিয়া বাহিরে আপাততঃ চুপ মারিয়া গেল।

এর কিছু দিন আগে যখন সোফিয়া যৌবনে পা দিবে দিবে করিতেছিল, তখন এক দিন সে তাহাদের দোকানে এক জন বিদেশী ব্যবসাদারের এজেন্টকে তাহাদের মাল গছাইবার জন্য ক্যান্‌ভাস করিতে আসিতে দেখিয়াছিল। সেই এক দিন এক চমকে দেখা নাম-না-জানা লোকটিকে সোফিয়া মনে গাঁথিয়া রাখিয়াছিল। সেই অচেনা অজানা লোকটি তাহার কিশোর মনে পৌরুষ ও সুন্দরের প্রতিরূপ হইয়া যে ছাপ রাখিয়া গিয়াছিল, তাহা তাহার বয়স-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দিন দিন উজ্জ্বলতর গভীরতর হইয়া উঠিতেছিল।

কিছু দিন পরে তাহাদের সহর বার্সলীতে একটা সার্কাসের দল আসিয়াছিল। সার্কাসের একটা হাতী ক্ষেপিয়া উঠাতে তাহাকে গুলী করিয়া মারিয়া ফেলা আবশ্যক হয় এবং স্থির হয় যে, সেখানকার ভলাণ্টিয়ার সৈন্যদল সেই হাতীটাকে গুলী করিয়া মারিবে। অতবড় একটা প্রকাণ্ড জন্তুকে গুলী করিয়া মারা হইবে, এই দৃশ্য দেখিবার প্রলোভন, এমন কি, মিসেস বেন্‌স্ পর্য্যন্ত সম্বরণ করিতে পারিল না। সে যখন তাহাদের সঙ্গে সোফিয়াকেও যাইতে ডাকিল, তখন সোফিয়া বলিল, "হাতী দেখার চেয়ে আমার ঢের কাযের কায হাতে আছে।" সোফিয়া তখন মাষ্টারণী হইবার জন্য বিশেষ আগ্রহের সহিত লেখাপড়ায় মন দিয়াছিল। তাহার শয্যাগত পিতাকে দেখিবার জন্য এক জন লোকের বাড়ীতে থাকা আবশ্যক বলিয়া তাহার মাতা তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য আর অনুরোধ করিল না। সে তাহাদের দোকানের ম্যানেজার মিঃ সামুয়েল পোভিকে অভিভাবক করিয়া কন্‌স্ট্যান্‌স্‌কে সঙ্গে লইয়া হাতী মারা দেখিতে চলিয়া গেল।

সোফিয়া জানালায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহার মাতা ও ভগিনীর চলিয়া যাওয়া দেখিতে লাগিল। সে এখন অনুভব করিতে লাগিল যে, সে হাতীর মত বিরাট অতিকায় জন্তুটাকে তুচ্ছতাচ্ছল্য করিয়া কাযটা ভালো করে নাই, সে তো বাড়ীতে থাকিয়া গেল, কিন্তু মজা দেখার আনন্দ যে প্রবল প্রলোভন দেখাইয়া তাহাকে যাইবার জন্য ক্রমাগত তাগাদা দিতে আরম্ভ করিয়া দিল। সে জানালায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আপনার নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য যখন আপনাকে ধিক্কার দিতেছিল, তখন সে দেখিল, দূরে এক জন যুবক যাইতেছে, এক জন মুটে তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে একটা ঠেলাগাড়ীতে চাপাইয়া মাল লইয়া যাইতেছে। সেই যুবকটি তাহারই জানালার তলা দিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। সোফিয়া চমকিত হইয়া লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। সে তাহার সোফার উপর ছড়ানো বই-গুলির দিকে একবার দেখিল, তার পর তার পিতার দিকে চাহিল। তাহার পিতা মিঃ বেন্‌স্ জীর্ণ-শীর্ণ, নিতান্ত করুণার বস্তুর ন্যায় বিছানায় পড়িয়া তখনও ঘুমাইতেছে, তাহার মস্তিষ্ক এখন আর কায করে না, তাহার বুদ্ধিশুদ্ধি একদম লোপ

পাইয়া গিয়াছে, তাহাকে দাড়িওয়ালা শিশু বলিলেও হয়, তাহাকে এখন খাওয়াইয়া দিতে হয়, তাহার সমস্ত অভাব অপরের বুঝিয়া পূরণ করিয়া দিতে হয়, এবং সে এক লাগাড়ে দিনের বেলাও অনেক ঘণ্টা ঘুমে অচেতন হইয়া পড়িয়া থাকে।

সোফিয়া তাহার পিতাকে একা ফেলিয়া রাখিয়াই ঘর হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল, এবং সে যখন তাহাদের দোকানে আসিল, তখন তাহাদের দোকানের তিন জন দাসী তাহার ভূতের মত চেহারা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

সোফিয়া দোকানে প্রবেশ করিয়া দেখিল, সেই ক্যান্‌ভাসার এজেন্ট যুবকটি তাহাদের দোকানে আছে। যাহাকে একবারমাত্র দেখিয়া এত দিন হৃদয়ে রাখিয়া ভালবাসিয়াছে, তাহাকে আবার দেখিয়া সে আরও অধিক ভালবাসিয়া ফেলিল, এবং তাহার প্রেমে একেবারে মজিয়া গেল। সেই যুবকও সোফিয়াকে দেখিয়া আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হইল, এবং অল্পক্ষণেই তাহাদের আলাপ-পরিচয় হইয়া স্থির হইয়া গেল যে, তাহাদের প্রকাশ্যে ও গোপনে মিলনের জন্য তাহাদের মন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে।

সোফিয়া তাহার মাতাকে বিস্মিত করিয়া দিয়া, তাহার মাষ্টারণী হইবার সাধ বিসর্জ্জন করিয়া, লেখাপড়া ছাড়িয়া দিল এবং দোকানে কায করিতে সম্মত হইল।

প্রেমিক-প্রেমিকার এখন ঘন ঘন মিলন ঘটে,—কখনও বা যেন হঠাৎ প্রকাশ্যে আর কখনও বা গোপনে চুরি করিয়া। তাহাদের গোপন মিলনের সংবাদ মিসেস বেনস্ জানিতে পারিল। সে তখন কন্যাকে তাহার গোপন প্রেমাভিনয় হইতে বিরত করিবার জন্য তাহাকে তাহার মাসীর বাড়ীতে জোর করিয়া পাঠাইয়া দিল। তাহার মা যে তাহাকে তাহার মাসীর বাড়ীতে পাঠাইবার জন্য কেন এত ব্যস্ত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে সোফিয়ার বিলম্ব হয় নাই। সে ক্রুদ্ধস্বরে মাতাকে বলিল,—"আমি কি বুঝিতে পারিতেছি না, কেন তুমি আমাকে এখান হইতে দূরে পাঠাইবার জন্য এমন ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছ, আমি তোমরা যতটা ভাব, ততটা বোকা নই।"

সোফিয়া অতি তাচ্ছীল্যের সহিত তাহার মাতার নিকট বিদায় লইয়া যাইবার সময় বলিয়া গেল—"আমার বেলায় বড় আপত্তি, কিন্তু দিদিকে তো যা খুশী তা করতে বাধা দাও না।"

সোফিয়ার এই শেষ বাক্যের ইঙ্গিত এই যে, কন্‌স্‌ট্যান্‌স্ তাহাদের দোকানের ম্যানেজার সামুয়েল পোভীর সঙ্গে প্রণয় করে, তাহাতে তাহার মাতা পূর্ব্বে আপত্তি করিলেও এখন আর আপত্তি করে না বা তাহাদের মিলনে বাধা দেয় না।

সোফিয়া তাহার মাসীর বাড়ীতে গিয়া তাহার মাসীর টাকা চুরি করিল, এবং তাহার প্রণয়ী সেই এজেন্টের সঙ্গে পলায়ন করিল। সেই এজেন্টের নাম জেরাল্ড স্কেল্‌স্। জেরাল্ড স্কেল্‌স্‌ও তাহার কোনো আত্মীয়ের উত্তরাধিকার-সূত্রে বারো হাজার টাকা পাইয়া গিয়াছিল। কাযেই তাহাদের এখন টাকার অভাব ছিল না।

তার পর সোফিয়া পত্র লিখিয়া তাহার মাতাকে জানাইল যে, তাহারা বিবাহ করিয়াছে, এবং তাহারা বিদেশে যাইতেছে। ইহার পরে কালে-ভদ্রে বড়দিনের সময় বা কোনো পার্ব্বণ উপলক্ষে দু একখানা কার্ড পাঠানো ভিন্ন সোফিয়া আর কোনো সংবাদ দিত না। এখন কিছু দিনের জন্য সোফিয়া আমাদের কাহিনী হইতে সরিয়া পড়িল।

কন্‌স্‌ট্যান্‌স্ ও পোভী বিবাহ করিয়া তাহাদের মধুচন্দ্রিকা সম্ভোগ করিয়া বিদেশ হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইয়াছে। এখন পোভীই মিসেস বেন্‌স্‌এর কাপড়ের দোকানের মালিক হইয়া বসিয়াছে। কন্‌স্‌ট্যান্‌সের বিবাহিত জীবন এক রকম নিরুপদ্রব স্বচ্ছন্দতার ভিতর দিয়াই প্রবাহিত হইয়া চলিতে লাগিল। গ্রন্থকার বেনেট এই নব-বধূর সুখ-দুঃখ, আশা, আনন্দ অতি নিপুণভাবে সমস্ত খুঁটিনাটির সহিত আমাদের জানাইয়াছেন।

তাহাদের একটি সন্তান জন্মিয়াছে। বেনেট অতি প্রতিভাবান্ লেখক, তিনি নিজের জীবনের বাল্যস্মৃতি ও শিশু-জীবনের অন্য অভিজ্ঞতার কথা আশ্চর্য্য রকম স্মরণ করিয়া করিয়া ঐ শিশুটির চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। শিশুর পিতার রুক্ষ মেজাজ, মাতার আদর ও তাহাকে অতিরিক্ত 'নাই' দেওয়া, এবং এই উভয়ের সংমিশ্রণে শিশু-চরিত্রের গঠন অতি আশ্চর্য্য অভিজ্ঞতার সহিত লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। শিশু সিরিলের প্রথম অপরাধ চুরি, এবং তাহার চরিত্রের মধ্যে ভয়ের জন্য মিথ্যাচার ও গোপন করিবার প্রবৃত্তি ও তাহার শিশু-চরিত্রের স্বাভাবিক কোমলতা ও মাধুর্য্য এমন তন্ন তন্ন করিয়া লেখক বর্ণনা করিয়াছেন, যেন সিরিলই তাঁহার উপন্যাসের প্রধান চরিত্র

অথচ এই সিরিলের জীবনকথা লেখক আমাদের শেষের দিকে কিছুই জানিতে দেন নাই। বই যখন শেষ হইল, তখন আমরা কিছুই জানিলাম না যে, সিরিলের অদৃষ্টে কি ঘটিল, তাহার যে অদৃষ্ট, তাহা আমাদের নিকটে চিরকালের জন্যই অদৃষ্টই রহিয়া গেল।

সামুয়েল পোভীর এক জন খুড়াত ভাই ছিল। তাহার নাম ড্যানিয়েল পোভী। তাহার সন্দেশের দোকান ছিল, এবং তাহার দোকানই শহরের মধ্যে সেরা ছিল। সে আবার তাহাদের শহরের ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের মেম্বর ছিল। কাযেই সে এক জন মাতব্বর লোক। যদিও সামুয়েল পোভী ন্যায়পরায়ণ ধার্ম্মিক লোক ছিল, তথাপি সে মনে মনে তাহার ভাইকে একটু ঈর্ষার চোখে দেখিত। ড্যানিয়েলের চেহারা সুশ্রী, তাহার সাংসারিক বুদ্ধি প্রখর, সে খেলাধূলায় শিকারে ওস্তাদ, আর সর্ব্বোপরি তাহার খ্যাতি ছিল যে, সে খাসা গল্প করিতে পারে, যদিও তাহার গল্পগুলি অধিকাংশই বিদ্যাসুন্দরী ধাঁচের কেচ্ছা।

এক দিন পথে দুই ভাইয়ের দেখা হইয়া গেল।

ড্যানিয়েল বলিল—"জানো দাদা, বৌ মদ ধরেছে। দু বচ্ছর ধ'রে মদ খাচ্ছে।"

তাহার পরে সে তাহাদের একমাত্র পুত্রের দুরবস্থার কথা বলিতে লাগিল—সে দিন অনেক রাত্রে বাড়ীতে ফিরিয়া গিয়া দেখিলাম, ছেলেটা প্রায় উলঙ্গ, একলাটি সিঁড়ির উপর বসিয়া আছে। এর আগেই ছেলেটার অসুখ করিয়াছিল, সর্দ্দিজ্বরে সে শয্যাগত ছিল, রাত্রে ভিজা বিছানায় শুইয়া থাকার জন্য সর্দ্দিজ্বর, রাত্রে কে বা তাহার ভিজা বিছানা বদ্‌লাইয়া দেয়। কাল রাত্রে তাহাকে কিছুই খাইতে দেওয়া হয় নাই, ছেলেটা তাহার মাকে ডাকিয়া ডাকিয়া হায়রান, কাহারই কোনো সাড়াশব্দ নাই, তখন সে তাহার মায়ের কাছে আসিবার জন্য নীচে নামিয়া আসিতে চাহিল, কিন্তু সিঁড়িতে পা হড়কাইয়া পড়িয়া গিয়া তাহার হাঁটু ভাঙিয়া গেল, সে আর না পারে নীচে নামিতে বা না পারে উপরে উঠিয়া গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িতে।

সামুয়েল জিজ্ঞাসা করিল—আর তোমার বউ, খোকার মা?

—সে মদ খেয়ে বেহুঁশ···

—চাকর-দাসীরা?

ড্যানিয়েল হাসিয়া বলিল,—চাকরদাসী! আমাদের বাড়ীতে কি চাকরদাসী টেকে নাকি, তারা টিক্‌তে পারে না।

সামুয়েল ড্যানিয়েলের সঙ্গে তাহার বাড়ীতে গেল। সে গিয়া দেখিল, তাহার ভ্রাতৃবধূ একটা নোংরা ঘরে আলুথালু হইয়া পড়িয়া আছে। তাহার মুখ হাঁ করিয়া আছে, আর তাহা দিয়া লালা গড়াইতেছে, তাহার চক্ষু দুইটা যেন ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া যাইতে চাহিতেছে। তাহাকে দেখিলেই গা ঘিনঘিন করে। এই বাড়ীর গিন্নী! গৃহলক্ষ্মী! পত্নী ও মাতা! গৃহের সর্ব্বশৃঙ্খলা ও ব্যবস্থার কর্ত্রী! "ইয়ং গেহে লক্ষ্মীরমৃতবর্ত্তির্নয়নয়োঃ!" বিপদে সান্ত্বনা আর রোগে শান্তিদায়িনী! এই কি "গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।" সে যে মূর্ত্তিমতী অলক্ষ্মী! তাহার মুড়া চুল কয় গাছা নুড়া পাকাইয়া নোংরা হইয়া গিয়াছে, তাহার হাতে ময়লা থিকথিক করিতেছে, তাহার কণ্ঠা-বাহির হওয়া গলাতেও ময়লা জমিয়া আছে, তাহার কাপড় ছেঁড়া ময়লা নেতা ছাড়া আর কিছু নয়। সে তাহার নারীত্বের, মাতৃত্বের, পত্নীত্বের, গৃহিণীত্বের এবং তাহার বয়সের অপমান আর লজ্জা মূর্ত্তিমতী!

বুড়া ড্যানিয়েল দরজার গোড়ায় দাঁড়াইয়া বলিল—আর কি দেখছ দাদা, আমি হয় তো ওকে মেরেই ফেলেছি। আমি ওকে ধ'রে আচ্ছা ক'যে এক ঝাঁকানি দিয়েছিলাম, তাতেই বোধ হয় ওর দম আট্‌কে দফা শেষ হয়ে গেছে। তখন কি আর আমার জ্ঞান-গোচর কিছু ছিল, আর আমি কি জানি যে, এমন হয়ে যাবে? যাক, আর মদ খেতে হবে না! এখন সব মাতলামি ঠাণ্ডা!

ড্যানিয়েল নিজেই পুলিস ডাকিয়া গ্রেপ্তার হইল।

তার পর থেকে সামুয়েল ভাইকে বাঁচাইবার জন্য তাহার সর্ব্বস্ব পণ করিয়া মকদ্দমার তদ্বির করিতে লাগিয়া গেল। এ যেন তাহার কর্ত্তব্য, তাহার ধর্ম্ম, তাহার একমাত্র কায। তাহার ব্যবসায়ে আর সে মন দেয় না, তাহার নিজের স্বাস্থ্য-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে তাহার আর লক্ষ্য নাই, সে এখন কেবল যেন ভাইকে বাঁচাইবার জন্যই বাঁচিয়া আছে। তাহার চিন্তা বাক্য এখন ঐ একই বিষয়ে। সে জলের মত টাকা ঢালিয়া দিতেছে।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ড্যানিয়েল দোষী সাব্যস্ত

হইল। সামুয়েল নিজে মুসাবিদা করিয়া তাহাদের শহরের ২৫ হাজার নরনারীকে দিয়া সই করাইয়া দয়া প্রার্থনা করিয়া দরখাস্ত পেশ করিল। কিন্তু তাহাও নিষ্ফল হইয়া গেল। ড্যানিয়েলের ফাঁশী হইল।

অল্পদিন পরে সামুয়েলও মারা গেল। হতভাগ্য ভাইয়ের জন্য দেহে মনে পরিশ্রান্ত ও শোকার্ত্ত হইয়া ও সর্ব্বস্বান্ত হইয়া বেচারা নিজেও মরিয়া গেল।

সামুয়েলের দোকান এত দিন তাহার স্ত্রী কন্স্ট্যান্স্ চালাইতেছিল, কিন্তু সামুয়েলের মৃত্যুর পরে আর দোকান চালানো সম্ভব হইল না। দোকান বিক্রয় হইয়া গেল। কন্স্ট্যান্স্ তাহার দোকানের নূতন মালিকের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়া দোকানেরই উপর তলাটা ভাড়া লইয়া সেখানেই পুত্র সিরিলকে লইয়া বাস করিতে লাগিল।

পূর্ব্বে যেমন মিসেস বেন্স্ ও তাহার কন্যা সোফিয়ার মধ্যে মতের গরমিলের জন্য মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল, এখনও তেমনি কন্স্ট্যান্স্ ও তাহার পুত্র সিরিলের মতবিরোধ উপস্থিত হইল এবং যাহা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র ঘটিয়া থাকে, শেষকালে মাতাকেই পরাজয় মানিয়া ছেলের মতেই সায় দিয়া চলিতে হইতে লাগিল এবং তাহাতে নিজের মতই অভ্রান্ত মনে হইলেও তাহার জন্য আর প্রকাশ্যে কোন আপত্তি করা চলিল না। সিরিল তাহার মাতার মতের বিরুদ্ধে চিত্রকর হইবার সঙ্কল্প করিয়াছে। সে স্থানীয় আর্ট স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছে। কন্স্ট্যান্সের মনে সুখ নাই, ছেলে আর্ট স্কুলে পড়া মানেই অল্প কয়েক বৎসর পরেই সে অধিক শিক্ষার জন্য লণ্ডনে যাইতে চাহিবে। হইলও তাহাই, সিরিল মাতাকে জানাইল যে, সে স্কলারশিপ পাইয়াছে, সে লণ্ডনে যাইবে। মাতা পুত্রকে বিদায় দিয়া গর্ব্বে ও দুঃখে পূর্ণ হইয়া একাকিনী গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

সোফিয়া জেরাল্ড স্কেল্স্কে বিবাহ করিবে বলিয়া তাহার মাসীর বাড়ী হইতে টাকা চুরি করিয়া পলাইয়া লণ্ডনে আসিয়াছিল। তাহারা দুজনে এক হোটেলে আসিয়া একটা ঘর ভাড়া করিয়া আছে। সোফিয়া হোটেলে তাহাদের শয়নকক্ষে জেরাল্ডের কাছে আসিয়া বলিল—এখন তুমি ভিন্ন আমার আর আপনার বলিতে কেহ নাই।

সোফিয়ার কথায় স্কেল্স্ খুশী হইল না, তাহার মন দমিয়া গেল, সে যখন আনন্দ আর স্ফুর্ত্তির কথা ভাবিতেছিল, তখন তাহার কর্ত্তব্য ও দায়িত্বের কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া সে পছন্দ করিতে পারিল না। সে একটু উদাসভাবে ক্ষীণ হাসি হাসিয়া চিত্রশালা দেখিতে যাইবার প্রস্তাব করিল।

সোফিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কিন্তু আমাদের বিয়েটা কবে হইবে?

স্কেল্স্ বলিল—সে তো এখানে হইবার যো নাই, কি সব আইনের বাধা আছে, আমরা ফ্রান্সে প্যারিসে গিয়া সহজেই শুভকার্য্য সমাধা করিতে পারিব।

সোফিয়া সন্দেহমাত্র করিল না যে, স্কেল্স্ প্রতারক ব্যভিচারীর সনাতন কৌশল অবলম্বন করিয়া তাহাকে বোকা বুঝাইয়া ফাঁকি দিবার চেষ্টাতেই আছে। কিন্তু সোফিয়া স্কেল্সের কথা অবিশ্বাস না করিলেও তাহার আগ্রহহীনতা ও আবেগশূন্যতা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিতে না আসিতেই এই সমাদর! ইহাতে সোফিয়া বিরক্ত হইয়া কোট ধরিয়া বসিল যে, বিবাহ না হইলে সে লণ্ডন ছাড়িয়া এক পাও নড়িবে না, সে স্কেল্সের সঙ্গে কোথাও যাইবে না। স্কেল্স্ সোফিয়াকে বুঝাইবার জন্য অনেক সাধ্যসাধনা করিল, কিন্তু সোফিয়া একরোখা মেয়ে, সে আপনার সঙ্কল্প হইতে কিছুতেই বিচলিত হইল না। স্কেল্স্ সোফিয়াকে আদরে গলাইয়া দিবে মনে করিয়া সোফিয়ার গলার পিছনে অধর স্পর্শ করিতেই সোফিয়া তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া সরিয়া দাঁড়াইল, এবং ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ক্রুদ্ধস্বরে বলিল—খবরদার, আমাকে তুমি ছুঁইও না।

সোফিয়া স্কেল্সের জন্য পাগল বলিয়াই সে তাহার প্রেমের অভাব বা নবপ্রণয়ের আবেগের অভাব ক্ষমা করিতে পারিতেছিল না। এই অল্প কিছুক্ষণ আগেই সে স্কেল্সকে তাহার অধর চুম্বন করিতে দিয়াছে, কিন্তু এখন তাহার গলায় তাহার অধরস্পর্শ বিষবৎ বোধ হইল। সে এখন স্কেল্সকে ঘৃণা করে।

তাহারা রীতিমত ঝগড়া লাগাইয়া দিল। সোফিয়া তাহার প্রণয়ীকে দূর হইয়া চলিয়া যাইতে বলিল, এবং সেও চলিয়াই গেল। তখন সোফিয়া মনে মনে স্বীকার করিতে লাগিল যে, বাড়ীর বাহির হইয়া আসাটা নিতান্ত গর্হিত ও বোকামির কায হইয়াছে। সে এখন স্বীকার করিতে লাগিল যে, তাহার মা মাসী তাহার চেয়ে ভালো বোঝে, এবং

সে তাহাদের মতে না চলিয়া নিতান্ত অন্যায় করিয়াছে। কিন্তু ফিরিবার পথে তো সে কাঁটা দিয়া আসিয়াছে, এখন নিজের বোকামির আর প্রবৃত্তিবশতার ফলভোগ করিতে হইবে একা তাহাকেই।

কিন্তু স্কেল্‌স্ আবার ফিরিয়া আসিল। সেও সোফিয়ার জন্ম পাগল, সোফিয়াকে পাইবার জন্য তাহার লালসা উগ্র প্রবল হইয়া তাহাকে পীড়া দিতেছিল, তাহার কামনা তাহার মন জুড়িয়া বসিয়াছিল। সে পুনঃ পুনঃ নিজেকে বলিতেছিল—সোফিয়াকে আমার পাওয়া চাই-ই চাই, সোফিয়াকে আমার না পাইলেই নয়। তাই সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল যে, সে সোফিয়াকে বিবাহই করিবে। সে একটা মেয়ের জেদের কাছে পরাভূত হইয়া অবশেষে বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইল।

তাহাদের বিবাহ হইল। তাহারা উভয়ে প্যারিসে চলিয়া গেল। এইখানে গ্রন্থকার বেনেট প্যারিসের বহু চিত্র অঙ্কিত করিয়া আমাদের দেখাইয়াছেন, কিন্তু এ চিত্রগুলি কাপড়ের দোকানের চিত্রের মত অমন মনোরম নয়, এগুলি তাহার বাল্যস্মৃতির রং দিয়া তো চিত্রিত নয়, এগুলি তাঁহার অধিক বয়সের ফিকা রঙের ছবি।

প্যারিসে আসিয়া সোফিয়া দু'একদিন আনন্দের আতিশয্যে দেহ-মনের কোন ক্লান্তিই অনুভব করিতেছিল না। তাহার স্বামী তাহাকে প্যারিসের হাল ফ্যাসানের গাউন কিনিয়া দিল; তাহার দামের অঙ্ক শুনিয়া তো তাহার চক্ষুস্থির। তাহার স্বামী তাহাকে লইয়া খুব উঁচুদরের রেস্টরাঁয় খাইতে যায়, আর সেখানে প্রচুর শ্যাম্পেন পান করে। এক দিন তাহার স্বামী এত বেশী মদ খাইয়া মাতাল হইয়া পড়িয়াছিল যে, সে একটি ইংরেজ মহিলাকে দেখিয়া বেশ উচ্চস্বরেই অশ্লীল রসিকতা করিয়া বসিল। সেই ইংরেজ মহিলার সঙ্গী ইংরেজ পুরুষটি তাহার কথা শুনিতে পাইল, এবং সে ক্রুদ্ধ হইয়া স্কেল্‌স্‌কে মারে আর কি। কিন্তু সেও মদ খাইয়া চুর হইয়াছিল, তাহাদের কাহারই লড়াই করিবার প্রবৃত্তি ছিল না। অধিকন্তু তখনই সেই হোটেলে চিরাক নামে এক জন সংবাদপত্রের লেখক আসিয়া উপস্থিত হইল, সে স্কেল্‌স্ আর ঐ ইংরেজদের পরিচিত, কাষেই তাহার সঙ্গে আলাপে প্রবৃত্ত হইয়া ইংরেজটি দ্বন্দ্বের কথা ভুলিয়াই গেল।

সোফিয়া তাহারই সামনে স্কেল্‌স্‌কে পরস্ত্রীর প্রতি লোলুপতা প্রকাশ করিতে শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু মারামারি লাগিবার ভয়ে সে আর নিজের কোপ প্রকাশ না করিয়া পলায়ন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। সে স্বামীকে বলিল, সে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, সে এখন বাসায় ফিরিয়া যাইতে চায়। কিন্তু স্কেল্‌স যাইতে রাজী হইল না, সে আরো মদ দিতে ফরমাস করিল, এবং মদ খাইতে খাইতে আবার সেই ইংরেজ মহিলাটিকে উদ্দেশ করিয়া অকথ্য কথা কহিল। তখন সেই ইংরেজ পুরুষটি তাহাকে বাহিরে গিয়া তাহার সঙ্গে বুঝাপড়া করিতে আহ্বান করিল, এবং তাহারা দুই জনে বাহিরে চলিয়া গেল।

সোফিয়া তাহার স্বামীর অভব্য আচরণে লজ্জায়, ঘৃণায়, ক্রোধে বিহ্বল হইয়া একাকিনী অনেকক্ষণ স্বামীর প্রত্যাগমনের প্রত্যাশায় পথ চাহিয়া প্রতীক্ষা করিল। কিন্তু স্কেল্‌স্ আর ফিরিল না। রাত্রি তিনটা বাজিয়া গেল, তখনও তাহার স্বামীর দেখা নাই। তাহাকে রেস্টরাঁর বিলের দেনা শোধ করিয়া দিতে হইবে, তবে সে রেস্টরাঁ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে পারিবে। অথচ তাহার সঙ্গে তো টাকা নাই। সোফিয়া অকূল সমুদ্রে পড়িয়া প্রমাদ গণিল।

চিরাক সোফিয়াকে দেখিয়া যে মুগ্ধ হইয়াছে, তাহা তাহার আচরণে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু তাহার আচরণ সম্মানপূর্ণ হওয়াতে সোফিয়ার বিরক্তির কারণ হয় নাই সে সোফিয়াকে উদ্ধার করিতে অগ্রসর হইয়া আসিল, এবং তাহার দেনা শোধ করিয়া দিয়া তাহাকে লইয়া তাহার হোটেলে পৌছাইয়া দিল।

স্কেল্‌স সকালবেলা মুখে চোখে রক্তাক্ত হইয়া হোটেলে ফিরিয়া আসিল। তাহার এই দুর্দশা দেখিয়া সোফিয়ার পিত্ত জলিয়া উঠিলেও সে স্ত্রীর কর্ত্তব্য স্মরণ করিয়া তাহার স্বামীর কাটা ঘা জল দিয়া ধুইয়া তাহাতে ঔষধপ্রলেপ লাগাইয়া দিল।

পরদিন স্কেল্‌স্ সোফিয়াকে বলিল, সে চিরাকের সঙ্গে জেলখানায় এক জন কয়েদীর গলা কাটা মৃত্যুদণ্ড দেখিতে যাইতেছে। যখন সে ফিরিয়া আসিল, সে যেন মৃত্যুর প্রতিরূপ হইয়া আসিয়াছে।

সোফিয়া তাহার স্বামীর সেই মাতাল বেহুঁশ অবস্থার বীভৎসতা এবং তাহার চেহারার কদর্য্যতা দেখিয়া একবারে

স্তব্ধ হইয়া গেল। সে তাহার স্বামীর কুশ্রী অবস্থার দিকে দেখিতে না চাহিলেও তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে দেখিতে হইতেছিল, এবং তাহার কথা ভাবিতে না চাহিলেও তাহাকে ভুলিবার জো তাহার নাই। তাহার স্বামীর দৈহিক ও নৈতিক অধঃপতনের জন্য ব্যথার চেয়ে তাহার নিজের অদৃষ্টের সম্ভাব্য নানা দুর্দ্দশার বেদনাই তাহার মনে অধিক প্রবল হইয়া উঠিল। তাহার স্বামী সমস্ত রাত ধরিয়া মদ গিলিয়াছে, তাহার মনুষ্যত্ব ও বুদ্ধি অপেক্ষা তাহার পেটুকতা ও নেশার লালসা প্রবল হইয়া তাহাকে এইরূপ পশুর অধম জড়পিণ্ড করিয়া ছাড়িয়াছে। সমস্ত রাত সে হয় তো কত বেহায়া মেয়েদের সহিত বেলেল্লাপনা করিয়া কাটাইয়াছে। এই ছিল তাহার কপালে! এখন হইতে তাহাকে প্রত্যহ রাত্রে, প্রভাতে ও দিবসে এইরূপ কদর্য্য বীভৎসতা দেখিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে। অসহ্য দুঃখ, অপমান, লজ্জা, লাঞ্ছনা ভোগ করিবার জন্য তাহাকে আজ হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে। তাহার স্বামী সমস্ত রাত অপর রমণীর সহিত অনাচার করিয়া প্রভাতে আসিয়াছে তাহারই কাছে কেবল অচেতন হইয়া ঘুমাইতে ও তাহার দেহ, মন, আবাস, আবেষ্টন সমস্ত কিছুকে অপবিত্র ও কলুষিত করিয়া নোংরা করিয়া তুলিতে। এই পশুটা তাহার স্বামী, পতি! ইহার সঙ্গে সে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ! সে বন্ধন মোচন করিয়া তাহাকে মুক্তি দিবার ক্ষমতা এক যম ছাড়া আর কোনো লোকের নাই। সে নিজের হাতে নিজের সমস্ত স্বাভাবিক আশ্রয় নষ্ট করিয়া এই নরাধমের সঙ্গে বাহির হইয়া আসিয়াছে, আর তো তাহাকে সাহায্য করিবার —তাহার দুর্দ্দশায় ব্যথিত হইয়া আহা বলিবার কেহ নাই।

সোফিয়া অসুস্থ হইয়া শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছে। এক দিন তাহার হোটেলের লোক আসিয়া সংবাদ দিল যে, ম্যাসিয় চিরাক নামের এক জন ভদ্রলোক সোফিয়ার স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চায়। সোফিয়া কি দেখা করিবে?

সোফিয়া চিরাকের সহিত সাক্ষাৎ করিল। চিরাক তাহাকে জানাইল যে, কাল স্কেল্‌স্ চিরাকের আপিসে গিয়া তাহাকে বলিল যে, তাহার ৫ শত টাকা পাইবার কথা আছে, তাহা এখনও আসিয়া পৌঁছায় নাই, সে টেলিগ্রাম পাইয়াছে, টাকাটা কাল আসিয়া পৌঁছিবে, অথচ তাহার আজই টাকার নিতান্ত দরকার, আমি তাহাকে ঐ টাকাটা একদিনের জন্য ধার দিলে তাহার উপকার করা হয়। আমার হাতে তখন টাকা ছিল না, আমি আপিসের তহবিল হইতে টাকা লইয়া তাহাকে দিলাম। কিন্তু তার পর আর তাহার দেখা নাই। অথচ আজ আমাকে আপিসের তহবিল পূরণ করিয়া রাখিতেই হইবে। এখন উপায়?

সোফিয়া মনে মনে মিলাইয়া দেখিল যে, যখন স্কেল্‌স্ চিরাকের কাছে টাকা ধার করিতে গিয়াছে, তখন থেকে সে নিরুদ্দেশ। এর আগেই তাহার স্বামী তাহাকে শুনাইয়া দিয়াছে যে, তাহার হাতে আর একটি পয়সাও নাই। সে তখন ভাবিয়াছিল, তাহার স্বামী তাহাকে মিথ্যা বলিয়া প্রবঞ্চনা করিতে চাহিতেছে; কিন্তু এখন সে বুঝিতে পারিল, তাহার স্বামী তখন ভয়ানক সত্য কথাই বলিয়াছিল। তাহার স্বামীর চরিত্রের সব আব্রু—সব মর্য্যাদা তাহার চোখের সম্মুখ হইতে খসিয়া পড়িল, তাহার চরিত্রের কুশ্রী কদর্য্যতা একেবারে নগ্নভাবে তাহার সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল। তাহার সদুপায়ে পাওয়া টাকা সব ফুঁকিয়া উড়াইয়া দিয়া এখন সে লোক ঠকাইয়া টাকা সংগ্রহে মন দিয়াছে। সে তো চিরাকের টাকা চুরি করিয়া পলাইয়াছে, অধিকন্তু চিরাকের দয়ার পরিবর্ত্তে তাহাকে বিপদে ফেলিবার পথ খোলসা করিয়া দিয়া গিয়াছে। সে টাকা লইয়াই মদ ও মেয়েমানুষের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়া কোথায় না জানি পড়িয়া আছে।

সোফিয়া চিরাককে সঙ্গে করিয়া এক পোদ্দারের দোকানে গিয়া তাহার পুঁজি ২ শত পাউণ্ডের ইংরেজী নোট ভাঙাইয়া চিরাককে তাহার প্রাপ্য ৫ শত ফ্রাঁ দিয়া দিল। তার পর যখন চিরাক সোফিয়াকে গাড়ীতে করিয়া হোটেলে পৌঁছাইয়া দিতে লইয়া আসিতেছিল, তখন সোফিয়া গাড়ীতেই অসুস্থতা বোধ করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। যখন তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, সে দেখিল, সে একটা নোংরা বোর্ডিং হাউসের বিছানায় শুইয়া আছে, এবং সেখানকার বাড়ীওয়ালী ও একটি অল্পবয়সী মেয়ে তাহাকে শুশ্রূষা করিতেছে। তাহারা তাহাকে সেবা-যত্ন করিয়া ভালো করিয়া তুলিল। সোফিয়া ক্রমশঃ জানিতে পারিল যে, ঐ দুজন মেয়েরই কাছে পুরুষ বন্ধু আসে, এবং তাহারা তাহাদের অবস্থার জন্য অসুখী হইয়া আছে ও অস্বস্তি অনুভব করে। চিরাক সোফিয়াকে ভালোবাসিয়া

ফেলিয়াছে, কিন্তু সে তাহাকে ভয় করে, সম্মান করে, তাহার সহিত সম্ভ্রমের সহিত ব্যবহার করে, সে নিত্য তাহাকে দেখিতে ও তাহার খোঁজ লইতে আসে। সোফিয়া চিরাকের কাছ হইতে জানিতে পারিল যে, হোটেলওয়ালী স্ত্রীলোকটি চিরাকের বন্ধু, সে টাকার টানাটানিতে পড়িয়া তাহার হোটেলের সব আস্‌বাবপত্র বাঁধা দিয়াছে, এবং তাহা উৎরাইয়া লইতে পারে নাই বলিয়া শীঘ্রই সেগুলি ক্রোক হইয়া যাইবে। সোফিয়া হোটেলওয়ালীর সেবাশুশ্রূষার জন্য তাহার নিকটে যে কৃতজ্ঞতা অনুভব করিত, তাহার প্রেরণায় সে স্থির করিল যে, তাহার ২ শত পাউণ্ডের অবশিষ্ট যাহা আছে, তাহা দিয়াই সে হোটেলওয়ালীর দেনার দায়ে বন্ধক আস্‌বাবপত্র খালাস করিয়া দিবে। সে তাহাই করিল, এবং এই সর্ত্তে হোটেলওয়ালীর সঙ্গে সে হোটেলের অংশীদার হইল যে, অতঃপর হোটেলওয়ালী ভদ্রলোক ছাড়া আর কাহাকেও হোটেলে রাখিতে পারিবে না। মুদীর জানা-শোনা এক জন ভদ্র বাসাড়ে জুটিয়া গেল, চিরাক ও আসিয়া এই হোটেলেই একটা ঘর ভাড়া লইয়া বাস করিতে লাগিল। সোফিয়া তাহাদের হোটেলটিকে ভদ্রলোকের আবাস করিয়া তুলিতে পারিয়া সুখী হইল, এবং এই উপায়ে সে সদুপায়ে যে নিজের জীবিকা উপার্জ্জন করিয়া লইতে পারিবে, তাহাতে নিঃসংশয় হইয়া নিশ্চিন্ত হইল।

এই সময় জার্ম্মাণরা প্যারিস অবরোধ করিতে আসিয়া-ছিল। সোফিয়া সস্তা দামে খাদ্যদ্রব্য কিনিয়া অবরোধের সময় চড়া দামে বেচিয়া বেশ দু পয়সা রোজগার করিয়া লইল।

কিন্তু সোফিয়ার ভাগ্যে বিধাতা সুখ লিখেন নাই। তাহার রূপ-যৌবন তাহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। সেই মুদীর পরিচিত ভাড়াটে এক দিন তাহাকে বলিয়া বসিল—সুন্দরি, আমি তোমায় ভালোবাসি।

সোফিয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য বলিল—আপনার না স্ত্রী আছে?

ভাড়াটে বলিল—ও! আপনার আপত্তির কারণ বুঝিতে পারিয়াছি, তা আমি সাবধান হইয়াই আপনার ঘরে যাওয়া আসা করিব, গভীর রাত্রি ভিন্ন আপনার ঘরের চৌকাঠ ডিঙাইব না।

সোফিয়া খুব রাগ করিল, কিন্তু ভাড়াটে ভালো বলিয়া নিজেকে বুঝাইল যে, লোকটা বুড়ো বাহাত্তুরে বোকা। ইতিমধ্যে সোফিয়া ৫ শত ফ্রাঁ জমাইয়াছে, সে আরো টাকা করিতে চায়, সে অমন ভালো ভাড়াটেকে হাতছাড়া করিতে পারে না। সে তাহাকে হোটেল হইতে তাড়াইবার কথা মনেও আনিল না।

এই সময় প্যারিস হইতে বেলুনে করিয়া বাহিরে যাইবার প্রয়োজন হওয়ায় দুজন লোক খোঁজা হইতেছিল। সোফিয়ার প্রণয়ে ও বিরহে বিহ্বল চিরাক তাহার প্রণয়িনীর কাছে বীরপুরুষ বলিয়া প্রতিভাত হইবার ও তাহার মনে নিজেকে সুস্পষ্ট করিয়া তুলিবার দুরাশায়, এবং কতকটা বা গোঁয়ারতুমি দেখাইবার প্রলোভনে আর তাহার নিজের খবরের কাগজের জন্য উত্তেজনাপূর্ণ কৌতুকাবহ সংবাদ সংগ্রহের আকাঙ্ক্ষায়, ঐ বেলুনের এক জন আরোহী হইতে স্বীকার করিল।

সোফিয়া চিরাকের অনুরোধে তাহার বেলুনযাত্রা দেখিতে গেল, এবং তাহাকে বেলুনে উড়িয়া যাইতে দেখিতে দেখিতে সোফিয়ার মনে হইতে লাগিল, যেন তাহার দম বন্ধ হইয়া যাইতেছে। এইখানে বেলুন ওড়ার বর্ণনা চমৎকার।

যে চিরাককে সোফিয়া প্রায় ভালোবাসিয়া ফেলিতে-ছিল, তাহার যে ইহার পর কি হইল, তাহা আর গ্রন্থকার আমাদিগকে কিছুই বলেন নাই।

জার্ম্মাণরা প্যারিস অধিকার করিয়াছে। সোফিয়ার হোটেলের এখন পড়তা মন্দ পড়িল, ভাড়াটে জোটে না। যে রাস্তার উপর তাহার হোটেল, তাহা ভালো পাড়া নয়, সে পাড়াটার বদ্‌নাম ছিল, কাজেই ভদ্রলোক তাহার হোটেল মাড়ায় না, আর বদ লোকদের সোফিয়া তাহার হোটেলের চৌকাঠ মাড়াইতে দেয় না। সোফিয়া শুনিল, একটা ইংরেজী হোটেল ভদ্র পাড়ায় বিক্রয় হইবে। সে নিজের মন্দ পাড়ার হোটেলটা বিক্রয় করিয়া ভদ্র পাড়ার নূতন হোটেলটা কিনিয়া ফেলিল এবং সেই হোটেলটাকে আরো ভালো করিয়া তুলিয়া অনেক লাভ করিতে লাগিল।

কিন্তু সোফিয়া সুন্দরী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্না রমণী ছিল, লোকের নজর এড়াইয়া চলা তাহার পক্ষে কঠিন ছিল। তাহার হোটেলে ফাইভ টাউন্‌সের কুম্ভকার-বংশের এক জন লোক আসিয়া তাহার ভাড়াটে হইল। সে সুরুচিসম্পন্ন আর্টিষ্ট ধাঁচের লোক বলিয়া কন্‌স্ট্যান্‌সের ছেলে আর্টিষ্ট

সিরিলের বন্ধু ছিল। সে সিরিলের কাছে তাহার পলাতকা মাসীর কাহিনী শুনিয়াছিল। সোফিয়ার চমৎকার সৌন্দর্য্য ও তাহার গাম্ভীর্য্য দেখিয়া কুমারের পো তাহার সম্বন্ধে কৌতূহলপরবশ হইয়া সোফিয়ার পরিচয়ের খোঁজখবর লইতে লাগিল। সে শুনিল, তাহার নাম সোফিয়া স্কেল্স্। তখনই তাহার সন্দেহ হইল যে, এই তাহার বন্ধুর পলাতকা মাসী। সে এক দিন কথায় কথায় সোফিয়াকে জিজ্ঞাসা করিল—বার্সলী শহরের সিরিল পোভী নামে কেহ কি কখনো এখানে বাস করিত?

সিরিলের নাম শুনিয়া সোফিয়া অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িল। সে তাহার নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রবে থাকিতে পাওয়ার অবসান ঘনাইয়া আসিয়াছে মনে করিয়া অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। সে ভাবনায় চিন্তায় অভিভূত হইয়া পীড়িত হইয়া পড়িল।

তাহার যাহা ভয় হইয়াছিল, তাহাই ঘটিল। কুম্ভকার-নন্দন তাড়াতাড়ি গিয়া তাহার বন্ধু সিরিলকে তাহার মাসীর খবর ও ঠিকানা জানাইল। কন্স্ট্যান্স্ তাহার বহু-কাল-হারানো বোনের খবর পাইয়া সোফিয়াকে পরম স্নেহের সহিত তাহার কাছে যাইয়া থাকিবার জন্য আহ্বান করিয়া পত্র লিখিল। সোফিয়াও তাহার দিদির পত্র এত দিন পরে পাইয়া ও তাহাতে তাহার স্নেহের পরিচয় পাইয়া আনন্দিত হইল, তাহারও মনে দিদির প্রতি পুরাতন ভালোবাসা আবার জাগ্রত হইয়া উঠিল। সেও খুব সস্নেহ-ভাবে দিদিকে জবাব দিল এবং তাহাকে জানাইল যে, সে আর কোন্ মুখ লইয়া তাহাদের বার্সলীতে ফিরিয়া যাইবে? তার চেয়ে বরং কন্স্ট্যান্স্ই প্যারিসে আসুক, তাহারা দুই বোনে এখানে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারিবে। কন্স্ট্যান্স্ তাহাকে লিখিল, সে পীড়িত, তাহার নড়াচড়া করা ডাক্তারের নিষেধ।

এই সংবাদ পাইয়া সোফিয়া বিবেচনা করিল, এ অবস্থায় তাহারই তাহার দিদির কাছে যাওয়া কর্ত্তব্য। সে তাহার হোটেল বিক্রয় করিয়া ফেলিয়া তাহার জন্মস্থানের উদ্দেশে যাত্রা করিল।

দুই বোনের করুণ মিলন ঘটিল দীর্ঘ বিচ্ছেদের পরে। সোফিয়া কিছু দিন তাহার ভগিনীর কাছেই, তাহারা উভয়েই যে বাড়ীতে জন্মিয়াছিল, সেই বাড়ীতে রহিল। এখন সোফিয়ার একমাত্র চিন্তা তাহার দিদির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য; সে স্থির করিল, সে তাহাকে ত্যাগ করিয়া আর পৃথক্ হইয়া থাকিবে না। কিন্তু সে বার্সলী শহরকে ঘৃণা করে, এখানে থাকিলে সে দম বন্ধ হইয়া মারাই যাইবে। সে দেখিল যে, তাহার দিদি যে কেবল বুড়াই হইয়া গিয়াছে, তাহা নহে, সে বয়স-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত খিটখিটে ও সামান্য বিষয় লইয়া গণ্ডগোল করিতে পটু হইয়া উঠিয়াছে। সে তাহার দিদিকে বলিল—তোমার কোথাও কিছু দিন বেড়াইতে যাওয়া দরকার।

সে অনিচ্ছুক কন্স্ট্যান্স্কে এক রকম জোর করিয়া টানিয়া লইয়া বাক্স্টন শহরের এক ফ্যাশানদুরস্ত হোটেলে গেল। কন্স্ট্যান্স্ কখনো আপনার ঘরকন্না ছাড়িয়া এক দণ্ড কোথাও টিকিতে পারে না। সে এখানে আসিয়া জলছাড়া মাছের মতন হাঁপাইয়া উঠিতে লাগিল।

সোফিয়া দেখিল, তাহারা দুই বোনে পরস্পরকে যথেষ্ট ভালবাসিলেও তাহাদের স্বভাব একেবারে উল্টা রকমের হইয়া গিয়াছে, একের যাহাতে আরাম ও আনন্দ, অপরে তাহাতে অস্বস্তি অনুভব করে। বহু কালের অভ্যাসের ফলে তাহাদের প্রকৃতি এমন বদল হইয়া গিয়াছে যে, এখন তাহাদের দুজনের একমত হইয়া চলা অসম্ভব। তাহাদের পৃথক্ হইয়া থাকা ছাড়া আর গত্যন্তর নাই। তাহাদের দুজনের জীবনের উপরই মৃত্যুর ছায়াপাত হইয়াছে; যেমন সকলের ভাগ্যেই জীবনের স্বপ্ন নিষ্ফল হইয়া ভাঙ্গিয়া যায়, তাহাদেরও জীবনের স্বপ্নঘোর কাটিয়া গিয়াছে।

সোফিয়ার জীবনস্বপ্ন আগেই অতি শীঘ্র ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। মধুচন্দ্রিকা-সম্ভোগ শেষ হইতে না হইতে তাহার বিবাহের মোহ কাটিয়া গিয়াছিল; যে লোককে সে দেবতা ভাবিয়া তাহার আত্মীয়স্বজন, মানসম্ভ্রম, সুনাম সব বিসর্জ্জন দিয়া একাকিনী অকূলে পাড়ি দিয়াছিল, তাহাকে সে অল্প-দিনেই জানিল যে, সে একটি মিথ্যাবাদী মাতাল দুশ্চরিত্র পাষণ্ড নরাধম!

কন্স্ট্যান্সেরও জীবনস্বপ্ন ভাঙ্গিয়াছে, কিন্তু এত দ্রুত নয়; তাহার অতি আদরের একমাত্র পুত্র তাহার মা'র খোঁজখবরও লয় না, সে তাহার মায়ের কোনো তোয়াক্কাই রাখে না, এই ছিল কন্স্ট্যান্সের প্রধান দুঃখ

সোফিয়া ৩৬ বৎসর তাহার নিরুদ্দেশ স্বামীর কোনো

খবরই পায় নাই। তাহার স্বামীর এক আত্মীয় তাহাকে পত্র লিখিয়া জানাইল যে, তাহার বাড়ীতে সোফিয়ার নিরুদ্দেশ স্বামী মরণাপন্ন পীড়িত হইয়া পড়িয়াছে। সোফিয়া তাড়াতাড়ি সেখানে ছুটিয়া গেল এবং গিয়া দেখিল, সে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তাহার স্বামী মারা গিয়াছে।

সোফিয়ার মনে তাহার স্বামীর চেহারা সম্বন্ধে যে ধারণা ছিল, তাহাতে সে ভাবিয়া রাখিয়াছিল যে, সে বৃদ্ধ হইলেও তাহার পূর্ব্বশ্রী নষ্ট হয় নাই। কিন্তু তাহার স্বপ্ন ঘুচিয়া গেল, যখন সে দেখিল, তাহার স্বামী তখন সত্তর বৎসরের অনাচারীর বীভৎস ছবি, তাহার চক্ষু কোটরগত, মুখখানা বাদুড়চোষা আমের মত চুপসাইয়া তোবড়াইয়া গিয়াছে, সমস্ত চামড়া বলিকুঞ্চিত হইয়া জড়ো জড়ো হইয়া গিয়াছে, তাহার দুই গালের চামড়া থলথলে হইয়া যেন পালক-ছাড়ানো পাখীর গায়ের চামড়ার মত চকচক করিতেছে। তাহার গালের হাড় উঁচু হইয়া উঠিয়াছে, আর তাহার তলায় গালের উপর মৃত্যু যেন দুটি কবর খুঁড়িয়া রাখিয়া গিয়াছে। দুটিখানি নুড়নুড়ে দাড়ি তাহার চিবুকের উপর পাটের নুড়ির মত ঝুলঝুল করিতেছে। তাহার মাথার চুল প্রায় উঠিয়া বিশ্রী রকম পাতলা হইয়া পড়িয়াছে, দুটিখানি পাকা চুল তাহার কাণের উপর গজাইয়াছে। তাহার মুখের মধ্যে একটাও দাঁত নাই হয় তো, তাহার ঠোঁট দুইটা মুখের দিকে ঢুকিয়া গিয়াছে। তাহার মুখে তাহার সারা জীবনের অনাচার-অত্যাচারের ক্লান্তি অবসাদ ছাপ রাখিয়া দিয়াছে। এই লোকটাই এক দিন সুন্দর যুবা-পুরুষরূপে তাহার মনোহরণ করিয়াছিল, এবং এখন সে কদর্য্য কুশ্রী বৃদ্ধ হইয়া মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। মানবের এই পরিণাম! যৌবন উদ্যম এইরূপে অবসান হইয়াছে। সব বস্তুরই পরিণাম ও অবসান এইরূপ।

সেই অবসান সোফিয়ার নিকটে আসিতে বিলম্ব করিল না। সে ফিরিবার পথে গাড়ীতেই অচেতন হইয়া পড়িল এবং কন্‌স্‌ট্যান্‌স্‌ অনেক চেষ্টা করিয়াও আর তাহার জ্ঞান ফিরাইয়া আনিতে পারিল না। সোফিয়া অজ্ঞান অচৈতন্য অবস্থায় বিছানায় পড়িয়া আছে; যত দিন যাইতেছে, ততই তাহার সুন্দর সুশ্রী মুখের উপর মৃত্যুর ছাপ গভীর হইয়া পড়িতেছে; তাহার মুখ ক্রমশঃ বিকৃত হইয়া পড়িতে লাগিল। ডাক্তার মাঝে মাঝে চাপা গলায় ফিসফিস করিয়া কথা বলে, পাছে কাহারও কণ্ঠস্বরে মৃত্যুর পদধ্বনি চাপা পড়িয়া যায়। ডাক্তার কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে রোগীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া তাহার নাড়ী দেখিল, তাহার বুকে চোঙ লাগাইয়া হৃদয়ের ক্রিয়া দেখিল, তার পর ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সে কন্‌স্‌ট্যান্‌সের মুখের দিকে নীরব উদাস দৃষ্টিতে চাহিল।

কন্‌স্‌ট্যান্‌স্‌ জিজ্ঞাসা করিল—কি, হইয়া গিয়াছে?

ডাক্তার ঈষৎ মাথা হেলাইল।

সোফিয়ার মৃত্যুর পর কন্‌স্‌ট্যান্‌স্‌ও আর বেশী দিন বাঁচিল না। তাহাদের দোকান বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সে দোকান প্রথমে তাহার বাবা চালাইয়াছে, তাহার পরে তাহার স্বামী চালাইয়াছে, সেই দোকান মিসেস ক্রিচলো ফিরিয়া চালাইতে পারিল না, দোকান বন্ধ হইয়া গেল, ইহা কন্‌স্‌ট্যান্‌সের মনে বড় আঘাত করিল। দোকান বন্ধ হইয়া তাহাদের নাম তো শেষ হইয়া গেলই, তাহার উপর তাহার আশঙ্কা হইল যে, তাহাকে এইবার হয় তো তাহার জন্মভিটা ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে হইবে। সে বাস্তবিক তাহার আশৈশবের বাস্তভিটা ছাড়িয়া যাইবার নোটিশ পাইল, নীচের তলায় যে নূতন দোকান খোলা হইয়াছে, তাহারই ম্যানেজার সাহেব ঐ উপরের তলায় থাকিবে, কন্‌স্‌ট্যান্‌স্‌কে তাহার জন্য যায়গা ছাড়িয়া দিয়া অন্যত্র যাইতে হইবে। সে এই দুঃখে পীড়িত হইয়া পড়িয়া অল্প কয়েক দিন পরে একেবারে ইহলোক ছাড়িয়া মহাপ্রস্থান করিল। সব ফুরাইল।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

তিব্বতের বিভীষিকা

ষষ্ঠ প্রবাহ

দুঃসংবাদ

সুইফ-সির কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে নীচের তলায় কি একটা গোলমাল হইল। সুইফ-সি বারান্দার ধারে সরিয়া গিয়া তাহা শুনিবার চেষ্টা করিলেন।

তিনি কয়েক জন ভৃত্যের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন। সেই গোলমাল শুনিয়া জ্যাকের সেই স্থান হইতে পলায়ন করিয়া লুকাইবার ইচ্ছা হইল; কিন্তু সে সোফা হইতে নামিয়া যাইবার পূর্ব্বেই সিঁড়ির দরজা খুলিয়া তাহারের ভিতর দিয়া পূর্ব্বোক্ত সোয়াতো সারেঙ সেই বারান্দায় প্রবেশ করিল। সার গর্ডন তাহাকে দেখিয়া জ্যাকের হাত ধরিয়া তাহাকে সোফায় বসাইয়া দিলেন, এবং তাহাকে ইঙ্গিতে জানাইলেন, তাহার আশঙ্কার কোন কারণ নাই।

সারেঙের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়; তাহার পরিচ্ছদ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, এক হাত ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় তাহা বাঁধিয়া সে গলায় ঝুলাইয়া রাখিয়াছিল; মুখ ও কপালের বহু স্থানে তরবারি বিদ্ধ হওয়ায় সেই সকল স্থানে রক্ত জমিয়াছিল। একটি কাণের আধখানা কাটিয়া ঝুলিতেছিল। মস্তকে ব্যাণ্ডেজ, তাহা রক্তে ভিজিয়া গিয়াছিল। তথাপি সে সার গর্ডনের সম্মুখে আসিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল। অদম্য উৎসাহ ও উদ্দীপনায় তাহার চক্ষু হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল।

সার গর্ডনের ভৃত্যরা তাহাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সে তাহাদিগকে ঠেলিয়া ফেলিয়া সবেগে দোতলার বারান্দায় আসিয়া সার গর্ডনকে অভিবাদন করিল। সে এবং অন্যান্য চীনাম্যানরা জানিত, তাঁহার নাম সুইফ-সি এবং তিনি সাংঘাইয়ের সর্ব্বজন-সম্মানিত ও মহা ধনাঢ্য মান্দারীণ।

সার গর্ডন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সারেঙের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি এখানে? কি খবর, বল।"

সারেঙ বলিল, "হাঁ মহিমময়, আমি বিপন্ন হইয়া আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে আসিয়াছি; ইহাতে যদি আমার অপরাধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনি এই অধম ভৃত্যকে যে শাস্তি দিবেন, তাহাই সে মাথা পাতিয়া লইতে প্রস্তুত আছে। আমি মহিমময়ের আদেশ পালন করিতে পারি নাই, এজন্য ঘৃণায় লজ্জায় আমি মরিয়া আছি।"

সার গর্ডন বলিলেন, "আমার আদেশানুসারে তুমি কায করিয়াছিলে?"

সারেঙ বলিল, "হাঁ, আমার প্রভুর আদেশে আমি দা-তুং-মুনএ গিয়াছিলাম। সেখানে দাঁড়াইয়া আমি কুলী সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিছু কাল পরে সেখানে একটি লোককে আসিতে দেখিলাম; তাহাকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম, আপনি আমাকে তাহারই উপর লক্ষ্য রাখিতে আদেশ করিয়াছিলেন। আমি তাহাকে আপনার সাঙ্কেতিক চিহ্ন দিলে সে তাহা গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু আমার কায শেষ হইবার পূর্ব্বেই সেখানে হঠাৎ হাঙ্গামা আরম্ভ হইল। মুখোসধারী মোহান্ত হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হইয়া সকল কায নষ্ট করিয়া দিয়াছে।"

সার গর্ডন জ্যাকের প্রতি সারেঙের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া বলিলেন, "এই ছেলেটিকে পূর্ব্বে কোথাও দেখিয়াছ কি, কান-উও?"

সারেঙ জ্যাকের মুখের দিকে চাহিয়া বিস্ময় প্রকাশ না করিলেও তাহার স্মরণ হইল, সেই বালক দা-তুং-মুনে তরবারি-হস্তে শত্রুগণের সহিত প্রচণ্ডবেগে যুদ্ধ করিয়া অবশেষে আহত হইয়াছিল। তাহাকে সুইফ-সির গৃহে আসিয়া বিশ্রাম করিতে দেখিয়া সে বিস্মিত হইল। সে জ্যাকের মুখের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "হাঁ ধর্ম্মাবতার, আজ আমি উহাকে দেখিয়াছিলাম।"

সার গর্ডন বলিলেন, "হাঁ, দাঙ্গার সময় এই বালকটিও সেখানে ছিল। মুখোসধারী মোহান্ত উহারও দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে নাই। কিন্তু তুমি যাহাকে সাঙ্কেতিক চিহ্ন দিয়াছিলে, সে এখন কোথায়, বলিতে পার?"

সারেঙ বলিল, "তাহাকে ধরিয়া জঙ্কে লইয়া গিয়াছে, ধর্ম্মাবতার!"

সার গর্ডন ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "সময় অল্প; আমি ঠিক সংবাদ জানিতে চাই।"

সারেঙ বলিল, "হাঁ ধর্ম্মাবতার, তাহাকে শবাধার জঙ্কে তুলিয়া লইয়া গিয়াছে।"

সার গর্ডন চমকিয়া উঠিলেন; মিঃ লকের জীবন এভাবে বিপন্ন হইবে, ইহা তাঁহার স্বপ্নের অগোচর! তিনি বিচলিত স্বরে বলিলেন, "তাহাকে শবাধার জঙ্কে তুলিয়া লইয়া গিয়াছে! তুমি কি ঠিক জানিতে পারিয়াছ, কান-উও? যদি তোমার সংবাদ সত্য না হয়, তাহা হইলে তোমার দুর্গতির সীমা থাকিবে না, মুখোসধারী মোহান্ত তোমার সর্ব্বনাশের যেটুকু বাকি রাখিয়াছে, আমি সেটুকু শেষ করিব।"

সারেঙ সভয়ে বলিল, "মহিমময়, আপনার এই আনাড়ী ভৃত্য তাহার তুচ্ছ চক্ষুতে যাহা দেখিয়াছে, তাহাই বলিয়াছে। উহা ইচাংএর শবাধার-বাহক লেন্-সি-ফোর জঙ্ক, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। সেই জঙ্কের গলুইএর নীচে নদীর অপদেবতাদের তাড়াইবার যে চিহ্নটি আছে, তাহা আমি নিজে দেখিয়াছি।"

সার গর্ডন বলিলেন, "কিরূপ চিহ্ন? লাল চক্রের ভিতর একটি সরল রেখা?"

সারেঙ বলিল, "ঠিক ঐ চিহ্নই বটে, ধর্ম্মাবতার!"

সুইফ-সি জ্যাকের মুখের দিকে চাহিলেন। জ্যাক মস্তক অবনত করিল। তাহার স্মরণ হইল, মিঃ লককে যে জঙ্কে আবদ্ধ করা হইয়াছিল, তাহার গলুইএর নীচে সে লাল বর্ণের একটি বৃহৎ বৃত্ত এবং তাহার মধ্যস্থলে একটি স্থূল সরলরেখা অঙ্কিত দেখিয়াছিল। অপদেবতারা নদীপথে কোন অনিষ্ট করিতে না পারে, এই উদ্দেশ্যে চীনদেশের প্রত্যেক জঙ্কের মাথার নীচে এক একটি চক্ষু অঙ্কিত থাকে; কিন্তু শবাধার-বাহী জঙ্কের বিশেষত্ব ঐরূপ বৃত্তমধ্যবর্ত্তী সরল রেখা। জ্যাক উহার মর্ম্ম না জানিলেও ঐ চিহ্ন দেখিয়াই জঙ্কখানি চিনিতে পারিয়াছিল। কারণ, নদীতীরবর্ত্তী অন্য কোন জঙ্কে ঐরূপ চিহ্ন ছিল না। কিন্তু 'শবাধার জঙ্ক' কথাটির অর্থ সে বুঝিতে পারিল না। এই সংবাদে সুইফ-সি হঠাৎ উৎকণ্ঠিত ও বিচলিত হইলেন কেন—তাহাও অনুমান করা তাহার অসাধ্য হইল।

সুইফ-সি বিচলিত স্বরে বলিলেন, "কান-উও, ইচাংএর শবাধার-বাহক লেন্-সি-ফোর জঙ্কে তাহাকে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, ইহা অত্যন্ত দুঃসংবাদ।"

গর্ডন সেই বারান্দার অন্তপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলেন। জ্যাক কিছুই বুঝিতে না পারিয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইল। কিন্তু সারেঙ সার গর্ডনের বিশ্বস্ত অনুচর হইলেও জ্যাক যে সত্যই চীনা কুলী নহে, ইহা তাঁহার নিকট প্রকাশ করা সে সঙ্গত মনে করিল না। জ্যাক দেখিল, সুইফ-সি বারান্দার রেলিংএ অধীরভাবে পুনঃ পুনঃ করাঘাত করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে পূর্ব্বে কোন দিন এরূপ বিচলিত দেখা যায় নাই।

'শবাধারবাহী' জঙ্ক—এ কথার অর্থ কি?

কয়েক মিনিট পরে সুইফ-সি চিন্তাকুল-চিত্তে ধীরে ধীরে সারেঙের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাহার পর ক্যাণ্টনী ভাষায় তাহাকে যে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলেন ও যে উত্তর পাইলেন, জ্যাক তাহা উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল। ক্যাণ্টনী ভাষায় জ্যাকের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল।

সুইফ-সি বলিলেন, "শবাধারবাহী জঙ্কখানা এখনও কি সেই স্থানে আছে?"

সারেঙ বলিল, "না, ধর্ম্মাবতার! আমি দা-তুং-মুনএ অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়াছিলাম, কিছু কাল পরে দেখিলাম, তাহা হোয়াংপু নদীর ভাটীতে চলিয়া গেল। বোধ হয়, এতক্ষণ তাহা ইংরাজ সরকারের বাঁধ ছাড়াইয়া বড় নদীতে গিয়া পড়িয়াছে।"

সুইফ-সি বলিলেন, "তাহা কি উজানে যাইবে?"

সারেঙ বলিল, "উজানেই ত তাহার যাইবার কথা। উহা লেন-সি-ফোর জঙ্ক কি না, উহাতে বিস্তর শবাধার আছে। উহা উচাংএ যাইবে; তাহা ছাড়াইয়াও যাইতে পারে। উহা ভগবান্ বুদ্ধদেবের কোলের সামগ্রী।"

সার গর্ডন বুঝিতে পারিলেন, সারেঙের কথা মিথ্যা নহে, তিনি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "হাঁ, জঙ্কখানা ইয়াংসি নদী দিয়াই লইয়া যাওয়া হইবে। যদি আজ রাত্রিতে তাহা ইয়াংসি নদীতে পড়ে, তাহা হইলে বিভিন্ন জঙ্কের সহিত তাহা চীন দেশে উপস্থিত হইবে। তাহার পর শবাধারটি সমাধি-ক্ষেত্রে লইয়া গিয়া সমাহিত করা হইবে। জঙ্কখানা যদি নানকিং অতিক্রম করে, তাহা হইলে আমাদের সকল চেষ্টাই বিফল হইবে। সুতরাং তাহার পূর্ব্বেই উহা ধরা চাই। কান-উও, তুমি নীচে যাও; শীঘ্র প্রস্তুত হইয়া লইবে। আমি পরে তোমাকে ডাকিয়া পাঠাইব। তোমার হাতে লোক আছে ত?"

সারেঙ বলিল, "দাঙ্গায় যাহারা জখম হয় নাই, তাহারা এখনও আমার হাতে আছে, ধর্ম্মাবতার!"

স্যর গর্ডন বলিলেন, "অতিরিক্ত যে সকল লোকের প্রয়োজন, আমিই তাহাদিগকে পাঠাইয়া দিব। তুমি এখন দা-তু-মুনে ফিরিয়া যাও। তুমি প্রথমে তোমার লোকজন সংগ্রহ করিয়া, বৃটিশ সীমায় যে বাঁধ আছে, সেই বাঁধের সম্মুখে তোমার জঙ্কখানি লইয়া যাইবে। সুচাও খালের ওধারে নঙ্গর ফেলিবে। আজ রাত্রিতেই নদীতে জঙ্ক চালাইবার জন্য প্রস্তুত থাকিবে। এই সকল কায শেষ হইলে এখানে ফিরিয়া আসিবে।"

সারেঙ বলিল, "আপনার হুকুম তামিল করিব ধর্ম্মাবতার, এখন আমি চলিলাম।"

সারেঙ সুইফ-সিকে অবনত-মস্তকে অভিবাদন করিয়া তাহার নিকট বিদায় লইল। সে প্রস্থান করিলে জ্যাক অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে সুইফ-সিকে বলিল, "শবাধারবাহী জঙ্ক, এ কথার অর্থ কি, কর্ত্তা?"

সুইফ-সি গম্ভীরভাবে বলিলেন, "দুঃসংবাদ জ্যাক, যে সংবাদ পাইলাম, তাহা অপেক্ষা মন্দ সংবাদ কিছুই হইতে পারে না। শবাধারবাহী জঙ্ক এবং সেই মুখোসধারী মোহান্ত, ইহাদের উভয়ের একত্র সমাবেশ—আগুনের সঙ্গে বাতাসের মিলনের ন্যায় আশঙ্কাজনক। ইচাংএর শবাধারবাহক লেন্-সি-ফোর অনেকগুলি জঙ্ক আছে। সে সেই সকল জঙ্কে মৃতদেহপূর্ণ শবাধার বহন করে। তুমি বোধ হয় জান, চীনাম্যানদের মৃত্যু হইলে তাহাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার যে ব্যবস্থা আছে, তাহা অতি বিচিত্র ব্যাপার! ইহা তাহাদের পূর্ব্বপুরুষের পূজাপদ্ধতির অঙ্গবিশেষ। যে সকল চীনাম্যান দেশান্তরে বাস করে, তাঁহাদের মৃত্যুর পর মৃতদেহ যাহাতে চীনদেশে আনিয়া তাহাদের পূর্ব্বপুরুষের সমাধিক্ষেত্রে তাহা সমাহিত হইতে পারে, এই উদ্দেশ্যে সেই সকল ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য তাহারা যথাসাধ্য অর্থ-সঞ্চয় করিয়া রাখে, ঐ সকল মৃতদেহ দেশান্তর হইতে চীনদেশে বহন করিয়া আনা একটা প্রকাণ্ড লাভের ব্যবসায়। ইচাংএর লেন্-সি-ফো ঐ ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করে। সে তাহার শবাধারবাহী জঙ্কগুলিতে ঐ সকল মৃতদেহ শবাধারে আবদ্ধ করিয়া ইয়াংসি নদীপথে চীনদেশে লইয়া যায়। তুমি যে জঙ্কের সম্মুখভাগে লাল রঙের বৃত্ত ও রেখা অঙ্কিত দেখিয়াছ, তাহা ঐ শ্রেণীর জঙ্ক। উহার ভিতর অনেকগুলি শবাধার আছে। এই সকল শবাধারবাহী জঙ্ক দেবতার সিংহাসনের ন্যায় পবিত্র সামগ্রী, তাহা যখন নদীপথে যাতায়াত করে, তখন তাহা আটক করা বা খানাতল্লাস করা নিষিদ্ধ; এই কার্য্যে কাহারও অধিকার নাই। এমন কি, যে সকল চীনা বোম্বেটে নদীতে ও সমুদ্রে বোম্বেটেগিরি করে, ষ্টীমার, জাহাজ প্রভৃতি লুঠ করে, তাহারাও সসম্ভ্রমে শবাধারবাহী জঙ্কের পথ ছাড়িয়া সরিয়া যায়, তাহারাও ঐ সকল জঙ্ক স্পর্শ করে না। মৃতদেহগুলি দীর্ঘকাল শবাধারে আবদ্ধ থাকে, অনেক সময় বৎসরাবধি তাহা সমাহিত হয় না, অবশেষে মৃত ব্যক্তির স্বগ্রামবাসীরা একটা শুভদিন স্থির করিয়া তাহার পূর্ব্বপুরুষের সমাধিক্ষেত্রে বহিয়া লইয়া যায় এবং সেখানে সমাহিত করে।

"সুতরাং তোমাদের কর্ত্তাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া ঐরূপ জঙ্কে আবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্য কি, তাহা বোধ হয় তুমি বুঝিতে পারিলে। তাঁহাকে ধরিয়া জীবিত অবস্থাতেই একটা শবাধারে পুরিয়া রাখা উহাদের অসাধ্য বলিয়া মনে হয় না। বায়ুপ্রবাহহীন শবাধারে আবদ্ধ হইলে শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু অনিবার্য্য। তবে তাঁহাকে অশেষ যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করিবার জন্য তাহারা সেই শবাধারে কয়েকটি ছিদ্র করিতে পারে, সেই ছিদ্রপথে অল্প অল্প বায়ু গিয়া তাঁহাকে দুই এক দিন জীবিত রাখিতেও পারে। শবাধারে আবদ্ধ হইয়া যথেষ্ট বায়ুর অভাবে এবং ক্ষুধায় ও পিপাসায় অসহ্য যন্ত্রণা ভোগের পর তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইবে। তাঁহাকে যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করিবার জন্য তাহারা অন্য ব্যবস্থাও করিতে পারে; বস্তুতঃ তাঁহাকে তাহারা কি অবস্থায় রাখিয়াছে, তাহা অনুমান করা আমার অসাধ্য। কিন্তু তিনি যে অবস্থাতেই থাকুন, সেই জঙ্কের গমনে বাধা দিব বা খানাতল্লাস করিব, সে অধিকার আমাদের নাই, ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অসুবিধার বিষয়। তাহারা জঙ্কখানি অবাধে সাংহাইয়ের সীমার বাহিরে লইয়া যাইবে। আজ রাত্রিতে যে সকল জঙ্ক নদীপথে যাত্রা করিবে, তাহাদের ভিতর হইতে যদি শবাধারবাহী জঙ্ক চিনিয়া লইতে না পারি এবং যদি আমাদের অভিসন্ধি গোপন রাখিবার জন্য অন্যান্য জঙ্কগুলির গমনে বাধা দিতে না পারি, তাহা হইলে তোমাদের কর্ত্তার ভাগ্যে কি ঘটিবে, তাহা ভাবিয়া

অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছি। কাল প্রভাতে চীন-সমুদ্রে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই হয় ত তোমার কর্ত্তার জীবন-রবি চির-অস্তমিত হইবে।"

জ্যাক উত্তেজিতভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "না মহাশয়, তাঁহার পরিণাম যাহাতে ঐরূপ শোচনীয় না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতেই হইবে। বোম্বেটেগুলা তাঁহাকে হত্যা করিবে, এ চিন্তা অসহ্য। সময় থাকিতে তাঁহার উদ্ধারের ব্যবস্থা করিতেই হইবে।"

স্মিফ-সি অচঞ্চল স্বরে বলিলেন, "শোন বৎস, আমি তাঁহার উদ্ধারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিব, আমার এই অঙ্গীকারে তুমি নির্ভর করিতে পার। কিন্তু জঙ্ক-শ্রেণীর ভিতর হইতে অন্ধকার রাত্রিতে সেই জঙ্কখানি চিনিয়া লওয়া, শববাহী জঙ্ককে আক্রমণ করিয়া তাহার ভিতর হইতে কয়েদীকে উদ্ধার করা কিরূপ কঠিন, তাহা আমার অজ্ঞাত নহে; কি উপায়ে এই দুরূহ কার্য্য সাধন করিব, তাহা এখনও স্থির করিতে পারি নাই। আমি ভাবিয়া দেখি; হাঁ, আমাকে সকল দিক বাঁচাইয়া একটা উপায় স্থির করিতে হইবে। এরূপ বিপদ ঘটিবে, ইহা পূর্ব্বে ধারণা করিতে পারি নাই। আমার সম্মুখে গাঢ় অন্ধকার এবং সমস্যা অত্যন্ত জটিল।"

সপ্তম প্রবাহ

শববাহী জাহাজ

দলে দলে আততায়ী যখন জোয়ারের জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় বিপুল-বেগে মিঃ লকের উপর আসিয়া পড়িল, তখন তাহাদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করা তাঁহার অসাধ্য হইল। তাহারা তাঁহার হাত হইতে তরবারি কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে ধরিয়া শূন্যে তুলিল, তাহার পর তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া নদীতীরে লইয়া গেল। নদীতীরে তখন অসংখ্য সাম্পান, উপান প্রভৃতি জলযান শ্রেণীবদ্ধভাবে সংরক্ষিত ছিল, এবং তাহাদের কিছু দূরে 'জঙ্ক' নামক চীনদেশীয় জাহাজ জলে ভাসিতেছিল। মিঃ লকের সহকারী জ্যাক ও সোয়া-তোর সারেঙ দূরে দাঁড়াইয়া তাহা দেখিতে পাইয়াছিল।

মিঃ লককে 'হাতসাঁই' করিয়া কোথায় লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, তাহাও তাহারা দেখিতে পাইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে কালো আলখেল্লা-মণ্ডিত মুখোসধারী মোহান্তও সেই জাহাজে উপস্থিত হইয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া জ্যাকের ধারণা হইয়াছিল, সে সাধারণ দর্শকমাত্র; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহারই ইঙ্গিতে আততায়ীরা পরিচালিত হইতেছিল।

জ্যাক ও কান-উও উভয়েই মনে করিয়াছিল—আততায়ীরা মিঃ লককে জঙ্কের উপর লইয়া গিয়া সেই জঙ্কের খোলের ভিতর নিক্ষেপ করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের এই ধারণা সত্য নহে। কান-উও জানিতে পারিয়াছিল, মিঃ লক যে জঙ্কে নীত হইয়াছিলেন, তাহা সাধারণ জঙ্ক নহে, তাহা ইচাংএর 'শববাহী জঙ্ক।' সেই জঙ্কখানির খোলের ভিতর বহুসংখ্যক চীনদেশীয় শবাধার ছিল। গাছের গুঁড়ি কুরিয়া সেই সকল শবাধার নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেই সকল শবাধারের আকার অনেকটা কাঠের 'ডোঙার' অনুরূপ; তাহার ভিতর চীনাম্যানের মৃতদেহ সংরক্ষিত করিয়া তাহার উপর কাঠের ডালা আঁটিয়া দেওয়া হইত। ডালার উপর গালার পলস্তারা; এবং তাহা বার্ণিশ দ্বারা সুরঞ্জিত।

মিঃ লক প্রথমে জঙ্কের পার্শ্বস্থিত দোতলার কেবিনে আবদ্ধ হইলেন। তিনি সে সময় বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলেন না, ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করিয়াও ব্যাকুল হইলেন না। কারণ, তিনি বুঝিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ নিষ্ফল। তাঁহাকে লইয়া অতঃপর কি করা হইবে—তাহাই লক্ষ্য করিবার জন্য তাঁহার আগ্রহ হইল। মুখোস-ধারী মোহান্তই যে তাঁহার ভাগ্যসূত্র পরিচালিত করিতেছিল, এ বিষয়ে তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। কিন্তু মোহান্ত তাঁহার প্রকৃত পরিচয় পাইয়াছে কি না, এবং সে কি উদ্দেশ্যে তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়া জঙ্কে কয়েদ করিয়াছে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। তবে তিনি যে চীনাম্যান ভিন্ন আর কোন দেশের লোক, ইহা বুঝিবার উপায় ছিল না, তাহা তিনি জানিতেন। কেহ তাঁহাকে য়ুরোপীয় বলিয়া সন্দেহ করিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা তিনি পূর্ব্বেই করিয়াছিলেন।

মিঃ লককে যে কেবিনে আবদ্ধ করা হইয়াছিল, তাহার গঠন-সৌষ্ঠব ছিল না; তাহা জঙ্কের দোতলার অধিকাংশ স্থান জুড়িয়া প্রসারিত ছিল। তাহার পশ্চাতে একজোড়া বাতায়ন ছিল, কিন্তু তাহাতে কাচের আবরণের পরিবর্ত্তে শামুকের খোলার স্বচ্ছ আবরণ ছিল। সেই আবরণ ভেদ করিয়া মৃদু আলোক কেবিনে প্রবেশ করিতেছিল। মিঃ লক

সেই কক্ষের প্রাচীরে ফ্রেমের ভিতর লাল কাগজে সোনালী অক্ষরে ছাপা কয়েকটি কবিতা দেখিতে পাইলেন। সেই কবিতা পাঠ করিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন, সেই জঙ্কখানি মৃতদেহ বহনের জন্য নিয়োজিত হইয়াছিল। তাঁহাকে শববাহী জাহাজে আবদ্ধ করা হইয়াছে! তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "অপরম্বা কিং ভবিষ্যতি!"

মুখোসধারী মোহান্ত সহসা সেই কেবিনে প্রবেশ করিয়া মিঃ লকের সম্মুখে উপস্থিত হইল।

মিঃ লক পূর্ব্বে বহুবার নানা কার্য্যে চীনদেশে আসিয়াছিলেন, এ জন্য প্রাচ্যের এই 'স্বর্গরাজ্য' সম্বন্ধে তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। চেং-তু মঠের মুখোসধারী মোহান্ত সম্বন্ধে নানা জনরব দীর্ঘকাল হইতেই তিনি শুনিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু সেই সকল জনরবের উৎপত্তির কারণ কি, তাহা সত্য কি না, এবং কিরূপে তাহা মহাচীনের সুদূর অংশে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা তিনি কোন দিন জানিতে পারেন নাই। কিন্তু এই মোহান্তের যে যথেষ্ট শক্তি ছিল, এবং সে ইচ্ছা করিলে লোকের নানাপ্রকার অনিষ্ট করিতে পারিত, ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেন, এবং সেই দিনের ঘটনায় তাঁহার এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছিল।

কিন্তু মোহান্তের জীবন রহস্যাবৃত। ভগবান্ বুদ্ধদেবের অনুশাসন-সংক্রান্ত যে মহামূল্য 'হিরণ্ময় গ্রন্থ' অপহৃত হইয়াছিল, তাহা এই মোহান্তেরই স্বার্থপ্রণোদিত চেষ্টার ফল, অথবা অধিকতর শক্তিশালী কোন নেতার ইঙ্গিতে পরিচালিত হইয়া সে এই কার্য্য করিয়াছিল, তাহা জানিবার উপায় ছিল না। রাজকুমার আউলিং বহুদিন হইতে চীনের নেতৃত্বভার গ্রহণ করিয়া জনসাধারণের উপর অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছিলেন; চীনদেশের রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতির উপর তাঁহার অপ্রতিহত আধিপত্য ছিল। চেং-তুর এই মোহান্ত তাঁহারই ইঙ্গিতে পরিচালিত হইতেছিল কি না, তাহাও লকের বুঝিবার সাধ্য ছিল না। অল্পদিন পূর্ব্ব হইতে এই মোহান্তের প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যাইতেছিল, সে হঠাৎ কোথা হইতে আসিয়া এরূপ অসাধারণ শক্তি সঞ্চয় করিয়াছিল, তাহাও জানিবার কোন উপায় ছিল না।

মিঃ লক মোহান্তের মুখের দিকে চাহিলেন, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টিতে বিন্দুমাত্র আগ্রহ বা কৌতূহল ছিল না। মোহান্তও গম্ভীর দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সে জঙ্কের সেই কেবিনে প্রবেশ করিয়া মস্তকাবরণ ও মুখোস উন্মোচিত করিয়াছিল, এ জন্য মিঃ লক তাহার মুখ সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইলেন। তাহার বর্ত্তুল মস্তকটি সম্পূর্ণরূপে কেশহীন, চক্ষু দুইটি সুগোল, কর্ণদ্বয় সম্মুখে প্রসারিত; মুখ ঈষৎ ত্রিকোণাকৃতি; ললাটে ক্ষতচিহ্ন, মিঃ লকের অস্ত্রাঘাতেই তাহার ললাটে ক্ষত হইয়াছিল। তাহার মুখ দেখিয়া সে তাতার-বংশীয় কি তিব্বতীয়, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার উপায় ছিল না। সে যে ভাষায় কথা কহিল, তাহা ইয়াংসির উত্তরাংশেই প্রচলিত। কিন্তু তাহার কণ্ঠস্বরে চীনের পশ্চিম প্রদেশের অধিবাসীদের কথার টান ছিল। মিঃ লক তাহার মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, মোহান্তকে পূর্ব্বে কোন দিন তাঁহার দেখিবার সুযোগ হয় নাই।

মোহান্ত মিঃ লককে সম্বোধন করিয়া সংযত স্বরে বলিল, "ওরে কুকুর, তুই আমাকে ও আমার অনুচরগণকে কিরূপ কষ্ট দিয়াছিস, তাহা আমি কখনও ভুলিতে পারিব না। তুই কোন্ দেশ হইতে আসিয়াছিস, দক্ষিণাঞ্চলের লোকের দলেই বা তুই কেন ভিড়িয়াছিলি?"

লক বুঝিলেন, মোহান্ত তাঁহাকে য়ুরোপীয় বলিয়া সন্দেহ করিতে পারে নাই; কিন্তু তিনি তাহার অশিষ্ট কথায় ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন, "তুমি মোহান্ত, ভগবান্ বুদ্ধের শিষ্য, সম্ভবতঃ তুমি ধার্ম্মিক লোক; কিন্তু তোমার কথা ইতরের মত! তুমি কি ভদ্রভাবে কথা বলিতে জান না? ধার্ম্মিক ব্যক্তি স্বভাবতঃই বিনয়ী, তাঁহার প্রকৃতি নম্র; কিন্তু তোমার কথায় সে ভাবের সম্পূর্ণ অভাব।—তুমি আমাকে অন্যায়ভাবে দোষী করিতেছ, কারণ, ঐ বিবাদ-বিসম্বাদের জন্য আমি দায়ী নহি। আমি স্বেচ্ছায় কাহারও সহিত বিবাদ করি নাই; কিন্তু আক্রান্ত হইলে আত্মরক্ষার অধিকার সকলেরই আছে। আমিও বিপন্ন হইয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়াছিলাম, তাহার অধিক আর কিছুই করি নাই।" —তিনি ক্যাণ্টনী ভাষায় এই সকল কথা বলিলেন।

মোহান্ত তাঁহার কথায় কিঞ্চিৎ নরম হইয়া বলিল, "তুমি উত্তরাঞ্চলের ভাষায় কথা বলিলে। তাহা না বলিলে তোমাকে হয় ত এখানে আসিতে হইত না। তোমাকে জনতার মধ্যে দাঁড়াইয়া দাঙ্গা করিতে দেখা গিয়াছিল। তুমি দক্ষিণাঞ্চলের কুলী নও, তাহা বুঝিতে পারিয়াছি; তবে দক্ষিণাঞ্চলের যে কুকুর দাঁত বাহির করিয়া কামড়াইতে

আসিয়াছিল, তুমি তাহার দল পুষ্ট করিয়াছিলে; তাহার সঙ্গে তোমার দোস্তি আছে।"

মোহান্ত তাঁহার নিকট তাহার প্রাপ্য সম্মানের দাবী করিল না, তাঁহার 'সমান সমান জবাবে' ক্রোধ প্রকাশ করিল না দেখিয়া লক বিস্মিত হইলেন। দক্ষিণাঞ্চলের লোক উত্তরাঞ্চলের মহা সম্রান্ত ব্যক্তিকেও খাতির করে না, ইহা জানিতেন বলিয়াই মিঃ লক তাহাকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করেন নাই। তিনি মোহান্তকে বলিলেন, "এ তোমার অন্যায় কথা, মঠধারী! তুমি কাহার কথা বলিতেছ? তাহাকে আমি কখন দেখি নাই; তবে তুমি যে বলিয়াছ, আমি দক্ষিণাঞ্চলের লোক, এ কথা আমি স্বীকার করি। আমি উত্তরদেশের কোনও খবর রাখি না, সেই অঞ্চলের লোকের খাতিরও করি না। আমি জাহাজে চাপিয়া এখানে আসিয়াছিলাম, এখন আমি দক্ষিণেই যাই, আর ইয়াংসির উজানেই যাই, আমার পক্ষে দুই-ই সমান। আমি কাহারও চাকর নহি।"

মোহান্ত বলিল, "তুমি ক্যাণ্টনী নহ? তবে তুমি কোন্ অঞ্চল হইতে আসিয়াছ?"

লক বলিলেন, "য়ুনান।"

মোহান্ত তাহাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। লক মনে করিয়াছিলেন, চীনের দক্ষিণ-পশ্চিম-প্রান্তস্থ প্রদেশের নাম বলিলে মোহান্ত ধাঁধায় পড়িবে। তবে সে যে তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দিবে, ইহা তিনি আশা করিতে পারিলেন না। তথাপি তিনি সুযোগ পাইলেই পলায়ন করিবেন, এ সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন না। সেই শববাহী জঙ্কের খোলের ভিতর নিক্ষিপ্ত হইলে তাঁহার অবস্থা কিরূপ হইবে, ইহা তিনি সুস্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সেই জাহাজ কিরূপ সামগ্রী বহন করিয়া আনিয়াছিল—তাহা তখনও তিনি জানিতে পারেন নাই।

মোহান্ত মিঃ লকের মুখের দিকে চাহিয়া কঠোর স্বরে বলিল, "যিনি তোমার মুখ হইতে তোমার মনের কথা বাহির করিয়া লইতে পারিবেন, তাঁহার সম্মুখে গিয়া তোমাকে জবাব করিতে হইবে। তুমি বড় নদীর উজানে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছ, তোমার এই আশা পূর্ণ হইবে।"

মোহান্তের পশ্চাতে কয়েক জন চীনাম্যান দাঁড়াইয়া তাহার আদেশের প্রতীক্ষা করিতেছিল। মোহান্ত তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "ইহাকে লইয়া গিয়া নিরাপদ স্থানে শয়ন করাও। আমরা যে সকল পবিত্র দেহ এই জাহাজে তুলিয়া লইয়া যাইতেছি, ইহাকে তাহাদের সঙ্গে যাইতে হইবে। কিন্তু উহার যেন শ্বাস রুদ্ধ না হয়, কারণ, উহাকে জীবিত অবস্থায় পৌঁছাইয়া দিতে হইবে।"

মোহান্তের আদেশে আট দশ জন চীনা কুলী মিঃ লকের হাত-পা-মাথা ধরিয়া তাঁহাকে শূন্যে তুলিল, তাহার পর তাঁহাকে ঝুলাইয়া লইয়া সেই কেবিনের বাহিরে আসিল এবং সিঁড়ি দিয়া জাহাজের খোলের ভিতর নামিতে লাগিল। মিঃ লক একবার মাথা ঘুরাইয়া খোলের ভিতর দৃষ্টিপাত করিলেন; খোলের ভিতর ডোঙ্গার মত শবাধারগুলি শ্রেণীবদ্ধভাবে সংরক্ষিত দেখিয়া তাঁহার মাথা ঘুরিয়া উঠিল। তাঁহার মনে হইল, মৃত্যুর শীতল শ্বাস সেই সকল শবাধার হইতে ঊর্দ্ধে সঞ্চালিত হইতেছে।

তিনি মুক্তিলাভের জন্য তখনও কোনরূপ চেষ্টা করিলেন না। সিঁড়ির ঠিক নীচেই একটি উন্মুক্ত শবাধার সংরক্ষিত ছিল; তাহার ডালা পাশে পড়িয়াছিল। দুই জন কুলী সেই শবাধারটির দুই পাশে কয়েকটি গোলাকার ছিদ্র করিতেছিল। মিঃ লক বুঝিতে পারিলেন, এই শবাধারে তাঁহাকে শয়ন করাইয়া তাহার ডালা বন্ধ করা হইবে, তাহার পর তাঁহাকে সেই ভাবে ইয়াংসি নদীর উজানে লইয়া যাওয়া হইবে। মোহান্তের কথা শুনিয়া তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া গিয়া তাঁহাকে কোন শক্তিশালী ব্যক্তির সম্মুখে উপস্থিত করা হইবে।—চেং-তু মঠের মুখোসধারী মোহান্তের অপেক্ষাও কোন পরাক্রান্ত ব্যক্তি!—কিন্তু কে সে?

মিঃ লকের তাহা জানিবার উপায় ছিল না; চীনা কুলীরা তাঁহাকে সেই শবাধারের ভিতর শায়িত করিয়া তাহার ডালা আঁটিয়া দিল। মিঃ লক সেই শবাধারে আবদ্ধ হইয়া হতাশহৃদয়ে স্তব্ধভাবে পড়িয়া রহিলেন। সেই সময় তিনি মোহান্তের কোন কোন কথা শুনিতে পাইলেন। মোহান্ত অনুচরবর্গ সহ তাঁহার শবাধার পরীক্ষা করিতে আসিয়াছিল। চিরবৈচিত্র্যময়ী শ্যামলা বসুন্ধরার স্পর্শসুখ পুনর্ব্বার অনুভব করিতে পারিবেন,—এ আশা স্বপ্ন বলিয়াই লকের মনে হইল। [ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।
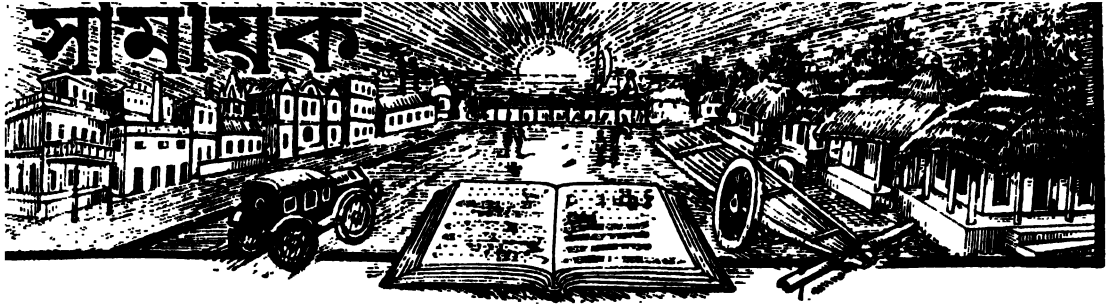
চুক্তি-ভঙ্গ

এ দেশে পদার্পণের পর বড়লাট লর্ড উইলিংডন কিছু দিন পর্য্যন্ত মামুলী অভিনন্দনের উত্তরে বক্তৃতাদান ব্যতীত এ দেশের বর্ত্তমান রাজনীতিক অবস্থার সম্পর্কে কোন অভিমত প্রকাশ করেন নাই। কয়েক দিন পূর্ব্বে শিমলায় চেমসফোর্ড ক্লাবে বক্তৃতাদানকালে তিনি এ সম্বন্ধে মনের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। উহাতে তিনি বলিয়াছেন, —"আমি শান্তিকামী, এ দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহাই আমার ইচ্ছা এবং সে জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। দিল্লীর আরউইন-গন্ধী চুক্তির উদ্দেশ্য শান্তিপ্রতিষ্ঠা করা, উহা যুদ্ধ-বিরতির জন্য করা হয় নাই। মিঃ গন্ধী অকপটে চুক্তির সর্ত্ত পালন করিতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহার কোন কোন অনুচর দেশের লোককে ভবিষ্যতে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিতে উপদেশ দিতেছেন। উহাতে চুক্তি-ভঙ্গ হইতেছে।"

লর্ড উইলিংডন

লর্ড উইলিংডন কাহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া এই উক্তি করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। পণ্ডিত জহরলাল নেহরু, সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল এবং শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত প্রমুখ কংগ্রেস নেতারা কোন কোন স্থানে বক্তৃতায় দেশবাসীকে সর্ব্বদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিতে উপদেশ দিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা অকারণ এরূপ সমরপ্রিয়তা দেখাইয়াছেন, এমন ক... বলা যায় না। ... গোল টেবিল বৈঠকে উভয় পক্ষের আ...পোষের সম্ভাবনা আছে সত্য, কিন্তু যে ভাবে বিলাতের ...শীল দলের চার্চ্চহিল, বলডুইন প্রমুখ নেতারা গত গোল টে...বলের বাঁধনকষণের সর্ত্তগুলি বজায় রাখিবার জন্য জিদ প্রকাশ করিতেছেন, ঐ সর্ত্তগুলি পূর্ব্বাহ্ণে স্বীকার করিলে আগামী গোল টেবিলে কংগ্রেসকে স্থান দেওয়া হইবে, অন্যথা নহে বলিয়া তাঁহারা যে ভাবে কংগ্রেসকে ও তথা মহাত্মা গন্ধীকে শাসাইতেছেন এবং যে ভাবে তাঁহাদের কেহ কেহ সাইমন রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনপদ্ধতি নির্ণয় করিবার আভাস দিতেছেন, তাহাতে গোল টেবিলের ফলাফল ভারতের পক্ষে বিশেষ মঙ্গলকর হইবে না বলিয়া মনে করা অস্বাভাবিক নহে। বিশেষতঃ মার্কিণের প্রেসিডেণ্ট হুভারের উদার ব্যবস্থায় বৃটেনও অন্যান্য য়ুরোপীয় জাতিদের মত উপকার প্রাপ্ত হইয়া ভারতকে সাহায্য ও সহানুভূতি দান করিবে বলিয়া প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোনাল্ড পার্লামেণ্টে যে ঘোষণা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে এমন কথার আভাস পাওয়া গিয়াছে, যাহাতে ভারতবাসীর মন সন্দেহাচ্ছন্ন হইবার কথা। মিঃ ম্যাকডোনাল্ড ভারতের ব্যবসার বাজারে এবং বর্ত্তমান অর্থনীতিক দুরবস্থায় ভারতকে অর্থ-সাহায্য করিবেন ও বৃটেনের সুনাম দান করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন। নানাকারণে ভারতের আর্থিক অবনতি ঘটিয়াছে। সেই হেতু ব্যবসায়ের বাজারে বা লেনদেনের কারবারে ভারতের সুনামের ব্যত্যয় ঘটিয়াছে, ইহা মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের অভিমত। এ জন্য যত দিন জগতের বাজারে আবার ভারতের নাম সুপ্রতিষ্ঠ না হয়, যত দিন লোক ভারতের সহিত ভরসা করিয়া লেনদেন করিতে বা ভারতকে ঋণ দিতে সাহসী না হয়, তত দিন পর্য্যন্ত ভারতের শাসনপদ্ধতির পরিবর্ত্তন সম্ভবপর হইবে না। সেই জন্য বৃটেন ভারতের পশ্চাতে আছে, এইটুকু জানাইবার সুবিধা করিয়া দিয়া জগতের অন্যান্য জাতির ভারতের প্রতি অবিশ্বাস দূর করা তাঁহার উদ্দেশ্য। বৃটেন অষ্ট্রেলিয়ার পশ্চাতে আছে বলিয়া অষ্ট্রেলিয়া দুর্ব্বল হইলেও এবং নৌবলে নগণ্য হইলেও জাপ প্রভৃতি প্রবল প্রতিবেশীরা

বল্লভভাই পেটেল

যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত

অষ্ট্রেলিয়াকে আক্রমণ করিতে সাহসী হয় না। এই সুনাম দেওয়ার ফলে অনেক রাজ্য বাঁচিয়া যায়। কিন্তু সুনাম কোন জাতিকে অন্য জাতি নিঃস্বার্থ পরোপকার বলিয়া দান করে না, বিনিময়ে কিছু চাহে! মিঃ ম্যাকডোনাল্ডও ভারতের নিকট চাহিয়াছেন। তিনিও বিনিময়ে ভারতের নিকট provisions (বা বাধনকষণের) কড়ার চাহিয়াছেন। বিনিময়ে তিনি যে সাম্রাজ্যের পক্ষ হইতে ভারতের রাজস্বের ও সৈন্যের উপরেও কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার কথা পাড়িবেন না, তাহাও হইতে পারে না। তাহার পর সিভিল সার্ভিস, বৃটিশ বাণিজ্য-স্বার্থ, বিদেশীদের বিচারের স্বার্থ,—এ সব ত আছেই।

এই সকল বাধন কষণের সম্ভাবনা আছে বলিয়াই যে পণ্ডিত জহরলাল প্রমুখ ভারতীয় নেতারা ভবিষ্যতের জন্য দেশবাসীকে প্রস্তুত থাকিতে বলিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ পরে সংবাদ আসিয়াছে যে, রক্ষণশীলদলীয় প্রায় ৬ শতের অধিক সদস্য এক সভায় সমবেত হইয়া মন্তব্য গ্রহণ করিয়াছেন যে, (১) বাধনকষণগুলি স্থায়ী, প্রকৃত ও ভারতের মত বৃটিশ স্বার্থেরও অনুকূল করিয়া ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন-ব্যবস্থার সহিত গ্রথিত করিয়া দিতে হইবে এবং (২) যে প্রস্তাবে ধ্বণাক্ষরে পূর্ণ স্বাধীনতার কথা থাকিবে, এমন প্রস্তাব গোল টেবিল বৈঠকে আনয়ন করিতে দেওয়া হইবে না,—শ্রমিক সরকারের নিকট এইরূপ প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা হইবে; যদি শ্রমিক সরকার তাহাতে সম্মত না হন, তাহা হইলে রক্ষণশীল দল গোল টেবিল বৈঠকে আর যোগদান করিবেন না। অর্থাৎ তাঁহারা পূর্ব্বে শ্রমিক সরকারের সহিত একযোগে যাহা করিয়াছেন, তাহা পূর্ণরূপে গ্রহণ করাইয়া পরের বৈঠকে যোগ দিবেন, অন্যথা নহে। প্রকাশ, বিলাতে শ্রমিক সদস্যদের এক সভায় শ্রীযুক্ত বিঠলভাই পেটেল (ব্যবস্থা-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট) এই প্রস্তাবের উত্তরে বলিয়াছেন, "যদি শ্রমিক সরকার কিছু অদলবদল করিয়াও রক্ষণশীলদের এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন, তাহা হইলে মহাত্মা গন্ধীকে গোল টেবিলে যোগদান করার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে মতপরিবর্ত্তন করিতে হইবে। তখন নূতন উদ্যমে আইন অমান্য আন্দোলন প্রবর্ত্তিত হইবে। উহার ফলে বিলাতী পণ্য চিরতরে ভারতে বর্জ্জিত হইবে এবং ভারতবাসীরা কেবল ঐ বর্জ্জনের দিকেই সমস্ত শক্তি ও আগ্রহ নিয়োজিত করিবে। পরন্তু স্বাধীনতার সমর্থনকামীরা প্রবল হইবে এবং ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনকামীরা হীনবল হইয়া পড়িবে। অবশ্য ইহাতে ভারতবাসীকে বহু কষ্ট ও বিপদ ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু ইংলণ্ডের কষ্টবিপদ্‌ভোগ তদপেক্ষা অধিক হইবে।" ব্যবস্থাপরিষদের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট আজ এমন কথা বলিতেছেন কেন, তাহা রাজনীতিক বড়লাট লর্ড উইলিংডন নিশ্চিতই বুঝিতেছেন। এইরূপ ঘটনার সম্ভাবনা আছে বলিয়াই দেশনেতাদিগের মধ্যে কেহ কেহ পূর্ব্বাহ্ণে প্রস্তুত হইবার কথা পাড়িয়াছেন। অবশ্য ঈশ্বর না করুন যে, এরূপ হয়! যাহাতে শান্তির আবহাওয়ার মধ্যে গোল টেবিলের কার্য্য সুসম্পন্ন এবং উভয় জাতিই আপোষ-সন্ধিতে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হয়, তাহার আশাই সকলে করে।

শ্রীযুক্ত বিঠলভাই পেটেল

এরূপ অবস্থায় কংগ্রেস বা কংগ্রেস-নেতারা চুক্তি-ভঙ্গ করিতেছেন কিরূপে বলা যায়? বরং তৎপরিবর্ত্তে এমন সব দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়, যাহাতে সপ্রমাণ হয় যে, ভারত সরকার না করুন, কোন কোন প্রাদেশিক সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ দিল্লীর চুক্তি ভঙ্গ করিতেছেন। যুক্তপ্রদেশে জমীদার ও প্রজার মধ্যে খাজনা দেওয়া উপলক্ষে যে মনোমালিন্য উপস্থিত হইয়াছে, তাহার ফলে সংঘর্ষ ও হাঙ্গামাও হইয়া গিয়াছে এবং সেই সম্পর্কে বিস্তর দরিদ্র কৃষক গ্রেপ্তার হইয়াছে; পরন্তু যে সকল স্থানীয় কংগ্রেসকর্ম্মী মধ্যস্থতা করিয়া প্রজাদিগকে সাধ্যমত খাজনা দেওয়াইতেছেন, তাঁহাদের মধ্যেও কাহাকেও কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ইহাতে কি চুক্তি-ভঙ্গ করা হইতেছে না? ইহাতে কি শান্তির আবহাওয়া বজাইবার বিপক্ষতাচরণ করা হইতেছে না? বোম্বাই ও অন্য অন্য কয়েক স্থানের স্বেচ্ছাসেবকগণ ও ছাত্রগণ মহাত্মা গন্ধীর নিকট এমন ভাবে অভিযোগ করিতেছে, যাহাতে মনে হয়, চুক্তির সর্ত্ত ভঙ্গ হইতেছে। বাঙ্গালাদেশে এখনও কোন কোন রাজবন্দী চুক্তি অনুসারে মুক্ত হয় নাই; জেলেও রাজবন্দীদের প্রতি মন্দ ব্যবহারের সংবাদ প্রকাশ পাইতেছে; বিনা বিচারে এখনও অনেক লোককে আটক করিয়া রাখা হইতেছে। কিছু দিন পূর্ব্বে এক বরিশালেই ১২ দিনে ১৫ জন লোককে বিনা বিচারে আটক করা হইয়াছে।

এ সকল কার্য্যে কি চুক্তি ভঙ্গ করা হইতেছে না, শান্তির আবহাওয়া দূষিত করা হইতেছে না ?

রাজপ্রতিনিধি যদি কয়েক জন কংগ্রেস নেতার ক্রটির কথার উপর এত জোর না দিয়া য়ুরোপীয় ও অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের দ্বারা রাজদ্রোহ প্রচারের দিকে খর দৃষ্টি রাখেন, এবং স্থানীয় সরকার গুলিকে যথার্থ শান্তির পথে অগ্রসর হইতে উপদেশ দেন, তাহা হইলেই শান্তিপ্রতিষ্ঠার সমধিক সম্ভাবনা, অন্যথা নহে।

ফরিদপুর

ফরিদপুর জাতির মুক্তির ইতিহাসের পত্রাঙ্কে আপনার নাম স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত করিয়া রাখিল। ফরিদপুরের মুসলিম বৈঠকে বাঙ্গালার জাতীয়তাবাদী মুসলমানবৃন্দ জগৎকে জানাইয়া দিলেন যে, বাঙ্গালায় জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক মুসলমানরা মুষ্টিমেয় নহেন, তাঁহারা সংখ্যায় সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক স্বার্থান্বেষী মুসলমান অপেক্ষা অনেক অধিক। বাঙ্গালায় ভারতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মুসলমানের বাস, সেই বাঙ্গালাতেই যখন জাতীয়তাবাদী মুসলমানের সংখ্যা সাম্প্রদায়িক স্বার্থবাদী মুসলমান অপেক্ষা অধিক, তখন ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁহাদের মতামতই সর্ব্বাগ্রে গ্রহণীয় হইবে না কেন, তাহা কেহ বলিতে পারেন কি ?

ডাক্তার আন্‌সারী

ডাক্তার আন্‌সারী সর্ব্বজনমান্য দেশপ্রেমিক নেতা, তিনি আজীবন দেশ-সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া আসিয়াছেন। তিনি মুসলমান, এ কথা সত্য ; কিন্তু হিন্দুও তাঁহাকে তাহাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জন-নায়ক বলিয়া স্বীকার করে। দেশবাসীর পক্ষ হইতে যাহা সর্ব্বোচ্চ সম্মান, তিনি তাহাও লাভ করিয়াছেন, তিনি কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট-রূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। বাঙ্গালার জাতীয়তাবাদী মুসলমানরা তাঁহাকে ফরিদপুর বৈঠকের সভাপতিপদে বরণ করিয়া যোগ্যতার সম্মান রক্ষা করিয়াছেন, গুণের পুরস্কার দিয়াছেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি লাল মিঞা সাহেবও যে উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে বাঙ্গালার জাতীয়তাবাদী মুসলমানের মনোভাব স্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে।

ডাক্তার আন্‌সারী জাতীয় নেতা হইলেও মুসলমানের বিশেষ স্বার্থসংরক্ষণে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন নাই। ফরিদপুরের বৈঠকে তিনি মিশ্র নির্ব্বাচনের ও প্রাপ্তবয়স্কগণের ভোটাধিকারের সমর্থন করিয়া হিন্দুর সহিত একযোগে ভারতের মুক্তির দাবী ঘোষণা করিলেও মুসলমানদের জন্য কয়টি বিশেষ ব্যবস্থার কথাও পাড়িয়াছেন, যথা,—

(১) কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক প্রতিষ্ঠানে মুসলমানদের এক-তৃতীয়াংশ প্রতিনিধি থাকিবে।

(২) যোগ্যতার সর্ব্বনিম্ন মান অনুসারে সরকারী চাকুরী কমিশন কর্ম্মচারীদের নিয়োগ ব্যবস্থা করিবেন। কোন সম্প্রদায়কে তাহার প্রাপ্য ন্যায্য অংশ হইতে বঞ্চিত করা হইবে না, এরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৩) বিভিন্ন ব্যবস্থাপক প্রতিষ্ঠানের সকল দল একযোগে যেরূপ স্থির করিবেন, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রিসভায় মুসলমান স্বার্থ সেই ভাবে রক্ষিত হওয়া প্রয়োজন।

মিঃ চৌধুরী গোলাম গফুর
ফরিদপুরের জাতীয় মুসলমান সম্মেলনের সাধারণ সম্পাদক

(৪) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশ ও বেলুচিস্থানকে অন্যান্য প্রদেশের মত শাসনব্যবস্থা প্রদান করিতে হইবে।

(৫) সিন্ধু-প্রদেশকে স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত করিতে হইবে।

এই ভাবের অনেক পরামর্শ আছে। এ সকলের মধ্য দিয়া এইটুকু ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, "নির্ব্বাচনব্যাপার এমন ভাবে পরিচালিত করিতে হইবে, যাহাতে মুসলমানের সংখ্যার আধিক্য যেন সংখ্যার অল্পতায় পরিণত না হয়, এমন কি, যেন অপর সম্প্রদায়ের সহিত সমান পর্য্যায়ভুক্তও করা না হয়।" আরও একটা কথা তাঁহার অভিভাষণ হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে, তিনি (সংখ্যাধিক সম্প্রদায়ের জন্য) প্রাপ্ত-বয়স্কের ভোটাধিকার অনুসারে সদস্যপদ সংরক্ষণকে গণতন্ত্রবাদের বিরোধী বলিয়া স্বীকার করিলেও পঞ্জাব ও বাঙ্গালার মুসলমানদের জন্য

সদস্যপদ সংরক্ষণ সমর্থন করিয়াছেন, অথচ এই দুই প্রদেশেই মুসলমানরা সংখ্যায় অধিক।

সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার সমর্থক মুসলমানরা ইহার অধিক আর কি চাহেন? সে যাহাই হউক, ডাক্তার আন্‌সারী এইরূপে মুসলমান স্বার্থসংরক্ষণে যত্নবান্ হইলেও মূলে জাতীয়তা সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার অভিভাষণে তিনি বলিয়াছেন, "জাতীয় মুসলমান দল যেরূপ প্রতিনিধিমূলক, বর্ত্তমানে ভারতের কোন মুসলমান দলই সেইরূপ নহেন। মুসলিম লীগ ও খেলাফৎ কমিটীকে বাদ দিলে নিখিল ভারত মুসলিম বৈঠকে যাঁহারা আছেন, তাঁহারা নগণ্য। মুসলিম লীগের অস্তিত্ব বহুদিন লোপ পাইয়াছে। এলাহাবাদের অধিবেশনে মাত্র ৭৫ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। খেলাফৎ কমিটী এখন পুরাতনের ছায়ামাত্র। অথচ জাতীয় মুসলমান দলের সংখ্যা সমগ্র ভারতেই আছে। লক্ষ্ণৌএর বৈঠকে ঐ দলের ৬ শত ১৯ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।" ইহার কি জবাব অপর পক্ষ অথবা সরকার ও তাঁহাদের সুরে পোঁধরা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়া দিতে পারেন? তবে কোন্ হিসাবে আগামী গোল টেবিল বৈঠকে জাতীয়তাবাদী মুসলমানকে বাদ দিয়া মুষ্টিমেয় সম্প্রদায়িকতা-বাদীদিগকে গ্রহণ করা হইবে?

লাল মিঞা
ফরিদপুরের জাতীয় মুসলমান সম্মেলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি

অর্থ-কষ্ট

দেশের সর্ব্বত্রই দারুণ অর্থ-কষ্ট অনুভূত হইতেছে। কেবল কৃষক ও শ্রমিক অথবা মধ্যবিত্ত ভদ্র-পরিবার নহে, জমীদার-তালুকদাররাও ইহার কবল হইতে মুক্তি পান নাই। সারা জগদ্ব্যাপী বাণিজ্য-ব্যবসায়ের অবনতি এবং কৃষিজ পণ্যের মূল্য-হ্রাস ইহার মূল কারণ। বাঙ্গালা, আসাম, বিহার, যুক্তপ্রদেশ, পঞ্জাব, বোম্বাই—সর্ব্বত্রই একই কথা, অর্থাভাবে লোক অনাহারে বা অর্দ্ধাশনে রহিয়াছে, অথবা সকল জ্বালা জুড়াইবার জন্য আত্মহত্যা করিতেছে, পুত্র-পরিবারকেও হত্যা করিয়া তাহাদের দীর্ঘকাল যন্ত্রণাভোগের সম্ভাবনা দূর করিয়া দিতেছে! কোন্ দেশে মানুষ এইরূপে অর্থ-কষ্টে অনাহারে মরে? সরকার এই অর্থ-কষ্ট-নিবারণে দেশের দাতব্য প্রতিষ্ঠান-সমূহের মত সাহায্য দান করিতেছেন, বাঙ্গালার গভর্ণর স্বয়ং ৮ শত টাকা এতদর্থে দান করিয়াছেন, কিন্তু সে সাহায্যদান সমুদ্রে শিশিরবিন্দু তুল্য হইতেছে। এত দিন দেশবাসীকে কেবল কৃষি ও চাকরী অথবা ওকালতী-ডাক্তারীর উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে দিয়া দেশে নিত্য নূতন ধনাগমের পথ রুদ্ধ করিয়া এই অবস্থা আনয়ন করা হইয়াছে। শিল্প, বাণিজ্য ও কারিগরি শিক্ষার প্রয়োজনানুরূপ ব্যয় না করিয়া কেবল কেতাবতী বিদ্যা শিক্ষা দিয়াই এই সর্ব্বনাশ হইয়াছে। তাহার পর শাসনকার্য্যে ও দেশরক্ষায় রাজস্বের প্রায় সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া জাতিগঠন-কার্য্যে যৎসামান্য প্রদান করিয়া জনসাধারণকে পঙ্গু করিয়া রাখা হইয়াছে, সুতরাং এক বৎসরের ব্যবসায়ের অবনতির ফলে তাহাদের উত্থানশক্তি রহিত হইয়াছে।

বাঙ্গালায় অর্থ-কষ্টের ফল কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহার একটু পরিচয় দিতেছি:—(১) রাজসাহী জেলার বুকুৎসা গ্রামের উত্তরপাড়ার আতাবী বেওয়া জানাইয়াছে যে, তাহার জামাতা চেতু কারিগর অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে। চেতু তাহার পত্নী ও দুইটি কন্যা লইয়া আতাবীর বাড়ীর নিকট বাস করিত। চাকুরী বা দিন-মজুরী তাহার পেশা। কষ্টে সে সংসার প্রতিপালন করিত। শেষে যখন কায জুটিল না, তখন সে কোন দিন অর্দ্ধাশনে, কোন দিন অনশনে অতিবাহিত করিয়া ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়ে। ভিক্ষালাভেও অসমর্থ হইয়া সে চারি দিন উপবাসের পর মারা যায়। (২) নেত্রকোণার ঈশ্বরগঞ্জ থানার এলাকায় পচাই গ্রামের বৃদ্ধ কৃষক নবী সেখ অনাহারে কষ্ট উপভোগের পর উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তাহার অভুক্ত জামাতা অতিথিরূপে গৃহে উপস্থিত হইলে সে আহার্য্য দিতে না পারিয়া দুঃখে ও অপমানে আত্মহত্যা করিয়া জ্বালা জুড়াইয়াছে। (৩) হাওড়ায় এক যুবক ও তাহার পত্নীও আত্মহত্যা করিয়াছে; যুবক ভদ্র দরিদ্র বংশের সন্তান; বেকার বসিয়া থাকিয়া সে স্বয়ং আত্মহত্যা করিয়াছে এবং পত্নীকেও আত্মহত্যা করিতে বলিয়াছে।

যুক্তপ্রদেশে একরূপ কৃষাণ-বিদ্রোহই উপস্থিত হইয়াছে

[ঘ]টতে হইবে। সরকারের ও জমীদার-তালুকদারের কর্ম্ম-চারীদের কড়াকড়ি খাজনার তাগাদায় অস্থির হইয়া তাহারা আইন-ভঙ্গ করিতে সাহসী হইয়াছে, এইরূপ প্রকাশ। এতদুপ-লক্ষে খুন, জখম ও ধরপাকড় হইয়া গিয়াছে। কোথাও কোথাও কংগ্রেসকর্ম্মীরা এই সম্পর্কে ধৃত হইয়াছে।

বোম্বাই সহরেও বেকার নর-নারী আত্মহত্যা করিয়া ইহ-লোক ত্যাগ করিয়াছে, এ সংবাদও প্রকাশিত হইয়াছে।

পঞ্জাবেও প্রজারা খাজনা দিতে পারিতেছে না। আহারই জুটিতেছে না, খাজনা দিবে কোথা হইতে?

চারিদিকেই হাহাকার। এ ক্ষেত্রে সরকার ও জমীদার, তালুকদার যদি এক বৎসরের জন্য যথার্থ অভাবগ্রস্ত প্রজাকে খাজনা রেহাই না দেন এবং মহাজনরা যদি সুদ এ বৎসরে ছাড়িয়া না দেন, তাহা হইলে এ অবস্থার প্রতীকার হওয়া অসম্ভব।

বর্জ্জন ও পিকেটিং

এলাহাবাদের তিন জন মুসলমান স্থানীয় মুসলমান বিদেশি-বস্ত্র-ব্যবসায়ীদের পক্ষ হইতে এলাহাবাদ কংগ্রেস কমিটীর প্রেসিডেন্টকে এক পত্র লিখিয়া জানাইয়াছেন যে,—

(১) মুসলমানরা কংগ্রেসে যোগদান করেন নাই, কারণ, কংগ্রেস ও হিন্দুরা কিছুতেই সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান করিতে সম্মত হন নাই। এই হেতু মুসলমানরা সরকারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন নাই, কংগ্রেসের সহিত সরকারের যে চুক্তি হইয়াছে, তাহারও সহিত সংস্রব রাখেন নাই। এই হেতু তাহারা স্থানীয় কংগ্রেস কমিটীর আদেশ মানিতে প্রস্তুত নহে। কংগ্রেস পুনরায় বিদেশী বস্ত্র সিল করিয়া গুদামজাত করিতে আদেশ দিয়াছে, এ আদেশ মুসলমান বস্ত্র-ব্যবসায়ীরা মানিবে না।

(২) কংগ্রেস আদেশ দিয়াছে যে, যদি তাহাদের আদেশ অমান্য হয়, তাহা হইলে আবার পিকেটিং চালান হইবে। পিকেটিংএ মুসলমানের সমূহ ক্ষতি হইয়াছে। বিশেষতঃ ইহাতে মুসলমান তন্তুবায়দের ভীষণ ক্ষতি হইয়াছে। তাহারা বিলাতী বস্ত্র ও সূতার কারবার করিত। পিকেটিংএ উহার সর্ব্বনাশ হইয়াছে, লাভ হইয়াছে খদ্দর-ব্যবসায়ী ও দেশীয় [ক]াপড়ওয়ালাদের।

(৩) কাশী, আগ্রা, মির্জ্জাপুর ও কাণপুরের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরোধের ফল আরও অধিক প্রবল হইয়াছে। সুতরাং এ সময়ে মুসলমান বিদেশি-বস্ত্র-ব্যবসায়ীদের বিপক্ষে পিকেটিং করিলে অবস্থা সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইবে, হয় ত উহা হইতে দাঙ্গা-হাঙ্গামার উৎপত্তি হইবে।

(৪) এই সকল কারণে মুসলমান বস্ত্রব্যবসায়ীদের গুদামে যে সকল বিদেশী বস্ত্র মজুত আছে, তাহার বিপক্ষে আপনারা পিকেটিং করিবেন না, বরং যাহারা নূতন করিয়া বিদেশী বস্ত্রের অর্ডার দিয়াছে, তাহাদের বিপক্ষে পিকেটিং করিবেন। যদি এরূপ না করেন, তাহা হইলে ফল বিষময় হইবে।

'পাইওনিয়ার' প্রমুখ অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্র-সমূহ ইহাকে মুসলমানের সাবধান-বাণী বলিয়া বিভীষিকার রব তুলিয়াছেন, ম্যাঞ্চেষ্টারের ওকালতীতে যেটুকু বিদ্যার প্রয়োজন, তাহারও পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু কংগ্রেসের পক্ষ হইতে পণ্ডিত জহর-লাল নেহেরু এই পত্রের যে জবাব দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলেই এই পত্রের যুক্তি কিরূপ শিথিল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ার ওকালতী কত অসার, তাহা নিরপেক্ষ ব্যক্তি-মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। তাঁহার মূল কথা এই:—"কংগ্রেস ও সরকারের মধ্যে যে সাময়িক চুক্তি হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, কংগ্রেস যখন প্রয়োজন মনে করিবেন, তখন বিদেশী বস্ত্রের বিপক্ষে শান্তিপূর্ণ পিকেটিং চালাইতে পারিবেন। আইন অমান্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও ভারত-বাসীর যে বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন করিবার অধিকার আছে এবং সে জন্য দেশবাসী যে প্রচারকার্য্য ও পিকেটিং চালাইতে পারেন, ইহা সরকারও স্বীকার করিয়া-ছেন। সুতরাং বর্ত্তমানে এ জন্য কংগ্রেসের সহিত সরকারের বিরোধ বা যুদ্ধের কথা আসিতে পারে না। কংগ্রেস চুক্তির সর্ত্ত এ যাবৎ যথাসাধ্য পালন করিয়াছে, ভবিষ্যতেও করিবে। এই সকল কারণে কংগ্রেস বিদেশী বস্ত্রের বিপক্ষে প্রচারকার্য্য ও পিকেটিং চালাইবেই। দুঃখের বিষয়, ইহার সহিত সাম্প্রদায়িক সমস্যার কথা বিজড়িত করা হইয়াছে। বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জনের সহিত এই সমস্যার কোন সম্পর্ক নাই। ইহা জাতির অর্থনীতিক সমস্যার সহিত বিজড়িত। বিশেষতঃ দরিদ্র তন্তুবায়, সূতা-কাটুনী, রংরেজ মিস্ত্রী প্রভৃতির অর্থ-সমস্যার সহিত ইহার সম্পর্ক আছে। তন্তুবায় প্রভৃতি অধিকাংশই মুসলমান। সুতরাং বিদেশী বস্ত্রবর্জ্জন দ্বারা মুসলমানরাই অধিক উপকৃত হইবেন। তবে কিরূপে বলা যায় যে, মুসলমান তন্তুবায়রা পিকেটিংয়ের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে?"

জহরলাল নেহেরু

পণ্ডিত জহরলালের কথাগুলি অক্ষরে অক্ষরে সত্য, তাঁহার যুক্তি খণ্ডন করা যায় না। স্বদেশী বস্ত্রের প্রসার করিতে

হইলে বিদেশী বস্ত্রের প্রসার সঙ্কুচিত করিতে হইবেই। যখন শান্তিপূর্ণ পিকেটিং দিল্লী-চুক্তির বিরুদ্ধ নহে, তখন দেশের দরিদ্র জনসাধারণের অন্নসংস্থানের উদ্দেশ্যে খদ্দর ও দেশীয় মিলের বস্ত্রের প্রসারকল্পে বিদেশী বস্ত্রের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ পিকেটিং করিলে কোন অপরাধ হইবে কেন, আর সে জন্য সাম্প্রদায়িক বিরোধেরই বা সৃষ্টি হইবে কেন, তাহা ত সহজ বুদ্ধির অনধিগম্য।

পণ্ডিত জহরলাল বলিয়াছেন, "যাঁহারা বিদেশী বস্ত্র ক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে স্বচ্ছন্দে ক্রয় করিতে দেওয়া হইবে। কেবল একবার বুঝাইয়া বলা হইবে যে, বিদেশী বস্ত্র ক্রয় করা হেতু দেশের দরিদ্রের সর্ব্বনাশ হইতেছে। কোনও প্রকার ভয় বা লোভ প্রদর্শনের চেষ্টা থাকিবে না।" সকলেই জানেন, মহাত্মা গন্ধী স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, যদি দেখা যায়, পিকেটিং-এ ঘুণাক্ষরেও বলপ্রয়োগের বা প্রলোভন-প্রদর্শনের সম্ভাবনা আছে, তাহা হইলে পিকেটিং বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। সে ক্ষেত্রে পিকেটিংএ সাম্প্রদায়িক বিরোধ বা দাঙ্গার সম্ভাবনা থাকিবে কেন, বিভীষিকার কারণই বা থাকিবে কেন?

দীনেশ গুপ্তের ফাঁসী

কর্ণেল সিমসনের হত্যা মামলায় দণ্ডিত দীনেশচন্দ্র গুপ্তের ফাঁসী হইয়া গিয়াছে। লক্ষ লক্ষ দেশবাসী সরকারের নিকট কাতর প্রার্থনা নিবেদন করিয়াছিল—প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে অন্য যে কোন কঠিন শাস্তি তাহাকে প্রদত্ত হউক; কিন্তু সরকার সে নিবেদনে কর্ণপাত করেন নাই। সম্রাটের নিকট প্রাণভিক্ষার শেষ আবেদনও যথাস্থানে প্রেরিত হয় নাই। ২০ বৎসর বয়সে দীনেশ গুপ্তের জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইয়া গেল।

কিছু দিন পূর্ব্বে ইংলণ্ডে প্রাণদণ্ড তুলিয়া দিবার জন্য বহুমতে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। ৫ বৎসর পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইবে, মানুষের হিংস্র প্রকৃতি কোন্ পথে চলিতেছে। বহু সভ্য দেশ ইদানীং এই ভীষণ প্রথা তুলিয়া দিয়াছেন। ভারতবর্ষের ভাগ্যবিধাতারা যদি দীনেশ গুপ্তের ফাঁসীর পরিবর্ত্তে অন্য দণ্ডের ব্যবস্থা করিতেন, তাহাতে তাঁহারা উদার মনোবৃত্তির পরিচয় দিতে পারিতেন; কিন্তু সে ক্ষমা-গুণের পরিচয় দিবার সুযোগ তাঁহারা হারাইয়াছেন।

যে তরুণ যুবক মৃত্যুকালে ফাঁসীর রজ্জু স্বহস্তে গলদেশে তুলিয়া দিতে পারে—মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূকে পত্রে লিখিতে পারে "আগুন আমাকে পুড়াইতে পারে না, জল আমাকে পচাইতে পারে না, বায়ু আমাকে শুষ্ক করিতে পারে না, আমি অজর, অমর ও অব্যয়", তাহাকে ফাঁসী দিয়া শাসকশক্তি শাসনদণ্ডের অমর্য্যাদা করিয়াছেন কি না, বুঝিয়া দেখিতে পারেন। দণ্ডের উদ্দেশ্য যদি অপরাধীর মনে ভীতির সঞ্চার করা হয়, দর্শকদের চিত্তে বিভীষিকার তরঙ্গ জাগাইয়া তোলা হয়, তাহা হইলে দণ্ডিতের ব্যবহারে এবং দেশবাসীর শোভাযাত্রায় তাহা কি ব্যর্থ হয় নাই?

প্রাণদণ্ড প্রগতিশীল উন্নত মানব-সভ্যতার পরিপন্থী বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। জীবিত অবস্থায় মানুষ যদি আত্মকৃত অপরাধের জন্য অনুতাপের অবকাশ না পায়, তাহা হইলে দণ্ডদানের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া থাকে। সভ্যমানবের দীর্ঘকালের ইতিহাস মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছে, কঠোরতম শারীরিক দণ্ডে অপরাধপ্রবৃত্তি প্রশমিত না হইয়া উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে।
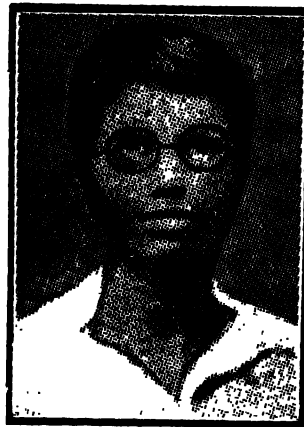
দীনেশচন্দ্র গুপ্ত

দীনেশ গুপ্ত হীন স্বার্থ বা প্রতিহিংসা-প্রণোদিত হইয়া কায করে নাই, হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ জষ্টিশ বাকল্যাণ্ড তাঁহার রায়ে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। কলিকাতা কর্পোরেশন সভায় মেয়র ডাঃ বিধানচন্দ্র দীনেশ গুপ্তের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি-প্রদান সম্পর্কে বলিয়াছেন, "দীনেশ গুপ্তের সাহস ও দেশপ্রেম যতই বিপথে চালিত হইয়া থাকুক না কেন, আমরা তৎপ্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করিয়াই পারি না।"

এই তরুণ যুবকের কার্য্যপদ্ধতির প্রতি দেশবাসীর শ্রদ্ধা না থাকিতে পারে, কিন্তু যে ঈশ্বরবিশ্বাসী যুবক মৃত্যুকে এমন ভাবে জয় করিতে পারে, ইতিহাস তাহার স্মৃতি চিরকালই বক্ষে বহন করিয়া চলিবে, এ কথা শাসকবর্গ অবশ্যই স্বীকার করিবেন।

১৯২৯-৩০ খৃঃ অব্দের ভারত

ভারতবর্ষের ১৯২৯-৩০ খৃষ্টাব্দের সরকারী শাসন-বিবরণ গত ৩রা জুলাই তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি ৪ শত ৫৯ পৃষ্ঠায় পূর্ণ, তাহা ছাড়া সূচি ও পরিশিষ্ট অংশ আছে। কতকগুলি চিত্রও ইহাতে সন্নিবিষ্ট আছে। গ্রন্থে জ্ঞাতব্যবিষয়

...ক আছে। কিন্তু এই রিপোর্ট যে সময়ে প্রকাশিত হওয়া উচিত ছি., তাহাতে যথেষ্ট বিলম্ব হইয়াছে। 'ষ্টেটশম্যান' পত্র এই হেতু মন্তব্য করিয়াছেন যে, "যে অর্থ এই গ্রন্থ-প্রণয়নে ব্যয়িত হইয়াছে, তাহা ব্যয় করা কর্ত্তব্য হইয়াছে কি না, ব্যয়সঙ্কোচ কমিটীর পক্ষে তাহা বিবেচনা করিবার কথা বটে।" বস্তুতঃ এই হিসাবে এই প্রকৃতির সরকারী রিপোর্ট প্রকাশ করা বন্ধ করিয়া সরকারের ব্যয়সঙ্কোচ করিলে অন্য প্রয়োজনীয় বিষয় বাবদে ব্যয়ের সুবিধা হইতে পারে। আর একটা কারণেও এই প্রকৃতির রিপোর্টের প্রচার বন্ধ করা উচিত। দেশের রাজনীতিক অবস্থা সম্বন্ধে এই প্রকৃতির রিপোর্টে যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করা হয়, তাহাতে সরকার পক্ষের প্রচারকার্য্য অবাধে চালানো হয় বটে, কিন্তু জনসাধারণের কোন উপকার না হইয়া অপকারই হইয়া থাকে। বিদেশী জাতিরা এই রিপোর্ট পাঠ করিয়া এ দেশের মুক্তির আন্দোলন সম্বন্ধে বিকৃত ধারণা করিতে পারে। উহা দেশের পক্ষে মঙ্গলকর নহে। সুতরাং সরকারী অর্থে (যাহা প্রজার প্রদত্ত রাজস্ব মাত্র) প্রজার অযথা নিন্দা প্রচার করিবার প্রয়োজন কি ? অবশ্য শিক্ষা,স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে এই প্রকৃতির রিপোর্টে জানিবার কথা থাকে, কিন্তু দোষের অনুপাতে এই গুণের ভাগটা যে সামান্য, তাহাও অস্বীকার করা যায় না। যদি সরকার যথার্থই নিরপেক্ষভাবে এই ভাবের বার্ষিক শাসন-বিবরণ যথাসময়ে প্রকাশ করিতে পারেন, তবে ইহাদের সার্থকতা থাকে, অন্যথা এই অপব্যয় এই অর্থকৃচ্ছ্রতার দিনে বন্ধ করিয়া দিলে দেশের মঙ্গল করিতে পারিবেন।

পণ্ডিত হরিহর শাস্ত্রী

বারাণসী হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গসাহিত্যের খ্যাতনামা অধ্যাপক, কাশী, জয়পুর ও কলিকাতার বিভিন্ন সংস্কৃত শিক্ষাকেন্দ্রের পরীক্ষক শাস্ত্রী মহাশয় অকালে—মাত্র ৪২ বৎসর বয়সে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। সংস্কৃত-সাহিত্যে সুপণ্ডিত শাস্ত্রী মহাশয় অনেকগুলি বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের লেখক ছিলেন। সংস্কৃত ভাষাতেও তিনি "তর্কসংগ্রহ" ও "দীপিকার" "ন্যায়সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলীর" শব্দখণ্ডের এবং খণ্ডে খণ্ডে "ন্যায়লীলাবতী"র টীকা-টিপ্পনী প্রকাশ করিয়া এবং "প্রবন্ধ-পঙ্কজ" প্রভৃতি বিবিধ পাঠ্য-গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। তাঁহার রচনায় যুক্তি ও তর্কের সমন্বয় প্রশংসার্হ। বেদান্ত ও ন্যায়শাস্ত্রে শাস্ত্রী মহাশয়ের বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল। শাস্ত্রী মহাশয়ের অশীতিপরা জননী নিদারুণ পুত্রশোক পাইলেন। এ শোকের সান্ত্বনা নাই।

মিঃ রুস্তমজি ধোতিওয়ালা

ভারতীয় সিনেমা জগতের ঐন্দ্রজালিক নীরব কর্ম্মবীর মিঃ রুস্তমজি কারসেটজি ধোতিওয়ালা বিগত ৫ই জুন তারিখে সাধনোচিত ধামে গমন করিয়াছেন। সপ্তদশ বর্ষ বয়সে, বিগত ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে রুস্তমজি মেসার্স জে. এফ. ম্যাডান্ কোম্পানীর কারবারে এক জন সামান্য সহকারিরূপে প্রবেশ করেন। পরে মিঃ ম্যাডান্ যখন চলচ্চিত্র বিভাগ প্রতিষ্ঠিত করিয়া রঙ্গজগতে প্রতিষ্ঠালাভ করেন, তখন রুস্তমজিও তাঁহার সহায়তার অবতীর্ণ হন। তাঁহারই পরিশ্রম ও যত্নে ম্যাডানের চলচ্চিত্র বিভাগ উন্নতির উচ্চতর স্তরে উপনীত হয়। প্রতিভাবান্ ব্যবসায়ী মিঃ ম্যাডান রুস্তমজির কর্ম্মানুরাগে—সুযোগ্যতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন। কর্ম্মের দায়িত্ব তাঁহাকে জীবনের বহু ভোগসুখ ও আরামে বঞ্চিত রাখিয়াছিল। তাঁহার জীবনকথা আলোচনা করিলে মনে হয়, এই সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠান সুপরিচালনের জন্য তিনি অকাতরে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। সমগ্র কর্ম্মজীবনের মধ্যে তিনি এক সপ্তাহকালও পূর্ণ বিশ্রামসুখ উপভোগ করিয়াছেন কি না সন্দেহ। বিনয়, সৌজন্য, মিষ্টভাষণ তাঁহাকে সর্ব্বজনপ্রিয় করিয়াছিল। কেবল পার্শী সম্প্রদায় নহে—বিনয়-নম্র ব্যবহারে এবং হৃদয়ের ঔদার্য্যে ও মাধুর্য্যে তিনি সর্ব্বসম্প্রদায়ের প্রীতি-শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছিলেন। কর্ম্মসূত্রে তিনি যাঁহার সহিতই সংশ্লিষ্ট হইয়াছিলেন, তিনিই তাঁহার একান্ত গুণমুগ্ধ হইয়াছেন। ম্যাডান্ চলচ্চিত্র বিভাগে তাঁহার নায়কত্বের অভাব যে বিশেষ ভাবেই অনুভূত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার মত আদর্শ কর্ম্মবীরের কর্ম্মানুরাগ বাঙ্গালীমাত্রেরই শিক্ষণীয়।

মিঃ রুস্তমজি ধোতিওয়ালা

পরলোকে শৈলেন্দ্রনাথ বসু

সুপ্রসিদ্ধ মোহনবাগান ক্লাবের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শৈলেন্দ্রনাথ বসু দেহত্যাগ করিয়াছেন। ফুটবল-ক্রীড়ারসিকমাত্রেই এই প্রসিদ্ধ ক্রীড়া-বীরের নামের সহিত সুপরিচিত। যে সময়ে বিজয়ী মোহনবাগানের গৌরব-গর্ব্বে বাঙ্গালীমাত্রেরই হৃদয় উদ্দীপিত হইয়াছিল—সেই সময়ে শৈলেন্দ্রনাথই তাহার নায়ক ছিলেন। শুধু ফুটবল নহে, শৈলেন্দ্রনাথ অন্য নানাপ্রকার শারীরিক ব্যায়ামেরও ভক্ত ছিলেন। বাঙ্গালীর গৌরবস্বরূপ স্বনামধন্য ভূপেন্দ্রনাথ বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র শৈলেন্দ্র-নাথ, বাঙ্গালী পল্টনের অন্যতম নায়ক-রূপে মহাযুদ্ধের সময় মেসোপটেমিয়ায় গমন করিয়াছিলেন। গৃহের ভোগ-বিলাস ও স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রা তাঁহাকে গৃহে আবদ্ধ রাখিতে পারে নাই। রণক্ষেত্রে নায়করূপে তিনি কর্ম্মনৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া কর্তৃপক্ষের প্রশংসা-ভাজন হইয়াছিলেন। তাঁহার অকালবিয়োগে আমরা প্রিয়জনবিয়োগবেদনা অনুভব করিতেছি।

শৈলেন্দ্রনাথ বসু

সতীশচন্দ্র রায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি, একনিষ্ঠ সাহিত্য-সেবক সতীশচন্দ্র রায় তাঁহার বাসগ্রাম ধামগড় হইতে পরলোকযাত্রা করিয়াছেন। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ হইতে সংস্কৃত ভাষায় এম, এ পরীক্ষা দিয়া তিনি সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগবশতঃ তিনি সংস্কৃতের অধ্যাপনা ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার সাহিত্য-সাধনার প্রধান ফল "পদ-কল্পতরু" সম্পাদন। জয়দেব-রচিত "গীতগোবিন্দ," কালিদাসের "মেঘদূত" প্রভৃতি অমর গ্রন্থের কবিতার অনুবাদ করিয়া তিনি যশোলাভ করিয়াছিলেন। "অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী" সংগ্রহ করিয়া তিনি বাঙ্গালীমাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। ভবানন্দ-বিরচিত "হরিবংশ" নামক একখানি প্রাচীন কাব্য সম্পাদনেও তাঁহার কৃতিত্ব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। তাঁহার ন্যায় এক জন একনিষ্ঠ সাহিত্য-সেবককে হারাইয়া বাঙ্গালা সাহিত্য যে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

দেশসেবক কে?

বাঙ্গালায় কংগ্রেস-দ্বন্দ্বের মীমাংসা করিতে বাহিরের শ্রীযুক্ত মহাদেব অ্যানে আসিয়াছেন! ইহা হইতে লজ্জা ও অপমানের কথা কি আছে? এখনকার যুগে এমন দেশকর্ম্মী দেখা দিয়াছে, যাহারা সভায় বয়োজ্যেষ্ঠ নেতাকে অপমান করে, যাহারা দলাদলির জন্য অপর পক্ষের মিথ্যা কুৎসা-গ্লানি রটাইয়া থাকে, জাল-জুয়াচুরি, তঞ্চকতা, প্রবঞ্চনা—এমন কি, রক্তারক্তি কাণ্ডেও লিপ্ত হয় বলিয়া শুনা যায়। ইহারা দলের কর্তৃত্ব হস্তগত করিবার সুযোগ ত্যাগ করে না। ইহাই কি দেশসেবকের কর্ত্তব্য? মহাত্মা গন্ধী বোম্বাইএর হিন্দুস্থানী সেবাদলের পরীক্ষোত্তীর্ণ স্বেচ্ছাসেবকগণকে প্রশংসা-পত্র প্রদান উপলক্ষে বলিয়াছেন, "আমাদের মধ্যে প্রকৃত সেবার ভাব নাই। ক্ষমতাপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় বিভিন্ন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মিগণ অর্থব্যয় করিয়া জঘন্য আবহাওয়ার সৃষ্টি করিতেছে। যিনি পদগৌরবের লালসায় অধীর না হইয়া দৃঢ়চিত্তে সামান্য সেবকরূপে কার্য্য করিয়া যান, তিনিই প্রকৃত দেশ-সেবক।" দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নেতার সারগর্ভ উপদেশ ক্ষমতালোলুপ কর্ম্মী ও নেতৃগণ মনে প্রাণে অনুভব করিতে পারিবেন কি?

গুণের পুরস্কার

খিদিরপুর পল্লীর স্বনামখ্যাত ব্যবহারাজীব পরলোকগত সতীশ-চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, মহাশয় কলিকাতা করপোরেশানের অন্যতম কমিশনার ছিলেন। কমিশনাররূপে তিনি খিদিরপুর অঞ্চলের জনসাধারণের সেবায় সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। মেয়র ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় করপোরেশানের কাউন্সিলারদের কক্ষে তাঁহার প্রতিকৃতি উন্মোচন করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার গুণের মর্য্যাদা রক্ষিত হইয়াছে। কলিকাতার নাগরিকগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া তিনি যে কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা কলিকাতার ইতিহাসে জাগরূক হইয়া রহিবে।

সম্পাদক—শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।

বসুমতী প্রেস] সাকির স্বপ্ন [শিল্পী—শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ

১০ম বর্ষ] শ্রাবণ, ১৩৩৮ [৪র্থ সংখ্যা

মহাকবি তুলসীদাস গোস্বামী

মহাকবি তুলসীদাস গোস্বামীর সুধারসস্যন্দিনী কবিতার আস্বাদন অনেক শিক্ষিত বাঙ্গালীই করিয়া থাকেন, সুতরাং শিক্ষিত বাঙ্গালী নর-নারীগণের নিকট তাঁহার নূতন করিয়া পরিচয় দিবার বিশেষ আবশ্যকতা আছে, ইহা মনে হয় না; তথাপি তাঁহার সম্বন্ধে আমি কিছু বলিতে চাহি। কেন যে বলিতে চাহি, তাহাও বলিতেছি। হিন্দী ভাষার কবিগণের মধ্যে মহাকবি সুরদাস ও তুলসীদাস যে সর্ব্বোচ্চ পদে সমারূঢ়, তাহা সকলেই জানেন। উভয়েই ভগবদ্ভক্তি-রসের অতুলনীয় কবি। ভাবের গাম্ভীর্য্যে, সরল ও মধুর পদবিন্যাসে ও ললিতকল্পনাময়ী অসামান্য প্রতিভায় উভয়ের সমকক্ষ হিন্দী কবিকুলের মধ্যে আর কেহই নাই, ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই দুই মহাকবির অমর কবিতাবলীর তুলনামূলক সমালোচনা করিবার সামর্থ্যও আমার ন্যায় হিন্দী ভাষায় সামান্য জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে সম্ভবপর নহে, তাহা আমি বিলক্ষণ বুঝি; সুতরাং সে বিষয়েও আমি এখানে কিছু বলিতে চাহি না। মহাকবি তুলসীদাসের কবিতাবলি পাঠ করিয়া তাহাতে যে অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য আমার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, তাহা হিন্দী-কবিতা-রসাস্বাদনপর সহৃদয় বাঙ্গালী-মাত্রেরই প্রীতিপ্রদ হইবে, এই বিশ্বাসে আমি তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। আমার যাহা ভাল লাগিয়াছে, তাহা সকলের ভাল লাগিবে কি না, তাহা আমি এখনও বুঝিতে পারিতেছি না। কিন্তু যদি কাহারও তাহা প্রীতিপ্রদ হয়, এই আশায় আমি আলোচনা করিতেছি, এই মাত্রই আমার ইহাতে আত্মপক্ষসমর্থন।

সুরদাস ও তুলসীদাস উভয় মহাকবির কাব্যসৃষ্টির মূলীভূত উপাদান সংস্কৃত কাব্য ও পুরাণ হইতেই সংগৃহীত, সুতরাং অবান্তর-বস্তুকল্পনায় ইঁহাদের স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণভাবে বিদ্যমান থাকিলেও প্রধান বস্তুবিষয়ে ইঁহারা যে স্বতন্ত্র ছিলেন না, তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেরই সুবিদিত; সুতরাং সে বিষয়ে আমার অধিক বলিবার কিছু নাই, তুলসীদাসও ইহা নিজ কাব্যের প্রথমে স্পষ্টই বলিয়াছেন,—

"মুনিন প্রথম হরিকীরতি গাই।
তেহি মগ চলত সুগম মোহি ভাই॥"
"অতি অপার জে সরিত বর,
জো নৃপ সেতু করাহি।
চড়ি পিপীলিকা পরম লঘু
বিনু শ্রম পারহি জাহি॥"
মুনিগণ গাহিলেন কীর্ত্তি শ্রীহরির!
চলিতে সুগম সেই পথ মোর স্থির॥

সেই জলনিধি হয় অতি সুদুস্তর।
তাহে যদি বাঁধে সেতু কোন নৃপবর॥
অতি ক্ষুদ্র পিপীলিকা চড়িয়া তাহায়।
না করিয়া পরিশ্রম পারে চলি যায়॥

সংস্কৃত-কবিগণের বর্ণিত মূল বস্তুর বর্ণনার উপর নির্ভর করিয়া ভাষা-কবিতা যাঁহারা রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই প্রায় প্রচুরভাবে সংস্কৃত-কবিতা-রচনা-প্রণালীর অপরিহার্য্য রীতি, ভাব ও অলঙ্কার-সমূহের যে অনুকরণ করিয়া থাকেন, ইহাতে বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই। বরঞ্চ ইহাই স্বাভাবিক, সুতরাং সংস্কার, শিক্ষা ও অভ্যাস বশতঃ তুলসীদাসও যে এই প্রাচীন ভাষা-কবিগণের অবলম্বিত পথেরই অনুসরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহাও স্থির। সংস্কৃত সাহিত্যে যে সকল মহাকবির উদ্ভাবিত শব্দ ও অর্থগত অলঙ্কার, তাহাই নিজ মাতৃভাষাতে অনুবাদ করিয়া বহু কবিই ভাষা-সাহিত্যে প্রভূত যশ অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। আদিকবি বাল্মীকি ও মহাকবি কালিদাস প্রভৃতির উদ্ভাবিত উপমা, উৎপ্রেক্ষা, দৃষ্টান্ত, প্রতিবস্তূপমা ও নিদর্শনা প্রভৃতি অর্থালঙ্কারের সন্নিবেশে ভাষাকবিগণের অনুবাদাংশে সুতরাং গতানুগতিকতার প্রাচুর্য্য নিঃসন্দিগ্ধভাবেই উপলক্ষিত হইয়া থাকে। মহাকবি তুলসীদাসও এই পথে চলিতে কোনপ্রকার দ্বিধাবোধ করেন নাই, ইহা সত্য। কিন্তু অনেক স্থলেই তাঁহার কল্পনা এই ভাষাকবিগণের অনুসৃত পন্থাকে একবারে পরিত্যাগ করিয়াছে। মহাকবি কালিদাস উপমালঙ্কার-সৃষ্টি দ্বারা বহু স্থলে আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকির সমকক্ষতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, ইহা সংস্কৃত-কাব্যরসিক ব্যক্তিমাত্রেরই সুবিদিত। তাই এখনও সংস্কৃত-সাহিত্যবিদ্গণের মধ্যে "উপমা কালিদাসস্য" এই প্রবাদবচন শ্লাঘার সহিত উচ্চারিত হইয়া থাকে। সংস্কৃত ভাষার সাহিত্যে মহাকবি কালিদাসের অসামান্য সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কার-সৃষ্টিজনিত গৌরব এ পর্য্যন্ত কোন সংস্কৃত-কবি নূতন মৌলিক অলঙ্কার-সৃষ্টির দ্বারা খর্ব্ব করিতে সমর্থ হয়েন নাই, ইহা ধ্রুব সত্য। হিন্দী প্রভৃতি ভাষা-সাহিত্য-রচয়িতা কবিগণও নূতন অলঙ্কার-সৃষ্টি-বিষয়ে সংস্কৃত-কবিগণের ন্যায় মহাকবি কালিদাসের সমকক্ষতা পান নাই, ইহাও ধ্রুব সত্য; কিন্তু মহাকবি তুলসীদাসের কবিতাবলিতে এই নিয়মের ব্যতিক্রম কবিগণ অপেক্ষা মহাকবি তুলসীদাসের ইহা হইল প্রণিধান-যোগ্য অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সাদৃশ্যমূলক অর্থালঙ্কার সৃষ্টি করিয়া পাঠকগণের হৃদয়ে রসসৃষ্টির অনুকূল অসাধারণ বিস্ময় উৎপাদন করিতে তিনি যে মহাকবি কালিদাস অপেক্ষা ন্যূন শক্তিসম্পন্ন ছিলেন না এবং ইহা তাঁহার কবি-জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল, কয়েকটি উদাহরণ দ্বারা তাহাই আমি এই প্রবন্ধে দেখাইতে চাহি।

তাঁহার রামায়ণ কাব্যের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার এই বৈশিষ্ট্য প্রতি পত্রেই সুস্পষ্টভাবে উপলক্ষিত হইয়া থাকে। উদাহরণরূপে আমি এই প্রবন্ধে গুটি কয়েক স্থল মাত্র উদ্ধৃত করিতেছি। আশা এই যে, কাব্য-রসামোদী ব্যক্তিগণ তাহা দেখিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিবেন, এবং আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত হিন্দীভাষা-কবিতাকাশে শারদ পূর্ণচন্দ্রসদৃশ মহাকবি তুলসীদাস গোস্বামীর অমর কাব্য তুলসীদাসী রামায়ণের স্বতন্ত্রভাবে অধিক অনুশীলন দ্বারা অপার আনন্দ অনুভব করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিবেন।

ভক্ত-প্রধান তুলসীদাস শ্রীরামচরিত-বর্ণনে উদ্যত হইয়া নিজের অশক্তিজ্ঞান সত্ত্বেও নিজ রচিত কাব্যে সকলের রুচি কেন হইবে, তাহাই বুঝাইবার জন্য বলিতেছেন—

"প্রিয় লাগহিঁ অতি, সবহিঁ মম ভণিত রাম-যশ-সঙ্গ।
দারু বিচার কি করহি কোউ বন্দিয় মলয়-প্রসঙ্গ॥"

"আমার সকল কথা হবে সর্ব্বপ্রিয় তথা
শ্রীরামের সুযশের সঙ্গে।
করে কি হে কোন জনে দারুর বিচার মনে
পূজনীয় মলয়প্রসঙ্গে॥"

সাধু ও খলের চরিত-বর্ণনপ্রসঙ্গে—

"সন্ত অসন্তনকী অসকরণী—
জিমি কুঠার চন্দন আচরণী।
কাটে পরশু, মলয়জ সুনু ভাই
নিজ গুণ দেই সুগন্ধ বসাই।
তাতে সুর শীসন চঢ়ত—
জগবল্লভ শ্রীখণ্ড।
অনল দাহি পীটত ঘনহি,
পরশুবদন যাহ দণ্ড॥"

"সাধু অ-সাধুর ভ্রাতঃ! করণ কেমন

শুন ভ্রাতঃ কাটে যবে চন্দনে কুঠার
চন্দন সুগন্ধ তারে দেয় আপনার ॥"

"দেবতার শিরোপরে তাহে আরোহণ করে
জগতের বল্লভ শ্রীখণ্ড।
অনলে দহিয়া পুন পিটি তায় ঘন ঘন
কামার কুঠারে দেয় দণ্ড ॥"

সাধু ও খলের সঙ্গে কি পরিণতি হয়, তাহার বর্ণনা-প্রসঙ্গে—

"গগন চঢ়ৈ রজ পবনপ্রসঙ্গা
কীচই মিলই নীচ জলসঙ্গা।"
"গগনেতে চড়ে রজ পবন-প্রসঙ্গে।
কর্দ্দমে মিলিত হয় নীচ জলসঙ্গে ॥"

খলের স্বরূপ-বর্ণনপ্রসঙ্গে—

"পর অকাজ লগি তনু পরিহরহী।
জিমি হিম উপল কৃষীদল গরহী ॥"
"পরের অকাজে তনু ত্যাগ করে খলে।
শস্যরাশি নাশি যথা হিমশিলা গলে ॥"

শঠ ব্যক্তিও সাধুসঙ্গে কিরূপ হয়—

"শঠ সুধরহি সতসঙ্গতি পাই।
পারশ পরশি কুধাতু সুহাই ॥"
"সংশোধিত হয় শঠ সুসঙ্গ পাইয়া।
কুধাতু সুন্দর হয় 'পরশ' ছুঁইয়া ॥"

অপর দিকে অসাধু-সঙ্গে সাধুর কোন পরিবর্ত্তন সম্ভবপর নহে-

"বিধিবশ সুজন কুসঙ্গতি পরহিঁ।
ফণিমণি সম নিজগুণ অনুসরহিঁ ॥"
"বিধিবশে পড়িলে কুসঙ্গে সুজন।
ফণি-শিরে মণি, গুণ ভুলে না আপন ॥"

সাধু ব্যক্তির ব্যবহার সকলের প্রতিই একরূপ হয়—

"বন্দৌঁ সন্ত সমান চিত,
হিত অনহিত নহিঁ কোউ।
অঞ্জলিগত শুভ সুমন জিমি
সম সুগন্ধকর দোউ।"

"সজ্জনে বন্দনা করি, সমভাব সর্ব্বোপরি,
প্রিয়াপ্রিয় কেহ যাঁর নয়।
কুসুম অঞ্জলিগত, সুগন্ধিকরণে রত,
সমভাবে যেন হস্তদ্বয় ॥"

রাম-নামের মহিমা-বর্ণন-প্রসঙ্গে—

"রাম-নাম মণি-দীপ-ধরু
জীহ দেহরী দ্বার।
তুলসী ভীতর বাহিরৌ
জো চাহসি উজিয়ার ॥"

"রাম-নাম মনোহর মণির প্রদীপকর
দেহ দ্বার জিহ্বায় স্থাপিত।
তুলসী কহিল সার যদি বাঞ্ছা করিবার
ভিতর বাহির আলোকিত ॥"

নীচাশয় ব্যক্তিকে সাহায্যদানে যে সমুন্নত করে, তাহার পরিণাম কিরূপ হয়, তাহার বর্ণনপ্রসঙ্গে—

"যে হিতে নীচ বড়াই পাবা।
সো প্রথমহি হঠি তাহি নশাবা ॥
ধূম অনল সম্ভব সুনু ভাই।
তেহি বুঝাব ঘন পদবী পাই ॥
রজ মগপরী নিরাদর রহই।
সবকর পদপ্রহার নিত সহই ॥
মরুত উড়াই প্রথম সোভরই।
পুনি নয়ন কিরীটন পড়ই ॥"
"যার বলে নীচ নিজে সমুন্নত হয়।
উচ্চে উঠি তাহাকেই আগে করে লয় ॥
অগ্নিবলে বাষ্প হয়ে উচ্চে উঠে বারি।
ঘন হয়ে করে পুন বিনাশ তাহারি ॥
পথ-মাঝে ধূলি অনাদরে পড়ি রহে।
পদ-পরহার সকলেরি নিত সহে ॥
উড়াইলে বায়ু আগে তাহাকেই ভরে।
নৃপের মুকুটে নেত্রে পড়ে তার পরে ॥"

হরিভক্তিহীন মোক্ষসুখও বিবেকিগণের স্পৃহণীয় হইতে পারে না—

"জিমি থল বিনু জল রহি ন সকাই।
কোটি ভাঁতি কৌউ করে উপাই ॥
তথা মোক্ষ-সুখ খগরাই।
রহি ন সকৈ হরিভক্তি বিহাই ॥
অস বিচারি হরিভক্ত সয়ানে।
মুক্তি নিরাদরি ভক্তি লুভানে ॥"

"থল বিনা জল যেন রহিতে না পারে।
করিলেও সুযতন বিবিধ প্রকারে ॥
সেইরূপ মোক্ষ-সুখ শুন খগপতি।
রহিতে না পারে ত্যজি হরির ভকতি ॥
এরূপ বিচার করি দক্ষ হরির ভকত।
মুক্তি অনাদরি সদা ভকতিতে রত ॥"

ভক্তি বিনা সাধু ব্যক্তির হৃদয় থাকিতেই পারে না।

"রামভক্তি জল, মম মন মীনা।
কিমি বিলগায় মুনীশ-প্রবীণা ॥"

"রামের ভকতি জল, মম মন মীন।
কিরূপে হইবে ভিন্ন মুনীশ-প্রবীণ ॥"

ভক্ত ও শ্রীভগবান্ এই দুইএর মধ্যে কে বড় ?

"মোরে মন প্রভু অসবিশ্বাসা।
রামতে অধিক রামকর দাসা ॥
রাম সিন্ধু, ঘন সজ্জন ধীরা।
চন্দন-তরু হরি, সন্ত সমীরা ॥"

"মোর মনে প্রভু এই সুদৃঢ় বিশ্বাস।
রাম চেয়ে গুরুতর শ্রীরামের দাস ॥
শ্রীরাম সাগর, ঘন সম সাধু ধীর।
চন্দনের তরু হরি, সজ্জন সমীর ॥"

উপরে যে কয়টি উদাহরণ প্রদর্শিত হইল, বর্ত্তমান প্রবন্ধের পক্ষে তাহাই আমি পর্য্যাপ্ত বিবেচনা করি। সহৃদয় পাঠক দেখিবেন, ঐ সকল উদাহরণে মহাকবি তুলসীদাস গোস্বামী দৃষ্টান্ত প্রভৃতি যে সকল সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কারের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা তাঁহারই মৌলিক কল্পনা-প্রসূত। এই জাতীয় অলঙ্কার-সৃষ্টিতে তাঁহার শক্তি অসাধারণ, স্থানাভাব বশতঃ তাঁহার ভুবনপ্রসিদ্ধ রামায়ণ হইতে আমি অতি অল্পমাত্রই উদ্ধৃত করিতে পারিয়াছি। তুলসীদাস গোস্বামীর অমর ভাষা রামায়ণ কাব্যের সহিত যাহার বিশিষ্ট পরিচয় আছে, তিনিই জানেন—তৎকৃত রামায়ণের প্রতি পত্রেই এইরূপ অসাধারণ অলঙ্কার-সৃষ্টির বিস্ময়াবহ পরিচয় প্রভূত পরিমাণে পাওয়া যায়। আজ আর সময় নাই। অবসর পাইলে হিন্দী ভাষার মহর্ষি বাল্মীকিকল্প তুলসীদাস গোস্বামীর কাব্য-রচনাতে আরও অনেক প্রকার প্রণিধানযোগ্য বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করিবার আশা হৃদয়ে পোষণ করত আমি এই প্রবন্ধের শেষ করিলাম। পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এই প্রবন্ধে—"—" এইরূপ চিহ্ন দ্বারা অঙ্কিত বঙ্গভাষার পদ্যানুবাদগুলি আমার রচিত নহে, এগুলি তুলসীদাস-কৃত ভাষা-রামায়ণের পদ্যে অনুবাদক শ্রীযুক্ত মদনমোহন চৌধুরী বি, এল মহোদয়ের রচিত। এই কারণে আমি তাঁহার প্রতি আমার বিনয়পূর্ণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ (মহামহোপাধ্যায়)।

অশ্বত্থ

১

তৃষাশীর্ণ, দাহদীর্ণ ভূখণ্ডের ধ্যান-শতদলে
হে তরুদৈবত তুমি নীলাভ্রের চন্দ্রাতপতলে
সূর্য্যাতপধারা-স্নাত। নমি তোমা দেব বনস্পতি।
অর্হৎ শ্রমণ ভিক্ষু যুগে যুগে কত দণ্ডী যতি
তপঃকৃচ্ছ্র সাধনায় লভিয়াছে ব্যজন সরস
স্বিন্ন-তপ্ত-ভালতটে বাৎসল্যের অঞ্চল-পরশ।
সহস্র প্রশাখা দিয়া রচিয়াছ একাই আশ্রম,
শিখায়েছ তপোক্রম আশ্রিতেরে কঠোর সংযম
আপনি আচরি ধর্ম্ম। পর্ণত্বক্ পাংশুল মলিন
যুগে যুগে কুণ্ডলিত হোমধূম তব অঙ্গে লীন।
ছায়াচ্ছন্ন মায়ামন্ত্রে রচিয়াছ তীর্থ ঘাটে ঘাটে
কান্তারে, প্রান্তরে, বনে, জনপদপুর-বাটে-বাটে
বোধিক্ষেত্র, দীক্ষাকেন্দ্র, তপঃসিদ্ধি-মন্ত্রৌষধিদানে,
দানসত্র তব অঙ্ক, মিলে যথা প্রজ্ঞানে বিজ্ঞানে।

নাইয়া ধ্যানরস চিত্তে তুমি টান ঊর্দ্ধপানে
মুমুক্ষু মুক্তির আগে তব অঙ্কে স্বাদ তার জানে।
শাখায় জাগে না পুষ্প মূলে তাই এত পুষ্প জুটে?
তলে তাই যোগীদের দিব্য নেত্রে বোধিপদ্ম ফুটে?
পায়নিক স্বাদু ফল তব শাখে তাঁদের রসনা
চতুর্ব্বর্গফলে তাই পূরালে কি সে মনোবাসনা?

বানপ্রস্থ-সংসারের মধ্যপথে যাত্রীদের লাগি
রচিয়াছ ধর্ম্মশালা, বিনা শুল্কে সর্ব্বস্ব তেয়াগি,
চরম শরণ্যা অম্বা মৃত্তিকার হে জ্যেষ্ঠ সন্ততি,
মৈত্রী প্রীতি বাৎসল্যের তুমি শ্যাম মিশ্র পরিণতি।
চাহিয়া তোমার পানে, স্মরি নিজ জীবন নশ্বর
কত দণ্ডী বৃথা আর এ জীবনে বাঁধে নাই ঘর।

আতপ্ত করি ও মূল সন্ন্যাসীরা ধুনীর অনলে,
স্বর্গ-কল্পপাদপের স্বপ্ন দেখে তব অঙ্কতলে,
বেদিয়ারা ঘুরে ঘুরে তব অঙ্কে রচিয়া আস্তানা,
চলে দীর্ঘ ভবপথ। তাহাদের ছিন্ন কন্থাখানা
অশুচি মৃন্ময় পাত্র, ঝোলা-ঝুলি ঝুলে তব শাখে;
তাদের সর্ব্বস্ব-ধন অকপটে সঁপিয়া তোমাকে
নিশ্চিন্ত সংসার পাতে। দোলে শিশু বাঁশের দোলায়
তোমারি বাৎসল্য তারে ঝিল্লীতানে আদরে ভোলায়।

সর্ব্বস্ব গিয়াছে যার, সংসারে যে হয়েছে নির্ম্মম
গৃহ যার অগ্নি-দগ্ধ—গৃহ যার অগ্নিগৃহ-সম
লাঞ্ছিত করেছে যারে প্রিয়জন বিশ্বাসঘাতক,
কুষ্ঠ, দৃষ্টিহীনতায় ব্যক্ত যার প্রাক্তন পাতক,
সবাই তোমারি অঙ্কে একে একে জুটে ভাগ্যক্রমে,
রুক্ষ প্রকৃতির মাঝে তব তীর্থে, আতুর আশ্রমে,
বর্ষায় তলের মাটী ক্ষয় পেয়ে শিকড়ে জাগায়,
লক্ষ লক্ষ অতিথির পদরজে পুন ঢেকে যায়।

তোমার আশ্রয়ে এসে সর্ব্বজ্বালা পায় অবসান,
যাত্রী যাত্রা ভুলে যায়, পথহারা পথের সন্ধান,
গৃহমুখী পান্থ এসে ভাবে বুঝি গৃহে আসিলাম,
তব মূলে শির রাখি স্মরে তার গৃহেরি আরাম।
অমৃত আস্বাদ তুমি দাও তব আশ্রিতে স্বপনে
লক্ষ রোমকূপ-পথে ছায়ারসে নিভৃতে গোপনে
ঢালো তুমি কোন্ প্রীতি? ছেড়ে যেতে চক্ষে বহে
ধারা, পিছুপানে যত চায় জঙ্ঘা তার হয় বলহারা।
তোমার সহস্র মূল পৃথ্বীতলে নিঃশব্দসঞ্চারে
গুল্ফ ধ'রে টানে তারে ফিরাইতে চায় বারে বারে।

সদাগতি শুব্ধ রয়, পর্ণ তব তবু স্পন্দমান,
সর্ব্বাঙ্গের স্নেহোদ্বেল ইঙ্গিতে সে তোমার আহ্বান,
যোজন দূরের পান্থে ডাক তুমি—"রে তাপিত আয়,
অনাশ্রয় অশরণ কে জুড়াবি শীতল ছায়ায়।"

হে চিরনির্ভর বন্ধু, শাখা ভাঙে বৈশাখী ঝঞ্ঝায়
তবু পান্থ ছুটে গিয়ে তব অঙ্কে আপনা লুকায়,
তুমি বাঁচাইবে ভাবি'। ছুটে তরী আসে তব পাশে,
নিরাশ্রয় মূল তব, তবু সেথা আশ্রয়ের আশে।
তোমারে প্রহরী জেনে পশারিণী যৌবন পশারা
শিরের পশারা সাথে বিছাইয়া ঘুমে সংজ্ঞাহারা।
ও অঙ্কে লুকায় শিশু মার ভয়ে, বিচিত্র কি নয়?
জীবন্ত শরণ্য ভাবি দেবতাও লয়েছে আশ্রয়
তোমার বিরাট দেহে। ভয় পেয়ে গ্রীষ্ম অভিযানে
বসন্ত আশ্রয় লয় তব কাণ্ড-শাখার বিতানে।

সহিয়া দারুণ দাহ, বারিধারা, ঝঞ্ঝা, বজ্রানল,
হে অশ্বত্থ, রচি শ্যাম লক্ষ পত্রে ছত্রের মণ্ডল,
দিকে দিকে প্রসারিয়া ছায়াঘন মায়া আপনার
বিশাল কাণ্ডটি ঘেরি রচিয়াছ প্রকাণ্ড সংসার।
সে সংসারে মেলা বসে মহোৎসবে মাতে নর-নারী,
কেনা-বেচা করে হাটে লক্ষ লক্ষ সংসারী পশারী।
মানুষ ত আসে যায় তার কাছে তব ছায়ামূল,
ভব-সংসারেরি মত। তার চেয়ে সংখ্যায় বিপুল
তাহারা, রচেছে যারা তব কোলে আজন্ম বসতি,
মরণও তোমারি অঙ্কে একমাত্র পার্থিব সঙ্গতি
তাদের তোমারি স্নেহ। শাখে শাখে দুলিছে কুলায়
সহস্র সন্তান তব তব গণ্ডে পালখ বুলায়।

গাহিছ তাদেরি কণ্ঠে, শান্তিসম হে জীবরক্ষক
শরট, করট, ভেক, ইন্দ্রগোপ, ভুজঙ্গ, তক্ষক
কত শত সরীসৃপ, কত কীট পতঙ্গ কত না,
কে জানে তাদের নাম? কে তাদের করিবে গণনা?

কোটরে বল্মীকমূলে বল্কতলে বীজের ভিতরে
জন্মিছে মরিছে কত কালচক্রে যুগযুগান্তরে।
শুধু জীবচক্র কেন? গুল্ম লতা উপরক্ষকুল
কেহ শাখা কেহ কাণ্ড ঘেরিয়াছে কেহ তব মূল।
একটি বিশ্বই যেন করিয়াছ প্রকট ভূমায়,
তাহে তব জীবলোক বাঁচে মরে জাগে ও ঘুমায়।

২

প্রান্তরের মাঝে তুমি অন্তরের ব্রহ্মচিন্তাসম
পথের সম্বল-বল—রসমর্ত্ত তোমা নমোনমঃ।
কেন্দ্রসম আকর্ষিছ সর্ব্বজীবে পরিধিমণ্ডলে,
চারিদিকে পাঠাইয়া আমন্ত্রণী চল পর্ণদলে।
চক্রনেমিসম তুমি সর্ব্বগতি কর নিয়মিত,
যেথা নাই শৈলনদী, সেথা তুমি করেছ চিহ্নিত,
দূরত্ব, সামীপ্য, সীমা, পথ-ঘাট, বসতি সংস্থান,
ক্লান্তি ভুলে পথশ্রান্ত, ভ্রান্ত পায় পন্থার সন্ধান
তোমারে নেহারি দূরে। কোন ঠাঁই রয়নাক দূর
বিশ্বাসে সবল করে পান্থে তব আশ্বাস মধুর।
দীর্ঘ পথে হ্রস্ব কর মাঝখানে করিয়া ছেদন,
দীর্ঘ দিনে হ্রস্ব কর সুপ্তিভরা ছায়ায় যেমন।

রাখাল পাচনি ফেলি লভে বংশীবাদন-কৌতুক,
ধেনুরা নয়ন মুদি ভুঞ্জে মৃদু রোমন্থন-সুখ।
ভূযজ্ঞে ঋত্বিক্‌সম কৃষীবল তোমার ছায়ায়
যজ্ঞফল লাভ আশে স্বিন্ন ভালে রহে প্রতীক্ষায়।
ধীবরবধূরা মিলি ভাগ করে দিনের শিকার
তোমারি সমক্ষে তরু, —করো বুঝি তাহারো বিচার?
অচেনা পথিকগণে তব তলে করি আমন্ত্রণ
নব পরিচয়-ডোরে গ্রামে গ্রামে করিছ বন্ধন।

মরীচিকা আলেয়ায় কোন রাহী আজি পথহারা?
দিগন্ত হরিল কার কুজ্ঝটিকা খর বারিধারা?
প্রান্তর সন্তরি কেবা কোনখানে দ্বীপ নাহি পায়,
ভারাক্রান্ত রোগশীর্ণ বয়োজীর্ণ কেবা ক্লান্তকায়?
ক্ষুধা-তৃষ্ণা-নিদ্রাতুর, দূর ভাঙা হাটের পশারী,—
সবারে অভয় বাণী কহিতেছ গগন বিদারি।

অশক্ত, যষ্টির ভরে চলে আর তোমা পানে চায়
শিবিকা উল্লাসে উচ্চে বোল তোলে হেরিয়া তোমায়,
অন্ধকারে দূর হতে পাছে পান্থ না পারে চিনিতে
লক্ষ খদ্যোতের দীপ শীর্ষে তাই জ্বালাও নিশীথে।
দু'দিনের ব্রত নয়, পালো এরে শতবর্ষ ধরি'
বিরাট এ ব্রতচক্র রেখেছে কি তোমা স্থাণু করি?

মাঠে তৃণ পত্র দেয় ধেনুমুখে, ঘাট স্বাদুনীর,
ছায়া বিনা সবই ব্যর্থ—তৃণ-জল হয় না ত ক্ষীর।
বিরচিত চারি পাশে তাই গোষ্ঠ গোকুলমণ্ডল,
পান্থপল্লী গড়ি উঠে তোমারেই করিয়া সম্বল।
সংসার রয়েছে পাতা নিত্য নব সংসারীর তরে,
বিছানো দূর্ব্বার কন্থা, স্বচ্ছ জল তব সরোবরে,
ঢেলায় উনুন গাঁথা, শুষ্ক কাষ্ঠ, কুলুঙ্গি কোটরে,
সবুজ ছাউনি শিরে, মঞ্চ গড়া বঙ্কিম শিকড়ে,
চারি পাশে গোষ্ঠভূমি, মাঠে মাঠে ফলিছে ফসল
জীবের আর কি চাই? নেই শুধু দ্বন্দ্ব-কোলাহল।
দিনেকের এ সংসার জীবনের কেন নাহি হয়,
ভাবিয়া বিস্মিত তুমি। তব তল কভু শূন্য নয়!

প্রপৌবমণ্ডল সম গ্রামটিকে অন্তরালে রেখে
রাজো তুমি হে গ্রামণী গ্রামবৃদ্ধ। গ্রামান্তর থেকে
তোমারে হেরিয়া রাহী দূর হতে চিনে গ্রামখানি,
দূরের পান্থেরে ডাক দিবাশেষে দিয়া হাতছানি।
অতিথি প্রথম লভে তব পাশে স্নিগ্ধ আপ্যায়ন,
গ্রাম ছেড়ে যায় যেবা তারে কও বিদায়-বচন।
পিতৃ-গৃহে ফিরে যবে কিশোরীটি, শিবিকার ফাঁকে
তোমা দূরে হেরি হর্ষে মার মুখ কল্পনায় আঁকে।
প্রবাসী পুত্রের মাতা তব তলে রহে প্রতীক্ষায়
পাণিতে শাণিত করি ক্ষীণ দৃষ্টি, পথ পানে চায়।
চিরবরণের সভা তব অঙ্ক, প্রিয়জন সাথে
প্রথম মিলনোল্লাস তব ছায়ে প্রথম সাক্ষাতে।
শুধু আবাহন কেন বিসর্জ্জনে করুণ ও কোল,
বোধন-সানাই সনে বাজে হোথা বিজয়ার ঢোল।

স্বজনে বিদায় দিয়া তব শাখা ধরি কত জন
যত দূর দৃষ্টি চলে চেয়ে থাকে সজল নয়ন।

যাদের বুকের ধন গেল চলি তারা, তরুবর,
আছাড়িয়া পড়ে কেঁদে তোমারি ও কোলের উপর।
স্নেহ তব সান্ত্বনায় পত্রে পত্রে বিগলিয়া ক্ষরে,
দণ্ড দুই কেঁদে শেষে তারা তাই ফিরে যায় ঘরে।
বর-বধূ গ্রাম পশে করি তোমা প্রথমে প্রণাম,
মহাযাত্রী শুনে যায় তব অঙ্কে শেষ হরিনাম।

গ্রামবধূগণ মিলি ঘেরি তোমা রচিয়া অঞ্জলি
মাতৃ-হৃদয়ের আর্ত্ত আবেদন যায় তোমা বলি
সন্তানমঙ্গলকামে। তুমি লও সকলের ভার,
কাকুতি করিয়া কত কৃপা যাচো ষষ্ঠীদেবতার।

মন্থন-দণ্ডের মত গ্রামমাঝে তব অবস্থিতি,
আনন্দ-নবনীটুকু তোমা ঘেরি উন্মথিত নিতি।
কত যুগ যুগ হ'তে সুখ-দুঃখ-স্মৃতির সঞ্চয়
সবই তব অঙ্গে আছে—বিশ্বে কিছু পায় না ত লয়—
উপচীয়মান তাহে তনু তব কঠোর শোভন,
কর্কশ করেছে কাণ্ডে, পর্ণশ্রীরে করেছে চিক্কণ।
জীবনের যত রস—নয়নের যত অশ্রুজল
মৃত্তিকার রন্ধ্রপথে ও শ্যামাঙ্গে ফিরেছে সকল।
তোমারে ঘেরিয়া আজো রসোৎসব পুণ্য অনুষ্ঠান
তেমনি চলিছে বন্ধু, কথকতা, রামায়ণগান,
সংকীর্ত্তন, যাত্রা, কবি, মনসার ভাসান, ঝুমুর,
শানায়ে বাজিছে সেই আগমনী বিজয়ার সুর।
গ্রাম্যদেবতারে তুমি মূলপাশে আঁকড়ি ধরিয়া
আজিও রেখেছ বাঁধি অঙ্গ তার সিন্দূরে ভরিয়া।
একা শিলা নহে দেব, জড় সাথে মিলিয়া জীবন
হয়েছে তোমারি অঙ্গে দেবতার জাগর-বোধন।

তব অঙ্কতলখানি প্রভাতের বিচার-ভবন,
মধ্যাহ্নের চতুষ্পাঠী, সন্ধ্যানন্দে প্রীতি-নিকেতন,
বৈকালের পাঠশালা। ইষ্টগোষ্ঠী, সমিতি-সংহতি
তোমারে ঘেরিয়া বসে তুমি তায় মূক সভাপতি।
শিল্পী হোথা রচে কারু, বসি বসি নেহারে অলস,
অঙ্গে তব দোলা দেয় অট্টহাস্যে রসিকের রস।
জমায়ে শিশুর মেলা যাদুকর বিতরে উল্লাস,
তরুণমণ্ডলে বসি গ্রামবৃদ্ধ কহে ইতিহাস।

বৈশাখে তৃষিত ভক্ত তব বক্ষে সম-বেদনায়
জাগায় তৃষ্ণার ব্যথা। সে তৃষ্ণারে কেমনে জুড়ায়?
কোশা ভরি মূলে তব ঢালে গঙ্গাবারি সুশীতল,
কৃতজ্ঞতা? ভক্তি-অশ্রু? যাহা বলো দীনের সম্বল।

কবে বৃদ্ধ-পিতামহী প্রতিষ্ঠিত করি তোমা কুলে,
কুলধর্ম্মতরীখানি বেঁধে গেল তব পাদমূলে।
গঙ্গাজলে বিগলিয়া ভক্তিপূত সেই কুলপ্রথা
তব মূল স্পর্শি বহে। পরিবৃত, হে কুলদেবতা
শতাধিক বৈশাখের শত শত অঞ্জলিমণ্ডলে,
আজি তাঁর স্বর্গ হ'তে বিলম্বিত অঞ্চলের তলে।
রঘুরাজকুলগুরু চিরঞ্জীব বশিষ্ঠের মত
সে কুলের ক্রম ধরি ইষ্টচিন্তা করিছ সতত।

এই বিশ্ব ব্রহ্মময়—তাই বিশ্ব এত রসময়
এ কথা সবাই বলে—তুমি তার দিলে পরিচয়,
কঠোর ইষ্টকশিলা তার মাঝে রসের সন্ধান
তুমি রাখ, ব্রহ্মানন্দে ধ্যানমগ্ন কর তাই পান,
ধূলি হ'তে রস হরি গড়িয়াছ শ্যাম স্নিগ্ধকায়া
রৌদ্রেরে নিঙাড়ি তুমি রচিয়াছ কারুণ্যের ছায়া।

অবিরত স্পন্দমান তব চল পল্লব সকল,
সঙ্কেতে কি বলে নাক এ জীবন এমনি চঞ্চল?
কি সত্য সূচিত অই বিরাটের ভ্রূণকণাবীজে?
এ বিশ্বে প্রকট যিনি তিনি অণোরণীয়ান্ নিজে।
ইষ্টকশিলায় নর রচে তুঙ্গ মন্দির সুন্দর,
অন্ধকারে বদ্ধ দ্বারে বন্দী দেব ব্যথিত কাতর।
তুমি রচ শ্রীমন্দির বিদারি সে দেউলের বুক,
দেবতা লভিয়া মুক্তি অঙ্কে তব লভে শান্তিসুখ।
যুগে যুগে মূঢ় নর রচে তবু দেব-কারাগার
চূর্ণ জীর্ণ করি তায় দেবতারে করিছ উদ্ধার।

শ্রীকালিদাস রায়।

ধর্ম্মদাস

[তৃতীয় ভাগ]

পরিচ্ছেদ—এক

ধর্ম্মদাসের গৃহে প্রত্যাগমনের পর কতিপয় বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে।

একবার ভাঙ্গিলে কাচে যেমন আর কিছুতেই বেমালুম জোড় লাগে না, পিতা-পুত্রের মনেও তেমনই একটা চিড় রহিয়া গেল। রক্তের জোর কমিয়া গিয়াছিল, তাহার উপর ঠেকিয়া শিখিয়াছিলেন, তাই শক্তিপ্রকাশ সহসা জলিয়া উঠিতেন না; কিন্তু ভিতরের আগুন গুমিয়া পুড়িত। প্রকাশ না হইলেও সে কথা ধর্ম্মদাসের নিকট অবিদিত থাকিত না। সেও যথেষ্ট সাবধানতার সহিত চলিত; কিন্তু তাই বলিয়া ধর্ম্মদাস যাহা উচিত বুঝিত, তাহা নিঃশব্দে করিয়া চলিতে এক দিনের জন্যও পশ্চাৎপদ হয় নাই।

এ কথা পরিষ্কার প্রকাশ পাইল—যখন ধর্ম্মদাস আর কিছুতেই স্কুলে গেল না। সে বলিল, আমি প্রাইভেটে পরীক্ষা দেব। প্রয়োজন হ'লে শিক্ষকদের বাড়ী গিয়ে প'ড়ে আসব। কিন্তু···

হেড মাষ্টারের ডাক পড়িল। তিনি সকল কথা শুনিলেন এবং মৃদু হাসিয়া বলিলেন, বোধ করি, ওর লজ্জা হচ্ছে, এই নিয়ে অনেক হৈ-চৈ, অনেক গোলমাল হয়ে গেল কি না!

শক্তিপ্রকাশ বলিলেন, তার জন্যে ত আমি দায়ী নই; কে ওকে বাড়ী থেকে চ'লে গিয়ে এ ধাষ্টামি করতে বলেছিল?

হেড মাষ্টার নিরুত্তর রহিলেন। কেন না, এ কথার প্রকৃত উত্তর দিলে, শক্তিপ্রকাশ তাহা কিছুতেই সহ্য করিতে পারিবেন না, তাহা তিনি ভাল করিয়াই জানিতেন।

এই দুই জন বিজ্ঞ বিদ্বান্ পুরুষ কিন্তু ধর্ম্মদাসের প্রকৃত আপত্তি কোথায়, তাহা বুঝিলেন না, এবং বুঝিবার বিশেষ চেষ্টাও করিলেন না।

নবকিশোরের নিদারুণ বিচ্ছেদের ক্ষত ধর্ম্মদাসের মন হইতে কিছুতেই অপসৃত হইল না। তাহার কথা ভাবিলে তাহার চিত্ত এমনই ব্যাকুল হইয়া উঠিত যে, সে আর কিছুতেই আত্মসম্বরণ করিতে পারিত না।

নবকিশোরের শোক তাহার মনের গভীরতম প্রদেশে নিহিত ছিল, তাহাকে সে প্রকাশ করিতে পারিত না; তাহা প্রকাশিত হইবার তিলমাত্র সম্ভাবনা যেখানে, সেখান হইতে সে পলাইয়া বাঁচিত। তাই স্কুলের কথা মনে হইলে ধর্ম্মদাস দেহ-মনে যেন অবসন্ন হইয়া পড়িত।

সেখানে যুক্তি-তর্ক, জোর-জবরদস্তি কোনই কাজে আসিল না। ধর্ম্মদাস পাহাড়ের মত অচল, অটল, নির্ব্বাক হইয়া পিতার ক্রোধের ঝড় আপনার উপর দিয়া অনায়াসে বহিয়া যাইতে দিল।

অবশেষে হেড মাষ্টার এক দিন আসিয়া বলিলেন, দেখুন, ছেলেমানুষ, হয় ত অত বড় বড় অসুখ থেকে উঠার পর এ একটা ঝোঁকের মত, বায়নার মত হয়েছে; দিন কতক ও যেমন বল্‌ছে, চলতে দিন; তার পর, আমার বিশ্বাস, সব ঠিক হয়ে যাবে, ও আবার স্কুলে যেতে আরম্ভ করবে—

শিক্ষকের কথার মধ্যে একটি গভীর অনুনয়ের ব্যঞ্জনা ছিল; গভীর স্নেহ, যাহা পীড়িত আর্ত্তের প্রতি মানুষের সহজেই আসে।

শক্তিপ্রকাশ আজ আর যেন কিছুতেই রাগ করিতে পারিলেন না। তাঁহার মনের মধ্যে কোথায় যেন একটি চাপা সুরে করুণার ধ্বনি বাজিয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন, কিন্তু ও যে কথা বলছে, তা আমি হতে দেব না—

তা হ'লে, বলিয়া হেড মাষ্টার উঠিয়া পড়িলেন, তা হ'লে আমাকে দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হ'তে হচ্ছে···

শক্তিপ্রকাশ বলিলেন, না, না, উঠবেন না, বসুন; আমি কি চাই, সেই কথাই আপনাকে বলছি, রমেশ বাবু!

শিক্ষক বসিলেন।

শক্তিপ্রকাশ বলিলেন, আমি চাইনে যে, ও যখন তখন বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায়। যদি স্কুলেই যাবে না

সকাল বিকেল ক'রে স্কুলের কয়েক জন শিক্ষক এসে পড়িয়ে যেতে পারেন। তাতে আমার যা খরচ হয়, আমি করতে রাজি আছি। আপনি স্কুলের প্রধান শিক্ষক, এ কায করবেন কি না জানিনে—তবে অনুরোধ আমার যে, আপনি যদি ভার নেন, আপনাকে গাড়ী দেব।

তিনি হাসিয়া বলিলেন, আমি ধর্ম্মদাসকে বড় স্নেহ করি, তাকে পড়াতে আসা আমার আনন্দের ব্যাপার, তবে রাতে ফেরবার সময় যদি গাড়ী হয় ত ভালই। আর দক্ষিণা? আমি কিছু নেব না, আমায় মাপ করবেন।

শক্তিপ্রকাশ বলিলেন, বিলক্ষণ, আমি ত আর গরীব নই? অধিক পরিশ্রম করবেন; এই যে রাজি হচ্ছেন, এই যথেষ্ট।

আমাদের দেশে একটা কথা প্রচলিত আছে, "মনকে চোখ ঠারা।" শক্তিপ্রকাশ এমনই করিয়া ধর্ম্মদাসের কথা কাটিয়া নিজের জেদ বজায় রাখিলেন।

সে বৎসর পরীক্ষার ফল ধর্ম্মদাসের বড় ভাল হইল। সে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষার্থীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিল।

শক্তিপ্রকাশ এতটা কোন দিনই আশা করেন নাই।

মণিময় এই শুভ-সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া সর্ব্বপ্রথমে সংবাদ দেন। তখনও কাগজে সংবাদ বাহির হয় নাই।

পত্রে মণিময় ধর্ম্মদাসের কলিকাতায় থাকিয়া পড়ার সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন :—

জানি, আপনি ছেলেদের বাসায়, মেসে কি হোষ্টেলে থাকা পছন্দ করেন না। তাই বলিতে সাহস করিতেছি, কলিকাতায় ধর্ম্মদাস যত দিন পড়িবে, তত দিন সে আমার বাড়ীতে থাকে, এই আমার মা ও আমার দুজনেরই একান্ত ইচ্ছা। আশা করি, ইহাতে আপনার অমত হইবে না।

পত্র পড়িয়া শক্তিপ্রকাশ খুসী হইলেন এবং উত্তরে লিখিলেন :—

ধর্ম্মদাসের সহিত তোমার কন্যার বিবাহ দিবার ইচ্ছা আমার জননী ঠাকুরাণীর আছে, সেবার তুমি কথাচ্ছলে আমাকে জানাইয়াছিলে। আমারও এ বিষয়ে বিশেষ কিছু অমত করিবার নাই। অতএব আমার মনে হয়, যদি অবিলম্বে শুভ-বিবাহটি দেওয়া যায়, তাহা হইলেই ধর্ম্মদাস তোমার ওখানে থাকিয়া পড়া-শুনা করিতে পারিবে।

এ বিষয়ে তোমাদের মতামত জানিতে পারিলে সুখী হইব।

মণিময়ের উত্তর পড়িয়া শক্তিপ্রকাশ প্রায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। মণিময় লিখিয়াছেন, কমলার বয়স অল্প। এই অপরিণত বয়সে বিবাহ দেওয়া একবারেই বাঞ্ছনীয় নহে।

কিন্তু তাহার পরের প্রস্তাব শক্তিপ্রকাশকে অগ্নিশর্ম্মা করিয়া তুলিল। মণিময় লিখিয়াছিলেন, ধর্ম্মদাস যেরূপ ফল করিয়াছে, তাহাতে বোঝা যায় যে, আই-সি-এস, পাশ করা তাহার পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন হইবে না। সে যখন বিলাত যাইবে, সেই সময় কমলার সহিত বিবাহ দিয়া তাহাকে পাঠান বোধ করি সর্ব্বতোভাবে ভাল হইবে।

নিজেকে অনেক সম্বরণ করিয়া শক্তিপ্রকাশ লিখিলেন :—

আমি হিন্দুশাস্ত্র বিশ্বাস করি। বাল্য-বিবাহে কি স্ত্রী, কি পুরুষ কাহারও কোন ক্ষতি হয় না। তবে আপনার কন্যা, তাহার বিবাহ বিষয়ে আপনার মতই প্রবল হইবার কথা।

আই-সি-এস, পাশ করিয়া চাকুরী করিবার প্রয়োজন বোধ করি ধর্ম্মদাসের হইবে না। আর সেই পাশ করিতে গিয়া নিজের জাতি-ধর্ম্ম খোয়ান যে কত বড় অন্যায় এবং অধর্ম্ম, তাহা আমি বলিতে পারি না।

আপনার সহিত এই দুই বিষয়ে মতের অনৈক্য হওয়ায় আপনার বাড়ীতে উহাকে রাখা কোনমতেই সম্ভব হইবে না বলিয়া আশঙ্কা করি। ধর্ম্মদাসকে হোষ্টেলে রাখিব মনে করিয়াছি এবং কলিকাতায় পাঠাইবার পূর্ব্বে তাহার বিবাহ দেওয়া একান্ত প্রয়োজন বিধায় সেই কার্য্য সত্বর সম্পন্ন করিবার জন্য মনোযোগ করিতেছি।

বলা বাহুল্য, ধর্ম্মদাস কিছুতেই বিবাহ করিতে রাজি হয় নাই। সে যথাসময়ে গিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হইয়া হিন্দু হোষ্টেলে বাসা বাঁধিল।

শক্তিপ্রকাশ আরম্ভে আস্ফালন করিলেন, টাকা দিবেন না; কিন্তু মাসের পর মাস ধর্ম্মদাস কর্ম্মচারিগণের কাছ হইতে টাকা পাইতে লাগিল; কর্ত্তার হুকুমমতই।

———

পরিচ্ছেদ—দুই

অধ্যাপকরা বলাবলি করিতেন যে, অঙ্ক-শাস্ত্রে ধর্ম্মদাসের অগাধ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। সে কথা সত্য প্রমাণিত হইয়াছিল বি, এ পরীক্ষার ফলে। যে ছাত্র দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহার সহিত ধর্ম্মদাসের নম্বরের আকাশ-পাতাল তফাৎ। তাই অধ্যাপকগণ তাহাকে অঙ্কে এম, এ দিবার অনুরোধ করিলেন।

কিন্তু মণিময়ের বড় ইচ্ছা যে, ধর্ম্মদাস দর্শনে এম, এ দেয়। ধর্ম্মদাসের মন স্থির করিতে কয়েক দিন কাটিল।

সে নিজে জানিত যে, অঙ্ক লইলে তাহার সহিত প্রতিযোগিতা করিবার মত কেহই সেবারে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ছিল না। প্রথম স্থান তাহার করতলগত। কিন্তু দর্শনে সন্দেহ।

লেখা-পড়ার মধ্যেও যুদ্ধের মত সকলকে পরাজিত করিয়া শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিব, এমন একটা জিদ্ মানুষকে পাইয়া বসে। প্রতিযোগিতার উত্তেজনার মধ্যে বড় হইবার, অগ্রগামী হইবার তীব্র প্রচেষ্টা, প্রবল আশা-আকাঙ্ক্ষায় বিদ্যার্থীর মনে এমন একটি আবেগ আনে—যাহা জীবনের পক্ষে একান্ত কল্যাণকর।

সেই কথাই মণিময় ধর্ম্মদাসকে বুঝাইতেছিলেন। তিনি বলিতেছিলেন, তুমি দর্শনে অজিতের নীচে হয়েছ। কিন্তু অঙ্কে তোমার নাগাল ধরে কে? অঙ্কে এম, এ তুমি, আরও ছ-মাস পরে দিও; কিন্তু এবার তোমাকে দর্শন নিয়ে অজিতকে হারাতেই হবে; কি বল?

ধর্ম্মদাস মৃদু হাসিয়া বলিল, আমি পারব?

মণি।—পারবে না? কি বল হে ধর্ম্মদাস? মনে করলে তুমি কি না পার?

হঠাৎ ধর্ম্মদাসের নজর পড়িল—পাশের ঘরে কমলা নিজের পড়ার টেবিলে বসিয়া পড়িতে পড়িতে হঠাৎ পড়া বন্ধ করিয়া তাহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া আছে।

সে দৃষ্টির অর্থ যেন নিমেষে ধর্ম্মদাস বুঝিতে পারিল। সে দৃষ্টির মধ্যে ছিল যেন বীর-নারীর পরিপূর্ণ মিনতি, তাহার প্রিয়তমকে অবিলম্বে জীবন-মরণের যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য। যেন তাহার মধ্যে ছিল, উৎসাহের অগ্নিময় বাণী; জানি, জানি, তুমি অজেয়; কিসের ভয় তোমার? অজিতের?

কমলা সেবার কলেজে প্রবেশ করিয়াছে। তাই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সব ভাল ছেলের নাম ছিল তাহার নখাগ্রে।

মণিময় কমলাকে দেখিতে পাইতেছিলেন না।

ধর্ম্মদাস চক্ষু অবনত করিয়া বলিল, আমাকে আরও কয়েক ঘণ্টা সময় দিন। আজ সন্ধ্যার সময়, ফেরার আগে আমি আপনাকে সঠিক উত্তর দিতে পারব আশা করি।

সে দিন রবিবার ছিল, মণিময় বাজারে বাহির হইয়া গেলেন।

ধর্ম্মদাস ধীরে ধীরে কমলার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। কমলা যেন জানিতে পারে নাই, এমনই করিয়া মাথা নামাইয়া লিখিয়া চলিল।

ধর্ম্মদাস ধীরে ধীরে বলিল, রায় লিখছ মিণ্টু?

কমলা মাথা তুলিয়া হাসিল, তাহার দুই কপোল লজ্জায় আরক্তিম। সে বলিল, কেন? কিসের আবার রায়?

এই যে এখুনি বিচার করলে! তা কি আমি জানিনে? তার পর আমার ভয় দেখে মামলা ডিস্‌মিস্ করছ?

কমলা কিছুক্ষণ উত্তর দিল না। তাহার পর সে তাহার উজ্জ্বল দুইটি চক্ষু ধর্ম্মদাসের মুখের উপর রাখিয়া বলিল, বাবা বোধ হয় তোমাকে অন্যায় জোর করছেন?

কিন্তু সে ত আমারই কল্যাণের জন্যেই—বলিয়া ধর্ম্মদাস একখানা চেয়ার টানিয়া টেবিলের অপর দিকে বসিল।

কিন্তু মিণ্টু, তোমার কি মত?

মিণ্টু হাসিল। সে বলিল, আমার মতে তোমার কি লাভ?

ধর্ম্ম।—লাভ আছে বৈ কি? তোমার মত জানতে পারলে আমার সুবিধে হবে।

মিণ্টু আবার লাল হইয়া উঠিল। সে জানিত, ধর্ম্মদাস তাহাকে মনে মনে কতখানি ভালবাসে।

কিন্তু সে দুষ্টামি করিয়া বলিল, আমি ত আদার ব্যাপারী, জাহাজের কি খবর জানি?

দুষ্টুমি হচ্ছে? বলিয়া ধর্ম্মদাস তাহাকে একটা কৃত্রিম ধমক দিল।

ধর্ম্ম।—বলতেই হবে তোমাকে—নৈলে—

সে বলিল, নৈলে কি শুনি?

ধর্ম্ম।—তোমার সঙ্গে আড়ি।

কম।—সে আর নতুন কথা কি? তুমি ত লোকের সঙ্গে ঝগড়াই কর।

সে কথা সত্যি! বলিয়া ধর্ম্মদাস একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল।

কমলা বুঝিল যে, ধর্ম্মদাসকে সে একটি ক্ষুদ্র আঘাত দিয়াছে। তাহাকে আঘাত দিতে তাহার মজা লাগিত। ছোট-খাট কলহের পর ধর্ম্মদাসের প্রসন্নতা তাহার কাছে বর্ষার পর শরৎ-আকাশের মত একান্ত মধুর মনে হইত।

মিন্টু এবার নিজের কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য ত্যাগ করিয়া সহজ উল্লাসে কথা কহিল, জানো নতুনদা! আমি এক লাইনও লেখা-পড়া করি নি, তোমাদের সব কথা শুনেছি। আমার কি মনে হচ্ছিল জান?

কি? কি?—আগ্রহভরে ধর্ম্মদাস জিজ্ঞাসা করিল।

বল, শেষে আমায় লজ্জা দেবে না?

ধর্ম্মদাস হাসিতে লাগিল। তোমায় আবার কবে লজ্জা দিলুম?

কম।—নাঃ, তা কি? আমার সব কথা মনে আছে, তোমার মত ভুলো নই আমি তা ব'লে।

আচ্ছা, ধর্ম্মদাস বলিল, কথা দিচ্ছি, বল; আমি শুনে একটিও ঠাট্টার কথা বলব না।

আব্দারের সুরে কমলা বলিল, না, আমার লজ্জা করে—তুমি নিশ্চয় হাসবে।

ধর্ম্ম।—বাঃ, হাসতেও পাব না, যদি হাসির কথা হয়?

তবে আমি বলতে পারবো না।—কমলা কহিল।

আচ্ছা, হাসব না; তোমায় কথা দিচ্ছি, বলিয়া ধর্ম্মদাস গম্ভীর হইয়া বসিল।

এবার কমলা বলিতে রাজি হইল। সে বলিল, অজিত বাবুকে তুমি ভয় করছ? আর আমার মনে হয়, আমি যদি তুমি হতুম, তা হ'লে ওকে আমি—

আর কমলা বলিল না; সে হাসিয়া লুটোপুটি খাইতে লাগিল। অবশেষে গম্ভীর হইয়া কমলা বলিল, তুমি যে কাউকে ভয় করবে, এ আমার ভাল লাগে না; সইতে পারিনে যেন!

ধর্ম্মদাস কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, তুমি যদি আমাকে একটা কথা দাও ত আমি দর্শন নিই।

কি কথা?

খুব সোজা।

তবুও—কমলা কহিল, না জেনে কথা দেওয়ার মূল্য কতটুকু?

আচ্ছা, বলছি—বলিয়া ধর্ম্মদাস গম্ভীর হইয়া বলিল, তুমি বল যে, এবারের পরীক্ষায় তুমি প্রথম হবে?

কমলা দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, অসম্ভব, অসম্ভব, আমি?

কেন?

ওরে বাবা রে, কি সব ভাল ভাল ছেলে আছে—

আচ্ছা, বল তুমি প্রাণপণ চেষ্টা করবে?

কমলা কহিল, শুধু চেষ্টায় কি হয়?

তবে?

কমলা বলিল না; কিন্তু ধর্ম্মদাস বুঝিল।

আচ্ছা, ধর্ম্মদাস কহিল, আমার যথাসাধ্য চেষ্টা আমি করবো।

তা হলে? কমলা এবার প্রায় আস্ফালন করিয়া বলিল, তা হ'লে? আমি কাউকে ভয় করিনে।

ধর্ম্মদাস কমলাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া তাহাকে বাক্য-দান করিল। সে বলিল, কিন্তু আর একটা কথা রইল; যদি দর্শনে প্রথম স্থান না নিতে পারি ত আমি সন্ন্যাসী হয়ে যাব।

কমলা তাহার দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, না, ও কথা তুমি আর কোন দিন মুখে আনতে পারবে না।

তাহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গিয়াছিল।

পরিচ্ছেদ—তিন

শক্তিপ্রকাশের বয়সে শিকারের সখ অত্যন্ত বেশী ছিল। তাঁহার সাজ-সজ্জাও থাকিত রাশি রাশি। দামী বন্দুক, বারুদ, টোটা, গুলী, ছর্‌রা ঘর-ভরা। এই সকলের যত্ন লইবার জন্য একটি মুসলমান চাকরও ছিল, বাহেদ আলি।

সেকালে জমীদারীর ইহা ছিল একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ। জঙ্গলে বাঘেরও কমতি ছিল না; এবং প্রজা-সাধারণও কতক কাবু থাকিত; বিশেষ করিয়া চোর-ডাকাত।

কিন্তু সর্ব্বোপরি আর একটি কথা ছিল, যাহা জমীদাররা সহজে প্রকাশ করিতে চাহিতেন না; ইংরাজ জাতি নাকি শিকার খেলিতে বড় ভালবাসেন। তাঁহাদের জন্মগত সহজ

বীরত্ব-প্রবণ প্রকৃতি পশু বধ করিয়া তাজা থাকে। তাই জেলার হর্ত্তা-কর্ত্তারূপে তাঁহারা জমীদারকে শিকার খেলিয়া দাক্ষিণ্য-সূত্রে আবদ্ধ রাখিতেন।

কর্ত্তাদের সহিত যোগ রাখিবার ইহা ছিল একটি সহজ সূত্র। জমীদারদের হাতী-শালার হাতী, তাহাদের মাহুত এবং বিশেষ করিয়া বৃদ্ধ বাহেদ আলির মত চাকরদের কাছে বাঘ মারার অপূর্ব্ব কীর্ত্তি-কাহিনী শুনিলে মনের তেজ বাড়ে।

রামপ্রসাদ লেখাপড়ার দিক দিয়া উন্নতির ভার বোধ হয় অগ্রজ ধর্ম্মদাসের উপর সমর্পণ করিয়া বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে জমীদারীর এই দিকটাতেই মনোযোগ দিতেছিল।

কর্ম্মচারীরা বলিত, লেখাপড়া করিলে বড় চাকরী পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু জমীদার-নন্দন ত চাকরী করিবার জন্য এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন নাই। তাঁহাদের রাজ্য-রক্ষা করা কায; ইহাই প্রকৃত রাজ-ধর্ম্ম!

রামপ্রসাদ সেই কথা শুনিয়া সদর্পে আস্তিন গুটাইয়া বলিত, বুঝেছেন নায়েব মশাই, আমারও সেই মত!

নায়েব মশাই শিব-নেত্র করিয়া তাহার কথা শুনিতেন, এবং কি করিয়া গোঁজামিল দিয়া হিসাবটি মনিবের কাছে পেশ করিবেন, সেই অবসরে ঐ বিষয়ে মনে মনে গভীর তোলা-পাড়া করিয়া লইতেন।

শক্তিপ্রকাশ রামপ্রসাদের এই সকল অসামান্য কীর্ত্তির কতক কতক সংবাদ জানিতে পারিতেন; কিন্তু সে দিকে বিশেষ নজর করিতেন না। কেন যে করিতেন না, তাহার মনস্তত্ত্ব একটু বিচিত্র।

ধর্ম্মদাসের প্রতি তাঁহার ব্যবহার প্রায় সকল সময়েই একটু কড়া ছিল; কারণ, ধর্ম্মদাস তাঁহার কাঠিন্য নির্ব্বাকে সহ্য করিত। কোন দিন 'সামনা-সামনি' করে নাই। অর্থাৎ কথার উত্তর দিয়া তাহার ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে নাই। তাহার স্বভাব নরম,-যেমন ইচ্ছা তেমনই করিয়া বাঁকাইয়া দেওয়া যায়। তাই শক্তিপ্রকাশ জ্ঞাতে অজ্ঞাতে তাহার সহিত সেই ব্যবহার করিতেন।

সেকরা যেমন ইস্পাতের গহনা গড়ে না, তেমনই কোথা দিয়া কেমন করিয়া শক্তিপ্রকাশের একটা ধারণা জন্মিয়াছিল যে, রামপ্রসাদের প্রকৃতিটি ঐ কঠিন ধাতুর তুল্য-মূল্য। তাহাকে মনোমত করা সহজ নহে। তাহাকে বেশী চাপ দিলে সে ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে।

কিন্তু এ কথা তিনি প্রকাশ করিতেন না। তথাপি সকলেই ইহা জানিত যে, রামপ্রসাদের তাঁহার কাছে যেন সাত খুন মাপ!

সে দিন আহারের পর রাত্রিতে শক্তিপ্রকাশ আরাম-চেয়ারে বসিয়া তামাক টানিতেছিলেন এবং কানাই পায়ের কাছে বসিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার পা টিপিয়া দিতেছিল।

কানাই বুঝিয়াছিল যে, বাবুর মেজাজ ভাল, তাই ধীরে ধীরে বলিল, একটা ভারি মুস্কিল হয়ে গেছে, বাবু!

কি রে কানাই? কি হয়েছে?

ঐ ওহেদ্ বলছিল—

টাকা চাই?

না; একটা বন্দুক—বলিয়া কানাই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া অবশেষে বলিল, চুরি হয়ে গেছে—

বলিস কি রে? সর্ব্বনাশ! কবে হলো? বেটা এক-দম বুড়ো হয়ে গেছে—কবে চুরি হ'লো?

কানাই বলিল, পরশুও সেটাকে পরিষ্কার করে-ছিল বলে।

শক্তিপ্রকাশ একটু আশ্বস্ত হইলেন।

একটু ভাবিয়া বলিলেন, কোন্‌টা বল ত? যেটা রামপ্রসাদ নেয়?

সেটাই!

তোরা ওকে জিজ্ঞেস করেছিলি?

উনি বলে, আমি কি জানি।

ডাক্ ত, ডাক্ ত ওকে।

রামপ্রসাদ আসিল। সে পূর্ব্বেই জানিত যে, ডাক কেন হইয়াছে এবং তাহার জন্য রীতিমত প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিল।

রামপ্রসাদের সহিত শক্তিপ্রকাশ বিবেচনা করিয়া কথা কহিতেন; জানিতেন, নিজের মান নিজের হাতে। বলিলেন, রামপ্রসাদ, একটা বন্দুক যে পাওয়া যাচ্ছে না—

রাম। তা আমি কি জানি? বন্দুকের ঘরের চাবি কি আমার কাছে থাকে? আমি কি পাহারা দেব? [illegible], মজার কথা! ঐ ওয়াদে বেটাই বেচে মেরেছে—

কথা শুনিয়া শক্তিপ্রকাশের রাগ হইয়াছিল; [illegible] তাহার প্রকাশ হইল অক্ষম হাসিতে। বলিলেন, কি যে [illegible] তুই! ঐ তেকেলে বুড়ো বিশ্বাসী চাকর, ও কি বেচতে পা[illegible]?

রাম। ও হ'ল বিশ্বাসী, আর আমি হলুম চোর? কথা শুনলে রাগে সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা করে—বলিয়া কৃত্রিম রাগ দেখাইয়া রামপ্রসাদ গুম্ গুম্ করিয়া পা ফেলিয়া বাহির হইয়া গেল।

অসহায় শক্তিপ্রকাশ নির্ব্বাক্ হইয়া বসিয়া রহিলেন!

অবশেষে কানাইকে বলিলেন, কাল সকালেই সায়েবের সঙ্গে দেখা করতে যেতে হবে, বুঝেছিস? কোচওয়ানকে ব'লে দে, আর সকালে আমার কাপড়-চোপড় বার ক'রে দিবি। এমন ত কথ্খনো হয় নি। আর পারিনে, কাশী চ'লে গেলেই শান্তি হয়।

আজকাল তিনি কাশী যাওয়ার কথা প্রায়ই বলিতেন। কানাই জানিত, ইহার অর্থ কি। যখন তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ অসহায় বিবেচনা করিতেন, তখনই এই কথা মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িত।

সকালে শক্তিপ্রকাশ বাহির হইয়া গেলে রামপ্রসাদ অপিস-ঘরে গিয়া বাহাদুরি করিতে লাগিল। আমি ত আর ধর্ম্মদাস নই, খুব দুকথা শুনিয়ে দিতেই একেবারে চুপ। কর্ম্মচারীরা বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গেল। বাস্তবিক কর্ত্তাকে এতবড় জব্দ আর ইতিপূর্ব্বে কেহই করিতে পারে নাই

জেলার কর্ত্তা সাহেব ছিলেন শান্ত-প্রকৃতির লোক। শক্তিপ্রকাশের সকল কথা শুনিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন যে, ভয় নাই, পুলিস নিশ্চয় খুঁজিয়া বাহির করিবে, আপনি পুলিস-সাহেবকে সংবাদ দেন।

তাহার পর এদিক ওদিক কথা হইতে লাগিল। সাহেব নিজের ছেলে-মেয়ের কথা বলিয়া অবশেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, বড় ছেলেটি কি করে?

শক্তিপ্রকাশ বড় মুখ করিয়া বলিলেন, সে এবার বি, এতে ফার্ষ্ট হইয়াছে।

সাহেব। বাঃ বাঃ, ভারি আনন্দের কথা। এই ত চাই!

তাহার পর সাহেব একটা বিচিত্র প্রস্তাব করিয়া বসিলেন। তিনি বলিলেন, আমরা চাই যে, এই রকম ছেলেরা সরকারের চাকুরী গ্রহণ করে। সেই জন্যই ত ডেপুটীদের পরীক্ষা তুলে দেওয়া গেল। আমার একান্ত অনুরোধ, আপনি ঐ ছেলেটিকে সার্ভিসে দিন্। আর মাসখানেকের মধ্যেই আমাদের নাম পাঠাতে হবে, আপনি লিখে দিন আপনার ছেলেকে, এসে আমার সঙ্গে দেখা করে।

শক্তিপ্রকাশ ইহার জন্য একটুও প্রস্তুত ছিলেন না। হঠাৎ 'না' বলিতেও তাঁহার সাহস হইল না। কেবল একটু আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিলেন, সে এম, এ দিতে চায়, তার জন্য প্রস্তুতও হচ্ছে।

সাহেব বলিলেন, এম, এ পাশের কোন দরকার নেই। বি, এ; তার উপর জমীদারের ছেলে। আমরা ঐ রকম ছেলেই চাই। লিখে দেন, তার আসা চাই-ই, বুঝেছেন?

শক্তিপ্রকাশ আর 'না' বলিতে পারিলেন না। বন্দুকের গোলমালটা তাঁহার মনে মহা গোলযোগের সৃষ্টি করিয়াছিল। সাহেব সেটাকে অবহেলা করিয়া যে অনুরোধ করিয়া বসিলেন, তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিলে ফল যে মোটেই ভাল হইবে না, তাহা তিনি খুব ভাল করিয়াই জানিতেন। অগত্যা শেষ কথা দিয়া আসিতেই হইল।

পরিচ্ছেদ—চার

শক্তিপ্রকাশ কয়েক দিন যেন অপরাধীর বিবেক লইয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন। তিনি মনে মনে জানিতেন যে, সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে না যাইলে সাহেব কখনই আপনা হইতে উপরি-পড়া হইয়া কিছু এই অনুরোধ করিতে আসিতেন না।

সমস্ত নষ্টের মূলে হইল এই বন্দুক-চুরি এবং ইহার ভিতর যে রামপ্রসাদ ছিল, তাহাতে প্রায় তাঁহার কোন সন্দেহই ছিল না। কিন্তু রামপ্রসাদকে জব্দে আনা যেন তাঁহার শক্তির বাহিরে। পিতা পুত্রকে শাসন করেন, তাহার কল্যাণের জন্যই; কিন্তু সেই শাসন লোক-চক্ষুর অন্তরালে, গোপনেই করিতে চাহেন; কারণ, পুত্রের সকল অপরাধ প্রকাশ করিতে লজ্জা বোধ হয়, এমনই মমত্ব-বোধ পিতা-পুত্রের মধ্যে জড়িত আছে!

পুত্র যদি সেই শাসনকে অবহেলা করিয়া চতুর্দ্দিকে সেই শাসনব্যাপারে বিকৃতকাহিনী রাষ্ট্র করিতে থাকে! লজ্জা নাই, সরম নাই; পিতার প্রতি কোনরূপ শ্রদ্ধা-সম্মান নাই! তাহা হইলে সেই শাসন হইতে বিরত থাকা ভিন্ন আর পিতার উপায় কি? শুধু তাহাই নহে, পুত্রের অপরাধের ভার তখন যে পিতাই বহন করিতে থাকেন!

সরকারকে খুসী করিবার মোহ যে শক্তিপ্রকাশের ছিল

না, তাহা নহে ; লোভও ইহার কারণ বলিয়া মনে হয় না। বংশপরম্পরায় জমীদারী রক্ষায় ইহা যেন একটি জন্মগত সহজ সংস্কার। যেমন শিকারী হাতী দিয়া মন-রক্ষা করিতে জমীদারের পক্ষে বড় বেশী কিছু আসিত যাইত না ; উপরন্তু একটা আড়ম্বর। হয় ত ধর্ম্মদাস এম, এ পাশ করিলে সরকারের নেক-নজরটি একটি কাম্যরূপেই বিবেচিত হইত। কিন্তু অসময়ের বৃষ্টির মত আজ শক্তিপ্রকাশ ইহাকে লইয়া যেন সকল দিক দিয়া বিব্রত হইয়া পড়িলেন। তিনি মনে মনে এই কথা বলিয়াই ক্ষুব্ধ হইলেন যে, রামপ্রসাদের অপরাধের শাস্তি অন্যায় করিয়া আজ ধর্ম্মদাসের কাঁধে আসিয়া নামিতেছে! এ কি বাস্তবিক অবিচার নহে?

আর কোন উপায় না দেখিয়া তিনি সকল কথা পরিষ্কার করিয়া ধর্ম্মদাসকে চিঠি লিখিয়া দিলেন। চিঠির সর্ব্বশেষে লিখিলেন, তুমি বড় হইয়াছ, সমস্ত বিবেচনার ভার তোমার উপর রহিল। "না" বলিলে, সাহেবের বিরক্তির বশে যদি শেষ পর্য্যন্ত জেলে যাইতেই হয়, বুঝিব, তাহা আমার পূর্ব্ব-জন্মের দুষ্কৃতির ফল।

পত্র পড়িতে পড়িতে পিতার নিষ্প্রভ-মলিন মুখ মনে করিয়া ধর্ম্মদাসের বুকের মধ্যে ব্যথা করিয়া উঠিল। তেজোদৃপ্ত শক্তিপ্রকাশ আজ এতখানি অনুনয়-বিনয়ের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছেন! ইহাও তাহার যেন ভাল লাগিল না।

এক নিমেষেই ধর্ম্মদাস স্থির করিল যে, পিতার এই অনুরোধটি সে যেমন করিয়াই হউক রক্ষা করিবে। সে আর দেরী করিল না, তাড়াতাড়ি লিখিয়া দিল, আপনি কিছুমাত্র চিন্তিত হইবেন না ; আমি আপনার ইচ্ছামত এই চাক্‌রী লইয়া আপনার সকল দুশ্চিন্তার অবসান করিব স্থির করিয়াছি!

পত্র পড়িয়া শক্তিপ্রকাশ চক্ষুর জল ফেলিলেন। বুকের মধ্যে যেন দুঃখ সুখের কড়ি ও কোমল একসঙ্গে বাজিয়া উঠিল।

সম্পূর্ণ আবেগের বশবর্ত্তী হইয়া ধর্ম্মদাস চাক্‌রী স্বীকার করিয়াছিল। পিতৃ-আজ্ঞা-পালনের উত্তেজনা বেশী দিন থাকিল না। মোহ কাটিতেই সে বুঝিতে পারিল, তাহার জীবনে কত বড় ক্ষতি-স্বীকার সে করিয়া বসিয়াছে।

গোড়ায় গোড়ায় সে নিজেকে বুঝাইবার চেষ্টা করিত। সে মনে মনে বলিত, পিতৃ-সত্য-পালনে রাম কি করেছিলেন? ত্যাগ, বিরাট ত্যাগ! ত্যাগের কোন মূল্যই থাকে না, যদি যা চাইছিলাম, তাই পরে পরে সব পেয়ে যেতে থাকি! ত্যাগ হ'লো কোথায়?

ত্যাগ সে করিতে প্রস্তুত ছিল ; কিন্তু তাহারও অধিক কিছুর দাবী সে চাক্‌রী তাহার উপর করিতে চাহিল। কিছু দিনের মধ্যে সে বুঝিল যে, এম, এ পাশ বহু ব্যক্তি না করিয়াও বাঁচিয়া থাকে ; কিন্তু আত্ম-সম্ভ্রমকে চাক্‌রীর পায়ে ডালি দিয়া কেমন করিয়া বাঁচা যায়? সে বাঁচা যে পশু-জীবনেরও অধম। পশুর আত্ম-সম্ভ্রম-বোধের কোন লেঠাই নাই!

এক জন পাকা দেশী কর্ম্মচারী তাহাকে কায শিখাইতেছিলেন ; তাঁহাকে এক দিন ধর্ম্মদাস পরিষ্কার জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, আপনারা এ সব সহ্য করার অভ্যাস কি ক'রে করলেন?

বৃদ্ধ এদিক ওদিক চাহিয়া বলিলেন, এক দিন আমাদেরও রক্ত গরম ছিল ধর্ম্মদাস, বুঝেছ? কিন্তু চাক্‌রীর বিষ ধীরে ধীরে মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবেশ ক'রে ক্রমে আমাদের সুখে-দুঃখে অনাসক্ত ক'রে দিয়েছে। চাক্‌রী মানে কি?

বলিয়া তিনি অর্থপূর্ণ হাসি হাসিলেন। বলিলেন, তবুও এখনও এ জিনিষের পূর্ণরূপ দেখতে পাওনি।

ধর্ম্মদাস অল্পদিনের মধ্যেই পূর্ণরূপ দেখিয়াছিল। কিন্তু সে কি, তাহা সে কোন দিন আর প্রকাশ করিয়া কাহাকেও বলিল না।

বড় সাহেব এক দিন ডাকিয়া বলিলেন, তোমাকে আরও বেশী ভদ্রতা শিক্ষা করতে হবে। আমার কাছে খবর এসেছে, তুমি তোমার উপরিতন কর্ম্মচারীর মর্য্যাদা রক্ষা ক'রে চলতে পার না।

ধর্ম্মদাস ব্যাপারটা কি জানিত ; তাই বলিল, আপনি যে সংবাদ পেয়েছেন, তা সত্য নয়। আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকি, যিনি আমার চেয়ে মান্যে বড়, তাঁর মান রেখে চলতে।

বড় সাহেবের দুই কর্ণ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল।

ধর্ম্মদাস তাহা লক্ষ্য না করিয়াই বলিতেছিল, কিন্তু তা ব'লে অযথা অপমানকর ব্যবহার পকেটস্থ করা মানুষের দ্বারা সম্ভবপর নয়।

তুমি আমাকে মান?

মানি।

আমি যা বলবো, তা তুমি মানবে?

ধর্ম্মদাস বলিল, যদি ন্যায়সঙ্গত কথা হয় ত অবশ্য মানব।

আমি! আমি! আমি অন্যায় বলবো? এ ত তোমার ভয়ঙ্কর ধৃষ্টতা!

আপনিও ত মানুষ? ভুল-ভ্রান্তি কার না হয়?

তুমি তোমার কথা প্রত্যাহার কর, নৈলে তোমাকে সস্‌পেণ্ড করলাম।

আপনার যা ইচ্ছা হয় করতে পারেন—বলিয়া ধর্ম্মদাস বাড়ী চলিয়া আসিল।

কিন্তু এ কথা আর বড় কেহ জানিল না। ধর্ম্মদাস নিজের কর্ম্মস্থান হইতে সেই রাত্রিতেই রওনা হইয়া কলিকাতা চলিয়া গেল।

কথামালায় একটি সুন্দর গল্প আছে; তুই ঘোলাস্‌নি ত তোর বাপ ঘুলিয়েছিল জল, তাই তোকে আমি খাব।

বেচারী ভেড়ার পিতৃবিয়োগ ঘটিয়াছিল, কিন্তু ধর্ম্মদাসের জমীদার পিতা জীবিতই ছিল।

এক দিন ডাকের চিঠি খুলিয়া শক্তিপ্রকাশ বজ্রাহতের মত বসিয়া রহিলেন। সর্ব্বনাশ, ধর্ম্মদাস এ করেছে কি? জলে বাস ক'রে কুমীরের সঙ্গে লড়াই করা চলে?

শক্তিপ্রকাশ সেই দিনই কলিকাতায় রওনা হইয়া পড়িলেন। কিন্তু সেবার তাঁহার নিষ্ফল যাত্রা হইল।

ধর্ম্মদাসকে কোন প্রকারেই চাকরীতে যোগদান করাইতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, জানিস্, এমন করলে জমীদারী থাকবে না? খাবি কি?

ধর্ম্মদাস বলিল, দোষ ত আমার, আপনার জমীদারী যাবে কেন?

বৃদ্ধ রাগে দিশাহারা হইয়া বলিলেন, সব জিনিষের "কেন" আছে? জমীদারী যে যাবে, তা আমি জানি, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ভেবে দেখ, কি করছিস তুই, কুলাঙ্গার!

ধর্ম্মদাস রাগ করিল না, বলিল, বাবা, একটা অনুরোধ আমার রাখুন; আপনি আমাকে ত্যাগ করলে, সায়েব আপনার উপর সন্তুষ্ট হবেন নিশ্চয়।

শক্তিপ্রকাশ স্তব্ধ হইয়া কি ভাবিলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইবার সময় বলিলেন, আজ থেকে তোর সঙ্গে আমার আর কোন সম্পর্ক রইল না। এ কথা যেন চিরদিন তোর মনে থাকে।

আকাশের বজ্র যখন মানুষের মাথায় পড়ে, তখন মানুষ মৃত্যুর শান্ত আলিঙ্গনে একবারে স্তব্ধ হইয়া যায়। ধর্ম্মদাস বহুক্ষণ সেইমত স্তব্ধ থাকিয়া নিজের মনে মনে অবশেষে বলিল, কিন্তু গ্লানির জীবন যে মৃত্যুর চেয়েও কষ্টকর! পৃথিবীতে টাকাই কি সব চেয়ে বড়? মানুষ বড় নয়?

নিজের দেহের শিরা-উপশিরা, ধমনী, হৃৎপিণ্ড যেন সমস্বরে ঝঙ্কার দিয়া ধর্ম্মদাসকে বলিল, তাই, তাই! ধর্ম্মদাস, ঠিক বলছো তুমি! [ক্রমশঃ।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

সুবর্ণরেখা

এ কোন্ সুবর্ণরেখা সন্ধ্যার আকাশে,
হেম বিগলিত বর্ণে বহে ধীরে ধীরে,
ইন্দ্রমণি উৎপলের আভা হাসে তীরে
ভাসে অতীতের স্বপ্ন সুস্নিগ্ধ বাতাসে?

মদালস সন্ধ্যাচ্ছায়া ছেয়ে আসে দিক—
কে তুমি কিরণময়ী দেবী অরুন্ধতী?
কোন্ বার্ত্তা আনিয়াছ কহ মোরে সতি—
পাটল-পল্লবে গুপ্ত কোথা ডাকে পিক?

তপোবন-তরুতলে কোন্ যজ্ঞশেষে
দেখিলে কি মন্ত্র দেবি কোন্ সাধনাতে—
তাই কি লিখিছ সাঁঝে সুবর্ণরেখাতে—
স্তব্ধ চরাচর মোহ-নিদ্রার আবেশে?—

ম্লান-মৌন মুখচ্ছবি ফুটে হাসি-রেখা
বালু-লীন রতনের পেয়েছে যা দেখা।

মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

ভারত পরাধীন হইল কেন? *

পাশ্চাত্য সমালোচকগণ বলিয়া থাকেন যে, ভারতীয় মনীষা যদিও বা দার্শনিকতা, ধর্ম্ম, আর্ট ও সাহিত্যে বিশিষ্ট শক্তির পরিচয় দিয়া থাকে, উহা জীবন-সংগঠনব্যাপারে অপটু ছিল, কার্য্যকরী বুদ্ধির প্রয়োগে ন্যূন ছিল। উহার ইতিহাসে সুনিপুণ রাষ্ট্রনীতিক গঠন, গবেষণা ও কর্ম্মের স্থান শূন্য। কিন্তু প্রকৃত তথ্য সকল অবগত হইলে এবং ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার স্বরূপ ও নীতি যথার্থভাবে হৃদয়ঙ্গম করিলে এরূপ অভিযোগ একবারেই দাঁড়াইতে পারে না। বরঞ্চ প্রকৃত সত্য এই যে, ভারতীয় সভ্যতা যে চমৎকার রাষ্ট্রব্যবস্থার বিকাশ করিয়াছিল, তাহার নিরেট গঠন ও স্থায়ী উৎকর্ষতা ছিল। রাষ্ট্রগঠন প্রচেষ্টায় মানুষের বুদ্ধি রাজতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র ও অন্যান্য যে সব আদর্শ ও নীতির দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে, ভারতীয় সভ্যতা অপূর্ব্ব কৌশলের সহিত সে সবের সমন্বয়সাধন করিয়াছিল, অথচ বর্ত্তমান য়ুরোপীয় রাষ্ট্রের যে দোষ, সকল জিনিষকে যন্ত্রবৎ করিয়া তোলার দিকে অত্যধিক প্রবণতা, তাহা এড়াইতে সমর্থ হইয়াছিল। ক্রম-বিকাশ ও প্রগতির পাশ্চাত্য আদর্শ অনুসারে বিচার করিলে ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে সব আপত্তি তোলা যাইতে পারে, পরে আমি সে সমুদয় আলোচনা করিব।

কিন্তু রাষ্ট্রনীতির আর একটা দিক আছে, যাহাতে এ কথা বলা যাইতে পারে যে, ভারতের রাষ্ট্রনীতিক মনীষা অকৃত-কার্য্যতা ছাড়া আর কিছুই দেখাইতে সমর্থ হয় নাই। উহা যে ব্যবস্থার বিকাশ করিয়াছিল, তাহা স্থায়িত্ব ও শাসনবিষয়ক কার্য্যপটুতায় এবং প্রাচীন অবস্থানুযায়ী সমষ্টি-জীবনের শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতাবিধানে ও জনসাধারণের কল্যাণবিধানে প্রশংসনীয় হইতে পারে, কিন্তু যদিই বা ভারতের অন্তর্গত বহু জনসমাজ প্রত্যেকে পৃথক্‌ভাবে স্বায়ত্তশাসনশীল ছিল, সুশাসিত ও সমৃদ্ধ ছিল এবং সমগ্র দেশে এক উচ্চবিকশিত সভ্যতা ও কাল্‌চার নিশ্চিতভাবে ক্রিয়া করিতে পারিত, তথাপি উক্ত ব্যবস্থা ভারতের জাতীয় ও রাষ্ট্রনীতিক ঐক্যসাধন করিতে কৃতকার্য্য হয় নাই এবং অবশেষে বিদেশীর আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিতে, জাতির অনুষ্ঠানগুলির ধ্বংস নিবারণ করিতে এবং বহুকালব্যাপী পরাধীনতা নিবারণ করিতে কৃতকার্য্য হয় নাই। কোন সমাজের রাষ্ট্রনীতিক ব্যবস্থার বিচার করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমেই অবশ্য দেখিতে হয় যে, উহা জাতিকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠা, সমৃদ্ধি, আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলা দিতে কতখানি সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু আবার ইহাও দেখিতে হয় যে, অন্যান্য রাষ্ট্র হইতে নিরাপদ থাকিবার কিরূপ ব্যবস্থা সে করিয়াছে, বহিঃশত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বি-গণকে আক্রমণ করিতে এবং তাহাদের আক্রমণে আত্মরক্ষা করিতে প্রয়োজনীয় ঐক্য ও শক্তির কতদূর বিকাশসাধন করিয়াছে। ইহা যে দেখিতে হয়, সেটা হয় ত মানব-সমাজের পক্ষে নিছক প্রশংসার কথা নহে। যে জাতি বা দেশ এরূপ রাষ্ট্রনীতিক শক্তিকে হীন (প্রাচীন গ্রীকরা এবং মধ্যযুগের ইতালীয়ানরা যেরূপ ছিল) সংস্কৃতি ও সভ্যতাতে তাহার বিজেতাদের অপেক্ষা সে অনেক উন্নত হইতে পারে এবং কৃতী সামরিক রাষ্ট্র, আক্রমণশীল জাতি, পরদেশলুণ্ঠনকারী সাম্রাজ্য অপেক্ষা মানব-জাতির প্রগতিতে অনেক বেশীই সাহায্য করিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু মানুষের জীবন এখনও প্রধানতঃ রহিয়াছে প্রাণশক্তির ক্ষেত্রে। এ ক্ষেত্রে আত্মবিস্তার, ভোগদখল, আক্রমণ, পরস্পরকে গ্রাস করিবার ও অপরের উপর আধিপত্য করিবার জন্য দ্বন্দ্ব, এই সবের প্রেরণাই সমধিক বলবান্। কারণ, এই সবই হইতেছে প্রাণশক্তির প্রাথমিক ধর্ম্ম। অতএব যে সমষ্টিগত মনীষা ও চেতনা, আক্রমণ ও আত্মরক্ষায় সর্ব্বদা অসামর্থ্যের পরিচয় দেয় এবং নিজের নিরাপদতার জন্য প্রয়োজনীয় কেন্দ্রীভূত ও কার্য্যকরী ঐক্যের বিধান না করে, সে যে রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীতে স্থান পাইবার যোগ্য নহে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ভারতের জাতীয় ও রাষ্ট্রনীতিক ঐক্য কখনই সাধিত হয় নাই। ভারত প্রায় এক সহস্র বৎসর ধরিয়া বাহির হইতে বর্ব্বর জাতিদের আক্রমণে বিধ্বস্ত হইয়াছে এবং প্রায় আর এক সহস্র বৎসর ক্রমান্বয়ে নানা বিদেশী শাসকের পদানত রহিয়াছে। অতএব বলিতেই হয় যে, ভারতবাসী রাষ্ট্রনীতিক ব্যাপারে অক্ষম।

এখানেও প্রয়োজন, সর্ব্বাগ্রে অত্যুক্তি সকলের খণ্ডন। প্রকৃত তথ্য এবং তাহাদের মর্ম্ম সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা ও ভারতের সুদীর্ঘ ইতিহাসে বস্তুতঃ যে সমস্যাটির সমাধান হয় নাই, তাহার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব যথার্থভাবে হৃদয়ঙ্গম করা। আর প্রথমতঃ যদি একটি জাতি ও সভ্যতার মহত্ত্ব বিচার করিতে হইলে তাহার সামরিক আক্রমণশীলতার হিসাব লইতে হয়, দেখিতে হয়, কি পরিমাণে সে অপরের দেশ জয় করিয়া লইয়াছে, অপর জাতির সহিত সংগ্রামে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছে, তাহার সুব্যবস্থিত পরস্বাপহরণের প্রবৃত্তি কতখানি জয়লাভ করিয়াছে, তাহার

* শ্রীঅরবিন্দের A Defence of Indian Culture হইতে অনুবাদিত।

পরের দেশ শাসন ও শোষণ করিবার প্রেরণা কেমন অদম্য, তাহা হইলে অবশ্য স্বীকার করিতেই হইবে যে, জগতের মহাজাতি সকলের তালিকায় ভারতের স্থান বোধ হয় সর্ব্বনিম্নে। ভারত যে কখনও পরের দেশ আক্রমণ এবং নিজের অধিকার-সীমার বাহিরে রাজ্যবিস্তারের চেষ্টা করিয়াছে, তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। জগতের উপর আধিপত্যস্থাপনের কোনও মহাকাব্য বা সুদূর দিগ্বিজয় ও ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবিস্তারের কোনও মহান্ কাহিনী ভারতের কৃতিত্ব বর্ণনা করিতে রচিত হয় নাই। ভারত আত্মবিস্তার, দিগ্বিজয়, আক্রমণের যে একমাত্র মহান্ প্রয়াস করিয়াছে, তাহা হইতেছে তাহার শিক্ষাদীক্ষার বিস্তার, বৌদ্ধধর্ম্ম কর্ত্তৃক প্রাচ্য জগৎ আক্রমণ ও অধিকার এবং তাহার আধ্যাত্মিকতা, আর্ট এবং চিন্তাশক্তির সঞ্চারণ। আর এই যে আক্রমণ—ইহাও ছিল শান্তিময়। ইহাতে যুদ্ধবিগ্রহ ছিল না। কারণ, বলপ্রয়োগ ও দেশজয়ের দ্বারা অধ্যাত্ম-সভ্যতাবিস্তারের যে নীতি আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে গর্ব্ব করিবার বিষয় বা অজুহাতস্বরূপ, তাহা ভারতের প্রাচীন মনোভাব ও মতিগতির এবং তাহার ধর্ম্মের মূল আদর্শের বিরোধী ছিল। সত্য বটে, পর্য্যায়ক্রমে কতকগুলি ঔপনিবেশিক অভিযান ভারতের রক্ত এবং ভারতের শিক্ষাদীক্ষাকে দ্বীপপুঞ্জে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল, কিন্তু যে সকল জাহাজ ভারতের পূর্ব্ব ও পশ্চিম উপকূল হইতে যাত্রা করিয়াছিল, সেগুলি নিকটবর্ত্তী দেশসমূহকে জয় করিয়া ভারত-সাম্রাজ্যবিস্তারের উদ্দেশ্যে প্রেরিত রণতরী ছিল না। সেগুলিতে ভারত হইতে নির্ব্বাসিত ব্যক্তিগণ অথবা সাহসিক ভাগ্যান্বেষণকারিগণ ভারতের ধর্ম্ম, স্থাপত্য, শিল্প, কাব্য, চিন্তা, জীবনধারা, আচার-ব্যবহার সঙ্গে করিয়া লইয়া এমন সব দেশে গিয়াছিল, যেখানে এখনও সভ্যতার আলোক পৌঁছায় নাই। সাম্রাজ্য-স্থাপনের, এমন কি, জগৎ-ব্যাপী সাম্রাজ্য-স্থাপনের কথা যে ভারতবাসীর মনে স্থান পায় নাই, তাহা নহে; কিন্তু তাহাদের কাছে ভারতই ছিল জগৎ এবং তাহাদের সাম্রাজ্য-চেষ্টার লক্ষ্য ছিল ভারতের অন্তর্গত জাতিসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া এক বিরাট জাতিতে পরিণত করা।

এই আদর্শ, এই প্রয়োজনের অনুভূতি, ইহাকে কার্য্যে পরিণত করিবার নিয়ত প্রেরণা ভারতের ইতিহাসে বরাবর দেখিতে পাওয়া যায়—বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া রামায়ণ ও মহাভারতে বর্ণিত যুগে, গুপ্ত ও মৌর্য্য সম্রাটগণের চেষ্টায়, মোগল ঐক্যসাধনে এবং শেষে পেশোয়াদের উচ্চাকাঙ্ক্ষায়,—যতক্ষণ না শেষ পর্য্যন্ত সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে, এবং সকল বিবদমান শক্তি এক বিদেশী শাসনের অধীনতায় সমতা লাভ করিয়াছে, স্বাধীন জাতির স্বাধীন ঐক্যের পরিবর্ত্তে পরাধীনতার সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখন প্রশ্ন হইতেছে, ঐক্যসাধনের এই যে ধীর মন্থর গতি, দুষ্করতা, অবস্থাবিপর্য্যয় এবং সুদীর্ঘ প্রয়াসের সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পরিণতি, ইহার কারণ কি ভারতীয় সভ্যতার, ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় চেতনা ও সামর্থ্যের কোন মূলগত অক্ষমতা, না, ইহার অন্য কোন কারণ আছে? ভারতবাসী ঐক্যবদ্ধ হইতে অক্ষম, তাহাদের মধ্যে এক দেশপ্রেমের অভাব—তাহা কেবল বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবেই স্পষ্ট হইতেছে—ধর্ম্ম ও জাতিভেদে তাহারা বহুধা বিভক্ত, এই সব লইয়া অনেকেই অনেক কথা বলিয়াছেন ও লিখিয়াছেন। এই সব সমালোচনার গুরুত্ব যদি সম্পূর্ণভাবেই স্বীকার করিয়া লওয়া যায়—এগুলি সবই একবারে সত্য নহে বা ঠিকভাবে বর্ণিত হয় নাই—তথাপি এ সব হইতেছে উপসর্গ মাত্র, ইহাদের গভীরতর কারণের সন্ধান আমাদিগকে করিতেই হইবে।

এইরূপ সমালোচনার সাধারণতঃ এই উত্তর দেওয়া হয় যে, ভারত একটা মহাদেশ বলিলেই হয়, বহুসংখ্যক জনসমাজকে লইয়া ইহা আয়তনে প্রায় য়ুরোপেরই সমান। য়ুরোপের ঐক্যসাধনে যে সব বাধা, এখানকার বাধাও তেমনই গুরু। য়ুরোপের ঐক্যসাধন এখনও কেবল আদর্শের স্তরে নিষ্ফল কল্পনামাত্র হইয়া রহিয়াছে, আজও তাহা কার্য্যতঃ সিদ্ধ করা সম্ভবপর হয় নাই। ইহা যদি পাশ্চাত্য সভ্যতার অযোগ্যতার অথবা য়ুরোপীয়গণের রাষ্ট্রনীতিক অক্ষমতার পরিচায়ক না হয়, তাহা হইলে ভারতের ইতিহাসে যে দেখিতে পাওয়া যায়, ভারতবাসী ঐক্যের আদর্শটিকে অনেক বেশী স্পষ্টতার সহিত গ্রহণ করিয়াছে, উহাকে কার্য্যে পরিণত করিতে অবিরত চেষ্টা করিয়াছে, এবং পুনঃ পুনঃ সফলতার নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, ইহাকে অন্য মানদণ্ড লইয়া বিচার করা ঠিক হয় না। এরূপ যুক্তিতে কিছু জোর আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ সঙ্গত নহে, কারণ, সাদৃশ্যটি মোটেই পূর্ণ নহে, এবং আনুষঙ্গিক অবস্থানিচয়ও ঠিক এক রকমের নহে। য়ুরোপের জাতি সকল তাহাদের সমষ্টিগত সত্তায় পরস্পর হইতে অতি সুস্পষ্টভাবে বিভক্ত, এবং খৃষ্টধর্ম্মে তাহাদের যে আধ্যাত্মিক ঐক্য, এমন কি, এক সাধারণ য়ুরোপীয় সভ্যতায় তাহাদের যে শিক্ষা-দীক্ষাগত ঐক্য, তাহা ভারতের প্রাচীন আধ্যাত্মিক ও শিক্ষা-দীক্ষাগত ঐক্যের ন্যায় কখনই এত বাস্তব ও সম্পূর্ণ ছিল না। আর তাহা তাহাদের জীবনের একবারে কেন্দ্রস্বরূপ ছিল না, ইহার ভিত্তি বা দৃঢ়প্রতিষ্ঠাস্বরূপ ছিল না। তাহা কেবল একটা সাধারণ আবহাওয়া বা বেষ্টনীর মত ছিল। তাহাদের জীবনের ভিত্তি রাষ্ট্রনীতিক ও অর্থনীতিক সংস্থানে নিহিত

ছিল এবং ইহা প্রত্যেক দেশে বিশিষ্টভাবে পৃথক ছিল। আর পাশ্চাত্য-মনে রাষ্ট্রনীতিক চেতনার যে প্রাবল্য, তাহাই য়ুরোপকে বহু প্রতিদ্বন্দ্বী ও সর্ব্বদা বিবদমান জাতিতে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছে। রাজনীতিক ব্যাপারে ঐক্যবুদ্ধি এবং বর্ত্তমানে অর্থনীতিক ব্যাপারে পরস্পরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরতা, কেবল ইহাই শেষ পর্য্যন্ত যাহা সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা ঐক্য নহে, তাহা একটি league of nations বা জাতিসঙ্ঘ, তাহাও এই সবে মাত্র গড়িয়া উঠিতেছে, এখনও বিশেষ কোন কাযের হয় নাই। তাহা যুগযুগান্তের দ্বন্দ্বের ফলে যে মনোভাব সৃষ্ট হইয়াছে, সেইটিকে য়ুরোপীয় জাতিসকলের সাধারণ স্বার্থে নিয়োজিত করিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু ভারতে অতি প্রাচীনকালেই আধ্যাত্মিক ও সংস্কৃতিমূলক ঐক্য পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং তাহাই হইয়াছিল হিমালয় ও দুই সাগরের অন্তর্বর্ত্তী এই বিরাট জনসমূহের জীবনের মূল উপাদানস্বরূপ। প্রাচীন ভারতের লোকসকল রাজনীতিক ও অর্থনীতিক জীবনে কখনই পরস্পর হইতে সুস্পষ্টভাবে বিভক্ত পৃথক পৃথক জাতি ততটা ছিল না, যতটা তাহারা ছিল এক মহান্ আধ্যাত্মিক ও কৃষ্টিসম্পন্ন জাতির অন্তর্গত বিভিন্ন উপজাতি। সে মহাজাতি ভৌগোলিক সংস্থানে সমুদ্র ও পর্ব্বতমালার দ্বারা অন্যান্য দেশ হইতে এবং তাহার বৈশিষ্ট্যের তীব্র অনুভূতি ও তাহার বিশিষ্ট ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির দ্বারা অন্যান্য জাতি হইতে সুদৃঢ়ভাবে পৃথক্ হইয়াছিল। অতএব দেশটি যতই বিশাল হউক এবং কার্য্যতঃ যতই বাধা থাকুক, তাহার রাষ্ট্রনীতিক ঐক্য য়ুরোপের ঐক্য অপেক্ষা সহজেই সম্পাদিত হওয়া উচিত ছিল। কেন তাহা হয় নাই, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে আমাদিগকে আরও গভীরভাবে গবেষণা করিতে হইবে। তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইব যে, সমস্যার সমাধানটিকে যে-ভাবে দেখা হইয়াছিল বা দেখা উচিত ছিল, বাস্তব চেষ্টা সেই পথে চালিত হয় নাই এবং তাহা ভারতবাসীর বিশিষ্ট মনোভাবের বিরোধী ছিল।

ভারতীয় মনের সমগ্র ভিত্তিটি হইতেছে উহার আধ্যাত্মিকতা ও অন্তর্ম্মুখীনতার দিকে ঝোঁক। সকলের আগে এবং প্রধানতঃ আত্মা ও অন্তরের জিনিসের সন্ধান করা এবং আর সব কিছুকেই গৌণ বলিয়া, নিম্নতন জিনিষ বলিয়া দেখিবার প্রবৃত্তি। মহত্তর জ্ঞানের আলোকে এই সমুদয়কে নির্ণয় করিতে হইবে, ব্যবহার করিতে হইবে। এ সব হইতেছে গভীরতর অধ্যাত্মলক্ষ্যের একটা প্রকাশ মাত্র, একটা প্রাথমিক ক্ষেত্র বা সহায়, অন্ততঃ একটা আনুষঙ্গিক কিছু। অতএব ভারতীয় মনের গতি হইতেছে—যাহা কিছু সৃষ্টি করিতে হইবে, প্রথমে সেটিকে অন্তরের ক্ষেত্রে সৃষ্টি করা এবং পরে তাহার অন্যান্য দিকের বিকাশ করা। এই মনোভাব এবং ইহার ফলস্বরূপ ভিতর হইতে আরম্ভ করিয়া বাহিরের দিকে সৃষ্টি করিবার প্রবৃত্তি থাকার দরুণ, ইহা অবশ্যম্ভাবীই ছিল যে, ভারত নিজের যে ঐক্য প্রথমে সৃষ্টি করিবে, তাহা হইবে আধ্যাত্মিক ও কৃষ্টিমূলক ঐক্য। রোমে অথবা প্রাচীন পারস্যে বিজয়ী রাজ্য বা সমরতান্ত্রিক সংগঠনশীল জাতির প্রতিভা কর্ত্তৃক কেন্দ্রানুগত বাহ্য শাসনের দ্বারা যে রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্য সাধিত হইয়াছিল, ভারতে প্রারম্ভেই সেরূপ রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্যসাধন সম্ভবপর হয় নাই। আমার মনে হয় না যে, ইহা ভুল হইয়াছিল। ইহা ভারতবাসীর ব্যবহারিক বুদ্ধির অভাবের প্রমাণ, বা এক রাষ্ট্র প্রথমেই গঠন করা উচিত ছিল, পরে এক স্বাধীন ভারতীয় সাম্রাজ্যের বিশাল শরীরের মধ্যে আধ্যাত্মিক ঐক্য নিশ্চিতভাবে বিকাশলাভ করিতে পারিত। প্রারম্ভেই যে সমস্যাটি উঠিয়াছিল, সেটি হইতেছে শতাধিক রাজ্য, কুল, জাতি, গোষ্ঠীর আবাসভূমি এক বিরাট দেশের সমস্যা। গ্রীসে যেমন মূলগত ঐক্যবোধের সৃষ্টি করিতে হেলেনিক্ (Hellenic) কাল্চারের ঐক্য প্রয়োজন হইয়াছিল, এখানেও এবং আরও অলঙ্ঘনীয়রূপে এই সকল লোকের মধ্যে একটা সচেতন আধ্যাত্মিক ও কৃষ্টিমূলক ঐক্য প্রথম ও অপরিহার্য্যরূপে প্রয়োজন ছিল, ইহা ব্যতীত কোনও স্থায়ী ঐক্য সম্ভবপর ছিল না। এ বিষয়ে ভারতীয় মনীষার, ভারতের শিক্ষাদীক্ষার প্রতিষ্ঠাতা মহানুভব ঋষিগণের সহজোপলব্ধিতে কোন ভুলই হয় নাই। আর যদিই ধরিয়া লওয়া যায় যে, প্রাচীন ভারতের লোক সকলের মধ্যে রোম্যান জগতের ন্যায় সামরিক ও রাষ্ট্রনীতিক উপায়ের দ্বারা একটা বাহ্য সাম্রাজিক ঐক্য স্থাপন করা যাইত, তাহা হইলেও আমাদের মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, ঐ রোম্যান ঐক্যও স্থায়ী হয় নাই। এমন কি, রোমের জয় ও সংগঠনের দ্বারা প্রাচীন ইতালীর যে ঐক্য সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহাও স্থায়ী হয় নাই। ভারতের বিশাল পরিধির মধ্যে পূর্ব্বেই আধ্যাত্মিকতা ও কৃষ্টির ভিত্তি প্রতিষ্ঠা না করিয়া ঐরূপ ঐক্যসাধনের চেষ্টা করিলে তাহাও স্থায়ী হইত বলিয়া মনে হয় না। যদিই বা আধ্যাত্মিক ও কৃষ্টিমূলক ঐক্যের দিকে একান্ত বা অত্যধিক ঝোঁক দেওয়া হইয়া থাকে, এবং রাষ্ট্রনীতিক ও বাহ্য ঐক্যের চেষ্টা যৎসামান্যই হইয়া থাকে, তাহা হইলেও ইহা বলা চলে না যে, ইহার ফল কেবলই অনর্থকর হইয়াছিল বা ইহাতে কোনও সুবিধা হয় নাই। এই যে মূল বৈশিষ্ট্য, এই অমোচনীয় আধ্যাত্মিকতার ছাপ, সকল ভেদের মধ্যে এই অন্তর্নিহিত ঐক্য, ইহারই ফলে ভারত যদিও এ পর্য্যন্ত এক

সঙ্ঘবদ্ধ রাষ্ট্রনীতিক জাতিতে পরিণত হইতে পারে নাই, তথাপি টিকিয়া আছে এবং আজও ভারতই রহিয়াছে।

বস্তুতঃ কেবল আধ্যাত্মিক ও কৃষ্টিমূলক ঐক্যই স্থায়ী ঐক্য। একটা জাতি টিকিয়া থাকে বেশীর ভাগ তাহার স্থিতিশীল মন ও আত্মার জন্য। তাহার স্থায়ী স্থূল শরীর ও বাহ্য সংগঠনের জন্য নহে। এই সত্যটি পাশ্চাত্যের প্রত্যক্ষবাদী (Positive) মন বুঝিতে বা স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক হইতে পারে, কিন্তু যুগ-যুগান্তের ইতিহাসে ইহার প্রমাণ লিখিত রহিয়াছে। ভারতের সমসাময়িক প্রাচীন জাতি সকল, এবং তাহার পরে উদ্ভূত, তাহা অপেক্ষা তরুণ বহু জাতি লয়প্রাপ্ত হইয়াছে, কেবল তাহাদের স্মৃতিচিহ্নগুলি পশ্চাতে পড়িয়া আছে। গ্রীস ও মিশর রহিয়াছে কেবল নামে ও মানচিত্রে। কারণ, হেলাসের আত্মা (the soul of Hellas) অথবা যে জাতীয় আত্মা মেম্‌ফিস্ (Memphis) নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তাহা আর আমরা এখন এথেন্স বা কাইরোতে দেখিতে পাই না। রোম ভূমধ্যসাগরের তীরবর্ত্তী জাতি সকলের উপরে একটা রাষ্ট্রনীতিক এবং একটা শুধু বাহ্য কৃষ্টিমূলক ঐক্য চাপাইয়া দিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের জীবন্ত আধ্যাত্মিক ও কৃষ্টিমূলক ঐক্য সৃষ্টি করিতে পারে নাই। সেই জন্যই পূর্ব্ব পশ্চিম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল, আফ্রিকা সামরিক রোম্যান অধিকারের চিহ্ন পর্য্যন্ত লুপ্ত করিয়া দিল। এমন কি, পশ্চিমের জাতিসমূহ, যাহাদিগকে এখনও লাটিন (Latin) জাতি বলা হয়, তাহারাও বর্ব্বরদের আক্রমণে কার্য্যতঃ বাধা দিতে সমর্থ হয় নাই। বিজাতীয় জীবনীশক্তির সংমিশ্রণে নবজন্ম লাভ করিয়া তবেই তাহারা আধুনিক ইতালী, স্পেন ও ফ্রান্স হইতে পারিয়াছে। কিন্তু ভারত আজও বাঁচিয়া আছে, এবং আভ্যন্তরীণ মন, প্রাণ, আত্মায় যুগযুগান্তের ভারতের সহিত যোগসূত্র বজায় রাখিয়াছে। বিদেশীর আক্রমণ ও শাসন, গ্রীক, পার্থিয়ান, হুন, ইস্‌লামের বিপুল বিক্রম, বৃটিশ-শাসন ও বৃটিশতন্ত্রের সর্ব্বপেষণকারী ষ্টীম্-রোলার সদৃশ গুরুভার, পাশ্চাত্যের অতি প্রবল সঞ্চাপন, কিছুই বৈদিক ঋষিগণ কর্ত্তৃক সৃষ্ট ভারতের দেহ হইতে তাহার প্রাচীন আত্মাকে বহিষ্কৃত বা ধ্বংস করিতে সমর্থ হয় নাই। প্রতি পদে, প্রত্যেক বিপদ, আক্রমণ ও পরাধীনতার মধ্যে সে সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের দ্বারা আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। তাহার গৌরবের যুগে সে ইহা করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহার আধ্যাত্মিক সংহতির বলে এবং স্বায়ত্তীকরণ ও প্রতিক্রিয়া করিবার শক্তির বলে। যাহা গ্রহণসাধ্য নহে, তাহা দূর করিয়া দিয়াছে, যাহা দূর করা যায় না, তাহা অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছে। এমন কি, যখন তাহার অবনতি আরম্ভ হইয়াছে, তাহার পরও ঐ শক্তির বলেই সে বাঁচিয়া থাকিতে সমর্থ হইয়াছে। নিস্তেজ হইয়াও অবধ্য থাকিয়াছে। পিছু হটিয়া দক্ষিণ দেশে কিছু কাল তাহার প্রাচীন রাষ্ট্রতন্ত্রকে বজায় রাখিয়াছে। ইস্‌লামের আক্রমণ হইতে তাহার প্রাচীন আত্মা ও আদর্শকে রক্ষা করিতে রাজপুত, শিখ ও মারাঠা অভ্যুত্থান করিয়াছে। যেখানে সক্রিয়ভাবে প্রতিরোধ করিতে পারে নাই, সেখানে নিষ্ক্রিয়ভাবেই আত্মরক্ষা করিয়াছে, তাহার সমস্যার সমাধান করিতে না পাবায় বা তাহার সহিত মীমাংসা করিতে না পারায় সাম্রাজ্যের পর সাম্রাজ্যকে সে ধ্বংসের মুখে পাঠাইয়াছে এবং সর্ব্বদা সে তাহার পুনরভ্যুত্থানের সুদিন অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে। আর এখনও আমাদের দৃষ্টির সম্মুখেই আমরা এইরূপ একটি ব্যাপার ঘটিতেছে প্রত্যক্ষ করিতেছি। তাহা হইলে যে সভ্যতা এই অসাধ্যসাধন করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহার অতুলনীয় জীবনীশক্তি সম্বন্ধে এবং যাঁহারা ইহার ভিত্তি কোন বাহ্য জিনিষের উপর স্থাপন না করিয়া আত্মা ও আভ্যন্তরীণ মনের উপর স্থাপন করিয়াছিলেন এবং আধ্যাত্মিক ও কৃষ্টিমূলক ঐক্যকে তাহার ক্ষণভঙ্গুর শোভা মাত্র না করিয়া তাহার জীবনের মূলও সারবান্ করিয়া দিয়াছিলেন, ধ্বংসশীল উর্দ্ধস্তর মাত্র না করিয়া চিরস্থায়ী ভিত্তি করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহাদের দূরদৃষ্টি ও জ্ঞান সম্বন্ধে আর বলিবার কি আছে ?

কিন্তু আধ্যাত্মিক ঐক্য ব্যাপক ও নমনীয় জিনিষ। রাষ্ট্রনীতিক ও বাহ্য ঐক্যের ন্যায় ইহা কেন্দ্রীকরণ ও সমরূপতার উপর নির্ভর করে না ; বরঞ্চ ইহা সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে এবং জীবনের বহু বৈচিত্র্য ও স্বাধীনতার অবাধ অবসর দেয়। প্রাচীন ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করিবার সমস্যা কেন এত কঠিন ছিল, এইখানেই আমরা সেই গূঢ় কারণের আভাস পাই। সাধারণতঃ যে ভাবে ইহা সম্পন্ন করা হয়, এক কেন্দ্রানুগত সমাকার সাম্রাজিক ষ্টেটের দ্বারা সকল স্বচ্ছন্দ বৈচিত্র্য, স্থানীয় স্বাতন্ত্র্য, প্রতিষ্ঠিত সাম্প্রদায়িক স্বাধীনতা লুপ্ত করিয়া দেওয়া হয়, ভারতে তাহা সম্ভব হয় নাই এবং যতবারই এইরূপ চেষ্টা করা হইয়াছে, ততবারই তাহা দীর্ঘকাল কৃতকার্য্যতার আভাস দিলেও শেষ পর্য্যন্ত ব্যর্থ হইয়াছে। এমন কি, আমরা ইহাও বলিতে পারি যে, ভারতের ভাগ্যদেবতাগণ যে ঐরূপ চেষ্টাকে ব্যর্থ হইতে বাধ্য করিয়াছেন, যেন তাহার আভ্যন্তরীণ সত্তার বিনাশ না হয়, যেন সামরিক নিরাপদতার ব্যবস্থা করিতে গিয়া তাহার আত্মা তাহার জীবনের গভীর উৎসগুলিকে নষ্ট করিয়া না ফেলে, তাহা ঠিকই করা হইয়াছে। ভারতের পক্ষে প্রকৃত প্রয়োজন কি, ভারতের প্রাচীন মনীষা তাহা সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করিয়াছিল ; তাহার

সাম্রাজ্যের আদর্শ ছিল এমন এক ঐক্যসাধক শাসনতন্ত্র, যাহা স্থানীয় ও সাম্প্রদায়িক স্বাধীনতা যেখানে যাহা আছে, সব বজায় রাখিবে। কোন জীবন্ত স্ব-তন্ত্র অনুষ্ঠানকে বৃথা নষ্ট করিবে না, জীবনের সমন্বয়সাধন করিবে, যান্ত্রিক ঐক্য নহে। যে অবস্থা-পরম্পরার মধ্যে এরূপ সমাধান নিশ্চিতভাবে বিকশিত হইতে পারিত, পরবর্ত্তী কালে সে সবের অভাব হয় এবং তাহার পরিবর্ত্তে শাসনমূলক একচ্ছত্র সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করা হয়। এক আসন্ন ও বাহ্য প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ঐরূপ চেষ্টা করিতে হইয়াছিল, কিন্তু তাহার মহত্ব ও গৌরব সত্ত্বেও তাহা সম্পূর্ণভাবে সফল হইতে পারে নাই। পারে নাই, কারণ, উহা যে পথ ধরিয়াছিল, ঘটনাক্রমে তাহা ভারতীয় আত্মার প্রকৃত গতির অনুযায়ী হয় নাই। দেখা হইয়াছে যে, ভারতীয় রাষ্ট্র-সমাজ-ব্যবস্থার মূলগত নীতি ছিল কম্যুনাল বা সাম্প্রদায়িক স্ব-তন্ত্র অনুষ্ঠান সকলের সমন্বয়সাধন, গ্রামের স্বাতন্ত্র্য, নগর ও রাজধানীর স্বাতন্ত্র্য, জাতির (Casts) স্বাতন্ত্র্য, গিল্ড, গোষ্ঠী, কুল, ধর্ম্মসঙ্ঘ প্রভৃতির স্বাতন্ত্র্য এই সবের সমন্বয়সাধন। ষ্টেট বা রাজ্য বা রাজতন্ত্র বা গণতন্ত্র ছিল এই সকল স্বতন্ত্র অনুষ্ঠানকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া রাখিবার এবং এক মুক্ত ও জীবন্ত সংবিধানের মধ্যে লইয়া সকলকে পরস্পরের সহিত সমঞ্জসীভূত করিবার যন্ত্র। সাম্রাজ্যিক সমস্যা ছিল আবার এই সকল ষ্টেট, জাতি, নেশন্‌কে তাহাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া ঐক্যবদ্ধ করা এবং এইভাবে এক বৃহত্তর মুক্ত ও জীবন্ত সংবিধানের মধ্যে তাহাদের সমন্বয়সাধন করা। এমন এক রাষ্ট্রসংগঠন আবিষ্কার করা প্রয়োজন ছিল, যাহা তাহার সকল অঙ্গে শান্তি ও ঐক্য রক্ষা করিবে, বাহ্য আক্রমণ হইতে নিরাপদতার সুব্যবস্থা করিবে, ভারতীয় সভ্যতা ও কৃষ্টির আত্মা ও শরীরের স্বচ্ছন্দ ক্রিয়া ও ক্রমবিকাশকে ঐক্যে ও বৈচিত্র্যে, অঙ্গীভূত সকল সাম্প্রদায়িক ও স্থানীয় অনুষ্ঠানের অপ্রতিহত ও কর্ম্মময় জীবনে সম্পূর্ণতা প্রদান করিবে, ধর্ম্মকে বিরাট ও সমগ্র আয়তনে কায করিতে দিবে।

ভারতের প্রাচীন মনীষা সমস্যাটির এইরূপ অর্থই করিয়াছিল। পরবর্ত্তী কালের শাসনমূলক সাম্রাজ্য ইহাকে কেবল আংশিকভাবে গ্রহণ করে, কিন্তু তাহার প্রবণতা ছিল খুব ধীরে ধীরে এবং প্রায় অজ্ঞাতসারেই অধীনস্থ স্বায়ত্তশাসনমূলক অনুষ্ঠানগুলিকে ধ্বংস করা না হউক, অন্ততঃ শক্তিতে ক্ষীণ ও দুর্ব্বল করিয়া দেওয়া,—সকল কেন্দ্রীকরণ চেষ্টাতেই এইরূপ প্রবণতা অবশ্যম্ভাবী। ইহার পরিণাম হইয়াছিল এই যে, যখনই কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়িত, তখনই ভারতের জাতীয় জীবনে মূলতঃ প্রয়োজনীয় প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যের চিরন্তন নীতি পুনরায় মাথা তুলিয়া কৃত্রিমভাবে প্রতিষ্ঠিত ঐক্যকে ক্ষুন্ন করিয়া দিত, কিন্তু তাহার দ্বারা যাহা হওয়া উচিত ছিল, সমগ্র জাতীয় জীবনের গভীর সামঞ্জস্যসাধন এবং অধিকতর মুক্ত অথচ ঐক্যবদ্ধ ক্রিয়ায় সহায় হওয়া, তাহা আর হইয়া উঠিত না। সাম্রাজ্যিক রাজতন্ত্র স্বাধীন জাতীয় সভাগুলির শক্তিও হ্রাস করিয়া দিয়াছিল এবং তাহার ফলে মূল সাম্প্রদায়িক স্ব-তন্ত্র অনুষ্ঠানগুলি এক ঐক্যবদ্ধ শক্তির অঙ্গ না হইয়া পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভেদের সৃষ্টি করিয়াছিল। পল্লী-সমাজ (Village Community) নিজের সজীব শক্তি কতকটা বজায় রাখিয়াছিল, কিন্তু উর্দ্ধতম কর্তৃপক্ষের সহিত তাহার কোন জীবন্ত সম্বন্ধ ছিল না এবং বৃহত্তর জাতীয়তাবোধ হারাইয়া যে কোন দেশী বা বিদেশী শাসনতন্ত্র তাহার নিজের স্ব-পর্য্যাপ্ত সঙ্কীর্ণ জীবনকে সম্মান করিত, তাহাকেই স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত ছিল। ধর্ম্মসঙ্ঘগুলির মধ্যেও ঐরূপ ভাব আসিয়া পড়িয়াছিল। জাতিভেদ কোনও প্রকৃত প্রয়োজন ব্যতীত অথবা দেশের আধ্যাত্মিক বা অর্থনৈতিক প্রয়োজনের সহিত কোনও সম্বন্ধ ব্যতীত সংখ্যায় বাড়িয়া উঠিয়া কেবল অলঙ্ঘ্য আচারমূলক বিভাগে পরিণত হইল, এইভাবে সেগুলি দেশের মধ্যে ভেদবিরোধেরই সৃষ্টি করিল, পূর্ব্বের ন্যায় আর সমগ্র জাতীয় জীবনের সুসমঞ্জস ক্রিয়ার অঙ্গ রহিল না। ইহা সত্য নহে যে, প্রাচীন ভারতের জাতিবিভাগ দেশের মিলিত জীবনের পরিপন্থী ছিল কিম্বা পরবর্ত্তী কালেও সাক্ষাৎভাবে তাহারা রাজনীতিক দ্বন্দ্ব বা অনৈক্যের সৃষ্টি করিত (যদিও শেষকালে, চরম অবনতির যুগে, বিশেষতঃ মহারাষ্ট্র-সংগঠনের শেষভাগে এইরূপই ঘটিয়াছিল); কিন্তু বাস্তবিকই তাহারা সমাজে ভেদবৈষম্য সৃষ্টি করিবার এবং মুক্ত ও জীবন্তভাবে ঐক্যবদ্ধ জাতীয় জীবন পুনর্গঠনের পরিপন্থী অচলায়তন বিভাগ সৃষ্টি করিবার গৌণ শক্তি হইয়া উঠিয়াছিল।

ব্যবস্থাটির আনুষঙ্গিক দোষগুলি মুসলমান আক্রমণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিশেষভাবে প্রকাশ পায় নাই, কিন্তু সূত্রপাতরূপে তাহারা পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান ছিল, এবং পাঠান ও মোগল সাম্রাজ্যের দ্বারা যে অবস্থানিচয়ের সৃষ্টি হয়, তাহার মধ্যে সেগুলি দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই সব উত্তরকালীন সাম্রাজ্যিক অনুষ্ঠান যতই চাকচিক্যময় ও শক্তিশালী হউক, তাহারা স্বরূপ স্বৈরাচারমূলক (autocratic) ছিল বলিয়া তাহারা তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী সাম্রাজ্য সকল অপেক্ষাও অধিক পরিমাণে

কেন্দ্রানুবর্ত্তিতার দোষে দূষিত ছিল, এবং কৃত্রিম ঐক্যসাধক ব্যবস্থা প্রতি ভারতের প্রাদেশিক জীবনের সেই একই বিরোধিতার ফলে সেগুলি পুনঃ পুনঃ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, অথচ জাতির জীবনের সহিত তাহাদের কোনও সত্য, জীবন্ত, মুক্ত যোগ না থাকায় তাহারা এমন সাধারণ দেশাত্মবোধের সৃষ্টি করিতে পারে নাই—যাহা তাহাদিগকে বিদেশীর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে পারিত। আর অবশেষে আসিয়াছে এক যন্ত্রবৎ পাশ্চাত্যশাসন। উহা অবশিষ্ট সাম্প্রদায়িক ও প্রাদেশিক স্ব-তন্ত্র অনুষ্ঠানগুলিকে বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছে এবং তৎপরিবর্ত্তে যন্ত্রবৎ প্রাণহীন ঐক্য স্থাপন করিয়াছে। কিন্তু আবার ইহারও বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ায় আমরা দেখিতে পাইতেছি, সেই প্রাচীন নীতি সকল জাগিয়া উঠিতেছে, ভারতবাসীর স্থানীয় স্ব-তন্ত্র জীবন পুনর্গঠনের দিকে প্রবণতা, জাতি ও ভাষার সত্য বিভাগ অনুযায়ী প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য দাবি, রাষ্ট্র-শরীরের স্বাভাবিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় জীবন্ত অনুষ্ঠানরূপে অধুনালুপ্ত পল্লী-সমাজের আদর্শের দিকে ভারতীয় মনের পুনরায় দৃষ্টি এবং এখনও পুনরুজ্জীবিত না হইলেও, অপেক্ষাকৃত উন্নত ব্যক্তিগণের মনে আভাসরূপে দেখা দিতে আরম্ভ করিতেছে, ভারতীয় জীবনের উপযোগী কম্যুনাল ভিত্তির, এবং আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠার উপর ভারতীয় সমাজ ও রাষ্ট্রকে নবীভূত ও পুনর্গঠিত করিবার আরও সত্য আদর্শ।

অতএব ভারতীয় ঐক্যসাধন যে ব্যর্থ হইয়াছিল এবং তাহার পরিণামফল বিদেশীয় আক্রমণ এবং শেষ পর্য্যন্ত পরাধীনতা, তাহার কারণ কাযটির বিশালতাও বটে, আবার উহার বিশিষ্ট স্বরূপও বটে। কারণ, কেন্দ্রীভূত সাম্রাজ্যের সহজ পন্থা ভারতে প্রকৃতপক্ষে সাফল্যলাভ করিত না, অথচ মনে হইয়াছিল যে, এইটিই বুঝি একমাত্র পন্থা। সে জন্য পুনঃ পুনঃ এই দিকেই চেষ্টা করা হইয়াছিল। সে চেষ্টার আংশিক সফলতা সাময়িকভাবে এবং বহুকাল পর্য্যন্ত তাহাকে সমর্থন করিলেও শেষ পর্য্যন্ত তাহা কখনই সাফল্যলাভ করে নাই। আমি বলিয়াছি যে, ভারতের প্রাচীন মনীষা সমস্যাটির মূলস্বরূপ স্পষ্টভাবে অনুভব করিয়াছিল। বৈদিক ঋষি ও তাঁহাদের উত্তরাধিকারিগণ ভারতীয় জীবনের আধ্যাত্মিক ভিত্তি স্থাপন এবং ভারতের অন্তর্গত বহু জাতি ও জনসমাজের মধ্যে আধ্যাত্মিক ও কৃষ্টিমূলক ঐক্য স্থাপন করাকেই তাঁহাদের প্রধান কায বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা রাষ্ট্রনীতিক ঐক্যের প্রয়োজন সম্বন্ধেও অন্ধ ছিলেন না। তাঁহারা দেখিয়াছিলেন, আর্য্যগণের কুলপ্রথামূলক জীবনের নিরন্তর প্রবৃত্তি হইতেছে, বিভিন্ন আকারের কুল, বংশ, রাজ্য পরস্পরের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইবে এবং সকলে মিলিয়া কাহারও নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া লইবে। এইভাবে বৈরাজ্য ও সাম্রাজ্যের অধীনে দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ হওয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, এই প্রবৃত্তির পূর্ণ পরিণতির দিকে অগ্রসর হওয়াই ঠিক পন্থা এবং সেই জন্য তাঁহারা চক্রবর্ত্তীর আদর্শের বিকাশ করিয়াছিলেন,—এক ঐক্যসাধক সাম্রাজিক শাসন আসমুদ্র হিমাচল সমগ্র ভারতের অন্তর্গত বহু রাজ্য ও জাতিগুলিকে তাহাদের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট না করিয়া ঐক্যবদ্ধ করিবে। এই আদর্শকে তাঁহারা ভারতীয় জীবনের অন্যান্য সকল বিষয়ের ন্যায়ই, ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতার দ্বারা সমর্থন করিয়াছিলেন, ইহার বাহ্য প্রতীকস্বরূপ অশ্বমেধ ও রাজসূয় যজ্ঞের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, এবং এই আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করা শক্তিশালী নরপতির পক্ষে তাঁহার ধর্ম্ম বলিয়া, তাঁহার রাজকীয় ও আধ্যাত্মিক কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। সে ধর্ম্ম তাঁহাকে তাঁহার অধীনতায় আগত জনসমূহের স্বাধীনতা নষ্ট করিতে, তাহাদের রাজবংশকে সিংহাসনচ্যুত বা ধ্বংস করিতে অথবা তাহাদের কর্ম্মচারিগণের পরিবর্ত্তে নিজের কর্ম্মচারী ও প্রতিনিধি নিয়োগ করিতে দিত না। তাঁহার কায ছিল, এমন এক ঊর্দ্ধতন আধিপত্যের প্রতিষ্ঠা করা, যাহা সামরিক শক্তিতে দেশের মধ্যে শান্তিরক্ষা করিতে সমর্থ হইবে এবং প্রয়োজন হইলে দেশের সমস্ত শক্তিকে একত্র করিতে পারিবে। আর এই প্রাথমিক কর্ত্তব্যের সহিত আর এক আদর্শ যুক্ত হইয়াছিল, এক প্রবল ঐক্যসাধক শক্তির অধীনে ভারতীয় ধর্ম্মের, ভারতের আধ্যাত্মিক, ধার্ম্মিক, নৈতিক ও সামাজিক কৃষ্টির যথাযথ ক্রিয়ার সংরক্ষণ ও পূর্ণবিকাশ।

এই আদর্শের পূর্ণ রূপটি আমরা দেখিতে পাই রামায়ণ ও মহাভারতে। মহাভারত এইরূপই এক সাম্রাজ্যস্থাপন, ধর্ম্মরাজ্যস্থাপন চেষ্টার কাল্পনিক অথবা ঐতিহাসিক কাহিনী। সেখানে আদর্শটিকে এমনই অবশ্য-পালনীয় ও বহুজনস্বীকৃত বলিয়া চিত্রিত করা হইয়াছে যে, শিশুপালের ন্যায় দুরন্ত রাজাও বশ্যতা স্বীকার করিয়া যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে যোগদান করিয়াছিল এবং তাহার কারণ দর্শাইয়াছিল যে, যুধিষ্ঠির যাহা করিতেছেন, তাহা ধর্ম্মেরই অনুশাসন। আর রামায়ণে আমরা দেখিতে পাই, এইরূপই এক ধর্ম্মরাজ্যের, এক সুপ্রতিষ্ঠিত সর্ব্বব্যাপী সাম্রাজ্যের আদর্শ চিত্র। এখানেও সেটি স্বেচ্ছাচারী স্বৈরশাসন নহে, পরন্তু রাজধানীর, প্রদেশসমূহ এবং সকল শ্রেণীর প্রতিনিধিগণ দ্বারা গঠিত স্বাধীন জনসভা দ্বারা সমর্থিত সার্ব্বভৌম

রাজতন্ত্র; উহা ভারতীয় ব্যবস্থানুযায়ী সাম্প্রদায়িক স্ব-তন্ত্র অনুষ্ঠানগুলির সমন্বয়সাধক এবং ধর্ম্মের নীতি ও বিধানরক্ষক রাজতন্ত্র ষ্টেটেরই পরিবর্দ্ধিত রূপ। যে বিজয়ের আদর্শ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা বিজিত জনসমূহের জীবন্ত স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান সকলের বিলোপসাধনকারী এবং তাহাদের অর্থনৈতিক সম্পদশোষণকারী ধ্বংসপরায়ণ লুণ্ঠনাত্মক আক্রমণ নহে, পরন্তু তাহা এক যজ্ঞীয় যাত্রা, তাহাতে যে শক্তিপরীক্ষা হইত, সকলেই তাহার ফলাফল সহজে মানিয়া লইত। কারণ, পরাজয়ের ফলে অবমাননা, দাসত্ব বা উৎপীড়নের সম্ভাবনা ছিল না। কেবল যে বিজয়ী শক্তির একমাত্র লক্ষ্য জাতির ও ধর্ম্মের প্রকাশ্য ঐক্য-সাধন, তাহার প্রতি আনুগত্যই দৃঢ়ীভূত হইত। প্রাচীন ঋষি-গণের আদর্শ এবং তাঁহাদের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট। বুঝা যায় যে, দেশের বিচ্ছিন্ন ও কলহনিরত জনসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করার সামরিক ও রাষ্ট্রনৈতিক প্রয়োজন তাঁহারা দর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা আবার ইহাও দেখিয়াছিলেন যে, প্রদেশ সকলের স্ব-তন্ত্র জীবন বা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিয়া ঐ ঐক্যসাধন উচিত নহে। অতএব কেন্দ্রীভূত রাজতন্ত্র অথবা কড়াকড়িভাবে ঐক্য-মূলক সাম্রাজিক অবস্থার সৃষ্টিসাধন ষ্টেটের দ্বারা উচিত নহে। তাঁহারা দেশবাসীর মনে যে আদর্শ সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য দেশে তাহার নিকটতম সাদৃশ্য হইতেছে এক সাম্রাজিক আধিপত্যের অধীনে বিভিন্ন স্ব-তন্ত্র জাতি ও রাজ্যের সম্মেলন, **"A hegemony or confederacy under an imperial head."**

এই আদর্শকে কার্য্যে পরিণত করা যে কখনও সম্ভব হইয়া-ছিল, তাহার কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই—যদিও পৌরা-ণিক কিম্বদন্তী এই যে, যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মরাজ্যের পূর্ব্বেও এইরূপ রাজ্য কয়েকবারই স্থাপিত হইয়াছিল। বুদ্ধের সময়ে এবং পরে চন্দ্রগুপ্ত ও চাণক্য যখন ভারতের প্রথম ঐতিহাসিক সাম্রাজ্য গঠন করিতেছিলেন, তখনও দেশ স্বাধীন রাজ্য ও গণতন্ত্রে পূর্ণ ছিল এবং আলেকজান্দারের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার মত কোন ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য বর্ত্তমান ছিল না। পূর্ব্বে যদিই বা কখনও চক্রবর্ত্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহাকে স্থায়ী করিবার উপায় বা ব্যবস্থা যে আবিষ্কৃত হয় নাই, তাহা বুঝা যায়। যদি সময় দেওয়া হইত, তাহা হইলে হয় ত ইহার বিকাশ হইতে পারিত, কিন্তু ইতিমধ্যে এক গুরু পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহাতে অবি-লম্বে একটা সমাধান করা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে। ভারতের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ দুর্ব্বলতা হইতেছে, তাহার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তদ্বার-সমূহের ভেদ্যতা। আধুনিক কাল পর্য্যন্ত অবস্থা এইরূপই ছিল। যত দিন প্রাচীন ভারত সিন্ধুনদকে অতিক্রম করিয়া উত্তরে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এবং শক্তিশালী গান্ধার ও বহ্লিক রাজ্যদ্বয় বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে অজেয় দুর্গস্বরূপ দণ্ডায়মান ছিল, তত দিন ঐ দুর্ব্বলতার কোনও অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু সঙ্ঘবদ্ধ পারশ্যসাম্রাজ্যের আক্রমণে তাহারা ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং তখন হইতে বরাবর সিন্ধুনদের পরপারে অবস্থিত দেশ সকল আর ভারতের অন্তর্গত থাকে নাই। সেই জন্যই তাহারা আর ভারতের রক্ষকস্বরূপ না হইয়া বরং পর পর প্রত্যেক আক্রমণ-কারীর দাঁড়াইবার নিরাপদ স্থানে পরিণত হয়। আলেকজান্দারের আক্রমণ ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক মনকে বিপদটির গুরুত্ব সম্বন্ধে বিশেষভাবে সজাগ করিয়া দিয়াছিল এবং সেই সময় হইতেই আমরা দেখিতে পাই, কবি, লেখক, রাষ্ট্রনৈতিক, চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ সাম্রাজ্যের আদর্শ সর্ব্বদা প্রচার করিয়াছেন অথবা কি উপায়ে তাহাকে কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে, সে বিষয়ে গবেষণা করিয়াছেন। কার্য্যতঃ ইহার প্রত্যক্ষ ফল হইল চাণক্যের রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিভা দ্বারা আশ্চর্য্যরূপে দ্রুত গঠিত সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়, মাঝে মাঝে দুর্ব্বলতা এবং অন্তর্নিহিত ধ্বংসের বীজ থাকা সত্ত্বেও সেই সাম্রাজ্য আট নয় শত বৎসর ধরিয়া ক্রমান্বয়ে মৌর্য্য, সুঙ্গ, কানোয়া, অন্ধ্র ও গুপ্ত বংশের দ্বারা রক্ষিত বা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সাম্রাজ্য, ইহার অপূর্ব্ব সংগঠন, কার্য্যনির্ব্বাহক পদ্ধতি, জনসাধারণের হিতকর অনুষ্ঠানসমূহ, সমৃদ্ধি, চমৎকার কৃষ্টি এবং ইহার আশ্রয়াধীন দেশবাসীর তেজ, বিক্রম, শ্রী ও আশ্চর্য্য সৃষ্টিশক্তিপূর্ণ জীবনের ইতিহাস কেবল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অসম্পূর্ণ নিদর্শন সকল হইতে পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু তাহা হইলেও ইহাকে পৃথিবীর মহান্ জাতিসকলের প্রতিভা দ্বারা গঠিত ও রক্ষিত মহত্তম সাম্রাজ্য সকলের মধ্যেই স্থান দেওয়া যায়। সাম্রাজ্য-গঠনে প্রাচীনকালে ভারত যাহা করিয়াছে, তাহাতে এই দিক দিয়া তাহার গর্ব্ব না করিবার কোনও কারণ নাই, অথবা যাহারা হঠাৎ মত প্রকাশ করিয়া বসে যে, তাহার প্রাচীন সভ্যতার সমর্থক কার্য্যকরী প্রতিভা বা উচ্চ রাষ্ট্রনৈতিক দক্ষতা ছিল না, তাহাদের কথাও মাথা পাতিয়া লইবার কোন কারণ নাই।

তবে ইহাও ঠিক যে, একটি আসন্ন প্রয়োজন মিটাইতে এই সাম্রাজ্যটির প্রাথমিক গঠনে যে তাড়াতাড়ি, জোর-জবরদস্তি ও কৃত্রিমতা অবলম্বন করা অপরিহার্য্য হইয়াছিল, তাহার ফলও তাহাকে ভুগিতে হইয়াছিল। কারণ, সে জন্য

উহা প্রাচীন ভারতীয় প্রণালী অনুসারে সুদৃঢ়ভাবে ভারতের গভীরতম আদর্শের সুচিন্তিত, স্বাভাবিক ও সুনিয়ন্ত্রিত বিকাশে পরিণত হইতে পারে নাই! এক কেন্দ্রীভূত সাম্রাজিক রাজতন্ত্র-স্থাপন চেষ্টার পরিণাম হইল এই যে, স্থানীয় স্ব-তন্ত্র অনুষ্ঠানগুলির মুক্ত সমন্বয় সাধিত হইল না, পরন্তু সেগুলি ভাঙ্গিয়া পড়িল। ... ভারতীয় নীতি অনুসারে তাহাদের আচার ও অনুষ্ঠান সকলকে সম্মান করা হইত এবং প্রথম প্রথম তাহাদের রাষ্ট্রনীতিক অনুষ্ঠানগুলিকেও অন্ততঃ অনেক ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করিয়া দেওয়া হয় নাই, পরন্তু সাম্রাজিক ব্যবস্থারই অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছিল, তথাপি সেগুলি সাম্রাজিক কেন্দ্রানুগতার ছায়ায় বাস্তবিকপক্ষে সজীব ও সতেজ থাকিতে পারে নাই। প্রাচীন ভারতের স্বাধীন জাতি সকল অদৃশ্য হইতে লাগিল, তাহাদের ভগ্নাবশেষ হইতেই পরে বর্ত্তমান ভারতীয় জাতি (races) সকলের উদ্ভব হয়। আর আমার মনে হয়, মোটের উপর এই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, যদিও মহান্ জাতীয় সভাগুলি বহুকাল পর্য্যন্ত সতেজ ছিল, শেষ পর্য্যন্ত তাহাদের ক্রিয়া অনেকটা যন্ত্রবৎ কৃত্রিম হইয়া পড়ে এবং তাহাদের জীবনী-শক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত ও ক্ষুন্ন হইতে আরম্ভ করে। নাগরিক রিপাবলিকগুলিও ক্রমশঃ সংহিত রাজ্য বা সাম্রাজ্যের কেবল মিউনিসিপালিটীতে পরিণত হয়। সাম্রাজিক কেন্দ্রীকরণ এবং পূর্ব্বকালের উচ্চতর স্বাধীন জাতীয় সভাগুলি দুর্ব্বল ও লুপ্ত হওয়ার ফলে যে মনোভাব ও সংস্কারের উদ্ভব হয়, তাহাতে একটা আধ্যাত্মিক বিভাগের মত সৃষ্টি হইল। এক দিকে প্রজাবর্গ, যে কোন গবর্ণমেণ্ট তাহাদের নিরাপদতার ব্যবস্থা করিত এবং তাহাদের ধর্ম্ম, জীবন, আচার-ব্যবহারের উপর অত্যধিক হস্তক্ষেপ না করিত, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকিতে লাগিল। আর অন্য দিকে রহিল সাম্রাজিক শাসন। তাহা হিতকারী ও গৌরব-সমুজ্জ্বল ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু ভারতের প্রাচীন ও সত্য রাষ্ট্রনীতিক মনীষা স্বাধীন ও প্রাণময় জাতি-সকলের যে জীবন্ত অধিনেতার কল্পনা করিয়াছিল, তাহার আর অস্তিত্ব রহিল না। এই সকল পরিণাম সুস্পষ্ট হয় এবং চরমে উঠে অবনতির সঙ্গে সঙ্গে, কিন্তু বীজরূপে তাহারা বরাবরই ছিল এবং ঐক্যসাধনের জন্য যান্ত্রিক প্রণালী অবলম্বন করায় তাহারা এক প্রকার অবশ্যম্ভাবীই হইয়া পড়িয়াছিল। সুবিধার মধ্যে হইয়াছিল অধিকতর শক্তিমান্ ও সংহত সামরিক উদ্যোগ এবং অধিকতর নিয়মিত ও সমভাবাপন্ন শাসনক্রিয়া, কিন্তু যে স্বাধীন প্রাণময় বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনে জাতির মন ও প্রকৃতির সত্য প্রকাশ, তাহা লুপ্ত হওয়ায় এ সবের দ্বারা শেষ পর্য্যন্ত সে ক্ষতির পূরণ হয় নাই।

ইহার আরও একটা অশুভ পরিণাম হইয়াছিল। ইহা ধর্ম্মের অত্যুচ্চ আদর্শ হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছিল। রাজ্যের সহিত রাজ্য প্রভুত্বের জন্য দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত থাকায়, পূর্ব্ববর্ত্তী মহত্তর নৈতিক আদর্শ সকলের পরিবর্ত্তে সকলে কূট রাজনীতিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িল, দুরন্ত বিজয়াকাঙ্ক্ষাকে দমন করিবার মত কোন আধ্যাত্মিক বা নৈতিক প্রতিবন্ধক রহিল না, এবং রাজনীতি ও শাসন-নীতিতে জাতির মন অনেকটা রূঢ় ও নীচ হইয়া পড়িল। মৌর্য্য-যুগের কঠোর দণ্ডবিধি আইনে এবং অশোক কর্তৃক উড়িষ্যাবিজয়ে নৃশংস রক্তপাতে ইতিমধ্যেই তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। এই অবনতি, ধর্ম্মভাব ও উচ্চ বুদ্ধিমত্তার দ্বারা নিরুদ্ধ থাকায়, আরও প্রায় এক হাজার বৎসর চরম অবস্থায় পৌঁছিতে পারে নাই; ইহার পূর্ণ বেগটি আমরা দেখিতে পাই কেবল চূড়ান্ত পতনের যুগে। তখন পরস্পরকে অবাধ আক্রমণ, রাজা ও নেতৃগণের উচ্ছৃঙ্খল অহমিকা, রাষ্ট্রনীতিক বুদ্ধির এবং কার্য্যকরী-ভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হইবার শক্তির একান্ত অভাব, এক সাধারণ দেশ-প্রেমের অভাব এবং কোন্ রাজার পরিবর্ত্তে কে রাজা হইল, সে বিষয়ে জনসাধারণের চির-উদাসীনতা, এই সমগ্র বিরাট দেশকে সমুদ্রপার হইতে আগত মুষ্টিমেয় বণিকের হস্তে তুলিয়া দিল। কিন্তু চরম ফলগুলি যতই মন্থরগতিতে আসুক, এবং প্রথম প্রথম সাম্রাজ্যটির রাষ্ট্রনীতিক মহত্ত্ব, দেশের সভ্যতার অপরূপ বিদ্যাবুদ্ধি ও শিল্পসম্পদ এবং পুনঃ পুনঃ আধ্যাত্মিক অভ্যুত্থানের দ্বারা সেগুলি যতই সংশোধিত বা নিবারিত হউক, শেষ গুপ্ত রাজগণের সময়ের মধ্যেই ভারত তাহার অধিবাসিবৃন্দের রাষ্ট্র-নীতিক জীবনে তাহার সত্য মন ও অন্তরতম আত্মার স্বাভাবিক ও পূর্ণ বিকাশ করিবার সম্ভাবনা হারাইয়া ফেলিয়াছিল।

যে প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার জন্য সাম্রাজ্যটি সৃষ্ট হইয়াছিল, ইতিমধ্যে তাহা সম্পূর্ণরূপে না হইলেও যথেষ্টভাবেই সিদ্ধ করিতে সে সমর্থ হইয়াছিল। ভারতের মাটী ও ভারতীয় সভ্যতাকে অসভ্য বর্ব্বর জাতিগণের বিরাট প্লাবনতুল্য উপদ্রব হইতে রক্ষা করার যে মহৎ প্রয়োজন ছিল, যাহা সকল প্রাচীন সুপ্রতিষ্ঠিত সভ্যতারই পরম বিপদ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং যাহার বিরুদ্ধে উচ্চ-বিকশিত গ্রীকো-রোম্যান সভ্যতা এবং বিশাল ও শক্তিশালী রোমক সাম্রাজ্য শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়াইতে সমর্থ হয় নাই, সে উপদ্রব টিউটন, শ্লাভ, হূন ও শকগণের বিপুল বাহিনী সকল পশ্চিমে, পূর্ব্বে, দক্ষিণে ছড়াইয়া দিয়াছিল। বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতের দ্বারে তাহারা পুনঃ পুনঃ দারুণ আঘাত করিয়াছিল। কোথাও কোথাও তাহারা ভিতরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু যখন এই উপদ্রবের শক্তি অবসন্ন হইয়া পড়িল,

তখন তাহা ভারতীয় সভ্যতার মহান্ সৌধকে দণ্ডায়মান রাখিয়া গেল। তাহা তখনও সুদৃঢ়, মহান্ ও নিরাপদ হইয়া রহিল। যখনই সাম্রাজ্যটি দুর্ব্বল হইয়া পড়িত, তখনই তাহারা ভারতে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইত। মনে হয়, দেশ কিছু দিন ধরিয়া নিরাপদ থাকিলেই এইরূপ ঘটিত। যে প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য সাম্রাজ্যটির সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার অভাব হইলেই সেটি দুর্ব্বল হইয়া পড়িত। কারণ, তখন প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য-বোধ আবার জাগিয়া উঠিয়া পৃথক্ হইবার আন্দোলন আরম্ভ করিত, ফলে সাম্রাজ্যটির ঐক্য নষ্ট হইত অথবা উত্তরদেশে উহার বিরাট বিস্তার ভাঙ্গিয়া পড়িত। কোন নূতন বিপদ উপস্থিত হইলে, কোন এক নূতন বংশের অধীনে উহা আবার সবল হইয়া উঠিত। এইরূপ ব্যাপার পুনঃ পুনঃ ঘটিয়াছিল। তার পর বিপদটি বহু-কালের জন্য অন্তর্হিত হওয়ায়, সেই বিপদ নিবারণের জন্য যে সাম্রাজ্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাও চিরতরে লুপ্ত হইল। তখন তাহার অবশিষ্ট রহিল পূর্ব্বে, দক্ষিণে ও মধ্যদেশে কতকগুলি মহান্ শক্তিশালী রাজ্য এবং উত্তর-পশ্চিমে রহিল অপেক্ষাকৃত বিশৃঙ্খল জনপুঞ্জ। এই দুর্ব্বল ভাগই মুসলমানরা আসিয়া ভেদ করে এবং অল্পসময়ের মধ্যে উত্তরদেশে সেই প্রাচীন সাম্রাজ্যটিকে পুনর্গঠিত করে, তবে অন্য এক ধরণে, মধ্য-এশিয়ার ধরণে।

এই সব পূর্ব্বতন বিদেশী আক্রমণ এবং তাহাদের ফলাফলকে তাহাদের যথার্থ গুরুত্ব হিসাব করিয়া দেখিতে হইবে। কারণ, ঐতিহাসিক গবেষকগণের অতিরঞ্জিত থিওরি বা মতবাদ সকলের দ্বারা অনেক সময়েই তাহা গোলমাল হইয়া যায়। আলেক্-জান্দারের আক্রমণ ছিল বস্তুতঃ প্রাচীন গ্রীক্ সভ্যতার পূর্ব্বমুখীন বিস্তার, পশ্চিম ও মধ্য-এশিয়ায় তাহার কিছু কায করিবার ছিল, কিন্তু ভারতে তাহার কোনও ভবিষ্যৎ ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক বহিষ্কৃত হওয়ায় তাহার আর কোন চিহ্ন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান রহিল না। পর-বর্ত্তী মৌর্য্যগণের দুর্ব্বলতার সময়ে গ্রীকো-ব্যাক্‌ট্রিয়ানগণের (Graeco-Bactrians) যে অভিযান ভারতে প্রবেশ করে এবং সাম্রাজ্যটির পুনরুত্থিত শক্তির দ্বারা লুপ্ত হয়, তাহা ছিল এমন এক গ্রীক্-সভ্যতাপ্রাপ্ত জাতির অভিযান—যাহা ইতিপূর্ব্বেই ভারতীয় কৃষ্টির দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। পরে পার্থিয়ান, হুন ও শকগণের যে আক্রমণ আইসে, তাহা ছিল আরও গুরু। কিছু কালের জন্য এমন আশঙ্কাও হইয়াছিল যে, উহা বুঝি ভারতের বিশিষ্ট সভ্যতার পক্ষে বিপজ্জনক হইবে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহারা কেবল পঞ্জাবকেই প্রবলরূপে প্রভাবান্বিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। অবশ্য তাহারা তাহাদের তরঙ্গ পশ্চিম উপকূল দিয়া আরও দক্ষিণে প্রেরণ করিয়াছিল এবং বহু দূর দক্ষিণে কিছু কালের জন্য বিদেশী রাজবংশও প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু এই সকল বিভাগের জাতিগত প্রকৃতি কতখানি পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহা আদৌ নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। প্রাচ্য-সম্বন্ধে গবেষণাকারী পণ্ডিতগণ এবং নৃ-বিজ্ঞানবিদ্‌গণ কল্পনা করিয়াছেন যে, পঞ্জাব শক জাতিতে পরিণত হয়, রাজপুতরা শকেদেরই বংশধর, এমন কি, আরও দক্ষিণে এই আক্রমণের দ্বারা জাতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল। এই সকল জল্পনা-কল্পনা অতি অপর্য্যাপ্ত বা বিনা প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহাদের বিরুদ্ধে অন্যান্য থিওরি বা মতও আছে এবং ইহা খুবই সন্দেহজনক যে, আক্রমণকারীরা এত বেশী সংখ্যায় আসিয়াছিল,—যাহাতে এরূপ গুরু পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতে পারে। আরও ইহা অসম্ভব বলিয়া প্রতিপন্ন হয় এই জন্য যে, দুই তিন পুরুষের মধ্যেই এই সকল আক্রমণকারীর দল সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, সম্পূর্ণভাবেই ভারতের ধর্ম্ম, আচার, ব্যবহার, কৃষ্টি গ্রহণ করিয়াছিল এবং ভারতীয় জনসাধারণের সহিত মিশিয়া গিয়াছিল। রোমক-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দেশ-সমূহে যেরূপ হইয়াছিল, সেরূপ ভারতে বর্ব্বরজাতি সকল এক মহত্তর সভ্যতার উপরে নিজেদের আইন-কানুন, রাষ্ট্রব্যবস্থা, বর্ব্বরোচিত আচার-ব্যবহার ও বিজাতীয় শাসন চাপাইয়া দিতে সমর্থ হয় নাই। এই সব আক্রমণের এই সাধারণ তথ্যটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য এবং ইহার তিনটি কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। আক্রমণকারীরা ছিল সম্ভবতঃ সৈন্যদল মাত্র, জনসমূহ নহে; বিদেশী শাসনরূপে তাহাদের অধিকার একাদি-ক্রমে বহুদিন স্থায়ী হইতে না পাওয়ায় তাহার বিজাতীয় রূপটি দৃঢ় হইয়া উঠিতে পারে নাই। কারণ, প্রত্যেক আক্রমণের পরই ভারতীয় সাম্রাজ্যটি আবার সবল হইয়া উঠিত এবং বিজিত প্রদেশ সকলকে পুনরধিকার করিয়া লইত এবং শেষতঃ ভারতীয় কৃষ্টি এমনই সতেজভাবে প্রাণময় ও গ্রহণশীল যে, আক্রমণকারিগণের দিক হইতে কোনরূপ মানসিক বাধাই সাঙ্গীকরণের প্রক্রিয়াকে প্রতিহত করিতে সমর্থ হয় নাই। যাহাই হউক, যদি এই সব অভিযান খুবই গুরু হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ভারতীয় সভ্যতা অপেক্ষাকৃত তরুণ গ্রীকো-রোম্যান সভ্যতা অপেক্ষা অধিকতর প্রাণশক্তি ও সুদৃঢ়তার পরি-চয় দিয়াছিল, গ্রীকো-রোম্যান সভ্যতা টিউটন্ ও আরবদের

আক্রমণে ভূলুণ্ঠিত হইয়াছিল, অথবা নীচে পড়িয়া কোনরকমে আত্মরক্ষা করিয়াছিল, বর্ব্বরতার দ্বারা সাতিশয় প্রভাবিত ও নিষ্পেষিত হইয়া তাহা এমনই হীন দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, তাহাকে আর চিনিবার উপায় ছিল না। আর ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, রোমক-সাম্রাজ্য যতই সুদৃঢ়তা ও মহত্ত্বের বড়াই করুক, ভারতীয় সাম্রাজ্যটি কার্য্যতঃ তাহা অপেক্ষা অধিকতর দক্ষতার প্রমাণ দিয়াছিল। কারণ, পশ্চিমপ্রান্তে বিদ্ধ হইলেও ভারত উপদ্বীপের বিরাট ভাগকে সে নিরাপদে রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল।

পরে যে অধঃপতন হয়, আরবদের দ্বারা মুসলমান আক্রমণ কৃতকার্য্য না হইয়া বহুকাল পরে মুসলমানরা পুনরায় সেই চেষ্টা করে ও কৃতকার্য্য হয় এবং ইহার যে সব পরিণাম ঘটে, তাহাই ভারতবাসীর সামর্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহকে সমর্থন করে। কিন্তু এখানে কতকগুলি প্রচলিত ভুল ধারণা দূর করা প্রয়োজন। এই পরাজয় ঘটিয়াছিল এমন এক সময়ে—যখন প্রাচীন ভারতীয় জীবন ও কৃষ্টির প্রাণশক্তি দুই সহস্র বৎসর অপূর্ব্ব কর্ম্মপরায়ণতা ও সৃষ্টিকুশলতার পরিচয় দিবার পর ইতিমধ্যেই সাময়িকভাবে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল অথবা অবসন্নতার খুব সমীপবর্ত্তী হইয়াছিল এবং জাতীয় শিক্ষা-দীক্ষা সম্পদকে সংস্কৃত ভাষা হইতে জনসাধারণের ভাষায় এবং নবোত্থিত প্রাদেশিক জাতিগুলির মধ্যে আনিয়া তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য কিছু নিশ্বাস ফেলিবার সময় প্রয়োজন হইয়াছিল। উত্তরাঞ্চলে মুসলমান-বিজয় খুবই দ্রুত সম্পাদিত হইয়াছিল, যদিও তাহা সম্পূর্ণ হইতে কয়েক শতাব্দী লাগিয়াছিল। কিন্তু দক্ষিণদেশ ইতিপূর্ব্বে যেমন দেশীয় সাম্রাজ্যটির বিরুদ্ধে নিজের স্বাধীনতা বজায় রাখিয়াছিল, এই মুসলমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধেও বহুকাল তেমনই করিতে সমর্থ হইয়াছিল। আর বিজয়নগর রাজ্যের পতনের পর মহারাষ্ট্রের অভ্যুত্থান হইতেও খুব বেশী সময় লাগে নাই। রাজপুতরা আকবর ও তাহার উত্তরাধিকারীদের সময় পর্য্যন্ত নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিল, এবং শেষকালে কতকটা রাজপুত মন্ত্রী ও সেনাপতিগণের সাহায্যের জোরেই মোগলরা পূর্ব্বে ও দক্ষিণে তাহাদের আধিপত্য পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। আর ইহাও যে সম্ভব হইয়াছিল, তাহার কারণ—এই কথাটা প্রায়ই ভুলিয়া যাওয়া হয়—মুসলমান শাসনের বৈদেশিকতা খুব শীঘ্র দূর হইয়া গিয়াছিল। এ দেশের অধিকাংশ মুসলমানই রক্তে ভারতীয় ছিল এবং এখনও রহিয়াছে, কেবল পাঠান, তুর্ক ও মোগল রক্তের যৎসামান্য সংমিশ্রণ হইয়াছে; আর বিদেশ হইতে আগত রাজা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণও অবিলম্বেই মনে, প্রাণে ও স্বার্থে ভারতীয় হইয়া পড়িয়াছিল। ভারতবাসী যদি বাস্তবিকপক্ষে য়ুরোপের কয়েকটি দেশের ন্যায় বহু শতাব্দী ধরিয়া বিদেশীয় শাসনের অধীনে নিশ্চেষ্ট, সম্মত, নিরুপায় হইয়া পড়িয়া থাকিত, তাহা হইলে সেটা জাতির অন্তর্নিহিত এক মহাদৌর্ব্বল্যের প্রমাণস্বরূপ হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে বৃটিশ শাসনই প্রথম বিদেশী শাসন, একাদিক্রমে ভারতে আধিপত্য করিতেছে। প্রাচীন সভ্যতাটি মধ্য-এশিয়া হইতে আগত ধর্ম্ম ও কৃষ্টির সহিত সম্মিলিত হইতে না পারিয়া তাহার প্রভাবে ম্লান ও হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই; কিন্তু সে চাপ সে কাটাইয়া উঠিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহার উপরে নানাদিক দিয়া নিজের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এবং আমাদের সময় পর্য্যন্ত অবনত অবস্থাতে হইলেও জীবিত রহিয়াছে, পুনরভ্যুত্থানে সমর্থ রহিয়াছে। এইভাবে সে যে শক্তি ও সুনিপুণতার পরিচয় দিয়াছে, মানবীয় সভ্যতা সকলের ইতিহাসে তাহা সুদুর্ল্লভ। আর রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে উচ্চশক্তিশালী রাজা, রাজনীতিবিদ্, যোদ্ধা ও শাসনকর্ত্তার অভ্যুত্থান করিতে সে কখনও বিরত হয় নাই। অবনতির যুগে তাহার রাষ্ট্রনীতিক প্রতিভা এমন পর্য্যাপ্ত ছিল না, এমন সংহত এবং দৃষ্টিতে ও কর্ম্মে তৎপর ছিল না—যাহাতে পাঠান, মোগল ও য়ুরোপীয়গণের আক্রমণকে প্রতিহত করা যাইত; কিন্তু সে সকল আঘাত কাটাইয়া উঠিতে এবং পুনরভ্যুত্থানের প্রত্যেক সুযোগ গ্রহণ করিতে উহা সমর্থ ছিল। রাণা সঙ্গের অধীনে সাম্রাজ্যগঠনে প্রতিযোগিতা করিয়াছিল, শক্তিশালী বিজয়নগর রাজ্যের সৃষ্টি করিয়াছিল, রাজপুতানার পর্ব্বতমালায় বহু শতাব্দী ধরিয়া মুসলমানের বিরুদ্ধে নিজের প্রতিষ্ঠা বজায় রাখিয়াছিল, এবং অতি দুর্দ্দশার দিনেও দক্ষতম মোগল সম্রাটের সমগ্র শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া শিবাজীর রাজ্যগঠন ও রক্ষা করিয়াছিল, মহারাষ্ট্রসঙ্ঘ ও শিখ খালসা গঠন করিয়াছিল, মহান্ মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি ক্ষয় করিয়া দিয়াছিল এবং পুনরায় সাম্রাজ্য-গঠনের এক শেষ চেষ্টা করিয়াছিল। যখন চরম ও প্রায় মারাত্মক অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছে, চারিদিকে বর্ণনাতীত অন্ধকার, অনৈক্য, বিশৃঙ্খলা, তাহার মধ্যেও সে রণজিৎসিং ও নানা ফড়নবিশের অভ্যুত্থান করিয়া ইংলণ্ডের ভাগ্যলক্ষ্মীর অবশ্যম্ভাবী জয়যাত্রাকে বাধা দিতে সমর্থ হইয়াছিল। মূল সমস্যাটি ঠিকমত দেখিবার ও সমাধান করিবার অক্ষমতা, নিয়তি পুনঃ পুনঃ যে প্রশ্নটি তুলিয়াছে, তাহার সদুত্তর দিবার অক্ষমতা সম্বন্ধে যে অভিযোগ আনা যাইতে পারে, এই সকল ঐতিহাসিক তথ্যের দ্বারা সে

অভিযোগের গুরুত্ব কিছুমাত্র কম হয় না বটে, কিন্তু যদি বিবেচনা করিয়া দেখা যায় যে, এই সব ব্যাপার অবনতির যুগের ঘটনা, তাহা হইলে ইহা এমন এক বিস্ময়জনক ইতিহাস—যাহার তুলনা সহজে অন্য কোথাও মিলিবে না, এবং লোক যে অজ্ঞভাবে বলিয়া থাকে, ভারত চিরকালই পরাধীন এবং রাষ্ট্রনীতিক ব্যাপারে অক্ষম, তাহার পরিবর্ত্তে সমগ্র প্রশ্নটি এক সম্পূর্ণ নূতন আলোকে দেখা যায়।

মুসলমানবিজয়ের দ্বারা যে সমস্যাটি উঠিয়াছিল, সেটি বস্তুতঃ বিদেশীয় পরাধীনতা এবং তাহা হইতে মুক্ত হইবার সমস্যা নহে, সেটি ছিল দুই সভ্যতার দ্বন্দ্ব। একটি প্রাচীন ও দেশীয়, অপরটি মধ্যযুগীয় এবং বাহির হইতে আনীত। সমস্যাটির সমাধান সম্ভবপর হয় নাই এই জন্য যে, উভয়ের সহিতই এক একটি শক্তিশালী ধর্ম্ম জড়িত ছিল। একটি সংগ্রামপ্রিয় ও আক্রমণশীল, অপরটি আধ্যাত্মিকতার দিক্ দিয়া সহনশীল ও নমনীয় হইলেও নিজের বৈশিষ্ট্যের প্রতি কঠোর নিষ্ঠাসম্পন্ন এবং সামাজিক আচার-ব্যবহারের দুর্ভেদ্য প্রাচীরের অন্তরালে আত্ম-রক্ষাপরায়ণ। সমস্যাটির সমাধান দুই প্রকারে হইতে পারিত। এমন এক মহত্তর অধ্যাত্ম-তত্ত্বের অভ্যুত্থান যাহা উভয়ের মধ্যে সমন্বয়বিধান করিতে পারিত, অথবা এমন রাষ্ট্রনীতিক দেশপ্রেমের বিকাশ যাহা ধর্ম্মের দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করিয়া উভয় সম্প্রদায়কে মিলিত করিতে পারিত। প্রথমটি সে যুগে অসম্ভব ছিল। মুসলমানদের দিক্ হইতে আকবর সে চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার ধর্ম্ম ছিল বস্তুতঃ মানসিক বুদ্ধির দ্বারা রচিত, রাষ্ট্রনীতি-প্রসূত। তাহাতে আধ্যাত্মিক সৃষ্টি ছিল না এবং সম্প্রদায় দুইটির প্রবল ধর্ম্মভাবাপন্ন মন যে সে ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে, এমন সম্ভাবনা কখনও ছিল না। হিন্দুদের দিক হইতে নানক ঐ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার ধর্ম্ম মূলনীতিতে সার্ব্বজনীন হইলেও, কার্য্যতঃ তাহা সাম্প্রদায়িক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আকবর এক সাধারণ রাষ্ট্রনীতিক দেশপ্রেম সৃষ্টি করিবারও চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সে চেষ্টারও ব্যর্থতা প্রথম হইতেই অবশ্যম্ভাবী ছিল। এইরূপ বাঞ্ছনীয় মনোভাব সৃষ্টি করিতে হইলে উভয় সম্প্রদায়ের শক্তিমান পুরুষ, রাজা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের ভিতর দিয়া উভয় সম্প্রদায়ের কার্য্যকরী শক্তিকে আকৃষ্ট করিয়া ঐক্যবদ্ধ ভারত সাম্রাজ্য-গঠনের ফল সাধারণ কার্য্যে প্রয়োগ করার প্রয়োজন। কিন্তু মধ্য-এশিয়ার আদর্শে গঠিত স্বৈরাচারী সাম্রাজ্যের পক্ষে এরূপ করা সম্ভব ছিল না; দেশবাসীর জাগ্রত সম্মতির প্রয়োজন ছিল, কিন্তু তাহা-দিগকে উদ্বুদ্ধ করিবার মত রাষ্ট্রনীতিক আদর্শ ও অনুষ্ঠান সকলের অভাবে তাহা সক্রিয় হইয়া উঠিতে পারে নাই। মোগল সাম্রাজ্যটি ছিল এক মহান্ ও চমৎকার সৃষ্টি, তাহার গঠন ও সংরক্ষণে অপরিসীম রাষ্ট্রনীতিক প্রতিভা ও বুদ্ধি নিয়োজিত হইয়াছিল। তাহা ছিল কীর্ত্তি-সমুজ্জ্বল, শক্তিশালী, জনহিতসাধক, এবং আরও বলা যাইতে পারে যে, আওরঙ্গজেবের প্রবল গোঁড়ামি সত্ত্বেও সেটি ধর্ম্মের ব্যাপারে মধ্যযুগের ও সমসাময়িক সকল য়ুরোপীয় রাজ্য ও সাম্রাজ্যের তুলনায় যে কত বেশী উদার ও সহনশীল ছিল, তাহার উল্লেখ করা যায় না, এবং তাহার অধীনে ভারত সামরিক ও রাষ্ট্রনীতিক শক্তিতে, অর্থনীতিক ঐশ্বর্য্যে এবং আর্ট ও কৃষ্টির গৌরবে অনেক উচ্চে উঠিয়াছিল। কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাম্রাজ্যের ন্যায় ইহাও আরও শোচনীয়ভাবেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। এই ধ্বংসের মূলে সেই একই প্রণালী বিদ্যমান—বহিঃশত্রুর আক্রমণে নহে, অন্তর্বিপ্লবের ফলে। সামরিক ও শাসনমূলক কেন্দ্রীভূত সাম্রাজ্যের দ্বারা ভারতের জীবন্ত রাষ্ট্রনীতিক ঐক্য সাধন সম্ভব হয় নাই। আর যদিও প্রদেশগুলিতে নবজীবনের অভ্যুত্থান হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু সেই সময়ে য়ুরোপীয় জাতিগণের অনাহূত আগমনে এবং তাহাদের দ্বারা দেশের বিশৃঙ্খল অবস্থার সুযোগ গ্রহণে সে সম্ভাবনা মুকুলেই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল; পেশোয়াগণের অকৃতকার্য্যতা এবং তাহার পরবর্ত্তী অরাজকতা ও অধঃপতনের বিষম বিশৃঙ্খলা তাহাদিগকে এই সুযোগ প্রদান করিয়াছিল।

ভাঙ্গনের যুগে দুইটি বিশিষ্ট সৃষ্টির দ্বারা ভারতের রাষ্ট্রনীতিক প্রতিভা পুরাতন অবস্থা-পরম্পরার মধ্যে নবজীবনের ভিত্তি স্থাপন করিবার শেষ প্রয়াস করিয়াছিল, কিন্তু কোনটিই কার্য্যতঃ সমস্যাটির সমাধান করিবার মত উপযুক্ত হইয়া উঠিতে পারে নাই। রামদাসের মহারাষ্ট্র-ধর্ম্মের আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং শিবাজী কর্ত্তৃক সংগঠিত মারাঠা অভ্যুত্থান ছিল প্রাচীন আদর্শ ও অনুষ্ঠানের যাহা কিছু জানা বা বুঝা যায়, তাহাই পুনঃসংস্থাপনের চেষ্টা, কিন্তু প্রারম্ভে অধ্যাত্মপ্রেরণা ও প্রজাতান্ত্রিক শক্তি সকলের সাহায্য পাওয়া সত্ত্বেও তাহা সাফল্যলাভ করে নাই। বস্তুতঃ অতীতকে এইরূপে ফিরাইয়া আনিবার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইতে বাধ্য। পেশোয়াগণ তাঁহাদের সকল প্রতিভা সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠার দৃষ্টিলাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা কেবল এক সামরিক ও রাষ্ট্রনীতিক রাজ-সঙ্ঘেরই (confederacy) সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহাদের সাম্রাজ্যস্থাপনের চেষ্টা কৃতকার্য্য হয় নাই। কারণ, তাহার মূলে ছিল প্রাদেশিকতা, তাহা নিজের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী

ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই, সমগ্র ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করিবার জীবন্ত আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হইতে পারে নাই। অপর পক্ষে শিখ-খালসা ছিল এক আশ্চর্য্য রকমের মৌলিক ও নূতন সৃষ্টি, তাহার দৃষ্টি অতীতের দিকে নহে, ভবিষ্যতের দিকেই প্রসারিত ছিল। গভীর আধ্যাত্মিক সূচনা, ধর্ম্মগুরুর নেতৃত্ব, সাম্যতান্ত্রিক সংগঠন, ইস্‌লাম ও বেদান্তের গভীরতম সত্যগুলির সমন্বয়সাধন করিবার প্রথম চেষ্টা, এই সব লইয়া এই বিশিষ্ট ও অভিনব অনুষ্ঠান ছিল মানবসমাজের তৃতীয় বা অধ্যাত্মস্তরে প্রবেশ করিবার অকাল-প্রয়াস; কিন্তু উহা আধ্যাত্মিকতা ও বাহ্যজীবনের মধ্যে যোগ-সাধক সমৃদ্ধ সৃষ্টিমূলক চিন্তা ও কৃষ্টির বিকাশ করিতে পারে নাই। এইভাবে প্রতিহত ও অসম্পূর্ণ হওয়ায় সে চেষ্টা সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিক গণ্ডীর মধ্যেই আরম্ভ ও শেষ হইয়াছিল, প্রগাঢ়তা লাভ করিয়াছিল, কিন্তু প্রসারতার শক্তিলাভ করিতে পারে নাই। যে অবস্থানিচয়ের মধ্যে ঐরূপ চেষ্টা কৃতকার্য্য হইতে পারিত, তখন তাহাদের অস্তিত্ব ছিল না।

পরে আসিল নিশার অন্ধকার এবং সকল রাষ্ট্রনীতিক উদ্যম ও সৃষ্টি সাময়িকভাবে বন্ধ হইয়া গেল। আমাদের এক পুরুষ পূর্ব্বে যে পাশ্চাত্য আদর্শ ও অনুষ্ঠানগুলি দাসসুলভ নিষ্ঠার সহিত অনুকরণ ও গ্রহণ করিবার যে প্রাণহীন প্রয়াস দেখা গিয়াছিল, তাহা হইতে ভারতবাসীর রাষ্ট্র-নীতিক মনীষা ও প্রতিভার কোন সত্য পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু আবার অনেক ভ্রান্তি-কুজ্ঝটিকার মধ্যেও এক নূতন সন্ধ্যার আলোক দেখা যাইতেছে, প্রদোষের সন্ধ্যা নহে, প্রভাতেরই যুগ-সন্ধ্যা। যুগযুগান্তের ভারত মরে নাই, তাহার সৃষ্টির শেষ-কথাও এখনও বলা হয় নাই; সে জীবিত রহিয়াছে নিজের জন্য, সমগ্র মানবজাতির জন্য এখনও তাহার কিছু করিবার রহিয়াছে। আর এখন যাহা জাগ্রত হইতে চাহিতেছে, তাহা একটা ইংরাজীভাবাপন্ন (Anglicised) প্রাচ্য জাতি নহে, পাশ্চাত্যের অনুগত শিষ্য হইতে এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার ফলাফলগুলির পুনরভিনয় করিতে বাধ্য নহে, পরন্তু তাহা এখনও সেই প্রাচীন স্মরণাতীতকালের শক্তি পুনরায় নিজের গভীরতর আত্মার সন্ধান পাইতেছে, সকল জ্যোতি ও শক্তির পরম উৎসের দিকে নিজের মাথা আরও উচ্চ করিয়া তুলিতেছে, নিজের ধর্ম্মের পূর্ণ অর্থ ও বিশালতর রূপ আবিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে।

শ্রীঅনিলবরণ রায়।

তপস্যার জয়

হর-যোগাশ্রমে যবে প্রবেশিলে তুমি, হৈমবতি !
সুকুমার পদস্পর্শে তব মধুঋতু দিল দেখা
অকালে মহিম দীপ্র দিকে দিকে আঁকি রক্ত রেখা
কূজনে গুঞ্জনে ভরি আশ্রম-কানন,—দিব্য জ্যোতি
বিম্বাধর তব মুখ শোভিল সে শ্যামারণ্য-মাঝে
নীলাম্বরে পূর্ণচন্দ্র যথা, হেরি মহেশের মন
ভৈরব আন্দোলে আন্দোলিয়া উঠে,—প্রলয়ের সাঁঝে
মহাসিন্ধু যেই মত তরঙ্গে গর্জ্জনে সুভীষণ।
কি ভ্রূকুটি দেখা দিল ভবেশের দুষ্প্রেক্ষ্য বদনে
তৃতীয় নয়ন হতে সহসা পিঙ্গল বহ্নিজ্বালা
স্ফুরিল কি অকস্মাৎ! ত্রাসবিদ্ধ বক্ষে ফুলমালা
শুকাইল অপমান-তাপে শুষ্ক আনত আননে
ফিরিল হিমাদ্রি সুতা, ব্যর্থ রূপ মানি আপনার
না পারি হরের হিয়া করিবারে রূপে অধিকার।

পরে উগ্র তপস্যায় তুষিবারে সন্ন্যাসী সে হরে
রাজবালা গৃহ ত্যজি নিরত কি দৃঢ়ব্রত 'পরে!
পঞ্চতপা খরতাপে, বর্ষাধারা শিরে ধরি ধরি
শীত পদ্মহীন সরঃ মুখপদ্মে উদ্ভাসিত করি
নাহি ক্লান্তি নাহি খেদ,—ধৈর্য্যের সে সাক্ষাৎ প্রতিমা
ধ্যান-রতা জল-লীনা,—প্রেমে তার কেবা দিবে সীমা!
রাজরাজেশ্বরীরূপ রেখায় রেখায় বিমলিন
শীর্ণ পাংশু মুখচ্ছবি—দীপ্ত-চক্ষু-ম্লান জ্যোতিহীন!
হেনকালে ভক্তি-মুগ্ধ মহেশ্বর দিলা আসি দেখা
সার্থক করিয়া তপ—সিদ্ধ করি সকল সাধনা
গৌরীর আশ্রম-মাঝে—নিবিড় কাননে যথা একা
তপস্বিনী মগ্ন মহাতপে। 'চাহ চাহ চন্দ্রাননা'
কন শিব, 'অয়ি শুভে, আসিয়াছি তব তপোভূমি;
রূপে নহে,—তপো-মূল্যে কিনিলে আমারে আজি তুমি!'

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

অসম্পূর্ণ

১

ক্লাশের মধ্যে ভাল ছেলে বলিয়া রঞ্জনের সুখ্যাতি ছিল। কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীতে উঠিবার মুখে সহসা শোনা গেল, সে অকৃতকার্য্য হইয়াছে।

সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া পরস্পরকে প্রশ্ন করিতে লাগিল, ব্যাপার কি? এ রকম অঘটনটা হঠাৎ কেন হইল?

গ্রামের ম্যালেরিয়া? ভালরূপে সন্ধান লইয়া জানা গেল, রঞ্জনের বাড়ীতে এই বৎসরে সর্দ্দির আমেজটি পর্য্যন্ত নাই—ম্যালেরিয়া ত দূরের কথা!

ক্রীড়ায় অত্যাসক্তি? হইবার যো কি! মাথার উপর কঠোর শাসনের বেত্রখানি লইয়া মাষ্টার পিতা সতত প্রহরা দিয়া থাকেন।

তাহার ছোট বোন্‌টি কিন্তু এক দিন এই অকৃতকার্য্যতার সূত্র হঠাৎ আবিষ্কার করিয়া ফেলিল এবং অবিলম্বে যথাস্থানে সে সংবাদ গিয়া পৌছিল।

রোগা খাতাখানির ছুটি পৃষ্ঠায় কত কি লেখা!

ধোপার খাতা আনিতে গিয়া ছোট বোন্ অনুপস্থিত দাদার সেই খাতাখানি আনিয়া বাপের হাতে দিল এবং খাতার ছুই একখানি পাতা উল্টাইয়া বাপের গম্ভীর মুখ ভীষণ হইয়া উঠিল।

তের বছরের ছেলে, একবারে ইচোড়ে পাকিয়া গিয়াছে। এই বয়সে কবিতা!

প্রথম পাতা উল্টাইতেই নজরে পড়িল বড় বড় হরফে লেখা—

"তৃষিত চাতক"

জল বিনা চাতকের নাহি বাঁচে প্রাণ।
কেন হে কৃপণ মেঘ নাহি কর দান॥

পরের পাতায়—

"গরু"

চারিখানি পদ আছে—আছে লেজ সরু।
চোখ কাণ শিং মাথা লোম-ভরা গরু॥

"বাঃ ছোকরা! আর আছে গোবর—যাহা তোমার মাথাটির মধ্যে গজগজ করিতেছে!"

তার পর? কি সর্ব্বনাশ!—

"প্রেম"

চোখ কাণ নাক নাই তবু আছ তুমি।
জীবন-মরণ-মাঝে শস্যভরা ভূমি॥
মরুভূমি-মাঝে তব শস্যের হিল্লোল।
শ্যামরূপে জাগাইছে হরষ-কল্লোল॥

একগাছি ভাঙ্গা বেত সম্মুখেই ছিল। সবেগে মেঝের উপর আস্ফালন করিয়া তিনি ডাকিলেন, "রঞ্জন!"

রঞ্জন তাঁহার সম্মুখে আসিতেই কবিতাভরা খাতাখানি তাহার মুখের উপর ছুড়িয়া দিয়া চীৎকার করিয়া কহিলেন, "পাজী, শূয়ার, গাধা, উল্লুক!"

খোলা খাতার 'প্রেম' শীর্ষক কবিতাটি চোখে পড়িতেই রঞ্জন ব্যাপারটা মুহূর্ত্তে বুঝিতে পারিল। বুঝিল, কাব্যের 'প্রেম' যত সুকোমলই হউক না কেন, পিতার হৃদয়ে তাহার স্থান নাই। চোখ মুছিতে মুছিতে অল্প একটু ফোঁপাইয়া সে তাড়াতাড়ি কহিল, "বিশের খাতাটা এখানে কে আনলে? বাঃ!"

রক্ত আঁখি পাকাইয়া পিতা বলিলেন, "বিশের খাতা! দাঁড়া, তোকে বুঝিয়ে দিচ্ছি, কে আনলে?"

অতঃপর তিনি রঞ্জনের পৃষ্ঠে, মস্তকে নিষ্করুণভাবে বেত চালাইতে লাগিলেন।

রঞ্জনের পরিত্রাহি চীৎকারে জননী ছুটিয়া আসিলেন এবং সে যাত্রা রঞ্জন মরিতে মরিতে বাঁচিয়া গেল।

'প্রেম' কিন্তু মরিল না, আর সেই অশরীরী আত্মাকে আশ্রয় করিয়া বাঁচিয়া রহিলেন,—কবিতা সুন্দরী। দিনের পর দিন তিনি রঞ্জনের খাতায় প্রসব করিতে লাগিলেন,—গরু, ছাগল, গাছপালা, পাহাড়, নদী, চন্দ্র, সূর্য্য, নর-নারী, হাতী, ঘোড়া ইত্যাদি।

মেয়ে-মহলে রঞ্জনের পসার বাড়িয়া গেল।

বোসেদের বড়বৌ তাহার ছোট বোনের বিবাহে রঞ্জনকে দিয়া কবিতা লিখাইয়া লইলেন,—

"আনন্দোচ্ছ্বাস"

আকাশ ভুবন ছেয়ে আজ বাজছে কিসের বাঁশী
ফুলের মুখে নদীর জলে কাঁপ্‌ছে মোহন হাসি।

চাঁদের আলো উজল হয়ে দেখছে বিয়ের সাজ,—
ফুর-ফুরিয়ে মলয়-বায়ু গড়ছে সুখের তাজ।

বিবাহ হইয়াছিল—আষাঢ় মাসের কৃষ্ণা তিথির এক বর্ষা-মুখর রাত্রিতে। অর্দ্ধসিক্ত কুশাসনের উপর—নিমন্ত্রিতরা এই কিশোর কবি-রচিত যুগোপযোগী কবিতাবাহী কাগজখানি পাতিয়া বসিয়া বড়ই তৃপ্তিতে গরম গরম লুচির সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। ভাগ্যে তাঁহাদের মধ্যে কেহ কোন পত্রিকার সমালোচক ছিলেন না, তাহা হইলে, নিষ্ঠুর পিতার ততোধিক নীরস বেত্রাঘাতের অপেক্ষা তাঁহার সমালোচনার কশাঘাত এই কিশোর কবির সমস্ত তরুণ আশাকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া ফেলিত।

ঠিক ইহার তিন মাস পরে শরতের এক উজ্জ্বল সন্ধ্যায় গাঙ্গুলী বুড়ার স্বর্গারোহণে তাহার ছোট মেয়ে সুরমার অনুরোধে সে লিখিল—

"শোকোচ্ছ্বাস"

আকাশের আঁধার মুখে ঝরে শুধুই জল,
বাতাসের বেদন বাঁশী কাঁদছে অবিরল।
মানুষের রোদন সাথে কাঁদছে পাখী, পশু,
ছেলে-মেয়ে নাতনী-নাতি—কাঁদছে বুড়া, শিশু।

এইরূপে কবিতার চর্চ্চা করিয়া, বাপের তাড়নার আওতায়, পুরা পাঁচটি বৎসরে তৃতীয় শ্রেণী হইতে ম্যাট্রিকুলেশনের দ্বারে আসিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল। সেখানে সে এমন স্থাণুর মত আসন গ্রহণ করিল যে, মাষ্টার পিতাও বেত ফেলিয়া দিয়া এক দিন গৃহিণীকে সদুঃখে বলিলেন, "ছোঁড়াটার আর কিছু হ'লো না দেখছি।"

গৃহিণী দেবতাদের উদ্দেশে প্রণাম জানাইয়া বলিলেন, "তা না হোক, বেঁচে থাক।"

অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে রঞ্জন স্কুল পরিত্যাগ করিয়া এইরূপে নিরুদ্বেগে বাঁচিয়া রহিল।

২

কবিতার নূতন খাতা আসিয়াছে। সে খাতায় গাছপালা, পশু-পক্ষী, নদী, পর্ব্বত লইয়া যে সব কবিতা, তাহার স্থান নাই। বাল্যকালে রচিত তরুণ প্রেম নানা ছন্দে, নানা ভাবে খাতাটির সবগুলি পাতাকেই গ্রাস করিয়া সাবলীল-ভাবে বহিয়া যাইতেছে। বাল্যে যাহার আকার ছিল না, আজ তাহার অবয়ব হইয়াছে। আজ বসন্তের দক্ষিণ বায়ুতে, বর্ষার ব্যাকুল ধারায়, শরতের স্নিগ্ধ মেঘে ও শীতের আরাম-শয়নের মধ্যে যিনি অকস্মাৎ আবির্ভূত হইয়াছেন, তিনি একান্ত মানসকল্পিত কল্পলোকবাসিনী নহেন। তিনি পরমা সুন্দরী; চম্পকবরণা না হইলেও কবির নয়নে মোহের মনোহর অঞ্জন পরাইয়া মায়া-মুকুর মেলিয়া ধরিয়াছেন।

সেই খাতাখানির কবিতা-প্লাবিত নির্ঝরের অন্তস্তলে মূল উৎসস্বরূপিণী বিরাজ করিতেছেন মণিমালা—রঞ্জনের নব-বিবাহিতা তরুণী পত্নী।

এইরূপে কাব্য-জগতের কুঞ্জদ্বারে দাঁড় করাইয়া দিয়া পিতা আবার অকরুণ মূর্ত্তিতে তাহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন।

চাই উপার্জ্জন। গৃহস্থ-সংসারে পোষ্য বাড়িলে, আয়ের পন্থা যদি সুগম না হয় ত দিন চলা ভার!

পিতার আয়ের সামান্য টাকায় এতগুলি প্রাণীর দিন চলা ভার!

রঞ্জন যখন তখন পিতার বাক্যস্রোতে অতিষ্ঠ হইয়া প্রমাদ গণিল।

হয় ত বাহিরে বাদলধারায় রিমি-ঝিমি বাজিতেছে, মেঘে মেঘে ঘর্ষণ হইয়া বিদ্যুৎ ঝলকিতেছে, গৃহকোণে বসিয়া প্রদীপের আলোয় রঞ্জন তাহার খাতায় লিখিয়া চলিয়াছে—

ওগো প্রিয়া বাদল মেঘে বিজলী আলো জেলে
কোন্ সুদূরের গোপন কথা কইতে তুমি এলে!
আমার ঘরের মাটীর প্রদীপ হাওয়ায় নিবে যায়—
তোমার কাজল-সজল চোখের কাতর কল্পনায়—
আজ যে মনে বাজছে মাদল—মেঘ মেলেছে পাখা—

এমন সময় পিতা ডাকিলেন, "রঞ্জন!"

প্রথমটা রাগ করিয়া রঞ্জন উত্তর দিল না। কিন্তু আহ্বানকারীর কণ্ঠ কক্ষ-বাহিরে পূর্ণোদ্যমে বাজিতে লাগিল এবং কাঠের কপাটে করাঘাতও কল্পনাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিল।

খাতা-কলম ফেলিয়া রঞ্জন দ্বার খুলিয়া বিরক্ত-মুখে বলিল, "কি?"

পিতা বলিলেন, "বলি, গিছলি বাবুদের বাড়ী? কি বললে?"

রঞ্জন রাগ করিয়া উত্তর দিল, "বল্লে—এখন চাকরী-টাকরী হবে না। যে বাজার—কত লোকের চাকরী যাচ্ছে।"

পিতা বলিলেন, "হুঁ। তবে এক কায কর। পাল সায়েবের ম্যানেজার আমার বন্ধু। শুনলাম, গদীতে একটা মুহুরীর পোষ্ট খালি আছে। আপাততঃ না হয়—কি বলিস?"

রঞ্জনের ইচ্ছা হইল, মুখ ফুটিয়া বলে, 'শিরসি মা লিখ—মা লিখ।' কিন্তু সে কথা অন্তরে আবৃত্তি করিয়া মুখ গোঁজ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

পিতা আরও কয়েকটি সদুপদেশ দিয়া বলিলেন, "কাল আটটার সময় তোকে নিয়ে রায়পুর যাবো,—কোথাও বেরুসনে যেন।" বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

দুয়ার বন্ধ করিয়া রঞ্জন অসম্পূর্ণ কবিতার পাদ-পূরণের জন্য কলমটি তুলিয়া ধরিল। কিন্তু ভাবতরঙ্গ কখন্ এক সময়ে রায়পুরের গদীখানায় মোটা মোটা মুহুরীর খাতার ঘূর্ণীপাকে পড়িয়া ভাসিয়া গিয়াছিল! চোখের কোণে কয়েক ফোঁটা জল বাহির করিয়াও রঞ্জন কবিতাটি সম্পূর্ণ করিতে পারিল না।

সে দিন সে ভাল করিয়া খাইল না, ঘুমাইল না, অতি প্রত্যুষে উঠিয়া সকলের অলক্ষ্যে সে গৃহত্যাগ করিয়া শ্বশুরালয়ে পলাইয়া গেল।

৩

শ্বশুরালয়ে বাদলের মেঘ ছিল না, বৃষ্টিধারাও কাণে বাজিতেছিল না। তথাপি রাত্রিতে প্রিয়ার সম্মুখে বসিয়া রঞ্জন লিখিল,—

শিউলিভরা আঙ্গিনাতে
চাঁদের হাসি তারার সাথে
প্রথম যে দিন শরৎ-রাতে
ঘোমটা তুলে চায়!

ঠুং করিয়া চাবির শব্দ হইল। রঞ্জন চাহিয়া দেখিল, বান্ধুলী-রাগরঞ্জিত অধরে মধুর হাসিটুকু বিলীন হইয়া গিয়াছে। চক্ষুতারকায় অলস ভ্রূকুটির ছায়া।

কলম ফেলিয়া সে কহিল,—"শুনবে?"

মণিমালা কহিল,—"রাত হয়েছে, শোবে না?"

রঞ্জন কলম তুলিয়া কহিল, "রাত! তুমি কাছে থাকলে কি মনে হয় জান?—

দিবস করেছি রাতি, রাতিকে দিবস গো।"

মণিমালা চাপা গলায় কহিল, "আস্তে কথা কও, শুনতে পাবে।"

"—কে?"

—আরও একটু সরিয়া আসিয়া মণিমালা কহিল, "ওরা সব আড়ি পেতেছে যে।"

রঞ্জন হাসিয়া বলিল, "তা পাতুক। আজকের রাত আড়ি পাতার ভয়ে নষ্ট করবো না। শোন—

যদি আঁখিপাতে ঘনাইয়া আসে ঘুমঘোর,
তবে বরষিয়া বিষাদের ঘন কালো লোর
মলিন ক'রো না প্রিয়ে নিশীথের হিয়া,
মধুর চুম্বনে দিয়ো সুধা বিতরিয়া।"

লজ্জিতা হইয়া মণিমালা সরিয়া গেল।

রঞ্জন কলম ফেলিয়া মণিমালার নিকটে আসিয়া তাহার দুইখানি হাত আপনার হাতে তুলিয়া লইয়া কহিল, "আমি পাগল, নয় মণি?"

মণিমালা অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "দূর,—তা কেন?"

রঞ্জন আবেগভরে বলিল, "তুমি যাই বল, কিন্তু আমি জানি। জানি, এই জগতের কঠিন মাটীতে পা ফেলে যারা সংসারকে স্বচ্ছন্দে বহন ক'রে নিয়ে যেতে পারে, তারা মানুষ। যারা তা পারে না, তারা অপদার্থ। শোন—বলতে দাও। বাবা আমায় দু'বেলা এই সত্য চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন। তবু এমনই অপদার্থ হয়ে গেছি যে, মানুষ হ'তে পারি না। কিসের টানে আমায় ভাসিয়ে নিয়ে যায়। আচ্ছা মণি, জীবনটা শুধু এমনি ক'রে, শুধু কথা কয়ে, গান গেয়ে কেটে যায় না? সংসারে সংসারী না হওয়াটা কি কি এতই অপরাধের?"

মণিমালা বলিল, "ও সব কথা আমি বুঝতে পারি না। তবে কায মানুষকে একটা করতে হয়, না হলে সংসার—"

বাধা দিয়া রঞ্জন বলিল, "এই পৃথিবীটা চিরকাল চলছে—চলবে, মণি।—আমাদের নিয়ে ওর মাথাব্যথা নেই। জান—

কায দিয়ে যদি বাঁধতে চাহিস জীবনের এই কটা দিন
কাযের ভারে জীবন-গীতির স্বল্প আয়ু হবে রে লীন।
সময়-হারা অকাজগুলো ফাঁকের ঘরে আলোর রেখা
জীবন-খাতার সোণার পাতে তারাই কাযের নিপুণ লেখা।

সুতরাং কোন্‌টা কায—আর কোন্‌টা অকায, এ বিচার বাইরের লোকের যেমন আছে, মনের মনুষটিরও তেমনি।"

মণিমালা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া কহিল, "আলোটা নিবিয়ে দেব ?"

রঞ্জন হাসিতে হাসিতে বলিল, "হাঁ, আলোটা নিবিয়ে দাও, আর আমার মাথায় একটু বাতাস কর।"

রহস্য বুঝিতে পারিয়া মণিমালা রাগ করিয়া পালঙ্কের এক পার্শ্বে শুইয়া পড়িল।

রঞ্জনের ইচ্ছা হইল, প্রিয়ার এই সুন্দর ভঙ্গী লইয়া একটা কবিতা লেখে। কিন্তু, থাক এ সাধ।

আলো নিবাইয়া সেও মণির পার্শ্বে শুইয়া পড়িয়া কহিল, "রাগ করেছ না কি ?"

মণিমালা কোন কথা কহিল না।

তার পর, মান অভিমানের মধুর পদাবলী—সেই বিরাট অন্ধকারের বুকে রাত্রির খাতায়, দুইটি তরুণ-তরুণীতে যাহা লিখিয়া রাখিল, তাহার ভাষা ও ছন্দ সৃষ্টির আদিকাল হইতে একই ভাবকে আশ্রয় করিয়া লিখিত হইতেছে। সুতরাং সেই চিরপ্রকাশমান অপ্রকাশ্য রহস্যকে আলোর নীচে লিখিয়া রাখিতে যাওয়া বাহুল্য মাত্র।

৪

শ্বশুরবাড়ীতে কিছু দিন কাটিবার পর সে দিন এক টেলিগ্রাম আসিল, 'পিতা পীড়িত—শীঘ্র এসো।'

সংসারের বৃহৎ কাযগুলিকে উপেক্ষা করা চলিলেও, এই রূঢ় কর্ত্তব্যকে ফাঁকি দেওয়া চলে না।

বাড়ী আসিয়া রঞ্জন দেখিল, সেখানকার কর্ত্তব্য প্রায় শেষ হইতে চলিয়াছে।

একমাত্র পুত্রের হাতের জল-গণ্ডূষ পান করিয়া তারক-ব্রহ্ম নাম জপিতে জপিতে পিতা চক্ষু মুদিলেন।

মায়ের হাহাকার ও ছোট বোনের আকুল রোদনের মধ্যে রঞ্জনকে শেষ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইল।

সংসারে সবই রহিল, শুধু কাযের কথা বলিবার লোকটিই চলিয়া গেলেন। তিনি থাকিতে কাযের কথাগুলা রঞ্জনের গায়ে সেরূপ তীক্ষ্ণ হইয়া বিঁধিতে পারে নাই। আজ নিরুপায় সংসারে রঞ্জন সম্পূর্ণ অনাবৃত গাত্রে সেই কণ্টকাঘাত সহ্য করিতে লাগিল। অভাবের এই বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার তাড়নায় কাব্যলক্ষ্মীর পাদ্য-অর্ঘ্যটুকুও বুঝি আর অম্লান থাকে না !

তথাপি আঘাতের বেদনা ভুলিতে সে যখন কাগজ-কলম লইয়া বসে, তখন মনে হয়, কালীর অক্ষরে এইমাত্র যে মণি-মঞ্জুষা ফুটিয়া উঠিবে—তাহাতে দুঃসহ দুঃখকে সুসহ করিয়া লওয়া চলে। ছন্দ ও সুর যেন শোক-দুঃখ সহিবার অটুট বর্ম্ম। কবিতার স্রোত উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। সংসারে পঙ্ক-ক্লেদ আসিয়া জমিতে লাগিল।

মা নিতাই কাঁদিয়া বলেন, "একটা কায যা হয় ক'রে খুঁজে নে রঞ্জন, সংসার ত আর চলে না।"

রঞ্জন মনে মনে হাসে। কায—কায ! কাযের জীবন ত পৃথিবীর চারিদিকে। কর্ম্মরথের চক্রতলে নিষ্পেষিত না হইয়া সে যদি এতটুকু নিরালা খুঁজিয়া ক্ষণতরে বিশ্রাম লইতে চাহে ত তাহাতে কাহার কি ক্ষতি ? কেন শত দিক্ হইতে সহস্র কণ্ঠে চীৎকার উঠে,—কায—কায !

সংসার চলিবে। মানুষকে লইয়া সংসারের প্রয়োজন নহে, সে চলে তাহার নিজের প্রয়োজনে। সে সৃষ্টি করে—ঘণ্টা-মিনিটের সমষ্টি লইয়া—রাত্রি-দিন। তাহার অঙ্গনে আহ্নিকগতিতে আলো অন্ধকার ঘনাইয়া উঠে, তাহার আবর্ত্তনে নব ঋতুর নবীন সমারোহ। সংসার চলিতেছে—চলিবে।

সংসার চলিলেও মায়ের কান্নার বিরাম নাই।

বিরক্ত হইয়া রঞ্জন এক দিন সুরেনকে বলিল, "জান ত ভাই, সংসারের ক্ষুধা মেটাবার সামর্থ্য আমার নাই। আমি নেহাৎ অকেযো।"

সুরেন তাহার বাল্যবন্ধু। রঞ্জনকে সে ভালবাসিত এবং তাহার কাব্য-প্রতিভার অন্ধ স্তাবক ছিল।

সে কহিল, "সে ক্ষমতা তোমার আছে, ভাই। তোমার লেখা আমায় দিও,—দেখি ব্যবস্থা করতে পারি কি না ?"

কয়েক মাসের মধ্যে কয়েকখানি বিশিষ্ট পত্রিকায় তাহার লেখা ছাপা হইয়া গেল। কিন্তু মূল্য কিছু মিলিল না।

সুরেন দুঃখিতভাবে বলিল, "কবিতার আদর আছে, কিন্তু মূল্য দিতে কেউ চান না। কোন কোন পত্রিকায় স্থান-পূরণের জন্য কবিতা ছাপা হয়।"

রঞ্জন হাসিয়া বলিল, "বলেছি ত, ও কাষের মূল্য পৃথিবীর ব্যবসায়ীরা দিতে পারেন না। যাই হোক, একটা উপকার তুমি আমার করেছ। ছাপার অক্ষরে নিজের নাম দেখবার এত প্রবল আকাঙ্ক্ষা কেন মানুষের, জানি না। আমার কেবলই মনে হচ্ছে, দিন-রাত ব'সে ব'সে লিখি, আর ছোট বড় সব পত্রিকা আমার নাম বুকে নিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াক।"

সুরেন শুষ্কস্বরে বলিল, "এক কায কর,—একখানা কাব্য লেখ। কিছু টাকা আসতে পারে।"

রঞ্জন বলিল, "দেখা যাক্।"

৫

আষাঢ় মাসের প্রথমেই রঞ্জন কাব্য লিখিতে মনস্থ করিল।

পূর্ব্বরাত্রিতে ভালরূপ আহার হয় নাই, মায়ের শুষ্ক মুখের পানে আর চাওয়া যায় না। কয়েক মাস হইতে কাপড়গুলি একযোগে প্রতিযোগিতা করিয়া ছিঁড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের লইয়া লোকালয়ে বাহির হওয়া চলে না। সাবান অভাবে সেগুলির বর্ণও মলিন হইয়াছে। ভাগ্যে বধূ এখানে নাই! থাকিলে অভাবের তাড়নাটা সুপুষ্ট হইয়া রঞ্জনকে বিচলিত করিত।

আকাশে কোমল মেঘের সঞ্চার হইয়াছে। মেঘ ধরণীর আনত আননের উপর জল-ভরা চোখ লইয়া নামিয়া আসিয়াছে। যে কোন মুহূর্ত্তে তাপক্লিষ্টাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য তাহার প্রচুর সলিল সহস্র আঁখিছিদ্র দিয়া নিঃসারিত করিতে পারে। চালা-ঘরের উপরের দিকে চাহিলে মেঘের লীলায় মন ভরিয়া উঠে।

খাতা-কলম লইয়া রঞ্জন কাব্য লিখিতে বসিল।

কয়েকটি ছত্র লিখিবার পর মেঘের অবরোধ মুক্ত করিয়া বৃষ্টিধারা নামিয়া আসিল এবং রঞ্জনের খোলা খাতার উপরে কয়েকটি বিন্দু ঝরিয়া পড়িল।

না, কাব্য লেখা চলে না। প্রকৃতির এমন প্রাণ-মাতানো দৃশ্যে —বাস্তব বড় সাধেই বাদ সাধিল।

খাতা-কলম উঠাইয়া রঞ্জন গৃহকোণে সরিয়া গেল। বৃষ্টিধারা ঝরিতে লাগিল—টপ—টপ—টপ।

কায—কায—কায! কাযের মানুষকে মানুষ আদর করে, ভালবাসে, প্রকৃতিও তাহার কাছে পরাজিত।

অকেযোর দুঃখে ঐ বৃষ্টিবিন্দুও নিষ্ঠুর পরিহাস করিতেছে।

বাতায়ন-বাহিরে বৃষ্টিধারার ছন্দে ছন্দ মিলাইয়া কাব্য-লক্ষ্মী কবির খাতায় ধীরে চরণপাত করিয়া থাকেন। তাঁহার নূপুর-মুখরিত চরণের তলে ফুটিয়া উঠে—অমৃত-শতদল। যুগযুগান্ত ধরিয়া বিশ্বজনের মানস ক্ষুধা সেই অমৃত-বিন্দুতে পরিতৃপ্ত হয়।

আর হতভাগ্য রঞ্জন! তাহার অন্তরে ভাবের তরঙ্গ; বাহিরে বৃষ্টিধারা, কুটীর অন্তরেও সে ধারা ভাবসম্পদকে ভাঙ্গিয়া ভাসাইয়া দিতেছে। নিরুপায় লেখনী মুষ্টির মধ্যে আকুল দীর্ঘশ্বাসে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে!

অভিযোগ নিষ্ফল জানিয়া মা আর অভিযোগ করেন না।

ভিজিতে ভিজিতে ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "বিছানাটা গুটিয়ে রাখিস নি, বাবা! ওটা যে ভিজে গেছে।"

রঞ্জন মায়ের পানে অসহায় দৃষ্টিতে চাহিল।

তুচ্ছ বিছানার অপেক্ষা আরও কত বড় সম্পদ্ যে নষ্ট হইয়া গেল, তাহা ত কেহ দেখিলেন না!

রঞ্জনের সম্মুখে একখানা চিঠি ফেলিয়া দিয়া মা বলিলেন, "দেখ ত চিঠিখানা, বোধ হয়, বৌমার বাপের বাড়ী থেকে এসেছে। কি লিখেছে?"

পত্র পড়িয়া রঞ্জনের মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তাহার দারুণ ক্ষতি যেন ঐ কয়টি অক্ষরের আনন্দ-প্রবাহে কোথায় ধুইয়া মুছিয়া গেল।

অন্তরের আনন্দপ্রবাহকে বাঁধ দিয়া সলজ্জকণ্ঠে সে বলিল, "মা, খবর ভাল,—তোমার নাতি হয়েছে।"

মায়ের মুখেও আনন্দের ঢেউ উথলিয়া উঠিল।

সে রাত্রিতে নিদ্রা কাহারও হইল না।

মধ্যরাত্রিতে মাতা সহসা বলিলেন, "ভাবছি, কি দিয়ে নাতির মুখ দেখবো।"

রঞ্জন বলিল, "তুমি দেখবে আশীর্ব্বাদ দিয়ে।" সেই সঙ্গে সে মনে করিল, একটি ছোট কবিতা দিয়ে সে নবাগতকে আশীর্ব্বাদ করিবে।

মা অতি কষ্টে দীর্ঘ নিশ্বাস চাপিয়া বলিলেন, "আশীর্ব্বাদ ত দেবই, কিন্তু তাতেও যে তৃপ্তি নেই, বাবা।"

রঞ্জন তখন আর কোন কথা বলিল না।

বধূ যে দিন নবপ্রসূত সন্তানকে লইয়া এ বাড়ীতে আসিল, রঞ্জন সত্য সত্যই একটি চতুর্দ্দশপদী কবিতার দ্বারা তাহাকে অভিনন্দিত করিল। পরিতৃপ্ত মুখে খোকাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া প্রাণভরা চুম্বন তাহার ওষ্ঠে আঁকিয়া দিল। মা দিলেন অশ্রুধারার সঙ্গে আশীর্ব্বাদ।

কাব্য-শতদলের অঙ্কুর রঞ্জনের হৃদয়-অঙ্গনে উপ্ত হইয়া গেল।

৬

তার পর রঞ্জন কাব্য-সমুদ্রে ডুব দিল—গভীরভাবে।

এবার সংসারের অভাব অভিযোগ লইয়া বধূ যখন তখন দেখা দিতে লাগিল। কিন্তু রঞ্জনের মৃদু হাসির বর্ম্মে ঠেকিয়া তাহার সমস্ত অনুনয় ব্যর্থ হইয়া গেল।

রঞ্জন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কাব্যলক্ষ্মীর প্রসাদ লাভ করিয়া সে সংসারের দুঃখ দূর করিবে। অক্ষম খ্যাতি সে এই লেখনীর শস্ত্র দিয়া টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ফেলিবে। আজ তাহার অঙ্গনে যে ফুল ফুটিয়াছে, সর্ব্বস্ব দিয়াও তাহার অধরের হাসিটুকু অম্লান রাখিতে হইবে।

অর্থ চাই। উপার্জ্জনের সমস্ত পথ দুর্গম। দেখা যাক, এই ক্ষীণ-রশ্মি-বিভাসিত বন্ধুর পথের প্রান্তে বিশ্রামের এতটুকু কুটীর একখানি আছে কি না? সেই কুটীরখানি প্রসন্ন ভাগ্যলক্ষ্মীর অঞ্চলচ্ছায়াতলে সুশীতল কি না? সংসারের তুচ্ছ অভাব দুদিনের। ভবিষ্যৎ জয়মাল্যের পুষ্প এই কণ্টকক্ষত চরণে; স্থৈর্য্য প্রফুল্ল আননে—তাহাকেই চয়ন করিতে হইবে।

এ দিকে নব অতিথির আগমনে সংসারের নিত্যকার অভাব তীব্রতর হইয়া উঠিল। নববধূ শীর্ণ সন্তানের পানে চাহিয়া আপনার সামান্য অলঙ্কার একে একে বিক্রয় করিয়া ফেলিল। কচি ছেলে,—দুধ নহিলে কয় দিন বাঁচিবে!

কয়েক মাস চলার পর যখন কোন দিকেই কোন উপায় রহিল না, রঞ্জনের কাব্যপুষ্পচয়ন নির্ব্বিকারভাবেই চলিতে লাগিল, তখন বুদ্ধি করিয়া নববধূ শুষ্ক শীর্ণ শিশুটিকে লেখন-নিরত পিতার সম্মুখে শোয়াইয়া দিতে লাগিল।

ফল তাহাতেও কিছু হইল না। ক্ষুদ্র শিশু ক্ষুধার তাড়নায় যদি বা চীৎকার করিয়া উঠে, তাহার সে ক্ষীণ চীৎকার কণ্ঠ ঠেলিয়া অতি সন্তর্পণে বাহির হইয়া আসে এবং কক্ষের চারিপার্শ্বে অস্পষ্ট হইয়া মিলাইয়া যায়।

পিতার লেখনী নিরুদ্বেগে দ্রুত চলিতে থাকে। কখনও বা সে বালকের ক্ষুধাতুর ক্ষুদ্র মলিন মুখের পানে চাহিয়া মাথা নাড়িয়া অস্ফুট স্বরে বলে, "ওরে অজ্ঞান, তোরই জন্যে আমার এই অক্লান্ত পরিশ্রম। আর দুটি দিন সবুর কর্—তোর এই বিরক্তি-ম্লান মুখে এমন একটি সুস্নিগ্ধ হাসি ফুটাইয়া তুলিব, যাহার ক্ষয় কোন কালে হইবে না।"

কখনও বা মুহূর্ত্তের তরে উঠিয়া আসিয়া ক্ষুদ্র মুখে একটি চুম্বন আঁকিয়া দেয়। আবার লেখনী ধরিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে পাতার পর পাতা লিখিয়া চলে।

অন্তরালবর্ত্তিনীর ছল-ছল চক্ষু দুইটি অশ্রু-আবেগে মুহূর্ত্তের জন্য দুলিয়া উঠে। আশার হিল্লোলে বুকখানিও শিহরিত হয়; কিন্তু নির্ব্বিকার লোকটির হাতে লেখনী উঠিতে দেখিয়া শিশুর পানে চাহিয়া তাহার অশ্রু আর অবরোধের মাঝে আত্মগোপন করিয়া থাকিতে পারে না। অঞ্চলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে সে ঘরে ঢোকে এবং শিশুকে তুলিয়া লইয়া ধীরপদে প্রস্থান করে।

সে জানে, এই তপস্বীর দুষ্কর তপস্যাকে বিচলিত করিতে পারে, এমন কোন দুঃখই এই চির-দুঃখগ্রস্ত ক্ষুদ্র সংসারের ভাণ্ডারে নাই।

শিশুকে তাহার মাতা আর কক্ষে রাখিয়া যান না। শিশুর কান্নাও শোনা যায় না।

লেখনী থামাইয়া এক দিন রঞ্জন মুখ তুলিয়া দেখিল, উঠানে দাঁড়াইয়া বধূ কি কায করিতেছে। ইঙ্গিতে সে তাহাকে ডাকিল।

মণিমালা আসিলে বলিল, "খোকা কোথায়?"

মণিমালা উত্তর দিল, "ও ঘরে।"

রঞ্জন হাসিয়া বলিল, "আর যে তাকে বড় এখানে রেখে যাও না?"

মণিমালা মুখ তুলিয়া অনেক কথা বলিবে ভাবিয়া স্বামীর পানে চাহিয়া নিস্তব্ধ হইয়া গেল। তাহার হাসির অন্তরালে উদ্বেগকাতর চক্ষু দুইটিতে যেন অপরিসীম ব্যথার প্রলেপ মাখানো।

কঠিন উত্তর আর দেওয়া হইল না, শুধু মাথা নত করিয়া বধূ বলিল, "না।"

রঞ্জন ম্লান হাসিয়া বলিল, "আমি জানি। রেখে যাওয়া নিষ্ফল বলেই রেখে যাও না, কেমন? মণি, আর কটা দিন অপেক্ষা কর, ওর জন্য কি অমূল্য রত্ন আমি তৈরী করছি, শীঘ্রই দেখতে পাবে।"

মণিমালা অতি কষ্টে অশ্রুধারাকে চাপিয়া রাখিলেও কণ্ঠের স্বরে সজলতা ধরা পড়িল। কহিল, "আজ পনেরো দিন হ'ল খোকা দুধ খেতে পায় নি।"

তাহার বিশুষ্ক শীর্ণ দেহ হইতেও শিশুর খাদ্যের অভাব হইয়াছে, সে কথাটা বাহুল্যবোধে আর উচ্চারণ করিল না।

রঞ্জন ব্যগ্রভাবে বলিল, "আরও কটা দিন হয় ত খেতে পাবে না। তার পর, এই লেখা বেচে ওকেও খাওয়াব, আমরাও খাব।"

মণিমালার মুখ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, কহিল, "সত্যি টাকা পাবে?"

রঞ্জন বলিল, "পাব। কিন্তু অনুরোধ—এই কটা দিন আমায় বিরক্ত ক'রো না। লক্ষ্মীটি, শুনবে ত আমার কথা?"

মণিমালা সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া কক্ষ ত্যাগ করিল।

* * * *

রঞ্জন বাহ্যজ্ঞানশূন্য। কাব্যের শেষ সর্গে তাহার লেখনী দ্রুত ছুটিতেছে। সমাপ্তির স্বর্ণ-কিরণে এই কাব্য অচিরেই মরকতমণির প্রভা বিকীর্ণ করিবে। আর কয়েকটা ছত্র লিখিতে পারিলেই—

অকস্মাৎ কক্ষদ্বার খুলিয়া গেল। উন্মাদিনীর মত মণিমালা গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িয়া বুকফাটা স্বরে কহিল, "ওগো,—আর কেন লিখছো? খোকা যে ক্রমেই নির্জীব হয়ে পড়ছে।"

কলম থামিল, রঞ্জন মুখ তুলিয়া ব্যগ্রভাবে কহিল, "লক্ষ্মীটি, চুপ কর মণি। আর কটা লাইন।"

মণিমালা চাপা কান্নায় ফুলিতে ফুলিতে কহিল, "ওগো, কেমন ক'রে চুপ করি? বাছা যে আর কথা কইছে না।"

রঞ্জন সমস্ত চোখে মুখে ব্যগ্রতা ঢালিয়া কহিল, "তবু—তবু—চুপ কর। এই কটা লাইন শেষ হ'লে কোন দুঃখ আর থাকবে না।"

অভাগিনী জননী হাহাকার করিয়া কক্ষতলে লুটাইয়া পড়িল। লেখনী রাখিয়া রঞ্জন উঠিয়া আসিয়া তাহার পাশে বসিল ও ভূলুণ্ঠিতা শোকগ্রস্তা নারীর মাথাটি কোলের উপর তুলিয়া লইয়া স্নিগ্ধস্বরে কহিল, "মণি, এক মিনিট সময় আমায় দিতে পার না? আমি এখনি ও ঘরে যাচ্ছি, শুধু এক মিনিট। এ সময় বয়ে গেলে আমি সব হারাব। এত পরিশ্রম আমার বৃথা হবে।"

স্বামীর নয়নে অশ্রুবিন্দু দেখিয়া মণিমালা আসন্ন শোকের কথা ভুলিয়া গেল। ত্বরিতে উঠিয়া সে কক্ষ ত্যাগ করিতে উদ্যত হইল।

রঞ্জনও ক্ষিপ্রপদে বিছানায় উঠিয়া বসিয়া কলমটি তুলিয়া লইল।

কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে কক্ষান্তরে রঞ্জনের মাতার আকুল ক্রন্দন যেন তাহাদিগকে বজ্রাহত করিয়া দিল।

মণিমালা অস্ফুটস্বরে 'বাবা রে' বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। রঞ্জন কলমটিকে সজোরে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া স্তম্ভিত নির্নিমেষ দৃষ্টিতে শূন্য পানে চাহিয়া রহিল।

অসম্পূর্ণ কাব্যের শেষ কয়টি ছত্র আর পূর্ণ হইল না।

* * * *

ক্ষুদ্র চিতার উপর অতি ক্ষুদ্র যে শিখাটি উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিয়া উঠিল, তাহারই অঙ্কে রঞ্জন তাহার তপস্যার সমস্ত সঞ্চয় অকম্পিত করে তুলিয়া দিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

সেই দিন হইতে সে আর কবিতা লিখে নাই।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়।

বর্ষা

চীৎকারি মহাব্যোম আজি কারে বন্দে
বিদ্যুৎবাতি জ্বালি' পরম আনন্দে?
নির্ম্মল ঢল-ঢল কার ঐ মু'খানি,
চঞ্চল টল-টল কার চোখ দু'খানি?
মঞ্জীর বাজে কার ঝলকল ছন্দে?

কে ও বলো এলো কালো মেঘ-শাড়ী পরিয়া
কেয়া-কেতকীর ডালা কাঁকালেতে করিয়া?
কে দিল রে ধরণীর শ্যামলিমা বৈভব,
কদম্বে শিহরণ, বাদলেতে কলরব?
চঞ্চল বায়ু কার কুন্তল-গন্ধে?

শ্রীগোপেন্দ্রনাথ সরকার।

"বন্ধুরূপে অরি।"

"বন্ধুর পোষাকে অরি অতি ভয়ঙ্কর।" যিনি বন্ধু, তিনি আমার শুভাকাঙ্ক্ষী, যাহা আমার পক্ষে মঙ্গলকর, তিনি সর্ব্বদা তাহাই করিবেন। আমার সুখে তিনি সুখী, আমার দুঃখে তিনি দুঃখী, আমার উন্নতিতে তিনি উল্লসিত, আমার বিপদে তিনি ভগ্নচিত্ত।

বন্ধু সকলেরই কাম্য। জগতে যতগুলি শুভ অনুষ্ঠান আছে, বন্ধুত্ব সেগুলির মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

প্রকাশ্য শত্রুতা বুঝিতে পারা যায়। কারণ, দেখা যায়, শত্রু সব সময়েই আমার অমঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করিতেছে, আমার অশুভে তাহার আনন্দ, আমার অমঙ্গলে তাহার কৌতুক।

বন্ধুকেও বুঝা যায়, শত্রুকেও বুঝা যায়, কিন্তু বন্ধুত্বের ভাণ করিয়া যে শত্রুতা করে, তাহার নিকট হইতে আত্মরক্ষা সর্ব্ব-সময়ে কষ্টসাধ্য। বন্ধুত্বের ভাণ করিয়া আমার নিকট আসিতে পারিতেছে এবং আমার গলা জড়াইয়া কথা কহিবার সুবিধা পাইতেছে; সেই সুযোগ পাইয়া যদি অপর পক্ষ আমার গলা চাপিয়া ধরে, সেরূপ অবস্থায় আত্মরক্ষা বড়ই কঠিন। আমি শত্রু পক্ষকে চিনিতে পারিয়াই পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হইতে পারি এবং পূর্ব্ব হইতেই আত্মরক্ষা হেতু বিশেষ সতর্ক হই; কিন্তু যিনি বন্ধুভাবে আমার নিকটবর্ত্তী হইয়া আমার গলা চাপিয়া আমাকে মারিতে চান, তাহা হইতে আত্মরক্ষা করা বিশেষ অসুবিধাজনক।

সমাজে এরূপ অনেক লোক আছে, যাহারা নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য বাহিরে বন্ধুত্বের ভাণ করে, কিন্তু অন্তরে অন্তরে বিষকন্তের ন্যায় আমার সর্ব্বনাশসাধন করে। এই প্রকার "মুখে মধু, হৃদে বিষ" লোক লইয়া জীবনযাত্রা করা অত্যন্ত ক্লেশদায়ক। এই সব কারণেই বলিতেছিলাম, বন্ধুত্বের আবরণে শত্রু অতি ভয়ঙ্কর।

এ জগতে প্রত্যহ ছদ্মবেশী বন্ধুর হাতে লোক লাঞ্ছিত ও বিপদ্‌গ্রস্ত হইতেছে, তাহারই একটি উদাহরণস্বরূপ নিম্নলিখিত ঘটনাটি বিবৃত করিতেছি।

মিসেস্ এলাইজা যখন মিস্ টফি ছিলেন, তখন মিঃ এলাইজা তাঁহাকে বিবাহ করেন। বিবাহের পর ১০ বৎসরকাল সুখে দুঃখে উভয়ে জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এই ১০ বৎসরের মধ্যে তাঁহাদের দুইটি পুত্র-সন্তান ও দুইটি কন্যা-সন্তান জন্মিয়াছিল। পরস্পর পরস্পরকে বিশেষ ভালবাসিতেন এবং পরস্পরের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধারও অভাব ছিল না।

এক দিন রাত্রি ২টার সময় মিসেস্ এলাইজাকে একটা কাঁকড়া-বিছা দংশন করিল। তিনি যন্ত্রণায় অস্থির। কাঁকড়া-বিছার দংশনে যদিও মানুষ মরে না, তথাপি এত যন্ত্রণা পায় যে, তাহা অসহ্য।

রাত্রি ২টার সময়েই মিঃ এলাইজা ডাক্তারের সন্ধানে বাহির হইলেন। যেখানে যান, সেইখানেই ডাক্তারের দরজা বন্ধ। এইরূপ করিয়া এক ডাক্তারের দরজা হইতে অপর ডাক্তারের দরজায় যাইলেন, কিন্তু কোন ডাক্তারকেই পাইলেন না। শেষ রাত্রি ৫টার সময় নূতন ডাক্তার মিষ্টার মুখার্জ্জীকে পাওয়া গেল এবং মিঃ এলাইজা ঐ ডাক্তারকে সঙ্গে লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহাদের প্রতিবাসী মিসেস্ গোমেষ মিসেস্ এলাইজার ক্রন্দন শুনিয়া সেই স্থানে আসিলেন এবং টোটকা ঔষধ দিয়া তাঁহার যন্ত্রণার অনেক উপশম ঘটাইলেন।

এখন যে দিনকাল পড়িয়াছে, তাহাতে লোক টোটকা ঔষধে বিশ্বাস হারাইতেছে। ইদানীং কথায় কথায় সামান্য কারণে ডাক্তার ডাকা হয়। পূর্ব্বে পূর্ব্বে গৃহকর্ত্রী নাড়ী দেখিতে পারিতেন, সামান্য সামান্য অসুখে ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারিতেন, ফলে কথায় কথায় ডাক্তার ডাকিতে হইত না; আর ডাক্তার ডাকিবার আনুষঙ্গিক কষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করিতে হইত না। অনর্থক ডাক্তারের দর্শনী দেওয়ার হাত হইতে গৃহস্থ রক্ষা পাইত। অধুনা হোমিওপ্যাথিক ঔষধের দর সস্তা হওয়ায় গৃহস্থের দরকার হইলেই প্রতিবাসী হোমিও-প্যাথিক ডাক্তারের পরামর্শ লন, আর না হয় বিনা ব্যয়ে, না হয় অতি স্বল্পব্যয়ে ঔষধ পান। অসময়ে চিকিৎসকের প্রয়োজন হইলে তাহাকে না পাওয়া ও একটি চিকিৎসকের জন্য দ্বারে দ্বারে রাত্রিতে ঘুরিয়া বেড়ান অতিশয় কষ্টদায়ক। রাত্রিকালে Senior Doctor ত পাওয়া যায়ই না, Junior Doctor পাওয়াও কষ্টসাধ্য ও ব্যয়সাধ্য।

বিলাতবাসীদের কিন্তু এই অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। প্রত্যেক Countyতেই কতকগুলি করিয়া ডাক্তারের একটি Panel আছে। সেই তালিকায় যে যে ডাক্তারের নাম আছে,

রোগীর তরফ হইতে ডাক পড়িলে তাঁহাকে যাইতেই হইবে। দর্শনীর টাকাও ঠিক করিয়া দেওয়া আছে। রাত্রিকাল বলিয়া কোন ডাক্তার অধিক ফি চাহিতে পারিবেন না, আর রোগীর তরফ হইতে তাঁহাকে ডাকিতে যাইলে তিনি আসিতে বাধ্য। যদি আসিতে অস্বীকার করেন, তার পরদিন ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে নালিশ করিলে ঐ ডাক্তারের নামে শমন বাহির হইবে এবং না আসিবার যোগ্যতর ও উপযুক্ত কারণ দেখাইতে না পারিলে তাঁহার জরিমানা হইবে। ইহা অতি সুন্দর নিয়ম। এই নিয়মের দরুণ ডাক্তাররা ঝোপ বুঝিয়া কোপ মারিতে পারেন না, তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট দর্শনী লইয়া অতি গভীর রাত্রিতেও রোগী দেখিতে যাইতে বাধ্য। তবে সব সুনিয়মেই ব্যতিক্রম ও ব্যভিচার আছে।

এক সময়ে গভীর রাত্রিতে একটি লোকের অনেক দূরে যাইবার প্রয়োজন ছিল, ট্যাক্সি গাড়ী খুঁজিতে গেল, পাওয়া গেল না; যাহা একখানা পাওয়া গেল, সেও অত্যন্ত অধিক ভাড়া চাহিল। যে লোকটি গাড়ী খুঁজিতেছিল, সে খুব হুঁসিয়ার; হঠাৎ সে এক ডাক্তারের বাড়ী গিয়া উঠিল, ঘণ্টা বাজাইয়া ডাক্তারকে ডাকিলে ডাক্তার উপস্থিত হইল। তখন সে ডাক্তারকে বলিল, তাহার এক আত্মীয়ের অসুখ হইয়াছে, সেই আত্মীয়ের বাটী সেই Countyর শেষভাগে।

এই বলিয়া ডাক্তারকে সঙ্গে করিয়া তাহারই মোটরে সেই স্থানে উপস্থিত হইল। উপস্থিত হইয়া ডাক্তারের যাহা ন্যায্য ফি, তাহা ডাক্তারকে দিয়া বলিল,—"ডাক্তার, রোগী এখন ভাল আছে, আপনাকে কষ্ট করিয়া উপরে যাইতে হইবে না।" এই বলিয়া ডাক্তারের হাতে ভিজিটের টাকা দিল এবং বিদায় লইয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিল। মোটরে আসিতে যে ভাড়া লাগিত, ডাক্তারের ফি তাহা অপেক্ষা কম লাগিল।

রাত্রিতে লোক খোঁজা অতিশয় কষ্টসাধ্য ও অসুবিধাজনক। আমি এক সময়ে খুনী মামলার কাগজ পড়িতেছিলাম, তাহাতে দেখিলাম, সন্ধ্যা ৭টার সময় একটি লোক আহত হইয়াছিল, তার পরদিন ভোরে ৫টার সময় তাহার মৃত্যু হয়। এই দশ ঘণ্টার মধ্যে আহত ব্যক্তির জীবনের শেষ জবানবন্দী লওয়া হয় নাই। আমি ইহা দেখিয়া বিশেষ অসন্তুষ্ট হইলাম এবং ইন্‌স্পেক্টরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি তাহার শেষ জবানবন্দী কোন এক ম্যাজিষ্ট্রেটের দ্বারা লন নাই কেন? অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের সংখ্যা ত কম নয় এবং প্রত্যেক পাড়ায় চার পাঁচ জন করিয়া অনারারী হাকিম আছেন।"

তখন ইন্‌স্পেক্টর তাহার একটি রিপোর্ট দেখাইল। তাহাতে দেখা গেল, সে তাহার উপরওয়ালাদিগকে লিখিতেছে, যদিও সে দশ বারো জন অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের বাটীতে গিয়াছিল, কেহই কার্য্য করিতে রাজী হন নাই; কাহারও মাথা ধরিয়াছে, কাহারও স্ত্রী বাপের বাড়ী গিয়াছেন, কাহারও ভাই বাটীতে ফিরিয়া আসেন নাই, কাহারও বাত হইয়াছে, কাহারও ডাক্তারের বারণ ইত্যাদি নানাপ্রকার অজুহাতে কেহই আসিলেন না।

এই শ্রেণীর অবৈতনিক হাকিমরা হাকিমি করিবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত। হাকিম-শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ, কিন্তু ভর্ত্তি হইবার পর সেই আগ্রহের এক-চতুর্থাংশ থাকে না। তাঁহারা অনেকেই নামের জন্য ব্যস্ত, কামের জন্য খুব কম।

আমার মতে ভারতবর্ষের প্রত্যেক স্থানেই ডাক্তারের একটি করিয়া Panel বা তালিকা থাকা উচিত। যে সকল ডাক্তারের নাম ঐ Panelএ থাকিবে, সেই সকল ডাক্তারকে রোগীর জন্য ডাক পড়িলে যাইতেই হইবে, না যাইলে তাঁহাদের নামে মামলা চলিবে এবং বিশেষ কারণ দর্শাইতে না পারিলে তাঁহাদের সাজাও গ্রহণ করিতে হইবে।

অবৈতনিক হাকিমদের পক্ষেও নিয়ম করা উচিত যে, তাঁহাদের ডাক পড়িলে তাঁহারা সর্ব্বসময়ে শেষ চরম জবানবন্দী লইতে ও আসামীর স্বীকারোক্তি গ্রহণ করিতে বাধ্য। বিনা কারণে তিন চার দফায় যাইতে অস্বীকার করিলে অবৈতনিক হাকিমদের তালিকা হইতে তাঁহাদের নাম সরাইয়া দেওয়া উচিত।

কিছু দিন পরে এক দিন রাত্রিতে মিঃ এলাইজার প্রস্রাবের দ্বার দিয়া রক্ত নির্গত হইতে লাগিল। মিঃ ও মিসেস্ এলাইজা দুই জনেই অত্যন্ত ভীত হইলেন এবং মিসেস্ এলাইজা সেই রাত্রিতেই ডাক্তার আনিবার জন্য বাটী হইতে বাহির হইয়া দুই ঘণ্টাকাল ঘুরিয়া মিষ্টার দে বলিয়া এক জন ডাক্তারকে আনিলেন। ডাক্তার প্রথমে লম্বা-চওড়া ফি হাঁকিলেন, শেষে অনেক কাকুতি-মিনতি করিয়া ডাঃ দেকে ন্যায্য Visitএ আনিবার বন্দোবস্ত করিলেন।

লোক হিসাবে ডাঃ দে পাষাণ-প্রকৃতির মানুষ ছিলেন না, তাহার উপর এক জন যুবতী তাঁহার দয়া-ভিক্ষা করিতেছেন, এক জন মানুষের তাঁহার দ্বারা যন্ত্রণার উপশম হইতে পারিবে, এইরূপ ভাবিয়া ডাঃ দে মিসেস্ এলাইজার সহিত আসিলেন। রোগীকে দেখিয়া তিনি ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন এবং যন্ত্রণারও কথঞ্চিৎ উপশম হইল।

অধুনাতন উকীলদিগের মত ডাক্তারদেরও 'fancy fee' হইয়াছে। মুলতুবিও উকীলদের মত চলিয়াছে, অধিক অং

উপার্জনের জন্ত মানুষকে মানুষের মত ব্যবহার করেন না, অধিক ফি আদায় করিবার জন্ত অনেকে অবৈধ পথ অবলম্বন করেন। বাড়ীতে স্ত্রীলোক প্রসব হইতে পারিতেছে না, ধাত্রী-ডাক্তারের বাটীতে গৃহকর্ত্তা গেলেন। ধাত্রী-ডাক্তার ঘরের বাহিরের বারান্দায় আসিয়া একটা লম্বা-চওড়া ফি'র কথা বলিলেন, "এই ফি না পাইলে আমি যাইব না।"

পূর্ব্বে ডাক্তারদের ও কবিরাজদের দয়া-মায়া ছিল। কবিরাজরা অতি অল্প প্রণামী লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন এবং ঔষধের দাম অতি যৎসামান্তই গ্রহণ করিতেন। এখন ডাক্তারদের ফি ছাড়াও আরও অনেক খরচার ব্যবস্থা আছে—জুনিয়ার নম্বর ১, জুনিয়ার নম্বর ২, জুনিয়ার নম্বর ৩, ঔষধের তালিকাও একটি ছোট-খাটো অবৈতনিক ঔষধালয়ে যতগুলি ঔষধ থাকে, প্রায় ততগুলি। পূর্ব্বে কবিরাজদের ঔষধ সপ্তাহে এক টাকা, পাঁচ সিকা,—খুব বেশী দুই টাকা ছিল, এখন সেই স্থলে ১২৲ হইতে ৪০৲ টাকা পর্য্যন্ত কবিরাজদের সাপ্তাহিক ঔষধের দাম। ডাক্তাররা যেমন তিন চার জনে মিলিয়া রোগীর পাশের ঘরে বসিয়া পরামর্শ করেন, কবিরাজদেরও এখন তাহাই হইয়াছে। "স পাপিষ্ঠস্ততোঽধিকঃ।" তাই বলিতেছিলাম, সরকার বাহাদুর প্রত্যেক পাড়ায় পাড়ায় ডাক্তারদের একটি করিয়া Panel করিয়া দিন। দিনেই হউক, রাত্রিতেই হউক, তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট ফি'তে রোগী দেখিতে যাইতে বাধ্য; না যাইলে আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইবেন। আজকাল মানুষের মনোবৃত্তি যেরূপ হীন হইয়াছে, তাহাতে উপযুক্ত মুদ্গরের প্রয়োজন।

যাহা হউক, এলাইজা-দম্পতি সুখে-দুঃখে এক রকম সুন্দরভাবেই জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। ১০ বৎসর এইরূপভাবে কাটিয়া গেল। শেষ তাঁহাদের শনিরূপে মিষ্টার ভেঙ্কার বলিয়া এক জন তাঁহাদের ভাগ্যাকাশে উদয় হইল। সে এক দিন মিঃ এলাইজার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত, পরিচয় দিল, Toffygণ তাহার নিকট-আত্মীয়। সে বলিল, মিসেস্ এলাইজা এক জন Miss Toffy ছিলেন। সেই জন্ত সে পূর্ব্বেকার আত্মীয়তাসূত্রে তাঁহার সহিত আলাপ করিতে আসিয়াছে। অধিকাংশ স্ত্রীলোকেরই বাপের বাড়ীর নাম শুনিলে জিহ্বা হইতে লালা নিঃসৃত হয়।

মিঃ ভেঙ্কারের কথা শুনিয়া মিসেস এলাইজা বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন এবং সুবিধা পাইলে সময়ে সময়ে তাঁহাদের বাসস্থানে আসিবার জন্ত তাহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন।

"সেদো ভাত খাবি?—না হাত ধোব কোথায়?"—মিঃ ভেঙ্কারের এইরূপ মানসিক অবস্থা। নিমন্ত্রণ পাইয়া নিজেকে অতিশয় ধন্ত মনে করিল এবং সে যে এই নিমন্ত্রণ পাইয়া আপ্যায়িত হইয়াছে, তাহা সুন্দর ভাষায় মিসেস্ এলাইজাকে বুঝাইয়া দিল। এইরূপ করিয়া মিঃ ভেঙ্কার এলাইজাদের বন্ধুরূপে যাতায়াত করিতে লাগিল। ক্রমে মিঃ এলাইজার সহিত তাহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইল এবং সে ঘন ঘন এলাইজাধামে যাতায়াত করিতে লাগিল।

এই জগতে অনেক বেকার লোক আছে, তাহারা কোনই কাযকর্ম্ম করে না, অথচ বেশ সুখে জীবন কাটাইয়া দেয়।

মিঃ এলাইজাকে সংসার চালাইবার জন্ত সর্ব্বদাই কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিতে হয়। স্ত্রী-পুত্রকে বাটীতে রাখিয়া তাঁহাকে কর্ম্মক্ষেত্রে যাইতে হয়।

মিঃ ভেঙ্কার কোনই কাযকর্ম্ম করে না। সে কি রকম করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাহা বলা বড় শক্ত। কিন্তু এটা ঠিক, যখনই মিঃ এলাইজা কর্ম্মক্ষেত্রে যাইতেন, মিঃ ভেঙ্কার তখনই তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইত এবং মিসেস্ এলাইজাকে সুখী করিবার জন্ত যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহাই সে করিত—অবশ্য মিঃ এলাইজার অর্থে। সে প্রায় বলিত, মিসেস এলাইজা স্ত্রীরত্ন; তাঁহাকে সুখী করা প্রত্যেক মানুষেরই কর্ত্তব্য। মিঃ এলাইজা কায লইয়াই পাগল, মিসেস্ এলাইজার সন্তুষ্টির জন্ত তিনি কি করেন? যে ব্যক্তি অর্থ উপায়ের জন্ত ব্যতিব্যস্ত, তাহার সুন্দরী স্ত্রীকে বিবাহ করিবার অধিকার নাই, ইত্যাদি ইত্যাদি।

মিসেস্ এলাইজা তাহা শুনিয়া একটু মুচকি হাসিয়া বলিতেন, "আমার স্বামীর ত কোন দোষ নাই। তিনি আমাকে প্রগাঢ়রূপে ভালবাসেন, আমার সুখশান্তির জন্ত যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহা তিনি করেন। তিনি যে কর্ম্মক্ষেত্রে অধিক সময় অতিবাহিত করেন, তাহাও আমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্ত। তিনি অর্থ উপার্জ্জন না করিলে আমাদের খরচপত্র কোথা হইতে চলিবে? শুধু ত 'প্রেমসুধারস পানে' বাড়ীওয়ালার ভাড়া, মুদির বিল, চাকর-বাকরের মাহিনা, ধোবার খরচা কিছুই চলিবে না?"

মিঃ ভেঙ্কার।—মাপ করিবেন মিসেস্ এলাইজা। আপনার স্তায় স্ত্রী-রত্ন আমার ভাগ্যে ঘটিলে, আমি আমার মাথাটি আপনার পদতলে লুটাইয়া দিতাম। আপনার মত স্ত্রীরত্ন পাওয়া খুব অল্প মানুষের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে।

মিসেস্ এলাইজা।—আমাকে মাপ করিবেন। মোহের ছায়া আমার কাছে ধরিবেন না। আমি বেশ সুখে আছি, ইহা অপেক্ষা সুখ আমার ভাগ্যে সম্ভব নয়।

মিঃ ভেঙ্কার।—আপনি স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে দুর্লভ পদার্থ,

সর্ব্বসময়েই স্বামীর মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে ব্যস্ত। আপনি ধন্যা, আপনার শিক্ষা-দীক্ষা ধন্যা। আপনি নারীকুলের দুষ্প্রাপ্য পদ্মরাণী।

এই সময় হইতেই মিঃ ভেঙ্কার প্রায়ই এলাইজা-ভবনে আসিত এবং মিসেস্ এলাইজাকে সুখী করিবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত থাকিত।

এক দিন মিসেস্ এলাইজার শরীর কিঞ্চিৎ অসুস্থ ছিল। তিনি বিছানায় শুইয়া আছেন, সেই সময়ে ভেঙ্কার সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। কথোপকথনে জ্ঞাত হইল, মিসেস্ এলাইজা অসুস্থ; তাঁহার হাত-পায়ে বেদনা অনুভব করিতেছেন। এই শুনিয়াই মিঃ ভেঙ্কার তাঁহার অসুস্থতার জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করিল এবং মিসেস্ এলাইজার পা দুইটি নিজের পায়ের উপর রাখিয়া টিপিয়া দিতে লাগিল এবং বলিল, "আমার এক নিকট-আত্মীয় বড় ডাক্তার, তিনি আমাকে পুনঃ পুনঃ বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, গা-পা কামড়াইলে, সেই স্থান টিপিয়া দিলে রোগী সুস্থ বোধ করিবে। আমার পরম সৌভাগ্য যে, আমি আপনার গা-হাত টিপিয়া দিবার অধিকার পাইয়াছি।"

মিসেস্ এলাইজা মিঃ ভেঙ্কারের হস্তদ্বয় হইতে তাঁহার পা দুটি বাহির করিয়া বলিলেন,—"মিঃ ভেঙ্কার! মাপ করিবেন,—আপনাকে দিয়া পা টিপাইতে আমি পারিব না। আপনার সদিচ্ছার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি, কিন্তু ইহার অধিক নয়।"

এই অর্থকৃচ্ছ্রতার দিনে প্রত্যেক স্বামীকেই সুচারুরূপে সংসার চালাইবার জন্য ২৪ ঘণ্টা ব্যস্ত থাকিতে হয়। বাটীতে স্ত্রীর সহিত খোসগল্প করিয়া সময় কাটাইতে একবারেই সুবিধা হয় না, আর এই বেকারের দিনে অনেক বেকার যুবকেরই কাছে সময়ের কোনরূপ মূল্য নাই। তাহাদের হাতে যথেষ্ট সময় আছে, সেটুকু স্ত্রীলোকের সহিত গল্পগুজব করিয়া ও আমোদ-আহ্লাদ করিয়া কাটাইতে পারে। সর্ব্বদাই স্বামী যে সেই স্ত্রীলোকদিগের উপযুক্ত নয়, তাহাই প্রমাণ করিতে ব্যস্ত। স্ত্রীলোকদের মনস্তুষ্টি করিবার জন্য সমস্ত সময়েই তাহারা তাহাদের কাছে হাজির থাকে, আর সয়তান-শিশুর ন্যায় সর্ব্বদাই অপরের স্ত্রীর সন্তুষ্টি-সাধনের জন্য নিজেকে তাহাদের চরণে বিকাইয়া দেয়। এই সব সময়ে আত্মরক্ষা করিতে গেলে ধর্ম্ম বিনা অন্য কিছুই ঐ সকল স্ত্রীলোককে সাহায্য করিতে পারে না। ধর্ম্মশিক্ষাই আত্মরক্ষার একমাত্র ভিত্তি। ধর্ম্মের সাহায্য বিনা কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কেহই সৎপথে থাকিতে পারে না। সৎপথে থাকিবার জন্য ধর্ম্মই তাহাদের প্রধান ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন।

এইরূপে কিছু কাল কাটিয়া যায়। মিসেস্ এলাইজাকে প্রাপ্তির স্পৃহা ভেঙ্কারের মনে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। আজকাল সে প্রত্যহই মিসেস্ এলাইজার নিকট উপস্থিত থাকে এবং তাঁহাকে খুসী করিবার জন্য প্রাণপাত করিতে থাকে। এই সব নীচ শ্রেণীর লোকের উদ্দেশ্য একই। যে কোন উপায়ে অপরের স্ত্রীকে ভুলাইয়া নিজ কবলে লইয়া আসা, আর কবলে আনিবার পর তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করা।

সয়তান ক্রমশঃ মিঃ এলাইজার বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করিতে সুরু করিল। লোকটা এলাইজা-দম্পতির বন্ধু। তাঁহাদের পায়ে কাঁটা ফুটিলে ভেঙ্কার বেদনা পায়, কিন্তু মনে মনে সে এলাইজার পরম শত্রু। কোন গতিকে তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিতে পারিলেই তাহার কার্য্যসিদ্ধি হইবে। সেই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য সে সর্ব্বদাই ব্যস্ত। অনেক অনুসন্ধানের পর সে মিষ্টার নস্‌ট্রাম নামে এক ব্যক্তিকে খুঁজিয়া পাইল। কথায় কথায় সে জানিতে পারিল, যখন নস্‌ট্রামের ভাগ্য ভাল ছিল, যখন দুঃখ-দৈন্য তাহাকে আক্রমণ করে নাই, তখন সে মিঃ এলাইজার কাছে ১ হাজার টাকা জমা রাখিয়াছিল। মিঃ এলাইজা মিঃ নস্‌ট্রামকে এই টাকার একখানি স্বীকারোক্তি দিয়াছিলেন। মিঃ নস্‌ট্রাম চাহে নাই, তবুও তিনি জোর করিয়া একখানি রসিদ দিয়াছিলেন। সময়ে মিঃ নস্‌ট্রাম সেই টাকাটি মিঃ এলাইজার কাছ হইতে ফিরাইয়া পাইয়াছিল, কিন্তু রসিদটি তাহার কাছেই রহিয়া গিয়াছিল। মিঃ নস্‌ট্রামের সময় তখন খুব খারাপ, অর্থকৃচ্ছ্রতা তাহাকে চঞ্চল করিয়া ফেলিয়াছিল।

এই সময়ে কুমতি ভেঙ্কার তাহাকে বুঝাইয়া দিল, মিঃ এলাইজার অবস্থা এখন খুব ভাল, সে একটু চালাকি করিলেই তাঁহার কাছ হইতে কিছু টাকা আদায় করিতে পারে। অতএব অনেক বুঝাইয়া সুঝাইয়া মিঃ এলাইজার নামে নালিশ করিতে নস্‌ট্রামকে সে রাজি করিল।

মিঃ ভেঙ্কারের অনেক উকীল-কৌন্সিলির সহিত আলাপ। এক জন জুনিয়র কৌন্সিলি ও জুনিয়র উকীলের মুরুব্বি সাজিয়া তাহাদিগকে দিয়া বিশ্বাসঘাতকতার এক মামলা রুজু করিয়া দিল। দরখাস্তে লিখিয়া দিল, টাকা জমা দেওয়া হইয়াছে এক বৎসর পূর্ব্বে। টাকাটি এলাইজার কাছে গচ্ছিত রাখা হয়, আর পুনঃ পুনঃ তাগাদা করিয়াও সে টাকাটি ফেরত পায় নাই। ও দিকে মিঃ নস্‌ট্রামের বন্ধুরূপে তাহাকে দিয়া সে মামলা রুজু করাইল এবং এলাইজা-দম্পতির বন্ধুরূপে তাঁহাদের ভাগ্যগগনে উদয় হইয়া আসামীর তরফে মামলার তদ্বির করিতে লাগিল।

মিঃ এলাইজা আমাকে পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন এবং তিনি আমাকে তাঁহার উকীলরূপে নিযুক্ত করিলেন। তিনি যখন আমার চোরবাগানস্থ বাটীতে আসিয়া মামলার বিষয় আমাকে সব বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন, মিঃ ভেঙ্কারও সেই সময়ে উপস্থিত ছিল, আর মোকদ্দমার বিষয় বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিল। আমাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিল, "মিঃ সাধু, মিঃ এলাইজা আমার ভাইয়ের অধিক, আর মিসেস্ এলাইজা যদিও আমার সহোদরা নয়, তত্রাপি তাহার সুখস্বচ্ছন্দতার জন্য আমি নিজেকে বলিদান দিতে রাজি। এমন কিছু কার্য্য নাই, যাহা আমি মিসেস্ এলাইজাকে সুখী করিবার জন্য করিতে পারি না।"

মিঃ এলাইজা, মিসেস্ এলাইজা ও মিঃ ভেঙ্কার তিন জনে আসিয়া আমাকে মোকদ্দমার বিষয় বুঝাইয়া দেন। মিঃ ভেঙ্কার এক দিন এলাইজা-দম্পতির সম্মুখেই আমাকে বুঝাইতে লাগিল, "দেখুন মিঃ সাধু! ইঁহারা ধর্ম্মভীরু লোক, কোন কারণেই ইঁহারা মিথ্যা বলিবেন না। মিঃ নস্ট্রাম যে তাঁহার কাছে টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছিল, তাহা সত্য কথা, তিনি সে কথা কোনমতেই অস্বীকার করিবেন না, তবে এ কথাও সত্য, তিনি ঐ টাকা তাঁহাকে ফেরত দিয়াছেন।"

মিঃ এলাইজা।—মিঃ ভেঙ্কার যাহা বলিলেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। মিঃ নস্ট্রাম আমার কাছে টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছিল, তাহার পর সে সেই টাকা ফেরত লইয়া গিয়াছে।

আমি।—তাহা হইলে ত পাপ চুকিয়া গিয়াছে। টাকা যখন ফেরত দেওয়া হয়, সে সময়ে কি রসিদ লওয়া হয়?

মিঃ এলাইজা।—না।

আমি।—তাহার কোন সাক্ষী-সাবুদ আছে?

মিঃ এলাইজা।—না।

মিঃ ভেঙ্কার।—তুমি অত্যন্ত নির্ব্বোধের ন্যায় উত্তর করিতেছ। (আমার দিকে ফিরিয়া) মিঃ সাধু! আমার বন্ধু মিঃ এলাইজা বিপদে পড়িয়া সব ভুলিয়া যাইতেছেন। যখন টাকা ফেরত দেওয়া হয়, তিন জন লোক সাক্ষী আছে। মিঃ চিক্, মিঃ ডিক্, মিঃ টিক্।

মিঃ এলাইজা।—আমি ত ইহাদের চিনি না।

মিঃ ভেঙ্কার।—তুমি ভুলিয়া যাইতেছ, এ তিন জনেই তোমাকে চেনে, আর তুমি যখন টাকা ফেরত দাও, তাহারা উপস্থিত ছিল।

মিঃ ভেঙ্কার এমনভাবে কথা বলিতে লাগিল, যেন সে সবই জানে। মিসেস্ এলাইজাও স্বামীর বিপদে বিশেষ বিপন্না। তিনি স্বামীকে বলিলেন, "মিঃ ভেঙ্কার যাহা বলিতেছেন, তাহাই শুন, বিপদে পড়িয়া তুমি সব ভুলিয়া যাইতেছ।"

চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে মোকদ্দমা চলিতে লাগিল। আমি আসামী পক্ষের উকীল। মিসেস্ এলাইজা, মিঃ এলাইজা ও মিঃ ভেঙ্কার আমাকে মোকদ্দমার সাক্ষী-সাবুদ বিষয় ওয়াকিভাল করিতে লাগিল। আমি তাহাদের তিন জনকার নিকট হইতেই মোকদ্দমার অবস্থা অবগত হইতে লাগিলাম।

মামলা চলিতে লাগিল। চার পাঁচ দিন মামলা চলিবার পর ফরিয়াদীর উকীল আমাকে বলিলেন, "আপনি আপনার মক্কেলকে বলিয়া আমার মক্কেলকে কিছু টাকা পাওয়াইয়া দিন, তাহা হইলে সে মামলা তুলিয়া লইবে।" কথায় কথায় তিনি আরও বলিলেন, ১ শত টাকা পাইলেই তাঁহার মক্কেল মামলা তুলিয়া লইতে রাজি আছে।

প্রথম হইতেই আমার এ শিক্ষা হইয়াছিল যে, ফৌজদারী মামলায় আসামী হইয়া কখন জোর করিয়া মামলা চালাইতে নাই। আসামীর পক্ষে খুব ভাল মামলা হইলেও ফৌজদারী মামলা চালান সব সময়েই বিপজ্জনক। এই সম্বন্ধে আমি একটি ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা বলিতেছি।

আমি তখন নূতন উকীল। এক জন স্বর্ণকারের পক্ষে উকীল হইয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। তাহার নামে নালিস যে, পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে সে এক জন ভদ্রলোকের জন্য একটি গহনা প্রস্তুত করিয়াছিল। পাঁচ বৎসর পরে সেই গহনা ভাঙ্গিলে দেখা গেল, তাহাতে অত্যধিক পান আছে, আর ভিতরে একটা লোহার পাতও আছে। ফরিয়াদী পুলিস-আদালতে নালিশ করিল প্রতারণার অজুহাতে। আমি তখন জুনিয়র উকীল। এক জন প্রবীণ উকীল ফরিয়াদীর তরফে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

মোকদ্দমায় নিয়োজিত হইয়া আমার মহা আনন্দ যে, এ মামলা জিতিবই। কারণ, ফরিয়াদী কেমন করিয়া প্রমাণ করিবে যে, আমার মক্কেল ঐ লোহা দিয়াছে ও পান দিয়াছে। দুই এক জন অপর উকীলকেও জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁহারাও বলিলেন, আপনার মক্কেলের বিপক্ষে মামলা প্রমাণ করা ফরিয়াদীর পক্ষে দুঃসাধ্য। কিন্তু পাশে এক জন বৃদ্ধ উকীল বসিয়াছিলেন, তিনি বলিয়া উঠিলেন, "তারক বাবু, ও প্রমাণ-ক্রমাণের কথা শুনিবেন না, ফৌজদারী মামলায় আসামীর তরফে থাকিয়া মেটামিটির কথায় কখন বাধা দিবেন না।"

যাহাই হউক, ফরিয়াদীর উকীল আমাকে বলিলেন,—"দেখুন, সেকরারা এরূপ কার্য্য করিয়াই থাকে। প্রবাদ আছে, মাতার অলঙ্কার প্রস্তুতকালেও সোনা চুরি করে। যাহা হউক, আপনি আপনার মক্কেলকে বলিয়া আমার মক্কেলকে ৪০৲ টাকা দেওয়াইয়া দিন, আমি মামলা তুলিয়া লইব।"

আমি দেখিলাম, আমার মোকদ্দমা ভাল আছে। ফরিয়াদীর পক্ষে এই মামলা প্রমাণ করা বড়ই কঠিন, অতএব আমি এ প্রস্তাবে রাজি হইলাম না।

ম্যাজিষ্ট্রেট এক জন বাঙ্গালী ব্যারিষ্টার। পসার যে নাই, এ কথা বলার কোন সার্থকতা নাই; কেন নিজের পসার থাকিলে বিনা "ফি"য়ে কার্য্য করিতে আসিবেন?

মোকদ্দমা ডাক হইলে, ফরিয়াদীর উকীল মোকদ্দমার বিষয়টি ম্যাজিষ্ট্রেটকে বুঝাইলেন। আমি তখন বলিলাম, "হুজুর, গহনার ভিতর লোহার পাত থাকিতে পারে বা সোনায় অধিক পান থাকিতে পারে, কিন্তু এ গহনা যে আমার মক্কেলই প্রস্তুত করিয়াছে, তাহার প্রমাণ কোথায়? গহনা ৫ বৎসর পূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়াছিল; অধিকন্তু ঠকাইবার মতলবে আমার মক্কেল যে নিজহস্তে এই সব কার্য্য করিয়াছে, তাহারই বা প্রমাণ কোথায়?

অবৈতনিক হাকিম।—তারক বাবু, আপনি যাহাই বলুন, আমার অন্ধ বিশ্বাস, আপনার মক্কেল এ বিষয়ে দোষী। আমি নিজে সেকরার হাতে এইরূপ নিগৃহীত হইয়াছি। আপনি যাহাই বলুন, আমি আপনার মক্কেলকে ছাড়িব না।

পাশে এক জন আমার অপেক্ষাও জুনিয়র উকীল বসিয়াছিল, সে হাকিমের এই কথা শুনিয়া আমাকে বলিল,—"তারক বাবু, আপনি মোকদ্দমা স্থানান্তরিত করিবার জন্য দরখাস্ত করুন।"

আমি আস্তে আস্তে তাহাকে বলিলাম,—"মোকদ্দমা স্থানান্তরিত করিবার যথেষ্ট কারণ হইয়াছে, কিন্তু খরচা?" অতএব সেই দিন মোকদ্দমার মুলতুবী লইয়া ফরিয়াদীর প্রবীণ উকীলকে ধরিয়া ৮০ টাকা দিয়া মকদ্দমা মিটাইয়া লইলাম। মামলা শুনানীর প্রথম দিনের প্রাতঃকালে ফরিয়াদী ৪০ টাকা চাহিয়াছিল, হয় ত ২০৲ টাকায় মিটিয়া যাইত, কিন্তু আমি একগুঁয়েমি করিয়া মামলা মিটাইয়া লইলাম না। হাকিমের এইরূপ মনোভাব দেখিয়া ফরিয়াদী আর সস্তায় মিটাইল না, ফলে ৮০৲ টাকা দিয়া মিটাইতে হইল।

আর একটি ঘটনা ঘটে। নূতনবাজারের একটি মৎস্য-বিক্রেতা একটি ভদ্রলোককে ওজনে কম দিয়া মাছ বেচিয়াছিল। ক্রেতা কম টের পাইয়া, মাছ-বিক্রেতাকে কমটি পূরণ করিয়া দিতে বলিল। সে কিছুতেই রাজি হইল না; ফলে পুলিসে খবর দিল। পুলিস আসিয়া তাহার সমস্ত বাটখারা ইত্যাদি লইয়া গেল এবং আসামীকে চালান দিল। আমি আসামীর উকীল। আমার বক্তব্য ঐ কম ওজনের বাটখারাগুলি, মফঃস্বলে মাছ চালান দিবার সময় যে বরফ ব্যবহার করিতে হয়, সেই বরফ ভাঙ্গিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। হাকিম এক জন অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট। তিনি আমার কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, "তারক বাবু, আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা হইতেও পারে, না হইতেও পারে, কিন্তু আমি আপনার মক্কেলকে ছাড়িব না। আমি শ্যামবাজারের বাজারে মাছ কিনিতে গিয়া নিজে এইরূপ ঠকিয়াছিলাম।" এই সব কারণে হাকিমের মনে মামলা সম্বন্ধে কি ধারণা হইবে, তাহার যখন স্থিরনিশ্চয় নাই, তখন ফৌজদারী মামলায় আসামীর তরফ হইতে মেটামিটিতে বাধা দেওয়া দুর্ব্বুদ্ধির পরিচায়ক।

কাযেই অপর পক্ষের উকীলের প্রস্তাবটি মিঃ এলাইজাকে বলিলাম। মিঃ এলাইজা বলিলেন, "মিঃ সাধু, যদি ১ শত টাকা দিলে এই ছেঁড়া লেঠা হইতে অব্যাহতি পাই, তাহা হইলে আমি দিতে রাজি আছি।"

ইহা শুনিয়া মিঃ ভেঙ্কার বলিল, "তুমি এত কাপুরুষ, এই মিথ্যা মোকদ্দমাটি এই টাকা দিয়া মিটাইবে? লোকে বলিবে, তুমি দোষী; সেই জন্যই ভয়ে মামলা মিটাইতেছ, আমি থাকিতে তাহা কখনই হইতে দিব না।"

মিসেস্ এলাইজাও নিমরাজি ছিলেন, কিন্তু মিঃ ভেঙ্কারের স্থিরপ্রতিজ্ঞা ও মনোভাব দর্শন করিয়া আর কিছু বলিলেন না। সে প্রস্তাবটি জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

মোকদ্দমা চলিতে লাগিল। আসামীর পক্ষে মোকদ্দমা এই যে, টাকা লইয়াছিলাম, কিন্তু ফিরাইয়া দিয়াছি। কাযেই টাকা লওয়ার সম্বন্ধে কিছু কথা উঠিল না, কারণ, আসামী স্বীকার করিতেছে, সামান্য প্রমাণই যথেষ্ট হইল। টাকা ফেরত দেওয়ার প্রমাণ করার ভার আমাদের হাতে পড়িল। মিঃ ভেঙ্কার যে তিন জন সাক্ষীর নাম দিয়াছিল, একে একে তাহাদের ডাক হইল। তিন জনেই বলিল, টাকা ফেরত দিবার কথা তাহারা কিছুই জানে না। হরি, হরি, সব অন্ধকার!

আসামীকে বাঁচাইবার কোন উপায় রহিল না। পূর্ব্ব হইতেই আসামীর কথা এই ছিল যে, সে টাকা ফেরত দিয়াছে, তাহাই সে প্রমাণ করিতে পারিল না। আমার আর কিছু বলিবার রহিল না। ফলে আসামীর চারি মাসের জেল হইল। বাহিরে আসিয়া দেখি, মিসেস্ এলাইজা ও মিঃ ভেঙ্কার দুই জনেই উধাও! আমি এই মামলার আসল তথ্য ও গূঢ়তত্ত্ব কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। প্রমাণ-ভার কেন আমরা ইচ্ছা করিয়া আমাদের ঘাড়ে লইলাম? যাহা হউক, তিন দিন ধরিয়া আমার ঘুমের ব্যাঘাত হইয়াছিল, অবশ্য তখন আমি প্রবীণ উকীল হই নাই।

পাঁচ মাস পরে মিঃ এলাইজা আমার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত। আমি তাঁহাকে দেখিয়া লজ্জায় অধোবদন হইলাম। তিনি আমাকে এইরূপ অপ্রতিভ দেখিয়া বলিলেন, "মিঃ সাধু! আপনি আমার মোকদ্দমায় যাহা কিছু করিয়াছিলেন, তাহার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিতে আসিয়াছি। আমার যে জেল হইয়াছে, তাহার কারণ বন্ধুরূপে শত্রুর ব্যবহার। আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ ভেঙ্কারের আমার স্ত্রীর উপর নজর পড়িয়াছিল। আমার স্ত্রী বরাবরই ভাল ছিল। শেষে সয়তানের চক্রান্তে পড়িয়া তাহার কুমতি হইল। ভেঙ্কার বন্ধুরূপে আবির্ভূত হইয়া চেষ্টা-চরিত্র করিয়া ঘোর শত্রুর কার্য্য করিল, আমাকে জেলে পাঠাইয়া দিল। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম, টাকা যখন ফেরত দিই, তখন সাক্ষী কেহই ছিল না। ভেঙ্কারই এই তিনটি সাক্ষীর নাম দেয় ও জোগাড় করিয়া আনে। আমি ইহাকে ভদ্রলোক ও বন্ধু বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। আপনি আমাকে মোকদ্দমা মিটাইবার কথা বলিয়াছিলেন, এই শত্রুই তাহাতে বাধা দেয়। আমার জেলে যাইবার পর আমার যাহা কিছু স্থাবর সম্পত্তি ছিল ও নগদ টাকাকড়ি ছিল, সেই সমস্ত লইয়া ও আমার স্ত্রীকে লইয়া ভেঙ্কার মোসৌরিতে চলিয়া যায়। তিন মাস সেইখানে স্বামি-স্ত্রীরূপে বাস করিয়া যখন টাকাগুলি সব শেষ হইয়া গেল, মিসেস্ এলাইজাকে রাখিয়া সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে, তাহার কোন সন্ধান নাই। লোকটা নররূপী সয়তান। আমার সংসার নষ্ট করিয়া সে অন্য সংসার নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে নূতন নূতন স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ভগবান্ কি কারণে এই সব নররূপী পিশাচকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা বুঝা বড়ই কঠিন। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমি ইহার কোন কারণই বুঝিয়া পাই নাই। আমার নিজের তরফের লোক যদি সয়তানী করিয়া আপনাকে ভুল পথে লইয়া যায়, তাহা হইলে আপনি কি করিবেন? আপনি জানেন না, এইরূপ বন্ধুবেশে নরপিশাচ প্রত্যেক ভদ্রলোকের পশ্চাতে লাগিয়া আছে। আমার স্ত্রী এইরূপ লোকের কথায় প্রলোভিত ও প্রতারিত হন। নরনারী সকলেই ভুল করে, তিনিও করিয়াছেন। আমি মনে করিয়াছি, তাঁহার দোষ মার্জ্জনা করিয়া তাঁহাকে পত্নীরূপে পুনরায় গ্রহণ করিব। দোষ তাঁহার নয়, দোষ সেই নরপিশাচের।"

কয়েক বৎসর পরে এলাইজা-দম্পতি এক দিন আমার বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা আমাকে খবর দিলেন যে, আফ্রিকায় মিঃ ভেঙ্কারকে বাঘে খাইয়াছে। এলাইজা-পত্নী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "মিঃ সাধু! এরূপ নরপিশাচের পরিণাম এইরূপই হওয়া উচিত। আমি চিরকালই পতিব্রতা ছিলাম, এই নরপিশাচ আমার ও আমার স্বামীর মাঝখানে আসিয়া আমার উপর কিরূপ নির্ম্মম অত্যাচার করিয়াছে, তাহা আপনি শুনিয়াছেন। ভগবানের ধর্ম্মরাজ্যে অধর্ম্মের সুবিধা সাময়িকই হইয়া থাকে, বেশী দিন চলে না।"

শ্রীতারকনাথ সাধু (রায় বাহাদুর)।

মেঘদূত

বাদলের আগে পাঠালেম তোমা
অপূরব মেঘদূত!
অসময়ে বড়, জানি জানি হবে
অপরূপ অদ্‌ভুত!
চলিয়াছ তুমি ফাগুন গগনে
আগুনের পাখা খুলি,
বিশ্বের যত বেদনার রাশি—
জমাট বুকের ধূলি
সব নিলে তুমি তুলি।
আমি সাথে তব পাঠালেম মোর
বিরহের লিপিখানি—
গত দিবসের মূর্ত্ত আমার
ব্যথিত প্রাণের বাণী!

ওগো পুষ্কর, চ'লে যাও ওই
উত্তর পথ দিয়া
নদ, নদী, গিরি পার হয়ে মোর
লিপিখানি হাতে নিয়া!
উড়ে যেতে যেতে দেখিবে যেথায়
'কানন কুসুম-হীন'
মধুপ-গুঞ্জনে ব্যথা সকরুণ
ওঠে যেথা নিশি দিন,
সন্তাপে বিমলিন—
বসি আনমনে বাতায়ন-কোণে
শূন্য দৃষ্টি হানি
যে রয়েছে চেয়ে আকাশের পানে
তারে দিয়ো লিপিখানি!

শ্রীকালীপদ দেব।

নিমকহারাম

প্রথম

তিন পুরুষে কেহ কখনও মোড়লগিরির স্বপ্নটুকু পর্য্যন্ত না দেখিয়া থাকিলেও ন'পাড়ার বসিরুদ্দী যে কেমন করিয়া 'মোড়লের পো' বলিয়া দেশময় প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া ফেলিয়াছিল, কোন অনুসন্ধিৎসু প্রত্নতাত্ত্বিক আজ পর্য্যন্ত তাহা আবিষ্কার করিতে পারেন নাই।

গবেষণায় এইটুকু জানা যায়, বসিরুদ্দীর পিতামহ মন্নু মিঞা পশ্চিম হইতে আসিয়া বিবাহ করিয়া এই গ্রামে সংসার পাতাইয়া বসে। সংসারে তাহার চির-সুহৃদ ছিল দারিদ্র্য, আর জীবিকার্জ্জনের প্রধান অবলম্বন ছিল ভিক্ষাবৃত্তি।

মন্নুর পুত্র মণিরুদ্দী পিতৃপরিত্যক্ত এই উভয়বিধ সম্পত্তিরই অবিসম্বাদী অধিকারী হইয়াছিল সংসারে চারিটি পোষ্য ;—স্বয়ং মণিরুদ্দী, তাহার মা, স্ত্রী ও শিশু পুত্র। একের ভিক্ষাবৃত্তিতে বাড়ন্ত সংসারের উদরান্নের সংস্থান করিতে না পারিয়া মণিরুদ্দী ঝাড়-ফুঁক তন্ত্র-মন্ত্র শিখিয়াছিল। সে ভূত ছাড়াইত, কবচ-তাবিজ দিত, সাম্বৎসরিক মড়ক উপলক্ষে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বাঁশের খুঁটির আগায় মাটীর 'সরা' বাঁধিয়া আপদ তাড়াইত। তাই ভিন্ন গ্রামে সে ছিল মোল্লা মণিরুদ্দী। এ হেন পিতৃ-পিতামহের সন্তান বসির কিন্তু 'মোল্লার পো' না হইয়া 'মোড়লের পো' বনিয়া গিয়াছিল।

ওস্তাদের নিষেধে মণিরুদ্দী 'হেকিমী' করিয়া অর্থ লইত না। কিন্তু নিরক্ষর কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামবাসী পারিশ্রমিক-স্বরূপ ভার বোঝাই করিয়া যাহা 'সিন্নি' দিত, তাহাতে তাহার সংসারের দাবী মিটাইয়া কিছু কিছু সঞ্চয়েরও যোগাড় হইত। সুতরাং সুদীর্ঘ পঁয়ষট্টি বৎসর একটি একটি করিয়া দিন গণিয়া গণিয়া মহাকালের আদেশে মণিরুদ্দী যখন বেহেস্তে খোদাতাল্লার চরণপ্রান্তে চলিয়া গেল, বসির তখন পিতৃপিতামহের মত অন্ন-চিন্তায় পর্য্যাকুল হইয়া পড়ে নাই।

বাল্যকালে বসির গ্রামের পাঠশালায় গিয়াছিল। তথায় প্রাথমিক পাঠ সমাপন করিয়া সে দেশপ্রথানুসারে জমীদার সরকারে নকরী অন্বেষণ না করিয়া পিতৃপুরুষের ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া হাল গরু কিনিয়া কৃষিকার্য্যে মন দিয়াছিল, ধনাঢ্যের বিলাসবাহুল্য না থাকিলেও বসিরের সংসারে অসচ্ছল রহিল না।

দৈনন্দিন কর্ম্মাবসানে বসির আপনার কুটীরের দাওয়ায় বসিয়া সাপ্তাহিক 'বসুমতী' পড়িয়া গাঁয়ের দশ জনকে দেশ-বিদেশের সংবাদ শুনাইত। নিজে মোল্লাবৃত্তির পৃষ্ঠপোষক না হইলেও গ্রামবাসী তাহার কাছে রোজা-ঈদ-মহরমের হিসাব লইত, বিয়া-সাদির পরামর্শ চাহিত। কেহ কোন বিপদে পড়িলে সে সর্ব্বপ্রথমেই ছুটিয়া গিয়া বসিরের শরণাপন্ন হইত। তাহাদের ধ্রুব বিশ্বাস ছিল, বসির 'মন' করিলে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে। খোদাতাল্লার অফুরন্ত দয়ায় পরম ধর্ম্মপ্রাণ বসিরের অদৃষ্টে কখনও অকৃতকার্য্যতার গ্লানিভোগ ঘটে নাই।

নিরহঙ্কার বসির যদিও দশ জনের এক জন বলিয়াই সকলের সঙ্গে সখ্য-সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিল, তবু গাঁয়ের সবাই তাহাকে পীর-পয়গম্বরের মত ভক্তি-শ্রদ্ধা করিত। জাতিধর্ম্মবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলেই এই ধর্ম্মপ্রাণ লোকটির কাছে পরামর্শের জন্য আসিত। এই সব উপলক্ষ করিয়াই বোধ হয়, সে "মোড়লের পো" পদবী অর্জ্জন করিয়া ফেলিয়াছিল।

গ্রামবাসী তাহার পিতৃদত্ত নাম ভুলিয়া গিয়াছিল। মোড়লের পো বলিলে ভিন গাঁয়ের লোকও তাহাকে চিনিত, ডান হাত কপালে ঠেকাইয়া উদ্দেশে সেলাম করিত।

গ্রামের কৃষক বৎসরের ছয়টি মাস চিরাগত রীতিতে অধ্য-ভাবে উদ্‌গ্রীবনেত্রে অগ্রহায়ণের পানে চাহিয়া আপনাদের ক্ষুদ্র সঞ্চয় নিঃশেষ করিত, যাহার সঞ্চয় নাই, সে দিন-মজুরের কাযে অসহ্য পরিশ্রম করিয়া কোন প্রকারে উদরান্নের সংস্থান করিত। অগ্রহায়ণের ফসল যদি মুখ তুলিয়া চাহিত, ক্ষুদ্র গ্রামখানি আবার কৃষকের হাস্যলাস্যে মুখর ও চঞ্চল হইয়া উঠিত। যখন অজন্মা পড়িত, দিকে দিকে হাহাকার উঠিত। সময় বুঝিয়া কলেরা-বসন্ত গ্রাম ছাইয়া ফেলিত। দেখিতে দেখিতে গ্রাম উজাড় হইয়া যাইত। দুই দিন পরে আপনা হইতেই সব চুপ-চাপ। অভ্যস্ত গ্রামবাসীরা চোখের জল মুছিতে মুছিতে আবার আপনাপন উদরান্নের জন্য দৈনন্দিন কর্ম্মে অবহিত হইত।

সংবাদপত্রের শিক্ষায় বসির এ চিরাগত রীতির বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। সে গ্রামবাসীদিগকে একত্র জড় করিয়া অভ্যস্ত অলসতার ছয়টি মাসের সদ্ব্যবহার করিতে পরামর্শ দিল। বসিরের উৎসাহে গাঁয়ে চরকা আসিল, তাঁত বসিল। কেহ কেহ বাঁশ-বেত লইয়া ঝুড়ি, চুপড়ি, চাটাই প্রস্তুত করিতে লাগিয়া গেল। কেহ বা আবার ক্ষেতের পাট লইয়া দড়ি পাকাইয়া পল্লীর নিত্য-প্রয়োজনীয় নানা দ্রব্যজাত নির্ম্মাণ করিতে লাগিল।

গ্রামের বুদ্ধিমান্ যাহারা, তাহারা নূতন আয়ের পন্থা দেখিয়া নূতন নূতন কাযে হাত দিল। সংস্কারাচ্ছন্ন যাহারা, তাহারা বসিরের পরামর্শ পীর বা দেবতার আদেশ মনে করিয়া লাভ-ক্ষতির হিসাব না করিয়াই কর্ম্মে মাতিল। অনতিবিলম্বে গ্রামের শ্রী ফিরিল। ন'পাড়ার সুখসমৃদ্ধি আশে-পাশের অনেক গ্রামে ঈর্ষার সঞ্চার করিল।

দ্বিতীয়

বিধাতার বিধান কি না বলা যায় না, কিন্তু সে বৎসর ন'পাড়া গ্রামে অকস্মাৎ অজন্মার রোষদৃষ্টি পতিত হইল। হতাশ কৃষক আশাভঙ্গে বড় মুষড়িয়া পড়িল। ক্রমে অন্নাভাব, অনশনের করাল ভ্রূকুটী গ্রামবাসীদিগকে শঙ্কিত, অধীর করিয়া তুলিল। বসির গ্রামবাসীর দুর্দ্দশায় অতিমাত্রায় বিচলিত হইয়া নিজের গোলাঘরের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিল। হিতৈষী আত্মীয় অনাত্মীয় যাহাদের তখনও বস্ত্র ও অন্নাভাব ঘটে নাই, তাহারা সবাই বসিরকে এ বিষয়ে নিরস্ত করিতে গেল। বসির শুনিল না। ঊর্দ্ধে চাহিয়া উদ্দেশে খোদাতাল্লার কৃপা ভিক্ষা করিয়া, দ্বিগুণ উৎসাহে বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া সে অভাবগ্রস্তদিগকে সান্ত্বনা দিল। নূতন নূতন উপার্জ্জনের অভিনব পন্থা সে ভীত-সন্ত্রস্ত গ্রামবাসীদিগকে দেখাইয়া দিল।

বিপদ তবু কাটিল না। ভাগ্যবিধাতা বাঁকিয়া বসিলেন। অগ্রহায়ণের ফসল আগেই নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। সহসা অকাল-বন্যায় বৈশাখের ফসল ফাঁকি দিল। আগামী অগ্রহায়ণেরও আশা রহিল না। ভীষণ দুর্ভিক্ষ বিকট করাল মুখব্যাদান করিয়া অসহায় গ্রামবাসীকে গ্রাস করিতে ধাইয়া আসিল।

ন'পাড়ার শান্ত মধুর শ্রী বিলুপ্ত হইয়া গেল। অন্নহীনের কাতর আর্ত্তনাদ আকাশ ও বাতাসকে ব্যথিত করিয়া তুলিল। হতভাগ্য নরনারী ক্ষুধার তাড়নায় দলবদ্ধ হইয়া পথে পথে গ্রামে গ্রামে ভিক্ষাপাত্র লইয়া উন্মত্তের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। বসির—নিঃস্ব বসির প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াও অদৃষ্টের গতি ফিরাইতে পারিল না।

বসির জমীদার সরকারে সাহায্য চাহিয়া আবেদন করিল। সাহায্য আসিল না। বরং জমীদার বিগত সনের অনাদায়ী খাজনা সত্বর আদায় করিবার জন্য কড়া চিঠি লিখিলেন।

অনন্যোপায় বসির সংবাদপত্রে দুর্ভিক্ষের তাণ্ডব-লীলা বিবৃত করিয়া সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিল। প্রবন্ধের একখানি নকল জেলার কালেক্টর সাহেবের দরবারে প্রেরণ করিল। ভগবান্ অবশেষে বুঝি মুখ তুলিয়া চাহিলেন। কালেক্টর সাহেব সে এলাকা পরিদর্শন করিতে আসিলেন।

সে দিন দ্বিপ্রহর অতীতপ্রায়। সারা দিনের অভুক্ত অস্নাত বসির কয়েকটি যুবকের সহায়তায় গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া সাপ্তাহিক মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া ক্লান্তদেহে দীর্ণ-বক্ষে স্বগৃহে প্রবেশ করিয়াই শুনিল—কালেক্টর গ্রামে আসিয়াছেন। বসিরের ক্লান্তি টুটিল। সে চাদরখানি গায়ে জড়াইয়া ঘর ছাড়িয়া বাহির হইল।

বসিরের মা বলিল, "কোথা যাস, বাবা? দুপুর ব'য়ে গেল, এক ফোঁটা জলও ত পেটে দিলি নে—গতর টেকবে কি ক'রে?"

বসির হাসিয়া বলিল, "পেট ত খালি নেই, মা। আমার এখনও যে দু'বেলা দু'মুঠো চলছে। আর গতর!—এ গতর লোহার মা! রক্ত-মাংসের গন্ধও এতে নেই! আর না-ই বা যদি টে'কে, তাতে আপশোষ করবার কি আছে? এ গাঁয়ে যে মা হাজার মায়ের হাজার ছেলে চ'লে গেছে! আরও হাজারের পেটে অন্ন নেই। যদি তাদের মুখে ভাত দিতে পারি ত ঘরে ফিরে নিজেও খাব—নইলে—"

বসির চলিয়া গেল। কালেক্টর বসিরের সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম পরিদর্শন করিয়া লোকের দুর্দ্দশায় বিচলিত হইলেন।

গ্রামবাসী সরকারী সাহায্যে কোন প্রকারে প্রাণরক্ষা করিয়া ভবিষ্যতের আশায় ক্ষেতের কাযে ব্যাপৃত হইল।

এমনই দুর্দ্দিনে জমীদারের নায়েব অনাদায়ী খাজনা উশুল-তহশীলের জন্য গ্রামে শুভাগমন করিলেন। বসির

গ্রামবাসীর পক্ষ হইতে নায়েব মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া লোকের দুর্দ্দশার করুণ ইতিহাস বিবৃত করিল; এ বৎসরের মত খাজনার দায় হইতে রেহাই দিবার জন্য সাগ্রহ অনুনয় করিল।

নায়েব মহাশয় এ অঞ্চলে নূতন লোক। বসিরের করুণ আবেদন তিনি অগ্রাহ্য করিলেন। নায়েবের পাইক কাহারও সর্ব্বস্ব হাল-গরু বাজেয়াপ্ত করিয়া অল্পমূল্যে ভিন্ন গ্রামের হাটে বিক্রয় করিল। কাহারও কুটীরে প্রবেশ করিয়া থালা, ঘটি, সান্‌কি ছিনাইয়া লইল, পুরুষদের মারধর করিল। সকল ক্ষেত্রে অন্তঃপুরের মান-সম্ভ্রমও বজায় রহিল না। এ অকাল-ধূমকেতুর অত্যাচারে গ্রামবাসী ক্ষেপিয়া উঠিল। বসির পুনরায় নায়েব মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া অপমানিত হইয়া ফিরিয়া আসিল।

মুহূর্ত্তে এ সংবাদ গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। গ্রামের যুবক বৃদ্ধ বিপুল আক্রোশে লাঠি-সোটা লইয়া কাছারী আক্রমণ করিল। বসির প্রাণপণ চেষ্টায় উত্তেজিত গ্রামবাসীকে শান্ত করিতে পারিল না। উন্মত্ত জনতার সমবেত চীৎকারে তাহার ক্ষীণ ভাষা ডুবিয়া গেল। অনন্যোপায় হইয়া বসির এক তীক্ষ্ণধার ছোরা হাতে লইয়া গর্জ্জিয়া বলিল, "ভাই সব, তোমরা কেউ যদি নায়েবের উপর অত্যাচার কর, আমি এখনই তোমাদের চোখের সামনে এই ছোরা আমার বুকে বসিয়ে দেবো।"

মুহূর্ত্তে মত্ত ঝটিকা শান্ত হইল। একসঙ্গে সহস্র উদ্যত যষ্টি ভূমিতলে নামিয়া আসিল।

এক জন অগ্রসর হইয়া বলিল, "কিন্তু মোড়লের পো, এই হাড়হাবাতের বেটা যে তোমায় বেইজ্জত করেছে! না—না মোড়লের পো, তুমি যা বল না কেন, আমরা এর কৈফিয়ৎ চাই!

বসির হাসিয়া বলিল,—"রাগ কচ্ছ কেন ভাই? নায়েব মশায়ের কোন দোষ নেই। তিনি জমীদারের চাকর! নিমক-হালাল ভৃত্যের মত মনিবের আদেশ জারী করতে এসেছেন। যা হুকুম পেয়েছেন, তাই ত উনি করবেন। ওঁর কি দোষ? আর বেইজ্জৎ! বেইজ্জৎ কাকে বলছ ভাই? আমরা চিরকাল জমীদারের খেয়ে মানুষ। জমীদার বাপের মত। বাপ যদি কুকথা বলেন, ছেলের কি তাতে রাগ করতে আছে, ভাই? আমরা খাজনা দিই জমীদারকে। জমীদার খাজনা দেন সরকার বাহাদুরকে। তাই, আমরা যদি খাজনা বন্ধ করি, জমীদারের উপায় কি হয়, বল দেখি?"

"কিন্তু আমরা দিতে পারি কি না, জমীদার সে খোঁজ করেছিল? তুমি যখন ভিক্ষে চেয়েছিলে, মোড়লের পো, মনে পড়ে কি জমীদার তোমায় কি নিষ্ঠুর জবাব দিয়েছিল? না মোড়লের পো, আমরা আজ এই বাঁদীর বাচ্ছাকে ছাড়ছিনে—যদি সে তোমার কাছে ক্ষমা না চায়, আর আজই গ্রাম ছেড়ে না যায়।"

বসির বলিল, "কুকথা ব'লে মুখ খারাপ কচ্ছ কেন, ভাই? খোদাতাল্লা মুখে ভাষা দিয়েছেন ব'লে তার অপব্যবহার করো না। নায়েব জমীদারের প্রতিভূ। আজ যদি এঁকে অপমানিত কর, এতে যে জমীদারেরই অপমান করা হবে। আজ যদি তোমরা এঁর গায়ে হাত তোলো, সে আঘাত যে জমীদারের বুকে বাজবে। আজ ইনি যদি প্রাণভয়ে আমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেন,—উনি হয় ত তা পারেন। কিন্তু উনি ত পরের চাকর। যে দিন থেকে অপরের দাসত্ব স্বীকার করেছেন, সে দিন হতেই ত উনি ব্যক্তিত্ব হারিয়েছেন। তাই, এ মার্জ্জনা যে ভাই প্রকারান্তরে জমীদারের কাছ থেকেই উশুল ক'রে নেওয়া হবে। আমি ত তা পারিনে। আমার কাছে যে জমীদার দেবতা—পয়গম্বর—তার কল্পনাই যে 'গোণা' হয়।"

"তবে আমাদের কি করতে বল?"

"তোমরা যদি আমায় ভালবাস, তোমরা যদি আমায় একটুকুও স্নেহ কর, এই মুহূর্ত্তে তোমরা ঘরে ফিরে যাও—আর কথাটি কয়ো না।"

সমবেত জনমণ্ডলী কিয়ৎক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। তার পর ধীরে ধীরে কাছারী-বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব গৃহের অভিমুখে প্রস্থান করিল।

তৃতীয়

অকৃতজ্ঞ নায়েব সদরে ফিরিয়া গিয়া সব কথা অতিরঞ্জিত করিয়া প্রভুপদে নিবেদন করিল। বসির যদিও তাহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল, তবু সে সহস্র গ্রামবাসীর সমক্ষে তাহার উদ্দেশে তাচ্ছীল্যের ভাষা প্রয়োগ করিয়াছে, তাহাতে তাহার মনে বসিরের প্রতি একটা সুতীব্র আক্রোশ জাগ্রত

হইয়া রহিয়াছিল। জমীদার শুনিলেন, বসিরের প্ররোচনায় সামর্থ্য থাকিতেও কেহ খাজনা দিতে চাহে না। নায়েব বসিরকে শাসাইয়াছিল, তাই বসির গ্রামবাসীদিগকে একত্র দলবদ্ধ করিয়া তাহার প্রাণ-নাশের চেষ্টা করিয়াছিল। শুধু পরমায়ুর জোরে আর হুজুরের নাম-মাহাত্ম্যে সে এ যাত্রা রক্ষা পাইয়াছে।

জমীদার এ কাহিনী শুনিয়া বিষম ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি অবিলম্বে দুই শত বরকন্দাজ লইয়া ন'পাড়ার অভিমুখে স্বয়ং অভিযানে বাহির হইলেন।

সে দিন ন'পাড়ার হাট। গ্রামবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা হাটে চলিয়া গিয়াছিল। জমীদার এই সুযোগে বসিরের তলব দিলেন।

জমীদারের শুভাগমনে বসির কেমন যেন একটু বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। আজ হাটবারে এ সময় কাছারী হইতে আহ্বান আসার তাৎপর্য্যও সে বুঝিল। সে এক দিকে যেমন আশু বিপদের সম্ভাবনায় একটু চাঞ্চল্য বোধ করিতেছিল, অন্য দিকে গ্রামবাসীদিগের অনুপস্থিতিতে যেন একটু নিশ্চিন্তও হইল।

বসির চাদরখানি গায়ে জড়াইয়া খোদাতাল্লাহ্‌ বলিয়া বরকন্দাজের পশ্চাদনুসরণ করিয়া নির্ভীকভাবে কাছারী-বাড়ীতে প্রবেশ করিল। জমীদার নিতান্ত অস্থির-চিত্তে বসিরেরই অপেক্ষা করিতেছিলেন। বসির কক্ষে প্রবেশ করিয়া আভূমি প্রণত সেলাম করিয়া খোদাতাল্লার কাছে জমীদারের দীর্ঘজীবন কামনা করিল।

জমীদার কোন ভূমিকা না করিয়া তাচ্ছীল্যের স্বরে বলিলেন —"আপনিই ন'পাড়ার স্বনামধন্য মহাপুরুষ মোড়লের পো?"

জমীদারের এ উপহাসে বসির বুকে একটু ঘা খাইল। কিন্তু সে আজ তাঁহার কাছে এ ব্যবহারের অধিক কিছু প্রত্যাশা করে নাই। সে নির্ব্বিকারভাবে বলিল, "হুজুর, এ বান্দার নাম বসির। গাঁয়ের লোক আমায় মোড়লের পো ব'লে ডাকে। আমরা তিন পুরুষ হুজুরের রাজ্যে এ গাঁয় আছি।"

"নিমকহারাম! তাই আজ তার শোধ দিচ্ছ! তুমি না কি ন'পাড়ার সবাইকে খাজনা দিতে বারণ কচ্ছ?"

"হুজুর যা শুনেছেন, তা সত্যি নয়। আমি কাউকে নিষেধ করিনি। সাধ্য থাকলে ত তারা দেবে? তিন তিনটে ফসল নষ্ট হয়ে গেল, এক মুঠো ধান কারও গোলায় নেই। সরকার বাহাদুরের সাহায্যে কোন প্রকারে তারা দুমুঠো খেয়ে আছে। আমি খাজনা দিতে বারণ করিনি। এ অজন্মার দিনে হুজুরের দরবারে খাজনা রেহাই চেয়ে আরজি করেছিলুম।"

"সে এক কথাই ত হ'ল। এরই নামই ত প্রকারান্তরে বারণ করা। রোসো, তোমায় মজা দেখাচ্ছি। বজ্জাত—নিমকহারাম!"

এ কুৎসিত ভাষাও বসির নিরাপত্তিতে হজম করিল। তার পর ধীরে ধীরে বলিল, "হুজুর! আমি নিমকহারাম নই। এ গাঁয়ে কেউ নিমকহারাম নয়। জমীদারকে আমরা পীর-পয়গম্বরের অবতার ব'লে মনে করি। অনেক দুঃখে প'ড়ে হুজুরের দরবারে আরজি পেশ করি। আমাদের দুরদৃষ্ট! বোধ হয়, এখনও আমরা বিধাতার অভিশাপ কাটিয়ে উঠতে পারি নি। আজ আপনি এসেছেন। প্রজারা আপনার সন্তান। পিতা হয়ে পিতার দরদ নিয়ে একবার সকলের চূড়ান্ত দুর্দ্দশা প্রত্যক্ষ করুন। সন্তানের মুখে অন্ন দিন, বুকে ভরসা জাগিয়ে তুলুন। দেখবেন—হাজার শির ভক্তি-শ্রদ্ধায় আপনার পায়ে লুটিয়ে পড়বে। সহস্র কণ্ঠ প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায়, পর্ব্ব-উৎসবে ভগবানের কাছে আপনার অতুল শ্রীবৃদ্ধি—অনন্ত জীবন যেচে নেবে। আমরা নিঃস্ব—নিতান্ত নিঃস্ব, কিন্তু আমরা নিমকহারাম নই!"

জমীদার ধমক দিয়া বলিলেন, "থাম্‌ পাজি! বেটা বক্তৃতার ঝুড়ি খুলে দিয়েছে। বলি নিমকহারামের দল! আমার প্রতি দরদ দেখাতে গেছিলে ত আমার নায়েবের প্রাণনাশের চেষ্টা ক'রে! পাপিষ্ঠ! তুই-ই নাকি সে দলের সর্দ্দার!"

বসিরের মুখ রক্তজবার মত লাল হইয়া উঠিল। সে এবারও কোনক্রমে আত্মসংবরণ করিয়া ধীরকণ্ঠে বলিল, "হুজুর মিথ্যা কথা শুনেছেন।"

মিথ্যা কথা? জমীদার গর্জ্জিয়া উঠিলেন। কঠোর কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "রহিম সর্দ্দার! বেটাকে হাটের মাঝখানে ধ'রে নিয়ে গিয়ে পঞ্চাশ জুতো লাগা! একশো বরকন্দাজ সঙ্গে নিয়ে যা'—পাজি! নচ্ছার!"

বসির বলিল, "হুজুর, প্রকৃতিস্থ হোন! এ অসমসাহস করবেন না। শেষে আপশোস করবার অবকাশ থাকবে না।"

"কি ! আমাকে চোখরাঙ্গান ! আমি প্রকৃতিস্থ নই ?" জমীদার বিষম ক্রোধে জ্ঞানহারার ন্যায় সম্মুখের রুল তুলিয়া বসিরের মাথা লক্ষ্য করিয়া সজোরে নিক্ষেপ করিলেন। বসিরের মাথা ফাটিয়া গেল। দরদর ধারে তপ্ত রক্ত-স্রোত হু হু করিয়া ছুটিল। বসির উত্তরীয়ে ক্ষতস্থান চাপিয়া ধরিয়া অবিকৃত-কণ্ঠে বলিল, "হুজুর ! আপনি নিরর্থক ক্রোধ করেছেন। আমার মনে হচ্ছে, আপনি আমাদের কথা যা শুনেছেন, তা সর্ব্বৈব মিথ্যা। এক দিক শুনেছেন, আমাদের বক্তব্য শুনুন, তার পর যদি মনে করেন, আমরা অন্যায় করেছি, আমাদের কঠোরভাবে যেমন ইচ্ছে শাস্তি দিন, কেউ কিছু বলবে না। আবার বলছি হুজুর—"

বসিরের উত্তরীয় রক্তে লাল হইয়া উঠিল। জমীদার কেমন যেন একটু বিচলিত হইয়া পড়িলেন।

বসির ভাঙ্গা গলায় বলিল, "হুজুর ! একটু জল ! বড্ড তেষ্টা পেয়েছে !"

জমীদারের ইঙ্গিতে ভৃত্য জল লইয়া আসিল। বসির ঢক্ ঢক্ করিয়া এক ঘটী জল নিঃশেষে পান করিয়া দেওয়াল ঘেঁষিয়া মাথা এলাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, "হুজুর ! আমি বড্ড শ্রান্ত হয়ে পড়েছি। আজকের মত আমায় একটু স্থান ভিক্ষা দিন। আর—একটা লোক পাঠিয়ে আমার বাড়ীতে খবর দিন, একটা বিশেষ কাযে হুজুরের আদেশে আমি সদরে গেছি। আসতে দিন দুই দেরী হ'তে পারে। না, হুজুর ! একটু কাগজ-কলম দিতে হুকুম করুন—আমি নিজে লিখে দি, নইলে হয় ত তারা বিশ্বেস করতে পারবে না।"

বসির বেঞ্চের উপর শুইয়া পড়িয়া বলিল, "হুজুর আমি আপনার নগণ্য প্রজা। কিন্তু আজ যদি আমি এই রক্তাক্ত-দেহে রাস্তায় দাঁড়াই, হাজার জোয়ান মৃত্যু পণ ক'রে এক সাথে হুজুরের কাছারী-বাড়ীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। আমি মার খেয়েছি—হুজুরের হাতে মার খেয়েছি, এ আমার 'নসিব'। আমার কোন দুঃখ নেই—ক্ষোভ নেই ! কিন্তু মূর্খ সরল গ্রামবাসী ! তারা যে এ অভাগাকে বড় ভালবাসে। বোধ হয় একটু—"

বসির শেষ করিতে পারিল না। তন্দ্রাচ্ছন্নের মত চক্ষু মুদিল।

সহসা মার্ মার্ শব্দে চারিদিক বিকম্পিত হইয়া উঠিল। হাটে কে সংবাদ রটাইয়া দিয়াছিল যে, জমীদারের পাইক মোড়লের পোকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। অমনই হাট ভাঙ্গিয়া গেল। যে যাহা হাতে পাইল—কোদালি, কুড়ুল, লাঠি, বাঁকারি, কাটারী—যাহা কিছু একটা হাতে লইয়া প্রায় দুই হাজার লোক কাছারি-বাড়ী আক্রমণ করিল।

সর্দ্দারের হুকুমে বরকন্দাজের দল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আক্রমণ প্রতিহত করিতে লাগিল। তুমুল সংগ্রাম বাধিল। জমীদারের দুই শত বরকন্দাজ যুঝিতে যুঝিতে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল। আহতের করুণ আর্ত্তনাদে দিগ্‌দিগন্ত প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। জমীদার বিপুল আতঙ্কে বন্দুকে গুলী-বারুদ বোঝাই করিয়া দুরু দুরু বক্ষে জানালায় দাঁড়াইয়া সেই তুমুল বিপ্লব লক্ষ্য করিতে লাগিলেন।

মাথার আঘাতে বসির অবসন্নের ন্যায় নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। সহসা গুড়ুম শব্দে বন্দুকের আওয়াজ হইতেই সে চমকিয়া উঠিয়া বসিল। তার পর নিতান্ত উদ্বিগ্ন স্বরে বলিল, "হুজুর, যা ভেবেছিলুম, তাই ! দেখি—দেখুন হুজুর—নিমকহারাম আজ কি ক'রে 'জান্' দেয়—"

পাশে সেরেস্তায় কাহার একখানা চাদর পড়িয়া ছিল, বসির তাহা দিয়া মাথায় কসিয়া পাগ্‌ড়ী বাঁধিয়া একগাছা লাঠি তুলিয়া লইয়া উন্মত্তের ন্যায় সদর-দ্বারে ছুটিয়া গেল।

বসির লাঠি তুলিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "ওমর, ওসমান্, মহেশ, কানাই, ভাই সব, লাঠি নামাও !"

সঙ্গে সঙ্গে উন্মত্ত জনতা যেন কোন অজানা মায়ামন্ত্রের অমোঘ প্রভাবে একসঙ্গে সহস্র উদ্যত যষ্টি ভূমিতলে ন্যস্ত করিল। বরকন্দাজের দল নিতান্ত বিস্ময়ে পশ্চাতে ফিরিয়া বসিরকে সম্মুখে দেখিয়া হতবুদ্ধির ন্যায় জনতার দেখাদেখি অপূর্ব্ব ভক্তিভরে হাত তুলিয়া সেলাম করিল।

এ দিকে এক লোমহর্ষণ কাণ্ড ঘটিল। বসির সদর দ্বারের গোলমাল থামাইয়া পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিল, আততায়ীর অপর এক দল পশ্চাতের দ্বার দিয়া আঙ্গিনায় প্রবেশ করিয়াছে, আর জমীদার মরিয়া হইয়া গুলীর পর গুলী ছুড়িতেছেন।

জমীদারের গোলাগুলী ফুরাইল। উন্মত্ত জনতা দ্বার ভাঙ্গিয়া কাছারী-কক্ষে প্রবেশ করিল। বসির আর স্থির থাকিতে পারিল না। সে উন্মত্তের ন্যায় ছুটিল। কয়েক জন বরকন্দাজও তাহার অনুসরণ করিল।

দ্বারপ্রান্তে সবাইকে শান্ত করিয়া বসির কক্ষে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার চক্ষুস্থির হইয়া গেল! জমীদার রক্তাক্ত-দেহে আততায়ীদের সহিত হাতাহাতি করিতেছিলেন। কে এক জন জমীদারের বক্ষোদেশ লক্ষ্য করিয়া সুদীর্ঘ ছোরা তুলিল। উদ্যত শাণিত ছোরা কক্ষের স্তিমিতালোকে ঝিক্‌মিক্ করিয়া উঠিল।

ঐ গেল যাঃ, সব শেষ! সকলে চাহিয়া দেখিল, জমীদার অক্ষত। নিমকহারাম বসির আততায়ীর সুতীক্ষ্ণ ছোরা নিজ বক্ষে লইয়া হো হো করিয়া অট্টহাসি হাসিয়া উঠিল।

জমীদার এক লম্ফে অগ্রসর হইয়া বসিরকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "মোড়লের পো! মোড়লের পো! এ কি করলে, ভাই?"

বসির হাসিল—বলিল, "হুজুর! আজ পর্য্যন্ত হুজুরের ন্যায্য প্রাপ্য থেকে হুজুরকে বঞ্চিত করবার চেষ্টা করিনি। যাবার বেলা নিমকহারাম বসির একটু নিমকহারামী ক'রে গেল—"

বসির এলাইয়া পড়িল। সুযোগ পাইয়া তাহার স্বভাব-মুক্ত প্রাণপাখী রক্তমাংসের পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া অনন্তশূন্যে উধাও হইয়া ছুটিয়া গেল!

শ্রীসত্যরঞ্জন চৌধুরী।

চুরির শাস্তি

বহু দিবস চোরকে নিরাশ ক'রে রেখেছিলাম একুশখানা গিনি,
পিপীলিকায় ফাঁকি দিয়ে যেমন কৌটা-মাঝে বন্ধ রাখে চিনি।

ছিল নাক মোটেই সতর্কতা
মনে ছিল হবেই নাক ক্ষতি;
কল্পনারি রাজ্যে যখন ঘুরি,
সন্ধানীরা সজাগ ছিল অতি।

বারেক যদি বঞ্চিত হয় কেহ
আসে নাক এ কথা নয় ঠিক;
ঘুরে ফিরে আসে বারম্বার,
খুঁজে পেতে দেখে চতুর্দ্দিক।

ছুটীর পরে একটা গুরুবারে
পাইনে খুঁজে কোথায় তারা আছে,
হয় ত গেল আবার অনাদরে
অচেনা কোন্ চেনা লোকের কাছে।

কিম্বা যত কৃপণ লোকের ধনে
চির-দিবস যাহার অধিকার,
গিনিগুলি জোর করিয়া ধ'রে
নিয়ে গেল নিজের কাছে তার

একে অর্থ অনর্থেরি মূল
তাহার উপর ঘৃণিত কাঞ্চন,
ভেঙে দিয়ে আমার মহাভুল
বেঁটে নিলে গোপনে পাঁচজন

ধর্ম্ম-ধন ত চর্ম্ম-ধনের মত
উড়ে গেল পেয়ে যুগল-পাখা,
সারা দিবস মনটা ভারী ভারী
সহজ জিনিষ নহিস রে তুই টাকা!

পায়রা সম একুশখানা গিনি
বাজি দিয়ে ব্যোমেই গেল মিশি,
ঊর্দ্ধে তাদের ডাক দিয়েছে বুঝি
এক সাথেতে সূর্য্য এবং শশী।

কি সন্ধানে কনক-তরীর বহর
ছুটলো আমার? ভাবলে তারা বুঝি
কোনো দিবস চাইনে আমি সোনা,
চির-দিবস পরশ-পাথর খুঁজি!

তারা আবার অনেক দিনের সাথী
যেথায় থাকে শুনেই তারা থাক্
জ্যোৎস্নাতে আসবে আমার ঘরে
নূতন কনক পারাবতের ঝাঁক।

চোরের চেয়ে শাস্তি চুরির বেশী
উপদেষ্টা হ'ল দেশের লোক,
কারও মুখে ফুটলো গোপন হাসি,
কেউ বা আমায় বল্লে আহাম্মক!

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

যশোবন্ত সিংহ ও যশোবন্ত রায়

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাজা যশোবন্ত বা যশোমন্ত সিংহ এবং মুন্সী বা দেওয়ান যশোবন্ত রায়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুই জনকে কেহ কেহ অভিন্ন প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন। প্রথমে স্বর্গীয় রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থে রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের 'শিবসঙ্কীর্ত্তন বা শিবায়ন' গ্রন্থের প্রসঙ্গে এই মত ব্যক্ত করেন। তাহার পর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' তাহাই বলিতেছেন। আমরা মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে দেখাইয়াছিলাম যে, এই দুই জন এক ব্যক্তি নহেন, স্বতন্ত্র ব্যক্তি হওয়াই সম্ভব। সম্প্রতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় 'সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায়' (সপ্তত্রিংশ ভাগ তৃতীয় সংখ্যা ১৩৩৭ 'চিরঞ্জীব শর্ম্মা' প্রবন্ধে) উভয়ের অভিন্নতা সম্বন্ধে মত প্রকাশ করায় আমরা সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিবার চেষ্টা করিতেছি।

রাজা যশোবন্ত বা যশোমন্ত সিংহ মেদিনীপুর কর্ণগড়ের রাজা ছিলেন। বহু পুরুষ হইতেই তাঁহারা কর্ণগড়ে রাজত্ব করিতেছিলেন। আমরা মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে কর্ণগড়-রাজবংশীয়দের যে পরিচয় দিয়াছিলাম, এ স্থলে তাহার উল্লেখ করিতেছি—"কর্ণগড়ের রাজবংশীয়রা জাতিতে সদেগাপ। ইঁহাদের আদিপুরুষ লক্ষ্মণসিংহ মেদিনীপুরের তদানীন্তন মাজি রাজা সুরতসিংহের সেনাপতি হইয়াছিলেন। তিনি উড়িষ্যার কেশরিবংশীয় কোন রাজার সাহায্যে সুরতসিংহের হস্ত হইতে মেদিনীপুরের অধিকার বিচ্ছিন্ন করিয়া লন ও কর্ণগড়ে আপনার রাজধানী স্থাপন করেন। লক্ষ্মণসিংহের পর রাজা শ্যামসিংহ ও ছত্রসিংহের উল্লেখ দেখা যায়। ছত্রসিংহের পর রঘুনাথসিংহ কর্ণগড়ের রাজা হইয়াছিলেন। এই রঘুনাথই রামসিংহের পিতা। রাজা রামসিংহের পুত্র রাজা যশোমন্ত সিংহই কবির (শিবায়ন-প্রণেতা রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের) প্রতিপালক এবং তৎপুত্র অজিতসিংহকেও কবির আশীর্ব্বাদভাজন বলিয়া দেখা যায়। অজিতসিংহের রাণী ভবানী ও রাণী শিরোমণি নামে দুই পত্নী ছিলেন। তাঁহারা নিঃসন্তান হওয়ায়, ক্রমে কর্ণগড়ের সম্পত্তি তাঁহাদের আত্মীয় নাড়াজোলের খাঁ-বংশীয়দের হস্তগত হয়। অদ্যাপি নাড়াজোল-বংশীয়রা তাহা ভোগ করিতেছেন।" 'শিবায়নে'ও কবি রামেশ্বর তাঁহাদের এইরূপ পরিচয় দিতেছেন,—

"মহারাজ রঘুবীর রঘুনাথ সম ধীর
ধার্ম্মিক রসিক রসময়।
যাঁহার পুণ্যের বলে অবতীর্ণ মহীতলে
রাজা রামসিংহ মহাশয়॥
তস্য পুত্র যশমন্ত সিংহ সর্ব্ব গুণবন্ত
শ্রীযুত অজিত সিংহতাত।
মেদিনীপুরাধিপতি কর্ণগড়ে স্থবসতি
ভগবতী যাহার সাক্ষাৎ॥
* * * * *
তস্য পোষ্য রামেশ্বর তদাশ্রয়ে করে ঘর
বিরচিল শিব-সঙ্কীর্ত্তন॥"

কবি রামেশ্বরের পূর্ব্বনিবাস ছিল মেদিনীপুরের অন্তর্গত বর্দ্দা পরগণার যদুপুর গ্রামে। এই বর্দ্দা পরগণা সভাসিংহের জমীদারী ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এই সভাসিংহ ও উড়িষ্যার পাঠান সর্দ্দার রহিম খাঁ পশ্চিম-বঙ্গে বিদ্রোহের পতাকা উড়াইয়া সকলকে সন্ত্রাসিত করিয়া তুলিয়াছিল। সভাসিংহের ভ্রাতা হেম্মতসিংহের অত্যাচারে রামেশ্বর যদুপুর পরিত্যাগ করিয়া কর্ণগড়ের রাজা রামসিংহের আশ্রয়ে আসিয়া অযোধ্যাবাড় নামক গ্রামে বাস করেন।

"যদুপুরে পূর্ব্ববাস হেমতসিংহ পরকাশ
রাজা রামসিংহ কৈল স্থিত।"

ইত্যাদি কবির কথায় তাহা বুঝা যাইতেছে। আর যশোমন্ত সিংহের সভায় তিনি যে শিবসঙ্কীর্ত্তন রচনা করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। আমরা শিবসঙ্কীর্ত্তনের যে গ্রন্থ দেখিয়াছি, তাহাতে 'যশমন্ত সিংহই' লিখিত আছে। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের গ্রন্থে যশোবন্ত সিংহ দেখা যায়।

এক্ষণে যশোবন্ত রায় সম্বন্ধে ঐতিহাসিকেরা যাহা বলিয়াছেন, আমরা তাহার উল্লেখ করিতেছি। ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, যশোবন্ত রায় মুর্শিদাবাদের প্রতিষ্ঠাতা নবাব মুর্শিদকুলী জাফর খাঁর মুন্সী ও তাঁহার দৌহিত্র সরফরাজ খাঁর ওস্তাদ বা শিক্ষক ছিলেন। পরে মুর্শিদকুলী খাঁর জামাতা নবাব সুজাউদ্দীনের সময় ঢাকার দেওয়ান নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রথমে আমরা 'রিয়াজস সালাতীন' হইতে তাঁহার কথা উদ্ধৃত করিতেছি। "নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ (নবাব সুজাউদ্দীনের জামাতা দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী) উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত হইলে সরফরাজ খাঁ

নবাব সুজাউদ্দীনের পুত্র) জাহাঙ্গীর নগরের (ঢাকা) কার্যভার প্রাপ্ত হন; কিন্তু তিনি ইরাণ (পারস্য) রাজবংশোদ্ভব গালেব আলী খাঁকে তথায় স্বীয় নায়েবরূপে প্রেরণ করেন। নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর (মুর্শিদাবাদের প্রতিষ্ঠাতা) মুন্সী ও সরফরাজ খাঁর শিক্ষক যশোবন্ত রায় দেওয়ান ও মন্ত্রীর পদে বৃত হইয়া গালেব খাঁর সহযোগী নিযুক্ত হন। ভগিনী নকিসা বেগমের সন্তোষবিধান জন্য সৈয়দ রজি খাঁর পুত্র মুরাদ আলী খাঁকে নাওয়ারা বিভাগের কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়। রাজস্ব ও শাসন বিভাগ, খালসা ও জায়গীর মহাল, নৌ-বিভাগ, তোপখানা, খাসনবিসি ও সহর অমিনার কার্য্যের ভার রায়ের উপর ন্যস্ত ছিল। মুন্সী যশোবন্ত রায় নবাব জাফর খাঁর (মুর্শিদাবাদের প্রতিষ্ঠাতা মুর্শিদকুলী খাঁ) নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি আপন অভিজ্ঞতা ও সাধুতাবলে এবং প্রত্যেক কার্য্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিদর্শন করিয়া যাহাতে সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধিলাভ করে এবং প্রজাগণ সুখস্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারে, তদনুরূপ কার্য্য করিলেন। তৎপর তিনি সওদার খাস তুলিয়া দেন এবং (জামাতা) মুর্শিদের সময় মির হবির অর্থ-শোষণ জন্য যে সকল প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তাহা রহিত করেন। তিনি শস্যাদি সুলভ মূল্যে বিক্রয়ের জন্য বন্দোবস্ত করিয়া দুর্গের পশ্চিম দ্বার উদ্ঘাটন করেন। নবাব শায়েস্তা খাঁ এই দ্বার রুদ্ধ করিয়া তাহার প্রস্তর-ফলকে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন যে, যাহার শাসনকালে তাঁহার সময়ের মত দামরীতে এক সের শস্য বিক্রীত হইবে, তিনিই উহা উদ্ঘাটন করিয়া দিবেন। তদবধি কোন শাসনকর্ত্তা পশ্চিম দ্বার উদ্ঘাটন করিতে পারেন নাই। তিনি দানশীলতা, ন্যায়বিচার ও অপক্ষপাত অবলম্বন করিয়া জাহাঙ্গীর নগরকে স্বর্গ-উদ্যানে পরিণত করেন। ইহাতে সরফরাজ খাঁও সর্ব্বসাধারণের নিকট যশস্বী হইয়া উঠেন।

নকিসা বেগমের অনুরোধে গালেব আলী খাঁর পরিবর্ত্তে সরফরাজ খাঁর জামাতা মুরাদ আলী খাঁ জাহাঙ্গীর নগরের শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত হইলেন। মুরাদ আলী খাঁ নৌ-বিভাগের মুন্সী রাজবল্লভকে পেশকারী প্রদান করিলেন। তাঁহার শাসন-কালে উৎপীড়ন আরম্ভ হইল। এজন্য যশস্বী মুন্সী যশোবন্ত রায় দুর্নামগ্রস্ত হইবার ভয়ে দেওয়ানী পরিত্যাগ করিলেন। অত্যাচারী শাসনকর্ত্তার হস্তে পতিত হইয়া দেশ শ্রীভ্রষ্ট হইতে লাগিল।"

—(রামপ্রাণ গুপ্তের অনুবাদ)

সরফরাজ খাঁ নবাব হইলে মুন্সী যশোবন্তকে রায়রায়ান বা রাজস্ব-মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন বলিয়া সালাতীনে উল্লেখ দেখা যায়। ষ্টুয়ার্টও যশোবন্ত রায়কে সরফরাজ খাঁর শিক্ষক ও নবাব মুর্শিদকুলী জাফর খাঁর নিকট শিক্ষা-প্রাপ্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং ঢাকার দেওয়ানী পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার মুর্শিদাবাদে যাওয়ার কথাই বলিয়াছেন। তাই আমরা মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে লিখিয়াছিলাম,—

"এই যশোবন্ত রায়কে কেহ কেহ মেদিনীপুরস্থ কর্ণগড়ের রাজা যশোমন্ত সিংহ মনে করিয়া থাকেন। ৺রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় ইহার অবতারণা করেন ও পরে দেখিতেছি, শ্রীযুক্ত দীনেশ-চন্দ্র সেন প্রভৃতিও সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। কিন্তু যশোবন্ত রায় ও যশোমন্ত সিংহ এক ব্যক্তি কি না, তাহার বিশেষ কোন প্রমাণ নাই। একমাত্র প্রমাণ এই যে, উভয়ের নামের সামঞ্জস্য আছে ও উভয়ে সমসাময়িক, কিন্তু ইহাতে বিশেষ কোন সিদ্ধান্ত স্থাপিত হয় না। অপর দিকে তাঁহাদের বিভিন্নতা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে। কর্ণগড়াধিপতি রাজা যশো-মন্ত সিংহ বহুপুরুষ হইতে মেদিনীপুর প্রদেশের রাজা ছিলেন। যশোমন্তের পিতা রামসিংহ কর্তৃক স্থাপিত হইয়া কবিবর রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য শিবসঙ্কীর্ত্তন রচনা করেন। ১৬৩৪ শকে বা ১৭১২ খৃষ্টাব্দে রাজা যশোমন্ত সিংহের রাজসভায় তাঁহার গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। সুতরাং তৎকালে রাজা যশোমন্ত যে কর্ণগড়ে বিদ্যমান ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আবার সেই সময়ে আমরা দেখিতেছি যে, যশোবন্ত রায় নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর মুন্সীর কার্য্য ও সরফরাজ খাঁর ওস্তাদী বা শিক্ষকতা করিতেছেন। যশোমন্ত সিংহরা যেরূপ পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন, তাহাতে নবাবের মুন্সী-গিরি বা নবাব-দৌহিত্রের ওস্তাদী করিতে আসা কদাচ সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। কোন প্রদেশের সহকারী শাসন-কর্তৃত্ব প্রভৃতি প্রাপ্ত হইলে আমরা দুজনের অভেদে কথঞ্চিৎ বিশ্বাস করিতে পারিতাম। বিশেষতঃ দুই জনের উপাধির সম্পূর্ণরূপ ও নামেরও কিছু কিছু পার্থক্য আছে। ঢাকা পরিত্যাগের পর যশোবন্ত রায় মুর্শিদাবাদেই অবস্থিতি করিতেন। সরফরাজ খাঁর রাজত্বকালে তাঁহাকে একবার রায়রায়ানের পদ প্রদানের প্রস্তাব হইয়াছিল। ফলতঃ মেদিনীপুর-রাজ যশোমন্ত সিংহ যশোবন্ত রায় হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলিয়াই আমাদের ধারণা।"

অবশ্য যশোবন্ত সিংহ ও যশোবন্ত রায় উভয়েই সমসাময়িক বলিয়া মনে হয়। কিন্তু শিবায়ন হইতে যশোবন্ত সিংহের সময় কষ্টকল্পনা করিয়াই স্থির করিতে হয়। শিবসঙ্কীর্ত্তন শেষ হওয়ার সময় এইরূপ লিখিত আছে,—

"শাকে হল চন্দ্রকলা রাম করতলে।
বাম হইল বিধি কান্ত পড়িল অনলে।
সেই কালে শিবের সঙ্গীত হ'ল সারা।"

ইহাতে ১৬৩৪ শাক বা ১৭১২ খৃঃ অব্দ ধরিয়া লওয়া হয়। কিন্তু শ্লোক হইতে তাহাকে কষ্টকল্পনা করিয়াই স্থির করিতে হয়। তবে যশোবন্ত সিংহ যে খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে বিদ্যমান ছিলেন, অন্ত দিক হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়। কবিবর রামেশ্বর হেম্মত সিংহের অত্যাচারে যদুপুর পরিত্যাগ করিয়া রাজা রামসিংহের আশ্রয়ে আসিয়াছিলেন। হেম্মত সিংহ বিদ্রোহী সভাসিংহের ভ্রাতা। ১৬৯৫-৯৬ খৃঃ অব্দে সভাসিংহের বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। এই সময়ে রামেশ্বর রামসিংহের আশ্রয় লইলে ১৭১২ খৃঃ অব্দে যশোবন্তের সভায় শিবসঙ্কীর্ত্তন শেষ হওয়া সম্ভব হইতে পারে। আবার যশোবন্ত রায় নবাব মুর্শিদকুলী জাফর খাঁর মুন্সী ও তাঁহার দৌহিত্র সরফরাজ খাঁর ওস্তাদ হওয়ায় ১৭০৩ খৃঃ অব্দে মুর্শিদকুলী খাঁ কর্তৃক মুর্শিদাবাদের প্রতিষ্ঠার পর মুর্শিদাবাদে অবস্থিতি করিতেন। তাহার পর নবাব সুজা-উদ্দীনের সময় ১৭৩৫ খৃঃ অব্দে ঢাকায় দেওয়ান নিযুক্ত হন। সে কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তিনি মুর্শিদাবাদেই অবস্থিতি করেন এবং সরফরাজ খাঁর রাজত্বকালে ১৭৩৯-৪০ খৃঃ অব্দে তাঁহাকে রায়রায়ানের বা রাজস্ব-সচিবের পদ প্রদানের প্রস্তাব হয়, সুতরাং যশোবন্ত সিংহ ও যশোবন্ত রায় যে সমসাময়িক, তাহা বুঝা যাইতেছে। তাই বলিয়া ইঁহাদের অভিন্নতা প্রমাণ হয় না।

শাস্ত্রী মহাশয় চিরঞ্জীব শর্ম্মাকে যে যশোবন্ত সিংহের সভাপণ্ডিত বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন, তাঁহাকে কর্ণগড়ের রাজা বলিয়াই মনে হয়। শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাকে রাঢ় দেশের এক জন জমীদার বলিতেছেন। চিরঞ্জীব শর্ম্মা তাঁহার সম্বন্ধে বলিতেছেন,—

"কোদণ্ডধ্বনিখণ্ডিতারিপৃতনাসর্ব্বাতিগর্ব্ব প্রভো।
গৌড় শ্রীযশবন্ত সিংহ নিতরামাকর্ণয়াকর্ণয়।"

এই যশোবন্ত সিংহ যে এক জন সামান্য জমীদার নহেন, তাহা অবশ্য বুঝা যাইতেছে। কর্ণগড়ের যশোবন্তের এবং ইঁহার একই সময় হওয়ায় এবং উভয়েই রাঢ় দেশের রাজা হওয়ায় দুই জনকে একই ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়। বিশেষতঃ চিরঞ্জীব শর্ম্মার যশোবন্ত যেরূপ পরাক্রান্ত, কর্ণগড়ের যশোবন্তও যে সেইরূপ ছিলেন, তাঁহাদের বংশপরিচয় হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়। আর একটি কথা এই যে, চিরঞ্জীব শর্ম্মা তাঁহার যশোবন্ত সিংহকে 'গৌড়' যশবন্ত সিংহ বলিতেছেন, সুতরাং তখন গৌড়ে এক জন প্রসিদ্ধ যশোবন্তই ছিলেন বলিয়া মনে হয়। ইঁহাকে 'গৌড়' নামে অভিহিত করার কারণ বোধ হয়, সে সময়ের বিখ্যাত মাড়ওয়াররাজ যশোবন্ত সিংহ হইতে তাঁহাকে স্বতন্ত্র বলিয়া বুঝান হইয়াছে। যদিও মাড়ওয়ারের যশোবন্ত সিংহ ইহার কিছু পূর্ব্বে ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার স্মৃতি তখনও পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল। শাস্ত্রী মহাশয় চিরঞ্জীব শর্ম্মার যশোবন্ত সিংহকে যে মুন্সী যশোবন্ত রায় বলিতেছেন, তাহ সম্ভব নহে। চিরঞ্জীব শর্ম্মার বর্ণিত যশোবন্ত সিংহ কোদণ্ড পরিত্যাগ করিয়া মুর্শিদাবাদে আসিয়া যে লেখনী ধারণ করিয়া মুন্সীর কার্য্য করিয়াছিলেন, ইহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার কর্ণগড়ের রাজা হওয়াই সম্ভব।

শাস্ত্রী মহাশয় চিরঞ্জীব শর্ম্মার উল্লিখিত জয়সিংহকে রাজপুতনা-জয়পুরের সওয়াই রাজা জয়সিংহ বলিতেছেন। অবশ্য সে সময়ে বঙ্গদেশে জয়সিংহ নামে কোন প্রসিদ্ধ রাজার কথা জানা যায় না। আর চিরঞ্জীব শর্ম্মা তাঁহার যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি যে এক জন বিখ্যাত রাজা ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। চিরঞ্জীব শর্ম্মার সময়ে সওয়াই জয়সিংহ বিদ্যমান থাকায় তিনিই তাঁহার উল্লিখিত জয়সিংহ হইতে পারেন। ১৭১৪ খৃঃ অব্দে সওয়াই জয়সিংহের অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠানের কথা শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন। আবার ১৭২৮ খৃঃ অব্দে তাঁহার কর্তৃক জয়পুর নগর প্রতিষ্ঠার কথাও জানা যায়। কিন্তু তাঁহার সহিত চিরঞ্জীবের কিরূপে পরিচয় ঘটিল, তাহা অবশ্য বুঝা যায় না। বাদশাহ দরবারে সওয়াই জয়সিংহ আসিতেন এবং কোন কোন প্রদেশে তিনি রাজকার্য্যের জন্যও যাইতেন এবং কাশীতেও সময় সময় আসিতেন, কাশীর মানমন্দির তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। ইহাতে তাঁহার নাম প্রচারিত হইয়াও থাকিতে পারে।

চিরঞ্জীব শর্ম্মা বিজয়সিংহ নামে এক রাজার কথাও বলিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার সম্বন্ধে কিছু জানিতে পারেন নাই বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। চিরঞ্জীব শর্ম্মার উল্লিখিত জয়সিংহ যদি জয়পুরের সওয়াই জয়সিংহ হওয়া সম্ভব হয়, তাহা হইলে তাঁহার ভ্রাতা বিজয়সিংহ চিরঞ্জীব শর্ম্মার উল্লিখিত বিজয়সিংহও হইতে পারেন। বিজয়সিংহ বাদশাহ মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে উজীর কামারউদ্দীন খাঁকে হীরা-জহরতাদি উপঢৌকন দিয়া জ্যেষ্ঠ জয়সিংহকে অম্বরের রাজগদী হইতে অপসারিত করিয়া নিজে তাহা অধিকার করিবার জন্য সনন্দ বাহির করাইয়াছিলেন। কিন্তু জয়সিংহের কৌশলে তাহাতে কৃত কার্য্য না হইয়া নিজেই অবশেষে বন্দী হইতে বাধ্য হন। ইহার পর তাঁহার পরিণাম কি হইয়াছিল, তাহা জানা যায় না। কিন্তু অম্বরের জয়সিংহ ও বিজয়সিংহের সহিত বাঙ্গালার চিরঞ্জীব শর্ম্মার কিরূপে পরিচয় ঘটিয়াছিল, তাহা অবশ্য ভাবিবার বিষয় বটে।

শ্রীনিখিলনাথ রায়।

বাণ মারিয়া নরহত্যার চেষ্টা

(সত্য ঘটনা)

মিঃ জর্জ হার্টলি মালয়ের 'বুকিট্ লালাং' রবার-ক্ষেত্রের ম্যানেজার। তিনি দীর্ঘকাল এই পদে নিযুক্ত আছেন। হঠাৎ এক দিন এই আবাদের মালিকদের এক পত্র পাইয়া তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল! মালিক মহাশয়রা তাঁহাদের লণ্ডনের আফিসে বসিয়া তাঁহার যোগ্যতায় কটাক্ষপাত করিয়া জানাইয়াছিলেন—ঐ আবাদে যে পরিমাণ রবার উৎপন্ন হইতেছে, তাহাতে খরচা পোষাইতেছে না। সুতরাং ভবিষ্যতে লাভ হয়, এরূপ ব্যবস্থা করিতে না পারিলে—তাঁহাকে—ইত্যাদি। অর্থাৎ ইঙ্গিতে তাঁহাকে জ্ঞাপন করা হইয়াছিল যে, যদি ভবিষ্যতে তিনি লাভ দেখাইতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহার পরিবর্ত্তে কোন নূতন ম্যানেজার নিযুক্ত করা হইবে।

মিঃ হার্টলি মনে মনে বলিলেন, "অনেক দিন হইতেই এই রকম আশঙ্কা করিতেছিলাম। সকল ক্ষতির মূল—সর্দ্দার ওয়াংসোপাউইরো। কুলীদের শাসনে রাখিবে—সে শক্তি তাহার নাই। সে তাহাদের টাকাকড়ি ধার দেয়, তাহাদের নিকট খাদ্যসামগ্রী বিক্রয় করে; এজন্য তাহাদিগকে শাসন করিতে পারে না। কিন্তু আমি সর্দ্দারকে পীড়াপীড়ি করিলেই সে কুলীগুলাকে লইয়া সরিয়া পড়িবে; তখন আমার অবস্থা আরও সঙ্কটজনক হইবে। এখানে নূতন কুলী সংগ্রহ করাও সহজ নহে। এখন করি কি?"

তিনি তাঁহার কেরাণীকে ডাকিয়া বলিলেন,"মিঃ ডা ক্রুজ, সদর আফিসের এই পত্রখানা পড়িয়া দেখ। ইহার প্রতীকার করিতে না পারি, এরূপ নহে। যদি বুঝিতে পারিতাম, সর্দ্দারটাকে তাড়াইলে সে কুলীগুলাকে ভাঙ্গাইয়া লইয়া যাইতে পারিবে না, তাহা হইলে আমি আজই তাহাকে লাথি মারিয়া তাড়াইয়া দিতাম। তুমি কোনও উপায় স্থির করিতে পারিবে কি?"

ডা ক্রুজ সদর আফিসের পত্রখানি পাঠ করিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিল; তাহার পর বলিল, "আপনার আদেশ পাইলে আমি একটা উপায়ের কথা বলিতে পারি।"

ম্যানেজার বলিলেন, "বল।"

ডা ক্রুজ বলিল, "'আয়ার পচ' আবাদের পরিদর্শক মিঃ পিল্লাই আমার বন্ধু। তিনি আমাকে বলিতেছিলেন—তিনি সেখানে যে বেতন পাইতেছেন, তাহাতে তাঁহার পোষাইতেছে না। এই জন্য তিনি সেই চাকরী ছাড়িয়া দিতে উদ্যত হইয়াছেন। যদি আমরা তাঁহাকে কিছু অধিক বেতন দিয়া এখানে চাকরী দিই, তাহা হইলে তিনি কতকগুলি ভারতীয় কুলী সংগ্রহ করিয়া দিতে পারেন।"

ম্যানেজার বলিলেন, "লোকটা কাযের লোক ত?"

কেরাণী বলিল, "হাঁ, মিঃ পিল্লাই কার্য্যদক্ষ, পরিশ্রমী কর্ম্মচারী; বিশেষতঃ, বিবাহ করিয়া সংসারী হওয়ায় তাঁহার সহিষ্ণুতারও অভাব নাই। আপনার আদেশ পাইলে আমি তাঁহার প্রশংসাপত্রগুলি আপনার নিকট পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করিতে পারি।"

ম্যানেজার বলিলেন, "বেশ, তাহাতে আমার আপত্তি নাই; তবে আমাদের সর্দ্দারটাকে আরও একবার সতর্ক করিব। যদি পিল্লাই কিছু কুলী সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারে, তবে তাহাদের কাযের অভাব হইবে না।"

মিঃ পিল্লাইএর প্রশংসাপত্রগুলি দেখিয়া ম্যানেজার তাহাকে চাকরীতে নিযুক্ত করিলে, পিল্লাই পঞ্চাশ জন তামিল কুলী লইয়া নূতন চাকরীতে যোগদান করিল। সে কার্য্যভার গ্রহণ করিবার সময় ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করিলে ম্যানেজার বলিলেন, "কিরূপ অসুবিধায় পড়িয়া আমরা তোমাকে চাকরী দিয়াছি, তাহা বোধ হয়, তোমার বন্ধু ডা ক্রুজের নিকট জানিতে পারিয়াছ, সুতরাং তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। 'এ' বিভাগের সকল ভার তোমার হাতে দিলাম। তোমাকে সর্দ্দার ওয়াংসোপাউইরোর উপদেশে চলিতে হইবে। তোমাকে সাহায্য করিবার জন্য আমি তাহাকে আদেশ করিয়াছি। সে জাভানী, এই আবাদে অনেক দিন কায করিতেছে; তাহার নিকট নানা ভাবে সাহায্য পাইবে।

"'এ' বিভাগের সকল কুলীই জাভানী, সর্দ্দারই তাহাদিগকে এখানে লইয়া আসিয়াছিল। সুতরাং তাহাদের সহিত ব্যবহারে তোমাকে সতর্ক থাকিতে হইবে। গাছের গা চাঁচিতে কোন ত্রুটি না হয়; এই কাযে যথেষ্ট খুঁত দেখা

যাইতেছিল। তুমি যে সকল কুলী লইয়া আসিয়াছ, তাহারা মিঃ মরের নেতৃত্বে 'বি' বিভাগে কায করিবে। আশা করি, তোমার কাযে দক্ষতার পরিচয় পাইব।"

পিল্লাইএর বয়স তখন ২৬ বৎসর মাত্র; সে খর্ব্বকায়, কষ্টসহ, উৎসাহী। লোকটি বেশ বুদ্ধিমান্; সর্দ্দারের সহিত 'এ' বিভাগের কুলীদের ঘনিষ্ঠতার কারণ সে দুই চারি দিনেই বুঝিতে পারিল।

ওয়াংসোপাউইরো দীর্ঘকায়, ক্ষীণ, তাহার বয়স কত, মুখ দেখিয়া তাহা বুঝিবার উপায় ছিল না। ত্রিশ বলিলেও চলিত, পঞ্চাশ বলিলেও অবিশ্বাস হইত না। সে অত্যন্ত চতুর। পিল্লাইকে নিযুক্ত করিবার কারণ বুঝিতে তাহার অধিক বিলম্ব হইল না।

পিল্লাইএর আবাদে আসিবার প্রায় এক সপ্তাহ পরে সেই উৎকট-নামধারী সর্দ্দারটি এক দিন রাত্রিকালে তাহার স্ত্রীকে বলিল, "এই নূতন লোকটার মেজাজ বড়ই কড়া। কুলীদের উপর অত্যন্ত জুলুম করিতেছে। তাহার ব্যবহারে অনেক কুলী হয় ত সরিয়া পড়িবে, তাহা হইলে যে টাকা তাহারা ধার লইয়াছে, তাহা জলে পড়িবে, আর তাহা আদায় হইবে না।"

সর্দ্দারের স্ত্রী বলিল, "আমি জানিতাম, তুমি ভয়ঙ্কর কুড়ে, কিন্তু তোমার ঘটে যে এক বিন্দু বুদ্ধি নাই, তাহা আমার জানা ছিল না।"

সর্দ্দার স্ত্রীর কথা শুনিয়া সক্রোধে বলিল, "তোমার ও কথার মানে কি? আমি নির্ব্বোধ?"

কিন্তু তাহার স্ত্রী আর কোন কথা বলিল না। সে যে তাহার স্ত্রীর কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারে নাই, এরূপ মনে করা ভুল, কিন্তু সে আর উচ্চবাচ্য করিল না।

পরদিন পিল্লাই ম্যানেজারকে কতকগুলি কুলীর নামের একটি তালিকা দিয়া বলিল, "এই সকল কুলী কাযে গাফিলী করিয়াছে, তাহাদের জরিমানা না করিলে কাযের ক্ষতি হইবে।"—ঐ সকল কুলীর বিরুদ্ধে আরও কতকগুলি অভিযোগ ছিল, তাহার তদন্তের জন্য সর্দ্দারকে আফিসে হাজির হইতে বলা হইল।

সর্দ্দার কুলীদের পক্ষাবলম্বন করিয়া বলিল, "যদি এই সকল ছোট-খাট বিষয় উপেক্ষা করা না হয়, তাহা হইলে তাহারা দল বাঁধিয়া সরিয়া পড়িতে পারে। তাহারা কাযে গাফিলী করে

না, তবে তাহারা কোন বিদেশীর শাসন বরদাস্ত করিতে রাজী নয়। পিল্লাই মাদ্রাজী, সে আমার কুলীদের ভাষা বুঝিতে পারে না, তাহাদের আচার-ব্যবহারের কিছুই জানে না। যাহা হউক, তাহারা ভবিষ্যতে কোন গাফিলী না করে, আমি তাহার ব্যবস্থা করিব।"

পিল্লাই তখন ম্যানেজারের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল, সে সর্দ্দারের কথা শুনিয়া বলিল, "ভবিষ্যতে ত গাফিলী হইবে না, কিন্তু বর্ত্তমানে যে অনেক গাছের গুঁড়িতে অস্ত্র স্পর্শ হয় নাই, অথচ কুলীরা প্রত্যহ পূরা মজুরী আদায় করিতেছে!"

ম্যানেজার উভয় কর্ম্মচারীকে পরদিন অপরাহ্ণে আফিসে হাজির হইতে আদেশ করিলেন, বলিলেন, সেই সময় কুলীদের জরিমানা সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য, তাহাও তিনি স্থির করিবেন।

সেই রাত্রিতে ম্যানেজার আহারাদির পর চিন্তাকুল-চিত্তে ধূমপান করিতেছিলেন, সেই সময় আফিসের এক জন প্রহরী অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে ম্যানেজারের বাংলোর বারান্দায় উঠিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে আতঙ্কবিহ্বল স্বরে তাঁহাকে জানাইল, ওয়াংসোপাউই-রোর কুলীরা নূতন পরিদর্শককে খুন করিতে উদ্যত হইয়াছে।
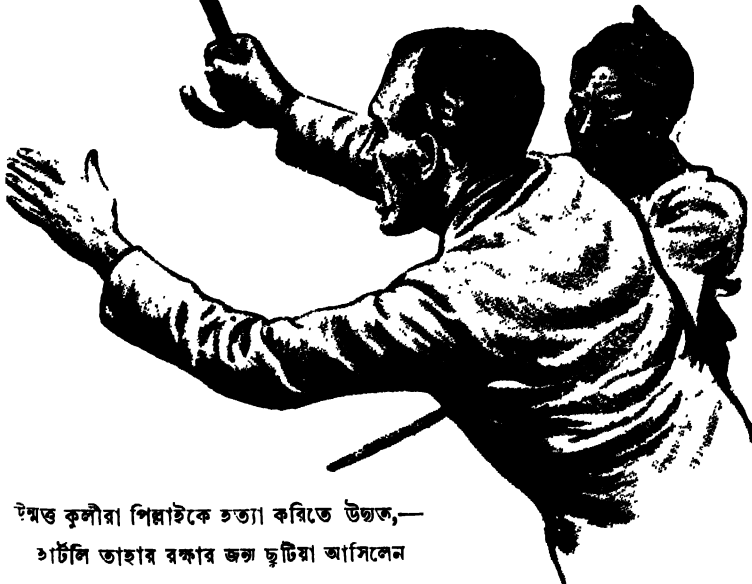
উন্মত্ত কুলীরা পিল্লাইকে হত্যা করিতে উদ্যত,—হার্টলি তাহার রক্ষার জন্য ছুটিয়া আসিলেন

এই সংবাদে হার্টলি হতভাগ্য পিল্লাইএর প্রাণ-রক্ষার জন্য ব্যগ্রভাবে কুলীর আড্ডায় উপস্থিত হইলেন। তিনি সেখানে পিল্লাইকে দেখিতে পাইলেন বটে, কিন্তু তাহার অবস্থা দেখিয়াই তাঁহার চক্ষুস্থির! এক দল ক্রোধোন্মত্ত জাভানী কুলী তাহাকে ঘিরিয়া তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতেছিল। কেহ তাহার কাপড় ধরিয়া টানাটানি করিয়া ছিঁড়িয়া দিয়াছিল, কেহ কেহ তাহার মাথার উপর 'প্যারচং' (মালয় দেশীয় কুঠার) তুলিয়া তাহাকে কাটিতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু তখনও যে হতভাগ্য পিল্লাই জীবিত ছিল, ইহাই অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয় বলিয়া ম্যানেজারের মনে হইল। কারণ, ক্রুদ্ধ জাভানীরা কাহাকেও হত্যা করিবার সঙ্কল্প করিলে তাহাদের সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইতে বিলম্ব হয় না। হত্যাকাণ্ডের পর তাহারা শোরগোল করে। কিন্তু তাহারা যে কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাহাকে হত্যা করিবে, এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ হইলেন।

যাহা হউক, মিঃ হার্টলি যষ্টি হস্তে কুলীদের নিরস্ত করিবার চেষ্টা করায় পিল্লাইএর প্রাণরক্ষা হইল। তিনি পিল্লাইকে ক্ষিপ্তপ্রায় কুলীদের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া তাঁহার দুই জন বরকন্দাজের জিম্বায় এক মাইল দূরবর্ত্তী 'বি' বিভাগে প্রেরণ করিলেন।

হার্টলি বলিলেন, "পিল্লাই তাহার স্বদেশীয় কুলীদের কাছে যাইতেছে, সেখানে তাহার বিপদের আশঙ্কা অল্প; মরেকে আমি তাহার উপর নজর রাখিতে বলিব।"

কিন্তু কেহ কাহাকেও হত্যা করিবার সঙ্কল্প করিলে সে নানা কৌশলে তাহার সঙ্কল্পসিদ্ধি করিতে পারে, পিল্লাইকে হত্যা করিবার প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ হইলে অন্যভাবে চেষ্টা চলিতে লাগিল।

মালয়দেশে শত্রুকে 'গুণ-জ্ঞানের' সাহায্যে ও বিষপ্রয়োগে হত্যা করিবার কৌশল সম্বন্ধে অনেকগুলি কেতাব আছে। শত্রুকে ইহলোক হইতে অপসারিত করিবার সেই সকল ফন্দী-ফিকির মালয়ের অধিবাসিগণের সুবিদিত। মনে করুন, 'এ' 'বি'কে শত্রু মনে করে, তাহাকে হত্যা করিতে উৎসুক। 'এ' কোন 'গুণী'র নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলিবে, "আমার একটা দুষমন আছে, তাহাকে সরাইতে চাই। আপনাকে কি দিতে হইবে?"

গুণী বলিবে, "তাহাকে কি তাড়াতাড়ি সরাইতে হইবে? না, কিছু দিন বিলম্ব করিলেও চলিবে?"

'এ' হয় ত বলিবে, "তেমন বেশী তাড়া নাই, শীঘ্র হউক, বিলম্বে হউক, কার্য্যোদ্ধার হইলেই হইল।"

অনন্তর দরদস্তর স্থির হইয়া যায়। গুণী অনেক টাকার দাবী করে এবং দাদনস্বরূপ কতক টাকা

তখনই অগ্রিম দিতে হয়; অবশিষ্ট টাকা পরে দিলেও আপত্তি হয় না।

পিল্লাই শীঘ্রই 'বি' বিভাগের কার্য্যভার গ্রহণ করিল। স্বদেশীয় কুলীদের দলে আসিয়া সে যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। সে যে বাসাটি পাইয়াছিল, তাহা যথেষ্ট আরামদায়ক; তাহার প্রতি তাহার উপরওয়ালার নেক্‌-নজর ছিল। সে সকলের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া উৎসাহভরে কাযকর্ম্ম করিতে লাগিল। সে অতীত দুঃখ-কষ্টের কথা বিস্মৃত হইল। তাহার জীবন যেন সুখের স্রোতে ভাসিতে লাগিল।

পিল্লাই তাহার প্রধান শত্রু ওয়াংসোপাউইরোর দুর্ব্ব্যহার বিস্মৃত হইয়া তাহার অপরাধ মার্জ্জনা করিয়াছে, ইহা বুঝাইবার জন্য সে এক দিন নৈশভোজনের জন্য তাহাকে নিমন্ত্রণ করিল। পিল্লাই তাহার জন্য উৎকৃষ্ট খাদ্যের ও মদ্যের আয়োজন করিয়াছিল। পরদিন প্রত্যুষে পাঁচটার সময় কুলীর দল লইয়া তাহাকে কাযে বাহির হইতে হইবে বুঝিয়া সে কোন প্রকার উগ্র সুরা আনাইবার ব্যবস্থা করে নাই। এ জন্য আহারের পর তাহাদের মাতাল হইবার আশঙ্কা ছিল না।

আহারাদির পর প্রফুল্ল-চিত্তে কিছু কাল গল্পগুজব করিয়া পিল্লাই তাহার অতিথির নিকট কয়েক মিনিটের জন্য বিদায় লইয়া শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল। কায শেষ করিয়া সে ওয়াংসোপাউইরোর নিকট ফিরিয়া আসিলে তাহার অতিথি হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—রাত্রি ক্রমশঃ অধিক হইতেছে, অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রি; সুতরাং তাহাকে অবিলম্বে বাসায় ফিরিতে হইবে। এ কথা শুনিয়া পিল্লাই তাহাকে বলিল, "বেশ, যাও, কিন্তু বোতলের বাকি মদটুকু সাবাড় করিয়া যাও।" আধখালি বোতলটা তখনও সেখানে পড়িয়াছিল।

পিল্লাইএর অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া তাহার অতিথি পুনর্ব্বার বসিয়া পড়িল; তাহার পর উভয়ে মহানন্দে বোতলটি শূন্যগর্ভ করিল।

অতিথি প্রস্থান করিলে পিল্লাই উঠিয়া গিয়া সদর-দরজা অর্গলরুদ্ধ করিল, তাহার পর টেবিল হইতে লণ্ঠনটা তুলিয়া লইয়া সে তাহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল এবং পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিতে লাগিল।

তাহার স্ত্রী বহু পূর্ব্বেই শয়ন করিয়াছিল; তাহার পরিচ্ছদ-পরিবর্ত্তনের সময় তাহার স্ত্রী নিদ্রা-বিজড়িত কণ্ঠে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এখন রাত্রি কত?"

পিল্লাই বলিল, "রাত্রি এখন ১১টা।"—কয়েক মিনিট পরে সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "এ কি হইল? আমার সর্ব্বাঙ্গ যে শীতে কাঁপিতেছে! আমাকে খানিক কুইনাইন খাইতে হইবে।"—এই কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার অসাড় দেহ শয্যায় লুটাইয়া পড়িল; দুই দিনের মধ্যে আর তাহার চেতনাসঞ্চার হইল না!

হার্টলি আরও এক মাস ওয়াংসোপাউইরোর কাযকর্ম্ম পরীক্ষা করিয়া উন্নতির কোন লক্ষণ বুঝিতে পারিলেন না; 'এ' বিভাগের কায প্রায় অচল হইয়া উঠিয়াছিল। তাহা দেখিয়া হার্টলি তাহাকে বোঝাবাগিল লইয়া সরিয়া পড়িতে আদেশ করিলেন। দায়ে পড়িয়া তাহাকে তিনি পদচ্যুত করিতে বাধ্য হইলেন। তাহার দলের কুলীগুলাও আবাদ ছাড়িয়া তাহার সঙ্গে চলিয়া গেল।

ওয়াংসোপাউইরোর অত্যাচারে আবাদের অধিকাংশ লোক নানাভাবে বিড়ম্বিত হইতেছিল; সে অত্যন্ত উদ্ধত, দাম্ভিক, স্বার্থপর ও কটুভাষী ছিল। তাহাকে 'বুকিট লালাং' বাগিচা হইতে পদচ্যুত হইয়া পলায়ন করিতে দেখিয়া সকলেই আনন্দিত হইল। পিল্লাই তাহাকে মৌখিক খাতির করিলেও মনে মনে তাহাকে ভয় ও ঘৃণা করিত; এই জন্য তাহার পদচ্যুতির সংবাদে সে নিঃশঙ্ক ও নিশ্চিন্ত হইল। বিশেষতঃ তাহার আশ্রিত কুলীর দল তাহার সঙ্গে আবাদ ত্যাগ করায় তাহার বুকের উপর হইতে যেন একটা ভারী বোঝা নামিয়া গেল। পিল্লাই অল্পদিন পরে প্রধান পরিদর্শকের পদ লাভ করিল, তাহার বেতনবৃদ্ধি হইল। সে নবজীবনের আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল। তাহার কাযকর্ম্মের সকল অসুবিধা দূর হইল।

সর্দ্দার পদচ্যুত হইয়া প্রস্থান করিবার অল্পদিন পরে এক রাত্রিতে হঠাৎ পিল্লাইএর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তাহার মনে হইল, যেন কেহ তাহার বুকের উপর অত্যুত্তপ্ত তরল পদার্থের ধারা ঢালিয়া দিতেছিল,—সেই অবস্থায় তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল। সে শয্যা হইতে লাফাইয়া উঠিয়া ল্যাম্পের আলো উজ্জ্বল করিল, সেই আলোকে তাহার কাপড়-চোপড়ের দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহা রক্তে ভিজিয়া গিয়াছে; টক্‌টকে লাল তাজা রক্ত! পিল্লাই আতঙ্কে আর্ত্তনাদ করিয়া তাহার স্ত্রীর নিদ্রাভঙ্গ করিল।

তাহার স্ত্রী নিদ্রাঘোরে বিরক্তিভরে বলিল, "মা গো,

হঠাৎ আর্ত্তনাদ করিয়া লাফাইয়া উঠিল। সে দিন তাহার কর্ণবিবর হইতে রক্ত ঝরিয়া শয্যা প্লাবিত করিয়াছিল!

পরদিন প্রভাতে পিল্লাই বাগিচার ডাক্তারের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার রোগ পরীক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ করিল। ডাক্তার দীর্ঘকাল ধরিয়া তাহার দেহ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, সে সম্পূর্ণ সুস্থ আছে, তাহার কোন রোগ নাই। 'নাসা' হওয়ায় তাহার নাক দিয়া মধ্যে মধ্যে রক্ত ঝরে, এবং কাণ দিয়া রক্ত পড়া ঐরূপ আর একটা উপসর্গ। উহা কোন কঠিন ব্যাধির নিদর্শন নহে। ডাক্তার তাহার কোন দৈহিক যন্ত্রের বিকার আবিষ্কার করিতে পারিলেন না। ডাক্তারের পরীক্ষাফলে পিল্লাইএর মানসিক অশান্তি দূর হইল না দেখিয়া বাগিচার ডাক্তার তাহার আহারাদি নিয়ন্ত্রিত করিবার ব্যবস্থা দিলেন।

উত্তেজনাপূর্ণকণ্ঠে সে তাহার স্ত্রীকে আহ্বান করিল

কি জ্বালা! তুমি কি একটু নির্ঝঞ্ঝাটে ঘুমুতেও দেবে না? ব্যাপার কি বল ত শুনি?"

পিল্লাই স্ত্রীর ঔদাসীন্যে ভয়ঙ্কর রাগ করিয়া বলিল, "তুমি নাক ডাকিয়ে সারারাত্রি নির্ঝঞ্ঝাটে ঘুমাও, কিন্তু আমি যে এ দিকে মারা যাই! আমার কাপড়-চোপড় রক্তে ভিজে সপ-সপ করছে, তা দেখতে পাচ্ছো না?"

পিল্লাই-পত্নী তাহার স্বামীর পরিচ্ছদের দিকে মিট-মিট করিয়া চাহিয়া অবজ্ঞাভরে বলিল, "তবু রক্তে! আমি ভাবছিলাম, কি একটা 'প্রেলয়' কাণ্ড ঘটেছে! ও তোমার নাকের রক্ত, তোমার 'নাসা' আছে কি না। বিছানায় নাক রগড়িয়েছ, তাই 'নাসা' ভেঙ্গে রক্ত ঝরেছে। চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ো দিকিন, রক্তঝরা বন্ধ হয়ে যাবে।"

পিল্লাই সুবোধ বালকের মত তাহার স্ত্রীর আদেশ পালন করিল। কয়েক মিনিটের মধ্যে রক্তপাত রহিত হইল। পিল্লাই ও তাহার স্ত্রী নিশ্চিন্ত-মনে ঘুমাইতে লাগিল। রক্তপাতের কারণ সম্বন্ধে আর কোন আলোচনা হইল না।

এক সপ্তাহ পরে আর এক রাত্রিতে পিল্লাই নিদ্রাঘোরে

কিন্তু পিল্লাইএর স্বাস্থ্য ক্রমশঃ ক্ষুণ্ণ হইতে লাগিল। তাহার দেহ মাংসল ও অত্যন্ত স্থূল ছিল, তাহা অস্থিসার ও জীর্ণ হইল। তাহার মুখ গোলগাল ও থল্‌থলে মাংসে পরিপুষ্ট ছিল, কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই তাহার মুখ শুকাইয়া গেল ও গালের হাড় বাহির হইয়া পড়িল। তাহার ক্ষুধার চিহ্নমাত্র রহিল না। সে সেই বাগিচার কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, কর্ম্মঠ কর্ম্মচারী ছিল, এ জন্য ম্যানেজার হার্টলি তাহার পক্ষপাতী ছিলেন। তাহার অবস্থা দেখিয়া ম্যানেজার দুঃখিত হইলেন। তিনি তাহাকে বিশ্রাম করিতে উপদেশ দিলেন, শয্যা ত্যাগ করিতে নিষেধ করিলেন, এবং বাগিচার ডাক্তারকে সতর্কভাবে তাহার চিকিৎসা করিতে বলিলেন।

ম্যানেজারের উপদেশে পিল্লাই এক সপ্তাহ শয্যায় পড়িয়া রহিল। সপ্তাহান্তে তাহার শরীর কিঞ্চিৎ সুস্থ হওয়ায় সে শয্যা ত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার কার্য্যভার গ্রহণ করিল।

পিল্লাই সুস্থ হইয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিবার পর এক সপ্তাহ অতীত হইল। সেই সময় এক দিন অপরাহ্নে মিঃ হার্টলির প্রধান সহকারী মরে ভ্রমণে বাহির হইয়া, কুঠীর পশ্চাতের দরজায় বহুসংখ্যক তামিল কুলীকে জটলা করিতে দেখিলেন। সেখানে দলবদ্ধ হইয়া কুলীগুলা গণ্ডগোল করিতেছিল। তাহাদের মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা আরম্ভ হইয়াছে ভাবিয়া মিঃ মরে ইহার কারণানুসন্ধানের জন্য ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন। তিনি দরজার বাহিরে সোপানের উপর একটি মনুষ্যমূর্ত্তিকে গড়াইতে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন।

মিঃ মরে সেই মূর্ত্তি পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিলেন, লোকটা সাধারণ কুলী নহে; কারণ, সেই ব্যক্তির মস্তকে কৃষ্ণবর্ণ পক্ষি-পালকের একটি শিরোভূষণ ছিল। এতদ্ভিন্ন এক ছড়া মালায় তাহার কণ্ঠ পরিবেষ্টিত ছিল। লোকটার দুই কস বহিয়া ফেণা ঝরিতেছিল। তাহার বিস্ফারিত চক্ষু দু'টি আরক্তিম, যেন উন্মত্তের চক্ষু! মরে আরও দেখিতে পাইলেন—সোপানশ্রেণীর একটি ধাপ ভাঙ্গিয়া তাহার নীচে এক ফুট গভীর একটি গর্ত্ত খনন করা হইয়াছে।

তিনি এই সকল অস্বাভাবিক ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া সেই কুলীর দলের সর্দ্দারকে উত্তেজিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সকল কি ব্যাপার, সর্দ্দার!"

পিল্লাই একটি ছোট বাণ্ডিল এবং রুমালের আকারের একখানি ন্যাকড়া হাতে লইয়া অদূরে দাঁড়াইয়া থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল; তাহার মুখ মৃতের মুখের ন্যায় বিবর্ণ, সে মরের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য স্খলিত স্বরে বলিল, "আপনি আসিয়াছেন মহাশয়! আমার হাতের জিনিষগুলি পরীক্ষা করুন, এই 'গুণী' লোকটি এগুলি খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন। আমার দেহ হইতে রক্তপাত বলুন, আমার পীড়া বলুন এবং আমার দেহের ক্ষত বলুন—এই জিনিষগুলিই ঐ সকল বিপদের একমাত্র কারণ!"

মরে সবিস্ময়ে বলিলেন, "তোমার দেহের ক্ষতের কথা কি বলিতেছ পিল্লাই?"

পিল্লাই বলিল, "হাঁ, আমার দেহ অসংখ্য ক্ষতে পূর্ণ, কিন্তু ইহা প্রকাশ হইয়া পড়িলে পাছে আমার চাকরী যায়, এই ভয়ে আমি সে কথা আপনাকে বা ম্যানেজার সাহেবকে বলিতে সাহস করি নাই। ওয়াংসোপাউইয়োই আমার এই দুর্গতির মূল। এত দিনে আমি জানিতে পারিয়াছি, সে আমাকে হত্যা করিবার জন্য এক জন লোককে টাকা দিয়া বশীভূত করিয়াছিল!"

মরে বলিলেন, "বুঝিলাম, কিন্তু এ লোকটা এখানে কেন?"—তিনি সোপানপ্রান্তে নিপতিত পক্ষি-পালকের মুকুটধারী সেই লোকটির দিকে অঙ্গুলি প্রসারিত করিলেন। তখন তাহার দেহ স্থির, আড়ষ্টপ্রায়, যেন মৃত্যুর পূর্ব্বলক্ষণ! তাহার দিকে নির্নিমেষনেত্রে চাহিয়া মরে বলিলেন, "এই লোকটার সঙ্গে তোমার ঐ সকল আপদ-বিপদের কি সম্বন্ধ?"

পিল্লাই সম্মানভরে মাথা নাড়িয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, "উনি? উনি মস্ত চতুর লোক, ভারী গুণী! উনিই ভূত ভাগাইয়াছেন।"

মরে উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "ভূত? তুমি কোন্ ভূতের কথা বলিতেছ?"

পিল্লাই বিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বলিল, "যে ভূত আমার দেহে প্রবেশ করিয়া, আমার সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, সেই ভূত!—আমার হাতের এই জিনিষগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই সকল ব্যাপার বুঝিতে পারিবেন।"—সে বাণ্ডিলটি খুলিয়া ও ন্যাকড়াখানি প্রসারিত করিয়া মরের সম্মুখে ধরিল।

মরে ন্যাকড়াখানি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, তাহা এক টুকরা 'ক্যালিকো', তাহার উপর একটি মনুষ্য-মূর্ত্তি অঙ্কিত, সেই মূর্ত্তির বক্ষঃস্থলে একটি বাণ বিদ্ধ। বাণটির ডগা মূর্ত্তির বুক ফুটা করিয়া পিঠ দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন সেই মূর্ত্তির সর্ব্বাঙ্গ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্রচিহ্নে আচ্ছন্ন! ন্যাকড়ার কোণে কতকগুলি হিজিবিজি দাগ!

মরে বলিলেন, "এই চক্র-চিহ্নগুলি দ্বারা কি বুঝাইতেছে, পিল্লাই?"

পিল্লাই গম্ভীরভাবে বলিল, "উহা আমার দেহের ক্ষতগুলির নিদর্শন। আপনার আদেশ পাইলে আমার দেহে সেই ক্ষতগুলি আপনাকে দেখাইতে পারি। চাকা চাকা ঘায়ে আমার সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া গিয়াছে। দেখিলে আপনি ঘৃণায় হয় ত মুখ ফিরাইবেন।"

মরে তাহাকে গাত্রাবরণ অপসারিত করিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন, "থামো !"

তাহার পর তিনি সেই পুঁটুলীটার জিনিষগুলি পরীক্ষা করিতে করিতে চর্ম্মনির্ম্মিত আধারে কয়েকটি ছুঁচ দেখিতে পাইলেন। তাহা দেখিয়া বলিলেন, "এগুলির উপযোগিতা কি ?"

পিল্লাই বলিল, "তাহা আমার জানা নাই, মহাশয় ! বোধ হয়, সেই সয়তানের কোন রকম সয়তানীর নিদর্শন। উহা আমার বাংলোর দরজার সিঁড়ির নীচে ছিল, মাটী খুঁড়িয়া বাহির করা হইয়াছে। ঐ ন্যাকড়া দিয়া পুঁটুলীটি ঢাকিয়া এ ভাবে মাটী চাপা দেওয়া হইয়াছিল যে, যতবার আমাকে যাতায়াত করিতে হইয়াছে, ততবারই ঐগুলি ডিঙ্গাইয়া যাইতে হইয়াছে।—এ কি সাধারণ চাতুরী ?"

মরে বলিলেন, "দেখ পিল্লাই, আমি ম্যানেজারকে বলিয়া তোমাকে ডাক্তার মার্চ্চেণ্ডের কাছে পাঠাইয়া দিব।"

পিল্লাই মাথা নাড়িয়া বলিল, "কোন প্রয়োজন নাই, মহাশয় ! ভূত ভাগিয়াছে, এখন আমি সহজেই সারিয়া উঠিব।"

মরে আর কোন কথা না বলিয়া গম্ভীরভাবে সেই স্থান ত্যাগ করিলেন। প্রাচ্য ভূখণ্ডে মন্ত্র-তন্ত্র ও কবচাদির প্রভাব, বাণ মারিয়া নরহত্যার কৌশল প্রভৃতি কিরূপ অব্যর্থ—তাহার প্রমাণ তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না; কিন্তু জ্ঞানবিজ্ঞানাভিমানী য়ুরোপ কুসংস্কার বলিয়া তাহাদের যেরূপ অবজ্ঞা করিত, তাহা কিরূপ বিড়ম্বনাজনক স্পর্দ্ধা, ইহা তাঁহার বুঝিবার শক্তি ছিল না। তথাপি পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত ডাক্তারটি এই অদ্ভুত রোগীর রোগ পরীক্ষা করিয়া পাণ্ডিত্যখচিত মস্তিষ্ক হইতে কোন্ তত্ত্বের মহিমা প্রচার করেন, তাহা জানিবার জন্য আগ্রহ হওয়ায় তিনি সেই দিন সায়ংকালে ম্যানেজারের নিকট আমূল বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন এবং মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "মন্ত্র-তন্ত্র, কবচ, মারণ, বশীকরণ—প্রভৃতি হরেক রকম কুসংস্কার প্রাচ্যের মূঢ়তার উজ্জ্বল নিদর্শন। কিন্তু বিজ্ঞানের চরমোন্নতির যুগে য়ুরোপে ইহা অচল; আসল কথা এই যে, পিল্লাইএর দেহে বিষপ্রয়োগ করা হইয়াছিল। সে বেচারা সতর্ক না হইলে তাহার অস্তিত্ব শীঘ্রই বিলুপ্ত হইবে।"

ম্যানেজার বলিলেন, "কি উপায়ে বিষপ্রয়োগ করা হইয়াছিল ? কিরূপ বিষ ?"

মরে বলিলেন, "বিষটা শেঁকো বলিয়াই সন্দেহ হয়; আমার বিশ্বাস, উহার খাদ্যদ্রব্য বিষাক্ত করিবার জন্য কাহাকেও উৎকোচদানে বশীভূত করা হইয়াছিল। আমি উহাকে বলিব, উহার স্ত্রী ভিন্ন অন্য কাহারও হস্তে প্রস্তুত খাদ্যদ্রব্য যেন কখন গ্রহণ না করে। যাহা হউক, উহার বিশ্বাস হইয়াছে—এখন উহার রোগ সারিয়া যাইবে। বিশেষতঃ যে ব্যক্তি উহার দেহে বিষপ্রয়োগের ভার পাইয়াছে, অদ্য যে কাণ্ড ঘটিয়াছে, তাহাতে ভয় পাইয়া সে হয় ত আর উহার কাছে ঘেঁসিবে না। আমার মনে হয়, উহাকে একবার ডাক্তার মার্চ্চেণ্ডের কাছে পাঠাইলে উহার রোগপরীক্ষা হইতে পারে।"

পিল্লাইএর দেহ হইতে ভূত ছাড়িলেও রোগ ছাড়িল না। তাহার স্বাস্থ্যের উন্নতি হইল না, বরং তাহার দেহ দিন দিন ক্ষীণ হওয়ায় তাহার আর পরিশ্রমের শক্তি রহিল না। চাকরী করিতে না পারায় অবশেষে সে স্বদেশ-প্রত্যাগমনের সঙ্কল্প করিল। তাহার বিশ্বাস হইল, দেশে ফিরিলে সে এই কাল-ব্যাধির কবল হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে।

পিল্লাই স্বদেশে প্রত্যাগমন করিল; কিছু দিন পরে সকলেই তাহার কথা বিস্মৃত হইল। ইহাই পৃথিবীর নিয়ম।

এক বৎসর পর এক দিন হার্টলি তাঁহার আফিসে বসিয়া চিঠি লিখিতেছিলেন, সেই সময় ডা ক্রুজ তাঁহার আফিসে প্রবেশ করিয়া বলিল, একটি লোক তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া বাহিরে বসিয়া আছে।

হার্টলি তাহাকে ডাকিতে বলিলেন।

মুহূর্ত্ত পরে আগন্তুক তাঁহার ডেস্কের নিকট উপস্থিত হইল।

হার্টলি মুখ না তুলিয়াই বলিলেন, "আর এক মিনিট; এই পত্রখানি প্রায় শেষ হইয়াছে।"

পিল্লাই বলিল, "বেশ, আপনি পত্র শেষ করুন।"

কণ্ঠস্বর শুনিয়াই ম্যানেজার যেন সম্মুখে ভূত দেখিয়াছেন, এই ভাবে লাফাইয়া উঠিলেন, রুদ্ধশ্বাসে বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য ! মিঃ পিল্লাই, তুমি ! আমি মনে করিয়াছিলাম, জীবনে আর—"

পিল্লাই তাঁহার কথায় বাধা দিয়া হাসিয়া বলিল, "হাঁ, মহাশয় ! আমিও মনে করিয়াছিলাম, আমার পরমায়ু

শেষ হইয়াছে, জীবনে আর আপনার সঙ্গে দেখা হইবে না; কিন্তু এই দেখুন, আমি আবার আসিয়াছি!"

হার্টলি সবিস্ময়ে তাহার স্বাস্থ্যপূর্ণ স্থূল দেহের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ইহা কিরূপে সম্ভব হইল? ডাক্তার মার্চ্চেণ্ড আমাকে বলিয়াছিলেন, তোমার জীবনের কোন আশা নাই, কয়েক দিনের মধ্যেই তোমার মৃত্যু অনিবার্য্য!"

পিল্লাই বলিল, "তবে শুনুন মহাশয়! গত বৎসর যখন এ দেশ হইতে দেশে ফিরি, তখন আমি আমার জীবনে হতাশ হইয়াছিলাম। বুঝিয়াছিলাম, ওয়াংসোপাউইরো আমাকে যে 'বাণ' মারিয়াছে, তাহাতে আমার মৃত্যু নিশ্চিত। সুতরাং স্বদেশে ফিরিয়া আমার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে মরিতেই আগ্রহ হইল, কিন্তু স্বদেশ-যাত্রার পূর্ব্বে আমি মলক্কায় গিয়া আমার কয়েকটি বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। সেখানে আমি হাঁসপাতালে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলাম; কিন্তু ডাক্তার আমার অবস্থা দেখিয়া বলিল, আমার জীবনের আশা নাই, আমার অন্তিমকাল উপস্থিত! হাঁ, চিকিৎসাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, বিজ্ঞ ডাক্তার আমার অবস্থা দেখিয়া এই কথা বলিয়া আমাকে হাঁসপাতাল হইতে তাড়াইয়া দিল। আমাকে দেশে ফিরিয়া মরিবার উপদেশ দিল। আমাকে স্পষ্ট বলিল, 'তোমার চিকিৎসার আর সময় নাই, তোমাকে বাঁচাইয়া তোলা আমাদের অসাধ্য।'

"তাহার পর আমি জাহাজ ধরিবার আশায় পিনাংএ চলিলাম, সেই সময় রেলগাড়ীতে শ্যামদেশীয় এক জন ধর্ম্মযাজকের সঙ্গে আমার দেখা হইল। তাঁহার সঙ্গে আমার পরিচয় হওয়ায় এ তিনি সাধু ব্যক্তি—ইহা বুঝিতে পারায় আমার বিপদের কাহিনী আনুপূর্ব্বিক তাঁহার গোচর করিলাম।

"আমার সকল কথা শুনিয়া তিনি আমাকে বলিলেন, 'তুমি আমার মঠে চল, হয় ত তোমার কোন উপকার করিতে পারিব।' তাঁহার কথা শুনিয়া আমি আশ্বস্ত-হৃদয়ে সেই স্থানে তাঁহার সঙ্গে নামিয়া পড়িলাম, এবং তাঁহার মঠে উপস্থিত হইয়া সেখানে দুই সপ্তাহ বাস করিলাম। সেই মঠে কয়েক জন সাধুকে দেখিতে পাইলাম, তাঁহারা সকলেই আমার প্রতি সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন, কিন্তু ট্রেণে যে ধর্ম্মযাজকের সহিত আমার পরিচয় হইয়াছিল, তাঁহার কৃপায় আমি রোগমুক্ত হইয়াছি।"

মিঃ হার্টলি বলিলেন, "তিনি কি ভাবে তোমার চিকিৎসা করিলেন?"

পিল্লাই বলিল, "সে বড় অদ্ভুত চিকিৎসা! তিনি আমাকে কোন ঔষধ দিলেন না। আমাকে মঠের একটি ক্ষুদ্র কক্ষে আবদ্ধ করা হইল। ধর্ম্মযাজক মহাশয় প্রত্যহ দুইবার সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া জল দিয়া আমার দেহ ধৌত করিতেন, সেই জল তিনিই লইয়া আসিতেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ও জলে কি আছে?' তিনি বলিলেন, আমি তাহা বুঝিতে পারিব না, তবে তাহাতেই আমি আরোগ্য লাভ করিব। দুই সপ্তাহ পরে আমি অনেকটা সুস্থ হইলাম। তখন মঠ হইতে বিদায় লইয়া দেশে চলিলাম। আমাকে দেশে ফিরিতে দেখিয়া আমার আত্মীয়-স্বজনরা অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তাহার পর এত দিন পর্য্যন্ত আমি বাড়ীতেই ছিলাম। আমি নীরোগ হইলাম, দেহে বল পাইলাম, আর কি রকম মোটা হইয়াছি, তাহা দেখিতেই পাইতেছেন। পূর্ব্বাপেক্ষা আমি কি অনেক অধিক মোটা হই নাই?"

ম্যানেজার সবিস্ময়ে তাহার স্থূল দেহের দিকে চাহিয়া রহিলেন। যখন তিনি শুনিলেন, পিল্লাই পুনর্ব্বার চাকরীর উমেদারীতে আসিয়াছে, তখন তিনি প্রসন্নচিত্তে তাহাকে নিয়োগ-পত্র প্রদান করিলেন। অতঃপর এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে পিল্লাই অসুস্থ হয় নাই। ওয়াংসোপাউইরোর আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই, সে বোধ হয়, সেই দেশ ত্যাগ করিয়াছিল।

আমাদের দেশেও 'বাণ মারিয়া' হত্যা করিবার অনেক প্রক্রিয়ার কথা শুনিতে পাওয়া যায় এবং ডাক্তারী চিকিৎসায় তাহাতে কোন ফল পাওয়া যায় না। এ ক্ষেত্রেও চিকিৎসা-শাস্ত্রবিশারদ ইংরাজ ডাক্তার যাহার মৃত্যু অপরিহার্য্য বলিয়া 'রায়' দিলেন, এক জন বৌদ্ধ পুরোহিত তাহাকে 'পড়া জল' মাখাইয়া নীরোগ করিয়া তুলিলেন! তথাপি যে সকল লোক মনে করেন—ডাক্তার যাহাকে বাঁচাইতে পারিল না, তাহার মৃত্যু নিশ্চয়, এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সকল বিষয়েই শ্রেষ্ঠ, প্রাচ্যের জ্ঞান-গরিমা 'বেদিয়ার ভেল্কি' মাত্র;—তাঁহাদের গোড়ামী দূর করিবার জন্য সাধারণ লোকের এইরূপ অভিজ্ঞতার বিবরণ প্রকাশ অনাবশ্যক মনে করিতে পারি কি?

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়

ড্যানিয়েল ডিফোর দ্বিশতবার্ষিক শ্রাদ্ধ উৎসব

সম্প্রতি ইংলণ্ডে ড্যানিয়েল ডিফোর মৃত্যুর দ্বিশতবার্ষিক স্মৃতি-উৎসব সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ঠিক দুই শত বৎসর পূর্ব্বে ১৭৩১ খৃষ্টাব্দের ২৬এ এপ্রেল তারিখে ডিফোর মৃত্যু হয়। ডিফো তৎকালের এক জন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁহার রচিত পুস্তকের সংখ্যা বহু হইলেও তিনি রবিনসন ক্রুশো-রচয়িতা বলিয়াই অমরতা লাভ করিয়াছেন।

ডিফো আনুমানিক ১৬৫৯ বা ৬০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ছিলেন এক জন কসাই—যদিও তাঁহার অবস্থা বেশ সম্পন্ন গৃহস্থের উপযোগী ছিল। ডিফোর পিতার নাম ছিল কেবল ফো। ডিফো একাক্ষর নাম পছন্দ না করিয়া নিজের নামে আর একটি অক্ষর যোজনা করিয়া লন, এবং সেই নামেই তাঁহার সাহিত্য-রচনা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। তিনি প্রথমে হোজার ও টালি-ইটের ব্যবসায়ে নিযুক্ত হন। কাপড়ের ও কসাইয়ের কারবারও তিনি করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু কোন ব্যবসায়েই লাভবান্ না হইতে পারিয়া তিনি অনেকবার পাওনাদারদের তাগাদা হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য পলাইয়া গা-ঢাকা হইয়া থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু পরে তাঁহার অবস্থা সচ্ছল হইলে তিনি সকল দেনদারের দেনা কড়ায় গণ্ডায় শোধ করিয়া নিজের সততা রক্ষা করেন।

ড্যানিয়েল ডিফো

ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লসের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা দ্বিতীয় জেম্‌স্ সিংহাসন দখল করিয়া রাজা হন। চার্লসের পুত্র ডিউক অফ মনমাউথ জেম্‌সের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। ডিফো সেই বিদ্রোহে যোগদান করেন। আবার জেম্‌সের জামাতা উইলিয়াম অফ অরেঞ্জ যখন ইংলণ্ডের সিংহাসন অধিকার করিতে আসেন, তখন ডিফো তাঁহার সৈন্যদলে ভর্ত্তি হন এবং রাজা উইলিয়ামের অনুগ্রহভাজন হইয়া পড়েন। তিনি উইলিয়ামের প্রশংসাসূচক এক কবিতা প্রকাশ করেন, তাহার প্রথম চরণদ্বয় বিখ্যাত হইয়া আছে।

Wherever God erects a house of prayer,
The Devil always builds a chapel there.

যেখানে ভগবান্ প্রার্থনামন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, তাহারই পার্শ্বে সয়তান তাহার পূজামন্দির প্রতিষ্ঠা করে।

ঐ কবিতায় কবি বলিয়াছেন যে, ইংরাজ জাতি এক মহা সঙ্করজাতি, বহু জাতির উঁছা আবর্জ্জনার মিশ্রণে এই জাতির উৎপত্তি। এই অপ্রিয় সত্য বলার সাহস পুরস্কৃত হইল, অতি অল্পদিনের মধ্যে ৮০ হাজার কপি কবিতা বিক্রয় হইয়া গেল।

ডিফো ধর্ম্মমতে স্বাধীন মতাবলম্বী ছিলেন, তিনি প্রচলিত মতবাদ মানিতেন না। তাঁহার লেখাতে লোক ও সমাজকে তিনি রেয়াৎ করিয়া কথা বলিতে জানিতেন না। এই জন্য তাঁহাকে দুইবার জেলে যাইতে হইয়াছে, এবং তিনবার তাঁহাকে পিলোরীতে অর্থাৎ তুড়ুং ঠুকিয়া বন্দী অবস্থায় পথের মাঝখানে রাখিয়া অপমানিত করা হইয়াছে। কিন্তু ডিফো এমন লোকপ্রিয় হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা জানাইবার জন্য জেলখানার দ্বার প্রশংসমান নর-নারীর মেলায় পরিণত হইত, দর্শকরা তাঁহার পিলোরী বা তুড়ুং ফুলের মালা দিয়া সজ্জিত করিয়া তাঁহার শাস্তিকে গৌরবে পরিণত করিতে চেষ্টা করিত।

ডিফো বহু দেশ পর্য্যটন করিয়া নানা অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেন। ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ও জেল খাটার বা তুড়ুং ঠোকার অভিজ্ঞতা তাঁহার প্রতিভাকে সাহিত্য-রচনার নূতন নূতন উপকরণ যোগাইয়াছে। যেখানে যখন যাহা কিছু তিনি নূতন দেখিয়াছেন বা অনুভব করিয়াছেন, তাহাই ছাপাখানার কপিতে পরিণত হইয়া গিয়াছে।

তিনি জেলে থাকিতেই কঠিন পরিশ্রম করিয়া একটি সংবাদপত্র—

A Review of the Affairs of France and of All Europe as influenced by that Nation, with observations on transactions at Home

প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। এই সংবাদপত্রের প্রসার, প্রতিপত্তি, প্রভাব প্রবল হয়। জেল হইতে বাহির হইয়া তিনি ব্যঙ্গরসরচনার পত্র Tatler এবং সাহিত্য পলিটিক্স সম্বন্ধীয় পত্র Spectator প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। ঐ তিনখানি কাগজের উৎকর্ষ ও একাকী নানা অসুবিধার মধ্যে উহাদের পরিচালনার বিষয় বিবেচনা করিলে আমরা বিস্ময়ে সম্ভ্রমে অবাক্ হইয়া যাই।

১৭০৩ হইতে ১৭০৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহার জেলেই কাটে। মুক্তি পাইয়া তিনি নানা বিষয়ে লিখিতে থাকেন। তিনি সমগ্র জীবনে ৩ শত ৭৫খানি বই লিখিয়া প্রকাশ করেন। ইহাদের মধ্যে প্রধান কতকগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি।

Essays on Projects........ইহাতে তিনি ব্যাঙ্ক ও ব্যবসায়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগ, স্ত্রীলোকের উৎকৃষ্টতর শিক্ষার ব্যবস্থা, পাগলদের প্রতি পাগলাগারদে অধিকতর সদয় ব্যবহার সম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

The Apparition of Mrs. Veal............ ইহা ভূতের গল্প; লোকের অপ্রাকৃত ব্যাপার সম্বন্ধে আগ্রহ তাঁহাকে ইহা লিখিতে প্ররোচিত করে।

A History of the Union, The Family Instructor, The original London Post, Journal of the Plague, Tour Through Great Britain, A New Voyage Round the World, The Complete English Tradesman, A History of the Great Storm, প্রভৃতি তাঁহার অন্যান্য পুস্তক। ইহাদের মধ্যে Journal of the Plague অনেকের মতে তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা। ইহা তাঁহার গবেষণাশক্তির সাক্ষী। ইহাতে তাঁহার বর্ণনাপটুতা, কথোপকথন লিখিবার ক্ষমতা ও ভয়ানক রসসৃষ্টির দক্ষতা একত্র মিলিত হইয়াছে। ঝড়ের বর্ণনা ও কল্পিত ভূমিকম্পের বর্ণনাতেও তিনি এই সমস্ত ক্ষমতা প্রচুর প্রকাশ করিয়াছেন।

১৭১৯ খৃষ্টাব্দে ব্রিষ্টল নগরে তিনি আলেকজাণ্ডার সেল্‌কার্ক নামক যানভগ্ন নির্জ্জন দ্বীপে আশ্রিত নাবিককে দেখেন। তাহাকে দেখিয়া ও তাহার অপূর্ব্ব কাহিনী শুনিয়া ডিফো **The Life and Surprising Strange Adventures of Robinson Crusoe of York, Mariner** রচনা করিয়া প্রকাশ করেন। প্রকাশমাত্রই উহা তাঁহার প্রধানতম রচনা বলিয়া সম্মান ও সমাদর লাভ করিল। সৃষ্টিকুশল কল্পনার সহিত সত্যাভাস মিশ্রণের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিয়া তাহা প্রশংসিত হইতে লাগিল। রুসোর ন্যায় সাহিত্যিক উহাকে জাতীয় শিক্ষার আদর্শ পুস্তক বলিয়া ঘোষণা করিলেন। দেশে বিদেশে তাঁহার জয়জয়কার পড়িয়া গেল।

ডিফো অনেকগুলি নভেল রচনা করেন। তাহার মধ্যে **The Adventures of Captain Singleton, Moll Flanders, Jack Shepherd, Jonathan Wild. Roxana, and Colonel Jacque** প্রধান। ইহাদের

মধ্যে শেষোক্তটিই বোধ হয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহার উপন্যাসগুলি সত্যের ও বাস্তবতার আকারে লেখা হইলেও তাহার মধ্যে কল্পনার অনুপ্রবেশও যথেষ্ট আছে। এ জন্য তাঁহার উপন্যাসগুলি এলিজাবেথের যুগের বাস্তবপন্থী নভেল ও অষ্টাদশ শতাব্দীর রোমান্টিক নভেলের মাঝামাঝি ধরণের। তাঁহার নভেলগুলি প্রায়ই সমাজের নিম্নস্তরের ও অপকৃষ্ট প্রকৃতির লোকদের কাহিনী লইয়া লেখা। যে সব পাপী, অপরাধী, দাগী, বদ্‌মায়েস এবং বেশ্যাদের তিনি জেলে গিয়া নিজের চোখে দেখিয়াছিলেন ও তাহাদের পরিচয় পাইয়াছিলেন, তাহাদেরই কাহিনী তাঁহার পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার কল্পিত চরিত্রগুলি এমন বাস্তব ও জীবন্ত যে, অনেকে মনে করেন যে, তিনি চোখে-দেখা লোকদেরই চিত্র করিয়া তাহাদের অমর করিয়াছেন ও নিজে অমর হইয়াছেন। তাঁহার রচনা নিখুঁত খুঁটিনাটি বর্ণনার সহিত হাস্যরসের সংমিশ্রণের জন্য অত্যন্ত লোকপ্রিয় হইয়াছিল।

৫৯।৬০ বৎসর বয়সে তাঁহার শ্রেষ্ঠ পুস্তকগুলি প্রকাশিত হয়। ইহাতে অনুমান হয় যে, ডিফো রচনা করিয়াই কিছু তাড়াতাড়ি প্রকাশ করিতেন না, কপি বহুদিন ফেলিয়া রাখিয়া পুরাতন হইলে তাহা দেখিয়া বদলাইয়া প্রকাশ করিতেন।

শেষবয়সে ডিফো রোগাক্রান্ত হইয়া কষ্টে জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। অর্থকষ্ট ভোগ করিয়া অবজ্ঞাত উপেক্ষিত অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

মৃত্যুর অনেক দিন পরে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে, তাঁহার স্বদেশের বালকবালিকারা রবিনসন ক্রুশো পাঠ করিয়া যে আনন্দ পাইয়াছে, তাহাই স্মরণ করিয়া চাঁদা তুলিয়া তাঁহার কবরের উপর তাহাদের কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ একটি চৌকা স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছে।

—

আধুনিক রুষসাহিত্য

রাসিয়ার বর্ত্তমান সাহিত্য দেশের গত বিপ্লবের ব্যাপার লইয়াই লিখিত। আধুনিক য়ুরোপীয় সাহিত্য যেমন গত মহাযুদ্ধ অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, তেমনই রাসিয়ার সাহিত্য দেশের বিপ্লবকাহিনী ত্যাগ করিয়া অন্য বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে পারিতেছে না। রাসিয়ার সাহিত্য বরাবরই নিছক রসরচনা নহে, তাহাতে পলিটিক্যাল, সামাজিক অথবা দার্শনিক মতের আলোচনাই প্রধান, কেবলমাত্র রসসম্ভোগ তাহাদের সাহিত্যের উদ্দেশ্য নহে। টুর্গেনেভ, ডষ্টয়েভস্কি এবং টলষ্টয় প্রভৃতি সাহিত্যিকদের প্রশংসা অথবা নিন্দা তাঁহাদের পলিটিক্যাল মতবাদের জন্য যত, নিছক আর্টিষ্টিক রসরচনার গুণ অথবা দোষের জন্য তত নহে। রাসিয়ার সাহিত্যের এইরূপ মতিগতির জন্য আধুনিক সাহিত্য কেবলমাত্র বিপ্লবকাহিনী অবলম্বন করিয়া যে রচিত হইতেছে, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণ নাই। আধুনিক রাসিয়ার প্রত্যেক লেখকই দেখাইতে ব্যস্ত যে, তিনি বিপ্লবের পরম ভক্ত, বিপ্লবের ফলে দেশে পরম কল্যাণ আবির্ভূত হইয়াছে। এখন সোভিয়েট রাসিয়ার প্রবল প্রতাপের জন্য কাহারও সাহসও নাই, আর সাধ্যও নাই যে, যে বিপ্লব দেশে ঘটাতে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট স্থাপিত হইয়াছে, তাহার সমর্থন না করিবে অথবা তাহার নিন্দা করিবে। কাজেই বাধ্য হইয়াই রাসিয়ার সাহিত্য বিপ্লবের প্রশংসায় পূর্ণ একদেশী সাহিত্য হইয়া উঠিতেছে।

সোভিয়েট রাসিয়ার প্রথম নভেল ১৯২১ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়; বোরিস পিল্‌নিয়াক প্রণীত সেই নভেল নেকেড ইয়ার **'Boris Pilniyak's Naked year'** নামে ইংরাজীতে অনুবাদিত হইয়া আমেরিকা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে একনিশ্বাসে গত বিপ্লবের ও তাহার আনুষঙ্গিক দুর্ভিক্ষের একটি অসংলগ্ন চিত্রপরম্পরা উপন্যাসের আকারে দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে উপন্যাসের কোনও সঙ্গত প্লট নাই। ইহা যদিও খুব উঁচুদরের সাহিত্যসৃষ্টি হয় নাই, তথাপি ইংরাজীতে যেমন অল্‌ কোয়ায়েট ইন্‌ দি ওয়েষ্টার্ণ ফ্রন্ট (All Quiet in the Western Front) নামক পুস্তক গত মহাযুদ্ধের কাহিনী অবলম্বনে উপন্যাস-রচনার পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিল, তেমনই নেকেড ইয়ার রাসিয়ার বিপ্লব অবলম্বনে উপন্যাস-রচনার প্রথম পথিপ্রদর্শক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইহার অনুবর্ত্তী নেভেরভ প্রণীত তাশকেণ্ট উপন্যাস (Noverov's Tashkent) এবং ব্যাবেল প্রণীত ছোটগল্পের সমষ্টি রেড ক্যাভালরী (Babel's Red Cavalry) ঐ বিপ্লবব্যাপার লইয়া বিরচিত হইলেও ইহারা তাহাদের অগ্রজ নেকেড ইয়ার অপেক্ষা ভাষায় ও

রচনা-রীতিতে উৎকৃষ্ট। এই সমস্ত লেখক বিপ্লবপূর্ব্ব প্রাচীন রাসিয়ার বুদ্ধিজীবী লোক হইলেও তাঁহারা বিপ্লবের সমর্থন ও প্রশংসা করিয়া পুস্তক রচনা করিয়াছেন। কারণ, তাঁহাদের আন্তরিক ভাব যাহাই হউক না কেন, তাঁহাদের সাধ্য নাই যে, তাঁহারা বিপ্লবের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে সাহস করিবেন। তাঁহারা মুখে যতই প্রশংসা করুন না কেন, তাঁহাদের দেশের সাধারণ লোক এখনও তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না, সুতরাং তাঁহাদের রচনার প্রতি তাহারা ঈর্ষা ও সন্দেহের দৃষ্টিপাত করিতেছে! একেবারে সাধারণ মুটেমজুর শ্রেণীর লোকের ভিতর হইতে এখনও কোন ভালো লেখক আবির্ভূত হন নাই। সাধারণ শ্রেণীর লোকের রচনার শ্রেষ্ঠ নমুনা বলা যাইতে পারে গ্লাডকভ প্রণীত সিমেণ্ট (Gladkov's Cement)। ইহা প্রাচীন ধরণের উদ্দেশ্যমূলক প্রকাণ্ড উপন্যাস—সোভিয়েট শাসন প্রবর্ত্তন ও সোভিয়েট প্রতিষ্ঠিত অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে সমর্থন করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই ইহা লেখা। রাসিয়াতে এই ধরণের উপন্যাস ঝুড়ি ঝুড়ি রচিত ও প্রকাশিত হইতেছে এবং নবীন সামান্যতাবাদী (Communist) পাঠকদের কাছে সমাদৃতও হইতেছে। কিন্তু রাসিয়ার বাহিরের পাঠকরা এই সব উদ্দেশ্যমূলক উপন্যাস অপেক্ষা রসরচনার অধিক পক্ষপাতী হওয়াতে বিদেশে দি এম্‌বেজলারস্ এবং ডায়ামণ্ডস্ টু সিট অন (The Embezzlers and Diamonds to Sit On) নামক দুইখানি প্রহসন অধিক সমাদর লাভ করিতেছে। কারণ, ইহাদের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র লোককে হাস্যরস বিতরণ করা, আর কোনও গভীর উদ্দেশ্য ইহাদের ত্রিসীমানায় যায় নাই। বর্ত্তমান রাসিয়ার প্রধান হাস্যরসিক সাহিত্যিক বোধ হয় জোশেঙ্কো (Zoschenko)। ইহার রচনার নমুনা বেন (Benn) লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত রাসিয়ার ছোট গল্প (Russian Short Stories) নামক পুস্তকে পাওয়া যাইবে। ইনি সোভিয়েট চেকভ নামে পরিচিত হইয়াছেন। যদি কাহাকেও কোনও বিশেষ নামের ছাপে চিহ্নিত করিতেই হয়, তবে ইঁহাকে 'রাসিয়ার ও' হেন্‌রী' (Russian O. Henry) নামে পরিচিত করা যাইতে পারে।

ইংরাজী পাঠকদের কাছে সোভিয়েট সাহিত্য মাত্র কয়েকখানি উপন্যাস ও ছোট গল্পের ইংরাজী অনুবাদের মধ্যেই আবদ্ধ। কিন্তু দেশের মধ্যে যখন সঙ্ক্ষোভ ও উত্তেজনা প্রবল হইয়া দেশের প্রাচীন প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করিতে থাকে ও নূতন নূতন চিন্তা, কল্পনা ও কর্ম্মের পথমোচন করিতে থাকে, তখন দেশের চিত্ত কবিতার ভিতর দিয়াই আত্মপ্রকাশ করিতে চেষ্টা করে। এই জন্য সোভিয়েট রাসিয়ার প্রথম যুগের সাহিত্যে কবিদের দানই বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। কবি এসেনিন (Esenin) বোধ হয় অন্য সকল রুস লেখক অপেক্ষা রাসিয়ার বাহিরে সমধিক পরিচিত। তিনি ইসাডোরা ডান্‌কান নাম্নী রমণীকে বিবাহ করিয়া আমেরিকায় চলিয়া যান, এবং পরে য়ুরোপে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া প্যারিস ও বার্লিনের হোটেলে মদ খাইয়া বেলেল্লাপনা করিতে করিতে শেষে আত্মহত্যা করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া আছেন। কিন্তু এই মাতাল দুশ্চরিত্র এসেনিন হইতে কবি এসেনিন একেবারে স্বতন্ত্র ব্যক্তি; যদিও তাঁহার গুণ্ডার আত্মকথা (The Confessions of a Hooligan) হইতে তাঁহার চরিত্রের আভাস পাওয়া যায়, এবং মনে হয়, যেন সোভিয়েট রাসিয়ার বিপ্লব লোককে কেবল মাতলামি করিবার ও প্রতিবেশীদের জানালা ভাঙিবার অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করে নাই, তথাপি এসেনিনের অন্য রচনা একেবারে স্বতন্ত্র ধরণের। তিনি চাষার ছেলে, তিনি প্রধানতঃ চাষা কবি। তাঁহার কবিতাগুলি গ্রাম্য দৃশ্য ও জীবনের নিখুঁত জীবন্ত চিত্র। তাঁহার কবিতার মধ্যে গ্রামের পশু-পক্ষীর প্রতি মমতা ও তাঁহার মাতার প্রতি ভালোবাসা এবং তাঁহার যৌবনের প্রণয়িনীর প্রতি প্রেম চমৎকার, সুন্দররূপে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। সোভিয়েট কবিদের মধ্যে আর একটি শ্রেষ্ঠ কবি হইতেছেন মায়াকোভস্কি (Mayakovsky)। তিনি মাত্র ১৭ বৎসর বয়সে ১৯১২ খৃষ্টাব্দে প্রথম সাহিত্য রচনায় প্রবৃত্ত হন। তখন তিনি ভবিষ্যপন্থী (Futurist) দলের লোক ছিলেন। ভবিষ্যপন্থীদের সহিত বল্‌শেভিকদের প্রকৃতিগত সাদৃশ্য আছে, তাহারা উভয়েই তথাকথিত ভদ্রলোকদের ঘৃণা করে, এবং তাহাদের মতের বিপরীতগামী হইয়া দেশে নূতন ধারা প্রবর্ত্তন করিতে অভিলাষী। ভবিষ্যবাদীদের উদ্দেশ্য সমস্ত ধরা-বাঁধা নিয়ম-কানুন ও আদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বাধীন স্বতন্ত্র পথে চলা। তাই যখন দেশে বল্‌শেভিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন তাহারা

ত নিয়ম-কানুন আদেশের বেড়াজালে আবদ্ধ হইয়া পড়িল, সুতরাং তাহারও সহিত ভবিষ্যপন্থীর বিরোধ বাধিবার কথা। কিন্তু মায়াকোভস্কির পূর্ব্বেকার বিদ্রোহী কবি বলিয়া খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা তাঁহাকে বল্‌শেভিক গভর্ণমেণ্টেরই কবি বলিয়া চালাইয়া দিল। মায়াকোভস্কিও তাঁহার রচনায় ভবিষ্যপন্থীদের ধরণটুকু মাত্র বজায় রাখিয়া বল্‌শেভিক মতেরই কবি হইয়া উঠিলেন, এবং সত্বর লোকপ্রিয় কবি বলিয়া সাধারণের নিকট সমাদৃত হইতে লাগিলেন। তাঁহার অসামান্য প্রতিভা প্রবল শক্তিতে নব নব সৃষ্টি করিয়া রাশি রাশি মিশ্র বিরুদ্ধ উপমা ও রূপকে রচনাকে ভূষিত করিয়া সকলের মনোহরণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ কবিতা হইতেছে '১৫ কোটি রাশিয়ার জনসংখ্যার অঙ্ক'; এই কবিতা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নায়ক উডরো উইল্‌সন সাহেবের মতের তীব্র প্রতিবাদ; তাঁহার মতকে ইনি ধনিক সভ্যতার উক্তি বলিয়া আক্রমণ করিয়াছেন। মায়াকোভস্কির কবিতার মধ্যে তাঁহার ব্যক্তিগত পরিচয় কিছুই পাওয়া যায় না। কবি এসেনিন আত্মহত্যা করিয়া মরিলে মায়াকোভস্কি তাঁহার উদ্দেশে তিরস্কার করিয়া যে কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, এরূপে স্বার্থপরভাবে মরিয়া দেশের বিপ্লবে সাহায্য না করা অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য, দেশের সেবা করিবার জন্য মরিবার ত হাজার দরজা খোলা আছে, তাহারই যে কোনো পথে মৃত্যুকে বরণ করিয়াই দেশব্রতীর মরা উচিত। কিন্তু তাহারই চার বৎসর পরে তিনি নিজে প্রণয়ে হতাশ হইয়া আত্মহত্যা করিলে সকলে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল।

মায়াকোভস্কির মৃত্যুই সোভিয়েট সাহিত্যের প্রথম যুগের অবসান বলিয়া ধরা যাইতে পারে। ইহার পর যে সাহিত্য রচিত হইবে, তাহাকে আর বিপ্লবের বর্ণনা একান্ত হইয়া পাইয়া থাকিবে না, তাহা স্বাধীন পথে বিচরণ করিবার মুক্তিলাভ করিবে।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাদল-সাঁঝে

ঝরে　ঝর ঝর অবিরল বাদল-ধারা,
দেয়া　দানবের করতালি গগনে বাজে,
বহে　বাঁধন-হারা বায়ু পাগল-পারা
আজি　সাজিল ধরা এ কি প্রলয়-সাজে!

দোলে　লম্বিত লটপট উতলা বেণী
ঘন　ঝটিকা-বিকম্পিত বনানী শিরে,
কোন্　রিপুর নিধনব্রতে যাজ্ঞসেনী
ভাসে　কুন্তল এলাইয়া নয়ন-নীরে!

আজ　তন্বী-নয়নে এ কি বহ্নি-জ্বালা!
কোন্　বেদনা গুমরি উঠে বক্ষপুটে,
কম　কণ্ঠে শোভে না কই তারার মালা,
চারু　চঞ্চল অঞ্চল চরণে লুঠে।

বাজে　রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ বাদল বীণা,
গুরু　গভীর সনে ঘনে মাদল বাজে,
কাঁদে　ধরণী যেন কার বিরহ-লীনা,
মন　বিমুখ আজি মম সকল কাযে।

মেঘ　মাদল সনে কেয়া-কদম-বনে
চাহি　কাহার পানে সুখে শিখিনী নাচে,
বন　মুখর করি রবে, আপন মনে
কাঁদি　দাদুরী-প্রিয়া বঁধুমিলন যাচে।

ক্ষণ　বিরাম-হারা ঘন বরষা-ধারা
ঘুম　পাড়ান সুরে ঝুরে বাদল-রাতে,
চিত　উদাস আজি ঘুরে আবাস-ছাড়া,
মোহ　স্বপন নামে মম নয়ন পাতে।

কার　কুন্তল-কুসুমের সুরভি পিয়া
বহে　উন্মদ সমীরণ শ্রাবণ-সাঁঝে,
মোর　ব্যথিত হিয়া আজি রহি' রহিয়া
কাঁদে　যক্ষ-বিরহী সম বক্ষ-মাঝে।

সুখ　আবেশ-ভরা তনু বিবশ করা
কা'র　পরশ লাগে মম অবশ দেহে
চারু　চরণ দুটি কা'র নূপুর-পরা
বাজে　রুম্ ঝুম্ রুম্ ঝুম্ হৃদয়-গেহে।

এই　পরশ হান, পুনঃ পালাও দূরে;
ওগো　ছলনাময়ি, এ কি নিঠুর খেলা?
আলো　ছায়ার মায়া-সনে স্বপন-পুরে
মিছে　এমনি ঘুরে মোর কাটিল বেলা।

শ্রীজগদানন্দ বাজপেয়ী।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

মায়ের মুখ হইতে শশাঙ্কের বিরুদ্ধে সে সব কথা রুবি শুনিল, সে সমস্ত কথাই নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করিতে তার মনের মধ্য হইতে সম্পূর্ণভাবে সায় আসিতেছিল না। শশাঙ্কের পত্র পড়িয়া সে মনে করিয়াছিল, হয় ত কোন রকমে শশাঙ্কের বাবার জমীদারী নীলামে চড়িয়াছে, না হয় ব্যাঙ্ক ফেল হইয়া তাদের বিস্তর টাকার লোকসান হইয়াছে, এই রকমই হয় ত কোন একটা কিছু না কিছু মন্দ ঘটনা ঘটিয়া থাকিবে। মনকে সে এই বলিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছিল যে, শশাঙ্ক বিদ্বান্, শুধু বিদ্বান্ নয়, প্রচুরতররূপে বুদ্ধিমান্ও বটে, যদিই তাদের জমীদারীর পয়সা কমিয়াই গিয়া থাকে, কিছু নিশ্চয়ই আছে, তার উপর সে চাকরী করিবে, যদিও ইহাতে ধন-সুখের প্রাচুর্য্য ঘটিবে না, কিন্তু তথাপি কি আর করা যাইবে, শশাঙ্ককে পাইলে, সেই সুখে এ অভাবকে সে না হয় কোন রকমে সহনীয় করিয়াও লইতে পারে। যতবারই সে হিরণ্ময়কে ভাবিতে গিয়াছে, শশাঙ্কের স্মৃতি তাহার মনকে জোর করিয়া তাহা হইতে তাহাকে নিবৃত্ত করিয়াছে, চিত্তকে তার পীড়িত করিয়া তুলিয়াছে। ধিক্কার দিয়া বলিয়াছে, ছি ছি, বলিস কি? মানুষের চাইতে পয়সাই তোর চোখে এত বড় হলো? শশাঙ্কর প্রেম, তার রূপ, তার গুণ কোন্ প্রাণে তুই ভুল্‌তে চাস? পার্‌বি কি তাকে ভুলতে? আর্ত্তস্বরে মন বলিয়াছে, না, না, না।

কিন্তু নর্ম্মদার মন্ত্রপাঠের পর হইতে সমস্ত অন্তঃকরণ তার যেন বিষ-বাষ্পে অভিভূত আচ্ছন্নবৎ হইয়া উঠিয়াছিল। সারা মন-প্রাণ তার যেন একটা নিদারুণ ঘৃণা ও বিদ্বেষে বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। মধ্যে মধ্যে যদিও একটা ক্ষীণ অস্পষ্ট সংশয় তার সেই বিদ্বিষ্ট রোষক্ষুব্ধ চিত্তকে ঈষৎ চঞ্চল করিয়া তুলিতে চেষ্টা না করিতেছিল, তা নয়, কিন্তু গভীর আহত বেদনায় তার অভিমানাহত চিত্ত সেই বিবেকের ক্ষীণ বাধাটুকুতে দৃক্‌পাত করিতে কর্ত্তব্যবোধ করিল না। যতবারই তার মানস-চক্ষুর সম্মুখে শশাঙ্কের অতি সুন্দর উজ্জ্বল মূর্ত্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতে চেষ্টা করিতেছিল, সক্রোধে ভ্রূকুটী করিয়া সে তার মুখ ফিরাইয়া লইতেছিল। মন তার ভিতরে ভিতরে বেদনায় আর্ত্তনাদ করিতে চাহিলে, সে তাকে এই বলিয়া বুঝাইতে চাহিতেছিল যে, স্মৃতি নিয়ে এ ব্যথা পাওয়া কেন? যদি সে স্মৃতি যার, তাকে পূজার বদলে ঘৃণাই করিতে হয়!

মনের এত বড় বিপর্য্যয়ের মাঝখানেই সে দ্রুত অস্থির হস্তে শশাঙ্ককে পত্রোত্তর দিয়া বসিল। কয় দিন ধরিয়া যে পত্র লেখা সম্ভব হয় নাই, আজ অভিমানাহত চিত্ত আত্মহত্যার মতই নিজেকে নির্ম্মম করিয়া তুলিয়া তাহাকে দিয়া এই নিষ্ঠুর কথা কয়টা লিখাইয়া লইল।—

সে লিখিল—

"আপনার পত্র পাইয়াছি, অনুগ্রহ পূর্ব্বক আর আমায় চিঠিপত্র না লিখিলে বড়ই বাধিত হইব। আমার আংটীটি ফেরৎ দিয়া আপনার আংটীটি ফেরৎ নেবেন, কালই ইন্‌সিওর ডাকে পাঠাইয়া দিব। আর বেশী কিছুই বলিবার নাই।

ইতি—

শ্রীমতী করবী গুপ্তা।"

এই চিঠি শশাঙ্কের পত্রের লিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিয়া জ্বালাভরা চিত্তে সে আসিয়া শয্যাশ্রয় লইল। তার পর হইতে বাকি সমস্ত দিনটা একান্ত মানসিক বিপ্লবের অশান্তিতে অস্বস্তিপূর্ণভাবেই কাটিতে লাগিল। ছাড়িতে চাহিলেই কোন জিনিষকে হঠাৎ ছাড়া যায় না, ভুলিব ভাবিলেই যাহাকে কখনও এক দিনের তরেও ভালবাসিয়াছি, তাহাকে ভুলিয়া যাওয়া সহজ নয়। বরঞ্চ ছাড়িতে চাহিলে যাহাকে ছাড়িতে চাওয়া যায়, সে আমাদের আঁকড়াইয়া ধরিয়া বিমুখ মনকে সমুখ ফিরায়, ভুলিব ভাবিলেই দেখি, ভুলিবার পাত্র আমাদের স্মৃতির মধ্যে সবচেয়ে বড় আসনখানাকেই দখল করিয়া লইয়া মৌরসি পাট্টার বন্দোবস্তমত অনড় হইয়া বসিয়াছে। হায় রে, মানুষ সকলের কাছে থেকেই এত বড় গলা জাহির করিয়া যে তার অধিকারের দাবী তুলিয়াছে, শুধু নিজের মনের কাছেই কি তার সব চাইতে পরাজয়!

নর্ম্মদা চাণক্য পণ্ডিতের নীতি অনুসারে ভেদবুদ্ধির যে অব্যর্থ মন্ত্রটি পাঠ করিয়া দিয়াছিল, করবীর কাঁচা মনে সে মন্ত্রের অব্যর্থ শক্তি তার পূর্ণ প্রভাব বিস্তৃত করিতে বড়

কশুর করে নাই। অভিচারক্রিয়া দ্বারা অভিভূত হওয়ার মতই তার সমস্ত হৃদয়-মন যেন এই মহামন্ত্রে আচ্ছন্নবৎ অভিভূত হইয়া গিয়াছিল। অন্তর্গূঢ়ব্যথার সহিত একটা নিগূঢ় বিদ্বিষ্ট অভিমান এবং সেই তীব্র অভিমানেরই ফল-স্বরূপ দুর্জ্জয় ক্রোধে তাহার আপাদ-মস্তক যেন ভস্ম করিয়া পুড়াইয়া ফেলিতেছিল। শশাঙ্ক দুশ্চরিত্র! শশাঙ্ক তাহাকে মিথ্যা প্রেমাভিনয়ে মুগ্ধ প্রতারিত করিয়া সামান্য একটা ক্রীড়নকের মতই তার সঙ্গে খেলা করিতেছে! করবীর চোখ ফাটিয়া জল আসিল না, তার বুক ফাটিয়া গেল। এই পৃথিবী! এই পুরুষের ভালবাসা! এই মিথ্যার অলীক আকাশ-কুসুম প্রেমের নামে জগতের এত কাব্য, এত কবিতা, এত গান যুগে যুগে সহস্র কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে, সঙ্গীত হইয়াছে, আজও তার শেষ নাই! সে সব মিথ্যা? এত দিনের যা কিছু সুন্দর, যে কিছু মধুর, যত কিছু পবিত্রতা, তার মাঝখানে এত বড় একটা ফাঁকিমাত্রই নিহিত ছিল? ভাণ সে সব? নাই নাই, পুরুষের প্রেমে সত্য নাই, ভালবাসা বলিয়া বস্তুতঃই জগতে কোন বস্তু নাই, সব ভুয়া বাজী, সমস্তই মায়া।

করবী রুক্ষ, শুষ্ক, অগ্নিজ্বালার মত তীব্র চক্ষুতে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। বৈশাখ-মধ্যাহ্নের আতপতপ্ত ঝটিকার মতই তার আহত প্রেমের তীব্র ব্যথা ব্যর্থক্ষোভে গুমরাইয়া আর্ত্তনাদ করিতে থাকিলেও সে নির্দ্দয় নিপীড়নে নিজেকে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিয়া অন্তরের সে মৃত্যু আর্ত্তনাদকে অন্তরের মধ্যেই নিরুদ্ধ করিতে চেষ্টিত হইল। নিজের মনের সন্দিগ্ধ আবেদনের সহস্র গুঞ্জনে নিষ্ঠুর ঔদাসীন্যে নির্লিপ্ত হইয়া রহিল। বিবেকের কোন মধ্যস্থতাই তার মনকে সে মানিতে দিল না।

মন তার শশাঙ্কের স্মৃতিভরা, তার মদন-গর্ব্ব-খর্ব্বকারী অপূর্ব্ব সুন্দর নারীমনপ্রার্থিত সুললিত মূর্ত্তির স্মৃতিসুখে পরিপূর্ণ চিত্ত, শশাঙ্কের গভীর হৃদয়াবেগে বেগবান্, অথচ পূর্ণাধিকারের অখণ্ডনীয় দৃঢ়তায় সুদৃঢ় সুপ্রচুর কণ্ঠস্বর, প্রচুরতর চরিত্রবলের পরিপন্থী তার বৃহদায়ত নেত্রের সপ্রেম দৃষ্টি সমস্ত মিলিয়া তাহাকে নর্ম্মদার অঙ্কিত কদর্য্য মলিন ঘৃণ্য চিত্রের নায়করূপে গ্রহণ করিতে ঘোরতর আপত্তি তুলিতে বারে বারেই চেষ্টা করিলেও জয়ী হইয়া উঠিতেছিল তীব্র সন্দেহ। শশাঙ্কের সে পত্র নিজেই যে নিজের অধঃপতনের এই কদর্য্য ভাষায় লেখা দলিল হইয়া রহিয়াছে। সে চিঠি না পাইলে, আজিকার এ অবিশ্বাস্য কথাকে সে কোনমতেই মনের মধ্যে ধারণা করিতেও সমর্থ হইত না। শশাঙ্ক স্বয়ং লিখিয়াছে, সে তার পৈতৃক সম্পত্তি-সুখে বঞ্চিত—না, না, হীনচরিত্র, প্রবঞ্চক, পথ-ভিখারীর স্মৃতির জন্য করবী এক বিন্দু সহানুভূতিরও অপব্যয় করিবে না, না, না, শশাঙ্ক পতিত, মিথ্যাচারী, অভিনেতা শশাঙ্ক তার কেহ নহে। তার সঙ্গে করবীর কোন সম্পর্ক নাই।

দিনে দিনে, পলে পলে, তিলে তিলে যে ভালবাসা আজ দুই বৎসর হইতে যায় সঞ্চিত হইয়া চঞ্চলা কিশোরীকে নব-প্রণয়মুগ্ধা ভাবময়ী যুবতীতে পরিণত করিতেছিল, একই ক্ষণে সেই প্রাণসঞ্চিত প্রেমরসকে সে তার শুষ্ক হৃদয়ের আতপ্ত-জ্বালা ঢালিয়া শুকাইয়া দিতে চাহিল। বিতৃষ্ণার তীক্ষ্ণকুঠার তুলিয়া সযত্নরোপিত প্রেমতরুর মূলোচ্ছেদন করিতে চাহিল।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্তব্ধ অনড় বহ্নিগর্ভ তালবৃক্ষের মতই গুমিয়া গুমিয়া পুড়িয়া সহসা সে তার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিল। মনকে আঁখি ঠারিয়া ভাবিল, শশাঙ্কের সঙ্গে আমার কিসের সম্পর্ক যে, তার জন্য আমি ভাবিয়া মরিতেছি? ভালই হইয়াছে—হয় ত এ ভালই হইয়াছে। তার প্রকৃত মূর্ত্তি ধরা পড়িয়াছে, আমি রক্ষা পাইয়াছি। এই মনে করিতেই তার মনটা অনেকখানি হাল্কা হইয়া গেল। তখন একটু সুস্থ-চিত্তে সে নিজের মনকে লইয়া বুঝাইতে বসিল। তাকে বলিল, দেখ, ও সব কিছু না, ঐ যে একনিষ্ঠ প্রেম-ট্রেম, ও সব নিছক কবি-কল্পনা। ওর কোন দাম নেই। এই ত শুনতে পাচ্ছো, চারিদিক থেকে কি রকম বাস্তবতার জয়গান উঠেছে! এর মধ্যে ঐ সব পচা পুরনো একনিষ্ঠ সতী-প্রেমের যায়গা কোথায়? অবশ্য শশাঙ্ককে যদি পেতুম, সে নিশ্চয়ই মন্দ হতো না, কিন্তু যখন তা হলো না, তখন তাকে ভালবেসেছিলুম ব'লেই যে আর এক জনের স্ত্রী হলে অমনি অসতী হয়ে যাব, গোল্লায় যাব, তার কোন মানে নেই।

এক জন পুরুষ একসঙ্গে বা একে একে দুটো মেয়েকে বিয়ে করলে দোষ হয় না, আর মেয়ের বেলাই বা এক জনকে ভালবেসে অন্যকে বিয়ে করলেই বা সে দ্বিচারিণী আখ্যায় আখ্যাত হইবে কেন? দময়ন্তী সাবিত্রী ত আর রোজ জন্মান না, আর তাঁদের সে সব পুরনো থিওরি এখন প'চে গ্যাছে। সতীত্ব-টতীত্ব ও সব কোন বাস্তব জিনিষ

নয়, ও সব মানুষের মন-গড়া কল্পনা মাত্র। আসলে পুরুষগুলোর স্বার্থপরতা পূর্ণভাবে রক্ষার জন্যই এই সতীত্ব পদার্থটির সৃষ্টি হয়েছে। ও সব জোচ্চুরীর দিন আর নেই, এ যুগে সতীত্ব অচল!—এই সব নব্য তন্ত্রের মহামন্ত্র হইতে বাঞ্ছনীয় যুক্তি গ্রহণ করিতে চাহিয়া করবী তার শিথিল দেহ-মনে বলসঞ্চয় করিয়া লইয়া উঠিল, তার ঘন কুঞ্চিত কেশে সাবধানে শিথিল কবরী রচনা করিয়া সযত্নে তার চারু দেহ সে সাজাইয়া তুলিল। মন তখনও মধ্যে মধ্যে বিদ্রোহ জাগাইতেছিল, তার সে দুষ্ট ঘোড়াকে রাশ টানিয়া শান্ত রাখার মতই তাহাকে বুঝাইতেছিল, না, না, কাঁদিবার মত কোন কিছুই হয় নাই, হউক গে যাই হিন্দুর মেয়ে, হোক না কেন একনিষ্ঠ প্রেমই প্রকৃত প্রেমের গৌরব, নারীর সতীত্বই তার প্রকৃত মহিমা। হিন্দু সতীর জগদ্বরেণ্য ত্যাগ, সংযম, পবিত্রতাকে ধ্বংস করা আর বিধাতার সব চেয়ে বেশি সূক্ষ্ম শিল্পকে নষ্ট করা একই রকম অপরাধ। যা স্থূল, যা রূঢ়, যা নীচ, তারই খাতিরে চির-সাধনায় লব্ধ অমূল্যনিধিকে হারিয়ে ফেলার মত মূর্খতা নেই।—এ সব কথা যারা বলে, তারা সেকেলে, তারা ভীরু, তারা কুসংস্কারাচ্ছন্ন, তারাই মূর্খ। না না, কিসের জন্য মনকে স্থির করতে পারছি না? হয়েছে কি? আমি শশাঙ্কের নই, হিরণ্ময়ের, হিরণ্ময়ই আমার স্বামী, মাসীমার মত শাশুড়ী, মনুর মত ননদ, ওঁর মতন স্বামী এ কোন্ মেয়ে তপস্যায় পায়? এত সুখ, এত ঐশ্বর্য্য, এত ভালবাসা এ শুধু একটা Ideaর খাতিরে নষ্ট করতে পারা যায় না, আর স্পষ্ট ক'রে কোন দিনই ত আমি তাকে কথা দিই নি, মনের মধ্যে আমার যাই থাক না কেন?

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

নর্ম্মদা ও অতুলেশ্বর হিরণ্ময়কে রুবির সঙ্গে একা হইবার সুযোগ দিবার জন্যই কাযের ছুতায় দুদিকে চলিয়া গেলে হিরণ্ময় মনে মনে হাঁফ ফেলিয়া বাঁচিল। এই রকম হঠাৎ নিমন্ত্রণ পাইয়া সে যত খুসী, ততই বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। রুবিকে আর একবার দেখিবার জন্য তার মন অস্থির হইয়া উঠিতেছে, এই এক মুহূর্ত্তের চোখের দেখাটুকু দেখিবার জন্যেও তার মনের মধ্যে বড় কম অধীরতা জাগ্রত হইয়া নাই, অথচ সে সুযোগ যেই দেখা দিল, অমনি নিবিড় লজ্জায় নবোঢ়ার মতই সে ভিতরে বাহিরে রাঙ্গিয়া উঠিল। কেমন করিয়া এ রকম না পর, না আপন অবস্থায় সে তার সঙ্গে দেখা করিবে, কথা কহিবে, গল্প করিবে? যদি সে সঙ্গতমত না পারে? রুবি তাহাকে অসভ্য বলিবে না ত? তার ভাষার দৈন্য, তার নারীসমাজের মধ্যে ব্যবহারের অজ্ঞতায় যদি তার প্রতি তাহার মনে একটা অবজ্ঞার আভাস আনিয়া দেয়? স্পন্দিত-বক্ষে কম্পিত-পদে আসিয়া সে দেখিল, আর যাই হউক, তার ভাবী শ্বশুর-শাশুড়ী তাকে হয় ত বা চিনিয়া লইয়াছেন, এবং তার পক্ষে কথঞ্চিৎ উপযোগী হইবে মনে করিয়াই হয় ত এ সময়ে অন্য কাহাকেও নিমন্ত্রণ না করিয়া তাদের দুজনকেই শুধু একা হইতে অবসরও দিয়াছেন। কৃতজ্ঞচিত্তে সে গুরুজনদের উদ্দেশ্যে মনে মনে অজস্র প্রণাম নিবেদন করিল। বাহিরে ত আর তেমনভাবে করা যায় না।

অতুলেশ্বর দু একটা কথা কহিয়াই স্কুলের মিটিংএর অজুহাতে এবং নর্ম্মদা হিরণ্ময়ের জলখাবার তৈরীর ছুতায় বিদায় লইয়া চলিয়া গেলে আসন্ন বিবাহপণে নিবদ্ধ ভাবী দম্পতিমাত্র সেখানে একা রহিল।

দুজনেরই মনের মধ্যে দুইটা বিভিন্ন ভাবের ঝড় বহিতেছিল। হিরণ্ময় ঈষৎ মুগ্ধ, ঈষৎ সলজ্জ, ঈষৎ বিপন্ন। আর রুবি? সে তখন তার মানস-মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা শশাঙ্কের প্রতিমূর্ত্তিকে জোর করিয়া টানিয়া বাহির করিয়া দিতে, সেই পূর্ব্বাধিষ্ঠিতের আসনে হাতে ধরিয়া হিরণ্ময়ের আসল মূর্ত্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া লইতে তার সমস্ত দেহ-মনকে সবলে জাগাইয়া তুলিতে প্রাণপণে নিয়োজিত রাখিয়াছিল। বার বার করিয়া নিজের মনকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিতেছিল, নাই বা হলো খুব হাঁস-হাঁসে ফরসা রং, কি সুন্দর শ্রী! কি শান্ত স্বভাব! আমার এই ভাল, আমার এই ভাল!

একটুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া হিরণ্ময় মুখ তুলিয়া করবীর দিকে চাহিল, কি বলিয়া কথা আরম্ভ করিবে, সে তার খেই খুঁজিয়া পাইতেছিল না। এত সুন্দর, এমন শিক্ষিতা, এরূপ না আপন না পর, এর সঙ্গে যে কোন্ ভাষার কোন্ ছন্দে আলাপ করা সঙ্গত, সে খবর বেচারা হিরণ্ময় তার পড়া কোন কেতাবেই খুঁজিয়া পাইল না! মনে পড়িল কপালকুণ্ডলার নবকুমারকে, কিন্তু না, নবকুমার না,

কপালকুণ্ডলাই প্রথমে প্রশ্ন করিয়াছিল, "পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?" হায়, এর চেয়ে হিরণ্ময় যদি সাগরদ্বীপের জঙ্গলে গিয়া পথ হারাইত ত ওর চেয়ে সে-ও ঢের ভাল ছিল।

কপালকুণ্ডলাই আগে কথা কহিল।

অপরাহ্নের আলো স্নিগ্ধ হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। সাম্‌নের খোলা বারান্দায় কয়েকটা মাটীর গামলায় দেওয়া ফুল-গাছের মধ্য হইতে ভায়োলেট ফুলের অতি মৃদু মধুভরা গন্ধটি স্নিগ্ধ-তর হইয়া আসিয়া নাকে লাগিতেছিল, খাঁচায় ঝুলানো অত-সীর পাখীটা আপন মনে বিড়-বিড় করিয়া কি বলিতেছিল। ঘরের পাশেই একটা প্রকাণ্ড বকুলগাছ, ফুল ফোটার সময় নহে, বাতাসে পাতাগুলি ঝির্ ঝির্ করিয়া কাঁপিতেছে। ডালে ডালে পাখীরা কিচমিচ শব্দে ঘুরিতেছে ফিরিতেছে, এক একটা অতি মধুর মিষ্ট কণ্ঠে তার সাথীর সহিত হয় ত বা রসালাপই করিতেছে। আলোর একটা ঝলক কোন অদৃশ্য দেবতার কৌতুক-স্মিত উজ্জ্বল দৃষ্টিপাতের মতই রুবির স্বভাবসুন্দর রূপকে সমুজ্জ্বলতর করিয়া তুলিয়াছিল। হিরণ্ময়ের বোধ হইল, সে যেন কোন রূপকথার রাজ্যে কোন এক স্বপ্নলোকে বিচরণ করিতেছে। নিজের জন্মকে এবং জীবনকে তার সার্থক সফল বলিয়া বোধ হইল।

নিজের মনের মধ্যের কঠিন বিদ্রোহের বিপ্লবে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়া আপনার চিত্তকে একটা অবলম্বন দিয়া সহজ করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যেই করবী কহিল,—"আপনাকে ত শুনলুম পরশুই 'জয়েন' করতে হবে, কাল রাত্রিতেই ফিরছেন বোধ হয়?"

হিরণ্ময়ের বোধ হইল, নবকুমারের চাইতেও সে ঢের বেশী ভাগ্যবান্! কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে এতগুলা কথা বলার সুযোগ প্রদান করে নাই। জোর করিয়া সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া সে উত্তর দিল, "কাল রাত্রেই যাবো—" তার পর তার চেয়েও অনেক বেশী সাহস সঞ্চয় করিয়া লইয়া এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল, "যদিও কাল ফিরতে না হলেই খুব বেশী সুখী হতেম।"

করবী মুখে কিছু জবাব দিল না, মুখ তুলিয়া হিরণ্ময়ের দিকে চাহিয়া একটুখানি হাসিল। হিরণ্ময়ের মনে হইল, হাজার হাজার গোলাপ-ফুলের পাপড়ী দিয়া যেন ঐ দু'খানি ঠোঁট তৈরী করা হইয়াছে, আর তার প্রান্তের ঐ হাসির ছোপটুকুও যেন সহস্র চাঁদের অফুরন্ত সুধার নির্ঝর! তার সমস্ত বুকখানা যেন চন্দ্রালোকিত সাগর-তরঙ্গের মতই মত্ত আবেগে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। আবেগ-স্পন্দিত কণ্ঠে সহসা সে মিনতিভরা স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি যদি মাকে আমাদের বিয়ের দিনস্থির একটু শীঘ্র ক'রেই করতে অনুরোধ জানাই, আপনার তাতে কোন আপত্তি আছে কি?"

করবীর মুখে তার বুক হইতে ছুটিয়া আসিয়া একটা তপ্ত রক্তের উচ্ছ্বাস আছাড় খাইয়া পড়িল। তার চোখ নাক কাণ যেন গরম পশ্চিমে হাওয়া লাগার মত অন্ত-র্বাষ্পের তাপে তপ্ত হইয়া রাঙ্গিয়া উঠিল। এক মুহূর্ত্ত সে প্রাণপণ বলে আপনাকে সামলাইয়া লইবার জন্য নীরব থাকিল। তার পর জোর করিয়াই প্রগল্‌ভভাবে ঈষৎ হাস্যের সহিত উত্তর দিল,—"না, আমার আপত্তি নেই; কিন্তু আপনি আমায় 'আপনি' বলছেন কেন?"

হিরণ্ময়ের সমস্ত দেহ যেন সুখাবসাদে শিথিল হইয়া আসিল, বুক তার আনন্দে দুরু দুরু করিয়া কাঁপিতেছিল। কোনমতে আত্মসম্বৃত হইতে হইতে সে-ও মৃদু হাসিয়া জবাব দিল, "সে ভুল ত আপনিও করছেন। অন্যায় জেনেও নিজেই সে অপরাধ করছেন কেন, এ কথা আমিও ত আপনাকে জিজ্ঞেস করতে পারি?"

করবী লীলাভরে অপাঙ্গে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল, কহিল, "কৈ, আপনি ত সে কথা বলেন নি, আমিই প্রস্তাবটা উপস্থাপিত করেছি। এ ক্ষেত্রে আপনিই আগে আমার প্রস্তাবটাকে সমর্থন করবেন।"

হিরণ্ময় সাহসভরে উত্তর করিল, "তাই যদি আপনি চান, না, তুমি চাও, তাই হবে, কিন্তু তোমাকেও আমি এই অনুরোধ জানাচ্ছি।"

এই সমস্ত আলাপ-আপ্যায়নের মাঝখানেও করবী বেশ নিশ্চিন্ত শান্ত হইতে পারে নাই, তার মনের মধ্যটায় যেন বিঁধিয়া থাকা কাঁটার মত কি একটা ব্যথার কণ্টক ফুটিয়া ফুটিয়া খচ-খচ করিয়া উঠিতেছিল। আপনাকে সে কোনমতেই প্রশ্রয় দিতে পারিল না। সহজ সরলভাবেই আলাপ সুরু করিল, হাসি-মুখে উত্তর করিল,—"বেশ, তাই হবে। দু'জনেই দু'জনকে 'তুমি' বলা যাবে। আচ্ছা, সত্যি সত্যি মলু যে রকম বর্ণনা করতো, তুমি কি ঠিক সেই রকমই?"

হিরণ্ময়ের মুখের উপর তপ্ত রক্তের একটা ঘন উচ্ছ্বাস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, সে ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া পড়িল এবং নতমুখে থাকিয়াই অপ্রস্তুতভাবেই এই প্রশ্ন করিল, "বলুন, আপনি কি শুনেছেন? অপরাধ জানতে পারলে আত্ম-সমর্থনের চেষ্টা হয় ত করতেও পারি।"

করবী হাসিয়া তার চঞ্চলতারক বৃহচ্চক্ষুর বিদ্যুদ্বর্ষী দৃষ্টি হানিয়া সাবলীল ভঙ্গীতে জবাব দিল, "বাঃ, আমি বুঝি আপনাকে কোন অপরাধের কথা বল্লুম? মল্ তার দাদাকে যে রং দিয়ে এঁকে এসেছে, তাতে পৃথিবীর মাটীর গন্ধ কোন দিনই খুঁজে পাইনি। আচ্ছা, সত্যিই কি আপনি সাধারণের মতই হাসি-কান্নায় ভরা মানুষ নন? কল্পনায় গড়া দেবতামাত্র? আমি কিন্তু একেবারে পৃথিবীর লোক, ঘোর সংসারী! আচ্ছা, আপনি কখন নভেল পড়েননি বোধ হয়? প্রেম, প্রণয় এ সবকে আপনি হয় ত সেন্টিমেণ্ট বা ছেলেখেলা মনে করেন, না? কিন্তু এই দেখুন, আমরা দু'জনেই ফের সেই 'আপনিতে'ই ফিরে চ'লে এসেছি!"

এই অপ্রত্যাশিত তাহারই আলোচনায় হিরণ্ময়কে একবারে যেন লজ্জায় মাটী করিয়া দিল। সে বিব্রত বিপন্নভাবে ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া নিজের বক্তব্য স্থির করিয়া লইল, তার পর কোনমতে বলিয়া ফেলিল, "তুমি আমাকে তোমার মত ঘোর সংসারী তৈরী ক'রে নিও।"—একটুখানি থামিয়া তার পর বলিল, "এ কথা সত্যি যে, আমি এর আগে কখন প্রেম-প্রণয়ের কাহিনী প'ড়ে রস পাই নি। মনে হতো, ও সব কবি-কল্পনা; কিন্তু আর ত এখন তা ভাবতে পারবো না, এখন যে গর্ব্ব টুটে গেছে।" এই বলিয়া রুবির সহসা আনত দীর্ঘ-পল্লবাবৃত চোখের দিকে সতৃষ্ণ-নয়নে চাহিয়া আবার বলিল, "তা ছাড়া আজকেই বিশুদ্ধ প্রেমের যে একটি করুণ কাহিনী শুনতে পেলুম, উপন্যাসের কোন্ কাহিনী আর তার চাইতে বেশী ত্যাগের পবিত্রতায় পূতশুদ্ধ?"

করবী হিরণ্ময়ের প্রতি একান্তভাবেই নিজের মনটাকে সঁপিয়া দিলেও তার মনের আনাচের ধারে ধারে একটা বেতালের উপদ্রব দেখা দিয়াছিল। তার কুমারীচিত্ত তাকে ধিক্কার দিতে চাহিয়া বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল যে, "ছি, আর এক জনের হাতেও এক দিন তুই এমনি ক'রেই নিজের মনকে সঁপে দিয়েছিলি, আজ আবার এ কি কাণ্ড!" সে ধমক দিয়া বলিল, "বয়ে গেল! বিয়ে ত আর হয় নি, মেমরা যে ডাইভোর্শ ক'রে আবার বিয়ে করে; আমাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন জাত ব'লেই এত ভয় সঙ্কোচ। কিসের ভয়, সে কে তোর যে তার জন্য!"—সদম্ভে মুখ ফিরাইয়া লইয়া সে হিরণ্ময়ের প্রতি মনের রাশটাকে একেবারেই ছাড়িয়া দিল, আবেগপূর্ণ-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—"এখানে এসে শুনতে পেলে? সত্যি কথা? কার কথা বলছো? আমি ত তেমন কারুকে জানি নে, তবে কন্টিনেণ্টাল নভেল আর তারই অনুকরণে আমাদের বাঙ্গালা উপন্যাসে গল্পে আজকাল যে সব কাহিনী পড়া যায়, তাতে শুদ্ধাচারটার নেই বটে, কিন্তু রস যথেষ্ট আছে। তুমি কি সেকেলে আদর্শবাদী?"

হিরণ্ময় ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। আবার আপনাকে সামলাইবার জন্য কিছুক্ষণ নিরুত্তরে উত্তর স্থির করিয়া লইয়া তার পর ধীরকণ্ঠে সে উত্তর দিল, "হয় ত আমি তাই এবং আমার মনে হয়, উচ্চ আদর্শ শুধু সেকেলেরই নয়, সর্ব্বকালের—এই আমি যার কথা বলছিলুম, এখানের বসন্ত বাবুর ছোট ছেলে শশাঙ্ক একটি মেয়েকে ভালবাসে ব'লে মা-বাপের নির্ব্বাচিত মেয়েকে বিয়ে করতে কিছুতেই সম্মত হয় নি, তাইতে বাপ তাকে রাগ ক'রে ত্যাজ্যপুত্র ক'রে গেছেন। আশ্চর্য্য! অমন গুণবান্ সুবিদ্বান্ ছেলে, তাকে অনর্থক এই সামান্য কারণে এত বড় শাস্তি দেওয়া, এ কি বাপের যোগ্য?"

তড়িৎস্পৃষ্টার মতই রুবি শিহরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। হিরণ্ময়ের হাত উন্মত্ত পাগলের মতই কঠিন বলে জোর করিয়া চাপিয়া ধরিয়া সে অর্দ্ধ-মূর্চ্ছিত অর্দ্ধ-উত্তেজিত উদ্‌ভ্রান্ত স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, "সত্যি? সত্যি এ কথা? সত্যি বলছো? সত্যি বলছো, সে এক জনকে ভালবেসেছিল ব'লে আজ পথের ভিখারী হয়েছে? ভুল নয়? মিথ্যা নয়? গল্প, কল্পনা, রটনা কিছুই নয়? সত্যি এ কথা?"

হিরণ্ময়ের বুকের মধ্যে অকস্মাৎ একটা ভাবী অশুভের কালমেঘ বজ্রধ্বনি করিয়া উঠিল। সে বিহ্বলব্যাকুল সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে করবীর আবেগোত্তেজিত রক্তবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, তার মর্ম্মতল হইতে কে যেন একটা আর্ত্ত বিলাপ করিয়া কহিল, "তোমার এই সুমিষ্ট কল্পনাটুকু 'Fools Paradise' মাত্র। তোমার জন্য সত্যকার এ[illegible]

বসুমতী প্রেস]　　　বেদুইন-তরুণী　　　[শিল্পী—শ্রীচারুচন্দ্র সেনগুপ্ত।

কিছুই নাই। তথাপি সে বিস্মিত কণ্ঠে মৃদুস্বরে কহিল, "না, এ খবর ত মিথ্যা নয়। আমার বাবাকেই উইল লিখতে ডাকা হয়েছিল। তিনি লেখেননি, কিন্তু তার জন্য কি লেখা আটকায়? শুনলেম, শশাঙ্ককুমার এর জন্য কিছুমাত্র দুঃখিত নন; কিন্তু কেন, কেন, তুমি এ রকম করছো কেন? রুবি! করবী! কি হলো? আমি কি না জেনে—"

করবীর সর্ব্বশরীর থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল, তার সমস্ত মুখ ছাইএর মত বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল, সহসা সে হিরণ্ময়ের হাত ছাড়িয়া দিয়া অসম্বরণীয় উচ্ছ্বাসে কাঁদিয়া উঠিয়া টেবিলের উপর হাতের মধ্যে মুখ গুঁজিল, "শশাঙ্ক আমার জন্যেই আজ সর্ব্বস্বান্ত—ভিখারী,—আর আমি? আমি কি?"—

হিরণ্ময় শুনিল। একটি মুহূর্ত্তের মধ্যেই তার মনের কপাট খুলিয়া গিয়া সে সবই দেখিতে পাইল, বুঝিতে তার কিছুই আর বাকি রহিল না। তার সমুজ্জ্বল নেত্র-তারকায় যে ভাব সেই মুহূর্ত্তেই ফুটিয়া উঠিল, তাহা ব্যথাতুরের যন্ত্রণাভিব্যক্তি, তার ঠোঁটের পাশের হাস্যস্মিত প্রসন্নতা বিলুপ্ত হইয়া গিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার স্থলে সুব্যক্ত হইল সুগভীর হতাশার আর্ত্ততা, তার কণ্ঠমধ্য হইতে তার প্রত্যেকখানি পাঁজরা খসাইয়া দিয়া যে দীর্ঘশ্বাসটা স্বতঃই উৎসারিত হইয়া উঠিল, তাহা একটা প্রাণ-ফাটা আর্ত্তনাদ ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিন্তু মানসিক শক্তিবলে নিজেকে সে জোর করিয়াই জয় করিল। কণ্ঠের কম্পন ও স্বরের জড়তাকে সবলে নিরোধ করিয়া সহানুভূতিপূর্ণ শান্ত স্বরে কথা কহিল, ধীরকণ্ঠে বলিল,—"আমি হয় ত ভুল করছিনে, আমার মনে হচ্ছে, এ বিয়েতে আমরা দুজনের এক জনও হয় ত সুখী হতে পারবো না।"

হিরণ্ময়কে তার বক্তব্য শেষ করিতে না দিয়াই করবী উঠিয়া তার পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়িয়া, অশ্রুবাষ্প-নিরুদ্ধ গদ্‌গদ স্বরে কহিয়া উঠিল,—"আপনি মহানুভব, আমি পাপিষ্ঠা—"

হিরণ্ময়ের বুকের মধ্য দিয়া পুনশ্চ একটা ব্যথার বিদ্যুৎ হানিয়া গেল। তার চোখের তারায় তার বুকের ব্যথা স্পষ্ট প্রকটিত হইল, কিন্তু তার বাক্যে এবারেও তার বিন্দু-মাত্র আভাস পাওয়া গেল না। হেঁট হইয়া করবীর হাত ধরিয়া তাহাকে ভূমি হইতে উঠাইবার চেষ্টা করিয়া সে প্রশান্ত উদারতার সহিত কহিল—"আমি তোমায় মুক্তি দিচ্ছি, করবী!"

তার পর দুজনেই অনেকক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিল, হিরণ্ময় স্তব্ধ স্থির আত্মস্থৈর্য্যসম্পন্ন। করবী বিবশা, বিহ্বলা, শোকভারস্তম্ভিতা, তার আনত দুই নেত্র হইতে তখনও অশ্রুবিন্দু ধীরে ধীরে ঝরিয়া পড়িতেছিল।

সন্ধ্যার অন্ধকার কখন্ অলক্ষিতে নিঃশব্দপদসঞ্চারে ঘরের ভিতর আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, জানালা দিয়া কোন্ সময়ে যে সন্ধ্যা-তারারা তাদের দিকে কৌতূহলী নেত্রপাত করিতেছিল, কেহই তা জানিতে পারে নাই। অনেকক্ষণ পরে যেন কোন গভীর চিন্তা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া হিরণ্ময় কহিল,—"কাল আমাদের বাড়ী থেকে তোমায় আশীর্ব্বাদ করবার কথা ছিল, কিন্তু তার বদলে আজ আমিই তোমায় আশীর্ব্বাদ ক'রে যাচ্ছি, করবী! তুমি—তোমরা সুখী হয়ো। এর জন্য গুরুজনদের যা বলতে হয়, আমিই বলবো, তার জন্যে তুমি নিজেকে ব্যস্ত করো না।"

সেই অশ্রুঝরা মৌন মুখে নীরবে নতদেহে করবী হিরণ্ময়ের পায়ের কাছে প্রণাম করিল। [সমাপ্ত।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

স্ত্রীলোকের পালা, ইহাতে প্রায় ৩০।৪০ জন স্ত্রীলোক হাতে খঞ্জনী লইয়া একত্র গান করে ও অঙ্গ দোলায়। ২ জন পুরুষ মৃদঙ্গ বাজায়, গানের স্বর অপেক্ষাকৃত মধুর, ইহা ঝুলন উপলক্ষে হইয়া থাকে। (৩) 'খুলং ইশৈ'—ইহা মণিপুরী জাতীয় গীত, বাঙ্গালার কোন সংস্রব নাই, বীণা-যন্ত্র লইয়া পুরুষরা বাজায়; গান মেয়ে পুরুষ একসঙ্গে করে, ইহা অনেকটা জুড়ীর গানের মত। গানের সহিত অঙ্গভঙ্গীও হয়। (৪) "মরপাক্ জগোয়"—ইহাকে মণিপুরীরা বিদেশী নাচ বলে, ইহা খ্যাম্‌টা জাতীয়, ইহা মাত্র মেয়েরাই করে।

মণিপুরের টাট্টুঘোড়া বিখ্যাত, ইহা যেমন বলিষ্ঠ, তেমনই কর্ম্মঠ। পোলো (Polo) খেলা মণিপুরেই সৃষ্টি হয়, ক্রমে উহা ভারতবর্ষ ও য়ুরোপে প্রচলিত হইয়াছে। মণিপুরীরা পোলো খেলায় খুব অভ্যস্ত। মণিপুরে হনুমান (মুখপোড়া বাঁদর) নাই, রুপী বাঁদর এবং পাহাড়ে নীল বাঁদর ও উল্লুক দেখা যায়। মণিপুরের দাঁড়কাক খুব বড় বড়। কিন্তু এখানে পাতিকাক নাই, শিবারবও এখানে দুর্লভ।

মণিপুর রাজপ্রাসাদ নূতন নির্ম্মিত হইয়াছে, ইহার বর্ণ শ্বেত এবং ইহা অনেকটা বিখ্যাত ফতেপুর-সিক্রির প্রাসাদের অনুকরণে হইয়াছে, রাজপ্রাসাদের দক্ষিণে দরবার হল, এখানে মহারাজার দরবার বসে। রাজপ্রাসাদের বামে সুন্দর শ্বেতবর্ণ শ্রীশ্রী৺গোবিন্দজীউর মন্দির। উহারই পশ্চাতে রাজার নৃত্যশালা। রাজপ্রাসাদের ঠিক বামেই রাজমহিষীগণের পৃথক্ পৃথক্ মহল। মণিপুরের ৭ মাইল দক্ষিণে হিয়াংথাং নামক পাহাড়ে ৺কামাখ্যা দেবীর মন্দির আছে, সেখানে মহাষ্টমী-পূজার দিবস মায়ের অর্চ্চনা হয়। ঐ দিন মণিপুরের অধিকাংশ লোকই হিয়াংথাংয়ে যায় ও মায়ের নিকট বর প্রার্থনা করে। উহা ইম্ফাল সহরের ৭ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। মণিপুর ইম্ফাল সহর হইতে ২২ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে একটা ৭।৮ মাইল ব্যাপী হ্রদ আছে, উহার নাম লোফতাক। ঐ হ্রদের মাঝে মাঝে 'আঙ্গা', 'কারাং' প্রভৃতি অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। ঐ হ্রদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বড়ই বিচিত্র। শীতকালে নানা দেশজাত বিভিন্ন প্রকারের পক্ষী ও হংস এই হ্রদের তীরে ঝাঁকে ঝাঁকে চরিতে আসে, এবং শিকারীরা দলে দলে শিকার করিয়া বেড়ায়। এই হ্রদটি ময়রাং বস্তীর সন্নিকটে। মোটর-গাড়ী ময়রাং পর্য্যন্ত যাইতে পারে।

রাজপ্রাসাদের বাম ভাগে অবস্থিত পূর্ব্বের যে ৺গোবিন্দজীউর মন্দিরের কথা বলিয়াছি, তাহার সম্বন্ধে একটি জনপ্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়,—রাজা চন্দ্রকীর্ত্তি স্বপ্ন পান যে, রাজবাটীর সন্নিকটস্থ কাঁঠালবৃক্ষে বসিয়া ৺গোবিন্দজীউ ঐখানে তাঁহার মন্দির নির্ম্মাণের এবং ঐ কাঁঠালকাষ্ঠে ৺গোবিন্দজীউর বিগ্রহ-মূর্ত্তি তৈয়ার করিবার আদেশ তাঁহাকে দিতেছেন। স্বপ্নের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া তিনি ঐ কাঁঠালবৃক্ষ ছেদন করেন, ইহাতে নাকি রক্ত বাহির হয়, পরে ঐ কাষ্ঠে বিগ্রহ-মূর্ত্তি ও ঐ স্থানে মন্দির নির্ম্মাণ করেন। ইম্ফাল সহরের কিছু দূরে ল্যাংথাবাল নামক একটি স্থান আছে। সেখানে একটি প্রকাণ্ড ফটক এখনও বর্ত্তমান, মণিপুরীদের বিশ্বাস যে, কোন বিপদের সম্ভাবনা থাকিলে সাবধান করিয়া দিবার জন্য পূর্ব্বে দেবতারা ঐ ফটকে একটি প্রকাণ্ড ঘণ্টা বাজাইতেন।

মণিপুরী রাজপ্রাসাদ

মণিপুরের পার্ব্বত্যজাতির মধ্যে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবাসীদের ভিতর বর্ত্তমানে একটু চাঞ্চল্য দেখা যায়। তাহারা কুকীদের প্রাধান্য স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক বলিয়া বোধ হয়, এবং খুব সম্ভব, এই কারণে নরহত্যার সংখ্যা ঐ স্থানে অধুনা কিছু বাড়িয়াছে।

মণিপুর রাজ্যে একটি আমেরিকান ব্যাপটিষ্ট মিশন আছে। সেখানে পাদ্রীরা খৃষ্টধর্ম্মের প্রচার করেন। চূড়া-চাঁদপুরে মিশনারীদের একটি প্রধান আড্ডা করিবার অভিপ্রায়ে "উত্তর-পূর্ব্ব ভারত সাধারণ মিশনের" সম্পাদক কোলম্যান সাহেব এই বিষয়ে মণিপুররাজের সহিত বর্ত্তমানে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। পূর্ব্বে প্রতি মহকুমায় একটি করিয়া সৈন্যদের ছাউনী ছিল, গত জানুয়ারি হইতে উহা উঠিয়া গিয়াছে, এবং উখরুলের সেনানিবাসটিকে

এক্ষণে ইম্ফালে স্থাপিত ৪র্থ আসাম রাইফেল্স সৈন্যগণের জন্য স্বাস্থ্যনিবাসে পরিণত করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহারাজ চূড়াচাঁদসিংহের জ্যেষ্ঠভ্রাতা সেনাপতি রাজকুমার ছুমুত্র সিংহ মণিপুর-রাজশক্তির সৈন্যাধ্যক্ষ। তিনি রাজদরবারেরও এক জন জুডিসিয়াল মেম্বার, এবং মহারাজ অসুস্থ হইলে বা সফরে যাইলে, মহারাজের সকল প্রকার ক্ষমতা তাঁহার উপর অর্পিত হয়। মণিপুর রাজশক্তির গঠন এইরূপ;—৮ জন ভারতীয় অফিসার, ১৭২ জন রাইফেলধারী সৈন্য, ৫ জন বিউগিল-বাদক ও ২৪ জন ব্যাণ্ডবাদক, সাধারণতঃ মহারাজকে গার্ড অফ অনার দিবার জন্য এই রাজশক্তির প্রয়োজন হয়। ইহারাই মহারাজের প্রাসাদ, জেলখানা, রেভিনিউ আফিস পাহারা দেয় এবং রাজ্যের আভ্যন্তরিক শান্তি-স্থাপনা করে। রাজার বৈদেশিক কোন শক্তির সহিত সংস্রব নাই। এই রাজবাহিনীতে ২ শত অল্প পাল্লাওয়ালা লোডিং লিগ্নফিল্ড রাইফেল আছে, ৯৭টি গাদা বন্দুক আছে এবং উহার অধিকাংশই নাকি বর্ত্তমানে অকর্ম্মণ্য অবস্থায় পড়িয়া আছে। ২টি মার্টিনি হেনরী রাইফেল আছে, উহাতে জেলখানা-রক্ষার কার্য্য হয়। নিভগ্ খোঁজান্ গোলাপসিংহ এক্ষণে এই বাহিনীর সুবেদার মেজররূপে আছেন। এই রাজশক্তি-রক্ষার জন্য বাৎসরিক ৩৭ হাজার ৫ শত ১৭ টাকা ব্যয় হয়।

শ্রীগোবিন্দজীউর মন্দির

রাজকুমার ভাস্করসিংহ এক্ষণে মণিপুর দরবারে পুলিস-সদস্যরূপে বিরাজিত আছেন, এবং তিনিই সিভিল পুলিসের হর্ত্তা-কর্ত্তা। এই পুলিস-বাহিনীতে ১ জন ইন্‌স্পেক্টর, ২ জন সাব-ইন্‌স্পেক্টর, ২ জন এসিষ্টাণ্ট সাব-ইন্‌স্পেক্টর, ৪ জন হেড্ কনেষ্টবল, ৬ জন রাইটার কনেষ্টবল এবং ৩২ জন কনেষ্টবল আছে। একটি গুর্খা কনেষ্টবল ব্যতীত আর সকলেই মণিপুরী। মণিপুর রাজ্যে ইম্ফাল সহরেই মাত্র ১টি থানা আছে এবং সহরের বাহিরে ৪টি পুলিস আউট পোষ্ট আছে। ইহার মধ্যে মাও ফাঁড়ীই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। কারণ, ইহা মণিপুর-ডিমাপুর রাস্তার উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা ব্যতীত বৃটিশ রিজার্ভ শান্তিরক্ষার জন্য পলিটিকাল এজেন্টের অধীনে ১ জন সাব-ইনস্পেক্টার ও ৭ জন কনেষ্টবল আছে। পার্ব্বত্য প্রদেশে বিশেষ কোন পুলিসের বন্দোবস্ত নাই, ল্যাম্বাসরাই ঐ স্থানে রাজ্যের দূত ও পুলিসের কার্য্য করে। পূর্ব্বে পার্ব্বত্য অঞ্চলেও বিচারের জন্য মধ্যে মধ্যে আদালত বসিত, এক্ষণে সবই ইম্ফালে হয়। অধুনা মণিপুরে দলিল প্রভৃতি প্রয়োজনীয় কাগজাদি রেজিষ্ট্রী করিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। মণিপুর সহরে কোন মিউনিসিপালিটী নাই।

বৃটিশ রিজার্ভে মিউনিসিপালের সমুদয় কার্য্যই একটি কমিটীর দ্বারা হয়। উহাতে পলিটিক্যাল এজেন্ট ও ৫ জন সভ্য থাকেন। ইহার ব্যয়বহনার্থে মণিপুর-রাজ বাৎসরিক ৫ হাজার ৫ শত ৬০ টাকা দিয়া থাকেন, বাকি করস্বরূপ প্রজাদের নিকট আদায় করা হয়। এই কমিটীই ইম্ফাল সহরের মিউনিসিপালিটীর কার্য্য করেন, এবং মণিপুর-রাজ ঐ খরচ বহন করেন। এখানে কোন ট্রাফিক পুলিস নাই। ইম্ফাল সহরে ২টি বাজার আছে। এখানে প্রত্যহই বৈকালে বাজার বসে। সদর বাজার ও ম্যাক্সওয়েল বাজার। ইহার মধ্যে ম্যাক্সওয়েল বাজারই খুব বড়। কর্ণেল ম্যাক্সওয়েল এক সময়ে পলিটিক্যাল এজেন্ট ছিলেন। তিনি চলিয়া যাইবার পর কর্ণেল সেক্সপীয়ার পলিটিক্যাল এজেন্ট হন, এবং তিনিই এই নূতন বাজারের নামকরণ করেন। এই বাজারে সকল প্রকার খাদ্যদ্রব্য, তরিতরকারী, মৎস্য ও বস্ত্রাদি বিক্রয় হয়, ইহার মধ্যে মণিপুরজাত বস্ত্রের বিক্রয়ই অধিক।

মণিপুরে কোন বিদেশীকে ৭ দিনের বেশী থাকিতে দেওয়া হয় না। ইহার বেশী এক দিন থাকিলেও ঐ রাজ্যের নিয়মানুসারে প্রত্যেক বিদেশীকে সেই বৎসরের জন্য ৫৲ হিসাবে কর দিতে হয়।

মণিপুর পার্ব্বত্য অঞ্চল বলিয়া বর্ষার প্রকোপ অধিক হইলে একটানা পার্ব্বত্য নদীগুলি অচিরেই স্থূলকায়া ও বেগবতী হয় এবং মধ্যে মধ্যে দেশে বন্যার প্রকোপ বেশ উপলব্ধি হয়। গত

১৯২৯ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে অত্যন্ত বারিপাত হওয়ায়, ইম্ফাল ও নম্বুল নদী প্রচণ্ডশক্তিশালিনী হয় এবং উভয় কূল প্লাবিত করিয়া খরতর বেগে বহিতে থাকে, অচিরে সমস্ত ইম্ফাল সহর, সেনা-নিবাস প্রভৃতি জলমগ্ন হয়। উপত্যকার দক্ষিণস্থ প্রদেশের অবস্থা আরও ভীষণ হইয়া উঠে। ইরিল নদীর জল এত দ্রুত বাড়িয়া উঠে যে, অবিলম্বে রাজপ্রাসাদ ও তৎসংলগ্ন সমুদয় অফিসাদি জলমগ্ন হইয়া যায়। ইহাতে রাজ্যের বহুতর ক্ষতি হয়। ইম্ফাল সহরের ১৪ মাইল উত্তরপূর্ব্বে লাইমাখান পাহাড়ে যেখান হইতে সহরে বিজলী সরবরাহের বন্দোবস্ত হইতেছে, সেখানে Hydro Electric plant এর যথেষ্ট ক্ষতি হয় এবং ঐ জন্য সহরে এখনও বিজলী সরবরাহ ঘটিয়া উঠে নাই। এই প্রবল বন্যার জল সহরের উপর ১০ই জুন হইতে ১৩ই জুন পর্য্যন্ত থাকে। ইহাতে টেলিগ্রাফের লাইন ভগ্ন হয় এবং টামু ও বর্ম্মার পথ ঘুরিয়া ঐ কয় দিন তার প্রেরিত হয়। মোটরের ডাক যাহা ডিমাপুর হইতে মণিপুরে যায়, তাহাও ঐ কয় দিন বন্ধ থাকে। এইরূপ নানাবিধ ক্ষতি ও অসুবিধা হইলেও শস্যের বিশেষ ক্ষতি হয় নাই, বরং জমীতে বন্যার জলে পলি পড়ায় এবং পুনরায় শস্য-রোপণের সময় অতিবাহিত না হওয়ায় শস্য আশাতীতরূপ হইয়াছিল।

মণিপুরে চাউলই প্রধান শস্য, এবং ষোল আনা শস্যের মধ্যে ইহাই বারো আনা। বাকি ইক্ষু, তামাক, গম, তুলা, সরিষা, আলু ও লঙ্কা। এ দেশ হইতে চাউল, মণিপুরী বস্ত্র, গুড়, লঙ্কা, সরিষার তৈল, ঘৃত, মোম, হাতীর দাঁত, পায়রা, মহিষ ও টাট্টু ঘোড়া বিদেশে রপ্তানী হয়। গত বৎসরে ১ লক্ষ ৬৪ হাজার ৫ শত ১০ মণ চাউল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল। আমদানী দ্রব্যের মধ্যে বিদেশী বস্ত্র, কেরোসীন তৈল, লবণ, শুঁটকী মাছ, চুণ, সুপারী, সিগারেট, সূতা, সৌখীন দ্রব্যাদি ও লৌহদ্রব্যাদি।

এক্ষণে মণিপুরে ১ শত ৫৬ খানি মোটর-লরী চলিতেছে। ঘোড়ার গাড়ীর মধ্যে একাই দেখা যায়। সহরের মধ্যে ট্রাম বা রেলওয়ে কিছু নাই। এই মোটর-লরীর উপর আসাম গভরমেণ্ট একটা মোটা রকমের টেক্স ধার্য্য করিয়াছেন। দিন-মজুরীর হার মণিপুরে বেশ সুলভ। খাস মণিপুরে রোজ ।৶০ আনা এবং পার্ব্বত্য অঞ্চলে ।০ আনা। মণিপুর ইম্ফাল সহরে ৪টি এবং পার্ব্বত্য অঞ্চলে ৪টি হাঁসপাতাল আছে। ইহা ব্যতীত কুষ্ঠাশ্রম ও ১২টি ডিস্পেন্সারী আছে।

শিক্ষাবিষয়ে মণিপুর বড় বেশী অগ্রসর দেখিলাম না। এখানে ইম্ফাল সহরে Johnston H. E. School নামে মাত্র একটি হাই স্কুল আছে। ইহার বর্ত্তমান ছাত্রসংখ্যা ৩ শত ৭টি। তিনটি মধ্য-প্রাথমিক স্কুল আছে, ইহার মধ্যে ইম্ফালে একটি বাঙ্গালী স্কুল ও উখরুল ও কাঙ্গ্‌ পোক্‌পিতে ২টি মিশন স্কুল। শেষোক্ত ২টি American Baptist Mission দ্বারা পরিচালিত হয়। ইম্ফালে ৩টি উচ্চ প্রাথমিক ও একটি বালিকা-বিদ্যালয় আছে। এই বালিকা-বিদ্যালয় ও বাঙ্গালী স্কুলটি প্রবাসী বাঙ্গালী সমাজের প্রচেষ্টায় স্থাপিত হইয়াছে। বালিকা-বিদ্যালয়টির নাম—Lady Earle Girl's School। মণিপুর-রাজ্যের বৃত্তি লইয়া এক্ষণে ২০টি ছাত্র বিদেশে শিক্ষালাভ করিতেছে।

মণিপুরীরা ঘোরতর অদৃষ্টবাদী। ইহাদের প্রকৃতি স্বভাবতই কোমল এবং ইহারা ভাগ্যচক্র ও বিধির নির্ব্বন্ধের উপর অত্যন্ত আস্থা স্থাপন করেন। বৈজ্ঞানিক জগতের সহিত ঘনিষ্ঠতার এখনও বহু বিলম্ব। রাজ-দরবারের সদস্য হওয়াই মণিপুরী যুবকের সর্ব্বাপেক্ষা বড় উচ্চাভিলাষ। ধর্ম্মবিষয়ে ইহারা পূরা বৈষ্ণব, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বৈষ্ণবমতানুযায়ী যে মোক্ষ, তাহাই মণিপুরীদের কাম্য।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, বর্ত্তমান মণিপুরে বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ আছে। পুরাকালের কথা ছাড়িয়া দিলেও, অনুসন্ধান করিয়া আমরা যতদূর জানি, ইদানীন্তনকালে বাঙ্গালীর মধ্যে বাবু ভুবনমোহন সেনগুপ্ত মহাশয়ই মণিপুরে প্রথম আগমন করেন। তিনি এই স্থানে পলিটিক্যাল এজেণ্টের অধীনে হেড ক্লার্কের কার্য্য করিতেন। তখন অন্য কোন বাঙ্গালী এখানে ছিলেন না। এখানে আসিয়া তিনি মণিপুরী স্ত্রী গ্রহণ করেন, এবং দক্ষতার সহিত অনেক দিন কর্ম্ম করেন, কিন্তু পরিশেষে রাষ্ট্রীয় কোন গুপ্ত সংবাদ প্রকাশের অভিযোগ তাঁহার উপর আরোপিত হয় ও সেই কারণে তিনি মণিপুর হইতে বহিষ্কৃত হন। ইহার পর রসিকলাল কুণ্ডু মহাশয় ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত হন। রসিক বাবু মণিপুর ষ্টেটের উন্নতিকল্পে নানাবিধ কার্য্য করেন এবং যথেষ্ট সুখ্যাতিও অর্জ্জন করেন। পলিটিক্যাল এজেণ্ট কর্ণেল ম্যাক্সওয়েল সাহেবের সময় তিনি কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন, এবং গভরমেণ্ট তাঁহার কর্ম্মে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে রায় বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করেন ও তাঁহার জন্য একটি স্পেশ্যাল পেন্সন্ নির্দ্দিষ্ট হয়। এক্ষণে রসিক বাবুর সুযোগ্য পুত্র বন্ধুবর মনোমোহন কুণ্ডু মহাশয় পলিটিক্যাল এজেণ্ট আপিসে রেজিষ্ট্রারের পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। রসিক বাবুর সহিতই শ্রীরামপুরনিবাসী বাবু উমেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় মণিপুরে আসেন ও প্রথমে মণিপুর ষ্টেটে, পরে পলিটিক্যাল এজেণ্ট আপিসে কেরাণীর কার্য্য করেন। ঐ সময়ে সিলেট-নিবাসী রামলাল পাল নামক এক ব্যক্তি

মণিপুরে ঠিকাদারের কার্য্য করিতেন। তিনি উমেশ বাবুকে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে অনুরোধ করেন। উমেশ বাবু রামলাল বাবুর সাহায্যে ও পরামর্শে অচিরে ব্যবসায় উন্নতি লাভ করেন ও মণিপুরে এক জন প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যবসায়ী বলিয়া অচিরে পরিগণিত হন। এক্ষণে তাঁহার সুযোগ্য পুত্রগণ কারবার দেখিতেছেন। উমেশ বাবু এখনও জীবিত আছেন, বয়স ৮০ বৎসর।

রামলাল পাল মহাশয় মণিপুরে রসিক বাবুর ভৃত্যরূপে আসেন। ক্রমশঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঠিকাদারীর কার্য্য করাতে কিছু সঙ্গতি অর্জ্জন করেন। ১৮৮৬ খৃঃ তৃতীয় ব্রহ্ম-যুদ্ধের সময় তিনি সৈনিকদিগের রসদের জন্য চাউল সরবরাহের কনট্রাক্ট পান এবং তাহাতেই স্বীয় অদৃষ্ট ফিরাইয়া লয়েন। তিনি এখানে দেবতা প্রতিষ্ঠা করেন এবং মণিপুরী স্ত্রী গ্রহণ করেন। তাঁহার ২টি পুত্র ও ৩টি কন্যা এখনও বর্ত্তমান।

লেখক—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

১৮৮৩ খৃঃ অব্দে দশঘরানিবাসী শ্রীযুক্ত বামাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সপরিবারে মণিপুরে আসেন। তিনি প্রথমে State Correspondence Clerkরূপে কর্ম্মে যোগ দেন ও পরে State Superintendentএর পদে উন্নীত হন। তাঁহার প্রতিভা বিভিন্নমুখী। ইনি মণিপুরের সমস্ত নষ্ট Administration Record বহু কষ্টে পুনরুদ্ধার করেন। মণিপুরে নূতন করিয়া সার্ভে ও সেটেলমেণ্ট করান এবং Stateর কার্য্যে একটা শৃঙ্খলা আনয়ন করেন। মণিপুর রাজ্যে তখন ইঁহার অসম্ভব প্রতিপত্তি। বর্ত্তমান মহারাজ চূড়াচাঁদ সিংহকে মণিপুর সিংহাসনে স্থাপন করিবার জন্য তিনি তৎকালীন পলিটিক্যাল এজেণ্ট ম্যাক্সওয়েলকে অনুরোধ করেন। ইঁহারই উদ্যোগে ১৮৯৩ খৃঃ মণিপুরে প্রবাসী বাঙ্গালী সন্তানগণের শিক্ষার জন্য Bengali School ও Lady Earle Girl's School স্থাপিত হয়। বাঙ্গালীদের থিয়েটার হল ও ভিক্টোরিয়া ক্লাবও তাঁহার প্রচেষ্টায় হয়। তাঁহারই উদ্যোগে মণিপুরে বাবুপাড়া ও বাবুপাড়া পার্ক নামে একটি যথারীতি বাঙ্গালী পল্লী স্থাপিত হয়। বামাচরণ বাবু অত্যন্ত মহৎ-চরিত্রের লোক ছিলেন। সেই সময়ে যে কোন বাঙ্গালী মণিপুরে আসিলেই তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিত। তিনি প্রায় ৩০ বৎসর দক্ষতার সহিত কর্ম্ম করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। গভর্ণমেণ্ট তাঁহার কর্ম্মের যথোচিত প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে রায় বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করেন। বর্ত্তমানে তাঁহার সুযোগ্য পুত্র সুহৃদ্বর প্রিয়গোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় সমুদয় পিতৃগুণের অধিকারী হইয়াছেন এবং মণিপুর রাজ-ষ্টেটে একাউণ্টেণ্টের পদে নিযুক্ত আছেন। মণিপুরে নূতন কোন বাঙ্গালী ভদ্রলোক আসিলে তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় না। প্রিয়বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত হরিভূষণ মুখোপাধ্যায় বর্ত্তমানে পালিটিক্যাল এজেণ্ট আপিসে একাউণ্টেণ্টের পদে নিযুক্ত আছেন।

প্রতি বৎসর মহামায়ার আগমনে মণিপুরে প্রবাসী বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের চেষ্টায় সমারোহের সহিত প্রতিমা-পূজা ও তদুপলক্ষে অভিনয় ও রঙ্গতামাসাদি হয়। *

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (এম-এ, বি-এল)।

* মণিপুরে অবস্থানকালীন বিশিষ্ট মণিপুরবাসী ও মণিপুরী বন্ধুগণের নিকট মণিপুরীদের আচার, ব্যবহার ও তাঁহাদের ক্রমোন্নতির বিষয় যেরূপ অবগত হইয়াছি, "মণিপুর ভ্রমণ" প্রবন্ধে সেইরূপই লিখিতে চেষ্টা করিয়াছি। মণিপুর বিষয়ে চিত্রের (Photo) পরিচয়াদিও মণিপুরী বন্ধুগণের নিকট অবগত হইয়াছি। অনেক বিশিষ্ট ও শিক্ষিত মণিপুরী লেখকের বন্ধু, সে কারণ লেখক মণিপুরীদের প্রতি স্বভাবতই অনুরাগী। বর্ণনার সত্যাসত্য বিষয়ে কোনরূপ ভ্রম-প্রমাদ থাকিলে এবং কেহ সুযুক্তিপূর্ণ কারণ দর্শাইলে লেখক তাঁহার বা তাঁহাদিগের নিকট বিশেষরূপে অনুগৃহীত থাকিবেন।—লেখক।

পৌরাণিক নাটকে মডার্ণ নোট

আষাঢ়ের রাত্রি। ঝিম্-ঝিম্ বৃষ্টি। দূরে কে গান গাহিতেছিল,—

"সে যদি বাসিত ভালো…"

আমার বুকখানা কাঁপিয়া উঠিল—আহা! ঐ 'যদি'! যদি বাসিত, তাহা হইলে কি না জানি হইত! কি হইত, সে কথা গানে না পাই, ঝাপ্সা-মত বুঝিতে তো পারি। সে ভালো বাসিলে রাজ্য-লাভ হোক্ না হোক্, চাকরি-বাকরি করিয়া ঘরে পিতৃ হইয়া গায়ক বসিতে পারিতেন, রাত্রে নিশ্চিন্তে ঘুমাইতে পারিতেন, এত রাত্রে অমন গান গাহিয়া দুঃখ জানাইতে হইত না!

আরো গান আছে, ঐ 'যদি'র দোহাই দিয়া…

এমন যামিনী, মধুর চাঁদিনী,
সে যদি গো শুধু আসিত!…

ইহাতেও ঐ 'যদি'! যদি আসিত! আসে নাই বলিয়া অমন জ্যোৎস্না-ভরা যামিনীতে প্রাণ একেবারে হাহাকার করিতেছে। 'যদি' আসিত, তবে হাহাকার অন্ততঃ উঠিত না! তাই ভাবি, ইতিহাস, পুরাণ—সর্ব্বত্র ঐ 'যদি'! সূর্পণখা 'যদি' বনে রাম-লক্ষ্মণ-সীতাকে না দেখিত! তাহা হইলে কি হইত? রাবণ সীতা হরণ করিত না, রামচন্দ্রকে বালি-বধ করিয়া তারার অভিশাপ কুড়াইতে হইত না, রাবণ সবংশে মরিত না, লঙ্কা ছারখার হইত না, এবং বেচারী সীতাদেবী অমন অগ্নি-পরীক্ষার অপমান হইতে মর্য্যাদা বাঁচাইতে ভূগর্ভে প্রবেশ করিতেন না! রামচন্দ্র রাজ্য করিতে পাইতেন নির্ঝঞ্ঝাটে এবং বাল্মীকি-মুনিকে দোশরা রামায়ণ লিখিতে হইত; তবে দুর্ভাগ্য ঘটিত বাঙলার নাট্যকারদের। তাঁরা ঐ রামায়ণ অবলম্বনে 'সূর্পণখা', 'তরণীসেন-বধ', 'মহীরাবণ', 'কুম্ভকর্ণ' প্রভৃতি নাটক লিখিবার উপকরণ পাইতেন না। বাঙলা থিয়েটার উৎসন্নে যাইত, বাঙলায় শতকরা নব্বইজন লোক নাটক লিখিবার সাব্জেক্ট পাওয়ার অভাবে নাটক না লিখিয়া কাঞ্চন-জঙ্ঘার অভিযানে বাহির হইতেন এবং ঐ 'রূপ-তরাসী,' 'রঙ-ফ্যাকাশি' প্রভৃতি রঙ্গ-জগতের সমালোচক-দল কলম-কণ্ডূতি রোগে দম্-ফাটা হইতেন। অর্থাৎ ক্ষুদ্র বাঙলা দেশে একটা ওলোট-পালোট ঘটিয়া যাইত! পুরাণ, ইতিহাস—সর্ব্বত্র এ সত্য খাটে। কিন্তু 'যদি' প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করে নাই তাই যা ঘটিয়াছে, আপনাদের কাহারো তা অবিদিত নয়!

বসিয়া বসিয়া অনেক কথা ভাবিতেছি। যা ঘটিয়াছে, তার আর চারা নাই! এই…'যদি'! যদি তখন একালের এই হাওয়া বহিত গো! তাহা হইলে কি হইত, প্রশ্ন করিতেছেন? উত্তরে আমি বলিব, কি না হইতে পারিত, ভাবুন তো!

দশরথ সত্যরক্ষার জন্য রামকে বনে পাঠানোর কথা তুলিলে রাম নিজের ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য ফোঁশ করিয়া উঠিতে পারিতেন; দশরথকে সিংহাচনচ্যুত, কারারুদ্ধ করিতে পারিতেন; কৈকেয়ীকে extern করিতেন; অর্থাৎ রামায়ণের ঐ সর্গটা একেবারে উত্তেজনায় ভরিয়া উঠিত।

ঐ বন-গমন ব্যাপার তাহা হইলে একটা dramatic event হইত!

বসিয়া বসিয়া এমনি কথাই ভাবিতেছিলাম,—সহসা দিব্য দৃষ্টির উন্মেষ হইল। কল্পনা…কল্পনায় রঙ চড়াইয়া 'যদি'র সাধনা করিলে কি হয়!

ঐ রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতির নাট্যশ্রাদ্ধ তো চূড়ান্ত হইয়া গিয়াছে। 'মহীরাবণ' নাটক বা 'নিকষা' মহাকাব্য লেখকের দল কোনো বিষয়েই কিছু লিখিতে বাকী রাখেন নাই। চর্ব্বিত-চর্ব্বণে লাভ কি? তাই New light—আধুনিক বিজ্ঞানের অভিনব সুইচ্ টিপিয়া পুরাণে নূতন বিজলী-আলোক পাত করিলে মন্দ হয় না। Flight of imagination, dramatic skill—একাধারে মিশাইতে পারিলে নব নব রসে বাঙলার রসিক-সম্প্রদায়কে বেজায় মুগ্ধ, অভিভূত করিয়া দিতে পারি!

এসো দেবি কল্পনা লো, উর এই 'পেনে'—
তোমার করুণা লভি 'পেনে' কালি-স্রোতে
ছুটুক নূতন তথ্য, তত্ত্ব রাশি রাশি
প্লাবিত করিয়া যত মাসিক পত্রিকা,
কিম্বা বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চ। বড়ই সুবিধা,
দু'খানা কাগজ যদি হাতে থাকে মা গো,
যা করিব তারি 'পরে মিলিবে বাহবা!
কলমের ডগা'পরে বসায়ে আমায়,
নাট্যকার-শ্রেষ্ঠ সবে বানাবে চকিতে!

চক্ষু মুদিলাম। পুরাণের নব-নব ছবি বুকের পটে ফুটল। ঐ রাম-সীতা বনে চলিয়াছেন মোটরে; লক্ষ্মণ গাড়ী চালাইতেছেন; ঐ সূর্পণখার ক্যাম্প; মোটর-ব্রেক-ডাউন; সূর্পণখার ক্যাম্পে বিশ্রাম; লক্ষ্মণ মিস্ত্রী খুঁজিতে গেলেন; সীতা বনের পাখী ধরিতে; রাম একা হতভম্বের মত বসিয়া, সূর্পণখা চায়ের পেয়ালা আনিয়া ধরিলেন। রাম চাহিয়া দেখেন, তরুণী মূর্ত্তি! সিঁথিতে সিঁদূর নাই! বিধবা? না, কুমারী? প্রশ্ন করিলেন। সূর্পণখা কহিলেন,—কুমারী। লঙ্কায় কলেজ বন্ধ, তিনি হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছেন; শীকার জানেন, সাঁতার জানেন, গানে ফার্ষ্ট প্রাইজ পাইয়াছেন।

বটে! রাম কহিলেন—একখানি গান গাও তো, শুনি।

সূর্পণখা গাহিলেন—একদম হালের মত্ত-করা সেরা স্থরে সেরা কবির চিত্ত-তত্ত্বের বিত্ত-ভরা গান,—

শাঙন-মেঘে চাঙন-বুক এই
　　ভাঙন-বেগে ফাটচে ফট্-ফট্!
জুড়ায় তায় কে,—ফুল-চুমুতে?
　　দিনে-রাতে করচি ছট্-ফট্!
বুলবুলি ঐ ঘুলঘুলিতে, কাক ডাকে সই ফুল-তলীতে,
গুঞ্জ-গানে ভোমরা-বঁধু,—মিথ্যে স্থর এ চিত্তে বুলায়!
ফাটল্ বুকের কল্‌জে পাটল—
　　দাও জুড়ে হে পথিক চট্‌পট্!

সূর্পণখার দুই চোখে শ্রাবণের ধারা ঝরিল।

রাম অবাক! বুঝি, প্রাণের কোণে তাঁর দরদ ফোটে! তিনি চায়ের পেয়ালা রাখিয়া 'বাকলের' প্রান্ত দিয়া সূর্পণখার অশ্রু মুছাইয়া তার হাত ধরিলেন। এমন সময় সীতা নেপথ্য হইতে ডাকিলেন—আর্য্যপুত্র—

রাম চমকিয়া উঠিলেন। এ কি বাধা! তিনি কহিলেন—তিষ্ঠ তরুণী।

রাম সীতার কাছে গেলেন। লাঞ্ছিত অবহেলিত রাক্ষসী-ের বেদনায় সূর্পণখা ফুঁশিয়া কহিল—ঐ নারী! আমার সুখের পথে পাথরের বাধা। ও বাধা সরাতে হবে ইত্যাদি। কিন্তু এত details দেওয়া ঠিক নয়। যেহেতু আমার প্লট লইয়া অপরে যদি কেহ আগে হইড়ে—

নাট্য-জগতে যেরূপ "প্রতিদ্বন্দ্বিতা" সুরু হইয়াছে, বলা যায় না! অতএব আমার লেখা নূতন নাটক 'মন্দোদরী'র নির্ব্বাচিত কয়েকটি দৃশ্য মাত্র আজ লোক-চক্ষুর সম্মুখে ধরিয়া দিতেছি। ইহাতে কাহারো inspiration যদি আসে, আসুক। বাঙলার 'তাজা-রক্তে' প্রাণবন্ত নাট্য-সাহিত্য গড়িয়া উঠিবে! নহিলে পৌরাণিক কাহিনীর চর্ব্বিত-চর্ব্বণে গ্যালারি আর ভুলিবে না। আমি পুরাণ ভাঙ্গিয়াছি যুগ-গ্যালারির খাতিরে। পুরাণ মামুলি উত্তেজনাহীন। নাটক লেখার প্রধান মন্ত্র, গ্যালারির সন্তোষ। নহিলে হাতে তালি বাজাইবে কে? পাৎলা 'টয়লেট্' কাগজে তারিফ উড়াইবে কে? একটা কথা, এই নাটকের গানগুলি কিন্তু আমার লেখা নয়। যাহাকে পাইয়াছি, তাহাকে ধরিয়া গান লিখাইয়া লইয়াছি। তাঁরা গান লিখিয়া আমার প্রাণটুকুকে গোলামির ফাঁশ-টানে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন।

নবযুগের পৌরাণিক নাটক

"মন্দোদরী"

(নির্ব্বাচিত কয়েকটি দৃশ্য)

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

লঙ্কাদ্বীপের সীমানা। মহাসমুদ্র গর্জ্জিয়া চলিয়াছে—
তার ভীষণ তরঙ্গ নিয়তির অট্টহাস্যের মত
ফাটিয়া পড়িতেছে।

(রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, হনুমান ও অঙ্গদ চিন্তাকুলভাবে দণ্ডায়মান। নেপথ্য হইতে রাক্ষস-পুরীর বিলাসিনীগণের বিলাস-সঙ্গীত লোণা-বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে।)

নেপথ্যে রাক্ষস-বিলাসিনীগণের সমবেত গান,—

তাথিয়া তাথিয়া থিয়া থিয়া থিয়া
　　বক্ষ-রক্ত কে দিবে দান?
আমরা হবো সে চরণের দাসী,
　　পায়ে তার সবে সঁপিব প্রাণ!

মন্দ মন্দ বহিতেছে বায়ু—কোন্ তরুণের ফুরালো রে আয়ু?
যৌবন-মদে মত্ত আমরা রক্ত-পিয়াসে মুখ-ব্যাদান!
বিকট দশনে চুম্বন যবে, জুড়াবে চিত্ত, মোহিবে মন,—
প্রণয়-ঝঞ্ঝা-প্রলয়ে অঙ্গ চুর-চুর করি গাহি এ গান!

(সুগ্রীব প্রভৃতি কপিদল গান শুনিয়া আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিল)

রাম। ভয় নাই। সিংহল-বিজয়ে আমার প্রথম সহায়—আমার প্রিয়া!

লক্ষ্মণ। (বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে রামের পানে চাহিল)

রাম। কূটনীতি! কূটনীতি ছাড়া এ দুরন্ত রাক্ষসদলকে জয় করা সম্ভব হতো না! তোমরা বুঝতে পারচো না? নরে-বানরে এইখানে তফাৎ! বানরের মস্তিষ্ক-স্ফুরণে সময় লাগবে। তা ভয় নেই, এটুকু উপকার আমি করবো!

সুগ্রীব। আপনার অভিপ্রায়টুকু সবিস্তারে খুলে বলুন, প্রভু!

রাম। তাই বলি। তোমরা জানো, আমি আজ রাজ্য হতে নির্ব্বাসিত?

হনুমান। কে এমন পামর, শয়তান? আদেশ করুন প্রভু! এই বৃহৎ লাঙ্গুলাঘাতে তার গলদেশ বিজড়িত ক'রে একটি আছাড়ে—

রাম। স্থির হও বৎস! আমি জানি, তোমার শক্তি ভয়ঙ্কর। কিন্তু তাতে ফল হবে না। অযোধ্যার প্রজারা ছাতু খেলেও বুদ্ধি তাদের একেবারে অশ্বডিম্ববৎ নয়!

অঙ্গদ। শুনতে দাও! বলুন প্রভু।

সুগ্রীব। আমায় আপনি অভীষ্ট দান করেচেন। ঐ তারা—তাকে প্রথম যৌবন-উন্মেষ থেকেই চিত্ত দান করেছিলুম। বালী বৃদ্ধ। কি জানে সে তরুণী বানরীর মর্য্যাদা! সন্দেহ হয় বালীর—আমাকে তাই রাজ্য-ছাড়া করে। আপনি বালীকে বধ করায় তারাকে আজ বসাতে পেরেচি আমার চিত্তাসনে। সে জন্য কৃতজ্ঞতা কি নেই?

হনুমান। বানরের যত দোষ থাকুক, নরের মত সে বেইমান, অকৃতজ্ঞ নয়। দুধ-কলায় সে মানে পোষ। সে সাপ নয়।

রাম। পিতা আমায় নির্ব্বাসন দিলেন। লক্ষ্মণ তখনি ধনুকে শর যোজনা করলে। তাই দেখে ভয়ে পিতার প্রাণ-পাখী বহির্গত হলো ধড় ছেড়ে। কিন্তু কৈকেয়ী শক্তি সঞ্চয় ক'রে ফেলেছিল—কেকয়-রাজের মেয়ে। কেকয় পাঞ্জাবে। পাঞ্জাবী শিখ ফৌজ—তারা ভারি গোঁয়ার—বে-ধড়ক লম্বা চেহারা—যেন দুশমনের মূর্ত্তি! তারা এসে চেপে বসলো রাজ্যে। অগত্যা আমায় চুপি- পি চ'লে আসতে হলো বনে! ছাতুর দল তাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে যদি না পারে! তাই।

হনুমান। তার পর?

রাম। পথে দেখা তরুণী সূর্পণখার সঙ্গে। সে প্রণয় যাচনা করলে। পরিচয়ে জানলুম, সে লঙ্কার রাজা রাবণের ভগ্নী—সভ্যা, মার্জ্জিতরুচি। সে চায় মানুষ, জীবন-পথের সাথী করতে। রাক্ষস বর্ব্বর—স্ত্রীকে ঠ্যাঙ্গায়, প্রাণে কাব্য নেই। স্ত্রীকে ভালো বাসতে জানে মানুষ। তখনি তার সঙ্গে চক্রান্ত হয়ে গেল।

লক্ষ্মণ। তাই রাবণ এসে দেবীকে হরণ ক'রে নিয়ে গেল?

রাম। ছেলেমানুষ! তোমায় তখন সব কথা খুলে বলিনি পাছে ষট্‌কর্ণ-ভেদ হয়ে যায়। সীতার সঙ্গেও পরামর্শ করলুম; তার আগে সূর্পণখার সঙ্গে। সূর্পণখা ছুটলো লঙ্কায় রাবণকে নারীর রূপে প্রলুব্ধ করবার অভিপ্রায়ে। সীতাকে বললুম, বনশোভা দেখে বেড়াও। তাকে স্বাধিকার দিলুম। স্পষ্ট বললুম, এ ছাতুর দেশ নয়—খোলো ঘোমটা, বেড়াও প্রমত্ত গৌরবে। দেখুক, বনের লোক, সভ্যতার পালিশে মানুষের রঙে জেল্লা খোলে কত। আসলে, অর্থাৎ বুঝচো?

সুগ্রীব। না প্রভু।

রাম। রাবণ সীতাকে দেখবে। দেখলেই তাকে হরণ করবে। সীতা রাজনীতি-তত্ত্বে খুব অভিজ্ঞ। সীতা ও আমি স্থির করলুম, অযোধ্যা না পাই, অধিকার করবো লঙ্কা। পরামর্শ স্থির হলো, সীতা মায়াজালে রাবণকে বিমুগ্ধ ক'রে লঙ্কায় যাবেন। পরে আমরা যাবো। সীতা সেখানে অসন্তোষ-বহ্নি জ্বালিয়ে তুলবেন। আর সূর্পণখা আছে, সে প্রণয়-পিপাসু। প্রণয়ের বেগ তার এমন যে, তাকে যা বলবো, সে তাই করবে। অর্থাৎ বুঝেচো—আমার লক্ষ্য সূর্পণখা নয়, আমার লক্ষ্য লঙ্কার সিংহাসন। একবার চেপে বসি তাতে—তারপর ছাতুর-হাতে অযোধ্যাকে ছাতু-পেষা করবো।

লক্ষ্মণ। দেখে নেবো ভরতের পাঞ্জাবী ফৌজকে, দেখে নেবো তাদের পাগড়ী আর দীর্ঘশ্মশ্রু!

হনুমান। এখন বুঝচি,—তাই সীতাদেবী আমায় ভর্ৎসনা করলেন, লঙ্কা পোড়াতে ল্যাজে আগুন নিয়ে আমি যখন মাতন সুরু করলুম।

রাম। (সহাস্য) বুঝচো না নির্ব্বোধ, লঙ্কার রাবণ-রাজার আমীরি রুচি। সৌখীন মানুষ। যেখানকার যা ভালো জিনিষ, তাই দিয়ে পুরী সাজিয়েচে। পুড়িয়ে পুরী নষ্ট করলে সে ঐশ্বর্য্যও যাবে। হাজার হোক, আমি ছাতুর দেশে মানুষ হয়েচি, এ রুচি আয়ত্ত করতে আমার তো সময় লাগবে।

সুগ্রীব। বেশ। এখন আপনার দ্বিতীয় আদেশের প্রতীক্ষায় আছি।

লক্ষ্মণ। আমাদের লঙ্কায় প্রবেশ দুন্দুভি-নাদে বিঘোষিত করি?

রাম। ক্ষেপেচো! আমাদের বল তো এই—বানর! ফন্দীতে ফাঁশ লাগাতে হবে। এদের দলে কাকেও লোভ দেখাও, চাকরির গদি দেবো। যে বড় কর্ম্মচারী, তাকে লোভ দেখাও, সিংহাসন দেবো, তার মনে সেই লোভ জাগিয়ে তোলো। দাঁতে কুটো নিয়ে সে তোমায় অলি-গলির সন্ধান দেবে। সহজে কার্য্যসিদ্ধি!

লক্ষ্মণ। যদি সন্দেহ করে?

রাম। মূর্খ! মানুষের কূট-বুদ্ধির মধ্যে প্রবেশ করবে রাক্ষস? ওরা আঁচড়-কামড়ই জানে শুধু। দেহের শক্তি, দেহের বিলাস নিয়ে আছে। মনের শক্তি কত, তা জানে না। মনের চর্চ্চাও করেনি। সহজ দৃষ্টান্ত শুনবে?

লক্ষ্মণ। শুনবো।

রাম। এই যে নারী-হরণ ব্যাপার! আরে মূর্খ, হরণ ক'রে নারীর চিত্ত বশ করবে রাক্ষস? ভয় দেখিয়ে? অসম্ভব। মানুষের বুদ্ধি! মানুষ এটুকু জানে, চোখের নেশা দুদিনের। পরকীয়া-প্রীতি—সে ক্ষণেকের মোহ! একটু পুরোনো হলেই অপর পরকীয়ায় লোভ জাগে। বিশেষ হৃতা-নারী যদি হয় শিক্ষিতা! তাছাড়া এ রাজনীতি। এতে মানুষের লক্ষ্য থাকে ভবিষ্যতে, বর্ত্তমানে নয়।

সুগ্রীব। ঠিক বলেচেন প্রভু। আমি তা হলে দেখি, কোন্ রাক্ষস উৎকোচে বা প্রলোভনে বশীভূত হয়!

রাম। শুনেচি, রাবণরা তিন ভাই। একটা কুম্ভকর্ণ; মোটা, বেজায় নিদ্রালু। আর একটা হলো বিভীষণ। সেই সেনা-নায়ক। তার কাণে লোভের সুর তোলো। বোঝাও, সে আর রাবণ এক মার পেটে জন্মেছে। সেও যে, রাবণও সে। তার হাতে সেনা। সে রাবণের অধীনে চাকরি করবে? আর রাবণ করবে রাজত্ব? না। তাকে বলো, লঙ্কা দু'ভাগ করো; এক ভাগের রাজা হোক রাবণ, আর এক ভাগের রাজা হোক ঐ বিভীষণ! না হলে ক্লীবের মত দাসত্ব করতে বিভীষণের জন্ম নয়!

হনুমান। আমি যাই—প্রভু।

রাম। কিন্তু কি-ভাবে যাবে?

হনুমান। বিদেশী পর্য্যটক সেজে।

লক্ষ্মণ। যদি ধরা পড়ো?

হনুমান। আপনি আমার লাঙ্গুলের শক্তি জানেন না ছোট কুমার বাহাদুর। সে ভয় করবেন না। বানর হলেও আমি ভারত-বাসী। বঙ্গদেশের পাশে কলিঙ্গ—সেখানে বাস। চাতুর্য্যে কলিঙ্গ বঙ্গের ছোট ভাই। বঙ্গের চাতুর্য্য বিশ্ববিশ্রুত! ফন্দী একটা এঁচে নেবো।

লক্ষ্মণ। বেশ।

রাম। তা হলে শুভস্য শীঘ্রং। এখনি কার্য্যারম্ভ হোক। হনুমান যাত্রা করো গূঢ় সংবাদ আনয়নের জন্য। আমরা ততক্ষণ সমুদ্র-স্নানের উদ্যোগ করি। অঙ্গদ, আজ রাঁধবার পালা তোমার। দগ্ধ করো কদলী, আর ছাখো চেষ্টা ছাতুর। লঙ্কার বাজারে সব পাওয়া যায়, শুনেচি। কিন্তু মুদ্রা?

অঙ্গদ। আছে প্রভু। কলিঙ্গ ছেড়ে আসবার সময় প্রচুর মুদ্রা এনেচি। বিদেশে আসচি—মুদ্রা-বলই প্রধান বল। জানি তো!

হনুমান। আমি যাত্রা করি। বলো সকলে রামজীকী জয়!

রাম। আশীর্ব্বাদ করি—নরের মহৎ সঙ্কল্পে, তার বিজয়-অভিযানে বানরের শক্তি সাফল্যে মণ্ডিত হোক্! এসো সুগ্রীব, এসো অঙ্গদ। লক্ষ্মণ, তুমি ছাখো, বাকলগুলো শুকোলো কি না।

লক্ষ্মণ। তাই হবে, দাদা।

[সকলের প্রস্থান।

[আপনারা বলিবেন, পুরাণকে হায়রাণ করা হইয়াছে। পিতৃভক্ত রাম পিতার বিরুদ্ধে ও-সব কথা বলে কি করিয়া? তা ছাড়া এ হীন চক্রান্ত রামের সাজে না—সীতাদেবীকেও এ চক্রান্তে ভিড়ানো sacrilege।—কিন্তু আপনারা বাতুল,

নাট্যরসে রসিক নন—তাই এমন কথা তুলিতেছেন। নাটক কি? না, আটক-হীন উত্তেজনা। ত্রেতাযুগের সত্যরক্ষা? ধিক্! মানুষকে মানুষ করা চাই—এবং modern মানুষ! পুরাতনের কাসুন্দি ঘাঁটিলে নাটক হয় না। পুরানো পুরাণ-ইতিহাসে নূতন নোট যদি দিতে না পারি, তবে পৌরাণিক কাহিনীকে যুগোপযোগী করি কি উপায়ে? বর্ত্তমানের ভাব-ধারা বলিয়া যে কথা উঠিয়াছে, পাৎলা টয়লেট কাগজে যে কথা ছাপা হইতেছে,—এ তাই। বর্ত্তমানের ভাব-ধারা, যুগ-বাণী! সবুর করুন, নাটকের মেওয়া হাতে দিব।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

লঙ্কার প্রাসাদ-কোণে উপবন-কুঞ্জ

মন্দোদরী ও দাসী ভগবতী

মন্দোদরী। (একখানি পত্র ভগবতীর হাতে দিয়া) চুপি চুপি দিবি—কেউ যদি কাছে থাকে তো সন্তর্পণে এক ধারে ডেকে এনে দিবি। বুঝলি—ভারী হুঁশিয়ার, বাঁদী!

ভগবতী। ভয় করে, রাণী-বৌদি।

মন্দোদরী। ভয়! এই নে। (একটা হীরকাঙ্গুরী ভগবতীর হাতে দিয়া) এই তোর বকশিস্। ভয় ভাঙ্গবে এতে?

ভগবতী। তা রাণী-বৌদি—তোমার কাজ যখন, তখন যেমন ক'রে হোক্, ভয় ভেঙ্গে করতেই হবে।

মন্দোদরী। যা। আমি এইখানে থাকবো। বলবি, ভারী জরুরি খবর আছে।

[ভগবতীর প্রস্থান

এ যৌবনে বন্যা বয়ে চলেছে। গঙ্গার স্রোতের বেগে ঐরাবত ভেসেছিল—ও কি ঐরাবতের চেয়েও মোটা? ঐরাবতের চেয়েও ওজনে ভারী? কেমন ক'রে না ভাঙ্গে, দেখি! নন্দন-গন্ধ-মন্থন-করা কি দখিণাই বইচে। একটা গান গাই ততক্ষণ। মনকে উদাস রাখবো না।

গান

আমার এ প্রাণ নয় তো, বন-তটিনী!
ডাগর হৃদয়-সাগর পানে
ছুটচে নেচে নাচ-নটিনী!
কোন্ অবেলায় ফুল-ঝামেলায়
জোছনা-তিথির বন-গীতেলায়,
হৃদ্-পুরের ঐ বাঁশী বাজা
শুনচি বসে ক্ষীণ-কটিনী!
বাসর-জাগা রঙীণ মনে
বুলবুলি গায় ঝিঙের বনে;
সবুজে-ফুলের নাচন দেখেও
প্রাণের খেলায় আমি হঠিনি!

ঐ যে আসচে।

বিভীষণের প্রবেশ

বিভীষণ। ডেকেচো বোঠান?

মন্দোদরী। হাঁ।

বিভীষণ। সকালে এখন কত কাজ! ফৌজের কুচ-কাওয়াজ—

মন্দোদরী। ভারী লম্বা আওয়াজ দিচ্ছ যে দেখচি।

বিভীষণ। তা ছাড়া রাজা-দাদা কাল থেকে অশোক-বনে আছে।

মন্দোদরী। ঐ দাদার সেবায় কাদা হয়েই থাকো! তুমি কি পুরুষ? ছি! নিরেট হাঁদা!

বিভীষণ। কি বলচো? পষ্ট না বললে—

মন্দোদরী। তোমার ব্যথায় ব্যথা পাই, তাই বলি। এ পুরীতে তোমার মুখ চায়, এমন কে-বা আছে!

বিভীষণ। (স্বগত) মার চেয়েও দরদী দেখচি বোঠানকে।

মন্দোদরী। শুনচি নাকি অশোক-বনে এক নারীকে আনা হয়েচে?

বিভীষণ। শুনেচি।

মন্দোদরী। ছেলেমেয়ে বড় হলো, এখনো বাড়ীর মধ্যে এ র‍্যালা।

বিভীষণ। একে রাজা, তায় দাদা—তাঁর বিচার আমার অনুচিত।

মন্দোদরী। তুমি ঐ সাগরের জলে ঝাঁপ দিয়ে মরো তবে। তুমি না নিকষা দেবীর গর্ভে জন্মেচো?

বিভীষণ। জন্মেচি তো।

মন্দোদরী। তবে দাসত্ব করবে কেন? তোমার হাতে ফৌজ—

বিভীষণ। তাই তো! (বিস্ময়ে চক্ষু ছানাবড়া হইল)।

মন্দোদরী। শোনো,—আমি আর পারি না। পলে পলে যৌবনের এ অপমান! আমার মত রূপসী দেখেচো? বলো, বলো,—চাও আমার মুখের পানে। আমি তরুণ রাক্ষসী, তুমি তরুণ রাক্ষস—বলো, বলো—অশোক-বনের সে নারী আমার চেয়েও সুন্দর?

বিভীষণ। (লক্ষ্য করিয়া) বোধ হয়, না।

মন্দোদরী। তবে? তবে? আমার পানে ফিরে চাইবার অবসর নেই তোমার দাদার! সেই রম্ভা, মেনকা… ছি! তার পর এই নারী। শোনো বিভীষণ, আমি তোমায় ভালোবাসি। আমার প্রাণ ভালোবাসার দাহে আফ্রিকার সাহারা হয়ে গেছে! আমার পানে চায়, এমন কেউ নেই। তুমি—তুমি—তুমি আমায় নাও। স'রে যেয়ো না। এ রাজ্য তোমায় দেবো। দশ-মুণ্ড? তাকে ভয়? তার মৃত্যু-বাণ তোমার হাতে তুলে দেবো। ছাখো, কি চাও? দাসত্ব? না, এই তরুণী রাক্ষসীর রাক্ষুসে প্রেম? মাসে মাসে সেনাপতির মাহিনা? না, ঐ লঙ্কার সিংহাসন?—তুমি যে, রাবণও সে! তবে—তবে কিসের দ্বিধা? তুমি এ রাজ্যের শক্তি! ঐ দশমুণ্ডটাকে শুধু আমোদ করার অবসর দেবে? আর তুমি মরবে খেটে? শুষ্ক ভাবনা-চিন্তা নিয়ে? আমোদ করো, প্রমোদ করো, হে তরুণ, যৌবন-সাধনা করো!

বিভীষণ। দেখি, দেখি, ভেবে দেখি—আমার সব কেমন গুলিয়ে দিলে, বৌঠান।

মন্দোদরী। ভাববে কি? রাক্ষসীর যৌবন—তোমার নাগালে। এখন ভাববার সময় নেই। শুধু হাতে তুলে নেওয়া, শুধু বুকে ধরা। এই লঙ্কা—এখনি নন্দনের পটে পরিবর্তন। কিসের খাটুনি? কিসের চিন্তা? এই বাহু—এসো, এ বাহু-লগ্ন হও—মগ্ন রাখবো প্রেম-স্বপ্নে তোমায় অহর্নিশি। (আলিঙ্গন)

বিভীষণ। (সভয়ে নিজেকে মুক্ত করিয়া) ছাড়ো, ছাড়ো, বৌঠান। এসে পড়বে কে।

মন্দোদরী। যে আসে, আসুক! করি না ভয় কাকেও। এ উপবন আমার রাজ্য। এখানে আমি সম্রাজ্ঞী! তোমার দাদা? সে তো একটা অন্ধ। বিশটা চোখ থাকলেও অন্ধ!

বিভীষণ। বৌঠান—

মন্দোদরী। এই যৌবন—ঐ সিংহাসন—রেখো মনে। আজ সন্ধ্যার পর এইখানে এসো। মুখে কিছু বলতে হবে না। যদি মুখের বাণী বন্ধ হয় লজ্জায়, তুমি এলেই আমার অন্তর মন ছন্দে পাগল হবে।—সব কর্শা ক'রে দেবো

বিভীষণ। আমি আসি।

মন্দোদরী। এসো। কিন্তু মনে রেখো। এ প্রণয়-নিবেদনের পর না পাই যদি তোমায় তো তোমার দিন অঙ্গুলির পর্ব্বে। যাও বীর, সেনা-নায়ক—

বিভীষণ। (একবার মুগ্ধ দৃষ্টিতে মন্দোদরীর পানে চাহিয়া) বৌঠান—? না। মহারাণী—? না। কি বলবো? কি ব'লে ডাকবো তোমায়?

মন্দোদরী। (হাসিয়া) ডাকবে? ডাকো—পিয়া, পিয়া—

বিভীষণ। পিয়া! আরে ব্যস্, রাজা-দাদা! আমি ঐ গাছগুলোর ফাঁক দিয়ে পালাই।

মন্দোদরী। পালাও। মোদ্দা মনে থাকে যেন—আজ সন্ধ্যার পর—এই কুঞ্জে—

বিভীষণ। বোধ হয় আসবো। আসতেই হবে। আমার শিরায় শিরায় আগুন ছুটেচে। রাক্ষসীর যৌবন, রাক্ষসের সিংহাসন! আসবো, আসবো, হবে আসতে আমাকে।

মন্দোদরী। ও শিরার আগুন-নির্ব্বাণের ওষধি আছে এই অধর-সুধা-সমুদ্রে। যাও (সন্তর্পণে বিভীষণের প্রস্থান) এই রূপ, এই যৌবন—ফুঃ! রাবণ যে রাবণ! তুমি তো রাবণের ছোট ভাই!

রাবণের প্রবেশ

রাবণ। শুনেচো? শুনেচো রাক্ষসী? লঙ্কার শোভা-সমৃদ্ধিতে নারী মশগুল। হাঁ ক'রে শুধু তাকায়। তার পর ঐ বড় মুক্তার মালা। মুক্তা কখনো চোখে দেখেনি। বলে, এ কি ছাতুর লাড্ডু! হাঃ হাঃ হাঃ! ঐশ্বর্য্যে তাকে মুগ্ধ করেচি। তবে সে চায়—

মন্দোদরী। কি চায়?

রাবণ। সে কি বলেচে,—জানো?

মন্দোদরী। কি?

রাবণ। বলেচে, কেন তুমি হরধনু ভাঙ্গতে পারলে না? গিয়েছিলে তো ভাঙ্গতে! তোমার দশ মাথা, দশ মুখ। দশ মুখে অমন দাঁত। ঐ দশ মুখের বিশপাটি দাঁতের কামড়ে সে হরধনুখানাকে আখের ছোবড়ায় পারো নি পরিণত ক'রে দিতে? আমার শৌর্য্য, বীর্য্য, আমার পরাক্রম, আমার ঐশ্বর্য্য—এ-সব দেখে মশগুল সে বোধ হয়। শুনচো মন্দোদরী? আছে শুধু এক ভয়। রাম যদি এসে হানা দেয়? রাজার

পাহাড় আছে—তার উপর চড়লে আমার দাদার প্রাসাদ দেখা যায়! সোনার লঙ্কা—শোনোনি! তার পর ও দিকে সমস্ত সমুদ্দুর—এসো, এসো—

হনুমান। (স্বগত) নাঃ, আশা নেই। তবু ভালোবেসে ফেলেচি। বানর, বানর, কলা-মুলো সব ফেলে কাকে ভালোবাসলি! রাজার বোন—কিন্তু না, আশা নেই। স'রে পড়ি। রামচন্দ্রকে খপর দি। রাজার বোন তো ছোট কুমার বাহাদুরের উপরই গড়ালো, দেখচি।

[প্রস্থান

সূর্পণখা। (লক্ষ্মণের হাত ধরিল) চমকে উঠো না। এসো। তরুণ তুমি, আমি তরুণী। এই লঙ্কা-দ্বীপ ঐশ্বর্য্যে ভরা। যা চাও, সব পাবে। কিন্তু তার আগে এখানকার যা সেরা মণি—

লক্ষ্মণ। কি সে? কি? (আকুল আগ্রহে সূর্পণখার পানে চাহিল)

সূর্পণখা। আমার হৃদয়, তোমাকে তা দিয়েচি, যেমন দেখেচি।

লক্ষ্মণ। ছি ছি, তুমি দাদাকে ভালোবেসেচো না?

সূর্পণখা। বেসেছিলুম, হয় তো খেয়াল! সে খেয়াল কেটে গেছে। আমার এ রাক্ষুসে প্রেম—কখন জাগে, কখন ঘুমোয়!

লক্ষ্মণ। এঁ্যা—(বিস্ময়-ভঙ্গী)

সূর্পণখা। এখন দেখচি, তোমায় ভালো আরো বেশী বেসেচি। এসো। এসো। এখানে ভিড়। চলো নিভৃত নির্জ্জনে, চলো মৃদু মলয়-বীজনে—

(গান)

জান্ যে যায়-যায়, প্রাণ তোমায় চায়—
নাও গো নাও তায় আমি রূপসী!
ডাকচে বুলবুল, প্রাণ মে চুলবুল—
মেরি জান্ কবুল—কেন দাঁড়াও ঘুপ্সী?
ঢেউ-সুমুদ্দুর, যেমন ঘুরঘুর
ডাঙায় চুরচুর পড়চে আছড়ে—
আমার মন ঠিক, অমনি ঝিক্ঝিক্
তোমার বুকটুক্ মাগচে হাতড়ে!
দরাজ মোর দিল,—ভাঙলে তার খিল—
এখন না এলে মরি যে চুপ্সি!

লক্ষ্মণ। নাঃ, তুমি আমার মন না টলিয়ে ছাড়বে না, দেখচি!

সূর্পণখা। এঁ্যা, কি কথা শোনালে! এসো তবে।

লক্ষ্মণ। কিন্তু দাদা—

সূর্পণখা। ভয় কি! কিছু জানতে পারবে না। তা ছাড়া তার সঙ্গে রাজনৈতিক সর্ত্ত আছে। সে হলো রাজনীতি, আর তোমার সঙ্গে শুধু প্রণয়-নীতি। কোনো স্বার্থ নেই এতে।

লক্ষ্মণ। (স্বগত) নারীর মুখের পানে চাবো না, তা হলেই বীর-ধর্ম্ম রক্ষা পাবে। এ রাক্ষসী—তবে ভয় কি?—চলো রাক্ষসী প্রণয়িনী—লঙ্কায় প্রথম পদার্পণে তুমি—আমার বিজয়-ডঙ্কা!

সূর্পণখা। কোনো শঙ্কা নাই, মানুষ—এসো, এসো! আমার অধরে যত মধু আছে, নিঃশেষে তোমায় পান করাবো। অশোকের ফুলেও এমন মধু পাবে না—ইন্দ্রের সুরাপাত্রও এ মধুর সন্ধান রাখে না! এসো, এসো—

[উভয়ের প্রস্থান

হনুমানের প্রবেশ

হনুমান। জীবনে কাকেও ভালোবাসিনি। কখনো না। একে আজ প্রথম দেখলুম। অমনি ভালোবাসার উদয়। তখনি সে ভালোবাসা আবার অস্তমিতও হলো! এ যেন সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার! যাক্। দীর্ঘ জীবনে আমি কখনো বিবাহ করবো না! বুকে নিশ্বাস পুরে তোমার প্রতীক্ষায় থাকবো, রাক্ষসী। বনের বানরী, নগরের নারী—কেউ আমার মন দোলাতে পারে নি। কিন্তু রাক্ষসী, তুমি—তুমি! (দীর্ঘশ্বাস) হায়, মানুষকে বাসলে তুমি ভালো! মানুষকে জানো না রক্ষ-সুন্দরী! দুদিন পরে প্রণয়-মুগ্ধাকে প্রত্যাখ্যান করে এরা ছেঁড়া চটির মত। যতদিন সে দুদ্দিন তোমার না আসে, তোমার প্রতীক্ষায় থাকবো। দুদ্দিনে? পরিত্যক্তা, অভাগিনী রাক্ষসী, এসো, এই হনুমানের বক্ষে—সজল চক্ষে, শ্রান্ত, ভগ্ন চিত্ত নিয়ে। তখন বুঝবে, রক্ষ-তরুণী, অকৃত্রিম ভালোবাসা বাসতে জানে শুধু এই হনুমান। মুখ পুড়লেও তার প্রেম কখনো পুড়বে না! এ কি! প্রভু—

হাসির হাট!

[সাজসজ্জা ব্যতীত একমুখের রকমারী হাসি]
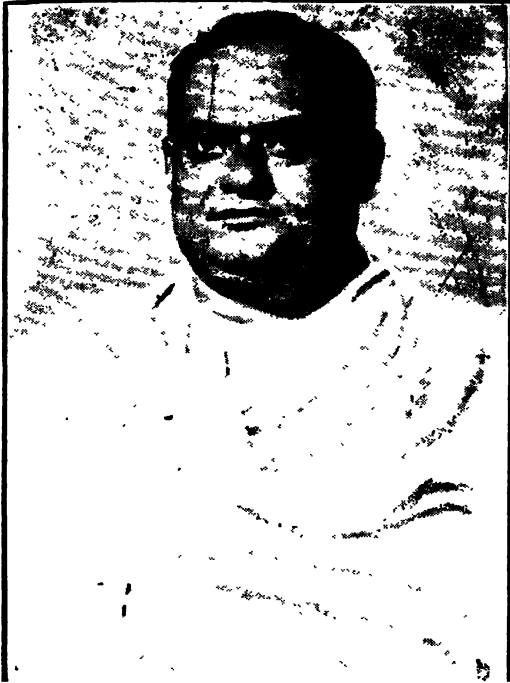
মূর্ত্তিমান্

কচি হাসি

নেয়াপাতি হাসি

শাসে-জলে হাসি

দোমালা হাসি

ডাশা হাসি

দরাজ, পাকা হাসি

বাঘা হাসি

[ক্রমশঃ ।

শ্রীচিত্তরঞ্জন গোস্বামী

রামের প্রবেশ

রাম। লক্ষ্মণ কোথায় ?

হনুমান। তাই তো ! (হতভম্ব-ভাব)

রাম। তুমি যেন কি কথা গোপন করচো ! বলো বৎস হনুমান—

হনুমান। না, না, প্রভু, আমায় কোনো প্রশ্ন করবেন না, আমি তা বলতে পারবো না।

রাম। কি কথা ? কিসের প্রশ্ন ?

হনুমান। তাই, তাই। তার মুখ এর সঙ্গে জড়ানো আছে। নিজের বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে, হয় তো মস্ত সুযোগও সেই সঙ্গে। যাক্ তা—তবু বলা হবে না। তার সুখ চূরমার করতে পারবো না, পারবো না। তুমি প্রভু হলেও সে আমার পোড়া মুখে বাক্যসুধা ফুটিয়ে দেছে, প্রাণে প্রেম-সুধা ছুটিয়েছে ! তোমায় শ্রদ্ধা করি। কিন্তু তাকে ? তাকে আমি ভালোবাসি। রাজা রাম !

রাম। কে কাকে ভালোবাসে, আমি সে কথা জানতে চাই না। আমি লক্ষ্মণকে খুঁজচি।

হনুমান। না, না ! ওঃ, কি করি ? এদিকে প্রভুর আদেশ, ওদিকে তার প্রাণের আরাম। এ কি বিপদে ফেল্‌লে, শিব-শঙ্করী ! আমি পালাই—ছুটে পালাই—আমার প্রভু-ভক্ত নামে কলঙ্ক রটবে ! রামায়ণের পাতা কালো হয়ে যাবে !

[দ্রুত প্রস্থান

রাম। এ কি হলো ! হনুমানের চক্ষে জল, বক্ষে খল ! কম্প্র বচন, মুখে কম্পিত ঝম্প্র নাচন ! এমন তো দেখিনি ! কিষ্কিন্ধ্যা ছেড়ে রাক্ষসের দেশ এই লঙ্কায় এসে বৎস হনুমান কার প্রেমে পড়লো শেষে ! বেচারী ! এই যে বিভীষণ—

বিভীষণের প্রবেশ

এসো বন্ধু—

বিভীষণ। না—ভাগ দেবে না, বলেচে। আমি ভাগ চাই না। পারো আমায় গোটা লঙ্কা দিতে ? বলো, বলো—

রাম। কিন্তু তোমার হাতে রশদ কি আছে, শুনি ! আমার তো প্রবল এই বানরের দল। লাঙ্গুল এদের মহা-অস্ত্র ! তা ছাড়া আঁচড়ে-কামড়ে বিশেষ পারদর্শী। লম্ফ-দানে তৎপর। এতেও কি রাক্ষসকুল পরাস্ত হবে না ?

বিভীষণ। রাবণ ভারী ওস্তাদ—বশীকরণের বহু মন্ত্র জানে। কত অপ্সরী-নারী ভুলিয়েচে—এরা তো বানর —ছুটো কদলীতেই তৃপ্ত হয় !

রাম। বলো কি ! মন্ত্রে তা হলে—।

বিভীষণ। ভয় নেই। রাজনীতিতে অভিজ্ঞা সীতাদেবী যে রাজনৈতিক মিশন্ নিয়ে অশোক-বনে প্রবেশ করেচেন, রাক্ষসদের শোকাকুল না ক'রে ও-বন ছাড়বেন না। সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন, কুমার বাহাদুর—

রাম। কিন্তু এই শক্তি নিয়ে—? ভাবনার কারণ হলো ! নেহাৎ ছাতুখোরের বুদ্ধি !

বিভীষণ। (জনান্তিকে) ভয় নেই। আমার সহায় রাবণের রাণী মন্দোদরী।

রাম। রাবণের স্ত্রী—বিবাহিতা স্ত্রী ?

বিভীষণ। হাঁ। স্ত্রী বিবাহিতা—কিন্তু রাক্ষসী উপেক্ষিতা অবহেলিতা ! তার রাক্ষসীত্ব পদে পদে অপমানিত হয়েচে রাবণের হাতে। সে আমায় ভালোবাসে। সে রাজ্য চায় না, সিংহাসন চায় না, সে চায় আমাকে ! রাবণের মৃত্যু-বাণ তার কাছে আছে। আমার হাতে সে-বাণ তুলে দিতে সে রাজী, যদি আমায় পায়—

রাম। জীতা রহো ! মস্ত সুযোগ। তুমি দ্বিধা করচো এখনো ?

বিভীষণ। রাবণ সন্দেহ করেচে। মন্দোদরীকে চোখে চোখে রাখচে। তুমি শুধু আশ্বাস দাও। যেমন ক'রে পারি, চিঠি পাঠিয়ে আমি মন্দোদরীকে জানাই, আমি তার, সে আমার।

রাম। এই দণ্ডে চিঠি পাঠাও, বন্ধু ! আমি লঙ্কার সিংহাসন তোমায় দেবো। এই কাঁচা লঙ্কা, তাজা টাট্‌কা লঙ্কা।

বিভীষণ। সে বিশ্বাস ?

রাম করতে পারো। আমি দেশ ছেড়ে ক'দিন এখানে থাকবো ? তার পর আজ খপর পেলুম, ভরতে-শত্রুঘ্নে সেখানে দাঙ্গা বেধেচে। এই লঙ্কা দখল ক'রে একবার আমাদের সম্মিলিত শক্তি নিয়ে যদি অযোধ্যায় যাই—বানরকে বড় ভয় করে অযোধ্যা-বাসী। তারা বলে, এরা বড় বর্ব্বর, মানুষের কোনো সম্মান রাখে না

সত্যেন্দ্র একটু গম্ভীরভাবে বলিল, "তোমরা বড়লোক, তোমাদের এখন ভোর হ'তে পারে; কিন্তু আমাদের ন্যায় গরীবের এখন বেলা ১০টা।"

হাসিয়া মোহিত আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। সত্যেন্দ্র হ্যাণ্ডনোটখানি বাহির করিয়া বলিল, "এই সামান্য টাকা কয়টির জন্য এসেছি।"

"ওঃ, কাল রাত্তিরের সেই টাকা! তা এ মাসের সুদ যখন দিতেই হবে, তখন এখনই কেন?"

"কিন্তু এই হ্যাণ্ডনোটের সময় আছে আর মোটে দু'দিন।"

"সে কি! দেখি।" বলিয়া মোহিত হ্যাণ্ডনোটখানির দিকে দৃষ্টিপাত করিল, দেখিল, আজ হইতে ঠিক তিন বৎসর পূর্ব্বে সে সত্যেন্দ্রের নিকট হইতে শতকরা ৩৲ টাকা সুদে এক শত টাকা ধার করিয়াছে! বলিল, "এ মিথ্যা হ্যাণ্ডনোট! আমি কাল রাত্তিরে তোমার কাছে টাকা ধার করেছি বটে; কিন্তু এ হ্যাণ্ডনোট জাল!" বলিয়া হ্যাণ্ডনোটখানা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল।

হ্যাণ্ডনোটখানা পকেটস্থ করিয়া সত্যেন্দ্র গম্ভীরভাবে বলিল, "আমি মাত্র জানতে চাই, এ টাকাটা তুমি দেবে কি না?"

মোহিত দৃঢ়স্বরে বলিল, "না।"

সত্যেন্দ্র বলিল, "বেশ। তা হ'লে দেখছি, কোর্টেই এর মীমাংসা হবে। তবে মনে রেখ, বাইজী, বোতল সব কথাই কোর্টে উঠবে। সামান্য টাকা বড় না মান বড়, সেটা তুমি ভেবে দেখ।"

মোহিত ভাবিল, কথাটা সত্য। হয় ত আমি মোকদ্দমায় জিতিতে পারি, কিন্তু একটা মস্ত বড় কেলেঙ্কারী হইবে। একবার তাহার ইচ্ছা হইল, হ্যাণ্ডনোটখানা কাড়িয়া লইয়া ছিঁড়িয়া ফেলে, কিন্তু তাহাতে চেঁচামেচি গোলমাল হইতে পারে, ভয়ে সে ইচ্ছা দমন করিল। অগত্যা সে ১ শত ২৬৲ টাকায় মিটমাট করিয়া তাহাঁকে টাকা দিল। সত্যেন্দ্রের দুই দিন যাতায়াত, বিড়ি, পাণ, জলখাবার ইত্যাদি এক টাকা, আসল ২৫৲ এবং লাভ এক শত টাকা!

সত্যেন্দ্র দেখিল, এ 'উপায়' ত মন্দ নহে। সে তখন তাহাতেই মনোনিবেশ করিল। এই ভাবে কিছুকাল চলার পরে তাহার হাতে কিছু টাকা জমিয়া গেল। এই সব স্থানবিশেষে যাতায়াতের ফলে সে দেখিতে পাইল, এই শ্রেণীর জীবরা অলঙ্কার গড়াইতেও যেমন—বিক্রয় করিতেও তেমনই তৎপর; তাই সে অনেক গবেষণার পর একটা জুয়েলারী দোকান করাই স্থির করিল।

যথোচিত আড়ম্বরে 'এস, এন, চাটার্জ্জি' নাম দিয়া সোনাগাছীর মধ্যস্থলে জুয়েলারী দোকান প্রতিষ্ঠিত হইল। কয়েক দিনের মধ্যেই বহুবিধ অলঙ্কার প্রস্তুত হইয়া 'সো-কেসের' শোভাবর্দ্ধন করিতে লাগিল। দুষ্ট লোকরা কিন্তু বলিত যে, উহার পনর আনা তিন পাই গিল্‌টির; কেবল ভড়ং দেখাইবার জন্য ঐরূপ আয়োজন।

হ্যাণ্ডনোটের কারবার চালাইবার জন্য সত্যেন্দ্রকে সোনাগাছীতে একটা আস্তানা রাখিতে হইয়াছিল; সেই আস্তানার অধিষ্ঠাত্রী দেবী যিনি, তাঁহাকেই সত্যেন্দ্র নিজের সততা খ্যাপন, তথা মক্কেলকে জালে আনয়ন করিবার জন্য নিযুক্ত করিল। নিজে দোকান ও হ্যাণ্ডনোটের কারবার মাহেশের রথের মত গড়গড় করিয়া চালাইয়া যাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে ছোট দোকান বড় হইল; অধিষ্ঠাত্রী দেবীর গায়ের অস্থি সকল ঢাকিয়া মাংস দেখা দিল; সত্যেন্দ্রের চেহারাও যেন কতকটা ভদ্রলোকের মত হইল; একখানা মোটরও বরাহনগর হইতে সোনাগাছী পর্য্যন্ত সত্যেন্দ্রকে বহন করিয়া যাতায়াত করিতে লাগিল।

এ জগতে এক শ্রেণীর লোক আছে, যাহাদের কায হইল পরের ছিদ্র অন্বেষণ করা। ঐরূপ এক দল পরশ্রীকাতর লোক বলে যে, এই জুয়েলারী দোকান স্থাপিত হইবার কিছুকাল পরে, এন, ঘোষ নামক এক ধনিসন্তানের সহিত সত্যেন্দ্রের বিশেষ প্রণয় হয়। এই প্রণয়-রস যখন জমাট বাঁধিয়া একবারে মিছরীতে পরিণত হইবার উপক্রম হইয়াছে, সেই সময় তাহার এক পুত্রহীনা বিধবা ভ্রাতৃবধূ প্রায় ২০ হাজার টাকার দাবী দিয়া এক উকীলের চিঠি দেয়। তখন পরোপকারৈকপ্রাণ সত্যেন্দ্রের পরামর্শে ঘোষজা মহাশয় সত্যেন্দ্রেরই নামে তাঁহার অর্দ্ধলক্ষাধিক টাকা-মূল্যের সম্পত্তি বেনামী করেন। রেজেষ্টারী আফিসে নগদ ২ হাজার এবং কতকগুলি হ্যাণ্ডনোট দাখিল করিয়া সত্যেন্দ্র দলিলটি পাকা করিয়া লয়। এন, ঘোষকে সত্যেন্দ্র বুঝায় যে, এরূপ না করিলে বেনামী প্রমাণ হইয়া যাইবে। এই কথা ঘোষজা সমীচীন মনে করে ও বিভিন্ন তারিখ দিয়া হ্যাণ্ডনোটগুলি লিখিয়া দেয় এবং রেজিষ্ট্রারের সম্মুখে ২ হাজার টাকা ও হ্যাণ্ডনোটগুলি গ্রহণ করে। তাহার পর যাহা হইবার, তাহা হইয়াছে—এস চ্যাটার্জ্জি সেই সম্পত্তিতে কায়েম মোকাম হইয়াছে। বরাহনগরের বাড়ীখানিও সেই সম্পত্তির অন্তর্গত। বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক যখন পরিচালকদের সুপরিচালন-কৌশলে স্বর্গীয় হয়, তখন লক্ষাধিক টাকার সহিত মহাপ্রভু সত্যেন্দ্রের নাম বিজড়িত ছিল; কিন্তু নির্ব্বোধ নামধেয় কোন পরিচালকের স্কন্ধে সে এরূপ কৌশলে উহা পূর্ব্বাপর চাপাইয়া রাখিয়াছিল যে, সকলকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া দন্তপাটী বিস্তারপূর্ব্বক সত্যেন্দ্র নিজের দোকানে সগৌরবে অধিষ্ঠান করিতে লাগিল।

দুর্বৃত্তরা আরও বলে, চাটুর্য্যের দোকানে রাবণের চিতার মত দিবানিশিই হাফরে আগুন জ্বলিতেছে এবং যে সাধু ব্যক্তি লোককে 'অর্থমনর্থ' নীতি শিক্ষা দিয়া তাহাদের স্বর্ণাদিরূপ গুরুভার লাঘব করে, সাধুত্তম সত্যেন্দ্র নাকি সেইগুলি তখনই অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিয়া তাহার বিশুদ্ধিতা সম্পাদন করে এবং খাতায় সেই দিনের স্বর্ণের দরে তাহা জমা হইয়া যায়। পুলিসের কোন কোন কর্ম্মচারীর সহিত সত্যেন্দ্রের নাকি এত হৃদ্যতা যে, তাহাদের সহিত তাহার মধ্যে মধ্যে 'সেক-হ্যাণ্ড' হইয়া থাকে। পুলিসের সহিত যাহার এত সদ্‌ভাব, তাহার দ্বারা অসৎকার্য্য হইতে পারে, ইহা যাহারা মনে করে, তাহারা নিতান্তই মূর্খ, সুতরাং কৃপার পাত্র।

হিংসাপরায়ণ ব্যক্তিদের আর একটি প্রচারকার্য্যের প্রতিবাদ অত্যাবশ্যক। তাহারা বলে, কলিকাতার দক্ষিণাঞ্চলের বড় এক জুয়েলারী দোকানে বিরাট মোটর-ডাকাতী হয়। সেই মহাপুরুষরা নাকি লক্ষাধিক টাকার জুয়েলারীরূপ বিরাট ভার সেই জুয়েলার মহাশয়ের মস্তক হইতে নামাইয়া নিজেদের মস্তকে লইয়া তাহাকে ভারমুক্ত করে। কিন্তু সেই ভারে যখন তাহাদের ঘাড় বাঁকিয়া যাইবার উপক্রম হইল, তখন তাহারা সেই গুরুভার মহাত্মা সত্যেন্দ্রের স্কন্ধে নিক্ষেপ করিয়া সামান্য কিছু 'কুলী-হায়ার' লইয়া সরিয়া পড়িল। সত্যেন্দ্র নাকি সে ভার বঙ্গদেশে নামাইবার চেষ্টা বৃথা বুঝিয়া উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের সহরগুলিতে সে ভার নামাইয়া আসে এবং বাহকস্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ লক্ষাধিক টাকা তহবিলজাত করে। ইহা কিন্তু সর্ব্বৈব মিথ্যা। ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ, যাহার মাথায় টীকী, ললাট চন্দনচর্চ্চিত, গলদেশে শুভ্র উপবীত, কণ্ঠদেশে তুলসীর মালা, পরিধান ক্ষৌমবসন—সেরূপ মহাপুরুষের যাহারা নিন্দা করে, তাহারা নিতান্তই পাষণ্ড।

দ্বিতীয় পর্ব্ব

"মামা!"

"কে—বিনু, আয়।"

মামা সত্যেন্দ্র। বিনু বা বিনোদিনী ভাগিনেয়ী।

"আর ত পারিনে মামা, তুমি এর একটা বিহিত কর।"

"কি বিহিত করব রে, তা ত বুঝতে পারিনে।"

"তোমার মত লোক যদি একটা বোকা লোকের কাছ থেকে আমার সম্পত্তি পাইয়ে দিতে না পারে, তবে তোমার বাহাদুরী সবই বেরথা।"

"বাহাদুরী আমার কিছুই নেই রে বাবা, সবই সেই তাঁরই দয়া।" বলিয়া সত্যেন্দ্র ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া যুক্তকর ললাটে ঠেকাইল।

"দেখ মামা, ও সব ছেঁদো কথা অপরকে বুঝিও, তোমার বংশের রক্তই ত আমার শরীরে রয়েছে। আমাকে কি তুমি বোকা বানাতে চাও? লোকে বলে, মামা আর ভাগনী—নিক্তিতে তুললে একেবারে কাঁটায় কাঁটায়।"

সত্যেন্দ্র হাসিয়া বলিল, "এ বেটীকে পারবার যো নেই। আচ্ছা, তুই কি করতে চাস, তাই বল্।"

"করতে আর বেশী কি চাই, ওঁর সব সম্পত্তিটা আমার নামে লিখিয়ে দাও।"

"তা তুই ত বললেই পারিস। বিশ্বেশ্বর যে ভালমানুষ, এখনই তা করবে।"

"তা কি বলিনি আমি তুমি মনে করেছ? এ দিকে ভাল-মানুষ হ'লে কি হবে, ধর্ম্মজ্ঞান যে টনটনে। বলে, 'আমরা দু'ভাইতে সম্পত্তি রোজগার করেছি, তার অর্দ্ধেক ধর্ম্মতঃ রামেশের প্রাপ্য। আমার নামে আছে বলেই কি সে ফাঁকি পড়বে'?"

"ভাই ম'রে ত কবে ভূত হয়ে গেছে। সে থাকলেও না হয় একটা চক্ষুলজ্জা হ'ত। ভাইপোকে ত বললেই পারে, তোমার বাপু, এতে কোন অধিকার নাই। তুই এ সব কথা বললেই সে তোকে সম্পত্তি দিয়ে দেবে।"

"আমি তোমার ভাগনী—তুমি কি মনে করেছ, আমার যে ক্ষমতা, তা আমি করিনি? নিজে হালে পানি না পেয়ে তবে ত তোমার কাছে এসেছি। তোমাকে এর যা হয় একটা বিহিত করতেই হবে। তোমার ভাগনী যদি ও সম্পত্তি ভোগ করতে না পারে, তবে তুমি মুখ দেখাবে কি ক'রে?"

বাপ-মা-মরা এই ভাগিনেয়ীটি সত্যেন্দ্রের আশ্রয়েই মানুষ হইয়াছে। বিনোদিনীর বাপের হাজার কয়েক টাকা সত্যেন্দ্রের কাছেই গচ্ছিত ছিল। কথা ছিল, বিবাহের খরচ বাদে বাকী টাকাটা বিনোদিনীকে সত্যেন্দ্র দিবে। কিন্তু একটু বেশী বয়স্ক বিশ্বেশ্বরের সহিত বিনোদিনীর বিবাহ দেওয়ায় সত্যেন্দ্রের বিশেষ কিছু খরচ করিতে হয় নাই, প্রায় সব টাকাটাই সত্যেন্দ্রের তহবিলে আত্মগোপন করে। বলা বাহুল্য, বিনোদিনী এ সব কিছুই জানিত না। বিশ্বেশ্বরের দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে বিশেষ যাতায়াত ছিল—সেই জন্য সাধুসংস্পর্শে সে বিবাহ করিবে না বলিয়াই স্থির করিয়াছিল, শেষে বিধিচক্রে সে সত্যেন্দ্র-ভাগিনেয়ী বিনোদিনীকেই বিবাহ করিয়া বসে। সে শিক্ষিত এবং সম্পত্তিশালী, এই সম্পত্তি সে ও তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হরিহর

উভয়ে কন্‌ট্রাক্টরী করিয়া অর্জ্জন করে। কারবারটা ছিল হরিহরের নামে, সম্পত্তি খরিদ হইয়াছিল ছোট ভাই বিশ্বেশ্বরের নামে। বিপত্নীক হরিহর যে দিন পরপারে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল, সে দিন সে একমাত্র পুত্র রামেশ এবং সম্পত্তি ছোট ভাইয়ের হাতে দিয়া যায়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুর পর বিশ্বেশ্বর একলা কারবার চালান অসুবিধাজনক মনে করিয়া উহা তুলিয়া দেয়।

সত্যেন্দ্রকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া বিনোদিনী একটু অভিমানের সুরে বলিল, "তা হ'লে দেখছি, তুমি কিছুই করবে না! আমি ছেলেপুলে নিয়ে ভেসে যাই, এইটেই তোমার ইচ্ছে!"

"আরে, না না, তোর কথাই ভাবছি। তোর যখন এটা চাই, তখন দিতেই ত হবে—তা যে ক'রে পারি।"

বিনোদিনীর মুখ জয়োল্লাসে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

এই সময় আইন অমান্য আন্দোলন পূর্ণবেগে চলিতেছিল। কালিকাপুরের কাছে বিশ্বেশ্বরের কিছু জমী ছিল। সেই জমীর পার্শ্ব দিয়া একটা লোণা জলের খাল চলিয়া গিয়াছে। সেই খালে এক দল সত্যাগ্রহী লবণ প্রস্তুত করিত, আর বিশ্বেশ্বরের জমীতে শিবির স্থাপন করিয়া তথায় বাস করিত। রামেশও পূর্ণোৎসাহে তাহাতে যোগদান করিয়াছিল।

পরদিন সত্যেন্দ্র দক্ষিণেশ্বরের বাটীতে যাইয়া উপস্থিত। বিশ্বেশ্বর তখন 'দৈনিক বসুমতীতে' দেশের সংবাদ সংগ্রহে ব্যস্ত। মামাশ্বশুরকে আসিতে দেখিয়া বিশ্বেশ্বর অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল। পরে আগমনের কারণ জানিতে চাহিল।

সত্যেন্দ্র গম্ভীরভাবে বলিল, "এ দিকে বড় বিপদ্।"

বিপদের কথা শুনিয়া বিশ্বেশ্বর ব্যস্তভাবে বিপদ্‌টা শুনিতে চাহিল। সত্যেন্দ্র বলিয়া যাইতে লাগিল,—"আমি তোমাকে বরাবরই ব'লে আসছি যে, ও স্বদেশী-টদেশীকে প্রশ্রয় দিও না; তা আমার কথা ত শুনলে না,. এখন ঠ্যালা সামলাও—মাগ-ছেলের হাত ধ'রে পথে দাঁড়াও।"

বিশ্বেশ্বর উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল, "স্বদেশী আন্দোলনে আমি এমন কি করেছি যে, আমাকে রাস্তায় দাঁড়াতে হবে?"

"কেন, তুমি তোমার জমীতে যত বেটা বওয়াটে ছোঁড়াকে আশ্রয় দাওনি?"

"বওয়াটে তুমি কাদের বলছ? যারা দেশের জন্য এতটা ত্যাগ করছে, এত লাঞ্ছনা নির্ব্বিবাদে সহ্য করছে, তারা বওয়াটে?"

সত্যেন্দ্র ও বিশ্বেশ্বর প্রায় সমবয়সী, তাই তাহাদের ভিতর 'তুমি' সম্বন্ধটা আটকাইত না।

সত্যেন্দ্র বলিল, "বওয়াটে নয় ত কি? দেশে লোক শান্তিতে বাস করবে, না—একটা দারুণ অশান্তি তারা সৃষ্টি করছে, তা আবার কি নিয়ে? না—নুণ। যার সের চার পয়সা! ছঃ!"

"সে যাক, তা নিয়ে তোমার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। এখন বিপদ্‌টা কি, তাই শুনি।"

"পুলিস তোমার উপর খুব নজর রেখেছে।"

"নজর রেখে থাকে, না হয় জেলে দেবে, তাতে আর বিপদ্ এমন কি? দেশের বড় বড় লোক যখন জেলে যাচ্ছেন—মতিলাল, মদনমোহন, মহাত্মা।"

"জেলে যাও, তাতে আমার এমন দুঃখ কিছুই নেই। বিপদ্ ত তা নয়।"

"তবে বিপদ্‌টা কি, তাই বল।"

"বিপদ্ এই যে, যারা যারা এই আন্দোলনে সাহায্য করেছে, গবর্ণমেণ্ট তাদের সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করবে।"

"তুমি কোথায় এ সংবাদ পেলে? কাগজে ত কৈ দেখিনি।"

"আরে, এ সংবাদ কি তোমার কাগজে বেরুবে? একেবারে নোটিশ আসবে; আমি ভেতর থেকে এ সংবাদ পেয়েছি।"

এই মামা-শ্বশুরটিকে বিশ্বেশ্বর সবিশেষ না চিনিলেও এটা সে জানিত যে, পুলিসের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ যোগ আছে এবং তাহাদের কতকগুলি গোপন কাযে সে সহায়তা করিত। সেই জন্য সত্যেন্দ্রের এই কথায় সে কিছু বিচলিত হইয়া পড়িল। কিন্তু মুখে সে বলিল, "তা করেই যদি ত আর করছি কি। মাগ-ছেলের হাত ধ'রে গাছতলায় দাঁড়াব। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট এ রকম বে-আইনী কায করবে ব'লে ত মনে হয় না।"

"কেন, বার্দ্দোলীতে কি হ'ল? গভর্ণমেণ্ট তাদের সব বেচাই দিয়েছে—নয়?"

"সে যে তারা খাজনা বন্ধ করেছিল।"

"আর তুমি নুণ তৈরী করবার সহায়তা ক'রে গভর্ণমেণ্টের তবিলে ঘা দিচ্ছ না? ও-কথা একই।"

বিশ্বেশ্বর এ যুক্তির উপর কথা কওয়া আবশ্যক মনে করিল না।

সত্যেন্দ্র মুরুব্বীয়ানার ভঙ্গীতে বলিল, "আমি যা বলি, তাই শোন। এখনও সময় আছে। এই সময় তোমার সমস্ত সম্পত্তি—মায় ভদ্রাসন পর্য্যন্ত বেনামী ক'রে ফেল।"

"তোমার নামে না কি?"

"ঠিক তাই।"

"আমাকে মেরে ফেললেও হবে না।"

"তুমি অতি বোকা, তাই এই কথা বলছ। অনেক বড় বড় নেতাও এ কায করেছেন, তা কি তুমি জান না?"

"কে কি করেছেন না করেছেন, তা আমার জানবার দরকার নেই। আমি পারব না—ব্যস্।"

"তোমাকে পারতেই হবে; কেন না, তুমি গেরস্ত—তোমার স্ত্রী-পুত্র রয়েছে। তুমি যদি সন্ন্যাসী হ'তে, তা হ'লে আমি তোমাকে এ অনুরোধ করতাম না।"

"এতেই কি থাকবে? তুমি যদি ফিরিয়ে না দাও?"

"রাধামাধবঃ! এ কথাও আমাকে শুনতে হ'ল! আমার ভাগনী—আমার মা'র পেটের বোনের মেয়ে—তাকে আমি ফাঁকি দেব?"

"আচ্ছা, বেনামীই যদি করতে হয়—অবশ্য আমি করব, তা বলছি না—ধর, যদিই করি, তা হ'লে রামেশের সম্পত্তি রামেশকে দিয়ে বাকীটা তোমার ভাগনীর নামে করি না কেন?"

সত্যেন্দ্রের মুখখানা যেন কি এক রকম হইয়া গেল। কিন্তু সে মুহূর্ত্তমাত্র। পরমুহূর্ত্তে স্বাভাবিকভাবে সে বলিল, "তাতে বিশেষ ক্ষতি ছিল না; কিন্তু এখন অবস্থা যে রকম দাঁড়িয়েছে, তাতে স্ত্রীর নামে বেনামী আর টিকবে না। তার পর ধর রামেশের কথা, সেও এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছে, তার নামের সম্পত্তিও কি রক্ষা পাবে?"

বিশ্বেশ্বর চিন্তিত হইয়া পড়িল।

সত্যেন্দ্র বলিয়া যাইতে লাগিল,—"আমার কথা শোন, এখন সব সম্পত্তিই আমার নামে বেনামী কর। এ সব গোলমাল মিটে গেলে আমিই তোমার ও রামেশের নামে—তুমি যে রকম বলবে, সেই রকমভাবে লিখে দেব।"

"এ গোলমাল যে কবে মিটবে, আর মিটবে কি না, তারও ঠিক নেই। মানুষের দেহের ত ভদ্রাভদ্র আছে।"

"নারায়ণ! ঠিক কথা—বেশ সঙ্গত কথা। আচ্ছা, তা হ'লে এক কায করা যাবে অখন। তুমি আমার নামে লেখাপড়া ক'রে দেও। তার পর দু-চার মাস বাদে আমি বিনুর নামে লেখাপড়া ক'রে দেব। এক হাত ঘুরে গেলে আর কোন দোষ হবে না। অবিশ্যি দু'চার মাসের মধ্যে আমি মরছিনি, এটা ঠিক।"

বিশ্বেশ্বর কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিল, "সবই ত বুঝলুম মাতুল, কিন্তু মন আমার প্রসন্ন হচ্ছে না। না, এ কায আমার দ্বারা হবে না।"

"তুমি যদি এ কায না কর, তা হ'লে আমি যদি গলায় দড়ি দিয়ে না মরি ত আমি বামুনের মেয়ে নই।"—তীব্রস্বরে এই কথাগুলি বলিতে বলিতে বিনোদিনী প্রচণ্ড ঝঞ্ঝার মত সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। এতক্ষণ সে পার্শ্বের বারান্দায় দাঁড়াইয়া সমস্ত শুনিতেছিল।

বিনোদিনীকে এইভাবে প্রবেশ করিতে দেখিয়া বিশ্বেশ্বর যেন একটু বিহ্বল হইয়া পড়িল; কিন্তু দৃঢ়স্বরে বলিল, "আমি বলছি, এ কায আমার দ্বারা হবে না। বিশেষ যে কারণের কথা শুনছি, সেটা কেবল তোমার ঐ মাতুলের মুখে। এ সত্য কি মিথ্যা, তারও ঠিক নেই।"

সত্যেন্দ্র বেশ একটু মুরুব্বীয়ানার ভঙ্গীতে বলিল, "দেখ, আমি গভর্ণমেন্টের ঘরের কথা ভাল রকম জানি—বিশেষ স্বদেশী সম্বন্ধে। আর এতে আমার স্বার্থই বা কি যে, আমি মিছে কথা বলব? এ কায করা না করা তোমার ইচ্ছা। তবে এটা ঠিক যে, আমি যা বলছি, তা খুবই সত্য।"

"ঐ শোন গো, শোন, মামা, কি বলছে। তুমি আমাদের জলে ভাসিয়ে দেবে—তোমার মনে কি এই ছিল গো?" বলিয়া বিনোদিনী বুক চাপড়াইয়া এমন বিকট কান্না জুড়িয়া দিল যে, ভদ্রলোক বিশ্বেশ্বর হতভম্ব হইয়া গেল।

সত্যেন্দ্র বলিল, "হা ভগবান্! আমরা স্ত্রী-পুত্রের জন্ত দেহপাত ক'রে ফেললুম,—আর বিশ্বেশ্বর, তুমি স্বেচ্ছায় স্ত্রী-পুত্রকে পথে বসাচ্ছো! কেন তুমি এ রকম করছ? আমি বলছি, তোমার সম্পত্তি তোমারই রইল। এ হাঙ্গামাটা মিটে গেলেই আমি না হয় তোমারই বিষয় তোমাকেই ফিরিয়ে দেব—স্ত্রীর নামে করতে যখন তোমার আপত্তি রয়েছে। তুমি নির্ভয়ে থাক। এ কেবল তোমার ভালর জন্তে।"

"ওগো, কেন তুমি অমন করছ? মামার কিসের অভাব যে, তোমার সম্পত্তি নিতে যাবে? মাগ-ছেলে কি লোক এমন ক'রে পথে বসায়? তোমার সঙ্গে আমার এমন কি শত্রুতা ছিল গো যে, তুমি আমার এত বড় অনিষ্ট করবে?" সঙ্গে সঙ্গে বক্ষে করাঘাত ও বিকট রোদন!

বিশ্বেশ্বরের এইখানটায় একটু দুর্ব্বলতা ছিল। সে কাহারও কান্না সহ্য করিতে পারিত না। বিনোদিনীর এইরূপ কান্না দেখিয়া আর সে নিজেকে সামলাইতে পারিল না, সত্যেন্দ্রকে বলিল, "বল মাতুল, আমাকে কি করতে হবে?"

তখন মহাপ্রাজ্ঞ সত্যেন্দ্র হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত করিয়া যাহা দেখাইল, তাহাতে বিশ্বেশ্বর বুঝিল, মাতুল শুধু বুদ্ধিমান্ নয়, ফন্দীবাজও বটে। সত্যেন্দ্রের হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত হইলে বিশ্বেশ্বর দেখিতে পাইল, একখানি ১৩ হাজার টাকার হ্যাণ্ডনোট—তাহাতে তাহার জ্যেষ্ঠ হরিহরের স্বাক্ষর এবং তাহারই নিম্নে তাহাকে স্বাক্ষর করিতে হইবে, যেহেতু, অকারণ ত কাহারও যথাসর্ব্বস্ব

বিক্রয় হইতে পারে না। কারবারের জন্য উভয় ভ্রাতায় একযোগে হ্যাণ্ডনোটে টাকা লইয়াছে, এখন সেই দেনার দায়ে সম্পত্তি বিক্রয় হইয়াছে, ইহাতে ভবিষ্যতে কোন গোল হইবার সম্ভাবনা নাই—সব পাকা। দেখিয়া শুনিয়া বিশ্বেশ্বর শিহরিয়া উঠিল।—অমনই বিনোদিনীর বক্ষে করাঘাত—ক্রন্দন!

বিনোদিনীর প্রবল কান্নার স্রোতে বিশ্বেশ্বরের প্রবল মনোবল ভাসিয়া গেল; বিশেষ সত্যেন্দ্র বার বার আশ্বাস দিতে লাগিল যে, তোমাদের মঙ্গলের জন্যই ইহার প্রয়োজন হইয়াছে এবং রামেশকেও এই উপায়েও রক্ষা করা হইবে। রামেশ সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি পাইয়া বিশ্বেশ্বর কতকটা নিশ্চিন্ত হইল। তার পর যথারীতি কোর্টে নালিশ হইল—বিশ্বেশ্বর হ্যাণ্ডনোট সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া সোলে ডিক্রী দিল। তাহার পর সমস্ত সম্পত্তি দেনার দায়ে সত্যেন্দ্রকে বিক্রয়-কোবালা লিখিয়া দিয়া বিষয়ভার হইতে মুক্ত হইল।

তৃতীয় পর্ব্ব

"বলি হ্যাগা, বড়মানুষের মেয়ে, বাড়ী থেকে বেরুবে, না—হাত ধ'রে টেনে বা'র করতে হবে?"

"আমরা ত যাব বলেছি, খুড়ীমা। তবে আমার এই অবস্থা, দুটো মাস মাত্তর সময় দাও।"

"অত সোহাগে কায নেই। দূর হয়ে যা—দূর হয়ে যা।" বলিয়া বিনোদিনী এমন এক মুখভঙ্গী করিল যে, রামেশের স্ত্রী সরলা আর কিছু বলিতে সাহস করিল না।

বিনোদিনী বলিয়া যাইতে লাগিল, "ওরে আমার সাত পুরুষের কুটুম, ওঁকে যায়গা দাও! তোর শ্বশুরের দেনার দায়ে সর্ব্বস্ব বিকিয়ে গেল,—ভাগ্যে মামা ছিল, তাই ভিটেয় মাথা গুঁজে রইছি! আবার বলে যায়গা দাও! দূর হ! লক্ষীছাড়া বউ কোথাকার। আমার ভিটেতে 'পর্শ' হ'তে দেব না।"

"ভিটে ত তোমার নয় খুড়ীমা, বাড়ী এখন তোমার মামার। আজও যে তোমায় লিখে দেয় নি, তা আমি জানি—আর আমাকে যে দেবেই না, সে কথা তুমি আমার চাইতেও ভালই জান।" বলিতে বলিতে রামেশ আসিয়া দেখা দিল।

"জানিস যদি, তবে এখানে কেন মস্তে রয়েছিস রে হতভাগা?"

"হতভাগা যে, তাতে আর সন্দেহ কি? তা না হ'লে আজ তোমার চক্রান্তে আমাকে পৈতৃক ভিটে হ'তে চ্যুত হ'তে হয়!"

বিনোদিনী একবারে চীৎকার করিয়া বলিল, "যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা? তোর বাবার দেনার দায়ে সর্ব্বস্ব বিকিয়ে গেল—আমরা শুদ্ধ রাস্তায় দাঁড়ালুম—আর তুই বলিস কি না—আমার চক্রান্তে!"

"ও সব ছেঁদো কথা অপরকে ব'লে নিজে সাধু হবার চেষ্টা করো। আমার ত অজানা কিছুই নেই। আমি সরল হ'তে পারি, কিন্তু বোকা নই। তুমি কি মনে কর, এ চক্রান্ত আমি বুঝতে পারিনি? এ সবই তুমি করিয়েছ।"

"বেশ করেছি—খুব করেছি, তুই তার করবি কি?"

"করবার আমার কিছুই নেই। তবে আজ আমার এই কথাটাই মনে পড়ছে যে, যে দিন এ ভিটের একমাত্র উত্তরাধিকারী হয়ে প্রথম এসেছিলুম, সে দিন এখানে কি উৎসবই না প'ড়ে গিয়েছিল। কাকা বিয়ে করবেন না—বাবার প্রথম সন্তান—২৫ বৎসর পরে ভিটেয় পুত্রের প্রবেশ—অল্পবয়সে বিধবা ঠাকুরমার আনন্দ-কোলাহল! কোথায় তখন তুমি ছিলে, খুড়ীমা! আজ জন্মের মত এ বাড়ী ছাড়বার সময় কেবল সেই কথাই মনে পড়ছে। নইলে তুমি কি মনে করেছ, তোমার এত কথা সয়েও, যেখানে আমি সর্ব্বময় প্রভু ছিলাম, যেখানে আমার ইচ্ছাই এ বাড়ীর ইচ্ছা ছিল—আমার আনন্দবিধান করাই যেখানে সকলের কাম্য ছিল, সেই আমি তোমার কথা শুনে এক মুহূর্ত্তও এখানে থাকতাম!"

বিনোদিনী ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল, "কে তোকে পায়ে ধ'রে থাকতে সেধেছিল, চ'লে গেলেই ত পারতিস। আমার বাড়ী—আমি থাকতে দেব না, ব্যস্। এর আর কথা শুনোনো কি?"

রামেশ বলিল, "শুধু কি কথা শুনোনো। আমার সঙ্গে যে ব্যবহার এ পর্য্যন্ত করেছ, তা মনে ক'রে দেখ।"

"কি ব্যাভার তোর সঙ্গে করেছি যে, মনে ক'রে দেখতে হবে?"

"তবে আমাকেই মনে করিয়ে দিতে হ'ল দেখছি। ভেবেছিলাম, কোন দিন বলব না, কিন্তু এখন দেখছি যে, আজ যদি না বলি, তা হ'লে হয় ত জীবনে বলবার সুযোগ আর আসবে না। মনে পড়ে—তিন দিনের পচা পান্তাভাতের ওপর গোটাকতক গরম ভাত ছড়িয়ে দিয়ে দেওয়া? মনে পড়ে—বাড়ীশুদ্ধ সকলের লুচী খাওয়া, আর সকলের শেষে ঝিকে দিয়ে ডেকে ঐ রকম ভাত দেওয়া? আর বলব? এমন এক আধ দিন নয়—মাসের পর মাস কেটে গিয়েছে, কিন্তু তবুও আমি এ বাড়ী ছাড়ি নি; কেন না, ঐ ঘরে আমি জন্মেছি, এই বাড়ী আমার জগদ্ধাত্রীর মত মাতার পদধূলিতে পবিত্র—এর প্রতি অণু-পরমাণুতে

আমার স্মৃতি বিজড়িত ; তাই আমি এই বাড়ী ছাড়তে চাইনি—” বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল।

বিনোদিনীও যেন ক্ষণকাল নির্ব্বাক্ হইয়া গেল। রামেশ স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, “এস, আমরা যাই। কলকাতায় বাসা ঠিক ক'রে এসেছি—গাড়ী দাঁড়িয়ে।” তার পর বিনোদিনীর দিকে ফিরিয়া বলিল, “খুড়ীমা, তুমি আর আমি প্রায় সমবয়সী, পায়ের ধুলো কোন দিন নিতে পারিনি, আজও পারলাম না। জন্মের মত পৈতৃক বাড়ী ছাড়বার সময় ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করি, তিনি যেন এ সম্পত্তি তোমাদের ভোগ করতে দেন। আর তুমিও এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমি তোমাকে ক্ষমা করতে পারি।” বলিয়া রামেশ যুক্তকর গৃহদেবতার উদ্দেশে কপালে ঠেকাইয়া স্ত্রীর হাত ধরিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

বিনোদিনী চিত্রপটের মত সেই গতিশীল গাড়ীর দিকে চাহিয়া রহিল।

চতুর্থ পর্ব্ব

বিনোদিনীর এখন কাযই হইতেছে—যাহার তাহার নিকট ইহাই স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া বলা যে, ভাসুরের দেনায় আমাদের সর্ব্বস্বই গিয়াছিল, কেবল মামার দয়ায় আমাদের সে বিপদ কাটিয়া গিয়াছে, তিনি দয়া করিয়া টাকা দিয়া আমাদের রক্ষা করিয়াছেন। যাহারা ভিতরের কথা কিছু জানিত না, তাহারা এই প্রচারকার্য্যের ফলে সত্যেন্দ্রের প্রশংসা করিত, আর যাহারা জানিত, তাহারা মুখ মচকাইয়া একটু হাসিত মাত্র।

বিশ্বেশ্বর প্রাতঃকালেই বিনোদিনীর তাগাদায় সত্যেন্দ্রের নিকট বিষয়োদ্ধারের জন্ম গিয়াছে। বিনোদিনী প্রতিবেশিনী ক্ষান্তর মা'র কাছে হাত-মুখ নাড়িয়া নিজের প্রচারকার্য্য চালাইতেছে আর মামার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইতেছে, এমন সময় বিশ্বেশ্বরকে আসিতে দেখিয়া সে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, “হ্যাঁ গা, মামা কি বললে ?”

বিশ্বেশ্বর উত্তর দিল, “বললে, সে জন্ম তোমার ভাবনা নেই, আমি সব বন্দোবস্ত করেছি, তুমি হয় ত আজই খবর পাবে।”

“তুমি যে তখন ভেবেছিলে, মামা হয় ত ফাঁকি দেবে, দেখলে ত, তিনি তেমন মানুষই নন।”

“আচ্ছা, একটা কথা শুনলুম, তুমি না কি রামেশকে কি বলেছিলে, তাই সে বাড়ী ছেড়ে চ'লে গেছে ?”

“ও মা, কি ঘেন্নার কথা ! রামেশকে আবার আমি কবে কি বললুম ? সেই ত চাকরীর যোগাড় ক'রে এ অসময়ে পাছে আমাদের কিছু দিতে হয়, এই ভয়ে তার পরিবার নিয়ে পালিয়ে গেল ! কলিকাল কি না ! আমরা যে তার এত করলুম, তা একবার মানলে না গা ! আমি যাবার সময়ও বললুম, বৌমার এই অবস্থা, দু'টো দু'-ঠাঁই হোক, তার পর যাবে। ও মা, ছেলে যেন আমাকে মারতে এল ! তাই আমি তখন বললুম, তা যাবে বৈ কি বাছা, যেখানে গিয়ে মনের সুখে থাকবে, সেখানে গিয়ে থাক গে। শুনেছি, তার ছেলে হয়েছে, আমার দেখতে এমনই ইচ্ছে হচ্ছে ! আহা, রামেশের ছেলে, আমাদের কত আদরের !”

কথাগুলি এমন সুরে ও ভঙ্গীতে উচ্চারিত হইল যে, সে সময় যদি রামেশ অথবা সরলা উপস্থিত থাকিত, তাহা হইলে তাহারাও মুগ্ধ না হইয়া পারিত না। ভালমানুষ বিশ্বেশ্বর ত কোন্ ছার।

রামেশ ছেলেটি ছিল সেই ধরণের—যে ধরণের লোক কোন অবস্থাতেই চীৎকার করা বা অত্যধিক রাগ প্রকাশ করাকে লজ্জাকর ব্যাপার মনে করে। তাহার আত্মসম্মানবোধ এতদূর প্রবল ছিল যে, সে অপমানিত বা নির্য্যাতিত হইলেও তাহা প্রকাশ করাকে আরও অধিক অপমানকর বলিয়া মনে করিত। সেই জন্ম বিনোদিনী-কৃত অপমান ও নির্য্যাতন কখনও সে কাকা বিশ্বেশ্বরকে বলিত না—বলাকে অত্যন্ত হীনতা বলিয়াই মনে করিত। রামেশের চরিত্রের এই অংশ বিশ্বেশ্বরের অজ্ঞাত ছিল না। তাই সে বিনোদিনীর ঐ সকল উক্তি বিশ্বাস করিল কি না, বুঝা গেল না। মাত্র বলিল, “যেখানেই থাক, সুখে থাক।”

এমন সময় বহির্ব্বাটী হইতে একটা কর্কশকণ্ঠে ধ্বনিত হইল, “বিশ্বেশ্বর বাবু বাড়ী আছেন ?”

কে এরূপ অসভ্যের মত চীৎকার করিতেছে, তাহা দেখিবার জন্ম বিশ্বেশ্বর বহির্ব্বাটীতে যাইতেই দেখিতে পাইল, সত্যেন্দ্রের এক কর্ম্মচারীর সহিত আদালতের একটা পেয়াদা কি একখানা কাগজ হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। বিশ্বেশ্বরকে দেখিয়াই সেই কর্ম্মচারীটি বলিয়া উঠিল, “ইনিই বিশ্বেশ্বর বাবু, এঁকেই সমনখানা দাও।”

বিশ্বেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, “কিসের সমন হে, ব্রজরাজ ?”

ব্রজরাজ নীরসকণ্ঠে বলিল, “প'ড়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন।”

বাক্যব্যয় বৃথা বুঝিয়া বিশ্বেশ্বর সমনখানা লইয়া পড়িতে লাগিল। পড়িতে পড়িতে বিশ্বেশ্বরের কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া আসিল এবং হাত দুইটা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল—সমনখানা হাত হইতে পড়িয়া গেল। পেয়াদার কণ্ঠ হইতে ঝন্-ঝন্ করিয়া শব্দ হইল, “একটা সই দেন, মশাই।”

"দেব না। তোমার ইচ্ছা হয় লট্‌কে দিয়ে যেতে পার।" বলিয়া বিশ্বেশ্বর কম্পিতপদে অন্তঃপুর অভিমুখে প্রস্থান করিল। বিনোদিনীও ব্যাপার কি দেখিবার জন্য বহির্ব্বাটীর দিকে আসিতে-ছিল; বিশ্বেশ্বরকে দেখিয়াই ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে? তোমার মুখ অমন শুকিয়ে গেল কেন?"

বিশ্বেশ্বর সংক্ষেপে বলিল, "এমন কিছু নয়, তোমার দয়াময় মাতুল পৈতৃক ভদ্রাসনরূপ গুরুভার হ'তে আমাদের মুক্তি দিতে ইচ্ছা করেছেন।"

"ও সব হেঁয়ালী রেখে দাও। সোজা কথায় বল, কি হয়েছে?"

"বিশেষ কিছু নয়, তোমার মামা এই বাড়ীখানা ও অন্যান্য সম্পত্তি কিনেছেন, এখন এ বাড়ী থেকে আমাদের তুলে দিয়ে ভাড়া দিতে চান। তাই একেবারে উচ্ছেদের নালিশ।"

"মিছে কথা! তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তুমি কি শুনতে কি শুনেছ।"

"শুনিনি আমি কিছুই, চোখে দেখেছি। তুমিও ইচ্ছা করলে দেখতে পার।" বলিয়া বহির্ব্বাটী হইতে সমনখানা আনিয়া বিনোদিনীর সম্মুখে ধরিয়া বলিল, "আমি না হয় ভুল শুনেছি, কিন্তু এ সমনখানা ত ভুল নয়।"

সমনখানা পড়িয়া দেখিয়া বিনোদিনী মাটীতে বসিয়া পড়িল। অশ্রু-বিজড়িত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "এখন উপায়?"

"উপায় এখন তার দয়া। আমি এই জন্য তখন লিখে দিতে চাইনি। কিন্তু আজ তার ফল ভোগ কর। আমি আমার জন্য ভাবছিনি; কেন না, এ আমার প্রাপ্য। আমি ভাবছি, রামেশটা ভেসে গেল!"

"তুমি তোমার মাগ-ছেলের কথা ভাবছ না, ভাবছ রামেশের কথা। ধন্যি লোক যা হ'ক!"

"আমি ত*বলেছি, এ আমার প্রাপ্য; কেন না, তোমার মনোগত ভাব আমি কতকটা জেনেও যখন সই দিয়েছি, তখন পাপের ফল আমাকে ভুগতেই হবে! কিন্তু রামেশ!"

বিশ্বেশ্বরের দুই চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল!

"ওগো, ন্যায়-অন্যায়ের বিচার পরে হবে। কিন্তু এখন উপায় কি?"

"মোকদ্দমা ক'রে দেখা যেতে পারে; কিন্তু সে বৃথা; কেন না, সে খুব পাকা কাযই ক'রে নিয়েছে। এখন উপায় একবার তোমার মামার কাছে যাওয়া, যদি সব নিয়েও শুধু বাড়ীখানা দেয়।

"তা হ'লে তুমি এখনই যাও।"

"আমি! পৃথিবীর বিনিময়েও নয়। ইচ্ছা কর যাও, নইলে আমার সঙ্গে গাছতলায় আশ্রয় নেবে চল।"

অগত্যা বিনোদিনীই বরাহনগরে সত্যেন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া কারণ জানিতে চাহিলে স্বনামনিষ্ঠ সত্যেন্দ্র বিনোদিনীকে বুঝাইল যে, যে জন্য হ্যাণ্ডনোট রচিত হইয়াছে—মোকদ্দমা-দায়ের হইয়াছে, শেষ বাটী ও সম্পত্তির বিক্রয়-কোবালা হইয়াছে, ইহাও তাহারই প্রয়োজনে। অর্থাৎ রামেশকে ফাঁকি দিতে হইলে এ সকলেরই প্রয়োজন আছে। বিনোদিনী 'নগদ বিদায়' পাইয়া হাসিমুখে বাড়ী ফিরিয়াই সগর্ব্বে বিশ্বেশ্বরকে বলিল, "আমি ত তখনই বলেছিলাম, এ মিছে কথা। * তা নয় আমাকে কত কথাই শোনান হ'ল। মামা কি আমার তেমনি লোক—অমন লোক কেউ কখন চোখেও দেখেছে!" বলিয়া বক্রদৃষ্টিতে বিশ্বেশ্বরের দিকে চাহিল।

* * * * * *

মাস দুই পরের কথা।

সরকার এইমাত্র সংবাদ দিয়া গেল, কোন ভাড়াটিয়াই ভাড়া দিল না; কারণ, সত্যেন বাবু সবাইকে নোটিশ দিয়াছে, অতঃপর তাহাকে ভাড়া দিতে হইবে; কেন না, সে অমুক মাসের অমুক তারিখে খোস কোবালায় ঐ সকল সম্পত্তি খরিদ করিয়াছে, আইনমতে সেই হকদার। ভাড়াটিয়ারা বলিয়াছে যে, আগে আপনাদের নিষ্পত্তি হ'ক, তখন ভাড়া দিব। এখন দিয়া কি আবার শেষে দো-কর দিয়া মরিব?

শুনিয়া বিশ্বেশ্বর হাঁ না কিছুই বলিল না। বিনোদিনী যেন আঁতকাইয়া উঠিল—তাহার মুখ সাদা হইয়া গেল। এখনই যে ঝি, চাকর, রাঁধুনী সকলকে মাহিনা দিতে হইবে—মুদী, গোয়ালা টাকা লইতে আসিবে! হাতে নগদ যাহা ছিল, কোলের খোকার অসুখের জন্য তাহার শেষ পয়সাটি পর্য্যন্ত ব্যয় হইয়া গিয়াছে। এখন উপায়?

এমন সময় চন্দনচর্চ্চিত-ললাট ও কণ্ঠদেশে তুলসীমালা-সমন্বিত সত্যেন্দ্র কয়েক জন লোক সহ আসিয়া উপস্থিত হইল। সত্যেন্দ্রকে দেখিয়া বিনোদিনী যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। সে সত্যেন্দ্রকে আবদারের সুরে বলিল, "মামা, এ সব কি? ভাড়াটেদের টাকা দিতে বারণ করলে কেন?"

"এরও একটু প্রয়োজন ছিল, মা। এ সবই তোর ভালর জন্য। আমি সব ব্যবস্থাই করছি। আরে মর, তোরা আমার সঙ্গে এখানে এসে ঢুকলি যে? বাইরে যা—এখন বাইরে যা। ডাকলে তবে আসিস।"

বিনোদিনী জিজ্ঞাসা করিল যে, উহারা কে?

"ওরা একটু সামান্য দরকারে আমার সঙ্গে এসেছে। বোধ হয়, এর দরকার হবে না; কেন না, তুমি ত আমার তেমন মেয়ে নও।"

বিনোদিনী কিছুই বুঝিতে না পারিয়া ফ্যাল্-ফ্যাল্ করিয়া মামার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

সত্যেন্দ্র বলিয়া যাইতে লাগিল, "দরকারটা এমন বিশেষ কিছুই নয় বিনু মা, অতি সামান্য। আমি তোমাদের জন্যে এই দক্ষিণেশ্বরেই একটা বাড়ী দেখে এসেছি, তোমরা আজ থেকে সেখানে গিয়ে থাক্‌বে—ভাড়া এমন বেশী নয়—গোটা কুড়ি টাকা হলেই হবে।"

বিনোদিনী যেন হাঁফাইয়া উঠিল। বলিল, "তুমি কি বল মামা, স্পষ্ট ক'রে বল।"

"বিনু মাকে আমার চিরকালই সব কথা বুঝিয়ে বলতে হয়, এখনও সে স্বভাবটা যায় নি। তবে শোন মা, এই বাড়ীঘর-গুলো অনেক টাকা দিয়ে কিনেছি, ফেলে রাখি কি ক'রে বল্? এর ভাড়া হবে অনেক—তা কি তুই দিতে পারবি? সেই জন্য ত একটা বাড়ীর সন্ধান জেনে তবে তোর এখানে এসেছি। তোকে ত আর রাস্তায় বসাতে পারিনে।"

শুনিয়া বিনোদিনীর সর্ব্বাঙ্গ হিম হইয়া গেল।

সত্যেন্দ্র বলিয়া যাইতে লাগিল, "আমি জানি, আমার বিনু-মা বড় ঠাণ্ডা, তাকে বল্‌বামাত্রই সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাবে, তার জন্ম লোকের দরকার হবে না; পেয়াদা বেটা কি তা শুনলে! সে ক'বেটাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এল—তার ভেতর বুঝি একটা মোছনমানও আছে। তা হ'লে ওঠ মা, বিনু, বেলা হয়ে যাচ্ছে। আবার আমাকে ত বরানগরে যেতে হবে।"

বিনোদিনী তীব্রস্বরে বলিল, "মামা, তুমি টাকা দিয়ে কিনেছ কি রকম? এ ত তোমার নামে বেনামী।"

"বোকা মেয়ে, আদালতে যে সব প্রমাণ আছে, তা জানিস নি? তবে জেনে শুনে ন্যাকা হচ্ছিস্ কেন, মা?"

"তুমি সত্যিই আমাদের বাড়ী থেকে তাড়াবে? মামা, তুমি যে আমাকে হাতে ক'রে মানুষ করেছ—আমি যে তোমার মেয়ের চেয়েও বেশী।"

"আমিও ত তাই জানি মা, সেই জন্যই ত তোমাকে আমার এ বাড়ীতে রাখতে পাচ্ছি না—মেয়ে কি চিরকাল বাপের বাড়ী থাকে, মা? শ্বশুরঘরে তাকে যেতেই হয়।"

"আমি এ বাড়ী থেকে যাব না মামা, দেখি তুমি কেমন ক'রে তাড়াও।"

"পাগ্‌লী কোথাকার! তোকে তাড়াচ্ছি কোথায়? এ সবই তোর ভালর জন্ম।"

"আর ভালয় কায নেই। এ বাড়ী থেকে আমি যাব না, দেখি তুমি কি কর।"

"ওরে গদা, এলাহিকে বল, বিনু মা'র হাত ধ'রে—কিন্তু খুব হুঁসিয়ার, যেন বিনু মা'র হাতে না লাগে—"

এতক্ষণ বিশ্বেশ্বর নির্ব্বাক্‌ভাবে বসিয়া বসিয়া সব শুনিতেছিল। কিন্তু যখন এলাহির ডাক পড়িল, তখন সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। বলিয়া উঠিল, "উঠে পড়, তুমি এখনও ঐ সয়তানের কাছে দয়ার প্রত্যাশা কর? ঐ পাজি নচ্ছার—"

কৃষ্ণবর্ণের দাঁতগুলি বাহির করিয়া সত্যেন্দ্র বলিল, "বিশু চিরকালই আমাকে ঠাট্টা করে—তবু আমার সঙ্গে ওর সে সম্বন্ধ নয়। ওরে গদা, ওদের আসতে বারণ কর। বাবাজী আমার বুদ্ধিমান্—শান্ত।"

বিশ্বেশ্বর দৃঢ়কণ্ঠে বিনোদিনীকে বলিল, "আর বিলম্ব করছ কেন? ওঠ। ছোট ছেলেটা ঘুমুচ্ছে, তাকে নিয়ে এস। আর এক মুহূর্ত্তও এখানে নয়।"

বিনোদিনী ছোট ছেলেটিকে কোলে লইয়া বাটীর বাহিরে যাইতে যাইতে বলিতে লাগিল, "আজ আমার রামেশের কথা মনে পড়ছে—কি ব্যথাটাই তার বুকে বেজেছিল! আজ আমরা কোথায় যাব, তার ঠিক নেই—তার তবু একটা চাকুরী ছিল—"

"তার সে চাকরী ত এখনও আছে, খুড়ীমা! বাইরে গাড়ী দাঁড়িয়ে—একেবারে গিয়ে উঠে পড়। তোমার সে বাসায় তোমাদের রান্না পর্য্যন্ত এতক্ষণ হয়ে গেল। আমি সব খবরই রাখতাম কি না।"

বিনোদিনী অবশকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "কে—রামেশ—রামেশ! তুই—তুই!"

শ্রীহরনাথ গুপ্ত।

তিব্বত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

২০শে জুন। অদ্য আমাদের নাথুলা পার হইতে হইবে। সুতরাং তাড়াতাড়ি ঘুম হইতে উঠিয়া রান্না ও আহার সমাপনান্তে রওনা হইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। ৭॥টার মধ্যে আমাদের খাওয়া হইয়া গেল। আর ১৫ মিনিটমধ্যে অশ্বতর এবং কুলীর পৃষ্ঠে আমাদের মাল দিয়া প্রায় ৭-৪৫ মিনিটের সময় বাংলো হইতে নির্গত হইলাম। প্রথম বাংলো হইতে নির্গত হইয়া কর্দ্দমাক্ত রাস্তার মধ্য দিয়া চলিলাম। গত দিবস বৃষ্টিপাতের ফলে যে কাদা হইয়াছিল, তাহা সমস্ত রাত্রি বৃষ্টি না হওয়ায় যদিও একটু কমিয়াছে, তবুও যথেষ্ট কাদা আছে। অশ্বতর-চলাচলের জন্য স্থানটি আরও খারাপ হইয়াছে। রাস্তার দুই দিকে বড় বড় গাছ এবং নিম্নদেশে ছোট ছোট ঝোপ। আমরা যত অগ্রসর হইতে লাগিলাম, জঙ্গল ততই কম হইতে লাগিল।

দুই মাইল কি আড়াই মাইল চলার পর ঝরণা নদী পার হইয়া ছোট ছোট রোডোডেনড্রন্ ঝোপের মধ্য দিয়া উপর দিকে উঠিতে লাগিলাম। কিছু দূর যাইয়া নাথুলার পাদদেশে উপস্থিত হইলাম। নাথুলার উপরে কোন বৃক্ষাদি নাই। পূর্ব্বে যে তুষার ছিল, তাহা প্রায়ই গলিয়া গিয়াছে। তবে পাহাড়ের যে স্থানে রৌদ্রের তেজ কম লাগে, সেই সকল যায়গায় এখনও কিছু কিছু বরফ আছে। যাইবার সময় নাথুলা সম্পূর্ণ তুষারাচ্ছন্ন থাকায় রাস্তা দুর্গম ছিল; কিন্তু এখন আর সে অবস্থা নাই। নাথুলা ১৫ হাজার ৩ শত ফুট উচ্চ। পাদদেশ হইতে আমরা আস্তে আস্তে নাথুলার উপরে উপস্থিত হইলাম। রাস্তা বড় ভাল নহে, তবে জেলাপেলার ন্যায় নিতান্ত কদর্য্য নহে। অবশ্য জেলাপেলার বরফ গলিয়া যাওয়ার পর আমরা দেখি নাই। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে একই সময় দুই স্থান যাহারা দেখিয়াছে, তাহারা জেলাপেলা হইতে নাথুলাই ভাল বলিয়া প্রকাশ করে। নাথুলার উপর হইতে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। কিন্তু কুয়াসার জন্য অধিক দূর দেখা গেল না। পরিষ্কার দিন হইলে তিব্বতের চুমরলহরী পর্ব্বত, তিব্বতের অন্যান্য পাহাড়, সমতল ভূমি, ফারি ইত্যাদি ও হিমালয়ের দৃশ্য এখান হইতে সুন্দর দেখা যায়।

এখান হইতে আমরা ধীরে ধীরে অবতরণ করিতে লাগিলাম। কিছু দূর রাস্তা খারাপ, তৎপর রাস্তা ভাল হইল। আমরা রাস্তা দিয়া খাড়াই সোজা নামিয়া ছোট একটি হ্রদের নিকট আসিলাম। উপর হইতে তুষারগলিত জল এই স্থানে জমা হইয়া একটি ছোট হ্রদের মত হইয়াছে। এখানে ছোট ছোট বিস্তর রোডোডেনড্রন্ ফুলের ঝোপ আছে। গাছে ফুল এখন কম দেখিলাম। কারণ, পূর্ব্বেই ফুটিয়া গিয়াছে। এই যায়গার নাম যারবটাং। নাথুলা হইতে নামিয়া আঁকা-বাঁকা রাস্তা দিয়া আমরা ক্রমে নীচের দিকে নামিয়া একটা জঙ্গলাবৃত উপত্যকা অতিক্রম করিলাম। উপত্যকার মধ্য দিয়া ছোট একটি নদী প্রবাহিত হইতেছে। এখান হইতে দ্বিতীয় পাহাড়ের গা দিয়া চন্দ্রাকৃতিভাবে ঘুরিয়া আসিলাম। ইহার পর তৃণাবৃত ঢালু জমীতে উপস্থিত হইলাম। এখানে অনেক গরু চরিতেছে দেখিলাম। রাখালদের থাকিবার ছোট ছোট ঘরও আছে।

১৫ মিনিট অবতরণের পর রাস্তা অপেক্ষাকৃত ভাল হইল। এই ভাবে আর অর্দ্ধঘণ্টা অগ্রসর হইয়া আমরা প্রায় ২০ মিনিটে অন্য একটি ছোট পাহাড়ে উঠিয়া তাহার গা দিয়া চলিতে লাগিলাম। কিছু কাল চলার পর ৫ মাইল আসিয়া আমরা ছাঙ্গু হ্রদের উত্তর পারে অবস্থিত ছাঙ্গু ডাকবাংলোয় পৌছিলাম। মে মাসের পূর্ব্বে এখানে পাহাড়ের উপর অনেক তুষার ছিল; এখনও কোথাও কোথাও সামান্য সামান্য বরফ আছে। শীতের সময় ছাঙ্গু হ্রদ পর্য্যন্ত জমিয়া এত শক্ত হইয়া যায় যে, তাহার উপর দিয়া অনায়াসে বিচরণ করা চলে।

উপরে পাহাড়ের গায়ে রাস্তা হইতে ছাঙ্গুহ্রদ স্থানটি অতি মনোরম দেখায়, উক্ত হ্রদের চতুর্দ্দিকেই পাহাড়। বরফ গলিয়া যাওয়ার পর এই চতুর্দ্দিকের পাহাড়ে এবং হ্রদের পারে নূতন ঘাস হইয়াছে ও ছোট ছোট চারা গাছ ও রোডোডেনড্রন্ ফুলগাছ নূতন পাতা ও ফুলে শোভিত হইয়াছে। হ্রদের পারে ছোট ছোট ঝোপে নীল এবং সাদা, বিশেষতঃ লাল ফুলই অধিক ফুটিয়া রহিয়াছে। পাহাড়ের শিরোদেশে তুষারমধ্যে নীলবসনা পাহাড়ের নীচে হ্রদটিকে চারিদিকে

বেষ্টন করিয়া লাল রংএর ফুল ফুটিয়াছে। স্থানটি দেখিলে মনে হয়, যেন নীলবসনা সুন্দরী পদদ্বয় অলক্তকরাগে রঞ্জিত করিয়া হ্রদের পারে দাঁড়াইয়া তাহার নবযৌবনের সৌন্দর্য্য জগৎকে দেখাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে।

ছাঙ্গু হ্রদ

উপর ঘরের ভিতর যাইয়া আমরা নৌকা বাহির করিয়া বৃষ্টির মধ্যেই নৌকায় বেড়াইতে লাগিলাম। হ্রদটি দীর্ঘে এক মাইল এবং প্রায় আধ মাইল চওড়া হইবে। হ্রদের জল কালো, ইহাতে মৎস্য কি অন্য কোন প্রাণী নাই। বরফ কোন কোন

উপরিস্থিত পাহাড় হইতে বরফ গলিয়া উত্তরদিক হইতে একটি ছোট নদী প্রবাহিত হইয়া হ্রদে আসিয়া পড়িয়াছে এবং অন্য একটি ছোট ঝরণা-নদী দক্ষিণদিক দিয়া হ্রদের জল বহির্গত করিতেছে। হ্রদের পশ্চিম পারে সুন্দর একটি রাস্তা। হ্রদে একখানা ছোট নৌকা আছে বলিয়া চৌকীদার প্রকাশ করিল। আমরা পূর্ব্ববঙ্গের লোক, জলে আমাদের খুব আনন্দ, কাযেই তাড়াতাড়ি আমরা নৌকা করিয়া হ্রদে একটু ঘুরিবার জন্য অগ্রসর হইলাম। চৌকীদার দাঁড় লইয়া আসিল, কিন্তু বাংলো হইতে বাহির হইতে না হইতে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। অগত্যা বর্ষাতি, টুপী ও ছাতি সঙ্গে লইয়া আমরা রওনা হইলাম। হ্রদের পারে জলের স্থানে এখনও হ্রদের ধার পর্য্যন্ত আছে। তাহার মধ্য হইতেই রোডোডেনড্রন্ গাছ বাহির হইয়া ফুল ফুটিতেছে। দক্ষিণদিকে যে স্থান হইতে জল বাহির হইয়া যাইতেছে, তথায় নৌকায় যাইয়া উপস্থিত হইলাম। দক্ষিণ-দিকে হাওয়া বহিতেছিল। ফিরিবার সময় ছাতি দ্বারা পাল ধরিলাম, কিন্তু হাওয়ার জোর বেশী না থাকায় তাহাতে বড় সুবিধা হইল না। কাযেই পুনরায় দাঁড় বাহিয়া ঘাটে ফিরিয়া আসিলাম। প্রায় দুই ঘণ্টা জলভ্রমণের পরে আমরা নৌকা হইতে পারে উঠিয়া আসিলাম।

সন্ধ্যা হইয়াছে, এখনও মেঘ আছে ও বৃষ্টি হইতেছে। বাংলোয় ফিরিয়া দেখি যে, কুলীরা রোডোডেনড্রন্ গাছের

ছাঙ্গু হ্রদের অপর দৃশ্য

কাষ্ঠে আগুন জ্বালাইয়া শীত-নিবারণের জন্য আগুন পোহাইতেছে। তখন বৃষ্টি হইতেছিল, সুতরাং খুব ঠাণ্ডা বোধ হইতে লাগিল। আমরা বাংলো হইতে নৌকায় যাওয়ার পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ডাইল চড়াইয়া তাহাতে সোডা দিয়া রাখিয়াছে। ডাইল এখনও সিদ্ধ হয় নাই। ডাইল সিদ্ধ হইতে হইতে ভাত তরকারী হইয়া গেল। তার পর রাত্রি ৮টা বাজিল, আমরা আহারাদি করিয়া অগ্নি জ্বালাইয়া শয়ন করিলাম। বাংলোয় দুইটি শয়ন ও বসিবার ঘর, তাহাতে ৪টি শয্যা। বাংলো কাষ্ঠে নির্ম্মিত, সম্মুখে বারান্দা কাচ দিয়া ঘেরা। জানালায় দুইটি করিয়া কাচের দরজা এবং মোটা পশমের পর্দ্দা ঝুলানো আছে। ছাঙ্গু ১২ হাজার ৬ শত ফুট উচ্চ।

২১শে জুন, ১৯২৭। ছাঙ্গু ডাকবাংলো হইতে আহারাদি সমাপন করিয়া প্রায় ৮ ঘটিকার সময় বহির্গত হইলাম। ছাঙ্গু বাংলো হইতে বাহির হইয়া আস্তে আস্তে ছাঙ্গু হ্রদের পশ্চিম পারের চালু রাস্তা দিয়া দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ১ মাইল যাওয়ার পরে ছাঙ্গু হ্রদের দক্ষিণ পারে উপস্থিত হইলাম। ছাঙ্গুর দক্ষিণপার রাস্তা হইতে জঙ্গলাবৃত উপত্যকার মধ্য দিয়া চাঙ্গু আঁকাবাঁকা রাস্তা বড় সুন্দর দেখায়। ছাঙ্গু হ্রদ হইতে যে ঝরণা-নদী প্রবাহিত হইতেছে, তাহার পশ্চিম পার দিয়া এই রাস্তা বরাবর নিম্নভাগে সর্পাকারে জঙ্গলের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে। আমরা এই রাস্তা দিয়া ক্রমে নীচের দিকে নালা পার দিয়া যাইতে লাগিলাম। জলের ধারে লাল, নীল, সাদা পুষ্প সকল ছোট ছোট ঝোপে প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে। মধ্যে মধ্যে পশম-বোঝাই অশ্বতরের তাড়নায় আমাদিগকে এক ধারে সরিয়া যাইতে হইতেছে। তৎপর জঙ্গলের মধ্য দিয়া কতক দূর যাইয়া একটি ছোট গ্রামে পৌঁছিলাম। এখানে খানকয়েক ঘর আছে। অশ্বতর ও তাহাদের রক্ষকদিগের জন্য থাকিবার আড্ডাও এখানে রহিয়াছে। আমাদের কুলীগণ চা খাইবার জন্য এক দোকানে প্রবেশ করিল।

আঁকা-বাঁকা পথ—ছাঙ্গু হ্রদের দক্ষিণ পার্শ্ব

এখান হইতে খানিক নীচের দিকে নামিয়া একটি ছোট হ্রদের মত জলাশয়ের নিকট পৌঁছিলাম। পাহাড় হইতে এই ছোট হ্রদে জল পড়িয়া হ্রদের জল পূর্ব্বদিকের রাস্তার উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া নীচে উপত্যকায় পড়িতেছে। আমরা এই নালার অপর পারে যাইয়া পুনরায় পাহাড়ের গায়ের রাস্তা দিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম। নিম্নে জঙ্গলাবৃত উপত্যকা, উপরেও জঙ্গলাবৃত গগনস্পর্শী পাহাড়। আমরা ক্রমে জঙ্গলের মধ্য দিয়া নীচের দিকে যাইতে আরম্ভ করিলাম। কিছু দূর অগ্রসর হইয়া পাহাড়ের গায়ে চন্দ্রাকৃতি হইয়া ঘুরিয়া যাইয়া একটি ঝরণার নিকট আসিয়া পৌঁছিলাম। ঝরণাটি বহু দূর উপর হইতে আসিয়া রাস্তার পশ্চিম পারে পড়িয়া রাস্তা গড়াইয়া পুনরায় নীচে উপত্যকায় পড়িতেছে। তখনও বৃষ্টি হইতেছিল। আমরা এখান হইতে ঘুরিয়া পূর্ব্বদিকে গিয়া পুনরায় দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইলাম। কার্পনাঙ্গের বাংলো বহু দূর হইতে দেখা যায় বটে, কিন্তু তখন কুয়াশায় আবৃত থাকায় আমরা দেখিতে পাইলাম না। এখান হইতে রাস্তা জঙ্গলের মধ্য দিয়া পাহাড়ের গা দিয়া চন্দ্রাকৃতি হইয়া কার্পনাঙ্গের বাংলো পর্য্যন্ত গিয়াছে। কিন্তু কার্পনাঙ্গ এই স্থান হইতে চন্দ্রাকৃতি রাস্তা দিয়া প্রায় ২ মাইলের উপর হইবে। এই রাস্তা পাথর দিয়া বাঁধান এবং স্থানে স্থানে পাথর কাটিয়া রাস্তা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। স্থানে স্থানে বড় বড় পাথর রাস্তার

উপর ঝুলিয়া রহিয়াছে। উপত্যকাটি গভীর, কোন কোন স্থানে উপত্যকায় পড়িয়া যাওয়ার ভয় হইতে যাত্রীদিগকে রক্ষা করিবার জন্য বেড়া দেওয়া হইয়াছে। আমরা এই রাস্তা ধরিয়া বরাবর নীচের দিকে যাইতে যাইতে একটি জল-প্রপাতের নিকট পৌছিলাম। জলপ্রপাতটির জল রাস্তার উপর পড়িতেছে। এখানে রাস্তার দুই পার্শ্বে বড় বড় বৃক্ষ এবং বৃক্ষের নীচে নানা রকমের 'ফার্ণ'। স্থানে স্থানে পাতা-মণ্ডিত এবং পুষ্পে বিভূষিত বড় বড় গাছ আকাশে মস্তক উত্তোলন করিয়া যেন পাহাড়ের শৃঙ্গের সহিত প্রতিযোগিতা করিতেছে। গণ্টক, জেলা পাহাড় ও দার্জ্জিলিং এই রাস্তা হইতে মধ্যে মধ্যে দেখা যায় বলিয়া শুনিলাম। কিন্তু আমরা কুয়াশার জন্য দেখিতে পাইলাম না।

জলপ্রপাত

ছাঙ্গু হইতে প্রায় ৭।৮ মাইল রাস্তা চলার পর আমরা গণ্টক যাইবার পুরাতন রাস্তা ছাড়িয়া নূতন রাস্তা দিয়া চলিলাম। এই রাস্তা দিয়া ক্রমে নিম্ন-দিকে যাইতে যাইতে আমরা বেলা ২টার পূর্ব্বেই কার্পনাঙ্গের বাংলোয় পৌছিলাম। এই বাংলো পাহাড়ের গায়ে একটি ছোট চটানের উপর অবস্থিত, নিম্নে উপত্যকা। ইহা ৯ হাজার ৫ শত ফুট উচ্চ; তিনটি ঘর এবং চারি জন লোকের শয়নের ব্যবস্থা আছে। ঘরটি টিনের, কাঠের বেড়া, সম্মুখে লম্বা বারান্দা, পশ্চাতে রান্নাঘর এবং পাহাড়ের নিম্নে কুলীদিগের বাসের জন্য ঘর ও আস্তাবল আছে। আমরা বৈকালে পাহাড়ের উপরে বেড়াইতে গেলাম। বাংলোর নিকটে কোন বস্তি, এমন কি, জনমানবও নাই। সূর্য্যাস্তের ২।১ খানা ছবি তুলিবার বাসনায় আমরা ক্যামেরা লইয়া উপরে উঠিলাম। দেখিলাম, উপরের পাহাড়ের উপরেও অনন্ত পাহাড়। আমাদের আরও অনেক উপরে উঠিতে হইবে। এ দিকে বৃষ্টিও আরম্ভ হইল। সুতরাং বিফলমনোরথ হইয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

২২শে জুন। বহু দিন পর্য্যটনের পর আমাদের সকলেরই বাড়ী ফিরিবার জন্য মন উদ্বিগ্ন হইয়াছে। বিশেষতঃ ইয়াথুনের পর হইতে কয়েক দিন যাবৎ পশমবাহী অশ্বতর-রক্ষক এবং বাংলোর চৌকীদার ব্যতীত অন্য জন-মানবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নাই। সুতরাং অদ্য গণ্টক পৌছিব, ইহা জানিয়া আমরা সকলেই উৎসাহিত। বিশেষতঃ আমাদের সঙ্গের খাদ্যসামগ্রীর অনাটন হওয়ায় আমরা গণ্টকে পৌছিবার জন্য আরও ব্যস্ত হইলাম। [ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রিয়নাথ রায়।

বর্ষার গান

গগনে ঘনায় ঘন-দামিনী খেলা
কোথায় দাঁড়াই বল যামিনী বেলা!
রুদ্ধ যে গৃহের দ্বার
বারি ঝরে বার বার
"খোল দ্বার, খোল দ্বার"—আমি একেলা।

যুঁই চাঁপা কোথা পাব?—এনেছি থালি
ভুঁই-চাঁপা ফুলদলে ভরিয়া থালি,
আঁখি-ভরা ছল ছল
এনেছি আঁখির জল
তোমারেই দিব বলি'—করো না হেলা!

শ্রীপ্রমথনাথ কুণ্ডার।

ধাঁধার উত্তর

১

মিস্ শেফালী গুপ্তা তাহার জীবনের সর্ব্বপ্রথম দিনটিতে, কোথাকার কোন্ গুপ্ত-বংশ উজ্জ্বল করিয়া যে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, তাহা অক্লান্ত অনুসন্ধান ও গভীর গবেষণা করিয়াও জানিবার উপায় ছিল না, এবং বর্ত্তমানে তাহার কি যে ধর্ম্ম, অর্থাৎ সে হিন্দু কি খৃষ্টান, বৌদ্ধ কি ব্রাহ্ম, তাহাও নির্দ্ধারণ করা সুকঠিন। কিন্তু তাহার সম্বন্ধে যাহা সুকঠিন নহে, অর্থাৎ অতি সহজেই যাহা বলা যাইতে পারে, তাহা এই যে, শেফালী উচ্চশিক্ষিতা না হইলেও শিক্ষিতা, অপূর্ব্ব সুন্দরী না হইলেও সুন্দরী এবং পরিপূর্ণ-যৌবনা না হইলেও বিগত-যৌবনা নহে, এবং এই তিনটি কারণেই শশিনাথকে তাহার দ্বিতীয় পক্ষের 'বাড়ী'র কড়া হুকুম ও সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়াও মিস্ শেফালীর গৃহে মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়।

সে দিনও শশিনাথ হঠাৎ এইরূপ আসিয়া পড়িয়াছিল এবং বাহিরের ক্ষুদ্র নির্জ্জন ঘরখানির মধ্যে টেবিলের উভয় পার্শ্বে দুই জনে মুখোমুখী বসিয়া নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনাদি করিতেছিল।

শেফালী কহিল, "কি জানেন,—যে স্বাধীনতা স্বাধীনতা ব'লে দেশের লোক আজকাল এত লাফা-লাফি দাপা-দাপি করছে, তার মূলই রয়েছে আল্‌গা। নারীকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে, সব বিষয়ে অধীন ক'রে রেখে, স্বাধীনতার আদর্শ কেমন ক'রে হ'তে পারে, তা ত বুঝি না। এ দেশের শাস্ত্র হিসেবে, মেয়েমানুষ ছেলেবেলায় তার বাপ-মার অধীন, যৌবনে স্বামীর অধীন, বুড়ো বয়সে ছেলের অধীন, অর্থাৎ তার জন্মাবার প্রথম দিনটি থেকে আরম্ভ ক'রে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত অধীনতার পাথর থাকে তার মাথায় চাপানো। মরবার পর তবে সেই জগদ্দল পাথর মাথা থেকে তার খ'সে পড়ে। তা-ও বোধ হয় পড়ে না, কেন না, তার স্বামি-পুত্তুরের একদলা চটকানো পিণ্ডি আর এক গণ্ডূষ জলের জন্যে মহাশূন্যে তাকে হাঁ ক'রে ব'সে থাকতে হয়, নইলে ত তার আর উদ্ধার নেই।"

ঈষৎ একটু হাসিয়া শশিনাথ বলিল, "এ সব নিয়ে অনেক দিন অনেক তর্কই আপনার সঙ্গে হয়ে গেছে, সুতরাং তর্ক করবার আর ইচ্ছেও নেই, দরকারও নেই। তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, মিস্ গুপ্তা। স্বাধীনতা পেয়ে স্বাধীনভাবে পথ চলবার শক্তিটা কি আপনারা সব নতুন ক'রে অর্জ্জন করতে পেরেছেন?"

"পাবার সঙ্গে সঙ্গেই অর্জ্জন হয়। য়ুরোপের মেয়েরাও এই ক'রে অর্জ্জন করতে পেরেছে।"

"কোন দেশের মেয়েরাই এ জিনিষটা অর্জ্জন করতে পারে নি। পুরুষের সমান হ'তে নারী কোন কালেই কোন দেশেই পারে নি। সৃষ্টির আদিকাল থেকেই নারী পুরুষের অধীন। সৃষ্টির উদ্দেশ্যই তাই, প্রাকৃতিক নিয়মই তাই।"

কিঞ্চিৎ ব্যঙ্গের ভাব দেখাইয়া মিস্ গুপ্তা কহিল, "কিন্তু আপনারাই ব'লে থাকেন যে, নারীই হচ্ছে শক্তির আধার, শক্তি না জাগলে দেশ জাগবে না।"

"হ্যাঁ। কিন্তু সে শক্তির কথা আমি বলছি না। সে শক্তি দেখিয়ে গেছে সে যুগের সীতা, সাবিত্রী, বেহুলা, দময়ন্তী, এ যুগের লক্ষ্মীবাঈ, দুর্গাবতী। আজকালকার নারীদের ভিতরও এ শক্তি অনেকেরই আছে, অনেকেই দেখাচ্ছেন। কিন্তু আপনাদের মত নারীদের মধ্যে, যারা ভারতের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে য়ুরোপের আদর্শ পুরো মাত্রায় আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করছেন, তাঁদের মধ্যে সে শক্তি আর জাগবে না। তবে আমি সে শক্তির কথাও বলছি না। আমি বলছি, মেম সাহেব সাজবার শক্তি আপনাদের আছে কি না। একে ঠিক শক্তি বলা চলে না, একে বলে বিলাস। এ বিলাস আপনাদের ধাতে সহ্য হবে কি?"

"অর্থাৎ?"

"অর্থাৎ ঘর ছেড়ে বাইরে এসে স্বাধীনভাবে সমান অধিকার নিয়ে চলা-ফেরা করা শেষ পর্য্যন্ত আপনাদের নরম ধাতে সহ্য হবে কি না। আমার মনে হয়, তা হবে না। অথচ সারা দেশের সমাজটাকে উল্টে দিয়ে ঐ রকম নতুন একটা বিলাসী সমাজও ওদের মত গ'ড়ে তুলতে পেরে উঠবেন না। ফলে নিরুপদ্রব শান্ত সমাজের ওপর দিয়ে এমন একটা মারাত্মক ঝড়ো হাওয়া বয়ে যাবে যে, তার মুখে যে পড়বে, সেই মরবে। যাদের বিলাসের এই জবর

আদর্শটা আপনারা নকল করতে বসেছেন, খোঁজ নিলে দেখবেন যে, তারাও ভেতর ভেতর নারীর নারীত্বকে, শক্তিকে গলা টিপে হত্যা ক'রেই আসছে। এ দেশের মেয়েরা বাল্যে বাপ-মার, যৌবনে স্বামীর আর বুড়ো বয়সে যে ছেলের অধীনে থাকে, তাইতেই ত তাদের নারীত্ব চিরকাল বজায় থাকে, অর্থাৎ সে মেয়ে হতে পারে, স্ত্রী হতে পারে, মা হতে পারে। কিন্তু যে দেশের মেয়েরা জীবনে কখনো—"

"ও কি, থামলেন কেন? আমি বিরক্ত হচ্ছি না, ভয় নেই! যে দেশের মেয়েরা—জীবনে কখনো?—"

"জীবনে কখনো মেয়ে হতে পায় না, স্ত্রী হয় না, মা হয় না, তারা যে কি ক'রে নারীর শক্তিলাভ ক'রে নারী হয়ে থাকতে পারবে, কিছু ত আমি বুঝি না। সে নরও হয় না, নারীও হয় না, হয় একটা কিম্ভুত-কিমাকার! যে কথা থেকে আজ কথাটা উঠলো, সেই কথা ধরেই বলি। বাপ-মা দেখে শুনে পছন্দ ক'রে যে এতকাল তাদের ছেলে-মেয়ের বিয়ে দিয়ে আসছে, তাতে কি এ পর্য্যন্ত কোন অনিষ্ট বা কুফল হয়েছে, না, স্ত্রীর স্বামিত্যাগ বা স্বামীর স্ত্রীত্যাগ করবার এ দেশে কোন কালেই দরকার হয়েছে?"

"তা হলে শশিনাথ বাবু, আপনি কি বলতে চান যে, সব স্বামী স্ত্রীই পরস্পর খুব সুখেই বাস করছে, কোথাও কেউ অসুখী নেই?"

"থাকে যদি, খুবই কম। হিসেবের মধ্যে তা ধরা যায় না। হিন্দুর বিয়েতে, সেই যে আগুনের সামনে পুরুত ঠাকুর গোটাকতক মন্ত্র আউড়ে দিয়ে দুজনের হাত এক ক'রে দেয়, সে এক করার ভেতর যতটা জোর থাকে, তেমন আর জগতের কোন জাতের বিয়েতে থাকে না। পরস্পরের মধ্যে ভবিষ্যতে যদি কোন দোষ-ত্রুটি দেখা দেয়, তা তারা নিজেরাই সয়ে সামলে নেয়, ভুলে যায়, মার্জ্জনা করে। তাই নিয়ে ডাইভোর্স য়্যাক্টের সৃষ্টি ক'রে তার শরণ নেবার তাদের দরকার হয় না। এ দেশে এই করেই এত দিন চ'লে এসেছে, চলেই যাবে, বিশেষ কোন গোলমাল বাধবে না, মিস্ গুপ্তা।"

"তা' হলে কি আপনি বলতে চান যে, সকল স্বামীই স্ত্রীকে ভালবাসে, আর সকল স্ত্রীই পতিগতপ্রাণ?" বলিয়া উচ্চ একটা হাসির রোল তুলিয়া শেফালী শশিনাথের দিকে ব্যঙ্গপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। শশিনাথ মনে মনে ভাবিল যে, ইহা লইয়া মিস্ গুপ্তার সহিত তর্কে কোন ফল নাই; কিন্তু চুপ করিয়াও থাকিতে পারিল না, কহিল,—"প্রায় তাই।"

"আপনি আপনার স্ত্রীকে তা হ'লে ভালবাসেন?"

"তা বাসি বৈ কি।"

"জল-জ্যান্ত অমন মিথ্যাটা আর বলবেন না।"

একটুখানি হাসিয়া শশিনাথ কহিল,—"পছন্দ তাকে হয় ত না করতে পারি, কিন্তু ভালবাসি যে, সেটা মোটেই মিথ্যা নয়।"

"তা হ'লে তাঁকে লুকিয়ে—" বলিয়া টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া শেফালী চুপি চুপি কি কহিল। শশিনাথ ঘাড় হেঁট করিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

শেফালী কহিল,—"সুতরাং স্বীকার করুন যে, ভাল-বাসেন না, বাঘের মত ভয় করেন। কিন্তু যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানেই সন্ধ্যা হয়" বলিয়া বাহিরের দিকে আঙুল বাড়াইয়া শশিনাথকে কি দেখাইল। শশিনাথ সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কিঞ্চিৎ চঞ্চল হইয়া পড়িল, কহিল,—"চাকর ছোঁড়াটাকে উঁনাই পাঠিয়েছে, আমি এখানে এসেছি কি না, সন্ধান নিতে। জ্বালাতন ক'রে মারলে। কি মুস্কিলেই যে পড়েছি।" বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই শশিনাথ উঠিয়া দাঁড়াইল।

"তা হ'লেও পবিত্র পরিণয়ের জোর বন্ধন!" শেফালী মৃদু একটু হাসিল।

মিস্ শেফালী গুপ্তা বৎসরখানেক পূর্ব্বে পশ্চিমের কোন একটা সহর হইতে আসিয়া ভবানীপুরে শশিনাথের বাটীর সম্মুখে বাসা করিয়া থাকে। সেলাই ও সঙ্গীতে শেফালী নিপুণা ছিল, এবং এই দুইটি বিদ্যাই তাহার উপজীবিকা। বড়লোকের বাড়ীতে এই দুইটি জিনিষ শিক্ষা দিয়া শেফালী যাহা উপার্জ্জন করিত, তাহাতে তাহার অবিবাহিত একক জীবনের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য-ভোগের পক্ষে কোনই অভাব হইত না।

এখানে আসিবার পর হইতেই তাহার সুমধুর আকর্ষণে পাড়ার অনেকের সহিতই তাহার আলাপ-পরিচয় হয়। সর্ব্বাপেক্ষা তাহার সৌহৃদ্য ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠে শশিনাথের সঙ্গে। এই ঘনিষ্ঠতা সেই সময় সকলেরই মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং বেশী করিয়া করে শশিনাথের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী

উষাবাগার। এই লইয়া শশিনাথের সহিত উষার মধ্যে মধ্যে সংঘর্ষ বাধিত এবং সেই সংঘর্ষে নিজের দোষ-স্থালনের জন্ম প্রথমটা হাঁক-ডাক করিলেও, শেষ পর্য্যন্ত দ্বিতীয়পক্ষের সম্মুখে তাহাকে নীরব হইতেই হইত। অবশেষে বাটীর ও বাহিরের হাওয়া যখন খুবই প্রতিকূল হইয়া পড়িল, তখন শশিনাথেরই পরামর্শে ওপাড়া হইতে শেফালী তাহার বাসা তুলিল এবং তখন হইতে আজ দুই তিন মাস যাবৎ সে বকুলবাগানের এই নূতন বাসায় আসিয়া রহিয়াছে।

উঠিয়া দাঁড়াইয়া শশিনাথ কহিল,—"ডাইভোর্স য়্যাক্ট থাকিলেই দেখছি ভাল হ'ত।" বলিতে বলিতে শশিনাথ ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া রাস্তায় নামিয়া পড়িল। অনুচ্চ কণ্ঠে শেফালী দরজার চৌকাঠ ধরিয়া কহিল,—"ভাবতে হবে না। এ দেশে শীগ্‌গীরই আমাদের দ্বারাই তা হবে জানবেন।"

পথে আসিতে আসিতে শশিনাথ ভাবিতে লাগিল যে, চাকরটা আজ তাহাকে এখানে দেখিয়া গেল এবং এই দেখার জন্ম উষাই যে তাহাকে চররূপে পাঠাইয়াছে, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। মিস্ গুপ্তার সম্পর্কে উষার মন হইতে মন্দ ধারণা দূর করিবার জন্ম এই দুই মাস ধরিয়া উষার কাছে তাহার সকল দিব্য-দিলাসা, সর্ব্বপ্রকার যত্ন-চেষ্টা একবারেই নষ্ট হইয়া গেল। কিন্তু যেমন করিয়াই হউক, এ ধাক্কা তাহাকে সামলাইয়া লইতেই হইবে। এই সামলাইয়া লইবার উপায় চিন্তা করিতে করিতেই বাকী পথটুকু অতিক্রম করিয়া শশিনাথ ভীত-মনে স্বগৃহে প্রবেশ করিল এবং উষার সম্মুখেই কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া আলনায় রাখিতে রাখিতে যেন বিরক্তচিত্ত হইয়া নিজের মনে বলিতে লাগিল,—"কত বড় অভদ্র মেয়েমানুষ, আমি একবার দেখে নোবো, আমার নামও শশী বোস।"

উষা সম্মুখে পানের সরঞ্জাম লইয়া পাণ সাজিতেছিল। কথাটা তাহার কাণে যাইল বটে, কিন্তু তাহাতে তাহার বিশেষ কোন মনোযোগের লক্ষণ দেখা গেল না। যেন অত্যন্ত বিরক্তির সহিত ঘাড় হেঁট করিয়া নীরবে তাহার কার্য্য করিয়া যাইতে লাগিল।

শশিনাথ পুনরায় তেমনই ক্রোধব্যঞ্জক স্বরে কহিতে লাগিল,—"পশ্চিম থেকে পাড়ায় এসে বাসা করলে, সভ্য-ভব্য শিক্ষিত দেখে, আর গান-টান ভাল জানে, তাই মাঝে মাঝে একটু-আধটু গিয়ে বসতুম, সুর তাল-টাল নিয়ে দুটো একটা কথা জিজ্ঞাসা করতুম,—কিন্তু ভেতর ভেতর তোমার এত!"

উষা একই ভাবে নিরুত্তর।

"আমিও বড় শক্ত ছেলে, সহজে তোমায় আমি ছাড়ছি নি। বাবা! বাসা খুঁজে খুঁজে হাল্লাক! যাক, সন্ধান ক'রে খুঁজে ত বার ক'রে ফেল্লুম, আর থোঁতা মুখ ভোঁতাও ক'রে দিয়ে এলুম!"

উষার পাণসাজা শেষ হইয়া গিয়াছিল। বাটা গুছাইতে গুছাইতে অতিমাত্রায় গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—"কি ব্যাপার, হয়েছে কি?" কিছু পূর্ব্বেই সে ভৃত্যের মারফত শেফালীর গৃহে স্বামীর অবস্থান ও উভয়ের মধ্যে কথোপ-কথনের খবর পাইয়াছিল।

খাটের উপর বসিয়া পড়িয়া শশিনাথ কহিল,—"ঐ মিস্ গুপ্তার কথা বল্‌ছি। এমনি মিথ্যাবাদী, অভদ্র যে, সুরেন রায় এটর্ণীর কাছে মিথ্যা ক'রে বলেছে যে, শশী বাবুর স্ত্রীকে গান-সেলাই শেখাতুম, ৩০ টাকা ক'রে মাইনে, ছ'মাসের টাকা বাকী, তার এক পয়সাও দেন নি। তার পর আরও কত কথা! এ পাড়ার লোক না কি সব খুব খারাপ, সেই জন্যেই তিনি এ পাড়া ছেড়ে চ'লে গেছেন। আমিও তার নতুন বাসা খুঁজে বার ক'রে আজ গিয়েছিলুম, খুব দু'কথা শুনিয়ে দিয়ে এসেছি।"

উষার গম্ভীর আননে একটু প্রফুল্লতার ভাব দেখা দিল। একটু পূর্ব্বে চাকরের মুখে শুনিয়া স্বামীর প্রতি চিত্ত তাহার বিতৃষ্ণায় ভরিয়া গিয়াছিল, এখন এই সমস্ত শুনিয়া তাহার বিতৃষ্ণাভরা মনে যেন অনেকখানি শান্তি ফিরিয়া আসিল। তবে এ সমস্তই তাহার স্বামীর চাতুরী কি না, এ সন্দেহও তাহার মনকে একটু দোলাইয়া দিল। এক একবার যেন তাহার ধাঁধার মত বোধ হইলেও, সমস্ত ব্যাপারটা চাতুরী বলিয়া মনে করিতে তাহার ইচ্ছা হইল না। ভাবিল, স্বামীর এই কথাগুলিই যেন ধ্রুব সত্য হয়। ধীরে ধীরে একটা টানা নিশ্বাস নিঃশব্দে ফেলিয়া উষা পাণের বাটা লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং এ সম্বন্ধে কোনরূপ আর প্রশ্নোত্তর না করিয়া মন্থরগতিতে শ্বশ্রূর ঘরের উদ্দেশে চলিয়া গেল।

২

দিন পাঁচ সাত পরে এক দিন অপরাহ্ণে শশিনাথ শেফালীর গৃহে পদার্পণ করিতেই শেফালী কহিল,—"বিশেষ দরকার, আসুন, আমার চিঠি পেয়েই চ'লে এসেছেন বোধ হয় ?"

রাস্তার দিকের দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া, শেফালীর মুখের দিকে হাঁ করিয়া থাকিয়া শশিনাথ জিজ্ঞাসা করিল,—"চিঠি ?"

কৌচের উপর বসিয়া পড়িয়া শেফালী বলিল,—"হ্যাঁ। আমার বয়কে দিয়ে একটু আগেই পাঠিয়েছিলুম, দিয়ে এসেছে। কি ব্যাপার বলুন ত ? ক'দিন যে একেবারেই দেখাসাক্ষাৎ নেই ?"

চিঠি দিয়া আসার কথা শুনিবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা দুশ্চিন্তার ছায়া শশিনাথের মুখের উপর ঘনাইয়া উঠিল। পার্শ্বের চেয়ারখানাতে বসিয়া পড়িয়া কহিল,—"এত ক'রে সাবধান ক'রে দিই আপনাকে যে, লেখা-লেখির ভিতর যাবেন না, তবু আজ আবার চিঠি লিখে পাঠালেন ? লেটার বাক্সে দিয়ে এসেছে নিশ্চয়। কবে উষার হাতে প'ড়ে আবার একটা কুরুক্ষেত্র-কাণ্ড বেধে উঠবে দেখছি।"

"কিচ্ছু বাধবে না। কেউ দেখতে পায়নি। বয় চুপি চুপি গিয়ে লেটার বাক্সের ভেতর ফেলে দিয়ে এসেছে। আপনার সঙ্গে বিশেষ একটা দরকারী কথা আছে, তাই। আজ আমার শরীর ভাল নেই, সমস্ত দিন কিচ্ছু খাইনি। সকাল থেকে কোন যায়গায় আজ বেরোতেও পারি নি।"

শশিনাথ বহুক্ষণ ধরিয়া শেফালীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কহিল,—"কিন্তু যাই হোক, আজই আপনাকে সব দিনের চেয়ে সুন্দর দেখাচ্ছে। চুলে আজ সাবান দিয়েছেন বোধ হয় ? একরাশ ঝর-ঝরে কোঁকড়ান চুলের ঢেউ, তাতে এই রাঙ্গা পাড় ধবধবে সাড়ীখানি প'রে আজ আপনাকে দেখাচ্ছে ঠিক যেন——"

"স্বর্গ থেকে তিলোত্তমা উর্ব্বশীর নতুন একটা এডিসান মর্ত্যে নেমে এসেছি। কেমন, এই ত ? কিন্তু মুখের দিকে ও রকম হাঁ ক'রে চেয়ে থাকবার আজ আর সময় নেই। একটা দরকারী কথা আছে, চলুন ওপরে যাই।"—বলিয়া রুক্ষ, কুঞ্চিত চুলের গোছা পিঠের উপরে দোলাইয়া শেফালী সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া গেল, শশিনাথ তাহার অনুসরণ করিল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে শেফালীর গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া শশিনাথ বরাবর আপন বাটীর বৈঠকখানার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল এবং পকেট হইতে চাবি বাহির করিয়া চারিদিকে একবার চাহিয়া, লেটার বক্স হইতে শেফালীর পত্রখানি লইয়া পড়িল। স্ত্রীর সম্বন্ধে মনে মনে তাহার যে একটা আশঙ্কা ছিল, তাহা দূর হইয়া মুখে স্বস্তি ও নির্ভাবনার একটা চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল এবং চিঠিখানি টুকরা-টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া রাস্তায় ফেলিয়া দিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল। তুলসীতলায় দীপ দিয়া, গলায় আঁচল জড়াইয়া উষা প্রণাম করিয়া উঠিতেই বারান্দা হইতে শাশুড়ী কহিলেন,—"শশী এল বোধ হয়, বৌমা, জলখাবারটা ওপরে দিয়ে এস।"

মিনিটকতক পরেই উষা এক হাতে জলখাবারের রেকাবী ও আর এক হাতে জলের গ্লাস লইয়া শশিনাথের সম্মুখে আসিয়া কহিল,—"কখন্ দুপুর বেলায় দুটি ভাত মুখে দিয়ে বেরিয়েছ, ক্ষিধেও পায় না ? শরীরের ওপর যে এই অযত্নটা করছ, কিন্তু আর্সি ধ'রে নিজের চেহারাখানা দেখো একবার, দিন দিন কি হয়ে যাচ্ছে ?"

অন্তরে অপরিসীম প্রীতি অনুভব করিয়া শশিনাথ উত্তর করিল, "এ শরীরে আর মায়া নেই, উষা !"

"তোমার না থাকতে পারে, কিন্তু আর এক জন ত আছে, যার ঐ শরীরের ভাল-মন্দই হচ্ছে সব।"

প্রত্যুত্তরে কি একটা শশিনাথ বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু না বলিয়া খাইয়া যাইতে লাগিল।

দুই এক মিনিট নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিবার পর উষা ধীর-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—"কোথায় গিয়েছিলে ?"

জলের গ্লাসটি হাত হইতে নামাইয়া রাখিয়া শশিনাথ কহিল,—"অনেক যায়গায় আজ ঘুরেছি। বড়বাজার, বোস কোম্পানীর আফিস, ব্যাঙ্ক, শিয়ালদ' ষ্টেশন, বসুমতী, লিলি ফার্ম্মেসী, বরেন ব্রাদার্স——"

"তা' হলে আবার ত এখুনি বেরুতে হবে ?"

"কোথায় ?"

"মিস্ শেফালী গুপ্তা ?"

শশিনাথ হাঁ করিয়া উষার গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

উষা কহিল,—"লেটার বাক্সে চিঠি পাওনি? বিশেষ দরকার, অবশ্য অবশ্য আজ একবার আসবেন, সাক্ষাতে সব জানাইব। পাও নি?"

শশিনাথের সমস্ত মুখখানা ফ্যাঁকাসে হইয়া গেল। কিন্তু মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের জন্য। কয়েক সেকেণ্ড পরেই শশিনাথ হাসিয়া লুটোপুটি খাইতে খাইতে কহিল,—"তা হ'লে চিঠিখানা তুমি দেখেছ?"

"দেখেছি বৈ কি। মা'র ঘরের জানালায় দাঁড়িয়েছিলুম, দেখলুম, মিস্ গুপ্তার চাকর ছোঁড়াটা চোরের মত এসে চিঠিখানা বাক্সে ফেলে দিয়ে গেল। তা শুভ সংবাদে হাসি যে আর কিছুতেই থামাতে পারছ না। কিন্তু দেরী হয়ে যাচ্ছে, যাবে কখন্?"

তেমনই হাসিয়া লুটোপুটি খাইতে খাইতে শশিনাথ কহিল,—"ব্যাপারটা কিছুই জান না তুমি। আমিও কি ছাই জানতুম? এই ত শুনলুম। দাঁড়াও, কেশব ভায়াকে ডেকে আনি, তার মুখ থেকেই সব শোন। কত বড় বদ মেয়েমানুষ ও, আমিও দেখবো,—আমারও নাম শশী বোস।" বলিয়াই অপেক্ষামাত্র না করিয়া শশী দ্রুতপদে নীচে নামিয়া গেল ও পার্শ্বের বাটী হইতে তাহার একান্ত অন্তরঙ্গ প্রতিবেশী কেশব ভায়াকে সংক্ষেপে সব বলিয়া বুঝাইয়া, হাতে পায়ে ধরিয়া, উপরে উষার সম্মুখে হাজির করিয়া কহিল,—"করেছে কি জানিস, কেশব,—একখানা চিঠি বাক্সে ফেলে দিয়ে গেছে, যেন আমার সঙ্গে ওর খুবই ঘনিষ্ঠতা, আমি যেন ওখানে যাই-টাই ;—লিখেছে, 'অবশ্য অবশ্য আজ একবার আসবেন, ক'দিন আসেন নি কেন?' মৎলবটা কি বুঝতে পেরেছিস ত? ঐ তুই যা সব আমায় বল্‌লি। তা আবার চিঠিখানা বাক্সে ফেলে দিয়ে গেছে কেমন সময়! তোর বৌদিকে মা'র ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, ওর সামনেই, ওকে দেখিয়ে দিয়ে গেছে, কেন না, ও তা হ'লে সেটা খুলে পড়বে। তোর বৌদিও ঠিক করেছে তাই। অন্য একটা চাবি দিয়ে বাক্স খুলেছে, তার পর জল দিয়ে খামখানা খুলে, প'ড়ে, আবার এঁটে রেখে দিয়েছে। ও ত তোর গিয়ে, এ সব কিছুই জানে না, ও মনে করেছে সত্যি। উঃ! কি রকম ফন্দীটা করেছে একবার ভাখ!"

কেশব বলিল,—"হ্যাঁ;—আমায় সে দিন বল্লে কি না যে, শশী বাবুকে আমি জব্দ করবোই। আমি পশ্চিম-ঘোরা মেয়েমানুষ, ওদের স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে একটা মনান্তর বাধাতে যদি না পারি ত আমার নামই নয়। কোলকাতায় আমার আসা থেকে অবধি শশী বাবু ভেতর ভেতর বরাবর আমার শত্রুতা ক'রে আসছেন।"

অপেক্ষাকৃত উচ্চ কণ্ঠে শশিনাথ বলিয়া উঠিল,—"তা ত করবই। দেখি তুমি কি করতে পার! তোমার দৌড় ত ঐ পর্য্যন্ত। মিথ্যা চিঠি পাঠিয়ে পরিবারের মন ভাঙ্গিয়ে দেবে, তেমন পরিবার পাও নি। 'এ বড় কঠিন ঠাঁই—গুরু-শিষ্যে দেখা নাই!' ও সব ফিকির-ফন্দী এখানে খাটছে না।"

উষা সমস্তটা সময় নির্ব্বাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সে দিনকার মত সমস্ত জিনিষটা আজও একটা মস্ত ধাঁধার রূপ লইয়া তাহার চক্ষুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল এবং কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, জলখাবারের শূন্য রেকাবিখানি ও গেলাসটা তুলিয়া লইয়া ধীরপদে নীচে নামিয়া গেল।

৩

কয় দিন হইতে শীতও যত পড়িয়াছে, উত্তুরে হাওয়ার প্রাবল্যও তত বাড়িয়াছে। উপরকার ঘরে গলা পর্য্যন্ত একখানি শাল মুড়ি দিয়া, শেফালী ইজি-চেয়ারে অর্দ্ধ-শায়িত অবস্থায় শশিনাথের সহিত কথা কহিতেছিল। পার্শ্বের একটি টিপয়স্থিত চায়ের কাপ হইতে অল্প অল্প ধোঁয়া উঠিতেছিল। শশিনাথ তাহার নিজের হাতের চায়ের বাটিটিতে একটি চুমুক দিয়া, তাহার অর্দ্ধ-সমাপ্ত কথা শেষ করিবার অভিপ্রায়ে কহিল,—"এ সব কথার বিস্তারিত আলোচনা এখানেও হয় না, দু'এক কথায়ও হয় না, মিস্ গুপ্তা। এই যেমন, মাসিক পত্রের ছোট গল্পের ভেতর রাজনীতি বা সমাজনীতির কোন বড় কথা বিস্তারিত ক'রে বলা চলে না, কেবল একটু ছুঁয়ে যেতে হয়, বিস্তারিত বলবার চেষ্টা করতে গেলেই সেটা না হয় ছোট গল্প, না হয় একটা প্রবন্ধ, সেই রকম, চা খেতে খেতে, আপনার এই ঘরে ব'সে ও সব আলোচনা চলে না। কিন্তু চা-টা যে আপনার শুধু শুধুই ঠাণ্ডা হয়ে গেল।"

হাতের চায়ের বাটিটা টিপয়ের উপর রাখিয়া দিয়া শশিনাথ উঠিয়া দাঁড়াইল।

শেফালী কহিল,—"চল্লেন না কি? তা' হ'লে 'এক্‌মাসের' দিন বাগান যাওয়া সম্বন্ধে ঠিক ক'রে একটা ব'লে যান।"

"আবার ঠিক কি? শনিবার বেলা ১২টা ১টার মধ্যে খাওয়া-দাওয়া শেষ ক'রে তৈরী হয়ে থাকবেন। আমি বেলা দুটো আড়াইটের সময় তৈরী হয়ে আপনার এখানে আসবো।"

"এই কথাই পাকা?"

সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে শশিনাথ কহিল,—"পাকা।"

ইহার পর কয়েক দিন কাটিয়া গেল। ৯ই পৌষ শনিবার, বড় দিনের দিন সকালে শশিনাথ আসিয়া শেফালীকে বেলা ১২টা ১টার মধ্যে তৈয়ারী হইয়া থাকিবার জন্য আর একদফা তাড়া দিয়া গেল। কারণ, সেই দিন ৪-১৭র ট্রেণে তাহাকে লইয়া তাহার নূতন ক্রয়-করা পাণিহাটীর বাগান দেখাইতে লইয়া যাইবে।

শেফালীর ওখান হইতে বাহির হইয়া শশিনাথ বাগান-যাত্রা সম্বন্ধে আরও দুই একটি কায তাড়াতাড়ি সারিয়া লইল এবং অনেক বেলায় গৃহে ফিরিয়াই শুনিতে পাইল যে, তাহার শ্বশুর আসিয়াছেন। উষা আসিয়া কহিল,—"তোমার আজ দক্ষিণেশ্বর যাওয়ার কথা, কিন্তু সেখানে আজ যাওয়া বন্ধ রাখতে হবে।"

"শশিনাথ কহিল,—"কেন বল দেখি?"

"পিসীমা পিসেমশাই ছেলেপুলেদের সব নিয়ে ঠাকুর-পুকুর এসেছেন। বাবা তাই আমাকে আজ নিয়ে যাবার জন্যে এসেছেন, তোমাকেও যেতে হবে। সেখান থেকে দুই এক দিন পরে ফিরে এসে না হয় যেখানে যাবার যেও এখন।"

"এমনই বরাত, উষা, যে, দক্ষিণেশ্বরেও যাওয়া হ'ল না, তোমার সঙ্গে ঠাকুরপুকুরও যেতে পারলুম না। কি বিপদ একবার দেখ। এই এখনই টেলিগ্রাম পেলুম বৈদ্যনাথ থেকে, সেখানে সুরেশ বাবু মর-মর," বলিয়া টেলিগ্রামখানা খুঁজিতে জামার পকেট কয়টি বার বার হাতড়াইতে লাগিল।

উষা চিন্তিত-মুখে কহিল,—"সুরেশ বাবু তোমার অনেক উপকার করেছেন, এ সময় তাঁকে দেখতে না যাওয়াটা অবশ্যি ভাল দেখায় না, কিন্তু বাবার বড্ড ইচ্ছে যে, এই সঙ্গে—"

"বাবাকে একটু বুঝিয়ে বোলো। সুরেশ বাবুর ওখান থেকে ফিরে এসে না হয় ঠাকুরপুকুর যাবো। রান্না-বান্না হয়ে গেছে ত? আমাকে তা হ'লে এখনই দু'টি খেয়ে নিয়ে আড়াইটের 'বৈদ্যনাথ-মেল'এ বেরিয়ে পড়তে হয়।" শশব্যস্তে শশিনাথ স্নানাদি সারিয়া লইবার জন্য চলিয়া গেল।

শশিনাথের শ্বশুর গুরুদাস বাবু তাঁহার দেশের বাটীতেই থাকেন। বেলা ১০টা আন্দাজ সময়ে এ বাটীতে আসিয়া বেয়ানকে ও কন্যাকে সব বলিয়া কহিয়া নিজের কোন কাযে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। জামাতা আড়াইটার 'বৈদ্যনাথ-মেল' ধরিবার জন্য গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইবার পর তিনি ফিরিলেন এবং কন্যার নিকট সমস্ত শুনিয়া কহিলেন,—"দিন দু'চ্চার পরে আমাকে আবার কোলকাতায় আসতে হবে, সেই সময় আমি না হয় শশীকে নিয়ে যাব এখন। কিন্তু দু'টি খেয়েই আমাকে আর একবার বেরুতে হবে, মা, বড় দরকারী একটা কায সারতে বাকী রয়েছে। তুই তোর তোরঙ্গ-টোরঙ্গ গুছিয়ে নিয়ে তৈরী হয়ে থাকিস, ফিরে এসে বেরিয়ে পড়বো। সেই ছ'টার ট্রেণ না হলে আর যাওয়া ঘটবে না দেখছি।"

প্রায় পৌনে পাঁচটার সময় গুরুদাস বাবু তাঁহার কায সারিয়া ফিরিলেন। উষা প্রস্তুত হইয়াই ছিল। চাকরটাকে একখানা ট্যাক্সি আনিতে পাঠাইয়া গুরুদাস বাবু উষাকে কহিলেন,—"অনেক আগে ফিরতে পারতুম, মা। পথে সারদা বাবুর সঙ্গে দেখা, তার সঙ্গে কথা কইতেই দেরী হয়ে গেল। আহা, বেচারার বড় বিপদ, উষা!"

"কি বিপদ, বাবা?"

অতঃপর গুরুদাস বাবু তাঁহার বিপন্ন বন্ধুটির বিপদের কথা বলিতে যাইয়া যাহা বলিলেন, তাহার সার মর্ম্ম এই যে, তাঁহার উক্ত বন্ধু শ্রীযুক্ত সারদা বাবুর কন্যাদের, ললিত দত্ত নামে যে লোকটি গান শিখাইতেন, সেই মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার বিধবা ভগিনীটি আজ পাঁচ ছয় দিন হইল কোথায় না বলিয়া চলিয়া গিয়াছে এবং শুধু তাহার চলিয়া যাওয়াই নহে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার 'সেফে'র মধ্যস্থিত নগদ ও অলঙ্কারে যে চারি পাঁচ হাজার টাকা ছিল, তাহারও কোন উদ্দেশ পাওয়া যাইতেছে না। সারদা বাবু ইহার জন্য যাহা করিবার, তাহা প্রায় সমস্তই করিয়াছেন, অর্থাৎ অবাক্‌ হইয়াছেন, কপাল চাপড়াইয়াছেন, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া

হা-হুতাশ করিয়াছেন, এক দিন এক রাত কিছু খান নাই এবং এ সকলের উপর পুলিসে খবর করিয়াছেন, মোটা পুরস্কার ঘোষণা করিয়া কাগজ ছাপাইয়াছেন, তাহাতে মাষ্টার মহাশয়ের নাম আছে, ধাম আছে;—লম্বা চুল, বটার-ফ্লাই গোঁফ, হাতের উল্কী; গায়ের রং ইত্যাদির উল্লেখ করিয়া আকৃতির পরিচয় আছে। প্রকৃতির পরিচয় অত্যন্ত সুস্পষ্ট, সুতরাং দিবার আবশ্যকতা বোধ করেন নাই।

সমস্ত ঘটনা কন্যার নিকট বিবৃত করিয়া গুরুদাস বাবু বলিলেন,—"সেই মাষ্টারটিকে সেবার ওদের বাড়ী বিয়ের সময় তুইও দেখেছিস, বৈঠকখানার মজলিসে ব'সে যে খুব গান গাচ্ছিলো। অনেক দিন থেকেই ত ওদের বাড়ী সকলকে গান-টান শেখাতো। অনেকটা আমাদের শশীর মত দেখতে। তুই কি তাকে দেখিসনি?"

উষা পিতার জন্য একটু জল-খাবারের আয়োজন করিতেছিল, কহিল,—"দেখেছি বাবা। ঠিক শাস্তিই হয়েছে। অতবড় বিধবা বোন্‌কে স্বাধীনভাবে ঐ রকম বাইরে ছেড়ে দেওয়া আর যার-তার সঙ্গে অবাধে মিশতে দেওয়ার ফলই এই, বাবা। ওঁর সেই বোন্‌টি একলাই ত লেক-টেকে বেড়াতে যেত, শুনতুম। এই সে দিন সাইকেল ক'রে আমাদের বাড়ীতেও ত এসেছিল। সাহেবী কায়দায় ঘরের ঝি-বউকে ওঁরা বাইরে ছেড়ে দেন, কিন্তু বাইরের দুরন্ত আবহাওয়ার হাত থেকে নিজেদের বাঁচাবার তেমন কোন সংশিক্ষাই দেন না, সুতরাং এর ফল এই রকমই হয়, বাবা।" বলিয়া জলখাবারের রেকাবিখানি পিতার সম্মুখে ধরিয়া দিয়া কহিল,—"তুমি একটু জল খেয়ে নাও, আমি ততক্ষণ কাপড়-চোপড় প'রে নি।"

খানিক পরেই ভৃত্য ট্যাক্সি ডাকিয়া আনিল এবং ৬টা ১৩ মিনিটের ট্রেণ ধরিবার জন্য পিতাপুত্রী ট্যাক্সিতে আসিয়া বসিল।

৪

শীতের শীর্ণ গঙ্গা। তবুও কি শোভা! অপরাহ্নের নিস্তেজ রবি, নিস্তরঙ্গ ভাগীরথীর হিম জলে কাঁপিতে কাঁপিতে বৈকালিক স্নান সমাপন করিয়াই তাড়াতাড়ি পশ্চিম পারের নিবিড় ঝোপ ও দীর্ঘ তরুরাজির অন্তরালে লুকাইয়া পড়িতেছিল। পরিপূর্ণ জোয়ারে গঙ্গার জল স্থির, ধীর, বীচিশূন্য। ও-পারে বহু দূরে কয়েকখানি জেলে-ডিঙ্গী হইতে জালের টানা দিয়া ভাটার অপেক্ষায় জেলেরা হাল ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। এ-পারে তীর ঘেঁসিয়া বাবুদের একখানি ভাউলিয়া মন্থরগতিতে উত্তরমুখে যাইতেছিল। আহীরিটোলার 'ফ্রেণ্ডস্ ড্রামাটিক ক্লাব'এর বাবুরা নৌকা ভাড়া করিয়া আজ 'বড়-দিন' উপলক্ষে জলবিহারে বাহির হইয়াছিলেন। নৌকার মধ্যে ছিল দশ বারোটি বাবু, একটি হারমোনিয়ম, একজোড়া বাঁয়া-তবলা, চায়ের সরঞ্জাম, ষ্টোভ, সোডাওয়াটার, কর্কস্ক্রু, হাতুড়ি, কাচের প্লেট, গেলাস, সাজা পাণ, পাঁউরুটী, স্বদেশী বিড়ি, এককড়া রাঁধা মাংস, কচুরী-সিঙ্গাড়া, গজা-মিহিদানা ইত্যাদি ইত্যাদি। আর ছিল—কেলনার কোম্পানীর ছাপ-মারা দশ বারোটি বোতল-ভরা একটি দেবদারু-কাঠের কেস্। নৌকামধ্য হইতে সঙ্গীত ও রসালাপের যে বিকট ধ্বনি উঠিতেছিল, ভাগীরথীর ক্ষীণ তরঙ্গ-কল্লোল তাহাতে একবারেই চাপা পড়িয়াছিল।

মাঝিদের এক জন দাঁড় টানিতে টানিতে কহিল,—"বাবু, ভাঁটাকা টান্ গিরা হায়, আউর্ ক্যায়সা যায়ে গা?"

বাবুদের এক জন তখন অস্তমিতপ্রায় সূর্য্যের দিকে তাকাইয়া পূরবী-আড়াঠেকায় গান ধরিয়াছিলেন—

'দিবা অবসান হোল, কি কর—'

ইত্যাদি, আর এক জন উক্ত গানের সঙ্গে 'ঝাঁপতাল' বাজাইয়া সাংঘাতিকরূপে সঙ্গত করিয়া যাইতেছিলেন। গানের সঙ্গে যিনি হারমোনিয়ম 'ফলো' করিতেছিলেন, তিনি অপূর্ব্ব অঙ্গ ও অঙ্গুলী সঞ্চালন পূর্ব্বক যাহা বাজাইয়া যাইতেছিলেন, তাহা একখানি ইংলিশ মার্চ্চ-গৎএর ডাল-খিচুড়ি। গলুইএর দিকে উবু হইয়া বসিয়া আর একটি বাবু একান্তমনে কচুরী ও মিহিদানা লইয়া বিশেষরূপ ব্যস্ত ছিলেন। মাংসের কড়াখানিও তাঁহার পার্শ্বে ছিল। মাঝিটি পুনরায় কহিল,—"ভাঁটাকা টান্ গিরা হায় বাবু, আউর ত নেহি যানে সেকে গা।" পানোন্মত্ত স্বরে এক জন লাফাইয়া উঠিয়া কহিল,—"আলবৎ সেকে গা। নৈহাটী, নবদ্বীপ, শুকচর, মুর্শিদাবাদ সব যানে হোগা। জরুর যানে হোগা—আলবৎ যানে হোগা।" বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই বাবুটি ঘুসি পাকাইয়া তুলিলেন। সুরা-বিকৃত কণ্ঠে দলের কর্ত্তা রাম বাবু কহিলেন,—"নেই যায় ত ঠায়রো হিঁয়া। জলে অনেকক্ষণ ভাসা গেছে, বাবা। বাইরেও মা গঙ্গা টল-টল করছেন, ভেতরেও বাবা-গঙ্গা কেলনার কোং টল-টল করছেন,

এইবার না হয় ডাঙ্গাতেই একটু ওঠা যাক। এই মাঝি, এঠো কোন্ যায়গা হায় ?"

"পানিহাটি হায়, বাবু।"

"পেনিটী ? পেনিটীই সই। লাগাও হিঁয়া। কুচ পরোয়া নেই, লাগাও, বক্‌সিস মিলেগা।"

নৌকা কিনারায় ভিড়িল। বাবুরা সকলেই ঠেলা-ঠেলি করিয়া লাফ দিয়া তীরে উঠিলেন। এক জন টাল সামলাইতে না পারিয়া ঝপাং করিয়া জলে পড়িয়া গেলেন। সেইখানে কাহাদের একখানি বাগানের পশ্চাদ্দিকের ভগ্নপ্রায় অনুচ্চ প্রাচীর তীর পর্য্যন্ত আসিয়া প্রায় গঙ্গার জলের সঙ্গেই মিশিবার উপক্রম করিতেছিল; লাফ দিয়া তাহা ডিঙ্গাইয়া প্রথমে রাম বাবু তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন, কহিলেন,—"এইবার এস বাবা, বাগান-পার্টি করা যাক, সমস্ত দিন ধ'রে নৌকা-পার্টিতে অরুচি ধ'রে গেছে। এই মাঝি, চিজ-উজ সব লে আও, এ হামারা বাগান হ্যায়, সাড়ে নও হাজার মে মুলা। লে আও সব, বকসিস্ মিলেগা, জরুর মিলেগা, আলবৎ মিলেগা।"

তখন নৌকা-পার্টির বাকী সকলেই বাগানের মধ্যে একে একে ঢুকিয়া পড়িলেন। যে বাবুটি জলে পড়িয়া গিয়াছিলেন, জল শুদ্ধ ভিজা কাপড়ে পাঁচিল ডিঙ্গাইতে গিয়া তাঁহার পা পিচলাইয়া গেল ও তিনি আর এক দফা ডাঙ্গায় পড়িয়া গিয়া কর্দ্দমে ভূষিত হইলেন। আর সেই বাবুটি, যিনি কচুরী ও মিহিদানা লইয়া নৌকার মধ্যে ব্যস্ত ছিলেন, তিনি কথঞ্চিৎ ফাঁপরে পড়িলেন। তিনি খাবারের বড় চ্যাঙ্গড়া দুইটি কাহারও হাতে ভরসা করিয়া ছাড়িতে পারেন নাই, দুই হাতে সেই দুইটি ধরিয়া নামিয়াছিলেন, সেই শুদ্ধ পাঁচিল ডিঙ্গাইতে তাঁহাকে একটু অসুবিধায় পড়িতে হইল। কিন্তু তাহা হইলেও, অসুবিধাকে সুবিধা করিয়া লইয়া, জগন্নাথের মত হাত দুইটিকে উঁচু করিয়া তুলিয়া কোন রকমে ভিতরে দলের মধ্যে তিনি আসিয়া পড়িলেন।

বরাবর বাগানের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া সকলে একটি খোলা হল-ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। ছবি, আয়না, টিপয়, কৌচ, চেয়ারে হলটি পরিপাটীরূপে সজ্জিত। মেঝেয় কার্পেট পাতা; তাহারই উপর বাগানের মালী দুইটি ধবধবে ফরসা একখানি চাদর পাতিবার উপক্রম করিতেছিল। হঠাৎ এতগুলি অপরিচিত বাবুকে দেখিয়া তাহারা থতমত খাইল। রাম বাবু টলিতে টলিতে কার্পেটের উপর বসিয়া পড়িয়া, তাহাদের উদ্দেশে কহিলেন,—"মধুয়া, টিকে সবুর কর, চাদর-টাদর আর পাতবার দরকার নেই। হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলি কাঁইকি ? আর, তোর নাম কি রে ? রাধুয়া ?"

সকলে তখন হুড়া-হুড়ি করিয়া কার্পেটের উপর বসিয়া পড়িল। হতভম্বের মত হইয়া মালী দুইটি চাদর হাতে নির্ব্বাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রাম বাবু কহিলেন,—"মধুয়া, আলো সব জ্বেলে ফ্যাল বাবা, অন্ধকার হয়ে আসছে। রাধুয়া, একটু তামাকের আয়োজন কর বাপধন, গড়গড়া-টড়গড়া আছে ত ?"

বড় মালীর বিস্ময় কাটিয়া গেলে কহিল,—"তম্ভার আক্কেল কিমতি! মোর বাবু আজি আসিব পারা! এমতি কাম———"

তাহাকে বাধা দিয়া, মহেন্দ্র বাবু চীৎকার করিয়া উঠিল,—"কোন্ শালা বাবু হায়। বাবু ত হাম হায়, ষ্টুপিড, হামবাগ কাঁহেকা!" পুনরায় তাহার ঘুসি পাকাইয়া উঠিল।

ছোট মালীটি একটু বেশী রকম উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল,—"হয়ে বাবু, তোমাদের কিমতি কাম অছি! তোমাদের ঘর কৌঠি ? যিয়—সব অভি চলি যিয়।"

হরেন বাবু খানকতক কচুরি ও গোটা দুই চারি মিহিদানা তাহার মুখের মধ্যে গুঁজিয়া দিতে দিতে কহিল,—"মাথা গরম করিস নি ধন আমার, খা; খেয়ে আগে পেট ঠাণ্ডা কর।"

বড় মালী মুখ ও হস্তের অপরূপ ভঙ্গী করিয়া তর্জ্জন করিয়া উঠিল,—"হয়ে কিমতি কাম হেলা পারা! যাও বাবু, চলি যিয় সব। মোর বাবু আসি দেখিকিরি আস্তর মথা খাইবি—পিণ্ড চটকাইবি!"

"কিছু চটকাইবি না। বাবু ত আমিই রে, মধুয়া! তোর এত ভুল হয় কাঁইকি ? আমায় চিন্‌তে পাচ্ছিস না বেটা ?—ওহে মহিন, দাও হে দাও, এক এক পেগ দিয়ে দাও, একটু স্ফূর্ত্তি করুক দু'জনে।"

ইত্যবসরে 'ফ্রেণ্ডস্ ড্রামাটিক'এর বাকি বাবুরা আলিবাবা অভিনয় করিবার উদ্যোগ করিতেছিল। হঠাৎ রাজেন, অতুল, প্রবোধ, সুরেশ একসঙ্গে গাহিয়া উঠিল—

'বাজে কাজে মিন্‌ষেকে আর যেতে দোব না।'

মতি তাকিয়াটা কোলের কাছে টানিয়া লইয়া তাহা দুই হাতে চাপড়াইতে চাপড়াইতে ফাটাইয়া ফেলিবার উপক্রম করিল।

ঠিক এই মাহেন্দ্রক্ষণে শশিনাথ শেফালীকে সঙ্গে করিয়া হল-ঘরের সম্মুখের দরজায় আসিয়া দেখা দিল এবং ব্যাপার দেখিয়া একবারে আকাশ হইতে পড়িল। না চলিল তাহার আর পা, না ফুটিল তাহার কথা, শুধু কাঠের পুতুলের মত দরজার চৌকাঠ ধরিয়া কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়াইয়াই রহিল। মরজিনা হরেন দেওয়ালের কোণ হইতে একগাছা ঝুল ঝাড়িবার ঝাঁটা হাতে করিয়া—

'ছিঃ ছিঃ এত্তা জঞ্জাল'

গাহিবার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া টলিতেছিল, আগন্তুকদের দেখিবামাত্র সে সেইটি উঁচাইয়া লাফাইয়া উঠিল,—"নিকালো পাজি, শুয়ার, রাসকেল, ডাকু! তোম কোন্ হ্যায়?"

রাম বাবু চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"লেডি—লেডি! আসতে দে হরনা, অসম্মান করিস নি।"

শেফালী দ্রুতপদে বাগান হইতে বাহির হইয়া একবারে রাস্তার উপর আসিয়া দাঁড়াইল।

মহেন্দ্র ঘুসি পাকাইয়া তর্জ্জন করিয়া উঠিল,—"নেই মাংতা হ্যায়। মারেগা ঘুসি, পাঠায়গা বেলঘরিয়া,—ড্যাম, ফুল, সোয়াইন কাঁহেকা।"

শশিনাথ উন্মত্ত-কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল,—"পুলিস! পুলিস! পুলিসমে দেবো সব! মাগুনিয়া!"

নীলকমল এক গ্লাস র হুইস্কি আনিয়া শশীর মাথায় ঢালিয়া দিল।

শশিনাথ আর সহ্য করিতে পারিল না। তাহার মাথার মধ্যে যে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, নিমেষে তাহা তাহার সর্ব্বশরীরে ছড়াইয়া পড়িল। উন্মত্তের মত ছুটিয়া বাহির হইতে বেড়ার একটা বাঁশ খুলিয়া আনিয়া শশিনাথ ড্রামাটিক কোম্পানীর উপর হুঙ্কার দিয়া পড়িল।

৮

শীতের সন্ধ্যা বহুক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

ক্ষুদ্র রেল-ষ্টেশন সোদপুর এতক্ষণ পর্য্যন্ত অন্ধকার, নীরবতা ও নির্জ্জনতার মধ্যেই ডুবিয়াছিল। কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আপ প্ল্যাটফরমের অল্পালোক বাতিগুলি জ্বালিয়া দেওয়া হইয়াছে, সেগুলি এক্ষণে মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে। কুলী ও তাহাদের বাবুদের এতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন সাড়া-শব্দই ছিল না, অল্পক্ষণ হইল তাহাদের অস্তিত্ব জানিতে পারা গিয়াছে। একটু আগেই গাড়ীর ঘণ্টা বাজিয়া গিয়াছে এবং দুই একটি প্যাসেঞ্জার টিকেট করিয়া গাড়ীর অপেক্ষায়, শীতে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া, প্ল্যাটফরমের ধারে আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অদূরে সম্মুখবর্ত্তী মাঠের চতুর্দ্দিক শীতের কুহেলিকায় আচ্ছন্ন;—শুধু শৃগাল ও ঝিঁঝির রবই সমস্ত স্থানটাকে মুখর করিয়া রাখিয়াছিল।

একটু পরেই শব্দ করিতে করিতে ট্রেণ আসিয়া প্ল্যাটফরমের ভিতর প্রবেশ করিয়া থামিয়া পড়িল। দুই একটি প্যাসেঞ্জারকে নামাইয়া এবং দুই একটিকে তুলিয়া লইবার পর যখন আবার তাহার ছুটিবার বাঁশী বাজিয়া উঠিল, ঠিক সেই সময় ছিন্ন-ভিন্ন, বিপর্য্যস্ত বেশে ধূলি-ধূসরিত হইয়া, হাঁপাইতে হাঁপাইতে শশিনাথ শেফালীর হস্ত দৃঢ়রূপে আকর্ষণ করিয়া, একরূপ তাহাকে টানিতে টানিতেই প্ল্যাটফরমের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং সম্মুখে যে কামরাটি পাইল, তাহাতেই উঠিয়া পড়িল।

সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ীর ভিতরের একটি ভদ্রলোক হা হা করিয়া তাহার নিকট ছুটিয়া আসিয়া কহিল,—"রিজার্ভ—রিজার্ভ! লেখা রয়েছে, দেখতে পেলেন না,—আপনি কি কাণা না কি? নেমে পড়ুন—নেমে পড়ুন।" কিন্তু তখনই গাড়ী ছাড়িয়া দিল। ভদ্রলোকটি উত্তেজিত হইয়া কহিলেন,—"হতভম্বের মত চেয়ে রইলেন কি? আরে, নেমে পড়ুন, নইলে——"

"নইলে আপনিও আবার মারবেন না কি" বলিয়া শশিনাথ জামার আস্তিন গুটাইতে লাগিল।

ও দিকে একটি স্ত্রীলোক একটি শিশুকে কোলে লইয়া বসিয়াছিল। ভদ্রলোকটিকে উদ্দেশ করিয়া সে কহিল,—"আহা, না দেখে উঠে পড়েছেন, ও রকম কচ্ছ কেন? পরের ষ্টেশনে গাড়ী থামলে উনি নেমে যাবেন এখন।" শেফালীর দিকে চাহিয়া স্ত্রীলোকটি কহিল,—"আপনার বসুন—বসুন, কিছু মনে করবেন না।"

শশিনাথ আর কোন কথাই কহিল না, শুধু অস্ফুটে তাহার মুখ হইতে উচ্চারিত হইল,—"উঃ! কি দুর্ভোগ রে বাবা!"

মিনিটকতক পরে পরের ষ্টেশনে গাড়ী থামিবামাত্র তাড়াতাড়ি শেফালীর হাত ধরিয়া শশিনাথ নামিয়া পড়িল ও অপর একখানি গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। গাড়ীখানিতে যে দুই চারি জন প্যাসেঞ্জার ছিল, তাহারা সেইখানে নামিয়া গেল। তখন সেই যে শশিনাথ খালিগাড়ীর এক কোণ ঠেসিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অচৈতন্যের মত বসিয়া রহিল, আর তাহার কোনই সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না।

শেফালী কি একটা কথা জিজ্ঞাসা করিল, শশিনাথের নিকট হইতে কোনই জবাব আসিল না। কয়েক মিনিট অতিবাহিত হইলে পুনরায় শেফালী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল,—"আচ্ছা বাগানে আজ আসা হয়েছিল, কি অধম্মের ভোগ বলুন!"

শশিনাথ তেমনই ভাবেই দুই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নির্জ্জীবের মত বসিয়া রহিল। না একবার চক্ষু চাহিল, না কোন কথার উত্তর দিল।

শেফালীর ইচ্ছা হইল, সে-ও আর কোন কথা কহিবে না, নীরবে বসিয়া থাকিবে; কিন্তু পারিল না, খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর কহিল,—"সেই যে রাতা-রাতি পুকুর-চুরির একটা কথা আছে, এ দেখছি—তারও বাড়া। বাস্তবিকই horrible! আচ্ছা, মালী দু'জনকে একবার গঙ্গার ধারটার ভাল ক'রে খুঁজে দেখে আসতে পারলে হ'ত। আহা, বেচারারা বড্ড মার খেয়েছে!"

এইবার শশিনাথ নড়িয়া উঠিল এবং চক্ষু চাহিয়া অত্যন্ত বিরক্ত স্বরে কহিল,—"আপনার দুঃসাহসের অন্ত নেই, মিস্ গুপ্তা! আপনি কি বলতে চান যে, তাদের খুঁজতে গিয়ে অর্দ্ধেকটা প্রাণ যা বাকী আছে, তা'ও ঐখানে গিয়ে রেখে আসলে ভাল হ'ত? আপনাকে যে লাঞ্ছনার হাত থেকে বাঁচাতে পেরেছি, এইটুকুই যথেষ্ট, বেশী বকে এখন আর আমায় বিরক্ত করবেন না, চুপ ক'রে ব'সে থাকুন।"

একটি মর্ম্মন্তুদ দীর্ঘ নিশ্বাস তাহার অন্তস্তল ভেদ করিয়া বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গেই পুনরায় তাহার চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত হইল ও পূর্ব্বের ন্যায় কোণ ঠেসান দিয়া অভিভূতের মত নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিল। সুতরাং আর তাহাকে কোন প্রশ্ন করিতেই শেফালীর সাহস হইল না, সেও সার্সি-ঢাকা বদ্ধ কামরাটির মধ্যে নীরবে বসিয়া রহিল।

ট্রেণ ষ্টেশনের পর ষ্টেশনে থামিতে থামিতে ক্রমাগতই অগ্রসর হইতে লাগিল। খালি কামরার মধ্যে এক জন অচৈতন্যপ্রায়, বেহুঁস; অপর জন সচেতন হইলেও একবারেই নীরব। কিন্তু যখন অর্দ্ধ-ঘণ্টা অতিবাহিত হইয়া গেল, তখন শেফালী নীরবতা ভঙ্গ করিয়া, শশিনাথের মুখের দিকে চাহিয়া উৎকণ্ঠিতচিত্তে জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনার শিয়ালদ যে এখনও আসে না, শশী বাবু।"

শশিনাথের নীরব মুখের উপর এমন একটা বিরক্তির চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল যে, শেফালী তাহার প্রশ্নের উত্তরের আশা পরিত্যাগ করিয়া তাহার গায়ের শালখানি পা পর্য্যন্ত ভাল করিয়া মুড়ি দিয়া নির্ব্বাক্ ও নিশ্চিন্ত হইয়া বসিল। কিন্তু যখন প্রায় আরও অর্দ্ধ-ঘণ্টা কাটিয়া গেল, তখন আর নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিল না, অতিমাত্রায় ব্যস্ত হইয়া কহিল,—"উঠে একবার ভাল ক'রে দেখুন না, কোথায় আমরা এসে পড়লুম।"

শশিনাথের হঠাৎ যেন চমক ভাঙ্গিল এবং তাড়াতাড়ি সার্সি ফেলিয়া দিয়া দেখিল যে, ট্রেণ মন্থরগতিতে বৃহৎ ষ্টেশনের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে এবং ল্যাম্পের আলোগুলির হিমাচ্ছন্ন কাচগুলিতে লাল রংয়ে বড় বড় করিয়া লেখা রহিয়াছে—রাণাঘাট। গাড়ী থামিবামাত্রই সে লাফাইয়া উঠিয়া শশব্যস্তে শেফালীকে টানিতে টানিতে নামিয়া পড়িল। চমকিত হইয়া শেফালী জিজ্ঞাসা করিল,—"এ কি,—রাণাঘাট! এ কি হ'ল!"

"আমার মুণ্ডু হ'ল! উঃ! আচ্ছা, আমার না হয় মাথার ঠিক নেই, আপনারও তখন একটু হুঁস হ'ল না?"

মৃদু হাসিয়া শেফালী কহিল,—"আমি এ লাইনে কখনও আসিনি, আমি কি জানি বলুন। বিশেষ, এ সব দেখে শুনে আমার যেন ধাঁধা লেগে গিয়েছিল। যাত্রাটি আমাদের আজ খুব চমৎকার! আমি ভাবছি কি শশী বাবু যে, অপরম্বা কিম্ ভবিষ্যতি।" বিকৃত মুখ করিয়া শশী কহিল,—"এ সময়ও আপনার হাসি আসছে, এইটুকুই আশ্চর্য্য, মিস্ গুপ্তা।"

শেফালী নীরব হইয়া প্ল্যাটফরমের দেওয়ালস্থ বিজ্ঞাপনগুলি একান্তমনে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পাঠ করিতে লাগিল।

* * * *

"তা হলে এখন কি করবেন?"

"এখন আর কিছুই করব না; চলুন, সামনের ঐ বেঞ্চখানাতে ব'সে কাটাবো। পরে যে গাড়ী আসবে, তাতেই ফেরা যাবে। আপনার কথাই ঠিক মিস্ গুপ্তা!—অপরম্বা কিং ভবিষ্যতি। উঃ, কি নাকাল রে বাবা! কোথায় শিয়ালদ, এসে পড়লুম কি না রাণাঘাট! জানি আমি যে, যখন নিজের বাগান থেকেই লাঞ্ছিত হয়ে, মার পর্য্যন্ত খেয়ে ফিরে আসতে হ'ল, তখন কপালে আরও অনেক দুর্ভোগ আছে। উঃ!—এই সে দিন এক কাঁড়ি টাকা খরচ ক'রে ঐ সব ফারনিচার কিনেছি, ব্যাটারা বাগানের কি আর কিছু আস্ত রাখবে আজ! পুলিসে একটা খবর——মাথাটা যে একেবারেই গুলিয়ে গেল কি না, নইলে——"

"নইলে কি করতেন, শশী বাবু?"

"খোঁজ-খবর ক'রে তখনই পুলিসের হেল্প নিতে পারতুম! ভাবলুম, শিয়ালদ' নেমেই সঙ্গে ক'রে একেবারে পুলিস নিয়ে সব য়্যারেষ্ট করব, কিন্তু—"

প্ল্যাটফরমের ওদিকে চাহিয়া শেফালী একদৃষ্টে কি যেন দেখিতেছিল, কহিল,—পুলিসের হেল্প নিতে চান, ঐ পুলিস নিজেই আসছে। দেখতে পাচ্ছেন না? ঐ যে 'ইউনিফর্ম্ম' পরা?"

অনতিবিলম্বেই একটি পুলিসের লোক সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। শশিনাথের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মশায়ের নাম?"

প্রমাদ গণিয়া শশিনাথ কহিল,—"শশিনাথ বসু।"

"আসল নামটা?"

"এ-ই আসল, এর ভেতর আর নকল-টকল কিছু নেই।"

"আছে বৈ কি, ললিত বাবু" বলিয়া পুলিস-বাবুটি পকেট হইতে একখানি কাগজ বাহির করিয়া কি পড়িলেন ও শশিনাথের আপাদমস্তক ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

"আপনি আমায় কি মনে করছেন? চোর? ডাকাত? খুন? বোমা?"

মৃদু হাসিয়া পুলিস-বাবুটি কহিল,—"সে সব কিছুই নয়, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণদেব—রুক্মিণী-হরণ! অর্থাৎ সারদা বাবুর এই ভগিনীটিকে লইয়া অন্তর্ধান! কিছুই বুঝতে পারছেন না বোধ হয়? পারবেনও না। গাইয়ে লোক—গানের মাষ্টার-তায় রাত্রিকাল, একটু বেহাগ খাম্বাজে জবাবটা দেবেন, ললিত বাবু।"

অত্যন্ত বিরক্তির সহিত মুখখানাকে বিকৃত করিয়া শশিনাথ কহিল,—"আমার নাম ললিত বাবু নয়।"

"হাতের অমন জল-জলে উল্কী L. D.টা লুকোবেন কি ক'রে, দত্ত মশাই?"

"ওটা আমার প্রথম পক্ষের স্ত্রী লীলাবতী দাসীর নামের আদ্যক্ষর।"

"আপনার হাতে! আহা, পরম প্রণয়ী পুরুষ কি না! যাই হোক, উপস্থিতবুদ্ধিটা খুব আপনার। এখন আমার সঙ্গে দু'জনকেই একটু আসতে হচ্ছে যে! এত সহজে যে মাষ্টার মশায়কে এখানে পাব, তা মনে করি নি। সারা কোলকাতা তন্ন তন্ন ক'রে হুজুরকে খোঁজা হয়েছে,—হুজুর যে রাণাঘাটে এসে হাজির—"

ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া শশিনাথ চীৎকার করিয়া উঠিল,—"ললিত দত্ত আমি নই, আমি শশী বোস! আপনার নামে আমি কেস আনবো জানবেন।"

সেই ট্রেণে যাহারা নামিয়াছিল, কেহ কেহ তখনও প্ল্যাটফরমের মধ্যে ছিল। শশিনাথের এই বিকট চীৎকারে তখনই তাহার চারি পার্শ্বে দুই দশ জন লোক ভিড় করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। তন্মধ্যে একটি যুবতী স্ত্রীলোকের সহিত শশিনাথের দৃষ্টিবিনিময় হইবামাত্র যুবতীটি সচকিতে তাহার ঘোমটা টানিয়া দিয়া পিছু হঠিয়া আসিল এবং তাহার সঙ্গী প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি পরমাশ্চর্য্যের সহিত বলিয়া উঠিলেন,—"এ কি! শশি?"

শশিনাথ আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। উষার এত দিনের সমস্ত ধাঁধার উত্তর আজ তাহারই সম্মুখে এই ভাবে দান করিয়া, সেইখানে প্ল্যাটফরমের সেই ধূলা-বালির উপরই পাগলের মত বসিয়া পড়িল।

দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভা

কেবল বেশ বা দেহ-পরিবর্ত্তনই নূতনত্বের দ্যোতক নহে। বসন্তের কিশলয়-মঞ্জুবনে যে শ্যামলতা, তাহা অবয়বে নবীন হইলেও অন্তরের দিক্ দিয়া নবীন নহে। উহা একটা পরিবর্ত্তন মাত্র। সেই পত্র-পল্লব, সেই সবুজ আভা, সেই পৌনঃপুনিক বিকাশ! নিখিল বিশ্বের অসীম রহস্যের আবিষ্কারই সত্যকার অভিনবত্ব। পরিদৃশ্যমান জগতে যাহা নাই, চিত্তক্ষেত্রে যাহা অনুভবগম্য নহে; যে আশা, যে আদর্শ, যে ভাব সাধারণ মানবের ইন্দ্রিয়-মনের অগোচর, মনীষায় তাহারই সৃষ্টি এবং আবিষ্কার কবি ও সাহিত্যিকের কার্য্য; এবং এই প্রতিভা-সঞ্জাত সৃষ্টিই যথার্থ নূতন।

বস্তুর আর যাহাই থাক, প্রতিভা-শক্তিতে সঞ্জীবিত না হইলে তাহা জীবন্ত হয় না। জড় বস্তুর মধ্যে যে স্থবিরতা, কৃত্রিমতার মধ্যে যে স্থূলত্ব ও অস্বচ্ছতা থাকে, প্রতিভাবিহীন বস্তুও সেই প্রকার জাড্যভাবাপন্ন হয়। উহার আত্মা আবৃত রহিয়াই যায়। অর্থাৎ উহা নূতন কিছু বলিতে পারে না, কিছু প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না। যে বস্তুর অন্তরে প্রতিভার দীপ্তি নাই, তাহা অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর। সাহিত্য-প্রতিভা প্রোজ্জ্বল না হইলে তাহার আবির্ভাব একান্তই অকিঞ্চিৎকর।

প্রকৃতির প্রাণে যেমন বৎসরে একবারই বসন্তের আবির্ভাব হয়, সাহিত্যও তেমনই কচিৎ প্রতিভার স্পর্শে অনুপ্রাণিত হয়। নিত্য যে সাহিত্য লইয়া কারবার করিতে হয়, তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কৃত্রিম। এমন সাহিত্য, জাতি তাহার অপ্রবুদ্ধ বুদ্ধি-যোগেই গ্রহণ করে, এবং এই সাহিত্যের সংস্পর্শে জাতীয় জীবনে কোন একটা নূতনতর সাড়া পড়িয়া যায় না। উহা কোনও মহান্ ভাবে উদারতম আদর্শের অনুসরণে জাতিকে প্রবুদ্ধ করে না।

দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্য-সাধনার সমগ্র অংশটাই প্রতিভার উজ্জ্বল প্রভায় প্রদীপ্ত। তাহার মধ্যে গতানুগতিকতা, পুরাতনের উপর প্রলেপ এই সবের অস্তিত্ব ছিল না। তিনি চলিয়াছিলেন সম্পূর্ণ নূতন পথে, একবারে স্বতন্ত্র পদ্ধতিতে। দ্বিজেন্দ্রলালের এই স্বাতন্ত্র্য শুধু রচনা-ভঙ্গিমার স্বাতন্ত্র্য নহে, উচ্চ আদর্শের বিশিষ্টতা।

সাহিত্য-সৃষ্টির মূলে দুইটি প্রেরণা, দুইটি কামনা বিদ্যমান। সাংসারিক বিলাস-সমূহের মধ্যে আধ্যাত্মিক বিলাসও এক প্রকার উপভোগ। মানসিক তৃপ্তির প্রেরণায় অধিকাংশ সময়েই সাহিত্য রচিত হয়। বিলাস-প্রণোদিত যে সাহিত্য, তাহা কখনই মহিম্ন ভাবোদ্দীপক হয় না। দ্বিতীয় প্রকারের সাহিত্য সাধকের সাধনা, ভক্তের আরাধনা-সঞ্জাত। এই সাহিত্যিক প্রচেষ্টা মানুষকে মহিমময় করিয়া তুলিতে চেষ্টা করে। তাহার সম্মুখে এমন এক দৈবী আদর্শ ধরিয়া দেয়—যাহাতে মর মানব অমর হইতে পারে। শেষোক্ত শ্রেণীর সাহিত্য সমস্ত হীনতাকে দলিত করিয়া, সকল কলুষতাকে বিধ্বস্ত করিয়া—যাহা অনিন্দ্য-সুন্দর, তাহারই সৃষ্টি করিতে তৎপর।

দ্বিজেন্দ্রলাল এই দ্বিতীয় শ্রেণীর সাহিত্যিক। তাঁহার প্রতিভা যে সত্য, যে জ্ঞান, যে মহত্ত্ব, যে পবিত্র সুন্দর চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার পরিচয় লইলে পূর্ব্বোক্ত মন্তব্যের সমর্থন পাওয়া যাইবে। দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভা ঊর্দ্ধগামী হইয়া চাহিয়াছে অধ্যাত্ম সৌন্দর্য্য এবং তাহারই দিব্যচ্ছটায় জাতি-জীবনকে উদ্ভাসিত করিতে। তাই 'প্রতাপসিংহ' নাটকে যোশী বলিতেছেন:—"এমন কবিতা লেখো, যা প'ড়ে ভাই ভাইয়ের জন্য কাঁদে। মানুষ মনুষ্যত্বের জন্য কাঁদে।"

এই ভাবটিই সমগ্র দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভার বিশেষত্ব। অতি আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে ভাইও নাই, মানুষও নাই। আছেন শুধু কবি এবং তাঁহার মানসী প্রিয়া। কাযেই ভাইয়ের জন্য অথবা মনুষ্যের জন্য কাঁদাইবার চেষ্টা মাত্র নাই। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার সমগ্র রচনার মধ্য দিয়া মনুষ্যের মহত্ত্ব দেখাইয়া তাহার প্রতি শ্রদ্ধা জাগাইয়া মানুষকে মনুষ্য-সেবক করিতে চাহিয়াছেন। সমগ্র দ্বিজেন্দ্র সাহিত্যে 'আমি'র একটি ক্ষীণ রশ্মিরেখা পর্য্যন্ত নাই। সমগ্র চিত্র ভাবে, আদর্শে, ত্যাগে, সংযমে ও পরার্থে উদ্ভাসিত।

দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্যকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম হাস্যরস, দ্বিতীয় নাটক। নাটকের তুলনায় হাস্যরস-রচনা অল্প হইলেও তাহার শক্তিও অল্প নহে। বরং সাধারণ ক্ষেত্রে তাহার কার্য্যকারিতা অধিক বলিয়াই মনে হয়।

তরঙ্গভাবে মানবচিত্ত সহজেই আকৃষ্ট হয় বলিয়া দ্বিজেন্দ্রলালের 'হাসির গান' ও 'আষাঢ়ে' প্রথমেই জাতীয় মনে একটা তরঙ্গ তুলিয়াছিল। কিন্তু তাহাতে হাসিতে গিয়াও অনেকে কাঁদিয়া ফেলিয়াছে। বিদ্রূপের রস উপভোগ করিতে গিয়া নিজস্বরূপের প্রতিবিম্ব দেখিয়া সামলাইয়া গিয়াছে। ভণ্ড অনাচারীকে ব্যঙ্গের কশাঘাত লাগাইতে গিয়া দেখিয়াছে, তাহা আগে পতিত হয় নিজেরই পৃষ্ঠদেশে।

যে সাহিত্য মনের উপর একটা স্থায়ী ভাবকে মুদ্রিত করিয়া না দেয়, তাহা নিতান্তই বিফল। শুধু অবসর-যাপনের জন্য রসভোগকে সাহিত্যানন্দ বলা চলে না। সাহিত্য যে ভাবকেই জাগ্রত করিয়া তুলুক, তাহার একটা স্থায়ী প্রভাব থাকা প্রয়োজন। ভণ্ড দেশসেবক নন্দলাল পড়িয়া যে হাস্যের তরঙ্গ প্রবাহিত হয়, তাহা পরক্ষণেই স্তব্ধ হইয়া যায় না। চিত্তকে সর্ব্বদা সতর্ক করিয়া রাখে। যেন স্বদেশ-সেবায় ঐ হীনতা না আসিতে পায়।

বর্ত্তমান বঙ্গ-সাহিত্য উন্নতির পথে চলিলেও একমুখীনতাই তাহার সর্ব্বাঙ্গীনতার অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাঙ্গালীও যেমন সুখস্বপ্নবিভোর হইয়া গরিষ্ঠ আদর্শকে অবলম্বন করিতে পারিতেছে না, বাঙ্গালা সাহিত্যও তেমনই সত্যদৃপ্ত মহীয়ান্ চিন্তাকে বরণ করিয়া পরিপুষ্ট হইতেছে না। সাহিত্যের প্রয়োজন কি?—আনন্দ। পরের প্রশ্ন, সাহিত্যের অভ্যন্তর দিয়া আনন্দ লাভ করিবার আবশ্যকতা কি? নাচিয়া গাহিয়া, নানা বিলাস উপভোগ করিয়া শতেক প্রকারে স্ফূর্ত্তি পাওয়া যায়। তবে, আবার একটা নূতন কেন? সাহিত্য-সুখের বিশেষত্ব কোথায়?

সংসারে দুঃখের ও বিঘ্নের অন্ত নাই, মোহের—ভ্রান্তির শেষ নাই। মানুষ সাহিত্যিক আনন্দ চাহে—অমৃতরূপে। তাহা হৃদয়কে বলিষ্ঠ, অপরাজেয় করিবে, আশা-আশ্বাসে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিবে। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য'—সেই আত্মার উদ্বোধন ঘটাইবে। আর যাঁহারা মহাভাবের ভাবুক, মহাকর্ম্মের সাধক, যাঁহারা দুঃখকে জয় করিয়াছেন, ক্লৈব্যকে অতিক্রম করিয়াছেন, তাঁহাদের চারিত্র্যজ্যোতিতে অন্তরকে উদ্ভাসিত করিয়া দেওয়াও সাহিত্যের কার্য্য। আর সাহিত্যরসের ইহাই বৈশিষ্ট্য।

দ্বিজেন্দ্রলাল এই বলপ্রদ উন্নততর সাহিত্যের স্রষ্টা। তাঁহার নাট্যসম্ভারে যতগুলি চরিত্র আছে, সবই মহনীয় চরিত্র। তাহাদের আছে ত্যাগ এবং সত্যনিষ্ঠা। দ্বিজেন্দ্র-নাট্যের চিত্রিত চরিত্রগুলি একটা সমুচ্চ আদর্শের প্রতি মনকে প্রবুদ্ধ করিয়া তুলে। এইখানে আর্টপন্থিগণ এমন একটা প্রশ্ন উপস্থাপিত করিতে পারেন যে, শিক্ষাই না হয় হইল, কিন্তু আনন্দ কৈ? সৌন্দর্য্য কোথায়?

সৌন্দর্য্যের একটা নির্দ্দিষ্ট অবয়ব নাই। শ্রী কোথাও দেহী, কোথাও অশরীরী। নির্ম্মেঘ শারদ-গগনে পূর্ণিমা-চন্দ্রও শোভন, আবার ঘনতমিস্র রজনীতে অন্ধকার ভেদ করিয়া যূথিকার পরিমল-মাধুর্য্যও মনোরম। একটা শরীরী লাবণ্য, আর একটা বিদেহী শোভা। সাহিত্য-শিল্প বিশেষভাবে আধ্যাত্মিক। চিত্তবৃত্তির বিচিত্র লীলাভঙ্গিমার অভিব্যঞ্জনায় যে মাধুর্য্যবোধের বিকাশ, তাহাই সাহিত্যশ্রী অথবা আর্ট। এই সংজ্ঞার ভিতর বহু জটিলতা রহিয়াছে। এক দল ভাল লাগা মাত্রকেই কারুতা বলিয়াছেন। কিন্তু সৌন্দর্য্যবোধের এইটুকু মাত্র গণ্ডী হইলে সাহিত্যের কোন মর্য্যাদা ও মহিমা থাকে না। দুর্নীতিও অনেকের ভাল লাগে। হিংসাকে, হত্যা-প্রবৃত্তিকেও ভাল লাগার কোঠায় ফেলা যায়। কিন্তু এই সবকে সাহিত্য-সৌন্দর্য্যের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। যদি বা যায়, তাহা তাহার বীভৎসতাকে পরিস্ফুট করিয়া তাহার প্রতি একটা ঘৃণা জন্মাইয়া দেওয়া চাই।

সাহিত্যে সৎ ও অসৎ দুইটি চিত্রই থাকিবে। কিন্তু উহা এমনভাবে থাকিবে, যাহাতে মন্দগুলি কুৎসিততম হইয়া এবং সাধু ভাবগুলি উজ্জ্বলতম হইয়া উঠে। যে রচনাভঙ্গীতে অসৎ চিত্রগুলি মলিন হইয়া পড়ে এবং উচ্চাদর্শগুলি লোভনীয় হইয়া উঠে, তাহাই শিল্পকলা অথবা আর্ট। বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যে কতকগুলি কুৎসিতভাব ও দুষ্টরুচি সাহিত্য-প্রাঙ্গণকে আবর্জ্জনাময় করিয়া তুলিতেছিল। দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভা সেই অনাচারের বিরুদ্ধে একটা দৃপ্ত অভিযান। তাঁহার নাটকগুলি প্রমাণ করিয়াছে—মহত্ত্বে কি উদারতম শিল্পশোভা! আত্মার পবিত্রতায় কি উথলিত অমৃত!

জাতীয় চিত্ত যখন বিলাসে, স্বার্থপরতায়, সহস্র দুর্ব্বলতায় ম্রিয়মাণ, তখন 'প্রতাপসিংহ', 'দুর্গাদাস', 'মেবার-পতন', 'ভীষ্ম' প্রভৃতি নাটকে যে পাঞ্চজন্য মন্দ্রিত হইয়াছে, তাহাতে জাগিবার, বাঁচিবার পুলকোচ্ছ্বসিত সাড়া পড়িয়া যায়। সুখী, রাজসম্মান-প্রাপ্ত মানসিংহের পার্শ্বে দুর্ভাগ্যপীড়িত রাণা প্রতাপকে দেখিয়া দুর্ভাগ্যকেই বরণ করিতে সাধ যায়। মনে হয়, জাতির সকলেই কেন দুর্গাদাস হইলাম না। ঘরে ঘরে কেন জন্মিল না 'পর-পারে' দাদামহাশয়। দ্বিজেন্দ্র-নাট্যে এমন একটা চরিত্র নাই, যাহাতে একটা না একটা মহাভাব উদ্রিক্ত করে। দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্যের সৌন্দর্য্য তন্দ্রাহীন, উহা দিবসের মত উজ্জ্বল ও দৃপ্ত—জাগরণ-প্রবুদ্ধ।

যে আর্টের ধূয়ায় পাপের চিত্রগুলি অবাধে সাহিত্যে প্রসার পাইতেছে, দ্বিজেন্দ্রলাল নীতিপরায়ণ হইলেও সেই কালিমালিপ্ত চিত্রগুলিকে একবারে পরিত্যাগ করেন নাই। অন্ধকারের পাশেই আলোকের দীপ্তি, মৃত্যুর কাছেই জন্মের মহোৎসব, কৃষ্ণবর্ণের পার্শ্বেই শুভ্রের শোভনীয়তা, দৈত্যের দ্বন্দ্বেই স্ত্রীর প্রতিষ্ঠা। তথাকথিত আর্টপন্থীরা মন্দকে এমনভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন যে, তাহার কাছে পুণ্য নিষ্প্রভ। দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্যে মন্দ আছে—মোহন হইয়া নহে; উত্তমকে উত্তমতম করিতেই তাঁহার অঙ্কন। সত্য ও শালীন আর্ট তাহাই। 'সাজাহান' নাটকে ঔরংজিবের সিংহাসনলাভ অপেক্ষা দারার দুর্ভাগ্যকেই শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে হয়। গুলনেয়ারের রূপ-যৌবন পিশাচীর কদর্য্যতায় ক্লিষ্ট।

অনেকের অভিমত, শিক্ষাবিষয়ক হইলেই কবিত্বের হানি ঘটে। কথাটা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। পতিতই কেবল মন্দের মধ্যে সৌন্দর্য্য দেখিতে পায়। বারাঙ্গনার দেহে যে চারুতা দেখে, লাম্পট্য ও কাপট্যে যে শোভা দেখিতে পায়, আত্মার অধোগতিতে যে রস পায়, তাহাকে সভ্য মানবতার গোষ্ঠীভুক্ত করা যায় না। মানব-সমাজের মাধুর্য্য যাহা, তাহা সমস্তই শালীন, শুদ্ধ ও সত্ত্বগুণান্বিত। তাই মানবের কাছে ভোগীর বিলাস-স্নিগ্ধতা সুন্দর নহে; মহিম্ন-সুন্দর হইতেছে—ভীষ্মের ত্যাগ, সিদ্ধার্থের তপস্যা।

মনোবৃত্তির ধর্ম্ম সত্য হইলে তাহা অপর ক্ষেত্রেও সংক্রমিত হইবে। এই জন্য সৌন্দর্য্য শিক্ষার বিরোধী নহে, পরন্তু অনুকূল। সৌন্দর্য্য-বোধের দুইটি দিক। একটি মাধুর্য্য; তাহা শুধু তৃপ্তি, একটু মিষ্ট অনুভূতি। ইহা অনেক সময়ই তন্দ্রার মত আবেশভরে আসে। অন্যটি মহিমা। ইহাতে জাগরণের আনন্দ, একটা পরিপূর্ণতর উপলব্ধি। যূথিকার সৌরভে হৃদয়কে মোহিত করিয়া দেয়, আকাশের বিশালতার অন্তরে জাগ্রত হয় একটা উদার আকাঙ্ক্ষা। দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্যে পুষ্পমাধুর্য্য অপেক্ষা অভ্র-মহিমারই আধিক্য। ইহাতে একটা উদ্দেশ্য নিহিত আছে। সে উদ্দেশ্য জাতির প্রাণশক্তিকে প্রবুদ্ধ করা। মহম্মদের সাম্রাজ্য উপেক্ষা, দারার নিস্পৃহতা, দুর্গাদাসের কর্ম্মসন্ন্যাস, দাদা মহাশয়ের দুলালী সরযূর স্বামিগৃহের দারিদ্র্য গ্রহণ এই সকল মহিমা প্রভাত-আলোক-স্পর্শের মত জীবনের প্রসুপ্ত মহনীয়তাকে প্রবুদ্ধ করিয়া তোলে। এক কথায় বলিলে দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্যসাধনা বাঙ্গালার নব প্রবোধনা। ক্ষুদ্রতা, দৈন্য, মালিন্য—যাহা ছদ্মবেশে জাতির মর্ম্মকে ক্ষয় করিতেছে, তাহা হইতে রক্ষা করিতে দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্য বিপুলভাবে চেষ্টা করিয়াছে।

আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে অনেক ক্ষেত্রে জননী ভগিনী—কল্যাণময়ী নারীমূর্ত্তিকে কেবল নায়িকারূপে দেখা যাইতেছে। ইহা জাতীয়তার পক্ষে অকল্যাণকর এবং অধঃপতনের দ্যোতক। ঈশ্বরের করুণা—যাহা নারীমূর্ত্তিতেই শরীরী, তাহাকে শুধু ভোগোপকরণ করিয়া রাখিলে, রাখিতে চাহিলে জাতি অধঃপাতে যায়। দ্বিজেন্দ্রলাল মহীয়সী নারীকে স্বর্গীয় ভাবেই অঙ্কিত করিয়াছেন। তাঁহার নারীচরিত্রগুলি "নির্ম্মেঘ উষার চেয়েও নির্ম্মল, বীণার ঝঙ্কারের চেয়েও পবিত্র।" মহামায়া, মানসী, সত্যবতী, সরযূ—ইহাদের প্রত্যেকের চরিত্র হইতে একটা পবিত্রোজ্জ্বল জ্যোতি বিচ্ছুরিত হইতেছে।

ভালবাসা ভোগে নহে,সেবায়; স্বার্থরক্ষায় নহে,আত্মত্যাগে। নারী সম্পূর্ণভাবে আত্মত্যাগ করিয়াছেন বলিয়াই তিনি বিশ্ব-মানবতার নিকট সম্পূজিতা? দ্বিজেন্দ্রলাল নারী-চরিত্রের এই ত্যাগপরায়ণ মূর্ত্তিটিই প্রকট করিয়া ধরিয়াছেন। পত্নীত্বও নারীত্বের একটা সুকুমার অংশ। তাহাও পবিত্র, সুন্দর, লালসা-লেশহীন। মহামায়া, সরযূ প্রভৃতিতে ইহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। আর লালসা-শূন্য করিয়াও যে প্রীতির চিত্র অঙ্কিত করা যায়, তাহার উজ্জ্বল প্রকাশ মানসী ও ছায়া।

দ্বিজেন্দ্রলালের নারীচরিত্রগুলিকে একটু অস্বাভাবিক বলা হয়। এই অভিমত মানিয়া লওয়া যায় না। ঐগুলি অসাধারণ বটে, কিন্তু অস্বাভাবিক নহে। সাহিত্য শুধু স্বাভাবিক হইলে উহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়। যে সমস্ত বিষয় ব্যবহারিক জগতে নাই, যে সকল আদর্শ, কল্পনা অপরিচিত, অথচ যাহা পবিত্র সুন্দর, সাহিত্য তাহাই সৃষ্টি করিবে। অবশ্য, সেই সকল অসম্ভব হইবে না। তাহার মধ্যে বাস্তবতার সম্পূর্ণ সম্ভাবনীয়তাই থাকিবে। শত তুচ্ছতার দাস, কামনাক্লিষ্ট মনুষ্যের কাছে ভীষ্মের ত্যাগ ও সংযম প্রত্যাশা করা অসম্ভব; কিন্তু তাহাই কি সত্য? ভীষ্ম-চরিত্রের আদর্শের মাঝে সত্য না থাকিলে মানুষ যে পশুত্ব হইতে উন্নীত হইতে পারে না।

সাহিত্যের নরনারী বেশীর ভাগ নায়ক এবং নায়িকা। ব্যবহারিক জগতে এই ভাব কিন্তু অসত্য ও অবস্তু এবং সংসারের পক্ষেও ইহা অশোভন ও অনিষ্টকর। দ্বিজেন্দ্রলাল এই অনাচারকে বর্জ্জন করিয়া মানুষকে সত্য করিয়াই অঙ্কিত করিয়াছেন। তিনি মানুষী ভাবের সঙ্গে দৈবী ভাবের সংমিশ্রণে সমুচ্চ মানবতার সৃষ্টি করিয়াছেন। তাই তাঁহার রচনায় স্নেহপাগল সাজাহান, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ দুর্গাদাস, দেশ-বৎসল প্রতাপ এবং মহীয়সী সরযূ ও মানসী, মহামায়া ও সত্যবতী স্থান পাইয়াছে। ঐ চরিত্রগুলির মধ্যে রহিয়াছে দেবতা ও মনুষ্য।

যুগে যুগে মনুষ্যই মনুষ্যের কাছে ঈশ্বরের প্রতিভূ হইয়া রহিয়াছে। সাক্ষাৎ দেহী ভগবান্ এই মর্ত্যেরই মানব। মানবের করুণা, স্নেহ, প্রীতি, সখ্য এই দুঃখদুর্ভর জগতে ঐশ্বরিক প্রকাশ। সাহিত্যে সেই নরদেবতা উপেক্ষিত ও বিকৃতমূর্ত্তি। দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্য কিন্তু নরমূর্ত্তিকে নরদেবতা করিয়াই অঙ্কিত করিয়াছেন।

জীবনের মধ্যে প্রীতিই গরিষ্ঠ বৃত্তি। সাহিত্যেও তাহা প্রধান। কিন্তু সাহিত্যে যে প্রেম আছে, তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কামনা-কলুষ। দ্বিজেন্দ্রলাল বাঙ্গালা সাহিত্যে উজ্জ্বল প্রীতির চিত্রই অঙ্কিত করিয়াছেন। প্রীতির ধর্ম্ম ত্যাগ, ভোগ নহে। প্রেমে স্বার্থের বড় বেশী অধিকার নাই। পরকে তুষ্ট করিয়া, আপনাকে সম্পূর্ণ বিলাইয়াই ভালবাসার সার্থকতা। সিংহলবিজয় নাটকের বালকের উক্তিতে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রেমের আদর্শ পরিস্ফুট হইয়াছে। বালক :—জানি তুমি প্রতিদানের জন্যই ব্যাকুল। কিন্তু আর এক ভালবাসা আছে জেনো মহারাণী, যাহা নিত্য বিশ্বের কল্যাণে আপনাকে জাগিয়ে তোলে! যাহা আপনাকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দেয়, সুখী করে, সুখী হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল এই সূত্র অবলম্বন করিয়াই তাঁহার প্রণয়-চিত্রগুলি অঙ্কিত করিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভা একটা শিষ্ট উদ্দেশ্যকে অঙ্গীকার করিয়াই প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। মানুষের মনুষ্যত্ব জাগরণের জন্য তাঁহার কবিত্ব-প্রতিভা বিশেষভাবেই চেষ্টা করিয়া চলিয়াছে।

স্বাজাত্যবোধ নব্যবঙ্গের নবধর্ম্ম। দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভা স্বজাতির এই নবজাগ্রত স্বাদেশিকতাকে পরিপুষ্ট করিতে বিশেষভাবেই চেষ্টা করিয়াছে। তাঁহার প্রত্যেক নাটকের প্রধান চরিত্রগুলিতে দেশপ্রীতির প্রস্রবণ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের স্বাদেশিকতা বৈদ্যুতিক শক্তির মত বুকের মাঝে একটা তীব্র অনুভূতি জাগাইয়া দেয়। প্রতাপসিংহের সহিত দেশের জন্য দুর্ভাগ্যকে বরণ করিয়া লইবার প্রবল আগ্রহ জন্মে, গোবিন্দসিংহের মত মায়ের সেবায় জীবনের সমস্ত সুখশান্তি বলি দিতে সাধ যায়, সত্যবতীর সন্ন্যাস বিলাসের মতই বরণীয় হয়।

দ্বিজেন্দ্রলালের স্বাদেশিকতা সঙ্কীর্ণ নহে। উহা প্রতীচ্য সাম্রাজ্যবাদের ছায়ায় গড়িয়া উঠে নাই। অন্তকার স্বদেশপ্রীতি একটা ছদ্ম স্বৈরাচার। উহা জগতে কেবল অশান্তির অনলই জ্বালিয়াছে। দেশ বড়, স্বজাতি সেব্য; কিন্তু মনুষ্যত্ব হেয় নহে। দেশভক্তি যদি মানব-ধর্ম্মের প্রতিকূল হয়, তবে তাহাও পরিত্যাজ্য। সংসার যদি মনুষ্যত্বের অনুকূল দেশপ্রীতির অনুসরণ করে, তবে পৃথিবীর সমস্ত অশান্তির অনল নিভিয়া যায়। দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভা সুস্থ স্বাদেশিকতার আদর্শ ধরিয়া বিশ্বসমস্যার একটা সুমীমাংসা করিতে চাহিয়াছে।

'মেবার-পতন' নাটকে মানসীর উক্তিতে জাতীয়তার ঐ শুভ্র প্রকাশ প্রস্ফুটিত হইয়াছে। মানসী বলিতেছেন :—"স্বার্থ অপেক্ষা জাতীয়ত্ব বড়, তেমনই জাতীয়ত্বের অপেক্ষা মনুষ্যত্ব বড়। জাতীয়ত্ব যদি মনুষ্যত্বের বিরোধী হয়, তবে মনুষ্যত্বের মহাসমুদ্রে জাতীয়ত্ব বিলীন হয়ে যাক্।" কোনও একটি প্রবন্ধে দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভার বিশেষ পরিচয় দেওয়া যায় না। তবে মোটামুটি বলিতে হইলে সমগ্র দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্যের অন্তর হইতে মেঘমন্দ্র-স্বরে মন্ত্রিত হইতেছে—'আবার তোরা মানুষ হ।'

দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যিক প্রচেষ্টা যেমন একটা বলিষ্ঠ আদর্শ অবলম্বন করিয়া অভিব্যক্ত হইয়াছে, তেমনই তাঁহার রচনা-পদ্ধতিতেও আছে একটা সুস্পষ্ট ভঙ্গিমা, তেজস্বী ছন্দঃসম্প্রসারিত প্রকাশ-পরায়ণতা। অক্ষমতা ও জাড্যভাব দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্যকে কোথাও পঙ্গু করে নাই। দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভা যেমন আহ্বান করে 'আবার তোরা মানুষ হ।' তেমনই তাহার ধ্বনিও উৎসাহপূর্ণ স্বরে উদ্‌বুদ্ধ করে, যেমন কর্ণে প্রবেশ করে, 'সত্য সেলুকস, কি বিচিত্র এই দেশ!' তখন ভারতবর্ষের যে রৌদ্রদীপ্ত ও প্রাণদীপ্ত মহিমময় মূর্ত্তি, তাহাই নয়নে ও হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

বিশ্বের সহিত সমপ্রাণতা দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভাকে অতিক্রম করে নাই; তথাচ তিনি সেই বিশ্বভৌমিকতার, জন্য স্বাদেশিকতাকে কখনও খাটো করিয়া ধরেন নাই। বরং দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যিক প্রচেষ্টায় স্বাদেশিকতা চিরভাস্বর—চির-উজ্জ্বল। তাঁহার ভাবের এবং ভাবনার প্রতিটি প্রকাশ হইতে অহরহ রণিয়া উঠিতেছে—

"ভারত আমার! ভারত আমার! কে বলে মা তুমি কৃপার পাত্রী।
কর্ম্মজ্ঞানের তুমি মা জননী, ধর্ম্মধ্যানের তুমি মা ধাত্রী!"

জাতীয়তার অপচীয়মান দিবসে প্রয়োজন—বলবত্তম আদর্শ এবং মহিম্ন প্রেরণা। প্রয়োজন—আত্মপ্রীতি ও আত্মপ্রতিষ্ঠা। দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্য ইহাতে সর্ব্বক্ষণই সমৃদ্ধ। দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভা অহরহই আত্মানুগতার মহিম্নগীতি উদাত্তস্বরে গাহিয়া চলিয়াছে—

"ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ।
গাইল জয় মা জগজ্জননী, জগদ্ধাত্রী ভারতবর্ষ!"

শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা।

প্রতিবাদ

লোকতত্ত্ব *

ভারতবর্ষের চৈত্র ও বৈশাখ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার চক্রবর্ত্তী বি-এ,মহাশয় পণ্ডিতাগ্রগণ্য পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী যোগানন্দ সরস্বতী মহোদয়ের উপদেশানুসারে যে অদ্ভুত সমালোচনাত্মক সারগর্ভিত ও সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে যথাকথঞ্চিৎ সমালোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। ইতিপূর্ব্বে স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহোদয় ও তাঁহার প্রচারিত 'মানবের আদি জন্মভূমি' নামক পুস্তকে এই জাতীয় যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়া মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি স্থানকেই স্বর্গাদিরূপে কল্পনা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সে সময়ে আমরা তাহা অকিঞ্চিৎকর বিবেচনা করিয়া উপেক্ষার হাসি হাসিয়াছিলাম মাত্র; কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধের লেখক এক জন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ, এবং এক জন সর্ব্বত্যাগী আত্মনিষ্ঠা-সম্পন্ন বহুদর্শী বিজ্ঞ স্বামীজীও উহা অনুমোদন করিয়াছেন, সেই জন্যই এ সম্বন্ধে যথাশক্তি সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে। প্রবন্ধের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত অমিয় বাবু বড়ই দুঃখের সহিত লিখিয়াছেন যে, "বাপ-দাদার আমল হইতেই লোকে স্বর্গ বলিতে আকাশের দিকে হাত উঠাইয়া থাকেন, আমাদের দেশের অনেক পণ্ডিত লোকও ইহার খবর রাখেন না, এবং উক্ত সিদ্ধান্ত যে কিরূপ ভ্রমাত্মক, তাহা কেহই জানেন না" ইত্যাদি। ইহার সাধারণতঃ মোটামুটি অর্থ ইহাই দাঁড়ায় যে, সৃষ্টির আবহমানকাল হইতে স্বর্গ বলিতে যাহা বুঝিতে পারা যাইত, তাহা নিতান্ত ভ্রমমূলক ছিল। ঋষিযুগ হইতে আমাদের বাপ-দাদারা সকলেই এক ভীষণ মোহান্ধগর্ত্তে নিমজ্জিত ছিলেন, স্বর্গাদিলোক সম্বন্ধে তাঁহাদের ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক ও ভিত্তিহীন ছিল, অমিয় বাবু স্বীয় প্রতিভাবলে চির-অনাবিষ্কৃত তত্ত্বের নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়া তাঁহাদের বংশধরগণের চিরসঞ্চিত মোহাপনোদনে সমর্থ হইয়াছেন। বস্তুতঃই তিনি যে সিদ্ধান্তের প্রচারে ব্রতী হইয়াছেন, তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ভারতের পৌরাণিক যুগের ইতিহাসে নূতন অধ্যায় রচিত হইবে, ভারতের শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ নবালোকে নূতন ভাবে সুরঞ্জিত হইবে, চিরপ্রচলিত ভারতের সংস্কার-সমূহ নূতন ভাবে সংস্কৃত হইবে, দেবপ্রাণ ভারতের দেবোদ্দেশে অনুষ্ঠিত যাগ, যজ্ঞ, ব্রত, আচার-সমূহ ব্যর্থ, পণ্ডশ্রম ও কুসংস্কার-মূলক প্রতিপন্ন হইবে,—এক কথায় চির-কুসংস্কারাচ্ছন্ন ঘোর ভ্রমকূপে নিমজ্জিত ঋষির শাসিত ভারত, নবভাবে নবোদ্যমে জাগ্রত হইয়া সম্পূর্ণ নূতনরূপে প্রতিভাত হইবে। আর এইরূপ পথ-প্রবর্ত্তক মহাত্মার স্থানও ব্যাস, বশিষ্ঠ, যাজ্ঞবল্ক্যের অনেক ঊর্দ্ধে নির্দ্দিষ্ট হইবে, ভগবান্ রামকৃষ্ণের ন্যায় প্রতি ঘরে ঘরে তাঁহার পূজা, অর্চ্চনা হইবে, প্রতি নর-নারীর মুখে অহর্নিশ তাঁহার নাম উচ্চারিত হইবে, প্রত্যেক মানবের হৃদয়ে তাঁহার মূর্ত্তি ইষ্টদেবরূপে প্রতিফলিত হইবে, এক কথায় তিনি যুগান্তকারী পরমপুরুষরূপে প্রখ্যাত হইতে পারিবেন। সুতরাং তাঁহার এই উদ্যম যে প্রশংসনীয়, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই; তবে উদ্যমানুকূল সামর্থ্য জগতে বিরলই দেখিতে পাওয়া যায়। সামর্থ্যানুযায়ী উদ্যমই জগতে প্রশংসার পাত্র হইয়া থাকে। নতুবা বামনের চাঁদ ধরার মত উপহাসাস্পদ হইতে হয়। যদিও এই যুগটা একটা নূতন করার যুগ। সাধ করিয়াই কবি গাহিয়াছিলেন "নূতন কিছু কর রে ভাই নূতন কিছু কর। যদি কিছুই না কর্ত্তে পার, ছাদ থেকে প'ড়ে মর।" সুতরাং এই নূতন যুগে নূতন তত্ত্বাবিষ্কারের প্রয়াস অবশ্য প্রশংসনীয়।

এই প্রবন্ধে, যুধিষ্ঠিরের পায়ে হাঁটিয়া স্বর্গগমন, অর্জ্জুনের অস্ত্র-শিক্ষার্থ স্বর্গগমন, রাজা দশরথের স্বর্গগমন, এবং সময়ে সময়ে ঋষিগণের স্বর্গলোকে গমনাগমন, এই কয়েকটি আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়াই স্বর্গাদিলোক যে মর্ত্ত্যলোকেই ছিল, ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য বিবিধ যুক্তি, তর্ক ও প্রমাণের অবতারণা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ভূলোক,—ভারতবর্ষ; ভুবর্লোক—কেতুমালবর্ষ অর্থাৎ আফগানিস্থানের উত্তরাংশ ও তুরস্ক পারস্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূমি; স্বর্লোক—কিম্পুরুষবর্ষ, হরিবর্ষ এবং ইলাবৃত-বর্ষ, (অর্থাৎ তিব্বত, চীন, তাতার ও মঙ্গোলিয়া) ইহার মধ্যে তিব্বতে শিবের, চীনে যমের, এবং মঙ্গোলিয়ায় ইন্দ্রের বাসস্থান ছিল। জনলোক—ভদ্রাশ্ববর্ষ, বর্ত্তমান দক্ষিণ সাইবেরিয়া, ইহা সূর্য্যের নিবাসস্থান। মহর্লোক—রম্যকবর্ষ; বর্ত্তমান চীন মাঞ্চুরিয়া প্রভৃতি, ইহা চন্দ্রের আবাসস্থান। তপোলোক—হিরণ্ময়বর্ষ, বর্ত্তমান মধ্যসাইবেরিয়া, ইহা বিষ্ণুর বৈকুণ্ঠ। সত্য-লোক—কুরুবর্ষ; বর্ত্তমান উত্তর-সাইবেরিয়া, মেরুদেশ এবং গ্রীনল্যাণ্ড, ইহা চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার ব্রহ্মলোক।

* 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত প্রবন্ধের প্রতিবাদ 'ভারতবর্ষে'ই প্রকাশিত হওয়া সঙ্গত ছিল, কিন্তু 'ভারতবর্ষে'র প্রবীণ সম্পাদক মহাশয় প্রতিবাদটি সুদীর্ঘ বলিয়া পত্রস্থ করেন নাই। এ জন্য আমরা প্রতিবাদটি প্রকাশ করিলাম। লেখক যে সকল যুক্তি-প্রমাণের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা সমীচীন ও শাস্ত্র-বাক্য দ্বারা প্রামাণ্য, ইহা সংক্ষেপ করিবারও উপায় দেখিলাম না। আশা করি, পাঠক মহাশয়গণের বিরক্তিকর হইবে না।—বসুমতী-সম্পাদক।

ইহা প্রতিপাদন করিতে গিয়া তিনি পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছেন যে, "ইহাতে কি বুঝা যায় না যে স্বর্গ, যাহা দেবতাদিগের আবাসভূমি ছিল, তাহা ভৌম ছিল, কদাপি শূন্যস্থ বা আকাশস্থ ছিল না। তাঁহার এই দৃঢ় সিদ্ধান্ত প্রাচীন শাস্ত্র ও শাস্ত্রকারগণের অনুভবের বিরুদ্ধ। ভাগবতে টীকাকার সর্ব্বজনমান্য শ্রীধরস্বামী ভৌম স্বর্গের অতিরিক্ত স্বরূপর দুই প্রকার স্বর্গের কল্পনা করিয়া থাকেন। ভাগবতের ৫ম স্কন্ধে ভুবনকোষের টীকায় তিনি বলিতেছেন,—'দিব্যভৌমবিলভেদাৎ ত্রিবিধঃ সর্গঃ। তত্র ভৌমস্বর্গস্য পদানি স্থানানি ব্যপদিশন্তি'। অর্থাৎ দিব্য, ভৌম ও বিল অর্থাৎ পাতালাদিলোক এই ত্রিবিধ স্বর্গ। তন্মধ্যে এখানে ভৌমস্বর্গের কথাই বলা হইতেছে। মহর্ষি বেদব্যাসও ঐ কথাই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—"তত্রাপি ভারতমেব বর্ষং কর্ম্মক্ষেত্রমন্যাস্যষ্টবর্ষাণি স্বর্গিণাং পুণ্য-শেষোপভোগস্থানানি ভৌমস্বর্গপদানি ব্যপদিশন্তি।" অর্থাৎ ভারতবর্ষই কর্ম্মক্ষেত্র, তদতিরিক্ত যে সমস্ত অন্যান্য বর্ষ আছে, সে সমস্ত পুণ্যশেষ উপভোগের স্থান, এবং তাহাদিগকে ভৌম-স্বর্গ বলা হয়। সুতরাং চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের উল্লিখিত ভৌমস্বর্গ ছাড়াও যে অন্য স্বর্গ আছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। এখন এই ত্রিবিধ স্বর্গেরই স্বরূপ কি, তাহাই আমাদের বিচার্য্য। সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারণস্বরূপ চেতনাময়ী প্রকৃতি হইতে অপঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূত, সাংখ্যমতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চ তন্মাত্রা, এবং তাহা হইতে স্থূল পঞ্চমহাভূতের সৃষ্টি। বেদান্তাদি দর্শনে ও উপনিষদাদিতে কারণরূপা প্রকৃতির উপহিত চৈতন্যকে ঈশ্বর, সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের উপহিত পৃথক্ পৃথক্ চৈতন্যকে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও মহেশ্বর ও এইরূপ শব্দস্পর্শাদিতন্মাত্রা ও একাদশ ইন্দ্রিয়ের উপহিত চৈতন্যের পৃথক্ দেবসংজ্ঞা উক্ত হইয়াছে। এই পরিদৃশ্যমান স্থূল জগতের সঞ্চালক সূক্ষ্ম জগৎ, আবার কারণ-জগৎ হইতে সূক্ষ্ম জগৎ সঞ্চালিত হইয়া থাকে। সূক্ষ্ম হইতেই যখন স্থূলের অভিব্যক্তি, তখন সূক্ষ্মকে ছাড়িয়া কেবল স্থূল জগৎকেই সর্ব্বস্ব মানিয়া লওয়া চলিতে পারে না। আর্য্য শাস্ত্রের সমস্ত বর্ণিত বিষয়ই স্থূল-সূক্ষ্মাত্মক। তাঁহারা স্থূলের প্রত্যেক বিষয়ের মধ্যেই সূক্ষ্ম দৈব সত্তার উপলব্ধি করিতেন। সূক্ষ্ম ত্যাগ করিয়া কেবল স্থূল জগতের বর্ণন আর্য্যশাস্ত্রে কমই দেখিতে পাওয়া যায়। জগতের প্রত্যেক বস্তুই দৈবাধীন, ইহাই ছিল আর্য্য ঋষির মত। দৃষ্টান্তস্থলে বলা যাইতে পারে যে, ভারতের উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত, শাস্ত্রে ঐ পর্ব্বতকে দেবতাত্মা, দেবীকে তাঁহার কন্যা, আবার কৈলাসশিখরকে শিবের নিবাসস্থান বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। স্থূল দৃষ্টিতে বিচার করিলে হিমালয়ে কোথাও শিবের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না, পর্ব্বতনন্দিনী পার্ব্বতীর ত কোনও সংবাদই পাওয়া যায় না। তবে কি ঋষিরা অসত্যভাষী ছিলেন? তাহা নহে। সৎ, চিৎ ও আনন্দ, ব্রহ্মের এই ত্রিবিধ সত্তা। তন্মধ্যে বিষ্ণুর মধ্যে চিৎ-সত্তার বিকাশ, ব্রহ্মার মধ্যে আনন্দ-সত্তা এবং শিবের মধ্যে সৎ-সত্তার বিকাশ পরিস্ফুট। সৎ-সত্তার সহিত এই স্থূল বিশ্বের সম্বন্ধ থাকায় পৃথিবীর অত্যুচ্চ সর্ব্বরত্নের আকর হিমালয়কে সৎ-সত্তার অধিনায়ক শিবের স্থান বলিয়া বলা হইয়াছে এবং শিবগেহিনী সতের স্ত্রী সতীর জনকরূপে কীর্ত্তন করা হইয়াছে। এইরূপে সর্ব্বত্র স্থূলের মধ্যে সূক্ষ্মের বর্ণন কীর্ত্তিত হইলেও স্থূল সত্তার অতিরিক্ত সূক্ষ্ম সত্তার পৃথক্ অস্তিত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে; এবং উহাকেই দিব্য স্বর্গ বলা হয়। ভূলোকের অতিরিক্ত ভুঃ আদি ঊর্দ্ধতন ছয় লোককে দিব্য স্বর্গ বলা হইয়া থাকে। দৈব ও আসুরী শক্তির সমাবেশেই এই সারা বিশ্ব রচিত হইয়াছে। সেই জন্য যেমন ঊর্দ্ধতন ছয়টি লোককে দিব্য স্বর্গ বলা হয়, তেমনই অতল-বিতলাদি অধস্তন সপ্তলোককে বিলস্বর্গ বলা হয়। এই সমস্ত লোকেও স্বর্গাদিলোকের ন্যায় সুখ ভোগের পদার্থ বর্ত্তমান রহিয়াছে। ভূলোক ব্যতিরেকে এই সমস্ত লোকই সূক্ষ্ম। এই চতুর্দ্দশ ভুবন লইয়াই একটি ব্রহ্মাণ্ড। ব্রহ্মা এই একটি ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি। এই চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ডই ব্রহ্মার শরীর বা আবাসস্থলরূপে কথিত হইয়া থাকে। যথা ভাগবতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিবার সময়ে ব্রহ্মা নিজেই বলিতেছেন যে—

"কাহং তমোমহদহং খচরাগ্নি বার্ভূ-
সংবেষ্টিতাণ্ডঘটসপ্তবিতস্তিকায়ঃ।
কেদৃগ্বিধাবিগণিতাণ্ডপরাণুচর্য্যা
বাতাধ্বরোমবিবরস্য চ তে মহত্বম্।"

অর্থাৎ প্রকৃতি মহৎ, অহঙ্কার, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, এবং পৃথিবী এই সকলে পরিবেষ্টিত যে অণ্ডঘট, তাহাতে আত্মপরিমাণে সপ্তবিতস্তিমাত্র পরিমিত আমার শরীর, কিন্তু এতাদৃশ অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডরূপ পরমাণু আপনার রোমবিবর-রূপ গবাক্ষে প্রতিনিয়ত যাতায়াত করিতেছে। এই চতুর্দ্দশ-লোকসম্বন্ধে দেবীভাগবতে দেখিতে পাওয়া যে,—

"স এব পুরুষস্তস্মাদণ্ডং নির্ভিদ্য নির্গতঃ।
সহস্রোর্ব্বঙ্ঘ্রি বাহ্বক্ষঃ সহস্রাননশীর্ষবান্।
যস্যেহাবয়বৈর্লোকান্ কল্পয়ন্তি মনীষিণঃ।
কট্যাদিভিরধঃসপ্ত সপ্তোর্দ্ধং জঘনাদিভিঃ।"

অর্থাৎ সহস্রশীর্ষা, সহস্রাক্ষ, সহস্রপাদ, সহস্রবাহু বিরাট পুরুষ অণ্ডভেদ করিয়া বহির্গত হইলেন, মনীষিগণ তাঁহার কটিদেশে অধোভাগে অধঃসপ্তলোক এবং ঊর্দ্ধভাগে ঊর্দ্ধসপ্তলোক কল্পনা করিলেন। তাঁহার নাভিদেশে ভূলোক, তাহার উপরে ভুবর্লোক, হৃদয়ে স্বর্লোক, বক্ষে মহর্লোক, গ্রীবাদেশে জনলোক, স্তনদ্বয়ে তপোলোক এবং মস্তকে সপ্তলোক কল্পিত হইল। কটির নিম্নদেশে অতল, উরুদেশে বিতল, জানুদ্বয়ে সুতল, জঙ্ঘাদ্বয়ে তলাতল, গুল্‌ফদেশে মহাতল, পাদদেশে রসাতল এবং পাদতলে পাতালের কল্পনা করা হইল। এই চতুর্দ্দশ ভুবনের জ্ঞান কিরূপে হইতে পারে, তদ্বিষয়ে মহর্ষি পতঞ্জলি বলেন যে, "ভুবনজ্ঞানং সূর্য্যে সংযমাৎ" অর্থাৎ সূর্য্যের উপরে সংযম করিলে ভুবনের জ্ঞান হয়। সুতরাং কেতাবী বিদ্যার দ্বারা শ্লোকের অযথার্থ কল্পনা করিয়া নিজের বাড়ীর সীমানায় দেবতাদের বাসভূমি কল্পনা করা প্রগল্‌ভতা ভিন্ন কিছুই নহে। যোগদর্শনের ভাষ্যে ভগবান্ বেদব্যাস কি বলিতেছেন, দেখুন—"অবীচেঃ প্রভৃতি মেরুপৃষ্ঠং যাবৎ ইত্যেষ ভূর্লোকঃ, মেরুপৃষ্ঠাদারভ্যাধ্রুবাৎ গ্রহনক্ষত্রতারাবিচিত্রোঽন্তরীক্ষলোকঃ, তৎপরঃ স্বর্গলোকঃ পঞ্চবিধঃ, মাহেন্দ্রঃ তৃতীয়লোকঃ, চতুর্থঃ প্রাজাপত্যো মহর্লোকঃ ত্রিবিধো ব্রাহ্মঃ; তদ্‌যথা—জনলোকস্তপোলোকঃ সত্যলোক ইতি। ব্রাহ্মস্ত্রিভূমিকো লোকঃ প্রাজাপত্যস্ততো মহান্। মাহেন্দ্রশ্চ স্বরিত্যুক্তো দিবি তারা ভুবি প্রজা ইতি সংগ্রহশ্লোকঃ।" অর্থাৎ অবীচি নামক নরকস্থান হইতে মেরুপৃষ্ঠ পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ ভূলোকের অন্তর্গত। মেরুপৃষ্ঠ হইতে ধ্রুব নক্ষত্র পর্য্যন্ত গ্রহনক্ষত্র-তারাময় লোক ভুবর্লোক বা অন্তরীক্ষ লোক। তদনন্তর স্বর্গলোক, তাহা পঞ্চবিধ। মাহেন্দ্রলোক তৃতীয়, ইহাই ইন্দ্রলোক। চতুর্থ মহর্লোক, এখানে প্রজাপতিগণ বাস করেন। তাহার উপরে ত্রিবিধ ব্রাহ্মলোক, যথা—জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক। সংগৃহীত শ্লোকে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়, যথা—ব্রাহ্মলোক ত্রিবিধ, প্রাজাপত্যলোক—মহর্লোক; মাহেন্দ্রলোক—স্বর্লোক, তারাগণযুক্ত ভুবর্লোক এবং মনুষ্যাদি জীবযুক্ত ভূলোক। এই অবীচি নামক নরক সম্বন্ধে ভাগবত বলেন, "অন্তরাল এব ত্রিজগত্যাস্তু দিশি দক্ষিণস্যামধস্তাদ্‌ভূমেরুপরিষ্টাচ্চ জলাৎ যস্যামগ্নিষ্বাত্তাদয়ঃ পিতৃগণা দিশি স্বানাং গোত্রাণাং পরমেণ সমাধিনা সত্যা এবাশিষ আশাসানা নিবসন্তি।" অর্থাৎ ভূমির নীচে এবং জলের উপরে যে অন্তরালপ্রদেশ, তাহাই নরকস্থান, এখানে অগ্নিষ্বাত্তা প্রভৃতি পিতৃগণ নিজ নিজ বংশধরগণের কল্যাণকামনা করিয়া নিবাস করিয়া থাকেন। সুতরাং উক্ত স্থান হইতে মেরুপৃষ্ঠ পর্য্যন্ত প্রদেশকে ভূলোক বলা হয়। অতএব মেরুপৃষ্ঠের চতুর্দ্দিকস্থ প্রদেশকে ভুবঃ স্বঃ আদি লোকে কল্পনা করা অসঙ্গত।

মেরুপৃষ্ঠ হইতে ধ্রুবলোক পর্য্যন্ত স্থানকে ভুবর্লোক বলা হয়। মহর্ষি বেদব্যাস বলেন—"গ্রহনক্ষত্রতারকাস্তু ধ্রুবে নিবদ্ধা বায়ুবিক্ষেপাদিনিয়মেনোপলক্ষিতপ্রচারাঃ সুমেরোরুপর্য্যুপরি সন্নিবিষ্টা বিপরিবর্ত্তন্তে।" অর্থাৎ সূর্য্যাদি গ্রহগণ, অশ্বিনীভরণ্যাদি নক্ষত্রগণ এবং অন্যান্য তারাগণ ধ্রুবতারার সহিত সংযুক্ত হইয়া মেরু পর্ব্বতের উপরিভাগে বায়ুসঞ্চালন করিতে করিতে যথানিয়মিতগতিতে পরিভ্রমণ করিতেছেন। ভাগবতে ইহার সীমা নির্দ্দেশ এইরূপ করিয়াছেন—"ততোঽধস্তাচ্ছতযোজনান্তর ইয়ং পৃথিবী যাবদ্ধংসভাসশ্যেনসুপর্ণাদয়ঃ পতত্রিপ্রবরা উৎপতন্তি।" অর্থাৎ ভূমণ্ডল হইতে ঊর্দ্ধশত যোজন পর্য্যন্ত ভূমণ্ডলের সীমা, হংস, ভাস, শ্যেন, সুপর্ণ প্রভৃতি পক্ষিগণ যেখানে উড়িয়া বেড়ায়। তাহার উপরে ভুবঃ অর্থাৎ অন্তরীক্ষলোক যথা—"ততোঽধস্তাৎ যক্ষরক্ষঃ-পিশাচ-প্রেতভূতগণানাং বিহারাজিরমন্তরীক্ষং যাবদ্বায়ুঃ প্রবাতি যাবন্মেঘা উপলভ্যন্তে।" অর্থাৎ ভূলোকের সীমা হইতে যে পর্য্যন্ত বায়ু প্রবাহিত হয়, মেঘ দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাই অন্তরীক্ষ লোক, সেখানে যক্ষ, রক্ষঃ, পিশাচ, প্রেত ও ভূতগণ নিবাস করিয়া থাকে। "ততো সিদ্ধচারণবিদ্যাধরাণাং সদনানি" তাহার উপরে সিদ্ধ, চারণ এবং বিদ্যাধর প্রভৃতির নিবাসগৃহ। সুতরাং ম্লেচ্ছগণের নিবাসভূমি আফগানিস্থান প্রভৃতি দেশকে ভুবর্লোক বলিয়া কল্পনা করা কতদূর যুক্তিসঙ্গত, পাঠকগণ অনায়াসেই বিবেচনা করিতে পারেন। এই ভুবর্লোকের ঊর্দ্ধে স্বর্লোকের স্থিতি, যথা পাতঞ্জলভাষ্যে ব্যাস বলিতেছেন—"মাহেন্দ্রনিবাসিনঃ ষড়্‌দেবনিকায়াঃ ত্রিদশাঃ অগ্নিষ্বাত্তাঃ যাম্যাঃ তুষিতা অপরিনির্ম্মিতবশবর্ত্তিনঃ পরিনির্ম্মিতবশবর্ত্তিনশ্চেতি। সর্ব্বে সঙ্কল্পসিদ্ধাঃ অণিমাদ্যৈশ্বর্য্যোপপন্নাঃ কল্পায়ুষো বৃন্দারকাঃ কামভোগিনঃ ঔপপাদিকদেহাঃ উত্তমানুকূলাভিরপ্সরোভিঃ কৃতপরিবারাঃ।" অর্থাৎ মাহেন্দ্রলোকে ত্রিদশ, অগ্নিষ্বাত্তা, যাম্য, তুষিত, অপরিনির্ম্মিতবশবর্ত্তী ও পরিনির্ম্মিতবশবর্ত্তী, এই ছয় প্রকার দেবতা বাস করেন। ইহারা সকলেই সঙ্কল্পসিদ্ধ অর্থাৎ যথেচ্ছভোগে সমর্থ, অণিমাদি ঐশ্বর্য্যযুক্ত, কল্পান্তপরমায়ু, যথেচ্ছবিহরণশীল, ঔপপাদিকদেহ অর্থাৎ যৌনসম্বন্ধব্যতিরেকে উৎপন্ন দিব্যশরীরধারী। তাঁহারা সুন্দরী অনুকূলা অপ্সরাগণের সহিত বিহার করিয়া থাকেন।

মহাভারতের বনপর্ব্বে এই স্বর্গলোক সম্বন্ধে বিশেষ বর্ণন দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—"উপরিষ্টাচ্চ স্বর্লোকে যোঽয়ং স্বরিতি সংজ্ঞিতঃ। ঊর্দ্ধগঃ সৎপথঃ শশ্বদ্দেবযানচরো মুনে।"

অর্থাৎ ঊর্দ্ধ তৃতীয় লোককে স্বর্গলোক বলা হয়। সেখানে দেবযানে চড়িয়া লোক বিচরণ করিয়া থাকে। সেখানে তপস্যা-হীন, যজ্ঞহীন, অসত্যপরায়ণ এবং দাম্ভিক লোক যাইতে পারে না। শান্ত, দান্ত, দানধর্ম্মশীল, জিতাত্মা এবং সমরবীর পুরুষই সেখানে যাইতে পারে। দেবতা, সাধ্য, বিশ্ব, মহর্ষি, যাম, ধাম, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণের তেজোময় লোকসমূহ ঐ স্বর্গলোকেরই অন্তর্গত। সেখানে ক্ষুধা, পিপাসা, গ্লানি, ভয় বা কোনরূপ বীভৎস বস্তু নাই, শীতল মন্দ সুগন্ধ পবন এবং শ্রুতিপ্রাণমোহন সঙ্গীতোচ্ছ্বাস সর্ব্বদা বিরাজিত। সেখানে শোক, দুঃখ, জরার লেশমাত্রও নাই। "ঈদৃশঃ স মুনে লোকঃ স্বকর্ম্মফলহেতুকঃ। সুকৃতৈস্তত্র পুরুষাঃ সম্ভবন্ত্যাত্মকর্ম্মভিঃ। তৈজসানি শরীরাণি ভবন্ত্যত্রোপপদ্যতাম্। কর্ম্মজান্যেব মৌদ্গল্য ন মাতৃপিতৃজান্যুত।" অর্থাৎ হে মুনে! সুকর্ম্মার্জ্জিত ইহাই সেই স্বর্গলোক, মানব পুণ্যকর্ম্মের দ্বারা যখন এই লোক লাভ করে, তখন তাহাদের শরীর তৈজস হইয়া যায়। পিতামাতা হইতে সেখানে শরীরোৎপত্তি হয় না, দেবতাদের মূত্রপুরীষ হয় না, শরীরে ঘর্ম্ম হয় না, দুর্গন্ধ হয় না, তাঁহাদের বস্ত্র ধূলিযুক্ত হয় না ইত্যাদি।

সেই জন্য মীমাংসকগণ মীমাংসাশাস্ত্রে স্বর্গের পরিভাষা করিয়াছেন—"যন্ন দুঃখেন সংভিন্নং ন চ গ্রস্তমনন্তরম্। অভিলাষোপনীতঞ্চ তৎ সুখং স্বঃপদাস্পদম্।" অর্থাৎ যেখানে সুখ দুঃখ-সংভিন্ন নয়; যেখানে সুখভোগের পর দুঃখের উদয় হয় না, এবং যেখানে ইচ্ছা করিবামাত্র ভোগ্য পদার্থ লাভ করা যায়, তাহাকেই স্বর্গ বলে। কঠোপনিষদেও বর্ণিত আছে যে, "স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিঞ্চনাস্তি ন তত্র ত্বং ন জরয়া বিভেতি। উভে তীর্ত্বা অশনায়াপিপাসে শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে।" অর্থাৎ স্বর্গলোকে কোনরূপ ভয় নাই, সেখানে জরা নাই, বুভুক্ষা নাই, পিপাসা নাই, এবং শোকও নাই। ইন্দ্র এই স্বর্গের অধিপতি। ইন্দ্র যে কেবল স্বর্গেরই অধিপতি, তাহা নহে। তিনি ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই ত্রিলোকেরই অধিপতি। যথা—"ইন্দ্রে ত্রৈলোক্য-মাধায় ব্রহ্মলোকং গতঃ প্রভুঃ।" (মহাভারত আদিপর্ব্ব)। অর্থাৎ ভগবান্ স্বয়ম্ভূ ইন্দ্রের উপরে ত্রিলোকের আধিপত্য অর্পণ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। "নষ্টস্ত্রিলোকেশমদ ইদমাহ কৃতাঞ্জলিঃ" (ভাগবত দশমাধ্যায়) অর্থাৎ ইন্দ্রের যখন ত্রিলোকাধিপত্যের অহঙ্কার চূর্ণ হইল, তখন তিনি বলিতে লাগিলেন। এই ইন্দ্রের পরমায়ু এক মন্বন্তর। পরবর্ত্তী মন্বন্তরে দৈত্যরাজ বলি ইন্দ্র হইবেন, এ কথা পুরাণে বর্ণিত আছে। স্বর্গলোক যে পুণ্যোপভোগের স্থান, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। পূর্ব্বে যজ্ঞাদি সুকৃতকর্ম্মের দ্বারাই লোক স্বর্গে গমন করিতেন, 'স্বর্গকামো অশ্বমেধেন যজেত' এই শ্রুতিবাক্য তাহাই সমর্থন করিয়া থাকে। ভগবান্ গীতা-শাস্ত্রেও তাহাই উল্লেখ করিয়াছেন—"ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূত-পাপা, যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে। তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্।" অর্থাৎ বেদবিদ্গণ যজ্ঞ দ্বারা স্বর্গকামনা করিতেন এবং পুণ্যকর্ম্মের দ্বারা ইন্দ্রলোক লাভ করিয়া বহুকাল পর্য্যন্ত দিব্য দেবভোগ উপভোগ করিতেন। তাহার পরেই আবার 'ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি' অর্থাৎ পুণ্যক্ষয় হইবামাত্র মর্ত্ত্যলোকে পতিত হইতে হইত।

এই স্বর্গই কি চক্রবর্ত্তী মহোদয়ের বিনির্দ্দিষ্ট মঙ্গোলিয়া? সাধারণতঃ ইহাই নিয়ম ছিল যে, পুণ্যশীল ব্যক্তিগণ মৃত্যুর পরে দেহাবসানে তৈজস দেহ ধারণ করিয়া এই লোকে গমন করিতে সমর্থ হইতেন। পূর্ব্বে মহাভারতের প্রমাণের দ্বারা ইহাই দেখান হইয়াছে যে, এই লোকে যাঁহারা নিবাস করেন, তাঁহা-দের সকলেরই দেহ তৈজস। পৃথিবীর পার্থিব দেহ সেখানে যাইতে পারে না। তৈজস শব্দের অর্থ তেজঃপ্রধান। এই পাঞ্চভৌতিক সৃষ্টির মধ্যে এই ভূলোক বা পৃথিবী পৃথিবীতত্ত্ব-প্রধান। পঞ্চীকরণমীমাংসায় ইহা দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই স্থূল পৃথিবীর মধ্যে পৃথিবীর অংশ অর্দ্ধেক এবং জল, বায়ু প্রভৃতি অপর চারিতত্ত্বের প্রত্যেকের এক এক অষ্টমাংশ ভাগ বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই জন্য এই পৃথিবীস্থ প্রাণিগণের শরীর পৃথিবীতত্ত্বপ্রধান। সেই কারণবশতঃ এই পৃথিবীস্থ জীব জল, অগ্নি বা বায়ুর আঘাত সহ্য করিতে পারে না। সামান্য অগ্নির দাহে কাতর হইয়া পড়ে, জলে চলাচল করিতে সমর্থ হয় না, সামান্য বায়ুর আঘাতেই ব্যথিত হইয়া পড়ে। ঐরূপ তেজোময় লোকে তেজস্তত্ত্বের প্রাধান্য বর্ত্তমান। সেখানের পঞ্চীকরণে তেজস্তত্ত্ব অর্দ্ধেক, এবং অন্যান্য তত্ত্বও পূর্ব্বোক্ত প্রকার এক এক অষ্টমাংশ। সুতরাং সে স্থলের অধিবাসিগণের দেহ তেজোময় বা তৈজস। পৃথিবীতত্ত্ব অপেক্ষা তাহা সূক্ষ্ম, সেই জন্য পার্থিব ভূলোকের জীব পৃথিবীতত্ত্বপ্রধান এই দেহ লইয়া সেখানে যাইতে বা থাকিতে পারে না। ইহা বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত। তবে বিশেষ বিশেষ স্থলে মানব যদি সুদুশ্চর তপশ্চর্য্যার প্রভাবে দেবতাদের অনুকম্পা লাভ করিয়া এই পার্থিব দেহকে তেজোময় দেহরূপে পরিণত করিতে পারে, তাহা হইলে তাহারা দেব-গণের সাহায্যে স্বর্গলোকে গমনাগমন করিতে পারে। গাধিরাজ বিশ্বামিত্র যেমন ক্ষত্রিয়-রজোবীর্য্য হইতে সমুদ্ভূত হইয়াও স্বীয় অসাধারণ সাধনার প্রভাবে নিজের স্থূল শরীরের ক্ষত্রিয় পর-মাণুকে ব্রাহ্মণ-দেহোপযোগী পরমাণুরূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া ব্রহ্মর্ষি হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, যোগিগণ যেমন স্বীয় অদ্ভুত যোগশক্তির

প্রভাবে স্বেচ্ছানুরূপ শরীর ধারণ করিয়া শত বৎসরভোগ্য প্রারব্ধ কর্ম্মকে ১০ বৎসরের বা তদপেক্ষা কম সময়ের মধ্যে ভোগ করিয়া মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হন। নিজের স্থূল পার্থিব পরমাণুকে জলময় পরমাণু অথবা আকাশময় পরমাণুতে পরিবর্ত্তিত করিয়া স্বেচ্ছায় জলময় লোকে অথবা আকাশমার্গে বিচরণ করিতে সমর্থ হন, তদ্রূপ স্বীয় শরীর-পরমাণুকে তৈজসরূপে পরিণত করিয়া তৈজস স্বর্গাদিলোকে গমনাগমনও বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নহে। প্রাচীন ঋষিগণ সেই কারণবশতঃই স্বীয় অচিন্তনীয় যোগশক্তিপ্রভাবে স্বেচ্ছায় ব্রহ্মাদিলোকে গমনাগমন করিতে পারিতেন। এই যোগসিদ্ধি দুই প্রকারে উদিত হইয়া থাকে। এক স্বয়ংসিদ্ধি, দ্বিতীয় কৃপাসিদ্ধি। ঋষিগণ অতি দুষ্কর তপস্যার দ্বারা স্বয়ং সিদ্ধ হইতেন, এবং তাহার দ্বারাই তাঁহারা সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে সমর্থ হইতেন। অর্জ্জুন, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি কৃপাসিদ্ধি দ্বারা স্বর্গারূঢ় হইয়াছিলেন। অর্জ্জুন যে পায়ে হাঁটিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন, ইহার কোনও প্রমাণ মহাভারতে পাওয়া যায় না, বরঞ্চ মহাভারতে ইহাই বর্ণিত হইয়াছে যে, অর্জ্জুন যখন শঙ্করের আরাধনা করিয়া পাশুপত অস্ত্র লাভ করিলেন, তখন ইন্দ্র স্বর্গ হইতে আগমন করিয়া তাঁহাকে স্বর্গে যাইতে অনুরোধ করিলেন, ইন্দ্রের অনুরোধে তিনি স্বীকৃত হইলে স্বর্গ হইতে তেজোময় রথ প্রেরিত হইল, এবং অর্জ্জুন সেই দিব্যরথে আরোহণ করিয়া ইন্দ্রের কৃপায় স্বর্গগমনে সমর্থ হইয়াছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র স্বীয় কার্য্যসিদ্ধির অভিপ্রায়ে অর্জ্জুনকে তাৎকালিক দৈব তৈজস দেহ প্রদান করিয়াছিলেন মাত্র। যদি অর্জ্জুনের নিজের সে শক্তি থাকিত, তাহা হইলে মৃত্যুসময়েও দেবলোকে গমন করিতে পারিতেন। যুধিষ্ঠিরের সম্বন্ধেও ঐ কথা বলা যাইতে পারে। ভীমার্জ্জুন প্রভৃতির পতন হইলে পর রাজা যুধিষ্ঠির যখন স্বর্গাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন, তখন দেবতাগণ তাঁহার নিকটে আগমন করিয়া তাঁহাকে স্বর্গ-গঙ্গায় স্নান করাইলেন, এবং স্নানের পরই তিনি দিব্য তৈজস দেহ ধারণ করিয়া স্বর্গলোকে গমন করিলেন। অথণ্ড সত্য-ধর্ম্মপালনের জন্য তাঁহাকে অর্জ্জুনের ন্যায় মর্ত্ত্যলোকে ফিরিয়া আসিতে হয় নাই। সেখানে গমন করিয়াই তিনি দেখিলেন যে, কুরুক্ষেত্র-সমরে নিহত শত ভ্রাতার সহিত রাজা দুর্য্যোধন, এবং ভীম, অর্জ্জুন প্রভৃতি চারি ভ্রাতা সকলেই সেখানে দিব্যদেহে বিরাজিত রহিয়াছেন।

যদি এই স্বর্গ ভৌম বা মঙ্গোলিয়া হইত, তাহা হইলে মৃত্যুর পরে সেখানে গমন কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে? মৃত্যুর পরে স্বীয় সুকৃতকর্ম্মের ফলে যে লোকে গমন করা যায়, তাহা দিব্য-স্বর্গ ভিন্ন আর কি হইতে পারে? ম্লেচ্ছভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ সর্ব্বদা যেখানে বাস করিয়া থাকে, যেখানে যাইবার জন্য বিশেষ কোন প্রয়াসেরই আবশ্যক হয় না, সেই আণ্টাই পর্ব্বতই যদি স্বর্গ হইত, তাহা হইলে সেই স্বর্গলাভের জন্য সারা জীবন ধরিয়া সুদুশ্চর তপশ্চর্য্যা, দান, যজ্ঞ, ব্রতাদি সাধন, এবং মৃত্যুর পরে সেই স্বর্গে গমন শাস্ত্রে লিখিত হইত না। শাস্ত্রকার এই সমস্ত অসম্ভব কথা লিপিবদ্ধ করিবার সময় কি চণ্ডুখানায় আড্ডা দিতেন? রামায়ণে লঙ্কা-বিজয়ের পর সীতার অগ্নি-পরীক্ষার সময় চতুর্দ্দশ বর্ষ পূর্ব্বে মৃত রাজা দশরথ কি মঙ্গোলিয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়া রামচন্দ্রকে দর্শন দিয়াছিলেন? অথবা গয়াধামে বালুর পিণ্ড গ্রহণের নিমিত্ত মৃত-শরীরে কিরূপে আগমন করিয়াছিলেন? কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধাবসানে গান্ধারীর প্রার্থনায় মহর্ষি বেদব্যাস মৃত কৌরবগণকে কি মঙ্গোলিয়া হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন? কেবল ভৌমস্বর্গ স্বীকার করিলে এই সব আখ্যানের কোনও সামঞ্জস্যই হয় না। দিব্য স্বর্গ হইতে তাঁহাদের আগমন সম্ভবপর। যেহেতু, দিব্যশরীরধারী দেবতা স্বেচ্ছায় পার্থিব শরীর ধারণ করিতে সমর্থ হন, ইহার বহু প্রমাণ পুরাণ গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। "দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে সূর্য্যমণ্ডলভেদিনৌ। পরিব্রাট্ যোগযুক্তশ্চ রণে চাভিমুখো হতঃ।" (মহাভারত)। পরিব্রাড়্-যোগী এবং সম্মুখ-যুদ্ধে নিহত ব্যক্তি উভয়েই সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া উর্দ্ধতন লোকে গমন করিতে সমর্থ হন। এই জন্যই ভগবান্ গীতায় অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন যে, "মৃতঃ স্বর্গমবাপ্স্যাসি।" অর্থাৎ মরণের পরই স্বর্গে যাইতে পারা যায়। এই স্বর্গলোকের উর্দ্ধে মহর্লোক অবস্থিত।

এই লোক সম্বন্ধে পতঞ্জলিভাষ্যে ভগবান্ ব্যাসদেব বলিতেছেন যে—"মহতি লোকে প্রাজাপত্যে পঞ্চবিধো দেবনিকায়ঃ, কুমুদাঃ ঋভবঃ প্রতর্দ্দনা অঞ্জনাভা প্রচিতাভা ইতি এতে মহাভূতবশিনো ধ্যানাহারা কল্পসহস্রায়ুষঃ।" অর্থাৎ প্রাজাপত্য মহর্লোকে কুমুদ, ঋভব, প্রতর্দ্দন, অঞ্জনাভ এবং প্রচিতাভ এই পাঁচ প্রকারের দেবগণ বাস করেন। পঞ্চমহাভূত সকল তাঁহাদের বশবর্ত্তী। তাঁহারা ধ্যানাহারী অর্থাৎ ভগবানের ধ্যান মাত্র সেবন করিয়াই জীবিত থাকেন, কল্পসহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত তাঁহারা জীবিত থাকেন। ইহার উপরে ব্রহ্মলোক ত্রিবিধ। যথা—জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক। জনলোকে ব্রহ্মপুরোহিত, ব্রহ্মকায়িক, ব্রহ্মমহাকায়িক এবং অমর এই চারি প্রকার দেবতা বাস করেন। "এতে ভূতেন্দ্রিয়বশিনঃ" (ব্যাস) তাঁহারা সকলেই পঞ্চমহাভূত এবং ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। দ্বিতীয় তপোলোকে অভাস্বর, মহাভাস্বর, সত্যমহাভাস্বর এই

ত্রিবিধ দেবতার নিবাস। "এতে ভূতেন্দ্রিয়প্রকৃতিবশিনো দ্বিগুণদ্বিগুণোত্তরায়ুষঃ সর্ব্বে ধ্যানাহারা ঊর্দ্ধরেতস ঊর্দ্ধমপ্রতিহতজ্ঞানা অধরভূমিষ্বনাবৃতজ্ঞানবিষয়াঃ।" অর্থাৎ পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয় এবং প্রকৃতি পর্য্যন্ত তাঁহাদের বশীভূত। অভাস্বর অপেক্ষা মহাভাস্বরের পরমায়ু দ্বিগুণ, এবং মহাভাস্বর হইতে সত্যমহাভাস্বরের আয়ু দ্বিগুণ পরিমিত। ইহারা সকলেই ধ্যানাহারী এবং ঊর্দ্ধরেতা, ঊর্দ্ধসত্যলোক এবং অধোলোকের জ্ঞানও ইহাদের করতলগত। ইহার উপরে সত্যলোকের স্থিতি, সেখানে অচ্যুত, শুদ্ধনিবাস, সত্যাভ এবং সংজ্ঞাসংজ্ঞী এই চারি প্রকার দেবতা বাস করেন। ইহারা সকলেই গৃহহীন এবং স্বপ্রতিষ্ঠ, এবং প্রকৃতিজয়ী। যত দিন পর্য্যন্ত সৃষ্টি থাকিবে, তত দিন পর্য্যন্ত তাঁহাদের আয়ু। অচ্যুতগণ সবিতর্ক ধ্যানে নিমগ্ন; শুদ্ধনিবাসগণ সবিচার ধ্যানে, সত্যাভগণ আনন্দমাত্রধ্যানে এবং সংজ্ঞাসংজ্ঞিগণ অস্মিতামাত্র ধ্যানে নিমগ্ন থাকেন। ইহাই সপ্তলোকের বৃত্তান্ত। ইহাই দিব্য স্বর্গ।

এইরূপ সপ্তপাতাললোকের বর্ণনও দেবীভাগবতে পাওয়া যায়। যদিও আধুনিক অনেকে আমেরিকাকে পাতাল বলিয়া থাকেন, এবং সেখানে বলিভিয়া নগর দেখিয়া বলির নামের সহিত সামঞ্জস্য থাকায় বলির রাজত্বস্থান বলিয়া কল্পনা করেন, তাহা সম্পূর্ণ ভুল। যে হেতু, বলির বাসস্থান পাতালে ছিল না, বলি তৃতীয় অধোলোক সুতলে বাস করিতেন। যথা দেবীভাগবতে—"তদ্বিলাধস্তলাং প্রোক্তং সুতলাখ্যং বিলেশ্বরম্। পুণ্যশ্লোকো বলির্নামা আস্তে বৈরোচনির্মুনে। ত্রিবিক্রমোঽপি ভগবান্ সুতলে বলিমানয়ৎ।" অর্থাৎ দ্বিতীয় বিলের নীচে তৃতীয় সুতল নামক লোকে বিরোচনসুত বলি বাস করেন। ত্রিবিক্রম ভগবান্ সুতলেই বলিকে আনয়ন করেন। অতএব আমেরিকাকেই পাতাল বলিয়া কল্পনা করিয়া লইলেও অন্যান্য ছয়টি অধোলোকের স্থান কে নির্দ্দেশ করিয়া দিবে? সেই জন্য ভূলোক ছাড়া অন্যান্য তেরটি লোকই যে সূক্ষ্ম, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই থাকিতে পারে না। এই স্থূল দৃশ্যমান পৃথিবী ছাড়াও যে অন্যান্য লোক আছে, এ সম্বন্ধে যে কেবল প্রাচীন আর্য্য শাস্ত্রেই প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা নহে। পাশ্চাত্য দেশের অনেক শ্বেতকায় মনীষীও ইহা স্বীকার করেন। এ সম্বন্ধে স্যার অলিভর লজ কি বলিতেছেন, দেখুন —I shall go farther and say, I am reasonably convinced of the existence of grades of being not only lower in the scale than man but higher also, grades of every order of magnitude from zero to infinity—Raymond or Life and Death by Sir Oliver Lodge.

অর্থাৎ স্যার অলিভর লজ বলিতেছেন, কেবল ইহাই নহে, আমি ইহাও বিশ্বাস করি যে, মনুষ্যলোকের উপরে এমন অনেক লোক আছে, যাহাতে অনেক প্রকারের উচ্চ তথা নীচ কোটির জীব বাস করে। এ ছাড়া The New Revelation. ও Raymond আদি পুস্তক পাঠ করিলেও লোকান্তরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেক কথাই দেখিতে পাওয়া যায়।

এ স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, ভূলোক ছাড়াও যদি এতগুলি লোকের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে সেই সমস্ত লোক কি ভাবে অবস্থিত? এ সম্বন্ধে পরম শ্রদ্ধাভাজন সর্ব্বশাস্ত্রনিষ্ঠ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য যোগিরাজ স্বামী দয়ানন্দজী মহারাজ বলেন যে, স্থূললোকের ন্যায় সূক্ষ্মলোকসমূহ দেশবিশেষের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে। স্থূললোকে যেমন পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি প্রত্যেক গ্রহের অবস্থান পৃথক্ পৃথক্ পরিদৃষ্ট হয় এবং এক অপরের দ্বারা সীমাবিশিষ্ট হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে, অর্থাৎ পৃথিবীর মধ্যে যেমন চন্দ্র, বুধ প্রভৃতি গ্রহের লোকসমূহ থাকিতে পারে না, সূক্ষ্ম লোকসমূহ সেরূপ নহে। অতল-বিতলাদি সপ্ত অধোলোক এবং ভুবঃ স্বঃ প্রভৃতি সপ্ত ঊর্দ্ধলোক পরস্পর পরস্পরের দ্বারা সীমাবিশিষ্ট না হইয়া একই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে। যেমন জীবের স্থূলশরীরের মধ্যে সূক্ষ্মশরীর, আবার সূক্ষ্মশরীরের মধ্যে কারণশরীর বর্ত্তমান থাকে, পঞ্চকোষাত্মক জীবদেহে অন্নময় কোষের মধ্যে প্রাণময় কোষ, প্রাণময় কোষের মধ্যে মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষাদির স্থিতি যেরূপে সম্ভবপর হয়, ঠিক তদ্রূপ এক সূক্ষ্মলোকের সহিত অপর সূক্ষ্মলোকের দেশাবচ্ছিন্ন কোনরূপ সীমার আবশ্যক হয় না। উহারা পরস্পর পরস্পরের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া একই ব্রহ্মাণ্ডরূপ বিরাট শরীরের অভ্যন্তরে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহাই দিব্যলোক ও বিল অর্থাৎ পাতালাদি লোকের রহস্য। ভৌমস্বর্গ সম্বন্ধে আলোচনা পরে করা যাইবে।

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ বেদান্তশাস্ত্রী (অধ্যাপক, সনাতনধর্ম্ম কলেজ)।

অপদার্থ

"কাল বলুলে টানাটানি যাচ্ছে। গরম জামা না হয় দশ দিন পরেই হ'ত, পিসীমা। কত মেয়েই ত সাদা জামা প'রে কলেজে যায় এখনও।"

"বাপু, একটা অসুখ-বিসুখ হ'লে খরচের যে কিনারা থাকবে না, তা ভাবিস না।?"

"বড্ড ভীতু কিন্তু তুমি। একটু ঠাণ্ডা পড়েছে কি না, গরম জামা না পরলে একেবারে নিমোনিয়া হবে! যা' অভ্যেস করা যায়, তাই সয়। নইলে দেখ না, কত দীন-দুঃখী মাঘ মাসের শীতে ফুটপাথে শুয়ে থাকে নির্ব্বিঘ্নে।"

"যা বাপু যা! কলেজে আর কিছু না হোক্, তর্কবীর হওয়া যায় বেশ. অধীর বলে মিথ্যে নয় যে, মেয়েদের ইস্কুল পর্য্যন্ত, বাস্। কলেজে গেলে একেবারে—"

"তোমার অধীরই এ কথা বলুতে পারে, পিসীমা।"

"ছিঃ! দিন দিন হচ্ছিস্ কি বল্ ত? অধীর 'দাদা' না?

"কেন, দাদা কিসের? না, কেউ নয়।"

"হঠাৎ অধীরের ওপর চটুলি কেন, শোভা? তুই-ই ত কয়েক মাস আগে বলতিস্, অধীরদা যাদের জামাই হবে, ঘর আলো করুবে তাদের। আর—"

ফাটবার আগে আগ্নেয়-গিরির মত খানিকটা কাঁপিয়া, শোভা বলিল, "আলো হয় ত করুবে। দু'এক দিনে ত আর লোক চেনা যায় না। এখন বেশ বুঝেছি, তার রূপই আছে, গুণের লেশও নেই। এ কথা বোঝ ত পিসীমা যে, নারীর কাছে রূপের চেয়ে গুণের আদরই বেশী? অধীর—সুন্দর, বড়লোক, কিন্তু অপদার্থ—"

"তুই ওঠ্। খেয়ে দেয়ে নে। তোর শরীরটা নিশ্চয়ই ভাল নয়।"

"না, ভাল নয়! তুমি রাগ করুলে বুঝি?"

"দূর! রাগ করুব কেন? অধীরের নামে অমন করুলি ব'লে একটু দুঃখ হ'ল বটে। আগে তুই তাকে ভক্তি করুতিস্।"

শোভা তিক্তকণ্ঠে বলিল, "তা করতুম, পিসীমা; কিন্তু যখন বুঝলুম, তিনি পড়াশুনো-বিরোধী, নিষ্ঠুর, ভীরু, অলস —তাঁর ওপর শ্রদ্ধা হারালুম।"

"পাগ্‌লি! অধীরকে একটুও চিন্‌তে পারিস্ নি!"

"নিজে চোখে না দেখে কোন কথা ত আমি বলি নি, পিসীমা। নিজে ত তিনি ইস্কুল-কলেজের ধারেও যান না, যারা যায়, তাদের বিদ্রূপ করেন। আমার কলেজে পড়া সম্বন্ধে তোমায় এক দিন বলছিলেন, আমি নিজের কাণে শুনেছি।"

"এই দেখ, বুঝিস্ নি। লেখাপড়া করার সে খুব পক্ষপাতী। সে বলে, ইস্কুল-কলেজে উপযুক্ত শিক্ষার অনেক বাধা, বাড়ীতে পড়াই ভাল।"

"বেশ। এক দিন একটি মেয়েমানুষ কিছু চাইতে, 'খাটবার সামর্থ্য রয়েছে, ভিক্ষে কর কেন, বাপু' ব'লে তাড়িয়ে দিলেন কেন? সে দিন এক জন সাহেব গয়লাদের ছোট ছেলেটাকে সাইকেল চাপা দিয়ে চ'লে গেল, উনি কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন, সাহেব ব'লে ঠোঁটটিও নাড়লেন না ত!—যাক্, আর ব'লে লাভ নেই।—"

"ওরে, হয় ত কোন কারণ ছিল।—কে কড়া নাড়ছে না? দেখ দিকি।"

পাড়া সম্পর্কে পিসী। কিন্তু শোভার কেরাণী ভাই মোহিতের মৃত্যুর পর, সেই পিসী শৈলবালাই তাহাকে কষ্টে-সৃষ্টে কয়-বছর মানুষ করিয়া আসিতেছে। আপন বলিতে জগতে কেহ নাই, স্বামী মাসিক ৩০ টাকা পাইবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন। কাযেই শোভার ভার লইতে তাহার খুব অসুবিধা হয় নাই। কিন্তু, ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া শোভা কলেজে প্রবেশ করা অবধি শৈলবালা ৩০ টাকায় ব্যয়ের কূল-কিনারা পায় নাই। মোহিতের বাল্য-বন্ধু অধীরের কাছে তাহাকে সাহায্যের জন্য জানাইতে হয়। অধীরের অভাব ছিল না, বন্ধুর বোন্‌কে দেখাও উচিত, এই জন্য দরকার হইলেই অধীরও সাহায্য করিত। প্রায় দুই বৎসর, শোভার বইখাতা, কাপড়-চোপড়, কলেজের বেতন, শৈলবালার কাছে সে গোপনে দিয়া আসিতেছে।

দরজা খুলিয়া দিয়া, শোভা পড়িবার ঘরে চলিয়া গেল।

তাহার পশ্চাতে অধীর আসিয়া দাঁড়াইতেই শৈলবালা ডাকিল, "শোভা, শোন্ রে।"

শোভা আসিতে, শৈলবালা বলিল, "হ্যাঁ অধীর, তুমি

নাকি বাপু এক জন স্ত্রীলোককে ভিক্ষে দাও নি, 'খেটে খেতে পার' ব'লে তাড়িয়ে দিয়েছ ?"

অধীর বুঝিল, অভিযোগ শোভার। হাসিয়া বলিল, "কেন তাড়িয়ে দেব না ? যা দু'চার টাকা আছে, সবাইকে বিলিয়ে দিয়ে যদি পথে দাঁড়াই, আমায় ত এক পয়সা কেউ দেবে না।"

"তার পর, একটা সাহেব, গয়লাদের ছেলেটাকে সাইকেল চাপা দিতে তুমি নাকি একটা কথাও বল নি ?"

"ব'লে তার পর মার খাই, জেলে যাই !"

শৈলবালা হো-হো করিয়া হাসিল।

অধিকতর বিরক্তিতে শোভার ভ্রূ কুঞ্চিত হইল।

অধীর শোভাকে ভালই বাসিত। কিন্তু, তাহাকে রাগাইয়া তাহার পর হাসাইতে তাহার বড় আমোদ হইত।

শৈলবালার হাসি থামিতে অধীর শোভাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "গরম জামাটি শোভার নতুন দেখছি। কত পড়ল ?"

অনিচ্ছাসত্ত্বে শোভা কোনমতে উত্তর দিল,"আট টাকা।"

বসিতে বসিতে অধীর কহিল, "ছেলেদের ও মেয়েদের মধ্যে কত তফাৎ দেখেছ ? বাবুয়ানীর চেয়ে ন্যায়-অন্যায় ভাল-মন্দ ছেলেদের কাছে বড়। বিশেষ ছাত্ররা পারতপক্ষে আজকাল আর বিলিতী কাপড়-চোপড় কেনে না। কিন্তু শোভা কেমন নির্ব্বিবাদে বিলিতী জামাটা কিনে এনেছে !"

নির্গুণের মুখে গুণাগুণের সমালোচনা শোভার অসহ্য হইল। রাগে তাহার চোখ-মুখ লাল হইয়া উঠিল। ওষ্ঠাধর কাঁপিতে লাগিল। সে তীব্রকণ্ঠে বলিল, "এ ভাল-মন্দটুকু বোঝবার বুদ্ধি আমার বহুদিন হয়েছে। এ সব টীকা-টিপ্পনী শুনতে আমার মোটেই ভাল লাগছে না।"

শৈলবালা এতক্ষণ হাসিতেছিল। সে চীৎকার করিয়া ধমক দিল—"কি শোভা !"

শোভার চোখ ফাটিয়া জল পড়িল। অধীরদা'কে অপমান করার জন্য নহে, পিসীমার ভৎ'সনায়।

পড়ার ঘরে উঠিয়া গিয়া টেবলে মাথা রাখিয়া শোভা ফোঁপাইতে লাগিল।

বিড়-বিড় করিয়া আপন মনে শৈলবালা বলিল, "পোড়া মেয়ে যদি জানত যে, তার কাপড়-চোপড়ের টাকা কে দেয় !"

অধীর কহিল, "এঃ পিসীমা ! তুমি শোভার ওপর রাগ করলে না কি ? আমার ত নিজের ওপর রাগ হচ্ছে। যাই, পাগলীটাকে ঠাণ্ডা করি।"

সে আসিয়া শোভার টেবলের ধারে একটি চেয়ারে বসিল। বলিল, "ছিঃ ! বুড়ো মেয়ে কাঁদে !"

কোনও উত্তর আসিল না।

"ও বাবা ! মুখ লুকিয়ে হাসি হচ্ছে ! দেখি—" বলিয়া অধীর শোভার মাথাটা তুলিবার চেষ্টা করিল।

বেশ একটু রুক্ষস্বরে শোভা বলিল, "পুরুষে স্পর্শ করার বয়েস আমার বহুদিন পার হয়ে গেছে, এটুকুও কি আপনাকে ব'লে দিতে হবে ? পিসীমার সঙ্গে দরকার থাকে, তাঁর কাছে যান। আপনার সঙ্গে আলাপ করা আমার বিশেষ অন্যায় হয়েছে, আমায় ক্ষমা করুন।"

অধীর একটু বিস্মিত না হইয়া আর পারিল না। এরূপ সে ত আশা করে নাই ! শোভাও ত তাহাকে ভালবাসিত, ভক্তি করিত; বাহিরের লোকের মত ত তাহাকে দেখিত না। শৈশব হইতেই তাহার দাদার সে বন্ধু, ইহা ত সে জানিত ! তবে ?

"রাগ কোরো না শোভা, আমার ভুল হয়েছে—" বলিয়া অধীর শৈলবালাকে কিছু না জানাইয়া চলিয়া গেল।

অধীরকে অপমান করিয়া শোভা বোধ হয় এক তিল কুণ্ঠাবোধ করে নাই। শৈলবালা বিশেষ দুঃখিত হইয়াছে দেখিয়া তাহার একটু কষ্ট হইয়াছিল।

অধীর নিয়মিত আসিত। শোভার সহিত কথা না কহিলেও, তাহার পড়াশুনার খরচা নিয়মিত শৈলবালার কাছে দিতে লাগিল।

জগৎকে হয় ত ফাঁকি দেওয়া যায়, মন যে সবই জানিয়া ফেলে। একটা অঙ্ক এই ভুলের অভিনয়ে, অধীরের মনে এক ছোপ কালি লাগিয়াছিল।

কিছু দিনের মধ্যে কিন্তু একটা দুর্বিপাকে তাহাদের এ অবস্থাও আমূল বদলাইয়া গেল।

দুইটি দিনের জ্বরে শৈলবালা পৃথিবী হইতে বিদায় লইল। পাড়াসম্পর্কের পিসীমা হইলেও শোভার সে-ই সব। তাহার চোখের জল শুকাইতেই দুই-তিন সপ্তাহ গেল। একটি কাঁটা তাহার বুকে বিঁধিয়াই রহিল—একটি কথা—এমনভাবে পলাইয়া যাইবে জানিলে সে কি অধীরকে অপমান করিয়া পিসীমাকে ব্যথা দিত !

পৃথিবী মানুষের মনের জন্য কোন দিন ভাবে নাই—আপন-নিয়মে চলিয়াছে—চলিবে।

শোভার মাথায় অন্ধকার ভবিষ্যতের কথা জটলা করিতেছিল। পিসীমার সহিত বীমা-আফিসের টাকারও শেষ হইল। সে কোথায় থাকিবে, কিরূপে বাঁচিবে?

অধীরের যেন চিন্তা হইল বেশী। শোভার কাছে আসিয়া সান্ত্বনা, আশা-ভরসা দেওয়ার জন্য তাহার প্রাণ আকুলি-ব্যাকুলি কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু লজ্জা ও অভিমানে আসিতে না পারিয়া পাগলের মত সে বেড়াইতে লাগিল। পাড়ার ছেলে-মেয়েদের কাছে শোভার কথা পুঙ্খানুপুঙ্খ করিয়া দিনে কতবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল।

তিন দিন পরে মাস-কাবার। ভাড়া-বাড়ী ছাড়িয়া শোভা কোথায় যাইবে? তাহার ত কিছুই নাই। অথচ তাহার সাহায্য সে নিশ্চয়ই লইবে না। অধীর ভাবিয়া কূল-কিনারা পাইল না।

একবার তাহার মনে হইয়াছিল, শোভাকে গিয়া বুঝাইয়া বলে, স্ত্রীলোকটি সাহায্য করার উপযুক্ত ছিল না বলিয়াই সে সাহায্য করে নাই। গয়লাদের ছেলে নিজের দোষে চাপা পড়িয়াছিল, সেই কারণে সে সাহেবকে কিছু বলে নাই। কিন্তু—

শেষে অনাথ বাবুকে গিয়া সে ধরিল।

তাঁহার প্রকাণ্ড সুবিধাই হইল। তাঁহার মেয়ে মিনতি সে বছর প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবে। শুধু বাড়ীতে থাকিয়া শোভা তাহাকে পড়াইবে ও নিজে পড়িবে। অধীর তাঁহার হাতে দিয়া মাহিনাস্বরূপ পঁচিশ টাকা করিয়া শোভাকে দিবে।—বেশ।

অনাথ বাবু অধীরের কথামত শোভার কাছে আসিয়া মিনতিকে পড়ান'র কথা প্রস্তাব করিলেন। শোভা ঈশ্বরকে শত ধন্যবাদ দিয়া চাকরী লইল।

দিন আসে যায়। মিনতিদের বাড়ীতে তাহার সবই ভাল লাগে। কিন্তু, তাহাদের সকলের মুখে অধীরের প্রশংসা যেন শোভার কেমন ঠেকে।

যাহাই হউক, শোভা পড়াইতে লাগিল।

দুই তিন মাসের মধ্যে অধীর অনাথ বাবুর সহিত দেখা করার ছলে কয়েকবার আসিয়াছে। শোভা তাহাকে দেখিয়া সরে চলিয়া গিয়াছে, কথা কহে নাই।

কলেজের গাড়ীতে শোভা যখন যাইত বা আসিত, অধীর দাঁড়াইয়া দেখিত। শোভা বিরক্তভাবে মুখ ফিরাইত।

সে দিন মিনতি 'দয়া' সম্বন্ধে রচনা লিখিতেছিল। শোভা বুঝাইয়া দিতেছিল—দয়া ঐশ্বরিক গুণ, দয়ালু লোক দেবতার সমান।

মিনতি বলিল, "তবে আপনি কেন অধীরদা'কে নীচ বলেন?"

ঘাড় নাড়িয়া শোভা বলিল, "দয়া নেই ব'লে।"

"অধীরদা'র দয়া নেই? ওঁর মতন দয়া কার? যে যখন কষ্টে পড়ে, বিপদে পড়ে, সে-ই ওঁর কাছে সাহায্য পায়।"

হাতের কলমটা মাথার চুলে নাড়িতে নাড়িতে শোভা বলিল, "বাজে কথা থাক্, যা লিখছ লেখ। টাকা আছে, কোন লোককে হয় ত বড়লোকরা সাহায্য করেছে। মান রাখবার জন্যে তাকে উনি দিয়েছেন, তাই দেখেছ। মিনতি, তাকে বলে নামের জন্যে দান, দয়া বলে না। কারুণ, সেটা প্রাণে দুঃখীর দুঃখ অনুভব ক'রে দেওয়া নয়, আমি—"

একটা কথা বলব? না—লিখি।"

"না, তর্ক করা ভাল, ভাববার কথা বলার ক্ষমতা বাড়ে, তাতে আমি রাগ করিনে।"

"না, আপনি রাগ করবেন বললে।"

"না না, করব না।"

ঘরের চারিদিকে, উঠিয়া গিয়া দোরের বাহিরে মিনতি দেখিয়া আসিল। নীচু গলায় বলিল, "একটা কথা যদি আপনাকে বলি, কারুকে বলবেন না, দিদি?"

শোভা ভাবিল, মিনতি অধীরকে ভালবাসে,—সেই কথা বলিবে। তাই কি সে সকল সময় অধীরের প্রশংসা করে!

মুখ দৃঢ় করিয়া সে বলিল, "বল, কারুকে বলব না।"

মিনতি আস্তে আস্তে বলিল, "নামের জন্যে অধীরদা' দান করে বলছেন, আপনার মাইনে যে বরাবর গোপনে দিচ্ছেন, তাতে কি ওঁর নাম হবে?"

শোভার মুখ সন্ধ্যার মত কাল হইয়া গেল।

কাঁচুমাচু হইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি বলছ, মিনতি? তোমার বাবা দেন না, উনি মাইনে দেন?"

মিনতি বলিল, "বাবা অত টাকা কোথায় পাবেন, দিদি? আপনার পিসীমা মারা যেতে অধীরদা'ই বাবাকে আপনাকে রাখতে বলেন—"

শোভা কথা কহিতে পারিল না।" তাহার লজ্জা ও ক্ষোভ হইল বোধ হয় যে, অধীরের দয়ার উপর সে জীবন ধারণ করিয়া আছে!

মিনতি তাহার অনুরোধে চলিয়া গেলে সে শুইয়া পড়িল। আলোটাও নিবাইতে পারিল না।

সে অতীতের কথা ভাবিতে লাগিল। ম্যাট্রিকুলেশন উত্তীর্ণ হইবার পর কলেজে পড়িবার কথায় পিসীমা বলিয়াছিলেন,—কলেজের খরচা এ ক'টাকায় হ'তেই পারে না, মা। তার পর অধীর বিকালে গল্প করিয়া গেলে পিসীমা বলিয়াছিলেন, ইচ্ছে যখন আছে পড়, চালাব এক রকম ক'রে। তবে কি অধীরই আগাগোড়া তাহার পড়িবার খরচ দিয়াছে?

শোভার চোখ জলে ভরিয়া উঠিল—অকারণে অপমানে অধীরদা ত বড় ব্যথা পাইয়াছে, ইহা সে বুঝিল।

কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মনে হইল, অধীরের সঙ্গে সে যে কথা কহে না, তাহার কারণ, পুরুষোচিত গুণ তাহার নাই। সত্যই যদি এ যাবৎ সে তাহার পড়াশুনার খরচ দিয়া থাকে, সে কি নিঃস্বার্থভাবে দিয়াছে? অধীর হয় ত তাহাকে ভালবাসে। তাহা হইলে ত এ দানে সদ্গুণের কোনও পরিচয় নাই!

ভাবিতে ভাবিতে অনেক রাত্রিতে শোভা ঘুমাইল। সকালে অনাথ বাবুকে সে বলিল, "দেখুন, কলেজে পড়ায় আমার বড় ক্ষতি হচ্ছে। শরীর খারাপ হয়, আর সময় বড্ড যায়। তার চেয়ে বাড়ীতে প'ড়ে শুনে আমি পরীক্ষা দেব ভাবছি। কাযেই টাকার আর আমার দরকার নেই ত। আমি আপনার মেয়ে, মাইনে আর আমায় দেবেন না।"

অধীর মাহিনা দেয়, এ কথা যে শোভা জানিয়াছে, অনাথ বাবু বুঝিতেই পারিলেন না। বলিলেন, "যা'তে তোমার ভাল হয়, তাই করবে, মা।"

অধীরকে অনাথ বাবু এ খবর দিলেন। সে এক আঁচড়েই সব বুঝিল।

শোভা মিনতিকে পড়ায়। অধীর আগের মত মাঝে মাঝে আসে। শোভা আর ভিতরে চলিয়া যায় না, হয় ত এক আধবার চোখোচোখি চাহিয়াও ফেলে, কিন্তু কথা কহে না।

বোধ হয় শোভার এ পরিবর্ত্তনের কারণ, যে এত দিন তাহাকে যে কারণেই হউক, সাহায্য করিয়া আসিয়াছে, তাহাকে ভক্তি না করিলেও, ভাল না বাসিলেও আর ঘৃণা করিবে না।

মিনতির বিদ্যালয় পূজার ছুটীতে বন্ধ হইল। অনাথ বাবুর শরীর খারাপ হইয়াছিল, সপরিবারে তিনি গিরিডিতে হাওয়া বদল করিতে গেলেন। শোভাও সঙ্গে সঙ্গে গেল।

ষ্টেশনের কাছাকাছিটা স্বাস্থ্যকরও নহে, লোকারণ্যও হইয়াছিল। অনাথ বাবু বারগণ্ডার এক নির্জ্জন প্রান্তে উস্রি নদীর তীরে ছোট একটি একতলা বাড়ী লইলেন।

শোভা ও মিনতি প্রত্যহ ভোরবেলা বেড়াইতে যায়। ছোট ছোট শাদা পাথর পথের বুকে বিছান। আশে-পাশে ছোট ক্ষেতগুলিতে ধানের শীষ দুলিতে থাকে। অদূরে দেহাতীর আড়ম্বরহীন কুঁড়ে কয়েকটি। তাহাদের আশে-পাশে বেঁটে বুনো গাছগুলি। পিছনে কুয়াসায় ঢাকা পাহাড়ের চূড়া, তরুণ অরুণের ফাগে আকাশের যেখানে রঙ ফলায়, সেখানে ছুঁইয়া থাকে। অতি মনোরম দৃশ্য!

মিনতি অধীরের আঁকা গিরিডির ছবির কথা বলিত।

শোভা যখন মিনতির সঙ্গে চলিয়া যায়, অধীর ঠিক করিয়াছিল, সে আগ্রা যাইবে। গিরিডিতে সে কিছুতেই যাইবে না। কারণ, দেখায়ও খারাপ, শোভাও হয় ত তাহাকে অত্যন্ত হীন ভাবিবে।

কয়েক দিনের মধ্যে কিন্তু অধীর অধীরই হইয়া পড়িল। বিদেশে শোভা কাহার সহিত বেশী মেশামেশি করে, কিরূপে থাকে—অধীর আপনাকে সংবরণ করিতে পারিল না।

আগ্রার বদলে গিরিডিই হইল তাহার গন্তব্য। তবে অনাথ বাবুর বাড়ীতে সে উঠিল না, কিছু দূরে ছোট একখানি বাড়ী ভাড়া করিল।

দ্বিপ্রহরে অধীর অনাথ বাবুর বাড়ী আসিল। মিনতির ও অনাথ বাবুর কি আনন্দ! শোভা কিন্তু তাহার দিকে তাকাইলও না, বিরক্তি প্রকাশ করিল।

অধীর আর আসিবে না ভাবিয়াও আসিত। শোভা গুম্ হইয়া থাকিত। তাহাদের মধ্যে এই অসদ্ভাব দেখিয়া মিনতির মুখেও যেন কথা ফুরাইয়া যাইত। তাহারা নিরানন্দ হয় বুঝিয়া অধীর কিছুক্ষণের মধ্যেই উঠিয়া যাইত।

তার পর শোভার সহিত অধীরকে লইয়া মিনতির তক দিন এইভাবেই কাটিতেছিল।

বসুমতী প্রেস]　　আয় চাঁদ আয় !　　[শিল্পী—বি, সিংহ ।

সে দিন বেলা-শেষে দূরে পাহাড়ের পিছনে সূর্য্য নামিয়া গিয়াছে। পাহাড়ের চূড়া ও তাহার মাথায় এক খণ্ড মেঘ রবি-রশ্মির বিদায়-স্পর্শে আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। গাছ-পালার মাথায় মাথায় সন্ধ্যা নামিতেছে।

নদীর ধারে অধীর বিভোর হইয়া বসিয়াছিল। শোভা ও মিনতি বেড়াইয়া ফিরিতেছিল, সে জানিতেও পারে নাই।

মিনতি ডাকিল, "অধীরদা, ফিরবেন না?"

অধীর একটু অপ্রস্তুতভাবে বলিল, "হাঁ, তোমরা এগোও।"

কিছু দূর অগ্রসর হইয়া মিনতি ওপারের দিকে দেখাইয়া কহিল, "উঃ! ওখানটা ধোঁয়ায় ঢেকে গেছে দেখ, দিদি!"

শোভা কোন উত্তর দিল না, চলিতে লাগিল।

ওপারের ধোঁয়া-ঢাকা যায়গাটির সম্মুখে আসিয়া মিনতি শোভার হাত ধরিয়া তাহাকে টানিয়া থামাইল। বলিল, "দিদি, কান্না ও চীৎকার শোনা যাচ্ছে না?"

শোভা কি যেন অন্যমনে ভাবিতেছিল। খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল, "মিনতি, কোন্ কুঁড়েতে আগুন লেগেছে! আহা, কার সর্ব্বনাশ হ'ল!"

মিনতি চীৎকার করিয়া উঠিল, "অধীরদা, অধীরদা!"

পাঁচ ছয় রশি পশ্চাতে অধীর ধীরে ধীরে আসিতেছিল। মিনতির চীৎকারে, তাহাদের কোন বিপদ হইয়াছে ভাবিয়া সে ছুটিয়া আসিল।

ব্যথা-ভরা স্বরে মিনতি বলিল, "কোন্ দুঃখীর ঘর পুড়ছে, অধীরদা! এই অন্ধকারে তুমিই বা—"

তাহার কথা শেষ হইবার আগেই অধীর জুতা ও আলোয়ান ছাড়িয়া নদীর জলে নামিয়া পড়িল।

কাছে গিয়া সে দেখিল, "দুইখানি কুঁড়ে ছাই হইয়া গিয়াছে, তৃতীয়খানি পুড়িতেছে। দেহাতী নরনারী, ছেলে-মেয়ে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতেছে, কাঁদিতেছে। দুই চারি জন বালতি করিয়া জল আনিয়া নিবাইবার চেষ্টা করিতেছে। আশে-পাশের কুঁড়ের লোকরা হুড়াহুড়ি করিয়া ভাঙ্গা টিনের বাক্স, ছেঁড়া মাদুর-বালিস যাহা পারে, বাহির করিতেছে।

এপার হইতে ধোঁয়া ও আগুন ছাড়া শোভাদের কিছু দেখিবার উপায় ছিল না।

মিনতি বলিল, "দিদি, অধীরদা সাধারণ মানুষের অনেক উঁচুতে।"

শোভা নীরব রহিল।

অধীর বুঝিল, জল দিয়া আগুন নিবান সম্ভব নহে। অথচ না নিবাইলেও কয়েক মিনিটের মধ্যেই কুঁড়েগুলি পুড়িয়া যাইবে।

গায়ের জামাটা ছিঁড়িয়া অধীর দুই হাতে জড়াইল। জ্বলন্ত চালার এক কোণ ধরিয়া প্রাণপণে টানিতে লাগিল।

আগুন-হাওয়ার হল্‌কায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঝল্‌সাইয়া গেল, অধীর কিন্তু হাল ছাড়িল না।

তিন চার মিনিট পরে চালাখানি হুড়মুড় করিয়া নীচে আসিয়া পড়িল।

অধীরের বুক ও হাত জ্বলিয়া যাইতেছিল।

বাড়ীর পথে অধীর অসহ্য জ্বালায় মাঝে মাঝে ভুল করিয়া 'উহু' বলিয়া ফেলিতেছিল।

মিনতি তাহার শতমুখে প্রশংসা করিতেছিল। শোভা এক একবার অধীরের দিকে দেখিতেছিল, কথা কহে নাই।

মিনতির অনুরোধে অধীর তাহাদের বাড়ীতেই গেল।

আলোকের সম্মুখে আসিয়াই মিনতি চীৎকার করিয়া উঠিল, "কি সর্ব্বনাশ! ফোস্‌কায় ভ'রে গেছে বুক-হাত। দিদি, বাবাকে ডাক, বাবাকে ডাক!"

পথেই শোভার বুক অধীরের প্রতি শ্রদ্ধায় ভরিয়া গিয়াছিল। কিন্তু, কথা কহিবার সাহস তাহার কুলায় নাই। তাড়াতাড়ি একটা মলম তৈয়ারী করিয়া সে অধীরের কাছে আসিয়া বসিল।

মিনতি ও সে দুই জনে ফোস্‌কায় মলম লাগাইতে লাগিল।

অনাথ বাবু কাণ্ড শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন।

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বাতাস করাতে অধীর ঘুমাইল।

শোভা ও মিনতির ঘুম আসিল না।

বিছানায় শুইয়া মিনতি জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি, অধীর-দা'র মানুষের উপযুক্ত কোন গুণ নেই—কেমন?"

শোভার ধারণা প্রকৃতই বদলাইয়াছিল। কিন্তু এ যাবৎ সে যে এত বড় ভুল করিয়াছে, এটুকু স্বীকার করিতে তাহার বড় লজ্জা হইল।

সে উত্তর দিল, "আমাদের কাছে বাহাদুরী নেবার জন্যে এটা করেছে, এটুকু বুঝতে পারলে না, বোকা মেয়ে?"

মিনতির বড় রাগ হইল। সে বলিল, "আপনার সব গুণ আছে, আর অধীরদার কোন গুণ নেই,—তা' হলেই হ'ল ত?"

শোভা হাসিয়া বলিল, "রাত শেষ হয়, ঘুমিয়ে পড়।"

কয়েক দিন গেল।

অধীরকে দেখিয়া শোভা আর বিরক্ত হয় না। সস্নেহ-দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকেও তাকায়, কিন্তু এত দিনের আচরণের জন্য লজ্জায় কথা কহে না।

কলিকাতায় ফিরিবার সময় গাড়ীর মধ্যে অধীর আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। কথা কহিবার জন্যই বলিল, "বড় কষ্ট হচ্ছে, শোভা, না? তুমি ভাল ক'রে বস, আমি বাংসের ওপর বসছি।"

সকলের সাক্ষাতে হঠাৎ এইরূপ কথায় শোভার মুখ লাল হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে হইল—হাত-বুক পুড়াইয়া গরীবকে যে সে রক্ষা করিতে গিয়াছিল, সেটা হয় ত মহত্ত্বের জন্য প্রকৃতই নহে—হয় ত স্বার্থের জন্য, তাহার কাছে বড় হইবার আশায়।

অধীরের প্রতি যেটুকু শ্রদ্ধা তাহার ফিরিয়াছিল, তাহা হইতে খানিকটা আবার কমিয়া গেল।

শোভা মুখ ঘুরাইয়া বসিয়া রহিল। অধীর অত্যন্ত ব্যথিত হইল। ভাবিল, শোভার মন বদলাইয়াছে, তাহার এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল।

কলিকাতায় আসিয়া অধীর অনাথ বাবুর বাড়ী আসা কমাইয়া দিল। কংগ্রেসের কাযে মন দিল একটু বেশী। তবে আগের মতই যতদূর সম্ভব লোকচক্ষুর অন্তরালে সে কাম করিত। হয় ত নাম-প্রশংসার ভয়ে।

অধীরের সঙ্গে কথা কহিবার বাসনা রেলের এই ঘটনার জন্য রহিল না। তাহা হইলেও তাহাকে অশ্রদ্ধা করিবার ভাবটুকু শোভার আর ছিল না। বরং অধিক দিন না দেখিলে অধীরকে সে চেষ্টা করিয়াই দেখিত।

আইন-অমান্য ও অসহযোগ আন্দোলনে অধীর কলিকাতার এক জন পাণ্ডা হইয়া পড়িল। অনাথ বাবুর বাড়ীতে যাইবার সময় সে পাইতই না। অধীরদা' এত বড় এক জন কংগ্রেস-কর্ম্মী জানিয়া শোভা অবাক্ হইয়া গেল। তাহাকে দেখিতে পাওয়ার আশায় শোভা কত সময় জানালায় আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত।

অধীর সভায় সভায় বক্তৃতা দিয়া বেড়ায়। শোভা অসহযোগ-আন্দোলনের বিষয় জানিবার ছলে অধীরের কথা অনাথ বাবুকে মিনতিকে জিজ্ঞাসা করে।

এক দিন মিনতি খবরের কাগজখানি হাতে করিয়া আসিয়া বলিল, "দিদি, অধীরদা'কে বক্তৃতা দেওয়ার জন্যে ধ'রে নিয়ে গেছে।"

শোভার আনন্দের সীমা ছাপাইয়া গেল, ব্যথাও লাগিল খুব।

শোভার আর কিছুই ভাল লাগে না। মন-মরা হইয়া বসিয়া থাকে, ভাবে।

মিনতি এক দিন জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কি হয়েছে, দিদি?"

সে বলিল, "কেন জানি না, ভাল লাগে না।"

বিচারের সময় প্রতিদিন শোভা অধীরকে দেখিবার চেষ্টা করিত—ভিড়ে ফিরিয়া আসিত।

যখন রায় প্রকাশ হইল—তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ড, শোভা তখন অশ্রু সংবরণ করিতে পারিল না।

মিনতি চোখ মুছাইয়া দিয়া বলিল, "কাঁদছ কেন দিদি, এত লোকের মাঝখানে! এ কি দুঃখের কথা? এত গৌরব—"

শোভা বলিল, "না মিনতি, তা নয়। এই লোককে আমি অপদার্থ ভেবেছি! সত্যি, কত উঁচু অধীরদা!"

মিনতি হাসিয়া বলিল, "এ-ও বাহাদুরী নেবার জন্যে!"

পাষাণ-কারায় রুদ্ধ করিতে ব্যস্ত রাজশকট সম্মুখে গর্জ্জাইতেছিল।

চারিদিকে জনসমুদ্রে দেশের নেতা, কর্ম্মিবৃন্দ, ধনী, গরীব, নর-নারী সকলের অসম্ভব ভিড়। অধীরের গলায় জয়মাল্য পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছিল।

শোভা ও মিনতি অধীরের পদধূলি মাথায় দিল।

রাজশকটের গর্জ্জন ছাপাইয়া জনতা হাঁকিল—"বন্দে মাতরম্!"

অধীরকে উদরস্থ করিবার জন্য গাড়ী হাঁ করিল।

শোভার চোখ ছলছল্ করিয়া উঠিল।

অধীর প্রীতিস্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার শোভার দিকে চাহিয়া হাসিমুখে গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

শ্রীঅমরেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় (এম্-এ, বি-এল্)।

অশ্বারোহী সেনাদলে রেডিও বার্ত্তা

অশ্বারোহী সেনাদল এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইবার সময় যাহাতে রেডিও যন্ত্রযোগে সংবাদ আদান-প্রদান করিতে পারে, সে জন্য মার্কিণ সেনাবিভাগ উন্নততর ব্যবস্থা করিয়াছেন। অশ্বের পার্শ্বদেশে রেডিও যন্ত্র সন্নিবিষ্ট থাকে। অশ্ব যখন চলিতে থাকে, তখন রেডিও যন্ত্রে ক্রিয়া আরব্ধ হয়। অশ্বারোহী

চলমান অশ্বারোহী সেনাদলে রেডিও বার্ত্তা

একটি উচ্চ, লঘুভার দণ্ড ধরিয়া থাকে। সম্প্রতি মরুভূমি ও পার্ব্বত্য অঞ্চলে পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, এই উপায়ে বিনা তারের বার্ত্তা অশ্বারোহী সেনাদল পাইতে পারিবে।

বিজ্ঞানের বাহাদুরী

পেনসিলভানিয়া রেলপথের এঞ্জিনীয়ারগণ "ওয়েষ্টিং হাউস ইলেকট্রিক এণ্ড ম্যানুফ্যাকচারীং কোম্পানী" প্রভৃতির সহযোগিতায় নূতন ধরণের রেলগাড়ী ও রেলপথ নির্ম্মাণ করিতেছেন। একটিমাত্র রেল-লাইন শূন্যে অবস্থিত থাকিবে। সেই রেল-লাইনের সহিত গাড়ীর উপরিভাগে অবস্থিত চাকাগুলি সংলগ্ন হইবে। অবশ্য যাত্রিবহ গাড়ীগুলি তাহাতে ঝুলিতে থাকিবে। তার পর বৈদ্যুতিক শক্তিপ্রভাবে সমগ্র ট্রেণ দ্রুততরবেগে শূন্যপথে চলিতে থাকিবে। গাড়ীগুলির তলদেশ ভূমি হইতে ১৫ ফুট অথবা ততোধিক উচ্চে অবস্থিত হইবে। ষ্টেশনগুলিও অনুরূপ উচ্চস্থানে নির্ম্মিত হইবে। প্রদত্ত চিত্র হইতে পাঠকবর্গ বৈজ্ঞানিক জাতির এই অভিনব ব্যবস্থার কথা কতকটা
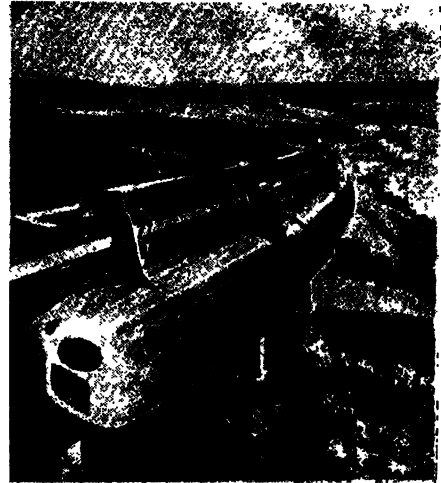
শূন্যপথে রেলগাড়ী

অনুমান করিতে পারিবেন। এইরূপ ট্রেণের গতিবেগ ঘণ্টায় ১ শত ৫০ মাইল হইবার সম্ভাবনা। নির্ম্মাণকার্য্য আরব্ধ হইয়াছে।

মার্কিণের ক্রীড়াসক্তি

দিবাভাগে মোটর-চালিত তরণীর সহিত ভাসমান ভেলাকে আবদ্ধ করিয়া ক্রীড়ায় আনন্দ উপভোগে আমেরিকাবাসীর আর স্পৃহা নাই। তাই রাত্রিভাগে এই বিপৎসঙ্কুল ক্রীড়ায় কালিফোর্ণিয়ার কোনও ক্রীড়া-রসিক আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। দ্রুতগামী কোনও মোটর-বোটের সহিত নিজের ভেলাটি একটি রজ্জুর সহিত সংলগ্ন করিয়া অন্ধকার রজনীতে তিনি সেই

রজ্জুর প্রান্তভাগ দন্ত সাহায্যে ধরিয়া রাখেন। তাঁহার দুই হাতে দুইটি প্রদীপ্ত মশাল জ্বলিতে থাকে। মোটর-বোট দ্রুত ধাবিত হইতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে তিনিও জলের উপর দিয়া

মার্কিণের বিচিত্র ক্রীড়ানুরাগ

দ্রুতবেগে চলিতে থাকেন। ইহাতে না কি তিনি প্রচণ্ড উল্লাস অনুভব করিয়া থাকেন।

জলমগ্ন বিমান রক্ষার পোত

যে সকল বিমান বিকল হইয়া সমুদ্রজলে নিক্ষিপ্ত হয়, তাহাদিগের উদ্ধারসাধনের জন্য মার্কিণ সমরবিভাগ এক জাতীয় পোত নির্ম্মাণ

জলমগ্ন বিমান রক্ষার পোত

করিয়াছেন। এই জলপোত, সংবাদ পাইবামাত্র দ্রুতগতিতে বিপন্ন বিমানের সন্নিহিত হইয়া, হয় তাহাকে পোতের ডেকে তুলিয়া লয়, নয় ত তাহাকে পোতের সহিত শৃঙ্খলিত করিয়া লইয়া আসে।

প্রাকৃতিক গোলক

উটায় কতকগুলি পাথরের বল বা গোলক আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রকৃতি যেন ক্রীড়াচ্ছলে উক্ত গোলাকার পদার্থগুলি নির্ম্মাণ করি-

প্রাকৃতিক পাথরের গোলক

য়াছে। এই বলগুলি সম্পূর্ণ গোলাকার এবং অত্যন্ত দৃঢ়। কোন কোন গোলকের ব্যাস দুই বা তিন ফুট। স্থানীয় লোকরা ইহাদিগকে "গোলিয়ার গল্‌ফ বল" বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। কিরূপে ইহার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা বৈজ্ঞানিকগণ গবেষণা করিতেছেন।

আরোহিবর্জ্জিত ঘোড়ার দৌড়

মেক্সিকোতে ঘোড়দৌড়ের অশ্বগুলিকে বিনা আরোহীতে দৌড়

আরোহিশূন্য ঘোড়ার দৌড়

করাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অশ্বদিগকে এমন ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে যে, তাহারা স্বয়ং দৌড়ের বাজিতে জয়লাভ করিতে পারে। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, শিক্ষিত অশ্বগণ দৌড়ের বাজিতে এমন কৌশল প্রদর্শন করে যে, তাহাতে দর্শকগণ প্রকৃতই কৌতুক অনুভব করিবে

গগনপ্রসারী সমুজ্জ্বল আলোকস্তম্ভ

হনোলুলুর ফোর্ট স্তাফটারএ অনেকগুলি আলোকরেখার সাহায্যে এক বিচিত্র ও প্রদীপ্ত রশ্মিজালের পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। ২৪টি শক্তিশালী "সার্চ লাইট"এর আলোকধারার সমন্বয়ে এমন

গগনপ্রসারী আলোকস্তম্ভ

আলোকস্তম্ভ গগনপথে উত্থিত হইয়াছিল যে, বহুদূর পর্য্যন্ত দিবালোকের মত প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। বিমানগুলি আকাশপথে আত্মগোপনের চেষ্টা করিয়াও আলোকস্তম্ভের সীমা অতিক্রম করিতে পারে নাই। ১৫ হাজার ফুট উর্দ্ধেও তাহার কিরণরাশি সমুত্থিত হইয়াছিল।

দর্দ্দুর-ক্রীড়া

যাহাদের জীবনে সখ আছে, অর্থ ও অবসর প্রচুর, তাহারা নানাবিধ জীবজন্তু লইয়া ক্রীড়া করিয়া থাকে। মোরগের লড়াই, বিভিন্ন পক্ষীর দ্বৈরথযুদ্ধ প্রভৃতি ক্রীড়া সৌখীন ভারতীয়রাও করিত। প্রতীচ্যদেশে এ সব ত আছেই, তাহা ছাড়া কূর্ম্মের প্রতিযোগিতা, ভেকের লম্প প্রভৃতি ক্রীড়ায় বহু নরনারী প্রতিযোগিতা করিয়া থাকে। কালিফোর্ণিয়ার কালাভেরাস্ অঞ্চলে প্রদর্শনীক্ষেত্রে ১ শত ৫০ জন প্রতিযোগী স্ব স্ব ভেক লইয়া সমবেত হইয়াছিলেন। লম্ফপ্রদানে যাঁহার ভেক জয়লাভ করিবে, সম্মান তাঁহারই। বিভিন্ন স্থান হইতে বহু দর্শক এই ক্রীড়ায় যোগদান করিয়া থাকে। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে যাঁহার ভেক জয়লাভ করিয়াছিল, এবার তাঁহারই পালিত ভেকপ্রবর জয়মাল্য লাভ করিয়াছে। লম্ফপ্রদানে ভেকটি ১১ ফুট ৫ ইঞ্চি দীর্ঘ স্থান উত্তীর্ণ হইয়াছিল। দ্বিতীয় স্থান যে ভেকটি গ্রহণ করিয়াছিল, সে প্রথমের অপেক্ষা ৪ ইঞ্চি পশ্চাতে পড়িয়াছিল।
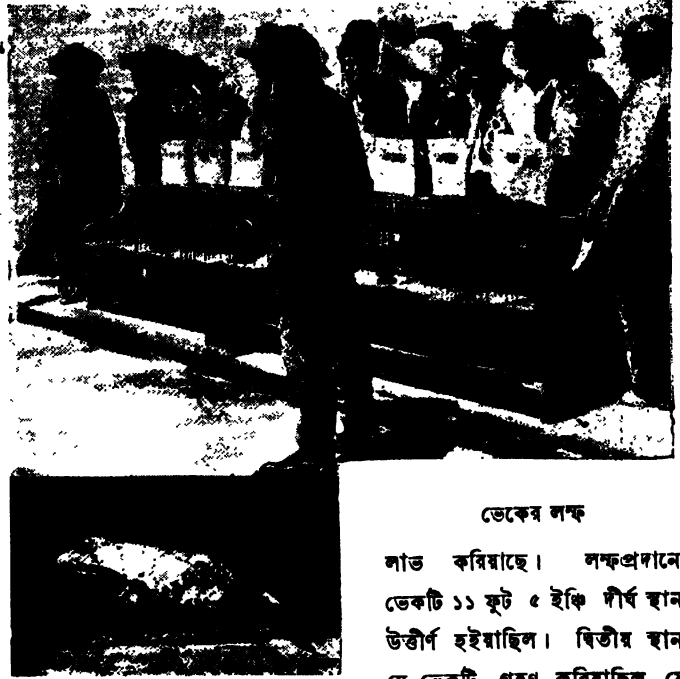
ভেকের লম্ফ

লোষ্ট্রপাত

ওহিও অঞ্চলে শিলাবৃষ্টির পর দেখা যায়, আকাশ হইতে লোষ্ট্র নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। উহাদের আকার গোলাকার মার্ব্বেলের মত। দেহ মসৃণ এবং দৃঢ়। কোন কোন লোষ্ট্র এমন দৃঢ় যে, হীরার ন্যায় কাচ পর্য্যন্ত কাটা যায়। বৈজ্ঞানিকগণ
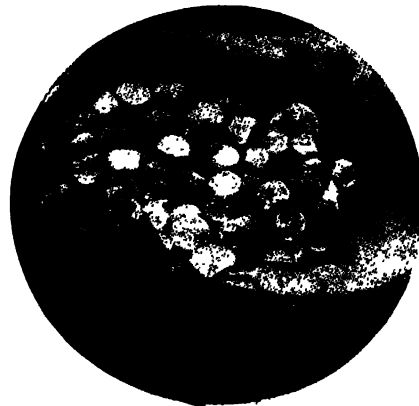
আকাশ হইতে লোষ্ট্রবৃষ্টি

এই ব্যাপার দর্শনে বিস্মিত হইয়া, ইহাদের স্বরূপ অবগত হইবার জন্য বিশেষরূপে গবেষণা করিতেছেন; কিন্তু তাঁহাদের ইষ্টসিদ্ধি আজিও হয় নাই।

অশ্বারোহী সেনার নদীপারের ব্যবস্থা

মার্কিণ যুক্তরাজ্যের সেনাবিভাগ ভাসমান ভেলার সহিত মোটর-বোট সংযুক্ত করিয়া তাহার উপর কামান ও অশ্বারোহী সেনাদল পারাপারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। গাঢ় ধূম্র-যবনিকা সৃষ্টি করিয়া তাহার অন্তরালে ভাসমান ভেলায় কামান ও অশ্বারোহী

অল্পসময়ে নদীপারে সেনাসমাবেশের ব্যবস্থা

সেনাদলকে অপরপারে লইয়া যাইবার প্রদর্শনী ফোর্ট হয়েল্ নামক স্থানে নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। যদি সেতু নির্ম্মাণ করিয়া এই সেনাদলকে পরপারে লইয়া যাইতে হইত, তাহা হইলে যে সময় লাগিত, সেই সময়ের অনেক পূর্ব্বে বিরাট বাহিনীকে এই উপায়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে কেন্দ্রীভূত করা যায়।

আক্রমণ-প্রতিরোধের নূতন ব্যবস্থা

সম্প্রতি জাপান তাহার সেনাদলকে আধুনিক সকলপ্রকার সরঞ্জামের সাহায্যে সুসংস্কৃত করিয়া লইতেছে। লাউড স্পীকারের আকারবিশিষ্ট শৃঙ্গাকৃতি যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া স্থানে স্থানে রক্ষিত হয়। বিমানপথে কোনও শত্রুপোত জাপান অভিমুখে অগ্রসর হইলে এই সকল যন্ত্রের সাহায্যে তাহাদের আগমন-সংবাদ বিঘোষিত

আক্রমণ-প্রতিরোধের নূতন ব্যবস্থা

হয়। এই সকল যন্ত্র চারিচক্রবিশিষ্ট আধারের উপর সংস্থাপিত থাকে। সুতরাং সহজেই তাহাদিগকে স্থানান্তরিত করার সুবিধা।

দীর্ঘাকার হাউণ্ড কুকুর

কালিফোর্ণিয়ার কোনও ভদ্রলোকের একটি ক্রীড়াসঙ্গী কুকুর আছে। এই সারমেয়টি যখন পশ্চাতের চরণের উপর ভর দিয়া দাঁড়ায়, তখন তাহার দৈর্ঘ্য ৭ ফুট ৯ ইঞ্চি হয়। কুকুরটি আইরিশ

দীর্ঘাকার হাউণ্ড কুকুর

"উল্ফহাউণ্ড" জাতীয়। ইহার শরীরের ওজন প্রায় ২ মণ ৬ সে[র।] ভদ্রলোকের বালিকা কন্যা ইহার পৃষ্ঠদেশে আরোহণ করিয়া বে[ড়ায়।]

এক জন বৈজ্ঞানিক

ইলেকট্রণ আবিষ্কারের পর হইতে পদার্থ-বিজ্ঞানে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ব্বে আলোক সম্বন্ধে ম্যাক্সওয়েলের যে মতবাদ প্রচলিত ছিল, ইলেকট্রণ আবিষ্কারের পর তাহা অচল হইয়া পড়িল। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক লোরেঞ্জ ইলেকট্রণ মতবাদ প্রচার করিলেন। তাহার পর প্ল্যাঙ্ক কোয়ান্টাম মতবাদ দ্বারা আলোকের নূতন রকম ব্যাখ্যা দিলেন এবং তাহার পর আরও অনেক নূতন মত বাহির হইয়াছে। এই সমস্ত মতের মূলে রহিয়াছে পদার্থের অবিভাজ্য বস্তুকণা ইলেকট্রণ। স্যার জে, জে, টমসন এই ইলেকট্রণের আবিষ্কর্ত্তা। কিন্তু তাঁহার ২৫ বৎসর পূর্ব্বে এক জন বৈজ্ঞানিক এই ইলেকট্রণের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নাম স্যার উইলিয়ম্ ক্রুকস্।

১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুন তারিখে লণ্ডন সহরে উইলিয়ম্ ক্রুকসের জন্ম হয়। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার সমস্ত বিষয়ে গভীরভাবে জানিবার ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল ছিল। যতক্ষণ কোন বিষয় সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে না পারিতেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে সম্বন্ধে তাঁহার অনুসন্ধানের অন্ত থাকিত না। ১০ বৎসর বয়সে তিনি একটি ক্ষুদ্র রসায়নাগার খুলিয়া বসিলেন এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি লইয়া সেখানে কায করিতেন। ইহাতে তাঁহার অত্যন্ত উৎসাহ ছিল। তাঁহার পিতামাতা রহস্য করিয়া তাঁহার গবেষণার নাম দিয়াছিলেন, "glory hole", কিন্তু তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, আজ এই "glory hole"এ বসিয়া যে বালকটি তাহার যন্ত্রপাতি লইয়া খেলা করিতেছে, তাহার ভিতর এমন প্রতিভা দেখা যাইতেছে—যাহাতে সে কালে দেশবিদেশে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া যাইবে।

১৬ বৎসর বয়সে তিনি লণ্ডনে Royal College of Chemistryতে পড়িতে যান। ডন্ হফ্ম্যান্ তখন এই কলেজের অধ্যাপক ছিলেন এবং ক্রুকস্ ইহার নিকট শিক্ষা পাইতে লাগিলেন। তখনকার দিনে কোন স্থানে ভাল রসায়নাগার ছিল না এবং যাঁহারা রসায়ন লইয়া গবেষণা করিতেন, কেহই তাঁহাদিগকে বিশেষ শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিত না। হফ্ম্যান্ অনেক চেষ্টায় এক দল রসায়নবিদ্ তৈয়ারী করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে রসায়নের যে উন্নতি হইয়াছে, এজন্য সমস্ত জগৎ হফ্ম্যানের নিকট ঋণী।

ক্রুকস্ এইখানে অত্যন্ত অধ্যবসায়ের সঙ্গে পড়াশুনা করিতেন। অধ্যয়ন শেষ হইলে তিনি ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ২২ বৎসর বয়সে অক্সফোর্ডে মেটিরিওলজি বিভাগে সুপারিন্টেন্ডেণ্ট নিযুক্ত হইলেন। কিছু দিন তিনি এখানে চাকরী করিলেন, কিন্তু এ কায তাঁহার ভাল না লাগায় তিনি পদত্যাগ করেন এবং চেষ্টারে অতি অল্প বেতনে একটি রাসায়নিকের পদগ্রহণ করিলেন। তিনি এখানে নানারকম গবেষণা আরম্ভ করিলেন। এই পদটিতে বেতন কম হইলেও তাঁহার আনন্দ কম ছিল না। এইখানে তিনি "Chemistry News" নামক একখানি পত্রিকা প্রকাশ করিলেন এবং ৫০ বৎসর ধরিয়া এই পত্রিকার সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। ইহার পর "Quarterly Journal of Science" নামক আর একখানি পত্রিকারও তিনি সম্পাদকতা করেন। এইখানে থাকিতেই একটি কাযে তিনি বিশ্বখ্যাত হইয়া পড়িলেন।

মেণ্ডেলিফ্ পিরিয়ডিক্ টেবল (periodic table) তৈয়ারী করেন। প্রত্যেক মৌলিক পদার্থের আণবিক ওজন (atomic weight) অনুসারে এই টেবল্‌টি গঠিত হইয়াছে। তাঁহার অনেক পরে মোজ্‌লী যখন আণবিক সংখ্যা (atomic number) বাহির করেন, তখন দেখা গেল যে, আণবিক সংখ্যা অনুসারে মৌলিক পদার্থ এই টেবল্‌এ ভাল সাজান যায় এবং বর্ত্তমানে আণবিক সংখ্যা অনুসারেই মৌলিক পদার্থ বসান হয়। মোজ্‌লী ২৬ বৎসর বয়সে গত মহাযুদ্ধে মারা যান—তাঁহার মৃত্যুতে বিজ্ঞানে যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। যাহা হউক, পিরিয়ডিক্ টেবল্ তৈয়ারী করায় মেণ্ডেলিফের যথেষ্ট কৃতিত্ব

আছে। পিরিয়ডিক্ টেবলে সমস্ত মৌলিক পদার্থের স্থান নির্দ্দেশ করা আছে; কিন্তু সমস্ত মৌলিক পদার্থ আজ পর্য্যন্তও আবিষ্কৃত হয় নাই। এই টেবল্এর ষষ্ঠ পিরিয়ডের তৃতীয় গ্রুপ্এ ১৩৮·৭ আণবিক ওজন হইতে ১৭৫ আণবিক ওজন পর্য্যন্ত যতগুলি মৌলিক পদার্থ আছে, সেগুলি 'rare earths" নামে পরিচিত। ইহাতে সর্ব্বশুদ্ধ ১৫টি মৌলিক পদার্থ আছে এবং ইহারই একটি ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ক্রুকস্ আবিষ্কার করেন। সাল্‌ফিউরিক্ অ্যাসিড্ প্রস্তুত হইবার পর যে অবশিষ্টাংশ পড়িয়া থাকে, তাহাই তিনি বর্ণবিশ্লেষক যন্ত্রে পরীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি লক্ষ্য করিলেন যে, বর্ণচ্ছত্রে একটি নূতন সবুজ রেখা দেখা যাইতেছে। প্রত্যেক মৌলিক পদার্থ নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বর্ণচ্ছত্র উৎপাদন করে—কাহারও বর্ণচ্ছত্রের সহিত কাহারও উৎপন্ন বর্ণচ্ছত্রের মিল হয় না। ক্রুকস্ এই নূতন রেখা দেখিয়া এই দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন এবং অল্প পরিশ্রমের পর তিনি "rare earths" এর একটি নূতন মৌলিক ধাতু আবিষ্কার করিলেন। তিনি এই ধাতুর নাম দিলেন thallium.

তিনি তখন thallium সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে গবেষণা আরম্ভ করিলেন। তিনি অনেক পরিমাণে thallium বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বাহির করিলেন এবং ইহার আণবিক ওজন প্রভৃতি স্থির করিলেন। তাঁহার গবেষণায় বৈশিষ্ট্য ছিল। যে বিষয়ে তিনি কায আরম্ভ করিতেন, তাহা সম্পূর্ণভাবে শেষ না করিয়া অন্য কাযে হাত দিতেন না। নিজের জীবনে তিনি একস্থানে লিখিয়াছেন,—

"To stop short in any research that bids fair to widen the gates of knowledge, to recoil from fear of difficulty or adverse criticism is to bring reproach upon science."

যখন তিনি thallium এর আণবিক ওজন স্থির করিতেছিলেন, তখন তিনি একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার লক্ষ্য করেন। তিনি বায়ুশূন্য পাত্রে একটি পদার্থ রাখিয়া তাহার ওজন ঠিক করিতেছিলেন। তখন দেখিলেন যে, পদার্থটির ঠাণ্ডা অবস্থায় যাহা ওজন, পদার্থটিকে উত্তপ্ত করিলে ওজন তাহা অপেক্ষা কম হয়। ইহাকে তিনি "repulsion from radiation" বলিয়া আখ্যা দিলেন এবং এই বিষয়ে কায করিতে যাইয়া একটি যন্ত্র তৈয়ারী করিলেন। ইহার নাম ক্রুকস্ রেডিওমিটর্।

একটি বায়ুশূন্য কাচের গ্লোবে চারিটি অভ্রের পাতলা পাখা চারিটি এলুমিনিয়ম তারের প্রান্তে আটকান আছে এবং চারিটি পাখা ইহার ভিতর স্বচ্ছন্দে ঘুরিতে পারে। প্রত্যেক পাখার একটি পার্শ্বে কাল রং করা হইয়াছে। কাল রংএর বিশেষত্ব এই যে, যদি কোন উত্তাপের ঢেউ ইহার উপর পড়ে, তাহা হইলে সেগুলি পাখার এই কাল পার্শ্ব সহজে ধরিয়া লয় এবং ফলে কাল পার্শ্ব অপর পার্শ্ব অপেক্ষা অধিকতর উত্তপ্ত হইয়া উঠে। কাল পাখার সংস্পর্শে গ্লোবের ভিতর যে অল্পপরিমাণ বাতাস থাকে, তাহাও উত্তপ্ত হইয়া উঠে। এই বাতাসের অণুপরমাণুগুলি পাখার উপর ধাক্কা দেয়; কিন্তু কালপার্শ্ব অপর পার্শ্ব হইতে বেশী উত্তপ্ত বলিয়া অণুপরমাণু বেশী পরিমাণে এই পার্শ্বের উপর পড়ে। ফলে এই পার্শ্বের উপর চাপও বেশী পড়ে, এবং পাখা চারিটি ঘুরিতে আরম্ভ করে। ক্রুকসএর এই যন্ত্রের পর আরও অনেকে নানা রকম যন্ত্র বাহির করিয়াছেন—যাহা দ্বারা অতি সামান্য পরিমাণ বাতাসের চাপ মাপিতে পারা যায়।

ইহার পর তিনি তাঁহার গবেষণার ধারা পরিবর্ত্তন করিলেন। তিনি একটি বায়ুশূন্য কাচের নলে দুই খণ্ড ধাতু প্রবেশ করাইয়া দিলেন। এই ধাতুর দুই প্রান্তে দুইটি তার সংযোগ করিয়া তিনি নলের ভিতর বিদ্যুৎ পরিচালনা করিলেন। প্রথমে কোন পরিবর্ত্তন বুঝা গেল না। সেই সময়ে কোন ভাল পাম্প ছিল না। ক্রুকস্ অল্প চেষ্টা করিয়া একটি পাম্প প্রস্তুত করিলেন। ইহাতে বাতাসের চাপের প্রায় দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ চাপ তৈয়ারী করা যাইত। ক্রুকস্ই সর্ব্বপ্রথম এত কম চাপ তৈয়ারী করিবার উপায় বাহির করেন। কিন্তু ইহাতেও তিনি সন্তুষ্ট হইলেন না। তখন আর এক উপায়ে তিনি সেই পূর্ব্বের পাম্পের আরও উন্নতি করিলেন। তাহাতে বায়ুর চাপের দু' কোটি ভাগের এক ভাগ চাপ তৈয়ারী করা যাইত।

এই পাম্প তিনি কাচের নলের সঙ্গে যোগ করিয়া, তাহার ভিতর হইতে বাতাস বাহির করিয়া ফেলিলেন এবং অতি বেশী চাপে (high volt) বিদ্যুৎ চালনা করিলেন। হঠাৎ সেই বায়ুশূন্য কাচের নল হইতে এক প্রকার গোলাপী আলো বাহির হইল এবং তিনি দেখিলেন যে, লক্ষ লক্ষ সূক্ষ্ম বস্তুকণার প্রবাহ একটি ধাতুখণ্ড হইতে অন্য ধাতুখণ্ডের দিকে চলিয়া যাইতেছে। পদার্থ কঠিন, তরল ও বায়বীয় এই তিন অবস্থায় থাকে। এই বস্তুকণাগুলিকে তিনি পদার্থের চতুর্থ অবস্থা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তিনি বলিলেন যে, এইগুলি—

"Ultragaseous and represents the border line between matter in its ordinary states and energy in the form of electricity."

এই সমস্ত বস্তুকণাই ইলেকট্রণ নামে পরিচিত। ২৫ বৎসর পরে স্যার জে, জে, টমসন্ ইহার ওজন এবং মিলিকান ইহার

বিদ্যুতের পরিমাণ বাহির করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, এইগুলিই পদার্থের অবিভাজ্য বস্তুকণা এবং সৃষ্টিস্থিতি-ব্যাপারে এই ইলেকট্রণের ক্ষমতা অসীম। কিন্তু ক্রুকস্‌ই ইলেকট্রণ আবিষ্কারের প্রথম পথ দেখান। বিদ্যুতের চাপ ক্রমশঃ বেশী করিলে একটি ধাতুখণ্ডের নিকটে একটা কালো ছায়া দেখা যায়। ক্রুকস্‌এর নামানুসারে ইহার নাম "Crooke's dark space" হইয়াছে।

স্যার জে, জে, টমসনের পর অধ্যাপক রঞ্জন এক্সরে আবিষ্কার করেন। এক্সরে আবিষ্কারের পর চিকিৎসা-জগতে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। পদার্থবিজ্ঞানেও সমস্ত বস্তুকে জানিবার এক্সরে একটি ভাল উপায়। এই আবিষ্কারের জন্য অধ্যাপক রঞ্জন নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন। কিন্তু ক্রুকস্ রঞ্জনের বহুপূর্ব্বে এক্সরে আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তিনি বায়ুশূন্য নলে বিদ্যুৎ চালনা করিয়া একটি ক্যামেরা ও লেন্সের সাহায্যে তাহা পরীক্ষা করিতেছিলেন। ক্যামেরা হইতে ফোটোগ্রাফের প্লেট খুলিয়া তাহা ডেভেলপ করিয়া দেখেন যে, তাহাতে একটি অস্পষ্ট ছবি পড়িয়াছে—যেন হাতের অঙ্গুলির একটি ছবি। তিনি প্লেট দূষিত মনে করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা ফিরাইয়া দেন। প্রকৃতপক্ষে তখন বায়ুশূন্য নলে এক্সরে উৎপন্ন হইয়া তাঁহার হাতের অঙ্গুলির ভিতর দিয়া ক্যামেরার ভিতর পড়ায় ঐ ছবি উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহাই এক্সরের প্রথম চিত্র। বর্ত্তমানে বেগুণাতীত রশ্মি দিয়া নানা রকম চিকিৎসা চলিতেছে। Finsen ইহার প্রবর্ত্তক। তিনিই প্রথম দেখান যে, নানা বর্ণের আলোক দ্বারা নানা রকম ব্যাধির চিকিৎসা চলে। এই জন্য তিনি নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত হন। Finsen-এর অনেক পূর্ব্বে ক্রুকস্ মানুষের শরীরের উপর আলোকের ক্রিয়া সম্বন্ধে নানা রকম গবেষণা করিয়াছিলেন।

সেই সময়ে আজকালকার মত কোন ইলেক্‌ট্রিক ল্যাম্প ছিল না। বৈদ্যুতিক আলো হিসাবে আর্ক লাইট (arch light) ব্যবহৃত হইত। ক্রুকস্ বায়ুশূন্য নলে বিদ্যুৎ চালনা করিয়া দেখেন যে, ইহা হইতে এক প্রকার রশ্মি নির্গত হয় এবং ইহাই প্রথম ইলেক্‌ট্রিক ল্যাম্প। ক্রুকস্‌এর পর তাঁহার পাম্প ব্যবহার করিয়া কয়েক প্রকার ইলেক্‌ট্রিক ল্যাম্প তৈয়ারী করা হইয়াছিল। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে উইলিয়ম ক্রুকস্ ফ্রেঞ্চ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া চার প্রকার ইলেক্‌ট্রিক ল্যাম্প পরীক্ষা করেন।

ক্রুকস্ "rare earths" সম্বন্ধে কায করিবার সময় জড়ের গঠন সম্বন্ধে একটি বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তাঁহার মত যে, বস্তুর একটি মূল প্রাথমিক অবস্থা থাকে। এই অবস্থায় বস্তু অতি সূক্ষ্ম অবস্থায় থাকে। এই সূক্ষ্ম বস্তুকণা লইয়া সমস্ত মৌলিক পদার্থ তৈয়ারী হইয়াছে এবং বস্তুকণার সংখ্যা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন মৌলিক পদার্থ উৎপন্ন হয়। ক্রুকস্ এই মূল বস্তুকণার নাম দিয়াছিলেন "protyle"। এই বস্তু কখনও বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকিতে পারে না। কোন কারণে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলে সেগুলি তৎক্ষণাৎ একত্র হইয়া মৌলিক পদার্থ গঠন করিবে। তাঁহার এই মতবাদের কিছু দিন পরে রেডিয়ম্ আবিষ্কৃত হইল। রেডিয়ম অতি আশ্চর্য্য ধাতু। ক্রুকস্ দেখিলেন যে, রেডিয়ম হইতে বস্তুকণা ক্রমাগত বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছুটিয়া বাহির হইতেছে এবং তৎক্ষণাৎ সেগুলি একত্র হইয়া হিলিয়ম্ গ্যাস তৈয়ারী করিতেছে। কাজেই ক্রুকস্‌এর Protyle মতবাদের এইরূপে পোষকতা হইল। বর্ত্তমানে অবশ্য তাঁহার এই মতবাদ অচল, কিন্তু "Protyle" মতবাদকে ইলেক্‌ট্রণ মতবাদের গোড়ার কথা বলা যাইতে পারে। বর্ত্তমানে জড়ের গঠনে প্রোটন অথবা ধনতাড়িৎকণা এবং ইলেক্‌ট্রণ বা ঋণতাড়িৎকণা উভয়কেই স্বীকার করিতে হয়। রেডিয়ম হইতে প্রোটন ও ইলেকট্রণ উভয় কণাই বাহির হয় এবং চারিটি প্রোটন ও চারিটি ইলেক্‌ট্রণের সংমিশ্রণে হিলিয়ম গ্যাস তৈয়ারী হয়। কোয়ানটম্ মতবাদের উপর ভিত্তি করিয়া অধ্যাপকপ্রবর প্রোটন ও ইলেক্‌ট্রণ দ্বারা হাইড্রোজেন পরমাণুর গঠন স্থির করিয়াছেন এবং দেখা গিয়াছে যে, পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানের সহিত এই গঠন বেশ মিলে।

অনেক বৈজ্ঞানিকের জীবনচরিত আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, পরিণত বয়সে তাঁহারা বিজ্ঞানের নিকট হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া প্রেততাত্ত্বিক হইয়া উঠেন। ক্রুকস্‌ও ইহাদের এক জন। তিনি প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করিয়াছিলেন এবং তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন যে, এ সম্বন্ধে যাহা হউক "একটা কিছু" আছে। তিনি "Researches in the phenomena of spiritual" নামক একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন।

রয়্যাল সোসাইটী হইতে তাঁহাকে রয়্যাল পদক, ডেভি-পদক ও কোপলী পদক দেওয়া হয় এবং ফ্রেঞ্চ একাডেমি হইতে তিনি একটি সুবর্ণ পদক প্রাপ্ত হন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ডায়মণ্ড জুবিলিতে—তাঁহাকে নাইটহুড় উপাধি দেওয়া হয়। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে তিনি বৃটনের সর্ব্বোচ্চ সম্মান "order of merit" প্রাপ্ত হন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়। বিজ্ঞানের দিক্ হইতে তিনি এত বড় কায করিয়া গিয়াছেন—যাহাতে সমস্ত বিজ্ঞানজগৎ যুগে যুগে তাঁহাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিবে।

শ্রীতারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (এম্, এস্-সি)।

পশুদিগের প্রণয়রীতি

পশুদিগের প্রণয়রীতির বিষয় আলোচনা করিতে যাইলে প্রথমেই সিংহের বিষয় উল্লেখ করা উচিত। সিংহের প্রণয়ের মধ্যে যে অনেক বিশেষত্ব আছে, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। জানুয়ারী মাসের শেষভাগ সিংহদের প্রণয়কাল। যৌনসমাগমকালে পল্বল বা নির্ঝরের সন্নিকটেই মৃগেন্দ্রের প্রণয়িনীলাভ ঘটিয়া থাকে। প্রণয়িনীকে লাভ করিবার পূর্ব্বে মৃগেন্দ্রকে প্রায়ই অপর প্রতিদ্বন্দ্বীদের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিয়া দৈহিক বলের বিশেষ পরিচয় দিতে হয়। সাধারণতঃ ঝর্ণার নিকট জলপান করিতে আসিয়াই সিংহের সহিত সিংহীর সাক্ষাৎ হইয়া থাকে। সে স্থলে একাধিক সিংহ বর্ত্তমান থাকিলেই ব্যাপার সঙ্গীন হইয়া উঠে। তখন প্রণয় ভুলিয়া উহারা প্রাণঘাতী যুদ্ধে নিরত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ তরুণ সিংহরাই প্রণয়-ব্যাপারে সিংহীকে অত্যন্ত বিব্রত করিয়া থাকে। এই কালে এক একটি সিংহীর সহিত প্রায়ই ৩।৪টি যবীয়ান্ সিংহকে চলিতে ফিরিতে দেখা যায়। ইহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য সিংহী বলিষ্ঠ ও পূর্ণবয়স্ক সিংহের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে এবং এরূপ কোনও সিংহ তাহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইলেই সে বয়ঃকনিষ্ঠ প্রণয়ীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া বয়স্ক কেশরীর সহিত মিলিত হইয়া থাকে। বয়স্ক কেশরী তরুণদিগকে যুদ্ধে নিরাকৃত করিয়া সিংহীর প্রণয়বাধা বিদূরিত করিয়া দেয়। সিংহরা যখন পত্নীলাভার্থে রণে ব্যাপৃত থাকে, সিংহী তখন নির্ব্বিকারচিত্তে অদূরে অবস্থান করিয়া প্রণয়িগণের সমররীতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকে। প্রণয়-প্রণোদিত এই সমর প্রায়শঃই ৮।১০টি সিংহের মধ্যে বাধিয়া থাকে। এই যুদ্ধে জয়ী সিংহই সিংহীর প্রণয়লাভে সমর্থ হইয়া থাকে। যুদ্ধাবসানের পর সিংহী সমর-বিজয়ী প্রণয়ীর ক্ষত লেহন করিয়া এবং রণশ্রান্ত সিংহ প্রণয়িনীর গাত্রের আঘ্রাণ লইয়া দাম্পত্যজীবনে প্রথম অনুরাগের সূচনা করিয়া থাকে।

যৌনসম্মিলনের পর পত্নীর প্রতি সিংহের প্রগাঢ় আসক্তি ও সেবা-যত্নের অনেক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রণয়িনীকে সঙ্গে না লইয়া সিংহ শিকারে বাহির হয় না। শিকারে গমন এবং শিকার হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে সিংহী অগ্রগামিনী হইয়া থাকে এবং তাহার অনুগমন করিয়া সিংহ পত্নীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। শিকারে গমন করিবার কালে সিংহদিগকে ঘন ঘন গর্জ্জন করিতে শুনা যায়। এই গর্জ্জন অনেক সময় প্রতি ১৫ মিনিট অন্তর গহন বনকে কম্পিত করিয়া তুলে এবং ইহার মধ্যেও এক অভিনব রীতি লক্ষিত হইয়া থাকে। সিংহী প্রথম গর্জ্জন না করিলে সিংহ গর্জ্জন করে না এবং স্ত্রীর ডাকে সাড়া দিয়াই কেশরী শিকারে অগ্রসর হইয়া থাকে। শিকারের সন্ধান পাইলে স্ত্রীকে শিকারশ্রম বহন করিতে না দিয়া সিংহ নিজেই ঝোপের মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে এবং কৃষ্ণসারাদিকে বধ করিয়া স্ত্রীর সমক্ষে উপস্থিত করে। নিহত প্রাণীর রক্ত-মাংসে স্ত্রীর ক্ষুধা পরিতৃপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত সিংহ আহারে বিরত থাকে। বনিতার আহার সমাপ্ত হইয়া যাইলে তাহারই ভক্ষ্যাবশেষে পশুরাজ উদরপূর্ত্তি করিয়া পশুপ্রণয়ের অদ্ভুত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া থাকে।

প্রণয়িনীর প্রতি সিংহের এতাদৃশ অনুরাগ থাকিলেও প্রণয়ীর প্রতি সিংহীর প্রণয়ে তাদৃশ আন্তরিকতা দেখা যায় না। পূর্ণবয়স্ক প্রণয়ীর সহিত প্রণয়কালেও দূরস্থিত অপর কোনও সিংহের গর্জ্জন শুনিলেই সিংহী চীৎকার করিয়া নিজের অস্তিত্ব জানাইয়া দেয় এবং প্রকারান্তরে তাহাকে আমন্ত্রণের আভাস দিয়া থাকে। এরূপ স্থলে অনেক সময়েই নবাগত সিংহের সহিত পূর্ব্ব-প্রণয়ীর যুদ্ধ বাধিয়া উভয়েরই জীবননাশ ঘটিয়া থাকে। ইহাতে কিন্তু সিংহী কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ না হইয়া মৃত সিংহদের অঙ্গের আঘ্রাণ লইয়া বরং তৃপ্তি অনুভব করিয়া থাকে। শীতের শেষভাগে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা, বিশেষতঃ অ্যালজিরিয়া প্রদেশই সিংহদের প্রণয়রীতি লক্ষ্য করিবার উৎকৃষ্ট স্থল।

যৌনসম্মিলনকালে মৃগকে আহ্বান করিবার নিমিত্ত মৃগী এক প্রকার অভিনব ভঙ্গীতে ডাকিতে থাকে। এই ডাকের মধ্যে প্রণয়-সঙ্কেত পাইয়াই মৃগ প্রিয়া-সকাশে ছুটিয়া আসে। কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকিলে সহজ মিলনের কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটে না। কিন্তু হরিণীর নিকট প্রণয়ীর আধিক্য ঘটিলেই পুরুষদের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়া যায়। এ যুদ্ধের প্রধান অস্ত্র উহাদের শৃঙ্গ ও খুর। শৃঙ্গাশৃঙ্গি করিয়াই উহারা প্রণয়-প্রণোদিত বিবাদের মীমাংসা করিয়া

লয়। মস্তকের শোভা-সম্পাদন যত হউক আর নাই হউক, প্রজননক্রিয়ার সহিত মৃগশৃঙ্গের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। বসন্তকালের প্রাক্কালেই শৃঙ্গের পরিপুষ্টি আরম্ভ হয় এবং যৌনসমাগমের সময় মৃগের বয়সানুযায়ী উহা পরিণতি লাভ করিয়া প্রেম-রণের প্রহরণস্বরূপ উহাদের মস্তকে বিরাজ করে। আবার যৌনসম্মিলন সমাপ্ত হইয়া যাইলেই উহা মৃগের মস্তক হইতে খসিয়া পড়ে। প্রতি বৎসর এই প্রকারে হরিণের মস্তকে নূতন নূতন শৃঙ্গের আবির্ভাব হইয়া থাকে। প্রণয়ব্যাপারে শৃঙ্গই মৃগের পরম অবলম্বন। যৌনসম্মিলন-কালে শৃঙ্গ ভাঙ্গিয়া বা নষ্ট করিয়া ফেলিলে বা কোনও কারণে সে সময়ে শৃঙ্গহীন হইয়া পড়িলে প্রণয়ব্যাপারে কুরঙ্গকে হতাশ হইতে হয়। শৃঙ্গের সহিত প্রজননব্যাপারের যে কত নিকট সম্পর্ক, তাহা কোনও মৃগকে নপুংসক করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। এরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত কুরঙ্গের প্রতি বৎসর শৃঙ্গপতন ও শৃঙ্গের পুনরাবির্ভাবব্যাপার বন্ধ হইয়া যায়। জননেন্দ্রিয়ের ক্ষেত্রে কোনও ক্রমে শুক্র আঘাতপ্রাপ্ত হইলে শৃঙ্গের বৃদ্ধি স্থগিত হইয়া যায়। ইহাতেই মনে হয়, সৌন্দর্য্য-সম্পাদন অপেক্ষা প্রণয়ব্যাপারের সহিতই মৃগের শৃঙ্গ ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট।

মৃগ-জাতির মধ্যে উত্তর আমেরিকার উত্তরভাগের মুস-মৃগ (moose) আকারে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। উত্তর-আমেরিকা ব্যতীত য়ুরোপের উত্তরভাগেও ইহারা বাস করে। তবে সেখানে ইহাদের সংখ্যা অল্প। য়ুরোপে এই মৃগের নাম এল্‌ক্ (Elk)। ইহাদের শৃঙ্গ অত্যন্ত বিস্তৃত। এই সুবৃহৎ শৃঙ্গের ওজন অল্পাধিক অর্দ্ধমণ। এই গুরুশৃঙ্গের এক আঘাতে অনুসরণকারী বৃকের প্রাণত্যাগ ঘটিয়াছে বলিয়া শুনা গিয়াছে। এই গুরুভার শৃঙ্গ বহন করিবার নিমিত্ত হস্তীর মস্তকের মত মুসের গ্রীবা অত্যন্ত স্থূল ও হ্রস্ব হইয়াছে। সে কারণে ইহারা অন্যান্য হরিণের মত যথেচ্ছ ঘাড় নামাইতে পারে না। গ্রীবার এই ত্রুটি সংশোধন করিবার উদ্দেশ্যেই ইহাদের উপরকার ওষ্ঠ জিরাফ ও উষ্ট্রের মত দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। উপরকার এই সুদীর্ঘ ওষ্ঠের দ্বারাই ইহারা আহার্য্য আকর্ষণ করিয়া থাকে। বল্গা হরিণের মত ইহারাও মেরুসন্নিহিত প্রদেশে বাস করিতে ভালবাসে। তথাকার অরণ্যের বার্চ্চ ও উইলো তরু ইহাদের প্রিয় খাদ্য। এই সকল তরু যথেচ্ছা ভক্ষণ করিয়া মুসরা সুমেরুবৃত্তস্থিত অরণ্যের যথেষ্ট ক্ষতি করে। ইহাদের স্বভাব খুব শান্ত। জননকাল ব্যতীত ইহারা একাকীই বিচরণ করিয়া থাকে। জননঋতুর সমাগমে ইহাদের ধীর প্রকৃতির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। স্ত্রীলাভের উদ্দেশ্যে তৎকালে ইহারা অপর পুরুষ-মুসদের সহিত খুর ও শৃঙ্গের সাহায্যে ভীষণ যুদ্ধ করিয়া থাকে। স্ত্রীর সহিত সম্মিলনের নিমিত্ত ইহারা তখন এতই অধীর হইয়া উঠে যে, সে সময় ইহাদের স্বর অনুকরণ করিলেই পুরুষ-মুসরা ছুটিয়া আসে। উত্তর-আমেরিকায় রেড-ইণ্ডিয়ানরা এই কালে বার্চবৃক্ষের 'ভেঁপুতে' ইহাদের ডাকের অনুকরণ করিয়া বহু মুসকে শিকার করিয়া থাকে। এই কৃত্রিম শব্দকে প্রতিদ্বন্দ্বীর স্বর মনে করিয়া এবং তাহাকে বিধ্বস্ত করিতে আসিয়াই মুসরা গুপ্ত ঘাতকের শরে প্রাণ হারাইয়া থাকে। এইরূপ শিকারের ফলে ইহাদের সংখ্যা আমেরিকার বাইসন ও দক্ষিণ-আফ্রিকার 'গ্নু'র মত হ্রাস হইয়া পড়ায় ইহাদের সংরক্ষণের নিমিত্ত আইন পাশ করা হইয়াছে। শীতকালে আমেরিকার মুসরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবারে আবদ্ধ হইয়া বাস করে। প্রতি পরিবারে একটি পুরুষ ও কয়েকটি স্ত্রী থাকিতে দেখা যায়। বরফের মধ্যে কতকটা স্থান খুরের দ্বারা পরিষ্কার করিয়া ইহারা তাহারই মধ্যে বাস করে।

মুস মৃগ যেমন আকারে বৃহৎ, এ দেশের কস্তুরী-মৃগের আকার সেইরূপ ক্ষুদ্র। মুসের মত কস্তুরী-মৃগের মধ্যেও প্রণয়রীতির বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায়। কস্তুরী-মৃগরা আকারে গ্রে-হাউণ্ডের মত। হিমালয় ও গিলগিট পর্ব্বতে এবং তিব্বত প্রভৃতি স্থানের পার্ব্বত্য প্রদেশে ৮ হাজার হইতে ১২ হাজার ফুট ঊর্দ্ধে ইহাদিগকে একাকী বিচরণ করিতে দেখা যায়। দিবাভাগে বনে লুক্কায়িত থাকিয়া রাত্রিকালে ইহারা বিচরণ করিতে বাহির হইয়া থাকে। যৌনসম্মিলনকাল ব্যতীত কস্তুরী-মৃগের সহিত মৃগীকে একত্র অবস্থান করিতে দেখা যায় না। ইহাদের মস্তকে অন্যান্য মৃগের মত শৃঙ্গের উদ্ভব হয় না। শৃঙ্গের পরিবর্ত্তে প্রণয়-রণের আয়ুধস্বরূপ ইহাদের উপর-চোয়ালের শ্বদন্ত দুইটি দীর্ঘাকারে বিলম্বিত হইয়া নীচের দিকে ঝুলিয়া পড়ে। কস্তুরী-মৃগের তলপেটে ক্ষুদ্র কমলালেবুর আকারের একটি থলি থাকে। যৌনসম্মিলন-কালে স্ত্রীকে আকৃষ্ট করিবার উদ্দেশ্যেই এই থলির মধ্যে মৃগনাভির উৎপত্তি হইয়া থাকে। সে সময় এক একটি

কস্তুরী-মৃগের উদরে প্রায় এক আউন্স পরিমাণ মৃগনাভি জন্মাইয়া থাকে, এবং ইহাদের অঙ্গ হইতে তৎকালে মৃগনাভির উগ্র গন্ধ চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। মৃগীরা বায়ুতে সে গন্ধের আঘ্রাণ লইয়া মৃগের সহিত সম্মিলিত হইয়া থাকে। মৃগীর উদরে কস্তুরীর উদ্ভব হয় না। মৃগীর নিকট প্রণয়ীর বাহুল্য ঘটিলেই যুদ্ধ বাধিয়া যায়। ঔষধে ভিষক্ মৃগনাভির যে গুণই বর্ণনা করুন না কেন, ইহা যৌন-সম্মিলনকালে প্রণয়িনীকে আকৃষ্ট করিবার উদ্দেশে কুরঙ্গের প্রসাধন-সামগ্রী ব্যতীত আর কিছুই নহে।

জনন-ঋতুতে হস্তীর কর্ণ ও চক্ষুর মধ্যস্থিত একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থি (gland) হইতে মদস্রাব হইয়া থাকে। মদস্রাবকালে এই গ্রন্থি স্ফীত হইয়া উঠে। এই স্রাবের বর্ণ পিঙ্গল এবং গন্ধ অনেকটা মৃগনাভির মত। হস্তীদিগের যৌবনারম্ভ হইতে অর্থাৎ পঞ্চবিংশ বৎসর বয়স হইতে এই স্রাবের ক্ষরণ হইয়া থাকে। হস্তিনীদের গণ্ডের উপরিভাগেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুইটি গ্রন্থিচ্ছিদ্র দেখিতে পাওয়া যায়। আলিপুর জীবনিবাসে যে দুইটি হস্তিনী আছে, তাহাদের উভয়েরই ললাটপার্শ্বে আমি মদস্রাবছিদ্র লক্ষ্য করিয়াছি। হস্তিনীদের এই গ্রন্থি হইতেও যৌনসম্মিলনকালে অল্পপরিমাণে স্রাব ক্ষরিত হইয়া থাকে।

মানুষে এই স্রাবের গন্ধ বিশেষ অনুভব করিতে না পারিলেও হস্তিনীরা তীক্ষ্ণ ঘ্রাণশক্তির দ্বারা ইহার আঘ্রাণ লইয়া করি-সমীপে উপস্থিত হইয়া থাকে। মদস্রাবী হস্তীর প্রকৃতি অত্যন্ত রুক্ষ। মদস্রাবকালে গৃহপালিত হস্তীকেও খুব সতর্কতার সহিত রক্ষা করিতে হয়। রেঙ্গুনের সুবৃহৎ কাষ্ঠশালা-সমূহের শ্রমিক হস্তিগণকে এই কালে স্বল্পাহার প্রদান করা হয় এবং উহাদিগের মনোভাব-পরিবর্ত্তনের উদ্দেশে কার্য্যের মাত্রা বর্দ্ধিত করা হইয়া থাকে। মদস্রাবকালে স্ত্রীর দর্শন সুলভ হইলেই ইহাদের স্বভাব শান্ত হইয়া পড়ে; নচেৎ উন্মত্তভাবে বনমধ্যে বিচরণ করিতে করিতে ইহারা যথেচ্ছাচারী হইয়া উঠে।

যৌনসম্মিলনকালে মাতঙ্গরা পরস্পর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। এই সংগ্রামে মৃগের শৃঙ্গের মত গজদন্তই ইহাদের প্রধান আয়ুধ। প্রণয়ক্ষেত্রে অনেক সময়েই দুর্ব্বল হস্তীরা প্রমত্ত করীর সুদীর্ঘ দন্তাঘাতে জীবনলীলা সংবরণ করিয়া প্রণয়-সমস্যার সমাধান করিয়া থাকে। আমি করি-সঙ্গমের একখানি মূল চিত্র দেখিয়াছি। গবাদি পশুদিগের রীতিতেই উহাদের সম্মিলনব্যাপার নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। যৌনসমাগমকালে হস্তিনীরা নিজ দেহ শীতল রাখিবার উদ্দেশে সর্ব্বদাই তদুপরি বারি ও ধূলি নিক্ষেপ করিয়া থাকে, প্রণয়কালে নিজ অঙ্গ হস্তীর দেহে ঘর্ষণ করিয়া হস্তিনীরা রতিক্রিয়ার সূচনা করিয়া থাকে। সঙ্গমসময়ে হস্তীরা শুণ্ড ও পুচ্ছ ক্রমাগত সঞ্চালন করে। হস্তীদের মধ্যে বহু দার-গ্রহণের রীতি দেখা যায়। নিবিড় অরণ্যে ইহাদের যে ক্ষুদ্র বৃহৎ দল দেখা যায়, তাহার মধ্যে স্ত্রীসংখ্যাই অধিক। অনেক সময়ে মাত্র একটি বলিষ্ঠ হস্তীই অরণ্যমধ্যে বহু হস্তিনীকে লইয়া বিচরণ করিয়া থাকে।

বানরদিগের মধ্যে বহুবিবাহের রীতি দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বানরদিগের যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে একটি করিয়া "বীর" থাকে। এই "বীর" বানরের বর্ণনা অনাবশ্যক। এই "বীরই" দলের মধ্যে একমাত্র পুরুষ এবং দলমধ্যস্থ অপরগুলি বানরী। ইহারা সকলেই "বীরের" আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া অবস্থান করে এবং এক একটি "বীর" বহু নারী-গোষ্ঠী লইয়া বনের মধ্যে সঞ্চরণ করিয়া থাকে। এক "বীরের" সহিত অপর "বীরের" সাক্ষাৎ ঘটিলেই সমর বাধিয়া যায়। "বীরদের" এই প্রকার যুদ্ধ পশ্চিমাঞ্চলে অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। সে যুদ্ধে যে দলের "বীর" পরাজিত হয়, সে দলের বানরীরা প্রায়ই বিজয়ী বীরের অধীনতা স্বীকার করিয়া তাহার পরিবারভুক্ত হইয়া পড়ে।

আফ্রিকার গরিলা ও শিম্পাঞ্জি এবং সুমাত্রা ও বোর্ণিও দ্বীপের ওরাং-উটান্ বা বনমানুষদের পারিবারিক ভাব সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এক পত্নীতেই ইহাদের আসক্তি দেখা যায় এবং তাহার রক্ষণাবেক্ষণেই ইহারা সচেষ্ট থাকে। পশ্চিম-আফ্রিকার গভীর বনে ইহারা নিজ নিজ স্ত্রী-পুত্র লইয়া স্বতন্ত্র বাস করিয়া থাকে। বিপদের সময় নিজ পরিবার-বর্গের রক্ষার নিমিত্ত আমরণ যুদ্ধ করে। গরিলারা বৃক্ষের উপর শাখা ও পত্র দ্বারা একপ্রকার "বাসা" নির্ম্মাণ করে। রাত্রিতে স্ত্রী ও সন্তানগণকে এই বাসায় উঠাইয়া দিয়া গরিলারা বৃক্ষমূলে শয়ন করিয়া থাকে। রাত্রিকালে স্ত্রী-পুত্রের আবাসতরুর মূলে গরিলাদের এইপ্রকার শয়নের রীতি দেখিয়া অনেকে অনুমান করিয়াছেন যে, পত্নী-পুত্রের রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যেই গরিলারা এই ভাবে পাহারা

দেয়। এ বিষয়ে আমার মনে হয়, গুরুভার দেহের নিমিত্তই পুরুষ গরিলারা বৃক্ষে আরোহণ না করিয়া তরুমূলে যামিনী যাপন করিয়া থাকে। এক একটি পুরুষ গরিলার ওজন ৫ মণেরও অধিক হইয়া থাকে। শিম্পাঞ্জিদিগের পারিবারিক রীতিও এই প্রকার। ওরাংউটানরা বৃক্ষের উপর এইরূপে পত্রাবাস নির্ম্মাণ করিয়া সপরিবারে তন্মধ্যে নিশাযাপন করিয়া থাকে। বোর্ণিও ও সুমাত্রা দ্বীপের অরণ্যে ভ্রমণ করিলে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষের উপর ওরাংদের যথেচ্ছাবিন্যস্ত বহু নীড় দেখিতে পাওয়া যায়। হর্ণাডে নামক এক জন আমেরিকাবাসী মিশনারী বোর্ণিও দ্বীপে ভ্রমণ করিবার কালে মাত্র এক দিনের ভ্রমণেই গাছের উপর ৪০টি বনমানুষের বাসা দেখিতে পাইয়াছিলেন। গরিলারা এক বাসায় একাধিক রাত্রি যাপন করে না, ওরাংরা কিন্তু একটি নীড়েই উপর্য্যুপরি কয়েক রজনী অতিবাহন করিয়া উহা পরিত্যাগ করে। গরিলা, শিম্পাঞ্জি ও ওরাংদের এই প্রকার পারিবারিক জীবন ও দৈনন্দিনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা লক্ষ্য করিলে উহাদের পত্নীপ্রেম ও সন্তান-স্নেহের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

আফ্রিকার বেবুনরা গরিলাদের মতই ভূমিতে বাস করে। অনুর্ব্বর পার্ব্বত্যভূমিই ইহাদের অভিমত স্থান। এই "কুকুরমুখো" বানরদিগের প্রণয় উল্লেখযোগ্য। এ দেশীয় কপিবর্গ হইতে ইহাদের অনেক বিশেষত্ব আছে। ফল-মূল হইতে কীট-পতঙ্গ, বৃশ্চিক ও সরীসৃপাদি ইহারা আহার করে। ইহাদের প্রকৃতি, বিশেষতঃ বয়স্ক বেবুনদিগের মেজাজ অত্যন্ত রুক্ষ ও ভীষণ। মাংসাশী পশুর সহিত শুধু যে ইহাদের প্রকৃতির অনেকটা সামঞ্জস্য আছে, তাহা নহে; মেরুদণ্ড, পাছা, হস্ত-পদের অস্থি সকলেরও অনেক সাদৃশ্য আছে। ইহাদের গলদেশে সিংহের মত কেশর থাকে এবং শ্বাদন্ত দুইটি দীর্ঘ হয়। এই শ্বাদন্তই উহাদের প্রণয়-সমরের তীক্ষ্ণ আয়ুধ। প্রণয়িনী-লাভের সময় যখন পুরুষ-বেবুনদের মধ্যে ভীষণ সমর বাধিয়া যায়, তখন উহাদের এই কেশরই প্রতিদ্বন্দ্বী বেবুনদের তীক্ষ্ণ দংশন হইতে উহাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকে।

বেবুন-শ্রেণীর অন্তর্গত ম্যানড্রিলদিগের বিষয়ই আমি এখানে উল্লেখ করিব। আলিপুরের পশুশালায় ড্রিল ও ম্যানড্রিল এই উভয়প্রকার বেবুনই রক্ষিত হইয়াছে। পশ্চিম-আফ্রিকার যে গভীর বনে গরিলা ও শিম্পাঞ্জির বাস, সেই নিবিড় অরণ্যেই বহু ম্যানড্রিল দেখিতে পাওয়া যায়। বানরদিগের মধ্যে দেখিতে কুৎসিত হইলেও ইহাদের অঙ্গসৌন্দর্য্য অতীব বিচিত্র। ম্যানড্রিলের নীল মুখ ও রক্ত-নিতম্বের শোভা দেখিলে গাজনের 'সং'এর কথাই মনে পড়ে। ড্রিলদের মুখ ও পাছার বর্ণ অপেক্ষাকৃত নিষ্প্রভ। ইহাদের এই বর্ণের একটু বিশেষত্ব আছে। মানসিক অবস্থানুযায়ী এই বর্ণ উজ্জ্বল বা নিষ্প্রভ হইয়া থাকে। কোনও প্রকারে উত্তেজিত হইলে ইহাদের নাসাগ্র ও পাছার রক্তিমতা অধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে এবং অসুস্থাবস্থায় উহা আবার মলিন হইয়া পড়ে। মৃত ম্যানড্রিলদের মুখে বা পাছায় বর্ণের কোন শোভাই দেখিতে পাওয়া যায় না। পাছা ও মুখের এই সৌন্দর্য্যই ম্যানড্রিলদিগের স্ত্রীনির্ব্বাচনের সহায়ক। স্ত্রী-দিগের নিতম্ব ও মুখের বর্ণ তত উজ্জ্বল বা মনোমদ নহে। পুরুষরা স্ত্রীসমক্ষে বদনসৌন্দর্য্য ও কটিশোভা সন্দর্শন করাইয়া তাহাদের মনোহরণ করিতে সচেষ্ট হইয়া থাকে। যে পুরুষের পাছার বর্ণ যত লাল, সেই পুরুষেরই তত নারীলাভের সম্ভাবনা। শৈশবকালে ম্যানড্রিলদের মুখের বর্ণ কাল থাকে। তিন বৎসর হইতে মুখের নীলিমা দেখা দিয়া থাকে এবং পাঁচ বৎসরের সময় ইহাদের অঙ্গশোভা পূর্ণ বিকাশলাভ করে।

গোজাতির প্রণয়রীতি সকলেরই বিদিত। বৃষ গাভীর গাত্র লেহন করিয়া, অঙ্গের আঘ্রাণ লইয়া অনুরাগ জ্ঞাপন করিয়া থাকে। আমি সম্প্রতি একটি বয়স্কা গাভীর প্রতি দুইটি তরুণ বৃষের প্রণয়রীতি লক্ষ্য করিয়াছিলাম। বৃষ দুইটি প্রায় সমবয়স্ক ছিল। প্রাপ্তবয়স্কা প্রণয়িনীকে মধ্যে রাখিয়া বৃষদ্বয় উহার গাত্র লেহনাদি আরম্ভ করিলে গাভীটিকে উভয় প্রণয়ীরই মন রক্ষা করিতে দেখা গিয়াছিল। গাভী প্রণয়ি-যুগলের প্রেমগ্রহণে কোনও কুণ্ঠা প্রকাশ না করিলেও বৃষরা কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই শৃঙ্গাশৃঙ্গি করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিচয় দিয়াছিল।

হস্তীর মত মেরু-সমুদ্রের শীলরাও যৌনসমাগমকালে বহু দারগ্রহণ করিয়া থাকে। শীলদের মধ্যে কর্ণযুক্ত ও কর্ণবিহীন এই দুই শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত বিপুলকায় ওয়ালরসকেও শীলমধ্যে গণনা করা হইয়া থাকে। কর্ণবিহীন বা আসল শীলের স্ত্রী-পুরুষদের আকৃতি প্রায়

একরূপ। জীবতত্ত্ববিদ্‌রা ইহাদিগকে একপত্নীক বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। সমুদ্রতীরে বা বরফের উপর সন্তান প্রসব করিলেও ইহারা স্থলে বহু দিন বাস করে না। স্থলোপরে ইহাদের চলিবার শক্তি অল্প বলিয়াই ইহারা বুকে হাঁটিয়া থাকে। কর্ণযুক্ত শীলকে সি-লায়ন বা সি-বেয়ার বলা হয়। কলিকাতার পশুশালায় কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একটি সি-লায়নকে (sea-lion) আনা হইয়াছিল। শীতপ্রধান দেশের জীব বলিয়া বোধ হয় উহাকে এখানে বহুদিন জীবিত রাখিতে পারা যায় নাই। সে সি-লায়নটির আকৃতি খুব বড় ছিল না।

সি-লায়নদের পুরুষরা স্ত্রী অপেক্ষা বৃহদাকার হইয়া থাকে। প্রজননকালে ইহারা স্থলের মধ্যে বহু দূরে চলিয়া যায় এবং সেখানে ৩।৪ মাস অবস্থান করে। স্থলের উপরে ইহারা একরূপ চলিতে পারে। যৌনসমাগমকালে ইহারা বহুদার গ্রহণ করিয়া থাকে। মে মাসের শেষভাগে পুরুষ সি-লায়নরা উত্তর-আর্টিক সমুদ্রের দ্বীপসমূহে একে একে উঠিতে আরম্ভ করে। সে সময়ে তীরভূমি বা তীরের সন্নিকটবর্ত্তী স্থান লইয়া পুরুষদের মধ্যে মহা যুদ্ধ বাধিয়া যায় এবং বলবান্ সি-লায়নরাই দুর্ব্বল পুরুষদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া দ্বীপের অগ্রভূমিগুলি অধিকার করিয়া লয়। প্রত্যেক পুরুষ সি-লায়ন নিজ ভাবী পরিবারের নিমিত্ত প্রায় এক শত বর্গফুট স্থান অধিকার করিয়া থাকে। জুন মাসের মাঝামাঝি স্ত্রীরা সিন্ধুগর্ভ হইতে উঠিতে আরম্ভ করে। সে সময়ে তাহাদিগকে সাদর অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত বেলাভূমিতে বলবান্ পুরুষ সি-লায়নদের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্য দেখা যায়। স্ত্রীরা একে একে উঠিতে আরম্ভ করিলেই পুরুষদের মধ্যে পুনরায় যুদ্ধের সাড়া পড়িয়া যায়। এক একটি স্ত্রীকে নিজ আশ্রয়ে লইবার জন্য পুরুষরা প্রাণঘাতী যুদ্ধে মত্ত হইয়া থাকে। আয়াসলব্ধ একটি স্ত্রী লাভ করিয়াই পুরুষ সি-লায়ন ক্ষান্ত হয় না। সমুদ্রগর্ভ হইতে আর একটি স্ত্রী উঠিলেই দ্বিতীয় পত্নীলাভের জন্য পুরুষ সি-লায়ন পুনর্ব্বার যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হয়। এই কালে সুযোগ বুঝিয়া পার্শ্ববর্ত্তী অপর কোনও পুরুষ প্রতিবেশী প্রথমা পত্নীকে বলপূর্ব্বক হরণ করিতে ছাড়ে না। এইপ্রকার বলপ্রয়োগের কালে স্ত্রীদের দেহ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেলেও তাহারা কোনরূপ বাধা দিতে চাহে না। পুরুষদের এইপ্রকার ধর্ষণ তাহারা নীরবে সহ্য করিয়া থাকে। এইরূপ যুদ্ধবিগ্রহ করিয়া দ্বীপের অগ্রভূমির প্রত্যেক পুরুষ নিজ আশ্রয়ে প্রায় দ্বাদশ হইতে পঞ্চদশটি স্ত্রীকে নিজ সংসারভুক্ত করিয়া লয়। সি-লায়নদের এক এক গৃহে এতগুলি পত্নী থাকিলেও উহাদের মধ্যে কোন বিবাদ-বিসম্বাদের ভাব লক্ষিত হয় না। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি উহারা সন্তান-সন্ততি সহ দ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে প্রত্যাবর্ত্তন করে। দ্বীপবাসকালীন সুদীর্ঘ মাসত্রয়ের উপবাসে উহাদের দেহ ক্ষীণ হইয়া পড়ে। তৎকালে গাত্রচর্ম্মের নিম্নস্থিত বসাই উহাদের শরীরের পোষণক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকে।

শ্রীঅশেষচন্দ্র বসু (বি, এ)।

অতিথি

ঘুরিতে ঘুরিতে বহুদিন পরে তোমারি দুয়ার-দেশে,
বন্ধু ! বন্ধু ! আবার আজিকে দাঁড়াইনু আমি এসে।
ঐ রবি ডোবে—বেলা নাই আর ;
খোল দ্বার—এনু অতিথি তোমার।
আমি যে ঢেকেছি মোর পরিচয় আমার মলিন বেশে !

সেবার যখন ফিরেছিনু, ওগো, ভেবেছিনু—সব ভার
ফুরাইয়া, ত্বরা আসিব ফিরিয়া, ফিরিতে হবে না আর।
কই হ'ল তাহা ?—ভাগ্য আমার !
মোর দিন গেল বহি' বহি' ভার।
আরো কতদিন বহিতে যে হবে, কে জানে—কহিবে কে সে ?

ক্লান্ত চরণ ভাঙিয়া পড়িছে,—নয়নে অন্ধকার,—
বধির বন্ধু ! আমি আসিয়াছি—একবার খোল' দ্বার।
বসিয়া তোমার প্রাসাদের কোণে
তোমারি দেওয়া প্রসাদ গ্রহণে
জুড়াইব ক্ষুধা,—আসিবে দু' আঁখি জড়িয়া তন্দ্রাবেশে।

শুধু বোল' দুটি সান্ত্বনা-বাণী, শুধু একবার হাসি'
নয়নের বারি মুছাইয়া, বোল'—"ওরে দীন, ভালোবাসি।"
প্রভাতে আবার উঠি পুনঃ হায়,
বাহিরিব কোন্ দূর-যাত্রায় ;
কে জানে কে ক'বে ফিরিব বা কবে—কবে—কতদিন-শেষে !

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী।

তিব্বতের বিভীষিকা

অষ্টম প্রবাহ

উদ্ধার

রাত্রিকাল। নৈশ-প্রকৃতি কুজ্ঝটিকা-সমাচ্ছন্ন; অন্ধকারে নদীর জল-রাশি দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না। বিভিন্ন জাতীয় তরণী নদীকূলে আবদ্ধ, নদীচর অপদেবতার ভয়ে প্রায় কোন নৌকা তখন নদীতে চলিতেছিল না; কেবল বহু দূরে একখানি নৌকা হইতে করতাল, দামামা প্রভৃতি নানা প্রকার বাদ্যধ্বনি শ্রবণগোচর হইতেছিল। সেই শব্দ শুনিয়া অন্যান্য নৌকার আরোহীরা বিস্মিত হইল না। তাহারা জানিত, নদীর অপদেবতাদিগকে দূরে তাড়াইবার জন্য কোন গুণীর নৌকায় ঐরূপ বাদ্যধ্বনি হইতেছে। সেই শব্দ ক্রমশঃ উচ্চতর হইয়া নদীর উভয় কূল, জল-স্থল প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। এক মাইল দূর হইতে সেই শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। যে নৌকায় এই সকল বাদ্য বাজিতেছিল, নদীর অপদেবতাদিগকে দূরে তাড়াইতে তাড়াইতে অবশেষে তাহা চিংকিয়াং প্রণালীতে প্রবেশোদ্যত হইল।

এই সময় করতাল ও সুবৃহৎ পিতলের ঘণ্টা আরও জোরে জোরে বাজিতে লাগিল। দামামা ও ঢক্কাধ্বনি আরও উচ্চতর হইল। মধ্যে মধ্যে দুম্‌দাম শব্দে 'বোম্' ফাটিতে লাগিল, এবং রাশি রাশি অগ্নিমুখ হাউই কুয়াসাচ্ছন্ন আকাশে উঠিয়া আলোকতরঙ্গ বিকাশ করিতে লাগিল। নৌকার আরোহীরা উচ্চৈঃস্বরে গান গাহিয়া ও মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া জলচর উপদেবতাগুলিকে দূরে তাড়াইতে লাগিল। এই শব্দ শুনিয়া সকলেই বুঝিতে পারিল, চিংকিয়াং প্রণালীতে কোন শববাহী জাহাজ প্রবেশ করায় ভূতের দৌরাত্ম্য নিবারণের জন্য ঐরূপ বাদ্যের আয়োজন করা হইয়াছে। চীনাম্যানরা সকলেই জানে, কোন শববাহী জাহাজ নদীপথে অগ্রসর হইলে নদীর অপদেবতারা চারিদিক্ হইতে সেই জাহাজের অনুসরণ করিতে থাকে, এবং বাজনা বাজাইয়া উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্র পড়িয়া তাহাদিগকে বিতাড়িত না করিলে তাহারা অন্যান্য নৌকার আরোহীদের প্রতি নানা ভাবে অত্যাচার করে, ঝড় তুলিয়া কোন কোন নৌকা ডুবাইয়া দিতেও কুণ্ঠিত হয় না।

শববাহী জাহাজ প্রণালীর মোহানায় প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই একখান সুদীর্ঘ উপান দূরে থাকিয়া তাহার অগ্রগামী হইল। তাহা সবেগে আসিয়া প্রণালীর মোহানার অদূরে এরূপ স্থানে অপেক্ষা করিতে লাগিল যে, শববাহী জাহাজকে প্রণালীতে প্রবেশ করিয়া সেই উপানের পাশ দিয়া যাইতেই হইবে।

সেই উপানে যে লোক ছিল, এতক্ষণ তাহা বুঝিবার উপায় ছিল না। তাহার মাঝি শুইয়া পড়িয়া হাল ধরিয়া ছিল, কিন্তু তাহার ছয় জন দাঁড়ি তৃণ-নির্ম্মিত ছৈএর অন্তরালে বসিয়া ছিল। তাহাদের সকলেই নিস্তব্ধ। অবশেষে উপানখানি নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলে দাঁড়িরা ছৈএর অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া দাঁড় ধরিল। উপানের দীর্ঘ খোলের ভিতর প্রায় এক শত লোক মাথা গুঁজিয়া গাদাগাদি হইয়া বসিয়া ছিল; তাহারা ধীরে ধীরে উপানের পাটাতনের উপর উঠিয়া আসিল। তাহাদের প্রত্যেকের হস্তে কোন না কোন রকম অস্ত্র ছিল। কাহারও হাতে ছোরা বা কিরীচ, কাহারও হাতে তরবারি এবং কাহারও হাতে বন্দুক। তাহাদিগকে দেখিলে কোন চীনা জাহাজের নাবিক বলিয়াই মনে হইত, তাহাদের আকৃতি অতি ভীষণ। তাহারা সকলেই মুসলমান।

শববাহী জাহাজখানি কয়েক মিনিট পরে সেই উপানের পাশ দিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইল। মুহূর্ত্তমধ্যে উপানখানি সেই জাহাজের পাশে ভিড়িল; সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের সেই পাশে ধূধূ করিয়া আলো জ্বলিয়া উঠিল। সেই আলোকে গাঢ় কুজ্ঝটিকা-স্তরও আলোকিত হইল। সেই আলোকে জলরাশিও যেন তরল অগ্নির আকার ধারণ করিল। জাহাজের নাবিকেরা জাহাজের পাশে হঠাৎ ধূ-ধূ করিয়া আগুন জ্বলিতে দেখিয়া আতঙ্কে অধীর হইল; তাহারা এই আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডের কারণ বুঝিতে পারিল না। সেই সময় দুইটি ভীষণ মূর্ত্তি হঠাৎ জাহাজের পাশে আসিয়া ভীত নাবিকদের মধ্যে লাফাইয়া পড়িয়া, অদ্ভুত চীৎকার করিতে করিতে প্রসারিত হস্তে নাচিতে লাগিল।

সেই মূর্ত্তিদ্বয়ের পরিচ্ছদ নীলবর্ণ, তাহা এরূপ ঢিলা যে, তাহা তাহাদের দেহের চারিদিকে লুটাইতেছিল, তাহাদের মুখে ভীষণাকৃতি মুখোস, মুখের নিম্নভাগ মানুষের মুখের মত, ঊর্দ্ধাংশ মকরের মুখের অনুরূপ। প্রত্যেক চীনা নাবিক জানে, এই দুইটি জলদৈত্য গভীর রাত্রিতে নদীবক্ষে বিচরণ করে, এবং কখন কখন জাহাজে উঠিয়া নাবিকগণের প্রাণসংহার করে। তাহাদের এক জনের নাম 'চো', দ্বিতীয়ের নাম 'সি'। তাহাদের আকার ও পরিচ্ছদ আগন্তুকদ্বয়েরই অনুরূপ। মৃতদেহবাহী জাহাজে তাহাদের আকস্মিক আবির্ভাবে জাহাজের নাবিকগুলা ভয়ে কাঁপিতে লাগিল, তাহাদের মূর্চ্ছার উপক্রম হইল। তাহারা জাহাজের চারিধার হইতে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে দোতলার ডেকে পলায়ন করিতে লাগিল। কিন্তু তথাপি তাহাদের নিস্তার নাই! ভীষণাকৃতি জলদৈত্যদ্বয় তাহাদিগকে তাড়া করিয়া চলিল, সেই সুযোগে উপানের আরোহীরা শববাহী জাহাজে উঠিয়া তাহাদের হাতের অস্ত্র আস্ফালিত করিতে করিতে ভৈরব-গর্জ্জনে নৃত্য করিতে লাগিল। জাহাজে যে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, সেই আগুনের আলোতে তাহাদের নানাবর্ণে রঞ্জিত নগ্নমূর্ত্তি অতি ভয়ানক দেখাইতে লাগিল, যেন তাহারা সেই জলদৈত্যদ্বয়ের অনুচর, হঠাৎ নদীগর্ভ হইতে উঠিয়া আসিয়াছে!

সহসা সেই জাহাজের সর্ব্বোচ্চ মঞ্চে কালো আলখেল্লা-মণ্ডিত একটি মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। জলদৈত্যবৎ যে দুইটি মুখোসধারী মূর্ত্তি কুজ্ঝাটিকা-সমাচ্ছন্ন নদীগর্ভ হইতে সেই জাহাজে উঠিয়া আসিয়া তাণ্ডব-নৃত্যে ও বীভৎস চীৎকারে জাহাজের নাবিকগুলাকে আতঙ্কবিহ্বল করিয়াছিল, তাহাদিগকে দেখিয়া মুখোসধারী মোহান্ত বিন্দুমাত্র ভীত বা বিচলিত হইল না। যে সকল ভয়বিহ্বল নাবিক জাহাজের চারিদিক হইতে পলায়ন করিয়া মোহান্তের অদূরে সমবেত হইয়াছিল, মোহান্ত তাহাদিগকে শান্ত ও সংযত করিবার জন্য হাত তুলিয়া তাহাদিগকে স্থির থাকিতে ইঙ্গিত করিল। কিন্তু মোহান্তের সেইরূপ নির্ব্বিকার ভাব দেখিয়া তাহারা আশ্বস্ত হইতে পারিল না, তাহারা বিহ্বলভাবে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল; তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ তখন থর-থর করিয়া কাঁপিতেছিল, ভয়ে তাহাদের চক্ষু কপালে উঠিয়াছিল। কুসংস্কারাচ্ছন্ন নির্ব্বোধ নাবিকদের অবস্থা দেখিয়া মোহান্ত তাহাদিগকে সংযত করিবার জন্য অনেক কথাই বলি, কিন্তু তাহার চেষ্টা সফল হইল না। এই সকল নাবিক বৌদ্ধমতাবলম্বী বা 'তাও'-সম্প্রদায়ভুক্ত হইলে মোহান্তের যুক্তি-তর্কে হয় ত শান্ত ও সংযত হইত, কিন্তু এই সকল নাবিক নিম্নশ্রেণীর মুসলমান, এ জন্য মোহান্তের যুক্তি-তর্কে তাহাদের হৃদয় হইতে জল-দানোর ভয় অন্তর্হিত হইল না। তাহাদের ধারণা হইল—তাহারা শববাহী জাহাজ পরিচালিত করায় জলদৈত্যেরা নদীগর্ভ হইতে উঠিয়া আসিয়া তাহাদিগকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছে।

ইত্যবসরে আততায়ীরা দুই দলে বিভক্ত হইযাছিল। এক দল ভীত নাবিকগণকে ভয়প্রদর্শন করিয়া জাহাজের দোতলার কেবিনে আটক করিয়া রাখিল, তাহাদিগকে কোন দিকে যাইতে দিল না; অন্য দল মশাল জ্বালিয়া সিঁড়ি দিয়া জাহাজের খোলের ভিতর নামিয়া গেল এবং কুঠারের সাহায্যে শবাধারগুলির আবরণ চূর্ণ করিয়া শব-দেহগুলি অনাবৃত করিতে লাগিল।

আততায়িগণের মধ্যে যাহারা শবাধারগুলি চূর্ণ করিতে-ছিল, তাহাদের মধ্যে এক জন দীর্ঘদেহ সারেঙ ছিল, তাহার মাথায় ব্যাণ্ডেজ; তাহার নয়নে প্রতিহিংসার অনল জ্বলিতে-ছিল। তাহার হস্তে দীর্ঘ তরবারি। যে কেহ তাহার কার্য্যে বাধা দিতে আসিত, সে সেই তরবারির এক আঘাতে তাহার মস্তক দেহচ্যুত করিতে পারিত।—সে তাহার হাতের তরবারি কোষবদ্ধ করিয়া কুঠারাঘাতে প্রত্যেক শবাধার উদ্ঘাটিত করিতে লাগিল, এবং তাহার পার্শ্ববর্ত্তী একটি কুলী-বালক মশালের আলোকে শবাধারস্থিত প্রত্যেক শবের মুখ পরীক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু কোন শবের মুখ পরিচিত বলিয়া তাহাদের মনে হইল না। অবশেষে সেই সারেঙ একটি বৃহৎ শবাধারের নিকট উপস্থিত হইয়া সেই শবাধারটির চারিদিকে অনেকগুলি গোলাকার ছিদ্র দেখিতে পাইল। এই শবাধারটি দেখিয়া সারেঙ উৎসাহে হুঙ্কার করিয়া উঠিল, এবং তাহার কুঠারের কয়েকটি আঘাতে সেই শবা-ধারের ডালার অর্দ্ধাংশ অপসারিত করিল। পূর্ব্বোক্ত কুলী-বালক মশালটি হাতে লইয়া, সারেঙের পাশে দাঁড়াইয়া সেই শবাধারের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল এবং মশালের আলোকের সাহায্যে শবাধারের অভ্যন্তরভাগ পরীক্ষা করিতে লাগিল। সে শবাধারের ভিতর শায়িত ব্যক্তির মুখ দেখিয়া চমকিয়া

উঠিল এবং করুণ স্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া শবাধারের পাশে বসিয়া পড়িল।

অতঃপর শবাধারের ডালা সম্পূর্ণরূপে অপসারিত করিয়া, সারেঙ ও সেই কুলী-বালক একটি 'জীবন্মৃত' কুলীর আড়ষ্ট দেহ শবাধারের ভিতর হইতে তাড়াতাড়ি বাহির করিয়া লইল। সারেঙের ইঙ্গিতে তাহার কয়েক জন অনুচর সেই সংজ্ঞাহীন দেহ জাহাজের খোল হইতে ডেকের উপর লইয়া চলিল, সারেঙ ও কুলী-বালক তাহাদের অনুসরণ করিল। সেই সময় মুখোসধারী মোহান্ত তাহার অনুচর-বর্গকে উত্তেজিত করিয়া তাহাদের সাহায্যে আততায়ীদিগকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু নাবিকরা প্রাণভয়ে তাহার আদেশ গ্রাহ্য করিতে সম্মত না হওয়ায় সে নাবিকদের মধ্যে লাফাইয়া পড়িয়া যাহাকে সম্মুখে পাইল, তাহাকেই চপেটাঘাত করিয়া শত্রুদের সহিত যুদ্ধ করিতে পাঠাইবার চেষ্টা করিল।

যে জীবন্মৃত কুলীকে শবাধার হইতে বাহির করা হইয়াছিল, তিনি মিঃ লক। সেই সময় লকের চেতনা বিলুপ্ত-প্রায়। কিন্তু জলদৈত্যের মুখোসধারী ব্যক্তিদ্বয়ের এক জন যথাসাধ্য চেষ্টায় তাঁহার চেতনাসঞ্চার করিয়া তাঁহার কাণে কাণে দুই একটি কথা বলিবামাত্র তিনি দাঁড়াইবার চেষ্টা করিলেন। তাঁহার উদ্ধারকারীরা তাঁহাকে লইয়া জাহাজের পার্শ্বস্থিত উপানে নিঃশব্দে নামিয়া গেল। কেহ কেহ নদীতে লাফাইয়া পড়িয়া সাঁতরাইয়া সেই উপানে উঠিল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই উপানখানি অন্ধকারে অদৃশ্য হইল। দুই তিন মিনিট পরে জাহাজ হইতে অগ্নির শত জিহ্বা ঊর্দ্ধাকাশে উঠিয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশ লোহিতালোকে উদ্ভাসিত করিল, দুই ঘণ্টার মধ্যে জঙ্কখানি সেই অগ্নিতে ভস্মীভূত হইল।

উপানখানি নিরাপদে সুচাও খালে প্রবেশ করিলে জলদৈত্যের মুখোসধারী নীল পরিচ্ছদমণ্ডিত এক জন লোক মুখোস খুলিয়া ফেলিলেন। সেই অন্ধকারে কেহ তাঁহাকে দেখিলে চিনিতে পারিত—তিনি সুইফ-সি! তিনি সোয়াতো সারেঙের সহিত মিলিয়া ছদ্মবেশে মিঃ লককে এইভাবে উদ্ধার করিয়াছিলেন। কুলী-বালকটি লকের সহকারী জ্যাক।

তাঁহাদের অনেক কথাই বলিবার ছিল, কিন্তু কেহই অধিক কথা বলিতে পারিলেন না। মিঃ লক দুই একটি কথাতেই বুঝিতে পারিলেন, সুইফ-সির চেষ্টা-যত্নে ও অদ্ভুত চক্রান্তে তাঁহার প্রাণরক্ষা হইয়াছে। সোয়াতো সারেঙকে দেখিয়া তিনি অনেক কথাই অনুমান করিতে পারিলেন; কিন্তু শববাহী জঙ্কখানি কি জন্য অগ্নিকাণ্ডে বিধ্বস্ত হইল, তাহা সুইফ-সিও বুঝিতে পারিলেন না; তিনি সেই জাহাজ হইতে লককে উদ্ধার করিবারই চেষ্টা করিয়াছিলেন, শববাহী জঙ্ক বিধ্বস্ত করিবার জন্য তিনি চেষ্টাও করেন নাই, তাঁহার সেরূপ ইচ্ছাও ছিল না। মিঃ লক চেতনা লাভ করিয়া যেরূপ বিচলিত হইয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া সুইফ-সির সন্দেহ হইয়াছিল, লক এই অগ্নিকাণ্ডের রহস্য অবগত আছেন; কিন্তু নিরাপদ স্থানে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে এ বিষয়ের আলোচনা করিতে তাঁহাদের প্রবৃত্তি হইল না।

তাঁহারা নিস্তব্ধভাবে উপানের ভিতর বসিয়া রহিলেন; উপানখানি সুদক্ষ দাঁড়ি ও মাঝি দ্বারা পরিচালিত হইয়া অবশেষে সুচাও খালের ভিতর প্রবেশ করিল। সেই খালের কিছু দূরে সুইফ-সির বাসভবন 'ধর্ম্মমন্দির' প্রতিষ্ঠিত ছিল। উপানখানি সেই মন্দিরের প্রান্তস্থিত উচ্চ প্রাচীরের পাশ দিয়া পাষাণবদ্ধ ঘাটের সোপানশ্রেণীর নীচে উপস্থিত হইল। এই মন্দিরের সম্মুখ হইতে সুচাও রোডের আরম্ভ, এবং তাহা সাংঘাই নগর পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল।

সোয়াতো সারেঙের মুসলমান অনুচররা উপান হইতে নিঃশব্দে বাঁধাঘাটে নামিয়া পড়িল, এবং অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হইল। সকলে প্রস্থান করিলে সুইফ-সি উপানের মাঝিকে নৌকার ভিতর ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি এই উপান লইয়া তাই-হু খালের ভিতর রাখিয়া আসিতে পারিবে?"

মাঝি বলিল, "হাঁ, হুজুর!"

সুইফ-সি বলিলেন, "তুমি এক জন দাঁড়িও সঙ্গে লইয়া যাও।"

মাঝি বলিল, "তাহাই করিব, হুজুর!"

সুইফ-সি বলিলেন, "বেশ, এ পথটুকু আমরা হাঁটিয়াই যাইব। আর এক কথা, কাঙ-উও কি বাহিরে অপেক্ষা করিতেছে?"

মাঝি বলিল, "হাঁ, হুজুর!"

সুইফ-সি বলিলেন, "উত্তম, তাহাকে বলিবে, সে যেন বাঁধের উপর আমার সঙ্গে দেখা করে। আর আমরা আজ রাত্রিতে এই উপানে কোথায় গিয়াছিলাম বা কি

করিয়াছিলাম, তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না, তোমার দলের লোকগুলিকেও তাহা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিবে। কোন লোক যেন এ সকল কথা জানিতে না পারে। জঙ্ক আগুন লাগিয়া পুড়িয়া গিয়াছে—এ কথা তোমাকে ভুলিয়া যাইতে হইবে।"

মাঝি বলিল, "এ বিষয়ে আমাকে কাণা ও বোবা মনে করিবেন হুজুর!"

স্নইফ-সি বলিলেন, "এখন তুমি যাইতে পার, পরে প্রয়োজন হইলে তোমাকে সংবাদ দিব।"

মাঝি প্রস্থান করিলে স্নইফ-সি লক ও জ্যাককে সঙ্গে লইয়া বাঁধা ঘাটের চাঁদনীতে উঠিলেন। সোয়াতো সারেঙ সেই স্থানে তাঁহাদের প্রতীক্ষা করিতেছিল। সে স্নইফ-সির আদেশে তাঁহাদের সঙ্গে সেই খালের বাঁধের উপর দিয়া চলিতে লাগিল। এই ভাবে তাঁহারা চারি জনে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া 'ধর্ম্মমন্দিরে'র বাগানে প্রবেশ করিলেন। সারেঙ সেই স্থান হইতে তাঁহাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল। স্নইফ-সি কিছু দূরে দেউড়ীতে একটি লণ্ঠন ঝুলিতে দেখিলেন, তাহার আলোকে চতুর্দ্দিক্‌স্থ কুজ্ঝাটিকার অন্ধকার যেন ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহারা নিঃশব্দপদসঞ্চারে সেই দেউড়ী অতিক্রম করিয়া একটি বারান্দায় উঠিলেন, বারান্দা হইতে তাঁহারা একতলার প্রশস্ত হলঘরে প্রবেশ করিলেন।

স্নইফ-সিকে দেখিয়া ভৃত্যরা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল। তিনি ভৃত্যদিগকে লকের জন্য পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য আনিতে আদেশ করিলেন। অতঃপর স্নইফ-সি তাঁহার ছদ্মবেশ ত্যাগ করিয়া ঢিলা পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন, এবং লককে সম্মুখে বসাইয়া পানাহারে পরিতৃপ্ত করিলেন। স্নইফ-সি তাঁহার চিরপ্রিয় অহিফেন-সংমিশ্রিত সিগারেটের ধূমপান করিতে লাগিলেন।

লকের আহার শেষ হইলে স্নইফ-সি তাঁহার পাশে বসিয়া বলিলেন, "তোমাকে যে আজ রাত্রিতে শবাধারের ভিতর জীবিত দেখিয়াছিলাম, ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। যদি তুমি শীঘ্র চেতনালাভ করিতে না পারিতে, তাহা হইলে আমরা কেহই এতক্ষণ জীবিত থাকিতাম না, আমাদের সকলকেই পরলোকের পথের পথিক হইতে হইত। কিন্তু ঐ দুর্ঘটনার কারণটা আমি বুঝিতে পারি নাই।"

মিঃ লক স্নইফ-সির মুখের দিকে চাহিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আমিও সেই শববাহী জাহাজের খোলে নীত হইবার পূর্ব্বে সেই জাহাজ-সংক্রান্ত গুপ্ত রহস্য ভেদ করিতে পারি নাই। আমি যে শীঘ্র চেতনা লাভ করিতে পারিয়াছিলাম, ইহা সত্যই আমাদের সৌভাগ্যের বিষয়। কারণ, আমি শবাধারে আবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে তাহাদের যে কয়েকটি কথা শুনিতে পাইয়াছিলাম, তাহাতেই আমি প্রকৃত রহস্যের সন্ধান পাইয়াছিলাম।

"আমাকে শবাধারের ভিতর শয়ন করাইয়া মুখোসধারী মোহান্ত তাহার এক জন প্রধান অনুচরের সহিত যে সকল কথার আলোচনা করিতেছিল, তাহা আমি শুনিতে পাইয়াছিলাম। সে সেই শবাধারবাহী জাহাজ, তাহার খোলের মাল প্রভৃতি সম্বন্ধে নানা কথা বলিয়া আজ রাত্রিতেই ইয়াংসি নদীর উজানে জাহাজ চালাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল। আমার সম্বন্ধে তাহারা নিম্নস্বরে যে সকল কথা বলিল, তাহা আমি শুনিতে পাই নাই। কিন্তু আমি তাহাদের অন্যান্য কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলাম, জাহাজে তাহারা যে সকল সামগ্রী বহন করিতেছিল, তন্মধ্যে কয়েকটি শবাধারে শব থাকিলেও অন্যান্য শবাধারগুলিতে মৃতদেহের চিহ্নমাত্র ছিল না।"

স্নইফ-সি সবিস্ময়ে বলিলেন, "মৃতদেহ ছিল না? তবে সেই শবাধারগুলি কি খালি ছিল?"

লক বলিলেন, "না, তাহাদের অধিকাংশের ভিতরেই গোলাগুলী, বন্দুক এবং প্রচুর পরিমাণে বারুদ ছিল।"

স্নইফ-সি বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! অগ্নিকাণ্ডের কারণ এখন বুঝিতে পারিতেছি; কিন্তু ঐ সকল সামগ্রী শববাহী জাহাজে শবাধারের ভিতর লুকাইয়া রাখিবার কি প্রয়োজন ছিল?"

লক বলিলেন, "তাহা কি আপনি বুঝিতে পারেন নাই? ঐ সকল যুদ্ধোপকরণ অন্য কোন জাহাজে নদীপথে প্রেরিত হইলে উহাদের শত্রুপক্ষ সেই জাহাজ আটক করিয়া তাহা খানাতল্লাস ও লুঠ করিতে পারিত; কিন্তু শবাধারবাহী জাহাজে শবাধারের ভিতর ঐ সকল সামগ্রী গোপনে প্রেরিত হওয়ায় চীনের কোন রাজনীতিক দল ঐ জাহাজ স্পর্শও করিত না, কেহ উহার গতিরোধ করিতেও সাহস করিত না। এমন কি, বোম্বেটেরাও শববাহী জাহাজের গতিরোধ

করা অধর্ম্মের কায বলিয়া মনে করে। গোলা, গুলী, বারুদ প্রভৃতি গোপনে ভিন্ন আড্ডায় পাঠাইবার এরূপ সুযোগ আর কি হইতে পারে? ঐ সকল সামগ্রী কোন্ দলের সাহায্যের জন্য প্রেরিত হইতেছিল, তাহা আমাদের জানিবার প্রয়োজন নাই। বর্ত্তমান সময়ে চীনদেশে যেরূপ অরাজকতা চলিতেছে, তাহাতে কে বিশ্বাসের পাত্র, আর কাহাকে অবিশ্বাস করিব, তাহা স্থির করা কঠিন। আজ যে শত্রু, কাল সে বন্ধু হইতে পারে। তাহাদের রাজনীতির সহিত আমাদের বর্ত্তমান কর্ত্তব্যের কোন সম্বন্ধ নাই। আমরা ভগবান্ বুদ্ধদেবের হিরণ্ময় গ্রন্থের উদ্ধার-চেষ্টায় বাহির হইয়াছি, সেই চেষ্টা সফল হইলেই আমরা নিশ্চিন্ত হইব।"

স্মিথ-সি বলিলেন, "তোমার কথা সত্য, লক! সেই হিরণ্ময় গ্রন্থের উদ্ধারসাধনই তোমার লক্ষ্য; কিন্তু সেই জঙ্কে গোপনে ও ছদ্মনামে কি মাল লইয়া যাওয়া হইতেছিল, তাহা যদি আমি পূর্ব্বে জানিতে পারিতাম! আমার ইচ্ছা ছিল—সেই জঙ্ক হইতে তোমাকেই মুক্তিদান করিয়া ক্ষান্ত হইব না; যে পর্য্যন্ত তোমার উদ্দেশ্যসিদ্ধি না হয়, সে পর্য্যন্ত সেই জঙ্কের প্রত্যেক নাবিককে কয়েদ করিব। কিন্তু আমাকে আর সে জন্য চেষ্টা করিতে হইল না, ভাগ্যদেবী সেই ভার আমাদের হস্ত হইতে স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছেন। হতভাগ্য নাবিকরা সেই জঙ্কে কি সামগ্রী বহন করিতেছিল, তাহা জানিত না, তাহারা ছিল তাহাদের মনিবের হাতের পুতুলমাত্র, বিনা দোষে তাহাদের সকলেরই প্রাণ গিয়াছে! তাহারা তোমার সম্বন্ধে আর কোন কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে পারিবে না, তাহাদের কণ্ঠ চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হইয়াছে।"

মিঃ লক দুই এক মিনিট চিন্তা করিয়া বলিলেন, "উঃ, কি ভীষণ অগ্নিকাণ্ড! জাহাজের খোলে যে সকল বারুদ লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল, তাহাতে আগুন লাগায় জাহাজের সকল অংশ একসঙ্গে জলিয়া উঠিয়াছিল, সুতরাং জাহাজের কোন লোকের প্রাণরক্ষা হইয়াছে, ইহা বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। তবে মুখোসধারী মোহান্তও সেই অগ্নিকাণ্ডে নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করিয়াছে কি না, তাহা অনুমান করা আমার অসাধ্য। আমরা জঙ্ক হইতে তাড়াতাড়ি আমাদের উপানে নামিয়া আসিবার পর জঙ্কের চারিদিকে যখন হু-হু শব্দে আগুন জলিয়া উঠিল, তখন আমি জাহাজের ডেকের দিকে চাহিয়া সেই ডেকের শেষপ্রান্তে যেন তাহার কালো আলখেল্লা উড়িতে দেখিয়াছিলাম। জাহাজের সর্ব্বোচ্চ অংশে সেই আগুন ছড়াইয়া পড়িবার দুই এক মিনিট পূর্ব্বেও যদি সে কোন কৌশলে জাহাজ ত্যাগ করিতে পারিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার প্রাণরক্ষা হইয়াছে সন্দেহ নাই। কারণ, জাহাজের অগ্নিরাশি ঊর্দ্ধেই লোল জিহ্বা প্রসারিত করিয়াছিল, সেই আগুন পার্শ্বে ছড়াইয়া পড়ে নাই, এ অবস্থায় সে তাড়াতাড়ি জাহাজের পাশ দিয়া কোন সাম্পানে নামিয়া আশ্রয় লইতে পারে নাই, এরূপ মনে হয় না।"

স্মিথ-সি গম্ভীরভাবে বলিলেন, "যদি সে কোন কৌশলে অগ্নিময় জাহাজ হইতে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের বিপদের আশঙ্কা পূর্ব্বের ন্যায় প্রবল থাকিবে। এই মোহান্তের জীবন যেন মন্ত্রবলে সুরক্ষিত বলিয়া মনে হয়; সহস্র বিপদেও মৃত্যুর ছায়া তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। সে কখন্ কোথায় উপস্থিত হয়, তাহা কেহই জানিতে পারে না, বায়ুর ন্যায় তাহার গতি অব্যাহত। আমি বহুবার তাহাকে ফাঁদে ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু সে অদ্ভুত কৌশলে সেই ফাঁদ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সকলের অজ্ঞাতসারে পলায়ন করিয়াছে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া তাহার অস্তিত্বেই আমার সন্দেহ হয়। মনে হয়, একাধিক ব্যক্তি তাহার ছদ্মবেশে নানা স্থানে বিচরণ করিতেছে!"

লক মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "কিন্তু তাহার অস্তিত্বে সন্দেহ করিবার কারণ নাই; আমি ও জ্যাক প্রত্যক্ষে তাহাকে দেখিয়াছি। শববাহী জাহাজের কেবিনে সে যখন আমার সম্মুখে আসিয়াছিল, তখন সে তাহার মস্তকাবরণ ও মুখোস খুলিয়া ফেলিয়াছিল। সেই সময় দেখিয়াছিলাম, তাহার মাথা ন্যাড়া; আমার তরবারির আঘাতে তাহার ললাটে যে ক্ষত হইয়াছিল, সেই ক্ষতচিহ্নটিও দেখিতে পাইয়াছিলাম। না, তাহার দেহ ছায়াময় নহে, তাহার দেহ আমাদের ন্যায় রক্তমাংসে গঠিত।"

স্মিথ-সি বলিলেন, "তুমি স্বয়ং যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছ, তাহা অবশ্যই অবিশ্বাস করিবার উপায় নাই।"

লক বলিলেন, "সে যাহাই হউক, আজ অবশিষ্ট রাত্রিটুকু এখানেই অতিবাহিত করা আমি সঙ্গত মনে করিতেছি না।

আমাদের সঙ্গে আপনার সংস্রব আছে, ইহা কাহাকেও জানিতে দিতে ইচ্ছা করি না। আপনার সঙ্গে আমাদের এখানে না আসাই উচিত ছিল। আমরা অবিলম্বে পুনর্ব্বার যাত্রা আরম্ভ করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছি। ইয়াংসি নদীর উজানে আমাদিগকে বহু দূর পর্য্যন্ত যাইতে হইবে। সবুজ ধান্যে যে স্থানের শস্যক্ষেত্র শ্যামায়মান, তাহাই আমাদের গন্তব্য স্থান। সেই স্থানে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে আমাদিগকে বহু বিপদ অতিক্রম করিতে হইবে। সুতরাং আমাদিগকে এখন সাংঘাইয়ের সহিত সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে হইবে। শববাহী জাহাজের শোচনীয় পরিণামের সংবাদ প্রচারিত হইবার পূর্ব্বেই আমাদিগকে চিংকিয়াং ও নান্‌কিন পার হইয়া যাইতে হইবে।"

সার গর্ডন দীর্ঘকাল মৌনভাবে বসিয়া রহিলেন, নানা চিন্তায় তাঁহার প্রশস্ত ললাট কুঞ্চিত হইল। মিঃ লক তাঁহাকে যে সকল কথা বলিলেন, তাহা যে সম্পূর্ণ সঙ্গত, ইহা তিনি অস্বীকার করিতে পারিলেন না। কিন্তু এই দুই জন ইংরাজ বহু দূরবর্ত্তী বিদেশে আসিয়া, উপযুক্ত অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত না হইয়া এবং আত্মরক্ষার কোন ব্যবস্থা না করিয়া সামান্য কুলীর ছদ্মবেশে কঠিন কার্য্য সংসাধনের জন্য বহু অজ্ঞাত বিপদরাশিকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইয়াছেন, অথচ দুর্গম বিদেশে তাঁহারা কাহারও সাহায্য লাভ করিতে পারিবেন না, এ কথা চিন্তা করিয়া তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইলেন। অধিক কি, তাঁহাদিগকে চিংকিয়াং ও নান্‌কিন পর্য্যন্ত যাইতে হইলেও নানাপ্রকার বিঘ্ন-বিপত্তির সম্মুখীন হইতে হইবে। তিনি সেই সকল স্থানে তাঁহাদের সঙ্গে থাকিলে তাঁহাদিগকে নানাভাবে সাহায্য করিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহাদের অনুসরণ করা তাঁহার অসাধ্য। তবে যে সকল স্থানে তাঁহার বন্ধুবান্ধব ছিলেন, তাঁহাদিগকে পত্র লিখিয়া সেই সকল স্থানে লককে যতটুকু সাহায্য করা যাইতে পারে, তাহাই করিবার সঙ্কল্প করিলেন।

কিছু কাল পরে সার গর্ডন তাঁহার এক জন অনুচরকে আহ্বান করিয়া সোয়াতো সারেঙকে তাঁহার নিকট উপস্থিত করিবার জন্য আদেশ করিলেন।

সোয়াতো সারেঙ তখন সেখানে ছিল না, সে পূর্ব্বেই তাহার আড্ডায় প্রস্থান করিয়াছিল, কিন্তু তাহার নিকট সংবাদ পাঠাইবামাত্র সে সার গর্ডনের সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া সার গর্ডন লককে বলিলেন, "তুমি বলিতেছিলে, আজ রাত্রে শববাহী জাহাজের ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছে, সেই সংবাদ চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইবার পূর্ব্বেই তুমি নান্‌কিনে উপস্থিত হইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছ। এই সারেঙ এ বিষয়ে তোমাকে সাহায্য করিবে। সারেঙ তোমার জন্য একখানি জঙ্ক স্থির করিয়া দিলে সেই জঙ্কে তুমি নান্‌কিন যাত্রা করিতে পারিবে। তোমাকে জাহাজের কুলী হইয়া যাইতে হইবে, এই জন্যই সারেঙের সহায়তা তোমার পক্ষে অপরিহার্য্য। জাহাজের কাপ্তেন তোমাকে কুলীগিরিতে ভর্ত্তি করিয়া লইবে; তোমার প্রকৃত পরিচয় সে জানিতে পারিবে না। ইহা ভিন্ন গোপনে নান্‌কিনে যাওয়া তোমার অসাধ্য হইবে; কিন্তু এই সুযোগ লাভ করিয়াও তুমি সেখানে নিরাপদে উপস্থিত হইতে পারিবে কি না, এ বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।"

লক বলিলেন, "কিন্তু বিপদের আশঙ্কায় ত নিরস্ত হইলে চলিবে না। আমি সকল বিপদকে আলিঙ্গন করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই এই দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছি। আপনার কৃপায় একবার মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধারলাভ করিলাম, এরূপ বিপদে কতবার পড়িতে হইবে ও তাহার কি ফল হইবে, পরমেশ্বর জানেন।"

সার গর্ডন বলিলেন, "তিনিই তোমাকে রক্ষা করিবেন; অবশিষ্ট রাত্রিটুকু এখানে বিশ্রাম করিয়া প্রত্যূষে সারেঙের সঙ্গে যাইও। বিদায় বন্ধু!"

নবম প্রবাহ

নান্‌কিং নগরে

উজ্জ্বল রবি-করোদ্ভাসিত নান্‌কিং নগরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে মনে হয়, রৌদ্রে চক্ষু জলিয়া গেল। নদীর উভয়-কূলে অসংখ্য জঙ্ক ও সাম্পান প্রভৃতি জলযান শ্রেণীবদ্ধভাবে বিরাজিত। স্থলে স্থানাভাব বশতঃ স্থানীয় অসংখ্য অধিবাসী এই সকল জলযানে সপরিবার বাস করিতেছে, যেন তাহাই তাহাদের বাসগৃহ। মধুমক্ষিকার দল যেমন প্রভাতে মধুচক্র ত্যাগ করিয়া মধু আহরণের চেষ্টায় চতুর্দ্দিকে ধাবিত হয়, সেইরূপ এই সকল জলযানবাসী চীনাম্যান তাহাদের ভাসমান বাসগৃহ ত্যাগ করিয়া দৈনন্দিন কার্য্যে যোগদানের জন্য চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইল।

নদীতীর হইতে একখানি বৃহৎ জঙ্ক দৃষ্টিগোচর হইল ; কিছু কাল পরে তাহা নদীতীরে আনিয়া নঙ্গর করিল। নদীতীরে কাষ্ঠনির্ম্মিত জেটী, জাহাজখানি ধীরে ধীরে সেই জেটীতে ভিড়িলে খালাসীর দল জাহাজের মালবহনকার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। নান্‌কিং বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র বলিয়া মালবাহী সকল জাহাজ হইতেই এখানে মাল নামাইবার ব্যবস্থা আছে।

জাহাজের খালাসীদের মধ্যে দুই জন খালাসী অন্যান্য খালাসীদের অপেক্ষা অধিকতর উৎসাহে মাল বহিতে লাগিল ; তাহারা জানিত, কায শেষ করিয়া দিতে পারিলেই তাহাদের ছুটী। তাহারা জাহাজ ত্যাগ করিবার জন্য অধীর হইয়াছিল। এই কুলীদ্বয়ের এক জন দীর্ঘদেহ, বলবান্, প্রৌঢ় ; দ্বিতীয় কুলী অপেক্ষাকৃত খর্ব্বকায় ও কৃশ, তরুণ যুবকমাত্র।

কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিয়া তাহারা কায শেষ করিল। কুলীদিগকে তাহাদের প্রাপ্য পারিশ্রমিক দেওয়া হইল। আমরা যে দুই জন কুলীর কথা বলিয়াছি, তাহারা উভয়ে তীরে নামিয়া আহার্য্যের সন্ধানে চলিল।

তাহারা কিছু দূরে আসিয়া একটি অপরিচ্ছন্ন ভোজনাগার দেখিতে পাইল। দীর্ঘদেহ প্রৌঢ় কুলী তাহাদের উভয়ের জন্য ভাত-তরকারী চাহিল।

এই দীর্ঘদেহ কুলীই যে ছদ্মবেশী ফেরার লক্, তাহা না বলিলেও চলিত। তিনি তাঁহার সহকারী জ্যাককে পাশে লইয়া আহার করিতে বসিলেন। তাঁহাদিগকে যে ভাত-তরকারী দেওয়া হইল, তাহা যেমন পরিমাণে অল্প, সেইরূপ অখাদ্য, কিন্তু কুলীর ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া তাহাই তাঁহাদিগকে গলাধঃকরণ করিতে হইল ; কুলীগিরি আরম্ভ করিয়া তাঁহারা ইহাতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং অসন্তোষ প্রকাশের কোন কারণ ছিল না। তিনি জানিতেন, কুলীরা এইরূপ ভোজ্যদ্রব্যেই অভ্যস্ত, এবং অনেকে এইরূপ অখাদ্য দ্রব্য পরম তৃপ্তির সহিত ভোজন করিয়া থাকে।

আহার করিতে করিতে মিঃ লক ভবিষ্যৎ কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে নান্‌কিংএ উপস্থিত হইতে পারিলেন বটে, কিন্তু অতঃপর তাঁহাদিগকে যে পথে অগ্রসর হইতে হইবে, তাহা কেবল দুর্গম নহে, অত্যন্ত বিপজ্জনক, এবং তাঁহাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত।

মিঃ লক কোন্ পথে কি ভাবে অগ্রসর হইবেন, তাহাই চিন্তা করিতেছিলেন, সেই সময় একটি বিশালকায় নিতান্ত সাধারণ পরিচ্ছদধারী চীনাম্যান সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া সেই ভোজনাগারের মালিককে তাহার জন্য খাদ্যসামগ্রী পরিবেষণ করিতে অনুরোধ করিল। তার পর সে অল্পদূরে বেতের চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

আগন্তুককে দেখিয়া মিঃ লক তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বিস্ময়ভরে অস্ফুট শব্দ করিলেন। তাঁহার মনে হইল, এই লোকটির সহায়তা লাভ করিতে পারিলে তাঁহার চেষ্টা সফল হইতেও পারে। তাহারই সহায়তা তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বাঞ্ছনীয় মনে করিলেন। কিন্তু কিরূপে তিনি সেই জোয়ানটার নিকট মনের কথা প্রকাশ করিবেন ?—'দেওয়ালেরও কাণ আছে' এ কথা চীনদেশ সম্বন্ধে যেরূপ খাটে, পৃথিবীর অন্য কোন দেশের দেওয়াল সেরূপ গৌরবের অধিকারী নহে।

মিঃ লক ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া সেই কক্ষের দেওয়ালে এক কোণে কয়েক টুক্‌রা পাতলা কাগজ ঝুলিতে দেখিলেন ; এতদ্ভিন্ন হোটেলওয়ালার দপ্তরে একটা চীনামাটীর দোয়াতে ঘন কালী এবং একটি তুলি দেখিতে পাইলেন ; সেই তুলিই চীনাম্যানরা লেখনীরূপে ব্যবহার করে।

মিঃ লক্ এক টুক্‌রা কাগজ সংগ্রহ করিয়া দোয়াতে সেই তুলিটা ডুবাইয়া কাগজখানিতে কয়েকটি কথা লিখিলেন ; এবং হোটেলওয়ালার পরিচারক আগন্তুকের জন্য খাদ্যসামগ্রী লইয়া আসিবার পূর্ব্বেই তিনি সেই কাগজখানি আগন্তুকের পদপ্রান্তে নিক্ষেপ করিলেন। জোয়ানটা মিঃ লকের মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ মুখভঙ্গী করিল, তাহার পর কাগজখানি পদপ্রান্ত হইতে তুলিয়া লইল।

জোয়ানটা কাগজখানি খুলিয়া পাঠ করিল, এবং ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া মুহূর্ত্তকাল কি চিন্তা করিল, তাহার পর সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া মিঃ লক্ ও তাঁহার সহকারীর সম্মুখে সরিয়া আসিল, এবং তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাঁহাদের উভয়ের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া গলা হইতে বাঘের গর্জ্জনের মত একটা শব্দ বাহির করিল। মিঃ লক বুঝিলেন, সেই সংক্ষিপ্ত শব্দটির অর্থ—"এসো।"

লক্ জ্যাককে ইঙ্গিত করিয়া সেই জোয়ানটার অনুসরণ করিলেন, জ্যাকও তাঁহার সঙ্গে চলিল। চীনাম্যানটা পথে

আসিয়া হঠাৎ ঘুরিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর মুখখান ভয়ঙ্কর গম্ভীর করিয়া, চক্ষু পাকাইয়া তাঁহাদের দুই জনকেই এরূপ ইতর ভাষায় গালি দিয়া উঠিল যে, মিঃ লক্ তাহার মতলব বুঝিতে না পারিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন, তাহার পর অন্য দিকে যাইতে উদ্যত হইলেন। তাহা দেখিয়া জোয়ানটা পুনর্ব্বার তাঁহাকে সরোষে গালি দিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘুরাইয়া বলিল, "এসো! জল্‌দি!"

মিঃ লক তাহার ব্যবহারে বিস্মিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন—কি রকম লোক এই চীনাম্যানটা?—যে মুখে গালি দিতেছে, সেই মুখে ডাকিতেছে!—সেই পথ দিয়া অনেক লোক যাতায়াত করিতেছিল; তাহারা দেখিল—দুই জন চীনা কুলী অপেক্ষাকৃত উচ্চতরস্তরের এক জন চীনা-ম্যানের গালি খাইতেছে; এই দৃশ্য এতই স্বাভাবিক ও সাধারণ যে, কোন পথিক তাহাদের দিকে ফিরিয়াও চাহিল না।

মিঃ লক ও তাঁহার অনুচর জ্যাক নানাপথে, এমন কি, অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ও নোংরা আঁকাবাঁকা গলির ভিতর দিয়াও সেই সচল মাংসপিণ্ডের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহারা ঘুরিতে ঘুরিতে নদীতীরের যে অংশে আসিয়া পড়িলেন, সেখানে বড় বড় গুদাম ও লম্বা লম্বা টিনের চালাঘর দেখিতে পাইলেন। জোয়ানটা চলিতে চলিতে একটা গুদামের আড়ালে গিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল, মিঃ লক তাহার মতলব বুঝিতে না পারিয়া তাহার ঠিক পশ্চাতে উপস্থিত হইলেন। সেই মুহূর্ত্তে সেই চীনাম্যানটা হঠাৎ ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া এক হাতে লকের টুঁটি চাপিয়া ধরিল! সে এরূপ জোরে তাঁহার গলা টিপিয়া ধরিয়াছিল যে, তাঁহার শ্বাসরোধের উপক্রম হইল, এবং জিহ্বা বাহির হইয়া পড়িল।

জোয়ানটা ইয়াংসির উত্তরাঞ্চল-প্রচলিত ভাষায় লককে তীব্রস্বরে বলিল, "হুম্, তোমাকে ঠিক কায়দায় পাইয়াছি; এখন বল দেখি—তোমার প্রকৃত পরিচয় কি? কে তুমি? আর আমাকে ঐ ভাবে রোকা লিখিবারই বা কারণ কি? যদি তুমি আমার সঙ্গে চালবাজি করিতে আসিয়া থাক, তাহা হইলে ভগবান্ বুদ্ধদেবের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, আমার এই আঙ্গুলের চাপেই তোমার প্রাণ বাহির করিব। তোমাকে হত্যা করিয়া তোমার মৃতদেহ নদীর জলে ফেলিয়া দিব, তাহা হাঙ্গর-কুমীরগুলার পেটে প্রবেশ করিবে।"

মিঃ লক মাথা তুলিয়া তাঁহার আততায়ীর মুখের দিকে চাহিলেন। তিনি তাহার চক্ষুতে পৈশাচিক নিষ্ঠুরতা প্রতিফলিত দেখিলেন, কিন্তু তাহার এইরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহারের কারণ স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি যথাসাধ্য চেষ্টায় তাহার আঙ্গুলের চাপ একটু শিথিল করিয়া বলিলেন, "তুমি আমার গলা হইতে হাত সরাইয়া লও, আমি তোমার শত্রু বা শত্রুপক্ষের গুপ্তচর নহি; আমি তোমার মহাসম্মানিত মনিবের বিশ্বস্ত বন্ধু।"

তাঁহার আততায়ী এই কথা শুনিয়া সবিস্ময়ে বলিল, "আমার মনিব?—তোমার এ কথার অর্থ কি?"

মিঃ লক্ বলিলেন, "ভগবান্ বুদ্ধদেবের পদচিহ্ন স্পর্শ করিয়া বলিতে পারি, আমি সত্য কথাই বলিয়াছি।"

আততায়ী বলিল, "তুমি সত্য কথাই বলিয়াছ? আমার মনিবের নাম তোমার জানা আছে? তাঁহার নাম বলিতে পার?"

মিঃ লক বলিলেন, "তোমার মনিব সুবিখ্যাত ও মহা সম্ভ্রান্ত জলদস্যু কাণ-সি-ওয়েন।"

মিঃ লকের কথা শুনিয়া জোয়ানটা তাড়াতাড়ি তাহার গলা হইতে হাত টানিয়া লইল, এবং তাহার মনিবের উদ্দেশ্যে সসম্ভ্রম অভিবাদন করিয়া বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে লকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সে ঐরূপ একটা সাধারণ কুলীর মুখে সেই নাম শুনিবে, ইহা পূর্ব্বে বিশ্বাস করিতে পারে নাই। সে অসঙ্কোচে বলিল, "সে তাহার মনিবের বন্ধু! সামান্য কুলী তাহার মহা সম্ভ্রান্ত মনিবের বন্ধু? কি ধৃষ্টতা! কি স্পর্দ্ধা!"

জোয়ানটা মিঃ লককে আর একটু দূরে টানিয়া লইয়া গিয়া পূর্ণ-দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সে তাঁহার মুখে যে নাম উচ্চারিত হইতে শুনিল, সেই নামের প্রভাব অতুলনীয়! এক দিকে নানকিং, অন্য দিকে ইচাং এই উভয় প্রান্তের মধ্যবর্ত্তী স্থানে ইয়াংসি নদীর সুবিস্তীর্ণ বক্ষে এবং তাহার কূলে কূলে এই নামের অমোঘ মহিমা সুপ্রচারিত। জলদস্যু কাণ-সি-ওয়েন নদীর এই অংশে যে জাহাজ দেখিত, তাহাই লুঠ করিত, তাহার কবল হইতে কোনও সদাগরী জাহাজের পরিত্রাণ ছিল না; এমন কি, তাহার নাম শুনিলে বড় বড় বিদেশী জাহাজের কাপ্তেনগুলিও আতঙ্কে বিহ্বল হইত, এবং ধনপ্রাণ-রক্ষার আশা পর্য্যন্ত

ত্যাগ করিত। সে নদীবক্ষে তাহার অনুচরবর্গকে শিকারের সন্ধানে পাঠাইয়া তাহার চানুগেহার আড্ডায় বসিয়া সুযোগের প্রতীক্ষা করিত। তাহার সেই আড্ডাটি দুর্গম ও দুষ্প্রবেশ্য, সেখানে সদলে গিয়া তাহাকে আক্রমণ করিতে কাহারও সাহস হইত না।

এই জলদস্যুই 'তিব্বতের বিভীষিকা' নামে সর্ব্বত্র পরিচিত ছিল। এক সময় তিব্বতাঞ্চলে তাহার প্রাদুর্ভাব ছিল, এবং সেই দিকে যত নদী ছিল, সকল নদীতেই তাহার প্রভুত্ব ও একাধিপত্য অক্ষুণ্ণ ছিল; সমারকন্দ হইতে ইন্‌সির উভয় তীরের সর্ব্বত্র সকল লোক তাহাকে 'জুজুর' মত ভয় করিত। অধিক কি, বিদেশী কোম্পানীর নদীপথ-গামী জাহাজ-সমূহের কাপ্তেনরা যদি শুনিতে পাইত, কাণ-সি-ওয়েনের 'জঙ্ক' নদীতে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা গিয়াছে, তাহা হইলে তাহারা গন্তব্য পথে অগ্রসর না হইয়া কোন নিরাপদ বন্দরে আশ্রয়গ্রহণের জন্য ফিরিয়া যাইত।

কাণ-সি-ওয়েনের প্রকৃত নাম 'খাঁ-সিবেন।' সে উত্তর বা দক্ষিণ-চীনের অধিবাসী নহে। তাহাকে চীনাম্যান বলিয়া মনে করাই ভুল। তাহার 'খাঁ' পদবীও চীনাম্যানের বংশগত নামের বিশিষ্টতার নিদর্শন নহে; বরং চীন সাম্রাজ্যের পশ্চিম প্রান্ত অতিক্রম করিলে তাহার জন্মভূমির সন্ধান হইতে পারে বলিয়া সে গর্ব্ব করিত, এবং বংশপরিচয় দিতে হইলে, সে মধ্যযুগের দুই প্রধান দিগ্বিজয়ী দস্যুর শোণিতের উত্তরাধিকারী বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া গৌরব অনুভব করিত। সে বলিত, পিতৃধারায় ও মাতৃধারায় তাহার দেহে কুবলা খাঁ ও জঙ্গীস্ খাঁর শোণিত প্রবাহিত হইতেছে; সুতরাং দস্যুবৃত্তিতে তাহার অধিকার আছে, এবং তাহা সে উত্তরাধিকারসূত্রেই লাভ করিয়াছে। সে তাহার পূর্ব্বপুরুষের ন্যায় দিগ্বিজয়ের খ্যাতিলাভ করিতে না পারিলেও দুর্দ্দান্ত জলদস্যু বলিয়া যে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল, তাহা অনেক শক্তিশালী ব্যক্তির আতঙ্ক ও উদ্বেগ উৎপাদন করিত।

তাহার সাহস, কৌশল, রণভরী ও সৈন্যবল এত অধিক ছিল, এবং তাহারা এরূপ অদ্ভুত বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া শত্রু-নিপাত করিত যে, তাহার নাম শুনিলেই লোকের আতঙ্ক হইত; অধিক কি, চীনের মহাপরাক্রান্ত প্রধান সেনাপতি সগণ্য রণনিপুণ সৈন্য পরিচালিত করিয়াও তাহার বিরুদ্ধে সমরাভিযানে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এমন কি, তাহার শক্তি-সামর্থ্য ও সৈন্যবলের পরিচয় পাইয়া উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রনায়করা তাহার সহযোগিতালাভের জন্য তাহার বন্ধুত্ব প্রার্থনীয় মনে করিয়াছিলেন। কারণ, কাণ-সি-ওয়েন যে পক্ষ অবলম্বন করিত, ইয়াংসি-বক্ষে সেই পক্ষেরই প্রভাব ও প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ থাকিত।

একটা সামান্য কুলী এইরূপ মহাপরাক্রান্ত দিগ্বিজয়ী পুরুষসিংহকে তাহার বন্ধু বলিয়া উল্লেখ করিল দেখিয়া কাণ-সি-ওয়েনের সেই অনুচরটা তাহাকে পাগল মনে করিল, এবং কঠোর দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। এই ছিন্নবস্ত্রধারী কুলী যে মিঃ লক, ইহা সে ধারণা করিতে পারিল না, এবং কাণ-সি-ওয়েন যে সত্যই তাঁহাকে বন্ধু মনে করিত, তাঁহার গৃহে তিনি সাদরে অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার আতিথ্যে পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা তাহার এই অনুচরটা জানিত না বা শুনিলেও বিশ্বাস করিত না।

কয়েক মিনিট চিন্তার পর সেই জোয়ান চীনাম্যানটা বলিল, "ওরে বেটা কুলী, ওরে ও ছেঁড়া ন্যাকড়ার মালিক, তুই আমার সেই মহাপরাক্রান্ত মনিবের নাম—যে নাম মুখে আনিতে ভয়ে আমারই হৃৎকম্প হইতেছে, সেই নাম কিরূপে জানিতে পারিয়াছিস্? যদি সত্য কথা না বলিস, তাহা হইলে আমি তোকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া নদীতে নিক্ষেপ করিব।"

মিঃ লক বলিলেন, "সুবিখ্যাত কাণ-সি-ওয়েন যাহাকে বন্ধু মনে করিয়া সম্মান করেন, যদি তাহার কোন অপকার কর, বা তাহার দেহ অস্ত্র দ্বারা বিদ্ধ কর, তাহা হইলে তিনি তোমাকে কি শাস্তি দিবেন, তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? তোমার মনিব আমার বন্ধু—এ কথা তুমি বিশ্বাস করিতেছ না; বোধ হয়, প্রমাণ পাইলে কথাটা বিশ্বাস করিবে। উত্তম, আমি তোমাকে ইহার প্রমাণ দিতেছি। তুমি আমার জামার আস্তীন গুটাইয়া বাঁ বগলটা একবার পরীক্ষা করিবে?"

সেই জোয়ানটা মিঃ লকের কথা শুনিয়া মুহূর্ত্তকাল কি চিন্তা করিল, কিন্তু তাঁহার জামার আস্তীন গুটাইয়া বাঁ বগল পরীক্ষা করিবার জন্য তাহার আগ্রহ হইলেও, সে ততখানি হীনতা স্বীকার করিতে সম্মত হইল না। সে

একখানি তীক্ষ্ণধার ছুরী বাহির করিয়া মিঃ লকের বাম বাহুমূল হইতে বগল পর্য্যন্ত জামার সকল অংশ বিদীর্ণ করিল, তাহার পর তাঁহার বগল উঁচু করিয়া সেখানে একটি পিঙ্গলবর্ণ গোলাকার উল্কি-চিহ্ন দেখিতে পাইল, চিহ্নটি অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, প্রায় আধ ইঞ্চি দীর্ঘ এবং তাহার মধ্যস্থলের বিস্তার এক ইঞ্চির অষ্টমাংশ মাত্র। সেই উল্কি-চিহ্নটি যে কৃত্রিম নহে, ইহা কাণ-সি-ওয়েনের সম্প্রদায়ভুক্ত যে কোন ব্যক্তি অনায়াসেই বলিতে পারিত, এবং সে ইহাও জানিত যে, কাণ-সি-ওয়েনের বিশ্বস্ত বন্ধুবান্ধব ব্যতীত অন্য কাহারও সেই উল্কি ধারণের অধিকার ছিল না।

কাণ-সি-ওয়েনের অনুচর বিস্ময়-বিহ্বল-নেত্রে ছদ্মবেশী লকের মুখের দিকে চাহিয়া তাহার হাতের অস্ত্র ভূতলে নিক্ষেপ করিল। তাহার বীরদর্প, উদ্ধতভাব মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হইল। সে মিঃ লককে বিনীতভাবে বলিল, "হাঁ, আপনি ঐ চিহ্নে আপনার পবিত্র অঙ্গ ভূষিত করিয়াছেন বটে; চিহ্নটি জাল চিহ্ন নহে, তাহাও আমি স্বীকার করিতে বাধ্য; সুতরাং আপনি সাধারণ কুলী নহেন, তাহা আর অস্বীকার করিতে পারিব না; তবে আপনি কে? সত্য করিয়া বলুন।"

মিঃ লক হাসিয়া বলিলেন, "আমি উত্তরাঞ্চলের দিক্‌পাল সুইফ-সির জ্ঞাতি-ভাই; তা ছাড়া, শক্তিধর হং-লু-চুই বল, আর কাণ-সি-ওয়েনই বল— তাঁহাদের সকলের সঙ্গেই আমার খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।"

কাণ-সি-ওয়েনের অনুচর বলিল, "এ যে ভারী লম্বা লম্বা কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন; আবার আমাকে সন্দেহে ফেলিলেন! ফাঁপা ঢাক বেশী বাজে। আপনি খাঁটি মানুষ, ইহার কোন প্রমাণ দেখাইতে পারিবেন? যদি না পারেন, তাহা হইলে বুঝিব, আপনি বুজরুক; আপনি যাহা দেখাইলেন—উহা সত্য নয়, আমার চোখের ধাঁধা মাত্র, ভেল্‌কীর খেলা। এ কথা সত্য হইলে আজ রাত্রিতেই আপনার মাথাটি তলোয়ারের এক পোচে কাঁধ হইতে খসিয়া পড়িবে। উহাই বুজরুকদের শাস্তি!—ঠিক বলুন, ছদ্মবেশে আপনি কে?"

লক বলিলেন, "আমি ফেরার লক।"

লোকটা বিস্ময়ে হুঙ্কার দিয়া দুই হাত দূরে সরিয়া বসিল, এবং উত্তেজিত স্বরে বলিল, "আপনি ফেরার লক!—যে ফেরার লককে আমরা 'বাঘ' বলি, আপনি কি সেই লোক? আপনি সেই বিদেশী বাঘ?"

লক হাসিয়া বলিলেন, "এ দেশে আমার বন্ধুরা আমাকে 'বাঘ' বলেন বটে, কিন্তু বাঘের মত আমার লেজ বা ধারাল দাঁত, নখ নাই।"

কাণ-সি-ওয়েনের অনুচর বলিল, "কিন্তু বাঘের মত আপনার সাহস ও শক্তি আছে, আর আপনার হুঙ্কারও প্রায় বাঘের মত। আপনি আমাকে চেনেন?"

লক বলিলেন, "না চিনিলে কি তোমার সঙ্গে এখানে আসিতাম? তোমাকে চিনি বৈ কি! তোমার নাম ফু-চেন-পু। বিখ্যাত কাণ-সি-ওয়েনের ভাই কাণ-উয়োর জাহাজের কর্ত্তা, তুমি সেই জাহাজের সারেঙ। ক্যান্টন নগরে 'কাঠের লণ্ঠন' নামক যে প্রসিদ্ধ বাড়ী আছে, সেই বাড়ীতে আমি কাণ-উয়োর সঙ্গে কিছু দিন বাস করিয়াছিলাম, সেই জন্য তাহার সঙ্গে এই অকৃতী অধমের বন্ধুত্ব হইয়াছিল।"

ফু-চেন-পু বলিল, "হাঁ, আপনার কথা শুনিয়া মনে হইতেছে, আমাদের অনেক ঘরোয়া ব্যাপার আপনার সুবিদিত। আপনার নিকট নির্ভরযোগ্য একটি প্রমাণ পাইলেই ফু-চেন-পু আপনার গোলামী স্বীকার করিবে।"

মিঃ লক হাসিয়া বলিলেন, "কিরূপ প্রমাণ পাইলে আমার কথা সত্য বলিয়া তোমার বিশ্বাস হইবে?—অনেক দিন পূর্ব্বে এক দিন রাত্রিকালে মাঞ্চু-রাজকুমার আউ-লিং রাজকীয় বজরায় মহা সমারোহে জলবিহার আরম্ভ করিলে কাণ-সি-ওয়েন তাঁহার জাহাজ লইয়া রাজকুমার আউ-লিংএর উপর চড়াও করিয়াছিলেন; তাঁহার পরাক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া আউ-লিং প্রাণ লইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন।—সেই রাত্রির এই ঘটনার কথা তোমার স্মরণ আছে?"

ফু-চেন-পু বলিল, "হাঁ, ঠিক স্মরণ আছে। আপনিও তাহা জানেন দেখিতেছি!"

লক বলিলেন, "সেই রাত্রিতে তুমি আউ-লিংকে তাঁহার পাশের দিক হইতে আক্রমণ করিয়াছিলে।"

ফু-চেন-পু তৎক্ষণাৎ তাহার তরবারি মিঃ লকের পদপ্রান্তে নিক্ষিপ্ত করিয়া বিনীতভাবে বলিল, "আমার সকল সন্দেহ দূর হইয়াছে; আপনিই আমাদের সেই বাঘ। আপনি আমার এই তলোয়ার লইয়া ইহার এক আঘাতে আমার মাথাটা ঘাড়ের উপর হইতে নামাইয়া ফেলুন। আমি আপনাকে অন্যায় সন্দেহ করিয়াছিলাম, আমার সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হউক।—আমি যে সকল কঠিন কথা

বলিয়া আপনার মনে কষ্ট দিয়াছি, তাহার উপযুক্ত শাস্তি দিতে হইলে আমার জিভটি কাটিয়া ফেলিতে হইবে। এ কাযটা আপনি আগে করুন, তাহার পর আমার মাথা লইবেন।"

মিঃ লক তরবারিখানি তুলিয়া লইয়া ফু-চেন-পুর হাতে দিয়া বলিলেন, "না, তা হয় না, ফু-চেন-পু! যে বীর পুরুষ ইয়াংসি-বক্ষে বিভীষিকার সঞ্চার করিয়া শত্রুগণকে বহুদূরে বিতাড়িত করিয়াছেন, তাঁহার বিশ্বস্ত ও সাহসী অনুচরদের এক জনকে হত্যা করিয়া তাহাদের সংখ্যা হ্রাস করিব—ইহা হইতেই পারে না। বিশেষতঃ আমি এখন তোমার সাহায্য-প্রার্থী। আমি চাংচায় উপস্থিত হইয়া তোমার প্রভু—মহাপরাক্রান্ত কাণ-সি-ওয়েনের সহিত সাক্ষাতের অভিলাষী; তুমি বোধ হয় এখন সেই স্থানেই যাইবে?"

ফু-চেন-পু বলিল, "হাঁ মহাশয়! রাত্রিশেষে নদীর অপদেবতাগুলা অন্তর্দ্ধান করিলে আমাদের জাহাজ চলিতে আরম্ভ করিবে।"

লক বলিলেন, "সেই সময় আমরাও তোমার সঙ্গে যাইব।"

ফু-চেন-পু বলিল, "হুজুরের আদেশ শিরোধার্য্য। আমাদিগকে অতি প্রত্যূষেই যাত্রা আরম্ভ করিতে হইবে। কারণ, আপনার এই অধম ভৃত্য জানিতে পারিয়াছে যে, আমার শক্তিশালী মনিবের জাহাজ অন্যান্য জাহাজের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া একাকী চলিতে আরম্ভ করিলেই দক্ষিণী কুকুর-গুলা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া দল বাঁধিয়া তাহা আক্রমণ করিবে। সুতরাং আমরা চাংচায় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই নদীর জল নরশোণিতে লোহিতবর্ণ ধারণ করিতে দেখিব।"

লক বলিলেন, "এরূপ দৃশ্য লোভনীয় বটে, কিন্তু কাণ-সি-ওয়েনের সহিত তাহারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে প্রস্তুত হইয়াছে, এরূপ শক্তি ও সাহস তাহারা কোথা হইতে সঞ্চয় করিল? তাহাদের এইপ্রকার ধৃষ্টতা কি বিস্ময়কর নহে?"

ফু-চেন-পু মাথা নাড়িয়া বলিল, "এ সংবাদ আপনার এই অধম কিঙ্করের অজ্ঞাত; আমার তাহা বুঝিবারও শক্তি নাই, তবে জনরবে প্রচার যে, চেং-তু মঠের সেই দুর্দ্দান্ত কালো মুখোসধারী মোহান্ত এই অঞ্চলেই ঘুরিয়া বেড়াই-তেছে। কাককে উড়িতে দেখিয়া ফিঙ্গের দল যে তাহার পশ্চাতে ছুটাছুটি করিবে, ইহাতে বিস্ময়ের কি কারণ থাকিতে পারে?"

কালো মুখোসধারী মোহান্ত সেই অঞ্চলে ঘুরিয়া কাণ-সি-ওয়েনের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার চেষ্টা করিতেছিল—এই সংবাদে মিঃ লক উৎকণ্ঠিত হইলেন। তাঁহার ধারণা হইয়াছিল, সে শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্কল্পে বাধা দান করিবে; কিন্তু এত শীঘ্র পুনর্ব্বার তাহার সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হইবে, ইহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। তিনি স্থির করিলেন, ভাগ্যে যাহাই ঘটুক, তিনি তাঁহার কঠোর সঙ্কল্প ত্যাগ করিবেন না। প্রাণ থাকিতে শেষ চেষ্টায় প্রতিনিবৃত্ত হইবেন না।

মিঃ লক বলিলেন, "হাঁ, কাককে উড়িতে দেখিলে ফিঙ্গের দল তাহার পিছনে লাগে বটে, কিন্তু তাহাতে কাকই বিপন্ন হইয়া পড়ে; ফিঙ্গের দলের ঠোকরে সে অস্থির হইয়া নিরাপদ স্থানে আশ্রয়গ্রহণের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। যাহা হউক, আমি তোমার সঙ্গে যাইব, ফু।"

ফু-চেন-পু তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া তাহার 'জঙ্কে'র দিকে চলিল। জাহাজে উপস্থিত হইয়া সে মিঃ লক ও তাঁহার সহকারী জ্যাককে পরম সমাদরে জাহাজের কেবিনের ভিতর লইয়া গেল, এবং সেই কেবিনে তাঁহাদের বাসের ব্যবস্থা করিল।

মিঃ লক সঙ্কল্প করিলেন, ফু-চেন-পুকে কৌশলে বশীভূত করিয়া তাহার নিকট হইতে জ্ঞাতব্য গুপ্ত সংবাদগুলি সংগ্রহ করিবেন; কাণ-সি-ওয়েন ফু-চেনকে অত্যন্ত বিশ্বাস করিত, এবং সে তাহার প্রিয় অনুচর বলিয়া এরূপ অনেক গোপনীয় সংবাদ ফু-চেন-পুর সুবিদিত ছিল—যাহা অন্য কাহারও জানিবার সম্ভাবনা ছিল না। ফু-চেন-পু প্রকাশ্যতঃ লকের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া, সরলভাবে তাঁহার নিকট গোপনীয় কথা প্রকাশ করিতে প্রস্তুত ছিল, ইহা তিনি প্রত্যাশা করিতে পারিলেন না।

মিঃ লক ফু-চেন-পুর মনোরঞ্জনের আশায় তাঁহার বিপৎ-সংক্রান্ত সকল কথাই তাহার গোচর করিলেন। ফু-চেন-পু কেবিনের ভিতর তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া গভীর আগ্রহে তাঁহার কথাগুলি শুনিতে লাগিল। তাহার কৌতূহল ও বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সে সকল কথা শুনিয়া মিঃ লককে বলিল, "বাঘ মহাশয়, কালো মুখোসধারী মোহান্তটা বদমায়েসের ধাড়ী; সে তাহার কালো আল্‌খেল্লার ভিতর

অনেক গুপ্ত রহস্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে, এবং আশা করিয়াছে, আমাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া সে জয়লাভ করিবে, আমরা তাহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিব; কিন্তু আপনি জানিয়া রাখুন, আমার মহাপরাক্রান্ত মনিব মহামান্য কাণ-সি-ওয়েন তাহার মুণ্ডপাত না করিয়া নিরস্ত হইবেন না। হাঁ, তাহার ন্যাড়া মাথা মাটীর ধূলায় লুটাইবে। হয় ত আমার হাতেই তাহার মাথাটা কাঁধ হইতে খসিয়া পড়িবে! আমার এই তরবারি তাহার রক্তে রাঙা হইবে।" সে তাহার তরবারি সবেগে উর্দ্ধে তুলিয়া তদ্দ্বারা শূন্যে আঘাত করিল।

মিঃ লক ও জ্যাকের ধারণা হইল, ফু-চেন-পুর সহায়তা লাভ করায় তাঁহারা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ হইয়াছেন এবং তাঁহাদের সঙ্কল্পপথের বিঘ্ন বহুপরিমাণে অপসারিত হইয়াছে। তাঁহারা সেই জাহাজে আশ্রয়গ্রহণ করিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন এবং সেই কেবিনেই নির্ব্বিঘ্নে রাত্রিযাপন করিলেন; তাঁহাদের সুনিদ্রার ব্যাঘাত হইল না।

প্রত্যূষে মিঃ লকের নিদ্রাভঙ্গ হইল, জ্যাক তখনও গা... নিদ্রায় অভিভূত। লক তাহার নিদ্রাভঙ্গ না করিয়া কেবিনের বাহিরে আসিলেন। তখন জাহাজখানি ইয়াংসির উদ্বেলিত তরঙ্গরাশি বিদীর্ণ করিয়া স্রোতের প্রতিকূলে (উজানে) ধাবিত। ফু-চেন-পু স্বয়ং সারেঙের স্থান অধিকার করিয়া ক্ষিপ্রহস্তে জাহাজ পরিচালিত করিতেছিল। মিঃ লক ডেকে দাড়াইয়া নদীবক্ষে বহুদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি প্রসারিত করিলেন। তখনও কুজ্ঝটিকার গাঢ়স্তরে চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন, জল, স্থল একাকার। ক্রমশঃ প্রভাত-সূর্য্যের উজ্জ্বল-কিরণসংস্পর্শে কুজ্ঝটিকার গাঢ়ধূসর যবনিকা ধীরে ধীরে অপসারিত হওয়ায় যে স্থানে নদীর উদ্দাম তরঙ্গলীলা মিঃ লকের নয়নগোচর হইল, সেই স্থানে তিনি ক্ষুদ্র মসীলেখাবৎ একটি কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ দেখিতে পাইলেন, তাহা পূর্ব্বোক্ত বায়সেরই অস্তিত্বের নিদর্শন বলিয়া তাঁহার ধারণা হইল!

[ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়

কবি-কুঞ্জ

চির-চঞ্চল নারিকেল-শাখা অঙ্গুলিসঙ্কেতে,
'এসো এসো' বলে, যে পথিক চলে দূর ফসলের ক্ষেতে,
'এসো বনপারে মাঠের কিনারে
সুশীতল গ্রাম রয়েছে এপারে
সরসী দুধারে ছায়া-রস-ঘন পল্লীর পথে যেতে।'

চলিতে চরণে দলিবে তোমার করঙ্গা ফুলগুলি
নিম বাবলায় ঝ্যাওড়ার ফুলে ঢাকিবে পথের ধূলি
সে পথে চলিতে হেরিবে তোরণ
মধুমঞ্জরী-ফুল-আভরণ
সারাদিনই চলে মধু আহরণ মল্লিকা-দল খুলি।

ব্যাহত-মধুপ-গুঞ্জন দিবে দ্বারদেশে আবাহন
কলাপীর কেকা শুকের প্রলাপ ময়নার আলাপন
নীলকণ্ঠেরে হেরি শুভখণে
যেমনি চরণ ফেলিবে আঙনে
হেরিবে আধেক খোলা বাতায়নে পুর-বধূ-স্মিতানন।

দীর্ঘ সোপান-প্রান্তে সেথায় প্রকোষ্ঠ একখানি
সজ্জা-বিহীন তবু অমলিন; কুটজ-গন্ধ আনি
নিভৃত নীড়েতে কপোত-কপোতী
বাস করে সেথা কবি-দম্পতি
স্বপন-বিলাসী বহুভাবভাষী আগামী কালের প্রাণী।

ছবির মতন দূরদিগন্তে নিমীল নয়ন মেলি,
বসে শাখামৃগ, আসে এক নাগ, চটক যায় বা খেলি,
কাঠ-বিড়ালীরা কভু নেচে যায়,
বিরহী কোকিল প্রাণ ভরি গায়,
সে কি ভোলা যায়? সেই কাক-টিয়া-আনন্দ-কল-কেলি!

শ্রীগোপাললাল দে (বি-এ)।

দস্যু-পর্ব্বত

পৃথিবীর বহু অনাবিষ্কৃত প্রদেশ, নদ, নদী, পর্ব্বতমালা প্রভৃতি আধুনিক সভ্য মানবেরও জ্ঞানের অগোচরে অবস্থান করিতেছে, ইহা সত্য। মার্কিণ জাতি সর্ব্বপ্রযত্নে এই সকল স্থান আবিষ্কার করিবার জন্য যেরূপ যত্ন, পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও অর্থব্যয় করিতেছেন, এমন আর কোনও প্রতীচ্য জাতি করিতেছেন না। চীন মহাদেশের অন্তর্গত এমন অনেক স্থান আছে—যাহা এখনও মানচিত্রে অঙ্কিত হইবার সুযোগ পায় নাই। মিশরে যখন ফারাও নৃপতিবৃন্দ প্রবল-প্রতাপে রাজত্ব করিতেন, তখন চীন মহাদেশ সভ্যতার আলোকে প্রদীপ্ত। কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত এই বিরাট প্রদেশের সকল স্থান সভ্য মানব জাতির জ্ঞানরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত নহে। চীনদেশ বলিলে একটা প্রকাণ্ড স্থানকে বুঝায় মাত্র; কিন্তু চীন অধিকার-সীমার মধ্যে কত বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষ আছে, কত বিভিন্ন স্থান আছে, কত বিচিত্র দৃশ্য বিদ্যমান, তাহা অনুমান করাও সম্ভবপর নহে। মার্কিণ জাতির অধ্যবসায়বলে এমন অনেক স্থানের কথা ইদানীং সভ্যসমাজ অবগত হইতে পারিতেছেন।

এ কথা যদি বলা যায় যে, সমগ্র চীনদেশে শুধু চীনারাই আছে, তাহা হইলে সে কথা কখনই সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইবে না। চীনদেশের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষতঃ ইহার সুদূর পশ্চিমাঞ্চলে, তিব্বতের সীমান্তপ্রদেশে বহু আদিম যুগের নরনারী বসবাস করিতেছে। ইহারা আদৌ চীনা নহে, স্বতন্ত্র আদিম জাতি। ইহাদের ভাষা বিভিন্ন; কাহারও কাহারও লিখিত গ্রন্থ এবং সাহিত্য পর্য্যন্ত বিদ্যমান। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ নসু, নাসি, চুঙ্গকিয়া ও মিয়াওজ জাতির নাম করা যাইতে পারে।

চীনের একান্ত পশ্চিম সীমায়, চীনের অধিকার-সীমার মধ্যে যে সকল তিব্বতী বাস করে, তাহাদের প্রতিবেশীর নাম ক্রেম জাতি। ইহারা একপ্রকার স্বাধীন জাতি। এরূপ জাতিগুলি তাহাদের সর্দ্দারের নায়কত্বে জীবন যাপন করিতেছে। কোন কোন জাতি নামে চীন অধিকার-সীমার অধীন হইলেও বংশপরম্পরায় যে সকল সর্দ্দার তাহাদিগকে পরিচালিত করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের দ্বারাই শাসিত হইয়া আসিতেছে। অবশ্য প্রাচীন যুগে চীন-সম্রাটগণ বর্ত্তমান সর্দ্দারদিগের পূর্ব্বপুরুষগণকে শাসন-কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া গিয়াছিলেন।

উল্লিখিত সর্দ্দারগণ যে সকল স্থানে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়া থাকেন, তাহা সুদূর এবং দুরধিগম্য পর্ব্বতাঞ্চলে অবস্থিত। সে সকল স্থানে চাষের উপযোগী পর্য্যাপ্ত ভূমি-খণ্ড নাই; সুতরাং চীনা কৃষক কোনও দিন এই সকল স্থানে আসিয়া কৃষিকার্য্য করিতে প্রলুব্ধ হয় নাই। স্থানের দুর্গমতা এবং আদিম অধিবাসীদিগের শৃঙ্খলাহীন উদ্দামতাপ্রযুক্ত চীনারা এ সকল অঞ্চলে আসিতে সাহস করে নাই। অথচ নানাবিধ মূল্যবান্ ধাতুসম্পদে স্থানগুলি পরিপূর্ণ।

যে সকল দেশ ও জাতির কথা উল্লিখিত হইল, তাহাদের সম্বন্ধে চীনাদিগের মনে উদ্ভট ধারণা আছে। জাতিদিগের যে নাম ও সংজ্ঞা প্রচলিত আছে, চীনারা সে সম্বন্ধে অবজ্ঞা-মিশ্রিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে ভিন্ন নামে অভি-হিত করিয়া থাকে। যথা—'নসু' জাতিকে তাহারা 'লোলো' বলিয়া ডাকে; 'নাসির' নাম 'মোসো'; 'ক্রেম' সম্প্রদায়ের নাম 'হিফান্' বা 'পশ্চিমের বর্ব্বরজাতি'। ক্রেমের পশ্চিম ভাগে সেচওয়ান ও উনানে যে তিব্বতীয় জাতি বসবাস করিয়া থাকে, চীনাদিগের নিকট তাহারা 'মাঞ্জু' বা 'দস্যু' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। বিশেষজ্ঞগণের মতে শেষোক্ত সম্প্রদায় সম্বন্ধে এই ধারণা ভ্রান্ত নহে। চীনারা অস্পৃশ্য কুকুরের ন্যায় উল্লিখিত জাতি বা সম্প্রদায়গুলিকে হেয় দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে।

মিঃ জোসেফ এফ রক্ এক জন প্রসিদ্ধ মার্কিণ ঐতি-হাসিক ও পর্য্যটক। চীনদেশের দুরধিগম্য এবং সভ্যজগতের অবিদিত অঞ্চলে পর্য্যটন করিয়া মিঃ রক্ অনেকগুলি স্থানের অপূর্ব্ব বিবরণ জনসাধারণের গোচরীভূত করিয়াছেন। কিছু দিন পূর্ব্বেও তিনি উল্লিখিত অঞ্চলে নানা বিপদ অগ্রাহ্য করিয়া গমন করিয়াছিলেন। চীনের পশ্চিম সীমান্তের যে সকল প্রদেশে তিনি পর্য্যটন করিয়াছেন, কোনও শ্বেতাঙ্গ তৎপূর্ব্বে তথায় গমন করেন নাই। বহুদিন ধরিয়া তিনি চীনদেশের অনাবিষ্কৃত স্থানসমূহে ভ্রমণ করিয়া আসিতেছেন। উনানের দক্ষিণাঞ্চল হইতে মঙ্গোলিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগের বহুস্থান তিনি আবিষ্কার করিয়াছেন। তিব্বতের উত্তর-পূর্ব্বভাগের 'তৃণভূমি'তেও তিনি গমন
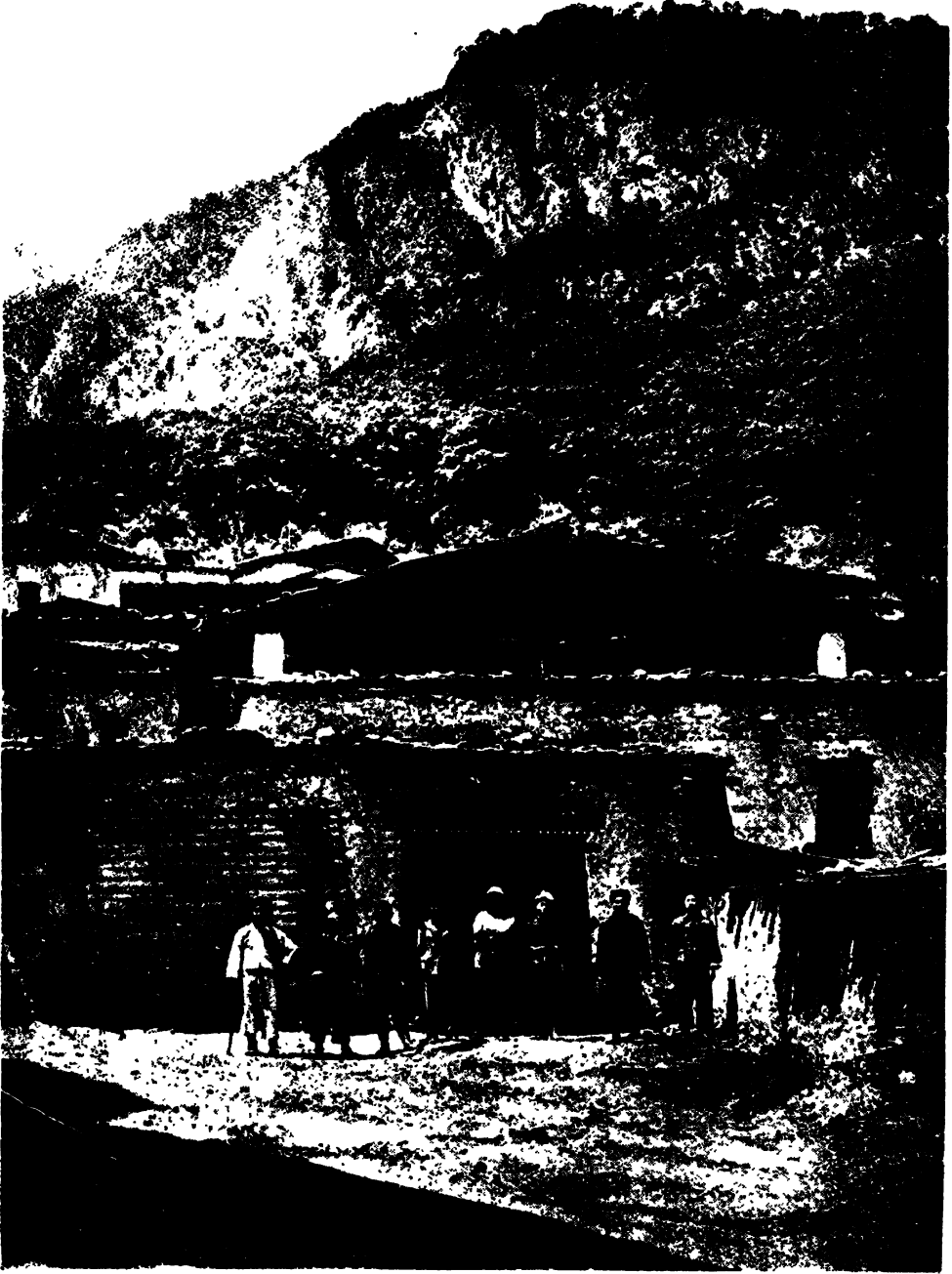
মুলি মঠে অভিযানকারীগণ

করিয়াছিলেন। বিরাট সীমান্তপ্রদেশে লোলোক, হিয়াং-চেঙ্গ এবং কঙ্কালিঙ্গ জাতি দ্বারা অধ্যুষিত স্থানসমূহ যেমন বিপৎসঙ্কুল, তেমনই দুরধিগম্য। তাহাদের দেশে কোনও পশ্চিমদেশীয় শ্বেতাঙ্গের পক্ষে প্রবেশ করা অত্যন্ত কঠিন চীনারা পর্য্যন্ত এই সকল দুর্দ্দান্ত, উচ্ছৃঙ্খল দস্যুর আবাস ভূমিতে প্রবেশ করিতে সাহসী নহে।

... রক্ ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে 'আমনাই মাচেন্' পর্ব্বতমালা আ...কার করিয়াছিলেন, পীত নদের উৎপত্তিস্থানও তিনি আ...কার করিয়া আসিয়াছিলেন। 'মাসিক বসুমতীতে' ইহা... বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছিল। মিঃ রকের পূর্ব্বে কোনও ... উক্ত অঞ্চলে কখনও পদার্পণ করেন নাই।

'আমনাই মাচেন্' পর্ব্বতমালা আবিষ্কারের পর মিঃ রক্ ক...লিং অঞ্চল আবিষ্কারের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠেন। এই অঞ্চল সভ্য মানব-সমাজের—প্রতীচ্য পণ্ডিতগণের জ্ঞানের অগোচর ছিল। মুলি-রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমভাগে কঙ্কালিং অবস্থিত। সেখানে যে বিরাট পর্ব্বতমালা বিরাজিত, তাহা আমনাই মাচেন্ অপেক্ষা উচ্চতায় সামান্য কম।

মিঃ রক্ ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের শীতকালে মুলিরাজ্যে গমন করিয়াছিলেন। সেখান হইতে তিনি তুষারাবৃত পর্ব্বতমালা দেখিতে পান। মুলির লামা-রাজার প্রমুখাৎ পরে তিনি অবগত হন যে, উল্লিখিত হিমকিরীটী অদ্রিমালা কঙ্কালিং প্রদেশে অবস্থিত এবং তিব্বতী দস্যুদল তথায় বসবাস করে। প্রবল ইচ্ছা থাকিলেও মিঃ রক্ তখন সাহস সহকারে উক্ত পর্ব্বতমালার দেশে অভিযান করিতে পারেন নাই। ইহার দুইটি কারণ ছিল। প্রথমতঃ শীতকালে সে প্রদেশে গমন করা দুঃসাধ্য; দ্বিতীয়তঃ মুলিরাজের সহিত তাঁহার তখনও ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব জন্মে নাই।

কোকোনর অভিযান হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইবার পর মিঃ রক্ এই অপরিচিত রাজ্যে ততোধিক অপরিচিত পর্ব্বতমালা আবিষ্কারের জন্য অভিযান করিবার সঙ্কল্প করেন। মানচিত্রে উল্লিখিত অংশ ফাঁকা ছিল।

মিটযুগা পাহাড়ের সন্নিহিত জলাশয়

ইতিমধ্যে মুলিরাজের সহিত মিঃ রকের বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে য়ুনানফু অভিযান সমাপ্ত হইলে মিঃ রক্ কতিপয় দক্ষ 'নাসি' সহকারীর সহিত প্রথমতঃ টালিফুতে গমন করেন। তথা হইতে লিকিয়াং যাত্রা করিয়া সেই স্থান হইতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভার সংগৃহীত হয়। সেখান হইতে সদলবলে মিঃ রক্ মুলিরাজ্যের অভিমুখে অগ্রসর হন। লিকিয়াং হইতে উত্তরভাগে দশ দিন গমন করিলে তবে মুলিরাজ্যে প্রবেশ করা যায়।

মিঃ রকের মনে আশা ছিল যে, মুলিরাজকে নানারূপে তুষ্ট করিতে পারিলে, তিনি তাঁহাকে অনাবিষ্কৃত প্রদেশে

নিরাপদে গমন করিবার জন্য কঙ্কালিং ও হিয়াংচেং দস্যু-সর্দারদিগকে অনুরোধ করিবেন। লামা-রাজের অনুরোধ দস্যুসর্দ্দারগণ উপেক্ষা করিতে পারিবে না। তাহা হইলে তিনি বিনা বাধায় অনাবিষ্কৃত প্রদেশের যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

মুলিরাজ্যে উপনীত হইবামাত্র মিঃ রক্ অবগত হইলেন যে, লামারাজ কোপাটী নামক ক্ষুদ্র মঠে অবস্থান করিতেছেন। কোপাটী সমুদ্রতট হইতে ১০ হাজার ২ শত ৬০ ফুট উচ্চে অবস্থিত। কোপাটী মঠের অভিমুখে যাত্রা করিয়া দুই দিন পরে তিনি তথায় উপনীত হন। তাঁহার আগমন-সংবাদ পাইয়া মঠের প্রধান লামা ও মুলি-রাজের মন্ত্রী তাঁহাকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গেলেন।

এই কোপাটী মঠে ইতিপূর্ব্বে আর কোনও শ্বেতাঙ্গ পদার্পণ করেন নাই। মঠ হইতে আরম্ভ করিয়া উহার পশ্চাদ্ভাগের শৈলশিখর পর্য্যন্ত ঘন দেবদারু-বৃক্ষের অরণ্য বিস্তৃত। মিঃ রক্ দেখিতে পাইলেন, মঠের প্রবেশপথে লামা সন্ন্যাসী ও রাজার পার্শ্বচরগণ দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই বাহু প্রসারিত করিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন

তিব্বতী ভিক্ষু

মিটযুগা পর্ব্বতমালা
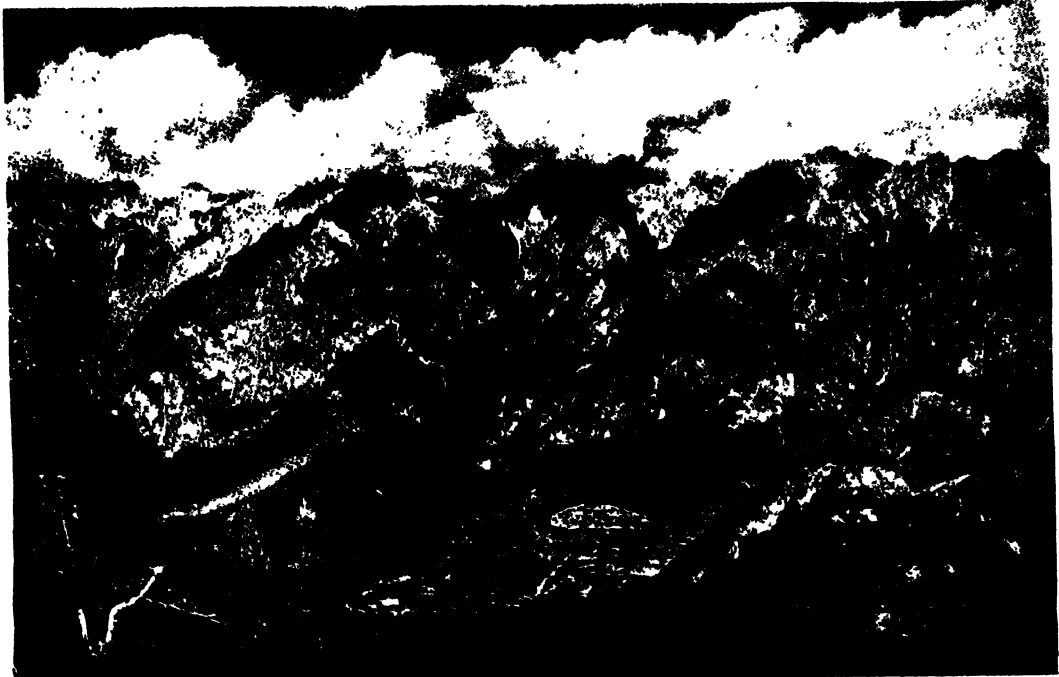
রোডোডেনড্রন অরণ্য

কোপাটীর নাম সভ্য-সমাজে অপরিচিত, শুধু তাহাই নহে, প্রাচ্যদেশেও এই মঠ সুপরিচিত নহে; কিন্তু মিঃ রক্ এই মঠের সুচিত্রিত কক্ষ ও কারুকার্য্য-সমন্বিত দ্বার-বাতায়নের সৌষ্ঠব দর্শনে বিস্মিত হইলেন। অল্প বিশ্রামের পরেই রাজার চীনা লেখক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রাজার মন্ত্রী ও চীনা লেখকের সহিত মিঃ রক্ তাঁহার গন্তব্য স্থান সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন। কানুসু হইতে মিঃ রক্ মুলিরাজের নিকট যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে মুলিরাজ জানিতেন যে, তিনি মুলিরাজ্যের মধ্য দিয়া টাটসিয়েনলুতে গমন করিতে চাহেন। এই অভিযান যাহাতে নিরাপদে সমাপ্ত হইতে পারে, মুলিরাজ ইতিমধ্যেই সে ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু মিঃ রক্ যখন প্রকাশ করিলেন যে, তিনি কঙ্কা বা কঙ্কালিং পর্ব্বতমালার রাজ্যে গমন করিতে বাসনা করেন, তখন মুলিরাজের মন্ত্রী ও চীনা লেখক পরস্পর পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎকাল পরে তাঁহারা বলিলেন যে, এ কার্য্য মিঃ রকের পক্ষে দুঃসাধ্য ব্যাপার। উল্লিখিত পর্ব্বতের তিনটি শৃঙ্গ দর্শন করিতে হইলে তাঁহাকে দুর্দ্দান্ত দস্যু-রাজ্যের মধ্য দিয়া যাইতে হইবে। সুতরাং পর্ব্বতমালাকে আবিষ্কার করা সম্ভবপর নহে।
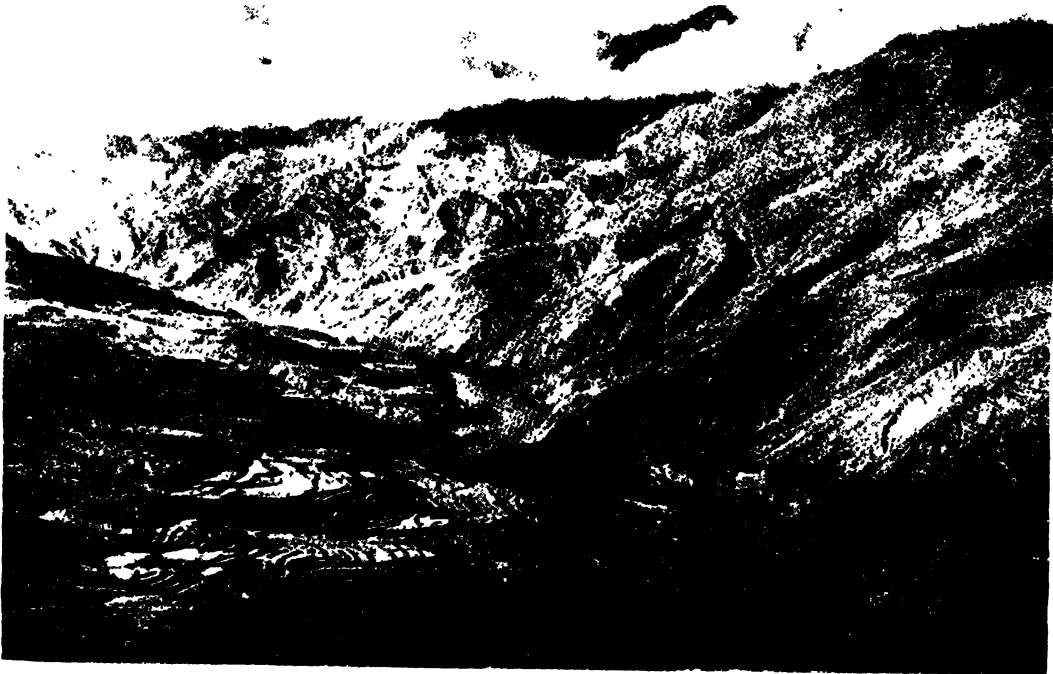
ইয়াংসি উপত্যকাভূমি

মিঃ রক্ তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে, মুলিরাজের জন্য তিনি প্রভূত মূল্যবান্ উপঢৌকন আনিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রীর হস্তে পঞ্চাশ মুদ্রা মূল্যের মার্কিণী স্বর্ণমোহর অর্পণ করিয়া মিঃ রক্ তাঁহাকে কি ভাবে মুলিরাজের নিকট তাঁহার আবেদন পেশ করিতে হইবে, তাহা বুঝাইয়া দিলেন।

এক ঘণ্টা পরে মন্ত্রী মহাশয় হাস্যমুখে ফিরিয়া আসিলেন এবং মিঃ রককে সঙ্গে করিয়া লামারাজের নিকট লইয়া গেলেন। মঠের প্রবেশপথের তোরণে উপনীত হইবামাত্র বারুদে অগ্নিসংযোগ করিয়া লামাগণ তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। সোপানশ্রেণী বাহিয়া ক্রমে সদলবলে মিঃ রক্ মুলিরাজের সকাশে নীত হইলেন।

মুলিরাজের পরিধানে পীতবর্ণের সাটিনের পরিচ্ছদ। সাদরে করগ্রহণ করিয়া তিনি মার্কিণ পরিব্রাজককে আসনে বসিতে অনুরোধ করিলেন। মিঃ রকের সহকর্মিগণের দুই জন উপঢৌকনাদি লামারাজের সম্মুখে রক্ষা করিলেন। মূল্যবান্ উপহারের প্রভাবে কঙ্কারিসুমহংবার তোরণদ্বার উদ্‌ঘাটিত হইবে।

মুলিরাজ—শিবিরদ্বারে

মুলিরাজের রাজ্যসীমার চতুর্দ্দিকে উচ্ছৃঙ্খল দস্যুদলের বাসভূমি। দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব্ব অঞ্চলে লোলো দস্যুজাতি বাস করে। পশ্চিম ও উত্তরপশ্চিম ভাগ কঙ্কালিং ও হিয়াংচেং দস্যুদলে পরিবেষ্টিত। ইহারা প্রায়ই মুলিরাজের রাজ্যসীমায় আসিয়া উৎপাত করিয়া থাকে।

রাজা যেমন প্রিয়দর্শন, তেমনই বন্ধুত্বপরায়ণ। মিঃ রককে প্রীত করিতে তাঁহার বিশেষ আগ্রহও ছিল; কিন্তু দস্যুদল-পরিবেষ্টিত দুর্গম রাজ্যে মিঃ রকের অভিযানপ্রস্তাব শুনিয়াই তিনি শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। নিরাপদে তাঁহার দুরধিগম্য প্রদেশে বিচরণ করিতে পারিবেন কি না, সে বিষয়ে রাজার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল। যে চণ্ডনীতিপরায়ণ দুর্দ্ধর্ষ দস্যুদল কঙ্কালিং অঞ্চল অধিকার করিয়া রহিয়াছে, তাহাদের সর্দ্দারের সহিত বন্দোবস্ত করিলেও মিঃ রক্ সদলবলে নিরাপদে পর্য্যটন করিতে পারিবেন কি না, এ বিষয়ে মুলিরাজ নিঃশঙ্ক হইতে পারিলেন না।

রাজার সহিত মিঃ রকের দীর্ঘকাল আলোচনা চলিল রাষ্ট্রনীতিক নানাপ্রকার আলোচনাও কথাপ্রসঙ্গে উত্থাপিত হইল। সভ্যজগৎ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইলেও মুলিরাজ চীনদেশ সম্বন্ধে প্রায় সকল সংবাদই অবগত ছিলেন। কি মিঃ রক্ বুঝিতে পারিলেন, বৈদেশিক ঘটনা সম্বন্ধে লামারাজের কোনই জ্ঞান ছিল না। বলশেভিক শাসনতন্ত্র যে কি, তাহা তিনি শুনেনও নাই। রুস-সম্রাট যে নিহত হইয়াছেন সে সংবাদ পর্য্যন্ত এখনও তাঁহার শ্রবণপথে প্রবেশ করে নাই। জার্ম্মান সাম্রাজ্যে কাইসার যে এখন শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছেন না, এ সংবাদও তাঁহার জানা নাই।
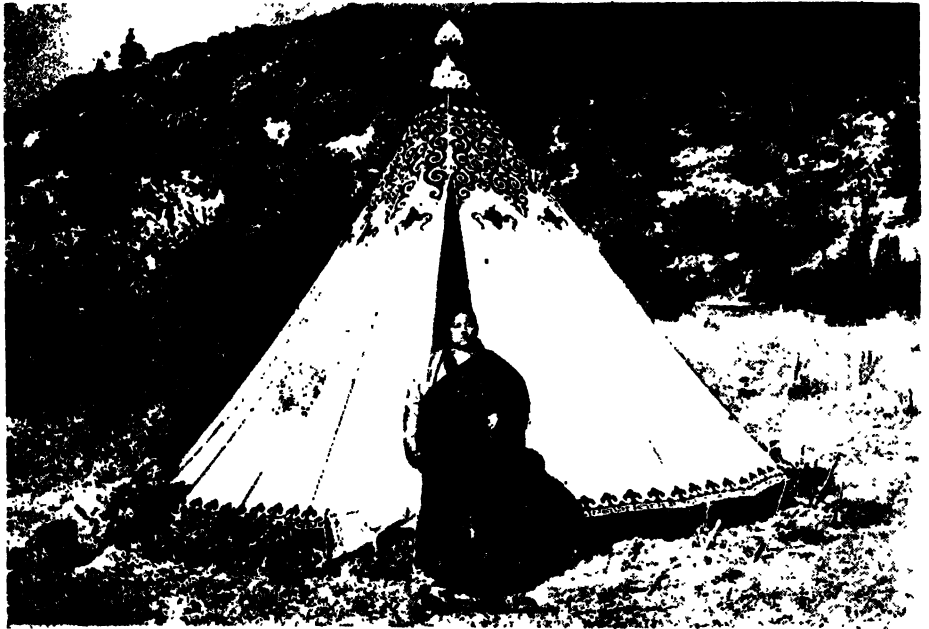
বিমানপথে মানুষ ব্যোমরথে চড়িয়া উড়িতে পারে, মুলিরাজ এ সংবাদও রাখিতেন না। অভিনব যুগের বিচি

সংবাদ শুনিয়া মুলিরাজ স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। ক্রমশঃ মিঃ রক্ তাঁহার গন্তব্য স্থানের আলোচনায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যে পর্ব্বতমালা আবিষ্কারের সন্ধানে মিঃ রক্ বিপদ্‌রাশিকে আলিঙ্গন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, মুলিরাজ বলিলেন, তাহার নাম কঙ্কারিস্থমগংবা। উহার তিনটি শৃঙ্গ;—চানাদরজি, জাম্বেয়াং ও সেনরেজিগ। তিব্বতী দেবতারা এই তিন তুষারকিরীটী শৃঙ্গে বাস করিয়া থাকেন। কঙ্কারিস্থমগংবা পর্ব্বতদেবতার নাম। ইনি দস্যুদলের উপাস্য দেবতা। উন্নতশীর্ষ পর্ব্বতমালার চতুস্পার্শ্বের উচ্চ উপত্যকাভূমিতে দস্যুদল বাস করিয়া থাকে। নির্ভর করিয়া কোনও ব্যক্তি এতদঞ্চলে তীর্থ করিতে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে প্রথমতঃ তাহার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া তাহাকে প্রাণে মারিয়া ফেলে। এইরূপ পাপকার্য্যের পর কঙ্কার-দস্যুদল পর্ব্বতপরিক্রমার দ্বারা পাপক্ষালনের চেষ্টা করিয়া থাকে।

মুলিরাজের নিকট মিঃ রক উল্লিখিত ব্যাপার শ্রবণ করিলেন। লামানরপতি তার পর চীনাদিগকে এজন্য দায়ী করিতে ক্ষান্ত হইলেন না। প্রথমতঃ কঙ্কালিং ও হিয়াংচেং সম্প্রদায় তিব্বতী রাজার শাসনাধীন ছিল। এই রাজা বাটাং ও টাটসিয়েন্‌লুর মধ্যবর্ত্তী লিটাং নামক স্থানে বাস করিতেন। প্রজাবর্গের উপর তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার ছিল। সে সময় যে কেহ নিরাপদে উল্লিখিত পর্ব্বতমালার চারিদিকে পরিভ্রমণ করিতে পারিত। শত শত তীর্থযাত্রী—নরনারী, বালক-বালিকা সে যুগে প্রতি বৎসর পরম নির্ভয়ে তীর্থযাত্রা করিয়া আনন্দলাভের অধিকারী ছিল।

হিফান সম্প্রদায়ের নরনারী

প্রত্যেক তিব্বতবাসী জীবনকালের মধ্যে অন্ততঃ একবার পবিত্র গিরিশৃঙ্গের চারিদিকে পরিক্রম করিবার পুণ্য অভিলাষ সঞ্চয় করিয়া রাখে। ঋতুবিপর্য্যয়ের মধ্যেও তাহারা এই সংকল্পসাধনে বিরত হইতে চাহে না। কিন্তু যখন হইতে দস্যুদল কঙ্কালিং গিরি অঞ্চল অধিকার করিল, তখন হইতে এই শুভ ইচ্ছা শুধু তাহাদেরই একচেটিয়া অধিকারভুক্ত। কারণ, তাহাদের অত্যাচারে অন্য কোনও মানুষেরই সে অঞ্চলে গমন করা সম্ভবপর নহে। বিগত বিশ বৎসরেরও অধিককাল ধরিয়া বাহিরের কোন ব্যক্তিই এই পবিত্র গিরিপরিক্রমার অভিলাষ সিদ্ধ করিতে পারে নাই। যদি দুঃসাহসে

কিন্তু তার পর চীনরাজ চাও-এর-ফেংএর সময় অরাজকতার সৃষ্টি হইল। তিনি অত্যন্ত ক্ষমতাগর্ব্বিত লোভী ব্যক্তি ছিলেন। সাম্রাজ্যবাদ তাঁহার চিত্তকে নিষ্ঠুর করিয়া তুলিয়াছিল। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি সেনাদলসহ টাটসিয়েন্‌লু অভিমুখে অভিযান করিয়া তত্রত্য নরপতিকে সিংহাসনচ্যুত করেন। লিটাংএর রাজবংশকে ধ্বংস করিয়া তিনি সমগ্র প্রদেশ নিজের অধিকারভুক্ত করিয়া লয়েন।

উল্লিখিত অঞ্চল চাও-এর-ফেং ৩১টি পরগণায় বিভক্ত করিয়া সেই স্থানে ৩১ জন ম্যাজিষ্ট্রেট বা হাকিম নিযুক্ত করিয়া দেশশাসনের ব্যবস্থা করেন। তন্মধ্যে চীন সরকার

এখন মাত্র ৯ জনের অধিকৃত স্থানের সংবাদ রাখেন। বাকী ২২টি বিভক্ত অঞ্চল অধুনা তিব্বতীয় দস্যুদলের অধিকারভুক্ত। তাহারাই সেখানে রাজত্ব করিতেছে। লিটাং রাজবংশের অধীনতায় কঙ্কালিং ও হিয়াংচেং অঞ্চলে সর্দ্দারগণ শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেন। কিন্তু চীন সরকার সে বংশকে ধ্বংস করার পর সমগ্র অঞ্চলই দস্যুদিগের অধিকৃত।

চীন সেনাদলের আগমনে উল্লিখিত অঞ্চলের তিব্বতীরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিল। কারণ, এই সুযোগে তাহারা অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইবার সুযোগ পাইয়াছিল। তাহারা চীনা বারিক আক্রমণ করিয়া সংখ্যায় অল্প সৈনিকের প্রাণ বধ করিত এবং তাহাদের বন্দুক, পিস্তল, কামান, গোলা-গুলী, বারুদ প্রভৃতি লুণ্ঠন করিয়া লইত। কিছু দিন পরে মুলিরাজ তাহাদের নিকট হইতে দুইটি কামান ক্রয় করিয়া লইয়াছিলেন। অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া এখন দস্যুদল দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছে।

কোপাটীমঠের ভজনাগার

চাও-এর-ফেং যখন অধিকৃত অঞ্চলে এক এক জন ম্যাজিষ্ট্রেট বা হাকিম নিযুক্ত করেন, তখন তিব্বতীরা তাঁহাদিগকে নির্ব্বোধ লোক বলিয়া বিশেষ গ্রাহ্য করিত না; সুতরাং প্রথমতঃ তিব্বতীরা তাঁহাদিগের প্রতি কোন প্রকার অত্যাচারও করিত না। বিশেষতঃ উল্লিখিত হাকিমরা ঠিক তাহাদের মধ্যে বাস করিতেন না। সীমান্ত অঞ্চলে তাঁহাদের বাসভবন ছিল ইদানীং কোনও পরগণায়
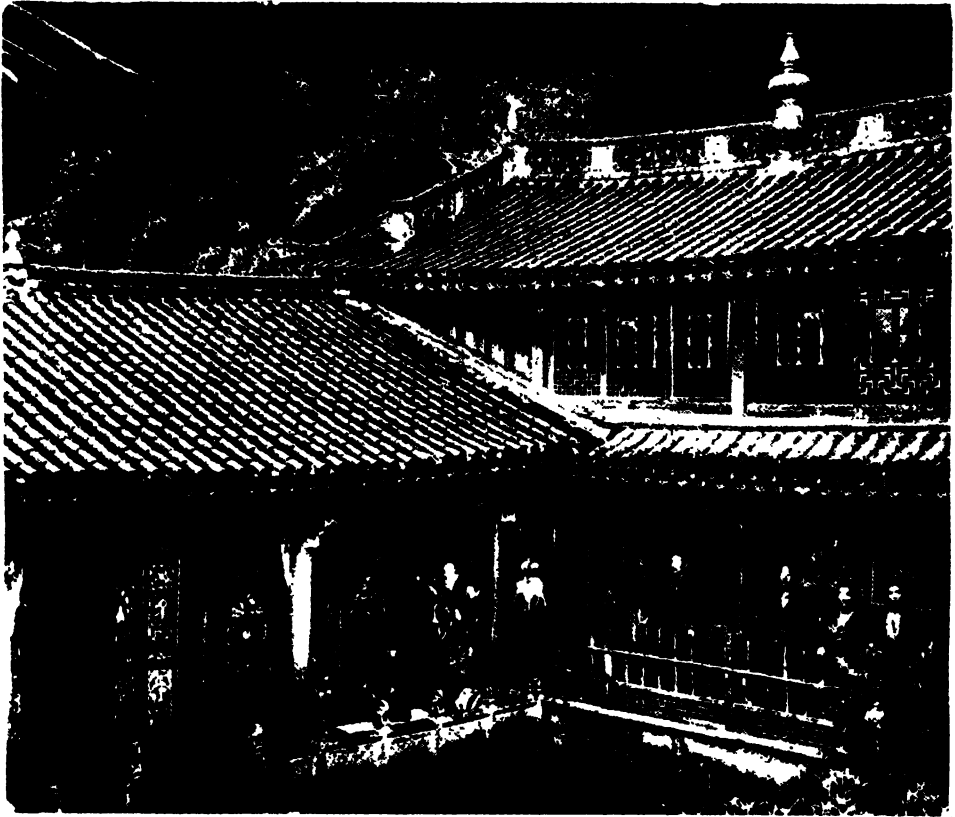
কোপাটীমঠের অভ্যন্তরভাগ

লা কার্ঙিং মঠ

...র কোনও হাকিম বাস করেন না। কারণ, দস্যুদল ...ক জন হাকিমের বিনা কারণে প্রাণবধ করায় নবনিযুক্ত হাকিম প্রাণভয়ে স্থানত্যাগ করিয়াছেন

কঙ্কালিং অঞ্চলের ন্যায় হিয়াংচেং অঞ্চলও এখন স্বাধীন। চীনসরকারের অধীনতা তাহারা স্বীকার করে না। শশাটিঙ্গা নামক জনৈক দস্যু এখন কর্ত্তা হইয়া ত্যাংপিলিং মঠে বাস

করিতেছে। অন্যান্য দস্যুসর্দ্দার তাহার সহকারী হইয়া সমগ্র অঞ্চল শাসন করিতেছে। সকলে মিলিয়া লুণ্ঠন ও হত্যাকার্য্যে নিযুক্ত থাকে। অধিকারসীমার বাহিরে গিয়াও তাহারা সার্থবাহগণকে আক্রমণ করে। যে সকল স্থানে নর-নারী শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করিতেছে, তাহাদের গ্রামে গিয়াও লুণ্ঠন ও হত্যাকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। কোনও চীনা কঙ্কালিং অথবা তিয়াংচেং অঞ্চলে প্রবেশ করিতে সাহসী নহে।

চীন সরকার লিটাং রাজবংশ ধ্বংস করার ফলেই বিশ বৎসরাধিক কাল ধরিয়া উক্ত অঞ্চলে অরাজকতার বীভৎস লীলা প্রকটিত হইতেছে, তিব্বত ও চীনের মধ্যে বাটাং ও লিটাং-টাটসিয়েন্‌লু পথে সর্ব্ববিধ ব্যবসা-ব্যাণিজ্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে। লিটাং-বাটাংএর পথে কোনও ব্যক্তি যদি নিরাপদে যাইতে চাহেন, তবে তিব্বতী দস্যুদলের সহিত পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাকে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

সো-চাউ উপত্যকার ওয়াটীগ্রাম

কঙ্কালিং প্রদেশ তিনটি পরগণায় বিভক্ত। প্রত্যেক পরগণায় এক জন করিয়া 'বেসি' বা মোড়ল আছে। সেই ব্যক্তিই পরগণা শাসন করিয়া থাকে। তিনটি পরগণার নাম, 'বনজুবেসি', 'রেমবেসি' ও 'টনাইবেসি'। শেষোক্ত পরগণাটি মুলিরাজ্যের সীমান্তপ্রদেশে লণ্ডা নদীর ধারে অবস্থিত।

উল্লিখিত তিনটি স্থানের মোড়লদিগের উপর যে তিব্বতী সর্দ্দার আধিপত্য করিতেছেন, তিনি হিয়াংচেং দস্যুদলের সর্দ্দার ড্রাসেট্‌সংপেন্‌এর অধীন। এই দস্যু-সর্দ্দার উত্তর-উনানের চংটিয়েন্‌ মঠের লামা ছিলেন। ধর্ম্মযাজকের পেশা পরিত্যাগ করিয়া ইনি ইদানীং দস্যুদিগের অধিনায়কত্ব করিতেছেন। কঙ্কালিঙ্গের ইনিই এখন সর্ব্বশক্তিমান শাসক।

ড্রাসেট্‌সংপেন্‌এর দ্বারা পরিচালিত দস্যুদল চতুর্দ্দিকে লুণ্ঠন করিয়া বেড়ায়। টাটসিয়েনলু হইতে উনানের দক্ষিণভাগে অবস্থিত লিকিয়াঙ্গের মধ্যবর্ত্তী বিস্তীর্ণ ভূভাগে কোনও সার্থবাহ দলকে দেখিতে পাইলেই ইহারা তাহাদিগের উপর আপতিত হইয়া সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া থাকে। ড্রাসেট্‌সংপেনএর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহোসান্‌ বণিকবেশে ভ্রাতার লুণ্ঠিত দ্রব্যসম্ভার বিক্রয় করিয়া থাকেন। মিঃ রক্‌এর সহিত মহোসানের একবার দেখা হইয়াছিল।
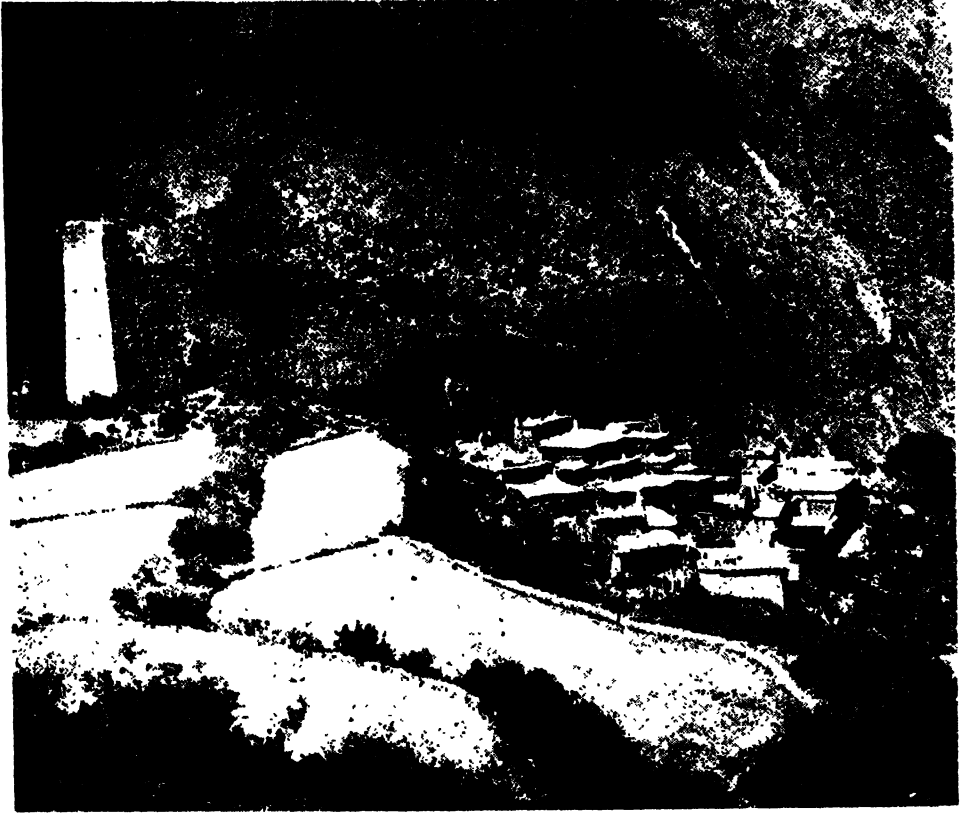
ড্রাসেট্‌সংপেন্‌এর অধীনে ছয় সাত শত দস্যু থাকে।

ইহারা অশ্বারোহী বন্দুকধারী দস্যু। ইহাদের প্রতাপে পার্শ্ববর্ত্তী জনপদের নিরীহ জনগণ সর্ব্বদাই শঙ্কিতচিত্তে কালযাপন করিয়া থাকে। লিকিয়াংএর মত বৃহৎ নগরকেও আক্রমণ করিতে ইহারা পশ্চাৎপদ হয় না। মুলিরাজের সহিত ড্রাসেট্‌সংপেন্‌এর বন্ধুত্ব আছে। এজন্য তাঁহার অধিকৃত প্রদেশের রাজপথ দিয়া দস্যুসর্দ্দার গমনাগমন করিয়া থাকেন। মুলিরাজ্যের মধ্য দিয়া দস্যুসর্দ্দার মাঝে

সো-চাউ নদীর উপর সেতু

মাঝে ইয়ংনিং এবং হ্লাহীন্ সম্প্রদায়কেও আক্রমণ করিয়া থাকেন। জেচওয়ান্‌এর সোসো এবং চিয়েন্‌সো সর্দ্দারদিগের অধিকার-সীমাও মাঝে মাঝে আক্রান্ত হইয়া থাকে। বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া অবাধ লুণ্ঠনের ফলে এই দস্যুদলের গতি এমনই দুর্ব্বার ও দস্যুদল এমনই শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে যে, চীনসরকার এখন ইহাদিগকে দমন করিতে অসমর্থ।

মিঃ রক্ যখন তিনটি পবিত্র পর্ব্বতশৃঙ্গ পরিদর্শনের জন্য যাত্রার উদ্যোগ করিতেছিলেন, তখন টনাইবেসির দস্যুরা সহায়হীন সোসো অঞ্চলের অধিবাসীদিগের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য দৃঢ়সংকল্প হইয়া উঠিয়াছে। এই প্রতিশোধ-স্পৃহার মূলে কিন্তু কোনও সত্য ছিল না। সম্পূর্ণ কাল্পনিক অভিযোগের উপর ভিত্তি করিয়া এই প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিয়াছিল। জনৈক তথাকথিত জীয়ন্ত বুদ্ধ টনাইবেসির লোক ছিলেন। তিনি সোসো অঞ্চলে বসবাস করিতে থাকেন। কালক্রমে স্বাভাবিকভাবে তিনি দেহরক্ষা করেন। কিন্তু কঙ্কালিং অঞ্চলের দস্যুদলের সোসো অঞ্চল লুণ্ঠিত করিবার অভিপ্রায়ে রটনা করিয়াছিল যে, সোসোর অধিবাসীরা উক্ত জীয়ন্ত বুদ্ধের ঐশ্বর্য্যলোভে তাহাকে হত্যা করিয়াছে। এই একই অজুহাতে ইহা তাহাদের দ্বিতীয় আক্রমণ মুলিরাজ দস্যুদলকে তাঁহার অধিকারসীমার মধ্যস্থ পথ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। ইয়ংনিং সর্দ্দারও ভয়ে ভয়ে তাঁহার অধিকারসীমার মধ্য দিয়া দস্যুদলকে গমনাগমনের পথ ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইয়াছিলেন। মুলিরাজ অবশ্য ভয়ে এ কার্য্য করিতে সম্মত হন নাই —বন্ধুত্বের খাতিরেই বটে এবং কিছু লাভের আশাও ছিল।

অভিযানকারীরা যখন পবিত্র পর্ব্বতমালার অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন, টনাইবেসির দস্যুদল তখন সোসো

অঞ্চল অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। সো-চাউ নদী উত্তীর্ণ হইয়া তাহার সেতুরক্ষার জন্য ৫০ জন দস্যুকে রাখিয়া গিয়াছিল। কারণ, প্রত্যাবর্ত্তনকালে এই সেতুর উপর দিয়াই তাহাদিগকে স্বরাজ্যে পৌঁছিতে হইবে। মিঃ রক্ সংবাদ পাইলেন যে, সোসো সর্দ্দারের বাসভবন ও একটি পল্লী ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে। দস্যুদল অসংখ্য যাক্, মেষ, গৃহপালিত অন্যান্য পশু, অশ্ব ও অশ্বতর লুণ্ঠন করিয়া আনিয়াছে। উল্লিখিত লুণ্ঠিত সম্পদ কঙ্কালিঙ্গ দস্যুদল দুর্ভেদ্য পর্ব্বত-রাজ্যে আনয়ন করিয়া জয়োল্লাসে মত্ত। ইয়ংসিং অঞ্চলের অধিবাসীরা দুই চারিটি পরিভ্রষ্ট মেষকে দেখিতে পাইয়া ধরিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু দস্যুদিগকে প্রত্যর্পণ করিতে সরল গ্রামবাসীরা কর্ত্তব্য মনে করিতে পারে নাই।

টনাইবেসির অধিবাসীরা এই সংবাদ পাইয়া ক্রোধে উন্মত্ত হইল। তাহাদের লুণ্ঠিত দ্রব্যে লোভ? দণ্ডস্বরূপ তাহারা ১০টি যাক্ দাবী করিয়া বসিল। ইহা না দিলে ইয়ংসিং-এর একটি প্রাণীরও রক্ষা নাই। নর, নারী, বালক, বৃদ্ধ সকলকেই মরিতে হইবে—সমগ্র অঞ্চল পুড়াইয়া দেওয়া হইবে।

মুলিরাজ ইয়ংসিং রাজ্য অপেক্ষা অনেক শক্তিশালী এবং ধর্ম্মজগতে তাঁহার প্রতিষ্ঠা ও সুনাম আছে; সুতরাং তাঁহার

টুরু গ্রাম

গাকর অধিবাসিগণ

আক্রমণ হইতে তাঁহার রাজ্য আক্রান্ত হইবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু মিঃ রক সদলবলে মুলিরাজ্যের অন্তর্গত উয়াসিগ্রাম অতিক্রম করিবার পর দস্যুদল সৌ-চাউ নদীর উপরিস্থিত কাষ্ঠের সেতু ভাঙ্গিয়া দিয়া, গ্রামের তিব্বতীদিগকে হত্যা করিয়া গ্রামখানিকে পুড়াইয়া দিয়াছিল।

মুলিরাজের রাজ্যসীমার কোনও অধিবাসী দেশত্যাগের অধিকারী নহে। এমন কি, কোনও চীনা যদি সপরিবারে এক বৎসরকাল মুলিরাজ্যে বসবাস করে, তবে তাহাকে রাজার প্রজা বলিয়া ধরা হয় এবং তাহার পক্ষে সে দেশ ত্যাগ করা অসম্ভব। মুলি-সীমান্তপ্রদেশ অতিক্রম করার অধিকার হইতে সে বঞ্চিত চাষীদিগের মধ্যে পরস্পর পরস্পরের সম্বন্ধে গোয়েন্দাগিরি করিয়া থাকে। সুতরাং একবার যে মুলিরাজ্যের প্রজা বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহাকে রাজা ও লামাগণের পদপ্রান্তে চিরদিনের জন্য দাসখত লিখিয়া দিতে হইবে।

এইরূপ অবস্থায় কোন মানুষেরই হৃদয়ে সাহস থাকিতে পারে না—যুদ্ধপ্রবৃত্তি প্রবল হইবার আদৌ অবকাশ পায় না। কাযেই সেনাদল-গঠনে এইরকম প্রজা সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। মুলিরাজ এজন্য গারুপল্লীর তিব্বতী প্রভাবর্গের মধ্য

ধনবতী ক্ষীচীন-তরুণী

রাজ্যমধ্যস্থ পথ-সমূহ ব্যবহার করার ফলে দস্যুদল তাঁহাকে ধনের কিছু অংশও প্রদান করিয়াছিল। এজন্য দস্যুদলের
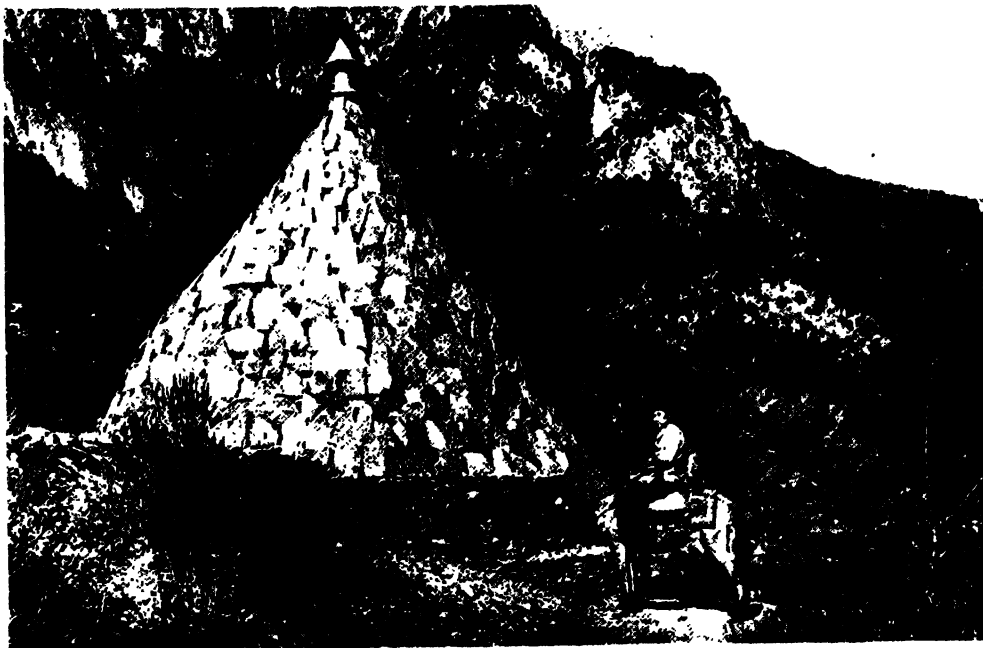
পাহাড়ের উপর ধর্ম্মগ্রন্থ মন্দির

হইতে সেনাদল গঠন করিয়া থাকেন। গারু অঞ্চল কঙ্কালিঙ্গের সীমান্তে অবস্থিত। গারুরা অসীম সাহসসম্পন্ন জাতি। উহারা কঙ্কালিঙ্গের দস্যুদলের প্রতিবেশীও বটে। এক সময়ে গারুরা এমন দুর্বিনীত হইয়া উঠিয়াছিল যে, মুলিমঠ আক্রমণ করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই।

বর্ত্তমান রাজার দুর্জ্জয় সাহস। তিনি কয়েক জন গারুবাসী তিব্বতীর মুণ্ডচ্ছেদ করেন এবং সাত জনের জানুর নিম্নভাগে এমনভাবে ক্ষত করিয়া দেন যে, সারাজীবনের জন্য তাহারা গতিশক্তিবিহীন হইয়া পড়িয়াছিল। গারুর

ভারবাহী যাক্

অধিবাসীরা মাঝে মাঝে কঙ্কালিঙ্গ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া লুণ্ঠনাদি কার্য্যও করিয়া থাকে।

এইরূপ ভীষণ প্রদেশে মিঃ রক্ অভিযানোদ্দেশে গমন করিতেছিলেন। দস্যুরাজা ড্রাসেট্‌সংপেনের সহিত মুলিরাজের মিত্রতা হেতু, মুলিরাজ কঙ্কালিঙ্গের প্রসিদ্ধ দস্যুসর্দ্দারদিগের নিকট পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। ড্রাসেট্‌সংপেনকেও তিনি বিশেষভাবে লিখিয়া দিয়াছিলেন যে, মার্কিণ পর্য্যটকগণ কঙ্কারিসুমগংরায় যাইবেন—পবিত্র পর্ব্বতশৃঙ্গগুলির পরিক্রমাকার্য্যে যেন তাঁহাদের কোনপ্রকার বিঘ্ন না ঘটে। কোনও দস্যুই যেন এই সকল ভদ্রলোক আক্রমণ না করে।

মিঃ রক্ অতঃপর কঙ্কালিঙ্গ অভিমুখে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হন। মুলিরাজ তাঁহাকে আশ্বাস দেন যে, তাঁহাদের কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। তাঁহারা অনায়াসে পর্ব্বত পরিক্রমণ করিতে পারিবেন। তবে পর্ব্বতের পশ্চিমাঞ্চলে যেন তাঁহারা অধিক সময় যাপন না করেন। বিশেষতঃ কঙ্কাগি মঠকে যথাসম্ভব পরিহার করিয়া যেন চলেন। উক্ত কঙ্কা পর্ব্বত হইতে পশ্চিমদিকে কয়েক দিনের পথ দূরে অবস্থিত। কঙ্কালিঙ্গের অর্থ "তুষারকিরীটী পার্ব্বত্য মঠ" এই মঠে ৪ শত সন্ন্যাসী বাস করে; তাহারা লুণ্ঠনের জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত। ইহারা লুণ্ঠনজনিত পাপের পর ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া পাপ-লাঘবের চেষ্টা করে।

দস্যুসর্দ্দারদিগের নিকট মুলিরাজের পত্র যে পর্য্যন্ত না পৌছায়, তত দিন মিঃ রক্ পর্ব্বতরাজ্যে প্রবেশ করিতে বিলম্ব করিতেছিলেন। এজন্য কোপাটী মঠ হইতে রাজার সহিত তিনি সদলবলে ডাগো যাত্রা করেন। রাজার শ্যালক এবং সেনাপতি তথায় অবস্থান করিয়া থাকেন।

...ঃ চ্যাঙ্গ এই সেনাপতির নাম। পূর্ব্বে তিনি দস্যুদলে ... করিতেন। পরে রাজার সহিত মধুর সম্বন্ধ জন্মিলে ...কে সেনাপতিপদে নিযুক্ত করা হয়। লোকটির সাহস ...এক।

...ই জুন তারিখে তাঁহারা ৩৬টি অশ্বতর ও অশ্ব, ২১ ... নাসি সৈনিক সহ পর্ব্বতরাজ্যাভিমুখে অগ্রসর হন। মুলি-...র প্রধান সন্ন্যাসী এক জন সৈনিক পুরুষ। রাজা ...াকে অভিযানকারীদিগের রক্ষক হিসাবে সঙ্গে প্রেরণ ...েন। স্থানীয় অভিজ্ঞতা ইঁহার সমধিক ছিল।

সৌ-চাউএর উৎপত্তিস্থান কঙ্কালিঙ্গ পর্ব্বতমালা নহে। এখান হইতে উত্তরে আরও ১১ দিনের পথ গেলে, হিয়াংচেং অঞ্চলে এই নদীর উৎপত্তিস্থান দেখিতে পাওয়া যাইবে। তবে অনেকগুলি শাখা-নদী কঙ্কালিঙ্গ অদ্রিমালা হইতে নির্গত হইয়া সৌ-চাউতে পড়িয়াছে। সে সকল নদীর নাম রেন্‌চু, টন্‌চু এবং কঙ্কাচু।

সৌ-চাউ নদী যে খাতের মধ্য দিয়া প্রবাহিত, মিঃ রক সে স্থানের অত্যধিক উত্তাপের কথা বিবৃত করিয়াছেন। অথচ উপরের বনভূমির শৈত্য তাহার তুলনায় অধিক।

মিঃ রক ও তাঁহার রক্ষিবর্গ

প্রথমতঃ তাঁহারা মিটজুনা পর্ব্বতাভিমুখে গমন করেন। ...ই পর্ব্বতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মুলিদিগের উপাস্য দেবতা। ...দঞ্চলে প্রচুর রোডোডেনড্রন পুষ্পের বৃক্ষ আছে; দেব-...রুর সংখ্যা নাই। এখানকার দৃশ্য মনোরম ও উপভোগ্য।

অভিযানকারীরা ক্রমশঃ সৌ-চাউ উপত্যকাভূমিতে প্রবেশ করেন। এই নদীর অপর নাম লৌহ নদী। কঙ্কালিঙ্গ পর্ব্বতমালার পাদদেশ ধৌত করিয়া ইহা প্রবাহিত হইতেছে। শৈলশৃঙ্গের ১০ হাজার ৬ শত ফুট নিম্নদেশে এই নদীর স্রোতোধারা—পর্ব্বতশিরে তুষারস্তূপ ও তুষারনদী। মুলিরাজ্যের প্রজা হিফান্ সম্প্রদায় সৌ-চাউ উপত্যকাভূমিতে গমন করে না। সেখানে সুহিন সম্প্রদায় বসবাস করে। ইহারা নাসি জাতি হইতে উদ্ভূত। ইহাদের ভাষাও স্বতন্ত্র —হিফান ও তিব্বতী ভাষার সংমিশ্রণজাত। এ ভাষা হিফান, তিব্বতী ও নাসি জাতির লোকরা বুঝিতে পারে না।

অভিযানকারীরা যাত্রাপথে নানাজাতীয় পুষ্প দেখিতে পাইয়াছিলেন। তবে এক জাতীয় মক্ষিকার দংশনজ্বালায় তাঁহাদিগকে দ্রুত পলায়নতৎপর করিতে হইয়াছিল—

নিসর্গ-শোভা দেখিয়া আনন্দানুভবের জন্য কালক্ষেপ করিতে পারেন নাই।

সৌ-চাউ উপত্যকাভূমি স্বর্ণের আকর। মুটিয়েন্‌ভয়াং নামক প্রসিদ্ধ নাসিরাজ কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বে এইখানে স্বর্ণখনি আবিষ্কার করেন। স্থানীয়রা এখন স্বর্ণ খনন ও ধৌত-কার্য্য করিয়া থাকে।

উপত্যকাভূমির নিম্নস্থ অঞ্চলের নাম লামা। কতিপয় গ্রাম এখানে বিরাজিত। প্রত্যেক গ্রামে একটি করিয়া উচ্চ ঘাঁটি বা পর্য্যবেক্ষণস্তম্ভ আছে। প্রাচীন যুগে নাসি-নৃপতিগণ সকলেই কঙ্কালিঙ্গ দস্যু-অধ্যুষিত রহস্যময় পর্ব্বতরাজ্য দর্শনের জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাসি রক্ষিগণ বহুকাল ধরিয়া মিঃ রকের সহিত নানা দুর্গম স্থানে গমন করিয়াছিল, এ ক্ষেত্রেও তাহারা উৎসাহভরে অগ্রসর হইল। একবার ৬ শত চীনা দস্যুর সম্মুখে মিঃ রক পড়িয়াছিলেন; কিন্তু এই বীর ও নির্ভীক নাসি সৈনিকগণ তাহাতে বিন্দুমাত্র শঙ্কা বা অধীরতা প্রকাশ করে নাই তিনি তাহাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকেন। আর একবারও ১৮জন তিব্বতী দস্যুকে এই নাসি সৈনিকগণ
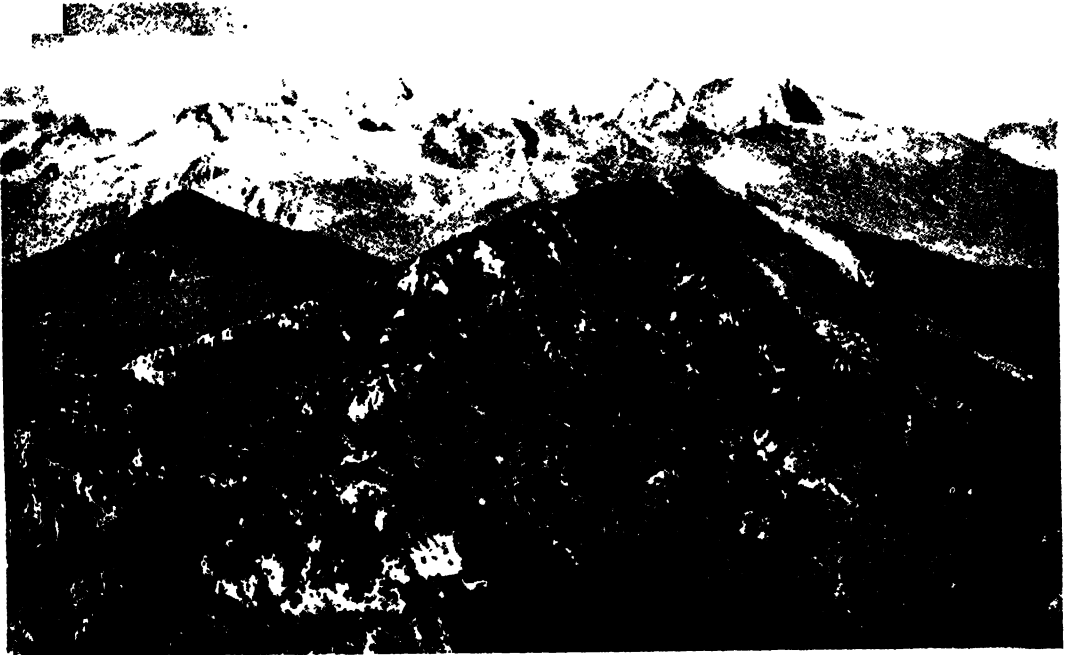
উহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। গ্রামের গৃহগুলি পরস্পর ঘন-সন্নিবিষ্ট। একটির ছাদে উঠিয়া সমগ্র পল্লীর ছাদে ছাদে বিচরণ করা যায়। স্থানে স্থানে বৃহৎ শিলাখণ্ড দেখিতে পাওয়া যাইবে। তাহাতে ক্ষোদিত আছে—"ওম্ মণিপদ্মে হুম্।"

গ্রামগুলির শেষ প্রান্তে সৌ-চাউ নদীর তটভূমির উপরিভাগে কানারাদ্‌জা মঠ অবস্থিত। মঠটি পীতবর্ণের, দেখিতে ক্ষুদ্র। ২০ জন সন্ন্যাসী এখানে থাকেন।

অভিযানকারীরা ইহার পর যে স্থানে প্রবেশ করিলেন, কোনও শ্বেতকায় সেখানে কখনও পদার্পণ করেন নাই। মুহূর্ত্তমধ্যে নিরস্ত্র করিয়া ফেলিয়াছিল। বর্ত্তমান ব্যাপারেও তাহাদের সাহস ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শনের আর একটা সুযোগ আসিয়া উপস্থিত।

মুলি সন্ন্যাসীটি কিন্তু অগ্রগমনের সঙ্গে সঙ্গে শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছিলেন। মিঃ রক বুঝিতে পারিতেছিলেন যে, সন্ন্যাসী তাঁহার অনুগামী হইয়া সুবুদ্ধির কায করেন নাই, এমন ভাব মাঝে মাঝে প্রকাশ করিতেছিলেন।

অভিযানকারীরা ক্রমে কঙ্কা-চু নামক নদীর তীরে উপনীত হইলেন। চানাদরদ্‌জি নামক পর্ব্বতের তুষার-নদী

হইতে এই নদীর উদ্ভব। সঙ্কীর্ণ গিরিবর্ত্ম পার হইয়া ক্রমশঃ তাঁহারা গারু নামক তিব্বতী পল্লীতে উপনীত হইলেন।

তাঁহারা দেখিলেন, এই পল্লীর অধিবাসীরা তাঁহাদিগকে অগ্রাহ্যভরে স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত হইল। অভিযানকারীদিগকে তেমন সমাদরে অভ্যর্থনা করিল না। কঙ্কালিঙ্গ দস্যুদের সহিত ইহাদের আত্মীয়তা আছে। মুলি লামা তাহাদিগকে দেখিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন।

গারুর অধিবাসীরা দীর্ঘাকার এবং বলিষ্ঠ। তাহাদের মনে শঙ্কার চিহ্নমাত্র নাই। গারুসর্দ্দারের গৃহের সান্নিধ্যেই তাহারা স্বীকার করিল যে, মুলিরাজ ২০ জন গারুকে অভিযানকারীদিগের সাহায্যার্থ অনুগমন করিতে আদেশ করিয়াছেন সত্য; কিন্তু তাহাতে মিঃ রকের জীবনরক্ষা সম্ভবপর নহে বলিয়াই তাহাদের বিশ্বাস। সুতরাং যাহাতে মিঃ রক আর অগ্রসর না হন, এজন্য তাহারা প্রতিবন্ধকতার কথা আলোচনা করিতে লাগিল।

লোকচরিত্রে মিঃ রকের বিশেষ অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল। তিনি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "আমি কি গারু রমণীগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া যাইব, না পুরুষরা আমার

চানাদরদজ্বির তুষার-নদী
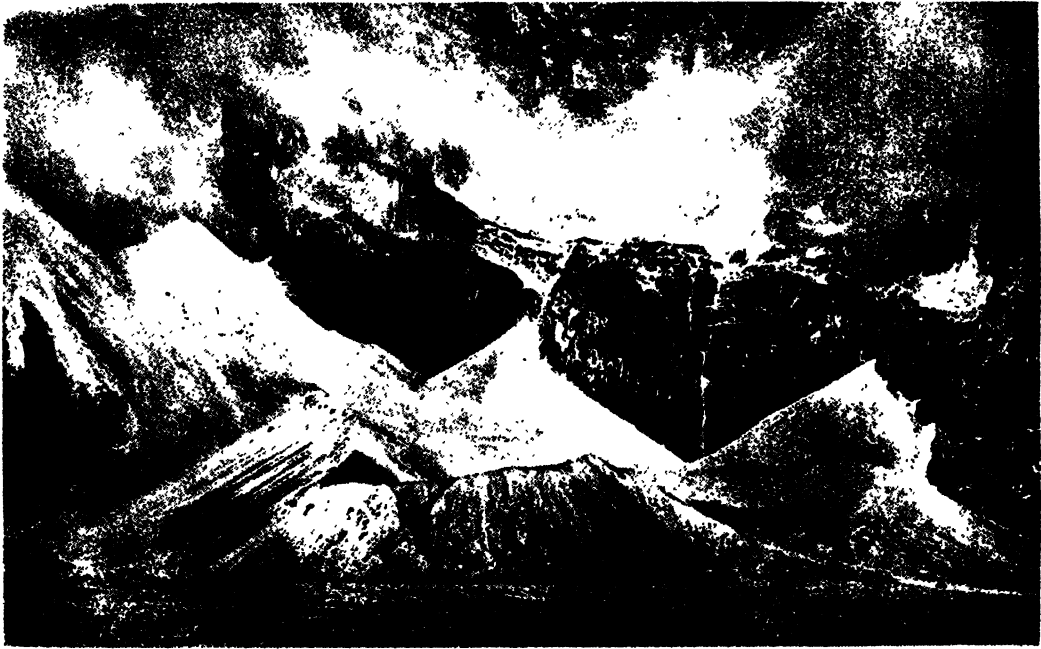
অভিযানকারীরা শিবির-সন্নিবেশ করিলেন। দস্যুসর্দ্দার সেটসংপেনএর জ্যেষ্ঠ সহোদর মিঃ রকের সহিত দেখা করিতে আসিলেন। গারুর বহুলোক অর্দ্ধচন্দ্রাকারে শিবিরের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। মিঃ রকের নাসি-সেনাদল সতর্কভাবে তাহাদের পশ্চাতে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

মিঃ রকের লামাদ্বিভাষী তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, এই পর্ব্বতপরিক্রমা-কার্য্যে গারুর অধিবাসীরা কোনও প্রকার দায়িত্ব লইতে অসমর্থ। কঙ্কালিঙ্গ দস্যুদলের উৎপাতে তাহারাই পুণ্যকার্য্য হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে।

অনুগমন করিবে?" এই বলিয়া তিনি মুলিরাজকে চিঠি লিখিলেন যে, লামা ও গারুরা এমনই ভীরু যে, তাঁহার অনুগমন করিতে সাহসী নহে। এই বলিয়া তিনি লিখিত পত্র এক জন বাহকের মারফত মুলিরাজকে প্রেরণ করিলেন। ইহাতে শুভফল দেখা দিল। গারুরা উৎসাহে গর্জ্জিয়া উঠিল। কি, তাহারা কাপুরুষ? না, প্রাণ গেলেও তাহারা মার্কিণ ভদ্রলোকের অনুগমন করিবেই।

পত্র লইয়া যে ব্যক্তি রওনা হইয়াছিল, উহারা তাহাকে ফিরাইয়া আনিল। গারুদিগের উপদেশ অনুসারে নিতান্ত

প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ব্যতীত অন্য সকল প্রকার বস্তুই গারুতে রাখিয়া মিঃ রক যাত্রার আয়োজন করিলেন। গারু সৈনিকগণ বন্দুকসহ অশ্বারোহণ করিল।

গারুমঠ হইতে যাত্রা করিয়া তাঁহারা কঙ্কালিঙ্গের দিকে অগ্রসর হইলেন। গভীর অরণ্যসমাকুল পথে অগ্রসর হওয়া সহজসাধ্য নহে। তাঁহাদের গতিবেগ হ্রাস হইল। অরণ্যমধ্যে বড় বড় বৃক্ষ ভূতলশায়ী হইয়া রহিয়াছে—যেন প্রচণ্ড ঝটিকা তাহাদিগকে উন্মূলিত করিয়া দিয়াছে। মিঃ রক অবশেষে জানিতে পারিলেন যে, গারুরা এই সকল বৃক্ষ উন্মূলিত করিয়া কঙ্কালিঙ্গ দস্যুদিগের সহসা আক্রমণ প্রতিহত করিবার আয়োজন করিয়া রাখিয়াছে।

একটি দুর্গম গিরিবর্ত্ম পার হইয়া তাঁহারা চানাদরদ্জি পর্ব্বতাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ১৫ হাজার ৩ শত ফুট উচ্চ স্থানে তাঁহারা শিবির-সন্নিবেশ করিয়া তথা হইতে কঙ্কালিঙ্গের অন্য শৃঙ্গগুলি দেখিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু মিঃ রকের সে আশা তখন পূর্ণ হইল না। সে দিনের মত তাঁহারা ঐখানেই যাপন করিলেন।

পর্ব্বতপরিক্রমা-ব্যাপারে দক্ষিণদিক হইতে আরম্ভ করিয়া বামে যাইতে হয়; ইহাই প্রাচ্য ব্যবস্থা। মিঃ রকের উদ্দেশ্য, প্রত্যেক দর্শনীয় বস্তুর আলোকচিত্র সং... অভিযানকারীদিগের পথিপ্রদর্শক মিঃ রককে ব... দিয়াছিল যে, কঙ্কালিঙ্গ অধিবাসীরা কোনও পশুপক্ষী... প্রাণনাশ করিতে দেয় না। গুলী করিয়া পাখী শি... তাহারা আদৌ পছন্দ করে না। অথচ মানুষের, বিশে... পুণ্যকামী তীর্থযাত্রীর প্রাণনাশে তাহাদের কুণ্ঠা নাই!

মুলিলামার মন হইতে দস্যুভীতি অন্তর্হিত হয় না; সুতরাং তিনি অভিযানকারীদিগকে ভিন্নপথে পরিচালি... করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। তিনি মিঃ রককে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন যে, পবিত্র পর্ব্বতের দর্শন পাইবার পর প্রত্যাবর্ত্তন সঙ্গত। পর্ব্বতপরিক্রমার প্রয়োজন কি? এইজন্য পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট পথে যাহাতে তিনি গমন না করেন, তাহারই চেষ্টায় মুলি সন্ন্যাসী ভিন্নদিকে দলবলকে পাঠাইয়া দিলেন। মিঃ রক যখন জানিতে পারিলেন যে, পশ্চিম-দিকের পরিবর্ত্তে তাঁহার অনুচরগণ উত্তরদিকে গিয়াছে, তখন তিনি মুলি-লামাকে তাহাদের গতি-পরিবর্ত্তনের জন্য পাঠাইয়া দিলেন। চানাদরদ্জির তুষার-নদীর

বামে জাম্বেয়াঙ্গ শিবির, দক্ষিণে সেনরেজিস্

... শিঙ্গারায় তাহাদিগকে মিলিত হইবার আদেশ ...লেন।

...ল্লখিত তুষার-নদীর পূর্ব্বভাগ মুলিরাজ্যের অন্তর্গত ... ও কোনও মুলিপ্রজা কঙ্কালিঙ্গ দস্যুদলের ভয়ে যাকদলকে ...নে বিচরণের জন্য লইয়া আসিতে সাহস করে না। মিঃ ...র বাহিনী অপরাহ্ণকালে শিঙ্গারায় ফিরিয়া আসিল।

...রদিবস মিঃ রক শিঙ্গারা উপত্যকা-ভূমির শিরোদেশ ...বিষ্কার করিলেন। অভিযানকারীরা দ্বিপ্রহরে বিশ্রামের জন্য সাইওকাটসো নামক উপত্যকা-ভূমিতে অবস্থান হইল। এতদঞ্চলে গুলীর শব্দ হইলেই লোক বুঝিতে পারে, কাহারও ইহলীলা সাঙ্গ হইয়া গেল। মিঃ রক যে পারাবতের জন্য গুলী-বারুদ অপব্যয় করিলেন, ইহা সে দেশের লোকের কল্পনাতীত।

অতঃপর অভিযানকারীদিগের পক্ষে পর্ব্বতের চারি পার্শ্বে গমন করা দুরূহ হইয়া উঠিল। যাকা গিরিসঙ্কট অতিক্রম করিবার পর মুষলধারে বর্ষণ আরম্ভ হইল। পথের রেখা কোথাও দেখা গেল না। অবিশ্রান্ত বারিপাতে পথ পিচ্ছিল হইয়া উঠিল।

কুলু মঠ

...রিলেন। দুইটি পর্ব্বতশৃঙ্গের মধ্যস্থানে এই উপত্যকা-ভূমি বিরাজিত। এই দুইটি শৃঙ্গকে তিব্বতীরা ধনদেবতা কুবেরের নামানুসারে ডাম্‌বালা বলিয়া ডাকিয়া থাকে।

শিঙ্গারায় মিঃ রক গুলী করিয়া কয়েকটি দেশীয় পারাবত শিকার করেন। গুলীর শব্দ শুনিয়া দুই জন কঙ্কালিঙ্গ তিব্বতী বৃক্ষান্তরালে আত্মগোপন করিতেছে, ইহা মিঃ রক দেখিতে পাইলেন। তাহাদিগকে আহ্বান করিলে, তাহাদের পশ্চাতে কয়েক জন নারীও শঙ্কিতভাবে উপস্থিত

পর্ব্বতরাজ্যে প্রবেশ করিবার পর প্রথম দিন অপরাহ্ণ-কালে তাঁহারা কঙ্কালিঙ্গ পর্ব্বতমালার সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ জাম্বে-য়াঙ্গের দক্ষিণপূর্ব্বদিকস্থ ঢালু ভূমিতে শিবিরসন্নিবেশ করেন। কঙ্কালিঙ্গ পর্ব্বতমালার তিনটি শৃঙ্গের নাম, সেনরেজিন্‌, চানাদরদজি ও জাম্বেয়াঙ্গ। প্রথমোক্ত দুইটির উচ্চতা ২০ হাজার ফুট। জাম্বেয়াঙ্গের উচ্চতা ২০ হাজার ফুটের অধিক।

বৃষ্টিপাত থামিল না। মিঃ রক সদলবলে বারিপাতের মধ্যেই পরিক্রমা সুরু করিলেন। পরদিবস রাত্রিতে

জাম্বেয়াঙ্গ পর্ব্বতের তুষার-নদীর পাদদেশে একটি স্থান মনোনীত করিয়া শিবিরসন্নিবেশ করেন। এখানে অতি অপূর্ব্বদর্শন পার্ব্বত্য কুসুমনিচয় দেখিয়া মিঃ রক বিস্মিত হন। তাঁহাদের পথিপ্রদর্শক লামা ও প্রধান রক্ষক জাম্বেয়াঙ্গ পর্ব্বতশৃঙ্গের একটি গুহার মত স্থান দেখিয়া তথায় প্রবেশ করেন। মিঃ রক অবগত হইলেন যে, এইখানে তীর্থযাত্রীরা পরিক্রমার সময় বিশ্রাম করিয়া থাকে—ইহা তীর্থস্থানের মত পবিত্র। দস্যুরাও এই আশ্রয়স্থানে আত্মগোপন করিয়া মানুষকে আক্রমণ করিয়া থাকে। রাত্রিকালে মিঃ রক ও

মিঃ রককে দেখিয়া দস্যু-দলপতি শিরোভূষণ উন্মো… করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন এবং সন্নিহিত শিলা… উপর উপবেশন করিতে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। দস্যু… কিছু মাখন ও রুটী লইয়া মিঃ রককে আহার করিতে ব… তখন বৃষ্টিপাত হইতেছিল বলিয়া মিঃ রক দস্যু-সর্দ্দার তাঁহার ত্রিশ জন সশস্ত্র অনুচরের আলোকচিত্র গ্রহণ করি… পারেন নাই।

মিঃ রক কোথায় রাত্রিবাস করিতে বাসনা করে… জানিতে চাহিলে, তিনি ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখি…

ইয়ংনিং অঞ্চলে অভিযানকারীদের শিবির

তাঁহার অনুযাত্রিবর্গ পাষাণবৎ সুদৃঢ় তুষারস্তূপসমূহের পতনজনিত ভীম শব্দ শ্রবণ করিয়াও ছিলেন।

পরিক্রমাকালে অভিযানকারীদিগের সহিত দস্যু-সর্দ্দার ড্রাসেট্সংগপেনের সাক্ষাৎ হয়। তিনিও তখন পবিত্র পর্ব্বত প্রদক্ষিণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। বোধ হয়, সম্প্রতি তিনি নরহত্যা ও লুণ্ঠনজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ এই পুণ্যকর্ম্মে অবহিত হইয়া থাকিবেন। তাঁহার সহিত অনেকগুলি প্রসিদ্ধ দস্যুও ছিল। তাহাদের মুখাবয়বে দস্যুতা ও নরহত্যা প্রবৃত্তির ছায়া সুনিবিড়।

দস্যুসর্দ্দার স্বীয় বক্ষোদেশে দক্ষিণ কর রাখিয়া বলিলেন, "আপনার শঙ্কার কোন কারণ নাই। আমি সর্ব্বত্র ঘোষণা করিয়া দিয়াছি, কেহ আপনার কেশাগ্রও স্পর্শ করিবে না।" ইহার পর উভয়ের আর সাক্ষাৎ হয় নাই।

অতঃপর অভিযানকারীরা 'টনাইবেসি' অঞ্চলে শিবির-সন্নিবেশ করেন। এইখানে দস্যুদলের নিকৃষ্ট অংশের বাসভূমি। এতদঞ্চলে অনেকগুলি হ্রদ আছে। তন্মধ্যে যে হ্রদটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহা ১৫ হাজার ৫ শত ফুট উচ্চে অবস্থিত। জাম্বেয়াঙ্গ তুষার-নদী হইতেই এই হ্রদের কলেবর পরিপুষ্ট

টানাই অঞ্চলের কঙ্কালিঙ্গ সুন্দরী

মিঃ রকের রক্ষিসেনাদলের নায়ক

এই হ্রদের নাম রুস্থ-টো'। পবিত্র পর্ব্বত-পরিক্রমার পক্ষে এই অঞ্চলই অত্যন্ত বিপৎপূর্ণ।

লামা পথিপ্রদর্শক একটি বন্দুক বহন করিতেছিলেন। এখানে আসিয়া তিনি উহা রক্ষিদলের নায়কের হস্তে কম্পিতদেহে ফিরাইয়া দেন। পর্ব্বতসানুদেশে, একটি পাহাড়ের অন্তরালে কতিপয় তিব্বতীয়কে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন। তাহারা হ্রদের পার্শ্বে যে ভাবে দাঁড়াইয়াছিল, তাহাতে তাহারা অনায়াসে অভিযানকারীদিগের গতিরোধ

চানাদরদজির শিবির

জাম্বেয়াঙ্গ গিরিগাত্রে বৃহৎ পুষ্প

করিতে পারিত। উহারা তীর্থযাত্রী অথবা দস্যুদল, তাঁহারা তাহা জানিতে পারিলেন না। মিঃ রক্ অন্য দিক্ দিয়া পর্ব্বতের উপর আরোহণ করিতে লাগিলেন।

সেই দিন অপরাহ্লকালে সেঙ্গু গম্বা নামক একটি ক্ষুদ্র মঠে তাঁহাদের পৌঁছিবার কথা। এই মঠটি সেনুরেজিন শৃঙ্গের পাদদেশে অবস্থিত। এইখানে পৌঁছিতে গেলে তাঁহাদিগকে ১৬ হাজার ২ শত ফুট উচ্চ একটি ভীষণ গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করিতে হইবে। পাহাড়ের গা দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া পথ চূড়ার উপর উঠিয়াছে। তার পর একটি অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। উহা অতিক্রম করিয়া পর্ব্বতপ্রাচীরের পার্শ্বে একটি হ্রদ দেখিতে পাইলেন। উহার নাম ডুটুমুকোয়া। হ্রদের পার্শ্ব দিয়া চলিতে চলিতে ক্রমশঃ অবসন্নদেহে তাঁহারা সেঙ্গু গম্বা মঠে উপনীত হইলেন। বনুকোয়েনডি ও সিনুডজি নদীর মিলনস্থানের উপর অবস্থিত।

মঠে পৌঁছিবামাত্র একটি প্রস্তররচিত অট্টালিকায় তাঁহারা নীত হইলেন। দস্যু-সর্দ্দারের আদেশানুসারে অভিযানকারীদিগের অতিথিসৎকার করিবার জন্য মঠবাসীরা

চীনা সেনাদলবেষ্টিত অভিযানকারীরা

সোজা বনুকোয়েনডি উপত্যকাভূমিতে উহা নামিয়া গিয়াছে। এই পথের বামদিকে—বহু নিম্নে, ভীষণ পার্ব্বত্য খাতের মধ্য দিয়া বেনুচু নদী প্রবাহিত। উহা কঙ্কালিঙ্গ মালভূমিকে বেষ্টন করিয়া উত্তরপূর্ব্ববাহিনী হইয়া সো-চাউ নদীতে গিয়া পড়িয়াছে।

মিঃ রক ভাবিয়াছিলেন, গিরিসঙ্কট হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেই অপর পারে সেঙ্গু গম্বা মঠ দেখিতে পাইবেন। কিন্তু তাঁহার আশা পূর্ণ হয় নাই। মঠ তখনও বহু দূরে। অবিশ্রান্ত বর্ষণের মধ্যেই তাঁহারা চলিতে লাগিলেন। বৃষ্টিধারায় সর্ব্ব-শরীর সিক্ত, হস্ত-পদ প্রায় স্পন্দন-রহিত। ক্রমে তাঁহারা প্রস্তুত হইয়াছিল। ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণে মাল নামান হইতে লাগিল। অপ্রশস্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন বারান্দার উপর দিয়া মিঃ রক অট্টালিকার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঘরগুলি ধূম্রজালে অন্ধকারাচ্ছন্ন, অপরিষ্কার এবং ক্ষুদ্রায়তন। সোপানপথে উপরে উঠিয়া মিঃ রক যে কক্ষে নীত হইলেন, তাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। সেইখানেই তিনি বিশ্রাম করিবেন। জীয়ং বৃদ্ধ এই ঘরেই অবস্থান করিয়া থাকেন। ঘরখানি সুচিত্রিত এক পাশে একখানি সিংহাসন ও শয্যা। প্রাচীরের গায়ে পীত জাতির প্রথম পুরুষ টংকাপার উক্তিগুলি তিব্বতী ভাষায় লিখিত।

এতদঞ্চলে ...কোনও ...ঙ্গের আবির্ভাব ঘটে নাই, ...ন্য এক দল ...বতী দস্যু-দের তীর্থযাত্রী বিচিত্র-দর্শন ...নারী অভি-যানকারীদিগকে দেখিতে আসি-য়াছিল। প্রাচীর বাহিয়া উঠিয়া তাহারা মিঃ রককে দেখিতে লাগিল; কৌতূহলনিবৃত্তির পর তাহারা আবার ধর্ম্মকার্য্যে মনোনিবেশ করিল অর্থাৎ স্তোত্রপাঠ করিতে করিতে মঠের চারি-পার্শ্বে বেড়াইতে লাগিল।

আম্নেয়াঙ্গগিরি-পাদমূলে দস্যুগুহা।
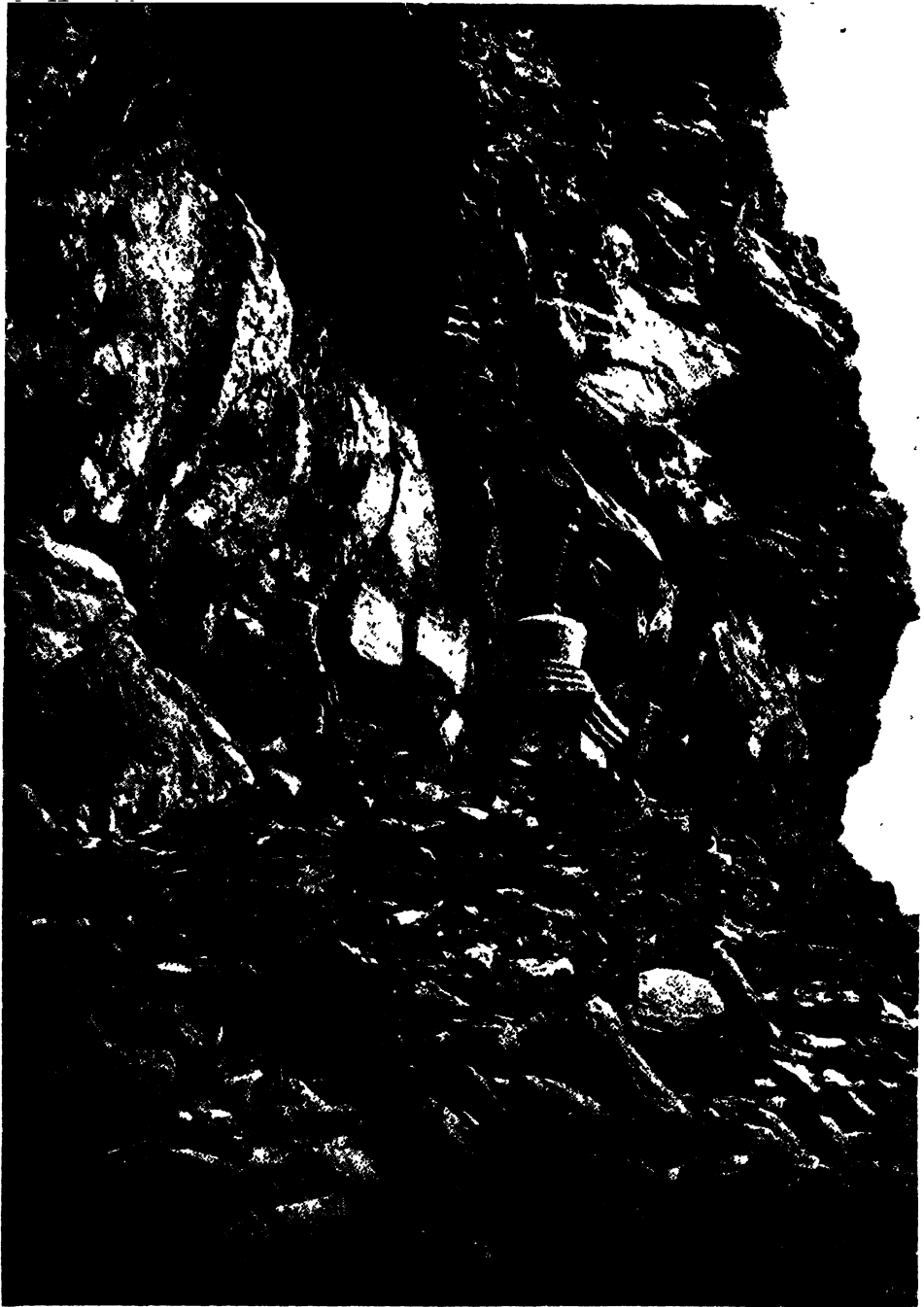
মঠটি দস্যু-দলের একটা আড্ডা। মুলি-...মা মিঃ রককে উপদেশ দিলেন যে, এ স্থানে দীর্ঘকাল অবস্থান করা নিরাপদ নহে। সুতরাং এক দিনের মধ্যেই কার্য্য শেষ করিয়া "স্থানত্যাগেন দুর্জ্জনঃ" নীতি অবলম্বন করাই সঙ্গত। কিন্তু মিঃ রক সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া ৩ দিন সেখানে যাপন করিলেন। আলোকচিত্র-গ্রহণ তাঁহার উদ্দেশ্য। সে কার্য্য সমাধা না করিয়া তিনি যাইবেন না।

এক দিন প্রভাতে তিনি একা মঠ পরিত্যাগ করিয়া

দেখিতে পাইয়া তাহারা ছুটিয়া আসিল। সশস্ত্র রক্ষিদল তাঁহার চারিদিকে বেষ্টন করিয়া বলিল যে,এরূপ ভাবে একাকী বাহির হওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক। মিঃ রক সহাস্যমুখে তাহাদের সহিত মঠে ফিরিয়া আসিলেন।

উল্লিখিত মঠটি কত দিনের, তাহা সন্ন্যাসীরা মিঃ রককে বলিতে পারিলেন না। তবে উহা যে শতাধিক বর্ষের পুরাতন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মিঃ রক মঠদর্শনে গিয়া সন্ন্যাসী-দিগকে রৌপ্যমুদ্রা বিতরণ করিলেন। মঠের মধ্যে ৪টি মন্দির বিদ্যমান। একটি মন্দির-কক্ষে অনেক-

ডুরন উপত্যকাভূমিতে অভিযানকারীদের শিবির

পাহাড়ে আরোহণ করিলেন। যে দস্যু পথিপ্রদর্শক তাঁহার সমভিব্যাহারে আসিয়াছিল, সে অনতিবিলম্বে এ সংবাদ পাইয়াই সদলবলে তাঁহার সন্ধানে বাহির হইল। তাঁহাকে

গুলি কুৎসিত চিত্র রহিয়াছে। মন্দিরকক্ষের বাহিরে একটি দারুস্তম্ভে তীর্থযাত্রীদিগের নানা প্রকার অঙ্গুরীয়, কঙ্কণ, মালা ও ঘণ্টা ঝুলিতেছে।

সেন্ধু গম্বা মঠে সন্ন্যাসিনীরাও বাস করিয়া থাকেন। একই কক্ষে সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীরাও যাপন করিয়া থাকেন। সন্ন্যাসিনীরা অত্যন্ত কৃশাঙ্গী, পলিতকেশা ও দীর্ঘাকারা। ৬ ফুটের কম কাহারও উচ্চতা নহে। সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের বেশভূষা একই প্রকারের। যখন তাঁহারা কথা কহেন, তখনই বুঝা যায়, তাঁহারা নারী।

মঠের বাসগৃহে অবস্থান করা মিঃ রকের পক্ষে দুঃসহ হইয়াছিল। সকল সময়েই ধূমরাশি নির্গত হইয়া চক্ষুপীড়া উৎপাদন করিতেছিল। মিঃ রক অনতিবিলম্বে স্থানত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

সিন্‌ডজি উপত্যকাভূমির গিরিসঙ্কট অতিক্রম করিয়া তাঁহারা অগ্রসর হইলেন। জাম্বেয়াঙ্গ গিরিশীর্ষের শোভা মিঃ রক দর্শন করিলেন। সে দিন আকাশ মেঘশূন্য, রবিকরোজ্জ্বল ছিল। ইহাই তাঁহার এ যাত্রার ইতিহাস।

ইহার পর ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে মিঃ রক আর একবার কঙ্কালিঙ্গ পর্ব্বত দর্শনের জন্য গিয়াছিলেন। মুলিরাজের সহায়তাও তিনি চাহিয়াছিলেন। কিন্তু এবার তিনি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। 'কুলু' মঠে সংবাদ আসিয়াছিল যে, দস্যু-সর্দ্দার মিঃ রকএর সম্বন্ধে কি লিখিয়া পাঠাইয়াছিল। তৎসত্ত্বেও মুলিরাজ তৃতীয়বার মিঃ রককে পর্ব্বত দর্শনের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। মিঃ রক কুলু মঠ হইতে ডাগো মঠে উপনীত হইবার পর সংবাদ পাইলেন, রাজা তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছেন, এ যাত্রা বন্ধ করিতেই হইবে। দস্যু-সর্দ্দার মুলিরাজকে জানাইয়াছেন, এবার মিঃ রক পার্ব্বত্য অঞ্চলে গমন করিলে দস্যু-সর্দ্দার তাঁহাকে হত্যা করিবে। দস্যু-সর্দ্দার জানাইয়াছেন যে, বিগত বারে কঙ্কালিঙ্গ হইতে মিঃ রক যখন ফিরিয়া আসেন, দেবতার কোপে প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টি হইয়া টনাইবেসি অঞ্চলের বার্লি শস্য ধ্বংস হইয়া যায়। মিঃ রক্ ব্যর্থমনোরথ হইয়া তৃতীয় যাত্রা পরিহার করেন। শ্বেতাঙ্গদের পক্ষে কঙ্কালিঙ্গ অঞ্চল চিররুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

ভাগবত-কুসুমাঞ্জলি

শ্রীমদ্ভাগবত ভক্তিরসাত্মক পরম পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ। কিন্তু মূলতঃ ভক্তিরসাত্মক হইলেও উহা বহু স্থলে দুরূহ দার্শনিক তত্ত্বের সহিত ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। ভক্তিপিপাসু রসরসিকের জ্ঞানাহরণ করিয়া তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইবার শক্তিই বা কোথায়, অবসরই বা কোথায়? শ্রীচৈতন্য এই হেতু জীবে দয়া ও নামে রুচির মহামন্ত্র প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন। এই হেতু যে সদ্‌গ্রন্থে ভক্তিরসরসিক রচয়িতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব্ব লীলারসমাধুর্য্য মাত্র অবলম্বন করিয়া মহাগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন, সেই গ্রন্থ যে ভক্তিগতপ্রাণ হিন্দুর নিকট পরম আদরের বস্তু হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

কলিকাতা, ১১ নং পটুয়াটোলার কমলকুঞ্জ হইতে প্রকাশিত ভাগবত-কুসুমাঞ্জলি এই শ্রেণীর সদ্‌গ্রন্থ। ইহা দ্বাদশ স্কন্ধে সম্পূর্ণ শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ হইতে কেবলমাত্র ভক্তিযোগ-সাধনাত্মক শ্লোকসমূহের সার-সঙ্কলন। রায় বাহাদুর পণ্ডিত গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কবিরত্ন এম, এ, মহাশয় মূল, টীকা এবং তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যা-সম্বলিত বঙ্গানুবাদ দিয়া এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের ৯০টি অধ্যায়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব্ব লীলা বর্ণিত হইয়াছে। একাদশ স্কন্ধের ৩১টি অধ্যায়ে আছে—নারদ-বাসুদেব সংবাদ ও শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব-সংবাদ। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য স্কন্ধে বিরিঞ্চি, নারদ, শুক, শৌনক, কপিল, ঋষভ, সনৎকুমার, প্রহ্লাদ প্রভৃতি ভগবদ্ভক্তের শ্রীমুখনিঃসৃত ভক্তিকথা। এই সকল অধ্যায় ভাগবতধর্ম্ম, ভক্তিতত্ত্ব ও ভক্তিসাধনোপদেশে পূর্ণ। ভাগবত পণ্ডিত গ্রন্থকার এইগুলি গ্রন্থে একত্র সমাবেশ করিয়া মাত্র শত ১টি শ্লোকে সংক্ষেপে ভক্তিরসপিপাসুগণকে ভগবদ্ভক্তিরসাস্বাদনের সুযোগ দিয়াছেন। যদিও শ্লোকগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন, তথাপি এইগুলি আদ্যন্ত পাঠে মনে হইবে, ইহা একরসাত্মক একভাবাত্মক গ্রন্থ। গ্রন্থকারের টীকা, ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদে তাঁহার গবেষণা ও পাণ্ডিত্যেরই পরিচয় পরিস্ফুট।

ভগবান্ এত দয়াল যে, ভক্তের উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন,—

"নিরপেক্ষং মুনিং শান্তং নির্ব্বৈরং সমদর্শনম্।
অনুব্রজাম্যহং নিত্যং পূয়েয়েত্যঙ্ঘ্রিরেণুভিঃ॥"

অর্থাৎ আশা-আকাঙ্ক্ষা-বিবর্জিত, নিষ্কাম, স্থিতপ্রজ্ঞ, প্রশান্তচিত্ত, সর্ব্বভূতসুহৃদ্, নিরন্তর মন্মননশীল আমার একান্ত ভক্তের আমি অনুক্ষণ অনুসরণ করিয়া থাকি, যাহাতে তাঁহার পবিত্র চরণরেণুর স্পর্শে আমি স্বয়ং পবিত্র হইতে পারি, এবং আমার অন্তর্ভূত ব্রহ্মাণ্ডসমূহ পবিত্র করিতে পারি।

সুতরাং সেই প্রেমের কৃষ্ণকে ধারণা করিতে হইলে জ্ঞান ও কর্ম্মের দ্বারা বুঝিবার চেষ্টা করিতে যাওয়া অল্পায়ু সাধারণ গৃহস্থের সহজসাধ্য না হইতে পারে, কিন্তু ভক্তির দ্বারা সে পথে অগ্রসর হইতে ত অধিক কষ্টস্বীকার করিতে হয় না। ইহাই বুঝাইবার জন্য গ্রন্থ রচিত। গ্রন্থের মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলেও গ্রন্থকার ভক্তের জন্য বিনামূল্যে বিতরণ করিয়া থাকেন। যে কেহ তাঁহার ১১ নং পটুয়াটোলা লেনস্থ আবাসগৃহে গিয়া প্রার্থী হইলেই সুন্দর কাগজে সুন্দর ছাপা এবং বাঁধা অমূল্য গ্রন্থখানি প্রাপ্ত হইবেন। এ জন্য তিনি জনসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন। এমন সদ্‌গ্রন্থের যতই প্রচার হয়, ততই মঙ্গল।

১৫

মন ভাল হইবার জন্য শান্তর সহিত অর্চ্চনা কাশী আসিল বটে, কিন্তু তাহার পিতৃবিয়োগের সদ্যোদুঃখের মধ্যে এই নূতন অভিভাবিকার শাসন ও সঙ্গ তাহার পক্ষে সুখের না হইয়া ক্রমেই অসুখের হইয়া উঠিল। একে অর্চ্চনার মন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, তাহার উপর শান্তর স্বার্থবিজড়িত অযথা কর্তৃত্ব সে মোটেই সহ্য করিতে পারিত না। ইতিপূর্ব্বে দুই একবারমাত্র শান্তকে সে তাহাদের কলিকাতার বাড়ীতে দেখিয়াছিল, তাহাও সামান্য দুই চারি দিনের জন্য। সুতরাং পূর্ণভাবে তাহাকে চিনিবার পক্ষে কখনও তাহার সুযোগ উপস্থিত হয় নাই। অর্চ্চনার যেরূপ শিক্ষা, তাহার যেরূপ অন্তর, কথাবার্ত্তা, চাল-চলন,—পুরাতন-পন্থী শান্ত সে সকলের সহিত কোনকালেই পরিচিত নহে, সুতরাং তাহার স্বভাব ও কার্য্যকলাপ শান্তর নিকট অত্যন্ত অশোভন ও বিসদৃশ বলিয়া বোধ হইত এবং সে জন্য উভয়ের মধ্যে প্রায়ই সংঘর্ষ ঘটিয়া উভয়ের মনে একটা নিরানন্দের সৃষ্টি করিতে লাগিল। শান্ত তাহার চিরকালের স্বভাবানুযায়ী চাহিত যে, তাহার দাদা যেমন তাহাকে অর্চ্চনার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ভারার্পণ করিয়া গিয়াছেন, সে-ও তেমনই সর্ব্ববিষয়েই কর্ত্রী হইয়া থাকিবে এবং অর্চ্চনা তাহার সম্পূর্ণ অধীনে থাকিয়া, তাহার নির্দ্দেশমতই উঠিবে ও বসিবে। কিন্তু অর্চ্চনা এ যাবৎ যেমন ভাবে চলিয়া আসিয়াছে, ঠিক তেমনই ভাবেই চলিতে চায়, তাহার শিক্ষিত, সরল, উদার, পরদুঃখকাতর, বিশুদ্ধ অন্তর শান্তর যুক্তিহীন ও অন্যায় নির্দ্দেশে কর্ণপাত মাত্র করিতে চাহে না।

এই লইয়া শান্ত ও অর্চ্চনার মধ্যে বচসা ও মনোমালিন্য দিনের পর দিন বাড়িয়াই চলিতে লাগিল এবং নিমাই বাবুর সতর্কীকরণ ও পরামর্শদান সত্ত্বেও শান্ত তাহার স্বভাব পরিত্যাগ করিতে পারিল না। এই উপলক্ষে এক দিন নিমাই বাবু আড়ালে তাহাকে খুবই ধমকাইলেন এবং কহিলেন—"তুই নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরে সব দিক নষ্ট না ক'রে ছাড়বিনি। ঐ ছোঁড়াটাকে এষ্টেট থেকে সরিয়ে আমি যাতে ঢুকতে পারি, আগে সেই চেষ্টা কর্, তার পর যা ইচ্ছে তাই করিস।" তখন হইতে শান্ত কতকটা শান্ত হইল এবং নেপালকে ছাড়াইয়া দিয়া, সেই যায়গায় নিমাই বাবুকে বাহাল করিয়া সকলের একসঙ্গে যাহাতে কলিকাতার বাটীতে থাকা হয়, এই কথাটা প্রায়ই সে অর্চ্চনার কাছে ইসারা-ইঙ্গিত ও ভাব-ভঙ্গীতে প্রকাশ করিতে লাগিল। অর্চ্চনার কাছে এই কথাটা প্রথম যে দিন সে খুলিয়া প্রকাশ করিয়া বলিল, সে দিন অর্চ্চনা প্রত্যুত্তরে শুধু কহিল,—"পিসী, তোমার যতটুকু অধিকার, তার সীমা ছাড়িয়ে কথা কইতে এস না। কাকে ছাড়ালে বা কাকে রাখলে ভাল হয়, সে আমি বুঝবো।" তাহার পর দুই দিন ধরিয়া শান্ত অর্চ্চনার সহিত আর কোন কথাই কহে নাই। এই দুই দিন নিমাই বাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া, তাহারই ফলে তৃতীয় দিনে সে সস্নেহে অর্চ্চনাকে কহিল,—"যা বলি, যা কই, সব তোর ভালর জন্যেই মা, অথচ তা তুই কিছুই বুঝতে পারিস না। তোকে ঠিক পেটের মেয়ের মত জ্ঞান করি বলেই, যাতে তোর মঙ্গল হয়, কায়মনোবাক্যে কেবলই সেই চেষ্টাই করি।" শান্তর চোখ দিয়া কয় ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

অর্চ্চনা বিস্মিত হইয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

শান্ত কহিতে লাগিল,—"সে দিন নিমাই দাদাও তোর কত সুখ্যাতি করছিলেন। বলেন—এমন হিসিবী মেয়ে, এমন ভদ্র, এমন শিষ্ট, এত সৎ আজকালকার দিনে চোখেই পড়ে না। অরুর আমার যেমনই রূপ, তেমনই অন্তঃকরণ, তেমনই শিক্ষা——"

রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ের ন্যায় তাহার শেষ কথার সূত্র ধরিয়া নিমাই বাবু হঠাৎ সেখানে আবির্ভূত হইয়া কহিলেন,—"সে কথা আর একবার ক'রে বলতে, শান্ত! এই কাশী সহরে মেয়েছেলের ত আর অভাব নেই, কিন্তু অরুর মত একটি মেয়ে তুই সারা কাশী ঢুঁড়ে আন দেখি, বোন্! কত বড় দরাজ মন ওর! 'বাপকা বেটী' যে, তা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে। ঐ যে অসির ওদিকে একটা নতুন ঘাট করবার জন্যে সব উঠে প'ড়ে লেগেছে, এইবার ওর শেষ রক্ষে কে করে একবার দেখি। হাজারখানেক টাকার যে ঘাঁটতি পড়েছে, এই কাশীর ভেতর রাজা-জমীদারের ত আর অভাব নেই, কিন্তু কার বুকের পাটা কত বড়, সেইটে আমায় একবার দেখতে হবে। তোকে ব'লে রাখি শান্ত, আ

একটি পাই-পয়সাও কারুর কাছ থেকে আদায় করতে হচ্ছে না। ও ঘাট শেষ হবে কারে দিয়ে জানিস? ঐ তোর সামনে যে লক্ষ্মী-প্রতিমাটি ব'সে রয়েছে, ওর দ্বারাই হবে। কিন্তু এটাও জেনে রাখিস শান্ত যে, এখন ওদের আমি কিচ্ছুটি বলছি না। আগে দৌড়টা কত দূর যায়, একবার দেখি, তার পর শেষকালে বলব যে, ঘাটটির নাম 'অর্চ্চনা ঘাট' রাখ আর আমার মায়ের কাছ থেকে হাজারটি টাকা নিয়ে যাও।"

শান্ত নিমাই বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল,—"আচ্ছা নিমাইদা, অরুর কাছে দাদার দেওয়া আমার যে পাঁচ হাজার টাকা রয়েছে, তার থেকে আমিও ত হাজারখানেক টাকা ঘাটটার জন্যে দিয়ে দিতে পারি? এত বড় একটা মহা পুণ্যের কায——"

মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে নিমাই বাবু শান্তর মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"পুণ্যের কাযে হিংসে জিনিষটাও ভাল। ঘাট ক'রে দেওয়ার পুণ্যির লোভটা বুঝি আর সামলাতে পাচ্ছিস না? সৎকাযে এম্নিই হয় বটে। তা তোর ঐ পুঁজিটুকুর মধ্যে থেকে এই টাকা দিতে আমি কিছুতেই মত দিতে পারি না, শান্ত; কেন না, ভবতোষ বাবু তোকে যে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে গিয়েছেন, তাই দিয়ে একটু তোর মাথা গোঁজবার যায়গা আগে তোকে ক'রে নিতে হবে বোন্, কেন না, তোর মত অনাথা নিরাশ্রয়া ভূভারতে আর নেই। তাই ত ভাবি যে, যে যত ভাল, তাকেই তুমি তত কষ্ট দাও, ঠাকুর! এক এক সময় তাই মনে করি যে, অরুকে বলি যে, মা, এত ভাল, এত সরল, এত সৎ তুই হোস নি; শান্তর দেখে তোর জন্যে আমার ভয় করে।"

নিমাই বাবুর বদন বিষাদে ভরিয়া উঠিল, চক্ষুতে অশ্রু জমিয়া আসিল। কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিতে মুছিতে তিনি কহিতে লাগিলেন,—"জানি যে তুই অর্চ্চনাকে ছেড়ে আর কিছুতেই অন্য কোথায় থাকতে পারবি না, তবু এখানে তোদের নিজের বলতে একটু আস্তানা থাকার দরকার। অরুরই যদি মাঝে মাঝে এসে থাকবার ইচ্ছে হয়। তুই আর অরু ত পৃথক নস। তোর হলেও তা অরুর, আর অরুর হলেও তা তোর। এর জন্যে আমিও চুপ ক'রে নেহাৎ ব'সে নেই জানবি। কেদারঘাটে যে বাড়ীখানা দেখছি, বিশ্বনাথের ইচ্ছেয় যদি এইটে হয় ত—দেখাই যাক্। তবে এ বাড়ী আর তোমার পাঁচ হাজারে হবে না, দশ হাজার দশ হাজার করছে, হাজার আষ্টেকের কমে আর হচ্ছে না।"

সঙ্গে সঙ্গেই নিমাই বাবু তাঁহার একটু পূর্ব্বের বিষাদ-পূর্ণ আননে ও অশ্রু-সজল-চক্ষুতে প্রসন্নতার হাসি ফুটাইয়া কহিলেন,—"বাকী তিন হাজার ভাইঝির কাছে খৎ লিখে দিয়ে ধার করবি, কিন্তু সুদ যদি না দিস, তা হ'লে কোর্টে গিয়ে অরুর হয়ে তোর বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়ে আসবো।"—বলিয়াই হো হো করিয়া নিমাই বাবু হাসিয়া উঠিলেন।

অর্চ্চনা আর বসিয়া থাকিতে পারিল না, উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং এক পা এক পা করিয়া ওদিককার ঘরে যেখানে মেঝের উপর উপুড় হইয়া শুইয়া কালী কি একখানা বই পড়িতেছিল, সেইখানে আসিয়া কহিল,—"চল দিদি, আজ একটু হরিশ্চন্দ্র-ঘাটে বেড়িয়ে আসি, মাথাটা বড্ড ধরেছে।"

তখন অপরাহ্ণকাল। হরিশ্চন্দ্র-ঘাটে আসিয়া উভয়ে গঙ্গা-সৈকতে বসিলে, অর্চ্চনা কালীকে কহিল,—"দিদি, এখানে আর আমি থাকতে পারব না, ভাল লাগছে না।"

কালী পরপারের দিকে দৃষ্টি আবদ্ধ করিয়া বলিল,—"আমারও লাগছে না বোন্,—অনেক দিন হয়ে গেল।" তাহার পর প্রসারিত দৃষ্টি ফিরাইয়া আনিয়া তন্ময়ভাবে বলিয়া উঠিল,—"এইখানে।"

অর্চ্চনা জিজ্ঞাসা করিল,—"এইখানে কি, দিদি?"

"হরিশ্চন্দ্র রাজার ঘাট রে! এক জন ছিল এইখানে, আর এক জন ছিল সেই কোথায় কে জানে, সহরের ভেতর কোন্ বামুনের বাড়ী! তার সেখানে জন্ম ও জীবনের উদ্দাম কোলাহল, এর এখানে মৃত্যু ও লয়ের অনন্ত নীরবতা! কি বিরাট ব্যবধানই দু'জনকে দু'পাশে ঠেলে রেখেছিল! কিন্তু পারলে না। অন্তরের দুর্ব্বার আকর্ষণে তা ভেঙ্গে-চুরে একাকার হয়ে গেল। সেই মহামিলনের পুণ্যস্থান এই,—এই সেই মহাশ্মশান" বলিয়া কালী সম্মুখস্থ মৃত্তিকার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া মস্তক ঠেকাইল, অর্চ্চনাকে কহিল,—"তুইও এই মাটীতে মাথা লুটিয়ে দে বোন্, আমাদের দু'জনের পক্ষে এমন পুণ্য তীর্থ আর কোথাও নেই।"

কালীর অনুসরণ করিয়া অর্চ্চনাও তত্রত্য ধূলার উপর মস্তক স্পর্শ করিলে কালী কহিল,—"দেখিস্ বোন্, তোর

সীঁথির সিন্দুরের শোভা শীগ্‌গীরই উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠবে।” তার পর মৃদু হাসির সহিত কহিল,—“আর আমার ইনি ত কবে এসে পড়েন।”

অর্চ্চনা কালীকে কিছু একটা বলিতে যাইতেছিল, কালী তাহাকে বাধা দিয়া, তাহার একখানা হাত নিজের মুঠার মধ্যে জোরে ধরিয়া কহিল,—“দেখ বোন্, পুরুষের স্ত্রী মারা যায়, কিন্তু স্ত্রীলোকের স্বামী কখনও মারা যায় না। বল্ না—যায়? স্ত্রীলোক কখনও বিধবা হয়?”

ক্ষণেক নীরবে থাকিয়া অর্চ্চনা ডাকিল—“দিদি!”

“কি বোন্?”

“কিছু আর ভাল লাগে না, কেন বল দেখি? জীবনটা এই চার মাস যেন বড় একঘেয়ে লাগছে। বাবা বেঁচে থাকতে মনে হ’ত, মাথার ওপর যেন অনেক কায আছে, একটা সংসার তখন আমার ঘাড়ে, এইটে সর্ব্বদাই মনে হ’ত। এখন যেন মনে হয়, কিছুই আমার নেই, সংসারের কোন কাযকর্ম্মই আমায় যেন আগেকার মত আর তেমন উৎসাহ দিতে পারে না। মনে হয়, সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে অনেক দূরের কোন নির্জ্জন দেশে গিয়ে, একটা নদীর ধারে ছোট্ট একখানা কুঁড়ে বেঁধে থাকি। সংসারের কাযের ভীড়, গোলমাল যেন সেখানে গিয়ে না পৌছায়, টাকা-কড়ির হিসেব যেন আর না করতে হয়। ঠাকুরঘরের ঠাকুরটির বদলে আমি যেন সেই বিজন দেশের মাঠে-ঘাটে, বনে-জঙ্গলে সর্ব্বত্র সব জিনিষেই ঠাকুরের সন্ধান পাই, আর তাই নিয়েই যেন জীবন আমার সেই নদীকূলের কুঁড়ের ভেতরেই এক দিন চুপি চুপি নিঃশেষ হয়ে যায়।”

খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কালী কহিল,—“তোর মাথা খারাপ হয়ে আসছে, তুই শীগগীরই কোলকাতায় যা। এই সব অলুক্ষণে কথা যদি ফের বলবি ত আমি পিঠে তোর গুম্ গুম্ ক’রে সাড়ে পাঁচ গণ্ডা কিল মারবো।”

“সত্যি দিদি, জীবনটা যেন বড্ড বেশী বেশী হাল্‌কা বলেই বোধ হচ্ছে, কোন কিছুতেই আর মন লাগে না। বাড়ী-ঘর, বিষয়-সম্পত্তি, টাকা-কড়ি, লোক-জন, সব যেন আমাকে তাদের কাছ থেকে খালি দূরে ঠেলে দিচ্ছে, কোন উৎসাহ—কোন আকর্ষণই যেন এদের থেকে আর আমি পাচ্ছি না।”

“মন হারিয়ে ব’সে আছিস, তা পাবি কোত্থেকে? চিরকালের চোখের জলে চূণকাম আর কত দিন টেকে; তবে মনের মালিকের তুই দেখা পাবি বোন্, আমি কায়-মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করছি, সে দিন তোর শীগ্‌গীরই আসবে, স্বামিদর্শন তোর শীগ্‌গীরই ঘটবে।”

নতমুখে থাকিয়া ঈষৎ হাস্যের সহিত অর্চ্চনা কহিল,—“দিদি, ও কথাটা আর তুমি বার বার বলো না। আমার সম্বন্ধে ওটা নেহাৎই বাজে কথা। এ যেন ঠিক দুপুরের রোদে খুব বড় একটা জিনিষের খুব ছোট একরত্তি ছায়া!”

একদৃষ্টে অর্চ্চনার আনত মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কালী কহিল,—“ছায়া? বাজে কথা? আমার আশীর্ব্বাদ মিথ্যা হবে? তুই জানিস অরু, জীবনে আমি কখনও কোন অন্যায় করি নি, কখনও কারও অন্তরে ব্যথা দিই নি, মুখ দিয়ে কখনও আমার মিথ্যা বার হয় নি। এত দিন পরে মুখের কথা আমার মিথ্যে হবে? সেই পুণ্যশ্লোক রাজা-রাণীর মিলনের এই পবিত্র ঠাঁই, এই পবিত্র শ্মশান, সামনে ঐ মা গঙ্গা, আর মাথার ওপর ঐ অনন্ত অমল নীল আকাশ,—যা বল্লুম বোন্, জানবি, এ পরম সত্যি। আমার মুখের এ আশীর্ব্বাদ কখনই মিথ্যে হবে না, স্বামীর দেখা তুই শীগ্‌গীরই পাবি—পাবি—পাবি।”

“পাবি—পাবি—পাবি।” পিছন হইতে সহসা কে বলিয়া উঠিল—“পাবি—পাবি—পাবি; কিন্তু পেলে কি হবে মা, ভোগে হয় না। পেলুম ত, কিন্তু ঠেলাঠেলিতে কি রাখতে পারবার যো আছে, ঝর-ঝরিয়ে সব প’ড়ে গেল, যে ছুটি থাকলো, তাই নিয়ে ছুটে পালিয়ে এলুম;—বাবা গো বাবা!”

উভয়েই চকিতে পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল, একটা পাগলী কোথা হইতে চারিটি ভাত শালপাতায় করিয়া আনিয়াছে ও অনতিদূরে তাহাই মাটীর উপর রাখিয়া খাইবার আয়োজন করিতেছে। কালী ও অর্চ্চনা তাহার দিকে ফিরিয়া বসিলে সে পরমাগ্রহে সেই ভাতগুলি খাইতে খাইতে কহিল,—“সারাদিন কিছু পাই নি গো, মা। দুপুরবেলা ঐ ওদের ছত্তরে গিয়েছিলুম,—ধাক্কা দিয়ে ঠেলে তাড়িয়ে দিলে। মোটা মোটা জোয়ান মিন্‌ষেগুলো রোজ পেট পুরে খেয়ে আসে, আর আমরা গেলেই তাড়িয়ে দেয়, মা। আমাদের একটা ছত্তর কারুকে দিয়ে করিয়ে দিতে পারিস্ তোরা?

দিস্ মা—দিস্, তোদের ভাল হবে। অন্নপূর্ণার রাজত্বে বাস করেও ক্ষিধের ছুটি অন্ন পাই না।"

অর্চ্চনা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি কোথায় থাক ?"

"তা, থাকি ভাল—ঐ পথে-ঘাটে-মন্দিরে। থাকবার বড় কষ্ট নেই, কালভৈরবের দয়া আছে, কিন্তু ঐ বেটী চোখ-খাকীর দয়া বড় কম। তুই রোজ ছুটি খেতে দিবি, মা ?"

পাগ্‌লী আর কোন কথা না বলিয়া আহারে মন দিল এবং কালী ও অর্চ্চনা সেইখানে বসিয়া তাহার খাওয়া দেখিতে লাগিল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই খুঁটিয়া খুঁটিয়া শেষ অন্ন-কণাটি পর্য্যন্ত যখন সে উদরস্থ করিল, তখন উঠিয়া দাঁড়াইল এবং মুখহাত ধুইবার অভিপ্রায়ে সৈকতভূমি অতিক্রম করিয়া ধীরপদে সে গঙ্গাগর্ভের অভিমুখে অগ্রসর হইল।

কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত সেইখানে বসিয়া থাকিয়া অর্চ্চনা পাগলীর প্রত্যাবর্ত্তন প্রতীক্ষা করিল, কিন্তু সে পথে পাগ্‌লী আর ফিরিয়া আসিল না। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার শ্মশান-ঘাটের উপর গাঢ় হইয়া আসিয়াছিল এবং চতুর্দ্দিক্‌স্থ দেব-মন্দিরগুলি হইতে সায়াহ্নের নহবৎ অসীম মাধুর্য্যের সহিত বাজিতে সুরু করিয়াছিল। অর্চ্চনা দাঁড়াইয়া উঠিয়া কালীর হাত ধরিয়া বলিল,—"চল, দিদি।"

বাসায় ফিরিয়া অর্চ্চনা নিমাই বাবুর ঘরে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কাকাবাবু, এখানে রোজ গুটি পঞ্চাশ ক'রে লোক খাওয়াতে হলে মাসে কত ক'রে ব্যয় হয় ?"

হর্ষোৎফুল্ল আননে মৃদু-মধুর হাসিতে হাসিতে নিমাই বাবু কহিলেন,—"এই রকম কিছু একটা যে তুই জিজ্ঞাসা করবি, তা আমি অনেক দিন থেকেই মনে মনে ক'রে আসছি। আমার নিজের ঘরের মেয়ে ব'লে জাঁক করছি না, কিন্তু তোর মত সচ্চরিত্র পুণ্যশীলে মেয়ে আজকালকার দিনে ক'টা মেলে, আমি তাই সকলকে জিজ্ঞাসা করতে চাই।"

শান্ত সেখানে জপের মালা হাতে লইয়া বসিয়াছিল। তাহার দিকে চাহিয়া তিনি কহিলেন,—"কেমন শান্ত, যা তোকে বলি, ঠিক তাই কি না বল্। অরু আমার—"

"মাসে কত টাকা লাগে, কাকাবাবু ?"

"বলি মা" বলিয়া মিনিটখানেক মনে মনে একটা হিসাব করিয়া নিমাই বাবু বলিলেন,—"তিন চার শ' টাকা ক'রে মাসে হলেই রোজ পঞ্চাশটি ক'রে ব্রাহ্মণভোজন হতে পারবে মা। এর চেয়ে কি আর মহৎ কায আছে রে,—না সকলের ভাগ্যে এ পুণ্যি ঘটে। দেখ শান্ত, ভবতোষ দা' যা ক'রে যেতে পারলে না, অরুর দ্বারাই তা হবে। কার দ্বারা কি হয়, তা কি কেউ বলতে পারে ?"

অর্চ্চনা কহিল,—"রোজ বিশ পঞ্চাশটি ক'রে এখানে কাঙ্গালী খাওয়াতে, কাকাবাবু, আমার বড্ড ইচ্ছে হচ্ছে।"

"হবেই ত, মা। তোর হবে না ত কার হবে ? তা, কাঙ্গালী খাওয়ান,—সে আরও ভাল, মা। এর মত মহাপুণ্য আর কিছু নেই। তা তোকে এর জন্যে কোন হাঙ্গামা পোয়াতেই হবে না, তুই শুধু মাসে মাসে টাকাটা আমার কাছে পৌঁছে দিস্, বন্দোবস্তের ভার—ঝক্কির ভার, সে সব এই বুড়োর ওপরই রইল। তবে, মাঝে মাঝে তোকে এসে দেখে-শুনে যেতে হবে, মা লক্ষ্মি, নইলে আমি ছাড়বো না। পয়সা কি জন্যে, মা ? এই ত হ'ল পয়সার সার্থক ব্যয়। ইদানীং তোদের বাড়ী তত আমার যাতায়াত না থাকলেও, তোর কথা ত চিরকালই আমি জানি। তাই ত শান্তকে আমি বলি যে, ভবতোষ দাদা এখন গত হ'ল, অরুকে এখন বুক দিয়ে আমাদেরই দেখতে হবে। আর এখানে মা অন্নপূর্ণার কাছে থাকা, আর অরুর কাছে থাকা, একই কথা—দুই-ই মহাতীর্থ।"

অর্চ্চনা নীরবে কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিয়া উঠিয়া গেল। নিমাই বাবু গুন্ গুন্ করিয়া আরও কি সব তাহার সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন।

অর্চ্চনার খাইবার সময় শান্ত সম্মুখে আসিয়া বসিল এবং তাহার অল্পাহারের উল্লেখ করিয়া কহিল,—"এই খেয়ে তুই বাঁচবি কি ক'রে, আমি তাই শুধু ভাবি। দুধ একপলা বেশী—তা খাবি নি, লুচি দুখানা বেশী খাবি—তা খাবি নি, তোকে নিয়ে আমি কি করি, অরু ? শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে, অমন যে লক্ষ্মীর মত রূপ, সে রূপ আর তোর আছে কি ?"

যাহার অল্পাহারের জন্য শান্তর এই বিকট দুর্ভাবনা, তাহার মাথায় তখন কলিকাতায় যাওয়ার ভাবনাই বেশী রকম অধিকার করিয়া বসিয়াছিল এবং তাই আহারান্তে সে তাহার শয়নঘরে যাইয়া সেই রাত্রিতেই নেপালকে

কলিকাতায় চিঠি লিখিতে বসিল। চিঠিতে তাহাকে দুই এক দিনের মধ্যেই কাশী আসিয়া তাহাদের সব লইয়া যাইতে লিখিল।

অর্চ্চনা যখন চিঠি লিখিতেছিল, তখন অন্য আর একটি ঘরে নিমাই বাবু অত্যন্ত চাপা এবং মৃদু গলায় শান্তকে কহিতেছিলেন,—"অনেকটা কায এগুচ্ছে, এখন যদি তুই সব নষ্ট করিস্, তা হ'লে তোর দুঃখ জীবনে আর যাবে না। কথায় কথায় অভিমান আর অসহি, এ তোকে ছাড়তে হবে, শান্ত। ও মেয়েকে কায়দা ক'রে আনা বড় সোজা কথা নয়, ও তোর আমার চেয়ে অনেক চতুর, আমাদের সাতবার ক'রে চকের বাজারে ও বিক্রী ক'রে আনতে পারে। আমার ভয় হচ্ছে যে, কলকাতায় গিয়ে হয় ত তুই সামান্য কিছু একটা উপলক্ষ্য ক'রে ঝগড়া বাধিয়ে বসবি আর সব নষ্ট করবি। তোকে বার বার সাবধান ক'রে দিচ্ছি যে, এখন শুধু কাদায় গুণ ফেলে সব বিষয়েই ওর মন জুগিয়ে চলবি।"

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা ধরিয়া নিমাই বাবু নানাপ্রকারে শান্তকে উপদেশ দিতে লাগিলেন এবং শান্ত সমস্তক্ষণই নীরব থাকিয়া তাঁহার কথাগুলি এক মনে শুনিতে লাগিল

[ক্রমশঃ।

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়।

অপরিণীতা বধূ

আয়ত তরল নয়নে তোমার শত কাব্যের মাধুরী ফোটে,
মন্থর তব গতি-ভঙ্গীতে কত সঙ্গীত ছন্দি' ওঠে!
এ হিয়া ভরিয়া মধু-তরঙ্গে
ঝরিছে অমিয়া সকল অঙ্গে!
মানস-ভৃঙ্গ তোমার ও দুটি রাঙা শ্রীচরণ-পদ্মে লোটে।

কত শত কথা সুখ দুখ ব্যথা বুকের গুহায় গুমরি মরে।
ভালবাসা-মাখা কত আশা সদা মোহন রঙীন মূরতি ধরে!
কবে এসে তুমি কুটীরে আমার
কাকলী বহাবে কোকিল-শামার,
শান্তি-সেবায় স্নেহ-করুণায় কমলার রূপে শোভিবে ঘরে?

নহ গরবিণী নাগরিকা তুমি, তুমি পল্লীর শ্যামল মায়া,
তুমি নির্জ্জন মল্লী কানন মাধবীলতার শীতল ছায়া!
জানো না ছলনা আবেশ চাতুরী
ছোট হিয়া ভরা সরল মাধুরী
ঢল ঢল স্নেহ উথলে নয়নে, প্লাবিয়া হৃদয় প্লাবিয়া কায়া!

তুমি আছ ব'সে নীরব আশায় আমি আছি ব'সে তোমার লাগি,
জানি না কখন্ ঋষি-প্রজাপতি ভাঙিয়া ধেয়ান ওঠেন জাগি!
সেই সুদিনের তরে দুই জনে
পথ চেয়ে ব'সে আছি বাতায়নে,
হেরি পশ্চিমে সন্ধ্যা নামিছে মোর জীবনের গগন রাঙি'!

আমার জীবনে নামিছে সন্ধ্যা তোমার জীবনে উষার আলো,
তোমার হৃদয়ে ভোরের কিরণ, মোরে ধীরে ধীরে ঘিরিছে কালো!
তব আশালতা মঞ্জরী ফুলে
মলয়-বাতাসে ওঠে দুলে দুলে
তব প্রেমনদী ভরা কূলে কূলে, ধরা আজি তব লাগিছে ভালো।

হায় সুন্দরী, মধু-মঞ্জরী জানি না কুসুমে শোভিবে কি না,
বসন্ত যায় লইয়া বিদায় বাজাইয়া তার করুণ বীণা।
কাল-বৈশাখী রাঙাইছে আঁখি
জানি না ভাগ্যে কিবা আছে বাকী
উড়ে যদি ঝড়ে, কাঁপে সেই ডরে আশার লতিকা হৃদয়-লীনা!

বাঁধো বুক বাঁধো, আশায় আশায় যাপিয়ো দীর্ঘ দিবস-রাত,
যদি আসে দিন এক সুলগনে বরবেশে বধূ, ধরিব হাত।
কি করিব বল, জীবন ভরিয়া
ধূলা-বালি শুধু এসেছে উড়িয়া,
ঘুম ছুটে গেছে, ব্যথার সলিলে সিক্ত হয়েছে নয়ন-পাত!

ভরসা কিছুই নাহিক কোথাও সবই মরীচিকা মায়ার খেলা,
অকূল সাগরে চলেছি একাকী ঢেউয়ে টলমল করিছে ভেলা!
কূলে গিয়ে যদি লাগে তরী মোর,
শঙ্কার নিশি হয় যদি ভোর,
নিধু নিকুঞ্জে তখনি মোদের বসিবে সে দিন প্রেমের মেলা।

শ্রীরামেন্দু দত্ত।

ল্যাঙ্কাশায়ারের এজেণ্ট
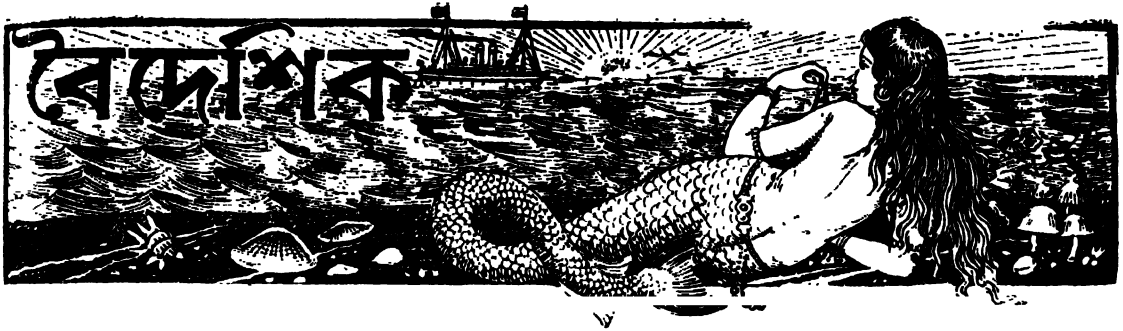
ম্যাঞ্চেষ্টার সহর হইতে 'ডেলি টেলিগ্রাফ' পত্রের সংবাদদাতা খবর দিয়াছেন যে, "লণ্ডন মসজিদের ইমাম বিলাতী বস্ত্রব্যবসায়ী-দিগকে উপদেশ দিয়াছেন, অতঃপর তাঁহারা যেন আর কলিকাতা, বোম্বাই ও করাচী বন্দরে কাপড়ের ব্যবসায় না চালাইয়া মুসলমান ব্যবসায়ীদের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া ভারতের মফঃস্বলে বস্ত্র-ব্যবসায়-প্রসারের চেষ্টা করেন, তাহা হইলে মুসলমানরা তাঁহাদের সাহায্য করিবেন।" অবশ্য বিলাতী পণ্য-বর্জ্জন দিল্লীর চুক্তির পর কংগ্রেস পরিহার করিয়াছেন, তবে বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জনের জন্য আন্দোলন পরিহার করেন নাই। ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য—নষ্টপ্রায় স্বদেশী শিল্পের উদ্ধারসাধন এবং দরিদ্র ভারতবাসীর সামান্য কিছু আয়ের পথ উন্মুক্ত করা; ইহার মূলে কাহারও বা কোন ব্যব-সায়ের প্রতি বিদ্বেষ বা ঘৃণা নাই। এ হিসাবে খদ্দরের বিরুদ্ধে ল্যাঙ্কাশায়ারের তাঁতিদের সহিত মুসলমানদের এই ভাবের বন্দো-বস্তের কথা সহজে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না; সুতরাং লণ্ডনের মসজিদের ইমাম এমন বন্দোবস্তের কথা পাড়িয়াছেন, ইহা যেন কেমন অবিশ্বাস্য বলিয়াই মনে হয়।

তবে এ দেশে এই ভাবের একটা ষড়্‌যন্ত্র চলিতেছে বলিয়া জনরব রটিয়াছে। জনরব কেন, কিছু দিন পূর্ব্বে মওলানা শওকৎ আলি প্রকাশ্যে বলিয়াছিলেন যে, ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্র-ব্যবসায়ীরা যদি মুসলমানদের সহিত বন্দোবস্ত করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহারা ভারতে আবার বিলাতী বস্ত্র চালাইতে পারেন। আবার সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমানদের নূতন বন্ধু ও উকীল 'ষ্টেটস্‌ম্যান' খবর দিয়াছেন যে, "দিল্লীতে একটি নিখিল ভারত মুসলিম ব্যবসায়ী সমিতি শীঘ্রই রেজেষ্ট্রি হইবে। উহার নাম হইবে,—'ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট করপোরেশান লিমিটেড।' উহার মূলধন হইবে ১০ কোটি টাকা। একটি বিশিষ্ট মুসলিম বোর্ড উহার তত্ত্বাবধান করিবেন এবং মাননীয় আগা খাঁ ইহার মুরুব্বী হইবেন। এই সমিতি বিদেশী বস্ত্রের ব্যবসায় চালাইবে।" আরও জনরব, মাদ্রাজের মুসলমানদের মধ্য হইতে এক শ্রেণীর লোক খদ্দরের দোকানে পিকেটিং করিবে বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিতেছে! আবার ইহার মধ্যে গুণ্ডামীও আরম্ভ হইয়াছে। বোম্বাই সহরের জিন্না হলে গত ৩রা আগষ্ট জাতীয় মুসলিম দলের যে সভা বসিয়াছিল, বিরুদ্ধবাদীদের গুণ্ডারা বলপূর্ব্বক সেই সভা ভাঙ্গিয়া দিয়াছে এবং হাকিম আবদুল জালিল প্রমুখ কংগ্রেস-নেতা ও কংগ্রেসকর্ম্মীদিগকে প্রহারের দ্বারা জর্জ্জরিত করিয়াছে। এই কাপুরুষরা জানে যে, কংগ্রেসকর্ম্মীরা অহিংসামন্ত্রে দীক্ষিত, ফিরাইয়া মারিবে না বা আদালতেরও আশ্রয় লইবে না। তাই তাহাদের বুক বলিয়া গিয়াছে। কেবল ইহাই নহে, তাহারা পথে খদ্দরধারী দেখিলেই মারপিট করিয়াছে! চমৎকার! আজ এই গুণ্ডাদের পশ্চাতে থাকিয়া যাহারা তাহাদিগকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছে, তাহাদেরও দিন আসিবে!

দেশের জোলা-তাঁতিরা খদ্দর-প্রসারের ফলে দুই মুঠা করিয়া খাইতেছিল। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান নরনারী। তাহাদের অন্ন মারিবার এ কি চমৎকার আয়োজন! নিজের নাক কাটিয়া যাহারা এই ভাবে পরের যাত্রাভঙ্গ করিতেছে, তাহারা হয় ত আজ স্বার্থান্ধ তৃতীয় পক্ষের নিকটে বাহবা পাইতেছে, কিন্তু এইসা দিন নেহি রহেগা! যে দরিদ্র জন-সাধারণের মুখের গ্রাস কাড়িবার জন্য এই বিকট দেশদ্রোহমূলক আন্দোলন চালান হইতেছে, সেই দরিদ্ররাই এক দিন ইহার প্রতীকার-ব্যবস্থা স্বহস্তে গ্রহণ করিবে। তখন এই স্বার্থপর কুচক্রী কুলাঙ্গারের দল কোথায় থাকিবে?

ক্রীতদাসী

প্রায় শত বৎসর অতীত হইল, আইন দ্বারা বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্য হইতে ক্রীতদাস-প্রথা নিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু ৯০ বৎসর হংকং অধিকারের পর এখনও তথায় ক্রীতদাস-প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে বলিয়া শুনা যায়। মাত্র ২ বৎসর পূর্ব্বে রাজার এই খাস উপনিবেশে (Crown Colony) ৯ বৎসরবয়স্কা এক চীনা বালিকাকে তাহার পিতামাতা ১ শত ১০ ডলার মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রয় করিয়াছিল,—বৃটিশ পার্লামেণ্টে সে দিন এই কথা সার জন সাইমন উত্থাপন করিয়াছিলেন। লণ্ডনের "ডেলি এক্সপ্রেস" লিখিয়াছেন, "এইরূপ ১০ হাজার বালিকা এখনও

হংকং সহরে এমন অবস্থায় বাস করে, যাহা ক্রীতদাসীত্বের অবস্থা ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না।" কি ভয়ানক কথা! বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার যুগে সুসভ্য বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে এখনও এই প্রথা প্রচলিত আছে, ইহাই আশ্চর্য্য। এ দেশেও কিছু দিন পূর্ব্বে আসামের চা-বাগানে ক্রীতদাস-প্রথা প্রচলিত ছিল। বর্ত্তমানে জনমত জাগ্রত হওয়ার ফলে কুলীদের অবস্থার কতকটা উন্নতি হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও অনেক সংস্কারের প্রয়োজন আছে। এ দেশের নানা স্থানে 'বেগার' প্রথাও প্রচলিত আছে। উহাও কি ক্রীতদাসত্বের নামান্তর নহে?

প্রজনন-ক্রিয়ারোধ

মার্কিণ দেশের ওয়াইওমিং অঞ্চলের পাদরী রেভারেণ্ড এ, অস্কার ব্রাউন পিটসবার্গ সহরে প্রেসবিটেরিয়ান পাদরীদের সভায় বক্তৃতাকালে বলিয়াছেন,—"The use of contraceptives is damnable in all classes, সমাজের সমস্ত শ্রেণীর মধ্যেই কৃত্রিম উপায়ে এই প্রজনন-ক্রিয়ারোধের চেষ্টা সর্ব্বদা নিন্দনীয়।" কেবল মার্কিণ কেন, এখন প্রাচ্যেরও অনুকরণপ্রিয় তথাকথিত সভ্যতাভিমানী 'সবুজদল' একটা 'নূতন কিছু' করিবার বা দেখাইবার অভিপ্রায়ে প্রজননক্রিয়া-রোধের নানা উপায় অবলম্বন করিতেছেন, অতীত, ভবিষ্যৎ তাঁহাদের কাছে নাই, বর্ত্তমানই সব। বর্ত্তমানটা enjoy করিলেই তাঁহাদের ধর্ম্মার্থমোক্ষকাম বোধ হয় অনায়াসে করায়ত্ত হইবে!

মার্কিণের প্রেসবিটেরিয়ান চার্চ্চের পক্ষ হইতে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিবার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান। ঐ দেশেরই Federal Council of Churches একটা বিবৃতি প্রকাশ করেন; ঐ বিবৃতিতে তাঁহারা প্রজনন-ক্রিয়ারোধের উপায় অবলম্বন করার আংশিক সমর্থন করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে ঐ দেশে বিবাহ-বিচ্ছেদ এবং পুনর্ব্বিবাহ সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধানের জন্য যে General Assembly's Commission বসিয়াছিল, সেই কমিশনও রিপোর্টে গৃহস্থের ঘরে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা সমর্থন করিয়া রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ইহাতে মার্কিণ দেশের প্রায় সর্ব্বত্র আগুন জ্বলিয়া উঠে। কেবল যে প্রেসবিটেরিয়ানরা এই অনিষ্টকর প্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, তাহা নহে, জনমতের তাড়নার ফলে কমিশন তাঁহাদের রিপোর্ট হইতে আপত্তিকর কথাগুলি তুলিয়া দিতে বাধ্য হন। জেনারল এসেমব্লিও, ফেডারল কাউন্সিলের বিপক্ষে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করেন।

পিটসবার্গের প্রেসবিটেরিয়ান চার্চ্চ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে,—

(১) Marriage is a lifelong and spiritual comradeship, বিবাহ এ জীবনে অচ্ছেদ্য এবং উহা নর-নারীর মধ্যে আধ্যাত্মিক সাহচর্য্য সূচনা করে।

(২) খৃষ্টানধর্ম্মবিবাহে অধুনা খৃষ্টান আদর্শ অনুসৃত হইবার জন্য কড়াকড়ি করিতেছেন না বলিয়াই এই অনর্থের উদ্ভব।

(৩) খৃষ্টধর্ম্মের এই অমনোযোগিতার ফলে divine principles that sanctify marriage নষ্ট হইয়া যাইতেছে এবং It has culminated in a Sex stampede and a practical acceptance of a pagan standard of life.

(৪) এ রোগ-প্রতীকারের উপায়,—A nobler conception of the marriage relationship in the minds of men and women, নরনারীর মনে বিবাহ সম্বন্ধে উচ্চ ধারণার উদ্ভব করা।

(৫) আমাদের সবুজ দলের (তরুণ-তরুণীদের) দৃষ্টি সংবাদপত্র, সাময়িক পত্র, মুভি, থিয়েটার এবং নাটক-নভেলের প্রভাবে কদর্য্য বিবাহের ধারণার দিকে আকৃষ্ট হইতেছে। তরুণ-তরুণীদিগকে অধিকারের দাবী করিতে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, কিন্তু দায়িত্ব সম্বন্ধে কোন শিক্ষা দেওয়া হইতেছে না (to demand their rights regardless of our responsibilities)। এ রোগের প্রতীকার করিতে হইবে।

(৬) হলিউড (চলচ্চিত্রের প্রধান আড্ডা) পথ দেখাইতেছে। চলচ্চিত্রে সুন্দরী নারীর চরিত্র এমন ভাবে অঙ্কিত হইতেছে, যাহাতে বিবাহ অপেক্ষা অনেক অধিক সুখের অবস্থার' কল্পনা করা যায়, যাহাতে দেখান হইতেছে যে, 'বিবাহ করিলেই নর-নারীর জীবন মাটী হইয়া যায়, কিন্তু বিবাহের দায়িত্ব গ্রহণ না করিয়া লালসা চরিতার্থ করা যায় (to gratify passions without the responsibilities of marriage)। সেই নারীর চরিত্র পুরাকালের রূপজীবিনীরই (harlots) অনুরূপ, যে অম্লানবদনে মুখ মুছিয়া বলিত, আমি পাপ করি নাই। এই সর্ব্বনাশ রোধ করিতেই হইবে।

প্রেসবিটেরিয়ান চার্চ্চ তাই দেশবাসীকে প্রতীকারোপায় নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন,—"সাহচর্য্য বিবাহ (companionate marriage) অথবা সহজ বিবাহ-বিচ্ছেদ দ্বারা এই ভীষণ রোগের প্রতীকার হইবে না, কড়া ঔষধ চাই। ইহার জন্য আমাদের গির্জ্জায়, স্কুলে ও কলেজে বিবাহ সম্বন্ধে ধর্ম্মের বিধিনিষেধবিষয়ে শিক্ষা দিতে হইবে। যাহাতে উহার ফলে আমাদের তরুণ-তরুণীরা

বিবাহের—দম্পতি-জীবনের সাফল্য সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে পারে, তাহারই জন্য আমাদের প্রাণপণ চেষ্টা করা উচিত।"

তরঙ্গ আসিয়া আমাদের দেশের বেলাভূমিতে আছাড়ি-পিছাড়ি খাইতেছে। সময় থাকিতে তথাকথিত 'সবুজ দল' সতর্ক হইতে পারেন।

মহাচীন

চীনদেশের গৃহবিরোধ আবার প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে। উত্তরে ন্যানকিং, দক্ষিণে ক্যান্টন, উত্তরের কর্ত্তা সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট জেনারেল চিয়াং কাইসেক, দক্ষিণের ইউজিনচেন। অথচ এই দুই মনীষীই এক দিন একযোগে চীনের War Lord বা স্বেচ্ছাচারী দস্যুদলপতিদিগের উচ্ছেদসাধন করিয়া চীনে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। চীনের ভাগ্য!

উভয়েই বলিতেছেন, "আমি ডাক্তার সান ইয়াটসেনের মন্ত্র-শিষ্য, আমি তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিতেছি।"

আজ ইউজিনচেন বলিতেছেন, "চিয়াং কাইসেক দেশের শত্রু, উহাকে ধ্বংস না করিলে চীনের মুক্তি নাই।" অথচ ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসে চিয়াং কাইসেকও ইউজিনচেন সম্বন্ধে ঠিক এই কথাই বলিয়াছিলেন। তখন হ্যাঙ্কো সহরে রাসিয়ার বোরোডিনের সহিত একযোগে ইউজিনচেন স্বতন্ত্র সাধারণতন্ত্র গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। চিয়াং তাঁহাকে মস্কোর এজেণ্ট ও দেশদ্রোহী কম্যুনিষ্ট আখ্যায় ভূষিত করিয়াছিলেন, তিনিও চিয়াংকে দেশের শত্রু ও বিদেশী শক্তিপুঞ্জের বেতনভুক্ বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন।

ভারতেরই মত এই গৃহবিবাদই চীনের সর্ব্বনাশ করিতেছে। বিধিলিপি!

নাটক-প্রহসনের যুগাবসান

মার্কিণ দেশ এখন পাশ্চাত্য সভ্যতায় সেরা দেশ। এখানে যাহা কিছু নূতন হয়, তাহা সেরা ভাবেই করা হয়। রঙ্গমঞ্চে নাটক-প্রহসনের অভিনয়ও এত দিন সেরা ভাবেই চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে এই ব্যবসায়ে মন্দা পড়িয়াছে, লোক যেন এ দিকে আর পূর্ব্বের মত ঝোঁক দিতেছে না। মার্কিণের একখানি সংবাদ-পত্র সম্প্রতি লিখিয়াছেন যে, নিউ ইয়র্ক সহরের ব্যসন-বিলাসের কেন্দ্রস্থান ব্রডওয়ের সমস্ত রঙ্গমঞ্চের আয়ের ক্ষতি এক বৎসরে ২০ লক্ষ ডলারেরও উপর হইয়াছিল। এই পত্র ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছেন যে, যে সকল রঙ্গমঞ্চ এখনও কোনমতে কায়ক্লেশে টিকিয়া আছে, সেগুলি যখন ভূমিসাৎ হইবে, তখন ক্ষতি ইহার দ্বিগুণ হইবে।

ইংলণ্ডেও নাটক-প্রহসনের অবস্থা তথৈবচ বলিয়া শুনা যাইতেছে।

ইহার কারণ কি? কারণ,—'মুভি' ও 'টকি' অর্থাৎ অ-বাক ও স-বাক চলচ্চিত্রের সর্ব্ববিধ্বংসী প্রভাব!

কিন্তু ইহার অন্য এক গুরু কারণও আছে। অধুনা 'সাইলেণ্ট মুভিতে' (অ-বাক চলচ্চিত্রে) এবং 'টকিতে' (স-বাক চলচ্চিত্রে) nasty show অর্থাৎ রুচিবিরুদ্ধ চিত্র প্রদর্শিত হই-তেছে। এজন্য সকল দেশেই কড়া Censor নিযুক্ত হইতেছে। নিয়ামক যাহা সমাজের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর মনে করেন, তাহা পাশ করেন না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও অনেক চিত্র অপরিণত-বয়স্কদের মনে বিকার আনয়ন করিয়া থাকে। বর্ত্তমানে প্রতীচ্যের উচ্ছৃঙ্খল সমাজও এখন এ দিকে বাঁধনকষণ ক্রমশঃ কড়া করিতেছেন। থিয়াটারেও রুচিবিরুদ্ধ অভিনয় হইয়া থাকে। কিন্তু থিয়েটারে ও বায়স্কোপে প্রভেদ এই যে, বায়স্কোপে অভিনেতা ও অভিনেত্রী সজীব নহে, থিয়েটারে সজীব। সুতরাং থিয়েটারে অশ্লীল চিত্রদ্রোহী অভিনয় আরও ভয়ঙ্কর। অপরিণত-বয়স্ক দর্শকের কামক্ষুধা তাহাতে শতগুণে বর্দ্ধিত হয়। ইহা সমা-জের পক্ষে বিষম অনিষ্টকর। তাই তাহার দিকে সেন্সরের দৃষ্টি সমধিক পতিত হইয়াছে। এজন্য থিয়েটারে ক্রমশঃ কতক পরি-মাণে নিয়ম ও সংযমশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে। বর্ত্তমানের ধর্ম্মশিক্ষা-বর্জ্জিত উচ্ছৃঙ্খল উদ্দাম অপরিণতবয়স্ক দর্শক এই হেতু থিয়ে-টারের অভিনয়ে তৃপ্তি পায় না, তাই দলে দলে সিনেমা-টকিতে গিয়া থাকে। বিশেষতঃ থিয়েটারে সিনেমার মত দৌড়ঝাঁপ নাই, রেল, মোটর, এরোপ্লেন, পর্ব্বত, সমুদ্র, নানা জাতি, নানা দেশ, নানা মন্দির মসজিদ নাই, ঘটনার পর ঘটনার সমাবেশ নাই; চমকাইয়া দিবার মত sensation after sensation নাই; stunt after stunt নাই। কাযেই থিয়েটারের দিন গত হইয়াছে, সিনেমার দিন আসিয়াছে।

Mr. Channing Pollock মার্কিণ যুক্তরাজ্যের খ্যাতনামা প্রহসন ও নাট্যকার। তিনি মার্কিণের একখানি পত্রে এ বিষয়ে লিখিয়াছেন,—"মার্কিণ মুলুকের বিলাসী আমোদপ্রিয় নরনারী কড়ি গণনা করা ছাড়া অন্য সকল বিষয়েই তাহাদের অজ্ঞতা লুকাইবার জন্য জগতের গভীর ভাব ও চিন্তাপ্রসূত জিনিষ-মাত্রেরই প্রতি লক্ষ্য করিয়া ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে। তাহারা বিবাহের বিরুদ্ধে আলোচনা দেখিতে পাইলেই প্রশংসা করে। কল্পনা, ভাব-প্রবণতা, সাধুতা এবং সাধারণ শিষ্টতা ও ভব্যতা তাহারা সহ্য

করিতে পারে না। ইহার নাম হইয়াছে Sophistication, এবং তাহারা কেবলমাত্র Sophisticated showই দেখিতে যায়।

"এই শ্রেণীর দর্শক ধর্ম্মভাবকে বিদ্রূপ করিলে বুঝে ভাল, কুরুচিব্যঞ্জক তামাসা-বিদ্রূপ উপভোগ করে ভাল, প্রায় উলঙ্গ chorusএর (সখীদের গান ও নৃত্যের) উল্লাস সহকারে বাহবা দেয়, অশ্লীল গান শুনিলে দাঁড়াইয়া উঠিয়া করতালি দিয়া 'এনকোর' দেয়। কিন্তু নীতিজ্ঞানসম্পন্ন নায়কের সহিত তাহারই গুণোপেত নায়িকার কিরূপে ঘটনাপরম্পরার মধ্য দিয়া মিলন হয় এবং কিরূপে কলঙ্ক ও বিবাহ-বিচ্ছেদকে বিষবৎ বর্জ্জন করিয়া দম্পতি সারা জীবন মনের সুখে জীবন-যাপন করে, তাহা তাহারা ধারণাই করিতে পারে না। এই ভাবের চরিত্রচিত্রকে তাহারা 'Old stuff' সেকেলে, 'Mid-Victorian' মধ্যযুগের এবং 'Unsophisticated' 'বেচারী অভিনয়' আখ্যা দিয়া থাকে।

"এই ক্ষুদ্র সংখ্যা-লঘিষ্ঠ শ্রেণী আপনাদিগকে দেশের মস্তিষ্ক (মনীষী) বলিয়া মনে করিয়া থাকে। ইহারাই অশ্লীল সিনেমা-থিয়েটারকে বাঁচাইয়া রাখে। কিন্তু সাধারণ গৃহস্থরা যে সকল থিয়েটারে সিনেমায় যায়, সে সকল সিনেমা বা থিয়েটার ক্রমশঃ উঠিয়া যাইতেছে। কাষেই ভদ্র গৃহস্থকে এখন আমোদ-প্রমোদ ত্যাগ করিয়া প্রায় প্রতিদিনই ঘরে বসিয়া থাকিতে হইতেছে।"

মিঃ পলক বলিতেছেন,—এইসা দিন নেহি রহেগা, প্রতিক্রিয়া আসিবেই, ইতিমধ্যেই আসিয়াছে। বস্তুতঃ মার্কিণের যথার্থ মনীষীরা এবং ভদ্র গৃহস্থরা সন্তানসন্ততির ভবিষ্যৎ ভাবিয়া এই অবস্থার পরিবর্ত্তনপ্রয়াসী হইয়াছেন, এ কথা শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। সেক্সপিয়ার ও রাণী এলিজাবেথের giant England চিরদিন রাডিয়ার্ড কিপ্‌লিংএর pigmy England থাকিবে না, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

বিষাদ-প্রাচীর

জেরুসালেম প্রদেশের যে বিষাদ-প্রাচীর বা Wailing wall লইয়া ইহুদী ও মুসলমানের মধ্যে ভীষণ বিরোধ ও দাঙ্গা বাধিয়াছিল, একটি সালিসী কমিশন সম্প্রতি সেই বিবাদ মিটাইয়া দিয়াছেন।

ওমর ৬৩৭ খৃষ্টাব্দে ইহুদীদের নিকট হইতে ইহুদা বা জেরুসালেম জয় করেন। তখন হইতে ১৯১২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মুসলমানদের ঐ স্থানে প্রভুত্ব ছিল। জার্ম্মাণ মহাযুদ্ধের পর জাতিসঙ্ঘের নির্দ্দেশ অনুসারে জেরুসালেম ইংরাজের 'অনুজ্ঞা প্রাপ্ত' (Mandated) দেশে পরিণত হয়। ইহুদীরা ঐ স্থানের একটি প্রাচীরকে পূজা করিত ও তথায় শোকপ্রকাশ করিত; এই হেতু উহা তাহাদের তীর্থস্থানে পরিণত হইয়াছিল। এত দিন কেহ তাহাদের এই পূজায় বা তীর্থযাত্রায় বাধা দেয় নাই। কিন্তু ইংরাজের কর্তৃত্বাধীনে আসিবার পর মুসলমান ও ইহুদীদের এই তীর্থ সম্পর্কে বিরোধ বাধিয়াছিল। মুসলমানরা ঐ স্থানে ইহুদীদিগকে তীর্থ করিতে বা শোক করিতে দিবে না বলিয়াছিল; ইহুদীরা বলিয়াছিল যে, ঐ প্রাচীর-সংলগ্ন স্থান রাজা সলোমনের প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের অবস্থানস্থান। মন্দির ব্যাবিলোনীয়রা ধ্বংস করিয়াছিল। এজরা নেহিমিয়া উহা পুনর্নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আবার রোমক সম্রাট টাইটাস উহা ধ্বংস করেন, তবে উহার কিয়দংশ এখনও পর্য্যন্ত ঐ পুরাতন প্রাচীরে বিদ্যমান রহিয়াছে। আমাদের উজ্জয়িনী তীর্থেও এই ভাবের এক ধ্বংসাবশেষের তোরণদ্বারকে রাজা বিক্রমাদিত্যের ফটক বলিয়া তীর্থযাত্রীকে দেখান হয়।

মুসলমানরা বলে, ঐ প্রাচীরটি ওমরের মসজিদ হারাম এস সরিফের ধ্বংসাবশেষের একাংশমাত্র। উহা মক্কা ও মদিনার পর মুসলমানদের পক্ষে পরম পবিত্র তীর্থক্ষেত্র।

এইরূপে এই প্রাচীর লইয়া উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ভীষণ বিরোধ বাধিয়াছিল। জাতিসঙ্ঘের নির্দ্দেশ অনুসারে বৃটিশ সরকার এক সালিসী সমিতির হস্তে মীমাংসার ভার অর্পণ করেন। ইহা ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের অর্থাৎ গত বৎসরের কথা। সুইজারল্যাণ্ডের চার্‌লস বার্ড, সুইডেনের ভূতপূর্ব্ব বৈদেশিক সচিব ইলিয়েন লেফগ্রেণ এবং ওলন্দাজদিগের এক ঔপনিবেশিক রাজকর্ম্মচারী এ, ভ্যাজকেম্পেন এই সমিতির সদস্য নিযুক্ত হন।

কমিশন নানা সাক্ষ্য-সাবুদ গ্রহণ করিবার পর রায় দিয়াছেন যে, (১) এখন হইতে ইহুদী ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই এই তীর্থস্থানে গমনাগমন ও ইচ্ছামত পূজাদি দিবার অধিকার থাকিবে, (২) প্রাচীরটি কিন্তু মুসলমানদেরই সম্পত্তি থাকিবে, (৩) প্রাচীরের সান্নিধ্যে রাজনীতিক বক্তৃতা, সভা বা শোভা-যাত্রাদি হইতে পারিবে না, (৪) ঐ স্থানে কেহ বেঞ্চ, কার্পেট প্রভৃতি আসবাবপত্র লইয়া যাইতে পারিবে না, (৫) ইহুদীরা ঐ স্থানের সান্নিধ্যে শিঙা বাজাইতে পারিবে না, (৬) মুসলমানরা তথায় 'সিকর' নাচ নাচিতে পারিবে না।

এখন ধরিত্রী শীতল হইলেই মঙ্গল। জগতে কত অনর্থই যে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মান্ধতার নিকট দায়ী, তাহা কে বলিতে পারে?
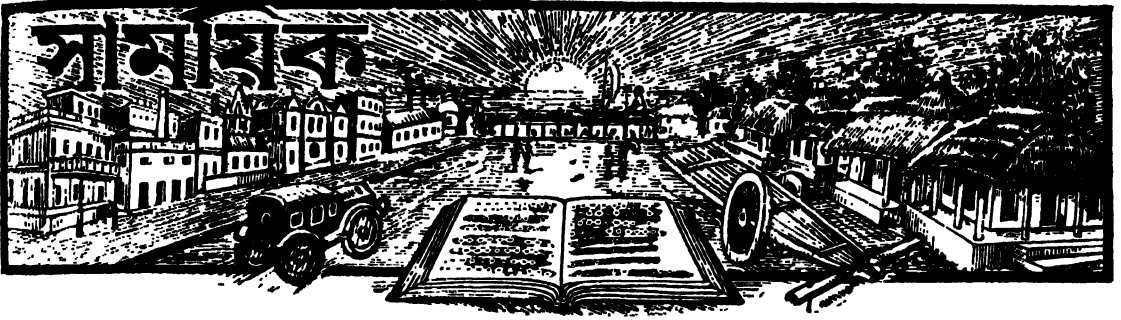
বিপ্লববাদীর ধ্বংসলীলা

চার্চ্চিল, ব্র্যাকেন বা রদারমিয়ার প্রমুখ অন্ধ অপরিণামদর্শী সাম্রাজ্যগর্ব্বীরা যাহাই বলুন, যাঁহারা স্থিরমস্তিষ্ক অভিজ্ঞ পরিণামদর্শী শান্তিকামী রাজনীতিক, তাঁহারা নিশ্চিতই স্বীকার করিবেন যে, ভারতের স্বার্থে ভারত শাসন না করিলে ভারতে প্রকৃত শান্তি কখনই প্রতিষ্ঠিত হইবে না, বরং তৎপরিবর্ত্তে অসন্তোষ উত্তরোত্তর বাড়িয়াই যাইবে। উহা সাম্রাজ্যের পক্ষেও শুভকর হইবে না, ভারতের পক্ষেও নহে। ভারতে জাতীয়তার ভাবতরঙ্গোচ্ছ্বাসের কথা সরকারের বার্ষিক শাসন-বিবরণীতেও স্বীকৃত হইয়াছে। উহার মূলে নবজাগ্রত জনশক্তির আশা-আকাঙ্ক্ষা নিহিত রহিয়াছে। কালোপযোগী করিয়া উহা পূর্ণ না করিলে উহার গতি গুপ্তপথে পরিচালিত হইবার আশঙ্কা আছে, কেন না, ভারতের অপরিণামদর্শী উত্তপ্তমস্তিষ্ক তরুণরা প্রতীচ্যের শিক্ষাদীক্ষার অনুকরণে হিংসামূলক আচরণের দ্বারা আপনাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির চেষ্টা করিবেই। ঘটিতেছেও তাহাই। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই এ দেশে কয়েকটি স্থানে বিপ্লববাদী তরুণের হিংসার খেলা দেখা দিয়াছে। মহাত্মা গন্ধীর শিক্ষায় অনুপ্রাণিত জাতীয় কংগ্রেসের মূলনীতি অহিংসা জানিয়াও এ দেশের তরুণ বিপথে পরিচালিত হইয়া একের পর একটি করিয়া রাজনীতিক হত্যা অথবা হত্যার চেষ্টা করিয়াছে। পুণায় বোম্বাই বিভাগের অস্থায়ী গভর্ণর সার আর্ণেষ্ট হটসনকে এক যুবক ছাত্র গুলী করিয়া হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। মহাত্মা গন্ধী এই হত্যা-চেষ্টার নিন্দাবাদ করিবার কালে বলিয়াছেন, "একেই ত তরুণ ছাত্রের পক্ষে এই গর্হিত কার্য্য সর্ব্বথা নিন্দনীয়, তাহার উপর সার আর্ণেষ্ট অতিথিরূপে ফার্গাসন কলেজের লাইব্রেরী পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন, সে অবস্থায় কলেজের ছাত্রের দ্বারা তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টা কতদূর নিন্দনীয়, তাহা একমুখে বলা যায় না।" তাহার পর জি, আই, পি রেল-লাইনের ভুসোয়াল ষ্টেশন হইতে কিছু দূরে চলন্ত ট্রেণে দুই জন বৃটিশ সেনানীকে দুই জন ভারতীয় তরুণ হত্যার চেষ্টা করিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। তন্মধ্যে এক জন সেনানী ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন, অপর জন গুরু আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছেন। কলিকাতার আলিপুর আদালতে পর পর দুইবার হত্যার চেষ্টা ও হত্যা সংঘটিত হইয়াছে। প্রথমোক্ত হত্যাকাণ্ডে যে লিপ্ত বলিয়া ধৃত হইয়াছে, সে শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ভদ্রপরিবারের সন্তান বলিয়া প্রকাশ। শেষোক্ত হত্যাকাণ্ডও যাহার দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ, তাহারও ভদ্র শিক্ষিত পরিবারে জন্ম বলিয়া অনুমান। আর শেষোক্ত ব্যাপারে যিনি নিহত হইয়াছেন, তিনি আলিপুরের দায়রা জজ মিঃ গার্লিক, তাঁহার ন্যায় জনপ্রিয় ন্যায়বিচারক অতি অল্পই আলিপুরে আসিয়াছেন। অথচ বিপথে পরিচালিত চরমপন্থী তাঁহার সে সমস্ত গুণের কথা একবারও ভাবিয়া দেখে নাই, এমনই মনের অবস্থা!

এ মনোবৃত্তি দেখা দেয় কেন? এই ভাবের নরহত্যা ও হিংসা-ক্রোধ এ দেশের ভাবধারার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। অহিংসা মন্ত্রই বহুদিন হইতে এদেশবাসীর অস্থি-মজ্জাগত, মহাত্মা গন্ধী সেই প্রাচীন মন্ত্রেরই প্রচারক। এ সকল হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করে নাই, এমন নেতা বা সংবাদপত্র এ দেশে বিরল। এমন ভাবের হত্যাকাণ্ড যখনই ঘটিয়াছে, তখনই এ দেশবাসী সমস্বরে উহার ঘোর প্রতিবাদ করিয়াছে। তবে এইরূপ হত্যাকাণ্ড থাকিয়া থাকিয়া ঘটে কেন?

দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান এপ্রুভার (সরকারী সাক্ষী) কৈলাসপতিকে যখন আসামী কাপূরচাঁদ জৈনের কৌসিলী ২৪শে জুলাই তারিখে জেরা করেন, তখন সে অন্যান্য কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিল,—"ভারতবর্ষীয়দের যত দুঃখ-কষ্টের মূলই হইতেছে বর্ত্তমান শাসনপ্রণালী। ভারতের সহায়হীন (helpless poverty) দারিদ্র্যেই উহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বহুকাল হইতে ভারতবাসী গুরু করভারের পাষাণ-চাপে অবসন্ন। কতকগুলি বিষয়ে অনাবশ্যক কর আদায় করা হয়, এমন কি, খাদ্যদ্রব্যও করভার হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হয় না। ভারতের অসংখ্য নিরক্ষর জনসাধারণের সামাজিক অবস্থার উন্নতিবিধান সম্বন্ধে ভারতের বৃটিশ সরকারের সহানুভূতিরহিত অমনোযোগিতাও এইরূপ সর্ব্বনাশসাধন করিতেছে। জনসাধারণের মানসিক ও আর্থিক

উন্নতিসাধনের দিকেও সরকারের যথোচিত দৃষ্টি নাই।............সরকার ইচ্ছা করিলে ব্যাঙ্ক ও কো-অপারেটিভ সমিতিসমূহ বিস্তৃতভাবে প্রতিষ্ঠা করিয়া জনসাধারণের আর্থিক কষ্ট দূর করিতে পারেন। কিন্তু এ দিকে ফলদায়ক কোন উন্নতিই সাধিত হয় নাই।............এই পচা সাম্রাজ্যিক সরকারের সৌধ ধ্বংস করিয়া উহার স্থানে সোসালিষ্ট সাধারণতন্ত্রের মহৎ সৌধ নির্ম্মাণ করিবার উদ্দেশ্যে এই বিপ্লবী দল লাহোর ষড়যন্ত্র ধরা পড়িবার পর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।"

এই এপ্রুভার তাহার পর দিল্লীর ষড়যন্ত্রকারীদের কর্ত্তা হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিয়াছিল। ইহার কথা সত্য কি না, তাহা আদালতের বিচারে প্রকাশ পাইবে। উহার সহিত এই প্রবন্ধের সম্বন্ধ নাই। কিন্তু এ দেশের এক শ্রেণীর বিপথগামী তরুণের মনোবৃত্তি কিরূপ হইতে পারে, তাহাই প্রদর্শন করা আমাদের উদ্দেশ্য। ইহারা ধ্বংসবাদী, হিংসার পথে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে চাহে। এরূপ মনোবৃত্তি এ দেশের ধাতুসহ নহে। ইহাদের এই মনোবৃত্তি কিরূপে পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে, তাহাই এখন সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন সমস্যার বিষয় হইয়াছে।

ধর্ষণনীতি, না আপোষনীতি ?

এই মনোবৃত্তি একটা রোগবিশেষ। ইহার প্রতিষেধক ঔষধও নিশ্চিতই আছে। এই যে প্রতীচ্যের এনার্কিজম্, নিহিলিজম্ বা অন্য প্রকার ধ্বংসনীতি এ দেশের এক শ্রেণীর তরুণদের মস্তিষ্ক বিকৃত করিয়া দিয়াছে, ইহার প্রতীকারের উপযোগী ঔষধ দুই প্রকৃতির হইতে পারে। কেবল যে শাসকশ্রেণীর ইহাতে ক্ষতি বা আশঙ্কার কারণ আছে, তাহা নহে, এ দেশবাসী গৃহস্থ ও নাগরিকেরও উহাতে বিশেষ ক্ষতি ও আশঙ্কার কারণ আছে। যে ভদ্রশ্রেণীর তরুণদের মধ্যে এ রোগ দেখা দিয়াছে, সেই ভদ্রশ্রেণীর ভবিষ্যৎ আশা-ভরসাস্বরূপ এই শ্রেণীর তরুণরা বিপথগামী হইলে পরিবারস্থ সকলেরই ক্ষতি হয়। আর সমাজের একটি বিশেষ অঙ্গ যদি এইরূপে রোগদুষ্ট হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতের জন্য দেশবাসীর আশঙ্কা জন্মিবেই। বিশেষতঃ যাহারা সুপ্রতিষ্ঠিত শাসনযন্ত্র বিকল করিবার জন্য নরহত্যার আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহারা কেবল যে বিদেশী সরকারকেই লক্ষ্যস্বরূপ গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট হইবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই, যে কোন সরকার (দেশী বা বিদেশী যাহাই হউক) তাহাদের মনের মত না হইলেই তাহার উচ্ছেদসাধনের চেষ্টা করিবে। সে ক্ষেত্রে কেবল শাসক জাতির নহে, এ দেশবাসীরও এই রোগের প্রতীকারোপায় চিন্তা করা বিশেষ প্রয়োজনীয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহার দুইটি পন্থা আছে। সে দুইটি কি? প্রথম পন্থা, বে-পরোয়া ধ্বংসনীতি। চার্চ্চহিল, ব্র্যাকেনের দল এই নীতির প্রচারক ও সমর্থক। বিলাতের 'ডেলি মেল', 'মর্ণিং পোষ্ট', 'ডেলি টেলিগ্রাফ' প্রমুখ সাম্রাজ্যগর্ব্বী শক্তিশালী পত্র এবং এ দেশেরও 'ষ্টেটশম্যান' প্রমুখ অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রও এই মতের সমর্থক। 'ডেলি মেল' বলিয়াছেন, "ভারতীয় ব্যাঘ্রকে বিড়ালের মাংস খাওয়াইয়া আরও রক্তপিপাসু করিয়া তুলা হইতেছে মাত্র, উহাতে কায হইবে না।" এখানকার 'ষ্টেটশম্যান' এই নরহত্যার জন্য কংগ্রেসকে দায়ী করিতেছেন এবং মহাত্মা গন্ধীকে কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া কো-অপারেটারদের সহিত যোগ দিয়া গোল টেবিলে যাইতে পরামর্শ দিয়াছেন। তিনি 'ভারতবন্ধু' নাম ধরিয়াছেন বটে, কিন্তু পাড়াকুঁদুলী ঠানদির মত ঘর ভাঙ্গাইতে নাটের গুরু! হিন্দু-মুসলমান-সমস্যায় যে সময়ে দেশহিতকামী হিন্দু-মুসলমান ব্যতিব্যস্ত, তিনি সেই সময়ে সুযোগ বুঝিয়া ভেদমন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের পক্ষেও ওকালতী করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, নির্লজ্জভাবে হিন্দুর পক্ষের অথবা জাতীয়তাবাদী মুসলমান পক্ষের কথা চাপিয়া রাখিয়া সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের ক্ষুদ্র ব্যাপারকেও হিমালয়ের মত বড় করিয়া তুলিতেছেন। অথচ তাঁহার পেটের ভাতের ভিত্তিপত্তন হইয়াছিল হিন্দু ইন্দ্রচন্দ্রের পয়সায়! এই নিমকহারাম হিন্দুদ্বেষী এখন যে কংগ্রেসকে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী করিতেছেন, সেই কংগ্রেসের মূলনীতিই যে অহিংসা এবং সেই কংগ্রেসই যে মহাত্মা গন্ধীকে তাঁহাদের একমাত্র প্রতিনিধিরূপে গোল টেবিলে পাঠাইতেছেন, তাহা যে তিনি জানেন না, তাহা নহে। তবে স্বার্থ বড় বালাই!

আজ ইহারা ক্রোধের বশে বন্ধুকেও শত্রু বলিয়া মনে করিতেছেন। কিন্তু প্রথমে যখন বৃটিশ সরকার কংগ্রেস নেতৃবর্গকে মুক্তিদান করিয়া তাঁহাদের গোল টেবিলে যোগদানের কথা পাড়িয়াছিলেন, তখন এই 'ষ্টেটশম্যানই' কত আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কেন? তাহার কারণ এই যে, 'ষ্টেটশম্যান' বিলক্ষণ জানিতেন যে, হিংসাবাদীদের বিরুদ্ধে হিমালয়ের মত বাধা একমাত্র মহাত্মা গন্ধী ও কংগ্রেস। কংগ্রেস ও মহাত্মা গন্ধী সরকারের শাসননীতির প্রতিবাদস্বরূপ আইন অমান্য করিয়া স্বয়ং দুঃখবিপদ ভোগ করিবেন, তথাপি ঘুণাক্ষরেও অপর পক্ষের ক্ষতি করিবেন না, রক্তপাত করা ত দূরের কথা,—ইহাই কংগ্রেসের নীতি। তাঁহারা বিপ্লববাদীর হিংসামূলক

কার্য্যের ঘোর শত্রু। সরকার এ কথা জানেন, সরকারের অবিচারিতচিত্তে স্তুতিবাদক এই সকল অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রও তাহা জানেন। তথাপি এই শ্রেণীর সংবাদপত্র ধর্ষণনীতির সমর্থন করিতেছেন এবং যে কংগ্রেস বিপ্লববাদের পরম শত্রু, তাহাকে ত্যাগ করিতে পরামর্শ দিতেছেন, ইহাই আশ্চর্য্য!

ময়মনসিংহে যখন পাঁচ হাজার উন্মত্ত মুসলমান-জনতা অসহায় জমীদার কৃষ্ণ রায়ের পরিবারবর্গকে নিষ্ঠুররূপে হত্যা করে, তখন এই শ্রেণীর লোকের মুখে আইন ও শৃঙ্খলার একটি কথাও শুনা যায় নাই। কয়েক দিন পূর্ব্বে তাহাদের বিচারের যে রায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, গুণ্ডারা এই বিপন্ন হিন্দু পরিবারের কয়েক জনকে স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিচারে নৃশংসভাবে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়াছিল, পরন্তু অবশিষ্ট কয় জনকে জীবন্ত পুড়াইয়া মারিয়াছিল। এই রায় প্রকাশিত হইবার পরেও কোন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্র বা সভা এ বিষয়ে সরকারের দুর্ব্বলতার বা অক্ষমতার কথা উল্লেখ করিয়া এ দেশে শাসনপাট উঠাইতে হুকুম দেয় নাই। ঢাকার শীতলাইএর তরুণ জমীদার মুকুলচন্দ্রকে যখন শত শত মুসলমান গুণ্ডা আক্রমণ করিয়াছিল, এবং তাহার ফলে তাঁহার অকালে শোচনীয় মৃত্যু ঘটিয়াছিল, তখনও তাঁহারা নীরব ছিলেন। সম্প্রতি কলিকাতায় প্রকাশ্য দিবালোকে তিন জন নিরীহ নাগরিককে দুই জন জিঘাংসু মুসলমান অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিয়া নিষ্ঠুররূপে হত্যা করিল, সে সময়ে এই শ্রেণীর সমালোচক শান্তি-শৃঙ্খলার নামে চীৎকার করে নাই। ইহার কারণ কি? নরহত্যা সকল ক্ষেত্রেই নরহত্যা, উহাতে সমাজের শৃঙ্খলা নষ্ট হয়। উহা রোধ করিবার জন্য সকল ক্ষেত্রেই আন্দোলন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহা বলিয়া বাছিয়া বাছিয়া কোন ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষকে কঠোর ধর্ষণনীতি অবলম্বন করিতে প্ররোচিত করার অর্থ কি?

সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ

লাহোর টাউন হলে পঞ্জাব সংখ্যাল্প বৈঠকের অধিবেশনে ভারতীয় খৃষ্টান সমিতির প্রেসিডেণ্ট মিঃ কে, এল, রল্যারাম তাঁহার সভাপতির অভিভাষণে বলিয়াছেন, "সমস্ত স্বার্থ ত্যাগ করিয়া সর্ব্বাগ্রে জাতির স্বার্থ দেখা কর্ত্তব্য। সাম্প্রদায়িক বিরোধ ছাড়িয়া দিয়া যাহাতে আমরা জগতের জাতিনিচয়ের মধ্যে আমাদের স্থান করিয়া লইতে পারি, আমাদের তাহাই করা কর্ত্তব্য। সকল সম্প্রদায়কে প্রতিযোগিতার ন্যায্য স্থান দেওয়া হউক, কাহারও প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবার প্রয়োজন নাই। কুক্ষণেই লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট দ্বারা সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন নীতিরূপে গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু সে সময়ে যদি নেতৃগণ পূর্ণরূপে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতেন, তাহা হইলে দেশের মুক্তির ইতিহাস স্বতন্ত্র আকার ধারণ করিত।"

দেশীয় খৃষ্টানরা সংখ্যায় কত অল্প! মুসলমানদের তুলনায় তাঁহাদের সংখ্যা ত নগণ্য। সংখ্যাগরিষ্ঠদিগের কর্ত্তৃত্ব হইতে আত্মরক্ষা করার প্রয়োজন তাঁহাদের যত, তত আর কোন সম্প্রদায়ের নহে। অথচ তাঁহারা জাতির মঙ্গলার্থে সে অধিকার ত্যাগ করিতে প্রস্তুত! ইহাই প্রকৃত দেশপ্রেম। শিখ ও অনুন্নত সম্প্রদায়ও সংখ্যায় অল্প। তাঁহারাও অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, নীতি হিসাবে তাঁহারা সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনের পক্ষপাতী নহেন, তবে মুসলমানরা যদি সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনের অধিকার দাবী করেন, তাহা হইলে তাঁহারাও করিবেন।

ভারতের অন্যান্য সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের প্রকৃত মনোভাব সাম্প্রদায়িকতার বিরোধী হইলেও দিল্লীর মুসলমান কনফারেন্স-ওয়ালাদের প্রতিনিধি মওলানা শওকৎ আলি ও তাঁহার অনুচর মৌলভী সফি দাউদী সাম্প্রদায়িকতাকে আঁকড়িয়া ধরিয়াছেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী মুসলমানদের দাবী পূর্ণ করিবার জন্য যতদূর সম্ভব উদারতা প্রদর্শন করিয়াছেন। জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতারা ইহা ন্যায্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। হিন্দুর পক্ষ হইতে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও ডাক্তার মুঞ্জে ইহা অনুমোদন করিয়াছেন, কিন্তু অন্যান্য হিন্দু ও শিখ নেতা ইহার ঘোর প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাঁহারা স্পষ্টই বলিতেছেন যে, উহা দ্বারা হিন্দু ও শিখের স্বার্থহানি করা হইতেছে এবং জাতীয়তার সর্ব্বনাশসাধন করা হইতেছে। দুই এক জন জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতাও বলিতেছেন, ইহাতে জাতীয়তা ক্ষুণ্ন করা হইতেছে। কিন্তু ইহাতেও মৌলানা শওকৎ আলি প্রমুখ সাম্প্রদায়িকতাবাদীদিগের মন উঠে নাই! মওলানা সাহেব বলিয়াছেন, "কংগ্রেসের কি হইয়াছে? যে বৃটিশ সরকার শান্তি ও সদিচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছেন, কংগ্রেস তাঁহাদের বিপক্ষে যুদ্ধ করিতে চাহে। কেবল ইহাই নহে, কংগ্রেস ভারতীয় রাজন্যগণের রাজ্যশাসনে হস্তক্ষেপ করিতে চাহে। তাহার পর কংগ্রেস মুসলমানদিগকে ভয় দেখাইয়া (bully) স্বকার্য্যোদ্ধার করিতে চাহে, অনুন্নত সম্প্রদায়ের মনের বাসনাকে পদদলিত করিতে চাহে এবং দেশের শ্রমিকগণকে ধনী মহাজনদের বিপক্ষে যুদ্ধ করিতে উৎসাহিত করে; পরন্তু পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু কৃষকগণকে জমীদারের বিপক্ষে উত্তেজিত করিতেছেন। আমি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর এই সিদ্ধান্তে একবারে সন্তোষলাভ করিতে পারি নাই।"

সন্তুষ্ট যে হইবে না, তাহাকে সন্তুষ্ট করা বিধাতারও সাধ্য নাই। কি গূঢ় কারণে তিনি এই ভাব ধারণ করিয়াছেন, তিনিই জানেন। এখন নাম-জাদা মুসলমান নেতাদের মধ্যে একা মওলানা শওকৎ আলিই দেখিতেছি সাম্প্রদায়িকতা আঁকড়িয়া ধরিয়া রহিয়াছেন, নতুবা সার মহম্মদ সফি বা অন্য কাহারও নাম এই সম্পর্কে শুনা যায় না। মৌলভী সফি দাউদী ও অন্য দুই চারি জন যাঁহারা সাম্প্রদায়িকতার সমর্থন করিতেছেন, তাঁহারা নগণ্য, দুই মাস পূর্ব্বে তাঁহাদের নামও কেহ শুনে নাই।

লক্ষ্ণৌএর জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের অন্যতম নেতা মওলানা কুতুবুদ্দীন আবদুল আলি এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন, "মৌলভী সফী দাউদী বা মিঃ মহম্মদ হোসেন অপেক্ষা আমি মুসলিম জনসাধারণের সংস্পর্শে অধিক আসিয়া জানিয়াছি যে, অধিকাংশ মুসলমানই ডাক্তার আন্সারি ও সার আলি ইমামের প্রতি আস্থাবান্। জাতীয়তাবাদী মুসলিমের সংখ্যা খিলাফৎ কমিটী, মুসলিম লীগ, দিল্লী কনফারেন্স বা তৎসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান-সমূহের সদস্যসংখ্যা অপেক্ষা অনেক অধিক। মাত্র গত এপ্রেলের শেষে এই দল গঠিত হইয়াছে, অথচ ইতিমধ্যেই দেশের নানা স্থানে ইহার ৮০টি শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং প্রত্যেক শাখার সদস্য শত-সহস্র।"

পঞ্জাবের বিখ্যাত মুসলমান নেতা ডাক্তার মহম্মদ আলাম এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন,—"মৌলভী সফী দাউদী বড়লাটকে তার করিয়া অনুরোধ করিয়াছেন, যেন সার আলি ইমাম ও ডাক্তার আন্সারিকে গোলটেবিলে গ্রহণ করা না হয়। তাঁহাকে কেহ জানেও না, নামও তাঁহার কেহ শুনে নাই। তাই এই সুযোগে তিনি তাঁহার কৃত্রিম প্রয়োজনীয়তা এইভাবে জাহির করিয়া লইতেছেন! মুষ্টিমেয় সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমান জগতের চক্ষুতে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া বুঝাইবার প্রয়াস পাইতেছে যে, ভারতের মুসলমানরা সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনের যূপকাষ্ঠে স্বাধীনতাকে বলি দিয়া চিরদিন দাসত্বের শৃঙ্খল পরিয়া থাকিতে চাহে।" ইহাতেও কি বুঝা যায় না যে, সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা-বাদী মুসলমানের সংখ্যা অল্প, তাহারা কোনও গূঢ় উদ্দেশ্যসাধনার্থে তাহাদের সমাজের অধিকাংশ লোকের অনিষ্ট করিতেছে?

সাম্প্রদায়িকতায় অন্ধ মওলানা শওকৎ আলি কংগ্রেসকে অযথা নিন্দা করিয়াছেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর মন্তব্যে এমন কোন্ কথা আছে, যাহাতে মনে হইতে পারে যে, কংগ্রেস মুসলমানদিগকে ভয়প্রদর্শন করিতেছে? যদি তাহা হইত, তাহা হইলে জাতীয়তাবাদী হিন্দুরা কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্তে আপত্তি তুলিতেন না। বরং ইহাতে সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমানের মনস্তুষ্টিসাধনের প্রয়াস প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়া জাতীয়তাবাদী মুসলমানরা অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। কংগ্রেস এ যাবৎ রাজন্যগণের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিয়াছে বা শ্রমিকগণকে ধনীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছে বলিয়াও শুনা যায় নাই। অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতি কংগ্রেস ত চিরদিনই সহানুভূতিসম্পন্ন। পণ্ডিত জহরলাল বরং কৃষক ও জমীদারের মধ্যে সদ্ভাব-প্রতিষ্ঠার জন্যই প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। তবে এ সব মিথ্যা গ্লানি প্রচারের উদ্দেশ্য কি?

খিলাফতের দিনে মওলানা সাহেব ভীষণ জাতীয়তাবাদী ছিলেন, বৃটিশ সরকারের বিপক্ষে ভীষণ যুদ্ধও করিয়াছিলেন। আজ হঠাৎ তাঁহার শান্তিপ্রিয়তা ও আমলাতন্ত্র সরকারের প্রতি প্রীতি কোথা হইতে জাগিয়া উঠিল? সে দিন তিনি অন্যতম প্রধান কংগ্রেসকর্ম্মী ছিলেন, আজ কেন তাঁহার এই কংগ্রেস-বিদ্বেষ? যুদ্ধে যে তিনি পশ্চাৎপদ, তাহাও নহে, কেন না, তিনি সে দিন বলিয়াছেন যে, 'লক্ষ গন্ধীর বিপক্ষে যুদ্ধ করিতেও তিনি প্রস্তুত', আবার তাহার পর মাদ্রাজে সে দিন তিনি বলিয়াছেন, "I am a man of war, অহিংসা আমার ধর্ম্ম নহে, নীতিহিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলাম।" তবে হঠাৎ তিনি শান্ত-শিষ্ট সাজিতেছেন কেন? কেবল তাঁহার সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে জাতীয়তামন্ত্রের উপাসক কংগ্রেস দণ্ডায়মান হইয়াছে বলিয়া নহে কি?

তিনি যাহাই বলুন, জাতীয়তার বেদীর উপরে ভিন্ন আর কিছুর উপরে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে না। হিন্দু-মুসলমান-মিলনই উহার মূল। মিঃ জিন্না কিছু দিনের জন্য বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বলিয়াছেন,—"The key to India's freedom অর্থাৎ ভারতের স্বাধীনতার মূল উপাদান হিন্দু-মুসল-মানের মধ্যে আপোষ বন্দোবস্ত।" অথচ এই মিঃ জিন্নার ১৪ পয়েন্টের জন্যই মিলন হইল না। সাম্প্রদায়িকতার যে বীজ উপ্ত হইয়াছে, আজ তাহা ফলে-ফুলে শোভিত বিশাল বিষবৃক্ষেই পরিণত হইতে চলিল।

মডারেটের অভিমত

যাঁহাদিগকে লইয়া বিলাতের সরকার প্রথম গোল টেবিল বৈঠক বসাইয়াছিলেন এবং যাঁহাদের সাহায্যে ও সহানুভূতিতে তাঁহারা প্রথম গোল টেবিলের অধিবেশন কতকাংশে সফল করিতে পারিয়াছিলেন,—সেই মডারেট-মালার মধ্যমণি শ্রীযুক্ত চিন্তাম. এবারকার মডারেট বৈঠকে তাঁহার সভাপতির অভিভাষণে

বলিয়াছেন,—"সংহিত রাষ্ট্রতন্ত্র শাসন ভারতে প্রবর্ত্তিত হউক বা না হউক, আমরা দায়িত্বপূর্ণ স্বায়ত্তশাসন চাই—সে দায়িত্ব প্রদেশ অপেক্ষা কেন্দ্রে অল্পপরিমাণে প্রতিষ্ঠিত করিলে চলিবে না, অর্থাৎ প্রাদেশিক শাসনযন্ত্রে যেরূপ দায়িত্ব প্রতিষ্ঠিত করা হইবে, কেন্দ্রীয় সরকারেও ঠিক সেইরূপ দায়িত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। ঐরূপ শাসনাধিকার পাইবার জন্য আমরা আর কালব্যাজ করিতে পারিব না।"

কথাটা বৃটিশ সরকারের পক্ষে ভাবিয়া দেখিবার। লর্ড মর্লে এক দিন এই মডারেটদিগকে সরকারের পক্ষপাতী (Rally the Moderates) করিবার চেষ্টা করিতে বলিয়াছিলেন এবং উঁহাদের উপর নির্ভর করিয়া সাইমন কমিশন বসান হইয়াছিল। কিন্তু ঐ কমিশনে ভারতীয় প্রতিনিধি গ্রহণ করা হয় নাই বলিয়া মডারেটরাও উহা বর্জ্জন করিয়াছিলেন। সুতরাং যাঁহাদের মনস্তুষ্টিসাধনের জন্য গোলটেবিল বৈঠকের কল্পনা হইয়াছিল এবং কংগ্রেসকে বাদ দিয়া তাঁহাদিগকে ঐ বৈঠকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল, আজ তাঁহারাই মহাত্মা গন্ধীর মত স্বাধীনতার ছায়া লইয়া সন্তুষ্ট হইতে চাহিতেছেন না, স্বাধীনতার কায়াই তাঁহাদের কাম্য। এখন বৃটিশ সরকার কি করিবেন ? সাম্রাজ্যবাদী ব্যুরোক্রাটদের সুরে পোঁ-ধরা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রসমূহ যাহাদিগকে agitator, অথবা আন্দোলনকারী এবং extremist অথবা চরমপন্থী বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন, মডারেটরা তাহা নহেন,—ব্যুরোক্রাট ও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের মতে মডারেটদের এ দেশে খোঁটা (stake) আছে, তাঁহারা স্থিরমস্তিষ্ক (sober and sane politicians), তাঁহারা সরকারের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করেন নাই। দেশবাসীর জন্মগত ন্যায্য অধিকারের মর্য্যাদা রক্ষা করার দিক হইতে না হউক, অন্ততঃ এই মঙ্গলকামী বন্ধুদিগের দাবীটাও তাঁহারা উড়াইয়া দিতে পারেন না। এইখানেই তাঁহাদের সদিচ্ছা ও ন্যায়পরায়ণতার পরীক্ষার অবসর আছে। এই পরীক্ষায় তাঁহারা উত্তীর্ণ হইতে পারেন কি না, তাহাই দেখিবার বিষয়।

কিশোরগঞ্জ

ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমায় গত মুসলমান-অনাচারের সময়ে স্থানীয় জঙ্গলিয়া য়ুনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট এবং জমীদার ও মহাজন কৃষ্ণচন্দ্র রায় কিরূপ নিষ্ঠুর বর্ব্বরোচিতভাবে সপরিবারে নিহত হইয়াছিলেন, সম্প্রতি সেই মামলার রায়ে তাহা বিশদরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। সহস্রাধিক উত্তেজিত মুসলমান নানা অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া এই হিন্দু-জমীদারের গৃহ আক্রমণ করে। তাহাদের মধ্যে অনেকে তাঁহার প্রজা অথবা খাতক ছিল। কুলারী আমলের এক শ্রেণীর মৌলভী ও লাল-ইস্তাহারের মত এবারও মুসলমানদিগকে হিন্দুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার লোক ও বক্তৃতার অসদ্ভাব হয় নাই। এই কুচক্রী বদমায়েসদের রটনার ফলে সরল গ্রামবাসী মুসলমানের বিশ্বাস হইয়াছিল যে, অন্ততঃ এক পক্ষকালের জন্য তাহারা মুসলিম-রাজ পাইয়াছে এবং ঐ সময়ের মধ্যে যদি তাহারা হিন্দুর উপর অনাচার আচরণ করে, তাহা হইলে তাহাদের কোন শাস্তি হইবে না!

এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া নিরক্ষর অজ্ঞ কৃষকরা হিন্দু-জমীদারের—মহাজনের গৃহ আক্রমণ করিতে অগ্রসর হয়। এই সুযোগে তাহাদের সুদের বা বাকী খাজনার হিসাবের খাতাপত্র ধ্বংস করিবার সঙ্কল্প তাহাদিগকে অধিকতর উত্তেজিত করিয়াছিল। ফলে বহুসংখ্যক লোক একত্র হইয়া কৃষ্ণ রায়ের গৃহ আক্রমণ করে। জমীদার বিস্তর কাকুতি-মিনতি করিয়া দয়া ভিক্ষা করিয়াছিলেন, জানালা হইতে বহু ধন-রত্ন ফেলিয়া দিয়া কেবল প্রাণ ভিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু নিষ্ঠুর আক্রমণকারীরা তাঁহার কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত করে নাই, তাহারা বলপূর্ব্বক গৃহে প্রবেশ করিয়া রাক্ষস-পিশাচের মত তাঁহাকে ও আরও আট জন লোককে হত্যা করিয়াছিল এবং গৃহে অগ্নিদান করিয়া কয় জনকে জীবন্ত পুড়াইয়া মারিয়াছিল। আদালতের রায়ে এ সব কথা না থাকিলে বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার যুগে বৃটিশ রাজ্যে এমন কাণ্ড ঘটিতে পারে, ইহা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়াই মনে হইত না!

চারি পাঁচ সহস্র লোক এই গুণ্ডামী করিয়াছিল, অথচ পুলিস মাত্র ৩৯ জন লোককে চালান দিয়াছিল। তন্মধ্যে ৩ জনের বিপক্ষে মামলা উঠাইয়া লওয়া হইয়াছিল। বাকী ৩৬ জনের ময়মনসিংহের অতিরিক্ত দায়রা-জজের এজলাসে বিচার হয়। বিচারক তাহাদের মধ্যে কাহাকেও হত্যাপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করেন নাই। আসামীদের বিপক্ষে অন্য যে সকল অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছিল, বিচারক সেই সকল অপরাধে ১৮ জনকে নির্দ্দোষ বলিয়া সাব্যস্ত করেন এবং বাকী ১৮ জনকে ডাকাতী, দাঙ্গা, গৃহ দগ্ধ করা ইত্যাদি অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া নানারূপ দণ্ড দেন। ১৩ জনের দশ বৎসর সশ্রম, ২ জনের ৫ বৎসর সশ্রম, ১ জনের ৪ বৎসর সশ্রম, ১ জনের ২ বৎসর সশ্রম, এবং ১ জনের ১ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। ইহাই বিচারক এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের উপযুক্ত শাস্তি

বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন! অ্যাংলো-ইণ্ডিয়া কলেজ ষ্ট্রীটের হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধেও যেমন নীরব, এই দণ্ডাদেশের সম্বন্ধেও তেমনই নীরব। অথচ তাঁহারা নিরপেক্ষতা এবং ন্যায়-বিচারের বড়াই করিয়া থাকেন! তবে একটা কথা, এই দেশেরই বহু কুলাঙ্গার তাঁহাদের সংবাদপত্রগুলির পৃষ্ঠপোষক!

আরও কিছু আছে। এই মামলার বিচারকালে ৪ জন এসেসর বসিয়াছিলেন, দুই জন হিন্দু, দুই জন মুসলমান। মুসলমান এসেসরদ্বয় সমস্ত আসামীকেই নির্দ্দোষ বলিয়া রায় দিয়াছিলেন, হিন্দু এসেসরদ্বয় দুই জন ছাড়া অপর আসামীদিগকে দোষী বলিয়াছিলেন। বিচারক ও হিন্দু এসেসররা যে সাক্ষ্য-প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া দোষী বলিয়া রায় দিয়াছেন, মুসলমান এসেসররাও সেই সাক্ষ্য-প্রমাণেরই উপর নির্ভর করিয়াছিলেন!

এখন সরকার কি করিবেন? বৃটিশ রাজার এক জন প্রজা সপরিবারে অসংখ্য নর-রাক্ষসের দ্বারা এমন নিষ্ঠুরভাবে নিহত হইল, রাজার শান্তিরক্ষকরা তাঁহাকে কণামাত্র সাহায্য দান করিতে পারিল না, অথচ বিচারে তাহাদের মধ্যে হত্যাকারী বলিয়া কেহ ধৃত হইল না, হইলেও বিচারে অন্য অপরাধে অপরাধী বলিয়া সামান্য কয় জন লঘু দণ্ড প্রাপ্ত হইল। এই দৃষ্টান্ত বিদ্যমান থাকিতে ভবিষ্যতে সর্ব্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষিত হইবে ত? সরকার এই বিচারে সন্তুষ্ট ত?

বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী

বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীতে এ দেশের ছেলেদের যে ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাহাতে তাহারা শিক্ষিত হইতেছে, না শিক্ষার যন্ত্রে পরিণত হইতেছে, তাহা ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। ইংরাজ আমলের প্রথম ও মধ্যযুগের শিক্ষা মনুষ্যকে মুখস্থ বিদ্যায় পারদর্শী করিয়াছে, কিন্তু প্রকৃত শিক্ষায় পারদর্শী করিতে সমর্থ হয় নাই, এইরূপ একটা কথা উঠিয়াছে। সেই হেতু বর্ত্তমান যুগের শিক্ষা প্রাচীন প্রণালী হইতে আমূল পরিবর্ত্তিতও করা হইয়াছে। দেখা যাউক, পরিবর্ত্তন ভাল কি মন্দের দিকে যাইতেছে।

জগদ্বরেণ্য অধ্যাপক সার চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রমণ বলিয়াছেন, —"কলিকাতা প্রাচ্যের সভ্যতার ও শিক্ষার সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্র, ইহারই সংস্পর্শে আসিয়া বহু জ্ঞানপিপাসু শিক্ষার্থী জগতে সুনাম ও যশঃ অর্জ্জনে সমর্থ হইয়াছেন।" সুতরাং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন গুণ ছিল না, তাহা কেহ বলিতে পারেন না। তবে প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালী যে একবারে দোষশূন্য ছিল, এমন কথাও কেহ বলে না। কিন্তু তথাপি তখনকার Syllabus-বর্জ্জিত শিক্ষার ফলে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল, হেমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, নবীনচন্দ্র, রঙ্গলাল, অক্ষয়চন্দ্র, ভূদেব, ইন্দ্রনাথ, চন্দ্রনাথ, অমৃতলাল, সার আশুতোষ, সার গুরুদাস, সার সুরেন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি দিক্‌পালগণের উদ্ভব সম্ভবপর হইয়াছিল। সার চন্দ্রশেখর, সার জগদীশ, সার প্রফুল্লচন্দ্র, সার রাজেন্দ্রনাথ প্রভৃতিও সেই শিক্ষার ফল। মুখস্থ বিদ্যাই হউক, আর যাহাই হউক, সেই প্রাচীন শিক্ষায় যে সব মানুষ গড়িয়া উঠিয়াছিল, আধুনিক সুসংস্কৃত Syllabus অনুযায়ী শিক্ষা তাহা আর গড়িয়া তুলিতে পারিতেছে না কেন?

বর্ত্তমানের শিক্ষাপ্রণালী নবীন প্রথায় গঠিত হইয়াছে। সরকার সেই শিক্ষাকার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত করিবার জন্য এক জন Director বা শিক্ষা-নিয়ামক নিযুক্ত করিয়াছেন, পরন্তু পাঠ্য-গ্রন্থ নির্ব্বাচনের উদ্দেশ্যে একটি Text Book Committee বা পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচন সমিতি সময়মত নিযুক্ত করিয়া থাকেন। এরূপ সুব্যবস্থা হওয়ার ফলে নিশ্চিতই ছেলেদের শিক্ষার উন্নতি হইতেছে, ইহা ভাবাই স্বাভাবিক। ব্যবস্থাটার কথা প্রথমে আলোচনা করা যাউক।

শিক্ষা-নিয়ামক মহাশয় পাঠ্য পুস্তকের একটা Syllabus বা পাঠ্য-সূচি নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া থাকেন। বর্ত্তমানের সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর ভূগোলের পাঠ্যসূচির তালিকা এইরূপ:—

Broad regional survey of Africa and Australia. Comparison with North and South America as regards climate and belts of vegetation. অর্থাৎ আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার সাধারণ বিবরণ এবং উত্তর ও দক্ষিণ-আমেরিকার সহিত তাহাদের জল, বায়ু ও উদ্ভিজ্জ-সংস্থানের তুলনা। মজা এই, Syllabus অনুসারে আমেরিকার বিবরণ ইহা হইতে উচ্চ শ্রেণীর পাঠ্য। সুতরাং সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র কিরূপে আমেরিকার জল, বায়ু বা উদ্ভিজ্জসংস্থানের খবর রাখিবে, তাহা পাঠ্য-সূচিনির্দ্দেশক শিক্ষানিয়ামক মহাশয় ও তথা পাঠ্যপুস্তকনির্ব্বাচক মহোদয়রা বলিয়া দিবেন কি? যে বালক ক, খ পড়িতেছে, তাহাকে 'সীতার বনবাস' হইতে বা চারুপাঠ হইতে প্রশ্ন করা যেমন সমীচীন, ইহাও তেমনই সমীচীন নহে কি? যে বিদ্যার বহরে এমন ব্যবস্থা হয়, সেই বিদ্যার মালিকগণকে প্রথমে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা উচিত নহে কি?

এইবার পাঠ্যপুস্তক-নির্ব্বাচক কমিটীর সদস্যদের কর্ত্তব্যপালনের

কথ বলিব। অতি কোমলমতি বালকও আজকাল স্কুলে 'পর্য্যবেক্ষণ' পরীক্ষা দিতে যায়। অথচ 'পর্য্যবেক্ষণ' কি বস্তু, তাহা তাহাদের অভিভাবককেও জিজ্ঞাসা করিলে সদুত্তর পাওয়া যায় কি না সন্দেহ! কিন্তু শিক্ষা-নিয়ামকের কড়া হুকুমে তাঁহারা যদি এইভাবে ছেলেকে শিক্ষায় 'লায়েক' করিয়া তুলিতে চাহেন, তাহা হইলে পরিণাম কি হইবে? ইহাতে কি মুখস্থবিদ্যারই জয়জয়কার নহে? আট বছরের ছেলে, একেই তাহার ঘাড়ে আটের দ্বিগুণ ষোল আনা পাঠ্যপুস্তক চাপাইয়া দেওয়া হয়, তাহার উপর এই প্রকৃত দুর্ব্বোধ্য কথা বুঝিয়া দেখিতে বলা হয়। এই দুর্ব্বহ পাষাণ-চাপ ছেলে-বয়স হইতে তাহাদের উপরে চাপিয়া বসিলে ছেলের দৈহিক ও মানসিক পুষ্টি কিরূপে সম্ভবপর হইবে? পূর্ব্বে ছেলেরা 'মুখস্থ' করিয়া পাশ করিত বলিয়া অপবাদ আছে। এখনকার শিক্ষার ভিত্তি-প্রস্তরেই "পর্য্যবেক্ষণ", কাজেই তাহার বিরাট সৌধ কিরূপ আকারের হইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়! ছেলেরা "বুঝিয়া পড়িবে," এই জন্যই বুঝি 'পর্য্যবেক্ষণ' আবিষ্কার করা হইয়াছে?

আট বৎসর-বয়স্ক বালকের অপেক্ষা যে সকল ছাত্র ২।৪ বৎসর বড়, এখনকার অবস্থায় তাহাদিগকে Constellations অর্থাৎ জ্যোতিষ্কমণ্ডল এবং Weather report বা আবহাওয়ার বিবরণ আদি পড়িতে ও শিখিতে বাধ্য করা হয়। ৭ম শ্রেণীর ছাত্রের পাঠ্য গ্রন্থে আছে:—Some well-known Constellations, ইহার অর্থ, কতকগুলি সুপরিচিত নক্ষত্রমণ্ডল। আকাশের কোন্ অংশে কোন্ কোন্ নক্ষত্রমণ্ডল অবস্থিত, কোন্ মাসে আকাশের কোন্ অংশে রাত্রির কোন্ সময়ে কোন্ মণ্ডল দৃষ্টিগোচর হয়, এ সকল কঠিন বিষয় শিখিবে ও বুঝিবে, আধুনিক সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র, ইহা শিক্ষানিয়ামক ও পাঠ্যপুস্তকনির্ব্বাচক মহাশয়রা আশা করেন ত?

পাঠ্য পুস্তকেও দেখা যায়, এই সম্পর্কে সপ্তর্ষিমণ্ডলের অবস্থা, ক্যাসিওপিয়া ও কালপুরুষের অবস্থান, লুব্ধকের অবস্থান, সিংহ কন্যা তুলা বৃশ্চিক প্রভৃতি দ্বাদশ রাশির সহিত সূর্য্যের গতির সম্পর্ক, ইত্যাদি বিবরণ উহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আট বৎসরের ছেলে কি একবারে জ্ঞানাবতার শঙ্কর যে, সেই অল্পবয়সেই বেদ-বেদান্ত শেষ করিয়া ফেলিবে? পূর্ব্বে বি, এ, ক্লাসের ছাত্রদের মধ্যে যাহারা গণিতশাস্ত্র পাঠ করিত, তাহারাও প্রায়ই যেন তেন প্রকারেণ এ সমস্ত কিছু কিছু গলাধঃকরণ করিয়া কিছু কিছু পরিদর্শন পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কোনমতে পাশ করিবার উপায় খুঁজিয়া লইত। তাহার কারণও ছিল। এ সব ভাল করিয়া শিখিতে হইলে দুরবীক্ষণযন্ত্র সাহায্যে রাত্রিকালে আকাশপটে পাঠ করিতে হয়। সে ব্যবস্থা তখন অধিকাংশ কলেজেই ছিল না। বি, এ পাশ করিয়াও এ সম্বন্ধে প্রকৃত শিক্ষা অনেকেরই হইত না।

এখন কি সমস্তই আশ্চর্য্যভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে? নতুবা যাহা দুই দশ দিন পূর্ব্বে বি, এ, পাশ ছেলেরাও বুঝিত না, এখনকার শিক্ষাব্যবস্থায় আট বৎসরের ছেলেরা তাহা বুঝিতেছে কিরূপে? আর একটা কথা, এই সকল বিষয়ে প্রকৃত শিক্ষা দিবার উপযুক্ত শিক্ষক মিলে ত?

ফল কথা, কেবল পাঠ্যপুস্তকের বোঝা চাপাইলেই যে ছাত্রদের জ্ঞানের পরিমাণ হু-হু বাড়িয়া যায়, এ ধারণা আমাদের নাই। মোটা মোটা Syllabus তৈয়ার করিলেই যে ছেলেরা বিদ্যাদিগ্‌গজ হয়, তাহাও বলা যায় না। প্রতি বৎসর পাঠ্যপুস্তক পরিবর্ত্তন করিলে কতকগুলি নূতন লোকের অন্নসংস্থানের উপায়-বিধান করা হয় বটে, কিন্তু উহাতে যে ছাত্ররাও সঙ্গে সঙ্গে নূতন জ্ঞানসঞ্চয়ের সুযোগ প্রাপ্ত হয়, এমন কিছু কথা নাই। পাঠ্যসূচি প্রস্তুত করিবার পর হইতে ছাত্ররা যে পূর্ব্বের ন্যায় মুখস্থবিদ্যার প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার সুযোগ পাইয়াছে, তাহারও ত পরিচয় পাওয়া যায় না। সুতরাং আধুনিক শিক্ষাদানপ্রণালী পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল, এ কথা কিরূপে বলা যায়?

অধুনা পাঠ্যপুস্তকের রচনা সাধারণতঃ যেরূপ ভ্রমপ্রমাদে পূর্ণ, তাহাতে ছাত্রদের জ্ঞানের পরিবর্ত্তে অজ্ঞানের সঞ্চয় হওয়াই স্বাভাবিক। ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য যে কোনও পাঠ্যপুস্তকের কয়েক পত্রাঙ্ক নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলেই ইহা সহজে প্রতিপন্ন হইবে। সে বিষয়ে আলোচনা করিলে একখানি মহাভারত রচনা করা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ মাত্র একখানি ভূগোলের এক ছত্রের পরিচয় দিতেছি। এই গ্রন্থে আফরিকার অবস্থান-স্থান সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ আছে,—আফরিকা প্রাচীন মহাদেশের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। প্রাচীন-মহাদেশ ত এসিয়া? আফরিকা কি এসিয়ার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত? বরং আফরিকাকে এসিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত বলা যায়। কিন্তু উত্তর-পশ্চিমে কিরূপে বলা যায়? এমন অনেক দৃষ্টান্ত দিতে পারা যায়। তাহা ছাড়া নামের ভুল যথেষ্ট আছে যথা—গার্ডাফুইকে গার্ভাফুই বলা, ইত্যাদি।

কোমলমতি বালকগণ অল্পবয়সে যাহা শিক্ষা করে, বয়স হইলে তাহার ছাপ থাকিয়া যায়, সে প্রভাব হইতে মুক্ত হওয়া কি সহজ কথা? কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত বিরাট শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ইহা সুনাম নহে। আমরা আমাদের

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংস্কারের উদ্দেশ্যেই এত কথা বলিতেছি, নতুবা উহার অযথা কলঙ্কপ্রচার আমাদের উদ্দেশ্য নহে। দেশের লোক যদি এই দিকে একটু মনোযোগ দেন, তাহা হইলে প্রতীকার হইতে বিলম্ব হইবে না।

বাঙ্গালীর পৌরুষ

সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র এক দিন বাঙ্গালীর হাতের লাঠির অভাবের জন্য খেদ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং পৌরুষের উপাসক ছিলেন, এই হেতু তিনি তাঁহার অমর রচনায় ভাবে ভাষায় বর্ণনায় চরিত্র-চিত্রে বাঙ্গালীর পৌরুষই ফুটাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার ভাষা ছিল যেমন জীবন্ত,—যাহা যখনই পাঠ করা যায়, তখনই চির-নূতন বলিয়া মনে হয়, তেমনই তাঁহার ভাবও ছিল প্রাণবন্ত, কোথাও তাঁহার মিনমিনে মিহিসুর বা মিহি কল্পনা ছিল না। তাঁহার চরিত্রাঙ্কনও ছিল যেমন মহান্, তেমনই তাঁহার আদর্শও ছিল মহান্। বাঙ্গালীকে বড় করিয়া না দেখাইলে তাঁহার তৃপ্তি হইত না। তাই তাঁহার বাঙ্গালী কমলাকান্ত শক্তিময়ী বঙ্গ-জননীর স্বপ্ন দেখিত, তাঁহার বাঙ্গালী সত্যানন্দ, জীবানন্দ 'বন্দে মাতরম্' গাহিত, তাঁহার বাঙ্গালী প্রতাপ ও ব্রজেশ্বর ভয়কে জয় করিয়াছিল, তাঁহার বাঙ্গালী রামচরণ লাঠির কদর করিত। মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রঙ্গলাল, পৌরুষের উপাসক কে ছিলেন না? রবীন্দ্রনাথও তাঁহার রামমোহন মালের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন, "আমি একা এই লাঠির আগায় এক শত লোকের মওড়া রাখতে পারি!"

আজ এই রামমোহন, রামচরণের দল কোথায় গেল? মিহি মিনমিনে সুরে ধার করা প্রতীচ্যের যৌনতত্ত্ব-বিশ্লেষণেই যেন বাঙ্গালীর সমস্ত মনীষা নিযুক্ত হইতেছে। বাঙ্গালীর পল্লীতে পল্লীতে মাত্র এক শত বৎসর পূর্ব্বে ভদ্রলোকরাও বাগ্‌দী-পোদের সহিত লাঠি-সড়কী-খেলা অভ্যাস করিত, কুস্তী তীরন্দাজী, বাচখেলা, কপাটিখেলাও তখন গ্রামে গ্রামে দেখা যাইত। বাঙ্গালীর সাহিত্যের মধ্য দিয়াও তাই তখন সেই পৌরুষের পরিচয় পাওয়া যাইত। এমন কি, পঞ্চাশৎবর্ষ পূর্ব্বেও বাঙ্গালীর অশনে, বসনে, ভ্রমণে, খেলায় এই পৌরুষ ফুটিয়া উঠিত। সাহিত্যও সেই ধারায় গঠিত হইত।

সুখের বিষয়, বাঙ্গালীর যে পৌরুষের পরিচয় লুপ্ত হইতে বসিয়াছিল, বাঙ্গালার কৃতী সন্তান শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয় তাহার একটা দিক আবিষ্কার করিয়া বাঙ্গালীকে উপহার দিতেছেন। তাঁহার 'বাংলার যোদ্ধা' প্রবন্ধে তিনি বীরভূমের "রায়বেঁশে" ও "ঢালী"র যে ইতিহাস দিতেছেন, তাহা পাঠ করিলে আনন্দে, গর্ব্বে হৃদয় স্ফীত হইয়া উঠে। মনে হয়, এখনও বাঙ্গালা হইতে এই শ্রেণীর পুরুষ ও পৌরুষ অন্তর্হিত হয় নাই। লজ্জার কথা, আমরা যাহাদিগকে 'ছোটলোক' বলিয়া এক পাশে ঠেলিয়া রাখিয়াছি, তাহারাই এখন বাঙ্গালীর পৌরুষের পক্ষে গর্ব্ব করিবার বিষয়! বাঙ্গালী 'ভদ্রলোক' যদি এখনও এই প্রকৃতির নিরক্ষর গ্রাম্য লোকদিগকে উৎসাহ দান করেন, তাহা হইলে আবার বাঙ্গালায় যে রাজা প্রতাপাদিত্যের "বাহান্ন হাজার ঢালীর" মত পুরুষ দেখা দিবে না, তাহা কে বলিতে পারে?

গোল টেবিল

শ্রীযুক্ত বিঠলভাই পেটেল ও মিঃ জিন্না প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় ভারতীয়রা বিলাতে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহার ফলে তাঁহারা উভয়েই গোল টেবিলের শুভ ফলে বিশেষ আশান্বিত নহেন। তাঁহাদের কথা,—The Tories are stiffening their backs, ক্রমশঃই রক্ষণশীলরা বাঁধন-কষণের কড়াকড়ি রাখিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইতেছেন। শ্রমিক সরকার নিজের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তাঁহাদিগের অসন্তোষ ঘটাইতে পারিবেন না, হয় ত শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাদের উদার প্রস্তাবের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিবেন না।

এ দিকে এ দেশের ও বিলাতের য়ুরোপীয় ও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান রুনা ব্যুরোক্রাট ও সংবাদপত্রওয়ালারা যে ভাবে কংগ্রেসের ও জাতীয় দলের বিপক্ষে আড়ে-হাতে লাগিয়াছেন, তাহাতে মনে হইতেছে, তাঁহারা গোল টেবিল ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। না হইলে তাঁহাদের পক্ষ হইতে মহাত্মা গন্ধীকে কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া ব্যক্তিগতভাবে গোল টেবিলে যাইতে উপদেশ দেওয়া হইবে কেন? এ দিকে ডাক্তার আন্সারীর মত জাতীয়তাবাদী সর্ব্বজনমান্য মুসলমান নেতাকে বাদ দেওয়া হইয়াছে।

তাহার পর সফি দাউদীর দল জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতাদের বিরুদ্ধে ঘোর আন্দোলন চালাইয়াছেন। বৈঠক পণ্ড হইবার যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহাও হইয়াছে! প্রদেশে সরকার দিল্লীর চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছেন বলিয়া মহাত্মা প্রতীকার-প্রার্থী হইয়াও বিফলমনোরথ হইয়াছেন। তিনি বৈঠকে যাইবেন না। বস্!

সম্পাদক—শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী-রোটারী-মেসিনে' শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

আমি তো চাহি না কিছু।
বনের আড়ালে দাঁড়ায়ে ছিলাম
নয়ন করিয়া নীচু।—রবীন্দ্রনাথ

বসুমতী প্রেস]

[শিল্পী—শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ

১০ম বর্ষ] ভাদ্র, ১৩৩৮ [৫ম সংখ্যা

চা-পান ও দেশের সর্ব্বনাশ

বাঙ্গালীর আত্মহত্যা

বর্ত্তমানে বাঙ্গালী জাতি আত্মহত্যা করিতে বসিয়াছে। একেই ত রাজনৈতিক কারণে বাঙ্গালার বাহিরে বাঙ্গালীর জীবিকার্জ্জনের দ্বার রুদ্ধ, তাহার উপর তাহার মাতৃভূমি এই সুজলা সুফলা বঙ্গদেশেও তাহার অন্ন উঠিবার উপক্রম হইতেছে। বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্র গৃহস্থ বাঙ্গালীর ত কথাই নাই। তাহাদের ঘরে যত বেকার, বোধ হয়, জগতের আর কোনও শ্রেণীর মানুষের মধ্যে তত নাই। যে বাণিজ্যে লক্ষ্মী বাস করেন, তাহার সহিত বাঙ্গালীর সম্পর্ক নাই, হয় ত দুই চারি দিন হইতে সে সম্পর্ক পাতান হইতেছে, কিন্তু বাঙ্গালী ব্যবসায়ীর সংখ্যা কয় জন? হয় ত দুই চারি জন খুচরা দোকানদার বাঙ্গালী আছে। কৃষি-কার্য্যেও অর্দ্ধেক লক্ষ্মী, কিন্তু তাহা এত ভরপুর যে, সেখানে আর স্থান নাই। ভরসা ওকালতী, ডাক্তারী অথবা চাকুরী! সে দিকে ত একবারেই স্থান নাই।

ইহা ছাড়া বাঙ্গালীর স্বকৃত অপরাধেরও ঘাট নাই। বাঙ্গালীর কর্ম্মবিমুখতা, শ্রমে আতঙ্ক, আলস্য ও আরাম-প্রিয়তা বাঙ্গালীকে জীবন-সংগ্রামে মরণের পথে লইয়া যাইতেছে। বাঙ্গালার বাহিরের লোকের সহিত প্রতিযোগিতায় বাঙ্গালী এই সকল দোষে পারিয়া উঠে না। বাঙ্গালী ধ্বংসের পথে যাইবে না কেন?

বাঙ্গালী স্বেচ্ছায় এই অপরাধকে পুষিয়া রাখিতেছে, ইহার প্রতীকারে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিতেছে। ইহা যদি আত্মহত্যা না হয়, তাহা হইলে আত্মহত্যা কি, আমি জানি না। কেবল কি কর্ম্মবিমুখতা? অপকর্ম্মেও বাঙ্গালী অগ্রণী। যে দোষগুলি মানুষকে মরণের পথে দ্রুত অগ্রসর করাইয়া দেয়, সেগুলিতে বাঙ্গালী যত সহজে ও সত্বর অভ্যস্ত হয়, তত বোধ হয় আর কোনও জাতি নহে। ইহার মধ্যে একটা মহৎ দোষ চা-পান।

এই চা-পানের অপকারিতার কথা আমি ইতিপূর্ব্বে বসুমতীতে "চা-পান না বিষ-পান" শীর্ষক প্রবন্ধে বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছিলাম। নূতন আমদানী সভ্যতার মাপকাঠি এই চা! চা না হইলে বাঙ্গালী গৃহস্থের ঘর-সংসার এক দিন চলে না। ভদ্র, শিক্ষিত, ইতর, অশিক্ষিত সকলের ঘরেই চা চাই! ইহার ফলে বাঙ্গালীর ধনের ও স্বাস্থ্যের প্রতিদিন কত অপচয় হইতেছে, তাহা কয় জন বাঙ্গালী ভাবিয়া দেখেন?

প্রথমেই দেখা যাউক, কি ভাবে কত অল্প সময়ের মধ্যে অর্থগৃধ্নু বণিকগণ চাএর প্রচলনের জন্য কত অদ্ভুত উপায়

অবলম্বন করিয়াছে। গত শতাব্দীর শেষ ভাগেও বাঙ্গালা দেশে চাএর এমন বিষম প্রচলন ছিল না। তখন দুই চারি জন সৌখীন বাঙ্গালী বাবু ও বাঙ্গালী ডাক্তার চা-পান করিতেন। বাঙ্গালী জনসাধারণ তখন চা-পান করিবার কথা স্বপ্নেও ভাবিত না। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দী অতীত হইবার দুই এক বৎসর পূর্ব্বে তদানীন্তন রাজপ্রতিনিধি লর্ড কার্জ্জন আসামে চা-বাগান পর্য্যবেক্ষণ করিতে যান। তথায় চা-করদিগের অভিনন্দনপত্রের উত্তরে তিনি তখন বলিয়াছিলেন, "তোমরা কেবল য়ুরোপ ও আমেরিকায় এক পেয়ালা চা-পান করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পা… যাহাতে ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়া-নাশের জন্য চাএর প্রচলন হয়, যাহাতে এদেশবাসী এক পয়সায় সস্তার চাএর মোড়ক পাইয়া ক্ষুৎপিপাসা-নিবৃত্তি করিতে পারে, আমি সেই ব্যবস্থা করিতাম।" লর্ড কার্জ্জনের এই ভবিষ্যৎ চিত্র আজ সফল হইয়াছে, চা-করর৷ তাঁহার উপদেশে অনুপ্রাণিত হইয়া অদ্ভুত বিজ্ঞাপন ও প্রচারের সাহায্যে এই বাঙ্গালা দেশের রাজধানী হইতে সুদূর পল্লীর নিভৃত কোণেও চা ছড়াইয়া দিয়াছেন।

টোপ

এদেশের চাএর প্রচলন করিবার জন্য ব্যগ্র, কিন্তু এই ত্রিশ কোটি লোকের আবাসভূমি ভারতবর্ষে চা চালাইবার কোন চেষ্টা করিতেছ না। আমি যদি তোমাদের মত চা-কর হইতাম, তাহা হইলে ভারতে চা চালাইবার ব্যবস্থা করিতাম। যাহাতে কৃষকগণ ধান কাটিতে কাটিতে এক-বার অবসরমত মাঠের মধ্যেই চা-পান করিয়া শীতের বা বর্ষার কাঁপুনী হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে, যাহাতে আবক্ষ জলে নিমজ্জিত থাকিয়া কৃষক পাট কাচিতে কাচিতে

ইহার পূর্ব্বে তাঁহারা আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ায় চীনা চাএর পরিবর্ত্তে ভারতীয় চাএর প্রচলনের চেষ্টা করিতেন। এতদর্থে তাঁহারা চিকাগোর বিশ্বমেলায় ভারত হইতে এক প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত ভারতীয় পরিচ্ছদভূষিত খিদমদগারও গিয়াছিল। তাহারা দর্শক-দিগকে বিনা মূল্যে ভারতীয় চা পরিবেষণ করিয়াছিল। মার্কিণ মুল্লুকের লোক, বিশেষতঃ মার্কিণ মহিলারা সর্ব্বদা নূতন চাহে। ভারতীয় পরিচ্ছদভূষিত খিদমদগার, বিনা

মূল্যে চা, উভয়ের যোগাযোগের ফলে মার্কিণে ভারতীয় চাএর প্রসার হইল। ভারতীয় প্রতিনিধি অতঃপর মার্কিণের অন্যান্য স্থানেও প্রচারকার্য্য চালাইয়াছিলেন। সভাসমিতি, শোভাযাত্রা, মেলা, প্রদর্শনী, হাট-বাজার প্রভৃতি সর্ব্বত্রই তাঁহার প্রচার চলিয়াছিল। ফলে মার্কিণ জাতি ভারতীয় চাএর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল।

ভারতে লর্ড কার্জ্জনের বক্তৃতায় কায হইল, চা-করর। এইবার ভারতে চা-প্রচারে মস্তিষ্ক ও অর্থ নিয়োজিত করিতে লাগিলেন। আসাম ও কাছাড়ের চা-করগণ স্ব স্ব চা-বাগিচার পরিমাণ অনুসারে চা ভিক্ষা দিতে লাগিলেন; সেই চা ছোট ছোট মোড়কে পূরিয়া কেবল বাঙ্গালায় নহে, ভারতের সর্ব্বত্র মাত্র এক পয়সা মূল্যে বেচিতে লাগিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার সময়ে পরীক্ষার্থীদিগকে বিনা মূল্যে চা-পান করাইবার উদ্দেশে কেন্দ্রে কেন্দ্রে তাম্বু ফেলা হইতে লাগিল।

এক জন "টি কমিশনার" এতদর্থে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার পূর্ব্বে ইণ্ডিয়ান টি সাপ্লাই কোম্পানী সুলভ মূল্যে জনসাধারণকে চা সরবরাহ করিত। "টি কমিশনার" সুলভ মূল্য নহে, একবারে বিনা মূল্যে জনসাধারণকে 'চা-খোর' করিতে লাগিলেন। প্রত্যেক রেল-ষ্টেশনে উপবীত-ধারী হিন্দুকে 'হিন্দু' চা বেচিবার জন্য নিযুক্ত করা হইল। পাছে জাতিনাশ হইবার ভয়ে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা চা ক্রয় না করে, এজন্য গেলাসের পরিবর্ত্তে মাটীর ভাঁড়ে চা বিক্রয় করা হইতে লাগিল।

তাহার পর সহরের নিকটবর্ত্তী স্থানে চাএর মজলিস স্থায়িরূপে বসাইবার বন্দোবস্ত হইল। বিদেশে রপ্তানী চাএর উপর যে সেস্ বা কর ধার্য্য করা হয়, উহা হইতে চাএর মজলিসের ব্যয় নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল। ১৯২৭-২৮ খৃষ্টাব্দে এই বাবদে পাঁচ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হইয়াছিল। ১৯২৫-২৬ খৃষ্টাব্দে চাএর উপর শুল্ক বাবদে সরকারের ১২ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছিল।

চ'লে আসুন মশাই !

এই স্থানে আমরা রয়্যাল কৃষি কমিশনের রিপোর্টের চতুর্থ ভাগের ৩৯৭ পত্রাঙ্ক হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি:—"বাজারের বিক্রেতাদের মারফতে চা বিক্রয়ে উৎসাহ প্রদান করিবার জন্য তহবিলের টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। চল্লিশ হাজারেরও উপর দোকানদারকে চা বিক্রয় করিবার জন্য প্রভাবিত করা হইয়াছে। তাহাদিগকে বিনা ব্যয়ে মনোহর বিজ্ঞাপন সমূহ সরবরাহ করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া চাএর আধার, চা ওজন করিবার সরঞ্জাম এবং চাএর মোড়কও বিনা পয়সায় দেওয়া হইয়াছে। খরিদ্দারগণকে দোকানে আকৃষ্ট করিবার নানারূপ প্রলোভনের উপায় করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বহু নদীর ষ্টিমারের

যাত্রীদিগকে চা পান করাইবার উপায় করা হইয়াছে, পরন্তু পূর্ব্ববঙ্গ, হাওড়া, বোম্বাই, বরোদা, মধ্য-ভারত, দক্ষিণ-ভারত রেলপথের বড় বড় জংশনে ও ষ্টেশনে গাড়ীর যাত্রীদিগকেও চা-খোর করিবার জন্য সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে। কমিটীর পরামর্শে ভারতের বড় বড় কল কারখানার সান্নিধ্যে চাএর দোকান খোলা হইয়াছে। প্রায় ৩ শত সামরিক আড্ডায় চা-পান ও আমোদ-প্রমোদের স্থান প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।

চা-প্রচার সমিতির কার্য্যপ্রণালীও অদ্ভুত। যে সকল স্থান দিয়া রেল-লাইন গিয়াছে, তাহার নিকটস্থ সহর ও পল্লী তাহাদের কার্য্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে ১৩৭টি সহরে চা-খানা স্থাপিত হইয়াছিল। বৎসরের শেষে উহা ৬৮৩টিতে পরিণত হয়। ইহা ছাড়া কেবল শুষ্ক চা বেচিবার জন্য ২ হাজার ৮ শত ৫৮টি দোকান খোলা হইয়াছিল। সম্বৎসরে ভারতের ৫২ হাজার ৪ শত ৩৩টি স্থানে চা প্রস্তুত করিয়া লোককে পরিবেষণ করা হইয়াছে!

চাএর বিজ্ঞাপনেও কম মস্তিষ্ক ও অর্থ নিয়োজিত হয় নাই। প্রচারকরা নানা প্রকারের বিজ্ঞাপন দ্বারা লোকের চিত্তাকর্ষণ করেন। যখন দেখেন যে, সহরে প্রায় শতকরা ৫০ জন লোক চা ধরিয়াছে, আর সহরেও চাএর দোকানের অভাব নাই, তখন তাঁহারা অন্যত্র প্রচারকার্য্যের জন্য যাত্রা করেন। সে সহরেও এই ভাবে টোপ ফেলা হয়। তবে যে স্থান ত্যাগ করিয়াছেন, সে স্থানে বিক্রয় বাড়িতেছে কি কমিতেছে, তাহাতেও দৃষ্টি রাখেন। টি সেস কমিটীর বিবরণে প্রকাশ—এমন সহর নাই, যেখানে দুই এক বৎসর প্রচারের পর চাএর কাটৃতি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় নাই!

বুঝিয়া দেখুন, বিদেশী ব্যবসাদারের প্রচারের মহিমা কিরূপ! বিষবৃক্ষের ফল কি মনোহর চমৎকার আকারেই না তাঁহারা দেখাইতে জানেন! তাঁহাদের মহিমা অপার। ৫ কোটি বাঙ্গালী এবং ৩২ কোটি ভারতবাসীকে বিদেশী অর্থ-পিশাচ স্বার্থান্ধ বণিক কি মোহন মন্ত্রেই না বশীভূত করিয়া চা-পান অথবা বিষ-পান করাইতেছেন এবং বাঙ্গালী ও ভারতবাসী সুধাভ্রমে গরল পান করিয়া কিরূপেই না ধনে প্রাণে উৎসন্ন যাইতেছেন!

এই স্থানে সাধারণ বাঙ্গালীর দৈনিক ব্যবহার্য্য খাদ্যের কথা উল্লেখ করিব। তিন চার বৎসর পূর্ব্বে 'দৈনিক বসুমতীর' স্তম্ভে দেখিয়াছিলাম, কিরূপে ৪০ হইতে ৬০ টাকা বেতনের বাঙ্গালী কেরাণী জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাহার বিবরণ আছে। কলিকাতা সহরে বাড়ী ভাড়া, তাহার উপর বাঙ্গালী 'ভদ্রলোকের' ভিতরে ছুঁচার কীর্ত্তন হইলেও বাহিরে কোঁচার পত্তন! অর্থাৎ জুতা, জামা, ধবধপে ধুতি উড়ানী। এ সকল বাদ দিলে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য একটি পরিবারের (গড়পড়তা ৫ জন) কি থাকে? কেবল কলিকাতা সহরে নহে, সারা বাঙ্গালা দেশটা ধরিলে শতকরা ৯৫ জন বাঙ্গালীর সামান্য একটু দুগ্ধও জুটে না। বাঙ্গালীর আহার অর্থে উদররূপ গহ্বরটিকে রাবিশের দ্বারা পরিপূর্ণ করা। খাদ্যতত্ত্ববিদ্গণ (যথা ম্যাস্ কারিসন) বলিয়াছেন যে, পুষ্টিকর খাদ্য হিসাবে বাঙ্গালী ও মাদ্রাজী ভারতের সকল জাতির নিম্নস্থান অধিকার করিয়া থাকে। মাড়বারী, গুজরাটী, পাঞ্জাবী, পশ্চিমা, বিহারী ও বোম্বাইবাসীরা যদিও প্রধানতঃ নিরামিষাশী—অন্ততঃ উচ্চজাতীয় হিন্দু—তথাপি তাহারা লাল আটার চাপাটী আহার করে; পরন্তু কিছু পরিমাণে ঘৃত বা অন্য গব্যদ্রব্যও তাহাদের নিত্য আহার্য্য। বাঙ্গালা, আসাম ও উড়িষ্যায়—বিশেষতঃ ভদ্রশ্রেণীর—কিন্তু ফেনরহিত ভাত, কিছু দাইলের জল, শাকপাতা ও ঘণ্ট দালনাই ভরসা! মৎস্য ব্যবহৃত হয় বটে, কিন্তু কেবল সধবাদিগের মনে প্রবোধ দিবার মত নামমাত্র মাছের টুকরা বা ঘুসা চিংড়ী ও চুনাপুঁটীই পাতে পড়িয়া থাকে!

এই সামান্য আহার—বাঙ্গালী কাযেই দিন দিন বলবীর্য্যহীন হইয়া পড়িতেছে। বাঙ্গালী পরিবারের শিশু-সন্তানগণের দেহের অবস্থা দেখিলে অশ্রুসংবরণ করা যায় না। এই সকল শিশুসন্তান কতটুকু দুগ্ধ পান করিতে পায়? কৃষক ও শ্রমিকের শিশুগণ ভাতের মাড় পায়। 'ভদ্র'গৃহস্থের শিশুদের বার্লি-শটীই ভরসা! অথচ রাসায়নিক বিশ্লেষণের ফলে জানা গিয়াছে যে, বাঙ্গালীর এই খাদ্যে অস্থি ও মাংসপেশী গঠনের উপাদান একবারেই নাই!

ইংরাজ রাজপুরুষগণ বলিয়া থাকেন যে, তাঁহাদের সুশাসনে দেশের দিন দিন সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হইতেছে। কিন্তু তাঁহারা যতই তাঁহাদের সুশাসনের মহিমা কীর্ত্তন করুন, আমি আমার বাল্যকালে বাঙ্গালীর যে শ্রীসম্পদ দেখিয়াছি, তাহার তুলনায় বর্ত্তমানের বাঙ্গালায় শ্মশানের স্পর্শ পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। যাট পঁয়ষট্টি বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালার পল্লীর

ঘরে ঘরে ধান্যের গোলা ও মরাই, ঢেঁকী ও ঢেঁকীশাল, গোশালায় পয়স্বিনী গাভী, তড়াগ-নদীতে খালে-বিলে প্রচুর মৎস্য, ক্ষেত্রে শস্য এবং বাগানে শাকশব্জীর প্রাচুর্য্য যাহারা দেখিয়াছে, তাহারা এখন বাঙ্গালার হৃতশ্রী পল্লীর অবস্থা দেখিয়া হৃদয়ে কত ব্যথাই না অনুভব করে!

সত্য বটে, তখন দেশে কথায় কথায় টাকার ছিনিমিনি খেলা ছিল না, টাকার প্রচলন খুবই কম ছিল, এমন কি, কড়ির বিনিময়ে বিকিকিনি চলিত। কিন্তু তাহাতে কোন ক্ষতি ছিল না। নগদ টাকায় বিলাসিতা বাবুয়ানা চরিতার্থ করা সম্ভবপর হইত না বটে, কিন্তু বাঙ্গালী তখন প্রচুর পরিমাণে পেট ভরিয়া পুষ্টিকর খাদ্য আহার করিত এবং সুস্থ ও সবল দেহে কালাতিপাত করিত। এখন আমরা কি করি? এখন আমাদের অঙ্গে বিদেশী চাকচিক্যশালী সৌখীন জিনিষ ব্যবহার করিতে ও নানা মাদকদ্রব্য সেবা করিতে শিখিয়াছি বটে, কিন্তু আমাদের পেটে অন্ন নাই, দেহে স্বাস্থ্য নাই, চক্ষুতে দীপ্তি নাই, শরীরে শক্তি নাই। বাড়ীর বাহির হইলেই আমরা ট্রামে বাসে উঠি, পথে নামিলেই পাণ সিগারেট সোডা লিমনেড কিনি, ঘন ঘন চা-পান করিয়া পিপাসার তৃপ্তিসাধন করি। এ দিকে আমাদের নন্দদুলালরা দরিদ্র অথবা মধ্যবিত্ত অভিভাবকগণের রক্ত শোষণ করিয়া আপনাদের প্রত্যেকের জন্য মাসিক ৪০।৫০৲ টাকা ব্যয়বাবদ আদায় করেন। তাঁহাদের প্রসাধনের (ক্ষৌরকর্ম্ম, টয়লেট ইত্যাদি) সরঞ্জাম বাবদ ব্যয়ে পূর্ব্বে ছেলের লেখাপড়ার ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারিত। তাহার পর শ্রীমানদের অপরাহ্ণে হোটেল রেস্তোঁরার চা-পানের সঙ্গে চপ কাটলেট টোষ্ট পুডিং সুপ-রোষ্টের ব্যয় আছে। সন্ধ্যা হইলে সপ্তাহে অন্ততঃ দুই তিন-বার সিনেমার খরচা আছে। ফুটবল ম্যাচে এক টাকা আট আনা নিত্য খরচ করা চাই। তাঁহাদের পরামাণিক চুল ছাঁটিলে চলে না, হেয়ারকাটিং সেলুনে গিয়া চারি পয়সার স্থানে চারি আনা দেওয়া চাই। সাধারণ রজক তাঁহাদের কাপড় কাচিতে পায় না, ডাইংক্লিনিংএর টিকিটমারা ধোপ-দোরস্ত ধুতি-জামা ঘরে আনয়ন করা চাই। ছাতায় তাঁহাদের বৃষ্টির জল আটক করে না, ওয়াটারপ্রুফ চাই। দোলাই-আলোয়ানে শীত ভাঙ্গে না, অলেষ্টার সোয়েটার চাই। আত্মহত্যার কত চমৎকার উপায়ই না আমরা নিত্য আবিষ্কার করিতে অভ্যস্ত হইতেছি! বাঙ্গালীর নিত্য ব্যবহার্য্য খাদ্যের এই অবস্থা, কাযেই যখন অধিকাংশ বাঙ্গালী 'ভদ্রলোক'ই কলম পিষিয়া জীবিকা অর্জ্জন করেন, তখন তাঁহাদিগকে কার্য্যকালের অবসরসময়ে চা-পান করিয়া কোনরূপে হাড়গোড়গুলিকে তাজা করিয়া লইতে হয়; প্রভাতে ৮টায় নাকে মুখে দুইটি শাকান্ন গুঁজিয়া ছুটাছুটি করিয়া কোনরূপে নৈহাটী, বারাসত, হুগলী, ব্যাণ্ডেল বা বারুইপুর সোনারপুর প্রভৃতি ষ্টেশনে রেলগাড়ী ধরিয়া কলিকাতার সরকারী বা সদাগরী আফিসরূপ তীর্থস্থানের অভিমুখে দৌড়াইতে হয়। সারাদিন মনিবের ঘানিতে জোড়া থাকিয়া অবসন্ন-ক্লান্ত-দেহে এক কাপ চা—তাহা যে কি অমৃত, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না! এইরূপ কাপের পর কাপ চলে, সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধাও মরিয়া আসে, অজীর্ণ রোগও উদরমধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া কায়েম-মোকাম হয়। বোম্বাইএর কেরাণীদের আমি দিনে ৬-৭ কাপ চা খাইতে দেখিয়াছি। বাঙ্গালী কেরাণী বাবুরাও বড় পশ্চাৎপদ নহেন। মাদ্রাজীরাও 'গরম পানি' পেটে দেন বটে, কিন্তু চায়ের পাঁচনে নহে, কাফির কাপে। ইহাতে কি সর্ব্বনাশের বীজ উপ্ত হইতেছে, তাহা পরে বলিবার ইচ্ছা রহিল। [ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় (আচার্য্য)।

বাদলী

ধারা-রজ্জুর ঋজু বন্ধনে—দোলে দিগন্তে দোলা কার?
ঋতু-কন্যকা বাদলী দুলিছে—মেঘালি বেণী যে খোলা তার।
পুবালি বাতাস বৃষ্টি-শীকরে,
রূপালি ওড়না রচে মুখ'পরে,
আমারি দুয়ারে ভুঁইচাপা-ঝাড়ে, আঁচলটি করে খেলা তার।

ভরা-দিন—তবু লাগিছে কেমন দিন যেন হয় বেলা-পার;
পল্লীর এক বকুল-তলায়, সময় এসেছে খেলাবার।
দোলায় দুলিছে সঙ্গিনী মোর,
আমি যেন মুখে চেয়ে আছি ওর,
বাদল-ঝরার মত ঝরে' পড়ে বকুল-বিন্দুগুলা—আর।

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী।

নর ও নারী

নর ও নারীর সম্বন্ধ লইয়া পশ্চিমের সমাজ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। য়ুরোপীয় সভ্যতার আর যে কোন ত্রুটি থাকুক, সে সভ্যতা গতিশীল, এ কথা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। যেখানে সমস্যা লইয়া নিত্য নূতন মতবাদ গড়িয়া উঠিতেছে, তাহার কারণ য়ুরোপীয় মানুষের মনের সজীবতা জড়তাকে লইয়া মুগ্ধ নহে। তাহাদের গতিশীল কৃষ্টি জীবনের সমস্ত ব্যাপারকে বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিতে চাহে।

আমাদের দেশে চারিপাশে সুখী দম্পতির সুখময় দাম্পত্য-জীবন দেখিয়া আমরা যেন ভুল না করি যে, য়ুরোপের এই ভাব-বিপ্লব—আমাদের অচলায়তনে প্রবেশ করে নাই। বাহিরের দমকা হাওয়া আমাদের ঘরের শান্তি নষ্ট করিতে উদ্যত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সম্প্রতি বাঙ্গালা দেশের মহিলা-সভায় কোন কোন মহিলা, সভায় যে সব মত প্রচার করিতেছেন, তাহা আমাদের সাধনা ও কৃষ্টির সমর্থক নহে। পশ্চিমের ঝড়ো হাওয়ায় তাঁহাদের মনেও যে ভাব-বিপ্লবের আবেগ সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাতে তিলমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব আজ অপক্ষপাত আলোচনায় নর ও নারীর প্রকৃত সম্বন্ধ নির্ণয়ের প্রয়োজন হইয়াছে। কলহের আবর্ত্ত সৃষ্টি করিয়া পাঠকের মনোরঞ্জন করার উদ্দেশ্য এ প্রবন্ধের নহে, দেশের মনস্বী ব্যক্তিগণের দৃষ্টি ঐ অপ্রিয় বিষয়ে আকর্ষণ করিবার জন্যই বর্ত্তমান প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে।

য়ুরোপীয় সমাজে নর ও নারীর সম্বন্ধ লইয়া যে সব দ্বন্দ্ব উপস্থিত, তাহাতে সে সমাজের বিবাহিত জীবনে সুখের নন্দন-কানন গড়িয়া উঠিতেছে না। সম্প্রতি এইচ, জি, ওয়েল্‌স লিখিত উইলিয়াম ক্লিসোল্ড নামক উপন্যাস পড়িতেছিলাম, তাহাতে তিনি য়ুরোপের নর ও নারীর জীবন সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সর্ব্বৈব সত্য। তিনি লিখিতেছেন :—

"At present we live sexually in a world of broken codes, and irregular and extravagant experiments and defiances. Most people are doing or pretend to be doing what they believe to be right in the eye of their friends and neighbours. Few people have the courage of their internal want of convictions. The large part of the younger generation of educated and semi-educated people in Europe and America seems to me to have no sexual morals at all, but cynical observances the plain inevitable result of an atmosphere of manifest shams and insincerities."

নর ও নারীর জীবনে অশান্তির এই যে বহ্নিজ্বালা, তা[illegible] বহু কারণ আছে। প্রাচীন সভ্যতার নিরাড়ম্বর জীবন [illegible] করিয়া কর্ম্মচঞ্চল যান্ত্রিক জীবন, য়ুরোপীয় জীবনের ভো[illegible] প্রেরণা, সেই ভোগবাসনার উৎস হইতে উৎসারিত স্বাতন্ত্[illegible] দাবী য়ুরোপীয় সমাজে আজ এই বিপ্লবের সুরু করিয়াছে। সে[illegible] বিপ্লবের সাধনা, সেই বিবর্ত্তনের সুর সাগর পার হইয়া আমাদে[illegible] দেশেও পৌঁছিয়াছে।

মহিলা-সম্মেলনের সভানেত্রী শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণী বলিয়াছেন যে, বঙ্গনারীর আত্মচেতনার বার্ত্তা লইয়া নারী-সম্মেলন, পুরুষের আত্মচেতনার সহিত তাহার কোন[illegible] সম্পর্ক নাই। বাঙ্গালার নারী জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরুষে[illegible] নিকট যে বৈষম্য-মূলক ব্যবহার পাইয়া আসিয়াছে, তাহা[illegible] ফলেই বাঙ্গালার নারী-জাগরণ। পুরুষ নিজ স্বার্থোদ্দেশে[illegible] নারীকে ব্যবহার করিয়াছে, নারীর আত্মস্ফূর্ত্তির বিশেষ কোন সাহায্যই সে করে নাই। নারীর মনের ভাব পুরুষ কোনও দিনই অনুভব করে নাই। পুরুষ নারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর—এই মনোভাবই নারীকে হেয় করিয়া রাখিয়াছে।

উল্লিখিত মনোভাব পড়িলে মনে হয়, যেন কোনও য়ুরোপীয় ফেমিনিষ্টের কথা শুনিতেছি। আমাদের দেশের ভাব-ধারা[illegible] সহিত এই সব মতবাদের মিল নাই। নর ও নারীর সুসমঞ্জস ও সুমধুর ঐক্য ও প্রীতির মহিমাই আমাদের দেশ প্রচার করিয়াছে। শিব ও শক্তির গভীর মিলনের মধ্যেই ভাবী জয় ও প্রগতির প্রতিষ্ঠা হয়, এই কথাই আমাদের কাব্য ও পুরাণে আমরা বার বার বলিয়াছি। নারীর উদ্বোধনের সহি[illegible] পুরুষের কোনই সম্পর্ক নাই, এ কথা শুনিলে তাই চমকি[illegible] হইয়া উঠি।

আমাদের দেশের নারীর প্রতি কোথাও যে কোন অবিচা[illegible] হয় নাই, এ কথা বলিতেছি না। আদর্শ অতি উচ্চ থাকিলেও মানুষের সাধারণ জীবনে সে আদর্শ বহুরূপে বহু ভাবে ক্ষুণ্ণ হয়। আমাদের দেশেও যে তাহা হয় নাই, তাহা নহে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাষ্ট্রবিপ্লবের মাঝে, বিভিন্ন সভ্যতা ও কৃষ্টির সংঘর্ষে আমাদের দেশের নব নব অবচার সৃষ্ট হইয়া পূজার্হা গৃহদীপ্তির আদর্শকে কখনও ম্লান, কখনও কুণ্ঠিত করিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু যখন আদর্শের তুলনা করি, তখন এই সব বিচ্যুতি দেখাইলেই আদর্শের মাধুর্য্য ও শ্রেষ্ঠত্বের অপলাপ হয় না।

মু লিখিয়াছেন :—

"বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃ স্মৃতঃ।
পতিসেবা গুরৌ বাসো গৃহার্থোগ্নিপরিক্রিয়া ॥"

বর্ত্তমানের নারী গৃহ-পরিধির এই শাস্ত্র বিধানকে অচলায়তন ভাবিয়া বিদ্রোহের বৈজয়ন্তী উড়াইতেছেন। দ্বার ভাঙ্গিয়া জীবনের সকল ক্ষেত্রে মুক্তির নিশ্বাস গ্রহণ করিতে তাঁহারা ব্যাকুল। পতির সুখে সুখ, পতির সেবায় পুণ্য, গৃহকর্ম্ম ধর্ম্ম-কর্ম্ম, এই মনোভাব লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। নারী আজ গৃহ-কোণকে গৌরবের ও মর্য্যাদার স্থান দিতে চাহেন না।

অথচ নর ও নারীর মিলন চাই। কেহ কাহাকেও বাদ দিয়া পরিপূর্ণ জীবন যাপন করিতে পারেন, ইহা আশা করা যায় না। বিবাহিত জীবনের মাধুর্য্যের মধ্যেই নর ও নারীর সম্পূর্ণ বিকাশ হয়। এ কথা শুধু আমার নহে, পশ্চিমের মানুষও এ কথা বলিতে চাহে। William Clissold পুস্তকের পড়ে পাই (নায়কের মুখে লেখকের মতই প্রকাশ পাইয়াছে)—

"I do not believe that a normal man can go as living a full mental life in a state of sexual isolation. * * * My impression is that abstinence involves so large an amount of internal conflict, so urgent and continuous an effort of self-control, such moods and humiliation and compensatory adjustments, that the diversion of attention and wastage of energy are far greater than the average disturbances and deflections of a normal life."

আমার জনৈক বিজ্ঞ বন্ধু বলেন, "নরের ও নারীর মনে তৃষ্ণা আছে, এ কথা মানি, কিন্তু সে তৃষ্ণা দূর করিবার জন্য বিবাহের নিগূঢ় বন্ধনের প্রয়োজন নাই।" বন্ধুর এ মতবাদ ভ্রমাত্মক। কামনার দাবদাহ লইয়াই বিবাহ নহে, কাম-তৃষ্ণা-পরিসমাপ্তির মধ্যেই নর ও নারীর মিলন সমাপ্ত নহে। H. G. Wellsএর কথা পুনরায় উদ্ধার করিতেছি :—

For most of us sexual life is a necessity, and a necessity not merely as something urgent that has to be disposed of and got rid of us, for instance; meretricious gratifications but as a real source of energy, self-confidence and creative power. It is an essential and perhaps the fundamental substance of our existence.

অর্থাৎ নর ও নারীর মিলন কেবল যৌন-লালসা-তৃপ্তির জন্য নহে, এই মিলন সাধারণ মানুষের প্রাণে শক্তি, আত্মশ্রদ্ধা ও সৃষ্টি-ক্ষমতার সঞ্চার করে। মানুষের পক্ষে দাম্পত্য-জীবন তাই একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু।

নর ও নারী একক ও পৃথক্ যাপন করিলে জীবনে পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। জীবনকে অখণ্ডভাবে জানিতে হইলে, জীবনের সমস্ত রস ও ঐশ্বর্য্যকে অধিগত করিতে হইলে, নর ও নারীর মিলন চাই। মানুষের অন্তর্নিহিত বৃত্তিগুলির সম্যক্ স্ফুরণের জন্য নর ও নারীর সামঞ্জস্য চাই, ঐক্য চাই। নর ও নারী একে অপরের পরিপূরক। বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে নিত্যদিবা যে লীলা চলিয়াছে, নর ও নারীর সহযোগিতা না হইলে তাহা কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। নর ও নারীর প্রতি-যোগিতার ধূয়া তুলিয়া যাঁহারা কলরব করেন, তাঁহারা সত্যই দেশ ও সমাজের বন্ধু নহেন।

মানুষ জীবসৃষ্টির সেরা। এই উচ্চাসন তাহাকে সাধনা করিয়া লাভ করিতে হইয়াছে। মানুষের গঠিত সভ্যতা আজ চমক লাগায়, কিন্তু সে সভ্যতা গড়িতে শতাব্দীর পর শতাব্দী মানুষের একান্ত গভীর প্রয়াস ও একনিষ্ঠ সাধনা লাগিয়াছে। সে সাধনা অব্যাহত রাখিতে হইলে মনস্বী ও কর্ম্মী সাধকের প্রয়োজন। নর ও নারী মিলিত হইয়া বিশ্ব-প্রগতির সেবক ও সাধক, বুদ্ধিমান এবং বলবান্ প্রজা সৃষ্টি করিবে, ইহাই বিবাহের অন্তর্নিহিত মূল উদ্দেশ্য।

'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রঃ পিণ্ডপ্রয়োজনম্' এ কথা শুনিলে বর্ত্তমানের নর ও নারী হয় ত উপহাসে দিঙ্মুখর করিবে, কিন্তু ইহাই বিবাহের প্রথম ও চরম কথা। বিশ্বজগতের সর্ব্বত্রই সৃষ্টিলীলা অব্যাহত রাখিবার এই প্রচেষ্টা ক্রিয়মাণ দেখা যাইবে। পুষ্পের যে মাধুর্য্য অন্তর মুগ্ধ করে, তাহার পশ্চাতে বীজসৃষ্টির প্রয়াস সুপ্ত আছে। জীব-সৃষ্টির উদগ্র কামনাই—বংশ-বিস্তারের বাসনাই বিশ্বভূমির বৈচিত্র্য ও প্রকাশের মূল কারণ।

আজকাল জন্মশাসনের বার্ত্তা খুব জোর গলায় প্রচারিত হইতেছে, কিন্তু সংযম ও ত্যাগের অপেক্ষা কি ভোগলালসার এই অনাবৃত আহ্বান দেশে আদৃত হইবে? সন্তান-সৃষ্টির প্রয়োজন এত বেশী যে, তাহার জন্য প্রকৃতির আয়োজন অশেষ। সেই আয়োজনের খাতিরে মানুষের মনে কামনার অন্ত নাই, এ কথা অবশ্য মানি। কিন্তু সে কামনাকে উচ্ছৃঙ্খল ভোগের পথে যাঁহারা নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহেন, তাঁহারা কি সত্যই কল্যাণের প্রতিষ্ঠা করিতেছেন? জন্ম-শাসননীতির ভিতরের কথা ভোগের মন্ত্র বৈ নহে। প্রজা-সৃষ্টির জন্য যে রূপ ও যৌবন, তাহাকে কেবলই নিঃশেষে পান করিব, অথচ প্রকৃতির ও সমাজের নিকট যে দায়িত্ব, তাহা মোটেই পালন করিব না, ইহা কি সত্যই শ্রেয়স্কর, যুক্তিসহ?

জন্ম-শাসনের দোষ-গুণ অবান্তর বিষয়, তাহার দোষগুণ

সম্যক্ আলোচনা এ প্রবন্ধে সম্ভব নহে। যাহা বলিতেছিলাম, তাহা এই,—ভাবী প্রগতির পরিচালক সৃষ্টি করিবার আকাঙ্ক্ষা লইয়া নর ও নারীর মিলনের প্রয়োজন। দৈহিক লালসা-পরিতৃপ্তির ব্যাকুলতা বিবাহকে পঙ্কিল করিয়া তুলে।

নর ও নারী উভয়ে বর্ত্তমানের কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে যথাযথ গ্রহণ করিয়া অনাগতের জন্য সংযত ও শান্তচিত্তে মিলিত হইবেন। উভয়ে যুগসভ্যতাকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়া নিজেদের জীবনকে ঋদ্ধ করিবেন এবং সেই সমৃদ্ধ ও পূর্ণ যুগ্মজীবনের মাঝে নব সভ্যতার শতদল আপন কোরক উন্মোচন করিবে।

বিশেষ এবং অসাধারণের কথা ছাড়িয়া দিতে হয়। সাধারণভাবে বলিতে গেলে, নারীর জীবনে মাতৃত্বের দাবী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দাবী। যুগমানবের মাতা হওয়ার বাণী, উন্মেষ-ব্যাকুল নব সভ্যতার ধাত্রী হওয়ার কথাই নারীর জীবনে শেষ কথা।

মাতৃত্বের বিকাশ ও পরিপুষ্টি যাহাতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়, সেই চেষ্টাই রাষ্ট্র ও সমাজের লক্ষ্য হওয়া উচিত। সৌজাত্য ফেলিবার কথা নহে। ভাল জাস পশু-সৃষ্টির জন্য মানুষ কত বিচার, কত বিশ্লেষণ, কত আয়োজন করেন, আর যাহারা মানুষের কৃষ্টির বিজয়-বৈজয়ন্তী নব নব গৌরবের অভিমুখে বহন করিবে, তাহাদের আবির্ভাবের জন্য কি কোন চেষ্টাই চলিবে না?

ভোগের ও বিরোধের বাণী তাই অসুস্থ মনের প্রলাপ। বীর্য্যবান্ পিতা ও বীর্য্যবতী মাতা বীর্য্যবান্ সন্ততির জনকজননী হইবে, ইহাই নর ও নারীর মিলনের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যকে সম্মুখে রাখিয়া উভয়ের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিতে হইবে।

আমি এমন কথা বলিতেছি না যে, নারীকে কেবলই গৃহকর্ম্মের সনাতন দাস্যের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিতে হইবে। নর ও নারী জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিভিন্ন অবচারের মধ্যে বিভিন্নভাবে জীবনযাত্রা চালাইবেন, কিন্তু নারীর কর্ম্মক্ষেত্র তাহার স্বাধীন অবস্থা ও অবচার অনুসারে নির্ণীত হইবে। নরের বহির্মুখী চাঞ্চল্যের সহিত নারীর অন্তর্মুখী শান্তি মিলিয়া আনন্দ-মধুর গৃহস্থালী গড়িয়া উঠিবে, সে গৃহে নারী মাতা বলিয়া সমাদৃতা ও গৃহীতা হইবেন। তাঁহার মাতৃত্বের বিকাশ ও পরিপুষ্টির সহায়করূপে, তাঁহার কর্ম্মপন্থাকে স্থির করিতে হইবে।

নর ও নারীর আত্ম-চেতনাকে তাই পৃথক্ করিয়া দেখিলে ভুল দেখা হইবে। যাঁহারা উত্তেজনা সৃষ্টি করিবার জন্য বলেন, নারীর আত্মচেতনা পুরুষের আত্মচেতনার সহিত কোনই সম্পর্ক রাখে না, তাঁহারা, আমার মনে হয়, জাগিয়া ঘুমান, নহে ত স্বেচ্ছায় মিথ্যা প্রচার করেন। নরের কৃষ্টি নারীর কৃষ্টি হইতে পৃথক্ হইতে পারে না। নরজগৎ এবং নারীজগৎ সৃষ্ট হই[illegible] কোনই লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। যত দিন নারীকে সন্তান ধা[illegible] এবং পালন করিতে হইবে এবং যত দিন নর সেই সন্তানের র[illegible] ও পোষক রহিবে, তত দিন নর ও নারী অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে [illegible] রহিবে। উভয়কে উভয়ের শক্তি ও প্রকৃতির সামঞ্জস্য করি[illegible] বিশ্ব-প্রগতির চেষ্টায় আত্মনিয়োজিত করিতে হইবে। নারী-প্রগতির জন্য বিশেষ এবং বিরূপ চেষ্টার হাঁক-ডাক করিয়া অনর্থক কোলাহল তুলিয়া বিশেষ লাভ নাই।

মাতৃত্বের জন্য নারী ও নরের মধ্যে যোগ্যতা ও শক্তি[illegible] বিভিন্নতা আছে। এই জন্যই বহু অভিজ্ঞতার ফলে অতি প্রাচীনকাল হইতেই নারী গৃহ-জীবনের স্নেহ-সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। পুরুষ রণ-জয় করিয়া ঋদ্ধি আনেন, নারী অন্নপূর্ণার মত কল্যাণ ও শান্তির অমৃত পরিবেশণ করেন।

বর্ত্তমানের নারী হয় ত বলিবেন, না, এ কর্ম্ম-বিভাগে আমরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়াছি। তোমাদের সহিত প্রতিযোগিতায় আমরা বিজয়ী হইতে পারি। চারিদিকে সমকক্ষ হইবার প্রচেষ্টা চলিয়াছে, কোথাও কোথাও নারী আপন শক্তি ও প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বলিতে হইলে এ কথা স্বীকার্য্য, নারী নরের সমকক্ষ নহে এবং এই সব প্রতিযোগিতার চেষ্টার কোনই প্রয়োজন নাই।

বিশ্ব-সভ্যতায় নারীর অবদান আসুক, নারী শিল্পে, সাহিত্যে ও কলায় তাঁহার সুকুমার শক্তির প্রয়োগ করিয়া বিশ্ব-সংস্কৃতিকে বরীয়ান্ করিয়া তুলুন, এ কামনা সর্ব্বতোভাবে করিলেও, এ কথা নির্ভীকচিত্তে বলিব যে, সে অবদান প্রতিযোগিতা এবং বিরোধের নহে, বরং সামঞ্জস্য এবং সমন্বয়ের ফলে হইবে।

সভ্যতার গতির সহিত মানুষের চিরাচরিত প্রথা ও প্রণালী দিন দিন বিবর্ত্তিত হইতেছে। কিন্তু পরিবর্ত্তন যে ভাবেই হউক না কেন, নারী যে মাতা এবং ধাত্রী, পুরুষ পোষ্টা এবং যোদ্ধা, ইহার পরিবর্ত্তন অসম্ভব। আমাদের জীবনযাত্রার পরিবেশ যতই রূপান্তরিত হউক না কেন, নর ও নারীর মধ্যে চিরদিনই ঐক্যের ও সংযোগের সম্বন্ধ থাকিবে, অনৈক্য এবং বিপ্লবের নহে। নর ও নারীর আত্মচেতনা এক এবং অভিন্ন. উভয়ের অন্তরে অন্তরে সংসক্তির ফলেই জীবনযাত্রা ঋদ্ধ এবং কুসুমাস্তৃত হইয়া উঠিবে। সেই পুরাতন দিনে দ্রষ্টা ঋষি যে মন্ত্র বলিয়া দিয়াছিলেন, 'যদিদং হৃদয়ং তব তদিদং হৃদয়ং মম' সে মন্ত্র পুরাতন হয় নাই। এখনও সেই মন্ত্রশক্তি অব্যাহত এবং অপ্রতিহত প্রভাবে বিরাজমান। নর ও নারীর এই একাত্ম হইবার কথা, বিশেষভাবে ভারতবর্ষের কথা এবং

কলহের মাঝে এই পুরাতন আদর্শ যেন ক্ষণিকের জন্য আমরা বিস্মৃত না হই।

এই সমপ্রাণতার আদর্শের কথা মনে রাখিলে আমরা বুঝিব যে, নারীর প্রতি যদি কোথাও কোন বৈষম্য দেখান হইয়া থাকে, সে বৈষম্য বিদ্বেষের ফলে নহে, সমাজস্থিতির তদানীন্তন আদর্শের ফলে সঞ্জাত হইয়াছে।

পতিব্রতার আদর্শ আলোচনা করিয়া বর্ত্তমানের নারী হয় ত বলিবেন, এই ত পুরুষ আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য বিধান দিয়াছেন :—

'আর্ত্তার্ত্তে মুদিতে হৃষ্টা প্রোষিতে মলিনা কৃশা।
মৃতে ম্রিয়েত যা পত্যৌ সা স্ত্রী জ্ঞেয়া পতিব্রতা॥'

এই দাসীপণা করিতে আমরা রাজী নহি। স্বামী অসুস্থ বলিয়া কি চলচ্চিত্রের নূতন অভিনয় দেখিব না? মহিলা-সভায় কর্ম্মের আহ্বান আসিয়াছে, তাহা ফেলিয়া কি পুত্র-কন্যার মলমূত্র পরিষ্কার করিব, কর্ত্তব্যের ডাকে উদ্‌বুদ্ধ হইব না?

বর্ত্তমানের ভোগ-ব্যাকুল যুগে কেমন করিয়া বলি, "না, তাহা হইলে প্রত্যবায়ী হইতে হইবে।" আমাদের দেশ নর ও নারীর মনের সম্মুখে যে অপার্থিব প্রেমের আদর্শ ধরিয়াছিল, সে আদর্শের কথায় বলিতে হয়, শোকে-দুঃখে, সুখে-মিলনে, সম্ভোগে-বিরহে নারী নরের অংশভাগিনী। কথায় বলে, 'যারে দেখতে নারি, তার চলন বাঁকা।' ভোগবাসনার মন লইয়া এই বৈষম্য দেখিলে হয় ত গাত্রজ্বালা উপস্থিত হয়, কিন্তু আমরা চিরকাল ত্যাগ করাকে, আত্মদানকে বড় করিয়াই দেখিয়াছি। পিতার সুখের জন্য ভীষ্ম চিরকুমার, পুরু যৌবনে যৌবন-সুখহারা, ভ্রাতার সুখের জন্য লক্ষ্মণ বনবাসী, গুরুর জন্য একলব্য অঙ্গহীন, অতিথির জন্য কর্ণ পুত্রহন্তা, স্বামীর জন্য সতী প্রাণত্যাগিনী। দৃষ্টান্ত বাড়াইয়া লাভ নাই, এই ত্যাগের কথাই আমাদের শাস্ত্র পুরাণ বার বার বলিয়াছে। সেই ত্যাগের চোখ দিয়া দেখিলে এই বৈষম্য প্রেয় বা শ্রেয়ঃ নহে বলিয়া মনে হয় না।

নরের জন্য নারীর আর্ত্তা হইবার বিধান আছে। নারীর জন্য কি নর হয় নাই? রঘুবংশের অজবিলাপ কাব্য-জগতের অকলঙ্ক মণি-দীপ। তাহারই একটুকু আলো ধার করিয়া বলিতেছি যে, পত্নীকে অগৌরবের আসন আমরা দিই নাই। ইন্দুমতীবিয়োগবিধুর মহারাজ অজ বলিতেছেন :—

"গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।
করুণাবিমুখেন মৃত্যুনা হরতা ত্বাং বদ কিং ন মে হৃতম্।"

এই অধীর ক্রন্দন কি নারীর মহিমা প্রকাশিত করিতেছে না, নারীকে কি সমকক্ষ আসন দিতেছে না?

পতি ও পত্নীর একাগ্র ও একনিষ্ঠ প্রেমের কথা রামের চরিত্রেও পরিস্ফুট। সীতাকে বনবাসিনী করিলেও রাম সীতার প্রতি প্রেমশূন্য হন নাই। অশ্বমেধযজ্ঞে যখন সহধর্ম্মিণীর প্রয়োজন, তখন রাম স্বর্ণ-সীতাকে আপন আসন দিলেন। মহাকবি কালিদাস তাই লিখিয়াছেন :—

"শ্লাঘ্যস্ত্যাগোঽপি বৈদেহ্যাঃ পত্যুঃ প্রাগ্বংশবাসিনঃ।
অনন্যজানেঃ সৈবাসীদ্ যস্মাজ্জায়া হিরণ্ময়ী॥"

তাই বলিতেছিলাম, নর ও নারী কাহারও আসন আমরা কখনও ছোট করিয়া দেখাই নাই। নর ও নারী উভয় উভয়কে লইয়া সম্পূর্ণ। উভয়ের জীবনধারা অপার্থিব প্রেমে ও স্নেহে যুক্ত ও সমৃদ্ধ করিবার জন্যই আমরা চিরদিন বলিয়াছি। পশ্চিমের ঝড়ো হাওয়ায় আমরা যেন সেই শাশ্বত অনবদ্য আদর্শ ভুলিয়া না যাই। আমরা যেন কাঞ্চনের পরিবর্ত্তে কাচকে গ্রহণ করিয়া আত্মবঞ্চিত না হই। বিদেশের বিপ্লব আসিয়া আমাদের জীবনের মাধুর্য্যকে যেন বিনষ্ট না করে।

চারিদিকে নারী-বিদ্রোহের এই যে শঙ্খ বাজিতেছে, তাহা শুনিলে ঈশপের লিখিত উদর ও অন্যান্য অবয়বের কলহের কথা মনে পড়ে। নর চিরদিন নারীর প্রশস্তি পড়িয়াছে। পত্নীকে সে বলিয়াছে 'দেহি পদপল্লবমুদারম্', অপরকে বলিয়াছে মাতা ও ভগিনী। সীতারাম এবং লক্ষ্মীনারায়ণ প্রভৃতির উক্তি নারী-গৌরবের কথাই কীর্ত্তন করে। নারীকে হেয় ও অবজ্ঞেয় করিয়া দেখিয়াছি, এ কথা বলিলে কাণে লাগে, প্রাণে বেদনা জাগে। পিতার অপেক্ষা মাতার আসন আমরা উপরে দিয়াছি। সেই মাতৃজাতি আজ এমন করিয়া কেন আত্মবিস্মৃত হইতেছেন, ভাবিয়া পাই না।

হয় ত ইহা কেবল অনুকরণের উচ্ছ্বাস। পশ্চিমের নব-নবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি, পশ্চিমের গতিশীল প্রতিভা, পশ্চিমের সচলতাকে জীবনে বরণ করিবার চেষ্টা ও উদ্যম আমাদের নাই, তাহাদের আবর্জ্জনা আনিয়া আমরা নিজেদের কেবলই হেয় করিয়া তুলি। মেমসাহেবরা স্কার্ট পরিতে আরম্ভ করিলেন, বাঙ্গালী মেয়েরা অমনই জানুর উপর শাড়ী পরিয়া কেরামতি দেখাইতে লাগিলেন! জানি না, ইহা ফ্যাসনের আবিষ্কর্ত্তাদের চোখে কেমন লাগে, কিন্তু আমাদের দৃষ্টিতে জানু-ধৃতা-শাড়ী-পরিহিতা বঙ্গনারীকে নিতান্ত বীভৎস ও অশোভন দেখায়। সুষমা ও শোভার পরিবর্ত্তে ইহাতে যে নারীর কমনীয়তা নষ্ট হয়, অন্ধ অনুচিকীর্ষা তাহা দেখিতে পায় না।

কিছু দিন আগে পড়িয়াছি, নারীরা কোন কোন সভায় বিবাহ-বিচ্ছেদ দাবী করিয়া প্রস্তাব মঞ্জুর করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। বিস্ময়ের বিহ্বলতা কাটিলে ভাবিতে বসিলাম। কালস্রোতের

কি দুর্জ্জয় দুরতিক্রম্য গতি ! যুগযুগান্ত যে আদর্শ, যে কল্পনা, যে বৈশিষ্ট্য আমাদের শিরায় শিরায় ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তাহা ভুলিয়া গিয়া বর্ত্তমানের নারী কেন এই উদ্ভট দাবী পেশ করিতেছেন ?

হিন্দুবিবাহ চুক্তি নহে—ধর্ম্মসম্বন্ধ। হিন্দুর বিশ্বাস, জন্ম-জন্মান্তরের জন্য নর ও নারী পরস্পরের সহিত যুক্ত ও মিলিত হইয়া জীবনের কাম্যের জন্য সাধনা করিয়া চলিয়াছেন। এই সুমহান্ আদর্শ কেন আমাদের দেশের এক শ্রেণীর নারীর অন্তরকে মুগ্ধ করিতেছে না ?

তার্কিক বলিবেন, যেখানে পতি ও পত্নীর মিলন হয় নাই, যেখানে উভয়ের সম্বন্ধ হৃদ্য ও প্রিয় হইয়া উঠে নাই, সেখানে সারা জীবন ব্যবধানের মাঝে জীবন্মৃত হইয়া থাকিয়া লাভ কি ? ভোগের দাবী যাহার, তাহাকে এ কথার উত্তর দেওয়া চলে না, কিন্তু ত্যাগ ও আত্মবিসর্জ্জন যাহাদের মন্ত্র, তাহাদের সান্ত্বনা আছে। জীবনের কয় স্থানেই বা আমরা বাঞ্ছিতের দর্শন পাই ? পদে পদে তাই আমাদের পারিপার্শ্বিকের সহিত আমাদের আপোষ করিয়া চলিতে হয়। যেখানে লালসার আহ্বান সর্ব্বদা জাগরূক, বৈষম্য দেখা দিতে না দিতে মানুষ সেখানে স্বাতন্ত্র্যের দাবী করিয়া বসিবে। আর যেখানে জানি যে সম্বন্ধ চিরন্তন, সেখানে কলহ মিলনেই পর্য্যবসিত হয়।

পশ্চিমের সামাজিক জীবন সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান নাই। পুস্তকে যাহা পড়ি, তাহাতে জানি, তাহাদের পরিণয় বহুক্ষেত্রেই ক্ষণস্থায়ী হয়। বিবাহ-বিচ্ছেদের হিড়িকে অনেকের জীবন ক্লিষ্ট ও পীড়িত হইয়া উঠে। কিন্তু ভারতীয় জীবনে দাম্পত্য-সুখের বহুল অস্তিত্বের কথা যে কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তিই স্বীকার করিবেন। আমাদের যত দৈন্যই থাকুক, যত প্রকারেই আমরা অবনমিত হই না কেন, আমাদের পারিবারিক শান্তি যে অক্ষয় ও অতুলনীয়, এ কথা সকলকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। সেই সুখ-শান্তির নীড় যাঁহারা ভাঙ্গিতে বসিয়াছেন, সেই আরাম ও উৎসাহের কেন্দ্রকে, সেই শান্তি ও ত্যাগের পবিত্র আশ্রমকে যাঁহারা নূতন দুর্দ্দৈব আনিয়া অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতেছেন, তাঁহারা সত্যই দেশের সমূহ ক্ষতি করিতেছেন।

সতীধর্ম্ম এবং সতীত্বের আদর্শ আমাদের সভ্যতার কৌস্তভ-মণি। আমাদের জীবনের নানা উত্থান-পতনের মাঝে, নানা বিপ্লব ও বিরোধের ক্ষণেও সতীধর্ম্মের অনির্ব্বাণ জ্যোতিঃ আমাদের পর্ণকুটীরে দিব্য আলো জালিয়া রাখিয়াছিল। আমরা জানি, সে আলো কোনও ঘূর্ণাবাত্যায় নিষ্প্রভ ও ম্লান হইবে না। নগ্ন কামনার লেলিহান শিখা যতই জ্বলুক, আমাদের ভয়ের কারণ নাই। আমাদের পিতৃ-পিতামহ সাধনায় ও আত্মদানে যে অপূর্ব্ব মধুর সংস্কার আমাদের প্রত্যেকের মনে জাগরূক করিয়া রাখিয়াছেন, কোন চীৎকারই তাহাকে দূর করিতে পারিবে না।

আমাদের জীবনে শতধা কুসংস্কার ও অজ্ঞান রাজত্ব করিতেছে। ধার-করা ভাবের পসরা লইয়া গলাবাজি না করিয়া যদি তথাকথিত সংস্কারকগণ এই সমস্ত অজ্ঞতা ও অন্ধতা দূর করিবার চেষ্টা করেন, তবে সত্যকার কায হইবে।

যে দেশের নারী এক দিন বলিয়াছিল, যাহাতে অমৃতত্ব পাইব না, তাহা লইয়া কি লাভ, সে দেশের নারী কখনই ভোগায়তনে নৈবেদ্য সাজাইবার ভার লইবে না। নর ও নারী পরস্পর পরস্পরের সহায় এবং সম্পূরক। নরের দৃঢ়তা এবং নারীর কোমলতা, নরের শক্তি এবং নারীর মাধুর্য্য উভয়ে মিলিয়া বিশ্বকে দীপ্ত ও প্রবুদ্ধ করুক, ইহাই আমাদের কামনা।

নর ও নারী শক্তির দুই ধারা। সমন্বয়ের মাঝে উভয়ে সার্থকতা লাভ করে। কেহ কাহাকে পিষিয়া ফেলিয়া বড় হইতে পারে না। বিরোধের জয়-ডঙ্কা বাজাইয়া কাণ ঝালা-পালা করিবার কি প্রয়োজন আছে, জানি না; কিন্তু সস্তা উত্তেজনার খোরাক যোগাইলে অশান্তি ও উপদ্রবের আশঙ্কা আছে।

ভগবান্ করুন, আমাদের সুবুদ্ধি হউক। সর্ব্বতোভাবে কামনা করি, ভারত-নারী গৌরব ও প্রতিষ্ঠা লাভ করুন। তাঁহাদের বিজয়-বৈজয়ন্তী যতই উচ্চে উড়িবে, আমাদের মুখ ততই উজ্জ্বল হইবে। কিন্তু হলাহল ও অমৃত এক নহে, এ কথা যেন তাঁহারা ভুলিয়া না যান। ভারতীয় আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য মানিয়াই এবং নিজ নিজ জীবনে সেই আদর্শকে প্রস্ফুট করিয়াই ভারতীয় নারী বিশ্বের দরবারে আসন পাইবেন, এ কথা যেন তাঁহারা মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলিয়া না যান। সতীধর্ম্মের শুচিসুন্দর দীপ্তিতে দীপ্তিময়ী, ত্যাগ ও মুমুক্ষুত্বের মন্ত্রে দীক্ষিতা ভারতীয় নারী ভারতবর্ষকে পুনরায় জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন আনিয়া দিবে, আমরা সেই শুভ লগ্নের প্রতীক্ষায় রহিয়াছি।

শ্রীমতিলাল দাশ (এম্, এ, বি, এল)।

ওড়া পথের কথা

ভারতে Air Service-এর ব্যবস্থা পাকা হইয়া গিয়াছে। ভারতীয় Air Service-এর ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছেন মিষ্টার নেভিল ভিন্‌সেণ্ট। শিমলায় তাঁর অস্থায়ী অফিসও খোলা হইয়াছে। স্থায়ী অফিস করাচীতে শীঘ্রই খোলা হইবে।

'বসুমতী'র বহু পাঠক-পাঠিকা ওড়ার সম্বন্ধে বহু তথ্য জানিবার উদ্দেশ্যে নিত্য আমায় বহু পত্র লিখিতেছেন, তাঁহাদের প্রত্যেককে স্বতন্ত্র উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কার কাছে ওড়া-বিদ্যা শেখা যায়—এ প্রশ্ন অনেকেই করিয়াছেন। সে প্রশ্নের জবাব দিব।

ওড়া বিদ্যা শিখিতে হইলে ফ্লাই-ইং ক্লাবের শিক্ষকের কাছেই সে বিদ্যা শেখা উচিত। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন এ বিদ্যায় যত পারদর্শীই হউন, শিক্ষক-হিসাবে তাঁদের নিরাপদ বলিতে পারি না। যেহেতু এ পথে এত রকম অকল্পিত সঙ্কটের আশঙ্কা আছে, এত সমস্যা—যার সমাধান মিলিতে পারে শুধু অভিজ্ঞ বহুদর্শী শিক্ষকের কাছে। আমার নিজের ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতায় দু-চারিবার সঙ্কটে পড়িয়াছিলাম। মস্তিষ্ক স্থির ও ধৈর্য্য রাখিয়াছিলাম বলিয়াই আজ আবার 'বসুমতী'র মারফৎ 'বসুমতী'র পাঠক-পাঠিকার সামনে দাঁড়াইতে পারিয়াছি, নহিলে বাঁচিবার আশা সত্যই ঘুচিয়াছিল। সে কথা পরে বলিব।

জরীপের কাজে নিযুক্ত একখানি সী-প্লেন

তার পূর্ব্বে এরোপ্লেনের সাহায্যে নব-নব যে-সব ভূমি-নদী প্রভৃতির আবিষ্কার চলিয়াছে, সে সম্বন্ধে দু'চার কথা বলি। এ সম্ভাবনা জাগে জার্ম্মাণ যুদ্ধের ফলে। যুদ্ধের সময় এই এরোপ্লেনের সাহায্যেই শত্রুপক্ষের অবস্থান প্রভৃতি নির্ণীত হইত। যুদ্ধ থামিলে প্রায় ৩০০০ বিশেষজ্ঞ পৃথিবীর বিস্তারিত মানচিত্র-গঠনে মনঃসংযোগ করেন। এ কাজের জন্য প্রয়োজন উৎকৃষ্ট ক্যামেরার।

কাজেই নব-নব ক্যামেরার সৃষ্টি হইতে লাগিল। পৃথিবীর সর্ব্বত্র গতি-বিধি চলিতে পারে, এমন এরোপ্লেন-গঠনের কাজও পূর্ণ উদ্যমে চলিতে থাকে। এই 'সার্ভের' কাজে এরোপ্লেনের প্রচলন পাশ্চাত্য দেশ-সমূহের সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্যীভূত হইল। পূর্ব্বে যে সব 'সার্ভে'-ম্যাপ তৈয়ার হইত, তাহাতে নদীর উৎস-মুখ, গিরি-পর্ব্বতের প্রকৃত অবস্থান অনেকটা অনুমানের উপর নির্ভর করিত। কিন্তু এরোপ্লেনের সাহায্যে সার্ভে করার ফলে নদীর গতি ও উৎস নির্ণয়ে কোথাও কোনো সংশয় রহিল না। পাশাপাশি বহু ফটো একত্র করিলে গোটা প্রদেশের সম্পূর্ণ ম্যাপ পাওয়া এখন
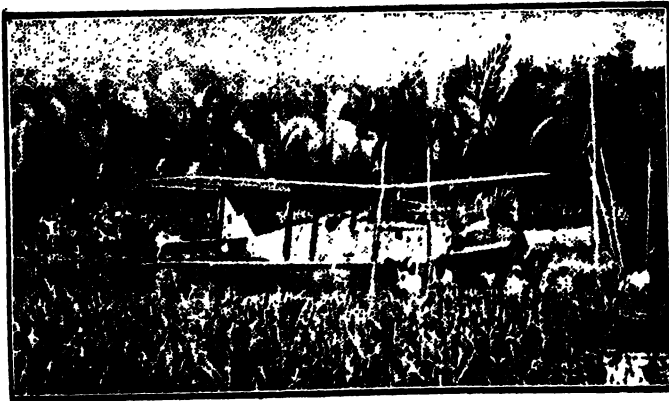
খুব সহজ হইয়াছে। কয়েকটা দৃষ্টান্ত লইলে আমাদের কথা বুঝা যাইবে।

এদেশের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এরোপ্লেনে চড়িয়া ফটো লওয়ার সাহায্যে বর্ম্মায়, আসামে বড় বড় জঙ্গল আবিষ্কৃত হইয়াছে; তাহাতে ব্যবসার ক্ষেত্র বাড়িয়াছে কতখানি, সহজেই বুঝা যায়। ভারত ও ব্রহ্মদেশের বাহিরে সুবিস্তীর্ণ পৃথিবীতে অনাবিষ্কৃত এমন কত জলা, কত জঙ্গল, কত বন, কত পাহাড় আছে, যাহার পরিচয় নরলোকে প্রচারের কোনো সম্ভাবনা ছিল না। এখন এরোপ্লেনের সাহায্যে সে সব অনাবিষ্কৃত বন, নদী, জলা, গ্রামের সন্ধান মিলিলে, শুধু ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার কি, উপনিবেশ-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির দিক দিয়া কতখানি জন-হিত সাধিত হইবে, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়!

এই ভাবে বোর্ণিও অঞ্চলে বিস্তীর্ণ বনভূমি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেখানে যে-সব গাছের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহা খুব মূল্যবান্—এ যাবৎ জগতের কোনো কাজে লাগে নাই। তার উপর সে সব প্রদেশে সুস্থ সবল কর্ম্মক্ষম বহু নর-নারীর বাসের সন্ধানও মিলিয়াছে। এই বন এখন রাজ্যের ধন-বল বাড়াইতে পারিয়াছে এবং ঐ সব বনবাসীও সভ্যতার আলোক-কিরণে নিজেদের চিত্ত উদ্ভাসিত করিতে পারিয়াছে। তা ছাড়া এই ফটো দেখিয়া উদ্ভিদ্‌তত্ত্বে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতের দল বলিয়া দিতে পারেন, এই সকল বনে কোন্ শ্রেণীর গাছের প্রাচুর্য্য এবং তাদের মূল্য কত।

ইংরাজীতে একটা কথা আছে—নদী-পথেই সভ্যতার বিস্তার (civilisation follows rivers)। এ কথা প্রমাণ করিতে ইতিহাস আলোচনার প্রয়োজন নাই। সারা বিশ্বের বাণিজ্য-প্রধান নগরগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই এ সত্য সহজে উপলব্ধি হয়। এরোপ্লেন সার্ভের ফলে বহু নদী আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং হইতেছে। এই নদী-পথে বাণিজ্য-সম্ভারের আমদানী-রপ্তানীও সুরু হইয়া গিয়াছে। চীনে ও আফ্রিকায় এমনি বহু নদী ও বহু অনায়ত্ত দ্রব্য-সম্ভার আজ মনুষ্য-সমাজের আয়ত্তীভূত হইয়াছে।

বাণিজ্যের ব্যাপারে মস্ত লাভ। রেলোয়ে কোম্পানিও এরোপ্লেন-ফটোগ্রাফির সাহায্যে প্রভূত লাভবান্ হইতেছেন। ইহার সাহায্যে নদী-সমূহের বেগ ও চপল গতি, পর্ব্বত-সমূহের বিচিত্র অবস্থান পূর্ব্বে নির্ণীত হইত না। তার ফলে বহুব্যয়ে টানেল ফুটাইয়া রেল-পথ বিস্তার করা হইত। নদীর গতি ও বেগ প্রভৃতির সঠিক তথ্য জানিবার উপায় না থাকায় যত্র-তত্র বহু ব্যয়ে বহু সেতু নির্ম্মাণ করিয়া তাহারই উপর দিয়া লাইন পাতা হইত। ফলে, বর্ষার বন্যায় সেতু ভাসিয়া যাইত—অর্থব্যয় পণ্ড হইত, এবং বহু আরোহীর প্রাণবিয়োগ ঘটিত। এখন বুঝা যাইতেছে বলিয়াই সুবিধামত লাইন ঘুরাইয়া, যোগ্যস্থলে সেতু রচিয়া বহু অর্থব্যয়, বহু সঙ্কটের হাত এড়ানো সম্ভব হইয়াছে।

এরোপ্লেন-ক্যামেরায় গৃহীত একখানি নিখুঁত মানচিত্র। সাধারণ মানচিত্রে নদীর গতি একটি লাইন দিয়া দেখানো হয়। ইহাতে শাখা-প্রশাখা অবধি নদীর যথার্থ অবস্থান লক্ষ্য করিবার বিষয়। কয়েকটি বিভিন্ন ফটোগ্রাফের সাহায্যে এই মানচিত্র রচিত হইয়াছে।

তার পর প্রত্নতত্ত্ব! ভারতে ও মিশরে বহু অনাবিষ্কৃত স্মৃতি-কীর্ত্তি আজ আবিষ্কৃত হইয়াছে শুধু এরোপ্লেন ক্যামেরার সাহায্যে। পূর্ব্বে যেখানে একটি বা দুটিমাত্র কীর্ত্তিস্তম্ভ লোক-লোচনের গোচরে আসিত, এখন সেস্থানে শ্রেণীসমূহের

আকাশ হইতে বনভূমির দৃশ্য। বন-বিভাগের বিশেষজ্ঞগণ এই জাতীয় ছবি দেখিয়া বৃক্ষাদির স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারেন। তীর-চিহ্নিত দ্বীপাকৃতি স্থান দুইটি মূল্যবান্ বৃক্ষপূর্ণ

ছবির কালো-অংশে চর বুঝাইতেছে। নদীর গতি ডাহিনে থাকার জন্য তীরে চর জাগিতেছে; এরোপ্লেন-ক্যামেরার সাহায্য ভিন্ন এ চর-নির্দ্দেশ শুধু কঠিন নয়, অসম্ভব ছিল

দেখা পাইতেছি। সম্প্রতি মিশরে এক হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার একটি রাজপথ আবিষ্কৃত হইয়াছে, সে রাজপথ জনহীন প্রদেশের মধ্য দিয়া গেলেও বিচিত্র রমণীয়।

যে সব পাইলট্ এই সব এরোপ্লেন চালান, তাঁদের চালনা-কৌশলের তুলনা নাই। যেহেতু ফটো লওয়ার সময় বায়ুমণ্ডলের একই নির্দ্দিষ্ট স্থানে এরোপ্লেনকে সম্পূর্ণ স্তব্ধ রাখা প্রয়োজন এবং একই লেভেলে। সে কি সহজ কাজ! এরোপ্লেন একটু স্থানভ্রষ্ট হইলেই ভূ-পরিমাপে আকাশ-পাতাল প্রভেদ ঘটিবে।

স্কুল-কলেজে ভবিষ্যতে যে সকল ম্যাপের প্রচলন হইবে, সে ম্যাপকে নির্ভুল করিতে গেলে এই এরোপ্লেন ফটোগ্রাফির সাহায্যেই শুধু করা সম্ভব। বিলাতে এ ব্যাপার লইয়া আন্দোলন চলিয়াছে এবং অচিরে পুরানো ম্যাপ-সমূহ স্কুল-কলেজ হইতে নিষ্কাশিত করিয়া তাদের স্থানে নব পদ্ধতির এই নির্ভুল ম্যাপ রক্ষিত হইবে।

এ সব গেল কাজের কথা। তার পর ভ্রমণের আনন্দ। মনের উপর এ আনন্দের প্রভাব অল্প নয়। আমার নিজের সম্বন্ধে এটুকু স্বীকার করিব, অত বড় দেশ-ব্রত-গ্রহণের যোগ্যতা আমার নাই, তবে এরোপ্লেনে নিত্য বিচরণ করা আমার প্রধান recreation হইয়া দাঁড়াইয়াছে। একটু অবসর মিলিলেই আমি দমদমায় গিয়া নিজের পুষ্প-রথে চড়িয়া বসি। তবে একা বেড়াইতে আমোদ হয় না।

বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন সর্ব্বদাই সাথী মিলে। সম্প্রতি বিচরণের মধ্যে একটু কৌতুকের আয়োজন মিলিয়াছিল। এক দিন সকালে গিয়া নামিলাম চাঁদীপুরে। চাঁদীপুর সমুদ্র-তীরে, কাঁথির ওদিকে। সমুদ্রতটে বালির উপর নামিলাম। দেখিতে দেখিতে লোকের ভিড় জমিয়া গেল। তখন ভাঁটা। সমুদ্র-তরঙ্গ অলসতায় ভরিয়া যেন নিঝুম! চাহিয়া দেখি, সমুদ্রের বুকে মাছের নৌকা; তীরের কাছেও মাছ ধরিবার ভারী ধুম। সমুদ্র-মৎস্য,—সে কথা বলা বাহুল্য, ছোট-বড় নানা আকারের। জেলেদের ডাকিয়া মাছ কিনিলাম, প্রায় পাঁচ ছ'সের মিলিল। তারা দাম চাহিল আট আনা। আমি অবাক্! সেই মাছ লইয়া কলিকাতায় ফিরিলাম—বেলা তখন দশটা, কি সাড়ে দশটা। এরোড্রোমে কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল, সেখানে কিছু বিতরণ করিলাম। পরে গৃহে আসিয়া সেখান হইতে আত্মীয়-বন্ধুর বাড়ী-বাড়ী কিছু পাঠাইলাম।

পুশ্-মথের ভিতরে বসিবার আসন

মাছ খাইতে ভালো লাগে সত্য, কিন্তু চাঁদীপুরের সমুদ্রের মাছ সকালে ধরিয়া তার দু ঘণ্টা পরে কলিকাতায় বসিয়া সে মাছ খাওয়া—ইহাতে যে আরাম মিলে, তার তুলনা আছে কি! তা ছাড়া মাছ-খাওয়ার ইতিহাসে এটুকু বোধ হয়, record-making!

এক দিন চাঁদীপুরের একটু দূরে গিয়া নামিয়াছিলাম। দেখি বিস্তর পাখী—বহু হাঁস, স্নাইপ। বন্দুক লইয়া গিয়াছিলাম—পক্ষি-শীকার করিলাম এবং বেলা এগারোটায় গৃহে ফিরিয়া সেই পক্ষি-মাংস ভোজন! শীকারে এমন আনন্দ, ইহার পূর্ব্বে আর কখনো পাই নাই।

শূন্যপথে জেনোয়া এরো ক্লাবের একখানি 'মথ' এরোপ্লেন

তার পর চাঁদীপুরে প্রায় যাতায়াত চলিল। শেষে রথযাত্রার সময় সন্নিকটবর্ত্তী হইল; ভাবিলাম, চমৎকার সুযোগ। পুরীধামে গিয়া রথ দেখিয়া সদ্য গৃহে ফিরিব। রথের দিন সকাল সাড়ে সাতটায় দমদমা ছাড়িলাম। ম্যাপ দেখিয়

পথ খুঁজিতেছিলাম। আড়াই ঘণ্টায় দেখি, নীচে কটক। মহানদীর তীরে প্লেন নামাইলাম। সেখানে দশ মিনিট-কাল থাকিয়া আবার প্লেন ছাড়িলাম। পুরীতে গিয়া পৌছি-লাম, বেলা স'দশটায়। নামিয়াছিলাম স্বর্গদ্বারের কাছে। সমুদ্রতীরে লোকের জিম্মায় প্লেন রাখিয়া মোটরে পুরী প্রদক্ষিণ করিলাম। তার পর বেলা আড়াইটায় ফিরিবার মুখে আকাশে এরোপ্লেন তুলিয়া রথের ধারে চক্র দিলাম, এবং বেলা সাড়ে চারিটায় নির্বিঘ্নে দমদমায় ফিরিলাম। আরো তিন দিন পুরী পরিভ্রমণ করিয়াছি। উন্টা রথের দিন, এবং আরো দু'দিন। এক দিন কণারকে গিয়াছিলাম, পুরার পথে। কণারকে নামি নাই। ঊর্দ্ধ হইতেই মন্দির-দর্শন ঘটিল—আরো দেখিলাম, অসংখ্য হরিণ। বালুর বুকে মনের আনন্দে বিচরণ করিতেছে।

ছিঁড়িয়া ফেলি; কিন্তু ফোস্কা যা পড়িবার ততক্ষণে পড়িয়া গিয়াছে। সেই ফোস্কা ছিঁড়িয়া ক্ষত হয়। সারাইয়া তুলিতে চার-পাঁচ দিন সময় লাগে। কথাটা বলিতাম না, বলিলাম এই কারণে যে, এ সব ব্যাপার তুচ্ছ বলিয়া যেন কেহ অগ্রাহ্য না করেন। সুখে থাকিতে ভূতকে কিলাইতে দিবার সুযোগ কেন দিই? তার উপর পেট্রোল-সম্বন্ধে সতর্কতার কড়া বিধি-নিষেধ থাকিলেও আমরা সে সম্বন্ধে এখনো ভারী উদাসীন। এ ঠিক নয়।

আর এক দিন এক বিপদ ঘটিয়াছিল। সে কথা বলিয়া আজিকার মত পালা শেষ করি। সে দিন দমদমায় উড়িবার সময় আমার সাথী ছিলেন, দুটি ইংরাজ মহিলা। তাঁদের লইয়া আকাশে বহু উর্দ্ধে উঠিয়া দেখি, সর্ব্বনাশ! মেশিনের তলার একখানি চাকা খসিয়া ঝুলিতেছে! আশঙ্কা
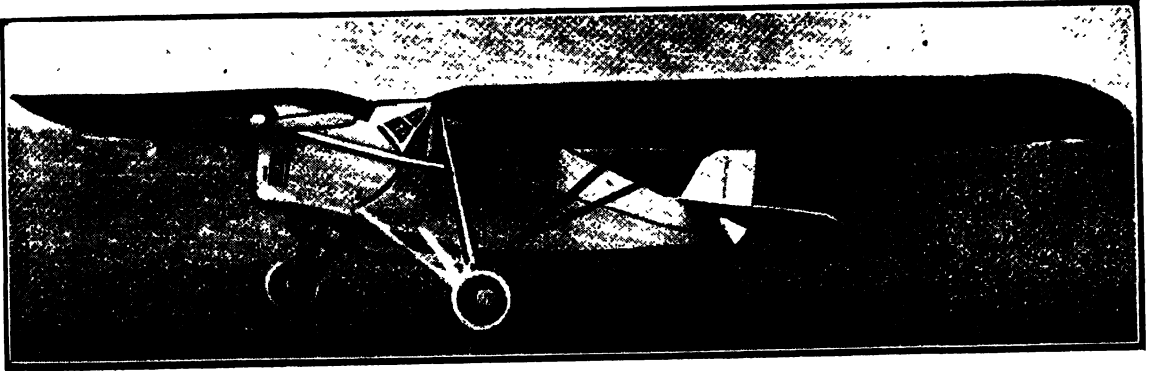
পুশ-মথ্ এরোপ্লেন্

শেষের দিন (২৬শে জুলাই, রবিবার) একটু বিপদ ঘটিয়াছিল। আমাদের একটি সঙ্গী বমি করিয়া ভাসাইয়াছিলেন। Bumping ছিল প্রচুর। এ ঘটনা পূর্ব্বে আর একটি সহযাত্রীর ঘটিয়াছিল; তা ছাড়া আর কখনো না। ফিরিবার মুখে প্লেনে পেট্রোল ভরিতে হইল। সঙ্গী নাই; নিজেই এ কাজ করিলাম। ট্যাঙ্ক ছাপাইয়া পেট্রোল গড়াইল। ছাদে ট্যাঙ্কের মুখ; সেইখানে পেট্রোল ভরিতে হয়। কতকটা পেট্রোল আমার জামায় পড়ে। রৌদ্রে কতক শুকাইয়া যায়; কোমরের কাছে জামার নিম্নাংশে ও কাপড়ের কষিতে পেট্রোল শুকায় নাই। সেই অবস্থায় আবার এই পথ ফিরি। পেট্রোল লাগায় কোমরে অত্যন্ত জ্বালা ধরে, এবং ফোস্কা পড়ে। পাইলট-সীটে বসিয়াই জামার ভিজা অংশ টানিয়া

জন্মিল। নামি কি করিয়া? এক চক্রে নামিতে গেলে প্লেন কাৎ হইয়া উন্টাইবে এবং অতঃপর কি যে না ঘটিবে!

ঘাবড়াইলাম না। সহযাত্রীদের কাছেও এ সম্বন্ধে কোনো কথা বলিলাম না। একে নারী, তায় এ পথে এই প্রথম ওঠা, ভয়ে যদি তাঁরা মূর্চ্ছাই যান! উড়িতে উড়িতে চিন্তার গহনে মনকে ছাড়িয়া দিলাম। সারা কলিকাতা প্রদক্ষিণ করিলাম। তাঁরা নামিতে চাহিলেন। তখন অতি সতর্কভাবে প্লেন ঈষৎ কাৎ করিয়া নামিয়া পড়িলাম। সে দিনকার ঘটনার সম্বন্ধে এখানকার Aero Clubএর জার্ণালে যাহা ছাপা হইয়াছে, উদ্ধৃত করিয়া দি—

......Mr. B. D. Mookerjea is to be congratulated on the cool manner in which he

handled a very delicate situation. Just after taking off in his Puss Moth with two passengers, Mr. Mookerjea noticed the star-board side of his under-carriage was hanging rather limply. He proceeded on his flight over Calcutta during which time he decided upon his course of action......a very slow port-wheel landing was decided upon having first of all turned off the petrol and switches. A perfect landing was made in his usual skilful manner and the machine came to rest in a normal position with the engine dead...... An external examination was made of the under-carriage but everything appeared normal. So the machine was carefully pushed into the nearby hanger.

গর্ব্ব-প্রকাশের জন্য এ কথাটুকু উদ্ধৃত করিতেছি না। এমনি সঙ্কটে মাথা ঠিক ও ধৈর্য্য রাখা ভারী প্রয়োজন। আঁকু-পাঁকু করিলে ফল কখনো ভাল হয় না। এরোপ্লেনে যে বহু প্রাণহানি ঘটিতেছে, তার শতকরা ৯০টির কারণ শুধু rashness ও cool-headednessএর অভাব।

আগামী সংখ্যায় gliding সম্বন্ধে কিছু বলিবার বাসনা রহিল।

শ্রীভবদেব মুখোপাধ্যায়।

বর্ষা-গীতি

ওগো—মন্দ মন্দ, মৃদু মৃদু মৃদু মন্দ্রিতা মেঘ-মল্লারী,—
ছায়া মায়া ঘন মধুরা-বিধুরা-সুধারা স্বর-সঞ্চারী!
উন্মদবায়ু—বাজে ঝঞ্ঝনা,
দ্যুলোকে দীর্ঘ দ্যুতি লাঞ্ছনা,
রভসা-বরষা পুষ্প-পরশা বিবশা-রস-উদ্গারী!

মুক্তধারার মুক্তো বরষে,
মুগ্ধ ময়ূর মত্ত হরষে,
গ্রীবা-বিভঙ্গে বর্ণ-বিলাস, চারু-চন্দ্রক-প্রসারী!
নীলমণিময়ী নৃত্য-নিপুণা,
বেণী-বল্লরী বিলোলা যমুনা,
পুলিনে পুলিনে স্পর্শ-পুলক উছল উর্ম্মি-উদ্গারী!

মদবাস মোহে মন্দ-চরণা,
চিত্রা হরিণী কান্ত-শরণা,
মৃগমর্দ্দিনী শার্দ্দূলী দোলে—রতি-রস-রাগে হুঙ্কারি।
শিখরিণী নব মেঘ-লীলায়িত,
বনভূমি শ্যাম নাগ-বলয়িত,
রজঃ মলয়জ মধুর শীতল নির্ঝর গীত-ঝঙ্কারী,—

ইন্দ্রধনুর মুকুট ময়ূখে,
ইন্দিরা জিনি শোভামধু মুখে,
মধুকর পাতি কাম-কটাক্ষ-নয়নে রাখ গো নিবারি।
বীর্য্য বিভবে সাজ মা রুদ্র,
তোল মা ঝঞ্ঝা তেজ-সমুদ্র,
সেজ না এমন, কেতকী-কুটজ-কুমুদ-কমল কহ্লারী।

মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ

১৬

প্রায় চারি মাস কাশীতে কাটাইয়া ফাল্গুনের শেষে যখন অর্চ্চনা কলিকাতায় তাহার নিজের গৃহে ফিরিয়া আসিয়া পরিতৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিল, তখন তাহার মন হইতে শোকের গুরুভার অনেক পরিমাণেই নামিয়া গিয়াছিল এবং তাহার আননে পূর্ব্ব-প্রফুল্লতা আবার যেমন ফুটিয়া উঠিয়াছিল, কথাবার্ত্তায় আগেকার সরসতাও তেমনই ফিরিয়া আসিয়াছিল। দীর্ঘদিন পশ্চিমের স্বাস্থ্যকর আব-হাওয়ার মধ্যে বাস করায় তাহার অসামান্য রূপ-লাবণ্যের পরিপূর্ণ উচ্ছ্বাস তাহার সর্ব্বদেহ ছাপাইয়া উঠিয়াছিল। সে দিন স্নানান্তে ভিজা কাপড়ে রোয়াকের উপর আসিয়া দাঁড়াইলে শান্ত একদৃষ্টে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অর্চ্চনা গামছা নিংড়াইতে নিংড়াইতে জিজ্ঞাসা করিল,—"কি দেখছো, পিসী ?" শান্ত তেমনই ভাবেই প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া কহিল,—"তোকেই দেখছি, অরু।"

অর্চ্চনা অল্প একটু হাসিয়া কহিল,—"আমাকে নূতন ক'রে দেখবার মত কিছু পেয়ে গেলে না কি, পিসী ?"

কথার উত্তর না দিয়া শান্ত একটা টানা নিশ্বাস ফেলিল এবং নিজের মনেই কহিল,—"বিধাতাপুরুষের কি যে লেখন, এত যে রূপ, কিছুই সার্থক হ'ল না !"

"এই কথা ! আমি বলি বুঝি আর কিছু ! কিন্তু যার জন্য তোমার এ দুঃখ, তা যে ষোল আনাই সার্থক হয়ে গেছে, পিসী। ওপরের ঠাকুর-ঘরে ঐ যে ক্ষুদে ঠাকুরটি আছেন, ওঁরই পায়ের তলায় যে সবই আমি দিয়ে দিয়েছি, তার সঙ্গে ঐ মহার্ঘ্য জিনিষটিও বাদ পড়ে নি।"—বলিয়া অর্চ্চনা ভিজা কাপড়ে তাড়াতাড়ি দালানে প্রবেশ করিল এবং সেখান হইতে বড় গলা করিয়া বলিল,—"পিসী, এক কায কর না হয়। যারা এ জিনিষটার জন্যে আপশোষে সারা হয়ে যাচ্ছে, আমার গা থেকে ঝেড়ে পুঁচে নিয়ে তাদের মধ্যে সব না হয় ভাগবাটোয়ারা ক'রে দাও, এতে তোমারও পুণ্যি হবে, আমিও হাল্কা হয়ে বাঁচবো।"

কেষ্ট দোতলায় পূজার ঘরে অর্চ্চনার পূজার ফুল রাখিয়া নামিয়া আসিতেছিল। কথাটার সব সে শুনিতে পায় নাই, শুধু কিছু একটা ভাগ করিয়া দিবার কথা তাহার কাণে গিয়াছিল। সিঁড়ি হইতে নামিয়া সে অর্চ্চনার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কি ভাগ ক'রে দেবে, দিদিমণি ?"

অর্চ্চনা তাহাকে কহিল,—"তুই এক ভাগ নিবি রে, কেষ্ট ?"

"নেব, দিদিমণি !"

"তবে দাঁড়া একটু" বলিয়া অর্চ্চনা পাশের ঘরে যাইয়া কাপড় ছাড়িল এবং ভিজা কাপড়খানি কেষ্টর হাতে দিয়া কহিল,—"আয়, ওপরে আমার ঘরে।"

উপরের ঘরে আসিয়া অর্চ্চনা আলমারী খুলিতে খুলিতে কেষ্টকে জিজ্ঞাসা করিল,—"তোর বাবা এসেছে, তোর মায়ের অসুখ ?"

"হ্যাঁ দিদিমণি।"

"তাই বুঝি তুই কাল মাইনে চাইছিলি ?"

"হ্যাঁ দিদিমণি। মাইনেটা নিতেই বাবা এসেছে।"

"ক' মাসের মাইনে তোর পাওনা হয়েছে বল দেখি ?"

"এই ফাগুন কাবার হলে পুরো পাঁচ মাস হবে, দিদিমণি।"

"ঠিক ত ?"

"হ্যাঁ দিদিমণি, কালী-গঙ্গার দিব্যি, বাবা তারকনাথের দি——"

"তুই ভারি চালাক, ম্যানেজার বাবু ত এখন এখানে নেই, তাই তাড়াতাড়ি যা' তা' ব'লে নেবার চেষ্টা,—না ?"

"সত্যি দিদিমণি, কালী-গঙ্গার দিব্বি, বাবা তারকনাথের দি—"

"আচ্ছা, তেত্রিশকোটি দেবতার আর দিব্বি গালতে হবে না। তা হ'লে পাঁচ মাসে তোর পাওনা কত হয় বল।"

"পনর টাকা।"

"টপ ক'রে ব'লে ফেল্লি, মুখের ভিতর জীইয়ে রেখেছিলি —না ? সমস্ত রাত বুঝি শুয়ে শুয়ে হিসেব-পত্তর সব একেবারে ঠিক ক'রে রেখেছিস্ ? কিন্তু, ঠকিয়ে নিচ্ছিস না ত, ঠিকই পনর ?"

"দেখ না দিদিমণি, দু'মাসে হল ছয়, আর দু'মাসে ছয়, তা হ'লে হল বারো, আর থাকলো গিয়ে এক মাস, তা হলে--

"ওরে বাবা, মাথা ঘুলিয়ে দিলি কেষ্ট! আচ্ছা, হিসেব-টিসেব সেই পরে হবে'খন, সেই ম্যানেজার বাবু এলে," বলিয়া অর্চ্চনা আলমারীর মধ্য হইতে পঁচিশটি টাকা বাহির করিয়া কেষ্টর হাতে দিয়া কহিল,—"তোর বাবাকে দি গে যা। বলবি, পনর টাকা তোর মাইনে, আর তোর মায়ের ওষুধ-পত্তরের জন্যে আমি দশ টাকা দিলুম, বুঝিছিস্?"

প্রসন্নতায় পূর্ণ হইয়া কেষ্ট বলিল,—"বুঝিছি। কিন্তু বামুনঠাকুরকে তুমি কিচ্ছুটি দিও নাক, দিদিমণি। ও যে তোমার কাছে জানাচ্ছিল যে, দেশে ওর ঘর পুড়ে গেছে, সব মিছে কথা দিদিমণি, ওর একটি কথাও তুমি পেত্যয় যেও নি।"

বামুনঠাকুরের সম্পর্কে নালিস ও পরামর্শদানের পর মুহূর্ত্তখানেক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া কেষ্ট জিজ্ঞাসা করিল,—"ম্যানেজার বাবু কবে আসবে, দিদিমণি?"

"কেন বল্ ত?"

"আমাকে দোলের পার্ব্বণী দেবে বলেছিল, এখন পেলে বাবাকে এই সাথে দিয়ে দিতুম।"

"সে ত চৈত্রমাসে। কবে দোল তার ঠিক নেই, এখনই তার পার্ব্বণী? গরজ বড় বালাই—না?"

কেষ্ট চুপ করিয়া রহিল। অর্চ্চনা কহিল,—"এখন যা, তোর বাপকে টাকা দি গে যা। দোলের সময় তোকে খুব বড় পিচকিরি আমি কিনে দেবো,—কেমন?"

প্রফুল্লমুখে কেষ্ট কহিল,—"দিও, দিদিমণি। তা হ'লে অনুকূলের দোকান থেকে দুপয়সার ফাগ কিনে আনবো।"

"কার গায়ে ফাগ দিবি?"

"বামুনঠাকুরের গায়ে" বলিয়া একমুখ হাসিয়া নাচিতে নাচিতে কেষ্ট নীচে নামিয়া গেল।

অর্চ্চনাও তাহার পিছন পিছন ঘর হইতে বাহির হইয়া ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিল এবং প্রায় ঘণ্টা দেড়েক পরে যখন বাহির হইয়া আসিল, তখন বহির্ব্বাটীতে নেপালের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া নীচে ভাঁড়ারে ঢুকিয়া শান্তকে কহিল,—"নেপাল বাবু এসেছেন পিসী, বামুনঠাকুরকে একটু খবর দিও।"

কাশী হইতে ফিরিবার সময় অর্চ্চনা কালীকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতা পর্য্যন্ত আনিয়াছিল এবং কয় দিন এখানে রাখিয়া গঙ্গাস্নান ও কালীদর্শন প্রভৃতি করাইয়া, দিন দুই হইল নেপালকে সঙ্গে দিয়া তাহাকে গিরিডি পাঠাইয়া দিয়াছিল।

শান্ত কহিল,—"তা ব'লে আসছি, কিন্তু তুই যাচ্ছিস কোথা?" চাবির রিং-বাঁধা বস্ত্রাঞ্চল আঙ্গুলে ধরিয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে অর্চ্চনা কহিল,—"একবার নেপাল বাবুর কাছে গিরিডির খবরটা শুনে আসি।"

চকিতে একটু কি ভাবিয়া লইয়া, অত্যন্ত অপ্রসন্ন-মুখে শান্ত কহিল,—"থাক, আর যায় না। হাজার হোক পর, যখন-তখন অমনি ক'রে অত মেলা-মেশা ভাল নয়।"

যাইতে যাইতে অর্চ্চনা ফিরিয়া দাঁড়াইল। তাহার চাবি ঘোরা'ন বন্ধ হইয়া গেল এবং শান্তর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—"বিশেষ কোন দোষ এতে হয় না, পিসী; যাদের হয়, তাদের হয়। তা ছাড়া, নিজের মনটা তোমার চেয়ে আমার নিজের বেশী জানা আছে।"

অর্চ্চনার মনটা তখন খুব ভাল ছিল না। কারণ, নেপালের গিরিডি হইতে প্রত্যাবর্ত্তন ও তাহার কণ্ঠস্বর শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মনে তথাকার সব কথা,—অর্থাৎ কালীর কথা, নোনিয়ার মা'র কথা, অক্ষয় ডাক্তারের কথা, উস্রি যাওয়ার কথা, ভবতোষ বাবুর অসুখ ও তাঁহার মৃত্যু, যে সব কথা এই কয় মাসের মধ্যে একটু একটু করিয়া সে ভুলিয়া আসিতেছিল, এক্ষণে চকিতে একটুখানি সময়ের মধ্যেই সেই সব তাহার মনে পড়িয়া গিয়াছিল এবং তাই, ঠাকুরঘর হইতে পূজা শেষ করিয়া বাহিরে আসার পর নেপালের কণ্ঠস্বর তাহার কাণে আসিবামাত্রই ভারাক্রান্ত-মনে সে তাহার কাছে গিরিডির সংবাদ জানিতে যাইতেছিল।

শান্ত কহিল,—"তা, কি আর তোকে বললুম অরু যে, তুই রাগ ক'রে উঠলি?"

"রাগ আমি করি নি, পিসী। কিন্তু নেপাল বাবু ঠিক পরের মত এ বাড়ীতে নেই। আমিও তাঁকে তেমন চোখে দেখি না, বাবাও কখনও দেখতেন না। তা ছাড়া, ওঁর সম্বন্ধে বাবার মুখের শেষ কথাগুলোও এরি মধ্যে বোধ হয় একেবারে ভুলে যাও নি, পিসী," বলিয়া বহির্ব্বাটীর বদলে অর্চ্চনা বরাবর উপরে নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

তরকারি কুটিতে কুটিতে শান্ত নিজের মনেই বলিতে লাগিল,—"তোর বাপের মুখের শেষ কথা তুই নিজেই শুধু

ভুলে আছিস্, নইলে যার ওপর তোর দেখবার শোনবার ভার দিয়ে গেল, তার চাইতে ঐ ছোঁড়াটাই তোর কাছে বেশী হ'ল! আমার কথার ওপর মুখে মুখে তুই জবাব দিস্—এত তোর অহঙ্কার! বলে—'না ছিল ভাত না ছিল ঘর, তিনিই হলেন রাজ্যেশ্বর।' হাজার হোক আঙুল ফুলে কলাগাছ ত!—"

সে দিন কুটনা কুটিতে শান্তর অযথা দেরী হইতে লাগিল এবং বহুক্ষণ ধরিয়া যে রাশীকৃত তরকারির স্তূপ বঁটির মুখে সে কুটিয়া ফেলিল, তাহা আবশ্যকের অপেক্ষা পরিমাণে এতই বেশী যে, তাহা দেখিয়া সে নিজেও যেমন চমকাইয়া উঠিল, বামুনঠাকুরের সম্মুখে সেগুলি ধরিয়া দিলে সে-ও মনে মনে তেমনই না চম্‌কাইয়া পারিল না।

যাহা হউক, সে দিনের চিন্তার ধারা তরকারি কুটিবার সঙ্গে সঙ্গেই শান্তর সাঙ্গ হইল না, পরন্তু রান্নাঘরের একাংশে বসিয়া সে আরও অনেক রকম ভাবিতে লাগিল। অনেক চিন্তার পর সে মনে করিল, একবার উপরে অর্চ্চনার কাছে সে যায় এবং তাহার রাগ শান্ত করিয়া আসে। কারণ, তাহার নিমাই দাদা এই সম্বন্ধে তাহাকে যথেষ্ট উপদেশ দিয়াছেন। যত দিন না অর্চ্চনার নিকট হইতে ঐ পাঁচ হাজার টাকা আদায় হয় এবং তাহাদের অন্যান্য মৎলব সিদ্ধ হয়, তত দিন মুখ বুজিয়া থাকিতে হইবে, এই তাঁহার আদেশ, সুতরাং অর্চ্চনার মন যোগাইয়া চলা ভিন্ন তাহার পক্ষে এখন গত্যন্তর নাই। কিন্তু শান্ত নিজের মন নিজে বুঝিত না, তাই সে মন যোগাইয়া থাকার কথাটা এমন সহজে ভাবিয়া ফেলিল। সে আজীবন স্বাধীনভাবেই কাটাইয়াছে, কখনও কাহারও একটা কথা সে সহ্য করে নাই; এমন কি, তাহার স্বামীর পর্য্যন্তও না। সংসারে থাকিয়া, পাঁচ জনের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে হইলে প্রতি সাধারণভাবে যে দুই চারিটা কথার আঁচড় পরস্পর সকলেরই গায়ে আসিয়া লাগে, তাহা সে কখনই সহ্য করিতে পারে নাই বলিয়া আজ সে আত্মীয় অনাত্মীয় সকলেরই সাহায্য ও সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইয়া দূরে পড়িয়া রহিয়াছে। শান্ত নিজের মনের ঠিক সংবাদটি যেমন কখনই পায় নাই, পরের মনের খাঁটি খবরটিও তাহার কাছে অগোচর থাকিয়া যাইত, তাই শুধু আজ বলিয়া নয়, ভবতোষ বাবুর মৃত্যুর পর হইতেই অর্চ্চনার সরস কথাবার্ত্তা, সর্ব্ববিষয়ে তাহার অত্যধিক পরিচ্ছন্নপ্রিয়তা, মিথ্যা লজ্জা ও সঙ্কোচশূন্য ভাব প্রভৃতি বরাবরই তাহার চোখে বিসদৃশ ঠেকিয়া আসিয়াছে এবং এই সব লইয়া অনেক দিনই উভয়ের মধ্যে তর্ক, বচসা, মতান্তর ও মনান্তর ঘটিয়াছে। অবশেষে নিমাই বাবুর সতর্ক ইঙ্গিতে তাহাকে নীরব হইতে হইয়াছে বটে, কিন্তু অসহ্য মনঃপীড়ার দুর্ব্বহ ভার তাহাকে বুকের মধ্যে পুরিয়া রাখিতে হইয়াছে।

কিছুক্ষণ রান্নাঘরের মেঝের উপর গালে হাত দিয়া বসিয়া ভাবিবার পর সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং পিছন ফিরিতেই দেখিল, অর্চ্চনা নিঃশব্দে আসিয়া তথায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। উভয়ে মুখোমুখী হইলে অর্চ্চনা অন্য দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া কহিল,—"পিসী কি রাগ ক'রে দুদিনের জন্য কোথাও চ'লে যাচ্ছ না কি?"

শান্ত থতমত খাইয়া কহিল,—"এ হেঁয়ালীর অর্থটা কি, অরু?"

"অর্থ এই যে, একেবারে দু'তিন দিনের তরকারী কুটে দিয়েছ, তাই বলছি। কিন্তু যেখানেই যেতে হয় বাপু, একটিনি দিয়ে যেতে যেন ভুলো না, নইলে আমার কথা মনে ক'রে তোমারও ভাত হজম হবে না আর আমারও মুখ আর কাষের ওপর এই ক'মাস ধ'রে তোমার হাতের শক্ত বাঁধনগুলো হয় ত সব আল্‌গা হয়ে আসবে।"

শেষের কথাগুলার অর্থ সম্যক্‌ভাবে বুঝিবার মত সূক্ষ্ম বুদ্ধি শান্তর ছিল না, সুতরাং সে দিকে কোন কিছু বলিবার চেষ্টা না করিয়া তাহার প্রথম কথাটির সূত্র ধরিয়া কহিল,—"তা, তরকারী কিছু বেশী না হয় কুটেই ফেলেছি, এইতে কি তোর জমীদারী নষ্ট হয়ে গেল, অরু? বাবা! কথার ধার কি লো! আমি কি তোর সংসার উড়িয়ে পুড়িয়ে দিতেই এসেছি? একটু আগে তুই যে এক কাঁড়ি টাকা ঐ চাকর ছোঁড়াটাকে দিয়ে দিলি, তার তুলনায় দু'টো তরকারী কি এতই অপব্যয় হয়ে গেল?"

মৃদু হাসিয়া অর্চ্চনা কহিল,—"কিন্তু সে এক কাঁড়ি টাকার একটা পয়সাও যে অপব্যয় নয়, পিসী। তার মধ্যে বেশীর ভাগ ত আমার কাছে তার নিজেরই পাওনা, বাকী যৎসামান্য ঐ নিরন্ন নিরাশ্রয়দের রোগে এক বিন্দু ওষুধ আর একটুখানি পথ্য।" বলিয়াই অর্চ্চনা ঘর হইতে বাহির

হইয়া গেল এবং একটু পরেই শান্ত নেপালের ঘরে অর্চ্চনার গলার আওয়াজ শুনিতে পাইল।

সন্ধ্যার পর শান্ত জপের মালা হাতে লইয়া নীচের দালানে থামের আড়ালের অন্ধকারে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। অর্চ্চনা সেই সময় উপর হইতে নামিয়া আসিলে তাহাকে কহিল,—"তুই ওপরে ছিলি? কেষ্টা খুঁজে বেড়াচ্ছিল, আমি মনে করলুম, বুঝি বার-বাড়ীর ঘরে ঐ এ-র সঙ্গে ব'সে ব'সে গল্প-টল্প কচ্ছিস।"

অর্চ্চনা উপরে তাহার ঘরে বসিয়া এতক্ষণ বাড়ী-ভাড়া আদায়ের কতকগুলি দরকারী হিসাব দেখিতেছিল। কাগজ-পত্রগুলি তেমনই ভাবেই খোলা ফেলিয়া রাখিয়া হঠাৎ সে কি একটা কথা শান্তকে বলিবার জন্য আসিয়াছিল, কিন্তু তাহা না বলিয়া কহিল,—"গল্প করতে এইবার যাচ্ছি, পিসী। তুমি ত মালা নিয়ে ভগবানের নাম করতে বসেছ, আমার ত সময় কাটাবার কিছু একটা চাই" বলিয়া অর্চ্চনা বহির্ব্বাটীর দিকেই অল্পে অল্পে অগ্রসর হইতে লাগিল। দুএক পা যাইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—"তুমি বরঞ্চ এক কায কোরো, নেপাল বাবুর চা-টা ক'রে কেষ্টকে দিয়ে পাঠিয়ে দিও।"

কথাটা শুনিবার সঙ্গে সঙ্গেই শান্তর মুখ-শ্রীর যে অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটিল, অন্ধকারে অর্চ্চনা যদিও তাহা দেখিতে পাইল না বটে, কিন্তু তাহার মুখের কথাগুলি তাহার কাণে আসিয়া মধু ঢালিয়া দিল—"ওর জন্যে চা-টা তুই তোর নিজের হাতেই ক'রে দিলে ভাল হয়, অরু।"

কাছে সরিয়া আসিয়া অর্চ্চনা কহিল,—"তা হয়, জানি। আমারই এষ্টেটের কর্ম্মচারী, আমারই আশ্রয়ে ভদ্রলোকের ছেলে ঘর ছেড়ে এসে রয়েছেন, বাবার স্নেহ, যত্ন, আদর আমার আমলেও যাতে বজায় থাকে, আমার সেটা দেখা উচিত বৈ কি। আর তোমরা সব আমার পরম হিতাকাঙ্ক্ষী, এ সব বিষয়ে যে আমায় পরামর্শ দিচ্ছ, এ-ও আমার কম ভাগ্য নয়। কিন্তু এই কটা দিন বাদে ওঁর স্ত্রী এখানে এলে পরে, তখন আর আমাদের এত ক'রে না দেখলেও চলতে পারবে।"

"তিনিও কি এখানে আসছেন না কি?"

"হ্যাঁ, আসছেন বৈ কি, বাবা কত ক'রে ব'লে গেছেন, জান না!"

শান্ত আর কোন কথা কহিল না, মুখ ফিরাইয়া নীরবে তাহার মালা-জপের কার্য্যে মনোনিবেশ করিল।

পরদিন আহারান্তে অর্চ্চনা তাহার কক্ষে বিশ্রাম করিতে যাইল, শান্ত নীচের একখানা ঘরে বসিয়া কাশীতে পত্র লিখিতে বসিল এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া অনেক রকম ভাবিয়া চিন্তিয়া অনেকগুলি ছত্রের পর ছত্র সাজাইয়া যাহা লিখিল, তাহার মর্ম্মার্থ এই যে, এখানে সে আর এক দণ্ডও থাকিতে পারিবে না, সুতরাং পত্রপাঠমাত্র সব কায ফেলিয়া রাখিয়া তাহাকে যেন এখান হইতে লইয়া যাওয়া হয়।

দিন চারি-পাঁচ পরে তাহার সেই চিঠি পাইয়া যিনি আসিলেন, তিনি বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়াই দালান হইতে উচ্চকণ্ঠে স্নেহের ডাক ডাকিলেন,—কৈ গো, মা অর্চ্চনা! আমার কৈ, অ—শান্ত!"

১৭

দিন দুই চার পরে এক দিন সকালবেলা নীচের দালানে পায়চারি করিতে করিতে নিমাই বাবু শান্ত ও অর্চ্চনাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—"স্নেহের টানের যে কত বড় জোর, তা তোরা কি বুঝবি? এই বয়সে, ধর্ম্মের প্রবল স্রোতকেও আমার রুদ্ধ ক'রে দিলে, নইলে তোরা চ'লে আসবার পর নিজের মনের আর নাগালই পাই না। না ভাল লাগে গঙ্গাস্নান, না যেতে ইচ্ছে হয় বিশ্বনাথের মন্দিরে, না লাগে মন জপে-তপে। খালি মনে হয়, এরা দুটো ছেলেমানুষ,—তোর ৩০-৩২ বছর বয়স হলেও জগতের তুই কি-ই বা বুঝিস আর কি-ই বা জানিস, সুতরাং অরুও যেমন ছেলেমানুষ, তুইও তাই ছাড়া আর কি,—তা ভাবতুম, এরা দুটি ছেলেমানুষ, কি করছে সেখানে গিয়ে, কেমন আছে, ভগবান্ না করুন, হঠাৎ যদি কোন বিপদ-আপদ হয়,—এই সব দিনরাত্রি খালি মনে হ'ত। এত দিন এক রকমে কেটে গিয়েছে, কিন্তু এই ক'মাস সব একসঙ্গে থেকে মায়ার বাঁধন যে কি রকম আমার আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়েছে, তা আমিই বুঝতে পারছি —আমিই বুঝতে পারছি। নইলে, কদিনই বা তোরা এসেছিস, এরই মধ্যে আমার মনের ওপর লাগাম কসে তোর ছুট কাটিয়ে আমায় এখানে নিয়ে এসে ফেললি ত?" তাহার পর মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া একটি সুদীর্ঘ শ্বাস ফেলিতে

ক্ষোভেতে কহিলেন,—"সবই বিশ্বনাথের ইচ্ছা—সবই বিশ্বনাথের ইচ্ছা!"

তাঁহার কথা ও দীর্ঘনিশ্বাস শেষ না হইতেই অর্চ্চনা উঠিয়া উপরে চলিয়া গেল এবং শান্তও গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া বিরক্তিপূর্ণ চাপা গলায় কহিল,—"আমি তা ব'লে কিছুতেই এখানে থাকতে পারব না, এ পাহাড়ী মেয়ের সঙ্গে বনিয়ে থাকা আমার কুষ্ঠীতে লেখে নি।"

হস্ত ও মুখের একটা অত্যদ্ভুত ভঙ্গী করিয়া রুদ্ধ গর্জ্জনে নিমাই বাবু কহিলেন,—"তোর মাথা আমি ভাঙ্গবো।" পরক্ষণেই সিঁড়িতে অর্চ্চনার পদশব্দ শুনিতে পাইয়া কহিতে লাগিলেন,—"মাথা খারাপ নয়? নিশ্চয়ই তোর মাথা খারাপ, হাজারবার বলব যে, তোর মাথা খারাপ, তুই এতে রাগই কর আর যাই কর। অরুকে প্রাণ দিয়ে ভালও বাসবি, আবার ওর সঙ্গে খিট-খিট করতেও ছাড়বি না। ছেলেবেলা থেকেই তোকে জানি ত। কিন্তু আমি জানি বলেই না হয় বুঝলুম, কিন্তু হঠাৎ এক জন বাইরের লোক, সে ত আর কিছু বুঝবে না, সে মনে করবে, সত্যিই তোর মনের ভেতরটা বুঝি কু'য়ে ভরা। বুদ্ধি-শুদ্ধি ত আর কিছুই তোর নেই। অরুর আমার যা বুদ্ধি-শুদ্ধি জ্ঞান-গম্যি আছে, তার এক কড়াও তোর নেই। অরুর ওপর নিজে তুই রাগ করবি, দু'কথা বলবি, অথচ ওর ওপর আর কেউ যদি তাই নিয়ে রাগ করে বা দুটো কথা বলে, তা আবার তোর সহ্য হবে না। তা এ তোর মাথা খারাপ নয় ত আর কি বলব বল্ না।"

মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া হয় ত শ্রোতাদের এ সম্বন্ধে কিছু বলিবার অবসর দিলেন, কিন্তু উভয় শ্রোতাই যখন পূর্ব্ববৎ নীরবেই বসিয়া রহিল, তখন পুনরায় কহিতে লাগিলেন—"এই যে নেপাল ছেলেটি, কি সৎ ছেলে বল দেখি! সভ্য, ভব্য, বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, সচ্চরিত্র—হীরের টুকরো ছেলে। বাস্তবিক ছেলেটিকে আমি বড্ডই ভালবাসি। গুণেতেই লোক আপন হয়। পর ত, কিন্তু তা ত মনে হয় না, মনে হয়, তুই যেমন, আমার অরু যেমন, নেপালটিও আমার ঠিক তেমনই। নইলে ভবতোষ দাদা আর বেছে বেছে ——আয় রে বাবা, অক্ষয় পরমায়ু হোক তোর, এই বাবাজীর আমার নাম কচ্ছিলুম।"

নেপাল নিকটে আসিয়া কহিল,—"সীতাপতি মজুমদার ব'লে একটি ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। আপনার নাকি অনেক দিনের বন্ধু।"

নিমাই বাবু ব্যস্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ বার-বাটীতে আসিলেন এবং দূর হইতে নেপালের আফিস-ঘরে উপবিষ্ট তাঁহার অনেক দিনের সেই বন্ধুটিকে দেখিয়া, অতীতকালের অনেক দিন ত দূরের কথা, একটি দিনের বন্ধুত্বের কথাও তাঁহার স্মরণপথে উদয় হইল না। নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ম'শায়ের নাম?"

ভদ্রলোকটি উঠিয়া দাঁড়াইয়া সসম্ভ্রমে নমস্কার করিতে করিতে কহিলেন,—"আজ্ঞে, সীতাপতি মজুমদার, জাতি বৈদ্য। আমাকে আপনার বোধ হয় স্মরণ নেই। স্মরণ না থাকাই সম্ভব, নানা কাযের লোক আপনি" বলিয়া সীতাপতি মজুমদার, জাতি বৈদ্য মহাশয় পরিহিত পাঞ্জাবীর হাতা গুটাইয়া হাতঘড়ীটা একবার দেখিলেন।

নিমাই বাবু কহিলেন—"ঠিক স্মরণ করতে পারছি না, আপনার নিবাস কোথায় বলুন ত।"

"শ্রীনিবাসপুর, যশোর। আমাকে ততটা আপনি চিনতে পারবেন না, যাঁকে দেখলে চিনতে পারবেন, তিনি যে লজ্জায় গাড়ী থেকে কিছুতেই নামতে রাজী হলেন না। একবার দয়া ক'রে—।" উভয়েই ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণ পার হইয়া রাস্তার উপর দণ্ডায়মান গাড়ীখানির দিকে অগ্রসর হইলেন।

নিমাই বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"ঠিক বুঝতে পারছি না। যশোর?—যশোরের ক্ষান্তবালা কি?"

মজুমদার মহাশয় সহাস্যবদনে কহিলেন—"আজ্ঞে।"

সেকেণ্ডক্লাস গাড়ীখানির দরজা বন্ধ করা ছিল। নিমাই বাবু আগ্রহভরে তাহা তাড়াতাড়ি হস্ত দ্বারা সরাইয়া ফেলিতেই যেন প্রবল বিদ্যুৎপ্রবাহ দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হইলেন। ভিতরে উপবিষ্ট দুই জন কনষ্টেবল তৎক্ষণাৎ তাঁহার দুই হাত ধরিয়া ফেলিল। তিনি বলপ্রয়োগে ছাড়াইয়া লইতে গিয়া দেখিলেন, তাঁহার পিছনেও আরও দুই জন কনষ্টেবল দাঁড়াইয়া। ব্যাপার দেখিয়া নেপাল তৎক্ষণাৎ প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া গাড়ীর দিকে ছুটিয়া আসিতে লাগিল, কিন্তু তাহার আসিয়া পড়িবার পূর্ব্বেই শ্রীনিবাসপুরের সীতাপতি বাবুর আদেশে নিমাই বাবুর হাতে হাতকড়া লাগান হইল এবং তাঁহাকে গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া গাড়ী ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

কয়েক মিনিট পরে নেপালের মুখে সমুদয় শুনিয়া শান্ত আছাড় খাইয়া একবারে কাঁদিয়া উঠিল, অর্চ্চনা অবাক্ হইয়া বসিয়া পড়িল এবং নেপাল তখনই কাপড়-চোপড় পরিয়া এই ব্যাপারের সংবাদ জানিবার অভিপ্রায়ে বহির্গত হইল।

অপরাহ্ন পর্য্যন্ত নেপাল কয়েকটি থানা ঘুরিয়া অবশেষে লালবাজারে আসিয়া নিমাই বাবুর সন্ধান পাইল এবং অনেক তদ্বির আয়োজনের পর জানিতে পারিল যে, যে অপরাধের জন্য নিমাই বাবু ধৃত হইয়াছেন, সে অপরাধের মূল আসামী তিনি নহেন। যিনি মূল আসামী, তাঁহার নাম শুনিয়াই নেপাল ভয়ে ও বিস্ময়ে চম্‌কাইয়া উঠিল। তিনি—জগন্নাথ ঘোষ, ওরফে—গয়ারাম আচার্য্য।—তাহাকে কয়েক দিন মাত্র পূর্ব্বে ভবানীপুর হইতে ধরিয়া কাশীতে চালান দেওয়া হইয়াছে।

এই ব্যাপারটির আদি অন্ত জানিতে হইলে, বৎসর দশ পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত কোন একটি ঘটনার বিষয় জানিতে হয় এবং তাহা শুনিবার পক্ষে যদি কাহারও ধৈর্য্যের অভাব না ঘটে, তাহা হইলে অতি সংক্ষিপ্তভাবে তাহা এইখানে বলা যাইতে পারে।

বৎসর দশ পূর্ব্বে যখন নিমাই বাবুর যাত্রী-তোলা ব্যবসা ছিল, সেই সময় জগন্নাথ ঘোষ নীরদা নাম্নী একটি স্ত্রীলোক সমভিব্যাহারে কাশীতে আসিয়া উঠে। নীরদা জগন্নাথের আপন স্ত্রী ছিল না এবং জগন্নাথ তাহাকে পরস্ত্রীর চক্ষুতেও দেখিত না। কেহ বলিত, জগন্নাথ নীরদার স্বামিগৃহ হইতে তাহাকে লইয়া পলাইয়া আসে, আবার কেহ বলিত যে, নীরদাই জগন্নাথের পিতৃগৃহ হইতে তাহাকে সরাইয়া লইয়া আসে। কে কাহাকে লইয়া আইসে, এতৎসম্বন্ধে মতানৈক্যের মীমাংসাকল্পে ইহা বলা যাইতে পারে যে, উভয়েই উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পরস্পর পরস্পরকে লইয়া গৃহত্যাগী হয় ও ধর্ম্মসঞ্চয়ে আত্মনিয়োগ করে। যাহা হউক, এই জগন্নাথের সহিত নিমাই বাবুর বিশেষরূপ বন্ধুত্ব জন্মে এবং সে সময় প্রতিদিনই তিনি কোন না কোন সময়ে জগন্নাথের বাসায় আসিতেন কিম্বা জগন্নাথ তাঁহার বাসায় যাইত।

এই সময় জগন্নাথের বাসার সন্নিকটে সোনামুখী নামে কলিকাতা সোনাগাছির এক অবসরপ্রাপ্ত রমণী পুণ্যসঞ্চয়ের উদ্দেশে কাশীবাস করিতে আসে। সোনামুখীর কিছু নগদ অর্থ ও অলঙ্কারাদি ছিল। জগন্নাথ ও নীরদা প্রায় প্রতিদিনই তাহার গৃহে যাতায়াত করিয়া তাহার শেষ জীবনের অবসর এবং পুণ্যসঞ্চয়ে বিঘ্ন ঘটাইতে লাগিল। নিমাই বাবু রাত্রির অন্ধকারের আড়ালে থাকিয়া কখন কখন অতি গোপনে সোনার সাহচর্য্যলাভ করিতে আসিতেন। এইরূপ সময়ে হঠাৎ এক গভীর রাত্রিতে সোনার ঘরে কাতর আর্ত্তনাদ শুনিতে পাওয়া গেল এবং সেই শব্দে বাড়ীর অন্যান্য দুই এক জন ভাড়াটিয়া তাহার ঘরে ছুটিয়া আসিয়া দেখিল যে, রক্তাক্ত-কলেবরে সোনার প্রাণহীন দেহ গৃহতলে লুটাইতেছে। পরদিন পুলিস-তদারকে জানা যায় যে, সোনার অর্থ ও অলঙ্কারের লোভে যে লোক তাহাকে খুন করিয়াছিল, ভয়েতেই হউক কিম্বা লোকজন আসিয়া পড়াতে সময়াভাবেই হউক, সে এতদুভয়ের কিছুই লইয়া যাইতে পারে নাই। যে দুই চারি জন ভাড়াটিয়া সোনার চীৎকারে তাহার ঘরে ছুটিয়া আসিয়াছিল, তাহারা আততায়ীকে ছুটিয়া পলাইয়া যাইবার সময় দেখিতেও পাইয়াছিল এবং চিনিতেও পারিয়াছিল। পুলিস তাহাদের সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা এবং অন্যান্য তদন্তের ফলে যে লোকটিকে আসামী বলিয়া নির্দ্দেশ করিল, তাহাকে সেই দিন হইতে কাশীতে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। পুলিসের সকল প্রকার তীক্ষ্ণদৃষ্টি ও সযত্ন অনুসন্ধান ব্যর্থ করিয়া দিয়া জগন্নাথ ও নীরদা সেই হইতেই নিরুদ্দেশ।

দীর্ঘ দশ বৎসর পরে অনেক দিনের অনেক চেষ্টা ও অনুসন্ধানের ফলে, কাশীর পুলিস ভবানীপুর হইতে জগন্নাথ ও নীরদাকে—অর্থাৎ বর্ত্তমানের গয়ারাম ও সুখদাকে গ্রেপ্তার করিয়া কাশী লইয়া গিয়াছে এবং গয়ারাম তাহার পরিত্রাণের আর কোন উপায় যে নাই, তাহা বুঝিতে পারিয়া, নিমাই বাবুকেও এই ব্যাপারে ভাল করিয়া জড়াইবার চেষ্টা করিয়াছে। গয়ারামেরই একরারমত এক্ষণে পুলিস নিমাই বাবুকে গ্রেপ্তার করিল ও তাঁহাকে কলিকাতা হইতে কাশী লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিল।

এই ঘটনায় শান্ত একবারে অধীর হইয়া পড়িল; অর্চ্চনাকে কহিল,—"তোর তিনি হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, অরু, তাঁর এই বিপদের সময় তোর একটু দেখা উচিত। ভগবানের ইচ্ছায় তোর টাকার অভাব নেই। তোরই বাড়ী থেকে এক জন নিরপরাধ ভাল লোককে চক্রান্ত ক'রে ধ'রে নিয়ে গেল, তাঁরে বাঁচানো তোরই কর্ত্তব্য মা, এতে

তোর পুণ্যি হবে। অমন ভাল লোক যে মিছিমিছি একটা দায়ে পড়লেন, মা বসুমতী কখ্‌খনো এ অন্যায়—"

মুখের কথা তাহার কাড়িয়া লইয়া অর্চ্চনা কহিল—"সহ্য করবেন না পিসী, কখ্‌খনও সহ্য করবেন না। হয় ত ত্রেতাযুগের মত আর একবার তিনি বুক চিরে তাঁর এই সন্তানটিকেও মিথ্যে কলঙ্কের দোষ থেকে বাঁচাবার জন্যে তাঁকে তিনি কোলে টেনে নেবেন। তাই আমি ভাবছি, মা-বসুমতীকে টেক্কা দিয়ে এ কাযে আমার নামা কিছুতেই উচিত হয় না, পিসী ;—কি বলেন নেপাল বাবু ?"

নেপাল সেইখানে উপস্থিত ছিল, নিরুত্তরে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইয়া বোধ হয় মনে মনে হাসিতে লাগিল। শান্ত আর কিছু না বলিয়া অন্যত্র উঠিয়া গেল এবং পরক্ষণেই ফিরিয়া আসিয়া কহিল,—"আমি আর নেহাৎ অধর্ম্মটা করতে পারব না, আমারও তিনি অনেক করেছেন। দাদার দেওয়া ঐ পাঁচ হাজার টাকা তুই তা হ'লে আমায় দিয়ে দে, আমার সাধ্যে যতটুকু হয়, একবার গিয়ে করি। দোহাই মা তোর, প্রাতর্বাক্যে তোকে আশীর্ব্বাদ করছি অরু, তোর ভাল হবে, টাকাগুলি এই সময়ে আমায় দিয়ে দে মা।"

অর্চ্চনা আঙ্গুলে কাপড়ের খুঁট জড়াইতে জড়াইতে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল,—"ও সবের ভেতর আমি নেই পিসী। টাকা-কড়ির ব্যাপার,—সে সব জানেন ঐ নেপাল বাবু, বাবা যাঁর ওপর তাঁর এষ্টেটের ভার দিয়ে গিয়েছেন। আমি খালি এইটুকু পারি যে, এক জন লোক সঙ্গে দিয়ে তোমায় কাশী পাঠিয়ে দিতে পারি, এমন কি, আজই রাত্রিতে যদি যেতে চাও ত তাও পাঠিয়ে দিতে পারি," বলিয়া অর্চ্চনা বারান্দা পার হইয়া বাগানের দিকে চলিয়া গেল। অগত্যা নেপালকে নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বলিতে হ'ল,—"টাকা আপনার আমাদের কাছে তোলা থাকলো, পিসীমা। মনে করুন, মোকর্দ্দমায় যদি বিলেত আপীলই করতে হয়, তখন ঐ টাকাতেই করতে হবে,—বুঝছেন না ? আপনি বরং শীগ্‌গীর সেখানে চ'লে যান, তাতেই অনেক কায হবে। এখানে আর একটা দিনও আপনার থাকা চলে না।"

শান্তর গলার স্বর ধরিয়া আসিয়াছিল। জোরে একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলিয়া শুধু কহিল,—"আচ্ছা, তাই হবে। জানি আমি যে, এ স্থলে আমার আসাও ঠিক হয় নি, থাকাও ঠিক হয় নি। তা' বেশই হ'ল।"

নেপাল শান্তর অসন্তোষ স্পষ্টই বুঝিতে পারিল, জিজ্ঞাসা করিল,—"তা হ'লে আজই যাবেন ত ?"

কোন উত্তর না দিয়া শান্ত ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

উত্তর না দিলেও, শান্ত সেই দিনই কাশী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল এবং অর্চ্চনাও তদুপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া তাহাকে কাশী পাঠাইয়া দিয়া হাঁফ ছাড়িল। নেপালকে কহিল,—"পাপ কাটলো, নেপাল বাবু। কালকে বাড়ীশুদ্ধ সব গিয়ে গঙ্গায় গোটাকতক ক'রে ডুব দিয়ে আসতে হবে। উঃ! কি সাংঘাতিক! এর ভেতর যে এত ব্যাপার, তা কে জানে বলুন। যাক্——পাপ বিদেয় হ'ল, না বাঁচা গেল!"

নেপাল কহিল,—"কিন্তু আবার ত 'রিটার্ণ জারনি' ক'রে টপ ক'রে এক দিন এসে পড়তেও পারেন, সুতরাং ভয়ের কারণ একেবারে যে কেটে গেল, তাও বলা যেতে পারে না।"

খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া অর্চ্চনা কহিল,—"সর্ব্বনাশ! ও ভয় আর দেখাবেন না, নেপাল বাবু, রক্ষে করুন।"

"তবে এক কায করা যাক। ওঁকে এই ব'লে একখানা চিঠি লিখে সাবধান ক'রে দেওয়া যাক যে, আপনি আর এখানে কদাপি আসবেন না, যেহেতু, কাশীর সেই সোনামুখী ভূত হয়ে এখানে চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা দিচ্ছে, আপনাদের দলের কাকেও এখানে দেখতে পেলেই হয় ত পেয়ে বসবে আর ঘাড় ভাঙ্গবে।"

ঘড়ীর দিকে চাহিয়া, সহাস্যে অর্চ্চনা কহিল,—"ভূতে কারুকে পেয়ে ঘাড় ভাঙ্গুক আর নাই ভাঙ্গুক, আমার কিন্তু পেটে ক্ষিধেও যেমন পেয়েছে, ঘুমেতে চোখও তেমনই ভেঙ্গে আসছে," বলিয়া অর্চ্চনা নেপালের সম্মুখস্থ চেয়ারখানি হইতে উঠিয়া বাড়ীর ভিতর চলিয়া যাইতেই ঘড়ীতে ঠং ঠং করিয়া ১০টা বাজিয়া গেল।

কলিকাতা হইতে চলিয়া যাইবার পর শান্তর আর কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। সে নিজেও কোন পত্রাদি দেয় নাই, অর্চ্চনারও তাহার সংবাদের জন্য কোনরূপ ঔৎসুক্য ছিল না। তবে নিমাই বাবুর মোকর্দ্দমার ফলাফল জানিবার জন্য নেপাল ও অর্চ্চনা উভয়েরই কতকটা আগ্রহ ছিল,

সুতরাং এ সম্বন্ধে যেমন করিয়াই হউক, তাহারা কিছু কিছু সংবাদ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিত এবং তাহারই ফলে জানিতে পারা গিয়াছিল যে, শান্ত কাশী পৌঁছিয়া কোন রকমে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া নিমাই বাবুর পক্ষসমর্থন করিবার জন্য দুই এক জন উকীল নিযুক্ত করিয়াছে এবং গয়ারামের পক্ষ হইতেও কে এক জন তদ্বির-আয়োজনাদি করিবার জন্য দাঁড়াইয়াছে।

যথাদিনে এই খুনী মামলার বিচার শেষ হইয়া রায় বাহির হইল। সকলে আশা করিয়াছিল যে, গয়ারামের প্রাণদণ্ড হইবে, কিন্তু তাহা হইল না। দীর্ঘদিন পরে বিচার হওয়ায় অনেক সাক্ষীকে পাওয়া যায় নাই এবং অন্যান্য অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করিবার পক্ষেও অনেক অসুবিধা ঘটিল। ফলে, শেষ পর্য্যন্ত ইহাই প্রমাণিত হইল যে, গয়ারামের হস্তস্থিত দা'য়ের আঘাতে সোনার মৃত্যু ঘটিলেও, গয়ারামের খুন করিবার উদ্দেশ্য ছিল না। সোনার নিজের হঠকারিতা এবং দোষেই সে আঘাত প্রাপ্ত হয় ও তাহার মৃত্যু ঘটে। আরও প্রমাণিত হইল যে, এই কার্য্যে নিমাই বাবুই গয়ারামকে পরামর্শদান, উত্তেজিত ও সাহায্য করিয়াছিলেন। যাহা হউক, বিচারে গয়ারামের শুধু যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাসের ব্যবস্থা হইল এবং নিমাই বাবু এই ব্যাপারে পরোক্ষভাবে জড়িত বলিয়া তাঁহার ১০ বৎসরের জন্য কারাবাসের হুকুম হইল। কাশীতে অসির ওদিকে অর্চ্চনাঘাট তৈরী, কেদারঘাটের আটহাজার টাকার বাড়ী, কাঙ্গালীদের জন্য অন্নসত্রের আয়োজন, ভবতোষ বাবুর এষ্টেটের পরিচালন প্রভৃতি সৎকার্য্যগুলি আপাততঃ ১০ বৎসরের জন্য স্থগিত রাখিয়া তাঁহাকে বর্ত্তমানে কারাতীর্থ আশ্রয় করিতে হইল। সুখদাকে পুলিস জড়াইয়াছিল বটে, কিন্তু বিচারে তাহার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ সুপ্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় সে অব্যাহতি পাইল।

মোকর্দ্দমার এই সংবাদ আনিয়া যে দিন নেপাল অর্চ্চনাকে জানাইল, সে দিন অর্চ্চনা কহিল,—"শান্ত পিসীর এ বাড়ীতে 'রিটার্ণ জারনি' বোধ হয় কোনকালেই আর হবে না, কখনও তেমন ইচ্ছা তিনি করলেও, তাঁর টিকিট বন্ধ। এইবার কিন্তু আপনার একটা কাযের পালা পড়েছে, নেপাল বাবু। আপনার স্ত্রীকে এইবার এখানে আনতে হবে। আর আপনার কোন ওজরই আমি শুনব না। বাবার শেষ কথা যে আপনি নিশ্চয়ই রাখবেন, তাতে আমি এক তিল সন্দেহ করি না। দেখুন না, বাড়ীতে একটা কথা কইবার কেউ সঙ্গী নেই, কি ক'রে কাটাই বলুন ত? তাঁকে এখানে নিয়ে এলে সত্যি আমি যে কত সুখী হব!"

নেপাল এ কথার কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া একখানা বইয়ের পাতার পর পাতা উল্টাইয়া যাইতে লাগিল।

অর্চ্চনা কহিল,—"তার পর মস্ত একটা কায করবার রয়েছে। কটক থেকে নায়েব মশাই একবার সেখানে যাবার জন্যে কেবলই লিখছেন, সেখানে একবার যেতেই হবে। জমীদারী আমার যতটুকুই হোক, আর যে কটাই সেখানে আমার প্রজা থাক্, তারা আমার সন্তান, আমি তাদের মা। তাদের যখন একবার আমাকে দেখবার ইচ্ছে হয়েছে, আমি না গিয়ে পারি না,—কি বলেন আপনি?"

অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে নেপাল কহিল,—"সে ত নিশ্চয়ই।"

তাহার পর অর্চ্চনা এই সূত্রে আরও কি সব বলিল, নেপাল তাহার সবটা হয় ত শুনিল, হয় ত শুনিল না, তাহার আনত মুখ খোলা বইয়ের উপর ঝুঁকিয়া রহিল এবং অর্চ্চনার প্রথম কথাটা লইয়াই তাহার মনে ভারের পর ভার আসিয়া চাপিয়া বসিতে লাগিল।

অর্চ্চনা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—"পড়ার আর আপনার ব্যাঘাত করব না, কিন্তু আমার কথাগুলো কাণে গিয়েছে ত?"

নেপাল বই হইতে মুখ তুলিয়া লইয়া মৃদু হাস্যের সহিত বলিল,—"চোখ দিয়েই পড়ছি, কাণ আমার ঠিকই আছে।"

"আমার কিন্তু পড়বার সময়, চোখ, কাণ, মন সকলে মিলেই পড়ে,—যাক্—এই হপ্তার মধ্যেই আপনার স্ত্রীকে এখানে আনা চাই। তিনি এলেই সকলে মিলে আমরা কটকে যাব।"

অর্চ্চনা উঠিয়া গেলে, একটা কথা অনবরত নেপালকে পীড়া দিতে লাগিল। ইহার পূর্ব্বেও কথাটা মধ্যে মধ্যে তাহার মনে পড়িয়া তাহাকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। কথাটা এই যে, সে তাহার স্ত্রী বর্ত্তমান আছে বলিয়া ভবতোষ বাবুর কাছে গোড়ায় যে পরিচয় দিয়াছে এবং এ সম্বন্ধে

অনর্থক সত্য গোপন করিয়া একটা যে অতি বিশ্রী কায করিয়া ফেলিয়াছে, এখন কোন্ ছলে সে তাহা শোধরাইয়া লইবে? এখন এমন সময় আসিয়াছে, যখন এক সময়কার সামান্য সেই মিথ্যা, অসামান্য গুরুত্ব সৃষ্টি করিয়া ভিতর ভিতর তাহাকে যৎপরোনাস্তি একটা অসুবিধা ও অতৃপ্তির অবস্থায় ফেলিয়াছে। অথচ এখন নূতন করিয়া সত্যপ্রকাশ করার মত একটা অশোভন হেঁয়ালীর সৃষ্টি করিতেও তাহার যথেষ্ট বাধিতেছে, এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়া এত দিন এই ব্যাপারের একটা প্রতীকারের পন্থা চিন্তা করিতে করিতেই তাহার দিনের পর দিন কাটিয়া গিয়াছে এবং যতই দিন গিয়াছে, পন্থা-নির্দ্ধারণের পরিবর্ত্তে ততই তাহার স্ত্রী বর্ত্তমান থাকার অলীক পরিচয়টাই মিথ্যার আসনে নিজের স্থান সুদৃঢ় করিয়া লইয়াছে।

কিন্তু এত দিনের পর এইবার হয় তাহাকে সত্য প্রকাশ করিয়া বলিতে হইবে, নয় ত এই মিথ্যা উক্তিকেই বজায় রাখিবার জন্য আরও অসংখ্য নূতন মিথ্যার দড়ি-দড়া দিয়া ইহার চারিদিকের বাঁধন কষিতে হইবে।

দিন পাঁচ সাত পরে অর্চ্চনার ক্রমাগত পীড়াপীড়িতে নেপাল শেষোক্ত পন্থা অবলম্বন করিয়া দিন দুয়েকের জন্য কোথা হইতে ঘুরিয়া আসিল এবং অর্চ্চনাকে জানাইল যে, বর্ত্তমান দুই চারি মাস তাহার স্ত্রীর এখানে আসার পক্ষে কতকগুলি অন্তরায় উপস্থিত, অর্থাৎ বাড়ীতে তাহার পিস্-শাশুড়ীর শরীর ভাল নহে, তাঁহাকে অসুস্থ অবস্থায় সেখানে একলা রাখিয়া আসা যায় না, তাহা ছাড়া সম্মুখে বর্ষা আসিতেছে, ঘরদ্বার সব মেরামত, ছাওয়ান আছে, ধান কলাই আলু প্রভৃতি সব একাকার হইয়া পড়িয়া আছে, সম্মুখেই চাষ-আবাদের সময়—ইত্যাদি ইত্যাদি। সুতরাং পিস্-শাশুড়ীর দেহ একটু সারিলে এবং কাযকর্ম্ম সব কতকটা গোছাইয়া লইয়া আশ্বিন মাসের গোড়াতেই তাহার স্ত্রীকে নিশ্চয় এখানে আনা যাইতে পারিবে।

নেপাল ভাবিয়াছিল যে, বর্ত্তমান ধাক্কা সে কোন রকমে সামলাইয়া লইয়া ভবিষ্যতে ভাল করিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া যাহা হয় ইহার একটা ব্যবস্থা করিবে।

যাহা হউক, নেপালের কথা শুনিয়া অর্চ্চনা কতকটা মনঃ-ক্ষুণ্ণ হইল ও দুই এক দিনের মধ্যেই কটকে তাহার জমীদারীতে যাইবার জন্য আবশ্যক উদ্যোগ-আয়োজনে ব্যাপৃত হইল।

১৮

সম্মুখে দিগন্তপ্রসারিত অনন্ত নীলাম্বুরাশি, পশ্চাতে, দূরে অসংখ্য ক্ষুদ্র বৃহৎ গৃহ ও তরুরাজি-পরিবেষ্টিত জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবমন্দির, মধ্যে বিস্তীর্ণ সৈকতোপরি অর্চ্চনা ও তাহার হাত কয়েক দূরে নেপাল বসিয়াছিল।

অপরাহ্লের সূর্য্য পশ্চাতের উচ্চচূড় মন্দিরান্তরালে নামিয়া পড়িয়াছিল। সম্মুখে বহুদূরে আসন্ন সায়াহ্নের অল্পান্ধকার সাগরজলে মিশিয়া ক্রমেই চতুর্দ্দিকে অল্পে অল্পে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছিল। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত সীমাহীন সিন্ধুর গম্ভীর বিশালতায় আবিষ্ট হইয়া নেপাল সম্মুখের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া তন্ময়চিত্তে নীরবে বসিয়া থাকিবার পর হঠাৎ তাহার মুখ হইতে বাহির হইল,—"যারা ভগবান্‌কে খুঁজতে গিয়ে যুক্তি-তর্কের কূল-কিনারা পায় না, এ দেখে তারা কি বলে?"

অর্চ্চনা কহিল,—"এ দেখে তারা বলে—সমুদ্র,—চলুন এখন, সন্ধ্যা হয়ে আসছে। যত দেখবেন, দেখবার সাধ আর মিটবে না, নেপাল বাবু। একবার গোঁসাইজীর আশ্রম হয়ে যেতে হবে, উঠুন।"

নেপাল উঠিয়া দাঁড়াইল।

আজ সাত দিন হইল নেপাল ও অর্চ্চনা পুরী আসিয়াছে। আরও দুই চারি দিন এখানে থাকিয়া সকলে কটক যাইবে। বামুনঠাকুর, কেষ্ট ও এক জন ঝি ছাড়া অর্চ্চনা প্রতিবাসী সত্যর মা ও সত্যচরণকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে। সত্যর মাকে অর্চ্চনা খুবই ভালবাসে, সত্যচরণ কলেজে পড়ে, অর্চ্চনাকে মাসী বলিয়া ডাকে। আজ শান্ত থাকিলে হয় ত ইহাদের সঙ্গে করিয়া আনিবার আবশ্যক হইত না।

পথ চলিতে চলিতে নেপাল কহিল,—"এ দেশের লোক ভাগ্যবান্ যে, এই মহাসৌন্দর্য্যের খনি তাদের চোখের সামনে নিত্য নিয়ত বিরাজ করছে।"

অর্চ্চনা কহিল,—"সে হিসেবে আমাদের ভারতের কোন দেশেরই লোক কম সৌভাগ্যশালী নয়। বাবার সঙ্গে আমি ত অনেক দেশেই বেড়িয়েছি, ভারতবর্ষের মত এমন সুন্দর, এমন শ্রেষ্ঠ, এমন বৈচিত্র্যে ভরা দেশ জগতে যে আর নেই, আমার বোধ হয়, অক্ষরে অক্ষরে সে কথা সত্যি। পাহাড়-পর্ব্বত, সাগর-প্রান্তর, নদ-নদী, হ্রদ-মরু, ঝরণা-প্রপাত কিছুরই এ দেশে অপ্রতুল নেই। এমন শান্ত পল্লীদৃশ্য, এমন

সোনার শস্যের মাঠ, এমন ফল-ফুলের শোভা, এমন ধর্ম্ম, এমন ধার্ম্মিক, এমন হৃদয়, এ দেশ ছাড়া আর কোথাও নেই। বাবা বলতেন যে, খালি দু'টি জিনিষ এ দেশে নেই,—আগ্নেয়-গিরির আগুনের স্রোত আর ভূমিকম্পের সর্ব্বনেশে কম্পন।"

"বাস্তবিকই তাই। কিন্তু আমাদের ভাগ্যে দেশের এই শ্রী-সম্পদের এক কণাও ভোগে হ'ল না। আমার মনে হয়, জীবনের সুখ টাকা-পয়সা, গয়না-গাঁটী, বিষয়-আশয়, গাড়ী-ঘোড়ার মধ্যে নেই; আছে ভগবানের সৃষ্টির এই সব সৌন্দর্য্যভোগের ভিতর। কিন্তু সংসারের কাযকর্ম্মের মধ্যে থেকে প্রকৃতির এই সব শ্রী-সম্পদের সঙ্গে পরিচয়লাভ আর আমাদের ঘটেই উঠে না। পাহাড়-পর্ব্বত, সাগর-ঝরণা দূরের কথা, মাথার উপর অনন্ত নীল আকাশের যে সৌন্দর্য্য-লীলা, তাই বা কখন্ চেয়ে দেখি বলুন। চোখের সামনে, কাণের কাছে দিয়ে বছর বছর ছ'টা ঋতু যে অনবরত ডাক দিয়ে—সাড়া দিয়ে চ'লে যায়, আসে, তাও কি কখন আমরা ফিরে চাই? কত বসন্ত, কত বর্ষা, কত শরৎ, তাদের মধু ছড়াতে ছড়াতে কখন্ কোন্ সময়ে যে আসে আর যায়, তার আভাস পর্য্যন্ত আমরা জানতে পারি না। আমাদের অবস্থা ঠিক কি রকম জানেন? যেন সোনা ফেলে আঁচলে গেরো।"

"আপনার ভিতর কবিত্ব দেখছি কম নেই, নেপাল বাবু!"

"আর আপনার ভিতর বুঝি কম আছে বলতে চান? এ দেশের ত সকলেই কবি। স্ত্রী-পুরুষ, ছেলে-বুড়ো, মুটে-মজুর, রাজা-প্রজা সকলেরই ভিতর ছন্দভরা। ভগবান্ এ দেশ কবিতার ছন্দে সৃষ্টি করেছেন, এর আকাশে সুর, বাতাসে সুর, মাঠে সুর, ঘাটে সুর, পাহাড়-পর্ব্বত জল-স্থল সর্ব্বত্রই এর সুরে ভরা। এ দেশের ধোপায় কাপড় কাচে গান গেয়ে, গাড়োয়ান গাড়ী হাঁকায় গান গেয়ে, কুলী-মজুর কায করে গান গেয়ে, দাঁড়ি-মাঝিরা নৌকো বায় গান গেয়ে। তাই এ দেশের ভিখিরী, ফকীর, পান্থ, তীর্থযাত্রী সকলের মুখেই গান। এমন কি, এ দেশের ফুল শুধুই রং ছড়ায় না, গানের সঙ্গে সঙ্গে সে নিত্য ফুটে উঠে, পাখীরা গান গেয়ে গেয়ে আকাশে উড়ে। এমন কবিতার দেশ—এমন গানের দেশ জগতের আর কোথাও আছে বলতে পারেন?"

কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সহিত অর্চ্চনা কহিল,—"কিন্তু বাবার মুখে শুনেছি, কে এক জন খুব বড় ইংরাজ পণ্ডিত না কি ব'লে গেছেন যে, দেশ যত বেশী অসভ্য আর মূর্খ থাকে, তার গান-কবিতাও তত বেশী থাকে। জ্ঞানের দেশে, সভ্যদেশে, কবিতা-গানের জন্ম হয় না। তা দেশ ছিল জংলী, লোক ছিল সব বুদ্ধিশুদ্ধিহীন অজ্ঞান বালকের মত, তাই গানেতেই দেশ ভ'রে আছে।"

"দেখুন, বেশী লেখাপড়া শিখি নি, কে কি ব'লে গেছেন, সে সব খবর রাখি না, তবে যিনি ব'লে গেছেন, তিনি যেই হোন, তিনি মানবজীবনের সত্যকার আসল বস্তুর সন্ধান পান নি। ভারতের বেদ-উপনিষদের গান বাদ দিলেও, তার চলতি মেঠো-গানের ভিতর যে গভীর জ্ঞানের ইঙ্গিত থাকে, তা বুঝতে তাঁর মত সভ্য-দেশের পণ্ডিতকে আরও কিছু জ্ঞানী হতে হবে, না হলে তিনি ভারতের সভ্যতার ওজনই ঠিক বুঝতে পারবেন না।"

মৃদু হাসিতে হাসিতে অর্চ্চনা কহিল,—"তা যাই কেন বলুন না, এ দেশের লোকের মত এমন আলসে জাত ত আর জগতের কোথাও নেই। পরিশ্রম করতে পারবে না, কাযকর্ম্ম করতে পারবে না, দেশ ছেড়ে বিদেশে যেতে পারবে না, পারবে শুধু ব'সে ব'সে গান করতে।"

একটু উত্তেজিত হইয়া নেপাল কহিল,—"পরিশ্রম করবার এ দেশের লোকের কোন কালেই দরকার যে হ'ত না। আপনি জগতের লোকের সঙ্গে তুলনা করছেন, কিন্তু তাদের সঙ্গে এ দেশের তুলনা হয় না। এ দেশের লোক বিনা পরিশ্রমেই ব'সে ব'সে পেট পূরে খেতে পেত, পরতে পেত, খাওয়া-পরার জন্যে এ দেশের লোকের মাথার ঘাম পায়ে ফেলবার দরকারই যে হ'ত না। শুধু সমুদ্রের নোণা জল, পাথরের চাঁই আর বরফের স্তূপ দিয়ে এ দেশকে ভগবান্ ত তৈরী করেন নি।"

"মস্ত মস্ত কথা ব'লে অন্যমনস্ক ক'রে দিচ্ছেন, আর এই অন্ধকার পথে খালি হোঁচট খেয়ে মরছি! তাই না হয় একটু আস্তে আস্তে চলুন।"

নেপাল চলিবার গতি অপেক্ষাকৃত মৃদু করিয়া কহিল,—"সুতরাং অন্ন-বস্ত্রের জন্যে এ দেশকে কখনই ভাবতে হয় নি ব'লে চিরকাল এরা শুধু পরিপূর্ণ সন্তোষের সঙ্গে গান গেয়ে আনন্দ খুঁজে এসেছে আর ভগবানের সন্ধান বার ক'রে তাঁর পায়ের ধূলোয় জীবন লুটিয়ে দিয়েছে।"

"ভারি কায করেছে। কর্ম্মই হ'ল জীবের ধর্ম্ম, সেই কর্ম্মশূন্য হয়ে——"

"কর্ম্মশূন্য কি বলছেন, বুঝতে পারছি না। খালি অন্ন-বস্ত্রের জন্যে হন্নে-হয়ে কামড়া-কামড়ি ক'রে মাথার ঘাম পায়ে ফেললেই বুঝি মস্ত কর্ম্ম করা হয়, আর সেই সূত্রে দুটো চারটে কল-কব্জা বানালেই বুঝি খুব করা হয়ে গেল? তাই যদি হয় ত পরিপূর্ণ সন্তোষ তারা পায় না কেন? আসল যাকে কর্ম্ম বলে, তা করেছে এই দেশেরই লোক। এরা নিজেরাও যেমন খেয়েছে, পরকেও তেমনি খাইয়েছে। মুষ্টি-ভিক্ষে, অতিথি-সেবা, অন্নসত্র, এ সব শুধু এদেশেরই জিনিষ। এরা কখন সত্য ছাড়া মিথ্যা বলে নি, চুরি বাটপাড়ি ডাকাতি জানে নি, পরের জিনিষের লোভে মারামারি কাটাকাটিও করে নি। এরা খেয়ে খাইয়ে আনন্দ নিয়ে কাটিয়েছে, শ্রেষ্ঠ জ্ঞান-বিজ্ঞানের তথ্যলাভ করেছে, আর সব শেষে পরমানন্দের সন্ধান পেয়ে চ'লে গেছে।"

অর্চ্চনা আর কোন কথা কহিল না, নীরবে চলিতে লাগিল।

নেপাল কহিল,—"অবশ্য দেশের সে অবস্থা যদিও এখন আর নেই—"

"নেই কেন নেপাল বাবু? দেশের সে রূপ নষ্ট হ'ল কিসে?"

"এ বিষয়ে অনেকের অনেক মত; তবে আমার বোধ হয় যে, দেশের লোকের ভিতর কিছু পাপ ঢুকেছে, সেই জাতীয় পাপের জন্যেই দেশের এই অবস্থা। আমাদের শ্যামসুন্দরপুরের আমিই ছেলেবেলা যে রূপ দেখেছি, এখন তার আর এক তিলও নেই। শুধু শ্যামসুন্দরপুরই বা বলি কেন, সব পল্লীগ্রামেরই সমান দুর্দ্দশা। আমিও হুগলী, বর্দ্ধমান, বাঁকড়ো জেলার অনেক গ্রাম বেড়িয়েছি, গ্রামের সব অবস্থা দেখলে সত্যিই চোখ ফেটে জল আসে। এখনকার তাদের এই ধ্বংসের ছবি দেখলেই, কি যে তাদের শ্রী ছিল, তা বেশ বুঝতে পারা যায়।"

এই সময় পথিমধ্যে থমকিয়া দাঁড়াইয়া অর্চ্চনা বলিয়া উঠিল,—"ঐ যাঃ!"

নেপাল জিজ্ঞাসা করিল,—"কি বলুন ত?"

"গোঁসাইজীর আশ্রমে যাওয়া হ'ল না ত।"

বাসার কাছেই প্রায় তাহারা আসিয়া পড়িয়াছিল। নেপাল কহিল,—"আজ আর ফিরে এতটা পথ গিয়ে কায নেই। কাল সকালে বরঞ্চ একবার যাবেন।"

শ্যামদাস গোস্বামী বহু কাল হইতে পুরীতে আছেন। তিনি সংসারত্যাগী, মুক্ত পুরুষ। এই কয় দিনই সমুদ্র-তীরে তাঁহার সহিত অর্চ্চনাদের প্রত্যহ সাক্ষাৎ হইয়াছে এবং নানা প্রকার কথাবার্ত্তা আলাপ-আলোচনাদি হইয়াছে। দুই এক দিনের এই একটুখানি মেলা-মেশাতেই অর্চ্চনা তাঁহার উপর প্রগাঢ় শ্রদ্ধাশালিনী হইয়া পড়িয়াছিল। আজ সত্যর মা'র শরীর ভাল ছিল না বলিয়া অর্চ্চনা সত্যকে বাসায় রাখিয়া আসিয়াছিল এবং সমুদ্রতীরে আসিয়াও আজ তাহারা গোঁসাইজীর সাক্ষাৎ পায় নাই। তাই ফিরিবার পথে তাঁহার সংবাদ জানিবার অভিপ্রায়ে অর্চ্চনা তাঁহার আশ্রম হইয়া আসিবার কথা বলিয়াছিল।

যাহা হউক, পরদিন প্রাতঃকালে অর্চ্চনা স্নানান্তে অভ্যাসমত জগন্নাথের মন্দিরে যাইবার উদ্দেশে সত্যকে সঙ্গে লইয়া বাসা হইতে বহির্গত হইল এবং সরাসর মন্দিরে না যাইয়া প্রথমেই গোঁসাইজীর আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইল।

একটুখানি বাগানের মধ্যে গোঁসাইজীর ক্ষুদ্র কুটীর। বারান্দায় একখানি মাদুরের উপর তিনি তখন কাৎ হইয়া শুইয়াছিলেন। অর্চ্চনা আসিয়া দাঁড়াইতেই কহিলেন,—"মা, কাল থেকে একটু জ্বরের মত হয়েছে।"

অর্চ্চনা তত্রত্য ধূলার উপর বসিয়া পড়িয়া তাঁহার কপালে ও মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। গোঁসাইজী কহিলেন,—"সে আজ পনর বছরের কথা, পাঁচ বছরের একটি ছোট মেয়ের কচি হাত জোর ক'রে ছাড়িয়ে এখানে চ'লে এসেছিলুম। সংসারে সেই ছিল শেষ বাঁধন। তোকে মা দেখে অবধি এত দিন পরে তার কথা আমার মনে পড়ে।" গোঁসাইজীর অন্তর হইতে দীর্ঘ একটি নিশ্বাস অল্পে অল্পে বাহির হইল। অর্চ্চনা জিজ্ঞাসা করিল,—"সে মেয়ে, বাবা, আপনার আছে?"

"থাকলে এত দিনে ঠিক তোরই মত হত, মা লক্ষ্মি।"—বলিয়া গোঁসাইজী হাত দিয়া আকাশের দিকে দেখাইয়া দিলেন। "তার মামার হাতে দিয়ে এসেছিলুম, বছর দুই পরে খবর পেলুম যে, জগন্নাথ আমায় পুরোপুরিই মুক্তি দিয়েছেন।"

ইহার পর কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত গোঁসাইজী নীরবে রহিলেন এবং অর্চ্চনা বসিয়া বসিয়া তাঁহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল।

সে দিন গোঁসাইজীর আশ্রম এবং জগন্নাথের মন্দির হইয়া বাসায় ফিরিতে অর্চ্চনার একটু বেলা হইল।

পরদিন অপরাহ্ণে অর্চ্চনা, নেপাল, সত্যর মা ও সত্যচরণ সকলে মিলিয়া গোঁসাইজীকে দেখিতে আসিল। গোঁসাইজীর সে দিন আর জ্বর হয় নাই, ভালই ছিলেন। কুটীরের দাওয়ায় বসিয়া সকলে নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল।

নেপালের কি একটা কথার উত্তরে গোঁসাইজী বলিলেন,—"বাবা, প্রকৃতির সব জিনিষেরই ওপর তিনি স্বপ্রকাশ। পাহাড় সমুদ্র দেখতে দেখতে তাঁর বিরাটরূপ যেমন চোখের সামনে ভাসে, ছোট একরত্তি একটা বন-যুঁইয়ের মধ্যে তেমনই তাঁর মধুর কচি রূপটি যেন ফুটে ওঠে। লক্ষ রূপে লক্ষ সুরে তিনি আমাদের চোখে কাণে সাড়া দিয়ে বেড়াচ্ছেন, আমরা চোখ-কাণের দরজা যদি বন্ধ ক'রে রাখি, তা হ'লে তাঁকে ধরব কি ক'রে, বাবা!"

নেপাল কহিল,—"আমিও ঠিক তাই বলি, বাবা। তাই সহরে থাকতে বাধ্য হলেও, মন আমার এতে বরাবরই নারাজ। মন আমার অহর্নিশ আমার সেই শ্যামসুন্দরপুরের মাঠে ঘাটেই ছুটে পালিয়ে যায়। সেখানকার সেই পল্লী-শ্রী, পায়ে-চলা সেই মাঠের পথ, সেই আম-কাঁঠালের বাগান, বাঁশ-ঝাড়, ঝোপ-জঙ্গল, নদীপারের সেই কাশ-বন আর পাটের ক্ষেত, গ্রাম-প্রান্তের সেই পদ্ম-ফোটা বিল, এ-সবের যে রূপ, সহরের সমস্ত ঐশ্বর্য্যের মধ্যে সে রূপ আমি খুঁজে পাই না।"

গোঁসাইজী কহিলেন,—"বাঙ্গালার পাড়া-গাঁ রূপেরই খনি ছিল বটে, কিন্তু সে রূপ আর এখন নেই, বাবা। ষোল বৎসর পরে এবার জন্মভূমিকে একবার দেখতে গিয়েছিলুম। দেখলুম, সে রামও নেই—সে অযোধ্যাও নেই। গ্রামের দুর্দ্দশা দেখে চোখে জল এসে পড়ল, বাবা! নদিয়া জেলার আমাদের সেই নারাণপুরের কি শ্রী-সম্পদই না ছিল, গিয়ে দেখলুম, এই ষোল বছরের ভিতর তার সব গিয়েছে। সিন্দুক ভেঙ্গে কে যেন তার ভিতরকার সোণা-দানা মণি-মাণিক সব চুরি ক'রে পালিয়ে গিয়েছে। গ্রামের সে আনন্দ নেই, সে শান্তি, সে সজীবতা, সে কোলাহল, সেই সব উৎসব, সে সবের আর কিছুই নেই, যেন ভানুমতীর বাজীর মত এই ক'বছরের ভিতরেই নিঃশেষে সব উবে গিয়েছে! যেন এক সর্ব্বনেশে ঝড়ের ঝাপটায় মা কমলার আঁচলখানি গাঁয়ের উপর থেকে কোথায় উড়ে গেছে!"

দুই হাঁটুর মধ্যে মস্তক রাখিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কিছুক্ষণ নীরবে থাকিবার পর গোঁসাইজী আবার বলিতে লাগিলেন,—"পাপ—পাপ, পাপেতেই এই হয়েছে, নইলে তেমন সাজানো বাগান সব এমন ক'রে কখনও শুকিয়ে নষ্ট হয়! দেখলুম, সেই আমাদের বারোয়ারীতলা মাঠ হয়ে প'ড়ে রয়েছে, সাধারণের পূজোর সেই প্রকাণ্ড মণ্ডপ ভাঙ্গা ইট-পাথরের স্তূপ হয়ে খাঁ খাঁ করছে। গোপীনাথের মন্দির, দোলমঞ্চ, রাস-মণ্ডপ, কদমবেদী, বকুলবেদী, এ সব শুধু ধূলোয় মিশতেই বাকী। পাড়ার পথগুলোতে মানুষের পায়ের দাগ আর পড়ে না, সাপের আঁকা-বাঁকা দাগই শুধু দেখতে পাওয়া যায়। তা'ও দু'পাশের ঘন বন এগিয়ে এসে সে পথগুলোকে পর্য্যন্ত যেন গেলবার উপক্রম করছে। পাপে নইলে আর এমনটা কখন হয়, বাবা! শুধু কি আমাদের নারাণপুর, বাঙ্গালার সব গাঁয়েরই এই দুর্দ্দশা! এ যেন সেই গল্পের দেশের অবস্থা, হাতীশাল আছে—হাতী নেই, ঘোড়াশালে ঘোড়া নেই, বাড়ী আছে, মানুষ নেই, বাজার আছে, পণ্য নেই! ঐশ্বর্য্যময়ী অম্বিকার এ যেন বিসর্জ্জনের পরের মাটী ছাড়া খড়ের মূর্ত্তি! ম্যালেরিয়া মহামারীতে দেশও যেমন উৎসন্ন গিয়েছে, দেশের লোকও যে দু'একটা বেঁচে আছে, তারাও তেমনই অধঃপাতে গিয়েছে। তারা যেমন অজ্ঞ, তেমনই সঙ্কীর্ণ মন, তেমনই তাদের খলস্বভাব।"

নেপাল কহিল,—"যা বলছেন, তা ঠিকই। গাঁয়ের সে স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যের এক কড়াও আর নেই, আর লোকেদের অধোগতির ত অন্তই নেই। তবু বাবা, সেই মাটীটুকুর কি যে টান, তা আর বলতে পারি না। মনে হয়, ম্যালেরিয়ায় মরি, আর সাপ-শিয়ালের সঙ্গে জঙ্গলের মধ্যেই বাস করি, কিন্তু তাইতেই যেন সব সুখ, তাইতেই যেন প্রাণের সব তৃপ্তি। প্রায় এক বৎসর ধ'রে কলকাতায় রয়েছি, এতেই যেন আমার হাঁফ ধরবার জো হয়েছে। আমার শ্যামসুন্দরপুরের সূর্য্য,—চিরকাল সকালবেলা তাঁরে বিলের ধার থেকে উঠতে দেখেছি, নদীর পারে ডুবতে দেখেছি, কিন্তু কলকাতায় এসে একটি দিনও তাঁর উদয় অস্তের খবর পাই নি! মানুষের বাড়ী-ঘর-দোর চারিদিককার বাতাসকে

পর্য্যন্ত কাছে আসতে দেয় নি। ভগবানের রাজ্যে মানুষ কি অত্যাচারই যে চারিদিকে ক'রে রেখেছে!"

গোঁসাইজী প্রফুল্ল দৃষ্টিতে নেপালের মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"দেশকে তুমি চিনেছ, বাবা, সঙ্গে সঙ্গে ভগবানকেও তুমি চিনেছ। দেশকে সত্যিই তুমি ভালবাস।"

অর্চ্চনা এতক্ষণ পরে কথা কহিল, বলিল—"ওঁর ওপর এক জন আছেন, বাবা। উনি তাঁর ছাত্র। ওঁরই মুখে অনেকবার ওঁর সেই হারু ঠাকুর্দ্দার নাম শুনিছি। মাঝে মাঝে নেপাল বাবুর কাছে সব শুনে আমার একবার ওঁদের শ্যামসুন্দরপুর যেতে ইচ্ছে করে। যাবও একবার ঠিক, অবিশ্যি নেপাল বাবু যদি নিয়ে যান। কিন্তু বাবার সঙ্গে একবার তারকেশ্বর গিয়ে একরাত ছিলুম, মশা আর শিয়ালের ডাকে সমস্ত রাত ঘুমোতে পারি নি। তা ছাড়া, খোলা জানালার ফাঁকে বাইরেকার মাঠের বিকট অন্ধকারের মধ্যে কত যে ভূত আর পেত্নী দেখেছিলুম!"

গোঁসাইজী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

সে দিন ইহাদের আর সমুদ্রতীরে বেড়ান হইল না। গোঁসাইজীর আশ্রমে গল্প করিতে করিতেই সন্ধ্যা হইয়া আসিল এবং সন্ধ্যার পর মন্দিরে ঠাকুর দর্শন করিয়া সে দিন সকলে বাসায় ফিরিল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়।

বৈজ্ঞানিক ও কবি

"ও ফুল কালই পড়বে ঝ'রে, হাস্‌বে নাক হেন
তাই ব'লে হায় ও ভাই কবি দুঃখ কর কেন?
দুইটি দিনের প্রজাপতি, তিনটি দিনের অলি,
শোক করো না, ফুলের সাথেই মরবে তারা বলি'।
মরণ-লীলার তলে তলে অমরতার ধারা
দেখবে নাক? দেখ্‌বে তবে হায় কে তুমি ছাড়া?
অমর পারিজাতের শোণিত সকল ফুলেই রয়,
কানন-রমার আশীর্ব্বাদে মৃত্যু করে জয়।
মধুতে তার অমৃত যে সংগোপনে জাগে,
ফুল যে রঙীন শোভায় ভরে অমর অনুরাগে।
গন্ধ তাহার কয় কাননে অমরতার বাণী,
মৃত্যুঞ্জয়ের ব্রতেই সে যে ভৃঙ্গে আনে টানি।
জুটে কি ঐ পতঙ্গেরা বৃথাই তাহার পাশে?
রঙীন পাখায় অমরতার বীজ ব'য়ে যে আসে।
মধুকোষের সূক্ষ্ম পথে অনেক ব্যথাই সহি'
ভৃঙ্গ পশে সৃষ্টিদেবীর নিদেশ শিরে বহি'।
প্রজাপতির ঘটকালিতে পুষ্প-পরিণয়,
ফুলের প্রণয় করে ফলের বীজেও প্রাণময়।
পরাগপথে ওরূপ হতে পুষ্প রূপান্তরে
আসছে চ'লে আদি হতেই পারিজাতের বরে।
যে ডোর জাগে হরের গলার হাড়ের মালার মাঝে
সেই ডোরেতেই অনন্তকাল ফুলের মালাও রাজে।
মরণ-লীলার মাঝে তাদের হ্রস্ব জীবনটুক
চিত্তলোকে অমর হতে তাও দেখ উন্মুখ।
শিল্পী তারে অজর কর, চিত্রটি তার আঁকো,
শোক করো না ছন্দে কবি অমর ক'রে রাখ'।"

কবি বলেন—"সবই বুঝি তত্ত্বজ্ঞানী ভাই,
সজল চোখে তবু আমার ফুলের পানেই চাই।
সত্য যা তা বুদ্ধি বোঝে, হৃদয় বোঝে কই?
ব্যথার আকুল পাথারে ভাই পায় না সে যে থই।
গীতায় প্রবীণ ব্রহ্মবাদী বৈরাগীটির চোখে,
অশ্রু কি আর ঝরে না ভাই প্রিয়জনের শোকে?
ফুলের জীবন রইবে বেঁচে নয়ন-অন্তরালে,
নয়ন যাহা হারায় তাহার তরেই ব্যথা ঢালে।
কি দোষ দেবে নয়নেরে? বঞ্চিত সে হায়,
ফুলের অমন অমরতায় তার কি আসে যায়?
অমরতাই নয়ক বড়। ঐ চাহনি হাসি,
পাতার দোলায় ঐ যে দোলন বড়ই ভালবাসি।
ঐ গ্রীবাটির ভঙ্গি-সোহাগ, সুরভি নিশ্বাস,
দেবে কি আর ফিরে তোমার কথাতে বিশ্বাস?
ফিরবে সবি? এই কাঁদা নয় শেষ তবে হায় হায়,
বারংবারই কাঁদতে হবে ফুলের বেদনায়?"

শ্রীকালিদাস রায়।

রবীন্দ্রনাথ ও মিষ্টিসিজম্

১

রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রতিভার উন্মেষের প্রথম প্রভাতেই প্রায় সকল সমালোচক ও অসমালোচক-মহলে একটি কথা শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল, রবীন্দ্রনাথ "ভাঙ্গা-ভাঙ্গা ছন্দ ও আধ আধ ভাষার কবি।" তাঁহার সমস্ত কবিতাই "ধোঁয়া-ধোঁয়া ছায়া-ছায়া।"

কথাটাকে একবারে ভিত্তিহীন বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। কবি নিজেই জীবনস্মৃতিতে ইহার উত্তর দিয়াছেন—"যেমন নীহারিকাকে সৃষ্টিছাড়া বলা চলে না, কারণ, তাহা সৃষ্টির একটা বিশেষ অবস্থার সত্য, তেমনি কাব্যের অস্ফুটতাকে ফাঁকি বলিয়া উড়াইয়া দিলে কাব্য-সাহিত্যের একটা সত্যেরই অপলাপ করা হয়।"

কাব্যের এই অস্ফুটতা—এই যে অরূপকে রূপ দিবার 'অব্যক্ত আকুতি' ইহা হইতেই জন্মগ্রহণ করে,—যাহাকে য়ুরোপীয় কাব্য-শাস্ত্রকারগণ নাম দেন—"মিষ্টিসিজম"। এই ব্যক্ত চরাচরে অনাদিকাল হইতে এক অব্যক্তের লীলা চলিতেছে, এক রহস্যময়ের মায়া উহাকে ঘিরিয়া আছে; অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন কবিগণ তাহাকে আভাসে ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিতে চাহেন। কারণ, তাঁহাদের কাব্যসাধনার স্তরে স্তরে রূপের ভিতরে অরূপের প্রকাশের সুরটি অনাহত ধ্বনিতে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে। জগতের সমস্ত রহস্যবাদী (mystic) কবিগণ সৃষ্টি-রহস্যের এই যবনিকা উদ্ঘাটন করিয়া সত্য শিব-সুন্দরের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে প্রয়াসী হন। উপনিষদের ঋষি হইতে আরম্ভ করিয়া পারস্যের সুফি ও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, সেলি, কিটস্ প্রমুখ প্রতীচ্য কবিগণের কাব্যমালা অনুসন্ধান করিলে এই পরম সত্যের সম্মুখীন হইতে হয়। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ যখন গাহেন,—

> "There is joy in the mountains,
> There is life in the fountains."

তখন প্রকৃতির মর্ম্মে মর্ম্মে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তিনি কোন্ রহস্যময়ের অনুসন্ধানে ফিরেন, তাহা আমরা উপলব্ধি করি।

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মত সেলিও কি এক 'অরূপ রতন আশা করে' নিখিল প্রকৃতির সৌন্দর্য্যসাগরের অতলে ডুবিয়া কাহাকে খুঁজিতে থাকেন,—

> "Spirit of Beauty that dost consecrate
> With Thine own hues, all Thou dost
> glance upon,
> Of human thought and form;
> Where art Thou gone?"

রবীন্দ্রনাথও বিশ্বের পরিদৃশ্যমান ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল বস্তুর অন্তরালে এই চির-সুন্দরের (Spirit of beauty) অনুসন্ধানে ফিরিয়াছেন—তাঁহার প্রেমিক অন্তরের সূক্ষ্ম অনুভূতি লইয়া। এই অ-ধরকে ধরিবার জন্যই তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল, আর এই জন্যই তিনি রহস্যময়ের পূজারী। মানসী ও কল্পনা হইতে আরম্ভ করিয়া গীতাঞ্জলি, গীতালি ও গীতিমাল্যে যাইয়া তাঁহার এই পূজানিবেদন পরিণতি লাভ করিয়াছে।

কোন সমালোচক এই মিষ্টিক কবিদের সম্বন্ধে বলেন,—"তার কাছে মধ্যাহ্নের তপন বড় রূঢ়, রুক্ষ; সে ভালবাসে ছায়া আলোর মিশ্রণ।" এই আলো ও ছায়ার ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' 'খেয়ার' পরপারে চলিয়া যায় সত্য, কিন্তু সেই যাত্রা-পথের গভীর আনন্দ-রেখা আমাদের প্রাণে প্রাণে অঙ্কিত হইয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্যসাধনার ভিতরে যে অপূর্ব্ব রহস্যময়ত্ব (mysticism) পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে, তাহাতে সর্ব্বত্রই কবির অনুসন্ধানের তীব্রতা, অনুভূতির প্রগাঢ়তা ও প্রকাশের অপ্রমেয়তা আমাদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। বোধ হয়, এই কারণেই অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন্ তাঁহার Philosophy of Rabindranath Tagore গ্রন্থের এক স্থানে লিখিয়াছেন—

> "It (Rabindranath's Poetry) is undoubtedly mystic, and on that account he should hold a permanent place in the firmament of world-poets."

২

রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনায় যে (mysticism) বা অধ্যাত্মবাদ বিকাশ লাভ করিয়াছে, তাহা একমাত্র প্রাচ্যেরই নিজস্ব সামগ্রী। "ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ"—ঈশোপনিষদের এই গভীর ভাব রবীন্দ্রনাথের সমাহিত অনুভূতিময় হৃদয়ে পরিপূর্ণভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে এবং ইহাই বিচিত্ররূপে কবির রঙ্গীন তুলিকাস্পর্শে চিত্রিত হইয়া উঠিয়াছে—তাঁহার প্রায় সমস্ত গান, কবিতা ও নাটকমালায়। এই অনুভূতির মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব-কবিত্বের প্রাণবস্তু নিহিত আছে, এই দিব্য দৃষ্টি লাভ করিয়াই তিনি কবি হইয়াও দার্শনিক।

> "তুমি যেন ওই আকাশ উদার,
> আমি যেন এই অসীম পাথার,
> আকুল করেছে মাঝখানে তার
> আনন্দ পূর্ণিমা।

তুমি প্রশান্ত চির নিশিদিন,
আমি অশান্ত বিরাম-বিহীন
চঞ্চল অনিবার;
যত দূর হেরি দিগ্‌দিগন্তে
তুমি আমি একাকার।"

এই একত্বের, এই পরিপূর্ণ মিলনের রাগিণী পাশ্চাত্যের জড় অন্তঃকরণ ভেদ করিয়া বাহির হয় নাই, হইতে পারেও না। কারণ, জড়বাদী প্রতীচ্যের নিকট এই বস্তুজগৎ ব্রহ্মের সহিত মিলনের অন্তরায়-স্বরূপ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ জগৎকে সীমার মাঝে অসীমের মিলনের সঙ্গীত শুনাইয়াছেন, তাই তিনি বিশ্বকবি। জীবনস্মৃতিতে আছে—"আমার কাব্য-রচনার একটিমাত্র পালা। সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে সীমার মধ্যে অসীমের সহিত মিলনসাধনের পালা।"

"সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর,
আমার মাঝে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।"

"সীমাকে লইয়াই অসীম, প্রেমকে লইয়াই মুক্তি। প্রেমের আলো যখন পাই, তখনই যেখানে চোখ মেলি, সেখানেই দেখি, সীমার মধ্যেও সীমা নাই।" এই সীমার মধ্যে অসীমের আভাসলাভ ও সর্ব্বত্র তাহার সূক্ষ্ম ইঙ্গিত—ইহাই রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমুদয় গান ও কবিতার একমাত্র ধ্বনি।

কখন কখন কবির রহস্যময় দেবতাটি পাশ কাটাইয়া লুকাইয়া চলিয়া যায়; আর কবি অধীর হইয়া ডাকিয়া উঠেন—"অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চলবে না।"

কবির মিলনকামী হৃদয় তাহার কোমল স্পর্শে ঘুমন্ত নিঝুম নিশীথে চমকিয়া জাগিয়া উঠে; ব্যথাকুল হইয়া বলে,—

"সে যে পাশে এসে ব'সে ছিল তবু জাগি নি,
কী ঘুম তোরে পেয়েছিল হতভাগিনি!"

সেই 'রহস্যময়' যে আসিয়াছিল, তাহার "মালার পরশ বুকে লাগেনি" সত্য, কিন্তু "গন্ধে তাহার দখিণ হাওয়া আকুল করিয়া" চলিয়া গিয়াছে, তাহা কি তৃষিত কবিহৃদয় বুঝিতে পারে নাই?

যখন "বিজন পথে করে না কেউ আসা-যাওয়া" তখন কবি 'হৃদয়-যমুনার' ঘাটে যে "অজনা বাজায় বীণা তরণিতে" তাহার সন্ধানে বাহির হইয়া যান।

কোন মেঘলা দিনে "একলা ঘরে চুপে চুপে" কবির সুরের রূপে যেন সে চলিয়া আসে।—

"আজি শ্রাবণ ঘন গহন মোহে, গোপন তব চরণ ফেলে,
নিশার মত নীরব ওহে সবার দিঠি এড়ায়ে এলে।"

শুধু কি তাই?—

"ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরাণ-সখা বন্ধু হে আমার।"

ঝড়ের ঘন গর্জ্জন ও প্রলয়-নৃত্যকে উপেক্ষা করিয়াও কবি-হৃদয় সেই রহস্যময় চিরসুন্দরের অভিসারে বাহির হইয়াছে।

সে কত দূরে কে জানে? কিন্তু কবি আজ সীমার বন্ধনে আর আপনাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারেন না।

"ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর, তুমি যে
বাজাও ব্যাকুল বাঁশরী;
মোর ডানা নাই আছি এক ঠাঁই,
সে কথা যে যাই পাশরি।"

সেই 'রহস্যময়ের' বংশীধ্বনি যাহার কাণে পশিয়াছে, সীমার বন্ধন কি আর তাহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে?

এই সকল 'মিষ্টিক' বা আধ্যাত্মিক কবিতার ভিতর দিয়া কবির অন্তর্জগতের বিরহভাব কি গভীরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহাদের মধ্যে তাঁহার অনুভূতিময় হৃদয়ের সপ্তস্বরা বীণায় যে রাগিণী বাজিয়া উঠিয়াছে, বিশ্বসাহিত্যে তাহা অপূর্ব্ব।

৩

শুনা যায়, বৈষ্ণব সাহিত্য হইতে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ভাবকুসুম চয়ন করিয়াছেন;—বৈষ্ণবের অধ্যাত্মবাদই রবীন্দ্র-কাব্যের মূল উৎস। বৈষ্ণব-কবির 'রাধাভাব' পারমার্থিক-রসানুভূতির চরম পরিণতি। আমরা দেখিতে পাই, রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও উহা গভীর ও ব্যাপক হইয়া সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে;—তিনি জলে-স্থলে, আকাশে-বাতাসে, ভবনে-বিজনে, আলোকে-ছায়ায় তাঁহার চিরসুন্দর প্রেমময়ের আভাস পান।

বৈষ্ণব কবি 'রসঘন বিগ্রহ' বলিয়াই তৃপ্তি পায়; কিন্তু এই ধরণীর প্রতি নরনারীর ভিতরে যে অন্তহীন প্রেম সান্ত আকারে দেখা দেয়, তাহা উপলব্ধি করিয়াই "বৈষ্ণব কবিতায়" রবীন্দ্রনাথের অধীর জিজ্ঞাসা;—

"শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান,
পূর্ব্ব-রাগ, অনুরাগ, মান, অভিমান,
অভিসার প্রেমলীলা বিরহ মিলন?"

তাহা ত নহে।—

"আমাদের কুটীর-প্রাঙ্গণে
ফুটে পুষ্প; কেহ দেয় দেবতা-চরণে,
কেহ রাখে প্রিয়জন তরে, তাহে তাঁর
নাহি অসন্তোষ। এই প্রেম-গীতি-হার
গাঁথা হয় নরনারী-মিলন-মেলায়,
কেহ দেয় তাঁরে; কেহ বঁধুর গলায়;

দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয় জনে ; প্রিয় জনে যাহা দিতে পাই,
তাহা দিই দেবতারে ;—আর পাব কোথা ?
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।"

এখানে দেখিতে পাই, কবির প্রেমিক হৃদয় বহুকালের প্রাচীন সংস্কার ছিন্ন করিয়া কি সহজ প্রেমে বিশ্বের দ্বারে দ্বারে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। যে বিশ্ব-আত্মার মিলনের জন্য বিশ্ব-প্রকৃতি চির-বিরহিণী, বিপুল নরনারীর বিচিত্র প্রেম-লীলার ভিতর দিয়া কি তাহাদেরই অনন্ত প্রেমের ফল্গুধারা বহিয়া চলে নাই ?

৪

এই ভাবে কবিকে বুঝিতে হইলে,—তাঁহার কাব্যের অন্তর্গূঢ় 'রহস্যময়তা' ভেদ করিতে হইলে, প্রথমেই কবির অন্তরের অপরূপ কর্ষণার (culture) স্বরূপকে বুঝিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্যসাধনার ভিতর দিয়া তাঁহার প্রাণের গভীর সাধনার বিচিত্র ধারা বহিয়া চলিয়াছে। এই সাধনার মূল প্রবাহটিকে ধরিতে না পারিলে, তাঁহার কাব্যের মর্ম্মদেশে প্রবেশ করা দুরূহ। অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন্‌এর ভাষায়—

"To catch sight of the philosophical ideal, we require meditation and mysitc insight."

রবীন্দ্রনাথের এক একটি কবিতার গভীর ভাব বুঝিতে গিয়া মনকে যতই প্রসারিত করা যায়, ততই যেন মনের ধারণাশক্তি উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলে, এবং সমাধি (meditation) ও অধ্যাত্মদৃষ্টির (mystic insight) সাহায্যেই তাহার স্বরূপ-তত্ত্বের উপলব্ধি হয়।

কিন্তু তাঁহার রহস্যাচ্ছন্ন কবিতাগুলির কোনও আভিধানিক ব্যাখ্যা চলে না। করিতে বসিলে ইহাদের অপরূপ সৌন্দর্য্যের পাপ্‌ড়িগুলিকে ছিঁড়িয়া ধূলায় নিক্ষেপ করা হয়। এই কবিতা-গুলির প্রত্যেকের এক একটি অখণ্ড অনবদ্য রূপ আছে,—যাহা কবির অন্তরের ভাবরসে রূপায়িত হইয়া উঠে ; সুতরাং এগুলি বুঝিতে হয় অন্তরের অনুভূতি দিয়াই।

পৃথিবীর মধ্যে এমন একটা স্থান আছে, যেখানে বিচার-বিশ্লেষণ চলেই না—যেখানে শুধু আভাস ইঙ্গিত—গান ও সুর। এই গান ও সুর রবীন্দ্রনাথের কাব্যরাজিকে ছাইয়া আছে। কারণ, তিনি সর্ব্বোচ্চ গীতি-কবি। গান কোন interpretation-এর বস্তু নহে ; ব্যাকরণ ও অভিধানের পাণ্ডিত্যে ইহার বিচার-ব্যাখ্যা চলে না। কিন্তু ইহার ভিতর দিয়াই—

"পাষাণ টুটে' ব্যাকুল বেগে ধেয়ে
বহিয়ে যায় সুরের সুরধুনী।"

সে কোথায় যায় ? যেখানে—

"দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে,
আমার সুর যেয়ে পায় তোমার চরণ
আমি পাই না খুঁজে তোমারে।"

কোন দার্শনিক গবেষণা বা ন্যায়ের ভাষ্য যেখানে পৌঁছিতে পারে না, সুরের কোমল ঝঙ্কার যাইয়া তাহাকেই স্পর্শ করে।

"মন দিয়ে যার নাগাল নাহি পাই
গান দিয়ে সেই চরণ ছুঁয়ে যাই,
সুরের ঘোরে আপনাকে যাই ভুলে।"

সুতরাং সীমার মাঝে অসীমের যে সুর অনাহত ধ্বনিতে নিয়ত বাজিয়া চলিয়াছে, তাহাই চিত্ত-বীণার তারে তারে অনু-রণিত হইয়া উঠা চাই। "যেখানে বিশ্ব-বাউলের একতারার ঝঙ্কার পথের বাঁকে বাঁকে বেজে বেজে ওঠে, মানুষের ভিতরকার বৈরাগীও আপন কাব্যে, গানে ও ছবিতে তারি জবাব দিতে দিতে পথে চলে, তেমনিতরোই গানের, নাচের, রূপের, রসের ভঙ্গিতে। বিষয়ী লোক আপন খাতাঞ্চি-খানায় ব'সে যখন শোনে, তখন অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করে—বিষয়টা কি ? এতে মুনাফা কি আছে ? এতে কি প্রমাণ করে ? অ-ধরকে ধরবার জায়গা সে খুঁজে তার মুখ-বাঁধা থলিতে, তার চামড়া-বাঁধানো খাতায়। নিজের মনটা যখন বৈরাগী হয়নি, তখন বিশ্ব-বৈরাগীর বাণী কোন কাজে লাগে না।" (পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি)

কোন কোন সমালোচক রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে প্রথম শ্রেণীর বলিয়া স্বীকার করিতে সম্মত হন না। কারণ, তাঁহার কবিতা-গুলি "full of metaphisics and mysticism." অনেকটা ইহাদের লক্ষ্য করিয়াই কবি শেষ জীবনে দুঃখ করিয়া গাহিয়াছেন—

"আনমনা গো আনমনা
তোমার কাছে আমার বাণীর
মালাখানি আনব না।
বার্ত্তা আমার ব্যর্থ হবে,
সত্য আমার বুঝবে কবে,
তোমারো মন জানব না।
আনমনা গো আনমনা।"

শ্রীবিশ্বনাথ কাব্যবিনোদ।

পরের মেয়ে

১

বড় রাস্তার ধারে প্রকাণ্ড বাড়ী। বাড়ীখানির স্তরে স্তরে নানা দেশের নানা জাতির লোক একটি বা দুইটি ঘর লইয়া আপন আপন জাতি ও সমাজগত বৈশিষ্ট্য লইয়া বাস করিত। তাই ইহার আশে-পাশে যে দুই এক ঘর বাঙ্গালী বাসিন্দা ছিলেন, তাঁহারা এই বাড়ীটির নাম দিয়াছিলেন—"নিখিল জাতি-সম্মিলন প্রাসাদ।"

এই বাড়ীখানির দ্বিতীয় স্তরের ঘরগুলি লইয়া বাস করিতেন—হাইকোর্টের মাঝারি রকম নাম-করা উকীল বিভূতি বাবু।

পূরা একটি তলায় আপনার আধিপত্য বজায় রাখিতে বিভূতি বাবুকে যে মোটা টাকা মাসে মাসে বাড়ীওয়ালাকে দিতে হইত, তাহার পরিমাণ নিতান্ত কম ছিল না। প্রতি মাসের প্রথমে ভাড়ার জন্য উপার্জ্জনের প্রায় অর্দ্ধেক টাকাই বাড়ীওয়ালাকে গণিয়া দিয়া কয়েক দিন ধরিয়া বিভূতি বাবুর মনটা যেন মুষড়াইয়া থাকিত। যত দিন আবার সেই পরিমাণ টাকা না সঞ্চয় করিতে পারিতেন, তত দিন বন্ধু-বান্ধবরা অল্প আলাপেই তাঁহার এই ব্যথার পরিচয় পাইত।

সে দিন রবিবার। রবিবারে সকালবেলাটা ছিল বিভূতি বাবুর বন্ধুদের সহিত দেখাশুনা আর আলাপ-পরিচয়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট।

আজ বন্ধু বিপিন অনেক দিনের পর আসিয়াছেন। তাই বেশ আনন্দে সুখ-দুঃখ ভাল-মন্দের গল্পে তিনি মগ্ন হইয়া গিয়াছেন। বিপিন তাঁহার ছেলেবেলার বন্ধু। দীর্ঘকাল একসঙ্গে অধ্যয়নের পর বিপিন অর্থের অনাটনে পড়া ছাড়িয়া চাকরী লইতে বাধ্য হইয়া পড়েন। বহু চেষ্টায় এক সদাগরী আপিসে চল্লিশটি টাকায় ঢুকিয়া আজ সে মাহিনা আশীতে উঠিয়াছে। বিপিনের ভাগ্যবলে, সাত পুরুষের পরিত্যক্ত একখানি জরাজীর্ণ বাড়ী হাত পাঁচেক চওড়া একটা গলির মধ্যে, আস্তাকুঁড়ের পাশে, তাঁহাকে আশ্রয় দিবার জন্য আজও কোনও মতে দাঁড়াইয়া আছে। তাই এই মাহিনায় গুটি পাঁচ ছেলে-মেয়ে লইয়া কোনমতে তিনি জীবন যাপন করিতেছেন।

উপস্থিত দুই বন্ধুতে বর্ত্তমান দেশ-জোড়া দৈন্য লইয়া আলোচনা করিতেছিলেন।

বিভূতি বাবু বলিতেছিলেন—"দেখ বিপিন, দিন দিন দেশের ভীষণ অবস্থা দাঁড়াচ্ছে। তোমার তবু মাথা গুঁজে দাঁড়াবার যায়গা একটু আছে; কিন্তু এই সহরের অর্দ্ধেক লোকের তাও নেই। এই বাজারে যাদের অল্প আয়, তারা পেটে খাবে, না বাড়ীর ভাড়া দেবে? আমাদের সব ভরসাই ত এই পরের হাতে। মক্কেল দিন দিন ত বাড়ছে না। খরচ কিন্তু বেড়েই চলেছে।"

বিপিন উত্তর দিলেন, "তা বটে ভাই, আমার ঐ ভাঙ্গা বাড়ীটুকু না থাকলে আজ কি যে করতুম! এই বাজার, তুমি খরচ একটু কমাতে চেষ্টা কর, বিভূতি! শুধু শুধু একটা তলা রাখবার তোমার কি দরকার? লোক ত তোমার ঐ একটি ছেলে কনক আর তোমরা দুজন, তার জন্য এত ঘর কি দরকার? মাস গেলে আড়াই শো টাকা ভাড়া, এ কি সোজা কথা?"

বিভূতি বাবু আক্ষেপের স্বরে বলিলেন,—"আরে ভাই, সাধে কি আর এতগুলা টাকা মাস মাস নষ্ট করি? আজকাল লোকগুলা ত আমাদের বিদ্যে-বুদ্ধি দেখে বিচার করে না, বিচার করে যার যত বড় বাড়ী, আর যত বেশী গাড়ী আছে, তাই নিয়ে। কাযেই পেটে না খেয়েও একটা বাড়ী চাই। আর আজকাল এই সব বড় বড় ম্যানশনের জ্বালায় বড় রাস্তার ধারে ছোট বাড়ী পাওয়াই যায় না। কাযেই রাস্তার ওপর বাস করতে চাইলে এই রকম ম্যানশন না হলে উপায় নেই। আবার ছত্রিশ দেশের ছত্রিশ জাতের সঙ্গে পাশাপাশি বাস করাও কঠিন, লোকেও নিন্দে করে। তাই একটা তলা না রেখে কি করি বল?"

বিপিন একটু চুপ করিয়া রহিলেন, তার পর বলিলেন—"আচ্ছা, তেমন চেনা জানা কোন বাঙ্গালী ভদ্রলোককে দু একখান ঘর ভাড়া দিলেই ত পার। ঘরের মত থাকবে, তোমার মক্কেলরাও বুঝতে পারবে না।"

বিভূতি বাবু হতাশভাবে বলিলেন—"তেমন পাই কোথায় হে! তার পর ভাড়া দিলেই যে সময়মত ভাড়া আদায় করতে পারবো, যে রকম দিনকাল পড়েছে, তা ত মনে হয় না। অল্প আয়ের লোকের কাছে নিয়মমত ভাড়া আদায় করা কঠিন। নেহাৎ কসাই না হলে পারা যায় না। তাই ত বলছি হে, এই সব বাড়ীওয়ালারা আলাদা রক্তমাংসে তৈরী। এদের পরিচয় তুমি জান না। সে দিন আমাদেরই এই ম্যানশনে এমন একটা কাণ্ড হয়েছে—যা নাকি চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন।"

বিপিন সবিস্ময়ে বলিলেন, "কি রকম?"

বিভূতি বলিলেন, "আমাদের তেতলায় একটি মাদ্রাজী ভদ্রলোক থাকতেন। বছর চারেক নাকি ছিলেন এ বাড়ীতে। ভদ্রলোক খুব বিদ্বান্ ছিলেন। ইংরাজী কাগজে নানা রকম লিখে, অনেক ব্যবসাদারদের প্রস্পেক্টাস্ লিখে দিয়ে তাঁর খরচ চলতো। লোক ছিল তাঁর একটি বছর পাঁচেকের ছেলে আর স্ত্রী। তেতলায় দুখানি ঘর নিয়ে ছিলেন। ভাড়া দিতেন চল্লিশ টাকা। মাস তিনেক আগে ভদ্রলোকটির টাইফয়েড জ্বর হয়, আমরা সকলেই শুনেছিলুম। কিন্তু যে যার কাযে ব্যস্ত, কেউ আর খোঁজ রাখিনি। কিছু দিন পরে শুনেছিলুম, তিনি ভাল হয়ে উঠছেন। তাঁর এক ডাক্তার বন্ধুই তাঁকে দেখছেন। সামান্য একটু জ্বর হয় বিকেলে। এমন সময় হঠাৎ এক দিন কোর্ট থেকে এসে শুনি কি যে, বাড়ীওয়ালা নাকি দু'মাসের ভাড়া পায় নি ব'লে এরি মধ্যে চুপি চুপি নালিশ ক'রে একেবারে সিল বার ক'রে সে দিন দুপুরে এসে ঘটি-বাটি ধ'রে টানাটানি আরম্ভ করতেই হঠাৎ দুর্ব্বল মাথায় ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি উঠতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন, এতটা উত্তেজনা সামলাতে পাবেন নি।"

বিপিন আশ্চর্য্য কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"কি ভয়ানক, তার পর?"

বিভূতি বাবু বলিলেন—"তার পর আর কি, ভদ্রলোকের স্ত্রী চেঁচিয়ে কেঁদে উঠেছেন। দুপুরবেলা প্রায় সবাই কাযে যায়। যে দু'এক জন ছিলেন, তাঁরা ছুটে যান। ব্যাপার দেখে ত সবাই অবাক্। কনকের মা কনকের মুখে শুনে আর না থাকতে পেরে সকলের সামনেই ওদের ঘরে গিয়ে যারা বাড়ীর অন্য ভাড়াটে ছিল, তাদের বলেছেন যে, 'ও লোকগুলাকে বাইরে যেতে বলুন, ওদের কত টাকা দিতে হবে, জিজ্ঞাসা ক'রে বলুন, আমি এখনই এনে দিচ্ছি, আর আপনারা কেউ যান, শীগ্‌গীর এক জন ডাক্তার আমুন।' তখন এক জন যান ডাক্তার আনতে, আর এক জন তাদের কাছে গিয়ে বলে ডিক্রীর কাগজ দেখাতে। তারা কাগজ দেখায় খরচ শুদ্ধ দু'মাসের ভাড়া ৯৭ টাকার ডিক্রী। কনকের মা টাকাটা এনে দেন। তারা চ'লে যায়। কিন্তু ডাক্তার এসেও ভদ্রলোকের জ্ঞান হয় নি। সন্ধ্যার পর আমরা সবাই এসে শুনে অনেক চেষ্টা করলুম, বড় ডাক্তার আনলুম, কিন্তু কিছুই হ'ল না। শেষ রাত্রে ভদ্রলোক মারা গেলেন।"

বিপিন আতঙ্কিত-কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "তাই ত, এ যে কল্পনাও করা যায় না। তার পর ভদ্রলোকের ছেলেটির আর স্ত্রীর তোমরা কি ব্যবস্থা করলে?"

বিভূতি বাবু বলিলেন,—'কি আর করবো, সবাই মিলে কিছু কিছু দিয়ে তাঁকে দেশে পাঠালুম। দেশেও নাকি তেমন কেউ নেই। একটি ভাই আছে, তার অবস্থাও ভাল নয়।"

বিপিন কি বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় দশ বৎসরের সুন্দর বালক কনক আসিয়া বলিল, "বাবা, মা বল্লেন, বেলা হয়েছে, বিপিন কাকাকে খেয়ে যেতে বলুন।"

বিভূতি বাবু উত্তর দিবার আগেই বিপিন কনককে কাছে টানিয়া বলিলেন, "না রে কনক, আজ নয়। বাড়ীতে ব'লে আসিনি। সব ভাববে। আসছে রবিবার এসে তোর মা'র রান্না খেয়ে আর তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে যাব। যে পরিচয় তাঁর পেলুম, এই স্বার্থের সংসারে তা যে দুর্লভ।"

কনক কিছুই বুঝিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিল। বিভূতি বাবু হাসি-মুখে বলিলেন, "দেখ হে, অতটা বাড়িয়ে দিয়ে আমার মাথা খেও না। শেষটা দু'হাতে দান আরম্ভ করলেই আমি গেছি আর কি। প্রশংসার লোভটা ত মানুষের কম নয়।"

বিপিন কনককে ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন, "না হে, ভয় নেই, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার লক্ষ্মীই ভ'রে রাখবেন, তোমার ভাবনা নেই। যাক, দেখ, যদি তুমি দু'খানা ঘর ভাড়া দাও ত খুব ভাল লোক আছে আমার জানা। দুই স্বামী স্ত্রী, আর একটি ছোট মেয়ে, আমাদের আপিসেই কায করে। ঢাকা জেলায় বাড়ী। আমাদের চেয়ে কিছু ছোট। স্ত্রীকে আনতে চায়, অথচ অল্প আয়, একটা বাড়ী নিতে পারে না, আবার পাঁচ জনের সঙ্গে একলা বউটিকে রাখতেও চায় না। তোমার এখানে ঘর পেলে সে বেঁচে যায়, বউটিকে নিয়ে আসে। যদি তোমার মত হয়, আমায় খবর দিও। তোমার কাছে তাকে পাঠিয়ে দেব।"

বিভূতি বাবু বলিলেন,—"বেশ ত, যদি কনকের মা'র মত হয়, তা হ'লে কাল কোর্ট থেকে আসবার সময় তোমাকে ব'লে আসবো।"

বিপিন কনককে একটু আদর করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। বিভূতি বাবু কনককে লইয়া ভিতরে চলিলেন।

২

সে দিন বিভূতি বাবুর সহিত বিপিনের কথা হইবার পর দুই মাস চলিয়া গিয়াছে। কনকের মা অন্নপূর্ণা বিভূতি বাবুর নিকট শুনিয়া বিপিনের চেনা অখিলকে দুইখানি ঘর দিয়া রাখিতে রাজি হইয়াছিলেন।

এত বড় বাড়ীতে সারাটা দিন সঙ্গিহীনভাবে কাটান তাঁহার পক্ষে খুব কষ্টকর ছিল। জনবহুল বাড়ী, কর্ম্মচঞ্চল পথিকের শব্দমুখর পথ চলার অবিরাম গতি, সবই যেন চলচ্চিত্রের ছবির

মত দৃষ্টির পর্দায় ছায়া ফেলিয়া সরিয়া যাইত। অগণিত জন-সমাবোহের মধ্যেও মন তাঁহার নির্জ্জনতার ভারে আকুল হইয়া উঠিত। তাই অখিলের স্ত্রী-কন্যার কথা শুনিয়া তিনি অখিলের অপেক্ষা বেশী ব্যগ্র হইয়া ৭ দিনের মধ্যেই অখিলের স্ত্রী প্রভা আর বছর ছয়ের মেয়ে কুন্তলাকে আনাইয়া ভিতরের দুইখানি ঘরে তাহাদের প্রবাসের গৃহস্থালী গুছাইয়া দিয়াছিলেন। আত্মীয়স্বজনবিরহিতা মমতাময়ী নারী যেন আপনার অন্তরের মায়াজালখানিতে ইহাদের ছাইয়া ফেলিতে চাহিয়া আপনাদের স্বজন-শূন্যতার অভাব মিটাইতেছিলেন।

অখিলের মেয়ে কুন্তলা এই দুই মাসেই যেন তাঁহার নয়নের মণি হইয়া পড়িয়াছিল। বহু দিনের কন্যা-কামনার নিষ্ফলতা তিনি এই সুন্দর মেয়েটিকে স্নেহে ভরাইয়া দিয়া যেন ভুলিতে চাহিতেছিলেন।

কুন্তলার মা প্রভা ছিল অতি নিরীহপ্রকৃতি, শান্ত-স্বভাবা, শাসন-সঙ্কুচিতা পল্লীবধূ। শ্বশুর-গৃহের বয়োজ্যেষ্ঠাদের অকারণ পীড়নের আবেষ্টন হইতে সদ্যোমুক্তা এই মেয়েটি অন্নপূর্ণার স্নিগ্ধ স্নেহের উৎসে স্নান করিয়া যেন জুড়াইয়া গিয়াছিল। আপনাকে সে সম্পূর্ণভাবে এই মমতাময়ীর মহৎ মনের উন্নত আশ্রয়ে ছাড়িয়া দিয়াছিল। যে শিক্ষায় প্রভা এতটা বয়স কাটাইয়াছে, তাহার অভিজ্ঞতায় সে শুধু জানে, মানুষ সংসারে একই পরিবারে বাস করিয়া অতি নিকট-সম্পর্কে বদ্ধ থাকিলেও তুচ্ছাতিতুচ্ছ স্বার্থ লইয়া সংগ্রাম করিতে এতটুকু কুণ্ঠা বোধ করে না। প্রতিদিন যাহাদের নয়নে দৃষ্টি মিলাইয়া সংসারে বেড়াইতে হইবে, সামান্য প্রয়োজনে মানুষ তাহাদের বিরুদ্ধে কত কিই যে করিতে পারে, তাহার হিসাব প্রভা কোনও দিন ঠিক করিতে পারে নাই। এখানে আসিয়া তাহার সেই সীমাবদ্ধ শিক্ষা অন্নপূর্ণার অসীম মমতার নিঃস্বার্থ বিতরণ দেখিয়া বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল। শ্রদ্ধায় ভক্তিতে মন তাহার এই অনুপমা নারীর চরণপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িয়াছিল।

কুন্তলাকে সে অসঙ্কোচে অন্নপূর্ণার হাতে ছাড়িয়া দিয়াছিল। সে বুঝিয়াছিল, এমন মনের মায়ার প্রভাবে কন্যাকে গড়িয়া তুলিতে পারিলে, কুন্তলার জীবন সার্থক হইয়া যাইবে।

সে দিন অপরাহ্ণে বিভূতি বাবু কোর্ট হইতে ফিরিয়া জল-যোগের পর একখানি আরাম-চেয়ারে বিশ্রাম করিতেছেন, পাশে মেঝেয় একখানি জাপানী ফুল-পাতা আঁকা মাদুরে অন্নপূর্ণা বসিয়া আছেন। উভয়ের মুখেই একটি স্নিগ্ধ তৃপ্তির দীপ্তি। বিভূতি বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ তোমার কুন্তী আর কনককে যে দেখছি না ?"

অন্নপূর্ণা প্রসন্ন-মুখে উত্তর দিলেন,—"তারা আজ অখিল ঠাকুরপোর সঙ্গে মাঠে খেলা দেখতে গেছে। অখিল ঠাকুরপো ত কুন্তীকে কিছুতেই নেবে না। বলে, ও মেয়েমানুষ, ও আবার খেলা দেখবে কেন ? কনকও শুনবে না। বলে, 'বা রে, মেয়েমানুষ বুঝি মানুষ নয়, তাই তার অর্দ্ধেক জিনিষ দেখতে নেই !' এমন দুষ্ট ছেলে, বলে কি, আচ্ছা কাকা বাবু, মেয়েরা যদি অর্দ্ধেক মানুষই হয়, কেন না তাদের অর্দ্ধেক কায ত কর্ত্তে নেই ! তবে মেয়েমানুষকে খুন করলে জজ সাহেবরা খুনীকে অর্দ্ধেক ফাঁসী কেন দেন না ?"

বিভূতি বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"ছেলেটা কার. বুদ্ধি হবে না ?"

অন্নপূর্ণাও হাসিয়া উত্তর দিলেন,—"আহা, কি বুদ্ধি রে, যত দুষ্ট বুদ্ধি, উকীলের ছেলে কি না !"

বিভূতি বাবু উত্তর দিলেন,—"দুষ্ট বুদ্ধিই ত আজকাল চাই। জান না, ভাল মানুষের ভাল নেই এখন ? যাক্, কুন্তীটা কি করছিল, যখন অখিল নিতে চাইছিল না ?"

অন্নপূর্ণা বলিলেন,—"কি আর করবে, বেচারা একবার ক'রে অখিলের দিকে চায়, একবার ক'রে কনকের দিকে চায়। যখন দেখলে, কনকই জিতলো, তখন গম্ভীর-মুখে তার হাত ধ'রে চলতে লাগলো ."

বিভূতি বাবু বলিলেন,—"ভারী শান্ত মেয়েটি. ও এসে কনক ভারী খুসী হয়েছে। একা একা ঘুরে বেড়াতো।"

অন্নপূর্ণা বলিলেন,—"তুমি ত তবু সারাদিন কনকের রকম দেখ না। কুন্তলাকে পেয়ে মস্ত মাতব্বর হয়েছেন, সারাদিন ভারিক্কী চালে এটা দেখাচ্ছেন, ওটা বোঝাচ্ছেন, যেন কতই পণ্ডিত উনি। কুন্তলা যখন মাঝে মাঝে বলে, তাই ত কনকদা, তুমি ভাই এত কি ক'রে শিখলে ? তখন সে কি মদগর্ব্বে বলে, 'ওরে, এ সব বুদ্ধির কায, সবাই কি পারে ?' আড়াল থেকে দেখে আমি আর প্রভা হেসে বাঁচি না। যাই বল, ওরা এসে অবধি যেন হেসে আর কথা কয়ে বাঁচছি। তুমি থাক দিন-রাত তোমার কায নিয়ে, যেটুকু সময় পাও, নাওয়া খাওয়া ঘুমেই কেটে যায়। আমার যেন সময় আর ফুরুতে চাইতো না। দুটি লোকের সংসার, কতটুকুই বা কায ! সারাদিনটা তাই চুপ-চাপ, প্রাণ যেন হাঁপিয়ে পড়তো। স্কুল থেকে এসে কনকেরও সেই দশা। মা ছেলে আর কতক্ষণ গল্প করা যায়। ও হ'ল ছেলেমানুষ, ওর মন খেলার দিকে। কুন্তী আর প্রভা এসে যেন বেঁচেছি। ওরা আবার বাড়ী যাবে, এটা ভাবতেও যেন ভয় করে। প্রভা

ত বলে, নেহাৎ দরকার না হলে আর ওরা যাবে না। হাজার হলেও দেশ আছে, চিরদিন কি আর থাকবে!"

বিভূতি বাবু বলিলেন,—"ভবিষ্যতের ভাবনা ভবিষ্যতে হবে, এখন তার জন্যে ভয় করা ভাল নয়। ওরা গেলেও কুন্তীটাকে কেড়ে রাখবো।"

অন্নপূর্ণা বলিলেন,—"সবাই ওরা এমন ভাল যে, পর ব'লে মনে করতেও লজ্জা হয়। মাস মাস ভাড়া দিয়ে আমাদের ওরা এখানে আছে, এটা আমার এমন খারাপ লাগে।"

বিভূতি বাবু বলিলেন,—"দেখ, তা জানি, কিন্তু ভাড়াটা না নিলে যেন ওদের ছোট করা হয় না কি? সর্ব্বদাই ওদের মনে কুণ্ঠা হবে, আমরা অমনি আছি। সেটা থাকলে মন থেকে সত্যিকার মায়া আসে না। তাই তুমি জান, ওরা যে ভাড়ার টাকা আমায় দেবে, সেটা কুন্তীর নামে জমা রাখবো ব'লে ছ'মাসের ভাড়ার টাকায় ব্যাঙ্কে একটা হিসেব খুলেছি। প্রতি মাসেই ওদের ভাড়ার টাকা জমা দেব। অখিল অল্প মাইনে পায়, জমাতে ত কিছু পারে না। থাক না এটা জমা, ওদের অসময়ে দরকার হলে কাযে লাগবে।"

অন্নপূর্ণা বলিলেন,—"আহা, অল্প মাইনে, ভাড়ার টাকাকটা ওরা এক রকম কিছু ভাল-মন্দ খাওয়া বন্ধ ক'রে আমাদের দেয়। ঐ ত মাইনে, কুড়ি টাকা ওর থেকে গেলে কি থাকে বল?"

বিভূতি বাবু হাসিয়া বলিলেন,—"অন্নপূর্ণা উপস্থিত থাকতে খাবার কষ্ট যে কেউ পাবে না, এটা জানি। আমাদের সংসারে ত ভাল জিনিষের অভাব নেই। সেটা যে ওদের পাতেও বাদ পড়ে না, এ খবরটা আমি রাখি গো! আর কিছু যদি দরকার হয়, গৃহলক্ষ্মীই তা পূর্ণ করবেন।"

অন্নপূর্ণা কি বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় বাহিরে কনকের কণ্ঠ শোনা গেল। সে বলিতেছে, "জানেন কাকীমা, কুন্তীটা কোনও কাযের নয়। অত লোক দেখে একেবারে কেঁদে ফেল্লে। অত ক'রে নিয়ে গিয়ে শেষটায় মরি কাকা বাবুর কাছে বকুনী খেয়ে।"

অন্নপূর্ণার আর কিছুই বলা হইল না। তিনি হাসিতে হাসিতে উঠিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

৩

কুন্তলারা কনকদের বাড়ী আসিবার পর নিরবচ্ছিন্ন শান্তি আর আনন্দের মধ্যে ছয়টি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, দশ বৎসরের কনক এখন ষোড়শবর্ষীয় কোমলকান্তি কিশোর। ছয় বৎসরের কুন্তলা আজ পরিপুষ্ট পদ্মকলির মত সঞ্চিত সৌন্দর্য্যের পূর্ব্বাভাসে মধুময়ী বালিকা। কনকের পিতা-মাতার স্নেহে সে ধনীর দুলালীর মতই শিক্ষায়, সৌন্দর্য্যে মনোহারিণী হইয়া উঠিয়াছিল।

বৈশাখের উত্তপ্ত বেলা। কুন্তলা রাস্তার ধারে একটি ঘরে জানালার কাছে দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে জলভরা নয়নে চাহিয়াছিল। বাহিরে কনকের স্বর শুনিয়া সে মুখ ফিরাইয়া দেখিল, কনক আনন্দসমুজ্জল মুখে ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে বলিতেছে,—"মা কোথায় রে, কুন্তী? তোর চোখে জল কেন? শোন শোন, এমন খবর দেব যে, কান্না-টান্না কোথায় পালাবে। বুঝলি? আমি পাশ করেছি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাবা, য়ুনিভারসিটীর প্রথম হয়ে, তোমার মতন কেঁদে ককিয়ে ক্লাশে ওঠা নয়, বুঝলে? মাস মাস টাকা পাব।"

কুন্তলার জলভরা চোখে তখনই হাসির বিদ্যুৎ ভাসিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল,—"সত্যি কনকদা! তুমি য়ুনিভারসিটীর প্রথম হয়েছ?"

কনক ব্যস্তভাবে বলিল,—"হ্যাঁ রে হ্যাঁ, মা কোথায়, তোর চোখে জল কেন?"

কুন্তলার মুখ আবার ম্লান হইয়া উঠিল। সে বিষন্ন-কণ্ঠে বলিল, "বাবার আপিসে আমাদের দেশ থেকে জ্যাঠামশাই টেলিগ্রাম করেছেন, আমার ঠাকুমা মর-মর, আমাদের আজই যেতে হবে।"

কনক জানালার উপর বসিয়া পড়িয়া বলিতে লাগিল, "বা রে —যেতে হবে! তোদের আবার আলাদা একটা দেশ আছে, এ যেন এত দিন মনেই ছিল না। এমন দিনটাই মাটী হয়ে গেল। আমি যার এরই মধ্যে কত প্লান ক'রে ফেলেছি, কি ক'রে সবাই মিলে এই পাশ করার আনন্দটা ভোগ করবো। আজই কি না ওর ঠাকুমা মর-মর, যেতে হবে। আরে বাবা, তুমি কি এমন বুড়ো গিন্নী হয়েছ যে, তোমার না গেলেই চলবে না? যান না কেন কাকা বাবু আর কাকীমা, তুই থাক্ না।"

কুন্তলা কুণ্ঠিতভাবে বলিল,—'রাগ কচ্ছ কেন, কনকদা! আমারই কি যাবার ইচ্ছে? বড়মা বাবাকে বলেছিলেন, তা তিনি রাজী হলেন না, বল্লেন, আমি এখানে থাকলে দেশে যে পিসীমা আর জ্যেঠামশাই আছেন, তাঁরা রাগ করবেন।"

কনক মুখটা বিকৃত করিয়া বলিল, "ইস, রাগ করবেন, ভারী ত—আচ্ছা আপদ ত, সব মাটী—"

কনকের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই অন্নপূর্ণা ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি মাটী রে, ফেল করেছিস না কি?"

কনক উত্তর দিল,—"না মা, খুব ভাল করেই পাশ করেছি। য়ুনিভারসিটীর প্রথম হয়েছি।"

অন্নপূর্ণা বলিলেন,—"তবে কি তোর মাটী হ'ল রে?"

মায়ের এমন ক্লান্ত কণ্ঠ, বিষণ্ণ মুখ! কনক সবিস্ময়ে তাঁহার দিকে চাহিল। কুন্তলার বিচ্ছেদব্যথার সম্ভাবনাই যে মাকে এমন রূপান্তরিত করিয়াছে, ইহা বুঝিতে কনকের বিলম্ব হইল না। সে তাড়াতাড়ি বলিল,—"কুন্তীরা নাকি আজ চ'লে যাচ্ছে? তাই বলছিলুম, এত আনন্দ আজ সব মাটী হ'ল। আচ্ছা মা! কুন্তী থাক না, ও সেখানে গিয়ে কিই বা করবে? যা মায়া ওর বুড়ী ঠাকুমার ওপর! হয় ত বুড়ীকে মনেই নেই।"

অন্নপূর্ণা একটু ম্লান হাসিয়া বলিলেন,—"তা কি হয় রে, পাগল! কুন্তী ত আর সত্যিই আমাদের আপন কেউ নয়।"

কথা কয়টি বলিয়া তিনি কুন্তলাকে টানিয়া বুকের কাছে আনিয়া বলিলেন, "আয় মা, চুলটা তোর আজও বেঁধে দিই। আর কোনও দিন দিতে পারবো কি না, কে জানে।"

গোপন অশ্রু কুন্তলার মাথায় নীরব আশীর্ব্বাদের মত ঝরিয়া পড়িল। কুন্তলা দুই হাতে অন্নপূর্ণাকে জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রু-ছলছল-নেত্রে বলিতে লাগিল, "কাঁদছ কেন, বড়-মা? আবার ত আমি আসবো।"

অন্নপূর্ণা মুখে কুন্তলাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন,—"হ্যাঁ মা, আসবে বৈ কি।"

কিন্তু মনে মনে তিনি জানিতেন, কুন্তলাকে এমন করিয়া আর তিনি পাইবেন না। বারো বছরের কুন্তলাকে কুমারী রাখার জন্য যে অভিযোগ অখিলের দেশ হইতে আসিতেছিল, দেশে গিয়া তাহার বেগ সহ্য করার মত শক্তি অখিলের বা প্রভার মনে ছিল না। কনকের সহিত বিবাহের সম্ভাবনা থাকিলে হয় ত তাহারা আরও বহুদিন কুন্তলাকে কুমারী রাখিতে পারিত। কিন্তু স্বজাতি হইলেও সগোত্র কনকের সহিত বিবাহ ত সম্ভব নহে, তাই তাহারা মাত্র অন্নপূর্ণার স্নেহের খাতিরে, তাঁহাদের অর্থের ভরসায়, সহরের সুন্দর শিক্ষিত পাত্রের অপেক্ষায় দেশের আপন জনের নির্ব্বাচিত পাত্রকে যে ফিরাইয়া দিতে পারিবে না, অন্নপূর্ণা তাহা বুঝিয়াছিলেন। তাই এই স্নেহ-পুত্তলীকে ছাড়িতে মন তাঁহার বেদনায় ভাঙ্গিয়া পড়িতে-ছিল। তবু ধরিয়া রাখিবার শক্তি নাই। সঙ্গিহীন দশ বৎসরের কনক আজ ছয় বৎসর ধরিয়া এই অকস্মাৎ পাওয়া কুন্তলাকে আপনার অন্তরের অনাবিল ভ্রাতৃস্নেহের অবারিত ধারায় অভি-ষিক্ত করিয়া দিয়াছিল। ছয় বৎসরের প্রতিদিনটি এই কোমলা বালিকার হাসি-কান্নায় ভরিয়াছিল। এত দিন কনকের নিকট যাহা অতি সুলভ ছিল, আজি হারাইবার আশঙ্কায় তাহা কত যে দুর্ল্লভ, তাহা কনকের জীবনের এই গৌরবময় দিনটির সকল আনন্দটুকু প্রথম বিচ্ছেদের কল্পনায় নিঃশেষ করিয়া দিয়া বুঝাইয়া দিল। কনকের প্রথম বেদনাতুর মন আপনার অন্তর দিয়া জননীর ব্যথা অনুভব করিয়া আকুল হইয়া উঠিল। সে বার বার ভাবিতে লাগিল, মাকে শান্ত করিবার পথ কোথায়? কুন্তলা যে সত্যই পর। কিন্তু হায়, কেন মানুষ পরের উপর এমন নিরুপায় মায়ায় জড়াইয়া পড়ে, আর কেনই বা মানুষ এই মায়াকে মানিতে চাহে না? কিশোর কনক ইহার কোনও উত্তর ভাবিয়া পাইল না। সে সেইখানেই বসিয়া রহিল। অন্নপূর্ণা কুন্তলাকে লইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

৪

কয় দিনের জন্য কুন্তলাকে কেন্দ্র করিয়া যাঁহার স্নেহ-উৎস হাসি আর তৃপ্তির উচ্ছল ধারায় সকলকে অভিষিক্ত করিয়া দিয়াছিল, কুন্তলা চলিয়া যাইবার পর সে পুণ্যপ্রবাহিণী নির্ঝরিণী চির-দিনের জন্য পৃথিবীর বুক হইতে শুকাইয়া গেল। মর্ম্মকাতরা অন্নপূর্ণা বুঝি অন্তরের অনুযোগ বিশ্ব-বিধাতার নিকট জানাইতে ব্যথাদীর্ণ বুকে, মাত্র চারি দিনের জ্বরে স্বামী আর সন্তানের সহস্র ব্যাকুলতা, অজস্র অর্থব্যয় ব্যর্থ করিয়া চলিয়া গেলেন।

নিঃশব্দ শোকের নিবিড় অন্ধকার কনকদের বাড়ীখানি ছাইয়া ফেলিল। অকস্মাৎ বজ্রাহত পিতা-পুত্র এই অতর্কিত সাংঘাতিক আঘাতে ভাষাহীন, অনুভবহীন, স্তম্ভিত হইয়া পড়িল।

বিভূতি বাবু প্রথম-যৌবনে আত্মীয়-সহায়শূন্য অবস্থায় যাহাকে ঘরে আনিয়া সকল সুখ-শান্তির ভার তাহার হাতে তুলিয়া দিয়া পরম নিশ্চিন্তমনে অর্থ উপার্জ্জনেই আপনার সকল কর্ত্তব্য শেষ করিয়া আসিতেছিলেন, এই সুদীর্ঘ দিন ধরিয়া সুমধুর সেবা আর সুধাস্নিগ্ধ সহানুভূতি লইয়া যে সকল সময় তাহাকে তৃপ্তি দিয়াছে, সেই কল্যাণময়ীর মঙ্গল হাত দুইখানি আপনার হাতে ভস্ম করিয়া ফিরিয়া বিভূতি বাবু যেন সহজ বুদ্ধি আপনার মধ্যে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছিলেন না। মাঝে মাঝে কনকের মৌন শোক আর সর্ব্বহারা দুঃখীর মত অসহায় দৃষ্টি তাঁহাকে যেন সচেতন করিয়া তুলিতেছিল।

মাতৃহারা কনক এখন যে শুধু তাঁহারই স্নেহাকাঙ্ক্ষী। পিতা চাহিতেন পুত্রকে সান্ত্বনা দিতে, নিজের দুঃখ গোপন করিতে। পুত্র চাহিত আপনার ব্যথা আবৃত করিয়া চিরদিন কর্ম্মপাগল, আত্মভোলা পিতাকে মায়ের সতর্ক সেবার অনুকরণে শান্তি দিতে।

এই কচি বয়সেই আপনাকে সংযত করিয়া আপনজনকে আশ্রয় দিবার এই মমতাময় প্রকৃতি কনক মায়ের নিকট হইতে পাইয়াছে ভাবিয়া বিভূতি বাবু মৃতার উদ্দেশে অন্তরের কৃতজ্ঞতা

জানাইয়া মনে মনে বলিতেন, 'তুমি তোমার সেবা, তোমার মায়া, আমার জন্যে, সংসারে সকলের জন্যে রেখে গেছ, যাকে তোমার বুকের রক্তে গ'ড়ে তুলেছ, তার বুকে।' এমনই করিয়া দীর্ঘ একটি মাস একটি বৎসরের মত মন্থর চরণে চলিয়া গেল। কর্ম্মহীন দিন, নিদ্রাহীন রাত্রি, স্তব্ধ নিঃশব্দপদে চলিয়া যায়, মনে হয়, সমস্ত জগতের সঙ্গে যেন এ বাড়ীর যোগ ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।

চিরচঞ্চল কনক যেন নূতন জীবনে নূতন অভিজ্ঞতায় বাড়িয়া উঠিল। মাকে হারাইয়া কনক সংসারে সকল আনন্দের পথ যেন হারাইয়া ফেলিল। মা কি শুধু কনকের জননীর আসন অধিকার করিয়াছিলেন? তিনি যে কনকের সুখ-দুঃখের সাথী, আশা-আকাঙ্ক্ষার উৎসাহদাত্রী, সংসারে সর্ব্বস্বই ছিলেন। পিতাকে কনক ভালবাসিত, ভয় করিত, সম্ভ্রম করিত। কিন্তু মা!—তিনি যে কনকের অন্তর্যামিনী ছিলেন। তরুণ জীবনের আশা উদ্দীপনা সকলই যে কনক মায়ের নিকট হইতেই সঞ্চয় করিয়া, কল্পনায় নূতন রূপ দিয়া আবার মায়ের কাছেই উজাড় করিত। মাকে হারাইয়া তাই কনক সর্ব্বহারা রিক্ত হইয়া আবার নূতন করিয়া আপনাকে গড়িয়া তুলিতে লাগিল।

কনক বুঝিত, শুধু তাহাকে লইয়াই মায়ের অসীম স্নেহ-ভাণ্ডার ফুরাইতে চাহিত না। তাই কুন্তলাকে তিনি অতৃপ্ত বক্ষে তুলিয়া লইয়াই সাধ মিটাইয়াছিলেন। কুন্তলাকে কাড়িয়া লইয়াই মাকে মারিয়া ফেলিল বলিয়া কনকের মন অখিলের উপর বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। দেশ হইতে ফিরিলে আর তাহাদের সহিত কোনও সম্বন্ধ রাখিবে না বলিয়া কনক মনে মনে স্থির করিল। কিন্তু হায়, এই কঠিনতার অন্তরালে শোকাতুর মন তাহার কুন্তলার স্নেহভরা প্রীতিস্নিগ্ধ স্পর্শটুকু পাইবার জন্য অতি কুণ্ঠিত কামনা জানাইতে ভুলিয়া গেল না।

৫

মাসখানেক পরে এক দিন অখিল একা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "প্রভা তাহাদের জন্মের মত ছাড়িয়া গিয়াছে।" তাহার পর আশ্চর্য্যরূপে পরিবর্ত্তিত কনককে দেখিয়া, বিভূতি বাবুর বিষণ্ণ গম্ভীর মুখের সংক্ষিপ্ত কথা শুনিয়া, সভয়-বিস্ময়ে অন্নপূর্ণার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া যাহা শুনিল, তাহা তাহাকে ক্ষণকালের জন্য স্তম্ভিত করিয়া দিল।

সুদীর্ঘ ছয় বৎসর ধরিয়া এই স্নেহময়ীর অন্তরের স্নেহ-বণ্টনের সুধা তাহার অংশেও ত কম পড়ে নাই! সংসারের চুলচেরা হিসাবী অখিল অন্নপূর্ণার এ দানের মূল্য তাঁহার জীবিতকালে না বুঝিলেও আজ আর স্বার্থের খতিয়ানে ইহা না ধরিয়া পারিল না। অনুতপ্ত অখিল বলিতে লাগিল, "তাই কুন্তলা গিয়ে অবধি কাঁদছে, আর বলছে, 'বড়মা নিশ্চয় খুব রেগে গেছেন, তাই আমার একখান চিঠিরও উত্তর দিলেন না।' আমি আসবার সময় কিছুতেই ছাড়বে না। বলে, 'মা নেই, বড়মার কাছে আমায় নিয়ে চল, তাঁকে একবার না দেখে আমি থাকতে পারবো না।' আমার ইচ্ছা ছিল আনি, ওর মা নেই, যাদের কাছে রেখে এলুম, তারা ওর আপন হয়েও এক রকম পরের মত। থাকতে ওর খুবই কষ্ট হবে সেখানে। কিন্তু কি করবো, দাদা, দিদিরও মত হ'ল না, মাও এখনও সেরে উঠতে পারেন নি। তাঁর সেবার দরকার, আর ওর বিয়ের ঠিকঠাক এক রকম হয়ে রয়েছে, অত বড় মেয়ে একলা এখানে আনাটা ভাল নয় সবাই বললেন, তাই নিয়ে আসতে পারলুম না।"

কনক গম্ভীর-মুখে বলিল,—"ভালই করেছেন।"

অখিল একটু সপ্রতিভভাবে বলিব, "হাঁা বাবা, সংসারে সব দিক বুঝেই চলতে হয়। মন মানুষের সবই সইতে পারে। দুদিন পরে কুন্তলা ওখানেই ভাল থাকবে। আর কদিনই বা, পরের বাড়ী ত তার যেতেই হবে, এই সব সাত-পাঁচ ভেবে তাকে এনে আবার একটা সংসারের ভার এখানে বাড়াতে ভাল লাগলো না। তাই এবার মেসে এসে থাকবো বলেই স্থির ক'রে এসেছি।"

বিভূতি বাবু চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন। কুন্তলা আর প্রভা ফিরিয়া আসিলে কনক হয় ত একটু ভাল থাকিবে বলিয়া যে আশা এত দিন তিনি করিতেছিলেন, তাহার আর কোনও সম্ভাবনাও নাই দেখিয়া তাঁহার মন এমন চিন্তাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল যে, অখিলের শেষের কথাগুলি তাঁহার কাণে যাইলেও মনে পৌঁছিল না।

কনক ধীরে ধীরে উঠিয়া বলিল,—"আপনার মেসে থাকাই ভাল।" কথা কয়েকটি বলিয়া কনক বাহির হইয়া গেল। রাগে, দুঃখে, অভিমানে কনক যেন আত্মহারা হইয়া পড়িল। কুন্তলাও আজ তাহারই মত মাতৃহীনা! তাহার উপর সে নিজে আজ মায়ের সহস্র স্মৃতি-ঘেরা নিজের হাতে গড়া এই সংসারটিতে পিতার ব্যাকুল স্নেহের ছায়ায় যে সান্ত্বনা পাইতেছে, কুন্তলার তাহাও নাই। সেই স্বার্থসর্ব্বস্ব হৃদয়হীন লোকগুলার মধ্যে তাহার দিন যে কেমন করিয়া কাটিতেছে, তাহা কল্পনা করিয়া কনক আর অশ্রু সংবরণ করিতে পারিল না। অল্প উত্তেজিত কিশোর মন এই মমতাহীন মানুষগুলার শাসনের কবল হইতে অতি আপনজন কুন্তলাকে কাড়িয়া আনিবার জন্য

আকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু অল্পদিনের অভিজ্ঞতা তাহাকে নিষ্ঠুর সত্য ভাষায় স্মরণ করাইয়া দিল, কে সে কুন্তলা? কি তাহার অধিকার?

৬

অন্নপূর্ণার মৃত্যুর পর কনক আর বিভূতি বাবুর জীবনের আরও পাঁচটি বৎসর নিত্য নিয়মিত কর্ম্মের উদাস অবসাদের মধ্য দিয়া বিষাদকম্পিত-চরণে চলিয়া গিয়াছে।

কিশোর কনক আজ সুন্দর যুবা। তাহার সুগঠিত দেহ অটুট স্বাস্থ্য আর অকলঙ্ক চরিত্রের পরিপূর্ণ শক্তিতে সতেজ। শিক্ষা-সবল মন তাহার সকল প্রকার অনাচারের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ আর বিতৃষ্ণায় ভরা।

পাঁচ বৎসর আগে সরস্বতীর প্রাসাদ-দ্বারের প্রবেশপথে ভাগ্য কনককে যে জয়মাল্য পরাইয়াছিল, দুর্ভাগ্য তাহাকে অশ্রুসিক্ত করিয়া দিয়াছিল। তাহার পর জননী বীণাপাণি আরও দুইবার এই মাতৃশোকাতুর সন্তানকে স্বহস্তে স্নেহ-চন্দনের টীকা কপালে আঁকিয়া দিয়াছেন। প্রতিবারই ভারতীর এই দান সেই প্রথম দিনের বেদনার স্মৃতি বহন করিয়া আনিয়া কনকের মনে জননীর বিয়োগব্যথা বাড়াইয়া, কুন্তলার কোমল প্রীতির স্মৃতি জাগাইয়া দিয়া, নিদ্রাহীন নিশীথে গোপন অশ্রুতে উপাধান সিক্ত করিয়া দিয়াছে।

এই পাঁচটি বৎসরে বিভূতি বাবুর জীবন যেন বার্দ্ধক্যের পথে অনেকখানি অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছিল। অনাসক্ত মন যেন আবশ্যকের তাড়ায় কায করিয়া যায়। জীবনের মূল যেন শিথিল হইয়া গিয়াছে। শুধু একটি কোণ এখনও ইহাকে জীবনের সহিত জুড়িয়া রাখিয়াছে। এমনই নিরানন্দ দিন, মাস, বর্ষ কাটিয়া যায়। বিপিন মাঝে মাঝে আসিয়া এ বাড়ীর বদ্ধ বায়ু খাতির করিয়া দিতে চাহেন, বহু দিনের হারানো হাসির সুর আবার এখানে ভরিয়া দিতে চাহেন, কিন্তু বৃথা চেষ্টা। যে সুর বিশ্ব হইতে হারাইয়া গিয়াছে, তাহাকে বাজাইতে যে বীণার আবশ্যক, তাহা ত তাঁহার ছিল না। তাই তাঁহার সহস্র চেষ্টাতেও এই বাড়ীর প্রতি ঘরে সেই সব হারান সুর ঘুরিয়া বেড়ায়। অনেক ভাবিয়া এক দিন বিপিন বিভূতি বাবুকে কনকের বিবাহ দিতে বলিলেন। এ প্রস্তাবে বিভূতি বাবু যেন অকূলে কূল পাইলেন। অনেক দিনের পর খুসী মনে বলিলেন, "তাই ত বিপিন, এটা কেন এত দিন বলনি, কনক ত বেশ বড় হয়েছে। বি-এটা পাশও করেছে, এবার ত ওর বিয়ে দিতে পারলেই আমি নিশ্চিন্ত। বিপিন, তোমায় কি ব'লে যে আমার কৃতজ্ঞতা জানাবো ভাই, এত বড় কথাটা এত দিন মনেই হয়নি আমার। কনকের ভাবনাই এত দিন আমার এত দুঃখেও মরবার কথা মনে করতে দেয়নি। ওর যুগ্যি একটি ভাল মেয়ে তুমি খুঁজে বার কর, ভাই!"

বিপিন বলিলেন, "এর জন্যে তোমায় অত ক'রে আমায় বলতে হবে না। তুমি একবার কনককে জিজ্ঞাসা ক'রে আমায় বোলো। আজকালকার ছেলে, বিশেষ ক'রে কনকের মত ছেলের মতটা জানা দরকার। তার পর বৌদির সংসারের ভার মাথায় তুলে নেবার মত মেয়ে আমি খুঁজে আনবো।"

বিভূতি বাবু বলিলেন, "তাই এনে দাও, ভাই! আমি ছুটী পাই। এ কথা ভেবেও এত দিনের পর মনটা আমার হাল্কা হল। সে চ'লে যাবার পর তার আদরের কনককে আমি কেমন ক'রে ভুলিয়ে রাখবো, এই ছিল সব চেয়ে বড় ভাবনা। কনকের মুখের যে হাসি সে মিলিয়ে দিয়ে গেছে, সেই হাসি আবার যদি আমি ফুটিয়ে দিয়ে যেতে পারি, তবেই তার সকল দেওয়া সার্থক হবে। সে যে তার দানে আমায় ভ'রে রেখে গেছে, বিপিন! তাকে যে আমি কিছুই দিতে পারি নি। সংসার থেকে চ'লে গিয়েও সে আমার জন্য তার দান রেখে গেছে কনকের বুকে। এখনও কনক তারই মত মমতায় আমায় ঘিরে রেখেছে। সেই সেবা, সেই সতর্কতা প্রতি মুহূর্ত্তেই যে মনে করিয়ে দেয়, প্রেম মরে না, স্নেহ পোড়ে না, একের অবসানে সে অপরের বুকে অমর হয়ে প্রেমাস্পদকে আগলে থাকে।"

বিভূতি বাবুর স্বর যেন ব্যথার সাগরে পথ হারাইয়া ফেলিল। বিপিন চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। কথা বলিয়া এ নীরবতা নষ্ট করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না।

৭

বিপিনের বহু চেষ্টায় ছয় মাস হইল সুন্দরী মায়া কনককে বরণ করিয়া অন্নপূর্ণার ফেলিয়া যাওয়া সংসারের হারান শ্রীটুকু ফিরাইয়া আনিতেছিল।

তাই দীর্ঘ দিন পরে হাসি যেন আবার এ বাড়ীর দরজায় উঁকি দিয়া যায়। মধুর তৃপ্তি যেন পিতা-পুত্রের মনে মাঝে মাঝে স্নিগ্ধ পরশ বুলাইয়া যায়। পিতা পুত্রের মুখে আপনার গত যৌবনের সুখস্মৃতির ছবি দেখিয়া স্বস্তি পান। পুত্র পিতার মুখে তৃপ্তির আভাস দেখিয়া আনন্দে উৎসাহ পায়। মন তাহার মায়ার প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠে।

সুমধুর আনন্দের আয়োজনের মধ্যে মায়া পিতা-পুত্রকে আপনার নিপুণতার শৃঙ্খলে ধীরে ধীরে জড়াইয়া ফেলিল। এই কল্যাণী কিশোরীর মায়ার সোণার কাঠির ঐন্দ্রজালিক

স্পর্শে এই সংসারের ব্যথা দীর্ঘ দিনের বাসা ফেলিয়া পলাইয়া গেল।

শীতের বেলা। বিভূতি বাবুর কোর্ট হইতে ফিরিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। তিনি বহু দিন পরে আবার সেই ভিতরের ঘরের আরাম-চেয়ারখানিতে বসিয়া খাবার খাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। সম্মুখে বসিয়া না খাইলে মায়া শুনিবে না। বিভূতি বাবু মুখ-হাত ধুইয়া বসিয়া আছেন। মায়া একখানি রেকাবীতে খান-কয়েক গরম কচুরী লইয়া ঘরে ঢুকিল। রেকাবীখানি বিভূতি বাবুর সম্মুখের ছোট তেপায়াটিতে রাখিয়া বলিল,—"আপনি ততক্ষণ খান, বাবা! আমি জল আর মিষ্টি নিয়ে আসি।"

বিভূতি বাবু রেকাবীখানি তুলিয়া লইয়া বলিলেন,—"রোজ রোজ কেন তুমি নিজে এ সব তৈরী কর, মা? ছেলেমানুষ, কোন্ দিন হাত-পা পুড়িয়ে ফেল্‌বে।"

মায়া একটু স্নিগ্ধ হাসির সঙ্গে উত্তর দিল,—"আমি ত তেমন ছোট নই, বাবা।"

বিভূতি বাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"না মা, তুমি আমার বুড়ী মা, কিন্তু কেন শুধু শুধু কষ্ট কর?"

মায়া বাহির হইয়া গেল। একটু পরে জল আর মিষ্টি লইয়া আসিয়া তেপায়ায় রাখিতে রাখিতে বলিল,—"আমি ভাল তৈরী করতে পারি না, তাই বোধ হয়, আপনার ভাল লাগে না, না বাবা?"

বিভূতি বাবু একটু অন্যমনস্ক হইয়া খাইতেছিলেন। আজ মায়া তাঁহার জন্য যে মাছের কচুরী ভাজিয়া আনিয়াছে, অন্নপূর্ণার হাতের এই কচুরী এক দিন তাঁহার অতি প্রিয় খাদ্য ছিল। এই ঘরে বসিয়া এই প্রিয় বস্তুটির স্বাদ লইতে লইতে সেই সুখময় দিনের স্মৃতি তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিয়াছিল।

মায়ার কথায় একটু অপ্রস্তুতভাবে বিভূতি বাবু উত্তর দিলেন,—"না মা, খুব সুন্দর করতে শিখেছ তুমি। আজ যে কচুরী তুমি করেছ মা, এমনই ঠিক তোমার মা করতেন। তুমি আমার মা কি না, তাই ছেলে যা ভালবাসে, ঠিক বুঝেছ। কিন্তু মা, লোভে প'ড়ে তোমায় রোজ রোজ কষ্ট দিতে মন কেমন করে যে।"

মায়ার মুখে একটা মধুর তৃপ্তির আভা ফুটিয়া উঠিয়া তাহার স্নিগ্ধ শ্রীটুকু আরও সুন্দর করিয়া তুলিল।

সে বেশ কৌতুকের স্বরে বলিল,—"আচ্ছা বাবা, বলুন ত, আমি ঠিক মা'র মত কচুরী ভাজতে কোথায় শিখলুম?"

বিভূতি বাবু বলিলেন, "কি জানি মা, তুমি এই বয়সে এমন গিন্নীপনা কেমন ক'রে শিখলে, তা ত আমি ভেবে পাই না।"

মায়া বলিল,—"আর কিই বা আমি জানি, যা দু একটা খাবার করি, সবই ত আমি এখানেই শিখেছি। এখানে মা'র একখানা খাবার তৈরীর বই আছে। যেগুলো মা লাল পেন্সিলের দাগ দিয়ে রেখেছিলেন, জিজ্ঞাসা ক'রে জানলুম, সেগুলো মা রোজই প্রায় করতেন। তাই ভাবলুম, মা যখন রোজ করতেন, তখন নিশ্চয়ই আপনার ওগুলো ভাল লাগতো, তাই চেষ্টা করি সেগুলো মা'র মত করতে।"

তাঁহাকে তৃপ্তি দিবার জন্য মায়ার এই আন্তরিক আগ্রহ বিভূতি বাবুর মনে একসঙ্গে সুখ-দুঃখের দোলা দিয়া গেল। তিনি ভাবিলেন, আহা, অন্নপূর্ণা অতৃপ্ত কন্যা-স্নেহে পরের মেয়েকে ভালবাসিয়া বুকভরা ব্যথা লইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু বিধাতা তাহার কত কামনার কনকের জন্যই এমন বধূ গড়িতেছিলেন।

বিভূতি বাবু বলিলেন, "তোমার এত যত্ন তোমার মা একটুও ভোগ করতে পেলেন না ব'লে দুঃখ হয়, মা! একটি মেয়ে মেয়ে ক'রে তাঁর মনটা যেন পাগল হয়েছিল। কনক ছেলে, ওকে সাজিয়ে শিখিয়ে মন তাঁর ভরতো না, তাই কুন্তলাকে পেয়ে যেন সমস্ত মন দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরেছিল। তখন যদি তোমায় পেতুম, মা!"

মায়ার চোখ দুইটি যেন ছল-ছল করিতে লাগিল। সে বলিল, "অমন মায়ের আদর পাবার ভাগ্য আমার নেই যে, বাবা! তাই তখন তাঁর কাছে আসতে পারিনি। আচ্ছা বাবা, মা কুন্তলাকে এত ভালবাসতেন আর তিনি মারা যাবার পর আপনারা তার কোনও খোঁজ-খবর নিলেন না? তারও ত মা মারা গিয়েছিলেন, তখন কষ্ট সে পেয়েছে, তার ত আর কোনও দোষ ছিল না।"

বিভূতি বাবু বলিলেন,—"তখন মা, নিজেরা এত অধীর হয়ে পড়েছিলুম কনকের ভাবনায়, আর কিছু ভাববার সময়ই পেতুম না। প্রথম যখন অখিল আসেনি, মনে করতুম, কুন্তলা আর তার মা ফিরে এলে কনক একটু শান্তি পাবে। যখন শুনলুম, তারা আর আসবে না, তখন কেমন ক'রে কনককে সামলে তুলবো, এই ভাবনা আমার এত বেশী হয়েছিল, কুন্তলার কথা আর মনে ছিল না। তার পর এত দিন ধ'রে বাপ আর ছেলে নিজের নিজের কাযগুলি সেরে যে সময়টুকু পেতুম, সেটুকু ছেলে থাকতো বাপকে আগলে, বাপ থাকতো ছেলেকে আগলে। এত দিনে তুমি মা আমাদের সে ভার তুলে নিয়েছ, তাই এখন অন্য কিছু ভাববার কথা ঢুক্‌ছে মনে।"

কথাগুলি বলিয়া বিভূতি বাবু যেন কতকটা আপন মনেই বলিতে লাগিলেন,—"তাই ত, কুন্তীটা এখন কোথায় আছে, কেমন আছে, কে জানে।"

মায়া বলিল,—"আচ্ছা বাবা, তার খবর পাবার কি কোন উপায় নেই? তাকে আমার বড় দেখতে ইচ্ছে করে। আপনাদের মুখে তার কথা শুনে শুনে মনে হয়, সে যেন আমারও কত আপনার কেউ।"

বিভূতি বাবু বলিলেন, "কেমন ক'রে আর খবর নেব! মাঝে বিপিন বলেছিল, অখিল নাকি কায ছেড়ে দেশে চ'লে গেছে। দেশ তার ঢাকা জেলায় জান্‌তুম। কিন্তু কোন্ গ্রাম, কি পোষ্টাফিস, এ সব কিছুই ত জান্‌তুম না, জান্‌বার যে দরকার হ'তে পারে, এও কোনও দিন তখন ভাবতে পারিনি, এখন তার কি ক'রে খোঁজ নেব, মা!"

মায়া চুপ করিয়া রহিল। মন তাহার কুন্তলাকে কেন্দ্র করিয়া অনেক কল্পনার জাল বুনিয়া যাইত, কিন্তু ইহাদের এই অনাত্মীয়া অথচ অতি অন্তরতম স্থানের নিভৃতবাসিনীকে দেখিবার কোন উপায় সে খুঁজিয়া পাইত না।

৮

সকালবেলা স্নান করিয়া আসিয়া মায়া প্রতিদিনের মত অন্নপূর্ণার ছবিখানিকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই দেখিল, কনক তাহার পাশে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া তাহার বড় বড় উজ্জ্বল দুইটি চোখের আনন্দ আর গর্ব্বমাখা অপূর্ব্ব দীপ্তিভরা দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। লজ্জায় মায়ার মুখখানি মধুর হইয়া উঠিল। সে ঈষৎ জড়িতকণ্ঠে বলিল—"তুমি এখন এখানে যে?"

কনক মায়ার কথার উত্তর না দিয়া মুগ্ধকণ্ঠে বলিল, "মায়া, তুমি আমার মাকে এত ভক্তি কর কেন? তুমি ত তাঁকে দেখ নি।"

মায়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "ঠাকুর-দেবতাকেও ত কেউ কোনও দিন চোখে দেখে নি, তবে ভক্তি করে কেন? হঠাৎ আজ সকালবেলা পড়া ছেড়ে আমার ভক্তির কৈফিয়ৎ নিতে এ ঘরে কেন?"

কনক সেইখানে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "আজ আমার এগ্‌-যামিন আরম্ভ হবে, সকাল সকাল যেতে হবে আজ, তাই তোমায় মনে করিয়ে দিতে এলুম।"

মায়া একটু হাসিয়া বলিল, "ভাগ্যি তুমি মনে করাতে এলে।"

কনক একটু গম্ভীর হইয়া বলিল, "জানি মায়া, এ সব কখনও তোমাদের ভুল হয় না, তবু তোমার এই প্রথম কি না, তাই।"

সুমিষ্ট পরিহাসতরল কণ্ঠে মায়া বলিল, "আর তোমার বুঝি এটা শেষ? এটা পাশ করতে পারলেই পরীক্ষার পালা এবারের মত শেষ হয়।"

কনক উত্তর দিল, "না মায়া, পরীক্ষা কি আর সহজে শেষ হয়? আরও একটি বছর প'ড়ে আর একটা একজামিনে পাশ করত পারলে তবে শেষ হবে।"

মায়া চাপা হাসির স্বরে বলিল, "তার পরে ঐ রকম কালো জামা গায়ে দিয়ে আলিপুরের গাছতলায় মক্কেলের আশায় আকাশপানে চেয়ে ব'সে থাকবে ত?"

কনক মৃদু হাসিয়া বলিল, "না মায়া, তোমার ঐ কল্পনার ছবি বোধ হয় কল্পনাতেই রয়ে যাবে। ওকালতী পাশ হলেও উকীল আমি হব না।"

মায়া একটু বিস্ময়ের স্বরে বলিল, "সে কি, বাবা ত তোমায় উকীল ক'রে তাঁর মক্কেলদের ভার তোমায় দেবেন বলেই আশা ক'রে আছেন। তুমি উকীল হলেই তিনি ছুটী নেবেন বলেন।"

কনক আবার গম্ভীর হইয়া উত্তর দিল, "হাঁ, ছুটী আমি বাবাকে দেব, কিন্তু সে তাঁর মক্কেলদের ভার নিয়ে নয়, অন্য উপায়ে উপার্জ্জন ক'রে।"

মায়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, যে জন্যে তোমায় ওকালতী পড়াচ্ছেন, তা করবে না কেন?"

কনক বলিল, "বাবাকে আমি খুব ভক্তি করি, কিন্তু আমি জানি, এই ওকালতী কাযটা কখন কেবল ন্যায়ের ওপর চলতে পারে না। তাই অনেক সময় ব্যবসার জন্যে অন্যায়কে ন্যায় ব'লে প্রমাণ ক'রে আইনকে ফাঁকি দিতে হয়। জেনে না জেনে এটা উকীলরা না ক'রে পারে না। তাই আমি জীবনে এমন একটা অসত্যকে প্রশ্রয় দিয়ে পয়সা উপার্জ্জনের পথ বেছে নেব না বলেই ঠিক করেছি।"

স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধায়, প্রেমে, মায়ার অন্তর ভরিয়া উঠিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কেন শুধু শুধু পড়ছ?"

কনক, বলিল, "অনেক অসম্ভব আশা মনে বাসা বেঁধে আছে, মায়া! ইচ্ছে আছে, যদি পারি, তবে চেষ্টা করবো বিচারক হতে। অনেক সময় ন্যায়বিচারের গৌরব অনেকে রাখতে পারে না। তাই আমাদের দেশে অনেক সময় প্রকৃত দোষী যে, সে যোগাড় আর তদ্বিরের জোরে ছাড়া পেয়ে আরও দুর্দ্দান্ত হয়ে বাড়ী যায়। আর নির্দ্দোষ যে, সে শাস্তি পেয়ে সৎপথে চলবার প্রবৃত্তি হারিয়ে ফেলে। তাই এখন আমাদের দেশে গণ্ডা গণ্ডা উকীলের চেয়ে নির্ভীক, বিচক্ষণ বিচারকের দরকার। তাই যাদের বিচারের মর্য্যাদা রাখবার

মত মন আছে, বিচারক হবার সুযোগ পাবার জন্যে তাদের চেষ্টা করা উচিত। সে গৌরব পাবার সৌভাগ্য আমার হবে কি না, জানি না, তবে চেষ্টা করবো।"

তরুণী মায়া স্বামীর প্রতি আরও অনেকখানি প্রীতি মনের মধ্যে লইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

কনক মায়ের ছবিখানির দিকে চাহিয়া সেইখানেই বসিয়া রহিল।

২

বহু দিন চলিয়া গিয়াছে। বিভূতি বাবু আর ইহলোকে নাই। পুত্র, কন্যা, প্রেমময়ী পত্নী-পরিবৃত কর্ম্মব্যস্ত কনকের মনে পিতার শোক মাতৃশোকের মত আঘাত করিতে না পারিলেও অনেক দিন অবধি একটা অকারণ অসহায় ভয় সকল কাযেই তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিত, পরমনির্ভর পিতা আর নাই। এখন সংসারের সকল বিপদ একা তাহাকে মাথা পাতিয়া লইতে হইবে। ক্রমে ইহা সহজ হইয়া গেল। যৌবনের প্রান্তবাসিনী মায়া যেন অন্নপূর্ণার প্রতিচ্ছবির মতই কনকের সংসারটিতে কল্যাণময়ীর মত মঙ্গলস্পর্শ বুলাইয়া রাখিয়াছিল।

যৌবনের স্বপ্ন সফল করিয়া কনক এখন পূর্ব্ববঙ্গের কোন জেলার জজ। সুদীর্ঘ দিন সতর্ক চিন্তায় অন্তরের বিবেককে সম্মুখে রাখিয়া বিচারের মর্য্যাদা সে রাখিয়াছে বলিয়া মন তাহার পরিতৃপ্ত।

ন্যায়নিষ্ঠ সহৃদয় বলিয়া সকলেই তাহাকে শ্রদ্ধা করে। এই সুনামই তাহাকে প্রৌঢ়ত্বের প্রারম্ভেই শাসকের সর্ব্বোচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া অপরাধীর জীবন-মরণ-দণ্ডের গুরুভার তাহার হাতে তুলিয়া দিয়াছে।

কনকের বিবেকানুমোদিত বিচারে আজ প্রথম সে এক জনের প্রাণদণ্ডের আদেশ—তাহার জুরীদের বিনা সমর্থনে দিয়া প্রথম একটি প্রাণ নষ্ট করিবার আদেশ দিবার অনভ্যাস-কুণ্ঠা সে অনুভব করিতে করিতে বাড়ী ফিরিল। বাড়ী আসিয়াও সে মনে মনে এই বিধানের সপক্ষে যে যুক্তিগুলি তাহার বহুবার পঠিত আইনের বইগুলিতে লেখা ছিল, তাহা দেখিতে লাগিল। না, কোথাও তাহার ভুল হয় নাই, এমনই অপরাধীর জন্যই যে প্রাণদণ্ডের বিধান স্পষ্টাক্ষরে বইগুলিতে লেখা আছে। এই অপরাধী—এই সহরের এক জন অত্যাচারী জমীদার। কু-কার্য্য করিতে বাধা পাইয়া এখানকার সে এক জন নির্দ্দোষ ভদ্রলোককে হত্যা করে। তাহারই প্রজারা জজ সাহেবের বাংলোয় গভীর রাত্রিতে আসিয়া কাঁদিয়া ইহার বিচার চাহে। কনক তখনই নিজে পুলিসে সংবাদ দিয়া অপরাধীকে গ্রেপ্তার করায়। যথারীতি মামলাটি বিচারের জন্য তাহার নিকট উপস্থিত হইলে ইহার ফল যাহা হইবে, তাহা বুঝিতে পারিয়া আসামী জমীদারের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীরা স্বগ্রামবাসী জুরীদের ধরিয়া, প্রভুর যাহাতে প্রাণদণ্ড না হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দৃঢ়চেতা নির্ভীক কনক চিরদিনের অত্যাচারের প্রতি তীব্র বিদ্বেষভরা মনে ইহাকে এতটুকু দয়া করিতে পারে না। এমন অনাচারীকে পৃথিবীর বুক হইতে বিদায় দেওয়াই যোগ্য শাস্তি বলিয়া তাহার মনে হইল। তাই সে জুরীদের অনিচ্ছায় আপনার ক্ষমতায় ইহাকে চরম দণ্ডের আদেশ দিয়া উচ্চ আদালতের সমর্থনের জন্য পাঠাইয়া দিল।

কিন্তু এইরূপ দণ্ডদান প্রথম বলিয়া কনকের মনের প্রান্তে কোথায় যেন একটা করুণ সুর বাজিয়া উঠিতেছিল। এমন অনুভূতি সে আদেশ দিবার পূর্ব্বে অনুভব করে নাই। কনক বুঝিতেছিল, হতভাগ্য জমীদারের মরণকাতর বিবর্ণ মুখই ইহার কারণ।

কোর্ট হইতে ফিরিয়া ভিতরে না যাইয়া কনক বাহিরে বসিয়াই তাহার বই খুলিয়া দেখিতে দেখিতে গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। এমন সময় ভৃত্য আসিয়া জানাইল, ভিতরে ডাক পড়িয়াছে। কনক উঠিয়া ভিতরে আসিতেই মায়া কোর্ট হইতে আসিয়াই আবার পড়িতে বসার জন্য অনুযোগ করিয়া ভৃত্যকে কনকের কাপড় আনিতে বলিয়া নিজে খাবার লইয়া আসিল।

কনক হাত-মুখ ধুইয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া যখন জল-খাবারের রেকাবীখানি টানিয়া লইয়া চুপ করিয়া অন্যমনস্কের মত খাইতে লাগিল, তখন মায়া বলিল,—"অত কি ভাবছো? কাল বুঝি খুব জটিল মামলার রায় দিতে হবে?"

কনক উত্তর দিল,—"কাল নয়, মায়া! আজই আমি একটা ফাঁসীর হুকুম দিয়ে এসেছি।"

মায়া শিহরিয়া বলিয়া উঠিল,—"মা গো, ফাঁসীর হুকুম, তুমি দিয়েছ? একেবারে মেরে ফেলতে? কি ভয়ানক! কেন দিলে?"

কনক উত্তর দিল,—"দোষ সে যথেষ্ট করেছে, অমন লোক বেঁচে থাকা বিপজ্জনক। সামান্য কারণে এক জনকে খুন করেছিল। এমন সে অনেক করেছে, এত দিন ধরা পড়েনি; এবার নেহাৎ আমি, তাই।"

মায়া বলিল,—"কিন্তু আর কোনও শাস্তি কি তার ছিল না?"

কনক উত্তর দিল,—"দিলে ছিল, জুরীরা তাই দিতে চেয়েছিল। কিন্তু তা দিলে অন্যায় হ'ত, অমন সব অত্যাচারীর জন্যেই ত ফাঁসীর আইন হয়েছে।"

মায়া বলিল,—"কেমন যে আইন তোমাদের, তাও ত বুঝি না। মানুষকে মারা অন্যায়, তাই তার শাস্তি দিলে তোমরা, সেই অন্যায় নিজেরা পাঁচ জনে মিলে ক্ষমতার জোরে ক'রে; সে নিজের স্বার্থে আপনার হাতে খুন করেছে, আর তুমি সমাজের স্বার্থে হুকুম দিয়ে খুন করালে। ঈশ্বরের সৃষ্ট প্রাণ তোমরা দুজনেই দু'রকম শক্তিতে নষ্ট করলে, তাঁর কাছে কে যে দোষী, সে বিচার যে কি, তা ত আমরা জানি না। যাকে শাস্তি দেবার জন্যে তোমরা মেরে ফেল, সে ম'রে যায়, তার সব চুকে যায়। কিন্তু তার যারা আপন লোক বেঁচে থাকে, তাদের কথা ভাব দেখি। সত্যি শাস্তি ত তাদেরই দেওয়া হয়। আহা, স্বামী পুত্র অসুখে মরলে শোকের অন্ত থাকে না। আহা——"

মায়া কনকের মুখ দেখিয়া আর কিছু বলিল না। সে মুখে যে পুঞ্জীভূত বিষাদের মেঘ জমিয়া উঠিল, তাহা দেখিয়া মায়া বুঝিল, তাহার কথায় ভাবপ্রবণ কনকের বাহ্য কঠোরতার আবরণের অন্তরালে অন্তরে যে অন্তঃসলিলা করুণার ধারা নিরন্তর প্রবাহিত ছিল, তাহা আজ তাহার ন্যায়-বিচারের সকল গৌরব নিঃশেষে ধুইয়া দিতেছে। সে ধীরে ধীরে বাহিরে চলিয়া গেল।

১১

বিশ্বের ব্যথা আপনার অন্তরের অনুভূতিতে ওজন করিয়া দেখিবার মত মন অন্নপূর্ণার ছিল। সেই মনের মায়ায় ষোলটি বৎসর বাড়িয়া উঠিয়া কনক প্রথম সংসারের পরিচয়ে অখিলের অকৃতজ্ঞতায় মাকে হারাইল ভাবিয়া সমস্ত সংসারের উপরই বিরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু নিভৃত বনভূমিতে, বর্ষার বর্ষণসিক্ত কোমল মাটীতে, সংসারের পথভোলা পথিক, সেই জনহীন পথের কোমলতায় যে চরণচিহ্ন আঁকিয়া যায়, শরতের রৌদ্রোজ্জ্বল দিন সে সজল পথকে শুকাইয়া তোলে, শীতের শুষ্কতা তাহাকে কঠিন করিয়া তোলে, তবু সেই প্রথম পথিকের পদরেখা তাহার বুকে তেমনই রহিয়া যায়। বায়ু শুধু আবর্জ্জনা উড়াইয়া আবৃত করিয়া রাখে মাত্র। বিশ্বের ব্যথাতুরা অন্নপূর্ণার অনুভূতিটুকু অতি সংগোপনে কনকের নিভৃত মনে নিভৃতই লুকাইয়াছিল। তাই যখনই কেহ তাহার সেই গোপন অন্তঃপুরের দ্বারে আঘাত করিত, তখনই সেখানে সেই মমতার সুর ঝঙ্কার দিয়া উঠিত।

মায়ার সরল বুদ্ধির সহজ কথাগুলি এত দিন পরে সূক্ষ্মদর্শী বিচারক কনককে চিন্তাকুল করিয়া ফেলিল। ন্যায়শাস্ত্রের সকল যুক্তি-তর্ক মনে মনে স্মরণ করিয়া সত্য ও ন্যায়ের নির্ভীক পূজারী কনক তাহার মীমাংসা করিতে চাহিল। তাহার মনে হইল, সত্যই কি ক্ষমতার গর্ব্বে মানুষের ঈশ্বরের সৃষ্ট প্রাণ নষ্ট করিবার অধিকার নাই, হত্যার অপরাধে হত্যাকারীকে প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়া বিধাতার কাছে দণ্ডিত ও দণ্ডদাতা একই অপরাধে কি অপরাধী হয়? কে এ প্রশ্নের উত্তর দিবে?

সহস্র সাধনায় ধরণীর বুকে যে প্রাণ মানুষ এক দিন ধরিয়া রাখিতে পারে না, শৃঙ্খলাকে শৃঙ্খলিত রাখিবার জন্য বিচারের বিধানে সে প্রাণ বিনাশ করিবার অধিকার মানুষের আছে কি না, সে মীমাংসা কনকের মনে হইল না। বহুদিন পরে শৈশবের সর্ব্বসমস্যার মীমাংসাকারিণী মাকে কনকের মনে হইল। মায়ের সেই স্নিগ্ধ মুখখানির সঙ্গে সঙ্গে এইমাত্র মায়া যে হতভাগ্য হত্যাকারীর আপন জনের কথা বলিয়া গেল, তাহার অনুসরণে তাহার মনে হইল, সেই হতভাগ্যের হয় ত আমার মায়ের মতই একটি জননী, ঐ দুর্বৃত্ত পুত্রের মুখ চাহিয়াই বাঁচিয়া আছেন। আজও প্রভাতে একান্ত আকুলতায় ঐ পাপিষ্ঠ পুত্রের জীবন ভিক্ষা করিয়া হয় ত দেবদ্বারে কত কামনা করিয়াছেন। অন্নপূর্ণার একান্ত স্নেহের পুত্র কনক আপনার অভিজ্ঞতায় মায়ের সম্মুখ হইতে সন্তানকে কাড়িয়া লইয়া পৃথিবী হইতে চিরদিনের জন্য বিদায় দেওয়া যে মানুষের কত অকরুণ স্পর্দ্ধা, তাহা অনুভব করিয়া শিহরিয়া উঠিল।

উদ্‌ভ্রান্ত কনক যেন মানসদৃষ্টিতে দেখিতে পাইল, একটি মৌনমুখী নারী স্বামীর অসংখ্য অন্যায় অকাতরে সহ্য করিয়া প্রতিদিন সংসারের সহস্র কল্যাণে আপনাকে রিক্ত করিয়া নিঃশব্দে সেবা আর স্নেহ ঢালিয়া দিয়া দিনান্তে সীমন্তে সিন্দুর-রেখাটুকু আঁকিয়া দিয়া পরম তৃপ্ত-মুখে, শুচিস্নিগ্ধ দেহে, সন্ধ্যার আসন্ন অন্ধকারে গৃহদেবতার দ্বারে দাঁড়াইয়া তাহার একমাত্র সৌভাগ্যের এই সিন্দুরটুকু অম্লান রাখিবার জন্য যে প্রার্থনা জানাইয়াছে, আজি সেই সর্ব্বসুখহারা নারী আসন্ন বৈধব্যের দুঃখময় ছবি দেখিয়া অশ্রুসিক্ত ম্লানমুখে সেই দেবদ্বারে কাহার নিষ্ঠুর বিচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাইতেছে? এই প্রেম-বঞ্চিতা, হয় ত বা লাঞ্ছিতা নারীর জীবনের একটিমাত্র গর্ব্ব কাড়িয়া লইয়া শুধু প্রিয়জন জীবিত থাকার তৃপ্তিটুকুও নষ্ট করিয়া সে আজ ন্যায় ও ধর্ম্মের মর্য্যাদা রাখিতে পারিল কি?

দুই হাতে মাথা টিপিয়া কনক ভাবিতে লাগিল।

যৌবনের স্বর্ণময় স্বপ্ন বিচারকের উচ্চ পদ আজি তাহার কাছে যেন অভিশাপ বলিয়া মনে হইল।

১১

কয়েক দিন চলিয়া গেল। অনুতপ্ত কনক প্রতিদিন সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করিত, উচ্চ আদালতে তাহার রায় যেন বহাল না থাকে। আসামী যেন পুনর্বিচারের চেষ্টা করে। কিন্তু তাহা হইল না। সুযোগ্য বিচারক কনকের রায়ই উচ্চ আদালত বহাল রাখিলেন।

কনকের নির্দ্দিষ্ট দিনে যথানিয়মে অতি প্রত্যূষে জেলের মধ্যেই হতভাগ্যের সকল অত্যাচারের অবসান হইয়া গেল। অনিচ্ছুক প্রাণ তাহার দুষ্কার্য্যের শাস্তি লইয়া সুস্থ দেহ ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

যথাসময় কনক বিমর্ষ-মুখে এজলাসে আসিয়া বসিল। মৃত জমীদারের সন্তানহীনা দুর্ভাগিনী পত্নীর পক্ষ হইতে উকীল আসিয়া মৃতদেহ সংকার করিবার জন্য লইবার অনুমতিপত্র জজ বাহাদুরের নিকট পেশ করিল। কনক কম্পিত হস্তে কাগজখানি লইয়া দেখিল, স্বাক্ষর রহিয়াছে 'কুন্তলা দেবী'।

কৈশোরের স্নেহে সিক্ত, যৌবনের মমতায় সঞ্চিত এই নামটি এই ভীষণ কাগজখানিতে লেখা দেখিয়া কনক চমকিয়া উঠি। ক্ষণকালের জন্য তাহার মন হইতে দীর্ঘ দিবসগুলি মিলাইয়া গেল।

এই বহুজনের সম্ভ্রমজড়িত আসনে উপবিষ্ট কনক মুহূর্ত্তের মধ্যে জীবনের সেই প্রথম গৌরবের বেদনাঙ্কিত দিনটিতে ফিরিয়া গেল। তাহার দৃষ্টির সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল সেই মাতার অশ্রুভরা নত নেত্রের তলে বিচ্ছেদ-কাতরা কুন্তলা কোমল কণ্ঠে বলিতেছে, "কাঁদছ কেন, বড়মা! আমি ত আবার আসবো।"

এত দিন পরে এমনই বেশে কুন্তলা কি আজ ফিরিয়া আসিল?

কম্পিত হস্তে সই করিয়া কনক উঠিয়া পড়িল। বন্ধ কণ্ঠে শুধু সে বলিতে পারিল, অসুস্থ সে, কোর্ট আজ বসিবে না।

* * * *

অপরাহ্ণে সহরবাসী সবিস্ময়ে দেখিল, যাহার নির্ভীক অটল শাস্তিদানে দুর্ভাগ্য জমীদার আজ পৃথিবী ছাড়িয়া প্রস্থান করিয়াছে, সেই ন্যায়নিষ্ঠ জজ বাহাদুর নগ্নপদে, নত-মস্তকে নির্বাক শোকাচ্ছন্ন-মুখে দুর্ভাগ্যের শবযাত্রার সঙ্গে, মৃতদেহের পার্শ্বে নিঃশব্দে চলিয়াছেন।

শ্রীমতী ঊষারাণী দেবী।

"দাদুরী আজ মরণ ভোল্"

পূব বাতাস আনিল আশ দীঘির বুকে জাগালো দোল্,
শ্রাবণ আসে প্লাবন নিয়ে দাদুরী আজ মরণ ভোল্।

ধরণী তাই বিছালো ঘাস অভ্যাগতের আসনখান্,
নদীর বুকে ঊর্ম্মি-নটী গাহিছে আগমনীর গান।
ও গান তুই কণ্ঠে ভরি' নিজের তান-লহরী তোল্,
দয়িত আজি আসিছে তোর দাদুরী আজ মরণ ভোল্।
"শ্রাবণ-রাজ আসিছে আজ করিতে সারা বিশ্বজয়"—
এ বাণী তুই কণ্ঠে ভরি' প্রচার কর জগৎময়।
আকাশে আজ বাজিছে ভেরী বীরের বুকে নাচিছে প্রাণ,
কালো খাপের গর্ভে ওই ঝলিছে ছাখ অস্ত্রখান।
ও নয় ওর যোদ্ধ্‌বেশ ও নয় ওর জগৎজয়,
নিজের প্রাণ নিঙাড়ি সুধা বিলাবে আজি বিশ্বময়।
ভৈরবের ও শান্তরূপ। প্রণাম কর! ছন্দ তোল্।
দাহন নাশি' শ্রাবণ আসে দাদুরী আজ মরণ ভোল্।
আষাঢ় ওর অগ্রদূত, আসার-রূপী পত্রখান্
বহিয়া নিয়া অগ্রে আসি' ধরার হাতে করিল দান।
পত্র পড়ি' রক্ত উজল লজ্জাবতীর শুষ্কমুখ,
বর্ষপরে বিরহিণীর পাবার আশে ভরিল বুক।
মেলেছে সে কেশের ভার নয়নে দেয় নীলাঞ্জন,
কর্ণে দেয় কলমী ফুল আসিছে ব'লে পরাণধন।
এল রে বুঝি শ্রাবণ ওই পূবতোরণে মন্ত্ররোল!
কণ্ঠ তোল্! মরণ ভোল্! দাদরী আজি মরণ ভোল্!

শ্রীকালীপদ হাজরা

প্রতিবাদ

লোকতত্ত্ব

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

দৃশ্যমান এই পৃথিবীকেই ভৌমস্বর্গ বলা হয়। এই ভৌমস্বর্গেও ইন্দ্রাদি দেবগণের অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। দেবীভাগবত, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, বায়ুপুরাণ, মহাভারত ও ভাগবত প্রভৃতি পুরাণশাস্ত্রে পৃথিবীর যে বিবরণ পাওয়া যায়, বর্ত্তমান সময়ের ভূগোলের সহিত তাহার অতি সামান্যই মিল হইয়া থাকে। প্রবন্ধ-লেখক প্রাচীন পুরাণের কিছু কিছু প্রমাণ গ্রহণ করিয়া বর্ত্তমান দৃষ্টিগোচরীভূত ভূগোলকেই অবলম্বন করিয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অনাবিষ্কৃত নিবন্ধন জ্ঞানের বিষয়ীভূত না হওয়ায় বোধ হয়, তিনি পৌরাণিক ভৌগোলিক বর্ণনকে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। ইহা কিন্তু আলোচনার একটা মস্ত ভুল। দেবগণের অস্তিত্ব পুরাণের মধ্যেই পাওয়া যায়। অতএব পুরাণের ঐ অংশ মাত্র গ্রহণ করিয়া তাৎকালিক ভূগোলবৃত্তকে অস্বীকার করিয়া বর্ত্তমান ভূগোলের মধ্যে তাহার সামঞ্জস্য করিতে যাওয়া অসঙ্গত। পৌরাণিক ভূগোলের অনেকাংশই অনাবিষ্কৃত থাকায় ও কালধর্ম্মানুসারে বিকৃত হওয়ায় ঠিক ঠিক তথ্য নির্ণয় করা দুরূহ। মহাভারত ভীষ্মপর্ব্বে ৫।৬।৭।৮ অধ্যায়ে যে বর্ণন পাওয়া যায়, তাহা এইরূপ :—আমরা যেখানে বাস করি, তাহার নাম জম্বুদ্বীপ। এই জম্বুদ্বীপের চারিধারে লবণ-সমুদ্র। ইহা নয় বর্ষে বিভক্ত। সম্পূর্ণ নিম্নভাগের নাম ভারতবর্ষ, ইহার উত্তরে হিমালয়, হিমালয়ের উভয়প্রান্ত পূর্ব্ব ও পশ্চিম সমুদ্রে মগ্ন। হিমালয়ের উত্তরে হৈমবতবর্ষ ও তাহার উত্তরে হৈমকূট পর্ব্বতশ্রেণী। তাহার উত্তরে বহু যোজন পরে নিষধ পর্ব্বত। বর্ত্তমান ভৌগোলিক জ্ঞানানুসারে এই পর্য্যন্তই আমাদের জ্ঞানের সীমা। অর্থাৎ উক্ত ত্রিবিধ পর্ব্বতমালাই হিমালয়, কারাকোরম ও আল্টাই পর্ব্বতরূপে আমাদের নিকট পরিচিত। হেমকূট ও নিষধ পর্ব্বতের মধ্যভাগকে হরিবর্ষ বলা হইত। কেহ কেহ কল্পনা করিয়া থাকেন যে, এই হরিবর্ষই, জাপান, মঙ্গোলিয়া তুর্কীস্থান, রুস, জার্ম্মাণী, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ এবং হৈমবতবর্ষই চীন, তিব্বত, ইরাণ, গ্রীস ও ইটালী প্রভৃতি। ইহার পরে যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহা বর্ত্তমান ভূগোলবৃত্তে পাওয়া যায় না। নিষধের উত্তরে ও পৃথিবীর মধ্যস্থলে ইলাবৃতবর্ষ, মেরুপর্ব্বত তাহার মধ্যস্থলে অবস্থিত। এই মেরুর উত্তরদিকে নীল, শ্বেত ও শৃঙ্গবান্ নামক পর্ব্বতশ্রেণী এবং এই মেরুপর্ব্বত বহু সহস্র যোজন বিস্তৃত ও সুবর্ণময়। এই মেরুর পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিকে মাল্যবান্ ও গন্ধমাদন নামক দুইটি পর্ব্বত। নীল, শ্বেত ও শৃঙ্গবান্ পর্ব্বতের মধ্যে নীলবর্ষ, শ্বেতবর্ষ ও হিরণ্ময়বর্ষ বর্ত্তমান আছে। মেরুপর্ব্বতের চারিদিকে চারিটি পুণ্যময় প্রদেশ আছে, যথা,—উত্তরকুরু, ভদ্রাশ্ব, কেতুমান ও জম্বু। হিমবান্ পর্ব্বতে রাক্ষসগণ বাস করেন, হেমকূটে গুহ্যকগণ এবং নিষধে সর্পগণ, শ্বেতপর্ব্বতে দেবতাগণ এবং নীলপর্ব্বতে ব্রহ্মর্ষিগণ বাস করেন। ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধেও প্রায় ঠিক এইরূপই বর্ণন পাওয়া যায়, যথা—জম্বুদ্বীপের চারিদিকে লবণসমুদ্র। ইহার মধ্যভাগের নাম ইলাবৃতবর্ষ। এই ইলাবৃতবর্ষের নাভিদেশে সুবর্ণময় কুলগিরিরাজ লক্ষ যোজন ঊর্দ্ধে বিস্তৃত মেরুপর্ব্বত। ইহার উত্তরদিকে নীল, শ্বেত ও শৃঙ্গবান্ নামক পর্ব্বত। এই সমস্ত পর্ব্বতের মধ্যভাগে যথাক্রমে রম্যকবর্ষ, হিরণ্ময়বর্ষ ও কুরুবর্ষ। ঐ সকল পর্ব্বতই পূর্ব্ব-পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইলাবৃত বর্ষের দক্ষিণে—নিষধ, হেমকূট ও হিমালয় পর্ব্বত, এবং ঐ সমস্ত পর্ব্বতের মধ্যভাগে যথাক্রমে হরিবর্ষ, কিম্পুরুষবর্ষ ও ভারতবর্ষ। ইলাবৃতের পূর্ব্বদিকে গন্ধমাদন পর্ব্বত ও ভদ্রাশ্ববর্ষ। পশ্চিমদিকে মাল্যবান্ পর্ব্বত ও কেতুমানবর্ষ। মেরুপর্ব্বতের চারিদিকে মন্দর, মেরুমন্দর, সুপার্শ্ব ও কুমুদ এই চারিটি পর্ব্বত। ইহারা প্রত্যেকেই দশ যোজন বিস্তৃত ও ঊর্দ্ধে উচ্ছ্রিত। এই চারিটি পর্ব্বত হইতে চারিটি নদী বহির্গত হইয়া চারিদিকে গমন করিয়াছে। তন্মধ্যে জম্বুনদী মেরুমন্দর পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া নিষধ, হেমকূট ও হিমালয়ের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষে পতিত হইয়া দক্ষিণ লবণজলধিতে গিয়া মিলিত হইয়াছে। অরুণোদা নামক নদী মন্দর পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া গন্ধমাদন পর্ব্বত ও ভদ্রাশ্ববর্ষের মধ্য দিয়া পূর্ব্বসমুদ্রে গিয়া পতিত হইতেছে। সুপার্শ্ব হইতে পঞ্চমধুধারা নামক

নদী নির্গত হইয়া মাল্যবান্ পর্ব্বত ও কেতুমান বর্ষের মধ্য দিয়া পশ্চিম-সমুদ্রে গিয়া নিপতিত হইতেছে এবং কামদুঘা নামক নদী কুমুদ পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া নিম্নাভিমুখে রম্যক, হিরণ্ময় ও কুরুবর্ষের মধ্য দিয়া উত্তর-সমুদ্রে গিয়া মিলিত হইতেছে। ইহা ছাড়া মেরুপর্ব্বতের পাদদেশে ২০টি কুলপর্ব্বত বর্ত্তমান আছে। এই মেরুর মূলদেশ হইতে সহস্র যোজন উপরে পূর্ব্বদিকে অষ্টাদশ সহস্র যোজন বিস্তৃত জঠর ও দেবকূট নামক দুইটি পর্ব্বত, পশ্চিমদিকে পবন ও পারিযাত্র নামক দুইটি পর্ব্বত, দক্ষিণদিকে কৈলাস ও করবীর নামক দুইটি পর্ব্বত এবং উত্তরদিকে ত্রিশৃঙ্গ ও মকর নামক দুইটি পর্ব্বত এইরূপে আটটি প্রধান পর্ব্বতশ্রেণী বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই মেরুর সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে শাতকুম্ভ নামক ব্রহ্মার পুরী, এবং তাহার আট দিকে অষ্টলোকপালগণের অমরাবতী, সংযমনী নামক আটটি পুরী বর্ত্তমান রহিয়াছে। মেরুর সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ ব্রহ্মলোক হইতে গঙ্গা নিপতিত হইয়া মেরুর চতুর্দ্দিকে গমন করিয়াছেন। ইহাদের নাম যথাক্রমে সীতা, অলকানন্দা, বক্ষু ও ভদ্রা। ইহার মধ্যে সীতা গন্ধমাদন হইয়া ভদ্রাশ্ববর্ষের দিকে, বক্ষু মাল্যবান্ হইয়া পশ্চিমদিকে কেতুমানবর্ষে, ভদ্রা উত্তরদিকে নীল, শ্বেত ও শৃঙ্গবান্ পর্ব্বত বাহিয়া উত্তর-কুরুবর্ষে এবং অলকানন্দা হিমালয়ে পতিত হইয়া ভারতবর্ষে গিয়া পতিত হইতেছে। এই চারিটি গঙ্গাই চারিদিকে লবণ-সমুদ্রে গিয়া পতিত হইতেছে। ইহাই লবণ-সমুদ্র-বেষ্টিত জম্বুদ্বীপ। এই জম্বুদ্বীপের বাহিরে আরও ছয়টি দ্বীপ ও ছয়টি সমুদ্রের বর্ণন দেবীভাগবতে বিশেষভাবে পাওয়া যায়। যথা—রাজা প্রিয়ব্রত রথচক্রের দ্বারা সপ্ত পরিখা নির্ম্মাণ করিয়া পৃথিবীকে সপ্ত ভাগে বিভক্ত করিলেন। ইহাই সপ্তদ্বীপরূপে কথিত হইল।

সপ্তদ্বীপের নাম যথা—জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর। এক একটি দ্বীপ উত্তরোত্তর ক্রমে দ্বিগুণায়তন, অর্থাৎ জম্বুদ্বীপের আয়তন যে পরিমাণ, প্লক্ষ তাহার দ্বিগুণ, শাল্মলী তাহার দ্বিগুণ ইত্যাদি। এই সাতটি পরিখা সপ্তসমুদ্ররূপে কথিত হইল। যথা—লবণ, ইক্ষু, সুরা, ঘৃত, ক্ষীর, দধি ও শুদ্ধজলসমুদ্র। তন্মধ্যে জম্বুদ্বীপ লবণসমুদ্রবেষ্টিত, প্লক্ষ ইক্ষুরসসমুদ্রবেষ্টিত, শাল্মলী সুরাসমুদ্রবেষ্টিত, কুশদ্বীপ ঘৃতসমুদ্রবেষ্টিত, ক্রৌঞ্চদ্বীপ ক্ষীরসমুদ্রবেষ্টিত, শাকদ্বীপ দধিসমুদ্রবেষ্টিত এবং পুষ্করদ্বীপ জলসমুদ্রবেষ্টিত। মহর্ষি বেদব্যাস যোগদর্শন-ভাষ্যে বলিয়াছেন যে, "সর্ব্বেষু দ্বীপেষু পুণ্যাত্মানো দেবমনুষ্যাঃ প্রতিবসন্তি" অর্থাৎ সমস্ত দ্বীপেই পুণ্যাত্মা দেবগণ ও মনুষ্যগণ বাস করেন। জম্বুদ্বীপের মধ্যেও যে নয়টি বর্ষের কথা বলা হইল, তন্মধ্যে ভারতবর্ষই কর্ম্মভূমি এবং অন্যান্য অ…ট বর্ষ পুণ্যশেষ উপভোগের স্থান ভৌমস্বর্গরূপে কথিত হইয়া থাকে। ইহাই হইল সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা। শৈবতন্ত্রে ইহার বিশেষ পরিমাণ উল্লিখিত হইয়াছে। "কোটিদ্বয়ং ত্রিপঞ্চাশল্লক্ষাণি চ ততঃ পরম্। পঞ্চাশচ্চ সহস্রাণি সপ্তদ্বীপা সসাগরা।" এইরূপে সপ্তদ্বীপ ও সপ্তসাগরবেষ্টিত ভূমির পরিমাণ ৫০ কোটি যোজন। ইহার নাম ভৌমস্বর্গ। এই স্বর্গ দেবতাগণের বিহারস্থানরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। দেবগণ বিহারের জন্য এই ভূমণ্ডলে আসিয়া বসবাস করিতেন, এবং বিশেষ বিশেষ স্থানের রক্ষাও করিতেন, ইহার বহু প্রমাণ পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়। শৈবতন্ত্রেও সেই জন্য "দেবানাং ক্রীড়নার্থায় লোকালোকস্ততঃ পরম্।" অর্থাৎ দেবতাদিগের ক্রীড়ার জন্যই লোকালোক পর্ব্বত বলা হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়েও যেমন শিমলা প্রভৃতি শৈলে বড় বড় লোকের শৈত্যাবাস, গ্রীষ্মাবাস আদি নির্ম্মিত হয়, দেবতাগণেরও তদ্রূপ বিহারের জন্য আবাসভূমি নির্ম্মিত ও রক্ষিত হইত।

মহাভারতেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, রাজা দুর্য্যোধন স্বীয় ধনৈশ্বর্য্য দেখাইয়া বনবাসী রাজা যুধিষ্ঠিরকে ক্ষুভিত করিবার উদ্দেশ্যে বনগমন করিয়া যখন চিত্ররথ নামক গন্ধর্ব্বের রক্ষিত উপবন বিনষ্ট করিয়া ধৃত ও বন্দী হইলেন, তখন রাজা যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন যে, এই গন্ধর্ব্ব শীঘ্রই স্বলোকে স্বর্লোকে গমন করিবে এবং প্রসঙ্গক্রমে ইন্দ্রের সভায় বর্ণন করিবে যে, কৌরব-পাণ্ডবগণের মধ্যে এমন কেহই বীর ছিল না যে, আমাকে পরাস্ত করিয়া রাজা দুর্য্যোধনকে মুক্ত করিতে পারে। আমি তাঁহাদের সকলকে পরাস্ত করিয়া দুর্য্যোধনকে বন্দী করিয়া আনয়ন করিয়াছি ইত্যাদি। আমি সব সহ্য করিতে পারিব, কিন্তু শত্রুর এই গর্ব্বোক্তি আমার পক্ষে অসহনীয় হইবে। ইহার দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে, সূক্ষ্মলোকবাসী হইয়াও যেমন গন্ধর্ব্বগণ ভূমণ্ডলে বন উপবন রক্ষা করিতেন, দেবতাদেরও সেইরূপ ছিল। মনে করুন, কৈলাস পর্ব্বত যদি মহাদেবের সর্ব্বদা বাসোপযোগী স্থান হইত, তাহা হইলে অর্জ্জুন যখন পাশুপত অস্ত্র লাভ করিবার জন্য গমন করিয়াছিলেন, তখন সোজাসুজি কৈলাসে শিবের ভবনে শিবের সাক্ষাৎ করিয়াই অস্ত্রলাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা না হওয়ায় অর্জ্জুনকে সেখানে গিয়া বহুকাল তপস্যা করিতে হইল, তাহার পরে আশুতোষ তুষ্ট হইয়া দর্শন দিলেন এবং পাশুপত অস্ত্র প্রদান করিলেন। ইহার দ্বারা সময়ে সময়ে আবির্ভাবের কথাই সিদ্ধ হয়। অর্জ্জুন যখন দিগ্বিজয়ে গমন করিয়াছিলেন, তখন তিনি 'ক্রমপুত্রেণ রক্ষিতম্' 'গন্ধর্ব্বরক্ষিতং'

অর্থাৎ কুবেরপুত্ররক্ষিত, গন্ধর্ব্বরক্ষিত দেশই জয় করিলেন। সুতরাং ঐ সমস্ত দেশও চিত্ররথ গন্ধর্ব্ব কর্ত্তৃক রক্ষিত উপবনের ন্যায় ছিল। বিশেষতঃ যদি ইন্দ্রাদি দেবতাগণের উহা চিরবাসভূমিই হয়, তাহা হইলে দিব্যস্বর্গে তাঁহাদের নিবাসের কথা থাকিত না। দেবতাদিগের যে কেবল জম্বুদ্বীপেই বিহারস্থান ছিল, তাহা নহে। অন্যান্য দ্বীপেও তাঁহাদের পৃথক্ পৃথক্ পুরীর বর্ণন পাওয়া যায়, যথা ভাগবতে পুষ্করদ্বীপবর্ণনপ্রসঙ্গে—"তদ্দ্বীপমধ্যে মানসোত্তরনামৈক এবার্ব্বাচীনাপরাচীন-বর্ষয়োর্মর্য্যাদাচলোঽযুতযোজনোচ্ছ্রায়ামঃ। যত্র তু চতস্রষু দিক্ষু চত্বারি পুরাণি লোকপালানামিন্দ্রাদীনাম্॥" অর্থাৎ পুষ্করদ্বীপে অর্ব্বাচীন ও অপরাচীন বর্ষের মধ্যে অযুতযোজন বিস্তৃত মানসোত্তর নামক পর্ব্বতের চারিদিকে ইন্দ্রাদি দেবতাগণের চারিটি পুরী বর্ণিত হইয়াছে। এই সমস্ত প্রমাণের দ্বারা ইহাই স্থির হইল যে, দিব্য স্বর্গে-ই দেবতাদের মুখ্য নিবাসস্থান, তবে ভৌমস্বর্গের সহিত তাঁহাদের বিহারের জন্য কিছু কিছু সম্বন্ধ আছে। সুতরাং ভৌম স্বর্গ-ই সব কিছু, ইহা ছাড়া অপর স্বর্গাদিলোক নাই, এরূপ বলিবার কোনও সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না।

ভৌমস্বর্গ-বর্ণন প্রসঙ্গে মহাভারত-ভাগবতাদির প্রমাণে আমরা বুঝিলাম যে, ইন্দ্র প্রভৃতি লোকপালগণের পুরী মেরু পর্ব্বতের অত্যুচ্চ শৃঙ্গে ব্রহ্মপুরীর চারিদিকে অবস্থিত। কিম্পুরুষবর্ষের উত্তরদিকে যম ও ইন্দ্রের রাজত্ব ছিল, এবং মানসের উত্তরদিকস্থ নিষধ পর্ব্বতের পূর্ব্বদিকে মঙ্গোলিয়ায় ইন্দ্রের বাড়ী ছিল, চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের এই কল্পনা সম্পূর্ণ অসঙ্গত। তিনি স্বীয় এই কল্পনা-পুষ্টির জন্য বিষ্ণুপুরাণের প্রমাণ দিয়াছেন যে—'মানসোত্তরশৈলে তু পূর্ব্বতো বাসবী পুরী।' এখানে 'মানসোত্তরশৈল' এই শব্দের দ্বারা মানসরোবরের কল্পনা আসে না, ইহা মানসোত্তর নামক পর্ব্বতবিশেষ। পুষ্করদ্বীপবর্ণনপ্রসঙ্গে ভাগবতেরও এইরূপ প্রমাণ আমি পূর্ব্বেই দিয়াছি। তাহার পরেই তিনি বলিতেছেন যে, এই ইলাবৃতবর্ষের এক নাম মঙ্গোলিয়া এবং এই দেশই তাঁহার রাজত্ব। ইলাবৃতবর্ষকে মঙ্গোলিয়া বলিয়া কল্পনা করিতে গিয়া তিনি যে সমস্ত যুক্তি দিয়াছেন, তাহার কোনও সার্থকতা নাই। কারণ, আমি পূর্ব্বেই প্রমাণিত করিয়াছি যে, ইলাবৃতবর্ষের মধ্যস্থিত যে ৮২ সহস্র যোজন উর্দ্ধে উচ্ছ্রিত মেরু পর্ব্বত, তাহারই শৃঙ্গদেশে দেবতাদিগের স্থান, ইলাবৃতবর্ষে একা মহাদেব ভিন্ন অন্য কেহ থাকিতেই পারে না, ভাগবতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়, যথা—"ইলাবৃতে তু ভগবান্ ভব এক এব পুমান্ ন হ্যন্যস্তত্রাপরো নির্ব্বিশতি ভবান্যাঃ শাপনিমিত্তজ্ঞঃ। যৎ প্রবেক্ষ্যতঃ স্ত্রীভাবস্তৎ পশ্চাৎ বক্ষ্যামঃ।" অর্থাৎ ইলাবৃতবর্ষে একমাত্র ভগবান্ ভবই বাস করেন, ভগবতীর শাপের জন্য সেখানে কেহ অদ্যাপি প্রবেশ করিতে পারে না, সেখানে প্রবেশমাত্রই যে স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়, সে কথা আমি পরে বলিব। এখন যদি চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কল্পিত ইলাবৃতবর্ষই মঙ্গোলিয়া হয়, তাহা হইলে মঙ্গোলিয়ার অধিবাসিগণ সকলেই স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইয়া বাস করিতেছেন কি? তা ছাড়া ইলাবৃতস্বামী বলিয়া তিনি যে মেরুকে আল্টাই বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই বা কিরূপে সম্ভবপর হয়? এই আল্টাই পর্ব্বতে গমন করিলেই কি পুরুষ স্ত্রী হইয়া যায়? ভাগবতকার বেদব্যাস কি মিথ্যাবাদী ছিলেন বা চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মত নিছক কাল্পনিক ছিলেন? তাহা নহে। ইলাবৃতবর্ষের মধ্যে যে সমস্ত পর্ব্বতের বর্ণন পাওয়া যায়, বর্ত্তমান ভূগোলের জ্ঞানে তাহা এখনও অনাবিষ্কৃত হইয়া রহিয়াছে। তপস্বী সাধক ব্যতিরেকে তাহার নির্ণয় কেহ করিতে পারে না। দ্বিতীয় কথা—যমের সংযমনীপুরী। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মতে মাশক দেশ বা বর্ত্তমান তিব্বত তাঁহার রাজধানী ছিল। তাহার হেতু তিনি দেখাইয়াছেন যে, এই প্রদেশ অত্যন্ত বাড়বানলসংযুক্ত ছিল এবং ইহা একটা প্রকাণ্ড জলাভূমির মত থাকায় অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর ছিল, এই জন্য উহাকে নরক বলা হইত। কি চমৎকার সিদ্ধান্ত! এ সম্বন্ধে তিনি আচার্য্য ভাস্করের প্রমাণ দিয়াছেন যে, 'বসন্তি মেরৌ সুরসিদ্ধসংঘা ঔর্ব্বে চ সর্ব্বে নরকাঃ সদৈত্যাঃ।" এখানে তিনি ঔর্ব্ব শব্দে বাড়বানল ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বস্তুতঃ ইহার অর্থ এই হইতেছে যে, মেরুপর্ব্বতে দেবতাগণ, সিদ্ধগণ, ঔর্ব্ব প্রভৃতি ঋষিগণ এবং দৈত্যগণের নরকসমূহ বর্ত্তমান আছেন। মেরু পর্ব্বতে যে নরকের স্থিতি—ইহা মেরুর উপর নহে, মেরুর নিম্নদেশে, যেহেতু, নরকের স্থান পৃথিবীর নিম্নপ্রদেশে, ভাগবতের প্রমাণ দিয়া তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। মেরুর পরিমাণ সম্বন্ধে ভাগবত বলেন যে, "মূর্দ্ধনি দ্বাত্রিংশৎযোজনবিততো মূলে ষোড়শসহস্রং তাবতান্তর্ভূম্যাং প্রবিষ্টঃ" অর্থাৎ এই মেরুর মস্তক ৩২ সহস্র যোজন এবং পৃথিবীতে প্রবিষ্ট ষোড়শ সহস্র যোজন এবং অবশিষ্ট ৫২ সহস্র যোজন পৃথিবীর উপরে স্থিত। বিষ্ণুপুরাণেও ঠিক এই কথাই পাওয়া যায় যে, "চতুরশীতিসাহস্রৈর্যোজনৈরস্য চোচ্ছ্রয়ঃ। প্রবিষ্টঃ ষোড়শাধস্তাদ্ দ্বাত্রিংশন্মূর্দ্ধ্নি বিস্তৃতঃ। মূলে ষোড়শসাহস্রো বিস্তারস্তস্য ভূভৃতঃ। এবং লক্ষ যোজনান্নাহ।" এইরূপে এক লক্ষ যোজন পরিমিত এই মেরুপর্ব্বত। সুতরাং পৃথিবীর অধঃপ্রবিষ্ট যে ষোড়শ সহস্র যোজন, তাহার মধ্যেই নরকের স্থিতি। ইহা স্বীকার না করিলে অন্যান্য প্রমাণসমূহ নিরর্থক হইয়া পড়ে।

অতএব এই প্রমাণের দ্বারা মানসের উত্তরপ্রদেশস্থ অস্বাস্থ্যকর স্থানে যমের সংযমনীপুরী, এরূপ কল্পনাও নির্ম্মূলক। এ সম্বন্ধে তিনি বায়ু-পুরাণের এক প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন—"দক্ষিণেন পুনর্মেরোর্মানসস্যৈব মূর্দ্ধনি। বৈবস্বতো নিবসতি যমঃ সংযমনে পুরে।" ইহার অর্থ হইতেছে এই যে, মেরুর দক্ষিণ-দিকে মানসের মস্তকে সংযমনপুরে যমের নিবাস। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, মেরুর দক্ষিণে নিষধ পর্ব্বত, নিষধের দক্ষিণে হেমকূট ও হেমকূটের দক্ষিণে হিমালয় পর্ব্বত, এই হিমালয় পর্ব্বতের উপরই তিব্বত প্রদেশ। সুতরাং ইহাকে মেরুর দক্ষিণে বলা যায় না, বিশেষতঃ 'মানসস্যৈব মূর্দ্ধনি' ইহার অর্থ তিনি করিয়াছেন, মানস সরোবর। কিন্তু সরোবরের মস্তক বলিতে কি বুঝায়? কেহ কি সরোবরের মস্তক কখনও কল্পনা করিতে পারেন? বস্তুতঃ ইহাও পুষ্করদ্বীপে বর্ণিত মানসোত্তর নামক পর্ব্বত এবং তাহারই শিখরদেশে যমের সংযমনী পুরী। যম যে মানুষ ছিলেন না, দিব্যস্বর্গ-বর্ণনের সময় তাহা বিশেষভাবেই দেখান হইয়াছে। যম-নচিকেতা-সংবাদ সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে যে, নচিকেতা পিতৃপরিত্যক্ত হইয়া কি ভাবে যমালয়ে গমন করিয়াছিল, তাহার কোনও বিবরণ উপনিষদে নাই। ইহা দুই প্রকারেই হইতে পারে, এক মৃত্যুর পরে, দ্বিতীয়তঃ পিতৃপ্রদত্ত শক্তিপ্রভাবে। স্থূল পার্থিব শরীর লইয়া যে সে যায় নাই, ইহা নচিকেতার প্রথম বর-গ্রহণেই প্রমাণিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ নচিকেতা যমের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন যে, হে যম! আমি যখন তোমার নিকট হইতে পিতার নিকটে গমন করিব, তখন যেন তিনি আমাকে চিনিতে পারেন। ইহাতেই বুঝা যায় যে, তিনি কোনও বিকৃত শরীর গ্রহণ করিয়াই যমলোকে গিয়াছিলেন। সুতরাং এই ঘটনাকে অবলম্বন করিয়াই যমকে মানুষবিশেষ কল্পনা করা অসঙ্গত। প্রেতলোক পিতৃলোক নহে, ইহা সত্য। প্রেতলোক হইতে পিতৃলোকের স্থান ভিন্ন হইলেও প্রেতলোকের সন্নিহিতই পিতৃলোকের স্থান পুরাণকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা ভাগবতে—"অন্তরাল এব ত্রিজগত্যাস্ত দিশি দক্ষিণস্যামধস্তাদ্ভূমেরুপরিষ্টাচ্চ জলাদ্ যস্যামগ্নিষ্বাত্তাদয়ঃ পিতৃগণা দিশি স্বানাং গোত্রাণাং পরমেণ সমাধিনা সত্যা এবাশিষ আশাসানা নিবসন্তি।" অর্থাৎ নরকের পার্শ্বে-ই পিতৃগণ নিবাস করিয়া নিজ বংশধরগণের কল্যাণকামনা করিয়া থাকেন। যম যে মৃত ব্যক্তিরই শাসক ছিলেন, ইহাও ভাগবতে পাওয়া যায়। যথা—"যত্র হ বাব ভগবান্ পিতৃরাজো বৈবস্বতঃ স্ববিষয়ং প্রাপিতেষু স্বপুরুষৈর্জন্তুষু পরেতেষু যথা কর্ম্মাবদ্যং দোষমেবানুল্লঙ্ঘিত ভগবচ্ছাসনঃ সগণো দমং ধারয়তি।" অর্থাৎ ভগবানের শাসনানুসারে যমরাজ মৃত ব্যক্তির দোষানুরূপ শাসনের বিধান করিয়া থাকেন। বরুণাদি দেবতা সম্বন্ধেও ঐ যুক্তি প্রযোজ্য হইতে পারে। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের জলতত্ত্বের অধিপতি বরুণ দেবতা। সমস্ত জলময় লোকই বরুণের রাজত্ব। ইহাই বরুণের দিব্যস্বর্গস্থান। বরুণাদি দেবতার ভৌমস্বর্গ ভাগবতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—"এবং নবকোটয় একপঞ্চাশল্লক্ষাণি চ যোজনানাং মানসোত্তরগিরিপরিবর্ত্তনস্যোপদিশন্তি, তস্মিন্নৈন্দ্রীং পুরীং পূর্ব্বস্মাৎ মেরোর্দেবধানীং নাম দক্ষিণতো যাম্যাং সংযমনীং নাম, পশ্চাদ্বারুণীং নিম্লোচনীং নাম, উত্তরতঃ সৌম্যাং বিভাবরীং নাম।" অর্থাৎ নয় কোটি একান্ন লক্ষ যোজন মানসোত্তর নামক পর্ব্বত। সেই পর্ব্বতে মেরুর পূর্ব্বদিকে ইন্দ্রের পুরী, মেরুর দক্ষিণে সংযমনী নামক যমের পুরী, পশ্চিমে নিম্লোচনী নামক বরুণের পুরী এবং উত্তরদিকে বিভাবরী নামে সোমের পুরী। অতএব আফগানিস্থান প্রভৃতি দেশে বরুণাদি দেবতার বাসস্থান কল্পনা করা কতদূর পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক, সহজেই অনুমেয়। তবে যে মহাভারতে 'বরুণপালিতাং' উল্লেখ করা হইয়াছে, উহাও গন্ধর্ব্বরক্ষিত উপবনের ন্যায়ই কল্পনা করা কর্ত্তব্য। ইহার পরে চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিতেছেন যে, অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, এই প্রজাপতি সূর্য্যকে আমরা আকাশস্থ জড়সূর্য্য বলিয়া ভাবিয়া থাকি। ইহা যে অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এরূপ কল্পনা পাশ্চাত্য শিক্ষাবিকৃতমস্তিষ্ক ব্যক্তিরাই করিয়া থাকেন। প্রাচীনরা এরূপ করিতেন না। তাঁহারা আদিত্যকে ভগবানের স্বরূপ বিবেচনা করিতেন। 'আদিত্যো ভগবান্ বিষ্ণুঃ' ইহাই তাঁহারা জানিতেন।

চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে যে, জড় সূর্য্য কিরূপে কশ্যপমুনির পুত্ররূপে অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিতে পারে? সুতরাং বলিতেই হইবে যে, সূর্য্য মানুষ ছিলেন। বাস্তবিকই কি তাহাই ঠিক? তাহা নহে। আধুনিক বিজ্ঞান যাহাকে জড় বলিয়া স্বীকার করেন, প্রাচীন ঋষিগণ সেই সমস্ত জড় পদার্থেরই মধ্যে জড় ও চেতন উভয় পদার্থেরই অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতেন। চেতনহীন জড় পদার্থ সংসারে কুত্রাপি উপলব্ধ হয় না। আধুনিক বিজ্ঞানাচার্য্য ডাক্তার জগদীশ বসুও প্রমাণিত করিয়াছেন যে, স্থূলাতিস্থূল প্রস্তরের মধ্যেও চেতনসত্তা বিদ্যমান রহিয়াছে, নতুবা তাহার হ্রাস-বৃদ্ধি হয় কিরূপে? যে বস্তু কেবল জড়, তাহার মধ্যে কোনও ক্রিয়াই হয় না। সেই জন্যই জড়ের প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই তাঁহারা দৈবসত্তা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন অগ্নিময় সূর্য্যলোকের সঞ্চালিকা চেতনশক্তিকে সূর্য্য ভগবান্ ব...

হইয়াছে। কশ্যপমুনির পুত্র সূর্য্য যদি তপস্যাপ্রভাবে স্বীয় সত্তাকে সূর্য্যের সত্তার সহিত মিলিত করিয়া সূর্য্যের আধিপত্য লাভ করেন, তাহা অসম্ভব হয় না। ইন্দ্রাদিদেবগণও ঐরূপে ইন্দ্রত্বাদি আধিপত্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মানুষ সাধনপ্রভাবে ব্রহ্মত্ব পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারে, এবং ঐ সমস্ত দেবপদও যে সীমাবিশিষ্ট, ইহাই শাস্ত্রকারগণের সিদ্ধান্ত। আগের মন্বন্তরে বলি ইন্দ্র হইবেন, এই ব্রহ্মার আয়ুঃ-শেষ হইলে হনুমান ব্রহ্মা হইবেন, এ সমস্ত কথাই পুরাণের মধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছে। প্রশ্নোপনিষদুক্ত সুকঠিন তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, শ্রদ্ধার সহিত ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়া আত্মানুসন্ধানের জন্য সূর্য্যলোকে গমন, কাশী, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে মানুষ-গুরুর নিকটে গমনের ন্যায় কিরূপে সম্ভাবিত হইতে পারে? কাশী প্রভৃতি স্থানে গমনের জন্য এত কঠিন তপস্যাদির আবশ্যক হয় না। বস্তুতঃ উক্ত তপস্যাদির দ্বারা "এষ বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ব্রহ্মা চৈব প্রজাপতিঃ" অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র এবং প্রজাপতির স্বরূপ সূর্য্যলোকে গমনই প্রমাণিত হইয়া থাকে। সুতরাং আদিত্য ও কাশ্যপেয় এই দুইটি শব্দ জড় সূর্য্যের সহিত জুড়িয়া দেওয়া হয় নাই, অথবা যোগানন্দ সরস্বতী মহোদয়ের মনঃকল্পিত ভগবানের পুত্র এরূপ অর্থেরও কোনও প্রয়োজন হয় না। সূর্য্য ও চন্দ্র যে কিরূপে সংবৎসর, অহঃ ও রাত্রি জনপদের অধিপতি ছিলেন, ইহার বিশেষ বিবরণ জ্যোতিষ-শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। সুতরাং ঐ বিষয় উত্থাপন করিয়া প্রবন্ধের কলেবরবৃদ্ধি করিব না। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রতি অনুরোধ, তিনি বিশেষরূপে সুবিজ্ঞ জ্যোতিষীর নিকট জ্যোতিষ শাস্ত্রের অধ্যয়ন করিলেই অহঃ, রাত্রি বা সংবৎসর যে জনপদ ছিল না, তাহা বেশ বুঝিতে পারিবেন। এই সমস্ত যুক্তিতর্ক ও প্রমাণাদির দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হইল যে, ভূলোকই যে সব কিছু, এইখানেই যে দেবতাদের বাসস্থান ছিল, ইহা ছাড়া স্বর্গাদি সূক্ষ্মলোক কিছুই ছিল না বা নাই, তাহা নহে, ভূলোকের অতিরিক্ত অন্যান্য লোক এবং দেবতাগণের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়া থাকে। মহর্ষি বেদব্যাস সেই জন্যই বলিয়াছেন যে—

"শ্রুত্বা যথা স্থূলসূক্ষ্মরূপং ভগবতো যতিঃ।
স্থূলে নির্জ্জিতমাত্মানং শনৈঃ সূক্ষ্মং ধিয়া নয়েৎ।"

অর্থাৎ যোগী ভগবানের স্থূল-সূক্ষ্মরূপ অবগত হইয়া স্থূলে আবদ্ধ আত্মাকে ধীরে ধীরে বুদ্ধিসংযোগে সূক্ষ্মরাজ্যে উন্নীত করিতে চেষ্টা করিবেন। স্থূলই সব কিছু—'যেন কেনাপি সুখং বসেৎ।' 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ' এই চার্ব্বাক পন্থা কখনও শ্রেয়স্কর হইতে পারে না।

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ বেদান্তশাস্ত্রী (অধ্যাপক, সনাতন ধর্ম্ম কলেজ)।

রামায়ণ

রামায়ণ কবিগুরু মহর্ষি বাল্মীকির আদি মহাকাব্য। এই মহাকাব্য অবলম্বন করিয়া বেদব্যাস মহাভারত নির্ম্মাণ করেন, ইহা পরে দেখান হইবে। কালিদাস, ভবভূতি, কৃত্তিবাস, তুলসীদাস প্রভৃতি কবিগণও ইহার অংশবিশেষ অবলম্বনে যে নিজ নিজ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, উক্ত উভয় গ্রন্থ পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। কালিদাসের রাবণবধের পর পুষ্পকারূঢ় রাম যে সীতাকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে চিত্রকূট পর্য্যন্ত স্থান দেখাইয়াছেন, ঐ বর্ণনা বাল্মীকির অনুরূপ অন্য অনেক স্থানেও ছায়া গ্রহণ করিয়াছে। ভবভূতির উত্তর-রামচরিতে, পদ্মপুরাণের পাতাল-খণ্ডীয় রামাশ্বমেধ প্রকরণ অবলম্বিত হইলেও কাব্যাংশে বাল্মীকির অনুকরণ যথেষ্ট রহিয়াছে। পর্ব্বতাদি বর্ণন বাল্মীকির নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। কৃত্তিবাস ও তুলসীদাস অধ্যাত্ম-রামায়ণ অবলম্বনে নিজ নিজ গ্রন্থ রচনা করিলেও মূলতঃ তাঁহারা বাল্মীকিরই অনুসরণ করিয়াছেন।

এই মহর্ষি বাল্মীকি নিজ পরিচয় সম্বন্ধে ভার্গব (১) এবং প্রচেতার দশম পুত্র (২) প্রাচেতস (৩) বলিয়াছেন।

প্রচেতস্ নাম অনেকের দেখা যায়। সপ্তর্ষিগণের এক জনের নাম প্রচেতস্, বরুণের নাম প্রচেতাঃ, এবং পৃথুর বংশধর প্রাচীনবর্হির দশ পুত্র প্রচেতস্; উঁহাদের পুত্র দক্ষ। ইহার অতিরিক্ত কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

মনুপ্রোক্ত ব্রহ্মার মানস দশ পুত্রই পারিভাষিক সপ্তর্ষি, তাহার অন্তর্গত প্রচেতার দশম পুত্র বাল্মীকি হইতে পারেন, পৃথুর বংশীয় প্রচেতোগণের বংশধর বাল্মীকি নহেন, উঁহারা স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরীয়, কবি বৈবস্বত মন্বন্তরের লোক।

বরুণেরও একটি নাম প্রচেতাঃ।

বাল্মীকির নাম মহাভারতে বা অন্য পুরাণে থাকিলেও ইহার অধিক পরিচয় পাওয়া যায় না।

অধ্যাত্মরামায়ণে চিত্রকূটস্থ কুলপতি বাল্মীকি নিজমুখে রামের নিকট যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্তার্থ এই;— "বাল্মীকি ব্রাহ্মণের সন্তান হইলেও কিরাতগণ সহ বর্দ্ধিত ও দুশ্চরিত্র হওয়ায় শূদ্রার গর্ভে তাঁহার বহু সন্তান হয়, তাহাদের পোষণার্থ চৌর্য্য ও দস্যুবৃত্তি করেন। একদা সপ্তর্ষিগণকে আক্রমণ করাতে

(১) ভার্গবেণ তপস্বিনা ৭।১০৭।২৫
(২) প্রাচেতসোঽহং দশমঃ পুত্রো রাঘবনন্দন।৭।১০৯।১৮
(৩) মুনিঃ প্রাচেতসস্তদা, বাল্মীকিঃ পরমোদারস্তুষ্ণী-মাসীন্মহামুনিঃ। ৭।১০৬।১৬

তাঁহাদের বাক্যে নিজ পরিজনের নিকট জিজ্ঞাসায় যখন জানিলেন, তাঁহারা চৌর্য্যলব্ধ দ্রব্য উপভোগ করিলেও তৎকৃত পাপের অংশ গ্রহণ করিতে সম্মত নহেন, তখন ঐ বাক্যে বৈরাগ্য হয় এবং সপ্তর্ষিদের কথায় 'মরা' শব্দ জপ করায় বল্মীকস্তূপে পরিণত হন, পরে ঐ ঋষিগণ আসিয়া উঁহাকে বাহির করেন। বল্মীক হইতে নির্গত হওয়ায় বাল্মীকি নাম হয়"। ২।৬

কৃত্তিবাস ইঁহার পূর্ব্বনাম দিয়াছেন 'দস্যু রত্নাকর' এবং চ্যবন মুনির পুত্র বলিয়াছেন। সম্ভবতঃ রামায়ণে ভার্গব বলায় চ্যবনের পুত্র বলিয়া থাকিবেন। ভৃগুর বংশে যখন কেহ প্রচেতাঃ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না, তখন ভার্গব শব্দে ভৃগুর শিষ্য বুঝিতে হইবে।

বাল্মীকি নিজ পিতার নাম প্রচেতা বলিয়া নির্দ্দেশ করা সত্ত্বেও কৃত্তিবাস কেন চ্যবনমুনির পুত্র বলিয়াছেন, তাহা বুঝা যায় না। অধ্যাত্মরামায়ণোক্ত বাল্মীকিকে রামায়ণকার বলিয়া বর্ণনা করা হয় নাই, বাল্মীকির রামায়ণেও চিত্রকূটে এক জন কুলপতি বাল্মীকির কথা আছে—তিনি পরে চিত্রকূটের অবিদূরে অশ্বের আশ্রমে গিয়াছিলেন, তখন তিনি অত্যন্ত জরাজীর্ণ বৃদ্ধ। ২।১১৪।

রামায়ণ-টীকায়—নাগেশ ভট্টও ইঁহাকে রামায়ণকার হইতে ভিন্ন বলিয়াছেন।

বাল্মীকি সীতার বিশুদ্ধিকালে রাজসভায় নিজ পরিচয়দানকালে প্রচেতার পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করায় ও অন্য পরিচয়ের প্রয়োজন বোধ না করায় প্রচেতা সপ্তর্ষির অন্যতম বলিয়া বুঝা যায়।

বাল্মীকি যে কোন সময় মিথ্যা বলেন নাই এবং অজিতেন্দ্রিয় ছিলেন না, তাহাও ঐ শপথবাক্য হইতে জানা যায়। তিনি বলিলেন, "হে রাম, সীতাগর্ভসম্ভূত বালকদ্বয় তোমারই, ইহা সত্য। জীবনে কখনও মিথ্যা বলি নাই, বহুসহস্র বৎসর তপস্যা করিয়াছি, মৈথিলী পাপযুক্তা হইলে আমি তাহার ফল যেন পাই না। কায়, মনঃ ও বাক্য দ্বারা কখনও পাপ করি নাই—তাহার ফল সীতা নিষ্পাপ হইলে আমি যেন ভোগ করিতে পারি"। ৭।১০৯।১৮।২০। এই শপথ হইতে কখনও তিনি যে দস্যু অজিতেন্দ্রিয় ছিলেন; তাহা বুঝা যায় না।

অধ্যাত্মরামায়ণোক্ত বাল্মীকি রামায়ণকর্ত্তা নহেন। নাম-সাদৃশ্যে মুগ্ধ কৃত্তিবাস কবির জীবনের অযথা অপযশঃ ঘোষণা করিয়া রাম নামের মাহাত্ম্য প্রচার করিলেও লোকচক্ষুতে তাঁহাকে অজিতেন্দ্রিয় বলিয়া দেখান অত্যন্ত গর্হিত হইয়াছে।

এই বাল্মীকিই দশরথের সখা ছিলেন। সীতানির্ব্বাসনকালে রাম বাল্মীকির আশ্রমে সীতা বিসর্জ্জন দিতে বলিয়াছিলেন, এক জন হীন চরিত্রের লোক পরে তপস্যা দ্বারা সাধু হইলেও লোকাপবাদভীত রাজা কিরূপে তাহারই আশ্রমে নিজ পত্নীর বিসর্জ্জন দিতে পারেন ? ফল কথা, কৃত্তিবাসের কবি-সম্বন্ধীয় এ গল্পকথায় আমরা বিশ্বাস করি না, পরন্তু তাঁহাকে দোষী বলিয়া মনে করি।

অথবা 'ভৃগুর্বৈ বারুণিঃ' এই শ্রুতি দ্বারা বরুণ হইতে দশম বাল্মীকি, ইহা হইলে ভার্গব ও প্রাচেতস দুই সুসঙ্গত হয়। বিষ্ণুপুরাণে আছে—'ঋক্ষোঽভূদ্‌ভার্গবস্তস্মাদ্বাল্মীকির্যোঽভিধীয়তে।' ইহা দ্বারা বাল্মীকির পূর্ব্ব-নাম ঋক্ষ পাওয়া যায়। 'চর্ষণী বরুণস্যাসীদ্ যস্যাং জাতো ভৃগুঃ পুনঃ, বাল্মীকিশ্চ মহাযোগী বল্মীকাদভবৎ কিল।' ভাগবত ৪-৫ শ্লোক ১৮ অধ্যায় ৬ষ্ঠ স্কন্ধ।

রামায়ণ নারায়ণ শিবায়ন পরায়ণবৎ সিদ্ধ অথবা রামকে যাহা দ্বারা জানা বা পাওয়া যায়, উহার নাম রামায়ণ। রাম + অয় + যুট, অথবা অয়ন শব্দে স্থান, রামের স্থান অর্থাৎ এই মহাকাব্যবাচ্য রামের স্থান যাহাতে, সেই পুস্তকের নাম রামায়ণ। 'রামায়ণ' সংজ্ঞা শব্দ। রামঃ অয্যতে প্রতিপাদ্যতে অনেন' ইতি রামায়ণঃ।

এই মহাকাব্যের শ্লোকসংখ্যা ২৪ হাজার। কবি বলিয়াছেন, ইহা সাত কাণ্ডে ৫০০ সর্গে গ্রথিত হইয়াছিল, দীর্ঘকালে উহার ব্যতিক্রম হইয়া ২৪১১৮ শ্লোক ও ৬৬০ সর্গ হইয়াছে। ইহা কোন কোন মুদ্রিত পুস্তকে দেখা যায়।

কাণ্ড শব্দে অংশবিশেষ বুঝা যায়, প্রধান প্রধান অংশবিশেষই কাণ্ড দ্বারা বিভক্ত হইয়াছে। সাতটি কাণ্ডের নাম আদি বা বাল, অযোধ্যা, অরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা, লঙ্কা ও উত্তর এই ছয়টি নাম শুনিলেই উহার অর্থ বুঝা যায়। পরন্তু একটি কাণ্ডের সুন্দরকাণ্ড নাম কেন হইল, তাহা বুঝা যায় না। কেহ কেহ বলেন, ঐ কাণ্ডের বর্ণনা অতি সুন্দর বলিয়াই উহার নাম সুন্দরকাণ্ড হইয়াছে। অপরগুলি অযোধ্যা অরণ্য কিষ্কিন্ধ্যা লঙ্কা স্থানচতুষ্টয়ের কথা লইয়াই বর্ণনা বলিয়া ঐরূপ নাম। রামের বাল্যচরিত লইয়া বালকাণ্ড এবং শেষ চরিত্র লইয়া উত্তরকাণ্ড লিখিত হইয়াছে।

রামায়ণ মহাকাব্য ইতিহাস বা পুরাণ নহে, কারণ, সূর্য্যবংশের ধারাবাহিক ইতিহাস উহাতে নাই, এমন কি, দশরথেরও সকল বৃত্তান্ত বর্ণিত হয় নাই এবং লব-কুশেরও নাই, মাত্র রামচরিত্র বর্ণন করাই কবির অভিপ্রেত। নারদের নিকট আদর্শ-চরিত্র মানবের কথাই তিনি প্রথমে শুনিতে চাহিয়াছিলেন, নারদও আদর্শস্বভাব রামের বৃত্তান্তই বর্ণন করেন এবং বাল্মীকি উহা সমাধিযোগে করামলকবৎ প্রত্যক্ষ করিয়া রচনা করিয়াছেন। ইহা কবির নিজের উক্তি। দশরথ সম্বন্ধে যেটুকু বর্ণনা আছে, উহা

রামচরিত্র সম্বন্ধে। সূর্য্যবংশের যে নামাবলী বশিষ্ঠদেব জনকের সভায় বলিয়াছেন, উহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইলেও অসম্পূর্ণ। মনু হইতে রাম ৩১শ বলা হইয়াছে, অথচ অন্যান্য পুরাণে রাম ৩৫ সংখ্যক বর্ণিত হইয়াছেন, ৩৪ জন রাজার নামই উল্লিখিত হয় নাই। অথচ নহুষ ও যযাতি এই দুইটি অতিরিক্ত নাম যোজিত হইয়াছে এবং নামগুলিও পরম্পরাক্রমে লিখিত নহে। মান্ধাতা ও অনরণ্যমধ্যে রামায়ণে ৬ষ্ঠ অনরণ্য, ১১শ মান্ধাতা; পুরাণ সকলে ২০শ মান্ধাতা ২৫শ অনরণ্য আছে। আমরা এই বিষয়ে কিছুই বলিব না, যে হেতু, সত্যঘটনামূলক রামায়ণ মহাকাব্য ইতিহাস বা পুরাণ নহে, ইহাতে পুরাণের পঞ্চলক্ষণ—সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর, বংশানুচরিতও অন্যান্য পুরাণাদির ন্যায় নাই, সামান্য রকমে মন্বন্তর ব্যতীত সকল কথাই একটু একটু আছে। মধুসূদন সরস্বতী প্রস্থানভেদত্রয়ে রামায়ণকে ধর্ম্মশাস্ত্রের অন্তর্গত বলিয়াছেন। চতুর্দ্দশ বিদ্যার অন্তর্গত রামায়ণ ও মহাভারত ধর্ম্মশাস্ত্রের অন্তর্গত।

রামায়ণ আলোচনার আবশ্যকতা

এই গ্রন্থ আস্তিক হিন্দুমাত্রের নিকট বেদতুল্য প্রমাণ বলিয়া গণ্য ও পূজ্য হইলেও আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায় প্রতীচ্য গুরুর উপদেশে এই গ্রন্থের নানা জাতীয় সমালোচনা করিয়াছেন। অর্দ্ধ-শতাব্দী পূর্ব্বেও ঐ জাতীয় সমালোচনা কেহ পড়িত না, বরং ঘৃণাভরে উপেক্ষাই করিত। এখন সে কাল-দিন নাই, দেশের অধিকাংশ লোকই প্রতীচ্য শিক্ষায় এবং প্রতীচ্য সভ্যতায় শ্রদ্ধা-বান্, সুতরাং এ সম্বন্ধে নির্ব্বাক্ থাকিলে বা উপেক্ষা করিলে আর চলে না। ঋষিগণ বলিয়াছেন, "ক্ষমায় বহুগুণ থাকিলেও একটি দোষ আছে যে, ক্ষমাশীলকে লোকে অশক্ত মনে করে," এ ক্ষেত্রেও তাহাই দাঁড়াইয়াছে। সনাতন হিন্দুদের বক্তব্য কি, তাহা বিবৃত করিবার জন্য তাহাদের এবং অন্যান্য রামায়ণের বহিরঙ্গ ও আভ্যন্তরীণ বিষয়ের আলোচনা করিব।

প্রতীচীর পরোৎকর্ষাসহিষ্ণু বিদ্বন্মণ্ডলী ও তাঁহাদের শিষ্য-গণ রামায়ণকে মহাভারতাপেক্ষা অর্ব্বাচীন বলেন। ইহার প্রধান কারণ, রামায়ণের নায়িকা সীতা আদর্শ-সতী, এবং সর্ব্বত্র সতীর প্রশংসায় পূর্ণ, এবং ব্যভিচার নিন্দিত হইয়াছে। মহাভার-তের নায়িকা এবং নায়িকার শ্বশ্রূ তৎশ্বশ্রূ সকলেরই বহু স্বামী বর্ণিত হইয়াছে, কবিও কানীন এবং ঋষির ব্যভিচার বর্ণিত আছে, সুতরাং বুঝিতে হইবে, মহাভারতের সময়ে ব্যভিচার নিন্দনীয় ছিল না। উহা আর্য্যদের প্রথমাবস্থার কথা। প্রথমে স্ত্রীগণ অনাবৃত ছিল, সকলেই ভোগ করিত, এমন কথাও মহাভারতে আছে, রামায়ণে বানর জাতির মধ্যের ব্যভিচার পর্য্যন্ত নিন্দা করা হইয়াছে এবং বালীকে রাম ঐ কারণেই বধ করিয়াছিলেন। সুতরাং রামায়ণ সমাজগঠনের পর রচিত, মহাভারতের সময়ে গঠন আরম্ভ হইয়াছিল মাত্র।

এই যুক্তি বিচারসহ নহে। (১) রামায়ণাপেক্ষা মহাভারতে সতীর মাহাত্ম্য কম বর্ণিত হয় নাই। পতিব্রতার উপাখ্যান, সাবিত্রী-সত্যবানের কথা, সতীর দেহত্যাগের কথা প্রভৃতি বহু কথাই আছে। মহাভারত কলির ১২ শত বৎসর অতীত হইলে লেখা হয়। তখন সমাজে বহু ব্যভিচার ঘটিয়াছে, রামায়ণের সময়ে সমাজ সুদৃঢ়, শাসকগণ অবহিতভাবে প্রজাপালন করিতে-ছেন, সমাজের কোন দিকেই একটা গলদ প্রবেশ করিতে পাবে নাই। মহাভারতে অম্বালিকা, অম্বিকা, কুন্তী, মাদ্রী ও দ্রৌপদীর বহুপতিকতার কৈফিয়ৎ আছে, যেখানে একটু শৈথিল্য বা ব্যভিচার, সেই স্থানেই ঐরূপ কৈফিয়ৎও আছে, উহা তৎকালীন সমাজে অত্যন্ত নিন্দিত না হইলে ওরূপ কৈফিয়ৎ দিতে হইত না।

(২) দ্রৌপদীর বিবাহ সম্বন্ধে বেদব্যাস অনেক কৈফিয়ৎ দিয়াছেন, বিচার করিয়া দেখিতে গেলে এই বিবাহে যুধিষ্ঠির ও কুন্তী অপূর্ব্ব রাজনীতিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। এই বিবাহ হইতেই প্রবলপরাক্রান্ত কৌরবের প্রতিদ্বন্দ্বী সৃঞ্জয়গণ পাণ্ডবের পক্ষ হয়। ভবিষ্যতে সুসমৃদ্ধ ও জনবলে বলীয়ান্ পরাক্রান্ত কৌরবগণের সহিত যে যুদ্ধ করিতেই হইবে, অন্যথা নিজরাজ্য-মধ্যে অবস্থান করিতেও পারা যাইবে না, ইহা ভীমকে বিষদান ও বারাণাবতের জতুগৃহদাহ হইতেই যুধিষ্ঠির বুঝিয়াছিলেন। তাই এই পরাক্রান্ত জাতিকে এইভাবে হস্তগত করা হয়। অর্জ্জুন একা দ্রৌপদীকে বিবাহ করিলে সৌভ্রাত্র থাকিবে না, এই ভয় যুধিষ্ঠির নিজেই করিয়াছিলেন, ধর্ম্মসঙ্গত কারণ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন স্বয়ংই লিখিয়াছেন। কৌরবপক্ষ এ বিবাহকে ধর্ম্মসঙ্গত বলিয়া মানিলে রাজসভায় দ্রৌপদীকে আনিয়া সর্ব্বজন-সমক্ষে অপমান করিতে নিশ্চয়ই কুণ্ঠাবোধ করিতেন, এবং ভীষ্ম ও দ্রোণ ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেন, তাঁহারা 'অর্থস্য পুরুষো দাসঃ' এই মাত্র বলিয়া নিরস্ত থাকিতে পারিতেন বলিয়া বোধ হয় না।

সুতরাং দ্রৌপদীর বিবাহ রাজনৈতিক ব্যাপার মাত্র। অম্বালিকা অম্বিকা কুন্তী মাদ্রীর নিয়োগবিধি অনুসারে অপর দ্বারা পুত্রলাভ বর্ণিত হইয়াছে, উহার নাম ব্যভিচার নহে, উহা ধর্ম্মসঙ্গত উপায়ে পুত্রলাভ। সূর্য্যবংশেও রামের বহু পূর্ব্বতন রাজা সৌদাসের স্ত্রী মদয়ন্তীর নিয়োগবিধি অনুসারে পুত্রপ্রাপ্তি হইয়াছিল, দীর্ঘতমা, বৃহস্পতি প্রভৃতি ঋষির যে ব্যভিচার উক্ত হইয়াছে, উহার মধ্যে দীর্ঘতমার নিয়োগানুসারে বৃহস্পতির প্রকৃত ব্যভিচার, কিন্তু উহা সত্যযুগের ঘটনা। বিবাহপ্রথা-সম্বন্ধ

বিচার নিয়ন্ত্রিত হইবার পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। সত্যসঙ্কল্প ঋষিদের চরিত্রের সমালোচনা করিবার যোগ্যতা আমাদের নাই। অনেকে মনে করেন, বৌদ্ধ বিপ্লবের পর বৌদ্ধগণ কর্ত্তৃক দেবতা ও ঋষিদের চরিত্রে এইরূপ দোষের কথা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। রামায়ণেও রেণুকার ও অহল্যার ব্যভিচার ও শাসন উভয়েই বর্ণিত হইয়াছে। মহাভারতের সময়েও সতীত্বের বহু গৌরব ছিল, তাহা মহাভারত পাঠেই জানা যায়। সতীর পতিনিন্দা শ্রবণে দেহত্যাগ, অনসূয়ার পাতিব্রত্যবলে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবকে পুত্ররূপে প্রাপ্তি প্রভৃতি অনেক ঘটনাই আছে। প্রথমে সতীত্বের আদর্শ উচ্চ ছিল, কালপ্রভাবে উহা ক্রমশঃ শিথিল হইয়াছে, ইহা ১ শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান কালের স্ত্রীচরিত্র আলোচনা করিলেও বুঝা যাইতে পারে। সকল যুগেই সতী ও ব্যভিচারিণীর কথা শুনা যায়। রামায়ণের লিপি দ্বারা কোনরূপেই এ কথা প্রমাণ হয় না যে, মহাভারত রামায়ণাপেক্ষা আদর্শ-সতীত্বের বর্ণনায় পশ্চাৎপদ, এই সকল অসার যুক্তির সাহায্যে রামায়ণকে পরবর্ত্তী বলা তাহাদেরই শোভা পায়—যাহারা "বাল্মীকির ব্যাকরণজ্ঞান কম ছিল, কারণ, যুদ্ধহীন কাণ্ডকে অযোধ্যাকাণ্ড বলিতে গিয়া অযোধ্যা লিখিয়াছেন" এইরূপ সমালোচনা করিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। গান্ধারীর পাতিব্রত্য, মাদ্রীর সহমরণবর্ণন এই উভয় ঘটনা দ্বারা পাতিব্রত্যের উৎকর্ষ ও নিয়োগবিধিতে ব্যভিচারাভাব প্রতীত হয়।

(৩) রামায়ণ যে মহাভারতের পূর্ব্বে লেখা হইয়াছে, তাহা একটু ধীরভাবে পড়িলেই বুঝা যাইবে। রামায়ণে সহমরণের উল্লেখ নাই; মহাভারতে মাদ্রীর সহমরণের উল্লেখ আছে। সহমরণ পূর্ব্বে ছিল না, থাকিলে ৭ শত ৫০টি দশরথস্ত্রীগণের মধ্যে কেহ সহমৃতা হইত। রামায়ণের কালে বিধবার প্রথম কল্প ব্রহ্মচর্য্যপালনে সামর্থ্য থাকায় দ্বিতীয় কল্প সহমরণপ্রথা ছিল না, পরে ব্রহ্মচর্য্যরক্ষায় অসমর্থ মনে করিয়া সহমরণপ্রথা প্রচলিত হয়।

(৪) রামায়ণে কোন দার্শনিক তত্ত্ব বর্ণিত হয় নাই, মহাভারতে সকল দর্শনেরই উল্লেখ আছে; বিশেষ করিয়া সাংখ্যের কথা এত অধিক আছে যে, মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বাধ্যায়ের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সাংখ্যের কথাতেই পূর্ণ। রামায়ণ-রচনাকালে কোন আস্তিক দর্শন রচিত হয় নাই বলিয়া বুঝা যায়। বাল্মীকি কপিলের কথা বহুবার বলিলেও তাঁহার দর্শনের কোন কথা বলেন নাই, কেবল এক স্থানে লোকায়তিক মত উক্ত হইয়াছে। ২।১১৩ সর্গে রামের বাক্যে জাবালিকে বুদ্ধ তথাগত বলা হইয়াছে দেখিয়া কেহ কেহ রামায়ণকে মহাভারতের পরবর্ত্তী বলেন। উঁহারা ঐ শ্লোকের পূর্ব্ব-শ্লোক পড়িলে এইরূপ বলিতে পারিতেন না। উহা দ্বারা নাস্তিকবুদ্ধিযুক্ত অর্থেই বুদ্ধ তথাগত শব্দ জাবালির উপর প্রযুক্ত হইয়াছে। যদি 'সর্ব্বজ্ঞঃ সুগতো বুদ্ধো ধর্ম্মরাজস্তথাগতঃ' এই পর্য্যায়বোধক বুদ্ধ হয়, তথাপি শাক্যসিংহ বুদ্ধের কথা বলা হয় নাই, লঙ্কাবতার সূত্রে শাক্যসিংহের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী বুদ্ধ তথাগত বর্ণিত হইয়াছে। বাল্মীকি ব্যাসের পরবর্ত্তী নহেন, তিনি তাহার বহু পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন।

(৫) মহাভারতে বহু স্থানে বাল্মীকির নাম আছে (শান্তি ৪৭ অধ্যায় ৮ শ্লোক), রামায়ণে ব্যাসের নাম নাই।

(৬) মহাভারতে এবং প্রায় সকল পুরাণেই রামায়ণের ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। রামায়ণে মহাভারতীয় ঘটনার কোন উল্লেখ নাই, এমন কি, রামায়ণে প্রসিদ্ধ সকল পৌরাণিক ঘটনার উল্লেখে শত উপাখ্যান বর্ণনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে ভারতযুদ্ধের বা কৌরব-পাণ্ডব-সৃঞ্জয়-যাদবগণের কোন ঘটনার উল্লেখ করেন নাই।

(৭) রামায়ণে কেবল রাম-চরিত্রই বর্ণিত হইয়াছে, কোন তীর্থ, ব্রত, ধর্ম্মকথা বর্ণিত হয় নাই। মহাভারতে বা অন্য পুরাণসমূহে ঐ সব কথা বহুলভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

(৮) রামায়ণে ত্রিবর্গের কথা আছে, যাহা নীতিশাস্ত্রেও আছে, দার্শনিকদিগের চতুর্ব্বর্গের কথা নাই। মোক্ষ অপবর্গকথা দার্শনিকদিগের, মহাভারতে একটি পর্ব্বাধ্যায়ের নাম মোক্ষধর্ম, রামায়ণের সময়ে কোন দর্শন রচিত হয় নাই অপবর্গ-কথাও নাই।

(৯) রামের রাজ্যাভিষেকের পর সীতানির্ব্বাসনের পূর্ব্বে রামায়ণ রচিত হইয়াছিল, এ কথা কবি নিজে বলিয়াছেন। (১।৪।১) রামের অধস্তন ৩১শ সংখ্যক রাজা বৃহদ্বল ভারতযুদ্ধে অভিমন্যুহস্তে নিহত হয়েন, সুতরাং মহাভারতের বহু পূর্ব্বে যে রামায়ণ রচিত, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই।

(১০) মহাভারতে যে ষোড়শরাজিকের উপাখ্যান বহুবার উক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে দাশরথি রাম অন্যতম।

(১১) "রামায়ণং মহাকাব্যমাদৌ বাল্মীকিনা কৃতম্, তন্মূলং সর্ব্বকাব্যানামিতিহাসপুরাণয়োঃ। সংহিতানাঞ্চ সর্ব্বেষাং মূলং রামায়ণং মতম্। তদেবাদর্শমারাধ্য বেদব্যাসো হরেঃ কলা। চক্রে মহাভারতাখ্যমিতিহাসং পুরাতনম্।"—বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ পূর্ব্বখণ্ড ২৫ শাধ্যায় ২৮-৩০।

রামায়ণ আদিকাব্য, উহাই মহাভারতের আদর্শ এবং তদবলম্বনে যে মহাভারত লিখিত, ইহা পরে প্রদর্শন করাইব।

(১২) 'ইদং কবিভ্যঃ পূর্ব্বেভ্যঃ।'—উত্তরচরিত ১ম শ্লোক। 'আদ্যঃ কবিরসি'—উত্তরচরিত ২য় অঙ্ক।

"জাতে জগতি বাল্মীকৌ কবিরিত্যভিধাঽভবৎ।
কবী ইতি ততো ব্যাসে কবয়স্ত্বয়ি দণ্ডিনি।"—উদ্ভট

'বল্মীকাদজনি প্রকাশিতগুণা ব্যাসেন লীলাবতী' ইত্যাদি উদ্ভট কবিবাক্য ও কিম্বদন্তী বাল্মীকিকেই ব্যাসাপেক্ষায় প্রাচীন বলিয়া দেন। আরও বহু প্রমাণ থাকিলেও লিখিবার আবশ্যকতা নাই। আমি মাত্র দুই চারি জন প্রতীচ্য পণ্ডিতের মতখণ্ডনার্থ এত কথা বলিতাম না, দুঃখের বিষয়, ভারতীয় কয়েক জন ব্রাহ্মণপণ্ডিতও ঐরূপ মত পোষণ করেন, ইহা জানা গিয়াছে, সেই জন্যই এই প্রমাণ সকল উপন্যস্ত হইল। জানি না, ইহা দ্বারা তাঁহাদের মত পরিবর্ত্তিত হইবে কি না। এইরূপ মত তাঁহাদের ইংরেজী শিক্ষার দ্বারা বড় বড় সাহেবের অভিমত পাঠে জন্মিয়াছে, ঋষিদের গ্রন্থ খুলিয়া নিজেদের পূর্ব্বপুরুষগণের সিদ্ধান্ত ঠিক কি না, তাহা তাঁহারা ভাবেন নাই। যদি এই ক্ষুদ্র ব্যাপারটি একবার ভাবিয়া দেখিতেন, তবে ঐরূপ যুক্তিপ্রমাণহীন মত প্রচার করিতে সাহসী হইতেন না। রাজাদির জন্মসময়বর্ণন প্রসঙ্গে রাশির উল্লেখ থাকায় ও মহাভারতে না থাকায় মহাভারতাপেক্ষা রামায়ণকে অর্ব্বাচীন যাঁহারা বলেন, তাঁহারা বিরাট পর্ব্বে ভীষ্মোক্ত পাণ্ডবদের সময়পূর্ত্তির বিচারে মলমাসের উল্লেখ আছে, উহা রাশি ব্যতীত হয় না, এ কথা একবার ভাবিয়া দেখিবেন।

রামায়ণ-রচনার কাল মহাভারতের রচনাকালের ন্যায় স্পষ্ট জানিতে পারা যায় না, তবে কয়েকটি প্রমাণ দ্বারা একটা আনুমানিক সময় নির্দ্দেশ করা যায়।

উত্তরকাণ্ডের ৮৭ সর্গে কথিত হইয়াছে—"সেই দ্বাপরসংজ্ঞক যুগক্ষয়কালে বর্ত্তমান সময়ে অধর্ম্ম ও মিথ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, এই দ্বাপর যুগে বৈশ্যের তপস্যাধিকার, তিন যুগে তিন বর্ণের তপস্যায় অধিকার" ইত্যাদি। (১) ইহা শম্বুকবধবৃত্তান্তমধ্যে নারদের উক্তি। শম্বুকবধ ভবভূতিও উত্তর-চরিতের দ্বিতীয়াঙ্কে বর্ণন করিয়াছেন। শূদ্র তপস্বী শম্বুকবধ সীতানির্ব্বাসনের পর হইয়াছিল।

রামের রাজ্যাভিষেকের পর সীতানির্ব্বাসনের পূর্ব্বে রামায়ণ রচিত হয়। (২)

রাম হইতে ৩১শ সংখ্যক অধস্তন রাজা বৃহদ্বল ভারত-যুদ্ধে অভিমন্যু-হস্তে নিহত হয়েন। ভারতযুদ্ধ কলির ১২ শত বৎসর অতীত হইলে সংঘটিত হয়, কহ্লনের মতে ৬৫৩ বৎসর কলির গত হইলে ভারত-যুদ্ধ হয়। এই মত ঠিক নহে, ইহা শ্রীধর স্বামীর উক্তি ও বৈদেশিকগণের আলোচনা হইতে বুঝা যায়। কারণ, বর্ত্তমানে কলির গতাব্দ ৫০৩১, খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৩২২ বৎসরে চন্দ্রগুপ্ত রাজা ছিলেন; পরীক্ষিতের রাজ্যকাল হইতে চন্দ্রগুপ্ত পর্য্যন্ত ১৬০০ বৎসর; সুতরাং বর্ত্তমান সময় হইতে ১৯৩০, ও ৩২২ ও ১৬০০ যোগ করিলে ৩৮৫২ হয়; সুতরাং পরীক্ষিতের পূর্ব্বে ১২ বৎসর কলির অতীত না হইলে পুরাণ সকলের প্রদত্ত এই সংখ্যা সকল মিথ্যা বলিতে হয়। অনেকের বিশ্বাস, কৃষ্ণ স্বর্গে গমন করিবার পর কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছে। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কারণ, ভাগবতের ১২শ স্কন্ধের ২য় অধ্যায়ে ২৩।২৪ শ্লোকে আছে, বিষ্ণু স্বর্গে গমন করিলে কলি মর্ত্ত্যে প্রবেশ করিয়াছিল। যে পর্য্যন্ত কৃষ্ণ পৃথিবীতে ছিলেন, তাবৎকাল কলি পৃথিবীতে পরাক্রম প্রকাশ করিতে পারে নাই। এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন—"শ্রীকৃষ্ণে পৃথিব্যাং বর্ত্তমানে সন্ধ্যারূপেণ কলিঃ প্রবিষ্ট এব আসীৎ তাবত্তস্য পরাক্রমাভাবাৎ।" ইহার পরশ্লোকে আছে, যে সময়ে সপ্তর্ষিগণ মঘানক্ষত্রে বিচরণ করিতেছিলেন, তখন দ্বাদশাব্দশতাত্মক কলি প্রবৃত্ত হইয়াছে। এই দ্বাদশাব্দশতাত্মক পদটির অর্থ স্বামী বলিয়াছেন—দিব্যমানে ১২ শত বৎসরাত্মক যে কলি, সে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, অর্থাৎ কলির বিশেষণ দ্বাদশাব্দশতাত্মক, যদি উহাকে তাবৎকালপ্রবৃত্তের বিশেষণ বলা যায়, তবে সকল দিকেই অর্থ ঠিক মিলিয়া যায়। অবশ্য স্বামিপাদও কৃষ্ণের সময়েই কলির বর্ত্তমানতা স্বীকার করিয়াছেন, এবং দিব্য সন্ধ্যারূপে কলি প্রবৃত্ত হইলেই লৌকিক ১২শ শত বৎসর অতীত হইতে পারে। কারণ, দৈবমানের ৩ বৎসর ৪ মাসে লৌকিক ১২ শত বৎসর অতীত হয়, সুতরাং ৫৩৩০ বৎসরের পূর্ব্বে যে রামায়ণ রচিত হইয়াছিল, ইহা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

রামায়ণের উৎপত্তি হয় একটি অসাধারণ ঘটনা হইতে। সশিষ্য বাল্মীকি নারদমুখে সংক্ষিপ্ত রামচরিত্র শ্রবণ করিয়া স্নানার্থ তমসার তীরে গমন করিয়া তত্রত্য বনশোভা দর্শন করিতে করিতে অকস্মাৎ ব্যাধবাণবিদ্ধ শোণিতাক্ত একটি ক্রৌঞ্চ পক্ষীকে দর্শন করিয়া ও ক্রৌঞ্চীর বিলাপধ্বনি শ্রবণে শোকার্ত্ত এবং তাঁহার কণ্ঠ হইতে অনুষ্টুপ্ ছন্দোবদ্ধ বাক্য নির্গত হয়; উহাই রামায়ণের উপাদান।

[ক্রমশঃ।

শ্রীশ্যামাকান্ত তর্কপঞ্চানন।

---

(১) তস্মিন্ দ্বাপরসংখ্যে তু বর্ত্তমানে যুগক্ষয়ে। অধর্ম্মশ্চানৃতঞ্চৈব ববৃধে পুরুষর্ষভ। অস্মিন্ দ্বাপরসংখ্যাতে তপো বৈশ্যো ন সমাবিশৎ। ৭.৮৭।২৪-৩৫

(২) প্রাপ্তরাজ্যস্য রামস্য বাল্মীকির্ভগবানৃষিঃ। তথা সর্গশতান্ পঞ্চ ষট্ কাণ্ডানি তথোত্তরম্।১।৪।১-২।

উড়ো আপদ

১

নারীর মন,—বিশেষ সে নারী যদি পত্নী হন্…সে-মনকে স্থির রাখিবার জন্য প্রাচীনের দল সাধে অত শাস্ত্র-শাসনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন!

মনের স্বচ্ছন্দ গতি—কথাটুকু শুনিতে বেশ, কিন্তু নারীর মনের ঐই স্বচ্ছন্দ গতি স্বামীর জীবনে কতখানি অস্বাচ্ছন্দ্য গড়িয়া তোলে, যদি থাকেন কোনো দুর্জ্জয় সাহসী মুক্ত-কণ্ঠ স্বামী, স্বীকার করিয়া বলুন! রবীন্দ্র-নাথও না কি তাঁর নাটকের কোন্ পাত্র না পাত্রীর মুখ দিয়া এমনি একটা কথা বলাইয়াছেন!…

উপরের এই কথাগুলা আমার নয়—ভূপতি এমনি নানা কথাই ভাবিতেছিল।

শ্রাবণ মাস। দুপুর রাত্রি। সারা আকাশ কালো মেঘে ভরিয়া দুনিয়ার বুকে এমন চাপিয়া বসিয়াছে যে, সে চাপে আলোর ক্ষীণ রেখাটুকুর দম্ বন্ধ হইবার জো! সঙ্গে সঙ্গে ঝম্-ঝম্ বারিধারা—বিরামহীন ছন্দে নামিল নর-নারীর চিত্তে আবেশ-তন্দ্রা ভরিয়া! মনে হইল, সংসারের কাজ-কর্ম্ম চিরদিনের মত চুকিয়া গিয়াছে, আর মিছা ছুটাছুটি করিয়া ফল নাই—জীবনের হিসাব-নিকাশের সময় আসিয়া উপস্থিত!

দোতলার ঘরে বিছানায় শুইয়া ভূপতি ঐ কাজল-কালো আকাশের পানে চাহিয়া এমনি চিন্তায় নিবিষ্ট হইয়া বাদল-ধারার বিক্রম দেখিতেছিল। সে একা। এমন বর্ষায় এতখানি নিঃসঙ্গতা জীবনে আর কখনো ঘটিয়াছে বলিয়া তার মনে পড়ে না! পত্নী জ্যোৎস্নাময়ী পিত্রালয়ে গিয়াছে—নিমন্ত্রণে নয়, সখ করিয়া নয়, দারুণ রোষে চেতনা হারাইয়া, প্রবল অভিমানে ফুলিয়া-ফুঁশিয়া! অথচ ভূপতির কি বা অপরাধ!…

তাই ভূপতি নিশ্বাস ফেলিয়া চক্ষু মুদিল। তিন বছর তার বিবাহ হইয়াছে। এ তিন বছর জ্যোৎস্নার সঙ্গে এক নিমেষ ছাড়া-ছাড়ি হয় নাই। জ্যোৎস্নাও তার প্রেমে পিত্রালয়ের সহিত সকল সম্পর্ক কাটিয়া বসিয়াছিল। সেখান হইতে কত অনুযোগ আসিত, হাসিয়া জ্যোৎস্না জবাব দিত,—যাবার উপায় নাই, মা। কার হাতে সংসারের ভার দিয়া যাই, বলো? যে-ভাবে সব সাজাইয়া বসিয়াছি, তার একটু এদিক-ওদিক হইলে আমার কষ্টের সীমা থাকিবে না। পারি তো ও-মাসে বরং…ইত্যাদি

সেই ও-মাস বহু মাসেও আসিয়া উদয় হইত না। শাশুড়ীর অনুযোগে ভূপতি যাওয়ার কথা তুলিলে জ্যোৎস্না বলিত,—ও, এরই মধ্যে আমি পুরোনো হয়ে গেছি বড্ড—না? আর ভালো লাগে না আমার সঙ্গ? তাড়িয়ে পাশ কাটিয়ে থাকতে পারলেই বাঁচো!

অকস্মাৎ এত বড় কথায় ভূপতি শিহরিয়া উঠিত,—তার উৎসাহ দপ করিয়া নিবিয়া যাইত!

প্রসাদ-পবন বলিয়া একটা কথার দেখা মেলে গল্পে ও গানে। জীবনে তেমন পবন দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না! ভূপতির জীবন-তরী কোথা দিয়া সেই প্রসাদ-পবনের পরশ পাইয়াছিল এবং সেই প্রসাদ-পবনে দিব্য বহিয়া চলিয়াছিল, না জানি, কোন্ সুখ-উপকূল লক্ষ্য করিয়া!

যে-বয়সে দুনিয়ায় শুধু বসন্ত জাগে; ফুলে-ফলে, রঙে-সুরে দুনিয়া সুর-লোককেও মলিন-মূর্চ্ছিত করিয়া দেয়; সে বয়সে আমাদের জীবনে দেখা দেয় কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ। ছুটাছুটি, মারামারি, তীরের ঝলকানি, তরবারির ঝঞ্ঝনা…নিমেষ বিরাম নাই! এ যুদ্ধে কেহ পড়িয়া প্রাণ দেয়, কাহারো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়, কেহ দারুণ ক্ষত বুকে লইয়া দুনিয়ার বুকে নির্জীব, অবসন্ন পড়িয়া থাকে! আর যারা এ-যুদ্ধে জয়ী হয়, তারা জীবনের পঞ্চমাঙ্কে সিংহাসনে উঠিয়া বসে—কাণে মহাপ্রস্থানের ভেরী বাজে! শতকরা নিরানব্বই জন বাঙালীর ভাগ্যে এই ব্যবস্থা। বাকী এক—ভাগ্যগুণে ভূপতি সেই একের দলে ঠাঁই পাইয়াছিল।

তাই তার পায়ে-পায়ে বাজিয়া চলিয়াছিল কত যন্ত্রীর কত না বাদ্য! কাণের কাছে গান চলিয়াছিল কত না বিচিত্র সুরে! সে সুরে ভূপতি বিভোর, তন্ময়! এ সুর বাঁধিয়া রাখিবার খেয়াল তার ছিল না। ভাবিত, কিসের ভয়? এ সুর কাটিবার নয়!

তার বুকে ছিল মণি—সে মণি নারীর মন! সে নারী পত্নী জ্যোৎস্না। এই মণি পাইয়া সে ভাবিত, দুনিয়ায়

তার চাহিবার আর কি আছে! এ মণি আজীবন বুকে থাকিবে!

কিন্তু এ মণি নারীর মন! যে-মন পাতার ভর সহে না! পলকে পলকে যার রঙ টুটিতে চায়! বড় সন্তর্পণে, বড় যত্নে রাখিবার বস্তু এই মন! শুইয়া শুইয়া ভূপতি সেই কথাই ভাবিতেছিল। কি তার অপরাধ? যার জন্য জ্যোৎস্নার অত রাগ, অমন অভিমান হইল···অভিমানে তাকে ত্যাগ করিয়া সহসা সে ছুটিল পিত্রালয়ে!···

ভূপতির বুকে শ্রাবণ-মেঘের অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল।

পাশের বাড়ীর নির্ম্মলা ওদিকে মাষ্টারের কাছে গান শিখিতেছিল।

নির্ম্মলা গাহিতেছিল,—

আজ কিছুতেই যায় না মনের ভার—
সারা আকাশ মেঘে অন্ধকার!

২

ব্যাপার খুবই তুচ্ছ। শুনিলে হাসি পায়। অথচ···কথাটা খুলিয়া বলি।

কাজ নাই—অথচ দিনগুলা কাটানো চাই। গান-বাজনা, মাসিক পত্র, রেডিও, লাইব্রেরী,—তার উপর শিবপুরের বাগান, জু, মিউজিয়ম, শেষে দার্জ্জিলিং, বোম্বাই···

বৈচিত্র্যের যেমন অন্ত নাই, রুচিরও তেমনি অবিরাম পরিবর্ত্তন! সম্প্রতি একখানা 'বটতলার' বই কোথা হইতে আসিয়া দেখা দিয়াছিল। বইখানা প্রথম উদয় হয় চাকরদের ঘরে। সেখান হইতে আসে পাকশালায়; এই পাকশালে থাকিতে বইখানা জ্যোৎস্নার নজরে পড়ে এবং সেটা তার হাতে চড়িয়া আসে তাদের প্রমোদ-কুঞ্জে।

ছোট্ট বই—নাম 'হনুমান-চরিত্র'। ভূপতি ভাবিতেছিল, কোন্ অতীত যুগে হনুমান আগুনে লঙ্কার প্রমোদ-কুঞ্জ দগ্ধ করিয়াছিল—সে ছিল জীবন্ত হনুমান। আর আজ সেই হনুমানের নাম-লেখা ছোট একটা বই তার সুখের কুঞ্জে আগুন লাগাইতে আসিল!

নিছক কৌতুকে এত-বড় ট্রাজেডির সূত্রপাত!

ভূপতিদের এক ক্লাব ছিল। ক্লাবে স্থির হইল, সভ্যেরা অভিনয় করিবে রবীন্দ্রনাথের 'গোড়ায় গলদ'। ভূপতি সাজিবে চন্দ্র···বাকী চরিত্রে অন্য সভ্যের দল। পুরা-দমে রিহার্শাল চলিয়াছে। ভূপতির রোজই ফিরিতে রাত হয়। ঘরে জ্যোৎস্নার মুখ গম্ভীর ঘোরালো হইতে থাকে! ভূপতি কথাটা ভাঙ্গে না—ভাবে, একেবারে প্লে দেখাইয়া জ্যোৎস্নার তাক্ লাগাইয়া দিবে—বিস্ময়ে জ্যোৎস্না বিহ্বল হইবে!···

দুপুর-বেলায় গোড়ায়-গলদ বইখানা লইয়া ভূপতি বিভোর, জ্যোৎস্না আসিয়া কহিল,—একটা মজার বই পেয়েচি, দ্যাখো···

ভূপতি চোখ মেলিয়া দেখে, জ্যোৎস্নার হাতে ছোট একখানা বই···তার মলাট মলিন তৈলসিক্ত। ভূপতি কহিল,—শেষে বটতলার বইও হাতে নেছ! ছি···

জ্যোৎস্না কহিল—বটতলা ব'লে ঘৃণা করো না গো! রামায়ণ-মহাভারত ঐ বটতলার কল্যাণেই প্রথম পড়েচি!··· তা ছাড়া নয়—এ নভেল নয়, কিম্বা সেই কলির মেয়ের বুকের পাটা, এক কোপেতে তিনটে কাটা···সে বইও নয়!

ভূপতি কহিল—বটে! কি বই তবে?

জ্যোৎস্না কহিল—পরে বলবো। আগে তুমি দাও তো এর এক জায়গায় হাত···বলিয়া একখানা পৃষ্ঠা ভূপতির চোখের সামনে মেলিয়া ধরিল।

ভূপতি দেখে, পাতায় একটা চাকার ছবি—চাকার মধ্যে বহু মুনি-ঋষির নাম ও কতকগুলি সংখ্যা; এবং উপরে লেখা আছে—

"অথ বিশ্বাস-পরীক্ষা।"

ভূপতি কহিল,—দেখি, কি বই!

জ্যোৎস্না কহিল,—না, এখন দেখাবো না। দাও না তুমি একটায় হাত···

ভূপতি কহিল,—বহু সাধু-সজ্জন, ঋষি-দেবর্ষির নাম দেখচি। কার নামে হাত দেবো—শেষে তিনি যদি ভস্ম ক'রে দেন?

ভ্রূকুটি-ভরে জ্যোৎস্না কহিল,—সবতাতেই চালাকি—ভালো লাগে না। সত্যি! দাও বলচি হাত···

ভূপতি কি করে—অগত্যা চক্ষু মুদিয়া এক জায়গায় হাত দিল। জ্যোৎস্না বই দেখিয়া কহিল,—দেখি, হাত দেছ, জনক ৩—বলিয়াই আর একখানা পাতা উল্টাইয়া কহিল,—এই

যে···জনক ও কহিতেছেন,—তুমি ইহাকে বিশ্বাস করিও না, ইহাকে দিলে পাইবে না।

ভূপতির চোখে-মুখে হাসির আভাস! ভূপতি কহিল,—কি হলো?

জ্যোৎস্না একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ভূপতির পানে চাহিল, কহিল,—হুঁ!

ভূপতি কহিল,—সত্যি, কি দেখলে, বলো না! নিশ্বাস পড়লো যে···

—কিছু নয়। বলিয়া জ্যোৎস্না আর একখানা পাতা খুলিয়া কহিল,—দাও এর এক ঘরে হাত···

ভূপতি দেখিল, পাতার গোড়ায় লেখা আছে, অথ শঙ্কা পরীক্ষা।

সে হাত দিল নারদের নামে।

জ্যোৎস্না বইখানা টানিয়া কহিল,—ছাড়ো···নারদ ও।

আর-একটা পৃষ্ঠা উল্টাইয়া ভূপতি কহিল,—দেখি।

দুজনে দেখে, লেখা আছে,—তোমার শঙ্কা এখন আছে, জানিবে।

জ্যোৎস্না একেবারে বাক্যহারা···গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল, দৃষ্টি খোলা জানালা দিয়া একেবারে বাহিরে মুক্ত আকাশের গায়ে গিয়া লাগিয়াছে!

ভূপতি বইখানা টানিয়া লইল, দু-চার পাতা উল্টাইয়া কহিল,—এ যে দেখচি, ভাগ্য গণনা!···বাঃ! তোমার এতও আসে! যাক্, তা অমন গুম হয়ে রইলে কেন? কি দেখলে?

জ্যোৎস্না স্থির দৃষ্টিতে স্বামীর পানে চাহিয়া রহিল, চোখের দৃষ্টি করুণ। তার মুখে কোনো কথা ফুটিল না।

ভূপতি কহিল,—ভালো গ্রহ···এলে বেশ হাসতে হাসতে! তার পর দু'পাতা উল্টোতে না উল্টোতে একেবারে 'মন-মরা মুখে ম্লান নলিনী'! কি এমন ভবিষ্যৎ দেখলে··· আমার মৃত্যু? না, তোমার বৈধব্য?

—যাও। বলিয়া জ্যোৎস্না বালিশে মুখ গুঁজিল।

হাসিয়া ভূপতি কহিল,—এমন পাগলও দেখিনি! আগে বলো না, তুমি কি দেখলে? ঐ তো প্রথমটায় কি? অথ বিশ্বাস পরীক্ষা···সত্যি, বলো না—জনক ও কি বললেন?

জ্যোৎস্না মুখ তুলিল, একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—আমি মনে-মনে ভেবেছিলুম—আমি যে তোমায় মন-প্রাণ দিয়েচি, তোমার মন-প্রাণ পাবো তো?···

ভূপতি কহিল—জনক ও তাতে কি বললেন?

জ্যোৎস্না কহিল—দেখলে তো···

ভূপতি কহিল—সত্যি মনে নেই। দেখি···

সমাধানের পৃষ্ঠা খুলিয়া জ্যোৎস্না দেখাইল, ছাপা আছে,—তুমি ইহাকে বিশ্বাস করিও না, ইহাকে দিলে পাইবে না···

দেখিয়া ভূপতি উচ্চ হাস্যরোল তুলিল, তুলিয়া কহিল—তবে আর কি? হনুমান-চরিতে ছাপা আছে, অবিশ্বাস! অতএব আমায় ত্যাগ করো। আমার মনের পরিচয় তোমার চেয়ে এই জনক-রাজর্ষি ঢের বেশী জানেন—না?···আচ্ছা, তোমার তার পরের চিন্তা কি?

জ্যোৎস্না ম্লান মুখে কহিল,—স্বামীর প্রেম হারাবো কি কখনো?···

ভূপতি কহিল—উত্তর কি পেলে?

বলিয়া নিজেই সে উত্তরের পৃষ্ঠা খুলিল। দেখে, ছাপা আছে···তোমার শঙ্কা এখন আছে, জানিবে।···

ভূপতি জ্যোৎস্নার পানে চাহিল। জ্যোৎস্নার দৃষ্টি তখনো ম্লান।

ভূপতি কহিল—ভালো আপদ! একেই বলে সুস্থ শরীর ব্যস্ত করা! তোমার মনের সন্ধানে আমি ছুটবো এই শ্রীযুক্ত হনুমানের কাছে···আর তুমিও vice versa? পরস্পরের মনের পরিচয় আজো পাইনি! হুঁঃ!···

কথাটা বলিয়া বইখানা ছুড়িয়া ভূপতি দূরে ফেলিয়া দিল

জ্যোৎস্না ভীতি-চকিতার মত উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল,—কি যে করো! দেবতা নিয়ে শাস্ত্র নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছল্য!

ভূপতি কহিল—মাপ করো জ্যোটি, ওকেও যদি দেবতা বলে' শিরোধার্য্য করতে হয়, তা হলে বুঝবো, হিন্দুধর্ম্মের পরমায়ু অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে এসেচে! অক্সিজেন-বাষ্প দিয়ে তাকে বাঁচাতে হবে।

জ্যোৎস্না কহিল—আমি আজ পনেরো দিন পরখ করচি, ঠিক-ঠাক মিলচে সব। তুমি অমনি উড়িয়ে দিলেই আমি শুনবো কি না।···

বলিয়া বইখানা তুলিয়া সসম্ভ্রমে সে মাথায় ছোঁয়াইল।

ভূপতি কহিল—পরখের বৃত্তান্ত শুনি···

জ্যোৎস্না কহিল—শুনবে ?

—শুনবো।

জ্যোৎস্না কহিল—বামুনদির একটা বাটি হারিয়েছিল। বামুনদি আমায় দেখতে বললে। আমি দেখলুম, যুধিষ্ঠির ৫ ; তাতে বলেচে, তোমার ধাতুদ্রব্য হারাইয়াছে, তোমার বাটীর পশ্চিম-উত্তরকার বাটীতে আছে পাইবে। আমাদের পশ্চিম-উত্তরে ঐ কানাই বাবুর বাড়ী…বামুনদি দেখতে গেল। যেতেই তারা বললে, বামুনদি কবে নাকি ও-বাটিতে ক'রে ওদের বাড়ী মুড়ি দিয়েছিল—বাটি ও-বাড়ীতেই পড়েছিল !

ভূপতি কহিল—বাটি তো হারায় নি তা হলে ! তোমার বামুনদি সেখানে ফেলে এসেছিল।

জ্যোৎস্না কহিল—তা বৈ কি ! হারানোর মানে কি…? না, যা পাওয়া যাচ্ছে না ! তুমি অমনি তর্ক তুললেই হলো ! আচ্ছা বেশ, আর একটা প্রমাণ শোনো তা হলে…

—বলো…

জ্যোৎস্না কহিল—ও-বাড়ীর নন্দর ছেলে হবার কথা ছিল…নন্দর মা আমায় বললেন, ছাখোতো বৌমা, নন্দর আমার কি হবে ? আমি গর্ভ-পরীক্ষায় দেখলুম, বিভীষণ ৩ ; তাতে বলেচে, এ গর্ভে কন্যা উত্তম হইবে। তার পর আজ চার দিন হলো নন্দর একটি মেয়ে হয়েচে, আর মেয়েটি চমৎকার সুন্দরী !…

হাসিয়া ভূপতি কহিল—বটে ! তুমি দেখচি তা হলে পাড়ায় বেশ পশার জমিয়েচো এ বই নিয়ে !

জ্যোৎস্না কহিল—পশার আবার কি ! তার পর বিন্দুঝী তার ছেলের চিঠি পায়নি আজ একমাস—মাগী ভেবে মরে। আমায় বললে, ছাখো না গা বৌমা—কি খবর ছেলের ? আমি দেখলুম,—মহাদেব ১। মহাদেব বললেন,—সেখানে কুশলে আছে, আনন্দে আছে। পরশু বিন্দুর ছেলের চিঠি এসেচে—লিখেচে, সকলে ভালো আছে—এবারে ধানও খুব হয়েচে।…মিললো তো ? কুশল, আর ধানের জন্য আনন্দ !

আনন্দে জ্যোৎস্নার মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। ভূপতি সে মুখের পানে চাহিয়া মুগ্ধ হইল। জ্যোৎস্নার গালে মৃদু করাঘাত করিয়া কহিল—খনা দেবী, না, Delphic oracle—কি বলবো ? তবে স্বদেশীর দিনে খনা নামই ভালো ! ঐ নামই রইলো তোমার। এখন থেকে বচন রাশি রাশি তৈরী করো…বাঁয়ে মুখ, ডাইনে চলো—বাপা এবার পটল তোলো ! নয়তো,…তিন থাবড়া, সাতটি কিল, তোমার বঁধুর গাঁথবে দিল। ভয় কি ! তোমার সহায় হয়েচেন বীর হনুমান ! শুধু আমার বেলাতেই হনুমান যা বিরূপ হলেন !

জ্যোৎস্না কহিল—একটাও ভুল বলেনি মশাই তা বলে আমার এই হনুমান চরিত্র…যতগুলো দেখেচি…

ভূপতি কহিল—তা হলে আমার সম্বন্ধে ওঁর কথাই মানো। আমায় যে প্রাণ-মন দেছ, তা ফিরিয়ে নাও। যেহেতু পরিবর্ত্তে আমার প্রাণ-মন তো পাবে না !…

জ্যোৎস্না কোনো কথা কহিল না।

৩

দু'দিন পরে এক কাণ্ড ঘটিল। ভূপতি সকালেই ক্লাবে গিয়াছিল…জরুরি কাজে। ফিরিল বেলা তখন বারোটা। তেল মাখিয়া সে স্নান করিতে গেল…গিয়া দেখে, তার বাথ-টবে জল নাই। ব্যাপার কি ? বাহিরে তার স্বতন্ত্র বাথ-রুম। বাথরুমে চৌবাচ্ছা নাই, বড় বাথ-টব। ভৃত্য ধীরু প্রত্যহ স্নানের জল ধরিয়া রাখে। টব শূন্য দেখিয়া ভূপতি হাঁকিল,—ধীরু

ধীরুর কোনো সাড়া নাই।…

বাথ-রুমের বাহিরে আসিয়া ভূপতি আবার হাঁকিল,—ধীরু…

জ্যোৎস্না আসিয়া কহিল,—ধীরু নেই গো। দেশে যাবে ব'লে তার খুড়োকে খপর দিতে গেছে।

—দেশে যাবে ?

—হাঁ।

—তার মানে ?

—ওর কদিন শরীরটা ভালো নেই। তা বাঙলা পড়তে জানে তো, শিখেচে ! আজ সকালে ঐ হনুমান চরিত্র বইখানা নিয়ে বুঝি পড়ছিল, তাতে দেখেচে, ওর সম্বন্ধে অনিরুদ্ধ ৯ বলেচে,—তোমার মরিবার কাল নিকট হইয়াছে, জানিবে। সেই দেখে কেঁদে আমার পায়ে এসে পড়লো, বাড়ীর জন্য মন কেমন করচে খুব ; এখানে একদণ্ড আর থাকতে পারবে না, প্রাণ ওর হাঁপিয়ে উঠচে ! বাবু এলে মাইনে চেয়ে রাখতে ব'লে সে তার খুড়োকে বলতে গেছে দেশে যাবার কথা…

রাগে ভূপতি জ্বলিয়া উঠিল। কহিল,—ন্যাকামি পেয়েচে ব্যাটা! বটে! হনুমান-চরিত্তির পড়ে খেয়াল দেখচেন! মাইনে দাও···দেশে যাবো!···আমার কাজ-কর্ম্ম প'ড়ে রইলো, নাচতে নাচতে উনি দেশে ছুটচেন! মাইনে দাও! ব্যাটা! ব্যাঙ্কে যেন টাকা জমা রেখেচে!—কভি নেহি দেগা, এক পয়সা নেহি···

জ্যোৎস্না কহিল,—এত বেলায় মাথা গরম করো না। তুমি ভিতরে এসো···আমার বাথ-রুমে জল আছে। তাতে তোমার স্নান খুব হয়ে যাবে!

ভূপতি গুম্ হইয়া বাথ রুমে গিয়া ঢুকিল।···

আহারে বসিয়াছে, বাহিরে ধীরু আসিয়া দাঁড়াইল—শুষ্ক মুখ, দুই চোখ বাষ্পার্দ্র। ধীরু ডাকিল,—মা···

ভূপতি ফোঁশ করিয়া উঠিল,—বেরো ব্যাটা আমার সামনে থেকে···শীগ্‌গির বেরিয়ে যা···

ধীরু অবাক্! বাবুর মুখে এমন কথা সে কখনো শুনে নাই! এমন রাগ···

জ্যোৎস্না কহিল,—যা এখন···

ধীরু চলিয়া গেল।···

ভূপতি কহিল,—খবদ্দার ও-ব্যাটাকে আস্কারা দিয়ো না! যদি দাও, আমি বাড়ী ছেড়ে চ'লে যাবো।···

আহারাদি চুকিলে মুখ ধুইয়া ভূপতি একখানা খাতা টানিয়া বসিল।

জ্যোৎস্না কহিল,—আমি খেয়ে আসচি।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে জ্যোৎস্না ফিরিল। ভূপতি তখনো খাতার মধ্যে নিমগ্ন।

জ্যোৎস্না সরিয়া পাশে বসিল; কহিল,—কিসের খাতা?

ভূপতি কহিল,—এমনি একটা হিসেব দেখচি। দু'মাস ফেলে রেখেচি, অমনি বিভ্রাট বাধিয়েচে।

জ্যোৎস্না চুপ করিয়া রহিল;···পাঁচ মিনিট পরে কহিল,—শুনচো?

খাতা হইতে মুখ না তুলিয়াই ভূপতি কহিল,—কি?

জ্যোৎস্না কহিল,—আহা, বেচারী ধীরু···একেবারে সিঁটিয়ে আছে!···

ভূপতি কহিল,—কি করতে হবে? বলো···

জ্যোৎস্না কহিল,—ও দেশে যাচ্ছে। ওর হিসেবটা···

ভূপতি কহিল,—ঐ হনুমান-চরিত্র দেখে রওনা হবেন! মরিবার দিন সন্নিকট—তাই?···দেবো না মাইনে, কিছুতে না···তুমি অনুরোধ করো না, সে-অনুরোধ রাখতে পারবো না।

জ্যোৎস্না কহিল,—ও কাঁদচে···থাকতে পারবে না,—তবু জোর ক'রে তুমি রাখবে?

ভূপতি কহিল,—আমায় লোক ঠিক ক'রে দিয়ে তবে যাক।···

জ্যোৎস্না কহিল,—কিন্তু ও যে আজই যাচ্ছে।

ভূপতি কহিল,—হয়েচে কি যে, হঠাৎ এক ঘণ্টার নোটিশে দেশে চললেন! হনুমান চরিত্রে লেখা, তার মৃত্যু সুনিশ্চিত, অমনি ছুটলো! এমন যার মন, তার চাকরি করতে আসা উচিত নয়।···

জ্যোৎস্না হাসিল। হাসিয়া বলিল,—জানোয়ার যদি তাই বোঝে?

ভূপতি কহিল,—যদি তাই বোঝে তো আমাদের উচিত সে দুর্ব্বুদ্ধি, সে নির্ব্বুদ্ধিতা ছাড়ানো!···তুমি ওর কথা বলো না! আমি এখন ব্যস্ত। এ হিসেবটুকু বিকেলের মধ্যে শেষ করা চাই। রাত্রে আবার বাড়ী ফিরবো কখন্!···

জ্যোৎস্না কহিল,—নিজের থেকে আমি টাকা দি। কাঁদচে বেচারী···হাজার হোক, আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে কোথায় বিদেশে প'ড়ে আছে! মন যদি ব্যাকুলই হয়ে থাকে···?

ভূপতি কহিল,—আমার কথার অবাধ্যতা করো যদি···বেশ, করো···ঠিক তো—তুমিও যে এখন আমার চেয়ে তোমার ঐ বটতলার হনুমানকে মানো বেশী। বেশ!

জ্যোৎস্না আর কথা কহিল না, ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহিরে গেল।

৪

'হনুমান চরিত্র' বইখানা শেষে জ্যোৎস্নাকে কেমন পাইয়া বসিল। কামনা করিবার পূর্ব্বেই বর্ত্তমানের সকল সুখ তার ভাগ্যে মিলিয়াছে, বুঝি, সে সুখের প্রাচুর্য্যে তার ছোট বুক ভরিয়া গিয়াছিল! বর্ত্তমান টপ্‌কাইয়া তাই ভবিষ্যতের সন্ধান লইবার জন্য মনে এখন আকুলতার সীমা নাই!

এ দুর্ব্বলতা চিরদিনই মানুষের মনে কত পরিবর্ত্তন আনিয়া দিয়াছে! কত শান্তি, কত অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছে! যে রহস্য গূঢ় গোপন, রহস্য-আবিষ্কারে মানুষের

মন সর্ব্বক্ষণ লোলুপ—তা, যত দুশ্চিন্তাই থাকুক সে আবিষ্কারের মধ্যে! এ এক মস্ত নেশা! জ্যোৎস্নারও এ নেশা···।

ক্লাবের প্রতি ভূপতির আকর্ষণ এদিকে বাড়িয়া চলিয়াছে। জীবনের যত মাধুর্য্য তারো বুকের কোথাও এতটুকু ফাঁক রাখে নাই, কাণায় কাণায় বুক সে মাধুর্য্যে ভরা। তাই এদিকে ওদিকে ছুটিতে চায় সে আজ নব মাধুর্য্যের সন্ধানে!

এ নিঃসঙ্গতা জ্যোৎস্নার বুকে প্রথমে বাজিত—তার পর তাকে বিভোর রাখিল বটতলার ঐ ছোট বই···হনুমান-চরিত্র।

ভবিষ্যতের কি রহস্য যে এ-বইয়ের পাতায় পাতায় বিদ্যুতের মত চমকিয়া ওঠে—সুখ-দুঃখের কত অস্পষ্ট ছায়া! এ মোহ যার মনকে স্পর্শ করিয়াছে, সেই জানে মোহের জোর কতখানি। মিথ্যা হোক, মরীচিকা হোক—এ মোহ জ্যোৎস্নার মনে এক বিচিত্র আবেশের সৃষ্টি করিয়াছিল। সে আবেশে স্বামীর এ-বিচ্ছেদ, মনকে কাতর করিতে পারে নাই

অর্থাৎ অন্দরে যেটুকু তার অবসর মিলিত, সে অবসরে তার চতুর্দ্দিকে দাসী-পাচিকা ও প্রতিবেশিনীদের মস্ত ভিড় আসিয়া জমিত। সে ভিড়ের কলরব-কোলাহলে তার অবসরের প্রতি মুহূর্ত্ত মুখরিত থাকিত!

শ্যামার মা প্রশ্ন করিত, তার মেয়ে শ্যামার পাত্র খুঁজিয়া সে তো হায়রাণ! সে পাত্রটি কোথায় আছে? বকুল দিদি প্রশ্ন করিত, তার ভগ্নীপতিটি ভগ্নী শান্তর কোনো হদিশ লয় না পোড়ারমুখী শান্তর অদৃষ্টে স্বামি-সঙ্গ মিলিবে কি, না? কার্ত্তিকের পিশি প্রশ্ন তুলিত, কার্ত্তিকের পেট-জোড়া পিলা—বৈদ্যের বড়ি খাইয়াও পেটে মিলায় না, সে-পিলার ধ্বংস কখনো ঘটিবে কি না? প্রশ্ন যেমন বিচিত্র রহস্যে আচ্ছন্ন, উত্তরও মিলিত তেমনি রহস্যে ভরা, তেমনি মজার! তার উপর স্বামী কৌতুক করিয়া তার নাম দিয়াছে, খনা দেবী! জ্যোৎস্নার মানস-নয়নে অতীত যুগের তপোবনের ছবি জাগিয়া উঠিত। সে ছবি আগা-গোড়া বাঙলা রঙ্গমঞ্চের তপোবন হইতে গৃহীত হইলেও শ্রদ্ধায় গৌরবে জ্যোৎস্নার মন তাহাতে ভরিয়া উঠিত···.

তরুতলে বেদী, ঋষি-কুমারীরা আলবালে জল সেচন করিতেছে, আশ্রম-মৃগের দল নীবারাগ্রভাগ খুঁটিয়া খাইতেছে, হোমাগ্নির ধূম গগন পরিব্যাপ্ত করিয়া তুলিয়াছে, আর এই আবেষ্টনীর মধ্যে বেদীতে বসিয়া খনা-রূপিণী জ্যোৎস্না···তার চতুর্দ্দিকে ভক্তবৃন্দ! ভবিষ্যতের মহা-রহস্যের সন্ধানে সকলে উন্মুখ, উদ্‌গ্রীব!···

এমনি করিয়া আশ-পাশের ছোটখাট সংসারগুলার বিচিত্র সুখ-দুঃখ বাহিরের যে হাওয়া বহিয়া আনিতেছিল, সে হাওয়ায় কীট ও বীজাণুর অভাব ছিল না! দু' একটা বীজাণু যে ঐ হাওয়ার সঙ্গে তার মনে গিয়া ঢুকিবে, তাও কিছু বিচিত্র নয়!

গভীর রাত্রিতে হঠাৎ সে দিন ভূপতির কথা মনে জাগিল। এক মাস ধরিয়া এই যে এত রাত্রিতে ভূপতি গৃহে ফিরিতেছে—কোথায় কি কাজে তার সময় কাটে···জ্যোৎস্না জানে না। স্বামীকে সে কোনো দিন কোন প্রশ্ন করে নাই, স্বামীও তাকে সাধিয়া বলে নাই!···আজ সন্ধ্যায় ও-পাড়ার মালতী আসিয়া নিজের দুঃখের যে কাহিনী পাড়িয়া বসিয়াছিল, তাহা যেমন বিচিত্র, তেমনি অব্যক্ত বেদনায় ভরা। মালতী শ্যামাঙ্গী, বয়সে তরুণী: স্বামী কুঞ্জলাল তার হৃদয়-কুঞ্জের দ্বারে কোনো দিন আসিয়া দাঁড়ায় না। মালতীর বুকে কত ফুল ফোটে·· সন্ধ্যায় আশার দীপ জ্বালিয়া বুকে আসন পাতিয়া পথের পানে সে চাহিয়া থাকে···কুঞ্জ ভুলিয়াও সে পথে আসে না! তাই সে আসিয়া জ্যোৎস্নার শরণ লইয়াছিল, তার কেতাবে মালতীর ভাগ্যের যদি সন্ধান মেলে!

এমন কাহিনী নাটক-নভেলের বাহিরেও থাকে! জ্যোৎস্না জানিত, এ-সব মানুষের মন-গড়া···গল্পেই শুধু ও কাহিনীর অস্তিত্ব! আজ মালতীর দুঃখ-বেদনা এ কাহিনীতে জীবন্ত দেখিয়া তার নারী-হৃদয় বিষাদের ছায়ায় মলিন হইল।···কেতাবে মালতীর ভাগ্যের হদিশ মিলিল,—ডাকিনীর মায়ায় সে আত্মহারা। তার আশা ছাড়িয়া দাও···

কি ভয়ঙ্কর কথা! বেচারী মালতী! এ কথা ছাপার অক্ষরে দেখিয়া তার মুখে আর একটি কথা ফুটিল না···দুই চোখে জল ছাপাইয়া আসিল! বুকে পাহাড় বহিয়া নিঃশব্দে সে চলিয়া গেল।···এখন নিঃসঙ্গ অবসরে মালতীর চিন্তা করিতে স্বামীর পিছনে জ্যোৎস্নার মন ছুটিল। কোথায় স্বামী? ভূপতি?

বাহিরের বিশ্ব জ্যোৎস্নার তেমন জানা নাই। সে জানে, থিয়েটার, বায়োস্কোপ, জু, শিবপুরের বাগান। রাত্রিতে কেহ জুয়ে যায় না···শিবপুরেও না। সেখানে যাইবার উপায়

নাই! থিয়েটার? বায়োস্কোপ? কিন্তু আজ মঙ্গলবার; থিয়েটার বন্ধ আছে। বায়োস্কোপ? এমন কি নেশা? নিত্য বায়োস্কোপ? তাও সম্ভব নয়। তবে?

মালতীর কাহিনীর সঙ্গে থিয়েটারে-দেখা 'জনা'র সে-দৃশ্য চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল।···সেই মায়ার রাজ্য··· মায়াবিনীদের বিভোর-করা নৃত্য-গীত! ডাকিনীর মায়া!

বাহিরে শ্রাবণের মেঘে-মেঘে ঝঞ্ঝনা। অনেকখানি আগুন ঝলসিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে যেন শত কামান দাগিল! চমকিয়া জ্যোৎস্না আকাশের পানে চাহিয়া দেখে; আকাশে কালো রঙের পোঁচড়া টানিয়া চাঁদ, নক্ষত্র সব কে মুছিয়া কালো করিয়া দিয়াছে! এই দুর্য্যোগে স্বামী বায়োস্কোপ দেখিতেছে?

সে 'হনুমান-চরিত্রের' পাতা উল্টাইল। 'অথ মিলন-পরীক্ষায়' দেখিল, দুর্য্যোধন ৭। জবাব মিলিল,—সে বড়লোক, তাহার সহিত মিলন হইবে না! জ্যোৎস্নার বুক ছাঁৎ করিয়া উঠিল। সে যে গরীবের মেয়ে···শুধু রূপ-গৌরবে ভূপতির পাশে পত্নীত্বের আসনে বসিতে পারিয়াছে, সে কথা মনে জাগিল। এ কথা কখনো মনে হয় নাই, আজ এই প্রথম! মন কাটা হইয়া উঠিল।···

'হনুমান চরিত্র' রাখিয়া জ্যোৎস্না 'সূর্পণখা-চরিত্র' খুলিল। এ বইখানি সে নূতন আনাইয়াছে। ভূপতির ভাগিনেয় অনন্ত আনিয়া দিয়াছে, বলিয়াছে—মামিমা, তুমি জ্যোতিষ আলোচনা করচো—এই ছাখো ও-সম্বন্ধে আর একখানা বই!···

এ বইয়ের কথাগুলা 'হনুমান চরিত্রের' চেয়েও স্পষ্ট; এবং নারীর অন্তর লইয়াই এ বইয়ের কারবার। সূর্পণখা রাক্ষসী হইলেও নারী···অর্থাৎ পুরুষ নয়। বোধ হয়, তাই এ বইয়ে নারীর অন্তরের প্রাধান্য! এই সূর্পণখা-চরিত্রে মালতীর সমস্ত কাহিনী একটিমাত্র উত্তরেই সাগরের তরঙ্গের মত উত্তাল হইয়া দেখা দিয়াছে।

সে-বই খুলিয়া জ্যোৎস্না স্বামীর তত্ত্ব লইল। মন্দোদরী ৫ উত্তর দিল—মায়াবিনীর মায়া। এ মায়া কাটিবে, তুমি যদি স্থানান্তরে যাও।

বাহিরে আকাশ ফাটাইয়া উদ্দাম রোলে বর্ষা নামিল, ঘরের মধ্যেও জ্যোৎস্নার বুক ফাটাইয়া অশ্রুর বর্ষা!··· সে যেন সাগর···কলরোলে উতরোল, সে অশ্রুর সাগর সীমাহীন বিস্তারে ফুঁশিয়া ফুলিয়া বহিয়া চলিয়াছে! জ্যোৎস্নার বুক সে সাগরে ভাসিয়া ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইবার জো!···

মেঝেয় আঁচল বিছাইয়া জ্যোৎস্না শুইয়া পড়িল, দুই চক্ষু মুদিল। স্বামীর মুখ, আদর-ভালোবাসায় ভরা অ···টুকুকে প্রাণপণে বুঝি বুকে আঁকড়াইয়া ধরিবার সঙ্কল্পে!···

গালে কিসের তপ্ত পরশ! যমদ্বারে আগুনের হল্‌ক··· জ্যোৎস্না স্বপ্ন দেখিতেছিল। যেন তার মৃত্যু ঘটিয়াছে··· যমদূতের দল টানিয়া হিঁচড়াইয়া তাকে কোথায় ··· যমপুরীতে লইয়া চলিয়াছে!···

ধড়মড়িয়া জ্যোৎস্না উঠিয়া বসিল; বসিয়া চাহিয়া দেখে, ভূপতি!···সে তবে আগুনের হল্কা নয়—ভূপতির চুম্বন!···

স্বামীর দুই হাত ধরিয়া জ্যোৎস্না কহিল—এত রাত যে! কোথায় ছিলে? বায়োস্কোপ?

ভূপতি কহিল,—না।

—নেমন্তন্ন?

—না।

—তবে?

ভূপতি কহিল,—সে কথা আজ বলবো না। মাপ করো, জ্যোতি···

আঁধার-ভরা আকাশে আঁধার আরো ঘনায়িত হইল। এ কি কথা! এমন কথা সেই গোবিন্দলাল বলিয়াছিল ভ্রমরকে···তার সে কথার পিছনে ছিল সেই কালামুখী রোহিণী! তবে কি···? জ্যোৎস্নার শির হেলিয়া স্বামীর বুকে পড়িল।···

সকালে সেই এক চিন্তা···মন্দোদরী ও যা বলিয়াছে! সেই ভাবনা! মিলনের নিবিড় আনন্দে জ্যোৎস্না এ দুর্দ্দিনের চিন্তাও করে নাই! ও-বাড়ীর পরাগ-দি যে বলিতেছিল, পুরুষের আদর-ভালোবাসা শুধু দুদিনের খেয়াল, ভাই··· দু'দিনেই আমরা পুরোনো হয়ে যাই ওদের কাছে। এ কি নারী···যে অনন্তকাল বুক-ভরা ভালোবাসা···তার বিরাম নেই, ক্ষয় নেই!···তাই?

সকালেও আকাশে মেঘ ছিল। সূর্য্যের দেখা নাই পৃথিবী মলিন ম্লান মূর্ত্তিতে তার পানে চাহিয়া আছে তারি দুঃখে এমন বিষাদিনী প্রতিমা?···বোধ হয়।

পাশের বাড়ীতে নির্ম্মলা নূতন গান শিখিতেছিল,—

চ'লে যে যায়
আর আসে না ফিরে!

জ্যোৎস্না ভাবিল, তার সুখও কি রৌদ্র-কিরণের ম···

হাসির হাট !

[সাজসজ্জা ব্যতীত একমুখের রকমারী হাসি]

গোলাপী হাসি

ছাগুলে হাসি

কাঠ হাসি

কুৎসিত হাসি

ক্যাব্‌লাকান্ত হাসি

উড়ে হাসি

ঠোঁট ফাটার হাসি

চীনে হাসি

[ক্রমশঃ ।

শ্রীচিত্তরঞ্জন গোস্বামী ।
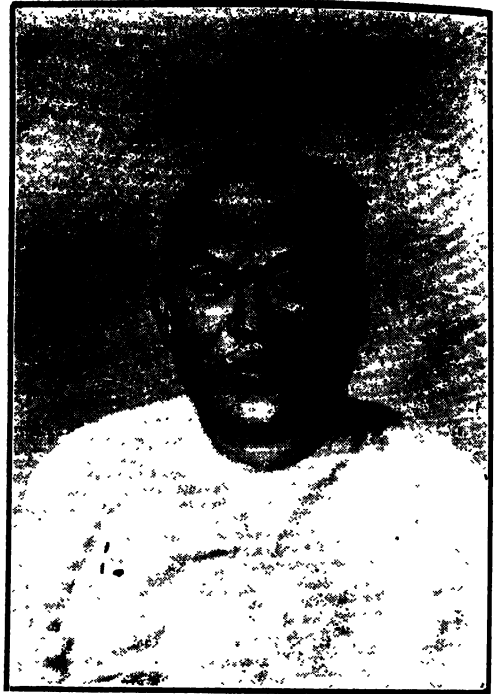
চলিয়া গিয়াছে? রৌদ্র-কিরণ কিন্তু আবার আসে—তার সুখ আর আসিবে না?

দুই চোখে জল, জ্যোৎস্না স্থির করিল, মন্দোদরীর কথাই সে শিরোধার্য্য করিবে। ছোট একটু চিঠি লিখিয়া নিঃশব্দে সে স্বামীর পাশ ছাড়িয়া দূরে স্থানান্তরে যাইবে!

দুপুরে আহার সারিয়া ভূপতি বাহির হইল, ক্লাবে জোর রিহার্শাল চলিয়াছে। ষ্টার থিয়েটারের ষ্টেজ ভাড়া লওয়া হইয়াছে। সামনের সোমবারে অভিনয়। ক্যান্তমণি সাজিবার জন্য একটি নূতন ছোকরা জুটিয়াছে। নাম সুরেশ পালিত। লক্ষ্ণৌয়ে সে শৈবলিনী সাজিয়াছে, জনা সাজিয়াছে, সিমলা-পাহাড়ে কুন্দ সাজিয়াছে, দেবী চৌধুরাণী সাজিয়াছে—stage-veteran…বাঃ! খাশা হইবে!

সংসার বা সংসারের প্রাণিবৃন্দের কোনো তত্ত্ব লইবার ভূপতির তিলার্দ্ধ সময় নাই!

জ্যোৎস্না নীরবে দাঁড়াইয়া দেখিল।…ভূপতি চলিয়া গেলে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সে নীচে নামিয়া গেল।…ভাতের সামনে বসিল মাত্র; পেটে কিছু গেল না। আহারে রুচি নাই, তার জগৎ একেবারে শূন্য হইয়া গিয়াছে!

তার পর গাড়ী ডাকাইয়া একজন ভৃত্য সঙ্গে জ্যোৎস্না পিত্রালয়ে গেল।…

সেখানে সকলের কৌতূহলের সীমা নাই। মলিন-হাসি-মুখে জ্যোৎস্না কহিল,—খারাপ স্বপ্ন দেখেচি মা কাল রাত্রে…তোমার যেন খুব অসুখ করেচে!

মা কহিলেন,—তাই হোক মা, সত্যি অসুখই করুক, দু'দিন তবু তোকে বুকের কাছে পাই।

রাত্রিতে ভূপতি গৃহে আসিয়া শুনিল, বৌদি বাপের বাড়ী গিয়াছেন!…

সে চমকিয়া উঠিল। হঠাৎ বাপের বাড়ী?…

টেবিলের উপর 'হনুমান চরিত্র' বইখানা পড়িয়া আছে, তার পাশে খামে মোড়া একখানা চিঠি। খামে তারি নাম লেখা। লেখা জ্যোৎস্নার।

ভূপতি চিঠি খুলিয়া পড়িল। লেখা আছে—

আমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে আমি বুঝিয়াছি। মন্দোদরী বলিয়াছে, মায়াবিনীর মায়া। এ মায়া কাটে আমি যদি স্থানান্তরে যাই। তাই মার কাছে যাইতেছি, পাশে থাকিয়া তোমার তাচ্ছিল্য সহিব, এমন শক্তি আমার নাই!

আমি বড় দুঃখিনী। তবে মায়া জানি না, যে-মায়ার বলে তোমায় চিরদিন বুকে ধরিয়া রাখিতে পারি!…

বাঃ! ভূপতি অবাক্! সেই বটতলার বই!…

হনুমান-চরিত্রখানা কুচি-কুচি করিয়া ছিঁড়িয়া সে জানালার বাহিরে ফেলিয়া দিল! দিয়া বিছানায় আসিয়া শুইয়াছে…বাহিরে বর্ষার মাতন। ভূপতির মনেও সে মাতন নেশার মত ছাইয়া বসিতেছিল!…এমন পাগলও মানুষ হয়। বিশেষ জ্যোৎস্না…তার সম্বন্ধে এমন ধারণা জ্যোৎস্নার মনে জাগে?…সে ভাবিতেছিল, এই গোড়ায় গলদের অভিনয়ে জ্যোৎস্নার তাক লাগাইয়া দিবে…কেন এত রাত্রি করিয়া ফিরে, কি তার এমন কাজ! হনুমান-চরিত্রকে এত দিন ফেলিয়া দেয় নাই, ভাবিয়াছিল, ও বই লইয়া জ্যোৎস্না তন্ময় থাকুক…তার অভিনয়-রঙ্গের মধ্যে কৌতূহল জাগ্রত করিবে না! আর জ্যোৎস্না কি না…ছি!…

এমনি চিন্তার সূত্র ধরিয়া তার মন শেষে নারীর চিত্ত-বিশ্লেষণে নামিয়াছে…প্রথম পরিচ্ছেদে আমরা সে বিশ্লেষণের আভাস দিয়াছি, খুঁটিনাটি প্রতিদিনের ঘটনা লইয়া তারি বিশ্লেষণ চলিয়াছিল। তার পর নিদ্রা আসিয়া কোন্ সময়…

সকালে ঘুম ভাঙ্গিতে ভূপতি দেখে, মেঘ নাই, আকাশ বেশ ফরশা! মুখ-হাত ধুইয়া সে একখানা ট্যাক্সি ডাকাইল। ট্যাক্সি আসিলে সে পাড়ি দিল বহুবাজারে। বহুবাজারে তার শ্বশুর-বাড়ী।

ফিরিবার পথে ভূপতি কহিল,—ডাক্তারে যেমন নিজের চিকিৎসা করে না, খনা দেবীরও তেমনি উচিত হয় নি, নিজের ভাগ্য বিচার করা, নিজের ভবিষ্যতের হদিশ নির্ণয় করা! জানো, একটি বচন আছে—

শুনো শুনো খনা বাপ্পা,
রেখো নিজের ভবিষ্যৎ চাপ্পা।
তার পাতাটি খুলেচো, কি, এ বিদ্যেটি ভুলেচো!
মিথ্যে এবং ভুলে তুমি হবে দারুণ খাপ্পা।

জ্যোৎস্না কহিল,—য্যাঃ, এ না কি আবার বচন আছে!…

ভূপতি কহিল,—সত্যি···না হ'লে আমি এ বচন কোথায় পাবো, বলো ?···ঐ যে নতুন পাঁজি বেরিয়েচে, 'বজ্রচূর্ণ বটিকা'-ওয়ালাদের—আমাদের ক্লাবে আছে, সে পাঁজিতে আমি দেখেচি। তাতে আরও বলেচে—

এ সব বচন, পুঁথির ঝুলি
খেলার সামিল ; তাইতে ভুলি
মজবে সে-জন, তার বিপদের
নাইকো অন্ত, নাইকো জের !

এই জন্যই আমি সাবধান করেছিলুম, ও সব পুঁথি ঘেঁটো না ! তুমি সে কথা শোনোনি বলেই মনে এতখানি দুঃখ পেয়েচো···

জ্যোৎস্না কহিল,—বটে !···তা সে বই তো ছিঁড়ে ফেলেচো ?

ভূপতি কহিল,—নিশ্চয় ফেলেচি !···এখন বিশ্বাস না হয়, সোমবার গোড়ায় গলদ প্লে দেখলে আমার কথা সত্য কি না বুঝবে ! জানো না তো, কি জোর রিহার্শাল চলছে ক্লাবে ! একে রবি বাবুর বই, তায় আমরা প্লে করবো, পাবলিক থিয়েটারকে ছুয়ো দিতে না পারলে যে লজ্জার সীমা থাকবে না !

জ্যোৎস্না কহিল,—এ কথা আমার কাছে গোপন না রাখলে আজ এ ব্যাপার ঘটতো না ! দোষ আমার একার নয় মশাই, তোমার দোষ ঢের-বেশী !

ভূপতি চারিদিকে চাহিল—ট্যাক্সি তীরবেগে ছুটিয়াছে। কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটের সম্মুখ। পথে লোক-জন···

ভূপতি কহিল,—বাড়ী চলো, এ অপরাধের শাস্তি নেবে৷ তোমার অধর-প্রান্ত থেকে···

জ্যোৎস্না কহিল,—যাও···হাত বাড়িয়ে ঘেঁষে আসচো কি ! খোলা গাড়ী, পথ—লজ্জাও নেই ? স'রে বসো, বলচি ! অসভ্য কোথাকার !

ভূপতি কহিল,—দূরে স'রে গেলে বলবে, নিষ্ঠুর ! কাছে ঘেঁষে এলে বলবে, অসভ্য ! আমরা ত্রিশঙ্কুর মত মধ্য-পথ পাই কোথায়, বলো ?

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

কাম্য

নাহি চাই তটিনীর কুল্-কুল্ বাণী গো,
ঝরণার ঝর্-ঝর্ সুস্বর ;
নাহি চাই বিহগীর সুললিত সঙ্গীত,
বন-পথে পত্রের মর্ম্মর।

কোকিলের কুহুতান আনে নাকো প্রাণে আর
উল্লাস,—হিয়ামাঝে তৃপ্তি,
শরৎ বিমলাকাশে অমৃতময় রাকা
নাহি দেয় মনে আনি দীপ্তি।

মনোলোভা কুসুমের সুবাসেতে নাহি আর
মত্ততা, অনাবিল গৌরব ;
কর্কশ লাগে গায় মধুর মলয়ানিল
চ'লে গেছে সব মধু সৌরভ।

শিশুর কোমল মুখে রূঢ়তার পরিচয়,
সুশ্যামা বসুমতী নগ্না,
ধরণী হারায়ে হাসি সব গুণ কোমলতা
বিষাদ-সাগরে আজি মগ্না।

সুধায় গরল আজ, অমরতা নশ্বর ;
দেবত্বে দানবের হাস্য ;
মৃত্যুর বিভীষিকা শুধু আনে দৃশ্যে
স্বর্গের অপ্সরা-লাস্য।

শ্রীমতী প্রফুল্লবালা দেবী।

তিব্বত

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অদ্য রবিবার, গণ্টকের বাজারের দিন। বাজারের সময় পৌছিতে পারিলে আমরা কিছু শাক্‌-শব্জী কিনিয়া পরিতোষের সহিত ভোজন করিতে পারিব বলিয়া অদ্য ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি তথায় পৌছিবার জন্য চলিতে লাগিলাম। অদ্য আমাদের মাত্র ১০ মাইল রাস্তা যাইতে হইবে, তবে চড়াই নহে—উৎরাই।

বেলা ৮ ঘটিকার সময় আহারাদি করিয়া রওনা হইলাম। উপরে গগনস্পর্শী পাহাড়, মধ্যে পাথর-বাঁধান রাস্তা, নীচে অতলস্পর্শী উপত্যকা, পাহাড়ের গায় ছোট বড় নানাপ্রকার বৃক্ষ, নানারূপ ফার্ণ এবং মধ্যে মধ্যে বেগুনীয়া দেখা যাইতে লাগিল। কোথাও বা জঙ্গল এত গভীর যে, আকাশ পর্য্যন্ত নয়নগোচর হয় না। অরণ্য-সীমার শেষে খোলা যায়গায় পৌছিয়া মোড় ফিরিবার সময় চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলে অতি সুন্দর দৃশ্য নয়নগোচর হয়। গণ্টক হইতে দার্জ্জিলিং ও উপরিস্থিত টাইগার হিল এবং জেলা পাহাড় কোন কোন স্থান হইতে দেখা যায়। মধ্যে মধ্যে পাহাড়ের গা হইতে জল ঝরিয়া রাস্তায় পড়িতেছে এবং তৎপরে উপত্যকার দিকে ধাবিত হইতেছে। বৃষ্টি হওয়ায় পাহাড়ের জল পড়িয়া রাস্তা কর্দ্দমাক্ত হইয়া উঠিল। আবার কতকদূর অগ্রসর হইতেই বৃষ্টি থামিয়া যাওয়ার পর রাস্তা সুন্দর হইল।

বর্ত্তমানে পশমবাহী অশ্বতর জেলাপালার উপর দিয়া নেটন, সোডেনচন, রঙ্গলী হইয়া ভারতবর্ষে আসে। জেলাপালার উপর দিয়া না যাইয়া এই পশমবাহী অশ্বতর নাথুলার উপর দিয়া গণ্টক হইয়া যায়, ইহাই সিকিম সরকারের একান্ত ইচ্ছা। জেলাপালা হইতে পশমবাহী অশ্বতরের গমনাগমন পরিবর্ত্তন করিয়া এই রাস্তা দিয়া আনিবার জন্য নাথুলা পাহাড়ের নিম্ন হইতে যাঙ্গু, কাপনাঙ্কা, আণ্টক পর্য্যন্ত রাস্তার উপর সিকিম গভর্ণমেণ্টের প্রখর দৃষ্টি। রাস্তায় অনেক স্থানেই পাথর সাজাইয়া সুন্দর করা হইয়াছে। এই রাস্তা দিয়া ৭ মাইল অগ্রসর হওয়ার পর পাহাড়ের এক সুন্দর প্রদেশে উপস্থিত হইলাম। এখান হইতে গণ্টক এবং দার্জ্জিলিং পর্য্যন্ত দেখা যায় বলিয়া কুলীরা প্রকাশ করিল। কুয়াসার জন্য আমরা দার্জ্জিলিং দেখিতে পাইলাম না; কিন্তু দূরের দৃশ্য ও গণ্টক সহর অতি সুন্দর দেখা যাইতে লাগিল।

পাহাড়ের উপর হইতে সর্পাকার আঁকা-বাঁকা রাস্তা দিয়া নামিতে নামিতে এক পাহাড় হইতে অন্য পাহাড়ের উপর দিয়া গণ্টকে পৌছিতে হইবে। সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। মুগ্ধভাবে তথায় কিছু কাল এই দৃশ্য উপভোগ করা গেল। এখান হইতে আঁকা-বাঁকা পথে গণ্টক প্রায় ৩ মাইল, কিন্তু সোজা রাস্তায় যাইতে পারিলে পথ ১ মাইল অপেক্ষাও কম।

গতকল্য পর্য্যন্ত রাস্তায় কোন অর্কিড দেখি নাই। অদ্য রাস্তায় যত নিম্নে যাইতে লাগিলাম, গাছে অনেক অর্কিড দেখিতে পাইলাম। রাস্তার দুই পার্শ্ব লতা-পুষ্পে শোভিত। আমরা ডালখ্যাসার পূর্ব্বধার দিয়া গণ্টকে আসিয়া পৌছিলাম। নাথুলার উপর হইতে তিব্বত ছাড়িয়া আমরা সিকিম মহারাজের রাজ্যে পৌছিয়াছি। এখন গণ্টকে পৌছিয়া সিকিম গভর্ণমেণ্টের রাজধানীতে পৌছিলাম। তখন বেলা প্রায় ১½ ঘটিকা।

ইয়াটুঙ্গের পর হইতে আর বাড়ীর কোন সংবাদ পাই নাই। বাড়ীর সংবাদ পাইবার জন্য মন উদ্বিগ্ন ছিল। সুতরাং প্রথমে আমি গণ্টক পোষ্ট আফিসে কোন পত্রাদি আসিয়াছে কি না অনুসন্ধান করিতে গেলাম এবং বাড়ীতে আমাদের গণ্টক পৌছার তার করিয়া দিলাম। তৎপরে রেসিডেণ্ট কর্ণেল বেলি মহোদয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তিনি আমাকে নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাগত দেখিয়া সন্তোষ-প্রকাশ করিলেন। তিনিও শীঘ্রই পরিদর্শনের জন্য সস্ত্রীক গ্যাণ্টসী যাইতেছেন বলিয়া প্রকাশ করিলেন।

আমাদের বাজার দেখিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বাজারে যাইতে বিলম্ব হইয়া গেল। ইতিমধ্যে বাজার প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, বাজার হইতে কিছু আলু, চাল, ডাল ও শাক ক্রয় করিয়া লইয়া আসিলাম। এখানে আমাদের অশ্বতরদিগকে বিদায় দিতে হইবে। কাযেই আমাদের কুলী সংগ্রহ করা প্রয়োজন। আমাদের পূর্ব্ব-বর্ণিত সিকিম

গভর্ণমেণ্টের পশুচিকিৎসক ডাক্তার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সাহায্যে সিকিম গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে রাস্তার ঠিকাদারদের উপর আমাদের মোট বহনের কুলী যোগাইবার পরওয়ানা পাইলাম। আগামী কল্য আমরা গণ্টক ছাড়িয়া দার্জ্জিলিং অভিমুখে রওনা হইব। ডাক্তার বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদিগকে তাঁহাদের বাসায় নিমন্ত্রণ করিলেন। সন্ধ্যার পর হইতে মুষলধারায় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। আমরা বাংলোয় বসিয়া রহিলাম। রাত্রি ৮টার সময় বর্ষাতি গায় দিয়া ভিজিতে ভিজিতে ডাক্তার মহোদয়ের বাসায় উপস্থিত হইলাম। তথায় পরিতোষের সহিত ভোজন করিয়া রাত্রি প্রায় ১০॥টার সময় ডাক-বাংলোয় ফিরিলাম। এখানে আসিয়া আমাদের শীত খুব কম বোধ হইতে লাগিল। শয়ন করা মাত্র ঘুমাইয়া পড়িলাম।

২৩শে জুন। অতি প্রত্যুষে শয্যা হইতে উঠিয়া হস্তমুখ প্রক্ষালন করত অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। সকাল হইতে বৃষ্টি হইতে লাগিল। অশ্বতরের মালিক নজুং কাজি প্রাপ্য ভাড়া লইয়া গেল। এ দিকে অন্য কুলী আসিতে বিলম্ব হইতে লাগিল। বিলম্ব দেখিয়া আমরা চিন্তিত হইলাম। আমাদের অদ্য রংপু পর্য্যন্ত ২৪ মাইল যাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কুলীদিগের বিলম্ব হওয়াতে তাহা হইয়া উঠিবে না বুঝিতে পারিলাম। বেলা প্রায় ৯॥টার সময় কুলীরা আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদিগের পৃষ্ঠে মোট দিয়া আমাদের ২।৩ মোট রহিয়া গেল। অগত্যা ডাক্তার বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ মোট কয়টি কুলী দ্বারা পশ্চাৎ পাঠাইয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হওয়ায় আমরা সেই মোট তাঁহার হেপাজতে রাখিয়া বেলা ১০টার পর রওনা হইলাম। তিনি প্রায় ৩ ঘণ্টা পরিশ্রমের পর কুলী সংগ্রহ করিয়া তাঁহার পাচক-ব্রাহ্মণ সঙ্গে দিয়া সেই মোট আমাদের পশ্চাতে পাঠাইয়া দিলেন। বাস্তবিক ডাঃ এন, এন, ব্যানার্জ্জী পরোপকারের জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত। তাঁহার ভদ্রতা, পরোপকার ও সৌজন্যের কথা গণ্টকে সকলেরই সুবিদিত।

আমরা গণ্টকের বাংলো হইতে বহির্গত হইয়া গণ্টকের মহারাজের প্রাসাদের এবং বাংলোর মধ্যস্থিত পার্কের উপর দিয়া কিছু দূর দক্ষিণে চলিলাম। তার পর ক্রমে নিম্নদিকে অবতরণ করিয়া গরুর গাড়ীর রাস্তায় পড়িয়া আরও কিছু দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইলাম। এইরূপে চলিতে চলিতে ক্রমশঃ বাজারের দক্ষিণ পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তথা হইতে বরাবর দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইয়া প্যাকীয়াং ও রংপু যাওয়ার রাস্তার মাথায় আসিয়া পৌছিলাম। এখান হইতে একটি রাস্তা প্যাকীয়াংএর দিকে গিয়াছে, অপর একটি রাস্তা শঙ্খখোলা দিয়া রংপুর দিকে গিয়াছে। আমরা প্যাকীয়াংএর রাস্তা বামদিক ফেলিয়া স্থানুডঙ্গের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

আমরা ক্রমাগত নীচের দিকেই নামিতে লাগিলাম এই স্থানটি মাত্র ২ হাজার ৩ শত ফুট উচ্চ। আমরা কখনও কার্ট রোড, কখনও বা সোজা রাস্তা দিয়া অগ্রসর হইতে হইতে বেলা ১টার পর স্থানুডঙ্গে উপস্থিত হইলাম এখানে গরম বোধ করিতে লাগিলাম। গায়ের গরম পোষাক খুলিয়া ফেলিলাম। ফ্লানেলের সার্ট মাত্র গায় রহিল। স্থানুডঙ্গের রাস্তার দুই পার্শ্বে কয়েকখানা ছোট ছোট দোকান-ঘর আছে। এখান হইতে একটু উপরে উঠিয়া পাহাড়ের কতক উপরে ডাক-বাংলো অবস্থিত। বাংলোটি বাজার হইতে দেখা যায় না। কুলীরা এখন পর্য্যন্ত আসিয়া পৌছে নাই। এখানে আমাদের কুলী বদল হইবার কথা। কাযেই আমরা বাজারে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কুলীর খোঁজে ঠিকাদারের নিকট গেলেন। ঠিকাদার পরোয়ানা পাইয়া কুলী সংগ্রহ করিতে বাহির হইয়া গেল। এ দিকে আমাদের কুলীরা প্রায় ১॥—২ ঘণ্টা পরে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি ৪টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলাম। তখনও সকল কুলী সংগ্রহ হয় নাই। কুলী দিতে পারিবে বলিয়া নেপালী ঠিকাদার আশ্বাস দিল।

নেপাল হইতে বহু লোক সিকিম রাজ্যে আসিয়া উপনিবেশ করিয়া বসবাস করিতেছে। এই নেপালীরা প্রায়ই পাহাড়ের নিম্নস্থানে কমলা, পাপিতা, পেয়ারা, ধান্য ও শাক-সব্জী চাষ করে। পাহাড়ের পাদদেশে, বিশেষত উপত্যকায় নেপালী বস্তী অধিক। কৃষিকার্য্যই ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। ঠিকাদার পরোয়ানা পাইলে তাহার অধীনস্থ চাষী নেপালীদের মোট বহিবার জন্য লইয়া আইসে। প্রত্যেক Stageএ এই কুলীদিগকে প্রতি মোটে ॥০ আনা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। কুলীরা আসিলে পর মোটের বন্দোবস্ত করিবার জন্য আমি শ্রীযুক্ত সতীশ-

ভট্টাচার্য্যকে ও কুলী-সর্দ্দারকে সেখানে রাখিয়া ৪টা ১৫ মিনিটের সময় স্তানুডঙ্গ হইতে রওনা হইলাম।

রাস্তার দুই পার্শ্বে জঙ্গল, তাহাতে শাল, বাঁশ এবং অন্যান্য বৃক্ষাদি ও ফার্ণ, চারাগাছ, লতা ইত্যাদি বিস্তর জন্মিয়াছে। লতা ও ছোট ছোট চারাগাছে, কতক কতক বৃক্ষে নানাপ্রকার ফুল ফুটিয়া বন-ভূমি সুশোভিত করিয়াছে। এক দিকে অভ্রভেদী পাহাড়, অপর দিকে রঙ্গলী নদী। নদী কোন স্থানে সোজা যাইয়া পাহাড়ের গায়ে লাগিয়া ঘুরিয়া যাইতেছে, কোথাও বা চন্দ্রাকৃতি হইয়া চলিয়াছে; কোথাও বা এক পাহাড়ে ধাক্কা লাগিয়া অন্য পাহাড়ে যাইয়া লাগিতেছে। এইরূপে নদী সর্পাকার গতিতে নিম্নদিকে প্রবাহিত হইতেছে। নদীর উভয় পারেই গগনস্পর্শী জঙ্গলাবৃত পাহাড়। পার্শ্বের উপত্যকায় এবং পাহাড়ের গায় বিস্তর চাষ আছে। রাস্তা কখনও পাহাড়ের পাদদেশ দিয়া, কখনও বা সানুদেশ দিয়া চলিয়াছে। স্থানে স্থানে রাস্তা পাহাড়ের গা দিয়া চলিয়া গিয়াছে এবং কোন কোন স্থানে পাহাড় কাটিয়া রাস্তা করা হইয়াছে। কোন যায়গায় রাস্তা নদী হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে। আবার কোন স্থানে রাস্তা নদীর উপরে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছে। কোথাও বা রাস্তা নদীতে ভাঙ্গিয়া যাইতেছে; আবার পাহাড় কাটিয়া নূতন রাস্তা হইতেছে। অন্য কোথাও আবার বৃষ্টির জলের স্রোতে ভাঙ্গিয়া রাস্তা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। প্যাকীয়াং যাইবার রাস্তা ছাড়িয়া পাহাড়ের নিম্নদেশ হইতে স্তানুডঙ্গ পর্য্যন্ত রাস্তায় ধ্বস্ নামিবার আশঙ্কা অধিক। বাস্তবিক আমরা এই রাস্তার মধ্যে বহু যায়গায় এইরূপ ধ্বস্ নামিতে দেখিতে পাইলাম। এই রাস্তা মেরামত করিবার জন্য সরকার হইতে লোক নিযুক্ত আছে। এই রাস্তার পার্শ্বে বহু ধানের চাষ ও কমলা-বাগান আছে। কমলাগাছে কমলার ফুল ও ছোট ছোট কমলার কড়া হইয়াছে।

সিংতাম নদী ও তদুপরিস্থ সেতু (অধুনা বর্ষাস্রোতে ভগ্ন)

আমরা এই রাস্তা দিয়া কখনও সামান্য উপরে উঠিয়া, কখনও সামান্য নিম্নে নামিয়া, কখনও সমতল রাস্তা দিয়া ৫ মাইল চলার পর সন্ধ্যার প্রাক্কালে সিংতাম নামক বাজারে পৌছিলাম।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ঘোড়া দৌড়াইয়া আনিয়া আমাদের সঙ্গে সিংতাম বাজারে মিলিত হইলেন।

সিংতাম বাজারটি বেশ বড়। এখানে কমলা ও এলাচীর আমদানী হয়। ইহার কতক দার্জ্জিলিং যায় এবং কতক তিস্তা দিয়া বাহিরে আসে। বড় এলাচী ও কমলার এই স্থানটি প্রধান আড়ত। এখানে বহু মাড়োয়ারী, কয়েক ঘর ভুটিয়া ও নেপালীও আছে; কিন্তু এলাচী ও কমলার ব্যবসা প্রায়ই মাড়োয়ারীদের হাতে। কমলার সময় বাঙ্গালীরাও তথায় যাইয়া নানাদিকে কমলা চালান দেয়। এখানে সিকিম গভর্ণমেণ্টের বাজারের ইন্‌সপেক্‌টারের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি প্রত্যেক বাজার পরিদর্শন করিয়া বেড়ান। আগামী কল্য সিংতামের বাজার বসিবে বলিয়া উহা পরিদর্শন করিতে আসিয়াছেন। এখানে সিকিম সরকারের একটি পুলিস-থানা আছে।

গত ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে দার্জ্জিলিং হইতে গণ্টক যাতায়াতের সময় সিংতামের নদীর উপর যে পুল ছিল, তাহা গত বর্ষায় নদীর স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। আমরা গণ্টক যাইবার সময় এই পুলের ফটো লইয়াছিলাম, ঐ পুলের ফটো দেওয়া গেল। নদী-পারাপারের জন্য অধুনা একটি অস্থায়িভাবে নূতন তারের পুল করা হইয়াছে। সিংতামের বাজারের নীচে সিংতামের নদী তিস্তা নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। তিস্তানদী কলকল নাদে এবং গভীর-গর্জ্জনে প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। এখনও আমাদের ৪ মাইল যাইয়া শঙ্খখোলার বাংলোয় পৌছিতে হইবে। সুতরাং তাড়াতাড়ি চলিয়া রাত্রি ৮টার পরে বাংলোয় উপস্থিত হইলাম। বাংলোটি বেশ বড়। ৬টি ঘর—তিনটি শয়নঘর, দুইটি খাবার ঘর এবং একটি বসিবার ঘর। ইহা ব্যতীত কুলী, ঘোড়া থাকিবার ও রান্নার জন্য আলাদা ঘর আছে। ইহা ১ হাজার ৪ শত ফুট উচ্চ। স্থানটি গরম বোধ হইল। এখানে মশকের ভীষণ উৎপাত আছে। এই স্থানে রাত্রিতে আমাদের মশারি ব্যবহার করিতে হইল, শীতবস্ত্র ছাড়িয়া সুতির পোষাক ব্যবহার করিলাম। কুলীদের আসিতে বিলম্ব হইবে, কাযেই আমরা সিংতাম বাজার হইতে কিছু চাউল, ডাইল, আলু, লবণ এবং মসলা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলাম। বাংলোয় পৌছিয়া প্রথমেই রান্না চড়াইয়া দিলাম। প্রত্যেক বাংলোয় রান্না করিবার ডেকচী ইত্যাদি আছে এবং খাওয়ার জন্য প্লেট পাওয়া যায়। রান্না শেষ হইতে রাত্রি ১০৷৷টা বাজিয়া গেল। ইতিমধ্যে কতক কুলী আসিয়া উপস্থিত হইল এবং কতক আসিল না। আমাদের আহার শেষ করিয়া শয়ন করিতে রাত্রি প্রায় ১১টা বাজিয়া গেল।

২৪শে জুন। অভ্যাস অনুসারে প্রভাতে ৫টার সময় আমরা নিদ্রা হইতে উঠিলাম। রাত্রিতে অবশিষ্ট কুলী আসিয়া পৌছে নাই। সকাল ৮টার সময় বক্রী কুলী আসিয়া পৌছিল। তাহারা গত রাত্রিতে সিংতাম বাজারে অপেক্ষা করিয়াছিল। ডাক্তার বন্দ্যোপাধ্যায় গণ্টক হইতে

তিস্তা নদীর বাঁক

পাচকের সহিত আমাদের মোটসহ যে তিনটি কুলী পাঠাইয়াছেন, তাহারা এখনও পৌছে নাই। আমাদের ৯টার সময় খাওয়া-দাওয়া হইয়া গেল আমরা সেই কুলীদের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। বেলা ৯৷৷০টার পর ডাক্তার মহোদয়ের পাচকের সহিত সেই তিন কুলী আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা এখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে; অন্য কুলীরা রংপু পর্য্যন্ত যাইবে। কুলী যোগাড়ের জন্য সিংতাম বাজার পর্য্যন্ত কুলীর সর্দ্দারকে পাঠাইলাম। কুলী পাওয়া দুঃসাধ্য হইল অগত্যা আমরা চাকরের ঘোড়ার পৃষ্ঠে ৩টি মোট বাঁধিয়া রংপুর দিকে রওনা হইলাম। রংপুতে আমাদের কুলী বদল হইবে। রংপুতে কুলীর

তিস্তা নদী

বন্দোবস্ত করার জন্য পরোয়ানাসহ শ্রীযুক্ত সতীশ ভট্টাচার্য্যকে অগ্রে পাঠাইয়া দিলাম।

এ দিকে আমরা শঙ্খখোলা ডাক-বাংলো হইতে তিস্তা নদীর ধার দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। বর্ষাকালে তিস্তা নদী আরও বাড়িয়া গিয়াছে জল এখন তীরবেগে নিম্নদিকে ছুটিয়াছে। কোন কোন স্থানে জল বাধা পাইয়া ভীষণ-গর্জ্জনে ফুলিয়া উঠিয়া কখনও বাঁধের ধার দিয়া, কখনও বা পাথরের উপর দিয়া চলিয়াছে। তিস্তা নদীর দুই পারে মধ্যে মধ্যে সমতল ভূমি, তথায় বহুস্থানে চাষবাস হয়। কোন কোন স্থানে উচ্চ-ভূমির উপর চাষ-বাস হয়। দুই পার্শ্বে জঙ্গলাবৃত অভ্রভেদী পাহাড়। এই দুই পার্শ্বের পাহাড়েও চাষ-আবাদ দেখা যায়। নিম্নে কুয়াসা নাই, কিন্তু পাহাড়ের উপরি-ভাগ মেঘে ও কুয়াসায় আবৃত। পাহাড়ের বাঁকে বাঁকে নদী হেলিয়া দুলিয়া নাচিতে নাচিতে চলিয়াছে। রাস্তাও নদীর ন্যায় উচ্চাবচ হইয়া তাহার সঙ্গে চলিয়াছে। কোন কোন স্থানে রাস্তা নদীর তীরপথ হইতে সরিয়া দূরে চলিয়া গিয়াছে। রাস্তাটি অতি সুন্দর। ইহাতে গরুর গাড়ী ও মোটর-গাড়ী বেশ চলিতে পারে; রাস্তার ধারে জঙ্গলে ছোট-বড় গাছে ও লতায় নানাপ্রকার ফুল ও ফল ধরিয়াছে। ফুল সহ অর্কিডও অনেক দেখিতে পাইলাম। আমরা প্রায় ৩ মাইল অগ্রসর হইয়া একটি পরিত্যক্ত তামার খনির নিকট আসিয়া পৌছিলাম। এই খনিতে পূর্ব্বে কায হইত, এখন হয় না। তামার খনির জল যে স্থান দিয়া নির্গত হইতেছে, সে স্থানের মাটী তামাটে রং ধরিয়াছে। আমরা এখান হইতে আরও ১ মাইল অগ্রসর হইয়া রংপু নামক একটি গ্রামে উপস্থিত হইলাম।

রংপুতে বাজার আছে। উহার পশ্চিমে তিস্তা নদী প্রবাহিত। দক্ষিণদিক হইতে আর একটি পার্ব্বত্য নদী আসিয়া বাজারের পশ্চিমদিক দিয়া তিস্তা নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই ঝরণা-নদীর উপরে একটি তারের সেতু আছে। উক্ত নদীর অপর পারে ইংরাজ-সরকারের রাজ্য।

রংপু

রংপুর বাজার দুই ভাগে বিভক্ত। উচ্চভূমির উপরে পুরাতন বাজার আছে,—তাহা পূর্ব্ব-পশ্চিমদিকে অবস্থিত। এখানে বহু ঘর, কারবারও বেশী। কমলা, চাউল, এলাচী চতুর্দ্দিক হইতে আসিয়া এই বাজার হইতে কালিম্পং, তিস্তা ইত্যাদির দিকে চলিয়া যায়। বাজারে একটি ডাক্তারখানা, পোষ্ট আফিস, পুলিস আউট পোষ্ট আছে। এখানে এক জন পার্শীর একটি বড় কাঠের কারবার আছে। কাঠ এখান হইতে সংগ্রহ করিয়া নানা-স্থানে চালান দেয়।

[ক্রমশঃ

শ্রীপ্রিয়নাথ রায়।

বুদ্ধি—পরা ও অপরা *

সেবার অবসর পেয়ে কাশীতে কিছু দিন ছিলাম।

সেখানে পরিচয় হ'ল বাসুদেব বেদরত্ন মহাশয়ের সঙ্গে। শুনেছিলাম, বেদে এঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি, বাঙ্গালীর মধ্যে কেন, ভারতবর্ষে এঁর সমকক্ষ বেদজ্ঞ কমই আছেন। এঁকে দেখবার ইচ্ছা পূর্ব্ব হতেই ছিল, এখন সাক্ষাতের সুযোগ পেয়ে বড় আনন্দ পেলাম। তাঁকে আমার অন্তরের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ক'রে জিজ্ঞাসা করলাম, বেদে আপনার এমন প্রগাঢ় অধিকার কি ক'রে হ'ল, বেদরত্ন মহাশয়?

অশীতিপর বৃদ্ধ—মুখে শান্ত সৌম্য ভাব। খানিকটা আমার দিকে চেয়ে থেকে বল্লেন, অধিকার, অধিকার বলছেন? তার পর মাথা নেড়ে বল্লেন, অধিকার বলতে যা বোঝায় অর্থাৎ সবটা একেবারে জলের মত স্বচ্ছ নির্ম্মল, কোথাও বাধামাত্র নেই, তা আমার হয় নি, আজও হয় নি। তবে যে বস্তুর চর্চ্চা আজ এই পঞ্চাশ বৎসরের ওপর ক'রে আসছি, তার সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা হওয়া সম্ভব বৈ কি, কিছু বিদ্যা, কিছু প্রবেশ, কিন্তু না, তাকে আমি অধিকার বলতে প্রস্তুত নই।

তার পর খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বল্লেন, না, অধিকার নয়, তবে বড় জোর এই কথা বলতে পারি যে, কিছু কিছু জেনেছি,—আর তাতে কিছুই বিস্ময়ের নেই, এক ত এই সুদীর্ঘকালের চর্চ্চা,—তার ওপর কোন্ গুরুর কাছে আমার বেদশিক্ষা জানেন?

আমি বল্লাম, না, জানি না ত!

বেদরত্ন মহাশয় দুই হাত কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম ক'রে বল্লেন, শ্রীমৎ ভাস্করানন্দ স্বামীর কাছে, জ্ঞানে যাঁকে লোকে সাক্ষাৎ শঙ্করের অবতার বলত।

আমি বিস্ময় প্রকাশ ক'রে বল্লাম, তাঁর কাছে? কিন্তু শুনেছি ত, তিনি কাউকেই বড় একটা আমল দিতে চাইতেন না সহজে, আপনার এ সুযোগ ঘটল কি ক'রে?

তিনি হেসে বল্লেন, ঘটনা-চক্র ভিন্ন আর কিছুই নয়, কিন্তু সে আশ্চর্য্য ঘটনা-চক্র। শোনবার মত ব্যাপার, কিন্তু হয় ত অত কথা শোনবার আপনার সময় নেই।

আমি বল্লাম, বিলক্ষণ, এর চেয়ে ঢের বেশী অপ্রয়োজনীয় কাযের জন্যও আমার এখন সময়বাহুল্য, বেদরত্ন মহাশয় আমার সময়ের জন্য ভাববেন না, এবং আপনার কথা শোনবার জন্যে কিছু আগ্রহও যে না হয়েছে, এমন নয়। কিন্তু কথা হচ্ছে এই যে, এর ভিতর হয় ত আপনার গোপনীয় কিছু থাকতে পারে—তা যদি হয় ত—

বেদরত্ন মহাশয় বল্লেন, না, আপনাকে বলব, তাতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। না, সাধারণকে বলতেও আমার আপত্তি নেই। কারণ, আমার মনে হয় যে, তাঁর কাছ থেকে যে সত্যের সন্ধান পেয়েছি, যে আলোর রেখা দেখতে পেয়েছি, তা শুধু একা আমারই সম্পত্তি না হয়ে সাধারণের সম্পত্তি হওয়া উচিত, তাতে আশা পাওয়া যায় অনেক, সান্ত্বনা আসে প্রচুর, এবং অন্ধকার মনের অন্তমিকার কবাটও খুলে যাওয়া অসম্ভব নয়। তবে অবশ্য অধিকারি-ভেদ আছে, এ কথাও সত্য।

ব'লে খানিকটা ভেবে নিয়ে বলতে লাগলেন;—

যৌবনে আমি প্রচলিত হিন্দু-মত ও শাস্ত্রাচারে বিশ্বাসী ছিলাম না, প্রত্যক্ষ দৃষ্টি ও প্রমাণের কঠিন পরীক্ষায় যা এড়াতে পারত না, তাকে আমলই দিতাম না, বরং কুসংস্কার ব'লে তা থেকে দূরেই থাকতাম। তখন হাওয়াই উঠেছিল এমনি, এবং তাকে আমি দোষও দিই না। নিজের বুদ্ধি ও বিবেচনাকে উপযুক্ত প্রসার না দিয়ে অন্ধ-বিশ্বাস এবং অন্ধ-অনুকরণের বিপক্ষে একটা প্রতিক্রিয়া সুরু হয়েছিল। খুব স্বাভাবিক। চিরদিন হয়ে আসছে বলেই যে পুরাতন সব চেয়ে ভাল, এ মত কখনই আমি পোষণ করি নি, কিন্তু পুরাতন হলেই যে তাকে মন্দ হতে হবে, এ মতও আমি আর পোষণ করি না, যদিও তখনকার হাওয়ার মধ্যে এই পুরাতনের প্রতি সর্ব্বপ্রকারের বিদ্রোহের ভাবটাই ছিল প্রধান, এবং আমিও তাইতেই আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম। সমস্ত প্রাচীনকে একেবারে ছিন্নভিন্ন ক'রে দিয়ে জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়ে দাঁড়াতে পার দাঁড়াও, কোন আপত্তি নেই, কিন্তু বুড়ো বয়সের অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি ত', সুতরাং এ কথা

---

* এই কাহিনীটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাসিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট শ্রুত।

এন বুঝি যে, তা বোধ হয় সম্ভব নয়। বটগাছটা যদি সহসা একদিন ব'লে বসে যে, বহুদিনের ঐ যে শিকড়টা, ও আমার কেউ নয়, ওর সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলতে পারলেই আমি আকাশে পৌছতে পারব ত তার ভাগ্যে দুঃখ আছে অনেক। শিকড়কে ত্যাগ ক'রে নয়, পরন্তু তার ভূগর্ভস্থ শক্তি-সম্ভাবনাকে গাছের গুঁড়ির দৃঢ়তায়, শাখার অনায়াস উদার প্রসারে এবং পাতার শ্যামলতায় পরিণত ক'রে তোলার মধ্যেই ঐ বটের সার্থকতা। প্রত্যেকের ভিতরেই ভগবান্ বিবেচনা দিয়েছেন, বুদ্ধি দিয়েছেন, তাদেরই চালনা ক'রে বুঝে নিতে হবে, কেমন ক'রে অতীতকে ফলে-ফুলে সার্থক করতে হবে বর্ত্তমানের মধ্যে, তার জন্যে কোন্‌টাকে বেছে নিতে হবে, কোন্‌টাকে ত্যাগ করা চাই! এমন সময় মাঝে মাঝে আসতে পারে যে, হয় ত আমার সঙ্কীর্ণ বুদ্ধিতে আর কুলোচ্ছে না, তখন সাহায্য নিতে হবে মহাজনদের। আর সৌভাগ্যক্রমে তাঁদের অভাব ভারতবর্ষে নেই, যে দিকে চাও—ভূরি ভূরি। দেখ, তাঁরা কি বলেছেন, কি করেছেন। তা দেখায় কোন লজ্জা নেই, তাকে কুসংস্কার বলে না। সাহিত্য শিখতে গেলে আমরা বড় বড় সাহিত্যিকের বই পড়ি, অঙ্ক শিখতে গেলে গণিতজ্ঞদের নির্দ্দিষ্ট পথে চলি, এমনি ক'রেই ত শিখতে হয়, এই ত ধারা!

যাক্, কি কথা এসে পড়ল। যৌবনের গোড়ায় একেবারে নতুনের আলোয় চোখে ধাঁধা লেগে আমি কাশীতে এলাম। শুনলাম, এখানে আছেন ভাস্করানন্দ ব'লে মস্ত এক জন সাধু। সাধু-টাধুকে বড় আমল দিতাম না—বড় বড় ঝুরি নামিয়ে সনাতন বটগাছের মত ভারতবর্ষের অনেকখানিই কুসংস্কারের অন্ধকারে ডুবিয়ে রাখার প্রতীকরূপেই ওঁদের দেখতাম, এবং ঐ জাতীয় সকলকেই নির্ব্বিচারে এক-গাড়ে বুজরুক শ্রেণীতে ফেলেছিলাম। সুতরাং স্বামীজীকে দেখবার জন্যে আগ্রহে আমি অধীর হলাম না।

মহাদেব ব'লে আমার এক বন্ধু ছিল—দিল্লীওয়ালা, দিল্লীতে মস্ত বড় কারবার, বহু-লক্ষপতি। জানতাম, স্বামীজীর সে এক জন মস্ত বড় ভক্ত। প্রকাণ্ড ব্যবসার পেছনে তার সমস্ত বুদ্ধির পুঁজিটুকু খরচ ক'রে, এ দিকটায় ভেবে দেখবার মত আর কিছুই বাকী ছিল না, তাই অপর দশ জনের মতই সে অনায়াস গতানুগতিকের পন্থা বেছে নিয়েছে, এই কথা মনে ক'রে তার সঙ্গে আমার এ সম্বন্ধে কোনও তর্ক ছিল না, বরং তাকে কতকটা করুণার দৃষ্টিতেই দেখতাম, এবং আমাদের দুজনের মতের অনৈক্য নিয়ে আমাদের মধ্যে কোন বিরোধও ছিল না।

সে দিন সকালে মহাদেব এসে উপস্থিত। বল্লে, আজ পঞ্জাব মেলে দিল্লী ফিরে যাব, বড় সব জরুরী কায এসে গেছে। একবার স্বামীজীর সঙ্গে দেখা ক'রে যেতে হবে। হয় ত এই সব কায চুকিয়ে এবার আবার কাশী আসতে দেরী হ'তে পারে, তাই তোমার সঙ্গেও দেখা করতে এলাম।

আমি তার বন্ধু-প্রীতির জন্য তাকে ধন্যবাদ দিলাম।

আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়ে সে উঠতে যাবে, হঠাৎ কি মনে হ'লো, বল্লে, চলো না দোস্ত আমার সঙ্গে, স্বামীজীকে দেখবে একবার। আমার গাড়ী রয়েছে, কোনও কষ্ট হবে না, ফেরবার পথে তোমাকে আবার পৌছে দিয়ে যাব।

আমি দ্বিধামাত্র না ক'রে বল্লাম, মাপ কর মহাদেব, জান ত, ও সব ব্যাপারে আমার বিশ্বাস কি রকম। তুমি একাই যাও।

সে ছাড়লে না। বল্লে, বিশ্বাস থাক বা না থাক, কৌতূহলও ত হওয়া উচিত। হাজারো হাজারো লোক যাঁকে দেখতে আসে, তাঁকে একবার দেখলে ত তোমার মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। শুনেছি, কলকাতায় তোমরা যাদুঘর দেখতে লাখো লাখো লোক যাও, অথচ সে ত সব মরা। আর ইনি এক জন জীয়ন্ত মানুষ, যাঁকে বহু লোক শ্রদ্ধা করে, আর যারা করে, তাদের সবাইকেই ত বেকুব বলা চলে না—ব'লে মহাদেব হাসতে লাগলো।

আমিও হেসে বল্লাম, তারা সব যে কি, তার চর্চ্চা না করাই ভাল। মহাদেব খুব হাসতে লাগলো, বল্লে, বেশ, সারা দুনিয়াই যেন বেকুব হ'ল, কিন্তু তোমার ত খুব বুদ্ধি আছে, —যাকে দেখতে যাবে, তিনি অন্ততঃ তোমাকে ত কামড়াতে পারবেন না। তবে এতই বা ভয় কেন—ব'লে জবরদস্তি সে আমার হাত ধ'রে গাড়ীতে গিয়ে উঠল।

গিয়ে দেখলাম, সে এক রীতিমত সভা ব'সে গিয়েছে। ভক্তের দল চারিদিকে ঘিরে রয়েছে, মাঝখানে স্বামীজী। আমরা যেতেই তিনি আমাদের দিকে দেখলেন, এবং কি জানি কেন, আমাকে একটু বিশেষভাবেই নিরীক্ষণ করলেন।

মহাদেব তাঁর পায়ের ধূলো নিলে, আমি একপাশ থেকে একটা শুষ্ক অভিবাদন ক'রে বসলাম।

খানিকক্ষণ কথাবার্ত্তা চল্লো সমবেত ভক্তবৃন্দের সঙ্গে, তার পর মহাদেব উঠে গড় ক'রে প্রণাম ক'রে পায়ের ধূলো নিয়ে হাত যোড় ক'রে বল্লে, বাবা, আজ পঞ্জাব মেলে আমাকে দিল্লী যেতে হবে—অনুমতি করুন।

তার দিকে স্নিগ্ধ-দৃষ্টিতে চেয়ে স্বামীজী বল্লেন, আজ মৎ যাও বেটা।

মহাদেব হাতযোড় করেই ছিল, মিনতির সুরে বল্লে, বড় দরকার দিল্লীতে বাবা, আজ ডাক-গাড়ীতে যেতে না পারলে ব্যবসার বড় লোকসান হবে, অনুমতি করতে আজ্ঞা হোক।

স্বামীজী হাসলেন, বল্লেন, তোমার জানের (প্রাণের) চেয়ে কি ব্যবসা বড় হ'ল, মহাদেব?

মহাদেব বিস্মিত হয়ে বল্লে, জান্? কেন এমন কথা বলছেন, মহারাজ?

স্বামীজী সহজ সুরেই বল্লেন, আজ ডাক-গাড়ী লড় যাগা, গাড়ীতে গাড়ীতে ধাক্কা লেগে ভীষণ কাণ্ড হবে, বহু লোক মরবে, আঘাত পাবে। প্রাণের যদি কোনও মূল্য থাকে ত যেও না।

মহাদেব বিনা দ্বিধায় বল্লে, তবে যাব না নিশ্চয়ই, মহারাজ।

স্বামীজী তার কথার সমর্থন ক'রে ঘাড় নেড়ে বল্লেন, না, যেও না।

মহাদেব আবার প্রণাম ক'রে বেরিয়ে এলো, সঙ্গে সঙ্গে আমিও এলাম।

আমার দেহের রক্ত যেন টগবগ ক'রে ফুটছিল। কি দম্ভ, কি ধৃষ্টতা এই মানুষটির, কাশীর এক প্রান্তে ব'সে সে ব'লে দিলে যে গাড়ীর কলিশন হবে, যেন সর্ব্বজ্ঞ ভগবানের অধিষ্ঠান হয়েছে, আর কি নির্ব্বোধ এই মহাদেবটা, যে, বিনা আপত্তিতে সভক্তি চিত্তে একে গলাধঃকরণ ক'রে তার যাওয়া বন্ধ ক'রে দিলে—যার ফলে হয় ত তার বহু অর্থক্ষতি হবে! ভাবলাম, এই মনোভাবের ফলেই ত আজ ভারতবর্ষের এই দুর্দ্দশা, এই মানুষকে দেবতার সিংহাসনে বসিয়ে, নিজের সমস্ত স্বাধীন বিবেচনা বিচারবুদ্ধির কণ্ঠরোধ ক'রে, পঙ্গু হয়ে যাবার ফলে!

গাড়ীতে ব'সে মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করলাম, দিল্লী যাবে না আজ? সে স্বচ্ছন্দে বল্লে, না।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কেন, তোমার কাযের ক্ষতি হবে না?

সে বিস্মিত হয়ে বল্লে, শুনলে না স্বামীজী কি বল্লেন? এর পরেও কি দিল্লী যাওয়া চলে?

আমার অন্তরের সমস্ত আগুন যেন ফুটে বেরিয়ে এল, বল্লাম, মহাদেব, তুমি এত বড় কারবারের মালিক, এত ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে যে, তোমার বিষয়-বুদ্ধি এবং সাধারণ বিবেচনা-শক্তি যথেষ্ট পরিমাণেই আছে, কিন্তু আজ সে সব কোথায় গেল তোমার? তোমার বুদ্ধি কি এই সামান্য কথাটা বুঝতে পারে না যে, তোমার স্বামীজী ভগবান্ নয়, সে যদি ভগবানের শক্তির ভান করে ত সে শুদ্ধ মাত্র তার ধৃষ্টতা, দাম্ভিকতা? তার কথায় তোমার সঙ্কল্প বিসর্জ্জন দেবে? টাকার ক্ষতি করবে? মানুষ হও মহাদেব, সারা হিন্দুস্থান যে এই পথে ধ্বংসে যেতে বসেছে!

মহাদেব একটুও রাগলে না, হেসেই বল্লে, আমি ত আগে পঞ্জাব মেলের কবল থেকে বাঁচি, তার পর হিন্দুস্থানের কথা ভেবে দেখব।

অর্থাৎ ও একেবারে ধ'রে নিয়েছে যে, পঞ্জাব-মেলে কলিশন লেগে ব'সে আছে!

বাড়ীর সামনে এসে গাড়ী দাঁড়াল, মহাদেবকে মনে মনে ধিক্কার দিতে দিতে তাকে সম্ভাষণমাত্র না ক'রে নেমে গেলাম।

আজকের এই ব্যাপার আমার মনের মধ্যে মস্ত একটা বিপ্লব সৃষ্টি করেছিল স্বীকার করতেই হবে। কলকাতায় তখনকার দিনে বড় গলায় এই কথাটাই বারম্বার শুনে এসেছি যে, মানুষ মানুষই, হ'রে ন'রে পরাণেকে দেবতার আসনে বসিয়ে তাকে যুগযুগান্তর থেকে পুজো দিয়েই মোহমুগ্ধ সারা দেশটা চলেছে মৃত্যুর পথে, ধ্বংসের পথে। মানুষ হতে হলে এই দাস-মনোভাবকে বিসর্জ্জন দিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে হবে। অথচ আজ চোখের সামনে দেখলাম, এক জন মানুষের দেবতার স্থান অধিকারের অপার দম্ভলীলা এবং আর এক জন মানুষের অগাধ দাস-মনোবৃত্তি।

কিন্তু কেমন ক'রে এত বড় দম্ভের কথা বলে ঐ স্বামীজী

লোকটা? পুরো একটা দিনও যাবার আগেই ত প্রতিপন্ন হবে ওর কথার অলীকতা, ওর শক্তির ব্যর্থতা, তখন কোথায় থাকবে ওর দম্ভ, তখন কেমন ক'রে বজায় রাখবে ও ওর উঁচু আসন?

কিন্তু ও কি এ কথা ভাবেনি? ও কি জানে না যে, গাড়ীর যখন কলিশন হবে না, তখন ওর আসন একেবারে ধূলোয় লুটবে? তখন কেমন ক'রে ও ওর মাথা খাড়া রাখবে, তাকে যে লজ্জায় নত হয়ে পড়তে হবে, সে কি ও জানে না? জানে নিশ্চয়ই, তবে কেমন ক'রে অতখানি নিশ্চয়তার সঙ্গে অত-বড় সাহস নিয়ে এমন কথা বলে? একবার ভাবলেও না, দ্বিধাও কল্লে না, কথায় কোন মারপ্যাঁচ নেই, একবারে সোজা ধ্রুব বাণী!

উত্তেজনায় সমস্ত রাত্রি ভাল ক'রে ঘুমাতে পারলাম না, এ যদি সত্য হয়ে যায় ত আমার এত দিনের সযত্ন-সঞ্চিত সংস্কার—মতবাদ যে আমারই চোখের সামনে তাসের ঘরের মত ধূলিসাৎ হয়ে যাবে!

ভোরবেলা ষ্টেশনে ছুটলাম। সেখানে এক জন রেলের কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করলাম, মশায় বলতে পারেন, কাল পঞ্জাব মেলের কিছু হয়েছে কি?

সে আমার দিকে তার অবসন্ন বড় বড় দুই চোখ তুলে বল্লে, ভয়ানক কাণ্ড হয়েছে। ভয়ঙ্কর কলিশন হয়ে গেছে মেলে মেলে, বহু লোক মরেছে, পুড়েছে, জখম হয়েছে। এই রেলে এত বড় দুর্ঘটনা আর কখনও হয়েছে ব'লে জানি না—তার পর থেকে তারে তারে হুকুমে হুকুমে অস্থির—ফুরসৎ নেই।

আমি সেইখানেই ব'সে পড়লাম। দাঁড়াবার আর শক্তি রইল না। কারণ, এই সংবাদে মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার মনে বিরুদ্ধধর্ম্মী দুই সংস্কারের যে ভয়ঙ্কর সংঘর্ষ ঘ'টে গেল, বাহ্য-জগতে গাড়ীর কলিশনের চেয়ে সে বোধ করি কোন অংশেই কম প্রচণ্ড নয়, এবং তার বিপুল আঘাত আমার অহং-বুদ্ধিকে পলকে বিধ্বস্ত বিচূর্ণিত ক'রে দিলে।

তার কাগজের রাশির মধ্য থেকে আবার চোখ তুলে কর্ম্মচারীটি জিজ্ঞাসা করলে, আপনার কেউ আত্মীয় ছিলেন না কি তাতে?

মুখে বল্লাম, না, কিন্তু মনে মনে বল্লাম, ছিল, পরমাত্মীয়রা ছিল, জ্ঞান, বুদ্ধি, অহঙ্কার,—তারা একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে,—আর চেনা যায় না তাদের!

অবিলম্বেই গেলাম স্বামীজীর কাছে। বহু-পরিচিত প্রিয় ব্যক্তির মত তিনি আমাকে কাছে বসালেন।

আজ মাথা ধূলায় নত হ'ল আপনিই তাঁর পায়ের সামনে, আজ হাত আপনিই যুক্ত হ'ল।

বল্লাম—আমার প্রশ্ন আছে মহারাজ।

তিনি সস্নেহে বল্লেন—বল।

আমি বল্লাম, গাড়ী লড়েছে ঠিক, কিন্তু মহারাজ, আপনি আগে থেকে কাল জেনেছিলেন কি ক'রে?

তিনি হাসলেন, বল্লেন, হাঁ, জেনেছিলাম, জানা যায়ই ত, কোন ঘটনাই ত স্বাধীন নয় যে, নিজের ইচ্ছেয় ঘটবে যেমন তেমন ক'রে।

ভাল বুঝলাম না, বল্লাম, তাই যেন হ'ল, কিন্তু একে নিবারণ করলেন না কেন তা হ'লে? কাগজে কাগজে ছাপিয়ে দিলেন না কেন, রেলের কর্ত্তৃপক্ষকে জানালেন না কেন, সকলকে সাবধান ক'রে দিলেন না কেন, তা হ'লে ত এতগুলো লোকের জীবন যেত না, এত বড় অনর্থও হ'ত না!

তিনি প্রসন্ন হাসি হাসলেন, বল্লেন, বেটা, তাতে দুর্ঘটনা নিবারণ ত হ'তই না, বরং যে প্রচার করত, সে ঐ ঘটনার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কারণ ব'লে বাঁধা পড়ত।

ব'লে তিনি ঊর্দ্ধে আকাশের দিকে একবার চাইলেন, তার পর তাঁর মুখমণ্ডল যেন প্রদীপ্ত হয়ে উঠল, দুই চোখ বিস্তৃত হয়ে গেল, মাথা নেড়ে বল্লেন, এই যে আশ্চর্য্য বিশ্ব-গ্রন্থ, এর একটি রেখাও কেউ মুছতে পারে না, উল্টোতে পারে না, বদলাতে পারে না, কেউ না, বৎস!

বুঝতে পারলাম না ভাল, কিন্তু যাঁর দৃষ্টি এমনই অপার, জ্ঞান এমনই অগাধ, তাঁর কথাই বা সব জলের মত বুঝব কেমন ক'রে?

আমার উপর তাঁর কি দয়া বলতে পারি না, এক দিন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তিনি আমাকে বেদ পড়াতে সুরু করলেন। বল্লেন, তোমার ভিতর জিনিষ আছে। কি যে দেখেছিলেন আমার মধ্যে, তা তিনিই জানেন!

এত বড় গুরুর কাছে বেদশিক্ষা, এমন সুযোগ, এত সৌভাগ্য, ভেবে দেখুন, কার হয়েছে এ যুগে? তবু অধিকার হ'ল না, বেদ এখনও ভাল বুঝতে পারিনে। সম্যক্ উপলব্ধি হয় না, সব কথা ঠিক বিশ্বাস করতে পারিনে, অলীক ব'লে মনে হয়।

স্বামীজীকে আমার এই সব কথা বলেছিলাম, তাতে তিনি হেসে বলেছিলেন, ধৃষ্ট! কি এমন আশ্চর্য্য সুকৃতি আছে তোমার যে, তুমি বেদ এই এক জন্মেই বুঝবে—কি এমন জ্ঞান—কি এমন বুদ্ধি আছে তোমার? বহু বহু জন্ম বেদ অধ্যয়ন করলে যদি কোনও দিন উপলব্ধি জন্মে ত সেই জেনো তোমার পরম সৌভাগ্য। আশীর্ব্বাদ করি, বৎস, কোন এক জন্মে যেন তোমার সেই সৌভাগ্য হয়।

তার পর তাঁর দুই চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বল্লেন, জানো, তোমার চেয়ে আমি বেশী দেখ্‌তে পাই, তোমার চেয়ে আমার দৃষ্টি দূরপ্রসারী?

আমি বল্লাম, জানি প্রভু, কত বেশী যে দেখেন, তার ধারণা পর্য্যন্ত আজও করতে পারিনি।

তিনি বল্লেন, তা যদি জান ত শোন, আমার এই দৃষ্টিতে দেখে আমি বলছি যে, বেদ সত্য সত্য, তার এক বর্ণ মিথ্যা নয়, কল্পনা নয়, তার প্রত্যেক অক্ষর সূর্য্যের মত ধ্রুব, ভাস্বর।

তার পর খানিকটা চুপ ক'রে থেকে সস্নেহে বল্লেন, দুঃখ করো না বেদ উপলব্ধি করতে পার না ব'লে। তার জন্যে পৃথক বুদ্ধির প্রয়োজন, বৎস। সে বুদ্ধি যে দিন হবে, সেই দিন বেদ বুঝবে, তার আগে কিছুতেই নয়। অসম্ভব সম্ভব হয় না।

তার পর আমার চিন্তিত মুখের দিকে চেয়ে বল্লেন, বৎস, বুদ্ধি দুই রকমের;—পরা আর অপরা। দুটোর প্রকার ভিন্ন, একেবারে আলাদা জিনিষ। এ ভেবো না যে, অপরা বুদ্ধি বড় হলে, প্রসারিত হলে পরা বুদ্ধি হয়। ছোট ইঁদুর বড় হলে ইঁদুরই থাকে, হাতী হয় না। সেই পরা বুদ্ধি না হলে বিশ্বের রহস্য উপলব্ধি হয় না—বেদ বোঝা যায় না। মনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা, জন্ম-জন্মের সংস্কার ও বিবর্ত্তন, আর সব চেয়ে বড় তাঁর রূপা না হলে পরা বুদ্ধি হয় না। এই হচ্ছে মানুষের সব চেয়ে বড় লাভ, 'যং প্রাপ্য চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ', এর জন্য বিপুল চেষ্টা চাই, গভীর সাধনা চাই, বহুজন্মব্যাপী সুকৃতি চাই তীব্র কামনা রাখো, আশীর্ব্বাদ করি, এক দিন তোমার সে বুদ্ধি আসুক—সে দিন বেদ বুঝবে, সে দিন আর দুঃখ থাকবে না।

এই ত তাঁর কথা। সবটা ভাল বুঝিও না। কিন্তু এ উপলব্ধি করি যে, বেদে অধিকার হয়নি—জানি না, কোনও দিন হবে কি না, সে পরা বুদ্ধি আসবে কি না!

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

ভুলের ফুল

ফণি-মনসার ফুলে,
দিন আসে আর দিন চ'লে যায় ভ্রমর বসে না ভুলে;
মধু নাহি তার নাহি সৌরভ,
শুধু যৌবন মদ গৌরব,
আড়ালে লুকানো কণ্টকায়ুধ বিষ-মধু-কোষ মূলে,
বৃথা যৌবন মিছা ঝ'রে যায় কামনার উপকূলে।

কেতকীর দেহময়,
খর-ধার অতি ক্ষুরধারা সম কণ্টক জাগি রয়,
শ্রাবণ-বেলার বিলোল বাদরে,
বুকে কেহ তারে ধরে না আদরে,
গন্ধের লাগি রহি দূরে দূরে সোহাগের কথা কয়,
ঝড় ঝঞ্ঝায় কুঞ্জের ছায় পায় নাক আশ্রয়।

বিষকলিকার ফুল,
কালকাসন্দা করঞ্জা আর বাবনখী ফুলদুল,
তাদের সরস দেহরূপ রস,
যেন বিধবার স্বৈর-পরশ,—
ভুলেও শাখায় বসে না দোয়েল কোয়েলা কি বুলবুল,
ফুল দোলে তবু ভ্রমর ভোলে না, এ ব্যথার কোথা তুল?

সুধা নিল দেবদল,
তখন যে জন পান করেছিল কালকূট-হলাহল,
ধুতুরা আকঁদ ভুজঙ্গ ভার,
যে দয়াময়ের কণ্ঠের হার,
প্রেত যাঁর সখা ভুলের দেবতা নিন্দাতে অবিচল,
কোন্ অপরাধে হারায়েছে এরা তাঁহারও চরণ-তল!

শ্রীগোপাললাল দে (বি-এ)।

অভ্র

১

পুরাকালের হিন্দু লেখকগণের মতে বিদ্যুৎ জমাট হইয়া অভ্র উৎপন্ন হইয়াছে। কিম্বদন্তী এই প্রকার ;—সত্যযুগে দেবতাদের শত্রু বৃত্রাসুরকে বধ করিবার জন্য ইন্দ্র তাঁহার বজ্র উত্তোলন করিলেন, অমনই বজ্রের তেজোরশ্মি বিদ্যুতের মত নভোমণ্ডলে বিকীর্ণ হইল। পর্ব্বতশিখরে পতিত তড়িৎপ্রভা অভ্রাকারে পরিণত হইল। ইহা ভিষগাচার্য্যগণ এতদ্দেশে ইংরাজী ভাষা আসিবার পূর্ব্বে বহুল পরিমাণে ঔষধার্থে ব্যবহার করিতেন আর সেই জন্যই উপরি-উক্ত কিম্বদন্তী।

অভ্র (muscovite mica) স্বচ্ছ, আলোকরশ্মি ইহার ভিতর দিয়া সুন্দররূপে চলিয়া যায়। উত্তাপতরঙ্গ যাইতে পারে না ; তড়িৎপ্রবাহও যাইতে পারে না। তদ্ধেতু এ্যাসিড ও করোসিভ তৈলে (corrosive oil) ইহার আকারপরিবর্ত্তন হয় না। অতি উষ্ণ অবস্থা হইতে সত্বর শীতল করিলে এবং অতি প্রচণ্ড কম্পনে ইহার পরিবর্ত্তন হয় না। ইহা সর্ব্বত্র আপন রাসায়নিক সত্তা (chemical stability) রক্ষা করে।

পূর্ব্বে ইহা জানালার শার্শিরূপে ব্যবহৃত হইত। অধুনা যুদ্ধজাহাজে আর এরোপ্লেনে ইহার প্রচলন। কারণ, কাচ কামানের প্রকম্পন সহ্য করিতে সমর্থ নহে। উত্তাপে ইহার পরিবর্ত্তন হয় না বলিয়া লণ্ঠন, কয়লা বা গ্যাস-ষ্টোভের চিমনি-স্বরূপ ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ধাতু সমূহ সুগলিত হইল কি না, নিরীক্ষণ নিমিত্ত ফার্ণেসের (furnace) অগ্রভাগ অভ্রনির্ম্মিত। অভ্র হইতে এক প্রকার এনভেলপ তৈয়ার হয়। ইহাতে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি রাখিলে তাহা কীটদষ্ট বা অগ্নি দ্বারা ভস্মীভূত হয় না। গ্রামোফনের বাক-যন্ত্রের ডিস্ক (The disc of the sound box of Gramophone) অভ্রনির্ম্মিত। ইহার সুদৃঢ় বর্ম্ম বৈদ্যুতিক তরঙ্গরাজি ভেদ করিতে সমর্থ নহে। তড়িৎযন্ত্রাদিতে এই জন্য ইহার প্রভূত ব্যবহার। ইহার সূক্ষ্ম পত্রসমূহ দ্বারা 'মাইকেনাইট' তৈয়ারী হয়। এই পত্রসমূহ এক ইঞ্চির এক সহস্র ভাগ পুরু। এই প্রকার বহু পত্র একত্র করিয়া দ্রাবক * সংযোগে বড় বড় পাত করা হয়। ইহারই নাম 'মাইকেনাইট'। 'মাইকেনাইটের' বড় পাত দ্বারা আধুনিক দোকান-ঘরের সুদৃশ্য দ্বারসমূহ নির্ম্মিত হয়। স্বল্পোত্তাপে নানা প্রকার আকার করিয়া উক্ত পাত বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদিতে ব্যবহৃত হয়, যথা —কমিউটেটারের বহিরাকার (Shell of commutator), আর্ম্মেচার স্যাফ্‌টের চোঙ্গ (cylinder for armature shaft), ট্রান্সফরমার (transformer) ইত্যাদি। ডাইনামো এবং বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদির নানা স্থানে ইহার ব্যবহার। যাঁহারা বেগশীল মোটর এঞ্জিন (যথা—এরোপ্লেন, মোটর-বোট, হাইড্রোপ্লেন—ইহারা জলে ও শূন্যে উভয় স্থানে চলে,) চালাইয়া থাকেন, তাঁহাদের একপ্রকার চশমা পরিতে হয়। ঐ চশমা কাচনির্ম্মিত নহে, উহা অভ্রপত্র-নির্ম্মিত। ঐ অভ্রনির্ম্মিত চশমা বায়ুর সংঘর্ষণ হইতে চালকদের দৃষ্টিশক্তিকে রক্ষা করে।

অভ্রের কাগজও নির্ম্মিত হয়। এই সমস্ত কাগজ নানা-প্রকার খাদ্যদ্রব্যের ও ঔষধ-সমূহের উপরে লাগান হয়। জাপানী ভাতের কাগজের উপরে ও তলায় খুব পাতলা অভ্রপত্র দেওয়া হয়। তার পর চাপ দিলে উহা অভ্র কাগজে পরিণত হয়।

অভ্রের কাপড়।—ইহা মূল্যবান্ সৌখীন দ্রব্যের গাত্রাবরণী। খুব মূল্যবান্ মস্লিন কাপড়ের উপরে ও তলায় পাতলা অভ্রপত্র দেওয়া হয়। তৎপরে উপযুক্ত দ্রাবক প্রয়োগে চাপ দিলে অভ্র-কাপড় তৈয়ার হয়।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভ্রসমূহ চূর্ণ করা হয়। বৈদ্যুতিক তারে যে সকল চীনামাটীর পাত্র ব্যবহৃত হইত, তৎস্থানে অধুনা অভ্রচূর্ণ ব্যবহার হইতে দেখা যাইতেছে। আমেরিকার যুক্তরাজ্য ও কানাডা প্রদেশের রেলগাড়ী-সমূহকে বরফের ভিতর দিয়া যাইতে হয়। যাহাতে এঞ্জিনের 'বয়লার' সহজে শীতল না হইয়া যায়, তজ্জন্য এঞ্জিন বয়লার এবং উহার বাষ্পনল-সমূহের চতুষ্পার্শ্ব অতি উত্তমভাবে অভ্রচূর্ণ দ্বারা আচ্ছাদিত। অভ্রচূর্ণ দ্বারা

* দ্রাবক—(Spirit and Shellac) স্পিরিট ও চাচগালা সংযোগে উক্ত দ্রাবক তৈয়ারী হয়।

আচ্ছাদিত থাকায় উত্তাপতরঙ্গসমূহ চারিদিকে বিকীর্ণ হইতে পারে না, আর তজ্জন্ত এঞ্জিনও সহজে শীতল হয় না। বৈদ্যুতিক তরঙ্গরাজির ন্যায় উত্তাপতরঙ্গরাজিও অভ্রগাত্র ভেদ করিতে সমর্থ নহে। শীতপ্রধান দেশের প্রায় সকলেই গৃহ উষ্ণ রাখিবার নিমিত্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভ্র দ্বারা গৃহের ছাদ আচ্ছাদিত করিয়া রাখেন। বিহার ও উড়িষ্যার অনেক স্থানে য়ুরোপীয়গণের বাড়ীর ছাদ অভ্রচূর্ণ-মণ্ডিত। গ্রীষ্মকালে উক্ত কারণে উক্ত গৃহাভ্যন্তর খুব উষ্ণ হয় না; বাহিরের তাপ হইতে অভ্রপত্রমণ্ডিত গৃহাভ্যন্তরের তাপ অন্ততঃ ১৫-২০ ডিগ্রী কম হয় দেখা গিয়াছে।

ভারতবর্ষে অভ্রপত্রে অতি মনোহর নানা রঙ্গের চিত্র প্রস্তুত হয়। অভ্রপত্র পিচ্ছিল বলিয়া তাহাতে রঙ্গ লাগান বড়ই দুরূহ ব্যাপার। ইহাতে যে কি প্রকারে রঙ্গ লাগাইয়া চিত্র প্রস্তুত করা হয়, তাহা আমাদের জানা নাই।

কলিকাতার যাদুঘরে কতকগুলি অভ্রপত্রে প্রস্তুত মনোহর চিত্র রক্ষিত আছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠকবৃন্দ যদি ঐ সব চিত্র দেখিয়া আসেন, তবে আমার এই প্রবন্ধ লেখা সার্থক মনে করিব।

য়ুরোপ, আমেরিকা, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া ও রাসিয়ার অধিকাংশ গৃহপ্রাচীরে নানারঙ্গের মনোহর কাগজ লাগাইয়া রাখা হয়। এই সমস্ত কাগজের উপরিভাগ খুব উজ্জ্বল। উক্ত কাগজসমূহ মসৃণ ও উজ্জ্বল করিবার নিমিত্ত কাগজের মসল্লার সহিত অভ্রচূর্ণ মিশ্রিত করা হয়। অভ্রচূর্ণ ব্যতিরেকে উহার নির্ম্মাণ অসম্ভব। নানাপ্রকার গাড়ীর চাকার বেষ্টনী নির্ম্মাণার্থ বেশীর ভাগ রবার ব্যবহৃত হয়। ঐ রবার তৈয়ার করিবার মসল্লার মধ্যে অভ্রচূর্ণ একটি প্রধান দ্রব্য।

অভ্রচূর্ণ পিচ্ছিল। ইংলণ্ড, আমেরিকা, জর্ম্মাণী ও জাপানে যে সব বিশালকায় অর্ণবপোত তৈয়ার হয়, উহাদিগকে জলাশয়ে নামাইবার সময় পোতাবস্থিত রেলের উপর অভ্রচূর্ণ ছড়াইয়া রাখা হয়। রেল ক্রমশঃ নিম্নগামী হইয়া সমুদ্রের কিনারায় পড়িয়াছে। উপরিস্থিত পোত অভ্রের পিচ্ছিলতার গুণে কোন প্রকার এঞ্জিনের সাহায্য ব্যতিরেকে স্বয়ং সমুদ্রে চলিয়া যায়। পিচ্ছিলতার নিমিত্ত পোতের গাত্রের সহিত রেলের কোন প্রকার ঘর্ষণ হয় না এবং সেই জন্য পোতের কোন প্রকার অনিষ্ট হয় না।

চিত্র নং ৩—মাইকেনাইট দ্বারা তৈয়ারী চোঙ্গ সমূহ
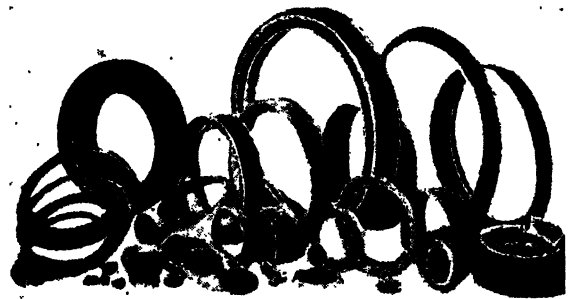
চিত্র নং ৪—মাইকেনাইট দ্বারা তৈয়ারী কমিউটেটরের কোণ ও আঙ্গটীসমূহ (Cones & Rings)
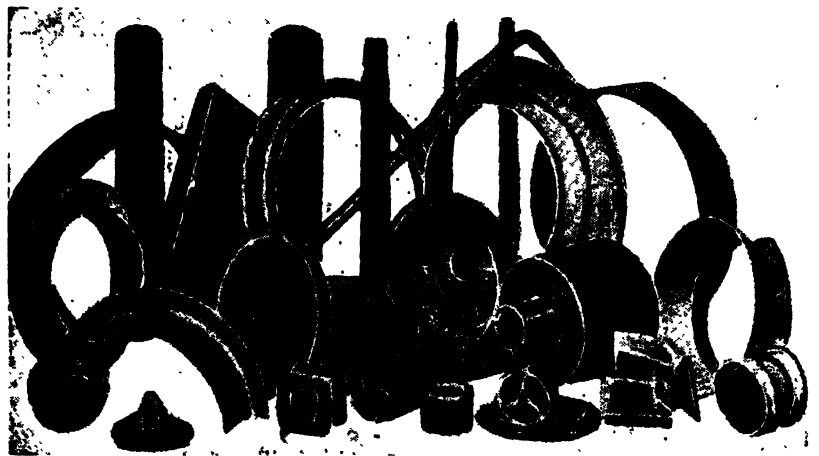
চিত্র নং ৫—মাইকেনাইট দ্বারা তৈয়ারী কমিউটেটরে ব্যবহৃত কোণ, আঙ্গটী ও চোঙ্গসমূহ

সাবান তৈয়ার করিবার সময় ঢালাই যন্ত্রে প্রথমতঃ অভ্রের প্রলেপ দিতে হয়, না হইলে যন্ত্রে সাবান লাগিয়া যায়।

বিজ্ঞানের অগ্রগতির সহিত নানা প্রকার যন্ত্রাদির আবিষ্কার

হইয়াছে। গতিশীল যে সব যন্ত্রাদি সৃষ্ট হইয়াছে, তাহার কতকগুলি অংশ ঘর্ষণপ্রাপ্তি হেতু শীঘ্র শীঘ্র ক্ষয় হইতে থাকিল। উহাদের ক্ষয় বন্ধ করিবার নিমিত্ত গতিশীল অংশের চতুষ্পার্শ্ব

চিত্র নং ৭—বৈদ্যুতিক উত্তাপ যন্ত্রাদিতে ব্যবহৃত অভ্র-পত্র আকৃতিসমূহ

ছোট ছোট ইস্পাতের 'বল' দ্বারা আবৃত করা হইল। ইহাদের নামকরণ হইল 'বল বিয়ারিং'। কিছু কাল পরে দেখা গেল যে, 'বল বিয়ারিং'এর ভিতর যদি 'গ্রিজ' দেওয়া যায়, তাহা হইলে গ্রিজের পিচ্ছিলতার জন্য ইহারা বেশী দিন টেকসই হয়। কিন্তু

চিত্র নং ৮—নানাপ্রকার বৈদ্যুতিক যন্ত্রের "ওয়াসার"সমূহ

চিত্র নং ৬—অভ্রপত্রে নির্ম্মিত কমিউটেটরে ব্যবহারের অংশসমূহ

দেখা গেল যে, ঐ গতিশীল অংশের উপরে যদি বৃহৎ চাপ প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে গ্রিজ দ্বারাও উহাদের আয়ু বৃদ্ধি করা চলে না। ঐ সময় বৈজ্ঞানিকগণ গ্রিজের সঙ্গে 'অভ্রচূর্ণ' এবং 'গ্রাফাইট' (এক রকম কয়লা) মিশ্রিত করিলেন। এবারে উহাদের আয়ু বর্দ্ধিত হইল। এই সব মসলার সংমিশ্রণকে লুব্রিকাণ্ট বলা হয়। আর যে ভাবে এই সব মসলার জন্য গতিশীল অংশের গতি ঘর্ষণ অভাব হেতু সহজ ও সরল হয়, তাহাকে 'লুব্রিকেশন' বলা হয়।

'ক্রিষ্টমাস স্নো' তৈয়ার করিবার জন্য অভ্রচূর্ণ ব্যবহৃত হয়। অভ্রচূর্ণের চাকচিক্য হেতু নানা প্রকার রঙ্গে ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। দেবদেবীর প্রতিমায় ও বিবাহের টোপরে অভ্রের ব্যবহার হয়। বিস্ফোরক ডিনামাইট তৈয়ারে অভ্রচূর্ণ নাইট্রোগ্লিসারিন সহ মিশ্রিত হয়।

অভ্রচূর্ণের ব্যবহার এইরূপ :—ছাদের কার্য্যে শতকরা ৬০ ভাগ, দেয়ালের কাগজে ২১, মোটরের টায়ারে ৪, রঙ্গ এবং ক্রিষ্টমাস স্নোতে ৩, ইলেকট্রিক যন্ত্রাদিতে ৩, সাবান ইত্যাদির যন্ত্রে ৩, লুব্রিকেশানে ২, মোট ১০০ ভাগ।

কার্য্যবিশেষে সরু ও মোটা অভ্রচূর্ণ ব্যবহার হয়। যে সমস্ত ছাকনী দ্বারা অভ্রচূর্ণ ছাঁকা হয়, উহার প্রতি স্কোয়ার ইঞ্চির তারের সংখ্যার উপর অভ্রচূর্ণের আকৃতির পরিমাপ নির্ভর করে। পরিমাপের ইতরবিশেষে কার্য্যের বিশেষ ক্ষতি হয়। অভ্রচূর্ণের পরিমাপ ও তাহার প্রতি পাউণ্ডের মূল্য প্রদর্শিত হইল।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দ (আমেরিকা)

যে ছাকুনীর প্রতি স্কোয়ার ইঞ্চিতে	নিষ্কাশিত অভ্রচূর্ণের প্রতি পাউণ্ডের মূল্য
২০০—১৬০ তার আছে	১'১২৫ পেন্স।
১৬০—১২০ „ „	১ পেন্স।
১২০—৮০ „ „	০'৮৭৫ পেন্স।
৮০—৪০ „ „	০'৭৫ পেন্স।
৪০—১০ „ „	০'৭৫ পেন্স।

কোন্ বিষয়ে অভ্রপত্রের কত ব্যবহার, তাহা ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের আমেরিকার যুক্তপ্রদেশের তালিকা হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

বৈদ্যুতিক শতকরা ৮৬ ভাগ, ষ্টোভ ১০ ভাগ, গ্রামোফন বাক্যন্ত্র ২ ভাগ, অন্যান্য ২ ভাগ।

অভ্রকণা পৃথিবীর অধিকাংশ প্রস্তরেই পাওয়া যায়। ইহা গ্রানাইট প্রস্তরের বিশেষ অঙ্গস্বরূপ (chief constituent) উক্ত প্রস্তরে ইহা অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দৃষ্ট হয়। সময় সময় ইহা কয়েক ফুট বড়ও পাওয়া যায়; তখন উক্ত প্রস্তরকে গ্রানাইট পেগমেটাইট বা শুধু পেগমেটাইট আখ্যা দেওয়া হয়। ব্যবহারোপযোগী বৃহত্তর আকারের অভ্র কেবলমাত্র পেগমেটাইট প্রস্তরেই পাওয়া যায়। এই পেগমেটাইট প্রস্তর পাথুরে কাচ (quartz), ফেল্‌ডস্পার (feldspar) আর অভ্রে গঠিত। এই প্রস্তরে অল্পবিস্তর বহুতর দুষ্প্রাপ্য মিনারেল (mineral) দৃষ্ট হয়। নিম্নোক্ত বস্তু সমূহ পেগমেটাইটের বিশেষত্ব।

চিত্র নং ১—অভ্র-পুস্তিকা

আলবাইট (Albite), এলেনাইট (Allanite), এমাজনষ্টোন (Amazone stone), এপেটাইট (Apatite), অটোমোলাইট (Automolite), বেরিল (Beryl), বাইওটাইট অভ্র (Biotite), লেপিডোলাইট অভ্র (Lepidolite), লিউকোপাইরাইট (Leucopyrite), মেগ্নেটাইট (magnetite), চন্দ্রবৈক্রান্তমণি (moon stone), মাস্কভাইট অভ্র (muscovite), অর্থক্লেজ (orthoclase), পিচব্লেণ্ড (Pitchblende), কেসিটেরাইট (cassiterite), কলাম্বাইট (columbite) এপিডোট (Epidote), ফ্লুয়োরস্পার (Fluorspar), গার্ণেট (Garnet), ইল্‌মেনাইট (Ilmenite), কায়েনাইট (Kyanite), পাথুরে কাচ রক্তবর্ণ ও শ্বেতবর্ণ (Quartz Pink and White), ষ্টরোলাইট (Staurolite), তুম্বলি—লোহিত, নীল, সবুজ ও কাল (Tourmaline, Red, Pink, Blue, Green and Black), টরবারনাইট (Torbernite), ট্রিপিলাইট (Tripilite) ইউরেনিয়ম ওকার (Uranium Ochre)।

অভ্র ক্ষণভঙ্গুর; সেই কারণে পৃথিবীর যে সমস্ত স্থান খুব বেশী সংঘর্ষণপ্রাপ্ত হইয়াছে, তথায় অভ্র-পুস্তিকা (mica-book) পাওয়া সুকঠিন। এই বিষয়ে ভারতবর্ষ ও আমেরিকার যুক্তরাজ্য খুব ভাগ্যবান্। ভারতবর্ষে লঙ্কাদ্বীপ হইতে হিমালয়ের পাদদেশ পর্য্যন্ত আর যুক্তরাজ্যে জর্জ্জিয়া হইতে কেরোলাইনা পর্য্যন্ত স্থান-সমূহে যে সব পেগমেটাইট আছে, তাহা হইতে উত্তম অভ্র পাওয়া যায়। এই স্থান-সমূহে বহু শত সহস্র বৎসর চাপ (Pressure) পড়ে নাই। কিন্তু ভারতবর্ষের উত্তর-ভাগ হিমালয় পর্ব্বত সমূহ উত্তর ও দক্ষিণ দিক হইতে সর্ব্বদা চাপ পাইতেছে, অভ্র-পুস্তিকা সমূহও সেই প্রচণ্ড চাপে চূর্ণ-বিচূর্ণ

চিত্র নং ১০—পর্ব্বতপৃষ্ঠ হইতে অভ্র-পুস্তিকা উত্তোলন—নেলোর

হইয়াছে। একই কারণে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের এপেলেচিয়ান পর্ব্বতসমূহে (Appalachian) সুপুস্তিকার অভাব।

ভারতবর্ষ, আমেরিকা যুক্তরাজ্য, কানাডা ও জর্ম্মাণ ইষ্ট আফ্রিকা—এই তিন দেশ হইতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট অভ্র উত্থিত হয়।

এবং উৎপাদনশক্তিবিষয়ে আফ্রিকার তৃতীয় স্থান, যুক্তরাজ্য ও কানাডার দ্বিতীয় আর ভারতবর্ষের প্রথম স্থান। সমগ্র উৎপাদিত অভ্রের ৪'৩ ভাগ আফ্রিকা হইতে আসে।

জর্ম্মাণ, পূর্ব্ব-আফ্রিকার উলুগুরু (uluguru) নামক পর্ব্বতে (Union of South Africa) অন্তর্গত পিটারস্বর্গ (Petersburg) সহরে, লিটল্ নামাকুয়ালেণ্ড (Little Namaqualand), দক্ষিণ রোডেসিয়া (South Rhodesia), কেপ প্রভিন্স আর ট্রান্সভালে অল্পবিস্তর উৰ্দ্ধ-বর্ণিত মাস্কভাইট অভ্র পাওয়া যায়।

চিত্র নং ১৪—ডিনামাইট সাহায্যে পর্ব্বতগাত্র উড়াইয়া খনির প্রবেশপথ নির্ম্মাণ হইতেছে

আমেরিকা যুক্তপ্রদেশের পেগমেটাইট প্রস্তর সাধারণতঃ কেম্ব্রিয়ান সময়ের অনতিপূর্ব্ব যুগের শিষ্ট ও নাইস্ প্রস্তরের সহিত সংমিশ্রিত। উত্তর-কেরোলিনা এবং নিউ হ্যাম্পসায়ার হইতে যথেষ্ট পরিমাণে অভ্রপত্র উত্থিত হয়। ইহা ছাড়া জর্জ্জিয়া, ভার্জিনিয়া, দক্ষিণ-কেরোলিনা, এলবামা, দক্ষিণ-ডেকোটা এবং ইডাহো নামক স্থানসমূহ হইতে অভ্র পাওয়া যায়।

ব্রেজিলের অভ্র খুব ভাল। মিনাজ গিরাজ, বাহিয়া এবং গোয়াজ এই তিন স্থান হইতে অভ্র উত্থিত হয়। খনির গভীর প্রদেশে ফেল্‌ড্‌স্পার্ সমূহ কেয়োলিনে পরিণত হইয়াছে।

চিত্র নং ১১—খনির অভ্যন্তরে পেগমেটাইট গাত্রে যে ভাবে অভ্র-পুস্তিকা থাকে, তাহার চিত্র। লৌহ-ছেনী ও হাতুড়ীর সাহায্যে উহাদের উত্তোলন-প্রণালী দর্শিত হইল—ফ্লাসলাইট আলোকচিত্র।

কানাডায় ফ্লোগোপাইট অভ্র (Phlogopite) প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। অভ্রপ্রাপ্তির স্থানসমূহ কুইবেক্ এবং অণ্টেরিয়ো অঞ্চলে আবদ্ধ।

ভারতবর্ষে পেগমেটাইট-সমূহ পুরাকালের আর্কিয়ান (archian) প্রস্তর-সমূহের মধ্যে প্রবিষ্ট। অভ্রপুস্তিকা-সমূহ পেগমেটাইটের উপরে অথবা অধোদেশে বর্ত্তমান। মধ্যে পাথুরে কাচ (Quartz), তুর্ম্মলি (Tournaline), গার্ণেট্ (garnet), এপেটাইট্ (apatite), বেরিল্ (Baryl) এবং পিচব্লেণ্ড (Pitchblende) পাওয়া যায়। এতদ্দেশে প্রধানতঃ বিহার ও মান্দ্রাজ অঞ্চলে উৎকৃষ্ট অভ্র বর্ত্তমান। বিহার প্রদেশের পেগমেটাইটযুক্ত অভ্রের স্থানের দৈর্ঘ্য ৬০-৭০ মাইল, প্রস্থ ১২ মাইল। নাইস্ (gneiss) ও শিষ্ট (Schist) প্রস্তরে গঠিত মালভূমি (Plateau) হাজারিবাগ অঞ্চলের বেন্ধি হইতে মুঙ্গেরের ঝাঁঝা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। প্রধান খনিসমূহের নাম—বেন্ধি, চারকি, ধাব, দোমচাচ, কোদারমা, রেজৌলি এবং তিস্রী। অভ্র-পুস্তিকার রং ফিকে লাল। ইহারা রুবি মাস্কভাইট পর্য্যায়ে পড়ে।

সর্ব্বাপেক্ষা বেশী এবং ভাল অভ্র পাওয়া যায়। ইহা মাস্কভাইট শ্রেণীর। বর্ণ সবুজ ও লাল আভাযুক্ত (Brown)। এতদ্দেশীয় পেগমেটাইটের বিশেষত্ব এই যে, ইহার ভিতর বৃহৎ বৃহৎ পাথুরে কাচ (Quartz) পাওয়া যায়। দক্ষিণ যুক্ত আফ্রিকার

মাদ্রাজের অভ্রসমূহ নেলোর অঞ্চলে অবস্থিত। নেলোরের সমতলভূমি নাইস আর শিষ্ট প্রস্তরে গঠিত। প্রধান খনিসমূহের নাম—পালিমিটা, টেলাবড়, কালিচেড়, ইনিকুর্ত্তি এবং লক্ষ্মী-নারায়ণ। অভ্রসমূহের বর্ণ সবুজ। সম্ভবতঃ ক্রোমিয়াম বর্ত্তমান থাকিবার জন্য।

মালাবার, কয়ম্বাটোর, গঞ্জাম এবং কুর্গে আশাপ্রদ অভ্রযুক্ত ভেইন (vein) পাওয়া গিয়াছে।

মহীশূর রাজ্যে অভ্র পাওয়া যায়। সাধারণতঃ অন্যান্য স্থানের তুলনায় ইহারা নিকৃষ্ট। আজমীর মারবারা, জয়পুর, কিষণগড়, শীরোহী, টঙ্কষ্টেট এবং উদয়পুরে অতি উত্তম অভ্রপত্র পাওয়া যায়।

ইহা ছাড়া মধ্য-ভারত, মধ্যপ্রদেশ, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি স্থানে উত্তম অভ্র পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষ, ইউ-নাইটেড্‌ষ্টেট্‌স্ এবং কানাডা হইতে ৯০ ভাগ অভ্র উত্থিত হয়। বাকী ভাগ অন্যান্য দেশ হইতে, যথা— গুয়াটেমালা, মেক্সিকো এবং পেরু, নরওয়ে, মাদাগাস্কার, নীয়াসালেণ্ড প্রোটেক্টোরেট, বোডেসীয়া, কেমেরান্, সিংহল, চীন, কোরিয়া, জাপান, সাইবেরীয়া এবং অষ্ট্রেলিয়া। বিভিন্ন দেশের অভ্র উত্তোলন-পরিমাণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বৎসর	মার্কিণ	কানাডা	ভারতবর্ষ	অপরাপর দেশসমূহ
১৯০৯	৯০৫	১৮৫	১,৪১১	১২৫
১৯১৮	৮২২	৩৭৪	৩,৬৮০	২১৮
১৯২৭	৬৭৫	৩৪৯	৩,৮৭৪	৭৪৮

মাস্কভাইট অভ্র পেগমেটাইট ব্যতীত অন্য প্রস্তরে পাওয়া যায় না। ফ্লোগোপাইট অভ্র ডাইকে (Dyke—একজাতীয় আগ্নেয় প্রস্তর) পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের মাস্কভাইট আর কানাডার ফ্লোগোপাইট প্রসিদ্ধ। ভারতবর্ষে হাজারিবাগ ও নেলোর অঞ্চলে খুব ভাল অভ্র-পুস্তিকা পাওয়া যায়। হাজারি-বাগের রুবি অভ্র চিরপ্রসিদ্ধ।

এক্ষণে আমরা হাজারিবাগের লোমচাচি অভ্রখনি সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। খনি সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আমরা পারিপার্শ্বিক দেশের অবস্থা বিচার করিব।

চিত্র নং ১৫—অভ্রখনির প্রবেশদ্বার

পর্ব্বতাদির ক্ষয় হইতে সমতলভূমির সৃষ্টি। ত্যক্ত পদার্থ-সমূহকে জল ধুইয়া লইয়া যাইতেছে আর সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ উক্ত প্রদেশ ঢালু হইয়া গিয়াছে। ক্ষয়কার্য্য এখনও চলি-তেছে। অভ্রখনি-সম্বলিত সমস্ত পর্ব্বতাদি নগ্নীকৃত অবস্থায় বর্ত্তমান।

কোদারমার মালভূমি উত্তরদিকে ক্রমশঃ ঢালু হইতে হইতে অভ্রসংশ্লিষ্ট খনিজ স্থানের মধ্য দিয়া গঙ্গার পলিমাটীর ভিতর মিশিয়াছে। স্থানীয় শৈলাদি অভ্র শিষ্ট প্রস্তরে গঠিত। উহাদের ডিপ বা ক্রমনিম্নতা পূর্ব্ব-উত্তর-পূর্ব্ব—পশ্চিম-দক্ষিণ-পশ্চিম। উহাদের ষ্ট্রাইক উত্তর-উত্তর-পশ্চিম—দক্ষিণ-দক্ষিণ-পূর্ব্ব।

দোমচাচ খনিটি বেশ বড়। ভিতরের রাস্তা-সমূহও বেশ প্রশস্ত।
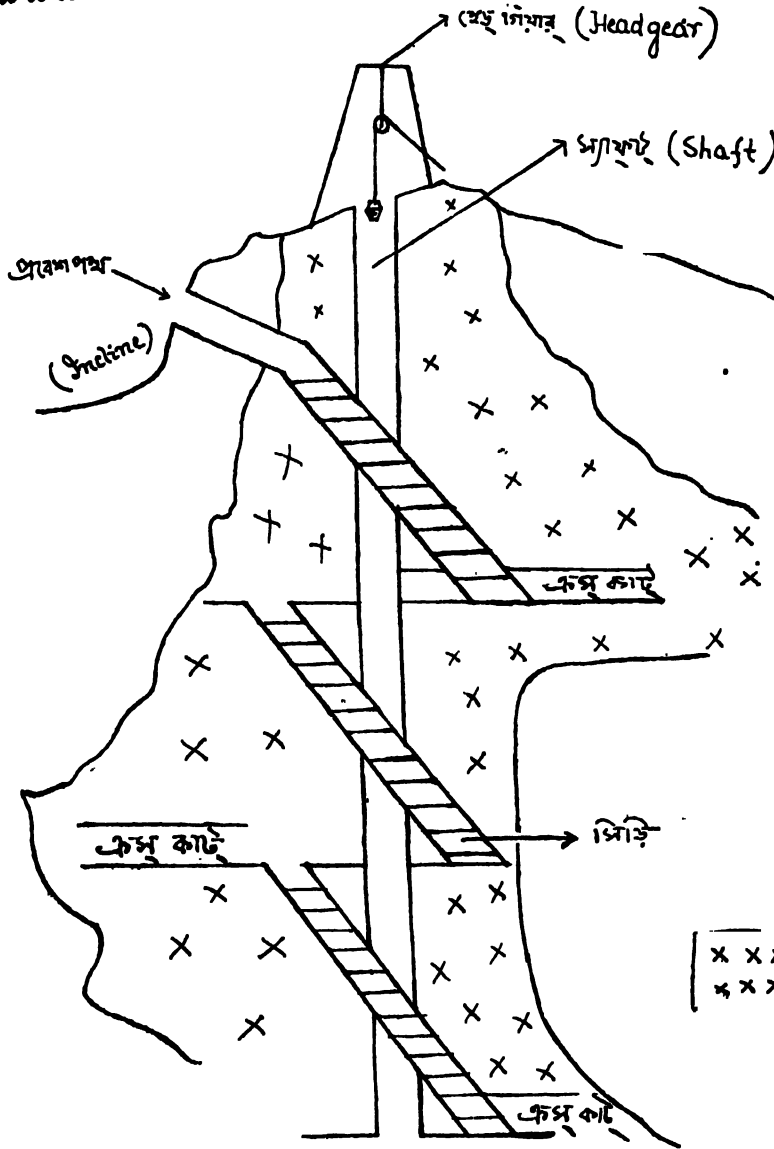
চিত্র নং ৯—অভ্র খনি

[উপরিউক্ত চিত্র শ্রীযুক্ত অরিন্দম সেন এম্, এস্, সি দ্বারা পরিকল্পিত। শ্রীযুত গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য বি, এ, উহা অঙ্কিত করিয়াছেন]

প্রবেশপথের মুখ কাষ্ঠ-নির্ম্মিত। তথা হইতে সিঁড়ি স্যাফটে নামিয়া গিয়াছে। এই প্রকার সিঁড়ি উক্ত খনির প্রায় সকল স্থানেই আছে। অবরোহীকে সেই সিঁড়ি দিয়া নামিতে হয়। স্থানে স্থানে পথ-সমূহ অপ্রশস্ত এবং বক্র, তদুপরি কাষ্ঠের পাটাতন এবং খুঁটীর দ্বারা উহা-দিগকে এমন ভাবে রাখা হইয়াছে যে, নিম্নগামী অবরোহীর মনে স্বতঃই ভীতির সঞ্চার হয়। সম্মুখে দারুণ অন্ধকার—মোমবাতির আলো লইয়া বড় কষ্টে ও অতি সন্তর্পণে নামিতে হয়। কোথাও বা হামাগুড়ি দিয়া, কোথাও বা বসিয়া এবং নিতান্ত সৌভাগ্য হইলে কোথাও দাঁড়াইয়া নামা যায়। আবার এমন স্থানও রহিয়াছে যে, তথায় শয়নপূর্ব্বক অগ্রসর ভিন্ন অন্য উপায় নাই। শুধু তাহাই নহে, প্রাণভয়ও যে একবারে নাই, তাহা বলা যায় না। নীচের দিকে সময় সময় শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসে ও অত্যন্ত গরম বোধ হয়। এ সকল সত্ত্বেও যখন সুড়ঙ্গের পাথরের গায়ে অভ্র-পুস্তিকা-সমূহ পাওয়া যায়, তখন দর্শকের মনে সত্যই আনন্দের উদ্রেক হয়।

দুঃখের বিষয়, এত পরিশ্রম, অর্থব্যয় ও নানারূপ সাবধানতা সত্ত্বেও খনি কোন কোন বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরাপদ নহে; যখন ভূমিকম্প হয়, তখন উহার স্থানে স্থানে ধ্বসিয়া যাইবার সম্ভাবনা। এতদ্ব্যতীত নানাপ্রকার পাহারা থাকা সত্ত্বেও রাত্রিকালে খনি হইতে অভ্র চুরি হইয়া থাকে।

এক জন লোক অনায়াসে দাঁড়াইয়া হাঁটিয়া যাইতে পারে। খনিটি পর্ব্বতপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ১ শত ফুট নীচে নামিয়া গিয়াছে—১৯২৭ খৃষ্টাব্দের কথা।

উপরিউক্ত চিত্রে খনির আকৃতি বিবৃত হইল। খনির

উক্ত খনির তলদেশে ফিলডস্পারের ক্ষয় হইতে যথেষ্ট পরিমাণে চীনামাটী হইয়াছে দেখা গেল। ক্ষয়কার্য্য এই প্রকারে সংঘটিত হয়;—

$K_2O.\ Al_2O_3.\ 6\,SiO_2 + CO_2 + aqua =$

Ortho clase feldspar.

$K_2CO_3 + Al_2O_3.\ 2\,SiO_2.\ 2H_2O + 4\,SiO_2$
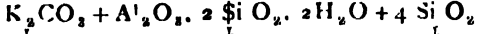
Absorbed by Subsoil	China clay or Porcellanite.	Taken to Sea by Drainage.

পসিলেনের দ্রব্যাদি কেয়োলিন দ্বারা তৈয়ারী। কেয়োলিন কলেরা ইত্যাদি সংক্রামক পীড়ায় ডিসিন্‌ফেকটাণ্টরূপে ব্যবহৃত হয়। এই জন্য বাণিজ্য-সংক্রান্ত মূল্য ইহার মন্দ নহে।

খনির শেষ প্রান্তভাগে খনির জল ক্ষরিত হইয়া থাকে। উপরি-স্থিত বাষ্পচালিত যন্ত্রসাহায্যে উক্ত স্থান হইতে জল উত্তোলিত হইয়া থাকে। উপরি-উক্ত কল সর্ব্বসময়েই জল টানিয়া তুলিয়া ফেলিতে থাকে বলিয়া খনিতে জল জমিতে পারে না এবং সেই জন্য কুলীদিগের কায করিবারও কোন অসুবিধা হয় না। কুলীরা খনি হইতে যে উপায়ে অভ্র বাহির করে, তাহা বড়ই চমৎকার। নিম্নে তাহা বর্ণিত হইল।

প্রথমতঃ তুরপুন্ দ্বারা শৈলপৃষ্ঠ ছিদ্র করা হয়। তৎপরে উক্ত ছিদ্রে বিস্ফোরক ডিনামাইট প্রবেশ করাইয়া তাহার সাহায্যে পাথর উড়াইয়া ও ভাঙ্গিয়া ক্রস্‌কাট এবং শ্যাকট সমূহ তৈয়ারী হয়। এই অবস্থায় চিত্র-প্রদর্শিত পেগমেটাইটের ভিতর উক্ত তৈয়ারী পথ-সমূহ চলিয়া আসে। 'বাজার-দাম' যে অভ্রের আছে অথবা যে অভ্র দ্বারা বৈজ্ঞানিক কার্য্য সাধিত হইতে পারে, তাহা পেগমেটাইট ব্যতীত অপর কোনও স্থানে পাওয়া যায় না;— যদিও পর্ব্বতাদির গঠিত উপাদানের মধ্যে অভ্রও একটি উপাদান। পেগমেটাইটের গাত্রে স্থানে স্থানে বড় বড় স্ফটিক পাওয়া যায়, তাহাদিগকে বৈজ্ঞানিকগণ অভ্র-পুস্তিকা নাম আখ্যা দিয়াছেন।

উহাদিগকে অতীব যত্নের সহিত হাতুড়ি ও লৌহ ছেনির সাহায্যে কুলীগণ বাহির করে। এই অন্ধপুরীতে এই ভাবে দিনের পর দিন এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা কুলীরা পালা করিয়া কায করিয়া থাকে—তাহাদের সাহস ও ধৈর্য্য প্রশংসনীয়। তিন চারি ঘণ্টায় বহু কষ্টে ও চেষ্টায় অভ্রপুস্তিকাগুলি 'পেগমেটাইটের গাত্র হইতে খুলিয়া ছোট ছোট গাড়ীতে (trolley) চাপান হয়। ঐ গাড়ীগুলি হইতে অভ্র এক স্থানে জড় করা হয়; সেই স্থান হইতে উর্দ্ধস্থিত বাষ্পচালিত যন্ত্র দ্বারা কপিকলে বড় বড় ঝুড়ি করিয়া উহা উপরে উঠান হয়। এই ভাবে ভূগর্ভ হইতে অভ্র উপরে আসে। তথা হইতে মোটর লরী ও গোযানের সাহায্যে ঐগুলি কারখানায় পাঠান হয়।

হাজারিবাগ অঞ্চলে কুলীরা পুস্তিকা হইতে পুস্তিকা গ্রহণান-স্তর শৈলশৃঙ্গ হইতে পেগমেটাইট কর্ত্তন করিয়া নিম্নে গমন করে। নেলোর অঞ্চলের পদ্ধতি অন্য প্রকার। সেখানে সমতল

চিত্র নং ১৩—গো-যান সাহায্যে খনি হইতে অভ্র-পুস্তিকাসমূহ ফ্যাক্টরীতে নীত হইতেছে

ভূমির উপর পেগমেটাইট পুস্তিকা উদ্দেশে কর্ত্তিত হয়। খাদ ৮।১০ ফুটের বেশী গভীর হয় না। উক্ত উভয় পদ্ধতিই অনিষ্ট-জনক; অধুনাতন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি-সমূহ উহাদিগের স্থান অধিকার করিতেছে।

বিগত মহাযুদ্ধে জর্ম্মাণ বৈজ্ঞানিকগণ রঞ্জন, ফেনল এবং ফর্ম্মালডাইড এই তিন দ্রাবক হইতে কাগজ সংযোগে অভ্রের ন্যায় এক প্রকার বস্তু তৈয়ার করিয়াছিলেন; ইহা হইতে অভ্রের অভাব পূরণ হইয়াছিল। সাধারণতঃ এই অভ্র কৃত্রিম 'কনডেন্সার' সমূহে ব্যবহৃত হইত। পার্টিনেক্স, পেস্নোলিন, ফর্ম্মালাইট, লেথারয়ড এই কয় নামে ইহাদিগকে প্রচলিত করা হইয়াছিল। এই সকল কৃত্রিম অভ্রসমূহ এখনও প্রকৃত অভ্রকে বাজার হইতে সরাইতে পারে নাই।

[ক্রমশঃ।

শ্রীজ্যোৎস্নাশঙ্কর ভাদুড়ী (বি, এস্-সি)।

কীটের সহিত সংগ্রাম

জীবজগতের ক্রম-বিবর্ত্তনে ধরাপৃষ্ঠে যে সমস্ত প্রাণীর আবির্ভাব হইয়াছে, তন্মধ্যে কীট-পতঙ্গ যে শুধু অতিশয় প্রাচীন, তাহা নহে ; অধিকন্তু তাহারা যুগে যুগে পারিপার্শ্বিক অবস্থা-পরিবর্ত্তনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া তাহাদিগের প্রধান প্রধান বংশাবলী অবিচ্ছিন্ন ধারায় বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সঞ্জীবিত রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উই-কীটের উল্লেখ করিতে পারা যায়। উই ও আরশুলার পূর্ব্বপুরুষ সমশ্রেণীর ; উই-বংশের কতিপয় পুরাতন জাতি অন্ততঃ এক কোটি বৎসর ধরিয়া অপরিবর্ত্তিত অথবা সামান্য পরিবর্ত্তিত অবস্থায় চলিয়া আসিতেছে। ফলতঃ কীট-শ্রেণীর প্রাণী যে সময়ে পৃথিবীতে দেখা দিয়াছে, সে সময়ে মানবের পূর্ব্বপুরুষের উদ্ভবেরও কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই। কীট মানব অপেক্ষা বহু প্রাচীন। কিন্তু নর-বংশের আবির্ভাবের সময় হইতেই নর ও কীটের মধ্যে জগদ্বক্ষে আধিপত্যলাভ করিবার জন্য তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়া আসিতেছে। নরের মিত্র-কীটও অবশ্য আছে ; কিন্তু অধিকাংশ জাতীয় কীটই তাহার শত্রু। সৌভাগ্যের বিষয় যে, কীটের দৈহিক বৃদ্ধির একটা সীমা আছে। উহাদের দেহের গঠন মানবের বিপরীত ; আমাদিগের দেহের কঙ্কাল যেমন ভিতরে অবস্থিত, কীট-দেহের কঙ্কাল অর্থাৎ কঠিনাংশ তেমনই বাহিরে বিন্যস্ত। তজ্জন্য কীটাবয়ব অনির্দ্দিষ্ট-রূপে বৃদ্ধি পাইতে পায় না। লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া কীটের দেহ সামান্য পরিসরের মধ্যেই আবদ্ধ রহিয়াছে। কিন্তু মানবের অথবা মেরুদণ্ডী জীব-সমূহের অবয়ব-বৃদ্ধির কোন নির্দ্দিষ্ট সীমা নাই ; সেই জন্য মেরুদণ্ডীদিগের মধ্যে অনেক অতিকায় প্রাণীর দৃষ্টান্ত দেখা যায়। কীটের যেরূপ অদ্ভুত প্রজননশক্তি রহিয়াছে, তাহার উপর যদি তাহার দেহ সুবৃহৎ হইত, তাহা হইলে এত দিনে কীটবংশই সমস্ত পৃথিবী ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিত। এখনও ঠিক বলিতে পারা যায় না যে, অনুকূল অবস্থা উপনীত হইলে কীট কোন দিন অন্য সমস্ত জীবজাতিকে পর্য্যুদস্ত করিতে সমর্থ হইবে কি না। কীটের উপদ্রবে অর্থাৎ সংঘবদ্ধ আক্রমণে মানবের দেশত্যাগের উদাহরণ ইতিহাসে বিরল নহে। মানবের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন যে, কীটকুলের অবাধ বংশবৃদ্ধির সহায়ক অবস্থা সকল সময় উপস্থিত হয় না। কিন্তু তাহা না হইলেও স্বাভাবিক অবস্থায় কীট মানব-জাতির যে ক্ষতি করিয়া থাকে, তাহাও বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে ভয়াবহ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে।

কীটজনিত ক্ষতি

কীটপতঙ্গ যে প্রাকৃতিকবর্গের অন্তর্ভুক্ত, তাহার ন্যায় বৃহৎ বর্গ প্রাণি-জগতে প্রায় আর নাই। ইহাদের বংশ, গোষ্ঠী ও গণ বহু-সংখ্যক। পৃথিবীর নানা স্থানে দৃষ্ট নানা প্রকার কীটের জাতির সমষ্টি করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, সংখ্যায় কোন বর্গীয় জীবই ইহাদিগকে পরাস্ত করিতে পারে না। এতদ্ভিন্ন অনেক কীটেরই বৎসরে একাধিকবার সন্তান জন্মিয়া থাকে, এবং প্রত্যেক বারেই সন্তানসংখ্যা অন্য প্রাণীর তুলনায় অগণিত। এই সমস্ত কারণে কীট বড়ই ভীষণ শত্রু। কীট প্রধানতঃ ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত ; উহাদের আবার অনেক উপশ্রেণী আছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মানবের অরাতি কীটই অধিক, মিত্রের সংখ্যা কম। মিত্র-কীটের মধ্যে মৌমাছি, লাক্ষা, রেশম, কোচিনীল কীট প্রভৃতি অন্যতম। ইহাদিগের পরিশ্রমের ফলে যে সমুদয় দ্রব্য উৎপাদিত হয় অর্থাৎ মধু ও মোম, গালা, রেশম ও কারমাইন্— সেগুলি সমস্তই মনুষ্যের কার্য্যে লাগে। কতিপয় কীটকে শিকারী কীট বলা হয় ; সেগুলি অন্য কীটের ধ্বংসসাধন করে। পরজীবী কীটও যে কীটের দেহাবলম্বনে পরিপুষ্ট হয়, অবশেষে তাহারই উচ্ছেদসাধন করে। ইহারাও পরোক্ষভাবে মানুষের মিত্র। কিন্তু এই কয় প্রকার কীট বাদ দিলে অবশিষ্ট বিশাল কীটকুল কোন না কোন প্রকারে মানুষের অপকারসংঘটনেই নিযুক্ত রহিয়াছে।

কীট দ্বারা মানবের যে কত ক্ষতি হয়, সাধারণ ব্যক্তি তাহা ঠিক উপলব্ধি করিতে পারে না। জগতের নানা স্থানে কীট-জনিত ক্ষতি হিসাব করিতে গেলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। সে সমুদয় কথার উল্লেখ না করিয়া আমরা যদি শুধুই ভারতের কথা আলোচনা করি, তাহা হইলেও দেখিতে পাই যে, কীট নিঃশব্দে আমাদিগের কি ভীষণ ক্ষতিসাধন করিতেছে। ম্যালেরিয়া যে কীট-বাহিত ব্যাধি, অর্থাৎ এনোফিলিগণীয় মশক দ্বারা দেহ হইতে দেহান্তরে সংক্রমিত হয়, তাহা অনেকেই জানেন। প্রতি বৎসর ম্যালেরিয়া-জ্বরের আক্রমণে গড়ে প্রায় দশ লক্ষ ভারতবাসী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যদি দরিদ্র ভারত-বাসীর প্রত্যেকের জীবনের মূল্য ন্যূনকল্পে এক শত টাকা বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে ম্যালেরিয়াজনিত বাৎসরিক ক্ষতির পরিমাণ ১০ কোটি টাকা দাঁড়ায়। ক্ষেত্র, উদ্যান ও অরণ্যজাত বহুপরিমাণ ফসল কীটের আক্রমণে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় ; মনুষ্যের আহার্য্য, পরিধেয় ও নানা প্রকারের সম্পত্তি, গুদামজাত মাল, গৃহ, গৃহসজ্জা, যান-বাহন ইত্যাদিও যে কি বিপুল পরিমাণে কীট

দ্বারা বিনষ্ট হয়, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। সরকারী কীটতত্ত্ববিদ মিঃ ফ্লেচার কিছু দিন পূর্ব্বে ভারতের কীটজনিত ক্ষতি অনুমান করিতে গিয়া নিম্নলিখিত তালিকা সঙ্কলন করিয়াছিলেন :—

ক্ষেত্রজ ফসলরোগ খাতে	বাৎসরিক	ক্ষতি	১৮০	কোটি	টাকা
আরণ্য ফসলরোগ	"	"	১	"	"
মনুষ্যরোগ	"	"	১৬	"	"
পশুরোগ	"	"	৩	"	"

মোট বাৎসরিক ক্ষতি ২০০ কোটি টাকা

বলা দরকার যে, উক্ত তালিকায় কেবলমাত্র উৎপন্ন ফসল ও ব্যাধি ব্যতীত অন্য কোন খাতে ক্ষতির পরিমাণ ধরা হয় নাই। মনুষ্যের সর্ব্ববিধ ব্যবহার্য্য দ্রব্য ও শিল্প এবং বাণিজ্যের বিষয়ীভূত নানাবিধ সামগ্রীর কীটজনিত অপচয়ের হিসাব করিলে মোট ক্ষতির পরিমাণ অন্ততঃ দ্বিগুণ অর্থাৎ চারি শত কোটি টাকা হইবে। অনশনক্লিষ্ট ভারতবাসীর পক্ষে উহা যে অসহনীয় ভার, তাহা বুঝাইবার বিশেষ প্রয়োজন হয় না।

কীটের আক্রমণরীতি

যদি যুদ্ধবিগ্রহ দ্বারা কোন দেশের লোকক্ষয় হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য কি উদ্যোগ ও অর্থব্যয়ই না করা হইয়া থাকে। সৈনিক বাহিনী, তাহাদিগের সাজ-সরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্রাদির খরচ কি বিপুল পরিমাণ হয়। কিন্তু কিছু কাল পূর্ব্ব পর্য্যন্তও মানুষ তাহার ঘোর আততায়ী কীটের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার কোন আয়োজনই আবশ্যক বলিয়া মনে করে নাই। পরন্তু ভাবিয়া দেখিতে গেলে যুদ্ধ ও মহামারী অপেক্ষা কীটের আক্রমণে মনুষ্যক্ষয়ের পরিমাণ অধিক। প্রভেদ এই যে, কীটের আক্রমণ সংগোপনে সাধিত হইয়া থাকে। কোন্ অবসরে কীট মনুষ্য অথবা অন্য প্রাণীর দেহে প্রবেশ করে কিম্বা রোগবীজ নিহিত করিয়া দেয়, তাহা সে সময়ে বিশেষ লক্ষ্যের বিষয় হয় না। পরে রোগ যখন প্রকাশ পায়, তখন প্রায়ই তাহা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে এবং তাহার প্রতীকারও তদনুপাতে কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এইরূপ অতর্কিতভাবেই কীট অনাদিকাল হইতে মানুষের শত্রুতা করিয়া আসিতেছে। ইহা আরও উল্লেখযোগ্য যে, অনেক কঠিন ব্যাধির উৎপত্তির সহিত যে কীটের সংস্রব আছে, তাহা প্রধানতঃ আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারাই ধরা পড়িয়াছে। পূর্ব্বে এইরূপ রোগ দৈবঘটিত বলিয়া বিশ্বাস ছিল। অনেক প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক এমন বিবেচনা করেন যে, বিশাল ও প্রবলপ্রতাপশালী রোম সাম্রাজ্যের অধঃপতন ও ধ্বংসের অন্যতম কারণ ম্যালেরিয়া। কত যুগ ধরিয়া, কত দেশে, কত জাতিকে বীর্য্যহীন করিয়া ম্যালেরিয়া লুপ্তির পথে প্রেরণ করিয়াছে, কিন্তু স্যার রোণাল্ড রসের আবিষ্ক্রিয়ার পূর্ব্বে তাহার প্রতাপ ও প্রভাবের সীমা যে এত বহু বিস্তৃত, তাহা কে জানিত এবং কোন্ ব্যক্তিই বা সন্দেহ করিত যে, নগণ্য মশক জগদ্ব্যাপী এরূপ করাল ব্যাধির বাহন? মশা, মাছি, ছারপোকা, আরশুলা প্রভৃতি মানুষের সহচর কীট-সমূহ নানা প্রকারে মানবের স্বাস্থ্যভঙ্গের হেতু হইয়া তাহার যে কি মহা অনিষ্টসাধন করিতেছে, তাহার পরিমাণ সঠিক নির্দ্ধারিত হওয়ার এখনও বিলম্ব আছে। চিকিৎসাবিষয়ক কীটতত্ত্বের আলোচনা অধিক দিন আরম্ভ হয় নাই। কিন্তু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যে ভাবেই কীট দ্বারা মনুষ্যের স্থিতি ও উন্নতি বাধা প্রাপ্ত হউক না কেন, এ সম্বন্ধে কোন মতভেদ নাই যে, তাহার প্রতীকার করিতে হইলে প্রথমতঃ কীট সম্বন্ধীয় জ্ঞানের পরিসর-বৃদ্ধি হওয়া আবশ্যক। তদ্ভিন্ন কীটের সহিত সংগ্রামে জয়ী হইবার অন্য কোন উপায় নাই।

ভারতে কীটতত্ত্ব-চর্চ্চা

কীট সম্বন্ধে পুরাকালের মানব-সমাজের অল্পবিস্তর জ্ঞান থাকিলেও কীট-তত্ত্বকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক বিজ্ঞান বলিতে পারা যায়। প্রাচীন মিশর, গ্রীস, রোম প্রভৃতি দেশের পুরাতন লেখকদিগের গ্রন্থে কীটের উপদ্রবের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তৎসমুদয় হইতে কীটের প্রকৃতি, স্বরূপ অথবা আক্রমণ-রীতির কোন বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। বরং বহু যুগ পূর্ব্বে হিন্দুগণ যে কীট সম্বন্ধে কিয়ৎ-পরিমাণ গবেষণা করিয়াছিলেন, তাহার কতিপয় প্রমাণ দৃষ্ট হয়। বৈদিক সময়ে বিশেষ-জাতীয় পিপীলিকা ও মাতাচী অর্থাৎ পঙ্গপালের আক্রমণ পরিলক্ষিত হইয়াছিল। আয়ুর্ব্বেদে সুশ্রুত-সংহিতায় রোগোৎপত্তির হেতু বলিয়া যে সকল কীটের উল্লেখ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে অধিকাংশই কৃমি-কীট হইলেও, তদ্রূপ বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, সে সময়ে কীট-বিদ্যার চর্চ্চায় হিন্দুগণ কতক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। প্রজনন-রীতির উপর ভিত্তি করিয়া সুশ্রুত ও তৎপরবর্ত্তী মনীষিগণ কীটের শ্রেণী-বিভাগ করিবারও প্রয়াস পাইয়াছিলেন। খৃষ্টীয় শতাব্দী-প্রারম্ভের পূর্ব্ব পর্য্যন্তও ঐরূপ বিভাগ চলিয়া আসিতেছিল। পরে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে জৈন মহাপণ্ডিত উমাস্বাতী কীটের ইন্দ্রিয়-সমূহের পরিপুষ্টির স্তর হিসাবে নব-প্রথায় শ্রেণী-বিভাগ আরম্ভ করেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বর্ত্তমান সময়ে

বৈজ্ঞানিক প্রথায় প্রাকৃতিক বর্গ-বিভাগের সহিত উমাস্বাতীর শ্রেণী-বিভাগের কতকাংশে বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে।

আধুনিক সময়ে ভারতে কীটতত্ত্ব আলোচনার সূত্রপাত ইংরাজ রাজত্বের সমসাময়িক এবং উহা প্রধানতঃ বিদেশীয় পণ্ডিতগণ দ্বারা পরিচালিত। বস্তুতঃ যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চিকিৎসা-বিভাগের কর্ত্তা ডাক্তার এণ্ডারসনই মাদ্রাজে কোচিনীল কীট-প্রবর্ত্তন উপলক্ষে এতদ্দেশে সর্ব্বপ্রথমে কীটতত্ত্বচর্চ্চা আরম্ভ করেন; তাঁহার বন্ধু, উদ্ভিদবিদ কনিগও (Koenig) প্রায় সমসময়ে উইপোকা-সম্বন্ধীয় গবেষণায় প্রবৃত্ত হয়েন। এই উভয়ই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগের ঘটনা। কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে ১৮০০ খৃষ্টাব্দে 'Donovan's Natural History of the Insects of India' নামক পুস্তক প্রকাশের সময় হইতেই ভারতে কীটতত্ত্বের আলোচনা আরম্ভ হয়। বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার ন্যায় কীটতত্ত্বের গবেষণাতেও Society of Bengal যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদিগের পত্রিকাতেই অনেক ভারতীয় কীটের তালিকা ও জীবন-বৃত্তান্ত প্রথম লিপিবদ্ধ হয়। উক্ত সোসাইটী কর্ত্তৃক সংগৃহীত বিভিন্ন শ্রেণীর ভারতীয় প্রাণিসমূহের নমুনা কলিকাতা যাদুঘরে (Indian Museum) স্থায়িভাবে স্থানান্তরিত হওয়ার পর হইতেই যাদুঘর কীটতত্ত্ব আলোচনার প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্ম্মচারিবর্গ এতদ্দেশীয় নানা শ্রেণীর কীটের তালিকা-সঙ্কলন, শ্রেণীবিভাগ ও জীবন ইতিহাস অনুশীলন ইত্যাদি অত্যাবশ্যক কার্য্য সম্পাদন করিয়া ভারত-বাসীর চির-কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। কলিকাতা যাদুঘরে কীটতত্ত্ব আলোচনা এখনও কম পরিমাণে হয় না। কিন্তু এই কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞগণকে জীববিজ্ঞানের অন্যান্য বিভাগেও কার্য্য করিতে হয়; সেই জন্য কীটতত্ত্ব এখানে মুখ্য স্থান অধিকার করিতে পারে না। পক্ষান্তরে, কৃষিগবেষণাগার-সমূহে ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে কীটতত্ত্ব আলোচনার যথেষ্ট অবসর আছে। এই সমুদয় কারণে আজকাল ভারতে কলিকাতা যাদুঘরে সাধারণ কীটতত্ত্ব ব্যতীত অন্য ছয়টি কেন্দ্রে কীটতত্ত্বের বিশেষ বিশেষ শাখার চর্চ্চা হইয়া থাকে, যথা—দেরাদুন অরণ্য-বিদ্যাগবেষণা-গারে অরণ্য ও কাষ্ঠাদি ধ্বংসকারী কীট; কসৌলী রোগতত্ত্বা-গারে মনুষ্য ও পশ্বাদির রোগোৎপাদক কীট; এবং পুসা, কাণপুর, লায়ালপুর ও কইম্বাটুরে প্রধানতঃ কৃষিজাত ফসল-ধ্বংসকারী কীট। বলা বাহুল্য যে, এই সমুদয় স্থলে এক এক জন প্রধান কীটতত্ত্ববিদ ও তাঁহার কতিপয় সহকারী রহিয়াছেন; কিন্তু ভারতের অভাবের অনুপাতে এইরূপে কীটতত্ত্ব গবেষণায় নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গের সংখ্যা যথেষ্ট নহে।

আজ পর্য্যন্ত ভারতীয় কীটবিষয়ক যে সকল তত্ত্ব ও তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে, তৎসমুদয় দেশীয় ও বিদেশীয় নানা গ্রন্থ ও পত্রিকায় বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। কোন পাঠক এক স্থলে ভারতীয় কীট-সমূহের বিবরণ দেখিতে ইচ্ছুক হইলে ভারত সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'Fauna of British India' নামক প্রামাণ্য গ্রন্থের কীটসম্বন্ধীয় অংশ তাঁহার পক্ষে দ্রষ্টব্য। Wood-Mason, De Niceville, Bingham, Swinhoe, Cotes, Distant, Lefroy, Fletcher প্রভৃতি অনেক পণ্ডিতই ভারতীয় কীটতত্ত্বের চর্চ্চা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগের গ্রন্থাদি সাধারণ পাঠকবর্গের বোধগম্য নহে। কীট-শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ পাঠক-পাঠিকাগণের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য যে সমস্ত পুস্তক লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে 'E H A.' রচিত Behind the Bunglow এবং অন্য দুইখানি পুস্তকই সর্ব্ব-প্রথমে উল্লেখযোগ্য। Stebbing's Insect Intruders in Indian Homes এবং Lefroy's Indian Insect Life 'এহা'-প্রণীত পুস্তকের ন্যায় সুখপাঠ্য না হইলেও সরল ভাষায় লিখিত ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদিপূর্ণ। সুখের বিষয় যে, বাঙ্গালা ভাষাতেও আজকাল কীটতত্ত্ব সাধারণের বোধগম্য করিয়া লিখিত হইতেছে। কিন্তু যত দিন না কীটতত্ত্ববিষয়ক প্রামাণ্য পুস্তক বঙ্গভাষায় লিখিত হইবে, তত দিন পর্য্যন্ত সাধারণ বাঙ্গালী কীটতত্ত্বচর্চ্চার দিকে আকৃষ্ট হইবে না।

কীটের আক্রমণ-প্রতিরোধ-প্রণালী

কীটের সহিত সংগ্রামে জয়ী হইতে হইলে কীটতত্ত্ব-বিষয়ক জ্ঞানের যথেষ্ট প্রচার হওয়া আবশ্যক। ভারতের ত কথাই নাই, সমষ্টিভাবে বৃটিশ সাম্রাজ্যও এই ব্যাপারে জগতের অন্যান্য সভ্য জাতির তুলনায় অনেক পরিমাণে পশ্চাতে পড়িয়া আছে। বিলাতে Medical Research Council এর সম্পাদক Sir Walter Motley-Fletcher সম্প্রতি 'জীব-বিজ্ঞান ও রাষ্ট্রনীতি' সম্বন্ধীয় একটি বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, সমস্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যে মোটে ২ শত ১৫ ব্যক্তি কীটতত্ত্বচর্চ্চায় নিযুক্ত আছেন। কীটদমনের জন্য বৃটিশ সাম্রাজ্যে যে পরিমাণ অর্থ-ব্যয় হয়, এক মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রেই তাহার চতুর্গুণ খরচ হইয়া থাকে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-সমূহে ব্যবহারিক কীটতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় অন্ততঃ মোটামুটি জ্ঞান লাভ করিবারও কোন সুবিধা নাই। অন্য দিকে মার্কিণ, জর্ম্মণী ও ফ্রান্সে কীট সম্বন্ধে গবেষণাও যেমন অধিক, কীটের আক্রমণ

হইতে মনুষ্য, পশ্বাদি ও নানাবিধ ফসল ও পণ্যদ্রব্যাদি রক্ষা করিবার প্রয়াসও তেমনই প্রবল এবং বহুদিকে বিস্তৃত। বৃটিশ সাম্রাজ্যের কীটতত্ত্ববিদ্‌গণের সম্মেলনে অধুনা নানা দেশে কীট-দমনের একটি সর্ব্বসম্মত ও অব্যাহত নীতি অনুসৃত হইবার প্রস্তাব হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা এখনও কার্য্যে পরিণত হয় নাই। অপর দেশে যাহাই হউক, ভারতে কীটজনিত নানাবিধ ক্ষতিনিবারণের ব্যবস্থা যে অচিরাৎ হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তিই দ্বিরুক্তি করিবেন না। সমাজের মধ্যে এমন কোন শ্রেণী নাই—যাহাকে কীট দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে না হয়। গৃহস্থ, কৃষক, বণিক, কারখানাওয়ালা ও বড় বড় কারবারের মালিক—সকলকেই সময়বিশেষে কীটের অত্যাচার সহ্য করিতে হয়। সেই জন্য এক দিকে সরকারী কৃষি, শিল্প, অরণ্য ও চিকিৎসাবিভাগ ও অন্য দিকে বায়ত, ব্যবসায়ী ও শিল্পিসমিতি-সমূহের কীট-সম্বন্ধীয় জ্ঞান প্রচারের উপর বিশেষ মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক। কারণ, সাধারণের সহানুভূতি ও সহযোগিতা ব্যতীত কীটরোগ অথবা কীটজনিত ক্ষতি নিবারণের কোন ব্যবস্থাই সফল হইতে পারে না।

কীট-দমনের প্রচলিত পদ্ধতি

যদিও বর্ত্তমান সময়ের পূর্ব্বে মানব পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই যে, কীট তাহার কিরূপ প্রবল শত্রু, তথাপি সহজ বুদ্ধিবশতঃ সে চিরকালই কীট-নাশের জন্য কোন না কোনরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া আসিতেছে। বস্তুতঃ ব্যবহারিক কীট-তত্ত্বের প্রধান লক্ষ্য—বিভিন্ন কীটের জীবন-বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হইয়া তাহাদের আক্রমণ প্রতিরোধ অথবা উচ্ছেদসাধনের সহজ উপায় নির্দ্দেশ করা। আমরা এ স্থলে দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি পরিচিত ও সচরাচর প্রচলিত উপায়ের উল্লেখ করিতেছি। কীটতত্ত্ব-চর্চ্চার উন্নতির সহিত ক্রমশঃ আরও সুনিশ্চিত বৈজ্ঞানিক উপায়-সমূহের যে উদ্ভাবনা হইবে, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। প্রথমতঃ গৃহের কথা বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, গৃহ ও গৃহস্থ উভয়ের পক্ষে পরিচ্ছন্নতা প্রধান উপায়। ইহার মধ্যে একটি নিয়ম রক্ষা করিয়া অপরটি বাদ দিলে চলে না। গৃহকোণে, প্রাঙ্গণে অথবা গৃহের সান্নিধ্যে যদি উচ্ছিষ্ট, মলমূত্র ও আবর্জ্জনাদি আকারে কীটখাদ্য সঞ্চিত থাকে, তাহা হইলে শুধু দেহের শুচিতাসাধন করিয়া কোন ফল নাই; তাহাতে কীট-বাহিত রোগ প্রতিরোধ করা যাইবে না, কিম্বা গৃহস্থের সম্পত্তির কীটজনিত ক্ষতিও বন্ধ হইবে না। আহার্য্য, পরিধেয়, ব্যবহার্য্য দ্রব্য, গৃহসজ্জা ও ভাণ্ডারজাত দ্রব্যাদিতে যাহাতে কীট আশ্রয় গ্রহণ করিতে না পারে, সে বিষয়ে সকল সময়ে গৃহস্থের সতর্ক থাকা দরকার।

কীট-বিতাড়ন ও বিনাশের যাবতীয় উপায়কে দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়, যথা—যান্ত্রিক (Mechanical) এবং রাসায়নিক পদ্ধতি অবলম্বন। শেষোক্তটিকে সাধারণতঃ ঔষধ-প্রয়োগ বলা হয়। যান্ত্রিক উপায় নানা প্রকারের হইতে পারে। ঘর ঝাঁট দেওয়া, ধোয়া, দেওয়াল ও আঙ্গিনা লেপন ইত্যাদি যান্ত্রিক উপায়ের অন্তর্গত। এখানে হস্ত দ্বারা সমাধি[illegible] হইলেও সুসভ্য প্রতীচ্যে এই সকল কার্য্যে যন্ত্র প্রয়োগ করা হইতেছে। গৃহের বাহিরেও কয়েক প্রকার যান্ত্রিক উপায় অবলম্বিত হয়। ক্ষেত্র অথবা উদ্যানের মাটী কোপাইবার অপর উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে কীটনাশও একটি উদ্দেশ্য। অনেক কীট মৃত্তিকা-গহ্বরেই বাস করে। মাটী কোপাইয়া দিলে এক দিকে যেমন তাহাদিগের বাসস্থান নষ্ট হয়, অন্য দিকে কীটগুলি তেমনই অনাবৃত হইয়া নানাপ্রকার পশু-পক্ষীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও তাহাদিগের ভক্ষ্য হয়। গৃহমধ্যে ও ক্ষেত্রে ফাঁদ পাতিয়াও অনেক কীট নষ্ট করা যায়। কোন গভীর পাত্রের ভিতর দিকে তৈল মাখাইয়া পিচ্ছিল করিয়া উহার নিম্নভাগে কীটের চিত্তাকর্ষক খাদ্য রাখিয়া দিলে, খাদ্যের লোভে উহারা নীচে নামিয়া যায়, কিন্তু পুনরায় উপরে উঠিতে না। বাগানে রাত্রিচর কীটের উপদ্রব অধিক হইলে একটি বড় গামলায় জল ভর্ত্তি করিয়া উহার মধ্যস্থলে কোন আধারে একটি দীপ জ্বালাইয়া রাখা হইয়া থাকে। জলের সহিত সামান্য পরিমাণে কেরোসিন তৈল মিশ্রিত করিলে ভাল হয়। দীপের দ্বারা যে সকল কীট আকৃষ্ট হইয়া আসে, জলে পড়িয়া তাহাদের মৃত্যু অনিবার্য্য। ক্ষেত্রজ ফসল ফড়িং প্রভৃতি দ্বারা আক্রান্ত হইলে, উহাদিগকে ধরিবার জন্য উপযুক্ত আকারের বাঁখারির কাটামোয় বিলম্বিত এক প্রকার উন্মুক্তমুখ থলিয়া লঘুভাবে ফসলের উপর দিয়া টানিয়া লইয়া যাওয়ার পদ্ধতি আছে। সম্মুখেই থলিয়ার খোলা মুখ দেখিয়া পতঙ্গরা উহাতে প্রবেশ করে এবং অবশেষে উহার তলদেশে পড়িয়া যায়। এইরূপে সংগৃহীত কীট-সমূহকে একত্র অগ্নিসংযোগে অথবা বিষমিশ্রিত জলে ফেলিয়া বিনষ্ট করা হইয়া থাকে। উই এবং পিপীলিকার প্রকৃত বাসা অর্থাৎ যেখানে রাণী বাস করে, তাহা আবিষ্কার করা অনেক সময় শক্ত, কিন্তু আবিষ্কার করিতে পারিলে উহাকে গভীরভাবে খনন করিয়া অগ্নি দ্বারা কীট-গুলিকে সমূলে ধ্বংস করাই কর্ত্তব্য। বড় বড় বাগিচায় উই-ঢিপি নষ্ট করিবার জন্য বিস্ফোরক পদার্থও ব্যবহার করা হয়।

ঔষধ প্রয়োগ অর্থাৎ রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহার কীট-নিবারণের অন্য উপায়। ঔষধ-প্রয়োগের ব্যবস্থা-সমূহের মধ্যে তিনটি প্রধান, যথা—ঔষধযুক্ত জল দ্বারা ধৌত করা, চূর্ণরূপে ঔষধ ছড়াইয়া দেওয়া এবং ধূমপ্রয়োগ করা। এই তিনটি পদ্ধতিরই বর্ত্তমান সময়ে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এতদ্দেশে মালীগণ গাছে পোকা ধরিলে যে হুঁকার জল প্রয়োগ করে, তাহা প্রথম পদ্ধতির একটি নিদর্শন। তামাকের বীর্য্য Nicotine উদ্ভিদ্-রোগ নিবারণের জন্য পাশ্চাত্যদেশেও যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। Bordeaux Mixture ও তুঁতের জলও কীটনাশক। ঔষধযুক্ত দ্রাবণ প্রয়োগের জন্য বর্ত্তমান সময়ে পিচকারী-যন্ত্র (Sprayer) ব্যবহৃত হইতেছে। আমাদের দেশে বেগুনগাছ প্রভৃতি কীটাক্রান্ত হইলে হলুদের গুঁড়া ছড়াইয়া দেওয়া হয়; London Purple, Paris green ও অন্যান্য বহুবিধ পেটেণ্ট গুঁড়ার উন্নত কৃষিকার্য্যে এখন খুবই প্রচলন হইয়াছে। গুঁড়া ছড়াইবার কলও আছে; অধিকন্তু বহু বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে চূর্ণ প্রয়োগের জন্য উড়ো জাহাজও ব্যবহৃত হইতেছে। ধূম-প্রয়োগ দ্বারা কীট-বিতাড়নের সাধারণ দেশীয় দৃষ্টান্ত গোয়ালে ধোঁয়া দিয়া মশকের উপদ্রব নিবারণ। কোনরূপ রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত না করিয়া বায়ুর অনুকূল প্রবাহের সহিত ক্ষেত্রে শুষ্ক শুষ্ক লতাপাতার ধোঁয়া দিয়াও কার্পাস ও অন্য কতিপয় ফসলে উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়। রাসায়নিক দ্রব্যাদির ধূম উন্মুক্ত স্থানে দেওয়া চলে না। মূল্যবান্ ফলবৃক্ষ-সমূহ কীট দ্বারা আক্রান্ত হইলে উহাদিগকে বস্ত্র-মণ্ডপ দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া ধূম প্রদান করিলে গাছগুলি রোগমুক্ত হয়। অবশ্য এরূপ পদ্ধতি গাছ-ঘর (Green-house) এবং কাচ-ঘরের (Glass-house) পক্ষেই প্রশস্ত। পশুপক্ষী প্রভৃতির রোগেও অঙ্গাদি প্রক্ষালন ও চূর্ণ প্রয়োগ উভয়বিধ ব্যবস্থাই অবস্থাবিশেষে করা হইয়া থাকে।

আমরা বর্ত্তমান্ প্রবন্ধে কীট-সমূহ দ্বারা মানুষের নানাপ্রকার ক্ষতি ও তাহা নিবারণকল্পে যেরূপ ভাবে চেষ্টা চলিতেছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিলাম। এতৎসম্বন্ধে সরকার ও জনসাধারণ, উভয়ের কর্ত্তব্যই সুস্পষ্ট। স্বাস্থ্যহানি, সম্পত্তিক্ষয় ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে অপচয়—ইহার প্রত্যেকটির সহিতই কীটের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। অনিষ্টকারী কীট-সম্বন্ধীয় মূল তথ্যগুলি স্কুল-শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত, বালকবালিকাগণকে কীট-পতঙ্গাদি সংগ্রহ করিতে ও তাহাদিগের জীবন-বৃত্তান্ত জানিতে উৎসাহিত করা আবশ্যক এবং মফঃস্বলে স্বাস্থ্য ও কৃষি-বিভাগের কর্ম্মচারিগণের সাহায্যে কীটবিষয়ক জ্ঞান প্রচারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। দেশের স্বাস্থ্য ও সম্পদের উন্নতি এবম্বিধ ব্যবস্থার উপর বহু পরিমাণে নির্ভর করিতেছে।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

কি ধন পেলে খুঁজি ?

হে তপস্বী আজ আমারে বলবে সোজাসুজি?
ভাবছ বুঝি ধনি!
তোমার মধুর আবির্ভাবে ধন্য মোরে গণি,
বলব হেসে বাণী
যা পেয়েছি যা চেয়েছি তুমি সে মোর রাণী.
তোমার ভালবাসা
তপস্যারে সফল ক'রে পূরল মনের আশা,
অজানা যার লাগি
বাহির হলেম বনের পথে অচিন অনুরাগী;
সে তুমি হায় তুমি
সব সাধনা স্ফূর্ত্তি লভে তোমায় প্রীতি চুমি।
তা নয় সখি তা নয়
বলব সে দিন বিজয়িনি! আজিকে পরাজয়!

মন যাহারে চাহে,
যাহার লাগি হৃদয় নিতি নূতন সুরে গাহে,
আমি কি তায় জানি?
মাঝে মাঝে শুনি কেবল আধ জাগা তার বাণী।
মেলি করুণ আঁখি,
দাঁড়িয়ে রবে তুমি তখন আঁচলে মুখ ঢাকি,
সময় যাবে ব'য়ে,
তোমার প্রাণে না জানি কোন গোপন কথা কয়ে।
চলাচলের দোলে,
আবার যদি জনম লভি, এই ধরণীর কোলে,
বলছি তোমায় প্রিয়ে
সত্যি ক'রে বলছি তোমায় করবো নাকো বিয়ে।

শ্রীমতিলাল দাশ (এম-এ, বি-এল)।

মানুষ-বাঘ

(অলৌকিক রহস্য)

পৃথিবীর অনেক দেশেই দীর্ঘকাল হইতে এই জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে, মানুষ মন্ত্রবলে ব্যাঘ্রদেহ ধারণ করিতে পারে। আমাদের দেশেও এইরূপ কিংবদন্তী শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কোন ব্যক্তি সত্যই মন্ত্রবলে ব্যাঘ্রদেহ ধারণ করিয়াছে, ইহা কেহ প্রত্যক্ষ করিয়াছে, একপ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

গত ১৯২০ খৃষ্টাব্দে মালয় দ্বীপের একটি রবারক্ষেত্রে একটি কুলীর ব্যাঘ্রমূর্ত্তি ধারণের অদ্ভুত বিবরণ, সংপ্রতি লণ্ডনের একখানি বিখ্যাত মাসিকে প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধের লেখক মিঃ মেল্‌রোজ সেই আবাদের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, তাঁহার লিখিত বিবরণ সম্পূর্ণ সত্য, তবে এই গল্পে তিনি যে কয় জন সরকারী কর্ম্মচারীর নাম প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কল্পিত নাম।

মিঃ মেল্‌রোজ লিখিয়াছেন—"মাত নূর সুমাত্রা-মালয় জাতীয় লোক। তাহার দেহ পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি দীর্ঘ, সে তাহার সহকর্ম্মীদের সকলের অপেক্ষা দীর্ঘকায়। মালয়রা সাধারণতঃ খর্ব্বকায়, তাহাদের দেহ স্থূলও নহে।

মাত নূর করতল প্রসারিত করিয়া দাঁড়াইল

রবারের গাছ চাঁচিয়া যখন তাহাদের রস-সংগ্রহের সময় আসিত, সেই সময় কুলীদের আদর বাড়িত, এবং তাহারা যথেচ্ছা মজুরীর দাবী করিত।

মালয়ের যে রবার-ক্ষেত্রের কার্য্যভার আমার হস্তে ন্যস্ত ছিল, সেই আবাদের আফিস-ঘরের দ্বারদেশে সহসা এক দিন প্রভাতে মাত নূরের আবির্ভাব! সে আমার নিকট চাকরীর প্রার্থনা করিয়া বলিল, আমি তাহাকে যে বেতনের উপযুক্ত মনে করিব, তাহাই লইয়া সে চাকরী করিতে রাজী।

সে তাহার হাতে কোন অস্ত্র-শস্ত্রাদি লুকাইয়া রাখে নাই, ইহা দেখাইবার জন্ম করতল প্রসারিত করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহার পশ্চাতে একটি সুরূপা তরুণীকে উপবিষ্ট দেখিতে পাইলাম; তাহার নাম মীনা, সে মাত নূরের স্ত্রী। মীনার কোলে পীতবর্ণ একটি ক্ষুদ্র শিশু ছিল। মীনা সেই শিশুটিকে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল, 'ভয় কি বাবা! আমাদের সাহেব মনিব তোমাকে মার্বেন না।'

মাত নূরের বিনীত অথচ সম্মানপূর্ণ নির্ভীক ভাব দেখিয়া তাহার সম্বন্ধে আমার অনুকূল ধারণা হইল। তাহার পরিধানে অপ্রশস্ত 'সারোং' (লুঙ্গী), তদ্দ্বারা তাহার কটি পরিবেষ্টিত, দেহের অবশিষ্ট সকল অংশই অনাবৃত; তাহার দেহচর্ম্ম রেশমের ন্যায় মসৃণ, তাহাতে উজ্জ্বল প্রভাত-রৌদ্র প্রতিফলিত হওয়ায় তাহার মসৃণতা বর্দ্ধিত হইয়াছিল; তাহার দেহের মাংসপেশীগুলি পরিপুষ্ট। কিন্তু তাহার চেহারায় একপ কোন বিশেষত্ব লক্ষ্য করিলাম—যাহা দেখিয়া আমার মনে কেমন একটা ধাঁধা লাগিল! সেই বিশেষত্ব আমি অনুভব করিলাম বটে, কিন্তু তাহার স্বরূপ কি, তাহা নির্দ্দেশ করা আমার অসাধ্য।

আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তুমি পূর্ব্বে যাঁহার চাকরী করিতে, চাকরী ছাড়িবার সময় তাঁহার নিকট হইতে ইস্তফা-মঞ্জুরীর টিকিট, কি কোন রকম চিট আনিয়াছ কি? তোমার যোগ্যতার কি প্রমাণ দেখাইতে পার?'

মাত নূর বলিল, সেরূপ কোন কাগজপত্র তাহার নিকট না থাকায় সে দুঃখিত। সে তাহার স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া যে জাহাজে

সুমাত্রা দ্বীপ হইতে মালয়ে আসিয়াছিল, সেই জাহাজে তাহার ও তাহার স্ত্রীর সর্ব্বস্ব চুরি গিয়াছিল। ঐ সকল কাগজপত্র মূল্যবান্ বোধে সেগুলি সে তাহার স্ত্রী মীনার অলঙ্কার ও রেশমী কাপড়-চোপড়ের সঙ্গে যে বাক্সে রাখিয়াছিল, তাহাও চোরে লইয়া গিয়াছিল। তবে যদি এক দিন তাহার কায পরীক্ষা করিয়া দেখি, তাহা হইলে তাহার কার্য্যদক্ষতায় আমি সন্তুষ্ট হইতে পারিব, এ কথা সে দৃঢ়তার সঙ্গে বলিল, এবং আমাকে এ কথাও জানাইল যে, তাহার ও তাহার স্ত্রী-পুত্রের জন্য একটু আশ্রয় ও কিঞ্চিৎ আহার তখনই না পাইলে চলিবে না। যদিও সে স্বয়ং 'ওরাং জাস্তান্' (মরদ আদমী) !

আমি আমার আফিসের এক জন কেরাণীকে ডাকিয়া মাত নূর ও তাহার স্ত্রীপুত্রকে মালয়-কুলীদের আড্ডায় লইয়া যাইতে আদেশ করিলাম, এবং ইহাও বলিলাম যে, তাহাদিগকে যেন কুলী-সর্দ্দার হাজী আউয়াংএর জিম্বা করিয়া দিয়া তাহাকে সেই সকালেই কোন প্রাচীন পরিত্যক্ত গাছ চাঁচিবার ভার দেওয়া হয়। যে সকল শ্রমজীবী গাছ চাঁচিবার কার্য্যের পরীক্ষা দিতে আসে, তাহাদের কার্য্যদক্ষতার পরিচয় গ্রহণের জন্য ঐ সকল বৃক্ষেই তাহাদিগকে অস্ত্রব্যবহার করিতে দেওয়া হয়।

সেই দিন অপরাহ্নে যখন কারখানার সম্মুখে কুলীদিগকে ডাকাইয়া, তাহারা কে কি পরিমাণ রস সংগ্রহ করিয়াছে, তাহা পরীক্ষা করা হইল, তখন দেখিতে পাইলাম, মাত নূরের বালতিতে রবারের তরল নির্য্যাস যে পরিমাণে সংগৃহীত হইয়াছে, তত অধিক নির্য্যাস আর কোন কুলী এক দিনের চেষ্টায় সংগ্রহ করিতে পারে না, এবং পূর্ব্বে কখন পারে নাই। বিশেষতঃ সে যে প্রণালীতে রবারের গাছ চাঁচিয়াছিল, তাহা এরূপ উৎকৃষ্ট যে, আমি পূর্ব্বে কোন দিন সেরূপ দেখিতে পাই নাই। কুলী-সর্দ্দার হাজী আওয়াংএর নিকট মাত নূরের সম্বন্ধে অনুকূল মন্তব্য প্রকাশ করিলাম।

আমার কথা শুনিয়া হাজী অস্বচ্ছন্দভাবে মাথা নাড়িয়া দাঁড়াইয়া রহিল ; সে আমার কথায় সায় দিল না ! ইহাতে আমি বিস্মিত হইলাম। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ব্যাপার কি হাজী ?'

হাজী অস্ফুটস্বরে বলিল, 'তুয়ান, বন্দার বেয়াদপি মাফ করিবেন ; আমার ধারণা—লোকটা 'জাহাৎ' (মন্দ)।'

সুমাত্রা হইতে এক জন বিদেশী আসিয়া কায আরম্ভ করিবামাত্র আমি মুক্তকণ্ঠে তাহার প্রশংসা করিলাম—ইহাতে হাজীর মনে ঈর্ষ্যার সঞ্চার হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, ইহা বুঝিতে পারিয়া আমি মনে মনে হাসিলাম, এবং হাজীকে তাহার ঐরূপ ধারণার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম।

হাজী বলিল, 'তুয়ান কি মাত নূরের ওষ্ঠ কি রকম চ্যাপ্টা, তাহা লক্ষ্য করেন নাই ?'

কথাটা সে অত্যন্ত অস্ফুটস্বরে বলিলেও তাহা শুনিয়া আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। হাজীর কথা শুনিয়া আমি মাত নূরের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, সত্যই তাহার ওষ্ঠ অত্যন্ত চ্যাপ্টা, নাকের নীচে তাহার অস্তিত্ব নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না !

যাহা হউক, আমি হাজীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মাত নূরের ওষ্ঠ ঐরূপ চ্যাপ্টা বলিয়া সে 'মন্দ লোক', এরূপ ধারণার কারণ কি ?—কিন্তু হাজী আমার প্রশ্নটি দুই একটি বাজে কথায় উড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিল। অতঃপর আমি অধীরভাবে কুলীদিগকে বিদায় করিলাম। তাহার পর এই আলোচনার কথা আমার স্মরণ রহিল না।

কয়েক সপ্তাহের পরীক্ষা-ফলে আমি জানিতে পারিলাম, মাত নূর কেবল যে বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন মজুর, ইহাই নহে ; তাহার মত সুদক্ষ নির্য্যাস-সংগ্রাহক আমাদের রবার-ক্ষেত্রে আর এক জনও ছিল না। কিন্তু আমি দেখিতাম, সে অন্যান্য শ্রমজীবীদের সঙ্গে আদৌ মিশিত না। সে তাহার স্ত্রীপুত্রদের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় অবসরকাল অতিবাহিত করিত। মালয়-কুলীরা দল বাঁধিয়া আমোদ-আহ্লাদ ও গল্প করিত, সে তাহাদের কাছে ঘেঁসিত না, তাহারাও তাহাদের তিন জনকে সর্ব্বদা দূরে পরিহার করিত।

পূর্ণিমার ঠিক পূর্ব্বদিন মাত নূর হঠাৎ বাগান হইতে অদৃশ্য হইল। মালয়-কুলীরা কোন কার্য্যব্যপদেশে স্থানান্তরে যাইবার পূর্ব্বে যথারীতি ছুটী লইত ; কিন্তু মাত নূর আমার অজ্ঞাতসারেই অন্তর্দ্ধান করিল ! অথচ তাহার স্ত্রী-পুত্র তাহার পর্ণকুটীরে নিরাশ্রয়ভাবে পড়িয়া রহিল। আমি মাত নূরের স্ত্রী মীনাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—তাহার স্বামী কোথায়, কি উদ্দেশ্যে কত দিনের জন্য বাগান ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে ? কিন্তু মীনার নিকট কোন সন্তোষজনক উত্তর পাইলাম না।

চারি দিন পরে মাত নূর ফিরিয়া আসিলে আমি তাহাকে আমার আফিসে ডাকাইলাম। আমার বিনানুমতিতে সে কোথায় গিয়াছিল, তাহা জিজ্ঞাসা করায় বলিল, আবাদ হইতে পনের মাইল দূরবর্ত্তী কোন গ্রামে (কাম্পং) তাহার একটি দোস্তের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিল ; আমার অনুমতি না লইয়া ও ভাবে চলিয়া যাওয়া অন্যায়, ইহা সে বুঝিতে পারে নাই ; ভবিষ্যতে আমি তাহার কার্য্যে অসন্তোষের কোন কারণ পাইব না। তাহার কথা শুনিয়া তাহাকে সতর্ক করিয়া ছাড়িয়া দিলাম। পরে আমার স্মরণ হইল—সে আমার নিকট (মালয়-শ্রমজীবীদের প্রথা অনুসারে) দাদন লইতে আসে নাই, কিংবা

বেতনের জন্যও অপেক্ষা করে নাই ; যে দিন কুলীদের বেতন দেওয়া হইয়াছিল, সে দিন সে বাগানে অনুপস্থিত ছিল। এতদ্ভিন্ন এরূপ দূরদেশে, বিশেষতঃ সমুদ্রতীর হইতে বহু দূরবর্ত্তী ঐরূপ দুর্গম স্থানে তাহার ন্যায় বিদেশীর কোন 'দোস্ত' থাকিতে পারে, ইহা একটু অসম্ভব বলিয়াই আমার মনে হইল।

উক্ত ঘটনার কয়েক দিন পরে আমি আমার বাগিচার প্রায় চল্লিশ মাইল দূরবর্ত্তী সুলতানের প্রাসাদে একটি অভ্যর্থনা-সভার কার্য্য শেষ করিয়া য়ুরোপীয় ক্লাবে উপস্থিত হইলাম। সেখানে আমার টেবলে যে দুই জন ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন, তাঁহাদের এক জন মিঃ ও'হালনন,—স্থানীয় পুলিসের কমিশনর ; দ্বিতীয় ব্যক্তি পূর্ত্ত-বিভাগের অধ্যক্ষ, মিঃ টম্সন। (তাঁহাদের নাম প্রকাশের অধিকার না থাকায় আমি কল্পিত নাম ব্যবহার করিলাম।)

পানের সময় আমাদের গল্প চলিতে লাগিল, ক্রমশঃ মালয়-দ্বীপের আচারব্যবহার ও বিভিন্ন কিংবদন্তী সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হইল। মাত নূরের চ্যাপ্টা ওষ্ঠের কথা হঠাৎ আমার স্মরণ হওয়ায়, হাজী আওয়াং তাহার সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিল, তাহা মিঃ ও'হালননকে বলিয়া কথাটার মূলে কোন সত্য আছে কি না, তাহা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি প্রায় ২৫ বৎসর মালয়ে বাস করিতেছিলেন।

তিনি বলিলেন, 'হাঁ, আমি উহা বলিতে পারি, কিন্তু মালয়রা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ও কথা আপনার নিকট প্রকাশ করিবে না। কারণ, উহা বলিতে তাহাদের ভয় হয়। উহাদের বিশ্বাস, ঐ রকম যাহাদের মুখ, তাহারা বৎসরের কোন কোন সময় ব্যাঘ্র-দেহ ধারণ করিতে পারে! তাহারা ব্যাঘ্রচর্ম্মে মণ্ডিত থাকিলে —কাহার সাধ্য তাহাদের সম্মুখে যায় ?'

এই কথার পর আমাদের হাসির গর্‌রা উঠিল। টম্সন্ মালয় দ্বীপের এক জন প্রসিদ্ধ শিকারী, তাঁহার মত শিকারী অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষ-বাঘের কথা উঠিতেই শিকারের কথা উঠিল। টম্সন বলিলেন, 'যদি বাঘের কথা বলেন, তাহা হইলে অল্পদিন পূর্ব্বে যে একটা প্রকাণ্ড বাঘের খবর পাইয়াছিলাম, সেটা এক জন চাইনীজ 'প্ল্যাণ্টারে'র সর্ব্বনাশ করিয়াছে! গত পূর্ণিমার রাত্রিতে বাঘটা তাহার ছয়টি বলদ মারিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বলদগুলির মৃত দেহ দেখিয়া মনে হইল, কেবল হত্যার উদ্দেশ্যেই সে সেগুলি মারিয়াছিল। প্রত্যেক বলদকে পেট চিরিয়া হত্যা করা হইয়াছিল ; কিন্তু তাহাদের দেহের প্রায় সকল অংশই অভুক্ত ছিল। বাঘে কোন পশু শিকার করিলে সেই 'মড়ি'র কাছে প্রায়ই ফিরিয়া আসে, কিন্তু এই ব্যাঘ্র মহাশয়কে কোন 'মড়ি'র নিকট ফিরিয়া আসিতে দেখা যায় নাই!

সেই সময় আমি কার্য্যোপলক্ষে উত্তরাঞ্চলে গিয়াছিলাম, অঙ্‌-লিঅং বেচারা বিপন্ন হইয়া আমার নিকট সংবাদ পাঠাইয়াছিল। আমি ফিরিয়া আসিলে সে আমাকে যে সকল 'থাবার দাগ' দেখাইল, তাহা দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম—হাঁ বাঘ বটে। আমি আশা করিলাম, বাঘটা 'বকিট মার্ব্বো' আবাদে আবার ফিরিয়া আসিবে।'

ইহার পর স্থানীয় 'প্ল্যাণ্টার'গণ ক্লাবে আসিয়া জুটিলে সায়ংকালে আমরা 'ব্রীজ' খেলিতে বসিলাম। কিন্তু আমার মন নানা দুশ্চিন্তায় বিচলিত থাকায় আমি 'ব্রীজে' সুবিধা করিতে পারিলাম না।

অন্যান্য চিন্তার মধ্যে একটি কথাই পুনঃ পুনঃ আমার মনে পড়িতেছিল। টম্সন যে গ্রামে বাঘের দৌরাত্ম্যের কথা বলিলেন, মাত নূর সেই গ্রামেই তাহার দোস্তের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিল।

যাহা হউক, পুনর্ব্বার পূর্ণিমা আসিল। আমার মনে হইল, এবার পূর্ণিমায় মাত নূর ছুটীর দরবার করিতে আসিবে না। কিন্তু যাহা ভাবিলাম, তাহাই হইল। কিছু কাল পরে মাত নূর আমার বাংলোর দরজায় হাজির! সে তিন দিনের জন্য ছুটীর প্রার্থনা করিলে আমি তাহার ছুটী মঞ্জুর করিলাম। কিন্তু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এবারও কি 'বকিট মার্ব্বো'তে যাইবে ?'

'হাঁ, তুয়ান!'—বলিয়া সে তাহার বড় বড় বাদামী চক্ষু মেলিয়া পূর্ণ-দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিল। সেই সময় তাহার চক্ষুতে পীতবর্ণের আভা দেখিতে পাইলাম ; কিন্তু তাহা সত্যই দেখিলাম, না উহা আমার কল্পনা মাত্র ?

প্রথমে আমার মনে হইল, পত্রবাহক মারফৎ টম্সনের নিকট একখানি 'চিট' পাঠাই ; কিন্তু পর-মুহূর্ত্তেই ভাবিলাম, আমি সত্যই কি কুসংস্কারান্ধ গর্দ্দভ ? টম্সন হয় ত আমার সঙ্গে মজা করিবার জন্য সেই গল্পটা বলিয়াছিলেন ; তাহার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাকে ঐরূপ 'চিট' পাঠাইলে আমাকে হয় ত হাস্যাস্পদ হইতে হইবে। না, আমি ঐ সঙ্কল্প ত্যাগ করিলাম। স্থির করিলাম, মাত নূরের প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিব।—আমি এ সম্বন্ধে কাহাকেও কোন কথা বলিলাম না।

পরদিন বেলা সাড়ে এগারটার সময় বাগিচার রবার-গাছগুলির নির্য্যাস সংগ্রহের পরিদর্শনকার্য্য প্রায় শেষ করিয়াছি, সেই সময় দেখিলাম, এক দীর্ঘমূর্ত্তি দুই হাতে দুইটি বালতি লইয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে রবার-বৃক্ষ-শ্রেণীর ভিতর দিয়া

আসিতেছিল; মনে হইল সে অতি কষ্টে পা ফেলিতেছিল।—সে মাত নূর।

সে আমার নিকট আসিলে দেখিলাম, রবারের নির্য্যাস তাহার বাল্‌তি ছাপাইয়া উঠিয়াছে। এইরূপ বাল্‌তি পূর্ণ করিয়া নির্য্যাস সংগ্রহেই সে অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু তাহার দক্ষিণ পদে হাঁটুর ঠিক নীচেই একখান ময়লা ন্যাকড়া জড়াইয়া রাখিয়াছে দেখিলাম।

আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সে ছুটী লইয়াও, যেখানে যাইতে চাহিয়াছিল, সেখানে যায় নাই কেন, আর তাহার পায়েই বা কি হইয়াছে? আমার প্রশ্নের উত্তরে মাত নূর বলিল, পূর্ব্বদিন অপরাহ্নে সে বাগিচার বাহিরে যাইতেছিল; যাইতে যাইতে সে আমাদের আবাদের মধ্যস্থিত একটা সাঁকোর কাঠের তক্তা পার হইয়াছে, ঠিক সেই সময় সেই তক্তাখানা হঠাৎ ভাঙ্গিয়া পড়ে, এবং সেই ফাঁকের ভিতর তাহার পাখানি প্রবেশ করায় তাহার পায়ে তক্তার একটা গজাল বিঁধিয়া গিয়াছিল।

আমি জানিতাম, মালয়দের শরীরের কোন অংশে ক্ষত হইলে তাহারা ময়লা ন্যাকড়া দিয়া সেই ক্ষতস্থল বাঁধিয়া রাখায় অনেক সময় তাহাদের রক্ত বিষাক্ত হইয়া থাকে। এই জন্য আমি তাহাকে আমার ডিস্‌পেন্সারীতে যাইতে বলিলাম; সেখানে যাইলে তাহার ক্ষত ধুইয়া, তাহাতে ঔষধাদি দিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিব, এ কথাও তাহাকে জানাইলাম।

সে ডিস্‌পেন্সারীতে উপস্থিত হইলে সেই ময়লা ন্যাকড়া অপসারিত করিয়া দেখিলাম, সে কোন গাছের পাতা ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া তাহার সঙ্গে তামাক-পাতা মিশাইয়া তাহার একটি পটী বাঁধিয়া রাখিয়াছে। সেই পটী ফেলিয়া দিয়া তাহার ক্ষত ধৌত করা হইল। তখন দেখিলাম, তাহার হাঁটুর নীচে যে ছিদ্র হইয়াছিল, তাহা প্রায় আড়াই ইঞ্চি গভীর, এবং তাহা পায়ের নলার ভিতর বহুদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত! গজাল বিঁধিলে কি ঐরূপ ছিদ্র হয়?

খানিক পশমী কাপড় ভাঁজ করিয়া তাহা 'আইয়োডিনে' ভিজাইয়া লইলাম, এবং তাহা ক্ষতস্থলে রাখিয়া তাহার উপর ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিলাম। অতঃপর মাত নূর তাহার কুটীরে প্রস্থান করিল।

সেই দিন সুশীতল সন্ধ্যায় আমি ও আমার স্ত্রী আমার বাংলোর বারান্দায় লম্বা চেয়ারে কাত হইয়া পড়িয়া বিশ্রাম করিতেছি, সেই সময় একখানি মোটর-সাইক্লের 'ঘস্‌-ঘস্‌' 'বসাবস্‌' শব্দ শুনিতে পাইলাম। সেখানে মোটর-সাইক্লের শব্দ সর্ব্বদা শুনিতে পাওয়া যায় না বলিয়া আমরা সবিস্ময়ে পথের দিকে চাহিয়া রহিলাম। কয়েক মিনিট পরে টম্‌সন আমাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি আমাদের পাশের একখানি চেয়ারে ক্লান্ত দেহ সংস্থাপিত করিয়া বলিলেন, 'আপনারা এই বাড়ীর কাছে কোথাও রক্তের চিহ্ন দেখিতে পাইয়াছেন কি না, তাহা জানিবার জন্য আপনাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিলাম। উঃ, আমি ভয়ঙ্কর পরিশ্রান্ত! কাল সারা রাত্রি একটা বাঘের সন্ধানে ঘুরিয়াছি; কিন্তু আজ আমাকে অত্যন্ত নিরাশ হইতে হইয়াছে।

'হাঁ, আমি বাঘটাকে ঠিক গুলী করিয়াছিলাম; কিন্তু সে তিন পায়ে ভর দিয়া পলায়ন করিল। চার মাইল পর্য্যন্ত তাহার ক্ষত হইতে রক্ত ঝরিতে ঝরিতে গিয়াছে; তাহা দেখিয়া আমি তাহার অনুসরণ করিয়াছিলাম। কিন্তু পরে আর সেই চিহ্ন দেখিতে পাই নাই। বোধ হয়, বাঘটা এই দিকেই আসিয়াছে; দেখুন মেল্‌বোর্ণ, যদি আমি আপনার অবস্থায় পড়িতাম, তাহা হইলে আমি আপনার গোয়ালের বলদগুলির উপর লক্ষ্য রাখিতাম।'

আমি বলিলাম, 'গুলীটা তাহার কোথায় লাগিয়াছিল?'

টম্‌সন বলিলেন, 'আমার বিশ্বাস, তাহার পশ্চাতের পায়ের নলায়। রক্তের চিহ্ন দেখিয়া এইরূপই অনুমান করিতেছি।'

আমরা অন্যান্য কথার আলোচনায় সন্ধ্যা অতিবাহিত করিলাম।

আমার এক জন তামিল ওভারসিয়ার আছে, সে না কি খৃষ্টান, নামটি কিন্তু পল। সে যৎসামান্য লেখাপড়া জানিত। সে এক দিন বিপন্নের মত মুখভঙ্গী করিয়া আমার বাংলোয় উপস্থিত!

সে 'স'কে 'ছ' উচ্চারণ করিত। সে গম্ভীরভাবে বলিল, 'ছার, আপনাকে একটা ভয়ঙ্কর কথা বলিতে আসিয়াছি, ছার! একটা বাঘ মহম্মদ মেরার বাড়ীতে পড়িয়া তাহার একটা বলদ মারিয়া ফেলিয়াছে।'

তাহার পর পল যে সকল কথা বলিল, তাহার মর্ম্ম এই যে, সে আমার একটা বন্দুক ও কিছু টোটা লইতে আসিয়াছে; সে বন্দুক লইয়া কয়েক জন বন্ধুসহ বাঘের প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিবে, বাঘটা আবার আসিলেই তাহাকে গুলী করিবে।

সে যে মহম্মদ মেরার কথা বলিল, সেই লোকটা ২ বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত আমার নানা প্রকার অসুবিধা ঘটাইয়া আসিতেছিল। সে ছোট জোতদার। আমাদের আবাদের সীমায় তাহার একখানি বাসগৃহ ছিল, এবং গবাদি পশুর জন্য আমাদের অধিকার-সীমায় একখানি টীনের চালাও তুলিয়াছিল। আমাদের আবাদের শ্রমজীবীদের নিকট সে প্রচুর পরিমাণে উগ্র মদ্য বিক্রয় করিয়া তাহাদের সর্ব্বস্ব শোষণ করিতেছিল।

অথচ সরকার হইতে সে সরাপ বিক্রয়ের লাইসেন্স গ্রহণ করে নাই। তাহার কারবার অনেকটা আমেরিকার অবৈধ পণ্য-ব্যবসায়ীদের কারবারের অনুরূপ। তাহার উপর সে আমাদের কোম্পানীর অধিকার-সীমার স্তম্ভগুলি গোপনে সরাইয়া দিয়া তাহার জোতের সীমা বাড়াইয়া লইতেছিল; সেই সময় আমি তাহাকে ধরিয়াছিলাম।

তাহার পর তাহার বিরুদ্ধে দুইটি ফৌজদারী মামলা আরম্ভ হয়। কয়েক দিন পরে এক দিন দেখি, সে আমার 'কুলী-লাইনে' প্রবেশ করিয়া মালয়-কুলী-রমণীদের লইয়া একটা হাঙ্গামা আরম্ভ করিয়াছে! তাহা দেখিয়া আমি আমার বরকন্দাজদের বলিয়া রাখিলাম, উহাকে রীতিমত পিটুনি দিয়া আমার আবাদ হইতে তাড়াইয়া দিবে।

সুতরাং বলা বাহুল্য, মহম্মদ মেরার সহিত আমার কিছুমাত্র সদ্ভাব ছিল না। তাহার ক্ষতির সংবাদে আমি বিচলিত হইলাম না। তথাপি আমি পলের প্রার্থনানুসারে একটি বন্দুক দিতে সম্মত হইলাম। আমার অস্ত্রাগারে একটি নূতন 'উইন্-চেষ্টার', একটি পুরাতন 'আর্মি রাইফেল' এবং একটি বকেয়া 'স্নাইডার' বন্দুক ছিল। 'স্নাইডারে' ব্যবহারের জন্য মোটা গুলীভরা টোটা ছিল।

পল স্নাইডারটিই পছন্দ করিল দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। সে বলিল, তাহার টোটা হইতে গুলী বাহির করিয়া টোটার অভ্যন্তরস্থ বারুদের সহিত সে কিঞ্চিৎ 'উবাং' (ঔষধ) মিশাইয়া দিবে, তাহার পর সেই টোটায় গুলী পুনঃ স্থাপিত করিবে; কিন্তু অন্য দুই রকম বন্দুকের টোটার গুলী সে ভাবে খুলিতে পারিবে না, এই জন্য স্নাইডারটাই সে লইয়া যাইবে।

সে কি উদ্দেশ্যে স্নাইডারের টোটার ভিতর 'উবাং' পূরিবে, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিল না।

পরদিন প্রত্যূষে পল ও মহম্মদ আমার বাংলোয় উপস্থিত; তাহাদের পশ্চাতে উত্তেজিত জনসঙ্ঘ! তাহারা আমাকে বন্দুকটা ফেরত দিতে আসিয়াছিল, কারণ, বাঘটা মারা গিয়াছিল। তাহারা আমাকে তাহাদের সঙ্গে গিয়া বাঘটাকে দেখিতে অনুরোধ করিল।

আমি তাহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলাম।

আমি মহম্মদ মেরার গোয়ালে প্রবেশ করিয়া গোয়ালের বাঁশের বেড়ায় একটি বৃহৎ ছিদ্র দেখিতে পাইলাম, বেড়ার সেই স্থানটি ভাঙ্গিয়া বৃহল্লাঙ্গুল মহাশয় গোয়ালে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

গোয়ালের ভিতর একটি বলদের মৃতদেহের উপর নিহত বাঘটিকে পড়িয়া থাকিতে দেখিলাম; অত বড় বাঘ আমি জীবনে কখন দেখি নাই! তাহার বুকে বন্দুকের গুলী বিদ্ধ হইয়া যে ফুকর হইয়াছিল, তাহার ভিতর মানুষের একখানি হাত অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারিত! আমি বাঘটার দেহ-পরীক্ষার জন্য তাহার কাছ ঘেঁসিয়া দাঁড়াইলাম।

বাঘটার পশ্চাতের পায়ে একটা টাটকা ক্ষতচিহ্ন দেখিতে পাইলাম, তাহা অত্যন্ত গভীর ক্ষত এবং পায়ের নলার ভিতর পর্য্যন্ত প্রসারিত।

আমি নিহত জানোয়ারটির চক্ষু পরীক্ষা করিলাম, তাহার পর বাংলোয় ফিরিয়া আসিলাম। যাহা দেখিলাম, তাহাই যথেষ্ট মনে হইল!

এখন উপসংহার।

আমি মাত নূরকে ডাকাইবার জন্য তাহার কুটীরে লোক পাঠাইলাম; সংবাদ পাইলাম, সে পূর্ব্বদিন অপরাহ্নে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। তাহার সন্ধান মিলিল না। দিনের পর দিন অতিবাহিত হইল, মীনা তাহার শিশু পুত্রটিকে লইয়া স্বামীর প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, কিন্তু মাত নূর আর ফিরিয়া আসিল না।

এক দিন প্রভাতে সংবাদ পাইলাম, মহম্মদ মেরা তাহার দোকান বিক্রয় করিয়া, অস্থাবর সম্পত্তিগুলি প্যাকবন্দী করিয়া সেগুলি সঙ্গে লইয়া দেশের কোন দূরবর্ত্তী অংশে সরিয়া পড়িয়াছে। মীনাও তাহার সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে!

এখন কথা এই যে, বাঘটার মৃত্যু ও মাত নূরের সেই দিনই অন্তর্দ্ধান এই দুইটি ব্যাপার কি কাকতালীয়-বৎ? এই ব্যাপারের মধ্যে প্রাচ্যদেশসুলভ কোন গুপ্ত ষড়যন্ত্র প্রচ্ছন্ন ছিল কি না, কে বলিবে?

'বকিট মের্কো'তে কি কোনও পল্লী-রমণী বাস করিতেছিল এবং তাহারই অনুজ্ঞায় মাত নূর সুমাত্রা হইতে এখানে আসিয়াছিল? সে সেই স্ত্রীলোকটিকে লইয়া কি হঠাৎ দেশান্তরে পলায়ন করিয়াছে? তাহার স্ত্রী মীনাকে ও শিশু সন্তানটিকে এই ভাবে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে? মহম্মদ মেরার সহিত কি সে পূর্ব্বে কোন রকম বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিল? কিংবা না, আমি ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না।"

মাত নূরই যে 'মানুষ বাঘ' মিঃ মেলরোজ ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পাইলেও, ঘটনাচক্র অত্যন্ত সন্দেহজনক।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

জীবন-স্বপ্ন

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

দুঃখের বরষা

পয়সা-কড়ির বিলি-ব্যবস্থা হইলে পিশিমা ও বিন্দু নানা তীর্থ ঘুরিয়া কাশীতে আসিলেন। কাশীতে পিশিমার মন এমন আঁটিয়া বসিল যে, তিনি বিন্দুকে বলিলেন,—এখানেই কিছু দিন থাকি, আয় মা।···দিন ফুরিয়ে আসচে, বাবার পায়ে মাথা রেখে যদি যেতে পারি!···জন্ম আবার নিতেও হবে, জানি। এ দুর্ভোগ না ভুগতে হয়, বাবার পায়ে নিত্য সেই প্রার্থনাটুকু জানিয়ে যদি মুক্তি মেলে···

বিন্দু কহিল,—বেশ তো, পিশিমা।

বিন্দুও মনে শান্তি পাইতে চায়। তার কিছু নাই। সংসারে কি চাহিতে হয়, কি পাওয়া দরকার, সে সব তত্ত্ব লইবার পূর্ব্বেই সংসারে তার ছুটি হইয়া গিয়াছে। ছেলেবেলার স্মৃতি বুকে সর্ব্বক্ষণ ঘুরিয়া ফিরিতে থাকে। বলাইয়ের কথায় মন ভরিয়া ওঠে, মন উদাস হয়, তখন সে গিয়া বসে দশাশ্বমেধ-ঘাটে। সম্মুখে জলের বিস্তার, ওপারে ঐ ছায়াচ্ছন্ন তীর-তরু-শ্রেণী, তাদের অন্তরালে দু'চারিখানা বাড়ী···ওধারে পুল, গগনচুম্বী মন্দির-চূড়া, মিনার-ওয়ালা হর্ম্ম্যরাজি, ঘাটের এই পাষাণ-সোপান—এ সোপান কত যুগের কত নর-নারীর পায়ের পরশ অঙ্গে ধরিয়াছে! কত দুঃখী, কত আর্ত্ত, মুক্তি-প্রয়াসী, কত সাধু-সন্ন্যাসী এই পাষাণে বসিয়া মনে কত শান্তি, মুক্তির কত বাণীর পরশ পাইয়াছে! বিন্দু শুধু চাহিয়া থাকে···মন হা-হা করিয়া কি যেন অবলম্বন খোঁজে, তা না পাইয়া অবশেষে ম্লান মূর্চ্ছাতুর হইয়া পড়ে!···

এমনি ভাবে প্রায় এক বৎসর কাটিতে চলিল। দেব-দেবীর সান্নিধ্য মনকে আর বাঁধিয়া রাখিতে পারে না, তুচ্ছ সংসারের কোলাহল-কলরব, নর-নারীর স্নেহ-মায়ার অস্পষ্ট আহ্বান কাণের কাছে বাজিতে লাগিল। সেই গৃহ—যেখানে জন্ম লইয়াছে, যে গৃহে দুঃখে-কষ্টে এত-বড় হইয়াছে, সে গৃহের জন্য মন ক্রমে লোলুপ হইয়া উঠিল।···

বৈকালে পিশিমা মন্দিরে যাওয়ার উদ্যোগ করিতেছিলেন, বিন্দু কহিল,—সত্যই আর বাড়ী ফিরবে না, পিশিমা? কোনো দিন না?

পিশিমা কহিলেন,—তোর মন কেমন করচে?

বিন্দু কহিল,—দেব-দেবীকে তাচ্ছল্য করচি না, পিশিমা, তবু বাড়ীর জন্য ক'দিন মন ভারী অস্থির হয়ে উঠেচে।

পিশিমা কহিলেন,—কি বন্ধন সেখানে আছে, মা?

বিন্দু কহিল,—তবু সে ঘর, পিশিমা। সেই কুঁড়ে-ঘর আমায় কেবলই ক'দিন ডাকচে।

পিশিমা কহিলেন,—তবে চ', মাস-খানেকের জন্য ঘুরে আসবি।

বিন্দু কহিল,—জ্যাঠাইমারা কে কেমন আছে, অনেক দিন তাদের কোনো খপর পাইনি···

পিশিমা কহিলেন,—তুই চিঠি লিখিস না?

বিন্দু কহিল,—বরাবর কমলীকে চিঠি দিয়েচি। সেও জবাব দেছে। কিন্তু তিন মাস একখানি চিঠি পাইনি!

পিশিমা ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন,—তবে চ, এই হপ্তাতেই যাই। হরেন্দ্রকে বলি।

হরেন্দ্র অপূর লোক। বৃদ্ধ। এক-কালে তাদের সংসারে সরকারী-চাকরি করিয়াছে। লোকটি বিশ্বাসী, বিষয়-কর্ম্ম ভালো বোঝে। অপূ তাই হরেন্দ্রকে এ সংসারে বাহাল করিয়া দিয়াছে—বিষয়-সম্পত্তির তদ্বির-তদারক করা, পিশিমাদের দেখা। এই হরেন্দ্রকে সাথী করিয়াই পিশিমা ও বিন্দু তীর্থ-ভ্রমণে এতটুকু অসুবিধা বা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন নাই।

পিশিমা মন্দিরে গেলেন। বিন্দু পথের ধারের বারান্দায় বসিয়া রহিল। বারান্দায় রেলিঙের ফাঁক দিয়া পথ দেখা যায়। পথে লোক চলিয়াছে—একা, মোটর, টঙ্গাও। বিন্দুর দৃষ্টি পথে নিবদ্ধ থাকিলেও মন কাশী ছাড়িয়া সংসারের কোন্ অজানা প্রদেশে বিচরণ করিতেছিল। বলাইদা একা—কেমন আছে, কি করে— কে জানে! এমন অভিমান যে এক-খানা পোষ্টকার্ড লিখিয়াও উদ্দেশ লয় না! অথচ এ ব্যাপার কখনো সম্ভব হইতে পারে, বিন্দু তা কল্পনা করে নাই! কেন এ অভিমান? এলাহাবাদে যাওয়া? সেটা এমন কি অপরাধ? প্রয়োজন ছিল, তাই।···তখন যদি তুমি দেশে থাকিতে, তুমিও পরামর্শ দিতে, যাও এলাহাবাদ!···

বিন্দুর দুই চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। কি প্রয়োজন বলাইদার অমন সুদূর বিদেশে একা পড়িয়া থাকিবার!

দুটা পয়সা উপার্জ্জনের জন্য তো? বিন্দুর আজ পয়সার অভাব নাই, বলাইদা যদি চায়, বিন্দু তার সমস্ত টাকা-কড়ি বলাইদার হাতে তুলিয়া দিতে পারে!...বলাইদা কতখানি তাদের আপনার...বিন্দুর আশ্চর্য্য বোধ হয়, সেই বলাইদা... তার কাছে বিন্দুরা এমন পর হইয়া যাইতে পারে!...একটা নিশ্বাস ফেলিয়া শূন্য নয়নে বিন্দু আকাশের পানে চাহিয়া রহিল।

চার-পাঁচ দিন পরে হরেন্দ্রকে সাথী করিয়া পিশিমা ও বিন্দু দেশে ফিরিলেন।...বাড়ীতে সনাতন মালী চৌকিদারী করিতেছিল। তাকে পূর্ব্বাহ্নে সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল। বাড়ীতে আসিয়া বিভ্রাটে পড়িতে হইল না।

জিনিষ-পত্র নামাইয়া বিন্দু তখনি বলাইদার গৃহে ছুটিল। সেখানে পা দিতেই বাড়ীখানা যেন হা-হা করিয়া উঠিল। নিত্যকার ব্যবস্থায় এখানে যেন মস্ত বিপর্য্যয় ঘটিয়া গিয়াছে! বাহিরের দিকে বড় চালার অবস্থা জীর্ণ। জ্যাঠামশায়ের সৌখীনতা এ চালাকে চিরদিন সৌষ্ঠবপূর্ণ রাখিয়া আসিয়াছে। হঠাৎ তার এ পরিবর্ত্তন! বিন্দুর বুক কি এক অজানা শঙ্কায় ছম্‌ছম্‌ করিয়া উঠিল। কম্পিত পায়ে উঠান পার হইয়া সে গিয়া অন্দরে প্রবেশ করিল।

সেখানেও পরিবর্ত্তন। সকালেই গৃহকর্ম্ম-রতা জ্যাঠাই-মার সেই কল্যাণী মূর্ত্তি...সামনের রোয়াকটিতেই এ সময় তাঁর সেই নিত্য আসন পাতা...! রোয়াকে কেহ নাই!

একান্ত সঙ্কোচে বিন্দু রোয়াক পার হইয়া দালানের দ্বারে দাঁড়াইল। দালানে বসিয়া কমলা খলে কি ঔষধ মাড়িতেছে। অসুখ?...কার? মৃদু স্বরে বিন্দু ডাকিল,—কমল...

কমলা চমকিয়া চোখ তুলিল।—বিন্দুদি!...

বিন্দু কহিল,—কার অসুখ?

কমলা কহিল,—বাবার।

—কি অসুখ?

কমলা কহিল,—আজ পাঁচ মাস বিছানায় শুয়ে। তবে তিন মাস বাড়াবাড়ি চলেছে। ওঠবার শক্তি নেই। কি যে হবে...কিছু ভালো বুঝচি না।

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কমলা চুপ করিল। বিন্দুও নিস্পন্দ। কমলা আবার কহিল,—এই সব কারণেই তোমায় চিঠি দিতে পারিনি, ভাই। বাবাকে নিয়ে মা সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত...আমাকেই সব দেখতে হয়...

বিন্দু কহিল,—আর সব খপর?

কমলা কহিল,—পিশিমা তার শ্বশুর-বাড়ী। ভাগনে না কে আছে, তার ওখানে চ'লে গেছে। এখানে পূজা-অর্চ্চনায় ব্যাঘাত ঘটে...রোগের বাড়ী!

—হুঁ! বলিয়া বিন্দু সেইখানে বসিয়া পড়িল। আরো অনেক কথা গলার কাছে ঠেলিয়া আসিয়াছিল, আরো বহু প্রশ্ন...কিন্তু কমলার দীন মলিন মূর্ত্তি দেখিয়া তার কণ্ঠ কে যেন চাপিয়া ধরিল। সে নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। কমলা ঔষধ মাড়িতে লাগিল।

ঘর হইতে মা কহিলেন,—কার সঙ্গে কথা কচ্ছিস রে?

কমলা কহিল,—বিন্দুদি এসেচে, মা...

যোগমায়া দেবী কহিলেন,—আয় মা, ঘরে আয়। তোকে কত কাল দেখি নি...

বিন্দু উঠিল, উঠিয়া ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিতেই বিছানায় চোখ পড়িল। সে চমকিয়া উঠিল। বিছানার সঙ্গে মিশিয়া...জ্যাঠামশায়?...সেই বিশাল মূর্ত্তি...রোগের তাড়নায় একেবারে পাত হইয়া গিয়াছে!

বিছানার কাছে আগাইয়া আসিয়া বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া মৃদু স্বরে বিন্দু কহিল,—ঘুমোচ্ছেন এখন?

যোগমায়া দেবী কহিলেন,—না। এমনি আচ্ছন্নভাবেই প'ড়ে আছেন আজ তিন মাস!

বিন্দু অতি-কষ্টে একটা নিশ্বাস চাপিয়া কহিল,—কি অসুখ?

যোগমায়া দেবী কহিলেন,—মাথার অসুখ। মাসে দু'বার করে' অজ্ঞান হয়ে যান...তার পর এই ভাব।

বিন্দু কহিল,—কি চিকিৎসা হচ্ছে?

যোগমায়া দেবী কহিলেন,—প্রথম দশ-বারো দিন বড্ড বাড়াবাড়ি গেছলো, প্রাণ নিয়ে টানাটানি। কলকাতা থেকে বড় বড় ডাক্তার এনেছিলুম। সে ধাক্কা সামলালেন...ডাক্তার বললে, দু' এক দিনে সারবার অসুখ এ নয়; অমন এক বছর, দু' বছরও লাগতে পারে, কারো বা সারে না। তখন উপায় নেই দেখে ও-পাড়ার নিমাই কবিরাজের চিকিৎসায় রাখা হয়েচে।

যোগমায়া দেবী নিশ্বাস ফেলিলেন, তার পর কহিলেন,—তিন মাস কি যুদ্ধই চলেছে যমের সঙ্গে!

কমলা ঔষধ লইয়া আসিল। যোগমায়া দেবী রোগীর

জিভে আঙুলে করিয়া সে ঔষধ লাগাইয়া দিলেন। তার পর কমলাকে রোগীর কাছে বসিতে বলিয়া যোগমায়া দেবী বিন্দুকে কহিলেন,—আয় মা, আমরা বাইরে যাই। অনেক কথা জমা হয়ে আছে।

বাহিরে দালানে আসিয়া যোগমায়া দেবী তেলের বাটি পাড়িলেন এবং মাথার খোপা খুলিয়া তেল মাখিতে মাখিতে একটি একটি প্রশ্নের উত্তরে বিন্দুদের সকল সংবাদ জানিয়া লইয়া বহু দিনের পুঞ্জিত এখানকার কাহিনী বলিতে বসিলেন। এ কাহিনী আরম্ভ করিবার মুখে অত্যন্ত কুণ্ঠিত স্বরেই প্রথমে কহিলেন,—তোমার সে টাকা···বলাই পুরো-পুরি পাঠিয়েছিল মা, কাছেও রেখেছিলুম। তার পর তোমার জ্যাঠামশায়ের অসুখে সব বার ক'রে দিতে হয়েচে। কোথায় কি পাবো, বলো? লজ্জায় তোমার মুখের পানে চাইবার আজ উপায় নেই, মা!

বিন্দু বাধা দিয়া কহিল,—কি যে বলো জ্যাঠাইমা! সামান্য টাকা—তার জন্য তুমি এমন কাতর! টাকা নিয়ে আমি কি করতুম? টাকায় আমার কি দরকার?···ও টাকা সে জ্যাঠামশায়ের অসুখে লেগেচে, এতে সে টাকা সার্থক হয়েচে। সত্যি, আমার তাতে আনন্দ হচ্ছে। ও টাকা ফেরৎ নেবো বলেও দিইনি···আমায় আজ এমন পর ক'রে দিয়েচো, জ্যাঠাইমা যে তুচ্ছ ক'টা টাকা···সেই কথাই আজ মনে পড়লো! তুমিও শেষে···

বিন্দুর কথা শেষ হইল না। প্রবল বাষ্পোচ্ছ্বাসে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল।

যোগমায়া দেবী এ কথায় বিচলিত হইয়া কহিলেন,—তোমায় পর করবো! এ চিন্তা মনে আসার পূর্ব্বে যেন আমার মরণ হয়!···তা নয় মা, তোমার বলাইদা বার-বার তাগাদা দিয়েচে, এ টাকা ধার নিয়েছিলুম মা, বিন্দুর কাছ থেকে—বেচারীর গহনা-বেচা টাকা—এ টাকা তাকে না দেওয়া পর্য্যন্ত আমার মনে স্বস্তি মিলবে না!

বিন্দুর দুই চোখে জল ঠেলিয়া আসিল। সে কহিল,—না, না, ও টাকা আমি চাই না, চাই না। ও টাকা আমায় দিলে আমি এ-বাড়ীতে আর কখনো আসবো না।···বুঝবো, আমার উপর তোমাদের এতটুকু মায়া নেই আর—। আমায় তোমরা ছেঁটে ফেলেচো!

তার দুই চোখে জলের ধারা নামিল।

যোগমায়া দেবী তার চোখের জল মুছাইয়া সস্নেহে কহিলেন,—বেশ মা, তুমি চুপ করো···এ টাকার কথা আর মুখেও আনবো না। এ টাকা তোমার গরীব জ্যাঠাইমাকে তুমি দিয়েচো বলেই জানবো।···

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া গাঢ় স্বরে বিন্দু কহিল,—সব খপর বলো জ্যাঠাইমা।

যোগমায়া দেবী তখন দুঃখের কাহিনী আরো সবিস্তারে পাড়িয়া বসিলেন,—ভুবন শ্বশুর-বাড়ীতেই রহিয়া গিয়াছে। বাপের এমন অসুখ—দু-তিন দিন মাত্র আসিয়াছিল, কুটুম্বের মত! কি একটা বড় চাকরির জন্য এগজামিন দিতে হইবে, সময় নাই! সুবলের বিবাহ হইয়া গিয়াছে গেল শ্রাবণে। ভুবনের শ্বশুরেরই কে আত্মীয়, কটকের মস্ত উকিল—তাঁর এক মেয়ে, এক ছেলে। ছেলে বিলাতে গিয়াছে ব্যারিষ্টার হইতে; সুবলকেও না কি বিলাত পাঠাইবে, ব্যারিষ্টার করিয়া আনিবার উদ্দেশ্যে। সুবল কটকে থাকিয়া পড়িতেছে। শাশুড়ী ছেলের অদর্শনে আকুল, মেয়ে-জামাইকে তাই পাশে রাখিয়া মনে শান্তি চান।

বিন্দু ফোঁশ করিয়া উঠিল,—আবার এ কাজ করলে জ্যাঠাইমা! বড় লোকের ঘরে একজনের বিয়ে দিয়ে তাকে হারিয়েচো, আবার জেনে-শুনে এটিকেও···

যোগমায়া দেবী কহিলেন,—বিয়ের কোনো কথায় থাকিনি, মা! দুই ভাইয়ে মিলে সব ঠিক-ঠাক হয়েচে চুপি-চুপি। তোমার জ্যাঠামশাই তো হাঁকিয়ে দিয়েছিলেন, শেষে ছেলেরা চোখ রাঙিয়ে বললে, কুছ পরোয়া নেই! ভুবনের শ্বশুর-বাড়ী থেকেই বিয়ে হবে!···তখন কি করি? ভালো দেখাবে না, পাঁচ জনে কি বলবে,—তাই দায়ে প'ড়ে নিশ্বাস ফেলে এ কাজে নামতে হলো!···এ যে কি দুর্ভোগ, কে বুঝবে!

যোগমায়া দেবী ক্ষণেক নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন।··· বিন্দু কহিল,—বলাইদার খপর কি?

যোগমায়া দেবী কহিলেন,—আজ চার মাস কোনো উদ্দেশ নেই। আছেন, কি গেছেন, তাও জানি না!···

বিন্দুর বুকে কে যেন কামান দাগিল! তার চোখের সামনে বিশ্বের আলো নিবিয়া গেল। যোগমায়া দেবী কহিলেন,—শেষ চিঠিতে লিখেছিল, মণিপুরের ওদিকে যেতে হবে—খুব বেশী কাজ; ভবিষ্যৎ ভালো!···এইটুকু। তার পর আসামের ঠিকানায় আমরা চিঠি দিয়েচি, চিঠি ফেরত

আসেনি, তার জবাবও মেলেনি!···আমি তার নাম কেটে দিয়েচি, মা। বরাত যেমন, বেশ বুঝেচি···যে আমায় দরদ করবে, তার তো থাকার কথা নয়!···

যোগমায়া দেবীর চোখ ছলছলিয়া আসিল।···এ সব কথা সবিস্তারে ভাবিবার এখন অবসর নাই, কাজেই মনের বেদনা মনের কোণে পড়িয়া আছে, মনটাকে ঝড়ের দোলায় দুলাইতে পারে না! আজ বিন্দুর সঙ্গে সে কথার আলোচনায় সুপ্ত ক্ষুব্ধ বেদনা মাথা নাড়িয়া পর্ব্বতের মত উঠিয়া আকাশ-বাতাস বন্ধ করিয়া দাঁড়াইল।

বিন্দু কহিল,—চার মাস কোনো খপর নেই? আচ্ছা, সেখানকার লোকগুলোই বা কেমন। মানুষের দায়ে-অদায়ে বাড়ীতে খপরটুকু অবধি দেবে না!

সনিশ্বাসে যোগমায়া দেবী কহিলেন,—খপর নিতে তোমার জ্যাঠামশাই···ভাইয়েরা তো তাকে শত্তুরের মত ভাবে। তার উপর ভাইয়েরা এখন ডাগর হয়েচে, খুঁটে খেতে শিখেচে, কাজেই আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার দরকারও ভাবে না। তোমার জ্যাঠামশাইয়ের এই অবস্থা···

বিন্দু কহিল,—এ অসুখ হলো কি ক'রে?

যোগমায়া দেবী কহিলেন,—বরাত কেমন, তাই তো বলচি, মা!···সেও ঐ শ্রাবণ মাসে। ওঁর জানা একটি ভদ্র লোক- বাড়ী তারকেশ্বরের কাছে হরিপালে। তাঁর একটি ছেলে—হুগলিতে চাকরি করে—ছোট সংসার। ছেলেটি ভালো। সেই ছেলের সঙ্গে কমলীর বিয়ের কথা পাড়তে উনি ছোটেন হরিপালে ছেলে দেখতে। হরিপাল অবধিও যেতে হলো না! ট্রেণেই নাকি সর্দ্দিগর্ম্মির মত হয়—ইষ্টিশানের লোকেরা হাঁসপাতালে দেয়। সেখান থেকে বাড়ী আসেন। তাও নিজে থেকে নয়, তারা ভলান্টীয়ার দিয়ে পাঠিয়ে দেয়। এসে সেই যে বিছানায় শুয়েচেন, এ বিছানা ছাড়বার আর নাম নেই!···সে প্রত্যাশাও রাখি না। শুধু ঠাকুরকে বলি, এমনি শুইয়েই রাখো, ঠাকুর! যে ক'দিন থাকেন! সহায়ের মধ্যে ঐ রামু! বেচারী! খিদিরপুরের ডকে একটা চাকরি পেয়েছিল, পঁচিশ টাকা মাইনে, তা চাকরিটুকু এঁর ব্যামোর জন্য রাখতে পারলে না। সেখানে থাকতে হবে। এঁকে এই অবস্থায় ফেলে কি ক'রে থাকে!···

বিন্দু কি ভাবিতেছিল, কহিল,—কমলীর বিয়ের কথা ঐখানেই থামলো?

যোগমায়া দেবী কহিলেন—উপায় কি, বলো? তারা শ্রাবণেই বিয়ে দেবে,—অথচ আমাদের তো এই দশা! ছেলের বিয়ে কেউ ফেলে রাখে না···বিশেষ এখানে পাঁচশো-সাতশো পাবার সম্ভাবনা ছিল না।

যোগমায়া দেবীর তেল মাখা শেষ হইল। তিনি কহিলেন—চট্ ক'রে ডুবটা দিয়ে আসি। তুই বস্‌চিস্ তো, মা?

বিন্দু কহিল,—বসচি। জ্যাঠামশায়ের কাছে যাই। তুমি নেয়ে এসো···

যোগমায়া দেবী স্নান করিতে গেলেন। বিন্দু গিয়া জীবনের ঘরে জীবনের কাছে বসিল। কমলীর সঙ্গেও কথা হইল। বলাইদার কথাই বেশী করিয়া।

কমলী কহিল—ছোড়দার টাকাতেই খরচ চলছিল—তাও বন্ধ। ছোড়দার কোনো উদ্দেশ নেই!···মাকে গহনাগুলি বাঁধা দিতে হয়েচে, বেচতেও হয়েচে দু'একখানা। মার হাত খালি। শুধু ঐ নোয়া আর শাঁখাটুকু···মা বলে, এ দুটো বজায় থাকুক! আমার আর গহনার কি দরকার!

বিন্দু শিহরিয়া চুপ করিয়া রহিল।

যোগমায়া দেবী স্নানান্তে ফিরিলে বিন্দু কহিল—এক কাজ করো জ্যাঠাইমা,—আমরা যখন এসেচি, তখন জ্যাঠামশাইকে বেঘোরে প্রাণ হারাতে দেবো না। মানুষের চেষ্টায় যেটুকু করা যায়, করবো। ওঁর চিকিৎসার ভার আমি নেবো।···তুমি আমাদের কোনো খপর না দিয়ে অন্যায় করেচো। এমন অনর্থ ঘটচে এখানে, আমার মন যেন বুঝেছিল, তাই এখানকার জন্য মন এমন আকুল হয়ে উঠলো হঠাৎ! যাক্‌···খুব সময়ে এসেচি··· একেবারে সব যে এখনো চোকেনি···একেই ভাগ্য ব'লে মনে হচ্ছে! শানু জানে এখানকার কথা?

যোগমায়া দেবী কহিলেন,—না মা। তাকে এমন অসুখের কথা জানাইনি।···অবস্থা জানে, তা ছাড়া অপূ কি মানুষ! জানতে পারলে খরচ-পত্র সব দেবে! যত দুঃখই পাই, জামাইয়ের কাছে হাত পাততে হলে সে লজ্জা রাখবার জায়গা থাকবে না, মা···

—হুঁ! বলিয়া বিন্দু চুপ করিয়া রহিল। [ক্রমশঃ।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

বঙ্গ-সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব

বঙ্গ-সাহিত্যে সর্ব্বতোমুখী প্রতিভাসম্পন্ন বঙ্কিমের প্রভাবকে অতুলনীয় ও অপ্রতিহত বলিলে এক বিন্দুও অত্যুক্তি হয় না। বঙ্গ-সাহিত্যের সর্ব্ব-বিভাগে সমভাবে তাঁহার ভাবময় প্রভাব ব্যাপ্ত হইয়া আছে। শুধু উপন্যাসে নহে, কবিতা ছাড়া সর্ব্ব-প্রকার রচনাতেই তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি যাহাতে হস্তস্পর্শ করিতেন, তাহা'ই হিরণ্ময় দ্যুতিতে ফুটিয়া উঠিত। বাল্যকালে "ললিতা ও মানস" প্রভৃতি দুই একটি কবিতা রচনা করিয়া সে প্রয়াস তিনি পরিহার করিয়াছিলেন। বুঝিয়াছিলেন, গদ্য লিখিবার জন্যই তাঁহার জন্ম। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্য-রচনার অবকাশে স্থানে স্থানে যে কাব্য-সৌন্দর্য্য বা কাব্য-মাধুর্য্য লীলায়িত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা অতুলনীয়—অনেক কবিতার মধ্যেও বিরল। তাঁহার রচনার এই বিচিত্র কমনীয়তা সকলের চিত্তকেই আকৃষ্ট করে এবং বঙ্কিমচন্দ্র যে এক জন মহাকবি, এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। ছন্দে রচনা করিলেই কবি হয় এবং গদ্য লিখিলে হয় না, এ ধারণা একান্ত ভ্রান্তিমূলক। এমন অনেক কবিতা-লেখক আছেন, যাঁহাদের রচনায় কাব্য-সুলভ সৌন্দর্য্য এক বিন্দুও নাই এবং এমন অনেক রসগর্ভ গদ্য-রচনা দেখিয়াছি—যাহা গদ্য-কাব্য নাম পাইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। শুধু মিল থাকিলে কাব্য হয় না, রসাত্মক রচনামাত্রকেই কাব্য আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। অতএব বঙ্কিমের এক একখানি উপন্যাস যে এক একখানি গদ্য-কাব্য, সে বিষয়ে সন্দেহ কি? শুধু উপন্যাস নহে, "কমলাকান্তের দপ্তর"—যাহাকে সাধারণতঃ হাস্যাত্মক রচনা বলিয়া সকলে মনে করে, তাহারও স্থানে স্থানে এমন কাব্যোচিত ভাবের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা কাব্যজগতেও দুর্লভ। হাস্যরসের সহিত উন্নত কাব্যরসের এমন অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। প্রতীচ্য ঋষি কার্‌লাইলের "সার্টর রিসার্টস্", "হিরোওয়ারশিপ" প্রভৃতি গদ্য-কাব্য ইংরাজী সাহিত্যের যেমন বিচিত্র সম্পদ, "কমলাকান্তের দপ্তর" বঙ্গ-সাহিত্যের তদ্রূপ কিম্বা তদপেক্ষাও বেশী অপূর্ব্ব সামগ্রী। এই গদ্য-কাব্যখানিতে অতুলনীয় প্রতিভাশালী বঙ্কিমচন্দ্র হাস্যরসাত্মক রচনার ছলে যে অপূর্ব্ব দেশাত্মবোধের ও তত্ত্বজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। ধর্ম্ম-নীতি, রাজ-নীতি, সমাজ-নীতি, এই অপূর্ব্ব গ্রন্থখানিতে অদ্ভুত ধীশক্তি-সম্পন্ন বঙ্কিম কিছুই বাদ দেন নাই। ইংরাজ গদ্যলেখক ডিকুইন্‌সীর গদ্য-রচনার মধ্যে কবিতাসুলভ ভাবপ্রবাহ দৃষ্টিগোচর হয়। সেই ডিকুইন্‌সীর "ওপিয়ম ইটার" নামক গ্রন্থের আদর্শে বঙ্কিমচন্দ্র "কমলাকান্ত" রচনা করেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, বঙ্কিমের "কমলাকান্তে"র স্থান ডিকুইন্‌সীর "ওপিয়ম্ ইটারে"র অনেক উপরে। অহিফেনসেবী ডিকুইন্‌সী তাঁহার অহিফেন-সেবনজনিত অভিজ্ঞতার বা সুখ-দুঃখের কথাই তাঁহার রচিত পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আর ভাবুকশ্রেষ্ঠ বঙ্কিম অহিফেন-সেবীর আত্মকথার ব্যপদেশে স্বদেশপ্রেম ও দার্শনিকতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন।

আমাদিগকে এখন দেখিতে হইবে, কিরূপ যুগে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব হইয়াছিল, বিধাতা পুরুষ কি প্রকার পারিপার্শ্বিকের মধ্যে তাঁহাকে স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহা হইলেই আমরা স্পষ্ট ও প্রকৃষ্টরূপে বুঝিতে পারিব, বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম কি অসাধ্য-সাধন করিয়া গিয়াছেন। বাহ্য-সম্পদের ঐকান্তিক উপাসিকা বস্তুতান্ত্রিক পাশ্চাত্য-সভ্যতার মোহিনী মায়ায় দেশ তখন দিগ্‌ভ্রান্ত। সেক্সপিয়রের মনুষ্য-চরিত্র চিত্রাঙ্কন, মিল্টনের গুরু-গম্ভীর স্বর্গ-নরক-বর্ণন, বাইরণের নিসর্গ-বর্ণনার উদ্দাম সৌন্দর্য্য, ডিকেন্সের বিচিত্র চরিত্রসৃষ্টি ও রস-রচনা এবং সার ওয়াল্টার স্কটের স্বদেশপ্রেমোদ্দীপক ঐতিহাসিক উপন্যাস-সমূহ তখন ভাবপ্রবণ বাঙ্গালীকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। ইংরাজ-জাতির অপূর্ব্ব সাহিত্য-সম্পদের দিকে তখন শিক্ষিত বাঙ্গালী বিস্ময়-বিমুগ্ধ-নয়নে চাহিয়া দেখিতেছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার স্রোত তখন দেশে প্রথম আসিয়াছে। সম্ভ্রান্ত এবং সমৃদ্ধের সন্তান ভিন্ন সে শিক্ষা তখন সকলের পক্ষে সুগম ছিল না। সম্ভ্রান্ত এবং সমৃদ্ধ বংশেই বঙ্কিমের উদ্ভব এবং তিনি তৎকালীন এক জন ডেপুটীর অন্যতম পুত্র। সুতরাং তিনি সহজেই নবাগত পাশ্চাত্য সাহিত্যের সহিত সুপরিচিত হইয়াছিলেন। অদ্ভুত ধীশক্তিবলে বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজী সাহিত্যে অসাধারণ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। সে সময়কার ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞের মধ্যে তাঁহাকে অগ্রণী বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। বৃক্ষ যেমন একটা নিগূঢ় শক্তিবলে মৃত্তিকা হইতে রস সংগ্রহ করিয়া স্বীয় দেহের পুষ্টিবিধানে সমর্থ হয়, মেধাবী বঙ্কিম তেমনই প্রতিভাবলে ইংরাজী সাহিত্যের রস বা সারভাগ তাঁহার হৃদয়-স্থিত বিচিত্র ভাবভাণ্ডারে সঞ্চিত রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শেষে তাহার দ্বারা তিনি বঙ্গসাহিত্যকে সম্পদবান্ বা সমৃদ্ধ করিতে বিস্মৃত হন নাই। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা হইতে যে রসধারা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, অদ্ভুত প্রতিভার সাহায্যে স্বকীয়

সৃষ্টিশক্তি ও কল্পনাশক্তিপ্রভাবে তাহাকে শতগুণে বর্দ্ধিত করিয়া মাতৃভাষাকে সৌষ্ঠবশালিনী করিয়াছিলেন, তাই ডিকুইন্সীর আদর্শে রচিত হইলেও তাঁহার "কমলাকান্তে"র মধ্যে আমরা ডিকুইন্সী অপেক্ষা অনেক বেশী উন্নতোজ্জ্বলভাবের প্রাচুর্য্য দেখিতে পাই, স্কটের অনুপ্রাণনায় প্রণীত হইলেও বঙ্কিমের উপন্যাস-সমূহে এমন অনেক অপূর্ব্ব সম্পদ দেখিতে পাই, স্কটলণ্ড-বাসী স্কট যাহা কল্পনাও করিতে পারেন নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার রচিত গভীর গবেষণামূলক ধর্ম্ম-তত্ত্বে পাশ্চাত্য দার্শনিকদের বিশ্লেষণ-প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন এবং কাণ্ট, কোঁৎ, হার্বর্ট স্পেনসর প্রভৃতি য়ুরোপীয় তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের অভিমত সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থখানি বঙ্কিমচন্দ্রের অগাধ পাণ্ডিত্যের নিদর্শন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য তত্ত্বজ্ঞগণের মতকে মিলাইয়া এমন সুন্দরভাবে সরল ভাষায় প্রশ্নোত্তরচ্ছলে ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব সম্বন্ধে এমন বিশদ আলোচনা আর কেহ করিয়াছেন কি না সন্দেহ। তত্ত্ববিদ্ বঙ্কিম কৃষ্ণচরিত্র এবং ধর্ম্মতত্ত্ব উভয় গ্রন্থে একটি সুমহান্ সারতত্ত্বকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। সে তত্ত্বটি অনুশীলন-তত্ত্ব। অনুশীলন-তত্ত্ব সম্বন্ধে এমন বিশদ আলোচনা বঙ্কিমের পূর্ব্বে কেহ করেন নাই, পরেও করিয়াছেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না। "কপালকুণ্ডলা" ও "কৃষ্ণকান্তের উইল" রচয়িতার "ধর্ম্মতত্ত্ব" রচনা তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার সমুজ্জ্বল নিদর্শন। যে অঘটন-ঘটন-পটীয়সী স্বচ্ছন্দ-বিহারিণী কল্পনা "কপালকুণ্ডলা" রচনা করিয়াছে, তাহাই সংযত ও সংহত হইয়া যে "ধর্ম্মতত্ত্বের" ন্যায় তত্ত্বগ্রন্থ রচনা করিতে সমর্থ হইয়াছে, ইহা অনেক সময় কল্পনা করাও কঠিন হয়। কিন্তু অদ্ভুত ধীশক্তিসম্পন্ন বঙ্কিমের পক্ষে তাহা অতি সহজেই সাধিত হইয়াছে। তত্ত্ববিজ্ঞানিপুণ তত্ত্বালোচনাতৎপর বঙ্কিম উপন্যাসের মধ্য দিয়াও গভীর তত্ত্বকথা কহিয়াছেন। দেবী চৌধুরাণী, আনন্দমঠ ও সীতারাম বঙ্কিমচন্দ্রের পরিণত বয়সের রচনা, এই অপূর্ব্ব উপন্যাসত্রয় গীতার তত্ত্ববিশেষকে ভিত্তি করিয়া বিরচিত।

পরমপ্রতিভাশালী বঙ্কিম যখন বঙ্গভাষার অপূর্ব্ব শ্রীসম্পাদনের জন্য প্রবল উৎসাহে লেখনী ধারণ করিলেন, তখন বঙ্গীয় সাহিত্য-সংসারের গদ্য-বিভাগে বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের অপ্রতিহত প্রভাব। ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহামনীষী রামমোহন রায়কে বঙ্গীয় গদ্য-সাহিত্যের পিতা বলা যাইতে পারে। তৎপূর্ব্বে গদ্য-সাহিত্য ছিল না, তাহা নহে, তবে তাহা তখনও সর্ব্বপ্রকার মনোভাব প্রকাশের উপযোগী হয় নাই। রামমোহন স্বীয় শক্তিপ্রভাবে সেই জড়ভাবাপন্ন গদ্যসাহিত্যে প্রথম প্রাণসঞ্চার করিলেন, ইহা বলিলে ঠিকই বলা হয়। তবে তাই বলিয়া বঙ্গীয় গদ্যের প্রবাহহীন আড়ষ্টভাব সম্যক্ বিদূরিত হইয়াছিল, এ কথা কিছুতেই বলিতে পারা যায় না। বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারই সুনিপুণ শিল্পীর ন্যায় বঙ্গীয় গদ্য-সাহিত্যের রুক্ষ-মলিন অঙ্গে একটা মার্জ্জিত শ্রী পরিস্ফুট করিয়া তুলিলেন। তাঁহাদের করস্পর্শে ভাষার পূর্ব্বকথিত আড়ষ্টভাব অনেকাংশে বিদূরিত হইল এবং বঙ্গসাহিত্য বীর, হাস্য, করুণ প্রভৃতি বিবিধ রসাত্মক বাক্য বা মনোভাব প্রকাশের উপযোগিতা লাভ করিল। বঙ্গভাষার অঙ্গে এই মনীষিদ্বয় যে শ্রী ফুটাইয়া তুলিলেন এবং ভাব-সম্পদ আনিয়া দিলেন, "সীতার বনবাস" ও "চারুপাঠ" প্রভৃতি গ্রন্থ তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

রামমোহন যাহাতে প্রাণমাত্র সঞ্চারিত করিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার যাহার অঙ্গে একটা মার্জ্জিত চিক্কণতা আনিয়া দিয়াছিলেন, অতুলনীয় প্রতিভাশালী বঙ্কিম তাহার শিরায় শিরায়—ধমনীতে ধমনীতে একটা অপূর্ব্ব জীবনীশক্তির তড়িৎ-স্পন্দন প্রদান করিলেন। বঙ্গীয় গদ্যসাহিত্য যাদুকর বঙ্কিমের করস্পর্শে অভিনব প্রাণ-হিল্লোলে দুলিতে লাগিল। যাহা প্রবাহহীন পল্বল সদৃশ ছিল, বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার তাহাকে সুপেয় ও স্বচ্ছ জলাশয়ে পরিণত করিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে বীচিমালা-বিশোভিতবক্ষা নৃত্যশীলা প্রবলবেগে প্রবহমানা বিপুলায়তনা কূলপ্লাবিনী মহানদীতে পরিণত করিলেন। দেবভাষার বিরুদ্ধে আদৌ বিদ্রোহী না হইয়া তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণের এবং বাগ্‌বাহুল্যের শৃঙ্খল হইতে মাতৃভাষাকে যতদূর সম্ভব মুক্ত করিলেন। তিনি ভাষাতে জল-স্রোতের ন্যায় এক সরল সহজ গতি বা প্রবাহ আনিয়া দিলেন বটে, কিন্তু ভাষার গাম্ভীর্য্য এক বিন্দুও নষ্ট করিলেন না। তিনি যখনই ইচ্ছা করিয়াছেন, তখনই ভাষাকে জলদ-মন্দ্রের ন্যায় গম্ভীরনাদিনী করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই শক্তিশালী শিল্পীর হস্তে ভাষা কখনও বেণু ও বীণার ন্যায় মৃদুল-মধুর ঝঙ্কার তুলিয়াছে, কখনও বা মৃদঙ্গ-ধ্বনির গুরু-গম্ভীর শব্দ নির্গত করিয়াছে। বঙ্কিমের ভাষা সরল হইলেও তাহাতে কোথাও অধুনা-প্রচলিত স্বেচ্ছাচারমূলক চটুলতা বা চপলতার লেশমাত্র নাই। আবশ্যক বুঝিলে তিনি তাঁহার রচনাকে সংস্কৃতবহুল শব্দসম্পদে সমৃদ্ধ করিতে বিন্দুমাত্রও সঙ্কুচিত হন নাই। তিনি রস ও ভাবানুসারে ভাষাকে চালিত করিয়া যেখানে যাহা সাজে, সেখানে তাহা দিয়াছেন। সকল সময়ে তাঁহার ভাষা নদী-স্রোতের মত স্বচ্ছন্দগতিতে অবাধে নৃত্য করিতে করিতে একটা মহৎ পরিণামের দিকে প্রবাহিত হইয়াছে।

বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবল প্রভাব এমন ওতপ্রোত

ভাবে জড়িত যে, বাহির হইতে দৃষ্টিপাত করিলে সে প্রভাবের পরিমাণ সহজে বুঝা যায় না। বঙ্গসাহিত্যে এক কবিতা ব্যতিরেকে সর্ব্ববিভাগেই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব বিদ্যমান। আর বঙ্গীয় কাব্যজগতে বঙ্কিমের প্রভাব নাই, তাই বা কেমন করিয়া বলি? কোনও কবি যে কোনও সময়ে বঙ্কিমের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া কবিতা লেখেন নাই, এমন কথা কখনও জোর করিয়া বলা যায় না। বঙ্কিমের অঙ্কিত চরিত্রাবলীকে অবলম্বন করিয়া বঙ্গের অনেক কবি অনেক কবিতা লিখিয়াছেন। সে ক্ষেত্রে বঙ্গের কাব্য-জগতে অর্থাৎ কবিতা-বিভাগে তাঁহার প্রভাব নাই, ইহা বলা যুক্তিসঙ্গত নহে। যাঁহারা সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের অপূর্ব্ব প্রতিভা-জ্যোতিদর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া "বঙ্কিম-প্রশস্তি" বা "বঙ্কিম-মঙ্গল" রচনা করিয়াছেন, সেরূপ কবির সংখ্যাও কম বলা চলে না। বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় প্রতিভাসম্পন্ন স্বজাতিবৎসল মহাপুরুষ অন্যদেশে জন্মিলে সেক্সপিয়রী সাহিত্যের মত বঙ্কিমী-সাহিত্য গঠিত হইত। সৌভাগ্যক্রমে বঙ্গভূমির এরূপ সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার আধার মহাপ্রাণ মহাপুরুষ তাহার বক্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, শুভাদৃষ্ট বশতঃ বঙ্গভাষায় বঙ্কিমের ন্যায় অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন লেখক তাহার পুষ্টিসাধন ও সৌষ্ঠব-সম্পাদনের জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমের ন্যায় প্রতিভাবান্ তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ প্রত্যেক দেশেই যুগে যুগে দুই একটির বেশী জন্মায় না, এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা চলে।

পাশ্চাত্য-শিক্ষা এ দেশে অমৃত ও গরল উভয়ই উদ্গীর্ণ করিয়াছিল। বঙ্কিম সেই শিক্ষার অমৃতময় ফল। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষায় পূর্ণশিক্ষিত হইয়াও দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত হইয়া স্বকীয় জাতীয়তা এক বিন্দুও বিসর্জ্জন দেন নাই। তিনি খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন এবং সকলকে মনে প্রাণে বাঙ্গালী হইতে উপদেশ দিতেন। শ্রীচৈতন্যপ্রমুখ বঙ্গভূমির প্রাণস্পন্দন তিনি পূর্ণভাবে অনুভব করিয়াছিলেন এবং সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গমাতার মহিমময়ী মানসীমূর্ত্তি গড়িয়া অপূর্ব্ব ভাবসম্পদপূর্ণ ভাষায় পূজা করিতেন।

বঙ্কিমচন্দ্র শুধু বঙ্গীয় উপন্যাস-জগতের একচ্ছত্র সম্রাট নহেন, তাঁহাকে বাঙ্গালা উপন্যাসের জনক বলিলে মিথ্যা বলা হয় না। বঙ্কিমের পূর্ব্বে উপন্যাস আখ্যা পাইবার উপযুক্ত আখ্যান ছিল না বলিলেই হয়। "আলালের ঘরের দুলালে"র ন্যায় পুস্তককে প্রকৃত উপন্যাস বলা চলে কি না, তাহা বিশেষ বিবেচনার বিষয়। সত্য কথা বলিতে গেলে, বঙ্কিমই সর্ব্বপ্রথম প্রকৃত উপন্যাস নাম ধারণ করিবার উপযুক্ত চিত্তাকর্ষক অথচ উন্নত উদ্দেশ্যমূলক উপাখ্যান রচনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যে যুগান্তর আনয়ন করেন। সে দিন বাঙ্গালার, বাঙ্গালীর এবং বাঙ্গালা ভাষার পক্ষে পরম শুভদিন—যে দিন অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস রচনা করিবার জন্য সর্ব্বপ্রথম লেখনী ধারণ করিলেন। সে দিন স্বর্গ হইতে দেবগণ তাঁহার মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন কি না, জানি না; কিন্তু বীণাবাদিনী বিশ্বারাধ্যা বাণীর বীণাতন্ত্রীতে সে দিন এক বিশ্ববিমোহন ঝঙ্কার উত্থিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। আজ সমগ্র বঙ্গদেশকে গল্পে ও উপন্যাসে আচ্ছন্ন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু এ বিষয়ের পথিপ্রদর্শক গুরু কে? এই উপন্যাসপ্রাচুর্য্য কাহার প্রবল প্রভাব বা শক্তির বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে? ইহার মূলে কাহার প্রেরণা বা অনুপ্রাণনা বিদ্যমান আছে? কোন্ মায়াবীর মন্ত্র-শক্তি সহসা দীনার পর্ণকুটীরকে সাম্রাজ্ঞীর সুবিরাট সৌধে পরিণত করিল? এ সকল প্রশ্নের একমাত্র উত্তর—অসাধারণ প্রতিভাশালী বঙ্গ-গৌরব বঙ্কিম!

বঙ্কিমচন্দ্রের অতুলনীয় ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শে রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি বহু লেখক উপন্যাস-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বলিতে গেলে বঙ্কিমচন্দ্র কর্ত্তৃকই বঙ্গে ও বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম ঐতিহাসিক আলোচনার সূত্রপাত হয়। মৃণালিনী, দুর্গেশনন্দিনী, সীতারাম, রাজসিংহ প্রভৃতি ঐতিহাসিক- উপন্যাস বঙ্গসাহিত্যে এমন একটা নূতন ধারার প্রবর্ত্তন করিল, যাহার প্রভাবে ও ফলে আমরা পরে অপর অনেক লেখকের নিকট হইতে অনেক সুন্দর ইতিবৃত্তমূলক উপাখ্যান প্রাপ্ত হইলাম। শুধু ঐতিহাসিক উপন্যাস নহে, বঙ্কিমচন্দ্রই ঐতিহাসিক গবেষণামূলক প্রবন্ধেরও প্রবর্ত্তক। 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমের লেখনীপ্রসূত এরূপ বহু প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। আমরা যে আজকাল বাঙ্গালা-ভাষায় এত ঐতিহাসিক প্রবন্ধের ছড়াছড়ি দেখিতেছি, তাহার মূলেও তত্ত্বজিজ্ঞাসু ও অনুসন্ধিৎসু বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব বর্ত্তমান আছে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

স্বদেশপ্রেমিক স্বজাতিবৎসল ও সত্যপ্রিয় বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশ ও স্বজাতির কলঙ্ক-কালিমা অপনোদন করিবার জন্য দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত হইয়া লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। "ভারতকলঙ্ক" এবং "বাঙ্গালার কলঙ্ক" নামক 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত প্রবন্ধদ্বয় তাঁহার সেই কলঙ্কক্ষালনের প্রাণপণ চেষ্টার অতুলনীয় ফল। বঙ্গের মিথ্যা কলঙ্ককাহিনী শুনিয়া বঙ্গমাতার অদ্বিতীয় সন্তান বঙ্কিমের বক্ষোদেশ বেগে স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছিল, তিনি স্থির থাকিতে পারেন নাই। সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয়, এরূপ অসম্ভব ব্যাপারে বিশ্বাসস্থাপন করা তাঁহার ন্যায় সত্যানুসন্ধানতৎপর দেশপ্রাণ তেজস্বী পুরুষের পক্ষে সম্ভব হয়

নাই। মুসলমান ঐতিহাসিকের কল্পিত এবং ইংরাজ ঐতিহাসিক কর্ত্তৃক গৃহীত এবং প্রচারিত এই অসত্যের বিরুদ্ধে বীর-বঙ্কিম বিপুলবিক্রমে দণ্ডায়মান হইয়া বজ্রকণ্ঠে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। বৎসরের পর বৎসর, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বাঙ্গালী নীরবে ও নতশিরে যে ঘৃণিত মিথ্যাকে অকাট্য সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, বাঙ্গালার এই তেজস্বী বীর সন্তান তাহাকে সে ভাবে গ্রহণ করিতে কিছুতেই পারিলেন না। আশ্চর্য্য এই, এতকাল ধরিয়া বাঙ্গালী এত বড় একটা অসম্ভব মিথ্যায় বিশ্বাস-স্থাপন করিয়া আসিতেছিল। একবার ভাবিয়াও দেখে নাই, যাহার সপ্তকোটি সন্তান, সেই বঙ্গভূমিকে সপ্তদশ অশ্বারোহী দ্বারা মুহূর্ত্তে অধিকারভুক্ত করা কখনও সম্ভব হইতে পারে কি? বাঙ্গালায় কি তখন একবারেই মানুষ ছিল না? এই মিথ্যা কলঙ্ক দেশভক্ত জাত্যভিমানী বঙ্কিমের বক্ষে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করিল, বঙ্কিম অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহার ফলে "বাঙ্গালার কলঙ্ক" প্রভৃতি প্রবন্ধ জন্মলাভ করিল। বঙ্কিমের এই সত্যানুসন্ধান বাঙ্গালায় এবং বাঙ্গালাভাষায় ঐতিহাসিক গবেষণার স্রোত সৃষ্টি করিল। সেই দিন হইতে বাঙ্গালী আর নির্ব্বিচারে বিদেশীয়ের লিখিত ইতিহাসে বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারে নাই।

মিনহাজ উদ্দীন স্বকপোলকল্পিত মিথ্যা প্রচার করিতে পারেন, বিদেশীয় ঐতিহাসিক স্বীয় পুস্তককে সেই মিথ্যার দ্বারা পূর্ণ করিতে পারেন, কিন্তু আত্মসম্মানজ্ঞানহীন হইয়া বাঙ্গালী কেমন করিয়া এই অদ্ভুত মিথ্যায় আস্থাবান্ হইল? ইহাই বঙ্কিমের সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের কারণ হইয়াছিল। তাই তিনি দেশবাসীকে সম্বোধন করিয়া শ্লেষাত্মক কণ্ঠে বলিয়াছেন—"এ বিশ্বাসের আর কোন কারণ নাই, কেবল এইমাত্র কারণ যে, সাহেবরা সেই মিনহাজ উদ্দীনের কথা অবলম্বন করিয়া ইংরাজীতে ইতিহাস লিখিয়াছেন। তাহা পড়িলে চাকরী হয়। বিশ্বাস না করিবে কেন? ভাই বাঙ্গালি! তোমায় জিজ্ঞাসা করি, সতের জন লোক লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালীকে বিজিত করিল, এইটাই কি প্রাকৃতিক নিয়মের অনুমত? যদি তাহা না হয়, তবে হে চাকরী-প্রিয়! তুমি কেন এ কথায় বিশ্বাস কর?" এই শ্লেষ তাঁহার প্রাণের প্রচণ্ড জ্বালা হইতে নির্গত হইয়াছিল। বাঙ্গালীর হৃদয়ে আজ যে আত্মসম্মানজ্ঞানের ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে এবং সেই ভাব যে ভাষায় আত্মপ্রকাশ করিতেছে, ইহার কারণ বঙ্কিম এবং বঙ্কিমের সেই জাতীয় কলঙ্ককালিমা-ক্ষালনের চেষ্টা। বঙ্কিমের প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করিয়া বঙ্গের ঐতিহাসিকগণ গভীর গবেষণার দ্বারা অনেক মিথ্যা জাতীয় কলঙ্ক অপনোদন করিয়াছেন। এই গভীর গবেষণা হইতে যে সকল গ্রন্থ জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার মধ্যে অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয়ের "সিরাজদ্দৌলা" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিদেশীয় ঐতিহাসিকগণ কর্ত্তৃক পলাশীর প্রহসন তুমুল সংগ্রামরূপে চিত্রিত হইয়াছে এবং তাঁহারা অন্ধকূপ-হত্যাকে অকাট্য সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তেজস্বী অক্ষয়কুমার ওজস্বিনী ভাষায় এই সকল বিষয়ের সত্য তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন। অক্ষয়কুমারের এই সত্যানুসন্ধানের মূলে যে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রেরণা রহিয়াছে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। "সিরাজদ্দৌলা" রচিত হওয়ার পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়া-ছিলেন, "ইতিহাসে কথিত আছে, পলাশীর যুদ্ধে জন দুই চারি ইংরেজ ও তৈলঙ্গী সেনা সহস্র সহস্র দেশী সৈন্য বিনষ্ট করিয়া অদ্ভুত রণজয় করিল। কথাটি উপন্যাস মাত্র। পলাশীতে প্রকৃত যুদ্ধ হয় নাই। একটা রঙ-তামাসা হইয়াছিল। আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, মুসলমানের লিখিত 'সএর মুতাখ্খরীণ' নামক গ্রন্থ পড়িয়া দেখ।" বঙ্কিমচন্দ্রের এই বাণীর দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই অক্ষয়কুমার সত্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

"বাঙ্গালার কলঙ্ক" ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র "বাঙ্গালার উৎপত্তি" নামক সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রবন্ধ রচনা করিয়া স্বদেশে ও স্বভাষায় স্বাধীন অনুসন্ধানের পথ মুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি জলদ-গম্ভীর-কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন, "বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালী কখনও মানুষ হইবে না।" বঙ্কিমচন্দ্র যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, অকুতোভয়ে তাহা প্রচার করিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধাবোধ করেন নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রই যে ঐতিহাসিক তত্ত্বালোচনা ও সত্যানুসন্ধানের প্রবর্ত্তক বা পথিপ্রদর্শক, তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারিলাম। ইহাও বুঝিলাম, বঙ্গসাহিত্য যে দিন দিন বহুবিধ ঐতিহাসিক গবেষণামূলক গ্রন্থের দ্বারা সমৃদ্ধ হইতেছে, তাহার কারণও বঙ্কিমচন্দ্র। আমরা পূর্ব্বেও আভাস প্রদান করিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি, বঙ্গসাহিত্যে ধর্ম্মতত্ত্বের স্বাধীন সত্যনিষ্ঠ ও বিজ্ঞানসম্মত ধারাবাহিক আলোচনার প্রবর্ত্তকও তত্ত্ববিদ্ বঙ্কিম। তাঁহার কৃষ্ণচরিত্র ও ধর্ম্মতত্ত্বই ইহার প্রধান পথি-প্রদর্শক। ইহা ছাড়া কয়েকটি প্রবন্ধেও তিনি ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনা করিয়া স্বদেশবাসীর মনে তত্ত্বজিজ্ঞাসা জাগাইয়া দিয়াছেন। আজ যে বাঙ্গালায় এবং বাঙ্গালা ভাষায় কৃষ্ণতত্ত্বের এত আলোচনা হইতেছে, কৃষ্ণভক্ত বঙ্কিমের "কৃষ্ণচরিত্র"ই তাহার কারণ, সে বিষয়ে কেহ সন্দেহ করিতে পারে না। "কৃষ্ণ-চরিত্রে" বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণের পূর্ণমানবত্ব প্রদর্শনের প্রয়াস করিলেও

কৃষ্ণ যে ভগবান্, এ সত্যে তিনি সম্পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন। "কৃষ্ণচরিত্রে"র ভূমিকায় তিনি ইহা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালী পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াও এখন যে পুনরায় কৃষ্ণের দিকে আকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণকথা কহিতে শিখিয়াছে এবং বঙ্গসাহিত্য যে কৃষ্ণবিষয়ক বহু পুণ্যগ্রন্থে সম্পদবান্ হইয়াছে, ভক্ত বঙ্কিমচন্দ্রই তাহার অন্যতম প্রধান কারণ, এ বাক্যকে কেহ অত্যুক্তি বলিয়া মনে করিবেন না। প্রতীচ্য দার্শনিক মতবাদ-সমূহের সহিত মিলাইয়া, প্রাচ্য বা ভারতীয় ধর্ম্মমত ও দার্শনিক তত্ত্ব সকলকে মথিত করিয়া তিনিই সর্ব্বপ্রথম অকুণ্ঠাসহকারে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সত্য তত্ত্ব প্রচার করিতে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। তাঁহার সেই পুণ্যময়ী প্রচেষ্টা ফলবতী হইয়াছিল। সেই পবিত্র প্রয়াসের পরিণতি-স্বরূপ আজ আমরা বঙ্গসাহিত্যের সাময়িক পত্রিকাপুঞ্জের পৃষ্ঠে বহু পৃষ্ঠাব্যাপী ধর্ম্মসম্বন্ধীয় তত্ত্বানুসন্ধানমূলক নিবন্ধমালা দেখিতে পাইতেছি।

ভক্ত অথচ তত্ত্বজ্ঞানী বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণের মুখারবিন্দবিনিঃসৃত অমৃতময়ী তত্ত্ববাণী গীতা সম্বন্ধে গভীরভাবে আলোচনা করিয়াছেন। সেই আলোচনার কিয়দংশ তিনি স্বীয় দেশ ও ভাষাকে প্রদান করিয়াছেন। তিনি শেষকালে গীতাতত্ত্ব দেশবাসীকে বিশেষভাবে জানাইতে বাসনা করিয়া লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বঙ্গদেশ ও বঙ্গভাষার দুর্ভাগ্য, তাঁহার সেই সুপবিত্র সঙ্কল্প সম্পূর্ণ সফল হইবার পূর্ব্বেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়া দিব্যধামে গমন করিলেন।

বঙ্গবিখ্যাত তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় গীতা সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, শ্রদ্ধেয় হীরেন্দ্র বাবুর ন্যায় গীতার গভীর তত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা বাঙ্গালায় আর কেহ করেন নাই। সেই হীরেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন, "ঐ দিন বঙ্কিম বাবুর সহিত গীতার প্রসঙ্গে আরও অনেক কথা হইল। তিনি বলিলেন যে, তদানীন্তন ভারতীয় সুধীসমাজে কর্ম্মবাদ, জ্ঞানবাদ, ভক্তিবাদ নামে যে বিভিন্ন সাধনপ্রণালী প্রচলিত ছিল, গীতাকার অদ্ভুত প্রতিভাবলে তাহার অপূর্ব্ব সামঞ্জস্যবিধান করিয়াছেন। বঙ্কিম বাবুর মুখে এই আমি প্রথম গীতার সমন্বয়বাদের সন্ধান পাইলাম। পরবর্ত্তী কালে আমি ইহার যথেষ্ট সম্প্রসারণ করিয়াছি, কিন্তু এ বিষয়ে আমার আদিম উপদেষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র। অতএব তাঁহার উদ্দেশে প্রণাম করি।"

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, গীতার তত্ত্ববিশেষকে ভিত্তি করিয়া তত্ত্ববিদ্যাবিশারদ বঙ্কিমচন্দ্র দেবী চৌধুরাণী, সীতারাম ও আনন্দমঠ এই তিনখানি উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। তিনি "ধর্ম্মতত্ত্বে" গুরু-শিষ্যের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে যে অনুশীলনতত্ত্ব বুঝাইতে চাহিয়াছেন, এই তিনখানি অপূর্ব্ব উপন্যাসে অভিনব উপায়ে সেই মহান্ তত্ত্বটিকেই পরিস্ফুট করিতে প্রয়াসবান্ হইয়াছেন। এই উপন্যাসত্রয় বাঙ্গালা ভাষার তিনটি অপূর্ব্ব রত্ন। শুধু বঙ্গসাহিত্যে নহে, পৃথিবীর কোনও সাহিত্যে ইহাদের সহিত তুলনা করিবার মত উপন্যাস আছে কি না সন্দেহ। কথাটাকে অনেকে হয় ত অত্যুক্তি বলিয়া মনে করিতে পারেন, কিন্তু বিশেষ মনোযোগ সহকারে এই গ্রন্থত্রয় পাঠ করিলে এ কথার সত্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিবে না। যে ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষকে তত্ত্বজ্ঞানের লীলাভূমি বলিলে বিন্দুমাত্রও অতিরঞ্জন হয় না, যে ভারতে অবতীর্ণ হইয়া পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ মরণার্ত্ত মানবের কর্ণকুহরে গীতার অমৃতবাণী ধ্বনিত করিয়াছিলেন, রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির ও জনক যে দেশের পুরুষের এবং সীতা ও সাবিত্রী যে দেশের নারীর আদর্শ, সেই দেশের মনীষী ভিন্ন এরূপ গ্রন্থ, বিশেষতঃ উপন্যাস অপর কোন দেশীয়ের লেখনী হইতে নির্গত হইতে পারে না। উপন্যাস যে এত উন্নত তত্ত্বকে ভিত্তি করিয়া রচিত হইতে পারে, এ গ্রন্থত্রয় প্রকাশ হওয়ার পূর্ব্বে তাহা কাহারও ধারণায় আসিত না। বঙ্কিমচন্দ্রই বঙ্গভাষায় তত্ত্বমূলক উপন্যাসের পথিপ্রদর্শক, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাস তিনখানিতে অসামান্য মনীষা প্রকাশ করিয়াছেন। শুধু ধর্ম্মতত্ত্ব নহে, বঙ্কিমের দেশাত্মবোধ কত দূর গভীর ছিল, এই পুস্তকত্রয় তাহারও জলন্ত নিদর্শন। বিশেষতঃ আনন্দমঠে বঙ্গমাতার অদ্বিতীয় সন্তান বঙ্কিম দেশমাতৃকার যে বিচিত্র চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, দেশভক্তির যে প্রবল প্রবাহ বহাইয়াছেন, জগতে তাহা একান্ত দুর্ল্লভ। অনেকে বলেন, স্কটল্যাণ্ডের প্রিয় সন্তান দেশভক্ত সার ওয়াণ্টার স্কটের রচনার দ্বারা প্রণোদিত হইয়া বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ রচনা করেন। হইতে পারে, স্কটের দেশাত্মবোধমূলক উপন্যাস পাঠ করিয়া সেই প্রকার গ্রন্থ রচনার বাসনা দেশপ্রাণ বঙ্কিমের প্রাণে জাগিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু "আনন্দমঠে" ভাবুকশ্রেষ্ঠ বঙ্কিম যাহা আঁকিয়াছেন, যাহা লিখিয়াছেন, তাহা তাঁহার সম্পূর্ণ নিজস্ব। সব ছাড়িয়া দিলেও বঙ্কিম দেশকে কত ভালবাসিতেন, একমাত্র "বন্দে মাতরম্" গানটিই তাহার অপূর্ব্ব নিদর্শন। জানি না, কোনও ভাষায় কোনও কবি কোনও দিন দেশমাতৃকাকে সম্বোধন করিয়া এমন আবেগময়ী ভাষা উচ্চারণ করিয়াছেন কি না!——

"তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম্ম,
তুমি হৃদি, তুমি মর্ম্ম,
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।"

এরূপ দেশাত্মবোধের তুলনা আছে কি? এমন ভক্ত সুসন্তানকে বক্ষে ধারণ করিয়া বঙ্গভূমি ধন্য। বঙ্কিমের ন্যায় স্বজাতিবৎসল মহাপুরুষের উদ্ভব হইয়াছিল বলিয়া বাঙ্গালী জাতিও ধন্য। শতাব্দীর পর শতাব্দী পরাধীন থাকিয়া যে জাতির এক জন দেশমাতাকে সম্বোধন করিয়া এমন প্রাণময়ী বাণী বলিতে পারে, সে জাতি কি ধন্য নহে?

সত্যই বঙ্কিমচন্দ্রের দেশভক্তি অতুলনীয়। শুধু আনন্দমঠ নহে, তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যেও স্বদেশপ্রীতির প্রবল উচ্ছ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি, যে "কমলাকান্তের দপ্তর"কে লোক হাস্যরসাত্মক রচনা বলিয়া মনে করে, তাহার মধ্যেও "আমার দুর্গোৎসব" "একটি গীত" প্রভৃতি প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র অনুপমা ভাবময়ী ভাষায় দেশপ্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। "আমার দুর্গোৎসবে" তিনি শারদীয়া দুর্গা-প্রতিমাকে দেশমাতৃকার মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া যে শব্দসম্পদময়ী ভাষায় মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা সকলের চিত্তকে অতি সহজেই স্পর্শ করিবে। "একটি গীতে" প্রসন্ন গোয়ালিনীকে একটি গান শুনাইতে গিয়া কমলাকান্তরূপী বঙ্কিম দেশের দুঃখে করুণকণ্ঠে ক্রন্দন করিয়াছেন। দেশভক্ত বঙ্কিম বৈষ্ণব কবির পদকে দেশাত্মবোধের দিক দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। বঙ্কিমের সে অভিনব অর্থকে দেশভক্তির চূড়ান্ত চিহ্ন বলিলে প্রতিবাদ করিবার কি আছে?—

'অনেক দিবসে মনের মানসে
তোমাধনে মিলাইল বিধি হে।'

মুক্তিমন্ত্রের উপাসক স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য ব্যাকুল বঙ্কিম এই পদ বুঝাইতে গিয়া বলিয়াছেন, "কই, অনেক দিবসে মনের মানসে বিধি মিলাইল কই? যাহা চাই, তাহা মিলাইল কই? মনুষ্যত্ব মিলিল কই? একজাতীয়ত্ব মিলিল কই? ঐক্য কই? বিদ্যা কই? গৌরব কই? হলায়ুধ কই? লক্ষ্মণসেন কই? আর কি মিলিবে না? হায়! সবারই ঈপ্সিত মিলে, কমলাকান্তের মিলিবে না?" ঠিক ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে দিন গণিবার কথায় বঙ্কিম বলিয়াছেন, "গণিব। আমার এক দুঃখ, এক সন্তাপ, এক ভরসা আছে। ১২০৩ সাল হইতে দিন গণি। যে দিন বঙ্গে হিন্দু নাম লোপ পাইয়াছে, সেই দিন হইতে দিন গণি। যে দিন সপ্তদশ আরোহী বঙ্গজয় করিয়াছিল, সেই দিন হইতে দিন গণি। হায়! কত গণিব! দিন গণিতে গণিতে মাস হয়, মাস গণিতে গণিতে বৎসর হয়, বৎসর গণিতে গণিতে শতাব্দী হয়, শতাব্দীও ফিরিয়া ফিরিয়া সাতবার গণি।"

কি ব্যাকুলতাপূর্ণ আবেগময়ী ভাষা! স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য কি আকুল আকাঙ্ক্ষা! কিন্তু এ আকুলতা—এ আবেগের এইখানেই শেষ নহে। তীব্রতর আকুলতা ও গভীরতর আবেগের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

'তোমায় যখন পড়ে মনে
আমি চাই বৃন্দাবন পানে
আলুইলে কেশ নাহি বাঁধি।'

ইহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া দেশভক্ত বঙ্কিম প্রাণের তীব্র আবেগে ভাবে আত্মহারা হইয়া আকুলকণ্ঠে বলিতেছেন, "আমার এই বঙ্গদেশের সুখের স্মৃতি আছে, নিদর্শন কই? গোপাল দেব, লক্ষ্মণসেন, জয়দেব, শ্রীহর্ষ, প্রয়াগ পর্য্যন্ত রাজ্য, ভারতের অধীশ্বর নাম, গৌড়ী রীতি, এ সকলের স্মৃতি আছে, কিন্তু নিদর্শন কই? সুখ মনে পড়িল, কিন্তু চাহিব কোন্ দিকে? সে গৌড় কই? সে যে কেবল যবনলাঞ্ছিত ভগ্নাবশেষ। আর্য্য রাজধানীর চিহ্ন কই? আর্য্যের ইতিহাস কই? জীবনচরিত কই? কীর্ত্তি কই? কীর্ত্তিস্তম্ভ কই? সমরক্ষেত্র কই? সুখ গিয়াছে, স্মৃতিচিহ্নও গিয়াছে, বঁধু গিয়াছে, বৃন্দাবনও গিয়াছে—চাহিব কোন্ দিকে? চাহিবার এক শ্মশান-ভূমি আছে—নবদ্বীপ। সেইখানে সপ্তদশ অশ্বারোহী বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল, বঙ্গমাতাকে মনে পড়িলে আমি সেই শ্মশান-ভূমির প্রতি চাই। যখন দেখি, সেই ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম বেড়িয়া অদ্যাপি সেই কলধৌতবাহিনী গঙ্গা তর তর রব করিতেছেন, তখন গঙ্গাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করি, তুমি আছ, সে রাজলক্ষ্মী কোথায়? তুমি যাহার পা ধুয়াইতে, সে মাতা কোথায়? তুমি যাহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া নাচিতে, সেই আনন্দ-রূপিণী কোথায়? তুমি যাহার জন্য সিংহল, বালী, আরব, সুমাত্রা হইতে বুকে করিয়া ধন বহন করিয়া আনিতে, সেই ধনেশ্বরী কোথায়? তুমি যাহার রূপের ছায়া ধরিয়া রূপসী সাজিতে, সে অনন্ত সৌন্দর্য্যশালিনী কোথায়? তুমি যাহার প্রসাদি ফুল লইয়া ঐ স্বচ্ছ হৃদয়ে মালা পরিতে, সে পুষ্পাভরণা কোথায়? সে রূপ, সে ঐশ্বর্য্য কোথায় ধুইয়া লইয়া গিয়াছ? বিশ্বাসঘাতিনি, তুমি কেন আবার শ্রবণ-মধুর কল-কল তর-তর রবে মন ভুলাইতেছ? বুঝি তোমারই অতল গর্ভমধ্যে

যবন-ভয়ে ভীতা সেই লক্ষ্মী ডুবিয়াছেন, বুঝি কুপুত্রগণের আর মুখ দেখিবেন না বলিয়া ডুবিয়া আছেন। মনে মনে আমি সেই দিন কল্পনা করিয়া কাঁদি।"

কল্পনাকুশলী মহাকবি দেশভক্তাগ্রগণ্য বঙ্কিম তার পর বাষ্পাকুল-নয়নে করুণরসাত্মিকা অথচ ঝঙ্কারময়ী ভাষায় বঙ্গ-লক্ষ্মীর গভীর গঙ্গাগর্ভনিমজ্জন লীলাময়ী কল্পনাবলে বিবৃত করিয়াছেন। কবিকুলচূড়ামণি বঙ্কিম পরমারাধ্যা দেশলক্ষ্মীর অন্তর্দ্ধানকালীন অকল্যাণসূচক চিহ্নসমূহ একে একে উল্লেখ করিয়া শেষে বলিতেছেন, "গাঢ়তর, গাঢ়তর, গাঢ়তর অন্ধকারে দিক্ ব্যাপিল; আকাশ, অট্টালিকা, রাজধানী, রাজবর্ত্ম, দেব-মন্দির, পণ্যবীথিকা সেই অন্ধকারে ঢাকিল; কূলতীরভূমি, নদী-সৈকত, নদী-তরঙ্গ সেই অন্ধকারে—আঁধার, আঁধার, আঁধার হইয়া লুকাইল। আমি চক্ষে সব দেখিতেছি—আকাশ মেঘে ঢাকিতেছে, ঐ সোপানাবলী অবতরণ করিয়া রাজলক্ষ্মী জলে নামিতেছেন। অন্ধকারে নির্ব্বাণোন্মুখ আলোকবিন্দুবৎ জলে ক্রমে ক্রমে সেই তেজোরাশি বিলীন হইতেছে। যদি গঙ্গার অতল জলে না ডুবিলেন, তবে আমার দেশ-লক্ষ্মী কোথায় গেলেন?"

দেশের জন্য, দেশের অতীত গৌরবের জন্য, দেশমাতার স্বাধীনতা-হীনতার জন্য এমন ভাবাবেগপূর্ণ ভাষায় করুণ কণ্ঠে কেহ কখনও কাঁদিয়াছেন কি না জানি না। ইহাও জানি না, মানব-ভাষায়, মানব-সাহিত্যে স্বদেশপ্রেমের উচ্ছ্বাস ইহা অপেক্ষা অধিক ব্যক্ত হইতে পারে কি না, কিম্বা দেশাত্মবোধের অনুভূতি ইহা অপেক্ষা তীব্রতর বা গভীরতর হইতে পারে কি না। আজ যে বঙ্কিমচন্দ্রের মাতৃভূমিতে ও মাতৃভাষায় স্বদেশপ্রীতির প্রবল বন্যা বহিয়া যাইতেছে, ইহার জন্ম কোথায়? কোন্ গিরিগাত্রনির্গত নির্ঝরধারা হইতে এই উত্তালতরঙ্গমালাসঙ্কুল বিরাট প্লাবনের সৃষ্টি হইয়াছে? আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিব, দেশ-প্রাণ বঙ্কিম সেই গিরিবর, তাঁহার অতুলনীয় স্বদেশপ্রেমোদ্দীপক বাক্যাবলী সেই নির্ঝর—যাহা এই দেশব্যাপী ভাবতরঙ্গ সৃষ্টি করিয়াছে। মুক্তিমন্ত্রের মহাসাধক ঋষি বঙ্কিম কি শুভক্ষণে "বন্দে মাতরম্" এই মহামুক্তি-মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন! শুধু বঙ্গভূমি নহে, হিমাদ্রি হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত, ব্রহ্মদেশ হইতে পঞ্চনদের প্রান্ত পর্য্যন্ত সমগ্র ভারত আজ সেই মন্ত্রধ্বনিতে মুখরিত। শুধু মুখরিত নহে, জাগরিত, অনুপ্রাণিত ও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। "আনন্দমঠে"র ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের কণ্ঠোচ্চারিত এই শক্তিসঞ্চারিণী বাণী জাতীয় জয়-ধ্বনিতে পরিণত হইয়া এই বিপুলায়তন ভারতভূমির নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে কণ্ঠে কণ্ঠে উচ্চারিত হইতেছে! এই একটিমাত্র অপূর্ব্ব সঙ্গীতের অনুপ্রাণনায় শত শত জাতীয় সঙ্গীত জন্মগ্রহণ করিয়া ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। আদিকবির কণ্ঠ-নিঃসৃত "মা নিষাদ" এই শ্লোক যেমন পৃথিবীর আদি কবিতা, মহাকবি বঙ্কিমের এই "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীত তেমনই বঙ্গের জাতীয় জীবনের আদি সঙ্গীত। আর বঙ্কিমের "আনন্দমঠ"কে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের বেদ বলিয়া অভিহিত করিলে বোধ হয় অন্যায় হইবে না। বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠে যে অত্যুন্নত আদর্শ আঁকিয়াছেন, তাহাকেই আজ দেশ শ্রদ্ধাবনত-শীর্ষে গ্রহণ করিয়াছে। আজ ভারতে মুক্তিমন্ত্রসাধক জাতীয় সন্ন্যাসী বা সন্তান-সম্প্রদায় সত্য সত্যই গঠিত হইয়াছে। বাহিরে সন্ন্যাসের গৈরিক বা কাষায় তাঁহাদের অঙ্গে না থাকিলেও তাঁহারা সকলেই স্বদেশের জন্য সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসিস্বরূপ হইয়াছেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? ঐ যে মহাপুরুষ ক্ষীণ কটিতটে ক্ষুদ্র চীরখণ্ড জড়িত করিয়া অনাবৃত মুণ্ডিত মস্তকে দাঁড়াইয়া আছেন, উনি কে? ঐ যে মহামানব পৃথিবীর সর্ব্বসুখে জলাঞ্জলি দিয়া স্বদেশের কল্যাণার্থ ত্যাগ ও বিবেক-বৈরাগ্যের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন, উনি কি সেই সত্যানন্দ নন? সত্য বলিতেছি, ঐ সত্যাশ্রয়ী সত্যপ্রাণ সত্যবাক্ পুরুষই সত্যানন্দ। যিনি স্বদেশের জন্য সর্ব্বত্যাগী, সত্যেই যাঁহার আনন্দ, তাঁহাকে সত্যানন্দ না বলিব কেন? আর ঐ যে পবিত্র প্রয়াগ-ক্ষেত্রের রাজভবনতুল্য স্বরাজভবনে শুভ্র সৌম্যমূর্ত্তি যুবক দাঁড়াইয়া আছেন, যিনি বিপুল ভোগৈশ্বর্য্যের মধ্যে পালিত হইয়াও হাসিতে হাসিতে মুহূর্ত্তে স্বদেশের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছেন, উনিও কি সত্যানন্দ-প্রবর্ত্তিত সেই সর্ব্বত্যাগী সন্তান-সম্প্রদায়ভুক্ত নন? স্বদেশের কল্যাণকামনায় ভোগ-সুখকে পদদলিত করিয়া পূর্ণ-যৌবনে যিনি কুসুমকোমল কমনীয় কায়াকে কঠোর তপস্যার আগুনে দগ্ধ করিতে পারেন, তিনি সন্তানপ্রবর। ঐ তরুণ তপস্বীর পার্শ্বে আমরা যে প্রশান্ত মূর্ত্তি প্রবীণ পুরুষকে দেখিতে পাইতাম, তিনি আজ কোথায়? যুক্তপ্রদেশের সন্তান-সমূহের শীর্ষস্থানীয় সেই সর্ব্বত্যাগী সুপ্রবীণ স্বরাজতপস্বী আজ স্বর্গে! তাঁহার বাসভবন "আনন্দভবন" আজ স্বরাজভবন নাম ধারণ করিয়া ভারতের মুক্তিমণ্ডপে পরিণত হইয়াছে। "আনন্দভবন" আজ সত্যানন্দ-প্রবর্ত্তিত জাতীয় সন্ন্যাসী বা সন্তানবর্গের মহা-মিলন-মন্দির।" "স্বরাজভবন" না রাখিয়া "আনন্দ-ভবনে"র নাম "আনন্দমঠ" রাখিলে বোধ হয় আরও উপযোগী হইত। আজ সহসা আর এক জন সর্ব্বত্যাগী সন্তানের মূর্ত্তি চিত্তপটে উদিত হইতেছে। সেই সন্তান-শিরোমণিও আজ

সুদূর স্বর্গে ! তিনি কে ? তিনি সপ্তকোটি বাঙ্গালীর চিত্তহারী চিত্তরঞ্জন ! তিনি বাঙ্গালার সন্তান-সম্প্রদায়ের গুরু, তিনি বাঙ্গালার সর্ব্বত্যাগী সত্যানন্দ,—যাঁহার উন্মাদনাপূর্ণ জলদগম্ভীর আহ্বানে শত শত বঙ্গসন্তান সানন্দে সন্তান-সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিয়া স্বরাজ-সাধনায় আত্মসমর্পণ করিয়াছিল ! এইখানে উচ্চকণ্ঠে বলিতে ইচ্ছা হইতেছে, ধন্য বঙ্কিমচন্দ্র ও চিত্তরঞ্জন-প্রসবিনী পুণ্যময়ী বঙ্গভূমি !

অতএব বঙ্কিমচন্দ্রই যে বঙ্গদেশে বঙ্গভাষায় জাতীয় সাহিত্যের স্রষ্টা, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। শুধু জাতীয় সাহিত্য নহে, আমরা বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের যে দিকেই মনোযোগ সহকারে দৃষ্টিপাত করিব, সর্ব্বত্রই সর্ব্বতোমুখী প্রতিভাসম্পন্ন বঙ্কিমের কল্যাণকর করচিহ্ন দেখিতে পাইব। রাজনীতি, সমাজ-নীতি, ধর্ম্ম-নীতি, সকল বিষয়েই তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল, সেই অধিকারের অমৃতোপম ফল তিনি বাঙ্গালীকে ও বাঙ্গালা ভাষাকে দান করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ-প্রণালীতে এই সকল বিষয়ের আলোচনা বঙ্গসাহিত্যে আর কেহ করেন নাই। বঙ্কিমের 'বিবিধ প্রবন্ধ, পাঠ করিলে আমরা বুঝিতে পারি, "সর্ব্বতোমুখী প্রতিভাসম্পন্ন" এই গৌরব-জনক আখ্যাটি তাঁহার পক্ষে কত উপযুক্ত। এমন কি, "কমলাকান্তের দপ্তর" নামক অদ্ভুত গ্রন্থখানিতে তিনি রাজ-নীতি, সমাজ-নীতি, ধর্ম্ম-নীতি প্রভৃতি সকল বিষয়ের আলোচনা অতি অভিনব সরস উপায়ে সম্পন্ন করিয়াছেন। "কমলকান্তের দপ্তর" গ্রন্থখানি বঙ্কিমের অসাধারণ প্রতিভার অপূর্ব্ব অবদান। এই গ্রন্থখানিতে হাসির অন্তরালে কিরূপ অশ্রুসিন্ধু লুক্কায়িত আছে, তাহা আমরা "একটি গীত" শীর্ষক প্রবন্ধের আলোচনা করিতে গিয়া দেখাইয়াছি। উহাতে দেশভক্ত বঙ্কিম দেশের জন্য কাঁদিয়া সাতকোটি বাঙ্গালীকে কাঁদাইয়াছেন। কে এমন পাষাণহৃদয় অনুভবহীন বঙ্গসন্তান আছে—বঙ্কিমের "আমার দুর্গোৎসব" পাঠ করিয়া যে অজস্র অশ্রুবর্ষণ না করিবে ? 'কমলকান্তের দপ্তরে'র প্রত্যেক প্রবন্ধের অভ্যন্তরে একটা উন্নত উদ্দেশ্য নিহিত আছে। হাস্যরসাত্মক রচনার ছলে বঙ্কিম ইহাতে বহুবিধ তত্ত্ব বাঙ্গালীকে বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার সে প্রয়াস সার্থক হইয়াছে। কমলাকান্তে যে হাস্যরস আছে, তাহা অতিশয় উন্নত ও অনাবিল, কোথাও পঙ্কিলতার লেশমাত্র নাই। বঙ্কিমই বঙ্গসাহিত্যে এইরূপ উন্নত হাস্যরসের অবতারণা করিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরস ছিল, কিন্তু সে রস সময়ে সময়ে শ্লীলতার সীমাকে অতিক্রম করিত। বঙ্কিম এই রসকে পঙ্কিলতামুক্ত করিয়া অনাবিল আনন্দের ধারায় পরিণত করিয়াছেন। "কমলাকান্তের দপ্তরে"র শেষাংশ কমলাকান্তের জবানবন্দীকে হাস্যরসের অজস্র নির্ঝর বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু এই অজস্র হাস্যরসাত্মক রচনাটিও উদ্দেশ্যবিহীন নহে। ইহার মধ্যেও একটি উদ্দেশ্যপূর্ণ ইঙ্গিত আছে। Right of Conquest আখ্যা দিয়া য়ুরোপ আজ যে একে একে নানা দেশ অধিকার করিতেছে, তাহার সেই কার্য্য কতদূর ন্যায়সঙ্গত, বঙ্কিম এই হাস্যাত্মক নিবন্ধে তাহারই ইঙ্গিত করিয়াছেন। যদি Right of Conquestর দোহাই দিয়া Might is right এই নীতি অনুসরণ করিয়া জোরপূর্ব্বক অপরের দেশ অধিকার করা অন্যায় বলিয়া গণ্য না হয়, তাহা হইলে Right of theft বলিয়া অপরের জিনিষ লইলে অন্যায় হইবে কেন ? প্রসন্ন গোয়ালিনীর গরুচুরি প্রসঙ্গে বঙ্কিম এই প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছেন। কমলাকান্তের অনুকরণে ঐ হাস্য-রসাত্মক অথচ গভীর উদ্দেশ্যমূলক পুস্তক বা প্রবন্ধ লিখিতে অনেকে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কেহ সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। আমরা সমগ্র বঙ্গসাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ঠিক "কমলাকান্তের দপ্তরে"র ন্যায় অপূর্ব্ব গ্রন্থ দেখিতে পাইব না। তবে বঙ্গসাহিত্যে ইহার প্রভাবান্বিত পুস্তক যে দুই একখানি পাইব, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

"কমলাকান্তের দপ্তরে"র ন্যায় বঙ্কিমের "লোকরহস্য"ও এক-খানি হাস্যরসাত্মক পুস্তক। বঙ্কিম এই পুস্তকখানিতেও হাস্যরসের যে প্রবল প্রবাহ বহাইয়াছেন, তাহা সকল সময়ে সকলের সাতিশয় উপভোগ্য হইয়াছে। এই সকল রচনার মূলেও এক একটি উদ্দেশ্য নিহিত আছে। আমাদের মনে হয়, স্বদেশের কল্যাণকামী বঙ্কিম স্বদেশবাসীর শুধু ক্ষণিক চিত্তরঞ্জনের জন্য উদ্দেশ্যবিহীনভাবে কিছু রচনা করেন নাই। "লোকরহস্যের" হাস্যরসের মধ্যে স্থানে স্থানে তীব্র শ্লেষ আছে, কিন্তু এ শ্লেষ তিনি সংস্কারের উদ্দেশেই প্রয়োগ করিয়াছেন, সংহারের জন্য নহে। "কমলাকান্ত" অপেক্ষা "লোকরহস্যে"র অনুকরণ কিছু সহজ হইলেও, লোকরহস্যের পন্থা অনুসরণ করিয়া বঙ্গসাহিত্যে কয়েকখানি হাস্যরসবহুল পুস্তক রচিত হইলেও, "লোকরহস্যের" সহিত তুলনা দিবার মত পুস্তক বঙ্গভাষায় আর নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

গ্রন্থবিশেষের সমালোচনামূলক প্রবন্ধ রচনাতেও বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। তাঁহার ভবভূতি-প্রণীত উত্তর-রাম-চরিত এই সমালোচনাশক্তির নিদর্শন। বঙ্কিমচন্দ্র বহুসংখ্য পুস্ত-কের সমালোচনা না করিলেও কিরূপে বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে সমালোচনা করিতে হয়, তাহা শিখাইয়াছেন বলিলে মিথ্যা বলা

হয় না। আমরা "কৃষ্ণচরিত্র" "ধর্ম্মতত্ত্ব" এবং "বিবিধ প্রবন্ধে"র বহুস্থানে বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা করিবার সামর্থ্যের পরিচয় পাই। পূর্ব্বে "সাহিত্যদর্পণ" "কাব্যপ্রকাশ" প্রভৃতি অলঙ্কার-সম্বন্ধীয় গ্রন্থের মতে কাব্যসমালোচনা করা হইত, বঙ্কিমচন্দ্র সে পন্থা পরিত্যাগ করিয়া পাশ্চাত্য প্রথানুসারে সমালোচনা আরম্ভ করিলেন। আজকাল সকলেই বঙ্কিমচন্দ্র-প্রবর্ত্তিত পন্থা অবলম্বন করিয়া থাকে। আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের "উত্তর-রামচরিত" সমালোচনা সম্বন্ধে আলোচনা এ স্থানে অনাবশ্যক মনে করি। শুধু আমরা ঐ সমালোচনা হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা-নৈপুণ্যের নমুনা দেখাইতেছি। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গভাষাকে জড়ত্বপাশবিমুক্তা কেমন অভিনব সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যে মণ্ডিতা করিয়াছেন, আমরা উদ্ধৃত অংশ হইতে তাহা বেশ বুঝিতে পারিব।

"রসোদ্ভাবনে ভবভূতির ক্ষমতা অপরিসীম। যখন যে রস উদ্ভাবনের চেষ্টা করিয়াছেন, তখনই তাহার চরম দেখাইয়াছেন। তাঁহার লেখনীমুখে স্নেহ উচ্ছলিতে থাকে, শোক দহিতে থাকে, দম্ভ ফুলিতে থাকে। ভবভূতির মোহিনী শক্তি-প্রভাবে আমরা দেখিতে পাই যে, রামের শরীর ভাঙ্গিতেছে, মর্ম্ম ছিঁড়িতেছে, মস্তক ঘুরিতেছে, চেতনা লুপ্ত হইতেছে; দেখিতে পাই, সীতা কখনও বিস্ময়স্তিমিতা, কখনও আনন্দোত্থিতা, কখনও প্রেমাভিভূতা, কখনও অভিমানকুণ্ঠিতা, কখনও আত্মাবমাননা-সঙ্কুচিতা, কখনও অনুতাপবিবশা, কখনও মহাশোকে ব্যাকুলা। কবি যখন দেখাইয়াছেন, একেবারে নায়ক-নায়িকার হৃদয় যেন বাহির করিয়া দেখাইয়াছেন।"

বঙ্কিমচন্দ্র কবিবর ভবভূতিকে উদ্দেশ করিয়া যাহা বলিয়াছেন, আমরা বঙ্কিমের উদ্দেশে তাহাই বলিতে চাই। সত্য সত্যই বঙ্কিমের লেখনী-মুখে স্নেহ উচ্ছলিতে থাকে, শোক দহিতে থাকে, দম্ভ ফুলিতে থাকে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি, বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গভাষাকে সংস্কৃত ব্যাকরণের কঠোর নিয়ম-নিগড় হইতে বিমুক্ত করিয়াছেন, কিন্তু আবশ্যক হইলে ভাষার সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্য বৃদ্ধি করিবার জন্য দেবভাষার অক্ষয় শব্দ-ভাণ্ডার হইতে শব্দচয়ন করিয়া এবং সংস্কৃত ব্যাকরণানুযায়ী সন্ধি ও সমাসের নিয়মকে মানিয়া স্বকীয় রচনাকে শব্দসম্পদশালিনী করিতে কোনও দিন বিস্মৃত হন নাই। এক সময়ে বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার বঙ্গীয় সাহিত্যজগতে প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন, কিন্তু আজ বাঙ্গালী যে ভাষায় কথা বলে, যে ভাষায় পুস্তক রচনা করে, সে ভাষা সাধারণতঃ বঙ্কিমের ভাষা। আজকাল একটা দল সংস্কৃতের সম্পূর্ণ বিদ্রোহী হইয়া ভাষার গাম্ভীর্য্য নষ্ট করিয়া ভাষার মধ্যে একটা চপল, চটুল ও তরল ভাব আনিয়া ফেলিতেছেন। কিন্তু এ দলও বঙ্কিমের প্রভাবকে এড়াইতে পারেন নাই। বঙ্কিম সাহিত্য-সৃষ্টিতে মধ্যপন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, সেই জন্য যিনি যে দিকেই যান, বঙ্কিমের প্রভাব তাঁহাকে স্পর্শ করিবেই। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গভাষায় একটা সরল অথচ সুন্দর, সরস অথচ সতেজ ভাব আনিয়া দিয়াছেন। তাঁহার ভাষায় সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের সহিত গাম্ভীর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের অপূর্ব্ব সম্মেলন দেখিয়া সত্যই বিস্মিত হইতে হয়। সংক্ষেপতঃ বলিতে গেলে বঙ্গ-সাহিত্যকে বঙ্কিমচন্দ্র যে সম্পদ দান করিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়। এরূপ অমূল্য রত্ন আর কেহ দিতে পারেন নাই। বঙ্কিমের দানে দীনা বঙ্গভাষা সত্য সত্যই রাজরাণীর গৌরব প্রাপ্ত হইয়াছেন। বাঙ্গালীর জীবনের সকল দিকেই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবের স্পর্শ আছে। পরাধীন হইলেও বাঙ্গালী যে আজ একটা আত্মসম্মানজ্ঞানসম্পন্ন জাগ্রত জাতি, দেশগতপ্রাণ বঙ্কিমের দেশাত্মবোধমূলক প্রবন্ধ ও গ্রন্থনিচয় তাহার অন্যতম কারণ, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি আছে?

বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থ রচনা করিয়া স্বদেশের সাহিত্যকে সম্পদবান্ করিয়াছেন এবং স্বজাতির হৃদয়ে জাতীয় ভাব জাগ্রত করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার সে চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে। ভারতীয় ভাষাবর্গের মধ্যে বঙ্গভাষাই আজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরবের অধিকারিণী। বঙ্গভাষার অনুকরণে বঙ্গসাহিত্যের প্রদর্শিত পথে গমন করিয়া ভারতের অপর ভাষা ও সাহিত্য সকল নিজেদের সম্পদবৃদ্ধির জন্য প্রয়াস পাইতেছে। বঙ্কিমের গ্রন্থাবলী ভারতীয় প্রায় সকল ভাষাতেই অনূদিত হইয়া সাদরে ও সাগ্রহে সকলের দ্বারা পঠিত হয়, এমন কি, তাঁহার কয়েকখানি পুস্তক য়ুরোপীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা-সমূহের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া অনেকে সাহিত্যসাধনা করিয়া সফলকাম হইয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও অনেককে উৎসাহান্বিত করিয়া সাহিত্যসাধনার পথে প্রেরণ করিয়াছেন। সাহিত্য-গুরু বঙ্কিমের শক্তিসঞ্চারক প্রভাবে তখন বঙ্গে বহু শক্তিমান সাহিত্য-সেবীর উদ্ভব হইয়াছিল। স্বর্গীয় ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় বঙ্গীয় সাহিত্য-সংসারে সুপরিচিত। বঙ্কিমের প্রভাবে তিনি কি ভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন, তাঁহার রচনা হইতে উদ্ধৃত করিয়া তাহা আমরা দেখাইতেছি।

"বঙ্কিম বাবুর লেখা পড়িয়া বাঙ্গালা শিখিতে ও লিখিতে সাধ গিয়াছিল। তাঁহারই কথা আমার ন্যায় কীটাণুকে সাহিত্যের সুবিশাল সাম্রাজ্যে সর্ব্বপ্রথম আকর্ষণ করিয়াছিল। সেই লেখা

হইতে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সংগ্রহ করিয়াছিল, সাহিত্য-প্রীতি জন্মিয়াছিল, সাহিত্যের সৌন্দর্য্যানুসন্ধানে প্রণোদিত ও প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। নহিলে আমার মত মূর্খলোকে কখনই সাহিত্যের সংস্পর্শে আসিতে সাহসী হইত না। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার "উত্তর-রামচরিত" সমালোচনায় এক স্থানে লিখিয়াছিলেন, যদি ইহার দ্বারা এক জন পাঠকেরও কাব্যানুরাগ বর্দ্ধিত হয় বা তাহার কাব্যরস-গ্রাহিণী শক্তির কিছুমাত্র সহায়তা হয়, তাহা হইলেই এই দীর্ঘ প্রবন্ধ আমরা সফল বিবেচনা করিব। এখানে আমার বলা আবশ্যক যে, বঙ্কিম বাবুর আকাঙ্ক্ষিত সেই এক জন পাঠক আমি, অথবা আমি অনেকের মধ্যে এক জন। বঙ্কিম বাবুর উক্ত সমালোচনা পাঠ করিয়াই আমি কাব্যরসাস্বাদশক্তির অনুশীলন করি ও সমালোচনা-তত্ত্বে অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হই। সাহিত্য-শালায় বঙ্কিম বাবু আমার সর্ব্বপ্রথম শিক্ষাগুরু, পরে দেশ-বিদেশে বিস্তর শিক্ষক পাইয়াছি বটে, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম এবং বোধ হয় প্রধান শিক্ষক।"

স্বর্গীয় ঠাকুরদাস বাবু সাহিত্য-সংসারে সুপরিচিত এক জন সুবিখ্যাত ও সুনিপুণ সমালোচক ছিলেন। তাঁহার লেখনী-প্রসূত উপরি-উক্ত বাক্য হইতে বঙ্গ-সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের অপ্রতিহত প্রভাব সম্বন্ধে আমাদের ধারণা আরও বদ্ধমূল হইবে সন্দেহ নাই।

যে দেশে বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় সর্ব্বতোমুখী প্রতিভাসম্পন্ন দেশ-প্রাণ মহাপুরুষের জন্ম হয়, সে দেশের নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। সে দেশ অবশ্যই এক দিন তাহার ঈপ্সিত বস্তুকে—তাহার বাঞ্ছিতকে পাইয়া কৃতার্থ ও ধন্য হইবে। যিনি ভাবে আত্মহারা হইয়া শারদীয়া শক্তিপ্রতিমার মধ্যে দেশমাতার মূর্ত্তি দর্শন করিতে পারেন, তিনি অসামান্য দেশভক্ত, তাঁহার অনন্য-সাধারণ দেশভক্তি ভগবদ্ভক্তির সহিত সমপর্য্যায়ভুক্ত হইবার যোগ্য। সেরূপ ভক্তের নিকট দেশমাতৃকায় ও জগন্মাতায় কোন পার্থক্য নাই। তত্ত্বজ্ঞ বঙ্কিমের দেশভক্তি অতি উচ্চাঙ্গের, জড়বাদী পাশ্চাত্য জগৎ তাহার কল্পনাও করিতে পারে না। পর্ব্বতবন্ধুরা কালিডোনিয়ার ভক্তসন্তান ওয়াল্টার স্কট ভাবাবেগে বলিয়াছেন—

"O Caledoina! Stern and wild!
Meet nurse for a poetic child!"

কিন্তু সেই দেশভক্ত স্কটেরও সাধ্য কি বঙ্কিমের এই আধ্যাত্মিক দেশপ্রীতিকে ধারণার মধ্যে আনিতে পারেন। অথচ সকলের বিশ্বাস, স্কটই দেশভক্তি-বিষয়ে বঙ্কিমের আদর্শ। আমরা বলি, এ দেশনিষ্ঠা, দেশাত্মবোধ, দেশগতপ্রাণতা বঙ্কিমের সম্পূর্ণ [illegible]। এই উন্নত, অপূর্ব্ব ও আধ্যাত্মিক দেশাত্মবোধের প্রবর্ত্তক তত্ত্বজ্ঞ ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, ইহার বেদ আনন্দমঠ, তন্ত্র কমলাকান্তের দপ্তর, পুরাণ দেবী চৌধুরাণী ও সীতারাম, মন্ত্র বন্দে মাতরম্! ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের মাতৃপূজা অতি অপূর্ব্ব! মাতৃভক্তি অতুলনীয়! মাতৃভক্ত সন্তান কাতরকণ্ঠে আকাশকে মথিত করিয়া, বাতাসকে স্পন্দিত করিয়া, বাঙ্গালার জলস্থল প্রতিধ্বনিত করিয়া বলিতেছেন—

"কোথা মা? কই আমার মা? কোথায় কমলাকান্ত-প্রসূতি বঙ্গভূমি? এ ঘোর কাল-সমুদ্রে কোথায় তুমি? সহসা স্বর্গীয় বাদ্যে কর্ণ-রন্ধ্র পরিপূর্ণ হইল, দিঙ্মণ্ডলে প্রভাতারুণোদয়বৎ লোহিতোজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ হইল, স্নিগ্ধ-মন্দ পবন বহিল—সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশির উপর দূর-প্রান্তে দেখিলাম, সুবর্ণ মণ্ডিতা, এই সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা! জলে হাসিতেছে, ভাসিতেছে, আলোক বিকীর্ণ করিতেছে, এই কি মা? হাঁ, এই মা। চিনিলাম, এই আমার জননী জন্মভূমি—এই মৃন্ময়ী—মৃত্তিকারূপিণী—অনন্তরত্নভূষিতা—এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা! রত্নমণ্ডিত দশ ভুজ—দশ দিক—দশ দিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত—পদাশ্রিত বীরজন কেশরী শত্রু-নিষ্পীড়নে নিযুক্ত! এ মূর্ত্তি এখন দেখিব না, আজ দেখিব না, কাল দেখিব না, কালস্রোত পার না হইলে দেখিব না—কিন্তু এক দিন দেখিব, দিগ্ভুজা, নানা প্রহরণপ্রহারিণী, শত্রুমর্দ্দিনী, বীরেন্দ্র-পৃষ্ঠবিহারিণী,—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানমূর্ত্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ, আমি সেই কালস্রোতোমধ্যে দেখিলাম, এই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা!"

এই সঙ্গে আমাদেরও বলিতে ইচ্ছা হয়, এই জাতীয় মহা-জাগরণের দিনে, কোথায় তুমি, বঙ্গের বরণীয় দেবতা, বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের বেদব্যাস, "বন্দে মাতরম্" মন্ত্রের ঋষি, সাহিত্যগুরু বঙ্কিম? যে মুক্তিমন্ত্র তুমি বঙ্গবাসীর কর্ণ-কুহরে ধ্বনিত করিয়াছিলে, আজ সমগ্র [illegible] প্রণত শীর্ষে সশ্রদ্ধ অন্তরে উচ্চকণ্ঠে সেই মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছে। বন্দে মাতরম্!

শ্রীসুরেশচন্দ্র কবিরত্ন।

ভালবাসার নির্য্যাতন

১

হুগলী জেলার পীতাম্বরপুর গ্রামে প্রবলপরাক্রান্ত ধার্ম্মিক পীতাম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয় জমীদারের বাস। পীতাম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয় যদিও গভর্ণমেণ্টের কোন উপাধি প্রাপ্ত হন নাই, দয়া-দাক্ষিণ্যগুণে তাঁহার প্রজা ও আমলাবৃন্দ তাঁহাকে "মহারাজা" নামে আখ্যায়িত করিয়াছিল। পীতাম্বরপুরে মহারাজা বলিলেই পীতাম্বর মুখোপাধ্যায়কেই বুঝাইত। প্রকৃত রাজার যাহা কিছু গুণ থাকা উচিত, পীতাম্বর মুখোপাধ্যায়ের সে সমস্তই ছিল। তিনি প্রজাপালক ও উপযুক্ত শাসক ছিলেন। শোষক বলিয়া কেহই তাঁহাকে জানিত না।

ন্যায়বিচারের জন্য প্রজাগণ তাঁহাকে ভয়ও করিত, ভক্তিও করিত। তাঁহার জমীদারীতে প্রজাগণকে ও অপরাপর জনসাধারণকে সদ্বিচারের আশায় ডেপুটী বা মুন্সেফের আদালতে আশ্রয় লইতে হইত না। তাহারা জানিত ও বুঝিত যে, সরকারী বিচারক সদ্বিচার করিতেও পারেন, না-ও করিতে পারেন, কিন্তু বিচার পাইবার পূর্ব্বে তোড়-জোড়ের খরচায় তাহারা মারা পড়িবে। উকীল, মোক্তার, কার্পরদাজ, টুর্ণি, পেশকার, বেঞ্চ ক্লার্ক, পেয়াদা প্রভৃতিকে খুসী করিতে করিতেই তাহাদের প্রাণান্ত হইতে হইবে। যদিও জিত হয়, তথাপি একটি কপর্দ্দকও বাড়ী গিয়া পৌঁছিবে না, আর হার হইলে ত কথাই নাই। কাযেই প্রজারা বাধ্য হইয়া রাজার আদালতের আশ্রয় না লইয়া এই "মহারাজার" দপ্তরে আশ্রয় লইত। খরচ অনেক কম, বিচার মোটের উপর ভালই হইত। মহারাজার রায়ের পর হুকুম জারী করিতে খরচা অনেক কম।

প্রজারা মোটের উপর সুখে স্বচ্ছন্দে তাঁহার জমীদারীতে বাস করিত। মহারাজ পীতাম্বরের একমাত্র পুত্র হরিশ্চন্দ্র। হরিশ্চন্দ্র পারিবারিক শিক্ষকের কাছে শিক্ষা পাইয়াছিলেন এবং মোটের উপর উচ্চশিক্ষিতই হইয়াছিলেন। পিতার যাহা কিছু গুণ ছিল, সবগুলিই সন্তানে বর্ত্তিয়াছিল; প্রজাপালন, দয়া-দাক্ষিণ্য, সজ্জনের সহায়তা, দুর্জ্জনের প্রতি দণ্ডদান, সবগুলি গুণই তাঁহাতে বর্ত্তমান ছিল।

হরিশ্চন্দ্রের দুই পুত্র ও দুই কন্যা। জ্যেষ্ঠা কন্যার নাম রাইমণি। অনেক পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া ঐ কন্যার নামটি রাইমণি বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছিল। পিতামহ পীতাম্বরের নয়নের মণি বলিয়া ঐ বালিকাটিকে "মণি" বলিয়া ডাকিতেন। বালিকার পিতা ও মাতা তাহাকে "রাই" বলিয়া ডাকিতেন। বালিকার পিতামহী কখন তাহাকে "রাই," কখন তাহাকে "মণি" বলিয়া ডাকিতেন। ফলে (ক্রমপরিবর্ত্তনের পর) শেষ নামকরণ হইল "রাইমণি," অর্থাৎ বালিকাটি রাইও বটে, মণিও বটে।

পীতাম্বরপুরের অনেক লোকই জানে যে, এই কন্যাটি মুখুয্যে-বংশের তিন পুরুষের মধ্যে প্রথমা কন্যা। মহারাজা পীতাম্বরের সহোদরও ছিল না। কাযেই এই রাইমণির ভূমিষ্ঠ-সময় হইতে আরম্ভ করিয়া অন্নপ্রাশনের সময় পর্য্যন্ত লোকের আনন্দের আর সীমা ছিল না। মহারাজা পীতাম্বরেরও কোষাগারের ধন-দৌলত, দান-ধ্যান ও আমোদ আহ্লাদে যথেষ্ট পরিমাণে ব্যয়িত হইয়াছিল। গরীব প্রজাদিগকে অন্নদান, বস্ত্রদান ও এক বৎসরের দেয় খাজনা হইতে অব্যাহতি-দান, জমীদার পীতাম্বর সবই করিয়াছিলেন। জন্মের তারিখ হইতে ষষ্ঠীপূজা পর্য্যন্ত কোন প্রজাকে নিজের বাটীতে রন্ধন করিয়া খাইতে হয় নাই। পীতাম্বরপুরের কোন ভদ্রলোককেই এক সপ্তাহ ধরিয়া নিজ বাড়ীতে সান্ধ্য ভোজন করিতে হয় নাই। ঘোষজা, বোসজা, দত্তজা, মিত্রজা, বাঁড়ুয্যে মশাই, চাটুয্যে মশাই, মুখুয্যে মশাই, সকল মশায়েরই আহ্বান হইতেছিল এবং চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় দ্বারা সকলেই পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন।

অন্নপ্রাশনের সময়েও সেইরূপ ধূম। সকলেই এই বালিকাকে রাণী আখ্যায়িকায় ভূষিত করিয়াছিল। জমীদার পীতাম্বরের স্ত্রীকে সকলেই রাণী বলিত, পীতাম্বরের স্ত্রী জীবিতা বলিয়া তিনি রাণী নামে খ্যাত ছিলেন। হরিশ্চন্দ্রের স্ত্রীকে সকলেই বৌমা বলিয়া খাতির করিত। কারণ, রাণী শ্যামাসুন্দরী পীতাম্বরের সহধর্ম্মিণী এখনও জীবিতা ছিলেন। কাযেই রাণী শ্যামাসুন্দরীর চাপে পড়িয়া হরিশ্চন্দ্রের গৃহিণী কাত্যায়নী বৌমা বলিয়া খ্যাত হইলেন। "রাণী" পদবী তাঁহার ভাগ্যে জুটিল না, কিন্তু তাঁহার কন্যাটি যখন জন্মগ্রহণ করিল, সে ভূমিষ্ঠ হইবার পরক্ষণ হইতেই "ছোটরাণী" নামে খ্যাত হইল।

পীতাম্বরপুরের ভদ্রলোকগণ এবং অপর অপর প্রজাবৃন্দ সকলেই এই বালিকার কি নাম হইলে সুখী হয়, তাহা স্থির করিতে পারিত না। কেহ রাইমণি, কেহ রাণীমণি, কেহ রায়-রাণী, এই রকম কত নামেই তাহাকে আখ্যায়িত করিত। ক্রমে মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর যাইতে লাগিল, রাইমণিও শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তখন 'সরদা বিল' পাশ হয় নাই, কাযেই আট বৎসর বয়সের সময় হইতেই

জমীদার পীতাম্বর পৌত্রীর বর অন্বেষণে বিশেষ ব্যস্ত হইলেন। হিন্দুর ঘরে উপযুক্ত পাত্র পছন্দ করা বড়ই কঠিন কার্য্য।

২

মানুষ যতই বড় হউক না কেন, বংশে কন্যা জন্মিলে তাহাকে মাথা নত করিতে হইবেই। সে লোক চিরকাল জোরের সহিত কাটাইয়াছে, কোন অবস্থায় নতমস্তক হয় নাই, কন্যা বা পৌত্রীর বিবাহের সময় তাহাকে রাস্তার ধূলায় মাথাটি লুটাইয়া দিতে হইবে।

আমার একটি নিকট-আত্মীয় আছেন, তাঁহার সন্তানগুলি সবই পুত্র, একটিও কন্যা নাই। তিনি স্পর্দ্ধা করিয়া প্রায়ই বলেন, আমার অপেক্ষা ভাগ্যবান্ পুরুষ কে আছে? যে হেতু, আমার কন্যা নাই, কাহারও হাঁটুতে হাত দিয়া আমাকে নতশির হইতে হইবে না। কথাটি অতি সত্য। মানুষ যে কতটা হীনবল ও অপরের দয়ার পাত্র, তাহা কন্যা হইতেই বুঝা যায়। তুমি অন্য বিষয়ে দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ হইতে পার, তথাপি কন্যার পিতা হইলে জামাতা ও তাহার আত্মীয়দিগকে কখন খুসী করিতে পারিবে না।

জামাতা দশম গ্রহবিশেষ। অবশ্য এ কথা ধ্রুব সত্য, প্রত্যেকেই ত অপর এক জনের জামাতা। অতএব জামাতার নামে শিহরিবার কি কারণ হইতে পারে? তবু এ কথা ধ্রুব সত্য যে, বিবাহের দিন হইতে প্রথম ১০ বা ১৫ বৎসর জামাতা পদবীর পূর্ণ ঝাঁজ থাকে অর্থাৎ যত দিন না জামাতা নিজে শ্বশুর হন, কিন্তু সেই ১০ হইতে ১৫ বৎসর জামাতার ঝাঁজ সহ্য করা কয় জন শ্বশুরের রক্তমাংসের শরীরে সহনীয় হয়? প্রত্যেক বালিকার পিতা ও পিতামহকে এই সম্বন্ধের দুশ্চিন্তা জর্জ্জরিত করে।

যে সকল পিতার কন্যাও আছে, অথচ নিজ পিতা বর্ত্তমান, তাহারাই বিশেষ ভাগ্যবান্ পুরুষ, কিন্তু তাহাদের নিজের সৌভাগ্য হইলেও পিতামহের অতিশয় দুর্ভাগ্য। যতই সে সম্পদশালী হউক না কেন, সদাই ভয়, নাতিনীর বরটি কিরূপ মেজাজের লোক হইবে। জামাতার বিষয়ও ভাবিতে হইবে, জামাতার পিতা-মাতার বিষয়ও ভাবিতে হইবে। অধিকাংশ সময়েই যদিও জামাতার পিতা-মাতা কোন একটি বা ততোধিক কন্যার পিতা-মাতা, তথাপি পুত্রবধূর সম্বন্ধে ভুলিয়া যান যে, তাহারাও অপর এক জনের পুত্রবধূর পিতা-মাতা।

হিন্দুর বিবাহ চিরদিনের জন্য অবিচ্ছিন্ন, কাযেই বিবাহের পূর্ব্বে কন্যার অবিভাবকগণের আকাশপাতাল ভাবিবার কারণ আছে। যদিও হরিশ্চন্দ্র এক মুহূর্ত্তের জন্য কন্যার বিবাহবিষয়ে মাথা ঘামান নাই, কন্যার পিতামহ রাজা পীতাম্বর ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী রাণী শ্যামাসুন্দরীর ভাবনার শেষ ছিল না। তাঁহারা তাঁহাদের প্রাণাধিকা পৌত্রীর বিবাহ লইয়া বিশেষ চিন্তান্বিত ছিলেন। অনেক স্থান হইতেই ভাল ভাল পাত্রের সন্ধান আসিতে লাগিল, কিন্তু একটা না একটা খুঁত বাহির হইতে লাগিল; নিখুঁত নাত-জামায়ের সন্ধান একবারেই মিলিল না। অনেক চেষ্টা-চরিত্রের পর কলিকাতার এক জন শ্রেষ্ঠ ব্যবহারাজীবের পুত্র রমেন্দুসুন্দরের সন্ধান পাওয়া গেল।

পাত্রটি অল্পবয়স্ক এবং দেখিতে শুনিতে অতি সুন্দর। খ্যাতনামা পিতার পুত্ররা অধিকাংশ সময়েই সুন্দর দর্শনডালি লইয়া পৃথিবীতে আগমন করেন। কাযেই বিবাহসভায় বরাসনে তাঁহারা অতি সুন্দর বর হইয়াই আসেন।

প্রায় চারি বৎসর ধরিয়া চেষ্টা করিয়া এই বালকটিকে কতকটা পছন্দ হইল। প্রথম অসুবিধা, ভাল ঘর পাওয়া, দ্বিতীয়—শিক্ষিত বর পাওয়া, তৃতীয়—দর্শনডালি চেহারা পাওয়া, চতুর্থ—কন্যাটিকে যত্ন করিবার জন্য উচ্চমনা শ্বশুর-শাশুড়ী পাওয়া। কাযেই ঘর মিলে ত বর মিলে না, আর বর মিলে ত শ্বশুর-শাশুড়ী মিলে না। অধিকাংশ সময়েই প্রথম হইতেই কন্যার অভিভাবকরা এই চতুর্ব্বর্গের সমন্বয় চান। ক্রমে খুঁজিতে খুঁজিতে যখন অধীর হইয়া পড়েন, তখন একটি করিয়া ছাড়িতে আরম্ভ করেন। প্রথম ছাড়েন ঘরের শ্রেষ্ঠত্ব, দ্বিতীয় ছাড়েন বরের কৃতিত্ব, তৃতীয় ছাড়েন বরের দর্শনডালিত্ব। শেষটা খালি রহিয়া যায়, বরের বালকত্ব আর বরের পিতামাতার কিঞ্চিৎ অর্থ।

চারি বৎসর ধরিয়া অনেক চেষ্টা-চরিত্রের পর উকীলপ্রবর রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীমান্ রমেন্দুসুন্দরকে নাত-জামাইরূপে গ্রহণ করিবার সংকল্প স্থির হইল।

রমেন্দুসুন্দরের পিতা রামচন্দ্র নিজ মেধাবলে কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন, পেশাতে নামও আছে, আর যেমন অনেকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবাসীরা সকলেই তাঁহাকে তাঁহার স্ত্রীর কলের পুতুল বলিয়া মনে করে। পীতাম্বর মুখুয্যে কয় পুরুষ ধরিয়া বনিয়াদী বংশ। রামচন্দ্র নিজ মেধাবলে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। অনন্যোপায় হইয়া রাজা পীতাম্বরকে এই বরই পছন্দ করিতে হইল। বাল্যকাল হইতে তাঁহার যে একটা ধারণা ছিল যে, তিনি এক জন মহা মেধাবী পুরুষ, ধনে, মানে, রূপে, গুণে, শিক্ষায় এক জন শ্রেষ্ঠ পুরুষ, আর তাঁহার কথা মান্য করে না, এমন লোক খুবই কম, এই ধারণাটি এত দিনের পর চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। তিনি দেখিলেন,

পীতাম্বরপুরে তিনি সর্ব্বজনমান্ত ব্যক্তি সত্য, কিন্তু উঁহার চতুঃ-সীমার বাহিরে তাঁহার স্বামিত্ব ও প্রভুত্ব অতিশয় কম। তাঁহার ধারণা ছিল, তিনি যাহাকে যাহা বলিবেন, তাহারা প্রত্যেকেই তাহা করিবে, প্রকাশ্যে তাঁহার মতবিরুদ্ধ কায করিতে সাহস করিবে না, কিন্তু পৌত্রীর বিবাহের সন্ধান করিতে গিয়া দেখিলেন, তাঁহার ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। পৌত্রীর বরের বাপ-মার কাছে তিনি অতি সামান্ত লোক। বর পছন্দ করিয়া লইয়া তিনি যে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা নহে, তবে কি করিবেন, অন্ত উপায় ছিল না, কাযেই বাধ্য হইয়া এই যুবাটিকে বররূপে গ্রহণ করিতে হইল।

৩

পীতাম্বরপুরে আজ মহাধূম। জমীদার-বাড়ী অতি সুন্দররূপে সাজান হইয়াছে। কলিকাতা হইতে নাচ-তামাসা অনেক আসিয়াছে। থিয়েটার, বায়োস্কোপও অনেক আনা হইয়াছে। অনেক দূর হইতে ভিখারীরা আগত হইয়াছে। দূর-দেশান্তর হইতে অনেক খ্যাতনামা লোকের আমন্ত্রণ হইয়াছে এবং তাঁহাদের পরিতুষ্টির জন্ত যথেষ্ট আয়োজন করা হইয়াছে। কলিকাতার ষ্টার থিয়েটার সদলবলে সৌরীন্দ্র বাবুর "স্বয়ম্বর" দেখাইবার জন্ত এখানে আহূত ও নিয়োজিত হইয়াছেন। দেশী আহার্য্যের যথেষ্ট বন্দোবস্ত করা হইয়াছে, তথাপি যাঁহারা ইংরাজী খাদ্যের পক্ষপাতী, তাঁহাদের রসনাতৃপ্তির জন্ত Imperial Restaurant নিয়োজিত হইয়াছে। দরিদ্রনারায়ণের প্রত্যেককে পরিতোষে তিন দিন ধরিয়া সেবা করান হইয়াছে, যাবার যাইবার পূর্ব্বে প্রত্যেককে একখানি করিয়া বস্ত্র ও দুইটি করিয়া টাকা দেওয়া হইয়াছে। সকলেই আনন্দে বিভোর। কন্তার পিতামাতা, কন্তার আত্মীয়স্বজন সকলেই মাতোয়ারা, কেবল প্রবীণ পীতাম্বরের বুকে কি যেন একটা খচখচ করিতেছে। তিনি যে কোন অমঙ্গলের আভাস দেখিতে পাইতেছেন, তাহা নহে, তবে তাঁহার বুকের এক কোণে মাছের কাঁটা ফোটার ন্তায় একটা যেন কিরূপ খচখচ করিতেছে। তিনি ক্রমাগত মনে মনে ডাকিতেছেন, নারায়ণ! আমি আমার চোখের মণি রাইমণিকে পাত্রস্থ করিতে মনস্থ করিয়াছি। এই আনন্দের দিনে কেমন একটা অস্পষ্ট অশুভ আমার মনে উদয় হইতেছে, দেখো ভগবান্! আমার রাইমণির কখন যেন অশুভ না হয়, আমার প্রাণ দিলেও যদি রাইমণির অবিচ্ছিন্ন সুখ বাধা থাকে, তাহা হইলে আমি প্রাণ দিতেও প্রস্তুত।

রাইমণির পিতামাতার এ বিবাহে কোনরূপ ভাবনা নাই, তাঁহারা প্রবীণ পীতাম্বরের সমীচীন মস্তকের উপর সমস্ত চিন্তার বোঝা নিক্ষেপ করিয়া নিশ্চিন্তমনে কন্তার সাজগোজের দিকে নজর দিতেছেন। পিতামহ সমস্ত ব্যবস্থাই সুচারুরূপে করিয়াছেন, তথাপি রাইমণির পিতামাতা কন্তাকে নিখুঁতভাবে সাজাইবার জন্ত বিশেষ ব্যস্ত। কাত্যায়নী পাড়ার ও আত্মীয়-স্বজন যত রমণী লইয়া কন্তা সাজাইতে সুরু করিয়া দিয়াছেন। হরিশ্চন্দ্র বন্ধুবান্ধব লইয়া, যেন বরপক্ষের কোনরূপ অভ্যর্থনার ত্রুটি না হয়, তাহার জন্ত বিশেষ মনঃসংযোগ করিয়াছেন।

বরের পিতার ইচ্ছা বরানুগমনের সময় ধূমধাম একবারেই না হয়। বরের মাতার ইচ্ছা, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ খুব ধূমধামের সহিত সম্পন্ন হয়। বরানুগমনের সহিত শোভাযাত্রা তাহার একটি প্রধান অঙ্গ। শেষে স্ত্রী-পুরুষের মতান্তরের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য হইয়া গেল। ভাল বাজনা ও নিখুঁতরূপে মোটর-গাড়ী সাজাইয়া বরানুগমনের শোভাযাত্রা হইল।

বরের মাতার ধারণা এই, পীতাম্বর মুখুয্যে বংশমর্য্যাদায় শ্রেষ্ঠ হইতে পারেন, কিঞ্চিৎ অর্থও থাকিতে পারে, তাহা হইলেও তাঁহার বংশ উচ্চশিক্ষিতের বংশ নহে। তাঁহার স্বামী এক জন উচ্চশিক্ষিত, পুরুষ-সিংহ; পেশা হিসাবে তাঁহার বেশ নামডাক আছে, তিনি স্বয়ং দেখিয়াছেন, কলিকাতার কত বড়লোক পেশা হিসাবে সাহায্য পাইবার জন্ত তাঁহার স্বামীর দ্বারস্থ। তাহাদের মধ্যে অনেক মফঃস্বলের জমীদারও আছেন। তাঁহারা পীতাম্বর মুখুয্যের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বৈ কম নহেন। কাযেই বর-মাতার এইরূপ ধারণা সংক্রামক হইয়া বর-পিতা ও তাঁহার আত্মীয়-স্বজন ও লোকজনকে বুঝাইয়া দিল—বরপক্ষের শ্রেষ্ঠত্ব।

অপর পক্ষে পীতাম্বর মুখুয্যে প্রবলপ্রতাপান্বিত জমীদার। পীতাম্বরপুরে তাঁহার শাসনে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়। তাঁহার এবং তাঁহার আত্মীয়-স্বজন, লোকজন সকলেরই বিশ্বাস, তাঁহারা বরপক্ষ অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ, তবে তাঁহাদের কন্তারত্ন রামচন্দ্র বাঁড়ুয্যের ঘর অনেক উচ্চ করিয়া দিল। আর এ ত হইয়াই থাকে, জমীদারের কন্তা ব্যবহারাজীবের ঘরে পড়িয়া সেই ঘরকে সমুজ্জ্বল করে। জমীদার-বংশ না থাকিলে উকীল-কৌন্সুলীদের চলিত কোথা হইতে? আর উকীল-কৌন্সুলীরা যদি নিজ নিজ পেশায় কৃতকার্য্য ও সফলমনোরথ হন, তবেই ত তাঁহারা পরবর্ত্তী স্তরে উঠিবেন অর্থাৎ জমীদার হইবেন। অতএব দুই পক্ষই নিজ নিজ পক্ষের শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন।

খুব ধূমধামে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। কন্তাপক্ষ যতদূর সম্ভব বরপক্ষের আর অভ্যাগত আত্মীয়-কুটুম্বের ও লোক

জনের আদর অভ্যর্থনা করিলেন। কোনরূপ ত্রুটি কেহ দেখিতে পাইল না, তথাপি বরপক্ষের কাছে কন্যাপক্ষের কোন না কোন ত্রুটির ছায়া রহিয়া গেল। দেনা-পাওনার হিসাবে রমেন্দুসুন্দর যাহা পাইলেন, তাহা সচরাচর বর পায় না, তথাপি কাত্যায়নীর মন সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট নহে। জিজ্ঞাসা করিলে মুখে বলিতে পারিবেন না কোথায় ত্রুটি হইয়াছে, তথাপি তাঁহার মনে একটা অস্বস্তি রহিয়া গেল।

৪

আজ কন্যা-বিদায়ের দিন। কাত্যায়নী ভাবিতে লাগিলেন, কন্যাকে ছাড়িয়া তিনি কেমন করিয়া থাকিবেন? সেই ভাবনা পীতাম্বরকে অভিভূত করিয়াছে। সকলেই এই সুখের দিনে কন্যার বিদায় হেতু ম্রিয়মাণ। জোর করিয়া আমোদ-আহ্লাদ করিতেছে, কিন্তু বিশেষ ভাবিত। কন্যা শ্বশুরবাড়ী যাইয়া কিরূপ ব্যবহার পাইবে, তাহা লইয়া বিশেষ চিন্তিত। প্রত্যহই এই কন্যা-বিদায়ের পালা চলিতেছে। ভগবানের কৃপায় প্রথম প্রথম অসুবিধা সত্ত্বেও সুন্দরভাবেই চলিয়া যাইতেছে, আর প্রত্যেক দিনই এই বিষয় লইয়া পিতামাতার, আত্মীয়-স্বজনের ভাবনার সীমা-পরিসীমা নাই। যাহা হউক, দৈনন্দিন নিয়ম অনুসারে এ কার্য্য শেষ হইল।

রাইরাণী শ্বশুর-গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল বধূরূপে; শ্বশুর, শাশুড়ী, স্বামী সকলেই নববধূ পাইয়া সুখী। স্বামী নববধূতে প্রথম হইতে অনুরক্ত হইল। এক মুহূর্ত্ত দৃষ্টির আড়াল হইলে পলকে প্রলয় বোধ করে। তবে এই ভালবাসার মাত্রা এত অধিক হইয়াছিল যে, রাইমণি ভালবাসার নির্য্যাতন ক্রমে হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিল। রাই ঘরে আসিতে বিলম্ব ঘটিলে সে যে সেটুকু সময়েরও অদর্শন সহ্য করিতে পারে না, তাহাও বলিতে ছাড়ে না।

কোন লোকই ২৪ ঘণ্টা মুখোমুখী করিয়া থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ অল্পবয়স্কা বালিকা। বয়স ১৪ বৎসর বৈ ত নহে! ভালবাসার পেষণে সে ব্যথিতা হইতে লাগিল। এই সময়ে চিরন্তন নিয়মানুসারে হরিশ্চন্দ্র কন্যা লইতে আসিলেন। জামাতার পিতামাতার ইচ্ছা পাঠাইয়া দেন; কিন্তু রমেন্দুসুন্দরের ইচ্ছা তাহা নহে, অথচ পিতামাতাকে স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারে না। শেষে সে রাইমণিকে বলিল—"তোমার বাবা তোমাকে নিতে এসেছেন, তুমি বল, তুমি এখন যাবে না।"

রাইমণি।—দেখুন, আমি এ কথা কেমন ক'রে বলব? কিছু দিন পরে আবার আপনার চরণসেবা করতে আসব। আমাকে কিছু দিনের জন্য ছুটী দিন, আর নতুন যায়গায় এসে আমার শরীরও খুব ভাল নেই।

রমেন্দুসুন্দর।—ও, বুঝেছি, তোমার এখানে ভাল লাগছে না। আমার ব্যবহারে তুমি সুখী নও।

রাইমণি।—কেন বৃথা দোষ দিচ্ছেন? এখানেই আমার স্বর্গ। আপনার কাছে থাকতেই আমার সুখ। তবে দাদু, দিদিমণি, মা, বাবা সকলকে দেখবার জন্য মন বড় ব্যস্ত হয়েছে। দয়া ক'রে কিছু দিনের জন্য ছুটী দিন।

অনেক কথাবার্ত্তার পর রমেন্দুসুন্দর রাজি হইল, তবুও তাহার মনে একটু অস্বস্তি রহিয়া গেল।

স্বামীর ভালবাসার আতিশয্যে রাইমণি একটু অসুবিধা অনুভব করিতে লাগিল। জগতে এমন স্ত্রীলোক নাই যে, স্বামীর অসীম ভালবাসার ভিখারিণী নহেন, কিন্তু তাহা হইলেও ২৪ ঘণ্টা স্বামীর ছায়ার ন্যায় থাকিতে বিশেষ অসুবিধা বোধ করেন। স্বামী যখন পলকের অদর্শনে প্রলয় বোধ করেন, তাহা স্ত্রীলোকের কাম্য হইলেও সব সময় সুবিধা বোধ করেন না।

রাইমণি পিত্রালয়ে যাইবার অনুমতি পাইল বটে, তাহার যাইবার দুই দিন পরে স্বামীর চিঠি পাইল। তাহার মর্ম্মার্থ—রাইমণিকে ছাড়িয়া তাহার থাকা একরকম অসম্ভব। যত শীঘ্র পারে, রাইমণি যেন চলিয়া আসে।

এইরূপ ভাবে ১৫ দিনের মধ্যে চারখানা চিঠি রাইমণি পাইল। রমেন্দুসুন্দরের ঘন ঘন নিমন্ত্রণ হইতে লাগিল। শেষ ভালবাসার নিষ্ঠুরতায় রাইমণিকে স্বামিগৃহে চলিয়া আসিতে হইল।

পরবর্ত্তী দুই বৎসরের মধ্যে রাইমণি ১৫ দিন করিয়া পিত্রালয়ে যাইবার ছুটী পাইয়াছিল, তাহাও স্বামীর কতকটা অনিচ্ছাসত্ত্বে। নিষ্ঠুর ভালবাসার প্রকোপে পড়িয়া রাইমণির শরীর ক্রমে অসুস্থ হইতে লাগিল। পরে এই অসুস্থ অবস্থায় দুই বৎসর কাটিয়া গেল। রাইমণির দাদামশাই তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ করিলেন এবং বলিলেন, "রাইমণির শরীর বিশেষ খারাপ হইয়াছে; অতএব তাহাকে পীতাম্বরপুরে লইয়া গেলে সে সুস্থ থাকিবে।"

রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁহার স্ত্রী পুত্রবধূর ভগ্নস্বাস্থ্য দেখিয়া কতকটা রাজি হইলেন, কিন্তু রমেন্দ্রসুন্দরের তাহাতে মত হইল না। সে তাহার পিতাকে বলিয়া সপরিবারে দার্জ্জিলিং যাত্রার ব্যবস্থা করিল। কাযেই রাইমণির পীতাম্বরপুর যাওয়া হইল না। দার্জ্জিলিং গিয়া প্রায় তিন মাস অবস্থানের পরও সেখানে কোন উপকার হইল না, বরং ক্রমে রাইমণির শরীর আরও খারাপ হইতে লাগিল।

তিন মাস পর যখন সপরিবারে রমেন্দুসুন্দর কলিকাতায় আসিল, তখন রাইমণির শারীরিক অবস্থা আরও খারাপ। সে পিতামহকে একখানি চিঠি লিখিল। চিঠিখানি এইরূপ :—

"প্রাণের দাদু,

তোমার প্রাণাধিক রাইমণির পীতাম্বরপুরে যাইবার অতিশয় ইচ্ছা হইয়াছে। পীতাম্বরপুরে তোমার চরণ দর্শন করিলে, সেই স্থানের পারিপার্শ্বিক অবস্থায় আমার শরীর শীঘ্রই সুস্থ হইবে। পীতাম্বরপুরের জল হাওয়ায় আমার জন্ম, বৃদ্ধি ও সুখ। পীতাম্বরপুর দেখিবার জন্য আমার প্রাণ অত্যন্ত আকুল হইয়াছে।" ইত্যাদি।

বৃদ্ধ পীতাম্বর এই চিঠি পাইয়া একবারে আকুল। তিনি মনে মনে সিদ্ধান্ত করিলেন, রামচন্দ্র বাঁড়ুয্যের ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, রাইমণিকে কিছু দিনের জন্য পীতাম্বরপুরে লইয়া আসিবেন। এই সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি কলিকাতায় আসিলেন এবং রাইমণিকে লইয়া যাইবার প্রস্তাব রামচন্দ্র বাবুর কাছে উত্থাপিত করিলেন। তিনি রামচন্দ্র বাবুকে বলিলেন, "দেখুন মহাশয়, স্বামিগৃহ স্ত্রীলোকের কাম্য। সে আপনার বাড়ীতে আছে, আপনার রাজসংসার, এখানে তার কিছু অসুবিধা নাই, তবে ভগ্নস্বাস্থ্যহেতু কিছু দিনের জন্য পীতাম্বরপুরে যাইলে সুস্থ হইবে। আপনি দয়া করিয়া আমার এই ভিক্ষা পূরণ করিবেন।"

অনেক সাধ্যসাধনার পর রমেন্দুসুন্দরের অনিচ্ছা সত্ত্বেও রামচন্দ্র বৃদ্ধ পীতাম্বরের ভিক্ষা পূর্ণ করিলেন।

৫

রাইমণি পীতাম্বরপুরে আসিয়াছে। ছুটীর মেয়াদ তিন হপ্তা হইতে এক মাস। রমেন্দুসুন্দর যাইবার সময় বলিয়াছিলেন, পার ত ১৫ দিন থাকিও, কোনরূপেই এক মাসের বেশী যেন না হয়। পীতাম্বরপুর আসিবার পর কিছু দিন রাইমণি সুস্থ বোধ করিল, কিন্তু উত্তরোত্তর শারীরিক সুবিধা না হইয়া অসুবিধা হইতে লাগিল। স্থানীয় কবিরাজ ও ডাক্তার সকলেই দেখিলেন, কিন্তু কেহ কিছু করিতে পারিলেন না। অবশেষে পীতাম্বর বাবু কলিকাতা হইতে ভাল ডাক্তার আনিলেন। ডাক্তার যান, আসেন, ভিজিট লন, খোসগল্প করেন, নিজের বুদ্ধিমত্তার অনেক গল্প করেন, কিন্তু রোগের কিছু করিতে পারিলেন না। শেষে কলিকাতার ভিষক্‌শ্রেষ্ঠ কবিরাজ-চূড়ামণি জয়জয়রাম মহাশয়কে লইয়া যাওয়া হইল। তিনি প্রথমে যাইয়া বৃদ্ধ পীতাম্বরকে কতকটা কবিয়া লইলেন, বলিলেন, "আপনারা পুরাতন লোক, আপনাদের জাতীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানে বিশেষ আস্থা নাই, নতুবা পূর্ব্ব হইতে আমাকে খবর দেন নাই কেন? বাঙ্গালার জল-হাওয়ায় দেশী ঔষধে উপকার দেয়, বিলাতীতে নয়।" এইরূপ একটি ক্ষুদ্র নাতিদীর্ঘ অভিভাষণ করিলেন এবং পরে বলিলেন, "মহাশয়, আমি রোগ আরাম করিব, কিন্তু সময় অধিক লাগিবে।" ভিজিটে আর ঔষধের দামের নামে যাহা গ্রহণ করিলেন, তাহা পীতাম্বরপুরের জমীদার পীতাম্বর মুখুয্যেব দেওয়া সম্ভব, আর কাহারও নহে। ভিষগ্বর জয়জয়রাম হপ্তায় দুই দিন করিয়া নিজে যান আর দুই দিন প্রধান ছাত্রকে পাঠাইয়া দেন। বড় গাছের আওতায় তাঁহারও ভিজিট কম নহে। তিনি কবিরাজ-শ্রেষ্ঠ জয়জয়রামের তাঁবেদারী না করিলে তিনি যে দর্শনী দাবী করিলেন, তাহার অষ্টম অংশের এক অংশ দাবী করিতে সাহস হইত না। চিকিৎসা জোরে হইতে লাগিল। যে ভাবে পীতাম্বর বাবুর অর্থদণ্ড হইতে লাগিল, তাহার তুল্যাংশে রোগের কোন উপশম হইতে লাগিল না। শেষ হোমিওপ্যাথি আরম্ভ হইল। তাহারও ফল সুবিধাজনক হইল না। রোগের উপশম না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এ দিকে রামচন্দ্র বাবুর নিকট হইতে জোর তাগাদা আসিতে লাগিল। প্রাতঃকালের কলের বাঁশীর ন্যায় একই ডাক, বৌমাকে যত শীঘ্র পারেন, পাঠাইয়া দিন। সংসার অচল, আমার পুত্রবধূ না থাকিলে সংসার কি করিয়া চলে? কিন্তু এই তিন মাসের মধ্যে শ্বশুর-শাশুড়ী কেহই পুত্রবধূকে দেখিতে আসিলেন না। স্বামী তিন চারবার আসিয়াছিলেন, তাহা কেবল বলিবার জন্য, যত শীঘ্র পার, চলিয়া এস।

তিন মাস পরে রামচন্দ্র বাবু একখানি কড়া চিঠি লিখিলেন। পীতাম্বর বাবুকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, যত শীঘ্র পারেন, বৌমাকে পাঠাইয়া দিবেন।

ধৈর্য্যের সীমা আছে। ইহা খোঁড়া ঘোড়ার ন্যায় স্খলিত-গতিতে চলে, কিন্তু অবস্থাবিশেষে চাট মারে। সর্ব্বজনপূজিত পীতাম্বরের আর সহ্য হইল না। প্রাণের অপেক্ষা প্রিয়তমা নাতিনী পীড়ায় ভুগিতেছে, কি হয় কি হয় অবস্থা, অথচ ক্রমাম্বয় শ্বশুরের তাগাদা। পীতাম্বর বাবু জীবনে এরূপ অত্যাচার ও অসৎ ব্যবহার সহ্য করেন নাই। অতি কষ্টে জবাব দিলেন, "আপনার চিঠি পাইয়া বিশেষ সুখী হইলাম। রাইমণি একটু ভাল হইলেই পাঠাইয়া দিব।"

এইরূপ ভাবে আরও দুই মাস কাটিল। রাইমণি তখন শয্যাশায়ী, কিন্তু বাঁড়ুয্যে মহাশয়দ্বয়ের তাগাদায় তাঁহার জীবন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। তখন ডাক্তারী চিকিৎসা হইতেছে। ডাক্তাররা সকলেই বলিল, এ যাত্রা যদি রাইমণি বাঁচিয়া যায়,

অন্ততঃ ছয় মাসের মধ্যে তাহার স্বামিগৃহে যাওয়া হইতেই পারে না। পুনঃ পুনঃ চিঠির প্রহারে পীতাম্বর মুখুয্যে জর্জ্জরিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার ক্রোধের সীমা রহিল না। ক্রোধে, ক্ষোভে ও দুঃখে তিনি ছোট ছেলের স্থায় কাঁদিতে লাগিলেন আর ডাকিতে লাগিলেন, "ভগবান্! এ কি করিলে!"

শেষে এক দিন নিজেই রামচন্দ্র বাবুর বাটী আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং রাইমণির শারীরিক অবস্থার কথা তাঁহাকে জানাইলেন। শেষে যোড়হস্তে রামচন্দ্র বাবুকে বলিলেন, "মহাশয়, দয়া করিয়া আমায় কিঞ্চিৎ সময় দিন।" ডাক্তারদের মতের কথাও তাঁহাকে বলিলেন। ডাক্তারদের মতের কথা শুনিয়া রামচন্দ্র বাবু জ্বলিয়া উঠিলেন। একবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বলিলেন, "মহাশয়, আপনার কাতর প্রার্থনার জন্য আপনাকে এক মাস সময় দিলাম; এই এক মাসের মধ্যে আপনি আপনার আদরের নাতনীকে না পাঠান, আমি আমার পুত্রের বিবাহ দিব।"

পীতাম্বর বাবু আর সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, "মহাশয়, ভগবানের ইচ্ছা এইরূপ।" এই বলিয়া চলিয়া গেলেন। দুই মাসের পর খবর পাইলেন, রামচন্দ্র বাবু তাঁহার পুত্রের বিবাহ দিয়াছেন। শুনিয়া বাড়ীতে হাহাকার পড়িয়া গেল। বড়রাণী, কাত্যায়নী সকলেই কাঁদিতে লাগিলেন। রাইমণি, একে শরীর অসুস্থ, ব্যাধিগ্রস্ত, এই খবর শুনিয়া একবারে অধৈর্য্য হইয়া পড়িল। বালিকা হইলেও সে উচ্চৈঃস্বরে ভগবান্কে ডাকিতে লাগিল; ব্যাধিগ্রস্ত না হইয়া আমি যদি মারা যাইতাম, ইহার অপেক্ষা অনেক ভাল ছিল।

এই নির্ম্মম ব্যবহারে পীতাম্বর বাবু প্রতিজ্ঞা করিলেন, এরূপ অবিবেচক লোকের ঘরে তাঁহার নাতিনীকে আর পাঠাইবেন না।

৬

এইরূপে দুই বৎসর কাটিয়া গেল। রাইমণি এখন ভাল হইয়াছে। স্বামী কি শ্বশুর কেহ খবর লয়েন না। এ দিকে পীতাম্বর বাবু নিজেকে এরূপ অপমানিত বোধ করিয়াছিলেন যে, তিনি স্থির করিলেন, নাতিনীর পুনরায় বিবাহ দিবেন। আত্মীয়-স্বজন সকলেই বলিতে লাগিল, "হিন্দুর মেয়ের কি পুনরায় বিবাহ হয়?" তাহাতে পীতাম্বর মুখুয্যে উত্তর করিলেন—"আমি গোঁড়া বংশধর, আমি জানি, হিন্দুর কি উচিত, কি উচিত নয়। প্রয়োজন হইলে আমার নাতনীকে মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করাইব। কোন এক ভদ্রবংশীয় হিন্দুর ছেলেকে মুসলমান করাইয়া রাইমণির সঙ্গে বিবাহ দিব। আমি যদি শম্ভু মুখুয্যের পুত্র হই, আমার নাতনীকে রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহে পাঠাইব না।"

তাঁহার প্রতিজ্ঞা শুনিয়া সকলেই নিস্তব্ধ, কাহারও আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হয় না। সকলেই মনে মনে বলিতে লাগিল, "ভগবান্! এ কি করিলে!"

ক্রমে পীতাম্বর মুখুয্যের প্রতিজ্ঞার কথা রাইমণি শুনিল। সে পিতামহকে ভালরূপে জানিত। তিনি যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা কোনমতেই ভাঙ্গিবেন না, তাহাকে শ্বশুর-বাড়ী পাঠাইবেন না। সে মনে মনে প্রমাদ গণিল, কিন্তু উপায়ান্তর নাই। পিতামহ পীতাম্বর উচ্চবংশীয় হিন্দু সন্তান খুঁজিতে লাগিলেন, যাহাকে রাজি করিয়া মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া মোসলেম মন্ত্রে দীক্ষিত রাইমণির সহিত বিবাহ দিবেন। এইরূপ হুকুমমত বর খুঁজিয়া পাওয়া বড়ই শক্ত। এইরূপে প্রায় দুই বৎসরকাল কাটিয়া গেল।

রাইমণি গৃহের দ্বিতলস্তরে একটি ঘর পছন্দ করিয়া লইয়াছিল। সেই ঘরেই সে থাকিত। হিন্দু রমণীর পূজাপাঠের জন্য যাহা কিছু জিনিষপত্র লাগে, সবই সেই ঘরে রক্ষিত হইয়াছিল। কৃষ্ণরাধার যুগলমূর্ত্তি, কালীমূর্ত্তি, দুর্গার মূর্ত্তি, সীতার সহিত রামচন্দ্রের মূর্ত্তি, এইরূপ হিন্দুর দেবদেবীর যত মূর্ত্তি—সবই এই কক্ষে রক্ষিত হইয়াছিল। রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, ধূপ, ধূনা, গুগ্গুল ইত্যাদি সুগন্ধ দ্রব্য সেই ঘরে শোভাবর্দ্ধন করিতেছিল।

গত ছয় মাস ধরিয়া রাইমণি সেই কক্ষেই ধূপ-ধূনা, চন্দন, গুগ্গুল ইত্যাদির সাহায্যে পূজাপাঠ করে। শয়ন সেই ঘরেই করে। প্রাতঃকালে স্নান-আহ্নিক করিয়া ঐ গৃহে প্রবেশ করে; বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত পূজা-পাঠ করিয়া বাহিরে আসিয়া কিঞ্চিৎ নিরামিষ অন্ন ভোজন করে। ঐ ঘরের ভিতর অনেক ধর্ম্মপুস্তক ও হস্তলিখিত পুথি সংগৃহীত হইয়াছিল। সুবিধামত রাইমণি ঐ শাস্ত্রগ্রন্থগুলি পাঠ করে।

রাইমণি যে ঐ ঘরের মধ্যে সদাসর্ব্বদা বাস করে, এই কথা পীতাম্বর মুখুয্যে মহাশয় জানিতে পারিয়া এক দিন সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ঐ সুন্দর ঘরে যাহা দেখিলেন, তাহাতে তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন। দেখিলেন, রাইমণি শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তি চন্দন-চর্চ্চিত করিয়া পূজা করিতেছে, আর শির নত করিয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহার নিকট কাতর প্রার্থনা করিতেছে। পিতামহকে দেখিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং শুষ্ক-মুখে একদৃষ্টে শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তির দিকে তাকাইয়া রহিল।

পীতাম্বর।—রাইমণি, এ কি!

রাই।—হিঁদুর মেয়ে, মহারাজ পীতাম্বরের পৌত্রীর যা কর্ত্তব্য, তাই করছে।

পীতাম্বর।—এতে তোর শরীর নষ্ট হয়ে যাবে।

রাইমণি নিরুত্তর।

পীতাম্বর।—উত্তর দাও।

রাই।—পূর্ব্বেকার আর্য্য-কন্যারা সকলেই এইরূপ পূজা-পাঠ ক'রে একরূপ মনের আনন্দেই জীবন কাটিয়ে দিয়েছে।

পীতাম্বর।—(অতি অস্পষ্ট স্বরে) আমি মনে করছিলুম, পুনরায় তোমার বিয়ের বন্দোবস্ত করব।

রাইমণি।—হিঁদুর মেয়ের বিয়ে একবারই হয়, দাদু। বাকি সমস্ত জীবনই সে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে অর্পণ করে।

পীতাম্বর।—তোমার স্বামী তোমাকে এক রকম ত্যাগ করেছে।

রাই।—শ্রীকৃষ্ণ আমাকে ত্যাগ করেন নি। তিনি আমার সম্মুখেই রয়েছেন, আমি তাঁর সেবায় জীবন দিয়েছি।

পীতাম্বর।—তোমার এই অল্প বয়স। এখন হ'তে স্বামীর সাহায্য বিনা কেমন ক'রে জীবন যাপন করবে?

রাই।—হিঁদুর মেয়ের পক্ষে এটা কিছুই নয়, দাদু। হিঁদুর মেয়ে ভোগবিলাসের বিশেষ ধার ধারে না। সব সময় ভোগের জীবন যাপন করে না, ত্যাগেতেও তাদের মহা আনন্দ। স্বেচ্ছাচার অপেক্ষা ত্যাগে মনের তেজ আরও বাড়ে।

পীতাম্বর।—(কাঁদিতে কাঁদিতে) তবে কি তুমি ভাবষ্যৎ জীবনটি এইরূপ ভাবে যাপন করবে?

রাই।—এ কষ্টতেও সুখ আছে। আমি আপনার নিকট একটি ভিক্ষা চাচ্ছি। আপনি বন্দোবস্ত ক'রে দিন, আমি যত দিন বাঁচব, কেউ আমাকে এই ঘরটির অধিকারচ্যুত করতে পারবে না। আমার আহারের জন্য যেন হবিষ্যান্নের বন্দোবস্ত থাকে।

পীতাম্বর বাবু কাঁদিয়া সে স্থান ত্যাগ করিলেন। রাইমণিকে মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া তদনুরূপ কোন হিন্দুর সহিত তাহার বিবাহের মোহ একবারেই পরিত্যাগ করিলেন।

৭

যে দিন তাহার পিতামহের সহিত পূজাকক্ষে রাইমণির সহিত সাক্ষাৎ ও কথোপকথন হয়, সে দিন হইতে ১৬ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। রাইমণি নিজের ঘরে পূজা-পাঠ করে এবং হবিষ্যান্ন ও ফলমূল ভক্ষণের দ্বারা তাহার শরীর রক্ষা করে।

রমেন্দুসুন্দর পুনরায় বিবাহ করিয়াছে। তাহার দুইটি সন্তানও হইয়াছে। মহারাজ পীতাম্বরের স্বর্গারোহণের পর শ্রাদ্ধোপলক্ষে রামচন্দ্রের বাটীতে নিমন্ত্রণ হয়, রামচন্দ্র কিম্বা তাঁহার পুত্র সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন নাই। রমেন্দুসুন্দরের পিতা ক্রোধান্ধ হইয়া তাহার বিবাহ দেন, কাযেই ভাল ঘর হইতে কন্যা পান নাই।

রমেন্দুসুন্দরের এ পক্ষের স্ত্রী অহিতা অতি কুটস্বভাবাপন্না। নিজের সুখশান্তি লইয়াই ব্যস্ত, অপর কাহারও সুখদুঃখের দিকে সে একবারেই তাকায় না, এমন কি, রামচন্দ্রের জন্যও নহে। এ জন্য পিতা-পুত্র দুই জনই দুঃখিত।

রমেন্দুসুন্দরের অনুতাপ-বহ্নি তাহার হৃদয়াভ্যন্তরে জ্বলিতে আরম্ভ হইয়াছে। সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল, নির্দ্দোষ, নিষ্পাপ সহধর্ম্মিণীকে অন্যায় অজুহাতে পরিত্যাগ করিয়া সে অত্যন্ত দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে।

গত চারি বৎসর ধরিয়া রমেন্দুসুন্দর হৃদয়ে এইরূপ অনুতাপ পোষণ করিতেছিল। এক দিন সে মনে করিল, আমি দানব, আমার প্রথমা পত্নী রাইমণি 'দেবী'। সে ক্ষমাশীলা, দয়াবতী, সাধ্বী স্ত্রী, তাহার কাছে দয়াভিক্ষা করিলে কি পাইব না? এইরূপ সন্দেহ-দোলায় দোদুল্যমান হইয়া এক দিন সে পীতাম্বর-পুর গিয়া উপস্থিত। পীতাম্বর জীবিত নাই; কাযেই তাহার এই স্থানে আগমনের দরুণ পীতাম্বরের তরফ হইতে কোনরূপ অভ্যর্থনাদি হইল না। হরিশ্চন্দ্র ও কাত্যায়নী, যে জামাতা বিনা দোষে তাঁহাদের কন্যাকে পরিত্যাগ করিয়া দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিয়াছে, তাহার প্রতি কোনরূপ সহানুভূতি দেখাইলেন না। এত বৎসর ধরিয়া এই পাপিষ্ঠ তাঁহাদের এই কন্যাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, অন্য পত্নী গ্রহণ করিয়াছে। মধ্যে একবার রাইমণির মরণাপন্ন অসুখ হইয়াছিল, সে সময়ে কোন খোঁজ-খবর লয় নাই। এই সব মনে করিয়া, তাহার আগমনে তাঁহারা কেহই সন্তোষের চিহ্ন দেখাইলেন না।

রমেন্দুসুন্দর এ স্থানে যে তাহার আদর নাই, তাহা বেশ বুঝিতে পারিল, তথাপি তাঁহাদের এই ব্যবহার সে গায় মাখিল না। সে রাইমণির সহিত দেখা করিতে চাহে। সে মনে মনে ভাবিল, রাইমণি তাহার কখন অবাধ্য হয় নাই, ছায়ার ন্যায় তাহার অনুসরণ করিয়াছে; তাহার নিজ মনোভাব ব্যক্ত করিবার পূর্ব্বেই তাহার ইচ্ছা পূরণ করিয়াছে, সেই রাইমণি কি এখন তাহাকে ক্ষমা করিবে না? তাহার হৃৎপিণ্ড খুব জোরে জোরে স্পন্দিত হইতে লাগিল। আশা, নিরাশা তাহাকে সন্দেহ-দোলায় দোলাইতে লাগিল।

রমেন্দুসুন্দর সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় ঐ স্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। সে রাত্রিতে তাহার সহিত রাইমণির সাক্ষাৎ করাইবার চেষ্টা করিতে কেহই সাহসী হইল না। পরদিন প্রাতঃকালে রাইমণির প্রাতঃকৃত্য সমাপন হইলে তাহার এক পুরাতন দাসী তাহাকে সংবাদ দিল, জামাইবাবু আসিয়াছেন।

রাইমণি।—জামাইবাবু? জামাইবাবু কে?

দাসী।—কলকাতা হতে রমেন্দু বাবু এসেছেন।

রাইমণি।—কারণ?

দাসী।—আমি জানি নে। খালি আমাকে বললেন—আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

রাইমণি।—প্রয়োজনের কথা কিছু বললেন?

দাসী বলিল, "না।"

রাইমণি।—আচ্ছা, আসতে বল।

পট্টবস্ত্রপরিধানা, চন্দনচর্চ্চিত দেহ, নয়নে সাধ্বীর জ্যোতি, তপোবলে ও মনোবলে সমুজ্জ্বল মুখশ্রী, সম্মুখে পূজার আয়োজন ও পাত্রাদি, ধূপধূনা ও গুগ্‌গুলের গন্ধে মাতোয়ারা গৃহ—এইরূপ অবস্থায় উপবিষ্টা রাইমণির নিকট রমেন্দ্রসুন্দর আনীত হইল। নিশ্চল, নিস্পন্দ—দেখিলে বোধ হয়, নিশ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে—এই অবস্থায় রমেন্দ্রসুন্দর রাইমণিকে দেখিল।

রাইমণি কলের পুত্তলিকার ন্যায় তাহাকে একটা প্রণাম করিল, কিন্তু বসিতেও বলিল না, অন্য কিছু কথাবার্ত্তাও বলিল না। রমেন্দ্রসুন্দরের মনে হইতে লাগিল, রাই কি আমাকে চিনিতে পারিল না? কৈ, এত দিনের পর একটু আদরও করিল না, একটু অভ্যর্থনাও করিল না!

রমেন্দু বলিল, "তুমি কি আমাকে চিনতে পারছ না?"

রাইমণি কোন বাক্যস্ফুরণ না করিয়া খালি ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে, তাহাকে চিনিতে পারিয়াছে।

রমেন্দু।—রাই, তোমার কিছু বলবার নাই?

রাই।—কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে অনেক বলবার ছিল, এখন আর কথা যোগাচ্ছে না। আপনার কিছু বলবার আছে?

রমেন্দু।—আমি তোমাকে আমার বাটীতে নিয়ে যেতে চাই, তুমি সেইখানেই আমার সহিত বাস করবে।

রাই।—অনেক বৎসরের চেষ্টায় বাসনাকে সংযত করেছি। আপনি গুরু হয়ে সে সংযমে কেন বাধা দিতে চান?

রমেন্দু।—আমি এত দিনে বুঝেছি, আমি তোমার প্রতি কু-ব্যবহার করেছি। যত দূর সম্ভব, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই, নিজেকে তোমার কাছে বলি দিতে চাই।

রাই।—আমাকে ক্ষমা করুন। এত বৎসর ধ'রে চেষ্টা ক'রে তবে মনকে সংযমের পথে এনেছি। আমি স্বামী, শ্বশুর-শাশুড়ী, সকলের কথাই ভুলে গিয়েছি। আপনি স্বামী, আমার সম্মুখে ছিলেন না বা আমার কোন খোঁজ-খবর রাখেন নি। আমাকে মঙ্গলের পথে নিয়ে যেতে কোনরূপ সাহায্যই করেন নি, কিন্তু এই জগৎ-স্বামী, (সম্মুখস্থ শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তিকে দেখাইয়া) যখন আপনি বিনা দোষে আমাকে পরিত্যাগ করেছিলেন, তখন তিনি আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন। আপনার কর্ত্তব্য আপনি পালন করেন নি; কিন্তু এই অন্তর্য্যামী আমাকে সকল সময়েই রক্ষা করেছেন। আপনার লালসা কেবল আমার শরীরের উপর, কিন্তু ইনি শুধু আমার কল্যাণই করেছেন। আমার অসুখ, অসুবিধা ও অভাবের দিকে কোনরূপ লক্ষ্য আপনি কোন দিন করেন নি; আর এই জগৎস্বামী—তিনি আমারও স্বামী, আপনারও স্বামী—তিনি আমাকে কখন উপেক্ষা করেন নি। আমার ভোগলালসা মিটে গেছে। আমি সেই ভোগলালসার পথে আর যেতে চাইনে। এক সময়ে আপনি আমার দেবতা ছিলেন, এখন আর আপনাকে সে ভাবে দেখতে পারব না। আপনি নিজ ইচ্ছায় আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন, কখন একবার ফিরেও তাকান নি। আমি জগৎ-স্বামী শ্রীকৃষ্ণের অধিকার হ'তে আপনার অধিকারে আর যাব না। আপনাকেও বলি, আপনি আর পুনরায় রূপমোহে পড়বেন না। আমার সে রূপও নেই, সে বয়সও নেই। হিন্দুর মেয়ের পত্যন্তর হ'তে পারে না—মনে মনে এইটি জেনে আমার প্রতি অন্যায় ব্যবহার করেছেন। আপনি পতি, আপনাকে প্রণাম করি। আপনি আমাকে আর লোভ-লালসায় নিমগ্ন করতে চেষ্টা করবেন না। এতগুলি বৎসর যে ভাবে কেটেছে, বাকি কয় দিনও সেই ভাবেই চ'লে যাবে। তবে এই কথা বলি, ভগবানের রাজ্যে কাকেও নির্ম্মমভাবে ব্যবহার করবে না। দোষ করলেই সাজা ভোগ করতে হয়। আমি এখন অন্যত্র যাচ্ছি, আপনি বাড়ী ফিরে যান। মনে মনে ভাবুন, আপনার প্রথমা স্ত্রী আর ইহজগতে নেই। প্রণাম—চললুম। আর আমার সম্মুখে আসবেন না, থাকবেন না। পরমকরুণাময় শ্রীকৃষ্ণ আপনার মনে শান্তি দিন, আপনার মঙ্গল করুন।

এই বলিয়া রাইমণি সে স্থান পরিত্যাগ করিল।

রমেন্দ্রসুন্দর কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় কয়েক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইয়া রহিল। পরে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "হিঁদুর ঘরে এরূপ হয়!" এই বলিয়া আস্তে আস্তে সেই স্থান পরিত্যাগ করিল।

শ্রীতারকনাথ সাধু (রায় বাহাদুর)।

স্বস্থতা ও স্বরাজ

প্রবন্ধের শিরোভাগে যে দুইটি শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে, সর্ব্বাগ্রে তাহার অর্থ সকলের অনুধাবন করা উচিত। তাহার কারণ—এই শব্দ দুইটির অর্থ নানা জনে নানারূপ বুঝিয়া থাকেন। সাধারণতঃ স্বস্থতা শব্দে নিরুদ্বিগ্নতা এবং নীরোগ অবস্থা বুঝায়। এই স্বস্থ অবস্থাকে স্বাস্থ্য বলে। কিন্তু ঠিক এই অর্থে আমি এই শব্দ এই প্রবন্ধে প্রয়োগ করি নাই। স্বস্থতা শব্দের আরও অনেক অর্থ আছে। সংস্কৃত ভাষায় সেই সকল অর্থে উহার ভূরি প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—স্বস্থতা অর্থে স্থিরত্ব, সমাহিতচিত্ততা, স্বাচ্ছন্দ্য ইত্যাদি। আজকাল বাঙ্গালায় ঐরূপ একটা অর্থে এই শব্দের ভূরি প্রয়োগ দেখা যাইতেছে। কিন্তু সেরূপ ভাবে উহার প্রয়োগ হইতেছে, তাহাতে উহার অর্থ যেন কেমন অস্পষ্ট রহিয়া যাইতেছে। শব্দার্থ কতকটা অস্পষ্ট থাকিলে শব্দপ্রয়োগকর্ত্তার মনের ভাব স্পষ্টভাবে বুঝা যায় না। সেই জন্য আমি শব্দ দুইটির অর্থ একটু পরিষ্কার করিয়া দিবার চেষ্টা করিলাম।

স্বস্থতা শব্দটি আমি মৌলিক অর্থেই ব্যবহার করিয়াছি। স্বস্থ অর্থে আপনাতে, অর্থাৎ যাহা কিছু নিজস্ব, তাহাতে অবস্থিত বুঝায়। সুতরাং নিজস্বকে অথবা যাহা কিছু আপনাদের বৈশিষ্ট্য, সেই সমস্তকে পরিহার না করিয়া, নিজস্বকে বিকাইয়া না দিয়া, তাহার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকাকে স্বস্থতা বলা যায়। ইহার অর্থ যে, আমার প্রকৃতিতে, আমার স্বভাবে, আমি যদি অবিচলিত থাকি, যাহা কিছু আমার নিজস্ব, তাহাই যদি আমার জাতীয় জীবন-প্রবাহ বিকাশের বেদিকা হয়, যদি পরস্ব কিছু লইতেই হয়, তাহা হইলে তাহাকে আমার নিজস্বের সহিত যদি আমি সমঞ্জসীভূত করিয়া লইতে পারি, তাহা হইলে আমার সেই অবস্থাকে স্বস্থ অবস্থা বলা যাইতে পারে। সেই অবস্থাকে বা ভাবকে আমরা স্বস্থতা বলিতেছি। মনে করুন, কোন একটি ব্যাঘ্র এক সাধুকে মারিয়া তাহার রক্ত এবং মাংস ভোজন করিয়া স্বীয় দেহের শোণিতাদি বৃদ্ধি করিল, কিন্তু ব্যাঘ্র-পাকস্থলী হইতে উহা যখন ব্যাঘ্রদেহে প্রবেশ করিল, তখন সাধুর শোণিত সেই ব্যাঘ্রের দেহের কোন্ শোণিত-কণিকা বৰ্দ্ধিত করিয়া দিয়াছে, দেহের কোন্ অংশের কোন্ মাংস কতটুকু বাড়াইয়াছে, তাহা বুঝিবার উপায় থাকে না। সাধুর দেহ তখন ব্যাঘ্রদেহে পরিণত হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ ব্যাঘ্র সাধুকে নিজস্ব করিয়া লইয়াছে। তাহার সেই সাধুভাব ব্যাঘ্রের হিংসা-ভাবেরই পোষক হইয়া পড়িয়াছে। পরস্বকে এইরূপ ভাবে স্বীকরণের শক্তি (power of assimilation) স্বস্থতার বা স্বাস্থ্যের লক্ষণ। ইহাতে মনে রাখা আবশ্যক যে, যে জাতি যত দিন তাহা স্বচ্ছন্দে পারে, অতিভোজনের মত জোর করিয়া অপরের প্রতিষ্ঠান, সিদ্ধান্ত প্রভৃতি গ্রহণ করিতে বাধ্য না হয়, সে জাতির স্বস্থতা বা স্বাস্থ্য তত দিন সম্পূর্ণ অটুট থাকে। কিন্তু পরিপাকশক্তিকে অতিক্রম করিয়া অতিরিক্ত ভোজন যেমন রোগের মূল এবং অস্বাস্থ্যের নিদান, সেইরূপ অন্য জাতির জীবন-বিকাশের সহায়ক প্রতিষ্ঠান, রীতি-নীতি প্রভৃতি প্রয়োজনমতে ঠিক নিজস্ব করিয়া লইবার শক্তির অভাব সত্ত্বেও জোর করিয়া উহা গ্রহণে জাতীয় জীবনের বিষম ক্ষতি হইয়া থাকে। এখানে এই কয়টি কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে। নিতান্ত প্রয়োজন না পড়িলে পরপ্রতিষ্ঠানাদি গ্রহণ করিতে নাই। দ্বিতীয়তঃ উহা গ্রহণ করিতে হইলে এমন ভাবে উহা লইতে হইবে যে, উহা যেন আমাদের জাতীয় জীবনের ধাতু-প্রকৃতির সহিত সম্পূর্ণভাবে খাপ খাইয়া যায়, আমাদের নিজস্বকে বিকাইয়া না দেয়। স্বজাতীয় চিরাচরিত আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি যদি আমাদের দৃষ্টিতে কতকটা হীন বলিয়াও মনে হয়, তাহা হইলেও তাহা বর্জ্জন করিয়া যাহা পরস্ব অর্থাৎ পরের আচার-ব্যবহার, তাহা গ্রহণ করা উচিত নহে। উহা করিলেই বিপদে পড়িতে হয়। সেই জন্য গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন :—

> "শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
> স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥"

অর্থাৎ স্বীয় ধর্ম্ম যদি একটু মন্দও হয়, তাহা হইলে তাহা অবলম্বন করিয়া থাকাই ঠিক, তথাপি পরধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা ঠিক নহে। স্বধর্ম্মে থাকিয়া যদি মরিতে হয়, তাহা হইলে সে মরণও ভাল। কারণ, পরধর্ম্ম ভয়াবহ অর্থাৎ বিনাশের কারণ। এখন "স্বধর্ম্ম" আর "পরধর্ম্ম" এই দুইটি শব্দ অনেকের পক্ষে বুঝা কঠিন হইয়াছে। ধর্ম্ম অর্থে যাঁহারা কেবলমাত্র Religion বা উপাসনাতত্ত্ব বুঝেন, তাঁহারা এই শ্লোকের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝেন বলিয়া মনে হয় না। হিন্দুর দৃষ্টিতে আচারও ধর্ম্ম, শুধু ধর্ম্ম নহে,—পরমধর্ম্ম। * সুতরাং অন্যের আচারাদি গ্রহণ করিলে পরিণামে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে এবং পিতৃপুরুষের আচার ত্যাগ

---

* আচারঃ পরমো ধর্ম্ম আচারঃ পরমং তপঃ।
আচারাৎ বৰ্দ্ধতে আয়ুরাচারাৎ পাপসংক্ষয়ঃ।
বিষ্ণু এবং বশিষ্ঠ উভয়েই এই কথা বলিয়াছেন।

করিলে পরিণামে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতেই হয়। কথাটা শুনিলে আজকালকার যুগের শিক্ষাভিমানী ব্যক্তিরা বোধ হয়, হাসিয়াই খুন হইবেন, কিন্তু তাঁহারা যদি একটু অনুধাবন করিয়া দেখেন, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবেন যে অপর দেশীয় বুধগণও স্বাধীনভাবে গবেষণা করিয়া ভিন্নদেশীয় লোকের আচার অনুষ্ঠান গ্রহণ যে অনিষ্টজনক, এই সিদ্ধান্তই করিয়াছেন। যেন তেন প্রকারেণ বিক্ষিপ্তভাবে পরের আচার গ্রহণ করিলে যে তাহাতে অনিষ্ট হইতে পারে, তাহা একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায়।

মানুষের সূতিকাগৃহ হইতে শ্মশান পর্য্যন্ত জীবনকে বিচ্ছিন্ন করিয়া তৎসম্বন্ধে বিচার করিলে বিষম ভুল করা হয়। সংসারে যত মানুষ জন্মগ্রহণ করে, তাহাদের মধ্যে কেহই এক একটি বিক্ষিপ্ত জীব হিসাবে জগতে আইসে না,—প্রত্যেকেই এক একটি জৈব ধারার অভিব্যক্তি হিসাবে জগতে আত্মপ্রকাশ করে। প্রত্যেক মানুষেই তাহার বংশধারার গুণ ও দোষ, অভ্যাস ও প্রকৃতি গর্ভিত (latent) অবস্থায় থাকে। অনুশীলনের এবং অভ্যাসের দ্বারা তাহা বিকশিত করা সম্ভব হয়। কখনও কখনও দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন বংশধারায় এক একটা লোক এমন জন্মে যে, সে তাহার বহু পুরুষ পূর্ব্বকার কোন এক পূর্ব্বপুরুষের হুবহু অনুরূপ। ৪ পুরুষ ৫ পুরুষ, এমন কি, ৭।৮ পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী পুরুষের বংশধারায় পুনরাবর্ত্তন প্রায় অনেক বংশে ঘটে। বংশধারা যদি অনাবিল থাকে,—উহাতে যদি যৌন দোষ বা বর্ণসঙ্করত্ব না ঘটে, তাহা হইলে সকল বংশেই ঐরূপ ঘটিয়া থাকে। ইহাকে ইংরাজী বৈজ্ঞানিকরা Atavism বলিয়া থাকেন। বাঙ্গালায় উহাকে 'পূর্ব্বাপাত' বলা যাইতে পারে। এ কথা আমার অন্য সময়ে বিশদভাবে বলিবার প্রয়োজন হইতে পারে। এখানে এইমাত্র বলিতে চাহি যে, প্রত্যেক মানুষই তাহার পূর্ব্বপুরুষের অনুবর্ত্তিত আচার অনুষ্ঠান প্রভৃতির ফলস্বরূপ কতকগুলি প্রবণতা (proneness) লইয়া জন্মগ্রহণ করে। সেই প্রবণতাকে একবারে উপেক্ষা করিয়া সাধনা করিলে সে সাধনায় সিদ্ধিলাভ সম্ভবে না। বিজাতীয় আচার গ্রহণ করা যে অত্যন্ত দোষের, ইহা কোন কোন মনস্বী পাশ্চাত্য পণ্ডিত স্বাধীনভাবে তথ্যানুসন্ধান করিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন। বিলাতে স্বনামধন্য যুক্তিবাদী হার্ব্বার্ট স্পেন্সার বলিয়াছেন,—অন্য জাতীয় আচার অর্থাৎ বিজাতীয় আচার গ্রহণ করা অতিশয় দোষাবহ। মানুষ পুরুষ-পুরুষানুক্রমে যে আচারের অনুবর্ত্তন করে, তাহা তাহাদের পক্ষে ক্ষেমঙ্কর হইয়া থাকে,—তাহা ত্যাগ করিয়া বিজাতীয় আচারগ্রহণ ক্ষতির কারণ হইয়া পড়ে। * আমাদের দেশের ইংরাজী-শিক্ষিত ব্যক্তিগণ জাতীয় আচার-অনুষ্ঠানকে বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন না। ইহাতে তাঁহাদের চিন্তাশক্তির অভাব এবং জ্ঞানের দৈন্যই প্রকাশ পায়। আমাদের দেশের লোক যতই আচারভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছে, ততই তাহাদের প্রতিভা, মনীষা প্রভৃতি লোপ পাইতেছে। ইহার কারণ—আচারলোপ হেতু উহারা স্বস্থ হইতে পারিতেছে না।

অনেকেই বোধ হয় অবগত আছেন যে, কোন কোন ব্যক্তি বাম কাতে, কেহ বা দক্ষিণ কাতে শুইয়া নিদ্রা গিয়া থাকেন। যাঁহার বাম কাতে শুইয়া নিদ্রা যাওয়া অভ্যাস, তিনি যদি কোন কারণে ডাইন কাতে শুইয়া নিদ্রা যাইতে বাধ্য হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার সহজে নিদ্রা আসে না। কেন এমন হয়, তাহার কোন বিশেষ কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। উহা অভ্যাসজনিত। এই অভ্যাসের ফল অত্যন্ত সুদূরগামী হইয়া থাকে। অভ্যাস কেবল ব্যক্তিগত হয় না, উহা বংশগত এবং গোষ্ঠীগতও হইয়া থাকে। মানুষ বংশপরম্পরাক্রমে যে সকল আচার পালন করিয়া থাকে, সেই সকল আচারে তাহারা বংশ হিসাবে, জাতি হিসাবে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে। তাহাতে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেই তাহারা স্বস্থ থাকে। উহাই হইল তাহাদের (constitutional adaptation)। বংশগত আচার বর্জ্জন করিলেই মানুষকে বিপদে পড়িতে হয়। বিশেষ নবগৃহীত আচার যদি তাহার পুরুষপরম্পরাগত আচারের বিরোধী হয়, তাহা হইলে অনিষ্ট অত্যন্ত অধিক হইয়া থাকে। বংশগত অভ্যাস মানুষের আন্তর ও বাহ্য প্রকৃতিকে সেই অভ্যাসের

*Any one variety of creatures in course of many generations acquires a certain constitutional adaptation with particular form of life and every other variety similarly acquires its own special adaptation. The consequence of that is, if you mix the constitution of two widely divergent varieties which have severally become adapted to widely divergent modes of life, you get a constitution which is adapted to the mode of life of neither, a constitution which will not work properly because it is not fitted for any set of conditions whatever.

মনুও বলিয়াছেন—

"সর্ব্বলক্ষণহীনোঽপি যঃ সদাচারবান্নরঃ।
শ্রদ্দধানোঽনসূয়শ্চ শতং বর্ষাণি জীবতি।"

একটা প্রবণতা (proneness) সৃষ্টি করিয়া দেয়। উহা মানুষের যেন প্রকৃতিগত হইয়া দাঁড়ায়। ব্যক্তিগত অভ্যাস যেমন কতকটা দ্বিতীয় প্রকৃতির মত হইয়া থাকে, জাতিগত ও গোষ্ঠীগত অভ্যাসও সেইরূপ অনেকটা জাতীয় প্রকৃতির মত হইয়া দাঁড়ায়। সেই অভ্যাস বা বংশগত আচার বর্জ্জন করিলে আন্তর ও বাহ্য প্রকৃতিতে গুরু আঘাত লাগে। সেই জন্য আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, আমরা যতই আচার-ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছি, ততই যে কেবল আমাদের প্রতিভা, মনীষা প্রভৃতি ক্ষুদ্র হইয়া পড়িতেছে, তাহা নহে, পরন্তু আমাদের আয়ুষ্কাল হ্রাস পাইতেছে। আমাদের শাস্ত্রকারগণ সেই জন্য আচার অর্থাৎ কৌলিক আচারকে দীর্ঘায়ুলাভের কারণ বলিয়াছেন। আজকালকার শিক্ষিত সম্প্রদায় এই বিষয়ে কোনরূপ অনুসন্ধান বা গবেষণা করেন না বলিয়া তাঁহারা এই বিষয়ে অজ্ঞ রহিয়াছেন এবং সেই জন্যই তাঁহারা অহমিকার বশবর্ত্তী হইয়া ইহা কুসংস্কার বিজৃম্ভিত কথা বলিয়া মনে করিতেছেন। কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন যে, বাহ্য প্রকৃতির বা বাহ্য অবস্থার সহিত দেহমনের সামঞ্জস্যসাধনই জীবনের একটা বড় কায। জীবমাত্রই যেমন অলক্ষ্যে বাহ্য প্রকৃতির সহিত আপনাদের জৈবনিক কার্য্যকে সমঞ্জসীভূত করিয়া লয়, না করিতে পারিলে তাহারা আপনারা ধ্বংস হইয়া যায়, সেইরূপ মানুষ যুগযুগান্তর ধরিয়া যে সকল আচার-অনুষ্ঠান পালন করিয়া থাকে, সেই আচার-অনুষ্ঠানের সহিত তাহাদের দেহ এবং প্রকৃতির অলক্ষ্যে একটা সামঞ্জস্য সাধিত হইয়া যায়। তাহাকেই হার্ব্বার্ট স্পেন্সার constitutional adaptation বলিয়াছেন। উহা অনেকটা বাহ্য প্রকৃতির সহিত জীবজীবনের সামঞ্জস্যসাধনের সমপর্য্যায়ভুক্ত। উহা নষ্ট বা পরিহার করিলে জীবের আয়ুঃ, স্বাস্থ্য ও প্রতিভা প্রভৃতি ক্ষুণ্ণ হইয়া যায়। সেই জন্য আমরা দেখিতে পাই যে, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, বিধবা প্রভৃতি যাঁহারা চিরাগত আচারানুষ্ঠান প্রতিপালন করিয়া চলেন, তাঁহারা দীর্ঘায়ু হইয়া থাকেন। অনেক স্থলেই দেখা যায় যে, আচারনিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের বংশেই প্রতিভাশালী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। এই আচারাদি প্রতিপালন করিলেই মানুষ সুস্থ হইতে পারে। স্বীয় কৌলিক অবস্থায় সুপ্রতিষ্ঠ থাকার নামই স্বস্থতা। স্বস্থ না হইলে জাতীয়তা রক্ষা হয় না। জাতীয়তা রক্ষিত না হইলে স্বরাজলাভ সম্ভবে না।

এখন জিজ্ঞাস্য, স্বরাজ কাহাকে বলে? মহাত্মা গন্ধী প্রথমে স্বরাজলাভই আমাদের লক্ষ্য, এই কথা প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বরাজ বলিতে কি বুঝায়, তাহা তিনি বহুদিন বুঝাইয়া দেন নাই। সাধারণ লোক স্বরাজ অর্থে স্বাধীনতাই বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু স্বরাজ শব্দে ঠিক স্বাধীনতা (Independence) বুঝায় কি না সন্দেহ। স্ব শব্দে আপনাকে বুঝায় আর "রাজ" ধাতুর অর্থ দীপ্তি পাওয়া। স্বরাজ অর্থে আপনাতে দীপ্তি পাওয়া। স্বস্থ থাকিয়া মানুষ যে অবস্থাতে দীপ্তি পায় বা উদ্ভাসিত হইয়া উঠে,—অর্থাৎ উন্নতির পথে ধাবিত হইয়া থাকে, সেই অবস্থাকে স্বরাজ বলা যায়। পরাধীন অবস্থায় স্বরাজ পাওয়া সম্ভবে না। কারণ, অন্য ব্যক্তি বা পৃথক্ জাতি প্রভৃতি যদি তাহাদের খোসখেয়াল অনুসারে আর এক ব্যক্তি বা জাতির আচার-অনুষ্ঠান এবং তাহাদের ভাবধারা নিয়ন্ত্রিত করে, তাহা হইলে সেই শেষোক্ত ব্যক্তি বা জাতি স্বরাজ লাভ করিতে পারে না। স্বরাজ লাভ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে মানুষকে স্বস্থ থাকিতে হইবে,—অর্থাৎ আপনাদের কৌলিক ভাবধারায় সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিয়া এমন অবস্থার সৃষ্টি করিতে হইবে যে, তাহাতে যেন তাহারা দীপ্তি পাইতে অর্থাৎ ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে। স্বস্থতায় আড়ষ্টভাব থাকিতে পারে, কিন্তু স্বরাজ লাভ করিতে হইলে স্বস্থতায় সমস্ত আড়ষ্ট ভাব পরিহার করিয়া উহাতে উন্নতিসাধনের অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করিতে হইবে। তবে এ কথাও খুবই সত্য যে, জীবনীশক্তির সহিত সচলভাব বা প্রগতিশীলত্ব নিত্য সম্বন্ধযুক্ত। যেখানে জীবনীশক্তি প্রবল, সেইখানেই একটা গতিশীলত্ব বা প্রগতিশীলত্ব যেন অঙ্গাঙ্গিভাবে অবস্থিতি করে বলিয়া বোধ হয়। শিশুর জীবনীশক্তি অত্যন্ত প্রবল। সেই জন্য তাহাতে একটা প্রবলগতিশীলত্ব বা প্রগতিশীলত্ব লক্ষিত হইয়া থাকে। তাহার ফলে তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি এবং মানসী শক্তি দ্রুত বৃদ্ধি পায়। শিশু অতি প্রবলভাবে রোগের সহিত যতটা যুঝিতে পারে, বৃদ্ধ ততটা পারে না। সেইরূপ যে সমাজের জীবনীশক্তি যত প্রবল, সে সমাজ ততই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ। আসল কথা, স্বস্থতার সহিত প্রবল জীবনীশক্তির সংযোগ হইলেই স্বরাজলাভ হইয়া থাকে। স্বরাজলাভ সহজ নহে।

সুতরাং স্বরাজের মূল কথা স্বস্থতা। সেই স্বস্থতাকে মৃতবৎ আড়ষ্ট করিলে চলিবে না,—উহাকে সজীব বস্তুর ন্যায় প্রগতিশীল করিতে হইবে। এ কথা সত্য। কিন্তু তাহা বলিয়া বিভিন্ন সভ্যতা-সৌধের কতকটা মালমশলা বা উপকরণ আনিয়া আমাদের সভ্যতার সহিত জোড়তালি দিলে তাহার দ্বারা পুরাতন সমাজকে প্রগতিশীল করা সম্ভব হইবে না। জীবনীশক্তি অন্তরের বস্তু। ভিতর হইতেই উহার শক্তি বৃদ্ধি করিতে হয়। বৈরাগীর আলখাল্লার মত জোড়তালি দিয়া একটা সভ্যতা খাড়া

করিলে, সেই সভ্যতার জীবনীশক্তি অতিশয় প্রবল হইবে, ইহা মনে করাই ভুল। আজকাল আমাদের দেশের এক শ্রেণীর লোক দেখা দিয়াছেন,—যাঁহারা সংযোগিত বা সংশ্লেষিত সভ্যতার (Synthetic Civilization) নামে একবারে জ্ঞানহারা হইয়া উঠেন। সংযোগিত সভ্যতা নামটি গালভরা। আপাততঃ দৃষ্টিতে উহা ভাল বলিয়াই মনে হইতে পারে; কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, পরস্পর বিভিন্ন ভাবের, বিভিন্ন প্রকৃতির এবং বিভিন্ন মালমশলা দিয়া গঠিত বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী সভ্যতার কিছু কিছু অংশের সংশ্লেষণ দ্বারা একটি সজীব এবং প্রগতিশীল সভ্যতা গড়িয়া তোলা যায় না। পরস্পর বিভিন্ন প্রকৃতির, বিভিন্ন ছাঁচের, বিভিন্নধর্ম্মা সভ্যতার সামঞ্জস্য-সাধন পূর্ব্বক একটা অখণ্ড সতেজ সভ্যতা গঠন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। উহা স্বস্থতাবিহীন একটা বিকৃত ব্যাপার হইবেই হইবে। আমাদের দেশের এক জন বিশিষ্ট চিন্তাশীল ব্যক্তি বলিয়াছেন যে, পাশ্চাত্য সভ্যতার সহিত আমাদের সভ্যতার সামঞ্জস্যসাধন পূর্ব্বক সংযোগ করা সম্ভবে না। উহা করিতে হইলে সমাজকে ও সভ্যতাকে একবারে ভাঙ্গিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। পাশ্চাত্য সভ্যতা এখন সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ হইয়া উঠে নাই। পাশ্চাত্য সভ্যতার অভিসন্ধি, ধরণ এবং উপকরণ আমাদের সভ্যতার অভিসন্ধি, ধরণ এবং উপকরণ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলিয়া উহার কিয়দংশ আমাদের সভ্যতা শরীরে অনুপ্রবিষ্ট করিয়া উহার অখণ্ডত্ব রক্ষা করা অসম্ভব। এ সম্বন্ধে জনৈক বিশিষ্ট চিন্তাশীল এবং সুপণ্ডিত ব্যক্তির মন্তব্য আমি পাদ-টীকায় উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। *

এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, আমাদের এই সভ্যতার সহিত য়ুরোপীয় সভ্যতার পার্থক্য অত্যন্ত অধিক। শান্তির প্রতিষ্ঠাই এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক ইষ্টলাভই আমাদের সভ্যতার মূল লক্ষ্য। সকলে শান্তিতে থাকিয়া আপন আপন আধ্যাত্মিক কল্যাণসাধন যাহাতে করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যেই এই সভ্যতা পরিকল্পিত হইয়াছে। যুগ-যুগান্তর ধরিয়া সেই সভ্যতায় তাহার উদ্দেশ্য অতি সুন্দরভাবে সাধন করিয়া আসিতেছে। ইহার কতকগুলি প্রতিষ্ঠানের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিকৃতি ঘটিয়াছে সত্য, কিন্তু সেই বিকৃতি এখনও এত গুরু হয় নাই যে, তাহাকে একবারে উচ্ছেদ করা আবশ্যক হইয়াছে। আমাদের বিকৃত দৃষ্টিতে উহাকে যতটা বিকৃত বলিয়া মনে হইতেছে, উহা ততটা বিকৃত হয় নাই। হাতে একটা ফোড়া বা নালী হইলেই আর কিছু বিবেচনা করিয়া যে হাত কাটিয়া ফেলিতে হইবে, ইহা সুবুদ্ধির কথা নহে। মনে রাখিতে হইবে যে, এই ভারতই মানব-জাতির আদি বাসস্থান এবং মানব-সভ্যতার আদি বিকাশস্থান। † এখানকার সভ্যতাকে উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে। যুগ-যুগান্তর ধরিয়া এখানে যে সভ্যতা স্বাভাবিকভাবে গজাইয়া উঠিয়াছে, তাহাই পৃথিবীর সকল সভ্যতার মূল বনিয়াদ। দেশ-কাল-পাত্রভেদে সেই সভ্যতা হয় ত নানা আকার ধারণ করিয়াছে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক অবস্থার ও পারিপার্শ্বিকতার সহিত আপনাদিগের জীবনগতিকে সমঞ্জসীভূত করিয়া লইবার জন্য বিভিন্ন দেশবাসী মানবজাতি তাহাদের সামাজিক, ব্যবহারিক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান-গুলি এবং রীতি-নীতিগুলি অনেক বিফলতার ভিতর দিয়া সফল করিয়া তুলিতে পারিয়াছে। তাহা তাহাদিগের পক্ষে অনুকূল হইলেও অন্যের পক্ষে অনুকূল না হইতে পারে। সুতরাং ভর্জ্জিত-মৎস্যান্বেষী মার্জ্জারের মত পরকীয় সামাজিক ও ব্যবহারিক

*If for the sake of argument, it be assumed, that there is a good deal in the Western structure which it is desirable to incorporate with ours, the incorporation cannot be compassed without demolishing the latter and building anew. That however would be altogether different from what we understand by synthesis. It is possible to adopt Western methods to some extent in the repairs, which the Indian structure needs periodically, but it is impossible to adopt Western design, Western style and Westsrn materials in the main body of the structure, without disfiguring, if not destroying it altogether. (Vide Mr. P. N. Bose's Swaraj—Cultural and Political, Page 237—38).

†In a recent lecture delivered by Prof. Sir Arthur Keith at the Royal Institution, he has expressed his opinion, shared by many modern anthropologists, that the cradle-land of humanity, was situated near or within Northern frontiers of India where the finds of fossil remains of extinct kinds of anthropoid apes have been numerous, though, so far, no trace of fossil man has been discovered. (RigVedic Culture P. 116).

প্রতিষ্ঠানগুলি গ্রহণ করিবার জন্য লোলুপ হইলে ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টই অধিক হয়। এইরূপ ভাবে পরকীয় জীবনযাত্রাপদ্ধতির অনুকরণফলে আমাদের কি দুর্গতি হইয়া দাঁড়াইতেছে, তাহার লক্ষণ দিকে দিকে সুপ্রকাশ। আমরা যতগুলি প্রতিষ্ঠান চালাইতে বসিয়াছি,—তাহার যেগুলি য়ুরোপীয় ভাবাপন্ন ভারতবাসীর দ্বারা পরিচালিত হইতেছে, তাহার সকলগুলিই যেন কেমন এলাইয়া পড়িতেছে। আমাদের মধ্যে খাঁটি মানুষ অতি অল্পই দেখা দিতেছে। যে দুই দশ জন প্রকৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিতেছেন, তাঁহারা প্রায় নিষ্ঠাবান্ পরিবারে ও বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। যে পরিবার বহু পুরুষ ধরিয়া স্বস্থ এবং সদাচারসম্পন্ন, সে পরিবারের কোন ব্যক্তি যদি দুই এক পুরুষ আচার-ভ্রষ্ট হয়, তাহা হইলেও তাহাদের কৌলিক শক্তি বা বংশগত বীজশক্তি বিশেষ ক্ষুণ্ণ হয় না।

আসল কথা, যদি স্বরাজ লাভ করিতে হয়, তাহা হইলে প্রথমে স্বস্থ হইতে হইবে, তাহা হইলে স্বরাজলাভ সম্ভব হইবে। স্বরাজলাভের সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রবল ও কর্ম্মশক্তি আপনিই ফুটিয়া উঠিবে। নতুবা বিজাতীয় ভাবধারা লইয়া কার্য্য করিতে যাইলে আমরা কখনই সাফল্যলাভে সমর্থ হইব না। জগতের নিকট ভারতের দান নিতান্ত অল্প ছিল না। এখনও জড়বাদী য়ুরোপকে ভারতের অনেক বিষয় শিক্ষাদান করিবার রহিয়াছে। কিন্তু আজ অধঃপতিত, পরানুচিকীর্ষু এবং য়ুরোপের মন্ত্রশিষ্য ভারতের উহা দান করিবার সামর্থ্য নাই। সেই জন্য ভারতকে স্বস্থ হইতে এবং স্বরাজ লাভ করিতে হইবে। তাহা হইলেই ভগবৎকৃপায় ভারত নির্ব্বেদগ্রস্ত পৃথিবীকে তাঁহার বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট মন্ত্রদানে শান্তির ও পূর্ণতার প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইবে। ভারতের এ কথা আর ভুলিয়া থাকিলে চলিবে না।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)।

শরতে মোর বর্ষা ঘনায়

দুই চোখে মোর বর্ষা ঘনায় আজ শরতের পয়লা দিনে।
বাদল-ধারে ডুবল যে পথ—কেমন ক'রে চলব চিনে ?
পঁচিশ শরৎ কাট্‌ল যে মোর একটানা হায় মেঘ-আঁধারে ;
রবির কিরণ চাঁদের হাসি আমারে কি চেনেই না রে !

ভোরের আলোয় ফুলের কলি কেমন ক'রে চক্ষু মেলে,
কোন্ সে খেলা দখিণ হাওয়া সন্ধ্যা নীপের সঙ্গে খেলে ;
দিন দুপুরে জ্যোছনা-রাতে নিজন বনে কাহার লাগি,
চকোর ঘুঘু কাঁদে এমন রাত্রি দিনের পহর জাগি ;

আকাশের ওই নীল নয়নে অসীম লোকের কোন্ বারতা,
রাতের তারার চোখে চোখে ঘুরে বেড়ায় কোন্ সে কথা ;
কানন রাণী কাজলা আঁচল ছড়িয়ে দিয়ে নদীর ধারে,
সাঁজ সকালে কাহার ধ্যানে রয় গো চেয়ে ওই ও-পারে ?

সে সব কথা রইল মনেই—দেখে ভেবে বুঝতে পারি,
এমন কপাল নয়ক' আমার—চোখের জলেই দিন সাঁতারি !

* * * *

কেউ যদি কয় রূপ-সায়রে ঢেউ লেগেছে পদ্মবনে,—
চাইতে গিয়েই দেখি খোকা কাঁপছে জ্বরের শিহরণে।
যে দিন ভাবি—"উর্ব্বশীটা" পড়ব আজ এমন প্রাতে,
মহাজনের সঙ্গে সে দিন কাট্‌ল সুদের বচসাতে।

কষ্টে এনে রঙীন সাড়ী বনবে ভাবি প্রিয়ার রং-এ,
হাঁকেন প্রিয়া, শূন্য হাঁড়ি,—ভরবে কি পেট তোমার ঢং-এ ?
পুজোয় কিছু পেলাম বোনাস্, ভাবলাম এবার গুছিয়ে নেবো ;
কাল কলেরায় গেলেন প্রিয়া, আজকে খোকাও বল্‌ছে যাবো !

আজকে কমল শিউলি বনে পড়ছে মধুপ প্রেম-গীতা,—
সামনে আমার নদীর ধারে জ্বলছে প্রিয়ার শেষ চিতা !
আজকে পুজোর আকাশ ভরা আগমনীর সেই সুরে,
কে দেবে হায় চোখে আমার আজ দু-ফোঁটা জল পুরে ?—

সাঁঝের কালো কোমল কোলে পড়লে ঢলে' ক্লান্ত রবি,—
কাল কি তোমার সাথে আবার হেরব প্রিয়ার সেই ছবি ?
তিমির লোকের ও-পার গিয়ে আজকে বঁধু বলো তারে,—
বিধির ভোলা এই অভাগায় সেও যেন হায় ভোলে না রে ॥

শ্রীঅমূল্যকুমার রায় চৌধুরী (বি, এল)।

সীতা

বৈশাখ মাস। কুমারী মেয়েদের শিবপূজার একটা মহা-পর্ব্ব। বোসেদের মস্ত পরিবার। বাড়ীতে গণ্ডার উপর অবিবাহিতা, কিশোরী ও বালিকা আছে; হর-পূজায় মনোমত বরের কামনা এই পুণ্যাহ মাসটিতে সকলেই করিবে। ঠাকুরঘরে স্থানের সঙ্কুলান হইবে না বলিয়া জননীরা বলিলেন, "উত্তরের ঘেরা ছাদটায় যা তোরা।"

কুমারীরা বুঝিতে পারিল, পাছে নিজেদের পূজার ব্যাঘাত ঘটে বলিয়া তাহাদের প্রতি এই আদেশ।

রৌদ্রের উত্তাপ যেমন সদ্য-ফোটা পুষ্পের মাধুরী বিনষ্ট করে, পূজার উৎসাহ-মাখা কুমারীদলের হাসিভরা মুখগুলি তেমনই ভাবে ম্লান হইয়া গেল। গুরুজনের মুখের উপর প্রতিবাদ করিতে নাই, তাহাতে নিন্দা ও ভৎর্সনা উভয়ই সুলভ হইয়া উঠে।

আদেশটা যখন নিছক স্বার্থপরতা বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া উঠে, পালনকারী হাজার সহিষ্ণুপ্রকৃতি হইলেও প্রতিবাদের একটা ক্ষীণ বাণী তাহার ওষ্ঠ দিয়া বাহির হইবেই।

মীনা কহিল, "আমাদের মন্ত্র ব'লে দেবে কে?"

কাকীমা কহিলেন, "বছর বছর ত কচ্ছ, নিত্যপূজা-পদ্ধতি দেখে কর গে।"

তরু কহিল, "না, তা হবে না। জ্যাঠাইমা, তুমি এস।"

অষ্টমী তিথি। জ্যাঠাইমার পূজার সে দিন অনেকখানি হাঙ্গামা ছিল। অথচ বড় মুখ করিয়া মেয়েরা ডাকিয়াছে; এই প্রভাতেই তাহাদের প্রথম প্রার্থনাকে নিষ্ফল করিতে তাঁহার অন্তর সায় দিল না।

অদূরে বসিয়া সীতা চন্দন ঘষিতেছিল, তাহার পানে চাহিয়া জ্যাঠাইমা কহিলেন, "ঐ ত সীতা আছে, ও সব দেখিয়ে দেবে। এত দিন পূজা কচ্ছে।"

মা জ্যাঠাইমাদের এই নিজেদের পক্ষ টানিয়া কথাগুলায় মেয়েদের অন্তর ক্রমশঃ বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছিল। তাহা প্রথম প্রকাশ হইল তরুর মুখে। কারণ, "মুখরা" নামে স্পষ্টবাদিতার জন্য তাহার একটা প্রসিদ্ধি ছিল। সে ঝাঁঝিয়া কহিল, "তবেই হয়েছে, গাছ ফলেই চেনা গেছে।"

অপর কুমারীর দল তাহাদের মুখপাত্র তরুদির কথাটা সমর্থন করিতে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

সীতা কথা কহিল না। এই মর্ম্মান্তিক পরিহাসে তাহার চক্ষুযুগল শুধু একবার চক্‌চক্ করিয়া উঠিল। বজ্রের দহন-শক্তিটা মেদিনী-বুকে নিঃশেষ হইয়া যায়। সীতা মুখখানি অবনত করিয়া মেঝের পানে চাহিয়া রহিল। তাহার অভ্যস্ত হাত দুইটি চন্দন-পিঁড়িটার উপর কাঠটা ঘষিতেছিল।

তরুর ব্যঙ্গ-উক্তিতে ও অপরাদের বিদ্রূপ-হাসিতে জ্যাঠাইমা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। অপরাজিতা-ফুলটির মত স্নিগ্ধ-মাধুর্য্য-মণ্ডিত সীতার শ্যামাঙ্গী মূর্ত্তির পানে চাহিয়া চিত্ত তাঁহার ব্যথিত হইয়া উঠিল। তীব্রকণ্ঠে তিনি কহিলেন, "আমি সকলের বড়, আমি আশীর্ব্বাদ কচ্ছি, দেখিস তোরা, সীতার বিয়ে তোদের সকলের চেয়ে ভাল হবে।"

স্বস্তি-মণি অনুক্ষণ স্বস্তি স্বস্তি উচ্চারণ করিয়া থাকেন। কদ্রু ও বিনতার উপাখ্যানটা মহাভারতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

সীতার চন্দন ঘষা শেষ হইয়াছিল। বড় বধূর পানে চাহিয়া কহিল, "মামীমা, আমি কোন্‌খানে বসব?"

"তুই এইখানে ব'স্, মা! ও ঢলানী ছুঁড়ীদের কাছে তোকে যেতে হবে না।"

বিদ্রূপটা করিয়াছিল ছোট বধূর কন্যা; কাযেই বড় বধূর কথাগুলি ছোট বধূর অঙ্গে কাঁটার মত বিঁধিল। বাতাসে উড়িয়া যাওয়া মেঘদলের মত প্রস্থানকারিণী কুমারীদলের পানে চাহিয়া গম্ভীরকণ্ঠে তিনি কহিলেন, "হাজার আমরা ওদের বলি, দিদি, কথাটা নেহাৎ মিথ্যে বলেনি। হাঁ দিদি, সীতার পূজা কবছর হ'ল, ভাই?"

বড় বধূ কহিলেন, "কে জানে, বোন্! অত কে হিসেব রাখে" বলিয়া তিনি পূজার সামগ্রীগুলা আপনার দিকে টানিয়া লইলেন।

ছোট বধূ বুঝিলেন, কথাটা বড়-যা চাপা দিতে চাহিতেছেন, কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা সেরূপ ছিল না। বিপরীতটাই মনের মাঝে উগ্র হইয়া জাগিয়াছিল। বীজকে অঙ্কুরিত করিবার জন্য মাটীকে পূর্ব্বাহ্ণ হইতে প্রস্তুত করিতে হয়। ছোট বধূ কহিলেন, "ও তোমার গৌরীর বয়সী! হাঁ, গৌরী বটে পূজা করেছিল। চার বছরের মাথায় বর এনে হাজির কল্লে! বিয়ের মত বিয়ে! গৌরী তোমার সাক্ষাৎ গৌরী।"

ধরা জপটাকে অঙ্গুলীর দ্রুত-সঞ্চালনে শেষ করিয়া এক কুশী জল দেবতার উদ্দেশ্যে তাম্রটাটে নিক্ষেপ করিয়া বড় বধূ কহিলেন, "তা তোরা যা বলিস, ছোট বৌ! সীতা আর গৌরীকে আট বছরে আমি শিবপুজা দিয়েছিলুম। এখন আশীর্ব্বাদ কর, কোলে তার একটা হোক।"

দক্ষ ব্যারিষ্টার যেমন কথার জাল বুনিয়া বিপক্ষবাদীর মুখ দিয়াই আপনার ইচ্ছানুরূপ কথাগুলি বাহির করিয়া লয়, তেমনই করিয়াই ছোট বধূ কহিলেন, "তা গৌরীর বয়স আমাদের কত হবে?"

বড় বধূর জপটা আবার ভঙ্গ হইল, কহিলেন, "ও ত সোজা হিসেব প'ড়ে রয়েছে, বোন্। বারো বছরে গৌরীর বিয়ে হয়েছিল, জামাই ছ'বছর বিলেতে ছিল, এই আঠারো বছর হ'ল।"

ছোট বধূ এইবার আচমন করিয়া পূজায় বসিলেন। বড় বধূও নমঃ বিষ্ণুঃ শ্রীবিষ্ণু করিয়া জপটা ধরিলেন।

শুধু অদূরে উপবিষ্টা সীতার অশ্রুসিক্ত চোখের দৃষ্টি মৃত্তিকানির্ম্মিত পুষ্পাচ্ছাদিত শিবলিঙ্গের উপর স্থির হইয়া রহিল।

* * *

দীর্ঘদিন ফুল, বেলপাতা, গঙ্গাজল পাইয়া আশুতোষ যাহা করেন নাই, দুইটি অশ্রুসিক্ত নেত্রের ব্যথিত দৃষ্টিতে তাহাই করিবার জন্য বোধ হয় আসন তাঁহার টলিল।

মনোরঞ্জন অন্দরে আসিয়া কহিলেন, "তা হ'লে ঐ ডাক্তার ছেলেকেই মত কল্লে?"

বড় বধূ কহিলেন, "না ক'রে আর কি করি! ঠাকুরঝির বড় ইচ্ছা ছিল, সৎপাত্রে পড়ে।"

মনোরঞ্জন কহিলেন, "তা কি আর জানি না।"

"সেই জন্যেই সীতাকে এই আঠারো বছরের কল্লুম। কপাল! খোঁজ নিয়ে দেখলুম, অবস্থাও ভাল, স্বভাবও ভাল। একটু বয়স হয়েছে, দ্বিতীয় পক্ষ এই যা। তা সীতা ত আমার ছোটটি নেই।"

"তা বটে, তবে প্রথম পক্ষের ছেলেমেয়ে রয়েছে।"

"অত খুঁৎ কাড়তে গেলে আর পাওয়া যায় না যে। দেখলে কি কেউ মত করে—চোখ-মুখ ওর যত ভালই হোক, রংটার জন্যেই যে সব মাটী করেছে।"

"সীতার বাপ কত দেবে বল্লে?"

"কত আবার—হাজার টাকা। তা অনেক বলতে।"

"নগদই ত তার সবটা যাবে?"

শৈশবে যাহারা মাকে হারায়, তাহারা অনেক ক্ষেত্রে সেই সঙ্গে জগতের সর্ব্বাপেক্ষা বড় দাবীর বস্তু সেই পিতৃস্নেহ হইতে বঞ্চিত হয় কি না, তাহা বলা বড় কঠিন!

মনোরঞ্জন কনিষ্ঠা ভগিনী সুনীতিকে বড় ভালবাসিতেন। বৎসরাবধি সে পীড়ায় ভুগিয়াছিল; এবং তাহার চিকিৎসার গুরু ব্যয়ভারটা মনোরঞ্জন স্বেচ্ছায় নিজ স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছিলেন। অবস্থার অতিরিক্ত অর্থব্যয় করিয়াও তিনি সুনীতিকে বাঁচাইতে পারেন নাই।

সুনীতি শেষসময়ে দাদার হাতটা চাপিয়া কহিয়াছিল, "দাদা ভাই, সীতা তোমার।"

মরণপথযাত্রীর পরপারের শান্তি অটুট রাখিবার তীব্র বাসনায় মুমূর্ষুর কাণের কাছে মুখ দিয়া মনোরঞ্জন বার বার কহিয়াছিলেন, "সীতা গৌরী এক, নীতি, সীতা গৌরী এক।"

শপথটা মনোরঞ্জন সারা অন্তর দিয়া করিলেও দেবতা তাহা বোধ হয় স্বীকার করেন নাই। গৌরীর গৌরী-মূর্ত্তি তাহাকে বারো বছর উত্তীর্ণ হইতে দিল না। হীরার গহনায় অঙ্গ মুড়িয়া ধনীর ঘরে বধূ হইতে সে চলিয়া গেল।

মনোরঞ্জন তন্ন তন্ন করিয়া সীতার জন্য পাত্র সন্ধান করিতে লাগিলেন—গোল বাধিল তাহার রূপ লইয়া। শরীরের একটা ইন্দ্রিয়-বৈকল্য থাকিলে অনেক সময়ে দেখা যায়, আর একটা ইন্দ্রিয়ের শক্তি বাড়িয়া গিয়াছে। তেমনই পিতৃস্নেহের সহিত সীতার সম্বন্ধ যতখানি পরিমাণে কম ছিল, তাহার আকৃতি ও বর্ণ ততখানি বেশী পরিমাণে পিতার সহিত সম্বন্ধ সকলের চোখে ফুটিয়া উঠিত। মামীরা কহিতেন, "ভাল পায়নি, মন্দ পেয়েছে।"

তার প্রতিবাদ কল্লে মনোরঞ্জন কহিতেন, "না গো, ঐ ওর শুভ। সুখী হবার লক্ষণ।"

কিন্তু যত দিন যাইতে লাগিল,—মনোরঞ্জনের প্রতিবাদের উচ্চ সুরটা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া অবশেষে লুপ্ত হইয়া গেল। কনিষ্ঠাকে স্মরণ করিয়া অন্তর তাঁহার পীড়িত হইত।

স্বামীর বিষণ্ণ মুখের পানে চাহিয়া আশ্বাসের বাণীতে বড় বধূ কহিলেন,—"কপালে সুখ থাকলেই ওতে হবে। ওর মার শেষ ইচ্ছা নিষ্ফল হ'তে পারে না, ও সুখী হবে।

এই যে আমাদের বুড় কৈলাস ডাক্তার, তিন পক্ষ হয়েছিল, চোখে দেখেছি, সুখ কোন পক্ষে কিছু কম ভোগ করেনি। আর কত সোমত্ত ছেলেভরা সংসার মজিয়ে অসময়ে চ'লে যাচ্ছে।"

—"কিন্তু—"

—"কিন্তু আবার কি গো,—ভাল মন্দ হয়, মন্দও আবার ভাল হয়। আসল অদৃষ্ট, মানুষ নিমিত্ত মাত্র।"

* * *

অনেক তোড়জোড় করিয়া মানুষ করিতে বসে এক; কল টিপিয়া ভগবান্ করিয়া বসেন আর এক।

সীতার বিবাহের সব পাকাপাকি হইয়াও সব উল্টাইয়া গেল। ছোট বধূ সরোদনে কহিলেন, "অলক্ষুণে মেয়ে।"

বড় বধূ শয্যা আশ্রয় করিলেন, চীৎকার করিয়া যন্ত্রণাটা প্রকাশ করিবার শক্তিটা অবধি তাঁহার লুপ্ত হইয়াছিল। মনোরঞ্জন উন্মত্তের মত একবস্ত্রে হাওড়া ষ্টেশন অভিমুখে চলিয়া গেলেন। উৎসবদিনে অগ্নিকাণ্ডর মত, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত বাড়ীখানি যেন একটা নিবিড় শোকে শ্রীহীন মূর্ত্তি ধারণ করিল। সুবৃহৎ পরিবারের প্রতি নর-নারীর মুখে তীব্রতর আতঙ্কের ছায়া আসন্ন বর্ষণ-ভরা কালো মেঘের মতই ঘনতর হইয়া ঢাকিয়া রহিল। বালকবালিকাদের কলরব অবধি থামিয়া গেল। আজ প্রভাতে একখানি সর্ব্বনাশা টেলিগ্রাম আসিয়াছিল, "গৌরীর কলেরা, শীঘ্র এস, অবস্থা সঙ্কটজনক।"

স্বামীকে অনেকখানি চোখের জলের অনুনয়ে সম্মত করিয়া গৌরী শাশুড়ীর সহিত পুরীতে রথ দেখিতে গিয়াছিল।

মনোরঞ্জন যখন কন্যার সমীপে উপস্থিত হইলেন, তখন আশা-আনন্দ-ভরা আঠারো বছরের তরুণীর চোখে ইন্দ্রধনু-রঞ্জিত পৃথিবীর আলো অন্ধকারে গ্রাস করিতেছে।

ভাঙ্গা গলায় মনোরঞ্জন কহিলেন, "এমন ক'রে ফাঁকি দিচ্ছিস্, মা?"

মৃত্যুপথযাত্রিণীর চোখের দুই পাশ দিয়া অশ্রুবিন্দু গড়াইয়া পড়িল। পৃথিবীর সুখভোগের বাসনাকে অতৃপ্ত রাখিয়া সে কি স্বর্গ কামনা করিতে পারে? মরিতে যে চাহে না, মৃত্যু অনুক্ষণ যে তাহারই পানে সাগ্রহ বাহু বাড়াইয়া থাকে।

মুমূর্ষু পত্নীর পানে কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া সুরথ শ্বশুরকে কহিলেন,—"আপনি ধৈর্য্য ধরুন।"

গৌরীর জ্ঞান পূর্ণমাত্রায় ছিল। তীব্র রোগের প্রকোপে কোটরপ্রবিষ্ট আয়ত নেত্রের স্তিমিত দৃষ্টি স্বামীর মুখের উপর মেলিয়া কহিল, "বাবার কোলে আমায় তুলে দাও।"

মনোরঞ্জন কন্যার মাথাটা আপনার কোলে তুলিয়া লইলেন। আর একটা চিরবিদায়ী মর্ম্মান্তিক দৃশ্য তাঁহার মানসনেত্রে ভাসিয়া উঠিল। সেও এমনই করিয়া মনোরঞ্জনের কোলের উপর মাথাটি রাখিয়াছিল। তাহার শেষ মিনতিটা এই দুঃসহ শোকে জাগিয়া উঠিল, "দাদা ভাই, সীতা তোমার।"

* * *

উচ্চ ক্রন্দনের রোলে অনেক কথা বিনাইয়া বিনাইয়া বড় বধূ অনেক দিন ধরিয়া কন্যার চিরবিচ্ছেদ-শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সমবেদনা জানাইতে, সান্ত্বনা দিতে আত্মীয়রা সকলেই তাঁহার কাছে অনুক্ষণ আসিতেন। ছোট বধূ আহার-নিদ্রা প্রায় ত্যাগ করিয়া যা'এর সেবায় লাগিলেন। "আহা, দিদির যেমন হয়েছে, এমন কি কারু হয়? সোনার সুরথ পর হয়ে যাবে, কেমন ক'রে কোন্ প্রাণে তা আমরা সইব? দিদির যে আর একটা নেই!" এমনই ভাবে নিরন্তর কথার মালা গাঁথিয়া তিনিও অনুক্ষণ গৌরী-হারার দুঃখটা জাগাইয়া রাখিতেন। কথা কহিতেন না শুধু এক জন। তাঁহার কোলের উপর গৌরীর জীবনদীপটা চিরতরে নিভিয়া গিয়াছিল। মনোরঞ্জনের কাছে সান্ত্বনার একটা ক্ষুদ্র বাণী বলিতে অতি নিকটতম আত্মীয় অবধি কুণ্ঠিত হইত।

সন্তান মা-বাপের সমান স্নেহের বস্তু হইলেও, আগুনে ঝলসানো গাছের মত মনোরঞ্জনের ম্লান-শ্রী চোখ-মুখের পানে চাহিলেই বুঝা যাইত, বড় বধূ যে আঘাতটা নিজের মাঝে ধরিতে পারিয়াছেন, মনোরঞ্জন এখনও সেটাকে নিজের মাঝে ধরিতে পারিতেছেন না। মনের অসহনীয় জ্বালাটা প্রকাশ করিতে ভাষা চিরদিনই অক্ষম! প্রকাশহারা শোক মৃত্যুর দূত!

পুরী হইতে ফিরিয়া আসিয়া মনোরঞ্জন সেই যে আপনার কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেখান হইতে তাঁহাকে বাহির করা ত সহজসাধ্য নহেই, উল্টা বিপত্তি অনেকখানি! স্ত্রীর ক্রন্দনের শব্দটা কাণে প্রবেশ করিলেই তাঁহার

হৃৎপিণ্ডের যন্ত্রণাটা বর্দ্ধিত হইয়া হাতপাগুলাকে শিথিল করিয়া দিত। তাঁহার অবসন্ন দেহটা মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণায় এমন কাতর হইয়া পড়িত যে, তাহা দেখিলে চোখের জল অসম্বরণীয় হইয়া পড়ে।

মনোরঞ্জনের এই যন্ত্রণার দর্শক শুধু একটিমাত্র প্রাণী। সে অনুক্ষণ তাঁহার পাশে থাকিত—মাতুলের গভীর মর্ম্মপীড়া শুধু সীতাই বুঝিত। মাতুলানীর প্রচণ্ড শোকের দাপাদাপিতে যখন বাড়ী-শুদ্ধ লোক তাঁহারই সেবা-সান্ত্বনায় ত্রস্তব্যস্ত হইয়া থাকিত, সেই অবসরে মাতুলের বাক্যহীন দুঃখের পাশে মূর্ত্তিমতী সান্ত্বনার মত সে নিঃশব্দে বিরাজ করিত।

সীতার সংবাদ কেহ রাখিত না। বিশেষতঃ ছোট বধূর কড়া তত্ত্বাবধানে বড় বধূর গৃহে সীতার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন ঘটিতে পাইত না। ছোট বধূর কন্যাদ্বয় তরু ও মণ্টুর রাত্রিতে বড় মার দুই পাশে শুইবার ব্যবস্থা ছোট বধূই করিয়া দিয়াছিলেন। আন্তরিক কৃতজ্ঞতায় বড় বধূ বলিতেন, "ছোট আমার জন্মান্তরে মার পেটের বোন্ ছিল।"

মৃত্যুর তীব্র জ্বালাটা কালের প্রলেপে ধীরে প্রশমিত হয়। ছয়টা মাস কাটিয়া গেল। মানুষ যতক্ষণ বাঁচিয়া থাকিবে, সুখে হউক, দুঃখে হউক, তাহার কর্ত্তব্য অবশ্য তাহাকে পালন করিতেই হইবে। ইহার মাঝে ছোট বধূ চারিবার সুরথকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। মেয়েই নহে তাঁহাদের বাঁচিয়া নাই, জামাই বাঁচিয়া থাক। তবু সেই গৌরীর বর, সে যে বড় আদরের ধন।

বড় বধূ কাছে বসিয়া জামাতাকে খাওয়াইতে পারিতেন না বলিয়া সে ভারটা ছোট বধূ লইয়াছিলেন। জামাতাকে খাওয়াইয়া শুধু বিদায় দেওয়া যায় কি? বুকে বড় বাজে যে! কাযেই ইচ্ছায় হউক আর নাই হউক, তরু ও মণ্টুর সহিত সুরথকে দুই হাত তাসে বসিতে হইত, তাহাদের সঙ্গীতেরও শ্রোতা হইতে হইত। 'না' বলিবার পথ ছিল না। ছোট বধূ চোখে আঁচল দিবেন; বড় বধূ কাঁদিয়া হাট বসাইবেন। তাই বিচ্ছিন্ন সম্বন্ধটাকে সুরথ পূর্ণরূপে বজায় রাখিয়া চলিবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু যাহা ভাবিয়া তিনি যান, তাহা গোটা করিয়া দেখাইবার দুঃখ যে কতখানি, তাহা জানিতেন শুধু সুরথের অন্তর্যামী।

মনোরঞ্জন কিন্তু গৌরীর মৃত্যুর পর জামাতার সহিত একটি দিনের জন্যও সাক্ষাৎ করেন নাই। সুরথের আগমনের কথাটা জানিতে পারিলেই সেই যে তিনি উঠিয়া দুয়ারটা বন্ধ করিয়া দিতেন, কাহারও সাহস হইত না, তাহা খুলিতে বলে। বেশী পীড়াপীড়ি করিতে গেলে কথাটা কোনরূপে সুরথের কাণে উঠিয়া একটা গ্লানিকর অবস্থার সৃষ্টি হইয়া পড়ে, সেই ভয়ে সকলেই শঙ্কিত হইয়া থাকিত।

ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়িয়া থাকে বলিয়া প্রবাদ। সে দিন আহারের শেষে সুরথ আপনিই উপযাচক হইয়া শ্বশুরের সহিত সাক্ষাতের বাসনা জানাইলেন।

ছোট বধূ ত্বরিত-কণ্ঠে কহিলেন, "তিনি শোকে, রোগে এক রকম হয়ে গেছেন। মানুষের ঘেঁসটা তেমন সইতে পারেন না।"

বিস্ময়ভরা চোখের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি শাশুড়ীর মুখের উপর স্থির করিয়া সুরথ কহিলেন,—"তিনি অসুস্থ?"

বড় বধূ উত্তরটা দিতে যাইলেও সেটা দিলেন ছোট বধূ; কহিলেন, "যেমন হয়ে থাকে। গৌরীকে বড্ড ভালবাসতেন, তুমি যে দু'টা বছর বিলেতে ছিলে, উনি তখন নিজে গৌরীকে পড়াতেন, গান শেখাতেন, তাই সে অত—"

ছোট বধূর বক্তব্যটা শেষ করিবার অবসর না দিয়াই বড় বধূ কহিলেন,—"গৌরী, সীতা ওঁর দুই চোখের মণি ছিল। আজ সে নেই, সীতাকে উনি একবারে চোখের আড় করেন না।"

অশ্রুতে বড় বধূর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। ছোট বধূ ব্যথিত কণ্ঠে কহিলেন,—"যেতে দাও দিদি, সে তোমার নয় বলেই রইল না। এখন যারা আছে, তাদের মুখ পানে চাও।" ছোট বধূ থামিলেন, সুরথ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

যন্ত্রের নীচু পর্দ্দায় সুর যেমন নামিয়া মৃদু হইতে মৃদুতর হইয়া সঙ্গীতকে মিলাইয়া দিতে দিতে সহসা উচ্চ পর্দ্দায় উঠিয়া শ্রোতাকে সচকিত করিয়া তুলে, তেমনই একটা প্রচণ্ড ব্যথা, যাহা মৃদু হইতে মৃদুতর হইয়া আসিতেছিল, সহসা তাহা জীবন্ত হইয়া কক্ষস্থিত প্রাণী কয়টির অন্তর বিপুল বেদনার ভারে চঞ্চল করিয়া তুলিল।

সুরথ কহিলেন, "আমার অন্যায় হয়ে গেছে, আমি আজ তাঁর সঙ্গে দেখা করব।"

* * * * * *

শ্বশুরের পানে চাহিয়া সুরথ স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। বিলাত হইতে ছয়টা বৎসর ধরিয়া তিনি যে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা

করিয়া আসিয়াছেন, তাহারই অভিজ্ঞতার জোরে দুই চোখের দৃষ্টিপাতে মনোরঞ্জনের দেহাভ্যন্তরের অবস্থাটা সুরথের বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তিনি মনোরঞ্জনকে ধরিয়া বসিলেন—চিকিৎসার অধীনে তাঁহাকে থাকিতে হইবে।

ঢলিয়া-পড়া দিনের আলোর মত নৈরাশ্যভরা ম্লান হাসিতে মনোরঞ্জন কহিলেন, "ওতে কিছু হবে না, বাবা! নীতিকে করতে আমি বাকী রাখিনি; গৌরীর কথা তুমি জান।"

সুরথ কহিলেন, "আয়ু আমরা দিতে পারি না সত্য, কিন্তু তেল-সল্‌তে থাক্‌তেও আলোটা না নিভে, সেটাই আমরা দেখি।"

খোলা জানালার পথে বাহিরের মুক্ত আকাশের পানে দৃষ্টিটাকে নিবদ্ধ করিয়া মনোরঞ্জন কহিলেন, "তাই যদি তাঁর ইচ্ছা হয়।"

সুরথ কহিলেন, "তাঁর ইচ্ছা কাযের ফলটা দেখেই আমরা বুঝতে পারি। তিনিই যখন নিশ্চেষ্ট থাকতে নিষেধ কচ্ছেন, তখন অন্ততঃ আমাদের মুখ চেয়ে ডাক্তারী শাস্ত্রটা আপনাকে মান্‌তে হবে।"

ইহার আর উত্তর কি আছে?

পরদিন যন্ত্রপাতির সাহায্যে সুরথ যখন শ্বশুরের দেহাভ্যন্তরের অবস্থাটা নিশ্চিত বুঝিয়া লম্বা প্রেস্‌ক্রপসন লেখাটা শেষ করিয়া মুখ তুলিয়া চাহিলেন, তখন অদূরে দণ্ডায়মানা সীতাকে দেখাইয়া মনোরঞ্জন কহিলেন, "আমার সম্বন্ধে যা কিছু বলবার আছে, সুরথ, আমার এই মাটিকে ব'লে যাও, আর কাউকে নয়, বাবা।"

শ্বশুরের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া সুরথ চাহিয়া দেখিলেন, বর্ষার সজল কোমল কালো মেঘখানির মত স্নিগ্ধ নম্রমূর্ত্তি সীতা আনতমুখে কক্ষের একটি পাশে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছে।

মাতুলের স্নেহ-কণ্ঠের আহ্বানে সীতা সরিয়া আসিলে ঔষধ-পথ্যাদি সেবনের বিধিব্যবস্থা চিকিৎসকের নিজস্ব গাম্ভীর্য্য লইয়া সীতাকে বুঝাইয়া দিয়া সুরথ উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

দরজার বাহিরে খুড়তুতো শ্যালিকা তরু অপেক্ষা করিতেছিল। সুরথ বাহিরে আসিতে সে কহিল, "মা আপনাকে জল খেতে ডাকছেন।"

সুরথ কহিলেন, "এখনও আমায় অনেকগুলা কল সারতে হবে, সকালে সময় হবে না। তাঁকে মাপ করতে বল গে, তরু।"

"তিনি মা, মাপ না ক'রে থাকতে পারবেন না, কিন্তু আমরা কচ্ছি না" বলিয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও তরু চলিয়া গেল।

অন্য দিন তরু এই কথাটা বলিলে সুরথ হাসিয়া তখনই উত্তর করিতেন, "মানভঞ্জনের যাত্রা করা আমার কিন্তু মোটেই অভ্যাস নেই"; আজ কোন কথা না কহিয়া, তিনি নিজের মোটরে গিয়া উঠিলেন।

দিন কয়েক কাটিয়া গেল। সুরথ যতখানি আশা করিয়াছিলেন, ততখানি না হইলেও ভালর দিকে কিছু যে ফলোদয় হইয়াছে, মনোরঞ্জন নিজেই তাহা স্বীকার করিলেন।

বড় বধূ সে দিন নিরালায় জামাতাকে পাইয়া কহিলেন, —"কেমন দেখছ, বাবা! আমার ত এই ভাঙ্গা কপাল।"

আশ্বাস-ভরা কণ্ঠে সুরথ কহিলেন, "না, যতটা ভয় ছিল, ততটা নেই অবশ্য।"

"কিন্তু ছোট বৌ বলে",—বড় বধূ থামিলেন।

কি বলে, জানিবার জন্য সুরথ চোখ তুলিতেই, দমদেওয়া গ্রামোফোনের মত এক নিশ্বাসে বড় বধূ বলিয়া গেলেন,—"কাউকে বলো না বাবা, বলে সীতাকে দিয়ে সেবা করানো ঠিক নয়। জন্মেই ত মাকে খেয়েছে।"

সুরথ চমকিয়া উঠিলেন। একটা প্রচণ্ড ক্রোধে তাঁহার পা হইতে মাথা অবধি রি-রি করিয়া উঠিল।

মানুষের মুখ দিয়া এত বড় নির্ম্মম বাণী বাহির হইতে পারে! গম্ভীর কণ্ঠে তিনি কহিলেন, "ওঁকে সারাবার ইচ্ছাটা যাঁদের থাকবে, তাঁরা সীতাকে ওঁর পাশ হ'তে নড়াবেন না।" বলিয়া স্বভাব-বহির্ভূত দ্রুতপদে সুরথ নামিয়া গেলেন।

* * * * *

সারাদিনের কর্ম্মরত দেহ, মন রাত্রিতে যখন শয্যার মাঝে অবসর গ্রহণ করিল, তখন সবার আগে গৌরীর কথাটা সুরথের মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল। বারো বছর বয়সে সোনার পুতুলের মত সে আসিয়াছিল। মন কেমন করিতেছে বলিয়া তাহার আয়তনেত্র-কোণ হইতে অনুক্ষণ অশ্রুর বান ডাকিত। কত এসেন্স, সাবান, খেলনা প্রভৃতি বালিকাকালের লোভনীয় দ্রব্য-সম্ভারের উপহারে

রৌদ্রবৃষ্টির মত যুগপৎ হাস্যমুখী পত্নীকে সুরথ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "কার জন্য সে অত কাঁদে ?"

গৌরী কহিয়াছিল, "বাবার জন্য ! বাবার কাছে আমরা খেতুম, গল্প শুনতুম, ঘুমুতুম।"

সুরথ কহিয়াছিলেন, "তোমরা আবার কে ? তুমি ত বাবার একলা !"

"বাঃ, তা বৈ কি ! সীতা নেই ? তাকে ত বাবা আমার চেয়ে ভালবাসেন।"

"সীতা কে ? সেই কালো পানা মেয়েটি ? বাসরে যে গান গাইলে ?"

"হাঁ, ভারী মিষ্টি গলা। বাবা আমাদের নিজে গান শেখান, সীতা আমার চেয়ে বেশী শিখতে পারে !"

সেই সীতাকে সুরথ সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া সুরথ যে কয়েকবার গৌরী জীবিত থাকা অবস্থায় শ্বশুরবাড়ী গিয়াছিলেন, তাহার মাঝে একটি-বারও তিনি সীতার সাক্ষাৎ পান নাই।

দীর্ঘ দিন পরে শ্বশুরের রোগশয্যাপাশে মূর্ত্তিমতী সেবার মত সেই সীতাকে দেখিয়া সুরথের সারা মনটা বেদনায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। শৈশবে মাতৃহারা, পিতৃস্নেহ-বঞ্চিতা এই দুর্ভাগা মেয়েটির একটিমাত্র স্নেহাবলম্বন মাতুল যে কোন মুহূর্ত্তে পরপারে সরিয়া যাইতে পারেন, হৃদ্‌যন্ত্রের অবস্থা পরীক্ষা করিয়া সুরথ তাহা বুঝিয়াছিলেন।

সীতার কালো রঙ্গের জন্যই যে মনোরঞ্জন কোন মনোমত স্থানে আজিও অবধি তাহার একটা দাবীর আশ্রয় করিয়া উঠিতে পারেন নাই, তাহার খানিকটা সংবাদ গৌরীর মুখে সুরথ শুনিয়াছিলেন।

পুরীতে যে দিন গৌরী জননীর নিকট হইতে পত্র পাইয়া-ছিল, দেবতা মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন, সীতার বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে, সে দিন সে স্বামীকে বলিয়াছিল, "আমার গয়নার মধ্যে সব চেয়ে যে ভালখানা, সেইখানা সীতাকে যৌতুক দেব।"

সুরথ কহিয়াছিলেন, "কেন, তোমার গয়না দেবে কেন ? কিনে দাও না, যা দাম দিতে ইচ্ছা হয়, আপত্তি নেই।"

"না তা হবে না। আমার সব চেয়ে ভালবাসার জিনিষ তাকে দিলে, সে বুঝতে পারবে, তাকে কত আমি ভালবাসি।"

রহস্যভরে সুরথ কহিয়াছিলেন,—"তোমার সব চেয়ে ভালবাসার জিনিষ ত আমি ! আমায় কেন দিয়ে দাও না ?"

"তা কি আর পারি না ? তবে সে নেবে কেন, ভারী অভিমানী, জান না তাকে ? আচ্ছা, তোমার কথা বলব আমি তাকে।"

পত্নীর সুকোমল গালের উপর সোহাগের একটা কোমল করাঘাত করিয়া কৃত্রিম শাসনের ভঙ্গীতে সুরথ কহিয়াছিলেন, "খবরদার !"

হাসির হিল্লোলে ঢলিয়া পড়িয়া গৌরী কহিয়াছিল, "আহা, তাকে তোমার লজ্জা কি গো ! বিলেত হ'তে যত চিঠি তুমি আমায় লিখেছ, আমি তাকে না দেখিয়ে একখানিরও জবাব লিখিনি।"

"ভারী দুষ্ট তুমি ! অবিশ্বাসী, আর আমি তোমায় চিঠি লিখব না।"

"বাঃ, সে ত আমারই লাভ গো ! আর তোমায় একা আমি ছাড়লে ত গো, যা হয়ে গেছে ছ'টা বছর।"

একটা গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া সুরথ পাশ ফিরিয়া শুইলেন। হায় রে গৌরী, তাঁহাকে আর একা থাকিতে দিবে না ! দুই চোখে অশ্রুর বন্যা বহিয়া চলিল।

সকালবেলা সুরথের যখন ঘুম ভাঙ্গিল, চাহিয়া দেখিলেন, ঘড়ীতে আটটা বাজিয়াছে। মা আসিয়া কহিলেন,—"সুর, চা যে জুড়িয়ে যাচ্ছে, বাবা। দুবার ফিরে গেলুম।"

অপ্রতিভমুখে সুরথ কহিলেন,—"বড্ড বেলা হয়ে গেছে, ডাকলে না কেন, মা ?"

"কি ক'রে ডাকি, বাবা ! যা তুই ঘুমুচ্ছিলি। মনে হ'ল, রাত্তিরে বুঝি ভাল ঘুম হয়নি, শরীর ভাল নেই। কপালে হাত দিয়ে দেখলুম ঠাণ্ডা, তবু আহ্নিকে বসতে পারিনি। চোখ-মুখ অত ব'সে গেছে কেন ?"

"যা গরম, রাত্রিতে ঘুম হচ্ছিল না, তাই বোধ হয়। এই সবে ভোর রাত্রিতে ঘুমুতে পেরেছি।"

"তা সত্যি ! পাখার হাওয়া বড্ড গরম লাগে। ছাদে আমার কাছে গিয়ে শুলিনি কেন, বাবা ! ঠাণ্ডায় মায়ে ছায়ে একটু গল্প করতুম, সেখানে ঘুমুতিস।"

চায়ের পেয়ালা টেবলের উপর রাখিয়া সুরথ কহিলেন, "আহা, বুদ্ধিটা যদি মাথায় আসত ! বেলা হ'লো, যাও মা, তুমি আহ্নিকে ব'স গে।"

"এই যাই, বাবা ! একটা কথা বলতে এসেছি।"

সুরথের বুকের মাঝটা কেমন ধক্ করিয়া উঠিল। শুষ্ক-মুখে মায়ের মুখ পানে চাহিয়া কহিলেন, "কি মা ?"

মা কহিলেন, "একা ত আর পাচ্ছি না, একটা দোসর না হ'লে।"

"কেন মা, তোমার অতগুলো ঝি, তারা কি সব চ'লে গেছে ?"

বিষাদের হাসিতে মা কহিলেন, "দূর পাগল ছেলে, ঝিরা আমার কি করবে ? সেই ছুঁড়ীকে বারো বছরের এনে হাতে গ'ড়ে মানুষ কল্লুম, অসময় ফাঁকি দিয়ে গেল।"

সুরথ চুপ করিয়া রহিলেন।

মা কহিলেন, "যদি আমার আর একটা ছেলে থাকত !—তা আজ একবার গ্রে ষ্ট্রীট্ যাবি ?"

"কেন, সেখানে কি, মা ?" সুরথ বিস্ময়ভরা নেত্রে মাতার মুখ পানে চাহিলেন।

"তখন তুই ছোট ছিলি, আমি দেখে পছন্দ ক'রে এনেছিলুম। এখন হাজার হোক্ তুই বড় হয়েছিস, মেয়েটিও ছুটো পাশকরা, গান-বাজনা জানে।"

অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া অবশেষে সুরথ কহিলেন, "বড্ড শীগ্গির হচ্ছে না, মা ! সে যদি ছটা মাস কোথাও গিয়ে থাকত।"

অশ্রুপূর্ণ-নেত্রে মা কহিলেন, "ছটা মাস কেন, বাবা, ছটা বছর থাকলেও আর কাউকে আনবার নাম আমি মুখে আনতুম না। কিন্তু দেরী হাজার করি, তাকে ত আর পাব না। আমি বুড়ো মানুষ, তোকে কারু হাতে গছিয়ে দিতে পেরেছি দেখলে নিশ্চিন্ত হ'তে পারি।"

ক্ষণেক থামিয়া অশ্রুজড়িত কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করিয়া মা কহিলেন, "আমার বুকেও কি বাজে না, সুর ? তবে কি করব, সংসারে থাকতে গেলে সবই সইতে হবে, বাবা ! সে নিজে হাতে তোকে চা ক'রে দিত, আমি কোন্ প্রাণে লোকের হাতে সে কায দেব ? তাতে তোরও কি সুখ হবে, বাবা ?"

* * *

দুপুরবেলা ছোট বধূ বড় বধূর হাতে পাণের ডিবা, জর্দার কৌটা দিয়া কহিলেন, "একটা কথা বলব ভাবি, কিন্তু দিদি, বল্‌তে পারি না।"

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে যা'এর মুখপানে চাহিয়া বড় বধূ কহিলেন, "কি কথা রে ছোটু, আমার কাছে তোর কুণ্ঠাই বা কিসের ?"

"কুণ্ঠার নয়, ভাই, তবে কষ্টের। আমার ছোট বোনের মেয়ের সঙ্গে সুরথের সম্বন্ধ হচ্ছে। মেয়ে কি না দু'টো পাশ করা।"

বড় বধূ চমকিয়া উঠিলেন। অতর্কিত চপেটাঘাত-প্রাপ্তের মত একটা নিষ্ঠুর যন্ত্রণায় সারা মুখখানি যেন নিমেষে নীল হইয়া গেল। গভীর নিশ্বাসে বুকের মাঝে জাগিল—'উঃ—গৌরী।'

সমবেদনাভরা কণ্ঠে ছোট বধূ কহিলেন, "সুরথ আমাদের পর হয়ে যাবে,—এ যে শক্তিশেলের মত বুকে বাজে। কিন্তু সেও ত তার মা'এর একটা ছেলে, আর অত অল্প বয়স !"

উত্তর দিতে হয় বলিয়াই বড় বধূ কহিলেন, "তা সত্যি !"

"কিন্তু আমি বলি, সুরথকে আমরা কিছুতেই পর হ'তে দিতে পারব না। গৌরীর অত সাধের সাজান ঘরকন্না ভোগ করবে পরে ?"

শরাহত পাখী যেমন কাতরতা-মাখা দৃষ্টিতে একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখে, এত বড় দণ্ড সে কেন পাইল, তেমনই কাতরতা-মাখা দৃষ্টিতে চারিপাশে চাহিয়া বড় বধূ কহিলেন, "আমার কপাল। এ কথা শুনলে ওঁকেই কি রাখতে পারব ? ঠাকুরঝি গিছল, সীতাকে নিয়ে সে শোক চাপা দিয়েছিলেন।"

"কি যে বল দিদি, দুধ ঘোল এক নয়, মেয়ে আর বোন্ ? তার চেয়ে বলি, তুমি যদি কিছু মনে না কর—দোষ না ধর।"

"তুই আমার মা'এর পেটের বোনের মত, তোর কথায় দোষ ধরব কি, ছোটু !"

"দিদি, তরুকে তোমায় দিয়েছি—ও তোমারই। সুরথকে তুমি ছেড় না। তোমার দেওরের সঙ্গে তাই আমার এক-চোট হয়ে গেল ভাই।"

কি যে একচোট হইয়া গেল, বড় বধূ তাহা না জানিতে চাহিলেও ছোট বধূ তাহা বলিলেন ;—কহিলেন, "উনি বলেন, সুরথ পর হয়ে যাবে দুঃখের কথা বটে ! কিন্তু বৌদিদি তরুর কথা মত করবেন কি ? আমি বলেছি, তরু আমার পেটে ভুল ক'রে এসেছে, ও দিদির। অমন কত যায়গায় হয়,—তরুও আমার পাশের পড়া পড়ছে। কি বলো দিদি ?"

বসুমতী প্রেস] অন্ধের 'নড়ি' শিল্পী—শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

"আমি আর কি বলবো, বোন্! আমার বুদ্ধিশুদ্ধি যে সব লোপ ক'রে দিয়ে গেছে।"

কথাটা ছোট বধূর ভাল না লাগিলেও কহিলেন, "সে তোমায় মেরে গেছে। তবে তুমি যদি সুরথকে চেপে ধর।"

গভীর বিস্ময়ভরা দুই চোখের দৃষ্টি তুলিয়া বড় বধূ কহিলেন, "আমি? আমি বলব আবার বিয়ে কর?" কান্নায় তাঁহার কণ্ঠস্বর ভাঙ্গিয়া পড়িল।

ছোট বধূ কহিলেন, "তোমার হয়ে আমি না হয় বলব তাকে। কিন্তু তুমি উপস্থিত থেক, তবে সে বুঝবে, তোমার ইচ্ছা আছে, 'না' বলতে আর পারবে না।"

* * *

গ্রে ষ্ট্রীটের মেয়েটকে সুরথ দেখিয়া আসিয়াছিলেন। অপছন্দ করিবার মত কোন খুঁৎ তাঁহার চোখে ধরা পড়ে নাই। মেয়েটি সুদর্শনা, শিক্ষিতা, নব্যরুচিসম্পন্না। শিক্ষিত স্বামীর সঙ্গিনী হইবার উপযুক্ত শিক্ষাই সে লাভ করিয়াছে। তথাপি সুরথের মনের মাঝে একটা মহা গোল উঠিয়াছিল।

পত্নীর শোকে তিনি যে সংসারাশ্রম করিবেন না, এমন কল্পনা তাঁহার মনোমধ্যে জাগিত না। জননীর উপর সন্তানের একটা কর্ত্তব্য আছে, এটা তিনি স্মরণে রাখিতেন; তথাপি বুকের মাঝে অন্তরটা তাঁহার গৌরীর জন্য হাহাকার করিয়া উঠে।

ছয়টি বছর গৌরী স্বামীকে ছাড়িয়া, স্বামীর আগমনের আশাপথ চাহিয়া বসিয়াছিল। সেই গৌরী আজ নাই বলিয়া তাহারই গৃহে অপরে আসিয়া আসন পাতিবে?

এই চিরাচরিত দুঃখ ছাড়া তাঁহার মস্তিষ্কে আর একটা তীব্র চিন্তা জাগিয়া উঠিতেছিল; তাহা শ্বশুর মনোরঞ্জনের জন্য। বিবাহের কথা অবশ্য চাপা থাকিবে না, মনোরঞ্জনের কাণে ইহা উঠিবেই। কিন্তু সেই কন্যাশোকাতুরের দুর্ব্বল বুকখানা এ আঘাত সহিতে সমর্থ হইবে কি? গৌরী যে পিতার অন্তরের কতখানি জুড়িয়া থাকিত, তাহার সংবাদ ত সুরথ জানেন। জামাতা পাছে বিলাত হইতে সাহেব বনিয়া আসেন, তাহার আশঙ্কায় মনোরঞ্জন নিজে কন্যাকে শিক্ষিতা করিয়াছিলেন। গৌরীর সন্তান হইলে কি নাম তাহার হইবে, সে গৌরীর কাছে থাকিবে কি মাতামহের কোলে লালিত হইবে, তাহারই মধুর কলহগুলা যে প্রতিনিয়ত পত্নীর মারফত সুরথের কাণে আসিত।

যে দিন সুরথ অপরের গলায় মালা দিবেন, সে দিন বিশ্বনিয়ন্তার চরণ-প্রান্তে পিতার দুঃখে গৌরী লুটাইয়া পড়িবে না কি? স্বামীকে নির্ম্মম ভাবিয়া স্বর্গবাসের আনন্দটা নিরানন্দে পরিণত হইবে না?

না, না, আধিব্যাধিপীড়িত শ্বশুরের উপর মর্ম্মান্তিক নিষ্ঠুরতার খড়্গ সুরথ হানিতে পারিবেন না। তিনিও ত মানুষ!

কিন্তু জননীর সম্বন্ধে কি করা যায়! তিনি যে তাঁহার একমাত্র বংশধর।

আর তাঁহার নিজের? এই যৌবনস্ফীত চিত্ত তাঁহার, এ কি সংযমের কঠিন বাঁধনে নিজেকে শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিতে পারিবে? না, কোন দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে একান্ত সুনামে অবমাননা করিয়া বসিবেন?

উপায় কি যথার্থ নাই? কোন পথ ধরিয়া জননী ও শ্বশুরের তৃপ্তি একই সঙ্গে কি তিনি সাধন করিতে পারেন না?

গৌরীর আত্মাকে কি শান্তি দিতে পারেন না? জননী ত হাতের দোসর বধূ চাহিয়াছেন। বধূ গৃহলক্ষ্মী—সন্ধ্যাদীপ জ্বালিবার কল্যাণমূর্ত্তি।

সীতা ফোন করিল, মাতুলের শরীরের অসুস্থতা হঠাৎ বাড়িয়া গিয়াছে।

সুরথ জানাইলেন, তিনি সন্ধ্যার সময় দেখিতে যাইবেন।

ডাকে বাহির হইবার পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া সুরথ কক্ষ হইতে বাহির হইতেছিলেন, মা আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন, কহিলেন, "রোগী দেখতে বার হচ্ছিস্?"

মা কক্ষে প্রবেশ করিলেন; বাধ্য হইয়া সুরথও কক্ষে প্রবেশ করিলেন; কহিলেন, "হাঁ মা! অনেকগুলো সারতে হবে।"

মা কহিলেন, "আহা, বাড়বাড়ন্ত হোক।"

সুরথ হাসিয়া কহিলেন, "কি রকম মা, বাড়ী বাড়ী অসুখ করবে ত?"

মা হাসিয়া ফেলিলেন, কহিলেন, "দূর, তা কেন? তোর হাতযশে যেন তোকে কেউ না ছাড়ে। ও কথা থাক, কাযের কথা আছে।"

"সেটা ফিরে এসে কইলে হয় না, মা?"

"হবে না কেন, হবে। তোর শ্বশুরবাড়ী হ'তে ফোন কচ্ছিল বুঝি ?"

"হাঁ মা ! শ্বশুর মশায়ের অসুখটা বেড়েছে, সন্ধ্যার পর দেখতে যাব তাঁকে।"

"সকালে যে শুনলুম ভাল আছেন।"

প্রশ্নভরা নেত্রে সুরথ মায়ের মুখ পানে তাকাইতে জননী কহিলেন,—"তোর খুড়তুতো শালা এসেছিল আমার কাছে, তোর শাশুড়ীর নাকি বড্ড ইচ্ছা, তরুর সঙ্গে তোর বিয়ে হয়।"

সুরথ কাঠের মত শক্ত হইয়া চেয়ারের উপর বসিয়া রহিল। স্নেহের ছদ্ম পরিচ্ছদের অন্তরালে নিঃশব্দে যে স্বার্থপরতা বিরাজ করিতেছিল, তাহার কদাকার মূর্ত্তিটা সুরথের চোখে মাএর সমাচারটার মাঝে ফুটিয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে খুড়শাশুড়ীর উপর একটা বিজাতীয় ঘৃণায় তাঁহার দেহ-মন ভরিয়া উঠিল।

মা কহিলেন, "তা তরু মেয়ে মন্দ নয়। বৌমার মত না হোক, তা সে রকমই বা কটা মেলে ? অত রূপ কি রাখতে পাল্লুম, রূপ আর চাই না।"

অনেকক্ষণের পর রুদ্ধ নিশ্বাসটা ধীরে ফেলিয়া সুরথ কহিলেন, "আমার শ্বশুর শুনেছেন ?"

"আমিও তা জিজ্ঞেস করেছিলুম, বল্লে, তাঁকে জানান হয়েছে, তিনি কিছু বলেন নি।"

মনোরঞ্জনের উপর সুরথের এতখানি যত্ন ও সতর্কতা লওয়া সত্ত্বেও অসুখটা হঠাৎ কেন বাড়িয়া গেল, চিকিৎসকের অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে দিনের আলোর মত তাহা স্বচ্ছ হইয়া ফুটিয়া উঠিল।

"তবে এখন আসি, মা।" বলিয়া সুরথ বাহির হইয়া গেলেন।

গোটা কয়েক কল সারিয়া সুরথের মোটর শ্বশুর-ভবনের গেটের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল।

বারান্দায় উঠিতে সম্মুখে পড়িল তরু। সে হাসিয়া লজ্জারক্ত মুখে কক্ষের অভ্যন্তরে সরিয়া গেল।

খুড়শ্বশুর আসিয়া কহিলেন, "দাদা আজ সারাদিন বড্ড কেমন ছট্‌ফট্ কচ্ছেন, তাঁকে দেখবে চল, বাবা।"

সুরথ আসিয়া মনোরঞ্জনের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সীতা পাশে বসিয়া মাতুলের গায় হাত বুলাইয়া দিতেছিল; বড় বধূ পায়ের কাছে বসিয়া পদসেবাই করিতেছিলেন। ছোট বধূ খাটের অনতিদূরে বসিয়াছিলেন; বোধ করি, কোনও সেবার বাসনা লইয়াছিলেন।

সুরথ গিয়া রোগীর বিছানায় বসিতেই সীতা উঠিয়া দাঁড়াইল। পীড়িত শিশু চিকিৎসককে নিকটে দেখিলে যেমন করিয়া জননীর হাতটা চাপিয়া ধরে, ঠিক তেমনই ধারা করিয়াই সীতার হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া মনোরঞ্জন ব্যাকুল-কণ্ঠে কহিলেন, "যাস নি, মা।"

সীতার পানে চাহিয়া গম্ভীর-কণ্ঠে সুরথ কহিলেন, "বোস।" স্বরে একটা কর্ত্তৃত্বের আভাস ফুটিয়া উঠিল। সীতা মাতুলের পাশে বসিয়া পড়িল।

কক্ষ নিস্তব্ধ। গম্ভীর মনোযোগ সহকারে সুরথ অনেকক্ষণ ধরিয়া শ্বশুরের দেহ পরীক্ষা করিয়া কহিলেন, "না, ভয় নেই। মানসিক দুর্ব্বলতা ! একটা ইঞ্জেক্‌সন্ দেব।"

মনোরঞ্জন কহিলেন, "আবার একটা ! না, তোমরা আমায় ছুটী দেবে না।" একটু হাসিয়া কহিলেন, "কাঠুরের গল্প জান ত ? আমার সেই অবস্থা। বিকালে যখন বড্ড অসুখ কচ্ছিল, তখন ভগবান্‌কে না ডেকে ভাবছিলুম সীতাকে। মনে হচ্ছিল, না, ওর জন্যেই আমার বাঁচতে হবে।"

সুরথ কোন কথা কহিলেন না। নিঃশব্দে তিনি আপনার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া সীতার কাছে হাত ধুইবার সাবান-জল চাহিলেন। ছোট বধূ কহিলেন, "এই যে আমি দিচ্ছি, এস।"

হাত ধোয়া-মুছা শেষ করিয়া সুরথ আসিয়া টেবলের সম্মুখে বসিলেন, এবং প্রেস্‌ক্রিপসন্ লেখা শেষ করিয়া সীতার পানে চাহিয়া কহিলেন, "এই ট্যাবলেটটা ছট্‌ফট্ কল্লেই দেবে, মিকশ্চারটা দিনে তিনবার চলবে। আর দুঘণ্টা অন্তর নাড়ীর বিট্ রেকর্ড করবে।"

'দন্ত্যর ন' যোগ করিয়া সুরথ সীতার সহিত কথা কহিতেন, আজ সেটা লুপ্ত হওয়ায় কথাগুলি সীতার কুমারী-বুকে কেমন একটা দোলনা দিতেছিল।

সুরথ চেয়ারখানি টানিয়া শ্বশুরের শয্যার পাশটিতে বসিতেই খুড়শ্বশুর কহিলেন, "দাদাকে ত ভাল দেখলে, সুরথ ?"

"আজ্ঞে হাঁ, আপনার চিন্তিত হবার বিশেষ কিছু নেই।" সম্মুখেই গৌরীর সুবৃহৎ তৈলচিত্র দেয়ালের গাত্রে বিলম্বিত ছিল, তাহারই পানে চাহিয়া মনোরঞ্জন শুইয়া ছিলেন।

একটা অসহনীয় নিস্তব্ধতা অশরীরী আত্মার মত কক্ষের মাঝে অসোয়াস্তির অনুভূতি ধীরে বর্দ্ধিত করিতেছিল।

ছোট বধূ বড় যা'এর গা টিপিয়া কহিলেন, "সুরথ, ও ঘরে জল খেতে যাবে, বাবা।"

সুরথ খোলা জানালার পানে চাহিয়া বসিয়াছিলেন, মুখ ফিরাইয়া কহিলেন,—"আজ থাক।"

বড় বধূ কহিলেন, "না, তা হবে না। ছোটু নিজে হাতে তোমার জন্য সব করেছে, বাবা।"

সুরথের বিকল অন্তরটা এই কথা কয়টায় মুহূর্ত্তে দৃঢ় ও আত্মস্থ হইয়া উঠিল। গৌরীর চিত্রের দিকে একবার চাহিয়া মনোরঞ্জনের পানে দৃষ্টি ফিরাইয়া কহিলেন, "আমি আপনাকে একটা কথা বলতে চাই।"

মনোরঞ্জন কহিলেন,—"বল বাবা।"

"মা আমাকে পুনর্ব্বার সংসার করবার জন্য তাগিদ দিচ্ছেন, কিন্তু"—সুরথ থামিলেন।

ক্ষীণ-কণ্ঠে মনোরঞ্জন বলিলেন,"কিন্তু কি বাবা? তোমার হিতাকাঙ্ক্ষীমাত্রেই তোমাকে এ অনুরোধ করবে।"

"না, আমি তা বলছি না। আপনি তাকে, আমার বিশ্বাস, আপনার কন্যাকে যতখানি ভালবাসেন, ততখানি সীতাকেও বাসেন।"

"ততখানি? না, এখন তার চেয়ে অনেকখানি বেশী। মানুষ দুটো চোখকেই ভালবাসে, কিন্তু দুষ্ট গ্রহ যদি একটা কেড়ে নেয়, তখন অন্তরের মায়াটা দ্বিগুণ হয়ে পড়ে, যেটা বাকী থাকে, তার উপর। সুরথ! সেটার জন্যে ব্যাকুলতার আর অন্ত থাকে না, বাবা।"

"তাই আমি সীতাকে চাইছি। আমার বিশ্বাস, গৌরীর আত্মা এতে তৃপ্তি পাবে, আপনিও সুখী হবেন।"

কক্ষের প্রত্যেক প্রাণী যেন মন্ত্রবলে স্তম্ভিত হইয়া গেল। মনোরঞ্জন দুই হাতে সুরথের হাতটা চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, "এ কি সত্যি—এত দয়া মানুষের থাকে! আমার সীতা তোমার হবে?"

দৃঢ় অবিচলিত কণ্ঠে সুরথ কহিলেন, "আমি সেই প্রার্থনাই কচ্ছি।"

শ্রীমতী পুষ্পলতা দেবী।

ঘুমের মোহ

পূর্ব্বাকাশে মুক্তি-রবি দিচ্ছে সবে উঁকি,
আজ আঙ্গিনায় রাখিস্ না রে ধূলি,
বদ্ধ-ঘরের অন্ধতা ঘোর নিঃশেষে যাক্ চুকি,
দে রে দে রে সকল দুয়ার খুলি।

গঙ্গোদকে ধৌত করি মায়ের কুটীরখানি,
রাখ্ তোরণে কলস-ভরা বারি,
দ্বারদেশে আজ দাঁড়া এসে যুক্ত দুটি পাণি,
মুক্ত-প্রাণে উদ্দেশে আজ তারি।

দীর্ঘ দিনের দীর্ঘ যুগের আরাধনার ধন
আসবে ব'লে পাঠিয়ে দিল লেখা,
আজকে তারে ভুলিস্ না রে ক'ত্তে আবাহন,—
লুকিয়ে যাবে ক্ষণিক দিয়ে দেখা।

দেখ না চেয়ে আবার বুঝি আকাশ আসে ছেয়ে—
ঈশান যে ওই নিকষ-কালো মেঘে,
হায় হারাবি এমন সুযোগ হাতের কাছে পেয়ে—
ঘুম ভেঙ্গে আজ উঠলি এ কি জেগে!

এক নিমেষের অবহেলায় হায় রে জানিস্ নাকি,
সর্ব্বনাশের আঁধার আসে ঘিরে!
জাগার মত জাগ রে, ওরে ঈর্ষ্যারক্ত আঁখি
ফেল্ রে ধুয়ে প্রেমের নিঝর-নীরে।

হে ভগবান্! এই মিনতি জানাই তোমার পাশে,
ঊষার আলো আর দিও না ঢেকে,
মিলন-হাওয়ার পরশ দিয়ে ভারত-ভাগ্যাকাশে
দীপ্ত-উজল জয়টীকা দাও এঁকে।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
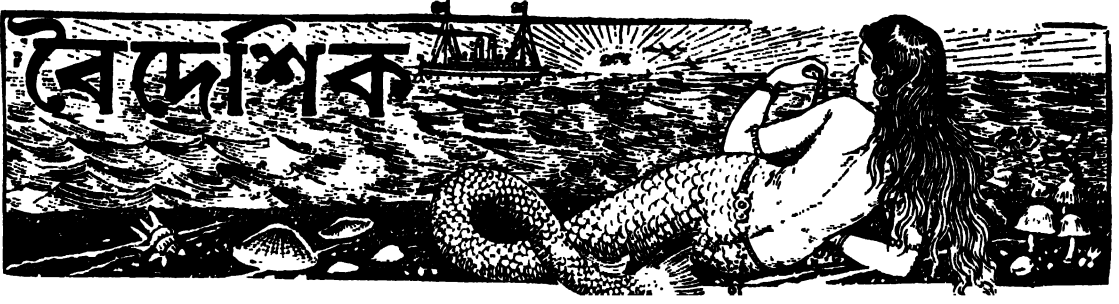
বিবাহ-বিচ্ছেদ

"ইংলণ্ডে দেহের ওজনবৃদ্ধিই অর্দ্ধেক বিবাহ-বিচ্ছেদের কারণ,—" কোন ইংরাজ মহিলা সমাজতত্ত্ববিদ্ এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থাৎ নারী (কোনও কোনও ক্ষেত্রে পুরুষ) বয়সের সঙ্গে মোটা হইতে আরম্ভ করিলেই, তাহার অর্দ্ধাঙ্গের (অর্থাৎ স্বামীর বা স্ত্রীর) সহিত মনোমালিন্যের সূত্রপাত হয় এবং ক্রমে উহা দম্পতির মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ আনয়ন করে। লেখিকা এই হেতু ইংলণ্ডের নারীদিগকে উপদেশ দিয়াছেন, "খবরদার! মোটা হইও না। অধিক ওজন আর বে-তার-বার্ত্তা (Weight and the wireless) ইংরাজ-পরিবারের পারিবারিক শান্তি নষ্ট করিতেছে।" বেচারা বেতার-বার্ত্তা কি অপরাধ করিল, তাহা লেখিকা খুলিয়া বলেন নাই। বোধ হয়, অসংসঙ্গে নরকবাস হিসাবে উহার অপরাধ ধরা হইয়াছে। কারণ, ইংরাজীতে কথা দুইটির আদ্য অক্ষর W, আর কথা দুইটি একত্র উচ্চারণ করিতে মিষ্ট লাগে। অথবা এমন হইতে পারে যে, বে-তারবার্ত্তার ঘটকালীতে অনেক কিছু ঘটিয়া যায়।

যাহা হউক, লেখিকা বিবাহ-বিচ্ছেদের মূলোৎপাটন করিতে আরও কতকগুলি উপদেশ দিয়াছেন। আমাদের দেশে যাঁহারা প্রতীচ্যের হাবভাব ও চিন্তার ধারা আমদানী করিবার জন্য একান্ত ব্যগ্র, তাঁহাদের পক্ষে এগুলি কার্য্যকর হইতে পারে। তিনি বলেন, "কথায় বলে, বিবাহ স্বর্গে হয় Marriages are made in Heaven (অর্থাৎ ভগবান্‌ই নারী ও পুরুষের মধ্যে বিবাহ-সম্বন্ধ ঘটাইয়া দেন)। কিন্তু বিবাহ স্বর্গে হইলেও খুব কমই স্বর্গে থাকে (অর্থাৎ বিবাহ প্রায়ই সুখ ও শান্তি প্রদান করে না)।" কথাটা বুঝুন। শুনা যায়, আমাদের দেশে নাকি প্রেমের বিবাহ (Marriage of love) হয় না। কারণ, এ দেশে নর-নারী পরস্পর পছন্দ করিয়া বিবাহ করে না, অভিভাবকরাই বিবাহ ঘটাইয়া দেন। প্রতীচ্যে ইহার বিপরীত। সেখানে যুবক-যুবতী অভিভাবকের ধার ধারে না, পরস্পর মিলামিশা করে, পূর্ব্বরাগ হয়, অনুরাগ দেখা দেয়, তাহার পর তাহাদের প্রেমের বিবাহ হয়। তবে এই ইংরাজ-মহিলা লেখিকা কেন বলিতেছেন যে, তাঁহাদের দেশের বিবাহ স্বর্গে হইলেও 'স্বর্গে থাকে না'? ইহাই ত সমস্যা।

লেখিকা সমাজে বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রাবল্য দেখিয়া তাঁহার স্বদেশী ভগিনীদিগকে পরামর্শ দিতেছেন,—"দেখ, পুরুষগুলাকে সেই শুষ্ক সেকেলে (dreary old) ধারণা পোষণ করিতে দিও না। নারীর বিবাহ ভিন্ন গতি নাই। বিবাহিত জীবন দীর্ঘকালব্যাপী হইতে পারে। এই জীবন প্রায়ই গতানুগতিক হইয়া থাকে, ইহাতে অভিনবত্ব কিছুই থাকে না, কাযেই সহজেই ইহাতে বিরক্তি আসিয়া থাকে। সুতরাং কেবল সংসার-প্রতি-পালনের উদ্দেশ্যে বিবাহ করার ফাঁদে কখনও পা দিও না। তোমরা যাহাই কর, কখনও 'ভাল স্ত্রী' হইও না (Avoid being a good wife). পুরুষ ভাল স্ত্রী চাহে না। যদি চাহে, তাহা হইলে তাহারা জানিতে চাহে না যে, তাহাদের স্ত্রী ভাল স্ত্রী। পুরুষ কেতাবে ভাল স্ত্রীর কথা পড়িতে ভালবাসে, কিন্তু কায হইতে ঘরে ফিরিয়া ভাল স্ত্রী দেখিতে চাহে না। এই হেতু কিছুতেই স্বামীকে জানিতে দিও না যে, তুমি তাহার জন্য বড় ব্যস্ত, বড় আগ্রহান্বিত। তুমি সর্ব্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিবে, স্বামীর গৃহে আসিবার সময় হইলে ভাল করিয়া সাজিয়া গুজিয়া থাকিবে। পৃথিবীতে পুরুষ অপেক্ষা নারীর ভাগ অধিক। এই হেতু কখনও স্বামীকে জানিতে দিবে না যে, তোমাকে সে হৃদয়ে পাইয়াছে বা বশ করিয়াছে, তাহার পাইবার আকাঙ্ক্ষাকে কেবল জাগাইয়া রাখিবে।"

তাহার পর আরও উপদেশ-সুধা বন্টিত হইয়াছে; উপদেশ এইরূপ:—"প্রেমে অথবা বিবাহিত জীবনে দুই পক্ষ থাকে; এক পক্ষ অপর পক্ষকে দূরে রাখিবার ভাণ করে, অপর পক্ষ প্রথম পক্ষের অনুগ্রহ ভিক্ষা করে। তুমি কখনও তোমার স্বামীর পশ্চাতে দৌড়াইও না, তাহাতে সে তোমার পশ্চাতে দৌড়াইবার জন্য সুযোগ অন্বেষণ করিবে। তবে বেশী দূরে থাকিও না। কেন না, সকল কাযের 'অতি'ই মন্দ। যখন বুঝিবে, আর তফাৎ থাকা উচিত নহে, অথবা যখন বুঝিবে, তোমার বয়স বাড়িতেছে বলিয়া তোমার আকর্ষণ-শক্তি কমিতেছে, তখন স্বামীকে তোমার নাগাল পাইতে দিও।

"নারী প্রায়ই একের অনুরাগিণী হয় (যদিও লোক ভিন্ন ধারণা পোষণ করে)। সুতরাং স্বামীর অনুরাগিণী হওয়া অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু আমার উপদেশ,—যথার্থ-ই স্বামীর প্রেমে পড়া নারীর কর্ত্তব্য নহে! আর যদিও বা তুমি স্বামীকে ভালবাসিয়া ফেল, তাহা হইলে কখনও সে কথা স্বামীকে জানিতে দিও না। কারণ, পুরুষ যদি বুঝিতে পারে যে, সে যাহা চাহে, তাহা পাইয়াছে, তাহা হইলে আর তাহার জন্য ব্যস্ত হইবে না বা তাহার আর কোন আকাঙ্ক্ষা থাকিবে না। মোটের উপর স্বামীর সহিত নিবিড় বন্ধুত্ব পাতানই স্ত্রীর কর্ত্তব্য। বন্ধুত্ব নিবিড় হইলেই আর বিবাহ-বিচ্ছেদের আশঙ্কা থাকে না।"

কেমন, সুন্দর উপদেশ নহে কি? যেখানে পুরুষ ও নারীর মধ্যে গভীর প্রেমের অস্তিত্ব থাকে, সেখানে রূপজীবিনীর

কৌশলজাল বিস্তার করিয়া স্বামীকে ধরিবার প্রয়োজন হয়, ইহা আমাদের দেশের চিরন্তনী ভাবধারা শিক্ষা দেয় না, সংসার-ক্ষেত্রেও তাহা দেখা যায় না। এই হেতু আমাদের বিবাহিত জীবনে দাম্পত্যপ্রেমের প্রগাঢ়তা বা স্থায়িত্ব কথার কথা নহে, তাহাই স্বাভাবিক। ব্যতিক্রম যে নাই, এমন কথা বলিতেছি না। তবে সংখ্যার আধিক্য দেখিয়া সাধারণ নিয়ম হয়। অল্প-বয়সে অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে যে বিবাহ হয়, তাহাতে পিতৃ-গৃহ ও শ্বশুর-গৃহে যাতায়াতের ও সংসারের সহিত মিলা-মিশার ফলে যে বন্ধুত্ব এবং পরে ভালবাসা দেখা দেয়, তাহা সহজে ভাঙ্গিয়া যায় না। আশ্চর্য্য এই, আমাদের "যদিদং হৃদয়ং মম", ইত্যাদির মত প্রতীচ্যের খৃষ্টান-বিবাহের মন্ত্রেও "Until death do us part, "মৃত্যু যত দিন আমাদিগকে পৃথক্ না করিবে," কথা স্বামী ও স্ত্রীকে বলিয়া অঙ্গীকারবদ্ধ হইতে হয়, অথচ প্রতীচ্যে সদাই বিচ্ছেদের আশঙ্কা থাকে। এই বিপরীত ভাবের অনুকরণ আমাদের সুখের সংসারে আমদানী করা ভাল কি মন্দ, তাহা দেশবাসীই বিবেচনা করিবেন।

প্রতীচ্যে বিবাহিত জীবন

অধুনা প্রতীচ্যজাতিদের মধ্যে মার্কিণরাই সর্ব্বাপেক্ষা নবীন, সভ্য ও শক্তিমান বলিয়া পরিগণিত। শক্তি বলিতে এখানে কেবল দৈহিক-শক্তিকে বুঝায় না, অর্থ-শক্তিকেও বুঝিতে হইবে। কিন্তু এই নবীন তেজোদৃপ্ত সুসভ্য জাতির বিবাহিত জীবন সাধারণতঃ সুখকর নহে বলিয়া তাহাদের দেশের বহু মনীষী আক্ষেপ করিতেছেন। বিলাতেও খৃষ্টান-পাদরীরা সভায় সমবেত হইয়া তথাকার বিশৃঙ্খল বিবাহিত জীবন ধর্ম্মের অনুশাসন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। ফরাসীদের অবস্থাও তথৈবচ।

এ সকল দেশের বার্ষিক বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যা অথবা আদালতে বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলার সংখ্যা দেখিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। কত সংসারের সুখ-শান্তি নষ্ট হইয়াছে, তাহা ইহা হইতেই জানা যায়। সমাজ উত্যক্ত হইয়া এখন এই অবস্থার প্রতীকারপ্রার্থী হইয়াছে। এ দেশগুলি তবু খৃষ্টান ধর্ম্মটিকে 'পোষাকী' করিয়া লইয়াছে। স্বার্থ ও অর্থ, এতদুভয়ই এখন ইহাদের আটপৌরে। কিন্তু 'ডেনমার্ক' ও 'স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া' দেশ সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় না। নরওয়ে, সুইডেন ও ডেনমার্ক,—এই তিনটি দেশের উপর এখনও বোধ হয়, ধর্ম্মের প্রভাব কতক মাত্রায় বিদ্যমান আছে। কিন্তু এই তিন দেশেও বিবাহ-বিচ্ছেদ বড় অল্প হয় না।

পরলোকগত সমাজ-সংস্কারক এলেন কে যখন তাঁহার প্রসিদ্ধ নীতি "প্রেমহীন বিবাহ—নীতি ও ধর্ম্ম-বিগর্হিত" প্রচার করেন, তখন হইতে নরওয়ে, সুইডেন ও ডেনমার্ক দেশে বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্বন্ধে যুক্তিসঙ্গত আইন-কানুন গঠন করিবার জন্য আন্দোলন উপস্থিত হয়। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে এতদর্থে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান কমিশন গঠিত হয়। আট বৎসরকাল তথ্য সংগ্রহ করিবার পর কমিশন তাঁহাদের রিপোর্ট প্রকাশ করেন। রিপোর্টে পরামর্শ দেওয়া হয় যে,—"অন্যান্য চুক্তির ন্যায় বিবাহও এক চুক্তি। দাম্পত্য যোগাযোগ চুক্তির উপর নির্ভর করে। তবে এই চুক্তি অনুসারে যোগ বা বিচ্ছেদ, যে ব্যবস্থাই করা হউক, সর্ব্বাগ্রে বিবাহের ফলে যে বালকবালিকার উদ্ভব হয়, তাহাদিগের সম্বন্ধে সুব্যবস্থা করিতে হইবে। বিবাহ স্বর্গের নির্দ্দেশে হয়, এ কথাটা কথার কথা বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। উহা যে মনুষ্যকৃত অনুষ্ঠান বা ব্যবস্থা (Human institution) এবং অভিজ্ঞতার ফলে উহার মাঝে মাঝে যে পরিবর্ত্তন, পরিবর্জ্জন, সংশোধন করা প্রয়োজন, তাহা মানিতে হইবে। বিবাহ-বিচ্ছেদ হইবার সময় স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে পৈতৃক সম্পত্তি সম্পর্কে যথাসম্ভব প্রভেদ বর্জ্জিত হইবে। স্বামীর অর্থ এবং স্ত্রীর সন্তানপ্রতিপালন তুল্য-মূল্য বলিয়া পরিগণিত হইবে।"

বুঝিয়া দেখুন, ইহাতে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদের কত চমৎকার সুবিধা ও সুযোগ প্রদান করা হইল! বিবাহ যে ধর্ম্ম-বন্ধন নহে, চুক্তিমাত্র, ইহা স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার মত ধর্ম্মভীরু দেশেও স্বীকৃত ও গৃহীত হইল। ইহার কি বিষময় ফল হইতে পারে?

১৯২৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সুইডেন দেশের আদালতসমূহ কতগুলি বিবাহ-বিচ্ছেদের রায় দিয়াছে, তাহার হিসাব দেখুন :—

(১) ১৯২৩ খৃঃ—১ হাজার ৫ শত ৩১টি, (২) ১৯২৪ খৃঃ—১ হাজার ৬ শত ৩৪টি, (৩) ১৯২৫ খৃঃ—১ হাজার ৭ শত ৪৮টি, (৪) ১৯২৬ খৃঃ—১ হাজার ৭ শত ৮০টি, (৫) ১৯২৭ খৃঃ—১ হাজার ৯ শত ৬৬টি। অর্থাৎ ক্রমেই ঊর্দ্ধগতি! একবার বন্ধন বা দায়িত্ব অথবা কর্ত্তব্যের হাঙ্গামা শিথিল করিয়া দিলে ফল কি হয়, তাহা ইহা হইতেই জানা যায়।

তাহার পর সুইডেন দেশে বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যার তুলনামূলক সমালোচনা করিলে দেখা যায়, ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে বিবাহ হইতে বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যা শতকরা ৪·০২ বাড়িয়াছিল, আর ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে বাড়িয়াছিল শতকরা ৫·০৫! ব্যাপার বুঝুন।

আরও দেখুন, সুইডেনে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে বিবাহ-বিচ্ছেদের আবেদন আদালতে দাখিল হইয়াছিল ২ হাজার ৩ শত ৩ খানা। ইহার মধ্যে নাগরিক নরনারীর আবেদন গ্রাম্য নরনারীর অপেক্ষা অনেক অধিক। ইহা হইতেই বুঝা যায়, সহরের পাপ এখনও গ্রামের সর্ব্বত্র প্রবেশ করে নাই। আবেদনগুলির মধ্যে ৩ শত ২৬ খানা স্ত্রীর, ২ শত ৫৭ খানি স্বামীর এবং ২ শত ৫৬ খানি মিশ্রসম্মতিক্রমে। যাহারা ৬ হইতে ১০ বৎসর বিবাহিত জীবনের পর বিবাহ-বিচ্ছেদ চাহিয়াছে, তাহাদের সংখ্যা ইহাদের মধ্যে শতকরা ৩০ জন। যে সকল স্ত্রী স্বামীর সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল, তাহারা ২০ হইতে ২৪ বৎসরের মধ্যে বিবাহিত হইয়াছিল। এই সকল বিবাহের ফলে নাবালক সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে ছিল শতকরা ৩০ জন।

এই সকল কথার আলোচনা করিয়া দেখা যায় যে, এই সকল খৃষ্টান ধর্ম্মপ্রাণ দেশেও যৌবনে পরস্পর অনুরাগ-পূর্ব্বরাগের ফলে বিবাহের রূপ কেমন! এমন আপন পছন্দমত যৌবনে বিবাহে ৬ হইতে ১০ বৎসর পরস্পর বড় বড় সন্তান-সন্ততি লইয়া ঘর করিবার পরেও স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে! কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্! এই বিষই না এ দেশের কেহ কেহ ভারতীয়ের সংসারে আনয়ন করিবার প্রয়াস পাইতেছেন?

এইবার 'সভ্যতার খনি' প্রতীচ্যের 'মুকুটমণি' মার্কিণ যুক্ত-রাজ্যের সহিত এই দেশগুলির তুলনা করিব। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের সরকারী সেনসাস বিবরণ হইতে হিসাব উদ্ধৃত করিতেছি।

	লোকসংখ্যা	বিবাহ	বিবাহ ও বিচ্ছেদের শতকরা তুলনামূলক আলোচনা	বিচ্ছেদ	হাজারকরা বিবাহ বিচ্ছেদ
মার্কিণ	১২২৭৭৫০৪৬	১২৩২৫৫৯	১৬'৩	২ লক্ষের বেশী	১'৬৪১
সুইডেন	৬১২০০৮০	*	*	২৩ হাজারের "	'৩৭৬
নরওয়ে	২৭৭২০০০	১৭৭৫২	৪'৪	৭ শত ৯১	'২৮৫
ডেনমার্ক	৩৪৩৪৫০০		৮'২	২২ হাজারের "	'৬৫৯

তাহার পর হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, প্রতীচ্যে অনেক সংসারে অধিক সংখ্যায় প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানসন্ততির জন্য অনেক সময়ে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটান দুষ্কর হয়। এজন্য অনেক স্বামী-স্ত্রী কিল খাইয়াও কিল চুরি করে। নতুবা বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যা আরও যে কত অধিক পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইত, তাহার ইয়ত্তা কে করিতে পারে? এই হেতু প্রতীচ্যের বহু পরিবারে বৎসরের অধিক দিন কলহ, হাঙ্গামা, অশান্তি ও মনঃকষ্ট (discord and lifelong unhappiness) লাগিয়াই আছে। অনুকরণপ্রিয় Sex psychology ওয়ালারা এইরূপ পারিবারিক জীবন কি এ দেশেও আমদানী করিতে চাহেন?

কোন্‌টা সত্য?

আধুনিক রাসিয়ার সম্পর্কে পরস্পরবিরোধী অভিমত দেখিতে পাওয়া যায়। এক পক্ষ বলেন, রাসিয়ার কম্যুনিষ্ট গভর্ণমেণ্ট নর-রাক্ষসবিশেষ। তাহারা ধর্ম্ম, সমাজ, সংসার, পরিবার, কোনও বন্ধনই মানে না, প্রীতির সম্বন্ধ তুলিয়া দিয়া মানুষকে যন্ত্রবিশেষে পরিণত করিয়াছে, ইত্যাদি। অপর পক্ষ ইহার বিপরীতই বলিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, এখন জগতের সমস্ত সাম্রাজ্য-বাদী ধনিক সরকারের রাসিয়ার কম্যুনিষ্ট শ্রমিক সরকারের আদর্শ অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। এই দুএর কোন্‌টা সত্য?

মিঃ ইথান টি কোলটন মহাযুদ্ধের সময় হইতে রাসিয়ায় বহু দিন বাস করিয়া রাসিয়ার সোভিয়েট সরকারের কার্য্যকলাপের সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়া রাসিয়ার বর্ত্তমান সরকারের সম্বন্ধে একখানি কেতাব লিখিয়াছেন। এই কেতাবে তিনি মোটামুটি লিখিয়াছেন,—

"সোভিয়েট সরকার দেশ হইতে সকল প্রকার ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়াছেন। তথায় ধর্ম্মবিশ্বাস নষ্ট করিবার জন্য সরকারের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হইতেছে। সেখানে এই উদ্দেশ্যে সরকারের সাহায্যে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, নাম তাহার Society of the Militant Godless ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে ইহার সদস্য-সংখ্যা ছিল মাত্র ৮৭ হাজার, এখন ৩৫ লক্ষ। এই সমিতির চেষ্টায় দেশের সর্ব্বত্র ধর্ম্মবিরোধী স্কুল-সমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ পুস্তক-পুস্তিকা অসংখ্য প্রচারিত হইতেছে। ধর্ম্মের যত উৎসব আছে, তাহার বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য চালান হইতেছে। 'রেড'-বিবাহ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এবং জাতকর্ম্ম (Christening) ইত্যাদি বাইবেলানুযায়ী ধর্ম্ম-অনুষ্ঠানের বিপক্ষে আবিষ্কৃত হইতেছে। এই সমিতির মুখপত্রের নাম 'বেজবোজনিক' অর্থাৎ নাস্তিক। এইরূপ শত শত পত্র আছে। এই সকল পত্রের মারফতে ধর্ম্মের গ্লানি ও ধর্ম্মের বিরুদ্ধে বিদ্রূপ-ব্যঙ্গ প্রচারিত হইতেছে। উক্ত পত্রের এক সংখ্যায় খৃষ্টানদের Lord's Supper উৎসবকে ব্যঙ্গচিত্র দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, সিনেমা, অভিনেতা, অভিনেত্রী প্রভৃতির দ্বারা কম্যুনিজমের ধর্ম্মদ্বেষের মন্ত্র প্রচার করা হইতেছে।"

এই মিঃ কোল্‌টন কিন্তু সাহিত্য-জগতে আদৌ পরিচিত নহেন। অন্য কোনও ক্ষেত্রে তাঁহার বৈশিষ্ট্য বা ব্যক্তিত্ব আছে কি না, জানা নাই। কিন্তু বিলাতের বিখ্যাত লেখক জর্জ্জ-বার্ণার্ড শ'র নাম শুনেন নাই, শিক্ষিত সমাজে এমন লোক আছে বলিয়া মনে হয় না। মিঃ শ কিন্তু এই লেখকের বিপরীত কথা বলিতেছেন। তিনি স্পষ্টবক্তা, কখনও রাখিয়া ঢাকিয়া কিছু বলেন নাই, কোন লোকের বা জাতির মন যোগাইয়া লিখেন নাই। তিনি রাসিয়ার সম্পর্কে লিখিয়াছেন,—

"আমি আজীবন সোসালিজম্ মন্ত্রের প্রচার করিতেছি। রাসিয়া ভ্রমণ করিয়া আসিয়া আমার ধারণা হইয়াছে যে, এই দেশই যথার্থ সোসালিষ্ট গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হই-য়াছে, ব্যবসায়-বাণিজ্য সোসালিজম্ মন্ত্রানুসারে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে এবং সাম্রাজ্যিকতা ও ক্যাপিট্যালিজমের সম্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। এই হেতু সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহে যে সকল সোসা-লিষ্ট অরণ্যে রোদন করিতেছে, তাহাদের রাসিয়া যাওয়া উচিত এবং কি ভাবে তাহাদের মন্ত্র অনুসারে দেশ শাসিত হইতে পারে, তাহা দেখিয়া আসা উচিত। ষ্ট্যালিন ও ট্রটস্কি কি ভাবে শাসনযন্ত্র চালাইতেছেন, তাহা দেখিয়া তাঁহারা বিস্মিত হইবেন। তাঁহাদের শাসন-পদ্ধতি পূর্ণ ধর্ম্মমূলক (religious system), ষ্ট্যালিন এ কথা শুনিয়া বড়ই আমোদ উপভোগ করিবেন বটে, কিন্তু ইহা সত্য কথা। রাসিয়াবাসীরা ধর্ম্মভীরু জাতি। আমার বিশ্বাস, রাসিয়ার 'পাঁচ বৎসরের শাসন-পদ্ধতির কল্পনা' (Five years' plan) আমাদের দেশে অনুসৃত হইলে অনেক উপকার হইবে। মার্কিণ যুক্তরাজ্যও যদি ঐ কল্পনামত শাসনদণ্ড পরিচালনা করে, তাহা হইলে তাহারও অনেক উপকার হইবে। রাসিয়ার শাসকরা শ্রমিক ও কৃষকদিগকে বলেন, "তোমরা কিছু কিছু উপবাস কর, বিলাস-ব্যসন একবারে ছাড়িয়া দাও, আগামী পাঁচ বৎসরের জন্য যতদূর সম্ভব হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম কর। তাহার ফল পাঁচ বৎসরের পরে ভোগ করিবে।"

কাহার কথা সত্য?

সভ্যতার আদর্শ

মিঃ বেসিল ম্যাথুস নামক য়ুরোপীয় লেখক লিখিয়াছেন,—"আধুনিক বিজ্ঞান জগতে কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনই না আনয়ন করিয়াছে? সিনেমা, টেলিগ্রাফ, গ্রামোফোন, টকি, বেতার, এরোপ্লেন, সমুদ্রের লাইনার,—এই সকল আবিষ্কার সময় ও দূরত্ব দূর করিয়াছে, সহস্র সহস্র মাইল দূরবর্ত্তী ঘটনা ও নরনারীর

চিত্র ও অভিনয় অতি অল্পসময়ে বহুদূরে স্থানান্তরিত করিতেছে। এ সকল আবিষ্কার একটা বড় সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার দ্বারা জাতিবিদ্বেষ ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। সিনেমা চলচ্চিত্রের কথাই ধরা যাউক। ইহা দ্বারা সহস্র সহস্র এসিয়া-বাসী ও আফ্রিকাবাসী য়ুরোপ ও মার্কিণ দেশের বীভৎস চিত্র নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছে। অসংখ্য ভারতীয় ছাত্র এই সকল চিত্র দেখিয়া কি ধারণা করিতেছে? ভিনাস, নক-আউট মিলি, ওনিমুন একস্প্রেস, এনজেল চাইল্ড, পপুলার সিন, হার্ট অফ সালোম প্রভৃতি চিত্র দেখিবার পর হিন্দু-মুসলমানের মনে প্রতীচ্যের যৌন-মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে যে জঘন্য ধারণা জন্মিতেছে, তাহাতে কি জাতির প্রতি জাতির ঘৃণা ও বিদ্বেষ সঞ্জাত হইতেছে না? বিলাসলালসাপূর্ণ প্রেমের অভিনয়, অশ্লীলভাবে নগ্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রদর্শন, মত্ততা, বাজী রাখিয়া ঘুসাঘুসির লড়াই দেখিয়া ভারতীয়রা কি প্রতীচ্যের সভ্যতার প্রতি ঘৃণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে না?"

কিন্তু জিজ্ঞাস্য, কেবলই কি 'কল্পনা' এই অনিষ্ট করিতেছে? প্রতীচ্যের বাস্তব সামাজিক জীবন কিরূপ? সে সব পারিবারিক বা সামাজিক জীবনের চিত্র ত লুকাইয়া রাখিবার উপায় নাই। প্রতীচ্যের যৌনতত্ত্ব-সম্বলিত উপন্যাস এবং সাময়িক পত্রাদির পত্রাঙ্ক দেখিলেই সেই সকল চিত্র যে চক্ষুর সমক্ষে জাজ্বল্যমান হয়। দুই একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি :—

(১) Cult of Nudity মার্কিণ দেশের এক শ্রেণীর নর-নারী নগ্নতার শিক্ষাদীক্ষায় অভ্যস্ত হইতেছেন। আদম ও হবা যে ভাবে 'ইডেন উদ্যানে' স্বভাবের অর্থাৎ প্রকৃতির অনুযায়ী জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সেই ভাবে 'স্বাভাবিক' জীবন যাপন করিয়া জগতে আদর্শ রাখিয়া যাইতেছেন। কিন্তু সকল দেশের মত সেখানেও পুলিস ও পেনাল কোড বড় বালাই! তাই সেখানে এই শ্রেণীর 'স্বাভাবিক' নরনারীর উপর নজর রাখিবার উদ্দেশ্যে এক Police of morals অথবা নীতিরক্ষী পুলিস নিযুক্ত করা হইয়াছে। তাহারা নানা সুবিধা-জনক স্থান হইতে চারিদিকে দূরবীক্ষণযন্ত্র সাহায্যে এই শ্রেণীর নরনারীর সন্ধান করিতে নিযুক্ত। নিউইয়র্ক সহরের একাংশে তাহারা এক দিন এক গৃহের ছাদের উপর একটি 'ইডেন উদ্যান' দেখিতে পাইল। সেখানে অনেক নরনারী নগ্নাবস্থায় বিশ্রাম ও আনন্দ উপভোগ করিতেছিল।

তখনই পুলিস সেই 'ইডেন উদ্যান' আক্রমণ করিল। অমনই আদম ও হবার দল তাড়াতাড়ি কোনরূপে এক একটা পায়জামা আঁটিয়া ফেলিল। কিন্তু পুলিস তাহাতেও ছাড়িল না, তাহাদের গ্রেফতার করিয়া থানায় লইয়া গেল। আদম ও হবার সংখ্যা দুই শত। তাহাদের মধ্যে অনেকে ইংরাজজাতীয়। তাহাদের মধ্যে কয়েকটি একবারে অল্পবয়স্কা যুবতী ও কিশোরীও ছিল। তাহারা যে ইডেন উদ্যানে হবা হইবার অভ্যাস করিতে যাইত, তাহা তাহাদের পিতামাতা বা অন্য অভিভাবক জানিতেও পারিত না।

নগ্ন-সভ্যতার উপাসকদের মূলমন্ত্র Back to Nature অর্থাৎ 'প্রকৃতির আদিম অবস্থায় ফিরিয়া চল'। এই উপাসক-দলের মধ্যে পৃথিবীর সমস্ত সভ্যজাতির সদস্য আছে। এই ক্লাবের খাতাপত্র দেখিয়া জানা গিয়াছে যে, য়ুরোপেই সদস্যের সংখ্যা ১০ হাজার, আর ইংলণ্ডে ৩ হাজার।

(২) নৈশসমিতি ও নাচ-ঘর। নিউইয়র্ক সহরের Night Clubs and Dance Halls এর নাচ বোধ হয় অনেকেই দেখেন নাই। এগুলি কি? মার্কিণ লেখক ও সমাজ-সংস্কারকরাই বলিয়া থাকেন, এগুলি নরকবিশেষ। এ সকল স্থানে পাপের নগ্নচিত্র যেরূপ বীভৎসভাবে দেখা যায়, জগতের কুত্রাপি তাহার তুলনা নাই। অথচ মার্কিণ জাতিই প্রতীচ্যের সভ্য-চূড়ামণি!

নিউইয়র্কে সমাজ-সংস্কারকরা একটি স্বেচ্ছাসেবক-সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, নাম তাহার Committee of fourteen. তাঁহারা সহরের নানা স্থানের পাপের আড্ডাসমূহ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, "অধুনা ব্যবসায়ের জন্য পাপ (Commercialised vice) যে মূর্ত্তিতে সহরে দেখা দিয়াছে, গত ১৫ বৎসরের মধ্যে সেরূপে কখনও দেখা দেয় নাই। আমরা ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি যে, সহরে ৪০টি 'নাচঘর' ও 'রাত্রি-সমিতি' (Night Clubs) আছে। প্রত্যেক নাচঘরটিতেই (মাত্র ৩টি ছাড়া) নাচিবার সঙ্গিরূপে যুবতী নারী পয়সা দিলেই পাওয়া যায়। প্রত্যেক সপ্তাহে ৩৫ হাজার হইতে ৫০ হাজার যুবক ও যুবতী এই সকল নাচঘরে 'ফুর্ত্তি' করিতে যায়। নারী-মোহিনীদের (Hostesses) সংখ্যা আড়াই হাজার হইবে। কতক নাচঘরের বাহিরটা বেশ ভদ্রতা ও শ্লীলতাসম্মত, কিন্তু ভিতরে সর্ব্বত্রই বীভৎস কাম-কলার ও বিলাস-লালসার বিকট চিত্র! সকল মোহিনীই রূপ-জীবিনী নহে; অনেকে গৃহস্থকন্যা! অনেক যুবতী গৃহস্থ-কন্যা প্রথমে প্রলুব্ধ হইয়া এইরূপ নাচ-ঘরে আসিলে তথাকার বীভৎস অশ্লীলতা ও নগ্নতা দেখিয়া ভয়ে পলাইয়া যায়। যাহারা বহুদিন অধঃপাতে গিয়াছে, তাহারা পাপের স্রোতে গা ভাসাইয়া দেয়। কেহ কেহ নাচঘরে থাকিয়া বাহিরে চুরি-বাটপাড়িতে অভ্যস্ত হয়। "একটা সঙ্ঘ (Syndicate) আছে, তাহার তাঁবে বিস্তর নাচ-ঘর আছে। এই সঙ্ঘের নাম Chain Dance Hall. জনরব, কয়েক জন লাইসেন্স ইন্‌স্পেক্টর, কয়েক জন পুলিসের লোক এবং এক জন ম্যাজিষ্ট্রেট গোপনে ইহার পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া থাকেন!" "বিশ বৎসর পূর্ব্বে যে সকল রূপজীবিনী পাপানুষ্ঠানকারিণীদিগকে সহর হইতে বিতাড়িত করা হইয়াছিল, তাহারা যুদ্ধের পর আবার প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে এবং ব্রুকলিন ও ম্যানহাটান পল্লীতে এই ভাবের নাচ-ঘর ও রাত্রি-যাপনের ক্লাবের ব্যবসায় খুলিয়াছে। তাহারা প্রকাশ্য রাজপথে 'পুরুষ ধরিয়া' বেড়াইতেছে।" সুতরাং যাঁহারা বলিতেছেন, প্রতীচ্যের সিনেমা প্রভৃতির দ্বারা প্রাচ্যের শিক্ষিত তরুণদের প্রতীচ্যের সভ্যতার প্রতি ঘৃণার উদ্রেক করা হইতেছে, তাঁহাদের কথার মূল্য কি? তাঁহাদের সমাজশরীরে যে বিষ প্রবেশ করিয়াছে, তাহা প্রতিষেধের জন্য তাঁহারা চেষ্টা করিলে সমাজের অনেক উপকারসাধন করিতে পারেন। মিস মেয়োর মত নর্দ্দামার ইন্‌স্পেক্টর প্রাচ্যের কল্পিত ছিদ্রান্বেষণে ব্যস্ত না হইয়া আপনাদের সমাজ-সংস্কারে মনোযোগ দিলে ভাল করিবেন না কি?

নায়াস্ দ্বীপ

সুমাত্রা দ্বীপের পশ্চিমভাগে নায়াস্ দ্বীপ অবস্থিত। মানচিত্রে ইহা একটি বিন্দুর মত স্থান অধিকার করিয়া থাকিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে নায়াস্ দ্বীপের দৈর্ঘ্য ৮০ মাইল। উহার বিস্তারও অল্প নহে।

সভ্যজগতের সহিত এই দ্বীপের কোনও সংযোগ নাই। বেতারবার্ত্তা অথবা তাড়িতবার্ত্তা এখানে পৌঁছিবার কোন ব্যবস্থাই নাই। শুধু মাঝে মাঝে যখন জলযান এই দ্বীপে আগমন করে, তখনই অন্তদেশের সংবাদ এই দ্বীপে সামান্য-ভাবে প্রচারিত হইয়া থাকে। তথাচ এখানে একটা প্রাচীন সভ্যতা বিদ্যমান। সেই প্রাচীন সভ্যতার সংবাদ পাইয়া অনুসন্ধিৎসু মার্কিণ ঐতিহাসিক বা প্রত্নতাত্ত্বিকগণকে উৎসাহিত করিয়া তুলে। তাঁহাদেরই এক জন নারী ঐতিহাসিক—মিসেস্ ম্যাবেল কুক্ কোল—এই দ্বীপের সংবাদ সভ্যজগতে সংপ্রতি প্রচারিত করিয়াছেন।

নায়াস্ দ্বীপের উত্তর প্রান্ত কিছু অনুর্ব্বর এবং প্রিয়দর্শন নহে। সে দিকে গ্রীষ্মের প্রখরতাও অধিক এবং খাদ্য-দ্রব্যাদিও প্রচুর নহে। দ্বীপের দক্ষিণাংশ ঠিক ইহার বিপরীত। প্রাচীন যুগের সভ্যতার মধ্যেও সেখানে আধুনিক যুগের দৃষ্টান্ত বিদ্যমান, নগরগুলি ধন-সম্পদের পরিচয় দান করিতেছে।

বহু শতাব্দী পূর্ব্বে বোধ হয় জলমগ্ন জাহাজের আরোহী অথবা উচ্চাশয় ব্যক্তিগণ এতদঞ্চলে আসিয়া বসবাস করিয়া থাকিবে। পৃথিবীর সহিত সংযোগসূত্র হারাইয়া তাহারা বংশানুক্রমে আপনাদের মনগড়া আদর্শানুযায়ী দেশের আইন, ললিত-কলা এবং যুদ্ধ-প্রণালী প্রভৃতির প্রবর্ত্তন করিয়াছিল।

নায়াস্ দ্বীপের জনৈক সর্দ্দার

আদিম যুগের দ্বীপাধিবাসীরা এখানে বড় বড় নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিল, রাজপথ প্রস্তর দ্বারা রচনা করিয়াছিল, প্রকাণ্ড পাথর কুঁদিয়া নানাবিধ মূর্ত্তি গড়িয়াছিল। বর্ত্তমান যুগের দ্বীপের যোদ্ধারা ধাতুনির্ম্মিত বর্ম্ম দ্বারা শরীর আবৃত করিয়া রাখে। তাহাদের দলপতি বা সেনাপতিগণ স্বর্ণখচিত পরিচ্ছদ ধারণ করে। অথচ এমন একটা সভ্য দেশের কথা সভ্যজগতের অধিকাংশ লোকেরই অবিদিত।

"স্পাইস্" দ্বীপপুঞ্জের সহিত বহু শতাব্দী পূর্ব্বে য়ুরোপীয়গণ যখন বাণিজ্যসূত্রে আবদ্ধ ছিল, তখন অর্ণব-যান-সমূহ সুমাত্রা দ্বীপের পূর্ব্ব-উপকূলে আশ্রয় গ্রহণ করিত। এই দিকে গমন করিবার সময় মালাক্কা প্রণালী অতিক্রম করিতে হইত। এখনও—বর্ত্তমান যুগেও, বহুমূল্য পণ্যপূর্ণ পোতসমূহ এই পথেই গতায়াত করিয়া থাকে। শুধু

একটিমাত্র য়ুরোপীয় পোতবিভাগ সুমাত্রার পশ্চিম উপকূল দিয়া জাহাজ চালাইয়া থাকেন। এই সকল জাহাজের আরোহীরা যদি কখনও নায়াস্ দ্বীপ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, তবে তাঁহারা উহাকে পর্ব্বত ও অরণ্যসমাকুল ক্ষুদ্র দ্বীপ মনে করিয়াই উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা স্বপ্নেও কল্পনা করেন নাই, উহা "স্বর্ণময় দ্বীপ!"

৮৫১ খৃষ্টাব্দে মুসলমান সদাগর সুলেমান সর্ব্বপ্রথম নায়াস্ দ্বীপের উল্লেখ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত বিবরণ পাঠে জানা যায়, এই দ্বীপের অধিবাসীরা প্রচুর স্বর্ণের অধিকারী। তাহারা নারিকেলভোজী এবং তৈল দ্বারা দেহ অভিষিক্ত করিয়া থাকে। কোনও পুরুষ যদি বিবাহপ্রার্থী হয়, তবে তাহাকে পূর্ব্বে শত্রুর মস্তকচ্ছেদন করিতে হইবে। পুরুষ প্রয়োজন হইলে দুইটি নারীকে বিবাহ করিতে পারে। বয়স ৫০ বৎসর হইলে সেই পুরুষ পঞ্চাশটি পত্নীরও অধিকারী হইতে পারে।

প্রধান সর্দ্দারের শরীররক্ষক

পরবর্ত্তী যুগের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি দৃষ্টে দেখা যায়, মাঝে মাঝে উক্ত দ্বীপের উল্লেখ আছে। উল্লিখিত পাণ্ডুলিপিগুলি আরবী ভাষায় লিখিত। পুরাতন মানচিত্রে দেখা যায়, নায়াস্ দ্বীপ যেখানে অবস্থিত, সেই স্থানে একটি স্বর্ণ-দ্বীপ বিদ্যমান। ১৫২০ খৃষ্টাব্দে পোর্ত্তুগীজরা এই দ্বীপ আবিষ্কারে এক অভিযান প্রেরণ করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়।

ওলন্দাজগণ মাঝে মাঝে এই দ্বীপে আসিলেও ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে তাহারা এই দ্বীপে আসিয়া উত্তর ও দক্ষিণদিকে কোন কোন স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করে। কিন্তু দ্বীপের অধিবাসীরা উহাদিগকে বন্ধু মনে করিতে পারে নাই। তাই প্রকৃতি দেবী দ্বীপবাসীদিগকে ওলন্দাজ-প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। বিগত ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে পুনঃ পুনঃ এতদঞ্চলে ভূমিকম্প হইতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের জল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া উপকূলবর্ত্তী উপনিবেশ ধ্বংস করিয়া ফেলে। তার পর দ্বীপবাসীরা ওলন্দাজদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করায় দ্বীপের অধিকাংশ স্থান হইতে তাহারা বিতাড়িত হয়। বিগত ২০ বৎসর ধরিয়া শ্বেতজাতি প্রকৃতপক্ষে এই দ্বীপকে শাসন করিয়া আসিতেছে।

তালকুঞ্জবেষ্টিত সমুদ্রকূলে গোয়েনোয়েং সিটোলী নামক একটি মনোরম গ্রামে ওলন্দাজ রেসিডেন্টের বাস। এখানে একটি জার্ম্মাণ মিশনও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গ্রামের দেশীয় কুটীরগুলি গোলাকার। উহারা ভিত্তিভূমি হইতে অনেক উপরে অবস্থিত। কুটীরের বাতায়নগুলি বংশনির্ম্মিত। কুটীরগুলি নর, নারী ও বালক-বালিকায় পূর্ণ। ম্যালেরিয়ার প্রকোপে তাহাদের দেহ পীতাভ ও শীর্ণ। বৎসরের অর্দ্ধেক কাল তাহারা অন্ন গ্রহণ করে, বাকী অর্দ্ধেক রাঙ্গা আলুই

তাহাদের প্রধান খাদ্য। কিন্তু উভয় বস্তুই দ্বীপে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপাদিত হয় না।

ইহাদিগকে দেখিলেই মনে হইবে, পর্য্যাপ্ত আহার্য্যের অভাবে ইহারা দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে; সুতরাং প্রচুর পরিমাণে শাকসব্জী ও ফল-মূল উৎপাদন করিয়া শরীরকে সবল করিতে ইহাদের উৎসাহের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

এই গ্রামের পল্লীবাসীদিগের কাছে অর্থের কোনও মূল্য নাই। শূকরই এই অঞ্চলের বাট্টার স্থান অধিকার করিয়াছে। অর্থের প্রতি কোন আকর্ষণ না থাকায় পরিশ্রমের প্রয়োজনীয়তা ইহারা উপলব্ধি করে না। সময়ে সময়ে তাহারা সমুদ্র উপকূলে গমন করিয়া চীনা ব্যবসায়ীদিগের নিকট হইতে বস্ত্র ক্রয় করিয়া থাকে। দ্বীপের অভ্যন্তরভাগে মুদ্রার কোনও মূল্য নাই। কোনও পুরুষ যখন তাহার স্ত্রী সংগ্রহ করে, তখন সে শূকর-বিনিময়েই তাহাকে গ্রহণ করিয়া থাকে। শূকর-চুরির অপরাধে চোরের প্রাণদণ্ড এই দ্বীপের বিধান।

নায়াস্ যুবক

ওলন্দাজ-অধ্যুষিত সমগ্র পূর্ব্বদ্বীপপুঞ্জে মাঝে মাঝে সরকারী বিশ্রাম-ভবনের ব্যবস্থা আছে। সেই বাসভবনে সরকারী কর্ম্মচারীরা বা অন্যান্য পর্য্যটক বিশ্রাম করিতে পারেন। স্থানীয় কোনও যুবক উল্লিখিত বিশ্রাম-ভবনের রক্ষণাবেক্ষণের ভার পাইয়া থাকে। সে রন্ধনবিদ্যায় অল্লাধিক পরিমাণে অভিজ্ঞ।

পরিব্রাজিকা ম্যাবেল কুক্ কোল্ স্বামিসহ নায়াস্ দ্বীপটি পরিক্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, লোলোওয়া গ্রামে গমন করিয়া তাঁহারা স্থানীয় দৃশ্যে এমন বিমুগ্ধ হন যে, কয়েক দিন তথায় বসবাস করেন। গ্রামের সর্দ্দার তাঁহাদিগের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল। দেশীয় এক জন দ্বিভাষী তাঁহাদের সহিত ছিল। গ্রাম্য সর্দ্দারটি বৃদ্ধ হইলেও বেশ উৎসাহী। সে একজোড়া স্বর্ণময় গুম্ফ পরিধান করিয়া আসিয়াছিল। তাহার শিরোভূষণও সুবর্ণখচিত, কর্ণে হিরণ্ময় বৃহৎ কুণ্ডল।

আগন্তুকদিগকে আনন্দদানের জন্য গ্রাম্য মণ্ডপ ও তাহার সমভিব্যাহারীরা উল্লম্ফন সহকারে নৃত্য দেখাইয়াছিল। বৃদ্ধ সর্দ্দার পূর্ব্বে যে অবলীলাক্রমে অনেক নরহত্যা করিয়াছিল, পরিব্রাজিকা তাহার ব্যবহারে সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়াছিলেন। শিষ্টাচারের অনুরোধে মিসেস্ কোল্ বৃদ্ধের গৃহেও বেড়াইতে গিয়াছিলেন। সেই সময় তিনি দেখিতে পান, একটি বালক একটা জিনিষ লুকাইয়া লইয়া যাইতেছে। উহা যে একটা মনুষ্যের মাথার খুলি, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশমাত্র ছিল না। বৃদ্ধ মণ্ডল গৃহের বহির্ভাগে রক্ষিত একটি দারুনির্ম্মিত বৃদ্ধের মূর্ত্তির উপর সাদরে হস্তাবমর্ষণ করিতেছে দেখিয়া পরিব্রাজিকা বিস্মিত হন।
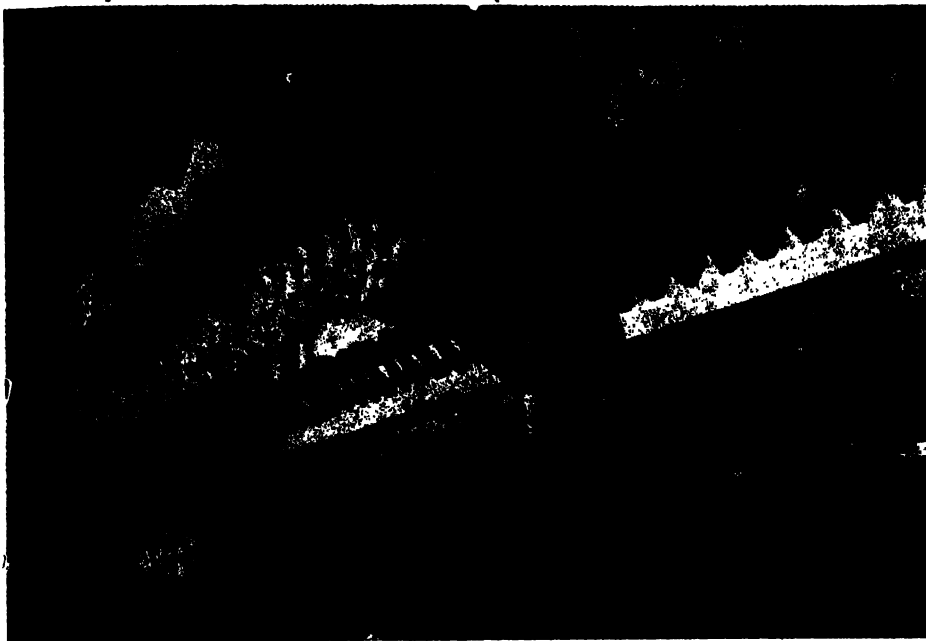
সর্দ্দার নিতুর গৃহ-প্রাচীরে রক্ষিত শূকরের চোয়াল
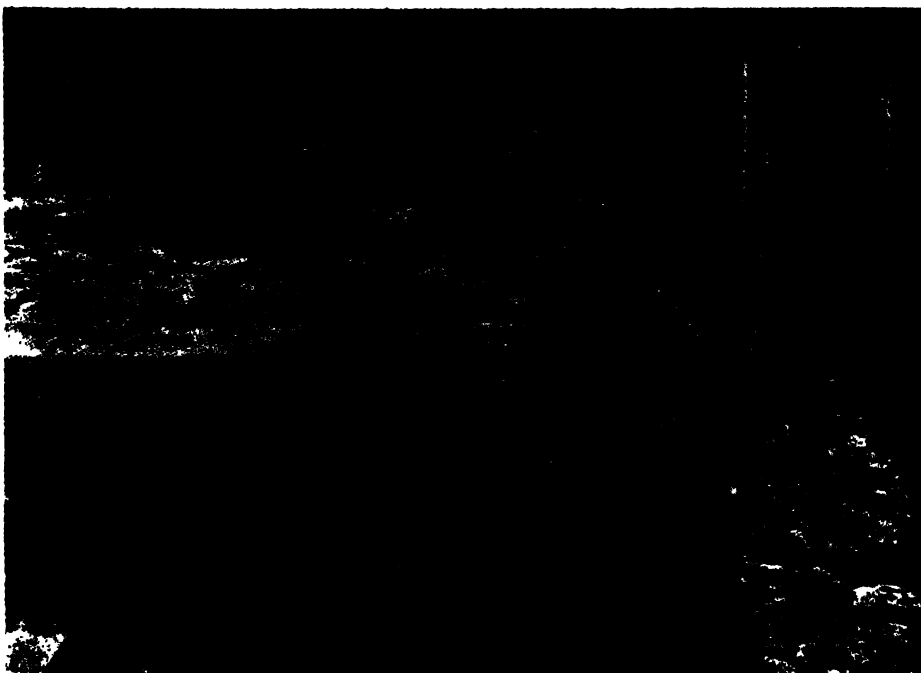
নারী-স্নানাগারের সন্নিহিত স্থানে পৌরাণিক পক্ষিমূর্ত্তি

পরে তিনি জানিতে পারেন, উল্লিখিত দারু-মূর্ত্তিটি বৃদ্ধের পিতামহের।

গ্রামের প্রত্যেক গৃহের মধ্যে এইরূপ দারুমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যাইবে। উক্ত দারুমূর্ত্তি-গুলির সম্মুখ হইতে বাহিরের পাষাণ-নির্ম্মিত আসন পর্য্যন্ত বাতায়নের মধ্য দিয়া বংশ-নির্ম্মিত সোপান-শ্রেণী দেখা যাইবে। পর-লোকগত আত্মা এই সকল পাষাণ-আসনে না কি উপবিষ্ট থাকে। প্রয়োজনমত ঐ সকল আত্মা পাষাণ-আসন হইতে উঠিয়া সোপান-পথে দারু-মূর্ত্তিতে আসিয়া থাকে।

নায়াস্‌দিগের বিশ্বাস, পূর্ব্ব-পুরুষগণ কখনও মরেন না।

গৃহত্যাগ করিয়া অন্যত্র অবস্থান করিলেও তাঁহারা বংশধরগণের সহিত সর্ব্বদা যোগাযোগ রাখিয়া থাকেন, তাহাদের মঙ্গলামঙ্গলে কৌতূহল প্রকাশ করেন। উল্লিখিত দারু-মূর্ত্তির সম্মুখে পূজা ও বলি প্রদান করিয়া জীবিত নায়াস্ মৃতের সাহায্য ও উপদেশ প্রার্থনা করিয়া থাকে।

উত্তর-নায়াসের গোলাকার গৃহ

দ্বীপের কোন কোন অংশে এইরূপ প্রথা প্রচলিত আছে যে, কাহারও মৃত্যুর পর, মৃতের আত্মীয়-বর্গ এবং জনৈক ঐন্দ্রজালিক মৃতের সমাধি-স্থানে সমবেত হয়। তথায় দারুনির্ম্মিত একটি মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া

পরলোকগত আত্মার উদ্দেশে নির্ম্মিত পাষাণ-আসনে উপবিষ্ট নায়াস্গণ

তাহারা মৃতের আত্মাকে দারুমূর্ত্তিমধ্যে আহ্বান করিতে থাকে। সমবেত ব্যক্তিবর্গ একটি উর্ণনাভের আবির্ভাবের জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতে থাকে। কারণ, তাহাদের বিশ্বাস, সমাধিক্ষেত্রে মৃতব্যক্তির আত্মা উর্ণনাভের মূর্ত্তি

শিশুর নামকরণ উপলক্ষে শূকরবধ

য়ুরোপীয় পরিচ্ছদে জনৈক সর্দ্দার

দারুমূর্ত্তিসহ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে এবং ঊর্ণনাভটিকে দারুমূর্ত্তির সন্নিকটে ছাড়িয়া দেয়। তাহাদের বিশ্বাস, উহা দারুমূর্ত্তির অভ্যন্তরে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে।

উল্লিখিত পূর্ব্বজগণের দারুমূর্ত্তিগুলিকে দেশীয় ভাষায় "আদু" বলে। ইহারা জীবিত ও মৃতের মধ্যে শুধু মধ্যবর্ত্তিতা করে না, ইহারা গৃহের রক্ষক, পরিত্রাতা, বিবাহ-বন্ধনের সাক্ষী। শত্রুর অভিসম্পাত হইতে ইহারা বংশধরগণকে রক্ষা করিয়া থাকে। প্রত্যেক গৃহের কুলুঙ্গীর উপর ধূম্রমলিন দারু-মূর্ত্তিগুলি দেখিলেই ইহা প্রমাণিত হইবে।

ধরিয়া আবির্ভূত হইয়া থাকে। যদি কোনও ঊর্ণনাভকে দেখিতে পাওয়া যায়, তখন তাহারা তাহাকে ধৃত করিয়া

নায়াস্‌বাসীরা পূর্ব্বপুরুষগণকে দেবতার ন্যায় শ্রদ্ধাভক্তি করিয়া থাকে; ইহাদের ধর্ম্মে বহু দেবতাবাদ ও অদ্বৈতবাদের সংমিশ্রণ আছে।

নায়াস্ দ্বীপের প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই অন্ততঃ এক জন করিয়া ঐন্দ্রজালিক বাস করিয়া থাকে। ঐন্দ্রজালিক বা "মিডিয়ম্"—পুরুষ অথবা নারী হইয়া থাকে। ঐ পুরুষ বা নারী 'মিডিয়ম্' দারুমূর্ত্তির সাহায্যে আত্মার সহিত কথোপকথন চালাইয়া থাকে। ইহারা এতৎসংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার বিধির সহিত পরিচিত, যে সকল আত্মাকে 'নামাইতে' হইবে, তাহাদের নাম ইহাদের জানিয়া রাখা অনিবার্য্যরূপে প্রয়োজন। আত্মার আহ্বানকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবার সময় মিডিয়ম্ বা ঐন্দ্রজালিক আত্মার প্রত্যেক আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে বাধ্য। ইহারা বৃষ্টি নামাইতে পারে, মেঘাবৃত সূর্য্যকে মেঘমুক্ত করিতে পারে, ভবিষ্যদ্বাণী ত করেই। ইহারা সুশস্যের কারক। বিবাহের পক্ষে কোন্ কোন্ দিন প্রশস্ত, কোন্ দিন বাঁশ কাটা কর্ত্তব্য, কোন স্থানে যাত্রা করিতে হইলে কোন্ দিন শুভ হইবে প্রভৃতি নানাবিধ গার্হস্থ্য ব্যাপারে ইহাদের মতামত গৃহীত হইয়া থাকে।

নায়াস্‌দের এক জন পূর্ব্বপুরুষের নাম 'লাটুর।' জনসাধারণ ইঁহাকে দেবতারূপে পূজা করিয়া থাকে। এই দেবতা জাল ফেলিয়া মৎস্য শিকার করিয়া থাকেন। এই জালকে ইন্দ্রধনুরূপে কল্পনা করা হইয়া থাকে। যখন জনসাধারণের মধ্যে কোন কারণে গভীর আতঙ্কের সঞ্চার হয়, তখন তাহারা উক্ত দেবতার উদ্দেশে জীববলি 'মানত' করিয়া থাকে। নহিলে দেবতার জালে তাহাদের আবদ্ধ হইবার আশঙ্কা থাকে।

মিসেস্ ম্যাবেল কুক কোল এবং তাঁহার স্বামীকে গ্রামের সর্দ্দার রাজকীয় প্রথায় অভ্যর্থনা করিয়াছিল। বল্লম ও ঢালধারী যোদ্ধগণকে আনিয়া তাহাদের সমরকৌশল দেখাইয়াছিল। নৃত্যকালে ঢক্কাধ্বনির সহিত সর্দ্দার দেশীয় গান গাহিয়া শুনাইয়া দিয়াছিল। সে গান নবাগতদিগের জয় ও স্তুতি-সংক্রান্ত। সমবেত যোদ্ধগণ সর্দ্দারের গানের প্রত্যেক শেষ চরণ আবৃত্তি করিয়া তাহাদের অনুমোদন জ্ঞাপন করিয়াছিল। অভিনন্দন-কার্য্য সমাপ্ত হইলে দেশীয় প্রথানুসারে দুইটি ডিম্ব ও কিছু মিষ্ট আলু তাঁহারা উপঢৌকন পাইয়াছিলেন।

বাউওমাটালুও সর্দ্দারের বাসভবন

নায়াস্ দ্বীপের কোন কোন স্থান অত্যন্ত উত্তপ্ত সূর্য্যের প্রখর রশ্মিজালে পথিকের অপরিসীম কষ্ট হইয়া

থাকে। নদীর জল পর্য্যন্ত উষ্ণ প্রস্রবণের ন্যায়। নদীর পারে যাইবার কোন সেতু কোথাও নাই। পথের মাঝে মাঝে নারিকেলকুঞ্জ বিদ্যমান। তাহারই ছায়ায় পথিক-দিগকে বিশ্রাম করিতে হয়।

কিন্তু লোলোওয়া হইতে এইভাবে দুই দিন যাত্রা করিবার পর যে স্থান দর্শকের সম্মুখে উপস্থিত হইবে, তাহা নন্দন-কাননের ন্যায় মনোরম। এখানে রাজপথ প্রশস্ত ও প্রস্তর-রচিত। এই রাজ্যের প্রবেশপথে প্রস্তর-নির্ম্মিত কুম্ভীর-মূর্ত্তি বিদ্যমান—যেন সে প্রবেশ-তোরণ রক্ষা করিতেছে। এই নগরের অধিবাসীর সংখ্যা ২ হাজার হইবে। প্রস্তররচিত রাজপথের দুই ধারে নাগরিকগণের বাস-ভবন-সমূহ শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান।

প্রত্যেক বাসভবনের সম্মুখে মসৃণ গোলাকার পাথরের ফলক। তাহার নিম্নভাগে গৃহের অধিবাসী পূর্ব্বপুরুষগণের মস্তকের খুলি সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। পশ্চাতে বড় বড় পাথরের স্তম্ভ। এইখানে পরলোকগত আত্মা বিশ্রাম করিয়া থাকে।

পথ-প্রাঙ্গণের মাঝামাঝি স্থানে ১০ ফুট উচ্চ প্রস্তরের সারি। তাহার উপরে নগরের যুবকগণ লম্ফ-ঝম্প সহকারে রণ-বিদ্যা শিক্ষা করিয়া থাকে। উহাদেরই সন্নিহিত স্থানে একটি আসন বা কেদারা। তাহার উপর ছত্র-দণ্ড। ইহাও প্রস্তর-নির্ম্মিত। এই আসনে উপবিষ্ট হইয়া বিচারক অপ-রাধীর উপর প্রাণদণ্ডাদেশ প্রদান করিয়া থাকেন।

কেহ কোন অপরাধ করিলে, স্থানীয় সর্দ্দার সে সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য গণ্যমান্য ব্যক্তিগণকে আহ্বান করেন। বিচারকালে এইটুকু লক্ষ্য থাকে যে, অভিজাত-সম্প্রদায়ের কাহারও উপর অত্যাচার হইয়াছে, কি কোনও দরিদ্র ব্যক্তি অত্যাচারিত হইয়াছে। প্রস্তর-রচিত আসনে বসিয়া সর্দ্দার অভিনিবেশ সহকারে সাক্ষ্য শ্রবণ করিতে থাকেন। তার পর বিচারক তাঁহার রায় প্রদান করেন। যদি সমবেত অভিজাত-সম্প্রদায়ের নিকট রায় গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত না হয়, তাহা হইলে বিচারককে অন্যবিধ রায় প্রদান করিতে হইয়া থাকে।

শূকর-চোর ধরা পড়িলে সাধারণতঃ তাহার প্রাণদণ্ড হইয়া থাকে। কিন্তু অন্যবিধ অপরাধের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জরিমানা দিয়া আত্মরক্ষা করিতে হয়! দণ্ডাদেশ

উত্তর-নায়াসের একটি পল্লী

প্রচারিত হইবার তিন দিনের মধ্যে অপরাধীকে জরিমানার পূর্ণ দাবীই মিটাইয়া দিতে হয়। যদি সে তাহা দিতে না পারে, তাহা হইলে তাহাকে ক্রীতদাস হইতে হয়, অথবা তাহার প্রাণদণ্ড হইয়া থাকে। অপরাধী শুধু জরিমানা দিয়াই নিস্তার লাভ করে না, বিচারক, সাক্ষী এবং অন্যান্য যাহারা বিচার-কার্য্যে সহায়তা করিয়াছে, সকলেরই নির্দ্দিষ্ট প্রাপ্য তাহাকে চুকাইয়া দিতে হয়। তার পর অপরাধী একটি শূকর উপহার প্রদান করে। সেই শূকরমাংস সকলে মিলিয়া ভোজন করে এবং যাহারা ভবিষ্যতে অনুরূপ অপরাধ করিবে, তাহারা যেন এই দৃষ্টান্ত দেখিয়া সতর্ক হয়, এমন শপথ গ্রহণ করে।

যদি অপরাধীকে খুঁজিয়া না পাওয়া যায়, তখন একটা কুকুরকে জীবিতাবস্থায় দগ্ধ করা হয়। উদ্দেশ্য, যেন অপরাধী অনুরূপ যন্ত্রণা ভোগ করে। অথবা জনসাধারণ একটি কুক্কুটকে মধ্যস্থলে রাখিয়া তাহার চারিদিকে বৃত্তাকারে দাঁড়ায়। কুক্কুটটি দৌড়াইয়া যাহার চরণের উপর পতিত হয়, তাহাকেই অপরাধী বলিয়া গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রামের এক প্রান্তে নারীদিগের জন্য স্নানাগার নির্দ্দিষ্ট থাকে। সেই স্থান প্রাচীর-বেষ্টিত। বংশ-নির্ম্মিত বহু নলের মধ্য দিয়া এই স্থানে জলধারা বর্ষিত হইতে থাকে। ভিতরে প্রস্তররচিত চাতালে বসিয়া, দাঁড়াইয়া নারী ও শিশুদিগের স্নানক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে। স্নানাগারটি বৃক্ষচ্ছায়াচ্ছন্ন।

প্রভাতে ও সন্ধ্যায় সূর্য্যের উত্তাপ অধিক থাকে না। তখন সকলে গৃহপ্রাঙ্গণে সমবেত হয়। পরলোকগত পূর্ব্বজগণের আত্মা এইখানে প্রস্তরাসনে বসিয়া থাকেন বলিয়া তাহাদের ধারণা। আকাশে চন্দ্রোদয় হইলে, তাহারা গানে, গল্পে, হাস্যে প্রাঙ্গণতল মুখরিত করিতে থাকে। গানের বিষয় চন্দ্র—আদিম মানব এই চন্দ্র হইতে প্রথম মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেই চন্দ্রের বিভিন্ন পর্য্যায় লইয়াই তাহাদের গান চলিতে থাকে। মানুষ ক্রমে ক্রমে কেমন করিয়া উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে—চন্দ্রের কলাবৃদ্ধির সহিত তাহার তুলনা করিয়া গান গীত হইতে থাকে। পূর্ণচন্দ্র নীল গগনে সমুদিত হইলে, তাহারা তাঁহার বন্দনাগান গাহিতে গাহিতে অধীর হইয়া উঠে। চন্দ্রের বুকে যে চিহ্ন দেখা যায়, তাহার উল্লেখ করিয়া বলে যে, তাহাদের আদিম পুরুষ ঐখানে শুইয়া আছেন।

অভিজাত-সম্প্রদায়ের নরনারীরা যখন দূরপথ পর্য্যটন করেন, তখন মনুষ্যবাহিত ডুলীতে আরোহণ করিতে হয়।
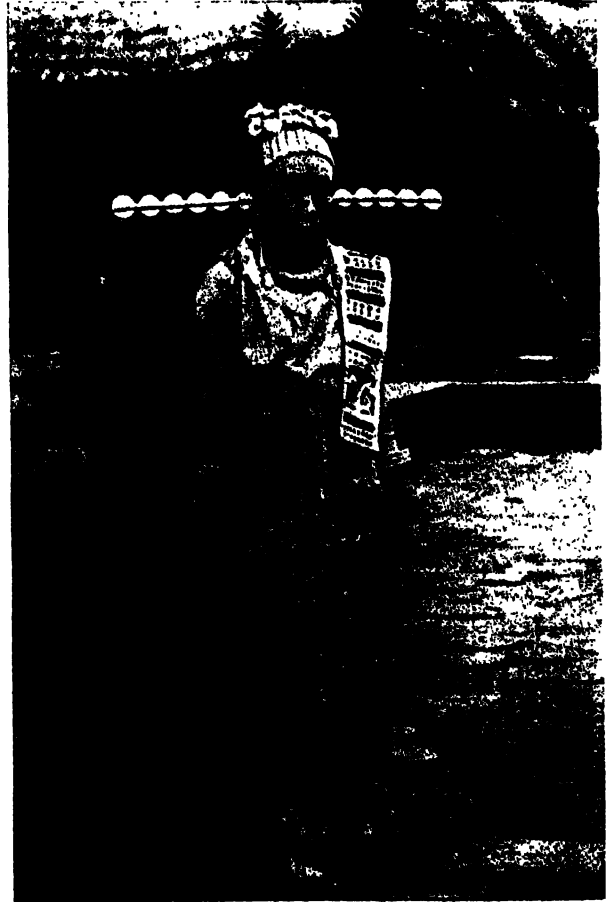
নায়াস্ পুরোহিত-রমণী

য়ুরোপ বা আমেরিকার পরিব্রাজকগণকেও এই ভাবে যাত্রা করিতে হয়। কারণ, সে অঞ্চলে অন্য বাহনের সম্পূর্ণ অভাব।

মিসেস্ ম্যাবেল কুক্ কোল্ দলবল সহ এই ভাবে এক সহর হইতে অপর সহরে যাত্রা করিয়াছিলেন। নারিকেলবীথির মধ্য দিয়া দ্বিতীয় সহরে উপনীত হইয়া তিনি দেখিলেন, পূর্ব্ব-নগর অপেক্ষা এই নগর আরও রমণীয়। এখানকার সর্দ্দারের গৃহে তাঁহারা আতিথ্য গ্রহণ করেন। এই গৃহের

কোন সদর-দরজা নাই। নবাগতগণ শ্রেণীবদ্ধ স্তম্ভের পাশ দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। আরোহণী সাহায্যে তাঁহারা একটি প্রশস্ত গর্ত্তের মধ্য দিয়া উপরে নীত হইয়াছিলেন। সে কক্ষ যেমন প্রশস্ত, তেমনই সুখসেব্য। গৃহ-প্রাচীরে ধাতুনির্ম্মিত বর্ম্ম দোদুল্যমান, নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র,—

মুখোস-পরিহিত নায়াস্ নর্ত্তক

তরবারি, বল্লম, ঢাল প্রভৃতি বিদ্যমান। পূর্ব্বপুরুষগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্ত্তিও সেখানে রক্ষিত আছে।

তাঁহারা মুগ্ধ দৃষ্টিতে উল্লিখিত দ্রব্যাদি পরিদর্শন করিতেছেন, এমন সময় দ্বারপথে এক বিচিত্র দৃশ্য তাঁহাদের নয়নপথে পতিত হইল। সেই জেলার সর্ব্বময় কর্ত্তা নিতু বিচিত্র বেশভূষা পরিধান করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার শিরোভূষণ স্বর্ণমণ্ডিত এবং নানারূপে সুশোভিত। সর্দ্দারের কর্ণে হিরণ্ময় কুণ্ডল, গলদেশে স্বর্ণহার। দেহে সমুজ্জ্বল রক্তবর্ণের অঙ্গাবরণ; তাহাতে পীতবর্ণের ফিতা সন্নিবিষ্ট। কটিদেশ হইতে একটি পীতবর্ণের আচ্ছাদন জানু পর্য্যন্ত বিলম্বিত। স্বর্ণময় কোষে অস্ত্র রক্ষিত।

সম্রাটের ন্যায় ভঙ্গীতে মধুরভাষে তিনি পর্য্যটকগণকে অভিনন্দিত করিয়া স্বীয় আবাসাভিমুখে তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গেলেন। তিনি যেখানে বাস করেন, সেই পল্লীর নাম বাউওমাটালুও।

৯ শত ফুট উচ্চ একটি পাহাড়ের উপর এই পল্লী অবস্থিত। সে স্থানের দৃশ্য এমন মনোরম যে, সকলেই বিমুগ্ধ হইয়া পথের শ্রান্তি পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইলেন। প্রশস্ত পাষাণরচিত রাজপথের উভয় পার্শ্বে পল্লীবাসীদিগের সুদৃশ্য বাসভবন। সর্ব্বশেষে নিতু সর্দ্দারের সুদৃশ্য গৃহ।

বাড়ীর সম্মুখে পূর্ব্বপুরুষগণের জন্য উদ্দিষ্ট মসৃণ, অত্যুচ্চ প্রস্তরস্তম্ভসমূহ সূর্য্যালোকে ঝক্‌ঝক্ করিতেছিল, শ্রেণীবদ্ধভাবে সশস্ত্র যোদ্ধগণ দণ্ডায়মান। তাহাদের দেহ বর্ম্মাবৃত, শিরোদেশে লৌহ, তাম্র ও স্বর্ণ-নির্ম্মিত মধ্যযুগের শিরস্ত্রাণ। সৈনিকবৃন্দ দর্শকগণকে পল্লীর যাবতীয় দর্শনীয় বস্তু দেখাইয়া বেড়াইল।

তাঁহারা দেখিলেন, প্রত্যেক ব্যবসায়ী সে অঞ্চলে কি ভাবে নিজ ব্যবসায়ের বিজ্ঞাপন প্রদান করে। প্রস্তরে ক্ষোদিত হার দেখিলেই বুঝিতে হইবে, সেইখানে স্বর্ণকার বাস করিয়া থাকে। লৌহকার বা কামারের বাড়ীর প্রাচীরে প্রস্তরে kris ক্ষোদিত থাকে। প্রস্তরে যদি ছিন্নহস্ত ও ছুরিকা ক্ষোদিত থাকে, তাহা হইলে চৌর্য্যবৃত্তির শাস্তিজ্ঞাপক বুঝিতে হইবে। প্রস্তরে ক্ষোদিত বৃত্ত সরকারী ধান্যের পরিমাপবোধক, শূকর-পদের ৪টি খুর-চিহ্ন একটি পূর্ণবয়স্ক শূকরের পরিমাপ-জ্ঞাপক।

বাউওমাটালুও প্রাচীন সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল। ইহার চারিপার্শ্বে রাজত্ব বিস্তৃত। এখান হইতে রাজপথসমূহ বিভিন্ন নগরাভিমুখে প্রসারিত। রাজপথের মাঝে মাঝে পরলোকগত আত্মাদিগের বিশ্রামার্থ পাষাণ-আসন নির্ম্মিত। পথচারী শ্রান্ত হইলেও এই সকল আসনে উপবেশন করিয়া থাকে। সর্দ্দার বা দুর্গাধিপতি এখানে বসিয়া দেশীয় প্রথা-অনুসারে অপরাধীর প্রতি দণ্ড দান করিয়া থাকেন।

দ্বীপের অধিবাসীরা দীর্ঘকাল ধরিয়া শ্বেতজাতির প্রভুত্বের বিরুদ্ধে প্রচেষ্টা করিয়াছিল। এখন যদিও মনুষ্যমুণ্ড শিকার ও যুদ্ধস্পৃহা ইহাদের মধ্যে অনেকটা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে, তথাপি তাহারা আপনাদের ভাবধারা অনুসারেই প্রধানতঃ জীবন-যাপন করিয়া থাকে।

দেশের অধিবাসীরা সর্দ্দার, ঐন্দ্রজালিক, অভিজাত-সম্প্রদায়, সাধারণ ও দাস এই কয় ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে বিশিষ্ট ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও এক শ্রেণী হইতে অন্য শ্রেণীতে উন্নীত হওয়া অসম্ভব নহে। এমন কি, এক জন ক্রীতদাসও সর্দ্দার হইতে পারে।

দারুনির্ম্মিত মূর্ত্তি—পূর্ব্বপুরুষ উদ্দেশে

অভিজাতসম্প্রদায় অনেক ক্রীতদাসের মালিক। যুদ্ধের ফলে যাহারা বন্দী হয়, তাহারাও ক্রীতদাসে পরিণত হয়। কিন্তু অধিকাংশ দাসই ঋণ-পরিশোধ করিতে না পারিয়া দাসত্ব গ্রহণ করিতে বাধ্য হয় কিন্তু কোনওরূপে যদি ঋণপরিশোধ করিতে পারে, তাহা হইলে যে কোনও ক্রীতদাস আবার মুক্তিলাভে সমর্থ হয়। কোনও ধনী বা প্রসিদ্ধ ব্যক্তি জনপ্রিয় হইবার জন্য বিরাট ভোজ প্রদান করিয়া থাকেন। তাহার ফলে আমাদের দেশের মহারাজ, রাজা-বাহাদুর, রায়-বাহাদুর প্রভৃতির ন্যায় খেতাবও তিনি লাভ করিয়া থাকেন। সেইরূপ খেতাবের নাম অনুবাদ করিলে দাঁড়ায়

সম্ভ্রান্ত পরিবার
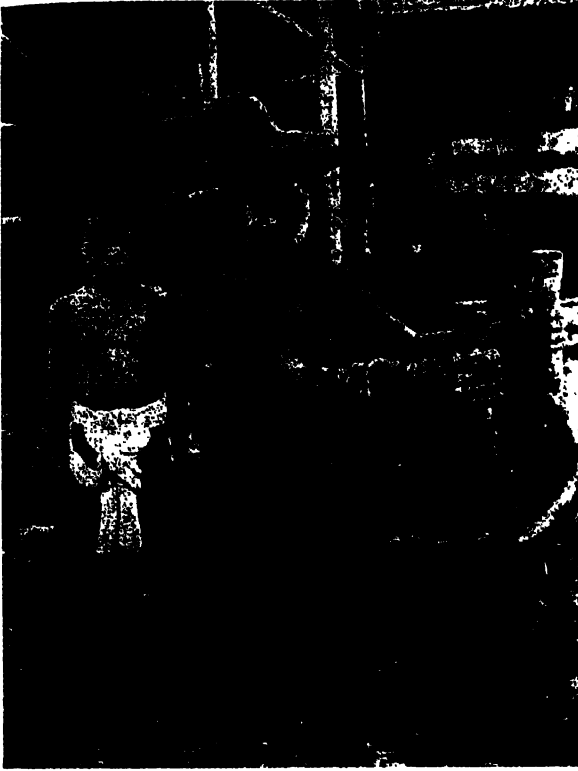
সর্দ্দারের বিচারাসন

'যথার্থবহ্নি', 'বিশ্বমূল' প্রভৃতি। এইরূপ খেতাব লাভের ফলে ভবিষ্যতে তিনি শাসকপদেও নিযুক্ত হইতে পারেন।

কোনও সর্দ্দারের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রই গদি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যদি তাহা না ঘটে, সেরূপ ক্ষেত্রে পরলোকপথযাত্রী সর্দ্দারকে তাঁহার গদির জন্য অন্তিমকালে শাসক মনোনীত করিয়া যাইতে হয়। যাহার সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে কোনরূপ সম্পর্ক নাই, এমন ব্যক্তিও কখনও কখনও শাসকপদে মনোনীত হইয়া থাকেন।

সাধারণতঃ দেশীয় বিধান অনুসারে প্রত্যেক গ্রামের এক জন করিয়া সর্দ্দার থাকে। কিন্তু বাউও-মাটালুও সহরের দুই জন সর্দ্দার। এক জন শুধু পর্ব্বতোপরিস্থ সহরের ভার লইয়া আছেন। 'নিতু' সর্দ্দার সহর ও সন্নিহিত গ্রামের মালিক।

নিতু সর্দ্দার পর্য্যটকগণের প্রীতিসাধনার্থ সেনাদলকে আহ্বান করিয়া কৃত্রিম যুদ্ধের আয়োজন করিয়াছিলেন। বাদ্যযন্ত্রাদিরও সমাবেশ হইয়াছিল। তার পর বলিদানকার্য্য আরব্ধ হইল।

নায়াস্ নর-নারী

সৈনিকগণ বর্ম্ম ত্যাগ করিয়া প্রাঙ্গণে সমবেত হইল। তাহাদের হস্তে তখন শুধু তরবারি ছিল। দুই শত শূকর প্রাঙ্গণক্ষেত্রে আনীত হইল। সর্দ্দার স্বয়ং একটি শূকরকে তরবারির আঘাতে নিহত করিলেন। তার পর দেখিতে দেখিতে দুই শত

শূকরের রক্তে ধরণী সিক্ত হইল। শূকর-মাংস সকলের মধ্যে বিতরিত হইল।

পরলোকগত আত্মার উদ্দেশে শূকর-রোমগুচ্ছ উৎসৃষ্ট হইয়া থাকে। দ্বীপবাসীর বিশ্বাস, ইহাতেই আত্মার সমধিক তৃপ্তি জন্মিয়া থাকে। নিতু সর্দ্দারের গৃহে নিহত শূকরদিগের চোয়াল সজ্জিত থাকে। তিনি যে দুষ্প্রাপ্য শূকরমাংস দ্বারা জনসাধারণের তৃপ্তিবিধান করিয়া থাকেন, উহা তাহারই পরিচায়ক।

মন্ত্রীসহ প্রধান সর্দ্দার নিতু

নায়াস্‌গণ পুত্রসন্তান বিশেষভাবে কামনা করিয়া থাকে। পুত্রগণই পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। যদি বিবাহের পর কোনও পুরুষের পুত্রসন্তান না হয়, সে অন্য পত্নী গ্রহণ করে। তাহারও গর্ভে যদি পুত্রসন্তান না জন্মগ্রহণ করে, তবে সে অন্য পত্নী গ্রহণ করিয়া থাকে। পুত্রসন্তান না হইলে অবশেষে সে দত্তক-পুত্র গ্রহণ করে। নিজের সম্পত্তি অন্যে পাইবে, ইহা কোন নায়াস্‌ই ইচ্ছা করে না।

নায়াস্‌দিগের পক্ষে পত্নী সংগ্রহ করা সহজসাধ্য নহে। পত্নীলাভের বিনিময়ে অনেকগুলি শূকর ত দিতেই হয়, তাহা ছাড়া অন্যান্য অনেকপ্রকার দাবী মিটাইতেও হয়।

বিবাহ-উৎসবভোজের পরই আর একটা উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। তাহাতে বর-কন্যাকে বহন করিয়া সহর বা গ্রামের পথে পথে প্রদর্শন করান হয়। তাহার পরেই আবার একটা বড় রকমের ভোজ দিতে বরকে অনেকগুলি শূকর সংগ্রহ করিতে হয়।

বাউওমাটালুওর দুই জন তরুণ

গ্রামের একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে একটি পাষাণখণ্ড রক্ষিত

হয়। তাহার উপর কন্যা এবং তাহার আত্মীয়-স্বজন উপবেশন করে। অপর একখানি প্রস্তর-খণ্ডের উপর বর উপবেশন করিয়া থাকে। বরকে কন্যার জন্য স্বর্ণালঙ্কার অবশ্যই গড়াইয়া দিতে হয়। বর-কেও স্বর্ণালঙ্কার ধারণ করিতে হয়। স্বর্ণালঙ্কার ধারণ উপলক্ষেও ভোজের ব্যবস্থা আছে।

সদর-তোরণশূন্য নায়াস্‌ভবন

বিবাহব্যাপার এমনই ব্যয়বহুল—শূকর, স্বর্ণ, চাউল, তালমদ্য (তাড়ি) প্রভৃতি উপযুক্ত পরিমাণ সংগ্রহ করা এমনই কষ্টসাধ্য যে, যে সকল অঞ্চলে বাল্যকালে বা শৈশবে বাগ্‌দান-প্রথা প্রচলিত আছে, তথায় দফায় দফায় বর-পক্ষকে মূল্য প্রদান করিবার সুযোগ দেওয়া হইয়া থাকে। দুই তিন বৎসরের শিশুদিগের মধ্যে বাগ্‌দান-প্রথা প্রচলিত।

এই প্রথা যতই কঠোর হউক, এ সম্বন্ধে কোন প্রকার বিরুদ্ধ মতবাদের বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই। পূর্ব্বপুরুষগণের আচরিত ব্যবস্থাকে মানিয়া লইতেই হইবে; নহিলে পূর্ব্বপুরুষগণের কোপচিহ্ন প্রজ্বলিত হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং কেহই সে কার্য্যে সম্মত নহে।

সন্তানের জন্মকালে 'বালিয়ু' এবং 'লোয়ালানি' নামক দুইটি আত্মার আরাধনা করা হইয়া থাকে। ইহারাই প্রথম মানবের জনকজননী। তাঁহাদের আত্মা নবপ্রসূত সন্তান-দেহে প্রবেশলাভ করিবার পূর্ব্বে সকলে জানিয়া লয়, পৃথিবীতে তাহার আগমনের কি উদ্দেশ্য আছে। এইরূপে প্রত্যেক নর-নারীর ভবিষ্য জীবন কিরূপ হইবে, তাহা নির্ণীত হইয়া যায়
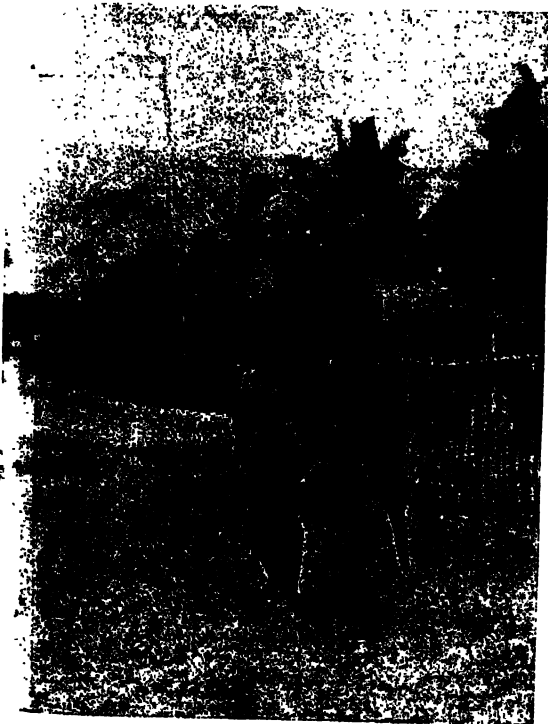
ঢাল ও বর্শাসহ আক্রমণকারী সৈনিক
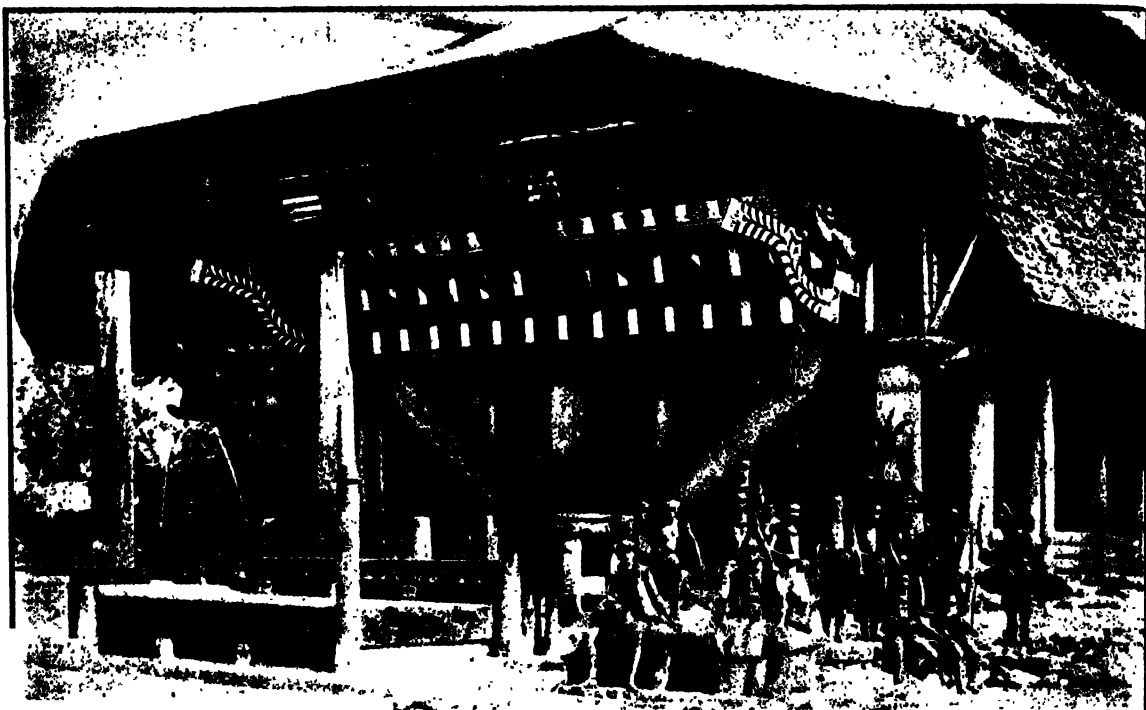
কোন অট্টালিকার সম্মুখভাগ

শ্বেতকায় অতিথিদিগের সম্মুখে সৈনিকগণ নৃত্যের জন্য প্রস্তুত

নগরের রাজপথ

নায়াস্ সেনাদলের একাংশ
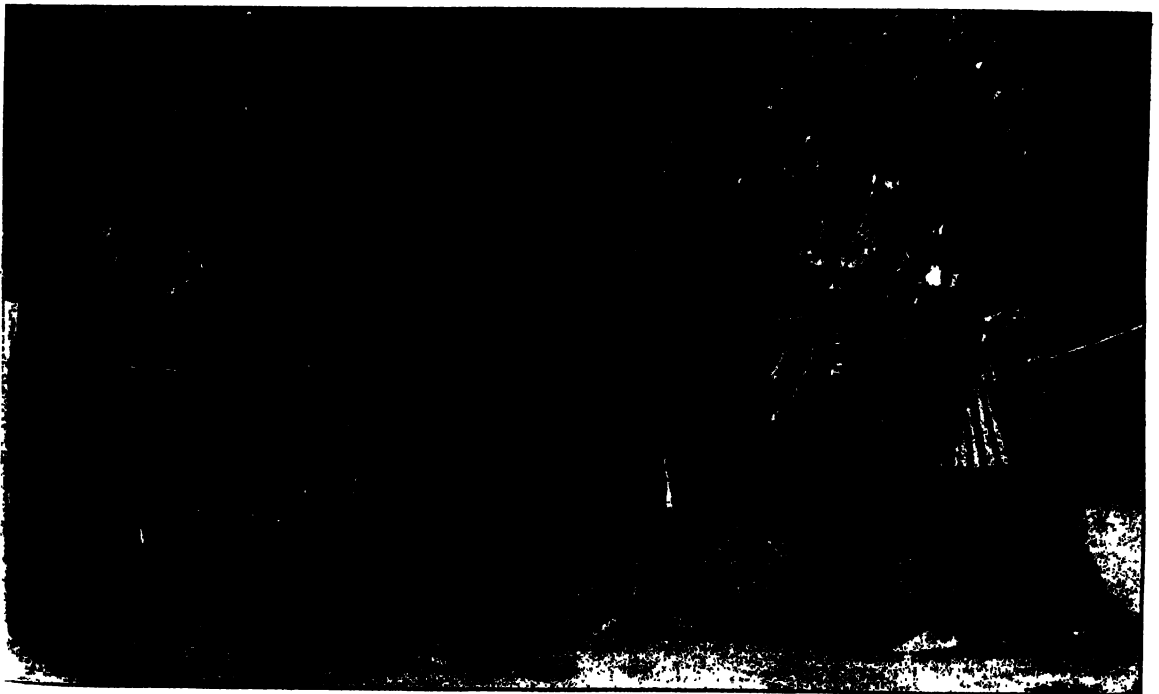
নায়াস্ জাতি প্রথমে মনুষ্যমুণ্ড শিকার করিয়া বেড়াইত। সেই জাতি কেমন করিয়া সভ্য জাতির ন্যায় প্রশস্ত রাজপথ ও নগর নির্ম্মাণ করিয়াছে, কেমন করিয়া সুন্দর স্থপতি-শিল্পের অধিকারী হইয়াছে, সভ্যজাতির ন্যায় মসৃণ প্রস্তর-স্তম্ভ-সমূহ নির্ম্মাণ করিয়া ললিতকলাপ্রীতির পরিচয় দিতেছে, বড় বড় অট্টালিকার গোপন কক্ষ-সমূহ নির্ম্মাণ করিতে শিখিয়াছে, ধাতুনির্ম্মিত বর্ম্মাদির ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে, ইহা এখন প্রতীচ্য পণ্ডিতগণের গবেষণার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এ বিষয়ে অনেকগুলি সিদ্ধান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এক জন প্রতীচ্য পণ্ডিতের মতে, প্রাচীন যুগের এক দল মালয়বাসী নায়াস্ দ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হয়। সেখানে তাহারা পূর্ব্ব-দ্বীপপুঞ্জের সহিত সমগ্র সম্বন্ধবিচ্যুত হইয়া বসবাস করিতে থাকে। এজন্য কালক্রমে সুমাত্রাদ্বীপের শিক্ষা-দীক্ষা হইতে তাহারা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে।

কিন্তু প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের গবেষণার ফলে দেখা যায় যে, এই সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক। কারণ, যে জাতি অন্য সকল প্রকার সভ্যজাতির সংস্রববিচ্যুত হইয়া থাকে, তাহাদের শিক্ষা, সভ্যতা ক্রমশই অধোগতি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু নায়াস্ জাতিকে সেইরূপ অধোগতি প্রাপ্ত বলিয়া অনুমান করিতে যাওয়া যথার্থ নহে। কারণ, ইহারা অনেক বিষয়েই সুসভ্য জাতির সমতুল্য।

ওলন্দাজ পণ্ডিত স্লোডার বলেন যে, নায়াস্জাতির ভাষা এবং ব্যবসায়বাণিজ্যসংক্রান্ত ছোটখাট বস্তু—ক্ষুদ্র আলোকাধার প্রভৃতি বিষয় লইয়া দেখা যায় যে, ফিনীসীয় ব্যবসায়ীরা সুমাত্রাদ্বীপে প্রাচীনকালে গতায়াত করিত। তাহারা নায়াস্দ্বীপেও গমনাগমন করিত। তাহাদের শিক্ষা ও সভ্যতার ছাপ আদিযুগের নায়াস্-জাতির উপর পড়িয়া থাকিবে।

লোলোওয়ার নৃত্যপরায়ণ সর্দ্দার

কিন্তু অন্যান্য গবেষকগণ উল্লিখিত কোনপ্রকার সিদ্ধান্তকেই গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না। মিসেস্ ম্যাবেল কুককোল অনুমান করেন যে, প্রাচীনকালের ভারতীয় রাজপুত্র এবং তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজন স্বদেশ হইতে ভারত-সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জে আসিয়াছিলেন। যবদ্বীপ ও সুমাত্রায় তাঁহাদের শিক্ষা, দীক্ষা ও সভ্যতাও বহন করিয়া আনিয়াছিলেন।

নায়াস্দ্বীপ প্রধানপথ হইতে দূরে অবস্থিত। সুতরাং এখানে ভারতীয় সভ্যতার ছাপ পড়িয়াছিল কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। যাহাই হউক, এখনও এই দ্বীপবাসী সম্বন্ধে গবেষণা চলিতেছে। মীমাংসা এখনও হয় নাই।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

তিব্বতের বিভীষিকা

দশম প্রাক্কা

কালো মুখোসধারী মোহান্ত কে ?

তখন সবে মাত্র প্রভাত হইয়াছে।

নির্গলিতাম্বুগর্ভ শুভ্র মেঘস্তরের ন্যায় লঘু কুজ্ঝটিকাস্তরে ইয়াংসি নদীর প্রশস্ত বক্ষঃ সমাচ্ছাদিত, তাহার উপর তরুণ অরুণের সুলোহিত কিরণধারাসম্পাতে তাহা মায়ালোকের বিভ্রম উৎপাদন করিতে লাগিল। নদীতীরে শান্তি-গিরির সমুন্নত উপত্যকায় চেং-তু নগর অবস্থিত; তাহার এক প্রান্তে নির্ম্মিত জ্যোতির্ম্মন্দিরের সহস্র বাতায়নের সুরঞ্জিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কপাটশ্রেণীতে প্রাতঃসূর্য্যের হেমাভ কিরণ-লেখা প্রতিফলিত হওয়ায় মন্দিরটি নদীবক্ষঃ হইতে পটাঙ্কিত চিত্রবৎ প্রতীয়মান হইল। সেই সুবৃহৎ মন্দিরের বহির্দ্দেশে তখন জনমানবের সমাগম ছিল না।

মন্দিরের বহির্দ্দেশ প্রভাতের আলোকে উজ্জ্বল হইলেও তাহার ধূসর অভ্যন্তরভাগ হইতে তিমিরাবরণ অপসারিত হয় নাই, তাহার প্রতি কক্ষে তখনও তরল অন্ধকার বিরাজিত। সেই অন্ধকারে মন্দিরবাসী কৃষ্ণপরিচ্ছদধারী সন্ন্যাসীরা প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া নিঃশব্দে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, অনেকে প্রাভাতিক উপাসনা আরম্ভ করিয়াছিল; কেহ কেহ আসনে বসিয়া মালা জপ করিতেছিল।

মন্দিরের একটি সুদীর্ঘ কক্ষ শুভ্র রজতবর্ণে সমুজ্জ্বল, প্রাতঃসূর্য্যকিরণ বাতায়নপথে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া নানাবিধ মূল্যবান্ আসবাবপত্রে প্রতিফলিত হইতেছিল। সেই কক্ষের মধ্যস্থলে ভগবান্ বুদ্ধদেবের প্রকাণ্ড মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। বুদ্ধদেব পদ্মাসনে বসিয়া ধ্যান করিতেছিলেন। বিশুদ্ধ স্বর্ণে সেই মূর্ত্তি নির্ম্মিত। তাঁহার সম্মুখে মঠের মোহান্ত জানু নত করিয়া বসিয়া যুক্তকরে ও নিমীলিত-নেত্রে উপাসনা করিতেছিলেন। বুদ্ধমূর্ত্তির উভয় নেত্রতারকা দুইখানি সুলোহিত মণি দ্বারা নির্ম্মিত, সেই লোহিত নেত্রের উজ্জ্বল প্রভা উপাসনারত মোহান্তের মুখমণ্ডলে প্রতিফলিত হইতেছিল।

মোহান্তের পশ্চাতে কিছু দূরে একখানি স্বতন্ত্র আসনে তাঁহার প্রধান চেলা ধ্যানস্তিমিত-নেত্রে উপবিষ্ট। তাঁহার পশ্চাতে যে তিন জন সন্ন্যাসী শ্রেণীবদ্ধভাবে বসিয়া উপাসনা করিতেছিলেন, তাঁহারাও মোহান্তের মাতব্বর চেলা। মোহান্ত সকল কার্য্যেই ইঁহাদের সহিত পরামর্শ করিতেন।

প্রধান মোহান্ত সে সময় জাফ্রাণী রঙ্গের একটি উজ্জ্বল পরিচ্ছদে ভূষিত ছিলেন। এই পরিচ্ছদের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, চীনদেশের রাজবংশোদ্ভূত লোক ভিন্ন অন্য কোন সন্ন্যাসী—তিনি কোন মঠের মোহান্তের পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও, এই বর্ণের পরিচ্ছদ ধারণ করিতে পারিতেন না; এমন কি, বর্ত্তমান কালে চীনসাম্রাজ্যে গণতন্ত্রশাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইলেও মোহান্ত বা সন্ন্যাসিগণের পরিচ্ছদ-সংক্রান্ত এই ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হয় নাই। যাঁহার দেহে রাজবংশের শোণিত নাই, তিনি সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিলেও পীতবর্ণের 'আলখেল্লা' ধারণ করিতে পারেন না। মোহান্তের প্রধান চেলা নীলাভ ও অন্য তিন জন মাতব্বর চেলা ধূসর আলখেল্লায় মণ্ডিত হইয়া উপাসনায় বসিয়াছিলেন। তুং-তিং হ্রদে যে দ্বীপ আছে, সেই দ্বীপে একটি প্রকাণ্ড মঠ বর্ত্তমান, সেখানে এবং ক্যাণ্টনের সুপ্রসিদ্ধ 'চিরপবিত্র মঠে' দৈনন্দিন উপাসনার এই রীতি প্রবর্ত্তিত থাকিলেও চেং-তু মঠে উপাসনাদি কার্য্যে যেরূপ নিয়মানুবর্ত্তিতা লক্ষিত হয়, অন্য কোথাও তাহা সতর্কতার সহিত সম্পন্ন হয় না।

সেই দিন সূর্য্যোদয়ের পরও সেই মঠে উপাসনা চলিতে লাগিল। ধ্যাননিরত মোহান্তের মস্তক ধীরে ধীরে তাঁহার বক্ষঃস্থলে ঝুঁকিয়া পড়িল। তাঁহার ওষ্ঠাধর স্ফুরিত, তাহা ধীরে ধীরে কম্পিত হইতে লাগিল, যেন তিনি তাঁহার সম্মুখস্থিত ভগবান্ তথাগতের মূর্ত্তির নিকট কোন বর প্রার্থনা করিতেছিলেন। তাঁহার পশ্চাতে যে চারি জন চেলা ধ্যান-নিমগ্ন ছিলেন, তাঁহাদের কাহারও অধরোষ্ঠ মুহূর্ত্তের জন্য কম্পিত হইল না, কাহারও ললাটের একটিও শিরা বিচলিত হইল না; তাঁহারা সকলেই স্থাণুর ন্যায় স্থির। কিন্তু তাঁহারা অন্য সকল বিষয়ে মোহান্তের উপাসনাপদ্ধতিরই অনুসরণ করিতেছিলেন।

কিছু কাল পরে মোহান্তের মস্তক তাঁহার বক্ষঃস্থল হইতে ধীরে ধীরে ঊর্দ্ধে উঠিল; তার পর তিনি মস্তকের উপর হইতে রেশমনির্ম্মিত পীতবর্ণের মুখোসটি টানিয়া লইয়া

তদ্দ্বারা মুখমণ্ডল আবৃত করিলেন। অনন্তর তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলে তাঁহার চারি জন চেলাও উঠিয়া সেই কক্ষের শেষপ্রান্ত পর্য্যন্ত নিঃশব্দে তাঁহার অনুসরণ করিলেন। সেই স্থানে একটি দ্বার ছিল; দ্বারটি রূপার পাতে এ ভাবে আচ্ছাদিত যে, তাহা দেখিলে রৌপ্যনির্ম্মিত দ্বার বলিয়াই ভ্রম হইত। তাহা চৌকাঠের সহিত এ ভাবে আবদ্ধ ছিল যে, দ্বারের কপাট ও চৌকাঠের পার্থক্য বুঝিবার উপায় ছিল না। মোহান্ত এক হাতে সেই দ্বার ঠেলিতে ঠেলিতে হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া তাঁহার প্রধান চেলার মুখের দিকে চাহিলেন এবং অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "তুমি কিছুকাল প্রাভাতিক প্রার্থনা করিবে ?"

প্রধান চেলাটি উভয় হস্তে ললাটস্পর্শ করিয়া বলিল, "হাঁ গুরুদেব, ঐরূপই আমার ইচ্ছা।"

মোহান্ত বলিলেন, "দিবাভাগে অন্যান্য যে সকল অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিবার পদ্ধতি আছে, তাহাও করিবে, যেন কোন কার্য্যের ত্রুটি না হয়। আমি আজ সারাদিন ধ্যানস্থ থাকিব, তোমরা কোন কারণে আমার ধ্যানভঙ্গ করিও না।"

চেলা বলিল, "মহিমময়ের আদেশ শিরোধার্য্য।"

পীত মুখোসধারী মোহান্ত বলিলেন, "আমার ও ভগবান্ বুদ্ধের আশীর্ব্বাদে তোমাদের কল্যাণ হউক।"

অতঃপর পীত মুখোসধারী মোহান্ত পূর্ব্বোক্ত রৌপ্যপাত-মণ্ডিত দ্বারটি খুলিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। মুহূর্ত্ত-মধ্যে তিনি অদৃশ্য হইলেও তাঁহার চেলারা কিছু কাল স্তব্ধ-ভাবে সেই দ্বারের নিকট যুক্তকরে দাঁড়াইয়া রহিল। অতঃপর তাহারা সেই স্থান ত্যাগ করিয়া প্রশস্ত বারান্দা অতিক্রম করিল এবং ধীরে ধীরে দূরবর্ত্তী হল-ঘরে উপস্থিত হইল।

এ দিকে মুখোসধারী মোহান্ত তাঁহার পশ্চাৎস্থিত দ্বার অর্গলরুদ্ধ করিয়া সেই কক্ষের প্রান্তস্থিত একটি সঙ্কীর্ণ পথে প্রবেশ করিলেন এবং সেই পথে কিছু দূর অগ্রসর হইয়া একটি ক্ষুদ্র কক্ষে উপস্থিত হইলেন। সেই কক্ষে আসবাব-পত্রের আড়ম্বর ছিল না। কক্ষের মধ্যস্থলে দুইখানি প্রস্তরের উপর একখানি প্রশস্ততর প্রস্তর আড়োভাবে স্থাপিত ছিল; তাহা টেবলের ন্যায় ব্যবহৃত হইত। তাহার পাশে বেঞ্চের মত একখানি অনুচ্চ পাথরের আসন ছিল। টেবলের উপর জলপূর্ণ একটি মৃন্ময় কলস এবং একখানি কাঠের বারকোশে রাশীকৃত গরম ভাত ছিল, ভাতগুলি হইতে তখনও ধোঁয়া উঠিতেছিল।

মুখোসধারী মোহান্ত বেঞ্চে বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে তালি দিলেন, তাহার পর তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী একটি রুদ্ধ দ্বারের দিকে সতৃষ্ণ-নয়নে চাহিয়া রহিলেন। মুহূর্ত্ত পরে একটি দীর্ঘদেহ স্থূলোদর চীনাম্যান সেই দ্বার খুলিয়া মোহান্তের সম্মুখে উপস্থিত হইল। লোকটির মুখ সুগোল ও মাংসল; তাহার দেহ সবল হইলেও তাহার মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারা যাইত, সে প্রৌঢ়ত্বের সীমা অতিক্রম করিয়াছিল, তবে তাহাকে ঠিক বৃদ্ধও বলা যাইত না। সে মোহান্তের সম্মুখে আসিয়া অবনত-মস্তকে প্রগাঢ় ভক্তি-ভরে অভিবাদন করিল। অনন্তর সে ধীরে ধীরে তাঁহার পশ্চাতে উপস্থিত হইল।

ভৃত্য তাঁহার পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইলে, মুখোসধারী মোহান্ত মুখের উপর হইতে মুখোসটি অপসারিত করিলেন। পূর্ব্বদিকের বাতায়নপথে রৌদ্রচ্ছটা তাঁহার বদনমণ্ডলে প্রতিফলিত হইলে তাঁহার মুখ সুস্পষ্টরূপে দৃষ্টিগোচর হইল, মুখখানি পাতলা, সন্ন্যাসীর মুখের বিশিষ্টতা সেই মুখে বর্ত্তমান, তাহাতে কৃচ্ছ্রসাধনের নিদর্শন ছিল। চক্ষু দুইটি অক্ষি-কোটরের অন্তর্নিহিত, কিন্তু তাহা উজ্জ্বল, প্রগাঢ় বুদ্ধিমত্তার নিদর্শন-সূচক। যাহারা তাঁহাকে চিনিত, তাহারা তাঁহার সেই মুখোসবিরহিত মুখ দেখিয়া তৎক্ষণাৎ বলিতে পারিত, তিনি মোহান্তের পরিচ্ছদে মণ্ডিত থাকিলেও কোন মোহান্ত বা সাধারণ লোক নহেন, তিনি সুবিস্তীর্ণ চীন-সাম্রাজ্যের মুকুটহীন সম্রাট, মহাসম্রান্ত ও অসীম শক্তিসম্পন্ন মাঞ্চু রাজবংশের সুযোগ্য বংশধর যুবরাজ আউ-লিং। চীনের রাজবংশ সিংহাসনচ্যুত হইলেও সমগ্র দেশে আউ-লিংএর প্রভাব-প্রতিপত্তি তখনও অক্ষুণ্ণ ছিল।

মাঞ্চু রাজবংশের শোণিত তাঁহার ধমনীতে প্রবাহিত হইতেছিল বলিয়া মঠে অবস্থিতিকালে তিনি রাজবংশের নিদর্শনস্বরূপ পীতবর্ণ পরিচ্ছদই ব্যবহার করিতেন; মঠের বাহিরে যাইবার প্রয়োজন না হইলে তিনি এই পরিচ্ছদ ত্যাগ করিতেন না। কিন্তু তিনি আহারে বসিবার পূর্ব্বে ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া উভয় হস্ত ঊর্দ্ধে তুলিলেন, তখন তাঁহার বিশ্বস্ত ভৃত্য সান তাঁহার দেহ হইতে সেই

পীত-পরিচ্ছদ উন্মোচন করিলে সেই পরিচ্ছদের নিম্নস্থিত কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদে তাঁহার দীর্ঘ দেহ আবৃত রহিল। সান তাঁহার বহুকালের ভৃত্য, তাঁহার শৈশবকালে সে তাঁহাকে কোলে-পিঠে লইয়া মানুষ করিয়াছিল, এবং তাঁহার যৌবন-কালে সে প্রাণ-মন সমর্পণ করিয়া তাঁহাকে সেবা করিত। সঙ্কটকালে তিনি কর্ত্তব্য স্থির করিতে না পারিলে সানের সহিত গোপনে পরামর্শ করিতেন, তাহার উপদেশ গ্রহণ করিতেন। সানের ন্যায় বিশ্বস্ত অনুচর তাঁহার দ্বিতীয় কেহ ছিল না। তিনি সানকে উপেক্ষা করিয়া অন্য কাহারও পরামর্শ গ্রহণ করিতেন না, সুতরাং সান কেবল ভৃত্য নহে, তাঁহার মন্ত্রীর স্থানও অধিকার করিয়াছিল। তিনি পীত-পরিচ্ছদ উন্মোচিত করিয়া, মোহান্তের কৃষ্ণ পরিচ্ছদে মণ্ডিত হইয়া আহার করিতে বসিলেন। তিনি আহারে প্রবৃত্ত হইলে সান নিঃশব্দে সেই কক্ষ ত্যাগ করিল।

কিন্তু তিনি যৎসামান্য অন্নব্যঞ্জন দ্বারা আহার শেষ করিয়া জলপান করিলে সান অন্যকক্ষ হইতে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। সে একটি পাত্রে জল ও একখানি ধোয়া তোয়ালে লইয়া আসিল। তিনি সেই জলে হাত-মুখ প্রক্ষালন করিয়া তোয়ালে দিয়া মুখ মুছিলেন, তাহার পর তাহা সানের হাতে দিয়া তাহাকে বলিলেন, "সান, তুমি ভিতরের কামরায় গিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিবে, তোমার সঙ্গে একটা জরুরী পরামর্শ আছে।"

সান অভিবাদন করিয়া বলিল, "প্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য।"

আউ-লিং যে বেঞ্চিতে বসিয়া আহার করিলেন, সেই বেঞ্চির ঠিক পশ্চাতেই আর একটি কক্ষের দ্বার ছিল। তিনি উঠিয়া গিয়া সেই দ্বার খুলিলেন, সেই দ্বার অতিক্রম করিয়া তিনি যে কক্ষে প্রবেশ করিলেন—সেই কক্ষটি সুপ্রশস্ত। সেই কক্ষের ঊর্দ্ধে 'স্কাইলাইট' থাকায় কক্ষটি উজ্জ্বল দিবালোকে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। সেই কক্ষটি দেখিলে কোন বৈজ্ঞানিকের কর্ম্মশালা বলিয়া ধারণা হইত, যেন তাহা সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিওর সময় হইতে তাঁহার পরীক্ষাগাররূপে বিরাজিত রহিয়াছে। সেই কক্ষে যে সকল বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রাদি সংরক্ষিত হইয়াছিল, তাহা দেখিলে মনে হইত, য়ুরোপের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকরাও সেই সকল দুর্লভ ও মূল্যবান্ যন্ত্রাদি সংগ্রহ করা যথেষ্ট গৌরবের বিষয় মনে করেন, এবং যথাসাধ্য চেষ্টাতেও তাহা সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারেন না। সুদুর্গম চেং-তু মঠের একটি নিভৃত কক্ষে বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকযুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি শৃঙ্খলাক্রমে থরে থরে সজ্জিত দেখিয়া য়ুরোপ ও আমেরিকার প্রধান প্রধান বৈজ্ঞানিকগণকেও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হইত।

এই কক্ষের এক প্রান্তে একটি বৈজ্ঞানিক লেবরেটারীর সকল দ্রব্য পরিপাটীরূপে সজ্জিত ছিল। বস্তুতঃ লণ্ডনে বা প্যারিসে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট পূর্ণাবয়ব লেবরেটারী দেখিতে পাওয়া যায় না। সেই কক্ষের অন্য প্রান্তে একটি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর শক্তিশালী দূরবীক্ষণযন্ত্র সংরক্ষিত ছিল। অন্যদিকে প্রাচীর জ্ঞানভাণ্ডার—আয়ুর্ব্বেদ, জ্যোতিষ, হকিমী, রসায়ন, শল্যবিদ্যা, তন্ত্র প্রভৃতি সম্বন্ধীয় যে সকল দুর্লভ সামগ্রী সজ্জিত, তাহাদের সম্বন্ধে য়ুরোপ ও আমেরিকার বিদ্বজ্জনমণ্ডলী এখন পর্য্যন্ত যথাযোগ্য ধারণা করিতে পারেন নাই। সেই সকল রহস্য এই বিংশ শতাব্দীতেও তাঁহাদের আয়ত্তাতীত রহিয়াছে! এতদ্ভিন্ন সেই কক্ষের মধ্যস্থলে শাল-কাঠের একখানি বৃহৎ টেবল ছিল, এবং কতকগুলি বৈজ্ঞানিক যন্ত্র শৃঙ্খলার সহিত সজ্জিত ছিল।

রাজকুমার আউ-লিং ধীরে ধীরে এই টেবলের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি টেবল-সন্নিহিত শাল-কাঠের এক-খানি ভারী চেয়ারে বসিয়া একরাশি লেফাপা ও দলীল-পত্রাদি পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি যাহাতে হাত দিলেন, তাহা এত শীঘ্র ও এরূপ তৎপরতার সহিত শেষ করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার ক্ষিপ্রতার পরিচয় পাইলে যে কোন ক্ষিপ্রহস্ত কার্য্যদক্ষ য়ুরোপীয়কে বিস্মিত হইতে হইত। কারণ, তাঁহাদের অনেকেরই ধারণা, প্রাচ্য ভূখণ্ডের লোকগুলি কুঁড়ের বাদশা, তাহারা তাড়াতাড়ি কোন কায শেষ করিতে পারে না!

তিনি কয়েকখানি চিঠিপত্র খুলিয়া তাহা পাঠ করিতে করিতে কি উত্তর দিবেন, স্থির করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার ভৃত্য সান নিঃশব্দে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। সে আউ-লিংএর চেয়ারের পাশে দাঁড়াইয়া তাঁহার আদেশের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। আউ-লিং তাঁহার হাতের পত্র হইতে মুখ না তুলিয়াই সানকে মৃদুস্বরে বলিলেন, "এত দিন

পরে ঠিক সংবাদ পাইলাম, সান ! ফেরার লক লণ্ডনে নাই, সে গোপনে লণ্ডন ত্যাগ করিয়াছে।”

সান আগ্রহ বা উৎসাহ প্রকাশ না করিয়া বলিল, “মহিমময় ত পূর্ব্বেই এইরূপ অনুমান করিয়াছিলেন।”

আউ-লিং বলিলেন, “হাঁ সান, এই রকমই অনুমান করিয়াছিলাম বটে ; কারণ, লোকটা কি রকম চতুর, তাহা আমার অজ্ঞাত নহে। কিন্তু হং-লো-চুকে এখনও কিঞ্চিৎ শিক্ষা না দিলে চলিতেছে না। লণ্ডনে এই জনরব প্রচারিত হইয়াছে যে, সেই কুকুর লক কি একটা জরুরী কাযে আমেরিকায় গিয়াছে। আর হং-লো-চু নাকি নিজের চোখে দেখিয়াছে—এই সংবাদ লণ্ডনের কাগজগুলাতে বাহির হইয়াছে! “কিন্তু এই সংবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা ; কেন মিথ্যা, তাহাও তোমাকে বলিতেছি। আমেরিকার নিউইয়র্ক সহরে আমাদের পীতপতঙ্গ সম্প্রদায়ের যে গুপ্ত সমিতি আছে, সেই সমিতির অধ্যক্ষ আমাকে এই পত্র লিখিয়া জানাইয়াছেন যে, আমেরিকার সর্ব্বস্থানে সতর্কভাবে অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছে, সেই ঘৃণিত কুকুরটা সে দেশে যায় নাই। কানাডা এবং ফ্রান্স হইতেও ঠিক ঐ সংবাদ পাইলাম। কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে সে ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়াছে—ইহা ঠিক জানিতে পারা গিয়াছে ; তাহা হইলে সে কোথায় গিয়াছে ?”

সান অস্ফুটস্বরে বলিল, “মহিমময়ের নিকট শুনিয়াছি, ভেলকীর ঢাকের উপর নানা অদ্ভুত জিনিষ দেখা গিয়াছে!”

আউ-লিং ডেস্কের উপর হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া সেই কক্ষের এক কোণের দেওয়ালের দিকে চাহিলেন। সেই স্থানে একখানি বৃহৎ সবুজ প্রস্তর সংরক্ষিত ছিল। সেই প্রস্তরস্তূপটি এরূপ বৃহদাকার যে, একখানি নিরেট পুরু টেবলের সহিত তাহার তুলনা হইতে পারিত। সেই পাথরখানির উপর সুন্দর পালিশ করা তামার একটি ঢাক ছিল। তাহার সহিত কয়েকটি কৃষ্ণবর্ণ হাতল সংযুক্ত ছিল। সেই ঢাক হইতে তামার কয়েকটি সরু চোঙ অদূরবর্ত্তী দেওয়ালের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাদের অন্য প্রান্ত অদৃশ্য! আউ-লিং চেয়ারে বসিয়া এক মিনিটকাল সেই অদ্ভুতাকৃতি ঢাকটির দিকে নির্নিমেষ-নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। তিনি কি ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাহার পর সানকে বলিলেন, “এই আয়না হইতে আজ কি জানিতে পারি—পরীক্ষা করিয়া দেখি।”

আউ-লিং সেই সবুজ পাথরখানির নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং তামার ঢাকটির উপর মুখ নামাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, ইহাতে সেই উজ্জ্বল তাম্রফলকে তাঁহার মাথা ও কাঁধ প্রতিবিম্বিত হইল। ঢাকের সেই তাম্রনির্ম্মিত পটহের পালিশের উপর এক বিন্দুও ধূলা না পড়ায় তাহা অত্যন্ত পরিষ্কৃত ছিল। সান তাঁহার ইঙ্গিতে অন্য টেবল হইতে একখানি চতুষ্কোণ ও অব্যবহৃত সাময় চামড়া আনিয়া তদ্দ্বারা সেই ঢাকের মসৃণ পটহটি ঘষিতে লাগিল। তাহা ঐ ভাবে ঘষিতে ঘষিতে পটহটি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উজ্জ্বল হইল।

অতঃপর আউ-লিং সেই ঢাকের দিকে হাত বাড়াইয়া প্রথমে তাহার কালো হাতলগুলির একটিতে, তাহার পর দ্বিতীয়টিতে অল্প জোরে মোচড় দিলেন। ইহাতে টুং টুং করিয়া মৃদু শব্দ হইল। সেই শব্দ শুনিয়া আউ-লিং সানকে বলিলেন, “হুঁসিয়ার হইয়া পরীক্ষা কর।”—তাঁহার কথা শুনিয়া সান বিস্ফারিত-নেত্রে সেই মসৃণ তাম্রনির্ম্মিত পটহের দিকে চাহিয়া রহিল।

সানের মনে হইল, সেই পটহের উপর দিয়া প্রথমে যেন একখণ্ড পাতলা মেঘের স্রোত চলিয়া গেল! তাহার পর পটহটি পূর্ব্ববৎ নিষ্কলঙ্ক ও মসৃণ দেখাইতে লাগিল। আউ-লিং এইবার পূর্ব্বোক্ত কৃষ্ণবর্ণ হাতলে আর একটি মোচড় দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সেই মসৃণ পটহের উপর একখানি ছায়াচিত্র পরিস্ফুট হইল। তাহা নান্‌কিন্‌ নগরের প্যাগোডাবৎ একখানি ঘরের ছাদের ছবি।

ক্রমশঃ চিত্রের পর চিত্র তাঁহার সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। কেহ এরোপ্লেনে আকাশে উড়িতে উড়িতে নিম্নস্থিত পৃথিবীর নগর, গ্রাম প্রভৃতির ফটো তুলিলে—সেই ছবিগুলি যেরূপ দেখায়, সান সেই তামার ঢাকের পটহের উপর সেইরূপ চিত্ররাশি প্রতিবিম্বিত দেখিল ; যেন একটি চিত্রের পর অন্যটি তাহার চক্ষুর উপর ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু প্রত্যেক ছবিই নান্‌কিন নগরের বিভিন্ন অংশের। তাহা অপেক্ষা পরিস্ফুট চিত্র সিনেমার পটে দেখিতে পাওয়া যায় না।

আউ-লিং সেই ঢাকের প্রত্যেক হাতলে মোচড় দিয়া সিনেমার দৃশ্যের মত সে সকল দৃশ্য সেই ঢাকের পটহে প্রতিবিম্বিত করিতে লাগিলেন, তাহা নান্‌কিন্‌ নগরের সকল অংশের চিত্র হইলেও তাঁহার আশা পূর্ণ হইল না।

অবশেষে তিনি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া আর একটি হাতলে মোচড় দিলেন, তখন ইয়াংসি নদীর উভয় কূল এবং নদীর বিস্তীর্ণ জলরাশির চিত্র ঢাকের পটহে প্রতিফলিত হইতে লাগিল। একাংশের পর অন্য অংশের চিত্র। নদীপথে নৌকারোহণে চলিবার সময় নদীর জলরাশি ও উভয় তীর যে ভাবে লক্ষিত হয়, সান তাহা সেই ভাবে ঢাকের পটহে প্রতিবিম্বিত দেখিল। অবশেষে আউ-লিংএর চক্ষু সঙ্কুচিত হইল; কিন্তু তাঁহার মুখে একটা নূতন ভাবের তরঙ্গ বহিয়া গেল!

তিনি ঈষৎ উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "সান, এবার বেশ মন দিয়া চাহিয়া দেখ, কোন কারণে অন্যমনস্ক হইও না।—নদীতে কি দেখিতে পাইতেছ?"

সান বিহ্বল-স্বরে বলিল, "নদীর জলে একখানা প্রকাণ্ড 'জঙ্ক'! হাঁ, জাহাজখানি দেখিয়া মনে হইতেছে, কান-সি-ওয়েন যে সকল জাহাজ লইয়া চেংচার চতুর্দ্দিকে বোম্বেটেগিরি করে, ইহাও সেইরূপ জাহাজ!"

আউ-লিং বলিলেন, "হাঁ, তোমার চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি অক্ষুণ্ণ আছে। বোম্বেটে কান্-সি-ওয়েন ঐ জাহাজের মালিক, তুমি ঠিকই বুঝিয়াছ, সান! ঐ দেখ, ঐ জাহাজের হালের কাছে দাঁড়াইয়া যে জাহাজ চালাইতেছে—সে ঐ জাহাজের চালক—ফু-চেন-পু। তাহার ছায়া-মূর্ত্তি দেখিয়া তাহাকে কি চিনিতে পারিতেছ?"

সান সেই চিত্রস্থিত জাহাজের পশ্চাতে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল; সে জাহাজের পরিচালক ফু-চেন-পুর পাশে একটি দীর্ঘ মূর্ত্তি দেখিল—তাহার পরিধানে জীর্ণবস্ত্র, তাহার আকার কুলীর চেহারার অনুরূপ। কিন্তু সান সেই ঢাকের পটহে তৎপূর্ব্বেও একাধিকবার সেই মূর্ত্তি প্রতিফলিত দেখিয়াছিল।

সান বলিল, "এখানেও সেই লম্বা কুলীটাকে দেখিতেছি, মহিমময়!"

আউ-লিং মাথা নাড়িয়া উৎসাহভরে বলিলেন, "হাঁ, তাই বটে, ও ঠিক সেই লোক!—তুমি উহাকে শেষবার কোথায় দেখিয়াছিলে, সান?"

সান ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, "শেষবার? নদীবক্ষে একখানি জঙ্কের খোলের ভিতর দেখিয়াছিলাম।"

আউ-লিং বলিলেন, "হাঁ, ঠিক তাহাই বটে।"

আউ-লিং জাহাজের উপর সেই কুলীর ছবির দিকে নির্নিমেষ-নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। অবশেষে জাহাজের দাঁড়িরা দুই পাশে ঝুঁকিয়া পড়িয়া সমতালে দাঁড় ফেলিতে লাগিল, এবং জাহাজের মাস্তুলে একখানি প্রকাণ্ড পাল উঠিল। জাহাজ পূর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতবেগে নদীতরঙ্গ বিদীর্ণ করিয়া তাহার গন্তব্যপথে ধাবিত হইল। এই দৃশ্য দেখিয়া আউ-লিং আর একটি হাতলে অঙ্গুলীর খোঁচা দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সেই ছায়াচিত্র অদৃশ্য হইল।

সান আউ-লিংএর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, তাঁহার মুখ গম্ভীর, চক্ষু প্রদীপ্ত, ওষ্ঠ শুষ্ক; তাঁহার উভয় হস্ত তখন থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল, যেন তাঁহার মনের ভিতর তুমুল ঝটিকা বহিতেছিল।

আউ-লিং অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "ঐ কুলী, হাঁ, সে ঐ কুলীই বটে, কুলীর ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া সে মনে করিয়াছে, আউ-লিংএর চক্ষুতে ধূলি দিবে, তাহাকে প্রতারিত করিবে!—ছেলেখেলার সাহায্যে সে আউ-লিংকে ভুলাইতে চাহে? আমার নিকট য়ুরোপীয়ের ঐ তুচ্ছ চাতুরীর মূল্য কি? সে কি আমার আদেশেই শববাহী জাহাজে নীত হয় নাই? এবং আমার আদেশেই তাহাকে শবাধারের মধ্যে জীবিত রাখিবার ব্যবস্থা করা হয় নাই? হাঁ, সে জীবিত অবস্থায় আউ-লিংএর সম্মুখে নীত হইবে, এই উদ্দেশ্যেই তাহাকে হত্যা করা হয় নাই। সে আউ-লিংএর নিকট তাহার সকল গুপ্ত কথা বলিতে বাধ্য হইবে।—হাঁ, সান, আমার অনুমান মিথ্যা নহে। সেই কুকুরটা—গোয়েন্দা ফেরার লক সত্যই চীনদেশে আসিয়াছে। আমাদের মহাশত্রুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আমার দীর্ঘকালের চেষ্টা নিষ্ফল করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে! আমি তাহাকে কুলীর বেশে চিনিতে না পারিলেও ধ্যানস্থ হইয়া তাহার প্রকৃত মূর্ত্তি মনশ্চক্ষে প্রতিফলিত দেখিয়াছি। ঐ কুলীই ফেরার লক।

"আজ আমরা নদীপথে ঐ জাহাজের অনুসরণ করিব। উহাকে আমার দৃষ্টির অন্তরালে যাইতে দিব না। আমার সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী উপান শীঘ্র প্রস্তুত রাখিতে আদেশ কর। কুড়ি জন দাঁড়ি উহা নক্ষত্রবেগে পরিচালিত করিবে। চুন-কংএর অভিমুখে আজই আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। আমাদের ঘরাও টেলিগ্রাফের সাহায্যে আদেশ কর—আরও কুড়ি জন দাঁড়ি পরিশ্রান্ত দাঁড়িদের অবসর-দানের জন্য প্রতীক্ষা করিবে। ইচাংএ সংবাদ পাঠাও, আমার মোটর-বোট আমার আদেশের অপেক্ষায় প্রস্তুত থাকিবে।

"কেবল ইহাই নহে, হাংকোতে চেন-সুনএর নিকট সংবাদ পাঠাও, আমার প্রত্যেক জাহাজ আমার প্রবলপ্রতিদ্বন্দ্বী 'বিভীষিকা' নামধারী শত্রুকে আক্রমণ করিবার জন্য যেন প্রস্তুত থাকে। কালো মুখোসধারী মোহান্ত সুন-মো আমার আদেশ কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য নদীপথে প্রেরিত হইয়াছে। আমি তাহাকে আমার কিছু কিছু শক্তি পরিচালিত করিবার আদেশ দান করিয়াছি। সে হয় ত ইতিমধ্যেই এই জাহাজ আক্রমণের বন্দোবস্ত করিয়াছে। যে জাহাজ সেই ছদ্মবেশী কুক্কুরটাকে—ক্যাণ্টনী কুলীকে বহন করিতেছে, সেই জাহাজ আক্রমণ করিয়া অধিকার করিতেই হইবে। কিন্তু আমি কালো মুখোসধারী সুন-মোর সাহস ও শক্তিতে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারিতেছি না।

"তিব্বতের বিভীষিকা কান-সি-ওয়েনের সহিত ক্যাণ্টনী কুলীর বেশধারী ফেরার লক যোগদান করিয়া আমার সঙ্কল্প ব্যর্থ করিবে? আমাকে প্রতারিত করিয়া কৃতকার্য্য হইবে? আমি তাহাদের শক্তি ও সাহসের পরীক্ষা করিব। সান, আজ রাত্রিতেই আউ-লিং যুদ্ধযাত্রা করিবে। এই দুই জাহাজী ইঁদুরের রক্ত বিন্দু বিন্দু করিয়া ইয়াংসির সহিত যাহাতে মিশিয়া যায়, আমাকে তাহার ব্যবস্থা করিতেই হইবে। আমার পথ পরিষ্কার। আমি আউ-লিং, প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, ফেরার লককে আর তাহার স্বদেশে ফিরিতে হইবে না। এই দেশের জলে বা মাটীতে তাহার ইহজীবনের অবসান হইবে। ইহাই আউ-লিংএর প্রতিজ্ঞা!"

একাদশ প্রাক্কা

জলযুদ্ধ

মিঃ লক ও জ্যাক ড্রেককে লইয়া জাহাজখানি যেরূপ বেগে ইয়াংসি নদীর স্রোতের প্রতিকূলে চলিতে লাগিল, তাহা দেখিয়া তাঁহারা বিস্মিত হইলেন। চীনের জাহাজগুলা যেরূপ জবড়জঙ্গ, তাহা দেখিলে সেগুলি যে দ্রুতবেগে চলিতে পারে, ইহা বিশ্বাস করা কঠিন; কিন্তু সেই জাহাজের নাবিক ফু-চেন-পু অসাধারণ কৌশলে জাহাজ পরিচালিত করিতেছিল।

জাহাজের কেবিনে মিঃ লক ও জ্যাক ভোজন করিতেছিলেন; ফু-চেন-পু ডেকে থাকিয়া জাহাজ পরিচালিত করিতেছিল। আহারে বসিয়াও মিঃ লক নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনি ভাবিতেছিলেন, কান-সি-ওয়েনের সহিত শীঘ্রই তাঁহার সাক্ষাৎ হইবে; তাহার পর তিনি যাহাতে নদীবক্ষে অবশিষ্ট পথ নির্ব্বিঘ্নে অতিক্রম করিতে পারেন, সেজন্য তাহার সাহায্য প্রার্থনা করিবেন; কান-সি-ওয়েন তাঁহার সেই প্রার্থনা পূর্ণ করিতে আপত্তি করিবে না, কিন্তু তাহার পর—

সহসা কেবিনের বাহিরে দুম্‌দাম্‌ পদশব্দে মিঃ লকের চিন্তা-স্রোত অবরুদ্ধ হইল। পরমুহূর্ত্তেই জাহাজের নাবিক ফু-চেন-পু ব্যগ্রভাবে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল।

ফু-চেন-পু রুদ্ধনিশ্বাসে বলিল, "যাহা ভয় করিয়াছিলাম, তাহাই ঘটিয়াছে! তাহারা আসিয়া পড়িয়াছে। আমাদের আত্মরক্ষার জন্য সকলকেই দল বাঁধিয়া চেষ্টা করিতে হইবে।"

মিঃ লক আহার করিতে করিতে বলিলেন, "কাহারা আসিয়াছে?"

ফু-চেন-পু বলিল, "দশবারোখানি জলযান দল বাঁধিয়া এই দিকে আসিতেছে! সেই দলে জঙ্ক আছে, সাম্পান, উপান, মোটর-বোট প্রভৃতি সকলই আছে। ইহা কালো মুখোসধারী মোহান্তেরই চক্রান্তের ফল! আজ মধ্যাহ্নে নদী দিয়া একখান ষ্টীমার যাইতেছিল, আমি তাহাকে সেই ষ্টীমারে যাইতে দেখিয়াছিলাম।"

কয়েক মিনিট পরে জলস্থল কম্পিত করিয়া নদীবক্ষ হইতে অতি ভীষণ, অতি তীব্র হুঙ্কারধ্বনি উত্থিত হইল। লক ড্রেককে সঙ্গে লইয়া দ্রুতবেগে ডেকে উপস্থিত হইলেন, আহার অসমাপ্ত পড়িয়া রহিল। এই জাতি আহারের জন্য কামান-গোলা ও বোমা-সবমেরিণ লইয়া সারা পৃথিবী চষিয়া ফেলে বটে, কিন্তু শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার সময় ইহাদিগকে আহারও ত্যাগ করিতে দেখা যায়।

ফু-চেন-পু দূরে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহাদিগকে বহুসংখ্যক জলযান দেখাইয়া দিল। তখন সন্ধ্যাগমের অধিক বিলম্ব না থাকিলেও অন্ধকার গাঢ় হয় নাই; তাঁহারা গোধূলির অস্ফুট আলোকে দূরে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতে পাইলেন। নানা আকারের জলযান শ্রেণীবদ্ধ হইয়া তাঁহাদের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। সেই সকল জলযানের মাঝি-মাল্লাদের রণহুঙ্কার সন্ধ্যার স্তব্ধ আকাশে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

ফু-চেন-পু পূর্ব্বেই সন্দেহ করিয়াছিল—এ সকল জলযান তাহার জাহাজ আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে সেই দিকে

আসিতেছিল; এই জন্য সে জাহাজখানি নদীর পূর্ব্বতীর ঘেঁসিয়া পরিচালিত করিতেছিল। কারণ, সে জানিত, নদীর পূর্ব্বকূলে প্রায় দুই মাইল দূরে যে গ্রাম ছিল, সেই গ্রামে কান-সি-ওয়েনের বহু অনুচর বাস করিত; প্রয়োজন হইলে তাহাদের নিকট সে কোন লোক পাঠাইলে কিম্বা কোন উপায়ে বিপদের সংবাদ জানাইলে সেই গ্রামের শত শত সশস্ত্র অধিবাসী তাহাকে সাহায্য করিতে আসিবে, এবং শত্রুদলের সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে বিতাড়িত করিবে।

কিন্তু ফু-চেন-পুর এই আশা পূর্ণ হইল না, সে নদীর পূর্ব্বতীরে জাহাজ চালাইবার পূর্ব্বেই প্রায় আধ মাইল দূরে থাকিতে শত্রুরা সবেগে তাহার জাহাজের গতিরোধ করিল এবং তাহাকে পরিবেষ্টিত করিয়া 'মার মার' শব্দে চীৎকার করিতে লাগিল। প্রত্যেক জলযান হইতে ভীষণ চীৎকার উত্থিত হইতে লাগিল। মোটর-বোটের ধস্‌ধসানিতে, ষ্টীম লঞ্চের এঞ্জিনের শব্দে, আততায়িগণের বিকট হুঙ্কারে সেই নদীবক্ষে যেন দুর্দ্দান্ত পিশাচের প্রেতলীলা আরম্ভ হইল! সেই সময় কোন কোন সাম্পান হইতে হাউই ও বোমা ছুড়িয়া নদীর অপদেবতাদিগকে দূরে তাড়াইবার চেষ্টা হইতেছিল!

মিঃ লক সেই জাহাজের উপর একখানি বৃহদাকার প্রশস্ত খড়্গ পাইয়াছিলেন। চীনদেশের জল্লাদরা সেইরূপ খড়্গে অপরাধীর মুণ্ডচ্ছেদন করে। সেই খড়্গ অত্যন্ত ভারী হইলেও সম্মুখ-যুদ্ধে তাহা অব্যর্থ, একবার উর্দ্ধে তুলিয়া কাহারও কাঁধে ফেলিতে পারিলে মুণ্ডসহ আধখানা দেহ 'কলম-বাড়ী' হইয়া নামিয়া যায়! কিন্তু তাঁহার নিকট পিস্তলও ছিল, তবে কতক্ষণ তাহা চালাইতে পারিবেন—ইহা বুঝিতে পারিলেন না; কারণ, অল্পসংখ্যক টোটাই তাঁহার কাছে ছিল। তথাপি তিনি তাহা শেষ পর্য্যন্ত চালাইবেন স্থির করিলেন।

ফু-চেন-পু মিঃ লককে বলিল, "উহারা আর ত্রিশ চল্লিশ-বার দাঁড় ফেলিলেই আমাদের বুকের কাছে আসিয়া পড়িবে!"—সে তাহার নাবিকগণকে যুদ্ধের জন্য পূর্ব্বেই প্রস্তুত হইতে বলিয়াছিল, এইবার সে তাহাদের উদ্যোগ-আয়োজন দেখিতে চলিল।

মিঃ লক ডেকের ধারে ঝুঁকিয়া পড়িয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে দৃষ্টি প্রসারিত করিলেন। তখন এক ঝাঁক সাম্পান ও উপান জাহাজের প্রায় পাশে আসিয়া পড়িয়াছিল। কয়েকখানি মোটর-বোট দূরে দাঁড়াইয়া গর্জ্জন করিতেছিল। বোধ হয়, তাহারা কিছু দূরে থাকিয়াই জাহাজের উপর গুলীবর্ষণের সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিল। তিনি শত্রুপক্ষের জাহাজ তিনখানির অধিক দেখিতে পাইলেন না; তদ্ভিন্ন কয়েকখানি 'মোটর-লঞ্চ' অগ্নিসংযুক্ত ছুঁচো-বাজির ছুঁচোর মত চারিদিকে 'ফর্‌ ফর্‌' করিয়া ঘুরিয়া নদীর জলরাশি আলোড়িত করিতেছিল। জাহাজগুলির আশে-পাশে সাম্পান ও উপানগুলি দেখিয়া লকের মনে হইল, কয়েকটা ধাড়ি রাজহাঁস তাহাদের ছোট ছোট বাচ্চাগুলিকে সঙ্গে লইয়া নদীবক্ষে আহারান্বেষণে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। যে জাহাজখানি মিঃ লক সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে দেখিলেন, সেই জাহাজের ডেকের উপর দণ্ডায়মান একটি দীর্ঘ মূর্ত্তির প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। সেই মূর্ত্তির সর্ব্বাঙ্গ কৃষ্ণবর্ণ মুখোসে আবৃত। মিঃ লক চিনিতে পারিলেন—সে পালের গোদা সেই 'মুখোসধারী মোহান্ত', দল বাঁধিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমশঃ গাঢ়তর হইল। সেই অন্ধকারে শত্রুপক্ষ ফু-চেন-পুর জাহাজের উপর চড়াও করিল। সন্ধ্যা-সমাগমে নদীবক্ষে সে দিন কুজ্ঝটিকার সঞ্চার না হওয়ায় মিঃ লক তাঁহাদের জাহাজের সর্ব্বোচ্চ মঞ্চ হইতে শত্রুপক্ষের জাহাজস্থিত চীনাম্যানদের যোগাড়যন্ত্র নিরীক্ষণ করিবার সুযোগ পাইলেন। তাহারা জাহাজ হইতে দলে দলে জাহাজের পার্শ্ববর্ত্তী সাম্পানে ও উপানে নামিয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিতে লাগিল। অবশেষে তাহারা দলে দলে জাহাজ আক্রমণ করিল। সেই সময় তাহারা যে ভীষণ রণহুঙ্কার আরম্ভ করিল, তাহা শুনিলে ভয়ে শরীরের রক্ত জল হইয়া যায়! তাহারা ঐরূপ হুঙ্কার করিয়া যেন শক্তি ও সাহস সঞ্চয় করিতে লাগিল।

মিঃ লক এই দৃশ্য দেখিয়া আর উদাসীন থাকিতে পারিলেন না। তিনি ডেক হইতে তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া আসিয়া শত্রুপক্ষের সম্মুখীন হইলেন। তখন শত্রুপক্ষের প্রথম দল অগ্রসর হইয়া জাহাজের নাবিকগণকে আক্রমণ করিয়াছিল। নাবিকরা তাহাদের কাপ্তেনের আদেশ-সূচক সাঙ্কেতিক হুইস্‌ল-ধ্বনি শুনিবার পূর্ব্বেই শত্রুগণের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতেছিল। মিঃ লক তাঁহার খড়্গ-খানি উভয় হস্তে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া উর্দ্ধে তুলিলেন, এবং দক্ষিণে

বামে যাহাকে দেখিলেন, সেই খাঁড়া দিয়া তাহারই মুণ্ডপাত করিতে লাগিলেন, মিনিটে মিনিটে তাঁহার হাতের খড়্গ উঠিতে পড়িতে লাগিল। তাঁহার দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া ফু-চেন-পুর অনুচরবর্গ তাহাদের দলপতি বোম্বেটে-সর্দ্দার 'তিব্বতের বিভীষিকা'র জয়গান করিতে করিতে মিঃ লকের অনুসরণ করিল। শত্রুগণের শোণিতে জাহাজের পাটাতন প্লাবিত হইল। অন্যদিকে ফু-চেন-পু দ্বাদশ জন সাহসী ও বলবান্ সমরকুশল অনুচর সহ আততায়ী শত্রুদলকে আক্রমণ করিয়া শাণিত তরবারি দ্বারা তাহাদের মস্তক দেহচ্যুত করিতে লাগিল। কেহ কেহ দুই হাতে জাহাজের রেলিং ধরিয়া তাহাতে উঠিবার চেষ্টা করিতেছিল, কেহ কেহ সাম্পান হইতে মাথা বাড়াইয়া জাহাজের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। ফু-চেন-পু ও তাহার সহযোগিবর্গের তরবারির আঘাতে তাহাদের প্রসারিত হস্ত ও মস্তক দ্বিখণ্ডিত হইয়া নদীর জলে নিক্ষিপ্ত হইল, এবং তাহাদের শোণিতরাশিতে ইয়াংসির জলস্রোত লোহিত আভা ধারণ করিল।

ফু-চেন-পুর তখন বাহ্যজ্ঞান ছিল না, সে দুই হাতে তরবারি চালনা করিতে করিতে যে ভৈরব হুঙ্কারে শত্রুগণের মনে ত্রাসের সঞ্চার করিতেছিল, তাহাতে শত্রুগণের চীৎকার ডুবিয়া গেল। সে জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া মহাবিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিল; কিন্তু কেবল সাহসে ও বিক্রমে যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারা যায় না। ফু-চেন-পু দেখিল, আততায়ীরা বহুসংখ্যক জলযান লইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছে, শত্রুসংখ্যাও অগণ্য; সে একখানি মাত্র জাহাজ ও পরিমিতসংখ্যক নাবিকের সাহায্যে কিরূপে আত্মরক্ষা করিবে? ফু-চেন-পু মুহূর্ত্তকাল কি চিন্তা করিয়া জাহাজের ডেক হইতে তাড়াতাড়ি খোলের ভিতর নামিয়া গেল, সেই সময় সে মিঃ লককে তাহার অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিল।

মিঃ লক ফু-চেন-পুর উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন না, সে কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবারও সুযোগ পাইলেন না; তিনি তৎক্ষণাৎ ড্রেককে তাঁহার অনুসরণের আদেশ করিলেন, তাহার পর ফু চেন-পুর পশ্চাতে জাহাজের খোলের ভিতর প্রবেশ করিলেন।

কয়েক মিনিট পরে তাঁহারা তিন জনেই জাহাজে ডেকের উপর প্রত্যাগমন করিলেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের হস্তে কয়েকটি অনতিদীর্ঘ কৃষ্ণবর্ণ দণ্ড, প্রত্যেক দণ্ডের অগ্রভাগে রবারের বলের মত এক একটি ভাঁটা। তাহা ভয়ঙ্কর 'ডিনামাইট'!

ফু-চেন-পু জাহাজের ডেকের উপর হইতে শত্রুপক্ষের একখানি জাহাজ লক্ষ্য করিয়া একটি 'ডিনামাইট' নিক্ষেপ করিল। মুহূর্ত্তমধ্যে তাহা নির্দ্দিষ্ট জাহাজে নিপতিত হইল এবং বোমার ন্যায় গর্জ্জন করিয়া তাহা বিদীর্ণ হইল। সেই গম্ভীর শব্দে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে জাহাজখানি চূর্ণ হইয়া নদীগর্ভে প্রবেশ করিল, জাহাজের আরোহীরা কেহ আহত হইয়া, কেহ ডুবিয়া মরিবার ভয়ে কাতর স্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। কেহ কেহ আর্ত্তনাদ করিবারও অবসর পাইল না, তাহাদিগকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য তাহাদের জাহাজে 'ডিনামাইট' নিক্ষিপ্ত হইবে, ইহা তাহাদের ধারণা করিবার শক্তি ছিল না।

ফু-চেন-পু একটা 'ডিনামাইট' নিক্ষেপ করিলে মিঃ লক মুহূর্ত্ত পরেই তাঁহার হস্তস্থিত ডিনামাইটগুলির একটি অন্য একখানি জাহাজ লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। আবার সেইরূপ শ্রবণভেদী গম্ভীর নির্ঘোষে জলস্থল প্রতিধ্বনিত হইল। সেই জাহাজখানিও চূর্ণ হইয়া নদীগর্ভে প্রবেশ করিল। জাহাজের আরোহীরা প্রাণরক্ষার আশায় সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রিকালেই নদীগর্ভে লাফাইয়া পড়িতে লাগিল। অনেকের মৃতদেহ জাহাজ হইতে গড়াইয়া নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইল।

অতঃপর জ্যাক্ ড্রেকও এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিল। ডিনামাইটের আঘাতে তিনখানি জাহাজ নদীগর্ভে অদৃশ্য হইল। তখন মিঃ লক ও জ্যাক শত্রুপক্ষের সাম্পান ও উপানগুলি লক্ষ্য করিয়া বোমা নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। বোমার আঘাতে আরোহিসহ সেই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলযান নদীগর্ভে অদৃশ্য হইতে লাগিল। তাহাদের রণহুঙ্কারের পরিবর্ত্তে চারিদিক হইতে করুণ আর্ত্তনাদ উত্থিত হইতে লাগিল। যে সকল নৌকা দূরে থাকিয়া এই শোচনীয় দৃশ্য নিরীক্ষণ করিতেছিল; তাহাদের আরোহীরা আর সম্মুখে অগ্রসর হইতে সাহস করিল না, তাহারা প্রাণভয়ে নিরাপদ স্থানে পলায়ন করিতে লাগিল।

কালো মুখোসধারী মোহান্তের আর সন্ধান মিলিল না। সে বিপদ বুঝিয়া অবশিষ্ট জাহাজখানি লইয়া

বহু দূরে পলায়ন করিল। ফু-চেন-পু এবার শত্রুগণের বিরুদ্ধে জাহাজ পরিচালিত করিয়া বহু দূর পর্য্যন্ত তাহাদের অনুসরণ করিল। কিন্তু মুখোসধারী মোহান্তের জাহাজ সে দিকে পাইল না। তখন সে নিরুৎসাহ-চিত্তে তাহার গন্তব্যপথে প্রত্যাগমন করিল।

মিঃ লকের বাহুমূল শত্রুর অস্ত্রাঘাতে বিদীর্ণ হইয়াছিল। তিনি সেই স্থানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতে বাঁধিতে জ্যাককে বলিলেন, "এবার আমরা অতিকষ্টে জয়লাভ করিয়াছি বটে, কিন্তু ইহার শেষ ফল কি হইবে, তাহা অনুমান করা কঠিন।"

জ্যাক বলিল, "উহারা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছে, আবার কি সদলে আমাদিগকে আক্রমণ করিতে সাহস করিবে ?"

মিঃ লক গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "এখন তাহা অনুমান করা আমার অসাধ্য। মুখোসধারী মোহান্ত এই আততায়ী দলের পরিচালক। আমরা এই জাহাজে আছি, তাহা সে জানিতে পারিয়াছে; সে আমাদিগকে উজানে অধিক দূর যাইতে দিবে বলিয়া মনে হয় না। সে আমাদের গতিরোধের চেষ্টা করিবে, এবং এই উদ্দেশ্যে আরও অনেক অনুচরসহ পুনর্ব্বার আমাদিগকে আক্রমণ করিলে, তাহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই।"

জ্যাক্ আর কোন কথা বলিল না। কিন্তু কয়েক দিন তাহারা মুখোসধারী মোহান্তের দলের কোন সাড়া পাইল না। তাহাদের জাহাজ নির্ব্বিঘ্নে নদীতীরবর্ত্তী আন্‌কিন বন্দরের অদূরে উপস্থিত হইল। ফু-চেন-পু সেই বন্দরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে দুই তিনবার বোমার গম্ভীর নির্ঘোষ শুনিতে পাইল। সেই বোমার শব্দে সে বুঝিতে পারিল, তাহার মনিব কান-সি-ওয়েন আন্‌কিনে পূর্ব্বেই উপস্থিত হইয়াছে।

ফু-চেন-পু জাহাজ থামাইয়া একখানি ক্ষুদ্র বোটে নামিয়া পড়িল, তাহা দেখিয়া লক জাহাজের ডেকে দাঁড়াইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "জাহাজ হইতে নামিয়া হঠাৎ কোথায় যাইতেছ ?"

ফু-চেন-পু বলিল, "আমার মনিব মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিতে চলিলাম। তাঁহাকে আমাদের যুদ্ধের সংবাদ জানাইতে হইবে। মুখোসধারী মোহান্ত এখানে আসিয়া এই সকল কীর্ত্তি করিতেছে, তাহাও তাঁহাকে জানাইতে চাই। তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া জাহাজে ফিরিয়া আসিব। আপনার দুশ্চিন্তার কোন কারণ নাই, বাঘ মহাশয়!"

ফু-চেন-পু একাকী একখানি সাম্পান লইয়া ইয়াংসি নদীর উদ্বেলিত তরঙ্গরাশি ভেদ করিয়া আন্‌কিন্ বন্দরে প্রবেশ করিল। সে সেই বন্দরে কান-সি-ওয়েনের নীলবর্ণ জাহাজ দেখিতে পাইল। কান-সি-ওয়েন সেই জাহাজ লইয়া বহু যুদ্ধ জয় করিয়াছিল, এবং বোম্বেটেগিরিতে প্রবৃত্ত হইয়া নদীপথে সে অনেক বণিকের বাণিজ্য-জাহাজ লুণ্ঠন করিতেছিল।

ফু-চেন-পু তাহার মনিবের জাহাজের পাশে সাম্পান ভিড়াইয়া জাহাজে আরোহণ করিল। সে সেই জাহাজে উঠিয়া তাহার মনিবের কেবিনের দিকে অগ্রসর হইল। সেই কেবিনের দ্বারের দুই পাশে দুই জন দীর্ঘদেহ ভীমকায় প্রহরী পাহারা দিতেছিল; তাহারা ফু-চেন-পুকে চিনিত; তাহারা তাহাকে সহসা একাকী সেখানে উপস্থিত হইতে দেখিয়া বিস্মিত হইলেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না, নিঃশব্দে সরিয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে তাহারা কেবিনে প্রবেশ করিতে দিল। ফু-চেন-পুকে তাহার প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রয়োজন হইলে এত্তেলা দিয়া তাহার অনুমতি গ্রহণ করিতে হইত না, সেখানে সকল সময়েই তাহার অবারিত দ্বার।

সেই কেবিনের ভিতর আর একটি কেবিন ছিল। সেই কেবিনের দ্বারেও দুই জন প্রহরী পাহারায় নিযুক্ত ছিল। কেবিনের দ্বার রুদ্ধ ছিল। ফু-চেন-পু সেই প্রহরিদ্বয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রুদ্ধদ্বারের কপাটে তিনবার অঙ্গুলির আঘাত করিল, সেই আঘাতের বৈশিষ্ট্য ছিল। সেই শব্দ শুনিয়া কান-সি-ওয়েন বুঝিতে পারিল, আগন্তুক তাহার নিজের লোক এবং সে বিনা এত্তেলায় তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইবারও অধিকারী।

কেবিনের ভিতর হইতে মেঘমন্দ্রস্বরে ধ্বনিত হইল, "ভিতরে আসিতে পার।"

মুহূর্ত্ত পরে ফু-চেন-পু যে অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন, বিশালদেহ তেজস্বী পুরুষসিংহের সম্মুখীন হইল, মঙ্গচীন হইতে তিব্বতের সীমাপ্রান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বস্থানে সে 'তিব্বতের বিভীষিকা' নামে পরিচিত। প্রাচ্য ভূখণ্ডে তাহার ন্যায় মহাপরাক্রান্ত অজেয় জলদস্যু দ্বিতীয় কেহ ছিল না।

[ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

ভারতে হিন্দু-মুসলমান

বহু শত বর্ষ হইতেই হিন্দু-মুসলমান ভারতমাতার যুগ্ম সন্তানের মতই এদেশে বসবাস করিতেছে। এক দিন ভারতের বাহির হইতেই মুসলমান এদেশে আসিয়া হিন্দুর অধিকার খর্ব্ব করিয়াছিল বটে, কিন্তু সে সুদূর অতীতের কথা। ভাই যখন মায়ের কোলে ভূমিষ্ঠ হয়, তখন বড় ভাইয়ের পূর্ণাধিকারকে খণ্ডিত করিয়াই আসে। আজ এদেশে যেমন হিন্দুর, তেমনই মুসলমানেরও অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত, আজ সে আগন্তুকমাত্র নহে; সে ভারতমাতার কনিষ্ঠ পুত্র; হিন্দুর ভাই।

ভারতবর্ষে মোগল পাঠান বাদশা সম্রাটদের মধ্যে অনেক স্বনামধন্য পুরুষের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। বলবন, আলাউদ্দিন, মহম্মদ তোগলক, ফেরোজ তোগলক প্রভৃতি পাঠান বাদশাহগণ অনেকানেক সদগুণে বিভূষিত থাকিলেও হিন্দু প্রজার প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন না হইতে পাবায় দেশপূজ্য হইতে পারেন নাই, কিন্তু কূটবুদ্ধি আকবরসাহ তাঁর দূরদৃষ্টি ও সূক্ষ্ম দর্শনশক্তিতে দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন, হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি ব্যতীত এদেশে মোগল সাম্রাজ্য স্থায়িত্বলাভ করিতে পারিবে না। এই তথ্য পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া তিনি এই নীতিরই অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাই হিন্দু-মুসলমাননির্ব্বিশেষে সকলকার নিকটেই তিনি সংপূজিতও হইয়াছিলেন। একদা মোগল-সম্রাটের শাসনকে দেশবাসী রামরাজ্যের সঙ্গে সমতুলিত করিয়া উচ্চ কণ্ঠে উচ্চারণ করিয়াছে—"দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা"। যদিও আকবরসাহ তাঁর এই রাজনৈতিক সমদর্শিতা তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী সেরসাহের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া তাহাকেই কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন। দাসবংশীয় নাসীরুদ্দিন, সেরসাহ ইঁহারাও বুঝিয়াছিলেন, ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য স্থাপন করা যত সহজ, হিন্দু প্রজার প্রতি বিদ্বিষ্টভাব পোষণ করিয়া তাহাকে পালন করা তত সহজ নয়। রাজার রাজধর্ম্ম সকল প্রজার প্রতি সমভাব পোষণে, তদব্যতীত রাজত্ব রক্ষা করা যায় না। কিন্তু সেরসাহের জীবনে এই অকলঙ্ক রাজনীতির পূর্ণ ফলপ্রাপ্তি ঘটিবার অবসর হইল না। তাঁহার আরব্ধ কর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পাদন করিয়া তাহার ফলভাক্ হইলেন আকবরসাহ। হিন্দু-মুসলমান সে দিনে এক মা'র সন্তানরূপেই রাজলক্ষ্মীর প্রসাদ-ভোগী হইয়াছিলেন। বড় লাটের, জঙ্গী লাটের পদ সে দিনে হিন্দুর প্রাপ্তি ঘটিয়াছিল মুসলমান সম্রাটের হস্ত হইতে। সম্রাট বুঝিয়াছিলেন, এক দেশে বসবাস করিয়া পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস রাখিয়া চলিলে দেশের উন্নতি, জাতির উন্নতি অচল হইবে। বঙ্গেশ্বর হুসেনসাহ এবং নসরৎসাহের নাম বঙ্গের শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই কে না জানেন? হিন্দুর ধর্ম্মগ্রন্থ কৃত্তিবাসী রামায়ণ রচনার উৎসাহদাতা ও সহায়ক হুসেনসাহের চিত্তের প্রসারতার তুলনা আজিকার এই বিংশ শতাব্দীর দিনেও বড় একটা দেখিতে পাই না। পরাগলী মহাভারত অর্থাৎ পরাগল খাঁর সহায়তার দ্বারা সংস্কৃত হইতে অনুবাদিত মহাভারতও ইঁহাদেরই ধর্ম্মসম্বন্ধে উদারতার পরিচায়ক। বস্তুতঃ ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানে বিবাদ মিটিয়া আসিতেছিল, বিশেষতঃ সমাবস্থাপন্ন অর্থাৎ উভয় সম্প্রদায়েরই যখন একই অধীনাবস্থা, তখন পরস্পরের ঈর্ষাদ্বেষ সহজেই মিটিয়া যাইতে পারিত, যদি না এর মধ্যে তৃতীয় পক্ষের কৌশল-হস্তের চালবাজী থাকিত। বহু দিন পূর্ব্বে ১২৯৬-৯৭ সালে অর্থাৎ এখন হইতে ৪২—৪৩ বৎসর পূর্ব্বে সুদূরদৃষ্টিসম্পন্ন মহাত্মা ভূদেব সামাজিক প্রবন্ধে "ভারতে মুসলমান" প্রবন্ধে যে কথাগুলি লিখিয়া গিয়াছেন, সেগুলি আজ বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়া উঠিতেছে। তাই আমি এইখানে উহা হইতে সামান্য একটুখানি অংশ উদ্‌ধৃত করিয়া দেখাইতেছি যে, বর্ত্তমানের যে সমস্যা স্থূলদৃষ্টিতে মুসলমানগণ দেখিয়াও দেখিতেছেন না, তাহা কত দিন পূর্ব্বে এদেশের এক উদারচিত্ত সমদর্শী মনীষীর দৃষ্টিপথে প্রতিভাত হইয়াছিল।

"হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভেদ রক্ষা করিবার এবং তাহা বর্দ্ধিত করিবার অপর একটি প্রবলতর কারণ উপস্থিত হইয়া আছে। অনেক ইংরাজ গ্রন্থকার কখন স্পষ্টাক্ষরে, কখন ইঙ্গিতে অনুক্ষণই বলিয়া থাকেন যে, মুসলমানেরা যখন দেশের রাজা ছিল, তখন তারা হিন্দুদের প্রতি অকথ্য অত্যাচার করিয়াছিল। এইরূপে উঁহারা হিন্দুদের চিত্তে একটি গূঢ় বিদ্বেষের বীজ বপন করিয়া দিতেছেন। আধুনিক ইংরাজীশিক্ষিত যুবকদের হৃদয়ে মুসলমানদিগের প্রতি যতটা বিদ্বেষ দেখা যায়, পূর্ব্বকালের পারস্য ভাষায় সুশিক্ষিত সদাচারসম্পন্ন সদ্‌ব্রাহ্মণদিগের মনে তাহার অর্দ্ধাংশও দেখা যাইত না। * * হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঝগড়া বাধাইয়া রাখিবার জন্য ইংরাজ আর একটি উপায় অবলম্বন করেন। * * পৃথিবীতে যত বিজিগীষু জাতি প্রাদুর্ভূত হইয়া গিয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে রোমীয় জাতির রাজনীতিই সর্ব্বাপেক্ষা শিষ্টরূপে দৃঢ়সম্বদ্ধ বলিয়া ঐ সকল ইংরাজের বিশ্বাস। * * রোমীয়েরা যেমন শত্রুরাজ্যের মধ্যে

পরস্পর ভেদ জন্মাইয়া দিয়া তাহাদের সকলগুলিকেই জয় করিয়াছিলেন, সেইরূপ প্রজায় প্রজায় মনের মিল না হইতে দেওয়াই রাজ্য-শাসনের বিধি, এই সংস্কার বশত তাঁহারা যাহাতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্মিলন না হইতে পারে, তাহার জন্য যত্ন করেন। কৌশল করিয়া মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর একটু বেশী আদর করেন এবং যেমনই সেই আদরে ভুলিয়া যায়, তখনই মুসলমানের দিকে বিলক্ষণ ঝোঁক দেন। এইরূপে ঐ সকল ইংরাজের কখনও এ দিক, কখনও ওদিকে ঝোঁক দেওয়াতে হিন্দু এবং মুসলমান পরস্পর পৃথক হইয়া পড়িতে পারে। ঐ সকল ইংরাজের এই কৌশলটি যে অপরিণাম-দর্শিতার ফল, তাহা নিঃসন্দেহ। কারণ যদিও রোমীয়দিগের ঐরূপ রোমনীতি সত্য হয়, তথাপি সে রাজনীতি ফলে রোমসাম্রাজ্য চিরস্থায়ী হয় নাই। অতএব এরূপ রাজনীতি সর্ব্বতোভাবে দুষ্য। কিন্তু যতই তাহা দুষ্য হোক, ভারতবর্ষীয়দিগের সাবধান হওয়াই উচিত। * * আর একটি কথা বলা আবশ্যক, ইংরাজ ভারতবাসীর মধ্যে যদি কাহাকে অধিক অবিশ্বাস করেন, তাহা মুসলমানকে। মুসলমানের হাত হইতেই প্রধানতঃ ইংরাজ সাম্রাজ্য লইয়াছেন, এবং মুসলমানের মধ্যেই সম্মিলন-প্রবণতা অপেক্ষাকৃত অধিক আছে।"

হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরুদ্ধ সম্বন্ধ আজ কেন যে, আবার এমন করিয়া এতদিন পরে মাথা খাড়া করিয়া উঠিল, এটুকু বালকেরও বোধগম্য! সংসারে দেখা যায়, পুরাতন শত্রুরাই একদিন প্রাণতম বন্ধুত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া দাঁড়ায়, যদি তাদের উভয়কারই একইরূপ পরাভবকারী তৃতীয় পক্ষ আবির্ভূত হয়। জর্ম্মাণ-যুদ্ধে চিরশত্রু ইংরাজ-ফরাসী তাদের বিসম্বাদ বিস্মৃত হইয়া এইরূপেই পরস্পরাশ্রয়ী বন্ধুত্ববন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিল, তাহা সকলেরই সুবিদিত! এদেশে হিন্দুমুসলমানেরও আজ সেই অবস্থা। তাদেরও মাথার উপর সেই তৃতীয় পক্ষের কর্তৃত্ব।

অত্যন্ত আধুনিক কেহ কেহ মনে করেন, হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলন—বৈবাহিক সম্বন্ধে পরস্পরকে সম্বদ্ধ করিতে না পারিলে কখনই হইতে পারে না। এ যুক্তি সারবান মনে হয় না। ভারতের লোকসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশের অধিক মুসলমান, প্রত্যেক হিন্দু প্রত্যেক মুসলমানকে বিবাহ করিলেও হিন্দুর সংখ্যা বেশী থাকে। য়ুরোপে জাতিভেদ এ ভাবে না থাকিলেও অন্য মূর্ত্তিতে খুব প্রবলভাবেই বর্ত্তমান আছে। সেখানে বর্ণভেদ খুব সুদৃঢ়রূপেই প্রচলিত, কিন্তু সমস্ত য়ুরোপীয়ের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধের আদানপ্রদানে সেখানে বাধা নাই। ইংরাজ, ফরাসী ও জার্ম্মাণ সকলেই বৈবাহিক সম্পর্কে মিলিত হইতে পারে এবং হয়-ও। শত্রুতার তো এদের মধ্যে অন্তও নাই। মানুষের কথা ছাড়িয়া দিই, একত্র উচ্ছিষ্টভোজী কুকুর-বিড়ালদের জাতিভেদ নাই, তাদের মধ্যেও ঝগড়া কিছু কম কি? বিবাহ-সম্বন্ধে হিন্দুর বিচার অত্যন্ত সূক্ষ্ম। ব্রাহ্মণের মধ্যেও বহুতর শ্রেণীবিভাগ আছে, ব্রাহ্মণের মধ্যেও সবার সঙ্গেই সবার বিবাহ দেওয়া চলে না। হিন্দু-মুসলমানেই যে শুধু বৈবাহিক সম্বন্ধ বাধিত রহিয়াছে এবং হিন্দুসমাজ যে শুধু মুসলমানকে ঘৃণা করিয়াই এ বিষয়ে বঞ্চনা করিতেছে, এ কথা সত্য নহে।

হিন্দু-মুসলমানে বৈবাহিক আদানপ্রদান ব্যতীত অনায়াসেই মিলিতে পারে এবং মিলিতেও ছিল, এ আমার ছোটবেলা হইতেই আমাদের পরিবারে দেখিয়া আসিয়াছি। আমার পিতামহ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অনেকানেক সদ্‌গুণরাশিতে যে বিভূষিত ছিলেন, তাঁহাকে যাঁরা জানেন, যাঁরা তাঁর জীবন-চরিত পড়িবেন, তাঁরাই তাহা দেখিতে পাইবেন। আহারাদিতে তিনি হিন্দুর নিয়ম-সংযম মানিতেন, কিন্তু তাঁর এবং আমার পিতৃদেবের মুসলমান-বন্ধুর সংখ্যা হিন্দু-বন্ধুর সংখ্যার চাইতে একটুও কম ছিল না। তাঁদের কেহ আমাদের জ্যেঠা, কেহ খুড়া, ভাইবোন সম্পর্কে মধুরতররূপে সম্পর্কিত ছিল। আমার ৺পিতৃদেবের অভিন্নহৃদয় বন্ধু ৺মৌলভী সখাওয়াৎ হোসেনের পত্নী মাননীয়া শ্রীমতী রুকেয়া হোসেনা কলিকাতার সখাওয়াৎ হোসেন মেমোরিয়েল বালিকা বিদ্যালয় পরিচালনা করিতেছেন, তিনি আমাদের স্নেহময়ী জ্যেঠাই-মা। আমাদের পরিবারে এইরূপ মুসলমান আত্মীয়গণ প্রয়োজনানুসারে দু-এক মাস করিয়া আসিয়া আমাদের গৃহে অতিথিস্বরূপে বসবাস করিয়া গিয়াছেন। আমাদের প্রতিবেশী হিন্দু-মুসলমান উভয়েই তাঁদের সুখদুঃখে সাহায্য ও সহানুভূতি সমানই লাভ করিয়াছেন। মুসলমান বলিয়া কখনও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। প্রকৃত মিলন মনের মিলন, সহানুভূতির মিলন। বাহির হইতে ভিন্ন সমাজ, বিভিন্নাচার ভিন্নধর্ম্মী নরনারীকে কৃত্রিম উপায়ে সম্মিলিত করিতে চাহিলেই জাতীয় সম্মিলন ঘটিতে পারিবে না, বরং বিপরীত হইয়া উঠিবে। দু'চারটি বা দু'একটি ভালবাসার বিবাহ দ্বারাও কোটি কোটির সম্মিলন সম্ভাব্য নহে, তার চেয়ে হিন্দু-মুসলমানের পরস্পরের প্রতি প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব পরিহারপূর্ব্বক অকৃত্রিম সহানুভূতিপূর্ণ সমসুখ-দুঃখভাগী দেশমাতার দুটি স্নেহশীল সন্তান, দুইটি ভাই বলিয়া নিজেদের অনুভব করিতে পারিলেই উভয়ের মধ্যে মিলন-সেতু রচিত হইবে।

সে যাহা হউক, হিন্দু-মুসলমানের স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন লইয়া যে তীব্র মনোমালিন্য উভয় পক্ষেই চলিতেছে, এর মীমাংসা আজ না করিলে নয়। যত শীঘ্র সম্ভব, এর সহজ মীমাংসা করিতেই হইবে। ঘরে যখন আমাদের আগুন লাগিয়াছে, তখন আমরা সে অগ্নি না নিবাইয়া ভবিষ্যতের লঙ্কাভাগে কার ভাগে কতখানি মিষ্টান্ন পরিবেষিত হইবে, তাই লইয়া পরস্পরকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইতেছি, এর মত আর লজ্জার কথা—ঘৃণার কথা কি যে আছে, ভাবিয়া পাই না। স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনে লাভ কাহার? ইহাতে সম্পূর্ণ লাভ হিন্দু-মুসলমানের নহে, অন্যের। এইটুকু আমরা বুঝিয়া দেখিতে চেষ্টা করিলেই বুঝিতে পারা আমাদের পক্ষে সহজ হইয়া যায়। মিশ্র-নির্ব্বাচনে উভয় দল মিলিত হইলেই আমাদের দেশে আমরা প্রবলতর হইব, আমাদের উভয়কেই যে শক্তি তার পদানত রাখিতে চায়, আমাদের এই মনোমালিন্যের স্বাতন্ত্র্যের সুযোগে তারাই যে প্রধানতঃ নিজেদের সবল করিয়া লইতেছে, এ আমরা বুঝিতে চাহি না বলিয়াই শুধু বুঝিতে পারি না, নতুবা এর মধ্যে কোথাও একটুও আবরণ নাই। স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের সুযোগে উভয় দলের বহির্ভূত সরকারী দল যখন যাহাকে খর্ব্ব করার প্রয়োজন, তার বিপক্ষে স্বপক্ষে অন্য পক্ষকে টানিয়া লইয়া অনায়াসেই কার্য্যসিদ্ধি করিতে পারিবার জন্যই এই ভেদনীতির প্রচারকার্য্য সেই 'ফুলারি যুগ' হইতেই প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। এরই জন্যই 'সোরাণী-দোরাণী'র অভিনয়; এর জন্যই যত কিছু ছলাকলা। আসলে—হে আমার হিন্দু-মুসলমান ভাইয়েরা! কেহই তাঁদের প্রিয় নহেন, প্রিয়াও নহেন। ইহা কোনমতে হইতেই পারে না। যেহেতু এদেশে হিন্দুর যেমন, মুসলমানেরও তেমনই একই স্বার্থ, দেশের স্বাধীনতায় যেমন হিন্দুর, তেমনই মুসলমানেরও স্বাধীনতা, উন্নতিতে উন্নতি, পতনে অধঃপতন। দেশ যদি পূর্ণ স্বরাজ লাভ করে, শিক্ষাকে সর্ব্বপ্রথম সার্ব্বজনীন করিয়া তুলিতে হইবে, সে যেমন হিন্দুর ছেলেমেয়ের জন্য, তেমনই মুসলমান ছেলেমেয়ের জন্যও। তখন আর শিক্ষিত অশিক্ষিতের যে বাধা আজ মিশ্র নির্ব্বাচনকে মুসলমানের দৃষ্টিতে সন্দেহ-দুর্ব্বল করিয়া রাখিয়াছে, তাহা বর্ত্তমান থাকিবে না। হিন্দুর মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা অধিকতর, এ বাধা বিদূরিত হইয়া যাইবে, উভয়েই বাধ্যতামূলক শিক্ষা পাইয়া। শিক্ষার স্বাদ—সুযোগ লাভ করিতে পারিলে উভয় সম্প্রদায়ের লোকই উত্তরোত্তর শিক্ষিত হইতে থাকিবে। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-বিষ-বিমুক্ত হইতে পারিলে যোগ্যতরের নির্ব্বাচনে কোনই সংশয় থাকিবে না। সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা পরিহার করিতে পারিলে রাজনীতি বা শিক্ষানীতি-ক্ষেত্রে, মহীউদ্দীনে বা মহেন্দ্রনাথে প্রভেদ কেন থাকিবে? পরস্পরের স্বার্থকে জাতীয় স্বার্থে যদি পরিণত করা যায়, তবে হিন্দু কেন এক জন উদারচেতা মুসলমানকে ভোট দিবেন না? মুসলমানেরই বা সহানুভূতি-সম্পন্ন বান্ধবতুল্য স্নেহশীল হিন্দু প্রতিবেশীকে ভোট দিবার পক্ষে বাধা কিসের? কর্ম্ম যখন নিষ্কাম হয়, সেবা যখন আত্মসুখ-সম্পাদন-বিরত হইয়া পরের প্রতি প্রযুক্ত হয়, ক্ষুদ্র স্বার্থ যখন বৃহত্তর—মহত্তর হইয়াই উঠে, পরিবার যখন সম্প্রদায়ে, সম্প্রদায় যখন জাতীয়তায় পর্য্যবসিত হয়, মানুষের মন তখন তার ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী হইতে বিমুক্তি লাভ করে, আত্মসুখ পরসুখে, একের স্বার্থ অনেকের স্বার্থের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া বিশালতা লাভ করে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী যেমন এক পারাবারে মিলিত হইয়া নিজেদের সমুদয় স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন করে, বহুধা এক হয়, তেমনই হে আমার স্বদেশবাসী হিন্দু-মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ! তোমরাও তোমাদের সমুদয় সঙ্কীর্ণ স্বার্থকে স্বদেশপ্রেমের একার্ণবে নিমগ্ন করিয়া একচিত্ত, একমনপ্রাণ হও, হীন স্বার্থ, তুচ্ছ মোহ, ক্ষুদ্রতম সাংসারিক আচার-ভেদকে তোমাদের অন্তরের মনুষ্যত্বের বিকাশ-পথের অন্তরায় করিয়া তুলিও না। তোমাদের জাতীয় স্বার্থকে ভবিষ্যতের সুখশান্তি সম্মিলনকে বর্ত্তমানের হীনাদপি হীন, তুচ্ছাদপিতুচ্ছ ক্ষুদ্র স্বার্থের চরণে উৎসৃষ্ট করিও না। এ সুযোগ—এ সুদিন যদি একবার ব্যর্থ হয়, আর সহজে ফিরিবে না। বড় সুসময় আসিয়াছে, এ সুযোগ বারবার আসে না, "প্রত্যায়াস্তিগতাঃ পুনর্নদিবসাঃ"—তবে আজ এস হিন্দু! এস মুসলমান! পাশাপাশি দাঁড়াও, হাতে হাতে ধরো, সমকণ্ঠে আজ তোমাদের দুজনকার মায়ের, তোমাদের সকলকার মায়ের জয়ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া সরল পথে তোমাদের জয়যাত্রা সুরু করো। সমবেত-কণ্ঠে বল—সনাতন হিন্দুধর্ম্মের জয় নয়, পুরাতন ইসলাম ধর্ম্মের জয় নয়, বল, জয় ভারতের, জয় ভারতবাসীর,—বন্দে মাতরম্! বন্দে ভারতম্! *

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

---

* এই প্রবন্ধটি বগুড়া মোসলেম রাষ্ট্রীয় কনফারেন্সে নিমন্ত্রিত হওয়ায় লিখিত হয়। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, কনফারেন্সে জাতীয়তাবাদী মুসলমান ও উহার বিরোধী মুসলমান ভ্রাতৃগণের মধ্যে মতভেদ জন্য গোলযোগ হওয়াতে ইহা সেখানে পঠিত হইতে পারে নাই। পরে 'নওগাঁ' (রাজসাহী)র কয়েক জন মুসলমান ভ্রাতার সহিত কথাবার্ত্তায়, তাঁদের মধ্যে এক জন অনুযোগ করিয়া বলেন, "আপনি আমাদের কথা কিছুই বলেন না কেন? আপনি যেমন হিন্দুকে তেমনই মুসলমানকেও কর্ত্তব্যে প্ররোচিত করুন।" তাই সঙ্গতবোধে প্রবন্ধটি ছাপিতে দিলাম।—লেখিকা।

নারীর অভিনব ব্যায়াম-পদ্ধতি

মার্কিণ নারীরা, শুধু মার্কিণ কেন, য়ুরোপীয় নারী-সমাজ ভোগ-বিলাস, ক্রীড়া, ব্যায়াম, সকল প্রকার বস্তুতান্ত্রিক ব্যাপারেই চরম লীলা করিবার জন্য সর্ব্বদাই উন্মুখ। জলবিহারের নানাবিধ নব নব উপায় অবলম্বিত হওয়া সত্ত্বেও প্রগতিবাদিনী, বস্তুতন্ত্রের উপাসিকা প্রতীচ্য নারীরা কিছুতেই তৃপ্তি পাইতেছেন না। তাই জলক্রীড়ার নূতন ব্যবস্থা হইয়াছে। যুগ্ম ভাসমান নৌকার আকারবিশিষ্ট বস্তুর উপর পাটাতন নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে রেলিং বসান হইয়াছে। কটিদেশ পর্য্যন্ত উচ্চ রেলিংএ দাঁড় বাঁধিয়া অর্দ্ধনগ্ন-বেশে কালিফোর্ণিয়ার তরুণীরা সমুদ্রবক্ষে

অভিনব জলক্রীড়া

জলক্রীড়া করিয়া থাকেন। তরুণীদিগকে দণ্ডায়মান অবস্থায় দাঁড় টানিতে হইয়া থাকে।

শুকপক্ষীর কথা শিক্ষার নূতন ব্যবস্থা

লস্ এঞ্জেলেসের পশুশালায় শুকপক্ষীর শিক্ষার অভিনব ব্যবস্থা হইয়াছে। ফনোগ্রাফ যন্ত্রের সাহায্যে তাহাদিগকে পাঠ শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। জনৈক অভিজ্ঞ শিক্ষক প্রতিদিন পশুশালার নিভৃত অংশে একটি প্রকাণ্ড খাঁচার মধ্যে চারি পাঁচটি শুক-পক্ষীকে লইয়া যান। তথায় একটি ফনোগ্রাফ যন্ত্র সন্নিবিষ্ট থাকে। পাখীগুলি উক্ত যন্ত্রের সম্মুখে অবস্থিত একটি দাঁড়ে বসিয়া থাকে। ফনোগ্রাফ যন্ত্র হইতে সমুত্থিত পরিচিত কথাগুলি শুনিতে শুনিতে প্রত্যেক পক্ষীই ক্রমে তাহা অনুকরণ করিতে থাকে। এইরূপে তাহারা নানা কথা বলিতে শিখিতেছে।

শুকপক্ষীর বিচিত্র শিক্ষা-ব্যবস্থা।

নিরাপদ সন্তরণের পদ্ধতি

জলস্থিচক্রযান ভাসমান ভেলার উপর সন্নিবিষ্ট করিয়া জল কাটিবার যন্ত্রকে পদ দ্বারা তাড়িত করিলে যে কোনও শিক্ষানবিশ

নিরাপদ সন্তরণ-পদ্ধতি

উৎকৃষ্ট সন্তরণকারী অপেক্ষা দ্রুতবেগে জলের উপর দিয়া ভাসিয়া যাইতে পারে। এই শ্রেণীর সাঁতারযন্ত্র শিক্ষার্থীর পক্ষে

যেমন নিরাপদ,তেমনই স্থিতিশীল। শিক্ষার্থী উহার সাহায্যে জলের উপর পরম নির্ভয়ে বিশ্রাম করিতে পারে। উহা উল্টাইয়া যাইবার বা শিক্ষার্থীর জলে ডুবিবার কোনও আশঙ্কা ইহাতে থাকে না। উপুড় হইয়া শিক্ষার্থীকে থাকিতে হয়। সন্তরণ কার্য্য শেষ হইলে, একটা শলাকা অপসৃত হইলেই উহাকে অনায়াসে গৃহে বহন করিয়া লওয়া যায়।

হস্তনির্ম্মিত বাতি

হস্তনির্ম্মিত বাতি

বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক যুগে প্রতীচ্য দেশে হস্ত-নির্ম্মিত বাতি চলিতেছে, ইহা বিস্ময়কর বলিয়া অনুমিত হইবে। কিন্তু ইহা আজগুবি গল্প নহে। লস্ এঞ্জেলেসের পুরাতন স্পেন পল্লীতে জোস্ হেবেবা নামক এক জন শিল্পী হাতে বাতি তৈয়ার করিয়া থাকেন। নানা আকারের শত শত বাতি তিনি প্রতিদিন নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন। মেক্সিকোর গির্জ্জা সমূহে এই শ্রেণীর বাতিই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বহু যাত্রিবহনোপযোগী বিমান

ফ্রান্সে একপ্রকার অতিকায় বিমান নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার দুই দিকে যাত্রিবহনের কামরা আছে। প্রত্যেক কামরার নিম্নভাগে ভূমিতলে অবস্থিতির চক্রও আছে।
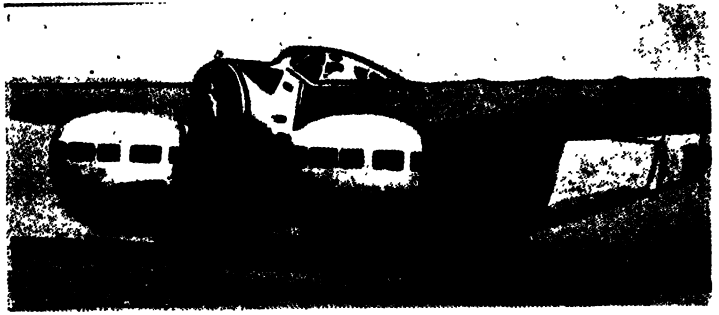
বহু যাত্রিবহনোপযোগী বিমান

পোত-চালকের কক্ষ বিমানের উপরিভাগে অবস্থিত। এই বিমানে বহু যাত্রী ও বহু মাল লইবার ব্যবস্থা আছে।

ক্ষেত্ররক্ষার বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা

পোর্টল্যাণ্ড ওর নামক স্থানের কোনও ক্ষেত্রস্বামী তাঁহার ক্ষেত্র-মধ্যে একটি মনুষ্যমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাহার বক্ষোদেশে একটি লাউড-স্পীকার যন্ত্র সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। মূর্ত্তিটির গায় কোট পরান থাকে। সুতরাং উক্ত যন্ত্রটি দৃষ্টিগোচর হয় না। ক্ষেত্র-স্বামীর গৃহে রেডিও যন্ত্র আছে। মূর্ত্তির সহিত রেডিও যন্ত্রের ব্যবস্থাও তিনি করিয়াছেন। সময়ে সময়ে লাউড-স্পীকার হইতে গম্ভীর নির্ঘোষে শব্দ নির্গত হইলেই বায়সসমূহ ক্ষেত্র হইতে দূরে পলায়ন করে। ক্ষেত্রের ফল-মূল শস্য প্রভৃতি ইহাতে নষ্ট হয় না।

ক্ষেত্ররক্ষার বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা

খাড়া রেলপথ

খাড়া রেলপথ

একটা বিরাট আরোহণী সোজা ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিলে যে দৃশ্য নয়নপথে পতিত হয়, "রয়াল জর্জ্জ অফ কোলোরাডো" নামক পর্ব্বত খাদবাহী রেলপথটি ঠিক তেমনই দেখিতে। এইরূপ খাড়া ভাবের রেলপথ আর কোথাও নাই। এই পথটি ১ হাজার ৭ শত ২৫ ফুট দীর্ঘ। এই পথ দিয়া রেলগাড়ী অবলীলাক্রমে নামিয়া আইসে। গাড়ীগুলিতে ব্রেক কষিবার নূতন বন্দোবস্ত আছে, তাহারই ফলে গাড়ীর গতিবেগ নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। এঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যার বিচিত্র কৌশল ইহাতে পরিলক্ষিত হইবে।

অতিকায় করাতী মাছ

অতিকায় করাতী মাছ

মিঃ এফ, এ, মিচেল হেজেস্ নামক জনৈক আবিষ্কারক প্যানামার তীরে জলপথে ভ্রমণকালে একটি অতিকায় করাতী মৎস্য কৌশলে শিকার করেন। মৎস্য-রাক্ষস ধরা পড়িয়াও পাঁচ ঘণ্টাকাল তাঁহার প্রায় ৫ শত ৫৪ মণ ভারী পোতখানিকে জলের উপর দিয়া টানিয়া লইয়া গিয়াছিল! তার পর ক্লান্ত হইয়া সে আত্মসমর্পণ করে। মৎস্যটির ওজন প্রায় ৭০ মণ।

ষ্টেথস্কোপ সাহায্যে ঘড়ী পরীক্ষা

ষ্টেথস্কোপ সাহায্যে ঘড়ী পরীক্ষা

চিকিৎসকগণ ষ্টেথস্কোপ যন্ত্র সাহায্যে যেমন রোগীর হৃদ্‌যন্ত্রের গতিবেগ প্রভৃতির পরীক্ষা করিয়া থাকেন, অধুনা বিদ্যুৎচালিত ঘটিকাযন্ত্রের পরীক্ষাও ঐ যন্ত্র সাহায্যে সম্পাদিত হইতেছে। ইহাতে কারখানায় নির্ম্মিত সহস্র সহস্র ঘটিকাযন্ত্রের পরীক্ষাকার্য; অতি অল্পসময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয় এবং কোথায় কোন্ ত্রুটি, তাহা নির্ণীত হইতে অধিক সময় লাগে না।

বৃক্ষশীর্ষে মোটর-গাড়ী

বৃক্ষশীর্ষে মোটর-গাড়ী

আমেরিকার আটলাণ্টা নামক নগরোপকণ্ঠে কোন মোটরগাড়ী মেরামতকারী তাঁহার কারখানার সম্মুখবর্ত্তী একটি উচ্চ বৃক্ষের শীর্ষদেশে একখানি মোটরগাড়ী তুলিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার কারখানার বিজ্ঞাপনের জন্যই এইরূপ ব্যবস্থা। উক্ত ব্যবসায়ী এমন কথাও বলেন যে, যদি কাহারও মোটরগাড়ী সত্যই কোনরূপে বৃক্ষের উপর উঠিয়া যায়, তবে তিনি তাহা সহজে নামাইয়া আনিতে পারেন এবং কোনও দোষ ঘটিলে তাহাও মেরামত করিয়া নূতনের মত দাঁড় করাইবেন।

ধর্ম্মদাস

পরিচ্ছেদ—পাঁচ

চতুর্দ্দিকের বন্ধনমুক্ত হইয়া ধর্ম্মদাস চিত্তের মধ্যে কেমন যেন ভয়জড়িত একটা স্বস্তি বোধ করিল। এই ভয় মানুষের আজীবন সহচর ; ইহা অজানার ভয় !

মানুষ যদি কোনক্রমে জানিতে পারিত, মৃত্যুর পর তাহার কি হইবে, তাহা হইলে হয় ত মৃত্যুর প্রতি এমন একটা মর্ম্মান্তিক ভয় থাকিত না। তেমনই ধর্ম্মদাস যদি জানিত, তাহার জীবনে তাহার পর কি, তাহা হইলে সে হয় ত আনন্দই করিত ; কেন না, মুক্তি তাহার পক্ষে কম লোভের ছিল না।

হোষ্টেলে বন্ধুর ঘরে অতিথি হইয়া বেশী দিন থাকা চলে না ; অন্যত্র কোথাও যাওয়া একান্ত আবশ্যক। তাহার উপর আর এক চিন্তা তাহার মনকে জুড়িয়া বসিল। তাহাকে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য আর অন্য কাহারও উপর নির্ভর করা চলিবে না। পিতার সহিত যে আর কোন দিন যোগ-স্থাপন হইবে; তাহা সে কল্পনাও করিত না। এক, সে হয় ত মণিময়ের বাড়ীতে যাইতে পারিত ; কিন্তু সেখানে কেমন যেন বাধ-বাধ ঠেকে !

পিতার সহিত কলহ করিয়াছিল সত্য ; কিন্তু পিতার কোনরূপ অখ্যাতি কি গ্লানিকর কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে, ইহা সে কিছুতেই চাহিত না। মণিময়ের কাছে যাইলে আর কোন কথা গোপন করা সম্ভবপর নহে ; কিন্তু দুইটি কথা সে কিছুতেই কাহাকেও বলিবে না স্থির করিয়াছিল। তাহার মধ্যে একটি পিতার সহিত বিচ্ছেদ, তাহাতে সে জানিত, পিতারই কলঙ্ক-প্রকাশ হয়, এবং অপরটি তাহার নিজের চাকরী ছাড়ার অব্যবহিত পূর্ব্বের ঘটনা।

ধর্ম্মদাস মনে মনে বুঝিয়াছিল, ছোট-সাহেব যতই না কেন তাহার সহিত হীন ব্যবহার করিয়া থাকুক, তাহাকে ধরিয়া প্রহার করাটা কিন্তু কোনমতেই উচিত হয় নাই।

ধর্ম্মদাস নিজে নিজে বলিত, ছিঃ ! রাগই মানুষের পরম শত্রু। এমন রাগও ত কোন কালে আমার ছিল না !

খরচ কম, এবং কতক পরিমাণে অজ্ঞাতবাস করিবার জন্য ধর্ম্মদাস অচিরে এক মেসে উঠিয়া গেল। মেসের ছোট ঘরটিতে বসিয়া সে কমলার কাছে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তাহারই সাধনায় আত্ম-সমর্পণ করিল।

ধর্ম্মদাস ভাবিল, যাহা ঘটিয়া গিয়াছে, তাহার জন্য অযথা চিন্তা করিয়া কোন লাভ নাই। সকলের কিছু জমীদারী, ধন, ঐশ্বর্য্য থাকে না। এমন পৃথিবীতে অনেক হতভাগ্য পুত্র আছে, যাহারা জন্মিয়া একবারের জন্যও তাহার জনক-জননীকে দেখিতে পায় নাই ; তবুও তাহাদের বাঁচিতে হয়, বাঁচিয়া থাকিয়া জীবনের সব কর্ত্তব্যই করিতে হয়। এই পৃথিবীতে শোক আছে, দুঃখ আছে, বিপদ-আপদ আছে, ইহাদের চাপে নত হইয়া পড়িলে জীবন ব্যর্থ হইয়া যায়। শোক-দুঃখ বিপদ-আপদকে অতিক্রম করিয়া যে বীরের মত সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে, যাহার দেহ, মন, প্রাণ বড় হইবার জন্য, ভাল হইবার জন্য ঐকান্তিক ব্যাকুলতায় পূর্ণ হইয়া উঠে, তাহাকে ভগবান্ প্রসন্ন-চিত্তে সহায়তা করেন।

এমনই করিয়া ধর্ম্মদাস দৃঢ় হইয়া নিজের কর্ত্তব্যসাধনের জন্য তদ্গতচিত্ত হইয়া লাগিয়া গেল।

নূতন মেসে সে বড় কাহাকেও নিজের পরিচয় দেয় নাই ; কাহারও সহিত বড় মেশামিশিও করিত না। কেবলমাত্র একটি দুশ্চিন্তা তাহাকে মধ্যে মধ্যে অনেকটা সংক্ষুব্ধ করিয়া দিত। তাহার কাছে যে সামান্য টাকা ছিল, তাহাতে পরীক্ষা পর্য্যন্ত কিছুতেই চলিতে পারে না।

পাঠ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া সে এক দিন একটু বিশ্রামের জন্য একখানা দৈনিক কাগজ হাতে করিতেই দেখিতে পাইল, লালপুকুর হাই-স্কুলের জন্য এক জন হেড-মাষ্টার আবশ্যক।

ধর্ম্মদাসের আর ত্বরা সহে না ; সে তাড়াতাড়ি একখানা দরখাস্ত লিখিয়া, ডাকে ফেলিয়া দিয়া আসিল।

আশায় আনন্দে তাহার হৃদয়-মন পূর্ণ হইয়া উঠিল। যদি এই কাযটি সে পায় ! পাইবে কি ? মনে সন্দেহ ঘনাইয়া আসে। আবার মনে হয়, নিশ্চয়ই পাইবে। যদি না পাওয়ার হইত, তাহা হইলে কেন পত্রিকাখানি আজ তাহার হাতে আসিয়া পড়িবে ? আবার মনে হয়, হয় ত তাহার মত কত লোকের হাতে পড়িয়াছে, তাহার মত কত জন দরখাস্ত করিয়াছেন ; কিন্তু ঐ একটি কায সকলেরই হইতে পারে না।

কিছুক্ষণ এই ভাবে চিন্তা করিয়া ধর্ম্মদাস মনে মনে হাসিয়া বলিল, উঃ, আমি কি বোকা ! একখানা দরখা

জেলে

বসুমতী প্রেস] [শিল্পী—শ্রীদ্বিজেন্দ্রচন্দ্র সরখেল

…র দিয়ে ব'সে ব'সে ভাবছি, আমার ওটা হবে! আমার …য়ে কত পাকা লোক হয় ত চেষ্টা করবেন, আমার মত …বয়সের ছোকরার কি হেড মাষ্টারী জোটে?

অবশেষে সে বলিল, কিন্তু আমারও ত একটা হওয়া চাই; …লে চলবে কেমন ক'রে—চেষ্টা করতে হবে। আচ্ছা! এই …কম সাতখানা দরখাস্ত ক'রে দিয়ে, চুপটি ক'রে বসবো আর …লবো ভগবান্‌কে, যদি আমাকে এমনই ক'রেই মুস্কিলে …লা তোমার ইচ্ছা হয়——হউক পূর্ণ তোমার ইচ্ছা!

করুণাময় স্বামীর করুণায় সাতখানি দরখাস্ত করিবার পূর্ব্বেই লালপুকুর হইতে পত্র আসিল। কিছু দিন হইতে এই পদ খালি থাকাতে স্কুলের কাযের বড় ক্ষতি হইতেছে, আপনি যত শীঘ্র পারেন আসিয়া কার্য্যে যোগ দিবেন। কি নাগাদ আসিতে পারিবেন, জানিতে পারিলে বিশেষ সুখী হইব।

চিঠিখানা পড়িতে পড়িতে ধর্ম্মদাসের হাত কাঁপিতে লাগিল। সে মাদুরের উপর শুইয়া পড়িয়া বলিল, উঃ, বাঁচা গেল! বাবা! মনে করেছিলাম, শেষ পর্য্যন্ত না—বাকি কথাগুলি উচ্চারণ করিতে তাহার লজ্জা হইল।

সেই রাত্রিতে শুইবার আগে ধর্ম্মদাস এই দীর্ঘ পত্রখানি লিখিল—

কল্যাণীয়াসু,

এই চিঠিখানি তোমাকে দিচ্ছি; অবশ্য দেওয়া উচিত ছিল বাবাকে তোমার। কিন্তু তাঁকে চিঠি দিতে আমার সাহসে কুলায় না; দেখা করা ত দূরের কথা।

অল্পদিনের মধ্যে আমার অবস্থার বহু পরিবর্ত্তন ঘটেছে; তোমরা শুন্‌লে অবাক্ হয়ে যাবে। আমি চাকরীতে ইস্তফা …য়েছি কি তারাই আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে, তা এখনও ঠিক বলতে পারিনে। গেজেট হ'লে লোকে জান্‌তে পারবে; আমি আর কি ক'রে জান্‌ব? গেজেট নিওনে—পড়িওনে।

তুমি জিজ্ঞাসা করবে, কেন ইস্তফা দিলে, তার উত্তরে যদি বলি যে, দেওয়া একান্ত দরকার হয়েছিল, তাতে তুমি হয় ত বুঝতে পার; কিন্তু ও কথায় তোমার বাবা কি আমার বাবা—কাউকেই নিরস্ত করা যাবে না। অন্ততঃ আমার বাবাকে ত যায়নি। তিনি কি ক'রে জানিনে, খবর পেয়ে সটান কলকাতায় এসে উপস্থিত। আমি তার আগের দিন এসে হোষ্টেলে উঠেছি। যদি অন্য কোথাও উঠতাম ত দেখাই হ'তো না।

দেখার পর যা হয়েছে, তার সংক্ষেপ এই যে, তিনি বোধ হয় এ জীবনে আর আমার মুখদর্শন করবেন না। আর আমিও বোধ হয় আর ফেরবার চেষ্টা করব না; করলে ওঁদের খুব ক্ষতি হবে নিশ্চয়।

আজ মাসখানেক হ'লো ফিরেছি। তোমাদের বাড়ী যাইনি—ভয়ে। এক মাস ধ'রে খুব এগিয়ে চলেছি পড়ার দিকে। যদি এমনই যেতে পারি, তা হলে হয় ত বা কথা রাখতে পারব, নৈলে অন্য পথ ত খোলা আছে। লোটা-কম্বল জোটান মুস্কিল নয়।

কাল কলকেতা থেকে রওনা হচ্ছি। খুব দূরে এক যায়গায় একটা চাক্‌রী পেয়েছি। যদি সেখানে মন বসে, কি তাদের আমাকে পছন্দ হয় ত তোমাকে জানাব। এখন আমি কাউকেই জান্‌তে দিতে চাইনে যে, কি করছি, কোথায় আছি। মে মাসের মাঝামাঝি থেকে, পুরো জুন আমাকে কলকেতায় থাকতেই হবে। তারই অর্থ সঞ্চয় করতে যাওয়া। সেই সময় পরীক্ষা দেওয়ার ইচ্ছা আছে।

তোমাকে আমি কোন নিষেধের বন্ধনের মধ্যে আবদ্ধ করতে চাইনে। যদি ইচ্ছা হয়, সব কথা তোমার বাবাকে ব'লো।

আমার শরীর ভাল আছে। আমার প্রণাম গুরুজনদের, —আর সস্নেহ ভালবাসা তোমার।

ইতি—তোমার নতুনদা।

চিঠিখানি যখন কমলার হাতে পৌঁছিল, তখন ধর্ম্মদাস কলিকাতা ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। চিঠি লইয়া সে মহা বিপদে পড়িল। বাবাকে দেখাইবে কি না? তাহার দিক দিয়া কোনই আপত্তি ছিল না; কিন্তু ধর্ম্মদাস যদি কিছু মনে করে।

বহু চিন্তার পর, অবশেষে পত্রখানি কমলা মণিময়ের টেবলের উপর রাখিয়া সে দিন সকালে উৎকর্ণ হইয়া রহিল, কখন্ বাবা ডাকেন।

বাবা পত্রখানি পড়িলেন, কিন্তু কমলাকে ডাকিলেন না।

পরিচ্ছেদ—ছয়

ধর্ম্মদাসের সংবাদ সংগ্রহ করা মণিময়ের দিক হইতে একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। কেন না, তিনি ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছিলেন যে, কমলার মনে কোন সুখ ছিল না, …ং দিনের পর দিন সে কৃশ হইয়া যাইতেছিল।

ধর্ম্মদাস যে কোথায় কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহা আবিষ্কার করা প্রায় অসম্ভব ; সে ইচ্ছা করিলে, পত্রে তাহা লিখিতে পারিত ; এবং সেই ইচ্ছা ছিল না বলিয়াই তাহা সে জানায় নাই।

তবে তাহার উপর মণিময়ের অগাধ বিশ্বাস ছিল। সে কোন অন্যায় কায করিতে পারে না। পিতার সহিত যে বনিল না, তাহা কেবলমাত্র অদৃষ্ট। শক্তি-প্রকাশের অব্যবস্থিতচিত্ততার পরিচয় মণিময় পাইয়াছিলেন। মানুষের সহিত মানুষের মতান্তর হওয়া ত খুবই সহজ এবং সাধারণ ব্যাপার ; কিন্তু সেই কারণে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ করিয়া বসিবার প্রয়োজন মণিময় কোন দিন সমর্থন করেন নাই।

ধর্ম্মদাসের পাঠ্যাবস্থায় তাহাকে চাকরীতে প্রবেশ করাইবার কিই বা প্রয়োজন ছিল ; এবং সেই চাকরী যদি সে না করিতে পারে ত পুত্রকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করারই বা কোথায় আবশ্যকতা ?

কিন্তু এ কথা মণিময় বুঝিতেন যে, দুই পক্ষের সকল কথা না জানিয়া কাহারও বিষয়ে বিচার করিলে অবিচারেরই সম্ভাবনা। তাই তিনি এক দিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া হাঁসচাকি রওনা হইলেন।

শক্তিপ্রকাশ কি মনের অবস্থায় দিনযাপন করিতেছিলেন, তাহা মণিময় জানিতেন না ; তাই সহসা তাঁহার বাড়ীতে গিয়া উঠিতে তাঁহার মন সরিল না।

মণিময়ের ভয় ছিল, উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া শক্তিপ্রকাশ এমন কোন ব্যবহার করিতে পারেন, যাহা তাঁহার পক্ষে সম্মানজনক না হইতে পারে ; অধিকন্তু সেই কথা ধর্ম্মদাসের গোচর হইলে তাহার মন পিতার প্রতি আরও বিরূপ হইবে। তাই তিনি গিয়া রমেশ বাবু—স্কুলের হেডমাষ্টারের বাড়ী উঠিলেন।

রমেশ বাবু যার-পর-নাই আনন্দিত হইলেন ; কিন্তু ধর্ম্মদাস সম্পর্কে বিশেষ কোন সংবাদই দিতে পারিলেন না। বলিলেন, কর্ত্তার সঙ্গে ও প্রসঙ্গ না করাই ভাল। ধর্ম্মদাসের নাম শুনলে তিনি, শুনেছি, ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে উঠেন। বলেন, ওর সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই—আমি ওকে ত্যাগ করেছি।

বড় দুঃখেই মণিময়ের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল।

রমেশ বাবু বলিলেন, কিন্তু অবিশ্বাস করার কিছু নেই মণিময় বাবু, এত বড় সত্যনিষ্ঠ লোক আর আমি দুটো দেখিনি ; কিন্তু সেই সত্যের পিছনে যেন বজ্রাগ্নি জ্বলছে নিজে জ্ব'লে পুড়ে গেলেন ; আর যে তাঁর কাছে যাবে তাকেও সেই তেজে যেন ঝলসে দেবেন !

মণিময় বলিলেন, কিন্তু ধর্ম্মদাস কোথায় ? কি করছে কিছু কি শুনেছেন ?

লোকে বলে, রমেশ বাবু বলিলেন—সে, সে নাকি কোথায় পালিয়ে গেছে—সরকারী চাক্‌রীতে গোলমাল করেছিল—চাক্‌রী ত গেছে—গেজেটে দেখলুম্ !

মণিময় জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার কি পরামর্শ ? আমি কি শক্তিপ্রকাশ বাবুর সঙ্গে দেখা করব একবার ?

কেন দেখা করতে চান ? রমেশ বাবু প্রশ্ন করিলেন।

মণিময় কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, এ কথা ইতিপূর্ব্বে আমি কাউকে বলিনি ; কিন্তু আপনি সুবিবেচক, আপনাকে বল্‌তে আমার আপত্তি নেই। আমার একমাত্র কন্যা কমলা ধর্ম্মদাসকে ভালবাসে এবং পরস্পরের মনের ভাব যতদূর আমি অবগত আছি, তাদের বিয়ে হ'লে তারা জীবনে সুখী হ'তে পারে।

আমি কিছু অর্থও সংগ্রহ করেছি,—মণিময় বলিতে লাগিলেন, আমার ইচ্ছা, বিবাহের পর ধর্ম্মদাসকে বিলাত পাঠাই। এই শুভকর্ম্মে তাহার পিতার আশীর্ব্বাদ যদি যুক্ত হয় ত বড় ভাল হয় না, রমেশ বাবু ?

একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া রমেশ বাবু বলিলেন, নিঃসন্দেহ ; কিন্তু তা প্রায় অসম্ভব। ধর্ম্মদাসের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেই শক্তিপ্রকাশ বাবু আপনার সঙ্গে হয়ত দুর্ব্ব্যবহার করবেন বলেই ত মনে করি।

মণিময় রমেশ বাবুর সহিত আর অধিক কথাবার্ত্তা কহিলেন না। তাঁহার মনে হইল, একবার নিজে গিয়া দেখিয়া আসাই ভাল।

বৈকালে কাহাকেও সঙ্গে না করিয়া মণিময় গিয়া শক্তিপ্রকাশ বাবুর বাড়ী উঠিলেন।

কর্ত্তা বাহিরের বারান্দায় বসিয়া জমীদারীর কাগজপত্র দেখিতেছিলেন। মণিময়কে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, নমস্কার, কবে এলেন ?

আজই এসেছি।

কৈ, এখানে উঠেন নি যে ?

মণিময় একটু অপ্রস্তুত হইলেন ; কিন্তু পরক্ষণে

সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, যে কাযের জন্য এসেছি, তাতে রমেশ বাবুর বাড়ীতে উঠলেই সুবিধে হয়,—আপনি আমাকে মার্জ্জনা করবেন।

উভয়ে বসিলেন। তাহার পর দুই পক্ষই স্তব্ধ।

মণিময় বুঝিলেন যে, তাঁহার পক্ষে স্তব্ধতা মোটেই শোভন হয় না, তাই বলিলেন, শরীর আপনার কেমন থাকছে?

আর শরীর!—এখন গেলেই সব দিকে মঙ্গল; আমার বেঁচে থাকা একটা বিড়ম্বনামাত্র।

আবার স্তব্ধতা।

মণিময়ের মুখ হইতে হঠাৎ কেমন বাহির হইয়া পড়িল, —মেয়েটি আমার বড় হয়েছে, একটি পাত্র অনুসন্ধান করতে এসেছি।

এই কথা বলিয়াই তিনি কিন্তু ভারী অপ্রস্তুত বোধ করিলেন।

শক্তিপ্রকাশ এক টুকরা কাগজের দিকে নিজের দুই চক্ষু নিবদ্ধ করিয়া বলিলেন, কেন? ধর্ম্মদাসের সঙ্গে বিয়ে দিতে আপনার কোন আপত্তি আছে না কি?

মণিময় বলিলেন, কিন্তু ধর্ম্মদাসকে পাই কি ক'রে?

শক্তিপ্রকাশ মণিময়ের মুখের প্রতি দৃঢ় দৃষ্টি সংলগ্ন করিয়া বলিলেন, ধর্ম্মদাসের সঙ্গে আমার আর কোন সম্পর্ক নেই; আমি তাকে ত্যাগ করেছি, চিরদিনের জন্য—চির-দিনের জন্য—চিরদিনের জন্য—

শক্তিপ্রকাশের কণ্ঠে যেন বজ্র-নিনাদ এবং দুই চক্ষু দিয়া ক্ষিপ্ততার জ্বালা বাহির হইতে লাগিল। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ থর-থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

মণিময় বুঝিলেন, শক্তিপ্রকাশ ভীষণ অসুস্থ হইয়াছেন। তাঁহাকে না ধরিলে পড়িয়া যাইবেন। তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া ধরিতেই সেই চেয়ারের উপর শক্তিপ্রকাশ শুইয়া পড়িয়া সংজ্ঞাহীন হইলেন।

কানাই ছুটিয়া আসিয়া মাথায় বরফের ব্যাগ দিল, এবং মণিময়ের কাণে কাণে বলিল, আপনাকে দেখেই হয়েছে; বাবুর এ সন্ন্যাস-রোগ। আপনি এখানে থাকবেন না, বাবু—

কানাইএর দুই চক্ষু কাকুতিতে পূর্ণ।

মণিময় দ্রুতপদে বাড়ীর বাহির হইয়া গেলেন।

—

পরিচ্ছেদ—সাত

ধর্ম্মদাস নিজের নূতন কর্ত্তব্যের মধ্যে যেন তাহার অভিনব দুঃখের সান্ত্বনা খুঁজিয়া পাইবার চেষ্টা করিতেছিল। অকা-রণে পিতৃ-বিচ্ছেদ তাহাকে তীব্র অশান্তির মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিল; কিন্তু এ কথা প্রকাশ করিবার নহে। যাহাদের নিকট এ কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিত, তাহারা কেহই নিকটে নাই। তাই সে দিবসে নিজের শিক্ষকতার কাযে এবং স্কুল হইতে অবসর পাইলে পরীক্ষার পড়ায় এমন অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়িত যে, আশ-পাশের সক-লের তাহার সম্পর্কে আর বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা ছিল না।

তাহার মনে হইত, একটিও বেশী কথা কহিয়া তাহার সময় ও শক্তির অপব্যয় করিবার অধিকার যেন তাহার নাই। কমলার কাছে যে সত্যে সে আবদ্ধ ছিল, তাহা হইতে চ্যুত হইলে ধর্ম্মত সে আর কমলাকে লাভ করিতে পারে না। কিন্তু কমলাকে না পাওয়া, সেই ত জীবনে তাহার পূর্ণ অভিশাপ!

পিতার আশীর্ব্বাদ হইতে সকল দিক দিয়া বঞ্চিত হওয়ার মধ্যে তাহার হাত সম্পূর্ণ ছিল না; যেন পশ্চাৎ হইতে কোন এক অদৃশ্য শক্তি তাহার ভাগ্য এবং ভবিষ্যৎকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া চলিতেছিল।

ক্ষুদ্র উত্তেজনার বশে গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়ার মধ্যে যত না জেদ ছিল, তাহার অধিক ছিল, চিত্তের উদ্-ভ্রান্ততা। বন্ধু-বিয়োগের আকস্মিক আঘাত যেন তাহাকে নিমেষের মধ্যে কোথায় উড়াইয়া লইয়া গেল! কিন্তু সে দিনের উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য কি সে পিতার চরণে বার বার ভিক্ষা চাহিয়া বলে নাই, আমায় মার্জ্জনা কর, আমায় মার্জ্জনা কর? এ কথা হয় ত সে সকল সময়ে প্রকাশ করিয়া বলিতে পারে নাই; কিন্তু যিনি এই বিশ্ব-সংসারের ঈশ্বর, তাঁহার কাছে ত কিছুই অবিদিত থাকে না! কৈ, তিনিও ত মার্জ্জনা করিলেন না? পিতার মন ত বজ্রের মতই কঠিন রহিয়া গেল।

সে রাত্রিতে পড়া শেষ করিয়া ধর্ম্মদাস আলো নিভাইয়া দিয়া নিজের ভাগ্যের কথা নিভৃত-একান্তে এমনই করিয়া ভাবিয়া লইতেছিল। সে মনে মনে বলিল, পিতা আমাকে বিষয় হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন বলিয়াই কি এই অনুতাপ? উঠিয়া বসিয়া ধর্ম্মদাস শান্ত হইয়া ভাবিয়া আত্মগতভাবে

বলিল, বোধ হয়, তা নয়! পিতার অর্থের উপর সত্যিই ত আমার লোভ নেই!—তবে কিসের জন্যে এই অনুতাপ? সে নিজেকে অতি কঠিন করিয়াই প্রশ্ন করিল,—সমস্ত মনের মধ্যে ভাল করিয়া খুঁজিয়া দেখিল; কিন্তু কোন উত্তরই নাই। একটা প্রকাণ্ড পাথর যেন বুকের মধ্যে চাপিয়া বসিয়া আছে!

পিতার তুষ্টির জন্য নিজের আত্ম-মর্য্যাদাকে জলাঞ্জলি দিতে হইবে? ক্ষতি কি? কি করিয়াছিলেন রামচন্দ্র? চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনে যাইবার আদেশ দশরথের মনের ঐকান্তিক ইচ্ছাপ্রসূত নহে, তাহা রামচন্দ্র জানিতেন; কিন্তু পিতার আদেশ পুত্রের শিরোধার্য্য, তাহাকে বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার অধিকার কি পুত্রের থাকে?

ধর্ম্মদাসের যুক্তি বলে, কেন থাকে না? কিন্তু চিত্ত বলে, বোধ হয় থাকে না; পিতা, পিতা! পুত্রের ক্ষুদ্র বিচার-বুদ্ধির বহু উর্দ্ধে সুপ্রতিষ্ঠিত তাঁহার অটল আসনটি!

ধর্ম্মদাস উঠিয়া মাথায় জল দিল, মনকে শান্ত করিল, বলিল, গতস্য শোচনা নাস্তি; ভবিষ্যতে আর কোন দিন এমন হবে না, এইবার গিয়ে বাবার পায়ে ধ'রে বলবো!

তাহার পর সে ঘুমাইয়া পড়িল।

নিদ্রা কি জাগ্রত অবস্থায়, ধর্ম্মদাস ঠিক করিয়া বুঝিতে পারিল না; কিন্তু তাহার বিশ্বাস যে, সে তখনও জাগিয়াই ছিল; সে দেখিল, শান্ত মূর্ত্তিতে শক্তিপ্রকাশ তাহার সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। মুখে তাঁহার স্নেহ-গম্ভীর হাসি!

ধর্ম্মদাস তাড়াতাড়ি উঠিয়া প্রণাম করিল। কাছে একটা চেয়ার ছিল, শক্তিপ্রকাশ তাহার উপর বসিয়া বলিলেন, এতদূরে এসেছো, সে খবর ত আমাকে দাওনি। আমি কত খুঁজে কত সন্ধান ক'রে তবে জান্‌তে পারলুম।

ধর্ম্মদাস কথার উত্তর করিল না। তাহার কেমন ভয় করে, মনে হয়, এ কি সত্য, না স্বপ্ন, না!——

শক্তিপ্রকাশ বলিলেন, আমি বেশীক্ষণ থাকতে পারব না, তোমাকে গুটিকয়েক কথা বলার আছে, বড় জরুরী ব'লেই আমাকে এত পথ অতিক্রম ক'রে আস্‌তে হ'লো—

কি কথা, বাবা?—ধর্ম্মদাস জিজ্ঞাসা করিল।

শক্তিপ্রকাশ বলিলেন, বিচারের ভূমি আছে; যার বিচার করি, তার ভূমিতে না যেতে পারলে বিচার সুবিচার হয় না। এত দিন আমি আমার নিজের ভূমি থেকে তোমার বিচার করেছি; তাই তোমার উপর অবিচার ক'রে নিজের উপর কঠোর শাস্তি এনেছি। এ কথা আজ হঠাৎ জান্‌তে পেরে তোমার কাছে এসে পড়লুম।

শক্তিপ্রকাশের কণ্ঠের স্বরে যেন কি একটি রহিয়াছে, যাহাতে মনে হয়, তাহা এই পৃথিবীর নয়, সে যেন একটি লোকোত্তর ব্যাপার!

তিনি হাসিয়া বলিলেন, তোমায় ডাক্‌লেই পারতুম, কিন্তু সে পথও নিজের হাতে রুদ্ধ করেছি…

ধর্ম্মদাসের মনে হইল, পিতা তীব্র অনুতাপে দগ্ধ হইয়া তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবার জন্য আসিয়াছেন। এই কথা মনে হইবামাত্র তাহার মনের মধ্যে বজ্রকঠিন যাহা কিছু ছিল, নিমেষে গলিয়া তরল হইয়া টলমল করিতে লাগিল।

ধরণীর বুকের মধ্যে যুগ যুগ ধরিয়া যে বাষ্প সঞ্চিত হইতে থাকে, তাহা এক দিন তরল অনলের সহিত আগ্নেয় পর্ব্বতের মুখ দিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া চতুর্দ্দিক প্লাবিত করিয়া দেয়। ঠিক তেমনই করিয়া ইহ-জীবনের সঞ্চিত অভিমান আজ ধর্ম্মদাসের বুক হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, সে চীৎকার করিয়া বাবা, বাবা, আমায় ক্ষমা করুন বলিয়া কাঁদিয়া পিতার পায়ে পড়িতে গিয়া ভূমিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

শুনিতে পাওয়া যায়, ঠিক এই দিন গভীর রাত্রিতে শক্তিপ্রকাশের আত্মা দেহ ত্যাগ করিয়া মহাপ্রস্থান করিয়াছিল।

হয় ত বা স্বর্গারোহণের পথে কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য তিনি প্রাণাধিক-প্রিয় ধর্ম্মদাসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাহার এই তপোবনের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

ধর্ম্মদাস স্বপ্ন দেখিয়াছিল, এ কথা একবারও সে মনে করে নাই।

সকালে ডাক্তার যখন বারম্বার বলিলেন যে, ধর্ম্মদাস স্বপ্নই দেখিয়াছিল, তখন তাহার দুই চক্ষু বহিয়া অশ্রু অবিশ্রান্ত ধারায় ঝরিয়া পড়িয়াছিল। সে মনে মনে জানিয়াছিল যে, শক্তিপ্রকাশ আর ইহ-জগতে নাই।

দিবাবসানে ধর্ম্মদাসের টেলিগ্রামের উত্তরে রামপ্রসাদ সেই কথাই জানাইয়া সকল সন্দেহ দূর করিয়াছিল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

মন্ত্রিমণ্ডলীর পরিবর্ত্তন

এত দিন বিলাতের শ্রমিক দল তথাকার শাসনকার্য্য পরিচালিত করিয়া আসিতেছিলেন। যেরূপ অবস্থায় এই দল গ্রেটবৃটেনের শাসনতরণী পরিচালিত করিয়া আসিতেছিলেন, সেরূপ অবস্থায় যে তাঁহারা এত দিন উহা পরিচালিত করিতে সমর্থ হইবেন, তাহা কেহই মনে করেন নাই। বিলাতের জনসাধারণের মধ্যে তিন দল রাজনীতিক বিদ্যমান। প্রথম রক্ষণশীল দল, দ্বিতীয় উদারনীতিক দল, তৃতীয় শ্রমিক দল। এই তিন দলের মধ্যে রক্ষণশীল দল বিশেষ প্রবল; কারণ, তাঁহাদের মধ্যে ধনী লোক অনেক আছেন। অর্থে এবং সামর্থ্যে ইঁহারা যেন কতকটা অসাধ্য-সাধন করিতে পারেন। উদারনীতিক দল এক সময়ে বিশেষ প্রবল ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী অনেক রাজনীতিক কিছু দিন পূর্ব্বেও বিরাজ করিতেন। কিন্তু এখন এই দল ধূমশেষ ধূমকেতুর ন্যায় ছায়ারূপে বৃটেনের রাজনীতিক গগনে অবস্থিত রহিয়াছেন। তাঁহাদের সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই। শ্রমিকরা উদীয়মান দল। তাঁহারা প্রায় সকলেই সমাজতন্ত্রবাদী। সুতরাং তাঁহাদের মত অনেকটা খাঁটি ডেমোক্রেসীর বা সাধারণ তন্ত্রবাদের সহিত সমঞ্জসীকৃত। সেই জন্য এই মতটা লোক অধিক পছন্দ করে। এই তিন দলের মধ্যে গত নির্ব্বাচনে শ্রমিক দলেরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লোক পার্লামেণ্টের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। কিন্তু অন্য দুই দলের সমবেত সদস্যসংখ্যা অপেক্ষা শ্রমিক দলের সদস্যসংখ্যা অনেক অল্প। তাহার উপর অন্য দুই দলের কোন দলই তাঁহাদিগকে পছন্দ করেন না। এরূপ অবস্থায় অন্য দুই দল একত্রীভূত হইলেই ভোট-ব্যাপারে শ্রমিকদিগকে সহজেই পরাভূত করিতে পারিতেন। সেই জন্য আমি প্রথমেই বলিয়াছি যে, শ্রমিক সরকার যে এত দিন বিলাতের শাসনতরণী পরিচালিত করিতে সমর্থ হইবেন, তাহা মনে করিতে পারা যায় নাই। উদারনীতিক দল রক্ষণশীল দলের সহিত যোগ দিলেই শ্রমিক রাজত্বের অবসান হইত।

তবে তাহা হইল না কেন? আজকাল মতের দিক দিয়া উদারনীতিক দল অনেক বিষয় রক্ষণশীলদিগের সহিত মিলিত হইয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলেও ইঁহারা শ্রমিক সরকারকে পরাভূত করিয়া রক্ষণশীল দলের হস্তে শাসনদণ্ড দিবার ব্যবস্থা করেন নাই। উদারনীতিক দলের করুণা বা শ্রমিকদলের সহিত তাঁহাদের সহানুভূতি উহার কারণ ছিল না। য়ুরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্রে করুণার বা সহানুভূতির স্থান অতি অল্প। তবে তাঁহারা তাহা করিলেন না কেন? তাঁহাদের তাহা না করিবার কারণ এক রাক্ষসী সমস্যা। বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের অবসান হইবার পর য়ুরোপের সমস্ত সভ্য জাতির মধ্যে যে দশস্কন্ধ বিংশতি-হস্ত রাবণের ন্যায় এক সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, তাহার সমাধান করিবার মত কোন শক্তিই এ পর্য্যন্ত কোন মানবেরই আছে বলিয়া মনে হইতেছে না। য়ুরোপের বহু আর্থিক এবং সামাজিক ব্যাপার এই অতিকায় সমস্যার করধৃত হওয়াতে তথায় যে জটিলতার সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে, নানারূপ স্বার্থে স্বার্থবান্ গ্রেট-বৃটেনে তাহা যেন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে সমস্যার স্বরূপ বিশদভাবে এ স্থানে বিবৃত করা সম্ভবে না। উহা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে বিবৃত করাই শ্রেয়ঃ। তবে এখানে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই সমস্যার উদ্ভবহেতু গ্রেট-বৃটেনের মুদ্রা-মূল্য হ্রাস পাইয়াছে, ব্যবসায়ের বাজারে ঘাট্‌তি ঘটিয়াছে এবং রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয়ের দুই মুখ মিল করা অত্যন্ত দুরূহ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রক্ষণশীল দল ইতঃপূর্ব্বে এই সমস্যার সমাধান করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সুতরাং রক্ষণশীল দল যদিও শ্রমিক দলকে পরাভূত করিয়া পুনর্নির্ব্বাচনে ক্ষমতা লাভ করিবার প্রয়াস পাইতে পারিতেন, তাহা হইলেও তাঁহারা এই রাক্ষসী সমস্যা সমাধানের ভয়ে ঐ কার্য্য হইতে বিরত ছিলেন। তাঁহারা 'যা শত্রু পরে পরে' হিসাবে এই সমস্যার সমাধানভার শ্রমিক দলের উপর দিয়াই দূরে দাঁড়াইয়া মজা দেখিতেছিলেন।

কিন্তু প্রকৃতির একটা প্রতিশোধ ত আছেই। শ্রমিক সরকারের নায়ক ও অন্যান্য মন্ত্রীরা সেই সমস্যার সমাধানের জন্য নানারূপ চেষ্টা করিয়াও তাহার সমাধান করিতে সমর্থ হইলেন না। শ্রমিক সরকারের অন্যতম মন্ত্রী ও আয়ব্যয়সচিব মিষ্টার ফিলিপ স্নোডেন এক জন

খুব বড় দরের হিসাব-নবীশ লোক। তিনি এবং প্রধান সচিব মিষ্টার র‍্যামজে ম্যাক্‌ডোনাল্ড অনেক হিসাব করিয়া অনেকগুলি কমিটী এবং কমিশন বসাইয়া এই সমস্যার সমাধান করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা কিছুতেই জমা-খরচের দুই মুখ সমান করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সাধারণতঃ বৃটিশ বজেটে স্বাভাবিক বৎসরে রাজকোষে আন্তর্জ্জাতিক হিসাবে ১৩ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড উদ্বৃত্ত হইয়া থাকে। গত বৎসর সেই উদ্বৃত্তির পরিমাণ ৩ কোটি ৯০ লক্ষ পাউণ্ডে নামিয়াছিল। একবারে ১০ কোটি পাউণ্ড (১৩০ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা) আয় কমিয়া গিয়াছিল। তাহার পর লক্ষণ দেখিয়া শঙ্কা হইয়াছিল যে, আগামী বজেটে ১২ কোটি পাউণ্ড ফাজিল হইবে। তখন মনে হইয়াছিল যে, সেই রাক্ষসী সমস্যা যেন তাহার দশটি বিকট বদন ব্যাদান করিয়া গ্রেট বৃটেনের আর্থিক সমৃদ্ধি গ্রাস করিতে বসিয়াছে। মিষ্টার স্নোডেন তখন প্রমাদ গণিয়া উহার সমাধানের যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন —তাহা যাচাই করিয়া লইবার জন্য বিশেষজ্ঞ দ্বারা গঠিত কয়েকটি কমিটী বসাইলেন। যথা (১) বেকার কমিশন (২) শিল্প এবং আর্থিক কমিটী এবং সর্ব্বশেষে (৩) মে কমিটী। এই মে কমিটী অনেক গবেষণা করিয়া যে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, তাহাতে সকলে একমত হইতে পারিলেন না। উহার চারি জন সদস্য (রক্ষণশীল এবং উদারনীতিক) একমত হইলেন, কিন্তু ২ জন শ্রমিক সদস্য সেই মতে মত দিতে পারিলেন না। এই কমিটীর অধিকাংশ সদস্য যে সিদ্ধান্ত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে ৯ কোটি ৬৫ লক্ষ পাউণ্ড ফাজিল কমিয়া যাইবে স্থির হইয়াছিল। ইঁহারা প্রস্তাব করেন যে,(১) ২৫ লক্ষ বেকার লোককে যে অর্থ-সাহায্য করিতে হয়, তাহা হইতে প্রতি পাউণ্ডে ৪ সিলিং করিয়া কাটিয়া লইতে হইবে। অর্থাৎ যাহাকে ১ পাউণ্ড দেওয়া হইত, তাহাকে ১৬ সিলিং দিতে হইবে। কমিটী মনে করিয়াছিলেন, এইরূপ দান কমাইয়া দিলে সরকারের ৬০ লক্ষ পাউণ্ড বাঁচিয়া যাইবে! অন্যান্য বিষয়েও ব্যয়সঙ্কোচের প্রস্তাব করা হইয়াছে, যথা—(২) শিক্ষকদিগের, পুলিশ বিভাগের কর্ম্মচারীদিগের এবং অসামরিক রাজপুরুষদিগের বেতন হ্রাস। ইহা ভিন্ন আরও কতকগুলি ছোটখাট বিষয়েও দানের কার্পণ্য করিবার ব্যবস্থা করিবার পরামর্শ দেওয়া হইয়াছিল, যথা—(৩) বাড়ীভাড়া এবং প্রসূতিচর্য্যা সম্বন্ধে সরকারী আনুকূল্যের সঙ্কোচসাধন, মার্কেটিং বোর্ডের উচ্ছেদ, আর ১০০ নং বিমান বিক্রয়।

মে কমিটীর ১ম এবং ২য় দফা প্রস্তাবে শ্রমিক দল অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন। ব্যাপারটা প্রকৃতভাবে বুঝিতে হইলে ইত্যবসরে বেকার কমিশন এবং ম্যাক্‌মিলান কমিটী অর্থাৎ শিল্প ও আর্থিক কমিটীর রিপোর্টের কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক। এই দুই কমিটী বিশেষতঃ ম্যাকমিল্যান কমিটী শ্রমিকদিগের উপর তীব্রভাবে আক্রমণ করে। এই ব্যাপার লইয়া বিলাতে খুবই একটা আন্দোলন উপস্থিত হয়। মিষ্টার শিবোহম্ রৌণ্টি (Seebohm Rowntree) বিলাতের 'নিউজ ক্রনিক্যাল' নামক সংবাদপত্রে সম্প্রতি লিখিয়াছেন যে, "পৃথিবীতে এখন যেরূপ দরে পণ্য বিকাইতেছে, আমাদের পণ্য-উৎপাদনের খরচা তাহার অনুপাতে কমিয়া যায় নাই অথবা বিদেশী খরিদ্দাররা যে দরে প্রস্তুত মাল খরিদ করিতে পারে,—সে দরে বিক্রয় করিবার মতও আমাদের পণ্য-প্রস্তুতের খরচা কমে নাই। ইহা দেখিয়া বিদেশীরা বলিয়া থাকেন যে, আমরা জাতি হিসাবে জীবনের মানদণ্ড এত উচ্চ করিয়া তুলিয়াছি যে, আমাদের পণ্য মূল্যের হিসাবে তাহা সমর্থন করা সম্ভবে না।" সেই জন্য মিষ্টার রৌণ্টি বলেন যে, হয় বৃটিশ জাতির জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের মানদণ্ড অর্থাৎ বিলাসিতা কমাইতে হইবে আর না হয় অধিক পণ্য উৎপাদন করিয়া তাহা কাটাইতে হইবে। আসল কথা, জাতি হিসাবে বৃটিশদিগের এত স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ চলিবে না। মিষ্টার রৌণ্টি বিলাতের এক জন খ্যাতনামা হিসাবনবীশ লোক। তিনি শেষটা বলেন যে, সমস্যা যেরূপ শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে,—তাহাতে সকল দলের সম্মিলিত হইয়া ইহার সমাধানকল্পে আত্মনিয়োগ করা উচিত।

এই ত গেল এক দিকের কথা। কিন্তু ইহার আরও একটা দিক অতিশয় প্রকট হইয়া পড়িয়াছে। বিলাতের এই আর্থিক সমস্যাটি জার্ম্মাণীর আর্থিক সমস্যার সহিত অনুস্যুত। জার্ম্মাণীর সঙ্কট ক্রমশঃ আন্তর্জ্জাতিক সঙ্কটে পরিণত হইবার অর্থাৎ সমস্ত পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িবার সম্ভাবনা ঘটিতেছে। সেই বিপদ পরিহার করিবার জন্য বৃটিশজাতি জার্ম্মাণীকে সাহায্য করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু গ্রেট বৃটেনের 'ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ড' দেখিলেন যে,

তাহাদের সঞ্চিত সুবর্ণ সমস্তই বাহির হইয়া যাইতেছে। অগত্যা উক্ত বৃটিশ ব্যাঙ্ক এই সমস্যার সমাধানকল্পে আমেরিকার 'ফেডারাল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের' শরণাপন্ন হইলেন। মার্কিণের ফেডারাল ব্যাঙ্ক বলিলেন যে, অগ্রে তোমাদের অনাবশ্যক খরচা কমাইতে হইবে। এখানে বলা আবশ্যক যে, মার্কিণ মুলুকে সরকার হইতে বেকারদিগকে অর্থদানের কোন ব্যবস্থাই নাই। মার্কিণের ধনকুবেরগণ কখনই বৃটিশ সরকারের এই বেকার-বীমার ব্যবস্থা সুনজরে দেখেন নাই। তাঁহারা বৃটিশ ব্যাঙ্কওয়ালাদের বলিতে আরম্ভ করিলেন, "বাপু হে! অগ্রে তোমরা তোমাদের দানের ঘটাটা কমাইয়া ফেল দেখি,—তাহার পর সহায়তা করিবার ব্যবস্থা করা যাইবে।" প্রকাশ—যে কমিটী তদনুসারেই বেকারদিগের সাহায্যদান ব্যবস্থা কমাইয়া দিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন এবং ম্যাক্ডোনাল্ড এবং স্নোডেন উভয়ে ওয়াল-ষ্ট্রীটের অর্থাৎ মার্কিণের 'হুকুম মতে' ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন। তবে যে কমিটী বেকারদিগকে দানের পরিমাণ শতকরা ২০ টাকা হারে (প্রতি পাউণ্ডে ৪ শিলিং) কমাইয়া দিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু মেসার্স ম্যাক্‌ডোনাল্ড ও স্নোডেন 'অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ' হিসাবে শতকরা ১০ টাকা হারে (প্রতি পাউণ্ডে ২ সিলিং) উহা কমাইয়া দিতে সম্মত হইয়াছিলেন।

বলা বাহুল্য, ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সাধারণ সমিতি এই প্রস্তাবে একবারে তেলেবেগুনে জলিয়া উঠিলেন। তাঁহারা কিছুতেই সে প্রস্তাবে সম্মত হইতে চাহিলেন না। তাঁহারা ঐ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দুইটি গুরু আপত্তি উপস্থিত করিলেন। প্রথম আপত্তি যে, এই ব্যাপারে কেবল শ্রমিকরাই নিজ স্বার্থ বলি দিবে, অন্য কেহ দিবে না কেন? দ্বিতীয় আপত্তি, ওয়ালষ্ট্রীটের হুকুমমতে গ্রেট বৃটেন চলিবে, ইহা অসহ্য। আসল কথা, পকেটে হাত পড়াতেই শ্রমিকদের ক্রোধ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। তাহারা বলে, যাহারা জমীর খাজনা পায়, অথবা কোম্পানীর কাগজের সুদ পায়, তাহারাই বা ত্যাগস্বীকার না করিবে কেন? তাহাদের এই আপত্তি যে যুক্তিযুক্ত, তাহা অস্বীকার করা যায় না। ফলে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ম্যাকডোনাল্ড এবং স্নোডেনের নেতৃত্ব আর মানিতে চাহিলেন না। এমন কি, মিষ্টার ম্যাক্‌ডোনাল্ডের মন্ত্রিমণ্ডলীর প্রায় সকল সদস্যই তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। মেসার্স ম্যাক্‌ডোনাল্ড ও স্নোডেন যদি আপনাদের মন্ত্রিমণ্ডলেই স্বীয় প্রস্তাবের সমর্থন না পান, তাহা হইলে তাঁহাদের পক্ষে মন্ত্রিত্ব করা অসম্ভব। অগত্যা ম্যাকডোনাল্ড পদত্যাগ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক মন্ত্রিমণ্ডলীর ও শ্রমিক সরকারের অবসান ঘটিল। রক্ষণশীল দল যে হাঙ্গামা পরিহার করিয়া আসিতেছিলেন,—সেই হাঙ্গামা আচম্বিতে অন্য দিক দিয়া উপস্থিত হইল।

কিন্তু উপায় কি? যে রাক্ষসী সমস্যার সমাধান করিতে যাইয়া রক্ষণশীলদল অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, তাহার সমাধানকল্পে শ্রমিকদল একেবারে পর্য্যুদস্ত হইয়া গেলেন, সেই রাক্ষসী সমস্যা ম্যঁই ভুঁখা হুঁ বলিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিতে কে গ্রেটবৃটেনের শাসন-তরণীর কাণ্ডারী-পদ গ্রহণ করিবে? রক্ষণশীলদলের নেতা মিষ্টার বল্ডুইন ঐ সমস্যা সম্মুখে থাকিতে সে কার্য্যভার লইতে ইচ্ছুক নহেন। উদারনীতিক দল ত ক্ষমতাশূন্য বাক্যবাগীশ। সুতরাং সেই ম্যাকডোনাল্ড এবং স্নোডেনকে সম্মুখে রাখিয়া একটি জাতীয় মন্ত্রিমণ্ডলী গঠিত করা হইল। অথচ সাধারণভাবে শ্রমিক সরকারের পতন হইলে গ্রেটবৃটেনে পুনরায় নির্ব্বাচন উপস্থিত করা হইত। নির্ব্বাচনে যে দল জয়যুক্ত হইতেন, সেই দলই শাসনতরণীর হাল ধরিতেন। কিন্তু এবার সমস্যা সঙ্গীন। যদি নির্ব্বাচনে রক্ষণশীল দল জয়যুক্ত হন, তাহা হইলে তাঁহাদের স্কন্ধেই এই সমস্যার সমাধানভার পড়িবে। সুতরাং নির্ব্বাচনের হাঙ্গামায় না যাইয়া "সবে মিলে করি কায, হারি জিতি নাই লাজ" হিসাবে সকল দল সম্মিলিত হইয়া এক জাতীয় মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন পূর্ব্বক এই সমস্যার সমাধানকার্য্যে ব্রতী হইলেন। এই জাতীয় মন্ত্রিমণ্ডলীতে সকল দলেরই কয়েক জন করিয়া সদস্য আছেন। যে জাতীয় মন্ত্রিমণ্ডলী গঠিত হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে ৪ জন রক্ষণশীল, ২ জন উদারনীতিক এবং ৪ জন শ্রমিক। মন্ত্রিগণের নাম:—

(১) মিষ্টার র‍্যামজে ম্যাক্‌ডোনাল্ড—প্রধান মন্ত্রী এবং খাজনাখানার অধ্যক্ষ।

(২) মিষ্টার ষ্ট্যানলী বল্ডুইন—লর্ড-প্রেসিডেণ্ট অব দি কাউন্সিল।

(৩) মিষ্টার ফিলিপ স্নোডেন—চান্সলার অব দি এক্সচেকার (কোষাধ্যক্ষ)।

(৪) সার হার্ব্বার্ট স্যামুয়েল—স্বরাষ্ট্র-সচিব।

(৫) লর্ড স্যাঙ্কে—লর্ড চান্সলার।

(৬) লর্ড রেডিং—পররাষ্ট্র-সচিব।

মিঃ ম্যাকডোনাল্ড

(৭) সার স্যামুয়েল হোর—ভারত-সচিব।

(৮) মিষ্টার জে এইচ টমাস—উপনিবেশ-সচিব।

(৯) মিষ্টার নেভাইল চেম্বারলেন—স্বাস্থ্য-সচিব

মিঃ চেম্বারলেন

(১০) সার ফিলিপ কান্‌লিফ লিষ্টার—বাণিজ্য-বোর্ডের সভাপতি।

এই ১০ জনকে লইয়া মন্ত্রিমণ্ডলী গঠিত হইয়াছে। মন্ত্রিমণ্ডলীর সহ-

লর্ড রেডিং
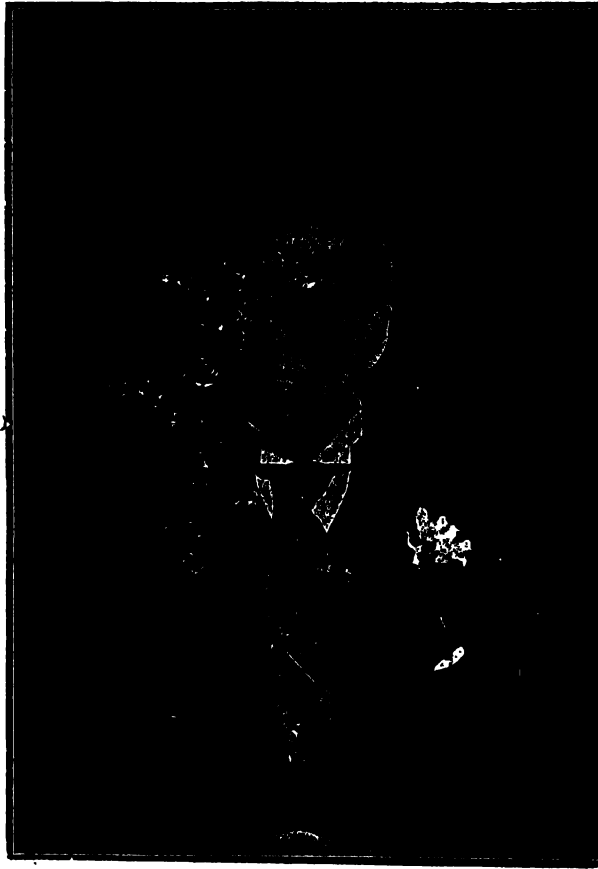
কারী কর্ম্মচারীর পদে মিষ্টার ম্যাকডোনাল্ড শ্রমিকদিগকে নিযুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তিনি ৮ জনের অধিক শ্রমিককে মন্ত্রিমণ্ডলীর কার্য্যসম্পর্কে নিযুক্ত করিতে পারেন নাই। মন্ত্রিমণ্ডলের কার্য্যে ৩১ জন রক্ষণশীল এবং ১১ জন উদারনীতিক নিযুক্ত হইয়াছেন। সহকারী ভারত-সচিব বলিয়া কেহ থাকিবেন না, তবে কেবল মারকুইস অব লোথিয়ান বিলাতের লর্ড সভায় ভারতের হইয়া কথা কহিবেন স্থির হইয়াছে। ইনি উদারনীতক এবং ডাচি অব লাঙ্কাশায়ারের চান্সলার; পক্ষান্তরে ভারত-সচিব সার স্যামুয়েল হোর ঘোর রক্ষণশীল এবং

মিঃ জে, এইচ, টমাস্

সার স্যামুয়েল হোর

সাম্রাজ্যবাদী। পরস্পর বিভিন্ন মতাবলম্বী লোকের এমন সমবায় অদ্ভুত। আপাততঃ কেবল এই রাক্ষসীসমস্যার সমাধানকল্পে এই মন্ত্রিমণ্ডলী গঠিত হইয়াছে। সাধারণতঃ এই ধরণের মন্ত্রিমণ্ডলীকে সমবায়ীকৃত মন্ত্রিমণ্ডলী বা সমন্বিত মন্ত্রিমণ্ডলী (Co-alition Ministry) বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ এই মন্ত্রিমণ্ডলীর সদস্যবর্গ বিভিন্ন-দলভুক্ত হইলেও তাহাদিগকে একসঙ্গে লইয়া কায করা হয়। বিগত যুদ্ধের সময় এইরূপ মন্ত্রিমণ্ডলী গঠিত হইয়াছিল; কিন্তু এই ভাবের মন্ত্রিমণ্ডলীর দ্বারা কায ভাল হয় না। প্রকৃত সমন্বিত মন্ত্রিমণ্ডলীর সদস্যগণের দলাদলির মত মনোভাব পরিহার করিয়া এবং পরস্পর তুল্য দায়িত্ব লইয়া কার্য্য করিতে হয়। কাযের সময় কেহই আপনাকে ভিন্ন দলের বলিয়া মনে করিতে পারেন না। কারণ, যাহা করা হইবে বা সিদ্ধান্ত হইবে, তাহাতে সকলের দায়িত্ব সমান। বিগত মহাযুদ্ধের সময় এইরূপ মন্ত্রিমণ্ডলী গঠিত হইয়াছিল। সাম্রাজ্যের আপৎকালে এই প্রকার মন্ত্রিমণ্ডলী গঠিত হইয়া থাকে, ইহাই সুপ্রসিদ্ধ রাজনীতিক মিষ্টার মনরোর মত।* বিগত যুদ্ধের সময় এইরূপ সমবায়ীকৃত মন্ত্রিমণ্ডলী গঠিত হইয়াছিল এবং তখন তাহা বহুকালস্থায়ী হইয়াছিল। তাহার কতকগুলি কারণ ছিল। তখন মহাসংগ্রামের জন্য স্বদেশপ্রেমিক ইংরাজগণ দলাদলি ভুলিয়া রাষ্ট্রীয় কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। যুদ্ধকার্য্য পরিচালনাই তখন তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল এবং সে বিষয়ে তাঁহাদের পরস্পর মতভেদ ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, তখন শ্রমিক সম্প্রদায় পার্লামেণ্টে বিশেষ প্রতিপত্তি-লাভ করিতে পারেন নাই। তখনকার মন্ত্রিমণ্ডলীতে শ্রমিকরা নামমাত্র আসন পাইয়াছিলেন। অন্য দুই দলের মধ্যে মোটের উপর মৌলিক মতগত বিশেষ পার্থক্য ছিল না, অন্ততঃ যে সকল বিষয়ে মতগত পার্থক্য ছিল, সে সকল বিষয় তখন মন্ত্রিমণ্ডলীর সম্মুখে উপস্থিত হয় নাই, হইবার সম্ভাবনাও ছিল না। এখন অবস্থা অন্যরূপ হইয়াছে। এখন শ্রমিক সরকার অনেকটা প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠিয়াছেন। সুতরাং এখন তিনটি বড় দলের সমবায়-সাধন একটা জটিলতর ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে। যে সমস্যার সমাধানকল্পে তাঁহারা সমবেত হইয়াছেন, সেই সমস্যার সমাধান বিষয়েই তাঁহাদের ভিন্নমত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। কারণ, মিষ্টার বলডুইনের মতাবলম্বীদিগের বিশ্বাস এই যে, পণ্য-শুল্কের হার বৃদ্ধি করিয়া এই আর্থিক সমস্যার সমাধান করা উচিত। অন্য দুই দলের সে বিষয়ে ঘোর আপত্তি বিদ্যমান। এখন কি ভাবে এই সমস্যার সমাধান হইবে, তাহা বলা কঠিন। ম্যাকমিল্যান এবং মে কমিটী দুইটির সিদ্ধান্ত অনুসারে যদি এই সমস্যার সমাধান করিতে যাওয়া হয়, তাহা হইলে দেশের বহু লোক তাহা হয় ত গ্রাহ্য করিয়া লইবে না। হয় ত বা বলডুইনী দলকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য রাজস্ব হিসাবে শুল্ক কিছু বৃদ্ধি করিতে হইবে। সুতরাং ব্যাপারটা বড় কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই জন্য যখন এই জাতীয় মন্ত্রিমণ্ডলী গঠিত হইয়াছিল, তখন প্রকাশ করা হয় যে, এই মন্ত্রিমণ্ডলী ঠিক কোয়ালিসন মিনিষ্ট্রী বা সমবায়ী-কৃত মন্ত্রিমণ্ডলী নহে, ইহা পরস্পরের সাহায্যার্থ সমবর্ত্তী মন্ত্রিমণ্ডলী (Co-operative Ministry) অর্থাৎ এই মন্ত্রিমণ্ডলীর সদস্যগণ পরস্পর পরস্পরের সহযোগিতা করিবার জন্য,—বিশেষতঃ মিষ্টার ম্যাকডোনাল্ডকে সুপরামর্শ দানে এই সমস্যার সমাধান কার্য্যসাধনে নিযুক্ত হইয়াছেন। অর্থাৎ সমন্বিত মন্ত্রিমণ্ডলীতে যদিও কার্য্যতঃ ততটা পরস্পরের নিবিড় সংযোগ থাকে না, তাহা হইলেও উহাতে যতটুকু সমদায়িত্ব থাকে, এই মন্ত্রিমণ্ডলীতে ততটুকুও সমদায়িত্ব স্বীকৃত হইবে না। সেই জন্যই মিষ্টার বলডুইন, মিষ্টার র‍্যামজে ম্যাক্‌ডোনাল্ডের অধীনে কার্য্য করিতে সম্মত হইয়াছেন। অর্থাৎ এই সমাধানের দায়িত্বটা বেশীর ভাগ মিষ্টার ম্যাক্‌ডোনাল্ডের স্কন্ধে চাপাইবার চেষ্টা হইয়াছে। শুনিতেছি, এ সমস্যার একটা সমাধান করা হইয়া গিয়াছে। শীঘ্রই ইহা প্রকাশ করা হইবে। তবে যদি কোন গতিকে এই সমাধান সন্তোষজনক হয়, তাহা হইলে সকলেই সে জন্য সমদায়িত্ব স্বীকার করিতে সম্মত হইতে পারেন।

---

*Ordinarily the cabinet is made up of members drawn from one political party but in times of national emergency, when it is desired to have all the parties work together, a coalition cabinet may be formed.—W. B. Munro.

Coalition Governments lack the cohesive quality which impels men who have done long service together to come to each other's defence in emergencies.—J. A. Spender.

এখন জিজ্ঞাস্য, ভারতীয় সমস্যা সম্বন্ধে এই সমবর্ত্তী মন্ত্রিমণ্ডলীর প্রভাব কিরূপ দাঁড়াইবে? উহার ফল যে অত্যন্ত অধিক মন্দ হইবে, তাহা আশঙ্কা করা ভুল। যাহা হইবার, তাহাই হইবে। সার স্যামুয়েল হোরের নিকট এই ব্যুরোক্রেসী-শাসিত দেশের ব্যুরোক্রেসী অধিকতর উৎসাহ পাইবেন। তাহার লক্ষণ ইতোমধ্যেই দেখা দিয়াছে। শ্রমিকরা স্বহস্তে শাসনভার লইয়া বিশেষ কিছুই করিতে পারেন নাই, কারণ, তাঁহাদিগকে অন্য দলের মন যোগাইয়া চলিতে হইয়াছিল। অধিকন্তু ভারতকে বৃটিশ রাজনীতিক দলাদলির বাহিরে রাখা হইয়াছিল। এখন শ্রমিকদল প্রতিপক্ষ থাকিবেন। প্রতিপক্ষ দলে থাকিয়া যদি কায করিতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহার অধিক কায করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয়। কারণ, এখন ত আর কাহারও মন যোগাইয়া চলিতে হইবে না।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)।

জন্মাষ্টমী

সে দিন ভাদর অষ্টমী-নিশা
ঝরিতেছে বারিধার,
চকিত-চপলা চমকে ঊর্দ্ধে
অবনী অন্ধকার।

গুরু-গুরু-গুরু মেঘের ডমরু
বাজিতেছে বারম্বার,
ভীম-হুঙ্কারে চলে উন্মাদ
তাণ্ডব-ঝঞ্ঝার।

সেই দুর্য্যোগে মথুরানগরে
নাহি পথে প্রতিহারী,
শঙ্কিত-হৃদে কম্পিত যত
নগরীর নর-নারী।

মত্ত পবনে ক্ষিপ্ত যমুনা
হয়েছে ভয়ঙ্করী,
আছাড়ি পড়িছে তটের প্রান্তে
সংহার-বেশ ধরি।

* * * * *

অন্ধ কারায় দেব-দেবকিনী
রয়েছে দুজনে জাগি,
শুষ্ক তাদের মলিন বদন
কি যেন শঙ্কা লাগি!

ঝন্ ঝন্ ঝন্ লৌহ-তোরণ
বাজিছে ঝঞ্ঝাঘাতে,
থাকিয়া থাকিয়া কারার প্রহরী
হাঁকিছে শুধু সে রাতে।

দীপ্ত করিয়া আঁধার কক্ষ
লভিল জনম হরি,
উদিল যেন গো শারদ ইন্দু
আলোকে ভুবন ভরি:

বসুদেব চাহি দেখিল তখন
মুগ্ধ নয়ন ভরে,
রয়েছে শায়িত চির-সুন্দর
দেবকী-অঙ্ক পরে!

পুলক-অশ্রু ঝরিল অঝোরে
উভয় গণ্ড পরে,
ঘুচিবে রে বুঝি বন্ধন-ব্যথা
স্নেহের দুলাল-করে!

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

আমেরিকায় মহাত্মা গন্ধীর মতবাদের প্রভাব

গন্ধীজীর কথা আজ আর ভারতবর্ষের সীমার মধ্যেই আবদ্ধ নাই, সমগ্র পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। যুগমানব মহাত্মা গন্ধী ভারতের অন্তরতম অন্তরাত্মার প্রতীক, তাঁহার চিন্তাধারা, জীবনযাত্রা, কর্ম্মপদ্ধতি সকলই ভারতের সনাতন রীত্যনুবর্ত্তী হইলেও প্রতীচীর কাছে নূতন। তাই সমগ্র পৃথিবী আজ অপলকনেত্রে চাহিয়া আছে তাঁহার দিকে,—তাহারা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে চাহে, এই নূতনত্বের মধ্যে কি আছে, আর ইহার পরিণামই বা কি হয়। মহাত্মা সাত্ত্বিক বৈষ্ণব, তাই তিনি দৈন্যকে করিয়াছেন মাথার মুকুট, ত্যাগকে করিয়াছেন অঙ্গের ভূষণ, অহিংসাকে করিয়াছেন জীবনের মূলমন্ত্র। ভারতের কোটি কোটি দীনদরিদ্র নরনারী যে তাঁহার নিতান্তই আপনার

জগতে শান্তিপ্রতিষ্ঠাকল্পে মহাত্মাজী চরকায় সূতা কাটিতেছেন

জন, ইহাই তিনি জীবনের প্রতিমুহূর্ত্তে মনে-প্রাণে উপলব্ধি করিতে চান; ত্যাগ ভিন্ন মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশ হয় না, আপনাকে বিলাইয়া দিতে না পারিলে পরকে আপন করা যায় না,—ইহাই তাঁহার জীবনের শিক্ষা; আর জীবজগতে অহিংসাই বিশ্বপ্রেমের মূল উৎস, ইহা তিনি জানেন, তাই ইহাই তাঁহার সাধনা। মহাত্মার পূর্ব্বেও বহু যুগাবতার ভারতের পুণ্যভূমিতে একই শিক্ষা দীক্ষা সাধনার প্রদীপ জ্বালিয়া গিয়াছেন এবং পরেও যে অনেকে আসিবেন, সে বিষয়েও সন্দেহ নাই,—কেন না, কাল নিরবধি।—বস্তুতন্ত্র-বাদী প্রতীচী ইহা আজিও বুঝে নাই, অদূর ভবিষ্যতেও হয় ত বা বুঝিবে না। কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা অন্ধ নহে, তাহারা দেখিতে চাহে, বুঝিতে চাহে। তাই গন্ধীতত্ত্ব আলোচনায় তাহাদের এত আগ্রহ।

সম্প্রতি আমেরিকার যুক্তরাজ্যে বিশ্ব-গন্ধী-সমিতি (All World Gandhi Fellowship) নামে একটি সমিতি গঠিত হইয়াছে। ইহার পরিচালক আমেরিকাপ্রবাসী বাঙ্গালী শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দাশগুপ্ত। গত ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ইনি লণ্ডনে ভারতীয় সমর-সেবা-বাহিনী (Indian Field Ambulance Corps) গঠনে মহাত্মা গন্ধীর সহযোগী ছিলেন। তদবধি ইনি মহাত্মাকে বিশেষরূপে জানিবার

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে মহাত্মা গন্ধীজী—
বামে বৃটিশ সেনানী ও দক্ষিণে দাশগুপ্ত

এবং তাঁহার শিক্ষার সহিত ওতপ্রোতভাবে পরিচিত হইবার সুযোগ পাইয়াছেন। এই সমিতির উদ্দেশ্য মানবসমাজে মহাত্মার শিক্ষার প্রচার করা, তাঁহার আদর্শে জীবনগঠনে মানুষকে সহায়তা করা, প্রাচী-প্রতীচীর মিলনসাধন করা, সত্যাগ্রহ অহিংসা মন্ত্রে সকলকে দীক্ষিত করা। আমেরিকার কতিপয় চিন্তাশীল নরনারী এ কার্য্যে তাঁহার সহায় হইয়াছেন। আপাততঃ তাঁহারা এই সমিতিটিকে একটি ক্লাবের মত করিয়া গঠন করিয়াছেন ইহার নিয়মাবলীর

মধ্যে একটি অদ্ভুত নিয়ম আছে—"সভ্যগণ কেহ চুরি করিতে পারিবে না।" এখানে "চুরি" অর্থে যে জিনিষ বাস্তবিক প্রয়োজন নাই, তাহা গ্রহণ করা। যেমন মটরগাড়ী। আধুনিক প্রগতির যুগে মটরগাড়ী পাশ্চাত্য সভ্যতার একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। তথাপি যথাসম্ভব ইহার প্রতিরোধ এবং সঙ্কোচ প্রয়োজন। অন্য কোন সাধারণ সমিতি বা ক্লাবে যদি কোন সভ্য একখানি অতি পুরাতন ঝরঝরে মেরামত করা মটরে চড়িয়া যান, তবে সকলে তাঁহাকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিবে, কিন্তু এই সমিতিতে হইবে ঠিক তাহার বিপরীত। ফল কথা, সকলকেই অল্পে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত দাশগুপ্ত বলেন—"অবশ্যই আমরা কাহাকেও মহাত্মার অনুরূপ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য করিতে পারি না, তাহা চাইও না। আমরা চাই প্রাচী এবং প্রতীচীর মিলন। প্রত্যেক বিষয়ে বিবেক হইবে মানুষের পরিচালক। খাদ্য-সম্বন্ধেও তাই। এখানে আমরা মহাত্মার আদর্শে সভ্যদের জন্য শুধু সংযমের অনুকূল খাদ্যের আয়োজন রাখিব,—অর্থাৎ শুধু নিরামিষ আহারেরই ব্যবস্থা রাখিব। তবে যদি কোন সভ্য আমিষ আহার করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি উহা সংগ্রহ করিয়া লইবেন। আমরা কখনও প্রমোদের জন্য জীবহত্যা করিব না। এখানে একটি উপাসনা-মন্দির থাকিবে, যেখানে সর্ব্বদেশের সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী লোক উপাসনা করিতে পারে। ইহাতে আমরা পরস্পরের ধর্ম্মের পরিচয় পাইব এবং তাহা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিব। একটি রঙ্গালয় থাকিবে, সেখানে সর্ব্বদেশের সর্ব্বজাতির নাটক অভিনীত হইতে পারিবে। উহা হইতে আমরা পরস্পরের ভাবধারার পরিচয় পাইব।" পাঠক-পাঠিকা এই সমিতির উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিলে সহজেই বুঝিতে পারিবেন, এরূপ স্থলে এরূপ ব্যবস্থাই প্রয়োজন।

এই সমিতি হইতে "ধর্ম্ম" নামে একখানি ষাণ্মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। তাহাতে বহুদেশের বহু চিন্তাশীল লেখকের লেখা এবং মতামত থাকে,—বেশীর ভাগই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে। ইহার জানুয়ারী-জুন সংখ্যা সম্প্রতি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই সংখ্যায় নিউইয়র্ক ওয়ার্ল্ড টেলিগ্রাম (New York World Telegram) হইতে একটি প্রবন্ধ উদ্ধৃত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে ঐ প্রবন্ধটি আমাদের বিশেষ প্রণিধানযোগ্য বোধে আমরা এখানে উহার সার সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

গন্ধীর দেশবাসী তাঁহাকে দেবতা বলে আর বিলাতের ঝাঁনো সাম্রাজ্যবাদীর দল তাঁহাকে বলে অর্দ্ধোলঙ্গ ধর্ম্মোন্মত্ত পিশাচ (Fanatic and Devil)। গন্ধী দেবতাই হউন কিম্বা পিশাচই হউন, এ কথা সত্য যে, তিনি সর্ব্বযুগের অধিকতম শক্তিশালী বৈপ্লবিক নেতৃগণের মধ্যে এক জন।

প্রতীচ্য দেশে গন্ধীজী প্রতিষ্ঠিত সৌভ্রাত্র সঙ্ঘে ডাঃ সাণ্ডারল্যাণ্ডের বক্তৃতা

বৈপ্লবিক নেতৃগণের প্রকৃত পরিচয় তাঁহাদের অমানুষিক শক্তি। গন্ধী নিজের অমানুষিক শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। লেনিন এবং সমশ্রেণীর অন্যান্য নেতৃগণ পরিচয় দিয়াছেন স্থূল দৈহিক শক্তির, আর গন্ধী পরিচয় দিয়াছেন সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক শক্তির। তিনি যুদ্ধ করেন যীশু খ্রীষ্টের মত।

এই পন্থাকে যে অ-প্রতিরোধ—(Non-Resistance) বলা হয় তাহা ভুল। ইহা অতি তীব্র রকমের প্রতিরোধ—নৈতিক প্রতিরোধ। ইহা যুদ্ধ,—ইহাতে হিংসার স্থান না থাকিলেও ইহা যুদ্ধ।

ইহার অস্ত্র আইন অমান্য। এ দেশে (আমেরিকার যুক্তরাজ্যে) থরো (Thereau) একবার এই পন্থা প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহ তাঁহার কথা শোনে নাই। বর্ত্তমানে এ দেশে (আমেরিকার যুক্তরাজ্যে) মদ্যনিরোধক আইন অমান্য করিয়া লোক সফলকাম হইয়াছে। দক্ষিণ-প্রদেশে শ্বেত সম্প্রদায় নূতন আইন সত্ত্বেও কাফ্রীদিগকে সমান অধিকার দেয় না, সমান দৃষ্টিতে দেখে না। তাহারাও আইন অমান্য করিতেছে। কিন্তু এ সকল আইন অমান্য করিতে হয় গোপনে চোরের মত। গন্ধী এবং তাঁহার

মহাত্মা গন্ধীর অনুবর্ত্তিনী মহিলা দেশসেবিকাবৃন্দ—পিকেট করিতেছেন

অসংখ্য অনুবর্ত্তিগণ যাহা কিছু করেন, সবই প্রকাশ্যে এবং নির্ভয়ে। তাঁহারা সাহস এবং বিশ্বাসের বলে বলীয়ান্ হইয়া অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তোলেন।

গন্ধী যে অসম্ভবকে সম্ভব করিয়াছেন, তাহা ব্রিটিশের সহিত (বৃটিশ রাজপ্রতিনিধির সম্পাদিত) তাঁহার সন্ধির সর্ত্তগুলি দেখিলেই স্পষ্ট বুঝা যায়।

এক বৎসর পূর্ব্বে যখন তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমুদায় শক্তিকে উপেক্ষা করিয়া লবণ প্রস্তুত করিবার জন্য সমুদ্র-তীরাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন, তখন প্রতীচীর জ্ঞানিগণ একবাক্যে বলিয়াছিলেন যে, ব্রিটেন কোনমতেই এই নিরস্ত্র বাদামী রংয়ের লোকটার ইচ্ছার কাছে শির নত করিতে পারে না। এক সপ্তাহ আগেও লোক ইহা অসম্ভব মনে করিত।

আজ গন্ধী ভারত স্বাধীনতার প্রথম মহাযুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছেন। তাঁহার দেশবাসী সমুদ্রতীরে লবণ প্রস্তুত করিয়া ব্রিটিশের একচেটিয়া ব্যবসায় ক্ষুণ্ণ করিতেছেন। আইন অমান্য অপরাধে অবরুদ্ধ তাঁহার সপ্তবিংশতি সহস্র (?) দেশবাসী মুক্তিলাভ করিবে। তাঁহাকে ছাড়া লণ্ডনে এবং দিল্লীতে যে হোমরুল বৈঠক বিফল হইয়াছিল, আজ উহার সকল আলোচনায় তাঁহারই প্রাধান্য থাকিবে।

ব্রিটেনকে তাঁহারই সহিত বুঝাপড়া করিতে হইবে, যেহেতু তিনিই ভারতবর্ষ।

ব্রিটেন যদি তাঁহার দাবী পূরণ না করে, তবে তাঁহার ক্ষীণ দুর্ব্বল হস্তের একটি ইঙ্গিতে পুনরায় পণ্য বর্জ্জনের (Boycott) সেই মহান্ আন্দোলন বন্ধনমুক্ত হইয়া ব্রিটিশের বাণিজ্য মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিবে।

গন্ধী দেবতাই হউন আর পিশাচই হউন, আজ বোধ হয়, তাঁহার ন্যায় শক্তিশালী মানব পৃথিবীতে আর কেহ নাই।

শ্রীবরদাপ্রসন্ন দাসগুপ্ত।
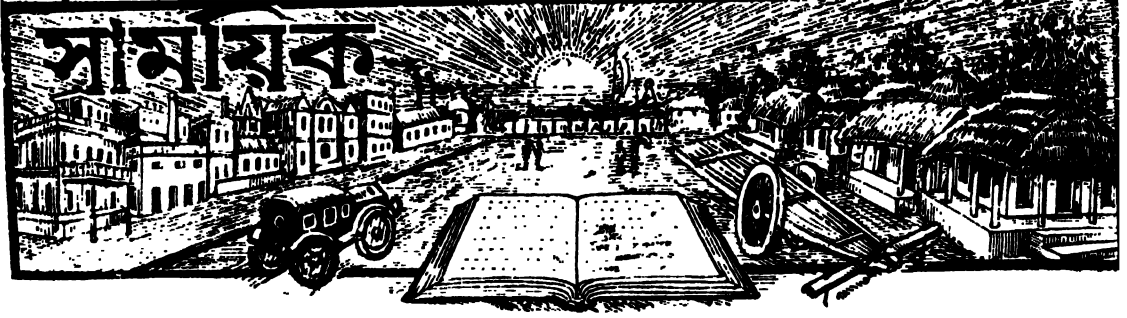
মন্ত্রিপরিবর্ত্তন ও বৈঠকে মহাত্মা গন্ধী

লর্ড-আরউইন কংগ্রেসের প্রতিনিধি মহাত্মা গন্ধীর সহিত দিল্লীর চুক্তি করিয়া কংগ্রেস যাহাতে লণ্ডনের গোল-টেবিল বৈঠকের দ্বিতীয় অধিবেশনে যোগদান করিতে পারে, তাহার পথ করিয়া দিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে তিনি কংগ্রেস নেতৃবর্গকে কারামুক্তি প্রদান করিয়াছিলেন। এ সকল কার্য্যে ভারত-সচিব মিঃ ওয়েজউড বেন্ তাঁহার মতের সমর্থন করিয়াছিলেন। আজ তাঁহারা কেহ স্বপদে অধিষ্ঠিত নাই, যে শ্রমিক সরকারের আমলে এ সকল ঘটনা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, সে শ্রমিক সরকারও আজ নাই, তাঁহাদের স্থানে বিলাতের তিনটি রাজনৈতিক দলের সদস্যগণের মধ্য হইতে বাছিয়া কয়জন সদস্যকে লইয়া মিশ্র মন্ত্রিমণ্ডলী (National Government) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যদিও শ্রমিক-সরকারের প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোনাল্ড এখনও স্বপদে অধিষ্ঠিত আছেন, তথাপি তিনি তাঁহার দলের ভাঙ্গা হাটে প্রতিদ্বন্দ্বিপক্ষদ্বয়ের সহিত যোগাযোগ করিয়া মাত্র ৬ মাস সাম্রাজ্যের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন, তাহার পর সাধারণ নির্ব্বাচনের ফলে তাঁহার শ্রমিকদলের ভাগ্য নির্ণীত হইবে। সম্ভবতঃ তাঁহার দলে যে ভাঙ্গাভাঙ্গি উপস্থিত হইল, তাহার ফলে তাঁহার দল দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে ও রক্ষণশীল দলই দেশশাসনের ভার প্রাপ্ত হইবেন।
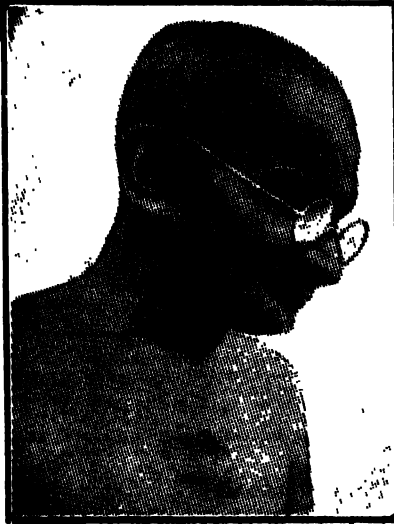
মহাত্মা গন্ধী

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য

শ্রমিক সরকারের বৈদেশিক মন্ত্রী মিঃ আর্থার হেণ্ডারসন এখন প্রকৃতপক্ষে শ্রমিকদলের নেতৃত্ব করিতেছেন। তাঁহার সহিত আরও কয়জন শ্রমিক মন্ত্রী পদত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই মিঃ ম্যাকডোনাল্ডকে বিশ্বাসহন্তা বলিয়া অভিহিত করিতেছেন। যে মিঃ ম্যাকডোনাল্ড শ্রমিকদলকে শক্তিশালী করিয়াছেন, আজ তাঁহাকেই শ্রমিকদল বিশ্বাসঘাতক বলিয়া গণ্য করিতেছে, ইহা প্রকৃতির পরিহাস বলিতে হইবে। কিন্তু তাঁহার বিপক্ষে অভিযোগও গুরু। তাঁহারই দলীয় শ্রমিক মন্ত্রীরা (যাঁহারা পদত্যাগ করিয়াছেন) বলিতেছেন যে, তিনি মার্কিণের ধনী ব্যাঙ্কারদের হুকুমে শ্রমিকদলের মূলনীতি বিসর্জ্জন দিয়াছেন। ইংলণ্ডের বেকারদিগকে যে সাহায্য বণ্টন করিবার কথা, তাহার সঙ্কোচসাধন না করিলে মার্কিণ ব্যাঙ্কারগণ ইংলণ্ডকে টাকা ধার দিবেন না বলিয়া শাসাইয়াছিলেন। ইংলণ্ডের এখন অর্থসঙ্কট উপস্থিত। মিঃ ম্যাকডোনাল্ড বলিতেছেন যে, টাকা না পাইলে অর্থসঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যাইত না, এই হেতু তিনি দেশের মঙ্গলের জন্য বেকারদের বণ্টনের ব্যয়সঙ্কোচ করিতে বাধ্য হইয়াছেন; এজন্য তিনি দলের স্বার্থ বলি দিতেও কাতর নহেন। যাহা হউক, এই ওলোট পালোটের সময়ে মহাত্মা গন্ধী কংগ্রেসের প্রতিনিধিরূপে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিতে যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহাকে স্ট্যাণ্ডিং কমিটী অথবা ফেডারল ষ্ট্রাকচার কমিটী (সংহিত রাষ্ট্রতন্ত্রশাসন গঠন কমিটীর) সদস্য মনোনীত করা হইয়াছে। সুতরাং ঐ কমিটীর যখন সেপ্টেম্বরের প্রথম মুখেই বসিবার কথা, তখন তাঁহার ১৫ই আগষ্ট তারিখেই জাহাজে বিলাতযাত্রা করা উচিত ছিল। কিন্তু সরকারের মনোনীত অনেক প্রতিনিধি ঐ দিন ভারত হইতে যাত্রা করিলেও তাঁহার যাওয়া হয় নাই। তাঁহার যাওয়া হয় নাই বলিয়া শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ও পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যও ঐ দিন বিলাতযাত্রা করেন নাই। গত ২৯শে আগষ্ট তারিখে তাঁহারা তিন জনেই

..রা করিয়াছেন। স্থায়ি কমিটীর অধিবেশন ৭ই সেপ্টেম্বরেই ..ইয়াছে।

এখন দেখিতে হইবে, নির্দ্দিষ্ট দিনে মহাত্মাজীর যাত্রায় ..ধা পড়িল কেন। লর্ড উইলিংডন মহাত্মাজীকে এক ..ত্র লিখিয়াছিলেন যে, "যে উদ্দেশ্যে ..ল্লী-চুক্তি হইয়াছিল, তাঁহার বিলাত না যাওয়ায় তাহা বিফল হইল।" ..ত্তাই তাই। প্রথমবারের বৈঠকের ..ধিবেশনে কংগ্রেসকে আমন্ত্রণ করা ..য় নাই বলিয়া উহা একরূপ বিফল ..ইয়াছিল। বৃটিশ-সরকার উহা মুখে স্বীকার না করিলেও অন্তরে তাহা নিশ্চিতই বুঝিয়াছিলেন; না হইলে তাহারা কংগ্রেস নেতৃগণকে মুক্তিদান করিয়া পরবর্ত্তী বৈঠকে আমন্ত্রণ করিতেন না। অবস্থা যখন এইরূপ, যখন কংগ্রেস ও মহাত্মা গন্ধী বৈঠকে কংগ্রেসের যোগদান এত প্রয়োজনীয় বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, তখন প্রথমে ১৫ই আগষ্ট তারিখে তাঁহারা বৈঠকে যোগদানে অসম্মত হইয়াছিলেন কেন? মহাত্মার মত শান্তিকামী এবং সম্মানের সহিত আপোষের প্রার্থী জগদ্বরেণ্য নেতা যে তুচ্ছ কারণে এইরূপ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার অতি বড় শত্রুও বলিবে না। স্বার্থসর্ব্বস্ব সাম্রাজ্যবাদী কংগ্রেসবিরোধী এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্র যাহাই বলুক, কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তিই বলিবে না যে, কংগ্রেস ইচ্ছাপূর্ব্বক পুনরায় সরকারের সহিত বিরোধ বাধাইবার জন্য অছিলা খুঁজিতেছিল বলিয়াই এইরূপ করিয়াছে।

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু

কংগ্রেসের উদ্দেশ্য

..েন বলিবে না, তাহার কারণও বলিতেছি। কংগ্রেস প্রথমে বৈঠকে আমন্ত্রিত হইয়াও পরে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। কেন, তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন। গুজরাট, যুক্তপ্রদেশ ও উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের প্রাদেশিক সরকার সমূহ দিল্লীর চুক্তিভঙ্গ করিতেছেন, কংগ্রেসের পক্ষ হইতে মহাত্মাজী এই অভিযোগ ভারত-সরকারের সকাশে উপস্থাপিত করিয়া বিচারপ্রার্থী হন। অবশ্য বাঙ্গালার কথা মহাত্মাজী ইহার মধ্যে ধরেন নাই। ..ন্ত বাঙ্গালাতেও যে ভাবে ধরপাকড় ও বিনা বিচারে আটক ..ও চলিতেছে, তাহাতে চুক্তি-ভঙ্গ হইতেছে বলিয়া সকলেরই ..শ্বাস। মহাত্মাজী কেন সে কথা তুলেন নাই, তাহা বুঝা যায় ..। বোধ হয় বাঙ্গালার কংগ্রেসী নেতারা স্ব স্ব প্রভুত্ব ও প্রতি..ও লইয়া পরস্পর গজকচ্ছপের যুদ্ধে উন্মত্ত বলিয়া সে কথা ..ার করিয়া মহাত্মাজীর ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং-কমিটীর সকাশে ..নাইবার অবসর পান নাই। যাহা হউক, মহাত্মাজীর প্রতী..ার প্রার্থনার পরে ভারত-সরকার বলেন, বিশেষ অভিযোগ ..স্থিত করিলে প্রাদেশিক সরকার সমূহ সে সম্বন্ধে বিচার ..রয়া দেখিতে পারেন।

যিনি অপরাধী, তিনিই বিচারক, এ ব্যবস্থা মন্দ নহে! মহাত্মাজী চাহিয়াছিলেন, সালিসি-বোর্ড বা মধ্যস্থসভ্য। সরকার বলিলেন, "কংগ্রেস, অন্যান্য প্রজার ন্যায় সরকারের প্রজা, তাহার সরকারের সমান পদ-মর্য্যাদা নহে (not a parallel government), সুতরাং কংগ্রেসের নির্দ্দেশে তৃতীয় পক্ষকে মধ্যস্থ বলিয়া সরকার মানিবেন না, দিল্লীর চুক্তিতে কংগ্রেসকে এ ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই।"

লর্ড উইলিংডন

বড়লাট লর্ড উইলিংডন স্বয়ং উদারমনা হইতে পারেন, কিন্তু যে ক্ষমতাবলে, যে ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ভারতের রাজপ্রতিনিধি তাঁহার সিবিলিয়ানী ভৈরবী-চক্রের প্রভাব অতিক্রম করিতে সমর্থ হন, তাহা তাঁহার আছে কি না, এই সন্দেহই সকলের মনে জাগিল। এক জন বিশিষ্ট মডারেট নেতা—যাঁহাকে সরকার অত্যন্ত সম্মান করেন এবং যিনি স্বয়ং সরকারের বিশেষ শুভানুধ্যায়ী, তিনিই বলিলেন, "সরকার যখন সকল প্রজার মধ্যে বাছিয়া কংগ্রেসের সহিত চুক্তি করিলেন, তখন কংগ্রেসকে ত অপর প্রজা অপেক্ষা বড় ও আপনার সমকক্ষ বলিয়াই মানিয়া লইলেন। যখন সমানে সমানে মতদ্বৈধ হয়, তখন মধ্যস্থই ত বিরোধের মীমাংসা করিয়া দেয়। তবে সরকার মধ্যস্থ নিয়োগ করায় অপমান বোধ করিলেন কেন?—ইজ্জৎহানিরই বা আশঙ্কা করিলেন কেন?"

এ অবস্থায় কংগ্রেসের আত্মসম্মান রক্ষা করিয়া কিরূপে বৈঠকে যাওয়া যায়? তাই মহাত্মা কংগ্রেস ওয়ার্কিং-কমিটীর পক্ষ হইতে যাত্রায় অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। অমনই চারিদিকে শৃগালের দল চীৎকার করিয়া উঠিল,—"কংগ্রেস সরকারের শত্রু, কংগ্রেস আপোষ চাহে না, একটা ঝগড়া ও যুদ্ধ বাধাইয়া আপনাদের কার্য্য বজায় রাখিতে চায়, সরকার তাহাকে বন্ধুভাবে কর-প্রসারণ করিলেও সেই করমর্দ্দন করিল না।" কিন্তু কেন যে কংগ্রেস মহাত্মাজীর মারফতে মধ্যস্থ চাহিয়াছিলেন, তাহা তাহারা জানিয়াও চাপিয়া গেল। স্বার্থ এমনই চীজ!

কিন্তু তখনও মহাত্মাজী হাল ছাড়েন নাই। তিনি বড় লাটের সহিত সাক্ষাতের বন্দোবস্ত করিয়া এ বিষয়ে বিচার-আলোচনা করিলেন। তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, মধ্যস্থ নাই দেওয়া হউক, সরকারেরই কর্ম্মচারী এক জন হাইকোর্টের জজের (যিনি উভয় পক্ষের শ্রদ্ধার পাত্র) উপর অনাচার-আচরণের ঘটনা সম্বন্ধে তদন্তের ভার দিলেই কংগ্রেসকে তিনি সন্তুষ্ট করিতে পারিবেন।"

তাহাতেও লর্ড উইলিংডনের সরকার সম্মত হইলেন না। হইবার পক্ষে একাধিক বাধা ছিল। একটি যে বিষম! এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রগুলা ফেউয়ের মত চীৎকার জুড়িয়া দিল, "দুর্ব্বল সরকার সব মাটী করিল"—"গেল রাজ্য গেল মান!" এ চীৎকারে মস্তিষ্ক শীতল রাখা সহজ নহে।

তখনও মহাত্মা গন্ধীর মাথা টলে নাই, তখনও তিনি আপোষের আশায় আশান্বিত। আবার বিচার-আলোচনা চলিল।

শেষে স্থির হইল যে, এক জন সিভিলিয়ান ম্যাজিষ্ট্রেট গুজরাটের দুই তালুকে সরকারী কর্ম্মচারীদের অনাচারের বিষয়ে তদন্ত করিবেন। তথাস্ত!—মহাত্মা তাহাও মানিয়া লইলেন। —কংগ্রেস কমিটী তাহাতেও সম্মত হইলেন। একের পর এক ধাপ নামিয়া দেশের লোকের সন্দেহ অবিশ্বাসের এবং অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ার টিটকারীর সম্ভাবনার অবসর দিয়া মহাত্মাজী এই চুক্তিতে সম্মত হইলেন কেন, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীও বা ইহা অনুমোদন করিলেন কেন?

কংগ্রেস শান্তিকামী

অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজের অন্যতম মুখপত্র সরকারের মতের পূর্ণ সমর্থক প্রয়াগের "পাইওনীয়ার" এ সম্বন্ধে এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন :—"কয়দিনের ঘোর উদ্বেগের পর শিমলার লোক অদ্য (২৮শে আগষ্ট) তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়াছে। সরকার ও কংগ্রেস পক্ষের মধ্যে যে আপোস বন্দোবস্ত হইল, তাহাতে সাধারণের বিশ্বাস দৃঢ়মূল হইল যে, সরকার তাঁহাদের মূলনীতির আসল বিষয়ে কোনওরূপ নরম হইবার লক্ষণ প্রকাশ করেন নাই।" কলিকাতার "ষ্টেটসম্যান" পত্রও এই ভাবের কথা বলিয়াছেন। অর্থাৎ সরকার নরম হন নাই, পক্ষান্তরে কংগ্রেসকে নামিতে হইয়াছে, এই ভাবের মত প্রকাশ করিয়া অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রগুলি আনন্দ অনুভব করিয়াছেন।

আবদুল গফুর খাঁ

বস্তুতঃ মাত্র গুজরাটের দুইটি তালুকে অনাচারের তদন্ত করিবার ব্যবস্থা হইল। তাহাও হাইকোর্টের জজের দ্বারা নহে, এক জন সিভিলিয়ান ম্যাজিষ্ট্রেটের দ্বারা। যুক্তপ্রদেশের অনাচারের তদন্ত সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা হইল না। পণ্ডিত জহরলাল এজন্য কোন প্রতিবাদ করেন নাই, এ কথা সত্য, কিন্তু তিনি যে কংগ্রেসে একতা-প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিবাদ করেন নাই, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সীমান্তে তদন্তের ব্যবস্থা না হওয়ায় খাঁ আবদুল গফুর খাঁ সন্তুষ্ট হন নাই বলিয়া অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। এমন কি, এই হেতু সীমান্তে লাল কোর্ত্তাদের মধ্যে দুই দল হইয়া গিয়াছে। উহাদের প্রায় একার্দ্ধ কংগ্রেসের সহিত সংস্রব রাখিবে না বলিয়া মন্তব্য গ্রহণ করিয়াছে। এ সংবাদটি কিন্তু মিথ্যা।

তাহার পর দেখা যাউক, সরকার কি ভাবে মহাত্মা গন্ধীর অভিযোগ গ্রহণ করিয়াছেন এবং অভিযোগ সম্বন্ধে উত্তর প্রদান করিয়াছেন। কংগ্রেসপক্ষ হইতে মহাত্মাজী ৭৯ দফা অনাচারের অভিযোগ করিয়াছিলেন। অভিযোগ হইয়াছিল প্রধানতঃ গুজরাট (বোম্বাই), যুক্তপ্রদেশ ও উত্তরপশ্চিম সীমান্তপ্রদেশের সরকারের বিপক্ষে। উক্ত সরকারত্রয় মোটামুটি উত্তর দিয়াছেন যে, "কতকগুলি অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, অনেকগুলি অভিযোগ সম্বন্ধে প্রকৃত ঘটনা বুঝিবার ভুল হইয়াছে, অবশিষ্টগুলি অতিরঞ্জিত করা হইয়াছে। আবার কতকগুলি ক্ষেত্রে কংগ্রেসকর্ম্মীদের কার্য্যের জন্য শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার্থে সরকারসমূহকে প্রতিষেধমূলক ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে।" ভারত সরকারও এই কৈফিয়ৎ সমর্থন করিয়াছেন, গ্রামোফোনের ন্যায় প্রাদেশিক সরকার সমূহের জবাবের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন।

কিন্তু সাপের বিষ নাই বলিলেই যে বিষ থাকে না, এমন কোন কথা নাই। সরকারী কর্ম্মচারীরা অনাচার-আচরণ করে নাই, কেবল এই কথা বলিলেই তাঁহাদের দোষ মুছিয়া যায় না। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে মহাত্মা চাহিয়াছিলেন,—

(১) কংগ্রেস যে ৭৯ দফা অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে, সরকারকে যে তাহার প্রত্যেকটাকেই বেদবাক্য বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। কংগ্রেস চাহে যে, ভারত সরকার প্রত্যেক অভিযোগের সম্বন্ধে তদন্তের ব্যবস্থা করেন, সেই তদন্তের ভার এক নিরপেক্ষ এবং স্বাধীন সালিস-সঙ্ঘের উপর প্রদত্ত হউক। কংগ্রেস সেই সঙ্ঘের সম্মুখে তাহাদের অভিযোগ সমূহের প্রমাণ দিতে প্রস্তুত আছে এবং এই সঙ্ঘের সিদ্ধান্তও মানিয়া লইতে প্রস্তুত আছে।

(২) সরকার কংগ্রেসের সহিত দিল্লীর চুক্তি করিয়াছেন। সুতরাং সেই চুক্তির সর্ত্ত ভঙ্গ হইয়াছে কি না, দুই পক্ষের কোন পক্ষই তাহার বিচার করিতে পারেন না, সে বিচার করিবেন এক নিরপেক্ষ ও স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ।

সরকার কংগ্রেসের এই দুই প্রার্থনার কোন্‌টি রক্ষা করিয়াছেন?

তথাপি মহাত্মা গন্ধী কংগ্রেসের পক্ষ হইতে লর্ড উইলিংডনের সরকারের শেষ সিদ্ধান্ত মানিয়া লইয়া গোল টেবিল বৈঠকে যাত্রা করিয়াছেন। কেবল ইহাই নহে, তিনি কংগ্রেসের পক্ষ হইতে সরকারকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, "যদিও কংগ্রেস ভবিষ্যতের জন্য আত্মরক্ষার্থে সরাসরি কার্য্যপদ্ধতি (Defensive direct action) অনুসরণ করিবার অধিকার রাখিয়াছে, তথাপি কংগ্রেস সরাসরি কার্য্যপদ্ধতি গ্রহণ না করিবার জন্য অনুক্ষণ প্রয়াস পাইবে।" নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীগুলিকে উপদেশ দিয়াছেন —"দেশের রাজনীতিক অবস্থার গুরু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এই পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও সকল প্রদেশের কংগ্রেসকর্ম্মীরাই যেন দিল্লীচুক্তির সর্ত্তসমূহ পালন করিয়া যান। হয় ত সরকারের আচরণের ফলে সর্ত্তগুলি যথাযথ পালন করা তাঁহাদের পক্ষে কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে তাঁহারা বিষয়টি কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষের গোচর করিবেন। কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত চুক্তির সর্ত্তবিরোধী কোন কায করা চলিবে না।"

সরকার কংগ্রেসপক্ষের তদন্ত প্রার্থনার দাবী অগ্রাহ্য করিবার পরেও কংগ্রেস-কর্ত্তৃপক্ষ এই আদেশ দিয়াছেন। বুঝিয়া দেখুন, শান্তিকামনা করে কে?

বৈঠকের ভবিষ্যৎ

ভবিষ্যতের কথা মানুষের ভাগ্যবিধাতা ব্যতীত কে বলিতে পারে? তবে অতীত ও বর্ত্তমানের ঘটনা বিচার করিয়া এবং পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া বুঝিয়া ভবিষ্যৎ কতকটা অনুমান করিয়া লওয়া যায়। পুন বৈঠকের পরিণাম ফল কি হইবে, তাহা কেহ স্থিরনিশ্চয় হইয়া বলিতে পারেন না বটে, তবে বৈঠকের অতীত ইতিহাস আলোচনা করিয়া, বৈঠকের বর্ত্তমান আকৃতি-প্রকৃতি দেখিয়া এবং ইংলণ্ডের বর্ত্তমান রাজনীতির পারিপার্শ্বিক ভাবগতি বুঝিয়া মনে যে ধারণা হওয়া সম্ভব, তাহা আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

এ সম্বন্ধে প্রয়াগের বিখ্যাত আংলো-ইণ্ডিয়ান পত্র "পাইওনিয়ার" বলিয়াছেন, "মিঃ গন্ধী অবশেষে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহাতে ইংলণ্ডে ও ভারতবর্ষে আনন্দ-কোলাহল উত্থিত হইবে। কেবল উভয় দেশের চরমপন্থীরাই ইহাতে অসন্তুষ্ট হইবে। মিঃ গন্ধী বিলাতের লোকের নিকট আন্তরিক সম্বর্দ্ধনা লাভ করিবেন। বর্ত্তমানে যত বিদেশী বিলাতে গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহই মিঃ গন্ধীর মত জনগণের আগ্রহ ও উৎসাহ সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। তাঁহার সম্বন্ধে ইংরাজীপত্র সমূহে যত অভিমত ও চিত্রাদি প্রকাশিত হইয়াছে, তত আর কাহারও সম্বন্ধে হয় নাই। কংগ্রেসের ন্যায় শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির প্রতি যে সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য, মিঃ গন্ধী গোলটেবিল বৈঠকে সেই সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রাপ্ত হইবেন। আমরা আশা করি, তিনি ভাঙ্গনে যে অসাধারণ ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন, গঠনেও এখন সেই ক্ষমতা ও প্রতিভা প্রদর্শন করিবেন। কেহ কেহ আশঙ্কা করিতেছেন যে, মন্ত্রিমণ্ডল পরিবর্ত্তনের ফলে বৈঠকে সন্তোষজনক ফলপ্রাপ্তির আশা অন্তর্হিত হইয়াছে। কিন্তু জাতীয় মন্ত্রিমণ্ডলে বিলাতের তিনটি রাজনীতিক দলের সদস্য সমান সংখ্যায় থাকিবেন। তবে মিঃ বেনের পরিবর্ত্তে সার স্যামুয়েল হোরের নিয়োগে একটা বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু মিঃ বেনের অপেক্ষা যে স্যার স্যামুয়েল নিকেশ কায করিবেন, ইহা মনে হয় না। মিঃ ম্যাকডোনাল্ড বৈঠকে পূর্ব্বের ন্যায় নেতৃত্ব করিবেন এবং রাষ্ট্রগঠন কমিটীর প্রেসিডেণ্ট থাকিবেন পূর্ব্বের মতই লর্ড স্যাঙ্কি। সুতরাং আশঙ্কার কোনও কারণ নাই। মিঃ গন্ধী যদি স্যার স্যামুয়েল হোরের কথাগুলি মনে রাখিয়া বৈঠকে বসেন, তাহা হইলে কোন গোলযোগেরই সম্ভাবনা নাই। সার স্যামুয়েল বলিয়াছেন, 'আমার মতে যিনি বস্তুতান্ত্রিকতার দিক দিয়া বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া বৈঠকে সংগঠনের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিবেন, তিনিই ভারতের যথার্থ হিতকামী বন্ধু। গভীর রাজনীতিক সমস্যা সমাধানে কথার তুবড়ী বা কল্পনার আতিশয্য কোনও কাযই করিতে সমর্থ হইবে না।' মিঃ গন্ধী যখন বৃটিশ রাজনীতিকদের সহিত মুখামুখি কথাবার্ত্তা ও বিচার-আলোচনা করিবেন, তখন উভয় জাতির মধ্যে সদিচ্ছা ও বন্ধুত্ব দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইবেই।"

এ সমস্ত কথা সত্য হইতে পারে, কিন্তু বৈঠকে ভারতের ন্যায্য আশা-আকাঙ্ক্ষার মর্য্যাদা কিরূপে রক্ষিত হইবে, তাহা না জানিয়া মহাত্মা গন্ধী কিরূপে কংগ্রেসের ও তথা ভারতের পক্ষ হইতে গঠনের কার্য্যে সহযোগিতা করিবেন? বর্ত্তমান ন্যাশানাল গভর্ণমেণ্ট কি ভারতের ন্যায্য আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার অনুরূপ শাসন-সংস্কার সাধন করিতে সম্মতি প্রদান করিবেন? শ্রমিক সরকার লণ্ডন বৈঠক বসাইয়া ভারতবাসীকে আকাশের চাঁদ হাতে ধরিয়া দেন নাই, দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতিও দেন নাই। তথাপি সেই সরকারের প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোনাল্ড তাঁহার দেশের সংস্কারবিরোধী রাজনীতিকদের বৃথা আশঙ্কার বিরুদ্ধে বলিয়াছিলেন, "ভারত শাসন করিবার দুইটি পন্থা আছে। হয় ভারতবাসীর ন্যায্য আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রয়োজনমত পূর্ণ করিয়া তাহাদের সহিত আপোষ-বন্দোবস্ত করিয়া দেশ শাসন করা, না হয় হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত বন্দুক-বেয়নেটে ছাইয়া ফেলিয়া নিছক দর্শণনীতি চালাইয়া দেশ শাসন করা, ইহা ছাড়া তৃতীয় পন্থা নাই। দর্শণনীতি কিছুকাল চালাইলে চলিবে না, উহা চিরকাল চালাইতে হইবে, নতুবা শান্তি রক্ষিত হইবে না। উহা অসম্ভব এবং কোন কালে কোন দেশে উহা সফল হয় নাই। এই হেতু প্রথম পন্থাই শ্রেয়স্কর।" মিঃ বেনও তাঁহার কথার প্রতিধ্বনি করিয়াছিলেন। কিছু কাল আইন অমান্য আন্দোলনের বিপক্ষে কঠোর ধর্ষণ-নীতি চালাইলেও তিনি বড় লাট লর্ড আরউইনের সহিত একমত হইয়া উহা প্রত্যাহার করিয়া কংগ্রেসের সহিত আপোষ-চুক্তি করিয়াছিলেন। লর্ড আরউইন দেশে ফিরিয়াও বলিয়াছেন যে, "ভারতের স্বার্থে আমরা ভারত শাসন না করিলে ভারত আমাদের হস্তচ্যুত হইবেই।"

বর্ত্তমান ন্যাশানাল গভর্ণমেণ্টের সম্বন্ধে এতটুকুও বলা যায় কি? 'পাইওনিয়ার' বলিয়াছেন, "গভর্ণমেণ্টের পরিবর্ত্তনে কিছুই আসিয়া যায় না। মিঃ ম্যাকডোনাল্ডই এই মন্ত্রিমণ্ডলের কর্ত্তা হইয়া রহিলেন। লর্ড স্যাঙ্কিই রাষ্ট্রশাসনতন্ত্র গঠন কমিটীর নেতৃত্ব করিবেন। শ্রমিক, রক্ষণশীল ও উদারনীতিক,—এই তিন দলেরই প্রতিনিধি সমানভাগে মন্ত্রিমণ্ডলে রহিলেন। তবে আর ভাবনা কি? কেবল সার স্যামুয়েল হোর, মিঃ বেনের স্থানে ভারত-সচিবের পদে বসিয়াছেন, ইহাতে কোন কোন জাতীয়তাবাদী ভারতবাসী শঙ্কিত হইয়াছেন। কিন্তু ইহাতেই বা শঙ্কার কি কারণ আছে? তিনিও প্রথম বৈঠকে বসিয়াছিলেন এবং সংহিত রাষ্ট্রশাসনতন্ত্র গঠনে শ্রমিক সরকারের পূর্ণ সমর্থন করিয়াছিলেন। এখনও তিনি সে কার্য্যে বাধা প্রদান করিবেন না। কাজেই যদি কংগ্রেসের প্রতিনিধি মিঃ গন্ধী তাঁহার সহিত আপোষে কথাবার্ত্তা কহেন, তাহা হইলে একটা সুবন্দোবস্ত হইবেই।"

খাসা কথা। কিন্তু এইখানেই একটা বিলক্ষণ রকমের "কিন্তু" আছে। সার স্যামুয়েল যে কে, তাহা এ যাবৎ কেহ জানিত না। তিনি নাকি ভারতসচিবের পদে বসিয়াই বলিয়াছেন, "ভারতের সহিত আমার এই যোগাযোগ আমার জীবনের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ঘটনা বলিয়া আমি গৌরব অনুভব করিতেছি।" না করিবেন কেন? ছিলেন, তিনি বিমানবিভাগের মন্ত্রী। একবার বিমানে সস্ত্রীক ভারতে উড়িয়া আসিয়াছিলেন। ভারতের সহিত সম্বন্ধ তাঁহার এইটুকু।

সুতরাং ভারতের সম্পর্কে তাঁহার অভিজ্ঞতা কত, তাহা বুঝিতে বাকী থাকে না। মিঃ ম্যাকডোনাল্ড তাঁহার সুযোগ্য সচিব মিঃ বেনকে সরাইয়া এ হেন লোককে ভারত-সচিবের পদে বসাইলেন কেন? ইহার মধ্যে কার্য্যকারণের কি সম্পর্ক আছে?

ভারতের ন্যায্য দাবী পূর্ণ করিবার দিকে তাঁহার কতটা টান, তাহার একটু পরিচয় দিতেছি। ভারত-সচিবের পদে বসিয়াই আনন্দে—গর্ব্বে স্ফীত হইয়া তিনি বলিয়াছিলেন,—"ভারতের ও বৃটেনের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে হইলে উভয় দেশেরই স্বার্থের দিকে চাহিয়া বস্তুতান্ত্রিকতার উপর নির্ভর করিতে হইবে, কল্পনায় কিছুই হইবে না। সাম্রাজ্যের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যে কয়টি রক্ষাকবচের ব্যবস্থা বিগত বৈঠকে ধার্য্য হইয়াছে, সেইগুলি শাসন-সংস্কারের মূলগত ও অপরিবর্ত্তনীয় সর্ত্ত বলিয়া ধরিয়া লইলে আমি বৈঠকে যোগদান করিয়া বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুমোদন করিতে পারি।" সার স্যামুয়েল ইহাতেও তুষ্ট হন নাই। তিনি ভারতে সিভিল সার্ভ্যাণ্টদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াছেন। বিলাতেও সিভিল সার্ভ্যাণ্ট আছেন। তাঁহারা সাধারণের সেবক বলিয়া বিবেচিত হন। সাধারণের প্রদত্ত বেতনের বিনিময়ে তাঁহারা এই সেবা করিয়া থাকেন। ইহাতে তাঁহাদের বাহাদুরীর কথা কেহ কখনও ঘোষণা করে না। এই হেতু তাঁহারা তাঁহাদের ওজন বুঝিয়া চলেন। কিন্তু ভারতের পক্ষে সবই বিপরীত। সার স্যামুয়েল মামুলী প্রথামত ইস্পাতের কাঠামোটিকে আরও শক্ত করিবার ইঙ্গিত দিয়াছেন। ইহা হইতেই তাঁহার ভারতের ন্যায্য দাবী পূর্ণ করিবার বিষয়ে মনোভাব বেশ বুঝা যায়।

বিলাতে "ডেলি মেল" পত্র সার স্যামুয়েলের এই কৈফিয়ৎ সত্ত্বেও সন্তুষ্ট হন নাই। তিনি তাঁহাকে শাসাইয়াছেন যে, "তিনি রক্ষণশীল পক্ষের তরফ হইতে গত বৈঠকে শ্রমিক সরকারের কার্য্যপদ্ধতির সমর্থন করিয়াছিলেন। এবার আর তাহা করা চলিবে না। রক্ষণশীল দল তাঁহার কাছে আরও কঠোর নীতির প্রত্যাশা করে। ভারতের ভূতপূর্ব্ব ভারত-সচিব বেন ও বড়লাট আরউইন ভারতে যে শাসননীতি প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহাতে যেন বৃটেনকে অগ্নিপরীক্ষায় ফেলা হইয়াছিল। সে নীতি আর চলিবে না। সার স্যামুয়েলকে রক্ষণশীল দলের হইয়া থাকিতে হইলে সেই নীতি একবারে পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে।"

যদি গোলটেবিলে এই নীতি অনুসৃত হয়, তাহা হইলে তাহার পরিণামফল কি হইবে? গতবারের বৈঠকের পূর্ব্বে বিলাতের কর্তৃপক্ষের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছিল, "বৈঠকে যে বিষয়ে অধিকাংশ একমত হইবে (The largest measure of agreement) তাহাই গৃহীত হইবে।" যদি সেই নীতি অনুসারে এবারেও কায হয়, তাহা হইলে বৃটিশ সরকার যে ব্যবস্থা করিবেন, তাহা কংগ্রেস প্রতিনিধি স্পর্শও করিবেন কি না সন্দেহ। কিন্তু যদি বৃটিশ কর্তৃপক্ষ এবার "অধিকাংশের মত" গ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের জাতীয়তাবাদীদের প্রতিনিধির আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবারও ব্যবস্থা করেন, তবেই বৈঠক সাফল্যমণ্ডিত হইবে। ন্যাশনাল গভর্ণমেণ্ট এ কথাটি স্মরণ রাখিবেন। ছয় মাস পরেও যদি বৈঠক চলিতে থাকে, তাহা হইলে তখনও যে গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাঁহাদিগকেও এ কথাটা স্মরণ রাখিতে হইবে। নতুবা শান্তি ও সন্তোষ চিরস্থায়ী করিবার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইবে।

দমনের উপদেশ

বিপ্লববাদ এ দেশের ধাতুসহ নহে, ইহা ভারতের অতীত ইতিহাসই সাক্ষ্য দিবে। ইংরাজ আমলের বহু দিন অতীত হইবার পর উহা প্রতীচ্যের শিক্ষা-দীক্ষা হইতে এ দেশে উদ্ভূত হইয়াছে। তবে উহা যে এখন এ দেশে বদ্ধমূল হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু উহা আমাদের দেশের ভাবধারার প্রতিকূল, উহা আমাদের ধাতুসহ নহে। কি কারণে তবে এই বিদেশী বিষবৃক্ষের বীজ এ দেশে উপ্ত হইল, তাহা লইয়া এখন আর তর্ক করিয়া কোন ফল নাই। বরং কিসে এই বিষের রোগ এ দেশ হইতে দূর করা যায়, তাহার উপায় চিন্তা করা সরকারের ও দেশবাসীর কর্ত্তব্য।

বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী যুগের বিপ্লববাদ ও বোমার ফলে একাধিক ষড়যন্ত্র ও হত্যাকাণ্ড বা হত্যার চেষ্টা হইয়া গিয়াছে। উহাতে বিপ্লববাদীদের লক্ষ্য ছিল সরকারী পুলিস কর্ম্মচারী, গোয়েন্দা ও সরকারের আদালতের বিচারক। সে অতীত ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। তাহার পর ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস হইতে এ যাবৎ এই ভাবের যতগুলি বৃটিশ কর্ম্মচারীর হত্যাকাণ্ড বা উহার চেষ্টা হইয়া গিয়াছে, কয়েক দিন পূর্ব্বে ভূতপূর্ব্ব ভারত-সচিব মিঃ বেন তাহার একটা হিসাব দিয়াছিলেন। হিসাবটি এই ;—

১৯২৮ খৃঃ—লাহোরে পুলিস কর্ম্মচারী মিঃ সণ্ডার্শের হত্যা ; ১৭ই ডিসেম্বর। ১৯২৯ খৃঃ—(১) দিল্লীর ব্যবস্থা পরিষদে বোমা নিক্ষেপ, ৮ই এপ্রিল (২) উত্তরপশ্চিম সীমান্তে এক সিপাহীর গুলীতে কাপ্তেন হেক্রফটের মৃত্যু, ২২শে এপ্রেল, (৩) ওয়াজিরিস্থানে কাপ্তেন ষ্টিফেন গুলীতে নিহত, ১৪ই জুন, (৪) দিল্লীর নিকটে বড় লাটের রেল-গাড়ী উড়াইয়া দিবার চেষ্টা, ২৩শে ডিসেম্বর।

১৯৩০খৃঃ—(১) লাহোরে ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ লুইসকে গুলী করিয়া হত্যা করিবার চেষ্টা, ফেব্রুয়ারী মাস, (২) লোরালাইতে সার্জ্জেণ্ট ইভস নিহত, ২রা ফেব্রুয়ারী, (৩) লাণ্ডিকোটালে লেফটানেণ্ট হক্‌স্ নিহত, ২৪শে ফেব্রুয়ারী, (৪) চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার আক্রমণকালে দুই জন য়ুরোপীয় নিহত, ১৮ই ফেব্রুয়ারী, (৫) মুলতানে য়ুরোপীয় পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আহত, ২০ মে, (৬) ঝাঁসিতে কমিশনারকে আক্রমণের চেষ্টা, আগষ্ট মাস, (৭) লায়ালপুরে চেনাব ক্লাবের মধ্যে বোমা নিক্ষেপ ৬ই জুন, (৮) কলিকাতায় পুলিস কমিশনার সার চার্লস টেগার্টের উপর বোমা নিক্ষেপ, ২৫শে আগষ্ট, (৯) ঢাকায় বঙ্গের পুলিসের ইনস্পেক্টর জেনারল লোম্যানকে হত্যা এবং পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ হডসনকে হত্যার চেষ্টা, ২৮শে আগষ্ট, (১০) লাহোরের পুলিস ইনস্পেক্টর মিঃ খাইদকে হত্যার চেষ্টা, ১৫ই আগষ্ট, (১১) বোম্বায়ে সার্জ্জেণ্ট টেলারকে ও তাঁহার পত্নীকে গুলী মারা, ১৬ই অক্টোবর, (১২) ব্রহ্মে ব্রহ্ম সরকারের বিশিষ্ট কর্ম্মচারিগণকে যে রেল-গাড়ী বহন

করিতেছিল, সেই ট্রেণ ধ্বংসের চেষ্টা, ২৮শে আগষ্ট, (১৩) কলিকাতার দক্ষিণে য়ুরোপীয় সরকারী পুলিস কমিশনারের বাঙ্গলোয় বোমা নিক্ষেপ, ২৯শে অক্টোবর, (১৪) হাইদ্রাবাদে পুলিস স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্টের গৃহপ্রাঙ্গণে বোমা নিক্ষেপ, ৪ঠা ডিসেম্বর, (১৫) কলিকাতায় বাঙ্গালার লাট দপ্তরে জেলের ইন্স্পেক্টর-জেনারেল লেফটানেণ্ট-কর্ণেল সিমসনকে গুলী মারিয়া হত্যা ও মিঃ নেলসনকে হত্যার চেষ্টা, ৮ই ডিসেম্বর, (১৬) লাহোরে কাপ্তেন ম্যাক্রেনাঘানকে গুলী মারিয়া হত্যা, ৯ই ডিসেম্বর, (১৭) লাহোরে পঞ্জাবের লাট সার জিওফ্রে মণ্টমোরেন্সীকে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তনকালে হত্যার চেষ্টা, ২৩শে ডিসেম্বর (১৮) ব্রহ্মের ওয়েওয়া নামক স্থানে বনবিভাগের মিঃ ফিল্ডস্ ক্লার্ককে হত্যা, ২৪শে ডিসেম্বর।

১৯৩১ খৃঃ—(১) চার্ণাদায় সহকারী কমিশনার কাপ্তেন বার্ণেসকে হত্যার চেষ্টা, ১৮ই ফেব্রুয়ারী, (২) কৃষ্ণনগরে পুলিস-স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্টের গৃহে বোমা নিক্ষেপ, ১৭ই মার্চ্চ, (৩) চার্ণাদায় আবার কাপ্তেন বার্ণেসকে হত্যার চেষ্টা, ৫ই এপ্রেল, (৪) মেদিনীপুরে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ পেডিকে হত্যার চেষ্টা (তাহার ফলে পরদিন মৃত্যু), ৭ই এপ্রেল, (৫) কাণপুরে পুলিস-স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট পত্রমধ্যে বোমার মশলা প্রেরণ, ২২শে মার্চ্চ, (৬) পুনায় বোম্বাইএর অস্থায়ী গভর্ণর সার আর্ণেষ্ট হটসনকে হত্যার চেষ্টা, ২২শে জুন, (৭) মধ্যপ্রদেশে চলন্ত পঞ্জাব-মেলে লেফটানেণ্ট হেক্সট ও লেফটানেণ্ট সীবকে হত্যার চেষ্টা, ২৩শে জুলাই, (৮) আলিপুরে সেসন জজ মিঃ গার্লিককে গুলী মারিয়া হত্যা, (৯) টাঙ্গাইলে ঢাকা বিভাগের কমিশনার মিঃ ক্যাসেলকে আদালতের এজলাসে গুলী মারিয়া হত্যার চেষ্টা, (১০) চট্টগ্রামের পুলিস ইনস্পেক্টর মিঃ আসামুল্লাকে (যদিও তিনি য়ুরোপীয় নহেন) গুলী করিয়া হত্যা, ৩০শে আগষ্ট।

ইহা ছাড়া ইনস্পেক্টর তারিণী প্রমুখ দেশীয় সরকারী কর্ম্মচারীও একাধিক হতাহত হইয়াছেন। ইহা উড়াইয়া দিবার কথা নহে। এদেশবাসী অহিংসা ধর্ম্ম বহু যুগ যাবৎ পালন করিয়া আসিতেছে। বর্ত্তমানে ভারতের অবিসংবাদী নেতা মহাত্মা গন্ধী এই মন্ত্র প্রচার করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারই মন্ত্রে অনুপ্রাণিত দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস দেশকে অহিংসায় অবিচলিত থাকিতে অনুজ্ঞা প্রদান করিয়াছে। মহাত্মা গন্ধী স্বয়ং, কংগ্রেস এবং বহু কংগ্রেস নেতা অহিংসা মন্ত্রে দীক্ষিত ও অবিচলিত বলিয়া বহুবার এইরূপ রাজনীতিক হত্যা বা হত্যার চেষ্টার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। তথাপি এক শ্রেণীর অ্যাংলোইণ্ডিয়ান পত্র কংগ্রেসকে দণ্ডিত করিবার জন্য ক্রমাগত সরকারের দরবারে 'হত্যা' দিতেছেন! আর তাঁহাদের সুরে পোঁ ধরিয়া এক শ্রেণীর বিদেশী ব্যবসাদার সভাসমিতি করিয়া সরকারকে ক্রমাগত ধর্ষণের আইন বানাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছেন। এই উপলক্ষে হঠাৎ এক ভূঁইফোঁড় 'Royalist' বা 'Loyalist' party গজাইয়া উঠিয়াছে। ইহারা সকলে যেন যুক্তি করিয়া সরকারকে জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিয়া গিয়াছেন। অথচ আশ্চর্য্য এই যে, কিশোরগঞ্জ, ঢাকা বা চট্টগ্রামে যে অনাচারে জাতীয়তাবাদীরা সর্ব্বস্বান্ত, লাঞ্ছিত ও বিপর্য্যস্ত হইল, সে সম্বন্ধে এই শ্রেণীর 'ভারত-হিতৈষীরা' সরকারকে কোনওরূপ কঠোর প্রতীকারোপায় অবলম্বন করিতে পীড়াপীড়ি করা দূরে থাকুক, এমন কি, হৃত-সর্ব্বস্ব উৎপীড়িতগণের প্রতি সমবেদনাও প্রকাশ করেন নাই!

এই শৃগালের দলের চীৎকারে অবশ্য ভারতবাসীর কিছুই আসিয়া যায় না, কিন্তু দুঃখের কথা, চীৎকারের অশুভ ফল ফলিবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। প্রকাশ, ব্যবস্থাপরিষদের অধিবেশনে সরকারী পক্ষ হইতে সরকারকে মুদ্রাযন্ত্র আইন পুনঃপ্রবর্ত্তিত করিবার উপযোগী বিল উপস্থাপিত করা হইয়াছে। ঐ বিলে হিংসামূলক কার্য্যের প্রশংসা দণ্ডার্হ করা হইতেছে। উহার অপব্যবহার হইবার সম্ভাবনা নাই, এমন কথা বলিতে পারা যায় না। বিলাতে সার মাইকেল ওডয়ার রৌলট আইনের অথবা সীমান্তের বিশেষ আইনের মত কঠোর আইন প্রবর্ত্তন করিবার জন্য সরকারকে পরামর্শ দিয়াছেন। এই প্ররোচনার জন্যই হউক, বা অন্য যে কারণেই হউক, বাঙ্গালার গভর্ণর সার ষ্ট্যানলি জ্যাকসন্ কতকগুলি 'হাম্ পন্থরায়' য়ুরোপীয় ও ভারতীয়ের 'প্রতিনিধির' (deputation) ধর্ষণনীতি প্রার্থনার উত্তরে বলিয়াছেন, "এমন অবস্থার উদয় হইয়াছে, যাহাতে সরকারকে ভাবিতে হইতেছে যে, বর্ত্তমান আইনে কলিকাতা করপোরেশনের কার্য্য নিয়ন্ত্রণ করিবার উপযোগী ক্ষমতা ও অধিকার সরকারের আছে কি না?" ইতিপূর্ব্বে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভকাল হইতে "ষ্টেটশম্যান" পত্র ক্রমাগত করপোরেশানের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য চালাইয়া আসিয়াছেন। যখনই করপোরেশান জাতীয় কোন্ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান-কার্য্যের আয়োজন করিয়াছে, তখনই এই ইণ্ডিয়ান পত্রখানি ক্রোধে হিংসায় জ্বলিয়া উঠিয়াছে, ইহার বিপক্ষে চীৎকার করিয়াছে, সরকারকে ক্রমাগত ইহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছে। য়ুরোপীয়রাও এই পত্রের সুরে সুর মিশাইয়াছে, ইলবার্ট বিলের আন্দোলনকালের 'নেভার নেভার' রবের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি তুলিয়াছেন। কাযেই আজ ইহার স্বাধীনতা হরণ করার বিভীষিকা প্রদর্শিত হইতেছে বলিয়া বিস্মিত হইবার কিছুই নাই।

ঠিক এই ভাবেই দেশীয় জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রসমূহের স্বাধীনতা হরণের চেষ্টা হইতেছে। সরকার ব্যবস্থাপরিষদের কতকগুলি বেসরকারী সদস্যের পরামর্শ অনুসারে সংবাদপত্র-দলন আইন পুনঃ প্রবর্ত্তন করিতেছেন। বলা হইতেছে, যে রচনা হত্যা বা হত্যার চেষ্টাকারীর প্রশংসা করিবে, অথবা ঐ হীন কার্য্যে উৎসাহিত বা উত্তেজিত করিবে, সেই রচনা দণ্ডনীয় হইবে। অবশ্য ইহাতে অহিংসাবাদী জাতীয়-দলের পত্রের আশঙ্কার কারণ নাই। কিন্তু এ দেশের পুলিস অতিরিক্ত ক্ষমতা পাইলে সে ক্ষমতার অনেক ক্ষেত্রে অপব্যবহার করিয়া থাকে। আশঙ্কা সেইখানে। লর্ড উইলিংডনের সরকার সে অস্ত্র কি ব্যবহার করিতে দিবেন? উহাতে অসন্তোষ ও অশান্তি বৃদ্ধি হইবারই সম্ভাবনা নাই কি?

জাতীয় পতাকা

বিগত ১৮ই ভাদ্র ৩০শে আগষ্ট রবিবার ভারতের সর্ব্বত্র জাতীয় পতাকা উৎসব সম্পন্ন হইয়াছিল। এই উৎসবের একটু বিশেষত্ব আছে। কেন না, এ যাবৎ যে পতাকা জাতীয় সম্মানের

প্রতীক বলিয়া গৃহীত হইয়া আসিয়াছে, সে পতাকার উৎসব হয় নাই, পতাকা নব কলেবর ধারণ করিয়াছে। গত ১৯৩০ খৃঃ প্রথম ভারতের জাতীয় পতাকা গৃহীত হইয়াছিল এবং তাহার মূলে সমগ্র জাতি সমবেত হইয়া অন্যান্য স্বাধীন জাতির মত আপনাদের জাতীয় পতাকার সম্মান রক্ষার জন্য প্রাণান্ত সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছিল। সেই পতাকা ফরাসীদেরই মত ত্রিবর্ণাঙ্কিত ছিল। কিন্তু উহাতে শিখ সম্প্রদায় ঘোর আপত্তি উত্থাপন করেন। তাঁহারা উহাতে সাম্প্রদায়িকতার নিদর্শন দেখাইয়াছিলেন। সুতরাং এ বিষয়ে বিচার আলোচনা করিবার জন্য কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ (ওয়ার্কিং কমিটী) গত ২রা এপ্রেল তারিখে এক কমিটী নিয়োগ করেন। ঐ কমিটী কংগ্রেসের গ্রহণযোগ্য পতাকার সম্বন্ধে পরামর্শ দিয়া তাঁহাদের রিপোর্ট পেশ করেন। বোম্বাই সহরে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর বিগত অধিবেশনে কমিটীর রিপোর্ট অনুসারে স্থির হয় যে, অতঃপর জাতীয় পতাকা ত্রিবর্ণাঙ্কিত হইবে বটে, কিন্তু উহার পরিকল্পনা এইরূপ হইবে :— "পতাকার উপর দিক হইতে যথাক্রমে গৈরিক (জাফ্রাণ), শ্বেত ও হরিৎ বর্ণ হইবে এবং শ্বেতাংশের মধ্যস্থলে গাঢ় নীল বর্ণের চরকা অঙ্কিত থাকিবে। বর্ণগুলি সাম্প্রদায়িকতার নিদর্শন হইবে না। গৈরিক বা জাফ্রান সাহস ও ত্যাগের, শ্বেত শান্তি ও সত্যের, হরিৎ বিশ্বাস ও শৌর্য্যের এবং চরকা আশার পরিচায়ক হইবে।" ওয়ার্কিং কমিটীর পরামর্শ নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটী গ্রহণ করিয়া নির্দ্দেশ করেন যে, ৩০শে আগষ্ট তারিখে সমগ্র ভারতে জাতীয় পতাকা উড্ডীন করিতে হইবে। ইহা উৎসবের ইতিহাস। মুক্তিকামী ভারতবাসী মার্কিণ জাতির "Star spangled Banner তারকালাঞ্ছিত পতাকা" অথবা ফরাসীর ত্রিবর্ণ পতাকার মত আপনার জাতীয় পতাকার সম্মানরক্ষায় দৃঢ়সঙ্কল্প হইবেন, ইহাই আশা।

কুটীর-শিল্প

বেকার সমস্যা ক্রমশঃ বাঙ্গালায়—বিশেষতঃ বাঙ্গালার ভদ্রলোকশ্রেণীর মধ্যে—যেরূপ প্রবল ও ভীষণ হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে দেশের লোকের ত কথাই নাই, সরকারেরও আর নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকার উপায় নাই। এই বেকার সমস্যা যে কতক পরিমাণে বিপ্লববাদীদের দলপুষ্টির কারণ, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না।

এই সর্ব্বনাশা রোগের প্রতীকারোপায় কি? দেশ কৃষিপ্রধান, কৃষিতে অধিকাংশ অধিবাসীই নিযুক্ত। কিন্তু সকল লোকই উহার উপর অথবা কৃষিজাত পণ্যের উপর নির্ভর করিতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাশিক্ষাও লোকের পক্ষে যতটুকু অর্থকরী হইবার, তাহা হইয়াছে, এখন উকীল, ডাক্তার, এঞ্জিনিয়ারের ক্ষেত্রও স্বল্পপরিসর। কাযেই অন্য এমন পন্থা আবিষ্কার করা চাই, যাহাতে ভদ্র বেকাররা এমন শিক্ষা লাভ করিবার সুযোগ পায়, যাহার ফলে তাহারা কেবল যে আপনাদের উদরান্ন সংস্থান করিতে সমর্থ হইবে, তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে তাহারা দেশে নিত্যনূতন ধনাগমের সুবিধা করিতে সমর্থ হইবে।

আমাদের বিশ্বাস, দেশের নষ্টপ্রায় অথবা ধ্বংসপ্রাপ্ত শিল্প-বাণিজ্যের উদ্ধারসাধন করার মধ্যে এই প্রতীকারোপায় পাওয়া যাইবে। আমাদের দেশে কখনও প্রতীচ্যের মত প্রকাণ্ড কল-কারখানার হাঙ্গামা ছিল না। উহা আমাদের ধাতুসহও নহে। বর্ত্তমানে প্রতীচ্যে বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রকাণ্ড কলকারখানার ও ব্যবসায়-সঙ্ঘ (Trusts) আদি প্রতিষ্ঠার ফলে সমাজে ওলট-পালোট হইয়াছে, কম্যুনিজম, নিহিলিজম প্রমুখ আন্দোলনে ধনিক ও শ্রমিকে বিরোধ বাধিয়াছে, সমাজে ক্রমাগত অল্পের সৌভাগ্য ও বহুর দুর্ভাগ্যের সংঘর্ষে অসন্তোষ ও অশান্তি বৃদ্ধি হইতেছে। ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী ও মার্কিণদেশের সংঘর্ষ সমধিক। ফ্রান্সে ততটা নাই। রাসিয়া কম্যুনিজমের চেহারা পরিবর্ত্তন করিয়া দিতেছেন এবং বড় বড় কলকারখানার পরিবর্ত্তে কুটীর-শিল্পের দিকে ঝোঁক দিতেছেন বলিয়া সে দেশে সংঘর্ষ অনেক কমিয়াছে।

এদেশে বহুযুগ ধরিয়া কুটীরশিল্পই রাজত্ব করিয়াছে। ব্যবসায় ও পেশার ভাগাভাগির ফলে এমন একটা Trade Guild গড়িয়া উঠিয়াছিল, যাহাতে শ্রমিক ও ধনিকে সংঘর্ষের সম্ভাবনা ছিল না। বহু প্রাচীন কালে মেগাস্থিনিস আমাদের জাতিবিভাগের ও পেশার ভাগাভাগির মধ্যে Trade guild-এর মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। আমাদের বিশ্বাস, এ দেশে এখন যদি বড় বড় কলকারখানার পরিবর্ত্তে নষ্টপ্রায় অথবা ধ্বংসপ্রাপ্ত কুটীরশিল্পের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে বেকার সমস্যার সমাধান সহজ হইতে পারে।

এই হেতু ২৯শে জুলাই তারিখে বঙ্গীয়-ব্যবস্থা পরিষদে শিল্প-বাণিজ্যের সাহায্যে সরকারের সাহায্য দান (Bengal State Aid to Industries) সম্পর্কে যে আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। এই আইনটি বিধিবদ্ধ হওয়ায় দেশের ভবিষ্যতে সমূহ মঙ্গল হওয়ার সম্ভাবনা। আমরা জানি, এই ভাবের একখানি বিল পাশ করাইয়া লইবার জন্য একাধিকবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালার দুর্ভাগ্যবশতঃ এযাবৎ উহা সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। গত বৎসরের আগষ্ট মাসে কৃষি ও শিল্প-বাণিজ্য বিভাগের মন্ত্রী অনারেবল মিঃ ফারোকী এই বিল কাউন্সিলে পেশ করিবার জন্য বাঙ্গালার গভর্ণরের অনুমতি গ্রহণ করিয়া বিল পেশ করিয়াছিলেন। কাউন্সিলের বর্ত্তমান অধিবেশনে তিনি বিলখানি বিবেচনা করিবার জন্য দিয়াছিলেন। তাহারই ফলে বিলখানি পাশ হইয়াছে, আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। ইহা ফারোকী সাহেবের দেশপ্রেমের পরিচায়ক। বিলের ভবিষ্যৎ উপকারিতার সম্ভাবনার কথা স্মরণ করিয়া দেশবাসী তাঁহার প্রতি নিশ্চিতই কৃতজ্ঞ থাকিবে। গভর্ণর স্যার ষ্ট্যানলিও এজন্য ধন্যবাদের পাত্র। তিনি যদি এখন আইনখানি কার্য্যকর করিতে পারেন, তবে তাঁহার নাম ফারোকী সাহেবের সহিত স্মরণীয় হইয়া রহিবে।

এ দেশের কুটীর-শিল্প সমূহের আকরস্থান সমূহ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তথাকার নষ্টপ্রায় অথবা ধ্বংসপ্রাপ্ত শিল্প-বাণিজ্যের পুনরুদ্ধার করিবার জন্য ইহার পূর্ব্বে এ দেশের অনেক রাজনীতিক বাঙ্গালা সরকারকে অনেক পীড়াপীড়ি করিয়াছেন। কিন্তু কখনও কখনও সরকার পক্ষ হইতে এক একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে দেশের লোকের কোনও উপকার

হয় নাই, বরং ক্ষতিই হইয়াছে। কারণ, সেই রিপোর্ট পড়িয়া বিদেশী বণিকরা আমাদের বাজারে বাজারে ঘুরিয়া লোকের চাহিদা বুঝিয়া বিদেশ হইতে লোকের রুচির অনুরূপ পণ্য প্রস্তুত করাইয়া এ দেশে চালান দিয়াছে। এইরূপে আমাদের কাপড়, পিত্তলকাঁসার বাসন, মাটীর খেলানা, আসবাব ও ঠাকুর-দেবতা প্রভৃতি পণ্যের ব্যবসা বিদেশীয়ের হস্তগত হইয়াছে। লর্ড কার্মাইকেল গভর্ণররূপে এ পাপের কতকটা প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গালার কুটীর-শিল্প সম্বন্ধে জ্ঞান বিতরণের উদ্দেশ্যে একটি নক্সা প্রস্তুত করান এবং উহার মধ্যে যেগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে, তাহার উদ্ধারসাধনার্থ সরকারী সাহায্য দানের সংকল্প করেন। তাঁহারই আমলে মিঃ মিকের নিয়ামকত্বে (Director of Industries) একটি শিল্পবাণিজ্য বিভাগের প্রতিষ্ঠা হয় এবং তৎসম্বন্ধে একটি Comm rcial মিউজিয়াম ও কমার্সিয়াল লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু সিবিলিয়ান ভৈরবীচক্র লর্ড কারমাইকেলকে যেমন বাঙ্গালায় সুপেয় পানীয় সরবরাহের সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত করিয়াছিল, এ ক্ষেত্রেও তাহাই করিয়াছিল। তাহার উপর এ দেশের অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ও য়ুরোপীয় ব্যবসাদারদের 'সাধু' চেষ্টায় তাঁহার মনের বাসনা অপূর্ণ রহিয়া যায়। তদবধি এ যাবৎ আর কোন চেষ্টা হয় নাই।

এখন সার ষ্ট্যানলি জ্যাকসনের আমলে আবার চেষ্টা হইতেছে। যে আইন পাশ হইয়াছে, তাহা কার্য্যক্ষেত্রে সকল করিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন সমধিক। সরকার যদি যথার্থই দেশের নষ্টশিল্প উদ্ধারে ব্রতী হইতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চিতই এ বিষয়ে কৃষিশিল্প বিভাগের মন্ত্রীকে যথার্থ কাজ করিবার সুযোগ দিবেন। ইতিমধ্যেই শিল্প বিভাগ হইতে একটি Industrial Directory রচিত হইতেছে। উহাতে বাঙ্গালার হাটে বাজারে যে সকল পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় হয়, অথবা চাহিদা আছে, তাহার ফর্দ্দ থাকিবে। অবশ্য Factroy Act বা কারখানা আইনের আমলে পড়ে না, এমন সমস্ত ছোটখাটো কুটীরশিল্পের সম্বন্ধেই পরিচয় থাকিবে। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে দেশের সর্ব্বত্র এই ভাবের ছোটখাটো কুটীরশিল্পজাত পণ্য দেখা দিয়াছে। দেশের লোকেরও এখন স্বদেশী পণ্য ক্রয়ে একটা বিশেষ আগ্রহ জন্মিয়াছে। সাবান, জুতা, কাপড়, তৈল, বাল্তি, ট্রাঙ্ক, গেঞ্জি, মোজা, রুমাল, সুটকেশ প্রভৃতি এখন দেশেই প্রস্তুত হইতেছে, বিদেশ হইতে আমদানী উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। কিন্তু এখনও অনেক পণ্য যাহাতে দেশেই প্রস্তুত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। দেশের হাটে বাজারে লণ্ঠন, বাল্তি, কর্ম্মকার ও সূত্রধরের যন্ত্রপাতি, বোতাম, পিতলকাঁসার বাসন ও খেলানা, মাটীর বাসন ও খেলানা, কাপড় কাচা ও গায়ে মাখা সাবান, ছাতা, করগেট আয়রণ, ষ্টিলট্রাঙ্ক প্রভৃতির খুবই চাহিদা আছে। এই সকল ছোটখাটো শিল্পব্যবসায়গুলিকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে এবং ক্রমে অন্যান্য শিল্প-ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। সাবান, ছুরি, কাঁচী, কাটারী, বঁটী, গন্ধদ্রব্য ও তৈল, মাটীর ও কাঠের অথবা পিতল-কাঁসার বাসন ও খেলানার পালিস ও রং করার যেটুকু বিজ্ঞানের শিক্ষা প্রয়োজন হয়, আমাদের কারিগররা তাহা জানে না, অথবা ভুলিয়া গিয়াছে। তাহার ভার বেকার শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিতরা গ্রহণ করিতে পারে। দেশবাসী ও সরকার সঙ্ঘবদ্ধভাবে এই সকল ক্ষুদ্র কুটীরশিল্পগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিলে কালে অবশ্যই সুফল ফলিবে। সরকার যদি ইহাতে অর্থসাহায্য করেন, তাহা হইলে দেশবাসী সমর্থ সম্পন্ন রায়বাহাদুর, খাঁ বাহাদুর ও রাজা নবাবের নিকট হইতেও অর্থ পাওয়া যাইবে।

অনারেবল মিঃ ফারোকী

যে আইন পাশ হইয়াছে, তাহাতে এই সকল ব্যাপারে সরকার পক্ষ হইতে (১) কর্জ্জদান, (২) গ্যারান্টিদান, (৩) ভুমি, কাঁচা মাল, জ্বালানী কাঠ ইত্যাদি সুবিধা দরে দান, (৪) কলকব্জা ধার দিয়া ক্রমে ক্রমে মূল্য আদায়ের সুবিধাদান প্রভৃতি ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সুতরাং আশা করা যায়, এইবার সত্য সত্যই দেশের নষ্টশিল্প উদ্ধারের উদ্দেশ্যে সুব্যবস্থা হইবে।

সরকার এই আইন অনুসারে একটি Board of Industries গঠন করিতে মনস্থ করিয়াছেন। Director of Industries অর্থাৎ শিল্পবাণিজ্য-নিয়ামক তাহার Secretary বা সম্পাদক হইবেন। বোর্ডটি বেসরকারী সদস্যগণের সমবায়ে গঠিত হইবে। সরকারী সাহায্যপ্রার্থীদের আবেদনের যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে বোর্ড অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট দিলে পরে প্রয়োজন বোধে সরকারী

সাহায্য প্রদত্ত হইবে। এখন কথা, এই বোর্ডে কি ভাবে সদস্য মনোনীত হইবে? যদি দেশের মঙ্গলের দিকে তাঁহাদের নজর থাকে, তাহা হইলে তাঁহাদের পরামর্শ অনুসারে সরকারী তহবিল হইতে সাহায্য প্রদত্ত হইলে ভবিষ্যতে দেশের নষ্ট শিল্পের উদ্ধার ও বেকার-সমস্যার সমাধান হইবে।

বন্যা-সাহায্য

উত্তর-বঙ্গ ও পূর্ব্ব-বঙ্গে এবার প্রবল বন্যায় অনেক স্থানে গ্রাম জনপদ ভাসিয়া গিয়াছে এবং অধিবাসিগণ দুঃখদুর্দ্দশার চরম সীমায় উপনীত হইয়াছেন, ইহা সকলেই শুনিয়াছেন। একে দেশ-ব্যাপী অর্থাভাব, তাহার উপর এই সর্ব্বনাশ! 'মাঠে কিছু নাই, ঘরে কিছু নাই, কত লোক সর্ব্বস্বান্ত ও গৃহহীন হইয়াছে, কত লোক অকালে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে, কোথাও কোথাও লোক কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া পুত্রকন্যা বেচিয়াছে বা আত্ম-হত্যা করিয়াছে। বাঙ্গালা সরকার ব্যবস্থাপক সভায় পুলিসের জন্য ৫ লক্ষেরও উপর ব্যয় বরাদ্দ করিয়া দুর্ভিক্ষ বন্যাপীড়িত প্রজার সাহায্যে দুই লক্ষ টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন। অথচ চীনের ভীষণ প্লাবনে চীন সরকার সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহারা উদ্যোগী হইয়া একটি 'রিলিফ-কমিশন' খুলিয়াছেন; চীনের অর্থ-সচিব মিঃ সুঙ্গ উহার সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি চীনদেশীয় ও বিদেশী প্রতিষ্ঠান সমূহের সহযোগিতায় অর্থসংগ্রহ করিতেছেন। ইতিমধ্যেই রোমের পোপ বিপন্নগণের জন্য ২৫০ হাজার পরিধেয় বস্ত্র প্রেরণ করিয়াছেন। মার্কিনের রেড-ক্রস সোসাইটী ২০ হাজার পাউণ্ড মুদ্রা দান করিয়াছেন। জাপ-সম্রাট স্বয়ং ১০ হাজার পাউণ্ড মুদ্রা সাহায্যার্থ প্রেরণ করিয়াছেন। এ দেশে তাহার সামান্য অংশের কাযও কি সরকারের দিক হইতে হইতেছে? তবে দেশের নানা দাতব্য প্রতিষ্ঠান ও সঙ্ঘ এ বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী হইয়া অনেক কায করিতেছেন, এ কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। দুঃখ এই, সকলগুলির মধ্যে যোগসূত্র নাই, সঙ্ঘবদ্ধভাবে কায করি-বার প্রবৃত্তি নাই, বরং কোন কোনটির মধ্যে বিরোধই পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান! বোধ হয়, বাঙ্গালার প্রতি ইহাই বিধাতার অভিসম্পাত! বাঙ্গালার কংগ্রেসে যেমন, বাঙ্গালার নারী কর্ম্মিসমিতিতে যেমন, তেমনই বন্যা সাহায্যেও বিরোধ ভীষণরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আমাদের বক্তব্য, এখন হইতে সাধারণের তহবিল সুনিয়-ন্ত্রিত ও সুব্যবস্থিত করিবার জন্য বিশেষ বিধিব্যবস্থা করিলে ভাল হয়।

চট্টগ্রাম

আবার! পাবনা, কিশোরগঞ্জ, ঢাকা,—তাহার পর চট্টগ্রাম!—চমৎকার! বিগত ৩০শে আগষ্ট রবিবার চট্টগ্রামের এক মাঠে ফুটবল খেলা দেখিতে গিয়া পুলিস ইনস্পেক্টর খাঁ বাহাদুর আসানুল্লা এক আততায়ীর গুলীতে নিহত হন। আততায়ী ষোল বৎসরের এক বাঙ্গালী যুবক, এইরূপ প্রকাশ পায়। সে তৎক্ষণাৎ ধৃত হইয়া পুলিস থানায় নীত হয়। সংবাদে প্রকাশ যে,

এই ঘটনার পরদিন নিদারুণ সংবাদ আসে যে, ন্যূনাধিক ৫০ হাজার ক্রোধোন্মত্ত মুসলমান বাহির হইতে সহরে প্রবেশ করিয়া বেলা ১১টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত হিন্দুর দোকানপাট ও অন্যান্য গৃহ আক্রমণ করে। ফলে বহু গৃহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, দুই একখানি অগ্নিদাহে ভস্মীভূত হয়, এবং প্রায় কোটি টাকা মূল্যের মণিমাণিক্য, অলঙ্কারপত্র এবং অন্যান্য দ্রব্য লুণ্ঠিত হয়। এই সম্পর্কে বহু হিন্দু যে প্রহৃত ও আহত হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। তবে প্রহারের ফলে কেহ নিহত হইয়াছে বলিয়া এ যাবৎ শুনিতে পাওয়া যায় নাই।

এই সম্পর্কে বহু জনরবের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। স্থানীয় শান্তিরক্ষকদের ঔদাসীন্য এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আক্র-মণে সাহায্য দান অথবা ইচ্ছাপূর্ব্বক সে বিষয়ে অগ্রণী হওয়ার জন-রবে সমগ্র হিন্দুসমাজ বিচলিত হইয়া উঠে। এমন সংবাদ পাওয়া যায় যে, বিপন্ন হিন্দুরা শান্তিরক্ষকদের সাহায্য চাহিতে গিয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল। শান্তিরক্ষক বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিলেন, হিন্দু নেতাদের কাছে যাও! এ সকল কথা সত্য কি না, জানি-বার উপায় ছিল না। কেন না, তখনও চট্টগ্রাম হইতে কোন বিশ্বাসযোগ্য শ্রদ্ধাস্পদ নেতা কলিকাতায় আসিতে পারেন নাই বা পত্র বা তারে কোন সংবাদ প্রেরণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু তথাপি যতই দিন যাইতে লাগিল, লুণ্ঠন ও গৃহদাহাদির হৃদয়বিদারী কাহিনী ততই আসিয়া পৌছিতে লাগিল।

এ কি অদ্ভুত ব্যাপার! এ ত অনিয়ন্ত্রিত সীমান্ত নহে; সুসভ্য বৃটিশ শাসক-শাসিত সুনিয়ন্ত্রিত বঙ্গদেশ। কেবল তাহাই নহে, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণ ও লুণ্ঠনের পর হইতে অতিরিক্ত পুলিস ও সেনা আনয়ন করিয়া চট্টগ্রাম ভরিয়া ফেলা হইয়াছে। এমন কি, আসাম সরকার তাঁহাদের সীমান্ত রাইফেল সেনা-সাহায্য এখানে ধার দিয়াছিলেন বলিয়া বাঙ্গালা সরকার কত ধন্যবাদ দিয়াছিলেন। সহরে Curfew order অর্থাৎ সন্ধ্যার পর ৮টা হইতে ভোর ৫টা পর্য্যন্ত সহরের পথে বাহির হইবার হুকুম ছিল না। সাধারণ পার্ক ও উদ্যান সমূহে হিন্দু ছাত্রগণের প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছিল। চৌমাথায় অথবা মোড়ে মোড়ে কড়া পাহারা বসান হইয়াছিল, যুবক ও বালক ছাত্রদের ঘাঁটির নিকট দিয়া যাতায়াত করাতেও লাঞ্ছিত হইবার সম্ভাবনা কম ছিল না। এত কড়া পাহারা সত্ত্বেও এক আধটি নহে, প্রায় ৫০ হাজার লোক কিরূপে সহরে বিনা বাধায় প্রবেশ করিতে পারে, তাহা ত কেহ ভাবিয়াও পাইল না।

সেই সময়ে কলিকাতা করপোরেশানের সভায় প্রকাশ পাইল, চট্টগ্রাম হইতে কোন ভদ্রলোক পত্রে যে সকল ভীষণ অনাচারের সংবাদ দিয়াছেন, তাহা সত্য হইলে স্থানীয় সরকারী শান্তিরক্ষক-দের অতীব লজ্জা ও কলঙ্কের কথা। নিরস্ত্র নিঃশঙ্ক নিশ্চিন্ত বৃটিশ প্রজার যে এই ভাবে সর্ব্বনাশ হইতে পারে, তাহা প্রথমে বিশ্বাসযোগ্য বলিয়াই মনে হইল না।

তাহার পর বিশ্বাসযোগ্য সূত্র হইতে একটি একটি করিয়া সংবাদ প্রকাশিত হইতে লাগিল, এগুলির সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য দেশবাসীর প্রতিনিধিদের লইয়া তদন্ত সমিতিও গঠিত হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু তাহার সভাপতি। তাঁহারা তদন্তে বসিলে নিম্নলিখিত কয়টি বিষয়ে নিশ্চিত

অনুসন্ধান করিবেন, (১) চট্টগ্রামের অন্যতম কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র দাসের কথায় জানা যায় যে, "৩০শে আগষ্ট বেলা সাড়ে ৬টার সময় নিজামৎ পলটনের ফুটবল খেলার মাঠে পুলিস ইনস্পেক্টর খাঁ বাহাদুর আসানুল্লা সাহেব নিহত হইবার পরেই সন্ধ্যা ৭টার সময় স্থানীয় চিটাগং ইনষ্টিটিউটে ঐ সংবাদ পৌঁছিবামাত্র উপস্থিত হিন্দু-মুসলমান সদস্যগণ এই জঘন্য কার্য্যের তীব্র নিন্দা করিয়া খাঁ বাহাদুরের পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেন। তথাপি ঐ রাত্রিতে ১১টার সময় ১৫।১৬ জন দারোগা, সার্জ্জেণ্ট, রেলের সাহেব, কনষ্টেবল ও গুর্খা সৈনিক, বন্দুক, লুইস গান, রিভলভার, লাঠি, ডাণ্ডা প্রভৃতি লইয়া বিভিন্ন দলে রাত্রি ১১টার সময় বাহির হইয়া পড়ে এবং সহরের গৃহস্থের বাড়ীতে খানাতল্লাস করে। তাহারা কোন পরোয়ানা দেখায় নাই, পরন্তু খানাতল্লাসের সময় যে সকল সাবধানতা অবলম্বন করা হয়, তাহা করে নাই।

(২) পাথরঘাটার 'পাঞ্চজন্য' আফিসে ও চকবাজারে তৎপরদিন প্রভাতে মফঃস্বলে যে সকল কাণ্ড সংঘটিত হয়, মহিম বাবু সে সকলেরও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবৃতি দিয়াছেন।

(৩) "৩১শে আগষ্ট দ্বিপ্রহরের সময় মুসলমান জনতা সেটেল্‌মেণ্টের মাঠে জমায়েৎ হইতে থাকে। জনতা ছত্রভঙ্গ করিয়া দিবার অনুরোধ গ্রাহ্য হয় নাই। বেলা ১১টা হইতে লুঠ আরম্ভ হয়, ২টার সময় শেষ হয়";—মহিম বাবুর বিবৃতিতে এ কথাও আছে।

(৪) ভারতীয় সংবাদপত্রসেবিসঙ্ঘের কার্য্যকরী সমিতির এক সভায় যে মন্তব্য গৃহীত হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায়, "যদিও পুলিস কর্ম্মচারীর হত্যাকারী হত্যার পরেই ধৃত হইয়াছিল বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তথাপি সহরে বহু সম্ভ্রান্ত অধিবাসীর গৃহ আক্রান্ত হইয়াছিল। তন্মধ্যে অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের আসামীদের আত্মীয়-স্বজনের গৃহও ছিল।"

(৫) চট্টগ্রাম পটিয়ার উকীল সমিতি গত ৩১শে আগষ্ট তারিখে তাঁহাদের এক সভার অধিবেশনে যে মন্তব্য গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়,—"৩০শে আগষ্ট পুলিস ইনস্পেক্টর নিহত হইবার পর ৩১শে তারিখের বেলা ১১টার সময় দুইটি য়ুরোপীয় অফিসার একদল সশস্ত্র সৈন্য লইয়া হঠাৎ পটিয়ার দুইটি স্কুলে উপস্থিত হন। তখনই সৈনিকরা লাঠি ও ছড়ি দ্বারা হিন্দু বালক ছাত্রগণকে প্রহার করে। তাহাদের অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হয় ও রক্তধারা বহিতে থাকে।"

এ সকল অভিযোগের শতাংশের এক কণা সত্য হইলেও কি বলিতে ইচ্ছা হয়? চট্টগ্রামের স্থানীয় রাজকর্ম্মচারীরা এক জন হিন্দু বালক হত্যাকারীর অপরাধে অথবা অস্ত্রাগার আক্রমণকারী বিপ্লববাদীদের অপরাধে সমগ্র হিন্দু সমাজকে 'শিক্ষা' দিবার জন্য উদ্যুক্ত হইয়াছিলেন, ইহা হইতে যদি কেহ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, তাহা হইলে তাহাকে কি বিশেষ অপরাধে অপরাধী করা যায়? চট্টগ্রামের এই অদ্ভুত সংবাদ শুনিয়া বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "বাঙ্গালার সহরসমূহে একটির পর আর একটিতে অত্যাচার অনাচার যেরূপ দ্রুতিগতিতে আত্মপ্রকাশ করিতেছে, তাহা আমাদের পক্ষে কেবলমাত্র পরিতাপেরই বিষয় নহে, উহা অত্যন্ত লজ্জারও কথা। সাম্প্রদায়িক স্মৃতি কলুষিত করিয়া জাতির ইতিহাসে চিরতরে এক কলঙ্করেখা অঙ্কিত করিবার মত মতিগতি আমাদেরই মধ্যে কোন এক সম্প্রদায়ের হইতে পারে, ইহা ভাবিয়া গভীর লজ্জায় ও বিস্ময়ে আমাদিগকে অধোবদন হইতে হইতেছে।" সে কথা ঠিক, কিন্তু এক সম্প্রদায়ের কতকগুলি নির্ব্বোধের এ বুকের পাটা হয় কেন, তাহা কি রবীন্দ্রনাথ চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন? পাবনা, কিশোরগঞ্জ, ঢাকা,—প্রতিবারই বলা হইয়াছে, যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, আর হইবে না। পূর্ব্ববর্ত্তী লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ডের অপরাধে আসামীদের মুখে শুনা গিয়াছিল যে, তাহাদের মধ্যে মোল্লা মৌলভী প্রচার করিয়াছিল যে, তাহারা ৭ দিন যথেচ্ছা আচরণ করিলেও কেহ তাহাদিগের কার্য্যে বাধা দিবে না। এমনও শুনা গিয়াছিল যে, শান্তিরক্ষকের উপস্থিতি সত্ত্বেও অবাধে লুণ্ঠন ও দাহ চলিয়াছিল। চট্টগ্রামেও যে সে কারণ উপস্থিত ছিল না, তাহাই বা কে বলিতে পারে? পটিয়া ও পাথরঘাটা প্রভৃতি অঞ্চলে স্থানীয় শান্তিরক্ষকদিগের আচরণের যে কথা রটিয়াছে, তাহা যদি সত্য বলিয়া সপ্রমাণ হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বের সন্দেহ সত্য হইবে না-ই বা কেন?

এ ক্ষেত্রে একটা কথা কেহ বুঝিতে পারিতেছে না। ৫০ হাজার মুসলমান বাহির হইতে সহরে প্রবেশ করিয়াছিল ও দোকানপাট লুণ্ঠন ও দগ্ধ করিয়াছিল বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। কেন? এই ৫০ হাজার মুসলমান কি পূর্ব্বাহ্নে জানিত যে, খাঁ বাহাদুর আসানুল্লা নিহত হইবেন? তবে তাহারা কি জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল? একসঙ্গে ৫০ হাজার লোক এক স্থানে জমায়েৎ হওয়া ত সচরাচর ঘটে না। আর এক কথা, এত লোককে সশস্ত্র অবস্থায় সহরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইল কেন? সহরে অতিরিক্ত কড়া প্রহরা সত্ত্বেও এমন অবাধে ৩ ঘণ্টা কাল প্রকাশ্য দিবালোকে সহর লুঠ হইল, ভারে ভারে লুঠের মাল পাচার হইল, এমন কি, নৌকাযোগেও মাল সরাইয়া দেওয়া হইল, অথচ শান্তিরক্ষকরা নিশ্চল পাষাণবৎ দণ্ডায়মান রহিল, পরন্তু হাজার হাজার লুঠেরার মধ্যে মুষ্টিমেয় নামমাত্র কয়জন পরে ধৃত হইল, এ সকলেরই বা কারণ কি?

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "এই সকল ঘটনা অবাধে পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠিত হওয়ায় ইংরাজ সরকারের নৈতিক মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে এবং অতীব দুঃখের বিষয় হইলেও বলিতে হইবে যে, ইংরাজ সরকারের উপর আমাদের আস্থা উহাতে বহুল পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে।" আজ রবীন্দ্রনাথের মত বিশ্বপ্রেমিক এবং বিশ্বভ্রাতৃত্বের উপাসক ও প্রচারকের মুখে এমন কথা ব্যক্ত হয় কেন, তাহা বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ বুঝিয়া দেখিলে পারেন।

সাংবাদিকের পরলোক

গত ৭ই সেপ্টেম্বর সিমলার ব্যবস্থাপরিষদের সভার অধিবেশনে যোগদানকালে স্বনামধন্য সাংবাদিক কেশবচন্দ্র রায় অকস্মাৎ পক্ষাঘাতরোগে আক্রান্ত হন, পরে অচৈতন্য অবস্থায় হাঁসপাতালে নীত হইয়া অকালে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। কিছু দিন হইতে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল, উহাই তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুর কারণ।

সামান্য অবস্থা হইতে বাঙ্গালী কিরূপে আপনার ধীশক্তি ও অধ্যবসায়বলে উন্নতির চরমশীর্ষে উপনীত হইতে পারে, কেশবচন্দ্র তাহার দৃষ্টান্তস্থল। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ফরিদপুর জেলার এক সাধারণ গৃহস্থ পরিবারে কেশবচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী ছিলেন না বটে, কিন্তু উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের পর হইতেই তিনি সংবাদপত্রে প্রবন্ধাদি লিখিতে আরম্ভ করেন। তৎকালীন 'ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ'ই তাঁহার সাংবাদিক জীবনের প্রথম সোপান। ক্রমে তিনি একাধিক ইংরাজী সংবাদপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট হন।

তৎকালে এ দেশে সংবাদ সরবরাহের কোন কার্য্যালয় ছিল না। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তিনি একটি সংবাদ সরবরাহের এজেন্সী প্রতিষ্ঠা করেন। বর্ত্তমান 'এসোসিয়েটেড প্রেসের' উহাই মূল। মিঃ (বর্ত্তমানে সার) এডোয়ার্ড বাক ও আমাদের প্রীতিভাজন বন্ধু শ্রীযুক্ত উষানাথ সেন তাঁহার সহায়ক ছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি, পুষ্টি ও পরিণতি কেশবচন্দ্রের প্রতিভাবলেই সম্ভবপর হইয়াছিল। তাঁহার ন্যায় উৎসাহী সাংবাদিক স্বদেশবাসীর মধ্যে বিরল ছিল বলিয়াই তিনি হিমগিরির দুরন্ত শীত অগ্রাহ্য করিয়া সিমলা শৈল হইতে বহু উচ্চে তুষারাচ্ছন্ন শৈলশিখরে অবস্থান করিয়া সুইডেনদেশীয় পর্য্যটক সিভেন হেডিনকে তিব্বতের অন্ধকার হইতে সর্ব্বপ্রথমে ভারতের সভ্যতালোকে সম্বর্দ্ধনা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহারই প্রদত্ত সিভেন হেডিনের বিবরণ জগতের সর্ব্বত্র তারযোগে প্রেরিত হইয়াছিল। সাংবাদিকের পক্ষে ইহার অপেক্ষা গৌরবময় কর্ত্তব্য-পালন আর কি হইতে পারে?

কেশবচন্দ্র রায়

প্রবল শক্তিশালী রয়টারের সহিত প্রতিযোগিতায় উপযুক্ত সাহায্য ও সমর্থন অভাবে পরিশেষে তিনি রয়টারের অধীনে এসোসিয়েটেড প্রেসের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে বাধ্য হন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি সসম্মানে উক্ত-পদে সমাসীন ছিলেন। তিনি ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্য-পদে মনোনীত হইয়াছিলেন এবং গত বৎসর সাম্রাজ্যিক সংবাদপত্র-সেবীর বৈঠকে এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধিরূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন। একাধিক কমিটীতেও তিনি সদস্যরূপে সাধারণের কার্য্য করিয়াছিলেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বেও তিনি ব্যয়সঙ্কোচ কমিটীর তদন্ত উপলক্ষে গুরু পরিশ্রম করিতেছিলেন। সরকার যে মুদ্রাযন্ত্র আইন বিধিবদ্ধ করিবার জন্য বর্ত্তমানে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, কেশবচন্দ্র তাহার বিপক্ষে যুক্তিতর্ক প্রদান করিবার আয়োজন করিতেছিলেন।

এমনই সময় ৫৭ বৎসর বয়সে কাল তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। ভারতের সাংবাদিক জগতে তাঁহার অভাব নিশ্চিতই অনুভূত হইবে। আমরা তাঁহার অকাল-প্রয়াণে বন্ধুবিয়োগব্যথা অনুভব করিতেছি। তাঁহার বিধবা-পত্নী ও সন্তানগণের শোকে দেশবাসী সমবেদনা প্রকাশ করিতেছে, সন্দেহ নাই!

মানস সরোবর ও কৈলাস

এখানি বহু চিত্র-সম্বলিত ভ্রমণবৃত্তান্ত। শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় ইহার রচয়িতা। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় ইহার ভূমিকা লিখিয়াছেন। গ্রন্থের নামকরণেই গ্রন্থের পরিচয় প্রস্ফুট। পুণ্যভূমি ভারতের তীর্থরাজি জগতে অতুলনীয়—ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু তীর্থযাত্রার জন্য যে কষ্ট-বিপদ সহ্য করে—যে অর্থ অকাতরে ব্যয় করে—তাহার তুলনা কোথায় খুঁজিয়া পাওয়া যায়? কৈলাস ও মানসসরোবর হিন্দুর পরম পবিত্র তীর্থ। এ দুর্গম তীর্থযাত্রা পূর্ব্বে বিপৎসঙ্কুল ছিল, বর্ত্তমানে কতক পরিমাণে এই যাত্রা সহজ ও সুগম হইয়াছে। গ্রন্থকার এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহার অভিজ্ঞতাও [illegible] লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার রচনা ধারাবাহিকরূপে পূর্ব্বে মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত হইয়াছে। এখন তিনি উহা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়া হিন্দু জনসাধারণের মনে কৈলাসযাত্রার আগ্রহ বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা, তথ্য সন্নিবেশ, শব্দবিন্যাস, ভাষা ও ভাবের মাধুর্য্য পাঠকের মন সহজেই আকৃষ্ট করে। হিমালয়ের এমন মহান্ স্নিগ্ধ গম্ভীর সুন্দর অথচ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, তীর্থ-সমূহের বিশদ চিত্তাকর্ষক বিবরণ এবং ধর্ম্মভাবের উদ্দীপনার উপকরণ অন্যত্র দুর্লভ বলিলে বোধ হয় অতিরঞ্জনদোষে দুষ্ট হইতে হইবে না। কাগজ, বাঁধাই ও ছাপা ভাল, বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরে প্রাপ্তব্য, মূল্য মাত্র দেড় টাকা। আমরা আশা করি, বাঙ্গালী যেখানে আছে, সেখানেই এই সৎগ্রন্থের বহুল প্রচার হইবে।

বিদায়-বাণী

(উপন্যাস)

[পূর্ব্ব-প্রকাশিত অংশের চুম্বক—মিষ্টার সনৎ বোস ব্যারিষ্টারের কন্যা সুমতি, ১৬ বৎসর বয়সে, বিখ্যাত কন্ট্রাক্টর রায় বাহাদুর জে, কে, নন্দী সাহেবের ভ্রাতুষ্পুত্র সুবোধ নন্দীর সহিত প্রেমে পড়িয়াছিল। সুবোধ তখন এঞ্জিনিয়ারিং পাশ করিয়া বিলাত হইতে অল্পদিন মাত্র ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু সুবোধ নন্দী জাতিতে তন্তুবায় বলিয়া, কায়স্থ বোস সাহেব তাহাকে কন্যা দিতে অসম্মত হন এবং উভয়ের দেখা-শুনা বন্ধ করিয়া দেন। ইহার অল্পদিন পরেই সুবোধ চাকরী লইয়া দিল্লী চলিয়া যায়।

এক বৎসর পরে, রামজীবন ঘোষের পুত্র, সদ্য এম্-এস্-সি পাস করা শ্রীমান্ অনিলকুমারের সহিত বোস সাহেব কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ করেন। অনিলকে তিনি নিজ ব্যয়ে বিলাত পাঠাইয়া ব্যারিষ্টারি পাস করাইয়া আনিয়া কলিকাতায় তাহার প্র্যাক্‌টিস জমাইয়া দিবেন, পাত্রপক্ষকে এইরূপ আশ্বাস প্রদান করেন। সুমতি কোনও আপত্তি করে নাই এবং পিতা-মাতার ব্যবস্থা অনুসারেই নিজ জীবনকে চালিত করিবার জন্য সে যত্নবতী। উভয়পক্ষের পাকা দেখাও হইয়া গিয়াছে এবং ১৭ই আষাঢ় বিবাহের দিনস্থির হইয়াছে।

নন্দী সাহেবের প্রথম পক্ষের কন্যা, সুমতির সখী কনকলতার জন্মদিন উপলক্ষে, নন্দী সাহেবের দ্বিতীয় পক্ষের গৃহিণী বিমলা সুমতিকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিলেন। সুবোধ দিল্লীতে আছে জানিয়া, বসু-দম্পতি পরদিন সুমতির নন্দী-ভবনে গমনে আপত্তি করিলেন না। বিমলা বাড়ী ফিরিয়া আসিবার পর টেলিগ্রাম আসিল, পরদিন প্রাতে সুবোধ আসিয়া পৌঁছিবে। সুবোধ তাহার ফারমের জন্য মাল কিনিতে বিলাত যাইতেছে, পথে কয়েক দিন কলিকাতায় কাটাইয়া যাইবে।

পরদিন যথাসময়ে সুমতি আসিয়া, অপ্রত্যাশিতভাবে সুবোধকে দেখিয়া, তখনই বাড়ী ফিরিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু মিসেস্ নন্দী বলিলেন, এত লোকের মাঝখানে ভয় কি, সুবোধের সঙ্গে না মিশিলেই হইল, আহারাদির পর বিকালে নবাগত মান্দ্রাজী মুথুস্বামীর ম্যাজিক দেখিয়া সুমতি বাড়ী যাইবে।

অগ্নি-ভক্ষণের ম্যাজিক প্রদর্শনকালে পশ্চাতের সীনে হঠাৎ আগুন ধরিয়া গেল। ছুটিয়া পলাইতে গিয়া সুমতি পড়িয়া অজ্ঞান হইয়া গেল।

সুমতির সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিলে সে দেখিল, সন্ধ্যা হইয়াছে, নন্দীভবনের এক শয়নকক্ষে সে শুইয়া আছে, সুবোধ তাহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত। শুনিল, অন্যান্য মেয়েরা সকলে বাড়ী গিয়াছে, ম্যাজিকওয়ালা অত্যন্ত পুড়িয়া গিয়াছিল, নন্দী সাহেব তাহাকে লইয়া হাঁসপাতালে গিয়াছেন, মিসেস্ নন্দীর ফিট হইয়াছিল, তিনি নিজ শয়নকক্ষে, তাঁহার কন্যা ও আয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছে, অগ্নিকাণ্ডের পূর্ব্বেই সুমতির পিতামাতা হঠাৎ কোনও বন্ধুর পীড়ার সংবাদ পাইয়া মোটরে বারাকপুর গিয়াছেন, রাত্রি নয়টার সময় ফিরিয়া সুমতিকে এইখান হইতে তুলিয়া লইয়া যাইবেন বলিয়া পাঠাইয়াছেন।

সেই দিন সন্ধ্যায় গাড়ী-বারান্দার ছাদে চা-পান করিতে করিতে সুবোধের সহিত সুনীতির অনেক কথাবার্ত্তা হইল। সুবোধের ধারণা জন্মিল, সুনীতি মনে মনে এখনও তাহাকে পূর্ব্বের মতই ভালবাসে, কেবল পিতৃ-মাতৃ-ভক্তির জন্য নিজেকে এ ভাবে বলিদান দিতে প্রস্তুত হইয়াছে। সুবোধ বলিল, "তুমি এখন ১৭ বৎসরের হইয়াছ, আইনের চক্ষুতে সাবালিকা, পরন্তু আমি বিলাতযাত্রা করিব, তুমিও আমার সঙ্গে চল, সেখানে পৌঁছিয়াই আমরা আইনসঙ্গতভাবে বিবাহিত হইব।" সুমতি বলিল, "মস্তিষ্ক আমার এখনও অত্যন্ত দুর্ব্বল, আমায় ভাবিবার জন্য এক দিন সময় দাও, কাল সন্ধ্যায় আমি তোমায় পত্র লিখিয়া উত্তর দিব।"

এমন সময় বারাকপুর-প্রত্যাগত তাহার পিতার মোটরগাড়ী কম্পাউণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করিল।]

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সন্দেহ-দোলায়

গাড়ী-বারান্দায় বোস-সাহেবের গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইতেই নন্দী-সাহেবের গাড়ীও ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিল। বসু-দম্পতি গাড়ী হইতে নামিয়া বারান্দায় উঠিতেই নন্দী-সাহেব নিজ গাড়ী হইতে নামিয়া বলিলেন, "হেল্লো বোস, সব শুনেছ ত?" সঙ্গে সঙ্গে তিনি টুপী উত্তোলন করিয়া মিসেস্ বোসের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

বোস-সাহেব বলিলেন, "কি শুনব? তুমি এ অসময়ে বেরিয়েছিলে কোথা?"

নন্দী নিকটে আসিয়া অপরাহ্লের দুর্ঘটনার কথা সংক্ষেপে বসু-দম্পতির নিকট বর্ণনা করিলেন। বলিলেন, "তোমার মেয়ের ফিট্ হয়েছিল, আমি তাকে বিছানায় শুইয়ে, ডাক্তার আনিয়ে শুশ্রূষার ব্যবস্থা করে, বেচারী মুথুস্বামী ম্যাজিক-ওয়ালাকে দেখতে মেডিক্যাল-কলেজে গিয়েছিলাম—এই ফিরছি। আমার স্ত্রীও খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। এতক্ষণ বোধ হয়, দু'জনেই সুস্থ হয়ে উঠেছেন, চল দেখি গে।"

তখন তিন জনেই দ্রুতপদে সিঁড়ি উঠিয়া উপরে গেলেন। কন্যার বিপদের কথা শুনিয়া মিসেস্ বোসের মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল, তাঁহার পা কাঁপিতেছিল। তিন জনে ড্রয়িং-রুমে প্রবেশ করিতেই দেখিলেন, সুবোধ একখানা বহি হাতে করিয়া একটা ঘর হইতে বাহির হইতেছে। তাহাকে দেখিয়া বোস-সাহেব অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "সুবোধ যে! তুমি কবে এলে?"

সুবোধকে দেখিয়া সুমতির সঙ্কোচ এবং ব্যাধ-ভীতা হরিণীর ন্যায় তাহার পলায়নের চেষ্টার কথা [illegible]-সাহেব

তাঁহার স্ত্রীর নিকট শুনিয়াছিলেন। সুতরাং যেন কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়াই বলিলেন, "সুবোধ আজ সকালেই এসেছে। ও যে বিলেত যাচ্ছে, ওদের ফারমের কাযে। আসবার কোনও খবরই আগে ছিল না, কাল সন্ধ্যেবেলা হঠাৎ টেলিগ্রাম পেলাম কি না। সে যা হোক, সুবোধ, তোমার কাকীমা কোথা? কেমন আছেন তিনি?"

সুবোধ বলিল, "আমি এই মাত্র তাঁর খবর নিয়ে আসছি, তিনি ভাল আছেন, ঘরে শুয়ে ঘুমুচ্ছেন। আয়া কাছে আছে।"

বোস সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর সুমতি? সে কেমন আছে?"

সুবোধ বলিল, "মিস্ বোসও ভাল আছেন। বাইরের খোলা বারান্দায় তিনি ব'সে আছেন, কনক তাঁর কাছে আছে।"

এইমাত্র সুবোধই যে কনককে ডাকিয়া সুমতির কাছে পাঠাইয়া দিয়াছে, তাহা প্রকাশ করা সে আবশ্যক বোধ করিল না।

শুনিবামাত্র মিসেস্ বোস কন্যাকে দেখিবার জন্য বাহিরের খোলা বারান্দা অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। "আপনি একটু বসবেন? গিন্নীকে আমি একবার দেখে আসি"—বলিয়া বোস সাহেবকে সেখানে রাখিয়া নন্দীও নিজ শয়নকক্ষ উদ্দেশে অন্তর্হিত হইলেন। তখন বোস সাহেবও ধীরে ধীরে গিয়া স্ত্রী-কন্যার সহিত মিলিত হইলেন।

কনক ইতিপূর্ব্বেই "মাকে দেখে আসি" বলিয়া প্রস্থান করিয়াছিল।

বসু-গৃহিণী কন্যার পার্শ্বে বসিয়া তাহার গায়ে-মুখে হাত বুলাইতে বুলাইতে মূর্চ্ছা যাওয়া ও জ্ঞান ফিরিয়া আসার পুঙ্খানুপুঙ্খ সকল বিবরণ সংগ্রহ করিতেছিলেন। সুমতি অত্যন্ত ক্ষীণ ও ক্লান্ত কণ্ঠস্বরে জননীর প্রশ্নগুলির উত্তর দিতেছিল। বোস সাহেব বলিলেন, "থাক্ না, ও সব কথা পরে শুনো এখন। এখন চল, আমরা বাড়ী যাই। তুমি কি মিসেস্ নন্দীকে একবার দেখতে যাবে?"

"তিনি ত ঘুমুচ্ছেন, শুনলাম।"

"নন্দী তাঁকে দেখতে গেছেন। যদি এতক্ষণ উঠে থাকেন।"

"হাঁ, তিনি আসুন।"

কিয়ৎক্ষণ পরে নন্দী আসিয়া বলিলেন, "মাফ্ করবেন, অনেকক্ষণ আপনাদের একলা ফেলে রেখে গেছি। মিসেস্ নন্দীর ঘুম ভেঙেছে, তিনি অনেকটা সুস্থ হয়েছেন। আপনারা এসেছেন শুনে তিনি বাইরে আসতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু দেহ এখনও অত্যন্ত দুর্ব্বল, তাই আমি মানা করলাম, কি জানি, যদি মাথা-ঘুরে প'ড়ে যান। বল্লাম, যেমন শুয়ে আছ, শুয়েই থাক, আমি বরং মিসেস্ বোসকেই ডেকে আনছি। সুমতিকেও তিনি দেখতে চাচ্ছেন। মিসেস্ বোস, আপনি আমার শয়ন-ঘর চেনেন ত?"

মিসেস্ বোস ও সুমতি উভয়েই দাঁড়াইয়া উঠিয়াছিলেন, সুমতি বলিল, "আমি চিনি, এস মা।"

বোস সাহেব স্ত্রী-কন্যাকে লইয়া যখন বাড়ী ফিরিলেন, রাত্রি তখন প্রায় দশটা। বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তনের জন্য সুমতি নিজ শয়নকক্ষে গেল। মিসেস্ বোস নিজ শয়নকক্ষে গিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতে করিতে স্বামীকে বলিলেন, "দেখ একবার আশ্চর্য্য কাণ্ড, এত দিন না তত দিন, আজ সকালেই সুবোধ এসে হাজির। আমার বোধ হয় বিমলা জানতো—জেনে শুনেই সুমতিকে নেমন্তন্ন ক'রে নিয়ে গিয়েছিল।"

বোস সাহেব বলিলেন, "না না, তা হতেই পারে না। তুমি ত কাল স্পষ্ট করেই বিমলাকে জিজ্ঞাসা করেছিলে' আজ নন্দীও ত বল্লে, সুবোধ এসে পৌছবে, সে খবর আগে ছিল না, হঠাৎ কাল সন্ধ্যাবেলা টেলিগ্রাফ এল।"

বসু-গৃহিণী বলিলেন, "সাহেবের খবর ছিল না, সে কথা হয় ত ঠিক, কিন্তু আমার ত মনে হয়, মেমসাহেবের খবর ছিল। বিমলার ত ভারি ইচ্ছে ছিল কি না যে সুবোধের সঙ্গেই সুমতির বিয়ে হয়! সে নিশ্চয়ই সুবোধকে চিঠি লিখেছিল, অমুক দিন কনকের জন্মদিন, ফি বছর যেমন করি, কনকের বন্ধু সব মেয়েদের আনাবো, সুমতিকেও আনাবো, তার বিয়ে, যদি শেষ চেষ্টা করতে চাও ত ঐ দিন তুমিও এস।—তুমি বিশ্বাস কর আর না কর, আমার কিন্তু তাই মনে হয়।"

বসু বলিলেন, "তোমার ভারী সন্দিগ্ধ মন। আর, তাই যদি বিমলা করেই থাকে, ক্ষতিটা আর কি হয়েছে তাতে?"

"ক্ষতিটা কি হয়েছে শুনবে? এ দিকে বিমলা অজ্ঞান হয়ে গেল, ও দিকে সুমতি অজ্ঞান হয়ে গেল। সুমতিকে

সামলায় কে? সে ভার পড়লো সুবোধের উপর। সেই তাকে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শোয়ালে, মুখে মাথায় অডি-কলোনের পিচকিরী দিতে লাগলো, তার পরে জ্ঞান হলে তাকে নিয়ে গিয়ে বাইরের খোলা বারান্দায় বসালে, দু'জনে সেই নিরিবিলিতে ব'সে চা খেলে—"

"এ সব কথা তোমায় কে বল্লে?"

"কেন, সুমতিই বল্লে। সে ত আমার মিছে কথা বলবার মেয়ে নয়!"

"ওদের কথাবার্ত্তা কিছু হয়েছিল না কি?"

"তা আর হয়নি? এক ঘণ্টার উপর দুজনে একলা ব'সে ছিল, মুখ বুজে কি আর ছিল? কি সব কথাবার্ত্তা হল, তাকে জিজ্ঞাসা করছিলাম, সেই সময় ত তুমি গিয়ে পড়লে, তুমি বল্লে, এখন ও-সব কথা বন্ধ রাখ।—শ্রান্ত আছে, আজ খেয়ে-দেয়ে ঘুমুক, কাল তখন সকল কথা ওকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখবো। আমার ত মনে বেশ ভয়ই হয়েছে।"

"কিসের ভয়? বলবে, এ বিয়ে আমি করবো না?"

"যদি তাই ব'লে বসে? সুবোধ মহা ধড়িবাজ ছেলে। সে যে তার কাণে কি মন্তোর দিয়েছে, তা ত জানিনে তাই যদি ও ব'লে বসে, তা হলে কি কেলেঙ্কারিটে হবে, একবার ভাবো দিকিন।"

ইহা শুনিয়া বসু কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন, তার পর বলিলেন, "ভদ্রসমাজে মুখ দেখানই মুস্কিল হবে।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

সুসংবাদ।

পরদিন প্রাতেও স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে অনেকক্ষণ এই প্রসঙ্গের আলোচনা হইল। কাল রাত্রিতে খাইতে বসিয়া সুমতির মুখ ভারি বিষণ্ণ ও গম্ভীর ছিল; ইহা তাঁহারা উভয়েই লক্ষ্য করিয়াছিলেন; এবং ভারি অন্যমনস্ক। কি যে মেয়ে ভাবিতেছে, ইহা নির্ণয় করিতে না পারিয়া দুই জনেই বড় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। সুবোধের সঙ্গে কি সব কথাবার্ত্তা হইল, জিজ্ঞাসা করিলে মেয়ে বলিবে কি না, তাহারই বা স্থিরতা কি?

বেলা ৯টার সময় প্রমীলা সুমতির খবর লইতে আসিল। সুমতি তখন স্নান-কক্ষে ছিল, মিসেস্ বসু প্রমীলাকে ডাকিয়া নিজের ঘরে লইয়া গিয়া বসাইলেন। সংক্ষেপে কন্যার কুশল-সংবাদ তাহাকে দিয়া তাহার উৎকণ্ঠা দূর করিয়া, গত সন্ধ্যায় সুবোধ-ঘটিত ব্যাপার যেটুকু তাঁহার জানা ছিল, তাহা বলিয়া, নিজ মনের আকুল-আশঙ্কাও প্রকাশ করিলেন।

শুনিয়া প্রমীলা হাসিয়া বলিল, "না মাসীমা, সে জন্যে কোনও চিন্তা নেই। এখন আর সুবোধের উপর ওর কোনও ঝোঁক নেই। সে কথা ওতে আমাতে হয়ে গেছে।"

"কবে হল?"

"কাল এমনি সময়।"

মা বলিলেন, "কিন্তু সুবোধের সঙ্গে তখনও ত ওর দেখা হয় নি, তা ছাড়া জীবনে সে আর কখনও দেখা হবে, তাও ও জানতো না। কাল হঠাৎ এমনি যোগাযোগ হল যে, সারা সন্ধ্যা ওরা দুজন একলা রইল। সেই জন্যেই ত আমার মনে ভয় হচ্ছে, প্রমীলা।"

এ বিবাহ-বিষয়ে এতদূর অগ্রসর হইয়া, বিবাহের মাত্র এই কয়টা দিন পূর্ব্বে সুমতি যদি বাঁকিয়া বসে, তবে যে কি কেলেঙ্কারীটাই হইবে, সমাজে ইঁহাদের কি পরিমাণ অপদস্থ হইতে হইবে, তাহা বসু-গৃহিণী প্রমীলাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিয়া তাহার হাত দুটি ধরিয়া বলিলেন, "তুমি এসেচ ভালই হয়েছে মা, আজ সারাদিন এইখানেই থাক, এখানেই খাও-দাও—আমি তোমার মাকে বরঞ্চ একখানা চিঠি লিখে পাঠাচ্ছি। আজ সারাদিন তুমি সুমতির সঙ্গে থেকে ওর মন বুঝে দেখ, যদি তেমন তেমন কোনও মৎলব ওর মাথায় এসে থাকে ত ওকে বেশ ক'রে বোঝাও সোজাও। নইলে মা আমাদের বড় বিপদ।"

প্রমীলা বলিল, "আমাকে অত ক'রে বলতে হবে না মাসীমা! আপনি যা ভয় করছেন, আমার বিশ্বাস, সে ভয়ের কোনও হেতু নেই, আর যদিই বা ওর মন বিগড়ে থাকে, আমি অবশ্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবো—যাতে ওর মন ফেরে। ও আপনাদের যথেষ্ট ভক্তি করে—ভালবাসে। সমাজে যাতে আপনাদের মাথা হেঁট হয়, তা কখনই ও করবে না বলেই আমার বিশ্বাস।"

গৃহিণী বলিলেন, "তাই বল মা, তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক! সুমতির বোধ হয় স্নান শেষ হয়েছে, তুমি যাও, তার সঙ্গে দেখা কর। আমি তা হলে তোমার মাকে চিঠি

লিখে দিই যে, তুমি সারাদিন এখানে থাকবে, বিকেলে তখন চা খাইয়ে তোমায় ফেরৎ পাঠাব, কেমন ?"

"লিখে দিন" বলিয়া প্রমীলা সুমতির সন্ধানে গেল।

আহারের সময়ও সুমতি পূর্ব্বদিনের মত গম্ভীর ও বিষণ্ণ-বদন। আহার শেষ করিয়াই সুমতি নিজ শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল, প্রমীলাও অবশ্য তাহার সঙ্গে গেল। বসু-গৃহিণী ভাবগতিক কিছুই বুঝিতে না পারিয়া কেবল অমঙ্গল-আশঙ্কাই করিতে লাগিলেন। বোস সাহেব চিন্তান্বিত-মনে কাছারী যাত্রা করিলেন।

বিকালে সুমতি তখনও প্রসাধনকার্য্যে নিযুক্ত ছিল, প্রমীলার সমাপ্ত হইয়াছিল, প্রমীলা একখানি চিঠি হাতে করিয়া মিসেস বসুর কক্ষে প্রবেশ করিল। প্রমীলাকে দেখিয়া বসুগৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার হাতে ও কি প্রমীলা ? কার চিঠি ?"

প্রমীলা বলিল, "দরোয়ানকে ডেকে পাঠান, সুবোধকে এ চিঠিখানা পাঠাতে হবে, মাসীমা।"

গৃহিণী বিস্মিত ও অধিকতর শঙ্কান্বিত হইয়া বলিলেন, "সুমতি লিখছে নাকি ? সুবোধকে সুমতি চিঠি লিখেছে ?"

প্রমীলা বলিল, "হ্যাঁ, কিন্তু আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন, মাসীমা ? চিঠি দেখুন, আপনাকে দেখিয়ে চিঠি পাঠাতেই ও বলেছে।"—বলিয়া প্রমীলা চিঠিখানি গৃহিণীর হাতে দিল।

খামখানি খোলাই ছিল, সুমতির হস্তাক্ষরে উপরের ঠিকানাটি পড়িয়া, কম্পিতহস্তে চিঠিখানি বাহির করিয়া গৃহিণী দেখিলেন, কোনও সম্বোধন নাই, নাম স্বাক্ষর নাই, এক টুকরা সাদা কাগজের মধ্যস্থলে, বড় অক্ষরে কেবলমাত্র লেখা আছে— "না !"

পড়িয়াই গৃহিণীর বুকের বোঝা অনেকটা হাল্কা হইয়া গেল, তাঁহার মুখে হাসি দেখা দিল, বলিলেন, "না ? কি না ?"

প্রমীলা হাসিতে হাসিতে বলিল, "সে যাই হোক না মাসীমা ! আপনি এখন মন ঠাণ্ডা ক'রে বিয়ের যোগাড়-যন্ত্র করুন।"

"সুমতির সঙ্গে তোমার কি কি কথা হ'ল, শুনতে পাইনে ?"

"না মাসীমা, সে সব আপনার শোনবার কোনও দরকার নেই।"

"আচ্ছা, শুধু এইটুকু বল, আমাদের আর কোনও চিন্তা নেই ত ? আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারি ?"

"নিশ্চয়।"

বসুগৃহিণী আনন্দ-গদ্‌গদস্বরে বলিলেন, "বেঁচে থাক মা, তোমার একটি মনের মত বর হোক, তুমি চিরসুখী হও, পাকা মাথায় সিঁদুর পর। কাল থেকে যা ভাবনা আমাদের হয়েছিল, আমরা ত চোখে অন্ধকার দেখছিলাম। উনি ত আজ খেতে ব'সে কিছুই খেলেন না, সে ত তুমি দেখেইছ। মুখখানি অন্ধকার ক'রে কাছারী গেলেন। ফিরে আসুন, এলে ভাল খবরটা ওঁকে দিই।"—বলিয়া তিনি দরোয়ানকে ডাকিতে পাঠাইলেন। প্রমীলাকে বলিলেন, "তুমি মা খামখানা জুড়ে, পিওনবুকে এণ্টার ক'রে চিঠিখানা পাঠিয়ে দাও।"

যথাসময়ে বোস-সাহেব কাছারী হইতে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি যখন বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতেছিলেন, গৃহিণী গিয়া তাঁহাকে সুসংবাদটা দিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে সকলে চা পান করিতে বসিলেন। কেবল সুমতি তখনও কিছু গম্ভীর—অপর সকলের হাস্যবদন। কথায় কথায় বায়স্কোপের কথা উঠিল। প্রমীলা বলিল, "অনেক দিন বায়স্কোপে যাই নি, আজ বড় বায়স্কোপ দেখতে ইচ্ছে করছে, মাসীমা।"

বোস-সাহেব বলিলেন, "আজ কোথাও কোনও ভাল বই আছে না কি ?"—বলিয়া তিনি অদ্য প্রাতের সংবাদপত্রখানা আনাইয়া বিজ্ঞাপন দেখিতে লাগিলেন। চৌরঙ্গীর একটা বায়স্কোপে একটা খুব হাসির পালা আছে দেখা গেল। গৃহিণী বলিলেন, "মেয়েদের কার সঙ্গে পাঠাব, চল না আমরাও যাই।" বোস-সাহেব সম্মত হইলেন। উমাচরণকে ডাকিয়া পাঠানো হইল। আদেশমত সে নীচে আফিসঘরে গিয়া ফোনযোগে সেই বায়স্কোপে একটি বক্স রিজার্ভ করিল। বসুগৃহিণী প্রমীলার জননীকে আর একখানি পত্র লিখিয়া দিলেন যে, প্রমীলাকে লইয়া তাঁহারা বায়স্কোপে যাইতেছেন, ফিরিবার পথে তাহাকে বাড়ীতে নামাইয়া দিয়া আসিবেন।

[ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক—শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী-রোটারী-মেসিনে' শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বসুমতী-প্রেস] রূপ-সৃষ্টি—কাশ্মীর [শিল্পী—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মজুমদার

১০ম বর্ষ] আশ্বিন, ১৩৩৮ [৬ষ্ঠ সংখ্যা

বি-এ পাস কয়েদী

১

পশ্চিমের একটি সহর। জজের আদালত, ফৌজদারী আদালত, কালেক্টরী প্রভৃতি সহরের ভিতর হইলেও, জেলখানাটি সহরের বাহিরে এক মাইল দূরে অবস্থিত। জেলের কর্ত্তা অর্থাৎ জেলর বাবুর নাম ইন্দুভূষণ সান্যাল—বয়স ৪২ বৎসর। স্ত্রীর নাম মনোরমা, বয়স ৩৪। ইঁহাদের দুইটি পুত্র—নগেন্দ্র ও খগেন্দ্র, বয়স ১৫ এবং ৫ বৎসর। কন্যা হয় নাই।

জেলখানার ফটকের উপর দ্বিতলে জেলর বাবুর সরকারী বাসা। পশ্চাতে টানা বারান্দা। সে বারান্দায় দাঁড়াইলে, জেলখানার ভিতরটা অনেকখানি দেখা যায়। জেলর বাবুর স্ত্রী মনোরমা সকালে বিকালে সেই বারান্দায় দাঁড়াইয়া জেল-প্রাঙ্গণে কয়েদীগণের আহার, গতিবিধি ও অন্যান্য কার্য্যকলাপ দেখিয়া চিত্তবিনোদন করিয়া থাকে।

মনোরমার বড় কষ্ট। কোনও প্রতিবেশিনী নাই যে, আসিয়া দুই দণ্ড গল্প করিবে, দু'হাত তাস খেলিবে, অথবা চুলটা তাঁহার বাঁধিয়া দিবে। প্রতিবেশিনী কিন্তু থাকিলে থাকিতে পারিত। ডেপুটি জেলর বাবু, অ্যাসিষ্টাণ্ট বাবু, জেলের ডাক্তার বাবু সকলেই বাঙ্গালী, ইঁহাদেরও সরকারী বাসা রহিয়াছে, কিন্তু স্ত্রী নাই, বা থাকিয়াও নাই। ডেপুটি বাবু বিপত্নীক, অ্যাসিষ্টাণ্ট বাবুর স্ত্রী তিন মাস হইল, সন্তান-সম্ভাবিতা হইয়া পিত্রালয়ে গিয়াছেন, কবে ফিরিবেন, তাহার স্থিরতা নাই, ডাক্তার বাবুর গৃহের যিনি গৃহিণী, তাঁহাকে ডাক্তার বাবু স্ত্রী বলিয়াই প্রচার করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু জনশ্রুতি এই যে, বিবাহটা তাঁহাদের গান্ধর্ব্ব মতে হইয়াছিল—কাযেই উক্ত মহিলার কোনও ভদ্র-পরিবারের সহিত মেলামেশা নাই।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পিত্রালয় হইতে মনোরমা এক অনাথা কায়স্থ-কন্যাকে ঝি-স্বরূপ আনিয়া নিজের কাছে রাখিয়াছিল। সে প্রায় মনোরমার সমবয়সী ছিল, তার নাম ছিল—কাতু বা কাত্যায়নী। নামে ঝি হইলেও, পূর্ব্বকালে রাজকন্যাদের যেমন "সহচরী" থাকিত, কাতু ছিল মনোরমার সেইরূপ সহচরী। উভয়ে বেশ আনন্দেই ছিল। কিন্তু গত বৎসর কাতুর গুরুজনপদস্থ কোনও আত্মীয়ের বিনা বেতনে একটি ঝির প্রয়োজন হওয়াতে, সে ব্যক্তি অনেক স্নেহ, করুণা এবং আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া কাত্যায়নীকে পত্র লেখে এবং অবশেষে পুত্র পাঠাইয়া তাহাকে লইয়া যায়।

মনোরমাকে গৃহকার্য্য বেশী করিতে হয় না। বামুন আছে, চাকর আছে, তা ছাড়া সরকার হইতে দুই জন জল-আচরণী কয়েদী পাওয়া যায়, তাহারা প্রাতে আসিয়া জল তোলে, বাসন মাজে, গ্রীষ্মকালে পাখা টানে। বিকালে ৫টার সময় তাহাদের অবশ্য আবার জেলে প্রবেশ করিতে

হয়। সাংসারিক কায-কর্ম্ম তেমন নাই, কি করিয়া মনোরমার দিন কাটে? তার স্বামী দুইখানি মাসিকপত্রের গ্রাহক—মাসের প্রথম সপ্তাহটা সেইগুলি পড়িয়া কাটে। আর বাকী সাড়ে তিন সপ্তাহ? উপন্যাস—তাও কালে-ভদ্রে দুই একখানা কেনা হয় মাত্র। সুতরাং মনোরমার বড় কষ্ট।

২

জেলর বাবু প্রাতে উঠিয়া চা পানান্তে সাতটার সময় আপিসে যান, আবার সাড়ে দশ কিংবা এগারোটায় বাড়ী আসিয়া স্নানাহার করেন। তৎপরে দিবানিদ্রান্তে বেলা সাড়ে তিনটায় উঠেন এবং চারিটার সময় আবার আপিসে গিয়া দুই তিন ঘণ্টা সরকারী কার্য্য করিয়া থাকেন।

আজ আহারাদির পর মনোরমার যখন অবসর হইল, তখন বেলা বারোটা বাজিয়া গিয়াছে।

মনোরমা পশ্চাতের বারান্দায় মাদুর বিছাইয়া, খোলা চুলের রাশি ছড়াইয়া দিয়া, একখণ্ড মাসিকপত্র হাতে লইয়া শয়ন করিল। চুল শুকাইবার উদ্দেশ্যেই এ সময় এ-ভাবে তাঁহার শয়ন। ভিতরের ঘরে পালঙ্কের উপর তাঁহার স্বামী নিদ্রিত, বড় ছেলে নগেন স্কুলে গিয়াছে, ছোট খোকা অনেক দুষ্টামি করিবার পর অবশেষে পিতার পাশে শুইয়া ঘুমাইয়াছে।

মনোরমা পত্রিকার ছবিগুলি দেখা শেষ করিয়া, তার পর সূচিপত্র পরীক্ষা করিতে লাগিল। এ সংখ্যায় কয়টা গল্প আছে, তাহাই দেখিবার বিষয়। গল্প-সংখ্যার অল্পতা দেখিয়া সে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া আপন মনে বলিল, "পোড়ারমুখো কাগজওয়ালাদের একটু যদি আক্কেল আছে! কেবল প্রবন্ধ আর প্রবন্ধ, কচুপোড়া খাও! প্রবন্ধ নিয়ে ত মানুষ ধুয়ে খাবে! তিনটি মোটে গল্প, এ পড়তে কতক্ষণই বা লাগবে?"—বলিয়া প্রথম গল্পটি পড়িতে আরম্ভ করিল। কিন্তু গল্পের অর্দ্ধেকটা পড়া হইবার পূর্ব্বেই পত্রিকাখানি বুকে করিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

বেলা যখন আড়াইটা, তখন হঠাৎ মনোরমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, কে তার পায়ে হাত দিয়া নাড়া দিতেছে। চক্ষু খুলিয়া দেখিল, ঠিকাদার বাবুর স্ত্রী সরোজিনী। "ও মা, তুমি!" বলিয়া মনোরমা উঠিয়া বসিল। চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিল, "কতক্ষণ এসেছ, ভাই?"

সরোজিনী বলিল, "তা প্রায় আধ ঘণ্টা হবে!"

"আধ ঘণ্টা চুপ ক'রে ব'সে আছ? আমায় জাগালে না কেন?"

"আহা অকাতরে শুয়ে ঘুমুচ্চ, তুলতে মায়া হ'ল। শেষে যখন দেখলাম, ঘুম আর ভাঙ্গে না, তখন কি করি, অগত্যা পাপ কাযটাই ক'রে ফেল্লাম। তা দিদি, খবর সব ভাল ত? ছেলে-পিলে ভাল আছে? দশ-বারো দিন আসতে পারিনি, মেঝ ছেলেটার জ্বর হয়েছিল।"

মনোরমা বলিল, "ফটিকের জ্বর হয়েছিল? কি জ্বর? কেমন আছে, এখন বেশ সেরে উঠেছে ত?"

সরোজিনী বলিল, "হ্যাঁ ভাই, এখন সেরে উঠেছে তোমাদের আশীর্ব্বাদে। সর্দ্দি-জ্বরই হয়েছিল, তবু ভাবনা ত কম হয় নি! তিন দিন হ'ল জ্বরটা ছেড়েছে, কাল দুটি মাছের ঝোল ভাত খেয়েছে! তোমাদের খবর সব ভাল ত?"

"হ্যাঁ ভাই, আমরা ভালই আছি। বোসো একটু, চোখে-মুখে জলটা দিয়ে আসি। এই মাসিকপত্রখানা ওল্টাও ততক্ষণ।"—বলিয়া মাসিকপত্র নবাগতার হাতে দিয়া মনোরমা উঠিয়া গেল।

সরোজিনী মাসিকপত্রের ছবিগুলা দেখা শেষ হইলে, কাগজ রাখিয়া বারান্দার রেলিঙের ফাঁক দিয়া জেলের প্রাঙ্গণের দৃশ্য দেখিতে লাগিল;—বিশেষ দেখিবার তখন যদিও কিছু ছিল না। কয়েদীরা সব বাহিরে কায করিতে গিয়াছে, কেবল চারি জন কয়েদী প্রাঙ্গণ-মধ্যস্থ পুষ্করিণী হইতে ঘড়া ঘড়া জল তুলিয়া বাঁকে ঝুলাইয়া কোথায় লইয়া যাইতেছে, আবার খালি ঘড়া লইয়া ফিরিয়া আসিতেছে।

সরোজিনীর স্বামী ভূতনাথ বাবু এই জেলের ঠিকাদার। কয়েদীদের আহারের জন্য চাউল, দাইল, নুণ, তেল প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্যই তিনি সরবরাহ করিয়া, মাসান্তে জেলর বাবুর নিকট তাঁহার বিল দাখিল করেন। সরকারী হুকুম অনুসারে জেলর বাবুকে প্রতি রবিবারে সহরে গিয়া খাদ্য-দ্রব্যাদির বাজার-দর জানিয়া আসিতে হয়, তজ্জন্য তিনি গাড়ীভাড়া পাইয়া থাকেন। তিনি সেই জ্ঞান অনুসারে ঠিকাদার বাবুর বিল-সংশোধনান্তে উহা পাস করেন। সুতরাং জেলর বাবুর উপর ঠিকাদার বাবুর অসীম ভক্তি। দেখা হইলেই আভূমি নত হইয়া পদধূলি গ্রহণ করেন এবং অপর কেহ সেখানে উপস্থিত থাকিলে, কারণে অকারণে জেলর বাবুর বিদ্যা, বুদ্ধি, ধার্ম্মিকতা, এমন কি, তাঁহার আকৃতি অবয়বের

পর্য্যন্ত অজস্র প্রশংসা করিয়া উপস্থিত ভদ্রলোকগণকে প্রশ্ন করিয়া থাকেন, "কি বলেন মশাই, অ্যাঁ? আমি একটি বর্ণও বাড়িয়ে বলছি ?" এ-দিকে আবার ঠিকাদার-গৃহিণীও, জেলর-গৃহিণীকে "দিদি" বলিতে অজ্ঞান। বাড়ীতে গাই আছে, খাঁটি দুধের ছানা কাটিয়া সন্দেশ করিয়া আনিয়া দেয়, কুল পাকিলে কুলের আচার, কাঁচা আম উঠিলে কাসুন্দি ও আম-তেল প্রস্তুত করিয়া উপহার দেয়। বাজার হইতে বোম্বাই আম কিনিয়া আনিয়া মনোরমাকে দিয়া বলে, "দেশ থেকে এসেছিল, আমাদের বাগানের আম।" বাঙ্গাল দেশের মেয়ে, ভাল সৌখীন কাঁথা সেলাই করিতে জানে, এবার জেলর-গৃহিণীর সন্তান-সম্ভাবনা হইলে কাঁথা সেলাই করিতে আরম্ভ করিবে, বলিয়া রাখিয়াছে।

প্রায় দশ মিনিট পরে মনোরমা পাণের ডিবা ও দোক্তার কৌটা হাতে করিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "পাণ ক'টা সেজে আন্‌তে দেরী হয়ে গেল, ভাই। চাকর-বাকরের সাজা পাণ আমার মুখে রোচে না জানই ত!"

সরোজিনী বলিল, "হ্যাঁ, তা জানি বৈ কি, দিদি। কি চমৎকার যে তোমার পাণ সাজা! যে খেয়েছে, সেই জানে। উনি কি বলেন জান? উনি বলেন, আমি এই যে কাযকর্ম্ম না থাকলেও নিত্যি জেলর বাবুর বাড়ী যাই, সে কেবল গিন্নী ঠাকরুণের সাজা পাণ খাবার লোভে। আমায় বলেন, তুমি তাঁর কাছে ঐ রকম পাণ সাজা শিখে এস না কেন? দিও ত দিদি, দু'এক দিন দেখিয়ে।"

"আচ্ছা দেবো" বলিয়া মনোরমা মুচকি হাসিল, কারণ, নিজ হাতে পাণ সে নিজের জন্যই সাজিয়া থাকে। অতিথি অভ্যাগত দূরের কথা, স্বামীর পাণও সে কদাচিৎ সাজে; কিন্তু সরোজিনী অপ্রতিভ হইবে বলিয়া সে আর তাহা প্রকাশ করিল না। পাণ ও দোক্তা সেবন করিতে করিতে দুই জনে গল্প করিতে লাগিল।

দুই চারি কথার পর সরোজিনী বলিল, "ভাল মনে প'ড়ে গেল। আমাদের বাড়ীর পাশে যে উকীল বাবু আছেন না—কেদার ভট্‌চায্যি—তাঁদের দেশ থেকে এক জন অনাথা স্ত্রীলোক এসে রয়েছে। ভদ্রঘরের স্ত্রীলোক, জাতে ব্রাহ্মণ। তার তিন কুলে কেউ নেই, দেশে থাকতে খেতে পেত না, এখানে এসেছে—যদি কোনও ভদ্রলোকের বাড়ীতে একটা রাঁধুনি-গিরি কায-কর্ম্ম জোটে। উকীল বাবুর বাড়ীতে আমি ত প্রায়ই যাই কি না, উকীল বাবুর বউ, মেয়েরাও আমাদের বাড়ী আসে যায়। তোমাদের সব কথাই আমি তাদের বলেছি ত! তাই উকীল বাবুর পরিবার সে-দিন বল্লে, তুমি ত জেলর বাবুর বাসায় প্রায়ই যাও, জিজ্ঞাসা কোরো না তাঁদের, তাঁরা যদি মেয়েটিকে রাখেন।"

মনোরমা জিজ্ঞাসা করিল, "বিধবা ত?"

"না, বিধবা কেন হবে? সধবা। কিন্তু স্বামী তার থেকেও নেই। সন্ন্যাসী হয়ে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে চ'লে গেছে, কোনও খোঁজ-খবরই নেই।"

"কত দিন নিরুদ্দেশ হয়েছে?"

"তা দিদি আমি জিজ্ঞাসা করিনি। পাঁচ সাত বছর হবে বোধ হয়। না, অত হবে না—তার কোলে একটি ছেলে, তার বয়স চার বছর।"

"ছুঁড়ীর বয়স কত?"

"আমার চেয়ে ছোটই হবে। এই—আঠারো উনিশ বোধ হয়। বল্লে, ওটি তার প্রথম সন্তান নয়—আর একটি হয়েছিল, সেটি ছ'মাসের হয়ে মারা গেছে।"

মনোরমার মুখ দিয়া অস্ফুট স্বরে "আহা!" শব্দটি বাহির হইল। কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে চিন্তা করিয়া বলিল, "মানুষটা নষ্ট-দুষ্ট নয় ত?"

সরোজিনী বলিল, "তা কি ক'রে জানবো দিদি? সে নারায়ণই জানেন। কিন্তু দেখে ত নষ্ট দুষ্ট ব'লে মনে হয় না। খুব ঠাণ্ডা, মুখে কথাটি নেই, চোখ দুটি সদাই ছলছল করছে! তা ছাড়া ধর, নষ্ট দুষ্টই যদি হত, রাঁধুনিগিরি করতে আসবে কেন? বয়স ত এখনও যায়নি, দেখতেও মন্দটি নয়!"

"নাম কি তার?"

"মোক্ষদা!"

"কোথায় বাড়ী বল্লে?"

"ঐ যে উকীল বাবুদের বাড়ী যেখানে। বরিশাল জেলার কোন্ একটা গ্রাম—নামটা মনে আসছে না।"

মনোরমা একটু ভাবিয়া বলিল, "এক দিন নিয়ে এস না তাকে সঙ্গে ক'রে—দেখি মানুষটা কেমন। কর্ত্তার মতটাও জিজ্ঞাসা ক'রে রাখি। তাকে আমরা রাখবো কি রাখবো না, সে কথা এখন থেকে কিছু ব'লে দরকার নেই।"

সরোজিনী বলিল, "বেশ,—তা কবে আনবো বল? তাকে শুধু বলবো এখন, চল এক যায়গায় বেড়িয়ে আসি।"

মনোরমা বলিল, "কাল কি পরশু যে দিন হয় নিয়ে এস।"

"বেশ, পরশুই তাকে আনবো তা হ'লে।"

কিয়ৎক্ষণ অন্যান্য কথার পর সরোজিনী বিদায়গ্রহণ করিল।

রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বে মনোরমা স্বামীর নিকট কথাটা পাড়িল।

ইন্দু বাবু সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, "বামনীর কায খুঁজছে, তা বামুন ত তোমার রয়েছে, কি করবে সে?"

মনোরমা কহিল, "রান্না-বান্নার কাযই যে তাকে দিয়ে করাতে চাচ্ছি, তা নয়। ঘর-কন্নার অন্য সব কাযও ত আছে। এই বিদেশে প'ড়ে আছি, একটা মানুষ-জন নেই, পাড়া-প্রতিবেশী নেই, দুটো কথা কোয়েও ত বাঁচবো।"

ইন্দু বাবু হাসিয়া কহিলেন,"ওঃ, তোমার একটি সহচরীর দরকার, তাই বল!"

মনোরমা কহিল, "সে তুমি যাই বল। তার পর, বামুন ঠাকুরের যদি দু'দিন অসুখ-বিসুখই হ'ল, বামুনের মেয়ে, তাকে দিয়ে স্বচ্ছন্দে কায চালিয়ে নিতে পারবো। হল বা ছোট খোকাকে স্নানটা করিয়ে দিলে। এই রকম সব কায আর কি! তার পর ধর, যা সন্দেহ করছি, তাই যদি শেষে দাঁড়ায়—" বলিয়া মনোরমা লজ্জায় অবনতমুখী হইল।

ইন্দু বাবু হাসিয়া বলিলেন, "তা বটে। ছোট খোকা হবার সময় কাতি যাই ছিল, তাই অনেক উপকার পাওয়া গিয়েছিল। আচ্ছা, তুমি ত তাকে আসতে বলেছ। আসুক, তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কোয়ে দেখ, তার পর যা বিবেচনা হয় করা যাবে।"

৩

মোক্ষদা আসিলে, তাহাকে দেখিয়া, তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া মনোরমার ভারি পছন্দ হইয়া গেল। সরোজিনী বলিয়াছিল, তাহার বয়স আঠারো-উনিশ, কিন্তু মোক্ষদা নিজে বলিল,তাহার একুশ পূর্ণ হইয়া গিয়াছে,বাইশ চলিতেছে। পাড়া-গাঁয়ের মেয়ে হইলেও, কথায় বার্ত্তায় বেশ সভ্য-ভব্য, আর, একটু লেখাপড়া-জ্ঞানও আছে। বলিল, বাল্যকালে সে স্কুলে পড়িয়াছিল, চতুর্থমান পর্য্যন্ত পড়া হইলে তার বিবাহ হয় এবং সেজন্য স্কুলে যাওয়া বন্ধ হইয়া যায়। বাঙ্গালার সঙ্গে তিনখানা ইংরাজী কেতাবও সে পড়িয়াছিল, মিশ্রভাগ পর্য্যন্ত অঙ্ক কষিয়া গঃ সাঃ গুঃ কষিতেও সুরু করিয়াছিল, তা ছাড়া ভূগোলপ্রবেশ, ইতিহাস-পাঠ ইত্যাদিও পড়িয়াছিল, কিন্তু এখন সে সব আর তাহার মনে নাই। ছেলেটিও তার বেশ শিষ্ট-শান্ত। কোনওরূপ অন্যায় আব্দার নাই, দৌরাত্ম্য নাই।

মনোরমা তাহাকে খোরাক-পোষাক ও মাসিক তিন টাকা বেতনে নিযুক্ত করিয়াছে। মনোরমা বেতনের কথা জিজ্ঞাসা করিলে মোক্ষদা বলিয়াছিল, "আমি আর কি বলবো—আপনি বিবেচনা ক'রে যা দেবেন, তাই আমার যথেষ্ট। ভদ্রঘরে আশ্রয় পেলাম, এই আমার পরম সৌভাগ্য।"

মোক্ষদার কাপড়-চোপড়ের দুরবস্থা দেখিয়া মনোরমার বড় দুঃখ হইল। স্বামীকে বলিয়া ঠিকাদার বাবুর দ্বারা মোক্ষদা ও তাহার পুত্রের জন্য আবশ্যক বস্ত্রাদি আনাইয়া দিল। ঠিকাদার বাবু যেরূপ সস্তায় জিনিষপত্র কিনিতে পারেন, এমন আর কেহই পারে না।

মোক্ষদা মনোরমার হাতের কায কাড়িয়া নিজে করে। নিজ পুত্র অপেক্ষা মনোরমার পুত্র দুইটিকে অধিক যত্ন করিয়া থাকে। কর্ত্রী ঠাকুরাণীকে সে দিদি এবং কর্ত্তাকে দাদাবাবু বলিতে আরম্ভ করিয়াছে—যদিও কর্ত্তার সামনে সে বাহির হয় না, তাঁহার সঙ্গে কথা কহা ত দূরের কথা।

আজ রবিবার। রবিবার বিকালে ইন্দু বাবু আফিস যান না, এই সময় তাঁহার বাজার-দর যাচাই করিবার জন্য সহরে যাইবার কথা। কাছাকাছি কোথাও ঠিকা গাড়ীর আড্ডা নাই, গাড়ীর আবশ্যক হইলে সেই সহরে লোক পাঠাইতে হয়। ভৃত্য গিয়াছে গাড়ী আনিতে। বড় ছেলে নগেন ম্যাচ দেখিতে গিয়াছে। ইন্দু বাবু স্ত্রীর সহিত পশ্চিমের বারান্দায় বসিয়া ছিলেন। হঠাৎ তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ওগো, দেখ, ঐ পুকুরের পাড়ে নিমগাছের তলায় ছোক্‌রা-গোছ এক জন কয়েদী দাঁড়িয়ে আছে দেখছ?"

মনোরমা বলিল, "হ্যাঁ, কে ও?"

"ও এক জন সাধারণ কয়েদী নয়, ও বি-এ পাস।"

"বি-এ পাস? বল কি? চুরি করেছিল না কি?"

"না, চুরি নয়, ডাকাতী করেছিল বলা যায়। ও যে এক জন মস্ত স্বদেশী।"

"কোনও স্বদেশী ডাকাতী বুঝি?"

ইন্দু বাবু হাসিয়া বলিলেন, "ডাকাতীও কি স্বদেশী আর বিলিতী হয়?"

"তা নয়। দেশ উদ্ধারের জন্যে টাকা সংগ্রহ করবার উদ্দেশ্যে যে ডাকাতী, তাকেই আমি স্বদেশী ডাকাতী বলছিলাম। ওর নাম কি ? কোথায় ডাকাতী করেছিল ?"

"ওর নাম শরৎ বাঁড়ুয্যে। কোথায় ডাকাতী করেছিল, তা এখন আমার মনে নেই, কিন্তু সে সময় খবরের কাগজে আমি ওর মোকর্দ্দমার কথা পড়েছিলাম।"

"কত দিনের কথা ?"

"বছর তিনেক হবে, কিম্বা কিছু বেশী। আমরা তখন পাটনায়। আগে ও আলিপুর জেলে ছিল—এই মাস দেড়েক হবে এখানে এসেছে।"

"কত দিন পরে ওর খালাস হবে ?"

"পাঁচ বছর জেল হয়েছিল, এখনও বুঝি বছরখানেক বাকী আছে।"

যাহার বিষয়ে এই আলোচনা হইতেছিল, এতক্ষণে সে লোক অদৃশ্য হইয়াছিল। মনোরমা বলিল, "আহা, ব্রাহ্মণের ছেলে, উচ্চশিক্ষিত, দেখ দেখি একবার কর্ম্মের ভোগ! কেন বাপু, তোরা এ সব করিস ? কি কায এখানে ওকে করতে হয় ? আপিসের কায করে ত ? লেখাপড়া-জানা কয়েদী যখন !"

ইন্দু বাবু বলিলেন, "সাধারণতঃ লেখাপড়া-জানা কয়েদী হলে তাকে আপিসের কাযই দেওয়া হয় বটে, কিন্তু এ যে অসাধারণ! গভর্ণমেণ্টের হুকুম নেই। ওকে বাগানের কাযে দিয়েছি, বেশী খাটতে হয় না।"

প্রত্যেক জেলের সংলগ্ন একটা করিয়া বাগান থাকে, সেখানে জেলের খরচের জন্য শাক-সব্জী তরকারি-পাতি উৎপন্ন করা হয়। জেলের কয়েদীরাই সে সব বাগানের কার্য্য করিয়া থাকে।

এ সময় ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, গাড়ী আসিয়াছে। ইন্দু বাবু প্রস্তুত হইবার জন্য উঠিয়া গেলেন।

রাত্রিতে আহারাদির পর শয়ন করিয়া মনোরমা স্বামীকে বলিল, "ওগো, দেখ, আমাদের মোক্ষদা ঐ ছেলেটির সম্বন্ধে অনেক কথা জানে। তোমাতে আমাতে যখন কথা হচ্ছিল, ঘরের ভিতরে পাণ সাজতে সাজতে ও ব'সে শুনেছিল।"

"কোন্ ছেলেটি ?"

"ঐ যে তোমার বি-এ পাস করা ডাকাত, শরৎ মুখুয্যে না কি।"

"শরৎ বাঁড়ুয্যে।"

"যখন ঢাকায় ওর মোকর্দ্দমা হয়েছিল, খবরের কাগজে সব কথা ও পড়েছিল। বল্লে, ও ত ডাকাতী করেনি, গভর্ণমেণ্ট অন্যায় ক'রে ওকে জেলে পূরেছে। বি-এ পাস ক'রে ঢাকা জেলার কোন ইস্কুলে নাকি ও হেড-মাষ্টারি করত। সেখানে ওরা একটা সমিতি করেছিল। সেই গ্রামের আর আশে-পাশের গ্রামের অনেক ছোঁড়া সেই সমিতির মেম্বর ছিল ও ছিল সেই সমিতির সভাপতি। কাছে একটা বড় গ্রামে কি সাহা নাম বল্লে, তার কাপড়ের দোকান ছিল। ওরা বার বার তাকে নিষেধ করা সত্ত্বেও সে বিলাতী কাপড় আমদানী ক'রে দোকানে বিক্রী করছিল। টাকার মহাজনীও করতো। গরীব চাষাদের বেশী সুদে টাকা ধার দিয়ে ক্রমে তাদের জোৎ-জমা নীলেম ক'রে নিয়ে তাদের সর্ব্বনাশ করতো, এই রকমে সেই সাহা পোড়ারমুখো অনেক টাকা জমিয়েছিল। স্বদেশীওয়ালারা কত বারণ করে, তবু সে শোনে না। তাই তাকে সাজা দেওয়ার হিসেবেও বটে, দেশের কাযে লাগাবার জন্যে টাকা-সংগ্রহের উদ্দেশ্যেও বটে, সমিতির লোকরা নৌকো ক'রে গিয়ে এক রাতে সেই সাহা মহাজনের বাড়ীতে ডাকাতী করেছিল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ধরা পড়ে। এক জন মহারাণীর সাক্ষী হয়ে সব কথা প্রকাশ ক'রে দেয়। ঐ শরৎ বাঁড়ুয্যে, সেই সমিতির সর্দ্দার ছিল কি না, তাই গভর্ণমেণ্ট রাগে ওকে সুদ্ধ জেল দিয়েছে, নইলে ও নিজে ডাকাতী করেনি, ডাকাতদের সঙ্গে ছিলও না।"

ইন্দু বাবু বলিলেন, "হ্যাঁ, আমিও খবরের কাগজে ঐ রকমই যেন পড়েছিলাম। এখন মনে হচ্ছে। তোমার সহচরী ঐ দেশেরই লোক বুঝি ?"

"না না, ওর বাপের বাড়ী শ্বশুরবাড়ী দুই-ই ত বরিশাল জেলায়। এ হ'ল ঢাকা জেলার ঘটনা, ও খবরের কাগজে সেই সময় পড়েছিল বল্লে।"

ইন্দু বাবু বলিলেন, "আমিও ত পড়েছিলাম, আমার ত মনে ছিল না। ওর খুব স্মরণ-শক্তি ত !"

মনোরমা বলিল, "খবরের কাগজ পড়ার ওর ভারি সখ কি না। তোমার যে ইংরিজি কাগজ আসে, ও ত পড়তে পারে না, এক দিন বলছিল, দাদাবাবু একখানা বাংলা কাগজ নেন না কেন, তা হলে আমরাও পড়তে পারি।"

ইন্দু বাবু বলিলেন, "একখানা ইংরিজি কাগজ নিচ্ছি, আবার একখানা বাংলা—এত টাকা কোথায় ?"

৪

মাসখানেক পরে, ইন্দু বাবুর পাচক ব্রাহ্মণ তিন মাসের ছুটী চাহিল। দেশে তার শ্বশুর নাকি মারা গিয়াছে, কন্যাই তার একমাত্র সন্তান, জ্যোৎস্নমী যাহা কিছু শ্বশুর রাখিয়া গিয়াছে, সমস্তই তাহার প্রাপ্য, কিন্তু দুষ্টপ্রকৃতি জ্ঞাতিরা সে সকল দখল করিবার চেষ্টায় আছে। এই বলিয়া, কয়েক দিন পরেই বামুনঠাকুর দেশে রওয়ানা হইল।

ঠিকাদার বাবুর সাহায্যে অন্য এক জন পাচক সংগ্রহের চেষ্টা চলিতে লাগিল। পাকশালার ভার পড়িল মোক্ষদার উপর। মনোরমাও তাহাকে মাঝে মাঝে সাহায্য করে।

এইরূপ কয়েক দিন চলিলে, ইন্দু বাবু এক দিন দ্বিপ্রহরে আহারে বসিয়া বলিলেন, "ওগো দেখ, সেই স্বদেশী কয়েদী শরৎ বাঁড়ুয্যের সঙ্গে আজ আমার অনেক কথা হ'ল।"

"কি কথা হ'ল ?"

"সে আমায় বলছিল, 'মশাই, জেলের অন্ন খেয়ে খেয়ে আমার ত প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে গেল! বাড়ীর কায-কর্ম্ম করবার জন্যে আপনার ত দু' জন কয়েদী সরকার থেকে বরাদ্দ আছে, আমায় যদি সেই এক জনের যায়গায় নিযুক্ত করেন ত একবেলা দুটো খেয়ে বাঁচি।'—আমি বল্লাম, 'তুমি বি-এ পাস, তুমি কি জলতোলা, বাসনমাজা, এ সব নোংরা কায করতে পারবে ? তা ছাড়া, তুমি বামুনের ছেলে, এঁটো বাসনই বা তোমায় দিয়ে মাজাই কি ক'রে ? রাঁধতে জান ?' সে বল্লে, 'কেন, আপনার বামুন ত আছে।'— জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি কি ক'রে জানলে আমার বামুন আছে ?' সে বল্লে, 'ঐ নাথুনী আর গুরুচরণ যারা রোজ আপনার বাসায় কায করতে যায়, তারা বলে যে!' আমি বল্লাম, 'বামুন ছিল, পালিয়েছে, রাঁধতে জান ত বল, গুরুচরণের বদলে তোমাকে নিই।' সে বল্লে, 'আজ্ঞে, রান্না-বান্না মোটামুটি যে না জানি, তা নয়; মা-ঠাকরুণ একটু আধটু দেখিয়ে শুনিয়ে দিলেই কায চালিয়ে নিতে পারবো।' আমি তাকে হেসে বল্লাম, 'আচ্ছা, দেখি বিবেচনা ক'রে।'—কি করবো, আনবো তাকে ?"

এই বি-এ পাস কয়েদী সম্বন্ধে মনোরমার মনে কিছু কৌতূহল ছিল; তা ছাড়া ব্রাহ্মণ-পুত্র ডাকাতী না করিয়াও কারাক্লেশ ভোগ করিতেছে জানিয়া তাহার উপর সহানুভূতি জন্মিয়াছিল। তাই সে স্বামীর প্রস্তাবে সহজে সম্মত হইল।

ইন্দু বাবু বলিলেন, "ও যে বলেছে, ওকে একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দিতে হবে, তুমি তা পারবে ত ?"

মনোরমা বলিল, "সেই ত মুস্কিল। ওর সঙ্গে কথা কইতে লজ্জা করবে যে!"

"কেন ? কাল যদি এক জন নতুন রাঁধুনী বামুন আসে, তুমি কি তার সঙ্গে কথা কইবে না ?"

মনোরমা বলিল, "কিন্তু, সে ত বি-এ পাস হবে না!"

ইন্দু বাবু হাসিয়া বলিলেন, "কি ভাগ্যিস আমি বি-এ পাস করিনি! তা হ'লে ফুলশয্যের রাত থেকে আজ পর্য্যন্ত তুমি আমার সঙ্গে কথাই কইতে না বল ?"

মনোরমা লজ্জিত হাসি হাসিয়া বলিল, "কি যে বল তুমি, তার ঠিক নেই! তুমি আর ও সমান ?"

৫

দুই দিন পরে শরৎ আসিয়া, স্নান করিয়া মনোরমার পাকশালায় প্রবেশ করিল। তাহার কথাবার্ত্তা, চালচলন অত্যন্ত বিনীত ও ভদ্র। মনোরমাকে গোড়াতেই সে মাতৃ-সম্বোধন করায়, তাহার সম্বন্ধে সঙ্কোচের ভাব মনোরমার মন হইতে অনেকটা দূর হইল। তথাপি মনোরমা মোক্ষদাকে বলিল, "যাও না ভাই, কি কি রাঁধতে হবে, বামুন-ঠাকুরকে ব'লে দাও গে না।"

মোক্ষদা বলিল, "না দিদি, আমি পারবো না ওর সঙ্গে কথা কইতে। তুমি গিন্নী-বান্নি মানুষ, তুমি যাও।"

অবশেষে মনোরমা গিয়া বামুন-ঠাকুরকে রান্নার বিষয় বলিল। আরও বলিল, "আমার বড় ছেলে নগেন দশটার সময় খেয়ে ইস্কুলে যাবে। বাবু খেতে বসবেন সাড়ে এগারোটায়"

বামুন-ঠাকুর বলিল, "তা হলে মা, বড় বাবুর ভাত কটি আগে চড়িয়ে দেবো এখন, কর্ত্তা বাবুর আর অন্য সবাইকের ভাত শেষে রাঁধবো।"

"তাই কোরো"—বলিয়া মনোরমা চলিয়া আসিল।

মাঝে মাঝে মনোরমা গিয়া আধঘোমটা দিয়া রান্না-ঘরের দ্বারের কাছে দাঁড়াইল, দেখিল, বামুন-ঠাকুরের কাযে কোনওরূপ ভুল হইতেছে না।

বামুন ঠাকুর দুই তিনবার শয়ন-ঘরের নিকট আসিয়া ঘড়ি দেখিয়া গেল। নগেনকে যথাসময়েই সে ভাত দিল, যদিও সব রান্না তখনও তাহার হয় নাই।

ইন্দু বাবু আফিস হইতে ফিরিয়া, স্নান করিতে যাইবার

সময় রান্না-ঘরের নিকট দাঁড়াইয়া, সকৌতুকে একবার বি-এ পাস বামুন-ঠাকুরের কার্য্যকলাপ দেখিতে লাগিলেন। বলিলেন, "কি হে শরৎ বাবু, রান্নার তোমার কত দূর ?"

শরৎ বলিল, "আজ্ঞে, আমায় আর বাবু ব'লে লজ্জা দেন কেন ? আর সব রান্নাই আমার হয়ে গেছে, ভাতটা চড়িয়েছি, আপনি স্নান করুন, ততক্ষণ ভাতও হয়ে যাবে।"

খাইতে বসিয়া, অর্দ্ধেক খাওয়া হইলে ইন্দু বাবু স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সব কি বামুন-ঠাকুর নিজে নিজেই রেঁধেছে ? তুমিই বোধ হয় দেখিয়ে শুনিয়ে দিয়েছ ওকে ?"

মনোরমা বলিল, "আমি কিছুই দেখিয়ে দিই নি।"

"তবে মোক্ষদা দেখিয়ে দিয়েছে বোধ হয় ?"

"ও ত রান্না-ঘরের ত্রিসীমানায় যায় নি। কেন, বামুন-ঠাকুর রেঁধেছে কেমন ?"

"বেশ রেঁধেছে গো!"—বলিয়া ইন্দু বাবু শরৎকে ডাকাইলেন।

শরৎ আসিয়া অনতিদূরে বিনীতভাবে দাঁড়াইয়া বলিল, "আর কি এনে দেবো ?"

ইন্দু বাবু বলিলেন, "আর কিছু এনে দিতে হবে না। কিন্তু শরৎ, ঠিক ক'রে বল দিকিনি, সত্যিই কি তুমি বি-এ পাস ?"

শরৎ কিছু উত্তর করিল না, শুধু একটু হাসিল।

ইন্দু বাবু আবার বলিলেন, "তুমি বলেছিলে মোটামুটি এক রকম রাঁধতে তুমি জান। এ ত মোটামুটি রকম নয়, এক্সপার্ট হাতের রান্না! এ তুমি শিখলে কি ক'রে ?"

শরৎ বলিল, "আজ্ঞে, আমি যখন মাষ্টারি করতাম, তখন ছেলেদের নিয়ে আমি একটা বোর্ডিং বলুন, আশ্রম বলুন, খুলেছিলাম। আমরা আশ্রমই বলতাম। মহাত্মা গন্ধীর আদর্শ আমরা অনুসরণ করতাম, নিজের নিজের সব কায আমরা নিজেরাই করতাম—এমন কি, বাসন-মাজা ঘর-ঝাঁট দেওয়া পর্য্যন্ত। কোনও চাকর-বাকর আমাদের ছিল না। প্রথম প্রথম পাকপ্রণালী হাতের কাছে রেখে রোজই আমি নিজেই রাঁধতাম, ছেলেরা পালাক্রমে আমার সাহায্য করত। ক্রমে তারাও সব শিখে ফেল্লে। তার পর, মাঝে মাঝে রাঁধতাম, পালা ছিল। হাতে-কলমে শেখা আর কি।"

ইন্দু বাবু হাসিতে লাগিলেন। মনোরমা বিস্ময় ও শ্রদ্ধা-মিশ্রিত দৃষ্টিতে বামুন-ঠাকুরের পানে চাহিতে লাগিল। ইন্দু বাবু বলিলেন, "তোমার খালাসের বুঝি আর দশ মাস বাকী আছে ?"

শরৎ বলিল, "ন' মাস।"

"ন' মাস ? হয় ত শেষে গুড্ কণ্ডাক্টের (সচ্চরিত্রতার) জন্যে এক মাস তুমি রেহাই পাবে। তবে তুমি স্বদেশী কয়েদী, বলা যায় না, এ অনুগ্রহ গভর্ণমেণ্ট তোমায় না-ও করতে পারেন। আপাততঃ আমি ব্যবস্থা করেছি, সারাদিন তুমি আমার বাসাতেই থাকবে, ও-বেলা তখন খাবার-টাবারগুলো ক'রে দিয়ে, ৫টার সময় জেলে ঢুকবে। সারাদিন ব'সে তুমি কি করবে ? তুমি তোমার আত্ম-জীবন-চরিত লেখ, খালাস হয়ে সে বই তুমি ছাপাবে। স্বদেশীর যে রকম হিড়িক, তোমার বই হু-হু ক'রেই বিক্রী হবে। যত দিন আবার কাযকর্ম্ম একটা না যোটাতে পার, সেই বইয়ের আয়ে তোমার চ'লে যাবে।"

শরৎ বলিল, "যে আজ্ঞে, আপনার এ পরামর্শ ভাল।"

পরদিন বড় খোকা (নগেন্দ্র) ইস্কুল হইতে ফিরিয়া একখানা বাঁধানো এক্সারসাইজ বুক (খাতা) বামুন-ঠাকুরকে দিল। মা তাকে পয়সা দিয়াছিলেন।

৬

তিন মাস অতীত হইল, কিন্তু ইন্দু বাবুর বামুন ঠাকুর ফিরিয়া আসিল না। মনোরমা বলিল, "ওরা ত ঐ রকমই করে। একবার ছুটী নিয়ে দেশে গেলে আর সহজে আস্‌তে চায় না।"

ইন্দু বাবু বলিলেন, "শ্বশুরের বিষয়-সম্পত্তি পেয়ে তার বোধ হয়, অবস্থা ফিরে গেছে, আর চাকরী করবার দরকার নেই। কায ত চ'লে যাচ্ছে। কিন্তু শরৎও বোধ হয় আর বেশী দিন এখানে থাকবে না।"

"বদলির হুকুম এসেছে না কি ?"

"না, আসেনি এখনও। কিন্তু আসতে কতক্ষণ ? স্বদেশী কয়েদীকে গভর্ণমেণ্ট বেশী দিন ত এক জেলে রাখে না।"

"এখানে কত দিন হ'ল ওর ?"

"মাস ছয়েক হ'ল বুঝি।"

"ওর মেয়াদের ত আর ছ'মাস মাত্র বাকী আছে। বেশ কাযকর্ম্ম করছিল, অতি ঠাণ্ডা স্বভাব, সচ্চরিত্র—বাকী ছ'টা মাস এখানে ও থাকলেই বেশ হত।"

এই তিন মাসে শরৎ সকলেরই প্রীতিভাজন হইয়া

উঠিয়াছে। অন্যান্য কয়েদী যাহারা জেলর বাবুর বাড়ীতে আসিয়া গৃহকার্য্য করিবার হুকুম পায়, একটা দুর্লভ সুযোগ তাহারা লাভ করে, লুকাইয়া তামাক খাইতে পায়। বাড়ীর চাকর-বাকরের সঙ্গে ভাব করিয়া, এই সুবিধাটুকু ভোগ করিয়া লয়। কিন্তু জেলে ত তামাক খাইবার কোনই উপায় নাই। শরৎ তামাক, সিগারেট, বিড়ি কিছুই খায় না। এমন কি, আহারান্তে পাণ পর্য্যন্ত নয়। প্রথম দিন শরতের আহার হইয়া গেলে মনোরমা ভৃত্যহস্তে দুটি পাণ তাহাকে পাঠাইয়া দিয়াছিল, কিন্তু শরৎ বলিয়াছিল, "মাকে বল, পাণ ত আমি খাইনে। দয়া ক'রে দুটো সুপুরি লবঙ্গ যদি দেন ত খাই।" বড় খোকা, ছোট খোকা, এমন কি, মোক্ষদার ছেলেটির সঙ্গে পর্য্যন্ত শরতের অত্যন্ত ভাব। বড় খোকাকে শরৎ কত দেশ-বিদেশের গল্প বলে, বিশেষ নেপোলিয়নের যুদ্ধের গল্প এমন সুন্দর করিয়া বলিতে পারে যে, শুধু বড় খোকা নহে, মনোরমা মোক্ষদাও শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া যায়। মনোরমা ত এখন শরৎকে দেখিয়া মাথার কাপড় পর্য্যন্ত দেয় না। মনোরমা বলে, "ও আমার বড় ছেলে।" মোক্ষদা মাথায় কাপড় দেয় বটে, কিন্তু শরতের সঙ্গে রীতিমত কথা কহে। পূর্ব্বে ইন্দু বাবু মনোরমাকে বলিয়াছিলেন, "তোমার সহচরীটাকে শরতের কাছে বেশী যেতে-টেতে দিও না। দু'জনেরই পুরো সোমত্ত বয়েস, জান ত, চাণক্য পণ্ডিত বলেছেন, ঘি আর আগুন—একসঙ্গে রাখবে না।"

মনোরমা বলিয়াছিল, "সে বুদ্ধি কি আমার নেই? হাজার হোক, গেরস্তর মেয়ে আমাদের আশ্রয়ে রয়েছে! এর ভাল-মন্দ আমাকেই দেখতে হবে ত।"

কিন্তু অল্পে অল্পে এ নিষেধ শিথিল হইয়া গিয়াছিল। এক দিন মোক্ষদাকে শরতের সহিত কথা কহিতে দেখিয়া ইন্দু বাবু স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "মোক্ষদা এখন শরতের সঙ্গে কথা কয় দেখছি।"

মনোরমা বলিয়াছিল, "এক বাড়ীতে থেকে কথা না কইলে চলে? কুটনো কুটে দেওয়া, বাটনা বেঁটে দেওয়া, রান্না-বান্নার যোগাড় ক'রে দেওয়া, সবই ত এখন মোক্ষদাই করে। ওগো, শরৎ সে ছেলে নয়, দেবচরিত্র পুরুষ। ওরা দুজনে রান্নাঘরে ব'সে কাযকর্ম্ম করছে, কত দিন এমন আমি আচম্কা গিয়ে পড়েছি, কখনও দু'জনকে হাসাহাসি করতেও দেখিনি। গম্ভীর মুখ। কেউ কারু পানে তাকায়ও না।"

যে-দিন স্ত্রীর সহিত ইন্দু বাবুর শরতের অন্য জেলে বদলি হইবার প্রসঙ্গে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহার এক সপ্তাহ পরে তিনি আপিস হইতে আসিয়া বলিলেন, "ওগো, শরতের বদলির হুকুম এসেছে।"

"কোথা?"

"বক্সার সেণ্ট্রাল জেলে।"

"কবে যেতে হবে?"

"পাঁচ দিন পরে।"

ইন্দু বাবু শরৎকে ডাকিয়াও খবরটা দিলেন। শুনিয়া সে মুখখানি চুণ করিয়া রহিল।

শরতের বদলির সংবাদে বাড়ীসুদ্ধ সকলেই দুঃখিত!

ইন্দু বাবু বলিলেন, "ঠিকাদার বাবুকে বলি, যদি জানা-শুনো একটা ভাল বামুন যোগাড় ক'রে দিতে পারেন।"

শেষ দিন কর্ম্ম করিয়া বিকালে জেলে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে শরৎ মনোরমাকে বলিল, "মা, এ ক'মাস আপনার বাড়ীতে বড় সুখেই ছিলাম। যেন বাড়ীর ছেলের মত ছিলাম—আমি যে জেল খাটছি, তা আমার মনেই হত না। কাল বেলা ন'টার সময় আমায় নিয়ে যাবে। যাবার আগে একবার আপনার পায়ের ধুলো নিয়ে যাব। আপনি বাবাকে ব'লে হুকুমটা করিয়ে দেবেন, নইলে ত সে সময় আমাকে আসতে দেবে না।"

মনোরমা সজল নয়নে স্বীকৃত হইল।

পরদিন যথাসময়ে শরৎ আর আসিল না।

আজ মোক্ষদাই রাঁধিবে। তবে আজ ফতেহাদোয়াজ দাহানের ছুটী বলিয়া নগেনের স্কুল নাই। রান্নার তাড়াতাড়ি নাই।

সাতটার সময় যখন জেলর বাবু আফিসে যাইতেছিলেন, তখন মনোরমা তাঁহাকে শরতের বিষয় স্মরণ করাইয়া দিল। ইন্দু বাবু বলিলেন, "আমি গিয়েই তারে পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

ইন্দু বাবু চলিয়া গেলে মনোরমা মোক্ষদাকে বলিল, "তুমি তা হলে স্নান-টান সেরে নিয়ে রান্নার যোগাড় দেখ তোমার স্নান হয়ে গেলে আমিও স্নান ক'রে রান্নাঘরে যাব।"

৭

অন্য দিন অপেক্ষা আজ একটু সকালেই—সাড়ে দশটা না বাজিতেই, ইন্দু বাবু আফিস হইতে বাড়ী ফিরিলেন। বস্ত্র-পরিবর্ত্তন করিতেছিলেন, এমন সময় মনোরমা ঘর্ম্মাক্ত-কলেবরে আসিয়া প্রবেশ করিল।

ইন্দু বাবু বলিলেন, "কি গো, কোথায় ছিলে?"

"রান্না করছিলাম।"

"কেন, মোক্ষদা?"

মনোরমা মুখখানি গম্ভীর করিয়া, কিয়ৎক্ষণ নীরব রহিল। তার পর বলিল, "ওর হাতে আমাদের আর খাওয়া চলবে না।"

"কেন, কি হয়েছে?"

মনোরমা থামিয়া থামিয়া বলিল, "ও—খারাপ—মেয়ে!"

ইন্দু বাবু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "অ্যাঁ? সে কি? কে বল্লে? কোথা শুনলে তুমি?"

"আমি নিজের চক্ষে দেখেছি। ভাত চড়িয়ে দিয়ে এসেছি, এখনও ফুটতে দেরী আছে। সব কথা বলি, শোন।"—বলিয়া মনোরমা একখানা চেয়ারে বসিল।

ইন্দু বাবু শঙ্কিত-নেত্রে স্ত্রীর পানে চাহিয়া বলিলেন, "কি, বল দেখি।"

তখন মনোরমা বলিতে লাগিল, "তুমি আপিস যাবার সময়, শরৎকে পাঠিয়ে দিতে তোমায় বল্লাম ত? সে আটটার সময় আমায় প্রণাম করতে এল। মোক্ষদা তখন স্নানের ঘরে, আমি এই ঘরে ব'সে তেল মাখছি। শরৎ এসে আমার কাছে বসল। সে থাকতে থাকতেই মোক্ষদা স্নানের ঘর থেকে বেরুল, বেরিয়ে ওদিকে চ'লে গেল। তার পর শরৎ আমায় প্রণাম ক'রে বিদায় নিলে, আমি স্নানের ঘরে ঢুকে দোর বন্ধ করলাম। স্নান করতে গিয়ে দেখি, আমার গামছাখানা নেই। আবার বেরিয়ে, গামছা খুঁজতে খুঁজতে রান্নাঘরের বাইরে দেখি, শরৎ আর মোক্ষদা দু'জনে জড়াজড়ি ক'রে রয়েছে, মোক্ষদার মাথা শরতের কাঁধের উপর, দুজনে একবারে জ্ঞানশূন্য। তার পর মোক্ষদার মাথাটা শরৎ তুলে, তার মুখে চক্‌চক্ ক'রে চুমো খেয়ে, চোখ মুছতে মুছতে পিছনের সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। মনে করেছিল, গিন্নী-মাগী স্নানের ঘরে বন্ধ, কেউ আমাদের দেখতে পাবে না।"

"তুমি যে দাঁড়িয়ে আছ, তা শরৎ দেখলে?

"না।"

"আর মোক্ষদা?"

"মোক্ষদা আমায় দেখলে বৈ কি—একটু পরেই।"

"তুমি কি বল্লে?

"রাগে আমার ব্রহ্মাণ্ড জ্ব'লে যাচ্ছিল, আমি দাঁড়িয়ে থর-থর ক'রে কাঁপছিলাম। মুখ দিয়ে আমার কথা বেরুচ্ছিল না। কোনও রকমে শুধু বল্লাম, 'মোক্ষদা, তুমি আর রান্না-ঘরে ঢুকো না।'—ব'লেই আমি গামছাখানা নিয়ে স্নানের ঘরে ঢুকলাম। প্রায় পনেরো মিনিট স্নান করতে পারলাম না, কাঠের মূর্ত্তির মত ব'সে রইলাম। তার পর স্নান সেরে মাথা মুছতে মুছতে বেরিয়ে দেখি, কয়েদীদের নিয়ে যাবার জন্যে জেলের গাড়ী ফটকে দাঁড়িয়ে আছে, আর মোক্ষদা জানালার গরাদে ধ'রে দাঁড়িয়ে হাঁ ক'রে ফটকের পানে চেয়ে আছে। আমি যে ঢুকেছি, তা বিবির হুঁস পর্য্যন্ত নেই।"

ইন্দু বাবু বলিলেন, "অ্যাঁ, তুমি দেখে ফেলেছ জেনেও? পরেও লজ্জা-সরম একেবারে বিসর্জ্জন?"

মনোরমা বলিল, "ওগো, বুঝছ না, ধরা প'ড়ে দু'কাণ কাটা হয়ে গেল কি না! এক কাণ-কাটা যায় গাঁয়ের বা'র দিয়ে, দু'কাণ-কাটা যায় গাঁয়ের ভিতর দিয়ে।"

"কোথা সে এখন? পালিয়েছে বোধ হয়?"

"পালাবে কেন? নিজের বিছানায় শুয়ে, বিরহিণী বোধ হয় বিরহের কান্না কাঁদছেন।"

ইন্দু বাবু কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকার পর থামিয়া থামিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "সংসারে মানুষ চেন্‌বার যো নেই! ঐ পাজিটাকেই তুমি এক দিন বলেছিলে—দেবচরিত্র পুরুষ! আর তাও ঐ মোক্ষদারই সম্বন্ধে। আর মোক্ষদাও যে এমন ভিজে বেড়ালটি, তা ত এক দিনের জন্যও সন্দেহ হয় নি! ছি ছি ছি, ভদ্রলোকের বাড়ীর মধ্যে এ কি কাণ্ড! দুপুর বেলা আমি এ ঘরে নাক ডাকিয়ে ঘুমুই। তুমিও মাঝে মাঝে সহরে বন্ধুবান্ধবের বাড়ী নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছ। দিব্যি সুযোগটি পেয়েছিল ওরা। ছি ছি ছি! চুলোয় যাক্! এখন কি করা যায়, বল দেখি?"

মনোরমা বলিল, "ঝাঁটা মেরে বিদায় করা ছাড়া আর কি করবার আছে? তুমি স্নান ক'রে ফেল, আমার ভাতও বোধ হয় হয়ে এল।"

আহারান্তে ইন্দু বাবু শয্যায় বসিয়া তামাক খাইতে লাগিলেন। তামাকটা শেষ হইলেই শয়ন করিবেন।

মনোরমা মোক্ষদার ভাত বাড়িয়া অবহেলাভরে তাহার ঘরে থালাখানা ফেলিয়া আসিয়া, স্বামীর পাতে নিজে খাইতে বসিল।

ইন্দু বাবু তামাকটা শেষ করিয়া, কি পড়িতে পড়িতে ঘুমাইবেন একটা বই-টই খুঁজিতেছিলেন, এমন সময় বড় খোকা একখানা খাতা হাতে প্রবেশ করিয়া বলিল, "বাবা, শরৎদা তার আত্ম-জীবনীখানা ফেলে গেছে।"

ইন্দু বাবু অন্য বহি না খুঁজিয়া, কৌতূহলবশতঃ সেইখানা হাতে লইয়াই শয়ন করিলেন। প্রথমে শেষটা দেখিলেন, সমাপ্ত হইয়াছে কি না। দেখিলেন, সমাপ্ত হয় নাই, ঢাকা জেলায় তাহার গেরেপ্তারের কথা পর্য্যন্ত লেখা হইয়াছে। পৃষ্ঠা উল্টাইয়া এখানে সেখানে দেখিতে দেখিতে দেখিলেন, একটা পরিচ্ছেদের শিরোনামা রহিয়াছে—"আমার বিবাহ।" সেই পৃষ্ঠাতেই রহিয়াছে, অমুক গ্রামের অমুকের কন্যা শ্রীমতী মোক্ষদাসুন্দরীর সহিত আমার বিবাহ হইল।

পড়িয়াই তাঁহার মনে হইল, এই মোক্ষদাই নহে ত? পড়িতে পড়িতে শেষ দিকে দেখিলেন, গ্রেপ্তারের সময় দেশে স্ত্রী তাহার গর্ভবতী। তারিখ হিসাব করিয়া দেখিলেন, এই মোক্ষদার পুত্রের সহিত বয়স মিলিয়া যায়।

অবাক্ হইয়া ইন্দু বাবু বসিয়া ভাবিতেছেন, এমন সময় মনোরমা আহারান্তে আসিয়া দাঁড়াইল। ইন্দু বাবু বলিলেন, "ওগো, মোক্ষদাকে একবার এখানে ডাক ত!"

"কেন?"

"বিশেষ দরকার। এক মুহূর্ত্ত দেরী কোরো না।"

মনোরমা মোক্ষদার ঘরে গিয়া দেখিল, সে যেমন শুইয়াছিল, তেমনই শুইয়া আছে, তাহার ভাত যেমন তেমনি পড়িয়া আছে। কর্ত্তার জরুর তলব মনোরমা কঠোর স্বরে তাহাকে জানাইল।

কাঁদিতে কাঁদিতে মনোরমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মোক্ষদা আসিয়া দাঁড়াইল।

ইন্দু বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "মোক্ষদা, ঐ শরৎ কয়েদী কি তোমার কেউ হয়?"

মোক্ষদা চোখে অঞ্চল দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জড়িত-স্বরে বলিল, "আমার স্বামী।"

"তুমি তা হ'লে এখানে হঠাৎ এসে পড় নি। তোমার স্বামী এখানে বদলি হয়ে এসেছে জেনেই তুমি এসেছিলে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ"—বলিয়া মোক্ষদা যাইবার উপক্রম করিল।

ইন্দু বাবু কম্পিত স্বরে বলিলেন, "মোক্ষদা, অন্যায় সন্দেহ করবার জন্যে তুমি আমাদের মাফ কর।"

মোক্ষদা গলবস্ত্রে ভূমিষ্ঠ হইয়া ইন্দু বাবুকে প্রণাম করিল।

মনোরমা সংশয়ভরে জিজ্ঞাসু নয়নে স্বামীর পানে চাহিল। ইন্দু বাবু চক্ষু নত করিয়া বলিলেন, "মোক্ষদা সত্যি কথাই বলেছে।"

মনোরমা তখন "চল চল" বলিয়া আদর করিয়া মোক্ষদার হাত ধরিয়া তাহাকে লইয়া গিয়া, জোর করিয়া ভাতের থালার কাছে বসাইল।

পরে জানিতে পারা গেল, বহু দিন স্বামীর অদর্শন সহ্য করিতে না পারিয়া, তাহাকে মাঝে মাঝে শুধু যদি চোখের দেখা দেখিতে পায়, এই আশায় জেলখানার কোনও বাবুর বাড়ীতে চাকরি করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই মোক্ষদা এ সহরে আসিয়াছিল। ঠিকাদার বাবুর স্ত্রীর এ বাড়ীতে যাতায়াত আছে শুনিয়া, সে হাতে স্বর্গ পাইয়াছিল।

অবশ্য এতটা সে আশা করে নাই যে, যে বাড়ীতে কর্ম্মে নিয়োজিত হইবে, তার স্বামীও সেই বাড়ীতে প্রতিদিন আসিবেন, তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিবার পর্য্যন্ত সুযোগ পাইবে।

মনোরমা বলিল, "দেখ, একটা কথা আমার মনে হচ্ছে।"

"কি?"

"শরৎ সেই যে তোমায় বলেছিল, জেলের অন্ন খেয়ে আমার প্রাণ গেল, আপনার বাড়ী আমি রাঁধবো, তার কারণ আছে। মোক্ষদা প্রায় পিছনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে জেলের উঠান দেখতো। আমি ভাবতাম, বুঝি তামাসা দেখছে। তখন কি জানি, ও স্বামীকে দেখছে। শরৎও পাঁচ দিন ওকে দেখে থাকবে। তাই এ বাড়ীতে কায করবার জন্যে ছোঁড়ার এত আগ্রহ হয়েছিল।"

ইন্দু বাবু বলিলেন, "তাই সম্ভব। কিন্তু আশ্চর্য্য সংযম ওদের। তিন মাস ছিল দু'জনে এক বাড়ীতে, অথচ শেষ দিনটি ভিন্ন—"

মনোরমা বলিল, "সত্যি!"

মনোরমার ছেলে হওয়া পর্য্যন্ত মোক্ষদা রহিল। বস্তুতঃ জেল হইতে খালাস পাইয়া শরৎ যখন স্ত্রীকে লইতে আসিল, মনোরমার ছেলে তখন তিন মাসের হইয়াছে।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

নিত্য স্রোতে

আর্ত্ত দুঃখীর দিন—তার কোথাও বৈচিত্র্য নাই। বড় দীর্ঘ! সে যেন কাটিতে চায় না! মর্ত্ত্যের পানে চাহিলে মনে হয়, দুঃখ আর যাতনা সীমাহীন পাথার রচিয়া রাখিয়াছে—সে দৃশ্যে নিশ্বাস অবধি বন্ধ হইয়া আসে। মুক্ত বাতাসের সন্ধানে আকাশের পানে চাহিলেও আতঙ্কের একশেষ! আকাশ সর্ব্বক্ষণ গুম্ হইয়া আছে, কখন্ নামিয়া মর্ত্ত্যকে চাপিয়া পিষিয়া ফেলে!

বিন্দু তবু এ-গৃহে আশার একটু বাণী যেন বহিয়া আনিয়াছে! দুঃখ-দুর্দ্দশা চারিদিকে—কিছু করিবার উপায় নাই! শুধু মা ও মেয়ে বসিয়া রোগীর পানে চাহিয়া থাকিত! বাহিরে জীবনের রথ-চক্র চলিয়াছে পূর্ণ তেজে···সে চক্র-রব কাণে আসিয়া বাজে, অথচ ও রথে চড়িয়া জীবনের বিচিত্র দৃশ্যমালা দেখিয়া আনন্দ বা তৃপ্তি উপভোগ করিবে, তার কোনো সম্ভাবনাই নাই! রোগের বেদনার চেয়ে নিরুপায়তায় এ বেদনা আরো তীক্ষ্ণ হইয়া যোগমায়া দেবীর বুকে বিঁধিত!

এখন বিন্দু আসিয়া পরিচর্য্যার ভার গ্রহণ করায় রোগের নিবিড় অন্ধকারে আশার মৃদু রশ্মি মাঝে মাঝে ফুটিয়া ওঠে! ডাক্তারদের আসা-যাওয়া, তাঁদের নির্দ্দেশ-পত্র বহিয়া ঔষধ আনিতে রামুর ছুটাছুটি· যোগমায়া দেবী নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবেন, ভগবান বুঝি উপায় করিয়া দিলেন!

কিন্তু তাঁর বেদনার যে সীমা নাই। চালে যার সহস্র ফুটা, বৃষ্টি-ঝঞ্ঝার বিপুল আক্রমণ হইতে চালাকে সে কি ভাবেই বা রক্ষা করিবে? যোগমায়ার দশা ঠিক তেমনি! জীবনের চিকিৎসার ব্যবস্থা হইল,—কিন্তু বলাই? তার যে কোনো খবর নাই! ওদিকে কি সর্ব্বনাশ হইয়া গেল! তাঁর দুই চোখে জলধারার বিরাম নাই, নিমেষের জন্য!

শত চেষ্টাতেও জীবনের আরোগ্য-লাভের সম্ভাবনা দেখা গেল না। মাসখানেক পরে বিন্দু একদিন ডাক্তারকে প্রশ্ন করিল,—লক্ষণ তো ভালো দেখচি না, ডাক্তারবাবু! তবে কি এ অসুখ সারবে না?

ডাক্তারটি বিচক্ষণ, প্রবীণ। তিনি কহিলেন,—রোগীর যাস হয়েছে—আমাদের শাস্ত্রে তাই বলে।

বিন্দুর বুকে বেদনা পাথরের মত ভারী হইয়া বসিল। বিন্দু কহিল,—তা হলে কোনো উপায়ই নেই?···একটা নিশ্বাস পড়িল। পরক্ষণে সে আবার প্রশ্ন করিল—তবু মেয়াদ কত দিন, শুনি?

ডাক্তার কহিলেন—তা বলা যায় না। এই যে পরিচর্য্যা চলেছে, এতে কোনোমতে ওঁকে ধ'রে রাখা গেছে। কিন্তু বন্যার মুখে বালির বাঁধ বৈ তো নয়! যেদিন বন্যার বেগ প্রবল হবে, সেদিন এ বাঁধের সাধ্যও থাকবে না, বাঁচায়! সব ভাসিয়ে নে যাবে!···এক বছর থাকতে পারেন, আবার এক মাসও হয় তো কাটানো সম্ভব হবে না। ঠিক ক'রে কিছু বলা শক্ত।

সজল চোখে বিন্দু ডাক্তারের পানে চাহিয়া রহিল। ডাক্তার কহিলেন—এই চিকিৎসা চলুক। সারানো সম্ভব নয়···তবে জোড়া-তালি দিয়ে যে ক'দিন টেনে রাখা যায়। এর বেশী বলতে গেলে মিথ্যা স্তোক্ দেওয়া হবে, মা।

নিশ্বাস ফেলিয়া বিন্দু রোগীর পানে চাহিয়া রহিল—তার দুই চোখের পিছনে অশ্রুর রাশি জোয়ারের প্রথম জলোচ্ছ্বাসের মত কাঁপিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল!···

ভাবনায় চিন্তায় বিন্দুর শরীরও ভালো রহিল না। হরেন্দ্র বলিল,—তুমি হুকুম করো মা, এক জন বাঙালী নার্শ এনে দি। না হলে তোমার শরীর যে গেল!

হাসিয়া বিন্দু কহিল,—কি যে বলো, কাকা! বাঙালীর মেয়ে চিরদিন রোগে সেবা ক'রে এসেচে। তা ছাড়া মানুষের শরীর চিরদিন এক রকমও থাকে না।

হরেন্দ্রকে বিন্দু কাকা বলিয়া ডাকে। হরেন্দ্র বলিল,—তোমার এখানে লোকাভাব যে, মা! তা ছাড়া পয়সা থাকতে···

বিন্দু কহিল,—যে পয়সা নিজের আয়েসে খরচ করবো, সে-পয়সায় একটি গরীবের মেয়ের বিয়েয় সাহায্য চলতে পারে, একটি রোগীর চিকিৎসার ব্যয়েও···

হরেন্দ্র চুপ করিল। সে দেখিয়াছে, তার বিন্দু-মার কাছে কোনো দায়ে হাত পাতিতে আসিয়া নিরাশ হইয়া এ পর্য্যন্ত কেহ ফিরে নাই!

কিন্তু এ সেবায়, এ পরিচর্য্যায় কোন ফল হইল না। জীবন ক্রমেই নির্জীব হইয়া পড়িতেছিল। শানুর ওখানে খবর দেওয়া প্রয়োজন, কিন্তু একটু বাধা ছিল। মাস-দুই পরে শানুর সন্তান হইবার সম্ভাবনা! হঠাৎ এত বড় বিপদের সংবাদে···ডাক্তার বাবু বলিলেন,—থাক্ মা।

যোগমায়া কহিলেন,—কি হবে এসে! শেষ তাকেও হারাবো। আমার যা বরাত!

পিশিমা বলিলেন,—তাই তো, কিছু বুঝচি না, ভাই।

বিন্দু কিছু না বলিয়া তাদের মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

দুপুর বেলায় বিন্দু বলিল,—এদের দুই ভাইকে চিঠি লিখে খপর দাও, জ্যাঠাই-মা। ছেলে—তাদের কর্ত্তব্য আছে। না হলে শেষে আমাদের দোষ দেবে···

যোগমায়া দেবী নিশ্বাস ফেলিয়া রোগ-শায়িত স্বামীর পানে চাহিয়া রহিলেন। তাঁর দুই চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। অনেক কথা মনে পড়িতেছিল।

বিবাহের পর সেই লজ্জাবতী বধূ আসিয়া এ-গৃহে পা দিয়াছিলেন। অবস্থা খুব ভালো না থাক্, সংসারে কোনো অস্বচ্ছলতা ছিল না। জীবন বি-এ পড়িতেছিল। ঐটুকু বয়সে এ-সংসারে আসিয়া তার ভার তখনি হাতে লইয়াছেন! রাত্রে জীবন ভবিষ্যতের কত স্বপ্ন-কাহিনী পাড়িয়া বসিত—সে উকিল হইবে, এবং পশার বাড়িলে দুঃখ ঘুচিবে। দাসী-চাকর, গাড়ী, ঘোড়া, বিলাস-ভূষণ···কোনো দিক দিয়া যোগমায়াকে সুখী করিতে ত্রুটি রাখিবে না।···কিন্তু বি-এ পাশ করিতে পারিল না। আর পড়িতেও ভালো লাগিল না। পড়ার উপায় এবং ধৈর্য্য সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত। অগত্যা চাকরীর উমেদারী সুরু হইল; এবং এ-অফিসে দু'মাস, সে-অফিসে দু'বছর—এমনি করিয়া সংসারটাকে চালাইয়া চলিল। তার পর ভুবন, সুবল, বলাই, শানু ছেলেমেয়েরা আসিল! ছেলে-মেয়ের কাপড়-চোপড়, দুধ, জলখাবার—ব্যয় বাড়িয়া চলিল, অসম্ভব রকম! কোথা হইতে এ সব হয়! জীবনের ক্ষোভের সীমা রহিল না। যোগমায়া দেবী বুঝাইতেন,—কেন ভাবো? কেন অমন উতলা হও? গরীবের ঘরে ছেলে-মেয়ে কি মানুষ হয় না? নাই বা সাটিনের জামা গায়ে দিলে, নাই বা পোলাও-কালিয়া খেলে···! তুমি ভেবো না। জীবন উত্তর দিত,—কিন্তু কি স্বপ্নই দেখতুম, যোগু!

যোগমায়া দেবী হাসিয়া বলিতেন,—স্বপ্ন স্বপ্নই! স্বপ্ন মানুষ চিরদিন দেখে—তা বলে তাকে আঁকড়ে কেউ কাঁদতে বসে না। ওঠো, ও-সব অনাসৃষ্টি ভেবো না।

নিশ্বাস ফেলিয়া জীবন উঠিয়া যাইত! তার পর সংসারের উপর দিয়া কত দায়, কত অদায় শ্রাবণের বারিধারার মত আসিল, গেল! জীবন অস্থির আকুল হইত, যোগমায়া দেবী বুঝাইতেন, ছেলেরা লেখাপড়া করচে—ওরা মানুষ হোক। নিজের স্বপ্ন ওদের জীবনে জাগিয়ে তুলো। ধৈর্য্যহারা হয়ো না। তুমি অস্থির হলে সব যাবে।

পয়সা-পয়সা করিয়া জীবন কোথায় কোন্ দিকে না ছুটিয়াছে! আপিসের কাজ, তার পর এর আড়তের মাল কেনা, তার বাড়ী-বেচার কথাবার্ত্তা বহিয়া দৌড়ানো··· নিজের এতটুকু স্বাচ্ছন্দ্যের পানে কোনো দিন চাহিয়া দেখে নাই। গৃহ-সুখ বলিয়া কথা আছে—সে গৃহ-সুখ বেচারী জীবন কতটুকু পাইয়াছে! মনে সর্ব্বক্ষণ অস্বাচ্ছন্দ্য···গরীবের ঘরে অভাব-অভিযোগের অন্ত নাই—দুশ্চিন্তাগ্রস্ত জীবন কোথা হইতে কি আনিয়া যে সে-অভাব অভিযোগ মিটাইয়াছে। যোগমায়া দেবী সংসারটাকে মাথাতেই না হয় বহিয়াছেন, কিন্তু এ সংসারে কোথায় এতটুকু ফাট্ ধরিল, কি চিড় খাইল, তখনি সে ফাট্ যেমন করিয়া হোক দাগ্‌রাজি করিয়াছে- ঐ জীবন।··· খাওয়া-পরার কষ্ট ছেলেমেয়েদের কোনো দিন জানিতে দেয় নাই! মেজাজ? দুঃখে-দারিদ্র্যে বুকে যার অষ্ট প্রহর চিন্তার আগুন জ্বলিতেছে, তার মেজাজ কি করিয়া ঠাণ্ডা থাকে! সংসারের অভাব-অভিযোগ ঘুচাইতে নিত্য যার বিরামহীন ভাবনা, যার চোখের সামনে অকূল সমুদ্র—তার মেজাজ ভালো থাকে না, থাকিতে পারে না···যোগমায়া দেবী তা বুঝিতেন, এবং বুঝিতেন বলিয়াই ছেলেমেয়েরা যখন বাপের আচরণে, বাপের ব্যবহারে অপ্রসন্ন হইত, বকাবকি করিত, যোগমায়া দেবী তখন তাদের সাম্‌লাইয়া এমন নিঃশব্দে সংসার চালাইতেন, যে, স্বামী জীবন তা জানিতেও পারিত না! তার উপর ঐ ভুবন, সুবল,—ছেলেদুটার কতখানি স্বার্থপরতা···মানুষ তাহাতে পাগল হইয়া যায়! এই ছেলেমেয়ের উপর আশা রাখিবার জন্য যোগমায়া দেবী স্বামীকে অনুক্ষণ উৎসাহিত করিতেন—তাঁর যৌবনের স্বপ্ন এই ছেলেরা সত্য করিয়া তুলিবে! হায় মানুষের আশা!···

যোগমায়া দেবীর চোখের পিছনে অশ্রুর তরঙ্গ ঠেলিয়া আসিল। অসীম বলে তিনি সে অশ্রু রোধ করিলেন। তিনি জানেন, কি ধৈর্য্যে কত গভীর ব্যথা-বেদনা তিনি রুধিয়া রাখিয়াছেন! না রাখিলে এ সংসারের অস্তিত্বও আর থাকিত না।

আর ঐ স্বামী! তাঁকেও কত বকিয়াছেন, তাঁর উপর কত রাগ করিয়াছেন! মুখের দুটা ভালো কথা, তার

হইতেও স্বামীকে বঞ্চিত রাখিয়াছেন। কিন্তু সে যে কত-খানি দুঃখে, কত-বড় যাতনায়! বেদনার রাশি ভারী পাথরের মত যোগমায়া দেবীর বুকে চাপিয়া বসিল।

তবু সংসার কোথায় রহিল? ছেলেরা চলিয়া গিয়াছে। মেয়ে? শানুর বিবাহ হইয়াছে ভালো—তার এমন ভাগ্যের কল্পনা তাঁর মনে উদয় হয় নাই! আহা, ভালো থাকুক, সুখে থাকুক! এ লক্ষ্মীছাড়া সংসারে তার আর আসিয়া কাজ নাই!...তাঁদের বেদনা, জীবনের এ অসুখ যদি সত্যই না সারে?...তিনি শিহরিয়া উঠিলেন—না, না! তাঁদের বেদনা যত গভীর হৌক, এ বেদনার বাষ্পও যেন অপু বা শানুর গায়ে না লাগে। যে যেখানে আছে, ভালো থাকুক, আরামে থাকুক! এখানকার সঙ্গে নাই বা কোন সম্পর্ক রাখিল!...কিন্তু এর পর...? সত্যই জীবনের যদি...

যা হয়, তাঁর অদৃষ্টে ঘটিবে!...তবে কমলী? এখন তার বিবাহটুকু ভগবান উপায় করিবেন না? মানুষ কি করিতে পারে? তার শক্তি কতটুকু! ভগবানই...! তিনি না দেখেন...? বিন্দুর কথা মনে পড়িল। মা যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী! কেহ না দেখে, বিন্দু আছে। বিন্দুর কাছে কিসের অপমান! মানুষের পেটের মেয়েও এমন দরদ করে না! দধীচির কাহিনী পড়া আছে—সেই দধীচির মত নিজের অস্থি দিয়া বিন্দু অসময়ে কি না করিতেছে! করুক! আহা, কি ওর আছে? কি সুখ? কি শান্তি? এমনি পাঁচটা কাজে মনকে যদি খাড়া রাখিতে চায়...নিজের দুঃখ ভুলিয়া থাকিবে, সংসারেও পাঁচজনের দুঃখ ঘুচাইবে!

যখন-তখন তাঁর মনে এমনি চিন্তার উদয় হইত! নিজের ও জীবনের সমস্ত অতীতটুকু যেন মানচিত্রের মত তাঁর চোখের সামনে কে মেলিয়া ধরিত! অতীত জীবনের সেই ছোট সুখ, বড় দুঃখ—মানচিত্রে আঁকা সেই সমুদ্র, মহাসমুদ্র, দেশ, মহাদেশের মতই জ্বলজ্বল্ করিয়া চোখের সাম্‌নে ফুটিয়া থাকিত!

দিনের পর দিন কাটিতেছিল—আশার ক্ষীণ সূত্রটিকে ক্রমেই দুর্ব্বল ছিন্ন করিয়া!

সেদিন বৈকালে কমলীর পাত্রের সন্ধান লইয়া এক ঘটক আসিয়া হাজির! ঘটকটিকে নিয়োগ করিয়াছে হরেন্দ্র,—বিন্দুর তাড়নায়। পাত্র ভালো—কলিকাতায় বাড়ী আছে; সম্প্রতি চাকরীতে ঢুকিয়াছে। চাকরী বোম্বাইয়ে। মাহিনা পায় দেড়শো টাকা। উন্নতির সম্ভাবনা প্রচুর। পাত্রটির বয়স পঁচিশ বছর মাত্র। টাকার খাঁই তেমন নাই। পছন্দ-মাফিক্ ভদ্রঘরের মেয়ে চায়—মেয়েটি নেহাৎ বালিকা না হয়!

যোগমায়া দেবী বিন্দুর হাত ধরিয়া কহিলেন—কি ব'লে আশীর্ব্বাদ করবো, মা! জন্ম-জন্ম সতী এয়োতিদের আশীর্ব্বাদে সিঁথির সিঁদুর অক্ষয় রেখো। এ-দুর্ভাগ্য আর কোনো জন্মে তোমার না ঘটে! পাত্র শৈলেশ্বর নিজে আসিয়াছিল পাত্রী দেখিতে। কমলীকে পছন্দ হইল। টাকাকড়ি? তারা গা-সাজানো গহনা চায়—নগদ? খুশী হয় দিবেন, না হয় ক্ষতি নাই! এই পর্য্যন্ত।

বিন্দু নিজে হইতে যৌতুকের ব্যবস্থা করিল; এবং বিবাহের দিনও স্থির হইয়া গেল। যত শীঘ্র কাজ চোকে! পাত্র শৈলেশ্বরের ছুটী কম এবং এ ছুটী শীঘ্র আর মিলিবে না। তার উপর জীবনের যে অবস্থা...মেয়ের বিয়ে যদি দেখিয়া যায়, কতক নিশ্চিন্ত হয়!

শানু? নাই আসিল! ভালোয়-ভালোয় বিবাহ হইয়া যাক। এর পর দেখাশুনা আলাপ-পরিচয়ের অভাব ঘটিবে না।

এমনি করিয়া কমলীর বিবাহ হইয়া গেল। ভুবন আসিয়াছিল নিমন্ত্রিতের মত! বধূও ঐ বিবাহের রাত্রে আসিয়া নিমন্ত্রণ রাখিয়া বিদায় লইল। ভুবন বলিল, তার থাকিবার জো নাই। এগজামিনটা ভারী কড়া এবং সামনে! তার একতিল সময় নাই, অপব্যয় করে!...সুবলের আসা হইল না। শাশুড়ীর শরীর খারাপ। তিনি ঐ মেয়ে-জামাই লইয়াই কোনো মতে টি'কিয়া আছেন। আইবুড়া-ভাতের শাড়ী ও মিষ্টান্ন-বাবত পাঁচটা টাকা তাঁরা মণি-অর্ডারযোগে পাঠাইয়া কুটুম্বিতা রক্ষা করিলেন। ভুবনের শ্বশুর তাও দেন নাই। প্রফেশর মানুষ—সামাজিক অপব্যয় চ'ক্ষে দেখিতে পারেন না!

মা চোখ মুছিলেন, বিন্দু রাগে গুমরিতে লাগিল। জীবন বিছানায় পড়িয়া রহিল মূর্চ্ছিতের মত!

তার পর এক দিন সে চরম-বিপদও ঘটিল। কমলার বিবাহের মাসখানেক পরে এক দিন প্রাতে জীবন চির-কালের জন্য চক্ষু মুদিল।...বাড়ীতে কোনো রোল উঠিল না। বিষাদের নীরব ছায়া...কটি প্রাণী নীরবে বসিয়া চোখের জল মুছিল।

—

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

গৃহ-হারা

বন্যার প্রবল স্রোত নামিয়া গেলে তীরে যেমন পড়িয়া থাকে কতকগুলা কাঠি-কুটা, জঞ্জাল—প্রলয়ের কালো স্মৃতিরেখার মত, এ সংসারেও তেমনি ঘটিল। তিনটি বিধবা নারী পরস্পরের মুখ চাহিয়া বসিয়া আছে! করিবার কাজ নাই। ভাবিবে,—সে ভাবনাও যেন চলিয়া গিয়াছে! কিসের ভাবনা! কি লইয়া ভাবনা! কি বা ভাবিবে! এখানকার কাজ তিন জনেরই চুকিয়াছে—কোনমতে যেন সেই ছুটীর ডাকটুকুর প্রত্যাশায় বসিয়া আছে!

যোগমায়া দেবীর মনে পড়িতেছিল, কবে প্রথম যৌবনে একবার তীর্থে গিয়াছিলেন, সেই কথা। তাঁর পাণ্ডা ছিল ভারী হুঁশিয়ার। মন্দিরে খুব ভিড়—সেদিকে ঘেঁষা যায় না। পাণ্ডা তাঁদের এক জায়গায় বসাইয়া মন্দিরে ঢুকিল, বলিয়া গেল, ভিড় একটু কমিলে ডাকিবে! তাঁরা সেই ডাকটুকুর প্রত্যাশায় নিঃশব্দে একধারে বসিয়াছিলেন—কখন্ পাণ্ডা ডাকিবে, এসো! এ-ও ঠিক তেমনি। কিন্তু মন্দির ছিল কাছে, চোখে তার দ্বার-পথ দেখিতেছিলেন; তা ছাড়া সে ভিড়ও নিমেষের। এখন যে বসিয়া আছেন—শেষের ডাক কোন্ দিক হইতে কি ভাবে কবে আসিবে, জানেন না! এখানে ভিড় নাই—তবু কে পড়িয়া থাকিবে, কার ডাক আগে পড়িবে,অনিশ্চয়তার সেই এক দুর্ব্বহ ভার! এ ভার বহিয়া থাকিতে হইবে—কে জানে, কত কাল!…

শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকিলে শৈলেশ্বর কমলাকে লইয়া বোম্বাইয়ে গেল। তার যাওয়া লইয়া এখানে এতটুকু আপত্তি বা প্রতিবাদ নাই। এ গৃহ হইতে তাকে বিদায় দিতে পারিলে যোগমায়া দেবী যেন বাঁচিয়া যান। এ গৃহে যে শনি ঢুকিয়াছে—কার কখন্ কি ঘটে, সারাক্ষণ তিনি শঙ্কিত থাকিতেন।

বিন্দুকেও তিনি বলিতেছিলেন—এখানে আমায় আঁকড়ে প'ড়ে থাকিস নে মা—কাশীতেই যা!

বিন্দু কহিল,—সে হয় না, জ্যাঠাই-মা। তোমায় কে দেখবে?

যোগমায়া দেবী কহিলেন,—ঠাকুরঝির শেষ বয়স—সত্যি, কোনো সাধ মেটে নি! কাশীতে থেকে এ দিনগুলো সত্যি যদি সার্থক ভাবে!

বিন্দু কহিল,—বেশ, তুমি সঙ্গে চলো। কালই কাশী যেতে রাজী আছি তা হ'লে।

যোগমায়া দেবীর দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। এ ঘর ছাড়িয়া কোথায় যাইবেন? এ ঘরের তুলনায় কাশী! তাঁর যত সুখ, যত ব্যথা, যত স্বপ্ন, সব এইখানে। পুরানো স্মৃতিতে আজও এ-গৃহ ভরিয়া আছে! এর প্রত্যেক দেওয়াল, ঐ তাক, জানলা, উঠান,—উঠানের ঐ গাছপালা,—এরা যে তাঁর অন্তরের বস্তু, মিশিয়া আছে! এদের ছাড়িয়া দূরে যাইবেন? কাশী? তীর্থ? না, না, অসম্ভব!

কিন্তু ভগবান এ স্মৃতিটুকুও ছিন্ন করিলেন! জীবনের মৃত্যুর দুই মাস পরে আদালতের লোক আসিয়া জানাইয়া দিল, বাড়ী বন্ধক ছিল—ডিক্রীর দায়ে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। যে ব্যক্তি কিনিয়াছে, সে বহুকাল পূর্ব্বে দখল লইত, লয় নাই শুধু জীবনের দুরারোগ্য ব্যাধির জন্য। তার পরও বহুদিন চুপ করিয়াছিল—সদ্য বিপদ্! যোগমায়া দেবীর পক্ষে ভালোই হয়, যদি স-মানে বাড়ী ছাড়িয়া দেন—অহেতুক তাহা হইলে কতকগুলা পেয়াদা-পাইক আনিয়া ঢাক-ঢোল পিটিয়া বিশ্রী কোলাহলের সৃষ্টি করিতে হয় না!

কথা শুনিয়া যোগমায়া দেবী কপালে হাত দিয়া বসিলেন। এ সংবাদ তাঁর জানা ছিল না! এ সংবাদ… যেন সেই বিনা-মেঘে বজ্রাঘাতের মত!

হরেন্দ্র বলিল—আমাদের ওখানে চলুন, বড়-দিদিমা…

ভাষাহীন বেদনায় বিন্দু মৌন মুখে রহিল। যোগমায়া দেবী সনিশ্বাসে কহিলেন,—মনে কত সাধ ছিল, সব চূর্ণ হয়েচে। একটা সাধ শুধু, যে, এই ভিটেয় মুখ গুঁজড়ে প'ড়ে থাকবো, তাতে কেউ বাধা দেবে না। তাতেই আমার শান্তি! ভগবান সে শান্তিটুকুও কেড়ে নিলেন, বিন্দু!

বিন্দু নির্ব্বাক্! এ বেদনায় সান্ত্বনা দিবার ভাষা নাই! আশ্রয়ের অবশ্য অভাব ঘটিবে না, অন্ন-বস্ত্রও মিলিবে—তবু এ গৃহ-ত্যাগের বেদনা কি ভীষণ,—বিন্দু মর্ম্মে মর্ম্মে তাহা অনুভব করিল। কিন্তু কি বলিবে, জানে না। তাই জ্যাঠাই-মার পানে চাহিয়া নিঃশব্দে সে বসিয়া রহিল।…

ভুবন, সুবল, বলাই…কোথায় তারা? মার প্রাণ… ছেলেদের জন্য আকুল অস্থির হইয়া উঠিল। মেয়েরা? ভগবান্ তাদের যে উপায় করিয়াছেন…এইটুকুই মস্ত সান্ত্বনা! ভগবানের উদ্দেশে এ জন্য তিনি প্রাণের কৃতজ্ঞতা জানাইলেন।

উপস্থিত আশ্রয়ের অভাব ঘটিবে না, বিন্দু আছে—তাহাও তিনি বুঝিতেন।…কিন্তু তাকে এমন করিয়া তাঁর

দুঃখ-দারিদ্র্যের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিবেন কি বলিয়া! বিন্দু তাহাতে কাতর হইবে না, বিন্দুর আগ্রহ এ বিষয়ে সীমাহীন…তা'ও জানেন। তবু তাঁর তো একটা কর্ত্তব্য আছে। কতখানি অভাব, কি দায় হইতে বিন্দু তাঁকে উদ্ধার করিয়াছে!…গভীর ঋণ! বুক-ভরা স্নেহে কি তার সে ঋণ শোধ হয় না!…

দিন চলিতে লাগিল। অবশেষে শাশুড়ীর কাছ হইতে বিন্দু একদিন এক চিঠি পাইল। হরিদ্বার হইতে চিঠি আসিয়াছে। শাশুড়ী নিজে লিখিয়াছে,—

মা গো

একা নিঃসঙ্গ দিন আর আমার কাটে না। আমায় ত্যাগ করলে মা? আমার কে আছে? কার মুখের পানেই বা এ বয়সে চাই? তোমায় বুকের কাছে পাইতে বড় সাধ হয়। পাঁচজনে মাঝে হইতে বিষয়-সম্পত্তি লইয়া একটা বিশ্রী কাণ্ড গড়িয়া তুলিল, শোকে-তাপে আমার তখন চৈতন্য ছিল না, মা। যা হোক, যা ঘটিয়াছে, তার জন্য মনে দুঃখ করো না, মা।

আমি মা—পাঁচজনের কথায় ভুলিয়া তোমার কি সর্ব্বনাশ করিয়াছি, তা আজ মনে-প্রাণে বুঝিতেছি। আমার উপর রাগ রেখো না, মা। সে সব কথা ভুলিয়া মা বলিয়া মনে করিও।

তোমায় দেখিবার জন্য প্রাণ বড় আকুল। তোমার পিশিমাকে সঙ্গে করিয়া এখানে আসিলে হাতে স্বর্গ পাইব! তীর্থস্থান। আমার কাছে পিশিমার আসিতে আপত্তি কেন হইবে? যদি আসার মত হয়, লিখিও। লোক পাঠাইব। আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। তোমার পিশিমাকে প্রণাম দিবে। আমার শরীর ভালো নয়। তুমি ছাড়া আমায় এ বয়সে কে দেখিবে, মা?

তোমার দুঃখিনী মা।

এ চিঠি যোগমায়া দেবী পড়িলেন, পিশিমাকেও পড়িয়া শুনাইলেন।

পিশিমা কহিলেন—আবার হয় তো কি ফন্দী এঁটেচেন! ওর মন্ত্রী তো আমার জা—আর সেই শম্ভুচন্দর!

যোগমায়া দেবী কহিলেন—না হতেও পারে, দিদি! বয়স হয়েচে—ছেলের বৌ!…তোর কি মনে হয়, বিন্দু?

বিন্দু কহিল—কিছু বুঝতে পারচি না।

যোগমায়া দেবী কহিলেন,—যাবি?

বিন্দু কোনো জবাব দিল না, নিঃশব্দে বসিয়া রহিল।

পিশিমা কহিলেন—হরিদ্বার। বলতে নেই, সকলি হয়েচে—তবু চমৎকার জায়গা, বৌ…যাবে?

যোগমায়া দেবী একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—যাবার উপায় নেই, দিদি…

পিশিমা ও বিন্দু তাঁর পানে চাহিল।

যোগমায়া দেবী কহিলেন—এ জায়গা ছেড়ে কোথাও নড়তে পারবো না।

বিন্দু কহিল—কেন জ্যাঠাইমা?

তার মনেও একটা কথা জাগিয়া গগন-বিহারী হইতেছিল।

যোগমায়া দেবী কহিলেন—বলাইয়ের পথ চেয়ে এই-খানেই আমায় থাকতে হবে। আমার মন কেবলি বলে, সে আছে,—সে আসবে, আমার কাছেই সে ফিরে আসবে।

বিন্দুর প্রাণ এ-কথায় কাঁপিয়া উঠিল; গায়ে কাঁটা দিল। তারও মনে এই কথা অহরহ গুঞ্জন-গান তুলিতেছে! সে-ও কি সাধে এখানে এই নিরানন্দ নির্জ্জন পুরীতে পড়িয়া আছে! যদি বলাইদা আসে…! আসিয়া তাদের কাহাকেও না দেখিয়া জন্মের মত কোনো দিকে চলিয়া যায়!

যোগমায়া দেবী বিন্দুর পানে চাহিলেন।

বিন্দু কহিল—আমরা কোথাও যাবো না, জ্যাঠাইমা। তীর্থ! কি হবে তীর্থে? আমার কোথাও থাকতে ভালো লাগে না।

পিশিমা আকাশের পানে চাহিয়াছিলেন, কহিলেন,—তা না যাস্, চিঠির জবাব দিস্। হাজার হোক, শাশুড়ী! সব-চেয়ে বড় সম্পর্ক—ছাঁটায় অধর্ম্ম আছে। সেধে চিঠি লিখেচে। স্নেহ ফেরাতে নেই! লিখিস্, পিশিকে রেখে কি ক'রে যাই!

বিন্দু কহিল—লিখবো।

বিন্দু চিঠি লিখিল। অচিরে তার জবাবও আসিল। শাশুড়ী আবার আকুলতা জানাইয়াছেন—পনেরো দিনের জন্য বেড়াইতে আসিলে কি ক্ষতি! তিনি আর কলিকাতায় আসিবেন না—পণ করিয়াছেন। না হইলে তিনিই তাঁর মাকে দেখিতে আসিতেন।

পিশিমা কহিলেন,—মাগীর সত্যি বুঝি মায়া হয়েচে রে!

যোগমায়া দেবী কহিলেন—বিচিত্র নয়। একবার না হয় ঘুরেই আয় মা…

বিন্দু কোনো জবাব দিল না, স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

সন্তানের নিবেদন

জানি জানি জননি গো অহেতুক সহজললিত
মাতৃ-মমতায় তুমি নিশিদিন হ'য়ে বিগলিত,
আমারে বেঁধেছ ব্যগ্র আগ্রহের সহস্র বন্ধনে,
তৃপ্তি দিতে চাহ মোরে বর্ণে, গন্ধে, কূজনে, গুঞ্জনে,
কতমত আয়োজন,—কত ভোগ্য লোভন শোভন
উৎসব বৈভব-ঘটা,—স্নেহঘন অমৃত-চুম্বন,
ভুলায়ে রাখিতে চায় ভালে-শিরে অঙ্গুলি বুলায়ে
তব পক্ষপুটতলে কলকূজ কপোত কুলায়ে।

বুঝি বুঝি হে জননি, তব মাতৃ-হৃদয়-মহিমা
খুব জানি পুত্র তরে দরদের নাহি তব সীমা,
কেমনে তবু মা ভুলি জীবনের ধ্রুব লক্ষ্যখানি,
হায় মা কেমনে ভুলি বিশ্ব মোরে দেয় হাতছানি
যাত্রাপথ টানে মোরে,— সত্য মোরে করিছে শাসন
উদ্‌যাপন লাগি হায় ব্রতগুলি করে আকিঞ্চন ?
হায় তাই যেতে হয়—স্নেহস্নিগ্ধ তোমার অঞ্চল,
বাঁধিয়া রাখিতে নারে, বৃথা তব ঝরে আঁখিজল।

মায়া-মূঢ়া হা জননি,—তুমি ভাব', নিষ্ঠুর সন্তান
কেমনে জানিবে মাতৃ-হৃদয়ের ব্যথার সন্ধান।
কেমনে বুঝাব মাতা সত্য তাহে নাহি এক কণা,
সহে পুত্র গূঢ় মর্ম্মে কি দুঃসহ দারুণ বেদনা,
কেমনে বুঝাবে মা গো, পুত্র তব নহে মা নিষ্ঠুর
নহে সে অবাধ্য, রূঢ়, অমানুষ, অকৃতজ্ঞ, ক্রুর,
ভাঙা বুক হস্তে চাপি,—ঠোঁটে রুধি অশ্রুর তুফান,
কাতর বিদায় লয় যুগে যুগে তোমার সন্তান;

জান না তোমার অশ্রু করে তার পন্থারে পিছল,
তব হাহাকার তার হ'রে লয় চরণের বল।
পথপানে চেয়ে তব ছলছল কাতর চাহনি,
পথেরে বন্ধুর করে পদে পদে, জান না জননি!
তবু তারে যেতে হয়—জননীর চরণে প্রণমি'।
ঘরে ঘরে মূর্চ্ছাহতা শচীমাতা, যশোদা, গৌতমী।

শ্রীকালিদাস রায়।

প্রত্যাবর্ত্তন

১

রেবা সত্যাগ্রহী দলে যোগদান করিয়াছে শুনিয়া অতুল আহ্লাদে আটখানা হইয়া রেবাকে তাহার অন্তরের উচ্ছ্বসিত উল্লাস জানাইতে আসিল।

বৈঠকখানায় রেবাকে একাকিনী দেখিয়াই অতুল ব্যগ্র উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল, "হ্যাল্লো!"

রেবা হাসি-মুখে বলিল,—"আজ থেকে তোমার দলই ভারী হ'ল, অতুল বাবু।"

অতুল চেয়ারে বসিয়াই টেবলখানির উপর সজোরে এক চপেটাঘাত করিয়া উত্তর দিল, "এ কথা আমার অনেক দিন আগেই জানা ছিল; কেবল দোটানায় প'ড়ে ক'টা মাস পেছিয়ে পড়লে বৈ ত নয়!"

মনে মনে কি ভাবিয়া রেবা বলিল, "তা মিছে নয়, কিন্তু মহেন্দ্র বাবুর কথাগুলো সঙ্গে সঙ্গে অবহেলা করতে পারতুম না কি না, তাই—"

বাধা দিয়া বেশ একটু জোরের সঙ্গেই অতুল বলিয়া উঠিল, "সে রাস্কেলটার কথা ছেড়ে দাও; তার কথার আবার দাম আছে!"

একটু গম্ভীর হইয়াই রেবা বলিল, "দাম না থাকুক, কিন্তু তার কথাগুলোর শক্তি যে কিছু আছেই, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। যদিও মহেন্দ্র বাবু কথাগুলো ফেনিয়ে বলতে অনভ্যস্ত, কিন্তু তার প্রত্যেক কথাটিই এক একটি সূচের মত মনে বিঁধে যায়, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তার জ্বালা থাকে।"

অতুল দেখিল, কথায় কথায় আবার সেই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িতেছে, যাহা তাহার নিকট বিষের মত আপত্তিকর, কিন্তু অপরিহার্য্য; কাযেই প্রসঙ্গটির মোড় ফিরাইবার জন্য সে বলিল, "একটু চায়ের হুকুম হোক।"

মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া, রেবা উঠিয়া পড়িল, বলিল, "একটু ব'স একলাটি, এখনই আমি হুকুম করেই আসছি।"

রেবা ভিতরে চলিয়া গেল। অতুল সেই দিকে চাহিয়া মনে মনে বলিল, "মহেন্দ্রের মোহ এখনও একবারে কাটে নি দেখছি।"

রেবা ধনীর কন্যা। তাহার পিতা দুর্লভ চক্রবর্ত্তী অভ্রের ব্যবসায়ে অল্পদিনের মধ্যেই যেমন হঠাৎ বড়মানুষ হইয়াছিলেন, তেমনই ভাগ্যপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই আধুনিক সভ্যতার আপাত-মধুর রীতি-নীতিগুলিরও হুবহু অনুকরণ করিয়া এলাহাবাদের প্রাচীন-পন্থী ও নব্য-তন্ত্রী উভয় সম্প্রদায়কেই চমৎকৃত করিয়া তুলিয়াছিলেন। প্রাসাদতুল্য অট্টালিকায় স্বামীর ইচ্ছানুসারে নূতন প্রথায় সংসারটি পাতিবার সময় সনাতন অনুষ্ঠান ও বিধিনিয়মগুলির মোহ পত্নী নিস্তারিণীকে কতকটা অভিভূত করিলেও, চক্রবর্ত্তী মহাশয় অকাট্য যুক্তির দ্বারা সহধর্ম্মিণীর ভাবপ্রবণ চিত্তের উপর ক্ষমতা-বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিলেন। পত্নীকে তিনি সহজভাবেই বুঝাইয়াছিলেন, "ধন ঐশ্বর্য্য পাবার কামনাতেই লোকে সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করে, আজ লক্ষ্মীপূজো, কাল শিবরাত্রি, পরশু সত্যনারায়ণ, এর আর নিষ্পত্তি নেই, একটার পর একটা লেগেই থাকে! ভাগ্যবশে আমরা যে ঐশ্বর্য্য পেয়েছি, তিন পুরুষ ব'সে ব'সে বড়লোকের চালে চললেও ফুরোবে না, তবে এ সব বালাই নিয়ে আমরা ব্যস্ত হব কেন? দেশের মধ্যে বড়লোক ব'লে নাম নিতে হ'লে, এ সব চলবে না। এর চেয়ে বড় বড় কাযে হাত দাও, খরচ যদি করতেই হয়, বুঝে সুঝে এমন যায়গায় কর, যাতে নাম জাহির হয়ে পড়ে, বুঝলে?"

নিস্তারিণীর মনটি ছিল এত কোমল ও সেই অনুপাতে এমন দুর্ব্বল যে, একটু বুঝাইয়া কোনও কথা কেহ বলিলেই তাহার মনটির মধ্যে তাহা আঁচড় কাটিয়া দিত, মনের মত না হইলেও প্রতিবাদ করিবার মত ভাষা সে খুঁজিয়া পাইত না, সেই বক্ষ্যমাণ কথাগুলিই দুর্ব্বল বক্ষ তাহার তোলপাড় করিত ও অবশেষে সে তাহাই ধ্রুব বলিয়া বরণ করিয়া লইত। এ ক্ষেত্রেও হইয়াছিল তাহাই; স্বামীকে তুষ্ট করিতে স্বামীর ইচ্ছানুসারেই তথাকথিত সকল 'কুসংস্কার' বিসর্জ্জন দিয়াই নূতন ভাবে সে তাহার সংসার পাতিয়াছিল।

একমাত্র কন্যা রেবার তরুণ জীবনের দিনগুলিও এই প্রচণ্ড সভ্যতার আলোক-সম্পাতে অনুরঞ্জিত ও উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবার অবকাশ পাইয়াছিল, এ কথা বলাই বাহুল্য। কলেজে উচ্চ শিক্ষার সংস্পর্শে, যুব-সঙ্ঘের সহিত অবাধ মেলামেশা, উৎসবাদিতে অসঙ্কোচে যোগদান, বিভিন্ন ধনভাণ্ডারের সহায়তাকল্পে কলেজের সংশ্রবে সাহায্য-রজনীর অভিনয়ে ভূমিকাগ্রহণ প্রভৃতি সভ্যতার গৌরবজনক প্রতীকগুলির প্রত্যেকটিতেই রেবার প্রাদুর্ভাব পূর্ণমাত্রায় দেখা যাইত।

চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সুসজ্জিত হলঘরে বসিয়া রেবা যখন তাহার কলেজের তরুণ বন্ধুদের সহিত রাজনীতি ও সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্কে যোগদান করিত, চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাহা আনন্দের সহিত উপভোগ করিতেন ও তাহাদিগকে উৎসাহ

দিতেন। এই সূত্রে অতুলকুমার রায় ও মহেন্দ্রমোহন উপাধ্যায় এই পরিবারের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত হইয়া পড়ে।

অতুল জমীদারের ছেলে। মানভূম জেলার যে অংশে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অভ্রের খাদ, তাহারই সান্নিধ্যে অতুলদের জমীদারী; এই সূত্রে অতুলের পিতা রাজনারায়ণ বাবুর সহিত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। রাজনারায়ণ বাবুর মৃত্যুর পর চক্রবর্ত্তী মহাশয় অভিভাবকের মত অতুল, তাহার বিধবা মাতা ও ভগিনীদের সদা-সর্ব্বদাই খোঁজখবর লইতেন।

মহেন্দ্রের পিতা মদনমোহন উপাধ্যায় স্বনামখ্যাত অধ্যাপক ছিলেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অনুরোধে তিনি কলেজের পর বাড়ীতে আসিয়া রেবাকে পড়াইতেন। উপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার মধুর ব্যবহারে এই পরিবারের সকলেরই প্রীতি ও সম্মান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রেবাকে তিনি কন্যার ন্যায় স্নেহ করিতেন, অনেক উপদেশও দিতেন; রেবা আধুনিক মতবাদ সম্বন্ধে তর্ক তুলিলে, উপদেশচ্ছলে উপাধ্যায় মহাশয় অতি সরল ভাষায় তাহার ভ্রমগুলি দেখাইয়া দিতেন। ঘটনাচক্রে নিয়তির নিয়ন্ত্রণে রেবাকে পড়াইতে পড়াইতে, সহসা সন্ন্যাসরোগে আক্রান্ত হইয়া, উপাধ্যায় মহাশয় ইহজীবনের মত অধ্যাপনা সাঙ্গ করিয়া চির-নিদ্রিত হন। এই সূত্রে উপাধ্যায়পুত্র মহেন্দ্রের উপর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের স্নেহসহানুভূতি পূর্ণ-মাত্রায় পতিত হয়; আর মহেন্দ্রও রেবাদের বাহিরের হলঘরখানি তাহার পিতার মহিমময় স্মৃতির শেষ প্রতীক মনে করিয়া দিনান্তে অন্ততঃ একটিবারও আসিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিত না। উপাধ্যায় মহাশয় ধনী না হইলেও, তাঁহার অবস্থা স্বচ্ছলই ছিল এবং অনাড়ম্বরভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন বলিয়া, তাঁহার কোন বিষয়েই অভাবগ্রস্ত হইবার আশঙ্কা ছিল না।

পর পর দুই বন্ধুর বিয়োগের পর, অবশেষে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পালা আসিয়া উপস্থিত হইল। ধনের খ্যাতি ও ব্যক্তিগত প্রতিপত্তি পরিপূর্ণভাবে সমাজের উপর বিস্তার করিবার যে কল্পনা তাঁহার ছিল, তাহা পূর্ণ হইতে না হইতেই মহাকালের আহ্বান তাঁহার কাণে আসিয়া বাজিল। সেই শেষ সময়টিতে তিনি ব্যগ্রভাবে পত্নী নিস্তারিণীকে বলিয়াছিলেন, "এখন মনে পড়ছে নিতু, তুলসীতলা, শালগ্রামশিলা! কিন্তু আর ত সময় নেই!"

শয্যাপ্রান্তে অনেকেই ছিল, মহেন্দ্রও ছিল; সে ছুটিয়া গিয়া কোথা হইতে নারায়ণের চরণামৃত ও তুলসীপাতা আনিয়া সেই পরপারের যাত্রীর শুষ্ক ওষ্ঠে স্পর্শ করাইতেই তিনি বিস্ফারিতনেত্রে মহেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া উল্লাসভরে বলিয়া উঠিয়াছিলেন, 'দেবদূত! দেবদূত!" পর-মুহূর্ত্তে সেই দৃষ্টি রেবার মুখের উপর ফেলিয়া 'নারায়ণ! তুমি সত্য—তুমি সত্য' বলিতে বলিতে শেষ নিশ্বাস ফেলিয়াছিলেন।

তাহার পর দুইটি বৎসর চলিয়া গিয়াছে—চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার বিষয়সম্পত্তির ব্যবস্থা কোন বিখ্যাত অ্যাটর্ণী আফিসের তত্ত্বাবধানে এমন সুন্দরভাবে সম্পন্ন করিয়া গিয়াছিলেন যে, স্ত্রী নিস্তারিণী বা কন্যা রেবাকে সে সম্বন্ধে কিছুমাত্র চিন্তিত বা বিচলিত হইতে হয় নাই। জীবনযাত্রা যেমন চলিতেছিল, সেই ভাবেই চলিয়া যাইতেছিল। রেবার পড়া-শুনা, অতুল ও মহেন্দ্রের সহিত আন্দোলন-আলোচনা কিছুরই ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

২

সে বৎসর অতুলের বি-এ পরীক্ষা দিবার কথা। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের ফলে সর্ব্বাগ্রে সেই মহা উৎসাহে কলেজ ছাড়িয়া দিয়া তরুণ-সঙ্ঘের নিকট বাহবা পাইল।

রেবা তখন দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী। অতুলের সৎসাহস দেখিয়া সে-ও উৎসাহভরে বলিল,—"আমিও কলেজ বয়কট করব।"

মহেন্দ্র হাসিয়া বলিল,—"তোমাদের আক্রোশটা শেষে কলেজের উপর গিয়ে পড়ল কেন, শুনি?"

মহেন্দ্রের কথার উত্তরে অতুল এক লম্বা বক্তৃতা দিয়া ফেলিল। মহাত্মা গন্ধীর দৃষ্টান্ত, সত্যাগ্রহীদের দলে দলে কারাবরণ, দেশের অবস্থা প্রভৃতি জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণনা করিতে করিতে তাহার সুন্দর মুখখানি লাল হইয়া উঠিল, রেবা মুগ্ধভাবে সে দিকে চাহিয়া তাহার সেই দৃপ্ত উক্তিগুলি যেন গলাধঃকরণ করিতেছিল। বক্তৃতা শেষ হইলে উভয়েই মহেন্দ্রের সেই স্বাভাবিক সরল সৌম্য মুখখানির দিকে কটাক্ষ করিল।

মহেন্দ্র পূর্ব্ববৎ হাসিয়া বলিল, "সবই ত বললে অতুল, কিন্তু কলেজগুলোর কি অপরাধ, সেইটিই বাদ দিয়ে গেলে যে!"

রেবা একটু খরস্বরেই বলিল, "কেন, অতুল বাবুর কথাতেই ত তা স্পষ্ট বোঝা গেল। কথাটা এই, এখন দেশের কাষ করবার সময়; কলেজে ব'সে প্রফেসরের লেকচার নোট করবার সময় নয়। আমাদের সবারই কর্ত্তব্য, এখন কলেজগুলোকে বয়কট করা।"

মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, আমাকে বুঝিয়ে দেবে রেবা, দেশের কাযটা কি?"

অতুল ক্রোধে টেবলের উপর প্রবলবেগে একটি মুষ্টিপ্রয়োগ করিয়া বলিল, "ননসেন্স! তুমি দেখছি, নিরেট নির্ব্বোধ, কিম্বা ভয়ঙ্কর দেশদ্রোহী—"

মহেন্দ্রের সৌম্য মুখখানিও যেন এ কথায় ক্ষণিকের জন্য দৃপ্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই সে ভাব সম্বরণ করিয়া সে বলিল, "শেষের কথাটি তোমার প্রত্যাহার করা উচিত, অতুল; তবে তোমার গোড়ার কথা আমি অস্বীকার করছি না।"

অতুলের উত্তেজনা তখনও উপশমিত হয় নাই, উষ্ণভাবেই বলিল, "আচ্ছা, তাই না হয় করা গেল, কিন্তু তুমি নির্ব্বোধ—নির্ব্বোধ—নির্ব্বোধ।"

হাসিয়া মহেন্দ্র বলিল, "আমি ত এ কথা আগেই স্বীকার করেছি ভাই, তাই না জানতে চাইছি তোমার কাছে, দেশের কাযটি কি?"

অতুল বক্তৃতার ভঙ্গীতে বলিল, "দেশের কায বলতে বুঝতে হবে, দেশের জন্য দেশবাসীর কায, আর তাইতেই দেশের লোকের সুখ সুবিধা স্বার্থ সব। এই যে আন্দোলন—এর উদ্দেশ্য কি? দেশের মুখ যাতে রক্ষা হয়, দেশের পয়সা যাতে দেশে থাকে, দেশের লোক স্বচ্ছন্দে দেশের পয়সা ভোগ করতে পারে, অনাহারে অনশনে না মরতে হয়, তার জন্যই এই আন্দোলন, আর এই আমাদের কাছে দেশের কায।"

রেবা হাসিয়া বলিল, "এবার বুঝতে পারলে, মহেন্দ্র বাবু?"

অতুল গর্ব্বভরে মহেন্দ্রের উপর কটাক্ষ করিয়াই রেবার মুখের উপর পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিল।

মহেন্দ্র অবিচলিত স্বরে বলিল, "বেশ কথাগুলি ব'লে গেলে ভাই, শুনতেও লাগল বেশ! এখন এইটুকু আমাকে বুঝিয়ে দাও ত ভাই, আজ যদি তোমার এই দেশের কাযের জন্যে দেশ থেকে স্কুলকলেজগুলো সব উঠে যায়, তা হ'লে দেশের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা দেবার পবিত্র ব্রত যাঁরা স্বেচ্ছায় নিয়েছেন, আর এইটিই যাঁদের একমাত্র উপজীবিকার উপায়, তাঁদের বেকার অবস্থাটা দেশের কাযের কোন্ ধারায় এসে দাঁড়ায়?"

রেবা ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিল, "এইবার অতুল বাবু,—জবাব দাও। মহেন্দ্র বাবুকে মনে মনে যা ভাব, তা কিন্তু নয়।"

অতুল মুখ লাল করিয়া বলিল, "ও কথার কোন মানে নেই। উপজীবিকার কথা জোর ক'রে টেনে আনলে দেশের কায হয় না। ওর কথা ছেড়ে দাও, এখন তুমি কি করবে বল? কলেজ ছাড়ছ ত?"

রেবা এ কথার কোন উত্তর না দিয়া মহেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমি কলেজ ছাড়বে না বোধ হয়, মহেন্দ্র বাবু?"

মহেন্দ্র দৃঢ়ভাবে বলিল, "নিশ্চয়ই নয়। হুজুগে প'ড়ে কলেজ ছাড়বার মত দুর্ব্বলতা যেমন আমার আসেনি, তেমনই তার আবশ্যকতাও আমি দেখছি না।"

রেবা বলিল, "আমার সম্বন্ধে তোমার কি মত? কলেজ ছাড়ব কি না?"

মহেন্দ্র বলিল,—"আমার মতে তুমি যদি কলেজে মোটেই না ঢুকতে, তাতে তোমার ভবিষ্যৎ ভালই হ'ত। কিন্তু এখন যদি এই সাময়িক উত্তেজনার বশে কলেজ ছাড়তে চাও, সেটা উচিত নয়, বরং অন্যায়—"

রেবা কোন উত্তর দিল না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

এই ভাবে রেবার বৈঠকখানাটি প্রত্যহ অপরাহ্নে এই তিনটি প্রাণীর তর্ক-বিতর্কে গুলজার হইয়া উঠিত। অতুলের রেবারই অনুকূলে উচ্ছ্বাসপূর্ণ বাক্যচ্ছটা, অনিন্দ্যসুন্দর কমনীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চালনসৌন্দর্য্য, কেশ ও বেশের পারিপাট্য, অভিনয়-কালে তাহার আবৃত্তি ও ভঙ্গীর চমৎকারিত্ব সময় সময় যেমন রেবার ভাবপ্রবণ মনটির ভিতর একটা অচিন্তনীয় শিহরণ তুলিত,—আবার মহেন্দ্র যখন তাহার প্রতি কার্য্যটির খুঁৎ ধরিয়া—রেবার অপ্রীতিকর হইবে জানিয়াও অসঙ্কোচে তাহার প্রতিবাদ করিত—ভুলটি দেখাইয়া দিত—রেবার তুষ্টি-অসন্তুষ্টির দিকে ভ্রূক্ষেপও করিত না, তখন রেবার অন্তরটি বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেও, সে স্তব্ধভাবে এই স্বল্পভাষী স্পষ্টবক্তা বলিষ্ঠ-দেহ যুবাটির কুণ্ঠাশূন্য মুখখানির দিকে চাহিয়া রহিত;—আর তাহার সেই সুস্পষ্ট রূঢ় অপ্রিয় উক্তিগুলি তীক্ষ্ণ শলাকার মত তাহার অন্তরের অন্তস্তলে বিঁধিতে থাকিত এবং পরদিনই সে ভ্রমসংশোধনের জন্য লালায়িত হইয়া পড়িত।

৩

রেবা নিজে ত কলেজ ছাড়িলই না, বরং যে সকল মেয়ে কলেজ ছাড়িবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, তাহাদিগকেও ছাড়িতে দিল না। কথাটা অতুলের কাণে উঠিতে বিলম্ব হইল না, মহেন্দ্রও শুনিল।

অতুল রাগের বশে সেই দিনই সত্যাগ্রহী দলে নাম লিখাইল। রেবা শুনিয়া মনে মনে হাসিল।

সেই দিনই অপরাহ্নে মহা আড়ম্বরে অতুল এই সমাচারটি রেবাকে শুনাইয়া বলিল,—"আমি প্রেসিডেণ্টকে বলেছি, সব চেয়ে সাংঘাতিক স্থান যেটি, সেখানেই যেন আমাকে পাঠান হয়। তিনিও রাজী হয়েছেন। 'কল্' এলো ব'লে।"

রেবা জিজ্ঞাসা করিল,—"সেই সাংঘাতিক স্থানটিতে গিয়ে তোমার রোজনামচাটা কি রকম হবে, অতুল বাবু?"

অতুল বলিল,—"তুমিও যে মহেন্দ্রের মতন আজগুবি প্রশ্ন ক'রে বসলে, রেবা!—সে ত আর বৈঠকখানা নয় যে, খানা-পিনা, গল্প-গুজব, আমোদ-আহ্লাদের একটা রুটিন্ থাকবে? সে বড় বিষম ঠাঁই!—ঠিক রণক্ষেত্রের মত ধরাবাঁধা সেখানে,—উপস্থিত-বুদ্ধি যেমন দরকার, তেমনই কথা বলবারও কায়দা চাই। উত্তেজিত 'মব্‌কে' সংযত করা,—পুলিসের লাঠির সামনে গিয়ে বুক পেতে দাঁড়ান—এমন কত কি কায সেখানে,—কত বলব?"

শুনিতে শুনিতে রেবারও বুকখানি উত্তেজনায় ফুলিয়া উঠিতেছিল,—মনে হইতেছিল, সে-ও বুঝি এক বিশাল জনসমুদ্রের আবর্ত্তে গিয়া পড়িয়াছে,—জনতা ভাঙ্গিবার জন্য শত শত লাঠি উঠিয়াছে, আর সে যেন সেই অসংখ্য উদ্যত লাঠির সম্মুখে তর্জ্জনী তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, সকলেই স্তব্ধ—স্তম্ভিত!

পরক্ষণেই অভিভূতের মত সে বলিয়া উঠিল,—"আমিও সত্যাগ্রহী দলে নাম লেখাব, তারা নেবে আমাকে?"

উৎসাহপ্রদীপ্তমুখে অতুল বলিল,—"আনন্দের সঙ্গে! তোমার মত শিক্ষিতা মেয়েই ত এরা চায়। যাবে সত্য, না, কলেজ ছাড়বার মত শেষে আবার পেছিয়ে পড়বে?"

এই সময় মহেন্দ্র আসিয়া বলিল,—"আজ আবার কোন্ পর্ব্ব চলেছে?"

অতুল মুখভঙ্গী করিয়া বলিল,—"কর্ণপর্ব্ব।"

উচ্চ হাস্যরবে সুবৃহৎ হলঘর মুখরিত করিয়া মহেন্দ্র বলিল,—"একবারে নিছক খাঁটি কথাটি ব'লে ফেলেছ, অতুল!"

রেবা মহেন্দ্রের মুখের উপর বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এর মানে?"

মহেন্দ্র বলিল,—"আমাদের দেশের কাযে স্থান-বিশেষে এখন কর্ণপর্ব্বই চলছে।"

অতুল বেশ তিক্তস্বরেই জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন বল ত?"

মহেন্দ্র হাসিয়া বলিল, "তুমি এত বড় অভিনেতা হয়েও কথাটা বুঝলে না?—কর্ণের কামনা ছিল—পাণ্ডব যদি ধ্বংস হয় ত তাঁর দ্বারাতেই হোক,—আর তা যদি না হয়, পাণ্ডব-ধ্বংসের প্রয়োজন নেই। এই জন্যেই কর্ণ ভীষ্মপর্ব্বে অস্ত্র হাতে করেন নি, দ্রোণপর্ব্বে যদিও লড়েছিলেন, কিন্তু সেও আড়-আড় ছাড়-ছাড় ভাব, শেষে যা কিছু করবার, নিজের পর্ব্বেই করেছিলেন। উত্তেজনায় প'ড়ে বা স্বার্থের মোহে অনেক সত্যাগ্রহী ও দেশ-ভক্তও আজ এই নীতি অবলম্বন করেছেন, তা দেখা যাচ্ছে।"

অতুল উত্তেজিত হইয়া বলিল, "তুমি মিথ্যাবাদী।"

মহেন্দ্র কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ না হইয়া গম্ভীরভাবে বলিল, "ধীরে বন্ধু, ধীরে! অত উত্তেজিত হয়ো না। কথার চেয়ে আমি কাযের বেশী পক্ষপাতী; তোমাকে দিয়েই এক দিন আমি আমার এই কথাটা প্রমাণ ক'রে দেব।"

অতুল বলিল, "যদি না পার?"

হাসিয়া মহেন্দ্র উত্তর দিল, "তা হ'লে না হয় হেরে যাব, কিন্তু উত্তেজনার বশে কোন শপথ বা পণ করতে প্রস্তুত নই, বন্ধু।"

অতুল গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিল, "তুমি আমার সঙ্গে যে রকম খিট-খিট আরম্ভ করেছ, এক দিন হাতাহাতি হয়ে যাবে দেখছি।"

মহেন্দ্র বলিল, "সভায় কথা পড়লে তাই নিয়ে তর্কাতর্কি করে মানুষ। আর দেখা হলেই হাতাহাতি কামড়াকামড়ি করে—মানুষের অনেক নীচে যে জন্তুবিশেষ—তারাই।"

রেবা বলিল,—"বন্ধুভাবে আমরা এখানে কোনও বিষয় নিয়ে যদি আলোচনা করি, আর সেই প্রসঙ্গে যদি কোন অপ্রিয় কথাও ওঠে, তাতে কি রাগ করা উচিত, অতুল বাবু? এস, আমরা অন্য কথা আলোচনা করি।"

কিন্তু সে দিন আর কোন কথাই তেমন জমিবার অবকাশ পাইল না।

৪

পরদিন মহেন্দ্র আসিতেই রেবা বলিল, "আমি মেয়ে সত্যাগ্রহী দলে যোগ দেব মনে করেছি, মহেন্দ্র বাবু, এতে তোমার আপত্তিটা কি বল ত?"

মহেন্দ্র স্থিরদৃষ্টিতে রেবার মুখের দিকে চাহিয়া, পরক্ষণে দৃষ্টি অন্য দিকে ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কথাটা তুলেই সঙ্গে সঙ্গে আপত্তির কথা জিজ্ঞাসা—এর অর্থ কি, রেবা?"

রেবা অভিমানের সুরে বলিল, "তুমি আমার কোন্ কথাটিতে আপত্তি কর নি বল ত? কলেজে থিয়েটার করা, সভায় গিয়ে বক্তৃতা দেওয়া, কোথাও বেড়াতে যাওয়া, কলেজ ছাড়া—সবটিতেই তোমার আপত্তি? কেন বল ত শুনি?"

মহেন্দ্র বলিল, "তুমি যদি কোন বিষয়ে আমার মত জিজ্ঞাসা কর, তার উত্তর তোমার পক্ষে অপ্রীতিকর হলেও, আমার তা ব্যক্ত করা অন্যায় কি? তুমি ইচ্ছা করলে তা না মেনেও পারতে।"

রেবা বলিল, "কলেজের থিয়েটারে তিনবার 'অ্যাপিয়ার' হয়ে ২১খানা মেডেল পেয়েছিলুম। শেষে তোমার খোঁটায় তাও ছেড়ে দিলুম—"

মহেন্দ্র বলিল, "না দিলেও পারতে। আমি সেটি অনুচি-

…ন করেই বারণ করেছিলুম। কিন্তু তুমি যদি তা না মেনে …নরায় তাতে যোগ দিতে, আমি ত বাধা দিতে পারতুম না।"

রেবা বলিল, "এখন যা জিজ্ঞেসা করলুম, তার জবাব …ও, শুনি।"

মহেন্দ্র হাসিয়া বলিল, "আমার জবাবদিহি ত তোমার মনো-…ত হবে না, রেবা।"

রেবা অভিমানভরে বলিল, "সে আমি জানি; তবু বল তুমি, …আপত্তি তোমার কি?"

মহেন্দ্র বলিল, "আপত্তি এই জন্য রেবা, যে, তুমি ওর ভিতরে …গেলেই বিপদে পড়বে—"

রেবা খল্-খল্ করিয়া হাসিয়া বলিল, "তোমার এ আপত্তি …সে গেল, মহেন্দ্র বাবু; বিপদকে বরণ করবার জন্যই না ঐ …লে যোগ দিতে যাওয়া? তবে বিপদে পড়ব, মানে?"

মহেন্দ্র বলিল, "মানে এই, তুমি যা মনে ক'রে ওতে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছ, গেলেও সেখানে তোমার মনের সে ক্ষুধাটুকু মিটবে না। মন যদি উপবাসী থাকে, তা হ'লেই বিদ্রোহ বেধে যায়। বিদ্রোহ এলেই আসে বিপদ। বাইরের বিপদকে ঠেকান যায়, কিন্তু মন বিদ্রোহী হয়ে ভিতরে ভিতরে যে বিপদ তৈরী করে, তাকে থামান যায় না। আমি তোমার এই বিপদের কথাই বলেছি, রেবা।"

এই সময় অতুল আসিয়া মহেন্দ্রের দিকে কটাক্ষ করিয়াই রেবার …কে চাহিল। রেবা উল্লাসভরে বলিয়া উঠিল, "এই যে, অতুল বাবু এসেছ, ব'সে পড় শীগ্‌গীর, মস্ত তর্ক আরম্ভ হয়েছে।"

অতুল একখানি চেয়ারে অঙ্গ ঢালিয়াই বলিল, "দালানে …কেই তার আভাস পেয়েছি, কথাগুলো যে না শুনেছি, তাও নয়; কিন্তু ঠিক হজম করতে পারি নি।"

রেবা হাসিয়া বলিল, "কেন বল ত?"

অতুল বলিল, "ঠিক বুঝতে পারছি না, মহেন্দ্রের তথ্যটি কি! …নস্তত্ব, না জ্যোতিষতত্ত্ব?"

রেবা মহেন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিল, "শুনছ ত, মহেন্দ্র বাবু?"

মহেন্দ্র বলিল, "খাঁটি কথার মার নেই, তার সব অর্থই হয়, …যে ভাবে তার রস গ্রহণ করতে চায়।"

রেবা বলিল, "আমি যদি তোমার কথাগুলো শুনে এই …র্থই করি যে, তুমি আমার সম্বন্ধে যা বললে, তা জ্যোতিষেরই …অন্তর্গত?"

মহেন্দ্র হাসিয়া বলিল, "আমার কিছু মাত্র আপত্তি নেই। …মানুষের মনস্তত্ত্ব জেনে যা ভেবে বলা যায়, জ্যোতিষও তাই …গণনা ক'রে ব'লে দেয়।"

রেবা অবাক্ হইয়া মহেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "বল কি?"

অতুল শ্লেষের সহিত বলিয়া উঠিল, "ভাগ্য-গণনাতেও তুমি তা হ'লে ওস্তাদ হয়েছ দেখছি! বাহাদুর ছেলে তুমি!"

মহেন্দ্র হাসিয়া বলিল, "এতে বাহাদুরী কিছুই নেই, আর গণনারও ঝঞ্ঝাট নেই। ইচ্ছে করলে সবাই এ রকম বাহাদুর হ'তে পারে।"

রেবা কৌতূহলের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "সে ইচ্ছাটি কি রকম, মহেন্দ্র বাবু?"

মহেন্দ্র বলিল, "ঈশ্বরে বিশ্বাস, মনে আর কথায় ঐক্য, সত্যনিষ্ঠা—"

রেবা দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, "ওরে বাবা! এক-বারে ব্রহ্মস্পর্শ যে!"

অতুল হাসিয়া বলিল, "বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় ভাগখানা আবার আজ থেকে পড়তে সুরু ক'রে দিও, রেবা! সদা সত্য কথা বলিবে—"

রেবা এই কথাটিতে খুব কৌতুক অনুভব করিয়াই উল্লাসভরে হাসিয়া উঠিল, কিন্তু মহেন্দ্রের ভাবময় মুখখানির দিকে তাহার হাস্যোচ্ছ্বসিত দৃষ্টি পড়িতেই অপরাধিনীর মত সঙ্কুচিত হইয়াই যেন সহসা সে হাস্যধারা সম্বরণ করিয়া বলিল, "তা হ'লে মহেন্দ্র বাবু, তোমার আপত্তির মধ্যে এটাও বোধ হয় এসে যায় যে, মেয়েদের বাইরের কোন অনুষ্ঠানেই যোগ দেওয়া উচিত নয়?"

মহেন্দ্র বলিল, "আমি তোমার সম্বন্ধেই আমার যা বলবার, তাই বলেছি রেবা; মেয়েদের সম্বন্ধে ত কোন কথা বলিনি আমি।"

অতুল একটু ব্যগ্রভাবেই বলিয়া উঠিল, "রেবার সম্বন্ধে তোমার যা ভবিষ্যদ্বাণী, সে ত শুনেছি, এখন বাহিরের মেয়েদের সম্বন্ধেও এই প্রসঙ্গে তোমার কি মত, সেইটিই শুনিয়ে দাও না, ভাই—"

মহেন্দ্র সহজভাবেই বলিল, "মেয়েদের সম্বন্ধে আমার মত এই, যারা সংসার-বন্ধন হ'তে মুক্ত হ'তে পেরেছেন, পেছনে কোন আকর্ষণ নেই, তাঁরা এই আন্দোলনে যদি যোগ দেন, তা যেমন শুভ হবে, তাঁদের যোগ দেওয়াটাও তেমনই সার্থক হবে।"

অতুল কিছু উষ্ণ হইয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "আর যাঁরা সংসার-ধর্ম্ম করছেন, তাঁরা বুঝি এর সংস্রব এড়িয়ে, শ্বশুর, শাশুড়ী, স্বামী, ছেলে-পুলে নিয়ে ঘরকন্না ক'রেই জীবনটা কাটিয়ে দেবেন?"

মহেন্দ্র বলিল, "নিশ্চয়ই; তাঁদের জীবনের কাজই হচ্ছে সংসারকে গ'ড়ে তোলা, সার্থক করা; তাঁদের স্বরাজ আন্দোলন গৃহসংসারে, গৃহের বাইরে নয়।"

উত্তেজিতভাবে অতুল রেবার মুখের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "শুনছ রেবা! কি রকম স্বার্থপরের মত কথা! এরাই নারীজাতিকে দাসীত্বের নাগপাশে বেঁধে রেখেছে—এরাই তাদের সকল রকমে পরাধীনা ক'রে রেখেছে—অর্থে, সামর্থ্যে, স্বাস্থ্যে—সব দিক দিয়েই,—এরা চায় নারীর দাসীত্ব,—চায় না তাদের মুক্তি!"

রেবার চক্ষু দুইটিও উত্তেজনার জ্বালায় যেন জ্বলিয়া উঠিল। তাহার তখন মনে হইতেছিল, এই নির্ম্মম স্বার্থপর জাতিকে তখনই সে উত্তমরূপে চাবুকপেটা করিয়া জানাইয়া দেয় যে, নারীজাতি মুক্তি পাইয়াছে, তাহারা আর তোমাদের দাসী নহে!

মহেন্দ্র দুই জনেরই উত্তেজনাভাব লক্ষ্য করিয়া কিছুক্ষণ মৌন হইয়াই রহিল, তাহার পর কি ভাবিয়া সহসা বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা, অতুল, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তোমার বাবা মারা গেছেন খুব বেশী দিন নয়, হয় ত বছর চারেকের কথা; সুতরাং তুমি তোমাদের পরিপূর্ণ সংসারই দেখেছ! তোমার মা সেই সংসারে তোমাদের সকলের চোখে কি ছিলেন, ভাই?"

অতুল দর্পের সহিত উত্তর দিল,—"আমার মা দেবী ছিলেন, আর এখনও আছেন,—তাঁর কথা ছেড়ে দাও—"

মহেন্দ্র ধীরভাবেই বলিল,—"তোমরা বড়লোক, জমীদার, তোমাদের সংসারের কথাই না হয় ছেড়ে দিলুম,—কিন্তু আমি, এই এলাহাবাদে, কাণপুরে, মীরাটে, আগ্রায়,—তার পর এ দিকে কাশীতে, পাটনায়, কলকেতায়, বাঙ্গালারও অনেক স্থানে গিয়েছি, কত পরিবারের সঙ্গে যে মিশিছি, তা বলা যায় না! তাঁদের মধ্যে বড়লোক, গৃহস্থ, গরীব,—বাঙ্গালী, অ-বাঙ্গালী, মুসলমান—সব রকমই দেখেছি,—আর সেই দেখাশোনার ফলে জেনেছি যে, স্বামীর সংসারে নারী দাসী নয়, মহীয়সী রাণী!—তবে সমাজের অভ্যন্তরে যারা কখনও প্রবেশ করবার অবকাশ পায় নি, হিন্দুর সমাজ ও সংসারের ধারার সঙ্গে যাদের পরিচয় নেই, কতকগুলো বেপরোয়া মেয়েকে মাতিয়ে যারা মেয়েদের মধ্যে একটা গণ্ডগোল বাধাতে চায়, তারাই আজ স্বামিসংসারে অধিষ্ঠিতা সর্ব্বে সর্ব্বময়ী নারীজাতির সম্বন্ধে এই সব চণ্ডনীতি প্রচার ক'রে বেড়াচ্ছে। কিন্তু পৌনে ষোল আনা নারীই এদের এই সব আজগুবি ধারণা শুনে অবাক্ হয়ে যান!"

রেবা স্তব্ধ হইয়া কথাগুলি সব শুনিল। সর্ব্বাপেক্ষা অতুলের বাড়ীর উপমাটা গভীরভাবে তাহার মর্ম্মস্পর্শ করিল।

অতুল হটিবার পাত্রই ছিল না। সে জোর করিয়া বলিল, "অর্থের দিক্ দিয়েই যে নারী আজ সকল রকমে পুরুষের এই অধীনতা মেনে চলেছে, এ কথা তুমি অস্বীকার কর?"

মহেন্দ্র বলিল, "আমি যদি তোমার এই কথাটিই ঘুরিয়ে বলি, সংসারকে স্বচ্ছল করতে, স্ত্রীপুত্র-পরিবারকে সুখী করবার জন্যে, নারীর দৈন্য ঘোচাবার জন্যেই—পুরুষই নানা ভাবে জীবন-সংগ্রামে ব্যস্ত; এর জন্য উচ্চ কায থেকে, নানা নীচ কায,—পরের দাসত্ব, উঞ্ছবৃত্তি, চুরি, বাটপাড়ি, জোচ্চুরি—কত কি করছে! তুমি এর উত্তরে কি বলতে চাও?"

অতুলকে নিরুত্তর দেখিয়া, পুনরায় সে বলিতে লাগিল, "পুরুষ পয়সা উপায় করে—নারীর জন্য, তাকে সকল রকমে সুখী করবার জন্য। এতে পুরুষের কাছে নারীর দৈন্য বা অধীনতার কথা আসতেই পারে না।"

অতুল এতক্ষণে ঘামিয়া উঠিয়াছিল। তবুও সে পরাজয় স্বীকার করিল না, পূর্ব্বের তেজ অপেক্ষাকৃত নরম করিয়াই বলিল, "তা হ'লেও নারীজাতির এ ভাবে জীবনযাত্রা গৌরবের নয়, এর চেয়ে অন্যত্র চাকরী করেও নারীদের স্বাধীনভাবে জীবিকানির্ব্বাহ শতগুণে শ্রেয়ঃ।"

হাসিয়া মহেন্দ্র বলিল, "মেয়েদের নাম দিয়ে কোনও কোনও পুরুষ ভীরুর মত আজকাল এই ধাঁজার প্রবন্ধ কাগজবিশেষে লিখে থাকে দেখেছি! আমি এই শ্রেণীর একটা ধড়িবাজকেও জানি। মেয়েদের নাম দিয়ে মেয়েদেরই বিরুদ্ধে এমন কথাই লেখে। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। তোমার বাড়ীর মা বা ভগিনীরা যেমন এ সব কথা শুনলে কাণে আঙ্গুল দেন নিশ্চয়, তেমনই সব বাড়ীর মেয়েদেরই এই অবস্থা জানবে। তাঁরা স্বামীর সংসারকে পরের সংসার ব'লে যখন ভাবেন না, তখন খাটুনিটাকেও দাসীপণা ব'লে মনের কোণেও স্থান দেন না। আর স্বাধীনভাবে চাকরী ক'রে জীবিকার কথা যা বললে, তার প্রতিবাদ করতেও লজ্জা হয়।"

অতুল উষ্ণভাবেই জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

মহেন্দ্র হাসিয়া বলিল, "সংসারের খাটুনিটাকে দাসীবৃত্তিই যদি বল, বাড়ীর মেয়েদের সেই দাসীবৃত্তিটুকুই আশ্রয় ক'রে জীবিকানির্ব্বাহ করাটা কতখানি কষ্টের, আর পরের বাড়ীতে রাঁধুনীবৃত্তি ক'রে স্বাধীন জীবিকা যাপন করাটা কতখানি গৌরবের, সেটা তুমিই মনে মনে ভেবে দেখ!—রেবা কি বল?"

দুই জনের কেহই কিছু বলিল না। রেবার অত উত্তেজনা, অত রোষ, স্বার্থপর পুরুষজাতির বিরুদ্ধে অত বড় মনের বিদ্রোহ—ধীরে ধীরে একবারে মনের মধ্যেই বিলীন হইয়া গিয়াছে দেখিয়া সে লজ্জায় ও সঙ্গে সঙ্গে তজ্জনিত অভিমানে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া-ছিল, আর অতুল বাম চক্ষুর কটাক্ষে রেবার সেই স্তব্ধ গম্ভীরভাব

ঈর্ষ্যায় উদ্বেলিত-হৃদয়ে দক্ষিণ চক্ষুর কটাক্ষে মহেন্দ্রকে বিদ্ধ করিয়াই মনে মনে ভাবিতেছিল, ক্ষণিকের জন্যও দেবতার আশীর্ব্বাদে এই কটাক্ষ যদি অগ্নিময় হইত !

মহেন্দ্র তখন মনে মনে ভাবিতেছিল, অহেতুকী জেদের উন্মেষে যেমন জ্বালাময় উচ্ছ্বাস, অবসানেও তেমনই গভীর অবসাদ !

৫

সত্যাগ্রহী দলে নাম লিখাইলেও অতুলের কিন্তু এ পর্য্যন্ত আহ্বান আসিল না। রেবা জিজ্ঞাসা করিলে বলিত, "আমি তাদের বলেই রেখেছি, ছোট-খাটো ব্যাপারে আমাকে যেন না টানে—বড় ব্যাপার এর মধ্যে তেমন কিছু আসেনি কি না—"

অতুল কিন্তু মনে মনে জানিত, আহ্বান না আসার জন্য, সে কি রকম কল-কৌশল প্রয়োগ করিয়াছিল। পয়সা হাতে থাকিলে, এ দেশে সবই সুলভ হয়; ঘরে বসিয়াও দিগ্‌গজ দেশকর্ম্মী হওয়া যায় !

মহেন্দ্র এ রহস্য জানিয়াও প্রকাশ করে নাই। অন্যের অসাক্ষাতে তাহার সম্বন্ধে কোনও অপ্রিয় কথা বলা তাহার কোন দিনই অভ্যাস ছিল না, এবং ইচ্ছাপূর্ব্বক যে ব্যক্তি কোনও কথা গোপন করিতে চায়, বিশেষ প্রয়োজন না হইলে তাহার গুপ্ত কথাও সে ব্যক্ত করিত না।

অতুল দেখিল, রেবা সকল বিষয়েই তাহার একান্ত পক্ষপাতিনী হইলেও, মহেন্দ্রের যুক্তিগুলি অধিকাংশ সময় তীক্ষ্ণ অস্ত্রের মত তাহাদের বন্ধন ছেদন করিয়া বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। সে বুঝিয়াছিল, মহেন্দ্রকে অন্ততঃ কিছু দিনের মত যদি তফাৎ করা যায়, রেবাকে পরিপূর্ণরূপে আয়ত্ত করা তাহার পক্ষে কঠিন হইবে না।

রেবা সে দিন কলেজ যায় নাই। অতুল সে খবর রাখিয়াছিল। রেবা বাহিরের হলঘরে বসিয়া সে দিনের 'লিডার' পড়িতেছে, এমন সময় অতুল ঝড়ের মত ছুটিয়া হলঘরে প্রবেশ করিল। তাহাকে সেই ভাবে সহসা আসিতে দেখিয়া ও তাহার মুখ-চক্ষুর অস্বাভাবিক ভঙ্গী দৃষ্টে রেবা চমকিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "হয়েছে কি, অতুল বাবু ?"

অতুল অভিনয়ভঙ্গীতে উচ্ছ্বাসের সহিত বলিয়া উঠিল, "আর ত এখানে আসা চলে না, রেবা; তাই আমি ছুটী নিতে এসেছি—"

রেবা তাহার কথার মর্ম্ম না বুঝিয়া জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অতুল বলিতে লাগিল, "এই ঘরখানিতে তোমার বাবার স্মৃতি মিশে আছে, তাই সময়ে অসময়ে এসে কথাবার্ত্তায় তৃপ্তি পেতুম। কিন্তু আর আসা চলে না—"

রেবা জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন, অতুল বাবু ? এ কথা বলবার অর্থ ?"

অতুল বলিল,—"মহেন্দ্রের অত্যাচার। সে যদি আমাকে অপমান করত, কি পথের উপর ধ'রে দু'ঘা বসিয়ে দিত, আমি ক্ষমা করতে পারতুম। কিন্তু সে তোমার বাবার অপমান করেছে—পথে দাঁড়িয়ে—সকলের সামনে।"

রেবার আপাদমস্তক শিহরিয়া উঠিল,—সঙ্গে সঙ্গে মুখখানি কালো হইয়া গেল; কিন্তু মুখ হইতে একটি কথাও বাহির হইল না।

অতুল তাহার সে ভাব কটাক্ষে লক্ষ্য করিয়া পূর্ব্ববৎ উচ্ছ্বাসের সহিত বলিতে লাগিল,—"যে দিন থেকে তোমার কলেজ ছাড়বার কথা হয়, সেই দিন থেকেই কত লোকের কাছে তোমার সম্বন্ধে কত নিন্দাই না করছে। তোমার নিন্দা করলেও না হয় সহ্য করা যেত, কিন্তু চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সম্বন্ধে যে সব কথা বলেছে, শুনলে নিজেকে বরদাস্ত করা যায় না—"

রেবা বিকৃত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"কি বলেছে ?"

অতুল বলিল,—"সে অনেক কথা। তোমার বাবা ছিলেন নাস্তিক, পাপিষ্ঠ,—সনাতন ধর্ম্মে আস্থা ছিল না,—তোমাকে প্রশ্রয় দিয়ে নটী তৈরী ক'রে গেছেন,—এই রকম নানা কথা,—আর এ সব, যার তার কাছেই ব'লে বেড়াচ্ছে! এই কাল বিকেলে—কলেজের সামনেই প্রফেসর পালিতের কাছেই তোমার কলেজ ছাড়বার কথা তুলে—কত কথাই না বললে—তোমার বাবাকে পর্য্যন্ত—সে সব আর কি বলব ? পালিত মহাশয় ত একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন !"

রেবা স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার ক্ষুদ্র বুকখানির মধ্যে তখন সমুদ্রের তরঙ্গ যেন আছাড় খাইয়া পড়িতেছিল,—অস্বাভাবিক উত্তেজনায় দুই চক্ষু হইতে বুঝি অগ্নিকণা ছুটিতেছিল।

অতুল বলিল,—"আজই তুমি এর একটা হেস্ত-নেস্ত ক'রে ফেল, রেবা। আমি কিন্তু মহেন্দ্রের সঙ্গে এ ঘরে আর বসব না, এ তোমাকে ব'লে রাখছি। আমি সব সহ্য করতে পারি, নিজের অপমানও; কিন্তু তোমার বাবার অপমান আমি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারব না !"

অভিনেতার ন্যায় বিচিত্র ভঙ্গীতে অতুল কথাগুলি বলিয়াই চলিয়া গেল। তাহাকে ডাকিয়া বসাইবার মত অবস্থা তখন রেবার ছিল না।

রেবা অবাক্ হইয়া মহেন্দ্রের ব্যবহার ভাবিতে লাগিল। সৌম্যমূর্ত্তি স্পষ্টবাদী মানুষটির ভিতরটি যে এমন কুৎসিত, তাহা ভাবিতেও সে শিহরিয়া উঠিতেছিল। পৃথিবীর মধ্যে তাহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়, সকলের চেয়ে গর্ব্ব ও গৌরবের বস্তু—তাহার পিতার স্মৃতি! সেই পুণ্যময় স্মৃতির অবমাননাকারী—সে যেই হউক না কেন, কিছুতেই সে তাহাকে ক্ষমা করিবে না। তাহার সম্মুখেই চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সুবৃহৎ তৈলচিত্রখানি ঝুলিতেছিল, অশ্রু-বিস্ফারিত লোচনে সে সেই দিকে চাহিয়া আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিল,—"মহাপ্রস্থানের সময় তুমিই তার দিকে ঐ দৃষ্টিতে চেয়ে বলেছিলে—দেবদূত! আজ তার তোমার প্রতি অদ্ভুত আচরণ!"

মহেন্দ্র কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াই রেবার তাৎকালীন মূর্ত্তি দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। পদশব্দ শুনিয়াই রেবা তাহার দিকে চাহিতেই তাহার সর্ব্ব-অঙ্গে যেন জল-বিছুটির জ্বালা ধরিল!

চেয়ারের হাতলটিতে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া মহেন্দ্র আর্দ্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার আজ কি হয়েছে রেবা,—বেশ স্বচ্ছন্দ ত দেখছি না!"

উদ্বেলিত জ্বালাময় হৃদয়কে সবলে আয়ত্ত করিয়া রেবা বলিয়া উঠিল,—"মহেন্দ্র বাবু, আমার বাবাকে অপমান করবার অধিকার তোমাকে কে দিয়েছে, আমি তা জানতে চাই—"

মহেন্দ্র তখন চেয়ারখানিতে বসিতে যাইতেছিল, তৎক্ষণাৎ বিদ্যুৎস্পৃষ্টবৎ ক্ষিপ্রভাবে সোজা হইয়া উঠিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, "কি বললে?"

মুখের কথা তাহার মুখেই রহিয়া গেল, বাহির হইল না। কিন্তু তাহার সেই ভাবপূর্ণ মুখভঙ্গী দেখিয়াও রেবার দয়া হইল না, বা ক্রোধের কিছুমাত্র উপশম হইল না। সে আরও খরস্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"ঐ আমার বাবার ছবি, ও পাশে তোমারও বাবার ছবি,—ওঁদের দিকে চেয়ে শপথ ক'রে তুমি বলতে পার—কাল কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে প্রফেসর পালিতের কাছে তুমি আমাদের প্রসঙ্গে কথা—"

মহেন্দ্র তাহার স্বভাবসিদ্ধ স্বরে উত্তর দিল,—"শপথ করবার ত কোন প্রয়োজন দেখছি না রেবা, সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করলেই ত পারতে। হাঁ,—আমি স্বীকার করছি, প্রফেসর পালিতের সঙ্গে তোমার সম্বন্ধে কথা হয়েছিল—"

শ্লেষপূর্ণ তীব্রস্বরে রেবা জিজ্ঞাসা করিল,—"আর আমার বাবার সম্বন্ধে কোন কথা?"

সেইরূপ সহজভাবেই মহেন্দ্র বলিল,—"হাঁ, তাঁর কথাও—"

কোনমতে আর আত্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া রেবা চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া অগ্নিদিগ্ধ স্বরে বলিল,—"তুমি নিন্দুক, বেইমান, যাঁর পায়ের তলায় এসে দাঁড়াবার যোগ্যতাও নেই তোমার—পথে ঘাটে তাঁর কথা নিয়ে—উঃ, তোমার দিকে চাইতেও আমার ঘৃণা হচ্ছে!"

এক নিশ্বাসে এই অগ্নিবর্ষণ করিয়াই সে ক্রোধে ক্ষোভে হাঁফাইতে হাঁফাইতে ভিতরের দিকে ছুটিয়া গেল,—আবার কি ভাবিয়া হঠাৎ ফিরিয়া আসিয়া জ্বালাময় কম্পিতস্বরে বলিল,—"আমি অনুরোধ করছি তোমাকে, মহেন্দ্র বাবু—আর এ ঘরে এসে তাঁর পুণ্যময় স্মৃতিকে লাঞ্ছিত ক'র না"—

ঝড়ের মত সে বাহির হইয়া গেল,—তখন দুই চক্ষু তাহার সেই দারুণ উত্তেজনার মধ্যেও শিশিরসিক্ত পদ্মের মত টস্ টস্ করিতেছিল!

মহেন্দ্র স্তব্ধ হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইল,—তাহার পর দেওয়ালে দোদুল্যমান চিত্রপট দুইখানির দিকে অশ্রুময় চক্ষুতে চাহিয়াই, পরক্ষণে কি ভাবিয়া, রেবার টেবল হইতে কাগজ-কলম লইয়া লিখিতে বসিল। কম্পিত হস্তে বড় বড় অক্ষরে সে লিখিল—

"রেবা,

আমার বাবার স্মৃতিবিজড়িত এই পুণ্যময় স্থানটি থেকে বিদায় নেবার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে অকপটেই জানিয়ে যাচ্ছি যে, প্রফেসর পালিত মহাশয়ের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে আমি এমন কোন কথাই বলি নাই, যাতে তোমার বা তোমার স্বর্গীয় পিতার সম্বন্ধে সম্মান ও শ্রদ্ধা-প্রকাশ ব্যতীত কোনরূপ অসম্মানের আভাস আসতে পারে। ইচ্ছা হয়, পালিত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করলেই সবিশেষ জানতে পাবে। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি সর্ব্বসুখী হও—

শুভার্থী
মহেন্দ্র।"

অর্দ্ধঘণ্টা পরেই অতুল হলঘরে আসিয়া দেখিল, রেবার টেবলের উপর মহেন্দ্রের হাতে লেখা চিঠিখানি খোলাভাবেই পড়িয়া রহিয়াছে।

অতুল তাড়াতাড়ি চিঠিখানি উঠাইয়া লইয়া এক নিশ্বাসে পড়িয়া ফেলিল। তাহার মুখখানি আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ক্ষিপ্রভাবে পকেট হইতে নোট-বহিখানি বাহির করিয়া তাহার মধ্যে চিঠিখানি ভাঁজ করিয়া রাখিয়া দিল।—তাহার পর ধীরে ধীরে সে যেমন আসিয়াছিল, তেমনই সেই কক্ষ ত্যাগ করিল। রেবার সহিত সে দিন সাক্ষাৎ করিবার কোন চেষ্টাও করিল না।

৬

একদিন মহেন্দ্রের সঙ্গে দেখা করিয়া অতুল সহসা জিজ্ঞাসা করিল, রেবার সঙ্গে তোমার হয়েছে কি হে? সে যে একবারে রেগে আগুন! ব্যাপার কি?"

মহেন্দ্র তাহার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল,—"কেন, সে তোমাকে কিছু বলে নি?"

অতুল বলিল,—"বললে সে অনেক কথা, তোমার সম্বন্ধে; আমার সে সব কথা মনে লাগল না। তার পর, তুমি কি একখানা চিঠি লিখে রেখে এসেছিলে, সেইটে দেখিয়ে বললে, আবার সাফাই মানা হয়েছে পালিত মশাইকে! আমি যাব জিজ্ঞাসা করতে তাঁকে, লিখতেও লজ্জা করলে না, 'লায়ার কোথাকার'—বলেই চিঠিখানা আমার হাত থেকে টেনে নিয়ে কুচ্‌কুচি ক'রে ছিঁড়ে ফেললে। তোমাকে ত যা তা বললেই, আমাকেও রেহাই দিলে না—"

মহেন্দ্র বলিল,—"তোমার অপরাধ?"

অতুল বলিল, বললে, তোমাদের কাউকে বিশ্বাস নেই,—তুমিও বাইরের লোকের কাছে আমাদের কুৎসা ক'রে বেড়াও কি না কে জানে?"

মহেন্দ্র বলিল,—"থাক, এ সব শোনবার আমার কোনও আগ্রহ নেই অতুল, আর আমার বাড়ী বয়ে এ খবরটুকু তুমি না দিলেও পারতে। এমন কিছু প্রয়োজনীয় ব্যাপার নয়।"

অতুল বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল,—"বলছ কি তুমি, মহেন্দ্র! এত বড় একটা অন্যায় কথা তোমার সম্বন্ধে সে—"

মহেন্দ্র বিরক্ত হইয়া বলিল,—"ক্ষান্ত হও অতুল, আমাকে এ ভাবে একটি দিন ধ'রে এই সব কথা শুনিয়েও তাতাতে পারবে না।"

অপরাহ্ণে রেবার বাড়ীতে আসিয়া অতুল রেবাকে খুঁজিয়া বাহির করিল। এদিনও সে বাহিরের ঘরে বসে নাই। তাহার মনের অবস্থাও স্বচ্ছন্দ ছিল না। অতুল আবার মহেন্দ্রের প্রসঙ্গ তুলিয়া, সে যে এখন মরিয়া হইয়া যার তার কাছে কি ভাবে তাহার কুৎসা করিতেছে, তাহাই সালঙ্কারে প্রকাশ করিয়া আসর জমাইবার চেষ্টা করিল।

কিন্তু রেবা হাত দুইটি যুড়িয়া বলিল,—"অতুল বাবু, যা হবার হয়ে গেছে, ও কথা ছেড়ে দাও,—আর তার কথা তুলে আমার যন্ত্রণা বাড়িও না,—তার যা মন যায়, তাই করুক।"

অতুল এখন দুই-বেলাই আসে, কিন্তু তাহাদের মজলিস আর সে ভাবে জাঁকিয়া উঠে না। অতুল নানা প্রসঙ্গ তুলিয়া বক্তৃতা করে, কিন্তু রেবা তাহা শুনিতে শুনিতেই উঠিয়া যায়।—অতুল কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নহে, রেবার উপর পরিপূর্ণ প্রভুত্ব বিস্তার করিবার যতগুলি অস্ত্র তাহার জানা ছিল, সে একে একে সবগুলিই প্রয়োগ করিতেছিল।

রেবা সে দিন সহসা কংগ্রেস আফিসে গিয়া সত্যাগ্রহী দলে নাম লিখাইয়া আসিল। ক্যাম্পে কায তখন বেশী ছিল না, গন্ধী-আরউইনের সন্ধিসর্ত্ত লইয়া তখন দিল্লীতে বৈঠক বসিয়াছে। সকলেরই লক্ষ্য তখন সেই দিকে। মহিলা-সঙ্ঘের কর্ত্রী রেবাকে জানাইলেন, কানপুরের সেবা-সঙ্ঘে সম্ভবতঃ মহিলা কর্ম্মীর আবশ্যক আছে, সেখান হইতে খবর আসিলেই তাহাকে জানাইবেন।

অতুল এ সংবাদ পাইয়াই সে দিন সর্ব্বাগ্রে ছুটিয়া আসিয়াছিল।

রেবাকে সে দিন অত্যন্ত প্রফুল্ল দেখিয়া অতুল সাহস করিয়া অনেক কথাই বলিয়া ফেলিল, তাহার পিতার আদর্শ অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিল। একটু মাথা খাটাইয়া পয়সার বলে তাহারা যে কত কাণ্ডই করিতে পারে—একটি মাসের মধ্যে দেশময় কি প্রকারে নাম জাহির করিতে পারা যায়, সে সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিল,—পকেট হইতে নোট-বুক বাহির করিয়া, নাম বাজাইবার পক্ষে যে সকল 'সাধু উদ্দেশ্য' টুকিয়া রাখিয়াছিল, রেবাকে তাহা সে পড়িয়া শুনাইল।

দেশের কাযেও, দেশ-মাতৃকার সেবার সুযোগেও যে, মানুষ পয়সার বলে, দেশবাসীর সঙ্গে এ ভাবে ছলনা করিবার কল্পনাও করিতে পারে, তাহা ধারণা করিতেও রেবার মনে কষ্ট হইতেছিল। ঘণ্টা দুই পূর্ব্বে যাহাকে সে হাসিমুখে সাদরে আহ্বান করিয়া বসাইয়াছিল, এখন তাহার সঙ্গও যেন তাহার পক্ষে কালসর্পের মত ভয়াবহ মনে হইতেছিল। কিন্তু মুখে কোনও বিরক্তিভাব প্রকাশ না করিয়া, সহসা শারীরিক অসুস্থতার ভান করিয়া সে অতুলকে বিদায় দিল। অতুল চলিয়া গেলে তাহার মনে হইতে লাগিল, যেন এক প্রাণান্তকর দূষিত বাষ্প ধীরে ধীরে সেই কক্ষ হইতে অপসৃত হইয়া গেল।

হঠাৎ তাহার দৃষ্টি পড়িল, টেবলের উপর অতুলের নোট-বহিখানি পড়িয়া আছে। দেখিবামাত্র তাহার মনে হইতেছিল, যেন একটি কৃষ্ণবর্ণ সর্প কুণ্ডলী পাকাইয়া টেবলের উপর পড়িয়া আছে।

রেবার মনে হইল, দরোয়ানকে দিয়া অতুলকে ডাকাইয়া, সেখানি ফেরৎ দেয়। আবার পরক্ষণে কি মনে করিয়া, অনিচ্ছা-সত্ত্বেও নোট-বুকখানি তুলিয়া লইয়া সেই স্বার্থপর ভণ্ড দেশ-ভক্তের নোটগুলি পড়িবার জন্য যেমন বইখানি খুলিয়াছে,—

অমনই তাহার মলাটের খাপ হইতে একখানি ভাঁজকরা চিঠি পড়িয়া গেল। তাড়াতাড়ি সেখানি তুলিয়া লইয়া খুলিতেই দেখিল, তাহারই নামাঙ্কিত কাগজে তাহারই নামে চিঠি! আশ্চর্য্য ত! নীচে দেখিল মহেন্দ্রের স্বাক্ষর। এক নিশ্বাসে সে চিঠিখানি পড়িয়া ফেলিল।

তখন রেবার মনে হইতেছিল, সমস্ত আসবাবপত্র লইয়া সেই সুবৃহৎ হলঘর খানি যেন দুলিতেছে!

সেই দিনই রেবা পালিত মহাশয়ের সহিত দেখা করিয়া, মহেন্দ্রের সম্বন্ধে কথা তুলিয়া, যাহা জানিল, তাহাতে বুঝিতে পারিল যে, কতবড় অন্যায় সে মহেন্দ্রের উপর করিয়াছে! পালিত মহাশয় সমস্ত শুনিয়া রেবাকে মৃদু তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন,—"মহেন্দ্র তোমার বাবার কুৎসা করবে আমার কাছে, এ কথা বিশ্বাস করতে তোমার প্রবৃত্তি হয়েছিল, রেবা? তোমার উচিত ছিল না কি, আগে আমাকে জিজ্ঞাসা করা। আমি মহেন্দ্রকেও জানি, অতুলকেও জানি। অতুলের সম্বন্ধে যে কোন মন্দ কায সম্ভব হ'তে পারে, কিন্তু মহেন্দ্রকে এ পর্য্যন্ত আমি এমন একটি কায করতে দেখিনি বা শুনিনি, যা কোন রকমে আপত্তি-জনক।"

বাড়ীতে আসিয়া রেবা একেবারে শয্যা গ্রহণ করিল। নিস্তারিণী দেবী অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়াও তাহাকে সে দিন জলস্পর্শ করাইতে পারিল না।

পরদিন অতুল আসিতেই, রেবা কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়া বলিল, "যে দিন মহেন্দ্র বাবু এখান থেকে বিদায় নিয়ে চ'লে যান, তিনি আমার নামে একখানা চিঠি লিখে রেখে গিয়েছিলেন। সে চিঠি তোমার নোটবুকের ভেতর ঢুকল কি ক'রে, অতুল বাবু?"

অতুল চাহিয়া দেখিল, টেবলের উপরেই সেই নোটবুক, আর তার পাশেই সেই চিঠি! কি সর্ব্বনাশ!—কিন্তু এ প্রশ্নে সে কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়াই বলিল,—"আমি ঘরে এসে দেখি, চিঠিখানা মেজের ওপর প'ড়ে আছে। কাযেই সেখানা তুলে নোট-বুকের ভেতর—"

রাগে রেবার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল,—তাহার কথায় বাধা দিয়া অসহিষ্ণুভাবেই সে বলিল,—"ছিঃ—আর কৈফিয়ৎ তৈরী করতে হবে না, আমি তোমাকে চিনিছি। কাল পালিত মহাশয়ের সঙ্গে আমি দেখা করেছিলুম। সবই তাঁর কাছে শুনে এসেছি। তোমাকে নমস্কার!" বলিয়াই নোটবহিখানি তুলিয়া সজোরে তাহার মুখের দিকে ছুড়িয়া দিল।

মরোক্কো চামড়ায় বাঁধান বইখানি সবেগে অতুলের ওষ্ঠের উপর পড়িতেই সে অস্ফুট স্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

রেবার মনে হইতে লাগিল, মহেন্দ্রের নির্ম্মম মনটির উপর যে দিন সে নিষ্ঠুরের মত মিথ্যা অপবাদের খোঁচা দিয়াছিল, সে দিন তাহার মুখের ভাব ইহা অপেক্ষাও মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল!

বইখানি তুলিয়া লইয়া, ওষ্ঠ-পুট বাম হস্তে চাপিয়া ধরিয়া অতুল বলিল, "আমি স্পষ্ট জানতে চাই রেবা, তোমার মতলব-খানা কি?"

রেবা বলিল, "তুমি নিতান্ত নির্লজ্জ, তাই এখনও এখানে দাঁড়িয়ে আমার মুখ থেকে 'প্রিয়' কথা শোনবার প্রত্যাশা করছ!"

অতুল তাহার সেই সুন্দর মুখখানি সঙ্গে সঙ্গে অস্বাভাবিক-রূপে বিকৃত করিয়া বলিল, "তোমার উপর আমার দাবী আছে, সে কথা কি তুমি অস্বীকার করতে চাও আজ?"

রেবা এবার ধৈর্য্য হারাইয়া উত্তর দিল, "উচ্ছিষ্টভোগী কুকুরের যে দাবী এখানে, তোমার তাও নেই; কেন না, তুমি তার চেয়েও অধম! কুকুর নিমকের সম্মান রাখে, তুমি বেইমান;—বেরিয়ে যাও এখান থেকে, নইলে আমি এখনই দরোয়ান ডাকবো—"

বীভৎস মুখভঙ্গী পূর্ব্বক রেবার দিকে পিশাচের দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অতুল টলিতে টলিতে বাহির হইয়া গেল।

রেবার মনে হইতেছিল, যেন অতুলের সেই সুন্দর কমনীয় মুখখানির উপর কে যেন এক ভয়াবহ মুখোস পরাইয়া দিয়াছে। কি ভীষণ তাহার ভঙ্গী, কি কুৎসিত তাহার দৃষ্টি!

দরোয়ান একখানি পত্র আনিয়া রেবার হাতে দিল। রেবা লেফাফাখানি খুলিয়াই দেখিতে পাইল, ভিতরে আর একখানি পত্রের উপর ক্ষুদ্র একটুকরা কাগজ পীন দিয়া গাঁথা, তাহাতে লেখা আছে—

রেবা মা,—

কাল তোমার সঙ্গে মহেন্দ্রের সম্বন্ধে কথা হলেও, মহেন্দ্র এখন কোথায়, সেই কথাটিই তোমাকে বলা হয়নি। আজ এইমাত্র মহেন্দ্রের পত্র পেয়েছি। কানপুরের কাছে কোনো অঞ্চলে একটা প্রসেশন নিয়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়ে গেছে। বহু লোক হতাহত হয়েছে। মহেন্দ্র প্রয়াগ সঙ্ঘের সঙ্গে সেখানে গিয়ে কায করছে। চিঠিখানি সেখান থেকে পাঠিয়েছে। তাই তার মূল পত্রখানি এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি।

অধ্যাপক পালিত।

রেবার দুই চক্ষু যেন অন্ধকার হইয়া আসিল। তাহার বুকখানির মধ্যে এত দ্রুত স্পন্দন উঠিতেছিল, সে যেন তাহার

প্রতি শব্দটিই শুনিতে পাইতেছিল। কম্পিত হস্তে চিঠিখানি খুলিয়া পড়িতে লাগিল—

প্রণাম!

এখানে এসে কায়মনঃপ্রাণে বিপন্ন গণদেবতাদের সেবায় লিপ্ত হয়ে বড় তৃপ্তি পেয়েছি। শিক্ষাক্ষেত্রের বাইরেও যে গণদেবতাদের সাহচর্য্যে শিক্ষালাভের অনেক বিষয়ই রয়েছে, তা আগে জানা ছিল না।

প্রসঙ্গক্রমে আজ আপনাকে আমি জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে, অজানিত ভাবে এক অপবাদের মুষল আমার মর্ম্মে বিদ্ধ হয়ে আছে। হয় ত অজ্ঞাতে নষ্টচন্দ্র দর্শন করেছিলেম। এরই প্রায়শ্চিত্তের জন্মই আমার এই অজ্ঞাতবাস ও সেই সূত্রে সেবানুষ্ঠানে আত্মোৎসর্গ।

আমাদের সঙ্ঘ শীঘ্রই কাণপুরে যাবে, সেখানে পঁহুছে আবার পত্র লিখব।

স্নেহধন্য মহেন্দ্র।

চিঠিখানি পড়িবার সময়, প্রতি ছত্রের প্রত্যেক অক্ষরটি মহেন্দ্রের সেই ম্লান মুখখানির মত রেবার অশ্রু-উচ্ছ্বসিত চক্ষু দুটির উপর ফুটিয়া উঠিতেছিল। বার বার তিনবার সে চিঠিখানি পড়িল, পড়িতে পড়িতে তাহার অফুরন্ত অশ্রুধারায় তাহা ভিজিয়া গেল, দুই হাতে সেই চিঠিখানি তাহার অনুতাপ-বিদ্ধ বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া টেবলে মুখ গুঁজিয়া রেবা ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

অবিশ্রান্ত অশ্রুবর্ষণের ফলে চিত্তের সেই আবেগময়ী ভারটি একটু লঘু হইতেই, রেবা আত্মসম্বরণ করিয়া উঠিয়া বসিল; রুদ্ধ রোদনাবেগে তাহার আয়ত নেত্র দুইটি অপরাহ্নের স্থলপদ্মের মত রক্তিমাময় হইয়া উঠিয়াছিল, সেই চক্ষু দুইটি বিস্ফারিত করিয়া, তাহার পিতার চিত্রপটের দিকে চাহিয়া আর্ত্তস্বরে সে বলিয়া উঠিল,—"তোমার দেবদূতকে আমি দানবীর মত দেশান্তরিত করেছি, বাবা!"

আবার প্রবল অশ্রুবেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল।

৭

প্রশ্নের মত রেবা অতুলকে পরিত্যাগ করিলেও, অতুল তাহার সকল সংবাদই রাখিতেছিল। আভিজাত্যের সম্ভ্রম, অর্থের প্রাচুর্য্য ও কমনীয় আকৃতির সহায়তায় স্থানীয় সংস্থাগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করিতে অতুলের বিলম্ব হয় নাই। কিন্তু তাহার এই বাহ্য মনোরম আকৃতির অভ্যন্তরে কি কুৎসিত ও কদর্য্য প্রকৃতি আত্মগোপন করিয়া থাকিত, সে দিন রেবাই প্রথম তাহার পরিচয় পাইয়াছিল। অতুলও সেই দিন হইতেই স্থির বুঝিয়াছিল, রেবা তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছে, সেখানে আর তাহার কোন আশাই নাই। তাহার এই অনুতাপই এখন মনে জাগিতেছিল, যথেষ্ট সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও কেন সে রেবার উপর তাহার দাবী অক্ষুন্ন রাখিবার উপায় তখন করে নাই! সময়ে সুযোগ থাকিতেও যাহাতে সে কুণ্ঠিত বা সঙ্কুচিত ছিল, এখন অসময়েই—তাহার সংস্পর্শের বাহিরে আসিয়াও সেই কুণ্ঠাকে অনায়াসে এড়াইয়া সে অন্ততঃ রেবার উপর এমন একটা কিছু প্রতিশোধ লইবার উপায় খুঁজিতেছিল, যাহাতে সমাজে রেবার মুখ দেখাইবার আর উপায় পর্য্যন্ত না থাকে।—সে নিজে যখন রেবাকে আয়ত্ত করিতে অসমর্থ হইয়াছে, তখন রেবার ভবিষ্যৎও ব্যর্থ বা কলঙ্ককালিমাময় হওয়াই উচিত!—দেশের জন্ম আত্মোৎসর্গপরায়ণ, দেশের নারীজাতির দুর্দ্দশা-দর্শন কাতর, দেশমাতৃকার আদর্শ সন্তান অতুলকুমারের ভাবময় অন্তর এইভাবেই বিভোর হইয়া তথাকথিত সুযোগের অনু-সন্ধান করিতেছিল।

অনেক কষ্টে নিস্তারিণী দেবীকে বুঝাইয়া, স্থানীয় সেবা-সঙ্ঘের কর্ম্মকর্ত্রীর মনোনয়নপত্র লইয়া, রেবা এক দিন সত্য সত্যই কাণপুরের সুভদ্রা সেবাশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইল। শ্রীমতী পার্ব্বতী ভার্গব নাম্নী এক মনস্বিনী মহিলা সনাতন পন্থায় এই সেবাশ্রম পরিচালনা করিতেছিলেন। রেবা আশ্রমের অঙ্গনে প্রবেশ করিয়াই দেখিল, একটি প্রৌঢ়া মহিলা নিপুণ-ভাবে আসনখানি সম্মার্জ্জনীর দ্বারা পরিষ্কার করিতেছে। রেবার পশ্চাতে এক জন কুলী তাহার তোরঙ্গ ও বিছানা লইয়া আসিতেছিল। রেবাকে দেখিয়াই মহিলাটি জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি আসছ কোথা থেকে, বাছা?"

রেবা বলিল,—"এলাহাবাদ থেকে। শ্রীমতী পার্ব্বতী দেবীর আফিস কোন্ ঘরে?"

মহিলাটি হাসিয়া উত্তর দিলেন,—"তোমার নাম রেবা চক্রবর্ত্তী? শ্রীমতী জোৎসী তোমাকে পাঠিয়েছেন ত?"

রেবা নির্ব্বাক্-বিস্ময়ে মহিলাটির মুখের দিকে তাকাইল, তাহার মনে হইতেছিল, একটা সামান্ত পরিচারিকা, সেও এত খবর এখানে রাখে!

রেবার বিস্মিতভাব দেখিয়া তিনি বলিলেন,—"আমারই নাম পার্ব্বতী ভার্গব।"

সবলে বিস্ময়ের ভাব কাটাইয়া রেবা সশ্রদ্ধায় পার্ব্বতী দেবীকে নমস্কার করিল।

যে উৎসাহে, যে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা লইয়া রেবা সেবাশ্রমে কায করিতে আসিয়াছিল, একটি দিনেই তাহার সে উৎসাহ শিথিল হইয়া পড়িল, আকাঙ্ক্ষা দূরে চলিয়া গেল। একটা ঘরে দশ বারোটি মহিলার সহিত যখন তাহাকে রাত্রিবাস করিতে হইল, তাহার আভিজাত্যের অভিমান তাহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিলেও নীরবেই তাহাকে রাত্রি কাটাইতে হইল। আহারের ব্যবস্থাটিও যতদূর সম্ভব সাধারণ ও মোটামুটি রকমের; জলখাবার—ভিজা ছোলা আর এক ডেলা আকের গুড়! বাড়ীর রাজভোগের কথা মনে পড়িল,—নানাবিধ উপাদেয় আহার্য্যেও তাহার তৃপ্তি আসিত না।

সে সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়াপন্ন হইল, জলযোগের পর যখন পার্ব্বতী দেবী আসিয়া তাহাকে বলিলেন, "রেবা, এবার তোমার কায আরম্ভ কর,—বালতি ক'রে জল নিয়ে ঘর দালানগুলো সব ধুয়ে ফেল।"

রেবা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল! এ কি পরিহাস না পরীক্ষা?—পার্ব্বতী দেবীর মুখের দিকে চাহিয়া সে গাঢ়স্বরে বলিল, "এঁরা ত সব বাইরে কায করতে চ'লে গেলেন,—আমাকেও অনুগ্রহ ক'রে বাইরে বেরুতে দিন,—"

পার্ব্বতী দেবী রেবার মুখের উপর স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন,—"ঘরের কাযে আগে তোমার পারদর্শিতা দেখি, তার পর বাইরের কাযের ভার দেব বৈ কি।"

রেবা একটু অসহিষ্ণুতার সহিত বলিল, "ক্ষমা করবেন, আমার ধারণা ছিল—আমার শিক্ষার অনুরূপ কোনও উচ্চ-শ্রেণীর কাযে লিপ্ত হবার অধিকার আমাকে দেওয়া হবে—"

পার্ব্বতী দেবী স্বাভাবিক গম্ভীরভাবেই প্রশ্ন করিলেন, "তোমার ধারণায়, উচ্চশ্রেণীর কাযগুলি কি কি শুনি?"

রেবা একটু সঙ্কোচের সহিত ধীরে ধীরে বলিল, "ধরুন, এই দোকানের সামনে স্পীচ দেওয়া, পিকেটিং করা, সেবা-শুশ্রূষার ভার নেওয়া—"

পার্ব্বতী দেবী বলিলেন,—"স্পীচ দেবার, বা পিকেটিং করবার আবশ্যকতা এখন ত নেই, কংগ্রেস হাঁসপাতালে কায বেশী পড়লে, এরা ত যায়ই—তোমাকেও আবশ্যক পড়লে হয় ত যেতে হবে। এখন এদের কায কি শুনবে? মহল্লা সকলের নির্দ্দিষ্ট আছে, এরা যে যার মহল্লায় বাড়ী বাড়ী গিয়ে মেয়েদের চরকা চালান শেখায়, তুলো দেয়, সেই তুলোর তৈরী সুতো নিয়ে আসে; তাতে কত কি তৈরী হয়। তোমাকেও ক্রমে ক্রমে এ সব শেখানো হবে। কিন্তু তা ব'লে ঘরের কায ত ফেলে রাখলে চলবে না। আর শিক্ষার কথা যদি বল, তুমি এখনও আই, এ, পাশ করনি, কিন্তু আমি বি, এ, পাশ ক'রেও, ঝাড়ু ধরতে লজ্জা পাই না, তা ত এসেই দেখেছ। যাও, আর দেরী ক'র না, কলতলায় বালতি আছে, তাইতে জল ভ'রে বেশ ক'রে আগাগোড়া সব ধুয়ে ফেল, আমাকে রান্নার ব্যবস্থা করতে যেতে হচ্ছে।"

বিনা বাক্যব্যয়ে রেবা অঙ্গনে গিয়া নামিল। বড় বড় দুইটি বালতি সেখানে রাখা ছিল। জল ভরিতে ভরিতে সে পার্ব্বতী দেবীকে ডাকিয়া বলিল,—"বালতিগুলো তুলে দেবার জন্যে একটা চাকর পাওয়া যাবে?"

পার্ব্বতী দেবী উত্তর দিলেন, "সেবাশ্রমে সবাই সেবিকা,—চাকর-বাকর এখানে নেই। অভ্যাস কর, রেবা,—অভ্যাস কর; আজ যা কষ্ট ব'লে মনে হচ্ছে, কাল তা সহজ হয়ে যাবে—"

ক্ষণমাত্র আর অপেক্ষা না করিয়া তিনি রন্ধনশালায় চলিয়া গেলেন। জল ভরিতে ভরিতে রেবার তখন মহেন্দ্রের কথা মনে হইতেছিল,—সে না এই বিপদের কথাই বলিয়াছিল। সত্যই ত, এমন বিপদের আবর্ত্তে সে ত আর কখনও পড়ে নাই। অথচ, এখন ফিরিবারও উপায় নাই। ফিরিলে, সে কি আর এলাহাবাদে মুখ দেখাইতে পারিবে? তা ছাড়া যে মূল উদ্দেশ্য লইয়া সে আসিয়াছে,—তাহার?

রেবা দুই হাতে অতি কষ্টে জলপূর্ণ একটি বালতি লইয়া সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া, দালানে ঢালিয়া দিল; তাহার পর ঝাড়ু দিয়া—ধুইয়া পরিষ্কার করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে দ্বিতীয়বার বালতি লইয়া উঠিবার সময়, সিঁড়ির উপর একখানি পা হঠাৎ পিছলাইয়া গেল, হাত দুইখানি হইতে বালতিটি স্খলিত হইয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে রেবাও সিঁড়ির নিম্নে ঝুঁকিয়া পড়িল।

ঠিক সেই সময় একটি যুবা অত্যন্ত ব্যস্তভাবে আশ্রমের অঙ্গন অতিক্রম করিয়া ভিতরের দিকে যাইতেছিল। সে এক লম্ফে আসিয়া পতনোন্মুখী রেবাকে ধরিয়া ফেলিল;—সঙ্গে সঙ্গে ভয়বিহ্বলভাবে আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিয়াই রেবা স্তব্ধ হইয়া গেল! ভয়ে পাণ্ডুর মুখখানির উপর কে যেন কালি ঢালিয়া দিয়াছিল—আয়ত দুই চক্ষুর পাতাগুলি যেন কোন অদৃশ্য হস্ত জোর করিয়া টানিয়া রাখিয়াছিল।

মহেন্দ্র রেবার মুখের দিকে চাহিয়াই গাঢ়স্বরে বলিল,—"রেবা,—রেবা,—তুমি!"

রেবা মুখখানি নত করিয়া দাঁড়াইল, কোন উত্তর দিল না। বা কি ভাবে মহেন্দ্রের সঙ্গে সে সম্ভাষণ আরম্ভ করিবে, তাহা স্থির করিতে পারিতেছিল না।

মহেন্দ্র তাহার ভাবভঙ্গীর দিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া বা তাহার এখানে উপস্থিতি সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন না তুলিয়াই সহসা বলিল,—"আমি বিশেষ প্রয়োজনেই এখানে এসেছিলেম। একটি ছেলের আজ শেষ অবস্থা, যে কোন মুহূর্ত্তে তার জীবন শেষ হয়ে যেতে পারে,—বিকার-ঝোঁকে সে কেবল তার মাকে খুঁজছে—"

রেবা মুখখানি তুলিয়া আবার জোর করিয়া মহেন্দ্রের মুখের উপর পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিল।

মহেন্দ্র বলিল,—"তুমি সেবাশ্রমে এসেছ, তাই তোমাকে বলতে সাহস পাচ্ছি। কলেজে অভিনয় করেছ,—আজ এখানে একটা অভিনয় করবে, রেবা?"

সকল প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া, সহসা মহেন্দ্রের মুখের এই প্রশ্ন রেবার বুভুক্ষু মনের উপর যেন বিষ ঢালিয়া দিল! অভিমানে, অপমানে, লজ্জায় তাহার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল।

মহেন্দ্র রেবাকে নিরুত্তর দেখিয়া বলিল,—"সেই ছেলেটির মা হয়ে, তোমাকে দেখা দিতে হবে,—সান্ত্বনা দিতে হবে তাকে,—এই জন্যেই আমি পার্ব্বতী দেবীর কাছে এসেছিলুম। কিন্তু তোমাকে যে দেখতে পাব, তা ত ভাবি নি—"

রেবা আর সহ্য করিতে পারিল না,—তাহার আত্মসম্বরণের অক্ষমতা তাহাকে দুর্জ্জয় অভিমানের উত্তেজনায় ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল। অসঙ্কোচে সে মহেন্দ্রের মুখের উপর জ্বালাময়ী দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিয়া উঠিল,—"কলেজে কবে কি করেছি, তার খোঁটা দিয়ে, তুমি এমনি ক'রে আমার লাঞ্ছনা করতে চাও? তুমি কি মনে করেছ, মহেন্দ্র বাবু, আমি পাবলিক থিয়েটারের নটী,—যে, যার তার কাছে আমাকে অভিনয় করতে—"

আর সে বলিতে পারিল না, দুই চক্ষু তাহার জলে ভরিয়া গেল।

মহেন্দ্র নিজেকে নিতান্ত অপরাধী মনে করিয়া অপ্রতিভভাবে রেবার মুখের দিকে চাহিয়া কোমল স্বরে বলিল,—"আমাকে ক্ষমা কর রেবা, ছেলেটির অবস্থায় মুহ্যমান হয়ে, আমি অন্যায় কথাই তোমাকে বলেছি—"

সঙ্গে সঙ্গে সে ঝড়ের মত ভিতরে চলিয়া গেল। রেবা সেইখানে দাঁড়াইয়া অভিমানে ফুলিতে লাগিল,—যাহার জন্য সে কত কল্পনা করিয়া রাখিয়াছে, আজ অপ্রত্যাশিতভাবে তাহাকে এভাবে পাইয়াও, আবার তাহাকে কত দূরে সরাইয়া দিল!

বালতিটি তুলিয়া লইয়া, কলতলায় গিয়া দাঁড়াইতেই রেবা দেখিল, মহেন্দ্রের সহিত পার্ব্বতী দেবী ব্যস্তভাবে অঙ্গন অতিক্রম করিয়া বাহিরের দিকে যাইতেছেন। পলকশূন্য নয়নে সে সেই দিকে তাকাইয়া রহিল।

৮

পরে পার্ব্বতী দেবীর মুখেই যখন রেবা শুনিল,—তিনিই সেই মুমূর্ষু বালকটির মা হইয়া তাহাকে প্রবোধ দিয়া আসিয়াছেন, ফলে বিকারের ভয়াবহ অবস্থা তাহার কাটিয়া গিয়াছে, তখন রেবার শূন্য বুকখানির মধ্যে যেন ব্যর্থতার একটা দমকা বাতাস বহিয়া গেল।

ভোজনের সময় সেবাশ্রমের মেয়েদের সম্মুখেই এই আলোচনা চলিতেছিল। এই প্রসঙ্গে কথায় কথায় মহেন্দ্রের নাম আসিয়া পড়িল। পার্ব্বতী দেবী মুক্তকণ্ঠে তাহার প্রশংসা করিলেন, মেয়েরা সকলেই তাহার সমর্থন করিয়া বলিল, এমন কষ্টসহিষ্ণু সৎসাহসী ছেলে দেখা যায় না।

মহেন্দ্রের প্রশংসায় রেবার মুখ যেমন আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, অন্তরের ভিতরটিতেও তেমনই অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছিল। আজ সে ইঁহাদের কাছে মহেন্দ্রের প্রশংসা শুনিতেছিল, একটি কথাও সে সম্বন্ধে বলিবার সাহস তাহার নাই, তাহার মনে হইতেছিল, সে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলে, মহেন্দ্রের জীবনের সমস্ত কথা, তাহার মহত্ত্ব, তাহার ত্যাগ, আর মহেন্দ্রের সঙ্গে কত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল তাহার! কিন্তু আজ সে মূক, তাহার বলিবার যে আজ কিছুই নাই।

সপ্তাহমধ্যেই রেবা পার্ব্বতী দেবীর তত্ত্বাবধানে ঘরের কায-কর্ম্মে অনেকটা অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। অবসরকালে সকলকেই চরকা চালাইয়া সূতা কাটিতে হইত, রেবা প্রথম দুই এক দিনের চেষ্টাতেই, এ বিষয়ে সকলের অপেক্ষা পারদর্শিতা দেখাইয়াছিল। পার্ব্বতী দেবী তাহার তৎপরতা দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমার কোন দোষ নেই রেবা, অধিকাংশ মেয়েই উত্তেজনার ঝোঁকে দেশের কায করতে আসে, তারা চায়, ছেলেদের সঙ্গে টক্কর দিয়ে বাইরের ঝঞ্ঝাটে এগিয়ে গিয়ে বাহোবা নেবে। কিন্তু এটা তারা বোঝে না, তাদের করবার মত কায ঘরের মধ্যেই রয়েছে, যার জন্য তারা ঘরে বসেই সকলের সুখ্যাতি পেতে পারে, আর তাতে সত্যিকারেরই দেশের কায করা হয়। ছেলেরা যদি বাইরে কায করে, আর মেয়েরা তাদের কায করবার শক্তি যদি ঘর থেকে যুগিয়ে দেয়, কত উপকার হয় বল দেখি! যখন জোরে পিকেটিং চলত, তুমি দেখনি, এই সেবাশ্রমের মেয়েরা তাতে মন না দিয়েও, এই আশ্রম থেকেই ছেলে পিকেটারদের কত সাহায্য করেছিল। এখনও ত দেখছ, এরা এখানে কত কায করছে।"

পার্ব্বতী দেবী দেখিলেন, রেবার মাথা নত হইয়া পড়িতেছে। তিনি বলিয়া চলিলেন, "তুমি রেবা, একটু লেখা-পড়া ছাড়া, কোন কাযই শেখনি বা শেখা আবশ্যক মনে করনি। কিন্তু দেখছ ত, সাতদিনের মধ্যেই তুমি কত কায শিখে ফেলেছ। তোমার মনে স্বাভাবিক শক্তি আছে প্রচুর, সেই শক্তি বুঝে প্রয়োগ করতে শিখলে, তুমি যথার্থই দেশের কায করতে পারবে।"

এক দিন অপরাহ্নে রেবা উপরের একখানি ঘরে বসিয়া প্রকাণ্ড একটি চরকায় খদ্দরের সুতায় নলি ভরিতেছিল। আশ্রমের মেয়েরা বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া তৈয়ারী সুতা আনিতে গিয়াছে, পার্ব্বতী দেবী পাকশালায় বসিয়া মসলা পিষিতেছিলেন।

হঠাৎ চরকার গুরু-গম্ভীর আওয়াজকেও চাপা দিয়া রেবার পশ্চাৎ হইতে হাস্যোচ্ছ্বসিত স্বরে ধ্বনিয়া উঠিল,—"হ্যাল্লো!"

রেবা চমকিত হইয়া পশ্চাতে চাহিয়াই দেখিল, অতুল অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে ঘরের দ্বারটির উপর দাঁড়াইয়া আছে। তাহার দুই চক্ষুর ব্যঙ্গভরা চপল দৃষ্টি রেবার চক্ষুর উপর পড়িতেই সে লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া মুখখানি নত করিল, একটি কথাও কহিল না।

অতুল নির্লজ্জের মত হাসিয়া বলিল, "এখনও রাগ তোমার যায় নি দেখছি। তুমি আমাকে যতই পরিহার করবার চেষ্টা কর না কেন, আমি তোমার অনুসরণ না ক'রে থাকতে পারি নি, রেবা।"

রেবার মুখখানি উত্তেজনায় আরক্ত হইয়া উঠিলেও, স্থান-কাল বিবেচনা করিয়াই সে তাহা দমন করিয়া শ্লেষভরে বলিল, "এই সাধু উদ্দেশ্যটুকু নিয়েই বুঝি কাণপুরে শুভাগমন হয়েছে?"

অতুল রেবার আরক্তিম মুখখানির উপর একটি তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করিয়া বলিল, "উদ্দেশ্য ত্রিবিধ,—এখানে কিছু বিষয়সম্পত্তি আমার আছে, এই সেবাশ্রমটির ওয়ার্কিং কমিটীর মেম্বর আমি, আর ঘটনাচক্রে এই আশ্রমেই এসে নাম লিখিয়েছ—তুমি, এক সঙ্গে তিনটিরই পরিচর্য্যা—বুঝেছ?"

রেবা একটু রূঢ় হইয়াই উত্তর দিল, "বুঝিছি, আর, কালই যে এই আশ্রমটি থেকে নাম কাটিয়ে আমাকে এলাহাবাদে ফিরে যেতে হবে, তাও স্থির ক'রে ফেলেছি।"

অতুল বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, "তার ত কোন প্রয়োজন নেই, রেবা। আমি এখানে এসেছি কেন শুনবে? পার্ব্বতী দেবীকে ব'লে কোন উচ্চ রকমের কাযে তোমাকে নিয়োজিত করতে—"

বিকৃত ভাবে হাসিয়া রেবা উত্তর দিল, "ধন্যবাদ! তোমার এই অযাচিত অনুগ্রহের পরিচয় পেয়ে বাধিত হলেম! এখন দয়া ক'রে কায করতে দেবে কি, না পার্ব্বতী দেবীকে ডাকতে হবে আমাকে?"

অতুল মনে মনে রোষে জ্বলিয়া উঠিলেও মুখে বেদনার ভাব প্রকাশ করিয়া বিগলিত স্বরে বলিল, "এখনও তুমি আমার প্রতি এত অকরুণ, রেবা? সত্যই কি আমার কোন আশাই নেই?"

রেবা তাহার কথার কোন উত্তর না দিয়া পরিপূর্ণ শক্তিতে চরকা ঘুরাইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পূর্ব্ব হইতেই রাস্তার দিকে একটা গোলমাল উঠিয়াছিল, আশ্রমের ভিতরে তাহার সম্বন্ধে প্রথমে কিছুই আভাস পাওয়া যায় নাই। সেই গোলমালের শব্দ উচ্চ ও স্পষ্ট হইয়া ক্রমশঃই অগ্রসর হইতেছিল। অতুল আসিবার সময় পথেই শুনিয়া আসিয়াছিল, ভগৎ সিংয়ের ফাঁসী উপলক্ষে হাঙ্গামা বাধিয়াছে। কাযেই গোলমাল শুনিয়া সে রেবার দিকে মনোযোগ না দিয়া বাহিরের দিকে উৎকর্ণ হইয়াছিল। রেবা কিছুই শুনে নাই, সে কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তাহার মনের যত কিছু উত্তেজনা চরকার উপরই প্রয়োগ করিয়াছিল।

বাহিরের দোকানের লোকজন গুণ্ডাদের আসিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি আশ্রমের ভিতরে আসিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু উন্মত্ত গুণ্ডার দল যখন অল্প চেষ্টাতেই ফটক ভাঙ্গিয়া জয়ধ্বনি সহকারে আশ্রমের ভিতর আসিয়া নিরস্ত্র আশ্রয়ীদিগকে নিষ্ঠুরভাবে আক্রমণ করিল, তখন রেবার চরকার ঘর্ঘর আওয়াজ মথিত করিয়া বিপ্লবের ভয়াবহ কোলাহল আশ্রম মুখর করিয়া তুলিতেছিল। বিস্ময়াতঙ্কে চরকা ফেলিয়া রেবা ঘরের গবাক্ষ দিয়া অঙ্গনের দিকে চাহিতেই এক অভূতপূর্ব্ব অপ্রত্যাশিত আতঙ্কে অভিভূত হইয়া অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

আশ্রমের অঙ্গন ও চারি ধারের দরদালান ব্যাপিয়া তখন গুণ্ডাদের উল্লাসভরা চীৎকারের সঙ্গে বীভৎস লাঠিবাজি চলিতেছিল। নিরীহ নিরস্ত্রগণ—যাহারা আশ্রমের মধ্যে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল, তাহাদের আর্ত্তনাদ, প্রাণভিক্ষার প্রার্থনা, পলায়ন-প্রয়াস, সমস্ত পদদলিত করিয়া, প্রায় পঁচিশ জন লাঠিধারী গুণ্ডা তাহাদের উপর পিশাচের মত লাঠি চালাইতেছিল, চারি ধারে চাতাল দিয়া হোলি উৎসবের আবিরধারার মত সেই নির্য্যাতিত হতভাগ্যদের রক্তের স্রোত ছুটিয়াছিল। পার্ব্বতী

দেবী অবস্থা বুঝিয়া, অকুতোভয়ে গুণ্ডাদের সম্মুখে, সিঁড়ির উপরে দাঁড়াইয়া দক্ষিণ হাতখানি তুলিয়া তাহাদের পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিলেন, উর্দ্দুতে আর্ত্তস্বরে তাহাদিগকে ক্ষান্ত হইতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহার উত্তরে পশ্চাদ্দিক্ হইতে এক জন গুণ্ডা ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার উদ্যত বাহুমূলে ছোরা বসাইয়া দিল! ফিন্‌কি দিয়া রক্ত ছুটিল, সঙ্গে সঙ্গে লাঠিও দুই চারি ঘা পড়িল! উত্তেজিত গুণ্ডার দল তখন বিজয়োল্লাসে আশ্রমের ভিতর ঢুকিয়া লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইল।

উপরের ঘরের গবাক্ষ হইতে রেবা সে দৃশ্য দেখিয়া চক্ষু মুদিত করিল, তাহার সর্ব্বাঙ্গ তখন ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল। অতুলও হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল, সে ঠিক এই সময় ব্যস্তভাবে ঘরের ভিতর আসিয়া দরজাটি বন্ধ করিয়া দিল। পরক্ষণেই কয়েক জন গুণ্ডা হল্লা তুলিয়া সেই দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। রেবা বায়ুচালিত লতাটির মত চরকার পিছনে গিয়া বসিয়া পড়িল।

দরজার উপর দুই একটি আঘাত পড়িতেছে, অতুল গবাক্ষ দিয়া বলিল, "আমি তোমাদের মেহেরবাণীর উপর ভরসা ক'রে দরজা খুলে দিচ্ছি।"

দরজা খুলিতেই গুণ্ডারা হল্লা করিয়া উঠিল, অতুল তৎক্ষণাৎ পকেট হইতে তাহার মণি-ব্যাগটি বাহির করিয়া তাহাদের সম্মুখে তুলিয়া অভিনয়ভঙ্গীতে বলিল, "নোটে আর নগদে এতে দেড় হাজার টাকারও বেশী আছে, এ সমস্তই তোমাদের দিচ্ছি, এই সর্ত্তে—আমাকে আর আমার স্ত্রীকে তোমরা নিরাপদে আমার আস্তানায় পৌঁছে দেবে।—সেখানে গিয়ে আরও এতগুলি টাকা তোমাদের দেব।"

অগ্নির লেলিহান শিখার উপর সহসা কতকগুলি কাঁচা পল্লব ফেলিয়া দিলে, ক্ষণিকের জন্য যেমন তাহার শিখা স্তিমিত হইয়া যায়,—গুণ্ডাদের অবস্থাও অনেকটা সেইরূপ হইল। কয়েক জন মিলিয়া পরস্পর কি পরামর্শ করিল, এক জন ততক্ষণে মনিব্যাগটি টানিয়া লইয়া নোট ও টাকার সংখ্যা পরীক্ষা করিতেছিল।—আর রেবা,—অতুলের কথায়, সেই আসন্ন ভয়াবহ বিপদের মধ্যেও, নূতন উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়া বিদ্যুতের মত মুহুর্মুহু চমকিত হইয়া উঠিতেছিল।

পরামর্শের পর গুণ্ডা দলপতি অতুলকে জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার বাড়ী কোন্ মহল্লায়?"

অতুল বলিল,—"মলে।"

গুণ্ডা মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া বলিল,—"ওদিকে আমরা যাবো না। পাশেই আমাদের ছুন্দো—কর্ণেলগঞ্জ;—তোমার বিবিকে নিয়ে সেথায় চল,—কিছু ডর তোমার থাকবে না, বাঙ্গালীবাবু, খানাপিনার কোন তগ্‌লীক্ হবে না। কিন্তু পাঁচটি হাজার চাই,—নিয়ে তবে ছাড়ান দেব।"

অতুল বলিল, "বেশ, তাতেই আমি রাজী।"

দলের এক জন টাকাটা প্রাপ্তি সম্বন্ধে একটু সংশয় প্রকাশ করিতেই, দলপতি হাসিয়া বলিল,—"আরে বেকুব, যার পকেটে হাজার দেড় হাজার থাকে, তারে কাছে পাঁচ হাজার আবার টাকা! বাবুসাহেবকে খুশী করতে পারলে—পাণ খেতেও বাবুসাহেব কোন্ না কিছু দেবে।"

পকেট হইতে চেক-বহি বাহির করিয়া অতুল বলিল,—"টাকার জন্যে তোমরা কোনও সন্দেহ ক'র না,—আমি বাসায় গিয়েই চেক লিখে দেব, তোমরা টাকা ভাঙ্গিয়ে আনবে"—

দলপতি হাসিয়া বলিল,—"আচ্ছা, আচ্ছা, সে সব হয়ে যাবে,—বাঙ্গালী লোকের দিল্ কত দরাজ, তা হামিলোকের জানা আছে—তোমার বিবিকে নিয়ে এস, কুছপরোয়া নেই, বাবুজী!"—

অতুল রেবার দিকে চাহিতেই, সে অস্বাভাবিক ভাবে খাড়া হইয়া উঠিয়া দৃপ্তস্বরে বলিল,—"যাব না আমি, তার চেয়ে মরব এইখানে—"

বাহির হইতে গুণ্ডা দলপতি বলিল, "ডর কিছু নেই বিবিসাহেব,—খোদার কসম, তোমার পানে কেউ বদ-নজরটিও দেবে না।"—

অতুল হাসিয়া বলিল,—"হঠাৎ এই সব রক্তারক্তি কাণ্ড দেখে আমার বিবিসাহেবের মাথা খারাপ হয়ে গেছে!"

রেবা তখন অগ্নিময় দৃষ্টিতে অতুলের দিকে চাহিয়া ছিল,—সহসা তাহার হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল,—"চল!"

নিম্নের ঘরগুলিতে তখনও লুণ্ঠনকার্য্য চলিতেছিল,—আশ্রমে সঞ্চিত বস্তা বস্তা চাল, ডাল, আলু, গুড় প্রভৃতি খাদ্যসামগ্রী,—যাবতীয় তৈজসপত্র, খদ্দরের রাশীকৃত কাপড়, পেঁটরা বাক্স—সমস্তই লুঠ হইতেছিল,—লুণ্ঠিত দ্রব্যজাত অঙ্গনের একাংশ পূর্ণ করিয়া ছিল,—চাতালের উপর আট দশ জন তখন মৃতকল্প অবস্থায় পড়িয়া ছিল, পার্ব্বতী দেবী রক্তাপ্লুত-দেহে সোপান-শ্রেণীর নিম্নে অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া ছিলেন।—আহত মুমূর্ষুদের দেহগুলি পদদলিত করিয়া হৃদয়হীন পাষণ্ডগণ পরমোৎসাহে লুঠের মালপত্র অঙ্গনে আনিয়া ফেলিতেছিল। যাহারা ফটকের সম্মুখে পাহারা দিতেছিল, তাহারাও লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া ফটকের দুই ধারের দোকানগুলির দ্রব্যজাত লুণ্ঠনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল।

লুণ্ঠনের ঠিক সন্ধিক্ষণে, বেপরোয়াভাবে গুণ্ডার দল যখন লুটের মালপত্র বহিতে ব্যস্ত,—ঠিক সেই সময় এক দল যুবক এমন সন্তর্পণে ও সুশৃঙ্খল ব্যবস্থায় সুভদ্রা আশ্রমকে পরিবেষ্টন করিয়া, অতর্কিতভাবে অঙ্গনের মত্যগুলি আগুলিয়া দাঁড়াইল যে, লুণ্ঠনোদ্যত দস্যুদল তাহাদিগকে দেখিয়াই স্তব্ধ হইয়া গেল।—আগন্তুক যুবাদের উল্লাসের হল্লা নাই,—কোন আস্ফালন নাই,—কিন্তু তাহাদের ব্যায়াম-পুষ্ট বলিষ্ঠ দেহ, দৃপ্তভঙ্গী,—তৈলপক্ক লাঠিহস্তে দাঁড়াইবার কায়দা দেখিয়াই গুণ্ডার দল শিহরিয়া উঠিল।

পরক্ষণেই হল্লা তুলিয়া তাহারা আগন্তুকদিগকে আক্রমণ করিতে ছুটিল।—উপরের গুণ্ডারাও লাফাইতে লাফাইতে নিম্নে নামিয়া আসিল। অতুল রেবার হাত ছাড়িয়া দিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল,—সংঘর্ষের সঙ্গে সঙ্গেই স্বয়ং দলপতি ও তিন চারিজন গুণ্ডা মাথায় চোট খাইয়া ধরাশায়ী হইয়াছে!

রেবা জানালা ধরিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে দেখিল,—মাথায় পাগড়ী বাঁধা কে এক জন অদ্ভুত কৌশলের সহিত গুণ্ডাদের বাধা দিতেছে, কয়েকজন তাহার পৃষ্ঠরক্ষা করিতেছে, আর সেই যুবার লক্ষ্য এমন ক্ষিপ্র ও সাংঘাতিক যে, তাহার প্রত্যেক অব্যর্থ আঘাতেই এক একটি গুণ্ডা ধরাশায়ী হইয়াছে!—এ কি মানুষ, না দেবদূত! এত শক্তি, এত সাহস, এমন শিক্ষা, মানুষে সম্ভবে!—পরাজিত গুণ্ডাদলকে ফটকের পথে পশ্চাদপসৃত হইতে বাধ্য করিয়া, সেই যুবা যখন লাঠির উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া সহচরদের কি ইঙ্গিত করিল,—তখন রেবার আতঙ্ক-বিহ্বল সংশয়োদ্বেলিত বুকখানি রাশিকৃত বায়ুহিল্লোলে দোদুল্যমান ফুলটির মত এক অপূর্ব্ব পুলকস্পন্দনে দুলিয়া উঠিল!—মাথায় সুবৃহৎ পাগড়ী বাধা সেই মধুর ভীষণ যুবা—তাহার পিতার প্রশংসিত সেই দেবদূত—আজ তাহার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা শঙ্কাসূচক অবস্থায় পরিত্রাতা দেবদূতের মতই উপস্থিত!

৯

একটি ঘণ্টার মধ্যেই সুভদ্রা সেবাশ্রমটি যেন সামরিক হাসপাতালে পরিণত হইল।—অঙ্গনে স্তূপীকৃত লুণ্ঠিত সামগ্রী যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া, আহতদের শুশ্রূষার সুব্যবস্থা করা হইল। গুণ্ডাদের মধ্যে এগার জন আহত হইয়াছিল, তাহাদের পলায়নের সামর্থ্য ত দূরের কথা, উত্থানশক্তিও ছিল না। তাহাদিগকেও স্বতন্ত্র ঘরে রাখিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা চলিল। আশ্রমের চারিধারে স্বেচ্ছাসেবকগণ প্রহরায় নিযুক্ত ছিল এবং কয়েক জন যুবক দলবদ্ধ হইয়া আশ্রমের সেবিকাদের অনুসন্ধানে ছুটিয়াছিল। তখন সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা সহরময় বিস্তারিত হইয়া পড়িলেও, এই অসমসাহসিক নির্ভীক কর্ম্মিদল অশ্রান্তভাবে সর্ব্বত্র ছুটাছুটি করিতেছিল এবং তাহাদের চেষ্টায় আশ্রমের সেবিকারা লাঞ্ছিতা হইবার পূর্ব্বেই সহায়তা পাইয়া আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়াছিল।—সেবকদলের মধ্যেই কয়েক জন চিকিৎসক ছিল,—আবশ্যক ঔষধপত্রও যত শীঘ্র সম্ভব আনাইয়া, সুচারুরূপে সকল বন্দোবস্তই সুশৃঙ্খলে হইতেছিল।

গুণ্ডার দল পলায়ন করিবার অব্যবহিত পরেই রেবা ধীরে ধীরে নামিয়া আসিয়া মহেন্দ্রের সম্মুখে দাঁড়াইতেই, মহেন্দ্র ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিল,—"এখন দাঁড়িয়ে ভাববার সময় নেই রেবা, কোমর বেঁধে কাযে লেগে যাও,—তুমি এখানকার সব জান, তোমার সাহায্য সব রকমেই দরকার।"

রেবা প্রত্যাশাও করে নাই, মহেন্দ্র তাহাকে এ ভাবে সম্ভাষণ করিয়া তাহাকেই আবার সহকর্ম্মিণীরূপে আহ্বান করিবে। মনের সমস্ত ব্যথা, গ্লানি, অবসাদ—মুহূর্ত্তের মধ্যেই যেন তাহার অস্থির বুক হইতে সরিয়া গেল,—পরিতৃপ্তির দৃষ্টিতে মহেন্দ্রের মুখের দিকে পরিপূর্ণরূপে চাহিয়া, পরম উৎসাহে কোমরে তাহার অঞ্চলখানি জড়াইয়া সে কাযে লাগিয়া গেল। তিনটি ঘণ্টা ধরিয়া সমানভাবে মহেন্দ্র ও তাহার সহকর্ম্মীদের সহিত খাটিয়া আজ সে যে তৃপ্তি, যে আনন্দ, যে সন্তোষ পাইল,—শৈশবের কথা তাহার মনে না থাকিলেও, উনিশ বৎসর বয়সের মধ্যে এমন হৃদয়ভরা উল্লাস পরিপূর্ণভাবে ভোগ করিবার সৌভাগ্য সে বুঝি আর কখনও পায় নাই।

সকল বন্দোবস্ত সম্পন্ন করিয়া, অবিশ্রান্তভাবে তিনটি ঘণ্টা পরিশ্রমের পর মহেন্দ্র বাহিরের সিঁড়িটির উপর আসিয়া সবে বসিয়াছে, এমন সময় রেবা আসিয়া বলিল,—"একটু দুধ আর কিছু খাবার, তোমাকে এনে দিই,—লক্ষ্মীটি, আপত্তি ক'র না।"

মহেন্দ্র বলিল,—"এখন নয় রেবা, ঘণ্টাখানেক পরে একসঙ্গেই সকলে জল খাব।"

উপরের ঘরখানি হইতে এই সময় টলিতে টলিতে অতুল নিম্নে নামিয়া আসিয়া বলিল, "মহেন্দ্র, তুমি নিশ্চয়ই জান যে, আমি এই আশ্রমের ওয়ার্কিং কমিটীর মেম্বর!"

মহেন্দ্র উদাসভাবে উত্তর দিল, "তাতে কি হয়েছে?"

অতুল বলিল, "আমি এখানে উপস্থিত আছি জেনেও, তোমরা আমার কোন অনুমতি নেওয়া আবশ্যক মনে করনি—এখানকার এই সব ব্যবস্থা সম্বন্ধে! এটা কত বড় অন্যায় হয়েছে, তা বুঝতে পারছ?"

মহেন্দ্র বলিল, "তা হবে; কিন্তু এই অন্যায়ের দণ্ডটা কি, অতুল বাবু?"

অতুল বলিল, "সে কাল বুঝতে পারবে।"

সঙ্গে সঙ্গে রেবা ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল, "সে না হয় বোঝা যাবে কাল, কিন্তু তার আগে তোমার সঙ্গে যে বোঝা-পড়াটা দরকার, সেটা ত এখনি হয়ে যাক।"

অতুল রেবার দিকে অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে চাহিতেই রেবা ক্রূর-শ্লেষের সহিত বলিল, "কমিটী-ফমিটী এখন থাক। 'মার্শেল-ল' জারী হয়েছে। কমিটীর মেম্বর হয়ে তুমি গুণ্ডাদের সঙ্গে প্যাক্ট করেছিলে, তার বিচার এখনই হয়ে যাক্।"

অতুল এবার ধৈর্য্য হারাইয়া বলিয়া উঠিল, "আস্পর্দ্ধা তোমার চরমে উঠেছে রেবা, তুমি জান, মেম্বরের অধিকার প্রয়োগ ক'রে আমি এখনই সব বন্ধ ক'রে দিতে পারি—তোমাকেও এখান থেকে তাড়াতে পারি?"

রেবাও সঙ্গে সঙ্গে রূঢ়স্বরে উত্তর দিল, "আর তুমি নিজেই বোধ হয় এটুকু জান না যে, সেবাশ্রমের এক জন সামান্য সেবিকাও, কমিটীর কোন মাতব্বরকে 'এমার্জ্জেন্সী কেসের' সময় কাযে যোগ না দিয়ে ঘরের কোণে নির্লিপ্তভাবে ব'সে থাকতে দেখলে, ঘাড় ধ'রে টেনে এনে কাযে নামাতে পারে?"

মহেন্দ্র মুগ্ধভাবে বলিয়া উঠিল, "বাঃ! বেশ কথা বলছ, রেবা! তোমার মুখে এমন স্পষ্ট কথা ত শুনিনি কখনও! আমি তোমার কথামতই কায করতে চাই।" বলিয়াই মহেন্দ্র ফতুয়ার পকেট হইতে একটি ক্ষুদ্র বাঁশী বাহির করিয়া বাজাইয়া দিল। পরক্ষণেই এক জন কর্ম্মী ছুটিয়া আসিল।

মহেন্দ্র বলিল, "মনসারাম, ইনিই সেই অতুল বাবু, এখন শুনছি, এই কমিটীর মেম্বর ইনি, অথচ এ পর্য্যন্ত উপরের ঘরটিতে চুপ ক'রে বসেছিলেন। আমরা কমিটীর বাইরের লোক হয়ে কায করব, আর ইনি মেম্বর হয়ে নির্লিপ্তভাবে ব'সে থাকবেন, সে ত ঠিক নয়। এঁকে নিয়ে যাও, কায করিয়ে নাও, বিশেষ ক'রে ওঁর গুণ্ডা বন্ধুদের শুশ্রূষার ভারটি এঁর ওপরেই দিও—"

মনসারাম অতুলের হাত ধরিতেই, সে রুখিয়া উঠিল,—কিন্তু মনসারাম জিজিৎসুর একটি ছোট প্যাঁচ কসিয়াই তাহাকে কাবু করিয়া ফেলিল। তাহার পরই, অতুলের গায়ের রেশমী পাঞ্জাবীটা ফড়্ ফড়্ করিয়া ছিঁড়িয়া দিয়া বলিল, "এ জিনিষ মেম্বর সাহেবের দেহে সাজে না!"

এই সময় রেবা অতুলের সেই মণি-ব্যাগটি আনিয়া বলিল, —"গুণ্ডাদের সঙ্গে তোমার মিতালির প্যাক্টের স্মৃতিচিহ্ন, অতুল বাবু! মনে আছে বোধ হয় তোমার, মহেন্দ্র বাবুর চিঠিখানা যে দিন তোমার নোটবুক থেকে আবিষ্কার করি, সে দিন সেই নোটবুক তোমার ঠোঁটের ওপর ছুড়ে মেরেছিলুম।—আর আজ তুমি, এই মণি-ব্যাগ ঘুষ দিয়ে আমাকেও তোমার স্ত্রী ব'লে পাচার করতে সাহস পেয়েছিলে,—তার এই পুরস্কার!"

সেই নোট ও মুদ্রাপূর্ণ মণিব্যাগটি রেবা অতুলের নাসিকা লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিল,—আবার সেইভাবে আর্ত্তস্বর তাহার কণ্ঠ হইতে নির্গত হইল। কিন্তু মনসারাম তাহার উপর কিছুমাত্র করুণাপ্রকাশ না করিয়া, মণিব্যাগটি মহেন্দ্রের হাতে তুলিয়া দিয়া অতুলকে দণ্ডিত অপরাধীর মত টানিয়া লইয়া গেল।

মহেন্দ্র স্নেহপূর্ণ স্বরে ডাকিল, "রেবা!"

রেবা গাঢ় উচ্ছ্বাসভরে বলিয়া উঠিল,—"এখনও আমাকে স্নেহকোমল স্বরে তুমি ডাকছ!"

মহেন্দ্র হাসিয়া বলিল, "কেন রেবা?—ভুল সবারই হয়। আমি প্রফেসর পালিত মহাশয়ের পত্রে সব জেনেছি।"

রেবা আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিল, "আর সে দিন এখানে?—যে ব্যবহার তোমার সঙ্গে করেছি! তা ভাবতেও যে—"

রেবার স্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল।

মহেন্দ্র বলিল, "সে সম্বন্ধে অত্যস্ত ব্যস্ততার জন্য আমিও ত নিরপরাধ ছিলুম না, রেবা! আমি হয় ত ভূমিকা না ক'রেই কথাগুলো তোমাকে ঠিক বুঝিয়ে দিতে পারি নি।"

রেবা অশ্রুপূর্ণ স্বরে বলিয়া উঠিল,—"তবু তুমি আমার দোষ দেখবে না,—অপরাধিনী জেনেও আমাকে শাস্তি দেবে না, এত তুমি মহৎ! কিন্তু আমি যে তোমার কাছে, আমার সমস্ত অপরাধ স্বীকার ক'রে দণ্ড নেব ব'লে তোমার অনুসরণ ক'রে এখানে এসেছি।"

মহেন্দ্র গাঢ়স্বরে বলিল,—"রেবা, মনের তোমার সমস্ত গ্লানি ধুয়ে-মুছে গেছে, তুমি এখন ভোগের মোহ কাটিয়ে, ত্যাগের তৃপ্তিকে বরণ করতে শিখেছ,—লালসার শিখায় ঝাঁপ দিতে গিয়ে দেবতার দয়ায় পুণ্যময় তপোবনে প্রত্যাবর্ত্তন করতে পেরেছ!"

রেবা ভাবোদ্বেলিতবক্ষে ভূমিতলে বসিয়া মহেন্দ্রের পা দুই-খানি জড়াইয়া ধরিয়া গদগদস্বরে বলিল, "সে-ও তুমি—তুমি! দেবদূতের মত পতনের পথ থেকে ফিরিয়ে এনেছ,—তোমার জন্যই আমার এই প্রত্যাবর্ত্তন!"

মহেন্দ্র অতি সন্তর্পণে রেবাকে ভূমি হইতে তুলিয়া লইল।

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরিচ্ছেদ—আট

শক্তিপ্রকাশের মৃত্যুর পর তাঁহার লিখিত কাগজ-পত্রের মধ্যে তাঁহার বহু অপূর্ব্ব এবং অভিনব ইচ্ছার পরিচয় পাওয়া গেল।

প্রথম তাঁহার শ্রাদ্ধ রামপ্রসাদ করিবে; শ্রাদ্ধ হইবে দান-সাগর; এবং তাঁহার জমীদারী হইতে ইহার জন্য মাত্র দশ হাজার টাকা লইবার অধিকার রামপ্রসাদের থাকিবে। তাহার অধিক ব্যয় করিতে হইলে ধর্ম্মদাস, মণিময় বাবু এবং রমেশ বাবুর অনুমোদন ভিন্ন তাহা করিতে পারিবে না।

শ্রাদ্ধ হইয়া গেলে স্কুলের উন্নতির জন্য জমীদারী হইতে আরও দশ সহস্র মুদ্রা স্কুল-ফণ্ডে দিতে হইবে। স্কুল-কমিটীতে তাঁহার স্থলে ধর্ম্মদাসকে লওয়া তিনি বাঞ্ছনীয় মনে করেন।

জমীদারীর কর্ত্তৃত্বের ভার রামপ্রসাদের উপর তাহার বয়স চল্লিশ বৎসর পূর্ণ হইলে ন্যস্ত হইতে পারিবে; তৎপূর্ব্বে নহে। ইহাও ঐ তিন জন একজিকিউটারের অনুমতিসাপেক্ষ।

মাসিক পাঁচ শত টাকার বেশী রামপ্রসাদ নিজের ব্যয়ের জন্য লইতে পারিবে না। বিবাহ হইলে আরও আড়াই শত টাকা সে বেশী পাইবে; এবং তাহার স্ত্রী পাইবে মাসিক দুই শত টাকা।

এইরূপ অনুজ্ঞার পর পর অনুজ্ঞা, রামপ্রসাদের স্বাধীন গতিবিধিকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া প্রায় পঙ্গু করিয়া দিয়াছিল। ধর্ম্মদাসের সম্পর্কে ঔদাসীন্য ছিল, কিন্তু কোথাও এক তিল অমর্য্যাদা নাই। জমীদারীর কায দেখার জন্য ধর্ম্মদাস যাহা উচিত মনে করিবে, নিজের খরচ বাবদ লইতে পারিবে। তাহার মধ্যে কোন ধরাবাঁধা ব্যবস্থা থাকিবে না।

সমারোহের সহিত শ্রাদ্ধ হইয়া গেল। ধর্ম্মদাস নিজের ব্যয়ে স্বীয় কর্ত্তব্যটুকু করিল। সে স্থির করিয়াছিল, জমীদারী হইতে এক কপর্দ্দকও কখনই গ্রহণ করিবে না।

কোথাও লেখাপড়ার মধ্যে ধর্ম্মদাসকে ত্যাগ করার কথা না থাকিলেও তাহার বহু ইঙ্গিত ছিল এবং একস্থলে পরিষ্কার লেখা ছিল যে, ধর্ম্মদাসের পুত্রগণের এই বিষয়ের অর্দ্ধেকের উপর পূর্ণ অধিকার রহিল।

রমেশ বাবুর বিশেষ অনুরোধে মণিময় আসিলেন। তিনি কি মনে করিয়া কমলাকেও সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন।

জমীদারীর ব্যবস্থা স্থির হইয়া গেলে রমেশ বাবু ধর্ম্মদাসকে ডাকিয়া বলিলেন, এবার তুমি কি করবে না করবে, তা জানার অধিকার অভিভাবক হিসাবে আমাদের দু'জনেরই আছে; তোমার কি এই সম্পর্কে আমাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বল্‌তে কোন আপত্তি আছে?

ধর্ম্মদাস মৃদু হাসিল; তাহার অর্থ এই যে, সত্যই কি আপনারা আমাকে এতই অবাধ্য মনে করেন?

রমেশ বাবু বলিলেন, আমার মনে হয়, তোমার আর ঐ স্কুলের কাযে গিয়ে কায নেই; বাড়ীতে ব'সে ভাল ক'রে এম-এ পরীক্ষাটা দিয়ে ফেলে, তার পর বিয়ে কর, ক'রে বিলেতে চ'লে যাও।

ধর্ম্মদাস বলিল, বিলেতে আমি যাব না—

দুই জনেই অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া বলিলেন, কেন?

ধর্ম্মদাস বিনীতভাবে নিবেদন করিল, বাবার বিলেত যাওয়াতে মত ছিল না যে—

এই কথা দুই জনে শুনিয়া বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গেলেন।

ধর্ম্মদাস কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, এই বাড়ীতেও থাক্‌তে আমার মন চাইছে না। তা ছাড়া আমার নিজের চলার জন্য আমাকে কায ত করতেই হবে। পরীক্ষার আর মাত্র তিন মাস আছে; আমাকে ফি জমা দিতে হবে; সে টাকা আমার ধার করতে হবে; নইলে এখন টাকা আমার কাছে নাই যে—

মণিময় শান্তভাবে বলিলেন, ধর্ম্মদাস, আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই, সেটি তোমার বিবাহের সম্পর্কে।

'বলুন' বলিয়া লজ্জায় ধর্ম্মদাস মাথা অবনত করিল।

তুমি কি কমলাকে বিয়ে করবে?

বহুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া ধর্ম্মদাস বলিল, আমার ধৃষ্টতা আপনারা মার্জ্জনা করবেন, আমি যদি কোন অন্যায় কথা ব'লে ফেলি, তাই আমার ভয় হয়—

দুই জনেই তাহাকে সাহস দিলেন; তুমি বুদ্ধিমান্, বিবেচক,—তুমি কোন অন্যায় কথা বল্‌তে পার না, তা আমরা ভাল ক'রেই জানি।

ধর্ম্মদাস বলিল, কমলাকে বিয়ে করা নিয়ে আমি একটা প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ আছি—

মণিময় ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, কি সে প্রতিজ্ঞা, ধর্ম্মদাস?

ধর্ম্মদাস বলিল, দর্শনের পরীক্ষায় যদি সর্ব্বোচ্চ স্থান না নিতে পারি ত, আমি কমলার অযোগ্য, আমি সন্ন্যাস অবলম্বন করব।

দুই জনেই হাসিয়া ফেলিলেন, এটা তোমার একদম ছেলেমানুষী, ধর্ম্মদাস,—এ কি বলছো ?

ধর্ম্মদাস কোন উত্তর দিল না ; কিন্তু তাহার দৃষ্টিতে তাহার এই কঠোর সংকল্পের দৃঢ়তাই ব্যঞ্জিত হইল।

মণিময় বলিলেন, তা হ'লে ত তোমার খুব ভাল করেই পড়াশুনো আরম্ভ করতে হয়, ধর্ম্মদাস !

ধর্ম্মদাস বলিল, তাই ত মনে করছি, কালই চ'লে যাই।

রমেশ বাবু এইবার কথা কহিলেন, দেখ ধর্ম্মদাস, আমাদের বয়সের কিছু অভিজ্ঞতা আছে, আর আমি তোমার মাষ্টার মশাই ব'লে তোমাকে উপদেশ দেবার অধিকার এখনও কিঞ্চিৎ মনে মনে রাখি ; আর আশাও করি যে, তুমি শুনে সেইমত কায করবে।

ধর্ম্মদাস মাথা নীচু করিয়া বলিল, আপনার কথা আমি এখনও আদেশ ব'লেই মনে করি। কি বলছেন আপনি ?

রমেশ বাবু বলিলেন, আমি জানি, তুমি জমীদারীর অর্থ এ জীবনে আর স্পর্শ করবে না। মণিময় বাবু তাঁর মেয়েটির সঙ্গে তোমার বিয়ে দিতে চান, যত দিন পর্য্যন্ত না সে সম্বন্ধ তোমার সঙ্গে হয়, তুমি তাঁর কাছেও টাকা নেবে না, এ দিকে উপার্জ্জন ক'রে তোমার খরচ চালাতে হ'লে তোমার পরীক্ষার ফল যে আশা-অনুরূপ হবে না, তাও অনুমান করা যেতে পারে ; অতএব আমার মতে পরীক্ষার আগে পর্য্যন্ত তোমার কোন কায করা উচিত হবে না। এখন প্রশ্ন—তোমার চলে কি ক'রে ? তুমি নিজেই বলেছ, ঋণ ক'রে ফি দিতে হবে—অতএব ঋণ করতেও তোমার আপত্তি নেই দেখছি—তা হ'লে বাপু, সেই ঋণ কেন আমাকে দিতে দেও না ? তুমি উপার্জ্জন ক'রে কড়ায়-ক্রান্তিতে তা শোধ ক'রে দিও।

কথাগুলি বলিয়া রমেশ বাবু এমন করিয়া হাসিতে লাগিলেন যে, তাঁহার মুখের উপর 'না' বলার আর তাহার সাধ্য ছিল না।

ধর্ম্মদাস টাকা লইয়া পরের দিন কলিকাতা রওনা হইয়া গেল।

—

পরিচ্ছেদ—নয়

পরীক্ষায় প্রথম হওয়ার সম্বন্ধে ধর্ম্মদাসের মনে আর কোন সন্দেহ ছিল না। তাই সে সে দিন কমলার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল।

মণিময় প্রত্যহই সংবাদ লইতেছিলেন, ধর্ম্মদাস কেমন পরীক্ষা দিতেছে এবং বন্ধু-বান্ধবদিগের নিকট এ সংবাদও পাইতেছিলেন যে, ধর্ম্মদাস শুধু যে প্রথম হইবে, এমন নহে, তাহার নম্বর বোধ হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকর্ড হইবে। এ কথা কমলাও শুনিত ; কারণ, মণিময় ধর্ম্মদাসের সম্পর্কে কোন কথাই কমলাকে না বলিয়া থাকিতেন না ; তিনি বুঝিয়াছিলেন, কমলা সত্যই ধর্ম্মদাসকে ভালবাসিয়াছিল।

ভালবাসা-বাসির মধ্যে লুকোচুরি মণিময় ভালবাসিতেন না। সে কথা কমলাও জানিত এবং ধর্ম্মদাসের নিকটও এ কথা অবিদিত ছিল না।

মণিময়ের সহিত কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিয়া ধর্ম্মদাস বড়মার কাছে গিয়া আব্দার করিতে লাগিল, আমি এত খেটে-খুটে, এত পরিশ্রম ক'রে পরীক্ষা দিয়েছি, এক দিন আমাকে পেট ভ'রে খাওয়াতে হবে !

বড়মা হাসিয়া বলিলেন, এক দিন কেন ধর্ম্মদাস, আজই তোমাকে ভাল ক'রে খেতে হবে, এখানে থাকতে হবে—

ধর্ম্মদাস বলিল, বাঃ, আমি যে ব'লে আসি নি—বাসায় তারা কি ভাববে ?

বড়মা হাসিলেন, ভাবুক গে তারা—

ধর্ম্মদাস আশা করিয়াছিল, তাহার চেঁচামেচি শুনিয়া কমলা বই ছাড়িয়া বাহিরে আসিবে ; কিন্তু কমলা আসিল না। কেন আসিল না, তাহা যেন ধর্ম্মদাস মনে মনে আন্দাজ করিতেছিল।

ধর্ম্মদাসের প্রতি কমলার অভিমান একান্ত স্বাভাবিক। ধর্ম্মদাস যে দুঃখ বহন করিবার জন্য সতত উন্মুখ, তাহার হেতু নির্ণয় করিতে বসিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, কমলার প্রতি তাহার ভালবাসা। কমলা সে কথা জানিত, তবুও ধর্ম্মদাস যে কষ্টস্বীকার করিতেছে, তাহাও কমলাকে দুঃখই দেয়। নিজের সহিত বিরোধ করিয়া, নিজেকে নিপীড়িত করিয়া ভালবাসা নিজের বিচিত্র পথে চলে। মহাপ্রভু বোধ করি তাই বলিয়াছেন, প্রেম—তপ্ত ইক্ষুচর্ব্বণ !

ধর্ম্মদাস আর বাহিরে অপেক্ষা না করিয়া ঝড়ের মত ঘরের মধ্যে আসিয়া ঢুকিল। কমলা একখানি বই খুলিয়া

গভীর অভিনিবেশের ভান করিতেছিল, সে যেন ধর্ম্মদাসের আগমন জানিতেই পারিল না!

ধর্ম্মদাস কিছুক্ষণ কাছে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর হঠাৎ বইখানা বন্ধ করিয়া দিয়া বলিল, উঃ, কি মন পড়ায়!

কমলা বলিল, হবে না কেন? আমাকে ত নিজের ভেলায় আশার সমুদ্র পার হ'তে হবে? সে কথা তোমার মনে না থাকতে পারে; কিন্তু আমি ত আর ভুলতে পারি নে।

ধর্ম্মদাস মুখ টিপিয়া হাসিল।

হাসছো যে?

নিজের দুঃখে।—ধর্ম্মদাস কহিল।

কমলা বলিল, দুঃখে যখন মানুষের হাসি পায়, তখন বুঝতে হবে, তার একান্ত সু-সময়।

ধর্ম্মদাস একটা চেয়ার টানিয়া বসিল, তাহার পর বলিল, সত্যি বলছি মিণ্টু, ভারি লজ্জা করে এসে তোমাকে পড়িয়ে যেতে—ছেলেগুলো সব কি ক'রে জান্‌তে পেরেছে, সবাই আমাকে ক্ষ্যাপায়, এক আসতে পারি রাত্তিরে চুপি চুপি, কিন্তু—ধর্ম্মদাসের মুখ লজ্জায় লাল হইয়া গেল।

মিণ্টু বলিল, আমি অত-শত জানি নে, প্রাণপণে চেষ্টা করবো, তার পর যদি ফার্ষ্ট না হ'তে পারি, আমিও সন্ন্যাসী হয়ে যাব। মনে আছে?

ধর্ম্মদাস বলিল, সব মনে আছে, একটি কথাও ভুলি নি; বল্লুম ত, কেন আসতে পারি নে।

বুঝেছি, বলিয়া টেবিলের উপর দুই হাতের মধ্যে নিজের মুখ লুকাইয়া সে কাঁদিতে লাগিল।

ধর্ম্মদাস ব্যস্ত হইয়া পড়িল, ছিঃ, কাঁদতে নেই, মিণ্টু আমার, লক্ষ্মী আমার—

কমলার কান্না আর কিছুতেই থামে না। ধর্ম্মদাস তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া দিল, চুলের মধ্যে আঙ্গুল চালাইয়া দিয়া কত আদর করিল; তাহার পর বলিল, চল, ছাদে গিয়ে বেড়াই গে।

কেন?—কমলা জিজ্ঞাসা করিল।

কেন? তোমার যে ভারি মাথা ধরেছে, তা কি আমি বুঝতে পারি নি? চল, একটু খোলা হাওয়াতে বেড়াই গে।

নাঃ, আমারও লজ্জা করবে, তোমার সঙ্গে বেড়াতে।

ধর্ম্মদাস এবার রাগিয়া গিয়া বলিল, মিণ্টি, তুই ভারি দুষ্ট হয়েছিস, শেষ পর্য্যন্ত ভূত ঝাড়তে হবে দেখছি।

ঝাড় না দেখি, কেমন রোজা তুমি!

ধর্ম্মদাস বলিল, তুমি বিশ্বাস করছ না, কিন্তু সেই বন-গাঁয়ে গিয়ে আমি ভূত ঝাড়তে শিখে এসেছি।

কমলা বলিল, যত সব তোমার আজগুবি কথা, ভূত আছে না কি? সে কি ধূলো-বালি যে ঝাড়বে?

ভূত আগে আমিও মানতুম না মিণ্টু; কিন্তু—বলিয়া ধর্ম্মদাসের সমস্ত দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

মিণ্টু বুঝিল যে, ধর্ম্মদাস যাহা বলিতে চায়, বলিতে পারিতেছে না, তাই সে সকৌতূহলে অবাক্ হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কি কথা? বলছো না কেন?

ধর্ম্মদাস বলিল, আজকে বলব না, বলতে ইচ্ছা হচ্ছে না; এক দিন কিন্তু বলবো সে কথা।

কমলা ধর্ম্মদাসের একটা হাত টানিয়া লইয়া বলিল, তোমার ত পরীক্ষা হয়ে গেল, এখন এখানেই থাক না কেন?

সেটা দেখতে শুনতে ভাল হবে না, মিণ্টু আমার।

কিন্তু আমার পড়ার কি হবে?

তাই ত ভাবছি, বলিয়া ধর্ম্মদাস একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল—মুস্কিল, কি যে করি!

বাহির হইতে মণিময় বলিলেন, কি গো, তোমাদের কিসের এত পরামর্শ চলছে?—বলিতে বলিতে তিনি ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বলিলেন, ধর্ম্মদাস, তোমাকে বোধ হয়, কয়েক দিনের জন্য কাযে ফিরে যেতে হবে —

কেন? ধর্ম্মদাস তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল।

তোমাদের স্কুলের সম্পাদক ভারি অনুনয়-বিনয় ক'রে টেলিগ্রাম করেছেন তোমাকে, শিক্ষা-বিভাগের বড় কর্ত্তা বোধ হয়, শীগ্‌গির স্কুল দেখতে যাবেন—

ধর্ম্মদাস যেন কি বলিতে গিয়া বলিতে পারিল না। কমলা ধর্ম্মদাসের এই অক্ষমতায় নিজেকে অপরাধী মনে করিয়া লজ্জায় আরক্তিম হইয়া উঠিল।

মণিময় হাসিয়া বলিলেন, এক সপ্তাহের জন্য তোমার এখানকার কাযটি আমি সর্ব্বাঙ্গসুন্দরভাবে চালাইয়া দিতে পারিব বলিয়াই মনে করি, ধর্ম্মদাস। তাহার পর কমলার দিকে চাহিয়া বলিলেন, পারবো না, মিণ্টু?

মিণ্টু লজ্জায় মস্তক অবনত করিল। [ক্রমশঃ।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

ব্যতিক্রম

সব জিনিষের বা সব নিয়মের যেমন একটি ব্যতিক্রম থাকে, মিত্রদের ছোট ভাইটিও ঠিক সেই ব্যতিক্রম। বড় ভাইয়ের নাম সুধীন্দ্র, মেজ ভায়ের নাম মুনীন্দ্র, ছোট ভাই একবারে হরিদাস। বড় ছোট-আদালতের উকীল। মেজ ডাক্তার, ছোট প্রায় ভবঘুরে;—কখন বা চাকুরী করে, কখন বা ভাগে কাহারও সঙ্গে একটা ছোট-খাটো দোকান করিয়া বসে। বাড়ীতে নূতন কেহ আসিলে ছোটটি যে ভাই, এ কথা চট্‌ করিয়া সে বুঝিতে পারে না। সকালে বাড়ীর কেহ উঠিবার অনেক আগেই হরিদাসকে উঠিতে হইবে। প্রথমেই কলের জল আসিবার আগে চৌবাচ্চায় পূর্ব্বদিনের অবশিষ্ট জলটুকু লইয়া নীচেকার সব স্থানটুকু পরিষ্কার করিয়া ফেলা, জল আসিবামাত্র চৌবাচ্চা ধুইয়া তাহাতে জল ধরিবার ব্যবস্থা, তার পর ষ্টোভ জ্বালিয়া চায়ের জল চড়াইয়া দেওয়া—এই হইল হরিদাসের প্রাতঃকালের প্রথম কর্ত্তব্য। তার পর ছোটবড় ভাইপো-ভাইঝিদের ক্ষুধার কোলাহল থামান—সে এক বিশাল কায। হরিদাস কিন্তু তাহা অতি শীঘ্র এবং অতি সহজে সুসম্পন্ন করিয়া ফেলে। পাঁউরুটী প্রতি রাত্রিতে কিনিয়া আনে; সেই রুটী চট্‌ করিয়া কাটিয়া লইয়া সেগুলি টোষ্ট করিয়া মাখন মাখাইয়া প্রত্যেককে দুই টুকরা রুটী ও ছোট পেয়ালার এক পেয়ালা চা ধরিয়া দিয়া তাহাদের শান্ত করা হয়। তার পর বড়দার ও মেজদার ঘরে রুটী ও চা পৌঁছাইয়া দেওয়া। বড়দার ঘরে কার্য্য সংক্ষেপেই হইয়া যায়। হরিকে চা-হস্তে ঢুকিতে দেখা মাত্র সুধীন্দ্র কাগজ-কলম ফেলিয়া লাফাইয়া উঠেন ও অত্যন্ত কুণ্ঠার সঙ্গে বলেন, "এখানে কেন আবার আন্‌লি, ভাই! এত বলি, আমাকে ওখান থেকেই ডাক দিস্‌, আমি গিয়ে খেয়ে আস্‌ব, তা যদি তোর মনে থাকে!"

মৃদু হাসিয়া হরি চলিয়া আসে।

মেজদার ঘরে মাঝে মাঝে বিপদ ঘটে। তাহার ঘরে কাপ তিনেক নিত্য লাগে। মুনীন্দ্র সস্ত্রীক চা-পান করিয়া থাকে; দুই কাপ সে নিজে, এক কাপ তাহার স্ত্রী।

হরিদাস চায়ের ট্রে লইয়া ঘরে ঢুকিবামাত্র মুনীন্দ্র একবার ঘড়ীটা দেখিয়া লয়। যদি দেখে, অন্য দিনের অপেক্ষা মিনিট পাঁচেক দেরী হইয়াছে, মুখ ভার করিয়া তৎক্ষণাৎ বলিয়া বসে, "আজ বড় দেরী হয়ে গেছে, হরি। এ রকম হ'লে ত আমাকে ডিস্‌পেন্‌সারী গিয়ে চা খেতে হবে দেখছি।" মেজবৌ চায়ের পেয়ালা টানিয়া লইয়া সুর দেয়, "তাই কল্লেই পার। যখন এত অসুবিধে! আমি না হয় চা খাওয়া ছেড়েই দেব।"

হরিদাস কোন কথাই গায় না মাখিয়া বলে, "কৈ মেজদা, দেরী ত হয় নি আজ!"

মেজদা মুখ ভার করিয়া বলে, "না, হয়নি, ঘড়ী দেখ দিকি।"

হরিদাস ঘড়ীর দিকে চাহিয়াই বলে, "তোমার ঘড়ী পাঁচ মিনিট ফাষ্ট, মেজদা। এখন ঠিক সাড়ে ছটা বেজেছে, ছটা পঁয়ত্রিশ নয়।" বলিয়া নিজের গায়ের ফতুয়ার পকেট হইতে একটি মূল্যবান্‌ ছোট ঘড়ী বাহির করিয়া মেজদার সম্মুখে মেলিয়া ধরে।

মেজদার রাগ বাড়ে, কিন্তু প্রকাশের ভাষা খুঁজিয়া পায় না। ঠিক সময় রাখা হরির একটা বাতিক, তাহা বাড়ীর সবাই জানে।

বাড়ীতে একটি ঝি ও দুইটি চাকরও আছে। তাহারা যে চা ইত্যাদি পৌঁছাইয়া দিতে পারে না, তাহা নহে। কিন্তু হরির এই সব করা অভ্যাস, তাই সে করে, করা দরকার বলিয়া নহে।

ইহাতেই শেষ নহে। চা-পর্ব্ব শেষ হইলে হরি কাপড়-চোপড় লইয়া পড়ে। নিজের জামা-কাপড় প্রতিদিন সে সাবান দিয়া কাচিয়া ধবধবে করিয়া ফেলে। যদি দেখিল, আর কাহারও কাপড় সামান্য একটু ময়লা হইয়াছে, অথচ চাকরে সেই কাপড়ই জলকাচা করিয়া সারিতেছে, হরি তখনই সে কাপড়খানি লইয়া সাবান দিয়া কাচিয়া দিবে।

বস্ত্র-পর্ব্ব শেষ হইলে হরি ঘণ্টা দুয়েকের জন্য বাহির হইয়া যায়। কোথায় যায়, সে কথা কেহ জানে না। কিন্তু সকলেরই বিশ্বাস, সে এ বাজার সে বাজার ঘুরিয়া বেড়ায়; কারণ, জিনিষপত্রের দর জানা তাহার দ্বিতীয় বাতিক এবং যখন ফিরিয়া আসে, হাতে তরকারি বা মাছ কিছু-না-কিছু নিশ্চয়ই থাকে।

বড়দা-মেজদার খাওয়ার পরে সে খাইয়া তৎক্ষণাৎ আর

একবার বাহির হয়। সে সময়ে বাড়ীর কাহারও না কাহারও কোন জিনিষের ফরমাস নিশ্চয়ই থাকিবে। হয় ত বড়বৌ বলিলেন, "ঠাকুরপো, আসবার সময় খুকী ছুটির জন্য ছুটো টুপী নিয়ে এসো ত, ভাই। রোজ ভাবি বল্‌ব তোমায়, ভুলে যাই।"

হরি হাসিয়া বলে, "তাই বুঝি আজ আঁচলে গেরো বেঁধে রেখেছিলেন?"

বড়বৌ লজ্জিত হইয়া আঁচলের গেরো খুলিয়া ফেলিয়া বলেন—"কি করি ভাই, সেকেলে মানুষ।"

মেজবৌ উহারই মধ্যে একটু রকমারি করিয়া বলে, "ঠাকুরপো, একটা কায করতে পারবে?"

গমনোদ্যত হরি গতি সংযত করিয়া বলে, "কি কায, বল।"

মেজবৌ তখন বলে, "যদি সময় পাও ত আমার জন্যে এক ডিবে ভাল জরদা এনো। তোমার মেজদাকে আন্‌তে বল্লে বলেন, ও জিনিষ আন্‌তে আমার লজ্জা করে। শুন্‌লে কথা!"

হরি ঘরের বাহিরে পা বাড়াইয়া বলে, "আচ্ছা।"

সন্ধ্যায় যখন হরি ফেরে, তখন সকল 'ফরমাসই' সে 'তামিল' করিয়া আসে।

সন্ধ্যার পরই হরি আবার বাহির হইয়া যায়। রাত্রি দশটা আন্দাজ হরি যখন বাসায় ফিরিয়া আসিয়া খাইতে বসে, বড়বৌ বলেন, "বাঁচালে ভাই আজকে; মেয়ে ছুটো ঠাণ্ডায় বড্ড কষ্ট পাচ্ছিল।"

মেজবৌ ছুই একবার জরদা দেওয়া পানের পিচ ফেলিয়া বলে, "কোত্থেকে জরদা এনেছিলে, ঠাকুরপো? ঠিক বাদলরামের জরদা নয় ত!"

হরি হাসিয়া বলে, "তা হবে, তোমার বাদলরাম বাবুর সঙ্গে আমার ত আলাপ নেই!"

আহারের পর হরি আর কাহারও নহে। একবারে সোজা গিয়া নিজে শোবার ঘরের দুয়ার বন্ধ করিয়া দেয়। তার পর সে যে সেখানে কি করে, কখন্ ঘুমায়, সে খবর কাহারও জানিবার উপায় থাকে না।

২

মাঝে মাঝে যেমন জিজ্ঞাসা করা হয়, আজও বড়বৌ তেমনই জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁগো, কিছু ঠিক হ'ল?"

সুধীন্দ্র পান চিবাইতে চিবাইতে বলিলেন—"কিসের?"

"কিসের! এরি মধ্যে ভুলে গেলে? আজ যাবার সময় তোমাকে পই পই ক'রে কি ব'লে দিলাম?"

"ওঃ, হরির বিয়ের কথা? তুমি ত কিছুতে কথাটা বুঝবে না!"

"কি মাথামুণ্ডু বুঝব? আমার গায়ে যে এ দিকে লোকে থুথু দিতে আরম্ভ করেছে, সে খবর রাখ?"

"কেন, থুথু দেবে কেন? থুথু দেবার মত কি অন্যায় কার্য্যটা তুমি করেছ?"

"আজ মাধু ঠাকুরঝি বেড়াতে এসেছিল। ছোট ঠাকুরপোর আজও বিয়ে হয় নি শুনে বল্লে, 'ওটা কিন্তু ভাল হচ্ছে না বৌদি তোমাদের। লোকে বল্‌ছে কি জান? বলছে, হরি গতরে খাট্‌ছে, তার ওপর যা দু-দশ টাকা উপায় কর্‌ছে, ভাইদের হাতেই দিচ্ছে। বিয়ে হ'লে ত সেটি হবে না। উপরন্তু ছেলেপুলে হ'লে খরচ বাড়বে। কাযেই বৌরা বিয়ে দিতে চাইবে কেন?"

"কি করি বল? হরি বিয়ে করতে চায় না। দুই একবার বলেছিলাম, কিছু ফল হয় নি। একবার উত্তর দিয়েছিল, এই বিদ্যা আর এই অর্থ উপার্জ্জনের ক্ষমতা নিয়ে কি ক'রে বিয়ে করি, দাদা? স্ত্রীও যে মুর্খ আর গরীব ব'লে ঘৃণা করবে। আর তুমি ত আগের কথা সব জান।"

"আগের কথা সব জানি বলেই ত বল্‌ছি। ঠাকুরপোকে ত তুমি জোর ক'রে পড়া ছাড়াওনি। ঠাকুরপোর মন উঁচু, তাই নিজে থেকে মেজঠাকুরপোকে পড়াবার জন্য ব'লে নিজে পড়া ছেড়েছিল।"

"তা হোক্, সে সময়ে আমার এমন অবস্থা যে, দু'জনকে পড়ানো একেবারে অসম্ভব ছিল; এক জনকে পড়িয়ে সংসার চালানো, তাও দুষ্কর ছিল। তাই না হরি পড়া ছেড়ে নিজে যৎসামান্য উপায় করতে আরম্ভ করে। হরিকে যে সে সময়ে পড়া ছাড়তে হয়েছিল, সে ত আমারই অক্ষমতার পরিচয়।"

"তা হোক, তুমি ত ক্ষমতা থাক্‌তে কাউকে পড়া থেকে বঞ্চিত কর নি। তোমাকে অসহায় দেখে, তোমার কষ্ট দেখে ছোটঠাকুরপো যে নিজে থেকে এ ব্যবস্থা করেছিল। আর ছোটঠাকুরপোর তার জন্য তোমার ওপর একটুও ক্ষোভ নেই। এখনও ত বড়দা বলতে ছোটঠাকুরপো অজ্ঞান।"

"বড়বৌ, তুমি ও কথা আমাকে আর মনে করিয়ে দিও না। তার সেদিনকার কথা মনে হ'লে আমার চোখে জল আসে; সে যে ছোট হয়েও বড়র চেয়ে বেশী ত্যাগ করেছে, এ মনে ক'রে আমি বড় ছোট হয়ে যাই। সে বলতো বটে—সে সাধারণ ছেলে, তার না পড়লে বিশেষ ক্ষতি হবে না, পড়লেও বেশী কিছু করতে পারবে না—বড় জোর না হয় কষ্টেসৃষ্টে আই, এ-টা পাশ করবে; কিন্তু মুনীন্দ্র ভাল ছেলে, তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, তাকে পড়ানোই উচিত। কিন্তু আমি যে হরিকে নিজে 'অ-আ' থেকে পড়িয়েছি, আমি ত জানি, তার বুদ্ধি কি অসাধারণ তীক্ষ্ণ ছিল। মুনীন্দ্র শুধু পড়ার বই নিয়ে থাকত, আর কোন দিকে তার দৃষ্টি ছিল না; কিন্তু হরির ছিল সর্ব্বদিকে দৃষ্টি। সংসারের কায, গুরুজনের সেবা, ক্লাশে যে সব ছেলে কিছু বুঝতে পারত না, তাদের পড়া বুঝিয়ে দেওয়া, ক্লাশের বই ছাড়া অন্যান্য অনেক ভাল ভাল বই পড়া—এই সব নিয়ে সে থাকত। এত ক'রেও যে সে প্রত্যেক বৎসর সেকেণ্ড থার্ড হয়ে প্রোমোশান পেত, এই তার বিশেষ বাহাদুরী। নিজে লেখাপড়া ছেড়ে সে মুনীন্দ্রের লেখাপড়ার ব্যবস্থা ক'রে দিলে, আর নিজে দিনরাত্রি পরিশ্রম ক'রে সে সংসার চালানোর সাহায্য করলে। দুপুরে একটা কায করত, সে কথা সবাই জানত। কিন্তু—"

সহসা সুধীন্দ্র থামিলেন। তাঁহার নয়নে দুই বিন্দু অশ্রু দেখা দিল। বড়বধূ স্বামীর দিকে নীরবে চাহিয়া রহিলেন। কষ্টে আপনাকে সংযত করিয়া সুধীন্দ্র বলিলেন, "এ ছাড়া আমাকে না বলেই সকালে বিকালে ফুটপাথের উপর পেনসিল, কলম, ছোটখাট বই নিয়ে বসত। এ থেকেও কিছু উপায় হ'ত। আর মাসের শেষে সমস্ত টাকা এনে আমার হাতে হাসিমুখে দিত। মাইনের চেয়ে বেশী টাকা কি ক'রে হ'ল, জিজ্ঞাসা করলে সে বলত, 'ন্যায্য উপায়ে কিছু উপরি পাওনা হয়েছিল, দাদা।' সে যখন নিজমুখে 'ন্যায্য' বলত, তখন যে সে উপায় ন্যায্য, তাতে আমার কোন সন্দেহ থাকত না। তার হাতখরচের জন্য তাকে পাঁচটা টাকা দিতাম, তাও সে নিতে চাইত না, জোর ক'রে দিতাম। সে যখন টাকা কটা হাত পেতে নিয়ে প্রসন্ন-বদনে চ'লে যেত, আমার দুটি চক্ষু ভ'রে জল আসত। আজ যে আমি উকীল হয়ে দাঁড়াতে পেরেছি, সে তারই জোরে; তার অতি কষ্টে অর্জ্জিত টাকা পেতাম, তাই কোন রকমে সংসার চালিয়ে মুনীন্দ্রকে পড়িয়েও ওকালতীতে টি'কে থাকতে পেরেছিলাম। নইলে সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে একটা মাষ্টারী নিয়ে জীবন কাটাতে হ'ত।"

"ছোটঠাকুরপো যে ফুটপাথের উপর পেনসিল, কলম ইত্যাদি বিক্রী করত, এ কথা ত কোন দিন বলনি। টাকা কোথায় পেত?"

"ঐ যে তাকে মাঝে মাঝে তারই টাকা থেকে পাচটা ক'রে টাকা দিতাম, সেই টাকা থেকে এ সব করত। নিজের জন্য সে ত একটা পয়সাও খরচ করত না।"

বড়বধূ কয়েক মুহূর্ত্ত কোন কথা কহিলেন না। নারী-হৃদয় এই পরম স্নেহপাত্রের অপূর্ব্ব পরিচয়-লাভে বোধ হয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "এ সবই ত ছোটঠাকুরপোর মহত্ব। ছোটঠাকুরপো পাশ না ক'রে যা করেছে, ক'জন লোক সব কটা পাশ ক'রে তা করতে পারে?"

"সে কথা ঠিক। কিন্তু তুমি আমি না হয় সে কথা বুঝলাম, বাইরের লোকে ত সে কথা বুঝবে না। ঘরের সবাইও হয় ত তা মানে না। হয় ত সে কথা মনেও নেই। কিন্তু হরি যাই অসাধারণ মানুষ, তাই তার গায়ে অকৃতজ্ঞ-তারও আঁচ লাগে না।"

মুনীন্দ্র ও মুনীন্দ্রের স্ত্রী হরিকে যে একটু অবজ্ঞা ও অনু-কম্পার দৃষ্টিতে দেখে, ইহা তাঁহার চক্ষু এড়ায় নাই। আজ তিনি তাহার একটু ইঙ্গিত স্ত্রীর নিকট করিলেন।

বড়বৌ বলিলেন, "যে যা মনে করে করুক, আমি কিন্তু ছোটঠাকুরপোকে এমন সন্ন্যাসী হয়ে আর থাকতে দেব না। এবার আমি তাকে স্পষ্ট ক'রে বলবই বলব। আমার কথা কি ঠেলতে পারবে?"

সুধীন্দ্র শান্তস্বরে বলিলেন, "হয় ত পারবে না—সে তোমায় যে মায়ের মত ভক্তি করে।"

সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চক্ষু সজল হইয়া আসিল।

বড়বৌও অঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন।

৩

বড়বৌ চোখের জল ফেলিয়া অনুরোধ করাতে হরি আর কিছুতেই 'না' বলিতে পারে নাই। তবে বড়বৌয়ের পায়ে ধরিয়া ছয় মাস সময় চাহিয়া লইয়াছে। ছয় মাস অতীত

হইলে আর কোন আপত্তি করিবে না, এ প্রতিজ্ঞাও বড়-বৌয়ের কাছে সে করিয়াছে। বড়বৌ অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছেন এবং প্রসন্নচিত্তে দেবরকে ছয় মাসের সময় দিয়াছেন।

সেই ছয় মাস প্রায় শেষ হইতে চলিয়াছে, এমন সময় একটি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল।

সে দিন ছুটী। মুনীন্দ্র ও হরিদাস দুই জনেই বাহিরে গিয়াছে। সুধীন্দ্র একা বাড়ীতে। ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, একটি বাবু দেখা করিতে আসিয়াছেন। বাবুটিকে বাহিরের ঘরে বসাইতে বলিয়া সুধীন্দ্র অল্পসময়ের মধ্যেই নীচে নামিয়া আসিলেন। পরস্পর নমস্কারান্তে উভয়ের পরিচয়াদি আরম্ভ হইল। আগন্তুকের কলিকাতাতেই বাড়ী। এক জন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক। নাম বলিতেই চিনিতে বিলম্ব হইল না। অধ্যাপক সন্তোষ বসু সর্ব্বজনবিদিত বলিলেই হয়।

সন্তোষ বাবু বলিলেন, "কন্যাদায় হ'তে উদ্ধারের জন্য আপনার কাছে এসেছি। আমার একটি বিবাহযোগ্য কন্যা আছে; এবার সে আই-এ পাশ করেছে। আপনার ভাইটি ত এবার ইংরাজীর এম্-এতে ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট হয়েছে। আপনি যদি অনুমতি করেন, আপনার ভাইয়ের হাতে মেয়েটিকে দিতে চাই।"

কথাটা শুনিবামাত্র সুধীন্দ্রের মুখ ম্লান হইয়া আসিল। তিনি বলিলেন, "আপনার ছেলে এবং বাড়ী ভুল হয়েছে। আমার ভাই দুর্ভাগ্যক্রমে একটাও পাশ করতে পারেনি। পড়তে পারলে সে খুব বড় হ'তে পারত, কিন্তু ঘটনাচক্রে সে কলেজে পড়বার সুযোগ পর্য্যন্ত পায়নি। আমার ও আমার মেজভাইয়ের সুবিধার জন্য সে স্বেচ্ছায় সে সুযোগ ত্যাগ করেছিল। তাই দুর্ভাগ্যক্রমে সে আজ অর্দ্ধ-শিক্ষিত বা অশিক্ষিত।"

সন্তোষ বাবু সবিস্ময়ে বলিলেন, "অর্দ্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত— এ সব কি বলছেন আপনি? আপনার ছোট ভাইয়ের নাম ত হরিদাস মিত্র। নন্-কলেজিয়েট হয়ে আই-এ, বি-এ পাশ করেন। এবার ইংরাজী এম্-এ-তে ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট হয়েছেন। আর আপনি প্রায় কাঁদ-কাঁদ হয়ে বলছেন যে, ভাই আপনার অর্দ্ধশিক্ষিত এবং আমার বাড়ী ভুল হয়েছে?"

সুধীন্দ্র বলিলেন, "হরিদাস মিত্র ব'লে কেউ এম-এ পাশ করেছেন হ'তে পারে। কিন্তু সে আমার ভাই নয়। আপনি একটু খোঁজ করলেই ভুল বুঝতে পারবেন।"

সন্তোষ বাবু বলিলেন, "আমার ভুল আপনি এখনও বলছেন? আপনার নাম সুধীন্দ্র মিত্র, পেশা ওকালতী, স্থান ছোট আদালত; আপনার মেজভাই মুনীন্দ্র বাবু ডাক্তার; আপনার ছোটভাই হরিদাস মিত্র এম-এ। আপনার বাসার ঠিকানা ২৭ নং হারাধন দাসের ষ্ট্রীট্। এত খবর আমি রাখি, আর আমার ভুল হয়েছে বলছেন? কিন্তু আপনার ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে, আপনারই কিছু ভুল হয়ে থাকবে। হরিদাস যে প্রাইভেটে এতগুলা পাশ করেছে, তা কি আপনি মোটেই জানেন না?"

সুধীন্দ্র অপার বিস্ময়ে নিমগ্ন হইলেন। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া বলিলেন, "না, আমি ত এ বিষয়ে কিছু জানিনে। সে রাত্রিকালে আপন মনে কিছু পড়াশুনো করে, এইটুকুমাত্র জানি। তা ছাড়া পরীক্ষা দেওয়া বা পাশ সম্বন্ধে আমি একেবারে অজ্ঞ। কিন্তু হরি ত সব কটা পরীক্ষায় পাশ করলে, আর আমাকে বললে না, এটা যে কি ক'রে সম্ভব হ'ল, তা ত আমি বুঝতে পারছিনে। আচ্ছা, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, হরিদাসের সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে?"

সন্তোষ বাবু হাসিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, বেশ ঘনিষ্ঠভাবেই পরিচয় আছে। ওরকম বুদ্ধিমান্ ছেলে আমি খুব কম দেখেছি। তবে হরিদাসের সঙ্গে পরিচয়ের একটা ইতিহাস আছে। সেটুকু বলা আবশ্যক। বছর ৮।৯ আগে কলেজ ষ্ট্রীটের ফুট-পাথের উপর এক সন্ধ্যায় একটি ছেলেকে কতকগুলি পুরানো বই, কলম, পেন্সিল ইত্যাদি নিয়ে বিক্রী করতে দেখি। ছেলেটিকে দেখেই আমার মনে হয়, সে ভদ্র ঘরের ছেলে। একটু সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে তার বিক্রী করবার পদ্ধতি এবং তার কথাবার্ত্তা শুনে তার প্রতি আমি একটু আকৃষ্ট হই। দরকার না থাকলেও তার কাছ থেকে দুচারটে পেন্সিল কলম কিনি; তার পর তার পুরানো বই নেড়ে চেড়ে দেখে দুই একখান বইও কিনি। দাম দিতে গিয়ে দেখলাম, তার দাম অন্যান্য লোকের চেয়ে ঢের কম। ইচ্ছে হ'ল, তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করি। কিন্তু চট্ ক'রে তা না ক'রে শুধু জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি এখানে রোজ এই সময়ে

ব'স কি? সে বল্লে, হাঁ। তখন আমি কলেজের ফেরৎ এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা ক'রে বাসায় ফিরছি। কাযেই জিনিষগুলা নিয়ে আর দেরী না ক'রে বাসায় ফিরে আসি। বাসায় ফিরে আসার ঘণ্টাখানেক পরে হঠাৎ আমার মনে পড়ে যে, কলেজ থেকে ফেরবার সময় আমার হাতে আমার যে বইখানা ছিল, সেখানা সেই দোকানেই ফেলে এসেছি, এবং আরও মনে পড়ল, সে দিন কলেজের ঠিকানায় ইনসিওর করা খামের ভিতরে যে পাঁচশো টাকার নোট পেয়েছিলাম, সেটাও খাম শুদ্ধ সেই বইয়ের ভিতর আছে। পাছে পকেটমারায় পকেট মেরে নেয়, সে জন্য টাকাটা আর পকেটে রাখিনি। তখনই একখানা ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। সেখানে এসে দেখলাম, সে ছেলেটি বা তার ছোট দোকানের কোন চিহ্নই সেখানে নেই।"

সুধীন্দ্র চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। অধ্যাপক সন্তোষ বাবু তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সুধীন্দ্র বাবুর দিকে চাহিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, "তার পর পাশের ২।১ খানা দোকানে তার কথা জিজ্ঞাসা করাতে তাদের কেউ কেউ বল্লে, অন্য দিন ছেলেটি ত একটু রাত করেই যেত, আজ কিন্তু সন্ধ্যার পরেই চ'লে গিয়েছে। কেন আজ সন্ধ্যার পরেই চ'লে গেছে—তা অনুমান করতে আর আমার দেরী হ'ল না। বুঝলাম, মানুষ চেনা বড় শক্ত কায। চেহারা দেখে বা কথা শুনে মানুষের কিছুই বোঝা যায় না। এই ত ছেলেটিকে দেখেই আমি ভেবেছিলাম, ছেলেটি বড় সাধু। সঙ্গে সঙ্গে তার সাধুতার নিদর্শন খুব মিলে গেল। পাঁচশো টাকা এমনি ভাবে নষ্ট হয়ে যাওয়ায় মনে বড়ই কষ্ট হ'ল। ক্লান্ত-দেহে ও ক্লান্ত-মনে যখন বাসায় ফিরলাম, তখন সতী—আমার মেয়ের নাম সতী—ছুটে এসে বল্লে, 'বাবা, এই দেখ, তোমার সেই বই পাওয়া গিয়েছে। এর ভিতরে কিসের একটা খাম ছিল, সেটা মায়ের কাছে আছে।' তাড়াতাড়ি স্ত্রীও এসে খামখানি হাতে দিলেন। খামখানা খুলে দেখি, তার মধ্যে একশো টাকার ক'রে পাঁচখানা নোট নির্ভয়ে বিরাজ কচ্ছে। তখন প্রাণ ঠাণ্ডা হ'ল। জিজ্ঞাসা ক'রে যা জানলাম, তাতে বুঝলাম, সেই ছেলেটিই এসে সে বইখানি ও খামখানি আমার স্ত্রীর কাছে ফেরত দিয়ে গেছে। থাকতে অনুরোধ করলেও সে থাকে নি—এমন কি, ঠিকানা পর্য্যন্ত দিয়ে যায় নি। আমার বইখানাতে ঠিকানা লেখা ছিল, ঠিকানা খুঁজতে গিয়ে খামখানাও বেরিয়ে পড়ে। তার পর বাসা খুঁজে বই ও খাম দিয়ে যায়।"

সুধীন্দ্র নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে অধ্যাপকের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সন্তোষ বাবু বলিলেন, "তার পর কি হ'ল জানেন? পরদিন সন্ধ্যার আগে তাকে সেইখানে গিয়ে ধরি ও প্রায় জোর ক'রে বাসায় নিয়ে আসি। সেই হচ্ছে হরিদাস। সে পড়তে ইচ্ছুক ব'লে তাকে আমি একটা স্কুলের ছোট মাষ্টারী যোগাড় ক'রে দিই! কারণ, মাষ্টারী করতে করতে সে পরীক্ষা দিতে পারবে। ঐ অবস্থায় সে একে একে দুটো পরীক্ষা পাশ করে। সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যার পরে সে আমার মেয়েকেও পড়াতে থাকে। এখন তারই অধ্যাপনায় সতী আই-এ পাশ করেছে।"

সুধীন্দ্র এই পর্য্যন্ত শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আপনি যা বললেন, এতে ত হরিই মনে হচ্ছে। সকালে বিকেলে কাগজ-পেন্‌সিল বিক্রী করত, এ কথা আমি শুনেছিলাম। এখন দেখছি, সকালে সে আপনার ওখানে পড়াতে যেত, বিকেলে ফুটপাথের ওপর বসত। কিন্তু পাশ করলে অথচ আমাকে সে খবর জানালে না! হরি এমন কেন করলে?"

সন্তোষ বাবু বলিলেন, "এম-এ পাশের খবর এখনও বাইরে প্রকাশ হয় নি। আমি এইমাত্র য়ুনিভার্সিটী থেকে জেনে আসছি।"

এমন সময় বাহিরে পায়ের শব্দ হইল। সঙ্গে সঙ্গে হরিদাস দাদার বসিবার ঘর খোলা দেখিয়া ভিতরে আসিল। দাদার কাছে আগন্তুককে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া হরি অত্যন্ত বিস্মিত হইল। তাহার মুখ হইতে বাহির হইল,—"আপনি!"

সন্তোষ বাবু হাসিয়া বলিলেন, "এই যে হরিদাস, এস। ফার্ষ্ট ক্লাশ ফার্ষ্ট হয়েছ। এই খবর নিয়ে আসছি। এখন কি খাওয়াবে খাওয়াও। কেমন সুধীন্দ্র বাবু, এখন ত আপনার কোন সন্দেহ নেই যে, হরিদাসকে আমি জানি এবং কোন বিষয়ে ভুল করি নি?"

সুধীন্দ্র একটু যেন ক্ষোভের সহিত বলিলেন, "হ্যাঁ হরি, তুই পাশ করলি সব কটা—কিন্তু আমাকে কেন এত বড় খবরটা বলিস নি, ভাই? তোর পড়া হ'ল না, তারই জন্য যে আমার ক্ষোভের অন্ত ছিল না।"

হরিদাস দাদার পায়ের কাছে নত হইয়া অপরাধীর মত

বলিল, "আই-এ পাশ যখন করি, তখন বলতে গিয়ে ভেবেছিলাম, এ কথা শুনলে আপনি হয় ত ভাববেন, না পড়তে পারার জন্য আমার মনে বড় দুঃখ লেগে রয়েছে এবং নিজে কষ্ট সয়ে আবার আমাকে কলেজে ভর্ত্তি ক'রে দিতে চাইবেন। বি-এ পাশ করার সময় বল্‌তে গিয়ে পিছিয়ে এলাম। ভাবলাম, এত দিন বলিনি, শুনে যদি রাগ করেন। তাই ঠিক করেছিলাম, একেবারে এম্-এ পাশ ক'রে নিশ্চয়ই আপনাকে জানাব। কিন্তু তার আগেই আপনি জেনে ফেলেছেন। আমায় ক্ষমা করুন।"

সুধীন্দ্র দাঁড়াইয়া উঠিয়া হরিকে ছোট ছেলের মত বুকে টানিয়া লইলেন। বলিলেন, "ক্ষমা করব কি রে? তুই কি রাগ করবার উপায় রেখেছিস্? তুই যে সকলের মুখ উজ্জ্বল করেছিস্। পড়ে অনেকে, পাশও করে অনেকে। তোর মত সবাইকে রক্ষা ক'রে এমন ক'রে ক'জনে পাশ করতে পারে! এখন ভিতরে গিয়ে তোর বৌদিদিকে নিজমুখে খবরটা দিয়ে আয়। তোর মুখে খবরটা না শুন্‌লে তাঁর মনে দুঃখ হবে।" তখন দুই ভ্রাতার নয়নে অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িতেছিল।

সুধীন্দ্র চক্ষু মুছিয়া আবার শান্ত হইয়া বসিলেন।

হরি আপনাকে সংবরণ করিয়া ধীরপদে বড়বৌদিদিকে খবর দিবার জন্য ভিতরে চলিয়া গেল।

সন্তোষ বাবু মুগ্ধচিত্তে এই দৃশ্য উপভোগ করিলেন।

৪

সতী মৃদুস্বরে বলিল, "আচ্ছা, কি ক'রে আপনি এত কাল ধ'রে এ সমস্ত ব্যাপার গোপন রেখেছিলেন?"

সতীর পাঠকক্ষে নিয়মিত সময়ে হরিদাস হাজিরা দিয়াছিল। হরিদাস হাসিয়া বলিল, "প্রথমটা ভেবেছিলাম, এখন জানতে পারলেই ভাববেন, আমি যে পড়া ছেড়েছি, তার জন্য নিশ্চয়ই বড্ড বেশী দুঃখ হয়েছিল। সে জন্য গোপনে গোপনে এত কষ্টে পড়েছি ও পাশ করেছি। বড়দার যে অসুবিধা দূর করবার জন্য এত কষ্ট ও চেষ্টা করেছি, সে সব ব্যর্থ হয়ে যাবে। বড়দা হয় ত ব'লে বস্‌বেন, না, তুই পড়; কলেজের খরচ আমি যেমন ক'রে হোক্ চালাব। প্রথমবার তা ভেবে বল্‌লাম না। দ্বিতীয়বার পাশ করবার পর ভাবলাম, এখন বল্‌তে গেলে যদি ব'লে বসেন, আগে কেন এ কথা বলিস নি, যদি রাগ করেন এই ভয়ে চেপে গেলাম। মনে করলাম, বার বার তিন বারের বার নিশ্চয়ই বল্‌ব।"

সতী বলিল, "আচ্ছা, তা যেন হ'ল, কিন্তু পড়তেন কখন্, আর কোথায়? বই বা রাখতেন কোথায়, সময়ই বা পেতেন কখন্, সকালে আমাকে পড়াতেন, সন্ধ্যার দিকে ত ব্যবসাবাণিজ্য করতেন। সত্যি, আমার ভারি আশ্চর্য্য মনে হয়!"

হরিদাস বলিল, "এমন আশ্চর্য্য আর কি? সকালে ত তোমাদের এখানে দুই একখানা বই আগে থেকে রাখা ছিল। পড়াবার অবসরে তাই একটু প'ড়ে নিতাম। তারপর রাত্রে বাড়ীতে পড়তাম।"

সতী বিস্মিতভাবে বলিল, "কি ক'রে পড়তেন? বই-ই বা কোথায় পেতেন, আর সকলকে লুকাতেনই বা কেমন ক'রে?"

হরিদাস বলিল, "ওঃ! তা বুঝি জান না? আমার শোবার ঘরে একটা বড় সিন্দুক আছে, তার মধ্যে বইখাতা সব লুকানো থাক্‌ত। খেয়ে দেয়ে ঘরে গিয়ে সেই যে দুয়ার বন্ধ করতাম, আর সকালের আগে কিছুতে খুলতাম না। ঘরে যে আমি কি করছি, তা জানতেও পারতেন না কেউ।"

হাসিতে হাসিতে সতী বলিল, "বাহাদুরী আছে আপনার যে, এত কাযের মধ্যে পড়ার মত—আর পাশের পড়ার মত—সময় ক'রে নিতে পারতেন।"

হরিদাসের আনন মৃদু হাস্যরেখায় অনুরঞ্জিত হইল।

সতী বলিল, "বাবার কাছে আমি আরও অনেক কথা শুনেছি আপনার সম্বন্ধে।"

হরিদাস বলিল, "কি কথা বল দেখি—কোন মারাত্মক কথা নয় ত?"

সতী গম্ভীরভাবে বলিল, "মারাত্মক ত বটেই—তার চেয়েও বেশী। আপনি আমাদের সম্বন্ধে একটা কথাও বাড়ীতে বলেন নি?"

হরিদাস বলিল, "না এবং হ্যাঁ।"

সতী বলিল, "বটে, এ সব হেঁয়ালী বুঝি নূতন শিখছেন? নাও বটে এবং হ্যাঁও বটে—এ কি ক'রে হ'ল?"

হরিদাস হাস্যমুখে বলিল, "ঠিক এখানকার নাম ক'রে কাউকে কিছু বলিনি, কিন্তু বড় বৌদিদি যে দিন আমাকে

বিয়ের জন্য অনুরোধ করতে গিয়ে কেঁদে ফেলেন, সে দিন এখানকার এক জনের কথা মনে ক'রে একটা কথা বলেছিলাম।"

সতী মাথা নত করিল। তাহার আরক্ত মুখে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম দেখা দিল।

হরিদাস কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বলিল, "আমি কি বলেছিলাম, সেটা তোমার শোনবার ইচ্ছে নেই না কি ?"

সতী কোন কথাই বলিল না। তাহার আরক্ত আননের মাধুর্য্য দেখিতে দেখিতে হরিদাস আত্মগতভাবেই বলিয়া চলিল, "তাঁকে বলেছিলাম, ছয় মাস পরে, তাঁর আদেশ পালন করব। কার কথা মনে ক'রে বলেছিলুম, তাও কি বলতে হবে ?"

সতী অস্ফুটস্বরে বলিল, "যান্ !——"

হরিদাস কথার মোড় ফিরাইয়া বলিল, "আর কি কথা শুনেছ, বল্‌লে না ত ?"

সতী স্বচ্ছন্দতা অনুভব করিয়া বলিল, "বাবা বল্‌ছিলেন, আপনার বড়দা আপনার কথা অর্থাৎ আপনার গুণের কথা বল্‌ছিলেন আর তাঁর চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল আর মাঝে মাঝে চোখে জল আস্‌ছিল।"

হরিদাস বলিল, "বড়দার চিরদিন ঐ ভাব। ভাবেন, তাঁর ছোট ভাই জগতের একটি অত্যাশ্চর্য্য জিনিষ! বৌদির সঙ্গে প্রতিদিন তাঁর একটি কথা হবেই হবে যে, তাঁর হরি যদি পড়তে পেত, কি কাণ্ডই না কর্‌ত। শুনে প্রথম প্রথম মনে হ'ত, ভাগ্যে পড়া ছেড়েছি, তা নইলে ত বড়দাকে নিরাশ হ'তে হ'ত।"

সতী বলিল, "আপনি সবাইকে রোজ চা তৈয়ার ক'রে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেন, নিজে হাতে সব ঘর-দুয়ার ধুয়ে দেন, সাবান দিয়ে রোজ কাপড় কেচে নেন—এতে আপনার মনে কোন বিকার আসে না ?"

হরিদাস সবিস্ময়ে বলিল, "বিকার ? কেন, বিকার আস্‌বে কেন ? আমি এতে আনন্দ পাই এই ভেবে যে, আমার দ্বারা একটু না একটু কায হচ্ছে। আর বড়দা সুখে আছেন। বড়দাকে সুখী করবার জন্য আমি এর চেয়ে বেশী কায এখনও করতে পারি।"

সতী বিস্ময়গর্ব্বে হরিদাসের প্রশান্ত মুখের দিকে চাহিল। তাহার হৃদয়ে যে আনন্দ-সমুদ্র উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহার পক্ষে সে বেগ ধারণ করাও যেন কঠিন হইয়া উঠিল। এমন ভ্রাতৃভক্ত, সরল, কর্ম্মঠ, কুণ্ঠাহীন মানুষ সত্যই সে পূর্ব্বে দেখে নাই।

হরিদাস সহসা বলিয়া উঠিল, "বড় বৌদিদি শীঘ্রই এক দিন আসবেন কিন্তু তোমায় দেখতে—অর্থাৎ আশীর্ব্বাদ করতে। আমি কিন্তু ক'দিন আর আস্‌তে পারব না। কি জানি, আমি থাক্‌তে থাক্‌তেই যদি এসে পড়েন।"

ঠিক সেই সময়ে সতীর ছোট ভাই জ্যোতি ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া সংবাদ দিল যে, মাষ্টার মহাশয়ের বড়ভাই, বড় বৌদিদি আসিয়াছেন।

হরিদাস তাড়াতাড়ি বলিল, "আমি তা হ'লে এখন পালাই, সতী।"

কিন্তু পলায়নের পূর্ব্বেই দ্বারপথে মনুষ্যমূর্ত্তির ছায়া পড়িল। উভয়ে মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, সুধীন্দ্রনাথ ও বড়বৌ হাসিমুখে দাঁড়াইয়া। তাঁহাদের পশ্চাতে সন্তোষকুমার ও তাঁহার পত্নী।

সতী লজ্জারুণ আননে, কুণ্ঠিতচরণে অগ্রসর হইয়া একে একে সকলের চরণে প্রণাম করিল। হরিদাসও দেখাদেখি সতীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিল।

বড়বৌ আশীর্ব্বাদ করিতে গিয়া অশ্রুধারায় গলিয়া সতীকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন।

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য।

"ইগ্‌নেশিয়া ৬"

নতুন বৌ—মাস দুই তিন বিবাহ হইয়াছে। নরেন কি একটা খুটি-নাটি করিয়া তাহার সহিত ঝগড়া বাধাইয়া বসিল। কিসে যে কলহের সূত্রপাত, তাহা দুই জনের কাহারও একটুও মনে ছিল না; কিন্তু তাহার জন্য পরিণতি ভীষণাকার ধারণ করিতে কিছুমাত্র দেরী হইল না। নরেন পাশ ফিরিয়া দীর্ঘশ্বাসের সহিত কয়েকটা 'উঃ' 'আঃ' ছাড়িতে লাগিল এবং নববধূ চোখের জলে আঁচল ভিজাইয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া নিজের মৃত্যুকামনা করিতে লাগিল।

একটার পর একটা করিয়া 'নবতারা' নরেনকে অনেকগুলি কথা জানাইয়া দিল। কহিল, যখন নরেন তাহাকে পিত্রালয়ে পাঠাইতে চাহিয়াছে, তখন সে এক মাসের জন্য কেন, জন্মশোধই সেখানে যাইবে; এবং নরেনের নিকট হইতে রওনা হওয়ার পরদিনই নরেন পত্রযোগে তাহার বাসনাপূর্ণকারী সংবাদ পাইবে। তখন সে স্বচ্ছন্দে অন্য এক জন রূপসীকে বিবাহ করিয়া নিজের জীবন সুখময় করিতে পারিবে।

নরেনও এ কথার উত্তর দিল। কলহ, মুখরতা পরিহার করিয়া যখন নীরবতার আশ্রয় গ্রহণ করিল, নরেন তখন বুঝিল, ব্যাপার ভাল হইতেছে না। সে শুনিয়াছিল, স্ত্রীলোকের আত্মহত্যা করা তাহাদের স্নান করা, কাপড় কাচার মতই দৈনন্দিন ব্যাপার। কিন্তু স্নান করা—কাপড় কাচা ও আত্মহত্যার মধ্যে যে ব্যবধান আছে, তাহা স্মরণ করিয়া নরেন অতিমাত্রায় চিন্তান্বিত হইয়া পড়িল।

একে সমস্ত দিনের হাড়-ভাঙ্গা খাটুনী, তায় এই বাগ্‌যুদ্ধে বেশ কিছু পরিশ্রম, উপরন্তু গভীর বিষাদময় দুশ্চিন্তা—নরেনের অজ্ঞাতসারে সর্ব্বসন্তাপহারী নিদ্রাদেবী তাহাকে অধিকার করিয়া বসিলেন। কিন্তু নবতারা অবিলম্বে তাহাকে সে অধিকার হইতে মুক্ত করিল। চাপা ক্রন্দন যখন আর চাপা রহিল না, তখন নরেন স্বীয় অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিয়া বিড়ি ধরাইল। তাহাতেও ক্রন্দন থামিল না, তখন সে টেবলের উপর হইতে নস্যের ডিবা খুলিয়া সবেগে দুই টিপ নস্য লইল। রেগুলেটারটা আরও দুই পয়েন্ট ঠেলিয়া পাখাটাকে বেশ জোর করিয়া দিয়া পুনরায় সে শয্যা গ্রহণ করিল।

সকালের আলোয় নরেন যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার গায়ের রক্ত জল হইয়া গেল। নবতারা নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ হইয়া মেঝেতে লুটাইতেছে; মুখ-চোখে রক্তের চিহ্ন নাই, সর্ব্বাঙ্গ শীতল।

পাশের বাড়ীতেই একজন ডাক্তার থাকেন; মস্ত নাম-ডাক; ৩২৲ টাকা 'ফি'; এ্যালোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি উভয় বিদ্যাতেই পারদর্শী। নরেন সটান তাঁহার কাছে গিয়া সমস্ত কথা অকপটভাবে ব্যক্ত করিল এবং তাঁহাকে আবশ্যক যন্ত্রপাতি সহ সঙ্গে আসিবার জন্য অনুরোধ করিল। ডাক্তার বাবু বিচক্ষণ ব্যক্তি; বয়সেও প্রবীণ; তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন,—"আমার যাবার দরকার নাই—ফিট্ হয়েছে—একটু মুখে চোখে জল দিন, যখন জ্ঞান হবে, এই ওষুধটা আনিয়ে এক ফোঁটা এক চাম্‌চে জলে দিয়ে খাইয়ে দেবেন।" একটা টুক্‌রো কাগজে তিনি ঔষধের নামটা লিখিয়া দিলেন—"ইগ্‌নেশিয়া ৬"।

নরেন বাড়ী ফিরিয়া অবিলম্বে চাকরকে 'কিং'-কোম্পানীতে পাঠাইয়া দিয়া, ডাক্তার বাবুর নির্দ্দেশ-মত নবতারার চোখে-মুখে জলের ছিটা দিতে লাগিল। সত্যই অল্পক্ষণের মধ্যে সে চোখ মেলিয়া নরেনের দিকে তাকাইল। অনুশোচনায় তখন নরেনের হৃদয় ভরিয়া গিয়াছে। মনে মনে সে প্রতিজ্ঞা করিতেছিল—আর নয়—আর কখনও সে নবতারার সহিত কোনও কারণে কলহ করিবে না—আর কখনও তাহার কোমল প্রাণে ব্যথা দিবে না—এবং যদি দেয়, তাহা হইলে ফল যে কত ভীষণ হইতে পারে, কল্পনা করিয়া সে শিহরিয়া উঠিল! 'ফিট্' যখন এই রকম, আত্মহত্যা তখন যে কি রকম হইবে—তাহার পর শূন্য ঘর, শূন্য বাড়ী, শূন্য জীবন! নাঃ, সে আর এরূপ হইতেই দিবে না।

নবতারা একটু পরে যখন উঠিয়া বসিল, তখন নরেন সকাতর নয়নে তাহার দিকে তাকাইয়া তাহার হাত ধরিল। নবতারা তাহাকে কোন কথা বলিবার অবকাশ না দিয়া শূন্য নয়নে প্রশ্ন করিল, "কৈ, আজ যে আমি বাপের বাড়ী যাবো; ব্যবস্থা কর।" নরেন অতিশয় বিপন্নের মত দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল; নবতারা না থামিয়া

বলিয়া চলিল, "আমি সত্যিই তোমায় অসুখী করছি, আমার যাওয়াই ভাল, যেমন ক'রেই হোক্ আজ বাড়ী গিয়ে আমি কালকে—"

বক্তব্যের বাকীটা চোখের জলে ও প্রচণ্ড ফোঁপানির মধ্যে ডুবিয়া গেল। নরেন রীতিমত ঘাবড়াইয়া গিয়া, চাকরটার ঔষধ আনিতে এত দেরী করার জন্য মনে মনে তাহার মুণ্ডপাত করিতে লাগিল। সে যে মনেও খুব ব্যথা পাইতেছিল, তাহা তাহার মুখ দেখিলে যে কেহ বলিতে পারিত। সমস্ত মান-অভিমান ও সঙ্কোচ পরিত্যাগ করিয়া সে নবতারার দুইটি হাত ধরিল; বলিল, "আমায় ক্ষমা কর তারা, তুমি যেয়ো না; বল যাবে না?"

বেরসিক চাকরটা ঠিক এই সময়েই খোলা দরজার বাহির হইতে হাঁকিল, "বাবু, ওষুধ এনেছি।"

এক হাতে একটা ছোট ধোওয়া চায়ের পেয়ালায় আন্দাজমত জল লইয়া ও অপর হাতে ইগ্‌নেশিয়ার শিশি লইয়া নরেন নবতারার সম্মুখে বসিল। বেচারার চোখ তখনও অনুতাপের অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া ছল ছল করিতেছে। সে যেমন একফোঁটা ঔষধ কাপে ফেলিতে যাইবে, অমনই টস্ করিয়া এক ফোঁটা চোখের জল তাহার মধ্যে পড়িয়া গেল!

নবতারা হাসিয়া ফেলিল; সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুখের চোখের রক্ত ফিরিয়া আসিল; বিষণ্ণভাব দূর হইল ও সে যেন আবার নূতন করিয়া নববধূর মত সলজ্জ হইয়া উঠিল। নরেনকে উদ্দেশ করিয়া সে বলিল, "থাক্, আর ওষুধ দিতে হবে না।"

নরেন তথাপি ঔষধ ঢালিতে প্রবৃত্ত হইতেছে দেখিয়া সে বলিল, "আমার আর কোন অসুখ নেই, ওষুধ দিতে হবে না।"

নরেন বলিল, "তুমি বাপের বাড়ী আর যাবে না বল?"

নবতারা বলিল, "না।"

নরেন হৃষ্টমনে সেখান হইতে উঠিয়া গেল। তাহার অন্তর হইতে গুরুভার যেন নামিয়া গিয়াছিল। যাইবার পূর্ব্বে সে নবতারাকে যথেষ্ট আদর করিয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য।

বাড়ীতে একখানা পুরাতন হোমিওপ্যাথি-গৃহচিকিৎসার পুস্তক ছিল; নরেন তাহারই পাতা উল্টাইয়া এক যায়গায় দেখিল—"দারুণ মনোবেদনাসঞ্জাত যে কোন রোগেরই মহৌষধ—এক ফোঁটা "ইগ্‌নেশিয়া ৬"। তাহার পর নরেন ছোট ছোট অক্ষরে ভবিষ্যৎ নবদম্পতিদের সুবিধার জন্য লিখিয়া রাখিল, "অথবা একফোঁটা চোখের জল।" নবতারা হাসিমুখে সেই দিকে আসিতেছে দেখিয়া নরেন বইখানা চট্ করিয়া আলমারীর পশ্চাতে লুকাইয়া ফেলিল।

শ্রীরামেন্দু দত্ত।

প্রতীক্ষা

কাতর প্রাণে তোমার পানে চাই
দরশ আশে কাটাই যে গো কাল—
কোন্ লগনে আসবে তোমার তরী
লাগবে ঘাটে নামিয়ে মোহন পাল!
সে দিন কত দূর—
ওগো সে দিন কবে হবে,
সকল চাওয়া স্তব্ধ ক'রে
তোমায় চাব যবে?
বুকের মাঝে ব্যথার তুফান ওঠে,
নয়ন-কোণে শোকের অশ্রুজল,
পূর্ণ ক'রে হিয়ার কমণ্ডলু
রাখবো তোমার ধুতে চরণতল।

আসবে কি গো
আসবে কি সে দিন?
ধন্য হবে ব্যথার পরশ
বাজবে হৃদয়-বীণ!
নানান্ কাযে নানান্ আনাগোনা,
বুকখানা যে ভগ্ন ক'রে দেয়;
যে পথেতেই যাই না তবু
সে পথ কি গো তোমার পানে নেয়?
সত্য কি গো
সত্য এ সব বাণী?
তোমায় চাওয়া ব্যর্থ নহে
তাই তো অবাক মানি।

শ্রীমতী সেবা মজুমদার।

মাটীর স্বর্গ

১৯

দিন দুইচারি পুরীতে থাকিয়া সকলে কটকে চলিয়া যাইবে, ইহাই সঙ্কল্প করিয়া অর্চ্চনা এখানে আসিয়াছিল, কিন্তু এক এক দিন করিয়া পনর যোল দিন অতিবাহিত হইয়া গেলেও পুরী হইতে যাইবার কথা কাহারও মুখ হইতে বাহির হইল না। এখানে আসিয়া সকলেরই যেন পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল। এ স্থান হইতে যে আর কোথাও যাইতে হইবে, সে কথা যেন কাহারও মনেই রহিল না।

কেষ্ট গিরিডিকে অপছন্দ করিয়াছিল, কিন্তু পুরীতে আসিয়া অবধি সে যে বেশ স্ফূর্ত্তিতেই আছে, তাহা তাহার চিরকালের শত্রু বামুন ঠাকুরের সহিত সদ্ভাব দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায়। সে দিন অর্চ্চনা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—এখানে ত বেশ আছিস্ রে কেষ্ট। কেষ্ট বলিয়াছিল,—হাঁা দিদিমণি, গিরিডির মত এখানে ত ঝাড় নেই। কিন্তু ঝাড় ছাড়া আর একটা যে কথা ছিল, সেটা সে গোপন করিয়া গেল। গিরিডিতে আমিষ দ্রব্য বড় দুষ্প্রাপ্য ছিল, পুরীতে সমুদ্রের কল্যাণে উক্ত দ্রব্যটি সুপ্রচুর, এবং তাই অন্য সকলের মত সমুদ্রের উপর প্রীতি তাহারও যথেষ্ট ছিল। সাগরবক্ষে সূর্য্যের উদয়াস্ত কিম্বা সিন্ধুর বিচিত্র তরঙ্গলীলা দেখিবার জন্য না হউক, বাজারে যাইবার সময় সে প্রত্যহ একবার করিয়া এই অসীম মৎস্যভাণ্ডারটিকে দর্শন না করিয়া যাইত না।

বামুন ঠাকুর ত তাহার গৃহেই আসিয়াছে। কারণ, পুরী জেলাতেই তাহার বাড়ী। সুতরাং ধরিতে গেলে সে ত তাহার গৃহের অঙ্গনের মধ্যেই আসিয়া পা দিয়াছে, এবং প্রতি মধ্যাহ্নেই সে বাসা হইতে বাহির হইয়া গিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পরিচিত অপরিচিত সমস্ত আড্ডাতে একবার করিয়া ঘুরিয়া আসিয়া প্রফুল্লচিত্তে রান্নাঘরে প্রবেশ করে।

অর্চ্চনার সহিত সত্যব মার আসিবার উদ্দেশ্যই জগন্নাথ-দর্শন। সুতরাং যত অধিক দিন পুরীতে থাকা হয়, ততই তাহার লাভ। পুত্র সত্যচরণের কাছে অবশ্য পুরীও যা, কটকও তা। কিন্তু সে কলেজের ছাত্র, তাহার নবীন বয়স, বর্ত্তমানকেই সে ভাল বুঝে, ভবিষ্যতের তত ধার ধারে না। সুতরাং বর্ত্তমানের পুরী ছাড়িয়া ভবিষ্যতের কটকের নামও সে কোন দিন করে নাই।

অর্চ্চনারও পুরী নিশ্চয়ই ভাল লাগিয়াছিল, নহিলে যে মুখ্য উদ্দেশ্যে তাহার এ দিকে আসা, সেই নিজের জমীদারীতে যাওয়ার কথা উত্থাপন মাত্র না করিয়া, জগন্নাথের মন্দির, বিমলা দেবী, গুণ্ডিচাবাড়ী, সমুদ্রতীর, গোঁসাইজীর আশ্রম প্রভৃতি লইয়া নিশ্চিন্তমনে সে দিনের পর দিন কাটাইতে লাগিল।

কিন্তু সব চেয়ে পুরীর মাটী যে যায়গাটিতে বেশী করিয়া টান্ দিয়াছিল, তাহা নেপালের অন্তর; কারণ, এখানকার এই মাটীর মধ্যেই যে সে তাহার সর্ব্বস্ব এক দিন হারাইয়া বসিয়াছে। বহুকালের বিস্মৃতপ্রায় এই সংবাদটি যেরূপ বৃহৎ ও সুস্পষ্ট হইয়া আজ তাহার মনে আসিয়া পড়িয়াছে, হয় ত এখানে না আসিলে সে কথা কোন দিনই এমন করিয়া তাহার মনের উপর আসিয়া পড়িত না। কিন্তু এত দিন পরে—কত দিন যে, সে তাহা স্মরণ করিয়া হিসাব করিতেও পারে না—তাহার সেই বালিকা স্ত্রীর মুখখানা সে ভাল করিয়া মনে আনিতেও পারে না। মনে থাকিবার মধ্যে শুধু তাহার নামটিই মনে আছে, আর মনে আছে, তাহার ব্রজরাণী এক দিন এইখানেই আসিয়াছিল এবং মুখ ফুটিয়া কিছু না বলিয়া, না জানি সেই শিশু বয়সেই কিসের অভিমানে এখান হইতে তাহাদের কাছে আর সে ফিরিয়া যায় নাই। অতি বড় দুঃখের এই স্মৃতি তাহাকে শুধু অন্তরে বেদনাই দিতেছিল না, তাহার চির অবরুদ্ধ প্রেমের দুয়ার ভাঙ্গিয়া হৃদয়ের শূন্য রত্ন-সিংহাসনে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমাকে কল্পনায় বসাইয়া ব্যথার সঙ্গে সঙ্গে তৃপ্তির একটা ক্ষীণ অনুভূতি সে পাইয়া আসিতেছিল। ইহাই দুঃখের সুখ। বুক-ফাটা চিন্তার মধ্যে এই যে একরত্তি মধুর সে আশ্বাস পাইয়াছে, তাহাই এ কয়দিন সে সমস্ত মন দিয়া উপভোগ করিবার চেষ্টা করিয়াছে।

সে দিন রাত্রিতে শয্যায় শয়ন করিয়া বহুক্ষণ পর্য্যন্ত সে এই সব কথাই ভাবিতে লাগিল। তাহার নীরস শুষ্ক জীবনে ইহাতে অনেকটা তৃপ্তিবোধ করিতে লাগিল। দুঃখপূর্ণ সত্যকে চাপা দিয়া অনেক সময় সে কল্পনায় একটা অলীক সুখের অবস্থা সৃষ্টি করিত এবং তাহাতে একটু আত্মপ্রসাদ লাভ করিত। আজও শুইয়া শুইয়া সে সেইরূপই ভাবিতে লাগিল। ভাবিল,—যেন তাহার ব্রজরাণী বাঁচিয়া আছে। পরিপূর্ণ রূপ-যৌবন লইয়া তাহার জীবনের সাথীরূপে তাহারই সঙ্গে সঙ্গে সে রহিয়াছে। যেন কোথা হইতে প্রচুর বিষয়-সম্পত্তির সে অধিকারী হইয়াছে এবং তাহারই তদারক করিতে সে যেন

তাহার স্ত্রীকে লইয়া, তাহার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া অর্চ্চনাদের সঙ্গে এখানে আসিয়াছে। স্ত্রী তাহার যেমন অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময়ী, তেমনই অশেষ গুণবতী; সুতরাং তাহার মত সুখী কে? অতুলনীয়া স্ত্রী, অগাধ সম্পত্তি, সুস্থ সুন্দর দেহ, পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য—

কিন্তু কিছু পরেই স্ব-রচিত তাহার এই স্বপ্ন যখন একস্থানে আসিয়া আর পথ না পাইয়া শেষ হইল, তখন ইহার সমস্ত মধুটুকু নিমেষে অন্তর্হিত হইল। প্রতিক্রিয়ার তীব্র একটা আঘাত আসিয়া কেবলই তাহাকে পীড়া দিতে লাগিল।

সে রাত্রিতে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত নেপাল এই সব চিন্তা করিতে করিতে একসময় ঘুমাইয়া পড়িলেও বাকী রাত ধরিয়া এই বিষয়েই সে স্বপ্ন দেখিতে লাগিল এবং অতি প্রত্যূষে কি একটুখানি শব্দে একবার চোখ মেলিয়া চাহিতেই দেখিতে পাইল, তাহার মুক্ত জানালার গরাদে ধরিয়া বাহিরে অর্চ্চনা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। পরস্পর দেখা-দেখি হওয়া মাত্রই চকিতে অর্চ্চনা সরিয়া গেল। তখনও ভাল করিয়া ফর্শা হয় নাই, বাহিরে ও ঘরের মধ্যে অল্প অল্প অন্ধকার তখনও রহিয়াছে। নেপাল শুইয়া ভাবিতে লাগিল যে, ইহাও সে স্বপ্ন দেখিল কি না। কিন্তু পরক্ষণেই অর্চ্চনা আবার আসিয়া জানালার ধারে দাঁড়াইল, কহিল,—"গরমেতে সমস্ত রাত আর চোখে পাতায় করতে পারি নি, আর আপনারা দেখছি বেশ সব ঘুমুচ্ছেন। শুয়ে শুয়ে দিদির গা ঠেলে গুণে চারবার ডাকলুম, সাড়া পেলুম না। ছাদে সত্যর নাক-ডাকারই বা দম কি!"

নেপাল চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে বিছানার উপর উঠিয়া বসিল।

একটু বেলা হইলে কেষ্ট নেপালের ঘরে ঢুকিয়া মেঝেয় পাতা পাটীর উপরে জলখাবারশুদ্ধ রেকাবী রাখিতে রাখিতে কহিল,—"দিদিমণি চা তৈরী ক'রে নিয়ে আসছেন, ততক্ষণ জলখাবার খান।"

খানিক পরেই এক কাপ চা হাতে লইয়া অর্চ্চনা এ ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, তখনও পর্য্যন্ত জলখাবারের রেকাবীতে নেপাল হাত দেয় নাই, তৎপরিবর্ত্তে একখানা বাঙ্গালা বই হাতে লইয়া চুপ করিয়া কি যেন ভাবিতেছে। চায়ের কাপটি রেকাবীর পার্শ্বে রাখিয়া অর্চ্চনা মেজের উপর বসিয়া পড়িয়া কহিল—"আজ যেন আপনি কোন একটা বিষয় খুব ভাবছেন, নেপাল বাবু। কি বই ওটা? কৈ, বইও ত পড়ছেন না!"

বইখানা পাটীর উপর রাখিয়া দিয়া জলখাবারের রেকাবীখানি হাতে তুলিয়া লইয়া নেপাল কহিল—"না, ভাল লাগছে না। কাল রাত থেকেই শরীরটা ভাল নেই। সমস্ত রাত ঘুমও ভাল হয় নি।"

"জ্বর-টর কিছু হয় নি ত?" বলিয়া অর্চ্চনা পাটীর উপর হইতে বইখানি তুলিয়া লইয়া দেখিতে লাগিল।

নেপাল কহিল,—"স্পষ্ট জ্বর না হোলেও, একটু জ্বরভাবের মতই হয়েছে, মাথাটাও ধরেছে।"

"তা হ'লে বাজারের কাছে ঐ যে ডাক্তারটি আছেন, ওঁকে সত্য গিয়ে একবার ডেকে আনুক। এই বিদেশ বিভুঁয়ে আপনার যদি অসুখ হয়ে পড়ে, তা হ'লে আর আমার ভাবনার অন্ত থাকবে না। কেন না, ভাগ্যটা আমার বড় মন্দ।"

"তেমন কিছু ভাববার মত শরীর খারাপ আমার হয় নি। সমস্ত রাত ঘুম হয় নি, মাথা ধরেছে, শরীরটা তাই একটুখানি মেজমেজ করছে।" একটু নীরব থাকিয়া পুনরায় কহিল—"কিন্তু মাঝে মাঝে এই কথাটা আমি ভাবি যে, খুবই আমি ভাগ্যবান্, তাই আপনাদের মত লোকের আশ্রয় আমি পেয়েছি। জীবনে এত যত্ন, এত আত্মীয়তা আমি আর কোথাও পাই নি, অথচ আমি আপনাদের চাকর ছাড়া আর কিছুই নই।"

"দেখুন, এই সব নেহাৎ বাজে কথা যদি আপনি ফের বলবেন—"

"না, সত্যই বলছি, তাই আমার মনে হয় যে, আপনারা সব পূর্ব্বজন্মে নিশ্চয়ই আমার পরমাত্মীয় ছিলেন।"

"পূর্ব্ব-জন্মেরই শুধু, এ জন্মের বুঝি আমরা কিছুই নই?" বলিয়া পাতা খোলা বইখানি মুখের উপর চাপিয়া ধরিয়া আড়াল করিয়া অর্চ্চনা মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল এবং পরক্ষণেই বইখানি মুখের উপর হইতে নামাইয়া লইয়া চকিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"যাঃ, বইখানা আপনার মাটী ক'রে ফেললুম!" নেপাল চাহিয়া দেখিল, অর্চ্চনার সীঁথির সিন্দুরের দাগ বইয়ের পাতার উপর তিন চারি স্থানে লাগিয়া গিয়াছে। অর্চ্চনা অপ্রতিভ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কি হবে নেপাল বাবু? মুছতে গেলে চারদিকে আরও লেগে যাবে।"

"তাই ত, ভয়ানক ক্ষতি ক'রে ফেললেন, কি করেই যে এ ক্ষতির পূরণ হবে" বলিয়া নেপাল মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

"হাসবেন না, নেপাল বাবু। নতুন বইখানা কি ক'রে দিলুম দেখুন দেখি! বাস্তবিক, আমার এ সিন্দুরের দুর্ভোগ যে কেন, তা জানি না। কত দিন মনে ভেবেছি, এ সব মিথ্যে ঝঞ্ঝাট আর রাখবো না, কিন্তু পাঁচ জনের জন্যে কিছুতেই তা হবার জো নেই।"

নিমেষমধ্যেই অর্চ্চনার সমস্ত মুখের উপর বিমর্ষতার একটা কালো ছায়া আসিয়া পড়িল। তাহার কথা ও ভাবে নেপালকে ভিতরে ভিতরে একটা পীড়া দিতে লাগিল এবং ইহাকে ঠেলিয়া ফেলিবার উদ্দেশে মুহূর্ত্ত পরেই নেপাল তাহার প্রতি চাহিয়া মৃদু হাস্যের সহিত কহিল,—"কিন্তু বইখানার দেড় টাকা দাম এখনি আমাকে দিতে হবে, আর একটু পরে যদি দেন, তা হ'লে দেড় টাকায় আর হবে না, ডবল দিতে হবে।"

ইহার পর কি কথা বলা যাইতে পারে, কেহই কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া কিছুক্ষণের জন্য উভয়েই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল এবং তাহার পরে ধীরে ধীরে অর্চ্চনা উঠিয়া বাহির হইয়া গেল।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে অর্চ্চনা আবার যখন এ ঘরে আসিল, তখন তাহার চোখে প্রফুল্লতা, মুখে হাসি। আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা নেপাল বাবু, যার জীবনে কোন উদ্দেশ্য নেই, কোন কায নেই, কোন বন্ধন নেই, কোন স্বপ নেই, সুখের আশা পর্য্যন্ত নেই, সে কি ক'রে জীবন কাটায় বলুন ত? আচ্ছা, ও বলতে হবে না,—আপনার জীবনের কি লক্ষ্য, তাই বলুন।"

নেপাল কহিল,—"পুরুষের জীবনে, স্ত্রীলোকের জীবনে অনেক তফাৎ। সুতরাং——"

"আচ্ছা, যদি আপনার আমার মত টাকা-কড়ি বিষয়-সম্পত্তি থাকতো, তা হ'লে আপনি কি করতেন?—নাঃ—এ কথা জিজ্ঞাসা করা আমার ঠিক হোল না। এর উত্তর ত আমিই বলতে পারি। আপনি বাড়ী করতেন, গাড়ী করতেন, বাগান বানাতেন। চাকর-চাকরাণী, লোক-জন, সোনা-দানা, আপনার স্ত্রী, আপনার ছেলে-মেয়ে, আপনার পরিপূর্ণ সংসারের মাঝখানে আপনি হয় ত স্বর্গের স্বপ——"

"কিন্তু হয় ত আমি ও-সব কিছুই করতুম না। হয় ত সমস্ত অর্থ আমি আমার দেশ-মায়ের পায়ে ঢেলে দিতুম। হয় ত কেন— তাই ঠিক দিতুম। আমি আমার শ্যামসুন্দরপুরের আগেকার সেই-রূপ ফিরে আনবার চেষ্টা করতুম। গ্রামের বন-জঙ্গল কাটাতুম, পচা পুকুর-ডোবা সব বুজিয়ে তার যায়গায় নতুন নতুন সব পুকুর কাটাতুম, বাইরে থেকে লোক এনে বসাতুম, রাস্তা-ঘাট করতুম; হাঁসপাতাল, স্কুল, টোল—এই সব বসাতুম। নিরন্নদের অন্নের ব্যবস্থা করতুম, আর বিপন্নদের ব্যথায় বুক পেতে দিতুম।"

শ্যামসুন্দরপুরের কথাপ্রসঙ্গে নেপালের উচ্ছ্বাসে অর্চ্চনা বেশ আমোদ পাইত, কহিল,—"ভবিষ্যতে কখনও সেখানে অন্ততঃ স্কুল করবার পক্ষে আপনাকে আমি সাহায্য করবো; এ সম্বন্ধে এখন থেকেই আমি আপনার কাছে বাক্য-দত্ত হোয়ে থাকলুম।" সঙ্গে সঙ্গেই কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিল,—"কিন্তু মেয়ে স্কুল একটা করবেন ত? তা হ'লে কিন্তু আমাকে মাষ্টার রাখতে হবে।"

নেপাল কহিল,—"স্কুল করার আকাশ-কুসুম, মনে করুন, যদি কখনও পৃথিবীর মাটীতেই সত্যি হয়ে ফুটে ওঠে, তা হ'লে আমি এ রকম স্কুল করব না; আমার স্কুলে সত্যিকারের মানুষ হবার মত শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। হাজার হাজার শিক্ষিত লোক দেখিছি, যাদের ডিগ্রীর বহরের সঙ্গে সঙ্গে, নীচতা, স্বার্থপরতা, দম্ভ-অভিমান, অন্যায় অত্যাচার, হিংসা-দ্বেষ, দুষ্টামি প্রভৃতিও ঠিক সমান বহরে থাকে। যে শিক্ষায় এই সব পশু-ভাব মন থেকে যায় না, বা নতুন ক'রে সৃষ্টি করে, তেমন শিক্ষার ধার আমি ধারি না। আমি ত দেখছি, আজকালকার স্কুল-কলেজের শিক্ষা যারা কিছুই পাইনি, বরঞ্চ তারাই অনেকটা মানুষ আছে।"

"আর যারা লেখাপড়া শিখেছে, তারাই সব অমানুষ হয়ে গেছে? তা নয়, নেপাল বাবু। যারা অমানুষ, তারা লেখাপড়া শিখলেও অমানুষ। এক শ্রেণীর লোক আছে বটে, যারা দেখতে শুনতে বেশ ভদ্রলোক, ভদ্রবংশেও জন্মেছে, অশিক্ষিতও নয়, অথচ দুষ্টের এক-শেষ, কুটীলতায় ভরা। এই সব প্রকৃতির লোকের একরত্তি একটু দৃষ্টান্তের কথা বলি। রেলে যেতে আসতে নিশ্চয় দেখেছেন যে, যথেষ্ট জায়গা রয়েছে, তবু ভেতরের বাবু ভদ্রলোক বাইরে থেকে আর কারুকে উঠতে দেবে না। হয় ত সে বেচারার যাবার সকলের চাইতে বেশী দরকার, হয় ত সে সারাপথ দাঁড়িয়ে যেতে পেলেও বেঁচে যায়, তবু দরজা চেপে ধ'রে তাকে কিছুতেই ঢুকতে দেবে না। এ সব কি কম অত্যাচার! শিক্ষিত লোক হয়ে এ সব কি ক'রে পারে, আমি ত ভাবতেও পারি না।"

"শিক্ষিত ভদ্রলোকদের ভেতর ও-রকম দৃষ্টান্ত ত হাজার হাজার। যাদের অতি-বড় ভদ্র পেশা, এই যেমন স্কুলমাষ্টার, সাহিত্যিক, কবি, এদের মধ্যেও অনেকের আজকাল এই সব নীচতা অল্প অল্প দেখা যাচ্ছে। যারা শিক্ষা দিয়ে মানুষ তৈরী করবে, জ্ঞান ছড়িয়ে দেশকে উন্নত করবে, তাদেরই মধ্যে অধিকাংশের মনে এত সঙ্কীর্ণতা যে, তা আর বলবার নয়। কিন্তু এ দোষ ত পূর্ব্বে ছিল না। নিশ্চয়ই আজকালকার স্কুল-কলেজের শিক্ষার ভেতর এমন কোন ত্রুটি লুকিয়ে রয়েছে, যাতে শিক্ষা পেয়েও অনেক স্থানে মানুষ না হয়ে অমানুষই হয়ে যায়।"

"না নেপাল বাবু, তা নয়, আপনি হয় ত ঠিক বুঝতে পারেন নি। এদের মধ্যে অল্প দু-এক জন হয় ত এ সব দোষে দোষী হ'তে পারেন, কিন্তু আপনি যে বলছেন, অধিকাংশ, তা নয়। আমি সামান্য মেয়েমানুষ, অবিশ্যি বেশী কিছু আমি জানি না, তবে এর মূলে অন্য একটা কারণ আছে। সেটা হচ্ছে—অর্থ। সেটা এ দেশে কোন কালেই বড় হয় নি। এখন হয়েছে। আর এ দেশের সব চেয়ে বড় যা ছিল, জ্ঞান আর মন, তা ক্রমেই নেবে আসতে সুরু করেছে। এইতেই আজ মানুষের এই দেশে কিছু কিছু অমানুষের——"

হঠাৎ এই মানুষ-অমানুষের প্রসঙ্গ চাপা দিয়া এক অতিকায় মানুষের আকৃতি দরজার বাহিরে দৃষ্ট হইল এবং অর্চ্চনা দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল,—"এ কি, নায়েব মশাই!"

নায়েব মহাশয়ের নাম পরমানন্দ সেনাপতি। এ বাড়ীর বাহিরের দিক্‌কার এই কক্ষের বৃহৎ দরজাটি বোধ হয় এই নায়েব মশায়ের দেহের মাপেই প্রস্তুত হইয়াছিল; কারণ, তাঁহার দৈহিক দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের সঙ্গে দরজার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ একবারে সমান। পুরী হইতে কর্ত্রীঠাকুরাণীর কটক যাইতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া সেনাপতি মহাশয় এই প্রচণ্ড গ্রীষ্মে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া তাঁহার সংবাদ লইতে আসিয়াছেন।

আহারাদির পর নেপাল, অর্চ্চনা ও সেনাপতি মহাশয়ের মধ্যে কটক অভিযান সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। স্থির হইল যে, শীঘ্রই কটক যাত্রা করিতে হইবে এবং তৎপূর্ব্বে কলিকাতা হইতে জমিদারীসংক্রান্ত একটা আবশ্যক দলীল আনাইয়া লইতে হইবে। জমিদারীর এক দিক্‌কার একটা সীমানা লইয়া কয় বৎসর হইতে একটা গোলমাল চলিয়া আসিতেছে, সম্ভবতঃ অর্চ্চনার উপস্থিতিতে বিরুদ্ধ পক্ষের সহিত এ সম্বন্ধে একটা মিটমাট হইয়া যাইতে পারে। দলীলখানি কলিকাতায় অর্চ্চনার উকীলের কাছে আছে। নায়েব মহাশয় পূর্ব্বাহ্ণে লিখিয়া জানাইলেও, আসিবার সময় অর্চ্চনা উহা আনিতে ভুলিয়া গিয়াছিল।

নেপালের দিকে চাহিয়া অর্চ্চনা কহিল,—"আপনি তা হ'লে আজই কলকাতা গিয়ে দলীলখানা নিয়ে আসুন।"

উত্তরে নেপাল অর্চ্চনাকে বুঝাইল যে, ইহার জন্য কলিকাতা যাইবার কোন আবশ্যক হইবে না, উকীলকে আজই একখানা পত্র দেওয়া হউক। অর্চ্চনা কিন্তু ইহাতে রাজী হইল না। কর্ত্রীঠাকুরাণীর ইচ্ছাকেই সমর্থন করিয়া সেনাপতি মহাশয়ও পত্র দেওয়া সম্বন্ধে ঘাড় নাড়িতে লাগিলেন। কিন্তু নেপাল এই জন্য নিরর্থক কলিকাতা যাওয়া সম্পূর্ণ অনাবশ্যক বলিয়া মনে করিল এবং অর্চ্চনাকে বিধিমতে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল যে, একখানা চিঠির দ্বারা যে কায হইতে পারিবে, শুধু তার জন্য কলিকাতা পর্য্যন্ত যাইবার কি প্রয়োজন? উকীল চিঠি পাইয়া দলীলখানি রেজেষ্ট্রী ডাকে পাঠাইয়া দিলে, সহজেই ত কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারিবে। কিন্তু অর্চ্চনা নেপালের যুক্তিতে বরাবরই ঘাড় নাড়িতে লাগিল এবং তাহাকে কলিকাতা যাইবার জন্যই বার বার অনুরোধ করিয়া বলিল,—"উকীলের সঙ্গে আমাদের কথা আছে যে, দরকারী দলীলপত্র আমাদের নিজেদের লোকের হাতে ছাড়া ডাকে যেন কখন কোথায় পাঠানো না হয়।"

যাহা হউক, নেপালের শরীর আজ এতই খারাপ লাগিতেছিল যে, ঘর হইতে এক পাও বাহির হইতে আজ তাহার ইচ্ছা হইতেছিল না। কিন্তু অর্চ্চনার জিদ দেখিয়া ইহা লইয়া আর বেশীদূর অগ্রসর হইতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না এবং বাকী সময় নীরবেই বসিয়া থাকিয়া মনে মনে ভাবিল যে, ইহাই চাকুরী। অর্চ্চনা যতই কেন না তাহাকে স্নেহ যত্ন ভালবাসা দেখাক, সে চাকর—অর্চ্চনা তাহার প্রভু। আজিকার এই ব্যাপারের মত প্রত্যহ প্রতিক্ষণ সে যে জিদের সহিত প্রভুত্ব দেখায় না, এইটুকুই যথেষ্ট। সুতরাং তাহার দেহ ও মন আজিকার এই অসুস্থতা লইয়া ঘরের বাহির হইতে নারাজ হইলেও, সে রাত্রির গাড়ীতে কলিকাতা যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

সন্ধ্যার পরই অর্চ্চনা নেপালের খাইবার আয়োজন করিয়া নিজেই তাহাকে ডাকিতে আসিয়া দেখিল, নেপাল যাত্রা করিবার জন্য কাপড়-চোপড় পরিতেছে। খাইবার কথায় কহিল,—"এই জ্বরের ওপর আর কিছু খাব না।"

চমকিত হইয়া অর্চ্চনা কহিল,—"জ্বর! আপনার কি স্পষ্ট জ্বর হয়েছে না কি? কই, ভাত খাবার সময় ত—"

চাদরখানা কাঁধে ফেলিয়া নেপাল কহিল, "তা হোক, ষ্টেশন পর্য্যন্ত কোন রকমে গিয়ে গাড়ীতে উঠতে পারলেই হ'ল।"

ব্যস্ত হইয়া অর্চ্চনা কহিল,—"না—না, কিছুতেই: তা হ'লে আপনার যাওয়া হ'তে পারবে না, আপনি কাপড়-চোপড় ছাড়ুন, আমি সত্যকে দিয়ে ডাক্তার——"

মেজের উপর হইতে সুটকেশটি তুলিয়া লইয়া নেপাল ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়া শুধু কহিল,—"তা হোক, তাতে আর কি," বলিয়া আর দ্বিতীয় কোন কথার অপেক্ষা মাত্র না করিয়া ত্রস্তপদে বাসা হইতে বাহির হইয়া সড়কের উপর পড়িল। অর্চ্চনা মিনিট দুই চারি চৌকাঠ ধরিয়া সেইখানে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবার পর সুদীর্ঘ একটি নিশ্বাস ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে নিজের ঘরে আসিয়া বসিয়া পড়িল।

অপরাহ্ণ হইতে সত্যই নেপালের জ্বর বেশ ফুটিয়াই প্রকাশ পাইয়াছিল। গাড়ীতে সমস্ত রাত্রির কষ্টের মধ্যে সেই জ্বর তাহার খুবই বৃদ্ধি পাইল, সঙ্গে সঙ্গে মাথার যন্ত্রণাও এত বাড়িয়া উঠিল যে, সারা রাত আর মাথা তুলিতেই পারিল না। ইহার উপর বার দুই তিন বমিও হইল। সুতরাং প্রভাতে ষ্টেশনে গাড়ী পৌঁছিলে, গাড়ী হইতে নামিবার পর্য্যন্ত তাহার শক্তি রহিল না। অতি কষ্টে কোন রকমে সে প্ল্যাটফরমে নামিয়া সম্মুখের একখানি বেঞ্চের উপর বসিয়া পড়িল।

খানিকক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর পশ্চাৎ হইতে কাহার হস্তস্পর্শে চমকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিতেই নেপাল সোজা হইয়া বসিয়া কহিল,—"এ কি, আপনি! এ যে দেখছি, চেনবার উপায় নেই।"

"তবুও ত চিনতে পেরেছেন। যাক,—আছেন কেমন বলুন?"

নেপাল তাহাকে পার্শ্বে বসাইয়া কহিল,—"ভাল না, খুব জ্বর। পুরী থেকে আসছি, বালীগঞ্জ যেতে হবে, কিন্তু পারছি না।"

অনেক দিন পরে এইরূপ সময়ে অতুলানন্দ বাবুর দেখা পাইয়া নেপাল খুবই আনন্দিত হইল। বহুক্ষণ ধরিয়া উভয়ের মধ্যে বহু প্রকারের কথাবার্ত্তা হইল। তাহার ফলে নেপাল জানিতে পারিল যে, অতুলানন্দ বাবুর মেস হইতে তাহার চলিয়া আসিবার পরই হঠাৎ তাঁহার মনের গতি অন্য দিকে প্রবাহিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বাসা, বাবুয়ানা, বিলাসিতা, শিক্ষকতা—সব পরিত্যাগ করিয়া এইরূপ নগ্নপদে, একখানি উত্তরীয় মাত্র গায় দিয়া ভারতের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। নিজের এই পরিবর্ত্তনের প্রসঙ্গে অতুল বাবু কহিলেন,—"টাকা-পয়সাও যথেষ্ট উপায় করলুম, বাবুগিরি বিলাসিতারও বাকী রাখলুম না। তার পর ভাবলুম, আর কেন, পরমানন্দের রাজত্বে আনন্দের একটু খোঁজ ক'রে দেখা যা'ক না।"

অতুল বাবুর অন্তর মধ্যে ত্যাগের যে এইরূপ একটা ভাবধারা প্রবাহিত ছিল, তাহা নেপাল তাঁহার সহিত অল্প কয়েকদিন বাস করিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিল। নেপাল জিজ্ঞাসা করিল,—"এখন তা হ'লে কোথায় যাবেন?"

"আপনারই সঙ্গে। কারণ, এ অবস্থায় আপনাকে ছেড়ে দিয়ে কোথাও ত আর যেতে পারি না, নেপাল বাবু।"

তখনই একখানি ট্যাক্সি ডাকিয়া অতুল বাবু নেপালকে লইয়া বালীগঞ্জের বাটীতে আসিলেন।

নেপালের জ্বর সারাদিনের মধ্যেও মগ্ন হইল না, সমান ভাবেই রহিল। শরীরের গ্লানি আরও বৃদ্ধি পাইল। অতুল বাবু একজন ডাক্তারকে আনিলেন। তিনি আসিয়া সব দেখিয়া শুনিয়া একটুখানি মুখ বাঁকাইয়া কহিলেন যে, জ্বর সোজা নহে।

পরের দিন সকাল বেলা নেপাল অতিমাত্রায় অস্থির হইয়া পড়িল, অতুল বাবুকে কহিল,—"রোগটা আমার শুধু একটু জ্বরই নয়, সুতরাং এখানে এমন ক'রে আমি প'ড়ে থাকবো না, অতুল বাবু। আপনি আমায় বাড়ী নিয়ে চলুন, আজই আমি শ্যামসুন্দরপুর যাব।"

অতুল বাবু অনেক ভরসা দিলেন, দেশে চিকিৎসা সম্বন্ধে নানাপ্রকার অসুবিধার কথা উত্থাপন করিয়া অনেক বুঝাইলেন; কিন্তু নেপাল কোন কথাই শুনিল না। তাহার মনে এই কথাটাই বার বার আসিয়া ব্যথা দিতে লাগিল যে, পরাধীন হইয়া প্রভুর আদেশ যদি তাহাকে পালন করিতে না হইত, তাহা হইলে আজ তাহাকে হয় ত এরূপভাবে পীড়িত হইয়া পড়িতে হইত না। এক জন এ বাটীর কর্ত্রী, আর সে তাহার ভৃত্য। এই সম্বন্ধ লইয়া এই অবস্থায় এ বাটীতে থাকিতে তাহার পীড়িত মন উত্তরোত্তর বিদ্রোহী হইয়াই উঠিতে লাগিল। এই কথাটার আলোচনা করিয়া যখন তিক্ততায় তাহার অন্তর ভরিয়া উঠিল, তখন এমনও তাহার মনে হইল যে, প্রভুর হুকুম তামিল না করিয়া যদি তৎপূর্ব্বে তাহারই বাটীতে তাহার মৃত্যুও ঘটে, তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে একটা বিরক্তি ও অনুযোগও ভবিষ্যতে এ ক্ষেত্রে একবারে অসম্ভব নহে। রোগশয্যায় এই সমস্ত ভাবিতে ভাবিতে শ্যামসুন্দরপুর যাইবার জন্য নেপাল একবারে যেন ক্ষেপিয়া উঠিল। অতুল বাবুও দেখিলেন যে, নেপালের অসুখ এই দুই দিনের মধ্যেই যে পথে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাতে সমস্ত দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে লইয়া এখানে পড়িয়া থাকা আর যুক্তিযুক্ত নহে। তিনি পূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন যে, দেশে নেপালের মা আছেন। স্ত্রী নাই, তাহা তিনি জানিতেন, কিন্তু অন্যান্য আরও আত্মীয়-স্বজন হয় ত থাকিতে পারে। এ অবস্থায় তাহাদেরই কাছে তাহাকে লইয়া গিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। সুতরাং পরদিন সকালের গাড়ীতেই নেপালকে লইয়া অতুল বাবু শ্যামসুন্দরপুর যাত্রা করিলেন।

২৩

নেপালের কলিকাতা যাওয়ার পর হইতে অর্চ্চনার মনে অত্যন্ত একটা অস্বস্তি আসিয়া জমা হইয়াছিল। তাহার পর একটি একটি করিয়া যখন পাঁচ ছয় দিন কাটিয়া গেল, অথচ নেপাল ফিরিয়া আসিল না, কিম্বা তাহার নিকট হইতে কোন পত্রও আসিল না, তখন এই অস্বস্তির উপর বিষম একটা দুর্ভাবনা আসিয়া চাপিয়া বসিল। সে বুঝিয়াছিল যে, নেপাল জোর

...শে রাগ করিয়াই অসুস্থ দেহ লইয়া কলিকাতায় গিয়াছে। একটা অতি-সামান্য এবং সোজা ব্যাপারের মধ্যে যে এমন একটা ...শী অবস্থা আসিয়া পড়িবে, তাহা সে কখনও ভাবে নাই। এক্ষণে ভয়ে, উদ্বেগে ও দুশ্চিন্তায় সে অবসন্ন হইয়া পড়িল। এমন হইবে জানিলে সে দলীল আনাইবার চেষ্টাই করিত না। যে ভাবে সীমানার গোলমাল এ কয় বৎসর চলিয়া আসিতেছে, সেই ভাবেই না হয় আরও কিছুকাল চলিত, তাহাতে এমন কোন বিশেষ ক্ষতি ইতিপূর্ব্বে হয়ও নাই, পরেও হয় ত হইত না।

কয়দিন হইতেই তাহার সব কাম প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। জগন্নাথদেবের মন্দির-দর্শন বা সমুদ্রতীরে বেড়ান বা গোঁসাই-জীর আশ্রমে যাওয়া, কিছুই আর তাহার ভাল লাগিত না। প্রত্যহ অভ্যাসমত পূজায় বসিত বটে, কিন্তু অস্থির মন যেন মোড় ফিরিয়া দাঁড়াইত। দেবতার রূপ ধ্যান করিতে যাইলে নেপালের বিদায়ক্ষণের অভিমানভরা মুখখানাই তাহার মুদ্রিত চোখের সম্মুখে বড় হইয়া ফুটিয়া উঠিত।

একবার অর্চ্চনা মনে করিল যে, সত্যকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দেয়। কিন্তু ইহার বিপক্ষে আর একটা কথা আসিয়া তাহাকে নিরস্ত করিয়া রাখিল। অথচ সে এইভাবে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেও পারিতেছিল না, চারিদিক্ হইতে তাহাকে যেন কিসে অনবরত টানাটানি করিতে লাগিল।

অর্চ্চনার এই কয়দিনের ভাবগতিক সত্যর মা বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিল এবং মুখে কিছু বলিতে না পারিলেও নিজের মনে সে অনেক প্রশ্নোত্তরই করিল। সত্যর মা সেই ধরণের মানুষ, যে, কাহার কাছে কোন্ বিষয়ের আলোচনা করিতে হয় এবং কাহার কাছেই বা করিতে নাই, সে সব কিছুই জানে না। তাই সে দিন সকালে সত্য যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"মাসীমার কি হয়েছে বল ত," তখন তাহাকে আড়ালে লইয়া গিয়া কহিল,—"বড় লোকের বড় কাণ্ড! অরুকে খুব ভাল মেয়ে বলেই জানতুম, কিন্তু—'যার সঙ্গে ঘর করি নি সে বড় ঘরণী, আর যার হাতে খাই নি সে বড় রাঁধুনী'!"

সত্য বলিল,—"নেপাল বাবু কি মাসীমাদের কেউ হয় না?"

"ছাই হয়। এই বছরখানেক হ'ল ত ছোঁড়াটা এদের বাড়ীতে এসে জুটেছে। জানিস নি ক', সেই মটর গাড়ীর ধাক্কা খেয়ে রাস্তায় প'ড়ে যায়, তার পর অরুর বাপ তাকে বাড়ীতে এনে দেখাশুনো করে, সেই থেকেই ত ও এখানে আছে। তাই বলি,—লেখাপড়া-জানা মেয়ে, এত বিষয়-সম্পত্তির মালিক, কাঁচা বয়েস, তার ওপর এত রূপ,——যাক্ বাবা, এ সব কোন কথায় আমাদের থাকবার দরকার নেই।"

"কে থাকে মা? তুমিই ত দেখছি সব চেয়ে বেশী রয়েছ" বলিয়া সত্যচরণ বাহিরের দিকে চলিয়া গেল।

অর্চ্চনা তাহার নিজের ঘরে বসিয়া কি করিতেছিল। সম্মুখে দিয়া সত্যকে যাইতে দেখিয়া তাহাকে ডাকিয়া কহিল,—"নেপালবাবুর সম্বন্ধে কি করা যায় বল্ দেখি? দেখতে দেখতে ক'দিন ত হোয়ে গেল, ফিরেও আসছেন না, কোন চিঠিও দিচ্ছেন না। জ্বর নিয়ে গেলেন, কি করি বল্ ত, বাবা?"

সত্যচরণ কহিল,—"একখানা টেলিগ্রাম ক'রে দেওয়া উচিত, মাসীমা।"

"তাই না হয় দে, বাবা। তোর নাম দিয়েই দে। একেবারে যাতে জবাব পর্য্যন্ত আসে, তার ব্যবস্থা করিস" বলিয়া তোরঙ্গ খুলিয়া একখানি দশটাকার নোট সত্যর হাতে দিল।

সত্য চলিয়া গেলে অর্চ্চনা একাই অত বেলায় বাসা হইতে বাহির হইয়া বরাবর গোঁসাইজীর আশ্রমে আসিয়া উঠিল। গোঁসাইজী কহিলেন, "ক'দিন আস নি কেন, মা?"

অর্চ্চনা দাওয়ার উপর বসিয়া পড়িয়া কহিল,—"শরীরটা ভাল ছিল না বাবা। তারপর নেপালবাবু এখানে নেই, কলকাতা গিয়েছেন, তাই আর——"

"নেপাল কলকাতা গিয়ে চিঠিপত্র দিয়েছে ত,—ভাল আছে?"

"জ্বর শুদ্ধ জোর ক'রে গিয়েছেন। একখানা দরকারী দলীল সেখান থেকে নিয়ে সঙ্গে-সঙ্গেই ফিরে আসবার কথা, কিন্তু আজ ছ'সাত দিন হ'ল, ফিরেও আসছেন না, কোন চিঠিপত্রও নেই।"

তা হ'লে ত ভাবনারই কথা বটে! একখানা চিঠি—না হয় ত সত্যকে একবার পাঠিয়ে দিলে হ'ত না? যা হয় কিছু একটা করা উচিত। ক'দিন তোরা আসিস্ নি ব'লে, পরশু আমি ঐ পাণ্ডার ছেলেটিকে তোদের বাসায় পাঠিয়েছিলুম, সে ফিরে এসে বল্লে—ডেকে ডেকে কারুর সাড়া পাওয়া গেল না। আজ নিজেই একবার যাব মনে কচ্ছিলুম।"

অর্চ্চনা অধোবদনে বসিয়া রহিল।

গোঁসাইজী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"এই ক'দিনেই মনের ওপর তুই যে আমার কি টান্ দিয়েছিস্, তা আর বলবার নয়। পনর বছর ধ'রে যা ভুলে রয়েছিলুম, তুই আবার তাই এতদিনের পর আমায় মনে করিয়ে দিচ্ছিস, মা।" অতি ধীরে গোঁসাইজী একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। তাহার পর কহিলেন,—"ক'দিনের মধ্যে তোরও চেহারাটা বড্ড যেন খারাপ হোয়ে গিয়েছে, মা।"

"হ্যাঁ বাবা, মনটা বড্ড খারাপ হোয়ে রয়েছে। আপনায়

কাছে ভক্তমালের গল্প শুনব বলে এলুম। ভক্তমাল শুনতে আমার বড্ড ভাল লাগে।"

অতঃপর আরও দুইচারিটি কথার পর গোঁসাইজী ভক্তমালের গল্প বলিতে লাগিলেন। অর্চ্চনা নীরবে বসিয়া রহিল। কিন্তু ঠিক যেখানে গল্পের শেষ হইল, সেইখানেই অর্চ্চনা অন্যমনস্কতার সহিত প্রশ্ন করিল,—"তারপর কি হ'ল, বাবা?"

গোঁসাইজী কহিলেন,—"গল্প ত শেষ হ'ল মা, আর ত তারপর নেই। তুই এক কায কর্, ঐ ভক্তমালখানা আমার বইয়ের তোরঙ্গ থেকে নিয়ে যা, রোজ দুপুরবেলা একটু পড়িস্। ঐ লাল তোরঙ্গটায় আছে, ঘরের ভেতরে গিয়ে নিয়ে আয়, মা।"

তাঁহার সব কথা না শুনিয়াই অর্চ্চনা ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল এবং সম্মুখেই একটি ক্ষুদ্র টিনের তোরঙ্গ দেখিতে পাইয়া তাহারই ডালা খুলিল, দেখিল, তাহার মধ্যে দু'একখানি কাপড়, হরিনামের ঝুলি, একখানি সাত হাতি চুরে সাড়ী, ছোট একখানি আরসি, চুল বাঁধিবার ফিতা, মাথার কাঁটা, নাম খোদাইকরা সোনার একটি সিল আংটা এবং আরও ঐ ধরণের কি সব রহিয়াছে। ভক্তমাল বা অন্য কোন পুস্তকই তন্মধ্যে নাই; থাকিবার মধ্যে কেবল একখানি বর্ণপরিচয় দ্বিতীয়ভাগ রহিয়াছে। দ্বিতীয়ভাগখানি খুলিয়া অর্চ্চনা দেখিতে লাগিল। হঠাৎ বইখানিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া সে দেওয়ালের উপর মাথা রাখিয়া ঢলিয়া পড়িল। বাহির হইতে গোঁসাইজী হাঁকিলেন,—"বই কি পেলি না, মা? সামনের ছোট তোরঙ্গটা নয়—ওদিকে ঐ যে লাল রংয়ের বড় তোড়ঙ্গটা রয়েছে—ঐটে।" কোন কথাই অর্চ্চনার কাণে প্রবেশ করিল না। সে একইভাবে দেওয়ালে মাথা রাখিয়া দুই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নীরবে তেমনই ভাবে বসিয়া রহিল, যেন দ্বিতীয়ভাগখানির মধ্য হইতে কোন তীব্র বিষবাষ্প বাহির হইয়া তাহাকে হতচৈতন্যপ্রায় করিয়া ফেলিল। তাহার সমস্ত শরীর অসাড় হইয়া পড়িল, কথা কহিবার শক্তি পর্য্যন্ত লোপ পাইল।

গোঁসাইজী তাহার কোন সাড়া-শব্দ না পাইয়া ঘরের ভিতর আসিলেন এবং এভাবে প্রস্তরমূর্ত্তির মত তাহাকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া চমকিত হইয়া কহিলেন,—"এ কি মা!" অর্চ্চনা কিছুই বলিতে পারিল না, শুধু তাঁহার পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িয়া বলিয়া উঠিল—"বাবা!"

হঠাৎ যে কি হইতে কি ঘটিল, গোসাইজী তাহা ভাবিবার মাত্র অবসর পাইলেন না। এক মহা রহস্য শুধু তাঁহার চোখের সম্মুখে আসিয়া চিন্তায় ও উদ্বেগে তাঁহাকে বিচলিত করিয়া ফেলিল। তিনি দেখিলেন যে, অর্চ্চনার মূর্চ্ছার মত অবস্থা হইয়াছে। তাড়াতাড়ি তিনি জল আনিয়া তাহার মুখে-চোখে ঝাপটা দিতে লাগিলেন ও জোরে জোরে পাখার বাতাস করিতে লাগিলেন।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে অর্চ্চনা কতকটা প্রকৃতিস্থ হইলে গোঁসাইজী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি হয়েছিল, মা?"

ভূলুণ্ঠিত অর্চ্চনা অতি ধীরে ধীরে কহিল, "কিছুই হয়নি, শরীরটা বড় দুর্ব্বল, হঠাৎ ঝিম্-ঝিম্ ক'রে কেমন যেন হয়ে এল।"

"একখানা গাড়ী এনে, চল মা, তোমায় বাসায় নিয়ে যাই।"

"আমি এখন কোথাও যেতে পারব না, বাবা!"

"কিন্তু স্নান আহার?"

অর্চ্চনা কোন কথা না বলিয়া নীরবেই রহিল।

গোঁসাইজী কহিলেন,—"আচ্ছা, মা, বাসায় আর গিয়ে কায নেই, এইখানেই স্নানাহারের ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি।" হয় ত এ কথা অর্চ্চনার কাণে যাইল না। গোঁসাইজী উঠিবার উপক্রম করিতে অর্চ্চনা কহিল,—"আপনি যাবেন না বাবা, আমার কাছে ব'সে থাকুন, শরীরটা এখনও আমার কেমন করছে।" গোঁসাইজী বসিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। অশ্রুগদ্‌গদকণ্ঠে অর্চ্চনা গোঁসাইজীর পায়ের উপর হাত রাখিয়া ডাকিল, "বাবা!"

"কি, মা।"

এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া অর্চ্চনা কহিল,—"আমি কিছুই যে বলতে পারছি না।"

"আমি তোর ছেলে, তুই আমার মা, ছেলের কাছে কোন কথা গোপন রাখিসনি, মা রে আমার!"

অতি ধীরে রহিয়া রহিয়া অর্চ্চনা কহিল,—"যদি ঠিক সেই চোখেই আমায় দেখেন, তা হ'লে——" চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অর্চ্চনা কি যেন ভাবিতে লাগিল। সমস্ত মুখখানার মধ্যে কোথাও যেন এক বিন্দু রক্ত তাহার ছিল না। বোধ হয়, কিছু একটু ভাবিবার পর্য্যন্ত তাহার যেন শক্তির অভাব ঘটিতেছিল।

অন্তরের সমুদয় শক্তি একত্র করিয়া অর্চ্চনা পুনরায় কহিতে গেল,—"বাবা!"

স্নেহ-করুণ কণ্ঠে গোঁসাইজী কহিলেন,—"বল মা, কি হয়েছে বল।"

"কিছু হয় নি বাবা। কিন্তু আমি আর একদণ্ড এখানে থাকতে পারব না। আজই আমায় কোলকাতা নিয়ে চলুন; যদি মেয়ে হই, মেয়ের জন্যে কিছু দিন জপ, তপ, সন্ন্যাস, আশ্রম সব ছাড়ুন।—আজই আমি যাব বাবা, কিন্তু আপনার হাত না ধ'রে আমি কিছুতেই যেতে পারব না।"

"আজই যেতে চাও?"

"আজই," বলিয়া অর্চ্চনার প্রসারিত হস্তদ্বয় গোঁসাইজীর পা দুইটি চাপিয়া ধরিল।

যে কথাটা অর্চ্চনা মুখ ফুটিয়া কিছুতেই বলিতে পারিতেছিল না, অভিজ্ঞ গোঁসাইজীর তাহা বুঝিতে বাকী রহিল না। তিনি শুনিয়াছিলেন যে, নেপাল মাত্র বৎসরখানেক হইতে অর্চ্চনার সংস্রবে আসিয়াছে। কিন্তু এই সময়টুকুর মধ্যেই সে যে অর্চ্চনার মনের উপর এত বড় প্রভাব ভিতরে ভিতরে বিস্তার করিয়াছে, যাহার ফলে আজ তাঁহারও সমক্ষে অর্চ্চনা এভাবে তাহার অন্তরের দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিয়া ফেলিল, এই কথাটাই সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসী বসিয়া বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

বেলা ক্রমে বাড়িয়া উঠিল। এত বেলা পর্য্যন্ত অর্চ্চনা বাসায় ফিরিয়া না যাওয়াতে সত্যচরণ তাহার সন্ধানে আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইল। গোঁসাইজী তাহাকে কহিলেন,—"একটু কায আছে, অর্চ্চনা এ-বেলা আমার কাছে এইখানেই থাকবে। ও-বেলা আমি নিজে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব।"

সত্যচরণ চলিয়া গেল।

সেই দিনই বাসার সমস্ত জিনিষপত্র বাঁধাছাঁদা করিয়া, সকল প্রকার বন্দোবস্ত করিয়া রাত্রির গাড়ীতে সকলকে লইয়া গোঁসাইজী কলিকাতা যাত্রা করিলেন। বাড়ীশুদ্ধ সকলকারই মনে একটা বিস্ময় আসিয়া জমা হইয়াছিল, কিন্তু প্রকাশ করিয়া কেহই কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পাইল না। নায়েব সেনাপতি মহাশয় তখনও পর্য্যন্ত সেখানে ছিলেন। তিনি শুধু অর্চ্চনাকে একবার বলিতে আসিলেন যে, দিন দুই চারি দিনের জন্য একবার কটক হইয়া গেলেই ভাল হয়। অর্চ্চনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত উত্তরদানে তাঁহাকে জানাইল,—"ভাল-মন্দ আমি বুঝব, আপনি এখন ফিরে যান, নায়েব মশাই।" নায়েব মশাই আর কোন কথা অর্চ্চনাকে বলিবার চেষ্টা করেন নাই।

রাত্রির ট্রেণে উঠিয়া পরদিন প্রভাতে গোঁসাইজী সকলকে লইয়া বালীগঞ্জের বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিলেন। আসিয়া শুনিলেন যে, ম্যানেজার বাবু খুব অসুস্থ হইয়াই এখানে আসিয়াছিলেন এবং কয় দিন এখানে থাকিয়া অসুখ খুব বাড়িয়া উঠিলে পর আজ তিন দিন হইল তাঁহার দেশে চলিয়া গিয়াছেন। নেপালের সম্বন্ধে সমস্ত শুনিয়া তিনি তখনই একবার বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলেন এবং প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে ফিরিয়া আসিয়া অর্চ্চনাকে কহিলেন, "মা, সবই জেনে এলুম। শ্যামসুন্দরপুর তারকেশ্বরের কাছে। মগরায় নেবে ছোট গাড়ীতে যেতে হয়। এ-বেলা আর কোন ট্রেণই নাই। ও-বেলা তিনটের ট্রেণে গেলে সন্ধ্যার পর সাতটা আটটার সময় সেখানে পৌঁছুতে পারা যাবে। কিন্তু বরাবর রাস্তা আছে, জলকাদারও এখন সময় নয়, বোধ হয় ট্যাক্সি চলতে পারবে। আমি বলি, তাইতেই যাওয়া হোক, তুই ততক্ষণ স্নান ক'রে কিছু খেয়ে দেয়ে নে।"

অর্চ্চনা যেমন বসিয়া ছিল, সেইরূপই বসিয়া রহিল, কোন কথাই তাহার মুখ হইতে বাহির হইল না।

২১

আজ দুই দিন হইল নেপাল শ্যামসুন্দরপুর আসিয়াছে। এই দুই দিনে রোগ তাহার যত দূর বাড়িবার বাড়িলেও, রোগের জ্বালা যেন তাহার একবারেই কমিয়া গিয়াছে। দুই দিন পূর্ব্বে বেলা দেড় প্রহরের সময় বালীগঞ্জ হইতে সে যখন শ্যামসুন্দরপুরের এক ক্রোশ দূরবর্ত্তী তাহাদের সেই ছোট্ট ষ্টেশনটিতে আসিয়া নামিয়াছিল, তখনই তাহার রোগকাতর রক্তশূন্য মুখ অতুলবাবুর দিকে ফিরাইয়া কহিয়াছিল,—"আর আমার কোন কষ্ট, কোন দুঃখ নেই অতুল, আমার সব জ্বালা যেন এখানে এসে জুড়িয়ে গেল।" অতুলবাবু একখানা ছইওয়ালা গরুর গাড়ীর ভিতর বিছানা পাড়িয়া তাহাকে শয়ন করাইয়া তাহার গায় হাত দিয়া দেখিলেন, জ্বরের উত্তাপ ক্রমশঃই বাড়িয়া উঠিতেছে। কলিকাতায় কয়দিন এইরূপই হইতেছিল। সকালের দিকে খানিকক্ষণের জন্য জ্বর একটু কম থাকে, তাহার পর বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সেই জ্বর বাড়িয়া অপরাহ্ণ হইতে রোগের এত বৃদ্ধি হয় যে, প্রতিক্ষণেই বিপদের একটা সম্ভাবনায় তাঁহাকে সশঙ্ক হইয়া কাটাইতে হয়।

শ্যামসুন্দরপুর আসিবার পর হইতে আজ দুই দিন নেপালের মুখে গভীর একটা প্রসন্নতা ও পরিতৃপ্তির ভাব দেখা গেলেও জ্বর তাহার পূর্ব্বেরই মত আসিতেছিল। দেহের ভিতরের যন্ত্রণা হয় ত তাহার পূর্ব্বাপেক্ষা দিন দিন বাড়িতেছে, কিন্তু বাহিরে আর কিছু সে প্রকাশ করে না। যে ঘরখানির মেঝের উপর শুইয়া তাহার বাবা চিরকালের জন্য এ বাড়ী ছাড়িয়া গিয়াছিল, গেল বছর প্রায় এমনই সময়ে যে ঘরখানির মধ্যে সে তাহার মাকে কাছে থাকিয়া হারাইয়াছে, সেই ঘরের মেঝের উপরই সে তাহার শয্যা বিছাইয়া লইয়াছে। কলিকাতা থাকিতে সে একটু একটু উঠিয়া বসিতে পারিত, এখানে আসিয়া তাহাও পারে না। সকালের দিকে যখন জ্বরের প্রকোপ একটু কম থাকে, তখন মাথার কাছের মুক্ত জানালাটি দিয়া সে বাহিরের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে। তখন সকালবেলা অদূরের মালীপুকুরে হাঁসের পাল সাঁতার কাটিতে কাটিতে ডুব দিয়া খেলা করে, পুকুরপাড়ে সাঁওতালদের ছেলেরা ধনুকহাতে কাঠবিড়ালের খোঁজে ঘুরিয়া বেড়ায়, ও-পারের মনসাতলায় ছেলের দল মিলিয়া 'চু-কবাটি'

কিংবা 'ধান্তি' খেলে। আরও দূরে, নেলোর বটতলায় রাখালরা গরু ছাড়িয়া দিয়া ওদিক্‌কার জামগাছে উঠিয়া গাছ ভাঙ্গিয়া ফেলিবার উপক্রম করে, তাহারই ওদিকে কেহ হয় ত আউস-ক্ষেতে লাঙ্গল দেয়, কেহ বা কলাই-ক্ষেতে কলাই বুনে! পাড়ার ঝি-বউরা মাঠের বিল হইতে স্নানান্তে তখন খাবার-জলের ঘড়া কাঁখে করিয়া ভিজা কাপড়ে ঘরে ফিরে। আর আমবাগানে বাঁশের ঝাড়ে, শিমুল গাছে, তেঁতুল-ডালে—দোয়েল, শালিক, বুলবুলি, 'গৃহস্থের খোকা হ'ক', 'কেষ্ট গোকুলে' প্রভৃতি পাখীর দল শিস্ দিতে দিতে উড়িয়া বেড়ায়, বৈঁচিবনের ঝোপে ঝোপে ছাতারের দল উল্লাসে নাচিয়া বেড়ায়। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এই সব দেখিতে দেখিতে নেপাল নিজের মনেই বলিয়া উঠে—"এই আমার স্বর্গ——এই আমার স্বর্গ!"

পাড়ার অনেকেই সকাল-সন্ধ্যায় আসিয়া নেপালকে দেখিয়া যায়। অতুল আর হিরু ঠাকুর সর্ব্বক্ষণই নেপালের পার্শ্বে বসিয়া থাকে, দুইবেলা খাইবার সময় কেবল একে একে গিয়া খাইয়া আসে। দুই ক্রোশ দূরে তেহাটার গঞ্জে এক জন এম-বি ডাক্তার থাকেন, তাঁহাকে এই দুই দিনই আনা হইতেছে। তিনি বলিতেছেন—'পারনিসাস্ ম্যালেরিয়া,' প্রবল জ্বরের তাড়নায় কখন্ যে রক্ত মাথায় উঠিয়া মৃত্যু ঘটাইবে, বলা যায় না।

নেপালের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে হিরুঠাকুর কহিল,—"ভাই রে, কি রোগ নিয়ে এলি বল্ ত, কি ক'রে তোকে সারাই, ভাই!" নেপাল কহিল—"রোগ ত আমার হয়েছিল কলকাতায়, এখানে ত আমি ভাল আছি, ঠাকুদ্দা। কত সুখে যে আছি, তা আর তোমায় কি বলব। তুমি কিন্তু এই রকম আমার কাছে থেকো, আমায় ফেলে রেখে যেন থেকো না।" তাহার পর নেপাল চোখ বুজিয়া ভাবিতে থাকে। ভাবে—কোন দুঃখই আর তাহার নাই, শুধু অর্চ্চনাকে এই সময় বড় বেশী করিয়া তাহার মনে পড়ে। সে তাহার কেহই নহে, তবু যদি এ সময় একবার সে তাহার দেখা পায়! হিরু ঠাকুর যদি জিজ্ঞাসা করে—"কিছু কি ভাবছিস, দাদা?" নেপাল ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলন করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া বলে—"তারা আমাকে বড় ভালবাসতো, রাগ ক'রেই চ'লে এসেছিলুম, একখানা চিঠি দিলে হয় না, হিরুদা?" পরক্ষণেই জানালার বাহিরে চাহিয়া বলে—"না—থাক্।"

জোর করিয়া অর্চ্চনার কথা নেপাল যত ঠেলিয়া রাখিতে চেষ্টা করে, ততই তাহার পীড়িত মনের উপর সে কথা চাপিয়া চাপিয়া বসে। সেবার মোটরের ধাক্কা খাইবার পর, তাহার সেই শুশ্রূষা, আর সেই শুশ্রূষার ভিতর কত স্নেহ, কত কোমলতা, কত দরদ! এই এক বৎসর কাল জীবনে কি যে একটা স্নিগ্ধ-শীতল ধারা তাহার সংস্পর্শে বহিয়া গিয়াছে! সত্যই যদি সারিয়া উঠিতে না পারে, তাহা হইলে ত আর কখনও দেখাও হবে না! সঙ্গে সঙ্গেই নেপাল অতিমাত্রায় চঞ্চল হইয়া উঠে। হিরু ঠাকুরের দিকে ফিরিয়া ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করে—"ডাক্তার কি বলে, আমি বাঁচব না, ঠাকুর্দ্দা?"

"ও কথা মুখে আনতে নেই, ভাই; ও সব কেন ভাব, দাদা?"

নেপাল কিছুক্ষণের জন্য আবার চক্ষু বুজাইয়া নীরবে থাকে, কিন্তু আবার ভাবে। ভাবে যে, পতিগতপ্রাণা অর্চ্চনার পবিত্র অন্তরমধ্যে কোন দিনের জন্য কোন পাপের ছায়াপাত সে দেখে নাই; সে নিজেও কোন দিন অন্য কোন ভাবে তাহার দিকে চাহে নাই। কিন্তু আজ অর্চ্চনার স্নেহ-কোমল মুখ সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া বার বার তাহার কেন মনে পড়িতেছে, তাহার মনের তন্ত্রীতে বড় জোরে জোরে মুহুর্মুহু ঘা দিতেছে! নেপাল ভগবান্‌কে স্মরণ করিয়া মনে মনেই কহিল,—"যদি এতে কোন পাপ হয়, আমায় ক্ষমা কোরো!"

সেই দিন মধ্যাহ্ন হইতে নেপালের একটা নূতন উপসর্গ আসিয়া জুটিল। বেলা ১০টা ১১টার সময় হইতে জ্বর বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে হিক্কা উঠিতে আরম্ভ হইল। বৈকালে ডাক্তার আসিয়া কহিলেন, লক্ষণ ভাল নয়। তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া হুগলী থেকে সিবিল সার্জ্জনকে আনিবার জন্য পরদিন সকালের ট্রেণে এক জন লোক পাঠান হইল।

তখন সকাল বেলা, নেপালের জ্বর খুব প্রবল ছিল না, সিবিল সার্জ্জনের কথায় কহিল,—"তা হ'লে কি সত্যিই আমি বাঁচবো না, ঠাকুদ্দা?"

হিরু ঠাকুর মৃদু ভর্ৎসনার ছলে কহিল,—"আবার তুই ঐ কথা বলবি, ভাই?"

নেপাল চক্ষু বুজাইয়া স্থির হইয়া রহিল। মুহূর্ত্ত পরে কহিল,—"তা হ'লে——"

"কি তা হ'লে, ভাই?"

অস্ফুটে নিজের মনেই নেপাল কহিল,—"একখানা টেলিগ্রাম ক'রে দিলে, তা পেয়ে চ'লে আসতে কত সময় লাগে?"

"কোথা থেকে রে?"

নেপাল কোন উত্তর দিল না, শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। অন্তরের অতি তীব্র একটা বেদনা তাহার চোখে-মুখে ফুটিয়া উঠিল। অত্যন্ত কাতর হইয়া ডাকিল,—"হিরুদা!"

"কি ভাই?"

"না—কিছু নয়।"

ইহার পর মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত নেপালের আর কোন সাড়াই পাওয়া গেল না। কেবল মধ্যে মধ্যে হিক্কা, তাহাও খুব বিলম্বে উঠিতেছিল। পূর্ব্ব দিন অপেক্ষা তাহার প্রবলতা খুবই কম।

তখনও পর্য্যন্ত হুগলী হইতে সিভিল সার্জ্জন আসিয়া পৌছি-লেন না। অতুলবাবু এক একবার বাহিরে রাস্তার ধারে আসিয়া দাঁড়াইয়া ত্রিবেণীর পথের দিকে যাইয়া দেখিতে লাগিলেন।

অপরাহ্ণ হইয়া. আসিল। নেপালের যন্ত্রণা যেন ভিতর ভিতর আজ খুবই বাড়িতে লাগিল। হিরু ঠাকুর তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ভাই, অমন কচ্ছিস কেন রে?" নেপালের বোধ হয় কথা কহিবার শক্তি কমিয়া আসিতেছিল। শিয়রের ধারের জানালা দেখাইয়া অত্যন্ত অস্ফুটে—অত্যন্ত ধীরে ধীরে কি কহিল, কিছুই বুঝা গেল না।

গরম বাতাসের জন্য মাথার দিকের জানালাটি মধ্যাহ্ন হইতে বন্ধ রাখা হইয়াছিল, এক্ষণে খুলিয়া দিতেই হু হু করিয়া স্নিগ্ধ বাতাস ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়িল।

অতুলবাবু মাথার শিয়রে বসিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "যন্ত্রণা কি বড্ড বাড়ছে?" নেপাল কোন কথাই কহিতে পারিল না, ফ্যাল্-ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। অতুলবাবু দেখিলেন, নেপালের চোখ জবাফুলের মত লাল হইয়া উঠিয়াছে আর সে চোখ যেন ক্রমেই ছোট হইয়া বুজিয়া আসিতেছে। ডাক্তারের আদেশে মাথা নেড়া করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, সেই মাথায় হাত দিয়া দেখিলেন, তাহা অগ্নিময় হইয়া উঠিয়াছে। অসাড় হাতখানি তুলিয়া লইয়া হিরু ঠাকুর একবার নাড়ী দেখিল। নাড়ীর বেগ খুবই তীব্র—খুবই চঞ্চল, নাকের কাছে হাত রাখিয়া শ্বাস-প্রশ্বাস অনুভব করিল, অগ্নিময় সে শ্বাস সহজভাবেই বহিতেছে। হিরু ঠাকুর মনে ভাবিল, জ্বরের অত্যধিক এই প্রবল অবস্থায় কোন বিপদ হইতে পারে না, তবে এই জ্বরত্যাগের সময় হয় ত——

এই ভাবে বহুক্ষণ কাটিবার পর হঠাৎ একবার নড়িয়া উঠিয়া নেপাল জড়াইয়া জড়াইয়া কি বলিয়া উঠিল, বুঝা গেল না!

তখনই অতুলবাবু রাস্তায় বাহির হইয়া আসিয়া দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার যেন বোধ হইল, অনেক দূরে একটা কাল মত পদার্থ এই দিকে আসিতেছে। মিনিট দুই তিন পরে স্পষ্টই দেখিলেন যে, সিবিল সার্জ্জনের মোটরই তীরবেগে ধূলা উড়াইয়া আসিতেছে বটে। তিনি নিশ্চিন্ত মনে ভিতরে আসিয়া হিরু ঠাকুরকে জানাইলেন। হিরু ঠাকুর বাহিরে আসিয়া পথের মধ্যস্থলে হাত তুলিয়া দাঁড়াইল। দুই এক মিনিটের মধ্যেই ট্যাক্সিখানি আসিয়া তথায় দাঁড়াইয়া পড়িল এবং তন্মধ্য হইতে যে দুইটি আরোহী ত্রস্তপদে নামিয়া আসিল, তাহাদের মধ্যে পুরুষ আরোহীটির প্রশ্নে হিরু ঠাকুর কহিল,—"হ্যাঁ, এই বাড়ীই বটে, কিন্তু———"

"কিন্তু কি?"

হিরু ঠাকুর কোন কথা না বলিয়া উভয়কে পথ দেখাইয়া ভিতরে আনিল। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া উচ্চকণ্ঠে কহিল,—"নেপু, কারা এসেছেন, দেখ রে ভাই।" বোধ হয় নেপাল শুনিতে পাইল না, অথবা চাহিয়া দেখিবার তাহার শক্তি ছিল না। শুধু সে ঈষৎ নড়িয়া উঠিল এবং ঠোঁট দুইটি তাহার বার-দুই কাঁপিয়া উঠিল।

অর্চ্চনা কোন দিকে না চাহিয়া অতি ধীরে এক-পা এক-পা করিয়া আবিষ্টের মত অগ্রসর হইয়া নেপালের শিয়রে আসিয়া বসিল, এবং বালিসের উপর হইতে তাঁহার মাথাটি নিজের কোলের উপর তুলিয়া লইল। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই যে রোগীর সব যন্ত্রণার শেষ হইয়া গেল, তাহা আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে কেহই বুঝি জানিতে পারিল না।

হিরু ঠাকুর গোঁসাইজীর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "উনি কে?"

গোঁসাইজী কহিলেন,—"ওঁরই স্ত্রী—ব্রজরাণী।"

* * * * *

সেই দিনই এই দুঃসংবাদ গ্রামময় ছড়াইয়া পড়িল। পরদিন গোলমালে কাটিয়া গেল। তৎপরদিন নাপিত-বাড়ীর চণ্ডী-মণ্ডপে বসিয়া পাড়ার দুই-দশ জন লোক, হিরু ঠাকুর, অতুল-বাবু, গোঁসাইজী প্রভৃতি নেপাল ও তাহার স্ত্রী ব্রজরাণীর সম্পর্কে আলোচনা করিতে লাগিল। গোঁসাইজীর মুখে ব্রজরাণীর জীবনের ক্ষুদ্র ইতিহাস সকলে পরমাগ্রহে শুনিতে লাগিল।

যেটুকু বৃত্তান্ত গোঁসাইজী নিজে জানিতেন এবং বাকী কথা যাহা সে দিন পুরীতে, সত্যকে বাসায় ফিরাইয়া দিবার পর, তাঁহার আশ্রমের ঘরে বসিয়া অল্পে অল্পে তিনি অর্চ্চনাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহাই সকলের নিকট বর্ণনা করিলেন। প্রথমতঃ যেটুকু তিনি নিজে জানি-তেন, সেইটুকু বলিতে গিয়া বলিলেন যে, প্রায় পনর ষোল বৎসর পূর্ব্বে তিনি তাঁহার একমাত্র শিশুকন্যাকে তাহার মাতুলের কাছে রাখিয়া সংসার ত্যাগ করিয়া পুরী চলিয়া আসেন। সেই সময়ে পুরীতে এক বৃদ্ধ বৈরাগী ঠাকুরের আশ্রম ছিল। তিনি আসিয়া তাঁহারই আশ্রয়ে রহিলেন। সেই বৃদ্ধ বৈরাগী এখন আর বাঁচিয়া নাই, বৎসর দশ বারো হইল, তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। যে বৎসর গোঁসাইজী তাঁহার আশ্রমে

আসেন, সেই বৎসরই আশ্বিন মাসে কি একটা বিশেষ যোগের সময় এক দিন বৈরাগী ঠাকুর খবর পান যে, নিকটের এক যাত্রিবাসে একটি স্ত্রীলোক কলেরায় মারা গিয়াছে এবং তাহার স্বামীও মুমূর্ষু। তাহাদের সঙ্গে তাহাদের গ্রামের যে দুইচারি জন সঙ্গী ছিল, তাহারা তাহাদিগকে এই অবস্থায় ফেলিয়া পলাইয়া গিয়াছে।

বৈরাগী ঠাকুর এই সংবাদ পাইয়াই সেই যাত্রিবাসে ছুটিয়া যান এবং গিয়া দেখেন যে, পুরুষটিরও আর বড় বিলম্ব নাই। তাহাদের সঙ্গে মাত্র পাঁচ ছয় বৎসরের অতি সুন্দর তাহাদের একটি কন্যা ছিল। কন্যাটির সেই বয়সেই বিবাহ হইয়াছিল; কারণ, তাহার সীঁথিতে সিন্দুরের চিহ্ন ছিল। মেয়েটি তখনও পর্য্যন্ত রোগাক্রান্ত হয় নাই দেখিয়া, বৈরাগীঠাকুর তাহাকে তাঁহার আশ্রমে লইয়া আসেন। সেই সময় এক বাঙ্গালী জমীদার সস্ত্রীক আশ্রমে বেড়াইতে আসেন। তাঁহার স্ত্রী মেয়েটিকে দেখিয়া এবং তাহার বিষয়ে সব শুনিয়া সেই দণ্ডেই বৈরাগী-ঠাকুরের কাছ হইতে মেয়েটিকে চাহিয়া লইয়া তাঁহাদের বাসায় লইয়া যান। মেয়েটিকে নিরাপদ করিবার পর বৈরাগীঠাকুর পুনরায় যাত্রিবাসে ফিরিয়া আসিলেন এবং তাঁহার ফিরিবার কিছু পরেই মেয়েটির বাপ মারা পড়ে।

উহার সঙ্গে বেশী কিছু জিনিসপত্র ছিল না। শুধু একটি টীনের লাল রংয়ের তোরঙ্গ ছিল। উহার মধ্যে দুই চারিখানি কাপড়, মেয়েটির একখানি ডুরে রঙ্গীন সাড়ী, চুল বাঁধিবার ফিতা, চিরুণী, মেয়েটির পড়িবার একখানি বর্ণপরিচয় দ্বিতীয়ভাগ, একটি এন, সি, ডি নাম খোদাই-করা সোনার সিল আংটী, গোটাকয়েক টাকা, এবং আরও দুই একটা কি জিনিস ছিল।

মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে বৈরাগী ঠাকুর ঐ লোকটির নাম-ধাম, মেয়েটির নাম, তাহার স্বামীর নাম ও ধাম প্রভৃতি যতটুকু তাহার নিকট হইতে জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহা একটুকরা কাগজে লিখিয়া লইয়া, ঐ কাগজখানি তোরঙ্গের ঐ দ্বিতীয়-ভাগখানির মধ্যে রাখিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, সবশুদ্ধ ঐ তোরঙ্গটি সেই জমীদারবাবুর কাছে দিয়া আসিবেন, এবং তিনি ঐ ঠিকানা খুঁজিয়া মেয়েটির সম্বন্ধে যাহা হয় কোন ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু সেইদিনই সন্ধ্যার সময় তিনি তাঁহার বাসায় যাইয়া দেখিলেন যে, বাসায় কেহই নাই, তাঁহারা স্বামি-স্ত্রী মেয়েটিকে লইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। বৈরাগী ঠাকুর জমীদারবাবুর অনেক খোঁজ করেন, কিন্তু তাঁহার আর কোনই সন্ধান পান নাই। তখন হইতেই ঐ টিনের তোরঙ্গটি আশ্রমের ঘরের একধারে পড়িয়াছিল। গোঁসাইজী কখনও সেটি খুলিয়া দেখেন নাই বা সেই মেয়েটির সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত তিনি কোন খোঁজ-খবরও করেন নাই।

এই পর্য্যন্ত শুনিয়া হিরু ঠাকুর বলিয়া উঠিল,—"নাম-লেখা সেই সিল আংটী আমিই নেপালের বিয়ের সময় কোলকাতা থেকে তৈরী ক'রে আনিয়ে ওর বাপকে দিয়েছিলুম। পরে শুনেছিলুম যে, নেপালের বউটি এখানে যখন একবার এসেছিল, তখন তার হাতে সে পরিয়ে দিয়েছিল। আর সেই সময় নেপাল একদিন কুণ্ডুদের দোকান থেকে একখানা দ্বিতীয় ভাগ কিনে এনে আমারই বাইবেকার ঘরে ব'সে মোটা কাগজের একটা মলাট দিয়ে সেলাই ক'রে দিয়েছিল; আমায় বলেছিল—'ঠাকুদ্দা, বউটিকে একটু একটু পড়াবার ব্যবস্থা করতে হবে'।"

গোঁসাইজী কহিলেন,—"আজ পনর বচ্ছর সে তোরঙ্গটির ভেতর কি আছে, তা দেখি নি। সে দিন দেখলুম যে, বইখানার পাতায় নেপালের আর তার স্ত্রীর দুজনেরই নাম আর নামের নীচে—শ্যামসুন্দরপুর, হুগলী—লেখা রয়েছে। বোধ হয়, নেপালেরই নিজের হাতের লেখা।"

ইহার পর গোঁসাইজী সে-দিন অর্চ্চনার নিকট হইতে যেটুকু জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহাও সকলকে জানাইলেন। তিনি কহিলেন যে, ব্রজরাণীকে যে জমীদারবাবু লইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার নাম ভবতোষবাবু। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী হঠাৎ এইভাবে ব্রজর মত একটি সুন্দর মেয়েকে পাইয়া খুবই আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং পরম যত্নে আপন কন্যার মতই তাহাকে পালন করিয়াছিলেন। তাঁহারা ব্রজকে তাহার বাপের নাম-ধাম, তাহার স্বামীর ও শ্বশুরের নাম-ধাম প্রভৃতি বার বার জিজ্ঞাসা করিয়াও বিশেষ কিছুই জানিতে পারেন নাই। কারণ, ছোট বেলায় ব্রজ খুব বোকা-গোছের মেয়ে ছিল। পাঁচ ছয় বৎসরের বালিকা হইলেও সে তখন এত নির্ব্বোধ ছিল যে, ভবতোষবাবু ও তাঁহার স্ত্রীর বার বার প্রশ্নে সে শুধু তাহার পিতার ও তাহার নিজের নামটিমাত্র বলিতে পারিয়াছিল, এতদ্ভিন্ন আর কিছুই সে বলিতে পারে নাই। তাহাদের কোন্ জেলায় বাড়ী, কোন্ ষ্টেশনে নামিয়া তাহাদের বাড়ী যাইতে হয়, কিছুই সে ঠিক করিয়া বলিতে পারে নাই, শুধু বলিয়াছিল যে, মাঝের পাড়ায় তাহাদের বাড়ী। এই কথার উপর নির্ভর করিয়া যেখানে যত মাঝের পাড়া নামে গ্রাম আছে, ভবতোষবাবু কোথাও আর সন্ধান করিতে বাকী রাখেন নাই।

হিরু ঠাকুর কহিলেন—"বর্দ্ধমান জেলার মায়াপুরে নেপুর শ্বশুরবাড়ী। বিয়ে দিতে আমিও গিয়েছিলুম কি না। গ্রামের মাঝের পাড়াতেই ওদের বাড়ী ছিল বটে।"

গোঁসাইজী কহিলেন,—"অর্চ্চনা সে সময়ে খুব বোকা থাকলেও তার স্মরণ-শক্তি খুব বেশী। তখনকার প্রত্যেক কথাটি তার মনে আছে। সে-দিন সে এই সব কথা একটি একটি ক'রে বলেছে।"

অতুলবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তার পর কি হ'ল ?"

গোঁসাইজী কহিলেন—"তারপর, যখন ব্রজর বাপের বাড়ী বা শ্বশুরবাড়ী কোনটারই কোন সন্ধান ভবতোষবাবু করতে পারলেন না, তখন তাঁর স্ত্রী বল্লেন যে, কোন খোঁজের আর দরকার নেই, ও আমারই মেয়ে, আমাদের যা-কিছু সব ওরই। বড় হলে ওর আমি আবার বে দোবো। তিনি বেঁচে থাকলে কি করতেন বলা যায় না, কিন্তু মেয়েটার যে কি অদৃষ্ট !"

গোঁসাইজী সুদীর্ঘ একটি শ্বাস ফেলিয়া কিছুক্ষণের জন্য নীরব হইয়া রহিলেন। তাহার পর, স্ত্রীর মৃত্যুর পর হইতে কি ভাবে, কত যত্নে, কত আদরে ভবতোষবাবু ব্রজকে বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছিলেন, কি ভাবে তাহাকে লেখাপড়া শিখাইয়া সুশিক্ষিতা করিয়াছিলেন, একে একে সবই তিনিই বলেন। এ সমস্তই অর্চ্চনার কাছে সে দিন তিনি শুনিয়াছিলেন।

অতুলবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"অর্চ্চনা নামটা কি তা হ'লে—"

গোঁসাইজী কহিলেন—"হ্যাঁ, ভবতোষবাবুর স্ত্রীই ব্রজকে ঐ নতুন নাম দিয়েছিলেন।"

এই অত্যাশ্চর্য্য কাহিনী শুনিয়া সকলেই একদিকে চমৎকৃত হইল, অন্যদিকে চির হতভাগ্য নেপাল ও ব্রজরাণীর জীবনভোর দুঃখে অন্তরে সকলেই একটি তীব্র বেদনা অনুভব করিল।

হীরু ঠাকুরের দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। একটা মর্ম্মন্তুদ দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে সে বাহিরের দিকে উঠিয়া গেল।

২২

এক বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। এক বৎসর পরে এ কাহিনীর আর কি-ই বা বলিবার আছে ! তবু দুই-একটি কথা এইজন্য বলা যে, তাহা শুনিয়া অর্চ্চনার বর্ত্তমান এই দুঃখে কেহ যদি একটুও সান্ত্বনালাভ করিতে পারে।

এই এক বৎসরের মধ্যে অর্চ্চনা শ্যামসুন্দরপুর ছাড়িয়া আর কোথাও যায় নাই, যাইবেও না। তাহার স্বামি-শ্বশুরের সেই ভিটার উপরে সে তাহার কালীদিদিরই মত এক মঠ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে বাস করিতেছে। হাতের লোহা, সীঁথির সিঁদুর, সে-ও খুলে নাই, মুছে নাই। কালীদিদির মত সে-ও বলে, স্বামীর দেখা পাওয়া অবধি সে তাহার অন্তরমধ্যেই নিশিদিন তাঁহাকে সযত্নে রাখিয়াছে। তথায় তাহার হৃদয়মধ্যে স্বামীর সহিত তাহার একদণ্ডের জন্যও বিচ্ছেদ হয় না।

নেপালের একখানি ফটো হইতে সে খুব বড় একখানা প্রতিকৃতি করাইয়া লইয়া তাহাই অতি যত্নে, অতি শ্রদ্ধায়, অচলা ভক্তিতে সে মঠের একাংশে স্থাপন করিয়াছে এবং পূর্ব্বকার মত ঠাকুরপূজার পরিবর্ত্তে তাহাই নিত্য দুইবেলা পূজা করিয়া থাকে।

এই এক বৎসরকাল অর্চ্চনা গোঁসাইজীকে ছাড়িয়া দিতে পারে নাই। তাঁহাকে, হীরু ঠাকুরকে ও অতুলবাবুকে এই এক বৎসরকাল নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ অর্চ্চনা দেয় নাই। এতদিনের পর এইবার চলিয়া যাইবার জন্য অর্চ্চনার কাছে গোঁসাইজীর ছুটী মঞ্জুর হইয়াছে। শীঘ্রই তিনি চলিয়া যাইবেন।

কোম্পানীর কাগজ ও ব্যাঙ্কের জমা প্রভৃতি লইয়া লক্ষাধিক টাকা ভবতোষবাবু তাহার নামে রাখিয়া গিয়াছিলেন। অর্চ্চনা গোঁসাইজীকে দিয়া সেই সমস্ত টাকা সংগ্রহ করিয়াছে ও এই এক বৎসরে ইঁহাদের দ্বারা সেই সমস্ত টাকা সে শ্যামসুন্দরপুরে একবারে ঢালিয়া দিয়াছে। স্বামীর প্রাণে যে কি সাধ ছিল, তাহা সে জানিত। তাই, অর্থবিহনে নেপাল যাহা করিয়া যাইতে পারে নাই, এক্ষণে অর্চ্চনা তাহাই করিল। লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিয়া তাহার স্বামীর চিরদিনের মনের ইচ্ছা সে পূর্ণ করিল। তবে, বাঁচিয়া থাকিয়া নেপাল ইহা দেখিয়া যাইতে পারিল না, এই দুঃখ। কিন্তু অর্চ্চনা তাহা বলে না, অর্চ্চনা বলে, স্বামী আমার নিশিদিন আমার সঙ্গে থাকিয়া এই সব করিতেছেন, দেখিতেছেন।

অর্চ্চনার লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে শ্যামসুন্দরপুরের নূতন রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। গ্রামের বন-জঙ্গল সব পরিষ্কার হইয়াছে। পুরাতন জলাশয়গুলির কোন কোনটি বুজাইয়া দেওয়া হইয়াছে, কোন কোনটির বা পঙ্কোদ্ধার করা হইয়াছে। তদ্ভিন্ন অনেক নূতন পুষ্করিণী কাটান হইয়াছে। গ্রামের দেবালয়গুলির সুন্দররূপ সংস্কার হইয়া সেগুলির ভোগ-রাগাদির সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে। পাঠশালা, বালিকা-বিদ্যালয়, হাই স্কুল, টোল বসিয়াছে। এ গাঁয়ে কোন হাট ছিল না, এক্ষণে নদীর ধারে বিস্তৃত ভূমির উপর নূতন হাটতলার সৃষ্টি হইয়াছে। এ সমস্ত ছাড়া, দাতব্য চিকিৎসালয়, অন্নসত্র, অতিথিশালা, দোলমঞ্চ, রাসমঞ্চ নূতন করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে। গ্রামের ভিতর অনেকগুলি নূতন রাস্তা নির্ম্মিত হইয়াছে এবং পুরাতন রাস্তাগুলির সু-সংস্কার হইয়াছে। ষ্টেশনের ও ত্রিবেণীর কাঁচা রাস্তা পাকা করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

এ গ্রামে প্রায় প্রতিবৎসরই সময়ে বৃষ্টির অভাবে শস্যহানি হইত এবং সে জন্য দরিদ্র চাষীদিগের প্রতিবৎসরই কষ্টের সীমা থাকিত না। ইহার প্রতীকারের জন্য, ভাল ইঞ্জিনিয়ারের

খাল নদীর কয়েক স্থান কাটাইয়া, তাহার সহিত কয়েকটি বড় বড় নালার যোগ করিয়া দিয়া, সেগুলি বরাবর মাঠের মধ্য দিয়া এমন ভাবে লইয়া যাওয়া হইয়াছে যে, অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টির জন্ম এ গাঁয়ে ভবিষ্যতে কখনও শস্যহানির আশঙ্কা নাই।

এই সমস্ত কার্য্যের দেখা-শুনার বন্দোবস্ত, তদারক প্রভৃতি করিতে হিরু ঠাকুরের উৎসাহ ও পরিশ্রমের আর অন্ত নাই। তাহা ছাড়া টোলের সম্পূর্ণ ভারই শুধু তাহার নিজেরই উপর।

অর্চ্চনার কলিকাতার সম্পত্তি এবং কটকের জমিদারী পরিচালনা করিবার জন্ম দুই চারি জন লোক লইয়া এখানে ক্ষুদ্র একটি আফিস করিতে হইয়াছে। সেখানেও হিরু ঠাকুরকে প্রত্যহ যাইয়া দেখা-শুনা করিতে হয় এবং কর্ম্মচারীদের সহিত কারণে অকারণে হাঁক-ডাক করিতে হয়। অর্চ্চনা তাহারই উপর সকল বিষয়ে নির্ভর করিতেছে, এই কারণেই একটা গভীর আনন্দ ও তৃপ্তিতে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই তাহাকে ব্যস্ত থাকিতে হয়। এ জন্ম পূর্ব্বাপেক্ষা তাহার নেশার টাইম, সংখ্যায় যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছে এবং মেজাজও তাহার পূর্ব্বাপেক্ষা রুক্ষ হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ইহারই মধ্যে কখন কখন তাহার দুই চোখ ভরিয়া জল ছাপাইয়া আসে, তখন দুই হাতে চোখ মুছিতে মুছিতে আপন মনেই বলিয়া উঠে—"ভাই রে, এ সব তুই কিছুই যে দেখলি নি রে, ভাই!"

হিরু ঠাকুরের মত অর্চ্চনার নিজেরও কাযের অন্ত নাই। প্রত্যহ অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া সে মঠ-সংলগ্ন তাহার নূতন বাগানে সাজী ভরিয়া ফুল তোলে। তাহার পর নদী হইতে স্নান করিয়া আসিয়া, বসিয়া বসিয়া সে সমস্ত ফুলের মালা গাঁথে, তোড়া বাঁধে। তার পর স্বামীর প্রতিকৃতির সম্মুখে বসিয়া ঘণ্টা-দুই ধরিয়া কি ধ্যান, কি পূজা করে, তাহা সেই জানে। পূজান্তে সেই তোড়া, সেই মালা, সেই ফুল দিয়া নেপালের ছবির সর্ব্বাংশ মনোমত করিয়া সাজায়। এই করিতেই তাহার এক প্রহর বেলা উৎরাইয়া যায়। তাহার পর সে পাড়ায় বাহির হয় এবং বাড়ী বাড়ী গিয়া সকলের খোঁজ-খবর লইয়া মঠে ফিরিয়া আসিতে প্রত্যহ বেলা গড়াইয়া যায়। তাহার পর স্বহস্তে একমুঠা চাউল সিদ্ধ,—তাহার পর তাহাই আহার।

কিছু দিন হইল সে অতুলবাবুকে গিরিডি পাঠাইয়া কালীকে একবার আনাইয়াছিল। কালী দিন চারি-পাঁচ থাকিয়াই কহিল,—"আর ভাই ঘর ছেড়ে এখানে থাকতে পারব না। সে এলে তাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসে তখন অনেক দিন এখানে থাকবো।" পায়ের ধূলা লইতে লইতে অর্চ্চনা মনে মনে কহিয়াছিল,—"পাগল হও, যা হও দিদি, তোমার মত এই রকম বিশ্বাস যেন আমার চিরকাল থাকে।"

অতুলবাবুর এখন আর বিশেষ কোন কায রহিল না। থাকিলেও তিনি এই এক বৎসরকাল বহু পরিশ্রম করিবার পর, কাযের কাছে বড় একটা আর ধরা দিতে চাহিতেন না। অথচ অর্চ্চনা তাঁহাকে অন্য কোথাও যাইতে দেয় নাই। সুতরাং সারাদিন ধরিয়া নদীর ধারে, মাঠের আলে, পাড়ায় পাড়ায়, পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেই তাঁহার সময় কাটিয়া যাইত। যখন সময় কাটিত না, তখন মাঠের একাংশে বসিয়া নিজের মনে প্রাণ ভরিয়া গান গাহিতেন। প্রায়ই গভীর নিশীথে শ্যাম-সুন্দরপুরের লোক তাঁহার গান শুনিতে পাইত।

অবশেষে এক দিন গোঁসাইজীর ফিরিয়া যাইবার দিন আসিল। যে দিন তিনি যাইবেন, সে দিন সকাল হইতেই অর্চ্চনার চক্ষু ছল-ছল করিতে লাগিল। তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতেও তাহার কষ্ট হইতেছিল, অথচ আর ধরিয়া রাখিতেও সে পারে না। কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবা. মেয়েকে মনে থাকবে?"

সংসার-ত্যাগী গোঁসাইজীর চক্ষুও ছল-ছল করিয়া আসিল, কহিলেন,—"এ কথা কেন জিজ্ঞাসা কর, মা?"

"কবে আবার আস্‌বেন?"

"যখনই আবার দরকার হবে, যখনই তুই আসতে বলবি।"

অর্চ্চনা তাঁহার পদপ্রান্তে গড় হইয়া প্রণাম করিল। গোঁসাইজী মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন,—"কিন্তু মা, একটা কথা তোকে বলি। তোর যা সাধ, তা হল। শ্যামসুন্দর-পুরকে তুই নূতন সাজে সাজালি। এখন বাকী জীবনটা পুরীতে জগন্নাথের পায়ের তলায়, কিম্বা বৃন্দাবনে গিয়ে থাকলে হত না? বেশ ক'রে ভেবে দেখে পরে না হয় আমায় জানাস, মা। পুরী-বৃন্দাবনের মত পুণ্যস্থানে———"

নতমুখে অর্চ্চনা কহিল,—"না বাবা, অন্য পুণ্যস্থান আর আমি চাই না। আমার মনের কথা ত কিছুই আপনার অজানা নেই। দেশকে যা করবার তাঁর সাধ ছিল, তা হয়েছে। তাঁর শ্যামসুন্দরপুরই আমার সব চেয়ে পুণ্যস্থান—আমার স্বর্গ—আমার মাটীর স্বর্গ।"

গোঁসাইজী নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

[সমাপ্ত]

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়।

বালীদ্বীপ

ভারত হইতে বালীদ্বীপের দূরত্ব তেমন অধিক নহে; কিন্তু এই দ্বীপ সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। আমরা বাল্যকালে ভূগোলে ইহার নাম পাঠ করিয়াছি, কিন্তু আমাদের কোন স্বদেশবাসী দেশপর্য্যটন উপলক্ষে কোন দিন এই দ্বীপ সন্দর্শনের সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন কি না, তাহা আমাদের অজ্ঞাত।

সংপ্রতি এডোয়ার্ড ই লণ্ড নামক এক জন ইংরাজ লণ্ডনের কোন প্রসিদ্ধ মাসিকে এই দ্বীপ সম্বন্ধে তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; তাহা পাঠ করিলে যবদ্বীপের অদূরে অবস্থিত এই দ্বীপটির বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়, মনে হয়, আমাদের দেশের অদূরে সুনীল সিন্ধু-বক্ষে এরূপ একটি অপূর্ব্ব সুন্দর স্বপ্নরাজ্য আছে, অথচ আমরা তাহার সম্বন্ধে প্রায় কোনও কথা জানি না! এই জন্যই আমরা এখানে মিঃ লণ্ডের ভ্রমণবৃত্তান্তটি উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। ইহা পাঠে পাঠক-পাঠিকাগণ বালীদ্বীপ সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা জানিতে পারিবেন।

মিঃ লণ্ডের লিখিত বিবরণ পাঠ করিলে এই দ্বীপটিকে ভূস্বর্গ বলিয়া ধারণা হয়। মনে হয়, এই ক্ষুদ্র দ্বীপটিতে দারিদ্র্য বা কর্ম্মাভাব নাই; ইহার অধিবাসিগণ সকলেই পরম সুখে ও শান্তিতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। ইহার প্রাকৃতিক দৃশ্য নয়নাভিরাম, জলবায়ু সুস্নিগ্ধ ও স্বাস্থ্যকর। স্থানীয় অধিবাসিবর্গ সহৃদয় এবং তাহাদের স্বভাবও মধুর। মিঃ লণ্ড অসঙ্কোচে লিখিয়াছেন, বালীদ্বীপ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম ও চিত্তাকর্ষক স্থান। এরূপ সুরম্য স্থান ভূতলে আর একটিও আছে বলিয়া মনে হয় না। এক জন ইংরাজ পর্য্যটক প্রাচ্য ভূখণ্ডের একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ দেখিয়া শত মুখে তাহার প্রশংসা করিয়াছেন, ইহা অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয়।

মিঃ লণ্ড বলিয়াছেন, যবদ্বীপের দক্ষিণপূর্ব্ব উপকূলে ক্ষীণ লবণাম্বুপ্রবাহবিচ্ছিন্ন এই দ্বীপটির বৈচিত্র্যে নয়ন-মন মুগ্ধ হয়। বালীদ্বীপের আয়তন প্রায় দুই সহস্র বর্গ-মাইল। জগতের সর্ব্বপ্রকার প্রাকৃতিক দৃশ্যের সমাবেশে এই দ্বীপটি সমলঙ্কৃত। গগনস্পর্শী সুবিশাল শৈলশ্রেণী, উত্তুঙ্গ গিরিরাজিপরিবেষ্টিত সুগভীর নীলাম্বু-সরোবর, নিবিড় তরুলতা-গুল্মাদি-সমাচ্ছাদিত নয়নাভিরাম উপত্যকা-শ্রেণী, কোথাও শ্যামায়মান তরঙ্গায়িত সুশোভন শষ্প-রাশি ও সমুন্নত ক্রমদলস্পর্দ্ধিত, অধিত্যকাসমলঙ্কৃত এই দ্বীপটি প্রাকৃতিক দৃশ্য-বৈচিত্র্যের তুলনায় ইংলণ্ডেরই কোন প্রমোদকাননবৎ প্রতীয়মান হয়। আবার কোথাও গ্রীষ্মপ্রধান দেশের ঘন বংশতমালতালীবনরাজি, কোথাও বা নবশস্যশ্যামল সুবিস্তৃত প্রান্তর ও নীলাকাশচুম্বী গিরি-সঙ্কুল তটলেখা, দীর্ঘায়ত তৃণশষ্পপরিপূরিত, তালীবন-রাজি বিরাজিত, নীলাম্বুচুম্বিত, বন্ধুরতাবর্জ্জিত সাগরবেলা, কোথাও বা তালীবনানী সীমান্তে সমুদ্রতটবিলম্বী পীতাভ সৈকত বিস্তার পর্য্যায়ক্রমে এই দ্বীপটির অনির্ব্বচনীয় শোভা পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছে।

মলয় সাগরবক্ষে বিরাজিত এই দ্বীপটির জলবায়ু অন্যান্য গ্রীষ্মপ্রধান দেশের জলবায়ুর তুলনায়, অন্ততঃ লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ! সমুদ্রতীরবর্ত্তী নিম্নভূমিতে স্নিগ্ধ মধুর রজনী, এবং উর্দ্ধস্থিত মাল-ভূমিতে শান্ত শীতল সমীরহিল্লোল নাতিশীতোষ্ণ-মণ্ডলের বায়ুপ্রবাহের ন্যায় সুখস্পর্শ। গ্রীষ্মপ্রধান দেশসুলভ সর্ব্বপ্রকার ফুলফল এখানে দেখিতে পাওয়া যায়, এবং উচ্চ ভূমিতে ইংলণ্ডের পুষ্প-সম্পদের অনুরূপ কুসুমরাশি, প্রস্ফুটিত গোলাপ, মধুমালতী, ভায়োলেট প্রভৃতি নয়ন-মনোলোভা পুষ্পরাশি সমীরণপ্রবাহে সুরভিধারা বিকিরণ করে।

বালীদ্বীপের বিশেষত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে বসিলে আরও একটি বিষয় হৃদয়ে গভীর বিস্ময়ের সঞ্চার করে। বালীনিবাসীরা আভিজাত্য-গৌরবে মালয় পলি-নেসীয় জাভানীদিগের নিকট-জ্ঞাতিকুটুম্ব হইলেও হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বী; হিন্দুর আচারব্যবহার-বর্জ্জিত যথেচ্ছাচারী যুবকরা পিতৃপিতামহের ধর্ম্মের পরিচয় দিতে হইলে যেমন কুণ্ঠিতভাবে বলে, মুই হ্যাঁদু,—ইহারা সেরূপ হিঁদু নহে, নিষ্ঠাবান্ হিন্দু, এবং হিন্দু দেব-দেবীর পূজার্চ্চনাদি আচারপদ্ধতির প্রতি অনুরক্ত। অথচ মালয় দ্বীপপুঞ্জের অন্যান্য সকল স্থানেই মুসলমানধর্ম্ম বা জড়চৈতন্যাধ্যাত্মবাদ' (এ্যানিমিজম) প্রচলিত।

সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে যখন হিন্দুধর্ম্মই পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইত, সেই সময় ভারত হইতে বহু নর-নারী বালীদ্বীপে গমন করিয়া বালীবাসীদিগকে সনাতনধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তাঁহারা তাহাদিগকে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াই নিরস্ত ছিলেন না, ভারতের জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য-কাব্য-নাটকাদির অনুশীলন দ্বারা তাহাদের হৃদয় জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন ; জননী বীণাপাণির বীণায় যে রাগিণী ঝঙ্কারিত হইয়াছিল, তাহা তাহাদের হৃদয় অননুভূতপূর্ব্ব পুলকে পূর্ণ করিয়াছিল ; ধর্ম্মে,জ্ঞানে, নীতিতে তাহাদের হৃদয় অলঙ্কৃত হইয়াছিল। এখনও বালীদ্বীপে তাহা প্রচলিত থাকিয়া অতীত হিন্দু-প্রভাবের পরিচয় জ্ঞাপন করিতেছে।

এইভাবে যবদ্বীপেও হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুর আচার-ব্যবহার ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়াছিল এবং তাহা উন্নতির উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়া খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ গৌরবে বিরাজিত ছিল। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতেই আরবের মুসলমানরা যবদ্বীপ আক্রমণ করিয়া অধিকার করিয়াছিল। সেই সময় যবদ্বীপের বহুসংখ্যক হিন্দু অধিবাসী বালীদ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করায় সেখানে হিন্দুর প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

বালীদ্বীপনিবাসী রণকুশল বীরেন্দ্রবৃন্দ হিন্দুর বলবিক্রম ও শৌর্য্য-বীর্য্যের পরিচয় দিয়া মুসলমানগণেরও শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিল ; এতদ্ভিন্ন অন্যান্য যে সকল বৈদেশিক মালয়দ্বীপে প্রথমে পদার্পণ করিয়াছিল, তাহারাও হিন্দুর বল-বীর্য্যের পরিচয় পাইয়াই জলধিকূলতল শৈলমালাসংরক্ষিত এই দ্বীপটিকে সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই তাহার নিকট বিদায় গ্রহণে বাধ্য হইয়াছিল। অবশেষে ওলন্দাজ জাতি বালীর অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া ইহার প্রতি নিখিল জগতের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছে।

বালীর রাজগণের মধ্যে নিত্যকালব্যাপী বিরোধ, এবং সমুদ্রোপকূলে বিধ্বস্ত অর্ণবপোত-লুণ্ঠন-লালসা-নিবৃত্তির জন্য ওলন্দাজরা দীর্ঘকাল-ব্যাপী ব্যয়-বহুল যুদ্ধবিগ্রহাদিতে লিপ্ত থাকিবার পর ১৯১১ খৃষ্টাব্দে তাহাদের দীর্ঘকালের চেষ্টা সফল করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই সময়েও, বালীর নয় জন হিন্দুরাজার রাজত্বকালের শেষভাগে, দুই জন হিন্দুরাজা বালীর অধীশ্বররূপে রাজদণ্ড পরিচালন ও প্রজাপালন করিতেছিলেন। তাঁহারা শত্রুহস্তে পরাজয় স্বীকার করা কাপুরুষের কার্য্য মনে করিয়া যখন দেখিলেন; পরাক্রান্ত শত্রুর অক্রমণে স্বাধীনতা রক্ষা করা তাঁহাদের সাধ্যাতীত, তখন ওলন্দাজ সৈনিকগণের তীক্ষ্ণাগ্র সঙ্গীনের সম্মুখে নির্ভীক বক্ষঃস্থল প্রসারিত করিয়া সপরিবারে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহারা বীরপুরুষের কাম্য অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন।

স্বাবলম্বী প্রজামণ্ডলী

কিন্তু আনন্দের বিষয় এই যে, বিজেতৃগণ বালীর অধিবাসিগণকে প্রকৃতপ্রস্তাবে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করিয়া এই দ্বীপটিকে ধ্বংসমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছেন, এবং ইহার দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যেরও উন্নতি হইতেছে। শিল্পীদের কেহ স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিবিধ কারুখচিত অলঙ্কারাদি, কেহ প্রস্তর ও কাষ্ঠ-ক্ষোদিত সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতেছে, কেহ নানা অদ্ভুতাকার অস্ত্রাদি প্রস্তুত করিতেছে। কৃষকরা এরূপ দক্ষতার সহিত কৃষিকর্ম্ম সম্পাদন করিতেছে যে, তাহাদের শস্যক্ষেত্রগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারা যায়, পর্ব্বতের উচ্চভূমি হইতেই কৌশলে জলসেচনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রাচীন-যুগের ব্যাবিলনের জলসেচন-প্রণালীর সহিত ইহার সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

বালীদ্বীপের অধিবাসীরা বহু শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে আত্মনির্ভরশীল, ইহারা উদরপূর্ত্তির জন্য ধান্য প্রভৃতি খাদ্যশস্য প্রচুরপরিমাণে উৎপন্ন করে ; এতদ্ভিন্ন এরূপ উৎকৃষ্ট কফি উৎপাদন করে যে, তাহা তাহারা যবদ্বীপে বিক্রয় করিয়া যে অর্থ সংগ্রহ করে, তদ্দ্বারা বহির্জগৎ হইতে তাহাদের প্রয়োজনানুযায়ী যাবতীয় বিলাসোপকরণ ক্রয়ে সমর্থ হয়।

বালীর অধিবাসিগণ প্রতীচীর নিকট কোনরূপ সাহায্য গ্রহণ না করিয়া তাহাদের সকল অভাব পূর্ণ করিতেছে। ওলন্দাজ-প্রবর্ত্তিত রাজনীতিও বৈদেশিক বণিক্‌গণের শোষণস্পৃহা হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছে ; এমন কি, খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারকগণকেও এখানে যে 'আস্তানা গাড়িতে দেওয়া' হয় নাই, তাহা সম্ভবতঃ সুবিবেচনারই কায হইয়াছে ; কারণ, বালীবাসীরা পরম নিষ্ঠাবান্, এবং বাহিরের কেহ আসিয়া যে তাহাদের ধর্ম্মবিশ্বাসে হস্তক্ষেপণ করিবে, ইহা তাহারা সহ্য করিতে প্রস্তুত নহে।

বালীবাসীদের মধ্যে হিন্দু-ধর্ম্মানুমোদিত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারি শ্রেণীই বর্ত্তমান। তাহাদের পল্লী-প্রান্ত সুদৃশ্য মন্দিরশ্রেণীর দ্বারা সুসজ্জিত, সেই সকল মন্দিরের গঠনপ্রণালী পিরামিডেরই অনুরূপ। মন্দিরগুলি অন্তঃপ্রাঙ্গণ ও বহিঃপ্রাঙ্গণ দ্বারা পরিবেষ্টিত; সেই সকল প্রাঙ্গণে বিভিন্ন সময়ে উৎসবের আয়োজন হইয়া থাকে। মন্দিরের বহির্দ্দেশে উজ্জ্বল সূর্য্যকিরণে, প্রস্ফুটিত কুসুমরাশির ও ধূপ-চন্দনাদির সুমিষ্ট সৌরভের আবেষ্টনের মধ্যে সকল পূজাই সম্পন্ন হয়।

ইহাদের গার্হস্থ্যজীবনে প্রাচীনযুগের অপদেবতাদের প্রভাবও পরিলক্ষিত হয়, এবং তাহাদের বাসভবনের পশ্চাদ্বর্ত্তী উদ্যানে সুন্দর সুন্দর দেব-মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। জন্ম-বিবাহাদি শুভানুষ্ঠান উপলক্ষে তাহাদের গৃহ-বিগ্রহের পূজা দেওয়া হয়। ঐ সকল মন্দিরে যে সকল বিগ্রহ-মূর্ত্তি অধিষ্ঠিত, তাহাদের মধ্যে শিবই প্রধান। কিন্তু বিষ্ণু, গণেশ ও হনুমানের মূর্ত্তিও সুপরিচিত; এতদ্ভিন্ন হিন্দু-ধর্ম্মবহির্ভূত অদ্ভুতাকৃতি মূর্ত্তিও কোথাও কোথাও দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল মূর্ত্তির মধ্যে একটি মূর্ত্তি উল্লেখযোগ্য—তাহা অর্দ্ধ-মনুষ্য ও অর্দ্ধ-মৎস্য মূর্ত্তি। ইহা প্রাচীন-যুগের ফিলিষ্টাইন-গণের দেবতা 'ডাগনে'র সহিত তুলনীয়। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এই মূর্ত্তিটিও 'ডাওয়াং' নামে পরিচিত! আরও একটি অদ্ভুত মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়—তাহা অর্দ্ধ-মনুষ্য অর্দ্ধ-জা [illegible] তাহার নাম 'লবঙ্গ'; (নরসিংহ কি?)

বালীদ্বীপের অধিবাসীর গৃহের পশ্চাতের উদ্যানে দেবস্থান

বালীদ্বীপের মন্দির

দেশীয় কুটীর

বালীদ্বীপে নগরের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। ইহার রাজধানী শিঙ্গারাদ্জার অধিবাসিসংখ্যা দশ সহস্রেরও কম! কিন্তু লক্ষ লক্ষ বালীবাসী পাষাণপ্রাচীর-বেষ্টিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে বাস করে। তাহাদের বাসভবন সাধারণতঃ কাঠ-পাথরে নির্ম্মিত। ইহারা কুকুর, হাঁস মুরগী প্রভৃতি পক্ষী এবং গরু মেষ ছাগ হইতে বরাহযুথ পর্য্যন্ত পুষিয়া মালয় উপদ্বীপের সর্ব্বত্র রপ্তানী করিয়া থাকে। স্থানীয় অশ্বের ব্যবসাও অল্পপরিমাণে প্রচলিত আছে।

ইহারা মোরগের লড়াই দেখিতে অত্যন্ত ভালবাসে; কিন্তু ওলন্দাজ কর্ত্তৃপক্ষ এই তামাসাটি আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন। ইহারা যাত্রা, থিয়েটার প্রভৃতি আমোদেও মাতিয়া থাকে। ভারতের দুই মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত হইতে এই সকল অভিনয়ের উপকরণ সংগৃহীত হয়। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, নাটকাভিনয়ে মালয় ভাষা ব্যবহৃত হয়; কারণ, বালীবাসীরা হিন্দু হইলেও হিন্দুস্থানের কোন ভাষার সহিত তাহাদের পরিচয় নাই।

চিতার উপর বালী দ্বীপের শবাধার

শবশোভাযাত্রায় মঙ্গলকামী আত্মার প্রতিমূর্ত্তি

বালীদ্বীপের পরম সৌভাগ্য, দারিদ্র্যের সহিত ইহার পরিচয় নাই। প্রায় সকল লোকেরই নিজের চাষের জমী আছে। এরূপ সুখী বালক-বালিকা অন্য কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় না। এ দেশের নারীজাতি অপেক্ষা অধিকতর স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যলাভের অধিকারিণী রমণীও প্রাচ্য ভূখণ্ডের অন্য কোন স্থানে দৃষ্টিগোচর হয় না। এখানে স্ত্রী-পুরুষ সমভাবে সংসার বহন করে। বালীর রমণী-সমাজ, কি অবরোধান্তরালে, কি রাজদ্বারে, সর্ব্বত্রই পুরুষের সহিত সমান গৌরবের অধিকার লাভ করিয়াছে। প্রাচ্য ভূখণ্ডের অন্য কোন দেশে স্ত্রীস্বাধীনতার এরূপ প্রাবল্য লক্ষিত হয় না; সুতরাং যাঁহারা এসিয়াখণ্ডের অন্য কোন দেশে নারী জাতির এরূপ স্বাধীনতা লক্ষ্য করেন নাই, এবং যাঁহারা 'স্ত্রীজাতিকে চিরদিনই পুরুষের অধীন বলিয়া জানেন, বালীতে নারী জাতির এইরূপ স্বাধীনতার পরিচয়ে তাঁহাদিগকে বিস্মিত হইতে হইবে।

বালীর নারীগণ যখন সুগঠিত দেহ 'সারং' (ঘাগরা) দ্বারা আবৃত করিয়া ক্ষিপ্রপদে রাজপথ দিয়া বাজার অভিমুখে ধাবিত হয়, তখন তাহাদের কটিদেশ হইতে দেহের উর্দ্ধভাগ নগ্ন থাকে, কিন্তু তাহাদের সুদৃশ্য মস্তকের উপর সুবিন্যস্ত পণ্যভার এবং তাহাদের উজ্জ্বল দেহ-কান্তির অনুরূপ বর্ণের পরিচ্ছদ দেখিলে তাহাদিগকে ব্রোঞ্জ-ধাতু-নির্ম্মিত মূর্ত্তিমতী দেবী বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু এই সকল দেববালা অবলীলাক্রমে মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়া পণ্যবীথির দুরূহ ক্রয়-বিক্রয় কার্য্যে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে।

মঞ্চসংলগ্ন সেতু—শবাধার ইহার উপর দিয়া নীত হয়

বালীদ্বীপের বাজারে নারীর প্রাধান্য

করে, এমন কি, সময়ে সময়ে পুরোহিতের কার্য্যও করিয়া থাকে। এই অদ্ভুত দেশে উচ্চ-শ্রেণীর রূপবতী ব্রাহ্মণীগণও জনসাধারণের সম্মুখে তাহাদের লাবণ্যময় অঙ্গসৌষ্ঠব ও কমনীয় মুখশ্রী উদ্ঘাটিত করিতে সঙ্কোচ বোধ করে না, অথচ ভারতে এই শ্রেণীর রমণী দূরের কথা, নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকরাও তাহাদের আত্মীয়-স্বজন ব্যতীত অন্যের সম্মুখে দেহশ্রী উদ্ঘাটিত করিতে কুণ্ঠিত হয়। তাহারাও ও-ভাবে জনসাধারণের সম্মুখে বাহির হয় না।
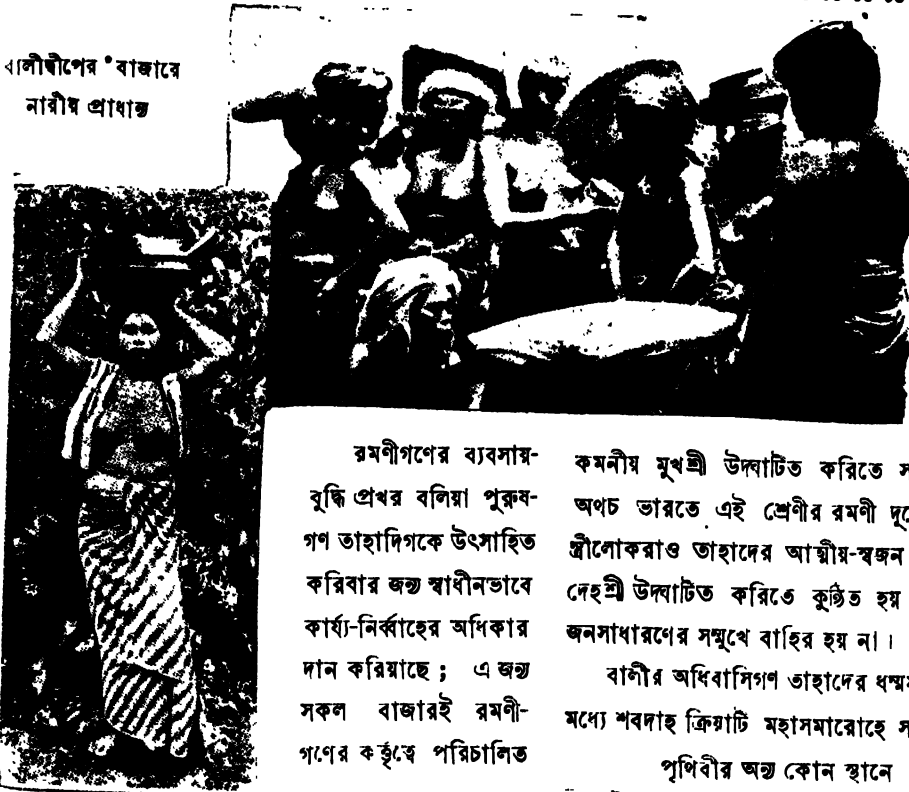
রমণীগণের ব্যবসায়-বুদ্ধি প্রখর বলিয়া পুরুষগণ তাহাদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য স্বাধীনভাবে কার্য্য-নির্ব্বাহের অধিকার দান করিয়াছে; এ জন্য সকল বাজারই রমণীগণের কর্ত্তৃত্বে পরিচালিত হয়। কিন্তু কেবল ক্রয়-বিক্রয়ের অধিকার লাভ করিয়াই এখানকার রমণীগণ নিশ্চিন্ত নহে, শস্যোৎপাদন কার্য্যেও তাহারা পুরুষগণকে যথেষ্ট সাহায্য করে। পুরুষগণের সহিত তাহারা প্রকাশ্যভাবে উপাসনাদি ধর্ম্মানুষ্ঠানে যোগদান

বালী দ্বীপের সুন্দরী নারী

গেলজেল মন্দিরের তোরণপথ

বালীর অধিবাসিগণ তাহাদের ধর্ম্মসংক্রান্ত অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে শবদাহ ক্রিয়াটি মহাসমারোহে সম্পন্ন করিয়া থাকে। পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে এরূপ দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয় না। মৃত ব্যক্তির সামাজিক মর্য্যাদানুসারে শবদাহ-ব্যয় নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। সম্ভ্রান্ত বংশের লোকের মৃত্যুর পর তাহার দেহ নানাপ্রকার সুগন্ধি মসলায় সুরভিত হইয়া কয়েক মাস সমাধি-মন্দিরে সংরক্ষিত হয়। ঐ সময় উত্তীর্ণ হইলে তাহা কাষ্ঠনির্ম্মিত একপ্রকার অদ্ভুতাকৃতি শবাধারে সংস্থাপিত হয়। এই শবাধারের ডালায় একটি গাভী-মূর্ত্তি ক্ষোদিত থাকে। জনসাধারণের বিশ্বাস, এই গাভী পরলোকে পুনর্জীবিত হইয়া মৃত ব্যক্তিকে পানীয় দুগ্ধদানে পরিতৃপ্ত করিবে।

শবদাহের তিন দিন পূর্ব্ব হইতে নানাপ্রকার ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। সেই তিন দিনের প্রথম দিন পুরোহিত শবদেহ দর্শনের পর তাহাতে শান্তিজল প্রক্ষেপ করেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পরে মৃতব্যক্তির মুখ-বিবরে মণি-মুক্তাখচিত একটি অঙ্গুরী রাখিয়া দেওয়া হয়, পুরোহিত সেই অঙ্গুরীটি বাহির করিয়া লইয়া তৎপরিবর্ত্তে স্বর্ণ, রৌপ্য, পিত্তল, লৌহ এবং সীসা—এই পঞ্চধাতুনির্ম্মিত পাঁচখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফলক সংস্থাপিত করেন;

প্রত্যেক ফলকে এক একটি দেবতার নাম লিখিত থাকে। প্রেতলোকে এই দেবগণই মৃতাত্মাকে রক্ষা করিয়া থাকেন।

দ্বিতীয় দিন পুরোহিত-গৃহে একটি শোভাযাত্রার ব্যবস্থা আছে। এই শোভাযাত্রার সহিত মৃতব্যক্তির প্রতিনিধিস্বরূপ বহুমূল্য মুদ্রা-রচিত প্রতিকৃতি এবং তাহার পূর্ব্বপুরুষগণের ব্যবহৃত পুরাতন পরিচ্ছদাদি বাহিত হইয়া থাকে। সাধারণের বিশ্বাস, এই অনুষ্ঠানের ফলে উক্ত পরিচ্ছদগুলির পূর্ব্বাধিকারীর আত্মা মর্ত্যলোকে আকৃষ্ট হইয়া তাহাদের মৃত আত্মীয়ের কল্যাণসাধন করিতে আসে। উহা ব্যতীত পারিবারিক আসবাবপত্র, পুষ্পদাম, মাল্য, জলপূর্ণ ঘট, তৈলপূর্ণ ভাণ্ড প্রভৃতি দ্রব্যও সেই শোভাযাত্রার সহিত বাহিত হইয়া থাকে। বালকগণ কৌতুকচ্ছলে বংশবেত্রাদি দ্বারা বৃহদাকার পিঞ্জর নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে থাকিয়া নৃত্যাদি দ্বারা দর্শকগণের মনোরঞ্জন করে। এই সকল বালককে পবিত্রাত্মা বলিয়া গণ্য করা হয়; জনপ্রবাদ, তাহারা অপবিত্র আত্মাগুলিকে লোকালয় হইতে বিতাড়িত করিতে পারে।

শোভাযাত্রা পুরোহিত-গৃহে উপস্থিত হইলে, সেখানে ধূপ-ধূনাদি দ্বারা অর্চ্চনা ও ঘণ্টাধ্বনি করা হয়। অতঃপর এক জন পুরোহিত-রমণী পুরোহিতের দক্ষিণ পদপ্রান্তে পূর্ব্বোক্ত মুদ্রা রচিত প্রতিকৃতির শিরোদেশ অবনমিত করে। পুরোহিত দ্বারা এই অপূর্ব্ব প্রণালীতে মৃতব্যক্তির পাপমোচন হইয়া থাকে। মৃতব্যক্তি জন্মান্তরে গৌরবর্ণ দেহ লাভ করিতে পারিবে, এই উদ্দেশ্যে মূল্যবান্ বস্ত্রাদি দগ্ধ করা হয়। জন্মান্তরে সে যাহাতে দীর্ঘকেশ লাভ করিতে পারে, এই উদ্দেশ্যে উৎকৃষ্ট সূত্রও দগ্ধ করা হয়। অতঃপর সূত্রনির্ম্মিত প্রতিকৃতি মৃতদেহের উপর সংস্থাপিত হয়।

তৃতীয় দিন—গীতবাদ্য ও উৎসবাদির আয়োজন হইয়া থাকে। এই সময় শবাধারটি উদ্যানস্থিত সমাধিমন্দিরে আনয়ন করিবার পর তাহা একটি উচ্চ মঞ্চে সংরক্ষিত হয়। এই মঞ্চটি বংশবেত্রাদিনির্ম্মিত ও বহু তালায় বিভক্ত। তাহা স্বর্ণরৌপ্যখচিত এবং তাহার মধ্যস্থলে দৈত্য-দানবাদির মূর্ত্তি বর্ত্তমান।

শবাধারটি মনুষ্যস্কন্ধবাহিত হইয়া শ্মশানভূমিতে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই পুরোহিত স্বর্ণনির্ম্মিত ধনুর্ব্বাণ লইয়া শোভাযাত্রার গতিরোধ করেন। অতঃপর তিনি চিতা-প্রান্তস্থিত শব লক্ষ্য করিয়া বাণ নিক্ষেপ করেন। কথিত আছে, এক রাজপুত্র ধর্ম্মের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেন বলিয়া তাঁহার ভীতিসঞ্চারের উদ্দেশ্যে কোন পুরোহিত একটি সর্প নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। রাজপুত্র সেই সর্পের ভয়ে ভীত হইয়া পুরোহিতের শরণাপন্ন হইলে

বালীনীয় ধানের মরাই

পুরোহিত সর্পটিকে বধ করিয়া রাজপুত্রের আতঙ্ক দূর করেন। তদবধি সম্ভ্রান্তবংশীয় কোন ব্যক্তির শবদাহের সময় পুরোহিত কর্ত্তৃক এই প্রকার অভিনয় অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে।

অতঃপর শবযানমঞ্চ দ্বারা তিনবার চিতা প্রদর্শন করাইলে অপবিত্র আত্মা পলায়ন করে। তখন বালকগণ একবার গতি স্থগিত করিয়া পুনর্ব্বার অগ্রসর হয়, তাহারা এই ভাবে একবার পশ্চাদাবর্ত্তন করিয়া এবং পুনর্ব্বার অগ্রসর হইয়া দেহ ও আত্মার জীবনসংগ্রামের অভিনয় করে। অবশেষে শবযানমঞ্চ চিতা-সন্নিধানে আনীত হইলে শবাধারটি মঞ্চ হইতে অপসারিত করিয়া চিতার

পার্শ্বে সংস্থাপিত করা হয়, এবং শবাধারের আবরণ উন্মোচিত হয়।

এইবার শবদেহে শান্তিজল প্রক্ষেপ ও পুষ্প বিকীর্ণ করা হয়। পুরোহিত একটি শ্বেতবর্ণ পুষ্প মৃত ব্যক্তির মুখে, দুইটি পুষ্পকোরক দুই নাসারন্ধ্রে স্থাপন করিয়া তাহার কর্ণদ্বয়ে মোম এবং চক্ষুর্দ্বয়ের উপর একখানি দর্পণ রাখিয়া পরলোকে তাহার সুন্দর মুখশ্রী ও বাগ্মিতার জন্য প্রার্থনা করেন। অতঃপর শবাধার পুনর্ব্বার আবৃত করা হয়। এই অবস্থায় এক জন মশালচি চিতা ও শবযানমঞ্চে অগ্নিসংযোগ করে এবং প্রজ্বলিত অগ্নিশিখায় এই অদ্ভুত অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হয়।

বালীদ্বীপে সাধারণতঃ হিন্দুধর্ম্ম প্রচলিত থাকিলেও দূরবর্ত্তী পল্লীসমূহে অহিন্দু আচরণের অনুষ্ঠানও দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল অনুষ্ঠানের মধ্যে 'ভূত-বিতাড়ন' একটি কৌতুকাবহ ও উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান।
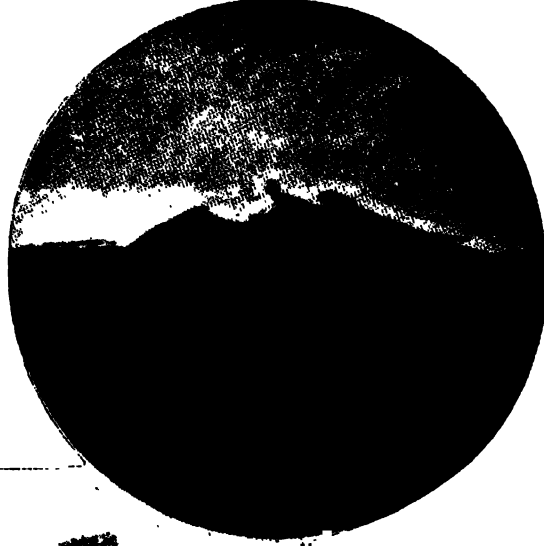
বাটোরের আগ্নেয়-গিরি

বালীদ্বীপের ধান্যক্ষেত্র

কোন গ্রামে দীর্ঘকাল যাবৎ ব্যাধি, পীড়া সংক্রামক হইলে বা দুর্দ্দৈবের প্রাদুর্ভাব হইলে গ্রামবাসিগণ পুরোহিতের নিকট সমবেত হইয়া নিবেদন করে—'দৈত্য-দানবের অত্যাচার অসহ্য হইয়াছে, অচিরাৎ ইহার প্রতিবিধানের প্রয়োজন।' তদনুসারে যে অনুষ্ঠান আরম্ভ করা হয়, তাহার বিবরণ নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

পুরোহিতগণ গ্রাম হইতে ভূত তাড়াইবার জন্য একটি শুভদিন নির্দ্ধারিত করেন। সেই শুভদিনে পুরোহিতরা গ্রামবাসীদিগকে সঙ্গে লইয়া একটি মন্দিরে গমন করিয়া থাকেন। সেই মন্দিরে ভোজনের আয়োজন করিয়া রাখা হয় এবং ভূত মহাশয়রাও যথারীতি নিমন্ত্রিত হইয়া থাকেন।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে মন্ত্রাদি পঠিত হয় এবং বহুসংখ্যক গ্রামবাসী সমবেত হইয়া প্রজ্বলিত মশাল হাতে চতুর্দ্দিকে ধাবিত হয়। তাহাদের সহস্র কণ্ঠস্বরে প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহদ্বার প্রতিধ্বনিত করিয়া গৃহকোণে লুক্কায়িত ভূতগণকে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ভোজে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করা হয়। জনসাধারণের বিশ্বাস, ভূতরা এই নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে না।

অতঃপর গ্রামবাসীরা মন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করে। তাহারা কল্পনা করে, নিমন্ত্রিত ভূতরা ভোজনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এই সময়ে পুরোহিতরা ভূতগুলাকে নির্দ্দিষ্ট গ্রাম ত্যাগ করিবার বিধান দান করেন।

ভূতরা গ্রাম ত্যাগ করিয়াছে, ইহা সপ্রমাণ করিবার জন্য এই অনুষ্ঠানের পর তিন দিন গ্রামের সকল কার্য্য স্থগিত রাখা হয়। কোন গৃহে রন্ধন হয় না, গ্রামবাসীরা মৌনী থাকে; মনে হয়, গ্রাম জনশূন্য। বালীবাসীদের বিশ্বাস, এই পন্থা অবলম্বন করিলে ভূতরা গ্রাম ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়।

এসিয়াখণ্ডের অন্যান্য জাতির ন্যায় বালীর অধিবাসিগণ নানা বিচিত্র লোকাচারপদ্ধতির অনুসরণ করে; এখানে তাহার দুই একটির বিবরণ লিখিত হইল।

এই দ্বীপে ধান্য উৎপাদনের জন্য নানাবিধ অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে। এই সকল অনুষ্ঠানের আলোচনা করিলে সভ্যতার আদিম অবস্থায় ভূকর্ষণ কার্য্যাদি কি প্রকারে সম্পন্ন হইত, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। ধান্য-চ্ছেদন আরম্ভকালে কৃষক ধান্যক্ষেত্র হইতে প্রথম দুই গুচ্ছ ধান্যশীর্ষ লইয়া স্ত্রী-পুরুষ রচনা করে। ইহাদিগকে শস্য-দম্পতি-স্বরূপ গণ্য করা হয়। ধান্যচ্ছেদন শেষ হইলে এই ধান্য-রচিত দম্পতি লইয়া গিয়া শস্যার উপর প্রতিষ্ঠিত করা হয় এবং তাহাদের ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর শস্য-বৃদ্ধির কামনা করা হয়। অতি দুর্দ্দিনে, এমন কি, দুর্ভিক্ষের সময়েও বালীবাসীরা এই ধান্য-দম্পতির ধান্য উদরসাৎ করিবার চিন্তাকে মনেও স্থান দিতে পারে না।

মিঃ লণ্ড লিখিয়াছেন, "বালীর একটি পল্লী অঞ্চলে এক দিন ভ্রমণ করিতে করিতে একটি ধান্যক্ষেত্র হইতে ভীষণ কোলাহল ও মেঘবৎ ধূলিরাশি উত্থিত হইতে দেখিলাম। কিন্তু পথের দিকে উচ্চ বেড়া থাকায় কিছুই দেখিতে পাইলাম না। অবশেষে কারণানুসন্ধানে জানিতে পারিলাম, এক-জোড়া বলদ দিয়া সেই জমী চাষ করা হইতেছিল। প্রত্যেক বলদের গলার নীচে এক একটি প্রকাণ্ড জয়ঢাক ঝুলিতেছিল; তাহা বৃটিশ অশ্বারোহী সৈন্যদলের কেটলড্রমের কতকটা অনুরূপ; অত্যন্ত পুরু ও পাতলা—এই উভয়বিধ চর্ম্ম দ্বারা নির্ম্মিত। আমি যখন সেই ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলাম, তখন বলদ দুইটি লাঙ্গল ঘাড়ে লইয়া সেই কর্ষিত ক্ষেত্রের একপ্রান্তে দাঁড়াইয়া ছিল। কিন্তু কৃষাণ তাহাদের পৃষ্ঠে লাঠি স্পর্শ করায় বলদ দুইটি প্রথমে দুল্‌কি চালে চলিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু অবশেষে তাহারা ঢাকের শব্দে ভয় পাইয়া প্রবলবেগে দৌড়াইতে লাগিল। সেই ঢাকের ভিতর কতকগুলি পাথরের নুড়ি থাকায় তাহাদের আঘাতে ঢাক হইতে ঐরূপ শব্দ উত্থিত হইতেছিল।
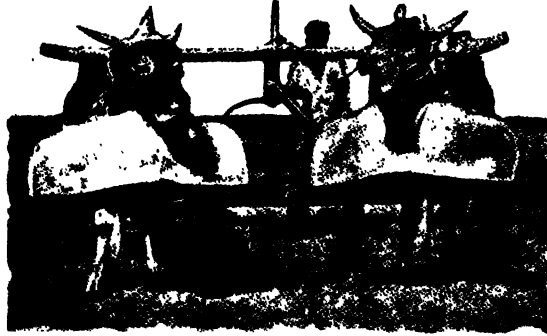
জয়ঢাকযুক্ত বলীবর্দ্দ—লাঙ্গল টানিতেছে।

"আমি স্বয়ং না দেখিলে এই অদ্ভুত ব্যাপার বিশ্বাস করিতাম না। কিন্তু আমি সেই কৃষককে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে আমাকে জানাইল, এই উপায়ে নির্দ্দিষ্ট সময়মধ্যে তাহার অধিক জমী চাষ হইয়া থাকে।"

মিঃ লণ্ড তাঁহার প্রবন্ধের উপসংহারে আর একটি অদ্ভুত ঢাকের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন,—"এই দ্বীপের মধ্যস্থলে তাম্পাকে শিরিং নামক একটি বিখ্যাত পার্ব্বত্যমন্দির আছে, তাহা দেখিতে যাইবার সময় আমাকে পেজেং নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রাম অতিক্রম করিতে হয়। এই গ্রামে একটি অদ্ভুতাকৃতি পাষাণময় মন্দির আছে। সেই মন্দিরে ধাতুনির্ম্মিত একটি ঢাক সংরক্ষিত হইয়াছে। সেই ঢাকের উর্দ্ধাংশে বহুসংখ্যক অদ্ভুতাকৃতি নরমুণ্ড ক্ষোদিত আছে। ভূতল হইতে প্রায় পনের ফুট উর্দ্ধে পাথরের জালিকাটা বাতায়নের সম্মুখে তাহা সংরক্ষিত হইয়াছে।

"এই ঢাকটি কোথা হইতে আসিয়াছিল, তাহা কেহই বলিতে পারে না। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে সুবিখ্যাত ওলন্দাজ উদ্ভিদ্‌বিদ্যাবিশারদ রামফিয়ন বালীদ্বীপ ভ্রমণে আসিয়া এই ঢাকটি দেখিতে পাইয়াছিলেন। জনশ্রুতিতে প্রকাশ, ঐ স্থানে উহা চিরদিনই আছে। বালীবাসিগণ এই ঢাকটি মহাসম্মানের বস্তু বলিয়া মনে করিয়া থাকে, এবং কোন বিদেশী ইহা যে কাছে গিয়া পরীক্ষা করিবে—ইহাতে তাহাদের মহা আপত্তি! আমি উহা পরীক্ষার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে আমার মোটরকারের দেশীয় 'সফেয়ার' আমাকে এই কার্য্যে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিল; এবং আমি উহা পরীক্ষার জন্য মন্দিরে উঠিতে আরম্ভ করিলে চতুর্দ্দিকের জনতা হইতে অসন্তোষের গুঞ্জন উত্থিত হইল।

"যাহা হউক, আমি মন্দিরের উর্দ্ধে উঠিয়া আমার ছুরী দ্বারা সেই ঢাকের পটহ বিদীর্ণ করিলাম, ইহাতে যে সুগম্ভীর ঝন্‌ঝনা-ধ্বনি উত্থিত হইল, সেই ঝঙ্কারের বিপুলতায় আমি বিস্মিত হইলাম।

"আমি নীচে নামিয়া চারিদিকেই গ্রামবাসীদের ভীতি-বিহ্বল মুখ দেখিতে পাইলাম। তাহারা অস্ফুটস্বরে বলাবলি করিতেছিল, যে অধার্ম্মিক বিদেশী পেজেংএর ঢাক স্পর্শ করিতে সাহস করিয়াছে, তাহার নিশ্চিতই অকল্যাণ হইবে।

"তাহাদের মন্তব্য শুনিয়া আমি মনে মনে বলিলাম, তাহাদের ঐ সকল কথা বাজে কথা মাত্র। আমি কাহারও ধর্ম্মবিশ্বাসে হস্তক্ষেপণ করি নাই বা কোন অপরাধ করি নাই। অতঃপর আমি তাম্পাকে শিরিং 'অভিমুখে যাত্রা করিলাম। সে দিন আকাশ বেশ পরিষ্কার ছিল, উজ্জ্বল রৌদ্রে চতুর্দ্দিক্ ঝলমল করিতেছে। আকাশের কোন অংশে মেঘের চিহ্নমাত্র ছিল না। আমি তাম্পাক শিরিং-এর চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম, এবং মুক্ত প্রকৃতির অপরূপ শোভা প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিয়া ধন্য হইলাম।

"কিন্তু সহসা গগনপ্রান্তে একখানি ক্ষুদ্র কৃষ্ণবর্ণ মেঘের সঞ্চার হইল; তাহা এরূপ অসাধারণ বেগে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল যে, তাহা দেখিয়া আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তাহার পর সুদূর মেঘমণ্ডলে কি ভীষণ বিজলী-প্রভা! সঙ্গে সঙ্গে কড়-কড়নাদে মেঘগর্জ্জন। অল্পকাল পরেই মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। যাহা হউক, শতবজ্রনাদ সহ ভীষণ ঝটিকা আরম্ভ হইতেই আমি দ্রুতবেগে আমার গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম।

"আমরা ফিরিয়া চলিলাম। কিন্তু আমার গাড়ী দশ বারো গজ অগ্রসর হইতে না হইতে একটা প্রচণ্ড আলোক-স্ফুরণে আমার চক্ষু ধাঁধিয়া গেল এবং শত মেঘগর্জ্জনবৎ শব্দ করিয়া আমার শকটের অদূরে একটি উল্কাপাত হইল। সেই উল্কাটি সবেগে পথিপ্রান্তে প্রোথিত হইল। আমি তখন আমার বিবেকের নিকট অপরাধী; আমার মনে হইল, পেজেংএর সেই ঢাকের কর্ম্মী দেবতা এইভাবে প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিল। কিন্তু এই ব্যাপার কাকতালীয়বৎ হইলে তাহাতে বিস্ময়ের কারণ ছিল না। কিন্তু যে কার্য্যে ঐরূপ সঙ্কটের আশঙ্কা ছিল, সেরূপ কার্য্যে আমি পরে আর কোন দিন হস্তক্ষেপণ করিতে সাহস করি নাই।"

বালীদ্বীপের উল্লেখযোগ্য অদ্ভুত দৃশ্যের মধ্যে বাটোরের দ্বিশৃঙ্গ আগ্নেয়গিরি অন্যতম। এই সুবৃহৎ আগ্নেয়গিরি বহু শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান। ইহার পার্শ্ব লাভা-প্রবাহের কৃষ্ণবর্ণ স্তরে আচ্ছন্ন হইয়াছে। ইহার পাদদেশে একটি সুন্দর হ্রদ নীলাম্বুরাশি বক্ষে লইয়া মনোহর শোভা বিকাশ করিতেছে। তীরবর্ত্তী বৃক্ষশ্রেণী সেই জলে তাহাদের হরিৎছায়া প্রতিফলিত করিতেছে।

বালীবাসীরা বলিয়া থাকে, শিব-মহিষী দুর্গা এই হ্রদে বাস করেন, এবং শিব বাটোরের বহু ঊর্দ্ধস্থিত এবং পর্ব্বতের কুজ্ঝটিকা-সমাচ্ছাদিত তুঙ্গ শৃঙ্গে অবস্থিতি করেন। বাটোরের আগ্নেয়গিরি হইতে মধ্যে মধ্যে যখন অগ্নিরাশি উদ্গির্ণ হইয়া নদীস্রোতের ন্যায় লাভাস্রোতে গিরিপাদ-মূলস্থিত সমতল প্রদেশ পরিপ্লাবিত করিতে উদ্যত হয়, সে ভীষণ দৃশ্য সন্দর্শন করিয়া স্থানীয় অধিবাসীরা পরস্পর বলাবলি করে, দেবতাদিগের শিব অচলাম্বর পরিধান করিয়া তাঁহার হ্রদবিহারিণী মনোমোহিনীকে আলিঙ্গন করিতে ধাবিত হইয়াছেন! জনসাধারণ তাঁহার বজ্রগতি প্রশমিত করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য প্রার্থনা করে। সেই ভীষণ আগ্নেয়গিরির নীচে একস্থানে না কি এই লাভাস্রোত একবার অবরুদ্ধ হইয়া উপাসনানিরত গ্রামবাসীদিগকে রক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু তাহার পর পুনর্ব্বার যখন শিব তাঁহার প্রিয়তমার সহিত মিলিত হইবার জন্য ধাবিত হইয়াছিলেন, সে সময় তিনি গ্রামবাসিগণকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার বজ্রগতি প্রতিহত করেন নাই!

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

মৃৎপ্রদীপ

[জাতিস্মরের স্বপ্ন]

১

প্রাণিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতরা মাটী খুঁড়িয়া অধুনালুপ্ত প্রাগৈতিহাসিক জীবের যে সকল অস্থি-কঙ্কাল বাহির করেন, তাহাতে রক্তমাংস সংযোগ করিয়া তাহার জীবিতকালের বাস্তব মূর্ত্তিটি তৈয়ার করিতে গিয়া অনেক সময় তাঁহাদিগকে নিছক কল্পনার আশ্রয় লইতে হয়! ফলে যে মূর্ত্তি সৃষ্টি হয়, সত্যের সহিত তাহার সাদৃশ্য আছে কি না এবং থাকিলেও তাহা কত দূর, সে সম্বন্ধে মতভেদ ও বিবাদ-বিসম্বাদ কিছুতেই শেষ হয় না!

আমাদের দেশের ইতিহাসও কতকটা ঐ ভূ-প্রোথিত অতিকায় জন্তুর মত। যদি বা বহুক্লেশে সমগ্র কঙ্কালটুকু পাওয়া যায়, তাহাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হওয়া দূরের কথা, তাহার সজীব চেহারাখানা যে কেমন ছিল, তাহা আংশিকভাবে প্রতিপন্ন হইবার পূর্ব্বেই বড় বড় পণ্ডিতরা অসংযতভাবে এমন মারামারি কাটাকাটি সুরু করিয়া দেন যে, রথী-মহারথ ভিন্ন অন্য লোকের সে কুরুক্ষেত্রের দিকে চক্ষু ফিরাইবার আর সাহস থাকে না। যুদ্ধের অবসানে শেষ পর্য্যন্ত সেই কঙ্কালের বিভিন্ন হাড় কয়খানাই রণাঙ্গণে ইতস্ততঃ পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়!

তাই যখনই আমাদের জন্মভূমির এই কঙ্কালসার ইতিহাসখানা আমার চোখে পড়ে, তখনই মনে হয়, ইহা হইতে আসল বস্তুটির ধারণা করিয়া লওয়া সাধারণ লোকের পক্ষে কত না দুরূহ ব্যাপার। যে মৃৎপ্রদীপের কাহিনী লিখিতে বসিয়াছি, তাহারই কথা ধরি না কেন। প্রাচীন পাটলিপুত্রের যে সামান্য ধ্বংসশেষ খনন করিয়া বাহির করা হইয়াছে, তাহারই চারিপাশে স্বপ্নাবিষ্টের মত ঘুরিতে ঘুরিতে জঞ্জাল-স্তূপের মধ্যে এই মৃৎপ্রদীপটি কুড়াইয়া পাইয়াছিলাম। নিতান্ত একেলে সাধারণ মাটীর প্রদীপের মতই তাহার চেহারা, ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া প্রায় কাগজের মত পাতলা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এতকাল পরেও তাহার মুখের কাছটিতে একটুখানি পোড়া দাগ লাগিয়া আছে। এই নোনাধরা জীর্ণ, বিশেষত্ববর্জ্জিত প্রদীপটি দেখিয়া কে ভাবিতে পারে যে, উহার মুখের ঐ কালীর দাগটুকু একদিন ইতিহাসের একটি পৃষ্ঠাকে একবারে কালো করিয়া দিয়াছিল এবং উহারই ঊর্দ্ধোত্থিত ক্ষুদ্র শিখার বহ্নিতে একটা রাজ্য পুড়িয়া ছারখার হইয়া গিয়াছিল?

অনুসন্ধিৎসু ঐতিহাসিকরা বোধ করি অবহেলা করিয়া এই তুচ্ছ প্রদীপটা ফেলিয়া দিয়াছিলেন, মিউজিয়মে স্থান দেন নাই। আমি সযত্নে কুড়াইয়া আনিয়া সন্ধ্যার পর আমার নির্জ্জন ঘরে মধু-মিশ্রিত গব্য ঘৃত দিয়া উহা জ্বালিলাম। কতদিন পরে এ প্রদীপ আবার জ্বলিল? পুরাবৃত্তের কোন্ মসীলিপ্ত অধ্যায়কে আলোকিত করিল? বিজ্ঞ পুরাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতরা তাহা কোথা হইতে জানিবেন? উহার অঙ্গে ত তাম্রশাসন, শিলালিপি নাই! সে কেবল আমার, এই জাতিস্মরের—মস্তিষ্কের মধ্যে দূরপনেয় কলঙ্কের কালিমা দিয়া মুদ্রিত হইয়া আছে।

প্রদীপ জ্বলিলে যখন ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া বসিলাম, তখন নিমেষমধ্যে এক অদ্ভুত ইন্দ্রজাল ঘটিয়া গেল। স্তম্ভিত কাল যেন অতীতের সঙ্গী এই প্রদীপটাকে আবার জ্বলিয়া উঠিতে দেখিয়া বিস্মিত দৃষ্টিতে পিছু ফিরিয়া তাকাইয়া রহিল। এই পাটলিপুত্র সহর মন্ত্রবলে পরিবর্ত্তিত হইয়া কবেকার এক অখ্যাত মগধেশ্বরের মহাস্থানীয় রাজধানীতে পরিণত হইল। আর আমার মাথার মধ্যে যে স্মৃতিপুত্তলিগুলি এতক্ষণ স্বপ্নের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, তাহারা সজীব স্পষ্ট হইয়া আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র ঘটনা—কত নগণ্য অনাবশ্যক কথা—এই বর্ত্তিকার আলোকে দীপ্তমান, সজীব, স্পষ্ট হইয়া আমার সম্মুখ হইতে বর্ত্তমান মুছিয়া একাকার হইয়া গেল, কেবল অতীতের বহুদূর—জন্মান্তরের বিচ্ছিন্ন কাহিনীর স্মৃতি ভাস্বর হইয়া জ্বলিতে লাগিল।

সেই প্রদীপ সম্মুখে ধরিয়া তাহার আলোতে আজ এই কাহিনী লিখিতেছি।

২

আজ হইতে ১৬ শতাব্দী আগেকার কথা।

ক্ষুদ্র ভূস্বামী ঘটোৎকচগুপ্তের পুত্র চন্দ্রগুপ্ত লিচ্ছবি রাজ-বংশে বিবাহ করিয়া শ্যালককুলের বাহুবলে পাটলিপুত্র

বসুমতী-প্রেস]   গৌরীর চিত্র-দর্শন   [শিল্পী—শ্রীচারুচন্দ্র সেনগুপ্ত

দখল করিয়া রাজা হইলেন। রাজা হইলেন বটে, কিন্তু নামে মাত্র। পট্টমহাদেবী লিচ্ছবিদুহিতা কুমার-দেবীর দুর্দ্ধর্ষ প্রতাপে চন্দ্রগুপ্ত মাথা তুলিতে পারিলেন না। রাজমুদ্রায় রাজার মূর্ত্তির সহিত মহাদেবীর মূর্ত্তি ও লিচ্ছবিকুলের নাম উৎকীর্ণ হইতে লাগিল। রাজার নামে রাণী স্বেচ্ছামত রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। রাজা দুই একবার নিজ আজ্ঞা প্রচার করিতে গিয়া দেখিলেন, তাঁহার আজ্ঞা কেহ মানে না। চন্দ্রগুপ্ত বীর-পুরুষ ছিলেন, তাঁহার আত্মাভিমানে আঘাত লাগিল, কিন্তু কিছুই করিতে পারিলেন না। নিষ্ফল ক্রোধে শক্তিশালী শ্যালককুলের প্রতি বক্রদৃষ্টিপাত করিয়া তিনি মৃগয়া, সুরা ও দ্যূতক্রীড়ায় মনোনিবেশ করিলেন।

প্রজাদের তাহাতে বিশেষ আপত্তি ছিল না। রাজা বা রাণী যিনিই রাজত্ব করুন, তাহাদের কিছু আসে যায় না। মহামারী, দুর্ভিক্ষ অথবা যুদ্ধের হাঙ্গামা না থাকিলেই তাহারা সন্তুষ্ট। কাণ্ব-বংশ লুপ্ত হইবার পর বহুবর্ষব্যাপী যুদ্ধ-বিগ্রহ, অন্তর্বিবাদে দেশ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। প্রকাণ্ড মগধ সাম্রাজ্য বিষ্ণুচক্রে ছিন্ন সতী-দেহের ন্যায় খণ্ড খণ্ড হইয়া বহু ক্ষুদ্র রাজ্যের সমষ্টিতে দাঁড়াইয়াছিল। ক্ষুদ্র রাজারা ক্ষুদ্র কারণে পরস্পরে কলহ করিয়া প্রজার দুর্গতি বাড়াইয়া তুলিয়াছিলেন। এই সময় চন্দ্রগুপ্ত পাটলিপুত্র ও তাহার পারিপার্শ্বিক ভূখণ্ড অধিকার করিয়া কিছু শান্তি আনয়ন করিয়াছিলেন। শান্তিতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পাইয়া প্রজারা তৃপ্ত ছিল, রাজা বা রাণী—কে প্রকৃতপক্ষে রাজ্যশাসন করিতে-ছেন, তাহা দেখিবার তাহাদের প্রয়োজন ছিল না।

যাহা হউক, তরুণী পট্টমহিষী একমাত্র শিশুপুত্র সমুদ্র-গুপ্তকে ক্রোড়ে লইয়া রাজ-অবরোধ হইতে প্রজাশাসন করিতেছেন, দেশে নিরুপদ্রব শান্তিশৃঙ্খলা বিরাজ করিতেছে, এমন সময় একদিন শরৎকালের নির্ম্মল প্রভাতে মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত নগরোপকণ্ঠের বনমধ্যে মৃগয়া করিতে গেলেন। মহারাজ মৃগয়ায় যাইবেন, সুতরাং পূর্ব্ব হইতে বনমধ্যে বস্ত্রাবাস ছাউনি পড়িল। কারুকার্য্যখচিত রক্তবর্ণের পট্টা-বাস সকল অকালপ্রফুল্ল কিংশুকগুচ্ছের ন্যায় বনস্থলী আলোকিত করিল। কিঙ্করী, নর্ত্তকী, তাম্বুলিক, সম্বাহক, সূপকার, নহাপিত প্রভৃতি বহুবিধ দাসদাসী কর্ম্ম-কোলাহলে ও আনন্দ-কলরবে কাননলক্ষ্মীর নির্জ্জন শান্তি ভঙ্গ করিয়া দিল। তারপর যথাসময়ে পারিষদ-পরিবেষ্টিত হইয়া সুরারুণ-নেত্র মগধেশ্বর মৃগয়াস্থলে উপস্থিত হইলেন।

প্রভাতে দ্যূতক্রীড়া ও তিত্তিরি-যুদ্ধ দর্শন করিয়া চন্দ্রগুপ্ত আনন্দে কালহরণ করিলেন। দ্বিপ্রহরে পান-ভোজনের পর অন্য সকলকে শিবিরে রাখিয়া মাত্র চারিজন বয়স্য সঙ্গে মহারাজ অশ্বারোহণে অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বয়স্যরা সকলেই মহারাজের সমবয়স্ক যুবা, সকলেই সমান লম্পট ও উচ্ছৃঙ্খল। চাটুমিশ্রিত ব্যঙ্গ-পরিহাস করিতে করিতে তাহারা মহারাজের সঙ্গে চলিল।

মৃগ-অন্বেষণে বিচরণ করিতে করিতে প্রায় দিবা তৃতীয় প্রহরে এক ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর কূলে সহসা তাঁহাদের গতিরোধ হইল। সর্ব্বাগ্রে মহারাজ দেখিলেন, তটিনীর উচ্চ তটের উপর ছিন্নমৃণাল কুমুদিনীর মত এক নারীমূর্ত্তি পড়িয়া আছে। দেহে বস্ত্র কিম্বা আভরণ কিছুই নাই—সম্পূর্ণ নগ্ন। কণ্ঠে, প্রকোষ্ঠে, কর্ণে অল্প রক্ত ছিল। দেখিলে বুঝা যায়, দস্যুতে ইহার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া পলাইয়াছে।

রাজা ত্বরিতপদে অশ্ব হইতে নামিয়া রমণীমূর্ত্তির নিকটে গেলেন। নির্নিমেষ নেত্রে তাহার নগ্ন দেহ-লাবণ্যের দিকে চাহিয়া রহিলেন। নারীর বয়স ষোড়শ কি সপ্তদশের অধিক হইবে না। নবোদ্ভিন্ন যৌবনের পরিপূর্ণ বিকসিত রূপ রাজা দুই চক্ষু ভরিয়া পান করিতে লাগিলেন। তাহার পর নতজানু হইয়া সন্তর্পণে রমণীর বক্ষে হস্তার্পণ করিয়া দেখিলেন—প্রাণ আছে, দ্রুত হৃৎস্পন্দন অনুভূত হইতেছে।

বয়স্য চারিজন ইতিমধ্যে রাজার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল ও লুব্ধদৃষ্টিতে সংজ্ঞাহীনার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিতেছিল। সহসা রাজা তাহাদের দিকে ফিরিয়া কহিলেন,—"এ নারী কাহার?"

রাজার আরক্ত মুখমণ্ডল ও চক্ষুর ভাব দেখিয়া বয়স্য-গণ পরিহাস করিতে সাহসী হইল না। এক জন কুণ্ঠাজড়িত কণ্ঠে বলিল, "রাজ্যের সকল নর-নারীই মহারাজের।"

মহারাজ বোধ করি অন্য কিছু ভাবিয়া এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু এইরূপ উত্তর পাইয়া তিনি প্রদীপ্ত দৃষ্টিতে দ্বিতীয় বয়স্যের দিকে ফিরিলেন। পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, "এ নারী কাহার?"

মন বুঝিয়া বয়স্য বলিল,—"মহারাজের।"

তৃতীয় বয়স্যের দিকে ফিরিয়া চন্দ্রগুপ্ত জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিলেন।

কিন্তু তৃতীয় বয়স্য—সে অন্তরের দুর্দ্দম লালসা গোপন করিতে পারিল না—ঈষৎ হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল;—দস্যু-উপদ্রুতা নারী শ্রীমৎ মগধেশ্বরের ভোগ্যা নয়। এই নারীদেহটা মহারাজ অধমকে দান করুন।

বারুণী-কষায়িত নেত্র কিছুক্ষণ তাহার মুখের উপর স্থাপন করিয়া মহারাজ উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। বলিলেন "বিট, স্বর্গের পারিজাত লইয়া তুই কি করবি? এ কুসুম আমার।" এই বলিয়া উষ্ণীষ খুলিয়া সূক্ষ্ম বস্ত্র-জালে রমণীর সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া দিলেন।

লুব্ধ বয়স্য তখনও আশা ছাড়ে নাই—রূপসীর প্রতি সতৃষ্ণ একটা কটাক্ষ হানিয়া বলিল,—"কিন্তু মহারাজ, এ অনুচিত। পট্টমহাদেবী শুনিলে—"

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ন্যায় রাজা ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। কর্কশ কণ্ঠে কহিলেন,—"পট্টমহাদেবী? ওরে পীঠমর্দ্দ, পট্টমহাদেবী আমার ভর্ত্রী নয়, আমি তাঁর ভর্ত্তা—বুঝলি? এ রাজ্য আমার, এ নারীও আমার—পট্টমহাদেবীর নয়।"

এই আকস্মিক উগ্র ক্রোধে বয়স্যগণ ভয়ে নিশ্চল বাক্‌শূন্য হইয়া গেল। চন্দ্রগুপ্ত নিজেকে কিঞ্চিৎ সংযত করিয়া কহিলেন,—"এই নারীকে আমি মহিষীরূপে গ্রহণ করিলাম। বয়স্যগণ, মহাদেবীকে প্রণাম কর।"

যন্ত্রচালিতবৎ বয়স্যগণ প্রণাম করিল।

তখন সেই সংজ্ঞাহীন দেহ সন্তর্পণে তুলিয়া লইয়া মহারাজ অশ্বারোহণে শিবিরে ফিরিয়া চলিলেন। মূর্চ্ছিতার অবেণীবদ্ধ মুক্ত কুন্তল কৃষ্ণ ধূমকেতুর মত পশ্চাতে উড়িতে উড়িতে চলিল।

শিবিরে ফিরিয়া সংজ্ঞালাভ করিবার পর রমণী যে পরিচয় দিল, তাহা এইরূপ:—

তাহার নাম সোমদত্তা। সে শ্রাবস্তীর এক শ্রেষ্ঠীর কন্যা, পিতার সহিত চম্পাদেশে যাইতেছিল, পথে দস্যু কর্ত্তৃক অপহৃতা হয়। তাহার পিতাকে দস্যুরা মারিয়া ফেলে। অতঃপর দস্যুপতি তাহার রূপযৌবন দেখিয়া তাহাকে আত্মসাৎ করিতে মনস্থ করে। অন্য দস্যুগণ তাহাতে ঘোরতর আপত্তি করিল। ফলে তাহারা পরস্পরের সহিত বিবাদ-বিসম্বাদ আরম্ভ করিল এবং একে অন্যের সহিত পশ্চাদ্ধাবন করিতে গিয়া যাহাকে লইয়া কলহ, তাহাকেই অরক্ষিত ফেলিয়া গেল। যাইবার সময় একজন চতুর দস্যু, পাছে সোমদত্তা কোথাও পলায়ন করে, এই ভয়ে তাহার বস্ত্র কাড়িয়া লইয়া তাহাকে অজ্ঞান করিয়া রাখিয়া যায়।

যথাকালে চন্দ্রগুপ্ত সোমদত্তাকে দোলায় তুলিয়া নগরে লইয়া গেলেন। শাস্ত্রমত বিবাহ হইল কি না জানা গেল না, যদি বা হইয়া থাকে, তাহা গান্ধর্ব্ব কিম্বা পৈশাচ-জাতীয়। যাহা হউক, দাসী-সহচরীপরিবৃতা সোমদত্তা রাজপুরীর পুরস্ত্রী হইয়া বাস করিতে লাগিল। তাহার অবস্থানের জন্য মহারাজ একটি স্বতন্ত্র মহল নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।

কুমারদেবী রাজার এই দুষ্মন্ত উপাখ্যান শুনিলেন, কিন্তু ঘৃণাভরে কোনও কথা বলিলেন না। বিশেষতঃ, সেকালে রাজাদের পক্ষে ইহা এমন কিছু গর্হিত কার্য্য ছিল না। একাধিক পত্নী ও উপপত্নী সকল রাজ-অন্তঃপুরেই স্থান পাইত। এমন কি, প্রকাশ্য বেশ্যাকে বিবাহ করাও রাজন্য-সমাজে অপ্রচলিত ছিল না। কুমারদেবী অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত পুত্রকে সম্মুখে রাখিয়া রাজকার্য্য পরিচালন করিতে লাগিলেন। মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত মধুভাণ্ডের নিকট ষট্‌পদের মত সোমদত্তার পদপ্রান্তে পড়িয়া রহিলেন।

এইরূপে ছয় মাস কাটিল।

তারপর এক দিন চূতমধুকুসুমগন্ধি বসন্তকালের প্রারম্ভে জলস্থল অন্ধকার করিয়া পঙ্গপালের মত এক বিরাট বাহিনী দেশ ছাইয়া ফেলিল। ইতিহাসে এই ঘটনার উল্লেখমাত্র আছে। পুষ্কর্ণ নামক মরুরাজ্যের অধিপতি চন্দ্রবর্ম্মা দিগ্বিজয়যাত্রার পথে মগধ আক্রমণ করিলেন। হীনবীর্য্য মগধ বিনা যুদ্ধে অধিকৃত হইল; কিন্তু চন্দ্রবর্ম্মা যাহা সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাহা এত সহজে সিদ্ধ হইল না, তিনি পাটলিপুত্রে জয়স্কন্ধাবার স্থাপন করিতে পারিলেন না। তাঁহার বিশাল সেনা-সমুদ্রের মধ্যস্থলে পাটলিপুত্র দুর্গ, দশ লৌহদ্বারে ইন্দ্রকীলক আঁটিয়া দিয়া ক্ষুদ্র পাষাণদ্বীপের মত জাগিয়া রহিল।

মগধেশ্বর তখন সোমদত্তার গজদন্ত পালঙ্কে শুইয়া ঘুমাইতেছিলেন; প্রহরিণীর মুখে এই বার্ত্তা শুনিয়া শয্যায় উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার বহুকাললুপ্ত ক্ষাত্রতেজ নিমিষের

জন্য জাগ্রত হইয়া উঠিল, কক্ষের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "আমার বর্ম্ম ?" বলিয়াই তাঁহার কুমারদেবীর কথা স্মরণ হইল, মুখের দীপ্তি নিভিয়া গেল। ক্ষীণ শ্লেষের হাসি হাসিয়া বলিলেন,—"আক্রমণ করেছে, তা আমি কি করব। পট্টমহাদেবীর কাছে যাও।" বলিয়া পুনশ্চ শয্যায় শয়ন করিলেন।

সোমদত্তা প্রাসাদচূড় হইতে দ্রুত চঞ্চলপদে নামিয়া আসিয়া দেখিল, রাজা পূর্ব্ববৎ নিশ্চিন্তে ঘুমাইতেছেন। তাহার শিখরতুল্য দশনে বিদ্যুতের ন্যায় হাসি খেলিয়া গেল। রাজার মস্তকে মৃদু করস্পর্শ করিয়া অস্ফুটস্বরে কহিল,—"ঘুমাও বীরশ্রেষ্ঠ! ঘুমাও।"

এ দিকে প্রহরিণী পট্টমহাদেবীকে গিয়া সংবাদ দিল। কুমারদেবী তখন ছয়বর্ষীয় কুমার সমুদ্রগুপ্তকে শিক্ষা দিতেছিলেন;—'পুত্র, তুমি লিচ্ছবিকুলের দৌহিত্র, এ কথা কখনো ভুলো না। পাটলিপুত্র তোমার পাদপীঠ মাত্র। ভরতের মত, মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের মত, চণ্ডাশোকের মত এই সপ্তসমুদ্র-বেষ্টিত বসুন্ধরা তোমার সাম্রাজ্য, এ কথা স্মরণ রেখো। তুমি বাহুবলে গুর্জ্জর হ'তে সমতট, হিমাদ্রি হ'তে অনার্য্য পাণ্ড্য-দেশ পর্য্যন্ত পদানত করবে। তোমার যজ্ঞীয় অশ্ব উত্তরাপথে ও দক্ষিণাপথে, আর্য্যাবর্ত্তে ও দাক্ষিণাত্যে সমান অপ্রতিহত হবে।"

বালক রত্নখচিত ক্রীড়াকন্দুক হস্তে লইয়া গম্ভীরমুখে মাতার কথা শুনিতেছিল!

এমন সময় প্রতিহারিণীর মুখে ভয়ঙ্কর সংবাদ শুনিয়া মহাদেবীর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল; ক্ষণকাল নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিলেন। একবার ইচ্ছা হইল, জিজ্ঞাসা করেন, আর্য্যপুত্র কোথায়। কিন্তু সে ইচ্ছা নিরোধ করিয়া বলিলেন,—"শীঘ্র কঞ্চুকীকে মহামাত্যের কাছে পাঠাও—এখনি তাঁকে আমার সম্মুখে উপস্থিত করুক। দুর্গের দ্বার সকল রুদ্ধ হ'ক। বিনা যুদ্ধে মহাস্থানীয়, শত্রুর হস্তে কখনই আত্ম-সমর্পণ করবে না।"

মহাদেবীর আদেশের প্রয়োজন ছিল না, মহাসচিব ও সান্ধিবিগ্রহিক পূর্ব্বেই দুর্গ-দ্বার রোধ করিয়াছিলেন। প্রাকারে প্রাকারে ভল্লহস্তে সতর্ক প্রহরী ঘুরিতেছিল। সিংহদ্বারগুলির উপরে বৃহৎ কটাহে তৈল উত্তপ্ত হইতেছিল। লৌহজালিকে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া আয়ুজ্যাযুক্ত ধনুহস্তে ধানুষ্কিগণ ইন্দ্রকোষে লুক্কায়িত থাকিয়া পরিখা-পারস্থিত শত্রুর উপর বিষ-বিদূষিত শর নিক্ষেপ করিতেছিল। প্রাকারের হস্তিনখমধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া সেনানীগণ শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিলেন। বুভুক্ষিত কুম্ভীরদল পরিখার কমলবনের মধ্যে খাদ্যান্বেষণে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছিল। বাহিরে শত্রুসৈন্য মাঝে মাঝে একযোগে দুর্গদ্বার আক্রমণ করিতেছিল। তখন মকরমুখ হইতে প্রচণ্ড-বেগে তপ্ত-তৈল বর্ষিত হইতেছিল। আক্রমণকারীরা হতাহত সহচরদিগকে দুর্গদ্বারে ফেলিয়া ভগ্নোদ্যমে ফিরিয়া যাইতেছিল।

পূর্ণ একদিন এইভাবে যুদ্ধ হইল। চন্দ্রবর্ম্মা বনহস্তীর দ্বারা দুর্গদ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে চেষ্টাও বিফল হইল। সর্ব্বাঙ্গে বাণবিদ্ধ হস্তী মাহুতকে ফেলিয়া দিয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে পলায়ন করিল। চন্দ্রবর্ম্মা দেখিলেন, যুদ্ধ করিয়া দুর্গজয় সহজ নহে। তখন তাঁহার সৈন্য যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়া দুর্গ বেষ্টন করিয়া বসিল। ক্রোশের পর ক্রোশ, যোজনের পর যোজন ব্যাপ্ত করিয়া তাহাদের শিবির পড়িল। নদীতে কাতারে কাতারে তরণী আসিয়া দুর্গপ্রাকারের বাহিরে গণ্ডী রচনা করিল। পাটলিপুত্রে পিপীলিকারও আগম-নিগমের পথ রহিল না।

ভিতরে মহামাত্য কুমারদেবীকে গিয়া সংবাদ দিলেন, "আশু ভয়ের কারণ নাই। কিন্তু বর্ব্বর চন্দ্রবর্ম্মা আমাদের অনাহারে শুকাইয়া মারিবার চেষ্টা করিতেছে। দেখা যাক, কতদূর কি হয়।"

দিগ্বিজয়ী রণপণ্ডিত চন্দ্রবর্ম্মার উদ্দেশ্য কিন্তু দুই প্রকার ছিল। ক্ষুদ্র দুর্ব্বল পাটলিপুত্র অচিরাৎ দখল করিতে তিনি বড় ব্যগ্র ছিলেন না। হইলে ভাল, না হইলেও বিশেষ ক্ষতি নাই, আপাততঃ মগধের অন্যত্র জয়স্কন্ধাবার স্থাপন করিলেই চলিবে। কিন্তু তাঁহার স্থল-সৈন্য বহুদূর পথ যুদ্ধ করিতে করিতে আসিয়া পরিশ্রান্ত—তাহাদের কিছুদিন বিশ্রামের প্রয়োজন। তাই তিনি এই অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল রাজার দেশে নিরুপদ্রবে ক্লান্তিবিনোদনের জন্য বসিলেন। গঙ্গার স্রোতে তাঁহার নৌবহর নোঙ্গর ফেলিল; দুর্গাবরোধ ও শ্রান্তি অপনোদন একসঙ্গে চলিল।

দুর্গ অবরোধের পঞ্চম দিবসে মহামাত্য আসিয়া রাণীকে জানাইলেন যে, দুর্গের খাদ্যভার কমিতে

আরম্ভ করিয়াছে—শীঘ্র ইহার কিছু বিধি-ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

মন্ত্রীর সহিত কুমারদেবী বহুক্ষণ পরামর্শ করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন;—"গোপনে খাদ্য আনিবার কোনও পথ কি নাই?"

সচিব বলিলেন,—"হয় ত আছে, কিন্তু আমরা জানি না, নদীর পথে খাদ্য আনা যেতে পারত, কিন্তু সে পথও বন্ধ। দুর্ব্বৃত্ত চন্দ্রবর্ম্মা নৌকা দিয়ে ব্যূহ সাজিয়ে রেখেছে।"

"তবে এখন উপায়?"

"একমাত্র উপায় আছে।"

তারপর আরও অনেকক্ষণ পরামর্শ চলিল।

শেষে মহামাত্য বিদায় হইলে পর কুমারদেবী অলক্ষিতে প্রাসাদশীর্ষে উঠিলেন। অঞ্চলের ভিতর হইতে রক্তচক্ষু ধূম্রবর্ণ দূত-পারাবত বাহির করিয়া আকাশে উড়াইয়া দিলেন। পারাবত দুইবার প্রাসাদ পরিক্রমণ করিয়া উত্তরাভিমুখে ধাবিত হইল। যতক্ষণ দেখা যায়, কুমারদেবী আকাশের সেই কৃষ্ণবিন্দুর দিকে তাকাইয়া রহিলেন, তার-পর নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে নামিয়া আসিলেন।

অতঃপর আরও আট দিন কাটিল। চন্দ্রবর্ম্মা কোনও প্রকার যুদ্ধোদ্যম না করিয়া কেবলমাত্র পথরোধ করিয়া বসিয়া রহিলেন। ক্রমে দুর্গে খাদ্যদ্রব্য দুর্ম্মূল্য হইতে আরম্ভ করিল। নাগরিকদিগের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিল।

এইরূপে আশায় আশঙ্কায় আরও একপক্ষ অতীত হইল। ফাল্গুন নিঃশেষ হইয়া আসিল।

৩

একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি। সেই বিট—সেই পীঠমর্দ্দ, যে সোমদত্তার অনাবৃত যৌবনশ্রী দেখিয়া উন্মত্ত হইয়াছিল, সে আমি। তখন আমার নাম ছিল, চক্রায়ুধ ঈশানবর্ম্মা। ঘটোৎকচগুপ্তের ন্যায় আমার পিতাও এক জন পরাক্রান্ত ভূস্বামী ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর আমি স্বাধীন হইয়া রাজধানীতে রাজার সাহচর্য্যে নাগরিক-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ঐশ্বর্য্যে বিলাসে কালযাপন করিতেছিলাম।

তীব্র আসবপান করিলে যে বিচারহীন বিবেকহীন মত্ততা জন্মে, সোমদত্তাকে দেখিয়া আমার সেই মত্ততা জন্মিয়াছিল। অবশ্য বিবেকবুদ্ধি তৎপূর্ব্বেই যে আমার অত্যন্ত অধিক ছিল, তাহা নহে। চিরদিন আমার চিত্ত বল্গাশূন্য অশ্বের মত শাসনে অনভ্যস্ত। কোনও বস্তু আত্মসাৎ করিতে—তা সে নারীই হউক বা ধনরত্নই হউক—নিজের ঐহিক সুবিধা ও সামর্থ্য ভিন্ন কোনও নিষেধ কখনও স্বীকার করি নাই। গুরুলঘুজ্ঞান কদাপি আমার বাসনার সামগ্রীকে দুষ্প্রাপ্য করিয়া তুলে নাই। যখন যাহা অভিলাষ করিয়াছি, ছলে-বলে যেমন করিয়া পারি, তাহা গ্রহণ করিয়াছি।

চন্দ্রগুপ্ত যখন সোমদত্তাকে শ্যেনপক্ষীর মত আমার চক্ষুর সম্মুখ হইতে ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল, তখন বাধাপ্রাপ্ত প্রতিহত বাসনা দুর্ব্বার আক্রোশে আমার বক্ষের মধ্যে গর্জ্জন করিতে লাগিল। চন্দ্রগুপ্ত রাজা, আমি তাহার নর্ম্মসহচর—বয়স্য; কিন্তু তথাপি কোন দিন তাহাকে আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা যোগ্যতর ভাবিতে পারি নাই। শ্যালক-প্রসাদে সে রাজা হইয়াছে; সুযোগ ঘটিলে আমিও কি হইতে পারিতাম না? বাহুবলে, রণশিক্ষায়, নীতিকৌশলে, বংশগরিমায় আমি তাহার অপেক্ষা কোনও অংশে ন্যূন নহি। তবে কোন্ অধিকারে সে আমার ঈপ্সিত বস্তু কাড়িয়া লইল?

অন্য তিন জন রাজপ্রসাদলোভী চাটুকার, যাহারা সে দিন আমার নিগ্রহ দেখিয়াছিল, তাহারা আমার ক্রোধ ও অন্তর্দ্দাহে ইন্ধন নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তামাসা, বিদ্রূপ-ইঙ্গিতের গোপন দংশনে আমাকে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিল। একদিন চন্দ্রগুপ্ত তখনও সভায় আগমন করেন নাই, সভাস্থ পারিষদবর্গের মধ্যে নিম্নকণ্ঠে বাক্যালাপ, হাস্য-পরিহাস চলিতেছিল, এমন সময় সিদ্ধপাল আমাকে লক্ষ্য করিয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে কহিল, "চক্রায়ুধ, দেখ ত, এই রত্নটি কেমন, কোশলের কোনও শ্রেষ্ঠী মহারাজকে উপহার দিয়েছে। মহারাজ বলেছেন, রত্নটি যদি অনাবিদ্ধ হয়, তা হ'লে স্বয়ং রাখবেন, নচেৎ তোমাকে উহা দান করবেন। দেখ ত, রত্নটি বজ্রসমুৎকীর্ণ কি না।" বলিয়া একটি ক্ষুদ্র অতি নিকৃষ্টজাতীয় মণি আমার সম্মুখে তুলিয়া ধরিল।

সভারূঢ় ব্যক্তিগণ এই কদর্য্য ইঙ্গিতে কেহ দাঁত বাহির করিয়া, কেহ বা নিঃশব্দে হাসিল। সিংহাসনের পার্শ্বে চামরবাহিনী কিঙ্করীগণ মুখে অঞ্চল দিয়া পরস্পরের প্রতি সকৌতুক কটাক্ষ হানিল। আমি লজ্জায় মরিয়া গেলাম।

ক্রমে আমার কথা পাটলিপুত্র নগরে কাহারও অবিদিত রহিল না। আমি কোনও গোষ্ঠীসমবায় বা সমাপানকে পদার্পণ করিবামাত্র চোখে চোখে কটাক্ষে কটাক্ষে গুপ্ত ইঙ্গিতের স্রোত বহিয়া যাইত। রাজসভায় রাজা আমাকে দেখিয়া ভ্রূকুটি করিতে লাগিলেন। অতঃপর আমাকে রাজসভা ছাড়িতে হইল, লোকসমাজও দুঃসহ হইয়া উঠিল। নিজ হর্ম্ম্যতলে একাকী বসিয়া অন্তরের অগ্নিতে অহরহ দগ্ধ হইতে লাগিলাম।

এই সময় সমুদ্রোচ্ছ্বাসতুল্য অভিযান পাটলিপুত্রের দুর্গ-তটে আসিয়া প্রহত হইল। আমি ক্ষত্রিয়, যুদ্ধের সময় আমার ডাক পড়িল। মহাবলাধিকৃত বিরোধবর্ম্মা আমাকে শতরক্ষীর অধিনায়ক করিয়া গোতমদ্বার নামক দুর্গের পশ্চিম তোরণ রক্ষার ভার দিলেন।

৪

কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রহীন রাত্রি। আমি অভ্যাসমত প্রাকারের উপর একাকী পাদচারণ করিতেছিলাম। অবসন্ন বসন্তের শেষ পুষ্প চম্পা চারিদিকে তীব্র বাস বিকীর্ণ করিতেছিল।

বাহিরে শত্রুশিবিরে দীপসকল প্রায় নিভিয়া গিয়াছে —দূরে দূরে দুই-একটা জ্বলিতেছে। নিম্নে পরিখার জল স্থির কৃষ্ণদর্পণের মত পড়িয়া আছে, তাহাতে আকাশস্থ নক্ষত্রপুঞ্জের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে। নগরের মধ্যে শব্দ নাই, আলোক নাই, গৃহে গৃহে দ্বার রুদ্ধ, দীপ নির্ব্বাপিত। রাজপথও আলোকহীন। তামসী রাত্রির গহন অন্ধকার যেন বিরাট পক্ষ দিয়া চরাচর আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

পাটলিপুত্র সুপ্ত, অরাতি-সৈন্যও সুপ্ত। কিন্তু নগর-দ্বারের প্রহরীরা জাগ্রত। তোরণের উপর নিঃশব্দে রক্ষক-গণ প্রহরা দিতেছে। প্রাকারের উপর স্থানে স্থানে সতর্ক রক্ষী নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান। শত্রু পাছে অন্ধকারে গা ঢাকিয়া অতর্কিতে প্রাকার-লঙ্ঘনের চেষ্টা করে, এইজন্য রাত্রিতে পাহারা দ্বিগুণ সাবধান থাকে।

রাজপুরী হইতে বেহাগ-রাগিণীতে মধ্যরাত্রি বিজ্ঞাপিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে পাটলিপুত্রের দশ দ্বারের প্রহরী দুন্দুভি বাজাইয়া উচ্চকণ্ঠে প্রহর হাঁকিল। নৈশ নীরবতা ক্ষণ-কালের জন্য বিক্ষুব্ধ করিয়া এই উচ্চরোল ক্রমে ক্রমে মিলাইয়া গেল; নগরী যেন শত্রুকে জানাইয়া দিল— "সাবধান! আমি জাগিয়া আছি।"

একাকী পাদচারণ করিতে করিতে নানা চিন্তা মনে উদয় হইতেছিল। কিসের জন্য এই রাত্রি দ্বিপ্রহরে নিদ্রা ত্যাগ করিয়া নিশাচরের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছি? পাটলিপুত্র দুর্গ রক্ষা করিয়া আমার লাভ কি? যাহার রাজ্য, সে ত কামিনীর কণ্ঠলগ্ন হইয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছে। পাটলিপুত্র যদি চন্দ্রবর্ম্মা অধিকার করে, তবে কাহার কি ক্ষতি? দুর্গের মধ্যে অন্নাভাবের সঙ্গে সঙ্গে রোগ দেখা দিয়াছে, মানুষ না খাইয়া মরিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাহির হইতে খাদ্য আনয়নের উপায় নাই। শুধু রাত্রির অন্ধকারে লুকাইয়া জালুকরা নদী হইতে প্রত্যহ কিছু কিছু মৎস্য সংগ্রহ করিতেছে। কিন্তু তাহাই বা কতটুকু?—নগরীর ক্ষুধা তাহাতে মিটে না। এভাবে আর কত দিন চলিবে? অবশেষে এক দিন বশ্যতা স্বীকার করিতেই হইবে; তবে অনর্থক এ ক্লেশভোগ কেন? সমগ্র দেশ যখন চন্দ্রবর্ম্মার চরণে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে, তখন পাটলিপুত্র নগর একা কয়দিন টিকিয়া থাকিবে?

চন্দ্রগুপ্ত যদি রাজ্যাধিকারের যোগ্য হইত, তবে সে নিজে আসিয়া নিজের রাজ্য রক্ষা করিত। আমি কেন এই অপদার্থ রাজার রাজ্যরক্ষার সাহায্য করিতেছি? সে আমার কি করিয়াছে? আমার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়াছে, আমাকে জগতের সম্মুখে হাস্যাস্পদ করিয়াছে। সোমদত্তা! সেই দেবভোগ্য অপ্সরা! বুঝি পুরুষের লালসা-পরিতৃপ্তির জন্যই তাহার অনুপম দেহ সৃষ্ট হইয়াছিল! তাহাকে না পাইলে আমার এই অনির্ব্বাণ তৃষ্ণা মিটিবে কি? —সে এখন চন্দ্রগুপ্তের অঙ্কশায়িনী। চন্দ্রগুপ্ত কি তাহাকে বিবাহ করিয়াছে? করুক না করুক, সোমদত্তাকে আমার চাই; যেমন করিয়া পারি, যে উপায়ে পারি, সোমদত্তাকে আমি কাড়িয়া লইব। পারিব না? নারীর মন, কত দিন এক পুরুষে আসক্ত থাকিবে? তখন চন্দ্রগুপ্ত! তোমাকে জগতের কাছে হাস্যাস্পদ করিব। সেই আমার লাঞ্ছনার যোগ্য প্রতিশোধ হইবে।

এই সর্ব্বগ্রাসী চিন্তা মনকে এমনই আচ্ছন্ন করিয়াছিল যে, অজ্ঞাতসারে গোতম-দ্বার হইতে অনেকটা দূরে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। প্রাকারের এই অংশ রাত্রিকালে স্বভাবতঃই

অতিশয় নির্জ্জন। এই স্থানের দুর্গ-প্রাচীর এতই দুরধিগম্য যে, প্রহরি-স্থাপনেরও প্রয়োজন হয় নাই।

ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে ফিরিব ভাবিতেছি, এমন সময় সহসা চোখে পড়িল, সম্মুখে কিছু দূরে প্রাকারের প্রান্তস্থিত এক কণ্টকগুল্মের অন্তরালে দীপ জ্বলিতেছে। পাছে বাহির হইতে শত্রু দুর্গ-প্রাচীর আরোহণ করে, এ জন্য প্রাচীরগাত্রে সর্ব্বত্র কাঁটাগাছ রোপিত থাকিত। কখনও কখনও এই সকল কাঁটাগাছ প্রাকারশীর্ষ ছাড়াইয়া মাথা তুলিত। সেইরূপ দুইটি ঘন-পল্লবিত কণ্টকতরুর মধ্যস্থিত ঝোপের ভিতর প্রদীপ জ্বলিতেছে দেখিলাম। প্রদীপ কখনও উঠিতেছে, কখনও নামিতেছে, কখনও মণ্ডলাকারে আবর্ত্তিত হইতেছে। কেহ যেন একান্তে দাঁড়াইয়া কোনও অদৃশ্য দেবতার আরতি করিতেছে।

পাদুকা খুলিয়া ফেলিয়া নিঃশব্দে কটি হইতে তরবারি বাহির করিয়া হস্তে লইলাম। তারপর অতি সন্তর্পণে সেই সঞ্চরমান দীপশিখার দিকে অগ্রসর হইলাম।

কণ্টকগুল্মের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, তন্মধ্যে এক নারী দাঁড়াইয়া পরিখার অপর পারে অনন্য স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে এবং প্রদীপ ইতস্ততঃ আন্দোলিত করিতেছে। পশ্চাৎ হইতে তাহার মুখ সম্পূর্ণ দেখিতে পাইলাম না, শুধু চোখে পড়িল, তাহার নবমল্লিকাবেষ্টিত কুণ্ডলিত কবরীভার, তাহার মধ্যে দুইটি পদ্মরাগমণি সর্প-চক্ষুর মত জ্বলিতেছে। বুঝিতে বিলম্ব হইল না, এ রমণী গুপ্তচর, আলোকের ইঙ্গিতে শত্রুর নিকট সংবাদ প্রেরণ করিতেছে।

লঘুহস্তে তাহার স্কন্ধ স্পর্শ করিলাম। সশব্দ নিশ্বাস টানিয়া বিদ্যুদ্বেগে রমণী ফিরিয়া দাঁড়াইল। তখন তাহারই হস্তধৃত মৃৎপ্রদীপের আলোকে তাহাকে চিনিলাম।

সোমদত্তা!

কম্পিত দীপশিখার আলোক তাহার ত্রাসবিকৃত মুখের উপর পড়িল। চক্ষুর সুবৃহৎ কৃষ্ণতারকা আরও বৃহৎ দেখাইল। মুহূর্ত্তের জন্য আমার মনে সন্দেহ জন্মিল, এ কি সত্যই সোমদত্তা, না আমার দৃষ্টিবিভ্রম? যে চিন্তা অহরহ আমার অন্তরকে গ্রাস করিয়া আছে, সেই চিন্তার বস্তু কি মূর্ত্তি ধরিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল? কিন্তু এ ভ্রম অল্পকালের জন্য, আকস্মিক আঘাতে বিপন্ন বুদ্ধি পরক্ষণেই ফিরিয়া আসিল। দেখিলাম, সোমদত্তার হস্তে প্রদীপ থর-থর করিয়া কাঁপিতেছে, এখনই পড়িয়া নিভিয়া যাইবে। আমি তরবারি কোষবদ্ধ করিয়া তাহার হাত হইতে প্রদীপ লইলাম; তাহার মুখের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া মৃদুহাস্যে বলিলাম,—"এ কি! পরমভট্টারিকা মহাদেবী সোমদত্তা!"

সোমদত্তা ভয়সূচক অস্ফুটধ্বনি করিয়া নিজ বক্ষে হস্তার্পণ করিল। পরক্ষণেই ছুরীর একটা ঝলক এবং সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণাগ্র অস্ত্র আমার বস্ত্রাবৃত লৌহজালিকের ব্যবধানপথে বক্ষের চর্ম্ম স্পর্শ করিল। ভিতরে লৌহজালিক না থাকিলে সোমদত্তার হস্তে সে দিন আমার প্রাণ যাইত। আমি ক্ষিপ্র-হস্তে ছুরিকা কাড়িয়া লইয়া নিজ কটিতে রাখিলাম, তারপর সবলে দুই বাহু দিয়া তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলাম। তাহার কর্ণে কহিলাম,—"সোমদত্তা, কুহকিনি, আজ তোমাকে পাইয়াছি।" তৈলপ্রদীপ মাটীতে পড়িয়া নিভিয়া গেল।

জালবদ্ধা ব্যাঘ্রীর মত সোমদত্তা আমার বাহুমধ্যে যুদ্ধ করিতে লাগিল, নখ দিয়া আমার মুখ ছিঁড়িয়া দিল। আমি আরও জোরে তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম, "ভাল-ভাল। তোমার নখর-ক্ষত কাল চন্দ্রগুপ্তকে দেখাইব।"

সহসা সোমদত্তার দেহ শিথিল হইয়া এলাইয়া পড়িল; অন্ধকারে ভাবিলাম, বুঝি মূর্চ্ছা গিয়াছে। তার পর তাহার দেহের দ্রুত কম্পনে ও কণ্ঠোত্থিত নিরুদ্ধ শব্দে বুঝিলাম, মূর্চ্ছা নহে—সোমদত্তা কাঁদিতেছে। কাঁদুক—কামিনীর ক্রন্দন আমার জীবনে এই প্রথম নহে। প্রথম প্রথম এমনই কাঁদে বটে। আমি তাহাকে কাঁদিতে দিলাম।

কিছুক্ষণ ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিবার পর সোমদত্তা সোজা হইয়া দাঁড়াইল, অশ্রুবিকৃত কণ্ঠে কহিল, "তুমি কে? কেন আমাকে ধরেছ? শীঘ্র ছেড়ে দাও।"

আমি আলিঙ্গন শিথিল করিলাম না, বলিলাম,—"আমি কে শুনবে? আমি চক্রায়ুধ ঈশানবর্ম্মা—তোমার চন্দ্রগুপ্তের বয়স্য, উপস্থিত দুর্গ-তোরণের রক্ষক। আরও অধিক পরিচয় যদি চাও ত বলি, আমি সোমদত্তার রূপের মধুকর। যে দিন তটিনীতটে অচেতনে পড়েছিলে, ছলনাময়ি, সেই দিন হ'তে তোমার রূপযৌবনের আরাধনা ক'রে আসছি।"

অনুভব করিলাম, সোমদত্তা শিহরিয়া উঠিল। আমি বলিলাম, "চিনেছ দেখছি। হাঁ, আমি সেই বিট, যে স্বর্গের পারিজাত দেখে লুব্ধ হয়েছিল।"

সোমদত্তা কহিল, "পাপিষ্ঠ, আমাকে ছেড়ে দাও, নচেৎ রাজ-আদেশে তোমার মুণ্ড যাবে।"

আমি হাসিয়া বলিলাম,—"পাপিষ্ঠা, তোমাকে ছাড়ব না। ছেড়ে দিলে পট্টমহাদেবীর আদেশে আমার মুণ্ড যেতে পারে। তুমি নিশীথ সময়ে রাজপুরী ছেড়ে কি জন্য বাইরে এসেছ? প্রাকারের নিভৃত স্থানে প্রদীপ নিয়ে কি করছিলে?"

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া সোমদত্তা উত্তর করিল,—"আমি রাজার অনুমতি নিয়ে পুরীর বাইরে এসেছি।"

ব্যঙ্গ করিয়া বলিলাম,—"চন্দ্রগুপ্ত বোধ করি তোমাকে শত্রুর নিকট সঙ্কেত প্রেরণ করবার জন্য পাঠিয়েছে?"

সোমদত্তা আবার শিহরিল। বলিল,—"আমি বৌদ্ধ সেবাশ্রমে আর্ত্তের চিকিৎসা করতে প্রত্যহ আসি—রাজার অনুমতি আছে। আজও এসেছি।"

"প্রাকারের উপর এতক্ষণ কোন্ আর্ত্তের চিকিৎসা করছিলে?"

"প্রাকারের উপর আহত কেহ আছে কি না, দেখতে এসেছিলাম।"

"ভাল, আজ রাত্রিতে আমার নিকট বন্দিনী থাক, কাল চন্দ্রগুপ্তকে এই কথা বলো। প্রহরী ডাকি?"

সোমদত্তা নীরব, মুখে কথা নাই।

আমি পুনরায় কহিলাম,—"কি বল? প্রহরী ডাকি?"

অবরুদ্ধ কণ্ঠে সোমদত্তা কহিল,—"তুমি যা চাও, দিব—আমাকে ছেড়ে দাও।"

আমি বলিলাম,—"যা চাই, তাই এখন জোর ক'রে নেব। তোমার দানের অপেক্ষা রাখি না।"

ভীত অস্পষ্ট কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করিল,—"কি চাও?"

"তোমাকে?"

সোমদত্তা পুনরায় আমার আলিঙ্গন-মুক্ত হইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। শেষে বিফল হইয়া আমার বক্ষের উপর সবলে করাঘাত করিতে করিতে বলিতে লাগিল,—"আমাকে ছেড়ে দাও! ছেড়ে দাও! ছেড়ে দাও! আমি রাজমহিষী, আমার উপর অত্যাচার করলে তুমি শূলে যাবে।"

আমি বলিলাম, "তুমি চন্দ্রবর্ম্মার চর,—রাজাকে রূপের কুহকে ভুলিয়ে রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছ। শূল ত দূরের কথা, তোমার উপর অত্যাচার করলে কুমারদেবী আমাকে পুরস্কৃত করবেন। মনে রেখো, তুমি তাঁর সপত্নী।"

সোমদত্তা কাঁদিয়া উঠিল, "দয়া কর, আমি রাজার স্ত্রী।"

"তুমি গুপ্তচর।"

তখন সোমদত্তা আমার বক্ষের উপর নিঃসহায়ে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল। এত কাঁদিল যে, বোধ করি, পাষাণও দ্রব হইয়া যাইত। কিন্তু আমি লোভে নিষ্ঠুর—তাহার অশ্রু আমাকে দ্রব করিতে পারিল না।

কাঁদিতে কাঁদিতে সোমদত্তা জিজ্ঞাসা করিল, "দয়া করবে না?"

আমি বলিলাম, "এইটুকু দয়া করতে পারি, আমি যা চাই, তা স্বেচ্ছায় যদি দাও, তবে চন্দ্রগুপ্ত কিছু জানবে না।"

ব্যাকুল হইয়া সোমদত্তা কহিল, "আমি সেরূপ স্ত্রীলোক নই। চন্দ্রগুপ্ত আমার স্বামী, আমি তাঁকে ভালবাসি। শুন, আমি চন্দ্রবর্ম্মার গুপ্তচর, এ কথা সত্য, তাঁর কার্য্যসিদ্ধির জন্য মগধে এসেছিলাম। কিন্তু তখন জানতাম না—ভালবাসার স্বাদ পাই নি। আজ আমি স্বামীর রাজ্য পরের হাতে তুলে দিবার যত্ন করছি; কেন করছি, তা তুমি বুঝবে না। কিন্তু স্বরূপ বলছি, আমি তাঁকে ভালবাসি, আমার চোখে তিনি ভিন্ন অন্য পুরুষ নেই। তুমি আমাকে দয়া কর, মুক্তি দাও। আমি শপথ করছি, চন্দ্রবর্ম্মা পাটলিপুত্র অধিকার করলে আমি তোমাকে কাশী, কোশল, চম্পা, গৌড়—যে রাজ্য চাও, তার সিংহাসনে বসাব। চন্দ্রবর্ম্মা আমাকে স্নেহ করেন, আমার যাচ্ঞা কখনো নিষ্ফল হবে না।"

"কিন্তু চন্দ্রবর্ম্মা যদি পাটলিপুত্র অধিকার করতে না পারেন?"

"এমন কখনো হ'তে পারে না।"

"বুঝলাম। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি যদি চন্দ্রগুপ্তকে সত্যই ভালবাস, তবে তার সর্ব্বনাশ করছ কেন?"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সোমদত্তা বলিল,—"চন্দ্রবর্ম্মা আমার পিতা।"

ঘোর বিস্ময়ে কহিলাম, "তুমি চন্দ্রবর্ম্মার কন্যা?"

অধোমুখে সোমদত্তা কহিল, "হ্যাঁ, কিন্তু বারাঙ্গনার গর্ভজাতা।"

"বুঝেছি।"

"তুমি নরাধম, কিছু বোঝ নি। আমি শৈশব হ'তে রাজ-অন্তঃপুরে পালিতা।"

"ভাল, তাও বুঝলাম। বুঝলাম যে, পিতার জন্য তুমি স্বামীর সর্ব্বনাশ করতে প্রস্তুত। কিন্তু আমার কথাও তুমি বুঝে নেও। আমি গৌড় চাই না, চম্পা চাই না, কাশী কোশল কিছুই চাই না—আমি তোমাকে চাই। অস্বীকার করলে কোনও ফল হবে না,—উপরন্তু চন্দ্রগুপ্ত তোমার এই অভিসার-কথা জানতে পারবে।"

সোমদত্তা কম্পিতস্বরে কহিল, "ইচ্ছা হয়, আমাকে হত্যা ক'রে ঐ পরিখার জলে ফেলে দাও, আমি কোনও কথা কইব না। কিন্তু মহারাজকে এ কথা বলো না। পুরুষের মন সর্ব্বদা সন্দিগ্ধ, তিনি আমার প্রকৃত অভিপ্রায় বুঝবেন না, আমাকে অবিশ্বাস করবেন। স্বীকার কর, বলবে না।"

নারী-চরিত্র কে বুঝিবে? কহিলাম, "উত্তম, বলব না। কিন্তু আমার পুরস্কার?"

সোমদত্তা নীরব।

আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমার পুরস্কার?"

তথাপি সোমদত্তা মৌন।

আমি তখন ক্ষিপ্ত। কুসুম-কোমলা নারীর দেহলতা পুরুষের দুর্দ্দম পেষণে শিহরিয়া উঠিতেছিল, বুঝিলাম।

বলিলাম, "সোমদত্তা, তোমার রূপের আগুনে আজ নিজেকে আহুতি দিলাম।"

সোমদত্তা যেন মন্মতন্তু ছিঁড়িয়া কথা কহিল; বলিল, "শুধু তুমি নও, তুমি, আমি, চন্দ্রগুপ্ত, মগধ—সব এই আগুনে পুড়ে ছাই হবে।"

৫

নগরের কেন্দ্রস্থলে প্রায় পাদক্রোশ ভূমির উপর মগধের প্রাচীন রাজপুরী। এই পাদক্রোশ ভূমি উচ্চ পাষাণ-প্রাচীর দিয়া বেষ্টিত। পূর্ব্বদিকে প্রশস্ত রাজপথের উপর কারুকার্য্য-শোভিত উচ্চ পাষাণ-তোরণ। এই তোরণ উত্তীর্ণ হইয়া প্রথমেই বহু স্তম্ভযুক্ত বিচিত্র দ্বিতল মন্ত্রগৃহ। তাহার পশ্চাতে মহলের পর মহল, প্রাসাদের পর প্রাসাদ,—কোনটি কোষাগার, কোনটি অলঙ্কারগৃহ, কোনটি দেবগৃহ কোনটি চিত্রভবন। মধ্যে কুঞ্জবেষ্টিত কমল-সরোবর—তাহাতে সারস-মরাল প্রভৃতি পক্ষী ও বহুবর্ণের মৎস্য ক্রীড়া করিতেছে

সকলের পশ্চাতে শীর্ণ অথচ জলপূর্ণ পরিখার গণ্ডীনিবদ্ধ মগধেশ্বরের অন্তঃপুর। সেতু পার হইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে হয়। সেতুমুখে কঞ্চুকীসেনা অহোরাত্র পাহারা দিতেছে। ভিতরে সুন্দর কারুশিল্পমণ্ডিত উচ্চশীর্ষ সৌধ-সকল পরস্পর সংলগ্ন হইয়া যেন ইন্দ্রভুবন রচনা করিয়াছে। এখানে সকল গৃহই ত্রিতল, প্রথম তল শ্বেতপ্রস্তরে রচিত, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তল দারুনির্ম্মিত।

এই পুরী চন্দ্রগুপ্তের নির্ম্মিত নহে, মৌর্য্যকালীন প্রাচীন রাজভবন। রাজ্যজয়ের সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রগুপ্ত ইহা অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজপুরীর যাহা সারবস্তু, সেই মোহন-গৃহ অনেক সন্ধান করিয়াও চন্দ্রগুপ্ত আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। মোহনগৃহ রাজভবনের একটি গোপন কক্ষ, দেখিতে অন্যান্য সাধারণ কক্ষের মতই, কিন্তু ইহার প্রাচীর ও হর্ম্ম্যতলে নানা গুপ্তদ্বার থাকিত। সেই গুপ্তদ্বার দিয়া ভূনিম্নস্থ সুড়ঙ্গপথে পুরীর বাহিরে যাওয়া যাইত; এমন কি, ঘোর বিপদ-আপদের সময় দুর্গের বাহিরে পলায়ন করাও চলিত। এই মোহনগৃহ প্রত্যেক রাজপুরীর একটি অপরি-হার্য্য অঙ্গ ছিল; স্বয়ং রাজা এবং পট্টমহিষী ভিন্ন ইহার সন্ধান আর কাহারও জানা থাকিত না। মৃত্যুকালে রাজা পুত্রকে বলিয়া যাইতেন।

এই রাজপ্রাসাদে, পূর্ব্ববর্ণিত ঘটনার পরদিন প্রভাতে আমি কিছু গোপন অভিসন্ধি লইয়া উপস্থিত হইলাম। সম্মুখেই মন্ত্রগৃহ, বহুজনাকীর্ণ। সচিব, সভাসদ, সেনানী, শ্রেষ্ঠী, বয়স্য, বিদূষক—সকলেই উপস্থিত; সকলের মুখেই দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠার চিহ্ন। চারিদিক্ হইতে তাহাদের মৃদুজল্পিত গুঞ্জনধ্বনি উঠিতেছে। সভার কেন্দ্রস্থলে রত্ন-সিংহাসনে বসিয়া কেবল মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত নির্লিপ্ত নির্ব্বিকার। আমি সভায় প্রবেশ করিতে চন্দ্রগুপ্ত একবার চক্ষু তুলিয়া আমার দিকে চাহিল—মেঘাচ্ছন্ন স্বপ্নাবিষ্ট ভাব —যেন কিছুতেই কিছু আসে যায় না। আমি সম্ভ্রম দেখাইয়া অবনত মস্তকে প্রণাম করিলাম, চন্দ্রগুপ্ত ঈষৎ বিরক্তিসূচক ভ্রূকুটি করিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল। আমার হাসি আসিল, মনে মনে বলিলাম;—"চন্দ্রগুপ্ত! যদি জানিতে!"

রাজ-সম্মুখ হইতে অপসৃত হইয়া ইতস্ততঃ ঘুরিতে

দ্বারিতে এক স্তম্ভের আড়ালে সন্নিধাতার সহিত দেখা হইল। সর্ব্বদা রাজ-সন্নিধানে থাকিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করা সন্নিধাতার কার্য্য। নানা কারণে এই সন্নিধাতার সহিত আমার কিছু প্রণয় ছিল; অনেকবার রাজপ্রাসাদের অনেক গূঢ় সংবাদ তাহার নিকট হইতে পাইয়াছি। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম;—"বল্লভ, খবর কি?"

বল্লভ বলিল;—"নূতন খবর কিছু নাই। মহারাজ আজ পত্রচ্ছেদ্যকালে বল্‌ছিলেন যে, মোহনগৃহের সন্ধান জানা থাক্‌লে এ পাপ রাজ্য ছেড়ে চ'লে যেতেন।"

আমি বলিলাম, "সংসারে এত বৈরাগ্য কেন?"

বল্লভ চোখ টিপিয়া মৃদুস্বরে কহিল;—"সংসারের সকল বস্তুতে নয়।—সে যাক, তোমায় বহুদিন দেখিনি, সভায় আস না কেন?"

আমি বলিলাম;—"দিনরাত গোতমদ্বারে পাহারা—সময় পাই না।—বিরোধবর্ম্মা কোথায়, বল্‌তে পার? সভায় ত' তাঁকে দেখ্‌ছি না।"

বল্লভ বলিল,—"মহাবলাধিকৃত উপরে আছেন, সান্ধিবিগ্রহিকের সঙ্গে কি পরামর্শ হচ্ছে।"

"আমারও কিছু পরামর্শ আছে" বলিয়া সোপান অতিবাহিত করিয়া আমি উপরে গেলাম।

বিরোধবর্ম্মা তখন গুপ্তসদস্যগৃহে বসিয়া সান্ধিবিগ্রহিকের সহিত চুপিচুপি কথা কহিতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া উভয়ে জিজ্ঞাসু নেত্রে আমার দিকে চাহিলেন। আমি কোনও প্রকার ভণিতা না করিয়া বলিলাম, "এরূপভাবে আর কত দিন চলবে? দুর্গে খাদ্য নাই, পানীয় নাই; এক দীনারের কমে আধক পরিমাণ মাধ্বী পাওয়া যায় না। ঘরে ঘরে লোক না খেয়ে মরতে আরম্ভ করেছে। যুদ্ধে মরিত কোন কথা ছিল না; কিন্তু শত্রুকে বিতাড়িত করবার কোন চেষ্টাই নেই। কেবলমাত্র দুর্গদ্বার রুদ্ধ ক'রে ব'সে থাকলে কি ফল হবে? নাগরিকগণ নানা কথা বলছে—দুর্গরক্ষীরাও সন্তুষ্ট নয়।"

সান্ধিবিগ্রহিক জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তারা কি বলে?"

আমি বলিলাম, "কাল সন্ধ্যায় চণ্ডপালের মদিরাগৃহে গিয়েছিলাম। সেখানে শুনলাম, অনেকেই বলাবলি করছে—চন্দ্রবর্ম্মার দিগ্বিজয়ী সেনার বিরুদ্ধে শূন্য উদর নিয়ে দুর্গরক্ষার চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র। দুর্গ একদিন তারা অধিকার করবেই, সুতরাং বাধা না দিয়ে নির্ব্বিবাদে আসতে দেওয়াই সুবুদ্ধি—তাতে তাদের নিকট সদ্‌ব্যবহার প্রত্যাশা করা যেতে পারে।"

সান্ধিবিগ্রহিক ও মহাবলাধিকৃত দৃষ্টি-বিনিময় করিলেন। বিরোধবর্ম্মা কহিলেন,—"চন্দ্রবর্ম্মা পাটলিপুত্র অধিকার করতে পারবে না, তার দিগ্বিজয়যাত্রা এইখানেই শেষ হবে।"

আমি বলিলাম,—"কিন্তু—"

বাধা দিয়া বিরোধবর্ম্মা বলিলেন,—"এর মধ্যে কিন্তু নেই। জেনে রাখ, আজ হ'তে দশ দিনের মধ্যে দিগ্বিজয়ী চন্দ্রবর্ম্মা লাঙ্গুল উচ্চে তুলে মগধ হ'তে পলায়ন করবে ইচ্ছা হয়, তুমি তার পশ্চাদ্ধাবন করো।"

ভিতরে কিছু কথা আছে, বুঝিলাম। কি কথা জানিবার জন্য পুনশ্চ বলিলাম,—"কেমন ক'রে এই অঘটন সম্ভব হবে জানিনে। দশ দিনের মধ্যে নগর শ্মশানে পরিণত হবে। তখন চন্দ্রবর্ম্মা রইল কি পালাল, কে দেখতে যাবে?"

বিরোধবর্ম্মা কহিলেন,—"খাদ্যের আয়োজন হয়েছে, কাল হ'তে সকলে প্রচুর খাদ্য পাবে।"

আমি বিস্মিতভাবে তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলাম। ইচ্ছা হইল, জিজ্ঞাসা করি, কি ভাবে কোথা হইতে খাদ্য আসিবে? কিন্তু প্রশ্ন করা সুবিবেচনা হইবে না বুঝিয়া বলিলাম,—"কিন্তু খাদ্য পেলেই কি চন্দ্রবর্ম্মাকে তাড়ানো যাবে?"

বিরোধবর্ম্মা বলিলেন,—"বলেছি, দশ দিনের মধ্যে চন্দ্রবর্ম্মাকে তাড়াব?"

"কিন্তু এই দশ দিন প্রজাদের কি ব'লে বুঝিয়ে রাখবেন? প্রজা ও রক্ষিসৈন্য মিলে যদি মাৎস্যন্যায় করে?"

"মাৎস্যন্যায়!" বিরোধবর্ম্মা গর্জ্জিয়া উঠিলেন,—"চক্রায়ুধ, যে যোদ্ধা শত্রুকে দুর্গসমর্পণের কথা চিন্তা করবে, তাকে শূলে দেব, যে প্রজা মাৎস্যন্যায়ের কথা উচ্চারণ করবে, তাকে হাত-পা বেঁধে পরিখার কুম্ভীরের মুখে ফেলে দেব। মাৎস্যন্যায়!—এখনো আমি বেঁচে আছি।" ঈষৎ শান্ত হইয়া বলিলেন,—"তুমি যাও, যে জিজ্ঞাসা করবে, তাকে বলো, অন্তরীক্ষপথে বার্ত্তা এসেছে, চন্দ্রবর্ম্মার উচ্ছেদ হ'তে আর অধিক বিলম্ব নেই।"

অন্তরীক্ষ-পথে! আমি উঠিলাম, উভয়কে প্রণাম করিয়া বাহির হইতেছি, সান্ধিবিগ্রহিক আমাকে ফিরিয়া

ডাকিলেন। ধীরে ধীরে কহিলেন, "চক্রায়ুধ! যা শুনলে, তা হ'তে যদি কিছু অনুমান ক'রে থাক, তা নিজ অন্তরে রেখো। মন্ত্রভেদে রাজ্যের সর্ব্বনাশ হয়।"

"যথা আজ্ঞা।" বলিয়া মনে মনে হাসিয়া আমি বিদায় লইলাম।

সেই রাত্রিতে মধ্যযাম ঘোষিত হইবার পর সোমদত্তা আবার আসিল। গতরাত্রির সঙ্কেতস্থানে আমি পূর্ব্ব হইতেই উপস্থিত ছিলাম, প্রদীপ হস্তে ধরিয়া ভুবনমোহিনীর ন্যায় আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। আমি দুই বাহু প্রসারিত করিয়া তাহাকে বুকে টানিয়া লইলাম। সোমদত্তা ভুবনমোহন হাসি হাসিয়া আমার আলিঙ্গনে আত্মসমর্পণ করিল।

এক রাত্রির মধ্যে কি অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন! নারীর মন এমনই বটে,—কাল যে ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ করিতেছিল, আজ সে নাগরের প্রেমে পাগল! আমি এমন অনেক দেখিয়াছি, তাই বিস্মিত হইলাম না। স্ত্রীজাতি যখন দেখে, কুল গিয়াছে, তখন প্রাণপণে নাগরকে ধরিয়া থাকে। দুই কুল হারাইয়া ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্ট হইতে চাহে না।

আমি বলিলাম, "সোমদত্তা, চন্দ্রগুপ্ত ভিন্ন অন্য পুরুষ পৃথিবীতে আছে কি?"

সোমদত্তা দুই মৃণালভুজে আমার কণ্ঠবেষ্টন করিয়া মুখের অত্যন্ত নিকটে মুখ আনিয়া মৃদু সলজ্জ স্বরে কহিল,—"আগে জানতাম না, এখন বুঝেছি, তুমি ভিন্ন জগতে অন্য পুরুষ নেই।"

সোমদত্তার কথা, তাহার স্পর্শ, তাহার দেহসৌরভ আমার সর্ব্বাঙ্গ ঘেরিয়া হর্ষের প্লাবন আনিয়া দিল। অনির্ব্বচনীয় সুখের মাদকতা মস্তিষ্ককে যেন অবশ করিয়া ফেলিল। সৃষ্টির আরম্ভ হইতে এমনই করিয়াই বুঝি নারী পুরুষকে বশ করিয়া রাখিয়াছে।

আমি বলিলাম,—"সোমদত্তা, প্রিয়তমে, তোমাকে আমি সমগ্রভাবে, অনন্যভাবে চাই। রাত্রিতে চোরের মত লুকিয়ে এই ক্ষণিকের মিলন—এতে আমার হৃদয় পূর্ণ হচ্ছে না।"

সোমদত্তা আমার স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া বলিল,—"তা কি ক'রে হবে, প্রাণাধিক? আমি যে রাজপুরীর পুরস্ত্রী—চন্দ্রগুপ্তের বনিতা।"

বহুক্ষণ দুই জনে নীরব রহিলাম। সোমদত্তার মত নারীকে যে পায় নাই, সে জানে না, তাহার জন্য পুরুষের মনে কি তীব্র—কি দুর্ব্বার আকাঙ্ক্ষা জাগিতে পারে। আমি যত দিন তাহাকে দূর হইতে কামনা করিয়াছিলাম, তত দিন তাহার এই দুর্নিবার শক্তি অনুভব করি নাই। সোমদত্তাকে লাভ করিবার বাসনা অপেক্ষা তাহাকে একান্তে নিজস্ব করিয়া ভোগ করিবার আকাঙ্ক্ষা শতগুণ প্রবল। তাহার মধ্যে এমন একটা আকর্ষণ আছে, যাহা তাহার অলৌকিক যৌবনশ্রীরও অতীত, যাহা ভোগে অবসাদ আনে না, ঘৃতাহুতির ন্যায় কামনার অগ্নিকে আরও বাড়াইয়া তুলে। সোমদত্তার ন্যায় নারীর জন্য পুরুষ ইহকাল পরকাল অকাতরে বিসর্জ্জন করিতে পারে, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়, সৃষ্টি রসাতলে পাঠাইতে তিলমাত্র দ্বিধা করে না।

"শত্রুর নিকট কাল কি সঙ্কেত পাঠাচ্ছিলে?"

সোমদত্তা আমার স্কন্ধ হইতে মস্তক তুলিল। আমার মুখের উপর দুই চক্ষু পাতিয়া যেন অন্তরের অন্তস্তল পর্য্যন্ত অন্বেষণ করিয়া লইল। সেখানে কি দেখিল, জানি না, বলিল,—"দুর্গের দুই একটা কথা জানাচ্ছিলাম।"

"তা না বললেও বুঝেছি। কি কথা?"

"নগরে খাদ্য নেই, এই সংবাদ দিচ্ছিলাম।"

আমি বলিলাম,—"ভুল সংবাদ দিয়েছ—কাল সকাল হ'তে নগরে আর অন্নাভাব থাকবে না।"

সোমদত্তা চমকিত হইয়া বলিল,—"সে কি! কোথা হ'তে খাদ্য আসবে?"

আমি বলিলাম,—"তা জানি না। বোধ হয় কোনও সুড়ঙ্গ আবিষ্কৃত হয়েছে। সেই পথে বাইরে থেকে খাদ্যাদি আসবে।"

"সুড়ঙ্গ? কোথায় সুড়ঙ্গ?"

"তা কি ক'রে জানব? এ আমার অনুমান মাত্র। কিন্তু নিশ্চিত বলছি, নগরে আর দুর্ভিক্ষ থাকবে না, সে আয়োজন হয়েছে। শুধু তাই নয়, শীঘ্রই চন্দ্রবর্ম্মা বাহির হ'তে আক্রান্ত হবেন—বোধ হয়, বৈশালী হ'তে সৈন্য আসছে।"

"সত্য বলছ? আমাকে প্রতারণা করছ না?"

"সত্য বলছি, আজ বিরোধবর্ম্মার মুখে এ কথা শুনেছি।"

সোমদত্তা ললাটে করাঘাত করিল; বলিল,—"হায়! কাল এ কথা শুনি নি কেন? শুনলে প্রাণ দিতাম, তবু—"

সোমদত্তা বিদ্যুদগ্নিপূর্ণ দুই চক্ষু আমার দিকে ফিরাইল। দীর্ঘকাল মৌন থাকিয়া শেষে বলিল,—'যা হবার হয়েছে, ললাট-লিখন কে খণ্ডাবে? বেশ্যার কন্যার বুঝি এই রকমই প্রাক্তন!"

আমি বাহু দ্বারা তাহার কটিবেষ্টন করিয়া সোহাগ-গদগদ স্বরে কহিলাম,—"সোমদত্তা, প্রেয়সি, কেন বৃথা খেদ করছ। তুমি আমার। চক্রায়ুধ ঈশানবর্ম্মা তোমার জন্য অগ্নিতে প্রবেশ করবে, জলে ঝাঁপ দেবে। চন্দ্রগুপ্তের কাল-পূর্ণ হয়েছে; তোমার জন্য আমি তার সর্ব্বনাশ করব।"

"তুমিও চন্দ্রগুপ্তের সর্ব্বনাশ করবে?"

"করব। তুমি পার, আর আমি পারি না? চন্দ্রগুপ্ত আমার কে?"

"সখা!"

"সখা নয়। আমি তার প্রমোদের সহচর, স্তাবক সভাষদ, বিট-বিদূষক মাত্র। চন্দ্রগুপ্ত এক দিন আমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছিল। আমিও নিয়েছি। যার অঙ্কলক্ষ্মীকে কেড়ে নিয়েছি, তার সঙ্গে আবার সখ্য কিসের? এখন আমরা দু'জনে মিলে তার উচ্ছেদ করব।"

কিছুক্ষণ নির্ব্বাক্ থাকিয়া সোমদত্তা প্রশ্ন করিল;—"কি করতে চাও?"

"শোন বলছি। সকালে বিরোধবর্ম্মার মুখে যা শুনেছি, তাতে অনুমান হয় যে, আজ হ'তে দশ দিনের মধ্যে লিচ্ছবিদেশ হতে পাটলিপুত্রের সাহায্যার্থে সৈন্য আসবে—পারাবতমুখে এই সংবাদ এসেছে। চন্দ্রবর্ম্মা যদি পাটলি-পুত্র অধিকার করতে চান, তা হ'লে তার আগেই করতে হবে, লিচ্ছবিরা এসে পড়লে আর তা সুসাধ্য হবে না। তখন নিজের প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে। এদিকে নগরের খাদ্যাভাবও ঘুচেছে, সুতরাং বাহুবলে এই দশ দিনের মধ্যে দুর্গজয় করা অসম্ভব। এরূপ ক্ষেত্রে উপায় কি?"

"কি উপায়?"

"বিশ্বাসঘাতকতা।"

"কে বিশ্বাসঘাতকতা করবে?"

"আমি করব। কিন্তু পরিবর্ত্তে চন্দ্রবর্ম্মা আমাকে কি দেবেন?"

"যা পেয়েছ, তাতে তৃপ্তি নেই?"

"না। কাল বলেছিলাম বটে, রাজ্য—সিংহাসন চাই না, কিন্তু তা ভুল। রাজ্য না পেলে তোমাকে পেয়েও আমার অতৃপ্তি থেকে যাবে। তুমি রাজ-ঐশ্বর্য্যের স্বাদ পেয়েছ,—অল্পে কি তোমার মন উঠবে?"

"তা বটে, অল্পে আমার ক্ষুধা মিটবে না। কৃতঘ্নতার মূল্য কি চাও?"

"আমি সব স্থির করেছি। তুমি দীপসঙ্কেতে চন্দ্রবর্ম্মাকে সমস্ত সংবাদ দাও,—জানাও যে, বিশ্বাসঘাতকতা ভিন্ন দুর্গ অধিকার হবে না। তাঁকে এ কথাও বল যে, এক জন দ্বারপাল সেনানী দুর্গদ্বার খুলে দিতে প্রস্তুত আছে, কিন্তু পুরস্কারস্বরূপ তাকে মগধের সিংহাসন দিতে হবে।"

সোমদত্তা প্রস্তরমূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল; তারপর হাসিয়া উঠিল। দীপের কম্পমান আলোকে সে হাসি অদ্ভুত দেখাইল। বলিল, "বেশ বেশ! আমিও ত এই জিনিষই চাচ্ছিলাম। মনে করেছিলাম, পিতাকে তুষ্ট ক'রে এক জনের জন্য মগধের সিংহাসন ভিক্ষে চেয়ে নেব, এক স্পর্দ্ধিতা দুর্ব্বিনীতা নারীর দর্পচূর্ণ করব। কিন্তু এই ভাল। তোমার ও আমার ষড়যন্ত্রে পিতা দুর্গ অধিকার করবেন, তার পর তুমি সিংহাসনে বসবে আর আমি—আমি তোমার পট্টমহিষী হব। এই ভাল।" বলিয়া সোমদত্তা আবার হাসিল।

আমি বলিলাম, "চন্দ্রগুপ্তকে হত্যা করতে হবে। তাকে বাঁচতে দিয়ে কোন লাভ নেই। পরে গণ্ডগোল বাধতে পারে। একটা সুবিধা আছে, চন্দ্রগুপ্ত পালাতে পারবে না, সে মোহনগৃহের সন্ধান জানে না।"

চন্দ্রগুপ্তের প্রতি সোমদত্তার মনে কোন মমতা আছে কি না, দেখিবার জন্য এই কথা বলিয়াছিলাম। দেখিলাম, তাহার মুখে করুণার ভাব ফুটিয়া উঠিল না, বরঞ্চ মুখ ও অধরোষ্ঠ আরও কঠিনভাব ধারণ করিল। সে স্থির নিষ্করুণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া রহিল। জিজ্ঞাসা করিল, "মোহনগৃহ কি?"

মোহনগৃহ কি, বুঝাইয়া দিলে সোমদত্তার মুখে কিছু উৎফুল্লতা দেখা দিল। সে আমার কণ্ঠবেষ্টন করিয়া বলিল, "প্রিয়তম, চন্দ্রগুপ্ত ও কুমারদেবী পুত্র নিয়ে পালাবে, এই কথা ভেবে আমার মনে সুখ ছিল না; এখন নিশ্চিন্ত হলাম। ভেবো না, তোমাতে আমাতে নিরাপদে রাজ্যসুখ ভোগ করব।"

"আর চন্দ্রগুপ্ত?"

"সে ভার আমার। আমি তার ব্যবস্থা করব।"

উষার সূচনা করিয়া শীতল বায়ু আমাদের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া গেল। পূর্ব্বগগনে কৃষ্ণপক্ষের ক্ষয়প্রাপ্ত শশিকলা রোগপাণ্ডুর মুখ তুলিয়া চাহিল। আমি বলিলাম, "আর বিলম্বে প্রয়োজন নেই, রাত্রি শেষ হয়ে আসছে, এই বেলা সঙ্কেত পাঠাও।"

সোমদত্তা প্রদীপ লইয়া প্রাকারের প্রান্তে গিয়া দাঁড়াইল। প্রসারিত-হস্তে কিছুক্ষণ প্রদীপ ধরিয়া থাকিয়া মুখে নিশাচর পক্ষীর মত একপ্রকার শব্দ করিল। উৎকর্ণ হইয়া শুনিলাম, পরিখার পরপার হইতে অস্পষ্ট উত্তর আসিল। তখন সোমদত্তা প্রদীপ ধীরে ধীরে সঞ্চালিত করিতে লাগিল। তাপসীর মত আত্মসমাহিত মুখ, নিশ্চল তন্ময় চক্ষু, সোমদত্তা দীপরশ্মির সাহায্যে সমস্ত সংবাদ বাহিরে প্রেরণ করিল।

সংবাদ শেষ হইলে বাহিরের অন্ধকার হইতে আবার শব্দ আসিল—এবার পাপিয়ার উচ্চতান। শব্দ স্তরে স্তরে উঠিয়া ঊর্দ্ধে বায়ুমণ্ডলে বিলীন হইয়া গেল।

সোমদত্তা প্রদীপ নামাইয়া বলিল, "কাল উত্তর পাবে।"

৬

নিশাবসানে পৌরজন নিদ্রাত্যাগ করিয়া দেখিল, নগরের হট্টে রাশি রাশি খাদ্য স্তূপীকৃত হইয়াছে। ঘৃত, তৈল, শালি-তণ্ডুল, গোধূম, চণক, শাক-সব্জী—কোন বস্তুরই অভাব নাই, কোথা হইতে খাদ্য আসিল, কেহ জানিল না। শুধু দেখা গেল, বুদ্ধ তথাগতের পাষাণময় বিহারের অভ্যন্তর হইতে এই খাদ্যস্রোত নিঃসৃত হইতেছে। নাগরিকগণ ঊর্দ্ধকণ্ঠে সৌগতের জয়ঘোষণা করিতে করিতে হট্টের অভিমুখে ছুটিল।

মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত তখন মল্লগৃহের সুচিক্কণ শীতল মণি-কুট্টিমের উপর শয়ান ছিলেন, দুই জন নহাপিত সুগন্ধি তৈল দ্বারা তাঁহার হস্তপদাদি মর্দ্দন করিয়া দিতেছিল। নাগরিক-দের এই আনন্দনিনাদ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল; তিনি মুদিত চক্ষু ঈষন্মাত্র উন্মীলিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল্লভ, কিসের চীৎকার? চন্দ্রবর্ম্মা কি দুর্গপ্রবেশ করল?"

সন্নিধাতা বল্লভ সুবর্ণস্থালীর উপর স্ফটিকপাত্রপূর্ণ ফলাম্লরস লইয়া অদূরে দাঁড়াইয়া ছিল—মহারাজ স্নানান্তে পান করিয়া শরীর স্নিগ্ধ করিবেন। সে বলিল, "না, আজ বহুদিন পরে পৌরজন খাদ্য পেয়েছে, তাই মহারাজের জয়-ধ্বনি করছে।"

চন্দ্রগুপ্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "খাদ্য কোথা হ'তে এল?"

বল্লভ সবিশেষ জানিত না, তথাপি মহারাজের কথার উত্তর দিতে হইবে; বলিল,—"বিহারমধ্যে খাদ্য সঞ্চিত ছিল, ভিক্ষুগণ তাই বিতরণ করছেন।"

মহারাজ আর প্রশ্ন করিলেন না, পুনশ্চ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কহিলেন;—"ভাল, মহাদেবীকে সমাচার দাও। তিনি প্রকৃতিপুঞ্জের জন্য বড়ই ব্যাকুল হয়েছিলেন।"

মহারাজের গূঢ় শ্লেষ বল্লভ অনুধাবন করিল না, মহাদেবী বলিতে প্রেয়সী সোমদত্তাকেই বুঝিল। "যথা আজ্ঞা" বলিয়া বাহিরে গেল। বাহিরে গিয়া দেখিল, অসংবৃতকুন্তলা এক তরুণী দাসী দ্রুতপদে বহির্মুখে যাই-তেছে। বল্লভ ইঙ্গিত করিয়া তাহাকে কাছে ডাকিল; বলিল,—"জয়ন্তী, তোমার কেশবেশ যেরূপ বিস্রস্ত, বাইরে গেলে লোকে নিন্দা করবে।"

জয়ন্তী মথিত-কজ্জল চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া কহিল,—"কি প্রয়োজন, তাই বল না, রসিকতার সময় নেই। আমি কাযে যাচ্ছি।"

বল্লভ বলিল,—"কায পরে করো এখন, অন্দরে ফিরে যাও।" বলিয়া তাহার মুখে সংবাদ পাঠাইয়া দিল।

জয়ন্তী সংবাদ লইতেই আসিতেছিল, ফিরিয়া গিয়া সোমদত্তাকে সকল কথা জানাইল।

সোমদত্তা তখন শীতল হর্ম্ম্যতলে পড়িয়া দুই বাহুর উপর মুখ রাখিয়া চিন্তা করিতেছিল। কি গহন, কি কুটিল তাহার চিন্তা, তাহা কে বলিবে? দাসীর কথা শুনিয়া সে উঠিয়া বসিল। দুই চক্ষু কালিমাবেষ্টিত হইয়া যেন আরও উজ্জ্বল, আরও প্রভাময় হইয়াছে, শিশির-কালের প্রস্ফুট হিমচম্পকের ন্যায় কপোল-দুইটি পাণ্ডুর। রূপের বুঝি অন্ত নাই। দাসী এই ক্লান্ত-সন্তপ্ত সৌন্দর্য্যের সম্মুখ হইতে বোধ করি লজ্জা পাইয়া ধীরে ধীরে সরিয়া যাইতেছিল; সোমদত্তা ডাকিল,—"জয়ন্তী!"

দাসী ফিরিয়া আসিয়া সসম্ভ্রমে বলিল,—"আজ্ঞা!"

অধোমুখে কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া সোমদত্তা বলিল,—"তুই একবার বাইরে যা। বৌদ্ধ-বিহারে গিয়ে শ্রমণাচার্য্য ভিক্ষু অকিঞ্চনকে আমার কাছে ডেকে আন। বলবি যে,

ভিক্ষুণী দীপান্বিতা তাঁকে স্মরণ করেছে। আর কঞ্চুকী যদি তাঁর পুরপ্রবেশে বাধা দেয়, এই মুদ্রা দেখাস্।" বলিয়া আপন কণ্ঠের রত্নহার হইতে স্বর্ণমুদ্রা খুলিয়া দাসীর হস্তে দিল।

জয়ন্তীর মুখ পাংশু হইয়া গেল, সে ভীতকণ্ঠে বলিল,—"কিন্তু অজ্জা কুমারদেবী জান্‌তে পারলে—"

সোমদত্তা কহিল,—"ত্যক্ত করিস না, যা বললাম, কর্।"

জয়ন্তী প্রস্থান করিল, মনে মনে বলিতে বলিতে গেল,—"তোমার আর কি! অন্দরে বৌদ্ধ-ভিক্ষু ডাকিয়েছি শুনলে পট্টদেবী আমার মাথাটি খাবেন।"

ভিক্ষু অকিঞ্চনকে লইয়া যখন জয়ন্তী ফিরিল, তখন সোমদত্তা স্নান করিয়া শুদ্ধশুচি হইয়া বসিয়াছে; ললাটে কুঙ্কুম-তিলক পরিয়াছে, বক্ষে কাঁচুলি বাঁধিয়া উজ্জ্বল দেহলাবণ্য সংযত করিয়াছে। ভিক্ষু কক্ষে প্রবেশ করিয়া সোমদত্তাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং আসন পরিগ্রহ করিয়া জিজ্ঞাসু নেত্রে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। সঙ্ঘ-স্থবিরের বয়স হইয়াছে, মস্তক ও মুখ মুণ্ডিত, পরিধানে পীতবস্ত্র, শান্ত সৌম্য মূর্ত্তি। কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে কিছু কৃশ, কিন্তু মুখমণ্ডলে ব্রহ্মচর্য্যের নির্ম্মল দীপ্তি জাজ্বল্যমান।

সোমদত্তা জয়ন্তীকে চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিল। জয়ন্তী প্রস্থান করিলে সে ভিক্ষুকে প্রণিপাত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল,—"অর্হৎ, আত্ম-পরিচয় গোপন ক'রে সঙ্ঘারামে গিয়েছিলাম—ক্ষমা করুন।"

অকিঞ্চন কহিলেন,—"আত্মগোপন ক'রে যে আর্ত্তের সেবা করে, সিদ্ধার্থ তাকে অধিক কৃপা করেন।"

সোমদত্তা কহিল,—"আজ রাত্রে বোধ হয় সঙ্ঘারামে যাবার অবকাশ হবে না। তাই অজ্জা কুমারদেবীর বৌদ্ধ-বিদ্বেষ জেনেও আপনাকে এখানে আহ্বান করেছি। আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে।"

অকিঞ্চন কহিলেন,—"সময় উপস্থিত হ'লে ভগবান্ শাক্যসিংহ কুমারদেবীকে সুমতি দেবেন। তোমার জিজ্ঞাস্য কি?"

সোমদত্তা কহিল,—"শুনলাম, নগরে খাদ্য আস্‌ছে। এ কথা সত্য?"

"সত্য।"

"কি ক'রে এল?"

ভিক্ষু কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া বলিলেন,—"তথাগতের কৃপায়।"

সোমদত্তা ঈষৎ অধীর হইয়া বলিল,—"তা জানি। কিন্তু কোথা হ'তে কোন্ পথে এল?"

অকিঞ্চন মৃদুহাস্যে বলিলেন;—"সঙ্ঘের পথে।"

শিরঃসঞ্চালন করিয়া সোমদত্তা কহিল,—"তাও জানি। খাদ্য সঙ্ঘারামে সঞ্চিত ছিল?"

"না।"

"তবে?".

"এ অতি গূঢ় বৃত্তান্ত। দীপান্বিতে, তুমি কৌতূহল প্রকাশ করো না,—আমি বলব না।"

"তবে আমিই বলছি! সঙ্ঘমধ্যে কোনও সুড়ঙ্গ আবিষ্কৃত হয়েছে, সেই পথে দুর্গের বাইরে থেকে খাদ্য আস্‌ছে—সত্য কি না?"

ইতস্ততঃ করিয়া ভিক্ষু কহিলেন,—"সত্য, জান যদি প্রশ্ন করছ কেন?"

"জানি না, অনুমান করেছি মাত্র। অর্হৎ, কন্যার প্রতি একটি অনুগ্রহ করুন। কি ক'রে কবে এই সুড়ঙ্গ আবিষ্কৃত হ'ল, আমাকে বলুন।"

কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া সঙ্ঘাচার্য্য বলিলেন,—"ভাল, শোন। এই সুড়ঙ্গের সন্ধান একপক্ষ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমি অথবা অন্য কেউ জানত না। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী সঙ্ঘ-স্থবির নির্ব্বাণের পূর্ব্বে মোহপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, তাই এর কথা আমাকে ব'লে যেতে পারেন নি।"

নির্নিমেষ চক্ষুর্দ্বয় ভিক্ষুর মুখের উপর স্থাপন করিয়া সোমদত্তা শুনিতে লাগিল।

অকিঞ্চন বলিতে লাগিলেন,—"সঙ্ঘের মধ্যে ভূগর্ভস্থ যে প্রকোষ্ঠে বুদ্ধের অস্থি রক্ষিত আছে, তার উপরে আর একটি কক্ষ আছে, তুমি দেখে থাকবে। কক্ষটি সচরাচর ব্যবহৃত হয় না, কদাচ আমি মননাদির জন্য উহা ব্যবহার ক'রে থাকি। গত পূর্ণিমা-তিথিতে আমি সেই কক্ষে প্রবেশ ক'রে দেখি, ঘরটি অত্যন্ত অপরিষ্কার হয়েছে এবং ছাদের মধ্যস্থলে যে প্রস্তরের ধর্ম্মচক্র ক্ষোদিত আছে, তার উপর মধুমক্ষিকা চক্রনির্ম্মাণ করেছে। ঘরটিকে মল-নির্ম্মুক্ত করবার মানসে আমি প্রথমে একটি বংশদণ্ডাগ্রে মশাল যোজিত ক'রে ধূমপ্রয়োগ

দ্বারা মধুমক্ষিকাগুলিকে বিদূরিত করলাম ; তারপর মধুচক্রটি স্থানচ্যুত করবার অভিপ্রায়ে বংশদণ্ড দ্বারা উহা তাড়িত করবামাত্র এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। ধর্ম্মচক্রের মধ্যস্থলে যে ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে, তাহার মধ্যে বংশের অগ্রভাগ প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গে কক্ষপ্রাচীরের এক স্থানে প্রস্তর সরে গিয়ে একটা চতুষ্কোণ গহ্বর দেখা দিল। আমি অতিশয় বিস্মিত হয়ে সেই রন্ধ্রটি পরীক্ষা করলাম, দেখলাম, অন্ধকার মধ্যে সোপান নেমে গেছে।

"পাছে অন্য কেহ এসে পড়ে, এ জন্য তখন আর কিছু করলাম না—কক্ষের কবাট বন্ধ ক'রে ফিরে এলাম। রাত্রিতে সকলে ঘুমুলে, প্রদীপ নিয়ে কক্ষের ভিতর থেকে অর্গলবদ্ধ ক'রে দিয়ে সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করলাম। প্রস্তর ও ইষ্টকনির্ম্মিত সুড়ঙ্গ, অতিশয় সঙ্কীর্ণ ও অনুচ্চ, মস্তক অবনত ক'রে চলতে হয়। অর্দ্ধ ক্রোশান্তরে বায়ু-প্রবাহের জন্য কূপ আছে—সেই কূপ সকল লঙ্ঘন ক'রে অগ্রসর হ'তে হয়। আমি এইভাবে বহুদূর পর্য্যন্ত গমন ক'রেও সুড়ঙ্গের শেষ পেলাম না। প্রদীপের তৈল নিঃশেষ হয়ে আস্‌ছিল, সে রাত্রিতে ভগ্নোদ্যম হয়ে ফিরে এলাম। তারপর উপর্য্যুপরি পঞ্চরাত্রি চেষ্টার পর ষষ্ঠরাত্রিতে সুড়ঙ্গের অপর প্রান্তে পৌঁছুলুম। কুক্কুটপাদ বিহারের অঙ্গনে গিয়ে সুড়ঙ্গ শেষ হয়েছে।"

সংহত নিশ্বাসে সোমদত্তা বলিল, "তারপর ?"

নিশ্বাস ফেলিয়া অকিঞ্চন কহিলেন,—"কুক্কুটপাদ বিহারের পূর্ব্বশ্রী আর নেই, এখন উহা জনহীন ভগ্নপ্রায়, শ্বাপদের বাসভূমি। কিন্তু তথাপি গোতমের করুণার উৎস এখনো শতমুখে উৎসারিত হচ্ছে, তাই ভগবান্ পথ দেখিয়ে দিলেন। আমি ফিরে এসে সান্ধিবিগ্রহিককে সংবাদ দিলাম, বল্লাম, সঙ্ঘের পথেই বুভুক্ষিতের ক্ষুধা নিবারণ হোক।"

ভিক্ষু অকিঞ্চন নীরব হইলেন। সোমদত্তা নতমুখে চিন্তা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ এইভাবে কাটিবার পর ভিক্ষু আসন ত্যাগ করিয়া উঠিবার উপক্রম করিলেন। তখন সোমদত্তা যুক্তপাণি হইয়া বলিল,—"শ্রীমন্, আর একটি প্রশ্ন আছে। এই রাজপুরী যিনি নির্ম্মাণ করেছিলেন, তিনি কি বৌদ্ধ ছিলেন ?"

অকিঞ্চন কহিলেন,—"হাঁ, শুনেছি, অশোক প্রিয়দর্শী এই পুরী নির্ম্মাণ করিয়েছিলেন,—সঙ্ঘারামও তাঁরই প্রতিষ্ঠিত।"

সোমদত্তা প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—"ভগবন্, আশীর্ব্বাদ করুন, যেন পূর্ণ-মনোরথ হ'তে পারি।"

সহাস্যমুখে অকিঞ্চন কহিলেন,—"সুমঙ্গলে, গোতমের ইচ্ছায় তোমার মনস্কাম সিদ্ধ হবে—গোতম অন্তর্যামী।"

সঙ্ঘ-স্থবির বিদায় হইলে সোমদত্তা কক্ষমধ্যে পাদচারণ করিতে করিতে ভাবিতে লাগিল। দীর্ঘকাল গভীর চিন্তা করিল। ধর্ম্মচক্র ! ধর্ম্মচক্র ! কিন্তু পুরীমধ্যে কোথাও ত ধর্ম্ম-চক্র নাই। বুদ্ধের মূর্ত্তি, ধর্ম্মচক্র প্রভৃতি যাহা ছিল, তাহা অপসারিত করিয়া তৎপরিবর্ত্তে দেবমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে।

ভাবিতে ভাবিতে অজ্ঞাতসারে তাহার চক্ষু ঊর্দ্ধে নিপতিত হইল। তখন বিস্ফারিত নেত্রে স্তম্ভিত বক্ষে সে দেখিল, উচ্চ ছাদের মধ্যস্থলে রক্ত-প্রস্তরে উৎকীর্ণ ধর্ম্মচক্র—এবং তাহার কেন্দ্রমধ্যে ক্ষুদ্র সুগোল একটি ছিদ্র !

বহুক্ষণ স্তব্ধ থাকিবার পর সোমদত্তা ছুটিয়া গিয়া জয়ন্তীকে ডাকিল। উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল,—"জয়ন্তি, শীঘ্র যা—অস্ত্রাগার হ'তে ধনুর্ব্বাণ নিয়ে আয়। জিজ্ঞাসা করলে বলিস্, মহাদেবী সোমদত্তা লক্ষ্যবেধ শিক্ষা করবেন।"

৭

শব্দতরঙ্গে অন্ধকার পরিপূর্ণ করিয়া বাঁশী বাজিতেছিল সোমদত্তা প্রদীপের সম্মুখে বসিয়া করতলে চিবুক রাখিয়া এই দূরাগত বংশীধ্বনি শুনিতেছিল। আমি প্রাকার-কুড্য আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম।

বাঁশী প্রথমে বসন্ত-রাগ ধরিল ; তার পর কিছুক্ষণ গুর্জ্জরী-রাগ লইয়া ক্রীড়া করিয়া আবার বসন্ত-রাগে ফিরিয়া আসিল। শেষে এই দুই রাগ ছাড়িয়া বাঁশী মালকোষ ধরিল। কত নিপুণ স্বরের কৌশল, কত মীড়গমক-ঝঙ্কার, কত তানলয়ের পরিবর্ত্তন দেখাইল। তার পর সহসা বাঁশী স্তব্ধ হইল।

"বাঁশী কি বলিল ?"

সোমদত্তা যেন তন্দ্রার ঘোর হইতে জাগিয়া উঠিল অতি দীর্ঘ এক নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল,—"তুমি যা চাও, তা পাবে, চন্দ্রবর্ম্মা তোমাকে মগধের ক্ষত্রপ নিযুক্ত করবেন।

আগামী অমাবস্যার রাত্রিতে দ্বিতীয় প্রহর ঘোষিত হবার পর আমি এই প্রদীপ দ্বারা রাজপুরীতে অগ্নিসংযোগ করব। অগ্নি যখন ব্যাপ্ত হয়ে আকাশ লেহন করবে, সেই সময় তুমি গোতমদ্বারের অর্গল খুলে দেবে। রাজপ্রাসাদে অগ্নিসংযোগই সঙ্কেত, এই সঙ্কেত পাইয়া চন্দ্রবর্ম্মার সেনা দুর্গ প্রবেশের জন্য প্রস্তুত থাকবে, তুমি দ্বার খুলে দিলেই তারা প্রবেশ করবে। পৌরজন রাজপুরী রক্ষার্থে ব্যস্ত থাকবে, সেই অবসরে চন্দ্রবর্ম্মা বিনা বাধায় পাটলিপুত্র অধিকার করবেন।"

আমি উত্তেজিত হইয়া বলিলাম,—"অমাবস্যার রাত্রি? তার ত আর বিলম্ব নেই—আগামী পরশ্বদিন!"

"হাঁ। অধিক বিলম্বে ভয় আছে, লিচ্ছবিগণ এসে পড়তে পারে।"

ইহার পর সোমদত্তা আবার মৌন অবলম্বন করিল, করলগ্নকপোলে নিষ্পলক দৃষ্টিতে দীপশিখার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। আমিও সহসা কি কথা বলিব ভাবিয়া পাইলাম না, মানসিক উত্তেজনা রসনাকে যেন জড় করিয়া দিল। তথাপি চেষ্টা করিয়া কহিলাম,—"বাঁশী ত রাগ-রাগিণীর আলাপ করল, তুমি এত কথা বুঝলে কি ক'রে?"

সোমদত্তা অন্যমনে কহিল,—"ঐ রাগ-রাগিণীতে সংযুক্ত কথাগুলো আমার জানা। যিনি বাঁশী বাজাচ্ছিলেন, তিনি আমার গীতাচার্য্য ছিলেন।"

অতঃপর আবার দীর্ঘ নীরবতা বিরাজ করিতে লাগিল। কাহারও মুখে কথা নাই। এই সুকঠিন মৌন আর সহ্য করিতে না পারিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—কি ভাবছ?"

সোমদত্তা মুখ তুলিয়া বলিল,—"ভাবছি, কি অপরিমেয় শক্তি এই ক্ষুদ্র মৃৎপ্রদীপের! এত তুচ্ছ, ভঙ্গুর—মাটীতে পড়লে ভেঙ্গে শতখণ্ড হবে; অথচ একটা রাজ্য ধ্বংস করবার শক্তি এর আছে। এমনি কত শত ছার মৃৎপ্রদীপ কেবল রূপশিখার অনলে সংসার ভস্মীভূত করছে।"

আমি তাহার বাক্যের মর্ম্ম বুঝিয়া হস্তধারণ পূর্ব্বক বলিলাম,—"মৃৎপ্রদীপ নয়, সোমদত্তা, তুমি রত্নপ্রদীপ! তোমার দীপ্তিতে মগধ আলোকিত হবে।"

সোমদত্তা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—"আমি শ্মশানের আলো। এখন চললাম, সেই অমাবস্যার রাত্রিতে আবার সাক্ষাৎ হবে। চন্দ্রবর্ম্মাকে সঙ্গে নিয়ে প্রাসাদে যেও, আমি মন্ত্রগৃহে প্রতীক্ষায় থাকব।"

আমি তাহাকে সাদরে নিকটে টানিয়া লইয়া বলিলাম,—"সেই দিন আমাদের মনোরথ পূর্ণ হবে।"

ঈষৎ হাসিয়া সোমদত্তা বলিল,—"হাঁ, সেই দিন আমার মনোরথ পূর্ণ হবে।"

৮

মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত সোমদত্তার কক্ষে সুখসেব্য শয্যায় নিদ্রা যাইতেছিলেন। অকস্মাৎ তীব্র শ্বাসরোধকর ধূমের গন্ধে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। চক্ষু না খুলিয়াই ডাকিলেন,—"সোমদত্তা!" উত্তর পাইলেন না। তখন নিদ্রাকষায়-নেত্র উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, শয্যায় সোমদত্তা নাই। কক্ষের চারিদিকে চাহিলেন, সোমদত্তাকে দেখিতে পাইলেন না।

বাহিরে তখন সমস্ত পুরী জাগিয়া উঠিয়াছে। সদ্য-উত্থিতা নারীদের ভীত-চীৎকার, গৃহপালিত ময়ূর-শারিকা প্রভৃতি পক্ষীদের সচকিত আর্ত্তস্বর এবং সর্ব্বোপরি বিস্তারশীল অগ্নির গর্জ্জন নৈশ বায়ুকে বিলোড়িত করিতেছে। দারু-প্রাসাদে আগুন লাগিলে রক্ষা করিবার কোনও উপায় নাই, পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করাই একমাত্র পথ। পুরীস্থ সকলে মহা কোলাহল করিয়া নিজ নিজ মূল্যবান্ দ্রব্য যাহা পাইতেছে, লইয়া পলাইতেছে। কে পড়িয়া রহিল, রাজা-রাণী কে মরিল, কে বাঁচিল, কাহারও দেখিবার অবসর নাই। নিজের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য সকলেরই উগ্র বাহ্যজ্ঞান-শূন্য ত্বরা।

অগ্নি ক্রমশঃ আরও ব্যাপ্ত হইতে লাগিল; এক প্রাসাদ ছাড়িয়া সংলগ্ন-প্রাসাদ সকল আক্রমণ করিল। বায়ুর বেগ বাড়িয়া গেল। অমাবস্যা রাত্রির মসীতুল্য অন্ধকার এই ভীষণ অগ্নিকাণ্ডে যেন বিদীর্ণ—শতখণ্ড হইয়া গেল। বহু দূর পর্য্যন্ত নগর রক্তাভ আলোকে উদ্ভাসিত হইল।

নাগরিকগণ জাগিয়া উঠিয়া কোলাহল করিতে করিতে রাজপুরীর দিকে ছুটিল। উত্তেজিত বিহ্বল নর-নারী স্খলিত-বসনে মুক্ত-কেশে বাহ্যজ্ঞানশূন্যভাবে জ্বলন্ত রাজপ্রাসাদের চতুর্দ্দিকে সমবেত হইতে লাগিল।

সহসা বহুদূরে সম্মিলিত সহস্রকণ্ঠে মহা জয়ধ্বনি শ্রুত হইল। রাজপুরীর চারিপাশে সমবেত নাগরিকগণ উর্দ্ধমুখে অনলোল্লাস দেখিতেছিল,তাহার মধ্য হইতে কে এক জন চীৎকার করিয়া বলিল,—"পালাও! পালাও! নগরে শত্রু প্রবেশ করেছে।" অমনই বিক্ষুব্ধ জনতা উন্মত্তের ন্যায় চারিদিকে দৌড়িতে আরম্ভ করিল। কেহ উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে পড়িয়া গিয়া জানু ভাঙ্গিল, কেহ জনমর্দ্দের চরণতলে পড়িয়া পিষ্ট হইয়া গেল। ক্রন্দন, হাহাকার এতক্ষণ রাজপুরীর মধ্যে নিবদ্ধ ছিল, এবার নগরময় ছড়াইয়া পড়িল।

সোমদত্তা তখন কোথায়?

সোমদত্তা তখন আলুলায়িত কুন্তলে, লুণ্ঠিত বসনে পট্টমহাদেবীর প্রাসাদে প্রবেশ করিতেছে। কুমারদেবীর ভবনে তখনও ভাল করিয়া আগুন লাগে নাই; কিন্তু দাসী, কিঙ্করী, প্রহরিণী যে যেখানে ছিল, সকলে পলাইয়াছে। কুমারদেবীর অরক্ষিত শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া সোমদত্তা দেখিল, বিস্তৃত শয্যার উপর পুত্রকে বুকের কাছে লইয়া তিনি তখনও নিদ্রিতা।

সোমদত্তা সবলে তাঁহার অঙ্গে নাড়া দিয়া বলিল, "দেবী, উঠুন, উঠুন—প্রাসাদে আগুন লেগেছে।"

কুমারদেবী চক্ষু মুছিয়া শয্যায় উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "কে?"

"আমি, সোমদত্তা। আর বিলম্ব করবেন না, শীঘ্র শয্যাত্যাগ করুন।" বলিয়া ঘুমন্ত সমুদ্রগুপ্তকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইতে গেল।

কুমারদেবীর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ও কঠিন হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন,—"আমার পুত্রকে স্পর্শ করো না। দাসীরা কোথায়?"

"কেউ নেই, সকলে প্রাণভয়ে পালিয়েছে।"

"মহলে কি ক'রে আগুন লাগল?"

আর গোপন করিবার প্রয়োজন ছিল না। সোমদত্তা স্থিরদৃষ্টিতে কুমারদেবীর মুখের পানে চাহিয়া বলিল, "আমিই মহলে আগুন দিয়েছি।"

কুমারদেবী চীৎকার করিয়া কহিলেন,—"স্বৈরিণি, তা জানি। যখন বৌদ্ধ ভিক্ষুকে ঘরে এনেছিস, তখনি তোর অভিসন্ধি বুঝেছি।"

সোমদত্তা কহিল,—"অজ্জা, ক্রোধে অন্ধ হয়ে নির্দ্দোষের প্রতি দোষারোপ করবেন না। সেই বৌদ্ধ ভিক্ষুর প্রসাদেই আজ আপনাদের প্রাণরক্ষা করতে পারব। এখন আসুন, পুরী এতক্ষণ ভস্মসাৎ হ'ল। আর বিলম্ব করলে বুঝি আপনাদের বাঁচাতে পারব না।"

"তুই বাঁচাবি? কেন, আমি কি আত্মরক্ষা করতে জানি না?"

"না অজ্জা, আজ আমি ভিন্ন আর কেউ আপনাদের বাঁচাতে পারবে না।"

"তার অর্থ?"

"তার অর্থ চন্দ্রবর্ম্মার সেনা দুর্গে প্রবেশ করেছে, এতক্ষণে বোধ করি, রাজপুরী ঘিরে ফেলেছে।"

কুমারদেবীর চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল,—"ডাকিনী, এ তোর কার্য্য। তুই মগধরাজ্য ছারখারে দিলি।"

সোমদত্তা স্থিরভাবে বলিল, "স্বীকার করলাম। কিন্তু আর বিলম্ব করলে কুমারকে বাঁচাতে পারব না। ঐ দেখুন, অগ্নি প্রাসাদ বেষ্টন করেছে।"

এই সময় অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বাতায়নপথে অগ্নির আরক্ত লোলরসনা ও কুণ্ডলিত ধূমোদ্গার কক্ষে প্রবেশ করিল।

সোমদত্তা সমুদ্রগুপ্তকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া বলিল, "আজ আমার স্বামীর বংশধরকে বাঁচাব ব'লে এসেছি, নইলে আসতাম না। আপনি থাকতে হয় থাকুন, আমি চল্‌লাম।" বলিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল।

কুমারদেবী ছুটিয়া আসিয়া তাহার বাহু ধরিলেন,—"রাক্ষসি, ছেড়ে দে, আমার পুত্রকে ছেড়ে দে।"

সোমদত্তা প্রজ্বলিত নয়নে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—"দুর্ভাগিনি, নিজের ইষ্ট বুঝতে পার না? আমার স্বামীর পুত্র কি আমার পুত্র নয়? এ রাজ্যে আগুন আমি জ্বালিনি—জ্বেলেছে তোমার দুরন্ত অন্ধ অভিমান। সেই আগুনে তুমি পুড়ে মর!"

কুমারদেবীর হাত ছাড়াইয়া পুত্র বুকে লইয়া সোমদত্তা ধূমান্ধকার অলিন্দের ভিতর দিয়া ছুটিয়া চলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে উন্মাদিনীর ন্যায় কুমারদেবী তাহার পশ্চাতে চলিলেন।

নিজ শয়নকক্ষে ফিরিয়া আসিয়া সোমদত্তা দেখিল, রাজা অভিভূতের ন্যায় শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আছেন—চতুর্দ্দিকে

কি ঘটিতেছে, তাঁহার যেন কোনও ধারণায় নাই। ঘর ধূমাচ্ছন্ন—ঘরের চারিকোণে চারিটি স্বর্ণ-প্রদীপ তখনও ক্ষীণ আলোক বিস্তার করিয়া জ্বলিতেছে।

হাঁপাইতে হাঁপাইতে পুত্রকে স্বামীর ক্রোড়ে ফেলিয়া দিয়া সোমদত্তা ছুটিয়া গিয়া ধনুর্ব্বাণ লইয়া আসিল। ভাল দেখা যায় না, দুই চক্ষু বহিয়া অশ্রুধারা ঝরিতেছে। সোমদত্তা ধর্ম্মচক্রের মধ্যস্থল লক্ষ্য করিয়া শরসন্ধান করিল। লক্ষ্যভ্রষ্ট শর পাথরে লাগিয়া ফিরিয়া আসিল। আবার শরনিক্ষেপ করিল, ব্যর্থ শর আবার প্রতিহত হইয়া ভূমিতে পড়িল। অদম্য ক্রন্দনের আবেগে সোমদত্তার বক্ষ ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল। তবে কি গুপ্তদ্বার খুলিবে না?

এদিকে ঘরের মধ্যে অগ্নির অসহ্য উত্তাপ উত্তরোত্তর বাড়িতেছে। রাজা এবং কুমারদেবী নির্ব্বাক্ নিষ্পলক হইয়া সোমদত্তার এই উন্মত্তবৎ কার্য্য দেখিতে লাগিলেন। সোমদত্তা অসীমবলে আপনাকে সংযত করিয়া পুনশ্চ ধনুর্ব্বাণ তুলিয়া লইল। লক্ষ্যবস্তু নিকটেই, কিন্তু ভাল করিয়া দেখা যায় না; হাত কাঁপে, চক্ষু কূলে কূলে ভরিয়া উঠে। বহুক্ষণ ধরিয়া অনেকবার চক্ষু মুছিয়া অতি সাবধানে লক্ষ্য স্থির করিয়া সোমদত্তা তীর ছুড়িল। এবার আর তীর ফিরিয়া আসিল না—ধর্ম্মচক্রের মধ্যস্থলে বিঁধিয়া রহিল। সোমদত্তা ধনু ফেলিয়া দিয়া একবার ক্ষণকালের জন্য মাটীতে লুটাইয়া পড়িল।

কিন্তু পরক্ষণেই চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কুমারদেবীর নিকট গিয়া বলিল,—"অজ্জা, এইবার স্বামিপুত্র নিয়ে এই সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করুন। সুড়ঙ্গ নগর-বাহিরে কুক্কুটপাদ বিহারে গিয়ে শেষ হয়েছে। সেখানে শত্রু নেই, সেখান হ'তে সহজেই নিরাপদ স্থানে যেতে পারবেন।"

চন্দ্রগুপ্ত সুড়ঙ্গমুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিলেন। এতক্ষণে প্রথম কথা কহিলেন,—"নগর-বাহিরে যাবার প্রয়োজন কি?"

সোমদত্তা কহিল,—"প্রয়োজন আছে। শত্রু নগর অধিকার করেছে।"

তখন পুত্র লইয়া দুই জনে সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিলেন।

সোমদত্তা চন্দ্রগুপ্তের চরণে মস্তক রাখিয়া প্রণাম করিয়া কহিল,—"অজ্জুভত্ত! এইবার বিদায় দাও।"

সহসা চন্দ্রগুপ্ত যেন তাঁহার সমস্ত চেতনা ফিরিয়া পাইলেন; ভীষণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সোমদত্তা, তুমি আসবে না?"

সোমদত্তা দুই হাতে মুখ ঢাকিল; বলিল,—"না প্রিয়তম, আমি আর তোমার সঙ্গে যাবার যোগ্য নই। কেন নই, তা দেবীর মুখে শুনো। চন্দ্রবর্ম্মা আমার পিতা—এই কথা মনে ক'রে যদি পারো, আমাকে ক্ষমা করো। তোমরা যাও—আমি ভিন্ন পথে যাব।"

হৃদয়-বিদারক স্বরে চন্দ্রগুপ্ত ডাকিলেন,—"সোমদত্তা!"

দুই হস্তে কর্ণ আবরণ করিয়া সোমদত্তা কাঁদিয়া উঠিল,—"না না, ডেকো না—আমি যেতে পারব না। আমায় মরতে হবে। প্রিয়তম, আবার জন্মান্তরে দেখা হবে, তখন তোমার সোমদত্তাকে সঙ্গে নিও।"

এই বলিয়া সবলে টানিয়া সুড়ঙ্গের পাষাণ দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। চন্দ্রগুপ্তের মুখনিঃসৃত অর্দ্ধোচ্চারিত বাণী পাষাণ-প্রাচীরে লাগিয়া স্তব্ধ হইয়া গেল।

তখন সেই উত্তপ্ত হর্ম্ম্যতলে পড়িয়া, বসুধা আলিঙ্গন করিয়া কেশ বিকীর্ণ করিয়া ভূতলে ললাট প্রহত করিয়া সোমদত্তা কাঁদিল।

কিন্তু তবু অগ্নি নিভিল না।

৯

এক হস্তে মুক্ত তরবারি, অন্য হস্তে প্রজ্বলিত মশাল লইয়া দুর্গাবরোধকারী সেনা গোতমদ্বার দিয়া প্রবেশ করিল। তাহাদের পুরোভাগে লৌহবর্ম্মাবৃত ধাতুনির্ম্মিত শিরস্ত্রাণধারী ভীষণাকৃতি স্বয়ং চন্দ্রবর্ম্মা। দ্বারের প্রহরীদিগকে পূর্ব্বেই সরাইয়া দিয়াছিলাম, সুতরাং একবিন্দুও রক্তপাত হইল না।

চন্দ্রবর্ম্মা আমাকে দেখিয়া পরুষকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমিই বিশ্বাসঘাতক দ্বারপাল?"

কথার ভাবটা ভাল লাগিল না। যাহার জন্য বিশ্বাসঘাতকতা করিলাম, সেই বিশ্বাসঘাতক বলে! যাহা হউক, বিনীত কণ্ঠে বলিলাম,—"হাঁ আমিই। সম্রাটের জয় হোক।"

চন্দ্রবর্ম্মা নিষ্করুণ আরক্ত দুই চক্ষু আমার মুখের উপর স্থাপন করিয়া মনে মনে কি যেন গবেষণা করিল,

তার পর বলিল,—"ভাল, সর্ব্বাগ্রে পথ দেখিয়ে রাজপ্রাসাদে নিয়ে চল।"

পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবার কোনও প্রয়োজন ছিল না। বিরাট অনলস্তম্ভের মত প্রাসাদ তখন জ্বলিতেছে—সমস্ত নগর আলোকিত করিয়াছে। আপনার প্রভায় রাজপুরী স্বয়ং-প্রকাশ।

সেনাদলের অগ্রে অগ্রে আমি চলিলাম। পথে কেহ গতিরোধ করিবার চেষ্টা করিল না, যে সম্মুখে পড়িল, চৈত্রের বায়ুতাড়িত শুষ্কপত্রের মত নিমেষমধ্যে বিপরীতমুখে অন্তর্হিত হইল।

প্রাসাদের শূন্য তোরণ পার হইয়া সদলবলে সম্মুখস্থ মন্ত্রগৃহে প্রবেশ করিলাম। অগ্নি তখনও মন্ত্রগৃহ পর্য্যন্ত সংক্রামিত হয় নাই, তবে দীর্ঘ জিহ্বা বিস্তার করিয়া অগ্রসর হইতেছে—অচিরাৎ গ্রাস করিবে।

বিশাল বহুস্তম্ভযুক্ত মন্ত্রগৃহ প্রায়ান্ধকার, জনশূন্য। কেবল তাহার মধ্যস্থলে সিংহাসনের বেদীর সম্মুখে সোমদত্তা দাঁড়াইয়া আছে। অশনিপূর্ণ বৈশাখী মেঘের ন্যায় তাহার মূর্ত্তি; বক্ষে পৃষ্ঠে মুক্ত রুক্ষ কেশজাল, ললাটে রক্তরেখা, নয়নের কৃষ্ণতারকায় জ্বালাময় বিদ্যুৎ। যেন ভয়ঙ্করী সংহারিণী প্রতিমা!

বহু মশালের দীপ্তিতে মন্ত্রগৃহ আলোকিত হইল। তখন সোমদত্তা চন্দ্রবর্ম্মাকে দেখিতে পাইয়া দ্রুতপদে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল।

"বৎসে! কল্যাণি!" বলিয়া চন্দ্রবর্ম্মা সোমদত্তাকে পদপ্রান্ত হইতে তুলিলেন। ক্ষণকালের জন্য এই ভীষণ দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধার কণ্ঠস্বর যেন প্রসাদগুণ প্রাপ্ত হইল।

সোমদত্তা অবরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "পিতা, আপনার কার্য্য সিদ্ধ হয়েছে।"

চন্দ্রবর্ম্মা বলিলেন, "পুত্রি! সে তোমারই জন্য। তোমার যোগ্য পুরস্কার আমি সযত্নে সঞ্চিত ক'রে রেখেছি। এখন এই রত্নহার গ্রহণ কর।" বলিয়া নিজ বক্ষ হইতে অমূল্য রশ্মিকলাপ মণিহার খুলিয়া সোমদত্তার হস্তে দিল।

সোমদত্তা হার দুই হস্তে ছিঁড়িয়া দূরে ফেলিয়া দিল; বলিল, "আর আমার পুরস্কারে প্রয়োজন নেই। আমার জীবনের সমস্ত প্রয়োজন শেষ হয়েছে।"

চন্দ্রবর্ম্মা বলিলেন, "সে কি! চন্দ্রগুপ্ত কোথায়?"

সোমদত্তা কহিল, "তা নয়, আমি বিধবা হই নি। কিন্তু আমার স্বামীকে আর আপনি খুঁজে পাবেন না। তিনি পুরী ত্যাগ করেছেন।"

"পুরী ত্যাগ করেছে? কোথায় গেল?"

"আমি তাঁকে গুপ্তপথে দুর্গের বাইরে পাঠিয়েছি।"

"কন্যা, এ কায কেন করলে?"

"দেব, এ ভিন্ন আমার আর অন্য পথ ছিল না। তিনি থাকলে সকল কথা জানতে পারতেন, তা হ'লে মরেও আমার এ নরক-যন্ত্রণা শেষ হ'ত না। পিতা, আমার কিছু নেই—সমস্ত গিয়েছে। নারীর যা কিছু মূল্যবান্, যা কিছু প্রেয়, এক নরকের পশু তা হরণ করেছে।"

অঙ্গারের মত দুই চক্ষু সোমদত্তা আমার দিকে ফিরাইল। তর্জ্জনী প্রসারিত করিয়া বিকৃতমুখে চীৎকার করিয়া কহিল,—"এই নরকের পশু আমার সর্ব্বস্ব হরণ করেছে।"

অল্পকালের জন্য সমস্ত পৃথিবী যেন নীরব হইয়া গেল। আমি আমার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে রক্তপ্রবাহের শব্দ শুনিতে পাইলাম। তার পর ব্যাঘ্রের মত গর্জ্জন করিয়া চন্দ্রবর্ম্মা আসিয়া আমার কেশমুষ্টি ধারণ করিল। অন্য হস্তের অঙ্গুলিগুলা আমার চক্ষু উৎপাটিত করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছিল। ক্রূর হাসি হাসিয়া সোমদত্তা কহিল,—"পিতা, ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, আমি পুরস্কার চাই। এই পিশাচকে এখনি মারবেন না, একে তিলে তিলে দগ্ধ ক'রে মারবেন। দীর্ঘকাল ধ'রে বিষকণ্টকপূর্ণ অন্ধকূপে যেন এই নরাধম পচে পচে মরে; গলিত ক্রিমিপূর্ণ শূকরমাংস ভিন্ন যেন অন্য খাদ্য না পায়। মরবার পূর্ব্বে যেন এর প্রত্যেক অঙ্গ গলে খসে পড়ে! আমার আত্মা পরলোক হ'তে তা দেখে সুখী হবে।"

চন্দ্রবর্ম্মা আমার কেশ ছাড়িয়া দিয়া বলিল,—"তাই করব। একে বেঁধে রাখ।"

দশ জন মিলিয়া আমাকে বাঁধিয়া মাটীতে ফেলিল। তখন সোমদত্তা আমার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার অগ্নিপূর্ণ দুই চক্ষু হইতে যেন অনলধারা বর্ষিত হইতেছিল, সে আমার মুখে একবার পদাঘাত করিল। তারপর চন্দ্রবর্ম্মার নিকট ফিরিয়া গিয়া স্থির শান্ত স্বরে কহিল,—"পিতা, এইবার পিতার কায করুন।"

চন্দ্রবর্ম্মার বজ্রের মত কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিল;—"কি কার্য্য, বৎসে?"

সোমদত্তা বলিল,—"এ দেহ আপনিই দিয়েছিলেন, আপনিই একে নাশ করুন।"

পাষাণ-স্তম্ভের মত চন্দ্রবর্ম্মা নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সোমদত্তা পুনরায় কহিলেন,—"আমার মন নিষ্কলুষ, এই দূষিত দেহ হ'তে তাকে মুক্ত ক'রে পিতার কর্ত্তব্য করুন।"

বহুক্ষণ পরে অস্ফুট কণ্ঠে চন্দ্রবর্ম্মা বলিলেন,—"সেই ভাল, সেই ভাল।"

সোমদত্তা তখন দুই হস্তে বক্ষের কঞ্চুকী ছিঁড়িয়া ফেলিয়া পিতার সম্মুখে নতজানু হইয়া বসিল।

চন্দ্রবর্ম্মা দক্ষিণহস্তে সুতীক্ষ্ণ ভল্ল তুলিয়া লইয়া চতুর্দ্দিকে চাহিয়া কর্কশ-ভয়ানক কণ্ঠে কহিলেন,—"সকলে শুন, আমার কন্যার দেহ অশুচি হয়েছিল। আমি তাহাকে ধ্বংস করলাম।" বলিয়া দুই পদ পিছু হটিয়া গিয়া ভল্ল ঊর্দ্ধে তুলিলেন। সোমদত্তা উন্মুক্ত বক্ষে নির্ভীক নিষ্পলক দৃষ্টিতে পিতার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

আমি সভয়ে চক্ষু মুদিলাম।

পুনরায় যখন চক্ষু উন্মীলিত করিলাম, তখন দেখিলাম, রক্তচন্দন-চর্চ্চিত শৈবালবেষ্টিত শ্বেত কমলিনীর মত সোমদত্তার বিগতপ্রাণ দেহ মাটীতে পড়িয়া আছে।

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।

মাটীর ধরণী

বিচিত্র সঙ্গীতময়ী আলো-ছায়া ভরা,
—এই না কি ব্যথাময়ী ধরা!
অদি-হীন বিধাতার উত্তপ্ত নিশ্বাস
রুদ্র-অভিশাপ সম ভরি' এর আকাশ-বাতাস
ফিরে না কি এ-রি বুকে শ্বসিয়া শ্বসিয়া—
হাহাকারে দশদিশি মুখর করিয়া!

তারা বুঝি দেখেনি এ ধরণীর মোহিনী মূরতি!
সুললিত গতি—
শোনে নি সঙ্গীত তার—ছন্দোময়ী আনন্দের বাণী!
জীবনের পূর্ণ পাত্রখানি,
তুলিয়া ধরে নি বুঝি কোনো দিন প্রাণের নেশায়
তৃষাতুর অধর-রেখায়!

—এই এর মাটী,
এ যে রূপে রসোচ্ছ্বাসে পড়িতেছে ফাটি'
কুসুমে পল্লবে নিত্য,—দিগন্ত-বিসার
তৃণাস্তীর্ণ প্রান্তর-মাঝার।

এ-রি পাষাণের বুক ধূসর বন্ধুর
ভেদিয়া যে নামে নিত্য সুধাদ্রব সঙ্গীতের সুর
উপলে উপলে তার নৃত্যতালে মঞ্জীর-শিঞ্জনে
অশ্রান্ত আনন্দ-গানে,—পুলকের অসহ স্পন্দনে!

বজ্র-গর্ভ এ-রি মেঘমালা
বুকে নিয়ে বিজলীর তীব্র বহ্নি-জ্বালা—
ফিরে যে গম্ভীর কণ্ঠে গান গেয়ে গগনে গগনে,
পুলকাশ্রু-পূর্ণ দু'নয়নে!
তালীবনে বর্ষা নামে—ঝর-ঝর ঝর—
কদম্ব শিহরি উঠে আনন্দের পরশ-কাতর!
সর্ব্বহারা—
বালুকা-কঙ্কালকীর্ণা এ-রি মরু ধূসর সাহারা
আনন্দের রচে ইন্দ্রজাল,
মরীচিকা হেসে উঠে বক্ষে তার বালুকা-বিশাল!
কি প্রচণ্ড আনন্দের সুরের সংঘাত
জাগায় বিচিত্র ছন্দে প্রাণে কত নব নব সৃষ্টির প্রভাত!

* * * *

এ-ই যদি ব্যথাময়ী ধরা—
তোমরা মাগিয়া লও তোমাদের তৃপ্তি-শান্তিভরা
সুখস্বর্গ, কল্প-লোক, মন্দাকিনী—আনন্দ-নির্ঝর
কল্পবৃক্ষ—সুখের আকর!
ধূসর-বরণী—
এ ধরণী,—মাটীর ধরণী—
এই মোর ভালো—
এ-রি বুকে এ-রি প্রেমে জ্বলেছিল জীবনের আলো!

শ্রীবিজয়মাধব মণ্ডল (বি, এ)।

স্বখাত-সলিলে

১

শুভেন্দুর ফিরিয়া যাওয়া হইল না, সে চিত্রার্পিতের মত ডাক-ঘরের সোপানের উপরে দাঁড়াইয়া রহিল।

গোধূলির অস্তোন্মুখ সূর্য্য তখনও আকাশের বুকে আবির ছড়াইতেছিল। সাঁওতাল পরগণার এই রাজপুর ষ্টেশনটি অনুন্নত, ধূসর পর্ব্বতমালার বুকের মধ্যে বাঙ্গালীর যত্নেই গড়িয়া উঠিয়াছিল—বাঙ্গালী আসিয়া সহর না বানাইলে উহা কয়লা ও কুলীর সহরই থাকিয়া যাইত। আজ বাঙ্গালীরই গড়া সেই সহরের রাজপথে প্রকাশ্য দিবালোকে এ কি অচিন্তনীয় অভাবনীয় দৃশ্য! শুভেন্দু ডাক-বাবুকে ডাকাইয়া জরুরী পত্র কয়খানি পোষ্ট করিয়া সবেমাত্র সোপান অবতরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, অমনই কয়টি অশিষ্ট পরিহাস-বাণী তাহার কর্ণকুহর সন্তপ্ত করিল,—"বাহবা ! কেয়াবাৎ জোড়া টাট্টু!" শুভেন্দু থমকিয়া দাঁড়াইল।

বিশুদ্ধ খদ্দরমণ্ডিতা একটি সুন্দরী তরুণী সঞ্চারিণী-লতার মত সম্মুখস্থ রাজপথ দিয়া পারিজাত-পাহাড়ের দিকে সান্ধ্যভ্রমণে যাইতেছিল, তাহার হস্তধারণ করিয়া আর একটি তরুণী পথ চলিতেছিল, তাহার সাজসজ্জায় কিন্তু সৌখীনতার সকল চিহ্নই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। শেষোক্তা তরুণী কোন কিছু রচনা আবৃত্তি করিতে করিতে পথাতিক্রম করিতেছিল, প্রথমোক্তা অভিনিবেশ-সহকারে তাহা শ্রবণ করিতেছিল। উত্তেজনার আবেশে আবৃত্তি-কারিণীর নয়ন দুইটি ধক্ ধক্ জ্বলিয়া উঠিতেছিল, কুসুম-পেলব চম্পকাঙ্গুলীগুলি দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ হইতেছিল—সেই উত্তেজনা বয়ঃকনিষ্ঠার সর্ব্বাঙ্গে যেন উত্তপ্ত তড়িৎ-স্রোতের সঞ্চার করিতেছিল।

হঠাৎ পথের অপর পার্শ্ব হইতে ইতরোচিত রসিকতার সুর বাতাসে ভাসিয়া আসিল, তরুণীরাও শুভেন্দুর মত চমকিত হইয়া নিশ্চল পাষাণমূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল। পাণবিড়ির দোকানে কয়েকজন যুবক পাণ-সিগারেট কিনিতেছিল, তাহাদেরই মধ্যে কেহ যে অশিষ্ট ভাষা প্রয়োগ করিয়া ভদ্র-মহিলাদের অপমান করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ ছিল না। বয়োজ্যেষ্ঠার সহিত তরুণদিগের দৃষ্টিবিনিময় হইবার পরেই কিন্তু তাহার অধরপ্রান্তে মৃদু হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল! কনিষ্ঠার দৃষ্টিতে ভয় বা ক্রোধের অপেক্ষা বিস্ময়ের ভাবই সমধিক আত্ম-প্রকাশ করিল। তাহারা সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালীর মেয়ে, এই সাঁওতালের দেশে তাহাদের প্রতি এই ভাষাপ্রয়োগ? স্পর্দ্ধা ত ইহাদের অল্প নহে,—বোধ হয়, এই কথাই তখন তাহার মনে উদয় হইয়াছিল। অনুচ্চস্বরে সে সঙ্গিনীকে বলিল, "এরা কি ভদ্রলোকের ছেলে?" বিস্ময়ের পরিবর্ত্তে প্রচণ্ড ক্রোধই তখন তাহার হৃদয় জুড়িয়া বসিয়াছিল—তাহার শেষের মনোভাব তরুণদিগের দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিল না।

একটি শ্যামাঙ্গ যুবক সিগারেটের ধূমোদ্গিরণ করিতে করিতে হাসিয়া অঙ্গুলীর অগ্রভাগ ললাটে স্পর্শ করিয়া তরুণীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "নমস্কার!" সে যে বাঙ্গালী, তাহার প্রসাধনের বৈশিষ্ট্য ও দেহের আকৃতি-প্রকৃতিই তাহা বলিয়া দিতেছিল, নতুবা তাহার সঙ্গীদিগকে পৃথক বলিয়া ধারণা করিবার উপায় ছিল না; কেন না, তাহাদের বেশভূষা একই প্রকৃতির হইলেও পরিচ্ছদ-পরিধানের বৈশিষ্ট্য ও অঙ্গসৌষ্ঠবের ভঙ্গীই তাহাদিগকে পশ্চিমা বলিয়া ধরাইয়া দিতেছিল। বাঙ্গালী তরুণটি ব্যঙ্গের সুরে অভিবাদন করিয়া বয়ঃকনিষ্ঠা অপরিচিতার মুখের প্রতি চাহিয়া হাসিয়া বলিল, "ওরে বাপ, ফোঁস কেউটে যে! একবারে র! এটিকে কোথেকে আমদানী করলেন আপনারা, দেখিনি ত এদ্দিন।"

বয়ঃকনিষ্ঠা তরুণীর অধর স্ফুরিত হইল, ঘৃণা ও ক্রোধভরে সে বলিল, "ছিঃ!" ততক্ষণ বয়োজ্যেষ্ঠা তাহাকে একরূপ জোর করিয়া টানিয়া লইয়া কয়েকপদ অগ্রসর হইয়াছিল, সে তাহাকে শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে বলিল, "দূর বাঁদরী! ওদের কথার জবাব দিতে আছে না কি!" সে আর মুহূর্ত্তমাত্রও অপেক্ষা করিল না, সঙ্গিনীকে লইয়া দ্রুত-পদে স্থানত্যাগ করিল।

শুভেন্দু প্রথমে সোপানাবতরণ করিতেছিল, কিন্তু বয়ঃ-কনিষ্ঠার মুখের উপর দৃষ্টিপাত হইবামাত্র সে অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া রহিল। মুহূর্ত্তপরে যখন তরুণী দুইটি স্থানত্যাগ করিল, তখন সে দ্রুতপদে তরুণদিগের সম্মুখীন হইয়া বলি, "আপনি ত দেখছি বাঙ্গালী—তা এদের সঙ্গে কেন?

তরুণরা মার-মুখ হইয়া উঠিল, কিন্তু বাঙ্গালী তরুণটি সঙ্গীদিগকে বাধাপ্রদান করিয়া আপনি অগ্রসর হইয়া বলিল, "আপনি কে? ভারী খদ্দরধারী স্বদেশীওয়ালা এসেছে এখানে মুড়ুলী করতে! ওদের সঙ্গে আমার চেনাশোনা আছে—"

শুভেন্দু বলিল, "তা থাকতে পারে, কিন্তু ভদ্রমহিলাদের সঙ্গে পথের মাঝখানে এ কি রকম ঠাট্টা-তামাসা? বিশেষ এই পশ্চিমে মেড়োদের সামনে—"

একটি তরুণ চীৎকার করিয়া বলিল, "মুখ সামলে কথা কইবেন মশাই, আমরাও বাঙ্গালা জানি। পশ্চিমে মেড়ো! জাত তুলছেন আমাদের?" দুই তিনটি তরুণ উদ্যতমুষ্টি হইয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইল। শুভেন্দু মস্তক অবনমিত করিয়া বলিল, "মারবেন আমায়, মারুন।" তরুণের দল স্থির হইয়া দাঁড়াইল।

বাঙ্গালী তরুণটি বলিল, "চেহারাটা দেখছি ভদ্রলোকের মত। এদিকে ভিখিরি-বৈরিগীর মত খদ্দরের গেরুয়াধারী। এ ভেক কেন? পলাতক ফৌজদারী আসামী নও ত, বাবা?"

সে কথার প্রত্যুত্তর না দিয়া শুভেন্দু পশ্চিমদেশীয় তরুণ-দিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "জাত তুলিনি আপনাদের। জানি নি কি, আপনাদের মধ্যে কত মহাপ্রাণ দাতা আছেন? তাঁরা আছেন বলেই তোমাদের মত অনাচারীরা ময়ুরপুচ্ছ ধ'রে ময়ুর সেজে বেড়িয়ে এখনও টিকে আছ, নইলে—"

"চুপ রও পাজী! তোমায় শিখিয়ে দিতে পারি জানো? ভারী লম্বা লম্বা কথা দেখছি যে তোমার—"

বাঙ্গালী তরুণটি বক্তার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল, "আরে খেপেছ প্রিন্স—তুমি ঝগড়া করতে যাচ্ছ একটা ভিখিরি বোষ্টমের সঙ্গে? এস, এস, রিহার্শালটা আজ সন্ধ্যের পরেই বসাতে হবে। চল হে প্রভুদয়াল তোমরা সবাই, ষ্টেশনটা ঘুরে যাওয়া যাক্।"

তরুণরা ষ্টেশনের অভিমুখে চলিয়া গেল। শুভেন্দু চলন্ত মূর্ত্তিগুলির দিকে ক্ষণকাল তাকাইয়া রহিল, আপন মনে ঈষৎ হাসিল, তাহার পর যেন কিছুই হয় নাই, এইভাবে ধীর-মন্থর গমনে পথিপার্শ্বস্থ মুদীর দোকানে গিয়া বলিল, "কি সাহুজী, মালপত্র বেঁধে রেখেছ সব? কত পাওনা হ'ল হে?"

ফর্দ্দখানা গ্রহণ করিয়া শুভেন্দু পাঠে মনোনিবেশ করিল। বৃদ্ধ দোকানদার বলিল, "বাবুজী, [illegible]গোল করলে না, এরা ভারী জবরদস্ত লোক! বিশেষ পুরুষোত্তম বাবু, যে তোমায় ঘুষি তুলেছিল। ও লোকটা মস্ত বড়-লোক, এখানে সবাই ওর বশ। হাতে ওর অনেক নামজাদা গুণ্ডা আছে।"

শুভেন্দু হাসিয়া বলিল, "সত্যি না কি? তা থাকুক গে, তোমার আমার কি, সাহুজী! যাক্ গে, একবারে ৩১৲ টাকার ফর্দ্দ যে! এত টাকা'ত সঙ্গে আনি নি। আজ কেবল ১০৲ টাকার মতই জিনিষ দাও, কাল বাকীটা নিয়ে যাব'খন।"

মুদী একগাল হাসিয়া বলিল, "কেয়া হরজা হ্যায়, বাবুজী! নিয়ে যাও না যত টাকার ইচ্ছে মাল, যখন খুসী দাম দিয়ে যেও।"

শুভেন্দু বিস্মিত হইয়া বলিল, "সে কি সাহু সাহেব? অমনি মাল ছেড়ে দেবে? যদি দাম না দিয়ে পালাই? আমায় চেন না, জান না, কাল ত সবে এইছি রাজপুরে—"

মুদী বলিল, "তাতে কি হয়েছে, বাবুজী? স্বচ্ছন্দে মাল নিয়ে যাও। হাজার টাকার মাল তোমায় দিচ্ছি—"

শুভেন্দুর বিস্ময়ের সীমা রহিল না, সে বলিল, "আর আজই রাতে যদি দোসরা ষ্টেশনে গিয়ে উঠি?"

মুদী হাসিয়া বলিল, "না বাবুজী, তা তুমি করবে না, দেনা রেখে পালাবে না, আমি লোক চিনি, বাবু। তোমা-দের বাঙ্গালী বাবুদের মুখের জবানই সব। জান বাবুজী, বিশ বছর কারবার করি এই মুল্লুকে, বাঙ্গালী বাবু কখনও ফাঁকি দেয় নি।"

আনন্দে গর্ব্বে শুভেন্দুর নয়নপথে অশ্রু ঝরিয়া পড়িল, উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে সে একটি কথাও বলিতে সমর্থ হইল না। মুদী আবার বলিয়া যাইতে লাগিল, "দুঃখ এই বাবুজী, দু'চারটে বাঙ্গালী আজকাল আসছে, যারা দোকানদার ব্যবসাদারের সঙ্গে কথার খেলাপি করছে—তীর্থস্থানে এসে পাণ্ডাদের টাকা ধার ক'রে ফাঁকি দিচ্ছে, তাইতে তোমাদের বদনামী হচ্ছে।" তাহার পর বৃদ্ধ দোকানদার চারিদিকে চাহিয়া অনুচ্চস্বরে বলিল, "বাবুজী, তোমায় লুকিয়ে বলছি, এই ছোকরা বাবুদের মধ্যে কাউকে আমি দু পয়সা ধার দিয়ে বিশ্বেস করি না, ঐ ছোকরা বাঙ্গালী বাবুকেও না। তবু ওরা সব বড়লোক আছে, বাবুজী।"

শুভেন্দু মুদীর শেষ কথাগুলি শুনিয়াছিল কি না সন্দেহ। সে তখন কি ভাবিতেছিল, সেই জানে। কথার কোনও

উত্তর না দিয়া সে অন্যমনস্কভাবে বাসার দিকে ফিরিয়া চলিল। পথে অনুক্ষণ তাহার মনের মধ্যে একটা কথা তোলাপাড়া করিতে লাগিল,—"বাঙ্গালীর মুখের জবানই সব, বাবুজী!" কিন্তু আজ বাঙ্গালী কোথায় নামিতেছে?

২

"বেয়ারা" !—মিঃ সানিয়ালের স্নিগ্ধগম্ভীর নির্ঘোষ কক্ষান্তরের পিয়ানোর মৃদুমধুর গুঞ্জন অতিক্রম করিয়া বাতাসে ছড়াইয়া পড়িল, সেই গুঞ্জনের সহিত অস্পষ্ট সঙ্গীতের মধুর সুর বামাকণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছিল।

মিঃ সানিয়াল উত্তর না পাইয়া ঈষৎ রুষ্ট হইলেন—তাঁহার মুখের কথা খসিবার অবসর সহিত না। ঢিলা ইজারটা একটুকু টানিয়া তুলিয়া—ষ্ট্রাইপ্ট পিরিহানটার আস্তিন গুটাইয়া—গলাটা একবার শানাইয়া লইয়া তিনি চীৎকার করিয়া হাঁক দিলেন, "বেয়ারা!"

হাতকাটা জামা গায়ে তোয়ালে কাঁধে রাধু খানসামা চায়ের পেয়ালা লইয়া দ্রুতপদে কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল, "বাবু!"

বাবু বলিলেন, "সিগার।"

বাবুর দেরাজের টানা হইতে সিগারের বাক্স বাহির করিয়া রাধু সিগারাধারে রক্ষা করিল। বাবু তাহা হইতে একটি তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "তোর দিদিমণিরা বেড়াতে গেছে না? মিস পল্ যান নি?"

রাধু দিয়াশালাইএর কাঠি ধরাইয়া বাবুর মুখের সম্মুখে করপুটের অন্তরালে ধরিয়া বলিল, "দিদিমনিরা গেছেন নিউ লজের দিদিদের সঙ্গে বেড়াতে, মাষ্টার দিদিমণি গান সাধছেন।"

বাবু বলিলেন, "মিস পল্‌কে ডেকে দিয়ে যা। সন্ধ্যার সময় চা রেডি থাকে যেন।"

রাধু তোয়ালে দিয়া টেবিলটা ঝাড়িয়া কক্ষের বাহিরে গেল। একবার কক্ষের দিকে অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত করিয়া মুচকিয়া হাসিল, তাহার পর ভিতরে চলিয়া গেল।

যোগেশচন্দ্র সান্ন্যাল ওরফে মিঃ সানিয়াল 'মণীশের' ভূমিকা আবৃত্তি করিতেছিলেন, তাঁহারই মণীশের ভূমিকা। তাঁহাদের "স্বেচ্ছা-বিবাহ" নাটক অভিনীত হইবে, আজ তাহার ড্রেস-রিহার্শাল। রেণু যখন পুরুষ-বন্ধু অখিলের সহিত নিশাযোগে অনাস্বাদিতপূর্ব্ব জীবনের আস্বাদ-গ্রহণের উদ্দেশ্যে কোন্ এক অজানা নন্দনের উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করিল, তখন মণীশ স্বেচ্ছা-বিবাহিতা পত্নীর পত্র পাইয়া যে মানসিক অবস্থায় উপনীত হইল, মিঃ সানিয়াল মণীশের ভূমিকার সেই স্থানটা আবৃত্তি করিতেছিলেন। তখন তাঁহার মুখে বিস্ময় বা ক্রোধের চিহ্ন যত না ফুটিয়া উঠুক, তৃপ্তির একটা স্বর্গীয় ভাবের তদপেক্ষা শতগুণে অধিক আত্মপ্রকাশ করিবার কথা। আহা, এই ত স্বেচ্ছা-বিবাহ,—অবাধ, সাবলীল, স্বচ্ছন্দগতি! কিন্তু চেষ্টা করিয়াও মিঃ সানিয়াল মণীশের সেই স্বর্গীয় ভাবটি মুখে ফুটাইয়া তুলিতে পারিতেছিলেন না, বরং তৃপ্তির পরিবর্ত্তে ক্রোধ ও হিংসায় তাঁহার মুখচক্ষু দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। যেন মণীশ পরমুহূর্ত্তেই লম্ফত্যাগ করিয়া বেচারী পত্রবাহকের স্কন্ধদেশে আরোহণ করিতে উদ্যত! ইতিমধ্যে মিস পল্ কখন্ যে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া 'মণীশে'র অপরূপ অঙ্গভঙ্গি নিরীক্ষণ করিয়া মুখ টিপিয়া হাস্যসম্বরণ করিতেছিলেন, তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই।

মিস পল্ তাঁহার গৃহশিক্ষয়িত্রী, মিশনারী গার্ল-স্কুল-কর্ত্তৃপক্ষের দ্বারা প্রশংসিতা, বিদেশী নামের আবরণ থাকিলেও এ দেশেরই বাঙ্গালী নেটিভ খৃষ্টান। তাঁহার হৃষ্টপুষ্ট নধর দেহখানি মণীশের ভীষণ চীৎকার ও টেবিলের উপরে মুষ্ট্যাঘাতের ঘোর আওয়াজে ঈষৎ কম্পিত হইতেছিল, পৃষ্ঠোপরি কালো মেঘের মত আলুলায়িত কিন্তু যত্নবিন্যস্ত কেশরাশিও সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলিত হইতেছিল। তাঁহার সুঠাম সুললিত দেহে যৌবন যাই যাই করিয়াও যাইতে চাহিতেছিল না বলিয়া এখনও তাঁহার অঙ্গ বহিয়া 'লাবণি' ঝরিয়া পড়িতেছিল। সাঁওতাল পরগণার উষর মরুভূমির মধ্যে এই যত্নবিন্যস্ত প্রস্ফুট প্রসূনটি দেখিবার মত বটে! রাজধানীর শিক্ষিত গৃহস্থের গৃহে ইঁহাদের অভাব অসভ্যতার পরিচায়ক।

"ডেকেছেন আমায়, মিঃ সানিয়াল?" মিহি সুরে মিস পল্ কথাটি জিজ্ঞাসা করিয়া অবনতমস্তকে একপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইলেন।

মিঃ সানিয়াল পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "এই যে, বসুন। বেড়াতে যান নি? নীরোরা গিয়েছে যে। এখানে দু'বেলা না বেড়ালে শরীরটা"—

মিস পল্ আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "না, আজ ড্রেস-রিহার্শাল; ওদের নিয়ে বসতে হবে এখুনি। গান ক'টা প্র্যাক্‌টিস ক'রে নিচ্ছিলুম একবার।"

উৎফুল্ল আননে মিঃ সানিয়াল বলিলেন,"বাঃ, এই রকমই ত চাই! নীরো ভাবে, প্লে করাটা বুঝি খুবই সহজ। দেখুন না, সকাল থেকে একবারও বসলো না কো-এ্যাক্টরের সঙ্গে। রেণুর পার্টটা ওকে না দিলেই হ'ত। ওঃ, রেণু যা আপনাকে মানায়!—বিশেষ সেই পার্শী সাড়ীখানায়!—তা আপনাকে সব তাতেই মানায়, কি বলেন? হাঃ হাঃ!"

মিস পল্ কৃত্রিম কোপের সহিত বলিলেন, "যান, কি যে বলেন? আমার 'বাসন্তী'র পার্টে গানই ভাল। তবে অখিলের সঙ্গে যেখানে বাসন্তীর একটা ফ্লার্টেশান দিয়েছে, ঐখানটায় প্রিন্স পুরুষোত্তমের কো-এ্যাক্‌টিংটা আমার মোটেই ভাল লাগে না। একবারে ড্রাই অ্যাজ ডাষ্ট!"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া যোগেশবাবু ওরফে মিঃ জে, সি, সানিয়াল বলিলেন, "এঁ্যা, বলেন কি? প্রিন্স পুরুষোত্তম? ওঃ ফাষ্টক্লাস এ্যাক্টর—যাকে বলে ষ্টার এ্যাক্টর। জানেন না বোধ হয়, প্রিন্স ওদের কালেজের থিয়েটারে অ্যান্‌টোনিওর পার্টে গভর্ণরের কাছেও সার্টিফিকেট পেয়েছিলো।"

মিস পল্ বলিলেন, "তা হ'তে পারে, কিন্তু বাঙ্গালা প্লেতে ওঁদের খুব সুবিধে হবে কি?" তাহার পর মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "তবে সব মানিয়ে নেবেন আপনারা দুই ভাই-বোনে—নীরজা যেমনই রেণু, তেমনই আপনি মণীশ।" কথাটার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের সুর একটু ছিল কি?

বোধ হয় মিঃ সানিয়াল সেটুকু লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাড়াতাড়ি বলিলেন, "প্লেতে ও-রকম হয়ে থাকে—ওতে ভাই-বোনও নেই, বাপ-ঝিও নেই—ওটা হ'ল আর্ট।"

মিস পল্ তাড়াতাড়ি সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিলেন, "তা বটে, তা বটে। তা আপনারা 'বিষবৃক্ষ' করলেন না কেন? আহা, কুন্দ যে নীরজার বন্ধুকে মানাত! কি নামটা ঐ 'নিউ লজে' যারা সে দিন এসেছে, কি, শেফালী না কি?"

প্রশ্নের জবাব না দিয়া মিঃ সানিয়াল ঘৃণাভরে বলিলেন, "বিষবৃক্ষ? বঙ্কিমের? আরে রাম, রাম! থার্ড রেট রাইটার, এ যুগে একবারেই অচল। বাঙ্গালী 'প্রতাপ', 'রামচরণ',—ও সব একেবারেই আর্টিফিসিয়াল! রিয়্যাল লাইফের হিরো-হিরোইন দিয়েছে কি ঐ লোকটা?"

মিস পল্ বলিলেন, "তা বটে।"

মিঃ সানিয়াল বলিলেন, "মানুষ ত! রক্তমাংসের শরীর। প্রতাপটা পুরুষ না হয়ে নারী হ'লে বলা যেতো 'প্রুড্'!"

মিস পল্ হাসিয়া বলিলেন, "মিথ্যে বলেন নি বড়। যাক্, আমাদের প্লেতে এই মেয়েটিকে নামাতে পারেন না কোন রকমে? কি সুন্দর দেখতে—যেন ছবিখানি!"

মিঃ সানিয়াল বলিলেন, "কে, শেফালী? হাঃ হাঃ! তবেই হয়েছে! একবার ব'লে দেখুন না ওকে, ফোঁস ক'রে উঠবে। ওরা থিয়েটারই দেখে কি না সন্দেহ।"

"থিয়েটার দেখে না? এ যুগে? তিনি হন কে?" কথাটা বলিতে বলিতে আমাদের পূর্ব্ববর্ণিত বাঙ্গালী যুবকটি তাঁহার পশ্চিমা বন্ধুগণের সহিত কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

মিঃ সানিয়াল সাগ্রহে কর-প্রসারণ করিয়া বলিলেন, "আরে এস, এস রমেশ! বস, চা খাও। প্রিন্স কৈ?"

রমেশ বসিয়া বলিল, "সে 'প্রবাসে'ই ফিরে গেল—সব উদ্যোগ-আয়োজন করতে হবে ত তাকে। হাঁ, কার কথা বলছিলেন, মিঃ সানিয়াল, থিয়েটার দেখে না?"

মিঃ সানিয়াল সিগারে দম দিয়া বলিলেন, "ও নীরজার বন্ধু শেফালী—ওরা নিউ লজে এসেছে, ওর বাপ গিরিজানাথ বাবুর সঙ্গে আমার বাবার খুবই ইণ্টিমেসি ছিল।"

প্রভুদয়াল বলিল, "বটে? তা, এমন কনজারভেটিব কেন?"

মিঃ সানিয়াল বলিলেন, "ওরা ঐ রকম। অথচ ও নীরজার সঙ্গে একই ক্লাসে পড়েছে বরাবর, ম্যাট্রিকও পাশ করেছে।"

এই সময়ে রমেশ বলিল, "ওহো, বলতে ভুলে গেছি, ভারী রগড় হয়ে গেছে ওদের নিয়ে, মিঃ সান্ন্যাল! জান্‌লেন।"

"কি রকম?"

"সরযুর দোকানে পাণ কিনছিলুম আমরা—মিস নীরজারা ষ্টেশন থেকে ফিরে আস্‌ছিল এদিকে; বোধ হয়, ডাক্তারদের ওখানেই যাচ্ছিল। সঙ্গে কি বল্‌লেন, ঐ মিস শেফালী, না কি, উনিও ছিলেন। প্রিন্স ঠাট্টা ক'রে বল্‌লে, জোড়া টাট্টু,—এই আর যায় কোথা, যেন ফোঁস কেউটে! হাঃ হাঃ! সত্যি কথা ত এ যুগে বলবার যো নেই, ও তুলে রাখতে হয় কৌটোয় মণিমুক্তোর মত।"

প্রভুদয়াল বলিল, "আর সেই বাঙ্গালী বাবুঠো? লেকচার ঝাড়তে এলো আমাদের——"

যমুনালাল বলিল, "তা, প্রিন্সের কাছে হক্-মত জবাবও পেয়েছে সে।"

হঠাৎ মিস পল্ মিহিস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, আপনারা পুরুষোত্তম বাবুকে প্রিন্স বলেন কেন?"

মিঃ সানিয়াল কথাটা যেন কাড়িয়া লইয়া উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "বলবে না? বাই জোভ! এ সেকেণ্ড হেনরি ফোর্ড—একবারে টাকার মাচার উপর ব'সে রয়েছে—"

রমেশ বলিল, "বাপই ত চিনির দালালী ক'রে সাত-আট লাখ টাকা রেখে গেছে, তার উপর বিকানীরে বুড়ো মাতামো মলো ষোল-সতেরো লাখ টাকা রেখে—বলেন কি, ও যদি প্রিন্স না হয়, তা হ'লে কে?"

মিঃ সানিয়াল মিস পলের চক্ষুতে অপরূপ দীপ্তি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ভাবছেন, আলালের ঘরের দুলাল এমন কাল্‌চার্ড হ'লো কি ক'রে? ওর বাপ যে ইংলিস প্রোফেসার রেখে লেখাপড়া শিখিয়েছিলো—প্রেসিডেন্সী থেকে গ্রাজুয়েট হয়েছে। সেইখানেই ত মার্চ্চাণ্ট অফ ভিনিসে অ্যান্‌টোনিওর পার্ট প্লে করেছিলো। ভারী টেষ্ট হিষ্ট্রিওনিক আর্টে। এরা সব জানে, প্রভুদয়াল, রমেশ, যমুনালাল—সবাই এক সঙ্গে পড়তো। হাঁ, প্রিন্সের সঙ্গে ঝগড়া হলো সে লোকটা কে? এখেনেই থাকে না কি?"

রমেশ বলিল, "না, নতুন লোক। ছোপান খদ্দরধারী স্বদেশীওলা বোধ হয়—আমাদেরই বয়েসী—"

মিঃ সানিয়াল বলিলেন, "ওহো, হয়েছে, এই লোকটাই বটে তা হ'লে।"

রমেশ বলিল, "কোন্ লোকটা?"

মিঃ সানিয়াল বলিলেন, "আরে সে এক ভারী মজার কথা। ঐ লোকটাই নিশ্চয় কাল নার্শারীতে একটা রাউ বাধিয়েছিল। একটা ছোঁড়া চুরি ক'রে ফুল ছিঁড়ছিলো, মালীরা ধ'রে আমারই ইনষ্ট্রাকসান মত চড়টা-চাপড়টা দিয়েছিল। ঐ লোকটা কোথা থেকে ঝড়ের মত এসে হাঙ্গাম বাধালে মালীদের সঙ্গে। দিচ্ছিলো ওরা পুলিসে ধরিয়ে, তা ইনি মাঝে থেকে দিলেন ছাড়িয়ে ছুটোকে। আমি ছিলুম না কাল সে সময়ে, নইলে—"

প্রভুদয়াল বলিল, "কে এ লোকটা উড়ে এসে জুড়ে ব'সলো এখানে"—কথাটা শেষ হইল না, খানসামা আসিয়া বলিল, "পুরুষোত্তম বাবুর বাড়ী থেকে চিঠি নিয়ে এসেছে বেয়ারা—এই নিন।" পত্র দিয়া সে চলিয়া গেল।

সকলেই সাগ্রহে পত্রের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল। ততক্ষণ মিঃ সানিয়াল পত্রখানা পাঠ করিতেছিলেন। পাঠ করিতে করিতে তাঁহার মুখে বিস্ময়, ক্রোধ ও বিরক্তির ভাব একে একে ফুটিয়া উঠিল। তিনি টেবিলে প্রচণ্ড চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন, "ননসেন্স! বাপ মরেছে, তা প্লের সঙ্গে কি?"

সকলে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কি, কি, হয়েছে কি?"

মিঃ সানিয়াল বলিলেন, "হয়েছে কি? একটু কমন সেন্স নেই। শনিবারে ষ্টেজে প্লে—হাজার টাকা খরচ ক'রে ষ্টেজ বাঁধালে প্রিন্স—এখন বলে কি না আসতে পারবে না শনিবারে! ড্যাম ইট, আসতেই হবে।"

মিস পল্ মিহিস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কার আসা হবে না বলছেন আপনি? সুধাংশু বাবু?"

"আবার কে? দু'দিনের কড়ারে বাপকে দেখতে ছুটী ক'রে গেল—প্রিন্সকে কথা দিয়ে গেল, আকাশ ভেঙ্গে পড়লেও যেখানেই থাকুক, শনিবার সকালে এসে হাজির হবে। এখন বলে কি না বাপ ম'রে গেছে, আসতে পারবে না। র‍্যাস্কাল!"

রমেশ হাসিয়া বলিল, "তা সত্যি, বাপ বেটা দিন বুঝে মরতে পারলো না? বাপের মরা আগে, না প্লে আগে!"

সকলে হাসিল বটে, কিন্তু মিঃ সানিয়াল তখনও মনের মধ্যে গর্জ্জন করিতেছিলেন। কলিকাতায় থাকিতে তাঁহার সংসার হাজিয়া মজিয়া গেলেও কি তাঁহার রেস-খেলায় কামাই গিয়াছে? এত বড় অপবাদ তাঁহার অতি-বড় শত্রুও দিতে পারে না!

৩

"তা হ'লে আসছে শনিবারেই হবে?" নীরজা জিজ্ঞাসুনেত্রে মিঃ সানিয়ালের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

মিঃ সানিয়াল চুরুটে বিকট টান দিয়া বলিলেন, "তাই ত মনে করছি। এ তিন চারদিনের মধ্যে নাগরমলটাকে

সুধাংশুর পার্টটায় গড়ে নিতে হবে। সুধাংশুটাই সব মাটী ক'রে দিলে!"

নীরজা বলিল, "সুধাংশু বাবুর এ কিন্তু ভারী অন্যায়! তার ওপর যখন এতটা ডিপেণ্ড করছে—"

মিঃ সানিয়াল বিরক্তিভরে বলিলেন, "ইডিয়ট! বাপ থাকতে বাপের সঙ্গে মুখ-দেখাদেখি নেই,—বাপ মরলেই দানসাগর শ্রাদ্ধ! এ যেন পিঁপড়ের গর্ত্তে চিনি দিয়ে শেয়ারের বাজারে গিয়ে গলা-কাটা! যাক্ গে, মরুগ গিয়ে, শেফালীকে রাজী করতে পারলি?"

নীরজা বলিল, "তাই বটে, তেমনই মেয়ে কি না! থিয়েটারটা দেখতে রাজী হয়েছে এই ভাগ্যি! ওদের কথা বোলো না দাদা, একবারে সেকেলে! গেলো হরতালের দিনে জাতীয় পতাকা নিয়ে বেরুতে বাধে নি ওর, কিন্তু থিয়েটার? ওরে বাবা!"

মিস পল্ এতক্ষণ নীরবে পার্ট মুখস্থ করিতেছিলেন, হঠাৎ হাসিয়া বলিলেন, "আরও আপনারা বলেন, স্বরাজ করবেন!"

মিঃ সানিয়াল যেন স্বয়ং কত অপরাধী, এইভাবে নিতান্ত অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "কি জানেন, এখনও আমাদের মেয়েছেলেরা নিজেদের অধিকারের কথাটা ভাল ক'রে বুঝতে পারে নি। স্ত্রী-স্বাধীনতা কথাটার একটা ঢেউ এসেছে বটে, কিন্তু ওটা বোম্বাইএর দেশসেবিকারাই ঠিক বুঝেছেন, বাঙ্গালায় এখনও—আরে কে-ও শুভেন্দু যে, তুমি কোত্থেকে? এস, এস, বস।"

ভৃত্য একটি বাঙ্গালী ভদ্রলোককে বৈঠকখানায় পৌঁছাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। লোকটি কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিল। নীরজা তাহাকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল—সেই দিনের সেই বাঙ্গালী ভদ্রলোক না? মিঃ সানিয়াল বলিলেন, "কি হে, দাঁড়িয়ে রইলে যে, ভেতরে এস না হে। তোমারও প্রেজুডিস আছে না কি? পুরুষ আর নারী কি ভিন্ন? যাক্ গে, তার পর কি মনে ক'রে? কবে এলে?"

নীরজা আগন্তুককে অপ্রতিভ দেখিয়া ভিতরে চলিয়া গেল, মিস্ পল্ও ব্যাপার বুঝিয়া তাহার অনুগমন করিলেন। আগন্তুক অর্থাৎ শুভেন্দুর হস্তধারণ করিয়া কক্ষের মধ্যে আনয়ন করিয়া মিঃ সানিয়াল বলিলেন, "কথাই কচ্ছ না যে হে। তোমার সেই ইনসেপারেবল টেকো কই হে? হাঃ হাঃ।"

শুভেন্দু আসন পরিগ্রহ করিয়া বলিল, "টেকো যা হবার হবে, কিন্তু এ সব কি হচ্ছে আপনার? ফ্লাড-রিলিফের ফাণ্ডের হিসেব না দিয়ে এখানে এসে গা-ঢাকা দেবার মানে?"

মুহূর্ত্তে মিঃ সানিয়ালের মুখের হাসি মিলাইয়া গেল। তিনি অসম্ভব গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "তার মানে? টাকা আমি কি জানি? ভারী ত নশো-পঞ্চাশের তবিল!"

"যাই হোক সে ফাণ্ড, সেটা দেশের ত? আপনার তার হিসেব না দিয়ে এমন ক'রে লুকিয়ে চ'লে আসার মানে কি? উঃ, দু'মাসেও জানা যায় নি, কোথায় আছেন আপনি। ভাগ্যি মাসীমার সঙ্গে রাজপুরে এসেছিলুম!"

মিঃ সানিয়াল যেন সে কথা শুনিয়াও শুনেন নাই, এমনই ভাব দেখাইয়া বলিলেন, "তুমিই বুঝি সে দিনের বাঙ্গালী হিরো? হাঃ হাঃ! খুব গেরুয়া খদ্দরের ভেক নিয়েছো বটে! ছোকরারা না কি তোমায় মারতে উঠেছিল? ওরা ঐ রকম। নীরজা বলছিল, তুমি না কি ওদের ডিফেণ্ড ক'রে খুব সিভ্যালরী দেখিয়েছিলে, নিজে ঘাড় পেতে মার খেতে গিয়েছিলে? হাঃ হাঃ! নীরজা আমার সিসটার। ওরা সবাই এমেচার থিয়েটার করছে, তাই ওদের মধ্যে আলাপ-সালাপ আছে—"

শুভেন্দু পূর্ব্বের প্রশ্ন ভুলিয়া গেল; একটু উষ্ণ স্বরে বলিল, "তা হ'তে পারে, কিন্তু এ-সব কি ভাল?"

মিঃ সানিয়াল বলিলেন, "কোন্ সব?"

শুভেন্দু বলিল, "এই—এই রকম মেলামেশা?"

মিঃ সানিয়াল উষ্মা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "এ রকম, কি-রকম? সবাই আমার জানা, সবাই ভাল ছোকরা। তোমায় কত দিন নীরজাদের সঙ্গে ইন্‌ট্রোডিউস ক'রে দিতে গিয়েছি কলকাতায় থাকতে, কিন্তু তুমি যে নার্ভাস! লেডিস্‌দের নাম শুনলেই—কিন্তু ওরা না যোগ দিলে কি এতটা ট্রিমেণ্ডাস সাক্‌সেস হ'ত? এ দিকে স্বরাজ চাও তোমরা, অথচ সমাজের একটা অঙ্গকে পঙ্গু ক'রে রাখতে চাও। তাদের আর আমাদের মধ্যে কি কোন তফাৎ আছে? নারীরাও ত ভগবানের সৃষ্টি। তবে মিথ্যে একটা সুপিরিঅরিটির দাবী কর কেন? কংগ্রেস ত

ডিমোক্রেসী ফলো করে। তবে? ওদের স্বাধীনতা দেওয়া মানেই ত সমান অধিকার দেওয়া?"

শুভেন্দু বলিল, "ঠিক কথা। আগেও স্বাধীনতা ওঁদের যে ছিল না, তা নয়, তবে ভারতের দুর্দ্দিনের যুগে তা লোপ পেয়েছে নানা কারণে। কিন্তু সে স্বাধীনতা বা সমান অধিকার মানে নারীর বিশেষত্ব নষ্ট করা নয়।"

মিঃ সানিয়াল ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "এই দেখ ত, ইডিয়টের মত কথা বলছ! বিশেষত্ব—ঐ একটা ফুলিশ কথা উঠেছে। বিশেষত্ব আবার কি?"

শুভেন্দু ধীরভাবে বলিল, "চটবেন না। বলুন দেখি, পুরুষরা রাস্তার কল সারে, রাস্তা ঝাঁট দেয়, যুদ্ধ করে,—নারীদেরও কি তাই করতে বলেন? আচ্ছা, তাও যেন স্বীকার ক'রে নিলুম। কিন্তু এই যে পুরুষরা জল্লাদ হয়ে লোকের গলায় ফাঁসী দেয়। আপনি কি মনে করেন, নারীরাও জল্লাদ হ'লে খুব ভাল হয়? কাযের তফাৎ দু'জনেরই আছে, অধিকারও তেমনই দু' রকমের।"

মিঃ সানিয়ালের মুখ-চক্ষু রক্তবর্ণ ধারণ করিল। তিনি টেবলের উপর প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিয়া বলিলেন, "অল বস্ এণ্ড ননসেন্স! হাতিয়ার নিয়ে যুদ্ধ করলেই বুঝি যুদ্ধ করা হয়? এবার আমাদের নারীরা অহিংসার যুদ্ধে না নামলে কি করতে তোমরা ক'জন চরকা-টেকোওয়ালা? বিলেতের নারীরা কত রকম ক'রে পুরুষদের জার্ম্মাণ-যুদ্ধে নামিয়েছিল, তার খবর রাখ? ফুল-এর মত কথা কয়ো না।"

শুভেন্দু হাসিয়া বলিল, "আপনি বড্ড চটে যাচ্ছেন। যাক্ গে, ও কথা থাক—"

মিঃ সানিয়াল অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "না, না, চটবো কেন? চা-টা খাওয়া হয়েছে বোধ হয়? তা এত বেলায় চান্‌টান্ ক'রে এখেনেই খেয়ে যাও। বেয়ারা!"

শুভেন্দু বাধা দিয়া বলিল, "না, তার দরকার নেই, আমাদের সে বন্দোবস্ত হয়ে আছে। এখন কথাটা কি জানেন—"

মিঃ সানিয়ালও বাধা দিয়া বলিলেন, "না, সে হবে না, দু'মুঠো খেয়ে যেতেই হবে এখানে। নীরো!—সে দিন হাটের দরুণ মুরগী ক'টা আছে রে?" শেষ কথা কয়টা নীরজাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছিল; নীরজা তাঁহার আহ্বানে কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল।

নীরজা সে কথায় সাড়া না দিয়া বলিল, "বসুন না। আপনাকে খেয়ে যেতেই হবে, দাদা বলছেন যখন।"

নীরজাকে দেখিয়া শুভেন্দু দাঁড়াইয়া উঠিয়াছিল। সে কোন কথার জবাব না দিয়া নিতান্ত অস্বচ্ছন্দভাবে অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল।

মিঃ সানিয়াল হাসিয়া বলিলেন, "ওর ঐ-রকম। জানিস নীরজা, কলকাতায় তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে চেয়েছিলুম ব'লে আমাদের বাড়ীমুখো কখনও হোতো না, অথচ এ ফাষ্টক্লাসের এম-এ, উকীলও হয়েছিলো হাইকোর্টের, নন-কোঅপরেশান ক'রে ছেড়ে দিয়েছে কোর্ট। আমাদের বকুলবাগানের পশুপতি বাবুর ছেলে।"

নীরজা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, "সেসন জজ পশুপতি বাবু? যিনি রিটায়ার হয়েছেন?" মিঃ সানিয়াল হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ রে, তাঁরই ছেলে—"

শুভেন্দু অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতেছিল, সে তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিল, "আজ আসি যোগেশ বাবু, আর একদিন আপনার সঙ্গে দেখা করবো।"

মিঃ সানিয়াল তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "বা রে রস্‌কে! তাই না কি যেতে দিলুম—নীরো, বল না রে, দুপুরবেলা অতিথি ফিরে যায়—বাঃ—আরে আসুন, আসুন, নমস্কার! আপনি কবে এলেন?"

আগন্তুক গিরিজানাথ বাবু, তাঁহার পশ্চাতে তাঁহার কন্যা শেফালী, সে ঈষৎ অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া ঘরের বাহিরে একপার্শ্বে জড়সড় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। গিরিজা বাবু বলিলেন, "ভোরের গাড়ীতে এসেছি। সকালটা মাথার কয়লার কুচো তুলতে আর খেতে-দেতে দেরী হয়ে গেল। আমার ঝঞ্চাট মিটিয়ে আসতে দেরী হ'ল, শুভেন্দু বাবাজী ওর মাসীদের নিয়ে এসেছিলো আগে, ওরও শরীরটে খারাপ কি না। শুভেন্দু, তোমার জন্যে তোমার মাসীমা অপেক্ষা করছেন, যাও বাবা, স্নানাহার কর গিয়ে।"

শুভেন্দু যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। "যে আজ্ঞে" বলিয়া সে একবার সকলকে অভিবাদন করিয়া অবনত-মস্তকে দীর্ঘ পাদবিন্যাস করিয়া চলিয়া গেল।

গিরিজানাথ বাবু সস্নেহে তাহার চলন্ত মূর্ত্তির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "সবই ভাল ওর, কেবল—কই শেফালী কোথায় গেলি, মা?"

ততক্ষণ নীরজা তাহাকে বাহির হইতে ধরিয়া আনিতে গিয়াছিল। গিরিজা বাবু ইত্যবসরে বলিলেন, "হাঁ, ভাল কথা, তুমি শোন নি বোধ হয়, শেফালীর সঙ্গে শুভেন্দুর বিবাহের পাকাপাকি কথাই হয়ে গেছে। পশুপতির স্ত্রী আর শেফালীর গর্ভধারিণী একই গাঁয়ের মেয়ে, ছেলেবেলায় দু'জনে সই-পাতান ছিল। ওঁরাই ভিতরে ভিতরে সম্বন্ধ ঠিক করেছিলেন।"

মিঃ সানিয়াল হাসিয়া বলিলেন, "ওঃ, তাই বুঝি ঘরে এল না শুভেন্দু ছিল ব'লে। হাঃ হাঃ, স্কুলে পড়েও প্রেজুডিস গেল না এখনও।"

নীরজা শেফালীকে একরূপ টানিয়া ঘরে আনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "হাঁ, প্রেজুডিস যাবে! তবুও এখনও চার হাত এক হয় নি। দাদা আবার বলছেন, ওকে থিয়েটারে পার্ট দিতে! হয়েছে আর কি!" নীরজা গিরিজা বাবুর সমস্ত কথাই বাহির হইতে শুনিয়াছিল।

গিরিজা বাবু হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "দেখ যোগেশ, ঐটিতে মাপ করতে হবে। নীরজার অনুরোধ, থিয়েটার দেখতে আসবো আমরা, কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। যাক্, তোমরা ভিতরে যাও মা, আবার তোমার দাদার খাওয়া-দাওয়ার উদ্যোগ করতে হবে ত।"

যোগেশ বাবুকে নির্জ্জনে পাইয়া গিরিজানাথ বাবু বলিলেন, "তারপর যোগেশ, এ-সব কি হচ্ছে শুনি। আমি তোমার পিতৃবন্ধু, জোর আছে বলবার তোমার উপর। শুনলুম, কলকাতার বিষয়-আশয় বন্ধক পড়েছে, সাঁওতাল পরগণার নার্শারীটুকু আছে শুনলুম, গলায় তোমার ঐ ভগিনী ঝুলছে, বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে এখানে বসে আজ দু'তিন মাস নাচ-থিয়েটার নিয়ে মেতে আছ, তার মানে?"

মিঃ সানিয়াল নিতান্ত অস্বস্তি বোধ করিয়া বলিলেন, "ও-সব কথা শোনেন কেন? চলুন, এখানে কেমন লাইব্রেরী করেছি দেখিয়ে আনি।" তিনি দাঁড়াইয়া উঠিয়া ডাকিলেন, "বেয়ারা!" রাধু হাজির হইলে বলিলেন, "গোসলখানায় গরম জল নিয়ে যা, আমি যাচ্ছি।" রাধু চলিয়া গেল।

গিরিজা বাবু বলিলেন, "কোথা যাও, বোসো, আমার কথা শোন। এ রকম রেটে চললে কোথায় গিয়ে নামবে, ভেবে দেখছো কি? তোমার স্পেকুলেশান, তোমার রেস, তোমার সাহেবিয়ানা,—কোন্‌টা রেখে কোন্‌টা বলবো। পিতৃতুল্য এ বুড়োর কথাটা শোন। বল, কত টাকা দেনা করেছ—দেখি, যদি পারি, বন্ধকটা খালাস ক'রে আমার হাতে রাখতে। নার্শারীর আয়টা কি করছ? শুনলুম, সেটাও না কি জঙ্গলে ভরে আসছে?"

মহা ফাঁপরে পড়িয়া মিঃ সানিয়াল ঘামিয়া উঠিলেন। ঠিক সেই সময়ে তাঁহার মুখরক্ষা করিতে যেন ঈশ্বরপ্রেরিত দূতরূপে মিস পল্ একখানি টেলিগ্রাম হস্তে তথায় উপস্থিত হইয়া মিহিসুরে বলিলেন, "কলকাতার টেলিগ্রাম।"

তাড়াতাড়ি মোড়ক খুলিয়া কথা কয়টি পাঠ করিয়া মিঃ সানিয়াল লাফাইয়া উঠিয়া সানন্দে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "হুর্-র‍্যা হুর্-র‍্যা! বাই জোভ, এ নিউজ ইন এ থাউস্যাণ্ড। চলুন, মিস পল্, এখনই প্রিন্সকে খবর পাঠাতে হবে, সুধাংশু আসছে সন্ধ্যার গাড়ীতে। তাই ত বলি, তার ডিউটি-জ্ঞান নেই?"

উভয়ে দ্রুতপদে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। গিরিজানাথ অবাক্ হইয়া ভাবিতেছিলেন, ইহারা কে? প্রেত ও প্রেতিনী? ইনিই কি ইহাদের শিক্ষয়িত্রী? পিতৃবন্ধু কোথায় রহিল, কে তাঁহাকে অভ্যর্থিত করিবে—সে কথাও কি মনে রহিল না?

৪

আজ অভিনয়। এমন সমারোহ ব্যাপার রাজপুর জীবনে দেখে নাই। দর্শক ও শ্রোতা,—ষ্টেশন ও খনির এবং পার্শ্ববর্ত্তী কয়খানি ষ্টেশনের ও খনির বিস্তর বাঙ্গালী বাবু, বাঙ্গালী ডাক্তার ও পোষ্টমাষ্টার এবং তাঁহাদের পুত্র-পরিবার, বাকী সাঁওতাল ও কুলী। প্রিন্স পুরুষোত্তম অভিনয়কে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সফল করিবার উদ্দেশ্যে জলের মত অর্থব্যয় করিয়াছেন। কলিকাতা হইতে তাঁহার কয়েকটি বন্ধু নিমন্ত্রিত হইয়া তাঁহার বিজলীবাতি-শোভিত প্রাসাদোপম সুরম্য নিকেতনে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে আজ সমগ্র রাজপুরই তাঁহার গৃহে পান-ভোজন ও দর্শনের জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছেন, তাঁহার প্রাসাদে আজ দুই দিন যাবৎ 'দীয়তাং ভুজ্যতাং' রব শুনা যাইতেছে।

ফলে-ফুলে লতায়-পাতায় ধ্বজপতাকায় সমগ্র ভবন সজ্জিত। প্রাসাদের ডাইন্যামো হইতে বিদ্যুতের আলোক

সর্ব্বত্র আলোকিত করিয়াছে। রঙ্গীন চিত্রবিচিত্র আলোক-মালায় রঙ্গমঞ্চের কি শোভাই না ফুটিয়াছে!

নীরজা শেফালীকে সন্ধ্যার পর রঙ্গমঞ্চ ও নেপথ্য দেখাইয়া বেড়াইতেছিল। সে একের পর একটি দেখাইয়া বলিতে-ছিল, "এই যে বাঁ-দিকে সারি সারি ঘর দেখছিস, এর একটি পুরুষোত্তম বাবুর খাস সাজবার কামরা, মাঝখানে আর সব পুরুষদের সাজবার কামরা; তারপর আমাদের সাজবার কামরা। তার পাশে বাথরুম, তার পরে বিশ্রাম করবার কামরা। সব কামরাতেই ইলেকট্রিক আলো আর পাখা। কত টাকাই না খরচ করেছে প্রিন্স পুরুষোত্তম! এই যে আমার জড়োয়ার ব্রেসলেট আর নেক্‌লেস দেখছিস, এ সবও পুরুষোত্তম বাবু উপহার দিয়েছে, আর কাপড়-চোপড়, সে ত অগস্তি"—

শেফালী হাসিয়া বলিল, "আহা, প্রিন্স যদি বাঙ্গালী হোতো!"—

নীরজা কথাটার গুপ্ত ইঙ্গিত বুঝিতে পারিল, তাহার মুখচক্ষু রাঙ্গা হইয়া উঠিল, সে বলিল, "আহা মরি, কথার ছিরি দেখ! কথা কইতে জানিসনি, ঠাট্টা করতে আসিস কেন? এ ত অভিনয়—এতে মেলামেশায় অপরাধটা কি হয়েছে? আজকাল সবাই ত করছে। এত ক'রে সাধলুম, কিছুতেই ত স্বীকার হলিনি"—

শেফালীর এক জবাব,—সে অভিনয় করিতে জানে না, কখনও অভিনয় করে নাই। নীরজা রাগিয়া বলিল, "আহা যেন নেকী! আমরাই কোন্ জানতুম আগে, আমারও ত প্রথম প্রথম লজ্জা করতো"—

শেফালী কোণঠেসা হইয়া বলিল, "তবে ভাই স্পষ্টই বলি, অপরিচিত পুরুষদের সঙ্গে এমন মেলামেশা আমরা মোটেই পছন্দ করি না।"

নীরজা ক্রুদ্ধ অভিমানাহত স্বরে বলিল, "মেলামেশাটা আবার কি? তা হ'লে দাদা এতে মত করতেন কি? অপরিচিত পুরুষদের সঙ্গে ত আর সম্বন্ধ পাতাতে যাচ্ছিস না, তারা বাঘ-ভালুকও নয়, তোকে খেয়েও ফেলবে না!"

শেফালী হাসিয়া বলিল, "আশ্চর্য্যই বা কি? ভগবানের চিড়িয়াখানায় এই মানুষের মধ্যেই কত বাঘ-ভালুক রয়েছে—"

নীরজা বলিল, "বাঘ-ভালুক কি? এরা সবাই বড়-ঘরের ছেলে, সবাই এম-এ, বি-এ পাশ—"

শেফালী বাধা দিয়া বলিল, "তা হ'তে পারে, কিন্তু ওদের দাঁতও আছে, নখও আছে, আঁচড়াতে কামড়াতে কতক্ষণ?"

নীরজা ব্যঙ্গের সুরে বলিল, "দেখিস! একবারে মোমের পুতুল, আলো লাগলেই গলে পড়বি, বাঁচি নি আর! ওরা যতই মিশুক, আমাদের মান রেখে চলতেও জানে।"

শেফালীও সমান সুরে বলিল, "তা আর জানি নি—সে দিন ডাকঘরের সুমুখেই তা দেখেছি। আচ্ছা, তোকে একটা সোজা কথা জিজ্ঞাসা করি, সোজা জবাব দে। তোরা যে পুরুষ আর নারীর সমান অধিকার নিয়ে এত চুল-চেরা-চিরি করিস, বল দিকি, সকল সময়েই কি তা মেনে চলিস?"

নীরজা বলিল, "নিশ্চয়ই!"

শেফালী বলিল, "তবে যাদের কাছ থেকে এই আইডিয়া নিইছিস, তাদের দেশের জাহাজডুবির সময় নারীদের আগে বোটে চেপে পালাতে দেয় কেন?"

নীরজা বলিল, "ওটা সিভ্যালরি।"

শেফালী বলিল, "পুরুষদের ওটা সিভ্যালরী হ'তে পারে, কিন্তু নারীকে কি তাতে খাটো করা হয় না? অধিকার যদি দু'জনেরই সমান হয়, তা হ'লে সমান ভাগ ক'রে দু'জন-কেই বোটে চড়ান হয় না কেন? নারীকে দুর্ব্বল ব'লে মনে ক'রেই কি এমনই করা হয় না?"

নীরজা বিষম ক্রুদ্ধা হইয়া বলিল, "যা, যা, ভারী তার্কিক হয়েছিস। ওঃ, নাই প্লে করলি, ঢের জুটবে'খন আমাদের।" নীরজা মুখ ভার করিয়া রহিল।

এই সময়ে মিঃ সানিয়াল কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলি-লেন, "এই যে, তোমরা এখানে? বেশ, বেশ, শেফালীকে দেখিয়ে শুনিয়ে বেড়িয়েছ ত? কি হোলো, শেফালী রাজী হোলো?"

মিস পল্ তাঁহার পশ্চাৎ হইতে মিহিসুরে বলিলেন, "হাঁ ত, লক্ষীটি, রাজী হন্ ত মিস শেফালী। কথা মাত্র দু'চারটি! আঃ, আপনাকে যা মানাবে—"

নীরজার তখনও রাগ পড়ে নাই, সে গম্ভীরভাবে বলিল, "হাঁ, রাজী হবে! বলে, যে ট্যাসটে সে কথা ওর!"

মিঃ সানিয়াল সবিস্ময়ে বলিলেন, "সত্যি না কি? তা উনি রাজী না হন, আমি খুব পাকড়াও ক'রে শুভেন্দুকে রাজী করেছি—"

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের গীতা-উৎসব

পূর্ব্ববঙ্গের জলপ্লাবনে উৎপীড়িত দুঃস্থ নরনারীদিগের সাহায্যকল্পে যে ধনভাণ্ডার গঠিত হইয়াছে, তাহাতে অর্থ সাহায্যের জন্য কবিসম্রাট শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয় ম্যাডান রঙ্গমঞ্চে 'গীতা-উৎসবের' অভিনয় করিয়াছিলেন। কবিবর এই অভিনয়ের বিভিন্ন দৃশ্যে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

কবিসম্রাট রবীন্দ্রনা[illegible]

শ্রীমতী নিবেদিতা দেবী—সুমিতা চক্রবর্ত্তী—গীতা দেবী
শ্রীযুত শান্তি ঘোষ—কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ—বাসুদেব (মাদ্রাজী)
কুমারী মায়াদেবী—নন্দিতা দেবী

কুমারী নন্দিনী—কবিবর—শ্রীমান্ গৌরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীমতী সুমিতা চক্রবর্ত্তী—কবিবর—কুমারী নন্দিনী—শ্রীমতী নন্দিতা দেবী

শ্রীমান্ গৌরেন্দ্রনাথ—কবিসম্রাট—কুমারী নন্দিনী—শ্রীমতী সুমিতা চক্রবর্ত্তী

ছায়া চিত্রকর—শ্রীযুত চম্পটী।

বাদল-সাঁঝে

শিল্পী—শ্রীচারুচন্দ্র সেনগুপ্ত।

মিস পল্ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "এঁ্যা বলেন কি?" নীরজারও বিস্ময়ের সীমা রহিল না। শেফালী আরক্তমুখে অবনতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল।

মিঃ সানিয়াল বলিলেন, "হঁা, এক রকম বটে। তবে অভিনয় করবে না, করবে প্রম্‌ট। তবুও যথালাভ! কি বলেন আপনারা? হাঃ হাঃ।"

হঠাৎ ষ্টেজ-ম্যানেজার যেখানে ষ্টেজ খাটাইতেছিলেন, সেখানে একটা হৈ হৈ রব উঠিল, মিঃ সানিয়াল, নীরজা ও মিস পল্ সেই দিকে ছুটিয়া গেলেন। গিয়া দেখেন, কাচা গলায় সুধাংশুমোহন!—উপস্থিত সকলে তাহাকে তাহার সৎসাহসের (moral courage-এর) জন্য সুখ্যাতি (congratulate) করিতেছেন; কেহ করমর্দ্দন করিতেছেন, কেহ বা পিঠ চাপড়াইতেছেন। সুধাংশু হাসিতে হাসিতে বলিতেছিল, "হ্যাঁ, আমায় না কি ধ'রে রাখবে; মাই ওয়ার্ড ইজ ওয়ার্ড! যখন বলেছি প্লে করবো, তখন করবোই। মা, দাদা, হারু জ্যেঠা কেউ জানে না কোথায় যাচ্ছি—একবারে হাওড়া ষ্টেশনে লম্বা ছুট! যাকে বলে একবস্ত্রে—দেখ না, এই কাচা গলায়। সারা দুপুর রোদ্দুরে চাম্‌সে গেছি বাবা, পেটে ত সকালের সেই হবিষ্যির পিণ্ডি। পেগ না হ'লে বাবা মানাচ্ছে না—কোথায়, প্রিন্স কোথায়? এই যে মিঃ সানিয়াল; দিন একটা ফরমাস ক'রে, এক পেগ"—

মিঃ সানিয়াল একগাল হাসিয়া বলিলেন, "তা হলে এইছিস, সুধা? ওঃ, বুকটা আমার দমিয়ে দিয়েছিলি একবারে। আয় আয়, একটু রিফ্রেস্‌ট্ হবি আয়।"

* * * * *

ঐক্যতান বাদ্যের পর অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে। প্রথম অঙ্কের শেষ দৃশ্যে মিস পল্ একটি নৃত্য ও গীতের পর যখন নেপথ্য অভিমুখে চলিয়া আসিতেছেন, তখন প্রম্‌টার শুভেন্দু অপর উইংস্ হইতে মিঃ সানিয়ালকে যে ভাবে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতে দেখিল, তাহাতে তাহার আপাদমস্তক ঘৃণায় শিহরিয়া উঠিল—সে তখনই স্থানত্যাগ করিতেছিল, কেবল দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া কোনমতে স্থির হইয়া রহিল। একবার প্রিন্স পুরুষোত্তম তাহার পার্শ্বে আসিয়া কেতাবখানার পাতা উল্‌টাইয়া আপনার অংশটা দেখিয়া লইলেন—তখনও শুভেন্দুর মনটা দারুণ ঘৃণা ও ক্রোধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। ইহারা কি সকলেই কদর্য্য-স্বভাব? অভিনয়, বিদ্যার চতুঃষষ্টি কলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কলা, তাহার মর্য্যাদা কি রক্ষিত হইবে ক্ষুদ্রাশয় এই মদ্যপদিগের হস্তে? এই যোগেশ বাবু যদি প্রকৃতিস্থ থাকিতেন, তাহা হইলে কি শিক্ষয়িত্রীকে লইয়া প্রকাশ্যে এই অভদ্র আচরণ করিতেন? এই পুরুষোত্তম—এ না শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত? ছিঃ ছিঃ, আপনার সোদরাকে এই অপবিত্র আবেষ্টনীর মধ্যে——

হঠাৎ শুভেন্দুর চিন্তা-স্রোতে বাধা পড়িল—ষ্টেজ-ম্যানেজারের ঘণ্টার আওয়াজের সহিত প্রচ্ছদপট ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল, আবার অভিনয় আরম্ভ হইল। এই অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে নায়করূপে পুরুষোত্তম যে অভিনয় করিল, শুভেন্দুর মনে হইল, তেমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় সে কখনও দেখে নাই। এক এক সময়ে সে প্রম্‌ট করিতে করিতে স্তব্ধ-বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া রহিল, অন্য সময়ে কখনও তাহার মন ক্রোধে ক্ষোভে আলোড়িত হইয়া উঠিল, কখনও বা নয়ন অশ্রুভারাক্রান্ত হইল। পুরুষোত্তমের প্রতি তাহার মন শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিল। অদ্ভুত শক্তি তাহার! এত গুণ, কিন্তু—

তৃতীয় অঙ্কেই অভিনয় সমাপ্ত হইবে। প্রথম দৃশ্যে নায়করূপে পুরুষোত্তম অভিনয় করিতেছিল। শুভেন্দু চমকিত হইল—এ কি সেই দ্বিতীয় অঙ্কের নায়ক পুরুষোত্তম? অভিনয় করিতে করিতে নায়কের মাথা টলিয়া যাইতেছে কেন? তাহার চরণ কম্পিত হইতেছে কেন? তাহার ঢুলু ঢুলু নয়ন জবাকুসুমের আকার ধারণ করিয়াছে কেন? মাঝে মাঝে তাহার কণ্ঠস্বর জড়িত হইয়া যাইতেছে কেন?

তৃতীয় দৃশ্যে মিস পল্ ও নীরজাসুন্দরীর দ্বৈত গীতটি কি চমৎকার! দর্শকমণ্ডলী ঘন ঘন করতালি দিয়া তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। শেষে যখন উভয়ে নৃত্যের সহিত সঙ্গীত করিতে করিতে নেপথ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন, তখন অবিশ্রান্ত এনকোর, এনকোর ধ্বনিতে রঙ্গক্ষেত্র ভরিয়া উঠিল। দুই তিন বার নৃত্যগীত পুনরাবৃত্তির পর অবসন্ন শ্রান্তদেহে উভয়ে যখন প্রসাধন-কক্ষে উপস্থিত হইলেন, তখন পরবর্ত্তী অর্থাৎ শেষ দৃশ্যের জন্য প্রস্তুত হইয়া অধিকাংশ অভিনেতা ও অভিনেত্রী রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়াছেন, কেবল নায়ক প্রিন্স পুরুষোত্তম তাঁহার কক্ষদ্বারে দাঁড়াইয়া সিগারেটের ধূম উদ্গিরণ

করিতেছেন, তিনি শেষ মুহূর্ত্তে নীরজা ও মিস পল্‌কে লইয়া রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইবেন!

মিস পল্‌ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, নীরজা কক্ষদ্বারের বাজু ধরিয়া শ্রমজনিত দীর্ঘশ্বাস নিক্ষেপ করিতেছে। হঠাৎ অতর্কিতভাবে প্রিন্স পুরুষোত্তম তাহার সান্নিধ্যে উপস্থিত হইয়া তাহার মৃণাল-পেলব সুন্দর করযুগল দুই হস্তে গ্রহণ করিয়া সবলে তাহাকে বক্ষে আকর্ষণ করিয়া লালসার তীব্র জ্বালাময় সুরাজড়িত স্বরে বলিলেন, "মাই ডার্লিং! কি দিয়ে যে—"

কথা সাঙ্গ হইল না। নীরজা দারুণ বিস্ময় ও ক্রোধে তাঁহার বাহুপাশ হইতে মুক্ত হইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল, তাঁহার কথায় বাধা দিয়া ঘৃণাভরে সক্রোধে বলিল, "পাজী, ছুঁচো!"

রক্তের আস্বাদ পাইয়া শোণিতপিপাসু শার্দ্দূল যেরূপ শোণিতধারা-পানে উন্মত্ত হয়, পুরুষোত্তম তেমনই উন্মত্তের মত নীরজাকে বক্ষোমধ্যে আঁকড়িয়া ধরিয়া তাহার ফুল্লকুসুমতুল্য অধরোষ্ঠে তাঁহার তীব্র সুরাগন্ধামোদিত অধর স্থাপন করিলেন। তখন কক্ষমধ্যে দাঁড়াইয়া মিস পল্‌ মৃদু হাস্য করিতেছিলেন! নীরজা ব্যর্থ আক্রোশে ও রুদ্ধ রোষে কাঁদিয়া ফেলিল।

প্রসাধক ও দৃশ্যপট-পরিবর্তনকারিদ্বয়ের বিস্ময় অপনোদিত হইতে না হইতে শুভেন্দু ক্রুদ্ধ সিংহের মত লম্ফ দিয়া প্রসাধনকক্ষের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হইল এবং পুরুষোত্তমকে সবলে আকর্ষণ করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিল, হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "কাওয়ার্ড! ব্রুট্‌!" সে সময়ে ক্রোধে জ্ঞানহারা শুভেন্দুর পদাঘাত যে পুরুষোত্তমকে অব্যাহতি দিয়াছিল, এমন কথা বলা যায় না। দৃশ্যপটের উপর নিক্ষিপ্ত হইয়া পুরুষোত্তম সশব্দে ভূমিশয্যা গ্রহণ করিলেন, তাঁহার ললাট হইতে তপ্ত রক্তধারা গড়াইয়া পড়িল।

দারুণ হট্টগোলের মধ্যে অভিনয় ভাঙ্গিয়া গেল, অভিনেতা অভিনেত্রীরা নেপথ্যের অভিমুখে ছুটিয়া গেল, ষ্টেজ-ম্যানেজার যবনিকা ফেলিয়া দিলেন। বাঙ্গালী দর্শকদের মধ্যে বহুসংখ্যক লোক ভিতরে ছুটিয়া আসিলেন, তাঁহাদের মধ্যে গিরিজা বাবু ও শেফালী অন্যতম।

পুরুষোত্তম তখন দাঁড়াইয়া উঠিয়া রুমাল দিয়া রক্ত মুছিতেছেন, নীরজা ক্ষোভে দুঃখে লজ্জায় মৃতপ্রায় হইয়া অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়িয়াছিল। শেফালী অগ্রসর হইয়া তাহাকে ধরিয়া তুলিয়া প্রসাধনকক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

পুরুষোত্তম বাবুর লোকলস্কর গোলযোগ শুনিয়া সেই স্থানে সমবেত হইয়াছিল। তাহারা ব্যাপার কতকটা বুঝিতে পারিয়া শুভেন্দুকে আক্রমণার্থে উদ্যোগ করিতেছিল, পুরুষোত্তম বাবু ক্রুদ্ধ জনতার ঘৃণা ও রোষের অভিব্যক্তি অনুভব করিয়া অঙ্গুলী-সঙ্কেতে তাহাদিগেকে বাহিরে যাইতে আদেশ দিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "এর উচিত উত্তর আমি পরে দোবো।" শুভেন্দু তাঁহার দিকে তাকাইয়া একবার ঘৃণার হাসি হাসিল। পুরুষোত্তম বাবু স্থানত্যাগ করিলেন।

মিঃ সানিয়াল রোষকষায়িত লোচনে শুভেন্দুর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "আমাদের ঘরোয়া ব্যাপারে এ রকম আন্‌ডিউ ইণ্টারফারেন্সের মানে কি? শুভেন্দু বাবুর স্মরণ রাখা উচিত ছিল যে, এটা অভিনয়, আগে জানলে আমি তাঁকে ইনভাইট করতুম না।"

গিরিজা বাবু ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া বলিলেন, "নির্লজ্জ! আবার কথা কইছো? এস শুভেন্দু, ওদের নিয়ে আমরা বাড়ী যাই।"

* * *

ইহার পরদিন যখন শেফালী একান্তে আপনার ঘরে বসিয়া 'কৃষ্ণকান্তের উইল'খানি পড়িতেছিল, তখন নীরজাকে তাহার কক্ষে উপস্থিত হইতে দেখিয়া বিস্মিত হইল। নীরজার সে হাসিমুখ আর নাই, তাহাতে কে যেন নিবিড় কালিমা ঢালিয়া দিয়াছিল। এক দিনে এমন পরিবর্ত্তন শেফালী কখনও দেখিয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারিল না। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহাকে ধরিয়া বসাইতেই নীরজা সাগ্রহে তাহার হাত দুইখানি ধরিয়া বলিল, "তোরা আমায় একটু স্থান দিবি, শেফালী? নার্শারীতে আর ফিরে যাব না।"

শেফালী বিস্মিত হইল, বলিল, "সে কি? তোমার দাদা!"

নীরজা উত্তেজিত স্বরে বলিল, "দাদা? থাক—"

তাহার নীলোৎপল নয়ন দুইটি জলে ভরিয়া উঠিল। শেফালী তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইল তাহারও নয়ন অনার্দ্র রহিল না।

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।

ভগ্নচূড়

১

বেহারী এক অভাবনীয় কাণ্ড করিয়া বসিল।

যে গ্রামে তাহার বাস, সেখানে চাষীর সংখ্যা এতই বেশী যে, দুই-এক ঘর ভদ্র-পরিবার যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের পরিচয়ে গ্রামের পরিচয় পাওয়া সুকঠিন। কাজেই চাষ-আবাদ করিয়া যাহাদের অন্নসংস্থান করিতে হয়, তাহাদের অন্যদিকে মন দিবার অবসর মেলে কচিৎ। স্কুল-কলেজের কোন হাঙ্গামাই কাহাকেও পোহাইতে হয় না। ফল হইল এই যে, ছেলেগুলি যেমন ওজনে বাড়িতে লাগিল, তাহাদের জ্ঞান-বুদ্ধিও সেই পরিমাণে কমিতে লাগিল। বিদ্যার অনভ্যাস যখন সকলের মজ্জাগত হইয়া দাঁড়াইল, তখন বেহারী সেই চিরদিনের সংস্কারে এমন কঠিন আঘাত দিল যে, অনেক দিনের অচেতন পল্লী অকস্মাৎ সচকিত হইয়া উঠিল।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বেহারী তাহার প্রৌঢ় বয়সের একমাত্র পুত্র নিতাইকে ভিন্ন গ্রামের কোন এক স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিল। বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার এই দুরন্ত আশার ভয়াবহ পরিণতি সম্বন্ধে গ্রামের পাঁচ জনে যখন বেহারীর পত্নী মোক্ষদাকে নানা রকম আভাস-ইঙ্গিত দিতে লাগিল, তখন বেহারী ছেলে লইয়া স্কুলে চলিয়া গিয়াছে।

ছেলেকে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া বেহারী যখন কল্পনার তুলিতে ভবিষ্যতের আকাশ গাঢ় সোনালী রঙ্গে রঞ্জিত করিতে করিতে বাড়ী ফিরিল, তখন প্রখর মধ্যাহ্ন। রোজ এমনই সময় সে মাঠ হইতে জমীর কায করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসে; কিন্তু বিরক্তি ও শ্রান্তির পরিবর্ত্তে আজ আনন্দে তাহার মুখ উজ্জ্বল দেখাইতে লাগিল। সে বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া মোক্ষদাকে ছেলের ভর্ত্তির সু-খবর দিবার উদ্দেশে উচ্চকণ্ঠে ডাক দিয়া বারান্দায় চৌকি টানিয়া বসিল। কিন্তু নিত্যকার মত আজ কেহই তাহার হাত-মুখ ধুইবার জন্য জল, গামছা, খড়ম প্রভৃতি নিপুণ হস্তে গুছাইয়া রাখে নাই। বেহারী আজ এ সকল বিষয় লক্ষ্য করিল না। স্কুলে বসিয়া নিতাই এখন কি করিতেছে, কতখানি শিখিয়াছে, এই অল্প বয়সেই তাহার কাগজ-কলমের প্রয়োজন হইবে কি না, না তালপাতাই চলিবে, ইহা লইয়া সে আপন মনে আলোচনা করিবার অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিতেছিল। কিন্তু দুই তিনবার ডাকিয়াও যখন পত্নীর কোন সাড়া পাওয়া গেল না, তখন তাহার চমক ভাঙ্গিতেই সচকিতে দেখিল, অন্যান্য দিনের মত আজ আর কেহ তাহারই অপেক্ষায় উৎসুক দৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া নাই।

বেহারী বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারিল না। তাহার বিবাহের পর হইতেই কার্য্যশেষে গৃহাগমনের সহিত স্ত্রীর উপস্থিতি এতই ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল যে, আজিকার এই অনুপস্থিতি তাহাকে উদাসীন থাকিতে দিল না। সে ত্রস্তে ঘরে প্রবেশ করিতেই দেখিতে পাইল, মোক্ষদা দুয়ারের আড়ালে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে।

বেহারী স্ত্রীকে তদবস্থায় দেখিয়া অসুখ করিয়াছে কি না জানিবার জন্য ঈষৎ ঠেলিতেই সে অকস্মাৎ কাঁদিয়া ফেলিল এবং তাহার ব্যবহার বেহারীকে বুঝাইয়া দিল যে, যদি চ তাহার শরীর সম্বন্ধে আশঙ্কার কোন কারণ নাই, কিন্তু মন সম্বন্ধে সে সন্দিহান হইয়া রহিল।

মোক্ষদা কাঁদিয়া কাঁদিয়া যাহা বলিল, তাহার ভাবার্থ এই যে, বেহারী যেন নিতাইকে শীঘ্রই স্কুল হইতে ফিরাইয়া আনে। পাঁচ জনে দশ কথা শুনাইয়া গেল, ছেলে খৃষ্টান হইবে, মুর্গী খাইবে এবং আরও এমন দুই একটি অভক্ষ্যের নাম করিয়া গিয়াছে, যাহা হিন্দুর কুলবধূ হইয়া কিছুতেই সে মুখে আনিতে পারিতেছে না। পিতৃপুরুষ ছেলের হাতের জলগ্রহণ করিবেন না, বৈশাখের প্রখর রৌদ্রে তাঁহাদের মৃতাত্মা তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া ঘুরিবে এবং ছেলেকে অভিশাপ দিবে। ছেলে খৃষ্টান হইয়া ধুতি-চাদর ছাড়িবে, টেবলে খাইবে, কাহাকেও গ্রাহ্য করিবে না, ইহা তাহার সহ্য হইলেও পিতৃপুরুষ জলাভাবে কষ্ট পাইবে, এ চিন্তা কোনক্রমেই মোক্ষদার সহ্য হইতেছিল না। তাই সে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়া যখন বলিল, ছেলে তাহার মূর্খ হইয়া থাকিবে, সেও স্বীকার, কিন্তু পিতৃপুরুষের প্রেতাত্মা যে আশাভঙ্গের মনস্তাপ সহ্য করিয়াও মুক্তি পাইবে না, ইহা ঘটিতে দিয়া স্বামি-পুত্রের অকল্যাণের পথ এত সহজেই সে পরিষ্কার করিয়া দিবে না।

"পাঁচ জনের দশ কথায়" যেমন বেহারী ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, মোক্ষদার অশ্রুরাশিও তেমনই তাহাকে ভাবাইয়া তুলিল। সে মৃদুকণ্ঠে বলিল, "কিন্তু পাঁচ জনের এত দশ কথারই বা কি প্রয়োজন, শুনি ?"

"তারাই জানে,"—বলিয়া মোক্ষদা স্বামীকে বারান্দায় আনিয়া হাত-মুখ ধুইবার জল-গামছা প্রভৃতি আনিয়া দিল। বেহারী যদিও বা কিঞ্চিৎ সুস্থ হইল, কিন্তু কথাটাকে এইখানেই চাপা দিয়া যাইতে কিছুতেই পারিল না, বলিল, "কি জানিস মুখি, ঈর্ষ্যা! গাঁয়ের আর কারুর ছেলে স্কুলে পড়ে না, আমার

ছেলেই লেখাপড়া শিখবে, মানুষ হবে, এটা তাদের কিছুতেই সহ্য হচ্ছে না ; তাই গায় প'ড়ে এই উপদেশের বোঝা !"

বেহারী যতই বলুক, ছেলের খৃষ্টান হইবার দুর্ভাবনা এবং পিতৃপুরুষের আত্মার অধোগতির আশঙ্কা কিছুতেই মোক্ষদাকে ত্যাগ করিল না। সুতরাং সে যখন এই ইঙ্গিত করিয়াই তাহার তরফ হইতে প্রশ্ন করিল, তখন বলিবার হঠাৎ কিছু না পাইয়া বেহারী চুপ করিয়া রহিল।

বস্তুতঃ এ চিন্তা যে বেহারীরও ছিল না, ইহাও জোর করিয়া বলা শক্ত। কিন্তু এক 'হইতে পারে'র আশঙ্কায় পুত্রের ভবিষ্যৎ সে অন্ধকার করিয়া রাখিবে, ইহা সে কোনমতেই স্বীকার করিল না। তাই মৃদুস্বরে বলিল, "সে চিন্তা আমিও করেছি, মুখি ! কিন্তু তাই ব'লে যে, ছেলে আমার চিরকাল দুঃখ ভোগ করবে, তা আমি কিছুতেই হ'তে দেব না। হোক্ সে খৃষ্টান ; কিন্তু সুখী হোক্, সুখের মুখ দেখুক, আমি এই প্রার্থনাই করি !"

মোক্ষদা প্রশ্ন করিল, "কিন্তু চাষ-আবাদ দেখবে কে ?"

বেহারী নিজের শরীরের প্রতি চাহিয়া কহিল, "চাষ-আবাদের সুখ তো দেখছিস্, মুখি ? ঘরে খাবার নেই, পরবার কাপড় নেই, শস্য যা উঠবে, মহাজন কেড়ে নেবে, শরীর মাটী ক'রে এই যে পরিশ্রম, এর পুরস্কার তো এই ? আমি বলি যে, চাষ-আবাদে সুখ নেই, তার প্রয়োজনও নেই।"

মোক্ষদা থামিয়া থামিয়া কহিল, যে, সে পাড়ার লোকের কাছে শুনিয়াছে, ছুই পাতা ইংরাজী পড়িলে ছেলে পর হইয়া যায় এবং পিতামাতার সম্বন্ধকে এড়াইয়া চলে।

তাহার এই অসঙ্গত যুক্তিতে বেহারী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, "তাই বল্, যত ভাবনা তোর নিজের। কিন্তু ভয় করিস না রে, নিতাই সে ছেলে নয়। আজ তার উৎসাহ যদি দেখতিস্ !"

মোক্ষদা আর কোন কথা বলিল না। অতি শৈশবে সে বধূরূপে এই গৃহে প্রবেশ করিয়াছে। তাহার স্বামী কত উদার, কত মহৎ, তাহা কি সে জানে না ? শত দুঃখ-বিপদে একদিনও স্বামীর অসীম ধৈর্য্যকে সে বিচলিত হইতে দেখে নাই। না—সে স্বামীর কার্য্যে আর প্রতিবাদ করিবে না। মোক্ষদা নীরবে উঠিয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই এক গ্লাশ জল এবং কয়েকখানা বাতাসা আনিয়া বেহারীর হাতে দিল।

বেহারী পূর্ব্ব আলোচনাই সমাপ্ত করিবার জন্য মৃদুকণ্ঠে বলিল, "তোর যদি না ভাল লাগে, মুখি, তুই বল, আমি ফিরিয়ে আনি। ছেলের ভবিষ্যৎ ভেবেই আমি এ ব্যবস্থা করেছিলুম। কিন্তু তোকে আমি দুঃখ দিতে চাইনে।"

মোক্ষদা তদপেক্ষা মৃদুকণ্ঠে বলিল, "তুমি যা ভালো বোঝ কর, আমি আর কতটুকু বুঝি !" বলিয়া অকস্মাৎ নত হইয়া সে বেহারীর পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া দাঁড়াইল।

বেহারীর সমস্ত ভয়-ভাবনা দূরীভূত হইল। প্রসন্ন হাস্যে তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে স্নিগ্ধ স্বরে বলিল, "আমি বল্‌ছি, তোর ভয় নেই। ছেলে আমার ভাল হবে, যদি কেউ কিছু বলে বলুক, তুই তাতে কাণ দিস্‌নে। ভগবান্ করুন, যে দিন টাকা-পয়সা নিয়ে সে ফিরে আস্‌বে, সে-দিন দেখবি, আজ যারা নিন্দাবাদে ঘরবাড়ী ভ'রে তুলেছে, তারাই সে-দিন প্রশংসায় পঞ্চমুখ হ'য়ে উঠবে।"

২

নিতাই তাহার মাকে বুঝাইতেছিল, পৃথিবী গোল, তাহা দিবারাত্রিই ঘোরে, সূর্য্য ঘোরে না ; এক যায়গায় স্থির হইয়া আছে।

মোক্ষদা প্রতিবাদ করিয়া বলিল, দেবতার নামে মিথ্যা অপবাদ করিতে নাই। সে দেখিয়াছে, সূর্য্য ঠাকুর রোজ রোজ ঘোরাঘুরি করেন, এক ফোঁটা নিতাইর কথায় তো আর ঠাকুর-দেবতাকে উড়াইয়া দেওয়া চলে না ! সুতরাং সে বার বার এই ভবিষ্যদ্বাণীই করিতে লাগিল যে, ছেলে যদি খৃষ্টান না হয় তো তাহার নাম মোক্ষদাই নহে। যে ছেলে এই বয়সেই শাস্ত্র মানে না, বড় হইলে যে সে কি মহামারী কাণ্ড করিয়া বসিবে, তাহা ভাবিতেও মোক্ষদার বুকের রক্ত হিম হইয়া আসিল।

কিন্তু নিতাই বার বারই বলিতে লাগিল যে, বইয়ে লেখা আছে, সূর্য্য ঘোরে না, মাষ্টার মহাশয়ও তাহাই বলিয়াছেন। নন্দা জানে, হরি জানে, ইস্কুলের সকলেই যে কথা জানে, তাহার মা তাহা জানে না, বলিলেও বিশ্বাস করে না, ইহাতে তাহার বিস্ময় উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিল !

মোক্ষদা রাগ করিয়া বলিল, "তুই আর আমাকে শেখাতে আসিস নে, নিতা। মা'র কাছে মামা-বাড়ীর গল্প ! শাস্তরে লেখা আছে, আর তুই বল্লেই আমি বিশ্বাস কোরব,—না ?"

নিতাই জোর দিয়া বলিল, সে কিছুই বলিতেছে না। বইয়ে যাহা লেখা আছে, তাহাই বলিতেছে।

মোক্ষদা আরও রাগিয়া গেল, বলিল, "তর্ক করিস তো ভাল হ'বে না বলছি ! ওঃ, বইয়ে লেখা আছে ! আচ্ছা, আন্ তোর বই দেখি।"

নিতাই ছুটিয়া ঘরে গিয়া তাহার বই আনিতেই মোক্ষদা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, "ওই তোর বই, তার আবার

লেখা! এক পয়সার বই আর কত লিখবে! গাঁজার পয়সা জোটেনি, তাই আজগুবি গল্প লিখে পয়সা রোজগারের ফন্দি!"

নিতাই লজ্জা পাইল, সত্যই তাহার বই বড়ই ক্ষুদ্র। এক পয়সা না হউক, পাঁচ ছ' পয়সা দাম। সে প্রশ্ন করিল, "শাস্তর খুব বড়, আর খুব মোটা, না মা?"

মোক্ষদা হাসিয়া বলিল, "তুই আলগাতেই পারবি না, এত মোটা।"

নিতাইকে হার মানিতে হইল। যে বই এত বড় যে, সে আলগাতেই পারে না, তাহাকে তুচ্ছ করিয়া তাহার পাঁচ পয়সা দামের বইয়ের লেখাকেই সে অকাট্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিল না। তথাপি আর একবার শেষ চেষ্টা করিবার উদ্দেশে বলিল, "কিন্তু মাষ্টার মশাই যে বল্লেন, মা, সূর্য্য দেবতাও না, কিছুই না; তার ভেতরে খালি আগুন—আর আগুন!"

মোক্ষদা ব্যাকুল হইয়া উঠিল, বলিল, "এই রে, ঠাকুর-দেবতা নেই, এই বুঝি শেখান হচ্ছে। ওরে ও মূর্খ, দেবতা নেই তো দিবারাত্রি হয় কি ক'রে? কি সর্ব্বনাশ গো, এই বয়সেই এত!" বলিয়াই ছেলের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল। কিসে কি হয় দেখিয়া নিতাইচরণ পলায়ন করিল। ক্রন্দন শুনিয়া বেহারী কায ফেলিয়া ছুটিয়া আসিল, কহিল,—"কি হ'ল গো?"

মোক্ষদা জ্বলিয়া উঠিল, বেহারীর কথারই পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিল, "কি হ'ল গো! তখনই বলেছিলুম, গরীবের ছেলে, কায নেই বাবু লেখাপড়া শিখে! চাষ-আবাদ করুক, না জোটে, খাবে, না জোটে, উপোস দেবে। কে তখন শোনে কথা! এখন টের পান মজাটা! শাস্তর মানে না! ভারী তো বিদ্যে, যত সব অনাছিষ্টি কথা লিখে খিষ্টান করার ফন্দি! ঠাকুর-দেবতা নেই! দিন-রাত্তির হয় না, চন্দ্র-সূর্য্য ওঠে না? পৃথিবী ঘোরে। ওরে আমার বিদ্যে রে!—"

বেহারী বিস্মিত হইল, বিস্ময়াবিষ্টের মত আবার সেই প্রশ্নই করিল, "কি হল, বল না।"

মোক্ষদা অধিকতর ক্রুদ্ধ হইল, ঝাঁকি দিয়া কহিল,—"জানিনে বাবু, লোকে কি ক'রে এত অন্ধ হয়ে থাকতেও পারে। উনির কি, সকাল হলেই মাঠের কাযে বেরিয়ে যাবেন, জ্বালা যত পোয়াতে হবে আমাকে! একেই নিজের জ্বালায় অস্থির, তার উপর গুণধর ছেলের বোল কলাময় বিদ্যে! যাক গে বাপু, আমার কি? যে ছ'দিন আছি, চোক বুজে প'ড়ে থাকবো!"

স্ত্রীর নিকট হইতে কোন সদুত্তর পাওয়া অসম্ভব দেখিয়া বেহারী নিতাইএর উদ্দেশে বাহিরে গেল; এবং তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে?"

নিতাই বলিল, "কিছুই হয়নি, বাবা। মাকে বলছিলুম, বইয়ে লেখা আছে, পৃথিবী ঘোরে, সূর্য্য ঘোরে না, এই সব। শুনেই মা কেঁদে-কেটে অস্থির। আমি পালিয়ে এলুম!"

"হুঁ" বলিয়া বেহারী চুপ করিল। খানিক বাদে কহিল,—"যা হয়েছে, হয়েছে, আর ওর সামনে, ও-সব বলিস-টলিস নে। জানলি?"

নিতাই ঘাড় নাড়িয়া সরিয়া গেল। বেহারীও আপনার কাযে মন দিল।

স্কুলের বেলা হওয়ায় নিতাই ঝুপ্ করিয়া ডুব দিয়া আসিয়া কহিল, "ভাত দে।"

মোক্ষদা নিরুত্তরে বসিয়া রহিল।

মা'র গম্ভীর মুখ দেখিয়া নিতাইচরণ বিনা বাক্যব্যয়ে রান্না-ঘরে গেল। কিন্তু সেখানে সে আজ কেহ প্রবেশ করিয়াছে, তাহার কোন চিহ্ন দেখা গেল না। কোথাও কোন খাবার না পাইয়া সে অভুক্ত অবস্থায় স্কুলে চলিয়া গেল। পথে মাঠের কাযে ব্যাপৃত পিতাকে বলিয়া গেল যে, এইরূপ রোজ রোজ না খাইয়া স্কুল এবং পড়া-শুনা করা তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে না।

কথাটা বেহারীকে আঘাত করিল। বেলার দিকে চাহিয়া দেখিল, রৌদ্রে মাঠ খাঁ খাঁ করিতেছে। এই প্রখর রৌদ্রে নিতাইর মত বালকের পক্ষে অভুক্ত অবস্থায় ভিন্ন গ্রামে যাইয়া স্কুল করা যে কত শক্ত, তাহা অনুমান করিয়া সে দ্রুতপদে বাড়ী আসিল এবং গৃহ-কোণে উপবিষ্ট স্ত্রীকে কঠোর-কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "নিতার খাওয়া হয়েছে?"

মোক্ষদা অন্য দিকে চাহিয়া ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিল, "না!"

একেই সকালের ঘটনায় বেহারীর মন বিরক্ত ছিল। তার উপর এই রৌদের মধ্যে কায করিয়া করিয়া তাহার মন তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার উপর নিতাইএর অভিযোগ, এই সকল মিলিয়া তাহার মেজাজ মোটেই ভাল ছিল না। যে পুত্রের ভবিষ্যৎ চাহিয়া সে অক্লান্ত পরিশ্রমকে তুচ্ছ-জ্ঞান করিয়া ধার-কর্জ্জ করিয়াও তাহার খরচ জোগাইতেছিল, সে যে এমনই অকারণ বাধা পাইবে, ইহা তাহার মোটেই সহ্য হইতেছিল না; তাই সে রূঢ়-কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "কেন?"

বেহারীর কথা বলিবার ভঙ্গিতে মোক্ষদাও অন্তরে অন্তরে ক্রুদ্ধ হইতেছিল। সকালে কাঁদিয়া-কাটিয়া অনর্থ করিয়া সেই

যে সে চুপ করিয়া বসিয়াছিল, তাহার পর কেহ তাহাকে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করে নাই। স্বামী একটিবারের জন্য ফিরিয়া দেখেন নাই। তাহার প্রতি এই যে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য, ইহার ব্যথা সে কিছুতেই ভুলিতে পারিল না। বস্তুতঃ অভিমানে তাহার বুক ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল। তবুও সে ভাবিয়াছিল, মাঠের কাজ শেষ করিয়া বেহারী গৃহে ফিরিয়া তাহাকে শান্ত করিবে এবং সমস্ত অপরাধ নিতাইএর স্কন্ধে চাপাইয়া তাহাকে সুস্থ করিয়া তুলিবে। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে বেহারীর তিক্ত স্বর তাহাকে আরও ক্ষেপাইয়া দিল, সুতরাং সে-ও কঠিন কণ্ঠে উত্তর করিল, "রান্না হয়নি।"

বেহারী জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

মোক্ষদা বলিল, "ইচ্ছা।"

বেহারী রোষে দাঁত দিয়া ঠোঁট চাপিয়া বলিল, "বেশ!"

অতঃপর বেহারী রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়া থালা-বাসন, ঘটী-বাটির অকারণ শব্দে দ্বিপ্রহরের নিস্তব্ধ পল্লী সচেতন করিয়া রান্না চাপাইয়া দিল! অনভ্যস্ত হস্তের অনেক সাধ্য-সাধনার পর যখন সে চাল-ডালের খিচুড়ী নামাইয়া ঘরের বাহির হইল, তখন সূর্য্যদেব পশ্চিমাকাশে ঢলিয়া পড়িয়াছেন। বেলার দিকে চাহিয়া বেহারী গামছা-স্কন্ধে স্নান করিতে গেল। পরে গৃহে ফিরিয়া, খাইয়া, অবশিষ্ট অন্ন ঢাকা দিয়া মাঠের কাযে বাহির হইয়া গেল।

এমন ঘটনা মোক্ষদার জীবনে আর ঘটে নাই। কত দিন সে রাগ করিয়াছে, কত দিন অভিমানে দরজা বন্ধ করিয়া ঘরে শুইয়া থাকিয়াছে, বেহারী আসিয়া তাহাকে শান্ত করিয়া, তাহার অভিমান ভাঙ্গিয়া তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া তুলিয়াছে! কিন্তু আজিকার মত এমন নির্দ্দয়ভাবে বেহারী তাহাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে নাই, এমন করিয়া সংসারের অপ্রয়োজনীয় বলিয়া তাহাকে অবজ্ঞা করে নাই। ইহার বেদনা তাহার বুক জুড়িয়া রহিল। সেই যে 'বেশ' বলিয়া বেহারী রান্নাঘরে প্রবেশ করিল, তাহার পর তাহাকে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করে নাই, সে যে সংসারের একজন, তাহা তাহার কার্য্যে প্রকাশ পায় নাই! বধূরূপে এই ঘরে প্রবেশ করা অবধি আজ পর্য্যন্ত সেই একমাত্র কর্ত্রী ছিল। স্বহস্তে রাঁধিয়া স্বামিপুত্রকে খাওয়াইবার অনির্ব্বচনীয় সুখ সে প্রতিদিনই ভোগ করিত। বেহারী তাহাকে আদর দিয়া, তাহার অযথা আবদার পুরাইয়া তাহাকে বড়ই অভিমানী করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু অভিমানবশতঃ, কোনও দিন সে আজিকার মত এমন কাণ্ড করিয়া বসে নাই; মাঠের কার্য্যে শ্রান্ত স্বামীকে দ্বিপ্রহরে সে কোন দিনই রান্না করিতে দেয় নাই। কিন্তু আজ না কি তাহার বড়ই অভিমান হইয়াছিল, পুত্র আসিয়া তাহাকে কাঁদাইয়া গেল, স্বামী তাহার কোন শাসন করিলেন না, তাহাকে একটি সান্ত্বনার কথাও কহিলেন না, ইহা তাহার অভিমান-বিক্ষুব্ধ বক্ষে বড়ই বাজিয়াছিল! তথাপি সে ভাবিয়াছিল, বেহারী জোর করিয়া তাহাকে উঠাইয়া দিবে, তাহাকে রান্না করিবার জন্য অনুরোধ করিবে; অকৃতকার্য্য হইলে, স্বামীর মরামুখ দেখিবার অভিশাপ দিলেই মোক্ষদা ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিবে এবং বেশী অভিমান হইয়া থাকিলে নীরবে রান্না করিয়া স্বামিপুত্রকে ভাত দিয়া নিজে উপবাস করিবে। কিন্তু হায় রে, তাহার কিছুই হইল না—কিছুই না! স্বামী তাহাকে উপেক্ষা করিলেন! সে না হইলেও যে সংসার অচল হইয়া থাকিবে না, ইহাই যেন বেহারী স্পষ্ট বুঝাইয়া দিল।

ভাবিতে ভাবিতে মোক্ষদার কান্না আসিবার উপক্রম হইল। সে তেমনই নিস্তব্ধ, স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। ক্রমে বেলা পড়িয়া আসিল। নিতাই স্কুল হইতে ফিরিয়া ঢাকা ভাত খাইয়া খেলা করিবার জন্য বাহির হইল। বেহারীও মাঠ হইতে ফিরিয়া হুঁকা হাতে ও-পাড়ায় চলিয়া গেল। একটি কথাও কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল না। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মোক্ষদা উঠিয়া দাঁড়াইল!

* * * * *

সন্ধ্যার পর বেহারী বাড়ী ঢুকিতেই ও-বাড়ীর হরিচরণ ডাকিল, "কাকা!" বেহারী অর্থসূচক দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

হরিচরণ বলিল, "কাকীমা ধোবাপুকুর চ'লে গেছেন?"

বেহারী অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া কহিল, "কোথায়? বাপের বাড়ী?"

হরিচরণ বলিল, "হ্যাঁ, আর এই নিন ঘরের চাবি, আমার কাছে দিয়ে গেছেন।"

বেহারী জিজ্ঞাসা করিল, "কার সঙ্গে গেল রে?"

"নন্দর সঙ্গে।"

"ব'লে গেল কিছু?"

"হ্যাঁ, তাঁকে যেন আন্‌তে যাওয়া না হয়!"

"ওঃ—" বলিয়া হরিচরণের হাত হইতে চাবি লইয়া বেহারী ঘরে ঢুকিল। আলো জ্বালিয়া বিছানা পাতিয়া যখন রান্নাঘরে ঢুকিল, তখন গভীর আক্রোশে তাহার মন বিক্ষুব্ধ হইতেছিল। সে-ও ঠিক করিল, সে-ও আর যাচিয়া আনিতে যাইবে না। রাগ তাহার কত প্রবল, তাহা সে দেখিয়া লইবে।

৩

তারপর অনেক দিন কাটিয়া গেল। মোক্ষদা অভিমান করিয়া চলিয়া গেল, বেহারীও রাগ করিয়া নীরব রহিল। সুতরাং দুই পক্ষই যখন ভুল করিল, তখন সন্ধির কথাও কেহ মনে স্থান দিল না।

বেহারী নিতাইকে লইয়া দুইবেলার ভাত একবেলায় রাঁধিয়া সংসার নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। সকালে রাঁধিয়া খাইয়া সে মাঠের কাযে চলিয়া যাইত, নিতাই স্কুলের সময় ঢাকা ভাত খাইয়া রওনা হইত। তারপর সন্ধ্যাবেলা পিতাপুত্র একসঙ্গে বসিয়া সকালের ঠাণ্ডা ভাত নির্ব্বিকারে আহার করিত; ছেলের ভবিষ্যতের সোনার স্বপ্নে সে কোন দুঃখকেই দুঃখ বলিয়া গ্রাহ্য করিল না। মোক্ষদার অভাবও তাহার অনুভূত হইল না। নিতাই যে পিতার আশ্রয়ে থাকিয়াই অধিক আনন্দে পড়াশুনা করিতেছে, এই স্বপ্নেই সে মগ্ন রহিল। বস্তুতঃ, মাঝে মাঝে লোকের মুখে মোক্ষদার খবর পাইয়াই সে সন্তুষ্ট রহিল, তাহাকে আনিবার কথা একবারও মনে স্থান দিল না।

নিতাইও নীরব রহিল। পিতার নিকট অযথা আদর পাইয়া যখন সে মায়ের কঠোর শাসনাধীনে আসিত, তখন তাহার মোটেই ভাল লাগিত না। সুতরাং মায়ের অনুপস্থিতি তাহার আনন্দেরই কারণ হইয়া উঠিল। সে সকল রকম বন্ধনশূন্য হইয়া স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইতে লাগিল।

এমনই করিয়াই দুই তিন বৎসর কাটিয়া গেল। নিতাই শ্রেণীর পর শ্রেণী ছাড়াইয়া যে-দিন মাইনর স্কুলের শেষ পরীক্ষা দিয়া বাড়ী ফিরিল, সে-দিন বেহারীর আনন্দের আর সীমা রহিল না। ছেলের সুফল-কামনায় সে বাতাসা আনিয়া হরিলুট দিল, এবং আরও দিবার মানত করিল।

পাড়ার যাহারা এক দিন নিতাইকে স্কুলে দেওয়ার জন্য বেহারীর নিন্দায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছিল, আজ তাহারাই যখন তাহার বাড়ী বসিয়া সেই নিতাইয়ের মঙ্গল-কামনায় হরিলুটের প্রসাদের সহিত পাণ-তামাকের ধ্বংস করিতে করিতে নানাবিধ গল্পে মত্ত হইয়া উঠিল, তখন বেহারী তাহাদের প্রতি দীন-নয়নে চাহিয়া রহিল। তাহার মনে কি চিন্তারাশির উদ্রেক হইল, বলা যায় না, কিন্তু এমনই সময় গ্রামের শ্রেষ্ঠ ধনী ও শিক্ষিত যুবক মহেন্দ্রের আগমনে সে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল।

সকলেই কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইল। তাহাদের অশিক্ষিত গ্রামে মহেন্দ্রই একমাত্র আলোকপ্রাপ্ত যুবক। এই ধনী সুশিক্ষিত যুবকটি যে তাহার জ্ঞানের গরিমা, ধনের অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া আজিকার এই সন্ধ্যায় বেহারীর গৃহে স্বেচ্ছায় আসিতে পারে, ইহা তাহাদের কল্পনারও অতীত ছিল। এই স্বল্পভাষী যুবকটিকে তাহারা কিঞ্চিৎ অহঙ্কারী বলিয়াই জানিত। সুতরাং তাহাদের বিস্ময়ের উপশম হইতে না হইতেই মহেন্দ্র যখন হাসিমুখে বেহারীকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "কাল বাড়ী ফিরে সব শুনে আমি বড্ড খুসী হলেম, বেহারী! কিন্তু নিতাইর পড়া যেন এইখানেই শেষ না হয়; তাকে সহরে পাঠিয়ে দিও, সেখানে হাইস্কুল আছে।"

তাহার জীর্ণ কুটীরে মহেন্দ্র বাবুর আগমন! সে কি দিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিবে, কেমন করিয়া তাঁহার উপযুক্ত সম্মান দেখাইবে? বেহারী অতি ব্যস্ত হইয়া উঠিল। তখন মহেন্দ্র বলিল, "বেহারী, নিয়ে এস নিতাইকে। চিরদিনের সংস্কার কাটিয়ে যাকে তুমি ইস্কুলে পাঠালে, তাকে একবার দেখা দরকার।"

নিতাই আসিয়া মহেন্দ্রকে প্রণাম করিল। মহেন্দ্র তাহার হাতে একটি টাকা দিয়া বলিল, "যা রে নিতাই, তোর যা' খুসী কিনে খা গে।"

বেহারীর হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিল। যে ছেলেকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া সে তাহার স্বজাতির নিকট অজস্র তিরস্কার লাভ করিয়াছে, তাহারই জন্য মহেন্দ্র বাবু তাহাকে উৎসাহ দিয়া, নিতাইকে পুরস্কৃত করিয়া পরোক্ষে তাহারই কার্য্যের সমর্থন করিলেন, ইহার আনন্দ সে কিছুতেই গোপন করিতে পারিল না। সুতরাং সে যখন দেবতা সম্বোধনে মহেন্দ্রকে তাহার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতে উদ্যত হইল, মহেন্দ্র বাবু তাহাকে থামাইয়া হাসিমুখে বলিলেন, "থাক, বেহারী! যে দাম্ভিক, অহঙ্কারী ব'লে লোক-সমাজে পরিচিত, তাকে তুমি অযথা প্রশংসা না-ই বা দিলে।"

সকলে এই প্রকাশ্য ইঙ্গিতে লজ্জিত হইয়া নীরব রহিল।

মহেন্দ্র উঠিয়া কহিলেন, "আসি বেহারী, রাত হয়ে যাচ্ছে!"

বেহারী তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আসিতে লাগিল! উভয়েই নীরবে পথ চলিতে লাগিল। অবশেষে সেই স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া মহেন্দ্র বলিলেন, "ভাল কর নি, বেহারী! বড্ডই ভুল হচ্ছে।"

কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বেহারী বিস্মিতের মত মহেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অন্ধকারে কিছুই দেখা গেল না।

মহেন্দ্র কহিলেন, "আমি সব শুনেছি, বেহারী। সে যদি রাগ ক'রেই গিয়ে থাকে, তোমার তাকে ফিরিয়ে আনা উচিত ছিল। আজকের এই আনন্দের দিনে, তাকে নিরানন্দ রাখলে কি নিতাইর ভাল হ'বে, বেহারী?"

বেহারী বুঝিল, মোক্ষদার কথা হইতেছে। সে মৃদুকণ্ঠে বলিল, "আনতে বারণ ক'রে গেছে। তা' ছাড়া—"

মহেন্দ্র তাহাকে বাধা দিয়া কহিলেন, "সে আমি জানি, বেহারী। কিন্তু রাগ সে যতই করুক, তোমার ত ভুল করলে চলে না। আর পুরুষ মানুষের সংসার করাও শোভা পায় না; তাকে তুমি ফিরিয়ে আনো।"

বেহারী চুপ করিয়া রহিল।

মহেন্দ্র কহিলেন, "তা হ'লে কালই তাকে আনবে, বেহারী?"

বেহারী 'না' বলিতে পারিল না। সে মাথা নাড়িয়া মৃদুস্বরে বলিল, "আচ্ছা।"

মহেন্দ্রকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়া সে যখন ফিরিল, তখন অনেক রাত্রি হইয়া গিয়াছে। অন্ধকারে নির্জ্জন পথ চলিতে চলিতে মোক্ষদার স্মৃতি তাহার মনে ভিড় বাঁধিয়া আসিল। সত্যই সে বড় ভুল করিয়াছে। কিন্তু কি করিয়া সে এত নির্দ্দয় হইল?

ভাবিতে ভাবিতে বেহারীর অনেক দিনের অনেক কথা মনে পড়িল। বাল্যকাল হইতে মোক্ষদার সহিত তাহার ভাগ্যসূত্র দৃঢ়ভাবে গ্রথিত; কিন্তু কোনও দিনই ত সে এত বড় নিষ্ঠুরতার কায করিয়া বসে নাই। তবে এত দিন সে কি করিয়া নিশ্চিন্তে বসিয়া রহিল? সে হয় ত কত কষ্ট পাইতেছে, হয় ত বেদনায় তাহার বক্ষ ভাঙ্গিয়া যাইতেছে! কিন্তু অভিমান তাহার বড়ই প্রবল; যে অভিমানবশে জীবনের সর্ব্বপ্রথম স্বামীর বিনানুমতিতে গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছে, আবার কি করিয়া সেই গৃহে সে স্বেচ্ছায় ফিরিয়া আসিবে? বেহারী ত ইহা একবারও ভাবে নাই; এই সহজ সত্য একটুও বুঝিতে পারে নাই। ভাবিতে ভাবিতে তাহার দুই চক্ষু ভরিয়া জল আসিল। অন্ধকারে আর্দ্র চোখ মুছিয়া সে মনে মনে বলিল, "ভগবান্, যে পুত্রের ভবিষ্যৎ ভেবে ওর সামান্য ত্রুটিও আমি মার্জ্জনা করলাম না, সে যে আমার কত আশা-আকাঙ্ক্ষার ধন, তা তো তুমি জানো। ভুল যদি আমার হয়েই থাকে, প্রভু, আমায় তুমি মার্জ্জনা করো।"—কিন্তু উদ্গত অশ্রু কিছুতেই বাধা মানিল না। তাহার গণ্ড বহিয়া ধারা নামিতে লাগিল।

বাড়ী ফিরিয়া বেহারী নিতাইকে কাছে ডাকিয়া, তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "মা'র জন্য মন কেমন করে না রে, নিতা?"

নিতাই বিস্মিত হইল! মোক্ষদার চলিয়া যাইবার পর পিতার মুখে সে কোন দিন মায়ের কথা শোনে নাই। আজ বেহারীর শুষ্ক মুখ—কাতর দৃষ্টি তাহাকে ভাবাইয়া তুলিল। সে কি উত্তর দিবে, বুঝিতে না পারিয়া বলিল, "না বাবা, আমি বেশ আছি।"

বেহারী বিশ্বাস করিল না। সন্দিগ্ধভাবে বলিল, "কেন লুকোচ্ছিস্ রে, আমি বুঝি টের পাই নে? বাপের কাছে মিছে কথা বলতে নেই। খুব কষ্ট হচ্ছে, না রে?"

নিতাই কাতর কণ্ঠে কহিল, "না বাবা, আমার মোটেই কষ্ট হয় না। আমি বেশ আছি!"

বেহারী স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে তিরস্কার করিয়া বলিল, "আবার মিছে কথা? কিন্তু লজ্জা কি রে? কি-ই বা এমন বড় হয়েছিস যে, মা'র জন্য কষ্ট হচ্ছে বলতে লজ্জা করে?"

নিতাই চুপ করিয়া রহিল। বেহারী নিঃশব্দে তাহার মস্তকে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ নীরবে কাটিয়া গেল।

কিঞ্চিৎ আবেগের সহিত বেহারী কহিল, "যাবি নিতাই, কাল তোর মাকে নিয়ে আসতে?"

নিতাই সাগ্রহে বলিল, "যাবো, বাবা!"

বেহারী খুসী হইয়া কহিল, "দেখতে খুব ইচ্ছা হচ্ছে, না রে? হবে না? হবেই তো! আচ্ছা, আচ্ছা, কাল তাকে নিয়ে আসব। রাত হয়েছে, শুবি চল্।"

বিছানায় শুইয়া নিতাইএর ঘুম আসিল না। কি জানি, অকস্মাৎ সে-ও যেন অপরিসীম ঔৎসুক্য অনুভব করিল। বহু দিন পরে সে মায়ের কথা শুনিয়াছে; মাকে তাহার দেখিতে বড়ই ইচ্ছা করিতেছে! পিতার আদর তাহার একঘেয়ে হইয়া উঠিয়াছিল। মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করাও যেন এখন তাহার পরম সুখের বলিয়া মনে হইল। মা যখন তাহাকে বকিত, তখন তাহার বড়ই রাগ হইত। কিন্তু আজ আর তাহার মোটেই রাগ হইল না। বরঞ্চ সে-সব অবস্থা কল্পনা করিয়া এখন সে আনন্দই অনুভব করিল! ভাবিতে ভাবিতে নিতাই ঘুমাইয়া পড়িল।

রাত্রি না পোহাইতেই নিতাই বেহারীকে ঠেলিয়া কহিল, "বাবা, ওঠো, ওঠো; ভোর হয়েছে!"

বেহারী ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিল, কহিল, "কি রে?"

নিতাই কহিল, "ভোর হয়েছে!"

তাহার উৎসাহ দেখিয়া বেহারী হাসিয়া কহিল, "তাই কি?"

নিতাই উত্তর দিল না। তাহার লজ্জা করিতে লাগিল। কাল রাত্রিতেও সে পিতার প্রশ্নে বলিয়াছে যে, মায়ের জন্য তাহার কষ্ট হয় না; এখন সেই কথাই বা সে কেমন করিয়া অস্বীকার করিবে? সে নিঃশব্দে মাথা নত করিয়া বসিয়া রহিল।

বেহারী বুঝিয়া হাসিয়া কহিল, "ও,—ধোবাপুকুর যেতে হবে। বুড়ো হয়ে গেছি, মনেও থাকে না সব। ভাগ্যিস তুই ছিলি রে? তা না হ'লে বেলা হয়ে যেত।"

নিতাই একই ভাবে বসিয়া রহিল।

হাত-মুখ ধুইয়া, পিতা-পুত্র যখন ধোবাপুকুর উদ্দেশ্যে রওনা হইল, তখনও গ্রামের কেহ শয্যাত্যাগ করে নাই।

দ্রুত চলিয়া বেহারী ও নিতাই যখন ধোবাপুকুর পৌছিল, তখনও খুব বেশী বেলা হয় নাই। কত দিন পূর্ব্বে যে বেহারী এই গ্রামে আসিয়াছিল, তাহা সে স্মরণ করিতে পারিল না। অনেক দিন পরে শ্বশুর-বাড়ী যাইবে, কাযেই সে গ্রামের বাজার হইতে মিঠাই কিনিয়া নিতাইএর হাতে দিল। কিন্তু বাড়ীর কাছে আসিয়া তাহার দুই পা অচল হইয়া উঠিল; অপরিসীম লজ্জা আসিয়া তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। ছিঃ ছিঃ, বাড়ীর সকলেই জানে, মোক্ষদা রাগ করিয়া আসিয়াছে। আজ যদি সে হঠাৎ যাইয়া উপস্থিত হয়, তবে আত্মীয়-কুটুম্বের সপ্রশ্ন বাক্যবাণ সহিয়াও সে লজ্জার হাত এড়াইতে পারিবে না। মোক্ষদাকেই বা সে কি করিয়া মুখ দেখাইবে? বেহারী নিজেকে বুঝাইল, সে ভুল বুঝিতেছে, ইহাতে লজ্জার কিছুই নাই, কিন্তু অবাধ্য মন কিছুতেই বশ মানিল না। লজ্জার কাছে যুক্তি ভাসিয়া গেল। নিতাইকে বাড়ী চিনাইয়া দিয়া সে গ্রামের বাহিরে যাইয়া শূন্যমনে পথ চাহিয়া নিতাইএর অপেক্ষায় বসিয়া রহিল।

ঘণ্টাখানেক বাদে নিতাই শুষ্কমুখে ফিরিয়া আসিল।

বেহারী শঙ্কিত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "এল না?"

নিতাই কাতরস্বরে বলিল, "না, বাবা!"

উভয়ে পথ চলিতে লাগিল।

নিতাই বলিতে লাগিল, "যাওয়া মাত্রই মা কত খুসী। কাছে ব'সে মুড়ি-মুড়কী খাওয়ালে, তোমার কথা জিজ্ঞেসা করলে, কে রাঁধে, কে বাড়ে, সব খুটে খুটে জেনে নিলে! তোমার সে দিন ফ্যানে হাত পুড়ে গেছল ব'লে কত বকলে তোমায়! বল্লে, কপালে আছে, বেঘোরে প্রাণ খোওয়ান; আরও কি সব! তার পর আমার সঙ্গে রওনা হয়ে আবার ফিরে গেল—"

বেহারী বিস্মিত হইয়া বলিল, "রওনা হয়ে ফিরে গেল? সে কি রে?"

"কি জানি, বাবা। জিজ্ঞেসা করলে, 'তোর বাবা ভাল আছে রে?' আমি বললুম, 'চলই না, দেখবে এখন, বাবা ঐ হোতায় ব'সে আছে?' শুনেই মা থমকে দাঁড়ালো, বল্লে, 'ব'সে আছে?' আমি বললুম, 'হ্যাঁ।' মা বল্লে, 'তুই এলি যে?' বললুম, 'বাবা পাঠিয়ে দিলে।' শুনেই মা ফিরে গেল; বল্লে, 'আমার তো যাওয়া হবে না, বাবা। তোর মামা বাড়ী নেই। খালি বাড়ী ফেলে কি ক'রে যাই? সে এলেই আমি যাবো'।"

বেহারী নিঃশব্দে পথ চলিতে লাগিল। তাহার গম্ভীর মুখ দেখিয়া নিতাইও আর কিছু বলিল না।

বাড়ীর কাছে যাইয়া বেহারী কহিল, "তোর মা'র কাছে থাকবি, নিতাই? খুব ইচ্ছে হচ্ছে, না?"

নিতাই মৃদুস্বরে বলিল, "হ্যাঁ, বাবা, খুব ইচ্ছে হচ্ছে।"

"তবে রইলি না কেন রে?"

"মা'র কান্না দেখে আমি থাকতে চেয়েছিলুম। কিন্তু মা থাকতে দিলে না, পাঠিয়ে দিলে। আমি রাগ ক'রে বল্লাম, 'তবে কাঁদছ কেন, মা? যদি না-ই রাখবে তো কান্না কেন'?"

বেহারী বলিল, "কি উত্তর দিলে?"

"বল্লে, 'তোর কষ্ট হবে না রে, তোর বাবা একা থাকবে? না বাবা, তুই বাড়ী যা'!"

বেহারী আর কিছু বলিল না, নিশ্বাস ফেলিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিল। আজ তাহার কর্ম্মঠ মন পঙ্গু হইয়া উঠিল। সে নির্জ্জীবের মত বিছানায় পড়িয়া রহিল। নিতাই পাশের বাড়ী হইতে খাইয়া আসিল। বেহারী জলস্পর্শ করিল না।

৪

যথা-সময়ে নিতাইএর পাশের সংবাদ আসিল; কিন্তু বেহারীর আনন্দ আজ আর চঞ্চল হইয়া উঠিল না। তাহার গভীর আনন্দ বাহিরে বিন্দুমাত্রও প্রকাশ পাইল না।

মহেন্দ্র আসিয়া বুঝাইলেন, ছেলে যখন ভাল পাশ করিয়াছে, তখন তাহার বৃত্তি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং তাহার লেখাপড়া যদি এইখানেই সাঙ্গ হয়, তবে তাহা মহা দুঃখের কারণ হইয়া উঠিবে। বিশেষতঃ সুযোগ থাকিতেও যদি বেহারী অমত করে, তবে তদপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কিছুই হইবে না। অল্পবিদ্যা যে ভয়ঙ্করী, এ কথাও মহেন্দ্র ভাল করিয়া বুঝাইতে ছাড়িলেন না। এ কথার সত্যতা বেহারী হৃদয়ঙ্গম করিল। সে-ও কিঞ্চিৎ লেখাপড়া শিখিয়াছিল, কিন্তু কত বড় ভুলই না সে সে-দিন করিয়াছে। অতএব বেহারী আর অমত করিল না। মহেন্দ্র নিতাইকে দূর সহরে ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া, তাহার সুবিধায় থাকিবার সুবন্দোবস্ত করিয়া পাঠাইয়া দিল।

সে একা থাকিলে তাহার কত কষ্ট হইবে, এই ভয়ে মোক্ষদা নিতাইকে বেহারীর সঙ্গে পাঠাইয়া দিয়াছিল, আজ সেই নিঃসঙ্গ অবস্থায় আসিয়া বেহারী একরকম কঠিন আনন্দ অনুভব করিল। সে যেন নিজের উপর কঠোর পরিশোধ লইল। নিজেকে পলে পলে ব্যথা দিবার জন্যই সে নিতাইকে আর বাড়ী আনিল না;

চিত্তের চাঞ্চল্য দমন করিয়া গেল, স্বল্পভাষী হইয়া উঠিল। বন্ধনহীন হইয়া নিতাই পড়াশুনায় দ্রুতবেগে উন্নতিলাভ করিতেছে, এই স্বপ্নেই বেহারী মগ্ন রহিল।

এমনই করিয়াই আরও এক বৎসর কাটিয়া গেল। যে দুর্দমনীয় অভিমান স্বামি-স্ত্রীকে এই দীর্ঘকালের জন্য বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিল, তাহা প্রতিদিনকার দুঃখ-কষ্টের মধ্যে ক্রমেই বর্দ্ধিত হইল। সুতরাং বেহারীও মোক্ষদাকে আনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল না, মোক্ষদাও স্বেচ্ছায় স্বামিগৃহে ফিরিয়া আসিল না। মহেন্দ্র বাবুও তখন গ্রামে অনুপস্থিত ছিলেন। পল্লী-জীবনের নিত্য ঘটনা বলিয়াই কেহ আর এ'বিষয় লইয়া আলোচনায় মন দিল না!

শুষ্ক সায়াহ্নে গৃহে ফিরিয়া বেহারীর মন ভাঙ্গিয়া পড়িত। স্বেচ্ছায় সে যে শাস্তি মাথায় পাতিয়া লইয়াছিল, তাহার আঘাত তাহার বার্দ্ধক্য-পীড়িত শরীর সহ্য করিতে পারিল না। অনিয়মিত স্নানাহার, অত্যধিক পরিশ্রম, সকলে মিলিয়া তাহাকে এমন ভাবে আক্রমণ করিল যে, অবশেষে সে নিজের সম্বন্ধে ভাবনা একবারেই পরিত্যাগ করিল। শুধু নিতাইএর ভবিষ্যতের উজ্জ্বল স্বপ্নে তাহার দিন কাটিতে লাগিল।

এমনই যখন তাহার মনের অবস্থা, তখন তাহার জমাজমী তাহাকে পাইয়া বসিল। সারাদিন মাঠের কাষে মগ্ন থাকিয়াও তাহার তৃষ্ণা মিটিত না। তাহার বুভুক্ষু চিত্তের সমস্ত স্নেহ মাঠের কাষে উজাড় করিয়া দিয়াও তাহার তৃপ্তি হইত না। দেখিয়া শুনিয়া পাড়ার সকলেই স্থির করিল, বুড়া বয়সে বেহারীর মস্তিষ্ক-বিকৃতি হইয়াছে; কিন্তু ফসলের বেলা সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল, বেহারীর শস্য সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইয়াছে; তখন আর কেহই তাহার মস্তিষ্কের দোষ সম্বন্ধে পুনরালোচনায় মন দিল না।

মাঠের কাষ হইতে সে দিন বেহারী বাড়ী ফিরিতেছিল। চারিদিকে সন্ধ্যার নিবিড়তা ঘনাইয়া আসিতেছে। অন্যান্য সকলেই কাষ সারিয়া বেহারীর আগে গৃহে ফিরিয়াছে। বেহারীই সকলের শেষে ক্লান্তমনে বাড়ী ফিরিতেছিল। সন্ধ্যার স্তব্ধতার সহিত তাহার মনের স্তব্ধতা আশ্চর্য্য মিশিয়া গিয়াছে।

পথে মহেন্দ্রের সহিত বেহারীর দেখা হইল। তাহার শুষ্ক-মুখ, অবশ পদবিক্ষেপ এবং ভগ্ন শরীর দেখিয়া মহেন্দ্র বিস্মিত না হইয়া পারিলেন না। তাহার সহিত পথ চলিতে চলিতে মহেন্দ্র কহিলেন, "বেহারী, আমি কাল বাড়ী এসেছি!"

বেহারী উত্তর করিল না; নিঃশব্দে পথ চলিতে লাগিল।

মহেন্দ্র কহিল, "তোমার কি অসুখ করেছে, বেহারী?"

বেহারী শ্রান্তকণ্ঠে কহিল, "না।"

"কিন্তু শরীর যে একেবারে ভেঙ্গে গেছে!"

বেহারী কপালে হাত দিয়া কহিল, "নসীব।"

মহেন্দ্র কি একটা কথা বলিবার জন্য ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। অবশেষে বলিলেন, "খুড়ীমা কোথায়, বেহারী?"

বেহারী বিস্মিত হইল, থামিয়া মহেন্দ্রের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "কে?"

মহেন্দ্র তাঁহার কণ্ঠের জড়তা দূর করিয়া বলিলেন, "খুড়ীমা।"

বেহারী অবাক্-বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল।

মহেন্দ্র বলিলেন, "বুঝতে পাচ্ছো না, খুড়ো? আমি খুড়ীমার কথাই বল্‌ছি!"

বেহারী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "না মহেন্দ্রবাবু, সে আসেনি!"

উভয়েই নীরবে পথ চলিতে লাগিল। শেষকালে মহেন্দ্র বলিলেন, "কিন্তু এ আত্মহত্যার পাপ সইবে কে, বেহারী খুড়ো?"

"কিন্তু সে-ও তো আসতে পারতো!"

"ভুল বুঝো না, খুড়ো! স্ত্রীলোকের অভিমান যে কত প্রবল, তাহা কি আজও বুঝলে না? তা' ছাড়া, হয় তো খবরও পায়নি। পেলে কি আর নিশ্চিন্তে তোমার এই কষ্ট সহ্য করতে পারতো? না খুড়ো, তুমি যাও!"

বেহারী উত্তর দিতে পারিল না, এই একটি স্নেহের কথায়, সহানুভূতির বাক্যে তাহার অকস্মাৎ কান্না আসিল। তাহার দুই চক্ষু বহিয়া অজস্রধারে অশ্রু বহিতে লাগিল। না পারিল সে রোদন থামাইতে, না পারিল উত্তর দিতে।

দুই তিন বার ডাকিয়াও কোন সাড়া না পাইয়া, মহেন্দ্র বিস্মিত হইয়া কহিলেন,—"কিন্তু আমার কি অপরাধ, বেহারী খুড়ো?"

এইবার বেহারী উত্তর দিল। প্লাবিত-গণ্ড গামছার খুঁট দিয়া মুছিয়া ভারী কণ্ঠে বলিল, "না বাবু, গরীবের অপরাধ নেবেন না।"

মহেন্দ্র বুঝিলেন, বেহারী নিঃশব্দে রোদন করিতেছে। কারণ আন্দাজ করিতে না পারিয়া তিনি করুণ নয়নে চাহিয়া রহিলেন। অবশেষে বলিলেন, "সে যাই হোক, খুড়ো, আর ভুল কোর না, অবুঝ হয়ো না। কাল তুমি যাও!"

বেহারী নিরুত্তরে চলিতে লাগিল। তাহার অন্তরে যে অশ্রু-সমুদ্র উদ্বেল হইয়া উঠিল, তাহাকে সে কিছুতেই শান্ত করিয়া কথা কহিতে পারিল না।

মহেন্দ্র নিকটে সরিয়া আসিলেন। বেহারীর গলদেশে হাত রাখিয়া মৃদুকণ্ঠে ডাকিলেন, "বেহারী—খুড়ো!"

বেহারী অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "না বাবু! সে দিন যখন ধোপাপুকুর থেকে ফিরে এসে শুয়ে শুয়ে ছেলেটা সারা রাত কাঁদলে, আমি একটি সান্ত্বনার কথাও বলতে পারিনি। মুখ ফুটে বলতে পারিনি, তুই কাঁদিস নে, নিতাই, কাঁদিস নে! সে দিন পণ করেছি—"

মহেন্দ্র তাহাকে বাধা দিয়া কহিলেন,—"ছিঃ, বেহারী। সে দিন মনের দুঃখে যদি ভুল ক'রেই থাক, চিরকাল কি সেই ভুলেরই সেবা করবে? নিজেকে এমন ভাবে কষ্ট দেওয়ায় যে তোমার কি পাপ হচ্ছে, তাও কি তোমায় বুঝিয়ে দিতে হবে? না বেহারী, আমায় কথা দাও, কাল তুমি যাবে?"

বেহারী ভাবিতে লাগিল, অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিল, "না বাবু, আমি যাব না, যেতে পারব না। ছেলেটা থাকতেই যখন নিজে গিয়ে আনলুম না, কষ্ট করলুম, তখন এখন গিয়ে নিজের জন্য—না বাবু, আমি নিতাইকে পাঠিয়ে দেবো।"

মহেন্দ্রও কিছুক্ষণ ভাবিলেন। পরে বলিলেন, "যা ভাল বোঝ, কর! কিন্তু নিতাইকে খবর দেবে কে?"

"আমি। কাল সহরে গিয়ে তাকে পাঠিয়ে দিয়ে আসব।"

"তাই ভাল"—বলিয়া মহেন্দ্র ভিন্ন-পথ ধরিলেন। খানিক গিয়াই ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা, আসি খুড়ো?"

বেহারী উত্তর করিল না। একদৃষ্টে পথ চাহিয়া চিন্তিত মনে বাড়ী ফিরিল।

৫

পরদিন বেহারী রাত্রি থাকিতেই সহরে যাত্রা করিল। নিজের অন্তরে যে আশা-আশঙ্কার ঝড় বহিতেছিল, তাহার উত্তেজনা বৃদ্ধকেও যেন নব-যুবায় রূপান্তরিত করিল! ছয় ক্রোশ পথ হাঁটিয়া, দুই তিন ঘণ্টা রেলে চাপিয়া সে আসিয়া সহরে পৌঁছিল। তাহার মলিন জীর্ণ বস্ত্রে সহরের ধূলা আসিয়া পরম নিশ্চিন্তে আশ্রয় গ্রহণ করিল; তাহার শুষ্ক মুখ, রুক্ষ কেশ, নগ্ন পায়ের দিকে রাস্তার পথিক দুই একবার চাহিয়া দেখিল। কিন্তু বহু দিবস পরে পুত্রকে দেখিবার আনন্দ তাহাকে এমন অভিভূত করিয়া ফেলিল যে, সে দিকে সে লক্ষ্যই করিল না। আসন্ন পুত্রদর্শনের স্বপ্নে সে বিভোর হইয়া উঠিল। বিস্তৃত অপরিচিত সহরে অনেকক্ষণ খোঁজা-খুঁজির পর বেহারী বাসার সন্ধান পাইল। বুকভরা আনন্দ লইয়া সে নিতাইএর বাসায় আসিল। বাহিরে কাহাকেও না দেখিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতেই একটি ঘর হইতে তিন চারিটি তরুণ কণ্ঠের উচ্চ হাস্য-পরিহাস তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। নিতাইএর স্বরও সেই সঙ্গে বাতাসে ভাসিয়া আসিল। বেহারী একটু ইতস্ততঃ করিল। সুন্দর, সৌখীন বাড়ী। কোন দিকে আবর্জ্জনার চিহ্নমাত্র নাই। বারান্দায় উঠিবার সিঁড়ির দুই পাশে ফুলগাছের টব। দ্বিতল অট্টালিকা, বাহির হইতেই সে ভিতরের সৌন্দর্য্যের পরিচয় পাইয়াছিল। তাহার অপরিচ্ছন্ন জীর্ণ বস্ত্রের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বেহারীর মনে সন্দেহ হইল, হয় ত নিতাই এখানে নাই। তাই সে ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইল; কিন্তু ঠিক এমনই সময় নিতাইএর সু-উচ্চ হাসি বাতাসে ভাসিয়া আসিয়া তাহার সন্দেহকে কঠিন আঘাত করিল। বেহারী সন্দেহাকুল-চিত্তে ধীর পদবিক্ষেপে বারান্দায় উঠিয়া যে ঘরে কথাবার্ত্তা হইতেছিল, সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া অবাক্-বিস্ময়ে দাঁড়াইয়া রহিল!

ছোট সুন্দর একখানি ঘর। একটি টেবলের চারিদিকে বসিয়া চারি জন তরুণ খেলায় ব্যস্ত! গৃহের দেওয়ালে, আলনায় বিছানার উপর যে সমস্ত বিলাসের উপকরণ তাহার চোখে পড়িল, তাহা বেহারী কদাপি দেখে নাই। বিস্ময়ের প্রথম অবস্থা কাটিতেই বেহারী চাহিয়া দেখিল, যুবক চারি জনেই ধূমপানে ব্যস্ত। নিতাইএর দিকে চোখ পড়িতেই সে সহসা চুরুটটি নামাইয়া লইল, কিন্তু পরক্ষণেই তাহা মুখে উঠাইয়া টানিতে আরম্ভ করিল! বস্তুতঃ তাহার দৃষ্টিতে ভয়ের যে সুস্পষ্ট চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল, তাহা বেহারীর নিকট অজ্ঞাত রহিল না। পিতার ছিন্ন বস্ত্র এবং গৃহের কয়জনের পোষাকের প্রাচুর্য্যের দিকে সে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। নিতাই নিঃশব্দে মুখ নত করিয়া খেলায় যেন ডুবিয়া গেল। অন্য তিন জনও এতক্ষণ খেলায় ব্যস্ত ছিল। বেহারীর দিকে চোখ পড়িতেই এক জন পকেট হইতে পয়সা বাহির করিয়া কহিল,—"নাও হে!"

বেহারী ক্লান্তপদে টলিতে টলিতে ঘরের বাহিরে চলিয়া আসিল। ছিঃ ছিঃ, যে শিক্ষা দরিদ্র পিতাকে পিতা বলিয়া স্বীকার করিতে লজ্জাবোধ করে, সেই শিক্ষার জন্যই সে তাহার শেষ জীবনে যত দুঃখের বোঝা মাথায় করিয়া লইয়াছে! নিজেকে ক্ষুধার অন্ন হইতে বঞ্চিত করিল, সতী-সাধ্বী স্ত্রীকে বিনা দোষে নির্ব্বাসন দিল, পুত্রের শিক্ষা উপলক্ষে পত্নীর সামান্য অপরাধও মার্জ্জনা করিল না, আত্মীয়-স্বজনের বিরক্তি উৎপাদন করিল! হাঁ, উপযুক্ত পুরস্কারই সে পাইয়াছে! মাথার ঘাম পায় ফেলিয়া, বৃদ্ধ জরাজীর্ণ দেহকে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও অতিরিক্ত পরিশ্রম করাইয়া সে পুত্রের এমনই শিক্ষা দিল যে, সে তাহার বিলাসী বন্ধুদের নিকট আপনার পিতাকে ভিক্ষুক বলিয়া স্বীকার করিতেও কুণ্ঠাবোধ করিল না! সে একবার চাহিয়াও দেখিল না,

তাহাদিগকে একবার বাধা দিয়াও বলিল না,—"ওবে, ও ভিক্ষুক নয়, আমার পিতা, আমার দরিদ্র পিতা ; কিন্তু ভিক্ষুক নয় !"

বেহারীর নয়নে আরু অশ্রু শুকাইয়া গিয়াছিল। অস্নাত, অভুক্ত বেহারী আবার ষ্টেশনে আসিয়া ধোপাপুকুরের টিকিট কাটিয়া ট্রেণে চাপিল।

* * * * *

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। আকাশের গায় নক্ষত্র আত্মপ্রকাশ করিয়া যেন করুণ নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। বেহারী সোজা শ্বশুরালয়ে আসিয়া পৌঁছিল। ঘরের বাহিরে শ্রান্তপদে দাঁড়াইয়া কম্পিত কণ্ঠে ডাকিল, "মোক্ষদা !"

কত কাল পরে কত সুপরিচিত এই আহ্বান ! মোক্ষদার নিজের শ্রবণেন্দ্রিয়কে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইল না। কিন্তু বেহারী আবার ডাকিতেই সে ত্রস্তে বাহিরে আসিয়া স্বামীর দিকে চাহিতেই বজ্রাহতের মত বসিয়া পড়িল !

এ কি চেহারা ! মোক্ষদার পাপের তুলনা কোথায় ? বেহারীকে সে দিন বান্না করিতে দেখিয়া প্রতিহিংসাবৃত্তি তাহার কতই না প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। অভিমানবশতঃ সে কতই না ভাবিয়াছিল, 'আচ্ছা, খাও, সংসার করিয়া খাও, দেখি, কত দিন কাটে ?' কিন্তু তাহার ফল কি এই ?

কিছুক্ষণ পরে মোক্ষদার নয়ন বহিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িল। বেহারী তাহাকে উঠাইয়া কহিল,—"কাঁদিস নে, মুখি দোষ তোর নয়, আমার। সে দিন নিতে এসে যে ভুল আমি করলুম, তার ফল আজ তো দেখতেই পাচ্ছিস। সে-দিন লজ্জায় ফিরে গিয়েছিলুম, কিন্তু আজ নিতে এসেছি, চল।"

মোক্ষদা বেহারীর হাত ধরিয়া কহিল, "এস, ঘরে এস !"

বেহারী ধীর-স্বরে কহিল,—"না !"

মোক্ষদা সবিস্ময়ে কহিল, "সে কি ! এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে ?"

"আমি বাড়ী ফিরে যাচ্ছি মুখী, থাকবার অবসর নেই !"

"খাবে না ?"

"বাড়ী গিয়ে !"

"তবে দাঁড়াও একটু, দাদাকে ব'লে আসি।"

মোক্ষদার দাদা আসিয়া থাকিবার জন্য অনেক পীড়াপীড়ি করিল। কিন্তু বেহারী অচল অটল। অতঃপর সেই সন্ধ্যায় মোক্ষদা স্বামীর সহিত স্বামিগৃহে যাত্রা করিল।

পথে সে জিজ্ঞাসা করিল, "নিতাই কেমন আছে ?"

বেহারী যেন স্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিল, কহিল, "নেই !"

"বালাই, ষাট, ও-কি কথা ?"

বেহারী শ্রান্তভাবে বলিল, "না, মুখী, না। আজ আমি নিতাইকে আনতে গিয়েছিলুম ; কিন্তু—"

বিহারী অকস্মাৎ ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

মোক্ষদার ভয় ও বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। শঙ্কিত কণ্ঠে বলিল, "কি গো ?"

"তুই বলেছিলি না, মুখী, ছেলে লেখা-পড়া শিখলে বাপ-মাকে এড়িয়ে চলে।"

মোক্ষদা কিছুই বুঝিতে পারিল না। অবাক্ হইয়া বেহারীর গা ঘেঁসিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

স্ত্রীর স্পর্শ বেহারীকে শান্তিদান করিল। যে ব্যথা এতক্ষণ ধরিয়া তাহার বুকে জমাট বাঁধিয়া উঠিতেছিল, অজস্র অশ্রুবর্ষণে তাহা কিঞ্চিৎ দূরীভূত হইল ! সে চোখ মুছিয়া সমস্ত খুলিয়া বলিল ; মোক্ষদা চলিয়া যাইবার পর হইতে সে-দিন পর্য্যন্ত সমস্ত কথা বলিয়া সে নিঃশব্দে পথ চলিতে লাগিল।

মোক্ষদার দুই চক্ষুও শুষ্ক ছিল না। কিন্তু বেহারী যে কি আঘাত পাইয়াছে, তাহাই অনুমান করিয়া সে ভীত হইয়া উঠিল। যে সোনার স্বপ্নে সে এত দিন স্ত্রীর অনুপস্থিতিও সহ্য করিয়াছিল, তাহারই নির্ম্মম অবসানে সে যে কি নিদারুণ বেদনা পাইল, তাহা ভাবিয়া সে শঙ্কিত হইয়া উঠিল। স্বামীর নিকটে সরিয়া আসিয়া সে সান্ত্বনা দিয়া কহিল,—"কেন তুমি ভেবে মন খারাপ কচ্ছ, হয় ত নিতাই চিন্তে পারেনি। চিন্তে পারলে কি—"

বেহারী কহিল,—"মুখী, সংস্কার কি সহজেই যায় ? আমাকে দেখেই তার চুরুট খাওয়া বন্ধ হয়ে গিছল। আমার মলিন পরিচ্ছদ, রুক্ষ চুল, তার বাবু বন্ধু-সমাজে সে আমাকে কি ব'লে পরিচয় দেবে ? ধরা পড়ার ভয়ে তার চোখে-মুখে ভয়ের চিহ্ন কি আমি দেখিনি ? বৃথাই আমাকে সান্ত্বনা, মুখি !"

মোক্ষদা কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না।

অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। তার পর বেহারী যেন নিজের মনেই বলিতে লাগিল, "ভালই হল। ছেলে হারালুম, কিন্তু তুই তো আবার ফিরে এলি !"

মোক্ষদা শিহরিয়া উঠিল, কহিল, "ষাট, ষাট, তুমি ভেবো না গো, ভেবো না ! ছেলেমানুষ, লজ্জায় বুঝতে পারে নি। কিন্তু যখন বুঝতে পারবে, আপনিই ফিরে আসবে।"

বেহারী উত্তর করিল না। নির্নিমেষে চাহিয়া রহিল। তাহার চোখের সম্মুখের অন্ধকার গভীরতর হইয়া আসিল। মোক্ষদার হাত শক্ত করিয়া ধরিয়া, তাহার স্কন্ধে ভর করিয়া নিঃশব্দে সে পথ চলিতে লাগিল !

শ্রীঅতুল ভট্টাচার্য্য (বি, এ)।

শীতের রাত্রি

শীতের রাত্রি ; সারাদিন খাটিয়া শ্রান্ত-ক্লান্ত দেহে শয্যায় গা ঢালিয়া দিলাম। লেপটা বেশ করিয়া গায়ের উপর টানিয়া লইলাম ও এক মিনিটের মধ্যে গাঢ় নিদ্রায় বিভোর হইয়া পড়িলাম। আমার চেহারাটি একটু দোহারা, লোক বলিত মোটা। বাঙ্গালাদেশের পক্ষে সেটা বলা যাইতে পারে। কারণ, যে দেশে বারো আনা লোক কঙ্কালের কাঠামো মাত্র, সেখানে কাহাকেও একটু গায়ে লাগিতে দেখিলেই লোক বলে মোটা। কেহ কেহ বলে ফুট-বল। কিন্তু সে কোনও কাযের কথাই নয়। আসল কথা এই যে, আমার স্বাস্থ্যটা একটু বেশী রকমের ভাল ; আর কিছুই নয়। যাহা হউক, স্বাস্থ্যবান্ পুরুষের নিদ্রার গভীরতা বেশী এবং তাহাতে একটু-আধটু নাসিকার ধ্বনি যে না হয়, এমন নয়। বাড়ীর আর সকল লোক সেটা পছন্দ করে না। কাযেই, যাদের স্বাস্থ্য ভাল, একটু নিদ্রা ভাল হয়, তাহাদের ভাগ্যে ঈর্ষ্যাই ঘটে ! অন্য সকলের স্বাস্থ্য যেমন কাঁচা, নিদ্রাও তেমনি তরল। একটু নাক ডাকিলেই তাহাদের না কি নিদ্রার ব্যাঘাত হয় ! আমাকে সেইজন্য এই একধারের কুঠুরীটিতে শয়ন করিতে হয়। এক রকম ভালই হইয়াছে। নিকটের মধ্যে কেহ না থাকাতে নিদ্রাটি বেশ ভালমত হয়। নয় ত ছেলেমেয়ের চ্যাঁ-ভ্যাঁ এবং গৃহিণীর গুরু-গুঞ্জনে সাধ্য কি যে, চক্ষু বুজিতে পারা যায় !

যাক্, এ-দিন বোধ হয় নাসিকার ডাক কিছু গুরুতর হইয়াছিল। সারাদিনের পরিশ্রমের পর যাহা হয় আর কি ! হঠাৎ সেই শব্দে নিজেই চমকিয়া উঠিলাম। চোখে তন্দ্রা বেশ ছিল। পাশ ফিরিয়া শয়ন করিয়া লেপটি আরও ভাল করিয়া মুড়ি দিলাম।

এমন সময়ে শুনিতে পাইলাম, কে আমার এসরাজটিতে ঝঙ্কার দিল। মনে মনে প্রথমটা ভারি বিরক্ত হইলাম। নিজের হাতের যন্ত্রে অন্য কেহ হাত দিলে কোনও গুণী ব্যক্তি তাহা সহ্য করিতে পারে না। লেপ হইতে চক্ষু দুইটি মাত্র বাহির করিয়া বলিলাম, 'কেও ?' কোনও উত্তর আসিল না। এসরাজ বাজিতে লাগিল ; আমারও চক্ষু বুজিয়া আসিল। শুধু ঘুমে নয় ; সে বাজনার মধ্যে এমনই একটি মোহকরী শক্তি ছিল যে, আপনিই যেন চোখের পাতা বুজিয়া আসে। বুঝিলাম, নাটোরের মহারাজ জগদিন্দ্রনাথের যখন ভাল নিদ্রা হইত না, তখন তিনি কেরামতউল্লা খাঁকে পাঁচ শত টাকা মাহিনা দিয়া কেন শরদ বাজাইয়া ঘুম পাড়াইবার জন্য রাখিয়াছিলেন। বলিহারি বাজনা ! এসরাজ যেন কথা কহিতেছে। হঠাৎ বাজনা থামিয়া গেল। আমারও ঘুম টুটিবার উপক্রম হইল, যদিও আমি রাজা কি মহারাজ নই ! সহসা সমস্ত তারগুলিতে একবার ঝঙ্কার হইল ; বুঝিলাম, বাজনা শেষ করিয়া বাদক ছড়িটা এসরাজের গায়ে রাখিয়া দিল। জিজ্ঞাসিলাম, 'কেও ?'

'আমি।'

'ও।'

চিনিলাম না। তথাপি বলিলাম 'ও'। আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, 'থামিলে যে ?'

'এত নাক ডাকলে কি আর এসরাজ বাজানো চলে ? ঢাক কি জ্যাজ (Jazz) বাজাতে হয়।'

'আচ্ছা, এবারে আমি নাকে চাবি লাগাচ্ছি। একটু বাজনা শুনি। বেশ মিঠে হাত কিন্তু।'

আবার বাজনা সুরু হইল। 'ও কি ! ও যে শারঙ্গ রাগিণী।'

'হুঁ।'

'বাঃ ! এই বুঝি শারঙ্গের সময় ? দিবা অষ্টদণ্ড পরে'—

'নাই বা হলো। শুনুন ত !'

'না, নাঃ শারঙ্গে রিখব বিবাদী। তুমি তো বেশ খাড়া রে বাজিয়ে যাচ্ছ ?'

'তাতে আর কি হয়েছে ? আজকাল 'ওস্তাদপন্থী'র ঐ কুসংস্কারগুলো কেউ মানতে রাজি নয়। রাত দুপুরে শারঙ্গ বাজবে না, খাড়া রেখাব চলবে না, এ সব কথা বাসি হয়ে গেছে। এখন শুধু দেখবেন, মৌলিকতা। বুঝলেন ?'

কি আর প্রতিবাদ করিব ? ভাবিতে লাগিলাম। যেই একটু চিন্তায় নিমগ্ন হইয়াছি, অমনি নাক-ডাকা আরম্ভ হইল। বাদক এসরাজের সবগুলি তারে ছড়ির আঘাত করিয়া আমার মনোযোগ আকর্ষণ করিল। আমি সজোরে নাসিকা মর্দ্দন করিয়া আবার পাশ ফিরিয়া শুইলাম। ঘর অন্ধকার। পুরাতন কবাটের ফাটল দিয়া বারান্দার লণ্ঠনের

আলো কিছু কিছু ঘরে আসিতেছিল। তাহাতে বোধ হইল, যেন খাটের নীচে একটি মাদুর পাতিয়া বসিয়া কে যেন আমারই এসরাজটি বাজাইতেছে! আমার ঐ যন্ত্রে (মোটে ১৮টি টাকা দাম) যে এমন অপূর্ব্ব সুর আছে, তাহা আমার জানা ছিল না। বলিলাম, 'খাসা সুর বাঁধা হয়েছে। এমন সুর ত একদিনও পাইনি।'

'পাবেন কি ক'রে? বাজাতে জানলে ত পাবেন!'

রাগ হইল; বলিলাম, 'কি যে বলো, তার ঠিক নেই। আমজাদ আলি শা পেশোয়ারির নিকটে আমার এসরাজ-শিক্ষা। চালাকী নয় বড়ো।'

"ওঃ, বাজিয়ে ব'লে অভিমানটুকু ষোলো আনা আছে, দেখতে পাচ্ছি!'

'তোমার মতে বাজিয়ে আমি নই, তা' হলে?'

'নিশ্চয়ই নয়।'

'আচ্ছা, আমজাদ আলি শা'র সম্বন্ধে মহাশয়ের কি অভিমত, শুনতে পাই?'

'শিষ্যের নিকট তার গুরুর নিন্দা করতে নেই।'

'ওঃ! আস্পর্দ্ধা কম নয় ত! দেশ-শুদ্ধ লোক আমার বাজনার সুখ্যাতি করে, আর উনি বললেন কি না—'

'দেশ-শুদ্ধ লোকের কথা শুনবেন কেন? ওরাই ত সব ভুল-ধারণার খোরাক যোগায়! যারা গান-বাজনার সুখ্যাতি করে, তাদের মধ্যে শতকরা ৯৯ জন কিচ্ছু জানে না, বোঝে না। এই সব আনাড়ীর সস্তা সুখ্যাতির ফাঁদে প'ড়ে কত আশাপ্রদ প্রতিভার যে অধোগতি হয়েছে, তার সীমা নাই।'

'আমিও সেই দলে না কি?'

'প্রতিভার দলে?' মৃদু হাস্য শোনা গেল। আমি চট্ করিয়া লেপের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলাম। আবার বাজনা সুরু হইল। বলিলাম, 'বারোয়াঁ?'

'হুঁ।'

'এ ত বারোয়াঁর সময় নয় ঠিক—'

'আবার ঐ কথা? আচ্ছা, আপনি বল্‌তে পারেন, এখন ক'টা বেজেছে?'

'দয়া ক'রে দেরাজের ভেতর থেকে ঘড়িটে দেও, ব'লে দিচ্ছি। রেডিয়াম আছে—আঁধারেও বলতে পারব।'

'ওঃ! এই বিদ্যে? ঘড়ি দেখে সময় ঠিক ক'রে তার পরে স্থির হবে, এটা অমুক রাগিণীর সময় কি না—কেমন?'

'না, তা কেন? বারোয়াঁ বিকাল-বেলার সুর। এটা যে বিকেল নয়, সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে না কি?'

'যথেষ্ট। আপনি আইন্‌ষ্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বের নাম শুনেছেন? আপনার ঐ নাক-ডাকার প্রত্যেক ধাপে ধাপে পৃথিবী অনেকখানি সরে যাচ্ছে এবং সময়ও সেই অনুপাতে দ্রুত বদলে যাচ্ছে, তা জানেন?'

'না, তা জানি নে। আইন্‌ষ্টাইন্ যাই বলুন, তাতে বারোয়াঁ গতের সময় বদলাতে পারে না।'

'কেন?'

'এটুকু বুঝতে পারছেন না যে, আইন্‌ষ্টাইনের তত্ত্ব-ফত্ত্ব সত্ত্বেও আগে সব যেমন ছিল, তেমনই আছে এবং থাকবেও তেমনি।'

'এঃ,—আপনি দেখছি, আইন্‌ষ্টাইনের থিওরি কিছুই বুঝেন নি।'

'তুমি কিছু বুঝেছ, বাপু?'

'হ্যাঁ—। না—। হ্যাঁ—না—'

'থাক্, থাক্—বুঝিছি। যাও, এখন ঘুমুতে দেও।' বলিয়া আমি পাশ ফিরিয়া শুইলাম।

'আপনি চটলেন?'

'না জেনে-শুনে তর্ক করলে বড় রাগ ধরে।'

'তা বটে। কিন্তু না জেনে-শুনেই ত লোক তর্ক করে। সংসারের এই হ'ল নিয়ম, সেটা এড়াবেন কি ক'রে? যে যত কম জানে, ততই সে বড় বড় কথা কয়। গানের কিছুই জানে না, অথচ সে ওস্তাদদের উপরেও ওস্তাদী-চালে কথা কইবে। বাজাতে পারে না, অথচ বাজনার মস্ত বড় সমালোচক—আপনি কি দেখেন নি?'

'ঠিক বলেছ। যা হোক, তোমার বাজনা কিন্তু অপূর্ব্ব।'

'আপনার যন্ত্রেরই গুণ। আমি কিছুই না—'

'বাজনা শেখ নি?'

'না, রীতিমত শেখা হয় নি।'

'কি সর্ব্বনাশ!'

একটু চুপ করিয়া রহিলাম। তার পরে বলিলাম, 'যাক্, মরুকগে ও-সব তর্ক। তুমি আর একটু বাজাও।'

কেহ জবাব দিল না। বাজনাও শোনা গেল না।

বাজাইল কে? গেলই বা কোথায়? নিস্তব্ধ নিশি তেমনই ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল।

আবার একটু নিদ্রা আসিয়াছে। নাকও বোধ হয় ডাকিয়াছিল। সেই শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। শুনিলাম, কে যেন ক্যাশ-বাক্সটির ডালা খুলিয়া ফেলিল। তন্দ্রাজড়িত কণ্ঠে বলিলাম—'কেও?'

'আমি।'

'কে?'

'আমি।'

'ওঃ!'

ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। বলিলাম, 'কি করছ ওখানে?'

'কিছু না।'

'বাঃ, এ ঠাট্টা মন্দ নয়। হাতবাক্সের চাবি খুলে ফেলেছ, আর বেশ সপ্রতিভ ভাবে বল্‌ছ, কিছু না?—'

'পুলিস ডাকবেন না কি?'

'নিশ্চয়ই।' বলিয়া লেপের মধ্য হইতে চক্ষু দুইটি অতি কষ্টে বাহিরে আনিলাম। অন্ধকারে কিছু দেখা গেল না।

আগন্তুক বলিল, 'অত কষ্ট করবেন কেন? কি বা আছে বাক্সে—!'

ভাবিলাম, ঠিক বলিয়াছে। তথাপি বলিলাম, 'বাক্সে কিছু থাক্ বা না থাক্, তোমার অধিকার কি? পুলিসের হাতে দেওয়াই একমাত্র ব্যবস্থা।'

'তা ঠিক। তবে আপনার ক্রেডিট নষ্ট হবে। লোকে জানে, আপনার অনেক পয়সা। তখন বুঝবে যে, গণ্ডাকয়েক তামার চাকতি ব্যতীত আর কিছু না।'

'কেন? টাকা সব হাতবাক্সেই রাখতে হবে, এমন কি কথা আছে?'

'না। ব্যাঙ্কে রাখা যেতে পারে। তা ব্যাঙ্কের পাশ বকও এই হাতবাক্সে আছে, তা'তে জমার ঘরে বেজায় ফাঁক।'

'সেটাও দেখা হয়েছে?—যে দুর্ব্বৎসর; কারও ঘরে কিছু নেই, বুঝলে?' একটি দীর্ঘনিশ্বাস রোধ করিতে পারিলাম না।

'হাঁ। তা তো বুঝতে পারছি। কিন্তু লোকে যে অন্য রকম বলে।—'

'কি বলে, বল তো?'

'লোকে বলে যে, আপনার অগাধ পয়সা!'

মনটা খুসী হইল। বলিলাম, 'লোকের বলা ভাল।'

'তা বটে! কিন্তু পয়সা কোথায়?'

'নাই বা রইল পয়সা। পয়সা থাকা না থাকার চেয়েও লোকের খ্যাতি-নিন্দায় বেশী যায় আসে।'

'তবে লোকে বলে কেন?'

'জেনে আর ক'জনে বলে? না জেনেই বলে অনেকে। এক ভদ্রলোক আমার কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নিয়েছিল, লোকে বল্‌ত, অবস্থা ভাল; ইচ্ছে করলে তখনই টাকা ফেলে দিতে পারে। ও মা; তার পরে লোকটি হঠাৎ মারা গেলে দেখা গেল, কিচ্ছু নেই। স্ত্রী-পুত্র সব পথে বসেছে।'

'ওঃ, তা হলে আপনি ঠকে শিখেছেন?'

'হ্যাঁ গো, হ্যাঁ।'

'আবার আপনিও কত লোককে ঠকাচ্ছেন, কে বল্‌তে পারে?'

'তোমায় ঠকিয়েছি না কি?—'

'না, আমায় আর কি ঠকাবেন!'

'কিন্তু তুমি ত আমার সব খবর রাখ দেখছি—'

'হ্যাঁ, সে এই বাক্সের গুণে—।'

বাক্সের ডালাটি সশব্দে বন্ধ হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এই শীতের রাতে বড়ই কষ্ট পেলে!'

কেহ উত্তর দিল না। লোকটা কে? ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

আবার এ কি! আজ দেখিতেছি, ঘুম আর ভাগ্যে নাই। নাসিকার ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে আচমকা ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। শুনিলাম,—'রে—এ—এ—ডি!'

কিছুক্ষণ উৎকর্ণ হইয়া রহিলাম;—আবার সেই—'রেডি।'

আ—ম'লো, রাত দুপুরে কার আবার লুকোচুরি খেলতে সাধ গেল। জিজ্ঞাসিলাম,—'কে-ও!'

উত্তর হইল, 'আমি।'

ফি বারে ঐ একই উত্তর, শুনিয়া শুনিয়া কিছুই ঠাওর করিতে পারিলাম না। সেইজন্য এবারে লেপ একটু ফাঁক করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিলাম। কৈ, কেউ ত নয়! অথবা অন্ধকার ভেদ করিতে পারা গেল না। সাহস করিয়া বলিলাম ;—'আমি কে ?'

'ওঃ আমি ? আমি এই গে বেহারী।'

'বেহারী! বেহারী কে ?'

'তোমার বন্ধু।'

'আমার বন্ধু ? কিন্তু লুকোচুরি খেলা হচ্ছিল কার সঙ্গে ?'

'তোমার সঙ্গে।'

'আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেল্‌ছিলে ?—তোমার কথা ভাল বুঝতে পারছি নে.কিন্তু।'

'নাই বা পারলে! তাতে খেলার কিছু বাধা হবে না।'

'খেলার কিছু বাধা হবে না! বাঃ, চমৎকার!'

'চমৎকারটা কি ? রোজই ত খেলি।'

'কার সঙ্গে ?'

'এই তোমাতে আমাতে।'

'নাঃ, তোমার এ হেঁয়ালি আমি বুঝতে অক্ষম। আমি —দাঁড়াও, এখন আমার বয়েস ৪৫ বছর, ১০ বছর বয়েসের পর বোধ হয় আর লুকোচুরি খেলিনি। তুমি কি যে বল, তার ঠিক নেই। তোমার বয়েসটা কত শুনি ?'

'আমার বয়েস ? এই ৪৫ বৎসর ৩ মাস ৭ দিন।'

বাঃ, ও তো আমার বয়েস! তুমি এ কি ঠাট্টা করছ ?'

'ঠাট্টা নয়। তোমার সঙ্গে আমার খুব মিল আছে ব'লেই ত তুমি আমার বন্ধু।'

'হাঁ। নামেতে মিল আছে, সেটা আগেই মালুম হয়েছে।'

'আরও আছে।'

'কি বিষয়ে ?'

'এই মনে কর, তোমার সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী—'

'আঃ মরে যাই!. ভারি যে দরদী!'

'তার পরে এই ধর, তোমারও যা পছন্দ, আমারও তাই পছন্দ।'

'যথা ?—'

'যথা—এই তোমার মত আমিও একা থাকতে ভালবাসি।—'

'ঘুমুলে নাক ডাকে ? একটু মোটা বুঝি ?'—

'না, ঠিক তা নয়। আমি মোটাও নয়, রোগাও নয়। আমার নাকই নেই, তা নাক ডাকবে কোথা থেকে ?'—

'ওঃ, দোহারা চেহারা—খাঁদা; তা হ'লে তোমার চেহারা বেশ দেখবার মত, বল ?

'অত ঠাট্টা কেন ? তোমার যেমন চেহারা, আমার চেহারা তা' হ'তে বিশেষ খারাপ নয়।—'

'তার পর ?'—

কোন উত্তর পাওয়া গেল না। ভাবিলাম, লোকটা বোধ হয় চটিয়া গিয়াছে। বলিলাম, 'রাগ করলে ?—'

'না, রাগ করব কেন ? তবে কি না, চেহারার বিষয়ে রহস্য ভাল লাগে না।'

'সে ঠিক কথা। তবে বললে কি না, আমার সঙ্গে তোমার অনেক বিষয়ে মিল আছে,তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম—'

'আছেই ত। তোমার মত আমিও কুড়ে।—'

'কুড়ে ?'

'তোমার মত আমারও মনে এক, মুখে আর।'

'এ ভাবে গালাগালি দেওয়া ভদ্রতা-বিরুদ্ধ কিন্তু।'

'তোমার মত আমিও ভদ্রতার ধার বড় ধারিনে।—'

'এটা ঠিক বলেছ। আমার ও-বিষয়ে বেশ একটু সুনাম আছে—'

'তোমার মত আমিও লোক ঠকিয়ে বেড়াই—'

'অর্থাৎ ?—'

'এই যেমন বয়েস কম লেখাই, ট্রামের কণ্ডাক্টারকে কলা দেখিয়ে নেমে পড়ি, আয় কম দেখিয়ে ইনকম্-ট্যাক্স-অফিসারের চোখে বেমালুম ধুলো দি, পরিবারের কাছে যত সাধুতার গপ্প করি—'

'ওঃ, অমন সবাই করে।'

'কিন্তু সবাই ত ঠাকুর-দেবতাকে ঠকায় না ?'

'তুমি তা-ও কর না কি ? সর্ব্বনাশ!'

'হাঁ, তোমারই মত বিপদে পড়লে দেবতাদের চাল-কলা দিয়ে পূজো দিয়ে থাকি, আর যাই বিপদ কেটে যায়, অমনি দেবতাদের পায়ে গড় ক'রে বন্ধুবান্ধব নিয়ে ফুর্ত্তি করি—'

কথাটা শুনিয়া খুব রাগ হইল। জোর প্রতিবাদ করিবার জন্য লেপের ভিতর হইতে গলাটা বাড়াইয়া দিব, এমন সময় মনে পড়িল যে, লোকটা নেহাৎ মিথ্যা বলে নাই।

বলিলাম, 'আজকালকার দিনে, বুঝেছ ? সকলেই ওটা ক'রে থাকে। এতে আর এমন কি আছে ?—'

'না, তা নয়। তবে সকলেই কিছু পরিবারের শেলাই-শিক্ষয়িত্রীর প্রতি অত্যধিক পক্ষপাত দেখায় না। আমি তাকে সে-দিন যে কবিতা লিখেছি, শুনবে ?—

আমার মনের গোপন কথাটি
পুছিও না সখি—পুছিও না।
(আমার) নয়নের কোণে অশ্রু-রেখাটি
মুছিও না যেন মুছিও না।'

কি সর্ব্বনাশ ! এ কবিতা যে আমিই গোপনে লিখেছি, নলিনীর অর্থাৎ আমার স্ত্রীর শিক্ষয়িত্রীকে। এ লোকটা জানিল কিরূপে ? হঠাৎ আমার মুখ দিয়া বাহির হইল—'এ কবিতা ত আমি লিখেছি—'

আগন্তুক উত্তর করিল, 'একই কথা, বন্ধু। তুমিও যে, আমিও সে। নইলে আর বন্ধুত্ব কিসের ?'

ভাবিলাম, হাতে, পায়ে ধরিয়া বলি—ওগো বন্ধু, আমায় যেন ফাঁসিও না। লেপের ভিতর ঘামিতে লাগিলাম। উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু শরীর যেন পাথর হইয়া উঠিয়াছে ; পারিলাম না। ডাকিলাম, 'বন্ধু ! বন্ধু !'

কেহ সাড়া দিল না।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র (রায় বাহাদুর এম-এ)।

অবনত

হিমালয়ের কন্যা তুমি
তুঙ্গ গিরি-মন্দিরে রও,
কৈলাসেতে আবাস তোমার
মোটেই অধিগম্য ত নও।

বাহন তোমার সিংহ ভীষণ,
দশটি হাতে অস্ত্র দোলে,
দিক্‌পালেরা জানায় স্তুতি
লুটায় এসে চরণ-তলে।
এ সব কথা নয় মা নূতন
চির দিবস আমরা জানি,
তবু তোমায় ডাকের বলে
আমরা নীচে নামিয়ে আনি।
মা গো তুমি উচ্চ যেমন,
আমরা যে মা তেমনি নীচু,
তোমার কাছে উর্দ্ধে যাবার
শক্তি মোদের নেইক কিছু।

অন্য লোকে নিত্য বলে
আমরা তোমায় খর্ব্ব করি ;
এতে মোদের দুঃখ নাহি,
বরং তাতে গর্ব্ব করি।
আমরা সাজাই ভিখারিণী
ভিখারীদের তুমিই মা যে,
জরতী বেশ আমরা পরাই
সে বেশ তোমার ভালই সাজে।
আমরা জানি তুমি মোদের
দুখীর মাতা দুঃখিনী গো,
মহামায়া মহেশ্বরী,
মনে মনে খুব চিনি গো।

তোমার মাথা, জগন্মাতা !
নত যে হয় সগৌরবে,
ছোট ছেলে তুলতে কোলে
মাকে নত হতেই হবে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

কবি ও মানস-সুন্দরী

১

বার তিনেক আই-এ ফেল করিয়া এককড়ি চটিয়া কলেজ ছাড়িয়া দিয়া আজন্মের বাতিক কবিতা-রচনায় হাত পাকাইতে আরম্ভ করিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সরস্বতী তাহার উপর সদয় না হউন—কাব্য-লক্ষ্মী যে তাহার গলায় যশোমাল্য পরাইয়া দিবেন—এ বিশ্বাস তাহার অস্থিমজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল। কবি-প্রতিভা যে তাহার জন্মগত—এ কথা স্বয়ং বীণাপাণি তাহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া জানাইয়া গিয়াছেন—সকলের সমক্ষে এই কথা সে আস্ফালন করিয়া বলিয়া বেড়াইত।

উদীয়মান কবি এককড়ি কিন্তু মাসিক-পত্রের সম্পাদক-মহলে আমল পাইল না। প্রত্যেক সাময়িক পত্রের সম্পাদকের নিকট হইতে তাহার কবিতাগুলি অমনোনীত হইয়া ফেরত আসিতে লাগিল। কিন্তু এককড়িও সহজে হাল ছাড়িবার পাত্র নহে। কাব্যরসজ্ঞানহীন সম্পাদকগণ আজি-কালি না হউক, এক দিন তাহার কবিতার কদর বুঝিবেন, এই বিশ্বাস এককড়ির মনে বদ্ধমূল থাকায় তাহার উৎসাহ এবং সাহসের অন্ত ছিল না।

বসন্তপুরের বৃদ্ধ জমীদার সীতাপতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের তৃতীয় পক্ষের একমাত্র সন্তান এককড়ি। পর পর দুই জন স্ত্রী বন্ধ্যাবস্থায় গত হওয়ায়—বংশরক্ষার জন্য শেষ বয়সে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে তৃতীয় পক্ষ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। সেই বিবাহের ফল ব্যর্থ হয় নাই—এককড়ি তাহার প্রমাণ। মা-বাপের অত্যধিক স্নেহে এককড়ির স্বভাব কেমন একগুঁয়ে হইয়া গিয়াছিল।

দুই বৎসর হইল, এককড়ির বিবাহ হইয়াছে। বধূটি পাড়াগাঁয়ের। চেহারা নিন্দনীয় নহে, ধীর নম্র-স্বভাব, লেখাপড়াও মোটামুটি জানে, তথাপি শ্রীমতী বিন্ধ্যবাসিনীকে এককড়ির পছন্দ হয় না। তাহার মহৎ দোষ, সে রবি বাবুর কাব্য-গ্রন্থাবলীর রস-গ্রহণ করিতে পারে না, আধুনিক কথা-সাহিত্যের মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ বুঝিতে পারে না এবং সর্ব্বাপেক্ষা গুরু অপরাধের কথা এই যে, এককড়ির স্বরচিত কবিতাগুলির মাধুর্য্য-রস সে একেবারেই উপলব্ধি করিতে পারে না। ঐগুলি শুনিবার সময় প্রায়ই বিন্ধ্যার চোখের পাতা জড়াইয়া আসিত—উহা যেন তাহার নিদ্রাকর্ষণের সহায়তা করিত। কোন কবি স্বামী, স্ত্রীর এই ঔদাসীন্য ক্ষমা করিতে পারে কি?

এককড়ি প্রায়ই মনে মনে আক্ষেপ করিত, এই বিন্ধ্যার সহিত বিবাহ হইয়া তাহার জীবনটা মাটী হইয়া গিয়াছে। যদি উহার মাসতুত বড় বোন, উচ্চশিক্ষিতা সহরের মেয়ে রেখার সহিত তাহার মালা-বদল হইত, তাহা হইলে জীবনটা এমন উত্তপ্ত সাহারা-মরুতে পরিণত হইত না। শ্রীমতী রেখা দেবী যেমন রসিকা, তেমনই কাব্যানুরাগিণী—তাহার কথাবার্ত্তা, চালচলনও অতিশয় উচ্চাঙ্গের—তিনি যেন মূর্ত্তিমতী কাব্যলক্ষ্মী। সেই রেখার বিবাহ হইল কি না, একটা নীরস কাঠখোট্টা, তুচ্ছ টাকার কাঙ্গাল উকীলের সহিত। রেখা কখনই সেই রসজ্ঞানহীন, অকবি স্বামীকে ভালবাসিতে পারে না। রেখার প্রতি সমবেদনায় যখন-তখন এককড়ির শুষ্ক চক্ষু সজল হইয়া উঠিত। রেখা দেবী তাহার কবিতা শুনিয়া যেরূপ উৎসাহ প্রকাশ করিতেন, তাহাতে এককড়ির মনে হইত, রেখা নিশ্চয়ই তাহার পক্ষপাতিনী।

কবিদিগের এক জন করিয়া মানসসুন্দরী থাকে এবং অধিকাংশ কবি পরকীয়া-প্রেমে মস্‌গুল। কাউপারের "My Mary", "To Mary" কবিতা দুইটি, ওয়ার্ডস্‌-ওয়ার্থের লুসীর উদ্দেশ্যে লিখিত কবিতাগুলি তাহার প্রমাণ। বায়রণ ছেলে-বেলা হইতেই প্রণয়-চর্চ্চা করিতেন। পরকীয়া-প্রেমের প্রভাবেই তাঁহার গীতিকবিতা এতটা প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। স্বপ্ন-বিলাসী কবি কীট্‌স্‌এর কবিতার উপর কোন নারীর প্রভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে। তার পর সার ফিলিপ সিডনীর সেই উচ্ছ্বাস—"Stella the only planet of my light," মহাকবি দান্তের বিয়াত্রিস ছিল; আর চণ্ডীদাস মুক্তকণ্ঠে গাহিয়াছেন, "শুন রজকিনি রামি!" কবি বিদ্যাপতিরও অপবাদ ছিল না কি?

উদীয়মান কবি এককড়িরও এক জন মানসসুন্দরী ছিল—তিনি শ্রীমতী রেখা দেবী। এককড়ির যত গান, যত কবিতা—শ্রীমতী রেখা দেবীকে কেন্দ্র করিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত।

রেখা দেবীর উদ্দেশ্যে রচিত হতাশ-প্রেমের কবিতাগুলির মর্ম্ম বিন্দু কিছুই বুঝিত না বলিয়া এককড়ির ক্ষোভের সীমা ছিল না। সেই দুরস্থিতা—অন্যের অঙ্কশায়িনী মানস-সুন্দরীর ধ্যানে তন্ময় হইয়া এককড়ি যখন স্তবগান রচনা করিতে বসিত, তখন বিন্দু সাহস করিয়া তাহার কাছে যাইতে পারিত না।

এইরূপ এক দিন ধ্যানে বসিয়া এককড়ি 'কবে?' শীর্ষক একটি গীতি-কবিতা রচনা করিল। কবিতাটি লিখিয়া এককড়ি ভাবিল, এইবার কবির স্বপ্ন সফল হইয়াছে। এমন উচ্চাঙ্গের কবিতা তাহার হাত দিয়া ইতিপূর্ব্বে একবারেই বাহির হয় নাই। সজীব এবং রক্তমাংসের মানসসুন্দরী না হইলে কি এমন কবিতা বাহির হয়? মাসিকপত্রের সম্পাদক মহাশয়গণ এইবার তাহার মর্য্যাদা বুঝিবেন! অনাদৃত উপেক্ষিত কবি এককড়ি এইবার কাব্যজগতে যুগান্তর আনিবে। সে স্থির করিল, উক্ত 'কবে?' শীর্ষক কবিতাটি শীঘ্রই 'বিশ্ববন্ধু' মাসিকপত্রে ছাপাইবার জন্য পাঠাইয়া দিবে। সম্পাদক মহাশয় নিশ্চয় ইহা পত্রস্থ করিবেন। ইহার পর ভাবিতে লাগিল, ঐ 'কবে?' যখন 'বিশ্ববন্ধু'তে ছাপা হইয়া শ্রীমতী রেখার চোখে পড়িবে, তখন তিনি কি মনে মনে তাহার গলায় প্রশংসার জয়মাল্য পরাইয়া দিবেন না? কবিতার ভিতর দিয়া সে যে ব্যথা ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছে, সে কাহার জন্য?—শ্রীমতী রেখা কি তাহা বুঝিবেন না? কবির হৃদয়বেদনা অনুভব করিয়া মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার প্রাণ কাঁদিবে না কি? অহো 'কবে?' কবে প্রকাশিত হইবে—সে দিন কত দূরে?

পরদিন এককড়ি প্রসিদ্ধ 'বিশ্ববন্ধু' মাসিকপত্রে 'কবে?' শীর্ষক কবিতাটি ছাপাইবার জন্য পাঠাইয়া দিল। বলা বাহুল্য, মনের মধ্যে পূর্ব্ব দ্বিধা বিদ্যমান ছিল বলিয়া মতামত জানিবার জন্য ঐ সঙ্গে একখানি অর্দ্ধ আনার ষ্ট্যাম্প পাঠাইতেও ভুল করে নাই।

২

রেখার স্বামী উমাচরণ বাবু ভাগলপুরে ওকালতী করিতেন। এককড়ি মাঝে মাঝে মানসসুন্দরীর সাক্ষাদ্দর্শনলাভাশায় শ্যালীপতির বাসায় গিয়া মাসাধিক কাল কাটাইয়া আসিত। এককড়ি বলিত, পশ্চিমের জলহাওয়া যেমন তাহার স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল, তেমনই তাহার কবিতা-রচনারও সহায়তা করে।

বৃদ্ধ পিতৃদেব দক্ষিণদিকে রওনা হইলেই ভাগলপুরে একখানি বাড়ী কিনিয়া নির্জ্জনে কবিতাসুন্দরীর (তথা মানসসুন্দরীর) উপাসনা করিবে, এ সংকল্প সে মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু পিতৃদেবের ঐ দিকে পা বাড়াইবার উপস্থিত কোন লক্ষণ নাই দেখিয়া এককড়ি মনের ব্যথা মনেই চাপিয়া রাখিত।

'বিশ্ববন্ধু' আফিসে কবিতাটি পাঠাইয়া দেওয়ার দিন-দুই পরে এককড়ি বগলে খানচারেক সুবৃহৎ কবিতার খাতা লইয়া অকস্মাৎ ভাগলপুরে উমাচরণ বাবুর বাসায় গিয়া হাজির হইল।

উমাচরণ বাবু তখন একটা চৌকীতে বসিয়া সম্মুখের টেবলে ঝুঁকিয়া পড়িয়া কি লিখিতেছিলেন। অকস্মাৎ এককড়িকে উপস্থিত হইতে দেখিয়া একগাল হাসিয়া কহিলেন, "আরে, এসো হে, এসো! কবিবর এসো! বগলে ও কি? কাব্যগ্রন্থাবলী বুঝি? বোসো, বোসো—ঐ চেয়ারটায় বোসো, তার পর হঠাৎ কি মনে ক'রে?"

সম্মুখের টেবলের উপর খাতা কয়খানি নামাইয়া রাখিয়া চেয়ারে বসিয়া চাদর ঘুরাইয়া হাওয়া খাইতে খাইতে এককড়ি বলিল, "আপনি ত জানেন, ভাগলপুর আমার ভালো লাগে। এখানে এলেই আমি যেন অন্তরের গোপন রসভাণ্ডারের সন্ধান পাই। এখানকার হাওয়ার সঙ্গে যেন কাব্যরস মিশিয়ে আছে।"

হাতের কলমটি নামাইয়া রাখিয়া ঈষৎ হাসিয়া উমাচরণ বলিলেন, "কবিদের সবই সম্ভব। এখানকার হাঁটু পর্য্যন্ত ধূলোয় ভরা হাওয়ার মধ্যে কোথায় যে কবিতার উপাদান লুকানো আছে, কবিরাই বলতে পারে। তা বেশ করেছ, মাঝে মাঝে এসে হৃদয়ের গোপন রসভাণ্ডারের সন্ধান নিয়ে যেয়ো।"

ভিতরে ভিতরে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়া এ সব নীরস কথার হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য এককড়ি কহিল, "দেখুন, ও-সব আলোচনা পরে হবে। রেখা-দি কেমন আছেন তাই বলুন—"

বক্রহাসি হাসিয়া উমাচরণ বলিলেন, "ভালই আছেন।

ট্রেণে রাত জেগে এসেছ, মুখ-চোখ শুকিয়ে গেছে, যাও না ভেতরে চা-টা খেয়ে সুস্থ হও গে। তিনি বোধ করি গীতাঞ্জলি খুলে এতক্ষণ 'দিন চলে যায় আমি আনমনে, তারি আশা চেয়ে থাকি বাতায়নে' আওড়াচ্ছেন।"

প্রতিবাদ করিয়া এককড়ি বলিল, "দেখুন, ঐ কবিতাটি রবিবাবুর গীতাঞ্জলিতে নেই—ওটি—"

বাধা দিয়া উমাচরণ বলিলেন, "কি জানি ভাই, কিসে আছে, এত খোঁজ রাখি নে। আমরা কাযের লোক, টাকাটা-সিকেটা বুঝি, কবিতার রস আদৌ বুঝি নে। তা তোমাদের শ্যালী-ভগ্নীপতিতে মিলেছে ভালো, কাল রাত্রিতে তোমার কথাই বলছিলেন। তুমি অনেক দিন বাঁচবে হে; ঐ দেখ, আসছেন।"

বলিতে বলিতে শ্রীমতী রেখা দেবী সেই কক্ষে উপস্থিত হইলেন। এককড়িকে দেখিয়া মধুর হাসি হাসিয়া রেখা বলিলেন, "এই যে—কখন এলে, ভাই? আমাদের একবারেই ভুলে গেছলে? এসো, ভেতর দিকে এসো।"

তার পর উমাচরণের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "ওগো, তুমি স্নান-টান সেরে নাও, খাবার ঠিক হয়ে গেছে," বলিয়া চোখের ইসারায় এককড়িকে অন্দরের দিকে আহ্বান করিয়া ত্রস্তপদে চলিয়া গেলেন।

এককড়ির বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ড দুলিতে লাগিল, সে প্রাণপণ বলে বুকের আন্দোলন বন্ধ করিয়া অন্দরের দিকে চলিল। তখন তাহার বুকের মধ্যে স্বরচিত কবিতার শেষের ছত্র দুইটি গুঞ্জন করিয়া ফিরিতেছিল—

'কবে সে ফাঁসের দড়ি গলায় পরিয়া মরিব মধুর মরণে
তাই ভাবছি আপন মনে।'

৩

মধ্যাহ্ন-বেলা প্রায় জনহীন বাসায় কবি এককড়ির সহিত রেখা দেবীর কাব্য-আলোচনা হইতেছিল। উমাচরণ বাবু তখন আদালতে তুচ্ছ টাকার সন্ধানে ছুটাছুটি করিতেছিলেন।

"কবে?" কবিতাটি শুনিয়া রেখা দেবীর মুখ অকস্মাৎ গম্ভীর হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "চমৎকার হয়েছে। এ কবিতাটি তুমি প্রসিদ্ধ 'বিশ্ববন্ধুতে' ছাপতে দাও, নিশ্চয় বের হবে। তোমার এ সব কবিতা যখন ছাপার অক্ষরে লোকের চোখের সামনে পড়বে—তখন তুমি কি আমাদের এককড়ি থাকবে, ভাই? তখন একেবারে ছ'কড়ি ন'কড়ি হয়ে যাবে, আমাদের সমালোচনা কি তখন মনে লাগবে?"

মানসসুন্দরীর মুখে কবিতাটির অত্যধিক প্রশংসা শুনিয়া এককড়ির হৃদ্‌যন্ত্র বিপুলবেগে স্পন্দিত হইতে লাগিল। সে কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "না না, রেখা-দি, আপনি অসম্ভব বাড়িয়ে বলছেন।"

রেখার সুন্দর আননে যে হাসির ইন্দ্রধনু ফুটিয়া উঠিল, তাহাতে এককড়ি মুগ্ধ হইয়া গেল। তিনি বলিলেন, "না, একটুও আমি বাড়িয়ে বলি নি। এ কবিতাটি ত অসম্ভব উচ্চাঙ্গের হয়েছেই, তা ছাড়া, ঐ খাতাগুলির অধিকাংশ কবিতাই প্রথম শ্রেণীর। এক একটি এমন করুণ-রসাত্মক যে, চোখের জল রোধ করা যায় না।"

যাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া ঐ সব অশ্রুভরা বেদনার গান রচিত হইয়াছে, তাঁহারই মুখে সেইগুলির এমন ধরণের প্রশংসা শুনিয়া এককড়ির মনটা যেন পাখীর মত পাখা মেলিয়া হাওয়ার উপর উড়িতে লাগিল।

রেখা তাহাকে ঐ কবিতাটি 'বিশ্ববন্ধু'তে পাঠাইয়া দিতে বলিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বেই যে সে কবিতাটি উক্ত কাগজে পাঠাইয়া দিয়াছে, এ কথা সে রেখার কাছে স্বীকার করিতে পারিল না। কি জানি,'বিশ্ববন্ধু'র সম্পাদক মহাশয়কে বিশ্বাস নাই, যদি ছাপা না হয়, তাহা হইলে রেখার কাছে অপদস্থ হইতে হইবে। আর তাহা হইলে সে রেখাকে কখনও মুখ দেখাইতে পারিবে না। রেখার কাছে অপদস্থ হইলে ইহজীবনে সে কি আর মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিবে?

কবিকে নীরব থাকিতে দেখিয়া তাহার একখানি খাতা তুলিয়া লইয়া রেখা পড়িতে লাগিলেন।

পড়িতে পড়িতে রেখার নয়নযুগল যেন ছল ছল করিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "ভাই, তোমার লেখা বড়ই মর্ম্মস্পর্শী! বুকের রক্তে কলম ডুবিয়ে লিখেছো বোধ হয়? বিশেষ, ঐ যে ঐ ছত্রটি—'আঁখির সলিলে ভিজে ওঠে প্রাণ!' কি সুন্দর! কি সুন্দর! এই দেখ, আমার চোখেও জল এসেছে।"

তাহার প্রতি রেখার এই আত্যন্তিকী ভক্তিতে এককড়ি অস্থির হইয়া উঠিল। সে যে কি বলিয়া রেখাকে ধন্যবাদ

জানাইবে, ভাবিয়া পাইল না। কিছুক্ষণ উস্‌খুস্ করিয়া কথার স্রোত অন্যদিকে ফিরাইবার জন্য সে কহিল, "আচ্ছা রেখা-দি, একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো—উমা-দা কি বাঙ্গালা বই-টই পড়েন? আজ তাঁর টেবলের ওপর খানকতক বাঙ্গালা বই ও এক-গাদা মাসিকপত্র দেখে অবাক্ হয়ে গেছি!"

রেখা বলিলেন—"তুমি পাগল হয়েছ। ওগুলো সব আমিই জোর ক'রে আনিয়েছি, উনি আইনের বই নিয়েই দিনরাত মসগুল হয়ে থাকেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ধার দিয়েও যান না।"

একটা আরামের দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া এককড়ি বলিল, "হাঁ, দেখে তো তাই মনে হয়। আচ্ছা রেখা-দি, এই নীরস কাঠখোট্টা মানুষটির সঙ্গে আপনি কি ক'রে দিন কাটান?"

নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া রেখা বলিলেন,—"কি করবো, ভাই! উপায় নেই। এক এক সময়ে বড় কষ্ট হয়।"

ঠিক এই সময় বস্তুতান্ত্রিক জগতের মানুষটি, অর্থের একনিষ্ঠ উপাসক উমাচরণ আদালত হইতে ফিরিয়া আসায় তাহাদের মধুর কাব্য-আলোচনায় বাধা পড়িল। এখন বাসায় থাকা নিরর্থক মনে করিয়া এককড়ি ভাগলপুরের ধূলিসমাচ্ছন্ন পথে গোপন রস-ভাণ্ডারের সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িল।

পথে চলিতে চলিতে এককড়ির মনে হইল, "ঢালিছে যে সুরা শাশ্বত সাকী নিখিল পাত্র পরে," সেই সাকীর স্বহস্ত-প্রদত্ত একপাত্র ফেনপুষ্পিত সুরাপান করিয়া সে আজ মাতাল হইয়া উঠিয়াছে! আজ তাহার জীবন সার্থক হইয়াছে! তাহার অন্তরবাসিনী মানসপ্রতিমা আজ মূর্ত্তি ধরিয়া তাহাকে বরদান করিয়াছেন!

সে মনে মনে ভাবিল, রেখার প্রতি তাহার যে মনোভাব, ইহা কখনই দূষণীয় নহে, আধ্যাত্মিক প্রেম ইহাকেই বলে। আর তিনিও যে, তাহাকে মনে মনে প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন, তাহাতেও সন্দেহ নাই। রেখা দেবী ত আজ স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন, এ বিবাহে তিনি সুখী হইতে পারেন নাই। কেমন করিয়াই বা তাহা সম্ভবপর হইতে পারে? ঐ কাঠখোট্টা অরসিক কবিত্ব-মাধুর্য্য-অনুভূতিবর্জ্জিত, অর্থান্বেষী মানুষটিকে রেখার মত কাব্যানুরাগিণী সুন্দরী তরুণী নারী কি ভালবাসিতে পারে? এককড়ির মত ভাবুক কবিই প্রকৃতপক্ষে এই নারীর ভালবাসার পাত্র। দেহের মিলনই কি সব? নাই বা তাহার অদৃষ্টে সে যোগাযোগ ঘটিল। অন্তর-জগতে তাঁহাকে পাইয়াই এককড়ির মানব-জন্ম—কবি-জীবন সার্থকতা লাভ করিবে। ইহাতেই তাহার তৃপ্তি।

রেখার ভাষায় প্রকাশহীন, মূক প্রীতির স্বর্গীয় অনাবিল মাধুর্য্য উপলব্ধি করিয়া এককড়ির চোখের পাতা ভিজিয়া গেল।

কিছুক্ষণ এইভাবে উদ্‌ভ্রান্তের মত পথে পথে ঘুরিয়া এককড়ি যখন বাসায় ফিরিল, তখন রাত্রি সাড়ে আটটা বাজিয়া গিয়াছে।

তাহাকে দেখিয়া রেখা বলিলেন, "এতক্ষণ ছিলে কোথায়? আমার ত মনে হয়েছিল, বুঝি বা ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেলে।"

তাহার অদর্শনে রেখা কিরূপ চঞ্চল হইয়াছিলেন, ইহা কল্পনা করিয়া পুলকিত হইয়া এককড়ি কহিল, "আপনাদের সঙ্গে দেখা না ক'রে পালাবো, আমি কি এতই অভদ্র! আপনি ত জানেন, ভাগলপুর আমার কিরূপ ভালো লাগে। এখনো আট-দশ দিন পাদমেকং ন গচ্ছামি।"

স্নিগ্ধ দীপ্ত কটাক্ষ হানিয়া রেখা বলিলেন, "তোমার যত দিন খুসী থাকো। তবে ভয় হচ্ছিল, কবির খেয়াল, হয় তো বা না দেখা ক'রেই পালিয়ে গেলে।—'হারাই হারাই সদা মনে হয়, হারাই বা পাছে তাহারে'—জানই তো, তোমাদের কবির গানে আছে!"

রেখা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

ইহার পর আরও আট-দশ দিন ভাগলপুরে হাস্য-কৌতুকে, সুমধুর কাব্য-আলোচনায়, রেখার সাহচর্য্যে কাটাইয়া এককড়ি বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

৪

অগ্রহায়ণের প্রথম সপ্তাহ। এবার সকাল সকাল শীত পড়িয়াছে।

এককড়ি রাস্তার ধারের কক্ষে আলোয়ানে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া কি একখানি কাব্যগ্রন্থ পাঠ করিতেছিল। মাঝে মাঝে পুস্তক পাঠ বন্ধ রাখিয়া খোলা জানালা দিয়া বাহিরের জনবিরল পথের পানে তাকাইতেছিল। কখন্ পিয়ন আসিয়া দেখা দিবে, এই চিন্তায় তাহার মন নিবিষ্ট হইতে পারিতেছিল না।

কিছুক্ষণ এইভাবে কাটিয়া যাইবার পর সত্যই পিয়ন

আসিয়া জানালার বাহিরে দেখা দিল। একখানি সদ্যঃ-প্রকাশিত 'বিশ্ববন্ধু', একখানি খামে মোড়া চিঠি এবং একটি বুক-প্যাকেট, জানালা গলাইয়া তাহার হাতে দিয়া পিয়ন প্রস্থান করিল।

বুক-প্যাকেট খুলিয়া এককড়ি দেখিল, তাহার "কবে ?" শীর্ষক কবিতাটি 'বিশ্ববন্ধু' আফিস হইতে অমনোনীত হইয়া ফেরত আসিয়াছে। তবে 'বিশ্ববন্ধু' কে পাঠাইয়াছে ? এক বৎসর হইল, তাহার কবিতা প্রকাশ না করার জন্য রাগ করিয়া সে ত 'বিশ্ববন্ধু'র সহিত অসহযোগ করিয়াছে। অন্য কাহারও কাগজ ভুল করিয়া পিয়ন দিয়া যায় নাই ত ? তুলিয়া পুনরায় ঠিকানা দেখিয়া তাহার সন্দেহ দূর হইল। তাহার নামেই ঠিকানা লেখা আছে। তাহার পর খাম খুলিয়া ভিতরের পত্রখানি বাহির করিতেই তাহার সকল কৌতূহলের অবসান হইল। উক্ত পত্রখানি ভাগলপুর হইতে তাহার মানসী শ্রীমতী রেখা দেবী লিখিয়াছেন। এককড়ি পড়িতে লাগিল—

শ্রীশ্রীদুর্গা শরণং।

ভাগলপুর,
৩রা অগ্রহায়ণ, ১৩২৮।

কল্যাণবরেষু,

ভাই এককড়ি! এত দিন যে রহস্য তোমার কাছে গোপন করিয়া রাখিয়াছিলাম, আজ তাহা উদ্ঘাটন করিয়া দিব। তোমার সহিত এত দিন আমি কেবল প্রবঞ্চনা করিয়া আসিয়াছি—ইহার জন্য তুমি আমাকে ক্ষমা করিও।

আমি তোমাকে কনিষ্ঠ সহোদরের মত ভালবাসি, তাই তোমাকে একটা উপদেশ দিতেছি, আশা করি, রাগ করিও না। কবিতা রচনা কর বা না কর, তুমি বিন্ধ্যকে ভালবাসিবার চেষ্টা করিও। তাহাতে তুমিই সুখী হইবে।

তোমার মনের গোপন অন্তঃপুরে যে ভাবটি দিন দিন পুষ্ট হইতেছে, তাহা তোমার পক্ষে মঙ্গলকর নহে। আমি তোমাকে চিনি, তোমার মনের কথাও বুঝি; কিন্তু তুমি আমার স্নেহাস্পদ-বিন্ধ্যার স্বামী, হয় ত একটু পাগলামির ছিট আছে মনে করিয়া তোমাকে মনে মনে বরাবর ক্ষমা করিয়া আসিয়াছি। এ সমস্ত পাগলামি ত্যাগ করিয়া সৎ-পথে থাকিয়া জীবনযাপন করিবার চেষ্টা কর, তাহা হইলে যথার্থ সুখী হইবে। তোমার রচিত কবিতা ও গান পড়িবার সময় আমি যে কি কষ্টে হাসি সম্বরণ করিয়া রাখিতাম, তাহা তোমাকে বুঝাইতে পারিব না। আমার অনুরোধ, তুমি এমন হাস্যকর কবিতা রচনা করিয়া ব্যর্থশ্রম করিও না।

এই সঙ্গে অগ্রহায়ণ-সংখ্যা 'বিশ্ববন্ধু' এক কাপি পাঠাইলাম। উদীয়মান কবিদিগের মধ্যে প্রতিভাবলে যিনি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন, সেই দুর্গাপদ বাবুর সহিত তোমার সাক্ষাৎ পরিচয় আছে কি ? আমি তাঁহার সঙ্গে আজ তোমার আলাপ করাইয়া দিব। তিনি তোমারই ভায়রাভাই কাব্যরসজ্ঞানহীন কাঠখোট্টা উকীল মহাশয়! দুর্গাপদ তাঁহার ছদ্মনাম। এ সংখ্যায় 'বিশ্ববন্ধুর' প্রথমেই "সাগর-সঙ্গমে" শীর্ষক যে কবিতাটি প্রকাশিত হইয়াছে, সেটি আমার নীরসপ্রকৃতি স্বামী মহাশয়ের রচিত; তাঁহার অধিকাংশ কবিতা 'বিশ্ববন্ধু'তেই প্রকাশিত হয়, সে কথা তোমাকে বলাই বাহুল্য। তাঁহার বাহিরটা দেখিয়া কাহারও মনে এ সন্দেহ জাগে না যে, গোপনে তিনি কবিতাসুন্দরীর উপাসনা করেন।

বাঙ্গালা সাহিত্যেরও তিনি এক জন একনিষ্ঠ সেবক। কিন্তু এ বিষয় লইয়া বাহিরে আস্ফালন করিতে তিনি একবারেই নারাজ—এই জন্যই 'দুর্গাপদ' এই ছদ্মনাম ব্যবহার করেন। ভাবিয়া দেখিলে বুঝিবে, তাঁহার আসল নামের সহিত এই ছদ্মনামের অর্থগত কোনই প্রভেদ নাই।

বাঙ্গালা বিবিধ মাসিকপত্রে দুর্গাপদ বাবুর যে কবিতাগুলি প্রকাশিত হইয়াছে, সেগুলি একত্র সংগ্রহ করিয়া শীঘ্রই একখানি কবিতার পুস্তক ছাপা হইবে। সেই পুস্তক ছাপা হইলেই তোমার নামে একখানি পাঠাইয়া দিব। অবশ্য আসল নামেই পুস্তক প্রকাশিত হইবে।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে, তুমি আমার ছোট ভগিনীপতি, এই জন্য তোমার উদ্ভট কবিতা লইয়া যে একটু আমোদ করিয়াছি, তাহার জন্য অনুতপ্ত চিত্তে মার্জ্জনা চাহিতেছি। মানুষের হৃদয়ের দুর্ব্বলতা লইয়া এমন ভাবে মজা করাটা নিতান্তই নিষ্ঠুরতা, ইহা বুঝিয়া আমারও চোখ ফুটিয়াছে। ইহাও স্থির জানিও, আমি তোমার হিতাকাঙ্ক্ষিণী। দয়ালু চিকিৎসকের মত অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে তোমার রোগ আরোগ্যের জন্য এই অস্ত্র-প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইলাম। আশা করি, এইবার আমার ছোট ভাইটি প্রকৃত পথের সন্ধান পাইবে। ইতি—

তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী
রেখা-দি।

এককড়ির মনে হইল, পৃথিবীটা যেন ক্রমশঃ পায়ের তলা হইতে সরিয়া যাইতেছে। তাহার মূর্চ্ছার উপক্রম হইল। 'বিশ্ববন্ধু'র প্রসিদ্ধ কবি দুর্গাপদ বাবু রেখার স্বামী—উমাচরণ! বিন্ধ্য কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। এককড়ি প্রবল চেষ্টায় অতি কষ্টে মূর্চ্ছার বেগ প্রতিহত করিল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে স্বামীর এবম্প্রকার ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া সে ভয় পাইয়া গেল! সে তাড়াতাড়ি এককড়ির কাছে ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত দুইখানি চাপিয়া ধরিল। পড়িতে পড়িতে সামলাইয়া লইয়া বিন্ধ্যকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া ধরিয়া এককড়ি কহিল, "আমাকে তুমি ক্ষমা করো।"

এ কথার কোন তাৎপর্য্য খুঁজিয়া না পাইয়া বিন্ধ্য অবাক্ হইয়া স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ক্ষিপ্তা

১

ডেপুটীগিরি পদপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই নরেশ পুরাদস্তর 'সাহেব' বনিয়া গিয়াছিলেন। বাহিরের দিক্ দিয়াও বটে, অন্তরের দিক্ দিয়াও বটে। বাঙ্গালীর ছেলে যদি মনে-প্রাণে পশ্চিমের বায়ুগ্রস্ত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে প্রায়ই তাহাদের বেশী আক্রোশ প্রকাশ পায় স্বজাতীয় ধর্ম্ম-কর্ম্ম, আচার-ব্যবহারের উপর। ডেপুটী নরেশচন্দ্র হিন্দুসমাজকে শূলে চাপাইতে পারিলে ছাড়িতেন না। বন্ধুসমাজে এক দিন তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন, "হিন্দুদের এই তেত্রিশ কোটিই মালিক, আর তাদের পুরুষানুক্রমিক বর্ব্বরতার জন্যই তারা জগতের কাছে হীন হইয়া আছে।"

বন্ধুসমাজের মধ্যে যাঁহারা এই বর্ব্বরতার ভক্ত ছিলেন, তাঁহারা কোন দিনই এই গৌরাঙ্গপদলেহী ডেপুটীর উক্তির প্রতিবাদ করিতেন না। শুধু দুই-এক জন একটু মুচকিয়া হাসিয়া কহিয়াছিলেন, "বলি, দেব-দেবী ত নাই, তা বুঝলাম; কিন্তু ঐ গৌরাঙ্গ-দেবতাদের দূত এসে যখন তলব ক'রে নিয়ে যায়, তখন শ্রীমন্দিরে ঢুকবার পথে কোন মালিককে স্মরণ করা হয়, তাই একবার শুনি?"

ঐ সকল উক্তিতে নরেশ হাসিতেন, কখনও কর্ণপাতও করিতেন না।

কিন্তু গোল পাকাইয়া বসিয়াছিলেন নরেশের স্ত্রী সুনন্দা। তিনি যে তাঁহার মূর্খ, অধ্যাপক পিতার নিকট হইতে কি মন্ত্র বুকে ধরিয়া স্বামীর ঘর করিতে আসিয়াছিলেন, সে কথা তাঁহার অন্তর্যামীই জানিতেন। নরেশ বহু চেষ্টা করিয়া তাঁহাকে কোন দিন মোটরে বসাইয়া পার্টিতে লইয়া যাইতে পারেন নাই। বন্ধুদের মজলিসেও সুনন্দাকে বাহির করা ডেপুটী সাহেবের শক্তিতে কুলায় নাই।

নরেশের পিতা ছিলেন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মানুষ। অল্প বয়সেই নরেশের বিবাহ-ব্যাপারটা চুকাইয়া দিয়া তিনি স্বর্গীয় হইয়াছিলেন। ইতিমধ্যে নরেশের একটি পুত্রসন্তানও জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। এই পুত্রের মুখ চাহিয়াই হাকিমপ্রবর নরেশ ভট্টাচার্য্য-কন্যাকে বরদাস্ত করিয়া আসিতেছিলেন। স্ত্রীকে শুচিবায়ুগ্রস্তা অথবা ক্ষিপ্তা মনে করিয়া তিনি পুত্রের শিক্ষা-দীক্ষার ভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমানে নরেশচন্দ্র পাটনায় সিনিয়র ডেপুটী। পুত্র দেবীপ্রসাদও এম, এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া পিতার মুখোজ্জ্বল করিয়াছে। পিতার শিক্ষায় দেবীপ্রসাদও পূর্ণমাত্রায় সাহেবীয়ানার ভক্ত, একনিষ্ঠ উপাসক। পুত্র-গর্ব্বে পিতা যেন স্ফীত হইতেছিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ দুষ্ট গ্রহের মত সুনন্দার পুনরাবির্ভাবে এ সমস্তই যেন মাটী হইতে বসিল।

সুনন্দা ইদানীং বড় একটা স্বামি-পুত্রের কাছে থাকিতেন না। তাঁহার অন্ধ শ্বশ্রূঠাকুরাণীর সেবা ও পরিচর্য্যা লইয়া কাশীর বাড়ীতেই তিনি দীর্ঘ দিন অতিবাহিত করিতেছিলেন। সম্প্রতি নরেশের বৃদ্ধা জননীর কাশীপ্রাপ্তি হওয়ায় মাস তিনেক হইল, সুনন্দা পাটনায় স্বামীর কাছে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

আজ চাকরীর চেষ্টায় পুত্রকে সঙ্গে করিয়া নরেশ সাহেব-পাড়ায় বাহির হইবেন বলিয়া স্থির হইয়াছিল। প্রত্যূষে পুত্রের অপেক্ষায় নরেশ উপরের বারান্দায় পায়চারী করিতেছিলেন। দরজী আসিয়া দেবীপ্রসাদের নূতন স্যুট ইত্যাদি পৌঁছাইয়া দিয়া গেল। এই বেশ-ভূষায় সজ্জিত পুত্রকে যে কতটা সাহেবদের মত দেখা যাইবে, কল্পনায় তাহারই একটা ছবি অঙ্কিত করিয়া তিনি হৃষ্টচিত্তে বাহিরের দিকে তাকাইয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছিলেন।

অকস্মাৎ একটি ব্রাহ্মণ-সন্তানের মূর্ত্তি ডেপুটী সাহেবের বাংলোর উদ্যানের কঙ্করাকীর্ণ পথে দেখা দিল।

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের উপর নরেশচন্দ্রের মর্ম্মান্তিক আক্রোশ ছিল। তিনি যে স্বয়ং ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের পুত্র, এই অনতিক্রমণীয় ইতিহাস তাঁহার চিত্তে নিষ্ফল ক্রোধ পুঞ্জীভূত করিয়া রাখিয়াছিল বলিয়াই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের উপর তাঁহার অভিব্যক্তি তীব্রতরভাবে প্রকাশ পাইত।

উত্তেজনার আতিশয্যে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তিনি হুকুম দিলেন, "বেয়ারা, নিকাল দেও।" কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্তব্ধ হইয়া গেলেন। যে অভাবনীয়, অবিশ্বাস্য, অত্যদ্ভুত দৃশ্য তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল, তাহাতে আস্ফালন-বাক্যের বাকী শব্দ তাঁহার রসনা উচ্চারণ করিতে বিস্মৃত হইল।

তিনি দুই চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তরুণ ব্রাহ্মণ-সন্তানের সঞ্চরণশীল মূর্ত্তির দিকে পুনরায় চাহিলেন।

না, এ মূর্ত্তি দেবীপ্রসাদের—তাঁহার একমাত্র সন্তান বিশ্ববিদ্যালয়ের অত্যুজ্জ্বল রত্ন দেবীপ্রসাদেরই। তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

দেবীপ্রসাদ অতি প্রত্যূষে গঙ্গাস্নানে বাহির হইয়াছিল। স্নান সমাপন করিয়া এখন ফিরিতেছে! শুধু স্নান নহে,

সে তাহার এত যত্নের সাহেবী ফ্যাসানে শোভিত কেশগুচ্ছকে ছাঁটিয়া মাথাটিকে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের শিখাসমন্বিত মস্তকে পরিণত করিয়াছে।

নরেশের দুই চক্ষু দিয়া অগ্নিধারা নির্গত হইতে লাগিল। বুকের ভিতরটা ঠিক যেন ইটের পাঁজার মত জ্বলিতে লাগিল।

বেহারা পাশেই ছিল। সে বলিল, "হুজুর, উনি ছোট মা—হে—ব!"

নরেশ ক্রুদ্ধকণ্ঠে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, "চোপরাও, বুড়বক্!"

ভয়ে বেচারা এতটুকু হইয়া সরিয়া গেল।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে "দেবী কোথায় হে" বলিতে বলিতে হোড় সাহেব সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া আসিলেন। এই য়ুরোপীয়বেশধারী বাঙ্গালী-নন্দনটি নরেশের বন্ধু। এই সঙ্গে তিনিও গৌরাঙ্গ-তীর্থে যাইবেন কথা ছিল। ঘড়ী খুলিয়া হোড় সাহেব বলিলেন, "আর দেরী কেন? দেবী কোথায়, ডাকো তাকে।"

দেবী তখন ধীরপদে বারান্দার নিম্নস্থ পথ দিয়া অন্দরের দিকে যাইতেছিল।

হোড় সাহেব সেই দিকে তাকাইয়াই ঘন ঘন চশমা মুছিতে লাগিলেন। তিনি বিস্মিতকণ্ঠে কহিলেন, "হাঁ হে, দেবী না? এ সাজ-পোষাক আবার কবে থেকে হ'ল?"

নরেশ জবাব দিলেন না। তাঁহার বুকের ভিতর তখন হু হু করিয়া জ্বলিয়া যাইতেছিল। মুখে একটা অব্যক্ত শব্দ করিয়া সন্নিহিত সুটের বাণ্ডিলটা নাবিয়া দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন।

বন্ধুর অবস্থাটা উপলব্ধি করিয়া হোড় সাহেব আর প্রশ্ন করিলেন না। "আচ্ছা, আজ না হয় বুঝলে কি না" বলিতে বলিতে চিন্তিত মুখে তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

নির্ব্বাক্, নিস্পন্দ, নিশ্চলভাবে নরেশচন্দ্র দাঁড়াইয়া রহিলেন।

এমন সময় সুনন্দা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার জলখাবার কি এখানেই নিয়ে আসব?"

কিছু দিন হইতে সাহেব কঠিন শূল-বেদনায় আক্রান্ত হইয়া কষ্ট পাইতেছিলেন। সুনন্দা অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া স্বামীর আহার্য্য-প্রস্তুতের ভারটা বাবুর্চ্চিখানা হইতে সরাইয়া নিজহস্তে গ্রহণ করিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন। স্থির হইয়াছিল, আজ হইতেই নরেশ দিনকতক স্ত্রীর প্রস্তুত আহার্য্য গলাধঃকরণ করিয়া দেখিবেন। সে কথাটা স্মরণ করাইয়া দিয়া সুনন্দা কহিলেন—"এখানেই নিয়ে আসব, না, আমার ঘরে গিয়ে তুমি খাবে?"

স্ত্রী সুনন্দাই যে পুত্রের এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনের হেতু, ইহা নিঃসংশয়ে বুঝিয়া নরেশ একবারে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। তীব্র শ্লেষের ভঙ্গিতে কহিলেন, "বলি, কোশাকুশী, আসন-টাসন ঠিক ক'রে রেখেছ ত? আমাকেও এবার ভটচাজ্জি মশাই সাজতে হবে কি না?" বলিয়াই স্বরের তীব্রতা আরও একটু বাড়াইয়া কহিলেন, "তোমাদের শাস্ত্রে আহারের পূর্ব্বে গণ্ডূষ না একটা কি ক'রে নিতে হয় যেন। শোনাও দেখি সেই মন্ত্রটা, একবার কণ্ঠস্থ করি।"

ডেপুটী সাহেব এমন বিকট ভঙ্গিতে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে লাগিলেন যে, স্তম্ভিত আর্দ্দালিটা পর্য্যন্ত লজ্জিত হইয়া মুখ ফিরাইল। দাসী বারান্দা ঝাঁট দিতেছিল, সে মুখবিবরে বস্ত্র চাপিয়া ধরিল।

অপমানে ও লাঞ্ছনায় সুনন্দার মুখ দিয়া আর স্বর ফুটিল না। তিনি শুধু স্বামীর মুখের পানে স্তব্ধ নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

বেয়ারা ইতিমধ্যে রুটী-মাখন-ডিম প্রভৃতি প্রাতরাশ ও-ঘরে রাখিয়া আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল।

সুনন্দা আত্মসংবরণ করিয়া ধীরকণ্ঠে কহিলেন, "ও-সব তুমি নিয়ে যাও, সাহেবের খাবার-ব্যবস্থা আমিই করেছি।"

দেবীপ্রসাদ কি একটা প্রয়োজনে ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল। সেই দিকে দৃষ্টি পড়ায় সাহেব একবারে বোমার মত ফাটিয়া পড়িলেন। ভীষণ কণ্ঠে কহিলেন, "এই! যাও লে যাও।" বলিয়া মস্ মস্ করিয়া টেবলের ধারে বসিলেন।

সুনন্দা দরজা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া কহিলেন, "সত্যিই কি তুমি খাবে না?"

সে কণ্ঠস্বরে ব্যথা যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সাহেব গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "না!"

সম্মুখস্থ আহার্য্যের দিকে তিনি ঝুঁকিয়া পড়িতেই, সুনন্দা ভয়ে যেন শিহরিয়া উঠিলেন। আর্ত্তকণ্ঠে তিনি কহিলেন, "ওগো! আমি কাল সমস্ত রাত শুধু এই মুহূর্ত্তটুকুর জন্যই যে কত আশা ক'রে জেগে বসেছিলাম! তুমি খাবে না, আমার সমস্ত আয়োজন তবে কি মিথ্যাই হবে? আমি তা হ'লে বাঁচব কেমন ক'রে?" বলিতে বলিতে তাঁহার মুখমণ্ডল অস্বাভাবিক পাণ্ডুর হইয়া গেল।

সাহেব স্বামী শ্লেষভরে কহিলেন, "কেন; তোমার ঐ নোড়া নুড়িগুলো, ঐ যে সব কত কি আছেন, তাঁদের খাওয়াও গিয়ে!"

সুনন্দা বেদনাক্লিষ্ট চক্ষু দুইটি স্বামীর মুখের উপর স্থাপিত করিয়া উত্তেজিত ভাবে কহিলেন, "আঃ, ঐ তোমার এক কথা!

তাঁরা যে খান না, সে কথা তুমিও জান—আমিও জানি। কিন্তু কেমন ক'রে যে মানুষকে খাওয়াতে হয়, এই শিক্ষাটাই মানুষ তাঁদের নিবেদন করতে গিয়ে পেয়ে থাকে। এ যে আমার স্বামীর উদ্দেশে নিবেদন করা সেই ভোগ! আমি এখন এ নিয়ে কি করব ?"

স্বরে তীব্রতা নাই, জ্বালা নাই, এমন কি, কোথাও যেন কঠোরতার লেশমাত্র ছিল না! শুধু একটা করুণ, উদাস সুরের ব্যঞ্জনা কক্ষের বাতাসকে যেন অশ্রুসিক্ত করিয়া তুলিল।

সাহেবীয়ানায় অভ্যস্ত, পশ্চিমপন্থী, ডেপুটী নরেশের চিত্ত সহসা যেন পত্নীর আক্ষেপ-বেদনার পরিমাণ উপলব্ধি করিল। তিনি সুনন্দার দিকে চাহিলেন।

সুনন্দা টলিতে টলিতে বাহির হইয়া গেলেন।

যে ভৃত্য খাবার রাখিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, সে মুখ ফিরাইয়া লইল। যে দাসীটা পূর্ব্বে মুখে বস্ত্রাঞ্চল চাপিয়া হাস্য-নিরোধের চেষ্টা করিয়াছিল, সে এবার চোখের উপর অঞ্চল চাপিয়া দ্রুত চলিয়া গেল। দেবীপ্রসাদ জানালার গরাদে শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিল। নরেশচন্দ্রের মুখে অর্দ্ধসিদ্ধ ডিম আর উঠিল না। তিনি আহার্য্যগুলি ঠেলিয়া দিয়া দ্রুতবেগে কক্ষমধ্যে পদচারণ করিতে লাগিলেন।

অকস্মাৎ দাসদাসীর করুণ আর্ত্তনাদ অন্তঃপুর হইতে উত্থিত হইল। নরেশ ছুটিয়া ভিতরে গিয়া দেখিলেন, আহারের সমস্ত আয়োজন পরিপাটীরূপে সজ্জিত। তাহারই পার্শ্বে সুনন্দা মাটীতে লুটাইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন। সাহেব মুহূর্ত্তকাল সেই দিকে চাহিতেই তাঁহার চিত্ত পুনরায় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল! তিনি বলিয়া উঠিলেন, "রাবিশ!"

২

স্বামীর দেহ ও মনের সম্পূর্ণ পরিচয় সহধর্ম্মিণীর গভীর দৃষ্টিতে যেমন ধরা পড়ে, এমন বোধ করি, স্বামী নিজেও দেখিতে পায় না। স্বামীর দেহ ও মনের অতি সামান্য পরিবর্ত্তন স্ত্রীর দৃষ্টি অতিক্রম করে না। স্বামী যে ক্রমশঃ কৃশ ও মলিন হইয়া যাইতেছেন, ইহা সুনন্দা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। নরেশচন্দ্র পত্নীর উদ্বেগ দেখিয়া উহা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। গৃহচিকিৎসক পর্য্যন্ত সুনন্দাকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "আপনি চিন্তিত হবেন না। খাওয়া-দাওয়ার একটু ধরাকাট করলেই সেরে যাবে।"

কিন্তু সুনন্দা নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া ঠাকুর-ঘরে আসিয়া ধর্ণা দিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ স্মৃতিরত্নের তলব পড়িল। সুনন্দা আবেগভরে তাঁহাকে বলিলেন, "ঠাকুরের পায়ে তুলসী না দিলে ওঁর ব্যামো যে ভাল হবে না, বাবা!"

কিন্তু এ বাড়ীতে কোন শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান যে কিরূপ বিপদের কারণ, সে কথা ব্রাহ্মণ জানিতেন। তথাপি সুনন্দার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ বৃদ্ধ এড়াইতে পারিলেন না। স্থির হইল, সাহেবের অনুপস্থিতি সময়ে শান্তি-স্বস্ত্যয়নের মাঙ্গলিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া যাইবেন।

এক দিন কোন বিশেষ তদন্ত-কার্য্যে নরেশ মফঃস্বলে বাহির হইয়াছিলেন। ফিরিতে রাত্রি হইবে, এইরূপ জানা ছিল। কিন্তু শৃঙ্গধ্বনি করিয়া মোটর যখন ফটকে ঢুকিল, স্মৃতিরত্ন তখন পূজা সারিয়া গৃহে ফিরিতেছিলেন। তিনি পাশ কাটাইয়া সরিয়া গেলেন। তাঁহার গামছায় বাঁধা ২।৩টা ছোট বড় পুঁটুলী, হস্তে শালগ্রাম শিলা।

ব্রাহ্মণকে তদবস্থায় দেখিয়া ক্রোধে নরেশের আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। তিনি মোটর হইতে নামিবার সঙ্গে সঙ্গে দেখিলেন, পট্টবস্ত্রপরিহিত দেবীপ্রসাদ দ্রুতগতিতে পুরোহিত মহাশয়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় ভুলক্রমে কি যেন ফেলিয়া গিয়াছিলেন, তাহাই পৌঁছাইয়া দিতে বোধ হয় সে ছুটিয়া আসিয়াছিল।

অকস্মাৎ পিতৃদেবকে সম্মুখে দেখিয়া সে বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া গেল। নরেশচন্দ্র নিদারুণ ক্রোধ ও বিরক্তিভরে মুখ ফিরাইয়া লইলেন। অসহ্য অন্তঃপ্রদাহে ফুলিতে ফুলিতে তিনি বসিবার ঘরে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু সেখানেও নিষ্কৃতি নাই! তিনি দেখিলেন, তাঁহার অন্যতম স্পষ্টভাষী বন্ধু নিমাই বাবু প্রসাদী সন্দেশ, ফলমূল ইত্যাদি পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে ভোজন করিতেছেন! নিমাই বাবু পোষ্টাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, দূরসম্পর্কে নরেশের স্ত্রীর ভ্রাতা। এই মানুষটিই নরেশকে যখন-তখন খোঁচা দিয়া বন্ধু-বান্ধবদিগের সম্মুখে বিব্রত করিয়া থাকেন।

নরেশ তাঁহাকে দেখিয়া মনে মনে প্রমাদ গণিলেন।

নিমাই বাবু ভোজন অসমাপ্ত রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া অভিনয়ের ভঙ্গীতে দুই বাহু বিস্তার করিয়া গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "আরে, গৃহস্বামিন্ যে! আগচ্ছ! আগচ্ছ! আসতে আজ্ঞা হউক। ইহ তিষ্ঠ—ইহ তিষ্ঠ।"

মৃদু হাস্য রেখা তাঁহার অধরপ্রান্তে উদ্ভাসিত হইল। আসন গ্রহণ করিয়া পুনরায় গোটা-দুই সন্দেশ মুখে পুরিয়া চিবাইতে চিবাইতে বলিলেন, "ব্রাহ্মণ-আলয়ে ব্রাহ্মণ-সন্তান এই লোভেই ত পদার্পণ ক'রে থাকে! আঃ-হা-হা, তোমার সুমতি হোক্! এই

রকম পূজা-পার্ব্বণের সুব্যবস্থা হোক। দেব-দ্বিজে ভক্তি তোমার অচলা হয়ে থাকুক। অর্থাৎ অস্মদ্জাতীয় প্রাণীর লুচি-মণ্ডার একটু সু-ব্যবস্থার স্থান হোক্!" বলিয়া হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া বাড়ীটাকে যেন কাঁপাইয়া তুলিলেন।

নরেশের মনে হইতে লাগিল, এই লোকটাকে ধরিয়া আচ্ছা করিয়া চড়াইয়া দেন। কিন্তু নীরবে তিনি সমস্তই পরিপাক করিলেন।

ভিতরের ঘরে কি একটা পূজা তখনও চলিতেছিল। অকস্মাৎ কাঁসর, ঘণ্টা ও শঙ্খ-ধ্বনিতে বাড়ীটা যেন মুখরিত হইয়া উঠিল।

হাতের কোটটা চেয়ারের উপর ছুড়িয়া ফেলিয়া নরেশ য়ুরোপীয়ের অভ্যস্ত দীর্ঘ পদক্ষেপকেও অতিক্রম করিয়া সামরিক কায়দায় ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

একটি ক্ষুদ্র বিল্ববৃক্ষ রোপণ করিয়া তাহারই মূলে যথাবিহিত পূজা-অর্চ্চনা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু পূজার উপচার তখনও বর্ত্তমান। নরেশ সুনন্দাকে খুঁজিতে খুঁজিতে একবারে ঠিক স্থানটিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার ধৈর্য্য সীমা-রেখার প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই দৃশ্যে আর তিনি আত্ম-সংবরণ করিতে পারিলেন না। ভীষণ কণ্ঠে গর্জ্জন করিয়া কহিলেন, "এখানে এ গাছ পুতেছে কে? এত বড় দুঃসাহস হয়েছে কার, তাই আমি জান্তে চাই!"

দাস-দাসী যাহারা দাঁড়াইয়া ছিল, মনিবের ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া তাহারা স্থাণুর মত দাঁড়াইয়া রহিল!

নরেশ তাঁহার বুট মাটাতে প্রবলবেগে ঘষিতে ঘষিতে কহিলেন, "আমি জবাব চাই, কে এ কায করেছে।"

কে যে এই অপকর্ম্ম করিয়াছে, সে কথা মনিবটির বোধ করি অজ্ঞাত ছিল না। তবুও সে নামটি কাহারও মুখ দিয়া স্পষ্ট করিয়া বাহির হইতে চাহিল না।

ডেপুটীসাহেব সাহেবী ওজনে হাঁক দিলেন, "মালী!"

ছুটিয়া আসিয়া মালী মনিবের দিকে তাকাইয়া ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া রহিল।

হুকুম আসিল, "ফেলে দে ঐ গাছ! এখুনি দে বলছি!"

ধমক খাইয়া বেচারা ধীরপদে অগ্রসর হইতেই জপে নিযুক্তা সুনন্দা বৃক্ষপার্শ্বস্থ আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

তাঁহার আয়ত নেত্রের প্রশান্ত দৃষ্টি স্বামীর উপর স্থির হইয়া রহিল।

মালীটা সভয়ে পিছু হটিয়া আসিল। দাস-দাসীগণ অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল।

উজ্জ্বল সিন্দূর-রেখা সুনন্দার ললাটে তখন জ্বল্-জ্বল্ করিতেছিল, আলুলায়িত কুন্তলোপরি সাড়ীর লাল চওড়া পাড়টা কপালের উপর ঈষৎ ঝুঁকিয়া পড়ায়, সেই মধুর মুখশ্রীকে যেন আরও স্নিগ্ধ, আরও উজ্জ্বল, আরও মহিমা-মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছিল। স্বামীর ইষ্টকামনায় গত দিবস হইতেই সুনন্দার উপবাসে কাটিতেছিল, এখনও পর্য্যন্ত জলবিন্দু তাঁহার মুখে পড়ে নাই। কিন্তু সেই উপবাসক্লিষ্টা ভক্তিপরায়ণা নারীর মুখের দিকে তাকাইয়া মুহূর্ত্তের জন্য নরেশ আর চোখ ফিরাইতে পারিলেন না। কিন্তু এ তাঁহার ক্ষণিক দুর্ব্বলতা। পরমুহূর্ত্তেই পরুষ কণ্ঠে কহিলেন, "সরে দাঁড়াও, এ সব পাগলামি এখানে চল্‌বে না।"

সুনন্দা ঝাঁপাইয়া পড়িয়া দুই বাহুর দ্বারা বৃক্ষটিকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিলেন।

দেবরোষে পাছে স্বামীর অকল্যাণ হয়, এই আশঙ্কায় শঙ্কিতা নারী ব্যাকুলভাবে চতুর্দ্দিকে তাকাইতে লাগিলেন।

অবশেষে ত্রস্ত দৃষ্টিতে তিনি স্বামীর দিকে চাহিলেন। তাঁহার নয়নযুগল ভাষাময় হইয়া যেন স্বামীর কাছে ব্যাকুল আবেদন জানাইতে লাগিল।

অশ্রুসিক্তা পত্নীর নীরব মুখের দিকে চাহিয়া নরেশ মাথা নত করিলেন।

সুনন্দা অকস্মাৎ আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "হে ঠাকুর!—হে আমার দেবতা! আমার স্বামীর কোন অপরাধ নিও না, ঠাকুর! অপরাধের সমস্ত বোঝা আমার মাথায় চাপিয়ে দাও। আমার স্বামীকে তুমি নিরাময় কর, শান্ত কর, মানুষ কর। সারা জীবন ধ'রে এই প্রার্থনাই তোমাকে জানিয়ে এসেছি, ঠাকুর!"

অকস্মাৎ সুনন্দার নয়নযুগলের গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ তারকাযুগল স্থির নিশ্চল হইয়া গেল। দূর শূন্যে তিনি কি দেখিতেছিলেন, তাহা তিনিই জানেন।

এ দৃশ্যে নরেশ একবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন।

ইহা ত বৃক্ষের অর্চ্চনা নহে! কাহাকে উপলক্ষ করিয়া এ কাহার প্রতি আত্ম-নিবেদন! এই পূজার অন্তরালে শুধু স্ত্রীর—হিন্দুনারীর স্বামিপ্রেমের গাঢ়, অতুলনীয় অভিব্যক্তি দেখিয়াই পাশ্চাত্য সভ্যতাপ্রাপ্ত নিরীশ্বরবাদী নরেশের মনে একটা প্রচণ্ড আন্দোলন অনুভূত হইল!

এত দিন সম-মতাবলম্বী কোন কোন বন্ধুর সহিত নরেশ হিন্দুর পূজাপদ্ধতির অসারতা লইয়া কত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু আজ যেন কে তাঁহার এই সিদ্ধান্তের মূল ধরিয়া সজোরে নাড়া দিতে লাগিল। সোজা মাথাটা আর তিনি

খাড়া রাখিতে পারিলেন না। উহা যেন ক্রমশঃ মাটীর দিকে নত হইয়া পড়িতে লাগিল।

নিমাই বাবু এমন সময় পশ্চাৎ দিক্ হইতে আসিয়া বৃক্ষমূলে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "দেখ নরেশ! ওঁর এই অনুষ্ঠানটিকে গ্রহণ করতে যদি না-ও পারো, অশ্রদ্ধা কোরো না! এই অবিচলিত বিশ্বাসে আর অপ্রমেয় শ্রদ্ধার ভিতর দিয়েই হিন্দুনারী স্বামীকে চিনেছিল, পেয়েছিল, প্রাণটাকে বিলিয়ে দিয়েছিল। এ যদি যায় তো জান্‌বে, এ যাওয়ার বদলে যা আমরা পেলাম, সে সোনার বদলে একমুঠো ছাইও নয়।"

মনের মধ্যে যাহাই থাকুক, নরেশ কিন্তু বন্ধুর সম্মুখে প্রকাশ্য-ভাবে দম্ভটাকে ত্যাগ করিতে পারিলেন না। প্রত্যুত্তরে কহিলেন, "আচ্ছা! তোমার থিওরিটা সময়মত ভেবে-চিন্তে দেখব!" বলিয়াই তিনি চলিয়া যাইতেছিলেন। নিমাই পুনশ্চ ডাকিয়া কহিলেন, "ওহে, থিওরি নয়, এ একেবারে মোটা সোজা সাদা কথা, শ্রদ্ধা না থাকলে ভালবাসা কোন দিনই বাঁচে না। তোমরা যে বস্তু বানাতে যাচ্ছ, সে শ্রদ্ধাহীন ভালবাসা, একবারেই নিছক বাইরের জিনিষ। ওতে শান্তি আসে না। প্রাণের ধারে ওর ঘেঁষবার অধিকার নেই, ভায়া।"

নরেশ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "এটাও ভবিষ্যতের জন্য রইল।"

তিনি শয়নকক্ষের দিকে ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। ঘরের মধ্যে পা দিয়াই তিনি যেন আবিষ্টের মত দাঁড়াইলেন। দেখিলেন, একখানি জলচৌকির উপর তাঁহার নিজেরই তৈলচিত্রখানি স্থাপিত। যথারীতি ইহারও পূজা হইয়া গিয়াছে। উপকরণ-গুলি এখনও সরান হয় নাই। এমন কি, ভোগের আহার্য্যগুলি পর্য্যন্ত সেখানেই রহিয়াছে।

দেখিতে দেখিতে নরেশের বুকের ভিতর যেন কেমন করিয়া উঠিল। 'শ্রদ্ধা না থাকিলে যে ভালবাসা বাঁচে না। শ্রদ্ধাহীন ভালবাসা যে বাহিরের বস্তু,' নিমাই বাবুর এই কথাটাই ক্রমাগত তাঁহার বুকের ভিতর পাক খাইতে লাগিল।

যে বস্তু মিথ্যা, প্রাণহীন, সামান্য একটা প্রতিচ্ছবি মাত্র, তাহারই সম্মুখে যে এমন করিয়া শ্রদ্ধার অঞ্জলি নিবেদন করিতে পারে, নিজেকে যে এমন একান্তভাবে আর এক জনের ভিতর লীন করিয়া দিতে পারে, সত্যকে যে সে কি ভাবে আয়ত্ত করিয়াছে, ইহার মাধুর্য্যটুকু উপলব্ধি করিবার মত অনুভূতি নরেশের চিত্তক্ষেত্র হইতে বোধ হয় নির্ব্বাসিত হয় নাই!

তিনি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া প্রত্যেক খুঁটি-নাটি বস্তুটি পর্য্যন্ত পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। সুনন্দা বোধ করি উপকরণগুলি সরাইয়া লইতে আসিতেছিলেন। স্বামীকে এই অবস্থায় দেখিয়া ছুটিয়া তাঁহার পায়ের উপর গিয়া উপুড় হইয়া পড়িলেন।

নরেশের মনের মধ্যে তখন কোন্ ভাবের তরঙ্গ বহিতেছিল, তাহা প্রকাশ পাইল না। তবে তিনিও সেইখানেই ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িয়াছিলেন, ইহা প্রত্যক্ষ ব্যাপার!

পত্নীর আলুলায়িত কেশরাজির মধ্যে ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে বুলাইতে তিনি কহিলেন, "কি করতে হবে এখন আমায়, তাই বল।"

সঙ্গে সঙ্গে নরেশের মুখমণ্ডল সাগ্রহে স্ত্রীর মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল।

সুনন্দার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না। শুধু স্বামীর দুই পায়ের তলায় মাথাটিকে ন্যস্ত করিয়া তিনি তপ্ত অশ্রুর অবিশ্রান্ত ধারায় পা-দুইখানি অভিষিক্ত করিয়া দিলেন।

৩

আশ্বিন মাস, শারদীয়া দুর্গা-পূজা আসন্ন। ছুটীর দিনে নরেশের বৈঠকখানা-গৃহে কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু নিয়মিত ভাবে আসিয়া গল্প করিতেছিলেন। শ্রীমতী ভড়ও স্বামীর সঙ্গে এ বৈঠকে যোগ দিয়াছিলেন। এমন প্রায়ই হইত।

মজলিশ বেশ জমিয়া উঠিয়াছে, এমন সময় তিন জন ভদ্র-লোক কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিলেন।

স্থানীয় প্রবাসী বাঙ্গালীরা মিলিয়া শারদীয়া দুর্গা-পূজা করিয়া থাকেন। চাঁদা-সংগ্রহ করিতে তাঁহারা বাহির হইয়াছিলেন।

ক্ষুদ্র একটু ভূমিকা করিয়া, উদ্দেশ্যটা প্রকাশ করিতেই য়ুরোপীয় পরিচ্ছদধারী কক্ষস্থ সকলেরই ওষ্ঠপ্রান্তে চাপা হাসি খেলিয়া গেল।

নিজের বাড়ী বলিয়াই বোধ করি নরেশ চুপ করিয়া ছিলেন। কিন্তু নব্য হাকিম অচঞ্চল হোড় আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না। কহিলেন,—"মহাশয়দের সঙ্গে আমরা ত এখনও ক্ষেপে যাইনি। কাণ্ডজ্ঞান ব'লে বস্তু আমাদের কিছু কিছু আছে।"

ইহার পরেই চারিদিক্ হইতে শাণিত বিদ্রূপের যে সকল অস্ত্র বর্ষিত হইতে লাগিল, তাহাতে আগন্তুকত্রয় অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের শিষ্টতায় পরম পরিতৃপ্ত হইয়াই কাণ্ডজ্ঞান-বর্জ্জিতের দল হেঁটমুণ্ডে কক্ষত্যাগের জন্য পা বাড়াইলেন।

এমন সময় ভিতর হইতে ঝি ছুটিয়া আসিয়া হাঁপাইতে

হাঁপাইতে কহিল,—"আপনারা যাবেন না। মা, বাবুর কল্যাণে এই ১০৲ টাকা পূজার জন্ম পাঠিয়েছেন।"

ঝি নোটখানা তুলিয়া ধরিল।

নরেশচন্দ্র অকস্মাৎ গর্জ্জন করিয়া কহিলেন,—"খবরদার বলছি, ছোঁবেন না ঐ টাকা।" বলিয়াই দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া আসিয়া ঝির হাত হইতে নোটখানা ছিনাইয়া লইয়া টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। দাসীটা ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া রহিল। আগন্তুকের দল স্তম্ভিতভাবে মুহূর্ত্ত দাঁড়াইলেন। সম্মুখে বাজ পড়িলে যে অবস্থা হয়, এক-ঘর মানুষের সেই অবস্থা হইল।

নরেশ কঠোর কণ্ঠে বলিলেন, "সাধারণ পায়খানা গড়বে বলেও যদি চাঁদা চাইতে আসত, আমি বিশ টাকা দিতে প্রস্তুত ছিলাম! আর দেখলেন তো কাণ্ড! কি মানুষ নিয়ে আমায় সংসার করতে হয়।"

তাঁহার দেহ তখনও থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল।

ভড় সাহেবের কন্যা ভিতরে ছিল। ছুটিয়া আসিয়া সে কহিল,—"মা, শীগ্‌গির এস। কাকীমা যেন কেমন কচ্ছেন। মুখ-চোখ যেন কেমন হ'য়ে গিয়েছে।"

মায়ের হাত ধরিয়া টানিতেই তাহার জননী একটু নাসিকা কুঞ্চিত করিলেন মাত্র।

নরেশ দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া কহিলেন,—"কিছু করতে হবে না আপনাদের। উনি একটি বদ্ধ পাগলবিশেষ। আপনারা গেলেই পাগলামী তা'তে বাড়বে।"

নরেশচন্দ্র নিজের আসনে আসিয়া বসিয়া হাঁপাইতে লাগিলেন।

অকস্মাৎ এই অভাবনীয় কাণ্ড দেখিয়া সকলেই যেন অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছিলেন। নরেশের পায় বাতের ব্যথা ছিল। বছর তিনেক পূর্ব্বে এই ব্যাধির জন্য তিনি প্রায় চারি মাস শয্যাগত হইয়া ছিলেন। ক্রোধের উত্তেজনায় এতক্ষণ তাঁহার হুঁস ছিল না; বোধ হয়, এই ছুটাছুটিতে বেদনার স্থানটি আঘাত পাইয়াছিল। নরেশ বিকৃত মুখে সেই স্থানটি টিপিয়া ধরিয়া অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করিতে লাগিলেন। প্রতি দিন এই সময়ে তাঁহার পায় মালিশ চলিত।

যে চাকরের উপর এই কার্য্যের ভার ছিল, সে আসিয়া সবিনয়ে জানাইল যে, কর্ত্রীঠাকুরাণী হুকুম দিয়াছেন, তাহাকে আর মালিশ করিতে হইবে না।

হুকুম শুনিয়া সকলেই পরস্পরের মুখের দিকে চাহিলেন।

ভড়-জায়া বিদ্রূপের ভঙ্গিতে কহিলেন,—"তবে কি করতে হবে? মানুষটাকে তিনি মেরে ফেলতে চান?"

হোড় সাহেব মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "শিক্ষার ত্রুটি এ সব। দুঃখ করলে কি হবে বলুন।"

নরেশ স্ত্রীকে ক্ষিপ্তা, প্রেতিনী ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করিয়া যে কাণ্ড করিতে আরম্ভ করিলেন, তাহা বর্ণনাতীত। ভড়-পত্নী নিজের স্বামি-প্রীতির গভীরতা ও প্রশস্ততার পরিমাণ উপস্থিত সকলকেই শুনাইয়া দিবার জন্ম পাশে উপবিষ্ট হোড় সাহেবকেই লক্ষ্য করিয়া বুঝাইতে লাগিলেন। তাঁহার চিররুগ্ন স্বামীর জন্ম কি চমৎকার অভিনব ব্যবস্থা তিনি করিয়া দিয়াছেন, তাহাই সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া, গদগদকণ্ঠে কহিলেন, "নরেশ বাবুর স্ত্রী এ কায পারলেন কি ক'রে? আমরা ত পারতুম না। মিঃ ভড় খরচের ভয়ে আপত্তি করেছিলেন। কিন্তু আমি কোনমতেই শুনলাম না। কলকাতায় তার ক'বে দিয়ে নার্শ একটা এনে তবে আমি ছেড়েছি। এখন সেই সব কচ্ছে। মাইনের চাকর না হ'লে অত ঝঞ্ঝাট আর কেউ পোয়াতে পারে?"

তাঁহার স্বামিভক্তির পরিমাণটা উপলব্ধি করিয়া বোধ হয় সকলেই শ্রদ্ধায় বিগলিত হইয়া গেলেন। নিজের দুরদৃষ্টের জন্ম নরেশের দুঃখের আর অন্ত ছিল না। এখন ক্ষোভে এবং মর্ম্ম-পীড়ায় কান্না যেন নরেশের গলা পর্য্যন্ত ঠেলিয়া আসিতে লাগিল।

বেয়ারাটা পুনশ্চ মালিশের তৈল ইত্যাদি আনিতে গিয়াছিল। শূন্যহস্তে ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইতেই নরেশ একবারে ক্ষেপিয়া উঠিলেন। তীব্র শ্লেষের সঙ্গে কহিলেন, "ঠাকরুণকে বল গিয়ে, একটু বিষ জলে মিশিয়ে পাঠিয়ে দিতে। সেইটুকু ভোজন ক'রে আমি একবারে নিষ্কৃতি পেয়ে যাই।"

সম্ভবতঃ ভড়ের পত্নী-সৌভাগ্যের তুলনাটা তাঁহার চিত্তকে আরও বিক্ষুব্ধ করিয়া থাকিবে। মুখখানা বিকৃত করিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "একটু বেশী ক'রে দেওয়া হয় যেন। যদি বেঁচে যাই, তা হ'লে ত পাগলামি তার চলবে না!"

ঠিক এমনই সময় দাসীর হস্তে মালিশের সরঞ্জাম এবং নিজে গরম জলের ব্যাগটা হাতে করিয়া ধীরপদবিক্ষেপে সুনন্দা আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের কন্যা, সচরাচর বড় একটা কাহারও সাক্ষাতে বাহির হইতেন না, ইহাও ছিল নরেশের একটি প্রবল আক্ষেপ। আজ তাঁহাকে অকস্মাৎ এই-ভাবে এতগুলি লোকের সাক্ষাতে বাহির হইতে দেখিয়া সকলেই স্তব্ধবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন। সুনন্দা অবগুণ্ঠনটা ঈষৎ টানিয়া দিয়া স্বামীর পায়ের কাছে আড়ভাবে বসিয়া ব্যাগটা হাঁটুর উপর চাপিয়া ধরিলেন। নরেশ একটি কথাও কহিতে পারিলেন না। কেন যে চাকরের দ্বারা মালিশ বন্ধ হইয়াছিল, এখন তাহার
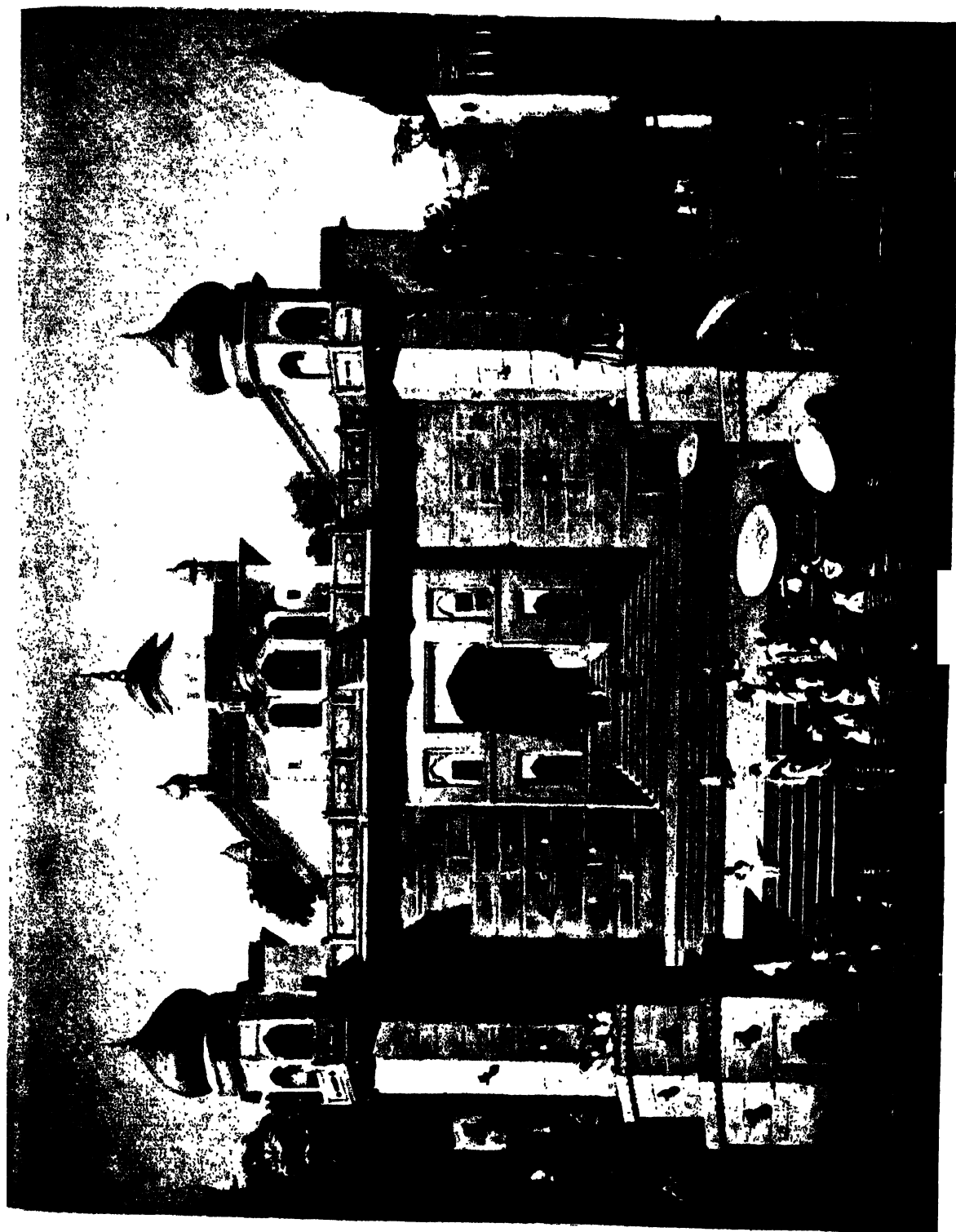
নিগূঢ় অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া পাংশু-বিবর্ণ মুখে, স্তব্ধ-বিস্ময়ে মূঢ়ের মত চাহিয়া রহিলেন।

দলের যাঁহারা এত দিন পর্দ্দা ও অবগুণ্ঠনকে নারীত্ব-বিকাশের অন্তরায় বলিয়া স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়াছিলেন, আজ যেন কে তাঁহাদের মুখের উপর একটা ভারী, পুরু কালো যবনিকা টানিয়া দিল।

ঝি মালিশের সরঞ্জাম ইত্যাদি পাশেই রাখিয়াছিল। সুনন্দা বেয়ারাটাকে পায়ের জুতাটা খুলিয়া লইতে বলিলেন। বোধ করি, একটুখানি টান পড়িয়াছিল। নরেশ 'উঃ' করিয়া পা টানিয়া লইতেই সুনন্দা চাকরটাকে নিষেধ করিয়া অনুচ্চ শান্ত-কণ্ঠে ডাকিলেন, "দেবী!—একবার এ দিকে আয় ত, বাবা!"

পুত্র সম্মুখে আসিতেই তিনি কহিলেন, "জুতাটা খুলে নে, বাবা! চাকরটা পারছে না, ওঁর কষ্ট হচ্ছে।"

আদেশ পাইবামাত্র দেবীপ্রসাদ সন্তর্পণে জুতা খুলিতে বসিয়া গেল। যেন এতক্ষণ সে মাতার এই আদেশেরই প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিল। অথচ এই দেবীপ্রসাদ এক দিন পিতার আজ্ঞায় একটা সামান্য কাপড়ের বাণ্ডিল হাতে করিয়া দোকানের দরজার সম্মুখে দাঁড়ান গাড়ীখানায় উঠিতে পারে নাই!

তাহার এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তনে নরেশ যেন আবিষ্টের মত হইয়া রহিলেন। শুধু অলক্ষ্যে তাঁহার দুই চক্ষু ছাপাইয়া জল আসিতে লাগিল।

রাজেন্দ্র বাবু প্রবীণ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। সকলেই তাঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিত। তিনিও এই সভায় নিয়মিতভাবে যোগদান করিয়া থাকেন। কিন্তু কোন দিন তাঁহাকে কোন বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতে কেহ কখনও শোনে নাই। আজ তিনি অকস্মাৎ তাঁহার প্রকৃতিগত মৌনতা ভঙ্গ করিয়া গভীর আক্ষেপের সঙ্গে মৃদু স্বরে কহিলেন, "এত বড় আদর্শটাকে হত্যা করতে বসেছি আমরা!"

সকলেই তাঁহার মুখের দিকে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। কেবল নিমাই বাবু লাফাইয়া উঠিয়া কহিলেন, "আমি চল্লুম ঐ দশটা টাকা দিতে!" রাজেন্দ্র বাবু পুনশ্চ ধীর শান্তকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, "দেওয়াই ত উচিত এবং সঙ্গত। লাঞ্ছনা ও তিরস্কার, অপমান ও অখ্যাতি, এ সমস্ত তুচ্ছ করা কি সহজ শক্তির প্রয়োজন? কিছুই তো কোন কাযে লাগল না। মুক্ত অনাবিল স্বামি-প্রেম সকলকেই ছাপিয়ে তার উন্নত শির আরও উন্নত করেই দাঁড়াল। ঐ টাকা দশটা তো তারই নিদর্শন।"

ভড়-পত্নী যেন মনে মনে জ্বলিতেছিলেন। উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "চলুন, মিঃ হোড়!"

হোড় যাইতে যাইতে অনুচ্চস্বরে কহিলেন, "ছিঃ-ছি-ছিঃ, নরেশ বাবুর বাড়ীর লোকগুলোর 'কালচারটা' যে এত ছোট, তা আমি জানতাম না।"

মিসেস্ ভড় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, "এতগুলো মানুষের সাক্ষাতে অমনি ক'রে পায়ের কাছে বসতে লজ্জা করল না ওর। যেন এ বাড়ীর দাসী!" বিরসমুখে তিনি কন্যাসহ গাড়ীতে গিয়া উঠিয়া বসিলেন।

৪

প্রতি বৎসর এই সময়ে নরেশ ঘটা করিয়া তাঁহার জন্মোৎসব করিতেন। বন্ধু-বান্ধবদিগকে পরিতোষ করিয়া ভোজন করানই ইহার মূল উদ্দেশ্য। এবারও তাহার উদ্যোগ-আয়োজনের ধূম পড়িয়াছিল।

মালীর ছেলেটার কয়েকদিন হইতে জ্বর। সুনন্দা তাহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। ফিরিবার মুখে বৃষ্টির জন্য বাবুর্চ্চি-মহলের সম্মুখে আসিয়া তিনি দাঁড়াইয়া পড়িলেন। এ দিকে সুনন্দা কদাচিৎ আসিতেন।

উৎসব উপলক্ষে জিনিসপত্র খরিদ হইয়া আসিয়াছে। সুনন্দা কৌতূহলী হইয়া প্রশ্ন করিলেন, "ও করিম, বলি কি কি এনেছ, আমায় দেখাও।"

করিম ব্যস্ত হইয়া জিনিষ-পত্র দেখাইতে সুরু করিয়া দিল। কিন্তু তাহার কর্ত্রীর দৃষ্টি ছিল অদূরে রজ্জুবদ্ধ বৃহদাকৃতি জঙ্গলী হংসযুগলের উপর। তাহাদের করুণ সজল চক্ষু দুইটির পানে চাহিয়া চাহিয়া অকস্মাৎ সুনন্দার দুই চোখ ছাপাইয়া জল আসিতে লাগিল।

তিনি কহিলেন,—"দেখ বাছা, তুমি বাপু বড় নিষ্ঠুর! মুখ ফুটে যেন ওরা দুঃখ-কষ্ট জানাতেই পারে না, তাই বলেই কি অমনি ক'রে বেঁধে রাখতে হবে? দেখ দেখি, পা দুটোর অবস্থা। ও যে ভেঙ্গে গেল।"

সুনন্দা মনে করিয়াছিলেন, করিম ইহাদের লালন-পালন করিতেই বুঝি আনিয়াছে। কিন্তু প্রত্যুত্তরে বাবুর্চ্চী তাহার কর্ত্রীকে যখন হেতুটা বিবৃত করিয়া কহিল, "কাল ত ওদের জবাই করতেই হবে, মাঠান্, তার আবার ভাঙ্গা আর আস্ত! ওগুলো ত সাহেবদের খানায় লাগবে ব'লে এসেছে।"

এ সংবাদে সুনন্দা চতুর্দ্দিকে যেন একবারে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। বাবুর্চ্চি অতটা বুঝিতে পারে নাই। সে পুনশ্চ কহিল, "ওরাও স্বামি-স্ত্রী, মা—একটার গলা কাটার সময় আর একটা যা চেঁচাবে! বড় জবর ভাব ওদের মধ্যে, একেবারে মনিষ্যিদের মত।"

কথা বলিয়া সে মুখ তুলিতেই দেখিতে পাইল, তাহার কর্ত্রী-ঠাকুরাণী কাণে আঙ্গুল দিয়া থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছেন! সে লোকটা হতবুদ্ধির মত ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল।

অদূরে খুঁটায় বাঁধা শুটিচারেক দুগ্ধপোষ্য মেষ-শাবক। বোধ করি, ক্ষুধার তাড়নায় মায়ের উদ্দেশ্যে ম্যা ম্যা করিয়া চেঁচাইয়া উঠিল।

সুনন্দা আর দাঁড়াইতে পারিলেন না। বক্ষঃস্থল সজোরে চাপিয়া ধরিয়া সেই অবিশ্রান্ত ঝড়-জল মাথায় করিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

কাছারীর পর জলযোগান্তে নরেশ চাকরটাকে ধমকাইতে-ছিলেন। ঐ কয়টা পক্ষী ও জানোয়ারগুলি উদরে পুরিয়াও যে তাঁহার বন্ধুবর্গের ক্ষুধার নিবৃত্তি হইবে না, ইহাই ছিল তাঁহার রোষের হেতু।

সজোরে মাটীতে এক পদাঘাত করিয়া তিনি কহিলেন, "যেমন ক'রে হোক, আর একজোড়া হাঁস আমি চাই-ই।"

ঠিক এমনই সময় সুনন্দা আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন।

তিনি কাতরকণ্ঠে কহিলেন, "ওগো, এতগুলি জীবহত্যা হবে, তোমার জন্মতিথিতে?"

নরেশ পরম শ্লেষের ভঙ্গিতে হাত নাচাইয়া কহিলেন, "তবে কি সত্যনারায়ণের পূজো হবে? ভাল মুস্কিল!"

সুনন্দা স্বামীর সম্মুখে আসিয়া যুক্তকরে কহিলেন, "এবারটির মত আহারের আর কোন ব্যবস্থা না হয় ক'রে দাও। আমি যে ওদের কাঁদতে দেখে এসেছি। ওগো, ওরা যে স্বামি-স্ত্রী!"

নরেশ মুখ ফিরাইয়াই রহিলেন।

সুনন্দা পুনরায় বলিলেন, "আমি নিজে হাতে সব ক'রে-কম্মে দিচ্ছি। তাঁদের খাওয়ার কোন কষ্ট হবে না।"

নরেশ এবার ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "দেখ, অনর্থক তোমার ঘ্যানঘ্যানানী আমার ভাল লাগে না। তাঁরা কেউ উপুসে বামুনঠাকুর নন। তোমার থোড় ডুমুর মোচা আর ঐ কুমড়ার পিণ্ডি তাঁদের কারও গলা দিয়ে গলবে না।"

স্বামীর কথা তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল কি না, বুঝা গেল না। তিনি দুই চক্ষু স্বামীর মুখের উপর স্থাপিত করিয়া অপলক-দৃষ্টিতে কি যেন দেখিতেছিলেন। অকস্মাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া সুনন্দা বাহির হইয়া গেলেন।

বাবুর্চ্চিটা কি একটা প্রয়োজনে তখন বাঙ্গলোর দিকে আসিয়াছিল। সুনন্দা তাহাকে ডাকিয়া অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া কহিলেন, "আমার একটি কথা তোমায় রাখতে হবে, বাছা! ঐ পাখীগুলো উড়িয়ে দিতে হবে কিন্তু। আর ঐ যে কচি শিশু চারটিকে বেঁধে রেখেছ, ওদের মায়ের কাছে পৌঁছে দিয়ে এস। দুধ না খেয়ে গলা যে ওদের শুকিয়ে গেল, করিম!" বলিয়াই অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে কহিলেন, "সাহেবকে কাল বলবে, মায়ীজী এসে সব খুলে উড়িয়ে পুড়িয়ে দিয়ে তবে চ'লে গিয়েছেন, বুঝলে।"

সুনন্দা তার পর কণ্ঠহার উন্মোচন করিয়া কহিলেন, "এই নাও তোমার বক্‌সিস্। বউকে দাও গিয়ে।"

এমন অদ্ভুত হুকুম সে বেচারা জীবনে কখনও শোনে নাই। সে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল।

সুনন্দা ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "পারবে না আমার কথা রাখতে? সে কথা বল-লেই হোত!"

দ্রুতপদে তিনি ভিতরে চলিয়া গেলেন।

দেবীপ্রসাদ ঘরের মধ্যে গভীর মনযোগসহকারে একখানা বই পড়িতেছিল। সুনন্দা আসিয়া ধপ্ করিয়া পাশে বসিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিলেন, "ও দেবী, এখন কি হবে, বাছা!"

দেবীপ্রসাদ তাড়াতাড়ি পুস্তকটা মুড়িয়া রাখিয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাইতেই জননী পুত্রের কাছে বাবুর্চ্চিখানা-ঘটিত ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া কহিলেন, "ওরে বাছা, তোদেরও স্বামি-পুত্তুরের ঘর। অবলা জীব-জানোয়ার ব'লে মুখ দিয়েই না হয় বলতে পারছে না। কিন্তু তাদের চোখ-মুখ পানে আর চাওয়া যায় না। দেখলে বুক ফেটে যায় যে! বাবা, আমার মত তারাও যে স্বামি-পুত্তুর নিয়ে ঘর করে!"

দেবীপ্রসাদ বিস্মিত দৃষ্টিতে মাতার দিকে চাহিয়া রহিল। সুনন্দা অশ্রুত্যাগ করিতে করিতে বলিলেন,—"না বাবা, তুই একটা কিছু আজ কর, দেবী।"

দেবীপ্রসাদ নৈরাশ্যপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, "না মা, এ বন্ধ হবার কোন উপায় নেই।"

সুনন্দা সবেগে মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "আছে। যাঁরা আসবেন, তাঁরা যদি না খেতে চান। তুই একবার চল দেখি আমার সাথে। আমি হাতে-পায়ে ধরলে কেউ তাঁরা ও-সব ছোঁবেনও না।"

দেবীপ্রসাদের ইচ্ছা হইল যে, সে তাহার এই মূর্ত্তিমতী স্নেহময়ী জননীকে মাথায় করিয়া বাহির হইয়া পড়ে। কিন্তু সে তাহার এই সকল পিতৃবন্ধুকে ভাল করিয়াই চিনিত। তাই সে কঠিন হইয়া কহিল, "না, মা! সে হবে না। তোমাকে এত বড় অপমান স্বীকার করতে আমি দেব না।"

সুনন্দা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "ওরে পাগলা, আমার

বাইরের অপমানটাই তুই দেখলি—আমার ভিতরটা যে কি হয়ে যাচ্ছে, সে কথা কি তোরা কোন দিনই বুঝবি না।"

চোখ মুছিতে মুছিতে তিনি কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

পরদিন প্রত্যুষে সুনন্দা নিজেই দাসীকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইতেছিলেন। নরেশের চোখে পড়ায়, কঠোর জেরার মুখে সমস্ত প্রকাশ হইয়া পড়িল।

ক্রোধে আত্মবিস্মৃত নরেশ স্ত্রীকে এমন লাঞ্ছনা ও অপমান করিলেন যে, বাড়ীর দাস-দাসীগুলি পর্য্যন্ত শুনিয়া কানে আঙ্গুল দিল।

বেলা দুইটা আন্দাজ সময়ে উদ্যোগ-আয়োজনের ঘটা পড়িয়া গেল। ক্রমশঃ নিমন্ত্রিতদের কল-কণ্ঠে সমস্ত বাড়ীটা মুখরিত হইয়া উঠিল।

সুনন্দা সমস্ত দিন ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া পড়িয়া ছিলেন। অপরাহ্নে জানালাটা খুলিয়াই ভয়ে শিহরিয়া উঠিয়া জানালার গরাদে দুই হাতে শক্ত করিয়া ধরিয়া কাঁপিতে লাগিলেন।

কেমন করিয়া গলা টিপিয়া হত্যা করিলে ভিতরের রক্ত এক বিন্দুও বাহিরে আসিবে না, বাবুর্চিখানার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, মিঃ ভড়, এই বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াটি খানসামাটাকে বিশদভাবে বুঝাইতেছিলেন।

সুনন্দার কাণের স্নায়ু শিরা কে যেন সাঁড়াসী দিয়া টানিয়া টানিয়া ছিঁড়িতে লাগিল। পরক্ষণেই বোধ করি, শেষ চেষ্টা দেখিবার জন্য উন্মাদিনীর মত তিনি স্বামীর উদ্দেশ্যে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলেন। নরেশ তখন বাহিরের ঘরে ছিলেন না, কয়েক-জন বন্ধু বসিয়া বসিয়া গল্প করিতেছিলেন।

সুনন্দা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন। পরে ফিরিয়া চলিলেন। কে এক জন প্রশ্ন করিলেন, "নরেশ বাবুর স্ত্রী না? অন্তত আজ ওঁকে ঘরে আটকে রাখা উচিত ছিল। পাঁচ জন নিমন্ত্রিত ভদ্রসজ্জনের সামনে—"

অপর ব্যক্তি সায় দিয়া কহিলেন, "হ্যাঁ, মিসেস ভড় বলছিলেন বটে। সে দিন নাকি মিঃ রায়ের পা জড়িয়ে কতকগুলি বিশিষ্ট ব্যক্তির সামনে অসঙ্কোচে ব'সে রইলেন।"

বন্ধুরা উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন। নরেশ সেই সময় ঘরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। স্ত্রীর সম্বন্ধে বন্ধুদের সমস্ত আলোচনাটাই তাঁহার শ্রুতিগোচর হইয়াছিল। সুনন্দা যে এ ঘরে আসিয়া-ছিলেন, তাহাও তিনি দূর হইতে দেখিয়াছিলেন।

অগ্নিগর্ভ গিরির ন্যায় তিনি সুনন্দার সম্মুখে গিয়া কহিলেন, "আমার মুখটা এমনি ক'রে না পুড়িয়ে গঙ্গায় গিয়ে ডুবে মর।"

যেমন ভাবে আসিয়াছিলেন, ঠিক তেমনই ভাবেই নরেশ বাহির হইয়া গেলেন।

লজ্জায় ধিক্কারে সুনন্দার সত্যই আজ মরিতে ইচ্ছা হইল।

ভড় সাহেবের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় হত্যাকাণ্ড সুরু হইয়া-ছিল। সুনন্দা তাড়াতাড়ি জানালাটা বন্ধ করিতে যাইয়া নিশ্চল নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইলেন।

একটা হাঁস বার-দুই ক্যাঁ-ক্যাঁ করিয়া স্থির হইয়া গেল। অপরটি এমন করুণ আর্ত্তনাদ সুরু করিয়াছিল যে, সুনন্দার বুকখানা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গুঁড়া গুঁড়া হইয়া গেল।

পরমুহূর্ত্তে অকস্মাৎ একটা বিকট শব্দ করিয়াই হাঁসটা জন্মের মত স্তব্ধ হইয়া গেল।

কয়েকজন পুরুষ ও মহিলা-বন্ধু ওখানে দাঁড়াইয়া এই তামাসা দেখিতেছিলেন। তাঁহারা বঙ্গ দেখিয়া হাসিয়া একবারে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিলেন।

সুনন্দা তখন নিজের ঘরে বেতস-পত্রের মত কাঁপিতেছিলেন। অকস্মাৎ তাঁহার কণ্ঠ হইতে তীব্র আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল—"মাগো! আমার স্বামীকে রক্ষা কর!" তাঁহার মূর্চ্ছিত দেহ ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল।

নরেশ তখন পাশের ঘরে ছিলেন। অসহ্য ক্রোধে তাঁহার আর জ্ঞান রহিল না। পাছে এই উন্মাদিনী, আবার তাঁহার বন্ধুদের আরামের বিঘ্ন উৎপাদন করে, এই আশঙ্কায় দ্রুতপদে ভিতরে আসিয়া, শিকলটা টানিয়া দিয়া বাহির হইয়া গেলেন। ভিতরে যে মানুষটা কি ভাবে পড়িয়া রহিল, সেটুকু দেখিবার প্রবৃত্তিও তাঁহার আর রহিল না।

দাসীর মুখে সংবাদ পাইয়া দেবীপ্রসাদ ছুটিয়া আসিল। সুনন্দার সংজ্ঞাহীন দেহটা মেঝের উপর লুটাইতেছিল। কপাল কাটিয়া যেন রক্তের নদী বহিতেছে!

দেবীপ্রসাদ মায়ের মাথা কোলের উপর তুলিয়া লইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। ক্রন্দন শুনিয়া দাস-দাসী ছুটিয়া আসিল। নরেশ বৈঠকখানায় ছিলেন, তিনিও উপস্থিত হইলেন। বন্ধুরাও দরজার উপর ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া উঁকি মারিয়া দেখিতে লাগিলেন। পাখার বাতাস ও জলের ঝাপটায় সুনন্দার চৈতন্য ফিরিয়া আসিতেই পুত্রকে জড়াইয়া ধরিয়া চতুর্দ্দিকে তাকাইতে লাগিলেন।

ঝি পাশেই দাঁড়াইয়া ছিল কহিল,—"মা, বাবুকে খুঁজছেন।"

নরেশ অপরিসীম বিরক্তির সঙ্গে কহিলেন,—"আচ্ছা আচ্ছা, হয়েছে। আপনি এখন বক্তৃতাটা কম ক'রে চালান।"

নরেশ দ্রুতপদে সে কক্ষ ত্যাগ করিলেন। বন্ধুরাও এক এক

করিয়া বাহির হইতেছিলেন। হোড় সাহেব দুঃখ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "মিঃ রায়ের উচিত, ওঁকে কোন মেণ্টাল হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া।" একবাক্যে সকলেই ইহার সমর্থন করিলেন। করিলেন না কেবল ভড়-পত্নী। তিনি ঝাড়া জবাব দিয়া কহিলেন, "ওঁর এখন মরাই-মঙ্গল। একটা মানুষের জীবনকে উনি একেবারে দুঃর্ভর ক'রে তুলেছেন!"

ও-ঘর হইতে ঝি কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিতেছিল, "মা বাবুর জন্য ভাবতে ভাবতেই প্রাণটাকে তাঁর বার ক'রে দিল।"

নরেশ বাহিরের ঘরে পা দিয়াছিলেন। কথাটা শুনিবামাত্রই অকস্মাৎ তিনি পা আর উঠাইতে পারিলেন না।

দেবীপ্রসাদ ছুটিয়া আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "বাবা, শীগ্‌গির আসুন, আপনি কাছে না থাকলে মাকে আজ বাঁচানই যাবে না।"

নরেশের সমস্ত দেহটা যেন অবশ হইয়া আসিল। মুহূর্ত্তকাল বিহ্বল-দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া মাতালের মত টলিতে টলিতে তিনি ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন।

৫

সেই যে নরেশ স্ত্রীর সংজ্ঞাহীন মৃতকল্প দেহের পার্শ্বে আসিয়া বসিয়া পড়িলেন, সমস্ত রাত্রিটা ঠিক এক ভাবেই কাটিয়া গেল। পুত্র অনেক পীড়াপীড়ি করিয়াও পিতাকে মুহূর্ত্তের জন্য সরাইতে পারিল না। পরদিন নরেশের মুখের দিকে চাহিয়া সকলেই উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। তাঁহার কপালের দুই পার্শ্বের শিরা ফুলিয়া উঠিয়াছে। চক্ষু দুইটি কোটরগত এবং তাহারই কোলে কাল মোটা দাগ পড়িয়া সেই চক্ষু কে যেন আরও ভিতরের দিকে ঠেলিয়া দিয়াছে। লক্ষ্যভ্রষ্ট দৃষ্টি!

প্রভাতে দেবীপ্রসাদ পিতাকে অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনের জন্য তুলিয়া দিয়াছিল। কাপড় ছাড়িয়া বারান্দায় আসিয়া তিনি স্তব্ধের ন্যায় দাঁড়াইয়া ছিলেন। প্রত্যহ এই সময়টা নরেশ সুরুয়া খাইতেন। ভৃত্য পাত্রটা আনিয়া মনিবের সম্মুখে ধরিতেই নরেশ একবারে ভয়ে শিহরিয়া উঠিলেন। চাকরটা সরিয়া দাঁড়াইল। দেবীপ্রসাদ তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিতেই কহিলেন, "দেখ একবার অত্যাচার! আমার সর্ব্বনাশ না ক'রে এরা ছাড়বে না।" দেবীপ্রসাদ পিতার রূপান্তরে চমৎকৃত হইল।

অপরাহ্নে নরেশ বাবুর্চ্চী খানসামা প্রভৃতিকে ডাকিয়া তাহাদের পাওনা-গণ্ডা চুকাইয়া দিলেন। এক বৎসরের বেতন বখশিশ করিয়া তিনি সকলকে বিদায় দিলেন। পিতার কাণ্ড দেখিয়া দেবীপ্রসাদ মনে মনে প্রমাদ গণিল। সন্ধ্যাবেলা পুত্র এক রকম জোর করিয়াই পিতাকে তুলিয়া দিয়া মায়ের শয্যা-পার্শ্বে বসিয়াছিল। অকস্মাৎ পিতার আহ্বানে ছুটিয়া গিয়া দেখিল, তিনি যেন একবারে ক্ষেপিয়া গিয়াছেন। পুত্রকে সম্মুখে পাইয়া কহিলেন, "ঠাকুর-ঘরে ধূপ-ধুনা প'ড়ে মরুক—প্রদীপটা পর্য্যন্ত জ্বালাবার জন্য একটা মানুষ আজ জুট্‌ল না। আমার যদি সর্ব্বনাশ না হবে, ত হবে কার? আজ তিনি অসুস্থা, তাঁর অনুষ্ঠানগুলি দেখবার জন্য এ বাড়ীতে কেউ নেই! হায় রে অদৃষ্ট!"

নরেশ শিরে করাঘাত করিতে করিতে বাহির হইয়া গেলেন।

বন্ধুরা আসিয়া দেখা করিবার জন্য বসিয়া ছিলেন। ভৃত্য মনিবের নিকট সংবাদ জানাইল। নরেশ দেখাও করিলেন না, বরং চাকরটার উপর দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া উঠিলেন। "বলতে পারলে না, ফাজলামী করবার মত অপর্য্যাপ্ত সময় বাবুর এখন নেই! কেবল মাস মাস মাইনে নিতেই তোমরা আছ!"

নরেশ পত্নীর শয্যার পার্শ্বে আসিয়া নীরবে বসিলেন।

আজ দেবীপক্ষের সপ্তমী। অদূরে ঠাকুর-বাড়ীতে মহামায়ার আরতির বাদ্য বাজিতেছিল।

খোলা জানালা দিয়া নরেশ মুক্ত আকাশের দিকে চাহিয়া ছিলেন। শারদীয় আকাশ সারদার শুভানুগমনে যেন নব-ভাবে সজ্জিত হইয়া ঝল্‌মল্ করিতেছে!

পাটনা সহরের ছোট বড় সাহেব বাঙ্গালী যত ডাক্তার ছিলেন, কাহাকেও আর ডাকিতে নরেশ বাদ দেন নাই। কিন্তু কেহ আশ্বাসের বাণী শুনাইতে পারেন নাই। নরেশ ভাবিতে-ছিলেন, মানুষ কত অসহায়, কত দুর্ব্বল! মনুষ্যশক্তি কত সীমাবদ্ধ!

তাঁহার অশান্ত চিত্তকে শান্ত করিবার কোন অবলম্বন তিনি খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। অথচ মানুষ নির্ভরশীল। কাহা-রও উপর আশ্রয় না করিয়া সে বাঁচিতে পারে না। নরেশ সমস্ত দিন আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া একান্ত নির্ভরের স্থল, সেই অজানাকেই খুঁজিতেছিলেন।

অকস্মাৎ সুনন্দার মৃতকল্প দেহটা বারকয়েক কম্পিত হই-য়াই আকুঞ্চিত হইতে লাগিল। বোধ হয়, এইটাই তাহার জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণ। চিকিৎসকগণও এইরূপ অভিমত জানাইয়া দিয়া গিয়াছিলেন।

নরেশ চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

দেবীপ্রসাদ ঔষধের শিশি ইত্যাদি লইয়া ঘরে ঢুকিতেছিল। নরেশ আর্দ্রকরুণকণ্ঠে চেঁচাইয়া কহিলেন, "ও সকল এখন আর

কিছু নয়, ওতে কিছু হবে না, বাবা! মায়ের আশীর্ব্বাদী চরণামৃত নিয়ে এস, দেখি যদি বাঁচাতে পারি।"

দেবীপ্রসাদ ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে বাহিরের একটা দমকা বাতাসে ভিতরের প্রজ্বলিত আলোকটি দপ করিয়া নিবিয়া গেল। ঘরটা জমাট অন্ধকারে ভরিয়া গেল।

নরেশ ত্রাসে হাহাকার করিয়াই উদ্গত অশ্রু রোধ করিতে মুখ-চোখ সবলে চাপিয়া ধরিলেন। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে রাজেন্দ্রনাথ ধীরপদে, নিঃশব্দে রোগীর মস্তকের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

ব্রাহ্মণ তাঁহার দক্ষিণ হস্তাঙ্গুষ্ঠে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া সুনন্দার মস্তক স্পর্শ করিলেন। শান্ত-গম্ভীর কণ্ঠে তিনি কহিলেন, "মা আনন্দময়ী কাউকে নিরানন্দ করেন না, নরেশ!" সঙ্গে সঙ্গে তিনি জগন্মাতার চরণামৃত সুনন্দার চৈতন্যশূন্য দেহে ও মস্তকে ছড়াইয়া দিলেন। মাতার নির্ম্মাল্য দেহের উপর ধীরে স্পর্শ করিলেন।

তার পর স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "সন্ধিক্ষণ কেটে গিয়েছে, নরেশ! তুমি আমার মা-জননীর মুখের দিকে একবার চেয়েই দেখ।"

কক্ষ তখনও অন্ধকার। মানুষ চেনা যায় না। কেবল খোলা জানালা দিয়া বাহিরের জ্যোৎস্না আসিয়া যেন বিশ্ব-জননীর আশীর্ব্বাদের মত সুনন্দার মুখখানির উপর পড়িয়াছিল। নরেশ সেই শান্ত-স্নিগ্ধ মুখের পানে পলকের জন্য তাকাইয়াই স্তব্ধ হইয়া গেলেন।

যখন চমক ভাঙ্গিল, দেখিলেন, সুনন্দা তাঁহার দক্ষিণ হস্তখানি বুকের উপর স্থাপিত করিয়া পরিপূর্ণ-শান্তিতে বিশ্রাম করিতেছেন।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায়।

তরুণ

বাংলা মা'র দুর্নিবার
আমরা তরুণ-দল।
শ্রান্তি-হীন ক্লান্তি-হীন
সঙ্কটে অটল!

গঙ্গা-রাঢ় পাল্-রাজার
বীর্য্য-গরিমা—
চণ্ডীদাস জয়দেবের
ছন্দ-মহিমা—
ঢেউ তাদের দেয় মোদের
চিত্তে অবিরল!

নিঃস্বতার দৈন্য-ভার
কর্‌ব উৎসাদন;
অজ্ঞতার অন্ধকার
কর্‌ব নির্ব্বাসন;—
ঘোর নিশার দুখ-নাশার
জাল্‌ব দীপ উজল!

সংযমের পৌরুষের
পাল্‌ব প্রেরণা;
শ্রম-যোগের উদ্‌যোগের
সাধব সাধনা।
বাংলা মার দুর্দ্দশার
মুছ্‌ব অশ্রুজল!

শ্রীগুরুসদয় দত্ত (আই. সি. এস্)।

ভাসমান তোষক

মোটর-চালিত শকট, দ্বিচক্রযান এবং অন্যান্য যানও জলযানে পরিণত হইয়াছে এবং হইতেছে। সম্প্রতি শয্যাকেও জলযান-রূপে ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। তোষককে বায়ুপূর্ণ

তোষকের নৌকা

করিয়া সৌখীন আমেরিকার বিলাসিনীরা জলক্রীড়ায় ব্যবহার করিতেছেন। জল হইতে তুলিয়া অর্থাৎ জলক্রীড়া সমাপ্ত হইবার পর তোষকটিকে ডাঙ্গায় তুলিলে অত্যল্পকাল পরেই উহা শুষ্ক হইয়া যায়। তখন শয্যারূপে উহার ব্যবহার চলে। তোষকের মধ্য হইতে বায়ু নির্গত করিয়া দিয়া ইহাকে ভাঁজ করিয়া ফেলা যায়।

মোটরগাড়ী-সংলগ্ন প্রসাধনাগার

আমেরিকার বাজারে এক প্রকার লঘুভার বস্ত্রাবাস বিক্রয়ার্থ বাহির হইয়াছে। মোটর গাড়ীর চাকার সহিত উহা সন্নিবিষ্ট করিতে হয়। এই বস্ত্রাবাসটি চতুষ্কোণ। উহার মধ্যে প্রবেশ করিতে গেলে একটি কোণ ফাঁক করিয়া লইতে হয়। বস্ত্রাবাসের নিম্নভাগে পাদপীঠ আছে। বস্ত্রাবাসের প্রাচীর-গাত্রে টোয়ালে, পরিধেয় বস্ত্রাদি রাখিবার পকেট আছে। তন্মধ্যে জিনিষগুলি নিরাপদে থাকে। চারি জন নারী বা পুরুষ এই বস্ত্রনির্ম্মিত প্রসাধনাগারে একসঙ্গে বেশাদি পরিবর্ত্তন করিতে পারেন। যতক্ষণ উহার মধ্যে মানুষ থাকে, ততক্ষণ কোনমতেই বস্ত্রাবাসকে খুলিয়া ফেলিবার উপায় নাই। গাড়ীর দরজার
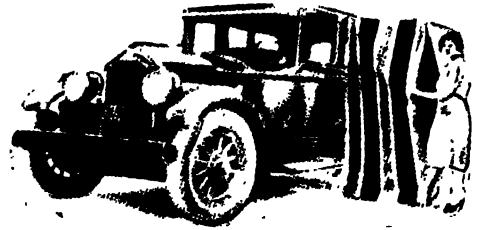
মোটরগাড়ী-সংলগ্ন বস্ত্রাবাস

সঙ্গে উহা এমন ভাবে সংলগ্ন থাকে যে, চাবিবন্ধ থাকা অবস্থায় বস্ত্রাবাসকে খুলিয়া ফেলা চলিবে না। চিত্র দেখিলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে।

সন্তরণ-শিক্ষার নূতন ব্যবস্থা

সন্তরণ-শিক্ষার নূতন পদ্ধতি

বায়ুপূর্ণ দুইটি বাহুবেষ্টনী উপরিভাগে ধারণ করিয়া সন্তরণ-অনভিজ্ঞা নারী অথবা প্রথম শিক্ষার্থী পুরুষ অনায়াসে সন্তরণ-বিদ্যায় অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে। বায়ুপূর্ণ বাহুবেষ্টনীর সাহায্যে মস্তক জলের উপর ভাসিয়া থাকে। উক্ত বেষ্টনীগুলি এত লঘুভার যে, জলের মধ্যে বাহুচালনার বিন্দুমাত্র অসুবিধা ঘটে না।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের জীব-জন্তু

পশুরাজ্যের অতিকায় জীব সকল লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবী-বক্ষে বিচরণ করিত। আমেরিকার মণ্টানা, ইণ্ডিয়ানা প্রভৃতি স্থানের মৃত্তিকা-স্তরের নিম্নভাগ হইতে বিলুপ্ত অতিকায় জীব-জন্তুর মৃত্তিকা-অবশেষ আকৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। অবিকল নকল চিত্র ও মূর্ত্তি রচনা করিয়া অভিজ্ঞগণ প্রাগৈতিহাসিক যুগের বহু জীবকে বর্ত্তমান যুগের মানবদৃষ্টির গোচরীভূত করিতেছেন। বিশেষজ্ঞ শিল্পীরা প্রথমতঃ মৃত্তিকার সাহায্যে ছোট আকারে মূর্ত্তির নমুনা যথাযথভাবে প্রস্তুত করেন। তার পর মৃত্তিকার অভ্যন্তরে প্রাপ্ত জীবদেহাবশেষের আকারে মূর্ত্তি রচনা করিয়া থাকেন। মিঃ চার্লস্, আর, নাইট নামক জনৈক প্রসিদ্ধ চিত্রকর প্রাগৈতিহাসিক জীব-জন্তুর মূর্ত্তি-রচনায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন। তিনি জীবাবশেষ দেখিয়া যথাযথভাবে এই সকল মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতেছেন। ভূ-স্তরে প্রাপ্ত যে অতিকায় জীবের অবয়বের অস্থিসমূহের মৃত্তিকাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার মত প্রকাণ্ড জীব পৃথিবীতে কখনও বিচরণ করে নাই বলিয়া অভিজ্ঞগণ মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই জীবের সংজ্ঞা কি, তাহাও এখন নির্ণয় করা কঠিন। ইহা দৈর্ঘ্যে ৭০ ফুট এবং ইহার দেহের ওজন সাড়ে ৫ শত মণ হইবে। ইহাকে হস্তী ও গিরগিটি জাতীয় মিশ্র জীব বলা যাইতে পারে। কিন্তু উহার মুণ্ডটি অনেকটা জিরাফের মত। ইহার গলদেশ ২০ ফুট দীর্ঘ, লাঙ্গুল ৩০ ফুট। এই জীব ৩০ ফুট উচ্চ বৃক্ষের উপরিস্থিত পত্রাদি সংগ্রহ করিতে পারিত।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় জন্তু

অত্যুচ্চ আলোক-স্তম্ভ

নিউ ইয়র্কের সন্নিহিত প্রদেশে সমুদ্র-পথে যাহারা জাহাজে গমনাগমন করিয়া থাকেন, তাঁহারা জানেন, মান্‌হাট্টান অঞ্চলে একটি অতিকায় আলোকস্তম্ভ দণ্ডায়মান আছে। এই স্তম্ভটি ১২ শত ফুট উচ্চ। "এম্পায়ার ষ্টেট বিল্‌ডিং"এর উপর এই আলোক-স্তম্ভটি স্থাপিত। ২ শত ফুট উচ্চ চূড়ার একটি কক্ষ হইতে ৪টি অত্যুজ্জ্বল শ্বেতরশ্মি নির্গত হইতে থাকে। এই আলোক-রশ্মি সমুদ্রবক্ষে ৫০ মাইল দূরবর্ত্তী স্থান হইতে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। সাধারণ কুজ্ঝটিকার যবনিকা ভেদ করিয়াও এই আলোকরশ্মি দৃষ্টিপথে পতিত হয়।

অত্যুচ্চ আলোকস্তম্ভ

ভাসমান শিক্ষাগারে নৌ-বিদ্যা-শিক্ষা

দক্ষিণ কালিফোর্ণিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদিগকে নৌ-বিদ্যা-সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপার শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। শিক্ষাদানকালে শিক্ষকগণ ছাত্রগণকে কোনও প্রকাণ্ড জলযানের উপর লইয়া যান। সমুদ্রবক্ষে শিক্ষাগারে ছাত্রগণ নৌ-বিদ্যা-সংক্রান্ত শিক্ষা

বিজ্ঞাপনের বিশেষত্ব

নিউ ইংলণ্ড নামক স্থানের রাজপথের ধারে এক জন ফলবিক্রেতা ক্রেতৃগণকে তাহার দোকানে আকর্ষণ করিবার জন্য, দোকানঘরের ছাদের উপর নানাবিধ নকল ফলের ঝুড়ি সাজাইয়া রাখিয়াছে। এই ফলগুলি কাষ্ঠনির্ম্মিত, প্রকৃত বর্ণবিন্যাসে নয়নরঞ্জক। উহা দেখিবামাত্র দর্শকের মনে লোভের সঞ্চার হইবে বহু দূর হইতে এই দৃশ্য দর্শকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে।

বিজ্ঞাপনের বিচিত্র উপায়

প্রত্যক্ষ ভাবে আয়ত্ত করিয়া থাকে। জলযানে মানচিত্র, দিঙ্‌নির্ণয়-যন্ত্র প্রভৃতি যাবতীয় যন্ত্রাদি সংগৃহীত থাকায় ছাত্রগণ স্বল্পায়াসে বিদ্যা আয়ত্ত করিতে পারে

উপরে ছাত্ররা যত্নযোগে পরীক্ষাকার্য্যে ব্যাপৃত; নিম্নে জলযানের উপর ছাত্র ও শিক্ষকবর্গ

শিকারী মৎস্য-রাক্ষসী

বৃটিশ যাদুঘরে গভীর সমুদ্রে অবস্থিত দুই শ্রেণীর শিকারী মৎস্যের নমুনা রক্ষিত হইয়াছে। ইহাদের পশ্চাতের ও মস্তকের পক্ষগুলি সাংঘাতিক; দন্তপংক্তিও ক্ষুরধার অস্ত্রের মত তীক্ষ্ণ। উল্লিখিত দুই শ্রেণীর মধ্যে একটির বাস পানামা উপসাগরে। স্ত্রী মৎস্যটি পুরুষ অপেক্ষা বৃহদাকার। স্ত্রী তাহার ক্ষুদ্রকায় স্বামী মাছটিকে তাহার ললাটদেশে স্থায়িভাবে বহন করিয়া থাকে। অপর শ্রেণীর শিকারী মৎস্যের নাসিকায় একটি প্রদীপ্ত বস্তু থাকে। উহাতে অন্য মৎস্য আকৃষ্ট হইয়া কাছে আসিয়া থাকে। উহার মুখমণ্ডলের নিম্নভাগে সমুজ্জ্বল শ্মশ্রুও বিদ্যমান। এই দুই শ্রেণীর শিকারী মৎস্য অতি ভীষণাকৃতিবিশিষ্ট।

শিকারী মৎস্য-রাক্ষসী

কেষ্ট-বিষ্টু

হাঁড়ীহাতে হোড়মশায় ঘরে ঢুকেই বল্‌লেন, আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, বেঁচে থাক।

মিত্তিরজা আপিংএর মৌতাতে ঝিমুচ্ছিলেন, সহসা সজাগ হয়ে বল্লেন, নিশ্চয়। কিন্তু হাঁড়ী কিসের?

নাতি হয়েছে, ভায়া! তাই গোটাকতক আনন্দলাড়ু—

কৈ, দেখি—দেখি—দেখি—দেখি, বলে মিত্তির-জা হোড়ের হাত থেকে হাঁড়ীটা এক রকম কেড়ে নিয়েই টপাটপ্।

আসরে গ্রাজুয়েট্ স্কুল-মাষ্টার ছিলেন, তিনি ব্রাহ্মণ। ক্ষুব্ধ হয়ে বল্‌লেন, মিত্তির মশায়ের ঐ বড় দোষ। সমস্ত হাঁড়ীটা এঁটো করে ফেল্‌লেন।

মিত্তির-জা বল্‌লেন, হাঁড়ী এঁটো হয় নি, স্কুল-মাষ্টার মশাই! তবে আনন্দলাড়ুর উপর ফোঁটা-দুই আনন্দাশ্রু পড়েছে জিব থেকে। আপনার দরকার থাকে ত হাঁড়ীটা গঙ্গাজলে ধুয়ে আপনার বাড়ী পাঠিয়ে দেব।

গ্রাজুয়েট্ বল্‌লেন, যে রকম চালিয়েছেন, তাতে শেষ অবধি হাঁড়ীতে না টান ধরে!

মিত্তির সে কথায় কাণ না দিয়ে বল্‌লেন, তবে হোড়-মশায়, নাতিটি—

হোড় বল্‌লেন, টি নয়, একেবারে জোড়া নাতি। যমজ সন্তান হয়েছে।

এই মরেছে, বলে গ্রাজুয়েট্ অন্য দিকে মুখ ফেরালেন।

শুভ ঘটনায় ব্রাহ্মণের মুখে বিসদৃশ উক্তি শুনে হোড়-মশায়ের মুখটি চুণ হয়ে গেল।

মিত্তির-জা বল্‌লেন, ও-কথায় কাণ দিও না, হোড়! কিন্তু তোমার জোড়া নাতি হয়েছে, জোড়া হাঁড়ী কৈ?

গ্রাজুয়েট্ বল্‌লেন, ও-হাঁড়ীটা শেষ হ'ল না কি?

প্রায়।

কে একজন বল্‌লেন, হবে না। জোড়া-জোড়া গালে দিচ্ছেন!

মিত্তির বল্‌লেন, তুমি ত বেশ হে! এ-গালটা চিবুবে, আর ও-গালটা চুপ ক'রে বসে থাক্‌বে। ভগবান্ দাঁত দিয়েছেন দু'পাটি।

গ্রাজুয়েট্ বল্‌লেন, কিন্তু পেট দিয়েছেন একটি।

স্কুল-মাষ্টারের বুদ্ধি কি না। সেটা ত থলে। হাঁড়ী কি, গাড়ী-গাড়ী করা চলে। যাও হোড়, তুমি আর একটা হাঁড়ী আনো।

গ্রাজুয়েট্ বল্‌লেন, এবার কিন্তু হোড়মশাই, হাঁড়ীটা আমার হাতে দেবেন।

মিত্তির বল্‌লেন তা দেবেন, দেবেন। লাড়ুগুল আমার হাঁড়ীতে ঢেলে দিয়ে খালি হাঁড়ীটা তোমার হাতে 'ব্রাহ্মণায় দণামি' করবেন।

কি রকম? আমরা কি লোভ-ইচ্ছা, সব ঠাকুরদের দিয়েছি?

আমি ত তাই জান্‌তুম।

কি জান্‌তেন?

জান্‌তুম যে, স্কুল-মাষ্টাররা কেবল একটি জিনিষ খেতে পারেন, ছেলেদের মাথা। ও-কথা যাক। হোড়, তুমি হাঁড়ী আনো।

এই আনি, বলিয়া বিমর্ষমুখে হোড় চলে গেল।

আমি বল্লুম, স্কুল-মাষ্টার, তোমার ও-কথাটা ভাল হয় নি।

কি কথা?

ওর নাতি হয়েছে, আনন্দ ক'রে আনন্দলাড়ু নিয়ে এল। তুমি যমজ হয়েছে শুনে বল্‌লে, এই মরেছে। তার মানে?

ইতিমধ্যে হোড় চার-পাঁচটি হাঁড়ী নিয়ে উপস্থিত। সর্ব্বাগ্রে স্কুল-মাষ্টারের হাতে একটি হাঁড়ী দিয়ে বল্‌লে, গ্রাজুয়েট স্কুল-মাষ্টার মশাই, আপনি একটু আশীর্ব্বাদ করুন, দুটি নাতি যেন দীর্ঘজীবী হয়।

গ্রাজুয়েট বল্‌লেন, সে হবে—হবে। আচ্ছা, হোড়, তোমার যমজ নাতি-দুটি কি ঠিক এক রকম দেখতে হয়েছে?

আজ্ঞে না। একটি ফরসা, একটি কালো। একটি বেঁটে, একটি লম্বা।

যাক্, বেঁচে গেছে।

হোড় একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বল্‌লেন, আঃ, বাঁচলুম! আমার ভয় হয়েছিল। ব্রাহ্মণের বাক্য!

একজন বল্‌লে, হ্যাঁ, তেমনি বামুন কি না! বামুন ছিল সেকালে অগ্নিহোত্রী। তাঁরা ফুঁ দিয়ে টিকে ধরাতেন।

আর এখনকার বামুন! 'দক্ষিণে গো-মৃগ-দ্বিজাঃ।' কিঞ্চিৎ দক্ষিণে পেলেই—

ভট্টাচার্য্য এতক্ষণ চুপ করেছিলেন, ফোঁস্ করে উঠলেন, দেখ বাপু, ফের যদি তুমি সংস্কৃত আওড়াও ত আমি পাহারা-ওলা ডাক্‌বো। এখনও এমন ব্রাহ্মণ আছে, যার বাক্য মাঘ মাসের মত অমোঘ। বামুন নেই বটে! চাষা সংস্কৃতর দোহাই পাড়ে! যা—যাঃ, কুলকর্ম্ম করগে যা।

গ্রাজুয়েট বল্‌লেন, আজ্ঞে, তা নয় মশাই! দুটির যদি ঠিক এক রকম চেহারা হত, কোন্‌টি কে, তাদের মা পর্য্যন্ত চিন্‌তে পারত না, তা হ'লে মুস্কিলের একশেষ হত।

সত্যি না কি?

নয়? বাল্‌সালে শ্যামসুন্দর, আলুই খেলে কালাচাঁদ; কি বিপদ্ বলুন ত?

সভায় এক জন নব্যতন্ত্র ছিলেন, তিনি প্রশ্ন কর্‌লেন, ঐ আলুই পদার্থ-টি কি?

তা জানি নে।

কোথা পাওয়া যায়?

হালুইকরের দোকানে, ব'লে মিত্তির-জা ঝিমিয়ে পড়লেন। তিনি মিষ্টিখোর, তাঁর বিশ্বাস, লোহার পেরেক থেকে ঝাড়লণ্ঠান, ছালুগিরি পর্য্যন্ত সব হালুইকরের দোকানে মেলে। যদি না মেলে, সে ক্রেতার দোষ—ন চ হালুইকরস্য।

গ্রাজুয়েট বল্‌লেন, আপনারা জানেন না। মনে করুন, চুরি ক'রে আম খেলে প্যালা, কিন্তু চড় খেলে ভজহরি—

দত্তজা বল্‌লেন, হ্যাঁ—হ্যাঁ, বলে যান, বলে যান্! জোলাপ নিলে যেদো, গাড়ু নিয়ে ছুট্‌ল গণশা। ছাদ থেকে পড়ল নফরা, হাড়গোড় ভাঙ্গলে ফক্‌রে।

এক জন বল্‌লেন, ঠিক্‌ই ত! জলে ভিজলে কাঙ্গালী, জ্বরে পড়ল দুঃখীরাম।

আর এক জন বল্‌লে, ঠিক! এ ত হামেসাই হয়! আমি স্বচক্ষে দেখেছি, গুল খেলে পটলা, গোটা-দাল ভাঙ্গতে লাগল হরের।

দত্তজা বল্‌লেন, ওহে, আমিও দেখেছি, যমদূত নিতে এল রেমোকে, চিন্‌তে না পেরে নিয়ে গেল শেমোকে।

থামুন মশাইরা! আপনারা ঠাট্টা করছেন! আমি প্রত্যক্ষ দেখেছি।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কোথা?

গ্রাজুয়েট বল্‌লেন, থিয়েটারে। আপনাদের বাঙ্গলা থিয়েটার নয়, মশাই! যে আগে দমাস্ ক'রে গদা এসে পড়ল ষ্টেজের উপর, তার পর থুড়িলাফ খেয়ে এসে পড়লেন ভীম। তার পর এসেই বক্তৃতা! আরে মর, একটু জিরিয়ে নে! আর সে বক্তৃতার তোড় কি! ভীম নয়, যেন ভিসু-ভিয়াস্! শুধু কি তাই? প্রোগ্রামে লেখা আছে, বন, দেখালে সাগর! সেই সমুদ্রের মাঝখানে ভীম চেঁচাতে সুরু করলে। তা সে কখন বলে দ্রৌপদী, কখন বলে কৃষ্ণা, কখন ভদ্রা, আবার কখন পঞ্চা। ডাক্‌তে ডাক্‌তে দ্রৌপদী বেরিয়ে এল—চোগা, চাপকান্, পাগড়ী পরে!

এক জন জিজ্ঞাসা করলেন, গোঁপ-দাড়ী ছিল?

সামান্য। আমার ম্যানেজারের সঙ্গে আলাপ ছিল; জিজ্ঞাসা করলুম, এ কি হল? সে বল্‌লে, দ্রৌপদীর তখন সাজা শেষ হয় নি। এ-দিকে ষ্টেজ ফাঁক যায়। এক জন সভাসদ্ সেজেছিল, তাকেই বার করে দিলুম। ভীম যে চেঁচাচ্ছে! না থামালে গলা ভেঙ্গে আগাগোড়া প্লে-টাই মাটী হবে। অডিয়েন্স ঠাট্টা করবে, গলাভাঙ্গা ভীম! আমি যে থিয়েটারের কথা বলছি, সে এ রকম নয়!

দত্ত প্রশ্ন করলেন, সে কি থিয়েটার?

বিলিতি। একবারে সব হুবহু।

কে বল্‌লে—বিলিতি থিয়েটার—কবে দেখলে, গ্রাজু-য়েট? এইখানেই ত বছর-দশেক কাটাচ্ছ!

গ্রাজুয়েট বল্‌লেন, সে অনেক দিনের কথা। আমি তখন গ্রাজুয়েট হব হব করছি।

হব-হব কি রকম?

তখন ফোর্থ ইয়ারে পড়ি।

ক' বছর পড়েছিলে?

তা হবে বৈ কি, বছর কয়েক হবে। ও-কথা যাক্। এক দিন প্রোফেসর বল্‌লেন, ওহে, বিলিতি থিয়েটার এসেছে। রোমের কবি প্লটাসের নাটক মিনেক্‌মী অভিনয় করছে। দেখে এস! আমি আর আমার এক ক্লাসফ্রেণ্ড দেখতে গেলুম।

টিকিট কিনে?

নয় ত কি! এ বাঙ্গলা থিয়েটার নয় মশাই, যে পাসে ভর্ত্তি! দু'জনে এক টাকা ক'রে দু-টাকার টিকিট নিলুম।

তোমার পকেট থেকে টাকা বেরুল?

আমার কেন মশাই, তার। আমি টাকাটা ধার নিলুম।

শোধ দিয়েছিলে?

গ্রাজুয়েট মাথা চুলকুতে লাগলেন।

দেওয়া হয় নি বুঝি?

কেমন ক'রে দেবো! সে যে মারা গেল।

কবে?

এই আর বছর।

এই একটা টাকা বিশ বছরে শোধ হল না?

গ্রাজুয়েট একটু বিরক্ত হয়ে বল্লেন, আপনারা বড় খুঁৎ ধরেন!

না না! তুমি কি দেখলে বল?

দেখলুম, দুই যমজ ভাইএর কাণ্ড। এক জন খানা খায়, দামের জন্য ধরে আর এক জনকে। এই রকম সব গোলমেলে ব্যাপার! তার পর আর এক দিন সেক্সপীয়ারের লেখা কমেডি অফ এররস্- ভ্রান্তি-কৌতুক দেখে এলুম। সে-ও কতকটা এমনি ব্যাপার! দুই যমজ ভাই! এক ভাই সকালে গেল, পেট-ফাঁপার দাওয়াই নিতে। এক ভাই বিকেলে গেল, দাঁত কন্‌কন্ করছে বলে। ডাক্তার একে দিলে এক বোতল রেড়ির তেল খাইয়ে।

এক বোতল!

হাঁ। ডাক্তার বল্লে, তোর আর জন্মে কখন পেট ফাঁপবে না।

আর পেট-ফাঁপা ভাইকে কি করলে?

চার-পাঁচ জন মিলে তাকে ধ'রে কাঁচা দাঁতগুলো তুলে দিলে। সে চেঁচাতে লাগল—ডাক্তার কর কি, কর কি! আর কর কি! ততক্ষণ পাটীকে পাটী সাবাড়!

দত্ত বল্লেন, ও-সব থিয়েটারী কেচ্ছা। তুমি বিশ্বাস কর, গ্রাজুয়েট?

খুব করি। আমাদের প্রোফেসর বলেছিলেন, মহা-কবির কলমে কখন মিথ্যা বেরয় না।

মিত্তির-জা ঝিমুচ্ছিলেন, বল্লেন, তা জানি নি। তবে দুই যমজ ভাইএর ব্যাপার আমি যা চোখে দেখেছি, বলতে পারি, যদি শোন।

বেশ ত, বলুন না, বলুন না, বলে সকলে তাঁকে ছেঁকে ধরলে। মিত্তির-জা ট্যাঁক্ থেকে কৌটটি বার ক'রে এক ডেলা আপিং গালে ফেলে গল্প সুরু করলেন—

আমি তখন বন-বিষ্ণুপুরে থাকি।

নব্যতন্ত্র জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি তখন আপিং খেতেন?

নিশ্চয়। এখন যা খাই, তার চেয়ে ঢের বেশি! এ ত সরষে!

দত্ত-জা বল্লেন, আহা, বাধা দাও কেন? আপিং মিত্তিরের পূর্ব্বজন্ম থেকে অভ্যাস। এখন গল্প চলুক।

মিত্তির-জা আবার আরম্ভ করলেন। বন-বিষ্ণুপুর যেমন বর্দ্ধিষ্ণু গণ্ডগ্রাম, সেখানকার হরিহর মুখুয্যে তেমনি বর্দ্ধিষ্ণু লোক ছিলেন। বাগানে তরি-তরকারি, পুকুরে মাছ, ঢেঁকিশালে ঢেঁকি, গোয়ালে গরু, মরাইভরা ধান—সুখের সংসার। কেবল এক দুঃখ—এ-সব ভোগ করবে কে? পুত্র নাই। হরিহর জমীদারি কেনেন আর বলেন, কার জন্যই বা কিনছি! ভোগ করবে কে? অথচ কিনতেও ছাড়েন না। বলেন, ঢাকে পিটি, ঢাকের বাদ্যি শুনলেই সড়-সড় করে। যা হক্, হরিহর মহা দুঃখে কাল কাটান। এমন সময় তাঁর মধ্যবয়সে একেবারে জোড়া ছেলে হল—অবিকল এক চেহারা! একরকম কণ্ঠস্বর! গ্রাজুয়েট যেমন বল্লেন, তাদের মা প্রায়ই ভুল করত। বাপ ত বটেই! হরিহর বিষয়ী লোক। শেষ বুদ্ধি বার করলেন, যমজের একটার কপালে চন্দনের টিপ দিয়ে রাখতেন। ক্রমে ছেলেদুটির অন্নপ্রাশন হ'ল। ফোঁটা-কাটা ছেলেটির নাম রাখলেন—রামকৃষ্ণ, অন্যটির নাম—রামবিষ্ণু। দুটিই সমান। কিন্তু ফোঁটা-কাটা রামকৃষ্ণের উপরই তাঁর টান্ বেশি।

দেখতে দেখতে বছর আষ্টেক কেটে গেল। ঐ সময় অর্দ্ধোদয় যোগ উপস্থিত। হরিহর রামকৃষ্ণকে একদণ্ড ছেড়ে থাকতে পারতেন না। তিনি কলকাতায় গঙ্গাস্নান করতে এলেন ফোঁটা-কাটাকে নিয়ে।

গঙ্গায় লোকে লোকারণ্য। সেই ভিড়ে রামকৃষ্ণ গেল হারিয়ে। বুঝতেই পারছ। হরিহর শয্যাধরা হলেন। অনেক খোঁজাখুঁজি হল। কিন্তু রামকৃষ্ণের কোন পাত্তাই পাওয়া গেল না। হরিহর দেশে ফিরে গেলেন। শোকে বিকল হয়ে রামবিষ্ণুকে কখন বলেন—রামবিষ্ণু, কখন রামকৃষ্ণ।

দুই ভাই এক সঙ্গে পাঠশালে যেত। রামবিষ্ণু যখন একা গিয়ে উপস্থিত হল, গুরু জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যাঁ রে, শুনছি, তোদের এক জন হারিয়ে গেছে। সে তুই, না, সে?

রামবিষ্ণু বললে, কি জানি মশাই? বাবা আমাকে কখন বলে রামবিষ্ণু, কখন বলে রামকৃষ্ণ।

এমনি উল্ট-পাল্টা নাম ধ'রে ডাকতে ডাকতে রামবিষ্ণু নাম লোপ পেয়ে রামকৃষ্ণ নাম পাকা বাহাল হল। ক্রমে রামবিষ্ণুও ভুলে গেল যে, তার নাম ছিল—রামবিষ্ণু। সে নাম জিজ্ঞাসা করলে বলত—রামকৃষ্ণ। কিন্তু এই রামকৃষ্ণ নাম চলন হ'লেও ঘটনা সুস্পষ্ট বোঝাবার জন্য আমি তার অন্নপ্রাশনের নাম রামবিষ্ণু বলেই উল্লেখ করব।

এমনি ক'রে বিশ-বাইশ বছর কেটে গেল। হরিহর মরবার সময় উইল করলেন, রামবিষ্ণু যদি রামকৃষ্ণকে খুঁজে না বার করতে পারে, তার অর্দ্ধেক ভাগ মঠে যাবে।

এই ত গেল গোড়ার কথা।

রামবিষ্ণু ভাবলে, খামাকা কেন আলসে-কুড়ে বৈরাগী-গুলো অর্দ্ধেক বিষয় ভোগ করবে। ওঃ, বাবাজীদের দেহ ত নয়, এক একটি মাংসপিণ্ড! ভুঁড়ি ত নয়, এক একটি গহ্বর! আর এক-এক জন মালপো-ভোগের জনার্দ্দন! আর কি ভক্তি! যেমন খোলের ঝঙ্কার, অমনি বাবাজীর ধনুষ্টঙ্কার! এ কখনই হ'তে দেব না। আমি ভায়াকে খুঁজে বার করব।

এই সময় এলাহাবাদে একটা মোকদ্দমা ছিল। রামবিষ্ণু এলাহাবাদে এল। দুটি উদ্দেশ্য—মোকদ্দমা দায়ের আর ভাইকে খোঁজা।

এলাহাবাদে কারুর সঙ্গে জানাশোনা নেই। অত বড় সহর, নিশ্চয় ভাল হোটেল পাওয়া যাবে, এই কল্পনা ক'রে রামবিষ্ণু প্ল্যাটফরমে নেমে দেখলে এক বৃদ্ধ উৎকণ্ঠিত হয়ে এ-দিক্ ও-দিক্ চাইছেন! একেই জিজ্ঞাসা করি ভেবে রামবিষ্ণু তাঁর কাছে গিয়ে বললে, মশাই—

বৃদ্ধ তার দিকে ফিরে বললেন, এই যে রামকৃষ্ণ—

রামবিষ্ণু বিস্মিত হয়ে বললে, মশাই কি আমাকে চেনেন?

বৃদ্ধ একটু চটা-মেজাজের লোক বললেন, তার মানে? আমি নেশা করেছি? নিজের জামাইকে চিনতে পারব না?

রামবিষ্ণু আরও আশ্চর্য্য হয়ে বললে, জামাই!

সেই সময় দু'টি যুবতী ওয়েটিংরুম থেকে বেরিয়ে এল। তাদের মধ্যে যেটি ছোট, সে বললে, এই যে মুখুয্যে মশাই!

রামবিষ্ণু অবাক্—মুখুয্যে মশাই! আমার নাম-পদবী এরা জানলে কেমন ক'রে? আমি ত এদের চিনি নি!

বৃদ্ধ বললেন, ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে দেখছ কি? আমাকে চেন না? না, তোমার শালীকে চেন না?

রামবিষ্ণু সাফ জবাব দিলে—কস্মিন্‌কালে না।

রামবিষ্ণুর পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বৃদ্ধ প্রশ্ন করলেন, কি, ব্যাপারখানা কি? গাঁজা খেয়েছ? এই এলাহাবাদে যাদব চাটুয্যেকে চেনে না, এমন গাড়ল কেউ নেই। ওহে ষ্টেশন-মাষ্টার!

ষ্টেশন-মাষ্টার জানত, বৃদ্ধের ভয়ানক চটা-মেজাজ। তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললে, কি আজ্ঞে করছেন?

ও-সব আজ্ঞে-টাজ্ঞে এখন রাখ। বাবুটিকে পরিচয় দাও, আমি কে?

ষ্টেশন-মাষ্টার বললে, সে কি হে, রামকৃষ্ণ বাবু! আপনার শ্বশুরকে চিনতে পারছ না?

শ্বশুর!

রামবিষ্ণু বললে, মশাইরা আমাকে মাপ করবেন আমার নাম রামকৃষ্ণ মুখুয্যে বটে! কি ক'রে আপনারা আমার নাম বলছেন, জানি নি। কিন্তু সত্য বলছি, বিশ্বাস করুন, আমি আগে আর কখন প্রয়াগে আসিনি। এই মাত্র ট্রেন থেকে নামলুম। বিশ্বাস করুন।

বৃদ্ধ গরম হয়ে বললেন, না, করব না। বিশ্বাস করব না। তুমি জোর ক'রে বিশ্বাস করাবে? জুলুম! আচ্ছা, তোমার বজ্জাতির দৌড়টা দেখি। আমায় ত চেন না?

আজ্ঞে না, আপনাকে জীবনে আমি এই প্রথম দেখলুম

জীবনে এই প্রথম দেখলে? রোজ রোজ লুচি-পাঁঠা মেরে এই প্রথম দেখলে? নেমখারাম!

বৃদ্ধ বড় মেয়েটিকে হাত ধ'রে টেনে এনে বললেন, এই তোমার স্ত্রী—বিমলা! একে চেন?

আমার স্ত্রী বিমলা! আমার ত বিয়ে হয়নি, মশাই।

নাঃ, তা হবে কেন? এটি তোমার শালী কমলা। এর সঙ্গে পরিচয় আছে?

মশাই, বিবাহই হয় নি, তার শালীর সঙ্গে পরিচয় কি?

এই সময় বিমলা কেঁদে উঠল—বাবা, আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে! কামিখ্যের কোন্ ডাইনী ওকে গুণ করেছে—

রামবিষ্ণু বল্‌লে, ভদ্রে—

যাদব একবারে সপ্তমে চ'ড়ে বল্‌লেন, চোপ্ ব্যাটা! ভদ্রে! আমার সামনে ভদ্রে! তোর বাবা ভদ্রে, তোর চোদ্দপুরুষ ভদ্রে, হারামজাদা! জানিস্, জাহাজ না লিখে অর্ণবপোত লিখেছিল ব'লে, আমার এক ছেলে জীবনকে আমি ত্যাজ্যপুত্তুর করেছি? তুই আমার সামনে আমারই মেয়েকে বলিস্—ভদ্রে! ভাদ্রমাসের পাকা তাল পেয়েছ? পাজি, নচ্ছার!

কি বিপদ্! মশাই, খামকা গাল দেন কেন?

খামকা কি রে ব্যাটা! তুই খামকা ভদ্রে বলিস কেন?

মশাই ভদ্রঘরের মেয়ে, তাই ভদ্রে বলেছি। আপনি গায় প'ড়ে ঝগড়া করেন কেন?

এই সময় যাদবের ছোট মেয়ে কমলা বল্‌লে, বাবা, আপনি মুখুয্যেমশাইকে বাড়ী নিয়ে চলুন। নিশ্চয় কোন আবাগী ওঁকে গুণ করেছে।

গুণ বার করছি, বলে যাদব হাঁক দিলেন, ধনী সিং!

রামবিষ্ণু দেখলে, একটি সচল হিমাচল এগিয়ে এল। পালাবার চেষ্টা বৃথা। আরও ভাবলে, মন্দ কি! কোথায় হোটেল্-হোটেল্ ক'রে ঘুরে মরতুম। যা হক্, একটা আশ্রয় ত পাওয়া গেল। জামাই-আদরে খাওয়াবে! দেখাই যাক্ না, কোথাকার জল কোথায় মরে! পরিবার, শালী, শ্বশুর ত মণ্ডকা মিল্‌ল। প্রথম পদার্পণেই স্ত্রীলাভ!

যাদব বল্‌লেন, ছট্টু আয়া?

হাঁ হুজুর!

ছুই মেয়ে সঙ্গে। যাদব রক্ষকরূপে ছুই দরোয়ান নিয়ে বেরিয়েছেন। ধনী সিংকে বল্‌লেন, জামাইবাবুকো ঘর লে চলো। আগর বখেড়া করে, বাঁধকে লে' আও।

তার পর রামবিষ্ণুকে বল্‌লেন, ভালমানুষের মত চল, বাপু! আমি যাদব চাটুয্যে, আমার কাছে গুণ!

যাদব ছুই মেয়ে নিয়ে এগুলেন।

আগু-পিছু দরোয়ান পাহারা রামবিষ্ণুও চল্‌ল। যাদব চাটুয্যের বাড়ীতে কমলার যত্নে-সেবায়-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে রামবিষ্ণু তার মুখের পানে চেয়ে রইল। কমলা মুচকে হেসে জিজ্ঞাসা করলে, মুখুয্যে-মশাই, অমন ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে দেখছ কি? আমাকে কি কখন দেখনি?

রামবিষ্ণু বল্‌লে, যদি দেখে থাকি ত সে এ জন্মে নয়! কিন্তু তখন তুমি এত সুন্দর ছিলে না।

কমলার গালে ছুটি গোলাপ ফুটে উঠল। বল্‌লে, ওমা, সে কি কথা! দিদি ত আমার চেয়েও সুন্দর!

কে তোমার দিদি?

আমার বোন্ গো, তোমার সর্ব্বস্বধন!

আমার সর্ব্বস্বধন তুমি।

বিমলা আড়ি পেতে কথাগুলি শুনছিল। কেঁদে গিয়ে যাদবকে বল্‌লে, বাবা, ওকে পাগলা-গারদে পাঠিয়ে দাও। আমার ত সর্ব্বনাশ করেছে, আবার কমলিকে মজাচ্ছে।

কি ক'রে?

কি ক'রে আর? ওকে বল্‌ছে সর্ব্বস্বধন।

বটে! পাজি ব্যাটা! নচ্ছার ব্যাটা! পাগলা-গারদে দোব? ওর ছিল্লে ক'রে দোব! আগে পথের কুকুর হয়ে দিনকতক বেড়াক! হারামজাদা! ধনী সিং!

ধনী সিং এলে যাদব বল্‌লেন উস্‌কো নিকাল দেও। ফিন্ ঘুস্‌নে মৎ দেনা।

যো হুকুম, মহারাজ! বলে ধনী সিং রামবিষ্ণুকে বার ক'রে দিলে। তার খানিক পরেই সত্যকার জামাই রামকৃষ্ণ এসে উপস্থিত।

এই পর্য্যন্ত ব'লে মিত্তির-জা ঝিমিয়ে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে নাক ডাকতে সুরু হ'ল।

দত্ত-জা বল্‌লেন, নাক-ডাকার জন্য মিত্তিরকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া উচিত। ওহে মিত্তির! তার পর কি হ'ল? শেষ হ'ল না কি?

মিত্তির-জা চমকে উঠে বল্‌লেন, নাঃ, কৌটায় এখনও ভরি তিনেক আছে।

দত্ত-জা বল্‌লেন, তোমার মাথা! সত্যিকার জামাই রামকৃষ্ণ ত ফিরে এল—

তা আসবে বৈ কি! চিরকালই কি কামরূপ কামাখ্যায় থাকবে! কিন্তু এসে পৌঁছুতেই ধনী সিং মনে করলে, রামবিষ্ণু ফিরে এসেছে। এমনি অবিকল এক চেহারা! বল্‌লে, ফিন্ আয়া, ভাগো!

জামাই রামকৃষ্ণ বল্লে, তবে রে ব্যাটা ছাতুখোর! সিদ্ধির নেশায় চোখে-কাণে দেখতে-শুনতে পাচ্ছ না। ফিন্ কি রে ব্যাটা, ফিন্ কি? আমি ত এই এলুম। হটো, রাস্তা ছোড়!

দেউড়ীতে গণ্ডগোল শুনে যাদব হেঁকে বললেন, কেয়া হায়, ধনী সিং?

দেখিয়ে হুজুর, দামাদ্ ফিন্ ঘুস্‌নে মাংতা।

কভি নেই! নিকাল দেও।

জামাই রামকৃষ্ণ বল্লে, কভি নেই কি, মশাই? এর মধ্যে কি হল? আমি ত এইমাত্র দরজায় পা দিচ্ছি।

পা দিচ্ছ, ব্যাটা! দেউড়ীতে মাথা গলালে গর্দ্দানা দিতে হবে। মচ্ছি-মুড়ো মেরে গিয়ে, এই এলুম! জোচ্চোর, বদ্‌মাস, সয়তান্!

আচ্ছা দেখে নোব, বলে জামাই রেগে টট্টর ক'রে চলে গেল। সে দিন এক বন্ধুর বাড়ীতে আশ্রয়। তিনি উকীল—বললেন, সোজায় ছাড়া হবে না। বুড়োকে যদি জব্দ করতে চাও, ফৌজদারী কর। তোমার স্ত্রীকে বে-আইনী আটক করেছে।

এ দিকে রামবিষ্ণু যাদবের বাড়ী থেকে বেরিয়ে ভাবলে, হ'ল ভাল। আহারটি পরিপাটী হয়েছে। এখন ধীরে-সুস্থে একটা হোটেল খুঁজে নি। কিন্তু এ পাড়ায় নয়। সে খুব দূরে একটা নূতন হোটেলে বাসা নিয়ে সহর দেখতে বেরুল। কিন্তু বেরুলে কি হবে? প্রতিপদে বাধা। পথে এক জন প্রশ্ন করল, এই যে রামকৃষ্ণ বাবু, এ ক'দিন যে দেখতে পাই নি?

রামবিষ্ণু অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, আপনি কি আমাকে চেনেন্?

লোকটি বল্লে, ভাল, ভাল! খবর নিতে পারিনি বলে ঠাট্টা করছেন!

ঠাট্টা আমার চোদ্দ-পুরুষে জানে না। ঠাট্টা করছেন আপনারা। চেনা নেই, জানা নেই, পথের মাঝখানে টানাটানি!

কি রকম?

রকম আর কি? আমি রামকৃষ্ণ বটে। কিন্তু আপনি কি ক'রে জান্‌লেন, ধর্ম্ম জানেন! আমি আপনাকে চিনি নি।

চেনেন না! তা চিন্‌বেন কেন? বড়মানুষের ঘর-জামাই কি না? ঐ যে কথায় বলে—

পয়লা কুত্তা কুত্তা পালে,
দোসরা কুত্তা ঘরজামাই—

বলেই লোকটা হন্ হন্ ক'রে চলে গেল।

কিছু দূর না যেতে যেতে আর এক ব্যক্তি বল্লে, রাম-কৃষ্ণ বাবু যে!

হুঁ, তা কি?

কি আবার, ক'দিন আড্ডায় যান নি—

কিসের আড্ডা? গাঁজা, গুলি, না—

আমরা ছোটলোক নই, মশাই! বলে সে দ্রুত চলে গেল। রামকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল, সহরশুদ্ধ লোক আমার নাম জানলে কি ক'রে? দূর হ'ক, বাসায় ফিরে যাই।

ফেরবার মুখে হঠাৎ এক ব্যক্তি গলি থেকে বেরিয়ে একেবারে হাত ধরে বললে, এইবার ত ধরেছি চাঁদ!

রামবিষ্ণু উত্ত্যক্ত হয়ে বললে, কি, মৎলবটা কি? পাগল করবে? আমি কালই চলে যাচ্ছি।

কোথা?

চুলোয়।

কিছু আপত্তি নেই। তবে বাপের সুপুত্তর হয়ে বাজীর টাকাটি দিয়ে যেখানে ইচ্ছা যাও।

কিসের বাজী?

বাবা, ঢের ঢের বব্‌বুলে দেখেছি। আমিও এক জন কম নয়। আদালতে মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে খাই। কিন্তু তোমার জোড়া নেই। বাজীর টাকাটা দাও।

কি বাজী?

ডিগবাজী—ডিগবাজী!

সে ত এই সহরে শুভাগমন ক'রে এস্তক খাচ্ছি। এখন আপনার অন্তরা ভাঙ্গুন।

বাবা, বোম-ছক্কায় দশ-দশ টাকা বাজী হেরেছ, জান না?

আজ্ঞে না।

আমি জানি।

তা হলে আপনি আমার চেয়ে অনেক বেশী জানেন। আর কিছু কথা আছে?

ছোটলোক!

আপনার সঙ্গে সদালাপ ক'রে সুখী হলুম বটে। বলে রামবিষ্ণু ছুটে বাসায় চলে গেল। আহারাদি ক'রে ভাবলে পালাই। কিন্তু খরচ-পত্তর ক'রে এতদুর এলুম। টাকাও পাওনা অনেকগুলো। মামলাটা দায়ের ক'রে যাই।

হোটেলওয়ালার কাছ থেকে এক জন উকীলের ঠিকানা জেনে নিয়ে সন্ধ্যার পর সেখানে উপস্থিত হ'ল। যেতেই উকীল বাবু দাঁড়িয়ে উঠে অভ্যর্থনা করলে, এই যে রামকৃষ্ণ বাবু! আসুন, আসুন!

রামবিষ্ণু কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল, এ সহরে কি অন্য নাম নেই?

উকীল বললে, দাঁড়িয়ে রইলেন যে, বসুন।

রামবিষ্ণু বসলে, উকীল জিজ্ঞাসা করলে, তার পর কি ঠিক করলেন? ফৌজদারী করাই ত মত?

রামকৃষ্ণ বিস্মিত, জিজ্ঞাসা করলে, কি ফৌজদারী? কার নামে?

আপনার শ্বশুরের।

কে শ্বশুর?

যে ব্যাভার করেছে, তাতে শ্বশুর বলে স্বীকার করতে ঘৃণা হয় বটে—

কি পাগলের মত বল্‌ছেন, মশাই! কে শ্বশুর, কিসের ফৌজদারী?

বলি, যাদব চাটুয্যে যে আপনাকে শ্যাল-কুকুরের মত দূর দূর ক'রে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলে—

আপনি শুনেছেন, বুঝি?

শুনেছি কি রকম?

কার মুখে?

আপনারই মুখে।

আমার!

রামবিষ্ণু ভাবতে লাগল, সহর-সুদ্ধ রাষ্ট হয়েছে। দি ব্যাটাকে জব্দ ক'রে।

ওর আর ভাবছেন কি? দিন ফৌজদারী ঠুকে। পরিবারটিকে কেড়ে আনুন আর শ্বশুর মশায়কে শ্রীঘরে পাঠান।

পরিবার! ওরে বাপ রে! কাজ নেই, মশাই। বলে রামবিষ্ণু উঠে পড়ল।

মিত্তির-জা বললেন, এই উকীলের সঙ্গেই জামাই রামকৃষ্ণ পরামর্শ করেছিল। কিছুক্ষণ পরে সে এসে হাজির।

উকীল বল্‌লে, এরই মধ্যে ফিরলেন যে!

এরই মধ্যে কি রকম?

এই চলে গেলেন।

কে—আমি?

উকীল ভাবলে, দারুণ অপমানে লোকটার মাথা বিগড়ে গেছে। বল্‌লে, আপনি অত ভাববেন না। দু'চার দিনের ভেতরই সমন বার ক'রে দোব।

বেশ কথা। এই টাকা নিন্‌। আমি এখন চল্‌লুম।

জামাই রামকৃষ্ণ পথে বেরুতেই এক দোকানদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ।

নমস্কার, রামকৃষ্ণ বাবু!

নমস্কার!

অনেক দিন হ'ল, সাড়ীখানার দামটা পড়ে রয়েছে। কি জানেন, আমরা ব্যবসাদার লোক। টাকাটা যত ঘুরবে, ততই ত লাভ।

লাভ তোমার। আমার কি?

সে কি মশাই! আপনার পরিবার। বেছে সাড়ী নিলেন। দামী সাড়ী। এখন বল্‌ছেন, আমার কি?

তা বৈ কি। আমার শ্বশুরের মেয়ে পরবেন সাড়ী, আর আমি দোব দাম?

তবে কে দেবে?

যার সাড়ী—সে।

সে কি, মশাই! স্ত্রীলোক, বলে দশ হাত কাপড়ে মেয়ে ন্যাংটা! তার কাছ থেকে আদায় হবে কি ক'রে?

নালিস ক'রে।

নালিস?

নিশ্চয়। নৈলে টাকা আদায় হবে না। আমি ও-টাকা দোব না।

বেশ! আপনাকে সাক্ষী দিতে হবে।

আমি ত এখান থেকে চলে যাচ্ছি। সাক্ষী দেবে কে?

দোকানদার কিছুক্ষণ গুম্‌ খেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার পর আস্তে আস্তে চলে গেল।

মিত্তির-জা আবার ঝিমিয়ে পড়লেন। দত্ত-জা হাঁকলেন, ও মিত্তির!

মিত্তির-জা হঠাৎ চম্‌কে উঠে বল্‌লেন, তবে রে শালা, আপিং চুরি? পাহারোলা, পাহারোলা, পাক্‌ড়ো! বামাল-সুদ্ধ ধরেছি, বলেই ভট্‌চায্যের টিকি ধরে টান!

ভট্‌চাযও চেঁচিয়ে উঠলেন, ছাড়, ছাড়, পাষণ্ড! আমি তোর আপিং নিয়েছি?

আল্‌বৎ! নৈলে তোর ট্যাঁকে কি?

নস্যদানি।

তবে আমার কৌট কৈ?

তোমার ট্যাঁকে।

মিত্তির ট্যাঁক থেকে কৌটা বার ক'রে এক ডেলা আপিং খেলেন।

ভট্‌চায বললেন, যে আপিং খেলে, ওতে বিশ-বাইশটা গোরা পল্টন সাবাড় হতে পারে।

খবরদার, ভট্‌চায! খুঁড়ো না। আমার আপিং খাওয়া কমে যাচ্ছে।

গ্রাজুয়েট বললেন, গল্পটা শেষ করুন! দোকানদার ত চলে গেল।

মিত্তির-জা চটে উঠে বললেন, তার মানে? আপিং না দিয়ে যাবে কোথা?

এঃ, এখনও এর ঝোঁক কাটে নি। মিত্তির-জা, গল্পটা শেষ কর। দোকানদার ত চলে গেল।

হাঁ-হাঁ, দোকানদার ভাবতে ভাবতে গেল, টাকাটা ত বরবাদ যায়। সাক্ষী না পেলে প্রমাণ হবে না। রামকৃষ্ণকে আটকাতে হবে। উকীলের পরামর্শে সে চিটিং চার্জ্জ দিয়ে, অর্থাৎ প্রবঞ্চনার নালিস ক'রে জামাই রামকৃষ্ণের নামে একেবারে ওয়ারেণ্ট বার করলে।

রামবিষ্ণু সে দিন খসরুবাগ দেখে ফিরছিল। পিয়াদা সঙ্গে দোকানদার বললে, এই রামকৃষ্ণ মুখুয্যে, ধর।

পিয়াদা জিজ্ঞাসা করলে তোমার নাম রামকৃষ্ণ মুখুয্যে?

রামবিষ্ণু বললে, কি বোধ হয়?

পিয়াদা বললে, রামকৃষ্ণ নও তুমি?

রামবিষ্ণু বললে, হাঁ-হাঁ, রামকৃষ্ণও বটে, মুখুয্যেও বটে। শুনছি, আমার এক পরিবারও আছেন।

ঐ পরিবারই যত গোল বাধিয়েছে, মশাই? সাড়ী কিনেছিলেন?

না।

দোকানদার বললে, সে সব কথা আদালতে হবে। তোমার কাজ কর।

পিয়াদা বললে, তোমার নামে ওয়ারিন্‌ আছে। এই নাও।

কিসের ওয়ারিন্‌?

সে সব কথা আদালতে হবে। এখন জামিন দেবে, না, হাজতে যাবে?

জামিন কোথা পাব?

তবে হাজতে চল।

দোকানদার বিমলা দেবীকে সাক্ষীর সপিনা দিলে। কি জানি, আসামী যদি সাড়ীর কথা অস্বীকার করে!

ইতিমধ্যে জামাই রামকৃষ্ণ যাদব চাটুয্যেকে সমন ধরিয়েছে।

হাকিম দেখলেন, এক মোকদ্দমায় রামকৃষ্ণ ফরিয়াদি, এক মোকদ্দমায় আসামী। এক দিনে মোকদ্দমার দিন ধার্য্য হল।

আগে দোকানদারের মামলা। রামবিষ্ণুকে আসামীর কাঠগড়ায় হাজির করলে।

উকীল জিজ্ঞাসা করলে, তোমার নাম?

রামবিষ্ণু বললে, রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

পিতার নাম?

হরিহর মুখোপাধ্যায়।

তুমি এই দোকানদারকে চেন?

আজ্ঞে না।

ভাল ক'রে দেখ।

বেশ ক'রে দেখছি।

এর দোকান থেকে তোমার পরিবারের জন্যে সাড়ী কেন নি?

মশাই, আমার বিবাহ এখনও হয় নি। পরিবারই নেই, তার সাড়ী।

তোমার বিবাহ হয় নি, ঠিক বলছ?

আজ্ঞে হাঁ।

আমি বললুম, মিত্তির-জা কি আপিংএর খেয়াল দেখছ? না গুলি ধরেছ?

কেন?

আসামীকে জেরা? কোন ফৌজদারী আদালতে হবার যো নেই।

তারা জেরা করলে, তার আমি কি করব !

এক জন বললে, রসভঙ্গ কোর না। গল্প চলুক।

হাকিম বললেন, গাওয়া বোলাও।

বিমলা সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠল।

হলপ করিয়ে নাম-ধাম জিজ্ঞাসা করার পর প্রশ্ন হল, তোমার স্বামী তোমাকে একখানা সাড়ী এনে দিয়েছিলেন ?

হাঁ।

তোমার স্বামীকে তুমি চেন ?

চিনি।

হাকিম জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন ক'রে ?

আমার স্বামী—আমি চিনি না ?

এ আদালতে তিনি আছেন ?

বিমলা রামবিষ্ণুকে দেখিয়ে বললে, ঐ যে।

রামবিষ্ণু একবার চোখ দু'ট রগড়ে, হাতে চিম্‌টি কেটে দেখলে, জেগে আছে কি না।

যে সাড়ীর কথা হচ্ছে, সে সাড়ী কোথা ?

এই যে, আমি প'রে আছি।

দোকানদার সনাক্ত করলে, এই সাড়ী।

এই সময় যাদব উঠে বললেন, ধর্ম্মাবতার।

হাকিম ধমক দিলেন, চোপ বেয়াদব! পেশকার, এ ধমক আমি দিতে পারি ?

পেশকার বললে, ধর্ম্মাবতার মালিক, সব পারেন।

উকীল বললে, ধর্ম্মাবতার, যাদব বাবু আসামীর শ্বশুর। উনি বলছেন, ওঁর জামাইএর মাথা বিগড়ে গিয়েছে।

হাকিম বললেন, মাথা যদি বিগড়ে গিয়ে থাকে, তা হলে মাথা নেড়া ক'রে দেন নি কেন ?

ধর্ম্মাবতার, এবার বাড়ী নিয়ে গিয়ে মাথা মোড়াবার ব্যবস্থা করবেন।

রামবিষ্ণু বললে, উকীল বাবু, ঐ সঙ্গে ঘোল ঢালার ব্যবস্থাও যেন হয়।

হাকিম বললেন, কি রকম মাথা বিগড়েছে ? আঁচড়ায় ?

না, ধর্ম্মাবতার।

কামড়ায় ?

না, ধর্ম্মাবতার।

তবে কি করে ?

যাদব বল্‌লেন, ওর শালীকে বলে—সর্ব্বস্বধন।

হাকিম বল্‌লেন, ও, বুঝেছি, ম্যারি-ম্যানিয়া (Marry-mania) বে করবার মতলব।

উকীল বল্‌লে, ধর্ম্মাবতার, আমার মক্কেল বলছে, সাড়ীর দাম পেলে আর মোকদ্দমা চালাবে না।

যাদব তৎক্ষণাৎ দাম চুকিয়ে দিলেন। কিন্তু হাকিম বল্‌লেন, প্রকাশ্য আদালতে মিথ্যা বলেছে, তার দণ্ড কি হতে পারে ? পেশকার !

পেশকার বল্‌লে, ধর্ম্মাবতার যে দণ্ড দেবেন—

বেশ। চাপরাশি, আদালত ছুটি হওয়া পর্য্যন্ত একটা ঘরে আসামীকে কয়েদ করে রাখ।

তাই হ'ল।

তার পর জামাই রামকৃষ্ণর মোকদ্দমা উঠল।

ফরিয়াদ রামকৃষ্ণ মুখুয্যে হাজির—

জামাই রামকৃষ্ণ হাজির হতেই হাকিম জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নাম ?

রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

পিতার নাম ?

হরিহর মুখোপাধ্যায়।

উকীল বল্‌লে, ধর্ম্মাবতার, আমার মক্কেলের শ্বশুর যাদব চাটুয্যে তার কন্যা বিমলা দেবীকে অন্যায়রূপে আটক ক'রে জামাইকে বাড়ী ঢুকতে দেয়নি।

রামকৃষ্ণ, হরিহর নাম দুটো যেন শোনা শোনা। হাকিম পূর্ব্ব-মোকদ্দমার নথী ওল্‌টাতে ওল্‌টাতে রামকৃষ্ণকে দেখতে লাগলেন। পূর্ব্ব-আসামীর ত ঠিক এই চেহারা! জিজ্ঞাসা করলেন, পেশকার, একটু আগে যে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছিল, এ সেই নয় ?

ধর্ম্মাবতার, যেন মনে হচ্ছে—সেই।

হাকিম ধমক দিলেন, বদ্‌মাস! তুমি এক মোকদ্দমায় আসামী, এক মোকদ্দমায় ফরিয়াদী ? এই প্রকাশ্য আদালতে বলে গেলে—তোমার সাদি হয়নি, আর এখন বলছ, তোমার শ্বশুর বাড়ী ঢুকতে দেয় নি, তোমার জরুকে আটক রেখেছে ?

জামাই রামকৃষ্ণ বললে, ধর্ম্মাবতার, আমি কখন এমন কথা বলিনি। ঐ আমার স্ত্রী বিমলা, আর ঐ আমার শ্বশুর যাদব চাটুয্যে।

হাকিম পুনরায় ধমক দিলেন, ঝুট্‌! তুমি ঘর

থেকে বেরিয়ে এলে কেমন ক'রে? আদালতের হুকুম অমান্য কর!

জামাই রামকৃষ্ণ বললে, ধর্ম্মাবতার, আমি ত ঘরে বন্ধ ছিলুম না।

হাকিম ডাকিলেন, চাপরাশি!

হুজুর!

ও আসামীকো তোম ছোড় দিয়া কাহে?

হুজুর, উস্‌কো নেই ছোড়া।

দেখো, তোমারা সামনে খাড়া।

হুজুর, ও ঘরমে বন্ধ্ হায়।

হাজির করো।

রামবিষ্ণুকে হাজির করা হল। দু'জনের অবিকল সাদৃশ্য দেখে আদালত-সুদ্ধ লোক তাক্।

রামবিষ্ণু রামকৃষ্ণকে দেখেই চিন্‌তে পারলে। ছুটে গিয়ে আলিঙ্গন ক'রে বললে, ভাই, ভাই, ছেলেবেলা তুমি হারিয়ে গেছলে। তোমাকে দেশ-দেশান্তরে কত খুঁজেছি। আজ আমার অদৃষ্ট প্রসন্ন। এখানকার সকল লাঞ্ছনা আমার সার্থক! এই পুণ্য-তীর্থে, জাহ্নবী-যমুনার পবিত্র মিলনক্ষেত্রে আমাদের বিচ্ছিন্ন জীবন-ধারা আবার এক হ'ল।

জামাই রামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলে, তুমি কি হরিহর মুখুয্যের ছেলে?

হাঁ, ভাই!

সরকারী উকীল প্রশ্ন করলে, তোমরা কি যমজ ভাই?

আজ্ঞে হাঁ।

হাকিম বল্‌লেন, যমজ কেয়া? যমকা লেড়কা? ঝুট্।

জামাই রামকৃষ্ণের উকীল বল্‌লে, ঠিক ঠাউরেছেন, ধর্ম্মাবতার! এক ভাই আর এক ভাইএর চেহারা অবৈধ-রূপে আত্মসাৎ করেছে।—A clear case of criminal misappropriation—

হাকিম বল্‌লেন, ঠিক্! দুই ভাই একরকম চেহারা তোমরা রাখতে পাবে না। এক জনকে চেহারা বদলাতে হবে। পেশকার, এদের দু'জনের মুচ্‌লেকা লিখিয়ে নাও যে, এক চেহারা রাখতে পারবে না।

মুচ্‌লেকা লেখা হল। কিন্তু তর্ক উঠল, কি ক'রে চেহারা বদলানো হবে।

জামাই রামকৃষ্ণের উকীল বললে, আমার মক্কেলের ভাইকে একটা লেজ পরে পথে বেরুতে ব'লে দিন।'

সরকারী উকীল বল্‌লেন, Criminal mis-appropriationএর উকীল পরলেও চলতে পারে।

হাকিম বললেন, মিলা। ঠিক্—Eureka—এক ভাইকো দাড়ী-মোচ্ বেলকুল উড়ায় দেও। কোই বার্ব্বার হায়? এক ভাই যাকে সাফা হোকে হাম্‌কো দেখলাও।

জামাই রামকৃষ্ণ এক নাপিতের কাছে গিয়ে দাড়ী-গোঁফ কামিয়ে এলো। রামবিষ্ণু ভাবলে, আমার ত মাথা মোড়াবার ব্যবস্থা হয়েছিল। তবে আর ইতস্ততঃ কেন?

খানিক পরে দু'জনেই যখন হাকিমের সামনে এসে দাঁড়াল, দেখে হাকিমের চক্ষু স্থির। দাড়ী-গোঁফ কামানতেও দু'জনের এক চেহারা। হাকিম বললেন—বস্। তিনি মহা চটে গেলেন। বললেন, এক ভাই দাড়ী-গোঁফ গজাও। আবি গজাও।

যাদব বললেন, ধর্ম্মাবতার, আপনি আমাদের ছুটি দিন। ওটা আমরা ঘরাও-বন্দোবস্ত ক'রে নেব।

তার পর যাদব দুই ভাইকে বললেন, তোমাদের দু'জনকে আমি অনেক গাল-মন্দ, অপমান করেছি। এক জনকে খেসারৎ ধরে দেব। তা হ'লে দু'জনেরই হবে। বলে কমলার পানে চাইলেন।

কমলা বললে, দিদি, তোর দু'জন বর উপস্থিত।

বিমলা বললে, এক জনকে তোকে দোব।

দময়ন্তী-স্বয়ম্বরে আসরে পঞ্চ নল উপস্থিত থাকতেও যে দেবতার ইঙ্গিতে দময়ন্তী আসল নলের গলায় বরমাল্য দিয়েছিলেন, সেই দেবতার ইঙ্গিতে কমলা রামবিষ্ণুকে বললে, মুখুয্যে মশাই, এখন ত চিন্‌তে পারছ, আমি তোমার কে?

রামবিষ্ণু তার কাণে কাণে বললে, তুমি আমার সর্ব্বস্বধন!

গল্পটি শুনে আসরে সকলে মতপ্রকাশ করলে, গল্পটি হয় আপিংএর খেয়াল, নয় গুলিখুরি। কি বল, মিত্তির-জা?

মিত্তির-জা উত্তরে একটি বড় ডেলা আপিং গালে ফেলে দিলেন।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

২০

ধর্ম্মাধিকরণ

ধর্ম্মাধিকরণ শব্দটি অতি প্রাচীন, এই শব্দের অর্থ বিচারালয়, ন্যায়-অন্যায়ের বিচারস্থল, ধর্ম্মস্থান, যে স্থানে ধর্ম্মাধর্ম্মের বা ন্যায়-অন্যায়ের বিচার হয়। এই শব্দটিতে ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ ও বিচারকও বুঝায়।

ধর্ম্মাধিকরণের উদ্দেশ্য মহৎ, ন্যায়-অন্যায়ের বিচারস্থল। কিন্তু এতগুলি লোকের মধ্য দিয়া এই বিচার-পদ্ধতি চালাইতে হয় যে, উদ্দেশ্য মহৎ হইলেও ফল আশানুরূপ ও নামের অনুরূপ হয় না।

ধর্ম্মস্থানগুলি অনেক সময়ে অধর্ম্মের দ্বারা বেষ্টিত, তাহা বিচারালয়ই বল, আর দেবালয়ই বল। সকলেই জানেন যে, তীর্থক্ষেত্রগুলি অধর্ম্মের সহিত এতদূর সংশ্লিষ্ট যে, সেগুলিকে ধর্ম্ম-স্থান না বলিয়া নিম্নস্তরের কোন নাম দিলে কোন অসুবিধা হইবে না। ধর্ম্মাধিকরণেও সেইরূপ অনেক অসুবিধা আছে।

আদালত বলিলেই সাধারণতঃ সেই স্থানটিকেই বুঝায়, যেখানে আইনের বিশ্লেষণ করিয়া বিচারক বিচার বিতরণ করেন। আইনকে কার্য্যকরী করিবার জন্য আইন বিশ্লেষণ করিয়া যে স্থানগুলিতে লোক সাধারণ আইনের সাহায্য পায়।

আদালতের মুখ্য উদ্দেশ্য, আইনের দ্বারা লোককে অন্যায় হইতে রক্ষা করা, যথেচ্ছাচারিতার হস্ত হইতে জনসাধারণকে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা।

ধর্ম্মাধিকরণের আর একটি নাম আদালত, অর্থাৎ যে স্থানে ধর্ম্মানুযায়ী জনসাধারণকে সাহায্য করা হয়।

যে সকল মকদ্দমায় দলিল-দস্তাবেজের সাহায্য আছে, তাহাতে বিচার করিবার কতকটা সুবিধা আছে। অর্থাৎ দলিল-দস্তাবেজ-গুলি জাল কি না, তাহা ঠিক করিয়া লইলে বিচারকের অনেক সময়ে বিচার করিবার সুবিধা হয়। কিন্তু যেখানে সাক্ষীর জবানবন্দির উপর নির্ভর করিয়া বিচার করিতে হয়, সেখানে অনেক সময়ে ভ্রম হইবার সম্ভাবনা।

বিচার করিবার প্রধান ও প্রথম স্তর সাক্ষীদের হাতে। তাহারা শপথ করিয়া আদালতে আসিয়া মিথ্যাসাক্ষী দিলে অনেক সময়ে বিচারকের পক্ষে তাহা ধরিয়া ফেলা অসম্ভব হয়।

হাকিম প্রমাণের উপর বিচার করিবেন। সেই প্রমাণ-প্রয়োগ সাক্ষীদের মুখে। কাযেই সাক্ষীরা যদি মিথ্যা প্রমাণ প্রয়োগ করে, তবে বিচারে বৈষম্য হইবার বিশেষ সম্ভাবনা।

প্রত্যেক বিচারালয়ে বিচারপতি ছাড়া আরও অনেক লোকের উপর বিচারের নিরপেক্ষতা নির্ভর করে। বিচারপতি, তারপর কৌন্সুলী, এটর্ণী, উকীল, আদালতের দ্বিভাষী, পেশকার, বেঞ্চ-ক্লার্ক—সকলেই নিরপেক্ষ বিচারের জন্য অল্পবিস্তর দায়ী।

এ সকল লোক ছাড়া আরও অনেক লোকের হাতে যথার্থ বিচারফল নির্ভর করে। দালাল নামধারী এক শ্রেণীর জীব আছেন, যাঁহারা অনেক সময়ে বিচার-বিভ্রাটের জন্য দায়ী। এই শ্রেণীর লোক বিদ্যা-বুদ্ধির তত ধার ধারেন না, অথচ বিচার-বিষয়ে অনেক সময়ে হস্তক্ষেপ করেন। এই দালাল-শ্রেণীর লোক সমাজ-শরীরের রক্তে মিশিয়া রহিয়াছেন। সর্ব্বস্থানেই তাঁহারা উপস্থিত আছেন। ভাল লোকও স্থানবিশেষে দালাল হইয়া দাঁড়ান।

দালাল সর্ব্বস্থানব্যাপী। ইহারা আদালত-গৃহে, এটর্ণীর অফিসে, উকীলের বাড়ীতে, কৌন্সুলের চেম্বারে, ভদ্রলোকের বৈঠকখানায়, জমীদারের বাগান-বাড়ীতে, তীর্থস্থানে, প্রত্যেক পল্লীতে—সর্ব্বত্রই বিচরণ করিতেছেন।

সব সময়েই যে ইহারা দালাল হইয়া বিচরণ করেন, তাহা নহে। সময়ে সময়ে ভদ্রবংশজাত ভদ্রলোক দালাল হইয়া দাঁড়ান, নিকট-আত্মীয় হইয়া এই শ্রেণীর মধ্যে ঢুকিয়া যান। বন্ধুবান্ধবও এই শ্রেণীভুক্ত হন।

বিচার-বিভ্রাট ঘটে নানা কারণে। তাহার মধ্যে অর্থকৃচ্ছ্রতাই একটি মূল কারণ। আপনার প্রতি অত্যাচার করা হইয়াছে, আপনার প্রতি জুলুমের জন্য অপর পক্ষ আইনের মস্তকে পদাঘাত করিয়াছে এবং আপনাকেও বিশেষ অসুবিধায় ফেলিয়াছে, তথাপি আইনের আশ্রয় লইতে গেলে, আপনার অর্থ না থাকিলে কোন সুবিধাই হইবে না।

ব্যবসা সব সময়েই একটি অর্থাগমের পন্থা। আইন-ব্যবসায়েও তাহার ব্যতিক্রম নাই। অনেক আইন-ব্যবসায়ী সৎপরামর্শ দেন, কিন্তু এমনও অনেক আছেন, যাঁহারা সৎপরামর্শ দেন না, অথবা দিবার ক্ষমতা তাঁহাদের নাই।

প্রত্যেক পল্লীতে ভাল-মন্দ দুই শ্রেণীর লোক আছে। যখন কেহ ধনী লোক কর্ত্তৃক উত্ত্যক্ত হয়, সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে গেলে তাহাকে অপর লোকের আশ্রয় লইতে হইবে। আশ্রয়দাতা যদি ভাল লোক হন, তবে কতকটা মঙ্গল। অসৎ

লোক হইলে আশ্রয়প্রার্থীর বিপদ। পরামর্শদাতার দোষ-গুণের উপর ফলাফল নির্ভর করে।

অনেক সময় দেখা যায়, যে স্থানে ছোট ছোট আদালত স্থাপিত, তাহার নিকটস্থ লোকগুলির মকদ্দমার সংখ্যা বেশী। তাহার কারণ, এক শ্রেণীর লোক, মকদ্দমার সংখ্যা-বৃদ্ধি করিয়া মামলাবাজদের অর্থেই জীবন পোষণ করে। এ জন্ম তাহারা সব সময়েই মকদ্দমার সংখ্যা-বৃদ্ধি করিতে ব্যস্ত!

অনেক সময়ে মকদ্দমা বাধাইয়া দিবার লোকসংখ্যা কম হইলে মামলার সংখ্যাও কম হয়। এ অবস্থায় দুই এক জন অত্যাচারিত হইয়াও, সেই অত্যাচারের প্রতীকার পান না। এরূপ দুটি ঘটনার বিপক্ষে আটটি ঘটনা পাওয়া যায়, যে স্থানে এই শ্রেণীর লোকের অভাবে মানুষ অত্যাচারিত হইলেও তাহা মনে করে না।

দালালের আবার বিভাগ আছে, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, উচ্চ শ্রেণীর দালাল, মধ্যম শ্রেণীর দালাল, নিম্নশ্রেণীর দালাল ইত্যাদি। এক শ্রেণীর লোক আছে, যাহারা মামলা না করিতে পারিলে তাহাদের ভাত হজম হয় না। ইহারা অস্বাভাবিক শ্রেণীর লোক।

সাধারণতঃ লোক মামলা ভালবাসে না। এই শ্রেণীর লোককে মামলার দালালরা উত্তেজিত করিয়া মকদ্দমায় লিপ্ত করে। আমি একটি ঘটনার কথা বলিতেছি। ইহা প্রায় ৩২ বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। আমি তখন আমার চোরবাগান ভুবন বাঁড়ুযোর লেনস্থিত বাটীতে ছিলাম। সে দিন তিন জন লোক আমার বৈঠকখানায় আসিয়া উপস্থিত। এক জনের মাথায় ফেট্টি-বাঁধা, অপর দুই জন তাহার সঙ্গে আসিয়াছে। গল্প-হিসাবে, যাহারা সঙ্গে আসিয়াছিল তাহাদের নাম দিব—প্রথম গোষ্ঠ, দ্বিতীয়—তুলসী, আর যাহার মাথায় ফেট্টি, তাহার নাম হেমন্ত।

গোষ্ঠ যুবা-পুরুষ, শুধু গোষ্ঠ কেন, তিন জনেই যুবা-পুরুষ। যখন তাহারা আমার বাড়ী আসিয়াছিল, তখন বেলা প্রায় ৯টা, আমি তখন আদালতে যাইবার জন্ম প্রস্তুত হইতেছিলাম। তিন জনের কাহাকেও পূর্ব্বে আমি কখনও দেখি নাই, তবে উত্তর কালে তল্লাসীতে জানা গিয়াছিল, গোষ্ঠ এক জন দালাল। সে সব আদালতেরই—কলিকাতা হাইকোর্ট, কলিকাতা স্মল-কজ কোর্ট (ছোট আদালত), কলিকাতা পুলিস কোর্ট, শিয়ালদহ ও হাওড়া আদালতসমূহে দালালী করিত। আরও জানা গিয়াছিল, সে আমাকে এক জন নূতন উকিল বলিয়া জানিয়াছিল।

গোষ্ঠ আমার নিকটবর্ত্তী হইবার সঙ্গে সঙ্গে ৮২ সিক্কার একটি প্রণাম করিল অর্থাৎ দুই হাত জোড় করিয়া গরুড়পক্ষীর ন্যায় দাঁড়াইল। সে মাথাটি এত নীচু করিল যে, প্রায় ভূমে ঠেকিয়া যায়। মুখে সে বলিল, "হুজুর, দণ্ডবৎ।" তাহার পর হেমন্তের দিকে ফিরিয়া বলিল, "আমার যা কিছু মামলা, সব ইনিই করেন।" (তাহার কথা শুনিয়া আমার মনে হয় নাই যে, আমি কখন তাহার মামলা করিয়াছি বা মুখ চিনি।)

গোষ্ঠ আরও বলিল, "ইনি যখন আদালতে মকর্দ্দমা করিতে দাঁড়ান, তখন ইনি সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করেন, আদালত কম্পবান হয়।" যদিও এ কথাগুলি সম্পূর্ণ মিথ্যা, তথাপি আমি তাহার প্রতিবাদ করিলাম না। তাহার পর হেমন্তকে দেখাইয়া দিয়া বলিল, "হুজুর, এইটি আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। আমাদের পাড়ার এক জন অত্যাচারী রমেশ বিনা দোষে ইহাকে প্রহার করিয়াছে। রমেশের সঙ্গে আরও তিন জন ছিল, তাহারা রমেশের সাহায্য করিয়াছে। আপনি জানেন, আমরা গরীব লোক; আপনাকে যৎকিঞ্চিৎ প্রণামী দিব, তাহাতেই কার্য্য করিতে হইবে।"

এই বলিয়া হেমন্তকে বলিল, "দাও, ৪৲ টাকা প্রণামী দাও। আর দরখাস্তের ষ্ট্যাম্প ১৲ টাকা, শমন-খরচার ২৲ টাকা জমা দাও।"

হেমন্ত বলিল যে, তাহার কাছে ৫৲ টাকা বই নাই। তাহা শুনিয়া গোষ্ঠ বলিল, "আচ্ছা, ৫৲ টাকাই এখন দাও, বাকি ২৲ টাকা আদালতে লইয়া যাইও।"

পাঁচটি টাকা পাইয়া আমি তখন দরখাস্ত লিখিয়া লইলাম, আর ঠিক ১০টার সময় লালবাজার পুলিস আদালতে যাইতে বলিলাম। আধ ঘণ্টা বাদ, আমি যখন আদালতে যাইবার জন্ম প্রস্তুত হইয়াছি, তখন গোষ্ঠ ও তুলসী আমার বাটীতে আসিল। গোষ্ঠ বলিল, "হুজুর, পাড়ার পাঁচ জনে আসিয়া ঐ মামলাটি মিটাইয়া দিয়াছে, অতএব ঐ মামলা রুজু করিবার আর কোন প্রয়োজন নাই। আপনি কিঞ্চিৎ লইয়া বাকী ফি'টি আমাকে ফিরাইয়া দিন। আর এ কথাও বলিয়া যাইতেছি, আমার মহল্লার যাহা কিছু মামলা, সবই আপনি পাইবেন।"

আমি তাহার এই প্ররোচনা-বাক্যে কিছু কাণ না দিয়া বলিলাম, "আমাকে কত কাটিয়া লইতে বল।"

তাহা শুনিয়া গোষ্ঠ বলিল, "উকীল বাবু, আপনি ১৲ টাকা কাটিয়া লউন।"

তাহা শুনিয়া আমি বলিলাম, যদি ১৲ টাকা কাটিয়া লইতে হয়, সে অবস্থায় কিছু না লওয়াই ভাল।" এই বলিয়া আমি তাহাকে ৫৲ টাকাই ফিরাইয়া দিলাম।

আদালতে গিয়া দেখি, সেই লোকটি, যে চোট খাইয়াছিল, সে উপস্থিত। আমি তাহাকে বলিলাম, "কি হে, তোমার মামলা মিটিয়া গিয়াছে?"

হেমন্ত আশ্চর্য্যের সহিত বলিল,—"আজ্ঞে না।"

আমি। সে কি! তোমার ভাই আমার বাড়ীতে আসিয়াছিল। আসিয়া বলিল, তোমার মামলা মিটিয়া গিয়াছে, আর যে টাকা দিয়াছিল, তাহা লইয়া গিয়াছে।

হেমন্ত। আজ্ঞে, সে আমার ভাই নয়। আমার মাথায় ফেট্টি দেখিয়া সে আমাকে সঙ্গে করিয়া আপনার বাটীতে লইয়া গেল, তাহার পর যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা আপনি জানেন।

আমি দেখিলাম, আমি বোকা বনিয়াছি। এ কথা প্রচার করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে। কাযেই বিনা বাক্যব্যয়ে তাহার দরখাস্ত রুজু করিয়া দিলাম। পরে নিজের গাঁট হইতে ষ্টাম্পের টাকা দিয়া মামলা রুজু করিলাম। আমার প্রতিবাসীদের ও লোকজনদের বলিয়া দিলাম, গোষ্ঠকে দেখিতে পাইলেই তাহাকে যেন ধরিয়া পুলিসের হাতে জিম্মা করিয়া দেয়।

তুই তিন মাস পরে এক দিন তিন চার জন লোক গোষ্ঠকে ধরিয়া আমার কাছে লইয়া আসিল, তখন দেখিলাম, তাহার কলেবর রক্তাক্ত। অনুসন্ধানে জানিলাম, তাহারা ক'জনে মিলিয়া তাহাকে উত্তম-মধ্যম শিক্ষা দিয়াছে। তাহার রক্তস্রাব দেখিয়া আমার মনে দয়া হইল! আমি তাহাকে পুলিসের হাতে না দিয়া বলিলাম, "খবরদার, ভবিষ্যতে এরূপ কার্য্য আর কখনও করিও না।" এই বলিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া হইল।

কিছুদিন পরে ঐ মামলার ফরিয়াদি হেমন্ত আমাকে বলিল, "মহাশয়, আমার মকদ্দমা করিবার একবারে ইচ্ছা ছিল না, ঐ গোষ্ঠ আমাকে ফুস্‌লাইয়া মামলা রুজু করিয়া দিয়াছিল; বলিয়াছিল, আমি দশ টাকা খরচ করিলে ৫০৲ টাকা পাইব।"

প্রকৃত কথা বলিতে গেলে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতে এবং পুলিসে যে সকল মামলা দায়ের করা হয়, তাহার মধ্যে শতকরা ৯০টি রুজু না হইলে পৃথিবীর কোন ক্ষতি হইত না। শতকরা ১০টি মামলায় মানুষ বিপন্ন হইয়া আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করে, বাকি ৯০টি সখের কাজল। মামলা দায়ের করিলে একটা হৈ চৈ হয়, দায়ের না করিলে উকীল, মোক্তার, কার্পরদাজাদি ছাড়া অন্য ক'হারও ক্ষতি হয় না।

অনেক সময়ে অনেক লোকের মামলা করা, থিয়েটার-বায়স্কোপ দেখার মত। হাতে সময় আছে, মনে স্ফূর্ত্তি আছে, অতএব মামলা করা চাই। মামলা করায় মাদকতা আছে, সেই মাদকতা উপভোগ করিবার জন্য মামলা রুজু হয়।

আমার এক অবস্থাপন্ন বন্ধুকে প্রায়ই মামলা করিতে দেখিতাম। সুস্থকায় অর্থশালী যুবাপুরুষ, খাটিয়া খাইতে হয় না—তিনি প্রায় মামলা করিতেন, আর মামলা লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন। এক দিন এক স্থানে তাঁহার সহিত দেখা; আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনাকে চার পাঁচ দিন দেখি নাই কেন?"

বন্ধু। কয়দিন বড়ই ব্যস্ত আছি।

আমি। আপনার আবার ব্যস্ত হইবার কারণ কি?

বন্ধু। একটি মকদ্দমা চলিতেছে, সাক্ষি-সংগ্রহে ও অন্যান্য বিষয়ে বড় ব্যস্ত আছি।

আমি। আপনি প্রায় মামলা লইয়া ব্যস্ত থাকেন, কারণ কি? মামলা না করিলে চলে না?

বন্ধু। রায়বাহাদুর, মামলা ছাড়িয়া দিলে কি লইয়া থাকিব? থিয়েটার, বায়স্কোপে ও রেসে মাদকতা আছেই, কিন্তু মামলার মাদকতাও কোন অংশে কম নয়। মামলা না থাকিলে সময় কাটে কি করিয়া? আর আমার অর্থবল, সামর্থ্য, লোকবল, সবই আছে, সেইটে মামলার দ্বারা অপর লোককে বিশেষ ক'রে বুঝাইয়া দিই। যখন সময় কাটে না, সময়ের জন্য ভারাক্রান্ত বোধ করি, তখন তুটো মামলা হাতে থাকিলে বেশ সময় কাটিয়া যায়।

এই কথাটি বেশী লোকের পক্ষে না খাটিলেও কতকগুলি লোকের পক্ষে খাটে। আমার একটি মাড়োয়ারী মক্কেল, বিশেষ অবস্থাপন্ন, যথেষ্ট ধনশালী, বিশেষ বুদ্ধিমান্ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কারণ, নিজ বুদ্ধিবলে তিনি অনেক টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন এবং নিজে অনেক টাকার মালিক। বোম্বাইতে তাঁহার প্রধান কারবার-স্থান, কলিকাতাতেও কারবারের শাখা-স্থান আছে।

এক জন গোমস্তা তাঁহার ১০।১২ হাজার টাকা মারিয়াছিল। তাঁহারই এক ভগিনীপতি রামচাঁদ এই গোমস্তাটিকে এই মাড়োয়ারী ভদ্রলোকটির কাছে নিয়োগ করিয়া দিয়াছিল। সেই মাড়োয়ারী ভদ্রলোকটির নাম জয়গোপাল। গোমস্তাটি জয়গোপাল বাবুর টাকা খাইবার পর যখন তিনি জানিতে পারিলেন যে, গোমস্তাটি টাকা খাইয়াছে, তখন তিনি রামচাঁদ বাবুকে ডাকাইয়া গোমস্তার অন্যায় কার্য্যের কথা বলিতে লাগিলেন।

রামচাঁদ বাবু জানিতেন, জয়গোপাল বাবু অতি মিতব্যয়ী, অর্থাৎ অন্যায়রূপে তাঁহাকে ঠকাইয়া তাঁহার অর্থ আত্মসাৎ করিবে, তাহা তিনি কোন অবস্থাতেই সহ্য করিতে পারিতেন না।

গোমস্তার নামে জয়গোপাল বাবু মামলা রুজু করিলেন এবং যখন মামলা চলিতেছিল, রামচাঁদ বাবু ও আরও কয়েকজন

মিলিয়া এই মামলাটি যাহাতে আপোষে মিটিয়া যায়, তাহার চেষ্টা করিতেছিলেন। কথায় কথায় বচসা আরম্ভ হইল। রামচাঁদ বাবু জয়গোপাল বাবুকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তুই শালা অতি কঞ্জুস, তোর গোমস্তার স্ত্রীর মরণাপন্ন অসুখ, তাহার দরুণ কিঞ্চিৎ টাকা অন্যায়ভাবে গ্রহণ করিয়াছে। সে বলিতেছে যে, সময় ও সুবিধা পাইলে তোমার টাকা ফিরাইয়া দিবে, কেন তুমি তাহাতে রাজি হইতেছ না? মকদ্দমা করিয়া এই লোকটিকে জেলে দিয়া কি লাভ হইবে? সে জেলে যাইবে, তাহার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা অন্ন বিনা ছন্নছাড়া হইবে;, অথচ তুমি যদি তাহার প্রতি দয়া কর, সে-ও বাঁচিয়া যাইবে, তোমারও বিশেষ ক্ষতি হইবে না। হয় ত তোমার টাকাও শোধ দিয়া দিতে পারে।"

কথায় কথা বাড়ে। জয়গোপাল বাবু বলিলেন, "সত্য, আমি তোমার শালা। তুমি আমার ভগ্নীকে বিবাহ করিয়াছ, কিন্তু তাই বলিয়া সময়ে অসময়ে স্থানে অস্থানে শালা শালা বলিয়া আমার পিছু পিছু দৌড়াইবে, তাহা হইতে পারে না। তোমাকে বারণ করিয়া দিতেছি, খালি শালা শালা বলিয়া আমাকে সম্বোধন করিও না।"

জয়গোপাল বাবুর এই বাক্যে রামচাঁদ বাবু কোন প্রতিবাদ করিলেন না, বরং হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। তাহাতে জয়গোপাল বাবু আরও রাগান্বিত হইলেন। শেষে বলিলেন, "দেখ রামচাঁদ, আমি তোমাকে পুনঃ পুনঃ বারণ করিতেছি, তুমি শালা শালা বলিয়া কুকুরের ন্যায় চেঁচাইও না। তাহা যদি কর, এই কথা লইয়া আমি তুলকালাম করিব।"

এই কথা শুনিয়া রামচাঁদ বাবু বলিলেন, "যাও, যাও, তোমার মত অনেক শালাকে তুলকালাম করিতে দেখিয়াছি।"

এই সব ঘটনার পর জয়গোপাল বাবু আমার কাছে আসিলেন এবং বলিলেন, রামচাঁদ বাবুর নামে মানহানির নালিশ করিতে হইবে।

সমস্ত ঘটনাটি তিনি আমাকে বলিলেন। শুনিয়া অতিকষ্টে আমি হাসি চাপিয়া রাখিলাম। শেষে জয়গোপাল বাবুকে বলিলাম, "দেখুন মহাশয়, অনেক সময়ে এক জন আর এক জনকে শালা সম্বোধন করিয়া থাকে। দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রথম ব্যক্তিকে শালা সম্বোধন করিবার কোন অধিকার নাই, তথাপি শালা সম্বোধনে তাহাকে বিভূষিত করে, আর আপনাকে এ-স্থলে তাঁহার শালা বলিবার অধিকার আছে।"

জয়গোপাল বাবু নাছোড়বন্দা হওয়াতে দরখাস্ত করিতে রাজি হইলাম। অনেকগুলি টাকার লোভ সামলাইতে পারিলাম না। তবে দরখাস্ত করিবার পূর্ব্ব হইতেই জয়গোপাল বাবুকে বলিয়া রাখিলাম, "এ শালা-শালী ব্যাপারে মামলায় বিশেষ সুবিধা না হইতে পারে।"

দরখাস্ত দাখিল করিবার সময় হাকিম হাসিয়াই আকুল। শেষে হাকিম আসামীর উপর একখানি নোটিস ইস্যু করিলেন, "কেন তোমার নামে মামলা চলিবে না?"

সেই নোটিস ধরাইবার সময় তাঁহার যে কার্পরদাজ সঙ্গে ছিল, তাহার সহিত সার্ভিং-পিয়নের পয়সা লইয়া বচসা, তাহা হইতে আর এক প্রস্থ মামলা।

তাহার আর এক জন গোমস্তা টাকা ভাঙ্গিয়াছিল, তাহার দরখাস্ত করিবার জন্য তিনি দরখাস্তকারীদের সঙ্গে দাঁড়াইয়া আছেন। দরখাস্তকারীরা এজলাসের ভিতর লাইনবন্দি হইয়া দাঁড়ায়। তাহারা একে একে ধারাবাহিকভাবে সাক্ষীর কাঠগড়ায় গিয়া দাঁড়ায়। কোর্টের সারজেন্ট তাঁহাকে যে স্থানে দাঁড়াইতে বলিয়াছিল, তাহা না শুনিয়া খানিকটা আগাইয়া যান এবং যাহাতে তিনি শীঘ্র সাক্ষীর কাঠগড়ায় উপস্থিত হইতে পারেন, এরূপ স্থানে দাঁড়ান। সারজেন্ট, তাঁহার কাছে গিয়া ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে পূর্ব্বস্থানে আসিতে বলে, এবং সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয়তাসূচক সম্ভাষণ করে অর্থাৎ "শালা" পদ ব্যবহার করে। জয়গোপাল বাবু মহা চটিয়া যান এবং শ্রেণী ভাঙ্গিয়া আমার কাছে আসিয়া বলেন, "আমার এ দরখাস্ত চুলোয় যাক্, আপনি সারজেন্টের নামে নালিশের দরখাস্ত করুন।"

প্রথমে আমি মনে করিলাম, জয়গোপাল বাবুর শুনিবার ভুল হইয়াছে। আমি সারজেন্টকে ডাকিলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলাম, এ কথা সত্য কি না—সে জয়গোপাল বাবুকে শালা বলিয়াছে? সে স্বীকার করিল যে, সে বলিয়াছে। আমি সারজেন্টকে জয়গোপাল বাবুর নিকট মাপ চাহিবার কথা বলিলাম, তাহাতে উভয় পক্ষই রাজী নহে।

হাকিম খাস-কামরা হইতে বাহিরে আসিয়া এজলাসে বসিলেই আমি এই ঘটনার কথা হাকিমকে জানাইলাম। তাহাতে তিনি সারজেন্টকে ডাকিয়া বেশ করিয়া ধমকাইয়া দিলেন এবং আমার মক্কেলের নিকট মাপ চাহিতে হুকুম দিলেন। হাকিমের হুকুমে সে যখন মাপ চাহিল, তখন আমার মক্কেলও খুসী হইয়া গেল।

অনেক সময় দুই পক্ষের মনোমালিন্য আছে, সুবিধা পাইলে এক পক্ষ অপর পক্ষের নামে হয় ফৌজদারী নয় দেওয়ানী মামলা লাগাইয়া দেয়। অনেক সময়েই যখন এক পক্ষ অপর পক্ষের

নামে বণ্টন-নামা মামলা রুজু করে, সামান্ত ক্ষমা-ঘৃণা করিলেই মামলা মিটিয়া যায়, কিন্তু তাহারা কখনই করিবে না। তাহার কারণ, দুই পক্ষের পশ্চাতেই পাঁচ জন ভদ্রলোক আছেন। উভয় পক্ষ মিটাইতে রাজি, কিন্তু প্রত্যেক পক্ষের শুভানুধ্যায়ীরা কখনই মিটাইতে দিবেন না। প্রত্যেক পক্ষের কাছেই এই পাঁচ জন লোকের খাতির—যত দিন মামলা চলিবে! কাযেই কোন ভদ্রলোকই এই সুবিধাটুকু ছাড়িতে প্রস্তুত নন।

অনেক সময়ে এক পক্ষ অপর পক্ষকে ঠকাইবার জন্ম মকদ্দমা রুজু করে। উদ্দেশ্য মহান্—অপর পক্ষকে ঠকাইয়া কিঞ্চিৎ আদায় করিবেন, আর সেই ঠকানটি ধর্ম্মাধিকরণের সাহায্যে। তাহার ফলে উকীল, কৌনসুলী এবং কার্পরদাজ ও পাঁচ জন ভদ্রলোক ছাড়া প্রত্যেক পক্ষেরই বিশেষ অসুবিধা ঘটে।

এই স্থানে আমি একটি সত্য ঘটনার কথা বলিব। রামচরণ দে পোদ্দারের কার্য্য করিয়া কিয়ৎপরিমাণে অর্থসঞ্চয় করেন। পাঁচ সাতখানি বাড়ী ও দুইখানি পোদ্দারী দোকান রাখিয়া তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার দুই পুত্র ছিল—শম্ভু ও যুগল। মৃত্যুর পূর্ব্বে কারবার দুইটি ও বাড়ী কয়খানি সমানভাবে ঐ দুই পুত্রকে দিয়া যান।

যুগলের এক পুত্র ছিল—নাম মহীপাল। শম্ভুর দুই পুত্র ছিল—ভরত ও নিমাই। মহীপাল, পিতার নিকট হইতে যাহা কিছু সম্পত্তি পাইয়াছিল, সবই নষ্ট করিয়া ফেলিল। দোকানখানি উঠিয়া গেল, মহীপালের কষ্টের অবধি রহিল না। এই সময়ে এটর্ণীর অফিসের এক কোর্ট-ক্লার্ক তাহার দুঃখ দেখিয়া তাহার সাহায্যে নিযুক্ত হইল।

রামচরণ তাঁহার বিষয়ের ভাগের কোন লেখাপড়া করিয়া যান নাই, তবে হাতে হাতে বখরা করিয়া দিয়া যান। কোর্ট-ক্লার্ক অষ্টাবক্র যে এটর্ণীর কাছে কার্য্য করে, তাহার আফিসে গিয়া মহীপালকে তুলিল।

দুই একদিন আনাগোনার পর সকল কথা শুনিয়া এটর্ণী তাহার মামলাটি লইতে রাজি হইলেন। রামচরণের সমস্ত সম্পত্তির দাম হইবে প্রায় দুই লক্ষ টাকা। মহীপাল পাঁচ-সহস্র টাকা ধার করিয়া তাহার অংশ বন্ধক দিল। মহীপাল পাইল ৫০্ টাকা, বাকি ৪৯৫০্ টাকা এটর্ণীর হাতে রহিয়া গেল মকদ্দমার খরচার জন্ম। যে মকদ্দমাটি রুজু হইল, তাহা এইরূপ:—

মহীপাল রামচরণের পৌত্র, যুগলের পুত্র। অপর-পক্ষ রামচরণের অপর পুত্রের বংশধর। এই বলিয়া মহীপাল নালিস করিল যে, রামচরণ সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন সব যৌথ। এখন বাটী প্রভৃতির ভাড়া আর কারবারের মুনাফা সবই শম্ভুর পুত্ররা লইতেছে, তাহাকে দিতেছে না। অতএব সে রামচরণের সম্পত্তির বণ্টননামার জন্ম নালিস রুজু করিল। আর্জিতে ইহা প্রকাশ করিল যে, রামচরণের যা কিছু সম্পত্তি সবই এজমালি, তাহার অর্দ্ধেক অংশ, আর অর্দ্ধেক অংশ ভরত ও নিমাইয়ের। সে আর্জিতে আরও প্রকাশ করিল যে, কতক সম্পত্তি তাহার জ্যেঠার নামে আছে, আর কতক সম্পত্তি তাহার নিজের নামে আছে। মহীপালের শ্বশুর বেনামী করিয়া মহীপালের নামে একখানি বাড়ী খরিদ করিয়া রাখিয়া-ছিলেন। মহীপাল আর্জিতে লিখিয়া দিল, সেই সম্পত্তিও তাহার পিতামহের বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে খরিদ করা হইয়াছে। এই বলিয়া বণ্টননামা মামলা রুজু হইল।

তাহার জ্যেঠার ছেলেরা মিতব্যয়ী ও পরিশ্রমী। অনেক পরিশ্রমের দ্বারা তাহারা পিতামহ ও পিতৃদত্ত সম্পত্তি অনেক বাড়াইয়াছিল। আর মহীপাল অমিতব্যয়ী, পরিশ্রম-কাতর, দুষ্টচূড়ামণি। বদখেয়ালীতে ও বসিয়া বসিয়া খাইয়া তাহার পিতৃদত্ত সম্পত্তি সব নষ্ট করিয়া দিয়াছিল।

এখন অষ্টাবক্রের এটর্ণীর পরামর্শে তাহার জ্যেষ্ঠতাতের ত্যক্ত-সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ রামচরণ ওয়ারিশনরূপে দাবী করিল।

ভরত ও নিমাই শমন পাইয়াই আশ্চর্য্য হইল। তাহাদের সম্পত্তি সব আলাহিদা। খুড়ার সম্পত্তির সহিত কোন সম্পর্ক নাই, তথাপি এ কি বিপদ!

যে দিন হইতে মামলা রুজু হইয়াছে, সেই দিন হইতেই মহীপালের অন্নের সংস্থান হইয়াছে অর্থাৎ তাহার এটর্ণী তাহার ভরণ-পোষণের জন্ম দু' পাঁচ টাকা করিয়া দেন। মহীপালের কাযের মধ্যে সকালে এটর্ণীর বাড়ীতে গিয়া বসিয়া থাকে, আর দুপুরবেলা তাহার আফিসের শোভাবর্দ্ধন করে।

ক্রমে মকদ্দমা বোর্ডে উঠিল। শেষ শুনানি রুজু হইল। কয়েকজন আত্মীয়-স্বজন মামলা মিটাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কোন ফল হইল না; কারণ, কোন পক্ষের এটর্ণী মামলা মিটাইতে রাজি নহেন। আসামী পক্ষের এটর্ণী বলেন, তাঁহার মক্কেলরা বলে যে, মামলা সম্পূর্ণ মিথ্যা, বিষয় পূর্ব্বেই ভাগ হইয়াছিল, অতএব যৌথ হইল কোথা হইতে? ফরিয়াদীর এটর্ণী বলেন, অর্দ্ধেক বিষয় চাই, তাহা না হইলে কিছুতেই রাজি হইব না। মহীপালের ইহাতে কোনই হাত নাই, সে দু' পাঁচ টাকা করিয়া খরচা পায়, আর বিষয়ের বখরা পাইলে সে কি করিবে, তাহা ভাবিয়াই আনন্দে মাতোয়ারা।

ছয় দিন মকদ্দমা শুনানীর পর, প্রমাণ-প্রয়োগের উপর

নির্ভর করিয়া বিচারপতি বণ্টননামা মামলায় ডিক্রি দিলেন। তার পরদিনেই মহীপালের এটর্ণী তাঁহাকে দিয়া ২০ হাজার টাকার আর একটি নূতন মর্টগেজ সহি করাইয়া লইলেন এবং নগদ ৫০৲ টাকা দিয়া বলিলেন, "যাও, স্ফূর্ত্তি কর।"

ভরত ও নিমাইয়ের অর্দ্ধেক বিষয় চলিয়া গেল। তাহার উপর আদালতের খরচা। তাহাদের কষ্টের সীমা রহিল না। আর মহীপাল—তাহার তো কথাই নাই। সে অর্দ্ধেক বিষয়ের ডিক্রি পাইল বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পাইল কি?—দন্ধরস্তা!

দিনকতক যাইবার পর সে প্রায়ই এটর্ণীর আফিসে আসিয়া কাঁদে ও বলে, আমার বিষয়ের কি হইল? অষ্টাবক্র ও তাহার এটর্ণী দু'জনে মিলিয়া বুঝাইয়া দেয় যে, মহীপাল কি নিমকহারাম! এত বড় একটা মামলা জিতিল, তাহাতে খুসী নহে! আর সে যে টাকা টাকা করে, তাহা অতি অন্যায়। মহামান্য হাইকোর্টে ছয় দিন মামলা চলিল, তাহা কি বিনা-খরচে চলে? আদালতে অনেক সময়ে বিচার কিনিতে হয়, তাহা না হইলে অমনই কি পাওয়া যায়? বিচার-ফল তো আর গাছের ফল নয় যে, গাছ হইতে পড়িবে, আর তুমি কুড়াইয়া খাইবে। মহীপাল কি কৃতঘ্ন! মামলা জিতিয়া আনন্দিত না হইয়া রোজ অষ্টাবক্র ও তাহার এটর্ণীকে টাকা চাহিয়া ত্যক্ত করিতেছে!

ইহার পরও এক বৎসর কাটিয়া গেল। এটর্ণী মহাশয় অষ্টাবক্রের গুণে খুসী হইয়া এই মামলার জন্য তাহাকে কিঞ্চিৎ অর্থ পারিতোষিক দিয়াছিল। সে মহীপালের কষ্টে বিশেষ সহানুভূতি দেখাইল, আর মনিবকে বলিল, "দেখুন, সবেরই একটা মাত্রা আছে। এত অধর্ম্ম ভগবান্ সহ্য করবেন না। আমার বয়স হইয়াছে। আদালতে কার্য্য করিতে আমার বিশেষ অসুবিধা হয়। মহীপালকে আমার সহকারী করিয়া দিন, যাহাতে দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পায়, তার ব্যবস্থা বন্দোবস্ত করুন, মাসে মাসে উহার তঙ্কা ১৫৲ টাকা করিয়া দিন। আপনাদের এই পেশায় ভাল-মন্দ সব রকমেরই তো লোক আছেন, হয় তো অন্য কোন এটর্ণী তাহাকে পাকড়াও করিতে পারেন। আর আপনারও একটা লোকের দরকার, ১৫৲ টাকায় একটা লোক পাইলে বিশেষ অসুবিধা হইবে না।"

সেই দিন হইতে মহীপাল অষ্টাবক্রের সহকারী হইয়া এটর্ণী মহাশয়ের কোর্টক্লার্করূপে কার্য্য করিতে লাগিল। তাই বলিতেছিলাম, মামলা জিতিলেও সব সময়ে সুবিধা হয় না. হারিলে ত নয়ই।

অনেক সময় অর্দ্ধভুক্ত, অভুক্ত আমলাদলের দ্বারা মামলার সৃষ্টি হয়। তাহারা যাহা বেতন পায়, তাহা তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট নহে, তাহাদের মনিবরা যেমন জানেন, তাহারা নিজেরাও তেমনই জানে। অপরে যেমন বাঁচিতে চায়, তাহারাও তেমনই বাঁচিতে চায়। না খাইয়া বাঁচিতে পারে না।

প্রকাশ্যভাবে চুরি করিলে মনিব তাড়াইয়া দিবে বা জেলে দিবে, তাই এমন করিয়া চুরি করে, যাহাতে মনিব মনে মনে বুঝিতে পারিলেও ধরা-ছোঁয়ার ভিতর কিছুতেই পড়ে না। তাই কৌনৃসুলী ও উকীলের ফি ও মকদ্দমার দরুণ যাহা যথার্থ খরচ হয়, তাহার চতুর্গুণ মনিবের খাতায় লিখাইয়া বক্রী অংশ আত্মসাৎ করে। ইহা বরাবরই চলিতেছে ও চলিবে, যতদিন না লোকের ধর্ম্মজ্ঞান বিশেষরূপে পরিস্ফুট হইবে। সাক্ষী হইয়া মিথ্যা কথা বলা ও মকদ্দমায় নিয়োজিত কর্ম্মচারিগণের খরচার অংশ নিজের কাছে রাখা লোক একরকম দোষযুক্ত বলিয়া মনে করে না।

অনেক সময়ে জমীদারের আমলাগণ এবং বড়লোকের ও ব্যবসাদারের গোমস্তাগণ মকদ্দমার সংখ্যা বৃথা কারণে বাড়াইয়া থাকে।

দুই ভায়ের দুই গোমস্তা, দুই সরকার; প্রত্যেকেরই কর্ম্ম এত সূক্ষ্ম যে, অপর ভাই ও তাহার লোকজনরা অযথা কথা বলুক আর না-ই বলুক, সে কিন্তু তাহার নিজ মনিবের নিন্দাবাদগুলি স্পষ্টরূপে শুনিতে পায় এবং নিজের মালিককে আসিয়া সেইগুলি শুনাইয়া দেয় এবং বলিয়া দেয়, "হুজুর, আপনারা বড়লোক, আপনাদের সামনে তো কেহ কিছু বলিবে না; তবে অসাক্ষাতে যাহা বলে, তাহা আমরা শুনিতে পাই; হাটে-বাজারে ঢি ঢি হইয়া যায়। এইরূপ অবস্থায়, আমরা নিমকের চাকর, আপনাকে না বলিয়াই বা কিরূপে স্থির থাকিতে পারি? আপনি আমাদের বাপ-মা, অন্নদাতা—সবই, আমাদের আর এ নিন্দাবাদ সহ্য হয় না।"

এই বলিয়া থিয়েটারের অভিনেতাদের ক্রন্দনের ন্যায় এক ঝলক কাঁদিয়া ফেলিল। উচ্চপদস্থ আমলা আসিয়া তাহার বাক্যের সমর্থন করিল। ফলে তাহার পরদিনই ৬নং দেওয়ানী ও ৩নং ফৌজদারী রুজু হইল।

লোককে যেমন সময়ে সময়ে ভূতে পায়, পেত্নীতে পায়, সেইরূপ মকদ্দমায় পায়। সেই সময়ে "মকদ্দমা পাওয়া" লোককে যতই সুপরামর্শ দাও, কোন ফল হইবে না, বেশী চাপাচাপি কর, মক্কেলটি হারাইবে। তোমার উপর অগাধ বিশ্বাস, তাই তোমার কাছে আসিয়াছিল, তোমার পরামর্শের পর, সে অন্য এক দোকানে যাইল, সেখানে মনের মত পরামর্শ পাইয়া মামলা রুজু করিয়া দিল!

আমি জানি, এক জন ধনী মাড়োয়ারীর সহিত তাহার একমাত্র পুত্রের "মত-পার্থক্য" হয়। ছেলে অন্যায়ভাবে বিষয় নষ্ট করিতে লাগিল। বাপ ছেলেকে খুব শাসন করিলেন, খরচের জন্য ১০০৲ টাকা চাহিলে ১০৲ টাকা দেন। এই হিসাবে দুই তিন বৎসর কাটিয়া গেল। ছেলের সাঙ্গোপাঙ্গরা মিতাক্ষরা আইনের চাল বুঝাইতে লাগিল, ফলে একটি পার্টিশন-স্যুট। পার্টিশন-স্যুটের শমন পাইয়াই, বাপ একটি ভদ্রলোক এটর্ণীর কাছে যাইলেন; যাইয়া বলিলেন, "মশাই, কি বিপদ দেখুন, আমার নিজের রোজগারের টাকা, আমি মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া রোজগার করিয়াছি, পৈতৃক কিছু ছিল, সেটিকে বহুকষ্টে অনেক গুণ বাড়াইয়াছি, একমাত্র পুত্র—তাহাকে শাসন করিবার চেষ্টা করিতেছি, 'পঞ্চজন ভদ্রলোক' মিলিয়া আমার পুত্রকে পরামর্শ দিয়া এই নালিস রুজু করিয়াছে। উকীল বাবু, আমি এত বোকা নই যে, আমাকে ধমকাইয়া বিষয় নষ্ট করিবে। আইন এমন কখনও অন্যায় হইতে পারে না।"

শুনিয়া উকিল বাবু বলিলেন,—"আমীরচাঁদ (ঐ মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের নাম), মিতাক্ষরা আইনই এরূপ, যে দিন তোমার পুত্র জন্মগ্রহণ করিল, সেই দিন হইতেই সে তোমার অংশীদার; অতএব বণ্টননামায় তাহার অধিকার আছে এবং আইনমতে সে পাইবে।"

আমীরচাঁদ বলিয়া উঠিল,—"সে কি বলেন উকীল বাবু, দুবেলা দেশে দেখিতেছি, বাপ ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র করিয়া শাসন করিতেছে।"

উকিল বাবু। বাঙ্গালায় দায়ভাগ আইন প্রবর্ত্তিত, তাহাতে অধিকারীর মৃত্যুর পর, তবে তাহার পুত্র অধিকারী হয়, তাহার পূর্ব্বে নয়।

আমীরচাঁদ তথা হইতে চলিয়া গেল, মনে শান্তি পাইল না। আর একটি মাড়োয়ারী আইনজ্ঞকে জিজ্ঞাসা করিল। তিনি শুনিয়া বলিলেন, "রামচন্দ্র! এইরূপ কখনও আইন হয়? সমন করিয়াছে, মামলা চলুক, দেখা যাইবে, কি করিয়া আদায় করে।"

আমীরচাঁদ মনের শান্তি পাইল। সে দিন আসিয়া ভাল করিয়া ঘুমাইল। পূর্ব্ব তিন দিন ভাল ঘুম হয় নাই, তাহার ক্ষতিপূরণের স্বরূপ বেশ করিয়া ঘুমাইল।

দেড় বৎসরের পর মামলার ডিক্রি। আইন অনুযায়ী বিচারক ছেলেকে সম্পত্তির অর্দ্ধেক অংশীদার সাব্যস্ত করিলেন। ফলে মকদ্দমায় অনেক টাকা খরচ হইল এবং বিষয়ের অর্দ্ধেক কুপুত্রকে দিতে হইল। আমীরচাঁদ বুঝিতে পারিল, প্রথম উকীল তাহাকে সৎপরামর্শ দিয়াছিল, দ্বিতীয় উকীল তাহার নিজ সুবিধাবাদ পরামর্শ তাহাকে দিয়াছিল। ফলে অর্থশোকে ও পুত্রের কুব্যবহারে সে শয্যাশায়ী হইল। কিছু দিন পরে ভবযন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইল। মরিবার সময়েও পুত্রের ও উকীলের অন্যায় ব্যবহার ভুলিতে পারে নাই।

যখন একটি মকদ্দমা হয়, মকদ্দমার প্রত্যেক পক্ষই একবারে ঘোড়ায় চড়িয়া থাকে, মিটমাটের কথা তাহাদের একবারেই ভাল লাগে না।

দ্বাপর যুগে যখন কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ হয়, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ সন্ধির প্রস্তাব লইয়া কুরুকুলে উপস্থিত হন। দুর্য্যোধনকে সন্ধির প্রস্তাব করিলে, দুর্য্যোধন যে কথা তখন বলেন, আজ পর্য্যন্ত প্রত্যেক মকদ্দমার প্রত্যেক পক্ষই সেই কথা বলে—

"সূচাগ্রেণ সুতীক্ষ্ণেণ ভিদ্যতে যা চ মেদিনী,
তদর্দ্ধং নৈব দাস্যামি বিনা যুদ্ধেন কেশব।"

এখনও প্রত্যেক সন্ধির প্রস্তাবকারীকে মকদ্দমার পক্ষবিশেষ তাহাই বলিয়া থাকে, এ মামলা মিটাইব না, যাহাই হউক।

মকদ্দমা করিয়া সুবিচার পাওয়া বিশেষ কঠিন, তাহার অনেকগুলি কারণ পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। বিচারক তীক্ষ্ণবুদ্ধি, ধর্ম্মজ্ঞ ও নিরপেক্ষ হইলেও মকদ্দমার সুবিচার হওয়া সহজসাধ্য নহে। তাহার কারণ এই, মকদ্দমায় সুবিচার শুধু বিচারকের উপর নির্ভর করে না, অনেকগুলি লোকের উপর নির্ভর করে। ইহা মনে রাখা উচিত যে, প্রত্যেক মকদ্দমাতেই এক পক্ষ সুবিচার চাহিতেছেন না। অনেক সময় হয় ত দুই পক্ষও নহে। যে পক্ষ অন্যায় লইয়া বা অন্যায় করিয়া আদালতে আসিয়াছে, সে ত নিরপেক্ষ বিচার চাহেই না এবং অপর পক্ষও আর তাহার তরফে "পঞ্চ জন" ভদ্রলোক অনেক কারণে নিরপেক্ষ বিচারের পক্ষপাতী নহে। এরূপ অবস্থায় আইন অনুযায়ী নিরপেক্ষ বিচার হইলেও প্রকৃত ঘটনা অনুযায়ী বিষয় লইয়া বিচার-ফল অনেক সময় যথেচ্ছাচারমূলক হয়।

অনেক সময়ে গরীব লোকই অত্যাচারিত হয়। বিচার পাইতে হইলে যাহা কিছু খরচ-পত্র ও তদ্বিরের প্রয়োজন, সেরূপ তদ্বির করিবার অত্যাচারিত ব্যক্তির সুবিধা নাই। তাহার প্রতি সহানুভূতি করিবার জন্য "পঞ্চজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক" তাহার তরফে পাওয়া বড়ই সুকঠিন। অতএব নিপীড়িত দরিদ্র ব্যক্তি, তাহার অত্যাচারী ধনশালী প্রতিবেশীর বিপক্ষে কিরূপ করিয়া সুবিচার পাইতে পারে? পাঠক-পাঠিকাগণ জিজ্ঞাসা করিবেন, তবে উপায়? উপায় উচ্চশিক্ষা নহে, উপায় হুঁসিয়ার।

মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি নহে, উপায় মানুষের ধর্ম্মশিক্ষা, মানুষের ধর্ম্মজ্ঞান। যাহারা সাক্ষ্য দিবে, যাহারা তদ্বির করিবে, যাহারা মামলার সাহায্য করিবে, সেই সব লোকের ধর্ম্মশিক্ষা ও ধর্ম্ম-জ্ঞান ব্যতীত, আইন-আদালতের বিচারে অধিক সুবিচারের ফল আশা করা যায় না।

অনেক সময়ে দেখা যায়, অবস্থাপন্ন লোক অপেক্ষা গরীব লোক সত্যবাদী। তাহার কারণ, তাহার ধর্ম্মভয় আছে, তাহার পরকাল-ভয় আছে; সে জানে, এ-জীবনে সে যথেষ্ট কষ্ট পাইতেছে, যদি জানিয়া শুনিয়া সে মিথ্যা বলে, তবে পর-জন্মেও সে কষ্ট পাইবে। এ-জীবনে সে ত সর্ব্বহারা, পর-জীবনে তাহার সুখ-শান্তি সে মিথ্যা বলিয়া হারাইতে চাহে না। এই জ্ঞান আছে বলিয়াই সে মিথ্যা বলিতে অনিচ্ছুক।

অনেক দিন পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ আইন-ব্যবসায়ী নর্টন সাহেব ও আমি, চোরাই মাল জানিয়া শুনিয়া খরিদ করার অপরাধে অভিযুক্ত একটি ধনিসন্তান আবদ্ধ হওয়ায়, তাহার পক্ষ-সমর্থন করিবার জন্য নিয়োজিত হইয়াছিলাম। আসামীর পিতা ধনী ভদ্রলোকটি খুব হুঁসিয়ার লোক, তিনি বুঝিয়াছিলেন, ভাল উকীল কৌন্সুলীর সাহায্য বিনা মামলা জয় হইতে পারে, কিন্তু সাক্ষীদের সাহায্য বিনা মামলায় জয় হইতে পারে না। অর্থ দ্বারা অধিকাংশ ভদ্রলোক সাক্ষীকে তিনি বশ করিয়া লইলেন।

সাক্ষীরা সকলেই একবাক্যে এইরূপ মত-প্রকাশ করিলেন, "ভদ্রলোকের এক জন ছেলে হঠাৎ বিপদে পড়িয়াছে, তাহাকে সাহায্য করা প্রত্যেক ভদ্রলোকেরই কর্ত্তব্য। পরহিতের জন্য আদালতে সাক্ষ্য দিবার সময় একটু এ-দিক ও-দিক করিলে বিশেষ ধর্ম্মহানি হইবে না।" কাযেই মামলার দিন জেরার সময় আসামী-পক্ষের সুবিধা হয়, এমন গুটিকতক কথা বলিলেন। এরূপ বেমালুমভাবে জেরার সময় তাঁহাদের উত্তরগুলির সহিত, প্রথমে যখন সরকারপক্ষে সাক্ষ্য দেন, সেগুলির সহিত এমন খাপ খাওয়াইয়া দিলেন যে, তাহা বেমালুম। তাঁহারা যে মিথ্যা বলিতেছেন, তাহা ধরিবার কোন উপায় রহিল না।

এক জন গরীব সাক্ষী, সে সহিসের কায করিত। যেখানে চোরাই মাল রাখা হইয়াছিল, সেখানটি তাহার আস্তাবলেরই পাশে। সে যাহা সাক্ষ্য দিল, তাহাতে আসামী যে মালগুলি চোরাই মাল বলিয়া জানিত, তাহা প্রমাণ হইল।

হাকিম তাহার সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া আসামীর প্রতি দণ্ডাজ্ঞা দিলেন। আপীলেও সেই দণ্ডাজ্ঞা রহিয়া গেল। গরীব ধর্ম্মভীরু এক জন মুসলমান সহিসের সাহায্য বিনা এই মামলায় বিচার-বিভ্রাট ঘটিত। তাই বলিতেছিলাম, অনেক সময়ে ধর্ম্ম-ভীরু, গরীব, ভগবানে আস্থাবান লোকের সাহায্যে সুবিচার হইতে পারে; ধর্ম্মজ্ঞানহীন, ঈশ্বরে বিশ্বাসবিহীন লোকের দ্বারা নহে।

অনেক তীক্ষ্ণবুদ্ধি কর্ম্মচারী তাহাদের মনিবের সুবিধার জন্য অনেক কায করিতে পারে। এই স্থানে আমি একটি হাসির গল্প বলিব। এক সময়ে একটি ধনী হীরা-পান্না-ব্যবসায়ীর মুনিম-গোমস্তা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়, আমার মালি-কের অনেক আত্মীয় শেঠ বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহারা সকলেই প্রভূত ধন-সম্পত্তিশালী ও খুব বড় ব্যবসায়ী। বাঙ্গালায় আসিয়া আমার মনিব 'বাবু' বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন, তাঁহাকে কি করিয়া 'শেঠ' করা যায়।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "তার জন্য আর ভাবনা কি, তোমরা সকলে মিলিয়া, তাঁহার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, সকলেই তাঁহাকে 'শেঠ' বলিয়া আখ্যাত কর, তাহা হইলেই তিনি শেঠ হইয়া যাইবেন।"

তীক্ষ্ণবুদ্ধি গোমস্তা বলিল, "মশাই, শুধু মুখে বলিলে হইবে না। খবরের কাগজে ইস্তাহার করিয়া তাঁহাকে 'শেঠ' করিতে হইবে।"

আমি বলিলাম, "খবরের কাগজে যাহা লিখাইবে, সেইরূপ ভাবেই প্রকাশ হইবে, তাহাতে শেঠ হুকুমচাঁদ বলিয়া লিখাইলে, তিনি শেঠ হুকুমচাঁদই হইবে।"

দশ বারোদিন পরে সে বলিল, "মশাই, কোন একটি সঙ্গতি-পন্ন বংশধর Inspectionএ (ভাঁকড়ে) জহরতাদি লইয়া গিয়া গায়েপ করিয়াছে, আপনি একটি দরখাস্ত করিয়া দিন।" সেই দরখাস্তের দরখাস্তকারী মুনিম-গোমস্তা। বর্ণনায় দরখাস্তে লেখা হইল, মুনিম-গোমস্তা শেঠ হুকুমচাঁদের তরফ হইতে দরখাস্ত করিতেছে।

দরখাস্তের উপর হাকিম হুকুম দিলেন। প্রকাশ্য আদালতে দরখাস্ত করা হইল। কাগজের রিপোর্টারদের ৫৲ টাকা দিয়া বন্দোবস্ত হইল। রিপোর্টে প্রকাশ পাইল, প্রসিদ্ধ জহুরী শেঠ হুকুমচাঁদকে প্রতারণা করিয়া আসামী পলাইয়াছে। অনেকগুলি বাঙ্গালা, হিন্দি, ইংরাজী কাগজে সেই রিপোর্ট প্রকাশ পাইল। সেই দিন হইতে তিনি শেঠ হুকুমচাঁদ হইয়া গেলেন।

সস্তায় প্রসিদ্ধি লাভ করিতে হইলে কাগজওয়ালাদের আদা-লতের রিপোর্টারের দ্বারা অনেক সুবিধা হয়।

শ্রীতারকনাথ সাধু (সি, আই, ই, রায় বাহাদুর)।

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত

১

রবিবার। আশ্বিন মাসের ৩রা কি ৪ঠা তারিখ। হাওয়ায় শারদীয়ার আভাস জাগিয়াছে। সতীনাথ দোতলার ঘরে বসিয়া একখানা পুরানো টাইম-টেব্‌লের পাতা উল্টাইতেছিল, পত্নী প্রমদা পাশের ঘরে বসিয়া ষ্টোভ জ্বালিয়া শিঙাড়া ভাজিতেছিল।

দু'একখানা ভাজা হইলে একটা প্লেটে তুলিয়া প্রমদা আসিয়া সতীনাথের কাছে দাঁড়াইল, কহিল,—ছাখো তো খেয়ে, ঠিক হলো কি না!

সতীনাথ মুখ তুলিয়া প্লেটের পানে চাহিয়া কহিল,—এই সকালে শিঙাড়া! অম্বলে বুক জ্বলে মরি আর কি! সারা দিনটা বরবাদ যাবে!

প্রমদা ভ্রূ কুঞ্চিত করিল, কহিল,—তা তো বটেই! ঘরে তোলা গাওয়া ঘী, তাতে ভাজচি···অম্বল হলেই হলো!

সতীনাথ করুণ দৃষ্টিতে প্রমদার পানে চাহিল; প্রমদা কহিল,—কত রঙ্গই জানো! বাজারের খাবার নয় কি না! যখন বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে মিশে বেলা বারোটায় দোকান থেকে হিঙের কচুরি আনিয়ে খাওয়া হয়, তখন তো অম্বলের ভয় হয় না!···প্রমদা থামিল।

একটা নিশ্বাস পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে সে কহিল,—এ যে আমি তৈরী করেচি—মুখে রুচবে কেন?···

প্রমদার দুই চোখ সজল হইয়া উঠিল। সতীনাথ কহিল,—অমনি অভিমান! দাও বাবু তোমার শিঙাড়া, খাই।

প্রমদা কহিল,—থাক্! মলিনার জন্য তৈরী করছিলুম। সে ভালো বাসে, এক দিন বলেছিল, আমার হাতের শিঙাড়া ভালো লাগে, তাই। ভাবলুম, নুণ-টুন সব ঠিক হলো কি না, তোমায় খাইয়ে বুঝি। তা···

আবার একটা নিশ্বাস!

প্লেট্ হাতে তুলিয়া সতীনাথ কহিল,—খাচ্ছি গো, খাচ্ছি!

প্রমদা কোনো কথা কহিল না। সতীনাথ শিঙাড়া খাইতে লাগিল।

প্রমদা কহিল,—নুণ কম-বেশী হয় নি?

দু'খানা শিঙাড়া নিঃশেষ করিয়া হাসিয়া সতীনাথ কহিল,—তা তো বুঝলুম না···

প্রমদা কহিল,—আচ্ছা লোককে চাকাতে এসেচি!

প্রমদা গমনোদ্যত হইল। সতীনাথ কহিল,—নিজে তৈরী করতে করতে দু'চার কামড় দিয়ে পরখ করলেই পারো! কথায় বলে—আপ্‌রুচি খানা।

হাসিয়া প্রমদা কহিল,—তোমার মত রাঁধুনি হ'লে তাই করতুম!

প্রমদা বাহিরে গেল। সতীনাথ কোচার খুঁটে হাত মুছিয়া আবার টাইম-টেবলের পাতা খুলিল।···ভাড়ার 'নির্ঘণ্ট' দেখিয়া কাগজ-পেন্সিল টানিয়া কি হিসাব ফাঁদিল।

প্রমদা দ্রুতপদে আবার ঘরে ঢুকিল, তার হাতে সেই প্লেট!

প্রমদা কহিল,—খাও, গরম গরম একখানা মুখে দাও দিকিনি। হাঁ করো, আমি খাইয়ে দি···

সতীনাথ নিঃশব্দে হাঁ করিল, প্রমদা শিঙাড়া ভাঙ্গিয়া সতীনাথের মুখে ফেলিল। সতীনাথ মুখ বুজিয়াই উঃ করিয়া আর্ত্ত রব তুলিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে শিঙাড়ার ড্যালা মুখ হইতে বাহির করিয়া দিল।

প্রমদা কহিল,—ও কি হলো?

সতীনাথ কহিল,—পুড়ে মরেছিলুম আর কি! জিভটা বোধ হয় গেছে। চট্ ক'রে হাইড্রোজেন পেরক্সাইড্‌টা আনো দিকিনি···

স্থির দৃষ্টিতে প্রমদা স্বামীর পানে ক্ষণেক চাহিয়া থাকিয়া কহিল,—কচি খোকা! দেখো···!

কথাটা বলিয়া সুদৃঢ় পদক্ষেপে সে ঘর হইতে প্রস্থান করিল।

সতীনাথ মৃদু হাসিল, হাসিয়া হিসাবের কাগজে মন দিল।···

বাহিরে কণ্ঠস্বর—সতী আছো···

সতীনাথ সাগ্রহে কহিল,—ললিত! চলে এসো হে···

ললিত বন্ধু। দু'জনে অন্তরঙ্গতার সীমা নাই। বহু বৎসর ধরিয়া সেই কলেজের ফার্ষ্ট ইয়ার ক্লাশ হইতেই এ

অন্তরঙ্গতা সমান রহিয়াছে! সুখে-দুঃখে পরস্পরে পরস্পরের পাশে দাঁড়াইয়া আসিতেছে চিরদিন। এবং এ অন্তরঙ্গতার ফলে ললিতের স্ত্রী মলিনা আর সতীনাথের স্ত্রী প্রমদা—দুজনে সখ্যত্ব বেশ নিবিড়। অর্থাৎ দুটি তরুণ পরিবারে হৃদ্যতার সীমা নাই।

ললিত কহিল,—বাড়ী ঠিক হলো হে। ঐ ডিহিরী-অন-শোণেই যাওয়া যাক। বাঙলা যা জোগাড় হয়েচে, ফার্ষ্ট ক্লাশ! একেবারে শোণের ঠিক উপরে!

সতীনাথ কহিল,—শোণে বন্যা নামে। শেষে…

হাসিয়া ললিত কহিল,—রামচন্দ্র! সেবারে অত বড় বন্যায় বেহারের বহু প্রদেশ ভেসেছিল, কিন্তু ডিহিরীর কোনো ক্ষতি হয়নি। Co-relative সে…ডিহিরীর নামই হলো ডিহিরী-অন্-শোণ—শুধু ডিহিরী নয়!…

ললিত প্রফেশরি করে—ফিলজফিতে এম, এ।

সতীনাথ কহিল,—হুঁ। আমি তা হ'লে মিছে হিসাব কষে মরি কেন?

ললিত কহিল,—কিসের হিসাব, শুনি?

সতীনাথ কহিল,—আমি ভাবছিলুম, বৈদ্যনাথ-ধামে যাওয়া যাবে।

—বাড়ী?

সতীনাথ কহিল,—মিষ্টার সরকারের বাড়ী আছে। পাওয়া যাবে—বলেচেন।

ললিত কহিল,—বৈদ্যনাথে ভারী ভিড়। সকলে যায়! ডিহিরী নির্জ্জন জায়গা…বাঙলো যে ক'খানি আছে, তার সংখ্যা আঙ্গুলে গণা যায়।…এঁরা দুই সখীতে বলছিলেন, ভিড়ের মধ্যে এঁরা যাবেন না। নির্জ্জন জায়গাই এঁদের পছন্দ!

—বেশ!

সতীনাথ হাঁকিল—ওগো…

পাশের ঘর হইতে 'ওগো' বলিল,—যাই।

সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমতী প্রমদার প্রবেশ। তার হাতে প্লেট; প্লেটে শিঙাড়া।

প্রমদা ললিতের সামনে প্লেটটা আগাইয়া ধরিয়া কহিল,—নিন্, খান্ দিকিন্। গরম আছে!

ললিতের দুই চোখ সুগোল হইয়া উঠিল। সেই সুগোল চোখের দৃষ্টি প্রমদার মুখে নিবদ্ধ করিয়া ললিত কহিল,—এখন-?

প্রমদা কহিল,—আপনাদের কি যে ভয়!… রবিবার। না হয় একটু বেলা ক'রেই ভাত খাবেন!

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ললিত কহিল,—সতীনাথের…?

সতীনাথ কহিল,—আমার ভোজন শেষ হয়েচে। প্রথমেই চেখেছি—চেখে চাখ্লাদার হয়ে বসে আছি। এবার তোমার পালা। বিশেষ যখন এ ভোজ্য শ্রীমতী মলিনা দেবীর জন্য তৈরী হচ্ছে, তুমিই right person তাঁর মুখের মত শিঙাড়া হয়েচে কি না, সে সম্বন্ধে opinion দিতে…

ললিত কহিল,—কি রকম?

সতীনাথ হাসিয়া কহিল,—তাঁর অধরের taste সম্বন্ধে তোমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান, এবং তা প্রচুর!

প্রমদা সলজ্জভাবে কহিল,—এ রসিকতার কথা বলবো'খন মলিনাকে।

সতীনাথ কহিল,—বেশ! আমি মিথ্যা কথা বলিনি, অপমানের কথাও বলিনি! এই তুমি…তোমার অধরের টেষ্ট সম্বন্ধে আমার যে অভিজ্ঞতা আছে, সে অভিজ্ঞতা কি ললিতের আছে, না, আর কোনো…

কথা শেষ হইল না। প্রমদা সতীনাথের দুই ঠোঁট হাতে চাপিয়া ধরিয়া কহিল,—ষ্টোভ জ্বলচে। এক খুরি ময়দার কাই ক'রে এনে দুটি ঠোঁট জুড়ে দিচ্ছি রসিকতার দম বন্ধ হয় কি না, দেখি। ইতর কোথাকার—ওকালতি করো কি না—যত নির্লজ্জ লোকের সঙ্গে সম্পর্ক দিবা-রাত্রি…

প্রমদার কবল হইতে নিজেকে উদ্ধার করিয়া করজোড়ে সতীনাথ কহিল,—ক্ষমা করো, দেবি! তোমার শাসনের ইঙ্গিতই পর্য্যাপ্ত! আর কাইয়ের প্রয়োজন হবে না। কবি বলেচেন—

অধর অধরে বসি প্রহরীর মত
চপল কথার দ্বার রাখুক রুধিয়া!

তুমি সে পরম-কাম্য পন্থা ত্যাগ ক'রে যে বর্ব্বর প্রথায় অধরের দ্বার রুদ্ধ করার ইঙ্গিত দিলে, তাতে বিভীষিকা প্রচুর! অতএব…

প্রমদা সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া ললিতের পানে চাহিল, চাহিয়া কহিল,—নুণ ঠিক হয়েচে?

ঘাড় নাড়িয়া ললিত কহিল,—খাশা হয়েচে। এ প্লেটটা নিঃশেষ করি। অসুবিধা ঘটবে না?

প্রমদা খুশী-মনে কহিল,—না। গাওয়া ঘী ঘরে তৈরী করেছিলুম; তাতে ভাজচি। কোনো অসুখ করবে না।

ললিত কহিল,—তুচ্ছ অম্বলের ভয়ে যদি এ প্লেট নিঃশেষ না করি, তাহলে অনুতাপের সীমা থাকবে না।

সতীনাথ কহিল,—ও কথা থাক। ললিত বাড়ী ঠিক করেচে গো—ডিহিরী-অন্-শোণে। পছন্দ হবে তো?

প্রমদা কহিল,—তোমরা যেখানে নিয়ে যাবে, সেই-খানেই যাবো। আমাদের আবার পছন্দ-অপছন্দ কি!

সতীনাথ কহিল,—সে কি! তোমাদের মতকে শিরো-ধার্য্য ক'রেই যে আমরা দু'জনে কর্ম্মপথে যাত্রা করতে চাই আমাদের ব্রত তাই!

প্রমদা কহিল,—অত তত্ত্ব-কথা জানি না। আমরা বলেচি, এই ভিড়ের মধ্যে যাবো না। শিমুলতলা, বদ্যিনাথ, মধুপুর, পুরী—এ-সব জায়গা ছেড়ে যেখানে হোক!···মানে, এখানে এই ভিড়ের কচকচি, আবার বাইরে জিরুতে গিয়েও যদি সেই ভিড় মেলে···

ললিত কহিল,—না, না—ডিহিরীতে মোটে ভিড় নেই।

প্রমদা কহিল,—বেশ। মলিনা জানে?

ললিত কহিল,—ঠিক হয়েচে, তা জানে না। ডিহিরীতে বাড়ী ঠিক করতে চলেছি, এ কথা তাঁকে ব'লে বাড়ী থেকে বেরিয়েচি।

ব্যাপার আর একটু খুলিয়া বলি। ক'জনে বাহির হইয়া পূজার ছুটিটা এবার পশ্চিমের কোনো জায়গায় একসঙ্গে কাটাইয়া আসিবে, স্থির হইয়াছে। এক বাড়ীতে বাস, অবিরাম সঙ্গ-সাহচর্য্য··আনন্দের সীমা থাকিবে না! সতীনাথ তাই টাইম-টেব্‌ল্ লইয়া হিসাব কষিতেছিল, কোথায় যাইতে কত খরচ পড়ে—এবং আত্মীয়-বন্ধু, কার কোথায় বাড়ী আছে; থাকিলে বিনা ভাড়ায় কার বাড়ী মেলে, তাহারই সন্ধানে ললিত ঘোরাফেরা করিতেছিল।

ডিহিরীতে বাড়ী পাওয়া গিয়াছে, ভাড়া লাগিবে না—সেই সংবাদ লইয়া এখন সে আসিয়াছে।

২

বাঙলাখানি চমৎকার। পিছনে শোণের বুকে বালি ধু-ধু করিতেছে; মাঝে মাঝে জল। রেলের ঐ প্রকাণ্ড পুল। পথে লোকের ভিড় নাই। গাড়ীর মধ্যে সেই সনাতন একা! কোনো রকমে ক'খানা ভাঙ্গা তক্তা জুড়িয়া তলায় দুটা চাকা লাগাইয়া দিয়াছে; এবং ঘৃতপক্ক একটা ঘোড়ার সঙ্গে একগাছা দড়ি দিয়া তক্তটাকে বাঁধিয়াছে—ঘোড়া দৌড়িলে সেই সঙ্গে চাকা-বাঁধা তক্তাগুলাকেও কাজেই দৌড়িতে হয়! এই গাড়ী! দু'চারখানা মোটরও কচিৎ দেখা যায়!

বাড়ীতে ফটকের পর বাগান,—বৃত্তাকারে বাগানটুকুকে বেড়িয়া তৃণাচ্ছন্ন পথ গিয়া বাঙলার সিঁড়ির পাশে ঠেকি-য়াছে। ফ্লোরের উপর বাঙলা। সামনে লম্বা টানা বারান্দা··· বারান্দার দুদিকে দুখানা ঘর; সামনে একখানা হল ঘর। পাশের দুই ঘরের সঙ্গে সংলগ্ন দুটি বাথরুম; ওদিকে রান্নাঘর, ভৃত্যদের ঘর স্বতন্ত্র হাতায়। একটা আস্তাবলও আছে। আস্তাবলের মধ্যে একখানি জীর্ণ-মলিন টঙ্গা চাকা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া আছে। চাকার কাঠে ও কম্পাশে উই ধরিয়াছে!

দিন আনন্দে কাটিতেছিল। বেড়ানো, গল্প, গান···মাঝে মাঝে ট্রেণে করিয়া সাসারাম, কিম্বা গয়ায় যাওয়া হয়। সেখান হইতে তরী-তরকারী কিনিয়া আনা—সুমধুর বৈচিত্র্য!

এক সপ্তাহ কোথা দিয়া যে কাটিয়া গেল! তার পর কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার রাত্রে যা ঘটিল, বলি।

ললিত সকালে কাশী গিয়াছে। তার পিশেমশায় আর পিশিমা সেখানে থাকেন···তাই। দু'দিন পরে ফিরিবে। বাঙালীদের ক্লাবে সন্ধ্যায় সতীনাথের নিমন্ত্রণ ছিল। সেখানে গান-বাজনার ব্যবস্থা আছে, এবং কিঞ্চিৎ জলযোগ।

ক্লাব সারিয়া সে বাঙলায় ফিরিল, রাত তখন ন'টা। ফিরিয়া দেখে, সামনের বড় ঘরে আম-কাঠের যে বড় টেবিল, সেই টেবিলের দুই প্রান্তে দুখানি চেয়ার। চেয়ারে বসিয়া মলিনা ও প্রমদা। মুখ গম্ভীর···কথা বা হাসির রেখাও নাই!

এই টেবিলে ভোজনের ব্যবস্থা। টেবিল হইলেও ভোজ্য সনাতন বঙ্গীয় প্রথায়,—ভাত, ডাল, ঝোল, অম্বল, লুচি, তরকারী।

সতীনাথ আসিয়া সস্মিত মুখে কহিল—কি! দুজনে এমন চুপচাপ ব'সে যে! খাওয়া-দাওয়া চুকেচে?

প্রমদা গম্ভীর স্বরে কহিল—না।···

সতীনাথ কহিল—খাবার দিতে বলো তাহলে। আমি এখনি মুখ-হাত ধুয়ে তৈরী হচ্ছি।

সতীনাথ চলিয়া গেল। মুখ-হাত ধুইয়া যখন ফিরিল, টেবিলে তখন এনামেলের থালা পড়িয়াছে। থালায় লুচি, ভাজি···ঠাকুর কাপে করিয়া ডাল-ঝোল আনিয়া দিল।

সতীনাথ কহিল,—ব্যাপার কি ? কেহ উত্তর দিল না।

দুজনের পানে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া সে কহিল—বাঃ! দুজনেই গম্ভীর! পরে মলিনার পানে চাহিয়া পরিহাস-ছলে সতীনাথ কহিল—বন্ধুর বিরহ…এবং সে বিরহ এমন ঘনীভূত যে, দুই সখীর মুখ আঁধারে আচ্ছন্ন! Lucky ললিত!

এ-পরিহাসও নিরর্থক হইল—কাহারো মুখে হাসির বা এতটুকু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিল না! সতীনাথ কহিল—কি হয়েচে ?

বলিয়া দুজনের পানে চাহিল। দুদিক হইতে শুধু মৃদু দুটি নিশ্বাস…তার পর অবস্থা পূর্ব্ববৎ! সতীনাথ বুঝিল, দুদিকেই মেঘ…এবং সে মেঘ কথার হাওয়ায় উড়িবার নয়! কিন্তু কি এমন ঘটিল চক্ষুর নিমেষে যে…

মলিনার পানে সতীনাথ চাহিল। আহা, স্বামী কাছে নাই…তাই মিলনানন্দের মাঝখানে সুর কাটিয়া গিয়াছে! বেদনায় তার বুক ভরিয়া উঠিল। সতীনাথ কহিল—মন্টুর সর্দ্দিটা বাড়লো না কি ? তাকে ব্রায়োনিয়া দেওয়া হয়েছিল ?

মন্টু মলিনার তিন বছরের পুত্র। মলিনা কহিল,—ভালো আছে।

—টেবি ?

সতীনাথের মেয়ে টেবি। বয়স দু'বছর। প্রমদা কহিল—তার আবার কি হবে ? সুস্থ মেয়ে ··

প্রমদার স্বরে কেমন একটু রুক্ষতা! সতীনাথের চক্ষু স্থির! সে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ভোজনে মনঃসংযোগ করিল। কিন্তু এ কি ভালো দেখায় ? ললিত নাই…মলিনার স্বাচ্ছন্দ্যের ভার তার উপর ? একটা দায়িত্ব তো! সতীনাথ আবার মলিনার পানে চাহিল, ডাকিল,—মলিন…

মলিনার সঙ্গে সতীনাথের পরিচয় তার বিবাহের পূর্ব্ব হইতে। মলিনার দাদা নীলাব্জ স্কুলে তার সহপাঠী ছিল। নীলাব্জর গৃহে তখন নিত্য যাইত। তার পর ম্যাট্রিক পাশ করিয়া নীলাব্জ পুনায় চলিয়া যায়। ললিতের সঙ্গে মলিনার বিবাহে ঘটক সতীনাথ স্বয়ং। তাই সে মলিনাকে ডাকে নানা নামে · মলু, মলিন, মলি, মিল, মিলা…যখন যে-নাম মনে আসে!…

সতীনাথের আহ্বানে মলিনা তার পানে চাহিল।

সতীনাথ কহিল—কি হয়েচে মলি ?

মলিনা প্রমদার পানে চাহিল। তার ঠোঁট কাঁপিল। মৃদু স্বরে মলিনা কহিল—কিছু না!

কথাটা বলিয়া সে মাছের কাঁটা বাছিতে মগ্ন হইল।

সতীনাথ নির্ব্বাক বিস্ময়ে স্ত্রীর পানে চাহিল, ডাকিল—প্রমোদ…

প্রমদা তার পানে চাহিল…ভ্রূকুটি-ভরা দৃষ্টি! সতীনাথ কহিল,—কি হলো তোমাদের ?

—কি আবার হবে!…প্রমদা ডাকিল,—ঠাকুর…

ঠাকুর নিকটে ছিল, আসিল। প্রমদা কহিল,—আমায় আর একটু মাছের চচ্চড়ি দিয়ে যাও তো!

ঠাকুর চলিয়া গেল। প্রমদা লুচির উপর ডাল ঢালিল। ব্যাপার দেখিয়া সতীনাথ কহিল,—বাঃ!

নিঃশব্দে ভোজন-পর্ব্ব চুকিল। মুখ-হাত ধুইয়া মলিনা গিয়া নিজের ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িল। বাঁয়ে প্রমদার ঘর। প্রমদা নিজের ঘরে গেল, ডাকিল—বিষণী…

বিষণী সতীনাথের ভৃত্য; আসিল। প্রমদা কহিল,—টেবির দুধ গরম ক'রে আন্।

বিষণী চলিয়া গেল। সতীনাথ ব্যাপার দেখিয়া একখানা বাঙলা মাসিকপত্র লইয়া বাহিরের বারান্দায় আসিয়া ইজি-চেয়ারে বসিল।…এ-পাতায়, ও-পাতায় চোখ বুলাইল; গল্প, উপন্যাস, সমালোচনা, হিন্দুশাস্ত্রের আলোচনা, বর্জ্জয়েসে ছাপা জাতিভেদের তর্ক কিছু বাদ রাখিল না; শেষে একটা পাতা উল্টাইয়া 'নিকারাগুয়া-ভ্রমণ' পড়িতে সুরু করিল।…

দু'ধারে বন। জন-প্রাণীর চিহ্ন নাই। সেই বনের পথে লেখক চলিয়াছে একা; এক হাতে রিভলভার, গুলি-ভরা—অপর হাতে বর্শা! গা ছম্-ছম্ করিতেছে। স্তব্ধ বন। এমন স্তব্ধতা জীবনে সে কখনো উপলব্ধি করে নাই!·· হঠাৎ একটা খড়খড় শব্দ। চমকিয়া লেখক চারিদিকে চাহিল। সামনে এক খেজুর গাছ—আর সেই গাছ জড়াইয়া এক প্রকাণ্ড অজগর সাপ। সাপটা হাঁ করিয়া ঘাড় দুলাইতেছে; লক্-লকে জিভ! লেখক ডান হাতে রিভলভার ধরিয়া তাগ্ করিল, বর্শা বাঁ হাতে…

সঙ্গীন মুহূর্ত্ত!…সতীনাথের গায়ে কাঁটা দিল…গা-ও ছম্ ছম্ করিতেছিল, কি হয়…কি হয় ? তবে লেখক বাঁচিয়া যাইবে নিশ্চয়; নহিলে এ লেখা মাসিকে ছাপিতে দিত কে ?

এমন সময় হাত হইতে কে বই টানিয়া লইল। সেই সাপটা….? চমকিয়া সতীনাথ সোজা হইয়া বসিল। চাহিয়া দেখে, প্রমদা !…প্রমদা আসিয়া বইখানা কাড়িয়া লইয়াছে! প্রমদা কহিল,—চলো, শোবে চলো। টেবির দুধ খাওয়া হয়ে গেছে। একলাটি ভয় করে, বাপু…

সতীনাথ কহিল,—বইখানা দাও গো। অজগরের মুখে লোকটা পড়েচে, তার কি হলো ··

প্রমদা কহিল,—ও গাঁজাখুরি গল্প পড়তে হবে না। ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখচেন! মন খুশী হয়, এমন বৃত্তান্ত লেখো, তা না…

সতীনাথ কহিল—বাঃ! ভ্রমণে বেরিয়ে নিছক সুখ, নিছক আরামই যে মিলবে, তার কি মানে আছে! ঐ যে উত্তর-মেরু-ভ্রমণের ব্যাপার—কি-সব ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটেছিল, ভাবো তো! যদি বিপদ ঘটে, সে কথা বুঝি ভ্রমণ-বৃত্তান্তে লিখবে না?

—না। ভ্রমণ-বৃত্তান্ত সুখের হবে। অজগর সাপের কথা লিখবে যদি তো ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ব'লে ছাপানো কেন? লিখুক 'সাপের মুখে' বা 'অজগর-চক্র'…যে, নামেই বুঝবো, এ্যাডভেঞ্চারের কথা বলচে।

সতীনাথ কহিল—ভ্রমণ আর এ্যাডভেঞ্চার co-relative terms.

—যা বলেচো! তবে ও তর্ক এখন থাক্। শোবে, এসো।

—বইখানা দেবে না? ওটুকু শেষ ক'রেই…

—না। কাল সকালে শেষ করো।

—রাত্রে ঘুম হবে না! হয় তো স্বপ্ন দেখবো, ঐ অজগর আমার গলা চেপে ধরেচে! সত্যি, বুঝচো না…

—না। বুঝচি না, বুঝবো না। এসো। বই পাবে না।…প্রমদা বই লইয়া গমনোদ্যত হইল।

সতীনাথ কহিল,—অমোঘ তোমার দণ্ড, কঠিন বিধান!

প্রমদার পিছনে তাকে আসিতে হইল।…ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া প্রমদা কহিল,—কথায় বলে পরভোজী হওয়া বরং ভালো, কিন্তু পরঘরী হওয়া ঠিক নয়!…

সতীনাথ কহিল,· হঠাৎ এত বড় তত্ত্ব-কথা?

প্রমদা সনিশ্বাসে কহিল—

কিন্তু থাক,—সে কাহিনী সবিস্তারে বলিবার প্রয়োজন নাই। যেহেতু দীর্ঘনিশ্বাস, অশ্রুবিন্দু, যুক্তি, বিচার প্রভৃতির সংমিশ্রণে সে কাহিনীটুকুর আমূল বর্ণনায় প্রমদার সময় লাগিয়াছিল, একটি ঘণ্টা; এবং এক ঘণ্টা ধরিয়া এ-কাহিনী শুনিয়াও সতীনাথের ধারণা যে খুব সুস্পষ্ট হইয়াছিল, এমন কথাও বলিতে পারি না। অস্পষ্ট আব্ছায়ায় এটুকু সে বুঝিল, জল গরম করা লইয়া ললিতের ভৃত্য শিউধনীকে মলিনা বকে—অথচ শিউধনীর কোনো অপরাধ ছিল না। তাই সে কথা প্রমদা বলিয়াছিল—এবং ঐ কথার প্রসঙ্গেই মলিনার সঙ্গে প্রমদার কি-না-কি তর্ক ঘটে…তাহাতে প্রচণ্ড অভিমানে ছেলের পিঠে মলিনা দুটা চড় কষাইয়া দেয়। প্রমদা গিয়া ছেলেকে তার কাছ হইতে কাড়িয়া আনে। মলিনা তাহাতে রাগিয়া নানা কথা বলে। সে কথা প্রমদার মনে নাই, তবে তার শেষটুকু কাঁটার মত মনে বিঁধিয়া আছে।

সতীনাথ কহিল—সে কথাটুকু কি শুনি?

প্রমদা কহিল—আমায় বললে,—আর টশ্ দেখিয়ে কাজ নেই, ভাই…চাকরের দোষ, তাকে বকচি, তাতে কারো মধ্যস্থতা কখনো আমি বরদাস্ত করি নি!

প্রমদার দুই চোখ সজল হইয়া আসিল। প্রমদা কহিল—মলিনা, এমন কথা আমায় বলবে স্বপ্নেও ভাবিনি!

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সতীনাথ কহিল—হুঁ!

৩

পরের দিন সকালে সেই টেবিলের ধারে আবার তিনটি প্রাণীতে দেখা। চা আসিল। সতীনাথ কহিল—চা খেয়ে নাও মলিন। আজ শোণের বুকের উপর দিয়ে ওপারে যাবো।

মলিন কোনো জবাব দিল না।

সতীনাথ তখন অবান্তর কথা পাড়িল,—কাল ষ্টেশনে এক মজার ব্যাপার দেখলুম।…সন্ধ্যার ট্রেণে এক হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক এসে নামলো। ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে যাবে, পুলিশ তাকে পাকড়াও করলে।…ব্যাপার কি? না, জামা খুলে দেখা গেল, জামার যে অস্তর থাকে, সেই অস্তরের নীচে আফিং…একেবারে পাৎলা আমসত্বর মত সাঁটা! Excise case। তা, আফিং প্রায় তিন হাজার টাকার। তারপর টান্ দিতে দাড়ি-গোঁফ খসে পড়লো। যাত্রী ট্রেণ থেকে নামলেন খোট্টা ভগবানদাস, টানা-হ্যাঁচড়ায় গোঁফ-দাড়ি খসিয়ে ভগবানদাস অবশেষে করিমুদ্দিন চাচা হয়ে গ্রেফ্তার!

কাহিনীটুকু বলিয়া সে নিজে হাসিয়া সারা হইয়া গেল, কিন্তু হাসির এতটুকু রেখা…না প্রমদার মুখে, না মলিনার মুখে!

সতীনাথ প্রমাদ গণিল।

চা-পান শেষ হইলে সতীনাথ কহিল—চলো মলিন, বেড়াতে যাই।

মলিনা কহিল—থাক। শরীরটা ভালো ঠেকচে না।

সতীনাথ কহিল—বলো কি! একরাত্রেই বিরহ এমন ভয়ঙ্কর হলো! এখনো যে দুদিন কাটাতে হবে! ললিতকে টেলিগ্রাম ক'রে দি না হয় যে, সখীর দারুণ বিরহ, জলদি আও…

সতীনাথ হাসিল। মলিনা গম্ভীর মুখে উঠিয়া নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিল।

সতীনাথ প্রমদার পানে চাহিল, কহিল—তুমি কি বেরুবে, না, তোমারো গোঁসা-ঘর?

প্রমদা কোনো জবাব দিল না; রান্নাঘরের দিকে চলিল। বিষণী কহিল—টেবুকে বেড়াতে নিয়ে যাবো, মা?

প্রমদা কহিল—না।…

ও-ঘরে শিউধনী বলিতেছিল, —খোঁকাবাবু যাবে না?

মলিনা কহিল—না।…

চমৎকার! সতীনাথ মাসিক পত্র খুলিয়া বারান্দায় বসিল…সেই 'নিকারাগুয়া ভ্রমণ'! এ গোলযোগে সে ভ্রমণ-কাহিনীর কথা সে ভুলিয়া গিয়াছিল।

তরকারী-ওয়ালী আসিল। সতীনাথ ডাকিল—ওগো…

ওগো সাড়া দিল না। সতীনাথ উঠিয়া মলিনার ঘরের দ্বারে আসিল, ডাকিল—মলিন…

—কেন?

সতীনাথ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। মলিনার হাতে একখানা নভেল। সে তক্তাপোষে শুইয়া নভেল পড়িতেছিল; সতীনাথকে দেখিয়া উঠিয়া বসিল। বিষাদিনীর মূর্ত্তি! ম্লান, মলিন মুখ!

সতীনাথ কহিল,—তরকারীউলি এসেচে। তরকারী নেবে না?

মলিনা কহিল—জানি না।

সতীনাথ কহিল—কি হলো তোমাদের? বলো তো আমায়।

মলিনার দুই ঠোঁট ঈষৎ কাঁপিল। মলিনা খোলা জানলার মধ্য দিয়া আকাশের পানে চাহিল।

সতীনাথ নিঃশব্দে বাহিরে আসিল। বারান্দায় প্রমদা তরকারীউলিকে কি বলিতেছিল।

সতীনাথ কহিল—এই যে তুমি! তরকারী এনেচে!

—হুঁ। বলিয়া গম্ভীর মুখে প্রমদা প্রস্থান করিল। তরকারী-ওয়ালী হতভম্বের মত সতীনাথের পানে চাহিল; সতীনাথ প্রমদার পিছনে চলিল, কহিল—তরকারী নেবে না?

প্রমদা কহিল—উনি কি বললেন? গিয়েছিলে তো জিজ্ঞাসা করতে।

সতীনাথ কহিল—মলি! তা সে তো দেখে না এ সব। তুমিই…

প্রমদা কহিল—আমি কিছু জানি না। মান ভাঙ্গাতে পারলে না? গিয়েছিলে তো! টশ্! ওঃ…

প্রমদার স্বর রুক্ষ। বিস্ময়ে সতীনাথের মন ভরিয়া উঠিল। সে ডাকিল,—প্রমোদ…সতীনাথ প্রমদার অঞ্চলাগ্র ধরিল।

প্রমদা কহিল, আঁচল ছাড়ো। আমি নাইতে যাচ্ছি। …আমি কিছু জানি না!

প্রমদা চলিয়া গেল। সতীনাথ হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিল।…

দু'ঘণ্টা পরের কথা।

বারান্দায় সেই ইজিচেয়ারে সতীনাথ পড়িয়াছিল। সাম্নে পথ। পথে দু'একজন করিয়া লোক চলিয়াছে। ফটকের মাথায় লতানে গাছটা বেশ ঝাঁকড়াইয়া উঠিয়াছে—কতকগুলা বেগুনি ফুলও তাহাতে ফুটিয়াছে।…ধূসর আকাশ, কোথাও এতটুকু মেঘ নাই, রৌদ্র-কিরণে চারিদিক ধপ-ধপ করিতেছে!…

প্রমদা আসিয়া ইজি চেয়ারের হাতায় বসিল।…

সতীনাথ কহিল—মলিনার কাছে চলো। তুমি বড়…ওর হাত ধরে মিটিয়ে ফ্যালো এ গোলযোগ…

প্রমদা কহিল,—কি করেচি আমি যে মেটাবো!

সতীনাথ কহিল, নাই করো! ওর মনে যদি আঘাত লেগে থাকে…

প্রমদা কহিল—কোথাও কিছু নেই—শুধু শুধু আঘাত…! তুমি তো শুনেচো…বেশ, বিচার করো। আমার কোনো অপরাধ হয়ে থাকে, আমি ভুঁয়ে নাক-খৎ দিয়ে গলবস্ত্র হয়ে মাপ চাইবো!

সতীনাথ কহিল,—তুমি তিলকে তাল করেচো, প্রমোদ!…বেচারী! একে ললিত নেই…মন খারাপ হয়ে আছে…তার উপর হয়তো কি অভিমান!

প্রমদা উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল—অভিমান আমার নেই? বলচি তো, কোনো অপরাধ করে থাকি, আমায় ধরে দুশো
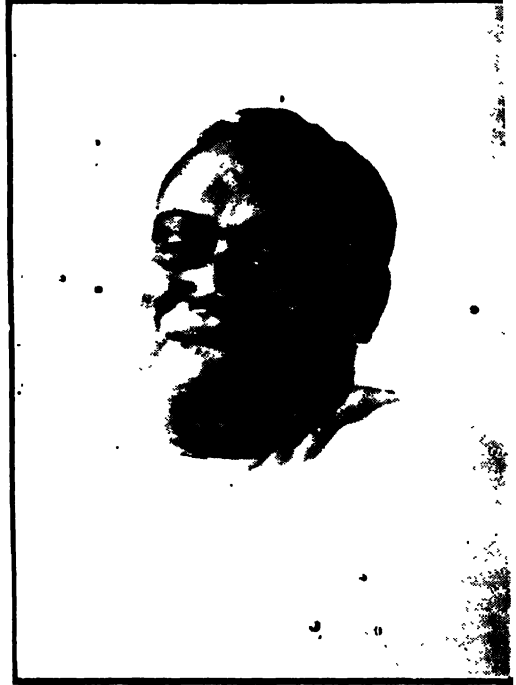
হাসির হাট!

[সাজসজ্জা ব্যতীত একমুখের রকমারী হাসি]

ব'নেদী হাসি

গরিলা হাসি

মুরুব্বী হাসি

গারুদে হাসি

কাঙুনে হাসি

বৌদ্ধিক হাসি

পেটুকের হাসি

কাফ্রী হাসি

[ক্রমশঃ ।

শ্রীচিত্তরঞ্জন গোস্বামী ।
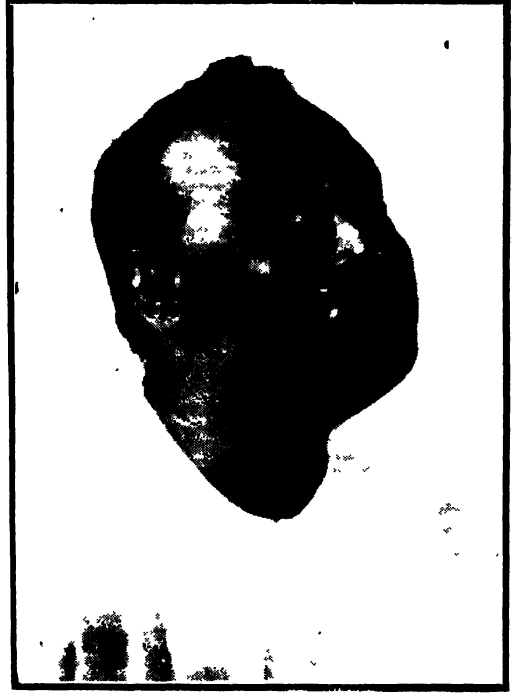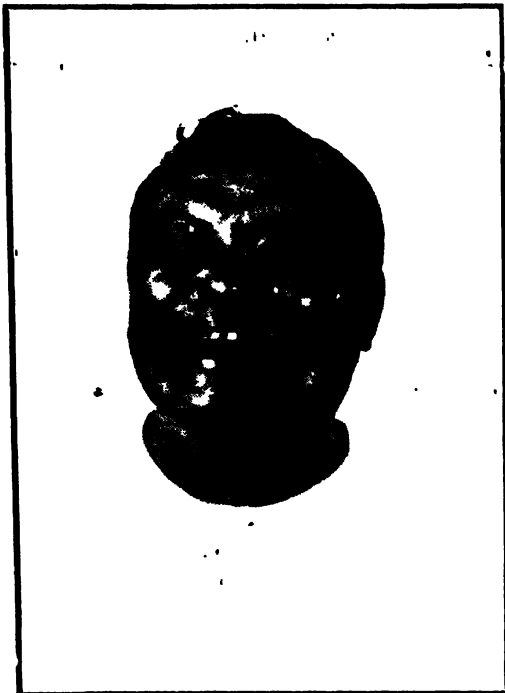
জুতো মারো, সইবো। তা ব'লে বিনা-দোষে গল-বস্ত্র হবো··· আমায় তো চেনো!

প্রমদা চলিয়া গেল।···সতীনাথ তেমনি বসিয়া; একেবারে থ!···অকস্মাৎ ঘরে ওদিকে টেবির ক্রন্দন। সতীনাথ উঠিয়া ঘরে গেল। দেখে, বিছানায় কালির দোয়াত উপুড় করা···চাদরে কালি···আর টেবি হাঁ করিয়া কাঁদিতেছে; টেবির মা প্রমদার রণ-বেশ! ব্যাপার জলের মত পরিষ্কার—বুঝিতে বাধে না!

সতীনাথ কহিল,—কালি-কলম একটু উঁচুতে রাখতে হয়। ছোট ছেলেপিলে···

প্রমদা কোনো কথা কহিল না; টেবিকে ধরিয়া সেই কালির উপর তার মুখ জুবড়াইয়া ধরিল। টেবির রোল পঞ্চম ছাড়িয়া সপ্তমে উঠিল।···

তার পর আবার সেই টেবিল···টেবিলের উপর ভাত, ডাল, মাছের ঝোল, দই। নিঃশব্দ ভোজন-পর্ব্ব! যেন সম্পূর্ণ অজানা তিনটি প্রাণী, কোথাকার হোটেলে আসিয়া উঠিয়াছে!

স্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া সতীনাথই কথা কহিল, বলিল—আমি বিকেলের ট্রেণে সাসারাম যাচ্ছি। আমার এক বন্ধু সেখানে মুন্সেফ! ছুটিতে বাড়ী যায়নি। আমায় যেতে লিখেচে।

প্রমদা বা মলিনা কোনো কথা কহিল না।

সতীনাথ কহিল,—রাত্রে বোধ হয় ফিরতে পারবো না। তেমন ট্রেণ নেই। তোমরা ছ'জনে থাকতে পারবে?

কে যেন কাহাকে কি বলিতেছে! প্রমদা ও মলিনা জবাব দিল না; পূর্ব্ববৎ গম্ভীর রহিল!

সতীনাথ কহিল,—ললিত তোফা আছে। শুধু আমার বরাতেই ··

কথা শেষ হইল না!···কাহার জন্যই বা শেষ করা!···

ছপুর বেলায় সময় আর কাটে না। আগে তাসের আসর বসিত। র‍্যমি, স্ন্যাপ্, গ্রাবু, ব্রে কত খেলা!·· আর আজ? মাসিক-পত্রের বিজ্ঞাপনগুলা অবধি সতীনাথের ছ'বার পড়া হইয়া গিয়াছে!···

ওদিকে বিষণী ঘুরিয়া আসিয়া শিউধনীকে বলিতেছিল, ভারী বান এসেছে রে দরিয়ায়। এ-পার থেকে ও-পার ইস্তক্ বালি সব ডুবে গেছে। আর কি টান···

শিউধনী ছুটিল—বিষণীও সেই সঙ্গে।···

কথাটা সতীনাথ শুনিল; ডাকিল,—ওগো···

ওগো বাহিরে আসিল। সতীনাথ কহিল,—টেবি ঘুমিয়েচে?

—হ্যাঁ। প্রমদা বারান্দার রেলিঙে কনুইয়ের ভর দিয়া দাঁড়াইল। তার পর ভিতরে গেল, গিয়া তখনি আবার ফিরিল; ফিরিয়া আপন-মনেই কহিল,—শোণে জল এসেচে।

সতীনাথ কহিল,—যাবে দেখতে?

—যাবো।···কাছেই চটি জুতা পড়িয়াছিল; প্রমদা চটি জোড়ায় পা ঢুকাইল।

সতীনাথ কহিল,—মলিকে ডাকি···

সে গিয়া মলিকে কহিল,—শোণে কূলে-কূলে ভরা জল! দেখতে যাবে?

জানলা দিয়া শোণের বুক দেখা যায়।···মলিনা জানলা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিল; পরে সতীনাথের পানে; তার দৃষ্টিতে আগ্রহ।

সতীনাথ ভাবিল, বেশ হইয়াছে। এবার ছুই সখীর এ মনান্তর তাহা হইলে সে···

সতীনাথ কহিল,—এসো। প্রমদাও যাচ্ছে···

মলিনা উঠিতেছিল, ওঠা হইল না। সে কহিল,—না, আপনারা যান। আমার ভারী মাথা ধরেচে।

সতীনাথের বুকখানা ছাঁৎ করিল। তবু হাল ছাড়িবে না! তাই পরিহাস করিয়া বলিল,—শুয়ে শুয়ে দিন-রাত বিরহ-চিন্তায় মগ্ন থাকলে মাথা ধরবেই। আমি ললিতকে চিঠি লিখে দিয়েচি, পত্র-পাঠ রওনা হও। ভাবনা নেই। এসো মলিন···

—না, সত্যি, পারচি না। আমায় মাপ করুন··· আপনারা যান।

সতীনাথের উৎসাহ নিবিয়া গেল। সে আবার কহিল, —আসবে না মলি? আমার কথায়···

—মাপ···আমায় মাপ করুন। মলিনা শুইয়া চক্ষু মুদিল। একটা নিশ্বাসও বুঝি, রোধ করিতে পারিল না।

সতীনাথ বাহিরে আসিল। তীব্র দৃষ্টিতে প্রমদা ঘরের পানে চাহিয়াছিল। সতীনাথকে দেখিয়া কহিল,—যাবে না?

সতীনাথ কহিল,—মলিনার মাথা ধরেচে···থাক্।

প্রমদা গর্জ্জিয়া উঠিল,—যাও, সেবা করো গে।···আমি জানতুম। বেশ, তুমি বাড়ী থাকো, সেবা করো। আমি যখন যাবো ঠিক করেচি, তখন যাবোই···

প্রমদা বাহির হইয়া গেল। সতীনাথ আবার সেই ইজি চেয়ারে বসিল।···

৪

আরও এক দিন এমনি ভাবে কাটিল। এমন বিপদে সতীনাথ কখনো পড়ে নাই। কাহারো পক্ষ লইবার উপায় নাই। নিশ্বাস ফেলিয়া সে ভাবিল, সেকালের পণ্ডিতরাই নারী-চরিত্র ঠিক বুঝিয়াছিলেন! একালের মত ছাপাখানা, মাসিক-পত্র বা গল্প, কাব্য উপন্যাসের এমন ছড়াছড়ি ছিল না,—জীবন্ত নারীর চরিত্র লইয়া তাঁরা কারবার করিতেন তাই! আর এ-যুগে তারা? কাব্য আর উপন্যাসের নারী-চরিত্র ঘাঁটিয়াই পরমানন্দে ভাসে, ওদিকটায় চূড়ান্ত রিশার্চ্চ হইয়াছে! সংসারে পদে পদে তাই এমন মান-অভিমান, উৎপাত, বিগ্রহ, বিপ্লবের উদয় হয়! কে জানে, অধীর নর-নারীর দল সেই জন্যই বুঝি-বা হিন্দুর ডিভোর্স-আইনের স্বপক্ষে ভোট দিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছে!…

অবশেষে রাত্রে কাশীর ফেরত ললিত আসিয়া ডিহিরী ষ্টেশনে নামিল। সঙ্গে আনিল, একটা টুকরি ও একটা টিন। টুকরিতে আপেল, নাশপাতি, পানিফল, আঙুর প্রভৃতি—ফলের বাগান! টিনের মধ্যে পরিপুষ্ট এবং উপাদেয় বেনারসী মাগুর মৎস্য।

সতীনাথ ষ্টেশনে আসিয়াছিল, আর কেহ আসে নাই।…

সতীনাথ কহিল,—মাগুর মাছ এনে হাজির! এ যে রোগীর পথ্য হে!

ললিত কহিল,—এ সে মাগুর নয়। নামে মাগুর হলেও আকারে মুগুর! দেখো। এমন মশগুল করেছিল হে যে, এই মাগুরের লোভে সাধ হচ্ছিল, ছুটির বাকী দিনগুলো সেই কাশীতেই কাটিয়ে আসি!

—বলো কি?

ললিত কহিল,—তাই।…

দু'জনে গৃহে ফিরিল। মলিনা বা প্রমদা যেন এ-বাড়ীর কেহ নয়, কিম্বা সদ্য-আসোনা নব বধূ…তাদের দিক্‌ হইতে এতটুকু চাঞ্চল্যের চিহ্ন নাই!

কাজেই সতীনাথকে গৃহিণীপনার ভার লইতে হইল। ললিত অবাক্‌! হাসির উচ্ছ্বাসে ভরা গৃহ দেখিয়া গিয়াছিল, ফিরিয়া দেখে, সেখানে এমন গাম্ভীর্য্য! যেন ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল আসিয়া ইন্‌স্‌পেক্‌শন্‌ সারিয়া গিয়াছে, কি রিপোর্ট দিবে, সেই চিন্তায় চারিদিকে ছম্‌ছমে ভাব!

আহারাদির পর বিশ্রাম। সতীনাথ ভাবিল, এবার মীমাংসা হইয়া যাইবে।

কিন্তু সকালে ললিতের আর-এক মূর্ত্তি!

সতীনাথ কহিল,—ফলের টুক্‌রিটা খোলা হোক!

ললিত কহিল,—খোলো…

উৎসাহ ও আগ্রহ যেন ডিহিরী দেশ ছাড়িয়া পলাইয়াছে!…নিশ্বাস ফেলিয়া সতীনাথ কহিল,—দুপুরবেলায় দেখা যাবে'খন, কি এনেচো…কেমন?

ফলের টুকৃরি তেমনি রহিয়া গেল। শিউধনী গিয়া মলিনাকে কহিল,—ও টুকরিঠো…

মলিনা কহিল,—আমি জানি না।

বিষণী গিয়া প্রমদাকেও ঐ এক প্রশ্ন!

প্রমদা কহিল,—আমি কি জানি!…

সতীনাথ ললিতের পানে চাহিল। ললিত আকাশের দিকে চাহিয়াছিল—তার দৃষ্টি উদাস! বধূদের কথা দুই বন্ধুর কাণেই প্রবেশ করিয়াছিল।…বেড়ানো ঘটিল না। সতীনাথ বারান্দায় বসিয়া খবরের কাগজ খুলিল—কাল ডাকে আসিয়াছে।

ললিত একখানা মোটা বই খুলিয়া বসিল, বারান্দার আর এক প্রান্তে।

সতীনাথ বইখানা দেখিল,—কার গ্রন্থাবলী। বসুমতী সাহিত্য-মন্দির হইতে প্রকাশিত।…

তার অস্বস্তির সীমা নাই! এ কি করিলে ভগবান! এ 'বরফ' কি করিয়া ভাঙ্গা যায়! ললিত হয়তো ভাবিতেছে, তার অনুপস্থিতিতে এরা তার প্রিয়তমা পত্নীর খুব যত্ন করিয়াছে, বটে!…

আহারাদির পর এ-ভাব একান্ত অসহ্য হইল। সতীনাথ ডাকিল,—ওহে ললিত…

ঘরের মধ্য হইতে ললিত কহিল—কেন?

সতীনাথ কহিল,—একবার বাজারের দিকে যাই, চলো…

—চলো!…স্বর উদাস!

ললিত বাহিরে আসিল। সে সদা-প্রসন্ন মুখ আর নাই! সতীনাথ নিশ্বাস ফেলিল।…

ফটকের বাহিরে আসিয়া সতীনাথ কহিল—একটা ইয়ে হয়েচে হে· এখানে ইতিমধ্যে অর্থাৎ…

ললিত কহিল—আমিও সে কথা বলবো, ভাবছিলুম !

সতীনাথ কহিল—তুচ্ছ একটা সেন্টিমেণ্টাল ব্যাপার ! বিশেষ কিছু নয়।

তার মুখের কথা লুফিয়া ললিত কহিল তুচ্ছ !··· বলিয়াই সে অন্য দিকে মুখ ফিরাইল।

সতীনাথ কহিল—না হয় একটু বোঝবার ভুলই···

ললিত কহিল—তা কি ক'রে বলি ?···যা শুনলুম···

সতীনাথ কহিল আসল ব্যাপার তুমি তা হলে শোনো নি···মলি একটু অভিমানী চিরদিন···

ললিত কহিল—এ অভিমানের কথা নয় !···অভিমানী সে হতে পারে, কিন্তু মিথ্যাবাদী নয়।

সতীনাথ শিহরিয়া উঠিল ; কহিল মেয়েদের সব খুঁটিনাটি কথা শুনো না। সেন্টিমেণ্টের সঙ্গে সত্য এমন মিশে যায়···

ললিত কহিল—ও কথা থাক্ ! আমি তাই ভাবছিলুম···

—কি ?

ললিত কহিল তাঁবু তুলে গৃহে ফেরা যাক্ !

– সে কি ! এর মধ্যে ? ছুটীটা মাটী হবে যে !

—মাটী যা হয়েছে, ঢের ! এখানে থেকে মাটী ছাড়া আর কিছু হবার আশাও দেখিনে!···অর্থাৎ তুমি ভাই প্রণয়ানুরাগে শ্রীমতীর অপরাধ সম্বন্ধে একটু পক্ষপাতিত্ব করচো ! আমি অবশ্য যা শুনলুম...

সতীনাথ কহিল—আমার প্রণয়ানুরাগ যতই থাকুক··· তোমার-আমার মধ্যে reasonএর ব্যাঘাত তাতে ঘটতে পারবে না, এ কথা নিশ্চয় জেনো !···

—থাক্, ও তর্কে প্রয়োজন নেই।

—বেশ !

—উত্তম !

তে-মাথা মোড়। সতীনাথ ডাহিনের পথে বাঁকিল। ললিত কহিল,—তুমি ওধারে যাচ্ছো ? আমি একবার ঐ আনিকাটের দিকে যাবো, ভাবছিলুম।

সতীনাথ কহিল—মানে, আমি ট্রাঙ্ক রোডে যাবো। হিমাংশু বাবু ব'লে একটি ভদ্রলোক আছেন। তাঁর কাছ থেকে কখানা বিলিতি ম্যাগাজিন্ আনবো। দেবার কথা আছে।

দুই বন্ধু দুই পথে চলিল।···দুজনের বুকে অসহ্য যাতনা !···এমন ঘটিতে পারে···কে জানিত ? প্রমদা আর মলিনা···দুজনে অমন ভাব···এতখানি অন্তরঙ্গতা !··· ছোট স্বার্থে একটু আঘাত···গৃহিণীপনায় বাধা ? হয় তো তাই ! কিন্তু নারী এমন অসার···

দুজনের মনে চিন্তার ধারাও বুঝি, এক !···

সন্ধ্যার দিকে সতীনাথ ঘরে বসিয়াছিল···পুরানো ষ্ট্রাণ্ডের পাতায় ছবি দেখিতেছিল।

প্রমদা আসিয়া কহিল—ওঁরা বেড়াতে বেরুচ্ছেন। তুমি যাবে না ?

সতীনাথ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল— তাই না কি !

প্রমদা কহিল তোমার বন্ধুটি স্ত্রীর কথায় ওঠেন-বসেন !···বোধ হয়, আমার নামে, গিন্নী লাগিয়েচেন। আমার সঙ্গে একটা কথাও কইলেন না !

প্রমদার স্বর গাঢ়।

সতীনাথ কহিল,– হুঁ···

প্রমদা আয়না পাড়িয়া চুল বাঁধিতে বসিল। সতীনাথ বাহিরে বারান্দায় আসিল।

সেই ফলের টুকবি তেমনি পড়িয়া আছে। একটা দুর্গন্ধ ! সতীনাথ নাসা কুঞ্চিত করিল।

ওদিককার ঘর হইতে বাহির হইল, ললিত আর মলিনা। মন্টুকে লইয়া শিউধনী আগেই গিয়াছে।···

সতীনাথ কহিল—বেড়াতে চলেছো ?

—হ্যাঁ। একটু ঘুরে আসি।

ললিত ও মলিনা চলিয়া গেল। সতীনাথ আন্‌লা হইতে জামা টানিয়া গায়ে দিল।

প্রমদা কহিল—বেড়াতে যাচ্ছো ? ওদের সঙ্গে ? ও···

কথা সংক্ষিপ্ত—কিন্তু স্বরে এমন বৈচিত্র্য খেলিয়া গেল ! সতীনাথ কহিল,—না, তোমায় নিয়ে বেরুবো।·· ওরা বেড়াতে যেতে পারে, আমরা পারি না ?

প্রমদা খুশী হইল, কহিল—আমার হলো ব'লে ! শুধু মুখে একটু সাবান দেবো।

—বেশ।···

পনেরো মিনিট পরে প্রমদা তৈয়ার হইয়া আসিল, এবং দুজনে বাহির হইল। কিন্তু যাইবে কোথায় ?

শোণেই চলো !···নদীর বুকে জল নাই—ধূ-ধূ বালি। মাঝামাঝি ঐ যে ললিত, মলিনা !

প্রমদার পায়ে হুঁচট লাগিল। প্রমদা কহিল,—না বাবু —ভস্‌ভসে বালি। পায়ে লাগে, হাঁটতে পারি না। চলো, ষ্টেশনের দিকে যাই!

সতীনাথ কহিল, বেশ!

হুদিন, তিন দিন, চার দিন আরো কাটিল। দিন কাটে, রাত কাটে, মেঘ তবু কাটিতে চায় না।···বামুন-চাকরে কাজ করিয়া যায়···কলের মত! সংসারও চলিতেছে··· কোথাও বিশৃঙ্খলা নাই।···তবু···কেমন যেন নির্জীব এঞ্জিন!

সতীনাথ ললিতকে পায় না, ললিতেরও সেই দুঃখ!··· কড়া নিষেধ,—না, ওধারে নয়। দু'দিকেই।···নিঃশব্দে দিন তবু এমনি কাটানো চাই!

ডাকে পরের দিন ললিত একখানা চিঠি পাইল—সতীনাথ লিখিয়াছে,—সকালে ষ্টেশনে আসিয়ো—কথা আছে।··

ললিত তার জবাব দিল—আচ্ছা! জবাবটুকু সে কোনো রকমে ষ্ট্রাণ্ডের পাতার মধ্যে পিণে গুঁজিয়া দিল।···

• !

পরের দিন সকালে ষ্টেশনের প্লাটফর্ম্মে দুজনে দেখা।

সতীনাথ কহিল—এ কি হচ্ছে ললিত?

ললিত কহিল—মারা যেতে বসেচি।···দুই সখীর মান-অভিমান আমাদের মধ্যে খাঁড়ার মত এসে পড়েচে!

সতীনাথ কহিল,—আমায় স্পষ্ট বলেচে, ঢের হাওয়া খাওয়া হয়েচে। বাড়ী চলো। তাতে আমি বলেচি, বাড়ী এগ্রিমেন্টে ভাড়া—ছাড়লে লোকশান হবে।

ললিত কহিল—আমারো ঐ দশা!···আমি বলি, শ্রীমতী প্রমদা তোমার চেয়ে বয়সে বড়, সম্পর্কেও তাই। তুমি আগে কথা কও। তাতে বলেচে, কি করেচি আমি যে আমার সঙ্গে কথা বন্ধ করেচে?···

সতীনাথ কহিল—উপায়?

ললিত কহিল—ঠাওরাও।···তুমি উকিল। মিথ্যা defence তো মাঝে মাঝে আদালতে খাড়া করতে হয়!

সতীনাথ কহিল,—হাকিমকে ভুলোনো আর স্ত্রীকে ভুলোনো—দু'য়ে বিস্তর প্রভেদ।

ললিত নিশ্বাস ফেলিল। সতীনাথ কহিল,—চলো, বেড়াতে বেড়াতে শোণ-ইষ্ট-ব্যাঙ্ক অবধি। একটা মতলব ঠাউরে তবে বাড়ী ফিরবো।

ললিত কহিল,—বেশ বলেচো!···

বেলা দশটা। দু'জনে দু'পথে গৃহে ফিরিল। সতীনাথ ডাকিল,—ওগো···

ললিত ডাকিল,—মলি···

কাহারো সাড়া নাই। সতীনাথ ডাকিল,—বিষণী···

বিষণী আসিল। সতীনাথ কহিল,—লগেজ বাঁধ্। বার্থ রিজার্ভ ক'রে এসেচি। আজই রাত্রের ট্রেণে গয়া যাবো!···

ললিত শিউধনীকে কহিল,—বিছানা-পত্তর বাঁধ, আজ বিকেলে কাশী যাচ্ছি। ধোপার কাছে যা···কাপড়-চোপড়গুলো নিয়ে আয়। ট্রেণের বার্থ রিজার্ভ হয়ে গেছে।··· বুঝলি?

গম্ভীর মুখে দুই বন্ধুতে পাকশালার দিকে চলিল। ওদিকে হাসি-গল্পের কি কলোচ্ছ্বাস!···তাহা হইলে···

সতীনাথ হাঁকিল,—চটপট্ সেরে নাও গো, আজ গয়া যাবো।

ললিত হাঁকিল,—কাশীর জন্য বার্থ রিজার্ভ ক'রে এলুম, মলি।

প্রমদা রান্নাঘরে; উনানে হাঁড়ি চাপাইয়া ডাকিল,—ওলো মলি···তোর হলো? আয় শীগ্‌গির···সুপুরি নিয়ে। যে মাংস, বাবাঃ! সেদ্ধ করা দায়। বাবুরা এলো বুঝি রে!

মলি কহিল,—দাঁড়াও দিদি···সুপুরি কি আছে! সব উই ধরেচে! মা গো, কি দেশ—সুপুরিতে উই ধরে!

—তুই আয় ভাই। হাঁড়িটা আমি বাইরে নিয়ে যাচ্ছি। উনুনও তেমনি·· জ্বাল নেই!

বেড়ি দিয়া উনুনের গলা ধরিয়া হাঁড়ি বহিয়া ওদিক হইতে প্রমদার প্রবেশ—এদিক হইতে একটা এনামেলের ডিশে উই-ধরা সুপারি লইয়া মলি···মধ্যপথে ললিত ও সতীনাথ!···

ললিত কহিল,—ও সব রাখো গো, গুছিয়ে নাও—শীগ্‌গির। আজই কাশী যাচ্ছি।

সতীনাথ কহিল,—ফ্যালো হাঁড়ি। বিছানা-পত্র বাঁধো। গয়া যাচ্ছি আজ।

—সে কি!

দুই সখী একসঙ্গে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল,—তার মানে?

প্রমদা কহিল,—এমন ডেরা পেতে বসেচি! একসঙ্গে আনন্দে আছি। না, উনি বলেন, গয়া চলো,—উনি বলেন, কাশী!

মলিনা কহিল,—যেতে হয়, তুই বন্ধুতে যাও। আমরা যাবো না। বেড়াতে এসেচি ব'লে কেবলি টো-টো করতে হবে! থিতু হবো না—না?

সতীনাথ ও ললিত অবাক্!··

সতীনাথ কহিল,—হাসি নেই, কথা নেই—দুজনের গোমড়া মুখ!

মলিনা কহিল,—তার বোঝাপড়া আমরা করবো। আপনারা পুরুষ-মানুষ—মেয়েদের কথায় থাকেন কেন?

সতীনাথ কহিল,—বটে! আমাদের যে প্রাণান্ত!

ললিত কহিল,—কত বিধি-নিষেধের সৃষ্টি! না, শুনবো না! আবার কাল তেমনি··

মলিনা কহিল,—আমার ভুল, আমি মান্‌চি। তার কারণও ছিল···তুমি চ'লে গেলে কেন? তোমারি দোষ। ক'দিনের জন্য আমোদ করতে আসা···ভারী রাগ হয়েছিল তাই। দিদি বারণ করলে না কেন? সতীবাবু যদি কোথাও যেতেন, আমি যেতে দিতুম না! তাই আমার রাগ হয়েছিল! আমার মনটার পানে কেউ দেখলে না! সেই রাগেই···

প্রমদা কহিল,—আমার কিন্তু অভিমান হয়েছিল সত্যি··

সতীনাথ কহিল,—তার পর?

প্রমদা কহিল,—আজ মাংস বেচতে এসেছিল—চাকররা বললে, কিনবো মা। সত্যি, তোমাদের খাবার কষ্টও হচ্ছে! নিত্য ঐ ট্যাঁড়শ আর চিচিঙ্গে! তাই গেলুম মাংস নিতে। এ-দিক থেকে আমি গেছি, ও-দিক থেকে ও···তার পর দু'জনে চোখো-চোখি হতে হেসে বাঁচি না!

সতীনাথ কহিল.—বাঃ! কিন্তু আমি যে বার্থ রিজার্ভ ক'রে এলুম···

ললিত কহিল,—চমৎকার! পিশিমাকে টেলিগ্রাম পাঠিয়েচি, আজই কাশী যাচ্ছি ব'লে—এখন উপায়?

প্রমদা কহিল,—না।···কেমন একসঙ্গে আছি, নির্ঝঞ্ঝাটে! যাবো না!

মলিনা কহিল,—এ ক'টা দিন মিছে কি দুর্ভোগে কাটলো। বেড়াতে আসার আনন্দ পেলুম কবে?

সতীনাথ কহিল,—স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং···

প্রমদা কহিল,—শাস্ত্র রেখে সুপুরি আনিয়ে দাও এখনি। না হলে এই এক-হাঁড়ি মাংস সেদ্ধ হবে না, চোখে জল ঝরবে! খাবে কি?

—অল্ রাইট্!···

কিন্তু বিধাতা সত্যই বিরূপ! ডিহিরীতে থাকা গেল না। সেই দিনই সন্ধ্যায় মণ্টুর প্রবল জ্বর দেখা দিল; এবং শেষ রাত্রে টেবির রক্ত আমাশয়!···উপায়? ডিহিরীতে ডাক্তারও নাই! শেষে···

কাজেই কোনো মতে জিনিষ-পত্র গুছাইয়া পরের দিন আবার সেই পুনর্মূষিক···অর্থাৎ কলিকাতার সেই ধূমাচ্ছন্ন আকাশ, আকাশের নীচে সেই বদ্ধ গলি, এবং সে গলিতে সেই কারা-গৃহ!···

সতীনাথ তাই আজও বলিতেছিল,—বাঙালীর ভাগ্যে রোমান্স সইবে কেন! কথায় বলে, তুমি যাও বঙ্গে, কপাল যায় সঙ্গে!···

ললিত বলে,—কপাল নয় হে, বলো, স্ত্রী! এই জন্যই শাস্ত্রকাররা ব'লে গেছেন, পথে নারী বিবর্জ্জিতা!

প্রমদা হাসিয়া বলিল,—থামো! তোমরা দুই বন্ধুতে কি ব'লে গম্ভীর হয়ে থাকতে মশায়? মুখ্যু মেয়েমানুষ নও··· এক জন উকিল, আর এক জন ফিলিজফির প্রফেশর!

মলিনা বলিল,—ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখে অনেকে ছাপায়, দেখি। আমার মনে হয়, আমাদের ডিহিরীর সেই বৃত্তান্ত যদি ছাপানো যায়···

সতীনাথ কহিল,—লোকের তাক লাগে তা হলে, ভাবে, নারী জাতটা এমন অপদার্থ!

প্রমদা কহিল,—পুরুষ যে তার চেয়েও অপদার্থ—সে প্রমাণ পেতেও কোনো বাধা ঘটে না!···আমরাই যেন মান-অভিমান করেছিলুম, কথা বন্ধ করেছিলুম···তোমরা পেরেছিলে সে অভিমান সারাতে?

ললিত হাসিল, হাসিয়া কহিল,—নারীর কাছে পুরুষের পরাজয় যুগে যুগে ঘটেচে! তা ছাড়া স্ত্রীর চিত্ত-বিনোদনের জন্য প্রয়োজন হলে chivalric পুরুষ স্বামী সব ত্যাগ করে। বন্ধুর সঙ্গে আলাপ, সে তো অতি তুচ্ছ পদার্থ!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

পোষ্যপুত্র

১

কপর্দ্দকহীন পিতৃ-গৃহে জন্মিয়াও রমাকান্ত বার্ষিক দুই লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তির মালিক হইয়াছিলেন।

অভাবের সহিত যুদ্ধ করিয়া যাহারা ঐশ্বর্য্যের প্রতিষ্ঠা করেন, খরচ তাঁহারা সহজে করিতে পারেন না! বিশেষতঃ দান। তাই নিঃসন্তান রমাকান্তের দানের খ্যাতিটা কোথাও ছিল না। যে বিশেষণটি ছিল, তাহার প্রভাবে তাঁহার নাম প্রাতঃকালে কেহ উচ্চারণ করিত না। কারণ, তাহাতে উপবাসের সম্ভাবনা আছে।

তথাপি লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের এই প্রহরী নিজের অবিদ্যমানে আপনার প্রতিষ্ঠা করিয়া রাখিতে চাহিলেন। রমাকান্ত দত্তক-পুত্র গ্রহণ করিলেন।

মানুষের অন্তর সকল ব্যাপারেই স্নেহহীন হয় না। নিষ্ঠুরতার বর্ম্ম আচ্ছাদনে যেমন করিয়া সে ঢাকা থাকুক না কেন, দুর্য্যোধনের ঊরুদেশের মত একটা না একটা স্থান তাহার দুর্ব্বল থাকিবেই।

জমাট তুষারস্তূপ যেমন সৌরকরস্পর্শে গলিয়া নদীর সৃষ্টি করে, সেইরূপ জীবনের প্রৌঢ়-বেলা ক্ষুদ্র শিশুর কোমল স্পর্শ রমাকান্তের বক্ষোনিরুদ্ধ স্নেহধারাকে পাষাণ কারা-অবরুদ্ধ নদীর মত টানিয়া বাহির করিল।

রতিকান্তের খাওয়া-শোওয়ার সব ব্যবস্থাই রমাকান্ত স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। পত্নী মহালক্ষ্মীর উপর ভার দিয়াও যেন তাঁহার তৃপ্তি হইত না; কি জানি, এটি ত তাঁহার গর্ভেধরা নিধি নহে! কিন্তু রমাকান্তের সহিত রতিকান্তের রক্তের সম্পর্ক ছিল। রতিকান্ত রমাকান্তের জ্ঞাতিপুত্র।

রমাকান্ত দরিদ্র হইতে বনকুবের হইয়াছিলেন। সকল স্তরের অবস্থার সহিত তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছিল। পুত্রের শিক্ষার জন্য তিনি সাধারণ ব্যবস্থাই করিতে চাহিলেন, কিন্তু মহালক্ষ্মী কাঁদিয়া আপত্তি তুলিলেন।

পড়িবার আলাদা ঘর, সর্ব্বক্ষণের জন্য অভিভাবক শিক্ষক, স্কুলে যাইবার গাড়ী, ফরমাস খাটিবার নিজস্ব খানসামা, সব ব্যবস্থা রতিকান্তের হইয়া গেল। সে যে লক্ষপতির বংশধর! কিন্তু এত আয়োজন-সত্ত্বেও রতিকান্তের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইতে পাইল না; বি-এ ক্লাসে পড়িবার সময় অসহযোগ আন্দোলনের বন্যায় পাঠের সহিত তাহার অসহযোগ ঘটিয়া গেল।

রমাকান্ত ভয় পাইলেন! ব্যাধির সংক্রামকতা পরিহারের জন্য মানুষ যেমন তৈলবিশেষ ব্যবহার করে, তেমনই এই অসহযোগ-ব্যাধির সংক্রামকতা হইতে পুত্রকে রক্ষা করিতে রমাকান্ত আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া রতিকান্তকে বিষয়কর্ম্ম-শিক্ষা-ব্যাপারের মধ্যে টানিয়া লইলেন। কোন্ রহস্যাবৃত পথ ধরিয়া বিষয়-বৈভব দেখিতে দেখিতে বাড়িয়া উঠে, সাবধানতার সহিত সেই দুর্জ্ঞেয় পথের দিকে তিনি পুত্রের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিলেন।

কয়েক বৎসর নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া গেল। রমাকান্ত বুঝিলেন, তাঁহার শিক্ষা নিষ্ফল হয় নাই। একটা নিশ্বাস ফেলিলেন, দুঃখে নহে, আরামে। বুকটা তাঁহার আনন্দে ভরিয়া উঠিল— উপযুক্ত ব্যক্তির হাতে এত কষ্টের সঞ্চিত কুবের-ভাণ্ডার নিশ্চিন্ত হইয়া তিনি দিয়া যাইতে পারিবেন।

* * * *

সে দিন মধ্যাহ্ন-বিশ্রাম শেষ করিয়া রতিকান্ত কাছারী-ঘরে প্রবেশ করিতেছেন, এমন সময় গোমস্তা অনুপতি আসিয়া এক রেজেষ্টারী পত্র তাঁহার হাতে দিলেন।

রতিকান্ত খুলিয়া দেখিলেন, এটর্ণীর বাড়ী হইতে সেখানি আসিতেছে। কোন একটা সম্পত্তি, যাহা রমাকান্ত অতি সুলভে কিনিয়াছিলেন, সেটা নাকি ঠিক পথ ধরিয়া আসে নাই। তাই দীর্ঘকাল পরেও তাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে। সম্পত্তির প্রকৃত অধিকারীর পক্ষের এটর্ণী সেই সংবাদটা জানাইয়াছেন।

সম্পত্তির ন্যায্য অধিকারী বলিয়া যে নামটা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা পড়িয়া রতিকান্তের ভ্রূদ্বয় কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। চিঠিখানি ড্রয়ারের মধ্যে রাখিয়া রতিকান্ত বেড়াইতে বাহির হইয়া গেলেন। বর্ষার ঘন মেঘভারে আচ্ছন্ন আকাশের মত তাঁহার অন্ধকার মুখের পানে চাহিয়া গোমস্তা নিঃশব্দে সরিয়া গেলেন। তবে সংবাদটা তিনি রমাকান্তকে দিতে ভুলিলেন না যে, খোকা বাবুর কাছে

এটর্ণী-বাড়ীর একখানি চিঠি আসিয়াছে ; কি সম্বন্ধে, এইটাই শুধু বলিতে পারিলেন না।

মহালক্ষ্মীর তত্ত্বাবধানে পিতা-পুত্র একসঙ্গে আহার করিতেন। রাত্রির আহারকালে রতিকান্তের পাতের পানে চাহিয়া রমাকান্ত কহিলেন, "রতু, খাচ্ছ না যে ?"

"না, এই যে" বলিয়া পুত্র মাথা হেঁট করিয়া পাতের লুচিগুলা নাড়া-চাড়া করিতে লাগিলেন

মহালক্ষ্মী কহিলেন, "খোকা, তোর কি শরীর ভাল নেই ?"

রতিকান্ত কহিলেন, "মাথাটা ধরেছে।"

রমাকান্ত ব্যস্তভাবে কহিলেন, "তবে এক কায কর, ও সব কিছু খেও না। শুধু দুধ আর ফল খাও।" পত্নীর পানে চাহিয়া কহিলেন, "দাও না, রতুর পাশের টেবিল-ফ্যানটা খুলে দাও।"

মাথার উপরেও পূর্ণবেগে বিজলী পাখা ঘুরিতে ছিল। দক্ষিণের সুবৃহৎ জানালাগুলি দিয়া উদ্যানের সদ্য-ফোটা পুষ্প-সৌরভ বাতাস বহিয়া আনিয়া সমগ্র কক্ষটিকে আমোদিত করিতেছিল। তথাপি পিতার এই ব্যস্ততায় রতিকান্ত লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। তিনি বলিলেন, "না, সে রকম কিছু হয়নি, সামান্য—"

বাধা দিয়া রমাকান্ত কহিলেন,—"ওই সামান্য হ'তেই বেশী হয়! রোগের সূত্রেই বাধা দেওয়া উচিত, রতু।"

টেবিল-ফ্যানের সুইচটা টিপিয়া দিয়া মহালক্ষ্মী কহিলেন,—"তোমার যত অনাছিষ্টি—একটু মাথা ধরেছে কি না ধরেছে, ও আর কিছু খাবে না!"

—"না না, তোমরা ও সব বোঝ না, খালি খাওয়াতেই জান! সেটা উপকারক কি অপকারক, তা অবধি চিন্তা কর না।"

রতিকান্ত ফলের রেকাবীটা টানিয়া লইলেন দেখিয়া মহালক্ষ্মী আর কথা কহিলেন না। পুত্র সম্বন্ধে স্বামীর এই সদাশঙ্কিত অন্তরের অতি সাবধানতা দেখিয়া দেখিয়া তাঁহার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল।

* * * *

শয়ন-কক্ষে রতিকান্ত যখন বিছানার উপর বসিয়া বালিসটাকে কি রকম করিয়া মাথায় দিবেন, নাড়িয়া-চাড়িয়া তাহাই ঠিক করিতেছিলেন, সেই সময়ে মহালক্ষ্মী কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার হাতে একখানি খাদ্যপূর্ণ রেকাবী ছিল। স্নেহকণ্ঠে তিনি ডাকিলেন, "খোকা!"

"কি মা-মণি" বলিয়া রতিকান্ত ফিরিয়া মায়ের পানে চাহিয়া হাসিয়া উঠিলেন। কহিলেন,—"রাতদুপুরে ও-সব আবার কি এনেছ তুমি ?"

পুত্রের হাসিতে মা-ও হাসিলেন। কহিলেন, "রাত বেশী হয়নি, সবে দশটা। লক্ষ্মীমণি আমার! এই কই-মাছের ডিম তোর নাম-করা—না, তোর কোন কথা শুনব না। পাণ আমি এনেছি। ওঁর সামনে জেদ কত্তে পারিনি, আমি হাতে ক'রে খাইয়ে দিচ্ছি।"

মহালক্ষ্মীর কণ্ঠে একটা নিবিড় স্নেহের তীব্র ব্যাকুলতা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। রতিকান্ত বিছানা হইতে নামিয়া পড়িলেন। স্নেহের এমন অনেক অত্যাচারই তাঁহাকে সহিতে হয়।

গভীর রাত্রিতে হঠাৎ রতিকান্তের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। গোলাপজলের গন্ধে কক্ষটা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। রতিকান্ত পাশ ফিরিয়া কহিলেন,—"বাবা, আপনি শুতে যান্ নি এখনও ?"

—"হ্যাঁ, গেছলুম! এই উঠে আসছি, তোর মাথায় একটু গোলাপ-জল দিয়ে দিলুম। এমন হঠাৎ ধরলো কেন ?"

রমাকান্ত উদ্বিগ্ন নেত্রে পুত্রের মুখপানে চাহিলেন।

রতিকান্ত কহিলেন,—"কি জানি! এখন কিন্তু একবারে সেরে গেছে। আপনি ঘুমোতে যান্।"

—"আঃ, বাচলুম! কত কথাই মনে হচ্ছিল—তবে ভাল আছিস, বাবা ?"

—"হ্যাঁ, বাবা! আমি বেশ ভাল আছি। আপনি শুতে যান, আপনার শরীর খারাপ হ'লে আবার আমায় বড্ড ভাবনায় পড়তে হবে।"

ছেলে যখন বলিতেছেন, তখন আর কি করেন! রমাকান্তকে বাধ্য হইয়া উঠিতে হইল।

* * * *

এটর্ণী-বাড়ীর চিঠিখানির সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এইরূপ। কোন একটা প্রকাণ্ড জমীদারী, যাহা দীর্ঘকাল ধরিয়া রমাকান্ত নিজের বলিয়া ভোগদখল করিয়া আসিতেছেন, তাহা আইনের দৃষ্টিতে রমাকান্তের হইতে পারে না। কারণ, তিনি ইহা যে ব্যক্তির নিকট হইতে কিনিয়াছিলেন, আইনের

অতি সূক্ষ্ম বিচারে বিক্রয়ের অধিকার তাঁহার ছিল না। অতএব ইহার প্রকৃত অধিকারী, ইহা ফিরিয়া পাইবার দাবী করিতেছেন।

এই জমীদারীটার প্রকৃত অধিকারী বলিয়া যিনি দাবী উপস্থিত করিতেছেন, তিনি রতিকান্তদিগের জ্ঞাতিপুত্র। সম্পত্তিটা সুকুমার রায়ের পিতার মাতামহের। কাযেই সুকুমার রায়ের পিতামহ অনাদি রায় ইহা কোনক্রমেই বিক্রয় করিতে পারেন না।

রতিকান্ত রায় স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিলেন। চিম্‌নীর ধোঁয়া যেমন তাল পাকাইয়া স্বচ্ছ আলোকভরা আকাশের খানিকটা মলিন করিয়া তোলে, তেমনই ভাবনার ধূম্রজাল অনাবিল আনন্দমাখা মনের মাঝে একটা চিন্তার তাল পাকাইয়া তুলিতে লাগিল। এই মামলা যখন কোর্টে উপস্থিত, তখন বড় সহজে ইহার নিষ্পত্তি হইবে না; পিতার কূট বিষয়-বুদ্ধি ও অসাধারণ জিদ্‌টা রতিকান্ত বিশেষ অবগত ছিলেন, শ্রাদ্ধটা গড়াইবে অনেক দূর! রতিকান্ত মানস-দৃষ্টিতে দেখিতে পাইলেন, ইহা প্রিভিকাউন্সিল অবধি চলিতে পারে। পিতার পুত্র তিনি, রমাকান্তের পক্ষই তাঁহাকে অবলম্বন করিতে হইবে।

অবসন্নভাবে রতিকান্ত কৌচটার উপর শুইয়া পড়িলেন।

মহালক্ষ্মী কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিলেন,—"খোকা, বেড়াতে বার হস্‌নি?"

রতিকান্ত নিঃশব্দে জননীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

মা কহিলেন,—"ও দুষ্ট, তুমি সব শুনেছ? তাই উস্‌খুস্ ক'রে বাড়ীতে ব'সে আছ!"

বিস্ময়ে রতিকান্ত কহিলেন, "কি শুনব, মা-মণি? কি হয়েছে?"

"ও মা, তুই সত্যি কিছু জানিস্ না?" মহালক্ষ্মী গালে হাত দিলেন! পরে হাসিয়া বলিলেন, "উনি আজ যে তোর জন্যে ক'নে দেখতে গেছেন। তোর মামাবাবু একবার দেখে এসেছিলেন,—ভারি সুন্দরী নাকি। লাখে একটা মেলে না। এত দিন চেষ্টার পর ভাল মেয়ে পাওয়া গেছে।"

রতিকান্ত হাসিয়া উঠিলেন, কহিলেন, "তোমার জন্যই শুধু ওই একটি সৃষ্টি হয়েছে তা হলে বল, মা-মণি।"

সগর্ব্বে মহালক্ষ্মী কহিলেন, "না ত কি! আমি যাকে বরণ করব, তাকে তপস্যা করা চাই। তোকে পাওয়া সহজ নাকি?" মহালক্ষ্মীর কথার শেষের দিকটায় কণ্ঠস্বর কেমন আপনা হইতে কাঁপিয়া উঠিল। তিনি অনায়াসে ত এই পুত্ররত্নের জননীপদ লাভ করেন নাই!

রতিকান্ত হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "মা-মণি! তোমার গর্ভে—তোমার এই একটি কোহিনুর নয় গো?"

"কোহিনুর নয় ত কি রে, খোকা? এত রূপ, এত গুণ কার ছেলের আছে বল ত?"

"নিজের ছেলেকে সবাই সাগর-ছেঁচা মাণিক দেখে, পরে দেখে কিন্তু বাঁদর!"

কৃত্রিম রোষে জননী কহিলেন, "বেশ রে, বেশ! তুই আমার ছেলেকে বাঁদর বল্লি,—আমি তোর ছেলে হ'লে তাকে ওই গাল দেব।"

"হ্যাঁ, বলবে—বাঁদর-বাচ্চা।"

"না, তোর সঙ্গে আমি আর পারি না, বাপু!"

রতিকান্ত হাসিয়া বলিলেন, "ছেলের কাছে সকলকেই হার মানতে হয় মনে রেখ, মা-মণি!"

* * *

দেববালার মত মেয়েটি রমাকান্ত রায়ের পুত্রবধূরূপে আনীত হইবে, এই কথাটা যে দিন রমাকান্ত নিশ্চিত করিয়া বলিয়া দিলেন, সেই দিন বৈকালে বেড়াইতে যাইবার সৌখীন পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া রতিকান্ত পিতৃকক্ষে প্রবেশ করিয়া কয়দিন পূর্ব্বের পাওয়া এটর্ণীর বাড়ীর সেই পত্রখানি পিতার হাতে দিলেন।

রমাকান্ত কহিলেন, "কে দিয়েছে?"

উত্তর হইল, "সুকুমার রায়।"

"সুকুমার রায়? অনাদির নাতি,—দেবের ছেলে! তা বিষয়টা কি, রতু?"

"লক্ষ্মীপুরের সমস্ত জমীদারীটা সে নিজের ব'লে দাবী করেছে।"

"তাই না কি?" রমাকান্ত উচ্চশব্দে হাসিয়া উঠিলেন। বোধ করি, এমনই করিয়াই ব্যাপারটাকে তিনি উড়াইয়া দিতে চাহিলেন। কহিলেন, "ছোকরার মাথা খারাপ হয়েছে না কি?"

রতিকান্ত কহিলেন, "শুনেছি, সে উকীল হয়েছে।"

হাসিতে হাসিতে রমাকান্ত কহিলেন, "ওই আলিপুরের গাছতলার ত!"

মহালক্ষ্মী কাছেই ছিলেন। তাঁহার মাতৃ-অন্তর ব্যথিত হইয়া উঠিল। কহিলেন, "তা হোক! আহা, ওর ঠাকুমা ওকে অনেক কষ্টে মানুষ করেছে। ছেলে বৌ ত অসময়ে চ'লে গেল। কপাল মন্দ! কম ঘরের ত মেয়ে ছিল না!"

বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে রমাকান্ত কহিলেন, "ওদের অমনি হয়ে থাকে। বেশ ত, নতুন রোজগার করতে শিখেছিস, টাকা-কড়ি দরকার হয়, আমার কাছে দু'-পাঁচ হাজার নে। অমন কি জ্ঞাত-গোত্রকে মানুষ দেয় না! বংশের এক জন বড় হ'লে পাঁচ জনকে মানুষ ক'রে তুলে। এই যে উকীল হলি, আমার কাছে এলে বিলেতের খরচটা কি দিতে পারতুম না?"

অপ্রত্যাশিতরূপে স্বামীর মুখে এই সম্পূর্ণ নূতন বাণী শুনিয়া মহালক্ষ্মী স্তম্ভিত ভঙ্গিতে চাহিয়া রহিলেন।

রমাকান্তের হাসি তখনও থামে নাই। তাহারই উচ্ছ্বাসে দুলিতে দুলিতে তিনি কহিলেন, "ছোঁড়া আবার 'ল' পড়েছে! এ কেস যে চলতেই পারে না, সব তামাদি হয়ে গেছে কোন্ কালে, তা জানে! সাহস ত কম নয়, রমাকান্ত রায়ের সঙ্গে মামলার সাধ!"

* * *

অনেক বৎসর পূর্ব্বের কাহিনী।

রমাকান্ত ও অনাদিনাথ ছিলেন—খুড়তুতো, জ্যাঠতুতো ভাই! বাল্যে খেলাধূলা, পড়াশুনা উভয়ের একসঙ্গে হইলেও দুই জনের চেহারার যেমন প্রচুর পার্থক্য ছিল, যৌবনে আর্থিক অবস্থাটারও সেইরূপ আকাশ-পাতাল ব্যবধান ঘটিয়াছিল।

ঘুম ভাঙ্গিয়া বাদশা হওয়া গল্পের মত—অনাদির অতি-সুন্দর মূর্ত্তিখানা তাঁহাকে অপুত্রক জমীদারের গৃহ-জামাতা করিয়া দিল।

রমাকান্ত দরিদ্র পিতার সন্তান থাকিয়াই কলিকাতার মেস হইতে এম-এ পরীক্ষা দিলেন।

দৈবানুগৃহীত ব্যক্তি বিনাশ্রমে যে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের স্বর্ণ-চাবিটা কুড়াইয়া পায়, সে তাহার মর্য্যাদা বুঝিতে পারে না; যে বুঝিতে পারে, সে পরিশ্রমের দ্বারা তাহা খুঁজিয়া বাহির করে।

বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী কথাটা সত্য প্রতিপন্ন করিবার জন্যই অদৃষ্ট-দেবতা রমাকান্তকে সামান্য কাপড়ের ব্যবসা হইতে 'মিল'এর মালিক হইবার অবস্থা, কালে ঘটাইয়া দিয়াছিলেন।

দ্বিতীয়ার চাঁদ কলায় কলায় বাড়িয়া উঠে; কিন্তু পূর্ণচন্দ্রের ক্রমেই ক্ষয়প্রাপ্তি ঘটে। জোয়ারের জল কূলে কূলে ভরিয়া উঠা শেষ হইলে ভাটার টান পড়ে। শ্বশুরগৃহে অতুল ঐশ্বর্য্যের সম্পূর্ণ মালিকদার হওয়ার পর হইতেই অনাদির হাতে তাহা ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করিল।

জগতে শতকরা পঁচাত্তর জন ব্যক্তির বিষয়-বৈভব যে কারণে বিনষ্ট হয়, অনাদির তাহা কিছু ছিল না। মানুষ সর্ব্বস্ব হারায় জুয়ায় কিম্বা চরিত্রের উচ্ছৃঙ্খলতায়। কিন্তু সে সব কারণের অভাব সত্ত্বেও অনাদি সর্ব্বস্ব হারাইলেন—তাঁহার উন্নত মন, পরোপকারী হৃদয় ও মুক্তহস্ত দানের জন্য।

মানুষের স্বার্থপরতার সহিত অনাদির পরিচয় ছিল না। আপনার নির্ম্মল, স্বার্থলেশহীন অন্তরের মত জগতের মানুষকে দেখিলেই তাহাকে ঠকিতে হয়; দেশ-কাল-পাত্র দেখিয়া দয়া, দান, ধর্ম্ম করিবার ব্যবস্থা শাস্ত্র দিয়াছেন, তাহা না মানিলে দুঃখ অনিবার্য্য।

দেশের সৎ অনুষ্ঠানগুলি বাঁচিতে পারে না, প্রকৃত মানুষের অভাবে! অনাদি তাহা মানিতেন না। অর্থের অভাবেই তাহাদের আয়ু নিঃশেষ হয়, এই বিশ্বাসেই তিনি শ্বশুরের বিপুল সম্পত্তিটাকে ক্রমে ঋণজালে জড়াইয়া ফেলিলেন। অবস্থা ক্রমে শোচনীয় আকার ধারণ করিল। তাঁহার নামে পাওনাদারের দশখানি ওয়ারেণ্ট বাহির হইল। অবশেষে নিজের বাটীতেই তাঁহাকে লুকাইয়া থাকিবার মত অবস্থা ঘটিল।'

রমাকান্তের হাতে তখন নগদ অনেক টাকা জমিয়াছে, অনাদি শুনিয়াছিলেন। কিছু অর্থের সাহায্যের জন্য তিনি তাঁহাকে লিখিয়া পাঠাইলেন। উত্তরস্বরূপ রমাকান্ত স্বয়ং অনাদির বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন।

অনেক বৎসর পরে দুই ভাইয়ে সাক্ষাৎ হইল। সাত দিন ধরিয়া কক্ষদ্বার রুদ্ধ করিয়া উভয়ে যুক্তি-পরামর্শ, তর্কবিচার অনেক কিছু হইল। বাহিরের একটি প্রাণী—এমন কি, অনাদির পত্নী উষা অবধি তাহার কিছু জানিতে পাইলেন না। তাহার পর দেখা গেল, অনাদি তাঁহার নিজস্ব দেনা একে একে সবই মিটাইয়া দিলেন। পুত্র দেবকুমারের বয়স তখন পনের বৎসর।

যে দিন উষা জানিতে পারিলেন, তাঁহার পিতার সাধের লক্ষ্মীপুর পরগণা আর তাঁহার নাই, সে দিন তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। জ্ঞান হইবার পর স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমার বাবা আজ তোমায় কি ব'লে আশীর্ব্বাদ করবেন? তাঁর নাতি-নাতনীদের তুমি গাছতলায় দিলে? আর পেটে যেটা এসেছে, এর দুধের কি ব্যবস্থা তুমি করবে বল?"

অনাদি নীরবে বসিয়াছিলেন। এই মর্ম্মান্তিক কঠোর অভিযোগের একটা সামান্য উত্তরও ছিল না। মন্দ গ্রহ সব কাড়িয়া লইয়াছে বলিয়া ভাগ্য-দেবতার স্কন্ধে সকল অপরাধের বোঝাটা নিঃসঙ্কোচে তিনি চাপাইয়া দায় খালাস হইতে পারিলেন না।

স্বামিস্ত্রীর কথা বন্ধ হইয়া গেল।

ইহার পরে যে অবশিষ্ট আটটি মাস তিনি বাঁচিয়াছিলেন, সে সময়টা তাঁহার কাটিয়াছিল বহির্ব্বাটীতে পুত্র দেবকুমার ও খবরের কাগজ লইয়া। বালক দেবকুমার সেই কিশোর বয়সেই পিতার দুঃখের সমভাগী হইয়াছিল।

এতগুলি কাচ্ছা-বাচ্ছা লইয়া উষা কেমন করিয়া সংসারটা চালাইতেছেন, অনাদি যেমন তাহার কোন তত্ত্বই লইতেন না, মর্ম্মান্তিক দুঃখে অভিমানে উষাও তেমনই স্বামীকে সংসারের সুখ-দুঃখের কোন সংবাদ দিতেন না।

বহির্ব্বাটীর কক্ষে বসিয়া উচ্চ শঙ্খধ্বনি শুনিয়া অনাদি বুঝিলেন, উষার পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল! প্রসূতি কেমন আছেন, তাহা জানিবার ইচ্ছায় তাঁহার অন্তর ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। দেবকুমারের জন্মদিনের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার চোখে জল আসিল! কিন্তু তখনই তাহা মুছিয়া ফেলিলেন, পাছে নব জাতকের অকল্যাণ হয়।

একমুখ হাসি লইয়া দেবকুমার আসিয়া সংবাদ দিল,—"বাবা, খোকা হয়েছে, বড্ড সুন্দর! দেখবে এস না।"

চকিতে অন্তর লোভাকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টায় আত্মসম্বরণ করিয়া অনাদি কহিলেন,—"না, থাক্‌, তুমি আমার কাছে এস, দেবু!"

অনাদি আশা করিয়াছিলেন, ষষ্ঠীর মাথায় জল দিবার পর উষা তাঁহার নূতন পুত্রকে স্বামীকে দেখাইতে আসিবেন, কিন্তু তাহা ব্যর্থ হইল। দুই মাসের মধ্যে উষা এক নিমেষের জন্য স্বামীকে পুত্র দেখাইতে আসিলেন না।

সে দিন মধ্যাহ্নে অনাদি যখন বিছানাটার উপর শুইয়াছিলেন, দেবকুমার নিঃশব্দে আসিয়া কহিল, "বাবা, মা-মণি ঘুমোচ্ছেন, এস না খোকাকে দেখবে!"

অনাদি শিহরিয়া উঠিলেন। এই পঞ্চদশবর্ষীয় বালক, এ-ও পিতা-মাতার ব্যবধানটা উপলব্ধি করিয়া চোরের মত নিঃশব্দে জনককে অন্তঃপুরে ডাকিয়া লইয়া যাইতে আসিয়াছে!

অনাদি অস্বাভাবিক উজ্জ্বল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পুত্রের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন।

দেবকুমার আবার ডাকিল, "বাবা!"

অনাদি উত্তর দিতে যাইলেন, পারিলেন না! একটা প্রচণ্ড কাসির বেগ তাঁহার শুভ্র বিছানাটাকে রক্ত-রাঙ্গা করিয়া দিল। কাসিতে কাসিতে তিনি অর্দ্ধোত্থিত হইয়া শয্যার উপর আবার লুটাইয়া পড়িলেন। দেবকুমার কাঁদিয়া উঠিল।

অন্তঃপুর হইতে উষা শুনিয়া ছুটিয়া আসিলেন। নিজের নিষ্ঠুর অভিমানের এই কঠোর পরিণাম দেখিয়া তাঁহার অন্তর কাঁপিয়া উঠিল। প্রখর সূর্য্যকিরণে শুষ্ক ফুল যেমন বাতাসের মৃদু আঘাতে ঝরিয়া পড়ে, তেমনই শ্রীহীন মূর্ত্তিতে অনাদি বিছানার উপর পড়িয়াছিলেন।

স্বামীর পায় মাথা রাখিয়া আর্ত্ত-কণ্ঠে উষা কাঁদিয়া উঠিলেন, "রাক্ষসী আমি, এ কি করেছি গো!"

দেবকুমার ক্ষিপ্রহস্তে পিতার বিছানাটা পরিষ্কার করিয়া ফেলিল।

নিজেকে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ করিয়া অনাদি ডাকিলেন, "উষা!"—অতীত দিনের মতই সে স্বর স্নেহ-মমতায় পরিপূর্ণ! অপরাধের ভয়ে সঙ্কুচিত নহে।

উষা স্বামীর মুখের কাছে সরিয়া আসিলেন।

"একটা কথা বলব তোমায়"—অনাদি পত্নীর হাতখানি চাপিয়া ধরিলেন।

চোখের জল মুছিতে মুছিতে উষা কহিলেন, "বল না গো তোমার সব কথা আমায়।"

অনাদি কহিলেন, "তোমার জীবনে ধূমকেতু হয়ে আমি এসেছিলুম।"

উষা স্বামীর মুখের উপর হাত রাখিয়া মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে কহিলেন, "ও কথা নয় গো! ও কথা থাক্‌।"

"না গো, না! আমায় সব বলতে দাও। আজ কি জানি, কেন মনটা তোমায় সব কথা বলবার জন্য ছট্‌ফট্‌ কচ্ছে, তুমি ধৈর্য্য ধর একটু।"

শিক্ষকের আদেশে শিষ্টা ছাত্রীর মত উষা স্বামীর পানে চাহিয়া স্থির হইয়া বসিলেন।

অনাদি কহিলেন, "তোমার বাপের বিষয় তোমার ছেলেরা কেউ ভোগ করতে পেলে না, এ অভিসম্পাতের বোঝা পরপারের শান্তিকেও আমার নষ্ট করবে! না, উষা, তা ভাবতেও আমার ভয় করে!"

অনাদির শীর্ণ-দুর্ব্বল দেহখানা চকিতে একবার কাঁপিয়া উঠিল! আকুল কণ্ঠে তিনি কহিলেন, "আমার একটা মিনতি—"

স্থিরকণ্ঠে উষা কহিলেন, "বল!"

"রমাকান্ত আমার একটি ছেলেকে পোষ্য করবার জন্য অনেক ক'রে চেয়েছিল, তার লোভ দেবুর উপর।"

উষা শিহরিয়া উঠিলেন।

অনাদি বলিলেন, "কিন্তু দেবুকে আমি দিতে পারব না। ওর হাতের জল না পেলে আত্মা আমার তৃপ্ত হবে না। যাকে চোখে দেখিনি, তাকে তুমি দাও, উষা! এই মিনতি করি, অন্ততঃ সে তার মাতামহের সম্পত্তিটা ভোগ করুক।"

উষার সারা দেহটা স্বামীর এই উক্তিতে যেন হিম-শীতল হইয়া গেল। কোলের যাদু, নয়নমণি! এতখানি দৈন্যের মাঝেও দশ মাস গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিয়া, দুঃখ সহিয়া তিনি যাহাকে কোলে পাইয়াছেন, সেই বুকের নিধিকে ছাড়িয়া দিতে হইবে স্বামীর অনুরোধে?

নিঃসম্বল! নিঃসহায়া তিনি। লক্ষপতি পিতার অতি আদরিণী কন্যা তিনি।

কিন্তু স্বামীর এই প্রার্থনাকে না-মঞ্জুর করিবার শক্তিও উষার ছিল না। তিনি যে বলিতেছেন, উষার পিতার অভি-সম্পাতের বোঝা তাঁহার পরপারের শান্তি নষ্ট করিবে।

অনেকক্ষণ পরে উষা মুখ তুলিয়া স্বামীকে কহিলেন, "তাঁকে চিঠি দাও, খোকাকে আমি দেব।"

উষার সংজ্ঞাহারা দেহটা খাটের উপর হইতে ভূমিতে পড়িয়া গেল।

* * *

মহালক্ষ্মী লোহার আলমারী খুলিয়া অলঙ্কারপত্র বাহির করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া গুছাইতেছিলেন। রতিকান্ত কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "ও কি হচ্ছে, মা-মণি?"

পুত্রের মুখপানে চাহিয়া মহালক্ষ্মী হাসিলেন, কহিলেন, "তোর বৌকে কি দেব, তারি ব্যবস্থা হচ্ছে।"

"বাঃ, বেশ মজা ত! খুব ভাল লোক আসছে, ছেলের ভাগ, গয়নার ভাগ—সব নেবে না কি?"

"না তো কি রে? সে যে কি জিনিষ, কি তপস্যার ধন আমার!"

"নমস্কার মা-মণি তোমার তপস্যায়! আমি অমন তপস্যা কখনো করবো না।"

"ষাট্‌! ষাট্‌! বালাই, বালাই! বড় হলি, এখনো কি কথা শুধরালো না, খোকা? ও কথা বলতে আছে, ছেলে না হওয়ার দুঃখ যে কতখানি—" মহালক্ষ্মী থামিয়া গেলেন।

রতিকান্ত মায়ের পাশে বসিয়া গহনাগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে দেখিতে একটা বড় নেকলেসের কেস বাহির করিয়া কহিলেন, "এটা ত কই দেখিনি, মা-মণি!"

"কোন্‌টা রে—" বলিয়া মহালক্ষ্মী মুখ ফিরাইয়া চমকিয়া উঠিলেন।

রতিকান্ত ততক্ষণ স্প্রিং টিপিয়া কেসটি খুলিয়া বেশ সপ্রশংস দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলেন, "বাঃ, চমৎকার! এ যে আগাগোড়া কমলহীরে, মা-মণি! কই, তোমায় তো এক দিনও পরতে দেখি নি?"

"ওটা ত আমার নয়, খোকা। তোর বৌকে দেব, বাবা।"

"তোমার নয়?" রতিকান্ত সবিস্ময়ে কহিলেন, "এ কি, উষা নাম কার গো, মা-মণি? এই যে কেসে লেখা রয়েছে!"

মহালক্ষ্মী গম্ভীর হইয়া উঠিলেন। চাঁদের উপর যেন মেঘ আসিয়া পড়িল। তাঁহার আনন্দদীপ্ত উজ্জ্বল মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিল।

পুত্র কিন্তু তাহা চাহিয়া দেখিলেন না। কৌতুকভরা কণ্ঠে কহিলেন, "বল না মা-মণি, উষা কার নাম?"

পুত্রের মুখপানে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া মহালক্ষ্মী কহিলেন, "তুমি জান না, খোকা, কার নাম ওটা?"

"কার নাম, আমি কি ক'রে জানব?"

"লক্ষ্মীপুরের জমীদারের মেয়ের নাম ! মামলার কাগজে দেখ নি ?"

সুগন্ধ কুসুম তুলিতে হাত বাড়াইয়া অকস্মাৎ সর্পদষ্ট মানুষ যেমন চমকিয়া উঠে, রতিকান্ত তেমনই ভাবে চমকিয়া উঠিলেন। বহু মূল্যবান্ নেকলেসটা তাঁহার হাত হইতে গালিচার উপর পড়িয়া গেল।

আন্তরিক রহস্যালাপের মাঝে আচম্বিতে কলহ হইয়া গেলে উভয় পক্ষের মুখের উপর যেমন একটা অসোয়াস্তি ফুটিয়া উঠে, তেমনই ভাবে উভয়েই বিরসমুখে বসিয়া রহিলেন। ক্ষণেক নিঃশব্দ থাকিয়া রতিকান্ত মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, "এ নেকলেস তোমার কাছে এল কি ক'রে মা-মণি, বলবে আমায় ?"

গম্ভীর কণ্ঠে মহালক্ষ্মী কহিলেন, "যেমন ক'রে তুমি এসেছিলে, এ-ও তেমনি ক'রে এসেছে, খোকা।"

অজানা বস্তুকে জানিবার জন্য মানুষের কৌতূহল ও লোভের অন্ত থাকে না। জ্ঞান হওয়ার পর রতিকান্ত ক্রমে ক্রমে জানিয়াছিলেন, তিনি পিতা রমাকান্তের ঔরষজাত পুত্র নহেন, দত্তক-পুত্র।

কিন্তু ব্যথা সে দিন বাজে নাই। নদীর জলস্রোতের মত মহালক্ষ্মী ও রমাকান্তের অন্তরের স্নেহপ্রবাহধারা অনুক্ষণ রতিকান্তের উপর প্রবাহিত হইত। সুতরাং নিমেষের তরে ক্ষীণ চিন্তার রেখাও রতিকান্তের মনে দুঃখের বেদনা জানাইতে পারিত না। আদরের দুলাল হইয়া মহানন্দে তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতেন। সেই পরিপূর্ণ জোয়ারের প্রথম ভাটা পড়িল সুকুমারের দাবী উপস্থিত হওয়ার পর।

আজ এই নেকলেসটা তাঁহার মনের মাঝে একটা অননুভূতপূর্ব্ব অনুভূতি অকস্মাৎ তীব্রভাবে জাগ্রত করিয়া তুলিল। হঠাৎ তিনি মহালক্ষ্মীর হাত চাপিয়া ধরিয়া গভীর মিনতিভরা কণ্ঠে কহিলেন, "বল না, মা-মণি, যখন আমি তোমার কোলে এলুম, তখন কতটুকু ? আর তারা দিলেই বা কি ক'রে ?—না, না, তোমায় বলতে হবে, আমার মাথার দিব্যি।"

তিরস্কারভরা তীব্রকণ্ঠে মহালক্ষ্মী কহিলেন, "খোকা, আমায় দিব্যি দিচ্ছিস ?" তাঁহার দুই নেত্র জলিয়া উঠিল।

মায়ের পায়ের উপর হাত দিয়া রতিকান্ত কহিলেন, "না গো মা-মণি, আমি দিব্যি দেব না। লক্ষ্মী মা, তুমি আমায় সব বল ! মা কেমন ক'রে ছেলেকে ছেড়ে দেয় ! তুমি কি আমায় দিতে পার ?"

রতিকান্তের শেষের দিকের কথায় মহালক্ষ্মীর মাতৃস্নেহ উথলিয়া উঠিল। পুত্রের ললাটে চুমা দিয়া মহালক্ষ্মী কহিলেন, "যাদু আমার, তোকে ছাড়বার আগে যেন আমার মরণ হয় !"

উচ্ছ্বসিত স্নেহের আবেগে মহালক্ষ্মী কহিলেন,—"ওরে, তোর মা কি সহজে আমায় দিয়েছিল ? তোর বাপ যে দিন সর্ব্বস্ব খোয়ালেন, সে দিন তুই মায়ের গর্ভে। তোর বাপ বদখেয়ালিতে কিছু নষ্ট করেন নি ; অতখানি উদার প্রাণ মানুষের দেহে শুধু তাঁরই ছিল।" মহালক্ষ্মী থামিলেন।

শুনিবার উৎকট বাসনায়, অধীর আগ্রহে রতিকান্ত কহিলেন, "থাম্‌লে কেন, বল না মা-মণি।"

"সে দুঃখের কথা কি শুনবি, যাদু ! গ্রহ মন্দ হ'লে সব যায় ! ইনি অনেক ক'রে তোকে ভিক্ষা চেয়েছিলেন। সে দাতা ছিল, মরণশয্যায় তোকে দান করেছে। তোর গর্ভধারিণী এই নেকলেসটা আমার হাতে দিয়ে বলেছিল, এটা আমাদের বংশগত জিনিষ, খোকাকে আজ পর কচ্ছি, সে জানবে না, বড় হলে আমি তার কে ! তবু আমার এই শেষ সম্পত্তিটা আমি তাকে দিলুম !"

সাগ্রহকণ্ঠে রতিকান্ত কহিলেন,—"দেবকুমার কেন তার মাতামহের সম্পত্তির দাবী করলেন না ?"

"সিংহশাবক কি তা পারে ! আইনের জোরে ফিরে পেলেও তার বাপের বিক্রী করা সম্পত্তি সে নেবে না, এই ছিল তার প্রতিজ্ঞা। আজ সুকুমার বড় অসময়ে দাবী কচ্ছে।"

* * * *

পিতৃকক্ষে প্রবেশ করিয়া রতিকান্ত কহিলেন,—"বাবা, লক্ষ্মীপুরের জমীদারীটা নিয়ে মামলা করবার আমাদের কিছু নেই।"

রমাকান্ত কৌচের উপর উঠিয়া বসিলেন। প্রফুল্লকণ্ঠে কহিলেন,—"আমিও তা জানি, রতু। সরকার সাহেবের কাছে কাগজ পাঠান হয়েছিল, তিনি মত দিয়েছেন, মামলা টিক্‌তে পারে না, তামাদির জন্য। বাছাধন বুঝবেন, যখন খরচের দাবী করব।"

"আমি সে কথা বলছি না, বাবা। আমি বলছি, বিক্রয়টা যখন অসিদ্ধ, তখন তামাদির বিচারে প্রয়োজন নেই ; ওটা আমরা ফেরৎ দেব।"

"অসিদ্ধ কিসে, রতু? তুমি ল-ইয়ার এক জন নাকি? ষ্ট্যাম্প করেনি না রেজেষ্টারী হয় নি?"

রমাকান্তের কণ্ঠের স্বরে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ রহিয়াছে, তাহা রতিকান্তের কাণে ধরা পড়িল।

ললাট আরক্তিম হইয়া উঠিল, রতিকান্ত কহিলেন, "সব হয়েছে স্বীকার করি! কিন্তু গোড়ায় গলদ, শ্বশুরের সম্পত্তি জামাই বিক্রী করে কোন্ অধিকারে?"

"সে তর্ক শ্বশুর-জামাই সেখানে করবে, এখানে আমাদের সে অপ্রিয় প্রসঙ্গের প্রয়োজন কি, রতু?"

"না, কিছু নেই, বাবা। গোল মিট্‌বে বিষয়টা ফেরৎ দিলে।"

এত বড় অসম্ভব প্রস্তাব এই সত্তর বৎসর বয়সের পূর্ব্বে রমাকান্ত কখন শুনেন নাই। পুত্রের মুখের পানে তিনি ক্ষণেক স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন, ভয় হইল, আচম্বিতে স্নেহের দুলালের মস্তিষ্ক বিকৃত হইল না কি। কহিলেন,—"তুমি কি বল্‌ছ, রতু? বার্ষিক ষাট হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তিটা আমি ফেরত দেব?"

পিতার মুখের পানে চাহিয়াই পুত্র উত্তর করিলেন,—কিন্তু ন্যায়সঙ্গত ওটা আমাদের নয়।"

"রমাকান্ত পুত্রের শান্ত দৃঢ় কণ্ঠের স্বরে বুঝিলেন, ইহা বিকৃত মস্তিষ্কের ক্ষণিক খেয়াল-প্রসূত নহে; উচ্চ আবেগের একটা সংঘাতও নহে। ইহা অনেকখানি চিন্তার পর কঠোর সঙ্কল্পের প্রকাশ। জেদ বা জবরদস্তিতে রমাকান্ত কাহার অপেক্ষা কিছু কম ছিলেন না, বরং অনেক উপরেই তাঁহার স্থান হইতে পারে। তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সহিত এই দুটা বস্তু মিলিত থাকিয়া নিঃস্ব অবস্থা হইতে তাঁহাকে কোটিপতির আসনে বসাইয়াছে। পুত্রের এই প্রস্তাব অঙ্কুর-উদ্গমে নিঃশেষ করিয়া দিবার জন্য অন্তর তাঁহার কঠিন হইয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "কেন, আমি কি টাকা দিইনি? সে কি আমার মুখ দিয়ে রক্ত তোলা নয়?"

"কিন্তু বাবা—"

রমাকান্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। তীব্রকণ্ঠে কহিলেন, "এর মাঝে কিন্তু কিছু নেই। ও আমার হকের ধন।"

রতিকান্ত কহিলেন,—"না বাবা, শুধু আমার জন্যেই ওটা আপনাকে ছাড়তে হবে।"

চমকিত হইয়া রমাকান্ত কহিলেন,—"তোমার জন্যে কেন, তুমি কি করেছ?"

"আমি কিছু করিনি। ওটা না ফেরত দিলে আমি শান্তি পাব না! আমি শুনেছি, তাদের অবস্থা তেমন নয়।"

"হ'তে পারে। আমি না বলছি না। অর্থ দিয়ে আমি তাদের সাহায্য করতে পারি। দেব যত দিন বেঁচে ছিল, আমার দরজা মাড়ায় নি। আমি আশা করেছিলুম, লোকমুখে আশ্বাসও পাঠিয়েছিলুম।"

"অর্থের সাহায্য তারা নেবে না। তারা ভিক্ষুক হবে না।"

শ্লেষপূর্ণ কণ্ঠে রমাকান্ত কহিলেন, "তবে সে মহামানীর দল এটা নেবেন কি ক'রে?"

"আইনের দাবীতে।"

শুষ্ক বিচালীস্তূপে অগ্নি নিক্ষেপ করিলে তাহা যেমন অচিরাৎ জ্বলিয়া উঠে, রমাকান্তও তেমনই ভাবে জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি তীব্রকণ্ঠে কহিলেন, "তাই নিক তবে। এ আমি কিছুতেই দেব না, রতু—সর্ব্বস্ব পণ রইল।"

"বাবা! আমার কথাতেও কি এটা আপনি দিতে তাদের পাবেন না?"

"না, তা পারি না। এটা আমার প্রথম কেনা সম্পত্তি। একে হাত ছাড়া কিছুতেই করব না। একে ছাড়লে লক্ষ্মী আমায় ছাড়বে।"

"এ আপনার কুসংস্কার।"

মহারোষে চীৎকার করিয়া রমাকান্ত কহিলেন, "তোমার সু-সংস্কার নিয়ে তুমি থাক! লক্ষ্মীছাড়ার ব্যাটা তুমি! পেটে এসে মায়ের সব খেলে, এইবার আমায় খাবে।"

* * * *

সিংহাসনে বসিতে গিয়া রাজপুত্র যে দিন বল্কলধারী হইয়া বনে গিয়াছিলেন, সে দিন সমস্ত অযোধ্যাপুরীতে যেমন শোকের ঝড় বহিয়াছিল, তেমনই তীব্র শোকের ঝড়ে রমাকান্তের প্রকাণ্ড প্রাসাদখানি ভরিয়া উঠিল। মহালক্ষ্মী শয্যা গ্রহণ করিলেন।

মাসের পর মাস চলিয়া গেল, রতিকান্তের সংবাদ কেহ জানিল না। রমাকান্তের কঠোর সঙ্কল্প, রতিকান্তের নাম মুখে আনিবেন না।

হাইকোর্টে নালিশ উঠিয়াছে, শ্রেষ্ঠ ব্যবহারজীবিরা

সকলেই রমাকান্তের ব্রিফ লইয়াছেন, সুকুমারের পক্ষে এক জন সামান্য ব্যবহারাজীব ছিলেন।

দুই বৎসর মামলার পর রায় বাহির হইল, সুকুমার রায় হারিয়াছেন।

আনন্দ জিনিষটা মানুষ একা ভোগ করিতে পারে না, প্রিয় জনকে তাহার অংশ বাটিয়া না দিলে অন্তর তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। কিন্তু এত বড় একটা বিজয়বার্ত্তা রমাকান্তের সদাগম্ভীর মুখখানিকে নিমেষের জন্য প্রফুল্ল করিতে পারিল না। যন্ত্রচালিতের মত তিনি শুধু মাথাটা একবার নাড়িলেন।

কিছু দিন পরে এটর্ণী সংবাদ দিলেন, দরখাস্ত উঠিয়াছে, কেস প্রিভিকাউন্সিলে যাইবে। রমাকান্ত চমকিয়া উঠিলেন, এত টাকার যোগানদাতা কে?

তত্ত্ব কিছুই খুঁজিয়া পাইলেন না, অন্ধকারেই রহিয়া গেলেন।

সে দিন মূলচাঁদ জহুরী একটি কমল-হীরার দুল আনিয়া রমাকান্তকে দেখাইলেন, তিনি এটা লইতে পারেন কি না।

রমাকান্ত চমকিয়া উঠিলেন, এ দুল জহুরী পাইল কোথা? এ যে তাঁহার সম্পত্তি!

প্রশ্নের উত্তরে বিক্রেতার নাম শুনিয়া রমাকান্ত স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। মহালক্ষ্মীর ভাই ইহা বিক্রয় করিতেছেন।

বজ্রবিদ্যুৎপূর্ণ মেঘের মত অন্ধকার মুখে রমাকান্ত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া পত্নীর সন্নিধানে আসিয়া দেখিলেন, মহালক্ষ্মী লোহার আলমারী খুলিয়া কি বাহির করিতেছেন।

তীব্র ব্যঙ্গভরা কণ্ঠে রমাকান্ত কহিলেন, "এমন অসময়ে সিন্দুক খুলেছ? বেই-বাড়ী নেমন্তন্ন নাকি?"

মহালক্ষ্মী জ্বলিয়া উঠিলেন। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিলেন, "আমার সে বরাত কি তুমি রেখেছ? কত সাধ ছিল বৌয়ের মুখ দেখব।"

"তা ত বুঝলুম, কিন্তু এ হীরের দুলটা কার, চিনতে পার?"

"পারি, আমার।"

"কার হাঁড়ি চড়াবার জন্য এটা বিক্রী হ'লো?"

জ্বালাভরা কণ্ঠে মহালক্ষ্মী কহিলেন, "কারু হাঁড়ি চড়াবার জন্যে এটা বিক্রী হয় নি গো। যার হাতের জলের গণ্ডূষ না হলে আমার তৃপ্তি নেই, উদ্ধার নেই, সেই তাকে ফিরে পাবার জন্যেই একে ছেড়েছি।"

মহালক্ষ্মী কাঁদিয়া ফেলিলেন। তার পর কহিলেন, "তুমি সিংহশাবককে ভয় দেখাতে গিছলে! আমি তার প্রায়শ্চিত্ত কচ্ছি। সুকুমারের মোকর্দ্দমার বিলেতের খরচ আমি দেব প্রতিজ্ঞা কচ্ছি।"

রমাকান্ত পাথরের মূর্ত্তির মত নিশ্চল হইয়া রহিলেন। মহালক্ষ্মীর উক্তিগুলি তাঁহার চোখের সম্মুখে একটা নূতন মূর্ত্তিকে চিনাইয়া দিল। একান্ত বিষয়কীট পিতার বক্ষ-পালিত সন্তান হইলেও কত বড় ত্যাগী মহাপ্রাণের নিকট হইতে তাঁহার উৎপত্তি। ঐশ্বর্য্যের সহস্র প্রলোভন তাঁহাকে বন্দী করিতে চিরদিনই অসমর্থ রহিবে।

রমাকান্ত বহির্ব্বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার আত্মাভিমানী অন্তর পুত্রের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেছিল; কিন্তু মহালক্ষ্মীর কান্নাটা আজ মনের মাঝে মহা সংগ্রাম বাধাইয়া দিল।

অবশেষে রমাকান্ত এটর্ণীকে লিখিয়া পাঠাইলেন, মোকর্দ্দমার প্রয়োজন নাই। লক্ষ্মীপুরের জমীদারীটা তিনি সুকুমার রায়কে ফেরত দিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

সে দিন প্রভাতে রমাকান্ত ইনসিওর করা চেক ও একখানি টেলিগ্রাম পাইলেন। বোম্বে সিনেমা কোম্পানীর সেয়ার হোল্ডার রতিকান্ত রায়, পিতাকে লভ্যাংশে বিশ হাজার টাকা পাঠাইয়াছেন।

ঠিক এই টাকাটা দিয়াই রমাকান্ত লক্ষ্মীপুরের জমীদারীটা কিনিয়াছিলেন।

আনন্দচঞ্চলপদে রমাকান্ত অন্দর অভিমুখে ছুটিয়া আসিলেন। প্রাণ-খোলা ভাবে হাসিয়া কহিলেন, "গিন্নি, সেই মেয়েটির খোঁজ নাও আগে, বিয়ে হয়েছে কি না?"

শ্রীমতী পুষ্পলতা দেবী।

ক্যাপ্টেন্ বুথ্

১

দু'তিন পুরুষ পূর্ব্বে, ভদ্র বংশের বাঙালীর ছেলেদের কান্ত কোমল নধর গঠনই ছিল প্রার্থনীয় ও প্রশংসনীয়। বুকে খাঁজ পড়লে, পেশী পুষ্ট হলে বা বাহুতে 'গুল্' দেখা দিলে, তাদের চোয়াড়ের দলে চালান দেওয়া হ'ত,—ভদ্র বংশের লজ্জার জিনিষ দাঁড়াতো। সাহসের কায করলে,—'ডানপিটে' খেতাব পেত; গাইতে পারলে গোল্লায় যেত; নাচলে—জাহান্নম্। ধীরে চলবে, সাত চড়ে কথা কইবে না,—এই ছিল আদর্শ। অবশ্য ধনীর ছেলেদের ননীর পুতুল হওয়াটাই ছিল গর্ব্বের কথা।

তবে কর্ত্তাদের একটা গুণ ছিল,—ইংরাজের সবই তাঁরা ভাল দেখতেন। তাই, ইস্কুলে যখন জিম্‌নাষ্টিক্ সুরু হ'ল—তাঁরা আপত্তি করেন নি। সেই সুযোগে অনেক ছেলেই 'গুল্' বাগিয়ে নিলে,—বড়দের ছেলেরা চুল বাগিয়েই খুসি। ক্রমে ক্রিকেটের দেখা। আমাদের সন্ধি-সমাসের দেশ, আমরা 'ব্যাটবল্' খেল্‌তে লাগলুম। দেশে 'ফুটবল্' তখনো ফুটার্পণ করেনি। ছেলেরা ট্রাপিজে ঝোলে, হরাইজেণ্টেলে ঘোরে আর ব্যাটবল্ খেলে।

এক পুরুষ উৎরে গেল, 'ফুটবল'ও এলো। পেশী-পুষ্ট তরুণদের শক্তি সামলাবার উপায় হল;—গুট্, শট্, কিক্ কাণে আসতে লাগলো। শরীর-চর্চ্চায় মনেও স্ফূর্ত্তি আসে। ঢিলে ভাবে চলাটাই ছিল অভ্যস্ত,—যেন—কার হাত কার পা! পূর্ব্বপ্রথায় সেইটাই ছিল ভদ্রতাব্যঞ্জক। সেটা কখন্ চ'লে গেল, বুঝতেই পারলুম না। বোধ হয়—দেহ শক্তি সঞ্চয় করলে সে আপনিই সোজা হয়, মাথা তোলে। আবার দেহের বল, মনেও সংক্রামিত হয়,—মন তখন নানা দাবী উপস্থিত করে। এটা করতে হবে, ওটা করা চাই,—আমরা অক্ষম কিসে? আমরা কি মানুষ নই,—ওরা পারে, আমরা পারবো না কেন? আমরা ভীরু, আমরা কাপুরুষ কিসে? ইত্যাদি।

ভিতর থেকে এই সব তাগিদ আসে, কিন্তু উপর থেকে উপায় আসে কৈ! ছট্‌ফটানি সাড়া দেয়,—মেলে বড়জোর 'শীল্ড'—অন্য কোনো ফিল্ড্ নেই। শিকারে যেতে চাও—ছিপ্ আছে,—বাকি—ইটিয়ে সাধ মিটিয়ে নাও,—সাপ, ব্যাং শ্যাল কুকুর মারো! শক্তির চরম ও পরম সার্থকতা ঐ পর্য্যন্ত। কাযেই ছেলেদের মনের অবস্থা ও অভিমানের পীড়া অনুমেয়।

এইরূপ সময়ে, আমাদের দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্যের মধ্যদূত হয়ে য়ুরোপে ভীষণ সমরানল জ্ব'লে উঠলো। তার তাড়ণ ভারত পর্য্যন্ত পৌছে গেল। ভারত চিরদিনই রাজভক্ত, সে তার অর্থ-সামর্থ্য সেই নরমেধযজ্ঞে অকাতরে নিবেদন ক'রে দিলে। অতিবড় ভক্তদের তাতেও মন উঠলো না। যেহেতু, এ যজ্ঞের প্রধান অর্ঘ্য নর-শোণিত। তাঁরা রণক্ষেত্রে বাঙ্গালী পণ্টন পাঠাবার প্রস্তাব তুললেন।—"এ কি কথা শুনি আজ!—এরা এ কি আবদার করে!"

অনেক মুখচাওয়াচায়ই, অনেক মাথাচুল্‌কুনির পর,—নাপার্য্যমানের রাজিনামা বেরুলো। ছেলেরা মুকিয়েই ছিল,—রামে বা রাবণে মারে। আমাদের আর যত অভাবই থাকুক—মরণের পথের অভাব নেই,—দুর্ভিক্ষ, মহামারি, জলপ্লাবন, সর্পাঘাত, ব্যাঘ্রভোগ, অনাহার, এ সব ত রয়েছেই,—স্বর্গপ্রাপ্তির সুবিধাটা ছাড়ি কেন!

ডাক্তারি কাট্‌ছাঁটের পর,—অনেক কোরে বাঙালী-পণ্টন্ গ'ড়ে উঠলো। কি আনন্দ! সংবাদপত্রের মারফত কুচ-কাওয়াজের আওয়াজ আসতে লাগলো। তাতে যে বাঙলার বক্ষ একটু গর্ব্ব অনুভব করছিল না, তা নয়। চিরদিনই নতশিরে অপবাদ বহন ক'রে আসছিলুম—আমরা না কি war-like বা লড়ায়ে জাত নই। কেন যে,—সেটার প্রমাণের পাত্তা পাই না। কবে যে সে পরীক্ষা হয়ে গিয়েছিল, তাও কারও জানা নেই। ইতিহাস উল্টো কথাই কয়। তবে নাই বললে শুনেছি সাপের বিষ থাকে না।

যাক্—ছেলেরা হাসিমুখে হাফ-প্যাণ্ট প'রে রাইফেল্ নিয়ে বেরিয়ে পোড়লো। লক্ষ-প্রাণের আশীর্ব্বাদ নিঃশব্দে তাদের সঙ্গ নিলে। অভ্যাসবশে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি উত্থিত হ'ল।

২

এই অপ্রার্থনীয় যোগ আমাদের তখন প্রার্থনীয় সুযোগে দাঁড়িয়েছিল। চন্দরনগরের যুবকেরাও চুপ ক'রে রইলেন না। তাঁরা ফরাসী প্রজা, আমরা না হয় ইংরাজের। জাতি, বর্ণে

আমরা একই,—অবস্থা-বৈষম্য যৎকিঞ্চিৎ। উভয়েই সমকলঙ্কী। প্রায়শ্চিত্তের অধিকারী।

ভূতনাথ ছিল—বলে ও সাহসে দলের সেরা। দীর্ঘে ছ' ফিট ছাড়িয়ে গিয়েছিল,—আবার all round sportsman সর্ব্বাংশেই সেপাই স্যাম্পেলের। কিন্তু প্রকৃতি ছিল অমায়িক, নম্র, সহৃদয়। দেহও ছিল সুগঠিত, সুন্দর,—সঙ্গীরা তাকে প্রধান ব'লে মেনে নিত সহজেই। এক কথায় ভূতনাথ ছিল ছেলেদের হীরো।

ল (law)এ ফেল হওয়ায়, দাদার তিরস্কারে বড় আঘাত পেয়ে, কলকেতায় চ'লে এসে অজ্ঞাতবাস করছিল। পাড়ার ছেলেমেয়েদের যুযুৎসুর training দিয়ে, টাকা যাটেক পেতো, তাইতে খরচ চালাতো। সঙ্কল্প—lawটা পাশ ক'রে দেশে ফিরবে।

অল্পদিনেই পাড়ায় সে পরিচিত ও সকলের প্রিয় হয়ে পড়ে। বৈকালে তরুণ-তরুণীরা কেহ শিখতে, কেহ শিক্ষা-পদ্ধতি দেখতে আসতো, অভিভাবকেরাও আসতেন। তাতে তার ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বেড়েই চলে। এক দিন সকালে আখড়াস্থলে সে একটি কাণের বটন প'ড়ে আছে দেখে কুড়িয়ে রাখে। নিশ্চয়ই কারুর প'ড়ে গিয়ে থাকবে।

সেই দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে যুযুৎসু শেষ হ'লে, তরুণীদের লক্ষ্য ক'রে ভূতনাথ জিজ্ঞাসা করলে, "আপনাদের কারও কিছু হারিয়েছে কি ?" শুনে সকলে মুখ-চাওয়া-চাউই করলে। শ্যামলী ব'লে একটি মেয়ে, তার পাশের একটি তরুণীর দিকে ইঙ্গিত ক'রে বললে, "এই রাধারাণীর কাণের একটা বটন্…"

রাধারাণী বাধা দিয়ে মৃদুকণ্ঠে বললে—"সে কোথায় প'ড়ে গেছে তার ঠিক নেই, এখানে…"

ভূতনাথ বটন্‌টি এগিয়ে ধ'রে বললে, "এইটি কি ?"

"এই ত" ব'লে শ্যামলী হাত বাড়িয়ে নিয়ে—"এই দেখুন না, এর জোড়া ওর কাণেই রয়েছে"…

"মাপ করুন, আমি ত অবিশ্বাস করছি না" ব'লে ভূতনাথ সার্টটা গায়ে দিতে দিতে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।

বটনটি ছিল হীরে বসানো, দামী। ভূতনাথের ওপর সকলেরই শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। সকলেই তার সুখ্যাতি, তার প্রশংসা করতে করতে ফিরলেন।

পরদিন রাধারাণীর বাপ মা উভয়েই এসে ভূতনাথের কাছে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে গেলেন। রাধারাণী আসেনি, ভূতনাথ সেটা লক্ষ্যও করেনি। কারণও ছিল না।

এই ঘটনার পর কয়েক দিন কেটে গিয়েছে, রাধারাণী আর আসেনি। ভদ্রতা রক্ষার্থে, তার সম্বন্ধে সংবাদ নেবার ইচ্ছা হলেও, ভূতনাথ তা পারেনি। যেহেতু, রাধারাণী তার ছাত্রী নয়, তা ছাড়া একটি ভদ্র মহিলা সম্বন্ধে এরূপ অনুসন্ধিৎসু হবার তার অধিকারই বা কি ?

* * * *

মহাযুদ্ধের তখন মহা সমারোহ। সারা বিশ্বের বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টি সমরপ্রাঙ্গণে কেন্দ্রীভূত। সকলেই সংবাদের প্রতীক্ষাপন্ন। কোথাও অন্য কথা নাই। সংবাদপত্র নিত্যই নূতন নূতন বীভৎস ব্যাপার শোনাচ্ছিল। মানুষ মারার এত রকম ব্যবস্থা ও সরঞ্জাম আমাদের মহাভারতেও নাই,—তাতে জাঠা জাঠি শূল শেল ফেল হলে ব্রহ্মাস্ত্রই শেষ কথা। এতে জলে স্থলে অন্তরীক্ষে কলে কায চলছে,—মুহূর্ত্তে বংশকে বংশ ধ্বংস! মানব-নিধনে মানবের কি উৎসাহ, কি উদ্যম, কি ঘটা! আবার তার কি চমকপ্রদ বর্ণনা ও জাতীয় শিক্ষাদীক্ষার গর্ব্বঘোষণা! সেরা সেরা নরহন্তাদের জন্য সেরা সেরা খেতাব ও মেডেল অপেক্ষা করছে।

ভূতনাথ সংবাদপত্রের জন্য প্রত্যহ উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে। এই মরণোৎসব দেখবার জন্য তার প্রাণ ব্যগ্র হয়ে উঠে। ভাবে,—আমাদের জীবনের মূল্যই বা কি, সার্থকতাই বা কতটুকু। চাকরি, আহার, নিদ্রা, ম্যালেরিয়া আর মরণ! কার মধ্যে কি শক্তি আছে, তা বোঝবার ও বোঝাবার পথও নেই, সুযোগও নেই। একই নির্দিষ্ট পথ ধ'রে অধিকাংশেরই যাওয়া আসা। কি অভিশপ্ত জীবন!

পরদিন 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় দেখতে পেলে, ফরাসী সরকার ব'লে পাঠিয়েছেন, এই জাতীয় সঙ্কটকালে আমাদের প্রজাদের মধ্যে যদি স্বাস্থ্যবান উৎসাহী যুবকরা সৈন্যরূপে আমাদের সাহায্যার্থে ফ্রান্সের সমরক্ষেত্রে স্বইচ্ছায় আসতে চান ত নির্দ্দিষ্ট নিয়মমত সৈনিকদের সর্ব্ববিধ প্রাপ্যে ও সুবিধায় তাঁদের দাবী থাকবে। যুদ্ধান্তে সরকার তাঁদের স্ব স্ব স্থানে পৌছে দেবেন, এবং তাঁদের ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি রাখবেন ইত্যাদি। স্ব স্ব স্থানে পৌছে দেবার ভারটা, তাঁদের পূর্ব্বে প্রতিপক্ষও নিতে পারেন। চিন্তার কারণ নেই!

এই বাঞ্ছিত অথচ অপ্রত্যাশিত সংবাদে ভূতনাথের

মনোরাজ্যে সহসা যেন অভিনব জগৎ উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। এ কি সত্য! অবজ্ঞাত চিরলাঞ্ছিতের এ সুযোগ সাগ্রহে গ্রহণ করাই উচিত। কেহ যেন ইতস্ততঃ না করে। মানসিক উত্তেজনায় সে বাসা ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো—অনির্দ্দেশ। চটি পায়, সার্ট গায়।

"মাষ্টার মশাই" এ ভাবে কোথায় চলেছেন?"

ভূতনাথ চমকে চেয়ে দেখলে, শ্যামলী, সঙ্গে সম্ভবতঃ ছোট ভাই। হাতে উল, আর কি কি।

ভূতনাথ নিজেই জানে না কোথায় চলেছে। বাধা-প্রাপ্তের মত সহসা দাঁড়িয়ে পড়লো, মুখে হাসি ফুটে উঠলো।

শ্যামলীর কাছে, পথের মাঝে, এরূপ প্রশ্ন সে আশাই করেনি। বিশেষ পরিচয়ও নেই, মাত্র সে দিনকার সেই বটন প্রত্যর্পণের ঘটনা। তাই তার একটু বিস্ময়ও এসেছিল। কিন্তু কথা একটা কইতেই হবে, বললে, "এমনি বেরিয়ে পড়েছি, বিশেষ কোনো কায নেই, এখনি ফিরবো।"

শ্যামলী জিজ্ঞাসা করলে, "আজ কি আখড়া বন্ধ?"

কথাটা যেন উদ্দেশ্যহীন, কথা বাড়াবার জন্যেই বলা। এর পশ্চাতে যেন আরও কথা আছে।

ভূতনাথের মনের মধ্যে আজ একটা উল্লাসের গোপন তরঙ্গ চলছিল। সে ব'লে ফেললে—"আখড়া ত আপনিই বন্ধ হয়ে যাবে দেখছি। যাঁর কিছু হারাবে, তিনিই ত আসা বন্ধ করবেন। অপরাধ না ক'রেও সাজাটা ত আমাকেই নিতে হবে।"

শ্যামলী সাবধানে হাসি চাপতে চাপতে বললে. "সবাই ত রাধারাণী নয়…"

কাযটা ভালো হয়নি। নিজের ভুল সামলাতে গিয়ে বললে, "না, ও কথা নয়, আখড়া সত্যিই বন্ধ করতে বাধ্য হলুম। বাড়ী যাচ্ছি, কত দিনে ফিরব, বলতে পারি না, চাই কি…"

"চাই কি, না ফিরতেও পারেন? এই বলছেন?"

"আমি বলছি, সেইটাই বলতে পারি না। যাক, যাঁরা দয়া ক'রে আসতেন, যদি তাঁদের কারো সঙ্গে দেখা হয়, অনুগ্রহ ক'রে ব'লে দেবেন, সে কষ্টটা আর না করেন। তাঁরা আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছেন, আমি কোনো দিন তা ভুলতে পারব না। জানবেন, আপনিও তাঁদের এক জন। আচ্ছা, এ ভাবে পথে দাঁড়িয়ে আর নয়। ক্ষমা করবেন" ব'লে নমস্কার ক'রেই—"আপনারা সুখী হোন" বলতে বলতে ভূতনাথ এগুলো।"

শ্যামলীর হাসিমুখ নিমেষে মলিন হয়ে এসেছিল। সে আর কথাও কইতে পারলে না, স্থিরভাবে দাঁড়িয়েই রইল। চটকা ভাঙার মত চেয়ে ভূতনাথকে আর দেখতে পেলে না। চোখ মুছে, ধীরে ধীরে চললো। "ছিঃ, রাধনের বড় অন্যাই, বড় অভদ্রতা হয়েছে। আসা বন্ধ করা কেন? এ'দিকে রোজ খবর নেওয়াটি ত ছিল—আজ নতুন কি দেখানো হল?"…

*   *   *   *

ভূতনাথ ঘণ্টাখানেক পথে পথে ঘুরে, বেলা পাঁচটায় বাসায় ফিরে এল। হাত-মুখ ধুয়ে, কিছু জল খেয়ে, যথানিয়মে আখড়ায় উপস্থিত হয়ে তরুণদের বললে, "তোমরা যা শিখেছ, তাতে অনায়াসে আত্মরক্ষা করতে পারবে ব'লে আমার বিশ্বাস। কিন্তু নিজেদের মধ্যে চর্চ্চা রাখা চাই, অন্ততঃ সপ্তাহে একবার। চর্চ্চায় শরীর হালকা হয়, ক্ষিপ্রতা আসে। কার্য্যক্ষেত্রে ক্ষিপ্রতাই উদ্দেশ্যসিদ্ধির মূলমন্ত্র।

—"নরেন, তুমি অনেকগুলি কৌশল আয়ত্ত করেছ, আমি না থাকলে, তুমি সকলকে নিয়ে চর্চ্চা কোরো। আমার বড়ই ইচ্ছা ছিল, আমাদের মেয়েদের আত্মরক্ষার কয়েকটি উপায় দেখিয়ে দেব, দু'একটি শিখিয়েছিও। সময় নেই,—আজ তার একান্ত প্রয়োজনীয় দুইটি দেখিয়ে দি। নরেন, লীলা, তোমরা সকলেই বিশেষ লক্ষ্য রেখো। এগিয়ে এস, লীলা।"

ভূতনাথের এ সব কথার উদ্দেশ্য বুঝতে না পারলেও, উপস্থিত সকলেই স্তব্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ছিল।

ভূতনাথ লীলাকে সহজ আত্মরক্ষার দুইটি উপায় দেখিয়ে দিয়ে,—নরেনের সঙ্গে তার পরীক্ষা করিয়ে সকলকে বিস্মিত ক'রে দিলে।

সে দিন বিশেষ বিশেষ কয়েকটি কৌশল দেখিয়ে দেবার পর ভূতনাথ বললে, "আমি সত্বরই ফ্রান্সে যাবার ইচ্ছা করেছি, কাল থেকে আমাকে আর পাবে না। যা শিখেছ, নিজেরাই তার চর্চ্চা রেখো,—ছেড়ো না। তোমরা সুখী হও, উন্নতি কর, আনন্দে থাক, এই আমার প্রার্থনা। যদি ফিরি,—ইত্যাদি।"

কেন যাবেন, কি করতে যাবেন, ইত্যাদি কাতর

প্রশ্নের পর, উৎসাহভঙ্গ কিশোরপ্রাণগুলি বেদনা-বিধুর বিমর্ষ মুখে 'সারের' পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে—অশ্রুনেত্রে ফিরলো।

ভূতনাথ একাধারে তাদের বন্ধু ও আত্মীয় হয়ে পড়েছিল। সেও কম বেদনা পেলে না!

ভূতনাথ ভোরের ট্রেণে চন্দননগর পৌঁছে—সরাসরি গিয়ে কর্ত্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে—নিজের ইচ্ছা জানালে। তাঁদের কাছে সে পূর্ব্ব হতেই পরিচিত,—সকল প্রকার ব্যায়ামে, বক্সিংয়ে ও খেলায় এবং দুঃসাহসের কাযে, অনেকবার তাঁদের হাত থেকেই প্রাইজ আর মেডেল পেয়েছে। এমন কি, ফ্রান্স থেকেও প্রশংসাপত্র এসেছে।

তাঁরা আনন্দে ও আগ্রহে তাকে চেয়ার দিয়ে প্রশ্ন করলেন,—"এত দিন তুমি কোথায় ছিলে? তোমার সঙ্গীদের জিজ্ঞাসা ক'রেও সন্ধান পাই নি। এই সঙ্কটসময়ে তোমার অভাব আমরা বিশেষ অনুভব করছিলুম। চন্দননগর যদি এ সময়ে সাহায্যে পশ্চাৎপদ হয়, এক-কম্পানীও না পাঠাতে পারে, সেটা চিরদিনের কলঙ্ক হয়ে থাকবে,—ইতিহাসেও। তোমাকে এ প্রস্তাব করবার পূর্ব্বেই,—তুমি স্বেচ্ছায় অযাচিতভাবে—ফ্রান্সে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ ক'রে বীরের যোগ্য কাযই করেছ। এখন তোমার নির্ব্বাচনমত পল্টন গঠন করবার ভার তোমাকেই দিলুম।—এই ক্যাপ্টেন কিচার পণ্ডিচেরি থেকে এসেছেন, ড্রিল, প্যারেড তোমার ভালই জানা আছে, কেবল সমরসংক্রান্ত বিশেষ বিশেষ বিষয়ে ইনিই শিক্ষা ও পরামর্শ দেবেন।" ক্যাপ্টেন দাঁড়িয়ে উঠতেই ভূতনাথ দাঁড়িয়ে—উভয়ে হাসিমুখে করমর্দ্দন করলেন। ভূতনাথ ফরাসী ভাষা জানে, দুজনে বন্ধুভাবে কথা হতে লাগলো। শেষ কথা হ'ল,—এ কাযে সত্বরতার মূল্যই সমধিক।

ঐখানেই চা খেয়ে,—সন্ধ্যার সময় দেখা হবে ব'লে ভূতনাথ বেরিয়ে পড়লো।

৩

বন্ধুদের প্রভাতী-বৈঠক কোথায় বসে ভূতনাথের তা জানাই ছিল। পৌঁছুতে না পৌঁছুতে খবর পৌঁছে গিয়েছিল। বন্ধুরা উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছিলেন। রাস্তা থেকে বাগানের ফটকে মাথা গলাতেই—বজ্রনির্ঘোষে—হিপ হিপ হুর্‌রের সঙ্গে সব বেরিয়ে পড়লো। সে কি উত্তেজনা,—উল্লাস, উচ্ছ্বাস! কেউ বললে—'না চাহিতে জল', কেউ ডিগবাজি মেরে ভল্ট খেলে! কেউ বললে—'এই কি উচিত তব'!—আজ কয়মাস বিধবার মত বেড়াচ্ছি! পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসের রেকর্ড একদম চুরমার ক'রে ফিরলে! ইত্যাদি থামতে আর থিতুতে দশ মিনিট লাগলো।

হীরেন বললে,—"কোন্ ভোঁতা ভিলেজে ছিলে, কোনো খবরই ত জান না!, এ দিকে ফ্রান্সে অগ্নিকাণ্ড,—জার্ম্মাণীর জোর আওয়াজ, য়ুরোপ তোলপাড়! আমরা 'মা ভৈঃ' ব'লে বেরিয়ে না পড়লে না কি রক্ষা নাই!"

অপরেশ বললে,—"তাঁদের একাডেমি থেকে আমাদের নাকি বিশ্ব-বিশ্রুত বীরের জাত ব'লে প্রাচীন পুঁথি বেরিয়ে পড়েছে। আমাদের পশ্চাতে যে সব ট্রাডিসন্ রয়েছে, তা নাকি ভীষণ চমকপ্রদ। সুতরাং কৃপা করতেই হবে।"

নির্ম্মল বললে, "এত দিনে তাঁদের পাত্তা লেগেছে—জোয়ান-অফ-আর্ক বাঙ্গালীর মেয়ে ছিলেন! আমাদের পূর্ব্ব ইতিহাস সবই ত অন্যের দখলে, অবিশ্বাস করবার কোন কারণই দেখি না। এই সব ট্রাডিসন্ যখন আপ্‌সে এসে পৌঁচুচ্ছে, তখন কি করা উচিত বল। তোমার অভাবে কর্ত্তাদের জবাব দিতে পারছিলুম না।"

নীরদ অন্যমনস্ক হয়ে কি ভাবছিল, বললে—"আলবৎ জোয়ান-অফ-আর্ক বাঙ্গালীর মেয়ে, তার বিশ্বাস, তার চিন্তার ধারাটাই দেখ না! একদম আমাদের পুরাণের পাক।"

ভূতনাথ হাসিমুখে সব শুনছিল। উত্তেজনা একটু কমলে বললে, "চল, ঘরে ব'সে বলি গে।"

আবার বৈঠক বসলো। ভূতনাথ সকল কথা শুনলে, সকল কথা, মায় কর্ত্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও কথা, শোনালে।

শুনে সকলে আনন্দে গর্ব্বে এ ওর মুখ চাইলে। ননী বয়সে ছোট, সে ভূতনাথের পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে সবিনয়ে বললে, 'ছোট ব'লে আমাকে যেন ছেঁটে দেবেন না, ফ্রান্স দেখবার আমার অনেক দিনের ইচ্ছে।'

"না, না, ও রকম টুকটুকে ছেলে পেলে সেখানে আবার নারী-যুদ্ধও লেগে যাবে! জার্ম্মাণেরা ওকে পেলে 'ব্রেকফাষ্ট' ক'রে ফেলবে!"

হীরেনের কথা শুনে সকলে হাসলে।

ভূতনাথ বললে, "বেশ ত, কিন্তু বাপ-মার রাজিনামা চাই।"

"আমি আজই কলকেতায় চললুম। কালই এনে দেব।"

পরে মহা উদ্যমে নামের তালিকা তয়ের হয়ে গেল। সকলকে সংবাদ দিতে অপরেশ ছুটলো। বৈকালে গঙ্গার ধারের * * বাগানে সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

ভূতনাথ বাড়ী গেল, আজ কয় মাস পরে। দাদা কাযে বেরিয়ে গিয়েছেন। বউদি সংবাদ পেয়ে ঘর-বার করছিলেন। ভূতনাথ গিয়ে প্রণাম করতেই তাঁর চোখ দিয়ে ঝর-ঝর ক'রে জল পড়লো, "সামান্য কথায় তোমার দাদার ওপর অভিমান ক'রে, মায়ের বেদনাটা আমাকে ভোগ করালে, ভাই!"

ভূতনাথ কথা কইতে পারলে না। বউদির স্নেহ-যত্ন সে কোনো দিনই ভুলতে পারেনি, আজ তাই কাতর-কণ্ঠে তাঁর কাছে কেবল ক্ষমা চাইলে! বললে, "ভুল করেছি, বউদি; তুমি আমার অপরাধ চিরদিনই সয়েছ, ক্ষমা করেছ।"

বউদি বললেন, "অভিমান জিনিষটে আমাদের মত দুর্ব্বলের অস্ত্র, তুমি পুরুষমানুষ, তুমি পরোক্ষে সেই অস্ত্র স্ত্রীলোকের ওপর প্রয়োগ করলে কি ব'লে? শুনছি, যুদ্ধে যাবে ফ্রান্সে, তোমাকে বিদায় দিতে আমার বুক ফেটে যাবে, কিন্তু মুখ ফুটে বাধা দিতে পারবো কি! ওতে যে পুরুষের অধিকার আছে, ও যে তোমার যোগ্য সঙ্কল্প।"—

ভূতনাথ বাধা দিয়ে বউদির পায়ের ধূলো নিয়ে বললে, "এইটিই তোমার আশীর্ব্বাদ ব'লে আমি মাথায় ক'রে নিলুম। আমি মনে মনে বড় বেদনা আর অশান্তি ভোগ করছিলুম, তুমি আমাকে বাঁচালে, বউদি। তোমার মত মা বোন, তোমার মত বউদি বাংলার ঘরে ঘরে যেন দেখতে পাই।"

"এস, নাবে খাবে এসো, বেলা হয়েছে।"

৪

সুগঠিত বলিষ্ঠ যুবকেরা ভূতনাথের ইঙ্গিতমত নিত্য কুচকাওয়াজ আরম্ভ ক'রে দিয়েছে। নিত্যই দু'এক জন বাড়ছে। ক্যাপ্টেন ফিচার উপস্থিত থাকেন। চন্দরনগরের বর্দ্ধিষ্ণু সম্ভ্রান্তেরা দেখতে আসেন, দেখে আনন্দ ও গর্ব্ব অনুভব করেন। ক্যাপ্টেন্ ফিচার মধ্যে মধ্যে আনন্দ-মুখর ভাষায় তাঁদের বলেন, "এরা আমাদের বিস্মিত ক'রে দিয়েছে; যুদ্ধবিদ্যা যুদ্ধকৌশল যে এদের মধ্যে এত কাল প্রচ্ছন্ন ছিল, কাল যে তার কিছুমাত্র হরণ করতে পারেনি, দেখে আমি অবাক্ হয়েছি! দু'তিন সপ্তাহমধ্যে এতটা কুশলী হতে, ইঙ্গিতমাত্র আয়ত্ত করতে, ইতিপূর্ব্বে আমাদের দেশেও দেখিনি! আর মিষ্টার বুথের (ভূতনাথের) ত এটা যেন সহজ ও স্বাভাবিক বিদ্যা—আনন্দচর্চ্চার লীলা-ক্ষেত্র। তার প্রাণ এর মধ্যেই স্ফূর্ত্তি পায়, ক্লান্ত হয় না। সুযোগ পেলে এরা সহজেই জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।"

শুনে সকলেই একটু ম্লান হাসি টেনে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলেন। মনে মনে অদৃষ্টকে ধিক্কার দেন। সভ্যতা রক্ষার্থে মুখে ক্যাপ্টেনের প্রতি ধন্যবাদ উচ্চারণ করেন।

পল্টন তয়ের হতে বিলম্ব হ'ল না, যেহেতু, সকলেই ভদ্র-সন্তান, শিক্ষিত। ভূতনাথকে বরাবরই তারা প্রধান ব'লে স্বীকার করতো। তার অধিনায়কত্বে থাকতে তারা স্বতই ইচ্ছুক। ভূতনাথও তাদের সঙ্গে একপ্রাণ ছিল, ফ্রেণ্ড বা কম্‌রেড বলেই সম্বোধন করতো। ক্যাপ্টেন্ ফিচার সেটা লক্ষ্য ক'রে তাকে নিজের লেফটেনেণ্ট ক'রে নিলেন, তাতে সকলেই খুসি।

আজ তাদের যাত্রার দিন। চন্দরনগরের সর্ব্বত্রই আজ প্রাণ চাঞ্চল্য প্রকট। স্ত্রী পুরুষ সকলেরই মধ্যে রণক্ষেত্র-যাত্রীদের প্রাণের সাড়া প্রতিধ্বনিত হয়ে যেন একাকার হয়ে গেছে।

প্যারেডের ময়দানে যাত্রী যুবকরা সৈনিকবেশে একত্র হয়ে দাঁড়াতেই সমাগত মহিলারা তাদের ধান দূর্ব্বা চন্দন দিয়ে, পুষ্পমাল্য পরিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন, কুমারীরা শঙ্খধ্বনি করলে।

ভূতনাথের আদেশমত মার্চ্চ করবার পদ্ধতিতে সকলে দাঁড়াতেই ভূতনাথ সর্ব্বাগ্রে স্থান নিলে। তখন একটি বর্ষীয়সী মহিলা তাকে বরণ ক'রে, মালা পরিয়ে দিয়ে বল্‌লে, "জয়ী হও, বিজয়-যশ-মণ্ডিত হয়ে ফেরো। আবার আমরা যেন সগর্ব্বে তোমাদের বরণ ক'রে ঘরে তুলতে পাই।" আর দৃঢ়তা রইল না, অঞ্চলে চক্ষু মুছতে মুছতে ফিরলেন। যাত্রীরা হাত তুলে নমস্কার করলে।

ক্যাপ্টেন ফিচার যাত্রী দলের পশ্চাতে স্থান নিয়েছিলেন, বর্ষীয়সী ধীরপদে উপস্থিত হয়ে মালা তুলে ধরতেই, ক্যাপ্টেন সবিনয়ে মস্তক নত ক'রে গ্রহণ করলেন, অভিবাদন জানালেন। এ দৃশ্যে তিনিও বিচলিত হয়েছিলেন।

শঙ্খ ও উলুধ্বনির মধ্যে ভূতনাথের আদেশমত "মার্চ্চ" সুরু হয়ে গেল। ফরাসী জাতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে 'বন্দে মাতরম্,' শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল। পথের দু'ধারে অলিন্দ হতে পুষ্পমাল্য বর্ষিত হ'ল। চন্দরনগরের সবাই আজ একাত্ম!

ইষ্টেশনে লোক ধরে না, অতি কষ্টে মহিলাদের এগিয়ে দেওয়া হল। ট্রেণ, ইষ্টেশন পুষ্পমাল্যে সুশোভিত।

ননী বাপ-মার সম্মতি নিতে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে ক'রেই এসেছিল। ননী চন্দননগরে মামার বাড়ীতে থাকতো। তার কাছে তার বাপ মা ভগিনী সকলেই ভূতনাথের চরিত্র, বীরত্ব, ব্যবহার ও সাহসের কথা শুনে, তাকে দেখবার জন্যে এবং প্রধানতঃ ছেলেকে বিদায় দেবার জন্যে এসেছিলেন। সকলেই ইষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন।

বাপ মা উভয়েই ননীকে নিয়ে ভূতনাথের কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, "আমাদের একমাত্র পুত্র এই ননীকে তোমার হাতে দিলুম। তোমার এই ছোট ভাইকে তুমিই দেখো, বাবা।" মায়ের চোখে অশ্রু ভ'রে এলো।

ভূতনাথ তাঁদের প্রণাম ক'রে বললে, "ভগবান্ আমাদের রক্ষা করবেন, কোন চিন্তা রাখবেন না, মা।" এই ব'লে ননীকে হাত ধ'রে টেনে নিলে। ভূতনাথের মনে হচ্ছিল, এদের কোথায় যেন দেখেছি।

তাঁরা একটু তফাৎ হতেই ত্বরিতগতিতে একটি তরুণী এসে ননীকে "দাদা, আমাকে নিয়মিত পত্র দিতে ভুলিও না" ব'লে তাকে প্রণাম করলে। সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে দাঁড়িয়ে নিতান্ত পরিচিতার মত ভূতনাথের দক্ষিণ হস্তে নিমেষে একটি সিল্কের রাখী বেঁধে দিয়ে, মৃদুকণ্ঠে "আপনার হাত থেকেই এই রাখী আমি যেন ফেরৎ পাই"…বলেই প্রণাম ক'রে চকিতের ন্যায় স'রে গেল। গোলমালে আর ভিড়ে এ ব্যাপারটি কারুর লক্ষ্যে পড়েনি। পড়লেও আত্মীয়া ভেবে থাকবে।

ভূতনাথ কাতর কণ্ঠে ননীকে জিজ্ঞাসা করলে, "রাধারাণী না?"

ননীও বিস্মিত হয়েছিল, বললে "হ্যাঁ—আমার ভগিনী।"

সহসা প্রতিনিধি-ভবন হতে তোপধ্বনি হতেই সত্বর সকলে নিয়মবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে তদুত্তরে একত্রে শূন্যে ভলি ফায়ার' করেই ট্রেণে উঠে পড়লো।

হিপ্ হিপ্ হুররে! ট্রেণ ছেড়ে দিলে।

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সোনালী শরৎ

কোন্ যাদুকর শিল্পী আজি তুলির টানে রং ধারায়।
নীলের উপর সোণার পরশ, বুলিয়ে দেছে কোন্ মায়ায়॥
নীল সাগরে নীলের ঢেউ,
আজ কি তোরা দেখিস্ নি কেউ,
ব'সে গেছে নীলের মেলা, নীল আকাশের স্নিগ্ধ ছায়॥

আজ, শরতের রৌদ্র ফুটে শ্যামল বন-বীথির' পরে।
সোণার-বরণ কিরণ-রাশি ছড়িয়ে গেছে থর্-বিথরে,
কাহার শুভ্র হাসি-রাশি
চমক লাগায় প্রাণে আসি,
সোণার কমল উঠলো ভাসি শান্ত দীঘি সরোবরে॥

নীল মদিরা ঝরি' ঝরি' বিশ্বপাত্রে উপচি উঠে,
দু'কূল ভরা নদীর বুকে, কলধ্বনির জোয়ার ছুটে,
বাতাসে আজ কি আমন্ত্রণ,
বুকের মাঝে দেয় পরশন,
কোন্ সুদূরে রয় প্রিয়জন, তারি লাগি চিত্ত টুটে।

স্বপন নদীর কুহক তীরে ভিড়ছে তরি অচিন কার
রূপ-কথার সে রাজপুরী, কোথা আছে সাগরপার,
সোণার কাঠির পরশ পেয়ে,
চিরন্তনী জাগবে যে, এ,
উতল্ হাওয়ায় শিউলী ঝরে বইতে নারে সুখের ভার॥

শ্রীমতী নলিনীপ্রভা বসু।

অসি ও বীণা

১

অতীতের রঙ্গমঞ্চে হাসিকান্নার যে লীলা চলিয়াছিল, তিমির-চ্ছায়া তাহা লুকাইয়া রাখিয়াছে। গোপনতার আড়াল হইতে তাহাকে জাগাইয়া কি লাভ হইবে, এ কথা হয় ত অনেকে প্রশ্ন করিবেন। পুরাতন হইয়া যাহা দৃষ্টির বাহিরে গিয়াছে, তাহার সহিত আমাদেরও যে অবিচ্ছেদ্য যোগ আছে।

মানুষের মন বর্ত্তমানের সংকীর্ণতা পাড়ি দিয়া অতীতের রস-সমুদ্রের মাঝে আনন্দের রসদ খোঁজ করে। সে বৃথা নহে। মহাকাল এক অপূর্ব্ব মাধুর্য্য দিয়া অবজ্ঞাত কাহিনীকে রঙ্গীন ও রসাল করিয়া রাখেন।

চোখের সম্মুখে যাহা ঘটে, নিত্যদিনের ধূলিজাল তাহাকে মলিন করে, জ্ঞাত খুটিনাটি তাহাকে পঙ্গু ও অপ্রিয় করে, কিন্তু অপরোক্ষ ইতিহাস রহস্যের শতদলের সৌরভে সৌরভিত হইয়া অনন্যসাধারণ অননুভূত এক রস-সংবেদনায় মধুর ও প্রেয় হইয়া দেখা দেয়।

বর্ষা-দিনের মেঘ-মেদুর আকাশের তলে ইলশেগুঁড়ির বাতাহত ধারা যেমন এক আবছায়া রচনা করে, তেমনই আবছায়া-ভরা ছবি আজ শরতের আলোক-সমুজ্জল প্রভাতে মনের আয়নায় ভাসিয়া যাইতেছে।

২

বহুসহস্র বৎসর পূর্ব্বের কথা।

সৌরাষ্ট্র ও কাঞ্চী রাজ্যের বিবাদ তখন পুরুষানুক্রমে চলিয়াছে। পুরুষানুক্রমে যুদ্ধবিগ্রহ-সন্ধি-পরাজয়ের মাঝ দিয়াও কলহের ধূমবহ্নি বাঁচিয়া রহিয়াছে। প্রথমে কি কারণে যে বিরোধ বাধিয়াছিল, কেহ সে কথা মনে করিয়া রাখে নাই। অথচ বর্ষের পর বর্ষ যুদ্ধ চলিয়া আসিয়াছে। বর্ষান্তে শরৎ যখন আলো ও আনন্দ লইয়া দেখা দেয়, প্রকৃতির আবেদন ও সুষমা ভুলিয়া দুই রাজ্যে তখন অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা বাজিয়া উঠে।

অসি-দেবতার পূজারী এই দুই রাজ্যের যুবকদের মনে কেবলই রণের আহ্বান সুস্পষ্ট ছিল; কিন্তু হঠাৎ ব্যতিক্রম দেখা গেল কাঞ্চীর যুবরাজ কুমারগুপ্তে। মল্লশালায় অস্ত্র-ক্রীড়ায় যুবরাজের আনন্দ নাই। ম্লান জ্যোৎস্নালোকিত শুভ্র বকুলবেদীতে বসিয়া তিনি সুরের সাধনা করেন।

সুরের নৌকা বহিয়া যুবরাজ অতীন্দ্রিয় আনন্দানুভূতির মধ্যে ডুবিতে চাহেন। দিগ্বিজয়ের প্রাক্কালে কাঞ্চীর মন্ত্রী আসিয়া জানাইলেন, "কুমার! পিতার আদেশ, আপনাকে এবার সেনানায়ক হয়ে সৌরাষ্ট্র বিজয় করতে হবে।"

সেতার হইতে মুখ তুলিয়া যুবরাজ বলিলেন, "মন্ত্রী, জয় ত কতবার হয়েছে; কিন্তু শান্তি মিলেছে কি?"

মন্ত্রী বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টি মেলিয়া চাহিয়া রহিলেন। পরে আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন, "শান্তি মেলে নি যুবরাজ, কিন্তু ক্ষত্রিয় হয়ে আমরা ত অবসাদ চাই নে। সংঘর্ষকে বাঁচিয়ে রেখে প্রতিদিন জয়ী হওয়াই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম।"

গোধূলির শান্তদীপ্তির মত মধুর এবং করুণ হাস্যে যুবরাজ উত্তর করিলেন, "মন্ত্রী, জয় করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম, কিন্তু সে জয় ক্ষণস্থায়ী, তার চেয়ে স্থায়ী জয়ের জন্য ব্যাকুল হওয়া প্রয়োজন। কল্যাণ ও প্রেমের পথে এই দুই বিবদমান রাজ্যকে বাঁধলে সত্যই শ্রেয় হবে।"

মন্ত্রীর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। শরতের দিগ্বিজয়ের আহ্বান শুনিয়া যুবরাজ পরম উল্লসিত হইবেন, মন্ত্রী এই আশা করিয়াছিলেন, কিন্তু যুবরাজের কথায় তিনি শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন।

দৃপ্তস্বরে কুমার অপ্রসন্ন মন্ত্রীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "মন্ত্রী, ক্ষত হ'তে ত্রাণ করে যে, সেই ক্ষত্রিয়। মানুষে মানুষে হিংসার অনল জাগিয়ে তোলায় লাভ নেই। প্রগতির পথ খোলা রয়েছে, সে পথে আমরা যেন চলতে শিখি। প্রীতির অমৃত দিয়ে জগৎ ভরিয়ে জগৎকে নিত্য নব উন্নতির পথে নিয়ে চলুন।"

আশা ও আকাঙ্ক্ষাভরা বাণী মন্ত্রীর হৃদয় স্পর্শ করিল। তিনি বলিলেন, "যুবরাজ কি করতে বলেন?"

"পিতাকে বলুন, কাঞ্চীসেনা কাঞ্চীর দুঃখ-দৈন্য দূর করুক, আমি একাই সৌরাষ্ট্র বিজয় ক'রে আসব।"

মন্ত্রী উদ্‌ভ্রান্তভাবে চাহিয়া রহিলেন। সৌরাষ্ট্রের শক্তির কথা কি যুবরাজ ভুলিয়া গিয়াছেন, না এ কর্ত্তব্য এড়াইবার ফিকির? যুবরাজের আনন্দ-দীপ্ত জ্যোতির্ম্ময় আননে প্রতারণার আভাসমাত্র নাই। আত্ম-সংবরণ করিয়া মন্ত্রী প্রশ্ন করিলেন, "কিন্তু কেমন ক'রে?" যুবরাজ কৌতুকের

হাসি হাসিয়া বলিলেন, "মন্ত্রী, নীতিশাস্ত্রে এত দিন চুল পাকালেন, মন্ত্রগুপ্তিই যে সিদ্ধির পথ, এ কথাও কি আপনাকে ব'লে দিতে হবে ?"

অপ্রতিভ মন্ত্রী নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য কুমারগুপ্ত বলিলেন, "কাঞ্চীর মাথা হেঁট হয়, এমন কায আমি করব না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

মন্ত্রী চলিয়া গেলেন। যুবরাজ বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। ক্ষণিকের উত্তেজনায় যে প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন, কেমন করিয়া তাহা সফল হইবে, তাহাই ভাবিতে বসিলেন। ভাবনা ক্রমেই জটিল হইয়া উঠিতে লাগিল, সিদ্ধান্ত দূর হইতে দূরতর হইয়া গেল।

যুবরাজ বিরক্ত হইয়া আলাপ আরম্ভ করিয়া দিলেন। বসন্তরাগের প্রিয় রাগিণী হিন্দোলীকে বরণ করিতে বসিলেন। সুরূপা, কৃশাঙ্গী, শুদ্ধভাবসম্পন্না, চন্দ্রকিরণোজ্জ্বলদৃষ্টিযুক্তা, কপোতকান্তি ও কলকণ্ঠা বলিয়া পণ্ডিতরা হিন্দোলীর পরিচয় দিয়াছেন। যুবরাজের চেষ্টায় হিন্দোলী যেন মূর্ত্তি ধরিয়া উঠিল। সুরের মূর্চ্ছনায় ভুবন মুগ্ধ, অভিভূত হইল। কিন্তু হিন্দোলীর আলাপে যুবরাজ যেন শান্তি পাইলেন না। তিনি তখন ভৈরব রাগের পত্নী তোড়ীর সাধনায় মনোনিবেশ করিলেন। তুষার-কুন্দোজ্জ্বলদেহযষ্টি, কাশ্মীর-কর্পূর-বিলিপ্ত-দেহা তোড়ী বীণাবাদনে বনে হরিণীর মনোবিনোদন করিতেছেন, এই বলিয়া সঙ্গীতরসজ্ঞরা তোড়ী রাগিণীর রূপ-বর্ণনা করিয়াছেন। কুমারগুপ্ত ভাবাবেশে তোড়ীকে যেন মূর্ত্তিমতী করিয়া তুলিলেন।

তোড়ীর সুর-মায়ায় তাঁহার দৃষ্টি যেন খুলিয়া গেল। তিনি উল্লাসে আপন মনে বলিয়া উঠিলেন, "আমার বীণাই আমার জয়শ্রী হবে।"

আনন্দের আতিশয্যে যুবরাজ বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। বাহিরে অশ্বের হ্রেষা যুদ্ধক্রীড়ারত কাঞ্চী-সৈন্যগণের প্রমোদ-লীলার কথা ধ্বনিত করিতেছিল। সমারোহ ও আয়োজনের এই চাঞ্চল্য কুমারগুপ্তকে বিক্ষুব্ধ করিল না। তিনি আপনমনে তোড়ীর রূপ ধ্যান-নিমগ্ন-নেত্রে দেখিতে লাগিলেন! যতদূর দৃষ্টি চলে, শুধু বন, অরণ্যের পর অরণ্যের বিস্তার। বনস্পতির পত্রবহুল শাখায় নিবিড় অন্ধকার ঘনাইয়া উঠিয়াছে। তাহার শেষে পাহাড়ের পাদদেশে নিঃশঙ্কচিত্তে হরিণ-হরিণী খেলা করিতেছে। হঠাৎ যেন কোনও দেববালা আসিয়া উপস্থিত। মিলনক্রীড়া ভুলিয়া হরিণীরা ছুটিয়া চলিল—পর্ব্বত-সানুতে রূপের আলোয় দিক ভুলাইয়া জ্যোতিঃশতদলের মত দীপ্তা তোড়ী বসিয়া বীণা বাদন করিতেছেন।

৩

সৌরাষ্ট্ররাজকুমারী মণিকা সৌরাষ্ট্রের নয়ন-পুত্তলী।

লাবণ্য-তরঙ্গিণী মণিকার উজ্জ্বল অপ্রতিম রূপ, অতুল গুণ সমস্ত সৌরাষ্ট্রের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আহরণ করিয়াছিল। মাতৃহারা কন্যা পিতার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেন। কিন্তু কুমারী মণিকা শুধু লাবণ্যবৃদ্ধির আয়োজনে আপনাকে নিমগ্ন করিয়া রাখেন নাই। অস্ত্রক্রীড়ায় তাঁহার অসীম আগ্রহ এবং নিপুণতা। মণিকা আবদার করিলেন, পিতার সহিত তিনি যুদ্ধে যাইবেন।

স্তোকবাক্যে চঞ্চলা মণিকা নিবৃত্ত হইলেন না। পিতার সহিত তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে চলিলেন। বিশ্বস্রষ্টা সুষমার সমাবেশ করিয়া যাহাকে অদ্বিতীয় সুন্দরী করিয়া পৃথিবীতে পাঠাইয়া-ছিলেন, শুদ্ধান্তঃপুর তাঁহাকে ভুলাইয়া রাখে নাই। পৌরুষের পরিচয় দিবার জন্য তিনি কলহ ও কল্লোলের মাঝে ঝাঁপ দিতে চাহেন। ললিতার বিলাসমধুর ভঙ্গিমায় যিনি জগজ্জয়ী হইতে পারেন, অসিনৈপুণ্যেও তিনি প্রতিষ্ঠা চাহেন।

রাজকুমার কুমারগুপ্তও কাঞ্চী-বাহিনীর অধিনায়ক হইয়া যাত্রা করিয়াছেন। পিতার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে তাঁহার কল্পনা সফল হয় নাই। কাঞ্চী-সেনা ও সৌরাষ্ট্র-সেনা মহাবনের বিশাল প্রান্তরে পরস্পরের সম্মুখীন হইল। শিবির স্থাপন করিয়া উভয় সৈন্য সমর-ক্রীড়ার বোধনোৎসব আরম্ভ করিয়া দিল

সন্ধ্যার অস্তরাগ নীল আকাশে বর্ণ-ভঙ্গিমা দেখাইয়া মিলা-ইয়া যাইতেছিল। যুবরাজ আকাশের পানে চাহিয়া ভাবিলেন, —"নিসর্গের এই সুষমা মানুষের মনকে কেন শান্ত করে না ? মানুষ কেন রক্তপাতের লালসায় উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠে ?"

পরদিন সৌরাষ্ট্রের সেনানিবাসে সংবাদ আসিল, কাঞ্চী-যুবরাজ একাই সৌরাষ্ট্রের যে কোনও বীরকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিয়াছেন। তিনি যদি পরাজিত হন, সৌরাষ্ট্র বিজয়-কীর্ত্তি লইয়া দেশে ফিরিবে, অন্যথায় কাঞ্চী বিজয়ী হইয়া ফিরিবে।

চারিদিকে চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা। কাঞ্চী-যুবরাজের প্রস্তাব অনেকেরই ভাল লাগিল না, কিন্তু দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান ত্যাগ করাও সম্মানজনক মনে হইল না। সমস্ত ব্যাপার

মীমাংসার জন্য মন্ত্রণা-বৈঠক বসিল। রথ-চক্র-সমুত্থিত ধূলিরাশি থামিয়া গিয়াছে। ভীমগর্জ্জন গজ যূথ কেবল কোলাহল তুলিতেছিল। উভয় পক্ষের চতুরঙ্গিণী সেনা আদেশ প্রতীক্ষা করিয়া নীরবে বসিয়া আছে।

রাজকুমারী মণিকা মন্ত্রণা-সভায় উঠিয়া বলিলেন, "আমিই এই আহ্বান গ্রহণ করব।"

রূপে, গুণে, আভিজাত্যে অতুলনীয়া, যৌবনলালিত্যে অনুপমা রাজনন্দিনী মণিকা। কুসুমপেলবা নারী কেমন করিয়া রণ-দক্ষ শত্রুর সম্মুখীন হইবে? সকলের মুখে উৎকণ্ঠার অবধি রহিল না। মিষ্টভাবে সকলেই রাজপুত্রীকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চাহিলেন। কিন্তু মণিকা অবিচল, কোনও হিতবাক্যই তাঁহাকে দমাইল না। তিনি বলিলেন, "যুবরাজের সহিত দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ রাজতনয়ই কেবল করিতে পারেন। আমার যখন ভাই নেই, আমিই তখন এ আহ্বান গ্রহণ করব।"

এ যুক্তির সারবত্তা সকলেই অনুভব করিলেন, কিন্তু তথাপি মন সায় দিল না। সৌরাষ্ট্ররাজ বলিলেন, "মা! আমিই যাচ্ছি, এ ত মা খেয়ালের কায নয়, সমস্ত সৌরাষ্ট্র এই দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের ফলের উপর চেয়ে থাকবে।"

"না বাবা! সে হয় না। আজ যদি তোমার পুত্র থাকত, সে কি তোমায় এমন ভাবে যুদ্ধে যেতে দিত? আমি পুত্র নই ব'লে কি তুমি আমায় অবজ্ঞা করবে?"

সৌরাষ্ট্ররাজ উত্তর দিলেন, "না, আমাদের সকলের নয়ন-পুত্তলী তুমি, তাই ত সবার ভয় হয়।"

রাজনন্দিনী দৃপ্তা সিংহীর মত বলিয়া উঠিলেন, "না, আমার অস্ত্র-শিক্ষা বিফল নয়, বাবা। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

সমগ্র সৌরাষ্ট্র সে কথা অবগত ছিল।

কাঞ্চী-শিবিরে খবর গেল। সৌরাষ্ট্র দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান গ্রহণ করিয়াছে, পরদিন দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইবে। আজ তাই উভয় শিবিরে উৎসব-ক্রীড়ার নানা আয়োজন চলিল। নানাজনে নানাবিধ কৌতুক-রঙ্গের উদ্ভাবন করিয়া সকলের প্রীতি-সম্পাদন করিতে প্রবৃত্ত হইল।

৪

শরদভ্রলেখার মাঝে গোধূলির নয়নমনোহর রশ্মি আসিয়া পড়িয়াছে। যুবরাজ কুমারগুপ্ত বীণা লইয়া অশ্বারোহণে বাহির হইয়া পড়িলেন। প্রান্তরের শেষে বনস্পতির স্নিগ্ধসরস নিরুপম কান্তি নয়নমনোহর। তাহার মাঝে ঘোড়া ছুটিয়া চলিল। নবপুষ্পিতা তরুশ্রেণীর পাশে পাশে ঘোড়া চলিতে লাগিল।

রাজকুমার তাম্রপর্ণী নদীর তীরে বন-ন্যগ্রোধের ছায়ায় ঘোড়া হইতে নামিয়া বীণা লইয়া বসিলেন।

কল্য যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইবে, তাহার কথা ভাবিয়া ভাবিয়া যুবরাজের মনে বেদনা সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিল। দিগ্বিজয়ী শরতের আবির্ভাব বিশ্বের দ্বারে দ্বারে সুষমার বার্ত্তা লইয়া লুটাইয়া পড়িতেছে।

কুসুম-ঘেরা সরোবরের মাঝে পদ্ম-কোরকের বিমল-শোভায় কুমারগুপ্তের অন্তর উল্লসিত হইয়া উঠিল। তিনি বীণায় ঝঙ্কার দিলেন।

করুণ-বেদনাভরা রাগিণী রূপায়িত হইয়া উঠিল। সুর-লহরী যেন বলিতে চাহিতেছিল, আমাদের জগৎ আলো, সৌরভ ও রসে ভরা, তুমি কেন নিরানন্দ হইয়া বসিয়া থাকিবে?

কানন-প্রান্তর ডুবাইয়া—প্লাবিত করিয়া সুরোচ্ছ্বাস বহিয়া চলিল। বীণ-কার সহসা দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে মূর্ত্তিমতী বনদেবতার মত এক অপূর্ব্ব সুন্দরী!

সুর-লীলা বন্ধ করিয়া কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে আপনি, বনদেবী?"

লজ্জা ও আনন্দের এক লাবণ্য-বিভা সেই স্বর্গীয় আননে প্রতিভাত হইল। আগন্তুক সুন্দরী বলিলেন, "আমি পথ-চারিণী, আপনার গান শুনে মুগ্ধ হয়ে গেছি।"

আনন্দ-মগ্ন-চিত্ত কুমার বলিলেন, "আমি ধন্য। আপনার মন আমার গানে তৃপ্তি পেয়েছে, কিন্তু আপনার পরিচয়—?"

কথা অর্দ্ধপথে থামিয়া গেল। অপরিচিতা নারীর পরিচয় জিজ্ঞাসা হয় ত শোভন ও সৌজন্য-সূচক হইবে না।

অঞ্চল দোলাইয়া অপরিচিতা উত্তর দিলেন, "আপনার সঙ্কোচের কারণ নেই। কারণ, আমার পরিচয় হয় ত জগৎ ধ'রে রাখতে চায় না—কালই হয় ত জগৎ ছেড়ে চ'লে যেতে হবে।"

অপরিচিতার কথা ভাবগদ্গদ তন্ময়তার মাঝে থামিয়া গেল। কুমারগুপ্তের মনেও ভাবের তরঙ্গ খেলিয়া গেল। অনাগত মৃত্যুর করুণ পদধ্বনি যেন দূরশ্রুত সঙ্গীতের মত কাণে বাজিয়া উঠিল। তিনি ভাববশে বিভোর হইয়া বলিলেন, "আপনাকে আমি জানি নে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, আপনার চারু চোখের দৃষ্টি দীর্ঘকাল ধরায়

প্রসাদ বৃষ্টি করুক, কিন্তু আমায় হয় ত মৃত্যু-বরের হাতে আপন প্রাণকে সমর্পণ করতে হবে—হয় ত কালই—"

চকিতে রাজকুমারী মণিকা সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়া লইলেন। বীণ-কারই তাঁহার ভাবী প্রতিদ্বন্দ্বী—হায়, এই কুসুম-সুকুমার তনু, এই সুন্দর কণ্ঠস্বর সে কি শুধু বিরোধের মাঝে স্পর্শ করিতে হইবে, কলহের মাঝে বাদানুবাদ করিতে হইবে? মণিকার অন্তর উন্মনা হইয়া উঠিল।

মণিকাও বনভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। সঙ্গিগণকে পশ্চাতে ফেলিয়া রাজকুমারী মণিকা বন-মাঝে একাকিনী আসিয়া পড়িয়াছিলেন। মধুর বীণা-ধ্বনিতে আকৃষ্টা হইয়া রাজকুমারী যুবরাজের সন্নিহিতা হইয়াছিলেন।

চোখের প্রথম দেখায় প্রগাঢ় প্রেম হয়, এ কথা মিথ্যা নহে। উভয়ের মন মকর-কেতন প্রণয়ের মধুর রসে বিহ্বল করিয়া তুলিল। কিয়ৎ-পরে আত্ম-সংবরণ করিয়া কুমার বলিলেন, "হায়! যদি আগে আপনার সঙ্গে দেখা হ'ত!"

রাজকুমারী হাসিয়া উত্তর দিলেন, "কেন, তা হ'লে কি হ'ত?"

অন্যমনা হইয়া কুমার উত্তর দিলেন, "না, এমনই বলছি, হয় ত জীবন অন্য সুরে বাজত।"

মণিকা প্রশ্ন করিলেন, "আমার প্রগল্‌ভতা মার্জ্জনা করবেন, কিন্তু আপনার দুঃখের কথা কি শুনতে পারি?"

"সে কথা শুনে আর কি হবে, ভদ্রে! কাল প্রাতে আমি আমার প্রতিপক্ষ যোদ্ধার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করব, ফলাফল অনিশ্চিত।" যুবরাজ থামিয়া গেলেন, সব কথা বলা হইল না।

মণিকা বলিলেন, "আপনি বীর, যুদ্ধে আপনি এত ভীত কেন?"

"ভীত? তা মোটেই নয়। তবে আমি যুদ্ধকে সত্যিই ভালবাসি নে। পৃথিবীতে এত আলো, এত হাসি থাকতে মানুষ কেন পরস্পর গলা-কাটাকাটি করবে, এ আমি কিছুতেই ভেবে পাইনে!"

রাজকুমারী বিস্মিত প্রীতিজাগরূক-চিত্তে কুমারের ভাবোচ্ছ্বাস শুনিলেন আর মনে মনে উল্লসিত হইয়া উঠিলেন। পরে বলিলেন, "আপনি যখন মরতে চান না, তখন মরণ আপনাকে ডাকবে না, বিজয়ীর বরমাল্য আপনি পাবেন।"

"আপনার শুভেচ্ছার জন্য ধন্যবাদ, ভদ্রে! কিন্তু আমার এই সুর-ভরা বীণা আর আপনার মত এক জন সঙ্গিনী পেলে—"

"এ কি বলছেন আপনি? আপনি আমায় চেনেন না, আমার প্রতি আপনার এ প্রশংসা প্রীতিকর বটে, কিন্তু আপনার সুবুদ্ধির পরিচায়ক নহে!"

"না, আমি ঠকিনি! আপনার এই দিব্য জ্যোতি আপনার মনের ছবিও ফুটিয়ে তুলছে। মনে হচ্ছে, আপনাকে যদি পাই, তা হ'লে সারা জীবন আমি হিমালয়ের নিভৃত গেহে কাটিয়ে দিতে পারি।"

ভাবাতিশয্যে কুমারগুপ্তের কণ্ঠ কাঁপিয়া উঠিল। থামিয়া তিনি বলিলেন, "ভদ্রে! আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করবেন। কিন্তু যার চোখের সামনে মরণ নাচছে, তার কাণ্ডজ্ঞান থাকে না।"

উভয়ে বহুক্ষণ নীরবে রহিলেন। বিদায়ের সময় নিকট হইয়া উঠিল। সন্ধ্যার অন্ধকার শারদ জ্যোৎস্নার সঙ্গে খেলা করিতে লাগিল। কুমারী বলিলেন, "এখন বিদায়, ভগবান্ করুন, আপনি দীর্ঘজীবী হ'ন।"

কুমারগুপ্ত বলিলেন, "কিন্তু আপনি একা কি ক'রে যাবেন?"

"সে জন্য আপনার চিন্তা নাই। বলছি ত আমি পথ-চারিণী।"

যুবরাজ কি কহিবেন, ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলেন না।

মণিকা যখন ফিরিতে উদ্যত হইয়াছেন, তখন যুবরাজ সহসা বলিয়া উঠিলেন, "ভদ্রে, আপনার হাসি আমায় সাহসী করেছে। আমার হাতের এই হীরার আংটী আপনার পেলব হাতে পরিয়ে দেই, এটা আমাদের এই প্রথম পরিচয়ের সাক্ষী হয়ে রইবে।"

মণিকা কথা কহিলেন না। নীরবে হাত বাড়াইয়া দিলেন। আংটী পরা হইয়া গেলে পার্শ্বস্থিত ঘোড়ার উপর এক লাফে চড়িয়া রাজকুমারী অশ্বকে ধাবিত করিলেন। মুক্তাবিন্দুর মত বড় এক ফোঁটা অশ্রু তাঁহার রক্তিম কপোল বহিয়া তাম্রপর্ণীর তীরে সবুজ শষ্পের মাঝে হারাইয়া গেল।

৫

পরদিন চতুরঙ্গ সেনা-বাহিনীর উপর শরতের শুভ্র-নির্ম্মল সূর্য্যালোক পড়িতে না পড়িতে নির্দ্দিষ্ট রণক্ষেত্রের চারিপাশ

উৎসুক দর্শকমণ্ডলীতে ভরিয়া গেল। উষ্ণীষ ও কবচে সূর্য্যালোক প্রতিফলিত হইয়া অপূর্ব্ব দৃশ্যের অবতারণা হইয়াছিল।

যুবরাজ কুমারগুপ্ত প্রথমে আপনার সুন্দর ও সুবেশ অশ্বে আরোহণ করিয়া মল্লভূমিতে প্রবেশ করিলেন। কাঞ্চীপক্ষের জয়নিনাদে দিঙ্মণ্ডল মুখর হইয়া উঠিল। প্রসন্নচিত্ত যুবরাজ উভয় পক্ষের উদ্দেশ্যে বিনতি জানাইলেন।

খানিক পরে রাজকুমারী মণিকা পুরুষবেশে সজ্জিতা হইয়া রণাঙ্গনে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পরিচয় দেওয়া হয় নাই, যুবরাজও জানিতে সমুৎসুক হন নাই।

কুসুম-সুকুমার মণিকাকে যোদ্ধবেশে বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। সৌরাষ্ট্রের জয়-ধ্বনি উঠিল, কিন্তু শঙ্কা তাহাদের জয়-ধ্বনিকে উচ্চ ও কল্লোলমুখর করিতে পারিল না।

পরস্পরকে অভিবাদন জানাইয়া যোদ্ধৃদ্বয় যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। বাল-সূর্য্যে উভয়ের তীক্ষ্ণধার অসি ঝলকিতে লাগিল।

উভয়ের শিক্ষা অনুপম। উভয়ের ক্রীড়া-নৈপুণ্য সকলকেই মুগ্ধ ও বিস্মিত করিয়া তুলিল।

প্রতিপক্ষকে দেখিয়া যুবরাজের মনে মাঝে মাঝে সন্দেহ জাগিতেছিল, হয় ত এই মুখখানি পরিচিত। কিন্তু কোথায় কবে দেখিয়াছেন, কিছুতেই স্মরণ হইল না।

যুদ্ধ চলিল। অসির ঝণৎকারের মাঝেও যুবরাজের মন সন্দেহ-দোলায় দুলিতে লাগিল।

একবার বিরামের ফাঁকে কুমারগুপ্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রতিপক্ষের পরিচয় নেওয়া শিষ্টরীতি। ভদ্র, আপনার পরিচয় কি ?"

ক্লান্ত মণিকা ধীর-গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "যুবরাজ! আপনার সৌজন্যের জন্য ধন্যবাদ, কিন্তু মৃত্যুর দ্বারে আর পরিচয় কেন ? আমি শুধু এক জন সৌরাষ্ট্র-সেবক।"

আবার যুদ্ধ চলিল। অশ্বারোহণে ঘুরিয়া ফিরিয়া উভয়ে অস্ত্রচালনা আরম্ভ করিলেন। মণিকার শিক্ষা অসামান্য।

যুদ্ধোন্মাদনার মাঝে একবার বিপক্ষকে কায়দায় পাইয়া যুবরাজ আঘাত করিতে উদ্যত হইলেন, এমন সময় মণিকার হাতে তাঁহার প্রদত্ত হীরক-অঙ্গুরীয় জল্-জল্ করিতেছে দেখিতে পাইলেন।

নিমেষের মধ্যে গত গোধূলির স্বপ্ন ও মিলনের কথা মনে পড়িয়া গেল।

অপরিচিতার বাক্য সকলই মনে পড়িয়া গেল। সন্দেহে ও বিস্ময়ে যুবরাজের একাগ্রতা টলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে উদ্যত হস্ত শিথিল হইয়া পড়িল।

কিন্তু বিপক্ষের সুতীক্ষ্ণ খরধার তরবারি আসিয়া বিহ্বল যুবরাজের অঙ্গে লাগিল, সে নিদারুণ আঘাত ব্যর্থ করিবার অবকাশ যুবরাজ পাইলেন না। ছিন্নমূল তরুর ন্যায় তাঁহার দেহ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূমিতলে পড়িয়া গেল। কাঞ্চীপক্ষের সেনার মাঝে হাহাকার উত্থিত হইল।

রাজকুমারী মণিকাও অশ্ব হইতে ক্ষিপ্র অবতরণ করিয়া যুবরাজের মস্তক আদর করিয়া কোলে তুলিয়া লইলেন। স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বলিলেন, "যুবরাজ! অসম্ভব সম্ভব হয়েছে, আপনি আপনার প্রিয়ার হাতেই নিহত হয়েছেন।"

যুবরাজের সংজ্ঞা লোপ পাইতে বসিয়াছিল, কষ্টে মাথা তুলিয়া মণিকার আনন্দ-দীপ্ত মুখের দিকে পলকহারা দৃষ্টি মেলিয়া চাহিয়া রহিলেন।

আনন্দ-অমৃতে কুমারের চিত্ত পরিপ্লুত হইয়া গেল। মণিকা তাঁহার দেহে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "আমিও আসছি, প্রিয়তম!"

রাজকুমারীর চারিদিকে উভয় পক্ষের প্রবীণরা সমবেত হইলেন। সকলকে বিস্মিত করিয়া মণিকা দৃপ্ত স্বরে বলিলেন,"কাঞ্চী ও সৌরাষ্ট্রের বিরোধ বহু কাল চলেছে, আজ তার শেষ হ'ক। ভূপতিত যুবরাজ আমার স্বামী। আমি তাঁর চিতায় সহমৃতা হব, আমাদের মৃত্যুর মাঝে দুই রাজ্যে মিলনের অমৃত-স্রোত বহুক।"

সকলে বিক্ষুব্ধ-চিত্তে কাহিনী শুনিল। তাহার পরে তাম্রপর্ণীর তীরে সেই বন-ন্যগ্রোধের মূলে চিতা জ্বলিল। সমস্ত অনুনয় উপেক্ষা করিয়া মণিকা যুবরাজের চিতায় আরোহণ করিলেন।

কাঞ্চী ও সৌরাষ্ট্রের মিলিত সেনা-বাহিনী মন্ত্রমুগ্ধ-চিত্তে এই অপূর্ব্ব লীলা দেখিল। তাহার পর আর বিরোধের বহ্নিশিখা উভয় রাজ্যকে আকুল করে নাই। বহু বর্ষ ধরিয়া চারণরা ও গ্রামবৃদ্ধরা এই অপূর্ব্ব প্রেমের কাহিনী লোকের কাছে বর্ণনা করিয়া চলিয়াছিল।

তাম্রপর্ণীর জলধারা আজও বহিয়া চলিতেছে; কিন্তু সে বন-ন্যগ্রোধ তাহার শাখা-প্রশাখায় আর চিতা-শয্যাকে শীতল ছায়া দেয় না, জনপদে আর এ কাহিনী কীর্ত্তিত হয় না।

শ্রীমতিলাল দাশ (এম্, এ; বি; এল)।
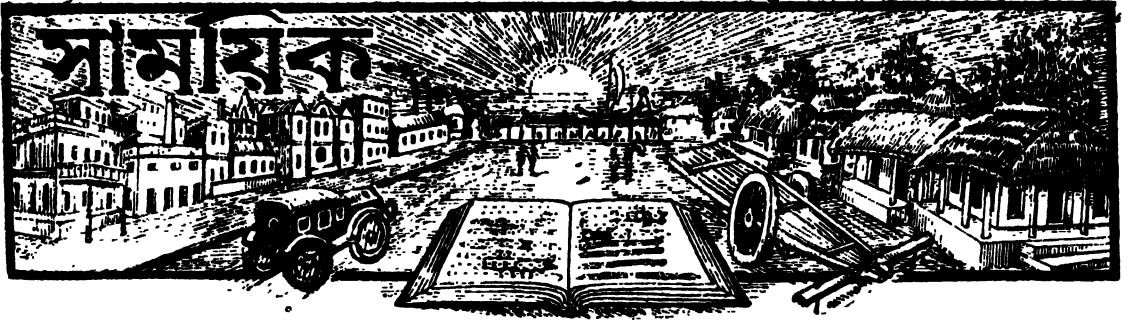
বৈঠকে মহাত্মা গান্ধী

লর্ড আরউইনের চেষ্টায় ইংরাজ ভারত সাম্রাজ্যে শান্তি-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে গোল টেবিল বৈঠক বসাইয়াছেন। ইহার প্রথম অধিবেশনে ভারতের প্রকৃত জনমত ব্যক্ত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হয় নাই, কারণ, সরকার ভারতের জাতীয় কংগ্রেসকে এই বৈঠকে আমন্ত্রণ করেন নাই। এই হেতু ঐ অধিবেশন ব্যর্থ হইয়াছিল। লর্ড আরউইন ইহা বুঝিয়া কংগ্রেসের সহিত দিল্লীর চুক্তি করেন এবং কংগ্রেসকে অন্যান্য সম্প্রদায় ও প্রতিষ্ঠানের সহিত বৈঠকের পরবর্ত্তী অধিবেশনে আমন্ত্রণ করেন। কংগ্রেস মহাত্মা গান্ধীকেই একমাত্র প্রতিনিধিরূপে নির্ব্বাচিত করেন। সেই সূত্রে মহাত্মা গান্ধীর বিলাত-যাত্রা।
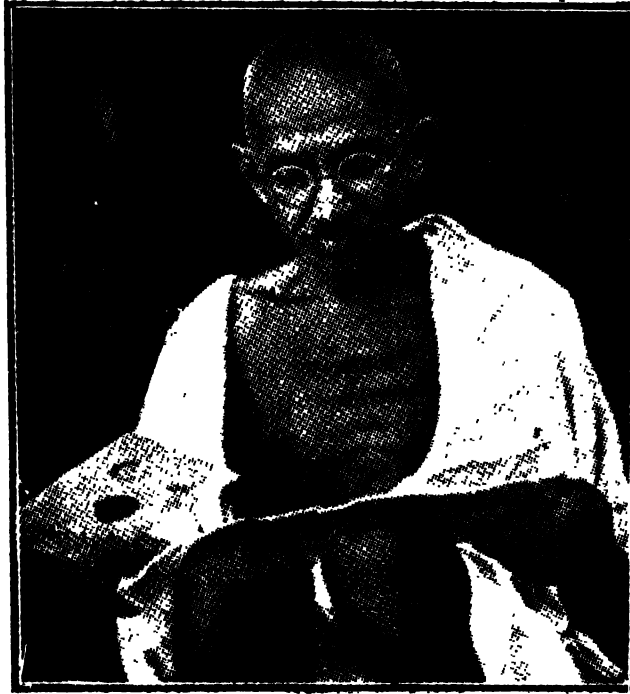
মহাত্মা গান্ধী

যাত্রাপথে এডেন, মার্শেল, প্যারী, ফোকষ্টোন, লণ্ডন প্রভৃতি স্থানে তাঁহার যে বিপুল অভ্যর্থনা হইয়াছিল, তাহার তুলনা জগতে বিরল। তাঁহার ব্যক্তিত্ব, [illegible], বিনয়, নির্ভীকতা, স্পষ্টবাদিতা এবং ন্যায় ও সত্যের ভিত্তির উপর যুক্তি-তর্কের আসন দানের প্রচেষ্টা সর্ব্বত্রই জনগণকে মুগ্ধ করিয়াছে। মহাত্মাজীর শ্রেষ্ঠত্ব ইহাতেই প্রতিপন্ন হইয়াছে। এখন দিকে দিকে, দেশ-বিদেশে তাঁহার নিমন্ত্রণ হইতেছে। রাজনীতিক, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষ, ধর্ম্মযাজক, পুরোহিত, সাহিত্যিক, শিল্পী, ব্যবসায়ী,—এমন কোন সম্প্রদায়, শ্রেণী বা প্রতিষ্ঠান নাই, যাহার কোন না কোন অংশ বা শাখা মহাত্মা গান্ধীর মতামত শুনিবার জন্য ব্যগ্র হন নাই। যাঁহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহাকে প্রীতিশ্রদ্ধার দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়াছেন। কেবলমাত্র লর্ড রদারমিয়ারের নিয়ন্ত্রিত 'ডেলি মেল' শ্রেণীর দুই একখানা গোঁড়া সাম্রাজ্যবাদী রক্ষণশীলদলীয় সংবাদপত্র ব্যতীত বিলাতের প্রায় সমস্ত প্রতিপত্তি ও শক্তিশালী সংবাদপত্র মহাত্মা গান্ধীর প্রতি বিশেষ বন্ধুত্ব ও গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন।

এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া ভারতীয় ফ্রী প্রেসের বিলাতস্থ বিশেষ প্রতিনিধি বলিয়াছেন, যদিও এ যাবৎ বৃটিশ পক্ষ হইতে ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষার দাবী স্বীকার করিয়া লওয়ার মত মনোভাব ব্যক্ত হয় নাই, তথাপি মহাত্মা গান্ধীর সহিত মিলামিশার ফলে এবং রাষ্ট্র-গঠন সাব-কমিটীর অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধীর বক্তৃতার ফলে ইংরাজ জাতি মহাত্মা গান্ধীর যুক্তি-তর্কে এবং ব্যবহারে বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছেন। তাঁহার মতে বিরোধী দল ভারতের মুক্তির পথে বাধা দিবার উদ্দেশ্যে মহাত্মা গান্ধীর এবং কংগ্রেসের বিপক্ষে যে আন্দোলন করিয়াছিল, তাহা ব্যর্থ হইয়াছে, সে আন্দোলনের কুফল নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখন বৃটিশ প্রতিনিধিরা মহাত্মা গান্ধীকে বুঝিয়াছেন এবং কংগ্রেসের উদ্দেশ্য কি, তাহাও বুঝিয়াছেন, অন্ততঃ বুঝিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন।

বিরোধী দল প্রচার করিয়াছিল যে, মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের পক্ষ হইতে অসম্ভব বিরোধী দাবী পেশ করিবেন। সে ধারণা ধীরে ধীরে অপসারিত হইতেছে। মহাত্মাজী কিছুই অসম্ভব দাবী করেন নাই, তিনি ভারতবাসীর ন্যায্য জন্মগত অধিকারই দাবী করিয়াছেন বলিয়া এখন অনেকের প্রতীতি জন্মিয়াছে।

ভারতের লণ্ডনস্থ কোন বিশেষ সাংবাদিক বলিয়াছেন, এখন লর্ড রেডিং, মিঃ ম্যাকডোনাল্ড, মিঃ বল্ডুইন, লর্ড স্যাঙ্কি ও সম্ভবতঃ সার স্যামুয়েল হোরের পরিবর্ত্তে (তিনি যদি পদত্যাগ করেন) সার জন সাইমন,—এই কয় জন বৃটিশ পক্ষের প্রতিনিধিরূপে গোল টেবিলে কথা কহিবেন, আর লর্ড রেডিংএর কথার মূল্যই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া বিবেচিত হইবে। লর্ড রেডিং মহাত্মা গান্ধীর সহিত আপোষ-বন্দোবস্ত করিতে আগ্রহান্বিত, এ কথা প্রকাশ পাইয়াছে। ইহা সত্য কি মিথ্যা, পরে জানা যাইবে।

মহাত্মাজী দুইটি বক্তৃতায় ভারতের দাবীর কথা স্পষ্ট ভাষায় বুঝাইয়া দিয়াছেন, একটি রাষ্ট্রগঠন সাব-কমিটীর সভায়, অপরটি পার্লামেণ্ট মহাসভায় শ্রমিক সদস্যগণের এক বিশেষ সভায়। তাঁহার বক্তৃতার মর্ম্ম এইরূপ :—

——"আমি বৃটিশ জাতির অতিথিরূপে এ দেশে আসিয়াছি। আমার বিশ্বাস, আমি সেই আতিথ্যের অসম্মান করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিব না। এমন সময় ছিল, যখন আমি আপনাকে বৃটিশ প্রজা বলিয়া গর্ব্ব অনুভব করিতাম। কিন্তু এখন আমি বিদ্রোহী বলিয়া পরিগণিত হইতে কামনা করি। কিন্তু তথাপি আমি বৃটিশ কমনওয়েলথের এক জন নাগরিক হইবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করি। বৃটিশ কমনওয়েলথের নাগরিক হইবার ইচ্ছা আমার পূর্ব্বেও ছিল, এখনও আছে। আমি চাহি বৃটিশ কমনওয়েলথের সমান অংশীদার হইতে। হয় ত সেই অংশীদারিত্ব অবিচ্ছেদ্যও হইতে পারে ; কিন্তু উহা এক জাতির উপরে অপর জাতির ন্যস্ত অংশীদারিত্বরূপে পরিগণিত হইবে না।

"আমি পূর্ণমাত্রায় সহযোগিতার ভাব লইয়া এই রাষ্ট্রগঠন সমিতিতে আসিয়াছি। আমি বৃটিশ ও ভারতীয় প্রতিনিধিদিগকে জানাইতেছি যে, আমি তাঁহাদের কার্য্যে কোনরূপ বাধা প্রদান করিব না, কারণ, তাঁহাদের প্রীতির উপরে আমার কার্য্য-সাফল্য নির্ভর করিতেছে। যদি দেখি, আমার দ্বারা সমিতির কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে না, তাহা হইলে তদ্দণ্ডেই আমি সমিতি হইতে সরিয়া দাঁড়াইতে দ্বিধাবোধ করিব না।

"আমি কংগ্রেসের এক জন সামান্য প্রতিনিধি, কংগ্রেসের অনুজ্ঞা অনুসারেই আমার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। কংগ্রেস ভারতের মূক জনসাধারণের প্রতিনিধি সভা। (এই স্থানে মহাত্মাজী কংগ্রেসের ইতিহাস উদ্ধৃত করিয়া বুঝাইয়া দেন যে, রাজনীতিক ক্ষেত্রে কংগ্রেস দেশের লোকের মত প্রতিবিম্বিত করিয়া থাকে, পরন্তু তিনি এই স্থানে করাচী কংগ্রেসের গৃহীত মন্তব্য সমূহের উল্লেখ করেন)। এই সভা করাচীতে ভারতের মুক্তি সম্বন্ধে যে মন্তব্য গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার সহিত বৃটিশ জাতির বিরোধ করিবার কোন কারণ নাই। আমি শিষ্টতা ও দৃঢ়তাসহকারে সেই দাবী উপস্থাপিত করিবার জন্য অনুজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া এই স্থানে আসিয়াছি।

"গোল টেবিলের পূর্ব্ববর্ত্তী বৈঠকে যে সকল সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে, প্রধান মন্ত্রী তাঁহার বক্তৃতায় যে আভাস দিয়াছেন, তাহাতে কংগ্রেসের দাবী পূর্ণ হইবে না। করাচী কংগ্রেসে যে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহা এখনও বলবৎ রহিয়াছে। যদি কেহ আমাকে বুঝাইয়া দিতে পারেন যে, সেই দাবী ভারতের মূক জনসাধারণের স্বার্থের প্রতিকূল, তাহা হইলে আমি ব্যক্তিগতভাবে আমার অভিমত সংশোধন করিয়া লইব। আমি প্রধান মন্ত্রীর বিবৃতি যত্নের সহিত পাঠ করিয়াছি, উহাতে বৃটিশ নীতির স্বরূপ কি, বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। পাঠ করিয়া দেখিয়াছি, উহা কংগ্রেসের দাবীর কাছেও যাইতে পারে না। কংগ্রেস ও আমি দাবী করিতেছি যে, আমরা দুই জাতি (বৃটিশ ও ভারতীয়) যাহাতে পূর্ণ স্বাধীন ও তুল্য অধিকারসম্পন্ন হইয়া পরস্পর অংশীদাররূপে বিরাজ করিতে পারি, তাহারই ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য ; নতুবা বৃটিশ জাতির সহিত সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়াছি বলিয়া আমরা গর্ব্ব করিতে চাহি না। আমরা উভয় পক্ষই স্বেচ্ছায় অংশীদাররূপে বিরাজ করিব,—ইহাই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য।

"মূক, অর্দ্ধাহারী কোটি কোটি ভারতবাসীর মুক্তিসাধনই কংগ্রেসের লক্ষ্য। পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের অধিকার ভারতের আছে। আমি আমার জন্মভূমির স্বাধীনতা চাহিতেছি। আপনারা আমাকে বিশ্বাস করুন। অন্য কোন জাতি বা ব্যক্তির দ্বারা আমাদের স্বার্থ হাসিল করিবার উদ্দেশ্যে আমি আমার জাতির জন্য স্বাধীনতা চাহিতেছি না।"

মহাত্মা গান্ধীর এই বিবৃতি জগতে অতুলনীয় ! এমন করিয়া সহজ, সরল, অল্প কথায় জন্মভূমির দাবীর কথা এ যাবৎ কোন দেশের কোন দেশপ্রেমিক বুঝাইতে পারিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। বিদেশেরই একাধিক কূট রাজনীতিক বলিতেছেন,—"মহাত্মা গান্ধী অপূর্ব্ব কৌশলে ভারতের স্বাধীনতার দাবী উপস্থিত করিয়াছেন। এমন অকাট্য যুক্তির উপর ভিত্তি করিয়া এমন শিষ্টমুষ্ঠু ভাষায় এই দাবী উপস্থিত করা হইয়াছে যে, বিরুদ্ধবাদীরা ইহার প্রতিবাদ করিতে পারিতেছেন না !" কোন কোন বৃটিশ রাজনীতিক মনে করিয়াছিলেন যে, মহাত্মা গান্ধী অসম্ভব রকমের দাবী উপস্থিত করিবেন এবং আইন অমান্যরূপ পিস্তল ধরিয়া সেগুলিকে গ্রহণ করিতে বৃটিশ জাতিকে বাধ্য করিবেন। কিন্তু এখন তাঁহারা ভাবগতি দেখিয়া ও বক্তৃতা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া কি করিবেন, স্থির করিতে পারিতেছেন না !

বৃটিশ সংবাদপত্রসমূহ (দুই একখানি ঝুনা সাম্রাজ্যবাদী ব্যতীত) বলিতেছেন, মহাত্মা গান্ধী যে দাবী করিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যাইতেছে, 'মহাত্মা গান্ধীর ও মন্ত্রিমণ্ডলীর মধ্যে যে মতপার্থক্য আছে, তাহা অনতিক্রমণীয় নহে। সুতরাং মহাত্মা গান্ধীর বক্তৃতা যে কতদূর ফলপ্রসূ হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

মহাত্মা গান্ধী কাযের লোক, অধিক কথা ভালবাসেন না। তাই বলিয়াছেন,—"আপনাদের এই বৈঠকের hope'ess uncertainty and endless delay অর্থাৎ আপনাদের মতের অনিশ্চয়তা এবং অসম্ভব দীর্ঘসূত্রিতা হেতু কমিটীর কার্য্য আদৌ অগ্রসর হইতেছে না। বিশেষতঃ আপনাদের (বৃটিশ পক্ষের) প্রতিনিধিরা তাঁহাদের স্ব স্ব দলের দ্বারা মনোনীত হইয়াছেন, কিন্তু আমাদের ভারতীয় প্রতিনিধিরা সরকারের দ্বারা মনোনীত হইয়াছেন, ভারতীয় জাতির দ্বারা নহে ; এই হেতু এই কমিটীর অবাস্তবতা স্বতঃই প্রতিপন্ন হইতেছে।" মহাত্মাজীর এই দুইটি অভিযোগ মিথ্যা,—এ কথা বৃটিশ পক্ষ বলিতে পারেন না। সত্য ভারতীয় প্রতিনিধিরা সরকারের মনোনীত, (কেবল মহাত্মা

গান্ধী কংগ্রেসের দ্বারা মনোনীত) নতুবা অন্য সকল প্রতিনিধিই সরকারের দৌলতে গোল টেবিলে স্থান লইয়াছেন। এ অনুযোগ সত্যসন্ধ স্পষ্টবক্তা মহাত্মা গান্ধী না করিয়া পারেন না। ইহাতে ফল এই হইয়াছে যে, বৃটিশ পক্ষ এখন কমিটীর কার্য্যে আর অনর্থক বিলম্ব করিতে সাহসী হইতেছেন না। ইহাও মহাত্মা গান্ধীর পক্ষে কম জয়ের ও লাভের কথা নহে। এমন করিয়া কে অল্পদিনে বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষকে প্রভাবান্বিত করিতে পারিয়াছেন? এইরূপ অদ্ভুতকর্ম্মা নেতা কোন্ দেশে কত দিন প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছেন?

মহাত্মা গান্ধী শেষে আরও স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন, "ভারতের শাসনসংস্কার সম্পর্কে সরকার বিশিষ্ট প্রস্তাবসমূহ উপস্থাপিত করিয়া, উহার সম্বন্ধে কমিটী কি অভিমত প্রকাশ করেন, তাহা জানিবার চেষ্টা করুন। তাঁহাদের পক্ষে যাহা কিছু বলিবার আছে, তাঁহারা তাহা বলুন।"

এমনভাবে এ যাবৎ কোন্ বিদেশীয় রাজনীতিক (বিশেষতঃ বৃটেনের অধীন দেশের) বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষকে স্পষ্ট কথা শুনাইয়া কায আদায় করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন? এই অদ্ভুত মানুষটির সকলই অদ্ভুত বটে! এত দিন তাঁহার অভাবে গোল টেবিল প্রাণহীন ছিল, এখন সত্যই প্রাণবন্ত হইল। মহাত্মা গান্ধীর ইহাই বৈশিষ্ট্য।

চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামের হৃতসর্ব্বস্ব, লাঞ্ছিত, নির্য্যাতিত হিন্দুদিগের উপর অনাচার আচরণের প্রতিবাদ করিয়া নিখিল ভারত হিন্দুসভার সম্পাদক জগৎনারায়ণ লাল বাঙ্গালার গভর্ণরের নিকট প্রতীকারের আশায় এক নিবেদন করিয়াছিলেন। চট্টগ্রামে লোমহর্ষণ অমানুষিক অত্যাচারের সম্বন্ধে বাঙ্গালার শাসন-কর্ত্তৃপক্ষ একবার ঘটনাস্থলে গিয়া অবস্থা প্রত্যক্ষ করাও প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন নাই, স্বয়ং গভর্ণর একবার এজন্য দার্জ্জিলিঙের সুখ শৈলবাস হইতে চট্টগ্রামে অবতরণ করিবেন, এ আশাও জনসাধারণ করিয়াছিল, কিন্তু সে আশায়ও তাহাদিগকে নিরাশ হইতে হইয়াছিল। কিন্তু তথাপি কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই যে, হিন্দু মহাসভার এই ন্যায্য নিবেদনের উত্তরও সরকারের তরফ হইতে এমন হৃদয়হীনতার সহিত দেওয়া হইবে, যথা,—

"চট্টগ্রামে খাঁ বাহাদুর আসানুল্লার হত্যাকাণ্ড ও তৎপরবর্ত্তী ঘটনাবলী সম্বন্ধে গত ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে আপনি যে তার করিয়াছেন, তাহার প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি। আমি গভর্ণর বাহাদুরের অভিপ্রায়ানুসারে আপনাকে জানাইতেছি যে, মহাসভা ঐ হত্যাকাণ্ডের যে নিন্দা করিয়াছেন, গভর্ণর সর্ব্বান্তঃকরণে তাহা সমর্থন করিতেছেন, কিন্তু আপনার তারের শেষাংশে আপনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, হত্যাকাণ্ডের পর যে হাঙ্গামা ও লুণ্ঠনাদি অনুষ্ঠিত হয়, তাহা সরকার কিম্বা সরকারী কর্ম্মচারীদের উপেক্ষার ফল। গভর্ণর যেরূপ সংবাদ পাইয়াছেন, তাহাতে বুঝা যাইতেছে যে, স্থানীয় উচ্চপদস্থ রাজপুরুষদের দূরদর্শিতা ও কর্ম্মতৎপরতার জন্যই চট্টগ্রামের গোলযোগের এত শীঘ্র অবসান হইয়াছে।"

কি চমৎকার উত্তর! কি সুন্দর প্রতীকারের ব্যবস্থা! ইহাকেই কথায় বলে, "কাটা ঘায়ে নুণের ছিটা!"

বাঙ্গালার শীর্ষস্থানীয় কয় জন ব্যক্তির সমবায়ে যে বে-সরকারী তদন্ত কমিটী গঠিত হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ঘটনা সম্বন্ধে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের রিপোর্টও প্রকাশিত হইয়াছে। কেবলমাত্র এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তাঁহারা বিবৃতিতে কেবল স্থানীয় রাজপুরুষদের অক্ষমতা এবং উপেক্ষার কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, পরন্তু অনাচারে উৎসাহ দিয়াছেন বা যোগদান করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ্যে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন। কেবল ইহাই নহে, তাঁহারা স্পষ্টভাষায় বলিতেছেন যে, চট্টগ্রামের ম্যাজিষ্ট্রেট এই কাণ্ডে তাঁহার অধীনস্থ শান্তিরক্ষকদিগকে অনাচারে উত্তেজিত করিয়াছেন; পরন্তু কলিকাতার ও স্থানীয় য়ুরোপীয়রা এবং অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্র 'ষ্টেটশম্যান' প্রকাশ্যে বে-সরকারী য়ুরোপীয়দিগকে দুর্ব্বল সরকারের ঔদাসীন্য হেতু স্বহস্তে 'আইন গ্রহণ করিতে' উত্তেজিত করিয়াছেন,—এরূপ অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন ও সদম্ভে বলিয়াছেন, 'অভিযুক্তদের যদি সাফাই গাহিবার সাহস থাকে, তবে তাঁহারা তাঁহাদের নামে আদালতে নালিস করিতে পারেন। এরূপ সমরাহ্বানের পরে স্থানীয় ও কলিকাতার য়ুরোপীয়রা এই উক্তির প্রতিবাদ করিয়াছেন বটে, কিন্তু আদালতে অগ্রসর হইতে সাহসী হন নাই।

গভর্ণরের উত্তরে আসল কোন কথা পাওয়া যায় নাই। তিনি চট্টগ্রামের সর্ব্বস্বান্ত প্রজার সর্ব্বনাশে কোন সমবেদনা প্রকাশ করেন নাই, বা প্রতীকারেরও কোন আশা দেন নাই। বরং তৎপরিবর্ত্তে একতরফা ডিক্রী দিয়াছেন। বাঙ্গালার গভর্ণরের সরকারই একটি সরকারী তদন্ত কমিটী নিয়োগ করিয়াছেন। বোধ হয়, তিনি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত প্রমুখ সম্ভ্রান্ত উচ্চপদস্থ দেশনায়কগণের কথাও বিশ্বাস করেন নাই, তাই স্বতন্ত্র এক কমিটী নিয়োগ করিয়াছেন এবং তাহাতে এক জনও নিরপেক্ষ বে-সরকারী লোককে স্থান দেন নাই! কিন্তু যাহাই হউক, উহাও একটি তদন্ত কমিটী ত! তাঁহাদের তদন্তের রিপোর্ট প্রকাশিত হয় নাই, তবে গভর্ণর কিরূপে হিন্দুসভার পত্রের উত্তরে স্থানীয় রাজপুরুষদিগের সাফাই গাহিলেন? যাঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এবং যে অভিযোগ হেতু উহার সত্যাসত্য নির্ণয়ার্থ স্বয়ং গভর্ণর সরকারী কমিটী নিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলে দোষে খালাস ও প্রশংসা পাইবার উপযুক্ত,—এ কথা গভর্ণর কিরূপে বলেন? সরকারের যে কর্ম্মচারীরা তদন্তে বসিয়াছেন, ইহাতে কি তাঁহাদের যথার্থ তথ্য নির্ণয়ের জন্য তদন্তের ও সাক্ষ্যসাবুদ গ্রহণের সুবিধা হইবে?

হিজলী

যে সময়ে গান্ধী-আরউইন চুক্তি অনুসারে দেশের সর্ব্বত্র জনগণ কংগ্রেসের নির্দ্দেশ অনুসারে আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করিয়া সরকারের সহিত সহযোগিতা করিতেছে, সকলে আশা করিয়াছিল, সেই সময়ে সরকার পক্ষ হইতেও ধর্ষণনীতিমূলক অনাচার কুত্রাপি অনুষ্ঠিত হইবে না। কিন্তু বাঙ্গালার দুর্ভাগ্য,

প্রথমে চট্টগ্রাম, তার পর হিজলী সেই আশার সুখস্বপ্ন ভঙ্গ করিয়া দিয়াছে!

কলিকাতায় যখন প্রথম হিজলীর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সংবাদ আসে, তখন জনসাধারণ সহসা উহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারে নাই,—বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার যুগে বৃটিশ শাসনাধীনে বৃটিশরাজ্যে এমন ঘটনা ঘটিতে পারে, ইহা সহজে বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না; কিন্তু চট্টগ্রামের পর এমন ঘটনা সম্ভব হওয়াও যে আশ্চর্য্য নহে, তাহা লোকের উপলব্ধি হইয়াছিল।

হিজলী বন্দিবাসে বিনা বিচারে বাঙ্গালার রাজবন্দীদের একাংশ কারারুদ্ধ ছিলেন। তাঁহারা নিরস্ত্র, বৃটিশ সরকারের আশ্রয়ে বাস করিতেছেন, সুতরাং তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণপোষণের ভার বৃটিশ সরকারের উপরেই ন্যস্ত—সে দায়িত্ব কত গুরু, তাহা সহজেই অনুমেয়। এই গুরু দায়িত্ব সত্ত্বেও কিরূপে কারারক্ষী শান্তিরক্ষকদিগের গুলীবর্ষণের ফলে দুই জন রাজবন্দী মুকুলিত যৌবনে নিহত হইলেন এবং ন্যূনাধিক কুড়ি জন রাজবন্দী অল্পবিস্তর আহত হইলেন, ইহা জনসাধারণ ধারণাও করিতে পারিল না। বিশেষতঃ রাজবন্দীদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দুই জন য়ুরোপীয় কম্যাণ্ডাণ্ট কারাগৃহের সান্নিধ্যেই বসবাস করিতেছিলেন। তাঁহারা সে জন্য সরকারের তহবিল হইতে মোটা মোটা বেতন পাইয়া থাকেন, পরন্তু সুরম্য বাসস্থানও পাইয়াছেন। তাঁহারা উপস্থিত থাকিতে তাঁহাদের অধীনস্থ শান্তিরক্ষকরা কি জন্য নিরস্ত্র রাজবন্দীদের উপর গুলীবর্ষণ করিল, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। পরে শুনা যায়, এক জন কম্যাণ্ডাণ্ট ঘটনার সময় ঐ স্থানে উপস্থিত ছিলেন না, অপর জন অসুস্থ ছিলেন!

যখন গুলী বর্ষিত হয়, তখন রাত্রি ৯টা। সে সময়ে রাজবন্দীদের মধ্যে কেহ কেহ আহারান্তে আপন আপন কক্ষে বিশ্রাম করিতেছেন, কেহ বা আহারে বসিয়াছেন। নিহত রাজবন্দীদের মধ্যে সন্তোষকুমার মিত্র কলিকাতার কংগ্রেসকর্ম্মী, অপর জন বরিশালনিবাসী তরুণ যুবক, তাঁহার নাম তারকেশ্বর। সন্তোষকুমার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিভাবান্ ছাত্র, এম, এ, বি, এল; মাত্র পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল, সম্ভ্রান্তবংশীয় ধনবান্ পিতার তিনি একমাত্র পুত্র, বয়স তাঁহার ত্রিশেরও অধিক হয় নাই। তাঁহার ন্যায় সঙ্ঘগঠনকুশলী দেশকর্ম্মী বাঙ্গালার তরুণদের মধ্যে বিরল।

ঘটনার দিন এই দুই জনের এক জন কারাগৃহের প্রাঙ্গণে কি গোলযোগ হইতেছে দেখিবার জন্য উপরের তলের বারান্দায় ও অপর জন নিম্নতলের কক্ষদ্বারে দণ্ডায়মান হন। অমনই গুলী বর্ষিত হইতে থাকে। সন্তোষকুমারের তলপেটে এবং তারকেশ্বরের কপালে গুলী লাগে, তাহাতেই তাঁহারা ইহলোক ত্যাগ করেন। আরও ছয় জন রাজবন্দী গুলী দ্বারা আহত হন। গুলী বাকসট নহে, বুলেট। এই সকল কথা প্রথমে প্রকাশ পায়।

রাজবন্দীদের নামে অভিযোগ, তাঁহারা প্রহরীদের সঙ্গে বচসা করিয়া সোডার বোতল, খাটের পায়া ইত্যাদি লইয়া প্রহরীদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, প্রহরীরা অবস্থা সঙ্গীন বুঝিয়া আত্মরক্ষার্থ গুলীবর্ষণ করে। এ বিষয়ে ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে বাঙ্গালা সরকার এই ইস্তাহার প্রকাশ করেন :—

"গত বুধবার ১৬ই সেপ্টেম্বর রাত্রি ৯ ঘটিকায় অব্যবহিত পরে মেদিনীপুর জেলার হিজলীর বন্দিবাসে কতিপয় রাজবন্দী চারি জন রক্ষীকে আক্রমণ করে। আক্রমণকারিগণ এক জন রক্ষীর বেয়নেট কাড়িয়া লয়; আর এক জন রক্ষীকে যথাকালে এক জন প্রহরী সৈনিক সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়াছিল বলিয়া রক্ষা করা সম্ভব হয়। রক্ষিগণের অবস্থা সঙ্গীন হইয়াছিল, ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য এবং বন্দিনিবাসে শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য আক্রমণকারীদের উপর গুলী চালাইতে হয়। ফলে ২ জন বন্দী নিহত ও ২০ জন আহত হয়, আহতদের মধ্যে ৪ জন গুরুতররূপে জখম হইয়াছে। অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ঘটনার তদন্ত করিতেছেন।"

ইহা প্রজার ধনপ্রাণরক্ষক, জনসাধারণের শান্তিরক্ষক, রাজবন্দীদের স্বেচ্ছানিযুক্ত অভিভাবক গভর্ণরের উপযুক্ত কৈফিয়ৎ বটে! কলিকাতা হইতে মেদিনীপুর কয় ঘণ্টারই বা পথ, অথচ এত বড় একটা নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের কথা ঘটনার দিন প্রেরিত হয় নাই। রাজবন্দীরা নিরস্ত্র, তাহারা প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে বাস করে, চারিদিকেই তাহাদের সশস্ত্র শান্ত্রীপ্রহরী, দুই জন শ্বেতকায় কমাণ্ড্যাণ্ট সৈন্যসামন্ত লইয়া তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন, সুতরাং সরকারের ঘোষণা মানিয়া লইলেও জিজ্ঞাসা করা যায় না কি, যদিই বা কয়েক জন রাজবন্দীর সহিত রক্ষীদের কাহারও কাহারও সহিত বচসা ও সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা হইলেও তাহারা যখন এত কড়াকড়ির মধ্যে রহিয়াছে, তখন তাহারা ত কারাগৃহটা মাথায় তুলিয়া লইয়া পলায়ন করিতে পারিত না বা মেদিনীপুর জেলাটা দখল করিয়া লইতে পারিত না, তখন হঠাৎ কি জন্য গুলীবর্ষণ করিবার প্রয়োজন অনুভূত হইল? আলিপুরের জেলেও রাজবন্দীদের মধ্যে এইরূপ এক ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহাতে দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র ও যতীন্দ্রমোহনও মার খাইয়াছিলেন, অথচ সে সময়ে অত বড় কাণ্ডেও গুলীবর্ষণের প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই, মেদিনীপুরে হঠাৎ হইল কেন? সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত বাঙ্গালীর বংশধরগণকে একেই ত বিনা বিচারে মরজি অনুসারে আটক করিয়া রাখা হইয়াছে, তাহার উপর তাহাদের প্রাণের মূল্য কি এতই অল্প বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে যে, কয়েক জনের সহিত কোন কোন রক্ষীর বচসা বা সংঘর্ষ হইয়াছিল বলিয়া তাহাদিগকে কুকুর-বিড়ালের মত গুলী করিয়া হত্যা করা ছাড়া বৃটিশ সাম্রাজ্য রক্ষা করা সম্ভব হইল না? আরও একটা কথা, বচসা হইয়াছিল "কয়েক জন রাজবন্দীর" সহিত, এ কথা সরকারী ঘোষণাতেই প্রকাশ। তবে তাহাদের শাস্তি দিলেই ত সরকারের আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষিত হইত। কিন্তু তাহা না করিয়া আহারান্তে গোলযোগ শুনিয়া যে সকল রাজবন্দী কক্ষদ্বারের বা দ্বিতলের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদের উপরেও গুলী বর্ষিত হইল কেন? যদিই বা ভয় দেখাইবার উদ্দেশ্যে গুলী বর্ষিত হইয়া থাকে, তবে তাহাদের কটিদেশের নিম্নে অর্থাৎ পদে গুলী বর্ষিত না হইয়া কাহারও তলপেটে বা কাহারও কপালে গুলী মারা হইল কেন?

এ সকল প্রশ্নের কৈফিয়ৎ বাঙ্গালা সরকারকে দিতে হইবেই। নিরস্ত্র, অসহায়, দুর্ব্বল জাতির নিকটে কৈফিয়ৎ দিবার প্রয়োজন না থাকিতে পারে, হয় ত আছে বলিয়া বিবেচিত হইবে না। কিন্তু জগতের দরবারে—সকল শাসকের উপরের শাসকের দরবারে বৃটিশ সরকারকে এই নির্ম্মম নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের কৈফিয়ৎ দিতে হইবেই!

হিজলী হত্যাকাণ্ডে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ

সমগ্র বাঙ্গালী জাতির প্রতিভূরূপে বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ টাউনহলের বিরাট সভায় বাঙ্গালীর মর্ম্মন্তুদ বেদনার কথা বিশ্বসকাশে নিবেদন করিয়াছেন। লক্ষাধিক বাঙ্গালীর সে দিন টাউনহলে স্থান সঙ্কুলান হয় নাই, তাই মাঠে রবীন্দ্রনাথকে সভা করিতে হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ প্রাণস্পর্শিনী ভাষায় বলিয়াছিলেন :—

"প্রথমেই ব'লে রাখা ভালো, আমি রাষ্ট্রনেতা নই, আমার কর্ম্মক্ষেত্র রাষ্ট্র-আন্দোলনের বাহিরে। কর্ত্তৃপক্ষের কৃত কোন অন্যায় বা ত্রুটি নিয়ে সেটাকে আমাদের রাষ্ট্রিক খাতায় জমা করতে আমি বিশেষ আনন্দ পাই নে। এই যে হিজলীর গুলী-চালনা ব্যাপারটি আজ আমাদের আলোচ্য বিষয়, তা'র শোচনীয় কাপুরুষতা ও পশুত্ব নিয়ে যা কিছু আমার বলবার, সে কেবল অবমানিত মনুষ্যত্বের দিকে তাকিয়ে।

"এত বড় জনসভায় যোগ দেওয়া আমার শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর, মনের পক্ষে উদ্‌ভ্রান্তিজনক; কিন্তু যখন ডাক পড়ল, থাকতে পারলুম না। ডাক এলো সেই পীড়িতদের কাছ থেকে, রক্ষক নামধারীরা যাদের কণ্ঠস্বরকে নরঘাতন নিষ্ঠুরতার দ্বারা চিরদিনের মতো নীরব ক'রে দিয়েছে।

"যখন দেখা যায়, জনমতকে অবজ্ঞার সঙ্গে উপেক্ষা ক'রে এত অনায়াসে বিভীষিকার বিস্তার সম্ভবপর হয়, তখন ধ'রে নিতেই হবে যে, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের চরিত্র বিকৃত হয়েছে এবং এখন থেকে আমাদের ভাগ্যে দুর্দ্দাম দৌরাত্ম্য উত্তরোত্তর বেড়ে চলবার আশঙ্কা ঘটল। যেখানে নির্ব্বিবেচক অপমান ও অপঘাতে পীড়িত হওয়া দেশের লোকের পক্ষে এত সহজ, অথচ যেখানে যথোচিত বিচারের ও অন্যায় প্রতীকারের আশা এত বাধাগ্রস্ত, সেখানে প্রজা-রক্ষার দায়িত্ব যাঁদের 'পরে, সেই সব শাসনকর্ত্তা এবং তাঁহাদেরই আত্মীয়-কুটুম্বদের শ্রেয়োবুদ্ধি কলুষিত হবেই, এবং সেখানে ভদ্র-জাতীয় রাষ্ট্রবিধির ভিত্তি জীর্ণ না হয়ে থাকতে পারে না।

"এ সভায় আমার আগমনের কারণ আর কিছুই নয়, আমি আমার স্বদেশবাসীর হয়ে রাজপুরুষদের এই ব'লে সতর্ক করতে চাই যে, বিদেশী-রাজ যত পরাক্রমশালী হোক্ না কেন, আত্ম-সম্মান হারানো তার পক্ষে সকলের চেয়ে দুর্ব্বলতার কারণ। এই আত্মসম্মানের প্রতিষ্ঠা ন্যায়পরতায়, ক্ষোভের কারণ সত্ত্বেও অবিচলিত সত্যনিষ্ঠায়। প্রজাকে পীড়ন স্বীকার ক'রে নিত্য বাধ্য করা রাজার পক্ষে কঠিন না হ'তে পারে; কিন্তু বিধিদত্ত অধিকার নিয়ে প্রজার মন যখন স্বয়ং রাজাকে বিচার করে, তখন তাহাকে নিরস্ত করতে পারে কোন্ শক্তি? এ কথা ভুললে চলবে না যে, প্রজাদের অনুকূল বিচার ও আন্তরিক সমর্থনের 'পরেই অবশেষে বিদেশী শাসনের স্থায়িত্ব নির্ভর করে।

"আমি আজ উত্তেজনা-বাক্য সাজিয়ে সাজিয়ে নিজের হৃদয়াবেগের ব্যর্থ আড়ম্বর করতে চাই নে এবং এই সভার বক্তাদের প্রতি আমার নিবেদন এই যে, তাঁরা যেন এ কথা মনে রাখেন যে, ঘটনাটা স্বতঃই আপন কলঙ্কলাঞ্ছিত নিন্দার পতাকা যে উচ্চে ধ'রে আছে, তত ঊর্দ্ধে আমাদের ধিক্কার-বাক্য পূর্ণবেগে পৌঁছিতেই পারবে না। এ কথাও মনে রাখতে হবে, আমরা নিজের চিত্তে সেই গম্ভীর শান্তি যেন রক্ষা করি, যাতে ক'রে পাপের মূলগত প্রতীকারের কথা চিন্তা করার স্থৈর্য্য আমাদের থাকে এবং আমাদের নির্য্যাতিত ভ্রাতাদের কঠোর দুঃখ স্বীকারের প্রত্যুত্তরে আমরাও কঠিন দুঃখ ও ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হতে পারি।

"উপসংহারে শোকতপ্ত পরিবারদের নিকট আমাদের আন্তরিক বেদনা নিবেদন করি এবং সেই সঙ্গে এ কথাও জানাই যে, এই মর্ম্মভেদী দুর্যোগের একদা সম্পূর্ণ অবসান হলেও দেশবাসী সকলের ব্যথিত স্মৃতি দেহমুক্ত আত্মার বেদীমূলে পুণ্য শিখায় উজ্জ্বল দীপ্তি দান করবে।"

রবীন্দ্রনাথ যে প্রাণের বেদনার কথা অপূর্ব্ব ভাষায় ও ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন, প্রত্যেক বাঙ্গালীই তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছে। কেবল কলিকাতায় নহে, বাঙ্গালার সর্ব্বত্র পল্লী জনপদে এই লোমহর্ষণ নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ হইয়াছে। বাঙ্গালা সরকারের শীর্ষস্থানীয় চট্টগ্রামেও একবার পদার্পণ করিয়া নির্য্যাতিত হৃতসর্ব্বস্ব প্রজার দুঃখবিপদে সমবেদনা নিবেদন করেন নাই, হিজলীতেও তাহার প্রয়োজন অনুভব করেন নাই! ম্যাজিষ্ট্রেটকে দিয়া তদন্ত করার ব্যবস্থা প্রথমে হইয়াছিল, তাহাতে দেশবাসীর মর্ম্মবেদনার ক্ষত নিরাময় হইবে, এই আশায় কি? রাজবন্দীরা বে-সরকারী

নিরপেক্ষ তদন্তের দাবী করিয়াছিলেন, সেই তদন্ত হইতেছিল না বলিয়া অনশনব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ব্রতভঙ্গ করিবার জন্য দেশের নানা স্থান হইতে তাঁহাদের অনুরোধ করা হইয়াছিল! শেষে দেশবরেণ্য রবীন্দ্রনাথের প্রাণস্পর্শিণী ভাষা তাঁহাদিগকে সঙ্কল্পচ্যুত করিয়াছিল।

যাহা হউক, সরকার ইহার পর, কি কারণে জানি না, একটি তদন্ত-কমিটী নিয়োগ করিয়াছেন, তন্মধ্যে এক জন সদস্য হইবেন কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি। দেশবাসী এই মন্দের ভালকে গ্রহণ করিতে পারে, যদি এই কমিটীর সমক্ষে দেশের বিশ্বাসভাজন ব্যারিষ্টারদিগকে সাক্ষ্যসাবুদের জেরা করিতে দিতে সম্মত হন।

শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত

অমঙ্গলে মঙ্গল

বাঙ্গালার কংগ্রেস-বিরোধের এত দিনে অবসান হইল, ইহাতে বাঙ্গালীমাত্রেই আনন্দ লাভ করিয়াছে। বাঙ্গালার অন্যতম

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু

জন-নায়ক সুভাষচন্দ্র এই বিরোধের অবসান করিবার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের ও করপোরেশানের অলডারম্যান পদ ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি দেশপ্রেমিক, কর্ম্মকুশলী, সঙ্ঘগঠনে বিশেষ কৃতী। যতীন্দ্রমোহনও দেশপ্রেমিক কর্ম্মী। তাঁহারা উভয়ে এখন মিলিত শক্তি প্রয়োগ করিয়া বাঙ্গালার সেবায় আত্মনিয়োগ করুন, ইহাই কামনা। তাঁহাদের মধ্যে আন্তরিক মিলন এখন হইতে সম্ভবপর হউক, এমন আশা বাঙ্গালী অবশ্যই করিতে পারে।

শ্রীযুক্ত অ্যানে

চট্টগ্রাম ও হিজলীর পর এই অভাবনীয় মিলন সম্ভবপর হইয়াছে, এজন্য বলিতে ইচ্ছা হয়, বাঙ্গালার ভাগ্যবিধাতা অমঙ্গলেও মঙ্গলের সূচনা করিয়াছেন। মহারাষ্ট্রের বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুক্ত অ্যানে এই মিলনে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার আর এ দেশে থাকিবার প্রয়োজন নাই বলিয়া তিনি মহারাষ্ট্রে চলিয়া গিয়াছেন। যাত্রার পূর্ব্বে তিনি বাঙ্গালার কংগ্রেসের সাময়িক একটা বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন। আপাততঃ শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র সভাপতিরূপে অন্য ২৪ জন কংগ্রেসকর্ম্মীকে লইয়া কংগ্রেসের কার্য্য সম্পাদন করিবেন। তাহার পর আগামী জানুয়ারী বা ফেব্রুয়ারী মাসে

নূতন নির্ব্বাচন হইবে। আজ বাঙ্গালী জাতি সুভাষচন্দ্র, যতীন্দ্রমোহন ও অ্যানেকে এই মিলনের জন্ম অভিনন্দিত করিতেছে।

পরলোকে সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

কাল একে একে দেবী ভারতীর প্রতিভাভাজন বরপুত্রগণকে হরণ করিতেছে। রায়বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার সাধনোচিত-ধামে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথ রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকার অবকাশে কলালক্ষ্মীর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

কথা-সাহিত্যে তিনি এক অপূর্ব্ব ভঙ্গী সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনায় অনবদ্য মধুর হাস্যরস স্বতঃ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়া সাহিত্যরসামোদী পাঠকবর্গকে পরিতৃপ্তি প্রদান করিত। প্রসাদগুণ সুরেন্দ্রনাথের রচনায় প্রচুরপরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। সঙ্গীতকলায় এই সুপ্রসিদ্ধ কথা-সাহিত্যিকের অসাধারণ অধিকার ছিল। যাঁহারা তাঁহার কণ্ঠ-সঙ্গীত ও যন্ত্রালাপ শ্রবণ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে এই সঙ্গীত-সাধকের অপূর্ব্ব নৈপুণ্যসম্বন্ধে প্রশংসা করিবেন। সুরেন্দ্রনাথের অন্তর শিশুর মত সরল ও মধুর ঔদার্য্যে পূর্ণ ছিল। প্রকৃত রসপিপাসু শিল্পীর অন্তঃকরণ তাঁহার রাজকীয় পদমর্য্যাদাপ্রসূত গাম্ভীর্য্যের আবরণে মলিন হইয়া পড়ে নাই। তিনি নিজে যেমন রসের সন্ধান পাইলেই উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেন, তেমনই পরিচিত বা স্বল্প-পরিচিত বন্ধু-বান্ধবদিগের মধ্যেও উহা সানন্দে পরিবেষণ করিতে পারিতেন। কথা-সাহিত্য রচনায় তাঁহার ভাষার যে বিশিষ্ট ভঙ্গী ছিল, তাহা সাধারণ লেখকের পক্ষে অনুকরণ করা সহজসাধ্য ছিল না। নাম না দেখিয়াই, দুই এক ছত্র পড়িবামাত্র বুঝা যাইত, এ রচনার অধিকারী সুরেন্দ্রনাথ ব্যতীত অপর কেহ নহেন। বেহার সরকারের ইনকামট্যাক্স কমিশনারের দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সরকারী কাগজ-পত্রের স্তূপের অন্তরালে তিনি তাঁহার সৃষ্টি-নিপুণ প্রতিভাকে নির্ব্বাসিত করিবার অবকাশ দেন নাই। বাঙ্গালী শিক্ষিত সমাজ তাঁহার রচনায় পরিতৃপ্তি লাভ করিতেন। সরকারী কার্য্য হইতে অবসর-গ্রহণের পরও তিনি সাহিত্য ও সঙ্গীত-সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন। স্বাস্থ্য-সঞ্চয়ের জন্য তিনি মন্দার পাহাড়ের বিরামকুঞ্জে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিলেন। সাধ্বী সহধর্ম্মিণী-বিয়োগের পর তাঁহার পত্নীগতপ্রাণ অত্যন্ত আহত হইয়াছিল। সে আঘাতে তাঁহার দেহ ও মন ভাঙ্গিয়া পড়ে। তদবধি তাঁহার অতুলনীয় লেখনী হইতে নির্ম্মল হাস্য-রসধারা আর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে নাই। "সাহিত্য", "মাসিক বসুমতী", "বার্ষিক বসুমতী" প্রভৃতি সাময়িক পত্রে তাঁহার অনবদ্য রচনাসম্ভার প্রকাশিত হইয়াছিল। রসপিপাসু পাঠকগণ তাহা পুনঃ পুনঃ পাঠেও সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত হইতে পারেন না। দেবী ভারতী তাঁহার এক জন একনিষ্ঠ পূজারীকে হারাইলেন, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের রচনাসম্ভার বাঙ্গালার সাহিত্য-ভাণ্ডারে উজ্জ্বল মণিমালার ন্যায় দীপ্যমান থাকিবে। সদানন্দ, হাস্য-প্রফুল্ল আনন, গভীর হৃদয়, বন্ধুবৎসল, সৌম্যদর্শন বন্ধুরত্নের স্মৃতি দীর্ঘকাল আমাদের চিত্তকে তাঁহার বিয়োগ-ব্যথায় অবসন্ন করিয়া রাখিবে। বঙ্গ-সাহিত্য হইতে যে অনাহত, উচ্ছল হাস্যরসের উৎস সহসা রুদ্ধ হইয়া গেল, তাহা কোনও দিন বন্ধন-মুক্ত ধারায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে, সে আশা সুদূর-পরাহত। ভগবান তাঁহার আত্মার কল্যাণসাধন করুন, তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গ শোকে সান্ত্বনা লাভ করুন।

সঙ্কটে অস্বাভাবিক ব্যবস্থা

কেবল ভারতের বিদেশী বর্জ্জনের ফলে নহে, জগতের সাধারণ বাজারের অবস্থা মন্দা হওয়ার ফলে যে, সরকারের ব্যয়-সঙ্কোচ করা এবং প্রীতি ও সহযোগ নীতি অবলম্বন করা বহুদিন পূর্ব্বে উচিত ছিল, এ কথা দেশহিতকামিমাত্রেই বলিয়া আসিতেছেন। কিন্তু সরকার ধনৈশ্বর্য্যের এবং বাহুবলের মোহে এতই আচ্ছন্ন ছিলেন যে, সে কথায় কর্ণপাত করেন নাই, বরং ইজ্জৎ ও প্রভুত্ব হানি হইবে, কেবল এই আশঙ্কায় অনুক্ষণ উদ্বিগ্ন থাকিয়া সিভিলিয়ানী পরামর্শই বড় বলিয়া মনে করিয়া আসিয়াছেন। ফলে এখন দেশের আর্থিক অবস্থা এমনই সঙ্কটসঙ্কুল হইয়া পড়িয়াছে যে, বড়লাটের পর পর দুইখানি অর্ডিনান্স জারী করিয়া টাকার বাজারে নূতন ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে।

প্রথমে বিলাতে টাকার বাজারে গণ্ডগোল উঠে। সেখানেও যখন মন্ত্রিমণ্ডল আর 'হালে পানি' পাইলেন না', তখন তাঁহারা তাঁহাদের স্বর্ণমান সাময়িকভাবে মুলতুবি রাখিতে বাধ্য হইলেন। বিলাতের 'ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডের' সুনাম জগতে অতুলনীয় ছিল, কিন্তু এই ব্যাপারের সম্পর্কে যখন 'ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ড' দে-

টাকা দেওয়া সাময়িকভাবে বন্ধ রাখিলেন, তখন জগতের লোকের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। লোক তখন কত কি ভাবিয়াছিল, তাহা আর প্রকাশ করিয়া না বলাই ভাল!

কিন্তু ভারতের সহিত এই ব্যাপারের সম্পর্ক কি? ভারতের স্বর্ণমান নাই, ভারতের মান রূপেয়া বা রূপার টাকা। পূর্ব্বে স্বর্ণই ভারতের মান ছিল, মোগল আমলে মোহরের প্রচলন ছিল, এ কথা সকলেই জানেন। খুব সম্ভবতঃ কোম্পানীর আমলে (ইষ্ট ইণ্ডিয়া) ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ হইতে বৃটিশ শাসন-কর্তৃপক্ষ ভারত হইতে স্বর্ণকে একবারে নির্ব্বাসিত করেন। এই হেতু এযাবৎ প্রায় এক শতাব্দীকাল ভারতবর্ষকে বাট্টার (Exchange) দায়ে এবং রিভার্শ কাউন্সিল বিল বিক্রয়ের ফলে অসম্ভব পরিমাণ অর্থক্ষতি সহ্য করিতে হইয়াছে।

বিলাতে সোণার টান ধরিয়াছিল। গত দুই মাসে উহার বেগ এত অধিক হইয়াছিল যে, কোন দেশের পক্ষেই উহা যোগান দেওয়া সাধ্যাতীত ছিল। বিলাতের ভাণ্ডারে তাই স্বর্ণের অভাব ঘটিয়াছে। এ জন্য বিলাতের ব্যাঙ্ক হইতে স্বর্ণ দেওয়া বন্ধ করার প্রয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু সে জন্য ভারতে স্বর্ণের বিক্রয় বন্ধ করার কি প্রয়োজন হইয়াছিল? প্রয়োজন আর কিছুই নহে, কেবল ভারত বৃটেনের অধীন বলিয়া বৃটেনের সহিত ভারতের ভাগ্যসূত্র গ্রথিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে,—অবশ্য সে বিষয়ে ভারতের সম্মতি অসম্মতির কোন প্রয়োজনই হয় নাই। নতুবা ভারতের ভাণ্ডারে কারেন্সি রিজার্ভ ফাণ্ডে এবং গোল্ড ষ্ট্যাণ্ডার্ড রিজার্ভ ফাণ্ডে ভারতের এমন বহু মূল্যবান্ ধাতু আছে, যাহাতে ভারতের সোণায় টান ধরিতে পারে না। কিন্তু এক শতাব্দী যাবৎ ভারতের কারেন্সি ও এক্সচেঞ্জ-নীতি মূলতঃ বৃটেনের স্বার্থে সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছে বলিয়া বৃটেনের দুর্গতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতেরও দুর্গতি ঘটিল! ইহা কিন্তু ভারতের স্বেচ্ছাকৃত নহে। এ দেশের শাসন-কর্তৃত্ব ভারতের স্বহস্তগত থাকিলে ইহা সম্ভবপর হইত না।

ভারতের ভাগ্যবিধাতারা টাকার ব্যাপারেও ভারতের ভাগ্য বৃটেনের সহিত নিয়ন্ত্রণ করিয়া দিয়াছেন। ভারত-সচিব রূপেয়াকে স্বর্ণমুদ্রার (Sterling) ভিত্তির উপর সংরক্ষিত করিবার হুকুম দিলেন, ভারতের বড়লাট তিন দিন উপর্য্যুপরি ব্যাঙ্ক বন্ধ করিবার হুকুম সম্বন্ধে পরিষদের আলোচনার মুখ বন্ধ করিয়া অর্ডিনান্স জারী করিলেন। অর্ডিনান্স কেবল একখানি নহে, পর পর দুইখানি! তিন দিন ব্যাঙ্ক বন্ধ হইবার কথায় ভারত-বাসীরা অনর্থক ভয় পাইয়াছে, অথচ বিলাতের লোক ধীর-স্থির আছে,—অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রে এই ভাবের কটাক্ষপাত করা হইয়াছিল। কিন্তু বিলাতের আর্থিক অবস্থা বুঝিয়া সরকার যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছিল বলিয়াই করা হইয়াছে—এ কথা সরকার বৃটিশ জনসাধারণকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাহাতে সেখানে আতঙ্কের সৃষ্টি না হইতে পারে। কিন্তু এখানে? এখানে জনমতের কণ্ঠ-রোধ করিয়া অর্ডিনান্স সাহায্যে কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের মরজিমত ব্যবস্থা করিয়াছেন, প্রভেদ এইটুকু! পার্লামেন্টে যখন ঐ সম্বন্ধে বিল উপস্থাপিত হয়, তখন বিলাতের তিনটি রাজনীতিক দলই একযোগে উহা আইনে পরিণত করিয়াছিলেন। আর এখানে?

প্রথম অর্ডিনান্সের দ্বারা ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়। দ্বিতীয় অর্ডিনান্স উহার মাত্র ৪ দিন পরেই জারী হয়। ভারত সরকার উহার ক্ষমতাবলে বাট্টার কারবার (Exchange transactions) নিয়ন্ত্রিত করিবার ক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক যে সকল ব্যাঙ্ককে সুবর্ণ সরবরাহ করে, সেই সকল ব্যাঙ্ক যাহাতে সোণার ব্যাপারে ফাটকাবাজী খেলিবার সুবিধা না পায়, প্রধানতঃ সেই উদ্দেশ্যে এই অর্ডিনান্স জারী হইয়াছে, এই কথা বলা হইয়াছে। যাহাতে এখন হইতে প্রকৃত ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য এবং ন্যায়সঙ্গত গৃহকর্ম্মের জন্য সুবর্ণ ব্যবহৃত হয়, তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সুবর্ণ-মুদ্রা বিক্রীত হইবার ব্যবস্থা করা হইবে। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ককে এই অর্ডিনান্সের দ্বারা দূরবিসারী ক্ষমতা প্রদান করা হইল। এই ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং গভর্ণর অর্থাৎ বড়কর্ত্তা পরিচিত (recognised) ব্যাঙ্কসমূহের তালিকা হইতে যে কোনও ব্যাঙ্কের নাম কাটিয়া দিতে পারেন। এই অর্ডিনান্স অনুসারে যে সকল কর্ম্মচারী কার্য্য করিবেন, তাঁহাদিগের বিপক্ষে মামলা করা চলিবে না।

এ দেশ যে ভাবে বর্ত্তমানে শাসিত হইতেছে, তাহাতে অর্ডিনান্সের জোরে এমন সব ব্যবস্থা হওয়ায় বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। কিন্তু এ বিষয়ে এত মন্ত্রগুপ্তির কি কারণ ছিল? এ দেশের জনমতের সম্মান যে ভাবে রক্ষিত হয়, তাহাতে তাহার অন্তরালে সবই করা ত সম্ভব। তবে?

২৩শে সেপ্টেম্বর বুধবার একখানি সরকারী ঘোষণা প্রকাশিত হয়। ঐ ঘোষণায় সাধারণের আতঙ্ক দূর করিবার জন্য সরকার-পক্ষ হইতে নানা আশ্বাস দেওয়া হয়। নিগোসিয়েবল্ ইন্‌সট্রুমেণ্ট অ্যাক্টের ২৫ ধারা অনুসারে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ২২শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার তারিখ সারা ভারতে সাধারণ ছুটির দিন বলিয়া ধার্য্য হইবে, মাত্র এইটুকু ২১শে সেপ্টেম্বর সোমবার সরকারী ঘোষণা করা হয়। ২৩শে সেপ্টেম্বর বুধবার সরকারী ঘোষণায় আতঙ্ক দূর করিবার চেষ্টা না করিয়া ঐ ২১শে সেপ্টেম্বর সোমবার তাহা করা হইল না কেন? জনমতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার ইচ্ছা যদি থাকিত, তাহা হইলে সরকার কি ঐরূপ করিতেন? আতঙ্ক দূর করিবার উদ্দেশ্যে বুধবারে যে ঘোষণা করা হয়, উহাতে বলা হইয়াছে যে, "সরকার জানিতে পারিয়াছেন যে, তিন দিন ছুটার ব্যবস্থায় সাধারণের মধ্যে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে।" কেন, সোমবারে কি উহা জানিতে পারেন নাই? এই কি সরকারের দূরদর্শিতা ও রাজনীতিকতা?

রাজস্ব-সচিব সার জর্জ্জ সুষ্টার ২৪শে সেপ্টেম্বর ব্যবস্থা পরিষদে বক্তৃতায় বলেন, "আপনাদের প্রত্যেকে আমার প্রতি যে শিষ্টতা ও সৌজন্য প্রকাশ করিয়া গত তিন দিবস কোন সমালোচনা করেন নাই এবং সদিচ্ছার সহিত আমার বক্তব্য শ্রবণ করিয়াছেন, ইহার জন্য আমি আপনাদের প্রত্যেকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। কেবল যে আপনারা ব্যক্তিগতভাবে আমার প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা নহে, আপনারা কোন সমালোচনা বা প্রশ্ন না করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সরকার যে ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহাতে আপনারা সম্পূর্ণ বিশ্বাসস্থাপন করিয়াছেন।" চমৎকার! অর্ডিনান্সের দ্বারা পরিষদের মুখবন্ধ করিয়া তাহার পর পরিষদের সদস্যদের নীরবতার জন্য প্রশংসাবাদ

মুনা সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ রাজনীতিকের পক্ষেই সম্ভবপর হয়। জগতে এমন কথার চাতুরী আর কেহ দেখাইতে পারিয়াছে কি?" ইহাকে কি 'কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা' বলা যায় না? কিন্তু পরিষদের বাহিরে ত দেশপ্রেমিক রাজনীতিক ও সংবাদপত্রের মুখবন্ধ হয় নাই, বিলাতেও মহাত্মা গান্ধী বা শ্রীযুক্ত ঘনশ্যামদাস বিরলার মুখ বন্ধ হয় নাই, কাযেই রাজস্ব-সচিব সুকৌশলী সার জর্জ্জকে পরিষদের বাহিরে উচিত কথা অনেক শুনিতে হইতেছে। টাকার ব্যাপারে অন্যক্ষেত্রে সার কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর ও শ্রীযুক্ত সম্মুখম্ চেট্টি মহাশয় ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য হইয়াও কি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও বোধ হয় সার জর্জ্জ বিস্মৃত হন নাই।

সার জর্জ্জ দেশবাসীকে আশ্বাস দিয়া বলিয়াছেন, "আমাদের মজুত রূপেয়ার পরিমাণ ১ শত ২১ কোটি, নোটের পরিমাণ ১ শত ৪৮ কোটি; উহা ভারতের লোকসংখ্যার ৪ গুণ। যদি ৩ দিন ছুটির ঘোষণায় আতঙ্কিত হইয়া জনসাধারণ ব্যাঙ্ক হইতে তাহাদের জমার টাকা উঠাইয়া লইতে ব্যগ্র হয়, তাহা হইলে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অন্য ব্যাঙ্কসমূহকে সাহায্য করিবে এবং ভারত সরকার ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের পশ্চাতে থাকিবেন।" ইহা নিশ্চিতই আশা ও আশ্বাসের কথা। কিন্তু সার জর্জ্জ নূতন অর্ডিনান্স সমর্থন করিয়া যাহা বুলিয়াছেন, তাহা কিরূপে গ্রহণযোগ্য হইতে পারে? এই অর্ডিনান্সের দ্বারা বড়লাট ৪ দিন পূর্ব্বের অর্ডিনান্স প্রত্যাহার করিয়া সুবর্ণ বিক্রয়ের ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন। কিন্তু ষ্টার্লিংএর প্রতি বাধ্যবাধকতা এবং রিভার্ণ কাউন্সিলের চাহিদা রক্ষা করিতে সরকার কি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন বা করিবেন, তাহা সার জর্জ্জ সরকারের পক্ষ হইতে ভাঙ্গিয়া বলিতে চাহিতেছেন না কেন? শ্রীযুক্ত সম্মুখম্ চেট্টি ব্যবস্থা-পরিষদে এ সম্বন্ধে বার বার প্রশ্ন করিয়াও ঠিক উত্তর পাইতে ব্যর্থ-মনোরথ হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত চেট্টি বলেন, "৩০শে আগষ্ট তারিখে আমাদের ৩১ কোটি টাকার সুবর্ণ ব্যয়িত হইয়া গিয়াছে। আমি জানিতে চাই, ভারতে সুবর্ণের একটা মাত্রা সর্ব্বদা মজুত থাকিবে কি না?" সার জর্জ্জ উত্তর দেন, "আপনার প্রশ্নের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হইতেছে। নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সুবর্ণ যাহাতে মজুত থাকে, ভারত সরকার সে জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবেন।" এই কি পাকা কথা? শ্রীযুক্ত চেট্টি আবার জিজ্ঞাসা করেন, "ভারত হইতে সুবর্ণ যাহাতে রপ্তানী না হয়, সরকার সে বিষয়ে কোন নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিবেন কি?" সার জর্জ্জ অম্লান বদনে বলেন, "নির্দ্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে এইরূপ ব্যবস্থা করিবার উপায় নাই।" যেন দেবতার অমোঘ বিধান! নিয়ম ত মানুষের সুবিধার জন্য, তবে তাহার নড়চড় হইবে না কেন? আসল কথা, ভারতীয় বণিক-সমিতির সরকারের সকাশে তারে প্রকাশ পাইয়াছে। তারটি এই:—"ভারতের সংরক্ষিত (রিজার্ভ) সুবর্ণভাণ্ডার আর যেন ক্ষয় না হয়। আমাদের আশঙ্কা এই যে, কয়েকটি অনুগৃহীত ব্যাঙ্ক সুবর্ণের রিজার্ভ ভাণ্ডার শোষণ করিয়া ফেলিবে।" ইহারাই কি নির্দ্দিষ্ট নিয়মের রদ-বদলে বাধা দিতেছে? এই সকল ব্যাপার দেখিয়াই সরকারের আশ্বাসবাণী সত্ত্বেও জনসাধারণের সন্দেহ ঘুচিতেছে না।

বোঝার উপর বোঝা

অর্ডিনান্সের পর অর্ডিনান্স—ভারতবাসীর আতঙ্কের অবসান হইতে না হইতে আবার উহার পর অর্থসচিব সার জর্জ্জ সুষ্টার গত ২৯শে সেপ্টেম্বর ব্যবস্থা-পরিষদে গুরুকরভারগ্রস্ত ভারতবাসীর ভগ্নপ্রায় পৃষ্ঠের উপর নূতন কর এবং করের উপর কর চাপাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সেই বিরাট কর ধার্য্য করার বিশদ বিবরণ প্রদান করিতে হইলে মহাভারত প্রণয়ন করিতে হয়, এই হেতু সময় ও স্থান অভাবে সংক্ষেপে তাহার মূল কথাগুলি উল্লেখ করিতেছি। ১লা অক্টোবর হইতে ভারতের সর্ব্ববিধ করের উপর শতকরা ২৫৲ টাকা অতিরিক্ত কররূপে ধার্য্য হইবে। ভারতের আভ্যন্তরীণ ডাকমাশুল শতকরা ৫০ টাকা হারে বৃদ্ধি পাইবে। ভারতের রাজস্ব স্থিতিশীল ও সামঞ্জস্যশীল করিবার উদ্দেশ্যে নূতন রাজস্ব বিলের এইগুলিই প্রধান সর্ত্ত।

তাহার পর বর্ত্তমান 'রাজস্ব বৎসরে' (অর্থাৎ আগামী মার্চ্চ মাসের মধ্যে) আয়করের উপর শতকরা সাড়ে ১২ টাকা অধিক কর ধার্য্য করা হইবে, আর আগামী 'রাজস্ব বৎসরে' অর্থাৎ মার্চ্চ মাসের পর হইতে সমগ্র বর্দ্ধিত কর ধার্য্য করা হইবে। পরন্তু ১ হাজার হইতে ২ হাজার টাকা বার্ষিক আয়ের উপরও কর ধার্য্য হইবে (টাকা প্রতি ২ পাই)।

তুলার উপর অর্দ্ধ আনার আমদানী শুল্ক ধার্য্য হইবে। যে সকল কলকব্জা ও রংএর উপরে শুল্ক ধার্য্য করা হয় নাই, সেগুলির উপরেও শতকরা ১০ টাকা হারে শুল্ক ধার্য্য হইবে। লাল চিনির উপরে যে শতকরা ৬ টাকা ১২ আনা শুল্ক ধার্য্য আছে, তাহার স্থানে ৯ টাকা ১ আনা পর্য্যন্ত অধিক শুল্ক ধার্য্য হইবে। এইরূপে নকল রেশম ও রেশম-নির্ম্মিত বস্ত্রাদি, জুতা, কর্পূর, ইলেকট্রিক বাল্ব প্রভৃতির উপরে অধিক শুল্ক ধার্য্য হইবে। নরওয়ে ও অষ্ট্রিয়া হইতে যে কাগজ এদেশের রোটারী মেশিনে মুদ্রণযোগ্য রিলের আকারে আমদানী হয়, তাহার উপর অধিক শুল্ক ধার্য্য হইবে। পোষ্ট-কার্ড ও খামের মূল্য ২ পয়সা ও ১ আনার স্থলে ৩ পয়সা ও ৬ পয়সা বর্দ্ধিত করা হইবে।

একেই বর্ত্তমানে শিল্প-বাণিজ্যের বাজার প্রায় শয্যাশায়ী হইয়াছে, তাহার উপরে সুবর্ণ-বিক্রয়সম্বন্ধে কড়াকড়ি এবং এই ভাবের করের উপরে করবৃদ্ধি হইলে ভারতের অবস্থা কি হইবে, তাহা কি সরকার ভাবিয়া দেখিয়াছেন? দুই একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। ডাকমাশুল বৃদ্ধি করিলে কি ডাকবিভাগের আয় বাড়িবে? গতবার বৃদ্ধির ফলে কি হইয়াছিল? উহাতে ত আয় হ্রাসই হইয়াছিল। তাহার উপরেও বৃদ্ধি,—এখন কি আর লোক সহজে পত্র লিখিবে? ব্যবসায়ে পত্র-বিনিময় প্রধান সম্বল। সুতরাং ডাকমাশুল বৃদ্ধির ফলে ব্যবসায়ীদের কি ক্ষতি হইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

রোটারী প্রেসে যে সকল সংবাদপত্র মুদ্রিত হয়, সে সকলের ত প্রচার একবারে বন্ধই হইয়া যাইবে। কেবল যে কাগজের শুল্কবৃদ্ধির ফলে কাগজের মূল্যবৃদ্ধি হইবে, তাহা নহে, তাহার উপর এজেন্টের কমিশন, ডাকমাশুল, রেল ভাড়া, কত কি আছে। সুতরাং সংবাদপত্র হইতে যে আয় হয়, ডাক-বিভাগের সেই আয়ই কি আর থাকিবে? ব্যবসায়-বাণিজ্য বিজ্ঞাপনের

বাঁচিয়া থাকে; কিন্তু বিজ্ঞাপনের বাহনের সর্ব্বনাশ ব্যবসায়ের যে ধুক্ ধুক্ শ্বাস এখনও পড়িতেছে, তাহাও কত দিন থাকিবে?

চিনির দর, ইলেক্‌ট্রিক বাল্‌বের দর, তুলার দর,—এমন বিস্তর জিনিষের দরই বাড়িয়া যাইবে। উহার ফল কি হইবে? তুলার কথাই ধরা যাউক। আমদানী তুলা না হইলে এ দেশের তুলায় এ দেশের বস্ত্রের চাহিদা মিটান সম্ভবপর হয় না। সুতরাং তুলার শুল্ক বাড়িলে তুলার মূল্য বাড়িবে, তখন বস্ত্রের মূল্যও বাড়িবে না কি? দেশের দরিদ্রের পক্ষে উহা কিরূপ হইবে?

ব্যবসায়ের বাজারের সাহায্য গ্রহণের যেটুকু আশঙ্কা বাকী ছিল, এই করবৃদ্ধির ব্যবস্থায় তাহা কি পূর্ণ হইয়া উঠিল না? সরকার কি আয়-হ্রাসের সামঞ্জস্যবিধানের জন্য অন্যায়রূপ করবৃদ্ধি ব্যতীত অন্য উপায় অবলম্বন করিতে পারিতেন না? শাসনযন্ত্রের অসম্ভব ব্যয় নানারূপে কি কমান যায় না? সরকারী কর্ম্মচারীদের বেতন-হ্রাসের ব্যবস্থা হইতেছে বটে, কিন্তু উহা ত সমুদ্রে শিশিরবিন্দু তুল্য! কেন, পুলিস ও সমর বিভাগের জঠর সঙ্কুচিত করা যায় না? শাসিতের প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাস দূর করিতে পারিলে ইহা ত সহজেই সম্ভব হয়। যখন গোলটেবিল বৈঠক বসাইয়া, কংগ্রেসের প্রতিনিধি মহাত্মা গান্ধীকে বৈঠকে আমন্ত্রণ করিয়া ভারতকে স্বায়ত্তশাসন দিবার ক্রিয়াকাণ্ড চলিতেছে, তখন এখন হইতেই বিশ্বাসস্থাপন করিলে ক্ষতি কি হয়?

প্রেস অ্যাক্ট

ব্যবস্থা-পরিষদে প্রেস অর্ডিনান্সের অনুরূপ এক প্রেস আইন বিধিবদ্ধ করিবার জন্য সরকার পক্ষ চেষ্টা করিতেছেন, সম্ভবতঃ উহা বিধিবদ্ধ হইয়া গেল। সরকার পক্ষ আইনের যে পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা দেশের লোককে আলোচনা করিবার অবসর না দিয়াই তাড়াতাড়ি সিলেক্ট কমিটীতে দিয়াছিলেন। ব্যবস্থা-পরিষদে এ জন্য বে-সরকারী সদস্যদের পক্ষ হইতে ঘোর আপত্তি উঠিয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমান ব্যবস্থা-পরিষদ যে ভাবে গঠিত, তাহাতে য়ুরোপীয় ও মুসলমান সদস্যদের ভোটাধিক্যে আপত্তি টিকে নাই। য়ুরোপীয়রাই প্রকৃতপক্ষে এই বিল প্রণয়নে সরকারকে পরামর্শ দিয়াছেন, উত্তেজিত করিয়াছেন। য়ুরোপীয় বণিক সমিতি ও তাঁহাদের বাহন 'ষ্টেটশম্যান' প্রমুখ অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্র ক্রমাগত চীৎকার করিয়াছেন যে, জাতীয়তাবাদী দেশীয় সংবাদপত্র-সমূহ কংগ্রেসের মত হিংসার প্রশ্রয় দিয়াছেন এবং হিংসাবাদী রাজনৈতিক হত্যাকারীদিগকে প্রশংসা করিয়া হত্যা বা হত্যা-চেষ্টা সমর্থন করিয়াছেন! এই মিথ্যা প্রচারের ফলেই যে এই আইন সৃষ্টি করিবার কল্পনা হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যদি দেশীয় সংবাদপত্র-সমূহ এই অপরাধে অপরাধী হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদের বিপক্ষে সাধারণ আইন অনুসারে ত আদালতে বিচার করা চলে। ব্যবস্থা-পরিষদে সরকার ৩ খানা বিবৃতিপত্র পেশ করিয়াছিলেন, তাহা সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য দেওয়া হয় নাই। উহার একখানিতে বহু দেশীয় পত্রের অপরাধজনক রচনা উদ্ধৃত ছিল। যদি ঐগুলি অপরাধ হইয়া থাকে, তবে ঐগুলির নামে অভিযোগ আনিলেই ত হইত। তবে তাহা না করিয়া নূতন আইনের সৃষ্টি করিয়া সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিবার আয়োজন করা হইল কেন? এক শ্রেণীর অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্র ক্রমাগত কংগ্রেস ও জাতীয়তাবাদী ভারতীয়দিগকে আক্রমণ করিয়া জাতি-বিদ্বেষের সৃষ্টি করিতেছে। তাহারা এক সময়ে সরকারকে অকর্ম্মণ্য ও উদাসীন বলিয়া গালি পাড়িয়া স্বহস্তে আইন গ্রহণ করিয়া দেশবাসীকে শাস্তি দিবে বলিয়া শাসাইয়াছিল। তাহারই ফলে যে চট্টগ্রাম ও হিজলীর ব্যাপারের সৃষ্টি হয় নাই, তাহাই বা কে বলিতে পারে? অথচ এই শ্রেণীর এক পত্রের সম্পাদক ব্যবস্থা-পরিষদে নেকা সাজিয়া বলিয়াছিলেন, "কৈ, কবে আমার কাগজে এমন কথা প্রকাশিত হইল?" ইহাদের বিপক্ষে আইন করা হইল না, আইন করা হইল জাতীয়তাবাদী দেশীয় সংবাদপত্রের বিপক্ষে! চমৎকার!

যাহা হউক, সিলেক্ট কমিটীতে বিল দিবার পর তাঁহারা কয়েকটি সংশোধনের পরামর্শ দিয়াছিলেন। পরামর্শে আইনের বাঁধন কিছু শিথিল করিবার কথা আছে। ইহাতে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্র ও সমিতিসমূহ, 'গেল রাজ্য', বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সংশোধন হউক বা না হউক, তাহা লইয়া ত কথা নহে, কথা হইতেছে মূলনীতি লইয়া। মহাত্মা গান্ধী বিলাতে থাকিয়া এই আইনের সংবাদ পাইয়া ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। দেশীয় সংবাদপত্র-দলনে বৃটিশ প্রতিশ্রুতির মূলনীতি ভঙ্গ হইতেছে বলিয়া দেশবাসীর বিশ্বাস। সরকার এই মূলনীতির অন্তর্জ্জলি করিবার পূর্ব্বে এ কথাটাও ভাবিয়াও দেখিলেন না।

৩রা অক্টোবর শিমলা হইতে সংবাদ আসিল, ব্যবস্থা-পরিষদে প্রেসবিল বিধিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ইহা যে বিধিবদ্ধ হইবে, তাহা জানাই ছিল, কেন না, কোন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রের লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা খবর দিয়াছিলেন যে, বিলাতের মন্ত্রিমণ্ডল এই বিল বিধিবদ্ধ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। রাজনৈতিক হত্যা বা হত্যাচেষ্টার প্রশংসাবাদ ভারতীয় পত্রে প্রকাশিত হয়, এইরূপ সংবাদ তাঁহাদিগকে বুঝান হইয়াছিল, তাই উহা বন্ধ করিবার জন্য তাঁহাদের এই আগ্রহ। সম্ভবতঃ লর্ড রেডিং নূতন ভারতসচিব সার স্যামুয়েল হোরকে এ বিষয়ে সমর্থন করিয়াছিলেন। সকলেই জানেন, সার স্যামুয়েল হোর ভারতসচিবের পদে বসিয়াই বলিয়াছিলেন যে, তিনি সর্ব্বতোভাবে ভারতের সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে সমর্থন ও সাহায্য করিবেন। কাযেই এই ভাবের আইন বিধিবদ্ধ করাই পূর্ব্বে সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। এই সাংবাদিক আরও বলিয়াছিলেন যে, "এমনও স্থির হইয়াছে যে, যদি প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে বড়লাট তাঁহার 'সার্টিফিকেট' ক্ষমতা-বলে প্রেসবিল পাশ করিয়া লইবেন।" সুতরাং অস্ত্র ত শান দেওয়া হইতেছিলই, এখন না হয়, পরিষদে পাশ হওয়ার ঠাটটা বজায় রাখা হইল। পরিষদে বিলের বিপক্ষে ২৪ ভোট ও পক্ষে ৫৫ ভোট হইয়াছিল। পরিষদ এখন যে ভাবে গঠিত, তাহাতে এই ২৪ ভোটই বা বিপক্ষে হইল

কেন, বুঝা যায় না। অনেক সদস্য ত বিলাতে, তাহার উপরে অনেকে এখানে থাকিয়াও সভায় যায় নাই। তবে আর কি ?

ভারতের লোকসংখ্যা

গত ১৯শে সেপ্টেম্বরের 'ইণ্ডিয়া গেজেটে' ভারতের গত আদমসুমারীর সংশোধিত হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে। এই হিসাবের সমস্তটাই যে অভ্রান্ত, এমন কথা আমরা বলিতেছি না। কেন না, গণনা যে ভাবে হইয়া থাকে, বিশেষতঃ এইবার যে ভাবে হইয়াছে, তাহাতে উহা ভ্রমপ্রমাদশূন্য হইয়াছে, বলা যায় না। তথাপি মোটামুটি এই গণনা ভবিষ্যতে উল্লেখের জন্য প্রয়োজন হইতে পারে, এই হিসাবে আমরা ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিতেছি।

ভারতের মোট লোকসংখ্যা ৩৫ কোটি ২৯ লক্ষ ৮৬ হাজার ৮ শত ৭৬ জন; তন্মধ্যে ১৮ কোটি ১৯ লক্ষ ২১ হাজার ৯ শত ১৪ জন পুরুষ এবং ১৭ কোটি ১০ লক্ষ ৬৪ হাজার ৯ শত ৬ জন নারী। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের লোকসংখ্যা অপেক্ষা বর্ত্তমানে শতকরা ১০·৬ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।

ভারতের হিন্দুর সংখ্যা মোট ২৩ কোটি ৮৩ লক্ষ ৩০ হাজার ৯ শত ১২ জন। মুসলমানের সংখ্যা ৭ কোটি ৭৭ লক্ষ ৪ হাজার ৯ শত ২৮ জন। শিখের সংখ্যা ৪৩ লক্ষ ৬ হাজার ২ জন। খৃষ্টানের সংখ্যা ৫৯ লক্ষ ৬১ হাজার ৭ শত ৯৪ জন।

প্রত্যেক প্রদেশের হিসাব :—

		মোট	হিন্দু	শিখ	জৈন	মুসলমান	খৃষ্টান
১।	আজমীর-মারওয়ার	৫৬০৪২৯	৪৩৪৫০৯	৩৪১	১৯৪৯৭	৯৭১৩৩	৬৯৪[illegible]
২	বাঙ্গালা	৫০১২২৫৫০	২১৫৩৭৯২১			২৭৫৩০৩২১	১৮০৫২[illegible]
৩	বিহার ও উড়িষ্যা	৩৭৬৭৬৫৭৬	৩১০১০৬৬০			৪২৬৪৭৭৬	৩৪১৭১[illegible]
৪।	বোম্বাই	২১৮৫৪৮৪১	১৬৬১৯৮৮৬	২০৭২৩	১৯৯৯৭৯	৪৪৫৭১৩৩	৩১৭০৪[illegible]
৫।	মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	১৫৫০৭৭২৩	১৩৪৬০১০৫			৬৮২৮৫৪	৫০৫৮[illegible]
৬।	কুর্গ	১৬৩৩২৭	১৪৬০০৭			১৩৭৭৭	৩৪৩[illegible]
৭।	দিল্লী	৬৩৬২৪৬	৩৯৯৮৬৩	৬৩৭৭৫	৩৪৫	২০৬৯৬০	১৬৯৮[illegible]
৮।	মাদ্রাজ	৪৬৫৭৫৬৭০	৪০৩৯২৯০০			৩৩১৬০৮২	১৭৭০৩২[illegible]
৯।	সীমান্ত	২৪২৫০৭৬	১৪২৯৭৭	৪২৫১০		২২২৭৩০৩	১২২১[illegible]
১০।	পঞ্জাব	২৮৫৮০৮৫২	৬৩২৮৫৮৮	৩০৬৪১৪৪	৩৫২৮৪	১৩৩৩২৪৬০	৪১৪৭৮[illegible]
১১।	যুক্তপ্রদেশ	৪৮৪০৮৭৬৩	৪০৯০৫৫২৩		৬৭৯৫৪	৭১৮১৯২৭	২০৫০[illegible]

ভারতবর্ষের মধ্যে ব্রহ্মদেশকেও ধরা হইয়াছে ; তাহার হিসাব :—

	মোট	বৌদ্ধ	হিন্দু	জৈন	মুসলমান
ব্রহ্মদেশ	১৪৬৪৫৯৬৯	?	৫৭৪৬৯৭	৭৭৮৯৫	৬০৬৮৪[illegible]

বৃটিশ ভারতের মোট লোকসংখ্যা ২৭ কোটি ১২ লক্ষ ৭৩ হাজার ১ শত ৭ জন। তন্মধ্যে হিন্দু ১৭ কোটি ৬৯ লক্ষ ৩৪ হাজার ৪ শত ৩৫ জন, মুসলমান ৬ কোটি ৭০ লক্ষ ৮৫ হাজার ৫ শত ১০ জন, শিখ ৩১ লক্ষ ৯২ হাজার ১ শত ৬৯ জন, খৃষ্টান ৩৫ লক্ষ ৩১ হাজার ৭ শত ৩ জন।

ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধের সংখ্যা কত, তাহার উল্লেখ নাই। তবে মোট সংখ্যা হইতে হিন্দু, জৈন ও মুসলমান বাদ দিলে অবশিষ্ট যাহা থাকে, তাহাই বোধ হয় বৌদ্ধদের সংখ্যা হইবে।

ইহা ছাড়া বঙ্গদেশে ৩ লক্ষ ১৫ হাজার ৮ শত ১ জন বৌদ্ধ আছে। বোম্বাই বিভাগে ১ হাজার ৮ শত ৯০ জন বৌদ্ধ, ৮৯ হাজার ৫ শত ৪৩ জন পার্শী ও ১৭ হাজার ৪ শত ৩৩ জন ইহুদী এবং পঞ্জাবে ৫ হাজার ৭ শত ২৩ জন বৌদ্ধ আছে। কিন্তু বাঙ্গালায় জৈন, ইহুদী বা শিখের সংখ্যা কত আছে, তাহা সংক্ষিপ্ত হিসাবে দেওয়া হয় নাই। ইহার কারণ কি ? ভারতে লোকগণনা যে ভাবে হইয়া থাকে, উহার পরিবর্ত্তন না হইলে গণনা নির্ভুল হইবার নহে।

সম্পাদক—শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী-রোটারী-মেসিনে' শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।